الموسوعة الاسلامية

باللغة البنغالية

ইসলামী বিশ্বকোষ

[১২শ খণ্ড]

ডনমি-তূলূনী বংশ

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

ইসলামী বিশ্বকোষ

[১২শ খণ্ড]

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯০
পুনর্মুদ্রণ
মাঘ ১৪২০
রবিউল আউয়াল ১৪৩৫
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

ই.বি. প্র. ১৭/১
ইফাবা প্রকাশনা ১৭৯৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ২৯৭.০৩
বিষয় ঃ ইসলাম-বিশ্বকোষ ও অভিধান

প্রকাশক
ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মূল্য : ৫৯০.০০ (পাঁচশত নব্বই) টাকা মাত্র

ISLAMI BISWAKOSH : The Encyclopaedia of Islam in Bengali, Volume12. complied and edited by the Board of Editors and published by Md. Dr. Muhammad Abdus Salam on behalf of the Islamic Foundation under the Department of Islamic Encyclopaedia. February 2014

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : wwwislamicfoundation-org bd.

Price : Tk 590.00
U.S.$: 30.00

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী	সভাপতি
ডঃ সিরাজুল হক	সদস্য
জনাব আহমদ হোসাইন	"
ডঃ মোহাম্মদ এছহাক	"
ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী	"
জনাব এম. আকবর আলী	"
ডঃ ছৈয়দ লুৎফুল হক	"
জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান	"
অধ্যাপক শাহেদ আলী	"
অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন	"
ডঃ কে. টি. হোসাইন	"
ডঃ এ. এস. এম. শরফুদ্দীন	"
জনাব কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ	"
ডঃ শমশের আলী	"
জনাব ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	"
জনাব আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	সদস্য সচিব

আমাদের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের অসীম রহমতে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর দ্বাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ) প্রকাশিত হইয়াছে। ইতোপূর্বে ২৬ খণ্ডে (২৮ ভলিউম) প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর দ্বাদশ খণ্ডটির মজুদ শেষ হইয়া যাওয়ায় ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে পুনর্মুদ্রণ করিয়া পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপন করিতে পারায় আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। সেই সাথে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাইয়্যিদুল মুরসালীন ওয়া খাতামুন্নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর লাখো কোটি দরূদ ও সালাম পেশ করিতেছি।

বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বকোষের সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে। বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ের ব্যাপক জ্ঞানভাণ্ডার জ্ঞান-পিপাসু পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিশ্বকোষের ভূমিকা অনন্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখা-প্রশাখা বিশ্বকোষের আওতাভুক্ত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানের পরিধি ক্রমাগত প্রসারিত হইতেছে। ফলে বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির যে প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, বিশ্বকোষের ক্ষেত্রেও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার ফলে আজ আমরা ইসলামী বিশ্বকোষের মত বিষয়ভিত্তিক গবেষণালব্ধ মূল্যবান গ্রন্থ রচনার প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। ইসলামের বিশাল জ্ঞান-সমুদ্রকে ইসলামী বিশ্বকোষের ক্ষুদ্র পরিসরে প্রকাশ করিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন অব্যাহত প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে।

ইসলামী জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত গবেষক, লেখক, সাংবাদিক, আইনজ্ঞ ও শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী বিশ্বকোষের গুরুত্ব বহু গুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংরেজি, উর্দু, আরবী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইলেও কোটি কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষের অভাব অত্যন্ত প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হইতেছিল। বাংলাভাষী গণমানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানের খোরাক আঞ্জাম দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারী দ্বীনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন 'ইসলামী বিশ্বকোষ' প্রকল্প গ্রহণ করে। বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে বহু তথ্যের সমাহার ঘটাইয়া নির্ভরযোগ্য তথ্যের উৎস হিসাবে ইসলামী বিশ্বকোষ এক অনন্য অবদান রাখিয়া চলিয়াছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২ খণ্ডে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ এবং ২৬ খণ্ডে (২৮ ভলিউম) বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছে, যাহা বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ প্রকাশনা হিসাবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পাঠক মহলে ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ) প্রকাশিত হইল।

প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর কোন কোন খণ্ডে বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইতেছে। পরবর্তীকালে বিশ্বকোষ-এর খণ্ডসমূহ পর্যালোচনা ও পরিমার্জনের পরিকল্পনা রহিয়াছে।

সম্পাদকমণ্ডলীসহ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের কাজে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইতেছি আন্তরিক মুবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা। একই সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের রূহের মাগফিরাত কামনা করিতেছি। সর্বশেষে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য আকুল ফরিয়াদ জানাইতেছি। আমীন !

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক

প্রকাশকের আরয

বিশ্বকোষ হইল বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানের একত্র সমাবেশ অর্থাৎ জ্ঞানভাণ্ডার। সেই অর্থে ইসলামী বিশ্বকোষ ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার। ইসলামের বিভিন্ন দিক, উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, খ্যাতনামা মুসলিম মনীষীগণের জীবনীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবন্ধ-নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে বিশ্বকোষে। প্রথমত ২০ খণ্ডে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের কথা থাকিলেও শেষ পর্যন্ত ২৬ খণ্ডে (২৮ ভলিউম) উহা সমাপ্ত হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশে বিশ্বকোষের ভূমিকা অসাধারণ। ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার হিসাবে ইসলামী বিশ্বকোষ যেন একটি অসাধারণ উৎস হয় সেইদিকটিও খেয়াল রাখা হইয়াছে। বাংলা ভাষায় ইসলামের ব্যাপক বিষয় ও তথ্য সম্বলিত ২৬ খণ্ডে (২৮ ভলিউম) বিশালাকায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়া নিঃসন্দেহে একটি বিরল ঘটনা। ইহা বাংলাদেশের জন্যে একটি গৌরবের বিষয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথমে ২ (দুই) খণ্ড সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইবার পর পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে বৃহত্তর পরিসরে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর প্রকাশনার কাজ হাতে নেওয়া হয়। আলহামদু-লিল্লাহ্ ! সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষের মতই ইসলামী বিশ্বকোষও ব্যাপকভাবে সকল মহলে নন্দিত হয়। স্বল্প সময়ের মধ্যে কয়েকটি খণ্ডের মওজুদ নিঃশেষ হইয়া যায়।

পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বাদশ খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করিলাম। এই কারণে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করিতেছি। ঐ সকল ব্যক্তিদেরও শুকরিয়া আদায় করিতেছি যাহারা এই খণ্ডটি প্রকাশে সহযোগিতা করিয়াছেন।

আগামীতে ইসলামী বিশ্বকোষ আরো সুন্দর ও পরিমার্জিত করিয়া প্রকাশ করা হইবে। ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নে বিভিন্ন সময় জড়িত থাকিয়া যাহারা আমাদেরকে যথাযথ সহযোগিতা করিয়াছেন আমরা তাঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাই। সবশেষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবার-পরিজনের রূহের মাগফিরাত কামনা করি।

ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম
পরিচালক

ইসলামী বিশ্বকোষ

বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

১। বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি; ২। বর্ণানুক্রম; ৩। পাঠ সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ; ৪। নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা; ৫। বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি

'আরবী, ফারসী ও ইংরাজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

ا = আ a	ج = জ dj, j	ز = য z	ع = '	م = ম m
ا = ই i	چ = চ c	ژ = ঝ zh	غ = গ gh	ن = দ n
ا = উ u	ح = হ h	س = স s	ف = ফ f	ه = হ h
ب = ব b	خ = খ kh	ش = শ sh	ق = ক k.q	و = ও w
پ = প p	د = দ d	ص = স s	ك = ক k	ى = য় y
ت = ত r	ڈ = ড d	ض = দ/য d	گ = গ g	ے = ে ay
ث = ছ th	ذ = য dh	ط = ত t	ل = ল l	ء = '
	ر = র r	ظ = জ z		
	ڑ = ড় r			

'আরবী স্বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর (ً) আ , ا = احد = আহ্‌াদ, بشر = বাশার,

যবর + আলিফ = ا حلال = হ্‌ালাল,

যবর + و = াও, يوم = য়াওম, قوم = ক্‌াওম,

যবর + ى = ায়, ليل = লায়ল, شيدا = শায়দা,

যের (ٍ) = ই / ি ابل = ইবিল,

যের + ى = ঈ / ী عيسى = ঈসা, نسيم = নাসীম,

যের (ফারসী শব্দ) = এ / ে پيش = পেশ,

পেশ (ٌ) উ / ু احد = উহ্‌দ, كتب = কুতুব, উল্টা পেশ ( ) = له = লাহূ

পেশ + و = ঊ / ূ قعود = কু'ঊদ, موسى = মূসা,

যবর ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যা بيّن = বায়্যানা, যের ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যি سيّد = সায়্যিদ, পেশ ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যু حيّ = হ্‌ায়্যু, যবর ও তাশ্‌দীদযুক্ত و = ওওয়া, صوّر = স্‌াওওয়ারা, যের ও তাশ্‌দীদযুক্ত وّ = ব্বি مصوّر = মুসাব্বির / মুসাব্বির পেশ ও তাশ্‌দীদযুক্ত و = ওউ تصوف = তাসাওউফ, যবরের পর أ = সাকিন رأس = রা'স, যেরের পর أ সাকিন بئس = বি'সা, পেশের পর أ সাকিন مؤمن মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া ولى = ওয়ালী, যেরযুক্ত و = বি وتر = বি'ত্‌র, পেশযুক্ত و = উ وضوء = উদ্‌ (উযূ'-);

খাড়া যবর = ا قتل = ক্‌াতালা, اوى = আওয়া,

খাড়া যের = ী, ربه = রব্বিহী, يحيى = য়ুহ্‌য়ী,

অন্তে অনুচ্চারিত ة = ঃ (বিসর্গ) ঃ جنة = জান্নাঃ, জান্নাঃ, عائشة = 'আ'ইশাঃ,

শেষ বর্ণ ه সাকিন = হ্‌ الله = আল্লাহ্‌ نامه = নামাহ।

ع = و এবং ى = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

ع = 'আ	عبد = 'আব্‌দ	وِ = বি	وتر = বি'ত্‌র
ع = 'ই	علم = 'ইলম	و = ু	وحى = 'ওয়াহ্‌'য়ি
ع = 'উ	عثمان = 'উছ'মান	وُ = উ	وضؤ = উদ্‌'(উয়ূ')
عا = 'আ	عابد = 'আবিদ	الف + و = ওয়া	واجب = ওয়াজিব
عى = 'ঈ	عيد = 'ঈদ	عْ + وُ = ওয়া'	وعظ = ওয়া'জ'
عو = 'উ	عود = 'উদ		
وَ = ওয়া	ولد = ওয়ালাদ	ى + و = ওয়ায়	ويل = ওয়ায়ল

يَ = য়া يهود = য়াহূদ وُ + و = য়ূ يوسف = য়ূসুফ يْ + يَ = য়ায় يِيئَسَ = য়ায়'আস্‌

a এ = া, আ I = ি ঈ U = ু = উ

অনুলিখনের বেলায় যেসব ব্যতিক্রম মানিয়া লওয়া হইয়াছে

ব্যতিক্রম

(১) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখিয়াছেন দেখা যায়, তাহার নামের সেই বানান রক্ষিত হইয়াছে।

(২) যে সকল 'আরবী, শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যথা ঃ

আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্‌তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযু / উযু, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির / কাফের, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, গযব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ, তসবীহ, তারিখ, তারিফ, দওলত (দৌলত), দফতর / দপ্তর, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্‌যিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা / মোকাবিলা, মুতাবিক / মোতাবেক, মুনাফিক, মৌলবী, রওযা, রমযান, রহমত, যাকাত, শহীদ, সালাম, সিজদা, সুন্নত, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই সকল শব্দ 'আরবী, ভাষার বাক্যাংশ কিম্বা উদ্ধৃতি অথবা ঐ সকল ভাষার গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম হইলে সেইগুলি প্রতিবর্ণায়িত হইবে।

বর্ণানুক্রম

নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে নিবন্ধাদি বিন্যস্ত হইয়াছে ঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

পাঠ-সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ

অনু. ..... অনুবাদ, অনূদিত
'আ ..... 'আরবী
আনু. ..... আনুমানিক
আবি. ..... আবির্ভাব
('আ) ..... 'আলায়হিস্‌-সালাম
ই. ..... ইত্যাদি
ইং. ..... ইংরাজী
ঐ. ..... ib. ibid, و هى كتاب
খৃ. খ্রী. ..... খৃস্টাব্দ, খ্রীস্টাব্দে, ع
খৃ. পূ. ..... খৃস্টপূর্ব

জ. ..... জন্ম
ড. ডঃ. ..... ডক্টর (পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি)
ডা. ডাঃ. ..... ডাক্তার (চিকিৎসক)
তা. বি. ..... তারিখবিহীন n.d.
তু. ..... তুলনীয় cf. قب
দ্র. ..... দ্রষ্টব্য, q.v., s. v. رك بان
নং. ..... নম্বর, No.
প. ..... পরবর্তী, sq. sqq. f. ff. ببعد
পরি. ..... পরিশিষ্ট, suppl.....supplement
পাণ্ড. ..... পাণ্ডুলিপি, MS.
পূ. গ্র. ..... পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, op. cit. كتاب مذكور
পূ. স্থা. ..... পূর্বোল্লিখিত স্থানে, loc. cit. محل مذكور
ব.ব. ..... বহুবচন
বি. স্থা. ..... বিভিন্ন স্থানে
মু., মুদ্র. ..... মুদ্রণ
মূ. ধা. ..... মূল ধাতু
মৃ. ..... মৃত, মৃত্যু = م
(র). ..... রাহ্‌মাতুল্লাহি 'আলায়হি
(রা). ..... রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হু
(স). ..... সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং. ..... সংস্করণ
সম্পা. ..... সম্পাদিত, ed.
স্থা. ..... বিভিন্ন স্থানে, passim, بمواضع كثيره
হি. ..... হিজরী, হিজরীতে,
প., দ্র. ..... পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra
ঐ লেখক. ..... id. Idem, وهى مصنف
শা/ধা. ..... section mark, فصل
শিরো, ধাতু. ..... শিরোনামে, بذيل مادة s.v.
পত্র, পত্রক. ..... fols.
তথা. ..... Sc.
মূ. পা. ..... Sic. মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
লা. ছত্র. ..... Line. লাইন, س
ক. ..... a
খ. ..... b
১খ. ৪০ ..... প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ ঃ ৭ ..... সুরাঃ ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে)
৪৫০/১০৫৮..... হি. ৪৫০ সন মুতাবিক খৃ. ১০৫৮ (সন উল্লেখের বেলায়) যেখানে জন্ম বা মৃত্যুসন অজ্ঞাত (বা অনিশ্চিত) সেখানে '?' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছে।

(৪) লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা

আ. খা, মু. আবদুল মান্নান ঃ ২৮৮, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৮, ৫৮০, ৫৮৫, ৬৭৭, ৬৮১।

আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম হোসাইনী ঃ ৫৮৭, ৫৮৯, ৫৯২, ৬৮৮।

আ. ন. ম. রফীকুর রহমান ঃ ১৮১।

আফতাব হোসেন ঃ ৯১, ১০১, ১০৪, ২৬১, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ৩৪০, ৩৪৬, ৩৭৭, ৫১৪, ৫১৮, ৫২২, ৫২৯, ৫৩৭, ৫৯২।

আবদুল খালেক ঃ ৩০৮।

আবদুল গফুর ঃ ৭৪।

ড. আবদুল জলীল ঃ ৮০, ১২০, ১৭৮, ২৬৪, ২৬৭, ২৭০, ২৮৭, ৩০৫, ৩৪৯, ৩৭৭, ৪১৫, ৫২০, ৫৬৫, ৫৮৩, ৫৮৪, ৬৭২।

আবদুল বাসেত ঃ ৮৮, ১২৬, ১২৮, ১৩৫, ২৪৮, ৩৪৬, ৩৭৩, ৩৮৮, ৪৯৪, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৬২, ৬৮৩।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম ঃ ৮৯, ৯৮, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৮৭, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৭২, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৬, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৫, ৬৭৭।

আবু মুহম্মদ ঃ ৫৯০, ৬৮৮, ৬৯৫, ৬৯৭।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ঃ ১০২, ১০৪, ২৭১, ৪১৫।

আহমদ মায়মূন ঃ ৮১, ২৬৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ৩৭৪, ৪৩৮।

আহমদ হোসাইন ঃ ৭১।

আঃ মতিন মাসঊদী ঃ ৮৩, ৪৩৪।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা ঃ ২৩৯, ৪১৩, ৪৯৩, ৫১৬।

(ডঃ) এ. কে. এম. আইয়ূব আলী ঃ ১৩৩, ১৫৭, ১৬৫, ৪৩২, ৫৮৬, ৫৮৭।

এস. এম. হুমায়ূন কবির ঃ ৪২১, ৪২৩, ৪৩৩।

খন্দকার মাহবুবুর রহমান ঃ ২৯৪।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ঃ ১৫৯, ৪৩৬।

নাসির হেলাল ঃ ৩৭৫।

বোরহান উদ্দীন ঃ ১৩৬, ১৫১, ১৫৩, ২৬১, ৬৮৫।

মু. আবদুল মান্নান ঃ ৩৯, ৫৪৫, ৫৬৪, ৫৮৫, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৮২, ৬৯৭।

মু. মাজহারুল হক ঃ ৩৫, ১২২, ১৮৮, ১৯৩, ২৫৯, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪৮৫।

মুহঃ আবু তাহের ঃ ৩৭, ১৪৯, ১৫৭, ১৬২, ১৭৬, ১৭৭, ২৯৭, ৩০২, ৩০৩, ৩০৭, ৩১৫, ৩৩৭, ৫৫৩, ৫৫৯, ৬৮০।

মুহম্মদ ইলাহি বখশ ঃ ৩৬, ৩৫৫।

মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী ঃ ৯২, ৯৩, ৯৫, ২৮৮, ২৮৯।

মুহাম্মদ আবদুল আজীজ ঃ ৫৬৪, ৫৭৯, ৫৮৯, ৫৯০।

মুহাম্মদ ইসমাইল ঃ ৯৬, ১২৯, ১৩০, ১৪৪, ১৬৮, ২৬০, ২৭৬, ২৮২, ৩৯৭, ৪১১, ৪১৮, ৪২৪।

মুহাম্মদ মূসা ঃ ২৯৭, ৩৫৭।

মুহাম্মদ য়াহয়া ঃ ১৬০।

মুহাম্মদ শওকত আলী ঃ ১১০, ২৩৮, ২৭৫, ২৮৪, ২৮৫, ৫১০, ৫১২।

মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম ঃ ৫৯২।

মুহাম্মদ সোলায়মান ঃ ৩৭৩।

মুহাম্মদ হাসান রহমতী ঃ ৬৮৬।

মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন ঃ ১০১, ১২৩, ১২৪, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৬৩, ১৬৫, ১৮৪, ২৪০, ২৪৩, ৩৫৬, ৩৯৬, ৫২৩, ৫২৬, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩২, ৫৬২, ৫৬৩।

মুহাঃ রুহুল আমীন রোকন ঃ ৮০, ১৩৪, ২৫২, ২৫৩, ৩৭৯।

মোহাম্মদ আলী ঃ ৩০৪, ৩০৫, ৩০৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৪৩২।

মোঃ আবদুর রব মিয়া ঃ ১৫৪।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ ঃ ২৫০, ২৫৮, ২৬২, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৯, ২৭০, ৩০৮, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯৪।

মোঃ ইফতেখার উদ্দীন ভূঞা ঃ ২৯৩।

মোঃ গোলাম সরওয়ার ঃ ৭৪, ১৭০, ১৭৯, ১৮২, ১৮৩, ১৫৬, ৫১৬।

মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান ঃ ৫৭৩।

মোঃ তাজির উদ্দীন প্রামানিক ঃ ৩৪।

মোঃ মনিরুল ইসলাম ঃ ৮৩, ৮৫, ১২৯, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬।

মোঃ রইস উদ্দীন ঃ ১৫৮।

ড. রফিকুল ইসলাম ঃ ১৪৮।

মোঃ রেজাউল করিম ঃ ১৪৫, ১৫০, ১৫৬, ১৫৭, ২৭৪, ৫৬৬।

মোঃ শফিকুর রহমান ঃ ৫৭১, ৫৭২।

যোবায়ের আহমদ ঃ ৪৩৫।

শায়খ ফজলুর রহমান ঃ ২১, ২৬, ১৬৫, ১৬৯, ২২৪, ২৬২, ৪০৯, ৪১০, ৪১৪, ৪২৮, ৫৭৩।

শেখ মাহবুবুল আলম ঃ ২৬, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ১৮৯, ২৯৪।

সিরাজ উদ্দিন আহমাদ ঃ ৯৯, ১১১, ৩১৬, ৩২০, ৩৮৩, ৫২০, ৫২২, ৫৩৪, ৬৭৭।

হুমায়ূন খান ঃ ২২, ১৪৫, ১৬৬, ১৭৩, ১৮৯, ১৯০, ১৯৩, ২২৪, ২৫১, ২৫৫, ২৯৫, ২৯৬, ৩০১, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৬, ৩৮৯, ৩৯৫, ৪০৮, ৪৪৪, ৪৫৩, ৫৭৫।

বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম

'আওফী, লুবাব=লুবাবুল আলবাব, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০৩-১৯০৬ খৃ.। আগানী[১] অথবা[২] অথবা[৩]=
আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী, আল-আগানী, বূলাক ১২৮৫ হি.; [২] কায়রো ১৩২৩ হি.; [৩] কায়রো ১৩৪৫ হি.।
আগানী, Tables=Tables Alphabetiques du কিতাবুল আগানী, redigees par 1. Guidi, Leiden ১৯০০ খৃ.।
আগানী, Brunnow=কিতাবুল-আগানী, ২১ খ., সম্পা. R. E. Brunnow, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ.।
আবুল-ফিদা, তাকবীম=তাকবীমু'ল-বুলদান, সম্পা. J.-T. Reinaud এবং M. de Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ.।
আবুল-ফিদা, তাকবীম, অনু.=Geographie d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en francais, ১খ., ২খ., I by Reinaud, প্যারিস ১৮৪৮; ২খ. by St. Guyard, ১৮৮৩ খৃ.।
আল-আন্‌বারী, নুযহা=নুযহাতু'ল-আলিব্বা ফী ত'াবাক'াতি'ল-উদাবা', কায়রো ১২৯৪ হি.।
'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই 'উছমানিয়্যীন তারীখ ওয়া জুগারাফিয়া লুগাতি, ইস্‌তাম্বুল ১৩১৩-১৭/১৮৯৫-৯।
ইদরীসী, মাগ'রিব=Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. R. Dozy ও M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।
ইব্‌ন কুতায়বা, আশ-শি'র=ইব্‌ন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ.।
ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার=কিতাবুল-'ইবার ওয়া দীওয়ানু'ল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি, বূলাক ১২৮৪ হি.।
ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা=Prolegomenes d'Ebn Khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ (Notices et Extraits xvi-xviii)।
ইব্‌ন খালদূন=The Muqaddimah, Trans. from the arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৫৮ খৃ.।
ইব্‌ন খালদূন-de Slane=Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।
ইব্‌ন খাল্লিকান=ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আন্‌বাউ আবনাই'য্‌-যামান, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1835-50 (quoted after the numbers of Biographies).
ইব্‌ন খাল্লিকান, বূলাক=the same, সং. বূলাক ১২৭৫ হি.।
ইব্‌ন খাল্লিকান, de Slane=কিতাব ওয়াফায়াতিল-আ'য়ান, অনু. Baron MacGuckin de Slane, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪২-১৮৭১ খৃ.।
ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (BGA VI)।
ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=আন-নুজূমুয-যাহিরা ফী মুলূক মিস'র ওয়াল-ক'াহিরা, সম্পা. W. Popper, Berkeley-Lieden 1908-1936.
ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=the Same, সং. কায়রো ১৩৪৮ হি. প.।
ইব্‌ন বাত্‌'তূ'তা=Voyages d'Ibn Batouta, Arabic text, সম্পা. এবং ফরাসী অনু. C. Defremery ও B. R. Sanguinetti, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫৩-৫৮ খৃ.।
ইব্‌ন বাশকুওয়াল=কিতাবু'স'-সি'লা ফী আখবার আইম্মাতি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ. (BHA II)।
ইব্‌ন রুসতা=আল-আ'লাকু' 'ন-নাফীসা, সম্পা. M.J. De Goeje, লাইডেন ১৮৯২ খৃ. (BGA VII)।
ইব্‌ন সা'দ=আত'-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, সম্পা. H. Sachau and others, লাইডেন ১৯০৫-৪০ খৃ.।
ইব্‌ন হ'াওক'াল=কিতাব সূ'রাতি'ল-আরদ', সম্পা. J. H. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮-৩৯ খৃ. (BGA II, ২য় সং)।
ইব্‌ন হিশাম=আস-সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1859-60.
ইব্‌নু'ল-আছীর=কিতাবুল-কামিল ফি'ত-তারীখ, সম্পা. C. J. Tornberg, লাইডেন ১৮৫১-৭৬ খৃ.।
ইব্‌নুল-আছীর, trad. Fagnan=Annales du Maghred et de l'Espagne, অনু. E. Fagnan, Algiers 1901.
ইব্‌নুল-আব্‌বার=কিতাব তাকমিলাতি'স'-সি'লা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৭-৮৯ খৃ. (BHA V-VI)।
ইব্‌নুল-'ইমাদ, শায'ারাত=শায'ারাতু'য-য'াহাব ফী আখবার মান য'াহাব, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি. (quoted according to years of obituaries).
ইব্‌নুল-ফাক'ীহ=মুখতাস'ার কিতাব আল-বুলদান, সম্পা. De. Goeje, লাইডেন ১৮৮৬ খৃ. (BGA V)।
য়াকূ'ত, উদাবা=ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব, সম্পা. D. S. Margoliouth, Leiden 1907-13 (GMS VI).
য়াকূ'ত=মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. F. Wustenfeld, Leipzig 1866-73 (anastatic reprint 1924)
য়া'কূ'বী=তারীখ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden 1883.
য়া'কূ'বী, বুলদান=সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1892 (BGA VII).
ইস্‌'ত'াখরী=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭০ খৃ. (BGA I) (এবং পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.)।
কুতুবী, ফাওয়াত= ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯ হি.।

খাওয়ানদামীর=হ'াবীবুস-সিয়ার, তেহরান ১২৭১ হি.।
ছা'আলিবী, য়াতীম=য়াতীমাতু'দ-দাহ্র ফী মাহ'াসিনিল-'আস'র, দামিশক ১৩০৪ হি.।
জুওয়ায়নী=তারীখ-ই জিহান গুশা, সম্পা. মুহ'াম্মাদ ক'াযবীনী, লাইডেন ১৯০৬-৩৭ খৃ. (GMS XVI)
তা-'আ. (TA), তাজুল-'আরূস, মুহ'াম্মাদ মুরতাদ'া ইব্ন মুহ'াম্মাদ আয-যাবীদী প্রণীত।
ত'াবারী=তারীখুর-রুসুল ওয়াল-মুলূক, সম্পা. M. J. De Goeje and others, Leiden 1879-1901.
তারীখ-ই গুযীদা=হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী আল-ক'াযবীনী, তারীখ-ই গুযীদা, সম্পা. in Facsimile by E. G. Browne, Leiden-London 1910.
তারীখ দিমাশক'=ইব্ন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক', ৭ খণ্ডে, দামিশক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১।
তারীখ বাগদাদ=আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১।
দাওলাত শাহ=তায'কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০১ খৃ.।
দাব্বী=বুগ্য়াতুল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজালি আহলিল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera J. Ribera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ. (BAH III).
দামীরী=হায়াতুল-হায়াওয়ান (quoted according to title of articles).
ফারহাংগ=র'াযমারা ও ন'াওতাশ, ফারহাং-ই জুগরাফিয়া-ই ঈরান, তেহরান ১৯৪৯-১৯৫৩ খৃ.।
ফিরিশ্তা=মুহাম্মদ ক'াসিম ফিরিশ্তা, গুলশান-ই ইব্রাহীমী, লিথো., বোম্বাই ১৮৩২ খৃ.।
বালায়ু'রী, আনসাব=আনসাবুল-আশরাফ, ৪খ., ৫খ., সম্পা. M. Schlossinger এবং S.D.F. Goitein, জেরুসালেম ১৯৩৬-৩৮।
বালায়ু'রী, ফুতূহ'=ফুতূহু'ল-বুলদান, সম্পা. M.J. de Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।
মাককারী, Analects=নাফহু'ত্-তীব ফী গুস্নিল-আনদালুসির-রাতীব (Analects sur l'histoire et la littereature des Arabes de l'Espagne), লাইডেন ১৮৫৫-৬১ খৃ.।
মাস'ঊদী, তানবীহ = কিতাবুত-তান্বীহ্ ওয়াল-ইশ্রাফ, সম্পা. M. J. De Goeje, Lieden 1894 (BGA VIII).
মাস্'ঊদী, মুরূজ = মুরূজুয'-য'াহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard et pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৬১-৭৭ খৃ.।
মীর খাওয়ানদ=রাওদ'াতু'স'-স'াফা, বোম্বাই ১২৬৬/১৮৪৯।
মুক'াদ্দাসী=আহ'সানুত-তাক'াসীম ফী মা'রিফাতিল-আক'ালীম, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭৭ খৃ. (BGA III).
মুনাজ্জিম বাশি=স'াহ'াইফুল-আখবার, ইস্তাম্বুল ১২৮৫ হি.।
যাহাবী, হু'ফ্ফাজ'=আয-য'াহাবী, তায'কিরাতুল-হু'ফ্ফাজ', ৪ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি.।
যুবায়রী, নাসাব=মুস'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কু'রায়শ, সম্পা. E. Levi-Provencal, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.।
লি. 'আ. (LA)=লিসানুল-'আরাব।
শাহরাসতানী=আল-মিলাল ওয়ান্-নিহ'াল, সম্পা. W. Cureton, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ.।
সাম'আনী=আস-সাম'আনী, আল-আন্সাব, সম্পা. In facsimile by D.S. Margoliouth, Leiden 1912 (GMS XX).
সাবকীস=মু'জামুল মাত'বূ'আত আল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮।
সিজিল্ল-ই'উছমানী =মেহমেদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১৩০৮-১৩১৬ হি.।
সুয়ূত'ী, বুগ্'য়া=বুগ্য়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি.।
হ'াজ্জী খালীফা=কাশফুজ'-জু'নূন, সম্পা. S. Yaltkaya and Kilisli Rifat Bilge, ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৪৩ খৃ.।
হ'াজ্জী খালীফা, জিহাননুমা=ইস্তাম্বুল ১১৪৫/১৭৩২।
হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel=কাশ্ফুজ' জু'নূন, Leipzig 1835-58.
হামদানী= সি'ফাতু জাযীরাতিল 'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Lciden 1884-91.
হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতুল কু'লূব, সম্পা. G. Le Strange, Leiden 1913-19 (GMS XXIII)
হু'দূদুল 'আলাম=The Regions of the World, অনু . V. Minorsky, London 1937 (Gms, N. S. Xi).

Abbreviated Titles
Of Some of The Most Often Quoted Works

Babinger=F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Ist, ed., Leiden 1927.
Barkan, Kanunlar=Omer Lutfi Barkan, XV vc XVI inci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.
Barthold, Turkestan= W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1928 (GMS. N. S. V).

Barthold, Turkestan^2=the same, 1st edition, London 1958.
Blachere, Litt.=R. Blachere, Histoire de la Litterature arabe, 1, Paris 1952.
Brockelmann, I, II=C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, zweite den Supplementbanden Angepasste Auflage, Leiden 1943-49.
Brockelmann, S. I, II, III=G. d. a. L., Erster (Zweiter, Dritter) Supplementband, Leiden 1937-42.
Browne, i=E. G. Browne, A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.
Browne, ii=A Literary History of Persia, From Firdawsi to Sa'di, London 1908.
Browne, iii=A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.
Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.
Caetani, Annali=L. Caetani, Annali dell'Islam, Milan 1905-26.
Chauvin, Bibliographie=V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages Arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.
Dozy, Notices=R. Dozy, Notices sur quelques arabes, Leiden 1847-51.
Dozy, Recherches^8=Recherches sur l'lristoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyenage, third edition, Paris and Leiden 1881.
Dozy, Suppl.=R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden 1881 (anastatic reprint, Leiden-paris 1927).
Fagnan, Extraits=E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
Gesch. des Qor.=Th. Noldeke, Geschichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.
Gibb, Ottoman Poetry=E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.
Gibb-Bowen=H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957.
Goldziher, Muh. St.=I. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle 1888-90
Goldziher, Vorlesungen =I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.
Goldziher, Vorlesungen^2=2nd ed., Heidelberg 1925.
Goldziher, Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, tr. F. Arin, Paris 1920.
Hammer-Purgstall GOR=J. von Hammer (Purgstall), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.
Hammer-Purgstall Gor^2=the same, 2nd ed., Pest 1840.
Hammer-Purgstall, Histoire=the same, trans. by J. J. Hellert, 18 vols., Bellizard (etc.), Paris (etc.) 1835-43.
Hammer-Purgstall=, Staatsverfassung=J. von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.
Hammer, Recueil=M. Th. Houtsma, Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.
Ibn Rusta-Wiet=Les Atours Precieus, Traduction de Gaston Wiet, Cairo 1955.
Idrisi-Jaubert=Geographie d'Edrisi, Trad. de l'arabe en francais par P. Amedee Jaubert, 2 vols., Paris 1836-40.
Juynboll, Handbuch=Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden 1910.
Lane=E.W. Lane, An Arabic-English Lexicon London, 1863-93 (reprint New York 1955-6).
Lane-Poole, Cat.=S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.
Lavoix, Cat.=H. Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris 1887-96.
Le Strange=G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930.

Le Strange, Baghdad.=G. Le strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.
Le Strange, Palestine=G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890.
Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus.=E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, new ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.
Levi-Provencal, Chorfa=E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.
Maspero-Wiet, Materiaux=J. Maspero et G. Wiet, Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao xxxvi).
Mayer, Architects=L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.
Mayer, Astrolabists=L. A. Mayer, Islamic Astrolabists and their works, Geneva 1998.
Mayer, Metalworkers=L. A. Mayer, Islamic Metalworkers and their Works, Geneva 1959.
Mayer, Woodcarvers=L. A. Mayer, Islamic Wookcarvers and their Works, Geneva 1958.
Mez, Renaissance=A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922.
Mez, Renaissance, Eng. tr.=The Renaissance of Islam, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London 1937.
Mez, Renaissance, Spanish trans.=El Renacimiento del Islam, translated into Spanish by S. Vila, Madrid-Granada 1936.
Nallino, Scritti=C. A. Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.
Pakalin=Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols., Istanbul 1946 ff.
Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des Klassischen Altertums.
Pearson=J.D. Pearon, Index Islamicus, Cambridge 1958.
Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos, arabigo-espanoles, Madrid 1898.
Santillana, Istituzioni=D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.
Schwarz, Iran=P. Schwarz, Iran in Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.
Snouck Hukrgronje, Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.
Sources inedites=Comte Henry de Castries, Les Sources inedites de l'Histoire du Maroc, Premiere Serie, Paris (etc.) 1905-Deuxieme Serie, Paris 1922.
Spuler, Horde=B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943.
Spuler, Iran=B. Spuler. Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 19052.
Spuler, Mongolen^2=B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 2nd ed., Berlin 1955.
Storey=C.A. Storey, Persian Literature : a Bio-bibliographical Survey, London 1927.
Survey of Persian Art=ed. by A.U. pope, Oxford 1938.
Suter=H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke Leipzig 1900.
Taeschner, Wegenetz=Franz Taeschner, die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.
Tomaschek=W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.
Weil, Chalifen=G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.
Wensinck, Handbook=A.J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammdan Tradition, Leiden 1927.
Zambaur=E. de Zambaur, Manuel de Genealogie et de chronologie pour l'Histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).
Zinkeisen=J. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

ABBREVIATIONS FOR PERIODICALS ETC

Abh. G.W. Gott.=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen,
Abh.K.M.=Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes.
Abh. Pr, Ak. W.=Abhandlungen der preussischen AKademir der Wissenschaften.
Afr.Fr.-Bulletin de Comite de 1'Afrique francaise.
AIEO Alger=Annales de 1'Institut d'Etudes Orientale de 1'Universite d'Alger N.S. from 1964.
AIUON=Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Anz. Wien=Anzeiger der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften, Wien. Philosophisch- historische Klasse.
AO=Acta Orientalia.
ArO=Archiv Orientalni.
ARW=Archiv Fur Religionswissenschaft.
ASI=Archaeological Survey of India.
ASI, NIS=ditto, New Inperial Series.
ASI, AR-ditto, Annual reports.
AUDTCFD=Ankara Universitesi Dilve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi.
BAH=Bibliotheca Arabico Hispana.
BASOR=Bulletin of the American Schools of Oriental Research.
Belleten=Belleten (of Turk Tarih Kurumu).
BFac.Ar.=Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.
BEt. Or.=Bulletin d'Etudes Orientales de 1'Institut Francais de damas.
BGA=Bibliotheca Geographorum Arabicorum.
BIE=Bulletin de 1'Institut d'Egypte.
BIFAO-Bulletin de 1'Institut Francais d'Archeologie Orientale de Caire.
BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.
BSE=Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), Ist ed.
BSE^2=the same, 2nd ed.
BSL(p)=Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris.
BSO (A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.
BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Nederlandsch-Indie).
BZ=Byzantinische Zeitschrift.
COC=Cahiers de 1, Orient Contemporain.
CT=Cahiers de Tunisie.
EI^1=Encyclopaedia of Islam, Ist edition.
EIM=Epigraghia Indo-Moslemica.
ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics.
GGA=Gottiger Gelehrte Anzeigen.
GMS=Gibb Memorial Series.
Gr. I. Ph.=Grundriss der Iranischen Philologie.
IA=Islam Ansiklopedisi.
IBLA=Revue de 1' Institut des Belles Lettres, Arabes, Tunis.
IC=Islamic Culture.
IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergisi.
IHQ=Indian Historical Qurarterly.
IQ=The Islamic Quarterly.
Isl.=Der Islam.
JA=Journal Asiatique.
JAfr. S=Journal of the African Coeiety.

JAOS=Journal of the American Oriental Society.
JAnthr.I=Journal of the Anthropological Institute.
JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
JE=Jewish Encyclopaedia.
JESHO=Journal of the Economic and Social Historyt of the Orient.
J(R)Num. S.=Journal of the (Royal) Numismatic Society.
JNES=Jouranal of Near Eastern Studies.
JPak. HS.=Journal of the Pakistan Historical Society.
JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.
JQR=Jewish Quarterly Review.
JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.
J(R) ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.
JRGeog. S.=Journal of the Royal Geographical Society.
JSFO=Journal de la Societe Finno-Ougrienne.
JSS=Journal of Semitic Studies.
KCA=Korosi Csoma Archivum.
KS=Keleti Szemle (Oriental Review).
KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy (Short communications of the Institute of Ethnography).
LE=Literaturnaya Entsiklopediya(Literary Encyclopaedia).
MDOG=Mitteillungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
MDPV=Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palastina-Vereins.
MEA=Middle Eastern Affairs.
MEJ=Middle East Journal.
MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de 1' Universite St. Joseph de Beyrouth.
MGMN=Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.
MGWJ=Monatsschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums.
MIDEO =Milanges de 1'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.
MIE-Memoires de 1' Institut d'Egypte.
MIFAO=Memoires publics par les membres de 1' Institut Francais d' Archeologie Orientale du Caire.
MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Francaise au Caire.
MMIA=Madjallat al-Madjma' al-Ilmi al-'Arabi, Damascus.
MO=Le monde Oriental.
MOG=Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte.
MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya (Small Sovite Encyclopaedia).
MSFO=Memoires de la Societe Finno-Ougrienne.
MSL(P)=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.
MSOS Afr.=Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Afrikanische Studien.
MSOS As.=Mitteilungen des Seminars fur Orentalische Sprachen, Westasiatische Studien.
MTM=Milli Tetebbu'ler Medjmu'asi.
MW=The Muslim World.
NC=Numismatic Chronicle.
NGw Gott.=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.
OC=Oriens Christianus
OLZ=Orientalistische Literaturzietung.
OM=Oriente Moderno.

PEFQS=Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Pet. Mitt.=Petermanns Mitteilungen.
QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.
RAfr.=Revue Africaine.
RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigraghie arabe.
REJ=Revue des Etudes Juives.
Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche.
REI=Revue des Etudes Islamiques.
RHE=Revue de l'Histoire des Religions.
RIMA=Revue de l'Institut des Manuscrits Arabes.
RMM=Revue Monde Musulman.
RO=Rocznik Orientalistyczny.
ROC=Revue de l"Orient Chretien.
ROL=Revue de l'Orient Latin.
RSO=Rivista degli Studi Orientali.
RT=Revue Tunisienne.
SBAk. Heid.=Sitzungsberichte der Heidelberger Akadekemie der Wissenschaften.
SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien.
SBBayr. Ak.=Sitzungsberichte der physixalisch-me Bayrischen Akademie der Wissenschaften.
SBPMS Erlg.- Sitzungsberichte der dizinischen Sozietat in Erlangen.
SBPr. Ak. W.=Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).
SO=Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).
Stud. Isl.-Studia Islamica.
S. Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie(Soviet Linguistics).
TBG-Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
TD=Tarih Dergisi.
TIE=Trudi Instituta Etnografiy(Works of the Institute of Ethnograpgy).
TM=Turkiyat Mecmuasi.
TOEM/TTEM=Ta'rikh-i 'Othmani (Turk Ta'rikhi) Endjumeni medjmi'asi.
Verh. AK. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.
Versl. Med. AK.Amst.=Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
VI=Voprosi Istoriy (Historical Problems).
WI=Die Welt des Islams.
WI'n. s.=The same, new series.
Wiss. Veroff. DOG=Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.
WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.
ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.
ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.
ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.
ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palastinavereins.
ZGErdk. Birl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.
ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

بسم الله الرحمن الرحيم

ড

ডন্‌মি ঃ তুর্কী শব্দ, ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, ১১শ/১২শ শতাব্দীর শেষভাগে তুরস্কের ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী য়াহূদীদের দ্বারা গঠিত একটি সম্প্রদায়ের নাম, মাসীহরূপে অভিহিত জনৈক শব্বেতাই সেবি-র দৃষ্টান্ত অনুসরণে তাহারা এইরূপ ধর্মান্তরিত হয়। মাসীহ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনাপরম্পরায় একটি যোগসূত্ররূপে য়াহূদীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত, এইরূপ অতীন্দ্রিয় ধারণা হইতে এই ডন্‌মি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইহার ফলে যাহারা ধর্মান্তরিত মাসীহ-এর অনুকরণ করিতে এবং মৃত্যুর পরও তাঁহার প্রতি অনুগত থাকিতে অভিলাষী তাহাদের ধর্মবিশ্বাস মযবুত করিতে সহায়ক হয়। মাসীহ-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই সম্প্রদায়টি ইসলাম ধর্মের অভ্যন্তরে থাকিয়া গোপনে যতদূর সম্ভব য়াহূদী ধর্ম এবং উহার অনুশাসন ও আচার-বিধি সাব্বাতীয় মাসীহ-এর অনুমোদিত সংস্কারাদিসহ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিত। কালক্রমে ধর্মান্তরকালীন দুর্যোগপূর্ণ যমানার মৌলিক ধ্যানধারণা বহুলাংশেই অস্পষ্ট ও বিস্মৃত হইয়া যায়, তখন এই সম্প্রদায়টি জীবনধারায় ধর্মাচরণগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, সমাজকল্যাণমূলক কার্যকলাপ এবং মাসীহ-এর দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমনের আশায় তাঁহার স্মৃতির প্রতি মৌলিক আনুগত্যের বিকাশ ঘটে। পরবর্তী কালে সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লইয়া সদস্যদের মধ্যে নানা মতবিরোধেরও উদ্ভব হয়।

এইরূপে ডন্‌মি সম্প্রদায় মুসলমানদের সহিত আন্তঃবিবাহ এড়াইয়া চলিতে থাকে। তাহাদের মন্দির ধ্বংস (৯ম আব) উপলক্ষে উপবাসের মাধ্যমে ঐ সম্প্রীতি বজায় রাখার পরিবর্তে তাহারা দিনটি মাসীহ-এর জন্মদিন হিসাবে আনন্দোৎসব করিতে থাকে। কিছুটা হিব্রু ভাষা শিক্ষা চালু রাখা হয়, বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্মের আচার-বিধি মানিয়া চলিতে লোকজনকে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু গোপনে হিব্রু নাম ইত্যাদি বজায় রাখা হয় এবং পৃথক বিবাহ ও জানাযা অনুষ্ঠানাদি পালিত হইতে থাকে।

১০৯৪/১৬৮৩ সালে গ্রীসের অন্তর্গত স্যালোনিকায় এই গণধর্মান্তর অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া মনে হয়। স্যালোনিকা ধর্মান্তরিত এই সম্প্রদায়টির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়; তবে এদীরনে, ইযমীর এবং পরবর্তীতে ইস্তাম্বুল শহর ও আলবেনিয়াতেও ইহার শাখা স্থাপিত হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাসীহ-এর উত্তরাধিকার ও নেতৃত্ব লাভের বিভিন্ন দাবিদারের অভ্যুদয়ের ফলে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ কলহের দরুন ডন্‌মি সম্প্রদায়টি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে (উপদলগুলির নামে পার্থক্য দেখা যায়, তবে সাম্প্রতিকতম নামগুলি হইতেছে হামদিবেইলার (Hamdibeyler), কারাকাশ (Karakas) ও কাপান্‌সিলার (Kapancilar) ঃ ইহারা সকলেই আন্তঃবিবাহের বিরোধিতা করে। এই বিভাগ হয়ত সামাজিক বিভাগের সহিত সম্পর্কহীন ছিল না; উপদলগুলির মধ্যকার পারস্পরিক পার্থক্য কেশবিন্যাস ও পোশাক-আশাকের স্টাইলে প্রকাশ পায়। ডন্‌মিরা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে পৃথক মহল্লায় বাস করিত। ডন্‌মিরা নিজেদেরকে বিশ্বাসী সম্প্রদায় (মু'মিনীন) বলিয়া মনে করিত। তাহারা কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখিত। প্রাথমিক যুগের পর তাহাদের সাহিত্যকর্ম হিব্রু, আরামীয় য়াহূদী, স্পেনীয় ও তুর্কী ভাষায় কিছু কবিতা ও প্রার্থনাবাক্যে সীমিত হইয়া পড়ে বলিয়া মনে হয়। তথ্য উৎসের স্বল্পতা এবং সম্প্রদায়টির গোপনীয়তাপ্রিয় স্বভাবের দরুন তাহাদের সম্পর্কে সমীক্ষা চালান দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে এবং তাহাদের ইতিহাসও অস্পষ্ট থাকিয়া যায়।

১৭০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ডন্‌মিদের কেন্দ্রীয় স্যালোনিকা দলে কয়েক শত পরিবার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি ইহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় আনুমানিক ১০,০০০ পরিবারে। তাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা ও বেসামরিক চাকুরীতে নিয়োজিত দেখা যায়।

১৯শ শতাব্দীর শেষদিকে ডন্‌মিদের মধ্যে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন এক ক্রমবর্ধমান নূতন ধারার যুব সমাজের বিকাশ ঘটে। তাহারা শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী, সাংবাদিক ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হয়। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়া কখনও কখনও উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পরিচয় দেয়, তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্য হইতেছে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের পর প্রতিষ্ঠিত নব্য তুর্কী শাসনামলে জাবিদ বে (দ্র.)-এর অভ্যুদয়।

মুসলমানরা মোটের উপর ডন্‌মিদের অস্তিত্বের প্রতি উদাসীন ছিল। তবে কখনও কখনও তাহাদের সম্পর্কে তদন্ত চালানো হয় এবং তাহাদের উৎপীড়নের বর্ণনা পাওয়া যায় (যেমন ১৭২০, ১৮৫৯ ও ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ঘটনাদি)। ডন্‌মিদের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে এমন কথাও শোনা যাইত।

১৯২৩-২৪ খৃ. গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে লোক বিনিময়ের ফলে স্যালোনিকার ডন্‌মিরা তাহাদের পূর্বপুরুষদের শহর ছাড়িয়া তুর্কী প্রজাতন্ত্রে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে তাহাদের জীবনে এক নূতন

অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইস্তাম্বুলে বসতি স্থাপন করে, ছোটখাটো কয়েকটি দল অন্যান্য শহরে আস্তানা গাড়ে। এই দেশ পরিবর্তন এবং তজ্জনিত পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার ফলে স্যালোনিকার খাঁটি য়াহূদী পরিবেশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ এবং তুরস্কের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ-সবকিছু মিলিয়া অপেক্ষাকৃত যুব বয়সের ডন্‌মিদের মধ্যে দৃঢ়তা শিথিল হইতে লাগিল। তবে সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে তাহাদের দলীয় অস্তিত্ব বজায় থাকে। ইস্তাম্বুলে কয়েক হাজার ডন্‌মি পরিবারের আগমনের ফলে ১৯২৪-২৫ খৃ. তুর্কী সংবাদপত্রে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা হইতে লাগিল ঃ তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িকভাবে পৃথক করিয়া রাখা হইবে, না তুর্কী জাতীয় জীবনে একীভূত করিয়া ফেলা হইবে। ইহা লইয়া মুসলমানদের সহিত ডন্‌মিদের আন্তঃবিবাহ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতে থাকে। কখনও কখনও বাধা-বিপত্তি দেখা দিলেও আধুনিক তুর্কী সমাজে তাহাদের সংহতিকরণ ক্রমশ জোরদার হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১-৩) H. Graetz, s. Dubnow, SW Baron রচিত য়াহূদীদের সম্পর্কিত সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থে ডন্‌মিদের সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যাইবে; (৪) য়াহূদী অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে G. Scholem চমৎকার গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন, উহার সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যাইবে এই গ্রন্থে ঃ The Jewish people, i, New York 1948; (৫) ঐ লেখক, Main trends in Jewish mysticism, New York 1941, বিশেষত পৃ. ২৮৭-২৩৬; (৬) ঐ লেখক, Shabbetai Sebi (Hebrew), 2 vols., Tel Aviv 1957; (৭) ঐ লেখক, Articles in Zion vi, Kiryat Sepher xviii-xix-এ প্রকাশিত নিবন্ধসমষ্টি; (৮) ঐ লেখক, Die Krypto-judische Sekte der Donme (Sabbatianer) in der Turkei, in Numen, vii (1960), 93-122; (৯) তু. Encyclopaedia Hebraica (xi, 1959, I. Ben Zvi) এবং IA, iii, 646 ff.-এ প্রকাশিত ডন্‌মি শিরোনামের নিবন্ধ; (১০) I. Ben Zvi, The exiled and the redeemed, Philadelphia 1957; (১১) a. Danon, REJ 1897-এ প্রকাশিত নিবন্ধ; (১২) L. Sciaky, Farewell to Salonica, New York 1946, ch. 9; (১৩) A. Staruck, Globus 1902-এ প্রকাশিত নিবন্ধ; (১৪) A. Galante Nouveaux documents Sur Sabbetai Sevi, Istanbul 1935; (১৫) E. E. Ramsaur Jr, The Young Turks, Princeton 1957, 96 ff. 108 n. ডন্‌মিদের সম্পর্কে তুর্কীদের প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে নিম্নোক্ত গ্রন্থদ্বয়েঃ (১৬) A. Govsa, Sabatay Sevi, Istanbul তা. বি., এবং (১৭) W. Gordlevsky-এর সমীক্ষা, Islamica, ii, 1926-এ প্রকাশিত; (১৮) ডন্‌মিদের রচনাকর্মের মূল পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন M. Atias, I. Ben Zvi, R. Molho, G. Scholem; (১৯) তু. Sefunot, iii, Jerusalem 1960.

M. Perlmann (E.I.[2])/শায়খ ফজলুর রহমান

ডাক্তার খান সাহেব (ڈاکٹر خان صاحب) ঃ জ. ১৮৮২, মৃ. ১৯৫৮ খৃ., চিকিৎসক, পাক-ভারতীয় রাজনীতিক। জ. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উছমানযাই। পেশোয়ার সরকারী হাই স্কুল, মিশন কলেজ, সেন্ট টমাস হসপিটাল ও লণ্ডনের মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। পরে পদত্যাগ করিয়া (১৯২১ খৃ.) স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন (১৯৩০ খৃ.)। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রথম কংগ্রেস সরকারের প্রধান মন্ত্রী (১৯৩৭ খৃ.); পদত্যাগ ও পুনর্বার কংগ্রেস সরকারের প্রধান মন্ত্রী (১৯৪৫ খৃ.); স্বাধীনতার পরে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী (নভেম্বর ১৯৫৪); তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী (১৯৫৫ খৃ.)। দুই বৎসর পরে তাঁহার মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া উক্ত প্রদেশ প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন করা হয়। তিনি রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। প্রখ্যাত সীমান্ত নেতা [কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে "সীমান্ত গান্ধী" (Frontier Gandhi) নামে খ্যাত] খান 'আবদুল-গাফ্‌ফার খান তাঁহার ভাই। ১৯৫৮-এর মে মাসে 'আতা' মুহাম্মাদ খান নামক আততায়ীর দ্বারা ডাক্তার খান সাহেব নিহত হন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৬৩৫

ডাকার (داکر) ঃ সেনেগালের রাজধানী, জনসংখ্যা (১৯৬৯ খৃ.) ৪,০০,০০০, কেপ ভার্দে উপদ্বীপের প্রান্তে অবস্থিত। ইহার অবস্থান প্রাচীন দুনিয়ার সর্বপশ্চিম উপনিবেশ বা ছাউনিস্বরূপ ছিল। ইহার দ্রাঘিমা আলমাদিজ প্রান্তের কাছে ১৭°১৬ পশ্চিম। ডাকার অঞ্চল প্রায় সমগ্র উপদ্বীপ জুড়িয়া অবস্থিত এবং উহা তিনটি ভাগে বিভক্তঃ (১) পূর্বদিকের উচ্চভূমি এলাকা (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০ মিটারের বেশি উঁচু); ন'দিয়াস পর্বতশ্রেণী তানমা হ্রদের প্রায় ৭০ মি. উপরে উঠিয়াছে। পূর্বদিকের ভূপ্রকৃতি পাহাড় ও নিম্ন মালভূমি নিয়া গঠিত। ধাপগুলি ধীরে ধীরে উঠিয়াছে কোথাও ৪০ হাত, ৫০ মিটারের বেশি নহে; (২) উপদ্বীপের প্রান্তভাগ; ফান (fann Point) হইতে বেল-এয়ার পর্যন্ত এলাকায় সমুদ্র তটরেখা খুবই বন্ধুর বা ভাঙা ও খাঁজযুক্ত, অসংখ্য অন্তরীপ দ্বারা (ফান্‌ন, ম্যানুয়েল অন্তরীপ, বেল-এয়ার) কয়েকটি উপসাগর চিহ্নিত হইয়াছে (সৌমবাদী, মাদেলীন, বার্নার্দ, ডাক্তার বন্দর ইত্যাদি)। উচ্চতা সামান্যমাত্র, ম্যানুয়েল অন্তরীপ কিছুটা বেশি উঁচু (৪০ মিটার); (৩) অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিম দিকে তটরেখা কমবেশি খাঁজকাটা, সেইখানে একের পরে এক অনেকগুলি অন্তরীপ; য়োফ অন্তরীপ, আলমাদীস অন্তরীপ। এখানে আবার তটরেখা বেশ উঁচু, মায়েল্লেস ১০০ মিটার, আর মালভূমির উচ্চতা ৩০ হইতে ৫০ মিটার। একটি বিশাল সমভূমি কেপ ভার্দে উপদ্বীপের দুইটি পার্বত্য অঞ্চলকে যুক্ত করিয়াছে। এই সমভূমির মধ্যভাগ জলাভূমি, মাঝে মাঝে মযবূত টিলা রহিয়াছে। উত্তর দিকে এইরূপ টিলার সারি শক্ত বেষ্টনীর মত হইয়া আছে, সমুদ্রগামীদের জন্য তাহা একটি বাঁধের মত। এইগুলির দ্বারা অনেকগুলি হ্রদ বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে, যথা য়োভি হ্রদ, তানমা হ্রদ, রেতবা হ্রদ, মবেবিউস্‌সে হ্রদ ইত্যাদি। দক্ষিণ দিকেও এইরূপ টিলার সারি রহিয়াছে, কিন্তু সেইগুলির স্থান পরিবর্তনশীল।

কেপ ভার্দে-এর আবহাওয়ার বিশেষত্ব রহিয়াছে, তাহা দেশের অভ্যন্তরভাগ হইতে ভিন্নরূপ। "খরা মৌসুমে" বা বর্ষাকালে তাপমাত্রা ২৫° হইতে ২৭° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে, বাতাসে জলীয় বাষ্প যথেষ্ট থাকে এবং গড় বৃষ্টিপাত হয় ৬০০ হইতে ৬৫০ মি.মি.। সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় আগস্ট মাসে। বর্ষাকাল মধ্য-জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এখানকার আবহাওয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে দীর্ঘ "ভাল মৌসুম" বা শুষ্ক মৌসুম, উহা নভেম্বর হইতে মধ্য-জুন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়াহেতু সামগ্রিক তাপমাত্রা মৃদু (১৯° হইতে ২৩° ডিগ্রী), মহাসাগরের, বিশেষ করিয়া শীতল ক্যানারী স্রোত মৃদু তাপের অন্যতম বিশেষ কারণ। এই স্রোত সেনেগাল-মৌরিতানিয়া

উপকূল বহিয়া প্রবাহিত হয়। অপর একটি কারণ হইতেছে আলিযে নামে পরিচিত সামুদ্রিক বায়ুপ্রবাহ। এই বায়ুর কারণে হারমাত্তান নামে পরিচিত শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ুপ্রবাহ এখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

ঐতিহাসিকভাবে কেপ ভার্দে উপদ্বীপ কায়োর রাজ্যের অংশ ছিল। ১৪৪৪ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজ দেনিস দায়াম এই স্থানটিতে আগমন করেন। এখান হইতে ৩ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত গরসি দ্বীপ ছিল য়ূরোপীয় নাবিকগণের গমনাগমন পথে বিশ্রামস্থল এবং গুলাম বা ক্রীতদাস ব্যবসায় কেন্দ্র। আর তটরেখা ধরিয়া একেবারে গাবোঁ (গ্যাবন) পর্যন্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী গভর্নরও সেইখানে বাস করিতেন। সেই সময়ে ডাকার ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রামমাত্র, সেখানে লেবৌ গোত্রের (উলুফ গোত্রের একটি শাখা) জেলেরা বসবাস করিত। ২৫ মে, ১৮৫৭ সালে Protet নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন লেবোঁর ধর্মতাত্ত্বিক প্রজাতন্ত্রের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমঝোতাক্রমে ডাকারে সরকারীভাবে ফরাসী পতাকা উত্তোলন করেন। তাহার পর হইতে ফরাসী সাম্রাজ্যের যত জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকাতে যাইত সেইগুলি পথিমধ্যে এইখানে থামিত। ১৮৯৫ খৃ. এখানে একটি সাধারণ সরকার গঠিত হয়। উহার দায়িত্ব হয় ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকাভুক্ত (A.O.F., l'Afrique Occidentale Francaise) বিভিন্ন ঔপনিবেশিক সরকারের গৃহীত নীতির সমন্বয় সাধন করা। সেনেগালের গভর্নর প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার রাজধানী সেন্ট লুই-এ।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে ডাকারে ফরাসী নৌঘাঁটি স্থাপিত হয়। ১৯০২ খৃস্টাব্দে ইহা ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার রাজধানী হয়। তখন হইতে এই শহরটি হয় A.O.F. বা ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার সঙ্গে ফ্রান্সের রাজধানীর যোগাযোগের মূল কেন্দ্র। ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ হইতে এখানে গ্র্যাণ্ড ফেডারেল কাউন্সিলের প্রধান দফতর স্থাপিত হয়। সেই ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ হইতেই ডাকার সেনেগাল উপনিবেশের রাজধানী হয়, পরে মালী ফেডারেশনেরও (সেনেগাল ও সাবেক ফরাসী সুদানীয় এলাকাসমূহ লইয়া গঠিত) রাজধানী হয়। অতঃপর ১৯৬০ খৃস্টাব্দে সেনেগাল দেশটি আন্তর্জাতিক সার্বভৌমত্ব অর্জন করিলে তখন ইহা উহার রাজধানী হয়।

সরকারীভাবে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় রাজধানী ডাকার কতকগুলি নগর এলাকা লইয়া গঠিত এবং সেইগুলি পরিষ্কারভাবেই চিহ্নিত বিভাগ। সেইগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় ১৯৪৬ ও ১৯৬১ খৃ. পরিকল্পনা অনুযায়ী। ১৯৪৭ খৃ. পরিকল্পনাতে চারিটি এলাকা স্থাপিত হয়ঃ (১) পশ্চিমের সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত আফ্রিকীয় ও য়ূরোপীয় মিশ্র আবাসিক এলাকা। উহা য়োঁফ (Yoff) বিমান বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত; (২) বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক এলাকা, উহার কেন্দ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বাণিজ্য বন্দর পর্যন্ত প্রসারিত; (৩) শিল্প অঞ্চল, উহা প্রধান জোট হইতে থিয়ারয়ে (Thiaroye) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং (৪) সবশেষে কতকগুলি সংরক্ষিত অঞ্চল।

১৯৬১ খৃ. যেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় তাহাতে পূর্বেকার পরিকল্পনার সামান্য পরিবর্তন করা হয়। শিল্প এলাকা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র গঠন করা হয় এবং ডাগৌডানে- সিকিনে নামক নূতন একটি নগর এলাকা চিহ্নিত করা হয়। উহা হয় মূল পরিকল্পনার সমন্বয় কেন্দ্র।

নগর গঠনের দিক হইতে ডাকার শহর উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত জুড়িয়া অবস্থিত। এই এলাকাটি বন্দরকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা দক্ষিণ-পূর্বের মালভূমির দক্ষিণের অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। সমভূমিতেই মদীনা নামে পরিচিত অংশও অবস্থিত। এই নগর এলাকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, শুধু এইখানেই মযবূত গড়নের পাকা ভবনসমূহ রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যেই রহিয়াছে রাজনৈতিক ধরনের জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রশাসনিক দফতরসমূহ, সমগ্র পাইকারী ব্যবসায় ব্যবস্থা, প্রায় সকল ব্যাংক, জীবনবীমা কোম্পানীসমূহ এবং গৃহনির্মাণ সংস্থাসমূহ। নগর পরিকল্পনাতে কোন সামগ্রিক সামঞ্জস্য নাই; বন্দর এলাকা সর্বাপেক্ষা পুরাতন, উহা আয়তাকার, চতুষ্কোণাকার বা ত্রিকোণাকৃতির; দক্ষিণ-পূর্বের এলাকা বেতারকেন্দ্রিক ধরনের, সেখানে কয়েকটি ঘোরাপথ রহিয়াছে; কেন্দ্রীয় অঞ্চল দাবার ঘরের মত, সেখানে রাস্তা সরু সরু; দক্ষিণাঞ্চলে নগরায়নের অগ্রগতি খুবই কম হইয়াছে।

ডাকার শহর কয়েকটি এলাকা নিয়া গঠিত। বাণিজ্য এলাকা, পুরাতন সওদাগর মহল্লাকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কেন্দ্রস্থলে কারমেল বাজার; সেখানে কিছু সংখ্যক পুরাতন প্রশাসনিক ভবন রহিয়াছে। তাহা ছাড়া প্রধান পোস্ট অফিস ও টাউন হলও সেইখানে অবস্থিত। টাউন হল সকালের দিকে খুবই ব্যস্ত থাকে; কিন্তু রাত্রে জনশূন্য হইয়া যায়; পশ্চিম এলাকা, উহা আযাদী চত্বরকে (Place de l'independence) ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, অত্যন্ত আধুনিক এবং অতি কর্মব্যস্ত এলাকা (ব্যাংক, ভবন নির্মাণ প্রতিষ্ঠানসমূহ, ট্রাভেল এজেন্সী বা ভ্রমণ সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জীবনবীমা অফিসসমূহ এখানে অবস্থিত); কেন্দ্রীয় এলাকা পাঁচমিশালী ধরনের, সেইখানে কিছু কিছু সেনাবাহিনীর অফিস সমেত অন্যান্য দফতর, পাইকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্যগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও উহা কাপড়ের ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানকার অধিবাসিগণ খুবই মিশ্র ধরনের, লেবাননী ও সিরীয়, ফরাসী, পর্তুগীজ কেপভার্দীয়, মূর বা আফ্রিকীয় আরব ইত্যাদি এবং প্রশাসনিক এলাকা, সেইখানে সুউচ্চ সব সরকারী ও আধা-সরকারী ভবন ঃ জাতীয় সংসদ, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ভবন, সরকারের মন্ত্রণালয়ের ভবনসমূহ, দূতাবাস, হাসপাতাল ও বিচারালয়। সেইখানে আবাসিক এলাকাও রহিয়াছে।

ডাকার শহরের উত্তর এলাকার পূর্ব অংশ অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে পূর্ণ; সেখানেও কিছু কিছু মযবূত পাকা ভবন রহিয়াছে (দ্র. Rebeuss); একটি কেন্দ্রীয় অংশ, সেখানে পতিত জমি, কিছু কিছু বড় ভবন (যেমন Colis Postaux, মালিক সাইকোল, জামি' মসজিদ, ইসলামী ইন্সটিট্যুট, পলি ক্লিনিক) এবং কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান (Huilerie Petersen, Brosette, Air Liquide ইত্যাদি) রহিয়াছে।

তৃতীয় যে শিল্প এলাকা, সেখানে রহিয়াছে আমদানী ও রফতানী শিল্প কারখানাসমূহ (তৈল কারখানা, বড় বড় মিল-কারখানা, সমুদ্র সংক্রান্ত কারখানা এবং অন্যান্য হালকা শিল্প-কারখানা)। এই এলাকাটি গড়িয়া তোলা কোন এলাকা নহে; অধিকাংশ এলাকাই পতিত, ফেলা জমি, আর আছে কিছু শাক-সব্জির বাগান এবং বস্তি ও কুঁড়েঘর। (দারোও কিপ, মাকা কলোবেন ইত্যাদি) বড় মদীনা (Grande Medina) এলাকাতে রহিয়াছে কয়েকটি মহল্লা ঃ Guele-Tapee নামে পরিচিত এলাকা কতকটা শহরীকৃত; সেখানে মযবূত ভবনের সংখ্যা অনেক, কিছু কিছু আছে বড় আধুনিক প্রতিষ্ঠান (যেমন ম্যাঙ্গেল মাতৃসদন হাসপাতাল ও ঔষধালয়, পৌর-নার্সারী ইত্যাদি); ফাস, উহা সামান্যই নগরীকৃত হইয়াছে; এখানে খুবই সামান্য পাথর বিছানো রাস্তা আছে, স্থানে স্থানে কুঁড়েঘর ও বস্তি রহিয়াছ, তবে ক্রমেই আধুনিক ধারায় উন্নয়ন সাধন করা হইতেছে (এখানেই OHLM Centre)। সেখানেই আযাদীর স্মৃতিসৌধ এবং Kennedy girls' lycee অবস্থিত; কলোবেন মহল্লা প্রায় ফাস-এরই অনুরূপ; জিব্রাল্টার মহল্লা সম্পূর্ণ

আবাসিক, সেখানে মাঝে মাঝে কিছু বিলাসবহুল ভবন রহিয়াছে, সেইগুলির নির্মাতা OHLM।

গ্রাণ্ড ডাকার এলাকা হইতেছে ডাকার শহরের সবচেয়ে আধুনিক, সবচেয়ে বিস্তৃত ও জনবহুল নগরঅঞ্চল। স্থানে স্থানে কুঁড়েঘর থাকিলেও এইখানেই সবচেয়ে আধুনিক ধারায় নগরায়ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত মহল্লাগুলি নিয়া এই এলাকা গঠিত ঃ ফান হক (Fann Hock), ফাননন-আবাস, মেরমোয, পয়েন্ট ই এবং জোন বি, উন্নততর একটি আবাসিক এলাকা (বিশ্ববিদ্যালয় ইকোল নর্মালে সুপারেকিউর, ইকোল ন্যাশনালে দ্যা ইকনমিক এপলিকুই, ব্লেইজ দায়ানে ও দেলাফোস লাইসিজ, অসংখ্য দূতাবাস ও মন্ত্রিগণের বিলাসবহুল বাসভবনসমূহ)। গ্র্যান্ড ডাকারের কেন্দ্রস্থলে কিছু কিছু স্বয়ংসম্পূর্ণ ভূম্যাধিকারীর ভবন ও জমি রহিয়াছে। জোন এ, সিটি দ্যু পোর্ট ডি কমার্স এট দেস দোনানে, দি এস্টেট অব বপ, এস্টেট অব ওয়াগৌনিআয়ে। উত্তরের এভিনিউ বোগিবাঁ ও রুট দ্যু ফ্রন্ট্ দ্য টেরে-এর মধ্যবর্তী এলাকার ভিতরে রহিয়াছে। সিটে ডি পুলিশ, কারাকে, সিকাপের সাদাসিধা ধরনের বহুতলবিশিষ্ট বাসভবনসমূহ, ক্যাস্টরগণের বাসভবন, Derkle, Cite des Eaux-এর বাসভনন এবং OHLM ১ ও ২-এর ভবনসমূহ। গ্র্যান্ড ডাকার আধুনিক ভবনসমূহ এবং বস্তি ও কুঁড়ে ঘরসহ এই রাজধানীর সবচেয়ে জনবহুল এলাকা (প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে ৫০০ জন)। কিন্তু ইহার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। ইহা নগরের ১০ নং ও ১৩ নং সড়কের মধ্যে অবস্থিত। SICAKP ও OHLM এইখানে আধুনিক নগরায়ন পদ্ধতি প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছে।

ডাকার ও উহার শহরতলী অঞ্চল ঃ নগরের ঠিক পশ্চাদভূমিতে অবস্থিত একটি এলাকাতে ডাকারের প্রভাব বুঝা যায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য দ্বারা; মূবাও পর্যন্ত শিল্প-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে; সেখানে ইতোমধ্যেই একটি তৈল শোধনাগার রহিয়াছে এবং সেইখানে ডাকার-মেরিন শিল্পাঞ্চল সম্প্রসারিত হইতেছে। কাকামে ও ক্যামবারিনে সামরিক ছাউনি নির্মিত হইয়াছে, য়ৌফ-এ রহিয়াছে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিভবনসমূহ; প্রধান ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহ, য়েউমবেল-এ ও রুফিসকু-এর উত্তরে কাছাকাছি স্থানে নির্মাণ করা হইয়াছে। রাজধানীর ৩০ কি.মি. দূরে বিভিন্ন সামরিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে; আবাসিক এলাকাসমূহে ডাকারের শ্রমিকদিগকে বাস করিতে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া রহিয়াছে আলমাদিগণ, নগোর, বিমান বন্দর, সাবে, গ্র্যান্ড, য়ৌফ, প্যাটে দ'ওয়ি-এর নিজস্ব এলাকাসমূহ, OHLM, গুয়েডিয়াওয়ে, পিকিনে, থিয়ারোয়ে এবং দিয়াকস-এর ভবনসমূহ।

ডাকার শহরের সঙ্গে উহার সন্নিকটবর্তী কিছু সংখ্যক গ্রামের পারস্পরিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পর্ক রহিয়াছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় পণ্যের বিনিময়ে শহর হইতে গ্রামে মাছ, তরি-তরকারি ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়। এই গ্রামগুলি হইতেছে হান-পেচিয়ুর, ঔকাম, নগোর (Ngor) ও য়ৌফ।

জনসংখ্যা ঃ এই শতাব্দীর শুরুতে ডাকারের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২০,০০০। বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হইয়াছে ৩,৫০,০০০। ১৯৬১ খৃ. আদমশুমারি অনুযায়ী ডাকার মূল শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৩,০২,৯২০, আর শহরতলী এলাকাসমূহের জনসংখ্যা ছিল ৭১,৭৮০ জন। সেই একই শুমারি অনুযায়ী অ-আফ্রিকীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০, তন্মদ্যে ২৯,১৮০ জন ছিল ফরাসী, ৯,৯০০ জন লেবানো-সিরীয় ও ৫,৮০০ জন মেতী, ৫০০ জন আনটিলী এবং প্রায় ১০০ জন উত্তর আফ্রিকীয়। লেবাননিগণকে বাদ দিলে এই অ-আফ্রিকীয় জনসংখ্যা আফ্রিকীয় শ্রেণীকরণ এবং ফরাসী সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি কমিয়া যাইবার কারণে ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। ১৯৬১ খৃ. আফ্রিকীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৩,৯৮,০৬ জন, উহা ছিল সমগ্র কেপ ভার্দের অধিবাসীদের (৪,৪৩, ৫৬০ জন, এক-দশমাংশ) অংশ। বিভিন্ন গোত্র ও উপজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশটি, তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান; ওলোফ গোত্র (২,০৩,৮৪০ জন অর্থাৎ ৫১·২ শতাংশ), তৌকৌলিউর গোত্র (৫০,৪৮০ জন বা ১২·৬%), লেবন গোত্র (৩৬,৬৬০ জন), সেরের গোত্র (২৫,৯৮০ জন) এবং পিউল ও ফৌলা গোত্র (২৩,৯০০ জন), সব মিলাইয়া ৩,৪১,০৬০ জন।

লেবানো-সিরীয়গণ ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আফ্রিকীয়গণ মাছ ধরা ও কৃষিকাজে নিয়োজিত (লেবৌগণ) বা বিভিন্ন সরকারী চাকুরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (কর্মচারী অথবা নিরাপত্তা রক্ষী বাহিনীতে চাকুরী করে), বিভিন্ন ব্যক্তিগত চাকুরীতে নিযুক্ত (তৌকৌলিউর, পিউল, তরুণ সেরেরে ও দিওলাগণ) অথবা নানারকম আইন সংক্রান্ত পেশাতে (উকিল, শরীফের পেয়াদা বা অন্যান্য পেশাতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে) নিয়োজিত রহিয়াছে। বিভিন্ন চাকুরীতে যত লোক শিল্পকারখানাতেও প্রায় তাহার সমসংখ্যক লোক কাজ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যে য়ুরোপীয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রের লোকেরা নিযুক্ত রহিয়াছে (কেরানী, নথিরক্ষক, হিসাবরক্ষক, প্রশাসক)। ব্যবসায়িগণের কর্মকাণ্ড সব আফ্রিকীয় এলাকাতে, আর পণ্যসামগ্রী বিক্রেতাগণ বিভিন্ন বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করে, এই কাজে গিনি (কোনাক্রি) হইতে আগত ফৌলা গোত্রীয়গণের শক্তিশালী আবাসিক এলাকা রহিয়াছে।

ধর্ম ঃ সেনেগালের প্রধান ধর্ম দুইটি ঃ ইসলাম ও খৃস্ট ধর্ম। খৃস্টানদের মধ্যে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট উভয়ই রহিয়াছে। রাজধানী ডাকারে সরকারীভাবে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এই উভয় ধর্মের লোকেরাই বসবাস করে।

প্রকৃতি পূজা অপসারিত হইয়া যাইবার পর হইতে সমগ্র সেনেগাল দেশটিরই প্রধান ধর্ম হইতেছে ইসলাম। বস্তুত ৯০% সেনেগালীই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, আর রাজধানী ডাকারের $\frac{৪}{৫}$ ভাগ লোকই মুসলিম। ইসলাম সেনেগালে ঐতিহ্যগত, এমন কি প্রায় স্থানীয় ধর্মেরই রূপ নিয়াছে, কিন্তু খৃস্ট ধর্ম সেইরূপ হইতে পারে নাই। এখানকার মুসলিমগণ মালিকী মাযহাবপন্থী। সাধারণভাবে তাহারা একটি বিশেষ তারীকাভুক্ত। সেই তারীকার একজন দরবেশ নেতা রহিয়াছেন। গ্রাম এলাকা হইতে ব্যাপক জনগমনের ফলে ডাকার শহরই হইতেছে এখন দেশের সকল তারীকাপন্থিগণের মিলনকেন্দ্র। ডাকার হইতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মুরীদ বা অনুসারী তৌবাতে 'ওরসে যোগদানের জন্য গমন করে; সেখানেই মুরীদীবাদের কেন্দ্র। আনু. ১৮৯৫ খৃ. শায়খ আহমাদু বামরা ম্বাকে দেশের একটি প্রধান তারীকার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অনেক মুরীদ ওরসে যোগদানের জন্য তিভাওনানেতেও গমন করে, উহা তীজানিয়া তারীকাপন্থিগণের কেন্দ্র। এই দুইটি শহর অবশ্যই দেশের ধর্মীয় রাজধানীস্বরূপ। তবে দেশের রাজধানী ডাকারই হইতেছে ধর্মীয় ও পার্থিব সকল কর্মকাণ্ডের মিলনক্ষেত্রস্বরূপ। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দেশের নানা স্থানের ধর্মীয় নেতাগণ সরকারী কর্মকর্তাগণের সঙ্গে সাক্ষাত করিবার জন্য ডাকারে আসিয়া থাকেন।

ডাকার শহরে যে বিভিন্ন তারীকার অনুসারীরা রহিয়াছেন সেইগুলি হইতেছে ঃ (ক) তীজানিয়া (দ্র.), ইহার বর্তমান খলীফা হইতেছেন আলহাজ্জ আবদু'ল-'আযীয সাই। ইনি মরহুম আলহাজ্জ মালিক সাই

(১৮৫০-১৯২২ খৃ.)-এর তৃতীয় পুত্র। খলীফা তাঁহার পিতা কর্তৃক তিভৌয়ানেতে প্রতিষ্ঠিত যাবিয়াতে গদীনশীন রহিয়াছেন; ডাকার শহরেও তাঁহার একটি বাসভবনস্বরূপ খানকাহ রহিয়াছে। সেখানে একটি মাদ্‌রাসা পরিচালিত হয় এবং তালিবগণ সেইখানেই থাকেন। খলীফা যখন শহরের বিভিন্ন স্থানে গমনাগমন করেন তখন তাঁহার এই বাসস্থানও ক্রমাগত বদল হইতে থাকে। সাই পরিবারের অনেক সদস্য ডাকার শহরে থাকেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই নিজ নিজ অনুসারী তালিবগণও বাস করেন।

ডাকারের তীজানীদের প্রসঙ্গে বলিতে গেলে অবশ্যই আলহাজ্জ সায়্যিদুনুরু তাল-এর কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইনি আলহাজ্জ 'উমার তাল (১৭৯৬-১৮৬৪ খৃ.)-এর নাতি, ধর্ম ও রাজনীতি এই উভয় ক্ষেত্রেই ইনি একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাঁহার বাড়ীতে সর্বদা সেনেগালী তৌকৌলিউর ও মালীয় শাগরিদগণের ভিড় লাগিয়াই থাকে।

(খ) মুরীদগণ ঃ বাওল গ্রাম অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক মুরীদ আসিয়া ডাকারে বসবাস করে; বাওলেই তৌবা গ্রাম এবং সেইখানে বিখ্যাত পীর শায়খ আহমাদু বাম্বার খানকাহ (যাবয়া) অবস্থিত। বহু সংখ্যক কৃষক শ্রেণীর মুরীদ প্রতি বৎসর তৌবাতে যিয়ারত (মোগাল) করিতে যায়। ম্বাকে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যই তৌবাতে, ম্বাকেতে, দিঔরবেলে বা সেইগুলির পার্শ্ববর্তী এলাকাতে থাকেন এবং আমাদের জানামতে শুধু শায়খ আহমাদু বাম্বার নাতি সেরিগনে শায়খ ম্বাকেই স্থায়ীভাবে ডাকারে বাস করেন। তাঁহার মুরীদগণের মধ্যে বহু শিল্পপতি রহিয়াছেন। তাঁহার নিজস্ব অনেক বাড়ি রহিয়াছে এবং একটি মহল্লাই তাঁহার নামে পরিচিত (সিকাপ সেরিগনে শায়খ)। প্রতিদিন তাঁহার বাড়ীতে বহু সংখ্যক তালিব ও নির্ভরশীল খাদেম ব্যক্তিগণের ভিড় হয়। খলীফা যখন ডাকারে রওয়ানা হন তখন অনুসারী লোকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়; প্রত্যেকেই অন্যকে ঠেলিয়া সামনে আগাইয়া গিয়া পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চায়; তালিবগণ সর্বক্ষণ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে কুরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াত করিতে থাকে অথবা তারীকার প্রতিষ্ঠাতার রচিত কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকে। খলীফার (বর্তমানে শায়খ 'আবদুল-আহাদ) আগমনের সমগ্র সফর ব্যাপিয়া ডাকার শহর বস্তুত আর এক তৌবাতে পরিণত হইয়া যায়।

(গ) কাদিরিয়া তারীকা ঃ সেনেগালে কাদিরিয়া তারীকার অনুসারিগণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রহিয়াছে। সেনেগালবাসিগণ প্রায়শই বাগদাদে গিয়া তারীকার প্রতিষ্ঠাতা বড় পীর হযরত 'আবদুল-কাদির জীলানীর (র) (দ্র.) মাযার যিয়ারত করিয়া থাকে, প্রতি বৎসর মৌরিতানিয়ার নিমযাতেও গিয়া থাকে। আফ্রিকার এই অংশে এইখানেই প্রথম এই তারীকার প্রবর্তন হইয়াছিল। সেনেগালের নদিয়াস্‌সানে হইতেছে কাদিরিয়াগণের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ডাকারে অন্যান্য তারীকাপন্থীর ন্যায় অনেক কাদিরিয়া তালিবও রহিয়াছেন। তাঁহারা খুবই কর্মতৎপর, বিশেষ করিয়া সেনেগালে এই তারীকার অন্যতম বিখ্যাত প্রচারক শায়খ সা'দ বুহ-এর নাতি যিনি বর্তমানে খলীফা তিনি যখন বাগদাদে যিয়ারত করিতে যান, তখন তালিবগণের কর্মতৎপরতা সবচাইতে বেশি পরিলক্ষিত হয়। ডাকার শহরে তাঁহাদের নিজস্ব মহল্লা রহিয়াছে, উহা ৬ নং সড়কের গিউল-তাপীতে অবস্থিত।

(ঘ) অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে (১৮৯০ খৃষ্টাব্দে) এখানে লায়ে তারীকার প্রচলন হইয়াছে। তবে উল্লিখিত তিনটির ন্যায় ইহার অনুসারীর সংখ্যা তত বেশি নহে। লায়ে কথাটি আসিয়াছে লিবাস্‌সে হইতে (উহা আবার আল-'আব্বাস শব্দের অপভ্রংশ); লিমামৌ লায়ে [অর্থাৎ ইমামুল্লাহ (র), ১৮৪৩-১৯০৯ খৃ.] নামক একজন দরবেশ ছিলেন এই তারীকার প্রবর্তক, তাঁহার প্রভাব কেপ ভার্দে উপদ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বিশেষ করিয়া লেবৌ গোত্রের অধিবাসিগণের মধ্যে। য়ৌফ-এ স্থাপিত একটি আস্তানা হইতে দরবেশ ইমামুল্লাহ এই তারীকা প্রচার করিয়াছিলেন। এই নিবন্ধ লেখার সময়ে খলীফা ছিলেন শায়খ সিদিনা মানদিওন লায়ে। তিনি ডাকারের অদূরবর্তী কামবারেনস নামক একটি গ্রামে বাস করিতেন।

(ঙ) তীজানীরা হইতেছে নিয়াসানীদেরই একটি শাখা। তাঁহাদের কেন্দ্র হইতেছে কাওলাকে। ডাকার শহরে তারীকার প্রধান মরিয়ম নিয়াসী (ইনি তারীকার প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্জ ইবরাহীম নিয়াসীর মেয়ে) মালিক সাই এভিনিউতে বসবাস করেন। সেনেগালের সকল অঞ্চল হইতে অনুসারিগণ সেখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান। তাহা ছাড়া নাইজিরিয়া, মিসর, ঘানা, দাহোমী ও অন্যান্য দেশ হইতেও মুরীদ বা অনুসারিগণ আসিয়া থাকেন। তাঁহার ভাইও ডাকারে বাস করেন। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাদ্‌রাসার তত্ত্বাবধান করেন। সেনেগালের বাহিরেও বহু দূর পর্যন্ত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম রহিয়াছে।

দেশের রাজধানী হওয়া ছাড়াও ডাকার হইতেছে সেনেগালের সকল তারীকার মুসলিমগণের মিলনকেন্দ্র। সেনেগাল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের বিশেষ গুরুত্বের কারণে মুসলিমগণ সরকার হইতে কতগুলি প্রতিষ্ঠানগত ও সংস্থাগত সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করিয়া থাকে। ডাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সাহিত্য অনুষদে একটি আরবী বিভাগ রহিয়াছে এবং IFAN-এ (Institut Fondamental D'Afrique Noire) ইসলামতত্ত্ব বিষয়ক একটি বিভাগ রহিয়াছে।

ডাকার জামে' মসজিদ বা বড় মসজিদ প্রকৃতপক্ষে সরকারী ধরনেরই একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ইহা নির্মাণের ৯৯% ব্যয়ভার রাষ্ট্র হইতে বহন করা হইয়াছিল। এই মসজিদের ইমাম নিযুক্ত হইয়া থাকেন লেবৌগণের মধ্য হইতে। তাঁহার বেতন ও বাসস্থান সরকার হইতে দেওয়া হয়। এই মসজিদের জুমু'আর সালাত ORTS-এর বেতার ব্যবস্থা হইতে প্রচার করা হইয়া থাকে এবং প্রধান প্রধান মুসলিম ধর্মীয় দিবসের সালাতে ও অনুষ্ঠানে সব সময়েই দেশের প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকেন। জামে' মসজিদের প্রাঙ্গণেই ডাকার ইসলামী ইন্সটিট্যুট অবস্থিত। ১৯৭৪ খৃ. দেশের প্রেসিডেন্ট উহার উদ্বোধন করেন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হইতেছে ইসলাম বিষয়ে মৌলিক গবেষণা, শিক্ষা এবং ইসলামী রীতিনীতি বিষয়ে শিক্ষা দান করা।

সেনেগালের রোমান ক্যাথলিকগণের প্রধান হইতেছেন সেই দেশেরই একজন আর্চ বিশপ। তিনি ডাকারে থাকেন এবং ঐ গির্জাই হইতেছে দেশের ক্যাথলিক গির্জাসমূহের কার্যাবলীর কেন্দ্রস্থল। এদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে গির্জার অবদান অনেক। এইখান হইতে শিশু শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা করা হইয়া থাকে। এই শিক্ষাদান পদ্ধতি সরকারীভাবে স্বীকৃত। সরকার হইতে এইগুলিকে যথেষ্ট আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হইয়া থাকে। সেনেগালে প্রটেস্টান্ট ধর্ম খুব বিস্তার লাভ করে নাই, তবে প্রটেস্টান্ট গির্জাসমূহ কিছু কিছু শিশু স্কুল পরিচালনা করিয়া থাকে, সেইগুলির সরকারী স্বীকৃতিও রহিয়াছে।

শিক্ষা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা বিষয়ক নির্মাণাদি এবং পর্যটনের প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রায় সকলই ডাকারে কেন্দ্রীভূত। সেনেগালের

একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, উহার বিভিন্ন অনুষদ ও ইন্সটিট্যুটসমূহ, IFAN এবং উহার অধীন প্রধান প্রধান স্কুল, তন্মধ্যে Ecole Normale Superieure. হইতে উচ্চ শিক্ষা, মৌলিক গবেষণা এবং উচ্চতর ক্যাডার সৃষ্টি করা হয়, সকলই ডাকারে অবস্থিত। প্রয়োগীয় গবেষণা ইন্সটিট্যুটসমূহ, যথা ঃ Institute of Nutritional Technology বা পুষ্টি ইনসটিট্যুট, ORSROM, উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বিষয় সংক্রান্ত ইন্সটিট্যুট, সমুদ্র গবেষণা ইন্সটিট্যুট (Institute of Oceanographic Studies of Thiaroye, BANAS, পাস্তুর ইন্সটিট্যুট, মনোচিকিৎসা গবেষণা ইন্সটিট্যুট, ফলিত কুষ্ঠব্যাধি ইন্সটিটুট এবং জাতীয় চারু ও কারুকলা ইন্সটিট্যুট, এইগুলি সকলই রাজধানী শহর ডাকারে অবস্থিত। ডাকারে টেকনিক্যাল বা প্রযুক্তি বিষয়ক, বৃত্তিমূলক, শিল্পকারখানা বিষয়ক ও হোটেল ট্রেনিং-এর ১২টি কেন্দ্র, শিক্ষার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সাধারণ শিক্ষার ১১২টি প্রতিষ্ঠান এবং সেইগুলি ব্যতীত শুল্ক, সামরিক স্বাস্থ্য, সশস্ত্র পুলিশ ও পুলিশদের ট্রেনিং কেন্দ্রসমূহ রহিয়াছে। দেশের সবগুলি যাদুঘরই ডাকারে অথবা গরীতে (Goree) অবস্থিত।

একটি প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রস্থল হইতেছে ডাকার। এই সকল ক্ষেত্রে ইহা পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার নিষ্ঠুর সংঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। তবে সকল সংঘাত ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া একটি সংহতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধনই হইতেছে মূল লক্ষ্য। ডাকার শুধু ইহার ভাগ্যই নূতনভাবে গড়িয়া উঠিতে আগ্রহী নয়, বরং বাস্তবসম্মত উপায়ে সমগ্র সেনেগালের ভবিষ্যত অগ্রগতি সাধনই উহার লক্ষ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. P. Angrand, Les lebou de la Presquile du Cap Vert, Dakar 1946; (2) A. Hauser, Les industries de transformaton de Dakar, IFAN Etudes senegalaises No. 5, Daker 1954; (৩) J. Richard Molard, Villes d'Afrique Noire, France Outre-mer No. 255, presencc Africaine, Paris 1958; (8) R. Pasquier, Les villes du Senegal au 19 siecle, in Revue d'histoire des colonies, 1960; (৫) M. Jodoin, Les industries manufacturieres de la region dakaroise, DES. University of Montreal 1963; (৬) Assane Seck, Dakar, metropole ouest-afraicaine, IFAN Memoire N. 85, Dakar 1970; (৭) A. Samb, Essai sur la contribution du Senegal a la literature d'expression arabe, IFAN Memoire No. 87, Dakar 1972; (৮) Annuaire officiel de la Requblique du Senegal, ed. La Societe Africa, Dakar 1976; (৯) J. Charny, La fovdation de Dakar (1845-1857-1889), Paris, n.d.

—Amar Samb (E.I.^{2})/ হুমায়ুন খান

ডামুড্যা ঃ পদ্মানদী বিধৌত বদ্বীপ উপজিলা। শরিয়তপুর জিলায় অবস্থিত। বৃহত্তর ফরিদপুর জিলার সাবেক থানা। ২৩ঃ১০´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উত্তরে পদ্মানদী ও মুনসীগঞ্জ জিলা, পশ্চিমে নরিয়া ও ভেদরগঞ্জ, দক্ষিণ-পশ্চিমে শরিয়তপুর সদর, দক্ষিণে গোসাইর হাট উপজিলা এবং পূর্বে চাঁদপুর জিলা। উপজিলার আয়তন ৯১ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৯০,২০১ জন। মুসলমান ৮৬,৯৪২, হিন্দু ৩১৮৪ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ৭৫ জন। মুসলমানদের হার ৯৫.২৪ এবং হিন্দুদের ৩.২৪% (১৯৮২-৮৩'র পরিসংখ্যান)। মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, মাদরাসা ১৭, মহাবিদ্যালয় ১, মসজিদ মোট ১৬১টি। উপজিলার ১১৫ মাইল দীর্ঘ পথের সবটাই কাঁচা (১৯৮২-৮৩'র পরিসংখ্যান মুতাবিক লঞ্চ স্টেশন ১)।

পূর্বে ডামুড্যা ফরিদপুরের অংশবিশেষের সঙ্গে ঢাকা-জামালপুর পরগনাভুক্ত ছিল। ১৮৭৩ সনে মাদারীপুর মহকুমার সঙ্গে ডামুড্যা থানা বাকেরগঞ্জ হইতে ফরিদপুরে স্থানান্তর করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Faridpur District Statistics, 1983, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, 17th February, 1983, pp. 3-7, 40, 115, 117, 119, 121, 126, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 163-165, 172-174, 179, 183-185; (2) Bangladesh Population Census 1981, District Faridpur, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, September 1984, pp. 5, 82; (৩) আ. ন. ম. আবদুস সোবহান, ফরিদপুরের কবি-সাহিত্যিক,ফরিদপুর, পৌষ ১৩৭৬, পৃ. ৯-২৭।

শেখ মাহবুবুল আলম

ডালমেশিয়া (DALMATIA) ঃ সার্বো-ক্রোট ভাষায় ডালমাসিজা (Dalmacija), যুগোস্লাভিয়ার একটি ঐতিহাসিক প্রদেশ, পূর্বে ক্রোশিয়া (Croatia, সমকালীন ডালমেশিয়া এলাকা) ও মন্টিনিগ্রো (Montenegro) ফেডারেল প্রজাতন্ত্রদ্বয়ের অংশবিশেষ এবং বোস্নিয়া-হার্যেগোভিনা (Bosnia-Herzegovina) ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের একটি অতি ক্ষুদ্র এলাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১। সাধারণ বিবরণ ঃ আড্রিয়াটিক সাগর (Adriatic Sea) বেষ্টিত ডালমেশিয়া দিনারিক (Dinaric) পর্বতশ্রেণীর (ভেলিবিট [Velebit], সিলাজা [Svilaja] ও বায়োকোভো [Biokovo]-এর পাদদেশে অবস্থিত এবং ইস্ট্রিয়া (Istria) উপদ্বীপ হইতে [কোন কোন গ্রন্থকারের মতে পাগ্ (Pag) দ্বীপ হইতে] আলবেনীয় সীমান্তবর্তী বোজানা (Bojana) নদী পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ কর্তৃক ডালমেশিয়া বলিয়া অভিহিত এলাকাটির কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা নাই। সত্যই কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ডালমেশিয়ার সীমারেখা বহুবার পরিবর্তিত হইয়াছে। যে আমলে ইহার পশ্চাদভূমি শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের (ক্রোশিয়া [Croatia], যিটা [Zeta], বোস্নিয়া [Bosnia], অ্যাঞ্জেভিনীয় হাঙ্গেরী [Angevin Hungary] ও চরম উন্নতিসম্পন্ন 'উছমানী সাম্রাজ্যের [Ottoman Empire]) নিয়ন্ত্রণে ছিল তখন ডালমেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল কেবল আড্রিয়াটিক সাগরের দ্বীপমালা ও কতিপয় দুর্গ-সুরক্ষিত শহর। মহাদেশীয় রাষ্ট্রগুলিতে যখন ভাঙ্গন দেখা দিল তখন বলকান উপদ্বীপের আরও অভ্যন্তরে ডালমেশিয়া তাহার এলাকা সম্প্রসারিত করিয়া লইয়াছিল।

বর্তমান সময়ে ডালমেশিয়া বলিতে মোটামুটি যুগোস্লাভিয়ার আড্রিয়াটিক সাগর তীরবর্তী এলাকার মধ্যভাগ অর্থাৎ ভেলিবিটের পশ্চিম হইতে যরমানজা (Zarmanja) নদীর উৎস পর্যন্ত এবং সেখান হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে মন্টিনিগ্রো সীমান্ত পর্যন্ত উপকূলবর্তী এলাকা বোঝায়।

যুগোস্লাভিয়ার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার অপর দুইটি অংশ হইল উত্তরে সেভার্নো প্রাইমোরজি (Severno Primorje) (উত্তর উপকূল এলাকা), ইস্ট্রিয়া উপদ্বীপ, কভার্নার (Kvarner) উপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত উপকূল এলাকার অংশটি, আর দক্ষিণে কর্নোগরস্কো প্রাইমোরজি (Crnogorsko Primorje), (মন্টিনিগ্রো উপকূল এলাকা), হার্সেগ নভি (Herceg Novi) হইতে আলবেনিয়া সীমান্ত পর্যন্ত উপকূল অঞ্চল।

তিন শ্রেণীর ভৌগোলিক এলাকা লইয়া ডালমেশিয়া গঠিত ঃ (ক) সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা, ইহার কোথাও সমতল, কোথাও খাড়াভাবে গড়ান, মধ্যে মধ্যে সংকীর্ণ গভীর উপসাগর ও সুরক্ষিত পোতাশ্রয় অবস্থিত; (খ) অনির্দিষ্ট সীমারেখাযুক্ত অভ্যন্তরভাগ এবং (গ) ডালমেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য দ্বীপ।

ডালমেশিয়ার আবহাওয়া ভূমধ্যসাগরীয়; কিন্তু 'বুরা' (Bura) নামক শীতল বায়ুপ্রবাহের (গ্রীকরা ইহাকে বলিত 'বোরেআস্' বা 'বোবরিস্', আর রোমানরা বলিত 'অ্যাকুইলো') প্রভাবে স্পলীট (Split)-এর উত্তরে শীতের আধিক্য।

অতীতের ডালমেশিয়ার অর্থনীতি প্রধানত মৎস্য শিকার, মেষ পালন, শস্য উৎপাদন, জলপাই, আঙ্গুর ও ফলের চাষের উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে ঐগুলি ছাড়া আয়ের অতিরিক্ত উৎস হইতেছে শিল্প, জাহাজ নির্মাণ ও পর্যটন। ইহার উল্লেখযোগ্য বন্দরগুলির মধ্যে আছে স্পলীট সাইবেনিক (Sibenik), যাদার (Zadar), প্লাচি (Ploce), গ্রুয, (Gruz), ডুব্রভ্নিক (Dubrovnik) বন্দর, পূর্বেকার রাগুসা (Ragusa), মন্টিনিগ্রো উপকূলবর্তী (সমকালীন) বার (Bar) এবং কটর (Kotor) উপসাগর উপকূলবর্তী টিভাট (Tivat), কটর, পেরাস্ট (Perast), রিসান (Risan) ও হার্সেগ নভি। কিন্তু যুগোস্লাভিয়ার প্রধান বন্দর কভার্নার (Kvarner) উপসাগরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত রিজেকা (Rijeka)-কে পূর্বেকার ফিউমে (Fiume) সাধারণত ডালমেশিয়ার এলাকার অন্তর্ভুক্ত নগরী বলিয়া ধরা হয় না; রিজেকাকে "আড্রিয়াটিক উপকূল" নগরী বলিয়াই গণ্য করা হয় (পূর্বেই বলা হইয়াছে, ডালমেশিয়ার এলাকা আরও দক্ষিণ হইতে শুরু হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়)।

২। ইতিহাস

ক. প্রাক-উছমানী আমল ঃ নব-প্রস্তর (Neolithic) যুগ হইতেই ডালমেশিয়ায় মানব-বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রোঞ্জ যুগে বিভিন্ন ইলিরীয় (Illyrian) উপজাতি এখানে বাস করিত, সম্ভবত ইহাদের একটি নাম ছিল ডেলমাটেস বা ডালমাটেস (Delmates/Dalmates)। [সে যাহা হউক, খৃ. প্রথম শতাব্দীর পর রোমানগণ তাহাদের ইলিরিকাম বা হিলুরিকাম (Illyricum/Hilluricum) প্রদেশের ঐরূপ নামকরণ করে]।

খৃস্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দী হইতে গ্রীকগণ এখানকার কয়েকটি দ্বীপে (ভিস [Vis], হার [Hvar], করকুলা [Korcula] প্রভৃতি) বাণিজ্য-ঘাঁটি স্থাপন শুরু করে। উপকূলবর্তী কতিপয় শহরেও (সোলিন [Solin], ট্রোগির [Trogir] প্রভৃতি) তাহারা ঐরূপ ঘাঁটি স্থাপন করে। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ডালমেশিয়ায় বিভিন্ন কেল্টীয় উপজাতির (Celtic tribes) হামলার বিবরণ পাওয়া যায়।

পরবর্তী কালে রোমানগণ ইলিরীয় অধ্যুষিত ডালমেশিয়া জয় করে। তাহাদের এই বিজয় অর্জিত হয় পর্যায়ক্রমে; স্থানীয় অধিবাসীরা রোমান হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং বহুবার বিদ্রোহ করে। শতাব্দীকাল পরে ডাইয়োক্লেসিয়ান (Diocletian) বিশাল রোমান প্রদেশ ডালমেশিয়াকে (ডালমেশিয়া তখন ইস্ট্রিয়া হইতে স্কাডার [Skadar] এবং আড়িয়াটিক হইতে সাভা [Sava], কলুবারা [Kolubara] ও যাপ্রাদা মোরাভা [Zaprada Morava] পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) দুইটি অঞ্চলে ভাগ করেন ঃ ডালমেশিয়া ও প্রেভালিস (Provincia Praevalitana)। শেষোক্ত অঞ্চলটির অন্তর্ভুক্ত ছিল মোটামুটি বর্তমানের মন্টিনিগ্রো, আলবেনিয়ার একাংশ, ম্যাসিডোনিয়া ও সার্বিয়া।

খৃ. ৫ম শতাব্দী হইতে বায়যানটীয় শাসনাধীনেও ডালমেশিয়া বিভিন্ন বার্বার জাতি কর্তৃক আক্রান্ত ও অস্থায়ীভাবে পরাভূত হয়; প্রথমত ওস্ট্রোগথ (Ostrogoths) ও পরে আভারদের (Avars) নিকট। পরবর্তী কালে খৃ. ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে বিভিন্ন স্লাভ উপজাতীয় (Slavic tribes) লোকেরা দলে দলে ডালমেশিয়াসহ সমগ্র বলকান উপদ্বীপে আসিয়া এলাকাটি প্লাবিত করিয়া ফেলে।

পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ডালমেশিয়া (কার্যকরভাবে বা অন্তত নামেমাত্র বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও) ইহার বিভিন্ন অঞ্চল পর্যায়ক্রমে ফ্রাঙ্ক জাতি (Franks), বিভিন্ন ক্রোলীয় ও সার্বীয় রাষ্ট্র (হারভাটস্কা [Hrvatska], নেরেটভা [Neretva], যাহুমল্জি [Zahumlje], ট্রাভুনিজা [Travunija], ডুক্লজা [Duklja] ইত্যাদি) এবং নর্মানদের (Normans) আধিপত্যাধীনে চলিয়া যায়।

মধ্যবর্তী কালে (৩য়/৯ম শতাব্দীতে) ডালমেশিয়া উপকূলের আরব হামলার, বিশেষত রাগুসায় (ডুব্রভনিক–) একটি ব্যর্থ অবরোধের বিবরণ পাওয়া যায়, যাহা ২৫২/৮৬৬-৭ সনে আনুমানিক পনের মাস স্থায়ী হয় (তু. Theophanes Continuatus, Historia de vita et rebus gestis Basilii..., সম্পা. I. Bekkeri, Bonnae 1838, 289-90; G. Musoa, L'emirato di Bari (847-871)[2]; Bari 1967; U. Rizzitano, নিবন্ধ Italiya, E. I.[2]-তে)।

১১শ শতাব্দী হইতে ডালমেশিয়ার উত্তরাংশের আধিপত্য লইয়া ভেনিসীয় (Venetians), ক্রোয়েটিস (Croats) ও হাঙ্গেরীয়দের (Hungarians) মধ্যে এবং দক্ষিণাংশের আধিপত্য লইয়া বিভিন্ন স্থানীয় বোসনীয় (Bosnian) ও সার্বীয় (Serbian) রাজ্য ও উপরাজ্যের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়া যায়।

১২০৫ খৃ. হইতে ১৩৫৮ খৃ.-র মধ্যে ডালমেশিয়ার এক বিরাট অংশ ভেনিসের দখলে ছিল। এই সময়ে মোংগলরা (Mongols) এখানে কয়েকবার হামলা চালায়; তাহারা পলায়নপর হাঙ্গেরীয় রাজা বেলা (King Bela)-র পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মার্চ ১২৪২ খৃ. স্পলীটের শহরতলী বিধ্বস্ত করে এবং স্কটর শহরটি লুণ্ঠন করে (তু. R. Grousset, L'Empire des steppes, Paris 1948, 332-3)।

১৩৫৮ খৃ. হইতে ১৪০৯ খৃ. মধ্যবর্তী কালে ডালমেশিয়া আঞ্জেভিনীয় হাঙ্গেরীর এবং ১৪০৯ খৃ. হইতে ১৪২০ খৃ. মধ্যে ভেনিসের আধিপত্যাধীনে চলিয়া যায়, যদিও ইতিপূর্বে বহুকাল যাবৎ ইহার অনেকগুলি শহর প্রায়শই অল্পবিস্তর (বা সম্পূর্ণরূপে) স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে, বিশেষত যেমনটি হয় ডুব্রভনিকের ক্ষেত্রে (তু. M. Novak, Autonomija dalmatinskih Komuna pod Venecijom, Zadar 1965)।

খ. 'উছমানী আমলঃ ডুব্রভনিক প্রজাতন্ত্রের (Republic of Dubrovnik) ইতিহাসের জন্য দ্র. রাগুসা (Ragusa); ডুব্রভনিকের দক্ষিণবর্তী উপকূল এলাকার ইতিহাসের জন্য দ্র. কোরা দাগ', অর্থাৎ মন্টিনিগ্রো (ক্রেনোগোরসকো প্রাইমোরজি)।

'উছমানীগণ কর্তৃক বলকান উপদ্বীপ বিজয় ও ভিয়েনা (Vienna) নগরী অভিমুখে তাহাদের অপ্রতিহত অভিযান পুনরায় ডালমেশিয়ার মানচিত্র বদলাইয়া দেয়। বস্তুত 'উছমানী সাম্রাজ্যের শক্তির শিখরে অবস্থানের সমগ্র কালটিতে ভেনিস কেবল আড্রিয়াটিক সাগরের দ্বীপমালা, উপকূলবর্তী শহরগুলি এবং ওমিস (Omis) পর্যন্ত একটি সংকীর্ণ সমুদ্র উপকূল অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করিত, অন্যদিকে সেটিনা [Cetina] ও নেরেটভা [Neretva] নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী উপকূল এলাকা (মাকারস্কো প্রাইমোরজি=Makarsko Primorje]) এবং সমগ্র পশ্চাদভূমি ছিল তুর্কীদের দখলে (সানজাক [=জিলা] লিকা, সানজাক ক্লিস্ ও সানজাক হার্যেগোভিনা)। কেবল (১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে) 'উছমানী শক্তির অবনতির সূচনার পর ভেনিস অধিকৃত ডালমেশিয়া পুনরায় উপদ্বীপটির অভ্যন্তরভাগে তাহার এলাকা বিস্তার করিতে শুরু করে।

খৃস্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে ডালমেশিয়ায় ভেনিসীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল সামন্ত প্রথাভিত্তিক, ভূমির মালিক ছিল অভিজাত শ্রেণী, যাহাদের অধিকাংশই ছিল বিদেশী বংশোদ্ভূত। শহরের কারিগর ও দোকানদারদের পৌর পরিষদে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হইত না। সামন্ত জমিদারদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গণবিদ্রোহের বিবরণ পাওয়া যায়। ডালমেশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্য সংকুচিত হওয়ায় ভেনিসই লাভবান হয়। অন্যদিকে প্রধানত তুর্কী অভিযানের মুখে পলায়নপর লোকজনের হিজরতের ফলে কৃষি বরং সমৃদ্ধই হয় (বিশেষত দ্বীপগুলিতে)। পরবর্তী দুই শতাব্দীতে একদিকে ভেনিসীয় শক্তির অবনতি ঘটে, অপরদিকে একই সময়ে ডালমেশীয় সমাজে এক বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে আমাদের মনোযোগ দিতে হইবে অতি উচ্চ স্তরের এক ডালমেশীয় সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের প্রতি।

(৩) তুর্কীগণের আগমন হইতে ১৫৭০ খৃ. পর্যন্ত

উত্তর ক্রোশিয়ার বিরুদ্ধে 'উছমানীদের প্রথম অভিযান শুরু হয় ৮২০/১৪১৭ সালে এবং ডালমেশিয়ার বিরুদ্ধে ইহার অল্প কিছুকাল পরে। ১৪৩২ খৃ. তুর্কীগণ যাদার এলাকা আক্রমণ করে এবং ১৪৬৩ খৃ.-র পরই সেনজ (Senj) আক্রমণ করে। অতঃপর সেপ্টেম্বর ১৪৬৮ খৃ. যাদার, সাইবেনিক ও স্পলীটে তুর্কী অভিযান শুরু হয়; পুনরায় ১৪৭০ খৃ. তাহারা যাদার এলাকা, ১৪৭১ খৃ. স্পলীট ও ট্রোগির এবং ১৪৮৬ খৃ. (সেনজ-এর অদূরবর্তী লিকা অঞ্চলে) মডরুসায় (Modrusa) অভিযান চালাইয়া ঐসব এলাকা দখল করিয়া নেয়; তবে (বায়োকোভো পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত) মাকারস্কা (Makarska) অঞ্চলটিই 'উছমানী আক্রমণের একেবারে মুখে পড়ে। ১৪৬৫-৭০ খৃ. হইতে পরবর্তী বৎসরগুলিতে তুর্কীগণ লুবুসকি (Ljubuski), ভিগোর‍্যাক (Vrgorac) ও ইমোটস্কি (Imotski)-সহ সমগ্র পশ্চাদভূমির নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। আরও কিছু দূর উত্তরে ওমিস্ (Omis) ১৪৯৮ খৃ. তুর্কীদের প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে (সমগ্র 'উছমানী শাসনামলে ওমিস্ এক বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ চালাইয়া যায়)। (১৫শ শতাব্দীতে ডালমেশিয়া এলাকায় ভেনিসের সীমান্ত অঞ্চল সম্পর্কে দ্র. M. Sunjic, Pomjeranje mletackih granica u Dalmaciji i odnosi sa susjedima tokom XV stoljeca, in Godisnjak Drustva Istoricara B. I, H., xv [1964], 47-62)।

১৪৯৩ খৃ. উদবিনা (Udbina)-র নিকটবর্তী ক্রাবাভস্কো পোলজি (Krbavsko Polje)-তে তুর্কীদের নিকট ক্রোশীয়দের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর ডালমেশিয়ার উপর চাপ আরও তীব্র হইয়া উঠে, বিশেষত ১৪৯৯-১৫০৩ খৃ. ভেনিসীয়-তুর্কী যুদ্ধের সময়। পুনরায় স্পলীট, ট্রোগির, সাইবেনিক, যাদার ও নীনে অভিযান চালাইয়া তুর্কিগণ এই সময় এলাকাগুলি বিধ্বস্ত করে এবং সমগ্র মাকারস্কো প্রাইমোরজি (সেটিনা নদী হইতে নেরেটভা নদী পর্যন্ত) এলাকার এবং ট্রোগির ও সাইবেনিকের মধ্যবর্তী বসিলজিনা (Bosiljina or Busoljina ?) ত্রিকোণ ভূমির নিয়ন্ত্রণ অধিকার করে (১৫০১ খৃ.)। মাকারস্কা বিজয় সম্পর্কে দ্র. V. Trpkovic, Vilajet Primorje, in Godisnjak Drustva Istoricara B. i.H., xiv [1963], 229-37।

১৫০৩ খৃ. গোড়ার দিকে স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির সুফল বাস্তব ক্ষেত্রে অতি সামান্যই দেখা গেল; তুর্কী সৈন্যরা ডালমেশিয়া এলাকা আক্রমণ করিয়া চলিল ঃ ১৫০৭ খৃ. তাহারা স্পলীট, ১৫০৯ খৃ. ওমিস, ১৫১২ খৃ. স্ক্রাডিন আক্রমণ করিল; ১৫১৩ খৃ. তাহারা (পোসুসৃজি [Posusje]-এর অন্তর্গত) চাচভিনা (Cacvina), (সেটিনা নদীর তীরবর্তী) নুটজাক (Nutjak) ও (ইমোটস্কির নিকটস্থ) ভীর (Vir) দখল করিল; ১৫১৪ খৃ. স্ক্রাডিন ও নীল আক্রমণ এবং কারীন (Karin) অধিকার, ১৫১৫ খৃ. ক্লীস্ (Klis) দুর্গ আক্রমণ, ১৫২০ খৃ. স্পলীট এলাকা দখল; ১৫২২ খৃ. তুর্কী সৈন্যরা বোস্নিয়ার খ্যাতিমান সানজাক-বেগ (জিলা শাসনকর্তা) খসরু বেগের (দ্র.) নেতৃত্বে পুনরায় ক্লীস্ অবরোধ করে এবং কনীন (Knin) (তু. V. Klaic, Knin za turskoga vladanja (1522-1688), in Serta Brunsmidiana, 1928, 257-62) ও স্ক্রাডিন অধিকার করে। ১৫২৩ খৃ. তুর্কিগণ ভেলিবিটের দক্ষিণের সমস্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিশালী শক্ত ঘাঁটি অস্ট্রোভিকা (Ostrovica) দখল করে এবং নাদিন (Nadin) ও ভ্রানা (Vrana) বিধ্বস্ত করে, ১৫২৪ খৃ. তাহারা সিন্জ দখল করে (কোন কোন লেখকের মতে সিন্জ শহর তুর্কীদের দখলে আসে মে-জুন ১৫১৩ খৃ.; তু. H. Sabanovic, Evlija Celebi, Putopis,Sarajevo, Svjetlost 1967, 151 n. 14); ১৫২৬ খৃ. গাবেলা প্রভৃতি এলাকা তুর্কীদের দখলে আসে।

অতএব দেখা যাইতেছে, ১৫২৪ খৃ. পর ক্লাস্ ও অবরোভ্যাক দুর্গ দুইটি ব্যতীত সেটিনা ও যরমাঞ্জা (Zrmanja) নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সমগ্র পশ্চাদভূমি (Hinterland) তুর্কীদের দখলে আসে। তাহারা ১৫৩১ খৃ. পুনরায় ক্লীস্ অবরোধ করে এবং ১৫৩৭ খৃ. ইহা চূড়ান্তভাবে অধিকৃত হয়; অবরোভাক দখল আগেই সম্পন্ন হয় (১৫২৭ খৃ.)। অন্যদিকে ডালমেশিয়ায় ভেনিসীয়দের অধিকারে থাকে কেবলমাত্র দ্বীপগুলি, ভেলিবিটের দক্ষিণের একটি সংকীর্ণ উপকূল ভূমি এবং (বসিলজিনার ত্রিকোণ ভূমি বাদে) ওমস্ ও নভিগ্রাডের মধ্যবর্তী এলাকাটি।

এই আমলের আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হইতেছে (সামন্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে) পুচানীদের (Pucani) গণবিদ্রোহ। বিগত শতাব্দীগুলিতেও অনুরূপ অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়; পুচানী বিদ্রোহসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হইতেছে ১৫১০ খৃ. সাইবেনিকের অভ্যুত্থান; তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহের ঘটনা হইতেছে হভার (Hvar) দ্বীপের মহাবিদ্রোহ (১৫১০-১৪ খৃ.) যাহার প্রচণ্ড

প্রতিক্রিয়া কেবল সুজীট সাইবেনিক ও যাদারেই নহে, ডালমেশিয়ার অন্যান্য বহু অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে।

তুর্কীদের ক্লীস্ দুর্গ অধিকার (১৫৩৭ খৃ.) ও ওমিস্ অবরোধের পর পুনরায় ভেনিসীয়-তুর্কী যুদ্ধ (১৫৩৭-৪০ খৃ.) বাঁধিয়া যায়। এই নূতন যুদ্ধ (স্পলীট) এই সময় হইতে জাদ্রো (Jadro) নদী ইহার সীমানারূপে নির্ধারিত হয়; ট্রোগির সাইবেনিক ও যাদার এলাকায় ধ্বংস ডাকিয়া আনে এবং ভ্রানা ও নাদিন বিধ্বস্ত হয় (১৫৩৭-৮ খৃ.)। ('উছমানী শাসনামলে ভ্রানা শহর সম্পর্কে দ্র. S. M. Traljic, Vrana pod turskom upravom, in Radovi JAZU, ix, [Zadar, 1962], 337-58; ঐ লেখকে Vrana injeni gospodari u doba turske vladavine, in Radovi, XVIII [Zadar 1971], 343-77)। এদিকে ভেনিসীয়গণ স্বল্পকালের জন্য স্ক্রাডিনের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করিয়া শহরটি লুণ্ঠন করে। অল্পকাল পরে ১৫৪০ খৃ. পল্‌জিকা (Poljica) এলাকা তুর্কীদের দখলে চলিয়া যায় এবং তাহারা ইহাকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করে (তু. A. Suceska, O Polozaju Poljica u Osmanskoj drzavi, in Prilozi za orijentalnu filologiju, xvi-xvii [Sarajevo 1966-7 (1970)] 77-91; ঐ লেখক, O drzavno-pravnom polozaju Poljica pod turskom vlascu, in Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, xvii/3-4 [1967], 386-94; ঐ লেখক, O polozaju Poljica u osmanskoj drzavi, in Plijicki Zbornik, ii. 1971], 61-75; ঐ লেখক, O posjedovnim odnosima u poljicama u svjetlu poljickih turskih isprava, in Godinjak Pravnog Fakulteta, xxii, [Sarajevo 1974], 411-22)। সম্ভবত এই আমলে, তবে নিশ্চিতরূপে ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, সেনজ-এর দক্ষিণে রাব (Rab) দ্বীপের বিপরীতে অবস্থিত ক্ষুদ্র শহর জাবল্যান্স (Jablance) ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী শতাব্দীর পূর্বে আর ইহার পুনর্গঠন শুরু হয় নাই (সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্র. G. Stanojenic, Dalmacija i crnogorsko Primorje u vrijeme mletackoturskog rata 1537-39 godine, in Istorijski Glasnik, Belgrade 1960/3-4, 87-112)।

১৫৩৯ খৃ. তিন মাস যুদ্ধবিগ্রহ স্থগিত থাকার পর ১৫৪০ খৃ. অকটোবরে যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, উহার ফলে তুর্কীগণ পূর্বে যেই সমস্ত এলাকা দখল করিয়াছিল ঐগুলি তাহাদিগের নিকট ছাড়িয়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া তুর্কীরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণও পায়।

এই সন্ধিচুক্তি ৩০ বৎসরকাল স্থায়ী হয়। এই সময়ের মধ্যে প্রায় শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্দশা মোচনের চেষ্টা করা হয়। ফলে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি ও পশু পালনের উন্নতি হয়; প্রধানত অধিকৃত এলাকা হইতে পলাইয়া আসা লোকজনের আগমনের ফলে ইহা সম্ভব হয়; মৎস্য শিকারেরও উন্নতি হয়, তবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরদের কাজকর্মের ততটা সুবিধা হয় নাই।

কিন্তু এই সন্ধিচুক্তিও ছিল ভঙ্গুর; উস্‌কোসি (Uskoci) নামে পরিচিত হানাদাররা প্রতি দিনই তুর্কী এলাকায় হামলা চালাইয়া ইহা লঙ্ঘন করিত; এই হানাদাররা ছিল গেরিলা কম্যাণ্ডো দল, ডালমেশিয়ার (প্রধানত সেনজ-এ (Senj) অবস্থিত) ঘাঁটি হইতে ইহারা তুর্কী-বিজিত এলাকসমূহে সামরিক অভিযান চালাইত। সমুদ্রপথে তুর্কীরা ছাড়া অন্যরাও ইহাদের জলদস্যুবৃত্তির শিকার হইত। ইহা ছাড়া উসকোসি গেরিলারা ভেনিসীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতেও ইতস্তত করিত না; আর খুব তীব্রভাবে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত, তবে প্রয়োজনের সময় আবার তাহাদের নিকট সাহায্যের আবেদনও করিত (তু. V. Vinaver, Senjski Uskoci i Venecija do Kiparskog rata, in Istorijski Glasnik, 1954/3-4, 43-66; G. Stanojevic, Priloszi za istoriju Senjskih Uskoka, in Ist. Gl, 1960/1-2, 11-141; ঐ লেখক, Jedan dokumenat o senjskinm Uskocima, in Vesnik Vojnog Museja JNA, vi-vii [Belgrade 1962], 97-108; এবং ঐ লেখকের সুবৃহৎ রচনা Senjski Uskoci, Belgrade 1973; এতদ্ব্যতীত দুই খণ্ডে প্রকাশিত সেরেস্তার কাগজপত্র ঃ B. Desnica প্রকাশিত Istorija Kotarskih Uskoka, Belgrade, SANU, 1950-1 এবং S. Pavicic প্রকাশিত Raseljavanje staroga stanovnistva senja i okolice, nastanjivanje uskoka i njihovo djelovanje, in Senjski Zbornik, ii [Senj 1967-8], 324-70)।

এই সময় শহরগুলিতে ডালমেশীয় সংস্কৃতির এক আশ্চর্য বিকাশ ঘটে, বিশেষত ল্যাটিন বা স্থানীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্য ক্ষেত্রে এই প্রস্ফুটন ছিল খুবই লক্ষণীয়। এই আমলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ লেখকবৃন্দ হইতেছেন মার্কো মারুলিক (Marko Marulic, ১৪৫০-১৫২৪ খৃ.), হানিবাল লুসিক (Hanibal Lucic, ১৪৮৫-১৫৫৩ খৃ.), পিটার হেক্টোরোভিক (Petar Hektorovic, ১৪৮৭-১৫৭২ খৃ.) ও অন্যরা। এই আমলের আরও তিনজন লেখক ইঁহাদের সমান খ্যাতিমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের রচনাবলী অধিকতর মনোযোগের দাবিদার। কারণ তাঁহাদের বহু সাহিত্য রচনা তুর্কীদের সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণায় নিবেদিত হইয়াছে; এইজন্য তাঁহাদিগকে "যুগোশ্লাভ প্রাচ্যবিদ্যার" পূর্বপুরুষ বলা যাইতে পারে। এই তিনজন গ্রন্থকার হইতেছেন ঃ রাগুসাবাসী ফেলিক্স পেটান্চিক (Felix Brutus Petancius, de Petancis, Petancius, Ragusinus Dalmata) আনু. ১৪৫৫ খৃ.-আনু. ১৫১৭ খৃ.); রাগুসাবাসী লুডোভিক্ ক্রাইজেভিক টিউবারন (Ludovik Crijevi Tuberon, Ludovicus, Aloysius de Ceraa, de Crieva, Cervarius, Tubero) [১৪৫৯-১৫২৭ খৃ.] এবং সাইবেনিকের আন্টুন ভ্রান্চিক (Antun Vrancic, Verantius, Varantius, Wrantius, Vrancich), ১৫০৪-৭৩ খৃ.)।

এই লেখকগণের প্রথমজনের রচনাবলীর মধ্যে আছে ঃ (১) Historia imperatorum regni Turcici (or Historia Turcica), ইহার পাণ্ডুলিপি নুরেমবার্গে রক্ষিত আছে; (২) De itineribus in turciam... (or...Quibus itineribus Turci sint aggrediendi...), সম্পা. Quibus tiineribus turci sint aggrediendi..), সং. Vienna 1522; (৩) Genealogia turcorum imperatorum.. (or Desciptio Turcicae), ইহার পাণ্ডুলিপি বুদাপেস্টে আছে (দ্র. D. Kniewald, Feliks Petancic i njegova djela, Belgrade, SANU, 1961; M. Kurelac, Enciklopedija Jugoslavije, vi 474)।

দ্বিতীয় লেখকের রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য (১) De turcarum origine, moribus et rebus gestis commentarius, সং.

Florence 1590; (2) commentariorum de rebus, quae temporibus eius in illa Europae parte, quam pannonni et Turcae eorumque finitimi incolunt, gestae sunt, libri xi, প্রথম সং. Frankfurt 1603, দ্বিতীয় সং. (শিরোনাম ঃ Syndromus rerum Turcico-Pannonicarum) Frankfurt 1627, তৃতীয় সং, প্রকাশিত ঃ J. G. Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricum, ii, 107-381; চতুর্থ সং. Dubrovnik 784 (দ্র. K. Kristic, in Enc. Jug, ii, 390-1)।

তৃতীয় লেখকের (ইনি নিজে কয়েকবার তুরস্ক সফর করেন এবং সেইখানে চার বৎসর বসবাস করেন) রচনাবলীর মধ্যে আছে ঃ (১) Iter Buda Hadrianopolim anno MDLIII..., সং. Venice 1774; (2) Diarium legationis nomine Maximiliani II...ad portam ottomanicam suscepta, a. C. 1567. সম্পা. ও প্রকাশিত M. G. Kovacich, Scriptores rerum Hungaricarum, Budae 1798; (৩) Ratio itineris in Turciam facti per Danubiam, সম্পা. ও প্রকাশিত, ঐ; (৪) Expeditionis Solymani in Moldaviam et Transylvaniam, সং. Budapest 1934 (দ্র. M. Kurelac, in Enc.Jug., viii, 534-5)।

(খ) সাইপ্রাস যুদ্ধ (১৫৭০-৩ খৃ.) হইতে ক্রীটের যুদ্ধ (১৬৪৫-৬৯ খৃ.) পর্যন্ত।

১৫৬৯ খৃ. ভেনিস সাইপ্রাস দ্বীপটি 'উছমানী সাম্রাজ্যের অধীনে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করায় পুনরায় তুরস্কের সহিত ভেনিসের যুদ্ধ বাঁধে; ১৫৭০ খৃ. হইতে ১৫৭৩ খৃ. পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। এই সময় লেপান্টোর যুদ্ধে (Battle of Lepanto) (অক্টোবর ১৫৭১ খৃ.) তুর্কী নৌবহর প্রচণ্ড পরাজয় বরণ করিলেও যুদ্ধের ফলাফল ডালমেশিয়ার প্রতিকূলে যায়; এই যুদ্ধে ডালমেশীয় নাবিকসহ কতিপয় ডালমেশীয় জাহাজও অংশগ্রহণ করে (দ্র. Lepantska bitka. Udio hrvatskih pomoraca u Lepantskoj bitki 1571 godine, Zadar JAZU, 1974)। বস্তুত ডালমেশিয়ায় ভেনিসীয়দের এই বিজয় কোন কাজে আসে নাই; ১৫৭১ খৃ. তাহারা ক্লীস্ অবরোধ করে এবং ১৫৭২ খৃ. স্বল্পকালের জন্য ইহা দখলে রাখে। অনুরূপভাবে স্ক্রাডিনও ভেনিসীয়রা দখল করে, কিন্তু শীঘ্রই দুর্গ-প্রাকারাদি আংশিক ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহারা ক্লীস্ ছাড়িয়া যায়। তাহারা মাকারস্কাও অবরোধ করে, কিন্তু দখল করিতে ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে তুর্কীরা মিজেট (Mljet) দ্বীপ লুণ্ঠন করে (১৫৭২ খৃ.), করচুলা (Korcula) দ্বীপ আক্রমণ করে (তু. V. Foretic, Turska opsada Korcule godine 1571, in Vesnik Vojnog Muzeja, v/2 [Belgrade 1958] 61-91), হভার (Hvar) দ্বীপ জ্বালাইয়া দেয়, কয়েকবার স্পলীট অঞ্চলটি বিধ্বস্ত করে (এই সময় তাহারা সোলিন [Solin] ও কামেন [Kamen] শহর দখল করিয়া নেয় [তবে অন্য সূত্রমতে কামেন দখল করা হয় বহু পূর্বে, ১৫৩৭ খৃ., দ্র. H. Sabanoec পূ. গ্র., 155, n. 37])। তাহারা ট্রোগির সাইবেনিক ও যাদার এলাকাগুলিও বিধ্বস্ত করে এবং যেমুনিক (Zemunik) অধিকার করে (অন্য সূত্র অনুযায়ী তুর্কীরা যেমুনিক দখল করে ১৫৩৯ খৃ.; তু. H. Sabanovic, পূ গ্র., 162 n. 92), নভিগ্রাড অবরোধ করে এবং স্বল্পকালের জন্য নীন (Nin) দখল করিয়া লয় (নীন শহর সম্পর্কে তথ্যের জন্য দ্র. S. M. Traljic, Nin pod udarom tursko-mlatckih ratova, in Radovi...Zadar 1969, 529-48)। মার্চ ১৫৭৩ খৃ. স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির ফলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেকার অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু তুর্কীরা যেমুনিক ও সোলিন-এর চতুর্দিকের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি নিজ দখলে রাখিয়া দেয়। এইখানে উল্লেখ্য যে, একদল উস্কোক (Uskoks) গেরিলা ও স্কিলীটের জনসাধারণের একটি সম্মিলিত দল এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ক্লীস্ দুর্গ দখল করে (৭ এপ্রিল-৩১ মে, ১৫৯৬ খৃ.); সমগ্র ডালমেশিয়ায় এই বীরোচিত অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

এই সমস্ত দুঃখজনক ঘটনার পর এবং সীমান্ত এলাকায় অনবরত ছোটখাটো সংঘর্ষ চলিতে থাকা সত্ত্বেও ডালমেশিয়ার (তুর্কী অধিকৃত ও ভেনিস অধিকৃত) দুই অঞ্চলের মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমশ আরও সঠিক ও স্বাভাবিক হইয়া আসে। তুর্কী অধিকৃত ডালমেশিয়ার পশ্চাদ্‌ভূমি এলাকার সহিত ভেনিসীয় ডালমেশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়; বলকান এলাকার বাহিরের দেশসমূহের সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। এই ক্ষেত্রে, বিশেষত ১৫৯২ খৃ. পরবর্তী কালে স্পলীট বন্দর একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে (দ্র. V. Morpurgo, Daniel Rodriguez i osnivanje splitske skele u XVI stoljecu, in Starine JAZU, liii [1966], 364-415)।

তবে ট্রোগির ও যাদার প্রভৃতি অন্যান্য শহরও 'উছমানীদের সহিত ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তোলে। ইহারা প্রধানত লবণ বিক্রয় করিত; আর গম, গোশ্‌ত, পনির ও পশম ক্রয় করিত (দ্র. S. Traljic, Trgovina Bosne i Hercegovine S lukama Dalmacije i Dubrovnika u XVII i XVIII stoljecu, in Pomorski Zbornik, i [Zadar 1962], 341-71) সম্পর্কের এই স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া ১৫৭৩ খৃ. হইতে ১৬৪৫ খৃ. পর্যন্ত প্রায় সত্তর বৎসর অর্থাৎ ক্রীটের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

(গ) ক্রীটের যুদ্ধ (১৬৪৫-৬৯ খৃ.) হইতে ১৮৮৩ খৃ. পর্যন্ত। ১৬৪৫ খৃ. বসন্তকালে এই দীর্ঘকালীন শান্তি ভঙ্গ হয় ভেনিস ও তুরস্কের মধ্যে এক নূতন যুদ্ধ শুরু হওয়ার মধ্য দিয়া, যে যুদ্ধ প্রায় পঁচিশ বৎসর স্থায়ী হয়। ইতোমধ্যে 'উছমানী সাম্রাজ্যের (যাহার উন্নতির তুঙ্গে অবস্থান বহুদিন পূর্বেই গত হইয়াছিল) অভ্যন্তরে এবং য়ুরোপে উভয় এলাকাতেই বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু এই নূতন যুদ্ধের ফলাফলও ডালমেশিয়া ব্যতীত অন্যত্র 'উছমানীদের অনুকূলে যায়।

ডালমেশিয়া ভূখণ্ডে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয় ১৬৪৬ খৃ. ও ১৬৪৯ খৃ.-এর মধ্যবর্তী সময়ে। ১৬৪৬ খৃ. 'উছমানীরা উত্তর ডালমেশিয়ার সাইবেনিক ও যাদার এলাকায় এক অতর্কিত আক্রমণ চালায়। তুর্কীরা নভিগ্রাড দখল করিয়া লয় (৩ জুলাই, ১৬৪৬), বায়োগ্রাড ও নীনও তাহাদের অধিকারে আসে; কিন্তু সাইবেনিকের উপর তুর্কী আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয় (অক্টোবর ১৬৪৬)। পাল্টা আক্রমণের মুখে ভেনিসীয় ও ডালমেশীয়রা স্ক্রাডিন অবরোধ করে এবং ১৬৪৭ খৃ. স্বল্পকালের জন্য ইহা পুনর্দখল করিয়া লয়। ১৬৪৬ খৃ. পল্‌জিকা অঞ্চল এবং ফেব্রুয়ারী ১৬৪৭ খৃ. মাকারস্‌কো প্রাইমোরজি (সেটিনা ও নেরেটভা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী উপকূল) এলাকা 'উছমানী সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভেনিসের সঙ্গে যোগ দেয় (তবুও অল্‌জিকা এলাকাটি আরও কিছুদিন তুরস্ককে 'খারাজ' [রাজস্ব] দিতে বাধ্য হয়)। (১৭শ শতাব্দীতে পল্‌জিকার মর্যাদা সম্পর্কে দ্র. v. Mosin, Poljicke Konstitucije iz 1620 i 1688, in Radovi

Staroslovenskog Instituta JAZU, i [Zagreb 1952], 175-206)।

১৬৪৭ খৃ. ভেনিসীয়রা (তাহাদের সৈন্যদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ 'উছমানী এলাকা হইতে আগত ডালমেশীয় ও স্লাভদের লইয়া গঠিত ছিল) যেমুনিক্, নভিগ্রাড, ভ্রানা ও নাদিন শহর পুনর্দখল করে এবং সাইবেনিকের বাহিরে তুর্কীদিগকে তাহারা আরও একবার হারাইয়া দেয় (আগস্ট ১৬৪৭ খৃ.)। অতঃপর অস্ট্রোভিকা, অব্রোভাক এবং স্বল্পকালের জন্য ড্রনিস (Drnis) [এইখানকার সমস্ত তুর্কী দুর্গপ্রাকার ও সৌধ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়] পুনরুদ্ধার করিয়া ভেনিসীয়রা নীন (Knin) ও ভারলিকা (Vrlika) আক্রমণ করে এবং বায়োগ্রাডের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে (১৬৪৮ খৃ.)। তবে তাহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সূচিত হয় বিখ্যাত ক্লীস্ দুর্গের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারে (৩০ মার্চ, ১৬৪৮)। 'উছমানীদের প্রতিক্রিয়াও বিলম্বিত হয় নাই; অল্পকাল পরই তুর্কী বাহিনী পাল্টা অভিযান চালাইয়া পল্‌জিকা ও বায়োগ্রাডের সন্নিকটবর্তী রাভ্‌নী কোটারী (Ravni Kotari) অঞ্চলদ্বয় বিধ্বস্ত করে।

পরিশেষে ১৬৪৯ খৃ. ডালমেশিয়ায়, বিশেষত সাইবেনিক ও যাদারে প্রথমে প্লেগ মহামারী ও পরে ব্যাপক দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় বড় রকমের সামরিক অভিযান বন্ধ হইয়া যায় (দ্র. G.Stanojevic, Dalmacija u doba Kandijskog rata 1645-1669, in Vesnik Vojnog Muzeja JNA, v [Belgrade 1958], 93-182; ঐ লখক, Trgovina robljem u doba Kandijshog rata, 1645-69, in Istorijski Glasnik, 1958/3-4, 105-112; D. Keckemet, Dva odlomka iz "Povijesti Kandijskog rata u Dalmacij" Sibenicanina Franie Divnica (Difnika) in Mogucnosti, xx [Split 1973], 876-88; S. M. Traljic, turskomletacke granice u Dalmaciji u XVI i XVII Stoljecu, in Radovi Inst. JAZU, xx (Zadar 1973], 447-58)।

ইহার কিছুকাল পূর্বে বিপুল সংখ্যক ভ্লাসি (Vlasi, একবচনে ভ্লাহ [Vlah] বা মোর্‌লাসি (Morlaci, একবচনে মোরলাক (Morlak)) বলিয়া অভিহিত স্লাভ জাতীয় লোকদিগকে হিজরত করিয়া ডালমেশিয়া ভূখণ্ডের দিকে আসার বিবরণ পাওয়া যায়;ইহারা সকলেই ছিল সশস্ত্র লোক, প্রতিদিনই ইহারা (হাজ্‌ডুসি [hajduci], একবচনে হাজ্‌ডুক [hajduk] এবং উস্‌কোসি [uskoci], একবচনে উস্‌কক [uskok] নামে পরিচিত) গেরিলা কম্যাণ্ডো দলগুলির সংখ্যা স্ফীতি ঘটাইতে থাকে। এই গেরিলা কম্যাণ্ডো দলগুলি লিকা, বস্‌নিয়া ও হার্‌যেগোভিনায় 'উছমানী এলাকায় অবিরাম আক্রমণ ও অতর্কিত হাম্‌লা চালাইয়া বহুদূর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত এবং যাত্রাপথে লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী হরণ প্রভৃতি দুষ্কর্মে লিপ্ত হইত। একই সময়ে হাজ্‌ডুসি ও উচ্‌কোসি গেরিলারা কখনও ভেনিস, কখনও অস্ট্রিয়ার প্রতি পক্ষপাতমূলক নীতি অনুসরণ করিত, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অস্ট্রিয়ার প্রতিই তাহারা অধিক পক্ষপাতী ছিল। এইরূপে সীমান্তের উভয় পার্শ্বেই একটি স্থায়ী ক্ষুদ্র যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করিতে থাকে; যুগোস্লাভিয়ার (মুসলমান ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ের) লোককাব্যেই এই পরিস্থিতির সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। এইসব কাব্যকাহিনীতে যে সকল বীর যোদ্ধার কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা সকলেই সুবিদিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব (হাজ্‌ডুকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ D. Popovic, O Hajducima, Belgrade 1930-1, 2 vols. এবং R Samardzic, Hajducke borbe protiv Turaka u XVI i XVII veku, Belgrade 1952)।

বড় রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রেক্ষিতে এইখানে উল্লেখ্য, নীনের বাহিরে একটি যৌথ ভেনিসীয়-ডালমেশীয় বাহিনী তুর্কীদের নিকট পরাজয় বরণ করে (১৬৫৪ খৃ.) এবং স্পলীটের উপর একটি আক্রমণের (১৬৫৭ খৃ.) পর তুর্কী সৈন্যরা ব্রাক (Brac) দ্বীপে হাম্‌লা চালায় এবং স্পলীট, সাইবেনিক ও যাদারে অভিযান চালাইয়া (১৬৫৭-৮ খৃ.) ঐসব এলাকার ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

১৬৭১ খৃ. একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ডালমেশিয়ায়। তখন ভেনিসীয়দের অবস্থান অধিকতর অনুকূল ছিল; কারণ তখন তাহারা ক্লীস্ ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকা, পল্‌জিকা অঞ্চল এবং ওমিসের ভেনিসীয়দের অবস্থান অধিকতর অনুকূল ছিল। কারণ এখন দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল এলাকা (মাকারস্কো প্রাইমোরজি) নিজেদের দখলে রাখে (এইখানে উল্লেখ্য, আইনত এই শেষোক্ত এলাকাটি 'উছমানীদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কথা, কিন্তু কার্যত উহা ভেনিসের দখলে চলিয়া যায়)। এখান হইতে ভেনিসের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমগ্র ডালমেশীয় এলাকা "acquisto vecchio' এবং তুরস্কের সহিত ইহার সীমান্ত 'linea Nani' নামে একটি সুরক্ষিত সীমারেখায় পরিণত হইল (১৬৭১ খৃ.; দ্র. I. Grcic, Jedna mletacka agarna rperacija u Dalmaciji, in Zadarska Revija, ii [Zadar 1953], 65-76; V. Omasic, Mletacko-tursko razgranicenje ns trogirskom podrcju makon Ciparskog i Kandijskog rata i njegove posledie, trogir 1971)।

এই শান্তিচুক্তির ফলে সূচিত শান্তিপূর্ণ অবস্থা প্রায় ১৫ বৎসরকাল স্থায়ী হয়। মহামারী ও দুর্ভিক্ষের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক দুর্দশা-দুর্গতির কথা বাদ দিলেও সুদীর্ঘকালীন যুদ্ধ-বিগ্রহের ধ্বংসলীলার পর দেশ পুনর্গঠনের জন্য এই সময় যথেষ্ট ছিল না; দেশের বিধ্বস্ত কৃষি ও বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করাও ছিল অসম্ভব। যাহা হউক স্পলীট বন্দর ইটালী ও বল্‌কান্ উপদ্বীপের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে দ্রুত তাহার হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিয়া লয়। এই সময় যাদার বন্দরের গুরুত্ব ছিল গৌণ।

এই আমলের 'উছমানী সামরিক অভিযান ও সাধারণভাবে ডালমেশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে একেবারে সরাসরি সংগৃহীত এক বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বিখ্যাত তুর্কী পর্যটক আওলিয়া চেলেবী [চেলেবী ১৬৬০ খৃ. কাছাকাছি সময়ে এই অঞ্চল সফর করেন] তাঁহার রচিত গ্রন্থ সিয়াহাত-নামায়, ৫খ, ৪৫৮-৭২, ৪৭৬-৭৮, ৪৮০-৯১, ৪৯৪-৫০০ (দ্র. বিশদ টীকা সম্বলিত ফরাসী তরজমা ঃ H. Sabanovic, E. C. Putopis, Sarajevo, Svjetlost 1967, 149-67, 175-91, 195-204)।

(ঘ) ১৬৮৩ খৃ. হইতে স্রেমস্কি কারলভসি চুক্তি (Treaty of Sremski Karlovci) [২৬ জানুয়ারী, ১৬৯৯] পর্যন্ত।

ভিয়েনা নগরীর বহিঃপ্রাচীরের পাদদেশে 'উছমানীদের চূড়ান্ত পরাজয় (সেপ্টেম্বর ১৬৮৩) ডালমেশিয়া হইতে তাহাদের বিদায়ের সংকেত ঘোষণা করে; ডালমেশিয়ায় এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীরা আতঙ্কিত হইয়া সাম্রাজ্যের

অভ্যন্তরভাগে পলায়ন করে এবং অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র উত্তর ডালমেশিয়ায় তুর্কী শাসনের অবসান হয়; ১৬৮৩ খৃ. শেষ হওয়ার পূর্বেই স্ক্রাডিন, ভ্রানা, কারিন, বেন্‌কোভ্যাক্, অবরোভ্রাক্ ও ড্রনিচ্ (Drnic) বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়; তুর্কীদের দখলে থাকে শুধু নীল ও সিন্‌জ শহর দুইটি।

পর বৎসর (১৬৮৪ খৃ.) বসন্তকালে ভেনিস যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং খোদ ডালমেশিয়ায় বহু সংখ্যক সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। সেপ্টেম্বর ১৬৮৬ সিন্‌জ তুর্কীদের হাতছাড়া হয়, ১৬৮৮ খৃ. তাহারা নীন, ভারলিকা ও ভনিগ্রাড (Zvonigrad) হারায়, ১৬৯০ খৃ. হইতে ১৬৯৪ খৃ.-এর মধ্যে ভারগোর‍্যাক (Vrgorac) এবং ১৬৯৩ খৃ. গাবেলার পতন ঘটে; ট্রোগির, সাইবেনিক ও যাদার এলাকায় চূড়ান্তভাবে তুর্কী শাসনের অবসান হয়।

জানুয়ারী ১৬৯৯ স্রেমেস্কি কার্লভসিতে (SremskiKarlovci) শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভেনিস তাহার বিজিত এলাকাগুলি নিজ দখলে রাখে এবং ডালমেশিয়ায় তাহার অধিকৃত এলাকা নূতন সুরক্ষিত সীমান্ত এলাকা অর্থাৎ নীন-বারলিকা-সিন্‌জ-জাদ্‌ভারজী-ভার্‌গোর‍্যাকগাবেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। অধিকন্তু এই সমস্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি ঘাঁটির চতুর্দিক সৈন্যদের একদিনের মার্চের দূরত্বের সমপরিমাণ নিরপেক্ষ এলাকা বেষ্টিত থাকিবে বলিয়া স্থির হয়। ইহার পরিবর্তে ভেনিস 'উছমানীদের নিকট হার্যেগোভিনায় তাহার বিজিত এলাকাগুলি ছাড়িয়া দিল। এইদিকে অস্ট্রিয়ার সমর্থনপুষ্ট হইয়া ডুব্রভনিক প্রজাতন্ত্র (Republic of Dubrovnik) ভেনিসীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হয়, যদিও চুক্তির শর্ত অনুসারে তুরস্ক আড্রিয়াটিক সাগরে প্রবেশের দুইটি সংকীর্ণ করিডর পায়। ইহার একটি হইল দক্ষিণে সুটোরিনা (Sutorina) [হার্যেগনভির নিকটে], অপরটি উত্তরে অবস্থিত নিউম-ক্লেক (Neum-Klek); শেষোক্তটি ছিল মাত্র ৯ কিলোমিটার দীর্ঘ অতি ক্ষুদ্র একটি উপসাগর নেরেটভা নদীর মোহনার দক্ষিণে অবস্থিত (সাধারণভাবে এই আমল সম্পর্কে দ্র. G. Stanojevic, Dalmacija u doba Morejskog rata 1684-1699, Belgrade, Vojno Delo, 1962; ডালমেশিয়া ও তুর্কী পাশা শাসিত বসনিয়ার মধ্যকার নূতন সীমান্তরেখা সম্পর্কে দ্র. E. Kovacevic, Granice bosanskog pasaluka prema Austriji i Mletackoj republici prema odredbama Karlovackog mira, Sarajevo 1973)।

(ঙ) ১৬৯৯ খৃ. হইতে পোজারিভ্যাকের সন্ধি (Peace of Pozarevac) [২১ জুলাই, ১৭১৮] পর্যন্ত।

খৃ. ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভেনিস-অধিকৃত ডালমেশিয়ার সর্বত্র গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয় (দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৬৯২ খৃ. ভ্রানা অঞ্চলের অভ্যুত্থান এবং ১৭০৪ খৃ. বুকোডিকা ও রাভ্‌নী কোটারী অঞ্চলের অভ্যুত্থান); ইহার আংশিক কারণ ছিল কৃষককুলের চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং আরও কারণ ছিল প্রাচ্যদেশীয় খৃস্টান চার্চের প্রতি রোমান ক্যাথলিক চার্চের আক্রমণাত্মক নীতি।

ডিসেম্বর ১৭১৪ খৃ. তুর্কীদের সহিত ভেনিসীয়দের এক নূতন যুদ্ধ বাধিয়া যায়; প্রধানত অস্ট্রিয়ার পরোক্ষ সাহায্যের দরুন ভেনিস ডালমেশিয়ায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কয়েক স্থানে সাফল্য অর্জন করে; ১৭১৫ খৃ. সিন্‌জ শহর উছমানীদের সর্বশেষ অবরোধ প্রতিহত করে এবং ১৭১৭ খৃ. ভেনিসীয় ডালমেশীয় বাহিনী সুনির্দিষ্টভাবে ইমোটস্কী (Imotski) শহর পুনর্দখল করে। ইহা ছাড়া হার্‌যেগভিনায় ভেনিসীয়দের সাফল্যও ডালমেশিয়ায় তাহাদের সামরিক বিজয়ের সহায়ক হয়। হার্‌যেগভিনায় ভেনিসীয়রা ১৭১৭ খৃ. মোস্তার (Mostar) শহর দখল করে (তু. G. Stamojevic, Dalmacija za vreme mletacko-turskog rata 1714-1718, in Istorjski Glasnik, 1962/1-4, 11-49; s. M. Traljic, Turskomletacko susjedstvo na Zadarskj Krajini XVIII. stoljeca, in Radovi JANU, iv-v [Zadar 1959] 409-24; M. Perojevic_T. Macan, ODjek Beckog rata na Makarskom Primorju i u Hercegovini 1683-1723, in Historijski Zbornik, xxiii-xxiv [zagreb 1970-1], 179-214)।

পোজারিভ্যাক শান্তিচুক্তির (জুলাই ১৭১৮) শর্ত অনুসারে ভেনিসকে গাবেলা শহরসহ হার্‌যেগভিনায় তাহার খণ্ড বিজিত এলাকা তুরস্কের নিকট ছাড়িয়া দিতে হয়। তবে ডালমেশিয়ার ইমোট্‌স্কী (Imtski) অঞ্চলটি ভেনিসের অধিকৃত এলাকার সহিত যুক্ত হওয়ায় উহার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ১৬৯৯ খৃ. সীমান্তরেখার কিছু রদবদলের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে নিউমক্লেক ও সুটোরিনা করিডর দুইটি ছাড়া সমগ্র ডালমেশিয়া তুর্কীদের হাতছাড়া হইয়া ভেনিসের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া যায় (দ্র. একক বিবরণী, রচয়িতা G. Skrivanic, Dnevnik Dubrovcanina Mihajla Pesica o Pozarevackom mirovnom kongresu 1718 godine, Belgrade 1952; I. Katic, Prilike u splitskoj okolici poslije odlaska Turaka, in Starine JAZU, xlvii [1957], 237-77)।

পোজারিভ্যাক শান্তিচুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত নূতন সীমান্তরেখাটি (Linea Mocenigo 1721-3) মেট্‌কোভিক (Metkovic), ইমোটস্কী, সিন্‌জ, ভারলিকা ও নীন শহরের পূর্বদিক দিয়া ক্লেক (Klek) ও যাব্‌সকা গোরা (Zabska Gora) পর্যন্ত প্রসারিত হইল এবং ভেনিস অধিকৃত সমস্ত ডালমেশীয় এলাকা Acquisto nuovissimo নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

স্থানীয় যেই সকল মুসলিম অধিবাসী সময়মত ডালমেশিয়া ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, তাহারা অল্পকাল পরেই প্রধানত ফ্রান্সিস্‌কানদের (Franciscans) দ্বারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয় [তু. J. Cvijic, Balkansko Polustrvo[2], Belgrade 1966, 337; ইহাতে প্রদত্ত বিশদ বিবরণী সংগৃহীত হইয়াছে (১) S. Zlatovic, Franovci drzave presvetog otkupitelja i Hrvatski puk u Dalmaciji, Zagreb, 1888, 233-4, 236-7 এবং (২) M. v. Batinic, Djelovanje franjevaca u Bosni i Hercegovini za prvih sest viekova- njikova boravka, Zagreb 1881-7, ii, 147 হইতে]। বস্‌নিয়া-হার্‌যেগভিনায় হিজরতকারী ডালমেশীয় মুসলমানদের সম্পর্কে দ্র. M. Petric, O migarcijama stanovnistva u bosni i Hercegovini Doseljavanja i unutrasnja kretanja, in Glasnik Zemaljskog Muzeja,xviii (Etnog.)·[sarajevo 1963] 10-11।

গ. 'উছমানী-পরবর্তী আমল

১৭৯৭ খৃ. প্রজাতন্ত্রের বিলুপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ডালমেশিয়া ভেনিসীয় শাসনাধীনে থাকে। পরে ইহা পর্যায়ক্রমে অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের (১৭৯৭-১৮০৫ খৃ.) ও ফরাসী সাম্রাজ্যের (১৮০৫-৯ খৃ.) অংশ, পরে একটি ইলিরীয় প্রদেশ হিসাবে (১৮০৯-১৩ খৃ.) এবং পুনরায় অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যের (১৮১৫-১৯১৮ খৃ.) অংশে পরিণত হয়।

১৮৭৮ খৃ. পর হার্‌যেগভিনা (উহা ঐ বৎসরই অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়) হইতে একদল মুসলমান ডালমেশিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করে। কিছুকাল পরে তাহাদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলে অস্ট্রীয়-হাঙ্গেরী সরকার ১৫ জুলাই, ১৯১২ খৃ. ডালমেশিয়ার এই মুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়কে (হানাফী মায্‌হাবপন্থী) সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয় (দ্র. Reichgesetzblatt fur Oesterreich 1912, 875, paras 1-7; M. Begovic, Organizacija Islmske verske zajednice u Kraljevini Jugoslaviji, in Arhiv za pravne i drustvene nauke, god. xxiii, drugo kolo, knjiga xxvii (xliv) br. 5, 25 November 1933, p. 379, ঐ লেখক, Islamka verska zajednica, in enciklopedija Jugoslavije, iv, 372)।

১৯২০ খৃ. হইতে ১৯৪১ খৃ. পর্যন্ত ডালমেশিয়া যুগোস্লাভিয়া রাজ্যের অংশ ছিল; অতঃপর ১৯৪১ খৃ. হইতে ১৯৪৫ খৃ. পর্যন্ত ইহা ফ্যাসিবাদী ইতালী ও উস্‌তাচি ক্রোশীয় রাষ্ট্রের (Nexavisna Drzava Hrvatska0 মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া যায়; পরিশেষে ১৯৪৫ খৃ. হইতে ডালমেশিয়া (ক্রোশিয়া গণ-প্রজাতন্ত্রের অংশরূপে) যুগোস্লাভ ফেডারেল গণ-প্রজাতন্ত্রের অংশে পরিণত হয়।

১৯৭১ খৃ. ডালমেশিয়ায় মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল-মোটামুটি ৪,০০০ (ঐ সময় সমগ্র যুগোস্লাভিয়ায় মুসলমান নাগরিকদের সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষের কিছু বেশি। তন্মধ্যে ১৮,৪৭৫ জন বাস করিত ক্রোশিয়ায় (দ্র. K. Hadzic, Brojnost i rasprostranjenost muslimana u Jugoslaviji, in Takvim [sarajevo 1975], 119-34)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ যুগপৎ স্থানীয়, তুর্কী ও ভেনিসীয় উৎস হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির সাহায্যে 'উছমানী শাসনামলে (১৫শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত) ডালমেশিয়া সম্বন্ধে অদ্যাবধি কোন গবেষণা হয় নাই। এই কথা সত্য যে, বর্তমানে প্রাপ্ত দলীলপত্রাদির কলেবর বিরাট এবং ইহার একটি বড় অংশ (বিশেষত আর্কাইভে রক্ষিত দলীলপত্রাদি) কেবল অতি অল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ গবেষককে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। সেইজন্য স্বাভাবিকভাবে যুগোস্লাভিয়ার যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও তুর্কী বিশেষজ্ঞ অতীতে এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত সংখ্যক গবেষণাপত্র, একক বিবরণী ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের রচনাবলীই গুরুত্ব পাওয়ার দাবি রাখে। তবে এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত প্রকাশিত রচনার সিংহভাগই প্রধানত ডুব্রভ্‌নিক্ প্রজাতন্ত্রের ব্যাপারেই তাহাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। সেইজন্য কেবল ডালমেশিয়া বলিয়া নির্ধারিত এলাকা সম্পর্কে কোন গ্রন্থপঞ্জী উপস্থাপনের কাজটি খুবই দুরূহ।

ডালমেশিয়া সম্পর্কে একটি চমৎকার সাধারণ জরিপ পাওয়া যায় J. Tadic-এর গবেষণাকর্মে, দ্র. Istorija naroda Jugoslavije, ii, Belgrade 1960, 277-74, 519-30, 595-601, 1145-60। ইহাতে তথ্যাদির উৎসসমূহের মূল্যবান ও সারগর্ভ বিশ্লেষণ স্থান পাইয়াছে ('উছমানী তথ্য-উৎসগুলিও সহজ-সরলভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে) এবং বিদ্যমান তথ্যউৎসের পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীও দেওয়া হইয়াছে, তু. ২৬৬প., ৫২৮প., ১১৫৯ প.)।

১৯৪৫ খৃ.-র পর হইতে ডালমেশিয়া সম্পর্কে যুগোস্লাভিয়ায় প্রকাশিত গ্রন্থাদির একটি সহজলভ্য তালিকার জন্য দ্র. (ক) J. Tadic (ed.), Dix annees d'historiographie yorugoslave 1945-1955, Belgrade 1955, (বিশেষভাবে দ্র. 217-55, 268-71, 374-84, 410-15, 540-54, 566); (খ) J. Tadic (ed.), Historiographie yougoslave 1955-1965, Belgrade 1965 (বিশেষত 113-42, 201-20 এবং স্থা.); (গ) D. Jankovic (d.), The historiography of Yugoslavia 1965-1975, Belgrade 1975 (বিশেষত 136-59, 185-96 এবং স্থা.)।

'উছমানী ঐতিহাসিকগণ (না'ইমা-রাশীদ, পেচিবী ও অন্যরা) ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রধান ইতিহাসগুলি [von Hammer, Zinkeisen, Iorga, প্রভৃতি রচিত] ব্যতীত নিম্নোক্ত ইতিবৃত্ত গ্রন্থগুলি বিশেষ মনোযোগের দাবিদার ঃ (১) G. Cattalinich, Storia della Dalmazia, 3 vols, Zadar 1834-5; (২) S. Ljubic, Pregled hrvatske prvijesti, Rijeka 1864; (৩) V. Lago, Memorie sulla Dalmazia, Venice 1869; (৪) V. Lamansky, Secrets d'etat de Venise, St. Petersburg 1884; (৫) J. N. Tomic, Grad Klis u 1596 godini, Belgrade 1908; (৬) J. Tadic, Spanija i Dubrovnik u XVI veku, Belgrade 1932; (৭) L. Voinovitch, Histoire de Dalmatie, 2 vols, Paris 1934; (৮) J. Ravlic, Makarska i njeno Primorje, Split 1934; (৯) B. Poparic, Povijest senjskih uskoka, Zagreb 1936; (১০) G. Novak, Proslost Dalmacije, 2 vols., Zagreb 1944; (১১) A. de Benvenuti, Storia di Zara., 2 vols, Milan 1944-53; (১২) J. Radonic, Rimska Kurija i juznoslovenske zemlje od XVI do XIX veka, Belgrade 1950; (১৩) L. Bozic, Dubrovnik i Turska u XIV i XV veku, Belgrade 1952; (১৪) A. Ujevic, Imotska Krajina, Split 1953; (১৫) G. Praga, Storia di Dalmazia[2], Padua 1954; (১৬) L. Katic, Solin od VII do XX stoljeca, Split 1956; (১৭) G. Novak, Povijest Splita, 2 vols. Split 1957-61; (১৮) V. Vinaver, Dubrovnik i Turska u XVIII veku, Belgrage 1960; (১৯) R. Samardzic, Veliki vek Dubrovnika, Belgrade 1962; (২০) B. Djurdjev and M. Vasic, Jugoslovenske zemlje pod turskom vlascu do kraja XVIII stoljeca Zagreb 1962; (২১) G. Novak, Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeca, Belgrade 1962; (২২) E. Albrecht, Das Tutkenbild in der ragusanisch-dalmatinischen Literatur des XVI, Jahrhunderts, Munich 1965; (২৩) Grad Zadar, Presjek kroz povijest, Zadar 1966; (২৪) M. Sunjic, Dalmacija u XV stoljecu, Sarajevo 1967; (২৫) G. Stanojevic, Jugoslovenske zemlje u mletacko-turskim ratovima XVI-XVIII veka, Belgrade 1970; (২৬) T. Popovic, Turska i Dubrovnik u XVI veku, Belgrade 1973।

পরিশেষে এই নিবন্ধে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলির তালিকা সংযোজন করা যাইতে পারে ঃ (১) A. Stragacic, Upadi osmanskih gusara u predjele Zadarskih otoka, in Zadarska Revija, ii/4 (1953), 195-204, iii/i (1954), 44-53; (২) S. M. Traljic, Zadar i turska pozadina od XV do potkraj XIX stoljeca, in Grad Zadar (Zadar 1966), 206-28; (৩) A. J. Soldo, Prilozi proucavanju agrarnodrustvenih odnosa u Gornjem promorju od

XVI do polovine XIX stoljeca, in Makarski Zbornik (1970), 337-80; (8) A. Rube-Filipi, Biogradsko-vransko primorje u doba mletacko-turskih ratovas osvrtom na povijest naselenja, in Radovi Inst. JAZU, xix (Zadar 1972), 405-98।

A. Popovic (E. I² Suppl.)/শায়খ ফজলুর রহমান

ডাহোমী ঃ টোগোল্যাণ্ড ও নাইজেরিয়াকে সংযুক্তকারী ৪১৮ মাইল দীর্ঘ ও ১২৫ মাইল প্রশস্ত ভূখণ্ড। ইহা গিনি উপসাগরের প্রাচীনতম দেশগুলির অন্যতম। ইহার নিম্ন উপকূলভাগের প্রান্তে রহিয়াছে লবণাক্ত হ্রদসমূহ আর কেন্দ্রীয় অঞ্চল মালভূমি ও বিচ্ছিন্ন পর্বতমালা দ্বারা গঠিত। উত্তরাঞ্চল অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং ৮০০ মিটার উচ্চ সাটাকোরা পর্বতমালার ঢাল পর্যন্ত বিস্তৃত, বিশেষত দক্ষিণে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি এবং তাপমাত্রা মোটামুটি অপরিবর্তিত, যদিও সেইখানে দুইটি বর্ষা ও দুইটি শুষ্ক ঋতু রহিয়াছে। ডাহোমীর প্রায় দুই মিলিয়ন জনসংখ্যা প্রধানত ফন (কেন্দ্রীয় অঞ্চল), গাউন ও য়োরুবা (দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল), আদজা (দক্ষিণ- পশ্চিম), বারিবা, সোম্বা ও ফুলানী (উত্তরাঞ্চল) প্রভৃতি লইয়া গঠিত।

প্রধান শহর কোটোনাউ (৮৭,০০০ অধিবাসী) যদিও পোর্টোনোভো সর্বদাই প্রশাসনিক রাজধানী। সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া ডাহোমী বিশেষভাবে দাসব্যবসা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, যাহা কতৃক রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, তন্মধ্যে আবোমী উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত রাজ্য ফরাসী অনুপ্রবেশের (১৮৯২ খৃ.) বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও প্রচণ্ডতম প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ডাহোমী ১৮৯৯ খৃ. ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বিভিন্ন অংশে গিয়া বসতি স্থাপনকারী ইহার অভিজাত সম্প্রদায়ের মাধ্যমে উহার উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করে। যাহারা প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করিয়াছিল সেনেগালসহ ইহা তাহাদেরই অন্যতম। ঐ আন্দোলনসমূহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই তাহাদের শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল।

ডাহোমী বেনিন সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ইহার গিনি উপসাগরীয় প্রায় সকল প্রতিবেশীর মতই প্রবল সর্বপ্রাণবাদী (Animism) ভিত্তিক মতবাদ সংরক্ষণ করিয়াছে, যাহার উপর উহার সভ্যতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

সর্বপ্রাণবাদ যেই দেশের রাষ্ট্রধর্ম ছিল সেই দেশের ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন কোনও বিদেশী মতবাদ প্রবর্তন নিষিদ্ধ করিয়ছিল এবং আবোমী রাজ্যের পতন না হওয়া পর্যন্ত খৃস্ট ধর্মের বিস্তার শুরু হইতে পারে নাই।

যেহেতু উত্তর-পশ্চিম ডাহোমীর সোম্বা নামে অভিহিত প্রাচীন গোত্রবদ্ধ সমাজগুলিতে কিংবা ইসলামী পান্থনিবাস সম্বলিত পর্যটন পথ যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপর দিয়া গিয়াছে সেইখানকার সামন্ত বারিবা সমাজে কিংবা দক্ষিণের নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে–যেইখানে রাজা ছিল পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন ধারক, যাহা তিনি পূর্বপুরুষদের সম্মানে প্রতি বৎসর পুনরুজ্জীবিত করিতেন ঃ প্রধানগণ ও স্থানীয় রাজাগণ নবম শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বে তাঁহাদের বিশ্বাসসমূহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে ইসলাম কোথাও গভীরভাবে শিকড় গাড়িতে পারে নাই কিংবা ব্যাপক ধর্মান্তর সাধন করিতে পারে নাই।

সম্ভবত উত্তর-পূর্ব হইতে মুসলিম অনুপ্রবেশ শুরু হইয়াছিল। বর্তমান কালের সোকোটো অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালি সাম্রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। তৎকালীন পর্যটকগণ উহাকে গুয়াংগারা নামে অভিহিত করিত। সেইখান হইতেই পর্যটক দলসমূহ কোলাদের আবাসস্থল, বর্তমান ঘানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইত। উত্তর হইতে কখনও কখনও এমন কি লিবিয়া হইতেও লবণ, দাস ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য দক্ষিণ-পশ্চিমে আসিলে আর কোলা বাদাম উত্তর ডাহোমী অতিক্রম করিয়া নাইজেরিয়া ও হাউসা পর্যন্ত যাইত। এইভাবে ডাহোমীতে ওয়াংগারা বা মারো নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম উপনিবেশ দ্রুত গড়িয়া উঠিয়াছিল যেইগুলি শীঘ্রই পারাকাউ, জাউগাউ অথবা কান্দির মত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। পর্যটন পথসমূহ যেই সমস্ত স্থানীয় প্রধানের শাসনাধীন অঞ্চল দিয়া যাইত তাঁহাদের নিকটস্থ অঞ্চলে বিদেশী বসতিসমূহ গড়িয়া উঠিত। তাহারা পরিবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং এইভাবে ইসলাম প্রবর্তন করিয়াছিল, যাহা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়াছিল।

পরবর্তী কালে সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে মরক্কোবাসীদের দ্বারা সোংহাই সাম্রাজ্য বিজিত হইলে দেনদি (Dendi)-নামক একদল মুসলিম সোংহাই নাইজারের দিকে চলিয়া যায়। ইহারা সম্ভবত আধুনিক ডাহোমীর উত্তর দিকের শেষ প্রান্তে নিজেদের বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের দ্বারা দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী প্রভাব আসে। তৃতয়ি পর্যায় সূচিত হয় ফুলানী মেষপালকদের আগমন ও বসতি স্থাপন দ্বারা; অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহারা ডামোহীর উত্তরাংশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যদিও ইহাদের ধর্ম তখনও সর্বপ্রাণবাদের রঙে রঞ্জিত ছিল তবুও ইহা একটি ইসলামী কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল যাহা বহু প্রাক্তন দাস বা গানদোকে ধর্মান্তরিত করিয়াছিল। ইহাদের সঙ্গে তাহারা স্থায়ী সংশ্রব রক্ষা করিত।

অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের বৎসরগুলিতে দক্ষিণ-পূর্ব দিক ও ডাহোমীর বর্তমান রাজধানী পোর্টোনোভো দিয়াও ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল। শীঘ্রই ঐ সকল স্থানে কিছু সংখ্যক মুসলিম য়োরুবা ব্যবসায়ী আগমন করিয়াছিল যাহারা ইলোরিন ও আধুনিক নাইজেরিয়ার পশ্চিম হইতে আসিয়াছিল। তাহাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহারা ডাহোমীর কতিপয় য়োরুবা পরিবারকে এবং ব্রাজিল ফেরত পর্তুগীজ নামধারী দাসদের কিছু সংখ্যক বংশধরকেও ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিল। যদিও পরিসংখ্যান প্রদান করা কঠিন তবুও আমরা হিসাব করিতে পারি যে, ডাহোমীর আঠার লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার হইতে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের মধ্যে, তন্মধ্যে এক লক্ষ মাত্র ধর্মাচারী।

তাহাদের বৃহত্তর অংশ তিজানী; কিছু সংখ্যক, বিশেষভাবে বয়স্কদের মধ্যে কাদিরিয়া তারীকার অনুসারী। উত্তরাঞ্চলে কিছু সংখ্যক হামাল্লিস্ট (Hamallist)-ও আছেন। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রায়-ঐক্য সত্ত্বেও বিশ্বাসগত পার্থক্য কিছু সংখ্যক য়োরুবা মুসলিমকে উত্তরাঞ্চলের (হাউসা-জারমা-ফুলানী-দেনদি) অধিবাসীদের বিরোধী করিয়াছিল যাহারা অধিকতর কঠোরতার সঙ্গে ধর্মাচরণ করিত বলিয়া দাবি করিত। ইসলামী ডাহোমীর এই দুইটি দিক প্রধানত লক্ষ করা যায় পোর্টোনোভোতে (ইসলামী য়োরুবা) ও পরাকাউতে (ইসলামী নর্থ) যেইগুলি শীঘ্রই দুইটি বৃহৎ মুসলিম রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। জাউগাউ ধীরে ধীরে প্রতিবেশী পারাকাউকে স্থান দিয়াছিল যেইখানে ইতোপূর্বে কিছু সংখ্যক ধর্মান্তরকরণ আন্দোলন জন্মলাভ করিয়াছিল।

সেইখানে কতিপয় কুরআন শিক্ষক বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের ধর্মের নূতন ও অধিকতর গতিশীল ধারণার অধিকারী ছিলেন।

সম্ভবত ভবিষ্যতে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ইমামদের শিক্ষিত লোকদের মধ্য হইতে অধিক হারে বাছাই করা হইবে এবং বংশানুক্রমিকভাবে সর্বপ্রাণবাদী প্রধানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পরিবার হইতে আর নহে। ইহাতে, বিশেষত উত্তর ডাহোমীতে যে কুরআন শিক্ষার বিদ্যালয়সমূহের উদ্ভব হইয়াছে, যেইখানে ধর্মীয় শিক্ষা সর্বদাই সম্মানের বিষয়, তাহাই স্পষ্ট হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Akindele and Aguessy, Le Dahomey, Paris 1955; (২) Akindele and Aguessy, Contribution a l'etude de l'histoire de l'amcien royaume de Porto-Novo, in Memoires IFAN, xxv; (3) 'Albeca, Les etablissements francais du golfe du Benin, Paris 1889; (৪) S., Berbain, Le comptoir francais de Juda au XVIIIe siecle, in Memoires IFAN, iii; (৫) G. Brasseur and Brasseur Marion, Porto Novo et sa palmeraie, in Memoires IFAN, xxxii; (৬) Brunet and Giethlen, Dahomey et dependances, Paris 1900; (৭) A. Burton, Amission to Gelele, King of Dahomey, London 1864; (৮) Desanti, Du Dahomey au Benin Niger, Paris 1945; (৯) Ed. Dunglas, Contribution a l'Histoire du Moyen-Dahomey, 3 vols. (Etudes Dahomeennes, xixi, xxi, xxi), Porto-Novo; (১০) Ed. foa, Le Dahomey, Paris 1895; (১১) R. Grivot, Reactions dahomeennes, Paris 1945; (১২) P. Hazoume, Le pacte de sang au Dahomey, Paris 1937; (১৩) ঐ লেখক, Doguicimi, Paris 1938; (১৪) M. J. Herskovits, Dahome—an ancient West African Kingdom, New York 1938; (১৫) M. Hubert, Mission Scientifique au Dahomey, Paris 1908; (১৬) H. Le Herisse, L'ancien royanme du Dahomey, Paris 1911; (১৭) J. Lombard, Cotonou, ville Africaine (Etudes Dahomeennes, x); (১৮) B. Maupoil, La geomancie a l'ancienne Cote des Ezclaves, Paris 1943; (১৯) P. Mercier, Carte Ethondemagraphique de l'aFrique Occidentale, v. IFAN Dakar; (২০) M. Quenum, Au pays des Fons, Paris 1938; (২১) Skertchly, Dahome as it is, London 1838; (২২) Cl. Tradits, Porto-Novo, London 1958; (২৩) P. Verger, Dieuz d'Afrique, Paris; (২৪) ঐ লেখক, Notes sur le culte des Oricha et Vodoun, in Memoires IFAN, v; (২৫) R. Cornevin, Histoire des Peuples de l'Afrique noire, Paris 1960, index.

J. Lombard (E. I.^{2}) / মোঃ তাজির উদ্দীন প্রামাণিক

ডিমলা ঃ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী একটি উপজিলা, নীলফামারী জিলায় অবস্থিত জিলার অন্যতম প্রধান ধান, চাল, পাট, আখ, গুড় উৎপাদন ও বিপণন কেন্দ্র। ইহা ২৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

সীমা ঃ উত্তরে বাংলাদেশের 'আঙ্গরপোতা, দহগ্রাম ছিটমহল ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে ডোমার, দক্ষিণে জলঢাকা উপজিলা এবং পূর্বে লালমনিরহাট জিলা। মোট আয়তন ১২৬ বর্গমাইল।

জনসংখ্যা ঃ ১৯৮১ খৃ.-র আদমশুমারি অনুসারে জনসংখ্যা ১,৬১,০২৫ জন। পুরুষ ৮২,০২০, নারী ৭৯,০০৫, উপজিলার মোট থানাসংখ্যা ২৬,৪৯৫টি। এই উপজিলায় মোট ইউনিয়ন ১০টি, মৌজা সংখ্যা ৫৩ এবং গ্রাম সংখ্যা ৫৮টি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৯, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫টি, মাদ্‌রাসা ২৬, গণশিক্ষা কেন্দ্র ১০২টি। উপজিলায় কোন কলেজ নাই।

স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ঃ মোট ডাক্তার ৪১, জিলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১টি, দাতব্য চিকিৎসালয় ৪টি এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র ৪টি। পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃসদন, টীকাদান কেন্দ্র ইত্যাদি ১২টি।

সরকারী অফিসঃ উপজিলায় মোট ডাকঘর ৯, টেলিগ্রাফ অফিস ১, ডাকবাংলো ১, ব্যাংকের শাখা ৪ ও অন্যান্য সরকারী অফিস ২৪।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঃ রেজিস্ট্রিকৃত ক্লাব ১, পাবলিক লাইব্রেরী ১টি, সমবায় সমিতি ৩৫টি। মোট বাজার ৬ এবং হাটের সংখ্যা ২৭। উপজিলায় কুটিরশিল্পের সংখ্যা ৩৮৬; তাঁতশিল্প ১০৯টি।

সড়ক ও পরিবহন ঃ উপজিলার সড়কের দৈর্ঘ্য ১৮৫ মাইল। ইহার ৮ মাইল পাকা, ১৬ মাইল আধাপাকা এবং ১৬১ মাইল কাঁচা।

ইতিহাস ঃ ১৭৯৩ খৃ. প্রথম ডিমলা থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ খৃ. প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে ডিমলা থানার কিছু অংশ কিশোরগঞ্জ থানায় পড়ে। ১৯৮৩ খৃ. পর্যন্ত ইহা রংপুর জিলার থানা ছিল। অতঃপর ১৯৮২-৮৩ খৃ. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ইহা নীলফামারী জিলার উপজিলায় পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh District Gazetteers, Rangpur, Cabinet Secretariat, Establishment Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka 1977, pp. 295, 301, 375; (২) Rangpur District Statistics, 1983, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, 14th February 1983, pp. 3-5, 71, 75, 83-87, 91-93, 97-99, 101, 105, 109; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউস লিমিটেড, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৫, ২খ, পৃ. ৬৪৯; (৪) Bangladesh Population Census, 1981, Bangladesh Bureau of Statistics, Establishment Division, Ministry of Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka 1984, pp. 3-5।

শেখ মাহবুবুল আলম

ডিয়েট্রিসি (Dietrici) ঃ ফ্রিডরিশ ডিয়েট্রিসি (Friedrich Dieterici), খৃ. ঊনবিংশ শতাব্দীর জনৈক বিশিষ্ট জার্মান প্রাচ্যবিদ। ইনি আরবী সাহিত্য ও মুসলিম দর্শনকে স্বীয় অধ্যবসায়ের বিশেষ বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত বিষয়দ্বয়ের উপর ইনি মূল্যবান গ্রন্থাবলীও রচনা করিয়াছিলেন। ডিয়েট্রিসি ১৮২১ খৃ. বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষালাভ করেন। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত লাইপযিগ ও হালে (Halle) শহর দুইটির জ্ঞানচর্চা

কেন্দ্রসমূহের পণ্ডিতগণের জ্ঞানভাণ্ডার হইতেও জ্ঞান আহরণ করিয়া আপন জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। তিনি প্রাচ্য দেশসমূহ অর্থাৎ মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্‌তীন ভ্রমণ করিয়া তথাকার পণ্ডিতগণের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৮৫০ খৃ. বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আজীবন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকেন।

আরবী সাহিত্যের পর্যালোচনা ক্ষেত্রে ডিয়েট্রিসি বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক আল-মুতানাব্বীকে অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাঁহার কবিতাবলীর সৌকর্য ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মুতানাব্বী রচিত দীওয়ান কাব্যগ্রন্থকে ওয়াহিদী লিখিত উহার ভাষ্যসহকারে দুইটি বৃহৎ কলেবর খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আছ-ছা'আলিবী রচিত 'রিসালাতুন ফীমা জারা বায়না'ল-মুতানাব্বী ওয়া সায়ফি'দ-দাওলা' গ্রন্থকেও প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আরবদের গৌরব ও তাহাদের প্রিয় কবিকে য়ূরোপবাসীদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়াছেন।

য়ূরোপে ডিয়েট্রিসির পূর্বে মাংক (Munk,) রেনান (Renan) প্রমুখ প্রাচ্যবিদ মুসলিম দার্শনিকদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ডিয়েট্রিসি তাঁহাদের এই কার্যধারাকে অব্যাহত রাখিতে গিয়া মুসলিম দর্শন সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। উক্ত গবেষণায় তিনি সর্বপ্রথমে রাসাইলু ইখ্‌ওয়ানি'স-সাফা' নামীয় পুস্তিকাসমষ্টির প্রতি মনোযোগ দেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত পুস্তিকাসমষ্টি হি. চতুর্থ শতাব্দীতে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক রচিত। উহাদের লেখকগণ এই সকল পুস্তিকায় তাঁহাদের যুগের সকল দর্শন ও অন্যান্য সর্বশ্রেণীর জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজ ও সাবলীল ভাষায় এবং সাধারণের বোধগম্য প্রকাশভঙ্গিমায় বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ডিয়েট্রিসি উক্ত পুস্তিকাসমষ্টিতে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং উহাদের কতকগুলি পুস্তিকাকে জার্মান ভাষায় অনুবাদও করেন। এইরূপে তিনি পাশ্চাত্যের লোকদিগকে এইরূপ পুস্তিকাসমূহের সহিত পরিচিত করিয়া দেন, যাহা মুসলমানদের জ্ঞানসাধনা ও জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

ডিয়েট্রিসি ফারাবী ও তাঁহার দর্শনের ব্যাখ্যার প্রতিও মনোযোগ প্রদান করেন। তাই জীবনের শেষ দিকে তিনি জার্মান ভাষায় ফারাবীর আস-সিয়াসাতু'ল-মাদানিয়্যা গ্রন্থের অনুবাদকার্যে ব্যাপৃত হন; কিন্তু অনুবাদকার্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার সুযোগ্য শাগরিদ পল ব্রোনলে (Paul Bronnle) তাঁহার ওসিয়াত অনুযায়ী উহার অনুবাদকার্য সমাপ্ত করেন। তিনি এতদসহ অনূদিত গ্রন্থের প্রারম্ভে একটি ভূমিকাও সংযোজন করিয়া দেন। ভূমিকায় তিনি আপন শহর শিক্ষাগুরুর সংক্ষিপ্ত জীবনীর উল্লেখ ছাড়াও জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানসমূহের বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। উক্ত অনুবাদ এই ভূমিকাসহ নিম্নে উল্লিখিত নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ঃ Die Staatsleitung von Alfarabi deutsch Bearbaitung, herausgegeben mit einem Gedenkblatt von Dr. P. Bronnle, লাইডেন ১৯০৪ খৃ.। অধ্যাপক ডিয়েট্রিসি ১৯০৩ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে লোকান্তরিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-কাসি সাহাব, ফারহাঙ্গ-ই খাওয়ারশিনাসাঁ, পৃ. ১১১; (২) নাজীব আল-'আকীকী, আল মুসতাশরিকূন, ২খ, পৃ. ৭১৬, কায়রো ১৯৬৫ খৃ.; (৩) Paul Bronnle, Introduction of F. Dietrici Die Staatslei-tung von Alfarabia, লাইডেন ১৯০৪ খৃ.।

শায়খ 'ইনায়াতুল্লাহ (দা.মা.ই.) /মু. মাজহারুল হক

ডুমুরিয়া ঃ বাংলাদেশের খুলনা জিলার ১৪টি ইউনিয়ন, ২০২টি মৌজা, ২২৩ টি গ্রাম লইয়া গঠিত একটি উপজেলা। জিলা সদর খুলনা হইতে ডুমুরিয়ার দূরত্ব ২৪ কি. মি. (=১৫ মা.)। ১৯°৩ ব. কি. নদী ও খালসমেত উপজিলাটির মোট আয়তন ৪৫৫°৫ ব. কি.। ২২°২৯′ ও ২২°৫৬′ অক্ষাংশ এবং ৮৯°১৫′ ও ৮৯°৩২′ পূর্ব-দ্রাঘিমায় ইহার ভৌগোলিক অবস্থান। ইহার উত্তরে ফুলতলা উপজিলা ও যশোর জিলার কেবশপুর উপজিলা, দক্ষিণে পাইকগাছা ও বটিয়াঘাটা উপজিলা, পূর্বে বটিয়াঘাটা উপজিলা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও দৌলতপুর উপজিলা এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা জিলার তালা উপজিলা ও যশোর জিলার কেশবপুর উপজিলা।

নামকরণ ঃ বৃটিশ আমলে ১৮৯৭ খৃ. এইখানে থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, এখন যেইখানে উপজিলা সদর অবস্থিত, সেইকালে সেইখানে 'ডুমরু' নামক একাধিক গায়ক সম্প্রদায়ের আবাসস্থল ছিল। উক্ত নামের ভিত্তিতে থানাটির নাম ডুমুরিয়া রাখা হয়।

১৯৮১ খৃ. অনুষ্ঠিত আদমশুমারি অনুযায়ী ডুমুরিয়া উপজিলার মোট লোকসংখ্যা ২,২৪,৫৭৫ জন, তন্মধ্যে ১,২১,১৩২ জন মুসলিম, ১.,০৩,১১০ জন হিন্দু, ৬৪ জন বৌদ্ধ, ২৪ জন খৃস্টান ও ২৪৫ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪৯৩ জন, আর সমগ্র খুলনা জিলায় বসতির গড় ৩৫৬। এক্ষেত্রে জাতীয় গড় ৬০৫।

১৯৮৮ খৃ. এক হিসাব অনুসারে অত্র উপজিলায় ১০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৭টি মাদ্‌রাসা, ৩টি মহাবিদ্যালয়, ৩৫৫টি মসজিদ, ১টি অনাথাশ্রম, ২১টি ডাকঘর, ২টি কৃষি ব্যাংক, ১০টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ৫১টি হাট-বাজার আছে।

ইতিহাস ঃ ডুমুরিয়া উপজিলার ইতিহাসের জন্য দ্র. কেশবপুর, খুলনা, তালা, পাইকগাছা প্রবন্ধাদি। উনিশ শতকে যখন কলিকাতা বৃটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল, তখন সুবিশাল সুন্দরবনের অধিকাংশই ছিল যশোর জিলার অন্তর্গত। তৎকালে সুদূর যশোর হইতে সুন্দবনের উপকূল এলাকা পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। এই কারণে বনাঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সরকারী রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সুন্দরবন এলাকায় জলদস্যুদের উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশে ১৮৮২ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য খুলনায় একটি স্বতন্ত্র জিলা প্রতিষ্ঠার সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঐ সালের ১ জুন হইতে তাহা কার্যকর হয়।

হিজরী ৯ম শতকের (ইংরাজি ১৫শ শতকের) প্রথমার্ধে প্রখ্যাত সুফী সাধক উগলুগ খান-ই জাহান আনু. ৬০ হাজার পার্শ্বচর-অনুচর সমভিব্যাহারে যশোরের বারোবাজার এলাকায় আসিয়া আস্তানা স্থাপন করেন। তিনি তাঁহাদের সাহায্যে বর্তমান যশোর-খুলনার বিস্তীর্ণ এলাকার সুন্দরবনের গাছপালা কাটিয়া সাফ করেন, রাস্তাঘাট, মসজিদ ও মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। সাধারণ্যে ইনি খান জাহান আলী নামে পরিচিত হইলেও তাঁহার নাম শের খান অথবা কেশর খান। তাঁহার দুই প্রভাবশালী

সহচর বুরহান খান ও তৎপুত্র ফাত্হ খান যশোর হইতে সরাসরি দক্ষিণ দিকে কপোতাক্ষ নদের তীরাঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তালা উপজিলার সদর হইতে সরাসরি ৩ কি. মি দূরে আগলঝাড়া গ্রামে অবস্থিত তাঁহাদের কথিত বসতবাটির ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে তিনটি ইষ্টকের ঢিবি অবস্থায় রহিয়াছে। এইখানে এখনও কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালিত হয় নাই। এই ঢিবিগুলি হইতে আনু. ৩ কি. মি. উত্তর-পূর্বে ডুমুরিয়া উপজিলাধীন আরশনগর গ্রামে বাংলার সুলতান আলাউদ-দীন হুসায়ন শাহের আমলে ২৩×১৬×৪½ সে.মি. আকৃতির প্রাচীন ইটে ৯০৭/১৫০১ সালে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বিগত চল্লিশের দশকে আবিষ্কৃত হয়। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে একটি বিরাট পুকুর আছে। এইখানে এই যাবৎ কোন প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালিত হয় নাই। তবে মসজিদের শিলালিপিটি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে (সংগ্রহ নং ৩৬১৫)। উহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার কার্য এখনও সম্পন্ন না হইলেও উহা হইতে কিছু কিছু তথ্য জানা গিয়াছে। মসজিদটির দক্ষিণ পার্শ্বে শায়খ শাহ আফদাল নামক জনৈক কামিল পীরের মাযার বর্তমান। তাঁহার মাযারের পূর্ব পার্শ্বে আরও একটি কবর আছে। এইখানে উল্লেখ্য যে, এইখানকার উপজিলাভিত্তিক বর্তমান প্রশাসনিক এলাকাগুলির সীমানা পরবর্তী কালে বৃটিশ আমলে নির্ধারিত হয়। সুতরাং এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ডুমুরিয়া, তালা, পাইকগাছা, বটিয়াঘাটা প্রভৃতি উপজিলায় খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে ১৫শ শতকের প্রথমার্ধে খান-ই জাহানের সহচর বুরহান খান ও তৎপুত্র ফাত্হ খান এবং ১৬শ শতকের প্রথমার্ধে আরশনগরের শায়খ শাহ আফদাল ও তাঁহাদের সঙ্গী-সাথীরাই ইসলাম প্রচারের পবিত্র দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। ডুমুরিয়া উপজিলার মলমলিয়া ও থুকড়া গ্রাম দুইটিতেও প্রাচীন মসজিদ আছে। কিন্তু এইগুলি সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh Population Census 1981, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, Community Tables of All Thanas of Khulna District, পৃ. ৮৯-৯৪ ; (২) Bangladesh District Gazetteers, Khulna, পৃ. ৩৮৪; (৩) মুহম্মদ আবূ তালিব, খুলনা জেলায় ইসলাম, প্রকাশক ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, জুলাই ১৯৮৮, পৃ. ৯৩-৯৪; (৪) সাতক্ষীরা জনসমিতির বার্ষিক মুখপত্র "সাতক্ষীরা" ৮০, পৃ. ১০; (৫) Upazila Statistics of Bangladesh, আগস্ট ১৯৮৮, Bangladesh Bureau of Statistics, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, পৃ. ১৩, ১৪৩, ২২১; (৬) ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, প্রকাশকঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ডেমরা ঃ ঢাকা মহানগরীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেট্রোপলিটান থানা ও শিল্পায়িত অঞ্চল। থানার প্রায় সবটাই ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে। ঢাকার অনেক প্রাচীন নিদর্শন, ঐতিহাসিক স্থান ও অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত। মহানগরীর দক্ষিণের প্রবেশ পথ হিসাবেও ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অবস্থান ঃ ইহা ২৩°৬৫′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°১৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে শীতলক্ষা নদীর ডান তীরে অবস্থিত।

সীমা ঃ উত্তরে মতিঝিল থানা, পশ্চিমে সুত্রাপুর থানা এবং দক্ষিণে ও পূর্বে নারায়ণগঞ্জ জিলা।

জনসংখ্যা ঃ ১৯৮১ খৃ. আদমশুমারি মুতাবিক ডেমরার মোট জনসংখ্যা ৩,২৬,১২৩; ইহার ১,৮৭,৫৯১ জন পুরুষ, ১,৩৮,৫৩২ জন স্ত্রীলোক। ৩,০২,৬১৪ জন মুসলমান, ১৭,৫৫০ জন হিন্দু, ৫৬ জন বৌদ্ধ, ৫৪ জন খৃস্টান, ১৭৮ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ের।

শিল্প-বাণিজ্য ঃ আহমদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস্, করিম ভাই মিল্স্, এফ. আর. জামদানী উইভিং, বেলা আর্টিফিসিয়াল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। পূর্বে ডেমরা খালের মাধ্যমে নদীপথে এখানে বাণিজ্য চলিত।

সড়ক পরিবহণ ঃ দেশের পূর্বাঞ্চল ও ঢাকার পার্শ্ববর্তী শহর-উপশহরের সঙ্গে সংযুক্তকারী ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-নরসিংদী সড়ক।

ইতিহাস ঃ এক সময় ডেমরা ঢাকা শহরতলীর দূরবর্তী গ্রামজনপদ ছিল। ১৯৬১ খৃ. পর্যন্ত ইহা তেজগাঁও থানাধীন একটি গ্রাম ছিল। অতঃপর ইহা থানায় উন্নীত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) East Pakistan District Gazetteer, Dacca, Statistics and Establishment Division, Dacca 1969, pp. 443, 454; (২) Dhaka District Statistics, 1983, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka, 17th Feb., 1983, p. 3-5, 67,133;, (৩) Bangladesh Population Census 1981, District, Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka August, 1983, pp 5, 62, 110-206; (৪) Syed Muhammad Taifur, Glimpses of old Dhaka, Second Edition (Date is not cited), P. 29, 42; (৫) মুনশী রহমান আলী তায়শ, তাওয়ারিখে ঢাকা, অনুবাদ ডক্টর আ. ন. ম. শরফুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চৈত্র ১৩১১ (এপ্রিল ১৯৮৫), পৃ. ৫০-৫২; (৬) গোলাম হোসেন সালীম, রিয়াজ-উস সালাতীন (বাংলার ইতিহাস), অনুবাদ, আকবর উদ্দীন, বাংলা একাডেমী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১ (মে ১৯৭৭), পৃ. ৩৩-৩৪; (৭) বাংলা বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রধান সম্পাদক খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, নওরোজ কিতাবিস্তান ও গ্রীন বুক হাউজ লিমিটেড, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৬৭৪।

শেখ মাহবুবুল আলম

ডেমোক্রাট পার্টি (Demokrat Party) ঃ তুর্কী রাজনৈতিক দল; ইহা ৭ জানুয়ারী, ১৯৬৪ সালে তালিকাভুক্ত হয়। একই বৎসর জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে দলটি ৪৬৫টি আসনের জন্য ২৭৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন দান করে। তাহাদের মধ্যে ৬১ জন প্রার্থী নির্বাচিত হইয়া প্রধান বিরোধী দল গঠন করে। ১৯৪৭ সনের ৭ জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত প্রথম দলীয় সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় কর্মসূচী ও সনদ গৃহীত হয়। বিভিন্ন প্রকার অভ্যন্তরীণ মতভেদের কারণে প্রতিনিধিদের একটি দলত্যাগী অংশ ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ন্যাশনাল পার্টি (Millet Partis) গঠন করায় ১৯৫০ খৃ.-র মধ্যে পরিষদে ডেমোক্রাট পার্টির শক্তি কমিয়া ৩১ জনে নামিয়া আসে। যাহা হউক, দেশের অভ্যন্তরে তাহাদের প্রভাব বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং ১৯৫০ সালের মে মাসের সাধারণ নির্বাচনে তাহারা একটি সুস্পষ্ট

সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ডেমোক্রাট পার্টি দেশের সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং পরবর্তী দশ বৎসরের জন্য ক্ষমতায় টিকিয়া থাকে। কয়েকটি মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছিল। জালাল বায়ার ও আদনান মেন্দেরেস যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ডেমোক্রটি পার্টি একটি বর্ধিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, কিন্তু ১৯৫৭ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে তাহারা শুধু একটি জনপ্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যাহা হউক, ইহা একটি বিভক্ত বিরোধী দলের উপরে একটি সুস্পষ্ট সংসদীয় সংখ্যাধিক্য লাভ করে। কিছুকাল বর্ধিষ্ণু অসন্তোষের পরে ডেমোক্রাট পার্টি ২৭ মে, ১৯৬০ সালের বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয় (TURKIYE. ইতিহাস দ্র.)। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে ইহা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলোপ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) K. H. Karpat, Turkey's Politics the transition to a multi-party System, Princeton 1959, পৃ. ৪০৮-৩১ ও স্থা.; (২) Tarik 2, Tunaya, Turkiyede Siyasi Pastiler, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৬৪৬-৯২; (৩) B. Lewis, Democracy in Turkey, in MEA, ১০খ. (১৯৫৯ খৃ.), ৫৫-৭২; (৪) G. Lewis, Turkey, The end of the first Republic, in World Today, সেপ্টেম্বর ১৯৬০, পৃ. ৩৭৭-৮৬; (৫) ঘটনাসমূহের জরিপ, coc. MEA, MEJ, OM.

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.^{2})/ মুহঃ আবু তাহের

ডেরা ইসমাঈল খান ঃ (১) বিভাগ (১১,১৩০ ব.মা., জন, ১২,০৫,৭১৯), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। ডেরা ইসমাঈল খান ও বান্নু জিলা এবং নর্থ ওয়াযীরিস্তান ও সাউথ ওয়াযীরিস্তান এজেন্সি সমবায়ে গঠিত। (২) জিলা (৪,৭২৩ ব.মা., জন. ৩,৮২,৭৪৬), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান টঙ্ক, কুলাচি ও ডেরা ইসমাঈল খান তহসীল এবং ডেপুটি কমিশনার শাসিত বিশেষ অঞ্চল সমবায়ে গঠিত। পূর্বে সুলায়মান পর্বতমালা ও ওয়াযীরিস্তান, পশ্চিমে সিন্ধু নদ, উত্তরে বান্নু জিলা এবং দক্ষিণে ডেরা গাযী খান জিলা। বিভিন্ন স্থানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। সাধারণভাবে সমতল ভূমি; কিয়দংশে সেচ ব্যবস্থা রহিয়াছে; গম, জোয়ার ও রাই সরিষা উৎপাদিত হয়। হস্তচালিত তাঁতশিল্প আছে, প্রচুর ঘি উৎপাদিত হয়। উত্তর-পূর্ব দিকে পেট্রোলিয়াম খনি ও উট প্রজনন কেন্দ্র। প্রধান শহর ডেরা ইসমাঈল খান, টঙ্ক ও কুলাচি। ১৯শ শতকের প্রথম ভাগে শিখ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। (৩) তহসীল (১৭৫৯ ব. মা.; জন.২,১৮,৫০০), ঐ জিলা, সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত। উত্তরাংশ পর্বতময়; নিম্নের সমতল অঞ্চলে সিন্ধু নদের বহু সংখ্যক খাল দ্বারা পানিসেচ হয়; বিভিন্ন স্থানে সড়ক যোগাযোগ রহিয়াছে। (৪) শহর, জন. ৪৪,৩১৯, ঐ বিভাগ, জিলা ও তহসীলের সদর, সিন্ধু নদের বাম তীরে (১ মা.) অবস্থিত; জিলার সড়ক যোগাযোগ কেন্দ্র; বাস, লরি, টোঙ্গা ইত্যাদি প্রধান যানবাহন। কৃষি পণ্যের বাহার (গম, জোয়ার, ছোলা, তৈলবীজ); ব্যবসায় কেন্দ্র (শস্য, লাড়কি, বুনটবস্ত্র, ঘি, ফল), হস্তচালিত তাঁতে পাগড়ী প্রস্তুত হয়; পশুখাদ্য প্রক্রিয়াজাত করা হয়। শহর মিউনিসিপ্যালিটি শাসিত; শহরে কলেজ, ট্রেনিং স্কুল; কয়েকটি হাসপাতাল; যক্ষ্মা হাসপাতাল; শহরের নিকটে ক্যান্টনমেন্ট (জন ১,৮২১)।

ডেরাগাযী খান জিলা ঃ (৯,৩৫৯ ব. মা. জন. ৭,৭৬,৬২০); মুলতান বিভাগ, পাঞ্জাব, পাকিস্তান। সিন্ধু নদের পশ্চিমে ইহা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ডেরা ইসমাঈল খান জিলা; দক্ষিণে সিন্ধু প্রদেশ, পশ্চিমে সুলায়মান পর্বতমালা। সাধারণত সমতল। বহু শত মাইল পানি-সেচের খাল আছে। প্রচুর ফসল জন্মে (গম, জোয়ার, ধান, তৈলবীজ, খেজুর)। হস্তচালিত তাঁতশিল্প, পশমী দ্রব্য তৈয়ারি, পশু পালন। ডেরাগাযী খান শহর সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে। মুলতান হইতে ৫০ মা. উত্তর-পশ্চিমে। এইখান হইতে মুলতান ও পোর্ট মনরো হইয়া কোয়েটা পর্যন্ত পাকা সড়ক আছে। মামুদকোর্ট জংশন হইতে গাযীঘাটে ফেরিতে সিন্ধুনদ পার হইয়া এইখানে আসা যায়; এইখান হইতে ফোর্ট মনরো ৫১ মা.। ব্যবসায় কেন্দ্র (খাদ্যশস্য, তুলা, খেজুর, নীল রং, বুনট কাপড়); তুলা হইতে বীজ নিষ্কাশন (জিনিং); চাউল তৈয়ারী, ময়দা ও তেলকল, হস্তশিল্প (রেশমী কাপড়, হাতীর দাঁতের গহনা নির্মাণ, পশমী দ্রব্য) ও আর্ট কলেজ আছে। নিকটেই পশু পালন হয়। আগে শহরটি ৭ মা. পূর্বে সিন্ধু নদের তীরে ছিল; বন্যা এড়াইবার জন্য ১৯০০ খৃ. বর্তমান অবস্থিতিতে স্থানান্তরিত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৬৬৩

ডেরা নওয়াব সাহেব ঃ শহর (জন ৪,৪৫৫), পূর্ব আহমাদপুর তহসীল, বাহাওয়ালপুর জিলা, বিভাগ ও পাঞ্জাব প্রদেশ, পাকিস্তান। পূর্ব আহমাদপুর শহরের ২ মা. দক্ষিণে অবস্থিত। বাহাওয়ালপুরের তৎকালীন আমীর স্যার সাদিক মুহাম্মাদ খান (৪র্থ), ১৮৬৬-৯৯, কর্তৃক স্থাপিত এবং তাঁহার নামানুসারে শহরটি সাদিক গড় প্যালেস নামেও পরিচিত। পাকিস্তানের সহিত বাহাওয়ালপুর রাজ্য একীভূত হওয়ার পর আমীর এইখানে স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করেন। ইহা বস্তুত বাহাওয়ালপুরের আমীরদেরই শহর; দর্শনীয় বহু অট্টালিকা আছে। শহরের উপকণ্ঠে একটি সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৬৬৩

ডেরা বুগতী ঃ (১) তহসীল, জন. ৩২,০৫৭. সিবি জিলা, কোয়েটা বিভাগ, বেলুচিস্তান, পাকিস্তান। পার্বত্য অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় দেড় হাজার ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত; বেলাব নদী ও বিভিন্ন অঞ্চল জুড়িয়া অসংখ্য সরু নালা প্রবাহিত। ৮টি পাটওয়ারী সার্কেলে বিভক্ত; সদর শহর সুই। অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা মেষ পালন ও পশম বিক্রয়। (২) সাব তহসীলের সদর শহর, ঐ তহসীল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,৪৭৮ ফুট উর্ধ্বে। যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই খারাপ; কাঁচা সড়ক দ্বারা তহসীল সদর সুই-এর সঙ্গে যুক্ত; জিলা সদর সিবি ও ডেরা বুগতীর মধ্যে যাতায়াতের ভাল বন্দোবস্ত নাই, কোন পানি সরবরাহ বা বিদ্যুৎ সরবরাহ নাই; স্কুল আছে; পশম ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র। ২০ মা. পশ্চিমে সংঘসিল্লাখ নামক স্থানে প্রাগৈতিহাসিক কালের মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৬৬৩

ডোমার ঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের অন্যতম উপজিলা। নীলফামারী জিলায় অবস্থিত। জিলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধান, পাট, আখ, চাল ও গুড় উৎপাদন ও বিপণন কেন্দ্র।

অবস্থান ঃ ৮৮°৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ২৬°৬০′ উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত।

সীমা ঃ উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে পঞ্চগড় জিলা, দক্ষিণে নীলফামারী সদর, পূর্বে জলঢাকা ও ডিমলা উপজিলা।

আয়তন ঃ ১৯৮৩ সনের পরিসংখ্যান মুতাবিক উপজিলার মোট আয়তন ৯৭ বর্গমাইল।

জনসংখ্যা ঃ ১৯৮১ সনের আদমশুমারি অনুসারে মোট জনসংখ্যা ১,৫২,৫৫০ জন। ইহার ৭৮,০৭৭ জন পুরুষ ও ৭৪,৪৭৩ জন স্ত্রীলোক। এই সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৪৩%।

১৯৮১ সনের আদমশুমারি মুতাবিক জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ১,৫৭৩ জন এবং খানা সংখ্যা ছিল ২৯,৩০১টি।

সড়ক ও পরিবহন ঃ উপজিলার ৩৪৯ মাইল সড়কের মধ্য মাত্র পাঁচ মাইল আধা পাকা। বাকী ৩৪৪ মাইল কাঁচা। রেলপথে সৈয়দপুর এবং সড়ক দ্বারা রংপুর শহরের সঙ্গে যুক্ত।

ঐতিহাসিক নিদর্শন ঃ ডোমারের পাঁচ মাইল পূর্বে ধর্মপালের আমলে নির্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। বর্তমানে ইহা টিবি সদৃশ মনে হয়। পাঙ্গা পীরের উরস উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ৩০ দিনব্যাপী বিরাট মেলা বসে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, নবজ্ঞান ভারতী, কলিকাতা, জানুয়ারী, ১৯৫৬, পৃ. ২৮৩; (২) Rangpur District Statistics, 1983, Dhaka, 14th February, 1983, pp 3-5, 71, 75 83-87, 91-93, 97-99, 101, 105, 109; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৬৬৭-৬৬৮; (৪) Bangladesh Population Census, 1981, Dhaka, 1984, pp 3-5; (৫) সৈয়দ মোশাররফ হোসেন, দিনাজপুরের ইতিহাস, ১খ; সাহিত্য মজলিশ, দিনাজপুর।

শেখ মাহবুবুল আলম

ঢ

ঢাকা (ঢাকা) ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ও বৃহত্তম নগরী; প্রায় চারি শত বৎসরের প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরী।

১। **অবস্থান, লোকসংখ্যা ও আয়তন ঃ** বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে ২৩°৪৫′ উ. অক্ষাংশ ও ৯০°২৪′ পূ. দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। নিকটতম ভারতীয় নগরী কলিকাতার ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে ও সমুদ্র উপকূল হইতে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে বাংলাদেশের প্রায় কেন্দ্রস্থলে ইহার অবস্থান। একই নামে বাংলাদেশের একটি বিভাগ ও একটি জিলাও রহিয়াছে এবং উহাদের সদর দফতরও ঢাকা নগরীতেই অবস্থিত। ১৯৯১ সনের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর (সিটি করপোরেশন এলাকাধীন) জনসংখ্যা ৩৩,৯৭,১৮৭ জন (পুরুষ ১৯,২৬,৭৪৫ ও মহিলা ১৪,৭০,৪৪২ জন), ঢাকা জিলর জনসংখ্যার ৫৭,৭৪,৮৪৫ জন (পুরুষ ৩১,৯৮,৭৭১ ও মহিলা ২৫,৭৬,০৭৪ জন) এবং ঢাকা বিভাগের জনসংখ্যা ৩,২২,৭০৯৯৪ জন (পুরুষ ১,৬৭,৭৪,৪৫৮ ও মহিলা ১,৫৪,৯৬,৫৩৬ জন)। শিক্ষিতের হার ঃ ঢাকা মহানগরী ৪৯.৩১%, ঢাকা জিলা ৪৩.৩৫% এবং ঢাকা বিভাগ ২৭.৮৩% (সমগ্র বাংলাদেশ ২৪.৮২%)। ঢাকা নগরীর আয়তন ২২৫ বর্গমাইলের মত, দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা সেতু (পোস্তগোলা) হইতে উত্তর-পশ্চিমে মীরপুর সেতু পর্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল। ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সনে নবগঠিত ঢাকা জিলার আয়তন ৫০৮ বর্গমাইল (উক্ত তারিখের পূর্বেকার ঢাকা জিলার আয়তন ছিল ২,৮৮২ বর্গমাইল) এবং ঢাকা বিভাগের আয়তন ৩০,৯৯৭ বর্গকিলোমিটার।

২। **রাজধানী হিসাবে ঢাকা ঃ** হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পরবর্তী শতাব্দীগুলি হইতেই ঢাকার ইতিহাসের যাত্রা শুরু হইলেও প্রকৃত ইতিহাসের আলোকচ্ছটায় ইহার আবির্ভাব ঘটে ১৬০৮ কিংবা ১৬১০ খৃস্টাব্দে, যখন বাংলার মুগল সুবাদার ইসলাম খান চিশতী রাজমহল হইতে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উহার পর প্রায় এক শত বৎসর যাবত ঢাকা ছিল মুগল রাজধানী। অন্তর্বর্তীকালে শাহ শুজা'র সুবাদারী আমলে ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৯ খৃ. পর্যন্ত বিশ বৎসরের জন্য রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সুবাদার মীর জুমলা রাজধানী পুনরায় ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ঢাকার শেষ মুগল সুবাদার আজীমুদ্দীন (পরবর্তীতে আজীমুশ্‌শান খেতাবে ভূষিত) মুগল সম্রাট আওরাঙ্গযীবের নির্দেশে ১৭০৩ বা ১৭০৬ খৃ. ঢাকা ত্যাগ করিয়া পাটনায় অবস্থান করিলে কার্যত ঢাকায় মুগল রাজধানীর পরিসমাপ্তি ঘটে। আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয় ১৭১৭ খৃস্টাব্দে। ইহার পর ঢাকায় নাইব নাজিম বা ডেপুটি গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৩ খৃ. সর্বশেষ নাইব নাজিমের ইনতিকালের সঙ্গে এই পদেরও বিলুপ্তি ঘটে। অতঃপর ১৯০৫ খৃ. পূর্ব বাংলা ও আসাম লইয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইলে ঢাকায় উহার রাজধানী স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯১২ খৃ. বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইলে ঢাকা পুনরায় রাজধানীর মর্যাদা হারায়। ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট ভারত বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইলে উহার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব বাংলা ও পরে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে পরিণত হইলে ঢাকা জাতীয় রাজধানীতে উন্নীত হয়। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান এই নগরী বিশ্বের অন্যতম জনবহুল নগরীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

৩। **বিভিন্ন প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে ঢাকা ঃ** ঢাকা জিলা ও ঢাকা বিভাগ মূলত বৃটিশ আমলের সৃষ্টি। আ'ঈন-ই আকবারী (মুগল সম্রাট আকবারের অন্যতম সভাসদ আবু'ল-ফাদল কর্তৃক রচিত) অনুসারে যাহাতে প্রশাসনিক ইউনিটের প্রাচীনতম পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তৎকালীন বাংলা ছিল উনিশটি সরকারে বিভক্ত এবং প্রতিটি সরকার আবার কয়েকটি মহল বা পরগনায় বিভক্ত ছিল। সাবেক (খৃ. ১৯৮৪ পূর্ববর্তী) ঢাকা জিলা, যাহা বর্তমানে ছয়টি জিলায় বিভক্ত, বাযুহা ও সোনারগাঁও নামক দুইটি সরকারের অংশবিশেষ লইয়া গঠিত ছিল। আ'ঈন-ই আকবারী রচনার পর এক শত বৎসরেরও অধিক কাল পর্যন্ত প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে সরকার বহাল ছিল। কিন্তু ১৭২২ খৃ. মুরশিদ কুলী খান (তৎকালীন বাংলার নাজিম) এই ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন এবং সরকারের স্থলে সমগ্র বাংলাকে চাকলা নামে তেরটি বৃহত্তর প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন। মুরশিদ কুলী খানের চাকলা ব্যবস্থায় চাকলা জাহাঙ্গীর নগর মোটামুটি সরকার বাযুহা, সোনারগাঁও, বাকলা, ফতেহাবাদ এবং সরকার মাহমুদাবাদ ও ঘোড়াঘাটের পূর্বাংশ লইয়া গঠিত ছিল। ১৭৬৫ খৃ. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাংলার দেওয়ানী লাভ করে তখন তাহারা এই চাকলা ব্যবস্থাকেই উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করে। ১৭৭২ খৃ. সার্কিট কমিটি মেঘনার পূর্বদিককার পরগনাগুলিকে চাকলা জাহাঙ্গীর নগর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লক্ষ্মীপুর কালেকটরেটের

সৃষ্টি করে। নূতন কালেক্টরেটটি ১৭৭৩ খৃ. স্থাপিত ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধীন ন্যস্ত করা হয়। অনুরূপভাবে অপর একটি পৃথক কালেক্টরেট সিলেট ও ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধীনে আনীত হয়। ১৭৮১ খৃ. প্রাদেশিক কাউন্সিল বিলুপ্ত হইলে এই কালেক্টরেটগুলি রাজস্ব ও নির্বাহী–উভয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রশাসনিক ইউনিটে (জিলায়) পরিণত হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ও ১৯শ শতাব্দীর শুরুর দিকে ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ ও ফরিদপুর জিলার সৃষ্টি হয় এবং ইহারা ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ১৮৭১ খৃ. ফরিদপুরের মূলফতগঞ্জ থানাকে ঢাকার মানিকগঞ্জের সহিত বিনিময় করা হয়। এইভাবে সাবেক ঢাকা জিলার সীমানা নির্ধারিত হয়। পরে ১৯৮৪ খৃ. দেশের সকল মহকুমাকে জিলায় রূপান্তরিত করা হইলে নারায়ণগঞ্জ, মুনশীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুর ঢাকা জিলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রতিটি পৃথক পৃথক জিলায় পরিণত হয়। বর্তমানে ঢাকা জিলা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পাঁচটি উপজিলা লইয়া গঠিত। এই উপজিলাগুলি হইল ঃ ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, সাভার, দোহার ও নওয়াবগঞ্জ, অন্যদিকে ঢাকা মহানগরী ১৪টি থানায় এবং ঢাকা সিটি করপোরেশন ৭৫টি ওয়ার্ডে বিভক্ত। থানাগুলি হইল ঃ কোতওয়ালী, সূত্রাপুর, লালবাগ, ডেমরা, মতিঝিল, সবুজবাগ, রমনা, তেজগাঁও, গুলশান, ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, মীরপুর, ক্যান্টনমেন্ট ও উত্তরা।

জিলা অপেক্ষা উচ্চতর প্রশাসনিক ইউনিট 'বিভাগ' বৃটিশ আমলের সৃষ্টি। ১৮২৯ খৃ. বিভাগীয় কমিশনারের অধীন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। একই বৎসর ঢাকা, ঢাকা-জামালপুর, ত্রিপুরা, শেরপুর ও ময়মনসিংহ জিলা লইয়া ঢাকা বিভাগ গঠিত হয় এবং বিভাগীয় সদর দফতর ঢাকায় স্থাপিত হয়। ১৮২৯-৩০ খৃ. ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার অফিসে মোট ২৩ জন কর্মচারী ছিলেন। তাহাদের মাসিক মোট বেতনের পরিমাণ ছিল ৫৪৩ টাকা। ১৮৬৭ খৃ. কর্মচারীর সংখ্যা ৩১ এবং বেতনের পরিমাণ ১,০৫৯ টাকায় বৃদ্ধি পায়।

কালক্রমে ঢাকা বিভাগে পূর্ববঙ্গ ও আসামের আরও কয়েকটি জিলার অন্তর্ভুক্তির ফলে ইহার আয়তন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ১৮৬০-এর দশকে ঢাকা বিভাগ পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলা এবং আসামের সিলেট ও কাছার জিলা সমন্বয়ে গঠিত ছিল। ১৮৭৪ খৃ. সিলেট ও কাছাড় জিলা দুইটিকে ঢাকা বিভাগ হইতে পৃথক করিয়া নব প্রতিষ্ঠিত আসাম চীফ-কমিশনারশীপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭৫ খৃ. ত্রিপুরাকে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ১৮৮০ খৃ. উহাকে আবার চট্টগ্রাম বিভাগে ফেরত দেওয়া হয়। ফলে ঢাকা বিভাগে মাত্র চারিটি জিলা–ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ অবশিষ্ট থাকে। ১৮৮৫ সাল নাগাদ ঢাকা বিভাগের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৮৭,০০,০০০-তে। ইহাদের নিকট হইতে পৌরকরসহ মোট রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬৯,১১,৮৮৩ টাকা। ১৯৬১ খৃ. পর্যন্ত ঢাকা বিভাগের আয়তন ছিল অপরিবর্তিত। কিন্তু ঐ সালে বাকেরগঞ্জ জিলাকে নবগঠিত খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে ঢাকা বিভাগে কেবল ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ এই তিনটি জিলা থাকিয়া যায়। ১৯৮৪ খৃ. প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে মহকুমার বিলুপ্তি ও তদস্থলে নূতন জিলা সৃষ্টির ফলে বর্তমানে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মোট সতেরটি জিলা রহিয়াছে। কিন্তু আয়তন পূর্বের ন্যায় একইরূপ রহিয়াছে (৩০,৯৯৭ ব. কি.)। জিলাগুলি নিম্নরূপঃ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুনশীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারিপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইল। এই সকল জিলায় মোট ১১৯টি উপজিলা রহিয়াছে।

নিম্নে শুধু ঢাকা নগরীর উপর আলোচনা করা যাইতেছে। এই আলোচনা প্রধানত ঢাকার ইতিহাস, ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলী, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৪। **ঢাকা নামের উৎপত্তি ঃ** প্রতিটি নামের পিছনে কিছু না কিছু কারণ থাকে। সেই কারণ যদি যথাসময়ে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা না হয় তাহা হইলে পরবর্তী কালে তাহা মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় এবং প্রথম জন্মের পরবর্তী জন্মের মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। পরে নামের কারণ লইয়া অনুসন্ধান ও গবেষণা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

কোন্ সুদূর অতীতে কিভাবে ঢাকা নামের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা আজ আর কাহারও পক্ষে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নহে। কারণ এই সম্পর্কিত সমসাময়িক কোন প্রমাণ এই পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে পণ্ডিতগণ এই নামের নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহা নিতান্তই অনুমাননির্ভর। যাহা হউক, ঢাকা নামকরণের কারণ সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন মতামত নিম্নে তুলিয়া ধরা হইল।

সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মত হইল 'ঢাকা' শব্দটি 'ঢাক' হইতে উদ্ভূত। পূর্বে এইখানে ঢাক নামের একটি গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিত বলিয়া স্থানটির নাম ঢাকা হয়। দ্বিতীয় মতটি একটি প্রাচীন কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কথিত আছে, সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন ছিলেন আদিশূরের এক স্ত্রীর গর্ভজাত এবং ব্রাহ্মণের আকৃতিতে ব্রহ্মপুত্রের ঔরসজাত পুত্র। বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর দিকের জঙ্গলে, যেইখানের আদিশূর তাহার উক্ত স্ত্রীকে নির্বাসন দিয়াছিলেন, বল্লাল সেনের জন্ম ও লালন-পালন হয়। পরে বল্লাল সেন যখন এইখানে একটি দেবী মূর্তি আবিষ্কার করেন তখন এই দেবীই তাহাকে তাঁহার দুঃখের দিনগুলিতে আশ্রয় দান করিয়াছে, এই বিশ্বাসে একটি মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেইখানে ঐ দেবীমূর্তিটি স্থাপন করেন। কেহ কেহ অবশ্য মন্দির নির্মাতারূপে আদিশূরেরও নাম করিয়া থাকেন, যিনি তখন বল্লাল সেনের লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেহেতু এই দেবীমূর্তিটি জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া গোপন হইয়া গিয়াছিল, তাই এই মন্দিরের নামকরণ করা হয় ঢাকেশ্বরী মন্দির বা গোপন ঈশ্বরীর মন্দির। ক্রমে জঙ্গল পরিষ্কার হইয়া এই স্থানে একটি শহর গড়িয়া উঠে। তখন ঢাকেশ্বরী হইতে শহরটির নামকরণ করা হয় ঢাকা। অনেকেই এই মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে স্থানের নাম হইতে মন্দিরের নামকরণ হইতে পারে, কিন্তু মন্দিরের নাম হইতে স্থানের নামকরণ হইতে দেখা যায় না। তাহারা বলেন, ঢাকা শহরের নাম হইতেই ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নামকরণ করা হইয়াছে। মন্দিরের নাম হইতে ঢাকা শহরের নামকরণ করা হয় নাই।

তৃতীয় মত হইল, 'ঢাকা' নামটি 'ঢাক' হইতে উদ্ভূত। 'ঢাক' বাংলা ভাষায় ঢোলের অপর নাম। কথিত আছে, মুগল সুবাদার ইসলাম খান বাংলার পূর্বাঞ্চলে রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্থান নির্বাচনের জন্য রাজকীয় বজরাযোগে দলবলসহ যখন ঢাকা নগরীর সম্মুখস্থ বুড়িগঙ্গায় উপস্থিত হন, তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজধানী হিসাবে স্থানটি পসন্দ হয়। অতঃপর তিনি সেইখানে নোঙর ফেলিয়া তীরে অবতরণ করেন এবং স্থানটি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখেন। তিনি যেইখানে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহা আজও তাঁহার নামানুসারে ইসলামপুর নাম ধারণ করিয়া আছে। ফিরিবার পথে তিনি একদল হিন্দুর সাক্ষাত পান, যাহারা ঢাক-ঢোল ও গান-বাজনাসহ পূজা অনুষ্ঠান করিতেছিল। ইসলাম খানের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলিয়া যায়। তিনি বাদকদলকে ডাকিয়া একত্রে এক স্থানে

দাঁড় করান এবং যত জোরে সম্ভব তাহাদিগকে ঢোল বাজাইবার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে তিনি তাঁহার তিনজন কর্মচারীকে লাঠিসহ পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, যেইখানে ঢোলের আওয়াজ আর শোনা যাইবে না সেইখানে যেন তাহারা তাহাদের নিজ নিজ লাঠি মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। এইরূপ করার পর তিনি স্থানটির নাম রাখেন ঢাকা (ঢাক বা ঢোল দ্বারা সীমা নির্ধারিত বলিয়া) এবং পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে যেইখানে লাঠি পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল সেইখানে সীমানা স্তম্ভ নির্মাণের আদেশ দেন। দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী সীমা নির্ধারিত হয়। এই সীমার মধ্যে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। এই মতটিও ঐতিহাসিকদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে নাই। কারণ ইসলাম খান এইখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া ইহার নাম রাখিয়াছেন তৎকালীন মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে জাহাঙ্গীরনগর। তাহা হইলে তিনি আবার কিরূপে ইহার নাম ঢাকা রাখিলেন? আসলে তিনি যখন এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন তাহার পূর্ব হইতেই ইহার নাম ঢাকা ছিল। তিনি তাহা পরিবর্তন করিয়া জাহাঙ্গীরনগর নাম রাখেন।

চতুর্থ আরেকটি মত এই যে, ঢাকা সম্ভবত ঢক্ক হইতে উদ্ভূত এবং ঢক্ক অর্থ চৌকি বা প্রহরার স্থান। এই মত অনুসারে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত এই শহরটি সম্ভবত পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজধানী বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও-এর প্রহরা স্থান বা সীমান্ত চৌকি হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং কালক্রমে এই ঢক্ক হইতেই শহরটি ঢাকা নাম ধারণ করে। উল্লেখ্য যে, প্রাকৃত ভাষার একটি স্থানীয় কথ্য রূপের নাম হিসাবে ঢক্ক ভাষার নাম পাওয়া যায়। এই মতানুসারীরা মনে করেন যে, এই ভাষা ঢাকার আশেপাশের লোকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত মতগুলির কোনটিই চূড়ান্ত নহে। সম্ভবত নামটি অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিয়াছে এবং ইহার মধ্যে কোন না কোন অজানা তথ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে।

৫। ইতিহাস ঃ (ক) প্রাক-মুগল যুগ (১৬০৮ খৃ.-র পূর্ববর্তী) ঃ ১৭শ শতাব্দীর শুরুতে মুগল রাজধানী হিসাবে ইতিহাসের আলোকচ্ছটায় ঢাকার আবির্ভাব হইলেও উহার পূর্বেও ঢাকার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তবে ঠিক কখন হইতে এইখানে জনবসতি শুরু হয় এবং কালক্রমে ইহা একটি নগরীর মর্যাদা লাভ করে তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। নদীর কিনারে ও অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে জনপদ গড়িয়া উঠা নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং কোন এক সুদূর অতীতে প্রয়োজনের তাগিদে মনুষ্য বসতির আদর্শ স্থান হিসাবে এই স্থানটির প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়িয়া থাকিবে এবং তাহারই ফলে এইখানে ক্রমে একটি জনপদ গড়িয়া উঠে। জনপদ সৃষ্টির পর সেইখানে মানুষেরই প্রয়োজনে প্রথমে হাট-বাজার, ব্যবসায়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে এবং তাহার পর উহা ক্রমে বন্দর, শহর ও নগর পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। অন্যদিকে সরকারের প্রশাসনিক প্রয়োজনে ফাঁড়ি, চৌকি, থানা ইত্যাদি স্থাপিত হয়, যেইগুলিকে ঘিরিয়া কালের পরিক্রমায় স্থানটি একটি প্রাথমিক শহরের রূপ লাভ করিয়া থাকিবে। পরে মুগল সুবাদার ইসলাম খান যখন পূর্ববঙ্গে রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্থান নির্বাচনের জন্য বাহির হন তখন এই শহরটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এইখানেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেন।

মুগলদের আগমনের বহু পূর্বেই ঢাকা মুসলিম অধিকারে আসিয়াছিল এবং মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে ইহা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। অন্তত দুইটি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হইতে ঢাকার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ইহাদের একটি আনুমানিক খৃ. ৭ম শতকের গুপ্ত শাসকদের স্বর্ণের নকল মুদ্রা। পিলখানার সামান্য পশ্চিমে নাওয়াব রাশীদ খান কা বাগীচা নামক স্থানে এই মুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হয়। অপরটি কালো পাথরের একটি হরিশঙ্কর মূর্তি যাহা সেন আমলের (খৃ. ১১শ-১২শ শতাব্দী) বলিয়া অনুমিত। এই মূর্তিটি তেজগাঁও এলাকায় একটি পুরাতন পুকুর খননকালে পাওয়া যায়। ঢাকা যে সেই যুগেও জনবসতিপূর্ণ ছিল এই দুইটি আবিষ্কার তাহারই সাক্ষ্য বহন করে।

১২০৪ খৃ. বাখতিয়ার খিলজী কর্তৃক উত্তর বাংলা বিজয়ের ফলে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়। তৎকালীন সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেন মুসলিম আক্রমণের মুখে রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া ঢাকার নিকট (প্রায় ১৫ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে) বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সেন বংশীয় রাজাগণ অন্তত ১২৪২ খৃ. পর্যন্ত সেইখান হইতেই বাংলার অবশিষ্টাংশ শাসন করেন। এই সময় ঢাকার অদূরে (প্রায় ১০ মাইল পূর্বে) সোনারগাঁও-এ দেব নামে অপর একটি হিন্দু রাজবংশের উত্থান ঘটে। ইহারা সেন বংশের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্মপ্রকাশ করিলে সোনারগাঁও ও বিক্রমপুর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজধানী শহরে পরিণত হয় (১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধ)। দুই রাজধানীর নিকটবর্তী ঢাকাও তখন একটি ছোটখাটো শহর বা জনপদের রূপ লাভ করিয়া থাকিবে। ১৩শ শতাব্দীর সত্তরের দশকে লাখনাওতীর (গৌড়, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জিলায় অবস্থিত, তৎকালীন মুসলিম বাংলার রাজধানী) মুসলিম গভর্নর মুগীছু'দ-দীন তুগরিল সর্বপ্রথম ঢাকা অঞ্চলে মুসলিম অভিযান পরিচালনা করেন এবং আশির দশকে রাজধানী সোনারগাঁও মুসলিম অধিকারভুক্ত হয়। তখন হইতে সোনারগাঁও লাখনাওতীর পরেই মুসলিম বাংলার দ্বিতীয় রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত রাজধানী হিসাবে (কখনও স্বাধীন কখনও বা লাখনাওতীর অধীন) ইহার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে।

প্রাক-মুগল মুসলিম যুগের নিদর্শন হিসাবে ঢাকায় দুইটি মসজিদ, দুইটি শিলালিপি ও একটি মাযার বর্তমান। মসজিদ দুইটির একটি নারিন্দায় অবস্থিত বিনাত বিবির মসজিদ। ইহার প্রবেশদ্বারে রক্ষিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মসজিদটি বাখত বিনাত নাম্নী জনৈকা মহিলা কর্তৃক ৮৬১/১৪৫৭ সালে নির্মিত। অপরটি বর্তমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পশ্চিমে অবস্থিত নাসওয়ালা গলির মসজিদ। এইখানে প্রাপ্ত শিলালিপিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, খাওয়াজা জাহান উপাধিধারী জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক ২০ শা'বান, ৮৬৩/২৫ জুন, ১৪৫৯ তারিখে একটি প্রবেশদ্বার নির্মিত কিংবা পুনঃনির্মিত হইয়াছিল। প্রবেশদ্বারটির অস্তিত্ব এখন আর বিদ্যমান নাই, এমনকি মসজিদটিও উহার পূর্বাবস্থায় নাই। এই সময়কার তৃতীয় নিদর্শন বঙ্গভবন এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত শাহ জালাল দাখীনীর মাযার। মাযার ভবনটি অনেক পরে নির্মিত হইলেও বাংলায় শাহ জালাল (র)-এর আগমন ঘটে ১৫শ শতাব্দীতে। জনগণের উপর তাঁহার প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তিতে সন্দিহান হইয়া গৌড়ের সুলতান ১৪৭৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। ইহা ছাড়া সেই সময়কার বিভিন্ন লেখাতেও ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলায় প্রাপ্ত ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৪৬০ তারিখের একটি আরবী শিলালিপিতে সর্বপ্রথম ঢাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত শিলালিপি অনুযায়ী শিলালিপিটির সময়কালের এক প্রজন্ম পূর্বে জনৈক তারবিয়াত খান কাসবা ঢাকা খাস-এর সার-ই গুমাশতা (প্রধান নিয়ন্ত্রক) পদে নিয়োজিত ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে কাসবা ঢাকা খাস ও বর্তমান ঢাকা অভিন্ন। আকবারনামা ও বাহারিসতান-ই গায়বী নামক গ্রন্থ দুইটিতে মুগল যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঢাকা বারবার উল্লিখিত

হইয়াছে। ঈসা খান (মৃ. ১৫৯৯ খৃ.) কর্তৃক একবার ঢাকার থানাদার জনৈক সায়্যিদ হুসায়নকে বন্দী করার কথা জানা যায়।

মুগল আগমনের পূর্বে ঢাকায় অন্তত তিনটি দুর্গ ছিল বলিয়াও জানা যায় ঃ ধোলাই খালের দুই তীরে দুইটি এবং বর্তমান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের স্থানে একটি। ইহাদের কোনটিই আজ আর টিকিয়া নাই। ঢাকার এই সকল নিদর্শন ও বর্ণনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, মুগলদের আগমনের বহু পূর্বে এবং বাংলার মুসলিম বিজয়ের প্রায় আড়াই শত বৎসরের ব্যবধানে ঢাকায় উল্লেখযোগ্য মুসলিম জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উহা একটি বর্ধিষ্ণু নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এইখানে অনেক সূফী সাধকেরও আগমন হইয়াছিল। প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবেও ঢাকার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল এবং সার-ই গুমাশতা ও থানাদার-এর ন্যায় কর্মকর্তাগণ এখানকার প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

(খ) মুগল যুগ (১৬০৮-১৭৬৫ খৃ.) ঃ ১২ জুলাই, ১৫৭৬ খৃস্টাব্দের রাজমহলের যুদ্ধে মুগল সেনাপতি খান জাহানের নিকট বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান কার্‌রানী বংশের দাউদ খান কার্‌রানীর পরাজয় বরণ ও নিহত হইবার পর বাংলায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রথমদিকে এই শাসন বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে মুগল আধিপত্য বিস্তারে আরও প্রায় সিকি শতাব্দীর অধিক কাল ব্যয়িত হয়। এই সময় এতদঞ্চলে সমষ্টিগতভাবে 'বার ভূঁইয়া' নামে পরিচিত কয়েকজন স্বাধীন সামন্ত শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন ঈসা খান, যিনি সোনারগাঁও-এ রাজধানী স্থাপন করিয়া ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও উত্তর বঙ্গের এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সম্রাট আকবার একাধিকবার ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিতে ব্যর্থ হন। ইহার ফলে তাঁহার শাসন আমলে (১৫৫৬-১৬০৫ খৃ.) বাংলার এই অঞ্চলটি মুগল শাসনের বাহিরেই থাকিয়া যায়। আকবারের ইনতিকালের পর তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খৃ.) সম্রাট হন। তিনি ইসলাম খান চিশ্‌তীকে বাংলার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। ইসলাম খান স্বীয় কর্মস্থল রাজমহলে পৌঁছিয়া বার ভূঁইয়াদের দমনের জন্য এক নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি স্থির করেন যে, বিদ্রোহীদিগকে তাঁহাদের সন্নিকটে থাকিয়াই দমন করিতে হইবে, রাজমহলের ন্যায় দূরবর্তী স্থানে থাকিয়া নহে। সুতরাং তিনি রাজমহল হইতে পূর্ব বাংলার সুবিধাজনক কোন স্থানে রাজধানী স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। পরিকল্পনা মুতাবিক নূতন রাজধানীর স্থান নির্বাচনের জন্য ইসলাম খান স্বীয় দলবল ও এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ পূর্ব বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নানা স্থান ঘুরিয়া তাঁহার রাজকীয় নৌবহর অবশেষে ঢাকা শহরের সম্মুখস্থ বুড়িগঙ্গা নদীতে নোঙর ফেলে। তিনি তীরে উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া স্থানটি পরিদর্শন করেন এবং তাঁহার পরিকল্পিত রাজধানীর জন্য স্থানটি তাঁহার পসন্দ হয়। ফলে এইখানেই তিনি বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং তৎকালীন মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গীরনগর'। ইসলাম খানের এই ঢাকা আগমন ১৬০৮ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষদিকে অথবা মতান্তরে ১৬১০ খৃস্টাব্দে হইয়াছিল।

ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের পর তিনি এতদঞ্চলের বিদ্রোহী শাসকদের দমনের উদ্যোগ নেন। ঈসা খানের পুত্র মূসা খান তখন সোনারগাঁও-এর শাসক। তিনি শুধু পিতার সুবিস্তৃত রাজ্যেরই উত্তরাধিকারী হন নাই, তাঁহার শৌর্য-বীর্যের গুণগুলিও পাইয়াছিলেন। তিনি স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া তাঁহার রাজ্য সুরক্ষিত করেন। ইসলাম খান তাঁহার নূতন শাসনকেন্দ্রের অতি নিকটে অবস্থিত এই শক্তিশালী মুগলবিরোধী নরপতিকে প্রথম সুযোগেই দমন করিতে সচেষ্ট হন। তিনি একে একে তাঁহার সব কয়টি দুর্গ অধিকার করেন। মূসা খান একের পর এক যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া অবশেষে রাজধানী সোনারগাঁও ছাড়িয়া ইবরাহীমপুর নামক মেঘনার এক চরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলাম খান বিনা বাধায় সোনারগাঁও অধিকার করেন (আনু. মধ্য এপ্রিল ১৬১১ খৃ.) এবং বস্তুতপক্ষে এই সঙ্গেই মূসা খানের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে। রাজধানী হিসাবে সোনারগাঁও-এর পতন এবং মূসা খানের বিস্তৃত রাজ্য মুগল অধিকারভুক্ত হওয়ায় ঢাকা এক নূতন যুগে প্রবেশ করে। এতদিন সোনারগাঁও ও তৎপূর্বে বিক্রমপুর এই অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র হিসাবেই গুরুত্বের অধিকারী ছিল, ঢাকা এখন সেই গুরুত্বই লাভ করিল এবং মুগল সংস্পর্শে ইহার গুরুত্ব ও মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বস্তুতপক্ষে ১৪শ-১৬শ শতাব্দীতে সোনারগাঁও উন্নতি ও সমৃদ্ধির যেই অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল—যেইরূপ চৈনিক পরিব্রাজক ও ইব্‌ন বাতূতার ভ্রমণ কাহিনী হইতে জানা যায়, ১৭শ শতাব্দীতে ঢাকাও ঠিক সেই অবস্থায়ই পৌঁছিয়াছিল। মুগল যুগের ঢাকার সহিত বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপিত হয়; ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে বহু বিদেশী জাতির এইখানে আগমন ঘটে।

তৎকালে এই অঞ্চলে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত চরমে পৌঁছিয়াছিল। ঢাকা পর্যন্ত ইহাদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের পরিধি বিস্তৃত ছিল। ঢাকার মুগল গভর্নরগণ ইহাদের প্রতিরোধের জন্য কৌশলগত স্থানগুলিতে দুর্গ নির্মাণ করেন। আজও নারায়ণগঞ্জ শহরের অদূরে শীতলক্ষ্যা নদীর ডান তীরে খিজিরপুর বা হাজীগঞ্জ দুর্গ ও বাম তীরে সোনাকান্দা দুর্গ এবং মুনশীগঞ্জ শহরের ইদ্রকপুর দুর্গ কাল-পরিক্রমায় উহার নীরব সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। ১৬২৬ খৃ. মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যু কর্তৃক ঢাকা লুণ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। তিন দিন পর্যন্ত তাহারা ঢাকা লুণ্ঠন করে, স্থানে স্থানে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং ঘরবাড়ীর ধ্বংস সাধন করে। অবশেষে বিশাল মুগল বাহিনীর আগমনবার্তা পাইয়া এই দস্যুদল ঢাকা নগরী ত্যাগ করে। মুগলদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার ফলে কালক্রমে জলদস্যুদের উৎপাত হইতে ঢাকা মুক্ত হইলেও চট্টগ্রামসহ সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল আরও কিছুকাল যাবত ইহাদের লুণ্ঠনের অবাধ ক্ষেত্ররূপে বিরাজ করে। অবশেষে মুগল সুবাদার শাইস্তা খান (১৬৬৪-৮৮ খৃ.) ইহাদের দমন করিয়া চট্টগ্রাম উদ্ধার করিতে সমর্থ হন (১৬৬৬ খৃ.)। তিনি ইহার নাম দেন ইসলামাবাদ। কালক্রমে সমগ্র বাংলা এই দস্যুদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করে।

বাংলার রাজধানী থাকাকালে ঢাকায় মোট ১৭ জন মুগল সুবাদার (গভর্নর) কর্মরত ছিলেন এবং আরও ৩ জন অনুপস্থিত সুবাদার হিসাবে অভিষিক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে ছয়জন সুবাদারের শাসনকাল ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়রূপে পরিকীর্তিত। ঢাকার প্রকৃত উন্নতি ও বিকাশ তাহাদের আমলেই সম্পন্ন হয়। এই সুবাদারগণ হইলেন ঃ (১) ইসলাম খান (১৬০৮-১৩ খৃ.); (২) শাহ শুজা' (১৬৩৯-৬০ খৃ.); (৩) মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩ খৃ.); (৪) শাইস্তা খান (১৬৬৩-৭৮ ও ১৬৭৯-৮৮ খৃ.); (৫) শাহযাদা মুহাম্মাদ আজাম (১৬৭৮-৭৯ খৃ.) ও (৬) শাহযাদা আজমীমুশ্‌-শান (১৬৯৭-১৭০৩ খৃ.)।

ইসলাম খান ঃ ১৬০৮-১৩ খৃ.) ইসলাম খান ফতেহপুর সিক্রির বিখ্যাত সূফী সাধক শায়খ সালীম চিশ্‌তীর পৌত্র ছিলেন। তাঁহার পূর্ণ নাম শায়খ 'আলাউদ্‌-দীন ইসলাম খান চিশ্‌তী। তাঁহাকে পাঁচ হাজারের

মানসাব দিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন এবং ভাটি, বুকাইনগর, তরফ ও মাতাং-এর জমিদারদের পরাভূত করেন। দীর্ঘদিনের মুগলবিরোধী শক্তিকে সাফল্যের সহিত দমন করিয়া তিনি পূর্ব বাংলায় মুগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঢাকায় তাঁহার প্রধান কীর্তি একটি দুর্গ নির্মাণ কিংবা পূর্ব হইতে বিদ্যমান দুর্গের পুনঃনির্মাণ। এই দুর্গটিই এইখানকার সুবাদারদের সরকারী বাসভবন ছিল এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই মুগল আমলের জনবসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বর্তমানে এই দুর্গের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই। এখন সেইখানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার অবস্থিত। সৈয়দ আওলাদ হোসাইন লেনে অবস্থিত ইসলাম খান কী মাসজিদ তাঁহার অপর একটি কীর্তি। পুরাতন ঢাকার অন্যতম প্রধান এলাকা ইসলামপুর তাঁহারই নামানুসারে নামকরণকৃত। পুরাতন হাইকোর্ট এলাকায় তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বসবাস করিতেন। ১৬১৩ খৃ. ইনতিকালের পর এইখানেই তাঁহাকে প্রথম দাফন করা হয়। পরে তাঁহার মরদেহ এইখান হইতে ফতেহপুর সিক্রিতে নিয়া পুনঃ দাফন করা হয়। অনেকে মনে করেন, পুরাতন হাইকোর্ট প্রাঙ্গণের বর্তমান মাযারটিই তাঁহার প্রথম সমাধিস্থল ছিল।

শাহ শুজা' ঃ (১৬৩৯-৬০ খৃ.) ঢাকা নগরীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সুবাদার ছিলেন শাহ শুজা'। তিনি ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খৃ. পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন, মধ্যখানে ১৬৪৭-৪৮ ও ১৬৫২ খৃস্টাব্দের স্বল্প বিরতি ব্যতীত। তিনি নিজে রাজমহলে অবস্থান করিতেন এবং তাঁহার সহকারী হিসাবে মীর আবুল কাসিম ঢাকা হইতে পূর্ব বাংলার শাসন কাজ পরিচালনা করিতেন। শাহ শুজা' ছিলেন মুগল সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র। বাংলায় তাঁহার উপস্থিতিতে সুবাদারের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার প্রবল প্রতাপে পার্শ্ববর্তী অবাধ্য জমিদারগণ সহজেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ঢাকায় তাঁহার সময়কার দুইটি প্রধান নিদর্শন বিদ্যমান ঃ একটি চকবাজারের নিকট বড় কাটরা ভবন এবং অন্যটি ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় সাত মসজিদ রোড সংলগ্ন ঈদগাহ। ত্রিপুরার রাজা তাঁহার সম্মানে কুমিল্লায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটির নাম শুজা' মসজিদ এবং যেই স্থানে উহা অবস্থিত তাহার নাম শুজাগঞ্জ। তাঁহার শাসনামলে বিপুল সংখ্যক শীআ পরিবারের ঢাকায় আগমন ঘটে এবং এইখানে ফারসী ভাষার চর্চা ও ইরানী আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক প্রথা প্রবর্তিত হয়।

শাহজাহানের শেষ জীবনে সিংহাসন লইয়া পুত্রদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে শাহ শুজাও উহাতে জড়াইয়া পড়েন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ভ্রাতা আওরাঙ্গযীবের নিকট পরাজিত হইয়া শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলা ছাড়িয়া আরাকানে পালাইয়া যাইতে বাধ্য হন (১৬৬০ খৃ.)। সেইখানে তিনি আরাকানের রাজা কর্তৃক সপরিবারে নিহত হন।

মীর জুমলা ঃ (১৬৬০-৬৩ খৃ.) পরবর্তী সুবাদার মীর জুমলা। তাঁহার আসল নাম মু'আজজাস খান। ১৬৬০ খৃস্টাব্দে সম্রাট আওরাঙ্গযীবের ভ্রাতা শাহ শুজাকে বিতাড়িত করার জন্য তাঁহাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। মীর জুমলার আমলে ঢাকার মর্যাদা আরেক ধাপ বৃদ্ধি পায়। তিনি আসামের বিভিন্ন স্থান জয় করেন এবং ভূমি রাজস্ব আদায়ের ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নূতন ব্যবস্থাবলী প্রবর্তন করেন। মীর জুমলার আসাম অবস্থানকালে বাংলায় এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল যাহা দুই বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁহার আমলে ঢাকার চারিপার্শ্বে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় এবং আরাকানী ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সুবাদার শাইস্তা খানের আগমনের পূর্বে ইহাদের সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয় নাই।

শাহ শুজা'কে পরাভূতকরণ, আসাম বিজয় এবং রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের জন্য মীর জুমলা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ঢাকায় এখনও তাঁহার আমলের কিছু কিছু স্মৃতিচিহ্ন বর্তমান। পাগলা পুল (বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত), টঙ্গী সেতু (বর্তমানে বিলুপ্ত ও তদস্থলে নূতন সেতু নির্মিত), ময়মনসিংহ সড়ক (বর্তমানে নূতন করিয়া নির্মিত) এবং মুন্‌শীগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি দাউদকান্দিতে অপর একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে উহার অস্তিত্ব বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই মহান যোদ্ধা ও নির্মাতা আসাম অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনকালে খিযিরপুরে ইনতিকাল করেন (৩১ মার্চ, ১৬৬৩ খৃ.)। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি খিযিরপুরের খানপুর নামক স্থানে সমাহিত আছেন এবং খানখানা নাম হইতে স্থানটির উক্ত নাম হইয়াছে। আবার অন্যরা মনে করেন, তাঁহার মৃতদেহ ইসফাহান কিংবা আগ্রায় নীত হইয়া তথায় সমাহিত হইয়াছে।

শাইস্তা খান ঃ (১৬৬৩-৭৮ ও ১৬৭৯-৮৮ খৃ.) ঢাকার মুগল সুবাদারগণের মধ্যে যাঁহার শাসনকাল ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়রূপে চিরস্মরণীয় তিনি হইলেন আমীরুল-উমারা নাওয়াব শাইস্তা খান। ইনি সম্রাজ্ঞী মুমতায মাহাল-এর ভ্রাতা এবং সম্রাট আওরাঙ্গযীবের মামা ছিলেন। মীর জুমলার ইনতিকালের পর ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে তিনি বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬৬৪ খৃস্টাব্দের শেষদিকে ঢাকায় আগমন করেন। তিনি দুইবারে (১৬৬৩-৭৮ ও ১৬৭৯-৮৮খৃ.) মোট ২৪ বৎসর কাল বাংলার সুবাদারের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৬৭৮-৭৯ খৃস্টাব্দে কিঞ্চিদধিক মাত্র এক বৎসরের জন্য সম্রাট আওরাঙ্গযীবের পুত্র শাহযাদা মুহাম্মাদ আজাম সুবাদার ছিলেন। শাইস্তা খান তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তির জন্য ঢাকা তথা বাংলার ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুগল নৌবাহিনী (নাওওয়ারা) গঠন করেন এবং উহার সাহায্যে চট্টগ্রামসহ বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের উপদ্রব চিরতরে দমন করেন। অনেকে মনে করেন, তাঁহার এই জলদস্যু দমনের ঘটনা হইতেই বাংলা ভাষায় 'শায়েস্তা' শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে তিনি আরাকানীদের নিকট হইতে চট্টগ্রাম উদ্ধার করেন এবং ইহার নাম দেন ইসলামাবাদ। বাংলার প্রধান সমুদ্র বন্দর হিসাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ইহা খুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু উহার পূর্বেই হুগলী নদীর তীরকে কেন্দ্র করিয়া য়ুরোপীয় বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরিণামে বন্দর নগরী হিসাবে কলিকাতার দ্রুত বিকাশ ঘটে।

তাঁহার আমলে ঢাকা নগরীতে অসংখ্য মসজিদ, মাযার ও কাটরা নির্মিত হয়। এই সময় মুগল স্থাপত্য-রীতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। এই কারণে তখনকার স্থাপত্য রীতি শাইস্তা খানী রীতি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ঢাকা এই সময় সমৃদ্ধির চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। চাউল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অত্যন্ত সস্তা দামে বিক্রয় হইত। এক টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। কথিত আছে, শাইস্তা খান যখন শেষবারের মত ঢাকা ত্যাগ করেন তখন এই তথ্যকে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য পুরাতন দুর্গের (বর্তমানে বিলুপ্ত) পশ্চিম দরজা বন্ধ করিয়া দেন এবং এই নির্দেশ রাখিয়া যান যে, যদি কখনও খাদ্যশস্য এই দামে বিক্রয় সম্ভব হয় তবেই যেন দরজাটি পুনরায় খুলিয়া দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, সেই দরজা কিংবা দুর্গের কোনটিই আজ আর অবশিষ্ট নাই। এইদিকে জিনিসপত্রের দামও আর কখনও সেই পর্যায়ে আনা সম্ভব হয় নাই। চাঁদপুরের নিকট শায়েস্তাগঞ্জ ও বরিশালের নিকট শায়েস্তাবাদ আজও এই মহান শাসকের স্মৃতি বহন করিয়া আছে। তাঁহার আমলে ঢাকা নগরীর আয়তন সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। ঢাকা নগরী এই সময়ে পূর্বে ডেমরা খাল হইতে পশ্চিমে মীরপুর এবং দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা হইতে উত্তরে টঙ্গী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বস্তুতপক্ষে ঢাকার এই সীমা কখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, বরং পরবর্তী কালে ঢাকার আয়তন হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া এক ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হয়। ১৯৪৭ খৃ. পর ঢাকা প্রথমে প্রাদেশিক ও পরে জাতীয় রাজধানীর মর্যাদা লাভ করিয়া পুনরায় ঐ সীমা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ছোট কাটরা ও বুড়িগঙ্গা তীরের একটি বাঁধ শাইস্‌তা খানের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ও পূর্ত কীর্তি। ছোট কাটরা তাঁহার প্রাসাদ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে উহা বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। বিখ্যাত পর্যটক তাভার্নিয়ার (Tavernier) এই ছোট কাটরা প্রাসাদেই শাইস্‌তা খানের সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন। বুড়িগঙ্গা তীরের বাঁধটির এখন আর কোন অস্তিত্ব নাই।

শাহযাদা মুহাম্মাদ আজাম (১৬৭৮-৭৯ খৃ.) ঃ সম্রাট আওরাঙ্গযীবের তৃতীয় পুত্র শাহযাদা মুহাম্মাদ আজমা মাত্র এক বৎসর দুই মাস (১৬৭৮-৭৯ খৃ.) বাংলার সুবাদার ছিলেন। এই সময় তিনি ঢাকার ইতিহাসখ্যাত লালবাগ দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু করেন বলিয়া কথিত আছে। এই দুর্গেই শাইসতা খান তাঁহার দ্বিতীয় মেয়াদকালীন সময়ে বসবাস করিতেন। দুর্গটি পরে অসমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। ঢাকায় সর্বপ্রথম ইটের রাস্তা নির্মাণ শাহযাদা আজামের অপর কীর্তি। তিনি আসামের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, পরে যাঁহার নাম হয় রাহমাত বানু। ইনিই তৎকালীন বাংলা ও আসামের অহোম রাজাদের মধ্যকার সকল সম্পর্কের উৎস ছিলেন।

আজীমুশশান (১৬৯৭-১৭০৩ খৃ.) ঃ ঢাকায় বসবাসকারী বাংলার সর্বশেষ খ্যাতনামা সুবাদার ছিলেন আজীমুশশান। ইনি দিল্লীর সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ্‌র পুত্র ও আওরাঙ্গযীবের পৌত্র ছিলেন। তিনি ১৬৯৬ খৃ. ঢাকায় সুবাদার নিযুক্ত হন, কিন্তু ১৭০২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি ঢাকায় আগমন করেন নাই। এই সময় তাঁহার এক সহকারী রাহমাত খান ঢাকায় শাসন কাজ পরিচালনা করিতেন। আজীমুশশান লালবাগ দুর্গের ৩০০ গজ দক্ষিণ-পূর্বে বুড়িগঙ্গার তীরে পোস্তা নামক স্থানে তাঁহার প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নদীর ভাঙ্গনে প্রাসাদটি অনেক পূর্বেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। সম্ভবত আজিমপুর এলাকার নামকরণ তাঁহার নামানুসারেই হইয়াছে। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, শাহযাদা মুহাম্মাদ আজাম-এর নামানুসারে স্থানটির নাম প্রথমে আজমপুরা এবং পরে উহা হইতে আজিমপুরা বা আজিমপুর হয়। আজীমুশশান জনসাধারণের সহিত বিভিন্ন উৎসবে অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের ভালবাসা অর্জন করেন। তিনি হিন্দু ধর্মীয় উৎসব 'হোলি'-তে অংশ গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন।

ধন-সম্পদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল অত্যধিক। বিদেশী মালামালের ব্যবসায় তিনি একচেটিয়াভাবে নিজের করার চেষ্টা করেন। সম্রাট আওরাঙ্গযীব ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত ব্যবসায় নিষিদ্ধ করিয়া দেন। অতঃপর সরকারী কোষাগারে অবৈধ হস্তক্ষেপ ব্যতীত তাঁহার অর্থ সম্পদ বৃদ্ধির আর কোন পথ ছিল না। ইহার ফলে নবনিযুক্ত দীওয়ান মুরশিদ কূলী খানের সহিত অচিরেই তাঁহার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। আজীমুশশানের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হইয়া মুরশিদ কূলী খান তাঁহার রাজস্ব অফিস ১৭০৪ খৃ. ঢাকা হইতে মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন। উল্লেখ্য যে, এই মকসুদাবাদই পরে মুর্শিদাবাদ নাম ধারণ করে এবং ১৭১৭ খৃ. বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়। এদিকে সম্রাট আওরাঙ্গযীব আজীমুশ-শানকে ঢাকা ত্যাগ করিয়া পাটনা গমনের নির্দেশ দান করেন। ফলে আজীমুশ শান ঢাকায় তাঁহার পুত্র ফার্‌রুখ সিয়ারকে সহকারী সুবাদার নিয়োগ করিয়া নিজে ১৭০৬ খৃ. পাটনা চলিয়া যান। ফার্‌রুখ সিয়ার ১৭১০ খৃ. পর্যন্ত নিজ পদে বহাল ছিলেন। ১৭১৭ খৃ. মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকাই ছিল বাংলার আনুষ্ঠানিক রাজধানী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আজীমুশশানের ঢাকা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ প্রায় ১০০ বৎসরের মুগল শাসনামলে অর্জিত ঢাকার গৌরবও অস্তমিত হয়। অতঃপর নাইব নাজিম বা ডেপুটি গভর্নর ঢাকার শাসনকাজ পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৮৪৩ খৃ. সর্বশেষ নাইব নাজিম নাওয়াব গাযিদ্‌-দীন হায়দারের ইনতিকালের পর এই ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটে। ইতিমধ্যে ১৭৫৭ সনে পলাশীতে লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ইংরেজ বাহিনীর নিকট বাংলার শেষ স্বাধীন নওয়াব সিরাজুদ-দাওলার পরাজয় হইলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঢাকাও ইংরেজদের কর্তৃত্বাধীন চলিয়া যায়। ফলে এইখানে মুগল শাসনের পরিসমাপ্তি ও ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

(গ) বৃটিশ যুগে (১৭৬৫-১৯৪৭ খৃ.) বিভিন্ন য়ূরোপীয় জাতির আগমন ঃ ১৬শ-১৭শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে য়ূরোপীয়দের আগমনের পথ ধরিয়াই ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে বাংলা ও উহার রাজধানী ঢাকায় তাহাদের আগমন ঘটে। মুগলদের রাজধানী ও উহার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে ঢাকার অভ্যুদয় য়ূরোপীয়গণকে ঢাকার প্রতি আকৃষ্ট করে। এইখানে তাহাদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন সাধন। এই লক্ষ্যেই এইখানে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, আরমেনীয়, গ্রীক ও ইংরেজদের আগমন হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজরাই এইখানকার শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠে।

য়ূরোপীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম পর্তুগীজরা ঢাকায় আগমন করে। তাহারা ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে এইখানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ঢাকার নিকট লরিকলে ইহারা লবণ ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। পর্তুগীজদের অপর একটি অংশ আরাকান রাজের অধীনে সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রামে শক্তি সঞ্চয় করে, পক্ষান্তরে অন্য একটি অংশ তখন উপকূল অঞ্চলে জলদস্যু-বৃত্তিতে নিয়োজিত ছিল। নওয়াব শাইস্‌তা খান চট্টগ্রামের একদল পর্তুগীজকে বসবাসের জন্য ঢাকা হইতে বার মাইল দূরে ইছামতি নদীর তীরে ফিরিঙ্গী বাজার নামক জায়গাটি দিয়াছিলেন। তেজগাঁও ও ঢাকার অন্যান্য স্থানে তাহাদের ফ্যাক্টরী ও গির্জা ছিল।

প্রায় সমসাময়িক কালে ঢাকায় আগমনকারী অপর য়ূরোপীয় জাতি ছিল ওলন্দাজ। নদীর তীরে বর্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের স্থানে ইহাদের ফ্যাক্টরী অবস্থিত ছিল। তেজগাঁও-এ ইহাদের একটি বাগানবাড়ি ছিল। শাইস্‌তা খান কর্তৃক পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত চট্টগ্রাম অভিযানকালে তাঁহার অনুরোধক্রমে ওলন্দাজরা তাঁহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সাহায্য পৌঁছিবার পূর্বেই শাইস্‌তা খান চট্টগ্রাম জয় করেন। ১৭৮১ খৃ. ওলন্দাজ সম্পত্তি ইংরেজদের নিকট সমর্পণ করা হয় এবং ১৮৩৪ খৃ. উহা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত হয়। ঢাকায় ওয়ারীর খৃস্টান গোরস্তানে একজন ওলন্দাজ প্রধানের কবর ব্যতীত তাহাদের আর কোন নিদর্শন অবশিষ্ট নাই।

ঢাকায় ফরাসীদের আগমন হয় ইংরেজদের পর ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের দিকে। কিন্তু অল্পদিনেই তাহারা প্রভূত সম্পদের মালিক হইয়া বসে।

বর্তমানে যেইখানে আহসান মঞ্জিল অবস্থিত সেইখানে তাহাদের ফ্যাক্টরী ছিল। ইহা ছাড়া তেজগাঁও-এ একটি বাগানবাড়ি ছিল এবং সমগ্র ফরাসগঞ্জই ছিল তাহাদের মালিকানাধীন; ফরাসীদের বলিয়াই জায়গাটির নাম হয় ফরাসগঞ্জ। ইংরেজ-সিরাজুদ-দাওলা বিরোধে ফরাসীরা নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। এইজন্য সিরাজের পতনের পর ঢাকার ফরাসী ফ্যাকটরীরও বিলুপ্তি ঘটে। ১৭৭৪ খৃ. এই ফ্যাক্টরীটি পরিত্যক্ত হয়, আর সেই সঙ্গে ঢাকায় ফরাসী বসতিরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৮শ শতাব্দীর প্রথমদিকে আর্মেনীয়রা ঢাকায় বসতি স্থাপন করে। ১৯শ শতাব্দীতে ইহারা পাট ব্যবসায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পাট ব্যবসায়ের পূর্বে তাহারা কাপড়, লবণ ও সুপারী ব্যবসায়ের সহিত জড়িত ছিল। কেহ কেহ জমিদারীও লাভ করিয়াছিল। পুরাতন ঢাকার আরমানিটোলা আজও তাহাদের স্মৃতি বহন করিতেছে।

অপরাপর য়ূরোপীয় জাতির তুলনায় অপেক্ষাকৃত পরে ঢাকায় আগমন হয় গ্রীকদের। আর্মেনীয়ানদের ন্যায় ইহারাও প্রধানত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। লবণ ও পাট ছিল তাহাদের বাণিজ্যের প্রধান পণ্য। উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনের অবসানের পরও নারায়ণগঞ্জে গ্রীকদের (র‍্যালী ব্রাদার্স) পাট ব্যবসায় অব্যাহত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় টি. এস. সি সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত একটি গ্রীক সমাধি ইহাদের নিদর্শনস্বরূপ আজও বিদ্যমান।

ঢাকায় ইংরেজদের সর্বপ্রথম আগমন হয় ১৬৫৮ সনের দিকে। ঐ সনেই ঢাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটি এজেন্সী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ক্রমে তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। এক সময় তাহারা বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকারও লাভ করে। প্রথমদিকে তাহাদের ফ্যাক্টরী তেজগাঁও-এ অবস্থিত ছিল। পরে শহরের যেই স্থানটিতে (বাহাদুর শাহ পার্কের পশ্চিমে) উহা স্থানান্তরিত হয় সেইখানে বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রাবাস অবস্থিত।

বৃটিশ রাজত্বের সূচনা ঃ ১৭৫৭ সনের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ নওয়াব সিরাজুদ-দাওলার ভাগ্য বিপর্যয়ের পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। তবে ঢাকায়, দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, কিছু দিন পর্যন্ত ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চলিতে থাকে। অবশেষে ১৭৬৪ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে একদল সৈন্যসহ লেফটেন্যান্ট সুউইনটনের (Lieutenant Swinton) ঢাকা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রতিরোধের অবসান ঘটে। ঢাকায় ইংরেজ শাসনের প্রকৃত সূত্রপাত তখন হইতেই।

ইংরেজ শাসনের প্রাক্কালে ঢাকায় বাংলার সুবাদারের সহকারী হিসাবে নাইব নাজিমের উপর শাসনভার ন্যস্ত ছিল। পলাশী যুদ্ধের সময় ঢাকার নাইব নাজিম ছিলেন জাসারাত খান। ইংরেজদের প্রতি তাঁহার নমনীয় ভাব থাকার কারণে ঢাকায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরেজরা তাঁহাকে নাইব নাজিম পদে পুনর্বহাল করে। সেই সঙ্গে 'চীফ' (Chief) হিসাবে একজন ইংরেজ কর্মকর্তাকেও নিয়োগ করা হয়। নূতন ব্যবস্থায় এই চীফই হন ঢাকার প্রধান শাসনকর্তা এবং নাইব নাজিম হন তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন দ্বিতীয় ব্যক্তি।

১৭৭৩ খৃ. রেগুলেটিং এ্যাকট পাসের পর ঢাকায় উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৭৭৪ খৃ. একটি প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হয়। নিজামত প্রশাসন নাইব নাজিমের হাতে থাকে। ভূমি রাজস্ব কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮১ খৃ. নিজামত আদালতের প্রশাসন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং একজন জজ উক্ত আদালত পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হন। একই বৎসর জাসারাত খান ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার পৌত্র হাশমাত জাং নাইব নাজিম নিযুক্ত হন। তিনি মাত্র সাত বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর নুসরাত জাং পরবর্তী ৩৭ বৎসরের জন্য নাইব নাজিম থাকেন।

পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে মুগল শাসনের স্থলে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা-লগ্নে দেশব্যাপী যে গোলযোগ ও অস্থিরতা দেখা দেয়, উহার মধ্যেই জন্ম নেয় সন্ন্যাসী ও ফকীর বিদ্রোহ (দ্র.)। ১৭৬৩ হইতে ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে এই বিদ্রোহ ঢাকা ও উহার আশেপাশে ছড়াইয়া পড়ে। ফকীর বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন ফকীর মাজনূ শাহ। সন্ন্যাসীরাও তাহাদের সহযোগী হিসাবে বিদ্রোহের আগুন চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়। ১৭৬৩ খৃ. একদল ফকীর ঢাকার ইংরেজ ফ্যাকটরী দখল করিয়া লইলে ঢাকায় এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। তাহারা যেইখানেই যাইত সেইখানেই নিজেদের আধিপত্য বিস্তার ও কর আদায় করিত। এইভাবে প্রায় দশ বৎসর কাল বিদ্রোহ চলার পর ক্রমে উহা স্তিমিত হইয়া পড়ে এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধা দূরীভূত হয়।

একই সময় নওয়াব শামসুদ-দাওলা, যিনি পরবর্তী কালে ঢাকার নাইব নাজিম হইয়াছিলেন, অযোধ্যার নওয়াব ওয়াযীর আলীর সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদের উৎখাতের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ফলে ইংরেজরা নির্বিঘ্নে তাহাদের শাসন কাজ চালাইয়া যাইতে থাকে।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রায় এক শত বৎসর পর ১৮৫৭ খৃ. অনুষ্ঠিত ইতিহাসখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহ। ঢাকায় এই বিদ্রোহের প্রভাব খুব সীমিত ছিল। তৎকালীন ঢাকা কলেজ প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ব্রেনান্ড (Brenand) ইহার দৈনন্দিন ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এক দল ইংরেজ নৌ-সেনা ও লালবাগ দুর্গে অবস্থানরত দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে মাত্র একদিনের সংঘর্ষের মধ্যে এই বিদ্রোহ সীমিত থাকে। ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঢাকায়ও যাহাতে এই বিদ্রোহ ছড়াইয়া না পড়ে তজ্জন্য ইংরেজ নৌ-সেনা দল লালবাগ দুর্গের সিপাহীদের অস্ত্রমুক্ত করার জন্য তথায় পৌঁছিলে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষে ইংরেজদেরই জয় হয় এবং সিপাহিগণ নিকটবর্তী বন-জঙ্গলে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হয়। প্রায় চল্লিশজন সিপাহী নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হয়। ইংরেজ পক্ষে মাত্র একজন নিহত এবং চারজন গুরুতর আহত হইয়া পরে মৃত্যুবরণ করে; আরও কিছু সংখ্যক লোক আহত হয়। সংঘর্ষের পরের দিন নগরীর ইংরেজ বাসিন্দাদের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকদের অনেকেই ভয়ে নগরী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পলাতক সিপাহীদের অনেকেই ধরা পড়ে এবং তাহাদিগকে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ফাঁসির মঞ্চ ছিল তৎকালীন আণ্টাঘর ময়দান, যাহা পরে ভিকটোরিয়া পার্ক এবং বর্তমানে বাহাদুর শাহ পার্ক নামে পরিচিত। এইখানে তখন অনেক বড় বড় বৃক্ষ ছিল, সেই বৃক্ষের ডালে ডালে ফাঁসিতে ঝুলাইয়া সিপাহীদের হত্যা করা হয়। সেইকালে ঢাকাবাসিগণ অনেক দিন পর্যন্ত নিহত সিপাহীদের প্রেতাত্মার ভয়ে সন্ধ্যার পর ঐ স্থান পরিহার করিয়া চলিত এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের মধ্যে অনেক ভৌতিক গল্পেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃ. নভেম্বর মাসে বৃটিশরাজ কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারত শাসন ক্ষমতা গ্রহণের ঘোষণা তৎকালীন ঢাকা কলেজের সম্মুখের উক্ত আণ্টাঘরের ময়দানেই ইংরেজী ও বাংলায় পাঠ করিয়া শোনান হয়।

মসলিন শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের পতন ঃ মুগল যুগে ঢাকা শুধু বাংলার রাজধানী হিসাবেই খ্যাত ছিল না, নানা প্রকার উৎপাদিত দ্রব্য ও উহার ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যও বিশ্বজোড়া ইহার খ্যাতি ছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে মসলিন ছিল বিশ্বব্যাপী এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বস্ত্রসামগ্রী, যাহার জন্য ঢাকার গৌরব ছিল তুলনাহীন। ইহার সহিত সম্পর্কিত ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাসীর নিকট ঢাকা এক স্বপ্নপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসনের প্রথম এক শত বৎসরের মধ্যে মসলিন উৎপাদন ও উহার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। মসলিন বুনন, তুলা চাষ ও সূতা তৈয়ারি ইত্যাদি হিন্দুদের প্রধান পেশা ছিল। অন্যদিকে নক্‌শা ও কারুকার্যকরণ ছিল মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত বিশেষ পেশা। বৃটিশ-পূর্ব যুগে ঢাকা নগরী তথা সমগ্র ঢাকা জিলার সকল শ্রেণীর অধিবাসী সূতা তৈয়ারির কাজে নিয়োজিত ছিল। ১৮২৪ খৃ. ঢাকায় প্রথমবারের মত বৃটিশ সূতা আমদানীর ফলে শিল্পের এই শাখাটি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে শুরু করে এবং ১৮২৮ খৃ. হইতে ইহার পতন দ্রুততর হয়। টেইলরের মতে (Taylor, Topography of Dacca. পৃ. ১৭২-৭৫), ঢাকা জিলায় প্রায় ছত্রিশ প্রকারের বিভিন্ন মসলিন কাপড় প্রস্তুত হইত। ইহাদের কোনটিতে ফুল, কোনটিতে ফোঁটা বা লম্বা দাগ, আবার কোনটিতে চার কোণাকার দাগ অঙ্কিত থাকিত। ইহাদের নামও ছিল বেশ সুন্দর সুন্দর ঃ আবে রাওয়াঁ বা চলমান পানি, শাবনাম বা কুয়াশা, ডোরা বা দ্বিগুণ সূতা, চার কোনা বা চার কোণাকার, সিরকার 'আলী বা নাওয়াবের গৃহসামগ্রী ইত্যাদি। তাঁতীদের বেশির ভাগই ছিল হিন্দু এবং ঢাকা, ধামরাই, জঙ্গলবাড়ি ও সোনারগাঁও ছিল প্রধান প্রধান মসলিন উৎপাদন কেন্দ্র। শেষোক্ত স্থানে প্রধানত মুসলমানরাই বয়নশিল্পে নিয়োজিত ছিল। এইখানেই জামদানী শ্রেণীর মসলিন উৎপাদিত হইত।

টেইলর এই শিল্পের বিকাশ ও পতনের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন (দ্র. পূ. গ্র. পৃ. ৩৬৪-৬৫)। তাঁহার মতে ১৬৬৬ হইতে ১৭৭০ সনের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে ঢাকার মসলিন কাপড়ের প্রচলন হয় এবং উক্ত সময় হইতে ১৭৮৭ খৃ. পর্যন্ত ঢাকায় ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীরা ইহার ব্যবসায়ের সহিত জড়িত ছিল। শেষোক্ত সনে ঢাকার বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল এক কোটি টাকা। ১৭৮৫ খৃ. বিশেষ এক ধরনের পাকানো সূতার প্রবর্তনের ফলে এই শিল্প মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। ১৭৮৮ হইতে ১৮০৩ খৃ. পর্যন্ত সময়কাল বৃটেনে তুলা ব্যবসায়ের সোনালী যুগরূপে বিবেচিত। এই সময় একদিকে বাষ্পের ব্যবহার ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে তুলা উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পায় ও উহার উন্নয়ন সাধিত হয় এবং বিদেশী দ্রব্যের উপর শতকরা ৭৫ ভাগ রক্ষণশীল শুল্ক আরোপের ফলে বস্ত্র শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে, ঢাকার বস্ত্রসামগ্রী উচ্চ হারের শুল্ক আরোপের ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডে আমদানী নিষিদ্ধ পণ্যের পর্যায়ে পৌঁছে এবং বৎসরের পর বৎসর ইহার পতন দ্রুততর হইতে থাকে। অবশেষে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে ইহার মর্যাদাই লুপ্ত হয়। ইংল্যাণ্ডে মসলিন রফতানীর পরিমাণ ১৭৮৭ খৃ. ছিল ৩০ লক্ষ টাকা, ১৮০৭ খৃ. ৮.৫ লক্ষ টাকা, ১৮১৩ খৃ. ৩.৫ লক্ষ টাকা এবং ১৮১৭ সনে রফতানী সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে ঢাকার এক কালের গৌরব মসলিনের বিলুপ্তি ঘটে এবং সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হইয়া পড়ে।

শিল্প ও বাণিজ্যের এই অবনতির ফলে ঢাকা নগরীর লোকসংখ্যাও দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ১৮০০ খৃ. দুই লক্ষ লোক অধ্যুষিত নগরীর জনসংখ্যা ১৮৩৮ খৃ. দাঁড়ায় মাত্র ৬৮,০৩৮ জনে। সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে ১৮৬৭ খৃ., তখন মাত্র ৫৯,৬৩৬ জন অধিবাসী ছিল। অতঃপর ১৮৭২ খৃ. ৬৯,২১২ এবং ১৯০১ খৃ. ৯০,৫৪২ জনে দাঁড়ায়। তখন হইতে প্রতি বৎসর ঢাকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১৯শ শতাব্দীতে ইংরেজদের স্থাপিত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ঃ বৃটিশ শাসনের কিছুটা সুফল ঢাকায় ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে অনুভূত হইতে শুরু করে। এই সময় বৃটিশ প্রবর্তিত নূতন নূতন বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, যথা স্থানীয় শাসন বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ইত্যাদি গড়িয়া উঠে। ১৮৬৪ সনের ১ আগস্ট ঢাকা পৌরসভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ১৮৮৭ সনের ১ অক্টোবর স্থাপিত হয় ঢাকা জিলা বোর্ড। ইহার পর অন্যান্য স্থানীয় বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৫ খৃ. ঢাকার প্রথম ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। স্কুল ভবন ইংরেজ ফ্যাক্টরীর স্থানে (বাহাদুর শাহ পার্কের পশ্চিমদিকে, যেইখানে বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রাবাস অবস্থিত) নির্মিত হয়। শীঘ্রই ইহাকে কলেজে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৪১ হইতে ১৮৪৬ খৃ. মধ্যে ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয় এবং ১৮৪৬ সনের জুলাই মাসে কলেজের ক্লাস শুরু হয়। ইহাই বর্তমান ঢাকা কলেজের গোড়ার ইতিহাস। ১৮৫৮ সনের ১ মে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার কালেটক্‌র রবার্ট মিটফোর্ড (Robert Mitford) ১৮২০ খৃ. ১,৬৬,০০০ টাকার একটি দাতব্য তহবিল রাখিয়া যান। এই তহবিলের টাকায় উক্ত হাসপাতালটি নির্মিত হয় এবং দাতার নামানুসারে উহার নামকরণ করা হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে প্রথম রেল যোগাযোগ ১৮৮৫ খৃ. স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৬ খৃ. উহা ময়মনসিংহ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। নারায়ণগঞ্জ ও গোয়ালন্দের মধ্যে নিয়মিত স্টিমার চলাচল ১৮৬২ খৃ. শুরু হয়। বৃটিশ শাসনের এই শুভ দিকগুলির উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করে।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী ও উহার বিলুপ্তি ঃ বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়া ঢাকা প্রায় দুই শতাব্দী কালের জড়তা কাটাইয়া পুনরায় প্রাদেশিক রাজধানী হইবার গৌরব অর্জন করে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া বৃটিশ শাসনের শুরুতেই যে বিশাল আয়তনের বাংলা প্রদেশ (Bengal Presidency) গঠিত হইয়াছিল তাহা এতদিনে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৃটিশদের নিকট এক ভারী বোঝা হইয়া দেখা দিল। পার্শ্বেই ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা প্রশাসনিক ইউনিট চীফ কমিশনার শাসিত আসামের অবস্থান। বৃটিশ সরকার বাংলার কিছু অংশ আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিলেন। সরকারের এই ধ্যান-ধারণারই ফসলস্বরূপ ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে একটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি হয় এবং ঢাকায় উহার রাজধানী স্থাপিত হয়।

সরকারের এই পদক্ষেপ ঢাকার জন্য এক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বহিয়া আনে। প্রায় দুই শত বৎসরের অবহেলা ও বঞ্চনার পর পুনরায় এইখানে প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়। মুগল ঢাকার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা এতদিনে পরিত্যক্ত হইয়া ঝোপ-জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকা পুনরায় রাজধানী ঘোষিত হওয়ায় তৎকালীন ঢাকা নগরীর উত্তর সীমা সংলগ্ন রমনা এলাকায় বিভিন্ন সরকারী ভবন গড়িয়া উঠে। রাজধানী ঘোষিত হইবার পূর্বেই লর্ড কার্জন (তৎকালীন ভারতের বড়লাট) ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী কার্জন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। তারপর একে একে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন), ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল (বর্তমান ফজলুল হক হল), ঢাকা হল (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল), গভর্নমেন্ট হাউস (বর্তমান পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, যেইখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অবস্থিত),

সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভবন), প্রেস বিল্ডিং (সাবেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ভবন, বর্তমান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশবিশেষ), বর্ধমান হাউস (বর্তমান বাংলা একাডেমী) এবং রমনা রেস্ট হাউস (বর্তমানে ঢাবা বিলুপ্ত) নির্মিত হয়। ইহা ছাড়া উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বাসভবন হিসাবে উদ্যান-শোভিত বহু সংখ্যক বাংলোও নির্মিত হয়। এইভাবে ঢাকা তাহার ঐতিহাসিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে।

ঢাকায় রাজধানীসহ নূতন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনের আরেকটি অপ্রত্যাশিত ফল ছিল নূতন প্রদেশটির মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাহা ছাড়া ঢাকা ছিল মূলত মুসলিম নগরী। পুরাতন বাংলা প্রদেশে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু এবং রাজধানী কলিকাতাও ছিল মূলত হিন্দু নগরী। সুতরাং প্রশাসনসহ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ছিল হিন্দুদের আধিপত্য। নূতন প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় তাহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ লাভ করে। অপরদিকে, হিন্দু সম্প্রদায় নূতন প্রদেশে সংখ্যালঘু হওয়ায় এবং প্রদেশটি কলিকাতার প্রভাবমুক্ত হওয়ায় তাঁহারা ইহাকে নিজেদের স্বার্থের পরিপন্থী গণ্য করে। মুসলমানরা নূতন প্রদেশ গঠনকে স্বাগত জানায় এবং ইহাকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করে। অন্যদিকে হিন্দুরা এই প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তোলে। অবশেষে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বিলুপ্তি ও বাংলাকে পুনরেকত্রীকরণ ঘোষণা করেন। তদনুসারে ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল হইতে ঢাকা পুনরায় রাজধানীর মর্যাদা হারাইয়া জিলা শহরে পরিণত হয়। এইজন্য মুসলমানদের মধ্যে দারুণ হতাশা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইলেও বৃটিশ সরকার হিন্দু বিরোধিতা প্রশমিত করাকেই শ্রেয় মনে করে।

ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টির ফলে হিন্দু মুসলিম স্বার্থের যে সংঘাত শুরু হয় উহারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এই সময় শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রসর এবং জাতীয় জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তারকারী হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলিম স্বার্থের বিরোধিতার মুখে মুসলমানদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রকাশের উপযুক্ত ফোরামের অভাব দারুণভাবে অনুভূত হয়। ঢাকার নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্ এই ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের এক সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্লাটফরম গঠনের প্রস্তাব করিলে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্লাটফরমটির নামকরণ করা হয় 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ' (All India Muslim League)। এইভাবে পরবর্তী কালে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সৃষ্টিকারী মুসলিম লীগ ঢাকায় উহারই এক মহান ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর ক্ষুব্ধ মুসলমানদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। দিল্লী দরবারের অব্যবহিত পর, ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী, ঢাকায় লর্ড হার্ডিঞ্জ (তৎকালীন ভারতের বড়লাট) এক ভাষণে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। ২ ফেব্রুয়ারী এই সম্পর্কে একটি সরকারী ইশতিহার প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লইয়া আরেকবার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। হিন্দুগণ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে। মুসলমানগণ এই প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের আহ্বান জানায়। প্রথম ঘোষণা দানের প্রায় দশ বৎসর পর ১৯২১ সালের জুলাই মাসে অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়। যে হিন্দুগণ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী ছিল, প্রতিষ্ঠার পর তাহারাই উহার অধিকাংশ শিক্ষকের পদ লাভ করে।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন ও বাতিল, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও উহার পক্ষ হইতে মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া উত্থাপন ও আদায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ও উহার বাস্তবায়ন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঢাকার ইতিহাসও সেই দ্বন্দ্ব ও সংঘাতেরই ইতিহাস। ১৯২৬ খৃ. ঢাকায় সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তখন হইতে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও ইহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে, যাহার পরিণতিতে ১৯৪২ সনের এক দাঙ্গায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র শহীদ নজীর হিন্দু দাঙ্গাবাজদের আক্রমণে প্রাণ হারান।

১৯৩৯ খৃ. য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইলে উহার প্রভাব বাংলায়ও অনুভূত হয়। জাপান জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে বৃটিশের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণ বাংলার পূর্ব কোণ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়। ফলে ঢাকা নগরী যুদ্ধের আওতার মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবেই ঢাকায় বিমান বন্দর (তেজগাঁও-এ বর্তমানে বিমান বাহিনীর ব্যবহারে) প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের জন্য সামরিক হাসপাতাল খোলা হয়। আহতদের সলীমুল্লাহ মুসলিম হলে এবং বর্তমানে যে ভবনটিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ অবস্থিত সেইখানে রাখা হইত। যুদ্ধ চলাকালেই ১৯৪৩ খৃ. দেখা দেয় এক দারুণ দুর্ভিক্ষ। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ এই দুইয়ে মিলিয়া দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় ঢাকার জনজীবনকেও অতিষ্ঠ করিয়া দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। অনাহার ও মৃত্যু শহরের সাধারণ দৃশ্যে পরিণত হয়।

যুদ্ধ শেষ হইলে ভারতের স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়টি বৃটিশ সরকারের নিকট বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই দিকে ভারতের দুইটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দুগণ অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা দাবি করে। কিন্তু মুসলমানগণ তাহাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে এবং হিন্দুদের অধীনে স্থায়ী সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার আশংকায় ভারতের মুসলিম-প্রধান অঞ্চল লইয়া পৃথক স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। হিন্দু ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অবশেষে মুসলমানদের এই দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হয়, যাহার ফলে ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় এই দুইটি অঞ্চল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। বৃটিশ আমলের বঙ্গদেশের পূর্বাংশ লইয়া পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল গঠিত হয়। ইহার নাম হয় প্রথম পূর্ব বঙ্গ ও পরে

পূর্ব পাকিস্তান এবং ঢাকায় ইহার রাজধানী স্থাপিত হয়। সুতরাং দ্বিতীয়বারের মত ঢাকা রাজধানী শহরের মর্যাদা হারাইবার মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় উহা প্রাদেশিক রাজধানীতে পরিণত হইল; নূতন করিয়া সেইখানে আবার রাজধানীর কোলাহল শুরু হইল।

(ঘ) আধুনিক যুগ (১৯৪৭ হইতে বর্তমান সময়) ঃ ভারত বিভাগ ও ঢাকায় পূর্ব বাংলার রাজধানী স্থাপনের ফলে হঠাৎ করিয়াই ঢাকা একটি জিলা শহর হইতে রাজধানী শহরে রূপান্তরিত হইল। এইজন্য কোন পূর্ব প্রস্তুতি না থাকায় এইখানে রাজধানী শহরের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বলিতে কিছুই ছিল না। প্রাদেশিক সরকারের সচিবালয় ইডেন মহিলা কলেজ ভবনে স্থাপিত হয়। প্রাদেশিক আইন সভার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের একটি ভবন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। হাইকোর্টের জন্য ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ভবন বরাদ্দ করা হয়। ঢাকার নবাবদের দিলখুশাস্থ বাগানবাড়িটি গভর্নর হাউসের মর্যাদা লাভ করে। এইভাবে প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন অফিস-আদালত সাময়িকভাবে বিভিন্ন ভবনে স্থাপিত হয়।

ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যেও কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। হিন্দুগণ (বিশেষ করিয়া বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত সচ্ছল ব্যক্তিগণ) ভারতের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে। অপরদিকে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য হইতে মুসলমানগণ বিপুল সংখ্যায় পূর্ব বাংলায় আসিয়া পৌঁছে। ইহাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে গ্রামাঞ্চল হইতেও বহু লোক ঢাকায় আসিয়া ভিড় জমায়। ফলে অপ্রত্যাশিতভাবেই ঢাকা জনসংখ্যার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই সকল সমস্যার আশু সমাধানের জন্য নূতন নূতন এলাকায় শহরের বিস্তৃতি ঘটে এবং নূতন নূতন দালানকোঠা ও ইমারত নির্মিত হয়। ভারত হইতে আগত মুহাজিরদের পুনর্বাসনের জন্য মোহাম্মদপুর ও মীরপুরে উপশহর গড়িয়া উঠে, যাহা বর্তমানে ঢাকা শহরের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হইয়াছে।

১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট অবিভক্ত বাংলার সাবেক প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্রথম মুখ্য মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। তখন হইতে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশ ও কেন্দ্রের ন্যায় পূর্ববঙ্গেও মুসলিম লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম গভর্নর হিসাবে একজন বৃটিশ আমলা স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছিল আয়তনে ক্ষুদ্রতর কিন্তু জনসংখ্যায় বৃহত্তর। সেই কারণে বাংলা ভাষাভাষী লোক পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীতে পরিণত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর বিভিন্ন ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিও জোরদারভাবে উত্থাপিত হয়। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাভাষী; স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তান হইতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করা হয়। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দূকে চাপাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে ঢাকায় ১৯৪৮ সন হইতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে, যাহার পরিণতি ঘটে ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারীতে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন তরুণের শাহাদত বরণের মধ্য দিয়া। অবশেষে ১৯৫৬ খৃ. গৃহীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে উর্দূর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৫২ খৃ. পর হইতে প্রতি বৎসর ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস হিসাবে পালিত হইতেছে।

১৯৫৪ খৃস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে প্রাদেশিক আইন পরিষদের মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জুটিয়াছিল মাত্র ১০টি আসন। বাদবাকী আসনগুলি পায় বিভিন্ন দল সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ এইরূপ ভরাডুবির পর আর কখনও জনসমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। যুক্তফ্রন্টের আমলে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। পরবর্তী দুইজন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসেন ঃ কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার ও আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান। শেষোক্ত জনের আমলেই ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয় এবং ২৭ অক্টোবর জেনারেল (পরে ফিল্ড মার্শাল) আইয়ুব খান দেশের প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন।

১৯৫৮ সনের সামরিক শাসন প্রায় চার বৎসর (১৯৫৮-৬২) স্থায়ী হয়। এই সময় ১৯৫৬ সনের পাকিস্তান সংবিধান বাতিল ঘোষিত হয় এবং সামরিক আইনের অধীনে দেশ পরিচালিত হয়। এই সময়কার পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সহিত মতদ্বৈততার কারণে এই জনদরদী গভর্নরকে পদত্যাগ করিতে হয়। ১৯৬২ খৃ. সামরিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ঐ বৎসরই পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান জারি হয়। এই সংবিধান অনুযায়ী পাকিস্তানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয় এবং প্রদেশগুলিতে প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। সারা দেশে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর ভোটে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হইতেন। এই ব্যবস্থাধীনে আইয়ুব খান দেশের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকেন। এই সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরদের মধ্যে আবদুল মোনয়েম খানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একনাগাড়ে দীর্ঘতম সময়ের জন্য গভর্নর ছিলেন। বৈষম্য দূরীকরণ আন্দোলন তাঁহার সময়েই দানা বাঁধিয়া উঠে। ১৯৬৯ সনের গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন, অতঃপর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সনে ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান।

১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিলে ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মত সামরিক শাসন জারি হয় এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ইয়াহহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁহার আমলে ১৯৭০ সনে দেশে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় উহাতে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক সরকারের টালবাহানার ফলে ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের প্রথম দিকে ঢাকা নগরী প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। সরকার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের প্রস্তাব দিলেও বাস্তবে কোন ফলপ্রসূ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ২৫ মার্চ রাত্রে পাকিস্তান সোনাবাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে এক অঘোষিত যুদ্ধের সূচনা হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা (পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন এবং অন্যান্য নেতা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু লোক ঢাকা নগরী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। পরদিন ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম রেডিও স্টেশন হইতে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে

তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙ্গালী অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান (পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট)-এর কণ্ঠে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংক্রান্ত পত্রটি পঠিত ও ঘোষিত হয়। তখন হইতে নয় মাস স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। বাঙালী তরুণ, যুবক ও সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা ইহাতে যোগ দেয়। ভারত এই যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষ অবলম্বন করে। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা এক নূতন যুগে পদার্পণ করে। ইতিপূর্বে তিন তিনবার ইহা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত ঢাকা জাতীয় রাজধানীতে পরিণত হইল। ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হিসাবে ইহার যে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছিল, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর উহা আরও দ্রুতগতি লাভ করে। লোকসংখ্যায়ও আসে পরিবর্তন। পশ্চিম পাকিস্তানী এবং অবাঙ্গালী মুহাজিরদের মধ্যে যাহারা রক্ষা পাইল তাহাদের অধিকাংশ ঢাকা ত্যাগ করিয়া পাকিস্তান চলিয়া যায়। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া অনেকে ঢাকাতেই বসবাস শুরু করে। গ্রামাঞ্চল হইতে আরও অধিক হারে লোকজন ঢাকায় কাজের সন্ধানে আসিতে শুরু করে। এইভাবে ঢাকা নগরী জাতীয় রাজধানী হিসাবে এক সুবৃহৎ নগরী হইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে ঘোষিত অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। কিছু দিন পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্টও তিনিই ছিলেন। স্বাধীনতার পর দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯৭৫ সনের ২৫ জানুয়ারী দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তিনি প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ বৎসর ১৫ আগস্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় নিম্নপদস্থ বিভ্রান্ত অফিসারের এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি সপরিবারে শাহাদাত বরণ করিলে প্রায় সাড়ে তিন বৎসরের আওয়ামী লীগ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৬। **ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ ঃ** বিগত চারি-পাঁচ শত বৎসরের ঢাকার ইতিহাসের নীরব সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান উহার অসংখ্য সৌধ। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ইহাদিগকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ ধর্মীয় ও জাগতিক। আবার নির্মাতাদের বিচারে ইহা মুসলিম, খৃস্টান, হিন্দু ও শিখ-এই চারিভাগে বিভক্ত। মুসলিম নিদর্শনসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ মসজিদ, মাযার, দুর্গ, সরাইখানা, সেতু ও জাগতিক উদ্দেশ্যে নির্মিত সৌধরাজি। খৃস্টান, হিন্দু ও শিখদের রহিয়াছে একমাত্র ধর্মীয় উপাসনালয়–যথাক্রমে গীর্জা, মন্দির ও সংঘত। এই নিদর্শনসমূহের অধিকাংশই ১৭শ শতাব্দীর নির্মিত, তবে উহার পরবর্তী সময়েরও কিছু কিছু নিদর্শন বিদ্যমান এবং বর্তমানেও এই নির্মাণধারা অব্যাহত রহিয়াছে। নিম্নে কেবল মুসলমানদের প্রধান প্রধান কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

ক. মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ ঢাকাকে মসজিদ নগরী বলা হইয়া থাকে। এইখানে মুসলমানদের আগমনের শুরু হইতেই মসজিদ নির্মাণের ধারাও শুরু হইয়াছে। মুসলমানদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের তাকীদেই মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানরা যেইখানেই গিয়াছে সেইখানেই তাহারা নিত্য দিনের প্রয়োজনের মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে। ঢাকায়ও এইভাবেই অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে, যাহার মধ্যে অনেকগুলিই কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়া আজও সেইকালের নীরব সাক্ষী হিসাবে রহিয়াছে। ডাঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান তাঁহার "Dacca, the City of Mosque" গ্রন্থে এই পর্যন্ত নির্মিত ঢাকার মসজিদের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন (পৃ. ৪৯-৮৬)। উহাতে মোট ৫০৭টি মসজিদের নাম স্থান পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ প্রাচীনকালের অনেক মসজিদ হয়ত এখন আর অবশিষ্ট নাই, আবার সময়ের সাথে সাথে নূতন নূতন মসজিদও নির্মিত হইতেছে। যাহা হউক, তিনি উক্ত গ্রন্থে শতাব্দী অনুযায়ী মসজিদ নির্মাণের যেই পরিসংখ্যান প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ ঃ

শতাব্দী	নির্মিত মসজিদ সংখ্যা
১৫শ	২
১৬শ	---
১৭শ	২৭
১৮শ	২২
১৯শ	৫১
২০শ	৩২৯
	মোট = ৪৩১
	তারিখবিহীন ৭৬
	সর্বমোট = ৫০৭

ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি মসজিদ ও অন্যবিধ ধর্মীয় স্থান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) **বিনাত বিবির মসজিদ (১৯৫৭ খৃ.) ঃ** নারিন্দা এলাকায় অবস্থিত এই মসজিদটি ঢাকায় বর্তমানে বিদ্যমান মসজিদসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম। ৮৬১/১৪৫৭ সনে মারহামাতের কন্যা বাখত বিনাত নাম্নী জনৈকা মহিলা এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির প্রবেশদ্বারে একটি শিলালিপি রক্ষিত আছে। আধুনিক সংস্কারের ফলে ইহার নির্মাণ বৈশিষ্ট্য অনেকখানি লোপ পাইয়াছে। আদিতে ইহা একটি এক গম্বুজবিশিষ্ট ভবন ছিল। চারি কোণে চারিটি আট কোণবিশিষ্ট মীনার এবং পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে একটি করিয়া মোট তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের প্রতিটি দিকের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট। গম্বুজটি অর্ধ গোলাকৃতির এবং সরাসরি ছাদের উপর স্থাপিত। সমগ্র ভবনটি পূর্বে প্লাস্টারবিহীন ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভবনটিতে প্লাস্টার করা হইয়াছে এবং দক্ষিণ দিকে আরেকটি এক গম্বুজবিশিষ্ট কক্ষ ও পূর্ব ও দক্ষিণে বারান্দা নির্মাণ করা হইয়াছে।

(২) **নাসওয়ালা গলির মসজিদ ও তোরণ (১৪৫৯ খৃ.) ঃ** ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পশ্চিম পার্শ্বে গির্দে কিল্লা মহল্লায় নাসওয়ালা গলির অবস্থান। এইখানে একটি তোরণের ধ্বংসাবশেষের নিকট একটি

শিলালিপি পাওয়া যায়, যাহা বর্তমানে ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। শিলালিপি অনুসারে খাওয়াজা জাহান নামক জনৈক ব্যক্তি ২০ শাবান, ৮৬৩/২৫ জুন, ১৪৫৯ তারিখে উক্ত তোরণটি নির্মাণ কিংবা পুনঃনির্মাণ করেন। তোরণটির নিকট পূর্বে একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। বর্তমানে উহার স্থলে একটি নূতন মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। কোন কোন লেখকের বর্ণনা অনুসারে (আওলাদ হাসান, Notes, ৩৪), 'পূর্বের মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি সুপ্রাচীন ভবন ছিল। কোন এক সময় ইহাতে বজ্রপাত ঘটে। ১৮৯৭ খৃ. ভূমিকম্পে ইহার ক্ষতিসাধিত হয়।

(৩) **ইসলাম খান কী মসজিদ (১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ)** ঃ ঢাকায় রাজধানী স্থাপনকারী প্রথম মুগল গভর্নর ইসলাম খান কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদটি ঢাকায় বর্তমানে বিদ্যমান মুগল সৌধরাজির মধ্যে প্রাচীনতম। ৩৮, সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেনে এই মসজিদটি অবস্থিত। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে ঢাকার প্রথম মুগল গভর্নর ইসলাম খান ইহার নির্মাতা এবং তদনুযায়ী ইহার নির্মাণ কাল ১৭শ শতাব্দীর প্রথমদিক। ইহা একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ, মধ্যখানের গম্বুজটি অন্য দুইটির তুলনায় বড়। প্রাচীরের বহির্ভাগ এবং চতুষ্কোণের মীনারসমূহ অলঙ্কারবিহীন। প্রবেশদ্বারসমূহ সাদামাটা খিলানযুক্ত। মসজিদটির এই নিরলঙ্কার ভাব প্রাক-শাইসতা খানী রীতির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্তমানে ইহার অনেক সংস্কার করা হইয়াছে।

(৪) **নবরায় লেন মসজিদ (১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিক)** ঃ ইসলামপুর রোড অথবা তাঁতীবাজার হইতে নবরায় লেনের এই মসজিদটিতে গমন করা যায়। মসজিদটি একটি উচ্চ ভিটির উপর নির্মিত। ইহার এক কোণে একটি কূপ রহিয়াছে। পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার ও পশ্চিম দেওয়ালে তিনটি মিহরাব বর্তমান। এইগুলি নানা অলঙ্করণে সুশোভিত। অধুনা পূর্ব দিকে একটি নূতন বারান্দা সংযোজিত হইয়াছে। মসজিদটির নির্মাতার নাম ও নির্মাণ তারিখ অজ্ঞাত। তবে স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী ইহা ১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকের নির্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

(৫) **ঈদগাহ (১৬৪০ খৃ.)** ঃ সাত মসজিদ রোড সংলগ্ন ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় একটি ঈদগাহের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় মিহরাবে রক্ষিত শিলালিপি অনুযায়ী ইহা শাহ শুজা'-র দীওয়ান মীর আবুল কাসিম কর্তৃক ১০৫০/১৬৪০ সালে নির্মিত। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে, ঢাকার তারিখযুক্ত মুগল স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে ইহা প্রাচীনতম হইলেও মুগল রাজকীয় স্থাপত্য রীতি ইহাতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে ৪ ফুট উঁচুতে অবস্থিত ২৪৫ × ১৩৭ ফুট আয়তনবিশিষ্ট ইট নির্মিত উন্মুক্ত স্থানটি প্রধান 'ঈদগাহ ময়দান। পশ্চিম দিকে ১৫ ফুট উঁচু একটি প্রাচীর বিদ্যমান। অবশিষ্ট তিনদিকে পূর্বে ৬ ফুট উঁচু প্রাচীর ছিল বলিয়া কথিত আছে, তবে বর্তমানে উহা ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যভাগে বিভিন্ন অলঙ্করণে সুশোভিত কেন্দ্রীয় মিহরাব অবস্থিত এবং উহার উভয় দিকে তিনটি করিয়া ছোট ছোট মিহরাব বর্তমান। উহার পরে দেওয়ালটি ভঙ্গ। বর্তমানে এইখানে বাৎসরিক দুই ঈদের জামাআত অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে একটি জামে মসজিদ নির্মিত হইয়াছে এবং ঈদগাহেরও সংস্কারসাধন করা হইয়াছে।

(৬) **দারা বেগমের সমাধি/মসজিদ (মধ্য-১৭ শতাব্দী)** ঃ ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় সাত মসজিদ রোড সংলগ্ন ঈদগাহ হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে মোহাম্মদপুরের নিকট প্রধান সড়ক হইতে প্রায় পৌণে চার মাইল দূরে দারা বেগমের সমাধি সৌধ/মসজিদ অবস্থিত। সৌধটি একটি উচ্চ স্থানে নির্মিত এবং ঢাকায় ইহা একটি নজীরবিহীন ভবন। এক গম্বুজ ও এক কক্ষবিশিষ্ট বর্গাকৃতির এই ভবনটির প্রতিটি দিকের দৈর্ঘ্য ২৭ ফুট ৭ ইঞ্চি। দক্ষিণ দিকে ১৩ ফুট প্রশস্ত বারান্দা রহিয়াছে। গম্বুজটি ঢাকায় বিদ্যমান গম্বুজসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ, ২৫ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট। দক্ষিণ দেওয়ালে তিনটি প্রবেশদ্বার, কোণসমূহে ছয়টি ক্ষুদ্র মীনার। ভবনটির অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে একটি করিয়া মোট তিনটি প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। উত্তরের দরজাটি বর্তমানে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম দিকে একটি অর্ধ-আট কোণাকার মিহরাব বর্তমান। উহার নিকট সম্প্রতি একটি মিম্বার নির্মিত হইয়াছে।

এই ভবনটি নির্মাণের তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। তবে ইহার স্থাপত্য রীতি অনুযায়ী ইহাকে প্রাক-শাইসতাখানী যুগের বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহা কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল তাহাও বলা কষ্টকর। ভিতরে কোন কবরের চিহ্ন দেখা যায় না। ভিতরে মিহরাবের উপস্থিতি ইহার সমাধিসৌধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি করে। কারণ বাংলাদেশের কোথায়ও সমাধিসৌধের অভ্যন্তরে মিহরাব নির্মাণের নজির নাই। দারা বেগম কে ছিলেন তাহাও অজ্ঞাত। ভবনটি বর্তমানে মেরামত করা হইয়াছে এবং অভ্যন্তরভাগে কিছু নূতন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হইয়াছে। জনসাধারণ ইহাকে মসজিদ গণ্য করিয়াছে এবং বর্তমানে ইহা সালাতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

(৭) **হুসায়নী দালান (১৬৪২ খৃ.)** ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হইতে নাজিমুদ্দীন রোডে প্রবেশের পর প্রথম যে রাস্তাটি পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তা ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই বাম পার্শ্বে হুসায়নী দালান অবস্থিত। এই দালানের নাম অনুসারে রাস্তাটিরও নাম হইয়াছে হোসেনী দালান রোড। ইহা শী'আদের একটি ধর্মীয় কেন্দ্র বা ইমামবারা। বিশাল এক তোরণের মধ্য দিয়া প্রাচীরবেষ্টিত অঙ্গনে প্রবেশ করিতে হয়। মধ্যখানে একটি পুকুরের উত্তর তীরে দালানটি অবস্থিত। এইখানে প্রতি বৎসর জাঁকজমকের সহিত মুহার্‌রাম অনুষ্ঠান পালিত হয়।

এই ভবনটির নির্মাণের তারিখ ও নির্মাতা সম্পর্কে প্রচুর মতভেদ রহিয়াছে। মূল ভবনের পূর্ব প্রাচীরে রক্ষিত শিলালিপি অনুযায়ী ইহা ১০৫২/১৬৪২ সনে মীর মুরাদ কর্তৃক নির্মিত। হাকীম হাবীবুর রহমানের মতে কোন এক অজ্ঞাত অতীত হইতেই এইখানে একটি ছোট্ট তাযিয়াখানা বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমান অট্টালিকাটি নওয়াব নাসরাত জাং (মৃ. ১৮২৩ খৃ.) নির্মাণ করেন। ১৮৯৭ খৃ. ভূমিকম্পের পর নওয়াব আহসানুল্লাহ্ উহার সংস্কার সাধন করেন (হাবীবুর রহমান, আসুদগান-ই ঢাকা, পৃ. ১৪২-৪৫)। ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নওয়াব জাসারাত খান কর্তৃক ইহা পুনর্নির্মিত হয় বলিয়াও স্থানীয় জনশ্রুতি আছে।

বর্তমান ভবনটি একটি উচ্চ মঞ্চের উপর নির্মিত। মঞ্চের নিচে কতকগুলি কক্ষ ও উহাতে কয়েকটি কবর রহিয়াছে। পূর্ব দিক হইতে সিঁড়ি দ্বারা ভবনের মেঝেতে পৌঁছা যায়। মূল কেন্দ্রীয় দালানের (চতুর্ভুজাকৃতির হলঘর) কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট্ট পুকুর, উত্তর ও দক্ষিণে

বারান্দা এবং পূর্ব ও পশ্চিমে তিনটি করিয়া কক্ষ বিদ্যমান। সর্ব উত্তরের কক্ষগুলি ব্যতীত পার্শ্ব কক্ষগুলির দ্বিতীয় তলায় গ্যালারী রহিয়াছে। উত্তর দিকে একটি অতিরিক্ত বারান্দা বর্তমান। দক্ষিণ দিক হইতে ভবনের সম্মুখ প্রাচীর এক আকর্ষণীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। নিকটবর্তী একটি ভবনে ঢাকার শেষ নাইব নাজিমগণ সমাহিত আছেন।

(৮) **চুড়িহাট্টা মসজিদ (১৬৪৯ খৃ.)** ঃ চকবাজার মসজিদের উত্তরে চুড়িহাট্টা নামক মহল্লায় এই মসজিদ অবস্থিত এবং মহল্লার নামানুসারে ইহার নাম চুড়িহাট্টা মসজিদ। শাহ শুজার বাংলার সুবাদারী আমলে ১৬৪৯ খৃ. মুহাম্মাদ বেগ নামক জনৈক মুগল কর্মকর্তা এই মসজিদ নির্মাণ করেন। একটি হিন্দু মন্দিরকে রূপান্তরিত করিয়া ইহা নির্মিত হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিলেও বাস্তবে উহার সপক্ষে সন্দেহাতীত কোন প্রমাণ নাই। চৌচালা আকৃতির ছাদবিশিষ্ট এই মসজিদের পূর্ব প্রাচীরে দ্বি-খিলানবিশিষ্ট তিনটি প্রবেশদ্বার এবং পশ্চিম প্রাচীরে তিনটি মিহরাব বর্তমান। আলো-বাতাসের জন্য পার্শ্বের প্রবেশদ্বারগুলি নির্মিত। আধুনিক কালে মসজিদটির বহুলাংশে সংস্কার সাধন করা হইয়াছে এবং পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজিত হইয়াছে।

(৯) **হায়াত বেপারীর মসজিদ (১৬৬৪ খৃ.)** ঃ এই মসজিদ নারিন্দা এলাকার সাবেক ধোলাইখালের (বর্তমানে রাস্তায় রূপান্তরিত) দক্ষিণে অবস্থিত। তৎকালীন বিখ্যাত ব্যবসায়ী হায়াত বেপারী ১০৭৪/১৬৬৪ সনে ইহা নির্মাণ করেন। একই সময়ে তিনি ধোলাইখালের উপর নারিন্দা সেতুও নির্মাণ করিয়াছিলেন। খালটি বর্তমানে রাস্তায় রূপান্তরিত হওয়ায় সেতুটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির এবং নিকটবর্তী বিনাত বিবির মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। বর্তমানে সমগ্র মসজিদটিই নূতন আদলে সংস্কার করা হইয়াছে।

(১০) **শাইস্‌তা খানের মসজিদ (১৭শ শতাব্দী)** ঃ এই মসজিদ মিটফোর্ড হাসপাতালের পশ্চাতে ও বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপর রক্ষিত শিলালিপি অনুসারে এই মসজিদ নাওয়াব শাইস্‌তা খান কর্তৃক নির্মিত। তিনি এই অঞ্চলে একটি প্রাসাদও নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কথিত আছে যে, সম্পূর্ণ মসজিদটি আগুনে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল এবং বর্তমানে ভবনটি গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়। মসজিদটি চতুষ্কোণের মীনারসহ তিন গম্বুজবিশিষ্ট স্বাভাবিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(১১) **চক বাজার শাহী মসজিদ (১৬৭৬ খৃ.)** ঃ এই মসজিদ চক বাজার সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে সগৌরবে দণ্ডায়মান। মসজিদটির কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপর রক্ষিত শিলালিপি মুতাবিক নাওয়াব শাইস্‌তা খান ১০৮৬/১৬৭৬ সনে ইহা নির্মাণ করেন। মসজিদটিতে সত্যিকারের শাইস্‌তা খানী স্থাপত্য-রীতি পরিদৃশ্যমান। ১০ ফুট উঁচু ও ৯৪-৮০ ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থের একটি মঞ্চের উপর মসজিদটি নির্মিত। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদে মুগল স্থাপত্য রীতির সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। বর্তমানে অভ্যন্তর ভাগের সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। মিহরাব আধুনিক কারুকার্যমণ্ডিত এবং মেঝে শ্বেত পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছে।

(১২) **লালবাগ দুর্গ মসজিদ (১৬৭৮-৭৯ খৃ.)** ঃ লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে দক্ষিণ প্রাচীর সংলগ্ন এই মসজিদ শাইস্‌তা খানী যুগের অন্যতম গৌরব। প্রবাদ অনুসারে শাহযাদা মুহাম্মাদ আজাম এই মসজিদের নির্মাতা এবং নির্মাণ রীতি হইতেও উহার সমর্থন পাওয়া যায়। ১৬৭৮-৭৯ সনে ইহা নির্মিত হয়। আয়তাকার এই মসজিদ সেই যুগের অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ, দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট ও প্রস্থে সাড়ে ৩২ ফুট। প্রায় দেড় হাজার মুসল্লী এক সঙ্গে সালাত আদায় করিতে পারেন। পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার, ছাদে তিনটি গম্বুজ ও চারি কোণে চারিটি মীনার বর্তমান।

(১৩) **খাওয়াজা শাহবায মসজিদ ও মাযার (১৬৭৯ খৃ.)** ঃ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে তিন নেতার (শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দীন) মাযারের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত হাজ্জী খাওয়াজা শাহবাযের মসজিদ এবং মসজিদের পার্শ্বেই রহিয়াছে তাঁহার সমাধিসৌধ। হাজ্জী খাওয়াজা শাহবায "মালিকুত-তুজজার" বা "বণিক সম্রাট" নামে খ্যাত ছিলেন। নিজ জীবদ্দশায় তিনি নিজের সমাধি ও এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপর রক্ষিত শিলালিপি অনুযায়ী ইহার নির্মাণকাল ১০৮৯/১৬৭৯ সন। ভবন দুইটিতে শাইস্‌তা খানী স্থাপত্য রীতির পূর্ণ ছাপ বিদ্যমান। সব কিছু মিলাইয়া এই মসজিদ একটি মনোরম স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে টিকিয়া আছে। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির সমাধিসৌধ অবস্থিত।

(১৪) **কাওরান বাজার শাহী মসজিদ (১৬৭৯-৮০ খৃ.)** ঃ বর্তমান ময়মনসিংহ রোড ধরিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইলে আধুনিক হোটেল সোনারগাঁও অতিক্রম করার পর ডান পার্শ্বে কাওরান বাজার সংলগ্ন তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নজরে পড়িবে। ইহাই কাওরান বাজার শাহী মসজিদ বা উহার প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে খাওয়াজা আম্‌বারের মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটির কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারে রক্ষিত শিলালিপি অনুযায়ী নাওয়াব শাইস্‌তা খানের প্রধান হারেম প্রহরী খাওয়াজা মালিক আমবার কর্তৃক ইহা ১৬৭৯-৮০ সনে নির্মিত। সাম্প্রতিক সংস্কারের ফলে মসজিদটির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। মসজিদটির উত্তর পার্শ্বে নির্মাতা খাওয়াজা আমবারের সমাধি অবস্থিত।

(১৫) **আল্লাকুরি মসজিদ (১৬৮০ খৃ.)** ঃ মোহাম্মদপুর এলাকায় অবস্থিত ইহা একটি মনোরম ক্ষুদ্রাকৃতির মসজিদ। মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট ও বর্গাকৃতির। কোণগুলিতে আটকোণী মীনার বিদ্যমান। অভ্যন্তর ভাগের প্রতিটি দিকের দৈর্ঘ্য সাড়ে ১২ ফুট। শাইস্‌তা খানী স্থাপত্য রীতির ইহা এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ঢাকার মুগল আমলে নির্মিত মসজিদগুলি সাধারণত বহু গম্বুজবিশিষ্ট ও আয়তাকার। কিন্তু এই মসজিদ এক গম্বুজবিশিষ্ট ও বর্গাকৃতির। ইহা তদানীন্তন সাধারণ স্থাপত্য রীতির এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হিসাবে পরিগণিত।

(১৬) **সাত গম্বুজ মসজিদ (১৭শ শতাব্দীর শেষ দিক)** ঃ মোহাম্মদপুর এলাকার দক্ষিণে জলাভূমির উত্তর তীরে আল্লাকুরি মসজিদ হইতে প্রায় ৫০ গজ দূরে বিখ্যাত সাত গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। পূর্বে বুড়িগঙ্গা নদী মসজিদের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্তমানে উহা প্রায় এক মাইল দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। প্রবাদ অনুযায়ী নাওয়াব শাইস্‌তা খান এই মসজিদের নির্মাতা এবং স্থাপত্য রীতি দেখিয়া মনে হয়, ইহা অবশ্যই ১৬৮০ সালের দিকে নির্মিত হইয়া থাকিবে। চারি কোণে চারিটি মীনারের পরিবর্তে ফাঁকা চারিটি টাওয়ার ও উহার উপর চারিটি গম্বুজ নির্মিত হওয়ায় মোট গম্বুজ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে সাতটি এবং ইহা হইতেই মসজিদটির নামকরণ হইয়াছে সাত গম্বুজ মসজিদ।

মসজিদটির উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ১০০ গজ দূরে দুইটি ইট নির্মিত সমাধিসৌধের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহাতে শাইস্‌তা খানের দুই কন্যা সমাহিত বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে।

(১৭) **কারতালাব খানের (মুরশিদ কুলী খানের) মসজিদ** ঃ (১৭০০-০৪ খৃ. কারতালাব খান মুরশিদ কুলী খানের উপাধি। তিনি

১৭০০ খৃস্টাব্দে সম্রাট আওরাঙ্গযীব কর্তৃক ঢাকার দীওয়ান বা রাজস্ব বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে সুবাদারের সহিত মনোমালিন্যের কারণে তিনি রাজস্ব দফতর ঢাকা হইতে মকসুদাবাদে (পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদ নামকরণকৃত) স্থানান্তর করেন এবং আরও পরে সমগ্র রাজধানীই সেইখানে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকায় তাঁহার অবস্থানকালে ১৭০০-১৭০৪ খৃস্টাব্দে তিনি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটি বেগম বাজারে অবস্থিত। মসজিদটি কয়েক কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমত, পূর্ববর্তী যুগের তিন গম্বুজের স্থলে ইহাতে পাঁচটি গম্বুজ স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয়ত, মসজিদ সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে বাংলা দোচালা ঘরের ছাদবিশিষ্ট একটি কক্ষ রহিয়াছে। এই কক্ষটি ইমামের বাসস্থান হিসাবে নির্ধারিত ছিল। তৃতীয়ত, প্রায় একই সময়ের নির্মিত মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে একটি প্রাচীন ধাপযুক্ত কূপ (বাওলী) রহিয়াছে। সমগ্র বাংলায় ইহাই এই ধরনের একমাত্র কূপ। মসজিদটিতে পাঁচটি গম্বুজ, পাঁচটি প্রবেশদ্বার ও পাঁচটি মিহরাব বিদ্যমান এবং এইগুলি স্বাভাবিক অলঙ্করণে সুশোভিত।

(১৮) **লালবাগ শাহী মসজিদ** (১৭০৩-৬ খৃ.) ঃ লালবাগ দুর্গের দক্ষিণ ফটকের দক্ষিণে এই মসজিদটি অবস্থিত। শাহযাদা (পরবর্তীতে সম্রাট) ফাররুখ সিয়ার তাঁহার পিতা আজীমুশ শানের প্রতিনিধি হিসাবে ঢাকায় অবস্থানকালে এই মসজিদ নির্মাণ করেন (১৭০৩-৬ খৃ.)। এইজন্য ইহা ফাররুখ সিয়ার মসজিদ নামেও পরিচিত। ১৭০৬ খৃ. তাড়াহুড়ার মধ্যে ফাররুখ সিয়ারের ঢাকা ত্যাগ করার কারণে তিনি মসজিদটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ইহা ঢাকার অন্যতম বৃহত্তম মসজিদ, ১৬৪×৫৪ ফুট আয়তনবিশিষ্ট। প্রথমে ইহার ছাদ ছিল কাষ্ঠ নির্মিত। ১৯শ শতাব্দীর শেষদিকে ঢাকার নাওয়াব আবদুল-গানী বর্তমান পাকা ছাদটি নির্মাণ করেন। ১৯৭৫ সালে ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করা হয়।

(১৯) **খান মুহাম্মদ মিরধার মসজিদ** (১৭০৪ খৃ.) ঃ লালবাগ দুর্গের সন্নিকটে আতিশখানা মহল্লায় অবস্থিত এই মসজিদ ফাররুখ সিয়ারের ডেপুটি গভর্নর থাকাকালে নির্মিত। মসজিদটিতে শাইস্তা খান-উত্তর-যুগের স্থাপত্য রীতি বিশদভাবে পরিস্ফুট। কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারে রক্ষিত শিলালিপি অনুযায়ী এই মসজিদ ১১১৬/১৭০৪ সালে কাযী 'ইবাদুল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে খান মুহাম্মাদ মিরধা কর্তৃক নির্মিত এবং তাঁহারই নামানুসারে নামকরণকৃত। মসজিদটি সাড়ে ১৬ ফুট উচ্চ এক বিশাল মঞ্চের একাংশের উপর অবস্থিত। তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার শ্রেণীর এই মসজিদ ৪৮ + ২৪ ফুট আয়তনবিশিষ্ট। চারি কোণে চারিটি মীনার, ছাদে তিনটি গম্বুজ। একই মঞ্চের উপর মসজিদের উত্তর-পূর্ব দিকে অপর একটি ভবন রহিয়াছে। ইহা একটি মাদরাসা হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং প্রধানত উহাতে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়।

(২০) **মারয়াম সালিহার মসজিদ** (১৭০৬ খৃ.) ঃ এই প্রাচীন মসজিদটি বাবুপুরা-নীলক্ষেত এলাকায় নিউ মার্কেট যাওয়ার পথে পুরাতন রেলপথ (যাহা বর্তমানে সোনারগাঁও সড়ক) অতিক্রম করার পর পরই রাস্তার ডান পার্শ্বে অবস্থিত। মসজিদের সঙ্গেই একটি কবরস্থান, যেইখানে সর্বপ্রধান কবরটি শাহ বাগু দীওয়ান ওরফে খালিকুর-রহমান নামক জনৈক ব্যক্তির। তাঁহার পুত্রের নাম আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ্‌র কন্যা মারয়াম সালিহা। মসজিদটির পূর্ব দিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপর রক্ষিত শিলালিপি অনুযায়ী উক্ত মারয়াম সালিহা ১১১৮/১৭০৬ সালে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি ঐতিহ্যবাহী মুগল রীতিতে ইট ও প্লাস্টার দ্বারা নির্মিত। ইহা একটি আয়তাকার ভবন, অভ্যন্তর ভাগ ৩৯×১৩ ফুট আয়তনবিশিষ্ট।

(২১) **মূসা খানের মসজিদ** (১৮শ শতাব্দী) ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন এলাকায় কার্জন হলের পশ্চিমে এবং শহীদুল্লাহ হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই মসজিদ অবস্থিত। সমগ্র এলাকাটি পূর্বে বাগ-ই মূসা খান নামে পরিচিত ছিল। বার ভূঁইয়ার অন্যতম ইতিহাসখ্যাত ঈসা খানের পুত্র মূসা খানের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। তবে মসজিদটির প্রকৃত নির্মাতা মূসা খানের পুত্র মুনাওওয়ার খান বলিয়া কথিত। স্থাপত্য রীতি অনুযায়ীও ইহাকে শাইস্তা খানী যুগের নির্মিত বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত শাইস্তা খানের আমলে অথবা তাহারও পরে ইহা নির্মিত হইয়া থাকিবে।

মসজিদের উত্তর-পূর্ব কোণে মূসা খানের কবর অবস্থিত। সম্প্রতি মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে আরও একটি কবর সংযোজিত হইয়াছে। কবরটি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও বহু ভাষাবিদ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র। ১৯৬৯ সনের ১৩ জুলাই তিনি ঢাকায় ইনতিকাল করেন।

(২২) **বিবি মেহেরের মসজিদ** (১৮১৪ খৃ.) ঃ নারিন্দার গুলাম মুহাম্মদ তোরণের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে এই মসজিদ অবস্থিত। শায়খ গুলাম মুহাম্মদ ও তাঁহার পিতা শায়খ গুলাম নবী নওয়াব জাসারাত খানের আমলে ঢাকার বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। গুলাম মুহাম্মাদ ঢাকার পর্তুগীজ ফ্যাক্টরীর এজেন্টও ছিলেন। তিনি এই এলাকায় পর্তুগীজ বাসভবন ক্রয় করিয়া নিজ বাসভবন নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহারই একটি তোরণমাত্র বর্তমানে অবশিষ্ট আছে। এই তোরণের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বর্তমান মসজিদটি। কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারে রক্ষিত শিলালিপি অনুযায়ী উক্ত গুলাম মুহাম্মাদের জনৈকা আত্মীয়া বিবি মেহের কর্তৃক ১২৩০/১৮১৪ সালে এই মসজিদ নির্মিত হয়।

(২৩) **সিতারা বেগমের মসজিদ** (১৮১৯ খৃ.) ঃ সিতারা বেগম উপরে বর্ণিত গুলাম মুহাম্মাদের স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহার মরহুম স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে ১২৩১/১৮১৯ সালে এই মসজিদ নির্মাণ করেন এবং নির্মাতার নামেই মসজিদটি পরিচিতি লাভ করে। বাংলা বাজারের পিয়ারী দাস রোডের সিংটোলা এলাকায় মসজিদটি অবস্থিত।

(২৪) **আমীরুদ্দীনের মসজিদ** (১৯শ শতাব্দী) ঃ বাদামতলী এলাকায় বুড়িগঙ্গার তীরে চতুর্দিক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে এই মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের পার্শ্বেই নির্মাতার সমাধি। বাবু বাজার সেতুর পূর্বদিক হইতে রাস্তাযোগে এইখানে যাওয়া যায়। ত্রিপুরার (বর্তমান কুমিল্লার) রতনপুরের অধিবাসী আমীরুদ্দীন ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে দারোগার চাকুরী করিতেন। তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

(২৫) **আগা মসিহ লেন মসজিদ** (১৯শ শতাব্দী) ঃ পুরাতন ঢাকার আগা মসিহ লেনে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এই মসজিদ অবস্থিত। পুরাতন শাইস্তা খানী রীতি ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। তিনটি গম্বুজ ও তিনটি প্রবেশদ্বারবিশিষ্ট আয়তাকার এই মসজিদে সকল মুগল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যদিও ইহা ১৯শ শতাব্দীতে নির্মিত।

(২৬) **কসাইটুলী মসজিদ** (১৯১৯ খৃ.) ঃ ইহা ঢাকার অন্যতম বহুল অলংকৃত মসজিদ এবং আবদুল বারী বেপারী ও আরও কয়েক ব্যক্তি ইহার নির্মাতা। ১৯১৯ সনে ইহার নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৪৫ সালে সম্প্রসারণ ও ১৯৭১ সালে সংস্কার ও অলঙ্করণ করা হয়।

(২৭) তারা মসজিদ (১৮শ-২০শ শতাব্দী) ঃ ইহা ঢাকার একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বহুল কারুকার্যখচিত মসজিদ। আবুল খায়রাত রোডে আরমানিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঠিক পার্শ্বেই এই মসজিদ অবস্থিত। মসজিদটি প্রথমে ১৮শ শতাব্দীর প্রথমদিকে মীরযা গুলাম পীর নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হয় এবং তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নাম হয় মীরযা গুলাম পীরের মসজিদ। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে (১৯২৬ সালে) ইহার নূতন মুতাওয়াল্লী আলী জান বেপারী মসজিদটির পূর্বদিকে একটি নূতন বারান্দা সংযোজন করেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ে আমদানীকৃত বিলাতী ও জাপানী কারুকার্য খচিত চীনা মাটির টালি দ্বারা মসজিদের ভিতর ও বাহিরের সৌন্দর্য বর্ধন করেন। মসজিদটির নূতন অলংকরণে প্রচুর তারকা আকৃতির টালি ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার বর্তমান নাম হইয়াছে তারা মসজিদ। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী মসজিদটির অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ নানা অলঙ্করণে অলঙ্কৃত ছিল। কিন্তু নূতন সংস্কারের পর পুরাতন কারুকার্য অনেকখানি বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং এতদস্থলে নূতন কারুকার্য স্থান পাইয়াছে। নূতন অলঙ্করণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গম্বুজ ও দেওয়ালের উপরিভাগে সর্বত্র তারকা আকৃতির ব্যবহার এবং ভিতর ও বাহিরে নানা রঙ-বেরঙের দামী চীনামাটির টালির ব্যবহার। বর্তমান শতাব্দীর আশির দশকে মসজিদটির আঙিনার সংস্কার সাধনপূর্বক আরেক দফা ইহার শোভা বর্ধন করা হইয়াছে (এই সম্পর্কে বিস্তারিত দ্র. তারা মসজিদ শিরো.)।

(২৮) বায়তুল মোকাররাম মসজিদ (১৯৬০ খৃ.) ঃ ঢাকা মহানগরীর সর্ববৃহৎ ও স্থাপত্য শিল্পের এক অনুপম নিদর্শন বায়তুল মোকাররাম মসজিদ, গুলিস্তান অভিজাত এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর ঢাকা পুনরায় প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা ফিরিয়া পাইলে নগরীর দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৯৫৯ খৃ. এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় এবং বিখ্যাত শিল্পপতি লতীফ বাওয়ানী ইহাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। শীঘ্রই ইহাতে সরকারী স্বীকৃতিও পাওয়া যায়। বিখ্যাত সিভিল সার্ভেন্ট জি. এ. মাদানী মসজিদের নামকরণ ও উহার স্থান নির্বাচন করেন। খ্যাতনামা স্থপতি আবুল হোসেন থারিয়ানী ইহার নকশা প্রণয়ন করেন। অতঃপর মসজিদ নির্মাণের দায়িত্বভার পালনের জন্য বায়তুল মোকাররাম সোসাইটি গঠিত হয়। জি. এ. মাদানী উক্ত সোসাইটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন। মসজিদ নির্মাণের জন্য বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি মুক্ত হস্তে দান করেন। তদানীন্তন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহাম্মাদ আইয়ুব খান ২৭ জানুয়ারি, ১৯৬০ সালে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মসজিদের প্রথম সালাত অনুষ্ঠিত হয় ২৫ জানুয়ারী, ১৯৬৩ সালে শুক্রবার (জুমু'আ)।

পূর্বদিকে প্রশস্ত সাহান সম্বলিত ইহা একটি আয়তাকার মসজিদ। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি প্রবেশপথের উপর দুইটি গম্বুজ। অভ্যন্তর কক্ষটি স্তম্ভরাজি সমন্বয়ে নির্মিত একটি বিশাল কক্ষ। এইখানে লম্বালম্বিভাবে ছয়টি করিয়া পাঁচটি স্তরে মোট ৩০টি স্তম্ভ থাকার কথা। কিন্তু গভীরতর ও নকশার বৈপরীত্য সৃষ্টির জন্য মাঝের দুইটি স্তরে ৪টি করিয়া মোট ৮টি স্তম্ভ অনুপস্থিত; স্তম্ভগুলি সুউচ্চ ও ডোরাকাটা। ইহাদের শীর্ষদেশ বা ক্যাপিটাল চিরাচরিত রীতিতে নির্মিত নহে। আকৃতিতে এইগুলি fort stated। কলেমা, আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম এবং স্টাকোর আরাবেস্ক ছাড়া অভ্যন্তরে অন্য কোন অলঙ্করণ নাই। কিবলা প্রাচীরের এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অসংখ্য জানালা পথে আলো ও বাতাস প্রবেশ করিয়া এক মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। মসজিদের মিহরাবটি আয়তাকার এবং অন্যান্য মসজিদের মিহরাবের তুলনায় ইহা একটি ব্যতিক্রমধর্মী মিহরাব।

মসজিদসহ সমগ্র প্রকল্পটি মোট ৮.৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মসজিদ ভবনটি মোট আট তলাবিশিষ্ট হইলেও ইহার প্রধান অংশটি ছয় তলাবিশিষ্ট। নীচতলায় প্রধান কক্ষটির আয়তন ১১৭×৮৩ ফুট ও ৮২×১৬ ফুট, মোট ১১,০২৩ বর্গফুট। নীচ তলার সঙ্গে রহিয়াছে সুপরিসর বারান্দা। ইহার ব্যালকনির আয়তন ১,৮৫৬ বর্গফুট। নীচের বারান্দাসহ নীচ তলার মোট আয়তন ১২,৩৫০ বর্গফুট। পূর্ব পার্শ্বের সাহানটির আয়তন ২১,০০০ বর্গফুট (সৌদী অর্থায়নে বর্তমানে ইহার উপর সেড নির্মিত হইয়াছে)। সাহানের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি করিয়া মোট দুইটি উযুখানা (উযু করিবার স্থান) রহিয়াছে এবং উভয় উযুখানার উপরে রহিয়াছে মহিলাদের সালাত কক্ষ; মসজিদের তিন দিকেই বিস্তৃত বারান্দা। মসজিদের দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্বদিকে নীচে হইতে উপরে উঠিবার জন্য অনেকগুলি ধাপসম্বলিত সিঁড়ি রহিয়াছে। মসজিদের দোতলা ও তৃতীয় তলায় রহিয়াছে দুইটি সুবৃহৎ কক্ষ, প্রতিটির আয়তন ১১,৩৮০ বর্গফুট। ৪র্থ ও ৫ম তলার কক্ষগুলি ভিন্ন ধরনের, ইহাদের প্রতিটির আয়তন ৬,৯৪৩ বর্গফুট। ৬ষ্ঠ তলার কক্ষের আয়তন ৭,৪৩৮ বর্গফুট। ৭ম ও ৮ম তলা যথাক্রমে ৬,৯২৫ ও ৭,৪৩৮ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট।

বায়তুল মুকাররাম মসজিদ দেখিতে অনেকটা কা'বা ঘরের ন্যায় বর্গাকৃতির। ইহার নির্মাণ কাজ এখনও শেষ হয় নাই। মীনার নির্মাণ ও সাহানের উপর বিশেষ ধরনের টালি বিছানোর কাজ শেষ হইয়াছে। বায়তুল মোকাররম মসজিদ শুধু ঢাকারই নহে, সমগ্র বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ মসজিদ। মসজিদের প্রধান অংশ সালাতের স্থানের আয়তন ৬০,০০০ বর্গফুট। মিহরাব হইতে প্রধান মসজিদ ভবনের উচ্চতা ৯৯ ফুট। মিহরাবে আল্লাহ্‌র ৯৯টি নাম উৎকীর্ণ আছে।

মসজিদ ছাড়াও এই কমপ্লেক্সে রহিয়াছে ঃ একটি গ্রন্থাগার, একটি সভাকক্ষ, বহু সংখ্যক দোকান সম্বলিত একটি বিপণী কেন্দ্র, একটি মিলনায়তন এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর কয়েকটি বিভাগ। সম্প্রতি ইহাকে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। সৌদী সরকারের অর্থায়নে মীনার নির্মাণ ও দক্ষিণ পার্শ্বের প্রশস্ত খোলা চত্তরকে দোতলা বরাবর করিয়া উহাকে মসজিদের সাহানে রূপান্তরিত করা হইয়াছে এবং গ্রাউণ্ড ফ্লোরে দোকানপাট করা হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে লাইব্রেরী ভবন নির্মাণাধীন আছে।

(২৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ ঃ ময়মনসিংহ রোডের পশ্চিম পার্শ্বে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও আর্টস ইনস্টিটিউটের মধ্যবর্তী স্থানে এই মসজিদ অবস্থিত। ইহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও ছবিতুল্য সৌধ। ১৯৬৬ খৃ. ইহা নির্মিত হয়। সুপ্রশস্ত সালাত কক্ষটির তিন দিকেই বারান্দা। ইহার অত্যন্ত আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে, সালাত কক্ষের দুই পার্শ্বের স্বাভাবিক আঙিনায় বৃত্তাকার দুইটি মীনার দণ্ডায়মান। ইহা একটি ব্যতিক্রমধর্মী মনোরম ভবন, ইসলামের ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিনাযুক্ত মসজিদ শ্রেণীর সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (মৃ. ২৯ আগস্ট, ১৯৭৬) এই মসজিদের উত্তর পার্শ্বে সমাহিত আছেন।

খ. মাযার ঃ ঢাকা নগরীর সূচনাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এইখানে সমাহিত হইয়াছেন বহু সূফী-দরবেশ, শাসক-রাজনীতিক, কবি-সাহিত্যিক ও পণ্ডিত-মনীষী প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তিগণ। এই নিবন্ধে বিভিন্ন প্রাচীন সৌধের বর্ণনাকালে কিছু কিছু মাযারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির মাযার রহিয়াছে। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের মাযারসমূহ সাধারণত সূফী, দরবেশ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের এবং সাম্প্রতিক কালের মাযারগুলি রাজনীতিবিদ ও দেশের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতগণের। নিম্নে উভয় শ্রেণীর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের মাযার সম্পর্কে আলোকপাত করা হইল।

(১) **শাহ জালাল দখিনীর মাযার** ঃ বঙ্গভবন প্রাঙ্গণে শাহ জালাল দখিনীর মাযার অবস্থিত। তিনি শায়খ পিয়ারার শাগরিদ ছিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে তিনি এইখানে আগমন করেন এবং জনগণের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। গৌড়ের সুলতান তাঁহার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া ১৪৭৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার কবরের উপর বর্তমান মাযার ভবনটি নির্মিত হয়।

(২) **শাহ আলী বাগদাদীর মাযার** ঃ ঢাকা শহর হইতে প্রায় আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে এককালের নিভৃত পল্লী এবং বর্তমানের ঢাকা নগরীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ মীরপুরে বিখ্যাত দরবেশ শাহ আলী বাগদাদীর মাযার অবস্থিত। মূল সমাধি ভবন একটি এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির ভবন। মসজিদটি প্রথমে ১৪৮০ খৃ. নির্মিত হয়, কিন্তু ১৮০৬ খৃ. মগবাজারের শাহ মুহাম্মদ সাহেব ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করেন এবং তখন ইহাতে একটি শিলালিপিও স্থাপিত হয়। অঙ্গনের অন্যান্য গৃহ নওয়াব আহসানুল্লাহ কর্তৃক নির্মিত।

মাখদুম সায়্যিদ শাহ আলী বাগদাদীর পিতা শাহ ফাখরুদ্দীন রাযী বাগদাদ শহরের গদ্দিনশীন পীর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর শাহ 'আলী বাগদাদী (র) বাংলাদেশে আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে স্বীয় পরিবারবর্গ ছাড়াও প্রায় একশত জন দরবেশ ছিলেন। তিনি ৮৩৭/১৪১২ সালে ফতেহাবাদ পরগনার (বর্তমান ফরিদপুর জিলার) অন্তর্গত মুহাম্মদপুর ঝিল বা ঢোল সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে কসবা গির্দায় উপস্থিত হন। তিনি কিছুকাল গির্দায় অবস্থান করার পর ঢাকার মীরপুরে চলিয়া আসেন এবং সেইখানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার মৃত্যু সন সম্পর্কে দারুণ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তিনি ১৪৮০ বা ৯০৩/১৪৯৮ অথবা ৯২৩/১৫১৮ কিংবা ৯৮৫/১৫৭৭ সালে চিল্লারত অবস্থায় ইনতিকাল করেন এবং মীরপুরে সমাহিত হন। কেহ কেহ তাঁহার মাযার মুহাম্মদপুর ঝিলের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বলিয়াও মনে করেন। মরহুম প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান ও প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফ ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার বংশধর।

(৩) **মালিক পীর য়ামানীর মাযার** ঃ ঢাকা মহানগরীর জিরো পয়েন্টের সন্নিকটে বাংলাদেশ সচিবালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব ও ওসমানী উদ্যানের উত্তর-পূর্ব কোণে আবদুল গনি রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে শায়খ মালিক পীর য়ামানীর মাযার অবস্থিত। এই মহান দরবেশ ১৪শ শতাব্দীর প্রথমদিকে শায়খ জালালুদ্-দীন তাবরীযীর সঙ্গে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার বর্তমান মাযার ভবনটি নওয়াব সলীমুল্লাহ কর্তৃক নির্মিত।

(৪) **পীর জঙ্গীর মাযার** ঃ প্রবাদ অনুযায়ী পীর জঙ্গী তাঁহার ঘোড়াসহ বর্তমান মতিঝিল কলোনীর উত্তর প্রান্তে, আইডিয়াল হাই স্কুলের নিকট কলোনীর মসজিদ সংলগ্ন স্থানে সমাহিত আছেন। কবরটি মাটির এবং এইভাবে নির্মিত যে, উহা হইতে একজন অশ্বারোহী ব্যক্তির ধারণা পাওয়া যায়।

(৫) **হাইকোর্ট মাযার** ঃ পুরাতন হাইকোর্ট ভবন অঙ্গনে উহার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এই মাযার অবস্থিত। এইখানে সমাহিত ব্যক্তি সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। হাকিম হাবিবুর রহমানের মতে ঢাকার প্রথম মুগল গভর্নর ইসলাম খানের জনৈক আত্মীয় এইখানে সমাহিত আছেন। কিন্তু এস. এম. তৈফুর মনে করেন, স্বয়ং ইসলাম খানকেই এইখানে সমাহিত করা হইয়াছে। মাআছিরুল-উমারার লেখক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইসলাম খানের মৃতদেহ ঢাকা হইতে ফতেহপুর সিক্রিতে বহন করিয়া নেওয়া হয় এবং সেইখানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার কবরের উপর একটি সৌধও নির্মাণ করিয়াছেন। ড. আহমদ হাসান দানী ইহার উপসংহার এইভাবে টানিয়াছেন (দ্র. Ahmad Hasan Dani, Dacca A Record Of Its Changing fortunes, ১৭২-৭৩) যে, সম্ভবত ইসলাম খানকে প্রথমে অস্থায়ীভাবে এইখানে সমাহিত করা হইয়াছিল, কিন্তু পরে তাঁহার মৃতদেহ ফতেহপুর সিক্রিতে নিয়া স্থায়ীভাবে দাফন করা হয়।

(৬) **শাহ আবদুর রাহীমের মাযার** ঃ শাহ আবদুর রাহীম একজন সূফী সাধক ছিলেন। জনৈক উন্মাদের হাতে তিনি ১১৮৫ হি. নিহত হন। তাঁহাকে লক্ষীবাজার মিয়া সাহেব ময়দানে দাফন করা হয়।

(৭) **শাহ নূরীর মাযার** ঃ শাহ নূরী ১১৮৮ হি. সালে ইনতিকাল করেন এবং মগবাজার এলাকায় সমাহিত হন। তিনি সকল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পালন করিতেন। ঢাকা নগরীতে তাঁহার বিপুল সংখ্যক অনুসারী ছিল।

(৮) **শাহ মুরতুযার মাযার**ঃ শাহ তুযা বা শাহ মুরতুযা (মুরতাদা) নামক জনৈক মাজ্জুব আবুল হাসনাত রোডের নিকটবর্তী সাত রওযায় সমাহিত আছেন। তিনি নওয়াব নুসরাত জাঙ্গ-এর আমলে (১৭৯৬-১৮২৩ খৃ.) জীবিত ছিলেন। তিনি হাতে সর্বদা একটি লোহার চুরি পরিধান করিতেন। চুরিটি বর্তমানে তাঁহার সমাধির উপর রক্ষিত আছে।

(৯) **শাহ মুহাম্মাদ দাইমের মাযার** ঃ আজিমপুর দায়রা শরীফে তাঁহার মাযার অবস্থিত। তিনি ১৯শ শতাব্দীর একজন জনপ্রিয় সূফী সাধক ছিলেন। একমাত্র হজ্জ-এর জন্য ব্যতীত তিনি কখনও নিজ বাড়ির বাহির হন নাই এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণও এই নিয়ম মানিয়া চলিতেন। তিনি ঢাকায় ইনতিকাল করেন এবং বর্তমান স্থানে সমাহিত হন।

(১০) **পরিবাগের শাহ সাহেবের মাযার** ঃ সায়্যিদ শাহ আবদুর-রাহীম সাধারণ্যে পরিবাগের শাহ সাহেব নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার নিজ অভিমত অনুযায়ী তিনি ১৮১০ খৃ. পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জিলার হরিপুর শহরের নিকট খিলাওয়াত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা যিঅন শাহ। তাঁহার বয়স যখন সত্তর বৎসর তখন তিনি ঢাকা আগমন করেন। সেই সময় ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ জীবিত ছিলেন। নওয়াব তাঁহাকে স্বীয় দুগ্ধ ভাণ্ডারের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন এবং তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা, ধর্ম চর্চা ও ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিবাগে বিরাট প্রশস্ত উদ্যানসহ একটি বাড়ি প্রদান করেন। এই বাড়িতে তিনি তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি আরমানিটোলায় নিজ বাড়িতে বাস করিতেন, কিন্তু প্রত্যহ একবার পরিবাগে আগমন করিতেন। ১৯৬১ খৃ.

১৫২ বৎসর বয়সে তিনি পরিবাগে ইনতিকাল করেন এবং সেইখানেই সমাহিত হন।

(১১) **দুধু মিয়ার মাযার** ঃ বংশাল রোডের একটি সংকীর্ণ গলিতে মাহুতটুলি ক্রসিং হইতে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে দুধু মিয়ার মাযার অবস্থিত। দুধু মিয়ার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ মুহসিন এবং তিনি ফারাইযী আন্দোলন নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র পুত্র ছিলেন। তিনি ১৮১৯ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৬০ সালে ঢাকায় ইনতিকাল করেন ও বর্তমান স্থানে সমাহিত হন। পিতার ইনতিকালের পর তিনি ফারাইযী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার ইনতিকালের পর এই আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়ে। তাঁহার কবরটি মাটির সঙ্গে মিশিয়া আছে এবং একটি চারকোণাকার বেষ্টনী দ্বারা সংরক্ষিত। ভিতরে প্রবেশের জন্য উক্ত বেষ্টনীতে দুইটি দরজা রহিয়াছে।

(১২) **নওয়াব সলীমুল্লাহর মাযার** ঃ বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকের বৃটিশ ভারতের প্রখ্যাত মুসলিম রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক নওয়াব স্যার খাজা সলীমুল্লাহ্ বাহাদুর জি. সি. আই. ই. বেগম বাজারের নিজ পারিবারিক গোরস্তানে সমাহিত আছেন। ১৯০৬ খৃ. ঢাকার মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা তাঁহার এক অনন্য অবদান। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হিসাবে ঢাকা নগরীর উন্নয়ন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসসহ বহু ঐতিহাসিক ও জনহিতকর কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত ছিলেন। ঢাকা শহর ও ইহার আশেপাশে সলীমুল্লাহ বহু মকতব, স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাযার ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন (বিস্তারিত দ্র. সলিমুল্লাহ, নওয়াব খাজা)।

(১৩) **তিন নেতার মাযার** ঃ শাহবায খান মসজিদ ও মাযার সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে এবং ময়মনসিংহ রোডের পূর্ব পার্শ্বে ১৯৬০-এর দশকের তিনজন বিশিষ্ট নেতার মাযার গড়িয়া উঠিয়াছে। এই নেতৃবৃন্দ হইলেন ঃ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২ খৃ.), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৮৯৩-১৯৬৩ খৃ.) ও খাজা নাজিমুদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪ খৃ.), তিনজনই বৃটিশ আমলে অবিভক্ত বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন (যথাক্রমে ১৯৩৭-৪৩, ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৩-৪৬ খৃ.) এবং মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনে অসামান্য অবদান রাখিয়াছেন। পরবর্তী কালে খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী (১৯৪৭-৪৮ খৃ.), পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল (১৯৪৮-৫১ খৃ.) ও প্রধান মন্ত্রী (১৯৫১-৫৩ খৃ.), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী (১৯৫৪-৫৫ খৃ.) ও প্রধান মন্ত্রী (১৯৫৬-৫৭ খৃ.) এবং শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী (১৯৫৪ খৃ.), পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৯৫৫-৫৬ খৃ.), পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর (১৯৫৬-৫৮ খৃ.)-এর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১৯৬২ সনের ২৭ এপ্রিল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬৩ সনের ৫ ডিসেম্বর ও খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৬৪ সনের ২২ অক্টোবর ইনতিকাল করেন এবং তিনজনকেই বর্তমান সমাধিস্থলে পরপর সমাহিত করা হয়। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের ইহা এক অনুপম নিদর্শন হিসাবে বিরাজমান (স্ব স্ব নিবন্ধাধীনে বিস্তারিত দ্র.)।

(১৪) **জিয়াউর রহমানের মাযারঃ** শেরে বাংলা নগরে ক্রিসেন্ট লেকের উত্তর পাড়ে জিয়াউর রহমানের মাযার অবস্থিত (বিস্তারিত দ্র. শিরো. জিয়াউর রহমান)।

(১৫) **জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরস্থ নেতৃবৃন্দের মাযার** ঃ শেরে বাংলা নগরে জাতীয় সংসদ ভবন চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক নেতা সমাহিত হইয়াছেন। তাঁহারা হইলেন ঃ (১) মৌলবী তমিজুদ্দীন খান (জ. ১৮৯০, মৃ. ১৯৬৩ খৃ.); (২) মশিউর রহমান (জ. ১৯২৪, মৃ. ১৯৭৯ খৃ.); (৩) আবদুস সবুর খান (জ. ১৯০৮, মৃ. ১৯৮২ খৃ.); (৪) বিচারপতি আবদুস সাত্তার (জ. ১৯০৬, মৃ. ১৯৮৫ খৃ.); (৫) আবুল মনসুর আহমদ ও (৬) শাহ আজীজুর রহমান। তাঁহারা সকলেই রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবদানের জন্য স্মরণীয় হইয়া আছেন।

গ. জাগতিক উদ্দেশ্যে নির্মিত সৌধমালা ঃ এই শ্রেণীর সৌধরাজির মধ্যে রহিয়াছে দুর্গ, প্রাসাদ, সরাইখানা ও বিভিন্ন প্রকার প্রশাসনিক ভবন। বিভিন্ন সময়ে ঢাকা রাজধানী থাকাকালে এই শ্রেণীর অনেক ভবন নির্মিত হইয়াছে এবং বর্তমানেও এই নির্মাণধারা অব্যাহত রহিয়াছে। নিম্নে ইহাদের প্রধান প্রধান কয়েকটি সম্পর্কে আলোকপাত করা হইল ঃ

(১) **বড় কাটারা** (১৬৪৪ খৃ.) ঃ চকবাজারের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরের কাছাকাছি এই ভবনটি অবস্থিত। পূর্বে বুড়িগঙ্গা নদী ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে ইহা দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইহা একটি কাটারা শ্রেণীর (চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত চতুর্ভুজ আকারে অঙ্গন বিশিষ্ট) ভবন এবং সরাইখানা হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইত। এই সুবিশাল ভবনটি মুগল আমলের ঢাকার অন্যতম প্রধান কীর্তি। ভবনটির দুইটি শিলালিপির কথা জানা যায়। উহাদের একটিতে উক্ত হইয়াছে যে, ১০৫৩/১৬৪৪ সালে আবুল কাসিম ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন। অপরটিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আবুল কাসিম আল-হুসায়নী আত-তাবাতাবা আস-সিমনানী এই ভবনটি নির্মাণ করেন এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও গরীব লোকদের সাহায্য প্রদানের জন্য ইহার সহিত সংযুক্ত বাইশটি দোকান ঘর বরাদ্দ করেন। এই সুবিশাল ভবনের নির্মাতা আবুল-কাসিম আল-হুসায়নী আত-তাবাতাবা আস-সিমনানী শাহ শুজার প্রধান স্থপতি (মীর-ই ইমারাত) ছিলেন।

এক মহৎ উদ্দেশ্যে নির্মিত বড় কাটারা ভবন বর্তমানে ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার উত্তরাংশটি সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বদ্বয়ের কিয়দংশ টিকিয়া আছে এবং দক্ষিণের সারিটি এখনও সম্পূর্ণ অটুট রহিয়াছে। মধ্যবর্তী অঙ্গনে বর্তমানে নূতন নূতন ভবন নির্মিত হইয়াছে এবং পুরাতন অট্টালিকার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

(২) **ছোট কাটারা** (১৬৬৩ খৃ.) ঃ বড় কাটারা হইতে পূর্ব দিকে প্রায় ২০০ গজ দূরে ছোট কাটারা ভবন অবস্থিত। এইখানে সংকীর্ণ গলিপথে যাতায়াত করা যায়। ১৬৬৩ খৃ. নওয়াব শাইস্‌তা খান এই ভবন নির্মাণ করেন। সম্ভবত ইহা তাঁহার বিরাট নির্মাণ প্রকল্পেরই একটি অংশ মাত্র ছিল। ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি প্রাসাদ, একটি মসজিদ এবং বুড়িগঙ্গার তীর বরাবর মিটফোর্ড হাসপাতাল হইতে লালবাগ পর্যন্ত একটি বিরাট বাঁধ (পোশতা নামে পরিচিত)। বড় কাটারার ন্যায় ছোট কাটারাও একই উদ্দেশ্যে এবং একই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত, তবে ইহা আকারে ক্ষুদ্রতর। সম্ভবত বিখ্যাত পর্যটক তাভার্নিয়ার (Tavernier) এই ভবনেই শাইস্‌তা খানের সহিত সাক্ষাতলাভ

করিয়াছেন। বর্তমানে ইহার মাত্র দুইটি তোরণদ্বার বিদ্যমান। নদীর দিকের তোরণটি তিনতলাবিশিষ্ট ও অপরটি দোতলা।

ছোট কাটরা অঙ্গনে, প্রতি দিকে ২৪ ফুট দীর্ঘ, এক গম্বুজবিশিষ্ট ও বর্গাকৃতির একটি প্রাচীন সমাধিসৌধ রহিয়াছে। সৌধটি ইট ও প্লাস্টার নির্মিত। ভিতরের কবরটি বর্তমানে মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সৌধটি বিবি চম্পার কবরের উপর শাইস্তা খান কর্তৃক নির্মিত বলিয়া কথিত আছে এবং চম্পার নাম অনুসারেই স্থানীয় এলাকাটির নামকরণ হইয়াছে চম্পাতলী। বিবি চম্পার সঠিক পরিচয় রহস্যাবৃত। কেহ তাঁহাকে শাইস্তা খানের কন্যা, আবার কেহ তাঁহার ক্রীতদাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) **লালবাগ দুর্গ** (১৬৭৮ খৃ.) ঃ ঢাকায় মুগল রাজধানী স্থাপনের পূর্ব হইতেই কয়েকটি দুর্গ বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। তন্মধ্যে ধোলাই খালের দুই তীরে দুইটি বেগ মুরাদ খানের দুর্গ এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগারের স্থানে একটি দুর্গ ছিল। শেষোক্ত দুর্গটিতে ইসলাম খান ও পরবর্তী মুগল সুবাদারগণ বাস করিতেন। কিন্তু বর্তমানে এই দুর্গগুলির কোনটিরই অস্তিত্ব নাই। বর্তমানে ঢাকায় যে একটি মাত্র দুর্গ বিদ্যমান তাহা সাধারণ্যে লালবাগ দুর্গ নামে পরিচিত। কিন্তু নির্মাতাগণ ইহার নাম দিয়াছিলেন আওরাঙ্গাবাদ দুর্গ (কিল'আ-ই আওরাঙ্গাবাদ) [সম্রাট আওরাঙ্গযীবের নাম অনুসারে]। ইহা আসলে একটি অসমাপ্ত দুর্গ। তৎকালীন বাংলার সুবাদার শাহযাদা মুহাম্মাদ আজম ১৬৭৮ খৃস্টাব্দে ইহার নির্মাণ কাজ শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই সম্রাট আওরাঙ্গযীব তাঁহাকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ডাকিয়া পাঠান। অতঃপর ইহার নির্মাণকার্য শেষ করার দায়িত্ব পড়ে তাঁহারই উত্তরাধিকারী আমীরুল-উমারা নওয়াব শাইস্তা খানের উপর। কিন্তু নির্মাণকার্য চলাকালে অকস্মাৎ শাইস্তা খানের কন্যা বিবি পরীর ইনতিকাল হইলে তিনি ইহাকে অশুভ মনে করিয়া নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দেন। ইহা আর কখনও শেষ করা হয় নাই। এই অসমাপ্ত দুর্গটি কিছুকাল নওয়াবের বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া কয়েদখানা হিসাবেও ইহার ব্যবহারের কথা শোনা যায়। বর্তমানে এই দুর্গটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রধান দুইটি ফটক, প্রায় ২,০০০ ফুট দীর্ঘ প্রাচীর এবং অভ্যন্তর ভাগে একটি পুকুর, একটি দরবার হল, একটি মসজিদ ও বিবি পরীর সমাধি সৌধ অবশিষ্ট রহিয়াছে। মসজিদটি সম্পর্কে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (উপরে 'ক' অংশের ১২ নং দ্র.)।

লালবাগ দুর্গের প্রধান স্থাপত্য নিদর্শন উহার দক্ষিণ ফটক। ফটকটি তিন তলাবিশিষ্ট, সর্বোচ্চ তলা অসমাপ্ত। ঢাকার তৎকালীন অধিকাংশ সৌধের ন্যায় ইহাও মনোরম কারুকার্য শোভিত। উত্তর ও দক্ষিণ ফটকের মধ্যস্থলে একটি সুন্দর পাকা পুকুর বিদ্যমান। পুকুরটির আয়তন ২৩৫ বর্গফুট। বর্তমানে ইহা ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। পুকুরটির পশ্চিমে ১৩০ ফুট দূরে একটি দোতলা ভবন। ইহা দরবার হল বলিয়া কথিত। হলটিতে পূর্বে গোসলখানা ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে, কিন্তু বর্তমানে উহার কোন চিহ্নই নাই। আরও পশ্চিমে ২৭৫ ফুট দূরে বিবি পরীর সমাধি অবস্থিত। সমাধি হইতে ১৭০ ফুট পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ।

বিবি পরী, যিনি ঈরান দুখত নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন, নওয়াব শাইস্তা খানের কন্যা ও শাহযাদা মুহাম্মাদ আজামের বাগদত্তা ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ১৬৮৪ খৃস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মরদেহের উপর শাইস্তা খান এই সমাধিটি নির্মাণ করেন। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান, যথা রাজমহল, চুনার ও জয়পুর ইত্যাদি স্থান হইতে আনীত বিভিন্ন ধরনের পাথর ইহার নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র সৌধটি বাহির হইতে প্রতি দিকে ৬০ ফুট দীর্ঘ। ভিতরে ইহা নয়টি অংশে বিভক্ত; একটি কেন্দ্রীয় সমাধিস্থল, প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ১৯ ফুট ২ ইঞ্চি, চারিকোণে চারিটি কক্ষ, কক্ষগুলির প্রতি দিকের দৈর্ঘ্য ১০ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি এবং চারিটি আয়তাকার পথ, প্রতিটি ২৪ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি × ১০ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি আয়তন বিশিষ্ট। কেন্দ্রীয় সমাধিস্থলে বিবি পরী সমাহিত। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কক্ষে বিবি পরীর জনৈক আত্মীয়া শামশাদ বেগম সমাহিত আছেন। সমাধি সৌধের দক্ষিণে একটি মঞ্চের উপর সারবুলান্দ খানের কবর অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, সারবুলান্দ খান-হাক্ক বান্দে খানের পুত্র, হাক্ক বান্দে খান-খুদা বান্দে খানের পুত্র এবং খুদা বান্দে খান-শাইস্তা খানের পুত্র ছিলেন।

(৪) **কার্জন হল** (১৯০৪ খৃ.) ঃ মুগল যুগের পতনের পর বাংলায় বৃটিশ যুগ সূচিত হইলে ঢাকার গৌরবময় অধ্যায়ের অবসান ঘটে। রাজধানী শহর হইতে ইহার মর্যাদা জিলা শহরে অবনমিত হয় এবং সর্বক্ষেত্রে ইহার মর্যাদা লোপ পায়। স্থাপত্য শিল্পের কোন চিরস্মরণীয় নিদর্শন এই সময়ের নাই বলিলেই চলে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হঠাৎ করিয়াই যেন ঢাকার ভাগ্যাকাশে এক ঝলক আলো খেলিয়া গেল। এই সময় নবগঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী এইখানে স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহা ছিল স্বল্পস্থায়ী (১৯০৫-১২ খৃ.)। কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রদেশ ও রাজধানী উভয়েরই বিলুপ্তি ঘটে। এই সময় সরকারী প্রয়োজনে কিছু কিছু নূতন ভবন নির্মিত হয়, যাহা কালের সাক্ষীরূপে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভবনগুলির মধ্যে কার্জন হল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও পুরাতন হাইকোর্ট ভবন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে কার্জন হল সর্বপ্রথম নির্মিত হয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন তাঁহার ঢাকা সফরকালে এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নামকরণ করা হয়। গভর্নমেন্ট হাউস রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের বিপরীত দিকে ইহার অবস্থান। কার্জন হল প্রথমে একটি টাউন হল হিসাবে নির্মিত হয়। কিন্তু ১৯১২ খৃ. বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পর এইখানে ঢাকা কলেজ স্থানান্তরিত হয়। ১৯২১ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হইতে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। মূল হলটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার হল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কার্জন হল লাল ইটের নির্মিত দোতলা ভবন। ইহার মধ্যভাগে অবস্থিত প্রধান হলঘর এবং পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে ইহার দুইটি শাখা রহিয়াছে। প্রত্যেক দিকেই সংলগ্ন বারান্দা বিদ্যমান। হলের অভ্যন্তর ভাগে পার্শ্বদেশে তিন স্তরবিশিষ্ট গ্যালারী রহিয়াছে। উত্তরমুখী এই ভবনটি অত্যন্ত মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করিয়া রাখিয়াছে।

(৫) **ঢাকা মেডিকেল কলেজ ভবন** (২০শ শতাব্দীর ১ম দশক) ঃ বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল যেই ভবনটিতে অবস্থিত উহা প্রথমে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম সরকারের সচিবালয় হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ রদের পর উহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ভবনের পশ্চিমাংশ প্রথমে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ও জগন্নাথ হল এবং পরে ফজলুল হক মুসলিম হলের ছাত্রাবাসরূপে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪২ সালে পশ্চিমাংশটি আহত সৈনিকদের থাকার জন্য সামরিক বাহিনীর দখলে চলিয়া যায়। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভাগের পর এই অংশটি স্থায়ীভাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে প্রদান করা হয় এবং পূর্বাংশটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া যায়। ১৯৬৫ খৃ. নীলক্ষেত এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভবন নির্মিত হইলে সেইখানে

বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়। তখন হইতে সমগ্র ভবনটিই ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমানে এই ভবনের আশেপাশে আরও কয়েকটি ভবন নির্মিত হইয়াছে, যথা ঃ ডেন্টাল কলেজ, আউটডোর রোগীদের চিকিৎসা কক্ষ, নার্স হোস্টেল, অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা ভবন, মসজিদ, প্রশাসনিক ভবন, ছাত্রাবাস ইত্যাদি। ১৯৫২ খৃ. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নিহতদের উদ্দেশ্যে নির্মিত শহীদ মিনারও এই ভবনটির অদূরে অবস্থিত।

(৬) পুরাতন হাইকোর্ট (২০শ শতাব্দীর ১ম দশক) ঃ কার্জন হলের বিপরীতে রাস্তার অপর পার্শ্বে পুরাতন হাইকোর্ট ভবন নামে পরিচিত ভবনটি কার্জন হলের পরে নির্মিত হয়। সুপ্রশস্ত অঙ্গনের মাঝখানে ইহা অবস্থিত এবং সুন্দর তোরণদ্বার দ্বারা এইখানে প্রবেশ করা যায়। ভবনটি প্রথমে গভর্নমেন্ট হাউস হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর তৎকালীন ভারত সরকারের উপদেষ্টা স্থপতি ইহাকে গভর্নরের বাসভবন হিসাবে অনুপযুক্ত মনে করিলে দীর্ঘদিন যাবত ইহা একটি অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং পরে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের জন্য এইখানে স্থান নির্ধারিত হয়। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভাগের পর এইখানে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। পরে ১৯৬০-এর দশকে ইহার উত্তর পার্শ্বে নূতন হাইকোর্ট ভবন নির্মিত হইলে সেইখানে হাইকোর্ট স্থানান্তরিত হয়। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর এইখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য স্থান বরাদ্দ করা হয়। ভবনটি সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় রীতি এবং রুচি অনুযায়ী নির্মিত, সাদা রঙের সুউচ্চ এই ভবনটি বাহির হইতে রাজকীয় গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ইহারই পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটি মাযার অবস্থিত, যাহা হাইকোর্ট মাযার নামে পরিচিত (উপরে 'খ' অংশের ৫ নং দ্র.)। ফজলুল হক হল (১৯৪০ খৃ.), শহীদুল্লাহ হল (প্রাক্তন ঢাকা হল) ও সলিমুল্লাহ হল (১৯৩১ খৃ.) বৃটিশ আমলের অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি।

(৭) সুপ্রীম কোর্ট ভবন ঃ ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর ঢাকা পুনরায় রাজধানীর মর্যাদা ফিরিয়া পাইলে এইখানে বিভিন্ন প্রয়োজনে পুনরায় দালান-কোঠা নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৬০-এর দশকটি এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময় এইখানে সরকারী প্রয়োজনে নূতন কিছু ভবন নির্মিত হয়। তৎকালীন হাই কোর্ট ও বর্তমান সুপ্রীম কোর্ট ভবন সমকালীন স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের উত্তর পার্শ্বে এই ভবনটি অবস্থিত। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের জন্য ইহা নির্মিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এইখানে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় এবং বর্তমানে ইহা সুপ্রীম কোর্ট ভবন নামে পরিচিত।

(৮) জাতীয় সংসদ ভবন (১৯৬৪-৮৩ খৃ.) ঃ ১৯৫৯ সালের ১২ ও ১৩ জুন পাকিস্তানের নাথিয়া গলিতে অনুষ্ঠিত গভর্নর সম্মেলনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদনুযায়ী ১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানে ঢাকা পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী ও জাতীয় পরিষদের সদর দফতররূপে ঘোষিত হয়। ইহারই ফলে গড়িয়া উঠে বর্তমান শেরে বাংলা নগর। পূর্বে এই এলাকায় একটি সরকারী কৃষি খামার ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় রাজধানীর জন্য স্থানটি নির্বাচিত হইলে ১৯৬২ খৃ. সেইখানে রাজধানী নির্মাণের কাজ শুরু হয়। অতঃপর এলাকাটির নামকরণ করা হয় তদানীন্তন পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের নামানুসারে আইয়ুব নগর। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয় শেরে বাংলা নগর।

শেরে বাংলা নগরের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন বিখ্যাত মার্কিন স্থপতি প্রফেসর লুই আই. কান (Prof. Louis I. Kahn)। একটি জাতীয় রাজধানীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরিকল্পনানুযায়ী এখনও ইহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় নাই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইলে স্বভাবতই দ্বিতীয় রাজধানীর ধারণা স্তিমিত হইয়া পড়ে এবং শেরে বাংলা নগরের নির্মাণকাজেও স্থবিরতা দেখা দেয়। এই পর্যন্ত এইখানে যেই সব দালান-কোঠা ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মিত হইয়াছে তন্মধ্যে রহিয়াছে জাতীয় সংসদ ভবন, সংসদ সদস্যদের হোস্টেল, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হোস্টেল ও বাসভবন, একটি হাসপাতাল (সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল), কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কিছু সংখ্যক অফিস ভবন। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়সহ অনেকগুলি ভবন নির্মিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া রহিয়াছে একটি লেক, উদ্যান ও কয়েকটি সড়ক। ইহাদের মধ্যে যেই ভবনটি সকলের শীর্ষে অবস্থান করিতেছে তাহা হইল জাতীয় সংসদ ভবন। প্রকৃতপক্ষ ইহা আধুনিক ঢাকার এক অতুলনীয় স্থাপত্য-কীর্তি এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর ইতিহাসের ইহাই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য সংযোজন।

সমগ্র শেরে বাংলা নগরের ন্যায় জাতীয় সংসদ ভবনের নকশাও প্রফেসর লুই আই. কান (Prof. Louis I. Kahn) কর্তৃক প্রণীত। তাঁহার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট স্থাপত্য কর্মের নকশা প্রণয়ন করেন তাঁহারই ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হেনরী এন. উইলকটস (Henry N. Wilcots)। ভবনটির কাঠামোগত নকশা (Structural design) প্রস্তুত করেন হ্যারি এম. পামবাম (Hary M. Palmbamm)। বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত বিভাগ এই ভবনটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে ইহার নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৩ সালে ১৪শ ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

এয়ার পোর্ট রোডের ফার্মগেইট হইতে মীরপুর রোডের আসাদ গেইটের নিকট পর্যন্ত সম্প্রসারিত মানিক মিয়া এ্যাভিনিউর উত্তর পার্শ্বে সুবিস্তৃত উদ্যান মাঠ সম্মুখে রাখিয়া বিশাল জাতীয় সংসদ ভবন দণ্ডায়মান। জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্স ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য স্থাপনা, যথা এম. পি. হোস্টেল, আবাসিক ভবন, লেক, উদ্যান ও সড়ক ২১৫ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় সংসদ ভবন কমপ্লেক্সের রহিয়াছে তিনটি প্রধান অঙ্গ ঃ (১) জাতীয় সংসদ ভবন, মোট নির্মাণ আয়তন ১,৫০,০০০ ব. ফু. ভিত্তির আয়তন, ৯,২৩,০০০ ব. ফু.। সংসদ কক্ষ ছাড়াও ইহাতে রহিয়াছে জাতীয় সংসদ সচিবালয়, প্রেসিডেন্ট, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, প্রধান মন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, অন্যান্য নেতা, বিভিন্ন দলের জন্য নির্ধারিত কক্ষ এবং ব্যাংক, ডাকঘর, সালাত কক্ষ, ক্যাফেটেরিয়া ও ভোজন কক্ষ ইত্যাদির ন্যায় প্রয়োজনীয় সুবিধাসমূহ। ভবনটি কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, (২) প্রেসিডেন্সিয়াল স্কয়ার, ইহাতে রহিয়াছে মার্বেল পাথরের সিঁড়ি, গ্যালারী, চত্বর ও নীচতলায় ফাঁকা জায়গা, (৩) দক্ষিণ প্লাজা, ভিত্তির আয়তন ঃ ২,২৩,০০০ ব. ফু. ; ইহাতে রহিয়াছে ঃ নিয়ন্ত্রণ গেইট, গাড়ি চলাচলের পথ–'বি' রাস্তা ইহার নীচ দিয়া গিয়াছে, প্রধান যন্ত্রপাতি কক্ষ, গাড়ি পার্কিং হল, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, গণপূর্ত বিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলীর অফিস, যন্ত্র সামগ্রীর ভাণ্ডার এবং খোলা চত্বর, সিঁড়ি ও ঢালু সিঁড়িসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি।

সংসদ কক্ষে সংসদ সদস্যদের জন্য ৩৫৪টি, বিশিষ্ট মেহমানদের জন্য ৫৬টি, সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ৪১টি, সাংবাদিকদের জন্য ৮০টি এবং দর্শকদের জন্য ৪৩০টি আসন রহিয়াছে।

১৯৬৪ সালে ইহার নির্মাণ ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা (তখনকার হিসাবে প্রায় ১ কোটি মার্কিন ডলার)। কিন্তু সময় অতিক্রমের সাথে সাথে ১৯৮৩ খৃ. নাগাদ এই ব্যয় ১৩৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় (৫ কোটি ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার) নির্ধারিত হয়। ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণ ও চালু রাখার জন্য বার্ষিক ব্যয় ধরা হইয়াছে ৫ কোটি ২৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা (প্রায় ২০ লক্ষ মার্কিন ডলার)।

(৭) আধুনিক ঢাকার কয়েকটি শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র —

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঃ ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও গবেষণা ইত্যাকার নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সনের ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশ, (দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৫, অর্থাৎ ১৯৭৫ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশবলে ঢাকায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন স্থাপিত হয়, অধ্যাদেশটি পরে আইনে রূপান্তরিত হয়। ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ অঙ্গনে ইহার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত (বর্তমানে শেরেবাংলা নগরে)। পূর্বে (১৯৫৯ খৃ. হইতে) বায়তুল মোকাররাম সোসাইটি ও ইসলামিক একাডেমী নামক দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রায় অভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও তৎসঙ্গে আরও কয়েকটি ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'আবদুল লাতীফ ইবরাহীম বাওয়ানী প্রমুখ শিল্পপতির উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম সোসাইটি গঠিত হইয়াছিল। অন্যদিকে ইসলামের বিভিন্নমুখী গবেষণা ও ইহার প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইসলামিক একাডেমী। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম (দ্র.) ইহার প্রথম পরিচালক ছিলেন। বায়তুল মোকাররম সোসাইটি বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও তৎসন্নিহিত বিপণী কেন্দ্র নির্মাণে অগ্রগতি অর্জন করে। কিন্তু ১৯৭১ খৃ. স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সোসাইটির কর্মকর্তাদের স্থানচ্যুতির ফলে ইহার কাজে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ইসলামিক একাডেমী ইসলামের গবেষণা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখিতে সক্ষম হয়, কিন্তু ১৯৭১ খৃ. পর ইহাকেও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ খৃ. উপরোক্ত সংস্থা দুইটি বিলোপ করিয়া ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উহাদের যাবতীয় সম্পদ, দায়দায়িত্ব ও কর্মসূচি ইহার উপর অর্পিত হয়। বায়তুল মোকাররম মসজিদ ও তৎসন্নিহিত বিপণী কেন্দ্রটিও ফাউন্ডেশনের আওতাধীন করা হয়। পরে (যথাক্রমে ১৯৮৬ ও ১৯৮৭ খৃ.) চট্টগ্রামস্থ আন্দর কিল্লা শাহী জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ও রাজশাহী শহরের হেতেম খাঁ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স-এর পরিচালন ভারও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত হয়।

ফাউন্ডেশনটি একটি বোর্ড অব গভর্নরস দ্বারা পরিচালিত। সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী চেয়ারম্যান এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব এই বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বোর্ডের সদস্য সচিব। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মহাপরিচালক ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক প্রধান। সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই সংস্থাটি পরিচালিত।

প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামের গবেষণা, প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করিয়া আসিতেছে এবং এই পর্যন্ত উহাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। নিম্নে উহার বহুমুখী কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচিত হইল। ঢাকায় প্রধান কার্যালয় ছাড়াও প্রতিটি জিলায় ইহার শাখা অফিস রহিয়াছে। এইগুলির মাধ্যমে নিয়মিত ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি শাখাতেই একটি করিয়া পাঠাগার রহিয়াছে। ইসলামী জ্ঞান বিস্তারে এই পাঠাগারগুলি প্রভূত অবদান রাখিতেছে। ইহা ছাড়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশের এক বিপুল সংখ্যক মসজিদে পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। পর্যায়ক্রমে সকল মসজিদেই অনুরূপ পাঠাগার স্থাপনের পরিকল্পনা রহিয়াছে। ঢাকায় ফাউন্ডেশনের একটি সুবৃহৎ ইসলামী গ্রন্থাগার রহিয়াছে। উহাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক দেশী-বিদেশী মূল্যবান গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে এবং হইতেছে।

গ্রন্থ রচনা, গবেষণা, অনুবাদ ও প্রকাশ ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। এই পর্যন্ত ফাউন্ডেশন কর্তৃক তিন হাজারেরও অধিক শিরোনামের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় কুরআনুল করীমের তরজমা, যাহা কুরআনুল করীম নামে পরিচিত, সাবেক ইসলামিক একাডেমীর একটি মহামূল্য অবদান। বৃহৎ ২৮ খণ্ডে বাংলা ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কীর্তি। ২৩ খণ্ডে সমাপ্য একটি সীরাত বিশ্বকোষ (১৪ খণ্ড প্রকাশিত) এবং ১০ খণ্ডে প্রকাশিতব্য আল-কুরআন বিশ্বকোষ রচনার কাজ অব্যাহত আছে। ইহা ছাড়া রহিয়াছে সীরাতুন্নবী, হাদীছ, তাফসীর, ইতিহাস, জীবনী ও অন্যান্য বিষয়ের মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থাবলী। ফাউন্ডেশনের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রহিয়াছে ঃ ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ইসলামী মিশন, কুরআন ক্যাসেটে ধারণ, দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, আরবী ভাষা শিক্ষাদান এবং দুস্থ ও বাস্তুহারা মানুষের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কর্মসচি ইত্যাদি। মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প ই.ফা.বা-এর সর্ববৃহৎ প্রকল্প, দেশব্যাপী যাহার শাখা বিস্তৃত। ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় হইতে তিনটি সাময়িকী প্রকাশিত হয় ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (সাবেক ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা), সবুজ পাতা, অগ্রপথিক প্রভৃতি।

ইসলাম ও মুসলিম জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৮২ খৃ. হইতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইসলামের মৌলতত্ত্ব, সীরাত গ্রন্থ, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, সৃজনশীল সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী গ্রন্থ, শিশু সাহিত্য, অনুবাদ, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্পকলা, ইসলাম প্রচার ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে প্রতি হিজরী সনে এই পুরস্কার প্রদান করা হয় (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. শিরো. "ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ")।

বাংলা একাডেমী ঃ বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন, প্রকাশনা ও গবেষণা এবং লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও এবম্বিধ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত একটি প্রতিষ্ঠান। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের সহিত বাংলা একাডেমীর ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৫৪ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয় এবং কিছুকাল পর ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ খৃ./১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ বাং শনিবার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আবূ হোসেন সরকার (দ্র.) বর্ধমান হাউসে বাংলা একাডেমীর উদ্বোধন করেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পর দি বেঙ্গলী একাডেমী এ্যাক্ট, ১৯৫৭' (১৯৫৭ সনের ২৫ নং পূর্ব পাকিস্তানে আইন) জারী করিয়া বাংলা একাডেমীকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর জারী করা হয় "দি বাংলা একাডেমী অর্ডার, ১৯৭২" (১৯৭২ সনের ৪৪ নং রাষ্ট্রপতি আদেশ) এবং আরও পরে "দি বাংলা একাডেমী অর্ডিন্যান্স,

১৯৭৮" (১৯৭৮ সনের ১৯ নং অধ্যাদেশ); বর্তমানে এই শেষোক্ত অধ্যাদেশবলে একাডেমীটি পরিচালিত এবং সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

বাংলা একাডেমীর গঠন পদ্ধতি নিম্নরূপ, একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা একাডেমী পরিচালিত। একাডেমীর মহাপরিচালক উক্ত পরিষদের সভাপতি। সভাপতি ব্যতীত পরিষদে আরও সতরজন সদস্য রহিয়াছেন। মহাপরিচালক একাডেমীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। সরকার কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৭২ খৃ. মহাপরিচালক পদ সৃষ্টি করা হয়। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (দ্র.) একাডেমীর প্রথম সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য তৎকালীন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠিত আরও একটি প্রতিষ্ঠান কার্যরত ছিল। উহার নাম ছিল কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড। ১৯৭২ খৃ. ইহাকে বাংলা একাডেমীর সহিত সংযুক্ত ও সমন্বিত করা হয়।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে বাংলা একাডেমী নিয়োজিত। বিদেশী কারিগরী ও অন্যান্য পরিভাষার বাংলা প্রতিশব্দ চয়ন ও প্রবর্তনে একাডেমী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলায় পাঠ্য পুস্তক রচনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ বাংলা একাডেমীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কাজ। অভিধান, জীবন-চরিত ও বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশও উক্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা একাডেমীর অপর একটি প্রধান দায়িত্ব। বাংলাদেশের লোকসাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা হয়। একাডেমী কর্তৃক পাঁচটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। একটি গবেষণাধর্মী, একটি বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক, একটি সৃজনশীল লেখাসমৃদ্ধ, একটি ইংরেজী ভাষায় ও একটি শিশুদের জন্য। একাডেমী গবেষণা ফেলোশীপ প্রদান করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যথা কবিতা, ছোট গল্প, নাটক, শিশু সাহিত্য, গবেষণা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ইত্যাদিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বাংলা একাডেমীর উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ইহাতে মোট পাঁচটি বিভাগ ও চারটি উপবিভাগ রহিয়াছে।

একাডেমীর গ্রন্থ প্রকাশের জন্য উহার নিজস্ব একটি মুদ্রণালয় রহিয়াছে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ঃ বাংলাদেশের শিশুদের জন্য বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৭৬ খৃ. এক অধ্যাদেশবলে (দি বাংলাদেশ শিশু একাডেমী অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬, ১৯৭৬ সনের ৭৪ নং অধ্যাদেশ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ইহা একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। একজন চেয়ারম্যানসহ বারো সদস্যবিশিষ্ট একটি "বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট" দ্বারা একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালিত। ঢাকার পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে শিশু একাডেমীর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একাডেমীতে নিম্নবর্ণিত বিভাগসমূহ রহিয়াছে ঃ (১) সাংস্কৃতিক, (২) প্রকাশনা, (৩) শিশু যাদুঘর, (৪) শিশু পাঠাগার, (৫) প্রশাসন ও (৬) হিসাব। এই বিভাগগুলির মাধ্যমে ইহার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হইয়া থাকে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক নিয়মিত মাসিক পত্রিকা 'শিশু' এবং শিশু পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পর্যন্ত ২২৪টি শিরোনামের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। 'জ্ঞানের কথা' একাডেমীর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা; "অগ্রণী ব্যাংক শিশু সাহিত্য পুরস্কার" একাডেমীর ব্যবস্থাপনায় এবং "বাংলাদেশ শিশু একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার" একাডেমী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য শিশু একাডেমী একটি শিশু যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ৭২টি শোকেসে শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস শিশু-কিশোরদের উপযোগী করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ঃ ১৯৭৪ খৃ. একটি আইনবলে (দি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী এ্যাক্ট, ১৯৭৪, ১৯৭৪ সনের ৮১ নং আইন) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, জাতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বিকাশ ও উন্নয়ন, জাতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ঐতিহ্যগত বিষয়ে গবেষণা, সৃষ্টিধর্মী ও গুণী শিল্পীদের সাহায্য প্রদান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাকে অনুমোদন অথবা শিল্পকলা একাডেমীর সহিত উহাদের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি। রমনা পার্কের বিপরীত দিকে সেগুনবাগিচার একটি বৃত্তাকার আর্ট গ্যালারী, একটি আধুনিক মিলনায়তন ও প্রশাসনিক ভবন সমন্বয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা কমপ্লেক্স অবস্থিত।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এশিয়ার 'মানুষ ও প্রকৃতি'র গবেষণায় নিবেদিত বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ১৮৬০ খৃ. সমিতি রেজিস্ট্রেশন আইনের অধীনে ইহা রেজিস্ট্রীকৃত এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল গবেষক ও গবেষণাপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের জন্য ইহার সদস্যপদ উন্মুক্ত। ইহা একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী অনুদান, বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ব্যক্তিদের দান হইতে ইহার ব্যয়ভার মিটান হয়। রাষ্ট্রপতি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি ইহার দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণত ভাষণ দানের জন্য আমন্ত্রিত হন।

১৭৮৪ খৃ. কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর উদ্যোগ ও কর্মপ্রেরণায় "এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামে সর্বপ্রথম এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জোন্স-এর অদম্য উৎসাহের ফলে শীঘ্রই ইহা প্রাচ্য গবেষণার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বৃটিশ-রাজ কর্তৃক ১৮৫৭ খৃ. ভারতের শাসনভার গ্রহণ করা হইলে প্রতিষ্ঠানটি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভক্তির ফলে সোসাইটি উহার কলিকাতাস্থ কার্যালয়সহ ভারতের অংশে পড়ে। সুতরাং "এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান" নামে নূতন একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দারুণভাবে অনুভূত হয়। উহারই ফলশ্রুতিতে ৩ জানুয়ারী, ১৯৫২ খৃ. দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের উদ্যোগে "এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান" গঠিত হয়। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ইহার নাম "এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ"-এ রূপান্তরিত হয়। সোসাইটির কার্যালয় ৫ পুরাতন

সেক্রেটারিয়েট রোড, নিমতলী, রমনা, ঢাকায়, পুরাতন যাদুঘর ভবনের পার্শ্বে অবস্থিত।

সোসাইটি উহার নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পরিচালিত। প্রতি দুই বৎসর অন্তর নির্বাচিত একটি কার্যানির্বাহী পরিষদের উপর উহার পরিচালনভার ন্যস্ত। এশিয়ার 'মানুষ ও প্রকৃতি' সম্পর্কে গবেষণা করার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী সোসাইটির যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত। সোসাইটির একটি অতি উচ্চ মানের গ্রন্থাগার রহিয়াছে। ইহাতে ৭০০০-এর অধিক শিরোনামের পুস্তক এবং অনেক মুদ্রা ও পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। পুস্তক প্রকাশনা সোসাইটির অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশনা ছাড়াও সোসাইটি নিয়মিত তিনটি সাময়িকী প্রকাশ করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ঃ সর্বস্তরের মানুষের পাঠের জন্য উন্মুক্ত কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ঢাকা মহানগরীর সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। ২২ মার্চ, ১৯৫৮ খৃ. এই লাইব্রেরী শাহবাগ এলাকার যেই ভবনটিতে উদ্বোধন করা হয় তাহা এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর অঙ্গীভূত। ১৯৬১ খৃ. লাইব্রেরী ভবনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উহার লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য হস্তান্তর করা হয়। বর্তমান পাবলিক লাইব্রেরী ভবন শাহবাগ এলাকায় জাতীয় যাদুঘর ও চারুকলা ইনস্টিটিউটের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ১৯৭৮ খৃ. এখানে লাইব্রেরীটি স্থানান্তরিত হয়। ইহা একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান।

১০,০৪০টি পুস্তক লইয়া ঢাকার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্বোধন করা হইয়াছিল। বর্তমানে (জানু. ১৯৯২) ইহার পুস্তক সংখ্যা ১ লক্ষ ৯ হাজার। পুস্তক ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীও এইখানে সংরক্ষিত আছে। পাঠকগণ উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে এই প্রতিষ্ঠানটি হইতে তাহাদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করিতে পারিতেছে।

বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ঃ বুলবুল ললিতকলা একাডেমী একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। প্রখ্যাত শিল্প বুলবুল চৌধুরীর স্মরণে ১৭ মে, ১৯৫৫ খৃ. এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয়। ইংরেজী নাম 'Bulbul Academy of Fine Arts'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'BAFA'-'বাফা' নামেই ইহা সর্বাধিক পরিচিত। এইখানে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ও শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যম সম্পর্কে শিক্ষা দান করা হয়। নৃত্য ও কণ্ঠ সঙ্গীতে ডিগ্রী কোর্স চালু রহিয়াছে। চার বৎসর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স একাডেমীর সর্বোচ্চ সার্টিফিকেট।

চারুকলা ইনস্টিটিউট ঃ ইহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ইনস্টিটিউট এবং ঢাকা মহানগরীতে চারুকলা শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৮ খৃ. মাত্র ১৮ জন শিক্ষার্থী লইয়া এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ইহা এক বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নানা বিষয় এইখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স এইখানে পড়ানো হয়। শাহবাগ এলাকায় সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউর পার্শ্বে ইনস্টিটিউট ভবন অবস্থিত। ১৯৫৫-৫৬ খৃ. আধুনিক কারুকার্যমণ্ডিত এই ভবনটিতে ইনস্টিটিউটটি স্থানান্তরিত হয়।

মেডিক্যাল কলেজ ঃ (ক) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ঃ ১৯৪৬ খৃ. এনাটমী, ফিজিওলজী ও কেমিস্ট্রী—এই তিনটি বিভাগ লইয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করা হয়। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভক্তির পর ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হয়। ১৯৪৮ খৃ. সর্বপ্রথম এই কলেজ হইতে মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট বাহির হন। বর্তমানে ইহা দেশের সর্ববৃহৎ মেডিক্যাল কলেজ।

একই সঙ্গে কলেজটির সহিত একটি হাসপাতালও স্থাপিত হইয়াছে। কলেজ ও হাসপাতাল উভয়ই সাবেক পূর্ব বাংলা ও আসাম সরকারের পরিত্যক্ত সচিবালয় ভবনে স্থাপিত হয়। ইহার একটি অংশ অনেক দিন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারভুক্ত ছিল। বর্তমানে সমগ্র ভবনটিই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধিকারভুক্ত। ইহার সংলগ্ন আরও নূতন নূতন ভবন নির্মিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ ভবন, ছাত্রী হোস্টেল ও নার্স হোস্টেল ভবন উল্লেখযোগ্য। নার্স প্রশিক্ষণ, স্কুল ও ডেন্টাল কলেজ একই অঙ্গনে অবস্থিত অপর কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অধিভুক্ত কলেজ। একজন অধ্যক্ষ ইহার প্রশাসনিক প্রধান।

(খ) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ ঃ ১৮৮৯ খৃ. ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল নামে ঢাকায় একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং উহাকে মিটফোর্ড হাসপাতালের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। স্কুলটিতে তখন এল.এম.এফ. (L.M.F.) কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটিই পূর্ব ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইখানে তখনকার পূর্ব বাংলা ও আসামের লাইসেন্সধারী ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত। অবিভক্ত বাংলার সরকারী মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির কম্পাউন্ডার ও ড্রেসারদের প্রশিক্ষণ দানের জন্যও ইহা ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৮ খৃ. স্কুলটিতে ছাত্র ভর্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ হইতে এম.বি.বি.এস. কোর্স চালু করিয়া ইহাকে মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করা হয়। ঢাকার বিখ্যাত নবাব স্যার সলিমুল্লাহর (দ্র.) নাম অনুযায়ী তখন ইহার নামকরণ করা হয় স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিক্যাল কলেজ। তখন হইতে পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে ইহার যাত্রা শুরু হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসাবে এম.বি.বি.এস কোর্স নিয়মিত শিক্ষা দান করিয়া আসিতেছে।

এই কলেজের সহিত সংযুক্ত হাসপাতালটি মিটফোর্ড হাসপাতাল নামে পরিচিত। ইহা পুরাতন ঢাকার ইমামগঞ্জ এলাকায় বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত।

হাসপাতাল ঃ ঢাকা নগরীতে উরোক্ত দুইটি মেডিক্যাল কলেজের সহিত সংযুক্ত হাসপাতাল ব্যতীত বর্তমানে আরও অনেকগুলি হাসপাতাল সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে চালু রহিয়াছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন অনেক ক্লিনিকও নগরবাসীকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করিতেছে। আমরা নিম্নে কতকগুলি হাসপাতালের নাম উল্লেখ করিতেছি, যেইগুলির বেশির ভাগই সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং যেইখানে চিকিৎসা সুবিধা অপেক্ষাকৃত সুলভে পাওয়া যায়। এই সকল হাসপাতালের মধ্যে কতকগুলি রহিয়াছে সাধারণ হাসপাতাল এবং কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগে ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত হাসপাতাল। ইহাতে যেমন ভিতরে রোগীদের জন্য শয্যা রহিয়াছে, তেমনি প্রতিদিন অসংখ্য রোগী বহির্বিভাগে

চিকিৎসা সুবিধা লাভ করিতেছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন এই হাসপাতালগুলিই ঢাকা নগরবাসী তথা সমগ্র দেশবাসীর চিকিৎসার প্রধান অবলম্বন। প্রধান প্রধান হাসপাতালের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ (১) আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র (কলেরা হাসপাতাল); (২) ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল; (৩) জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, (৪) হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, (৫) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, (৬) ঢাকা শিশু হাসপাতাল/বাংলাদেশ শিশু স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, (৭) পঙ্গু হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, (৮) বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, (৯) বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ও হাসপাতাল, (১০) মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (১১) শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, (১২) স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (পি.জি. হাসপাতাল; বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়), (১৩) স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (মিটফোর্ড হাসপাতাল), (১৪) হলি ফ্যামিলী রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, (১৫) যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, (১৬) শ্রমজীবী হাসপাতাল, (১৭) রেলওয়ে হাসপাতাল, (১৮) পুলিশ হাসপাতাল, (১৯) সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল, (২০) সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ও (২১) মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র।

উদ্যান ও পার্ক ঃ মুগল যুগের ঢাকা নগরী অনেক বাগ-বাগিচা ও উদ্যানে সুশোভিত ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে সেই সকল উদ্যানের অস্তিত্ব আজ আর নাই। এখনও বিভিন্ন স্থানে নামের সঙ্গে যুক্ত 'বাগ' শব্দটি সেকালের উদ্যানরাজির স্মৃতি বহন করিতেছে।

আধুনিক ঢাকায় কয়েকটি উদ্যান ও পার্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের সবগুলি বর্তমান শতাব্দীর এবং বেশীর ভাগ ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সৃষ্টি হইয়াছে, দেশী-বিদেশী অনেক বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য এই সকল উদ্যান বিশেষভাবে খ্যাত। ইহা ছাড়া নগরবাসীর বিনোদন কেন্দ্র হিসাবেও এইগুলি সমধিক পরিচিত। ইহাদের মধ্যে বলদা গার্ডেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেন, রমনা পার্ক, মীরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বলদা গার্ডেন ওয়ারী এলাকায় খৃস্টান কবরস্থানের বিপরীত দিকে অবস্থিত। ১৯২৫ খৃ. জমিদার নরেন্দ নারায়ণ রায় এই উদ্যানটি সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁহার জমিদারীর আয়ের এক বিরাট অংশ এই উদ্যান সৃষ্টির পিছনে ব্যয় করেন। দেশ-বিদেশের নানা প্রকার বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ দ্বারা তিনি ইহাকে সমৃদ্ধ করেন। উদ্যানস্থ নিজ ভবনে তিনি একটি যাদুঘরও স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যাদুঘরের প্রত্ন সম্পদগুলি ঢাকা যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়। অর্কিড (Orchid), ফার্ন (Fern), ক্যাকটাস (Cactus) ও নিমফায়া (Nymphaea) উদ্ভিদে এই উদ্যানটি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেন কার্জন হল এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা একটি ক্ষুদ্রাকৃতির উদ্যান হইলেও বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদে ইহা সমৃদ্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ছাত্রদের গবেষণার কাজে ইহা বিশেষভাবে ব্যবহৃত।

রমনা পার্ক ১৯৪৭ সন পরবর্তী কালের সৃষ্টি। অনেক দেশী-বিদেশী উদ্ভিদ ও পুষ্পোদ্যানে পার্কটি সমৃদ্ধ। নগরবাসীর প্রাতকালীন ও বৈকালিক ভ্রমণের জন্য ইহা এক উল্লেখযোগ্য স্থান।

মীরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ঢাকা নগরীর বৃহত্তম উদ্যান। নগরীর কেন্দ্রস্থল হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে মীরপুরে এক বিরাট এলাকা ব্যাপিয়া উদ্যানটি অবস্থিত। ১৯৬০-এর দশকে ইহার পরিকল্পনা রচিত হইলেও স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে ইহার সৃষ্টি হয়। অসংখ্য দেশী-বিদেশী উদ্ভিদে উদ্যানটি পরিপূর্ণ; প্রত্যহ বহু সংখ্যক দর্শকের সমাগম হয়। শীতকালে বনভোজনের জন্য ইহা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এককালে ঘোড়দৌড়ের মাঠ (রেসকোর্স ময়দান) ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এইখানে ঘোড়দৌড় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং তদস্থলে এক বিশাল উদ্যানের সৃষ্টি করা হয়। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর (দ্র.) নাম অনুসারে ইহার নামকরণ করা হয় হোসেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। পরে ইহার একাংশে শিশু পার্ক স্থাপিত হয়। উদ্যানটির পশ্চিমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, দক্ষিণ-পূর্বে সুপ্রীম কোর্ট ভবন এবং উত্তর-পূর্বে রমনা পার্ক অবস্থিত। দেশী-বিদেশী নানা প্রকার গাছ-গাছালি দ্বারা উদ্যানটি সুসজ্জিত। এইখানেও প্রত্যহ ভ্রমণকারীদের সমাগম হইয়া থাকে।

মীরপুর চিড়িয়াখানা ঃ ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় একটি চিড়িয়াখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তদনুযায়ী বর্তমান সুপ্রীম কোর্ট ভবনের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় একটি ছোট আকারের চিড়িয়াখানা গড়িয়া উঠে। কালক্রমে চিড়িয়াখানার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য স্থানটি অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ১৯৬০ খৃ. মীরপুরের বর্তমান স্থানটি নির্বাচিত হয়। কয়েক বৎসর পর সেইখানে চিড়িয়াখানাটি স্থানান্তরিত হয় এবং একটি ব্যাপক আকারের চিড়িয়াখানা গড়িয়া তোলার চেষ্টা করা হয়। এইভাবেই বর্তমান চিড়িয়াখানাটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

বোটানিক্যাল গার্ডেনের পার্শ্বে এক ব্যাপক এলাকা জুড়িয়া এই চিড়িয়াখানা অবস্থিত। ঢাকা মহানগরবাসীর ইহা অন্যতম প্রধান বিনোদনকেন্দ্ররূপে পরিগণিত। দেশ-বিদেশ হইতে বহু প্রজাতির পশু-পাখী সংগ্রহ করিয়া এইখানে রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে রহিয়াছে 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' নামে খ্যাত বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, চিতা, জলহস্তী, গণ্ডার, জেব্রা, জিরাফ, হরিণ ও আরও অনেক বিচিত্র ধরনের পশু ও পাখী। চিড়িয়াখানা সংলগ্ন জলাশয়ে প্রতি বৎসর শীতকালে প্রচুর অতিথি পাখীর সমাগম হয়। ইহারা শীতশেষে আবার নিজ দেশে চলিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এইখানে ইহাদের জন্য একটি অভয়ারণ্যের মত আশ্রয়স্থল গড়িয়া উঠিয়াছে। নগরবাসী তাহাদের কর্মক্লান্ত জীবনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জন্য এইখানে আসিয়া থাকে। তাই এইখানে দৈনিক প্রচুর দর্শনার্থীর ভীড় লক্ষ করা যায়।

পশু-পাখী ঃ ঢাকা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এককালে নানা প্রকার পশু-পাখী বিচরণ করিত। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভাওয়াল ও মধুপুর জঙ্গলে প্রচুর সংখ্যক হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, শূকর, হরিণ ও মহিষ

পাওয়া যাইত। বর্তমানে হাতি ও বাঘ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ছোট আকৃতির প্রাণীর মধ্যে বানর উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত শহরের যত্রতত্র ইহাদের বাস ছিল, বর্তমানে দূরে সরিয়া গিয়াছে। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে বাঘডাঁশ, খেকশিয়াল, সজারু, ইঁদুর, কাঠ-বিড়াল, বাদুড়, উদ্বিড়াল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পাখীর মধ্যে নিম্নোক্ত শ্রেণীর পাখী ঢাকা ও উহার আশেপাশের আকাশে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় ঃ কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, পেঁচা, কোকিল, টিয়া, তোতা, কবুতর, ঘুঘু, চড়ুই, টুনটুনি, দোয়েল, শালিক, কাক, চিল, বক, শকুন ইত্যাদি। শীতকালে প্রচুর অতিথি পাখী আগমন করে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে নানা প্রকার হাঁস ও অন্যান্য প্রজাতির পাখী। সাধারণত বিল, হাওড়, জলাশয় ও চরাঞ্চলে ইহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। শীত শেষে ইহারা আবার স্বদেশের পথে পাড়ি জমায়।

খেলাধুলা ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশ কিছু খেলাধুলার আসর বসে এই ঢাকা মহানগরীতে। তন্মধ্যে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস, সাঁতার, হাডু-ডু, নৌকাবাইচ, মুষ্টিযুদ্ধ ও দাবা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফুটবল খেলার জন্য বেশ কতকগুলি ক্লাব ঢাকা নগরীতে স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, আবাহনী ক্রীড়াচক্র ও ব্রাদার্স ইউনিয়ন প্রথম সারির তিনটি ক্লাব। ইহাদের মধ্যে সারা বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন কাপের ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট গোল্ডকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ও এশিয়ান ক্লাব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠেয় নিয়মিত দুইটি আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা। এই সকল প্রতিযোগিতায় অনেক বিদেশী দল অংশগ্রহণ করিয়া থাকে। আবার ঢাকার খেলোয়াড়গণও বিদেশের মাটিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। আন্তর্জাতিক জুনিয়র টেনিস প্রতিযোগিতা ঢাকায় অনুষ্ঠেয় আরেকটি জনপ্রিয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সাত জাতি (বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, পাকিস্তান ও মালদ্বীপ) দক্ষিণ এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 'সাফ গেমস' [SAF (South Asian Federation) Games] এই অঞ্চলের একটি অতি জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। এই পর্যন্ত ইহা পাঁচবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় 'সাফ গেমস' ১৯৯৫ খৃ. ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। দেশী-বিদেশী বহু ক্রীড়াবিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী এই সময় উৎসবের সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। এই সকল খেলাধুলার জন্য ঢাকা মহানগরীতে দুইটি জাতীয় স্টেডিয়াম (একটি নগরীর কেন্দ্রস্থলে, অন্যটি মীরপুর), একটি হকি স্টেডিয়াম, একটি মুষ্টিযুদ্ধ স্টেডিয়াম, দুইটি সুইমিং পুল ও একটি টেনিস কমপ্লেক্স রহিয়াছে। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান।

উৎসব ঃ বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসবে ঢাকা নগরী বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মুখরিত থাকে। মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব 'ঈদুল-ফিতর', তাহার পরেই 'ঈদুল-আদহার' স্থান এবং ১২ রবীউল আওয়াল মহানবী (স)-এর জন্মদিবস। মুহাররাম ঐতিহাসিক কারবালার শোকাচ্ছন্ন ঘটনার স্মৃতিবাহী দিবস। ইহা সাধারণত শীআ সম্প্রদায় জাঁকজমকের সহিত পালন করিয়া থাকে। অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে হিন্দুদের দুর্গাপূজা, খৃস্টানদের বড়দিন ও বৌদ্ধদের বুদ্ধ পূর্ণিমা উল্লেখযোগ্য। জাতীয় দিবস হিসাবে ২১ ফেব্রুয়ারী শহীদ দিবস ও জাতীয় শোক দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসরূপে পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতার সহিত পালিত হইয়া থাকে।

ঢাকা মহানগরীর আগমন ও নির্গমন স্থানসমূহ ঃ (স্টেশন, বিমানবন্দর, লঞ্চঘাট ইত্যাদি) ঃ সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পথে ঢাকা মহানগরী বাহিরের সহিত সংযুক্ত। এই সকল পথে প্রত্যহ অসংখ্য লোক ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করে এবং সেইখান হইতে বাহির হইয়া যায়। দেশের সব কয়টি জিলা সদরের সহিতই ঢাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই সকল সড়কে দিবারাত্রি যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে। ঢাকা নগরীর তিনটি স্থানে আন্তঃজিলা বাস টার্মিনাল রহিয়াছে ঃ গাবতলী, সায়দাবাদ ও মহাখালী। গাবতলীতে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ, সায়দাবাদে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ এবং মহাখালীতে ময়মনসিংহ এলাকায় চলাচলকারী বাসসমূহের টার্মিনাল অবস্থিত। দিবারাত্র অসংখ্য বাস এই সকল স্থান হইতে বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করে এবং সড়ক পথের যাত্রিগণ এই পথেই ঢাকা নগরীতে প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন করে।

ঢাকা মহানগরীর সহিত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর প্রভৃতি শহরের সহিত রেল যোগাযোগ রহিয়াছে। ঢাকার প্রধান রেল স্টেশন কমলাপুরে অবস্থিত। গেণ্ডারিয়া, তেজগাঁও, বনানী, ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদি স্থানেও ছোট ছোট স্টেশন রহিয়াছে। কমলাপুর স্টেশনটি ১৯৬০-এর দশকে নির্মিত হয়। ইহার প্রধান ভবনটি আধুনিক স্থাপত্য কর্মের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ইহার সমগ্র ছাদটি পদ্মফুল আকৃতির অসংখ্য গম্বুজ আচ্ছাদিত। এই স্টেশনটি সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণ পাশ দিয়া বুড়িগঙ্গা নদী প্রবাহিত। এই নদী প্রাচীনকাল হইতেই ঢাকা মহানগরীর সহিত বাহিরের যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে এই নদীপথে অসংখ্য লঞ্চ ও স্টীমার ঢাকার সহিত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। ঢাকা হইতে বরিশাল ও খুলনা স্টীমার চলাচল করে এবং চাঁদপুর, ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট ও খুলনা প্রভৃতি স্থানে লঞ্চ চলাচল করে। ঢাকার প্রধান নৌ-টার্মিনাল সদরঘাটে অবস্থিত। এই পথে দৈনিক অসংখ্য লোক ঢাকা নগরীতে আগমন ও তথা হইতে নির্গমন করিয়া থাকে।

১৯৪৭ সনের পূর্বে ঢাকার সহিত বাহিরের কোন বিমান যোগাযোগ ছিল না এবং সেই কারণে এখানে কোন বিমান বন্দরও ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তেজগাঁওয়ে বিমান বাহিনীর উঠানামার জন্য একটি ছোট বিমান অবতরণ ক্ষেত্র স্থাপিত হয়। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইহাকেই বিমান বন্দরে উন্নীত করা হয়। এখান হইতে তৎকালে পাকিস্তানের লাহোর ও করাচী, ভারতের কলিকাতা এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে বিমান চলাচল করিত। বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার পর বহির্বিশ্বের সহিত ঢাকার বিমান যোগাযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে বর্ধিত আকারের বিমান বন্দরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইহারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮০-এর দশকের প্রারম্ভে কুর্মিটোলাতে নূতন বিমান বন্দর স্থাপিত হয়। এই বিমান বন্দরে বাংলাদেশ বিমানসহ বিশ্বের বহু দেশের

বিমান উঠানামা করে। এশিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন নগরীর সহিত ঢাকার বিমান যোগাযোগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, যশোর, রাজশাহী, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর প্রভৃতি স্থানের সহিতও ঢাকার বিমান যোগাযোগ রহিয়াছে।

ঢাকার শিল্প, বাণিজ্য ও আবাসিক এলাকাসমূহ ঃ প্রাচীন কালের ঢাকা ছিল "বায়ান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি" খ্যাত নগরী। এখন আর ঢাকার সেই দিন নাই। বর্তমান ঢাকা অনেক বিরাট এলাকা ব্যাপিয়া বিস্তৃত। ইহার বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য চিহ্নিত। মতিঝিল ও দিলখুশা মিলিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে আধুনিক বাণিজ্যিক এলাকা। ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, দেশী ও বিদেশী অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই এলাকায় অবস্থিত। ঢাকা মহানগরীর আকাশচুম্বী আধুনিক সৌধমালাও এইখানেই গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্তুতপক্ষে ইহাই এখন ঢাকার প্রাণকেন্দ্র।

তেজগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে শিল্প এলাকা। এইখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বৃহৎ শিল্প এলাকা ঢাকার বাহিরে টঙ্গী, জয়দেবপুর, ডেমরা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। সম্প্রতি ঢাকার পূর্ব পার্শ্বে পাগলার নিকট গড়িয়া উঠিয়াছে আরও একটি শিল্প এলাকা। এই এলাকাটিও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত।

ঢাকার সর্বাধিক স্থান জুড়িয়া আছে ইহার আবাসিক এলাকাসমূহ। ধানমণ্ডি ১৯৪৭ পরবর্তী সর্বপ্রথম পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা। ইহার পর ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠে গুলশান, বনানী, উত্তরা ও বারিধারা আবাসিক এলাকাসমূহ। এই এলাকাগুলিই ঢাকার অভিজাত এলাকা। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিদেশীরা সাধারণত এই সকল স্থানেই বসবাস করেন। বিদেশী দূতাবাসের জন্য বারিধারায় একটি 'ইনক্লেভ' স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ভবন নির্মিত হইতেছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্রাক্তন ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট) এই সকল এলাকার পরিকল্পক। উক্ত কর্তৃপক্ষ ব্যতীত সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের উদ্যোগে গড়িয়া উঠিয়াছে মোহাম্মদপুর, মীরপুর ও খিলগাঁও আবাসিক এলাকাসমূহ। ১৯৪৭ খৃ. ভারত বিভক্তির পর ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ঢাকায় আগত মুহাজিরদের পুনর্বাসনের জন্য প্রধানত মোহাম্মদপুর ও মীরপুর এলাকার উন্নয়ন করা হয়। ১৯৭১ সনের পর এই এলাকা দুইটি সম্পূর্ণ বাঙালী বসতিতে পরিণত হইয়াছে। ঢাকার কমলাপুরে নূতন রেল স্টেশন স্থাপনের ফলে উচ্ছেদকৃত লোকদের পুনর্বাসনের জন্য স্থাপিত হইয়াছে খিলগাঁও পুনর্বাসন এলাকা।

ঢাকার অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র ইহার বাজার ও বিপণী কেন্দ্রসমূহ ঃ এখানকার পাইকারী বাজারসমূহ হইতে সমগ্র দেশে মালামাল সরবরাহ করা হয়। চকবাজার ও মৌলভী বাজার এইখানকার সর্বপ্রধান পাইকারী বাজার। ইহা দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রকার মালামালের পাইকারী বিক্রয় কেন্দ্র। ইহা ছাড়া ইসলামপুরে কাপড়ের, বাদামতলীতে চাউলের, সোয়ারীঘাটে মাছের এবং শ্যামবাজার, কাওরান বাজার ও মোহাম্মদপুরে শাক-সবজী ও কৃষি পণ্যের পাইকারী বাজার অবস্থিত। ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে এই সকল বাজার হইতে মালামাল সরবরাহ হইয়া থাকে।

কাপড়-চোপড়, প্রসাধনী ও বাসন-কোসন ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে আধুনিক বিপণী কেন্দ্রসমূহ। নিউ মার্কেট, বায়তুল মোকাররম, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, গুলশান ১ নং ও ২ নং মার্কেট অনুরূপ কয়েকটি অভিজাত বিপণী কেন্দ্র। এই সকল কেন্দ্র হইতে ঢাকা ও ঢাকার বাহিরের লোকজন তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে।

স্মৃতিসৌধ ঃ আধুনিক ঢাকার সৌধমালার এক নূতন সংযোজন বিভিন্ন স্মৃতিসৌধ। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এই সকল স্মৃতিসৌধের উৎপত্তি। ইহাদের সব কয়টিই ১৯৫০-এর দশক ও তৎপরবর্তী কালের সৃষ্টি। আধুনিক স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পর্যন্ত ঢাকায় মোট চারিটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হইয়াছে ঃ (১) ১৮৫৭ খৃ. স্বাধীন সংগ্রামের শহীদদের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধ, (২) শহীদ মিনার, (৩) বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ ও (৪) জাতীয় স্মৃতিসৌধ।

প্রথমটি বাহাদুর শাহ পার্কে অবস্থিত। ১৯৫৭ সনে ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়। ১৮৫৭ খৃ. এইখানে উক্ত সংগ্রামে অংশ গ্রহণকারী বহু সংখ্যক সিপাহীকে গাছের ডালে ঝুলাইয়া ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল এবং এই স্থানটির নামকরণ করা হইয়াছিল ভিক্টেরিয়া পার্ক। তৎপূর্বে ইহার নাম ছিল আস্টাঘর ময়দান। ১৯৫৭ খৃ. একই স্থানে উক্ত শহীদ সিপাহীদের স্মরণে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয় এবং স্থানটির নামকরণ করা হয় সর্বশেষ মুগল সম্রাট বাহাদুর শাহর নাম অনুসারে বাহাদুর শাহ পার্ক। ইহা চারটি স্তম্ভের উপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ আচ্ছাদিত সম্পূর্ণ ইটের তৈয়ারী লাল রঙের একটি সৌধমাত্র। স্তম্ভ ব্যতীত ইহার অভ্যন্তর ভাগ ও চতুষ্পার্শ্ব সম্পূর্ণ খোলা।

শহীদ মিনার ১৯৫২ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত।ইহা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে অবস্থিত। ১৯৫০-এর দশকে এইখানে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়। কিন্তু ১৯৭১ খৃ. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে উক্ত মিনারটি সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্তমান মিনারটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে নির্মিত।

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধটি মীরপুরে অবস্থিত। ইহার পার্শ্বেই রহিয়াছে বুদ্ধিজীবী কবরস্থান। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী পাক বাহিনী ও উহার দোসরদের হাতে প্রাণ হারান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁহাদেরই স্মরণে নির্মিত হইয়াছে এই স্মৃতিসৌধ। প্রতি বৎসর ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়। ঐদিন এইখানে বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ পুষ্পার্ঘ অর্পণ করিয়া থাকে।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকা মহানগরীর বাহিরে সাভারে অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যেই অসংখ্য নাম জানা ও অজানা নারী-পুরুষ জীবন বিসর্জন দিয়াছেন তাহাদের স্মরণে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত। ছোট হইতে ক্রমান্বয়ে বড় পরপর সাতটি স্তম্ভের সমন্বয়ে এই স্মৃতিসৌধটি নির্মিত এবং ইহার স্থপতি মইনুল হোসেন। প্রতি বৎসর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে এইখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকজনের

সমাগম হয়। তাহারা অজ্ঞাত শহীদদের উদ্দেশে এইখানে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য আগমন করেন, সৌধটির চারিপাশে একটি মনোরম উদ্যান রচনা করা হইয়াছে। বনভোজনের জন্য ইহা একটি আদর্শ স্থানরূপে বিবেচিত।

(৮) শিক্ষাকেন্দ্ররূপে ঢাকা ঃ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ঢাকায় উহার দুই শ্রেণীর অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাধারণত দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল; হিন্দুদের জন্য টোল এবং মুসলমানদের জন্য মকতব ও মাদরাসা। টোলের পাঠ্য বিষয় ছিল ঃ সংস্কৃত ব্যাকরণ, বেদ, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র। কোন কোন টোলে জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রও পড়ান হইত। ১৯৩৮ সালেও ঢাকা নগরীতে ১১টি টোল ও উহাতে সর্বমোট ৩০২ জন হিন্দু ছাত্র অধ্যয়নরত ছিল।

ঢাকায় মুসলিম বসতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এইখানে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এই ব্যবস্থায় প্রধান পঠিত বিষয় হইল ঃ কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, ইতিহাস, দর্শন, আরবী, ফারসী ও উর্দু এবং ইহাদের বিভিন্ন শাখা বিষয়। মকতব এই ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর এবং মাদরাসা উচ্চতর। সাধারণত প্রতিটি মসজিদে কিংবা মসজিদ সংলগ্ন স্থানে মকতব চালু ছিল এবং আজও ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে ইহা চালু রহিয়াছে।

নওয়াব শাইস্‌তা খান তাঁহার সুবাদারী আমলে (১৬৬৩-৭৮ ও ১৬৭৯-৮৮ খৃ.) ঢাকায় নদী তীরবর্তী অঞ্চলে একটি মাদরাসা ও মসজিদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মাদরাসাটি ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চালু ছিল। ইহার পর মাদরাসাটি বন্ধ হইয়া গেলে কিছু দিন অব্যবহৃত থাকার পর মাদরাসা ভবনে একটি হাসপাতাল চালু করা হয়। বর্তমানে নদী তীরে একটি ভগ্ন ঘাট ও একটি মসজিদ উহার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। ঢাকার মগবাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তি শাহ নূরী (র) তাঁহার কিবরিয়াতে আহমার গ্রন্থে (গ্রন্থটি বর্তমানে দুর্লভ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি রোজ চার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মগবাজার হইতে শাইস্‌তা খানের মাদরাসায় পড়িতে আসিতেন। এই অধ্যয়নকাল সম্ভবত ১৭০৮ খৃ. ছিল। ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে জনৈক ছাত্র এই মাদরাসায় থাকিয়াই ফাতাওয়া-ই খানিয়ার পাণ্ডুলিপি তৈয়ার করিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. আবদুস সাত্তার, আলিয়া মাদরাসার ইতিহাস, পৃ. ৩০-৩১)। লালবাগ দুর্গের অদূরে অবস্থিত খান মুহাম্মাদ মিরধার মসজিদের নীচের অংশটিকে এখনও মাদরাসা নামে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের আরও একটি মসজিদ ঢাকার আজিমপুরে রহিয়াছে। সম্রাট আওরাঙ্গযীবের পুত্র মুহাম্মাদ আজাম বা পৌত্র আজীমুশ-শানের নামে পরিচিত এই মসজিদের দোতলার উত্তর প্রান্তে কতিপয় আলো-বাতাসময় কামরা বিদ্যমান। অদ্যাবধি মসজিদের এই অংশটিকে মাদরাসা নামে অভিহিত করা হয়। এই মাদরাসাটি মূলত আত্মশুদ্ধি বা ইলমে বাতিন শিক্ষাদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এইখানে আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি ইলমে জাহির বা সাধারণ ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও প্রচলিত হয়। মসজিদ সংলগ্ন একটি খানকাহও রহিয়াছে। এই খানকাহতে এখনও ইবাদতপ্রিয় লোকেরা পূর্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী অধ্যাত্ম-সাধনায় মগ্ন থাকেন। ঢাকায় এই ধরনের আরও অনেক মসজিদ ও মাদরাসা ছিল বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে।

জানা যায়, মুগল সরকার শিক্ষার প্রতি সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে মাওলানা আসাদুল্লাহ নামক জনৈক শিক্ষককে মাসিক ৬০ টাকা বেতন প্রদান করিতেন। তিনি আরবী, যুক্তিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও ফিক্‌হ তাঁহার ঢাকাস্থ মাদরাসায় শিক্ষাদান করিতেন। কিন্তু ১৭৫১ খৃস্টাব্দে তাঁহার ইনতিকাল হইলে পদটি আর পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রায় দুই শত বৎসরের ইংরেজ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭ খৃ.) মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা চরম অবহেলা ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হয়; সরকারী আনুকূল্য প্রত্যাহৃত হয়, এমন কি যেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য লাখেরাজ সম্পত্তি বরাদ্দ ছিল তাহাও বাজেয়াফ্‌ত করা হয়। ফলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। এই কারণেই ঢাকা মহানগরীতে আজ আর মুসলিম যুগের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকিয়া নাই। ইংরেজগণ ইহার বিপরীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করে। ইংরেজী ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এই শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলমানগণ প্রথমে এই শিক্ষা বর্জন করিলেও পরে তাহারা ইহা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯শ শতাব্দীতে ঢাকায় এই ধারার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, যেইগুলির কিছু কিছু আজও বিদ্যমান।

এতদসত্ত্বেও ঢাকায় মুসলমানদের নিজস্ব উদ্যোগে ইসলামী শিক্ষা চালু ছিল। ১৮৭৩ খৃ. প্রণীত ঢাকা কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপালের এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, তখন ঢাকা শহরে ৫০টির অধিক মকতব বর্তমান ছিল, যেইখানে প্রায় ৫০০ ছেলে কুরআন শিক্ষা করিত। ১৮৭০-এর দশক পর্যন্ত পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে মুসলমান ছাত্ররা ঢাকায় খ্যাতনামা মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষকদের নিকট আরবী ও ফারসী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভিড় করিত। মুসলমানদের আবেদনক্রমে ইংরেজ সরকার ঢাকায় একটি মাদরাসা স্থাপন করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের প্রধান দৃষ্টি ইংরেজী শিক্ষার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং কালক্রমে মুসলমানরাও সেই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এইভাবেই ঢাকায় দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ঃ একটি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা বা মাদরাসা শিক্ষা, অন্যটি আধুনিক শিক্ষা বা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। বর্তমানেও এই ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। নিম্নে উভয় ধারার বিখ্যাত কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচিতি দেওয়া যাইতেছে।

আলিয়া মাদরাসা ঢাকা ঃ ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আলিয়া মাদরাসাই সর্বপ্রাচীন। তবে ঢাকায় ইহার আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পদিনের। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা ঢাকায় স্থানান্তরিত হইয়া মাদরাসা-ই আলীয়া, ঢাকা নাম ধারণ করে। তখন হইতে ঢাকায় এই মাদরাসাটি মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিনিধি হিসাবে অবস্থান করিতেছে।

প্রথমে ঐতিহ্যবাহী দারসে নিজামিয়া রীতি অনুযায়ী মাদরাসাটির শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। কিন্তু পরে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক ইহার সংস্কার সাধন করা হয়। উহারই এক পর্যায়ে ১৮২৬ খৃ. আলিয়া মাদরাসায় প্রথমবারের মত ইংরেজী শিক্ষা চালু হয়। ফলে মাদরাসাটি দুইটি বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে ঃ একটি আরবী বিভাগ ও অপরটি ইংরেজী বিভাগ। পরবর্তীতে ১৮৫৪ খৃ. এ্যাংলো-পার্সিয়ান ডিপার্টমেন্ট

নামে ইংরেজী শিক্ষার আরও উচ্চতর স্তরের একটি বিভাগ খোলা হয়। পরে এই বিভাগটি একটি সাধারণ হাই স্কুলে পরিণত হয়। ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত আলিয়া মাদরাসা উপরোক্ত দুইটি বিভাগ লইয়া গঠিত ছিল।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগটি কলিকাতায়ই থাকিয়া যায় এবং আরবী বিভাগটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তখন ইহাকে অস্থায়ীভাবে তৎকালীন ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে (বর্তমান কবি নজরুল সরকারী কলেজ) স্থান দেওয়া হয়। বখশী বাজারের একটি পতিত জায়গায় ১৯৫৯ সালের শেষ নাগাদ নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হইলে ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে মাদরাসাটি এইখানে স্থানান্তরিত হয়। তখন হইতে আলিয়া মাদরাসা উহার এই নিজস্ব ভবনেই চালু রহিয়াছে। মাদরাসা ভবনের পার্শ্বেই তিনতলাবিশিষ্ট উহার একটি ছাত্রাবাসও স্থাপিত হইয়াছে। মাদরাসাটির সমগ্র শিক্ষা কারিকুলাম দাখিল, 'আলিম, ফাযিল ও কামিল-এই চারিটি স্তরে বিভক্ত, যাহা আধুনিক শিক্ষার যথাক্রমে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের সমমান সম্পন্ন। ইহার একটি গবেষণা বিভাগও রহিয়াছে, সেইখান হইতে বেশ কিছু গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আলিয়া মাদরাসাসহ সমগ্র দেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বর্তমানে দেশের সকল মাদরাসা উক্ত বোর্ডের আওতাধীন।

ঢাকা মাদরাসা (আধুনিক কবি নজরুল সরকারী কলেজ) ঃ ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ঢাকায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে তখন এইখানে কয়েকটি স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। কিন্তু এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় একচেটিয়াভাবে হিন্দু ছাত্ররাই শিক্ষা গ্রহণ করিত। মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। ১৮৭৩ সালে প্রণীত ঢাকা কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপালের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, উক্ত সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে মোট ৩১৯ জন ছাত্রের মধ্যে ২৯০ জনই ছিল হিন্দু, মাত্র ১৪ জন মুসলমান ও অবশিষ্ট ১৫ জন খৃস্টান ছিল এবং ঢাকা কলেজে মাত্র ১ জন মুসলমান ছাত্র লেখাপড়া করিত। ১৮৪১ সালে উক্ত কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত কোন সময়ই উহাতে তিনজনের অধিক মুসলমান ছাত্র ছিল না। পক্ষান্তরে ঢাকা শহরে তখন ৫০টির অধিক মকতবে প্রায় ৫০০ ছেলে শিক্ষা লাভ করিত এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংখ্যক মুসলমান ছাত্র খ্যাতনামা মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষকদের নিকট আরবী ও ফারসীতে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য এইখানে আগমন করিত। মুসলমানগণ নিজেদের আমল-আকীদার পরিপন্থী ভাবিয়াই ইংরেজী শিক্ষা পরিহার করিয়া চলিত, কিন্তু তাহাদের চাহিদা পূরণের জন্য ঢাকায় কোন উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল না।

এই প্রেক্ষাপটে ১৮৭২ খৃ. ঢাকার নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলিকাতা 'আলিয়া মাদরাসার ন্যায় ঢাকায় সরকারী পর্যায়ে একটি মাদরাসা স্থাপনের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। বাংলা সরকার উক্ত আবেদনে সাড়া দিয়া ঢাকায় একটি নূতন মাদরাসা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে মুহসিন ফান্ড হইতে বার্ষিক ১০,০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। ১৮৭৪ সালের মার্চ মাসে ঢাকা মাদরাসা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ 'উবায়দী ইহার প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। মাদরাসাটিতে অধ্যয়নের জন্য প্রচুর শিক্ষার্থীর ভিড় হয়। প্রথম বৎসরই ৪০০ জন ছাত্র ভর্তির জন্য আবেদন করে। তন্মধ্যে মাত্র ১০৪ জন এবং আরও বৃহত্তর স্থান ভাড়া নেওয়ার পর ১৬৯ জন ছাত্রকে ভর্তি করা সম্ভব হয়। ইহাদের অর্ধেকই ছিল ঢাকার এবং বাকী অর্ধেক পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানের। মাদরাসাটিতে প্রথমে আরবী ও ফারসী শিক্ষাক্রম চালু করা হয়। পরে ১৮৭৫ খৃ. ইহাতে নূতন এ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়, যেইখানে আরবী ও ফারসীর সহিত ইংরেজী ও পাশ্চাত্যের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা করা হয়। কিছু দিনের মধ্যেই নূতন বিভাগটি বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। ১৮৮৩ খৃ. মাদরাসার মোট ৩৩৮ জন ছাত্রের মধ্যে ২০২ জনই ছিল এই বিভাগের। ১৮৮২ খৃ. প্রথমবারের মত এইখান হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনজন ছাত্র উহাতে উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী কালের বহু খ্যাতিমান মুসলিম ব্যক্তিত্বই প্রথম জীবনে এই মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, বিচারপতি জাহিদুর রহিম জাহিদ এবং লেখক এস. এম. তৈফুর এই মাদরাসারই ছাত্র ছিলেন।

১৯১৫ সালে মাদরাসাটিতে 'নিউ স্কীম' নামে সংস্কারকৃত নূতন মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ১৯২৩ সালে ইহার নামকরণ করা হয় ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। তখন ইহাতে ইন্টারমিডিয়েটের দুইটি ও হাই মাদরাসার চারিটি-মোট ছয়টি শ্রেণী ছিল এবং ছাত্রদিগকে প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শিক্ষা বিভাগে অধ্যয়নের উপযোগী করিয়া তোলা হইত। ১৯৫৭ সালের জুলাই হইতে কলেজ অংশে ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি ইন্টারমিডিয়েট সাধারণ কলা বিভাগও খোলা হয় এবং ১৯৬২ সালের জুলাই হইতে মাদরাসা অংশটিতে হাই স্কুলের জন্য নূতন প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম চালু করিয়া ইহাকে একটি পূর্ণাঙ্গ হাই স্কুলে রূপান্তরিত করা হয় এবং ইহার নামকরণ করা হয় ইসলামিয়া হাই স্কুল। তখন হইতে সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই একটি সাধারণ হাই স্কুল ও কলেজে পরিণত হয়। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া কবি নজরুল সরকারী কলেজ নামকরণ করা হয়। বর্তমানে ইহা উক্ত নামেই একটি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু রহিয়াছে।

১৮৭৫ খৃ. মাদরাসায় প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগটি কালের পরিক্রমায় একটি ইংরেজী স্কুলের রূপ নেয়। ১৯১৬ খৃ. ইহাকে মাদরাসা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক একটি হাই স্কুলে রূপান্তরিত করা হয় এবং ইহার নামকরণ করা হয় সরকারী মুসলিম হাই স্কুল, যাহা অদ্যাবধি বর্তমান। প্রথমে পাটুয়াটুলীর ডাকবাংলোতে ইহার জন্য স্থান বরাদ্দ করা হয়। পরে ১৯৪৫ খৃ. ইহার বর্তমান নিজস্ব ভবনে (বাহাদুর শাহ পার্কের পূর্ব পার্শ্বে) স্থানান্তরিত হয়। বহুদিন পর্যন্ত স্কুলটিতে মুসলিম বৈশিষ্ট্য বহাল ছিল। যেমন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলের জন্য মুসলমানী পোশাক ও মাথায় টুপী পরিধান করা এবং স্কুল প্রাঙ্গণে জামাআতের সহিত জুহরের সালাত আদায় করা বাধ্যতামূলক ছিল। ৩য় হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ফিক্হ বাধ্যতামূলক বিষয় হিসাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে ইহা অন্য যে কোন হাই স্কুলের মতই একটি হাই স্কুল হিসাবে পরিচালিত হইতেছে।

ইসলামী শিক্ষা তথা কুরআন, হাদীছ, ফিক্‌হ, তাফসীর-এর শিক্ষার প্রচার-প্রসারে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত দারসে নিজামীর পদ্ধতিতে প্রচলিত মাদ্‌রাসাসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। এই পদ্ধতির সর্বপ্রথম মাদ্‌রাসা স্থাপিত হয় ঢাকার বড় কাটরায় 'হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্‌রাস' নামে। দেওবান্দ-এর সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী খ্যাতনামা 'আলিম মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী' (ছদর সাহেব হুযুর), মাওলানা আবদুল ওহ্‌হাব (পীরজী হুজুর) ও মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুযুর) প্রমুখের উদ্যোগে ১৯৩১/১৩৫১ সালে উক্ত মাদ্‌রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয় চকবাজারের দক্ষিণ দিকে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে মুগল আমলে নির্মিত ভবনে। জিন্‌জিরার ধনিক ব্যবসায়ী হাফেজ মোহাম্মদ হাসানের আর্থিক সহযোগিতায় প্রথমত মাদ্‌রাসাটি চালু হয়। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ মাওলানা আযীযুল হক এই মাদ্‌রাসারই ছাত্র ছিলেন।

১৯৫০/১৩৭০ সালে মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুযুর), মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ খান ও মাওলানা আবদুর রাহমান বেখোদ-এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় এবং মাওলানা জাফার আহমাদ উছমানীর পৃষ্ঠপোষকতায় লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া (লালবাগ)। উক্ত প্রতিষ্ঠানে হাদীছ, তাফ্‌সীর ও ফাতাওয়া এই তিনটি শাখায়ই শিক্ষা দান শুরু হয়। এই মাদ্‌রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অসংখ্য আলিম দেশে-বিদেশে দীনী ইল্‌ম শিক্ষা দান ও উহার প্রচার প্রসারে নিয়োজিত রহিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও মাওলানা মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজ্জী হুযুর) প্রতিষ্ঠিত কামরাঙ্গীরচর মাদ্‌রাসা-ই নূরিয়া, ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসা, যাত্রাবাড়ী মাদ্‌রাসা, মালীবাগ জামেয়াতুল-ওয়াযযান ও চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসা, ইসলামপুর মাদ্‌রাসা, মোহাম্মদপুরের জামেয়া মোহাম্মদিয়া ও জামেয়া রহমানিয়া, বারিধারা মাদ্‌রাসা, মতিঝিলের পীরজঙ্গী মাযার মাদ্‌রাসা প্রভৃতি দারসে নিজামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে।

ঢাকার কয়েকটি ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ ১৯শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঢাকায় ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হয়। ১৮১৭ সালে খৃস্টান মিশনারীরা সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল স্থাপন করে। ১৮২৫ খৃ. তাহারা মেয়েদের জন্যও পৃথক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এই সকল স্কুল বেশি দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। সরকারী পর্যায়ে ঢাকার প্রথম ইংরাজী স্কুল ১৮৩৫ সালের ১৫ জুলাই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পুরাতন ফ্যাক্টরী ভবনে (বাহাদুর শাহ পার্কের পশ্চিম পার্শ্বে, বর্তমানে বিলুপ্ত) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। এই স্কুলটিই পরবর্তী কালে কলেজিয়েট স্কুল নাম ধারণ করে। ১৮৪১ খৃ. স্কুলটিতে একটি কলেজিয়েট শাখা খোলা হয় এবং উহার নামকরণ করা হয় ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ। প্রথমাবস্থায় কলেজটি দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল ঃ সিনিয়র ও জুনিয়র। ১৮৫৭ খৃ. এই দুইটি বিভাগ দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সিনিয়র বিভাগটি কলেজ ও জুনিয়র বিভাগটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয় এবং ইহাদের নাম হয় যথাক্রমে ঢাকা কলেজ ও কলেজিয়েট হাইস্কুল। ১৮৫৭-৫৮ খৃ. কলেজটিতে চার বৎসরের বি. এ. ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। ১৮৬৪ খৃ. ঢাকা কলেজ হইতে প্রথমবারের মত দুইজন ছাত্র বি. এ. পাস করে এবং ১৮৬৭ খৃ. দুইজন অঙ্কে এম. এ. পাস করে। শেষোক্ত বৎসর প্রথমবারের মত একজন মুসলমান ছাত্র বি. এ. পাস করে। ১৮৭৫ খৃ. কলেজটিতে পৃথক বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়। ইহা ছাড়া ইংরাজী, ইতিহাস, অর্থনীতি, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সও চালু করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কলেজটি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের পরেই বাংলার সর্ববৃহৎ প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯২১ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহ শিক্ষক ও ছাত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হইলে কলেজটি একটি ডিগ্রী কলেজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে এবং তখন একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ খৃ. ইহা পুনরায় ডিগ্রী কলেজের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯৫৮ খৃ. ইহাতে বিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণী খোলা হয়। কলেজটি উহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সুদীর্ঘ সময়ে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে ১৯৫৫ খৃ. ধানমণ্ডির নূতন সুপ্রশস্ত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। কলেজ ভবন ছাড়াও এইখানে দুইটি ছাত্রাবাস রহিয়াছে। এই ঐতিহ্যবাহী কলেজটি বর্তমানে ঢাকার সর্ববৃহৎ প্রথম শ্রেণীর কলেজ হিসাবে পরিগণিত।

ঢাকার দ্বিতীয় ইংরেজী স্কুল বেসরকারী উদ্যোগে ১৮৪৬ সালের ১২ জুন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহার নাম ছিল ইউনিয়ন স্কুল। কিন্তু দুই বৎসর পর অর্থাভাবে স্কুলটি বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে এন. পি. পগজ (N. P. Pogos) নামক জনৈক আর্মেনীয় জমিদার ইহার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহারই নাম অনুসারে স্কুলটির নাম হয় পগজ স্কুল, যাহা আজও অপরিবর্তিত রহিয়াছে। প্রথমদিকে স্কুলটি এন. পি. পগজের আর্মানীটোলাস্থ নিজস্ব বাসভবনে অবস্থিত ছিল। পরে পগজ ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করিলে ১৮৭৮ খৃ. উহা সদরঘাটের বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৮৪ খৃ. বালিয়াতির জমিদার কিশোরী লাল চৌধুরী ঢাকায় দ্বিতীয় ও বেসরকারী পর্যায়ে সর্বপ্রথম কলেজ হিসাবে জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজটি প্রথম মালিকানা ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে ইহা একটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের নিকট হস্তান্তরিত হয়। অতঃপর ১৯৬৮ সালে সরকার উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। তখন হইতে ইহা একটি সরকারী কলেজ হিসাবে চালু রহিয়াছে। ১৯১৭ খৃ. কলেজটি ইংরেজী ও সংস্কৃতিতে বি. এ. (সম্মান) এবং ফারসী, বাংলা, উর্দু দর্শন, অঙ্ক, ইতিহাস ও অর্থনীতিতে বি. এ. (পাস) কোর্সের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। ১৯২১ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা কলেজের ন্যায় জগন্নাথ কলেজও একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অবনমিত হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ইহা পুনরায় ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়। বর্তমানে কলেজটিতে কয়েকটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর কোর্সসহ দিবা ও নৈশ দুই শিফ্‌ট চালু রহিয়াছে। বর্তমানে ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে।

১৮৫৬ খৃ. ঢাকায় সর্বপ্রথম মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসর বাংলাবাজার ও লালবাগে দুইটি বেসরকারী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়

স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খৃ. স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে প্রথম মহিলা বিদ্যালয় (Female Adult School) প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানে প্রধানত বিবাহিত মহিলাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ স্বামীদের ইচ্ছানুযায়ী লেখাপড়া করিতেন। এই স্কুলটিই ১৮৭৮ খৃ. সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হইলে ঢাকার প্রথম সরকারী গার্লস স্কুলরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঢাকায় নারী শিক্ষা বিস্তারে তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্যার এ্যশলী ইডেন (Sir Ashley Eden)-এর গভীর আগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ উক্ত স্কুলটির নামকরণ করা হয় সরকারী ইডেন গার্লস স্কুলরূপে। ১৯২৬-২৭ খৃ. এই স্কুলটিকেই একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করা হয়। এইখানে প্রধানত কলা বিষয়সমূহ পড়ান হইত। ১৯৩৬-৩৭ খৃ. পর্যন্ত কলেজটি একটি পুরাতন ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থিত ছিল। ১৯৪৫ খৃ. ইডেন গার্লস কলেজ ইডেন বিল্ডিংস (বর্তমানে বাংলাদেশ সচিবালয়ের অন্তর্ভুক্ত)-এ স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত সেইখানেই অবস্থিত ছিল। ১৯৪৮ খৃ. ইহা ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইডেন বিল্ডিংস-এ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সচিবালয় স্থাপিত হয় এবং কিছুদিনের জন্য কলেজের ক্লাসসমূহ কামরুন্নেছা হাইস্কুল ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর কলেজটি বখশী বাজারে (বর্তমান বদরুন্নেছা কলেজ ভবনে) স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬০-এর দশকে কলেজটি আজিমপুরের বর্তমান স্থানে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এইখানে সুপ্রশস্ত কলেজ ভবন ছাড়াও তিন তলাবিশিষ্ট আধুনিক ছাত্রীবাসও রহিয়াছে। বখশী বাজারের পুরাতন ভবনে কিছু দিনের জন্য ইডেন গার্লস কলেজের ইন্টারমিডিয়েট শাখা চালু ছিল। পরবর্তীকালে কলেজটির নাম পরিবর্তন করিয়া বদরুন্নেছা সরকারী কলেজ নামকরণ করা হয়। ইডেন গার্লস কলেজে ১৯৬২ খৃ. হইতেই কয়েকটি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণী খোলা হয়। বর্তমানে এইখানে প্রধান প্রধান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু রহিয়াছে।

সমগ্র ১৯শ শতাব্দীব্যাপী ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। ১৮৮৫ খৃ. নাগাদ শিক্ষা ক্ষেত্রে ঢাকা নগরী সমগ্র বাংলাদেশে একমাত্র কলিকাতার পরেই দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয়। এই সময় অন্যূন ৫,০০০ ছাত্র ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত ছিল। ২০শ শতাব্দীতে ঢাকা এক বিশ্ববিদ্যালয় শহরে পরিণত হয়। ঢাকা মহানগরীর এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯০৫ খৃ. নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ১৯১২ খৃ. বাতিল ঘোষণার পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের শান্ত করার জন্য বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ৩১ জানুয়ারী, ১৯১২ সালে ঢাকা আগমন করেন। ঐ দিনেই তিনি মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সমাবেশে ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার শীঘ্রই ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সচিবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিবে। ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯১২ সালে প্রকাশিত এক সরকারী ইশতিহারে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত সরকারের সুপারিশের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষিত হয়। একই বৎসর মে মাসে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৩ সদস্যবিশিষ্ট নাথান কমিশন গঠন করা হয়। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর কমিশন ঢাকায় একটি রাষ্ট্রীয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে।

মুসলমানগণ সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। কিন্তু হিন্দুগণ যেইরূপ ইতিপূর্বে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করিয়াছিল, তদ্রূপ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও বিরোধিতা শুরু করে। তাহারা তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষুণ্ন করার মত কোন কিছুই বরদাশত করিতে রাজি ছিল না। এমন কি ঢাকা শহরের হিন্দু অধিবাসিগণও ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধী ভূমিকা পালন করে। এক পর্যায়ে (১৯১৭ খৃ.) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করা হয় "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠন ও ব্যবস্থাপনা" সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য। অবশেষে দীর্ঘ বিতর্কের পর ১৯২০ খৃ. ভারতীয় আইন সভায় "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন" গৃহীত হয়। ইহার ফলে ঢাকায় একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আইনগত ভিত্তি রচিত হয়। একই সালের ১ ডিসেম্বর পি. ডে. হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন।

অতঃপর ১৯২১ খৃ. ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। রমনা এলাকার ৬০০ একর জমি এবং উহাতে অবস্থিত তৎকালীন পরিত্যক্ত সচিবালয় (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ), ঢাকা কলেজের ভবনসমূহ (কার্জন হল ও পার্শ্ববর্তী ভবন), গভর্নমেন্ট হাউস (পুরাতন হাইকোর্ট ভবন) ও প্রায় ১০০ মনোরম বাংলো লইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা গড়িয়া উঠে। প্রতিষ্ঠাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট তিনটি অনুষদে ১২টি বিভাগ এবং ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৭৭ জন ছাত্র ছিল। অনুষদগুলি ছিল ঃ কলা, বিজ্ঞান ও আইন। কলা অনুষদে ৮টি বিভাগ ঃ সংস্কৃত ও বাংলা, ইংরেজী, শিক্ষা, ইতিহাস, আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ, ফারসী ও উর্দু, দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতি; বিজ্ঞান অনুষদে ৩টি বিভাগঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও গণিত এবং আইন অনুষদে একমাত্র আইন বিভাগ ছিল। ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত সময়কালে আরও দুইটি অনুষদ খোলা হয়। কৃষি অনুষদ ও চিকিৎসা অনুষদ। পূর্বের বিভাগগুলি ভাঙ্গিয়া আরও নূতন ৮টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয় ঃ রাণিজ্য, ফরাসী ভাষা, জার্মান ভাষা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, বাংলা, রাষ্ট্রনীতি ও জীববিজ্ঞান। এই সময় ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণের বেশি হয়। একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা হল (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল, ১৯২১ খৃ.), জগন্নাথ হল (১৯২১ খৃ.), সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (১৯৩১ খৃ.) ও ফজলুল হক মুসলিম হল (১৯৪০ খৃ.)।

১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীরূপে ঢাকা মহানগরী নূতন মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় প্রদেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফলে একদিকে দেশের মাস্টার্স ডিগ্রী ও উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষা দানের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তায়। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত ডিগ্রী ও সমমানের ৫৫টি কলেজের তদারকীর ভারও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হয়।

১৯৪৭-৭১ সময়কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৫টি নূতন অনুষদ খোলা হয়। এইগুলি হইল ঃ প্রকৌশল অনুষদ (১৯৪৭-৪৮ খৃ.), শিক্ষা অনুষদ (১৯৬০-৬১ খৃ.), চারুকলা অনুষদ (১৯৬৩-৬৪ খৃ.), সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ (১৯৬৯-৭০ খৃ.) ও বাণিজ্য অনুষদ (১৯৭০-৭১ খৃ.)। এই সময় ১৬টি নূতন বিভাগও স্থাপিত হয়। বিভাগগুলি হইল ঃ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রাণরসায়ন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, বিদেশী ভাষা, ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ফার্মেসী।

১৯৬০-এর দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সর্বপ্রথম ১৯৬০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয় শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট। তারপর একে একে প্রতিষ্ঠিত হয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউট এবং পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইন্সটিটিউট। এই ইন্সটিটিউটগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে নূতন উপাদানরূপে সংযোজিত হইয়াছে। এই দশকের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নির্মিত হয় নূতন কলাভবন, সায়ন্স এনেক্স, প্রশাসনিক ভবন এবং ৫টি নূতন আবাসিক হল। ১৯৫২ খৃ. ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ খৃ. স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক গৌরবময় ভূমিকা পালন করে।

১৯৭১ খৃস্টাব্দের পর স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে (ডিসেম্বর ১৯৯১) ১০টি অনুষদ, ৩৭টি বিভাগ, ৭টি ইন্সটিটিউট, ১৪টি আবাসিক হল, ৯টি উচ্চতর গবেষণাকেন্দ্র, ১টি আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, ২৩টি উপাদানকল্প কলেজ ও ২১৪টি অধিভুক্ত কলেজ লইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বৃহৎ পরিবার (ইতিমধ্যে আরও নূতন কয়েকটি বিভাগ খোলা হইয়াছে)। ইহার গ্রন্থাগারে রহিয়াছে ৫ লক্ষাধিক পুস্তক এবং ক্যাম্পাসের মোট আয়তন ২৫৬ একর (আরও দ্র. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯৬০-এর দশকে ঢাকার উপকণ্ঠে ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তদনুসারে ১৯৬৪ সালের ২৮ আগস্ট তৎকালীন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আয়্যুব খান, ফিল্ড মার্শাল (দ্র.) ঢাকা হইতে ২৫ মাইল উত্তরে জয়দেবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং নামকরণ করেন জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু কিছুদিন পর ঢাকা হইতে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সাভারে ইহার স্থান পরিবর্তন করা হয় এবং সেইখানেই নূতন ভবন নির্মাণের পর বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হইতে তৎকালীন সরকার মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়া ইহার পুনঃ নামকরণ করে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে ইহা একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠিত।

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ঢাকা মহানগরীর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০-এর দশকের অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৮৭৬ খৃ. ঢাকা কলেজের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটি সার্ভে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০২ সালে ইহাকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে উন্নীত করা হয়। এইজন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বাবদ সরকারী অনুদান ৬০,০০০ টাকা এবং ঢাকার নওয়াব খাজা আহসানুল্লাহ্‌র নিকট হইতে দানস্বরূপ ১,১২,০০০ টাকা পাওয়া যায়। এই দানের স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তী কালে স্কুলটির নামকরণ করা হয় আহসানুল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং। স্কুলটিতে চার বৎসরের ওভারসিয়ার কোর্স প্রবর্তন করা হয়। এইখান হইতে ছাত্ররা পশ্চিমবঙ্গের শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিত এবং উত্তীর্ণ হইলে ওভারসিয়ার সার্টিফিকেট লাভ করিত। ১৯০১-২ সালে স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪০; ১৯০৮-৯ সালে এই সংখ্যা ৬৭৩-এ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৬ খৃ. পর্যন্ত এই স্কুল হইতে ওভারসিয়ার ও মেকানিক্যাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র প্রেরিত হইত, কিন্তু ১৯১৬ সালের ১ এপ্রিল এই শাখা দুইটি বিলুপ্ত করা হয়।

১৯২২ খৃ. সমাপ্ত পঞ্চবর্ষ মেয়াদে স্কুলটিকে একটি কলেজে উন্নীত করা হয় এবং ইহার পুনঃ নামকরণ করা হয় আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একই ক্লাস দুইবার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ঢাকা কলেজের সহিত ইহার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় এবং এইখানকার জন্য পৃথক প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯২১-২২ খৃ. ছাত্রসংখ্যা ৩৭৫ জনে দাঁড়ায়। ১৯২৬-২৭ খৃ. হইতে গণপূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য বিভাগ, পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে এবং অন্যান্য প্রকৌশল সংস্থা তাহাদের কর্মচারিগণকে বাস্তব প্রশিক্ষণের জন্য এই কলেজে প্রেরণ করিতে থাকে। ঢাকার নওয়াব ১৯২৮-২৯ খৃ. হইতে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রের জন্য বার্ষিক ৩০০ টাকার একটি বৃত্তি প্রবর্তন করেন।

১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলেজটিতে সিভিল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কেমিক্যাল, টেক্সটাইল ও এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তিত হয়। ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৫২-৫৩ খৃ. কলেজটির মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৬৬ জন।

১৯৬০-৬১ খৃ. কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয় এবং ইহার পুনঃ নামকরণ করা হয় পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ইহার পরিবর্তিত নাম হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইবার পর এইখানে স্থাপত্যবিদ্যাসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ইহা দেশের প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষার সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। ঢাকার বাহিরে, কিন্তু ঢাকা বিভাগের মধ্যে, ময়মনসিংহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয়-বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এই লইয়া ঢাকা নগরীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট দুইটি, ঢাকা জিলায় তিনটি এবং ঢাকা বিভাগে চারটি (বর্তমানে অনেক)।

নিম্নে ১৯৮৯-৯০ খৃ. ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং উহাতে অধ্যাপনা ও অধ্যয়নরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা সম্পর্কিত কয়েকটি ছক সন্নিবেশ করা হইল। ইহা হইতে শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা মহানগরীর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যাইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী ঢাকা মহানগরীর (সিটি করপোরেশন এলাকার) শিক্ষিতের হার শতকরা ৪৯.৩১। ঢাকা জিলা ও ঢাকা বিভাগে এই হার যথাক্রমে ৪৩.৩৫ ও ২৭.৮৩। পক্ষান্তরে সমগ্র দেশে মাত্র ২৪.৮২ জন শিক্ষিত লোকের বাস। ঢাকা জিলা ও ঢাকা বিভাগের শিক্ষিতের হার দেশের অন্যান্য জিলা ও বিভাগের তুলনায় সর্বোচ্চ এবং ঢাকা মহানগরী সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষিত অধিবাসীর শহরগুলির অন্যতম।

ছক ১

ঢাকা মহানগরীর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৮৯ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট সংখ্যা	সরকারী	বেসরকারী	শিক্ষক	শিক্ষার্থী
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৭	৩২৬	৬১	৩,০৪৫	২,১৭,১১৬
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৩৪	২৩	২১১	৬,০৭১	১,৯২,২০৭
কলেজ	৪৯	১১	৩৮	১,৯১৯	১,০৩,১৩৯

ছক ২

ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শ্রেণীর মাদরাসার সংখ্যা (১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী)

দাখিল	'আলিম	ফাযিল	কামিল	মোট সংখ্যা
২৭	১	৯	৩	৪০

ছক ৩

ঢাকা মহানগরীর কারিগরী, চিকিৎসা, কৃষি ও অন্যান্য পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোট সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৬	৩৪৬	৪,০৯০
বিভিন্ন শ্রেণীর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২২	৬৮৭	৪,২৪৫
আইন কলেজ	৫	৪৪	২,৫৯৪
কৃষি কলেজ ও কৃষি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	২	৮০	৫০০

ছক ৪

ঢাকা মহানগরীর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৯-৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী)

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	শিক্ষক সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১,০৮১	১৬,৮৪৯
বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়	৩৫১	৪,৬৭১
	মোট ১,৪৩২	২১,৫২০

ছকসমূহে বর্ণিত সকল তথ্য Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics কর্তৃক প্রণীত Bangladesh Educational Statistics, 1990, ঢাকা জানুয়ারী ১৯৯১ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিরযা নাথান, বাহারিস্তান-ই গায়বী, ইংরেজী অনু. M.I. Borah, গৌহাটি ১৯৩৬ খৃ. ; (২) C.D. Oyly, Antiquities of Dacca, লণ্ডন ১৮২৪-১৮৩০ খৃ.; (৩) James Taylor, Topography and Statistics of Dacca, কলিকাতা ১৮৪০ খৃ.; (৪) Syed Aulad Hasan, Notes on the Antiquities of Dacca, ঢাকা ১৯০৪ খৃ.; (৫) F.B. Bradly Birt, The Romance of an Eastern Capital, লণ্ডন ১৯০৬ খৃ.; (৬) রাহমান আলী তায়শ তাওয়ারীখে ঢাকা (উর্দূ), ১৯১০ খৃ:; (৭) Ahmad Hasan Dani, Dacca-a Record of its Changing Fortunes, ২য় সং., ঢাকা ১৯৬২ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, Muslim Architecture in Bengal, ঢাকা ১৯৬১ খৃ:; (৯) Syed Muhammad Taifoor, Glimpses of old Dhaka, ঢাকা তা. বি.; (১০) Abdul Karim, Dacca the Muhgal Capital, ঢাকা ১৯৬৪ খৃ.; (১১) Dr. Syed Mahmudul Hasan, Dacca, the City of Mosques, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.; (১২) দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়া (উর্দূ), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, লাহোর ১৯৭৩ খৃ., ১০খ, ঢাকা শীর্ষক প্রবন্ধ; (১৩) Jadunath Sarkar, The History of Bengal, vol. ii, ঢাকা ১৯৪৮ খৃ.; (১৪) Sharif Uddin Ahmed, Dacca a Study in Urban History and Development, London/Riverdale ১৯৮৬ খৃ.; (১৫) S. & G. A. Department, Government of East Pakistan, East Pakistan District Gazetteers, Dacca, Ed., S. N. H. Rizvi, ঢাকা ১৯৬৯ খৃ.; (১৬) Muhammad Abdur Rahim, The History of the University of Dacca, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.; (১৭) এম. রুহুল আমিন, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৯ খৃ.; (১৮) ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা ১৯৩৫ খৃ, পৃ. ১৪৩-৪৪; (১৯) গোলাম সাকলায়েন, পূর্ব পাকিস্তানের সূফীসাধক, ঢাকা ১৩৬৮ বাংলা, পৃ. ৪৬-৪৯; (২০) বাংলা একাডেমি পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা ১৩৬৮ বাং, ৬৫-৮৪; (২১) আবদুস সাত্তার, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস (উর্দূ), বাংলা অনু., মোস্তফা হারুন, দিনাজপুর-ঢাকা ১৯৮০ খৃ.; (২২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, প্রাথমিক রিপোর্ট, আদমশুমারি ১৯৯১, ঢাকা ১৯৯১ খৃ; (২৩) অধ্যাপক কে. আলী, বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৮৬ খৃ.; (২৪) Department of Architecture and Public Works Department, Government of the People's Republic of Bangladesh, The National Assembly Building, Dhaka-Venue of the 14th Islamic Conference of Foreign Ministers; (২৫) Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics, Government of the People's Republic of Bangladesh, Bangladesh Educational Statistics, 1990, Dhaka January 1991, ৫০-৫৮; (২৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ১৯৮৯, ঢাকা ১৯৮৯।

মু. আবদুল মান্নান

ঢাকার সংবাদপত্র ঃ ঢাকা বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রকাশের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। এক হিসাবমতে সমগ্র দেশের প্রায় ৬৮% সংবাদপত্র ঢাকা হইতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এইখানকার সংবাদপত্রের ইতিহাস তত সুপ্রাচীন নহে। ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এইখানে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয় এবং উহার পরই সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা ঘটে। ঢাকার সর্বপ্রথম সংবাদপত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক 'The Dacca News' ১৮৫৬ খৃ. এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদনায় ছিলেন ঢাকার জনৈক স্কটল্যাণ্ডীয় ব্যবসায়ী Alexander Forbes। ইনিই ঢাকার সাংবাদিকতার জনকরূপে আখ্যায়িত। ১৮৬০ খৃ. হরিশ চন্দ্র মিত্র প্রথম বাংলা প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার পরই প্রকাশিত হয় ঢাকার সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র সাপ্তাহিক "ঢাকা প্রকাশ"। "হিন্দু হিতৈষিণী" সেই যুগের অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র। সমগ্র বৃটিশ যুগ এইভাবে বিভিন্ন সাময়িকী প্রকাশের মাধ্যমে অতিক্রান্ত হয়।

১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকার সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। ১৯৪৮ খৃ. কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক "আজাদ" ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ইহাই ঢাকার সর্বপ্রাচীন দৈনিক পত্রিকা। ইতিপূর্বে ১৯৩৬ খৃ. ৩১ অক্টোবর মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (দ্র.) কর্তৃক কলিকাতায় 'আজাদ' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তৎকালে এই পত্রিকা বাঙালী মুসলমানদের আযাদী সংগ্রামে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। বস্তুতপক্ষে 'আজাদ-ই হইল মুসলিম বাংলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র এবং মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন মুসলিম সাংবাদিকতার অগ্রদূত। ইহার পর একে একে দৈনিক 'ইত্তেফাক', 'The Pakistan Observer', 'সংবাদ', ' দৈনিক পাকিস্তান' ইত্যাদি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ খৃ. বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ' দৈনিক পাকিস্তান ও 'The Pakistan Observer' যথাক্রমে ' দৈনিক বাংলা ও 'The Bangladesh Observer' নাম ধারণ করে। আবুল কালাম শামসুদ্দীন (সম্পাদক, আজাদ), তফাজ্জল হোসেন মানিক মিঞা (সম্পাদক, ইত্তেফাক) এবং আবদুস সালাম (সম্পাদক, 'The Pakistan Observer') এই যুগের প্রথিতযশা সাংবাদিক।

১৯৭১ খৃ. ঢাকা জাতীয় রাজধানীতে পরিণত হইলে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। অনেকগুলি সংবাদপত্র এই সময় প্রকাশিত হয়। কিন্তু মাত্র চার বৎসর পর ১৯৭৫ খৃ. সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় সংযোজিত হয়। ঐ বৎসরের ১৭ জুন অধ্যাদেশবলে ঢাকার দুইটি দৈনিক পত্রিকা ("The Bangladesh Observer" ও " দৈনিক বাংলা") এবং কয়েকটি সাময়িকী ব্যতীত সকল সংবাপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে অবশ্য আরও দুইটি দৈনিক পত্রিকা সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে প্রায় এক বৎসর যাবত উপরোক্ত চারটি দৈনিক পত্রিকা সরকারী ব্যবস্থাপনায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা ছাড়া কয়েকটি সাপ্তাহিক ও মাসিক ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকাও বর্তমান ছিল। ১৯৭৬ খৃ. উক্ত অধ্যাদেশ বাতিলের ফলে এই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পূর্বেকার বাতিলকৃত অনেক পত্রপত্রিকাই আবার প্রকাশিত হইতে শুরু করে। ইহার সহিত অনেক নূতন পত্রপত্রিকাও যুক্ত হয়। ১৯৯১ খৃ. হইতে ঢাকার সংবাদপত্রের ইতিহাসে আরেক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। সরকারের উদার নীতির ফলে এই সময় অনেক নূতন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হইয়া ঢাকার সংবাদপত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

সরকারী হিসাবমতে ১২ নভেম্বর, ১৯৯১ পর্যন্ত ঢাকা হইতে নিম্নোক্ত সংখ্যক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় ঃ দৈনিক ৫৪টি, সাপ্তাহিক ২৫৩টি, পাক্ষিক ৭৯টি, মাসিক ১৮৬টি, দ্বিমাসিক ৩টি, ত্রৈমাসিক ৪১টি, ষান্মাসিক ৩টি ও বাৎসরিক ৬টি। উপরোক্ত হিসাবমতে ঢাকা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সর্বমোট সংখ্যা ৬২৫টি। সমগ্র

বাংলাদেশে সর্বমোট ৯২০টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। উহাদের প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগই প্রকাশিত হয় ঢাকা হইতে।

ঢাকায় বর্তমানে বাংলা ও ইংরেজী–এই দুইটি ভাষাতেই সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ খৃ. পর্যন্ত কিছু কিছু উর্দূ সংবাদপত্রও প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে (ফেব্রু. ১৯৯২) ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রধান প্রধান কয়েকটি সংবাদপত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাংলা দৈনিক ঃ ইত্তেফাক, ইনকিলাব, আজাদ, সংবাদ, দৈনিক দেশ, দৈনিক বাংলা, সংগ্রাম, মিল্লাত, বাংলার বাণী, খবর ইত্যাদি।

ইংরেজী দৈনিক ঃ The Bangladesh Observer, The Bangladesh Times, The New Nation, The Morning Sun, The Telegraph The Independent, The New Age, Bangladesh Today ইত্যাদি। ১২ জানুয়ারী, ১৯৯২ খৃ. The Telegraph-এর প্রকাশনা শুরু হয়। সাপ্তাহিক ও অন্যান্য সাময়িকী; বিচিত্রা, পূর্ণিমা, ঝাণ্ডা, সোনার বাংলা, চিত্রালী, পূর্বাণী, বেগম, Holiday, মেঘনা, মদীনা ইত্যাদি।

বিভিন্ন সংবাদপত্র ব্যতীত ঢাকায় বর্তমানে কয়েকটি সংবাদ সংস্থাও স্থাপিত হইয়াছে। এইগুলি হইল ঃ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস); Eastern News Agency (ENA) ও United News of Bangladesh (UNB)। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার কার্যালয়ও এখানে রহিয়াছে।

মু. আবদুল মান্নান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ এই উপমহাদেশের সর্বপ্রথম শিক্ষাপ্রদ (Teaching) ও আবাসিক (Residential) বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। খৃ. ১৯২১ সনে ইহার যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯০-৯১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০তম বার্ষিক বিবরণীতে ছাত্রসংখ্যা দেখা যায় ২৪,২৭৯ (তন্মধ্যে ছাত্রী ৫,৯৪০) এবং শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১১৫৮।

মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কোন বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং ইহা মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করে কেবল এই দুইটি প্রসঙ্গই এই নিবন্ধে আলোচিত হইল (অন্যান্য তথ্যের জন্য দ্র. ড. এম. এ. রহীম রচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশনা The History of the University of Dacca. ১৯৮১ খৃ, এই গ্রন্থের শেষভাগে মৌলিক উৎসসমূহের একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; আরও দ্র. বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধ)।

অবিভক্ত ভারতের ইংরেজ শাসকদের অঘোষিত নীতি ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের সহায়তা করা এবং মুসলিম শক্তি ধ্বংস করা। কারণ রাজ্যহারা মুসলিমগণ বিদ্রোহ করিতে পারে, অন্যপক্ষে হিন্দুরা ইংরেজগণকে স্বাগত জানাইয়াছিল (দ্র. বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ মঠ, শেষ পর্ব) এবং এক শ্রেণীর হিন্দু তাহাদিগকে আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিল। সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law), চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত Permanent Settlement) ইত্যাদি আইন প্রণয়ন এবং বাজেয়াফতী নীতি (Resumption Policy) প্রবর্তনের ফলে মুসলিমদের জমিদারী, ওয়াক্‌ফ ও লাখেরাজ সম্পত্তি ক্রমে হিন্দুদের নিকট হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দু মহাজনদের ঋণের দায়ে মুসলিম খাতকগণ সম্পত্তি হারায়। নিঃস্ব মুসলিমগণ তখন আক্ষরিক অর্থে কাঠুরিয়া ও ভিস্তির (Hewers of wood and drawers of water) জাতে পরিণত হয় (দ্র. W. W. Hunter, The Indian Musalmans, পুনর্মুদ্রণ, Comrade Publishers, Dacca 1945. চতুর্থ অধ্যায়, বংগানুবাদ আবদুল মওদুদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ.)। মুসলিম জমিদার তখন বিরল ব্যতিক্রম প্রায়, অন্যপক্ষে দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগুরু।

ইংরেজ শাসকের প্রবর্তিত নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানত মুসলিমগণের পশ্চাতপদতার জন্য দায়ী। ইংরেজদের ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) পলিসী অনুযায়ী এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম শিক্ষার স্থান রহিল না। ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে ধরা হইল আফিস-আদালতের ভাষা; প্রাথমিক স্তর হইতে ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইল। খৃস্ট ধর্ম প্রচারের জন্য মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল শহর ও গ্রামাঞ্চলে। মিশনগুলির পরিচালন দায়িত্বে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইল। অনেকগুলি ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক। বিনামূল্যে বাইবেল বিতরণ শুরু হইল ব্যাপকভাবে। খৃস্টান মিশনারীরা শ্রীরামপুরের মুদ্রণাগার হইতে খৃস্ট ধর্ম সংক্রান্ত প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করে। এক সময়ে ডিগ্রী পর্যায়ে বাইবেলের কিয়দংশ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, ইত্যাদি।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হইল এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা বা অন্তত য়ুরোপীয় মনোভাবাপন্ন করা। এই ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক যুবক প্রকাশ্যে মদ্য পান, নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে স্ব স্ব ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধা কিম্বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিল।

মুসলিমগণের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ এই আল্লাহবর্জিত (Godless) শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন করিল। 'আলিমগণ ফাত্‌ওয়া দিলেন, ইংরেজী শিক্ষা হারাম। প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালনে বাধ্য; সুতরাং ধর্মশিক্ষা তাহাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ ইসলামে পৌরোহিত ব্যবস্থা নাই। কিন্তু হিন্দুদের ব্যাপার আলাদা। প্রথমদিকে ধর্মনাশের আশঙ্কা করিলেও ক্রমে তাহারা নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করিল। প্রধান কারণ হইল ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকুরী এবং অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ। সর্বক্ষেত্রে তখন যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল ইংরেজী জ্ঞানের পরিধি। কালক্রমে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুগণ সরকারী। বে-সরকারী এমন কি পেশাজীবী, যথা ওকালতী, ডাক্তারী, ইন্‌জিনিয়ারিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইল। পূর্বে ফারসী শিক্ষিত মুসলিমগণ যে সকল চাকুরী লাভ এবং সুবিধা ভোগ করিতেন এখন তাহা অমুসলিম, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অধিকারে চলিয়া গেল।

শিক্ষা বিভাগের উপর হিন্দুদের কর্তৃত্ব লাভ বাংলার মুসলিমদের ধর্ম-সংস্কৃতির উপর মারাত্মক আঘাত হানিল। ইংরেজ সরকারের ছত্রছায়ায় হিন্দু পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষার আমূল পরিবর্তন সাধন করিলেন। 'আরবী-ফারসী শব্দ সম্ভারের পরিবর্তে তাঁহারা সংস্কৃত শব্দাবলী, ভাষারীতি ও সংস্কৃত ব্যাকরণ আমদানী করিলেন। স্বাভাবিকভাবে বাংলা সাহিত্যে এবং পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু ভাবধারা প্রতিফলিত হইল, মুসলিম ঐতিহ্য, ইতিহাস ইত্যাদি প্রায় বিদূরিত হইল। একটি মাত্র উদাহরণ যথেষ্ট বিবেচিত হইতে পারে ঃ রামসুন্দর বসাক (জনশ্রুতিতে ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর) কৃত "বাল্যশিক্ষা" বংগদেশের সর্বত্র প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে চালু হইল। ইহাতে ছিল অতি সহজ অথচ অত্যন্ত চমৎকার দুইটি কবিতা; একটিতে ছিল রামায়ণের আলেখ্য এবং অপরটিতে মহাভারতের উপাখ্যান। এই পুস্তকে মুসলিম ঐতিহ্যের কিছুই ছিল না। পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশনা, অনুমোদন ক্ষেত্রে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগুরু, স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে তাহারাই ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং বংগদেশের শিক্ষাংগণের পরিবেশ মুসলিম স্বার্থের প্রতিকূল হইয়া পড়িল।

এক শ্রেণীর হিন্দু লেখক তাহাদের সাহিত্যকর্মে মুসলিমদের চরিত্র হননে মনোনিবেশ করিল। উদাহরণস্বরূপ একটি মাত্র পুস্তক, বঙ্কিম চন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র নাম উল্লেখ করা যায়। ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে কলংক লেপনেও এক শ্রেণীর লেখক কুণ্ঠাবোধ করিল না, উদাহরণ "রঙ্গীলা রসূল" নামক একখানি পুস্তক।

মুসলিমগণ ভিন্ন গোত্রের এক অস্পৃশ্য জাতে পরিণত হইল। বংগের কোন কোন হিন্দু জোতদার-জমিদারদের বাড়ী বা কাছারীতে গেলে তাহাদিগকে মাটিতে বসিতে হইত, পৃথক হুঁকায় তামাক খাইতে দেওয়া হইত, কোন কোন হিন্দু কবিরাজ হাতে হাতে না দিয়া ঔষধের পুরিয়া মুসলিম রোগীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিত ইত্যাদি। হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত বহু স্কুলে মুসলিম শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। মুসলিমদের অপমানের চূড়ান্ত হইল যখন ইংরেজ শাসকগণ আদালতের পিয়ন-চারপরাশিকে টিপু সুলতান (দ্র.)-এর পোশাকে সজ্জিত করিল। তখনকার অশিক্ষিত ও ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিমদের মনে সাধারণত এই বিশ্বাস জন্মিল যে, হিন্দু ও ইংরেজই সুসভ্য অনুকরণীয় জাত, সভ্যতা-ইতিহাস বলিতে গর্ব করিবার মত মুসলিমদের কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে তখনকার মুসলিমগণ হিন্দু ও ইংরেজদের অনুসরণ, অনেক ক্ষেত্রে অন্ধ অনুকরণে গর্ববোধ করিতে লাগিল।

মুসলিম দলনেরও অন্ত ছিল না। বাংলার অধিকাংশ হিন্দু জমিদারদের মুসলিম প্রজাপুঞ্জ পূজাপার্বনে, জমিদারের পুত্র-কন্যার বিবাহে ভেট দিতে, জমিদারের জমিতে তলবমাত্র বেগার খাটিতে বাধ্য ছিল। তদুপরি ছিল হিন্দু গোমস্তাদের অত্যাচার, অফিস-আদালতে হিন্দু আমলাদের উৎপীড়ন, হিন্দু মহাজনদের শোষণ। গো-হত্যার দায়ে শাস্তিভোগ জুটিল তাহাদের ভাগ্যে। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মত জুটিল নীলকরদের অত্যাচার; এইভাবে বর্ণনাতীত দুর্ভোগের শিকার হইল বংগের মুসলিম জনগণ।

ইংরেজী শিক্ষা বর্জনের বিষময় ফল ছিল এই হিন্দু কর্তৃত্ব। স্বল্প সংখ্যক মুসলিম ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহ্যবাহী ইসলামভিত্তিক মাদ্‌রাসায় পড়াশোনা অব্যাহত রাখিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে মাদ্‌রাসাগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। Warren Hasting কর্তৃক স্থাপিত কলিকাতার মাদ্‌রাসা ঃ 'আলিয়া ও হাজী মুহাম্মাদ মুহসিন-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তির আয় (মুহসিন ফাণ্ডের অর্থ) দ্বারা পরিচালিত "মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা" নামে পরিচিত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত কয়েকটি মাদ্‌রাসা ব্যতীত অন্য মাদ্‌রাসাগুলির অবস্থা খুবই শোচনীয় হইয়া পড়িল। পূর্ব বর্ণিত Resumption Policy অর্থাৎ বাজেয়াপ্তি বা পুনর্দখল নীতির কল্যাণে অপর মাদ্‌রাসাগুলি (মসজিদ, এতিমখানা ইত্যাদিসহ) ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি এবং মুসলিম শাসকদের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি হারাইয়া দৈন্য দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে শিক্ষার মানেও অবনতি ঘটিল, অনেক মাদ্‌রাসা বন্ধ হইয়া গেল। মুসলিম জনগণের ঐকান্তিকতার দরুন জরাজীর্ণভাবে টিকিয়া থাকিলেও চাঁদাভিত্তিক মাদ্‌রাসাগুলি মুসলিমদের শিক্ষায় তেমন অবদান রাখিতে পারিল না। ফলে মুসলিমগণ মুসলিম ঐতিহ্যভিত্তিক শিক্ষাক্ষেত্রেও পশ্চাদপদ হইয়া পড়িল।

সালাতের সময় মসজিদের সামনে বাদ্য-বাজান ও গরু কুরবানী, প্রকাশ্যে গরু যবাহ্ ও গোশ্‌ত বিক্রয়ে বাধা সৃষ্টি বা শাস্তি প্রদান তিক্ত হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে ক্রমে তিক্ততর করিয়া তুলিল। মুসলিমদের সহিত ইংরেজদের সম্পর্কের অভিব্যক্তি ঘটিল কয়েকটি ঘটনায়, যথা তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহে, জালিয়ানওয়ালা বাগে, শহীদগঞ্জ মসজিদে ও কুলকাঠিতে নিরস্ত্র মুসলিম জনগণের উপর গুলি বর্ষণে ইত্যাদি। ইংরেজদের নৃশংস প্রতিশোধ ব্যবস্থা তথা সংক্ষিপ্ত বিচারে (?) রাষ্ট্রদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত মুসলিমদের ফাঁসি এবং প্রকাশ্য স্থানে তাহাদের ঝুলন্ত মরদেহ প্রদর্শন মুসলিম জনগণের মনে বাজিল অতীব তীব্রভাবে। পলাশী যুদ্ধের জ্বালাময় দগদগে ক্ষত তাহাদের অন্তরে তো ছিলই।

কালক্রমে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইংরেজ বিরোধী ভাবের প্রকাশ্য উন্মেষ ঘটিল। হিন্দু নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী দলের উদ্ভব ইংরেজগণকে শংকিত করিল। হিন্দু-মুসলিম যৌথ নেতৃত্বে অসহযোগ ও স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হইতে লাগিল। এই পরিস্থিতির অধিকতর বিবরণ এই নিবন্ধের আওতাধীন নহে। বলার কথা শুধু এইটুকু ঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে ইংরেজ শাসকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিল মুসলিমদের প্রতি এ যাবৎ তাহাদের আচরণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক হয় নাই। তাহারা পলিসী পরিবর্তনের তাকীদ অনুভব করিল। এই অনুভূতির অন্যতম নিদর্শন Communal Award (দ্র. Oxford History of India, 4th edn, p. 798, 809) যাহাতে তাহারা মুসলিম (এবং অপর সংখ্যালঘু) সম্প্রদায়ের দাবি পৃথক নির্বাচন স্বীকার করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘুদের আসন সংখ্যা নির্ধারণ করিল। চাকুরীর ক্ষেত্রেও বখ্‌রা (Quota) নির্ধারিত হইল। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে সরকারী ব্যয়ে "মুসলিম হাইস্কুল" প্রতিষ্ঠিত হইল। বেসরকারী মাদ্‌রাসায় কিছু সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা হইল। প্রাথমিক স্তরে মক্‌তব (مكتب) স্থাপিত হইল মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য। শিক্ষা প্রশাসন দায়িত্বে নিয়োজিত হইলেন এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর ফর মুসলিম এডুকেশন, বিভাগ পর্যায়ে এসিস্টেন্ট ইনস্পেক্টর ফর মুসলিম এডুকেশন, থানা পর্যায়ে মকতব সাব-ইনস্পেক্টর। মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র বৃত্তির ব্যবস্থা হইল, ইত্যাদি। হিন্দু সম্প্রদায় এই সকল ব্যবস্থা বৃটিশ ভেদনীতি (divide and rule)-র অভিব্যক্তি বলিয়া নিন্দা করিল।

বঙ্গ প্রদেশে নওয়াব আবদুল লাতীফের চেষ্টায় সরকার পরিচালিত কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় এ্যাংলো-পারসিয়ান ডিপার্টমেন্ট সংযোজন করা হয় (১৮৫১) এবং আলিগড়ে স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ খানের উদ্যোগে এম. এ. ও. (Muhammaden Anglo Oriental) কলেজ (পরবর্তী কালে আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি) স্থাপিত হইয়াছিল। শামসুল-উলামা আবু নাস্‌র মুহাম্মদ ওয়াহীদ-এর পরিকল্পনানুযায়ী পুনর্গঠিত মাদ্‌রাসা (Reformed Madrasah) সিস্টেম-এর আওতায় বংগদেশে কতকগুলি জুনিয়র (১ম-৬ষ্ঠ শ্রেণী) ও হাই (High ৭ম-১০ম শ্রেণী) মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহাতে আরবী এবং ইসলামিয়াতের পাশাপাশি কয়েকটি সেকুলার পাঠ্য বিষয় সংযোজিত হইয়াছিল। উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি ছিল ধর্মীয় কারণে ইংরাজী শিক্ষা বর্জনকারী মুসলিম জনগণকে ইসলামিক পরিবেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস। এই ব্যবস্থায় কিছুটা সুফল ফলে।

মূলত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে ১৯০৫ খৃ. ইংরেজ গভর্নমেন্ট পূর্ববংগ ও আসামকে একত্র করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিল, রাজধানী স্থাপিত হইল ঢাকায়। ইহাতে মুসলিম স্বার্থও জড়িত ছিল, কারণ এই নূতন প্রদেশে মুসলিমদের কার্যকর সংখ্যাগুরুত্ব (effective majority) নিশ্চিত হইল। অবহেলিত পূর্ববংগের দুঃস্থ মুসলিমগণ এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাইল, আর হিন্দু সম্প্রদায় বংগ-ভংগ রদের এক প্রবল সর্ব-ভারতীয় আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। ফলে ১৯১১ খৃ. বংগ-ভংগ রদ ঘোষিত হইল। ইহাতে পূর্ববংগের মুসলিমগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। কারণ ১৯০৫-১১ সালের মধ্যবর্তী স্বল্প মেয়াদের মধ্যে মুসলিম-স্বার্থ সংরক্ষণ, বিশেষত মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দৃষ্ট হয়। বংগ-ভংগ-রদ ঘোষণা এই অগ্রগতিকে ব্যাহত করিল। মুসলিম নেতৃত্বের দাবি অনুযায়ী মুসলিম স্বার্থের আংশিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ বৃটিশ সরকার ঢাকায় একটি আবাসিক ও শিক্ষাপ্রদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিল ১৯১২ খৃ.। বলা হইল ঃ (১) একজন য়ূরোপীয় অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে কলা অনুষদের আওতায় আরবী-ইসলামিয়াত বিভাগ (Deptt. of Arabic & Islamic Studies) এই বিশ্ববিদ্যালয় বৈশিষ্ট্য হইবে এবং যদিও প্রধানত মুসলিম-স্বার্থ রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হইবে, তথাপি (২) সকল জাতের ছাত্রদের জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে হিন্দু নেতৃবৃন্দ বড় লাটের দরবারে দেন-দরবার করিল। তাহারা বলিল ঃ (১) পূর্ববংগের কৃষক-শ্রমিকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই; (২) উৎকৃষ্ট ঢাকা কলেজটি ধ্বংস করিয়া একটি নিকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি অযৌক্তিক এবং (৩) ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (internal partition-বিশেষ ইত্যাদি। কিন্তু বড়লাট সংকল্পে অটল রহিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ হ্রাসের জন্যও আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যপক্ষে একটি Teaching বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সময়ের চাহিদা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ খৃ.) শুরু হইবার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ বিলম্বিত হইল। যুদ্ধাবসানের পর অর্থাভাবের কারণেও বিলম্ব হয়। অবশেষে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের সচিবালয়ের জন্য নির্মিত (পরবর্তী সময়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ব্যবহৃত) দ্বিতল ভবনটির নিম্ন তলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের অধ্যাপনা শুরু হইল। দ্বিতলে স্থাপিত হইল মুসলিম হল (Hall) অর্থাৎ ছাত্রাবাস, নিম্নতলের একাংশে ছিল মুসলিম হলের ডাইনিং হল [হিন্দু ছাত্রদের জন্য জগন্নাথ হল এবং সকল জাতের ছাত্রদের জন্য ঢাকা হল প্রতিষ্ঠিত হইল। বাস্তবে উভয় হল হিন্দু ছাত্রদের দখলে গেল]। পরবর্তী সময়ে Salimullah Muslim Hall নামে স্বতন্ত্র মুসলিম ছাত্রাবাস স্থাপিত হয়।

উল্লেখ্য, মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়তে প্রথম দিকে হিন্দু শিক্ষক এবং হিন্দু ছাত্রের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমগণের অনগ্রসরতা। সর্ব-ভারতীয় পরিমণ্ডলেও যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম শিক্ষক পাওয়া গেল খুবই কম। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্বেও হিন্দুদের প্রাধান্য রহিল।

সে যাহাই হউক, ঢাকা বি. বি. পূর্ব বংগের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানগণ অল্প খরচে কাছাকাছি স্থানে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ লাভ করিল। টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসৌকর্য এবং আবাসিক সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সংঘবদ্ধ জীবন (corporate life) তাহাদিগকে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গঠন ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করিল। সুতরাং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগণের মধ্য হইতে নূতন প্রজন্মের এক সারি মুসলিম নেতার উদ্ভব হইল, যাঁহারা কালে জাতীয় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত মুসলিম পুনর্জাগরণে তাঁহাদের নেতৃত্বের স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হইলেন [হিন্দু ও অপরাপর জাতের ছাত্রদের জীবনের উপরও অনুরূপ শুভ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এই শিক্ষাপ্রদ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়টি]। উল্লেখ্য, প্রতিটি আবাসিক হলে ছিল একটি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ, সভাকক্ষ, ভোজনালয়, কেন্টিন, গৃহাভ্যন্তরস্থ ক্রীড়াকক্ষ, বাগান ও নির্দিষ্ট খেলার মাঠ। তদুপরি মুসলিম হলে ছিল একটি মসজিদ এবং ইহার ইমাম। সুযোগ্য প্রভোস্ট (মুসলিম হলের সর্বপ্রথম প্রভোস্ট ছিলেন স্যার এ. এফ. রহমান) এবং হাউজ টিউটরগণের তত্ত্বাবধানে নির্বাচিত হইত হল-ইউনিয়ন-পরিষদ, যাহার সভাপতি হইতেন পদাধিকারে স্বয়ং প্রভোস্ট। পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে পরিচালিত এই হল ইউনিয়ন, বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্বন্ধে, বিশেষত আবাসিক ছাত্রগণকে নিজেদের দৃষ্টিভংগির স্বচ্ছতা অর্জনে সহায়তা করিত। অনাবাসিক ছাত্রগণ কোন না কোন হলের সহিত সংশ্লিষ্ট (attached) থাকিতে বাধ্য ছিল। অধ্যাপকগণের ক্ষেত্রেও ছিল একই নিয়ম। কয়েকজন প্রখ্যাত হিন্দু অধ্যাপকও স্বেচ্ছায় মুসলিম হলের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। অধ্যাপকগণ হল ইউনিয়নের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের কর্মতৎপরতায় সানন্দে অংশগ্রহণ ও নির্বাচন পরিচালনা করিতেন।

সুবিশাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ছাত্রগণকে সংঘবদ্ধ শিক্ষা জীবনের সুযোগ দান সম্ভব ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশও মুসলিম ছাত্রদের অনুকূল ছিল না এবং উহার অধিভুক্ত কলেজ ও স্কুলসমূহের পরিচালনা ক্ষেত্রেও মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য।

মুসলিম ও ইসলামী শিক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিল পূর্বোক্ত আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ-এর সংযুক্ত (অধুনা বিযুক্ত) ডিপার্টমেন্ট। পূর্বোক্ত পুনর্গঠিত মাদরাসা স্কীমের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি ছিল এই ডিপার্টমেন্টের পোষক (feeder)। জুনিয়ার মাদ্‌রাসা, হাই মাদরাসা, ইসলামিক ইন্টার-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ মিলিয়া একটি সমন্বিত (Integrotia) সিস্টেম (সাধারণ্যে কথিত নিউ স্কীম মাদরাসা)-এর পত্তন ঘটিল, যাহা ছিল অভূতপূর্ব এবং যাহাতে নিউ স্কীম মাদরাসার লাইন ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ., এম.এ. ইত্যাদি ডিগ্রী-ডিপ্লোমা লাভের সুযোগ পাইল এবং তাঁহাদের ডিগ্রী কলা অনুষদের ছাত্রদের ডিগ্রীর সমকক্ষরূপে গণ্য হওয়াতে তাঁহারা বি.সি.এস.আই.সি.এস. ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হইলেন। এই ডিপার্টমেন্টের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ (Head) পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন শামসুল-উলামা আবূ নাস্‌র মুহাম্মাদ ওয়াহীদ, তদানীন্তন ঢাকা সরকারী মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট এবং নিউ স্কীম মাদরাসার পরিকল্পনা রচয়িতা।

বংগ-ভংগ রদের ক্ষতিপূরণ এবং পূর্ব-বংগের মুসলিমগণের স্বার্থ রক্ষণের ঘোষিত তাগিদে স্থাপিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ব-বংগের হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত ও ১ম প্যারায় উল্লিখিত The History of the Univ. of Dacca। (আরও দ্র. ঢাকা নিবন্ধ, পৃ. ৪৯-৫০)।

আহমদ হোসাইন

ত

তংকা (Tanka) ঃ সংস্কৃত তংকা, ওজন ৪ মাসা, একটি ভারতীয় রৌপ্য মুদ্রা। গায্নার সুলতান মাহ্মূদ যখন উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করিয়া তাঁহার হিন্দু প্রজাদের সুবিধার্থে দ্বিভাষিক মুদ্রা প্রবর্তন করেন, তখন আররী দিরহাম-এর প্রতিশব্দ, নাগরী বর্ণমালায় মুদ্রিত এই তংকা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর সুলতান শাম্সুদ্দীন ইলতুত্মিশ (৬০৭-৬৩৩/১২১০-১২৩৫ সালে) ১৭৫ গ্রেন (১১.৩ গ্রাম) ওজনের একটি ভারী রৌপ্য মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং ইহাকে তংকা (যদিও 'তোলা' নামটিই অধিকতর যথার্থ হইত) নামে অভিহিত করেন। সম-ওজনের স্বর্ণ-তংকা সর্বপ্রথম নাসিরুদ্দীন মাহ্মূদ (৬৪৬-৬৬৪/ ১২৪৬-১২৬৫) কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এই সময় হইতেই এই দুই প্রকার মুদ্রা ভারতের মুদ্রা মানে (Standard) পরিণত হয়। সামান্য কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য সূরী মুদ্রা ছাড়া মুইয্যুদদীন মুবারাক (৮২৪-৩৭/১৪২১-১৪৩৩) সর্বশেষ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করেন। পুনর্বার সম্রাট আকবার কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রা প্রবর্তিত হয়, কিন্তু তখন তাহা মুহর (দ্র.) নামে পরিচিত হয়। মুহাম্মাদ ইব্ন তুগলাক-এর পর হইতে রৌপ্য তংকায় ক্রমে ক্রমে খাদ মিশ্রিত হইতে থাকে এবং লোদী শাসনামলে প্রকৃতপক্ষে উহা তাম্র (কালো তংকা) মুদ্রায় পর্যবসিত হয়। শের শাহ (৯৪৬-৯৫২/ ১৫৩৯-১৫৪৫)-এর বিখ্যাত মুদ্রা সংস্কারকালে উহা পূর্ব নিখাদত্ব ও ওজন পুনঃপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার নামকরণ করা হয় রুপী (রূপিয়া)। এই মুদ্রার রুপী নামটি সম্রাট আক্বার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং অদ্যাবধি ভারতীয় মুদ্রার একক হিসাবে ইহা প্রচলিত রহিয়াছে। সম্রাট আকবার তংকা নামটি তাম্র মুদ্রার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। তাঁহার তংকা ছিল ২ দাম (৬৪০ গ্রেন=৪১·৫ গ্রাম) ওজনের মুদ্রা। তিনি তাংকী নামে তংকার ১/১০ (৬৪ গ্রেন=৪·১৫ গ্রাম) ওজনের আরও একটি তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন করেন।

রৌপ্য নির্মিত এবং খুব বিরল স্বর্ণ নির্মিত তংকা প্রচলিত ছিল বঙ্গদেশ, গুজরাত, মালওয়া ও দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর সুলতানদের সমসাময়িক রাজন্যবর্গের আমলে। তংকা শব্দটি বাংলা ভাষায় এখনও 'টাকা'-রূপে টিকিয়া আছে 'রূপী'র প্রতিশব্দরূপে। দক্ষিণ ভারতের গোয়া (Goa)-তে পর্তুগীজ মুদ্রার ক্ষেত্রে এখনও এই নামটি ব্যবহৃত হয় কিন্তু এইখানে ইহার মূল্যমান এক আনার সমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Thomas, Chronicles of the Pathan Kings of Delhi, London 1871; (২) S. Lane-Poole, Catalogue of Coins of the Sultans of Delhi in the British Museum, London 1883, p. xix-xxvii.

J. Allan (E.I.[1])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

তাবলীগ পত্রিকা ঃ ১৯২৮-২৯, ধর্মীয় মাসিক পত্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কলিকাতা হইতে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন ও চৌধুরী শামসুর রহমান। আর্যসমাজী ও হিন্দু-সংগঠনীদের ইসলাম বিরোধী প্রচারকার্যের প্রতিরোধই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ১৯৩৭ খৃ. তবলীগ পুনরায় প্রকাশ করা হয়; কিন্তু এইবারও কয়েক মাস পরেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৬৯১

তমদ্দুন মজলিস (تمدن مجلس) ঃ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক সামাজিক আন্দোলন, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তদানীন্তন লেকচারার (অধ্যাপক) আবুল কাসেম। তমদ্দুন মজলিস মূলত একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হইলেও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনেও ইহার কার্যক্রম প্রসারিত ছিল।

পটভূমি ঃ ১৯৪০ খৃস্টাব্দে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হইলেও ১৯৪৭ খৃ. ঐ প্রস্তাবের কিছুটা ব্যত্যয় ঘটাইয়া উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং এই রাষ্ট্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে। বৃটিশ শাসনামলে পূর্ববঙ্গ অত্যন্ত অবহেলিত থাকায়, পাকিস্তানের ব্যুরোক্রাসীতে অবাঙ্গালী অফিসারদের বিপুল সংখ্যাধিক্য এবং বৃটিশ আমল হইতেই পাঞ্জাবে অতি উন্নত সেচ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সূচনাকাল হইতেই পূর্বাঞ্চলে একটা সুস্পষ্ট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিলেও বিংশ শতাব্দীতে এই কাজটি কতটা সুকঠিন তাহার উপলব্ধি নয়া রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দের ছিল না। এইসব কারণে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে, বিশেষত পূর্বাঞ্চলে গোড়াতেই একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতা পূরণ কামনায়ই তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠা। মজলিসের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড যে দুইটি প্রধান ধারায় অগ্রসর হয় তাহাতে মজলিস নেতৃবৃন্দের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়। ইহার একটি, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি ইনসাফ, দ্বিতীয়টি, আধুনিক সমাজ-মানসের উপলব্ধিযোগ্য ভঙ্গীতে ইসলামী আদর্শের উপস্থাপন।

আদর্শ ও লক্ষ্য ঃ তমদ্দুন মজলিসের আদর্শ ইসলাম। তবে ইসলামের আদর্শ উপস্থাপনে মজলিস সব সময় সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক, যুক্তিবাদী ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছে। তমদ্দুন মজলিসের মতে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপালক প্রদত্ত যে পূর্ণাঙ্গ আদর্শ যুগে যুগে বিভিন্ন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বজনীন সমাজ গঠনের প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহাই ধর্ম, তাহারই সর্বশেষ রূপ ইসলাম। সুতরাং ইসলামে কোন সংকীর্ণতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার বা সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই। ১৯৪৯ খৃ. তমদ্দুন মজলিসের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া "একমাত্র পথ" নামে যে প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহাতে পুঁজিবাদ, কমুন্যনিজম প্রভৃতি মতবাদকে ভ্রান্ত ঘোষণা দিয়া ইসলামের প্রতি মুক্তিকামী মানুষকে আবেদন জানানো হয়। এই পুস্তকে ইসলামের সংজ্ঞা দিতে যাইয়া বলা হয়, "অসাম্য, অন্যায়, অত্যাচার, হিংসা, বিদ্বেষ ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে খাঁটি মানুষ সৃষ্টির ভেতর দিয়ে মানব সমাজে প্রকৃত শান্তি আনয়নের জন্য যে ধর্ম বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করত প্রয়োগ-পদ্ধতিতে পরিবর্তিত ও প্রগতিশীল রূপ গ্রহণ করেছে, তা-ই ইসলাম। অন্য কথায়, যে মানব ধর্ম আদি পুরুষ আদম ('আ) হতে শুরু করে নিরবচ্ছিন্নভাবে মানব সমাজে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অর্থাৎ মানুষের সামগ্রিক সমস্যাসমূহের প্রগতিশীল সমাধান দিয়ে মানব সভ্যতাকে

সর্বাংগীন পূর্ণতা ও পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ-ই ইসলাম" ("একমাত্র পথ"–অধ্যাপক আবুল কাসেম ও শাহেদ আলী, ১৯ আজিমপুর রোড, ঢাকা, ১৯৪৯ খৃ, পৃ. ১৮-১৯)। এই পুস্তকে আধুনিক যুগে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতাকেই মানুষের বিভিন্ন সমস্যার জন্য দায়ী বিবেচনা করিয়া সমস্ত সমস্যার ভারসাম্যময় সমাধান একমাত্র ইসলামে রহিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয় এবং এই আদর্শের বাস্তব রূপ দানের উদ্দেশ্যে খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শে একদল বলিষ্ঠ কর্মীবাহিনী গঠনের উপর জোর দেওয়া হয়।

তমদ্দুন মজলিসের মতে ধর্ম ও ইসলাম সমার্থবোধক। ১৯৪৯ খৃ. ২৭ মার্চ গৃহীত মজলিসের প্রথম গঠনতন্ত্রে 'উদ্দেশ্য' শিরোনামের ধারায় ইসলামকে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে "যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদ" হিসাবে ("সাপ্তাহিক সৈনিক", ঢাকা, ২২ জুলাই, ১৯৪৯)। পরবর্তী কালে মজলিসের সংশোধিত গঠনতন্ত্রে "ধর্মভিত্তিক সাম্যবাদের" স্থলে ইসলামী (অর্থাৎ শান্তি) আদর্শকে তমদ্দুন মজলিসের আদর্শ বলিয়া উল্লিখিত হয়। অবশ্য বাংলাদেশ আমলে ১৯৭৬ সালের ৮ আগস্ট তারিখে সংশোধিত আকারে গৃহীত মজলিসের সর্বশেষ সংশোধিত গঠনতন্ত্রে ১ নম্বর ধারায়ই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয় ঃ "তমদ্দুন মজলিস ইসলামের আদর্শভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান" ('গঠনতন্ত্র'–তমদ্দুন মজলিস, প্রকাশক ঃ অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ.১)। তমদ্দুন মজলিস ইসলামকে কোন দৃষ্টিতে দেখে তাহার ইংগিত দিয়া গঠনতন্ত্রের "আদর্শ ও উদ্দেশ্য" ধারায় বলা হয় ঃ তমদ্দুন মজলিস তৌহিদী আদর্শে বিশ্বাসী। তাই তমদ্দুন মজলিস বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহ্‌র মালিকানা নীতির ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই আজকের সমস্যা জর্জরিত ও নিপীড়িত বিশ্বমানুষের মুক্তি সম্ভব (প্রাগুক্ত, পৃ. ১)।

কর্মসূচী ঃ প্রায় শুরু হইতেই তমদ্দুন মজলিসের কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ ঃ

"সংগঠন ও গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি করে গণজীবনের উন্নয়ন সাধন।"

"আলোচনা ও প্রচারের ভেতর দিয়ে যুক্তির মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে দেওয়া এবং ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা।"

"সাহিত্য, পত্রিকা, আলোচনা ও সভা-সমিতি মারফৎ ইসলামের সত্যিকার রূপ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং বিভিন্ন অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষতিকর আদর্শ এবং মতবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করে দেওয়া।"

"কবি-গায়ক, শিল্পী-সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করা" (দ্র. পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস-গঠনতন্ত্র, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের পক্ষে বদরুল আলম কর্তৃক ১৯, আজিমপুর, ঢাকা হইতে প্রকাশিত এবং এন. আর. জামালী কর্তৃক 'আমাদের প্রেস' ঢাকা হইতে মুদ্রিত. পৃ. ৩)। ইহা ছাড়াও "সম্ভাব্য সকল উপায়ে মানব কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ" করা এবং "জনতার সত্যিকার স্বার্থের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সংগ্রাম" করা, "সদস্যদের আদর্শগতভাবে সুশিক্ষিত" করিয়া তোলা, "শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমবায়িক জীবন-চেতনা ও গণ-সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে কবি-গায়ক, শিল্পী-সাহিত্যিক, দার্শনিক-চিন্তাবিদ ও কর্মীদের" লইয়া মাঝে মাঝে "তাঁবু জীবন" এবং "আত্মসমালোচনার ক্লাস" মারফত "নিজেদের দোষত্রুটি পর্যালোচনা করা"-ও মজলিসের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। (দ্র. ঐ. পৃ. ৩, ৪)।

তমদ্দুন মজলিসের এই সব কর্মসূচী পরিচালনার জন্য কতিপয় বিভাগ ছিল। এই সব বিভাগের নাম নিম্নরূপ ঃ

(ক) সাহিত্য বিভাগ,

(খ) লোককলা বিভাগ,

(গ) সমাজবিজ্ঞান বিভাগ,

(ঘ) জনসেবা বিভাগ,

(ঙ) লাইব্রেরী বিভাগ ও

(চ) প্রচার বিভাগ।

(দ্র. সাপ্তাহিক সৈনিক, ঢাকা, ২২ জুলাই, ১৯৪৯)।

তমদ্দুন মজলিসের সর্বশেষ গঠনতন্ত্রে এই বিভাগগুলির নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত অবস্থায় পাওয়া যায় নিম্নভাবে ঃ

(ক) সাহিত্য ও শিল্প বিভাগ,

(খ) শিক্ষা ও পাঠাগার বিভাগ,

(গ) প্রকাশনা বিভাগ,

(ঘ) জনসেবা বিভাগ,

(ঙ) জনসংযোগ বিভাগ ও

(চ) অর্থ বিভাগ।

(দ্র. গঠনতন্ত্র, তমদ্দুন মজলিস, প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ. ৩, ৪)।

তমদ্দুন মজলিস মূলত একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা বলিয়া ইহা শুরু হইতেই সাহিত্য সভা, সাহিত্য সম্মেলন, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক সম্মেলন, সঙ্গীত অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান, শিক্ষা শিবির, পাঠাগার, পাঠচক্র, সেমিনার, মাহফিল, আদর্শিক ক্লাস, পুস্তক-পত্রিকা প্রকাশ, সংকলন, দেওয়াল পত্রিকা, পোস্টারিং প্রভৃতি এবং জনসেবামূলক ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। তবে নিয়মিত কর্মসূচীর বাহিরে বহু সাংস্কৃতিক, সামাজিক, আধা-রাজনৈতিক ও রাজনৈতিক ইস্যুতে আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রথম দিকে মজলিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কর্মক্ষেত্র ও কর্মপদ্ধতি ঃ আদর্শের ভিত্তিতে সাংগঠনিক কর্মসূচী পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা গঠনের ব্যবস্থা ছিল শুরু হইতেই। প্রধানত সাবেক পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যেই মজলিসের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। পঞ্চাশের দশকে পকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচীতে প্রবাসী কিছু বাংলাভাষী মুসলিম শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের উদ্যোগে একটি শাখা গঠিত হয়, তবে তাহা দীর্ঘায়ু হয় নাই। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তমদ্দুন মজলিসের কার্যকলাপ ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সকল জিলা, বহু মহকুমা এবং কোন কোন স্থলে থানা পর্যায়েও মজলিসের শাখা গঠিত হয়। যেসব শহরে তমদ্দুন মজলিসের শাখা সর্বাধিক সক্রিয় ছিল সেই সবের মধ্যে চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লাকসাম, চাঁদপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, রংপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পার্বতীপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, সান্তাহার, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী,

নওগাঁ, নাটোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, ঝিনাইদহ, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, ভোলা, বরিশাল, ফরিদপুর, রাজবাড়ী ও মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৮ খৃ. হইতে ১৯৫৪ খৃ. পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের উত্তপ্ত দিনগুলিতেই তমদ্দুন মজলিসের কার্যকলাপ অধিক বিস্তৃতি লাভ করে। সমাজসচেতন অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবীরা ছাড়াও ছাত্র ও তরুণ সমাজকর্মীরা বিভিন্ন স্থানে মজলিসের শাখা গঠনে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন। প্রতিটি শাখায় সপ্তাহে নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট দিনে সাহিত্য সভা বা আদর্শ বিষয়ে আলোচনা সভা বসিত। ইহাতে সংশ্লিষ্ট স্থানের নেতৃস্থানীয় লেখক, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবিগণ সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেন। এই সব সভায় তরুণ সাহিত্যিকদের সাহিত্য চর্চায় বিশেষ উৎসাহ যোগানো হইত। সভায় সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও দেশ-বিদেশের চলমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা ও চিন্তার আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে আগাগোড়া ইসলামী আদর্শ ও জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিবসে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হইয়াছে। মজলিস-এর কর্মী, সদস্য ও সমর্থকদের আদর্শ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে আগাগোড়াই আদর্শ বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল (দ্র. সাংস্কৃতিক সংগঠনের রূপরেখা, অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রণীত, মুক্তি প্রকাশনী, ৬১/২, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা, জুলাই ১৯৭৭, পৃ. ১০-১৪)।

কর্মতৎপরতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ তমদ্দুন মজলিস এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাংবাদিকতার অঙ্গন ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মজলিসের কর্মকাণ্ড সংক্ষেপে নিম্নরূপ ভাগ করা চলে ঃ

(ক) **ভাষা আন্দোলন ঃ** ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিস পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিয়া আসিতেছিল। ভারতে হিন্দী একমাত্র রাষ্ট্রভাষা স্থিরীকৃত হওয়ায় অনেকেই উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রশাসনক্ষেত্রে অবাঙ্গালী অফিসারদের প্রভাব অত্যধিক থাকার ফলে পাকিস্তান গণপরিষদ এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই পোস্টকার্ড, এনভেলপ, মনি অর্ডার ফর্ম প্রভৃতিতে ইংরেজীর সাথে শুধু উর্দূর ব্যবহার শুরু হয়। এই পটভূমিতে ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিস বাংলা ভাষাকে উর্দূর পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানাইয়া পুস্তিকা প্রকাশ করে। "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ" শীষক এই পুস্তিকায় তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুসাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন এবং দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদের তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস-আদালতের ভাষা ও শিক্ষার বাহন করিবার দাবি জানাইয়া লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষার দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয় এবং এই প্রশ্নে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি বাংলা ভাষার দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়িয়া তোলার আবেদন জানান হয়। ইতোমধ্যে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ফজলুল হক মুসলিম হল এবং অন্যান্য স্থানে বাংলা ভাষার সমর্থনে একাধিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক নুরুল হক ভুইয়াকে আহ্বায়ক করিয়া রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদও গঠিত হয়।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দের শেষদিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের এক সার্কুলারে দেখা যায়, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিসের পরীক্ষার বিষয় তালিকায় ইংরাজী হইতে শুরু করিয়া উর্দূ, হিন্দী, সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা স্থান পাইলেও সেই তালিকায় বাংলা ভাষা স্থান পায় নাই। তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক ইহার প্রতিবাদে যে বিবৃতি দেন, তাহা কলিকাতার দৈনিক ইত্তেহাদ-এ প্রকাশিত হয় এবং ঐ সংখ্যাতে এই বিষয়ে একটি কড়া সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার কপি ঢাকায় পৌঁছিলে শিক্ষিত মহলে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং তমদ্দুন মজলিস নূতনভাবে আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৪৮ খৃ. গঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ও মজলিসের যুগপৎ সদস্য জনাব শামসুল আলমকে কনভেনর করিয়া সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এই কমিটির পক্ষ হইতে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় প্রতিবাদ দিবসে হরতাল, মিছিল ও সেক্রেটারিয়েট ঘেরাওয়ের ফলে প্রশাসন অচল হইয়া পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আট দফা দাবি মানিয়া লইয়া ১৫ মার্চ তারিখে এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার পর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কায়েদে আজম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আগমন করিয়া উর্দূই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে এই মত ঘোষণা দেওয়ার পর খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার ওয়াদা হইতে সরিয়া আসেন।

১৯৪৮ হইতে ১৯৫২ খৃ. পর্যন্ত তমদ্দুন মজলিস বিভিন্ন সভা-সমিতি অনুষ্ঠান, বিবৃতি প্রকাশ এবং লেখালেখির মাধ্যমে বাংলা ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করিয়া যায়। ১৯৪৭ খৃ. হইতেই তমদ্দুন মজলিস ভাষা আন্দোলনে রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ছাত্রনেতৃবৃন্দের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে তৎকালীন ডাকসু ভিপি জনাব ফরিদ আহমদ, রাজনৈতিক নেতা শামসুল হক, কামরুদ্দিন, ছাত্রনেতা নঈমুদ্দিন, বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা, মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক, এ. কে. এম. আহসান , ছাত্রনেতৃবৃন্দ আজীজ আহমদ, অলি আহাদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আখলাকুর রহমান, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, শেখ মুজিবর রহমান (বঙ্গবন্ধু), আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব, অধ্যাপক গোলাম আজম, সাংবাদিক আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী প্রমুখের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। ভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম দুই কনভেনরই ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের সদস্য। ১৯৫২ খৃ. পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের একটি বক্তৃতাকে কেন্দ্র করিয়া ভাষা আন্দোলন পুনরায় চাঙ্গা হইয়া উঠিলে একুশে ফেব্রুয়ারী প্রতিবাদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নূতন সংগ্রাম পরিষদ। এই সংগ্রাম পরিষদেও অন্যদের মধ্যে তমদ্দুন মজলিসের সদস্য ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ও জনাব আবদুল গফুর। বিভিন্ন সভা-সমিতি ছাড়াও তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র ১৯৪৮ সালের ১৪ নভেম্বরে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সৈনিক বাংলা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ফলে বহুদিন পর্যন্ত তমদ্দুন মজলিস, সাপ্তাহিক সৈনিক ও ভাষা আন্দোলন সমার্থবোধক হইয়া পড়িয়াছিল।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য যে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়

তাহার প্রতিষ্ঠার পিছনেও তমদ্দুন মজলিসের ঐতিহাসিক অবদান ছিল। প্রথম দিকে এই একাডেমীর কাউন্সিল সদস্য হিসাবে বাংলা একাডেমীর চলার পথে যাঁহারা দিকনির্দেশনা দান করেন, যেমন অধ্যাপক আবুল কাসেম, শাহেদ আলী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ইব্রাহীম খাঁ, ফররুখ আহমদ, আসকার ইব্‌নে শাঈখ, তালিম হোসেন, এম. এ. সাত্তার, হাসান জামান, আশরাফ ফারুকী, ইঁহাদের অধিকাংশই মজলিসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৯৫৪ খৃস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে যে প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হয় তাহাতে তমদ্দুন মজলিসের দুইজন সদস্যও নির্বাচিত হন। এই পরিষদে ১৯৫৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বাংলা ভাষার দাবিতে অধ্যাপক আবুল কাসেমের উত্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৫৬ খৃ. শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়ার পরও উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা চালু করার ব্যাপারে যখন অনেকের মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ পরিলক্ষিত হয়, তখন তমদ্দুন মজলিসের জনাব আবুল কাসেম তাঁহার সহকর্মীদের সহযোগিতায় ১৯৬২ খৃ. বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলার প্রচলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। সুতরাং দেখা যায় ১৯৪৭ খৃ. হইতে শুরু করিয়া বাংলা ভাষার আন্দোলন ও বাস্তবায়ন সব পর্যায়েই তমদ্দুন মজলিস পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে।

(খ) শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ" শীর্ষক যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবি উত্থাপন করা হয়। পরবর্তী কালে লাহোর প্রস্তাবের আলোকে দেশে জনাব লিয়াকত আলী খান কর্তৃক পেশকৃত বি.পি.সি. রিপোর্টের বিরুদ্ধে যে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন গড়িয়া উঠে তাহাতেও তমদ্দুন মজলিস সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র সাপ্তাহিক সৈনিক-এ এই বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত হইত। ১৯৫০ খৃ. ঢাকা জিলা বার লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় ভিত্তিতে একটি গ্রাণ্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসাবে বিবেচনা না করিয়া দুই অঞ্চলের একটি অঞ্চল (পূর্বাঞ্চল) হিসাবে বিবেচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি গৃহীত হয় তাহাতে তিনটি বিষয় ছাড়া সমুদয় ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে হস্তান্তরের দাবি জানানো হয়। তমদ্দুন মজলিস এই সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৪ খৃ. সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ হইতে যে একুশ দফা দাবি উত্থাপিত হয়, তাহার ব্যাখ্যায় তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে অধ্যাপক আবুল কাসেম রচিত "একুশ দফার রূপায়ণ" শীর্ষক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যুক্তফ্রন্ট নেতা শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন।

১৯৫২ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তমদ্দুন মজলিসের আদর্শিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে "খিলাফতে রব্বানী পার্টী" নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া উঠে। এই সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের চিন্তাধারার আলোকে একই সাথে ইসলামী আদর্শ ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন চালাইয়া যায়। ১৯৫৬ খৃ. পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যাধিক্যের অবমূল্যায়ন করিয়া পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ পাকিস্তানের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচনা করে, খিলাফতে রব্বানী পার্টীর পক্ষ হইতে অগণতান্ত্রিক বিধায় তাহার বিরোধিতা করা হয়। ১৯৫৭ খৃ. এই খিলাফতে রব্বানী পার্টীর উদ্যোগে এবং নেজামে ইসলাম পার্টী, জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের সমবায়ে যে সর্বদলীয় ইসলামী শাসনতন্ত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাহাতে রব্বানী পার্টীর তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল কনভেনর নির্বাচিত হন। ইহা ছাড়া পাকিস্তানের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করে, এই যুক্তিতে ও ইনসাফের তাকিদে ঢাকায় পাকিস্তানের রাজধানী স্থানান্তরেরও দাবি জানায় খিলাফতে রব্বানী পার্টী। ১৯৫৪ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে তমদ্দুন মজলিসের যে দুইজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অধ্যাপক আবুল কাসেম ও অধ্যাপক শাহেদ আলী খিলাফতে রব্বানী পার্টীর ব্যানারে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন, তাঁহারাও পরিষদের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে এই সময়ে শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে দৈনিক আজাদ অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসের তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক হাসান জামান কর্তৃক প্রণীত "ইসলামী শাসনতন্ত্রের চৌদ্দ দফা" শীর্ষক একখানি পুস্তিকাও ঐ সময় তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশের পূর্বে ইহা সাপ্তাহিক সৈনিক-এ প্রকাশিত হয়।

ফ্রন্ট ও অঙ্গসংস্থা ঃ তমদ্দুন মজলিস একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শে বিশ্বাসী বিধায় এই আদর্শের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তবায়নের লক্ষ্য শুধু সাংস্কৃতিক সাংগঠনের মাধ্যমে সম্ভবপর নয়–এই বিবেচনায়ই ১৯৫২ খৃ. তমদ্দুন মজলিসের আদর্শিক চিন্তাধারায় "খিলাফতে রব্বানী পার্টী" নামের রাজনৈতিক সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রথম সংগঠনী কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের সাবেক নেতা সোলায়মান খান। পরবর্তী কালে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ আল্লামা আবুল হাশিম ও প্রবীণ আইনজীবী এডভোকেট এ. এস. এম. মোফাখ্‌খার যথাক্রমে ইহার চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাচিত হন। আরও পরে জনাব মোফাখ্‌খার ইহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এই সংস্থা খুবই সক্রিয় ছিল।

ছাত্রদের মধ্যে তমদ্দুন মজলিসের আদর্শ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেই পাকিস্তান ছাত্রশক্তি নামে একটি ছাত্র সংগঠন গঠিত হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দেশের ছাত্র আন্দোলনে এই সংগঠন খুবই বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তী কালে এই সংগঠনের সাবেক নেতাদের উদ্যোগে পাকিস্তান যুব শক্তি নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রধানত এই দুই সংগঠনের সাবেক নেতৃত্বের একাংশের উদ্যোগেই বাংলাদেশে ইসলামিক পার্টী গঠিত হয়।

কিশোরদের মধ্যে তমদ্দুন মজলিসের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে "কিশোর মজলিশ" নামে এবং শ্রমিকদের মধ্যে একই উদ্দেশ্যে কাজ করার লক্ষ্যে "লেবার ফেডারেশন" নামে দুইটি সংগঠন গঠিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে প্রথমোক্ত সংগঠন বেশ সক্রিয় ছিল। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ আমলেও বহুদিন সক্রিয় ছিল।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঃ ১৯৪৭ খৃ. যখন তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয় এই দেশে তখন মুসলিম লীগ ছাড়া কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও বিরাজমান ছিল বিরাট শূন্যতা। সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে "পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠার আনন্দে সবাই ছিল বিভোর। কিন্তু পাকিস্তানে নেতাদের প্রতিশ্রুত ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন এবং লাহোর প্রস্তাব হইতে সরিয়া আসিয়া উভয় অঞ্চল লইয়া এক রাষ্ট্র গঠনের পর প্রশাসনে অবাঙ্গালীদের বিরাট প্রভাবের প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের চ্যালেঞ্জ কিভাবে

মুকাবিলা করা যাইতে পারে, এই সম্পর্কে খুব কম লোকই চিন্তা-ভাবনা করিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব দৃষ্টিকোণ হইতে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইতেই তমদ্দুন মজলিসের জন্ম হয়। এই দৃষ্টিতে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি প্রথমে সামনে আসিয়া পড়িলেও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আদর্শিক সমস্যা কখনও মজলিসের দৃষ্টি এড়ায় নাই। আধুনিক যুগ-মেধার আলোকে ইসলামী আদর্শ উপস্থাপনের লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিসের প্রথম প্রয়াস ছিল আদর্শ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ "একমাত্র পথ"। ইহার পর একদিকে আদর্শভিত্তিক পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ, অন্যদিকে নিয়মিত আলোচনা সভা, সাহিত্য সভা, সেমিনার, পাঠাগার, পাঠচক্র, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের গতিশীল আদর্শ জনগণের সামনে তুলিয়া ধরিবার লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইসলামী মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ খৃ. হইতেই তমদ্দুন মজলিস দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ফারুক' (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক পঠন-পাঠনে উৎসাহ দানের লক্ষ্যে নিয়মিত হযরত উমার (রা)-এর শাহাদত বার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা করে। ১৯৫০ খৃ. এই উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র আলোচনা সভা, জনসভা, সেমিনার, মাহফিল প্রভৃতির মাধ্যমে 'উমর দিবস' অনুষ্ঠিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, আল্লামা আবুল হাশিম, মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি ফররুখ আহমদ, মোহাম্মদ আজরফ, ডক্টর হাসান জামান, কবি মুফাখখারুল ইসলাম প্রমুখ দেশের নেতৃস্থানীয় 'আলিম ও বুদ্ধিজীবী অংশগ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া এই উপলক্ষে "বিপ্লবী উমর" নামে একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। তাহাতে আল্লামা আবুল হাশিম, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক হাসান জামান, অধ্যাপক আবুল কাসেম, অধ্যাপক আবদুল গফুর প্রমুখের গবেষণাধর্মী রচনা স্থান পায়। হযরত উমার (রা)-এর শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার এরূপ ব্যাপক প্রয়াস এই দেশে ইহাই ছিল প্রথম। ইহা ছাড়াও সাহাবীদের বিপ্লবী জীবনধারা সম্বন্ধে শিক্ষিত তরুণদের অবহিত করার লক্ষ্যে হযরত আবূ যার গিফারী (রা)-এর জীবনী ভিত্তিক একাধিক গ্রন্থও তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হয়। তমদ্দুন মজলিসের নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে পরবর্তী কালে ষাটের দশকে এই সাহাবী স্মরণে ঢাকায় "আবু জর গিফারী কলেজ" নামে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা সভা, সেমিনার প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছাড়াও তমদ্দুন মজলিস মাঝে মাঝে বড় আকারে সাহিত্য সম্মেলন বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করিত। "ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন" নামে এই ধরনের তিন দিন ব্যাপী একটি সম্মেলন ১৯৫২ সালের অক্টোবরে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন ঢাকার সংস্কৃতি মহলে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই সম্মেলন সাহিত্য, লোক-সংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান ও ইসলামী আন্দোলন এই চারটি অধিবেশনে এবং বহু শাখায় বিভক্ত ছিল। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনসহ বিভিন্ন অধিবেশন ও শাখা পর্যায়ে যাঁহারা অংশগ্রহণ করেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, কবি শাহাদৎ হোসেন, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক হাসান জামান, অধ্যাপক আবূ তালিব, কবি আবদুর রশীদ খান, অধ্যাপক ফেরদাউস খান, মাহবুবুল আলম, মীর শামসুল হুদা, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি ফররুখ আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম, কবি রওশন ইজদানী, আবদুল হাই মাশরেকী, শাহেদ আলী, আসকার ইব্নে শাইখ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী। তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী হইতে সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর মাজহার উদ্দীন সিদ্দিকী। ইহা ছাড়া রুশীয় তুর্কিস্তানের নির্বাসিত নেতা রুহী উইঘুর এবং কলিকাতার সাপ্তাহিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক জনাব আলাউদ্দিন খানের প্রেরিত দুইটি প্রবন্ধও সম্মেলনে পঠিত হইয়াছিল। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী পাঠাইয়াছিলেন মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা হাসান আল-হুদায়বী, ইরানের ফেদাইয়ানে ইসলাম আন্দোলনের আবদুল্লাহ কারবামাচাইন, পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর মাওলানা সায়্যিদ আবুল-আলা মাওদূদী এবং ইন্দোনেশিয়ার মাসজুমী পার্টী নেতা ও সাবেক প্রধান মন্ত্রী ডক্টর আহমাদ নাসীর। এই সম্মেলনে দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি মহলে ইসলামী নবজাগরণের বিষয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

ইসলামী আদর্শ ছাড়াও জাতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস নিয়মিত সাহিত্য সভা ও সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন করিত। ১৯৫১ খৃ. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তমদ্দুন মজলিস। ইহার প্রথম দিনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আবদুল হাই মাশরেকীর লেখা নজরুলের জীবনীভিত্তিক "দুঃখু মিয়ার জারী" কার্জন হলের স্টেজে নৃত্য-গীত সহকারে পরিবেশন করেন কবি আবদুল হাই মাশরেকী, নাট্যকার আসকার ইব্নে শাইখ, মোস্তফা কামাল (পরবর্তীকালে দৈনিক বাংলার সহকারী সম্পাদক) ও নাট্যশিল্পী সাদেক নবী। দ্বিতীয় দিনে বিদ্রোহী কবির "মৃত্যুক্ষুধা"উপন্যাস অবলম্বনে নাটক মঞ্চস্থ হয় নাট্যকার আসকার ইব্নে শাইখের নেতৃত্বে।

জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস বিভিন্ন সেমিনার, আলোচনা সভা প্রভৃতির আয়োজন করিত। ১৯৫৭ খৃ. সিপাহী বিপ্লবের শত বার্ষিকী উপলক্ষে কার্জন হলে তমদ্দুন মজলিস এবং সমমনা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে ড. হাসান জামানকে কনভেনর করিয়া একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আমাদের দুই শত বৎসরের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ও দেশপ্রেমমূলক গান পরিবেশিত হয়। দেশের নেতৃস্থানীয় শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও গবেষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী উদ্বোধন করেন তদানীন্তন প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান। এই অনুষ্ঠানে পঠিত সমস্ত প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি পরবর্তী কালে নওরোজ কিতাবিস্তান কর্তৃক "শতাব্দী পরিক্রমা" নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষা শিবির ঃ তমদ্দুন মজলিসের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মসূচী ছিল ইহার শিক্ষা শিবির, যাহাকে মজলিসের গঠনতন্ত্রে "তাঁবু জীবন" বা শিবির জীবনরূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। গঠনতন্ত্রে এই কর্মসূচী বর্ণিত হইয়াছে নিম্নরূপে ঃ "শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ সমবায়িক জীবন-চেতনা ও গণসংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে কবি, গায়ক, শিল্পী-সাহিত্যিক, দার্শনিক-চিন্তাবিদ ও কর্মীদের নিয়ে মাঝে মাঝে 'তাঁবু জীবন' যাপনের

ব্যবস্থা করা। এই ধরনের কর্মসূচীতে আদর্শের আলোকে সামষ্টিক জীবন অনুশীলনের, শ্রমের মর্যাদা ও স্বনির্ভরতার আদর্শ চর্চা এবং আদর্শিক চেতনা বিকাশের চেষ্টা করা হইত। ১৯৪৯ খৃ. এই ধরনের প্রথম "তাঁবু জীবন" অনুষ্ঠিত হয় চট্টগামের শহরতলীতে। পরবর্তী কালে ঢাকার তদানীন্তন শহরতলী মনিপুরে, সন্দীপে, চুয়াডাঙ্গায় ও কুমিল্লায় এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

জনসেবা ঃ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মসূচীও তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম কর্মক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হইত। বন্যা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শহর এলাকায় ছায়ানাট্য, সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন বা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া মজলিসকর্মীরা অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থ ও ত্রাণ সামগ্রী লইয়া মানবতার সেবায় আগাইয়া যাইত।

প্রকাশনা ঃ ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে সম্যক চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিস শুরু হইতেই প্রকাশনার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। ১৯৪৯ খৃ. আদর্শ বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ "একমাত্র পথ" প্রকাশের পূর্বেই তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে শাহেদ আলী রচিত "ফিলিস্তিনে রুশ ভূমিকা" শীর্ষক পুস্তিকা। ইহাতে ফিলিস্তীনীদেরকে তাহাদের আবাসভূমি ফিলিস্তীন হইতে উৎখাত করিয়া ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার আঁতাতের ইতিকথা বিবৃত হয়।"একমাত্র পথ"-এর পর আদর্শ বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ ছিল "মুক্তির ডাক" শীর্ষক একখানি সংকলন গ্রন্থ। ইহাতে আবুল হাশিম, শামসুল হক, মন্মথ নাথ সরকার, হাসান জামান প্রমুখের রচনা স্থান পায়। ইসলাম ছাড়াও সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে ছোট-বড় প্রায় অর্ধশতাধিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৫২ খৃ. অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষেই প্রায় ত্রিশখানি পুস্তক-পুস্তিকা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। মজলিসের পক্ষ হইতে রচিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ, একমাত্র পথ, ফিলিস্তীনে রুশ ভূমিকা, মুক্তির ডাক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ইসলাম, বিপ্লবী উমর, বিপ্লবী সাহাবী হযরত আবু জর গিফারী, ফারুকী খিলাফত, ইসলামী অর্থনীতি; ইসলাম কি দিয়েছে ও কি দিতে পারে, মুক্তি কোন্ পথে? ভুলের পুনরাবৃত্তি How to Begin, Political Science and Islam, Islamic Economy, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য ও তমদ্দুন, ইসলামী তমদ্দুন, কোরানিক অর্থনীতি, পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন, একুশ দফার রূপায়ণ, তৃতীয় ব্লক আন্দোলন, তমদ্দুনের বিকাশ, ইসলামী রাষ্ট্রনীতি, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, শ্রেণী সংগ্রাম, বস্তুবাদ ও আল্লাহ্র অস্তিত্ব, নয়া জামানার গান, নারী প্রগতি ও নারীর মর্যাদা, তওহীদ, ইজতিহাদ, আতিশয্যের শেষ পরিণতি, Economic Problem of Man and Its Islamic Solution, ইসলামী শাসনতন্ত্রের চৌদ্দ দফা, সাংস্কৃতিক সংগঠনের রূপরেখা, ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম, কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম, Historical Materialism and Islam, আদর্শ শাসক হযরত উমর (রা) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকার চাইতে মজলিসের চিন্তাধারার পরিপোষক যেইসব পুস্তক-পুস্তিকা, বিশেষভাবে কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি সৃজনশীল পুস্তক-পুস্তিকা বাহির হইতেই প্রকাশিত হয় অধিক। তমদ্দুন মজলিসের এই সব পুস্তক-পুস্তিকা একদা এদেশের তরুণ সমাজে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তাহা এক ঐতিহাসিক সত্য।

প্রকাশনা ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিসের আরেকটি বড় দিক ছিল সাপ্তাহিক সৈনিক এবং মাসিক দ্যুতি। ১৯৪৮ খৃ. ১৪ নভেম্বর প্রকাশকাল হইতেই সাপ্তাহিক সৈনিক এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সৈনিক যে নির্যাতিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শের আলোকে নিরাপোস ভূমিকায় অবতীর্ণ, তাহা সৈনিক-এর প্রতিটি সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও অন্যান্য রচনায় সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিত। সৈনিক-এ সংবাদ, নিবন্ধ, দেশ-বিদেশের ঘটনাবলীর উপর নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় প্রভৃতি ছাড়াও কবিতা, ছড়া, ব্যঙ্গ কবিতা, গল্প, নাটিকা, রম্য রচনা প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হইত। মাঝে মাঝেই সমসাময়িক ঘটনাবলীর উপর ব্যংগ চিত্র (কার্টুন) ইত্যাদিও মুদ্রিত হইত। সৈনিক-এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল ইহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। প্রথম দিকে মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নাম ছাপা হইত। ইহার দুই-তিন বৎসর পরই মুদ্রাকর প্রকাশক হিসাবে মোহাম্মদ আবদুল গফুরের নাম ছাপা হইত। সম্পাদক হিসাবে প্রথমদিকে অল্পদিন শাহেদ আলী ও এনামুল হকের নাম ছাপা হইত। পরে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হন শাহেদ আলী। ইহার পর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হিসাবে আবদুল গফুরের নাম ছাপা হইত। ইহারা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে যাঁহারা সৈনিক-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁহাদের মধ্যে হাসান ইকবাল, মফিজউদ্দিন আহমদ, দীদার আলম খান, ফারুক মাহমুদ, মোহাম্মদ নূরুল হক প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সৈনিক বহুবার বন্ধ হইয়া যায়। সৈনিক অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে বারবার বন্ধ হইয়া গেলেও আদর্শের প্রশ্নে কখনও আপোস করে নাই। সৈনিক-এর আদর্শের প্রশ্নে এই নিরাপোস ভূমিকার কারণে তদানীন্তন কবি-সাহিত্যিকগণ বিনা সম্মানীতেই সৈনিক-এ লিখিতেন। সৈনিক-এর পরিচালনা ও সম্পাদনার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা যেমন কখনও কোন সম্মানী গ্রহণ করিতেন না, তেমনি সৈনিক-এ যাঁহাদের রচনাদি ও কার্টুন ইত্যাদি ছাপা হইত সেইসব কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীরাও কখনও সম্মানী লইতেন না। তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে প্রকাশিত মাসিক দ্যুতি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। এই সাহিত্য পত্রিকাখানি মাত্র দুই বৎসর স্থায়ী হইলেও ইহা তদানীন্তন সাহিত্যিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। নাট্যকার আসকার ইব্নে শাইখ "ওবায়েদ আসকার" এই নামে মাসিক দ্যুতি-র সম্পাদনা করিতেন। সম্পাদনা কর্মে তাঁহাকে সহযোগিতা করিতেন মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল প্রমুখ।

সৈনিক বা দ্যুতি লেখক ও শিল্পীদের কোন সম্মানী না দিলেও এই পত্রিকা দুইটিতে দেশের নামকরা প্রবীণ-নবীন বহু শিল্পী-সাহিত্যিকের শিল্পকর্মই স্থান পাইত। সাপ্তাহিক সৈনিক-এর হেডপিস ছিল শিল্পী কামরুল হাসানের আঁকা, আর সৈনিক-এ নিয়মিত কার্টুন দিতেন দেশের প্রবীণতম কার্টুনিস্ট দোপেয়াজা ওরফে কাজী আবুল কাসেম। সৈনিক ও দ্যুতি-তে যেইসব কবি-সাহিত্যিকের লেখা নিয়মিত ছাপা হইত তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, আবুল কাসেম, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, মাহবুব-উল আলম, আবুল হাশিম, শাহাদৎ হোসেন, মোহাম্মদ আজরফ, ফররুখ আহমদ, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, শাহেদ আলী, আসকার ইব্নে শাইখ, কাজী দীন মুহম্মদ, কাজী গোলাম আহমদ, জাহানারা আরজু, মুহম্মদ আবূ তালিব, মীর শামসুল

হুদা, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, চৌধুরী লুৎফর রহমান, চৌধুরী ওসমান, মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, রওশন ইজদানী, আবদুল হাই মাশরেকী, তালিম হোসেন, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, নূরুন নাহার, দৌলতুন্নেছা খাতুন, হাসান জামান, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, আজীজুর রহমান, সানাউল্লাহ নূরী, মাযহারুল ইসলাম, রায়হান শরীফ, শেখ সাইফুল্লাহ, আবদুল গফুর, মোস্তফা কামাল, মাহফুজুল হক, ফারুক মাহমুদ, আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, আবুল খায়ের মুসলেহউদ্দিন, হাসান ইকবাল, মফিজউদ্দিন আহমদ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, প্রজেশ কুমার রায়, সরদার জয়েনউদ্দিন, জহুরুল আলম, ফেরদৌস খান, চেমন আরা, মমতাজ বেগম, সায়েমা চৌধুরী, আনোয়ারা বেগম, তরীকুল আলম, কায়সুল হক, খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম, মনোমোহন বর্মন, হেদায়েতুল ইসলাম খান, বজলুর রহমান, মহিউদ্দিন খান, মোবায়েদুর রহমান, আখতার-উল আলম প্রমুখ। ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রধানত সৈনিক ও দ্যুতি-তে প্রকাশিত রচনাদির মাধ্যমেই সাহিত্য জগতে প্রথম খ্যাতি লাভ করেন।

সাপ্তাহিক সৈনিক ও মাসিক দ্যুতি তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি মহলে যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয় তাহার কারণ গতানুগতিক সাংবাদিকতা নয়, একটি আদর্শবাদী আন্দোলনের মুখপত্র হিসাবে পত্রিকা দুইটি আগাগোড়া একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করিয়া যায়, বিশেষ করিয়া এই ব্যাপারে সাপ্তাহিক সৈনিক-এর ভূমিকা ছিল একই সাথে ইসলামী নবজাগরণ ও সমাজ বিপ্লবের দিশারীরূপে। এই ভূমিকার প্রতিফলন দেখা যাইত সৈনিক-এর বিভিন্ন বিশেষ সংখ্যায়। ঈদ, স্বাধীনতা দিবস ও শহীদ দিবস প্রভৃতি দিবসের বিশেষ সংখ্যার পাশাপাশি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সৈনিক-এর হযরত উমর সংখ্যা, আবু জর গিফারী সংখ্যা, জমিদারী-বিরোধী সংখ্যা, দুর্নীতি বিরোধী সংখ্যা, দাংগা বিরোধী সংখ্যা এইসব বিশেষ সংখ্যায় ইসলামের আদর্শের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যার সাথে সাথে নির্যাতিত মানবতার মুক্তিতে ইসলামের বিশেষ ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হইত।

সাপ্তাহিক সৈনিক-এ শুধু আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে নিয়মিত রচনা প্রকাশ পাইত না, এশিয়া ও আফ্রিকার নির্যাতিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের উপরও নিয়মিত নিবন্ধাদি প্রকাশিত হইত।

মোটের উপর তমদ্দুন মজলিস ইহার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পুস্তক-পুস্তিকা ও সংবাদপত্রসমূহের মারফত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী নবজাগরণের ক্ষেত্রে যে এক অনন্য পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে সক্ষম হয় ইহা এক বাস্তব সত্য। এদেশের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে এই প্রভাব এখনও বিভিন্ন পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাপ্তাহিক সৈনিক, ঢাকা; (২) মাসিক দ্যুতি, ঢাকা; (৩) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দূ, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ খৃ.; (৪) একমাত্র পথ, অধ্যাপক আবুল কাসেম ও শাহেদ আলী, ১৯৪৯ খৃ. ঢাকা; (৫) তমদ্দুন মজলিসের গঠনতন্ত্র (১৯৪৯, ১৯৬৫, ১৯৮৫); (৬) সাংস্কৃতিক সংগঠনের রূপরেখা, অধ্যাপক আবদুল গফুর (মুক্তি প্রকাশনী, ৬১/২, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা, জুলাই ১৯৭৭); (৭) পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি ঃ বদরুদ্দীন উমর (১৯৭০ খৃ.); (৮) জাতীয় রাজনীতি, অলি আহাদ; (৯) ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বশীর আল হেলাল, বাংলা একাডেমী; (১০) পাণ্ডুলিপি, ৫ম খণ্ড, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক আনিসুজ্জামান (১৩৮২ বাং)।

অধ্যাপক আবদুল গফুর

তরাইনের যুদ্ধ ঃ ১১৯১ ও ১১৯২ খৃ., ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ। গযনী রাজবংশের পতনের পর গোরী বংশীয় গভর্নর মুইয্যুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাম ওরফে শিহাবুদ-দীন বা মুহাম্মাদ গোরী লাহোর দখলের (১১৮৬) মাধ্যমে পাঞ্জাবে স্বীয় কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলে তাঁহার ভারত আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজ তখন দিল্লী ও আজমীরের শাসনকর্তা। অবশ্য গহড়বাল বংশীয় রাজা জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্র ছিলেন ভারতের বিক্রমশালী নরপতি। পৃথ্বীরাজকে তিনি ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না। মুহাম্মদ গোরী ১১৯০-১১৯১ খৃ. শীতকালে পাঞ্জাব সীমান্ত অতিক্রম করিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইলে ২,০০,০০০ অশ্বারোহী ও ৩,০০০ হস্তীসহ রাজপুত সামন্ত রাজাদের সহায়তায় বিরাট বাহিনী লইয়া পৃথ্বীরাজ তাঁহার অভিযান প্রতিহত করেন। জয়চাঁদ নিরপেক্ষ থাকেন। থানেশ্বরের সন্নিকটে তরাইনে উভয় পক্ষের সৈন্যদল সম্মুখ সমরে (১১৯১) লিপ্ত হয়। মুহাম্মাদ গোরী যুদ্ধে মারাত্মক রকম আহত হইয়া গযনী প্রত্যাবর্তন করেন। এই পরাজয় তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করিতে পারে নাই। তিনি বিপুল সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া পরবর্তী বৎসর (১১৯২) পুনরায় তরাইনে রাজপুত বাহিনীর সম্মুখীন হন। এইবার উন্নততর রণনৈপুণ্য ও সমর পরিচালনা কৌশল-গুণে তাঁহার নিকট রাজপুতদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে বন্দী ও নিহত হন। উত্তর-ভারতে মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য মুহাম্মাদ গোরী স্বীয় তুর্কী সামরিক অফিসার ও আমীর-ই আযুর কুতবুদ-দীন আয়বাককে বিজিত দিল্লী ও আজমীরের কর্তৃত্বভার অর্পণ করেন। অতঃপর পৃথ্বীরাজের স্বগোত্রীয়দের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৬৯৪

তা' (ت) ঃ আরবী হলফুল-হিজা (দ্র.)-এর তৃতীয় এবং উর্দূ-এর ৪র্থ অক্ষর। আবজাদী (দ্র.) হিসাব মতে ইহার মান ৪০০।

(দা. মা. ই.) /ড. আবদুল জলীল

তা' (ط=ظ) ঃ আরবী হুরূফ-ই হিজা'-র ১৬তম, ফারসীর, ১৯তম এবং উর্দূর ২২তম অক্ষর। উর্দূতে ইহার উচ্চারণ ত-য় এবং আরবী ও ফারসীতে তা'। ইহাকে তা'-ই হুত্তী, তা'-ই মুহমালা এবং তা'-ই গায়র মানকূত (বিন্দুবিহীন তা')-ও বলা হয়। আবজাদী (দ্র.) হিসাব অনুযায়ী ইহার সংখ্যা নয় (৯)। ইল্‌মে কিরা'আত-এর দিক হইতে ইহা হুরূফে মাহজূরার অন্তর্ভুক্ত। ফারসী ভাষায় 'তা' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে লোভী এবং মহিলাদের সহিত মেলামেশা করে (ফারহাংগ-ই আনান্দরাজ)। কখনও কখনও বরং তামীম বংশের কোন কোন গোত্র তা (ت) এবং দাল (د) প্রভৃতির স্থলে তা (ط) উচ্চারণও লিপিবদ্ধ করিয়া থাকে (দ্র.) তাজুল-আরূস ও Lane ,শিরো.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসানুল-'আরাব; (২) ফারহাংগ-ই আনান্দরাজ (ফারসী); (৩) ফারহাংগ-ই আসফিয়া (উর্দূ); (৪) নূরুল-লুগাত (উর্দূ)।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ড. আবদুল জলীল

তাআব্বাতা শার্‌রান (تابط شرا) ঃ [সে একটি অকল্যাণকর জিনিস (তরবারি) বগলে লইল] এক আরব কবির উপনাম

(nickname)। তিনি ছিলেন ফাহ্‌ম গোত্রের ছাবিত ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন সুফ্‌য়ান, পুরাকাহিনীতে বিখ্যাত প্রাচীন আরব বেদুঈন কবি ও বীর পুরুষ। তাঁহার এই উপনাম সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র হইতে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

তিনি তাঁহার বগলের নীচে 'অনিষ্ট' (شر অর্থাৎ তরবারি) বহন করিতেন কিংবা একটি ছুরি (হামাসা) অথবা একটি ভেড়া-যাহা গূল (غول দৈত্য)-রূপে প্রমাণিত হয় অথবা বহন করিতেন বিষাক্ত সর্প, পূর্ণ একটি চামড়ার থলি (আগানী)। কথিত হয়, তাঁহার মাতাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "ছাবিত কোথায়?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "জানি না, বগলে একটি شر ধারণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।" এই উক্তি হইতেই কবি ছাবিত-এর উপনাম تابط شرا -এর উৎপত্তি।

তাঁহার মাতা সম্বন্ধেও নানা বক্তব্য রহিয়াছে। একটিতে (Fresnel দ্র.) জানা যায়, তিনি একজন নিগ্রো মহিলা ছিলেন। আগানীর বক্তব্য মতে কবির মাতা ছিলেন ফাহ্‌ম উপজাতির আমীনা নাম্নী মহিলা, যিনি পরবর্তী কালে হুযায়ল গোত্রের আবূ কাবীর-কে বিবাহ করেন। আবূ কাবীর আমীনার পূর্ব-স্বামীর ঔরসজাত সন্তান কবি তা'আব্বাতা শাররানকে হত্যার সংকল্প করে, কারণ তিনি আজীবন বানূ হুযায়ল-এর (ও বানূ বাজীলার) শত্রু ছিলেন। বানূ বাজীলার সহিত সংঘর্ষে তাহাদের ভূখণ্ডের নুমার নামক পর্বতের উপর কবি মৃত্যুবরণ করেন (য়াকূত, মুশ্‌তারিক, পৃ. ৪২১)। Baur (তু. গ্রন্থপঞ্জী) কর্তৃক উদ্ধৃত ইব্‌ন কুতায়বার বক্তব্যে জানা যায় যে, এই কবি সমসাময়িক ছিলেন নাওফাল ইব্‌ন মুআবিয়ার যিনি ইসলাম-পূর্ব ষাট এবং ইসলামোত্তর ষাট বৎসর জীবিত ছিলেন বলিয়া ধারণা করা হয়। কিন্তু তাআব্বাত শাররান-এর জীবন সম্বন্ধে এবং তাঁহার কবিতাসমূহ হইতে যতটুকু লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহাতে সর্বত্র প্রাচীন আরব জাহিলিয়ার চেতনার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক আরব যুগের ভবঘুরে, দস্যু ও knight-এর সকল ঐতিহ্যগত সনাতন বৈশিষ্ট্য তাঁহার জীবনে ও কবিতায় প্রতিফলিত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তিনি তাঁহার যুদ্ধের সাথী (আম্‌র ইব্‌ন মার্‌রাকসহ) শানফারা-র মৃত্যুতে একটি শোকগাঁথা রচনা করেন (আগানী)। নিহত আত্মীয় সম্পর্কে লিখিত তাঁহার দীর্ঘতর কবিতা চতুষ্টয়ের মধ্যে দীর্ঘতম ও সুন্দরতম কবিতাটি কবি Goethe-কে একই স্টাইলে কবিতা রচনা করিতে উৎসাহিত করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ তাম্‌মাম, হামাসা, পৃ. ৩৩ প., ২৪৪ প., ৩৮২ প., তু. অনু. Ruckert; (২) আগানী, ১৮ খ, ২০৯-২১৮; (৩) কায্‌বীনী, সম্পা. Wustenfeld, ২খ, ৩১, ৫৬-৫৮, ৬১; (৪) ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবুশ-শি'র (تشعر), পৃ. ১৭৪ প., ৪২২ প., ৪৩৭; (৫) আল-কারীয়ূস, গাওদাতুল-আরাব, পৃ. ৭৪ প.; (৬) Diwan d. Hudhailiten, ed. Kosegarten, p. 247 প.; (৭) de Sacy., Schol. Zu Hariri, p. 416; (৮) Anthol., p. 344; (৯) Fresnel, Prem., lettre sur L'histoire des Arabes, p. 96 প.; (১০) Freytag, Carmen arab., Gottingen 1814; (১১) Goethe, Noten zum w. o. Diwan; (১২) Basset, La poesie arabe, p. 73; (১৩) Brockelmann, G.A.L.; i. 25; (১৪) Lyall, Four Poems of Taabbata Sharra, T.R.A.S., 1918; (১৫) Gustay Baur, in the Z.D.M.G.x. 74 প.

H. H. Brau (E. I[1] /মুহা রুহুল আমীন রোকন

তা'আম (طعام) ঃ (আ), আহার্য; আহার করাও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। শুকরিয়ার সহিত আহার গ্রহণকারী ধৈর্যের সহিত সাওম (রোযা) পালনকারীর ন্যায়। তাই খাদ্য গ্রহণের বিষয়টিও শারীআতের বিধান নিয়ন্ত্রিত। নীতিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ ইহার আদাব ও নিয়মাবলী সংকলন করিয়াছেন। অতি বেশি সাওম পালন করা নিষিদ্ধ। কেননা ইহার ফলে মানুষ তাহার ধর্মীয় কর্তব্য পালনের শক্তি হারাইয়া ফেলে। কুরআন মাজীদ ঘোষণা করে যে, পৃথিবীর যাবতীয় পবিত্র বস্তু আহার করা যাইতে পারে। ওয়াহ্‌য়ির সূচনাকালে অবতীর্ণ সূরা ৩৬ (ইয়াসীন) ঃ আয়াত ৩৩।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ .

"তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত যমীন, যাহাকে আমি সজীব করি এবং যাহা হইতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, যাহা তাহারা ভক্ষণ করে"-এর আলোকে উদ্ভিজ্জ ফসলও মানুষের একটি উপযোগী খাদ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। মন্দ বস্তু আহার করা নিষিদ্ধ।

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ .

"সে (নবী) তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে এবং অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে।"

ইমাম শাফি'ঈ (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে মন্দ বস্তু বলিয়া এমন বস্তুসমূহ বুঝান হইয়াছে, যেইগুলি লোকেরা সাধারণত ও স্বভাবগতভাবে খায় না।

আরও কিছু বস্তু রহিয়াছে যেইগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ। যেমন মৃত জন্তু (দ্র. মায়তা), রক্ত, শূকরের গোশত এবং যেই সকল প্রাণী দেবতার নামে বলি দেওয়া হয়।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ.

"আল্লাহ তো তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যবেহকালে যাহাতে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যের নাম লওয়া হইয়াছে" (১৬ ঃ ১১৫)।

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত 'মায়তা' শব্দ দ্বারা প্রথমত এইরূপ মৃত প্রাণী বুঝানো হইয়াছে, যাহা স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। দ্বিতীয়, এইরূপ জন্তুকেও উদ্দিষ্ট করা হইয়াছে, যাহার রক্ত প্রবাহিত করা হয় নাই। অন্য একটি আয়াতে নিষিদ্ধ রক্তের সংজ্ঞায় "প্রবাহিত রক্ত" শব্দটি উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতের মাধ্যমে আরবদের মধ্যে প্রচলিত রক্ত পান বা আহারের প্রথাকে রহিত করা হইয়াছে।

ইমাম তাবারী বলেন, গোশততুল্য রক্ত (যেমন কলিজা ও যকৃৎ) ও যবেহকৃত প্রাণীর গোশ্‌তের অন্তর্ভুক্ত রক্ত হালাল। উক্ত রক্ত সম্বন্ধে ইসলামে ততটুকু কঠোরতা নেই, যতটুকু য়াহূদী ধর্মে রহিয়াছে।

মায়তা শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, কণ্ঠনালী চাপিয়া হত্যা করা জন্তু, দণ্ডাঘাতে হত্যা করা জন্তু, উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া মরা জন্তু, অন্য জন্তুর শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং শিকারী প্রাণীর হাতে মৃত জন্তুও মায়তা-র অন্তর্ভুক্ত।

যেই সকল বস্তু অকাট্য দলীলের মাধ্যমে হারাম ঘোষিত হয় নাই, ফুকাহায়ে কিরাম সেইগুলির স্তরবিন্যাস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের একটি মূলনীতি ছিল, যেই সকল বস্তু মানুষ সাধারণত আহার্য হিসাবে গ্রহণ করে সেইগুলি হালাল। কোন অপরিচিত প্রাণী আরবদিগকে দেখানো হইলে তাহারা যদি সেই প্রাণীটিকে কোনও হালাল প্রাণী হিসাবে আখ্যায়িত করে তবে তাহাও খাওয়া যাইতে পারে। তাহারা যদি সেই প্রাণীটিকে কোন হালাল প্রাণী হিসাবে আখ্যায়িত

করিতে সমর্থ না হয় তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, কোনও হালাল প্রাণীর সহিত সেই প্রাণীর সামঞ্জস্য আছে কি না। সামঞ্জস্য থাকিলে তাহা হালাল বলিয়া বিবেচিত হইবে, নতুবা নহে।

হারাম প্রাণীর মধ্যে রহিয়াছে শিকারী পাখী ও হিংস্র প্রাণী। তাহা ছাড়া যেই সকল প্রাণী পেটে ভর করিয়া চলে এবং যেই সকল প্রাণী নিধনের জন্য মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেইগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বায়দাবী স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার প্রভাব রহিয়াছে। উল্লিখিত সকল বিধান অকাট্য দলীল (নাস্‌স) দ্বারা প্রমাণিত নহে। তাই এই সকল বিধানের বিশ্লেষণে ফিক্‌হবিদদের মতভেদ রহিয়াছে।

গৃহপালিত গাধা ও খচ্চর খাওয়া বৈধ নহে। কোনও কোনও প্রাণী হালাল হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পাওয়া যায়। যেমন ইমাম শাফিঈ (র)-র মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া হালাল, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব অনুযায়ী নিষিদ্ধ। ইমাম মালিক (র) ইহাকে স্পষ্টভাবে হারাম বলেন নাই, কিন্তু অপসন্দ করিয়াছেন। কেননা ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হইলে সৈনিকদের জন্য ঘোড়া পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িবে।

হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) গুইসাপের গোশত গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্য কাহাকেও ইহার গোশত খাইতে তিনি নিষেধ করেন নাই। টিড্‌ডী (পঙ্গপাল) খাওয়া বৈধ। ইমাম মালিক (র)-এর মতে যেই সকল প্রাণী পানির ভিতরে অথবা উপরে বাস করে সেইগুলি হালাল কিন্তু অন্যদের মতে কেবল মাছই হালাল, অন্যগুলি নহে।

সকল হালাল প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া যাইতে পারে, তবে শর্ত এই যে, প্রাণীটিকে নিয়ম মুতাবিক যবেহ করিতে হইবে। যবেহ করিয়া হইলে প্রাণীটিকে কিবলামুখী শোয়াইয়া আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করত (বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া) তাহার গলায় ছুরি চালাইবে। ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, মুসলিমদের যবেহ কার্য আল্লাহ্‌র নামেই হইয়া থাকে, চাই আল্লাহ্‌র নাম মুখে উচ্চারণ করুক অথবা ভুলিয়া যাউক। কিন্তু ফিক্‌হবিদদের ইহাতে মতভেদ রহিয়াছে। প্রাণীর গলায় বড় বড় চারিটি রগ থাকে–হানজারা (শ্বাসনালী), মুরী (খাদ্যনালী) ও কণ্ঠের দুই পার্শ্বে দুইটি রক্তবাহী শিরা। ইমাম মালিক (র)-এর মতে চারিটিই কর্তন করা আবশ্যক। ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, হানজারা ও মুরী কর্তন করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যেই কোনও তিনটি নালী কর্তন করিতে হইবে। ইহাকে যাকাত বলা হয় অর্থাৎ নিয়ম মুতাবিক যবেহ।

শারীরতত্ত্ব অনুযায়ী উটের দেহ ও গলার সংযোগস্থলে কাটা উচিত। ইহাকে নাহ্‌র (দ্র.) বলা হয়। নাহ্‌র করিবার নিয়ম হইল যে, উটের পদ চতুষ্টয় বাঁধিয়া দিবে এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় তাহার গলা ও দেহের সংযোগস্থলে ধারালো অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া ভালভাবে নাড়াইবে, যাহাতে সেইখানে অবস্থিত রগের গিঁটগুলি উত্তমরূপে কাটিয়া যায়। রক্ত নিঃশেষ হওয়ার পর উট এমনিতেই ঢলিয়া পড়িবে। তবে যদি অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় উটকেও শোয়াইয়া যবেহ করা হয় তাহাতেও দোষ নাই। কিন্তু উটের জন্য উত্তম পন্থা নাহর।

মহিলাদের জন্য নিজ হাতে যাব্‌হ করা উত্তম এবং কোনও "আহ্‌লে কিতাব" (য়াহূদী ও নাসারা)-এর সাহায্য গ্রহণ না করাই উত্তম। যদি কোনও প্রাণী গর্তে বা কূপে পড়িয়া যায় এবং যবেহ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে তবে যেই পন্থায় প্রাণীর দেহ হইতে সমস্ত রক্ত নির্গত করা সম্ভব সেই পন্থা অবলম্বন করা বৈধ। আহ্‌লে কিতাব-এর হাতে যকেহকৃত হালাল প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল যদি তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর নামে যবেহ না করিয়া থাকে। মুশরিক (পৌত্তলিক) ও অগ্নিপূজকদের হাতে যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ নহে। মাছ যবেহ করার প্রয়োজন নাই। মাছ ধরাই যবেহ-এর শামিল। যেই মাছ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করিবার পর পানির উপর ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা খাওয়া মাকরূহ। কিন্তু ইমাম মালিক (র) তাহাও হালাল বলিয়া অভিমত পোষণ করেন। হাদীছে আছে যে, একবার সমুদ্র উপকূলে একটি বিরাট মৃত মাছ পাওয়া যায়। মুসলিম সেনাবাহিনী ইহা খাইয়া দীর্ঘ এক মাস অতিবাহিত করে। এই বিশাল মৎস্যটি পানির উপরে উঠিয়া মরিয়া যায়। তখন সাহাবায়ে কিরাম-এর এতদসম্পর্কিত বিধান জানা ছিল না। তাঁহারা "অপারগতার বিধান" অনুসারে মৎস্যটি নিয়া খাইলেন। রাসূলুল্লাহ (স) মৎস্যটির একটি টুকরা আস্বাদন করিয়া উহার বৈধতা বর্ণনা করিয়া দিলেন (আবূ দাউদ, কিতাবুল-আতইমা)।

মৃত পড়িয়া থাকা টিড্‌ডী খাওয়া উচিত নহে। টিড্‌ডী মারিবার নিয়ম এই যে, তাহার মস্তক পৃথক করিয়া দিবে অথবা জীবিত অবস্থায়ই আগুনে ভাজিয়া লইবে।

শিকারের অনুমতি হইতে একাধিক বিধান নির্ণিত হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেই সকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে এইখানে সেইগুলির বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। শিকারী ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করিবার সময় অথবা শিকারী প্রাণী ছুটাইবার সময় যদি আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে তবে সেই শিকারকৃত পাখি বা পশুর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল। শিকারী কুকুর যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হয়, তবে তৎকৃত শিকার কেবল তখনই খাওয়া যাইতে পারে, যখন শিকারকৃত প্রাণীটিকে মৃত্যুর পূর্বে যবেহ করা সম্ভব হয়। কোন মুসলমান যদি অগ্নিপূজক কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার করে তবে সেই শিকার হালাল। কিন্তু অগ্নিপূজক যদি মুসলমান কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের দ্বারা শিকার করে তবে তাহা অপবিত্র তথা হারাম। কেননা অগ্নিপূজকগণ শিকারী কুকুর ছুটাইবার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না এবং তাহারা যবেহ করে না। মৎস্য যদি কোন অগ্নিপূজকও শিকার করে তবে তাহা হালাল। অনন্যোপায় হইলে হারাম বস্তু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহা হইতে আরও একটি মাসআলার উদ্ভব হয় যে, এমতাবস্থায় পেট ভরিয়া হারাম খাদ্য খাইবে না, এই পরিমাণ খাইবে যাহাতে সে হালাল খাদ্য পাওয়া যায় এমন স্থানে পৌঁছিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, হারাম খাদ্য খাওয়ার চাইতে অন্য কাহারও নিকট হইতে খাদ্য চাহিয়া খাওয়া উত্তম।

আল্লাহভীরু লোকেরা খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। তাঁহারা বলেন, খাদ্য বৈধ পন্থায় উপার্জন করা উচিত। যেই অর্থ দ্বারা খাদ্য ক্রয় করা হয় তাহাও শারী'আতের বিধি মুতাবিক উপার্জন করা চাই। কেহ কেহ এতটুকুও জাইয বলিয়া স্বীকার করেন না যে, তাহার শিশুকে কোন মহিলা দুই-চারি মিনিট দুধ পান করান। কেননা তাহার দুধ সন্দেহযুক্ত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। কেহ কেহ কেবল এইজন্যই নিজেকে কটাক্ষের পাত্রে পরিণত করিয়াছে যে, প্রথমে তাহারা দাওয়াত গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর খতাইয়া বেড়াইতে থাকে যে, খাবার হালাল কি না। তাই এই বিধি নির্ধারিত হয় যে, অন্যের ঘরে খাইতে যাইয়া (তাহার হালাল বা সন্দেযুক্ত হওয়া সম্পর্কে) প্রশ্ন তুলিবে না। মেহমান

যদি এইরূপ প্রশ্ন হইতে বিরত থাকিতে না পারে তাহার জন্য দাওয়াতে অংশগ্রহণ করাই উচিত নহে।

আদাব ও ভদ্রতার সহিত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তাই পথিমধ্যে আহারে রত এমন এক ব্যক্তিকে (হাদীছে) সতর্ক করা হইয়াছে। আহারের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়। মানুষের জন্য ডান হাতে এবং বসিয়া আহার গ্রহণ করা উচিত, শয়ন করিয়া নহে। খাবার নিজের সামনে হইতেই খাওয়া চাই। তবে ফলমূল নিজের ইচ্ছামত তুলিয়া খাওয়া যায়। পূর্বেকার যুগে এমন কি বর্তমানেও কোনও কোনও এলাকায় সবাই একই থালা হইতে আহার করিয়া থাকে (কুরআনে এই বিষয়ে এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে যে, সবাই একত্রেও খাইতে পারে কিংবা একা একাও খাইতে পারে)।

ইমাম গাযালী (র) দস্তরখানে খাওয়ার যেই সকল আদাব বর্ণনা করিয়াছেন সেইগুলি বুদ্ধি ও বিবেকের উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন, একাকী খাওয়ার সময় এই সকল আদাবের প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর, যাহাতে সভাস্থলে খাইতে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে না হয়। খাওয়ার পর অঙ্গুলিগুলি ধোয়ার পূর্বে চুষিয়া লওয়া ভাল। ভোজসভার লোকজন বসিয়া থাকিলে চিলমচী ডান দিক হইতে ব্যবহার করিবে। খাওয়া শেষ হওয়ার পর আল-হামদু লিল্লাহ বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করা উচিত। যেই খাদেম খাবার তৈয়ারি করে এবং পরিবেশন করে তাহাকে খাওয়ায় শরীক করা ভাল।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাবী (র) 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা' গ্রন্থে আদাবে মাআশ অধ্যায়ে পানাহারের আদাব সম্পর্কিত আলোচনায় বলেন, স্বভাব-চরিত্রে ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীর এমন সকল অধিবাসী ইহাতে একমত যে, যবহ ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে মৃত প্রাণীর গোশ্‌ত, পচা গোশ্‌ত, ঘৃণ্য নিকৃষ্ট হিংস্র স্বভাবের প্রাণীর গোশ্‌ত ভাল নহে; ইহা খাওয়া হইতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কুরআন কারীমে এতদ্‌সম্পর্কীয় একটি মূলনীতি রহিয়াছে ঃ

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالاً طَيِّبًا "আল্লাহ তোমাদিগকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়াছেন তাহা হইতে ভক্ষণ কর" (৫ ঃ ৮৮)।

অনুরূপভাবে খাওয়ার বস্তু দস্তরখানার উপর কোনও পাত্রে রাখিয়া খাওয়া সকলের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় কাজ। খাদ্য খাইতে শুরু করার পূর্বে হাত-মুখ ধৌত করিয়া নিবে। এইরূপ কাজ হইতে বিরত থাকা চাই যাহার ফলে তাহার সম্পর্কে লোভী হওয়ার ধারণা জন্মিতে পারে এবং বেহায়াপনার পরিচয় পাওয়া যায় এমন কোনও কাজ করা ঠিক নহে; এবং এমন কোনও বিষয়ও যেন প্রকাশ না পায় যাহা উপস্থিত সকলের ঘৃণার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। হাদীছ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থে "কিতাবু'ল-আকলি ওয়া'শ- শুরবি" নামক অধ্যায়ে পানাহারের ইসলামী নিয়মাবলী ও আদাবসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে (আরও দ্র. গিযা')। কুরআন মাজীদ হইতে প্রমাণিত যে, মানুষের চরিত্রে খাদ্যেরও গভীর প্রভাব পড়িয়া থাকে (দ্র. ২৩ ঃ ৫১)। পানাহার সম্পর্কে কুরআনের বিধান জানিতে হইলে দ্রষ্টব্য ঃ ৫ ঃ ৩, ৪২, ৪৭; ৬ ঃ ১১৯ প.; ৭ ঃ ৩১; ১০ ঃ ২৪; ১৬ ঃ ৫, ১৪; ২০ ঃ ৮১; ২২ ঃ ৩৬; ২৩ ঃ ১৯; ২৪ ঃ ৬১; ৩৬ ঃ ৩৩; ৪৭ ঃ ১২; ৪৯ ঃ ১২ আয়াত।

ইমাম গাযালী (র)-ও স্বীয় গ্রন্থ ইহয়া' 'উলুমি'দ-দীন-এ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (দ্র. ৩খ, ৬৮ প. ও ২খ, ২) এবং খাওয়ার পরের ইসলাম নির্দেশিত আদাবসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. ২খ, ২প. ; ৩খ, ৬৮ প.)।

ই. বি. [ও দা. মা. ই.]/আহমদ মায়মুন

আত-তা'ই লি-আমরিল্লাহ (الطائع لامر الله) ঃ অথবা আমর লিল্লাহ, 'আবদু'ল-কারীম ইবনু'ল-ফাদল একজন 'আব্বাসী খলীফা। তিনি ৩১৭/৯২৯-৯৩০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ যু'ল-ক'দা, ৩৬৩/৫ আগস্ট, ৯৭৪ তারিখে তাঁহার পিতা খলীফা আল-মুতী'-র সিংহাসনচ্যুতির পর তাঁহাকে আমীরু'ল-মু'মিনীনরূপে ঘোষণা করা হয়। তাঁহার মাতার নাম ছিল উৎব। তিনি আত্-তা'ই'-এর মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। আত্-তাই' খলীফা হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন নাই। ইবনু'ল-আছীর যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন (৯খ, ৫৬) যে, আত-তা'ই' তাঁহার রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিবার মত যথেষ্ট কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না। কেবল বিভিন্ন পদে নিয়োগের সনদ প্রদান, শোকবাণী প্রদান এবং এই জাতীয় অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতাসম্পন্ন কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হিসাবেই তিনি ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রথম দিকে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বুওয়াহী বংশীয়গণ [দ্র.], কিন্তু তাঁহাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন 'আদুদ-দাওলা [দ্র.]; তিনি খলীফার শ্বশুর ছিলেন। শাওয়াল ৩৭২/মার্চ ৯৮৩ মাসে তাঁহার ইনতিকাল করিবার পর তাঁহার পুত্রগণ নিজেদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ করেন। তাঁহাদের একজন ছিলেন বাহা'উ'দ-দাওলা [দ্র.]। তিনি একবার আর্থিক সংকটে নিপতিত হইয়া তাঁহার সৈন্যদের বেতন পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার প্রভাবশালী উপদেষ্টা আবু'ল-হাসান ইবনু'ল-মু'আল্লিম খলীফাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার খাজাঞ্চীখানা অধিকার করিবার জন্য বাহা'উ'দ-দাওলাকে প্ররোচিত করেন (শা'বান ৩৮১/অক্টোবর-নভেম্বর ৯৯১)। খলীফার সহিত নির্ধারিত সাক্ষাতের সময় বুওয়ায়হীগণ তাঁহাদের অনুচরবর্গের এক বিরাট দলসহ আগমন করে। এক পর্যায়ে বাহা'উ'দ-দাওলার আদেশে তাঁহার অনুচরগণ নিশ্চিন্তচিত্ত খলীফা আত-তাই'কে তাঁহার সিংহাসন হইতে জোরপূর্বক টানিয়া নামায়। অতঃপর খলীফাকে বাহা'উ'দ দাওলার বাড়িতে লইয়া বন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহার পর খলীফার চাচাত ভাই (Cousin) আবু'ল-আব্বাস আহমাদ খলীফার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তিনি আল-কাদির [দ্র.] নাম গ্রহণ করেন। রাজাব ৩৮২/সেপ্টেম্বর ৯৯২ মাসে পদচ্যুত খলীফাকে আল-কাদিরের প্রাসাদে আসিবার অনুমতি দেওয়া হয় এবং সেইখানে তাঁহার সহিত বেশ ভাল ব্যবহার করা হয়। তিনি ১ শাওওয়াল, ৩৯৩/৩ আগস্ট, ১০০৩ তারিখে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, ৩; (২) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg, viii-ix, see Index; (৩) ইব্‌ন খালদূন, আল-'ইবার, ৩খ, ৪২৮, ৪৩৬; (৪) ইব্‌নু'ত-তিক্‌তাকা, আল-ফাখরী, সম্পা. Derenburg, p. 391; (৫) Weil, Geschichte der Chalifen, iii, 21-44; (৬) Muir, The caliphate, its rise, decline and fall[3], p. 582; (৭) Le Strange, Baghdad during the Abbasia caliphate, p. 162, 270, 271।

K. V. Zettersteen (E.I. [1])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

তাইফ (طائف) ঃ আরবের একটি শহর, যাহা মক্কার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এইখান হইতে মক্কাগামী সড়ক পথে কতিপয় আঁকাবাঁকা ঘাঁটি অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া মোটর পথের দূরত্ব প্রায় পচাত্তর মাইল, সরাসরি দূরত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক কম। ইহা একটি মালভূমিতে অবস্থিত, যাহা সারাত পর্বতমালায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট

উচ্চে অবস্থিত। একটি চিত্তাকর্ষক কিংবদন্তী অনুযায়ী হযরত ইব্‌রাহীম (আ.) যখন স্বীয় পত্নী হাজার (রা)-কে সঙ্গে লইয়া সিরিয়া হইতে আরব মরুভূমির দিকে রওয়ানা হন তখন আল্লাহ সিরিয়ার তৃণভূমির একটি অংশ তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দেন, আর ইহাই তাইফ। শীতকালে এইখানে কখনও কখনও পানি জমাট বাঁধিয়া যায়। ইসলাম-পূর্ব যুগ হইতেই তাইফ ও মক্কার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তাইফে উৎপাদিত ফসলাদি মক্কায় বিক্রি হইত। একদিকে যদি মক্কার সম্পদশালী অধিবাসীরা, বিশেষভাবে বানূ উমায়্যা তাইফে জমি ক্রয় করিতে এবং গরমকাল কাটাইতে আসিত, তবে অন্যদিকে তাইফের কর্মঠ অধিবাসিগণও বাণিজ্যিক কাজকর্মের উদ্দেশ্যে মক্কায় বসতি স্থাপন করিত। কুরআন মাজীদে (আয-যুখরুফ ৪৩ ঃ ৩১) মক্কা ও তাইফকে একত্রে মিলিত করিয়া "কার্‌য়াতায়ন" (শহরদ্বয়) বলা হইয়াছে। ইসলামের প্রাক্কালে ইহা পশ্চিম আরবের একটি বিশিষ্ট শহর ছিল। এইখানকার মন্দির ছিল মক্কার প্রতিদ্বন্দ্বী। বর্তমান সু'উদী আমলে শহরটি গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থল হিসাবে বেশ উন্নতি করিয়াছে। এইখানে বহু সংখ্যক য়ূরোপীয়ান ও আমেরিকানও পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম-পূর্ব যুগে এইখান হইতে ফলমূল ও তরিতরকারি ছাড়া আঙ্গুরের তৈরী মদ, গম, জ্বালানি কাঠ ও পাকা চামড়া রফতানী করা হইত। তাইফবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর এক পত্রে গুবায়রা (জোয়ার দ্বারা তৈরী মদ)-কেও নিষিদ্ধ জ্ঞান করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

তাইফে যাহাকে অনেক সময় ওয়াজ্‌জ নামে অভিহিত করা হয়, সর্বপ্রথম 'আমির ইব্‌নু'জ-জারব গোষ্ঠীর 'উদ্‌ওয়ান গোত্রে বসতি স্থাপন করে। অতঃপর ছাকীফ ও আয়াদ আগমন করে এবং তৎপর অন্যান্য কিছু গোত্র, যাহারা আহলাফ নামে প্রসিদ্ধ।

তাইফের সহিত বানূ হাশিম গোত্রের আত্মীয়তা ছিল। বানূ 'আব্‌দ য়ালীলকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতুল বংশ বলা হয়। হযরত 'আব্‌বাস (রা)-এরও তাইফের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এইজন্য কোন আশ্চর্য কথা নহে যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কাবাসীদের হইতে যখন নিরাশ হন, তখন তিনি স্বীয় মাতুলদের দিকে মনোনিবেশ করেন, যদিও তিনি তাইফে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন ও নৈরাশ্য বৈ কিছুই লাভ করেন নাই। হিজরতের অব্যবহিত পরেই ২য় হিজরীর রাজাব মাসে সারিয়্যাঃ নাখ্‌লা (মক্কা ও তাইফের মধ্যবর্তী স্থান) সংঘটিত হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মক্কাবাসীদের উপর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ, কিন্তু মক্কার সহিত বাণিজ্যে ব্যাঘাত সৃষ্টিতে তাইফ-এর প্রভাবান্বিত হওয়া ছিল অপরিহার্য। মক্কা ও মদীনার যুদ্ধগুলিতে তাইফ সর্বদাই মক্কাবাসীদের সহায়তা করিতে থাকে। উহুদ যুদ্ধেও তাইফের কিছু অধিবাসী ফওজী আমলাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পরিখা যুদ্ধে তো (আল-বালাযুরী, কিতাবু'ল-আন্‌সাব, ১খ, ১৬৫-এর স্পষ্টোক্তি অনুযায়ী) বানূ ছাকীফের একটি পূর্ণ ডিভিশন মদীনা অবরোধে শরীক ছিল। য়ামান ও মক্কা ব্যতীত খুব সম্ভব আরবের উত্তরাঞ্চলের সহিতও তাইফবাসীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এই কারণেই আবূ 'উবায়দা হুদায়বিয়া (দ্র.)-র সন্ধিপত্রে যে শর্তাবলী উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও সুস্পষ্ট যে, যেই সকল মুসলমান বাণিজ্যের জন্য তাইফ বা য়ামান হইয়া মক্কায় গমন করিবে তাহারা নিরাপত্তা লাভ করিবে।

হিজ্‌রী আট সালে তাইফবাসী ও তাহাদের গ্রামাঞ্চলের আত্মীয়রা (বানূ হাওয়াযিন) মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে বিরক্তি ও ঘোর বিরোধিতা প্রদর্শন করে। খুব সম্ভব মক্কার বাজার হাতছাড়া হওয়ায় তাহারা খুব ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়াছিল। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হুনায়ন (দ্র.)-এ প্রথম সংঘর্ষ বাধে। পরে এই ধারা তাইফেও অব্যাহত থাকে, যাহা রাসূলুল্লাহ (স) কয়েক সপ্তাহব্যাপী অবরোধ করিয়া রাখেন। দাব্‌বাব, মিনজানীক এবং অন্যান্য দুর্গ-বিধ্বংসী অস্ত্র ব্যবহার সত্ত্বেও বিজয় সম্ভব হয় নাই। সাধারণ ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী ইরানের কোন এক কিস্‌রা (সম্রাট) জনৈক তাইফবাসী ব্যবসায়ীর আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন এবং একজন ইঞ্জিনিয়ারকে এই উদ্দেশ্যে পাঠান যে, তাহার বস্তির সন্নিকটে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিবে (আর ইহাই ছিল তাইফ)। ইমাম সুহায়লী একটি ভিন্ন বর্ণনা পেশ করিয়াছেন। উহা এই যে, য়ামানের কিছু নির্মাতাই এই কাজ আঞ্জাম দেয়।

রাসূলুল্লাহ (স) অবরোধের গতি না বাড়াইয়া বানূ ছাকীফের কতিপয় হালীফ (সমবৃত্তিসম্পন্ন) গোত্রকে, যাহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তাইফের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য আদেশ দেন। এক বৎসর অতিক্রান্ত না হইতেই তাইফবাসীরা বাধ্য হইয়া আনুগত্য কবূল করিয়া লয়। প্রথমদিকে উহার প্রতিনিধি দলের ইচ্ছা ছিল যে, তাহারা সালাতও পড়িবে না, যাকাতও দিবে না, নিজেদের দেব-মন্দিরও ধ্বংস করিবে না এবং মদ, ব্যভিচার ও সূদের নিষিদ্ধতাও মানিয়া লইবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) নিজে বুঝাইবার ফলে তাহারা লজ্জিত হয় এবং এই পর্যন্ত স্বীকার করে যে, তাহারা আসন্ন 'উকাজ মেলায় পূর্ব সূদী ঋণসমূহ আদায় করিয়া ভবিষ্যতে আর সূদী লেনদেনে জড়িত হইবে না, যাকাত ও জিহাদ হইতেও অব্যাহতি চাহিবে না এবং তাহাদের শহরকে এমন হারাম (পবিত্র ভূমি) আখ্যায়িত করা হইবে, যেইখানে পশু-পাখী শিকার করা ও বৃক্ষলতা কর্তন করা নিষিদ্ধ থাকিবে। তাহা ছাড়া নিজেদের দেব-মন্দির তাহারা স্বহস্তে ধ্বংস করিবে না। রাসূলুল্লাহ (স) মুগীরা ইব্‌ন শু'বা ছাকাফী ও আবূ সুফ্‌য়ানকে লাত-মন্দির ধ্বংস করার নিমিত্ত পাঠান।

বলা হইয়া থাকে যে, তাইফের বর্তমান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সেই মন্দির-স্থলেই নির্মিত হইয়াছে। তাইফ শহরের বর্তমান প্রাচীরটি তুর্কী শাসন আমলের; কিন্তু নিঃসন্দেহে উহার কিয়দংশ পুরাতন প্রাচীরের স্থলেই নির্মিত। কেননা ইব্‌ন হিশামের ভাষ্যানুযায়ী ইবন 'আব্‌বাস (রা)-এর মসজিদটি এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যেইখানে তাইফ অবরোধকালে রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় তাঁবু স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মস্‌জিদ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে তাইফ অবরোধে অংশগ্রহণকারী শহীদগণের কবরস্থান বর্তমান প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত। ওয়াহ্‌য়ি লেখক হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-ও সেইখানেই সমাধিস্থ। তুর্কী শাসনামলে মসজিদ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর পাঠাগারটি হাজার হাজার দুষ্পাপ্য পাণ্ডুলিপি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অতি কষ্টে আমরা পঞ্চাশ হইতে এক শতটি সাধারণ পাণ্ডুলিপি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জানিতে পারিলাম অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি অনেক লোকে রিয়াদে লইয়া গিয়াছে।

ইসলামী যুগে তাইফ কখনও বড় রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল না। কিন্তু উহার অর্থনৈতিক অবদানের কথা অনস্বীকার্য। হযরত 'আম্‌র ইব্‌নু'ল 'আস (রা) [ওয়াজ্‌জ হইতে তিন মাইল দূরে] ওয়াহ্‌ত নামক স্থানে এক বিরাট দ্রাক্ষাক্ষেত্র স্থাপন করেন এবং পরে উহা নিজ সন্তান-সন্ততিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। এই ওয়াকফনামা ইব্‌ন মুজাবির ("আল-মুস্তাবসির", প্যারিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, পৃ. ১২/খ-এ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমীর মুআবিয়া (রা) ইহার সন্নিকটে বিরাট এক দীঘি খনন করিয়াছেন, যাহার শিলালিপি, সন ৫৮ হি., আরবী ভাষার প্রাচীনতম শিলালিপিসমূহের অন্যতম (দ্র. George C. Miles, Early Islamic Journal Inscriptions near Ta'if in the Hijaz,

of Near Eastern Studies. USA. ৭/৪ খ. [অক্টোবর ১৯৪৮ খৃ.], ২৩৬-২৪২)।

বর্ণিত আছে যে, 'আব্বাসী শাসনামলে যুবায়দা নহর খননের পর উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রানী যুবায়দা তাইফ-এর কিছু আয় ওয়াক্‌ফ করিয়া দিয়াছিলেন। মক্কা হইতে কারা পর্বত হইয়া তাইফগামী পথ অবিরত অযত্ন ও বৃষ্টির দরুন বিনষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এখনও গাধার কাফেলার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং লেখকের পথনির্দেশকারী (Guide) বলিয়াছে যে, এই পথটি 'আব্বাসী যুগে নির্মিত।

হিজরী চতুর্থ শতক ও তৎপরবর্তী কালের আরব ভূগোলবেত্তাগণ উহাকে "বুলায়দাতুন সাগীরাতুন" (এক ক্ষুদ্র শহর) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তুর্কী শাসনামলে মক্কার শারীফ ও তুর্কী গভর্নর এখানেই গ্রীষ্মকাল কাটাইতেন। ১৮০২ খৃস্টাব্দে সু'উদী নাজ্‌দীরা উহা দখল করে এবং ১৮১৩ খৃস্টাব্দে তূসূন পাশার নেতৃত্বে মিসরীয় সৈন্যরা উহা পুনর্দখল করে। এক বৎসর পর বারখারট (Burckhardt) এই শহর ভ্রমণ করেন। তিনি লিখেন যে, অর্ধেক শহরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার চিহ্ন দেখা যায়। তিনি সেইখানে বড় বড় আঙ্গুর ভক্ষণ করিয়াছেন, যাহা অত্যন্ত সুস্বাদু ও সুবাসযুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি বেহী (এক জাতীয় অম্ল ফল), ডুমুর ও ডালিম খাইয়াছেন। অধিবাসীদের অনেকেই ছাকীফ বংশোদ্ভূত। এইখানে মক্কার অনেক সম্পদশালী লোকের বাড়ি আছে। বিদেশী লোকদের মধ্যে অনেক হিন্দুস্তানী মুসলমানও রহিয়াছে।

Philby ১৯১৮ খৃস্টাব্দে লিখেন যে, এইখানে পাঁচ সহস্রের অধিক লোক বসবাস করে না, তবে গ্রীষ্মকালে এই সংখ্যা বিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। এপ্রিল ১৯২৪ খৃস্টাব্দে শারীফ হুসায়নের সহিত যুদ্ধ করত নজদীরা এই শহর পুনর্দখল করিয়া লয় এবং বর্তমানে ইহা সু'উদী রাষ্ট্রের অতি উন্নতশীল শহরগুলির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে এইখানকার অধিবাসীর সংখ্যা পনের হাজার বলিয়া আমাকে বলা হইয়াছিল এবং ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে এই সংখ্যা চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। [বর্তমানে (১৯৭৪ খৃ.) ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২,০৪,৮৫৭ (Statesman year book, ১৯৮৭-৮৮)]। শহর এখন নগর-প্রাচীরের বাহিরে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। টেলিফোন, বেতার, আবহাওয়া অফিস, সুরম্য ঘর-বাড়ি এবং সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রহিয়াছে। মক্কা ও রিয়াদ হইতে ডাক বিভাগ বাস সার্ভিসও অব্যাহত রাখিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Lammens, La cite arbe de a la veille del, Hegire, Ta'if, MFOB, বৈরূত, ৮খ.; (২) ঐ লেখক, Ziad ibn Abihi, viceroi de L'Iraq, Lieutenant de Moawia, in R.s.O, ৪খ.; (৩) Burckhardt, Voyage en Arabia, Eyries -এর ফরাসী অনু. ১খ, ১১০-১১৩; (৪) Philby, The Heart of Arabia, ১খ, ১৮২-২০১, লণ্ডন ১৯২১ খৃ.; (৫) M. Hamidullah, Battlefields of the Prophet, in ইসলামিক রিভিউ, Woking, জুলাই ১৯৫১ খৃ., in Hunain and Ta'if; (৬) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, শব্দমূল শিরোনামে, Wustanfeld, ৩/৪৯৪-৫০১; (৭) আল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, পৃ. ২৭; (৮) আহসানু'ত-তাকাসীম, পৃ. ৭৯; (৯) মুখ্‌তাসারু কিতাবিল-বুলদান, পৃ. ২২; (১০) আল-হামাদানী, সিফাতু জাযীরাতি'ল-আরাব, সম্পা. Muller, পৃ. ১২০, ১২১; (১১) ইব্‌ন জুবায়র, আর-রিহলা, পৃ. ১২০-১২২; (১২) আল-'উজায়মী, আহ্‌দা'ল-লাতাইফ মিন আখ্‌বারি'ত-তাইফ (অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি, কায়রো পরিসংখ্যান তাং ৮৭); (১৩) কুতুব সীরাত (ইব্‌ন হিশাম, ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবারী প্রমুখ)-এর মধ্যে ছাকীফ ও হুনায়ন শব্দদ্বয়; (১৪) শিবলী ও সুলায়মান নাদাবী, সীরাতু'ন-নাবী (স), হুনায়ন ও তাইফ যুদ্ধের বিবরণ; (১৫) মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, রাসূল আকরাম (স) কী সিয়াসী যিন্দিগী, করাচী ১৩৬৯ হি., পৃ. ৩৮২-৩৯২; (১৬) ঐ লেখক, 'আহদে নাবাবী কে মায়দান জংগ, ৩য় সং, হায়দরাবাদ ১৯৪৫ খৃ., ৪৯-৫৩; (১৭) ঐ লেখক, আল-ওয়াছাইকু'স-সিয়াসিয়্যা ফি'ল-'আহদি'ননাবাবী (স) ওয়াল খিলাফাতি'র রাশিদা (মিসর ১৯৪১ খৃ.), সংখ্যা ১৮১-১৮৪, ইহা ছাড়া ছাকীফ ও হুনায়ন শিরোনামে দ্র.; (১৮) হাফিজ ওয়াহবা, জাযীরাতু'ল'আরাব ফি'ল-কারনি'ল-'ইশ্‌রীন; (১৯) খায়রু'দ-দীন আয-যিরিকলী, শিব্‌হু'ল জাযীরা ফী 'আহ্‌দি মালিক 'আব্‌দি'ল-'আযীয আস-সু'উদ, খ. ১-৪, বৈরূত, ১৯৭১ খৃ.]।

মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ (দা.মা.ই.)/আঃ মতিন মাসউদী

তা'ইয্য (تعز) ঃ দক্ষিণ আরবের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। পূর্বে ইহা তুরস্ক সাম্রাজ্যের তা'ইয্‌যিয়া সানজাক-এর রাজধানী ছিল এবং বিলায়েতসমূহের সাধারণ প্রশাসন সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় আইন তাকবীম-ই ওয়াকাই' (১৫ মার্চ, ১৯১৩) অনুসারে 'উদাইন, ইব্‌ব, মুখা, কামাইরা, কা'তাবা, হুজারীয়া কাদাসমূহ ও R. Manzoni-এর মতে মাখ্যদির, যী সুফাল এবং মাবীয়া অর্থাৎ আল-হুদায়দা হইতে 'আদান-এর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত স্বাধীন এলাকাসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত সম্পূর্ণ এলাকাই তা'ইয্‌যিয়া সানজাক-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা'ইয্য শহর ৪৪°৬´ ৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ও ১৩°৩৬´ ৫৫´ উত্তর অক্ষাংশে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। জাবাল (পর্বত) সাবর (আল-হামদানী-র বর্ণনায় সাবির)-এর উত্তর ঢালুতে স্থাপিত এই শহরের জনসংখ্যা ২-৩,০০০। পর্তুগীজগণ এই শহরকে তেইস (Teis) নামে, ইতালীয়গণ (Ludovico di Barthema এবং Andrea Corsati) তাইসা (Taesa) নামে অভিহিত করিত। এই শহর ২৫-৩০ ফুট প্রশস্ত এবং ৯-১২ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সান'আ' শহরের প্রাচীরের মত এই শহরেও প্রাচীরের পাশে পাশে প্রাচীর অপেক্ষা ৬-৮ ফুট বেশি উচ্চ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়। এই প্রাচীর রৌদ্রে শুকানো বড় বড় ইট দ্বারা নির্মিত এবং সেঁকা টাইলের বহির্ভাগ দ্বারা আবৃত। এই প্রাচীর একটি অনিয়মিত চতুর্ভুজ আকৃতির, যাহা পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত; এই চতুর্ভুজ প্রাচীরের পশ্চিম পাশে অবস্থিত একটি বহু কোণাকৃতি পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি খাড়া শৃঙ্গ ৪৫০ ফুট উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে, যাহার শীর্ষদেশে আল-কাহিরা দুর্গ অবস্থিত যাহা এক সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে পরিগণিত হয়, কিন্তু বর্তমানে ইহার অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ। ইহার বিপরীতে প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি উঁচু পাহাড় বিদ্যমান, যাহার চূড়া একটি খাড়া ঢিবির মত। শহর-প্রাচীরের পাঁচটি তোরণদ্বার আছে। পূর্ব দিকের তোরণটির নাম বাবু'ল-কাবীর, এইখান হইতে রাস্তা বাহির হইয়া মাবি'য়া-'আদান ও কা'তাবা-ইব্‌ব-য়ারীম-সান'আ' সড়কে গিয়া পৌঁছিয়াছে। পশ্চিম দিকের তোরণের নাম "বাবু শায়খ মূসা", ইহার পথ মুখা এবং হাইস যাওয়ার সড়কে পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের তোরণদ্বার বাবু'ল-ইমদাগার, ইহার পথ হুজারীয়া ও বানূ 'আলওয়ান, অভিমুখী সড়কে পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ দিকের তোরণদ্বার বাবু 'আয়ন দুম্মা, এইখান হইতে পথ জাবাল সাবর পর্বতে গিয়াছে, যাহা আল-কাহিরা দুর্গের সহিত উক্ত পর্বতকে সংযুক্ত করিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব পাশের তোরণদ্বার বাবু'ল-খুদায়রা, যাহা এখন প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার পথও জাবাল সাবর পর্বতে

পৌছিয়াছে। এই পাঁচটি তোরণদ্বারের একটি হইতে অন্যটির দূরত্ব খুব বেশী নহে এবং এইগুলি আরবীয় রীতিতে নির্মিত। ইহাদের পাশে অবস্থিত দুইটি টাওয়ার প্রাচীর অপেক্ষা উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে, তবে শহরের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণকারী তৃতীয় টাওয়ারটি প্রথম দুইটি অপেক্ষা অধিকতর উঁচু। জাবাল সাবর পর্বত হইতে ভূগর্ভে স্থাপিত পাইপের মাধ্যমে এই শহরে চমৎকার সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। শহরে একটি বড় বাজার আছে। খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্যোগের পর শহরের অবস্থা খুব অবহেলিত রূপ ধারণ করে। এক সময়ের পাথরের নির্মিত একতলাবিশিষ্ট সুন্দর সব বাড়িঘর অধিকাংশই ভগ্নদশায় উপনীত হইয়াছে। বড়জোর ২০টি বাড়ি এখনও বিদ্যমান আছে, অন্যগুলিকে অপসারণ করিয়া উহাদের স্থানে নিম্ন মানের ছোটখাট কুটির তৈরি করা হইয়াছে। শহরের দক্ষিণ এলাকা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেইখানে সর্বত্র ধ্বংসের চিহ্ন ছড়াইয়া আছে।

শহরে বিদ্যমান কয়েকটি সুন্দর মসজিদ এখনও রাসূলী বংশীয় শাসকদের এককালীন রাজধানীর গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই মসজিদসমূহের মধ্যে একটি হইতেছে এই বংশের শাসক আল-মালিক আল-আশরাফ ইসমাঈল ইবনু'ল-'আব্বাস (১৩৭৭-১৪০০ খৃ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশরাফীয়া মসজিদ। চতুষ্কোণাকৃতির এই মসজিদের দুইটি মিনার এবং ভিতরে দুই সারি স্তম্ভ আছে। ইহার তিনটি গম্বুজ বিভিন্ন রঙিন অলংকরণ দ্বারা সুসজ্জিত। মসজিদের দক্ষিণে ইহার প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিষ্ঠাতার পুত্র 'আলী এবং দুইজন দাসের সমাধি বিদ্যমান। নকশা-কাটা কাঠ দ্বারা তৈরী একটি জাফরির পিছনে অবস্থিত তিনটি মার্বেল নির্মিত শবাধারের ভিতরে মসজিদ প্রতিষ্ঠাতার সাতজন স্ত্রী সমাহিত আছেন। এইগুলির বিপরীত দিকে আরও একটি কবর আছে, যাহা চুনাপাথর ও ইট দ্বারা নির্মিত এবং খোদাইকৃত কাঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত, ইহা তাঁহার একজন দাসের কবর।

আল-মুজাফফারীয়া অন্য একটি বৃহৎ ও চমৎকার মসজিদ। ইহা জাবাল সাবর-এর ঢালুতে অবস্থিত। চতুষ্কোণ আকৃতির এই মসজিদটিতে তিন সারি স্তম্ভ, তিনটি বিরাট গম্বুজ এবং দুইটি মিনার রহিয়াছে। পর্বতের কালো আগ্নেয়গিরি পাথরের পটভূমিতে এই মসজিদের সাদা চুনকাম করা দেওয়াল ইহাকে অপরূপ চমৎকার ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার মেঝেও সর্পিল অলঙ্করণ ও অন্যান্য কারুকার্যে সজ্জিত। সম্মুখের দেওয়ালে জানালার সারি এবং জানালাসমূহ জাফরি ও লম্বা দণ্ডের উপর স্থাপিত খিলান দ্বারা সুশোভিত। ইহা এখনও শহরের প্রধান মসজিদ। ফরাসী পর্যটক Ludovico di Barthema ১৫০৮ খৃ. শহরটি ভ্রমণ করেন এবং এই মসজিদ ভবনকে যথার্থভাবেই রোমে অবস্থিত St. Maria Rotonda-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

শহরের অন্যান্য মসজিদের মধ্যে রহিয়াছে সুরক্ষিত 'আবদু'ল-হাদী মসজিদ, শহরের পশ্চিমে প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিত শেখ মূসা-র মসজিদ, পূর্ব পার্শে অবস্থিত তুর্কী বিজয়ের প্রথম যুগের সুরক্ষিত ও চমৎকার শেখ আফদাল ও তদীয় পরিবারের মসজিদ এবং শহরের উচ্চভূমি দক্ষিণ এলাকায় অবস্থিত একই যুগের মাখদাবীয়া মসজিদ যাহা এক আবিসিনীয় দাস হুসায়ন পাশা কর্তৃক নির্মিত। ইহা মিনারবিহীন একটি চতুষ্কোণ আকৃতির ভবন, যাহার কেন্দ্রভাগে একটি বিরাট প্রাঙ্গণ আছে। ইহার নির্মাণ কাজে বায়যান্টীয় ও আরবীয় রীতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ রহিয়াছে। নকশা-খচিত কাঠের দরজার উপরে দেওয়ালের ও স্তম্ভের গায়ে লিখিত বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা ইহা ব্যাপকভাবে অলংকৃত। মসজিদের বাম পাশে আছে উযূর জন্য নির্মিত বিরাট পানির আধার, কিন্তু বর্তমানে ইহা হাসপাতালের ধৌত কার্যে ব্যবহৃত হয়। এইগুলি ছাড়াও আছে শারাফু'দ-দীন-এর মসজিদ, যাহার সম্পূর্ণটাই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত, শুধু মিনারটি আছে। এই মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমাম শারাফু'দ-দীন ইব্ন ইমাম মুতাহ্হার এবং ইহা আশরাফীয়া মসজিদের মতই তা'ইয্যের দক্ষিণ এলাকার উচ্চভূমিতে অবস্থিত।

তা'ইয্য অনেক বাগান, মাঠ ও তৃণভূমিতে পূর্ণ। সর্বাপেক্ষা সুন্দর বাগানটির নাম বিরকাত হুসায়নীয়া, যাহা শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ইহার মালিক সুলায়মান পাশা। ইহার মধ্যভাগে একটি খোলা চত্বর এবং সেইখানে একটি সুন্দর ঘর আছে। উহার সম্মুখে আছে ঝর্ণাসহ একটি বিরাট ডিম্বাকৃতির পানির আধার। বাগানের ভিতরে আরও আছে এইখানে সমাহিত হুসায়ন পাশার উঁচু কুব্বা বা সমাধিসৌধ। শহরের বাগানসমূহে জাবাল সাব্র হইতে কৃত্রিম নালার মাধ্যমে প্রচুর পানি সরবরাহ করা হইয়া থাকে। সানআ ও রাওদাতে একমাত্র বাদাম (nut) ছাড়া সকল বৃক্ষ ও লতা জন্মে, তবে এইখানে খেজুর গাছ খুব ভাল হয় না। অন্যদিকে কলা খুব বেশি হয়। তা'ইয্য-এর চারিপাশের সমতল ভূমিতে ভাল চাষাবাদ হয়। তা'ইয্য-এর উত্তর-পূর্ব দিকে জাবাল সাবর-এর ঢালু এলাকাসমূহ ঝাউ গাছ ও Carob গাছের ছোট ছোট বাগান দ্বারা আবৃত এবং উহাদের পাশে পাশে অনেক ক্ষুদ্র পল্লীর অবস্থান। জাবাল সাবর সম্পূর্ণটাই একটি বোটানিকাল গার্ডেন বা বিভিন্ন উদ্ভিদের সাজানো বাগানের মত। ইহার নিম্ন ঢালু এলাকায় সকল প্রকার ফল, তেঁতুল, কুইন্স (Quince), জাম্বীর-লেবু, আঙ্গুর ও দ্রাক্ষালতা জন্মে এবং উঁচু ঢালু এলাকায় অন্যান্য বৃক্ষ ও লতা ছাড়াও সকল প্রকার মসলা জাতীয় গাছ জন্মে। পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থান পর্যন্ত সর্বত্রই চাষাবাদ করা হয় এবং বালি ও সরিষা (খারদাল) প্রচুর উৎপন্ন হয়। তবে দেশের প্রধান সম্পদের উৎস কাত [দ্র.] (Celastrus edulis Forsk)-এর ব্যাপক চাষ, যাহা হইতে য়ামানবাসীদের প্রিয় এক প্রকার উত্তেজক ঔষধ তৈরি করা যায়। Glaser উল্লেখ করিয়াছেন যে, তা'ইয্য একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান এবং এইখানকার আবহাওয়া ম্যালেরিয়ায় পূর্ণ। তা'ইয্য হইতে বিভিন্ন বাণিজ্য পথ যাবীদ, য়ারীম, ইব্ব, সান'আ' ও 'আদান প্রভৃতি শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। তুরস্ক শাসনামলে আল-হুদায়দা শহরের সহিত তা'ইয্যের সাপ্তাহিক ডাক যোগাযোগ চালু ছিল। ১৯১২ খৃ. রেল বিভাগ সান'আ' শহর হইতে আল-হুদায়দা পর্যন্ত রেল-সংযোগ স্থাপন করিয়া আল-হুদায়দা-যাবীদ তা'ইয্য-ইব্ব-য়ারীম-সান'আ' রেলপথ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করে, কিন্তু ইতালী-তুরস্ক যুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণে উহা নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই।

স্থানীয় এক জনশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে তা'ইয্য শহরের গোড়াপত্তন ঘটে। এই জনশ্রুতি তা'ইয্যের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত জাবাল দারবাত 'আলী পাহাড়কে মহানবী (স)-এর জামাতা ও পরবর্তী সময়ে খলীফা 'আলী (রা)-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, বর্তমানে পাহাড়ের যে দুইটি চূড়া আছে, পূর্বে তাহা মিলিত ও অখণ্ড একক চূড়া ছিল। হযরত 'আলী (রা) ইসলাম প্রচার ও য়ামান বিজয়ের জন্য নিযুক্ত হইয়া তা'ইয্য আগমন করিলে ইহার অধিবাসীরা তাঁহার প্রচারিত কুরআনের শিক্ষা ও তাঁহার প্রতি বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করে। 'আলী (রা) শহর অবরোধ করেন এবং পাহাড়ের চূড়ায় তাঁহার শিবির স্থাপন করেন, যে কারণে তাঁহার নামে এই পাহাড়ের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু ইহার অধিবাসীদের একটানা প্রতিরোধের কারণে অবরোধ দীর্ঘায়িত হইতে থাকে। 'আলী (রা)-এর দূতগণ শহরের নেতাদের সহিত কথা বলিয়া ব্যর্থ হইয়া এবং অনেক সময় কটূক্তি শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে থাকেন। একদিন একজন দূতের সহিত

দুর্ব্যবহার করা হয়, এমনকি শহরের লোকেরা তাঁহাকে মারধরও করে। ইহা শুনিয়া 'আলী (রা) এত রাগান্বিত হন যে, তিনি তাঁহার বিখ্যাত তরবারি দ্বারা পাহাড়ের চূড়ায় জোরে আঘাত করেন এবং ইহাতে পাহাড়ের চূড়া দুই ভাগ হইয়া মাঝখানে লম্বা ও গভীর খাদের সৃষ্টি হয়, যাহা আজিও বিদ্যমান আছে। যদিও 'আলী (রা)-এর কোন তাঁবুর এতটুকু ক্ষতি হয় নাই কিংবা তাঁহার কোন লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু তা'ইয্যের সমস্ত বাড়িঘর, এমনকি সর্বাপেক্ষা মযবুতগুলিও ধ্বংস হইয়া যায়। ইহাতে তা'ইয্যের লোকেরা 'আলী (রা)-এর নিকট আগমন করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

কিন্তু এই গল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। পাহাড় চূড়ার অদ্ভুত আকৃতিই হয়ত এই গল্পের জন্ম দিয়াছে। এইরূপ আরও কয়েকটি স্থানের সহিত 'আলী (রা)-কে যুক্ত করিয়া গল্প প্রচলিত আছে। 'আলী (রা)-এর প্রতি য়ামানবাসীদের বিশেষ ভক্তির কারণেও এইরূপ গল্প সৃষ্টি হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ Glaser উল্লেখ করিয়াছেন যে, যামারগামী রাস্তায় রুবাত স্থানের নিকট জাবালু'দ-দার পাহাড়ের উপর রাস্তার ধারে (সর্বোচ্চ চূড়ায় সম্ভবত) পাথরের উপরে 'আলী (রা)-র পদচিহ্ন (রিজল 'আলী) প্রদর্শিত হয় এবং উহার নিকটেই রাস্তার বাম পাশে অন্য একটি পাথর আছে যাহা ছিদ্র করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, উহাকে বলা হয় দারবাত 'আলী।

তা'ইয্যের সন্নিকটবর্তী এক স্থানের আরেকটি কাহিনী প্রচলিত আছে, ইহা হইতেছে সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তির কাহিনী। তাহাদের ঘুমের স্থানটিকে ইবনুল-মুজাবির জাবাল সাবর পাহাড়ের ভিতর একটি গুহার মধ্যে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই গল্পের দক্ষিণ আরবীয় বর্ণনায় বলা হয় যে, এক রাজার সাতজন পুত্রকে যিম্মী হিসাবে অন্য এক রাজা দাকিয়ানুস আল-গাদ্দার-এর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। একবার রাজা যখন যুদ্ধে গমন করেন, তখন যিম্মীরা এই সুযোগে পলাইয়া 'মা হুমায়দ (ছা'বাদ-এর নিকটে একটি স্থান) গমন করে এবং আত্মগোপন করিয়া থাকে। দীর্ঘদিন পরে তাহারা জাবাল সাবর-এর উপর কারয়াতু'ল-মি'কাব চূড়ায় আসিয়া অবস্থান করে। রাজা দাকিয়ানুস অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাদিগকে খুঁজিয়া পান নাই। তাহারা সেইখানে ৩১০ বৎসর অবস্থান করে এবং সম্পূর্ণ সময়টাই ঘুমের অবস্থায় অতিবাহিত করে। যখন তাহারা জাগিয়া উঠিল, তখন তাহাদের মনে হইল যেন, তাহারা মাত্র একদিন অতিবাহিত করিয়াছে। তাহাদের নিকট কিছু নগদ অর্থ ছিল এবং তাহারা তাহাদের একজনকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য শহরে পাঠাইল। শহরে দুষ্ট লোকেরা তাহার মুদ্রা দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া আটক করে। তাহারা মনে করিল যে, এই ব্যক্তি কোন গুপ্ত ধনের সন্ধান পাইয়াছে এবং তাহারা তাহাকে শহর কর্তৃপক্ষের নিকট লইয়া উপস্থিত করে। শহরে তাহার কোন বাড়ি ছিল না এবং তাহাকে কেহ চিনিতে পারিল না। সুতরাং লোকেরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া ছাড়িয়া দিল।

সে তখন গুহায় ফিরিয়া আসিল এবং এখনও সেখানেই আছে। সেই গুহা হইতে নাকি এখন বাতাস প্রবাহিত হয় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। Glaser ২০ নভেম্বর, ১৮৮৭ সালে উক্ত স্থান পরিদর্শন করেন। সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তির (আসহাবু'ল কাহ্‌ফ) মসজিদটি অত্যন্ত সুন্দর একটি মসজিদ। ইহাতে কাঠের তৈরী অদ্ভুত সুন্দর স্তম্ভসমূহ এবং অত্যন্ত ভাল ছাদ আছে। মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে ইহার পবিত্র স্থান মিহ্‌রাব অবস্থিত (Sanctuary proper), যাহা ত্রিকোণাকৃতির এবং প্রাচীর ঘেরা একটি স্থান। উহার ডান পাশে একটি গর্তের মত জায়গা আছে, যাহাকে আরবগণ মাগারা (গুহা) নামে অভিহিত করে। Glaser খুব নিকট হইতে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, কিন্তু কোন বায়ুপ্রবাহ বা উল্লেখযোগ্য কোন ফাটল বা ছিদ্র দেখিতে পান নাই। তবে তাঁহার ধারণা হয়, পাথরখণ্ডসমূহ একটির সহিত আরেকটি নিবিড়ভাবে একত্রে জুড়িয়া নাই, সুতরাং উহাদের মধ্য দিয়া সামান্য বাতাস প্রবাহিত হইতে পারে। মসজিদের নিকটে সায়্যিদগণ বাস করেন।

Botta ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং ভুলভাবে ইহাকে 'আহলু'ল-কাহ্‌ফ' নামে উল্লেখ করেন। তাঁহাকে জাবাল সাবর-এর পাদদেশে তা'ইয্যের নিকটে গুহার প্রবেশমুখ দেখানো হয়, যেইখান হইতে সাত ঘুমন্ত ব্যক্তি সমগ্র পাহাড়ের মধ্যে তাহাদের পথ করিয়া লয়। খুব সম্ভব যে, ইসলাম-পূর্ব যুগে তা'ইয্য-এর অস্তিত্ব ছিল না। এক সময় এই এলাকার রাজধানী ছিল সাওওয়া এবং পরে জাবা, উভয় স্থানই বর্তমান তা'ইয্য হইতে খুব বেশি দূরে অবস্থিত ছিল না। হাজ্জী খালীফার জিহাননুমা-র বর্ণনা অনুযায়ী ৫৭৮/১১৮২-১১৮৩ সনে য়ামান আগমনকারী আয়্যূবী বংশীয় আল-মালিক আল-'আযীয সায়ফু'ল-ইসলাম জাহীরুদ-দীন আবুল-ফাওয়ারিস তুগতেকীন এই তা'ইয্য শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। Glaser -এর মতে তা'ইয্য শহরের প্রধান অংশ গড়িয়া উঠে উহার সন্নিহিত একটি ছোট শহর ছা'বাদ-এর মতে মালমসলা লইয়া, যাহা ওয়াদী সালা-এর বাম তীরে অবস্থিত ছিল। তাঁহার গবেষণা অনুযায়ী, ৫০০-৬০০ বৎসর পূর্বে তা'ইয্য-এর নাম ছিল 'উদায়না, তবে সেই সময়ের শুধু বিভিন্ন ঘরবাড়ির ভিত্তিটুকুই অবশিষ্ট আছে, উহাদের উপরের দেওয়াল বা নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের সৃষ্টি।

'উদায়না গ্রাম তা'ইয্য হইতে ৩-৪ মাইল পূর্বদিকে তা'ইযযের মতই জাবাল সাবরের ঢালুতে অবস্থিত ছিল। প্রথমত ইহা শাসক বা রাজাদের শুধু বাসস্থান ছিল। অতঃপর একজন বিখ্যাত সুন্নী দরবেশ ইসমাঈল মুল্‌ক (তা'ইয্যের দরবেশ ব্যক্তি হিসাবে যাঁহার সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী চালু আছে) আল-কাহিরা চূড়ার উপরে একটি মসজিদ ও নিজের জন্য সমাধি সৌধ নির্মাণ করেন। পরবর্তী সময়ে এই স্থানেই দুর্গ নির্মিত হয় এবং শহর গড়িয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুখা, বায়তু'ল ফাকীহ, লুহায়্যা প্রভৃতি শহরের মত তা'ইয্য শহরেরও গোড়াপত্তন ঘটে একজন দরবেশের হাতে।

অন্যদিকে ১৮৮৭ খৃ. তা'ইয্যের কাযী য়াহ্‌য়া-র নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী Glaser বলিয়াছেন যে, তা'ইয্য শহর ছা'বাদ অপেক্ষা প্রাচীন। কারণ ছা'বাদ রাসূলী বংশীয় শাসকদের আমলে অথবা আরও পরে সপ্তম হিজরী শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাকে আরও বলা হয় যে, তা'ইয্য-এর অস্তিত্ব অনেক পূর্বে এমনকি ১৩৩/৭৫০-৭৫১ সালে 'উদায়না নামে বিদ্যমান ছিল এবং এই শহরের আয়তন অনেক বিস্তৃত ছিল। তবে এই বর্ণনা কতখানি সত্য তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। য়াকূত (মৃ. ১২২৯ খৃ.) ইতিপূর্বে তা'ইয্যকে য়ামানের একটি বিরাট ও বিখ্যাত দুর্গ শহর হিসাবে এবং 'উদায়নাকে তা'ইয্যের একটি শহরতলী হিসাবে বর্ণনা করেন। ইবনু'ল-মুজাবির (৬৩০/১২৩২-৩৩ লিখিয়াছেন) তা'ইয্যকে একটি শক্তিশালী দুর্গ এবং দেশের শাসকের বাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্‌ন বাত্‌তূতা ১৩৩২ খৃস্টাব্দে তা'ইয্য পরিদর্শন করিয়া বর্ণনা করে যে, য়ামানী শাসকদের এই বাসস্থান দেশের অন্যতম সুন্দর ও বৃহৎ শহর। কিন্তু ইহার অধিবাসীরা উদ্ধত, গর্বিত ও অমার্জিত প্রকৃতির। শহরকে চারিটি অংশে ভাগ করিয়া এক অংশে বাস করিত ইহার শাসক,

তাহার দাসদাসী, মামলূক ও অন্যান্য অমাত্য; 'উদায়না নামে পরিচিত দ্বিতীয় অংশে বাস করিত সেনাবাহিনী ও কর্মকর্তাগণ; তৃতীয় অংশে বাস করিত সাধারণ নাগরিকবৃন্দ এবং শেষ অংশে আল-মুহালিব নামে পরিচিত একটি বিরাট বাজার ছিল। রাসূলী বংশীয় শাসকদের রাজধানী থাকাকালে এই শহর খুব দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁহারা তা'ইয্য শহরে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন; তন্মধ্যে দুইটি করেন আল-মালিক আল-মানসূর 'উমার (১২২৯-১২৫০ খৃ.)। তৃতীয়টি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহার উত্তরসুরি আল-মালিক আল-ফাদল মুজাহিদ (মুজাহিদীয়া নামে পরিচিত), চতুর্থটি প্রতিষ্ঠা করেন আল-মালিক আল-আশরাফ ইসমাঈল (১৩৭৭-১৪০০ খৃ.; আশরাফীয়া নামে অভিহিত) এবং পঞ্চমটি প্রতিষ্ঠা করেন আল-মালিক আল-মুআয়্যাদ দাউদ (১২৯৬-১৩২১ খৃষ্টাব্দ)। শেষোক্ত জন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বইসহ একটি গ্রন্থাগারও গড়িয়া তোলেন। মৃত্যুর পর তাঁহাকে মাদ্‌রাসাতে দাফন করা হয়।

শহরের পূর্বোল্লিখিত দুর্গটি সম্ভবত খুব মযবূতভাবে নির্মিত ছিল না। কারণ ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে দুর্গ প্রাসাদের একটি অংশ ধ্বসিয়া পড়ে এবং ইহাতে দুইজন লোক নিহত হয়। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে মিসরীয় মামলূক সুলতান কানসাওহ আল-গাওরী-এর নৌ-সেনাপতি হুসায়ন আল-কুরদী তা'ইয্য দখল করেন। ১৫৪৫ খৃ. ইহা তুর্কীদের অধিকারে এবং ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে সান'আ'-র ইমামদের অধিকারে আসে। ফরাসী চিকিৎসক De la Grelaudiere ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তা'ইয্য ভ্রমণ করিয়া ইহাকে তুর্কীদের নির্মিত সুন্দর সুন্দর দেওয়ালবিশিষ্ট একটি বিখ্যাত পুরাতন শহর বলিয়া বর্ণনা করেন। শহরের দুর্গ মধ্যে ৩০টি কামান ছিল এবং দুর্গটি রাষ্ট্রের কারাগার হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ১৬৩৫ খৃ. তা'ইয্য তুর্কীদের নিকট হইতে সানআ'-র ইমামদের দখলে আসে এবং তাঁহাদের শাসনাধীনে এই শহর পূর্বের সকল আঘাত ও দুর্যোগ কাটাইয়া উঠে।

পরবর্তী কালে তা'ইয্য শক্তিশালী গোত্র যু' মুহাম্মাদ-এর দখলে আসে এবং তাহাদের নিকট হইতে ইবরাহীম পাশা ইহা (১৮৩০ খৃ.) দখল করিয়া লওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শাসন করেন এবং ১৮৩৫ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা মিসরীয় শাসনাধীনে থাকে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা য়ামান পুনর্দখল আরম্ভ করিলে ২৮ অক্টোবর তা'ইয্য তাহাদের অধিকারে যায় এবং ১৮৯২ খৃ. পর্যন্ত তাহাদের দখলে থাকে। এই সময় ইমাম আহমাদু'দ-দীন-এর নেতৃত্বে য়ামানীদের বিরাট গণবিদ্রোহ সংঘটিত হইলে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য শহরের দুর্গ যায়দীদের হাতে যায়। কিন্তু তুর্কীরা পর বৎসরই অর্থাৎ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনর্দখল করে এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের দখলে রাখে। য়ামান হইতে তুর্কীদের চলিয়া আসার পর তা'ইয্য আবার সান'আ'-র ইমামদের শানসাধীনে আসে। বর্তমানে য়ামান (আরব রিপাবলিক)-এর অন্তর্গত তা'ইয্য একটি সমৃদ্ধ শহর। দূতাবাসগুলি এই শহরে অবস্থিত (আল-মুন্‌জিদ, ২খ, ১৮৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৮৪৫, ৩খ, ৬২৪; (২) মারাসি'দু'ল-ইততিলা' সম্পা. T.G.J. Juynboll, ১খ, ২০৬; (৩) ইব্‌ন বাতূতা, রিহলা, সম্পা. C. Defremery ও B. R Sanguinetti, ii, প্যারিস ১৯১৪ খৃ., ২খ, পৃ. ১৭১ প.; (৪) W. Redhouse, The Pearl-Strings, a History of the Resuliyy dynasty of Yemen, G.M.S., III/ii, Leyden 1907, p. 205; (৫) Decada decima da Asia de Diogo de Couto, Lisbon 1786, Book viii, chap. 15; (৬) C. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Copenhagen 1772, p. 240. প.; (৭) C. Ritter, Die Erdkunde von Asien, viii/i, Berlin 1846, p. 235, 724, 740, প., 781 প., 785; (৮) A. Sprenger, Post-und Reiserouten des Orients, Abh. f d. Kunde d. Morgenlandes, III/3, Leipzig 1864, p. 152, 156; (৯) ঐ লেখক, Die alte Geographie arabiens, Bern 1875, P. 183; (১০) H. v. Maltzan, Reise nach Sudarabien, Braunschweig 1873, p. 205-207, 398-405; (১১) P. E. Botta, Relation d'un voyage dans l'Yemen entreprisen 1837, Paris 1880, P. 109-111, 132; (12) R. Manzoni, El, Yemen, tre anni nell' arabia felice. Escursioni fatte dal Settembre 1877 al Marzo 1880, Rome 1884, p. 180, 313-319, 342; (১৩) A. Deflers, Voyage au Yemer, Journal d'une excursion butanique faite en 1887 dans les montagens de l'Arabic heureuse, Paris 1889, p. 88. 91; (১৪) E. Glaser, Skizze der Geschichte u. Geographic Arabiens, ii, Berlin 1890. p. 162; (১৫) ঐ লেখক, Tagobuch i., fol. 19; ((১৬) ঐ লেখক, Tagebuch, ii, 1887, fol. 22v 23r, 27r, 28v, 32v; (17) M. Hartmann, Der lslamische Orient, Berichte und Forschungen, ii, Die arabische Frage, Leipzig 1909, p. 169, 417, 467 প., 538, 546; (১৮) G. W. Bury, Arabia Infelix or the Turks in Yemen, London 1915, p. 23-25; (১৯) F. Stuhlmann, Der Kampf um Arabien zwischen der Turkei und England, Hamburgische Forschungen,i, Braunsohweig 1916, p. 73, 77, 101; (২০) Handbooks prepared under the direction of the historical section of the Foreign Office, No. 61, Arabia, London 1920, p. 53, 69, 72; (২১) D. G. Hogarth, Arabia, Oxford 1922, p. 91 প., 98।

A. Grohmann (E.I[1]) মোঃ মনিরুল ইসলাম

তাইরে (TIRE) ঃ টায়ার? আনাতোলিয়ার একটি শহর, ইহা Kucuk Menderes উপত্যকায় অবস্থিত আইদিন বিলায়েত-এর অন্তর্গত তাইরের কাযা-র রাজধানী। Smyrn হইতে ইহা ১৮ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত এবং রেলপথের মাধ্যমে Smyrna-র সহিত সংযুক্ত। বর্তমান শহরটি সম্ভবত প্রাচীন Arcadiopolis (পরবর্তী নাম TIRE-শহর, উদাহরণ Thya-teira; তু.W. M. Ramsay, Historical geography of Asia Minor, পৃ. ১০৪, ১১৪)-এর স্থানে অবস্থিত। বায়যানটাইন আমলে শহরটি Thyrea এবং Thyraia (...তু. Ducas, পৃ. ৩৮, ৭৩, ৯৭, ১০৯, ১৭৬) নামে পরিলক্ষিত হয় এবং ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ একটি ভূমিকা পালন করে। Sasan ১৩০৮ খৃ. Ephesus-এর অধিবাসিগণের অনেককেই তাইরে-তে স্থানান্তরিত করেন (তু. Pachymeses, ২খ, ৫৮৮)। ইব্‌ন বাতূতা (২খ, ৩০৭) প্রমুখ পর্যটক Birge হইয়া Tire (যাহা ছিল বাগান, ফল বাগিচা ও নদী-নালায় বেষ্টিত এবং Birge-এর সুলতান অর্থাৎ আয়দিন ওগফু-এর এলাকায় অবস্থিত ছিল)-এ গমন করিতেন, তদ্রূপ দুঃসাহসিক ক্যাটালোনীয় কাহিনীকার Ramon Muntans-ও তাইরে হইয়া ভ্রমণে যান। খৃ. ১৪০৩ সালে তীমূর যখন তাইরের বিরুদ্ধে অভিযান করেন

তখন ইহার অধিবাসিগণ Smyrna পলায়ন করে (তু. Ducas, পৃ. ৩৮, ৯৭, ১০৯)। ৮৩০/১৪২৬ সালে আয়দিন ওগলু-র ক্ষুদ্র রাজ্যের পতনের পর তাইরে 'উছমানী সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। পরবর্তী কালের ইতিহাসে ইহা বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করে নাই। ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত এইখানে একটি টাকশাল ছিল এবং মাঝে মাঝে বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর বিবরণে ইহার উল্লেখ দে খা যায় (তু. J. Von. Hammer, G.O.R. ৪খ, ৩৯৮, টীকা এবং ৫খ, ৫০, টীকা)। প্রসিদ্ধ 'উলামা' 'আবদু'ল-লাতীফ ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয ইব্ন ফিরিশ্‌তে [আরবী ঃ ইবনু'ল-মালাক, তুর্কী ঃ ফিরিশ্‌তে ওগলু] যাঁহার মৃত্যু ঘটে ৭৯৯/১৩৯৬ সনে আয়দিন-এর সালনামা (বর্ষপঞ্জী) অনুসারে (পৃ. ২৩৯] (এই সম্পর্কে তু. শাকা'ইকু'ন-নু'মানিয়্যা, পৃ. ৬৬ দ্র.) তাঁহার সমাধি তাইরে শহরে অবস্থিত। তিনি এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন দুইটি রচনার জন্য ঃ এক, বহুল ব্যবহৃত কাব্য ছন্দের রচিত একটি তুর্কী অভিধান (লুগাত-ই ফিরিশ্‌তে ওগলু) এবং দুই, উসূলুল ফিক্‌হ সম্পর্কে আন-নাসাফী (দ্র.]-এর রচিত মানারু'ল আনওয়ার-এর ভাষ্য। তিনি সেইখানে এক মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করিতেন এবং অদ্যাবধি তাঁহার নামীয় মাদারাসাটি সচল রহিয়াছে। তাইরে শহর কতিপয় 'উছমানী লেখকের জন্মস্থান, যেমন শায়খ হায়দার ইব্ন 'আবদিল্লাহ (তু. 'আতা'ঈ, যায়ল-ই শাকাইক, পৃ. ১৯১), মুল্লা নাসরুল্লাহ আর-রূমী (ঐ, পৃ. ১২৩) এবং কাযীগণের কর্মস্থলরূপে ইহা উল্লেখ্য। এই কাযীগণ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একটি ভূমিকা পালন করেন (তু. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৩০, ১৭২ ও F. Babinger, G.O.W. পৃ. ১৪৬ ঃ জার্‌রাহযাদা)। নির্বাসনের স্থানরূপেও তাইরে শহরের উল্লেখ দেখা যায় ঃ উদাহরণস্বরূপ এই স্থানে বহুমুখী প্রতিভাধর ঐতিহাসিক শানী যাদা-র জীবনাবসান ঘটে (তু. F. Babinger, G.O.W. পৃ. ৩৪৬)। প্রাথমিক পর্যায়ের য়ূরোপীয় পর্যটকগণ কদাচিৎ তাইরে গমন করিতেন। স্বল্প সংখ্যক পর্যটকদের মধ্যে Smyrna-য় অবস্থিত ইংরেজ কারখানার chaplain Edm. Chishull (মৃ. ১৭৩৩) অন্যতম (তু. Traxelsin Turkey and back to London, London ১৭৪৭ খৃ., পৃ. ১৯ প, Thos. Smith, Septen Asiae Ecclesiarum Notitia)। আওলিয়া চেলেবী (দ্র.) তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীর ৯ম খণ্ডে (অদ্যাবধি অপ্রকাশিত) তাইরে শহরের বর্ণনা করিয়াছেন। মনে হয়, এই শহরে প্রাচীন কোন নিদর্শন নাই। বাগদাদ-এর শাসনকর্তা নাজীব পাশার প্রদত্ত উপহার যে গ্রন্থাগারে ১,৩২৫ গ্রন্থ (উল্লিখিত ফিরিশ্‌তে ওগলু-র ভাষ্যের Hologaph অর্থাৎ রচয়িতা বলিয়া উল্লিখিত ব্যক্তির নিজ হস্তে লিখিত পুস্তকসমেত) ছিল কেবল তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তুর্কী-গ্রীক অধিবাসী বিনিময়ের পূর্ব পর্যন্ত তাইরে শহরে প্রায় ১৫,০০০ প্রধানত গ্রীক অধিবাসী ছিল (তু, ৫খ, Cuinet, Turquie d' Asie, ৩খ, ৫০৮ প.)। তাহারা প্রধানত গালিচা বয়ন এবং আঙ্গুর চাষের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধগর্ভের নির্দেশনাসমূহের অতিরিক্ত) (১) Karl Buresch, Aus Ladien (Leipzig ১৮৯৮), পৃ,. ৩২, ১৬৫, ২১৪; (২) Stephanus. Byz., সম্পা. Westermann (Leipzig ১৮৩৯), পৃ. ২৭৩; (৩) Lebean, Histoire du Bas Empire, civ, 38; (8) Fr. V. J. Arundel, Discoveries in Asia Minor, London ১৮৩৪; (৫) ঐ লেখক, A Visit to the Seven Churches of Asia, London ১৮২৮; (৬) হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা (Stambul ১১৪৫), s. ৬৩৬; (৭) মুহাম্মাদ 'আশিক;, মানাযিবু'ল-মাওয়ালিন, Vienna, পাণ্ডুলিপি, পত্রক ২১৩১; (৮) F. Taeschner, Anatol. Wegenetz, Leipzig ১৯২৪-৬ খৃ., ১খ., ১৭৬, ২খ, ৩৯; (৯) শারাফুদ-দীন 'আলী আল-য়াযদী, যাফারনামা, ২খ, ৪৬৮; (১০) ঐ লেখক, অনু. by F. Petis de la Croix, Delft ১৭২৩ খৃ., ৪খ., ৪৪; (১১) W. Tomaschek, Zur histor. Topographie Kleinasiens in Mittelalter, in S. B. Ak. Wien exxiv/viii, ৩৪.।

F. Babinger (E.I. [1])/ আবদুল বাসেত

তাউস ইব্ন কায়সান (طاوس بن كيسان) ঃ (র), বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ ও ফকীহ। উপনাম আবূ 'আব্‌দি'র রাহ্‌মান। তাউস তাঁহার আসল নাম। কাহারও মতে তাঁহার আসল নাম যাক্‌ওয়ান এবং তাউস তাঁহার উপাধি। পিতৃপুরুষদের আবাস ছিল পারস্যে। তিনি বাহীর ইব্ন রায়সান আল-হিম্‌য়ারীর মাওলা ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে হাম্‌দান গোত্রের মাওলাও বলিয়াছেন। ইব্ন হিব্‌বানের মতে তাঁহার মাতৃকুল ছিল পারস্যের এবং পিতা ছিলেন আন-নাসির্ ইব্ন কাসিত গোত্রের। তাউসের পিতা য়ামানের প্রসিদ্ধ শহর জানাদে আসিয়া বসবাস শুরু করেন।

তাউসের জ্ঞান-গরিমা ও মাহাত্ম্য সর্বজনস্বীকৃত। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের তাবি'ঈ। পঞ্চাশজন সাহাবীর তিনি সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) হইতে বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণ করিয়াছেন, এই কারণে ফিক্‌হশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হইত "য়ামানের ইব্ন সীরীন"।

মুহাদ্দিছ হিসাবে তাঁহার স্থান শীর্ষভাগে। 'আবদুল্লাহ চতুষ্টয় [আল-'আবাদিলাতু'ল- আরবা'আহ-'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্‌'উদ (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আম্‌র ইব্নু'ল-আস (রা)] ছাড়াও হযরত 'আইশা (রা), আবূ হুরায়রা (রা), যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা), যায়দ ইব্ন আরকাম (রা), সুরাকা ইব্ন মালিক (রা), সাফ্‌ওয়ান ইব্ন উমায়্যা (রা), জাবির ইব্ন 'আব্‌দিল্লাহ (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্নু'ল-হাদ (রা) প্রমুখ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর বিশিষ্ট শাগ্‌রিদ। সুফ্‌য়ান ইব্ন 'উয়ায়না প্রসিদ্ধ তাবি'ঈ 'আবদুল্লাহ ইব্ন য়াযীদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনি কাহাদের সঙ্গে ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর মজলিসে যাইতেন?" উত্তরে বলিলেন, 'আতা' ইব্ন আবী রাবাহ (র) প্রমুখের সঙ্গে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাউস?" উত্তর দিলেন, "তিনি যাইতেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দলে"। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলিতেন, "আমি ত মনে করি তাউস জান্নাতবাসীদের অন্যতম।" তিনি হযরত 'উছমান (রা), 'আলী (রা) ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতেও হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তবে হাদীছ বিশারদদের মতে উহা মুরসাল। কেননা তিনি তাঁহাদের সাক্ষাত লাভ করেন নাই। হযরত 'আইশা (রা)-র সহিত তাঁহার সাক্ষাত লাভ সম্বন্ধেও দ্বিমত রহিয়াছে।

হাদীছ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে তাঁহার অত্যুচ্চ মর্যাদা দেখিয়া সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার শাগরিদত্ব গ্রহণ করেন, যাঁহাদের তালিকা অতি দীর্ঘ। উদাহরণস্বরূপ ওয়াহ্‌ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র), সুলায়মান আত-তায়মী (র), সুলায়মান আল-আহ্‌ওয়াল (রা), ইমাম ইব্ন শিহাব আয-যুহ্‌রী (র), ইব্‌রাহীম ইব্ন মায়সারা (র), মুজাহিদ (র), আবুয-যুবায়র (র), আল-হাসান ইব্ন মুসলিম (র), কায়স ইব্ন সা'দ

আল-মাক্কী (র), লায়ছ ইব্ন আবী সুলায়ম (র), 'আম্র ইব্ন শু'আয়ব (র), আল-হাকাম ইব্ন 'উতায়বা (র), হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত (র), 'আম্র ইব্ন মুসলিম আল-জানাদী (র), 'আম্র ইব্ন দীনার (র), সুলায়মান ইব্ন মূসা আদ-দিমাশকী (র) ও 'আবদু'ল মালিক ইব্ন মায়সারা (র)। তাঁহাদের মাধ্যমে তাউস বর্ণিত হাদীছসমূহ চতুর্দিকের মুহাদ্দিছ ও গ্রন্থকারদিগের হাতে গিয়া পৌছায় এবং দারসে হাদীছ ও হাদীছ গ্রন্থসমূহে মর্যাদার সহিত স্থান লাভ করে। তাউস ছিলেন একজন সমাদৃত মুহাদ্দিছ। হাদীছ বিশারদগণ তাঁহার সপ্রশংস প্রত্যয়ন করিয়াছেন। আয-যুহ্‌রী (র) বলিতেন, "তুমি যদি তাউসকে দেখিতে তাহা হইলে বলিতে, এই ব্যক্তি কখনও মিথ্যা বলিতে পারেন না।" 'আম্র ইব্ন দীনার বলেন, "আমি তাউসের সমতুল্য কাহাকেও দেখি নাই।' অনেকে তাঁহাকে ও সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র)-কে একই পর্যায়ের মনীষী মনে করেন। সুলায়মান ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক যখন হজ্জব্রত পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কা মুকার্‌রামায় আগমন করেন, নির্দেশ দিয়াছিলেন–যেন একজন ফকীহকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল, এই সম্পর্কিত কিছু প্রশ্নের সমাধান লাভ করা। তাঁহার দেহরক্ষী যখন ফকীহের সন্ধানে বাহির হইল তখন লোকেরা একজন হাজ্জীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "ঐ ত তাউস আল-য়ামানী, একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ।" ফলে দেহরক্ষী তাঁহাকে অনেকটা জোরপূর্বক খলীফার নিকট উপস্থিত করিয়াছিল। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ খলীফা একজন সৌম্য, সুদর্শন লোককে তাওয়াফেরত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" ইমাম যুহ্‌রী (র) ছিলেন তাঁহার সঙ্গে। বলিলেন, "ইনি তাউস, বহুজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন।" অতঃপর খলীফা তাঁহাকে ডাকাইয়া লইয়াছিলেন।

তাউস ইব্ন কায়সান (র)-এর জীবনের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দিক হইল যে, তিনি আমীর-উমারার প্রতি অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে কখনও তাহাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেন না, কখনও তাহাদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করিতেন না। নিতান্তই যদি কোন আমীর বা শাসকের নিকট উপস্থিত হইতে হইত, তবে অতিশয় রুক্ষ, দ্ব্যর্থহীন ও অকপট আলোচনা করিতেন (বিস্তারিত ঘটনাবলীর জন্য দ্র. আল-বিদায়া ওয়া'ন- নিহায়া, ৯খ, ২৪৬, ২৪৭, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ২খ, ৫১০)।

তাউস ইব্ন কায়সানের জীবনে জ্ঞানচর্চার সহিত বাস্তব কর্মের সাযুজ্য লক্ষণীয়। 'আমলের প্রতি তাঁহার ঝোঁক ছিল অত্যধিক। য়ামানের 'ইবাদাত-প্রেমিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। সিজ্‌দার আধিক্যে তাঁহার ললাটে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। কখনও গোটা রাত্রই 'ইবাদতে কাটাইয়া দিতেন। পার্থিব জীবন ও ইহার ভোগ-বিলাসের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নিরাসক্ত। মুমূর্ষু অবস্থায়ও তিনি দাঁড়াইয়া সালাত আদায় করিতেন। তিনি চল্লিশবার হজ্জব্রত পালন করিয়াছেন। তাওয়াফের সময় কোনরূপ কথাবার্তা বলিতেন না। তাঁহার কথা ছিল তাওয়াফ ও সালাত–এই সময় কথা বলা নিষিদ্ধ (বিস্তারিত দ্র. সিফাতু'স, সাফ্‌ওয়া, ২খ, ১৬২, ১৬৩; আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৯খ, ২৪৬; আল-হিল্‌য়া, ৪খ, ২৪)।

উপদেশ ও নসীহতের ক্ষেত্রেও তাউস অপরাপর সকলের অগ্রভাগে ছিলেন। তাঁহার উপদেশ খুবই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবহ ও হৃদয়গ্রাহী হইত। আবূ 'আব্‌দিল্লাহ আশ-শামী বলেন, "আমি একবার তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, "তুমি কি চাও আমি এই বৈঠকে তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনের উপদেশ কয়েক শব্দে তোমার হাতে তুলিয়া দেই?" বলিলাম, "কেন হইবে না?" তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্‌কে আর সব কিছু অপেক্ষা অধিক ভয় কর, তাঁহার নিকট আশাবাদী হও, তাহা ছাড়া নিজের জন্য যাহা ভালবাস অপরের জন্যও তাহা ভালবাস।" পুত্র 'আবদুল্লাহকে বলিতেন, "জ্ঞানীদের সঙ্গ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি জ্ঞানী না হইলেও মানুষ তোমাকে জ্ঞানী মনে করিবে। মূর্খদের সঙ্গ পরিহার কর, অন্যথায় তুমি জ্ঞানী হইলেও মানুষ তোমাকে মূর্খ ভাবিবে। 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-আযীয (র) খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাকে উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলেন, "যদি আপনি খিলাফাতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড উত্তমরূপে চালাইবার ইচ্ছা রাখেন, তবে সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে দায়িত্বে নিযুক্ত করুন।" খলীফা তাঁহাকে উত্তরে লিখিলেন, "আপনার এই উপদেশই আমার জন্য যথেষ্ট।" তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহও পিতার উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন।

তিনি হি. ১০৬ মতান্তরে ১০৫ হি. সনে হজ্জ আদায়ের প্রাক্কালে ইনতিকাল করেন। তখন তিনি মিনা বা মুয্‌দালিফায় ছিলেন। একে তো হজ্জ-এর মৌসুম, দ্বিতীয়ত, তাউসের ন্যায় ব্যক্তিত্ব, অতএব দর্শক ও শোকার্ত জনতার এত ভীড় জমিয়াছিল যে, সুশৃংখলভাবে জানাযা আদায় ও খাট লইয়া অগ্রসর হওয়া মুশ্‌কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হিশাম তাঁহার পুত্রকে তদারকির জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দেহরক্ষীদের সহায়তায় খুবই কষ্টে এই কার্য সম্পন্ন করেন। হযরত হাসান (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (র) অন্যদের সঙ্গে খাট বহনে শরীক ছিলেন। প্রচণ্ড ভিড়ে তাঁহার মস্তক হইতে টুপি পড়িয়া গিয়াছিল, যাহা আর তুলিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই। পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার চাদর মানুষের পায়ে পায়ে দলিত হইয়াছিল। বর্ণিত আছে, কোন ব্যক্তি তাঁহার জানাযা আদায়ের পর নিরাপদ পোশাকে ফিরিতে পারে নাই। এই সময় সকলের মুখে শুধু এই কথাই ছিল ঃ رحم الله ابا عبد الرحمن حج اربعين حجة "আল্লাহ আবূ 'আবদি'র-রাহ্‌মানের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; তিনি চল্লিশবার হজ্জব্রত পালন করিয়াছেন।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ৮, ৯; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৫৬; (৩) আস-সাম্'আনী, আল-আনসাব, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮, ২খ, পৃ. ৪১৯; (৪) ইবনু'ল-জাওযী, সিফাতু'স-সাফ্‌ওয়া, হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৯/১৯৬৯, ২খ, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, বৈরূত ১৯৬৯ খৃ., ২খ, ৫০৯, ৫১০, ৫১১; (৬) আয-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, বৈরূত ১৩৭৪ হি., ১খ, ৯০; (৭) ঐ লেখক, সিয়ার আ'লামি'ন নুবালা,' ১৪০৬/১৯৮৬, ৫খ, ৩৮-৪৯; (৮) ইব্ন আবী হাতিম, কিতাবুল-জার্‌হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৫০০; (৯) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৫খ, ৫৩৭, ৫৩৮; (১০) আবূ নু'আয়ম, হিলয়াতু'ল আওলিয়া', বৈরূত তা. বি., ৪খ, ২৩ প.; (১১) আন-নাওয়াবী, তাহ্‌যীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল লুগাত, মিসর তা. বি., ১খ, ২৫১; (১২) আল-বুখারী, আত তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৬৫; (১৩) ইব্ন হিব্‌বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৩৯১; (১৪) ইবনু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্‌কী, শাযারাতু'য-যাহাব, ১৩৯৯/

১৯৭৯, ১খ, ১৩৩; (১৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৯খ, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭; (১৬) য়াকূত আল-হামাবী আল-বাগ্দাদী, মু'জামু'ল-বুলদান, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ১৬৯।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

আত-তাওয়ামান (التوامان) ঃ যমজদ্বয়, Gemini নক্ষত্রপুঞ্জ; আল-কাযবীনী-র মতে ইহাতে ১৮টি নক্ষত্র রহিয়াছে, অন্য ৭টি নক্ষত্র এই অংকের সহিত যুক্ত নহে। ইহার অবয়ব দুইট মানুষের প্রতিকৃতির মত, যাহাদের মস্তক উত্তর-পূর্বে ও পদদ্বয় দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই নক্ষত্রপুঞ্জের শিরদেশের দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আরবী নাম আয-যিরা'উ'ল-মাব্সূতা (الذراع المبسوطة) অর্থাৎ প্রসারিত হস্ত, যাহা চন্দ্রের ৭ম অবস্থান নির্দেশ করে। দ্বিতীয় যমজের পদদ্বয়ের নিকটস্থ দুইটি নক্ষত্র চন্দ্রের আল-হান্'আ নামে কথিত অবস্থান গঠন করে। কালপুরুষ (Orion)-এর মত গোটা নক্ষত্রপুঞ্জটিকে আজ-জাওয়া নামেও অভিহিত করা হয়, আর এই একই কারণে Pollux নক্ষত্রের নাম হইয়াছে Ras algeuse। বর্তমানে যে নক্ষত্র দুইটি Castor ও Pollux নামে পরিচিত টলেমীর (Ptolemy) লেখায় ঐ দুইটি নক্ষত্রের নাম হইতেছে Apollo ও Heracles। এই নাম দুইটি আবার 'আলী রচিত টলেমীরত টীকাভাষ্যের ল্যাটিন অনুবাদে হইয়াছে Avellar ও Abracaleus।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কায্বীনী, 'আজা'ইবু'ল-মাখ্লূকাত, সম্পা. Wustenfeld, 1, 36; (2) L. Ideler, Untersuchungen uber den Ursprung und die Bedeutung der Sternnamen, 1809, p. 150 sqq.

J. Ruska (E. I[1])/ আফতাব হোসেন

তাওকী' (توقيع) ঃ ('আ) আভিধানিক অর্থ হালকা ছোট্ট চিহ্ন বশেষ (আস-সূলী)। ইহা দ্বারা একটি দলীল, যাহাতে একজন শাসকের স্বাক্ষর বা স্বাক্ষরের প্রতিভূ কোনও চিহ্ন (আলামা) রহিয়াছে, বুঝায়। এই কারণেই ইহা সাধারণত কোনও শাসকের ফরমান বা আদেশবিশেষ, যাহা লিখিত আকারে প্রণীত হইয়া থাকে। তাওকী'-র একটি বিশেষ অর্থও আছে যদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট শাসকের [মোটামুটি 'উছমানী শাসকদের তুগরা (দ্র.)-র সমতুল্য] উপাধিকেও বুঝাইয়া থাকে। এই দলীলটি রাষ্ট্রীয় সচিবালয়ে উৎকীর্ণ করা হয় এবং এতদ্বারা উহা বৈধতাও লাভ করে। সেই তুলনায় 'আলামা অর্থ শাসকের চিহ্ন কিংবা চিহ্নাঙ্কিত করার কিছু সীল (মোহর জাতীয়) যাহা সংশ্লিষ্ট শাসক স্বয়ং নিজ হাতে দলীলে অঙ্কিত করিয়া দেন এবং যাহা তাঁহার স্বাক্ষর হিসাবে গণ্য হয়। তাওকী' ও 'আলামা শব্দ দুইটি কিছুটা সমার্থকরূপেও ব্যবহার করা হয়, তবে কখনও কখনও নির্বিচারে ইহাদের প্রয়োগ দেখা যায়। তাওকী' মূলনীতির জন্যও ব্যবহৃত হয়।

ইন্শা' রচনাবলীতে সাসানী রাজানুশাসনগুলির (তাওকী'আত) উল্লেখ আছে। কথিত হইয়া থাকে যে, উমায়্যা শাসকদের আমলে তাওকী'র ব্যবহাররীতি প্রচলিত হয়। অবশ্য এই বিষয়টি নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, রীতিটি প্রকৃতপক্ষেই প্রাচ্য দেশীয়। স্বয়ং খলীফা জনসমক্ষে তাঁহার নিকট আনীত নানা অভিযোগ-ফরিয়াদের (কিসাস) বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়ার সময় এই তাওকী' রীতির প্রয়োগ করিতেন। অর্থাৎ খলীফা তাঁহার রায় দেওয়ার পর তাঁহার সচিবগণ, অতঃপর ঐ রায়ের বা আদেশের উপর তাওকী' লিপিবদ্ধ করিয়া দিতেন। 'আব্বাসী আমলের ব্যাপারে কুদামা এক বিশেষ দীওয়ানু'ত-তাওকী' (অনুশাসন দফতর)-র অস্তিত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। খলীফা হারূন'র-রাশীদের আমলে তিনিই 'আব্বাসী শাসকদের মধ্যে প্রথম বারমাকী উযীর জা'ফারকে প্রজাদের অভাব-অভিযোগের নিষ্পত্তি (তাওকী' 'আলা'ল-কিসাস) করিবার কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ফলে ইহাকে আমরা 'আব্বাসী শাসকদের উযীরদের ক্ষমতার গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধি হিসাবে বিবেচনা করিতে পারি। ইব্নুস সায়রাফীর বর্ণনা অনুসারে ফাতিমী শাসকদের দীওয়ানে প্রজাদের অভিযোগের বিচর নিষ্পত্তির জন্য একজন বিশেষ সচিব নিযুক্ত থাকিতেন। তাওকী'আত 'আলা'ল-কিসাস-এর জন্য নিযুক্ত সচিব পদমর্যাদায় শীর্ষস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মামলূক সুলতানদের শাসনামলে তাওকী' আলাল-কিসাস একান্ত সচিব (কাতিবু'স সিরর্)-এর কর্তৃত্বাধিকারভুক্ত ছিল। অবশ্য সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সুলতানগণ নিজেরাও এই অধিকার প্রয়োগ করিতেন।

মামলূক শাসন ব্যবস্থায় তাওকী' শব্দটি একটি বিশেষ শ্রেণীর পদে নিয়োগের বেলায় প্রযুক্ত হইত। ইব্ন ফাদলুল্লাহ অবশ্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা হইতে শুরু করিয়া বিখ্যাত গভর্নর (নুওওয়াব) অবধি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সকলের উপাধিতেই তাওকী' শব্দটি ব্যবহৃত হইত। আর তাই সাধারণভাবে সকল নিয়োগের বেলাতেই ইহা সর্বাপেক্ষা বহুল ব্যবহৃত শব্দ হইয়া উঠে। অবশ্য ইব্ন ফাদ্লুল্লাহ ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন, কেবল সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী কর্মকর্তা নিয়োগের বেলায় ইহা ব্যবহৃত হইত। কিছু পরে ইহা পাগড়িধারীদের (মুতা'আম্মিনূন) তথা ধর্মীয় ও দীওয়ানী কর্মকর্তাদের নিয়োগের বেলায় ব্যবহৃত হইতে থাকে। কাল্কাশান্দীর বর্ণনা অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে (বিলায়াত) তাওকী' হইতেছে চতুর্থ ও সর্বনিম্ন, সর্বাধিক ব্যাপক কর্মচারীবর্গের উপাধি বা খেতাব।

'উছমানী সাম্রাজ্যে নিশানজি বা তাওকী'ঈ নামে একজন বিশেষ কর্মকর্তা রাজানুশাসন সম্পর্কিত দায়িত্বগুলি পালন করিতেন। সুলতানের নাম ও খেতাব উৎকীর্ণ দলীল-পত্রাদির জন্য তিনি দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনি রাজ্যের (এরকান-ই দেওলেত) সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্যতম ও সম্রাটের সচিবালয়ের একজন সদস্য ছিলেন। স্বয়ং সুলতান যে তাওকী' জাতীয় দলীল লিখিয়া দিতেন তাহার প্রচলন এই আমলে বন্ধ হইয়া যায়। উছমানী কূটনৈতিক 'আলামেত-এর অর্থ ফারসী 'নিশান' শব্দের অনুরূপ অর্থাৎ রাজকীয় স্বাক্ষর বহি (ম্যানুয়াল)। একজন বিশেষ সহকারী নিশানজি-র দফতরে সুলতানের ঐ স্বাক্ষর বা চিহ্ন লিপিবদ্ধ বা উৎকীর্ণ করার দায়িত্ব সম্পন্ন করিতেন। এই কর্মচারীর পদবী ছিল তুগ্রাকেশ। এই ক্ষেত্রে 'আলামেত ও তাওকী' সমার্থক।

পরিশেষে তাওকী' বলিতে মধ্যযুগের শেষভাগে (১২শ-১৪শ খৃ. শতক) প্রচলিত এক বিশেষ শৈলীর লিপিকে বুঝাইত। এই ধরনের লিপি, বিশেষত ঐ যুগের মামলূক ও 'উছমানী শাসনাধীন অঞ্চলে দলীলপত্র লিখনে ব্যবহৃত হইত। 'উছমানী আমলের স্বর্ণযুগে (খৃস্টীয় ১৫শ শতক) দীওয়ান লিপি ঐ তাওকী' লিপির স্থলাভিষিক্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কামূস দ্র.; (২) কালকাশান্দী, সুবহু'ল-আ'শা', কায়রো ১৩৩২-১৩৪৬ হি.; (৩) W. Bjorkman, Beitrage Zur Staatskanzlei im islamischen Agypten, Hamburg 1928; (৪) 'উছমানী নিশান্জি সম্পর্কে তু. J. V. Hammer, Des Osmanlischen, Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, ii, Vienna 1815, p. 133 প.; (৫) Md. d'Ohsson, Tableau de l'Empire Othoman iii, Paris

1830, P. 350: (৬) Fr. Kraelitz, Osmanische Urkunden in turkischer Sprache, Vienna 1921, p. 18 প.। বিশেষ হস্তলিপি হিসাবে তাওকী' সম্পর্কে দ্র. (৭) Kraelitz, পূ. গ্র., P. 8; (৮) L. Fekete, Einfuhrung in die osmanisch-turkische Diplomatik der turkischen Botmassigeit in Ungarn, Budapest 1926, P. xx; (৯) তাওকী' ও 'আলামা তু.; (১০) আবু'ল-ফিদা', তা'রীখ, ইস্তাম্বুল সংস্করণ, ৩খ, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮-১৩২৫ হি., কায়রো পু. মু., ৩খ, ১৪৮, ১৪৯ ও ১৫১; (১১) 'আলামা-র ধারণায় মূলনীতি অর্থে তাওকী'-র ব্যবহারের জন্য দ্র. ইব্ন বীবী, সম্পা. Houtsma, পৃ. ২৮৮ (তু, Kraelitz, পৃ, ২৩, টীকা ২); (১২) আস-সূলী, আদাবু'ল-কুত্তাব, কায়রো ১৩৪১ হি., পৃ. ১৩৪, ১৪৮।

F. Taeschner (E.I.[1]) /আফতাব হোসেন

তাওফীক পাশা (توفيق پاشا) ঃ মিসরের খেদিভ (১৮৭৯-১৮৯২ খৃ.), জন্ম ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৫২, তিনি খেদিভ ইসমা'ঈল পাশার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি মিসরে শিক্ষা লাভ করেন এবং ১৯ বৎসর বয়সে Council of State (আল-মাজালিসুল-খুসূসী)-এর সভাপতি হিসাবে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। ১০ মার্চ, ১৮৭৯ সালে নুবার পাশা পদত্যাগ করার পরে তাঁহার পিতা কর্তৃক তিনি প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার মন্ত্রীসভায় পূর্বের ন্যায় একজন ইংরেজ ছিলেন অর্থমন্ত্রী এবং একজন ফরাসী ছিলেন সরকারী পূর্ত কার্যের মন্ত্রী। কিন্তু পূর্বে সেই বৎসরের ৯ এপ্রিল ইসমা'ঈল এক প্রকার বেআইনী শাসন পরিবর্তন দ্বারা এই নূতন মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং শারীফ পাশা [দ্র.] প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পরে শীঘ্র রাজনৈতিক সমস্যার কারণে সুলতান কর্তৃক (২৬ জুন) ইসমা'ঈল পদচ্যুত হন এবং তাওফীক ১৮৬৬ খৃ. প্রবর্তিত উত্তরাধিকারের আইন অনুযায়ী সিংহাসনে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

রাজ্য শাসনের প্রারম্ভে তাওফীক পাশাকে অনেক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সিংহাসনে আরোহণের অনতিপরে শারীফ পাশাকে শাসন-প্রণালীর মুসাবিদা নূতন খেদিভের নিকট দাখিল করিতে হয় এবং উহা অনুমোদিত না হওয়ায় শারীফ পদত্যাগ করেন (১৮ আগস্ট)। অল্প সময়ের জন্য তাওফীক নিজেই প্রধান মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্র রিয়াদ পাশা ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন এবং 'উরাবী পাশার সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর তিনি ঐ পদে ছিলেন। ইত্যবসরে অর্থ বিভাগের উপর ইংল্যাণ্ড ও ফরাসীর "দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ" পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮০ খৃ. মিসর একটি নূতন উন্নত যুগে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যাহা হউক ১৮৮০-এর জানুয়ারীতে সেনাবাহিনীতে প্রথম অশান্তির সূচনা হইলে শারীফ পাশার ক্ষমতায় আসায় ৯ সেপ্টেম্বর উহা জাতীয় বিদ্রোহের রূপ লাভ করে। 'উরাবী পাশা [দ্র.] শীঘ্র জাতীয় আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত হইলেন। খেদিভের কোন শক্তিশালী দল ছিল না, যাহার উপর তিনি তাঁহার কর্তৃত্ব রক্ষার্থে এই আন্দোলন প্রদমিত করিবার ব্যাপারে আস্থা রাখিতে পারেন, তেমনিভাবে মিসরের সার্বভৌমত্বের অধিকারী তুর্কী সুলতান, যিনি খেদিভ সরকারের স্বাভাবিক রক্ষক, এত দুর্বল ছিলেন যে, তাঁহার কোন গুরুত্বই ছিল না। সুতরাং পরবর্তী সময়ে খেদিভের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া এবং জাতীয়তাবাদীরা যে পন্থা গ্রহণ করা উপযুক্ত মনে করিত তাহা তাহাদিগকে করিতে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁহারা একটি পন্থা এই অবলম্বন করেন যে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। যদিও প্রথমে জাতীয়তাবাদী নেতারা সংযম দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু আন্তর্জাতিক আর্থিক সংকটের ফলে শেষ পর্যন্ত দেশে বিদেশীদের প্রতি সাংঘাতিক বৈরী মনোভাব সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে আলেকজান্দ্রিয়াতে (১১ জুন, ১৮৮২) হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ফলে তাহার পরপরই ১৭ জুলাই শহরে বৃটিশ রণপোতবহর কর্তৃক কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয়। খেদিভ তাঁহার সরকারসহ পূর্বেই রাজধানী হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার নিকটে আর-রাম্‌লাতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু 'উরাবী তখন শাসনকর্তার বিপক্ষে খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহ শুরু করিয়াছিলেন। তিনি কয়েক মাইল দূরে কাফর-দাওআর-এর স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাওফীক পাশার রাজত্বকালে ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা সংকটপূর্ণ সময়। তাঁহাকে জাতীয়তাবাদ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের মধ্যে একটিকে পসন্দ করিতে হইয়াছিল, একই সময়ে সুলতান তাঁহার পদচ্যুতির এবং তাঁহার স্থলে তাঁহার পিতৃব্য 'আবদু'ল-হালীমকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা, এমনকি মিসরে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। উহাতে য়ূরোপীয় শক্তিগুলির মনোভাব দ্বারা তিনি বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ ইংলণ্ডের সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে (তেল্‌লে'ল কাবীর-এর যুদ্ধ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২) দমন করা হইলে দেশ সেনাবাহিনীর দখলে চলিয়া যায়। যুদ্ধের পরে তাওফীক কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করিলেন কিন্তু এই অবস্থায় তাঁহার সিংহাসন রক্ষা করিবার সম্ভাব্য উপায় ছিল দখলকারী শক্তির ইচ্ছার নিকট নতি স্বীকার করা। প্রকৃতপক্ষে, পুনরায় শারীফ পাশার তত্ত্বাবধানে আগস্ট ১৮৮২ হইতে খেদিভ সরকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। ইংরেজ অধিকারের পরে মিসরের শাসনের অন্য গৃহীত সকল ব্যবস্থা (যেমন মে ১৮৮৩-এর নূতন Organic Law, ১৮৮৪-এর রাজস্ব সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সংবিধান) তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক পরবর্তী কালের সঙ্কটময় বৎসরগুলিতে খেদিভ ও বৃটিশ প্রতিনিধি (resident, যাঁহাকে Consul General বলা হইত)-র মধ্যে একটি সুদৃঢ় সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বৃটিশ রেসিডেন্ট পরে Lord Cromer উপাধিতে আখ্যায়িত হন। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা অমঙ্গলজনক ঘটনাসমূহের মধ্যে ছিল সুদানে মাহদী বিপ্লব এবং মাহদীকে পরাজিত করিবার বৃথা চেষ্টার পরে (১৮৮৫ জানুয়ারীতে খারতুমের পতন) অনেকখানি তাওফীকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিপক্ষে মিসর কর্তৃক এই প্রদেশ ত্যাগ করা। কেবল ১৮৯০ খৃস্টাব্দের দিকে এই দেশের জন্য একটি অধিকতর অনুকূল সময়ের আগমন ঘটে। অনতিকাল পরে ৭ জানুয়ারী, ১৮৯২-তে তাওফীক পাশা অপ্রত্যাশিতভাবে হুলওয়ানে তাঁহার প্রাসাদে ইনতিকাল করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আব্বাস হিলমী তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

কথিত আছে যে, তাওফীক পাশার এত দৃঢ় মনোবল ছিল না যে, তিনি বিব্রতকর রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হইতে পারিতেন, বিশেষ করিয়া সেনাদলে প্রথম বিপ্লবের সূচনায় নিজের ও তাঁহার সরকারের দুর্বল মনোভাব প্রকাশ পাওয়ায় তিনি ও তাঁহার সরকার অপরিহার্যরূপে ঘটনা প্রবাহের গতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলেন। অপরদিকে

একজন শান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি হিসাবে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তন্মধ্যে Lord Cromer ও অন্যান্য রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি যাঁহারা তাঁহার বর্ণনা দিয়াছেন, সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ২১ বৎসর বয়সে খেদিভ পরিবারের এক মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন এবং তিনি এক স্ত্রী লইয়া সারা জীবন অতিবাহিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জিরজী যায়দান, মাশাহিরু'শ-শারক, কায়রো ১৯১০ খৃ, ১খ., ৪৮ প.; (২) A. Hasenclever, Geschichte Agyptens, im 19. Jahrhundert, Halle a. s. 1917, esp. p. 198 প.; (৩) Lord Cromer, Modern Egypt, লণ্ডন ১৯১১ খৃ., পৃ. ৭১৫ প.।

J. H. Kramers (E.I[1])/ মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

তাওফীক ফিকরেত (توفيق فكرة) ঃ তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল মুহাম্মাদ তাওফীক, কাব্যিক নাম ফিকরেত, যাহা প্রথম দিকে ছিল তাওফীক নাজমী। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ তুর্কী কবি ও ছন্দ বিশেষজ্ঞ, তুর্কী কবিতায় আধুনিক চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠাতা। ২৪ শা'বান, ১২৮৪/২৫ ডিসে., ১৮৬৭ সালে কনস্টান্টিনোপল-এ জন্ম, পিতা হুসায়ন আফিনদী, যিনি ছিলেন ফাতিমা সুলতান-এর সচিব, পরবর্তী কালে মুতেসেররিফ হন মূলত আনাতোলিয়ার চেরকেশ-প্রখ্যাত ব্যক্তিদের পরিবারের একজন বংশধর এবং মাতা খাদীজা রিফী'আ খানীম Chios দ্বীপের একজন তুর্কী মহিলা (সম্ভবত আদিতে গ্রীক বংশোদ্ভূত)।

তিনি উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আকসারায়-এ মাহমূদীয়া ওয়ালিদে রুশদিয়া স্কুলে প্রেরিত হন। রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় মুহাজিরদের সমাগম হওয়ায় যখন স্কুলটি বন্ধ হইয়া যায়, তখন তিনি নয় বৎসর বয়সে গালাতা উচ্চ বিদ্যালয়ে (Ghalata Seray Sultanisi) প্রবেশ করেন। এই স্কুলের সহিত প্রায় সারা জীবন তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। এগার বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার মাতাকে হারান, যিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মক্কায় হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন এবং সেইখানে উভয়ে কলেরায় মরুভূমির মধ্যে মারা যান। (ফিকরেত কেবল সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ক্ষতি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, যখন তাঁহার ভগ্নী ইনতিকাল করেন)। তিনি তাঁহার স্মরণে একটি মর্মস্পর্শী মারছিয়া (শোকগাঁথা হেমশীরেম ইচুন ১৩১৮/১৯০০) রচনা করেন। শৈশবকালে তিনি ছিলেন দুর্দমনীয় ও স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি নিজের উপর প্রভুসুলভ নিয়ন্ত্রণ চালান এবং গম্ভীর, প্রায় মনুষ্য-সংসর্গত্যাগী ও অতিরিক্ত সংবেদনশীল হইয়া পড়েন। ১৩০৪/১৮৮৬-৮৭ সালে স্কুল হইতে উহার সর্বাপেক্ষা কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি পাস করিয়া বাহির হন, রাজদরবারে এক চাকুরীতে প্রবেশ করেন। উহা তিনি ১৩১১ হি.-তে ত্যাগ করেন। কারণ তৎকালীন তুর্কী সরকারের চাকুরীতে কাজ না করার প্রবণতাই ছিল অধিক, যাহা তাঁহার সম্মান-সচেতন মনকে পীড়া দিত। একই সময়ে তিনি গেদিক পাশা বাণিজ্যিক স্কুলে ফরাসী, তুর্কী ও সুন্দর হস্তলিপি শিক্ষা দিতেন। ১৩০৬/১৮৮৮-৮৯ সালে তিনি গালাতা সারায় উচ্চ বিদ্যালয়ে তুর্কী ভাষার শিক্ষক হন। তিনি উহা ১৩১১/১৮৯৯ সালে ত্যাগ করেন। কারণ সরকার তাঁহার বেতন হ্রাস করেন। ১৩১২/১৮৯৪-৯৫ সালে তিনি রুমেলি হিসার-এ রবার্ট কলেজের শিক্ষক হন এবং সেইখানে মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন। রুমেলি হিসার-এ তিনি একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা তিনি নিজের শিল্পীসুলভ পরিকল্পনা (তিনি একজন শিল্পীও ছিলেন) দ্বারা মনোরম সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি স্ত্রী ও পুত্র খালুকসহ কাব্যময় নিরাপদ জীবন যাপন করেন। তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞাতি ভগ্নীও হইতেন। তাঁহাকে তিনি ১৩০৬/১৮৮৮ সালে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্রকে তিনি একখানি কবিতা গ্রন্থ উৎসর্গ করেন। (ভাগ্যের পরিহাস যে, তাঁহার মাতা হজ্জ করিতে যাইয়া ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার পুত্র খালুক Glasgow-তে খৃস্টান হইয়া যান। তিনি আমেরিকায় একজন প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং তজ্জন্য তুরস্কের সহিত সম্পর্ক হারান)।

১৩০৭ হি. হইতে তিনি সাময়িক পত্রিকা মিরসাদ-এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। পত্রিকাটি কবি ইসমা'ঈল সাফা দ্বারা সম্পাদিত হইত। ১৩০৯ হিজরীতে সাহিত্যানুরাগী কতিপয় বন্ধুসহ তিনি মা'লূমাত পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। উহা ২৪ সংখ্যার পরে সরকার কর্তৃক বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৯০ খৃ. আহমাদ ইহসান কর্তৃক স্থাপিত সাময়িকী ছারওয়াত-ই ফুনূন-এর সাহিত্য অংশের সম্পাদনার দায়িত্ব তিনি ১৩১১ হিজরীতে গ্রহণ করেন। তাঁহার সুদূরপ্রসারী সাহিত্যকর্ম তখন আরম্ভ হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একজন সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকে পরিণত হন। সুলতান 'আবদু'ল-হামীদের রাজত্বকালে তিনি নানা প্রকার বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হন। ১৯০৮ খৃ. বিপ্লবের পরে তিনি তরুণ তুর্কী সরকার কর্তৃক গালাতা সারায় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালক নিযুক্ত হন। তখন তিনি শিক্ষা মন্ত্রী হইতে অস্বীকার করেন। তিনি ঐ স্কুলটিকে একটি আধুনিক তুর্কী বিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শীঘ্রই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রক্ষণশীল দলভুক্ত ব্যক্তি ও অফিসের কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে তাঁহার মতবিরোধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৩২৭/১৯১০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কবিতা রচনায় ও রবার্ট কলেজের শিক্ষকতায় পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় তিনি একটি নূতন ধরনের তুর্কী স্কুল (য়েনি মাকতাব)-এর পরিকল্পনা করেন, কিন্তু ইহা কখনও কার্যকর হয় নাই। দীর্ঘকালের অসুস্থতার পরে তিনি ১৩৩১/১৮ আগস্ট, ১৯১৫ সালে ইনতিকাল করেন।

১৪ বৎসরের তরুণ বয়সে ফিকরেত গাযাল লিখিতে আরম্ভ করেন, অবশ্য পুরাতন পদ্ধতিতে (মুনতাখাবাত-ই তারজুমান-ই হাকীকাত, পৃ. ৫৩৩)। তিনি তাঁহার সাহিত্যিক যোগ্যতার বিকাশ ঘটান তাঁহার সাহিত্যের শিক্ষক ফায়দী মু'আল্লিম নাজী, বিশেষ করিয়া রেজা'ই-যাদে আকরাম-এর সাহায্যে। তাঁহারা তাঁহার উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যেমনটি তাঁহারা করিয়াছিলেন সমগ্র তরুণ বংশধরদের উপর। আকরাম তাঁহাকে ছারওয়াত-ই ফুনূন-এর প্রধান সম্পাদক হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকায় ফিকরেত-এর আগমনের সাথে উহার এক নূতন যুগের সূচনা হয়। ঐ সাময়িকী সমগ্র আধুনিক তুর্কী সাহিত্যের জন্য এমন একটি মান নির্ধারিত করিয়া দেয়, যাহা তাওফীক ফিকরেত (কাব্য) এবং খালিদ দিয়ার (গদ্য) যুগ বলিয়া পরিচিত হয়। অতি শীঘ্র পাশ্চাত্য ধারায় হুসায়ন যাহিদ কর্তৃক সম্পাদিত মেকতেব-এর সহিত যুক্ত সকল লেখক ও কর্মচারী ছারওয়াত-এ যোগ দেন, যাঁহাদের মধ্যে ছিলেন 'আলী আকরাম, 'আবদু'ল-হাক্ক' হামিদ, জনাব শেহাবু'দ-দীন, খালিদ দিয়া', 'আলী নাদির, হুসায়ন নাজিম, আহমাদ

রাশীদ। ঐ নূতন সাহিত্যে প্রাচ্যপ্রবণতা 'মুসাওওয়ার মা'লূমাত" দ্বারা উপস্থাপিত হয়।

উক্ত পদে যোগদানের দুই বৎসর পরে ফিকরেত তাঁহার প্রধান গ্রন্থ রুবা-ই শিকেস্‌তে (ভগ্নবীণা) (এদেবিয়াত-ই জেদীদে কুতুবখানেসি, নং ২, ইস্তাম্বুল ১৩১৪/১৮৯৬] প্রকাশ করেন। ইহাও অতুলীনীয় কৃতকার্যতা লাভ করে এবং বার বার মুদ্রিত হয় (তাঁহার পরবর্তী রচনাসমূহসহ) ১৩১৭/১৮৯৯ সালে তিনি লেখেন সিস (কুয়াশা), 'আবদু'ল-হামীদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিপক্ষে লিখিত তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবিতা; বর্তমানেও ইহা পঠিত হয়। বিপ্লবের পরে তিনি তাঁহার রুজু' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৩১৮/১৯০০ সালে তিনি লেখেন মারছিয়া হেমশীরেম, ইচূন; ১৩২২/১৯০৪-এ 'আবদু'ল-হামীদের জীবনের উপর ব্যর্থ আক্রমণের ঘটনা লাজা-ই তে'এখ্‌খুর ১৯০৮-এ; মিল্‌লেত শারকীসী। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত তানীন কাগজে (১ নং)-এ তিনি প্রকাশ করেন সিস্‌ ও রুজু', উহা পূর্বে গোপনে একে অন্যকে প্রদান করিত। ১৩২৯/১৯০৯ সালে দোকসানবেশে দোগরু প্রকাশ পাইয়াছিল। উহা ফেজর-ই আতী, রুবাবীন জেওয়াবী, খালূকীন দেফতেরী (অবিকল প্রতিরূপ এদেবিয়াত-ই জেদীদে কুতুবখানেসি, নং ৩১-এ) পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় আন্তরিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ১৩২৮/১৯১০ সালে খানয়াগলা কবিতা প্রকাশ পায় ১৩৩০ হিজরীতে শিশুদের জন্য সংগীত সংকলন পারমাক হিসাবী শেরমীন, তাঁহার শেষ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

তাঁহার গ্রন্থ সংখ্যায় অনেক নয়, কিন্তু তুর্কী সাহিত্যের জন্য ইহার গুরুত্ব তুলনাবিহীন। ফিকরেত এখন একজন বহু বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। অথচ তিনি জীবিতকালে গগনচুম্বী প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কাব্য প্রতিভাধর হিসাবে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গুরুত্ব হ্রাস করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে, এমনকি তাঁহাকে একজন প্রকৃত কবি হিসাবে অস্বীকার করিবার এবং তাঁহাকে কেবল একজন গুণী শিল্পী ও দক্ষ ছন্দবিশারদ হিসাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। অবিশ্বাস্যভাবে তাঁহার দ্রুত খ্যাতি লাভের পরে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত সমালোচনায় তাঁহার প্রতি আধুনিক দৃষ্টিভংগীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মিলিবে, "ফিকরেত তুর্কী সাহিত্যে একজন দক্ষ প্রয়োগবিদ হিসাবে অমর, মানুষ হিসাবে অবিস্মরণীয়, কিন্তু কবি হিসাবে সম্ভবত ইতিপূর্বেই বিস্মৃত।"

তাঁহার প্রতি সুবিচার করিতে হইলে প্রত্যেক কবির ন্যায় ফিকরেতকে তাঁহার যুগে ও পরিবেশে পাঠ করিতে হইবে। শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞানে তিনি সুনিপুণ তুর্কী পুনরভ্যুদয়ের স্রষ্টা, পাশ্চাত্য পদ্ধতির শিক্ষা প্রচলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। পূর্ববর্তী যুগ (কামাল, হামিদ, আকরাম) পারসীয় ও আরবীয় আদর্শের আধিপত্যের বিলুপ্তি ঘটাইয়াছিল, কিন্তু প্রাচ্য ধারা বাকী রাখিয়াছিল। এখন জীবনকে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিমুক্ত করিয়া তৎপরিবর্তে পাশ্চাত্য অর্থাৎ ফরাসী চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটান ছিল নির্দিষ্ট কাজ। ফিকরেত প্রভাবিত হইয়াছিলেন ফরাসী আদর্শে, বিশেষত Francois Coppee. Le Comte de Lisle. Sully Prudhomme along witb Musset, Lamartine,. Baudelaire ও Verlaine-এর আদর্শে।

তিনি কবিতার এক নূতন ভাষা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কবিতার মিলের জন্য তিনি নূতন বিধি তৈয়ার করিয়াছিলেন; এই নীতি অনুসারে মিলের উদ্দেশ্য চক্ষুর সন্তুষ্টি নহে, যেমন ছিল আকরাম ও 'আবদু'ল-হাকক হামিদের ক্ষেত্রে, ইহা কর্ণের সন্তুষ্টির জন্য। তাঁহার সুন্দর রুচি ও গভীর বিচার ক্ষমতার দ্বারা তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন তুর্কী ধারায় এবং আকারে ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটাইতে, ভাষা হইতে ভাষাতাত্ত্বিক অরাজকতা দূর করিতে, বিদেশী উপকরণ ও ছন্দকে তুর্কীরূপ প্রদান করিতে, যদিও শব্দসম্ভারে তুর্কীকে আরবী ফারসী শব্দ দ্বারা ভারাক্রান্ত করিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না ও তাঁহার কবিতায় অনেক বিরল অতুর্কী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। নামীক কামাল গদ্যের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, ফিকরেত কবিতার জন্য তাহা করিয়াছিলেন। যে নিয়মগুলি তিনি প্রবর্তন ও অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা এখন এত সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় যে, তাহা আর নূতন সংস্কার বলিয়া অনুভূত হয় না। তাঁহার মনোযোগের প্রধান বিষয় ছিল ভাষা, বিষয়টি অন্য কবিদের ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। ভাষার বিশুদ্ধতার বিষয়ে তিনি মু'আল্লিম নাজী-র সদৃশ এবং ভাষার উপর আধিপত্যে তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কিয়ৎ পরিমাণে Platen-এর সঙ্গে তুলনা করা যায় তাঁহার ভাষার পূর্ণতার জন্য এবং কবিতা ত্রুটিমুক্ত হওয়ার জন্য, এমনকি আহমাদ মিদহাত-এর ন্যায় ব্যক্তিও যিনি "অবক্ষয়ের বিরোধীদের অন্যতম ছিলেন, তিনিও তাঁহার ভাষার বিশুদ্ধতায় ও রচনাশৈলীর লালিত্যে কোন ত্রুটি দেখিতে পান নাই। এতদসত্ত্বেও তাঁহার রচনা ছিল যেন প্রাণহীন মসৃণ মর্মর প্রস্তর।

এমনকি তাঁহার প্রাথমিক গাযালগুলিতে তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট, যদিও তখনও পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে অধিকতর পুরাতন রীতিনীতির প্রভাবে ছিলেন। তাঁহার ভাষা অতি দ্রুত বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ইহা তাঁহাকে অন্য সকল হইতে পৃথক করিয়াছিল এবং অন্য সকল কবির কাছে তাঁহাকে এক আদর্শে পরিণত করিয়াছিল।

পুরাতন রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, প্রতিটি শ্লোক ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ একক (এই কারণেই বিশেষ করিয়া গাযালের শ্লোকগুলিকে অগ্রপশ্চাতে পরিবর্তন করা যাইত)। এইরূপে ফিকরেত ইহার বিপরীতে তাঁহার কবিতার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার কবিতায় নমনীয়তা ও স্বাভাবিকতা আছে, কবি হামিদ রচিত কথোপকথনমূলক কবিতায় যাহার অভাব রহিয়াছে। তাঁহার কবিতার ভাষা উহার সুরকে বিষয়বস্তুর উপযোগী করিবার চেষ্টা করে, যাহা তাঁহার পূর্বে নেফ'ঈ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার সনেট কবিতার সূচনায় ইহা পরিলক্ষিত হয়; তখন হইতে তুর্কী ভাষায় এই রীতির ব্যাপক চর্চা করা হইয়াছে।

তিনি এখনও সম্পূর্ণরূপে মাত্রাছন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। অবশ্য শিশুদের জন্য রচিত কবিতাগুলি ইহার ব্যতিক্রম। অন্যথায় পুরাতন ধারার অনুসারীরা এত দ্রুত উপলব্ধি করিতে পারিত না যে, তিনি নিশ্চিতরূপে একজন কবি।

ফিকরেত ছিলেন এক সূক্ষ্ম সমালোচনাপ্রিয় মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি তাঁহার কালের নীতি, ধর্ম ও রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনা করিতেন এবং তিনি অটলভাবে তাঁহার অন্তর ও বিবেকের আদেশ অনুসরণ করিতেন। কিন্তু মানব ধর্মের সমস্যাসমূহ মীমাংসা করিতে সক্ষম দার্শনিক তিনি ছিলেন না, আত্মার গভীরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তাঁহার মনন-শক্তি ছিল অত্যন্ত সাধারণ, প্রায় নগণ্য প্রকৃতির। তাঁহার ইনান্‌মাক ইহতিয়াজি ও তা'রীখ-ই কাদীম তাঁহার সময়ের অবিশ্বাসের প্রতিরূপ। 'আবদু'ল-হামীদের স্বেছাচারী শাসনের বিষাক্ত আবহাওয়ায় এবং পরবর্তীকালে তরুণ তুর্কীদের অনিয়ন্ত্রিত ও

একপক্ষীয় শাসনকালে তাঁহার নির্মল ব্যক্তিত্বের দ্বারা, নিজের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের দ্বারা কর্তব্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও তাঁহার নিখুঁত উৎসাহ এবং কবিতার দ্বারা তিনি তাঁহার দেশের প্রতি এমন কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন যে, তাহা তৎকালীন তরুণের প্রতি আবেদন রাখিয়াছিল, "নিজের প্রতি ফিকরেতের ন্যায় হও, তোমার দেশের কাছে নামীক কামাল হও!" যেহেতু তাঁহার প্রতিটি কবিতা হইতে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিবার ছিল, একটি শিক্ষণীয় শক্তি হিসাবে তুরস্কের যুবকদের প্রতি তাঁহার এক বিরাট প্রভাব ছিল। শিক্ষার মূল্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল।

তাওফীক ফিকরেত একজন কবি, যদিও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিরা তাঁহাকে যত বড় ভাবিতেন, তিনি তত বড় নন। তাঁহার মধ্যে নামীক কামালের ন্যায় কাব্য-প্রতিভার অভাব ছিল, বিশেষ করিয়া তাঁহার অদ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাসমূহের মধ্যে। যে কবিতাসমূহ দ্বারা তিনি তাঁহার উৎসাহব্যঞ্জক রচনা সিস-এর ন্যায় স্বৈরতন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহা তৎকালীন যুবকদের নিকট সুসমাচার হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল, এখন উহা বর্ণহীন ও কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। সেইগুলি কামাল-এর কবিতার ন্যায় নৈরাশ্যের মধ্যে সৃষ্ট হয় নাই। ফিকরেত তাঁহার কবিতায় ক্ষুদ্রতম ও তুচ্ছ জিনিসেরও আকরামের চেয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গুণ কীর্তন করিয়াছেন, যদিও তিনি বলিয়াছেন যে, প্রতিটি জিনিস কবিতা, কার্যত ইহা আরোপ করা হয় পুষ্পে, মেঘে, পানিতে, প্রত্যূষে ইত্যাদিতে। তৎকালীন অভ্যাস অনুযায়ী সাময়িকীতে চিত্রের জন্য ফিকরেত লিখিত কিছু সংখ্যক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল রুবাব-ই শিকেস্‌তে-তে। সেই কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, যাহাতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে নাদীম, নেফ'ঈ, ফুদুলী ও হামিদ-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি বেশ কষ্টের সহিত কবিতা লিখিতেন এবং শব্দ ও বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ ভাবিতেন। এইভাবে তিনি একটি কবিতা শেষ করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বীকারোক্তিতেও ইহা পরিষ্কার হইয়াছে। তদুপরি তাঁহার পরিশ্রম ও কষ্ট অনেক কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে। ফলে তাঁহার সাহিত্যকর্মে মাধুর্যের অভাব রহিয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যের স্বল্পতাও ইহার সাক্ষ্য বহন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাওফীক ফিকরেতের উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ এবং সাময়িকী ও কবিতা সংগ্রহসমূহে তাঁহার বিক্ষিপ্ত কবিতাসমূহ; আরও অতিরিক্ত দ্র. (১) ইকদাম, নং ৬৬৪৮, ২০ আগস্ট, ১৯১৫; (২) ব্রুসালি মুহাম্মাদ তাহির, 'ওছমানলী মু'এললিফ্‌লেরি, ইস্তাম্বুল ১৩৩৩ হি., ২খ, ৩৮০; (৩) নুযহেত হাশিম, মিল্লি এদেবিয়াতা তোগরু, ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ., পৃ. ১৬৯; (৪) রূশেন এশরেফ, তাওফীক ফিকরেত, হায়াতীনা দা'ইর খাতিরেলের, ইস্তামবুল ১৯১৯ খৃ.; (৫) ইসমা'ঈল হাবীব, তুর্ক তেতেজদূদ-ই এদেবিয়াতী তা'রীখি, ইস্তাম্বুল ১৩৪০ হি., পৃ. ৪৪০-৪৫৭; (৬) কোপরুলুযাদে এম. ফু'আদ, বুগুন্‌কি এদেবিয়াত, ইস্তাম্বুল ১৩৪২ হি., পৃ. ৩২৪-৩২৯; (৭) ইসমা'ঈল হিকমেত, তুর্ক এদেবিয়াতী তা'রীখি, বাকু ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৭১৩-৭৯৭; (৮) সালিহ নিগিআর কেরামেত, ফিকরেতিআ হায়াত ওয়ো-এছারি ইস্তাম্বুল ১৯২৬ খৃ.; (৯) ইবরাহীম 'আলাউ'দ-দীন, তাওফীক ফিকরেত বুয়ূক আদামলার সেরিসি, ১খ., নং ৩৪, ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ.; (১০) দাওল, ইস্তাম্বুল, নং ৭, ১৩; (১১) Horn, Geschichteder turkischen Moderne, লাইপযিগ ১৯০২ খৃ.; (১২) Wl. Gordlewski, Ocerki po nowoi osmanskoi literature মস্কো ১৯১২ খৃ.; (১৩) Th. Menzel, Die turkische Literatur, in Hinneberg's Kultur der Gegenwart, I., Part vii, 2, লাইপযিগ, ১৯২৫ খৃ.।

Th. Menzel (E.I[1])/মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

তাওফীক মুহাম্মাদ (توفيق محمد) ঃ চায়লাক তাওফীক বলা হয়; একজন তুর্কী গ্রন্থকার ও সংবাদপত্রের সম্পাদক, কনস্টান্টিনোপল-এ শা'বান ১২৫৯/সেপ্টেম্বর ১৮৪৩ সালে জন্ম, পিতা মুসতাফা আগা, যিনি জানিসারী সেনাবাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাতা দাসত্বমুক্ত এক নারী এবং ঐ একই নগরে ১৩১১/১৮৯৩ সালে তাঁহার ইনতিকাল। সামান্য শিক্ষা লাভের পর তিনি যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ে কেরানী হিসাবে প্রবেশ করেন। ওয়াকিত ও মুখবির সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ফিলিব আফেন্দী কর্তৃক তিনি সংবাদপত্র পরিচালনার সাথে পরিচিত হন। অতঃপর তিনি ক্রমশ সাংবাদিকতা ও গ্রন্থ প্রণয়নে অধিক মনোযোগী হন। কেবল অফিসের সেক্রেটারী হিসাবে কনস্টান্টিনোপল ও প্রদেশগুলিতে (ব্রুসা, সারাজেভো ও বিহাচ) দীর্ঘ বা অল্প সময়ের জন্য কর্মরত থাকাকালে তিনি ইহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইতেন। মনে হয়, কোথাও তাঁহার ভালভাবে কাটে নাই। স্বাধীন মত ও মুক্ত চিন্তার প্রতি সরকারের দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে তাঁহাকে সাংবাদিক হিসাবে কঠিন বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের একজন অধ্যাপক ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও এই কার্যারম্ভের সময় রচনা পদ্ধতি তাঁহাকে অতিশয় বিপন্ন করিয়াছিল। তিনি মুখ্‌বির, ইস্তাম্‌বোল, তারাক্‌কী ও বাসীরাত সংবাদপত্রসমূহে লিখিতেন। তিনি ব্রুসার শাসনকর্তার জন্য একটি ছাপাখানা এবং ব্রুসায় প্রাদেশিক সরকারের মুখপত্র 'খুদাওয়ান্‌দিগার' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন, এতদ্ব্যতীত তিনি স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক কাগজ 'আসর ও 'উছমানলী এবং হাস্যরসাত্মক পত্রিকা গেওয়ায়েয, লেতা'ইফ-ই আছার ও চায়লাক প্রকাশ করেন।

একই সময়ে তিনি লেখক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছেন, বিশেষত ছোট গল্পে। তাঁহার গ্রন্থগুলি তুর্কী লোকসাহিত্যের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি প্রাচীন বিভিন্ন লোকাচার ও প্রথা যেইগুলি ক্রমশ বিলুপ্তির পথে সেইগুলি সংরক্ষণে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার "ইস্তামবোলদা বিরসেনে" বিশেষ করিয়া তাঁহাকে স্থায়ী আসন প্রদান করিয়াছে। তাঁহার রচনাগুলি সাধারণত কিছু কিছু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ফলে কিছু বই কোনদিনই সমাপ্ত হয় নাই। নিম্নলিখিতগুলি উহাদের আওতাভুক্তঃ যেইল-ই লেতা'ইফ-ই ইনশা', আক হিসারীনীন নিজাম-ই 'আলেম তেরজেমেসি; কাফিলে-ই শু'আরা, ১২৯০, মেশাহির-ই 'ওছমানিয়ে ১২৯৩, আছার-ই পেরীশান, মাজারিস্তান সেয়াহাত্‌-নামেসি, ১২৯৪, গারা'ইব-ই হিকায়াত, লেতা'ইফ-ই নাসীরু'দ দীন ১২৯৯, ইস্তামবোলদা বিরসেনে ১২৯৯-১৩০০, বুআদেম, ১২৯৯-১৩০২, তাখরীজ-ই খারাবাত ১৩০০, ইকি গেলিন ওদাসী ১৩০১, তা'রীখ য়াখোদ বিন য়ুয য়েতমিশ জিনায়েত লেরি ১৩০২; খাযীনে-ই লেতা'ইফ, ১৩০৩, লেতা'ইফ-এজ-জে'রাইফ, উসূল-ই ইনশা'উ-কিতাবেত ও শুমরুখ-ই এদেব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Th. Menzel, Turkische Bibliothek, ii, iii, iv, v., x., xiii., বিশেষ করিয়া তাঁহার আত্মজীবনী, ১০খ., ২০-৩৬; (২) ব্রুসালি মুহাম্মাদ তাহির, ওছমানলী মূএল্লিফলেরি, ইস্তাম্বুল ১৩৩৩ হি., ২খ., ১৭৭; (৩) Horn, Geschichte der

Turkischen Moderne, লাইপযিগ ১৯০২ খৃ.; (৪) Wl. Gordlewski, Ocerki po nowoi Osmanskoi literature, মস্কো ১৯১২ খৃ., পৃ. ৯৬-৯।

Th. Menzel (E. I[1])/ মুহাম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

তাওবা (توبة) ঃ تاب-يتوب ক্রিয়ার মাসদার [ক্রিয়ামূল] ও বিশেষ্য রূপ, আভিধানিক অর্থ ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তিত হওয়া, প্রত্যাগমন করা ইত্যাদি। বিশেষ্য পদে অর্থ অনুতাপ, অনুশোচনা। শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তা ও তাঁহার সৃষ্টিকুল বান্দাগণ উভয়ের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলার জন্য এই মর্মে যে, তিনি স্বীয় মাগ্‌ফিরাত (মার্জনা) ও রহমাত (করুণা) সহকারে বান্দাহদের প্রতি করুণা দৃষ্টি প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি বান্দাহ্‌দের তাওবা কবুল করেন। আয়াত يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (তিনি স্বীয় বান্দাহদের তাওবা কবুল করেন) [৯ ঃ ১০৫] এই অর্থের প্রকাশ ঘটায়। মূলত আল্লাহ তা'আলার সহিত এই ক্রিয়াটির সম্বন্ধ স্থাপন তাঁহার ক্ষমা-মাগফিরাত ও দয়া-রহমাতের বহিঃপ্রকাশ। তবে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য শব্দটি আল্লাহ্‌র সংগে সম্বন্ধিত হইলে আল-কুরআনে উহা عَلَى সংযোজক (صله) সহকারে ব্যবহৃত হয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও সমুন্নত অবস্থান প্রকাশ পায়। যথা ঃ

ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ " অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইলেন ও তাহাদের তাওবা কবূল করিলেন" (৫ ঃ ৭১)।

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ "অতঃপর তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ ও অনুগ্রহশীল হইলেন) [৯ ঃ ১১৭, ১১৮]। আর বান্দাহ্‌দের জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে الى সংযোজক (صله) যুক্ত হইয়া থাকে। যথা ঃ وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا "সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর-তাওবা কর" (২৪ঃ৩১)। মোটামুটিভাবে বান্দাহ্‌র তাওবা অর্থ সংক্ষেপে শারী'আতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও গর্হিত কর্ম হইতে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ফিরিয়া আসা, যিনি পুনরায় তাহাকে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করিবেন।

পবিত্র কুরআন, নবী কারীম (স)-এর হাদীছসমূহ এবং 'উলামা ও সূফীগণের অভিমত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'ইবাদতসমূহের মধ্যে তাওবা অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদত। উহার আবশ্যকীয়তার ব্যাপকতা ও উহাতে নিয়মানুবর্তিতার পরিমণ্ডল হইতে পাপী-তাপী যেমন বহির্ভূত নহে, তেমনি আল্লাহ্‌র ওয়ালীগণ ও নবীগণ (আ)-ও উহার পরিসীমা হইতে বাহিরে নহেন। ইহা সর্বাবস্থায় সর্বত্র সকলের জন্য প্রযোজ্য। পবিত্র কুরআনে হইয়াছে ঃ

وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

"আর হে মু'মিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার" (২৪ ঃ ৩১)।

নেক্‌কার মু'মিনদের জন্য তাওবা তাহাদের প্রতিপালকের সান্নিধ্য অর্জনের মাধ্যম হইয়া থাকে এবং উহা (তাওবা-র আধিক্য) তাহাদিগকে সিদ্দীকীন (নির্দ্বিধায় সত্য স্বীকারকারী) ও শহীদগণের তালিকাভুক্ত করিয়া দেয়। কেননা যে বান্দাহ্ যত অধিক পরিমাণে তাহার প্রতিপালকের সন্নিকট হইবে ততই তাহার নিজের অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, নিঃস্বতা ও প্রতিপালক সৃষ্টিকর্তার মাহাত্ম্য-মহিমা ও তাঁহার বান্দাহ্ প্রতিপালনের উপলব্ধি অনুভূত হইবে। এই কারণেই আম্বিয়া', আওলিয়াগণ তাওবা-ইস্‌তিগফারে সার্বক্ষণিক নিয়মানুবর্তিতা ও পালন করিতেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের (বিশেষত নবীগণের) এই তাওবা-ইস্‌তিগফারের আধিক্য বাস্তবেই তাঁহাদের কোন (তাওবাযোগ্য) অপরাধের অনিবার্যতা প্রতিপন্ন করে না, বরং ইহার উৎস হইল অন্যায় ও পাপাচারে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে অনুভূতি ও উহার সার্বক্ষণিক ভীতি। এই অনুভূতির কারণে তাঁহারা অন্যায়কারী হইয়া যাওয়ার কল্পনা ও আগাম আশংকায় তাঁহারা আল্লাহ্‌র পানে ছুটিতে ও ধাবিত হইতে থাকিতেন এবং এই পন্থায় তাঁহারা নিজেদের মালিক প্রতিপালকের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকিতেন। লক্ষণীয় فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ "আল্লাহ্‌র পানে ছুটিয়া চল" (৫১ঃ৫০)। তাওবার মহিমা এই যে, তাহা পাপ ও গুনাহ্‌কে এইভাবে দূরীভূত করিয়া দেয় যে, গুনাহগার-পাপী যেন পাপাচারে লিপ্ত হয়-ই নাই। হাদীছ শারীফে রহিয়াছে ঃ التائب من الذنب كمن لا ذنب له "পাপ হইতে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার কোনই পাপ নাই।"

ইমাম আল-গাযালী (র)-এর মতে প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে (على الفور) ও অবিলম্বে এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাওবায় অভ্যস্ত থাকা ওয়াজিব। কেননা কোনও আদম সন্তানই পাপমুক্ত নহে। আর পাপগুলি মূল ঈমানের জন্য বিধ্বংসী উপকরণরূপে সাব্যস্ত। মানুষ হয়ত তাহার অংগ-প্রত্যংগ দ্বারা পাপ সংঘটিত করে কিংবা তাহার মনঃজগতে পাপের ইচ্ছা জন্ম নেয় কিংবা শয়তানী কুমন্ত্রণা তাহাকে কখনও না কখনও আল্লাহ তা'আলার যিকির হইতে অমনোযোগী করিয়া ফেলে। এইসব হইল নেতিবাচক উৎসের পাপ। এইগুলি হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও আল্লাহ্‌র আহকাম পালন এবং আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও তাঁহার গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্মের পরিচিতি লাভে অভাব থাকিয়া যাইতে পারে (যাহা ইতিবাচক সূত্রের অপরাধরূপে স্বীকৃত)। কেননা কোনও মানুষ এই সকল দুর্বলতা ও ত্রুটি হইতেও মুক্ত ও পবিত্র হওয়া এবং ইহার কোন একটিও তাহার মধ্যে না থাকা অকল্পনীয় ও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার (ইয়াহ্‌য়া'-'উলূম, ৪খ, ৯)।

সকল শর্ত ও আনুষংগিক বিষয়াদিসহ শুধু পাপ হইতে প্রত্যাবর্তনের নামই তাওবা নহে; বরং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়া বান্দাহ কর্তৃক সংঘটিত পাপকর্ম বর্তমান ও ভবিষ্যতে বর্জন করিবার সংকল্প এবং সেই সাথে বিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণের যথাসাধ্য প্রচেষ্টাই হইল প্রকৃত ও খাঁটি তাওবা। তাওবার জন্য প্রথম জরুরী বিষয় হইল বান্দাহ্‌র এই জ্ঞান লাভ করা যে, গুনাহ তাহার জন্য অনিষ্টকর এবং তাহা তাহার ও প্রতিপালকের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে। এইরূপ জ্ঞান হাসিল হইলে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, অস্থির ও স্বীয় কৃতকর্মে অনুতপ্ত হইবে। তদ্রূপ তাওবা শুধু অনুতাপ অনুশোচনারই সমর্থক নহে, বরং তাওবার জন্য যে অপরিহার্য অবস্থাসমূহ মনঃজগতে জাগরূক হওয়া সমীচীন, অনুতাপ সেইগুলির একটিমাত্র। এই অবস্থা সৃষ্টি হইলে একের পর এক অন্যান্য অবস্থারও মনঃজগতে উন্মেষ হইতে থাকে। যেমন এইরূপ ইচ্ছা জন্ম নেওয়া যে, এই পাপ কাজটি পরিত্যাগ করা উচিত। পরবর্তী অবস্থা মনের সংকল্প অর্থাৎ ভবিষ্যতে উহা সংঘটিত হইবে না। তৃতীয় অবস্থা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিগত পাপের ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টা। মোটকথা, এই তিনটি বিষয় (ক) পাপের ক্ষতিকর হওয়ার অনুভূতি, (খ) অনুতাপ, অনুশোচনা ও (গ) পরিত্যাগের সংকল্প পরিশুদ্ধ তাওবার গুরুত্বপূর্ণ অংগসমূহ।

বিগত ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণের জন্য অনিবার্যভাবে 'আমাল-ই সালিহ–পুণ্য কর্মে আত্মনিয়োগ একটি ব্যবস্থা। কেননা পুণ্য পাপকে বিদূরিত করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ انَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ "সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়" (১১ ঃ ১১৪) এইরূপ (পুণ্য সংযোজিত) তাওবাই খাঁটি তাওবা হইয়া থাকে। আল-কুরআনের আলোকে وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانَّهُ يَتُوْبُ الَى اللّٰهِ مَتَابًا "যেই ব্যক্তি তাওবা করে ও (উহার সাথে) সৎ কর্ম করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়" (২৫ঃ৭১)। পবিত্র কুরআন ইহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, যদি অজ্ঞাতসারে পাপ সংঘটিত হইয়া যায় এবং অবিলম্বে তাওবা করিয়া নেওয়া হয় তবে আল্লাহ তা'আলা তাওবা কবুল করিয়া নেন।

انَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ .

"আল্লাহ তাওবা (তো) অবশ্যই কবুল করিয়া থাকেন (তবে) সেই সকল লোকের যাহারা ভুলবশত মন্দ কর্ম করে এবং সত্বর তাওবা করে; ইহারাই তাহারা, যাহাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করেন" (৪ ঃ ১৭)।

সেই সংগে ইহাও প্রতিভাত হয় যে, যেই ব্যক্তি অভ্যস্তরূপে পাপ সংঘটিত করিতে থাকে, তাওবা করিবার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাওবা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে তাহার তাওবা গৃহীত হয় না।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ انِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ .

"এবং তাওবা তাহাদের জন্য (গৃহীত) নহে যাহারা (আজীবন) মন্দ কার্য করিতে থাকে, অবশেষে যখন তাহাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, আমি এখন তাওবা করিতেছি" (৪ ঃ ১৮)।

আল্লাহ তা'আলা খাঁটি দিলে তাওবাকারীদের পাপই শুধু মাফ করিয়া দেন না, نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ "তোমাদের মন্দ কার্য মোচন করিয়া দেই" (৪ ঃ ৩১); বরং স্বীয় রহমাতে সেইগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করিয়াও দেন فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاتِهِمْ حَسَنَاتٍ "আল্লাহ উহাদিগের পাপ পরিবর্তন করিয়া দিবেন পুণ্যের দ্বারা" (২৫ ঃ ৭০)।

বান্দার তাওবার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তাহার পার্থিব জীবনের সুযোগ-সুবিধা ও জীবনোপকরণও বর্ধিত করেন।

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى .

"আরও এই যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁহার নিকট তাওবা কর, তিনি তোমাদিগকে একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করিতে দিবেন" (১১ ঃ ৩)।

কতিপয় পাপ এমনও রহিয়াছে যাহা সংঘটনকালে ঈমান বিচ্ছিন্ন (রহিত) হইয়া যায়। এই সকল ক্ষেত্রে ঈমানের নবায়নও অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কুরআনের ভাষায় ঃ اِلاَّ مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ..... "তবে যাহারা তাওবা করে এবং (পুনঃ) ঈমান আনয়ন করে এবং পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে উহাদিগের পাপসমূহ আল্লাহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন" (২৫ ঃ ৭০)।

যে কোন তাওবা যথার্থ হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহা গ্রহণ করেন। এইখানে প্রসংগত এই আলোচনা আসিয়া পড়ে যে, তাওবা কবূল করা আল্লাহ্‌র জন্য অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় হইবে কী? মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের দাবিমতে তাওবা কবূল করা আল্লাহ্‌র জন্য অবশ্য কর্তব্য, ওয়াজিব। আহ্‌লু'স-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের মতে, আল্লাহর জন্য কোনও বিধান অপরিহার্য নহে। ইমাম আল-গাযালী (র) মু'তাযিলাদের ঐ বাতিল মতবাদ এইভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাওবা করাকে পাপ মার্জনার মাধ্যম সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং যেই ব্যক্তি তাওবার শর্তাবলী পূরণ করিবে তাহার জন্য তাওবা কবূল করিবার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অঙ্গীকার রহিয়াছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَانِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا .

"এবং যেই ব্যক্তি তাওবা করে ও ঈমান আনিয়া পুণ্য কার্য করে...আমি তাহার (পাপের) জন্য বড়ই ক্ষমাশীল" (২০ ঃ ৮২)।

সুতরাং আল্লাহ পাকের স্বঘোষিত বিষয় ও তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ক্ষমার সুযোগ প্রদানকে তাঁহারই জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করা তথা বাহির হইতে তাঁহার উপরে চাপ সৃষ্টি করার মতবাদ নিতান্ত হাস্যকর। ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার যে, আল্লাহ নিজেই তাওবাকারীদের ক্ষমা করিবার ওয়াদা করিয়াছেন এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করিয়া থাকেন ঃ اَلا انَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ "জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য" (১০ ঃ ৫৫) এবং তিনি কখনও ওয়াদা ভংগ করেন না ঃ لَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ "এবং আল্লাহ কখনও তাঁহার ওয়াদা ভংগ করিবেন না" (২২ ঃ ৪৭) [সুতরাং তাওবা কবূল করা শুধু তাঁহার মেহেরবানী সূচিত ওয়াদা পূর্ণ করার ব্যাপার]।

ইমাম গাযালী (র) তাওবাকারীদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (১) বান্দাহ তাওবা করিবে এবং স্বীয় তাওবার উপরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল থাকিবে। অন্যায় ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার সাধ্যমত ক্ষতিপূরণ করিবে এবং পরবর্তী সময় তাহার মনে মানুষের স্বভাবজাত চাহিদাগত সাধারণ ছোটখাটো বিচ্যুতি ব্যতিরেকে কোন 'পাপ' সংঘটনের কল্পনাও উদিত হয় না। এই শ্রেণীর বান্দাহ্‌কে সাবিকুন বি'ল-খায়রাত (سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ =কল্যাণ ও শুভ কর্মে অগ্রণী) নামে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের তাওবাকে বলা হয় আত-তাওবাতু'ন–নাসূহ-নির্ভেজাল "পরিচ্ছন্ন তাওবা" এবং মন ও প্রবৃত্তির এই অবস্থার নাম হইল আন-নাফ্‌সু'ল-মুত্‌মাইন্নাহ-প্রশান্ত হৃদয়।

(২) তাওবাকারী প্রধান ও মৌলিক 'ইবাদতসমূহ যথাযথ আদায় করিতে থাকে এবং বড় ধরনের অশ্লীলতা (কবীরা গুনাহসমূহ) হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার অবস্থা এই যে, সেই সকল পাপ হইতে সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না যাহা তাহার পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থানের কারণে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাহাকে পাইয়া বসে।

মোটকথা তাহার অনুভূতি জাগ্রত থাকে। সে নিজের প্রবৃত্তিকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিতে থাকে এবং অনুতপ্ত হয়। পাপ সংঘটনের পরপর পুনঃ পুনঃ এই সংকল্প করে যে, সামাজিক ও পরিবেশগত যেই পরিস্থিতির কারণে তাহার দ্বারা পাপ সংঘটিত হইল তাহা হইতে সে দূরে অবস্থান করিবে এবং নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবে। এই প্রকৃতির প্রবৃত্তিকে আন-নাফ্সু'ল-লাওওয়ামা (তিরস্কারকর প্রবৃত্তি) বলা হয়। তাওবাকারীর জন্য ইহাও উচ্চতর স্তর, যদিও ইহা প্রথম স্তরের তুলনায় নিম্নতর। সাধারণ তাওবাকারিগণ এই দলভুক্ত সাব্যস্ত হইয়া থাকেন।

(৩) তাওবাকারী পরে বেশ দীর্ঘদিন তাওবার উপরে অবিচলিত থাকে। পরে কোনও পাপ তাহাকে বশীভূত করিয়া ফেলে এবং সে উহাতে লিপ্ত হয়। এতদসত্ত্বেও সে পুণ্যের কাজগুলি আনজাম দিতে থাকে এবং সব সময় এইরূপ আশান্বিত থাকে যে, সে তাহার অভ্যস্ত পাপকর্ম বর্জন করিয়া ফেলিবে অর্থাৎ সে বারবার তাওবা করে, আবার তাওবা ভংগ করিয়া অনুতপ্ত হয়। এই প্রকারের প্রবৃত্তিকে আন-নাফ্সু'ল-মুসাব্বিলা (النفس المسولة) প্রতারণাকারী প্রবৃত্তি বলা হয় (লক্ষণীয় اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ) "শয়তান তাহাদিগকে প্ররোচিত করিয়াছে (৪৭ ঃ ২৫)। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا "বরং তোমাদের প্রবৃত্তিসমূহ তোমাদিগকে একটি বিষয়ের জন্য প্ররোচনা দিয়াছে" (১২ ঃ ১৮)। এই প্রকারের বান্দাহ্দের সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا .

"এবং অপর একদল লোক যাহারা নিজেদের অপরাধের কথা স্বীকার করে এবং তাহারা একটি সৎ কর্মের সহিত অন্য একটি অসৎ কর্ম মিশ্রিত করিয়াছে ..." (৯ ঃ ১০২)।

(৪) পাপ সংঘটনকারী ব্যক্তি তাওবা করিবার পরে পুনরায় বিভিন্ন পাপ কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে; এমনকি তাহার মনে আর তাওবার চিন্তা উদিত হয় না এবং তাহার মনে কোন প্রকার আক্ষেপ, অনুতাপও জাগ্রত হয় না, বরং সে প্রবৃত্তির কু-চাহিদার গোলামে পরিণত হয়। এই ধরনের প্রবৃত্তিকে "আন-নাফ্সু'ল-আম্মারা" (النفس الامارة-পাপে প্ররোচনাদায়ী প্রবৃত্তি) বলা হয়। এই ধরনের বান্দাহ্র শেষ পরিণতি (মৃত্যু-পূর্ব অবস্থা) নেক ও পুণ্যের সহিত সমাপ্ত হইলে তবুও অবশেষে দোযখের 'আযাব হইতে তাহার মুক্তির আশা করা যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলার রহমাত ও মাগফিরাত অতি ব্যাপক ও প্রশস্ত। رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ "তোমাদের প্রতিপালক বিশাল ব্যাপক রহমাতের মালিক" (৬ ঃ ১৪৭)। [হাদীছ শরীফে রহিয়াছে ঃ وَسِعَتْ رَحْمَتِىْ غَضَبِىْ "আমার রহমাত আমার গাযাবের চাইতে বিশাল"]।

আল-কুশায়রী (র)-এর অভিমত অনুসারে তাওবা হইল তারীকাত (তাসাওউফ)-এর পথচারীদের প্রথম মান্যিল এবং হাকীকাত (তত্ত্ব) অনুসন্ধানীদের প্রথম সোপান। তিনি তাওবার তিনটি স্তর উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (ক) 'আযাবের ভয়ে যে বান্দাহ্ তাওবা করে, তাঁহার মতে সে তাওবাওয়ালা! (খ) ছাওয়াব হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাওবাকারী তাঁহার মতে 'ইনাবাত (সান্নিধ্য)-প্রার্থী এবং (গ) আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁহার হুকুম পালনে নিয়মানুবর্তিতার উদ্দেশ্যে তাওবাকারী হইল 'আওয়াব' (আল্লাহ্-তে ধাবমান), অর্থাৎ সাধারণ তাওবাকে তিনি সাধারণ মু'মিনদের গুণ সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং 'ইনাবাতকে আওলিয়াগণের বিশেষণ এবং 'আওবা' (اوبة) (ধাবমানতা)-কে তিনি নবী ('আ)-গণের ভূষণ সাব্যস্ত করিয়াছেন।

এই দীর্ঘ আলোচনাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার অলৌকিক ভাষা বিজ্ঞান দ্বারা অতি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ "যে তাওবা করে ও .....তাহার জন্য আমি অতি ক্ষমাশীল" এবং তিনি স্বীয় বান্দাহদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার মাগফিরাত পাইবার পন্থা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ . اُولٰئِكَ جَزَائُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ .

"এবং যাহারা এমন (পুণ্যবান হৃদয়) যে, তাহারা (মানবিক চাহিদার চাপে) কোন অশ্লীল কার্য করিয়া ফেলিলে কিংবা (অন্য কোন অর্থহীন কার্য করিয়া) নিজেদের উপর অনাচার করিলে (নিজেদের দীনের ক্ষতিসাধন করিলে) আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে (বান্দাহদের) পাপ ক্ষমা করিবে? আর তাহারা যাহা কিছু (অন্যায়-অপকর্ম) করিয়া ফেলে, জানিয়া-শুনিয়া তাহারই পুনরাবৃত্তি করে না, উহারাই তাহারা যাহাদের পুরস্কার তাহাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং (আরও) জান্নাত যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হইবে। এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম" (৩ ঃ ১৩৫, ১৩৬)।

নবী (স)-এর তাওবা-ইসতিগফার সম্পর্কে وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ "এবং তোমার প্রতি তাহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন" (৪৮ ঃ ২) এবং ইহার ব্যাখ্যায় খোদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাহ হইব না"? অর্থাৎ নবী (আ)-গণের তাওবা-ইসতিগফার তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ্র নি'মাতের পরিপূর্ণতা বিধায়ক এবং তাহাদের শোক্র আদায়ের মাধ্যম।

'আবিদ আহমাদ 'আলী (দা. মা. ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

তাওবা আল-'আন্বারী (توبة العنبرى) ঃ (র), খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও বয়ঃকনিষ্ঠ তাবি'ঈ। উপনাম আবু'ল-মুওয়ার্রি'। তাঁহার পিতার নাম কায়সান ইব্ন রাশিদ এবং উপনাম আবু'ল আসাদ বা আবূ রাশিদ। তিনি বানু'ল-'আনবার উপগোত্রের লোক। তাঁহাদের নিবাস ছিল সিজিস্তানে। পূর্বপুরুষদের কেহ কেহ য়ামামায় গিয়া বসবাস করেন এবং সেইখানেই তাওবার জন্ম ও লালন-পালন। অতঃপর তিনি বসরায় নিবাস গ্রহণ করেন। তিনি আয়্যুব ইব্ন আয্হারের মাওলা ছিলেন। তিনি দিমাশ্কে খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযের সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়াছিলেন। য়ূসুফ ইব্ন 'উমার তাঁহাকে প্রথমে সাবূর এবং অতঃপর আল-আহ্ওয়ায-এর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি পূর্ণ একাগ্রতা ও যোগ্যতার সহিত এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বলিতেন, য়ূসুফের এই দায়িত্ব আমাকে এমনভাবে বন্দী করিয়াছে যে, আমার মাথায় কোন কাল চুল বাকি রাখে নাই।

'আলী ইব্নু'ল-মাদীনী বলেন, "তাওবা ইব্ন আবি'ল-আসাদ প্রায় ত্রিশটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।" তাঁহার এই সব হাদীছ হযরত মালিক ইব্ন আনাস (র), মুওর্রাক আল-'ইজ্লী (র), আশ-শা'বী (র), 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল'আযীয (র), মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম আত-তায়মী (র), আবূ বুর্দা (র), ইব্ন আবী মূসা আল-আশ'আরী (র), আবুল-'আলিয়া

প্রমুখ হইতে আহৃত। বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে শু'বা (র), সুফ্য়ান আছ-ছাওরী (র), আবু'ল-আশ্হাব (র), আবূ বিশ্র (র), আবূ হিলাল আর-রাসিবী (র), মুতী' ইব্ন রাশিদ (র) ও হিশাম ইব্ন হাস্সান উল্লেখযোগ্য। হাদীছ বিশারদদের দৃষ্টিতে তাওবা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। য়াহ্য়া ইব্ন মা'ঈন, আবূ হাতিম, আন-নাসাঈ প্রমুখ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যয়ন করিয়াছেন। একমাত্র আবু'ল-ফাত্হ আল-আয্দীই তাঁহাকে প্রত্যাখ্যাত রাবী (منكر الحديث) বলা বিরল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আল-বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও আন-নাসাঈ প্রণীত হাদীছ গ্রন্থসমূহে তাওবা বর্ণিত হাদীছ সংগৃহীত হইয়াছে। সাহীহ আল-বুখারীতে শু'বার সূত্রে বর্ণিত তাঁহার দুই বা তিনটি হাদীছ স্থান পাইয়াছে। হি. ১৩১ সালে তিনি মহামারীতে আক্রান্ত হইয় ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৪ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, তাহযীবু'ত তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ, ৪৫২, ৪৫৩; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবু'ত-তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ৫০; (৩) ঐ লেখক, হাদ্য়ু'স-সারী (মুকাদ্দিমাত ফাত্হি'ল-বারী, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৩৯৪; (৪) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জার্হ ওয়াত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ১খ, ৪৪৬; (৫) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/১খ, ১৫৫; (৬) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৮৮।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাওবা (توبة) ঃ সূরা (দ্র. বারা'আ, সূরা)

তাওবাতুন-নাসূহ (توبة النسوح) ঃ নাসূহ-এর অনুতাপ, ইহা মৌলবী নযীর আহ্মদ রচিত একটি নীতিগর্ভ ও জনপ্রিয় উর্দূ উপন্যাস। নাসূহ্ উপন্যাসটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে একজন পাপী-তাপী লোক। কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় এবং সে একটি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে। জাগ্রত হইয়া আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত হয় এবং তওবা করে। দেখাদেখি তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-পরিজনেরাও আল্লাহ্ ভক্ত হইয়া উঠে। কিন্তু বড় পুত্র বিপথে থাকে এবং পিতার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কঠিন বিপদে পতিত হয়। লেখক গল্পের মাধ্যমে দুরাত্মার শাস্তি যে অনিবার্য তাহা প্রমাণ করিয়া দেন এবং বাল্যকালে সন্তান-সন্ততির চরিত্র গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। শুধু উর্দূভাষীদের নিকটই পুস্তকটি সমাদৃত হয় নাই, বরং ইহা হাজার হাজার বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকারও সমাদর লাভ করে। পুস্তকটি বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। প্রাথমিক উর্দূ উপন্যাসসমূহের মধ্যে ইহা বিশেষ স্থানের অধিকারী।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৬৮৬

তাওয়াক্কুল (توكل) ঃ (১) আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা। ইহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে গুরুত্ব দিয়া বলা হইয়াছে মুতাওয়াক্কিলুন (আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ) আল্লাহ্র নিকট প্রিয়। انَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁহার উপর নির্ভরশীলদের ভালবাসেন" (৩ ঃ ১৫৩)। ইহার দ্বারা...এমন কোনও সংসারবিরাগী (যুহ্হাদ) নির্দিষ্ট দলকে বুঝায় না, যেমন দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে এই উপাধিধারী দল বিদ্যমান ছিল। এই মুতাওয়াক্কিলূন দলের 'আকীদা বা বিশ্বাস তাওহীদ (দ্র.)-এর বিশ্বাসসমূহ (আকাইদ)-এর অন্তত নিকট সম্পর্ক রাখিত। কার্যত তাওয়াক্কুল সম্পর্ক কখনও কখনও এমন কঠোরতা পোষণ করা হয় যে, মুতাওয়াক্কিলকে এমন লাশের সঙ্গে তুলনা করা হয় যেই লাশকে গোসল প্রদানকারীর হস্তে দাফন-কাফনের নিমিত্ত দেওয়া হইয়াছে (আল-কুশায়রী, বাবুত-তাওয়াক্কুল) [এবং ইহাতে না থাকিবে কোনও গতি, না থাকিবে কোনও কর্মক্ষমতা]। ঐ সকল আত্মোৎসর্গীকৃত সাধকদের নিকট তাওয়াক্কুল নিশ্চিতভাবে প্রত্যেক প্রকারের অর্জন (কাসাবী বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও কর্ম)-এর বিপরীত। যদি কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে যে, প্রকৃত রিযিকদাতা একমাত্র আল্লাহ্, তাহা হইলে সে কিভাবে অন্বেষণ ও প্রচেষ্টাকে রিযিক প্রাপ্তির মাধ্যম মনে করিতে পারে? কুশায়রী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, প্রকৃত রিযিকদাতা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সেই সকল মাধ্যম ও উপকরণের দ্বারা রিযিক উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, যেই সকল মাধ্যম ও উপকরণের দ্বারা রিযিক উপার্জন প্রচেষ্টা রিযিকদাতার উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নহে এবং ইহা এমন নহে, যাহা দ্বারা তাহার বিশ্বাসে কোনও প্রকার দুর্বলতা সৃষ্টি হইতে পারে। কেননা ইহা ঐ পথ ও আত্মিক উন্নতির উন্নত ধাপ ছিল, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া তাসাওউফ প্রাচীন সন্ন্যাসমূলক মতবাদসমূহ পরিহার করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ তালিব আল-মাক্কী, কূতু'ল-কুলূব, ২খ, ২-৩৮; (২) Goldziher, W. Z. K. M., ১৩খ, ৪১-৫৬; (৩) ঐ লেখক, Vorlesungen uber den Islam, পৃ. ১৫৩ প.; (৪) R. Hartmann, Kuschairis Darstellung des Sufitums, পৃ. ২৫ প.; (৫) জালালুদ-দীন রূমী, মাছনাবী, ১খ, ৯০০-৯৯১।

R.A.Nicholson (দা. মা. ই.)/সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তাওয়াক্কুল (توكل) ঃ (২) তাওয়াক্কুল শব্দটির মূল و-ك-ل 'আরবী বাক্য وكلت امرى الى فلان-এর অর্থ ঃ "আমি আমার সাকুল্য বিষয় অমুকের উপর অর্পণ করিলাম" (লিসানু'ল-'আরাব, ১৪খ, ২৬১, শিরো.)। 'তাওয়াক্কুল' শব্দটি আরবী ভাষায় দুইভাবে ব্যবহৃত হয় ঃ (১) 'লাম' উপসর্গ সংযোজনের মাধ্যমে; যেমন "توكلت لفلان بالنجاح" "আমি অমুকের কৃতকার্যতার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম"; (২) 'আলা (على) উপসর্গ সংযোজনের মাধ্যমে, যেমন "توكلت عليه" "আমি তাহার উপর নির্ভর করিলাম"। ইমাম রাগিব বলেন, আল্লাহ তা'আলা ওয়াকীল (وكيل) এই অর্থে যে, তিনি সকল কর্মকাণ্ডের অভিভাবক, যিম্মাদার (মুফরাদাত)।

তাওয়াক্কুল শব্দের সহিত ঐসব অবস্থা জানা আবশ্যক, যেইসব বিষয়ে নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই মর্মে কুরআনের বহু আয়াত রহিয়াছে, যেমন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ انَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ .

"হে রাসূল! আপনি তাহাদের (সাহাবীদের) সঙ্গে পরামর্শ করুন, অতঃপর যখন কোনও বিষয়ে সংকল্প গ্রহণ করেন, তখন আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করুন; আল্লাহ তাঁহার উপর নির্ভরশীলদিগকে ভালবাসেন" (৩ ঃ ১৫৮)।

অথবা যেমন وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ انَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ .

"এবং (হে রাসূল) আপনার প্রভুর পক্ষ হইতে যাহা নাযিল হইয়াছে, আপনি তাহার অনুসরণ করুন, আপনি যেইসব কর্ম সম্পাদন করেন সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন। আপনি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন" (৩৩ ঃ ২, ৩)।

উপরোক্ত উভয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করা হইয়াছে। অথবা অপর এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ .

"হে আমার সম্প্রদায়! যদি আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট দুঃসহ হয়, তাহা হইলে আমি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করিলাম: (১০ ঃ ৭১)।

উপরোক্ত আয়াতে হযরত নূহ ('আ)-এর কথা বলা হইয়াছে। অপর এক স্থানে বলা হইয়াছে ঃ

اِنْ اُرِيْدُ اِلاَّ الْاِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلاَّ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ .

"আমি যথাসাধ্য সংশোধনের ইচ্ছা পোষণ করি এবং আমার কার্যসাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে; আল্লাহ্‌র উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁহারই দিকে আমি প্রত্যাবর্তন করি" (১১ ঃ ৮৮)।

উপরোক্ত আয়াতে হযরত শু'আয়ব ('আ)-এর বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত আয়াতকে সাহীহ বুখারী শারীফে শিরোনাম করা হইয়াছে اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ "যখন তোমাদের মধ্য হইতে দুইটি দলের সাহস হারাইবার উপক্রম হইয়াছিল" (৩ ঃ ১২১)। এই সম্পর্কে হযরত জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। আমরা দুই দল ছিলাম বানূ হারিছা ও বানূ সালাম।

যদিও ইহার মধ্যে "فَشَلَ" শব্দটির কোনও ব্যাখ্যা নাই, তথাপি এমন মনে হয় যে, উভয় দলে সাময়িক অবস্থাসমূহ দর্শন করিয়া অন্তরে দুর্বলতা সৃষ্টি হইয়া যায়, এইজন্যই পরে وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا "আল্লাহ এই উভয় দলের অভিভাবক"–এই কথা বলা হইয়াছে। এইজন্য জানা যায় যে, (সাহসহীনতা)-এর কোনও ভাব প্রকাশিত হয় নাই; বরং বীরত্বের সঙ্গে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া থাকিবে। পরে যখন আয়াতসমূহ নাযিল হয়, তখন নির্দেশ হয় মু'মিনদিগকে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করা উচিত।

পরবর্তী আয়াতসমূহে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে "তাওয়াক্কুল" -এর ঘোষণা দিয়া শিক্ষা দান করা হইয়াছে। কিন্তু কতিপয় আয়াত এমনও আছে, যেখানে "তাওয়াক্কুল"-এর সঙ্গে ধৈর্য ধারণ ও কর্মতৎপর হইবার কথা বলা হইয়াছে, যেমন– সূরা ইবরাহীম (১৪ ঃ ১২), সূরাতু'ন-নাহ্‌ল (১৬ ঃ ৪২), সূরাতু'ল-'আনকাবূত (২৯ ঃ ৫৮, ৫৯)।

হাদীছ দ্বারাও এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়। কেননা অনেক বর্ণনায় দেখা যায় যে, কিছু লোক সফরের প্রয়োজনীয় পাথেয় ব্যতিরেকে হজ্জ করিবার জন্য বাহির হইতেন এবং বলিতেন, "نحن المتوكلون" 'আমরা মুতাওয়াক্কিল'—আমরা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। কুরআন মাজীদ-এ এই চিন্তাধারাকে ভুল অভিহিত করিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, وَتَزَوَّدُوا "তোমরা পাথেয় সঙ্গে নিয়া চল"। অপর এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী আকরাম (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "আমি কি আমার উটনীটিকে আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভর করিয়া খোলাভাবে ছাড়িয়া দিব?" রাসূলুল্লাহ (স) ইহার অনুমতি দান করেন নাই এবং বলেন, "عَقِلْهَا وَتَوَكَّلْ" "উটনীকে বাঁধিয়া রাখ এবং আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর" (জামি' তিরমিযী, বূলাক, ১২৯২ হি., ২খ, ৮৪, "صفة القيمة وقَيِّدْهَ وَتَوَكَّلْ" ইত্যাদি পরিচ্ছেদ)। বায়হাকীতে "الورع والرقائق" শব্দাবলী রহিয়াছে (শুআবুল ঈমান)।

মোটকথা, কাজে-কর্মে উপকরণ ব্যবহার না করা এবং ইহাকে তাওয়াক্কুল অভিহিত করা ধর্মীয় পঙ্গুত্বের নামান্তর এবং ইহার সঙ্গে অন্তরের বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নাই, যাহা ইসলামী পরিভাষায় তাওয়াক্কুল। উপরে যেই সকল আয়াত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই সকল আয়াতের দ্বারা ইহা পরিষ্কার যে, পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণের সময়ে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে তাওয়াক্কুল-এর এই অর্থ মনে করা হইত না যে, উপকরণ দ্বারা কোনও কাজ করা যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে 'তাওয়াক্কুল'-এর কেন্দ্রবিন্দু হইল অন্তর। ইমাম কুশায়রী অত্যন্ত সুন্দর কথা লিখিয়াছেন ঃ ان التوكل محله القلب والحركة بالظاهر لا تنافى التوكل بالقلب "তাওয়াক্কুল"-এর অবস্থানস্থল অন্তর এবং বাহ্যিক হস্তপদ সঞ্চালন আন্তরিক তাওয়াক্কুল-এর পরিপন্থী নহে" (আর-'রিসালাতু'ল কুশায়রিয়্যা, বাবু'ত-তাওয়াক্কুল)। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া জীবন-জীবিকা অভিবাহিত করিতেন। কর্মের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন ছিল তাঁহার সুন্নাত।

তাওয়াক্কুলের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিকে হয় ধৈর্য অথবা কৃতজ্ঞতা বলিয়া অভিহিত করা যায়। যদি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির (মুতাওয়াক্কিল) ইচ্ছা অনুযায়ী কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও অনুগৃহীত হইবার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়, অন্যথায় অন্তরে ধৈর্য নামক আন্তরিক 'ইবাদত প্রকাশিত হয়। হযরত আবূ সা'ঈদ খাররাম তাওয়াক্কুলকে প্রশান্তিহীন চাঞ্চল্য এবং চাঞ্চল্যহীন প্রশান্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (ইহার ব্যাখ্যার জন্য দ্র. ইহ্‌য়া 'উলূম, ৪খ, ২২৮)। হযরত আবূ 'আলী আদ-দাক্কাক বলিতেন, আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল জীবনের তিনটি স্তর ঃ প্রথম তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, দ্বিতীয় তাসলীম বা আত্মসমর্পণ এবং তৃতীয় তাফবীদ বা দায়িত্ব সমর্পণ (ইহ্‌য়া' 'উলূম, ৪খ, ২২৮)। ইহাদের মধ্যে তাওয়াক্কুল মু'মিনদের গুণ, তাসলীম আল্লাহ্‌র বিশিষ্ট ওয়ালীদের গুণ এবং তাফবীদ একত্ববাদীদের (মুওয়াহহিদূন) অর্থাৎ বিশিষ্টদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট তাঁহাদের গুণ। তাওয়াক্কুল-এর ব্যাখ্যায় ইহাও বলা হইয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌র হাতে তাহার উপর সম্পূর্ণ দৃঢ় প্রত্যয় রাখা এবং যাহা বান্দাদের হাতে সেই সম্পর্কে হতাশা হইল আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনের মূল নীতি।

ইমাম গাযালী (র) "ইহয়া' 'উলূম" গ্রন্থে লিখেন, তাওয়াক্কুল-এর অর্থ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে এবং ইহার উপর আমল করা অত্যন্ত কঠিন। অতঃপর তিনি লিখেন ঃ

وقد يظن ان معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الارض كالخرقة الملقاة وكاللحم على الوضم وهذا ظن الجهال فان ذلك حرام فى الشرع... انما يظهر تاثير التوكل فى حركة العبد .

"কেহ কেহ তাওয়াক্কুল-এর অর্থ এইরূপ মনে করে যে, কায়িক শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন এবং অন্তরের চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ, পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্রের টুকরার ন্যায় মাটিতে পড়িয়া থাকা এবং সে যেন কসাইয়ের গোশত কাটিবার কাষ্ঠখণ্ডের উপর রক্ষিত গোশতের একটি টুকরা। কিন্তু ইহা মূর্খদের ধারণা, এই ধারণা শারী'আতে নিষিদ্ধ। তাওয়াক্কুল-এর প্রভাব বান্দার কর্মতৎপরতায় অভিব্যক্ত হয়" (ইহ্য়া' উলূমিদ্দীন, ৪খ., পৃ. ২২৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-গাযালী, ইহ্য়া' 'উলূমি'দ-দীন, মিসর ১৩৪৬ হি., ৪খ, পৃ. ২১০-২৫২; (২) ঐ লেখক, কীমীয়ায়ে সা'আদাত, নাওলকিশোর, লক্ষ্ণৌ, ৫০৮-৫৩০; (৩) 'আবদু'ল-কারীম আল-কুশায়রী, আর-রিসালাতু'ল-কুশায়রিয়্যা, মিসর ১৩৩০ হি., ৭৫-৮০।

'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তাওয়াক্কুল ইব্ন বায্যায (توكل ان بزاز) ঃ [তূকলী (র) ইব্ন ইস্মাঈল], একজন দরবেশ ও সাফ্ওয়াতু'স-সাফা (صفوة الصفا) নামে একখানা গ্রন্থের লেখক। গ্রন্থটি সাফাবী শাসক বংশের পূর্বপুরুষ আরদাবীল-এর সম্মানিত শায়খ সাফিয়্যু'দ-দীন (৬৫০-৭৩৫/ ১২৫২-১৩৩৪)-এর জীবনী, ৭৫০/১৩৫০ সালে সাফিয়্যু'দ-দীনের পুত্র শায়খ সাদরু'দ-দীনের নির্দেশে গ্রন্থখানি প্রণীত হয়। তাওয়াক্কুল তাঁহার এই গ্রন্থে বিদ্যাবিশারদ হিসাবে সাদরু'দ-দীনের বরাত দিয়াছেন। পরে শাহ ১ম তাহ্মাসপ-এর আমলে জনৈক আবু'ল-ফাত্হ হুসায়ন ঐ গ্রন্থের পাঠ সংশোধন করেন। ১৩২৯/১৯১১ সালে এই গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

সাফওয়াতু'স-সাফা প্রায় ২,১৬,০০০ শব্দের এক বিশাল রচনা। আঙ্গিকের বিবেচনায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ সাধুদের জীবন-কাহিনীমূলক রচনা, তবে নানা অলৌকিক কাহিনীর সহিত সংমিশ্রিতভাবে উত্তর-পশ্চিম পারস্যের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহাতে ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহাতে ১৪শ শতকের আযারবায়জানী আদি ইরানী কথ্য ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। সাফ্ওয়াতু'স-সাফা নামে এই গ্রন্থটি আর্দাবীলের সম্মানিত শায়খের খ্যাতি প্রচারে যে ভূমিকা পালন করিয়াছে, তদ্রূপ প্রসিদ্ধি দান করিয়াছে আফ্লাকী (দ্র.) প্রণীত মানাকিবু'ল-'আরিফীন নামক গ্রন্থটি কোনিয়ার মাওলাবী তারীকার মহান শায়খগণের ক্ষেত্রে। শাহ ইসমাঈলের ইতিহাসের [প্রণীত ঃ খাওয়াজা 'আবদুল্লাহ মুরওয়ারীদ (?) তু. F.R.A.S., 1902, p. 170 যাহার প্রথমাংশের অনুবাদ করেন E. D. Ross, F.R.A.S., 1895, p. 249-340] মতই সাফ্ওয়াতু'স-সাফা মহা সাফাবী আন্দোলনের নৈতিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য এক মূল্যবান দলীল। উল্লেখ্য, উক্ত আন্দোলন হইতেই আধুনিক পারস্য তথা ইরানের উদ্ভব হইয়াছে; এই গ্রন্থ হইতে সাফাবী "গুপ্ত তত্ত্ব" (Secret doctrine) কিভাবে রূপ পায় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। দরবেশ সাফিয়্যু'দ-দীনের পবিত্রতা (যে ব্যাপারে গোঁড়া ইতিহাসবিদদের কোনও সংশয় নাই) সম্পর্কিত বিশ্বাস পরবর্তী কালে চরম শী'ঈ মতবাদের জন্ম দেয়। এই মতবাদের নীতি বিগর্হিত বৈশিষ্ট্যগুলি খোদ শাহ ইসমা'ঈলের কবিতায় সুস্পষ্ট (তু. খাতা'ঈ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Khanykov, Lettre a M. Dorn, Mel. Asiat., 1852, i, p. 543-558, তু. ঐ, Sac d'Ardabil par les Georgiens vers 1209; প্রাগুক্ত, p. 580-583; (২) Rieu, Catal. Persian Mss., পৃ. ৩৪৫-৩৪৬; (৩) Horn, in Grundriss d. Iran, Phil. ii, p. 586; (৪) E. G. Browne, Pers Lit. in Modern Times, P. 34-35, 38 (cf, E.G. Brown-F.R. A. S, July, 1921, p. 417).

V. Minirsky (E.I. [1])/আফতাব হোসেন

তাওয়াদ্দুদ (تودد) ঃ "হাজার এক রজনী" গ্রন্থে এবং একই সঙ্গে স্বতন্ত্র অপর একটি রূপে অদ্যাবধি সংরক্ষিত ও প্রচলিত একটি কাহিনীর নায়িকা। তাওয়াদ্দুদ [ব্যক্তিনাম হিসাবে আরবী সাহিত্যের অপর কোন উদাহরণে ইহার ব্যবহার দেখা যায় না, যদিও একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল)-রূপে ইহার সচরাচর উপস্থিতি লক্ষণীয়, ইহা গঠনের দিক দিয়া তামান্নী, তাজান্নী ও অনুরূপ অন্য মহিলাদের নামের সদৃশ] ছিল জনৈক বণিকের ক্রীতদাসী। উক্ত বণিক ক্রমশ দারিদ্র্যে নিপতিত হইলে সে তাহার উক্ত ক্রীতদাসীকে প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে তাহার সমস্যা হইতে মুক্তি লাভের জন্য সেই ক্রীতদাসীকে খলীফা হারূন-এর নিকট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করে। হারূন এই শর্তে ক্রীতদাসীর জন্য দাবিকৃত অতি উচ্চ মূল্য প্রদানে সম্মত হন যে, ক্রীতদাসী একটি পরীক্ষার মাধ্যমে সে যে সকল জ্ঞানের অধিকারীরূপে দাবি করে তাহার প্রমাণ দিতে হইবে। ইব্রাহীম ইব্ন সায়্যার, আন-নাজ্জামসহ বহু সংখ্যক জ্ঞানী পণ্ডিত দ্বারা গৃহীত এই পরীক্ষায় তাওয়াদ্দুদ ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং দর্শনের ন্যায় বিষয়ে তাহার নিকট উপস্থাপিত সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করে, তাহাকে প্রদত্ত সকল প্রহেলিকার সমাধান প্রদান করে এবং দাবা ও পাশা খেলায় ও বীণা বাদনে তাহার বিশেষ দক্ষতার প্রমাণ দান করে। শেষ পর্যায়ে সে তাহার পালায় তাহার পরীক্ষকগণের নিকট কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দাবি করিলে তাঁহারা তাহার জবাব দিতে অসমর্থ হন এবং এইভাবে সে এমনকি গর্বিত নাজ্জামকেও লজ্জা দেয়। অতঃপর যখন খলীফা উক্ত ক্রীতদাসীকে তাঁহার নিকট হইতে যে কোন পুরস্কার লাভের জন্য অনুরোধ করিতে নির্দেশ দান করিলে সে তাহাকে তাহার পূর্বতন প্রভুর নিকট প্রত্যর্পণ করিবার অনুরোধ জানায়। খলীফা তাহার অনুরোধ মঞ্জুর করেন। অধিকন্তু তাহাকে পুরস্কারে ভূষিত করেন এবং তাহার পূর্বতন প্রভুকে খলীফার একজন অন্যতম অমাত্যরূপে নিয়োগ করেন।'

এই কাহিনীর সময়কাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে, শী'আ এমনকি খৃস্টান রূপান্তর (নিম্নে দ্র.)-সহ কাহিনীটির সকল ভাষ্যে উল্লিখিত আন-নাজ্জাম-এর নাম (মৃ. ২৩১/৮৪৫-৮৪৬) একটি সময়সীমা নির্ধারণে সহায়ক, অন্যদিকে প্রাচীনতম স্পেনীয় ভাষ্যটি সম্ভবত খৃস্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা রচনার সময় চিহ্নিত করে যাহা ইহার নিম্নতর প্রান্তিক হইতে পারে; তবে এই ক্ষেত্রে সম্ভবত খৃস্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর অধিকতর অতীতে গমন করার কোন প্রয়োজন নাই। কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে এই কাহিনী একটি স্বতন্ত্র গল্পরূপে অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ইহার বর্ণনাকারীর নামে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই নাম সকল উৎসে একই নহে এবং তাঁহার পরিচয় এই যাবত প্রতিষ্ঠিত করা যায় নাই। তাহার বিবরণের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হইল প্রশ্নাবলী ও সেইগুলির উত্তরসমূহ যাহা গল্পের প্রধান অংশ দখল করিয়া রহিয়াছে; তাওয়াদ্দুদ সংক্রান্ত গল্পটি কেবল তাহার জন্য একটি কাঠামো মাত্র যাহা তিনি এই সকল প্রশ্নোত্তর দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। আরব্য রজনীর অন্যান্য কাহিনীতে এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য সংগ্রহেও এই প্রসঙ্গে কতিপয় উদ্দেশ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন ক্রেতার বদান্যতা; তথাপি ইহার নীতিমূলক উদ্দেশ্য ও যে বিন্যাসে ইহাতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা এই কাহিনীকে পারসিকদের মধ্যে, খৃস্টান প্রাচ্য এলাকায়

এবং মধ্যযুগের য়ূরোপে ও এমন কি আরবী সাহিত্যেও প্রাপ্ত প্রশ্নপুস্তকসমূহের সহিত এক শ্রেণীভুক্ত করে। প্রশ্নাবলী সম্বলিত আরবী সাহিত্যের গ্রন্থগুলি কখনও কখনও জাহিজ প্রণীত কিতাবু'ত-তারবী' ওয়া'ত-তাদবীর গ্রন্থের ন্যায় জটিল, যাহা শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিকট বোধগম্য। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা রচিত হইয়াছে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের প্রশ্নাবলীর ন্যায় জনগণের শিক্ষার জন্য, যাহা অন্যান্য মুসলিম সাহিত্যে ক্রমশ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাওয়াদ্‌দুদ শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, যদিও এই কাহিনীর নীতিকথা অংশের ধর্মতত্ত্ব, কোন ক্রমেই 'আবদুল্লাহ্‌র গল্পসমূহের প্রশ্নাবলীর ন্যায় প্রাধান্যমূলক নহে। তাওয়াদ্‌দুদ কাহিনীর একটি শী'আ ভাষ্য আবু'ল-ফুতুওওয়া প্রণীত হাসানীয়া গ্রন্থে পাওয়া যায়, এই গ্রন্থ Malcolm -এর সময়ে পারস্যে জনপ্রিয় ছিল।

কাহিনীটির একটি খৃস্টান ভাষ্য হইল স্পেনীয় Historia della donzella Theodor, যাহার একটি পুরাতন সংস্করণ অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে এবং যাহা পরবর্তী সংস্করণে সংযুক্ত খৃস্টীয় সংযোজন হইতে মুক্ত। Historia della donzella Theodor নামক এই গ্রন্থটি (মাদ্রিদে রক্ষিত হিকায়াতু'ল-জারিয়া তূদুর পাণ্ডুলিপিতে ইতিমধ্যেই নামটির এই রূপান্তর লাভ ঘটিয়াছে) ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বই দশক পর্যন্ত একটি সস্তা উপন্যাসরূপে বারংবার মুদ্রিত হইয়াছে এবং পর্তুগীজ অনুবাদে তাহা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Chuvin, Bibliographie, ৭খ, ১১৭ প. ; (২) Horovitz, in Z.D.M.G, ৫৭খ, ১৭৩ প.; (৩) Menendez, in Homenaje Codera, পৃ. ৪৮৩ প.; (৪) W. Suchier, L'enfant sage (Gesellschaft fur romanische Litteratur, ২৪খ.); (৫) G. Heinrici, 'Griechisch- byzantinische Gesprachsbucher (Abhandlungen der sachsischen Gesellschaft der Wissensochaften, phil. hist. Klasse, ২৮খ,); (৬) G. F.Pijper, Het Book der duizend vragen, লাইডেন ১৯২৪ খৃ.।

J. Horovitz (E. I. [1])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাওয়াফ (طواف) ঃ 'আরবী, আভিধানিক অর্থ আবর্তন, চক্রাকারে পরিভ্রমণ, কোনও বস্তুর চতুষ্পার্শে বা চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ। লিসানু'ল-'আরাব গ্রন্থে রহিয়াছে ঃ طاف بالبيت واطاف عليه دار حوله শারী'আতের পরিভাষায় তাওয়াফ বলিতে বুঝায়, "নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে চক্রাকারে সাতবার প্রদক্ষিণ; অতঃপর দু'আ প্রার্থনা করা। ইসলামী দৃষ্টিকোণ হইতে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ সালাত ও সিয়াম-এর মতই একটি مقصود بالذات (মুখ্য) 'ইবাদত। এইজন্য তাওয়াফ করিবার সময় মানুষের শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র রাখা জরুরী।

তাওয়াফ প্রকৃতপক্ষে সুন্নাতে ইবরাহীমী তথা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত। ইসলাম ইহাকে ইবরাহীম (আ)-এর ঐতিহ্যবাহী স্মারক হিসাবে প্রচলিত রাখিয়াছে। কুরআনে হাকীমে দুই স্থানে ২ ঃ ১২৫ ও ২২ ঃ ২৬ উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম ('আ)-কে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ' ও সিজদাকারীগণের নিমিত্ত বায়তুল্লাহকে পাক-পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, সূরা আল-বাকারার ১২৪ আয়াত وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ "এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল"-এ كلمت -এর অন্তর্ভুক্ত দশটি বিষয়ের মধ্যে কা'বা শারীফের তাওয়াফ (এবং হজ্জ-এর অপরাপর রুকন, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ বা দৌড়ান ও কঙ্কর নিক্ষেপ)-ও অন্তর্ভুক্ত [যাদু'ল-মাসীর ফী 'ইলমি'ত-তাফসীর (১ম খণ্ড)]। সূরা আল-হাজ্জ-এর ২৯ আয়াত وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ -এ মুসলমানদিগকে তাওয়াফ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

তাওয়াফ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে তাঁহার গৃহের চতুষ্পার্শে অত্যন্ত বিনয় ও বিনম্র চিত্তে আবর্তন এবং আপন সমস্ত কিছু তাঁহারই নির্দেশে তাঁহার রাস্তায় উৎসর্গ করিবার বাস্তব ও কার্যকর প্রমাণ পেশ করিবার সমার্থক। একইভাবে পতঙ্গ অগ্নিশিখার চতুর্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সে ইহাতে আত্মাহুতি দেয়, তদ্রূপ তাওয়াফ করিবার সময় একজন মুসলিম নিজেকে আল্লাহ্‌র কুরবানগাহে পেশ করে। দুনিয়ার সমস্ত কিছু, এমনকি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পোশাক পরিত্যাগ করিয়া শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া বায়তুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে থাকে এবং আল্লাহ্‌র সমীপে দীনহীন বেশে স্বীয় পাপরাশির নিমিত্ত ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে থাকে। ইসলাম-পূর্বকালেও আরবের জনসাধারণ ইবরাহীম (আ)-এর দীনের অংশ হিসাবে বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করিত। কিন্তু অন্যান্য কুসংস্কারমূলক ও শারী'আত বহির্ভূত ধ্যান-ধারণার ন্যায় হজ্জ-এর কর্তব্যাদি পালনের ধারাবাহিকতায়ও তাহাদের সমাজে কয়েক ধরনের মনগড়া ও শালীনতা বিরোধী যেসব কুপ্রথা বদ্ধমূল ছিল তন্মধ্যে ইহাও ছিল একটি যে, তাহারা উলঙ্গ হইয়া কা'বা শারীফ তাওয়াফ করিত। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-র বর্ণনা মুতাবিক (মুসলিম, কিতাবু'ত-তাফসীর, হাদীছ ২৫) জাহিলী যুগে মহিলারাও উলঙ্গ হইয়া তাওয়াফ করিত। এই সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয় ঃ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ "প্রতি সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিবে" (৭ ঃ ৩১)। মক্কা বিজয়ের পর ৯ হিজরীতে যখন রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-কে আমীরুল হজ্জরূপে প্রেরণ করেন তখনই ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে কোনও মুশরিক হজ্জ করিতে পারিবে না এবং কেহ উলঙ্গ হইয়াও তাওয়াফ করিতে পারিবে না।

হাদীছ গ্রন্থসমূহে তাওয়াফের ফযীলত সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা রহিয়াছে। সুনান ইব্ন মাজায় (باب فضل الطواف) হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

سمعت رسول الله ﷺ يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة . "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিল এবং দুই রাক'আত সালাত আদায় করিল সে যেন একটি দাস মুক্ত করিল।"

ইব্ন মাজার অপর এক বর্ণনা মুতাবিক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্শ্ব সাতবার তাওয়াফ করিল এবং سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله এই বাক্যগুলি ভিন্ন আর কোনও কথা মুখ দিয়া বাহির করে নাই, তাহার দশটি গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, দশটি নেকী লেখা হয় এবং তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .

"যেই ব্যক্তি পঞ্চাশবার আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিল সে মাতৃগর্ভ হইতে সদ্যজাত শিশুর ন্যায় পাপমুক্ত হইয়া গেল (আত-তিরমিযী, باب فى فضل الطواف)।

তাওয়াফ হজ্জের রুক্‌নসমূহের অন্যতম রুক্‌ন (কিন্তু হায়য ও নিফাসওয়ালী মহিলা এই দায়িত্ব হইতে মুক্ত)। ইহার কিছু শর্ত, রুক্‌ন ও আদাব রহিয়াছে যেইগুলির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তাওয়াফ-এর শর্তসমূহ ঃ নিয়াত, (ছোট-বড় সকল প্রকার নাপাকী হইতে) শরীর ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাক-পবিত্র, সতর ঢাকা, তরতীব (অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ হইতে তাওয়াফ আরম্ভ করা), তাওয়াফ মস্‌জিদে হারাম-এর মধ্যে হইবে, মসজিদের পার্শ্বদেশে নহে (ইহার অর্থ এই যে, তাওয়াফ কা'বার অপরিহার্য অঙ্গ, মসজিদুল হারামের নহে)। হানাফীদের মতে তাওয়াফের আটটি ওয়াজিব। যথা ঃ শরীর পাক হওয়া (ওযূবিহীন, নিফাস ও ঋতুবতী মহিলা, অধিকন্তু নাপাক কোনও ব্যক্তি তাওয়াফ করিবে না), সতর ঢাকিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় পাক হওয়া, সতর ঢাকা, নগ্ন পদ হওয়া, ডান দিক হইতে সূচনা করা, হাজরে আসওয়াদ হইতে শুরু করা, হাতীমকে তাওয়াফ মধ্যে ফেলা এবং তাওয়াফের পর দুই রাক'আত সালাত আদায় করা।

তাওয়াফের আরকান ঃ সাত চক্করে (শাওত; ব. ব.–اشواط) প্রদক্ষিণ করা, তাওয়াফের চক্করসমূহ (اشواط طواف)-এর সংখ্যাও সালাতের রাক'আতের মতই হাদীছ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।

তাওয়াফের আদাব (রীতি-পদ্ধতি)-সমূহ ঃ বায়তুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হইতেই তাকবীর (আল্লাহু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চ স্বরে পড়িতে হয়) এবং আল্লাহ্ পাকের সমীপে দু'আ' প্রার্থনা করিতে হয়।

তাওয়াফের পদ্ধতি ঃ কেহ তাওয়াফ করিতে ইচ্ছা করিলে উযূ করিয়া মসজিদে হারামে প্রবেশ করিবে এবং সর্বাগ্রে তাওয়াফ করিবে। তাওয়াফের সূচনা হইবে হাজরে আসওয়াদ হইতে এবং তাহা এইভাবে ঃ হাজরে আস্‌ওয়াদ বরাবর দাঁড়াইয়া তাওয়াফের নিয়াত করিবে, হাজরে আসওয়াদ যেন নিজের বাম দিকে থাকে। নিয়াতের পর সালাতের সূচনার ন্যায় দুই হাত কান অবধি উঠাইবে এবং বলিবে بسم الله الله اكبر لا اله الا الله ولله الحمد। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করিবে (ইস্‌তিলাম), ইহা সুন্নাত। যদি অত্যধিক ভিড়ের কারণে চুম্বন প্রদান সম্ভব না হয় তবে হাত দ্বারা ইহা স্পর্শ করিয়া চুমা দিবে। ইহাও সম্ভব না হইলে কেবল হাত কিংবা অপর কিছুর সাহায্যে ইশারায় ইহা করিবে।

তাওয়াফ-এর সাত চক্কর (اشواط) বা সাতবার প্রদক্ষিণ ঃ প্রতিটি চক্কর হাজারে আস্‌ওয়াদ হইতে শুরু করিয়া ইহাতেই সমাপ্ত করিতে হয়। ইহার মধ্যে প্রথম তিন চক্করে 'রামল' করিতে হয়। অর্থাৎ তাওয়াফকারী স্বীয় স্কন্ধ একটু হেলাইয়া কিছুটা সদর্প এবং কিছুটা দ্রুত পদক্ষেপ সহকারে অগ্রসর হইতে হয় (মহিলাদের জন্য রাম্‌ল-এর বিধান নাই)। অবশিষ্ট চারটি প্রদক্ষিণ সাধারণ গতিতে চলিবে।

'রামল"-এর তাৎপর্য এই যে, হিজরতের পর যখন প্রথমবার রাসূলুল্লাহ (স) তদীয় সাহাবীগণ সমভিব্যাহারে 'উমরা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে মক্কা শারীফ আগমন করেন তখন মক্কার মুশরিকগণ বলে, "দেখ! য়াছরিবের (মদীনা) গরম আবহাওয়া তাহাদিগকে দুর্বল ও ক্ষীণ করিয়া দিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে হুকুম দিলেন যে, প্রথম তিন প্রদক্ষিণে (اشواط) সদর্প ও দ্রুত পদক্ষেপ এবং বুক টান করিয়া চল (আল-বুখারী, كيف كان بدء الرمل) রাসূলুল্লাহ (স) এবং তদীয় সাহাবায়ে কিরাম-এর অনুসরণে এই সুন্নাত তাওয়াফের আদাবের অন্তর্গত। প্রতিটি প্রদক্ষিণে তাওয়াফকারী যখন রুক্‌নে য়ামানী (বায়তুল্লাহ্‌র সেই কোণ যাহা দক্ষিণ পার্শ্বে য়ামানের দিকে অবস্থিত)-র নিকট পৌঁছিবে তখন ইহাও হাত দিয়া স্পর্শ করা মুস্তাহাব। ইহা রুক্‌নে য়ামানী-র ইস্‌তিলাম।

হাজরে আসওয়াদ-এর নিকট পৌঁছিলে প্রতিবার কোনরূপ কষ্টক্লেশ ব্যতিরেকে এবং অপরকে কষ্ট না দিয়া ইহা চুম্বন করিতে হইবে যেইভাবে সূচনাতে করা হইয়াছিল। তাওয়াফকালে দু'আ' পাঠ করিতে থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও ছানার মধ্যে মশগুল থাকা দরকার। তাওয়াফের জন্য বিশেষ কোন দু'আ' অপরিহার্য নয়। রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বহু সংক্ষিপ্ত ও ব্যাপক অর্থবোধক দু'আ' বর্ণিত আছে। সাধারণত এই তিনটি দু'আ পড়া হইয়া থাকে ঃ

(١) رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

(٣) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَاقَةِ وَمَوَاقِفِ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

তাওয়াফশেষে মাকামে ইবরাহীমের নিকট (সম্ভব না হইলে যেইখানে সম্ভব ও সহজসাধ্য বিবেচিত হয়) দুই রাক'আত সালাত আদায় করা ওয়াজিব। ইহার পরে দু'আ' করিবে। সাধারণত যখনই কেহ হারাম শারীফে প্রবেশ করিবে তাওয়াফ করিবে, ইহার বহু সাওয়াব। ইহা মুস্তাহাব এবং ইহা নফল তাওয়াফ। কিন্তু কেহ যদি নফল তাওয়াফের মানত করে তবে উহা আদায় করা ওয়াজিব হইবে।

তাওয়াফ তিন প্রকার ঃ (১) তাওয়াফু'ল-কুদূম (طواف القدوم) মক্কায় প্রবেশকারী প্রত্যেকের জন্যই ইহা সুন্নাত। ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র)-এর একই মত। ইমাম মালিক (র) ইহা ওয়াজিব মনে করেন।

(২) তাওয়াফু'ল-ইফাদা (طواف الافاضة) ঃ ইহা হজ্জ (উমরা)-এর অন্যতম রুক্‌ন। ইহাকে তাওয়াফু'য-যিয়ারাত (طواف الزيارة)-ও বলা হয়। (৩) তাওয়াফু'ল বিদা' (طواف الوداع) ইহাকে তাওয়াফু'স- সাদ্‌র (طواف الصدر)-ও বলা হয় এবং ইহা সুন্নাত। মক্কা মু'আজ্জামা হইতে স্বদেশে রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে ইহা আদায় করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী আস-সাহীহ (কিতাবু'ল-হাজ্জ); (২) মুসলিম, আ'স-সাহীহ (কিতাবুল হাজ্জ); (৩) আত-তিরমিযী, সুনান, কিতাবু'ল-হাজ্জ, (باب فى فضل الطواف); (৪) ইব্‌ন মাজা, সুনান, باب فضل الطواف (৫) মুহাম্মাদ ফুওয়াদ 'আবদু'ল-বাকী, মিফতাহু কুনূযি'স-সুন্নাহ, লাহোর ১৩৯১ হি.; (৬) জালালু'দ-দীন আল-খাওয়ারিযমী, আল-কিফায়া ফী শারহি'ল-হিদায়া, দিল্লী ১২৮৭ হি.; (৭) ইব্‌ন নুজায়ম, আল-বাহরু'র-রা'ইক শারহ কানযিদ দাকা'ইক, মিসর সং, ২ ও ৩ খ.; (৮) 'আলা'উদ'-দীন আল-কাসানী, বাদা'ই'উ'স-সানাই' ফী তারতীবি'শ-শারা'ই', কায়রো ১৩২৭ হি., ২খ; (৯) 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব খাল্লাফ, কিতাবুল-ফিকহ 'আলাল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ, মাতাবি' আশ-শি'আব, কায়রো; (১০) আস-সায়্যিদ

সাবিক, ফিকহুস-সুন্নাহ (১খ), বৈরূত ১৩৮৯; (১১) 'আবদু'র-রাহমান আল-জাযীরী, কিতাবু'ল-ফিকহ 'আলা'ল-মাযাহিবিল আরবা'আ, ১খ, আল-ইস্‌তিকামা সং. কায়রো; (১২) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামি'ল-কুরআন, ১২খ, কায়রো; (১৩) ছানাউল্লাহ পানীপাতী, আত-তাফসীরু'ল-মাজহারী, ৬খ.; (১৪) ইব্‌ন মানজূর, লিসানু'ল-'আরাব, তাওয়াফ শিরো.; (১৫) Hughes, A Dictionary of Islam, লাহোর ১৯৬৪।

আমীনুল্লাহ ওয়াছীর (দা. মা.ই.)/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

তাওয়াশী (طواشى) ঃ তুরকী শব্দ, 'খোজা' অর্থ প্রকাশক শ্রুতিমধুর শব্দ (euphemism); আল-মাকরীযী-র কথায় শব্দটি তুর্কী ও ইহার আদি রূপ ছিল তাবূশী (طابوشى)। শব্দটি স্পষ্টতই ভৃত্য অর্থে 'উছমানী তুর্কী শব্দ 'তাপুগচি'-র সহিত সম্পর্কিত। তাপুগচি শব্দটির অর্থও খাদেম (দ্র.) শব্দটির অর্থের মত একইভাবে বদলাইয়া গিয়াছে, যাহাতে খোজাদের শারীরিক পরিবর্তন এই শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ নহে, বরং ঐ শারীরিক বেশিষ্ট্য বুঝাইতে 'খাসী' (خصى) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাওয়াশী একজন বিশেষ 'ভৃত্য', একটি বিশেষ পদের অধিকারীকে বুঝায়, যে পদটি সাধারণত একজন খোজাকে দেওয়া হয়। তাই মিসরের প্রশাসনিক ভাষায় এই শব্দটি পাওয়া যায় এবং ইহা দ্বারা সামরিক বাহিনীতে দেহরক্ষী দলের (খাওয়াস্‌স) এক মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারীকে বুঝান হয়। অবশ্য ইহার পাশাপাশি খাদেম শব্দটিরও ব্যবহার প্রচলিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মাকরীযী, Histoire des Sultans Mamlouks, অনু. Quatremere, 1/ii, (1840),p. 132, note 163; (২) তুর্কী অভিধানসমূহ ও Brockelmann, Mitteltürk, Wortschatz, p. 195; (৩) Mez, Die Renaissance des Islams, p. 332 sqq., esp. 334 and note 4; (৪) Wustenfeld, Geographie u. Verwaltung von Agypten, p. 179।

M. Plessner (E. I. [1])/ আফতাব হোসেন

তাওরাত (تورات) ঃ Old Testament, বর্তমান বাইবেল-এর একটি অংশ। বাইবেলের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রহিয়াছে ঃ (১) পুরাতন নিয়ম (Old Testament) ও (২) নূতন নিযম (New Testament)। নূতন নিয়ম-এর তুলনায় পুরাতন নিয়ম বৃহদাকারের। গোটা বাইবেল সমগ্র য়াহূদী ও খৃস্টান সমাজের ধর্মীয় গ্রন্থ। কিন্তু য়াহূদীদের মৌলিক ধর্মীয় গ্রন্থ হইল পুরাতন নিয়ম। য়াহূদীগণ নূতন নিয়ম মান্য বা স্বীকার করে না। কেননা এই গ্রন্থটি ইন্‌জীল ও অন্যান্য সাহীফাসম্বলিত, যাহা খৃস্টানদের নিকট পবিত্র বলিয়া বিবেচিত।

পুরাতন নিয়মের গ্রন্থটি য়াহূদীদের বিভিন্ন পবিত্র সাহীফার সংকলন। খৃস্টানগণ প্রথম হইতেই ইহাকে তাহাদের পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে মানিয়া লইয়াছে, বরং খৃস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাধারণভাবে তাহাদেরও পবিত্র গ্রন্থ পুরাতন নিয়মই ছিল। খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে Epiphanius ও Athanasius বর্তমান আকারে রক্ষিত নূতন নিয়মকে মানিয়া লয় (Chambers Enc., Bible শিরো.)। য়াহূদী পণ্ডিতগণ পুরাতন নিয়মকে নিম্নোক্ত তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ

(১) তাওরাত (বিধি-বিধান-Law);

(২) আম্বিয়া'-ই কিরাম-এর সাহীফাসমূহ (Prophets); ও

(৩) পবিত্র সাহীফাসমূহ (Hagiographa অথবা কেবল Writings)।

অতএব তাওরাত সমগ্র বাইবেলের সমষ্টি নহে, আর সমগ্র পুরাতন নিয়মও তাওরাত নহে। কেননা উপরোক্ত বিভক্তি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে যে, তাওরাত ব্যতীত আরও সাহীফা রহিয়াছে যেইগুলি য়াহূদীদের পবিত্র গ্রন্থের অপরিহার্য অংশ। কিন্তু ঐ সমস্ত সাহীফার মধ্যে তাওরাত-এর একটি বিশেষ গুরুত্ব ও পবিত্র আসন রহিয়াছে।

নিম্নে সংক্ষেপে পুরাতন নিয়মের সমগ্র সাহীফা, বিশেষত তাওরাত সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। কেননা এই সমস্ত সাহীফা পুরাতন নিয়ম-এর অপরিহার্য অংশই নহে, বরং কতক মুহূর্তে তাওরাত বলিতে মোটামুটিভাবে সমগ্র পুরাতন নিয়মকেই বুঝাইয়া থাকে। কেননা পুরাতন নিয়ম-এ পরিণত গুরুত্ব ও আকারের দিক দিয়া তাওরাত-এর বিরাট মর্যাদা রহিয়াছে (Ency, Americana, Bible শিরো., ৬১৩)।

ঐতিহ্যগতভাবে তাওরাতকে মূসা ('আ)-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাতে মানব জাতির সৃষ্টি হইতে শুরু করিয়া বনী ইসরাঈল-এর ইতিহাস অবধি, অতঃপর মূসা ('আ)-এর ওফাত পর্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক বর্ণনা প্রসংগে বনী ইসরাঈল-এর জন্য যেই সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিসমূহ প্রণয়ন করা হইয়াছির তাহাও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মূল তাওরাত পাঁচটি সাহীফা (পুস্তিকা) সম্বলিত, যেইগুলিকে সাহা'ইফ-ই মূসা বা মূসা ('আ)-র সাহীফা বলা হইয়া থাকে (Pentateuch বা পঞ্চ সাহীফা)। ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নরূপঃ

(১) **আদি পুস্তক** (Genesis =تكوين) ঃ ইহাতে মূসা ('আ)-এর পূর্ববর্তী কাল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হযরত য়া'কূব ('আ)-এর বংশের গুরুত্ব তুলিয়া ধরা এবং ধর্মে নৈতিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের যেই মর্যাদা রহিয়াছে উহার সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ দান।

(২) **যাত্রাপুস্তক** (Exodus-خروج) ঃ এই সাহীফা মূসা ('আ)-এর জন্ম হইতে শুরু হয় এবং ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কিভাবে তিনি বনী ইসরাঈলকে মিসর হইতে বাহির করিয়া সীনাঈ পর্বত (طور سينين) পর্যন্ত লইয়া যান, যেইখানে তাহাদের নিকট হইতে পবিত্র অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় এবং তাহাদের নিমিত্ত বিধিসমূহ প্রণীত হয়।

(৩) **লেবীয় পুস্তক** (Leviticus=احبار/اللاوين) ঃ ইহাতে বনী ইসরাঈল-এর নিমিত্ত সেই সমস্ত বিধি রহিয়াছে 'ইবাদত-এর সহিত যেইগুলি বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

(৪) **গণনা পুস্তক** (Numbers-اعداد)ঃ ইহাতে মিসর হইতে বাহির হইয়া আসিবার পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রহিয়াছে, কিভাবে বনী ইসরাঈল (সীনাঈ) প্রান্তর হইতে বাহির হইয়া জর্দান ও ট্রান্স-জর্দান (اردن اور ماورے اردن) -এর এলাকা জয় করে। অধিকন্তু ইহাতে বিক্ষিপ্তভাবে বিধি-বিধানসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে।

(৫) **দ্বিতীয় বিবরণ** (Deuteronomy-تثنيه) ঃ ইহাতে ঐতিহাসিক পটভূমির উপর আলোকপাত করা হইয়াছে এবং সমষ্টিগত বিধিসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সাহীফা মূসা ('আ)-এর ওফাতের আলোচনার উপর সমাপ্ত হইয়াছে।

এইখানে পুরাতন নিয়ম-এর অশিষ্ট সাহীফাসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করা সমীচীন মনে করিতেছি, বিশেষত এইজন্য যে, তাওরাতের যেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়া বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে সেইগুলি এইসবের মধ্যেও পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়ম-এর তিন অংশের

মধ্য হইতে দ্বিতীয় অংশ হইল صحائف انبياء বা নবীদের পুস্তক (Prophets)। ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক. প্রথম যুগের নবীগণ ঃ

(১) য়ূশা' (যিহোশুয়-Joshua=يشوع);
(২) বিচারককর্তৃগণ (Judges-قضاة)
(৩) শমূয়েল (شموئيل-Samuel)
(৪) রাজাবলী (Kings-الملوك/السلاطين)

খ. শেষ যুগের নবীগণ ঃ

(৫) যিশাইয় (اشعياء-Isaiah);
(৬) যিরমিয় (ارميا-Ieremiah);
(৭) যিহিষ্কেল (حزقيال-Ezekiel) ও

(৮) انبياء اصاغر বা অপ্রধান নবীগণ (Minor Prophets) [অপ্রধান নবীদের বারটি সাহীফা (পুস্তক)। কিন্তু সবগুলি মিলাইয়া একটি সাহীফা গণ্য করা হয়]।

তৃতীয় অংশ পবিত্র গ্রন্থসমূহ বা صحف مقدسه (Hagiographa)। ইহাতে মোট ১১টি সাহীফা রহিয়াছে যেইগুলি তিন অংশসম্বলিত ঃ

ক. صحف اشعار বা কাব্য পুস্তক ঃ (১) مزامير গীত সংহিতা বা প্রার্থনা সঙ্গীত (Psalms); (২) امثال হিতোপদেশ বা নীতিবাক্যমূলক গ্রন্থ (Psalms) ও (৩) আয়্যূব বা ইয়োব (Job)।

খ. مجلات خمسه বা পঞ্চ পুস্তিকা (Megilloth) ঃ (৪) পরম গীত (Song of Songs) (৫) راعوت বা রূতের বিবরণ (Ruth), (৬) বিলাপ (Lamentation), (৭) كتاب جامعة سليمان (Ecclesiastes) ও (৮) ইস্টের (আস্তীর Esther)।

গ. বিশিষ্ট সাহীফা বা পুস্তকঃ (৯) দানিয়েল (دانيال-Daniel), উযায়র (عزر-عزرا)- Ezra) ও নাহিমিয় (نحميا-Nahemia) [এই তিনটি মিলাইয়া একটি সাহীফা গণ্য করা হয়] ও (১০-১১) কালক্রমিক ইতিবৃত্ত (Chronicles-ايام)।

এই সবগুলি মিলাইয়া ২৪টি সাহীফা হইল। এইগুলির ভাষা হিব্রু (عبرنى)। দানিয়াল ও 'ইয়রা পুস্তক কতিপয় বাক্য ব্যতিরেকে আরামায়িক ভাষায় লিখিত। য়াহূদীদের মধ্যে আসল হিব্রু পুরাতন নিয়মই প্রচলিত। ইংরেজী বাইবেলে এই সমস্ত সাহীফাকে আরও বিভক্ত করত ৩৯টি সাহীফা গণ্য করা হইয়া থাকে। ইহাতে "انبياء اصاغر" বা অপ্রধান নবীদেরকে পৃথক সাহীফা হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। 'ইযরা (ইস্রা)-কে নহিমিয়া (Nehemia) হইতে পৃথক গণ্য করা হইয়াছে এবং শমূয়েল, রাজাবলী ও বংশাবলী আরও অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই ক্রমবিন্যাসের মধ্যেও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খৃ. পূ. ১ম ও ৩য় শতাব্দীতে যখন গ্রীক ভাষায় পুরাতন নিয়ম-এর আনুবাদ করা হয় তখন এইসব সাহীফাকে বিষয়বস্তু বিচারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছিল ঃ

(১) ইতিহাস, (২) কাব্য ও (৩) ভবিষ্যদ্বাণী (Prophecy)। এই বিখ্যাত গ্রীক অনুবাদ Septuagint (سبعين) নামে খ্যাত। কেননা কথিত আছে যে, সত্তরজন অনুবাদক মিলিতভাবে এই অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছিল, যদিও এই বর্ণনার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই (Ency. Brit., Septuagint শিরো.)।

আমাদের নিকট কুরআন মাজীদের সাক্ষ্য রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ('আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করিয়াছিলেন, যেমন পরবর্তীকালে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর উপর ইনজীল কিতাব এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর কুরআন কারীম নাযিল করেন। তাওরাত ও ইন্‌জীল ব্যতীত কুরআন কারীমে আরও দুইটি সাহীফার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা ঃ صحف ابراهم ইবরাহীম ('আ)-এর সাহীফাসমূহ (৮৭ ঃ ১৯) এবং যাবূর, যাহা হযরত দাউদ ('আ)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল- وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا "আর আমি দিয়াছিলাম দাউদকে যাবূর" (৪ ঃ ১৬৩)। কুরআন কারীমে তাওরাতকেও সুহুফ (صحف) [সাহীফার ব. ব.] বলা হইয়াছে بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى-৫৩ ঃ ৩৬)। কুরআন কারীম হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত আম্বিয়া-ই কিরাম ('আ)-এর উপর আল্লাহ তা'আলা ওয়াহ্‌য়ি নাযিল করিয়াছেন كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ (৪ ঃ ১৬৩), কিন্তু সহিফার উল্লেখ কেবল চারিজন নবী অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ), হযরত মূসা ('আ), হযরত দাউদ ('আ) ও হযরত ঈসা ('আ) وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ (৫৭ ঃ ২৭)-এর সহিত করা হইয়াছে। ইবরাহীম ('আ)-এর সাহীফা অধুনা বিলুপ্ত। বৈশিষ্ট তিনটি সাহীফা কোনও না কোনও আকারে বিদ্যমান। বস্তুত তাওরাত ওয়াহ্‌য়ির সেই ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর যাহা আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরাম-('আ)-এর উপর নাযিল করিতেছিলেন। ইহার বিশেষ গুরুত্ব এই যে, ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ শারী'আত বা জীবনবিধান, যাহা হযরত মূসা ('আ)-কে বনী ইসরাঈলের জন্য প্রদান করা হইয়াছিল وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ "আমি মূসাকে দিয়াছিলাম কিতাব ও উহাকে করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য পথনির্দেশক" (১৭ ঃ ২) مَوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ "উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা" (৭ ঃ ১৪৫)। যদিও হযরত মূসা ('আ)-এর পর, যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে, দুইটি সাহীফা অর্থাৎ যাবূর ও ইন্‌জীল নাযিল হয়, কিন্তু হযরত মূসা ('আ)-এর শারী'আত বলবৎ থাকে, এমন কি 'ঈসা ('আ)-ও উহা বলবৎ রাখেন। যেমন তিনি বলেন, "মনে করিও না যে, আমি তাওরাত কিংবা নবীদের কিতাব লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, বরং পূর্ণ করিতে আসিয়াছি" (মথি, ৫ ঃ ১৭)।

কুরআন কারীমে তাওরাতের উল্লেখ প্রশংসাব্যঞ্জক শব্দে করা হইয়াছে। যেমন اَلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً ফুরকান ও জ্যোতি (২১ ঃ ৪৮); بَصَآئِرُ অর্থাৎ জ্ঞানবর্তিকা (২৮ ঃ ৪৩) প্রভৃতি, বিশেষ করিয়া ইহাও স্পষ্ট করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য ইমাম ও রহমাতস্বরূপ নাযিল করিয়াছেন। কুরআন কারীম হইতে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, তাওরাত ও অপরাপর সাহীফা সেই উম্মু'ল-কিতাব (অথবা শুধু আল-কিতাব)-এর প্রতিবিম্ব যাহা লাওহে মাহফূজ-এ সংরক্ষিত রহিয়াছে। মাক্কী সূরাসমূহে সাধারণভাবে তাওরাতকে আল-কিতাব বা কতক সৌন্দর্যবিষয়ক নাম (যেমন দিয়া', ফুরকান, রহমাত প্রভৃতি) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কেননা এইসবের ভিতর ইহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে যাহা য়াহূদীদের জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছিল। সেইখানে বিশেষভাবে তাওরাতের আলোচনা রহিয়াছে সঙ্গত এইজন্য যে, বিভিন্ন বিধান (আহকাম) সাধারণত তাওরাতেই উল্লিখিত হইয়াছে।

কুরআন কারীমের দৃষ্টিতে সেই তাওরাত যাহা হযরত মূসা ('আ) বনী ইসরাঈলের সামনে পেশ করিয়াছিলেন তাহা কুরআনুল-কারীমের মতই আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত ছিল (مُنَزَّلٌ مِّنَ اللّٰه)। অতএব সামগ্রিকভাবে অপরাপর আম্বিয়ায়ে কিরাম ('আ)-এর সাহীফাসমূহের উপর আস্থা স্থাপন মুসলমানদের উপর অপরিহার্য হইয়া যায়।

কুরআন কারীম দ্বারা ইহাও সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, তাওরাত হযরত মূসা ('আ)-এর উপর তূর পর্বতে চল্লিশ দিনে নাযিল হয় এবং তিনি ইহা কাষ্ঠফলকসমূহ/পাতের উপর লিখিয়া রাখেন। অধিকন্তু এই সমস্ত কাষ্ঠফলক/পাতের উপর আল্লাহ তা'আলা সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপদেশ এবং প্রতিটি ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশ লিখিয়া দেন (وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَىْءٍ-৭ ঃ ১৪৫)। জানা যায় যে, তাওরাত হযরত মূসা ('আ)-এর উপর তখন নাযিল হয় যখন তিনি বনী ইসরাঈলকে ফির'আওনের জুলুম-নিপীড়ন হইতে মুক্ত করত মিসর হইতে বাহির করিয়া আনিতেছিলেন এবং যেই মুহূর্তে তিনি সীনাঈ উপদ্বীপ তূর পর্বতের পাদদেশ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন (২০ ঃ ৮০)। সম্ভবত এই ওয়াহ্‌য়ি হযরত মূসা ('আ)-এর উপর কোনরূপ মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি নাযিল হয়। কেননা কুরআন কারীমে ওয়াহ্‌য়ি নাযিলের এই পদ্ধতিকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا (৪ ঃ ১৬৪) "এবং মূসার সহিত আল্লাহ্‌ সাক্ষাত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন।"

সন্দেহ নাই যে, তাওরাত বনী ইসরাঈলের জন্য হযরত মূসা ('আ)-এর কাল হইতে আরম্ভ করিয়া খাতামু'ন-নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদু'র রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্তএকটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ছিল যাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জীবন-নীতি হইতে শুরু করিয়া জীবনের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান ছিল। যেমন সমর আইন, শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার, যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আচার-আচরণ, দাম্পত্য জীবনের সমস্যা ও সংকট, সংক্রামক ব্যাধিসমূহ সম্পর্কে সতর্কতা, আবাসিক বাসগৃহ নির্মাণ সম্পর্কে নির্দেশনা দান ইত্যাদি।

একদিকে আমরা দেখিয়াছি যে, কুরআন কারীম তাওরাতকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত গ্রন্থ বলিয়াছে এবং তাওরাত ও বনী ইসরাঈলের বিরাট মর্যাদা বর্ণনা করিয়াছে। সম্ভবত দুনিয়াতে কুরআন কারীম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থ এমন নাই যাহা অন্য কোন ধর্মের গ্রন্থের এত প্রশংসা করিয়াছে যতটা কুরআন কারীম তাওরাতের করিয়াছে। কেননা সাধারণত ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ একে অপরের সহিত সম্পর্কশূন্যই নহে (Mutually exclusive), বরং একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু কুরআন কারীম আল্লাহ্‌র নবীদের ধারাবাহিকতা ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত সাহীফাসমূহকে মানিয়া লইয়াছে এবং দীনকে এক বলিয়া অভিহিত করিয়াছে বিধায় এইখানে বাস্তবে পারস্পরিক বিরোধিতা ও বৈপরীত্য অকল্পনীয়। অপরদিকে কুরআন কারীম ইহাও পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছে এবং দুনিয়াকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় নিজেদের বিদ্রোহ, অবাধ্য আচরণ, নবীদের হত্যা প্রভৃতি কারণে অভিশপ্ত ও ক্রোধ-নিপতিত হইয়া গিয়াছে (৪ঃ ১৫৫-৫৭; অধিকন্তু মথি ২৩ ঃ ৩৩-৩৯; যিশাইয় ৪৩ ঃ ২৮ ও যিরমিয় ১৯ ঃ ৮১৫, যেইখানে তাহাদের এই জাতীয় কর্মের ও ইহার প্রতিফলের উল্লেখ রহিয়াছে) এবং তাহারা তাওরাতকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করিয়া উহাকে আসল ওয়াহয়ির অবস্থায় কায়েম রাখে নাই (দ্র. ৪ঃ ৪৫; ৫ ঃ ১৪)। কুরআন কারীম সংক্ষেপে ইহাও বলিয়াছে যে, য়াহূদীগণ কিভাবে তাওরাতে রদবদল করিত। কোনও কোনও সময় তাহারা শব্দের পরিবর্তন করিত يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه (৪ ঃ ৪৬) এবং কখনও আবার তাহারা সঠিক মর্ম অনুধাবন সত্ত্বেও উহার পরিবর্তন ঘটাইত ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ-২ ঃ ৭৫) অতঃপর ইহার মর্মের মধ্যেও পরিবর্তন সাধন করিত (فَاخْتَلَفُ فِيْه-৪১ ঃ ৪৫)। কখনও কখনও তাহারা নিজেরাই সাহীফা লিখিয়া ফেলিত এবং বলিত যে, ইহা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত (يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰه-২ ঃ ৭৯)। কখনও তাহারা তাওরাতের আয়াত লুকাইত (দ্র. ২ ঃ ১৪; ৩ ঃ ১৮৭) ইত্যাদি। পুরাতন নিয়ম-এর অপরাপর সাহীফা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বিকৃতির সূচনা একেবারে প্রথম হইতেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। বনী ইসরাঈলের কতিপয় নবী নিজেরাও ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং য়াহূদীদের এই অপকর্মকে অপরাধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ঃ "আর পৃথিবী আপন নিবাসীদের পদতলে অপবিত্র হইল, কারণ তাহারা বিধানসমূহ লঙ্ঘন করিয়াছে, বিধির অন্যথা করিয়াছে, চিরন্তন নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে" (যিশাইয়, ২৪ ঃ ৫)। "তোমরা চিরঞ্জীব ঈশ্বরের, আমাদের ঈশ্বর বাহিনিগণের সদাপ্রভুর বাক্য বিকৃত করিয়াছ" (যিরমিয়, ২৩ঃ৩৬) প্রভৃতি।

আধুনিক পর্যালোচনা, সমালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের ফলাফল ও সিদ্ধান্ত বর্ণনার পূর্বে ইহা বিবৃত করা সমীচীন মনে হয় যে, তাওরাত সম্পর্কে য়াহূদী ও খৃস্টানদের ধর্মীয় 'আকীদা-বিশ্বাস কী? এই দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের 'আকীদা-বিশ্বাস (তাওরাত সম্পর্কে) এই যে, সাহীফাসমূহসহ তাওরাত অর্থাৎ সমগ্র পুরাতন নিয়ম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে প্রতিটি শব্দসহ নাযিলকৃত ওয়াহয়ি (وَحْىٌ مُنَزَّلٌ مِّنَ اللّٰه) এবং যাহা কিছু ইহার মধ্যে রহিয়াছে উহা আল্লাহ্‌র কালাম যাহার সত্যতার উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা যায় এবং যাহা সকল দিক দিয়া অনুরূপ ও স্ববিরোধিতামুক্ত। ইহা সেই মানদণ্ড যদ্দ্বারা প্রতিটি সত্য যাচাই করা যায়। এই পবিত্র গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ ওয়াহয়ির মাধ্যমে (রূহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে) মানব জাতি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল এবং যেইভাবে রূহুল-কুদুস ইহার সৃষ্টিতে কার্যকারক ছিলেন, তেমনই তিনি ইহার সংরক্ষণেরও যিম্মাদার (মূল ইংরেজী নিম্নরূপ ঃ For it was held that the Holy Ghost had been active, in its preservation as well as in its creation" O. T. Kraeling, Since the Reformation)। য়াহূদী পণ্ডিতগণের মধ্যে Philo (জন্ম খৃ. পূ. ২০ সালে) ও Josephus (হুদূদ, ১০০ খৃ.) উক্ত মতের সমর্থক ছিলেন। প্রথম শতাব্দীর খৃস্টানগণ যাহাদের অধিকাংশই রংশগতভাবে য়াহূদী ছিল, এই 'আকীদা-বিশ্বাসই অবলম্বন কিরয়াছিল এবং তাওরাতকে নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থরূপে মানিয়া লইয়াছিল।

সম্ভবত Origen (১৮৫-২৫৪ খৃ.)-ই ছিলেন প্রথম খৃস্টান পণ্ডিত যিনি পরিষ্কারভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন যে, বাইবেল, বিশেষত পুরাতন নিয়ম-এর ভিতর কতকগুলি বাক্য এমন যাহা হয়ত অর্থগত দিক দিয়া বিশুদ্ধ নহে অথবা নৈতিকতার মানদণ্ডে নিম্নমানের ও নিন্দার্হ (Ency. Brit, Bible শিরো.)। কিন্তু তিনি Philo-র method of allegory বা রূপক বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নিজেকে এইভাবে প্রবোধ দেন যে, এইরূপ ক্ষেত্রে বাহ্যিক শব্দ দ্বারা উচ্চতর অর্থ অনুসন্ধান করিতে হইবে। Augustine (৩৫৪-৪৩০ খৃ.) ও টমাস একুইনাস

(Thomas Aquinas-1225-74 খৃ.) এই মতই গ্রহণ করেন (Ency. Brit., পূ. স্থা.)।

য়াহূদী ও খৃস্টানগণ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে খৃ. ১৬শ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন (Reformation movement) অবধি কোনওরূপ বিশেষ সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করে নাই। কেবল Porphyry (২৩৩-৩০৪ খৃ.) ইহার বিপরীতে তাঁহার ধারণা ব্যক্ত করেন যে, দানিয়েলের পুস্তক ব্যবিলেনের নির্বাসনের যুগে লিখিত হয় নাই, বরং চারি শতাব্দী পর লিখিত হইয়াছে। অনুরূপ স্পেনের য়াহূদী পণ্ডিত ইব্ন 'আযরা (১০৯২-১১৬৭ খৃ.) গবেষণান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, صحائف خمسه বা পঞ্চ পুস্তক (Pentateuch) হযরত মূসা ('আ) পরবর্তী যুগের রচনা। কিন্তু গবেষণা যতই সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে ততই এই ধরনের সমালোচনামূলক অধ্যয়ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন ধর্মীয় দলের মধ্যে প্রচলিত হইবার পর এই প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায় এবং এই প্রতিক্রিয়াকে বিভিন্ন কারণ শক্তি যোগাইতে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যিক পুনর্জাগরণের যুগের (Renaissance) সূচনা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়। দর্শন ও ইতিহাসের সমালোচনামূলক অধ্যয়ন ও অন্যান্য জ্ঞানের অনুশীলনও শুরু হয়। ইহার ফলে অন্ধকার যুগসমূহ (Dark Ages বা Middle Ages, আনুমানিক ৬০০-১৪০০ খৃ.) য়াহূদী-খৃস্টান সমাজের গলদেশে অন্ধ আনুগত্যের যেই লৌহ শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং মন-মানসের উপর যেই তালা আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করত মানবীয় চিন্তাশক্তিকে অর্গলমুক্ত করিয়া দেয়। ফরাসী দার্শনিক ও পণ্ডিত Capellus (আনু. ১৬২৪ খৃ.) প্রমাণ করেন যে, তাওরাতের মূল হিব্রু পাঠ (متن) Massoretic স্বরচিহ্ন ছাড়া অন্য পন্থায়ও পাঠ করা যাইতে পারে। অধিকন্তু যেই হিব্রু মূল পাঠ বর্তমান, উহাও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। আরও একজন ফরাসী পণ্ডিত Morinus (আনু. ১৬৩৩ খৃ.) প্রমাণ করিয়াছেন যে, গ্রীক Septuagint ঃ LXX-এর রচনা অধিকাংশ স্থলে হিব্রু মূল পাঠের তুলনায় অধিকতর বিশুদ্ধ। আরও একজন খৃস্টান পণ্ডিত রিচার্ড সাইমন (Richard Simon, আনু. ১৬৮৫ খৃ.) এই মত ব্যক্ত করেন যে, বাইবেলের অধ্যয়ন ঐতিহাসিক সমালোচনার নিরিখে হওয়া সমীচীন। এই দুই মত বাইবেল সম্পর্কে দুইটি ধারা অর্থাৎ Textual criticism বা পুঁথিগত সমালোচনা এবং ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক সমালোচনা বা উচ্চতর সমালোচনার (Higher criticism) বুনিয়াদ রাখে। পরবর্তী কালে Morgan (আনু. ১৭৩৭ খৃ.)-ও দাবি করেন যে, বাইবেলের অধ্যয়ন জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে করা আবশ্যক। অপর মনীষী Reimarus নামক একজন জার্মান পণ্ডিত ১৭৪৭ খৃস্টাব্দে এক বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করেন, যাহাতে তিনি বাইবেলকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত (revelation) হওয়া অস্বীকার করেন। আরও একজন জার্মান পণ্ডিত Lessing (আনু. ১৭২৯-৮১ খৃ.)-ও দাবি করেন যে, বাইবেলে উল্লিখিত ঘটনাবলীর উপর ইতিহাসের বুনিয়াদ রাখা যাইতে পারে না। বাইবেলের সমালোচনামূলক গবেষণার দিক দিয়া খৃ. সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা উল্লিখিত পণ্ডিতবর্গ ছাড়া কতিপয় বিখ্যাত দার্শনিকও এই জাতীয় মতামত পেশ করিয়াছেন, যাহা কমবেশি প্রাচীন ধর্মীয় 'আকীদার বিরোধী ছিল। ইহাদের মধ্যে দার্শনিক স্পিনোযা (Spinoza) ও হব্‌স (Hobbes)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য (Kraeling)।

আধুনিক গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনা হইতে শেষাবধি ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বর্তমান তাওরাত ও পুরাতন নিয়ম-এর অপরাপর সাহীফাসমূহ প্রাচীন মূল ধর্মীয় 'আকীদার পরিপন্থী ওয়াহয়ি আল্লাহ্‌র কালাম কিংবা আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত ওয়াহয়ি (وحى منزل من الله) নহে, বরং উল্লিখিত বিভিন্ন সাহীফা মানুষ বিভিন্ন যুগে রচনা ও সংকলন করিয়াছে। বর্তমান তাওরাত হযরত মূসা ('আ)-এর পরবর্তী যুগের রচনা। এইভাবে বাইবেলের প্রতিটি পুস্তক কিংবা সাহীফা নির্বিচার ও নির্বিশেষে মানবীয় রচনা যাহা ঐ সমস্ত নবীদের বহু পরবর্তী কালে প্রণীত হয়, যাহাদের প্রতি ঐ সমস্ত সাহীফা প্রযুক্ত হইয়া থাকে! কুরআনী সাক্ষ্যের আলোকে ইহার ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত আসল সাহীফাসমূহ বিনষ্ট হইবার পর য়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ এইগুলি আবার নূতনভাবে রচনা ও বিন্যস্ত করেন। ইতিহাস হইতে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, তাওরাত আকস্মিক ঘটনাচক্রে কয়েকবার ধ্বংস হয়। এই সব ঘটনাচক্রের ইতিহাস মূলত সেই সব দৈব-দুর্ঘটনার ইতিহাস, যাহা য়াহূদী জাতিগোষ্ঠীর উপর কয়েকবারই আপতিত হয়। ইহা অনুমানসিদ্ধও বটে এবং আমাদের নিকট ঐতিহাসিক প্রমাণও রহিয়াছে যে, ঐ সকল জাতীয় দুর্যোগে য়াহূদীদের পবিত্র সাহীফাসমূহও ধ্বংস ও বিনষ্ট হইতে থাকে। খৃ. পূ. ৭০৫ হইতে ১৩৫ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তীন উপর্যুপরি বিভিন্ন আক্রমণকারী ও বিজয়ী শক্তির রণভূমিতে পরিণত থাকে। খৃ. পূ. ৭০০ সালে Sennacherib আক্রমণোদ্যত হন এবং জেরুসালেম অবরোধ করেন।

খৃ. পূ. ৫৮৬ সালে বুখ্‌ত নাসসার (নেবু চাদ নাচার)-এর আক্রমণের ফলে জেরুসালেম ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়। এই ধ্বংসযজ্ঞে তাওরাত ভস্মে পরিণত হয় এবং য়াহূদীদেরকে ব্যবিলন রাজ্যে নির্বাসন দেওয়া হয়।

খৃ. পূ. ৫৩৮ হইতে ৩৩২ সাল অবধি ফিলিস্তীন ইরানের অধীনে থাকে। সাইরাস (Cyrus) য়াহূদীদেরকে ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন।

খৃ. পূ. ৩৩২-৩২৩ সাল ফিলিস্তীন দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের শাসনাধীনে থাকে এবং খৃ. পূ. ৬৩-৩৯০ খৃ. অবধি রোম সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল, এই সময় খৃ. পূ. ৬৩ সালে রাজা Pompey জেরুসালেম জয় করেন, هيكل (Temple বা Synagogue) পুনর্নির্মিত হয়। ৭০ সালে Titus রূমী Temple বা Synagogue-সহ জেরুসালেম ধ্বংস করেন। খৃ. ১৩২-৩৫ সালে Hadrian য়াহূদীদের বিদ্রোহ দমনপূর্বক ফিলিস্তীনে তাহাদের পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেন।

উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে পরিষ্কার হইয়াছে যে, য়াহূদীদের আসল পবিত্র সাহীফাসমূহ কালচক্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমান তাওরাত পরবর্তী কালে রচিত ও বিন্যস্ত হইয়াছে, যেই সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত হইবে।

আমাদের নিকট কোন অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই যে, বর্তমান তাওরাতের সাহীফাসমূহ কখন প্রণীত ও সংকলিত হয় এবং কিভাবে ইহা নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হয়। সাধারণ ধারণা এই যে, এযরা (এযৌর Ezra) নবী পুনর্বার অস্তিত্ব দান করেন, নূতনভাবে ইহা বিন্যস্ত করেন এবং নির্ভরযোগ্য অভিহিত করেন। এক প্রচলিত বর্ণনা মুতাবিক নবী 'এযরা ('উযায়র ৯৪ সাহীফা ৪০ দিনে পাঁচজন লেখক দ্বারা পুনর্বার লিপিবদ্ধ করান (অর্থাৎ ২৪ সাহীফা পুরাতন নিয়ম ও ৭০ সাহীফা যাহা পরবর্তী কালে অনির্ভরযোগ্য [apocryphal] ঘোষিত হয়)। এই বর্ণনা ঐতিহাসিক দিক দিয়া গালগল্পের বেশি কোন মূল্য বহন করে না (Ency. Brit, Bible শিরো. "Worthless legend"; Ency. Ame. Bible, শিরো. "A merely fictitive outgrowth")।

ইহার মধ্যে এতটুকু সত্য রহিয়াছে যে, 'ইযরা ঐ সমস্ত বিনষ্ট ও বিলুপ্ত সাহীফাকে পুনর্বার লিপিবদ্ধ করেন। এই মত খৃস্টীয় ১৩শ শতাব্দীর পর জন্মলাভ করে, বিশেষত Elias Levita (১৫৩৮ খৃ.) ও Buxtorf (১৬৬৫ খৃ.) ইহাকে একটি অকৃত্রিম ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তি দান করেন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহা একটি কাল্পনিক গালগল্প মাত্র (a fictitive outgrowth)।

উপরোল্লিখিত বর্ণনা হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পুরাতন নিয়ম-এর আসল সাহীফাসমূহ বিনষ্ট হইবার পর নবী 'ইযরা ('উযায়র)-ও এইগুলিকে জনশ্রুতি মতে সংকলন করিয়াছেন, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত আসল সাহীফারূপে নহে এবং এই অভিমত প্রকৃত ও বাস্তব সত্যরূপে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়, যখন আমরা নিজেরা বর্তমানে প্রচলিত পুরাতন নিয়ম অধ্যয়ন করি। উল্লিখিত ঐতিহাসিক তথ্য হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, 'ইযরার পর ফিলিস্তীনের উপর কমপক্ষে আরও তিনবার ধ্বংসযজ্ঞ নামিয়া আসিয়াছিল। এমতাবস্থায় পুরাতন নিয়ম-এর আসল সাহীফাসমূহ বিলুপ্ত ও বিনষ্ট হইয়া যাওয়া বিস্ময়কর নহে, বরং বিস্ময়কর ইহা যে, উল্লিখিত নকল সাহীফাসমূহও আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও উপরোল্লিখিত অভিমতকে প্রমাণিত করে। উল্লিখিত পবিত্র গ্রন্থের হিব্রু মূল পাঠকে যাহা বর্তমানে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত আকারে বিদ্যমান উহাকে মাসূরী পাঠ (Massoretic Text) বলা হয়। এই হিব্রু পাঠ সম্ভবত ৬ষ্ঠ ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সংকলন করা হইয়াছিল। খৃস্টীয় ২য় শতাব্দীতেও ইহা বিন্যস্ত ও সংকলিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সময়কাল স্বীকার করিয়া লইলেও উল্লিখিত মূল পাঠ সুবিন্যস্ত হওয়া ও আসল সাহীফাসমূহের লিপিবদ্ধ করিবার কালের মধ্যে এক দীর্ঘ বিরতি প্রতিবন্ধক হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। হিব্রু মূল পাঠ সুসংবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এইজন্য যে, মূল হিব্রু লিপিতে (script) হারকাত (স্বরচিহ্ন) থাকিত না। ইহার অনিবার্য ফল ছিল এই যে, এক যুগ অতিবাহিত হইবার পর শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অর্থের বিকৃতি দেখা দিতে থাকে। কেননা (হারকাত না থাকায়) ইহা বিভিন্নরূপে পাঠ করা যাইত। এই কারণে য়াহূদী পণ্ডিতগণ খৃস্টীয় ৫ম ও ৯ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় আলামাত (বিরতি চিহ্ন), হারকাত (স্বরচিহ্ন, vowel signs) ও স্বরভঙ্গির চিহ্নাদি (accents) প্রভৃতি উদ্ভাবন করেন। বস্তুত যখন হিব্রু মূল পাঠ এইভাবে স্বরচিহ্ন সহযোগে সুসংবদ্ধ করা হয় তখন স্বভাবতই ইহাতে অর্থ নির্ধারণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গরমিল পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমান ওল্ড টেস্টামেন্টে বহু উদাহরণ এমন রহিয়াছে যেইগুলির মধ্যে ভুল হারকাত (স্বরচিহ্ন) সংযোগের কারণে বাক্য অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। তবে ঐ সকল পণ্ডিত একটি বিরাট কর্ম সম্পাদন করিয়াছেন যে, তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য হিব্রু মূল পাঠ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত পণ্ডিতবর্গকে মাসূরী (Massorites) বলা হয় এবং তাঁহাদের বিন্যস্ত মূল পাঠকে মাসূরী পাঠ (Massoretic Text) বলা হয়। ইহার মাধ্যমে তাঁহারা যেন একটি বর্ণনা (Massorites)-কে সংরক্ষিত করিয়া দিয়াছেন, যদিও Massoretic স্বরচিহ্ন (اعراب وحركات) পরিপূর্ণরূপে বোধগম্য হয় না (O.T., A Modern Study : Rowly)। পুরাতন নিয়ম বা ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রাচীনতম হিব্রু হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ৯১৬ খৃস্টাব্দের লিখিত (Cod. Babylonicus, Ency. Brit. Bible শিরো.; Ency. Amer. Massorah শিরো.; Bewer, পৃ. ৪৩৫। এই শেষোক্ত গ্রন্থে এই ধরনের ভুলের কয়েকটি উদাহরণ বর্তমান)। অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, এই সময়ের পূর্বে হিব্রু মূল পাঠে বহু মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, খৃস্টীয় ২য় শতাব্দীর পূর্বে যেই সকল পাণ্ডুলিপি ছিল তাহা একটি অপরটি হইতে বেশ ভিন্ন ছিল। সামিরী তাওরাত, বিশেষত গ্রীক Septuagint হইতে যাহা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম Version, ইহার প্রমাণ মিলে। হিব্রু মূল পাঠে এমন চিহ্নও পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন কারণে মূল পাঠে রদবদল করা বৈধ মনে করা হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ নামের মধ্যে পরিবর্তন, বাক্যের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন প্রভৃতি। তদুপরি এই পরিবর্তনসমূহ এক সময়ে নহে, বরং বিভিন্ন সময় হইয়াছে। স্বয়ং য়াহূদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, তাওরাতে এমন ১৮টি স্থান রহিয়াছে যেইখানে প্রাথমিক যুগের লেখকগণ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তন করিয়াছেন। ইহা ঐ সমস্ত পরিবর্তন যেইগুলির সাক্ষ্য আমাদের নিকট কোনও না কোনরূপে বর্তমান। ঐগুলি ভিন্ন আমাদের জানা নাই, কত পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়া থাকিবে যাহা নিশ্চয়তার সহিত জানা এক্ষণে কিংবা ভবিষ্যতে অসম্ভব। ইহাও সত্য যে, এই মাসূরী পাঠ (Massoretic Text) ছাড়াও প্রাচীনকালে আরও কিছু সংকলন ও অনুলিপি (Versions, recensions) ছিল, যাহা অধুনা বিলুপ্ত এবং এই সমস্ত কপিতে একে অন্যের সহিত গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য ছিল (Ency. Brit., Bible শিরো. Differed materially",; এতদ্ভিন্ন আরও দ্র Bewer, Literature of the O.T.)।

যখন আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়াস ইহা মানিয়া লইয়াছে যে, প্রচলিত তাওরাত (সাহীফাসমূহসহ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত নহে যখন বিভিন্ন সাহীফার রচনার ইতিহাস এবং সেইগুলির প্রকৃত রচয়িতাদের নাম জানিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞদের সাধারণভাবে ধারণা এই যে, পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর তিনটি অংশ (তাওরাত, আম্বিয়া ও সাহীফাসমূহ) ইহার সংকলনের তিনটি পর্যায়ের নিদর্শন পেশ করে। সর্বপ্রথম তাওরাত সংকলিত হয় এবং নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অতঃপর আম্বিয়া' ও শেষে পবিত্র সাহীফাসমূহ সংকলিত হয়। বাহিরের সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকিবার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ইহার সংকলনের তারিখসমূহ নিম্নরূপ হইতে পারে ঃ

(১) তাওরাত বর্তমান আকারে খৃ. পূ. ৪৪৪;

(২) আম্বিয়া' " " " ২০০-২৫০ এর মধ্যে;

(৩) পবিত্র সাহীফাসমূহ " " ১০০-১৫০ এর মধ্যে।

এই সমস্ত সাহীফাঃ, বিশেষত যেইগুলি দীর্ঘ, একজন রচয়িতার রচিত ও সংকলিত নহে, বরং ক্রমান্বয়ে ইহাতে বৃদ্ধি ঘটিয়াছে এবং পর্যায়ক্রমে উহা বর্তমান আকারে পৌঁছিয়াছে (Ency. Brit., Bible শিরো.; Rowley, Growth of the Old Testament)।

ইহা এক দীর্ঘ আলোচনা যে, আধুনিক গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়াস যখন বাইবেল সম্পর্কে য়াহূদী ও খৃস্টানদের ধর্মীয় 'আকীদার ভিত্তিসমূহ দুর্বল করিয়া দিল তখন বিভিন্ন ধর্মীয় দল-উপদলের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। কেহ কেহ এই অভিমত পেশ করেন যে, ওয়াহ্‌য়িও আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিল হইবার অর্থ শাব্দিক ওয়াহয়ি নহে; বরং ইহার অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ ওয়াহ্‌য়ি। কেহ কেহ ইহাকে রূপক

সমগ্র (Allegories) হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। অনন্তর যখন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কান্ট (Kant) উপলব্ধি করেন যে, কেবল শব্দগত দিক দিয়া তাওরাত বহু ক্ষেত্রে এক "দুর্বহ ও দুঃসহ ভার"-এ পরিণত হয় তখন তিনি রূপক পদ্ধতির (allegorization) মধ্যেই মুক্তির পথ দেখিতে পান (Kraeling, ৫৪)। সাধারণভাবে খৃস্টানদের নিকট বাইবেলের মূল্য ও মর্যাদা কোন মু'জিযার কারণে নহে যদ্দরুন ইহা অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে কিংবা ইলহামের কারণেও নহে, যাহা কেবল আম্বিয়া' কিরামের উপর নাযিল হইয়াছে, বরং ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে নিহিত যাহা বনী ইসরাঈলের নবীগণ করিয়াছেন এবং যেইগুলির পরিপূর্ণতা ঈসা ('আ)-এর জীবনী ও শিক্ষার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে (Ency. Brit.. ৩খ., ৫০১, কলাম ২, Bible শিরো.)। খৃস্টান সমাজের সম্পর্কে যতখানি পোপ ১৩শ লিউ (Leo XIII ঃ ১৮৭৮-১৯০৩ খৃ.) তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, "ইহা সম্পূর্ণ ভুল ও নিষিদ্ধ যে, ওয়াহয়িকে পবিত্র পুস্তকে শুধু কয়েকটি স্থানের জন্য সীমিত করিয়া দেওয়া হইবে কিংবা ইহা মানিয়া লওয়া হইবে যে, কোনও সাহীফা বা পুস্তক লেখকের দ্বারা ভুল হইয়া গিয়াছে" (It is absolutely wrong and forbidden either to narrow inspiration to certain parts only of Holy Scripture or to admit that sacred writer has erred)। এই সুচিন্তিত মতামত যাহা একটি বিশেষ ফরমানে পোপ ঘোষণা করিয়াছিলেন সমগ্র খৃস্টান সমাজ (রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট) অদ্যাবধি আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে (Ency. Brit., পূ. স্থা., কলাম ১)।

এই আলোচনার পর আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এতদসম্পর্কে কুরআন কারীমের সুস্থির ভূমিকা এবং তাওরাত সম্পর্কে ইহার সিদ্ধান্ত কি? আমরা দেখিয়াছি যে, কুরআন কারীম যেইখানে সংক্ষেপে তাওরাত-কে مُنَزَّلٌ مِّنَ اللّٰه (আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিল হইবার সত্যতা স্বীকার করিয়াছে– আজ হইতে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বে ইহাও ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল যে, য়াহূদীরা ইহাতে বিকৃতি (تحريف) সাধন করিয়াছে এবং কতকাংশ নিজেরাই রচনা করিয়া ইহার পরিবর্ধন ঘটাইয়াছে। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, এখন য়াহূদী ও খৃস্টান বিশেষজ্ঞগণ তাহাদের গবেষণার ভিত্তিতে এই কুরআনী দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তদুপরি তাহাদের অনেকেই আজ সুদৃঢ়ভাবে ইহার ওয়াহয়ি হওয়াকেই অস্বীকার করিয়াছেন, তাওরাতকে শব্দগত ও তাৎপর্যগতভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত ওয়াহয়ি হিসাবে স্বীকৃতি দান তো দূরের কথা, এখন প্রশ্ন যে, য়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এই 'আকীদা-বিশ্বাস কিভাবে প্রচলিত ছিল যে, তাওরাত শব্দগত ও তাৎপর্যগতভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত ওয়াহয়ি (এবং তাহাদের এই 'আকীদা-বিশ্বাস ঠিক সেই 'আকীদা-বিশ্বাসেরই অনুরূপ যাহা কুরআন কারীমের আলোকে খোদ কুরআন কারীম কিংবা অপর কোন ইলহামী (ঐশী) গ্রন্থ সম্পর্কে মুসলমানদের হইতে পারে। কেননা মুসলমানদের নিকট ইহা অকল্পনীয় যে, আল্লাহ্‌র দীনের বুনিয়াদ কোনও মনুষ্য রচনার উপর স্থাপন করা হইবে)। এই অভিমত সমীচীন মনে হয় যে, যদিও আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অবতারিত আসল সাহীফাসমূহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি সেই বিশ্বাস যাহা কোন এক সময় বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা অবশিষ্ট থাকিয়া গিয়াছে। আধুনিক য়াহূদী ও খৃস্টান বিশেষজ্ঞগণ এতদসম্পর্কে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন যে, বাইবেল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত হউক কিংবা উহা মনুষ্য রচনা হউক, ইহাতে কিছু যায় আসে না। আমরা বরং দেখিয়াছি যে, তাঁহারা উল্লিখিত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে কতক লোকের সংকীর্ণ দৃষ্টি ইহা দেখিতে অক্ষম যে, যেইখানে তাওরাতে মনুষ্য হস্তলিখিত রচনা বিদ্যমান সেইখানে উহাতে আজও ওয়াহয়ি ইলাহীর উজ্জ্বল দ্যুতির ঝলক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সত্যতা সমর্থন ও কতক বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত বর্ণনার সংশোধন কুরআন কারীম করে।

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ .

"তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করিয়াছি ইহার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে" (৫ ঃ ৪৮)।

অধিকন্তু আরও বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

"বনী ইসরাঈল যেই সমস্ত বিষয়ে মতভেদ করে, এই কুরআন তাহার অধিকাংশ তাহাদের নিকট বিবৃত করে" (২৭ ঃ ৭৬)।

অনন্তর আমরা দেখিতেছি যে, তাওরাতে যেই সমস্ত ভুল ও অসত্য বর্ণনা প্রবেশ করিয়াছে কুরআন তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছে। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম ('আ) সম্পর্কে যেই সমস্ত অশোভন কথিত কাহিনী বর্তমান তাওরাতে লিখিত [এইগুলির অধিকাংশই এমন যেই সমস্ত কথা মুখে উচ্চারণ করাকেও একজন মুসলমান অরুচিকর মনে করেন। উদাহরণ হিসাবে দ্র. যাত্রাপুস্তক ৩২ [হারূন ('আ) সম্পর্কে)]; শমূয়েল ২য় ১১ ঃ ২-১৩ [হযরত দাউদ ('আ) সম্পর্কে)]; রাজাবলি ১ম, ১১ ঃ ৪ (হযরত সুলায়মান সম্পর্কে); আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ৩১-৩৪ (হযরত লূত ('আ) সম্পর্কে) প্রভৃতি]। কুরআন মাজীদ ঐ সমস্ত অপরাধ হইতে আম্বিয়ায়ে কিরাম ('আ)-কে মুক্ত ও পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং তাঁহাদের মর্যাদা ও সঠিক অবস্থান সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে পুনর্বার অবহিত করিয়াছে। এই বিষয়টিও কুরআন মাজীদের বিরাট মহত্ত্ব প্রমাণ করে যে, যখন এই পবিত্র গ্রন্থ ও ঐ সমস্ত নবীর নাম উচ্চারণকারীরাই সঠিক অর্থে ঐ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের ('আ) নবুওয়াত অস্বীকার করিয়াছে এবং এই গ্রন্থকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিল হইবার অবস্থানগত মর্যাদা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তখন কুরআন কারীম ঐ সকল নবীর সত্যতা সমর্থন করিয়াছে এবং ইহার সত্যতা সমর্থনকে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ঈমানের অঙ্গে পরিণত করিয়াছে।

আল-কুরআনের আয়াত وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ হইতে ইহা অনিবার্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, মূল গ্রন্থের কিছু অংশ সংরক্ষিত ছিল ও আছে। কুরআন কারীম স্বীকার করিয়াছে যে, ইসলামের আবির্ভাবের সময় য়াহূদীদের কাছে তাওরাত বিদ্যমান ছিল।

وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰه .

"তাহারা তোমার উপর কিরূপে বিচারভার ন্যস্ত করিবে যখন তাহাদের নিকট রহিয়াছে তাওরাত, যাহাতে আল্লাহ্‌র আদেশ আছে" (৫ ঃ ৪৩)?

এবং এতদসঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিয়াছে যে, সমগ্র নহে, বরং ইহার একটি অংশ সংরক্ষিত রহিয়া গিয়াছে।

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰه .

"আমি নাযিল করিয়াছিলাম তাওরাত; উহাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ যাহারা আল্লাহ্‌র অনুগত ছিল তাহারা য়াহূদীদিগকে তদনুসারে বিধান দিত, আরও বিধান দিত রাব্বানীগণ ও বিদ্বানগণ; কারণ তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাবের রক্ষক করা হইয়াছিল" (৫ঃ৪৪)।

(ইহা প্রতীয়মান হয় যে, হিজায-এর য়াহূদী পণ্ডিতবর্গের নিকট তাওরাত সেই সময় এক স্বতন্ত্র সংকলনের আকারে বিদ্যমান ছিল)। ফলে কুরআন কারীমের সিদ্ধান্ত এই যে, তাওরাতে যেই ঐশী বিধানসমূহ ছিল আল্লাহ্‌ সেইগুলির রক্ষক বানাইয়া দিয়াছেন কুরআন কারীমকে (مهيمنا عليه)। অপর সিদ্ধান্ত হইল, আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত কুরআন কারীমের পর আর কোনও গ্রন্থ হিদায়াতের উৎস হইতে পারে না- وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً "এবং যাহার পূর্ব-সাক্ষী মূসার কিতাব, আদর্শ ও অনুগ্রহস্বরূপ" (১১ ঃ ১৭; ৪৬ ঃ ১২)। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, যখন কোনও বস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা ফুরাইয়া যায় তখন উহা ধ্বংস হইয়া যায়। মানব জাতির জন্য যাহা উপকারী ও কল্যাণকর হয় উহা স্থায়ী হইয়া থাকে وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ "এবং যাহা মানুষের উপকারে আসে তাহা পৃথিবীতে থাকিয়া যায়" (১৩ ঃ ১৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The Encyclopaedia Britannica, Bible, Jews প্রভৃতি শিরো.; (২) The Encyclopaedia Americana, উল্লিখিত শিরো. ছাড়াও দ্র. Massorah; (৩) An Encyclopaedia of Word History (Harrap), Palestine শিরো.; (৪) Chambers's Encyclopaedia, Bible শিরো.; (৫) H. H. Rowley, The Growth of the Old Testament, লণ্ডন ১৯৫৩ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, The Old Testament and Modern Study, অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ.; (৭) J. A. Bewer, The Literature of the Old Testament, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৩ খৃ. ; (৮) Rev. Cohu, The Old Testament in the Light of Modern Research, অক্সফোর্ড, লণ্ডন ১৯০৮ খৃ.; (৯) H. W. Robinson, Record and Revelation, অক্সফোর্ড ১৯৫১ খৃ.; (১০) The Bible Today, লণ্ডন ১৯৫৫ খৃ.; (১১) Emil G. Kraeling, The Old Testament since the Reformation, লণ্ডন ১৯৫৫ খৃ.; (১২) Robinson, Bible in its Ancient and English Versions; (১৩) Alfred Laisy, The Origins of New Testament (Chap. Bible as a supernatural Book); (১৪) Prefaces to O.T. and N.T. (Revised Standard Version), Thomas Nelson & Sons, এডিনবরা ও লণ্ডন; (১৫) Katie Magnus, Outlines of Jewish History, লণ্ডন ১৯২৪ খৃ.; (১৬) Cecil Roth, Short History of the Jewish People, লণ্ডন ১৯৩৬ খৃ.; (১৭) James Hosmer, The Jews ঃ Ancient, Mediaeval and Modern, লণ্ডন ১৯১৭ খৃ.; [(১৮) The Bible in India (Louis Jacolliot-এর ফরাসী পুস্তকের তরজমা), এলাহাবাদ ১৯১৬ খৃ.; (১৯) Isaac Taylor, History of the Transmission of Ancient Books to Modern Times, লিভারপুল ১৮৭৯ খৃ.]।

'আবিদ আহমাদ 'আলী (দা. মা. ই.)/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

তাওরিয়া (توربة) ঃ আ. বক্তৃতায় দ্ব্যর্থবোধক শব্দ প্রযোগকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র (বাদী')-এর একটি ধরন বা রীতি, যাহা দ্বারা এমন এক শব্দ প্রয়োগকরণ বুঝায় যাহার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়, একটি অর্থ প্রধান ও সুস্পষ্ট, দ্বিতীয়টি অপ্রধান। এই জাতীয় দ্ব্যর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের নিকট মুখ্যত প্রধান অর্থ দ্বারা 'অপ্রধান অর্থকে অবগুণ্ঠিত করা হয়। তাওরিয়া-র অপর নাম ঈহাম (ايهام=মনোভাব গোপন করা)। কারণ এইভাবে শব্দ প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য হইল প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ অর্থ দ্বারা দূরবর্তী ও পরোক্ষ অর্থকে গোপন করা। কখনও বা ইহাকে ইব্‌হাম (ابهام)-ও (মুখোশ ধারণ বা অস্পষ্টকরণ) বলা হয়।

'তাওরিয়া' দ্বিবিধ ঃ (১) সর্বাংশে 'বিযুক্ত' যাহার উদ্দিষ্ট অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, উদাহরণস্বরূপ "পরম ক্ষমাশীল 'আরশের উপরে সমাসীন হইলেন" (ইসতাওয়া-استوای) [২০ ঃ ৪], এই স্থলে দূরবর্তী ও পরোক্ষ অর্থ হইল- "অধিকর্তা ও নিয়ন্ত্রক হওয়া"-উক্ত শব্দগুচ্ছের দ্বারা নিকটতম ও প্রত্যক্ষ সহজবোধ্য অর্থ, যথা 'বিশ্রাম গ্রহণ', 'প্রতিষ্ঠা লাভ', 'আসন গ্রহণ' প্রভৃতির মধ্যে কোন একটিকে যথার্থ অর্থ হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(২) যেই ক্ষেত্রে শব্দের সুস্পষ্ট অর্থকে গ্রহণ করা আংশিকভাবে সম্ভব হইতে পারে। যথা ঃ "এবং আমরা আসমানসমূহকে স্বীয় হস্ত দ্বারা নির্মাণ করিয়াছিলাম" (৫১ঃ৪৭)। শাব্দিক অর্থানুসারে "এবং আসমানসমূহ- যাহা আমরা স্বহস্তে নির্মাণ করিয়াছিলাম"-এই ক্ষেত্রে ইহাই সকলের নিকট প্রতিভাত হয় যে, 'হস্ত' এইখানে 'ক্ষমতা' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, যদিও 'হস্ত' শব্দকে 'নির্মাণ-এর অনুষঙ্গে প্রয়োগবশত প্রাথমিক ও সুস্পষ্ট অর্থ বুঝাইতেছে-"বাহুদ্বয়ের অগ্রভাগস্থ শরীরাংশ বিশেষ"।

পারস্য দেশীয় কবি-সাহিত্যিকগণকেও এই জাতীয় বাক্যালঙ্কার প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। সম্ভবত তাঁহারা আরবদের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফাখরুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার আর-রাযী, নিহায়াতু'ল-ঈজায ফী দিরায়াতি'ল-ই'জায, কায়রো ১৩১৭ হি., পৃ. ১১৩; (২) মুহাম্মাদ সিদকী হাসান খান বাহাদূর, গুসনু'ল বানি'ল- মুরিক বি-মুহাস্‌সিনাতি'ল-বায়ান, কনস্টান্টিনোপল ১২৯৬ হি., পৃ. ২৪; (৩) ইব্‌ন হিজ্জা আল-হামাবী, কাশফু'ল-লিছাম 'আন ওয়াজহি'ত- তাওরিয়া ওয়া'ল-ইসতিখদাম, বৈরূত ১৩১২ হি.; (৪) আল-জুরজানী, তা'রীফাত, কনস্টান্টিনোপল ১৩০৭ হি., পৃ. ৪৯, দ্র. তাওরিয়া ও পৃ. ২৭, দ্র. আল-ঈহাম; (৫) S. de Sacy, Seances de Hariri, প্যারিস ১৮৪৭-১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৮৮; (৬) য়াহ্‌য়া ইব্‌ন হামযা ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-'আলাবী আল-য়ামানী, কিতাবু'ত-তিরায, কায়রো ১৩৩২ হি., ৩খ., ৬২; (৭) আবূ য়া'কূব য়ূসুফ আল-সাক্কাকী, মিফতাহুল-'উলূম, কায়রো ১৩১৮ হি., পৃ. ১৮০ ("আল-ঈহাম"); (৮) কাপাসিম বাখরজী, হিলয়াতু'ল-বাদী' ফী মাদহি'ন-নাবী আশ-শাফী', হালব ১২৯৩ হি., পৃ. ২১০ (তাওরিয়া, ঈহাম তাখয়ীল); (৯) 'আবদু'ল হামীদ কাদ্দাস ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আল-খাতীব, তালি' আস-সা'দ আর-রাফী' ফী শারহি'ন-নূরি'ল-বাদী' 'আলা নাজমি'ল- বাদী', কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৭৫; (১০) ইব্‌ন হিজ্জা আল-হামাবী, খিযানাতু'ল-আদাব, কায়রো ১৩০৪ হি., পৃ. ২৩৯ (ঈহাম, তাওজীহ, তাখয়ীর); (১১) 'আবদু'লগানী আন-নাবূলুসী, নাফাহাতু'ল আযহার 'আলা নাসামাতি'ল-আসহার, বূলাক ১২৯৯ হি., পৃ. ১৮৮; (১২) জালালু'দ-দীন আল-কাযবীনী আল-খাতীব, তালখীসু'ল-মিফতাহ (টীকাসহ

'আবদু'র রাহমান আল-বারকূকী), কায়রো ১৩২২/১৯০৪, পৃ. ৩৫৫; (১৩) সা'দ আত-তাফতাযানী, মুখতাসারু'ল মা'আনী, কনস্টান্টিনোপল ১৩১৮ হি., পৃ. ১৮০; (১৪) ঐ লেখক, আল-মুতাওয়াল, কনস্টান্টিনোপল ১৩০৪ হি., পৃ. ৪২৫; (১৫) তাশকোপরূযাদে, মিফতাহু'স- সা'আদাত, হায়দরাবাদ ১৩২৯ হি., ২খ, ৩৩৪; (১৬) 'আবদু'ল হাদী নাজাহ আল-আবয়ারী, সু'উতু'ল-মাতালি', বুলাক ১২৮৩ হি., ১খ., ৩১৫।

নমুনা ও উদাহরণের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (১) সাদু'দ-দীন আত-তাফতাযানী, মুখতাসার 'আলা তালখীসি'ল-মিফতাহ; (২) ইব্ন য়া'কূব আল-মাগরিবী, মাওয়াহিবু'ল-ফাত্তাহ ফীশারহ তালখীসি'ল-মিফতাহ; (৩) বাহাউ'দ-দীন আস্-সুবকী, 'আরূসু'ল-আফরাহ ফী শারহি'ত-তাখলীসি'ল-মিফতাহ ও পার্শ্বটীকা দ্র.; (৪) আল-খাতীব আল-কাযবীনী, আল-ঈদাহ; (৫) আদ-দাসূকী, হাশিয়া 'আলা মুখতাসারিত তাফতাযানী, বূলাক ১৩১৭ হি., ৪খ, ৩২২; (৬) শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স আর-রাযী, আল-মু'জাম ফী মা'আয়ির আশ'আরি'ল- 'আজাম, লাইডেন ১৩২৭/১৯০৯, পৃ. ৩২৬ (ঈহাম); (৭) Garcin de Tassy, Rhetorique et prosodie des langues de l'Orient musulman, প্যারিস ১৮৭৩ খৃ., পৃ. ৯০।

Moh. Ben Cheneb (E.I.^{2})/ মুহাম্মদ শওকত আলী

তাওহীদ (توحيد) ঃ (১) 'আরবী শব্দ, শব্দমূল و-ح-د-এর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। (مصدر) উহার আভিধানিক অর্থ ঃ "একত্ববাদ" অথবা 'একত্বের প্রমাণ' (Lane, পৃ. ২৯২৭ ক)। এইজন্য মুতাকাল্লিমূনের পরিভাষায় আল্লাহ্র "ওয়াহ্দানিয়্যাত অথবা তাওয়াহ্হুদ" অর্থাৎ আল্লাহ্র একত্ব বুঝাইতে এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয় (এই শব্দটির সকল অর্থে)। এই শব্দমূল ও ধাতুমূল কুরআন মাজীদে আসে নাই; এমন কি ইহার নিকটবর্তী ধাতুমূল "ا-ح-ا" হইতেও কোন ক্রিয়া আসে নাই, কিন্তু "লিসান"-এ (৪ ঃ ৪৬৪, পংক্তি ১৬, পৃ. ৪৬৫, পংক্তি ৪ হইতে পৃষ্ঠার শেষ পর্যন্ত) ইহার উপর বিস্তারিত ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে উভয় ধাতুমূল হইতে উৎসারিত শব্দরূপের ব্যবহারের অনেক নিয়ম-কানূন, যাহা আল্লাহ্ তা'আলা ও মানব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। 'ইল্মুত তাওহীদ ওয়াস-সিফাত' পারিভাষিক দিক হইতে 'ইলমুল কালামের সমার্থক [দ্র. শিরো. 'কালাম] এবং সম্পূর্ণ ইসলামী 'আকা'ইদশাস্ত্রের ভিত্তি ('আকা'ইদু'ন-নাসাফী গ্রন্থে তাফ্তাযানী-র ভূমিকা, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৪ প. এবং গ্রন্থের পাদটীকা; তাহানাবী, "কাশ্শাফ", ২২)। এই তাওহীদের আলোচনায় মু'তাযিলা ফিরকা গুণাবলীকে বাদ দিয়া কেবল তাওহীদকে আকা'ইদের ভিত্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু "তাওহীদ" বিস্তৃত ধারণা হইতে যথাসম্ভব অনেক দূরে। ইহা বাহ্যিক ও প্রকাশ্যও হইতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ ও গোপনীয়ও হইতে পারে। ইহার দ্বারা এই অর্থও হয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছু 'ইবাদতের যোগ্য হইতে পারে না এবং আল্লাহ্র কোন অংশীদার নাই। ইহার অর্থ এমনও হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তাঁহার সত্তায় এক, একক এবং ইহার এই অর্থও হইতে পারে যে, আল্লাহ্ই একমাত্র অস্তিত্ববান ও প্রকৃত (সত্য), অবশিষ্ট সৃষ্টিকুলের প্রতিটি বস্তুর অস্তিত্ব ধারণাযোগ্য। অতঃপর এই তাওহীদ (একক) পর্যন্ত জ্ঞানের (ও দূরদৃষ্টির) মাধ্যমে অথবা মা'রিফাত ও মুশাহাদার মাধ্যমে পৌঁছান সম্ভব। এই মা'রিফাত ও মুশাহাদাও অভিনিবিষ্ট ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে হইতে পারে অথবা দার্শনিক গূঢ় চিন্তা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেও হইতে পারে। মোটকথা, তাওহীদের সহজ-সরল অর্থ এই হইতে পারে যে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।" জ্ঞানের এই উত্তরণ ও উন্নয়নের উপর তাহানাবী, কাশ্শাফ, পৃ. ১৪৬৮-১৪৭০-এ মনোজ্ঞ আলোচনা করা হইয়াছে (তু. পৃ. ১৪৬৩-১৪৬৮)।

D. B. Macdonald (দা. মা. ই)/সিরাজ উদ্দিন আহ্মাদ

আত-তাওহীদ, 'ইলম ঃ (২) ইহার উৎস, ইহার উন্নতি এবং ইহার সম্পর্কে ধর্মীয় 'আলিমগণের মতামত।

ভূমিকা ঃ (১) তাওহীদের অর্থ আল্লাহ্কে এক মান্য করা, তাঁহার উপর ঈমান আনা, বিশ্বাস স্থাপন করা। তাওহীদ শব্দটির ক্রিয়ারূপ احد (وحد-শিরো-, লিসান) احدت الله، وحدته، وهو الواحد الاحد، وحد ও [অর্থাৎ আমি আল্লাহ্কে এক মানিয়াছি এবং আল্লাহ্ এক ও একক]। তাওহীদের প্রকৃত দাবি এই যে, আল্লাহ্র সত্তায় ও গুণাবলীতে কাহাকেও অংশীদার মান্য না করা [অর্থাৎ এই বিশ্বাস মনে পোষণ করা যে, প্রভু হওয়ায় এবং প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহে তাঁহার (আল্লাহ্র) কোন অংশীদার নাই] (তাফতাযানী, "আল-মাকাসিদ", আস্তানা সংস্করণ, ২খ, ৪৭)। ইব্ন খালদূন-এর মতে (মুকাদ্দিমা মাতবা'তাতু'ত-তাকাদ্দুম সংস্করণ, মিসর ১৩২২ হি., ৩৬৫-৩৬৬) এবং এই মত সঠিক, তাওহীদ সম্পর্কে কেবল বিশ্বাস অথবা সত্যায়ন যথেষ্ট নহে। পরিপূর্ণ তাওহীদ এই যে, অন্তরে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হইবে, যদ্দ্বারা সে অবলীলায় আল্লাহ্কে তাঁহার সত্তা, গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডে একক মনে করিবে। তাহানাবী [২খ, পৃ. ১৪৬৮ প.] যাহা বলিয়াছেন, তাহাও এই বক্তব্যের কাছাকাছি। তিনি বলেন, তাওহীদের কতিপয় স্তর রহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে জ্ঞানের স্তর অন্যতম যাহা দলীল-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। এই স্তরে চিন্তাবিদগণ আল্লাহ্প্রদত্ত জ্ঞান সাধনা দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা উপনীত হইতে পারেন। অপর একটি স্তর হইল প্রকৃত স্তর, যাহা ধর্মীয় ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে জ্ঞান বিলুপ্তির সৃষ্টি হয়। এইভাবে কোন ব্যক্তি তাহার আগ্রহ ও মুশাহাদার দ্বারা তাওহীদকে অর্জন করেন (অর্থাৎ আল্লাহ্ তাহার সত্তায়, গুণাবলীতে ও কর্মকাণ্ডে একক) এবং সেই ব্যক্তির এই কথার উপর বিশ্বাস অর্জিত হইয়া যায় যে, আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও কর্মকাণ্ডের সম্মুখে সকল সত্তা, সকল গুণ ও কর্মকাণ্ড মূল্যহীন এবং আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ইত্যাদির মুকাবিলায় সকল পার্থিব সত্তার কোন অস্তিত্বই নাই। মুশাহাদাকৃত ব্যক্তির যে বিশ্বাস অর্জিত হয়, তাহা আর কেহই অর্জন করিতে পারে না।

(২) মুসলিমগণের মধ্যে তাওহীদের আলোচনালব্ধ জ্ঞান সর্বজনবিদিত হওয়ার কারণ এই যে, তাওহীদ ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহের এমন এক জ্ঞান, যাহা প্রকৃত প্রমাণাদির দ্বারা অর্জন করা যায়। ইব্ন খালদূন [মুকাদ্দিমা, ৩৬৩] তাওহীদের সংজ্ঞা এইভাবে প্রদান করেন যে, তাওহীদ এমন এক জ্ঞান যাহার মধ্যে ঈমানের সঠিক বিশ্বাসসমূহকে জ্ঞানলব্ধ প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং ইহার দ্বারা বিদ'আতপন্থীদের কথাবার্তাকে (যাহারা সালাফ সালিহীন ও আহ্লুস-সুন্নাত-এর বিশ্বাসসমূহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে) বাতিল করা যায়। যাহা হউক, 'আলিমগণ তাওহীদের যে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন, ঐসব কিছুর সংক্ষিপ্তসার এই যে, তাওহীদ এমন এক জ্ঞান, যাহার মধ্যে মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়; রাসূলগণের ও তাঁহাদের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়; পরকাল ও উহার অবস্থাসমূহ সম্পর্কে অন্বেষণ করা হয় এবং পরিশেষে এমন সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়, যাহা তাওহীদের আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন ইসলামে নেতৃত্বের (ইমামাত) প্রশ্ন।

(৩) 'ইল্‌মুত-তাওহীদের একাধিক নাম রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতিপয় নাম এই ঃ (১) উস্‌'লুদ-দীন; (২) আল-ফিক্‌হু'ল-আকবার, এই নাম ইমাম আবূ হানীফা (র) প্রদান করিয়াছেন; (৩) 'ইল্‌মুন-নাজর ওয়াল-ইস্‌তিদ্‌লাল ও (৪) 'ইল্‌মুল- কালাম-জুরজানী, আত-তা'রীফাত, আল্‌-আস্তানা সংস্করণ ১৩২৭ হি., ১২৪; তাফতাযানী, আল-মাকাসিদ, ১খ, ৪; কিন্তু ইহাদের মধ্যে অধিক বিখ্যাত নাম হইল (৫) 'ইল্‌মুত-তাওহীদ; কেননা আল্লাহ্‌র একত্ব পর্যন্ত পৌঁছা এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ পর্যালোচনা ও উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম এবং (৬) 'ইল্‌মুল-কালাম এইজন্য যে, ইহার বিখ্যাত প্রশ্ন যাহাতে মতানৈক্য হয়, তাহা হইল আল্লাহ্‌র কালাম। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে অনেক হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হয় অথবা এই কারণে যে, ইহা শারী'আত সম্পর্কে বিতর্কে দক্ষতা সৃষ্টি করে, যেন দর্শনশাস্ত্র যুক্তিবিদ্যায় দক্ষতা সৃষ্টি করে। 'ইল্‌মু'ল-কালামের নাম এইজন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, যেন যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে ইহার পার্থক্য পরিষ্কার হইয়া যায় অথবা এইজন্য যে, ইহাতে সঠিক 'আকা'ইদ ও বিদ'আত সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা হইয়া থাকে এবং ইহার মধ্যে আলোচনার বিষয় হইল কালাম, কর্ম নহে (তাহানাবী, কলিকাতা সংস্করণ, ১খ, ২৪; আল-মাকাসিদ ১খ, ৫ ; ইব্‌ন খালদূন, ৩৬৮)।

(৪) যদিও পরবর্তী কালের গ্রন্থকারগণ তাওহীদশাস্ত্রের বিষয়সমূহ দর্শনশাস্ত্রের অধিবিদ্যার বিষয়সমূহের সঙ্গে এমনভাবে মিলিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, এই উভয় শাস্ত্রকে একটি শাস্ত্র বলিয়া মনে হয়। নিম্নে ইহা আলোচনা করা হইয়াছে। কালামশাস্ত্র ও অধিবিদ্যার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে; কেননা অধিবিদ্যার জ্ঞান তাহার বিশেষ আলোকে বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করে এবং যেই বিষয় দলীলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে সঠিক বলিয়া মনে করে এবং ইহার কোনই পরওয়া করে না যে, শারী'আতে এই সম্পর্কে কি বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'ইলমুল কালামের আলোচনা-পর্যালোচনা ধর্মীয় 'আকীদাসম্বলিত। ঐ 'আকীদাসমূহকে প্রথমে শারী'আতের দৃষ্টিকোণ হইতে অবশ্য পালনীয় মনে করিয়া জ্ঞান এমন জ্ঞানোচিত দলীল-প্রমাণ নির্ধারণে ব্যাপৃত হয়, যাহা দ্বারা ঐ শারী'আতের 'আকীদাসমূহের সহায়ক হয় অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যাহা অকৃত্রিমভাবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে তাহাই শারী'আত। "দার্শনিক প্রথমে যুক্তি খোঁজে, অতঃপর বিশ্বাস স্থাপন করে, পক্ষান্তরে মুতাকাল্লিম প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর যুক্তি খোঁজে" এবং এই উভয় মতবাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান (আল-মাকাসিদ, ১খ, ৯; ইব্‌ন খালদূন, ৩৯২; তাহানাবী, ১খ, ২৮)।

(৫) এই শাস্ত্রের স্বাভাবিক দাবি এই যে, ইহার সঙ্গে ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ভিন্নতা থাকিবে। তাহার পরেও যেমন খাওয়ারিযমী বলেন, ঐ বিতর্কিত প্রশ্নসমূহকে ১২টি মৌলিক প্রশ্নের অধীনে একত্র করা যাইতে পারে। প্রশ্নসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ (ক) শরীরসমূহ সৃষ্ট (৩১৮)। ইহার দ্বারা নাস্তিকদের প্রতিরোধ করা উদ্দেশ্য, যাহারা সময়কে চিরন্তন মনে করে। (খ) সৃষ্টিজগতের একজন স্রষ্টা আছেন এবং তিনি আল্লাহ্‌। (গ) আল্লাহ্‌ এক। ইহার দ্বারা দুই অথবা তিন খোদার প্রবক্তা অগ্নি উপাসক, যিনদীক; খৃস্টানদের ধর্মসমূহ অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করা উদ্দেশ্য। (ঘ) আল্লাহ্‌র উদাহরণযুক্ত আল্লাহ্‌র মত কোন বস্তু নাই। ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌কে যাহারা কোন সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে তুলনা অর্থাৎ তাশবীহ্‌ দ্র.] দেয় এবং যাহারা বলে যে, আল্লাহর শারীরিক অবয়ব আছে, সেইসব লোকের এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদকে অগ্রাহ্য করা উদ্দেশ্য। (ঙ) আল্লাহ্‌র দীদার অর্থাৎ পরকালে মু'মিন বান্দাগণ আল্লাহ্‌কে যে চর্মচক্ষে দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন এবং এই দীদারের সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার আলোচনা। (চ) আল্লাহ্‌র গুণাবলীর আলোচনা ও আল্লাহ'র গুণাবলী অস্বীকারকারী 'মু'আত্‌তিলা' সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ করা। (ছ) মানুষের কর্ম সম্পর্কে আলোচনা, মানুষ স্বয়ং তাহার কর্ম সৃষ্টি করিতে পারে না আল্লাহ তাহার কর্মেরও স্রষ্টা। (জ) আল্লাহ্‌ কি মন্দের অস্তিত্ব চাহেন, না চাহেন না? (ঝ) কবীরা গুনাহ্‌কারীদের সম্পর্কে কি নির্দেশ এবং তাহার ঈমান, তাহার শাস্তি এবং প্রকৃতপক্ষে কি প্রভাব পড়ে? (ঞ) সাধারণভাবে নবূওয়াতের যৌক্তিকতা প্রদর্শন, যাহাতে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি নবূওয়াত অমান্যকারীদের প্রতিরোধ করা যায়। (ট) বিশেষ করিয়া হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবূওয়াতের প্রমাণ ও তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন, (ঠ) নেতৃত্বের (ইমামাতের) প্রশ্ন এবং নেতৃত্বের জন্য যোগ্য কে? খাওয়ারিযমীর মতে এই ১২টি বিষয় ধর্মের মৌলিক বিষয়। এই বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করিয়া মুতাকাল্লিমূন-এর সকল আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিতর্ক আবর্তিত হয়। এইগুলি ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে, সব কিছুই ইহাদের শাখা-প্রশাখা, অবতরণিকা ও ভূমিকা (মাফাতীহু'ল-'উলূম, লাইডেন হইতে প্রকাশিত, ৩৯-৪১)।

(৬) উপরোল্লিখিত প্রশ্নসমূহের মধ্যে অধিকাংশের উপর বিতর্ক হওয়ার কারণে ইসলামে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি, কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে এইসব দল-উপদলের বিতর্কের উল্লেখ রহিয়াছে। এই দল-উপদলের সংখ্যা অনেক। ইহাদের মধ্য হইতে কতক কখনও একই শিরোনামের আওতায় একত্র হইয়া যায়, আবার কখনও ইহাদের পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হয়। কখনও অনেক দল একত্র হইয়া একই নামের অধীনে মিলিত হয়। এমতাবস্থায় ঐ সব দলের সংখ্যা ছয়টিতে সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে ঃ (১) আহ্‌লু'স-সুন্নাহ, (২) মুশাব্বিহা, মুজাস্‌সিমা, (৩) মু'তাযিলা, (৪) মুরজিয়া, (৫) খাওয়ারিজ, (৬) শী'আ। উপরোক্ত ফিরকার শাখা-প্রশাখার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান ঃ (১) শাহ্‌রাস্তানী, কিতাবু'ল- মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, (২) ইব্‌ন হাযম, আল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, (৩) আল আশ'আরী, মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, (৪) খাওয়ারিযমী, মাফাতীহু'ল-উলূম (উ. সংস্করণ, ২৪ প.)। (ইসফারাইনী, আত-তাবসীর, ১৫-১৬ ও ইব্‌ন হাযম, আল-ফিসাল, ২খ, ১১১-এ মূল দল ছয়টির স্থলে পাঁচটির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু আমরা খাওযারিযমীর অনুসরণ করিয়া 'আল-মুশাব্বিহাত'কে যুক্ত করিয়াছি। কেননা এই দলটি আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে স্বতন্ত্র মত পোষণ করে)।

এই শাস্ত্রের বিকাশ ঃ এই শাস্ত্রের পরিধি অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় প্রথমে সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা বিকাশ ও উন্নয়নের ধারা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হইতে থাকে। বস্তুত এই শাস্ত্রের বিকাশ ও উন্নতি বিভিন্ন কারণ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পূর্ণতার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। কারণসমূহের মধ্যে কতক পবিত্র কুরআন ও হাদীছের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কতক ঐ সকল নব্য মুসলিমের পরস্পরের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতিতে পরস্পর ভিন্ন ছিল এবং কতক গ্রীক ও অ-গ্রীক দর্শন আরবী ভাষায় অনূদিত হওয়ার কারণে বিকশিত হয়।

(১) কুরআন ঃ ইহা ইসলামের মূল গ্রন্থ। এই গ্রন্থ মানুষকে গভীর চিন্তা, ধ্যান ও উপলব্ধি করার জন্য আহ্বান জানায়। এইজন্য মুসলিমদের এই পবিত্র কুরআন উপলব্ধি করিতে তাহাদের জ্ঞান ও মতামত সাপেক্ষে কর্ম সাধন করা অপরিহার্য ছিল এবং অনুরূপভাবে সুন্নাতকেও, যাহা এই কুরআনেরই ভাষ্য। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্‌ (স) জীবিত ছিলেন, ততদিন কুরআন উপলব্ধি করিতে তাঁহাদের গভীর চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হইত না। কেননা যখন তাঁহারা কোন বিষয়

বুঝিতে পারিতেন না, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সমাধান করিয়া নিতেন। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর তিরোধানের পর হযরত 'উছমান ও হযরত 'আলী (রা)-র খিলাফাতকালে ফিত্নার এবং পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর হযরত আলী ও হযরত মু'আবিয়া (রা)-র যামানায় মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে বহু লোক হতাহত হয়। এই সময় গুনাহকারী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়, উহা কি এবং এই হত্যাকারী মু'মিন না কাফির? ফলে ঈমানের অর্থ ও ব্যাখ্যায় মতানৈক্য দেখা দেয়। এই মতানৈক্যের কারণে খাওয়ারিজ ও মুরজি'আ এবং পরবর্তী কালে মু'তাযিলাবাদের সৃষ্টি হয়। এই মতানৈক্য, যাহা প্রথমে রাজনৈতিক আকারে ছিল, পরিশেষে তাহা ধর্মীয় মতানৈক্যে পরিণত হয় এবং কালামশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নরূপে পরিদৃষ্ট হয়। অনুরূপভাবে ইমামাতের প্রশ্নটিও কালামশাস্ত্রের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। যদিও এই আলোচনা কালামশাস্ত্রের নহে, ফিক্হশাস্ত্রেরই অধিক উপযোগী ছিল। কেননা ইহার সম্পর্ক কর্মের সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে নহে। এই সম্পর্কে অধিক এতটুকু বলা যায় যে, ইমামাতের প্রশ্নের সম্পর্ক রাজনৈতিক কল্যাণের সঙ্গে [দ্র. শাহ্রাস্তানী, কিতাবু'ল- মিলাল, লন্ডন, পৃ. ১১৬] অর্থাৎ ইহার সম্পর্ক ঐ বিষয়ের সঙ্গে হওয়া উচিত যে, মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের উত্তম ব্যবস্থাপনা কে করিতে পারে। ইহার এই বিশ্বাসের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই যে, ইহাকে ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহের কোন একটি বিষয় হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু যখন ইমামী, রাফিদী ও খারিজীগণ এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিল এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই সম্পর্কে এমন মতবাদ প্রচার করে, যাহা অনুসরণ করিলে ইসলামের অনেক ভিত্তিমূলক মৌলিক বিষয় অস্বীকার করা হয়, তখন মুতাকাল্লিমগণ এই ইমামাতের প্রশ্নটিকে কালামশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন, যাহাতে এই বিষয়ে ধীরস্থিরভাবে আলোচনা করিয়া সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করা যায় এবং ধর্মের সঠিক 'আকীদা সর্বকালের জন্য সংরক্ষিত হইয়া যায় ([তাফতাযানী] আল-মাকাসিদ, ২খ, ১৯৯-২০৫; ইব্ন খালদূন, ৩৬৮)।

(২) দেশ বিজয়ের পর যখন মুসলিমদের মধ্যে স্থায়িত্ব আসিল, বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের অনেকেই ইসলামে দীক্ষিত হইল, তখন মুসলিমগণ একদিকে কুরআন বুঝার জন্য এবং ইহার গূঢ় অর্থ বাহির করার কাজে গবেষণায় মগ্ন হইল এবং অপরদিকে নও-মুসলিমদের ধর্মীয় ভিত্তি সুদৃঢ় হয় নাই, কেহ কেহ তাহাদের নূতন ধর্মীয় বিশ্বাসকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল, কেননা ঐ ধর্ম তাহাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত ছিল। তাহারা পূর্বের ধর্মের সপক্ষে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং এই সম্পর্কে মুসলিমদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। এই মোক্ষম সুযোগে চিন্তাবিদগণ কুরআন মাজীদের "মুতাশাবিহ্" আয়াতসমূহের প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং এইগুলি সমাধান করার চেষ্টা করেন। প্রত্যেক চিন্তাবিদের প্রচেষ্টা এমন ছিল যে, তাঁহারা ঐ সকল আয়াতের অর্থ করিতে গিয়া যথেচ্ছ অর্থ করিতেন। কেহ কেহ শব্দসমূহের বাহ্যিক অর্থের প্রবক্তা হইয়া গেলেন এবং কেহ যেসব আয়াতে বাহ্যত আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীতে তাশবীহ্-র ধারণা হয় [দ্র. তাশ্বীহ], সেইসব আয়াতে আল্লাহকে পূত-পবিত্র প্রমাণ করার জন্য ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কেহ বলিলেন, বাহ্যিকভাবে আয়াতসমূহ যেমন আছে, সেইভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, তাঁহারা ঐ আয়াতসমূহের তাফসীর করিতে চাহেন না এবং ইহাদের অর্থের ব্যাখ্যাও করেন না। ঐ আয়াতসমূহের ব্যাপারে একদল মানুষের এইরূপ নিস্পৃহতার ফলে ইসলামে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়ঃ (১) মুশাব্বিহা ও মুজাস্সিমা ও (২) মু'তাযিলা-মু'আত্তিলা, ইহারা আল্লাহ্র গুণাবলী স্বীকার করিত এবং আল্লাহ্কে তাঁহার গুণ সম্পর্কে শ্রান্ত মনে করিত, যাহাতে তাঁহার সীমাহীন পবিত্রতা রক্ষিত হয়; (৩) সিফাতিয়া এবং ইঁহারা হইলেন জমহূর মুতাকাদ্দিমীন, তাঁহাদের মতবাদ উপরোক্ত দুই দলের মতবাদের মধ্যবর্তী পর্যায়ের (ইব্ন খালদূন, ৩৩৭; শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল (১), ১খ, ১১৬)।

অপরদিকে আমরা লক্ষ করি যে, যখন ধর্মদ্রোহীদের ঔদ্ধত্য প্রবল আকার ধারণ করে, যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ধর্মদ্রোহিতা প্রসারিত করা এবং দুই খোদার প্রবক্তা ও ইহাদের মত অন্যান্য পথভ্রষ্ট লোকের লিখিত গ্রন্থের আনুবাদ প্রচার করা। এমতাবস্থায় মুতাকাল্লিমগণের মধ্যে যাঁহারা ধর্মীয় তর্ক-বিতর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারা লেখনীর মাধ্যমে ধর্মদ্রোহীদের উপর লিখিত নিবন্ধসমূহের কড়া প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। এই প্রতিরোধ যুদ্ধের নিশানবাহী কতিপয় বিশিষ্ট মু'তাযিলাপন্থী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারা এই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে নিয়া পুস্তিকা ও গ্রন্থাবলী রচনা করেন, যেইগুলি তাঁহাদের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও উত্তম কর্মকাণ্ডের প্রমাণ; নিম্নে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

(৩) এই যুগসন্ধিক্ষণে একদিকে যখন বিভিন্ন মাযহাব, ধর্মীয় দল (ফিরকা) ও মতবাদ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল, অন্যদিকে মুতাকাল্লিমগণের ইমামগণ বিপথগামী মু'তাযিলাপন্থীদের প্রতিরোধে ব্যাপৃত ছিলেন–এই সময়ে আবুল-হাসান আল-আশ'আরী আহ্লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ফলে তিনি 'আশ'আরীয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন। আল-আশ'আরী-র আবির্ভাবকাল তৃতীয়/নবম ও চতুর্থ/দশম শতাব্দী। তিনি অনুভব করেন যে, মুতাকাল্লিমগণের মধ্যে অনেক প্রশ্নে মতানৈক্য বিদ্যমান, বিশেষত আল্লাহ তা'আলার "সিফাত-ই কালাম ও রু'ইয়াত-ই বারী" (আল্লাহ্র দীদার)-এর প্রশ্নে। তিনি লক্ষ করিলেন যে, ঐ প্রশ্নসমূহে যেসব দল ভিন্নমত পোষণ করে, তাহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব অভিমত সঠিক প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর। ফলে তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া এমন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন, যাহার উপর সকল উম্মত ঐক্যবদ্ধ হইয়া যায়। তিনি যে বিষয়ের জন্য সাধনা করেন আল্লাহ্ তাঁহাকে কৃতকার্য করিলেন এবং তাঁহার মাযহাব পরবর্তীকালে সত্যানুসারীদের অর্থাৎ আহ্লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতের মাযহাব হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

(৪) ইমাম আশ'আরীর মাযহাব মুসলিম জাহানে বিস্তার লাভ করে। তাঁহার মতবাদ মুতাকাল্লিমগণ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নির্দিষ্ট মতবাদের উপর গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিরোধ করেন। মু'তাযিলাগণ, নাস্তিক ও অন্যান্য বাতিল দলকে (দ্র. আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ২খ, ৯৩) প্রতিরোধ করার নিমিত্ত দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইজন্য আশাইরাদিগকেও দর্শনশাস্ত্রের দিকে মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ফলে তাওহীদশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে দর্শনশাস্ত্রের অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। তবে ইহা মনে করা সঠিক হইবে না যে, 'ইল্মু'ল-কালাম দর্শনশাস্ত্র হইতে উদ্ভূত, কেননা অনেক পূর্ব হইতেই ইসলামে ইল্মু'ল-কালামের চর্চা আরম্ভ

[(১) এই নিবন্ধে মূল নিবন্ধকার "আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল"-এর ঐ সংস্করণের উদ্ধৃতি দিয়াছেন, যে সংস্করণ ইব্ন হায্ম, "কিতাবু'ল-ফিসাল ফি'ল-মিলাল"-এর পার্শ্বটীকায় আল-মাত্বাআতু'ল-আদাবিয়্যা, মিসর ১৩১৬ হি. এ প্রকাশিত। অতিরিক্ত অংশেও পার্শ্বটীকায় লণ্ডন সংস্করণের উদ্ধৃতি রহিয়াছে]।

হইয়াছিল। তবে যখন মুসলিমগণ দর্শনশাস্ত্রকে আত্মস্থ করিয়া নেয়, তখন 'ইলমু'ল-কালাম-এর উপর ইহার গভীর প্রভাব পড়ে।

আশ'আরীর মতবাদকে যাহারা সহায়তা দান করিয়াছেন, ইহাকে মুসলিম বিশ্বে প্রসার দান করিয়াছেন, কাদী আবূ বাক্‌র আল-বাকিল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.) তাহাদের অন্যতম। তাঁহার রচনা আনুমানিক পঞ্চাশ সহস্র পৃষ্ঠা হইবে। ধর্মের সহায়তা এবং নাস্তিক ও বিদ'আতপন্থীদের প্রতিরোধকল্পে তিনি লেখনী ধারণ করেন। এইসব গ্রন্থ ইমাম আল-বাকিল্লানীকে অমর করিয়া রাখিয়াছে (আল-ইসফারা'ইনী, আত-তাবসীর ফি'দ্-দীন, প্রকাশক, 'ইয্‌যাত আল-'আততার আল-হুসায়নী, মিসর ১৯৪০ খৃ., পৃ. ১১৯)। আল-বাকিল্লানী আল-আশ'আরীর মতবাদকে বিশ্লেষণ করিয়া সুবিন্যস্ত করেন এবং এই শাস্ত্রের প্রশ্নাবলী ও উহার সমাধানের জ্ঞানভিত্তিক হেতুবাক্য (Premises) ও নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন, যে সকল নিয়মের উপর দলীল-প্রমাণের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করা যায়। যেমন একক পরমাণু ও শূন্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে; একটি আপতন অপর একটি আপতনের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না; একটি আপতন দুই সময়ে স্থির থাকিতে পারে না ইত্যাদি বিষয়ের উপর মুতাকাল্লিমগণের সকল প্রমাণ নির্ভরশীল। কিন্তু এই সকল নব উদ্ভাবন সত্ত্বেও 'তাহারা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর উপর বিশ্বাস রাখা এমন অপরিহার্য বলিয়া ঘোষণা করেন, যেমন, ঈমানী 'আকা'ইদের উপর বিশ্বাস করা অপরিহার্য এবং দলীল হিসাবে তাঁহারা বলেন, 'আকাইদের প্রমাণের দলীলসমূহ ঐ সব নিয়মের উপর নির্ভরশীল। "দলীল রহিত হওয়া, যে বিষয়ে দলীল উপস্থাপন করা হয় তাহা রহিত হওয়া বুঝায়। এইজন্য যখন দলীল রহিত হইবে, তখন 'আকা'ইদও রহিত হইবে" (ইব্‌ন খালদূন, ৩৬৯)। এইভাবে কাদী বাকিল্লানী ও তাঁহার সঙ্গিগণ জনসাধারণের জন্য ক্ষেত্র সংকুচিত করিয়া দেন। যেই পর্যন্ত দলীল ও নিয়মাবলী জ্ঞাত হওয়া না যায়, সেই পর্যন্ত তাহাদের স্বীয় ঈমান সম্পর্কে এবং সাহাবা ও সাধারণ মুসলিমদের ঈমান সম্পর্কে, যাহাদের এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান পূর্বে ছিল না, পরেও হয় নাই, এই সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত হইবে সেই সম্বন্ধে জ্ঞান বিচলিত (আশ-শায়খ হুসায়ন ওয়ালী, কিতাবু'ত-তাওহীদ, ১ম সংস্করণ, ১৯০৯ খৃ., ১খ, ৫৪)।

(৫) মুসলিম উম্মাহর সৌভাগ্য যে, বাকিল্লানীর পরে ইমামু'ল-হারামায়ন আবুল-মা'আলী আল-জুওয়ায়নী এবং তাঁহার চেয়েও অধিক খ্যাতিমান তাঁহার শাগরিদ হুজ্জাতু'ল ইসলাম আবূ হামিদ আল-গাযালী (র) জন্মলাভ করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের যুগে মাযহাবের ইমামরূপে স্বীকৃত হন। 'দলীল রহিত হওয়ার ফলে যেই বিষয়ের দলীল উপস্থাপন করা হয় তাহাও রহিত হয়', বাকিল্লানীর এই মতবাদের সঙ্গে পরবর্তী ইমামগণ একমত ছিলেন না। তাঁহাদের নীতি মানুষের উপর হইতে দলীল আহরণের সকল বাধ্যবাধকতা দূর করিয়া দেয়। এই পদ্ধতিকে পরবর্তীদের পদ্ধতি বলা হয়। কালামশাস্ত্রের শিক্ষাদীক্ষায় অদ্যাবধি ইহাকেই স্বীকৃত রীতি হিসাবে মান্য করা হয়।

এই পদ্ধতির মধ্যে এক বিশেষ বিষয় এই যে, যেইসব প্রশ্নে দার্শনিকগণ ধর্মের সঙ্গে দর্শনের বিরোধিতায় উপনীত হইয়াছেন, সেই বিরোধিতার প্রতিরোধকল্পে এই পদ্ধতি আলোচনা ও বিতর্কের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়াছে। তাওহীদশাস্ত্রের সঙ্গে দার্শনিক আলোচনা মিলিয়া যাওয়ার ইহাই কারণ। "শেষ যুগের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহকে দার্শনিক প্রশ্ন ও ইহাদের প্রতিরোধ আলোচনা দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন যে, কখনও কখনও তাহা সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে (বর্তমানে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় যেইসব গ্রন্থ রহিয়াছে, সেই গ্রন্থসমূহে এই বিষয়টি পরিদৃষ্ট হয়)। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, উভয় শাস্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য রচনা করা যায় না। একটির প্রশ্ন অপরটির সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, উহাদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন" (তু. ইব্‌ন খালদূন, ৩৬৯)। অথচ উভয় শাস্ত্র স্বীয় আলোচ্য বিষয় ও আলোচনা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিত পরস্পর ভিন্ন, যেমন আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি।

'আল্লামা ইব্‌ন খালদূন (দ্র. মুকাদ্দিমা, পৃ. ৩৬৯) এই মত ব্যক্ত করেন যে, ইমাম গাযালী প্রথম ব্যক্তি যিনি কালামশাস্ত্রে এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিকদেরকেও প্রতিরোধ করেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে ইব্‌ন খালদূনের এই মত সঠিক মনে হয় না। কেননা ইমামু'ল-হারামায়ন-এর কোন কোন রচনা, যেমন "আল-ইরশাদ ফী কাওয়া'ইদি'ল-'ই'তিকাদ" (দ্র. পাণ্ডুলিপি দারু'ল-কুতুব, মিসর, সংখ্যা ৮১৯, তাওহীদ) গ্রন্থ অধ্যয়নে জানা যায় যে, গাযালী (র) দার্শনিকদের প্রতিরোধ করার পদ্ধতি তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করেন। عالم শীর্ষক পরিচ্ছেদ (পূ. গ্র., পৃ. ৭) ও 'আল্লাহর জ্ঞানের প্রমাণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদ পর্যালোচনা করিলেই ইহার সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে এবং ইহা জ্ঞাত হওয়া সম্ভব হইবে যে, দার্শনিকদের প্রতিরোধ করার পদ্ধতি ইমাম গাযালী (র) তাঁহার শিক্ষকের নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় দার্শনিকদের মতবাদসমূহের প্রতিরোধে ইমাম গাযালী (র)-কে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় না (কিতাবু'ত-তাওহীদ, ৫৭)।

মুতাকাল্লিমগণের গুরুত্বপূর্ণ উপদলসমূহ ঃ আমরা দেখিয়াছি কিভাবে কালামশাস্ত্র অস্তিত্বে আসে এবং কিভাবে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করিয়া বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়। এখন আমরা নিম্নে কালামশাস্ত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট উপদলসমূহের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করিব ঃ (১) কুরআন মাজীদে এমন কতকগুলি আয়াত আছে যদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার 'চেহারা', 'হাত' ও 'শরীর' রহিয়াছে এবং তিনি কথাবার্তা বলেন এবং চলাফেরা করেন বলিয়া মনে হয়। কতক আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তা'আলাকে কোন চক্ষু দেখিতে সক্ষম হইবে না, আবার কতক আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ্‌কে দেখা সম্ভব। এই সম্পর্কে ইব্‌ন খালদূন বলেন, "যেই সব দলীল দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টি জগতের গুণাবলী হইতে পবিত্র মনে হয়, সেই সকল দলীলকে অগ্রাধিকার দান করা হইয়াছে। কেননা এইসব দলীল অসংখ্য এবং ইহাদের অর্থও স্পষ্ট। ফলে তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ফেলেন যে, 'তাশবীহ' (দ্র.) অসম্ভব এবং ইহা যেহেতু মীমাংসিত বিষয়, "কুরআন মাজীদের সকল আয়াত আল্লাহ্‌র কালাম, ঐ সব আয়াতের উপর তাঁহারা বিশ্বাস করেন, ইহাদের অর্থ সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন নাই এবং ব্যাখ্যাও প্রদান করেন নাই" (দ্র. মুকাদ্দিমা ৩৬৭, তু. আল্-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ১খ, ১১৬-১১৭)। এই নীতি গ্রহণকারীদের মধ্যে ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (র) অন্যতম। ইমাম মালিক (র)-কে "اَلرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى" এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, استواى শব্দের অর্থ জানি, কিন্তু ইহার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান নাই। ইহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য এবং বুঝিবার চেষ্টা করা 'বিদ'আত' (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ১খ, ১১৮)।

পরবর্তী যুগে এমন বিদ'আতী দলও ছিল, যাহারা এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাহারা এই সমস্ত আয়াত ও হাদীছসমূহের বাহ্যিক অর্থ

প্রয়োগ করে এবং শব্দসমূহের আক্ষরিক তাফসীর করে, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করে না। সুতরাং ইহারা নিরেট তাশবীহ্ ও স্পষ্ট তাজসীম জড়িত করিয়া ফেলে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ এমন বিশ্বাস করিয়া বসে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাত, পা ও চেহারা ইত্যাদি রহিয়াছে। কেহ কেহ স্বীকার করিয়া নেয় যে, আল্লাহ একটি বিশেষ দিকে অবস্থান করেন, ঐ স্থান হইতে যখন চাহেন অবতরণ করেন। তাঁহার 'আরশ রহিয়াছে, এই 'আরশ-এর উপর তিনি স্থায়ী থাকেন। তিনি যেই কথা বলেন সেই কথার স্বর ও অক্ষর রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম দল আল্লাহ্র সত্তাকে অন্যদের সত্তার মত মনে করে এবং দ্বিতীয় দল আল্লাহ্র গুণাবলীকে অন্যদের গুণাবলীর মত অভিহিত করে। ফলে উভয় দল আল্লাহ্কে শারীরিক অবয়বযুক্ত অস্তিত্ব মনে করিতে থাকে (ইব্ন খালদূন, ৩৬৭-৩৬৮; আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ১খ, ১১৭)। এই মুশাব্বিহা-ই মুজাস্সিমাদের মধ্যে গোঁড়া হাম্বালীদের একটি দল ছিল যাহারা শব্দের বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করে। 'আল্লামা ইবনু'ল জাওযী তাঁহার "দাফ্'উ শুবুহাতি'ত-তাশ্বীহ" গ্রন্থে ঐ বাড়াবাড়িকারীদের মতামত অনেক বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে ছিলেন আল-হাসান ইব্ন হামিদ আল-বাগদাদী আল-ওয়াররাক', কাদী আবূ য়া'লা, আবুল-হাসান ইব্নু'য-যাগূনী প্রমুখ হাম্বালী ইমাম। ইব্নু'ল-জাওযী উল্লিখিত গ্রন্থে ঐ সব লোকের ব্যাপারে বলেন, আমাদের হাম্বালী মাযহাবের মধ্যে এমনও কতিপয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা ধর্মের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে অসঙ্গত কথাবার্তা উচ্চারণ করিয়া নিজেদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়াছেন। তাঁহারা আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত তাঁহার অবয়ব, চেহারা ও দুই চক্ষু, মুখ, অঙ্গুলীসমূহ, উরু, পায়ের গোছা এবং দুই পা আছে বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। 'আদুদ্'দ-দীন আল-ঈজী ইঁহাদের এই সব অশ্রাব্য কথাবার্তা উল্লেখ করিয়াছেন (আল-মাওয়াকিফ, মিসর ১৩৫৭ হি. পৃ. ২৭৩)।

(২) অস্পষ্ট আয়াত (متشابه) ও হাদীছসমূহের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারী তাশ্বীহ ও তাজসীমপন্থীরা মু'তাযিলাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'তাযিলাগণ আল্লাহ্র যাত-এর প্রতি এত অধিক জোর দেয় যে, তাহারা আল্লাহ্র গুণাবলীকে (صفات) সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বসে। মু'তাযিলাদের প্রধান ব্যক্তি ওয়াসিল ইব্নু 'আতা' (৮০/১৩১), এমন কি কোন কোন লেখক পুরা উপ-দলকেই অনেক সময় ওয়াসিলিয়্যা নামে অভিহিত করে (আশ-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ১খ, ৫৭)।

ওয়াসিল হাসান বাসরীর শাগরিদ ছিলেন। হাসান বাস্রী আহ্লু'স-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের ইমাম ছিলেন। একদিন হাসান বাস্রী (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, ঐসব দল সম্পর্কে আপনার কি অভিমত, যাহাদের মধ্যে একদল কবীরা গোনাহ্কারীদের কাফির বলে এবং অন্য দল তাহার উপর শাস্তি আরোপ মুলতবি রাখে। হাসান বাসরী (র) এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বেই ওয়াসিল ইব্ন 'আতা বলিয়া উঠেন, "আমি কবীরা গুনাহ্গারকে সম্পূর্ণ মু'মিন এবং সম্পূর্ণ কাফির বলি না, বরং সে উভয় স্থানের মধ্যবর্তী এক স্থানে [ফী মানযিলাতিন বায়না'ল-মানযিলাতায়ন]" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়া মসজিদের অন্য একটি স্তম্ভের নিকট বসিয়া তাঁহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। তখন হাসান বাসরী (র) বলিলেন, "ই'তিযালা 'আন্না ওয়াসিল"—ওয়াসিল আমাদের মধ্য হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে; ঐ সময় হইতে ওয়াসিল ও তাঁহার সঙ্গীদের নাম হইয়া গেল 'মু'তাযিলা' (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ৬০)। এই স্থানে আমাদের উদ্দেশ্য এই নহে যে, আমরা মু'তাযিলাদের নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করি। কারণ আমরা তাহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব না, কেবল এতটুকু বলিতে চাই যে, এক স্তম্ভ ত্যাগ করিয়া অপর স্তম্ভের দিকে চলিয়া যাওয়া বড় কথা নহে, বরং ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ে বিতর্কিত প্রশ্ন অর্থাৎ কবীরা গুনাহকারী সম্পর্কে যে অভিমত প্রচলিত ছিল, ওয়াসিল ইব্ন 'আতা' সেই অভিমতকে পরিত্যাগ করিয়া নিজস্ব এক স্বতন্ত্র অভিমত প্রতিষ্ঠা করেন।

মু'তাযিলাগণ মূলত দুই শাখায় বিভক্ত ঃ বসরার শাখা, ওয়াসিল এই শাখার ভিত্তি স্থাপক, মাস'ঊদী তাঁহাকে 'শায়খুল মু'তাযিলা" বলেন (মুরূজু'য-যাহাব, দারু'র-রাজা' সংস্করণ, মিসর, ৪খ, ৫৪) এবং ইহাই প্রাচীনতম শাখা। দ্বিতীয়, কুফার শাখা, বিশ্র ইবনুল-মু'তামির এই শাখা প্রতিষ্ঠা করেন (মৃ. ২১০ হি.)। মু'তাযিলাদের অনেক উপদল রহিয়াছে। কিন্তু তাহারা সকলেই পাঁচটি মূল বিষয়ে একমত ঃ (১) তাওহীদ, (২) 'আদল, (৩) ওয়া'দ ওয়া ওয়া'ঈদ, (৪) আল-মানযিলাতু বায়না'ল-মানযিলাতায়ন [অর্থাৎ ঈমান ও কুফ্র-এর মধ্যবর্তী অবস্থান] ও (৫) আম্র বি'ল-মা'রূফ ওয়া নাহী 'আনি'ল-মুনকার। যেই দল এই পাঁচটি মৌলিক বিষয় না মানে সেই দল মু'তাযিলা পদবীর যোগ্য নহে (আবুল-হাসান আল-খায়্যাত আল-মু'তাযিলী, আল-ইনতিসার, Dr. Nyberg কর্তৃক প্রকাশিত এবং দারু'ল-কিতাব কর্তৃক মুদ্রিত, ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১২৬)। অনেক রচনাকারী ঐ মৌলিক বিষয়গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেন; তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ আল-খায়্যাত তাঁহার আল-ইন্তিসার গ্রন্থে, মাস'ঊদী তাঁহার 'মুরূজু'য-যাহব' (৩খ, পৃ. ১৫৩-১৫৪) গ্রন্থে, শাহরাস্তানী আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল গ্রন্থে (১খ, ৫১ প.) বিষয়গুলি আলোচনা করেন। তাঁহারা ব্যতীত আরও অনেক মুতাকাল্লিম এই সম্পর্কে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। এইজন্য এই নিবন্ধে ইহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিক কিছু লেখার প্রয়োজন নাই।

তাওহীদ সংক্রান্ত প্রথম মৌল বিষয় এই যে, তাহারা আল্লাহ্কে মানুষের গুণাবলী হইতে পবিত্র নিরূপণ করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক—উভয় প্রকার গুণাবলীকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ জ্ঞান, শক্তি, জীবন ও ইচ্ছা ইত্যাদি অনেক বিষয়কে চিরন্তন মানিতে হয় এবং বাহ্যিক অর্থাৎ শ্রবণ, দর্শন ও কালাম (কান, চক্ষু ও মুখ) ইত্যাদি শরীরের অপরিহার্য অঙ্গ (ইব্ন খালদূন, ৩৮৮; তাফতাযানী, মাকাসিদ, ২খ, ৫৪)। তাহারা আল্লাহ্র গুণাবলী অস্বীকার করিতে গিয়া এমনভাবে সীমালংঘন করে যে, তাহারা 'মু'আত্তিলা' নামে আখ্যায়িত হইয়াছে (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ১খ, ১১৬; মাকাসিদ, ৫৪)। অর্থাৎ ইহারা আল্লাহ্র সত্তাকে তাঁহার গুণাবলীর সঙ্গে অসমঞ্জস করিয়া দিয়াছে। ইহাদের মুকাবিলায় আল্লাহ্র গুণাবলীর প্রবক্তা প্রাচীন 'আলিমদিগকে 'সিফাতিয়া' পদবী দেওয়া হইয়াছে।

স্বয়ং মু'তাযিলাগণ তাওহীদের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছে, ইহার উত্তম নিদর্শন এই, যাহা আল-আশ'আরী তাঁহার মূল্যবান গ্রন্থ "মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন". (পৃ. ১৫৫-১৫৬)-এ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আল্লাহ এক, তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। যেমন তিনি জিস্ম (শরীর), সূরাত (অবয়ব), পরমাণু ও আপতন কোন কিছুই নহেন। তাঁহার কোন বর্ণ ও গন্ধ নাই, স্পর্শ করা, এমন স্থান তাঁহার মধ্যে নাই। তাঁহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাও নাই। তিনি গতিশীল নহেন কিংবা স্থিরও নহেন। তাঁহার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। তাঁহার জন্য কোন দিক নাই, কোন স্থান তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিতে পারে না। তাঁহাকে মানুষের সংগে তুলনা করা যায় না এবং তিনি কোনভাবেই সৃষ্টির অনুরূপ

নহেন। চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম নয়। কান তাঁহাকে শ্রবণ করাইতে পারে না। এমনিভাবে ঐ সকল...গুণের বর্ণনা রহিয়াছে। এই গুণাবলীকে মু'তাযিলাগণ [পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে] প্রথম মৌলিক বিষয় হিসাবে অভিহিত করে অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে প্রতিটি বিষয়ে একক জানা এবং তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্টির সাদৃশ্যের দ্বারা প্রতিটি কথায়, যাহা কাহারও চিন্তায় উদিত হউক বা না হউক, পূত-পবিত্র মনে করিতে হইবে।

এই প্রশ্নে মু'তাযিলাদের মতামতের ভিত্তি এই হইবে যে, পবিত্র আয়াতসমূহের নির্দেশ ইহাদের মূল অর্থ অনুযায়ী পালন করিতে হইবে এবং অর্থের দিক হইতে অস্পষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা এমনভাবে করিতে হইবে যে, ইহা যেন তান্‌যীহ্‌ ও তাওহীদের সঙ্গে ইসলামের শিক্ষার ভিত্তিতে ঐকমত্য হয়। এতদনুযায়ী তাঁহারা "استوى على العرش" -এর অর্থ استيلاء অর্থাৎ'শ্রেষ্ঠত্ব' করিয়াছেন, হস্তের দ্বারা 'শক্তি' অথবা 'অনুগ্রহ' অর্থ বুঝাইয়াছেন এবং অপর আয়াত "وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي" -এ 'আয়ন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'জ্ঞান' (মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, ৫৯৫)। তাহারা এই কথার উপর 'ইজমা' প্রতিষ্ঠিত করিয়া লয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলাকে চক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নহে (ঐ গ্রন্থ, ১৫৭), কেননা তাহাদের মতে দেখার জন্য দিক ও শরীর (অবয়ব) প্রয়োজন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মু'তাযিলা সম্প্রদায় গ্রীক দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার্থে ও গ্রীক দর্শনের দ্বারা উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রণী ছিল এবং এই বিষয়ে তাহারা বাধ্যও ছিল। কেননা তাহারা ধর্ম ও ইহার 'আকীদাসমূহের সহায়তা করার দায়িত্ব এবং অপরাপর জাতি ও ধর্মনেতাদের বিরোধিতার প্রতিবাদ করার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে তাহাদের অনেক উল্লেখযোগ্য খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যেমন–আবুল-হুযায়ল আল্‌-'আল্লাফ যিনি শাহ্‌রাস্তানীর মতে তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ছিলেন (শাহরাস্তানী, ১খ, ৩৩)। তিনি হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহার শাগরিদ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সায়্যার আন-নাজ্জাম (মৃ. ২২১ হি.), ইনি অবিশ্বাসী কাফির, বিশেষ করিয়া ধর্মাদ্রোহীদের প্রতিরোধকে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাজ্জামের শাগরিদ যাঁহারা হাতে গড়া ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫ হি., ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে), তাঁহার বয়স ৯০ বৎসরেরও অধিক হইয়াছিল। তিনি সারা জীবন মু'তাযিলাদের মুখপাত্র ছিলেন। তিনি গ্রীক দর্শনে পূর্বসূরীদের তুলনায় অধিক পারদর্শী ছিলেন। তিনি মু'তাযিলা মতবাদের সহায়তার জন্য গ্রীক দর্শন হইতে অধিক সাহায্য গ্রহণ করেন। ধর্মের সহায়তা ও অবিশ্বাসীদের প্রতিরোধকল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা সম্পর্কে আবু'ল-হাসান আল-খায়্যাত বলেন, "গ্রন্থকার (ইব্‌নু'র- রাওয়ান্দী)-এর মত তাওহীদে অবিশ্বাসীর প্রতিরোধে যে বিপদ আপতিত হয়, যদি মুসলমানদের মধ্যে ইবরাহীম ও তাঁহার মত 'আলিম সৃষ্টি না হইত, যাঁহারা তাওহীদের পোষকতা ও ইহার সহায়তার দায়িত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং অবিশ্বাসীরা যখনই তাওহীদের উপর আক্রমণ করে, তখনই তাঁহারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া যান। যখন লোকজন পার্থিব সম্পদ আহরণ ও আরাম-আয়েশের উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত ছিল, তখন তাঁহাদের একমাত্র ব্রত ছিল অবিশ্বাসীদের বিরোধিতার উত্তর দেওয়া এবং অবিশ্বাসীদের প্রতিরোধকল্পে গ্রন্থ রচনা (আল-ইনতিসার, ৪১)।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন চিন্তাবিদ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এই মু'তাযিলাগণই কালামশাস্ত্রকে এই পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করিয়া এইভাবে ধর্মের সহায়তাকল্পে দৃঢ়তা অবলম্বন করেন এবং তাহাদের মতে যে দল সত্যের বিরোধী ছিল, তাহারা মুসলিম হউক কিংবা অমুসলিম, তাহাদের প্রতিরোধকল্পে মু'তাযিলাগণই বুক পাতিয়া দিতেন। এই সম্পর্কে শাহ্‌রাস্তানী লিখেন, "অতঃপর মু'তাযিলা 'আলিমগণ দার্শনিকদের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। এইসব দর্শন গ্রন্থের ভাষ্য খলীফা আল-মা'মূনের সময় প্রণয়ন করা হয় এবং ইহাদের পদ্ধতি কালামশাস্ত্রের পদ্ধতির সঙ্গে" মিশ্রিত হইয়া যায়। পরবর্তী কালে ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক পৃথক শাখায় পরিণত হয় যাহা "ইল্‌মু'ল-কালাম বা কালামশাস্ত্র" নামে আখ্যায়িত হয় (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ১খ, ৩২)। এইখানে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না যে, মু'তাযিলাগণ যে এই শাস্ত্রের উদ্ভাবক তাহা কি ভাল না মন্দ? কারণ আমাদের এই সীমাবদ্ধ আলোচনায় ইহার উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্র অন্যত্র।

(৩) যাহা হউক যুগ সন্ধিক্ষণে আশ'আরীর আবির্ভাব ঘটে। যখন বিভিন্ন 'আকীদা মাযহাব ও মতবাদ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল তখন আশ'আরী তাঁহার মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন যাহা পরবর্তী কালে আহ্‌লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত নামে স্বীকৃতি লাভ করে। এই মতবাদে বিশ্বাসী সকলেই সত্যানুসন্ধানী ছিলেন (আল-ইসফারা'ইনী, 'আত-তাবসীর ফী'দ-দীন, ১৬; ইব্‌ন হায্‌ম, ২খ, ১১৩)। আবু'ল-হাসান 'আলী ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-আশ'আরী, তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হি. ৩৩০ সনে ইনতিকাল করেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আল-আশ্‌'আরীর জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটে মু'তাযিলা মতবাদের ভিত্তিতে এবং তিনি আল-জুব্বাঈ'র সাহচর্য বরণ করিয়া তাঁহার যুগের মু'তাযিলা মতবাদের ইমাম হন। পক্ষান্তরে ওয়াসি'ল ইব্‌ন 'আতা' প্রথমে সালাফ-এর নীতির অনুসারী এবং হাসান বাসরীর শাগরিদ ছিলেন। ফলে আল-আশ'আরীকে নূতন মতবাদ প্রচার করিতে দেখিয়া জনসাধারণ তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে। এই সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে তাঁহার মু'তাযিলাপন্থী সহকর্মীবৃন্দ এমন কি তাঁহার আহলু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত উভয় দলের লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই অবিশ্বাস এত বৃদ্ধি পায় যে, হাম্বালী মাযহাবের অনুসারিগণ তাঁহাকে কাফির আখ্যায়িত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করে।

আশ'আরীর প্রচেষ্টা ছিল এই যে, বিভিন্ন মতবাদ, বিশেষত মু'তাযিলাদের মতবাদের মধ্যে আপস-মীমাংসা করার জন্য জ্ঞান ও সুস্থ চিন্তাকে বিচারক নির্ধারণ করা। পরিশেষে অনেক প্রশ্নে তিনি এমন এক অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যাহা বিশ্বাসযোগ্য চিন্তাবিদগণের মতে সঠিক ছিল। এই সম্পর্কে ইব্‌ন খালদূন পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে 'মুশাব্বিহা' ও 'মুজাসসিমা'দের মতামত এবং মু'তাযিলাদের ঐ সব মতবাদ যেইগুলি সালাফ সালিহীনের মাযহাব বিরোধী ছিল তাহা বর্ণনা করেন। তাহাদের মতবাদসমূহের মধ্যে একটি মতবাদ, যাহা কুরআন মাজীদ সম্পর্কে অর্থাৎ কুরআন মাজীদকে তাহারা সৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করে। এই কারণে খলীফা আল-মা'মূনের যুগে এবং পরে বিপরীত মত পোষণকারীদের সঙ্গে তাহাদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। ইহার পর ইব্‌ন খালদূন বলেন, ঐ সব কারণে আহ্‌লু'স-সুন্নাত দল মু'তাযিলাদের ঐ 'আকীদাসমূহের বিরুদ্ধে জ্ঞানভিত্তিক প্রমাণিত দলীল অন্বেষণে ব্যাপৃত হন যাহাতে ঐ বিদ'আতসমূহের প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন। আবু'ল-হাসান আল-আশ'আরী এই কর্তব্য পালন এবং সকল পদ্ধতির মধ্যে একটি মধ্যবর্তী পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি তাশ্‌বীহকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মৌলিক গুণাবলী প্রমাণ করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্রতার জন্য প্রাথমিক যুগে 'আলিমগণ যে সীমারেখা নির্ধারণ করেন

তাহাও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার বিশ্বাস, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা, উত্তম প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি সব কিছু সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করেন এবং এতদসহ ইমামাত সংক্রান্ত আলোচনাকেও সম্পৃক্ত করেন। কেননা ইমামিয়া দল বলে যে, ইমামাতের প্রশ্নটি ঈমানের 'আকীদার অন্তর্ভুক্ত (মুকাদ্দিমা, পৃ. ৩৬৮)।

আশ'আরী-র মর্যাদা ও কালামশাস্ত্রের উপর তাঁহার প্রভাব সম্পর্কে হাফিজ ইব্ন 'আসাকির (মৃ. ৫৭১) বলেন, "ঐ যুগে বিদ'আতপন্থীদের উৎপাত অধিক ছিল। মু'তাযিলাগণ মধ্যবর্তী পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়, আল্লাহ্‌র গুণাবলী অস্বীকার করিয়া বসে। অপরদিকে 'মুশাব্বিহা' দল সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। তাহারা এমন ধারণায় লিপ্ত হয় যে, তাহাদের পালনকর্তার শরীর রহিয়াছে, এই শরীরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এবং ইহা পৃথক ও মিলিত হওয়ায় সক্ষম। অবশেষে আশ'আরী আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে অবিশ্বাস করার মনোভাব পোষণকারীদের উপর জয়ী হন এবং সুন্নাতের বিরোধীদের দলীল দ্বারা নির্বাক করেন। তিনি তা'তীল (تعطيل) ও "তাশ্‌বীহ"–এই উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করেন (তাবঈনু কিযবিল-মুফতারী, নাশ্‌রু'ল-কুদসী, দামিশ্‌ক ১৩৪৭ হি., পৃ. ২৫-২৬)।

আশ'আরীর ভারসাম্যপূর্ণ পথ অবলম্বন ঃ পরবর্তী সময়ের বিখ্যাত চিন্তাবিদগণ, যাঁহারা আশ'আরীর মতবাদের সহায়তা করেন এবং তাঁহার মাযহাবকে আহ্‌লু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের মাযহাব হিসাবে অবহিত করেন, অনেক প্রশ্নে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট। আমরা উহাদের মধ্য হইতে নিম্নে তিনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উল্লেখ করিতেছি ঃ (১) গুণাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন, (২) কালাম সংক্রান্ত প্রশ্ন ও কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি আলোচনা–কুরআন সৃষ্ট না অসৃষ্ট অর্থাৎ নশ্বর না অবিনশ্বর? এবং (৩) আল্লাহ্‌র দর্শন সংক্রান্ত প্রশ্ন।

(১) গুণাবলী সংক্রান্ত সংকটপূর্ণ প্রশ্নে আশ'আরীগণ উপলব্ধি করিতে পারেন যে, মুশাব্বিহা ও মুজাস্‌সিমা দল বাহ্যিক বিষয়কে দলীল আখ্যায়িত করিয়া নিজেদের জ্ঞানকে বেকার করিয়া দেয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমন সব কথাবার্তা প্রয়োগ করিতে শুরু করে, যাহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি মানিয়া লইতে পারেন না। তাহারা বলে যে, আল্লাহ্‌র জন্য একটি বিশেষ দিক রহিয়াছে। তাঁহার জন্য স্থান রহিয়াছে। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। অপরদিকে মু'তাযিলাগণ সীমা অতিক্রম করিয়া আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। এইভাবে তাহারা 'তা'তীল' (শূন্য) মতবাদের প্রবক্তা হইয়া পড়ে। আশ'আরীগণ অবহিত হন যে, এই উভয় মতের মাঝখানে সত্য নিহিত। যেমন– তাঁহারা আল্লাহ্‌র জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণ আছে বলিয়া উল্লেখ করেন। এইগুলি দ্বারা আল্লাহ্‌কে একটি শারীরিক অবয়বরূপে স্বীকার করা অথবা কোন সৃষ্টির অনুরূপ মনে করা বুঝায় না। এইভাবে কার্যত তাঁহারা সীমা লংঘন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সরল পথে প্রতিষ্ঠিত হন।

এইরূপ দ্বিতীয় সংকটপূর্ণ প্রশ্ন অর্থাৎ কালাম সম্পর্কে আলোচনা যেমন–ইহা কি সৃষ্ট না চিরন্তন ও পবিত্র কুরআন সম্পর্কে, যেমন–কুরআন কি সৃষ্ট না অসৃষ্ট (চিরন্তন)। আশ'আরীগণ দেখিলেন যে, হাম্বালী ও হাশাবিয়্যা একদিকে গিয়াছে। তাহারা বলে, স্বর ও অক্ষরবিশিষ্ট অংশসমূহ একটির পর অপরটি ক্রমান্বয়ে আসা, যাহাতে পরবর্তী অংশ, ইহার পূর্বে আসা অংশের উপর বিন্যস্ত হয়। ইহা আদিতে প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং ইহাও বলিতে থাকে যে, তিলাওয়াতকারীর যে স্বর কর্ণগোচর হয় এবং কুরআনের দৃশ্যমান পংক্তিসমূহ অবিকল আল্লাহ্‌র চিরন্তন কালাম। কেহ কেহ ইহার চাইতেও অগ্রসর হইয়া বলে যে, কুরআনের জিল্‌দ (মলাট) ও আবরণও চিরন্তন এবং অপর কতিপয় ব্যক্তি বলিতে শুরু করে যে, এই অবয়বপূর্ণ মিশ্রণ (কালি), যাহার দ্বারা কুরআন লেখা হয় এবং অক্ষরসমূহ ও শব্দসমূহের যে আকার প্রকাশিত হয়, উহা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র কালাম। ইহা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু এবং পরে চিরন্তন হইয়া যায় (আল-মাকাসিদ, ২খ, ৭৪; আল-মাওয়াকিফ, উ. সংস্করণ, ২৯৩)। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, মু'তাযিলাগণ পবিত্র কুরআনকে নশ্বর ও সৃষ্ট বলে। কেননা যুক্তিস্বরূপ তাহারা বলে যে, এই কুরআন অক্ষরের দ্বারা বিন্যস্ত। ইহাদের সৃষ্ট হওয়া (হাদীছ) সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তাই তাহাদের বক্তব্য, কোন সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ্‌র সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে পারে না। ইহার ভিত্তিতে তাহারা বলে, আল্লাহ্‌র মুতাকাল্লিম (বক্তা) হওয়া স্বীকৃত। কেননা ইহা অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, তিনি কতক বিশেষ অবয়বের অভ্যন্তরে কালাম সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন; যেমন লাওহ্ মাহফূজ, জিব্‌রীল ও হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অভ্যন্তরে (আল-মাকাসিদ, ২খ, ৭৪; আল-মাওয়াকিফ, ২৯৩-২৯৪)।

এইভাবে আশ'আরীগণ হাম্বালী মাযহাবপন্থী ও মু'তাযিলা– এই উভয়ের মতবাদের মূল্যায়ন করিয়া উভয় দলের দলীল সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন এবং জ্ঞান ও ন্যায়দণ্ডে যাচাই করেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কুরআন চিরন্তন সম্পর্কে হাম্বালীদের বক্তব্য সঠিক। কিন্তু তাহাদের এই কথা বলা ঠিক নহে যে, কুরআন এমন শব্দ ও অক্ষরসমূহের নাম, যাহা আমরা পুস্তক আকারে লিখিত অবস্থায় দেখি, আমাদের কান দ্বারা শ্রবণ করি এবং আমাদের মুখ দ্বারা তিলাওয়াত করি, বরং কুরআন কেবল এমন আত্মগত অর্থের নাম, যাহা আল্লাহ্‌র সত্তার সংগে সংযুক্ত। অনুরূপ তাহারা মু'তাযিলাদের ঐ বক্তব্যকে সঠিক বলিয়া মানিয়া নেন, যেইখানে তাহারা বলে যে, স্বর ও অক্ষরসমূহের সমন্বয়ে যে বাকপদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে, এই বিন্যাসকৃত বিখ্যাত ও পরিচিত বিষয়টি সৃষ্ট (হাদীছ), কিন্তু ইহা ঐ কুরআন নহে, যাহা মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা আমরা প্রথমেই যেমন বলিয়াছি যে, কুরআন আত্মগত অর্থজ্ঞাপক, যাহা আল্লাহ্‌র সত্তার সঙ্গে স্থিত এবং ইহার চিরন্তন হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নাই (মাওয়াকিফ, ২৯৪; মাকাসিদ, ৭৪ প.)। আশা'ইরা-র এই রায় যাহা আমরা বর্ণনা করিতেছি, আমাদের নিকট তাওহীদ সম্পর্কে লিখিত সকল গ্রন্থে বিধৃত এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েও এই মতবাদের ভিত্তিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্বয়ং আল্-আশ'আরী-র 'কিতাবু'ল-ইবানা ও "কিতাবু মাকালাতি'ল-ইসলামিয়ীন" (পৃ. ২৯২)-এ এবং গাযালী (র)-ও তাঁহার আল-ইকতিসাদ গ্রন্থে (পৃ. ৫৩ প.) এই মতবাদ বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত দুইটি প্রশ্ন আলোচনার পর বর্তমান আলোচ্য বিষয় "আল্লাহ্‌র রুইয়াত" (দর্শন)। আল্লাহ্‌র দর্শন কি বৈধ না নিষিদ্ধ? যদি বৈধ হয় তাহা হইলে ইহার পদ্ধতি কি? হাম্বালী মাযহাব ও 'মুশাব্বিহা' দল আয়াত ও হাদীছসমূহের বাহ্যিক অর্থের অনুসরণ করিয়া 'আল্লাহ্‌র দর্শন'-কে এই পার্থিব জগতেই সম্ভব বলিয়া মনে করেন, যেমন– ইবনু'ল-জাওযী তাঁহার "দাফ্‌'উ শুবুহাতি'ত-তাশবীহ" (পৃ. ২৯ প.) গ্রন্থে এই মতের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ইহা একটি দিক ও একটি স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে পারে (আল-মাকাসিদ, ২খ, ৮২)। অপরদিকে মু'তাযিলাগণ আল্লাহ্‌র দর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে করে। কেননা ইহার জন্য একটি নির্দিষ্ট দিকের প্রয়োজন, যেই স্থানে দর্শক বস্তুটির সম্মুখীন হইয়া দেখিতে সক্ষম হয়। তাহাদের এই বক্তব্য পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে (আরও দ্র. আল-মাওয়াকিফ, ৩০৭ প.)।

অতঃপর আশা'ইরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পৃথিবীতে যদিও আল্লাহ্‌র দর্শন সম্ভব, কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত হইবে আখিরাতে এবং এই দর্শনের জন্য যাঁহাকে দেখিবে, তিনি কোন দিকে অথবা কোন স্থানে তাহাকে দেখা যাইবে, এইসব কিছুর প্রয়োজন হইবে না। ইহা ব্যতীত যাহাকে দেখার প্রয়োজন তাহার চেহারার চিত্র দর্শকের চক্ষের মণিতে চিত্রিত করা হইবে, অন্যথায় ইহার দ্বারা তাশ্‌বীহ বুঝা যাইবে (আল-মাওয়াকিফ, ২৯৯ প.; আল-মাকাসিদ, ২খ, ৮২ প.)। উদাহরণস্বরূপ এই প্রশ্নেও প্রথম দুই প্রশ্নের মত আশা'ইরার রায় অপর দুই দলের রায়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। মু'তাযিলাদের মতে "আল্লাহ্‌র দর্শন সম্পূর্ণ অসম্ভব" এই মতের প্রবক্তা তাঁহারা নহেন এবং হাম্বালী মাযহাবের মতও নহেন, যেমন–তাহারা আল্লাহ্‌র দর্শনকে এমনভাবে প্রমাণ করে যে, ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য দিক, স্থান ও মুখোমুখি হওয়া বুঝায়, হাদীছ অর্থাৎ সূচিত বস্তুর ক্ষেত্রে যেরূপ হইয়া থাকে।

আল্লাহ্‌র কালাম সংক্রান্ত প্রশ্নে আশা'ইরা কৃতকার্য হইয়াছেন। তাহারা শাব্দিক কালামে, যাহা আমরা পাঠ করিয়া থাকি এবং আত্মগত কালামে, যাহা আল্লাহ তা'আলার সত্তার সঙ্গে স্থিত, পার্থক্য নির্দেশ করেন এবং বলেন যে, শাব্দিক কালাম পৃথক এবং আত্মগত কালাম চিরন্তন। ইহার মধ্যে অভিধান, দৃষ্টান্ত ও জ্ঞান সবকিছুই তাহাদের মতবাদের অনুরূপ সিদ্ধান্তজ্ঞাপক। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন কুরআনকে সৃষ্ট বলার মত বৈধতা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি কুরআন সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বস্তু এমন কি জিল্‌দ (মলাট) ও আবরণ (কাপড়ের)-কে চিরন্তন বলার প্রয়োজন পড়ে নাই।

এমনিভাবে আল্লাহর দর্শন সংক্রান্ত সংকটপূর্ণ প্রশ্নেও তাঁহাদের প্রচেষ্টা সফল হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা প্রথমে যেসব বস্তুর দ্বারা আল্লাহ্‌র অনুরূপ আকার ও অবয়বের সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং যে ধারণায় 'মুশাব্বিহা' ও 'মুজাস্‌সিমা' দল ব্যাপৃত ছিল, সেই সব বস্তু হইতে আল্লাহ্‌কে পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার পর আল্লাহ্‌র দর্শন সম্ভব ও বৈধ–এই তথ্যজ্ঞাপক কুরআনের আয়াত ও হাদীছের বিবরণ দেখিয়া তাঁহারা আল্লাহ্‌র দর্শনের প্রবক্তা হন। কিন্তু তাঁহারা এই বিষয়টিকে এইভাবে গ্রহণ করেন যে, আল্লাহ্‌কে কিভাবে দেখা যাইবে তাহার পদ্ধতি আমরা জানি না এবং ঐ সকল অভ্যস্ত কথাবার্তা ব্যতিরেকে যাহা সৃষ্ট বস্তুসমূহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয়, যেমন দর্শকের সীমাবদ্ধতা, কোন্ দিকে এবং কোন্ স্থানে হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। স্পষ্টত ইহা কোন সুষ্ঠু জ্ঞানীর জন্য অসম্ভব নহে।

(৪) এখন আমরা নিম্নে খারিজী, মুরজিয়া ও শী'আদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর পরস্পর দ্বন্দ্বের কারণে খারিজীদের উদ্ভব ঘটে। রাজনৈতিক দল হওয়ার কারণে তাহাদের ইতিহাস ইসলামী সাম্রাজ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যেহেতু এইসব কথা সাধারণভাবে জানা বিষয়। তাই ইহা বর্ণনা করার প্রয়োজন নাই। এই ক্ষেত্রে আমরা কেবল কতক ধর্মীয় প্রশ্নে তাহাদের মতামতের মূল্যায়ন করিব, যাহা নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থার কারণে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে তাহাদের কঠোরতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তাহারা সিদ্ধান্ত দেয় যে, ঈমান কেবল বিশ্বাসের নাম নহে, বরং ইহার সঙ্গে আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত সকল নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য। সুতরাং যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একত্বকে স্বীকার করে এবং তাঁহার প্রেরিত রাসূলদের সত্য মনে করে, কিন্তু তাঁহার নির্দেশ পালন করে না, সে কাফির। এইখান হইতে খিলাফাতের প্রশ্নে এবং খিলাফাতের যোগ্য কে ইত্যাদি বিষয়ে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। এই দ্বন্দ্ব অত্যন্ত গভীরভাবে ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে খারিজী, শী'আ ও মুরজিয়া দলের উদ্ভব হয়।

খারিজীদের ২০টি উপদল রহিয়াছে। ইহারা পরস্পর নিজেদের মধ্যে আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ও ব্যাখ্যায় মতানৈক্য পোষণ করে। কিন্তু ইহারা সকলেই দুইটি মূলনীতির উপর ঐক্যবদ্ধ ঃ (১) 'আলী (রা), 'উছমান (রা), উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণ, উভয় সালিস অর্থাৎ ['আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস' (রা) ও আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)], উপরোক্ত দুই সালিস বা বিচারকের রায়ে যাহারা সম্মত ছিল, সকলেই কাফির; (২) মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ পাপ করিবে, সে-ই কাফির (আত্-তাবসীর, ২৬; শাহরাস্তানী, আল্-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ১খ, ১৫৪ প.; আল- মাকাসিদ, ২খ, ১৮২)। কেননা 'ইলম (জ্ঞান) ও 'আমাল (কর্মে পরিণত) করা,এই উভয়ের মিলিত নাম ঈমান। এই প্রশ্নটি কালাম শাস্ত্রের 'আলিমগণের নিকট 'মুরতাকিবু'ল-কাবীরা" নামে খ্যাত। যে কবীরা গুনাহ্ করে সে কি কাফির না মু'মিন, না মু'মিন ও কাফির-এর মধ্যবর্তী স্থানে। তদুপরি খারিজী, মুরজিয়া ও মু'তাযিলাদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইব্‌ন হায্‌ম উল্লেখ করেন যে, খারিজীদের মাযহাবের ঐকমত্য অনুযায়ী মূল ভিত্তিমূলক বিষয় (মাসআলা) চারিটি ঃ (১) ঈমান ও কুফ্‌র-এর অবস্থা কি? (২) মু'মিন ও কাফির নামের যোগ্য কে? (৩) ওয়া'দ (প্রতিজ্ঞা) ও (৪) ইমামাত (নেতৃত্ব)। উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের পরস্পর এবং তেমনি অন্যদের মধ্যেও পরস্পর মতানৈক্য রহিয়াছে (আল-ফিসাল, ২খ, ১১৩), এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসফারা'ইনী ঃ আত- তাবসীর -এর ও ইব্‌ন হায্‌ম-এর বর্ণনার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই।

"মুরতাকিব-ই কাবীরা"-এর কারণে উম্মাত কতিপয় মাযহাবে বিভক্ত এবং প্রতিটি মাযহাব স্বীয় নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণের উপর বিশ্বাস করে। আশা'ইরাগণ বলেন যে, কবীরা গুনাকারী মু'মিন। খারিজীদের মতে সে কাফির। মু'তাযিলাগণ উভয় মতের মধ্যবর্তী অবস্থানে। তাহাদের মতে, সে পরিপূর্ণ মু'মিনও নহে, আবার সম্পূর্ণ কাফিরও নহে, বরং ঈমান ও কুফ্‌র-এর মধ্যবর্তী স্থানে (আল-মাকাসিদ, ২খ, ১৮৯; আল-মাওয়াকিফ, উ. সংস্করণ, ৩৮৪ প.)। স্পষ্টত এই মতানৈক্য ঈমান ও কুফ্‌র-এর পরিচিতির উপর ইহাদের মধ্য হইতে নির্গত শাখা-প্রশাখায় পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৫) খারিজীদের নিকট ঈমান ও কুফ্‌র-এর পরিচিতিতে একটি বৃত্ত রহিয়াছে এবং মুরজিয়াদের কাছেও ইহার একই অবস্থা (ইব্‌ন হায্‌ম, আল-ফিসাল, ২খ, ১১২)। মুরজিয়াদের মতে ঈমান সত্যায়নের নাম অর্থাৎ অন্তর দ্বারা আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করা, ইহার মধ্যে মুখে উচ্চারণ করা এবং শরীরের, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা, আমল করা অন্তর্ভুক্ত নহে। কেহ কেহ অন্তরের পরিচয়ের সঙ্গে জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করার শর্তও আরোপ করেন এবং কেহ কেহ তো আরও অধিক বাড়াবাড়ি করে। তাহাদের মতে ঈমান কেবল জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ করার নাম, অন্তরে কুফ্‌র থাকিলেও অসুবিধা নাই। মোটকথা, ঈমানের উপলব্ধিতে 'আমলের অন্তর্ভুক্তি নাই (পূ. গ্র., ৪খ, ২০৪; শাহরাস্তানী, ১খ, ১৮৬-১৮৭)। ঈমান সম্পর্কে এই মনোভাব পোষণ করার জন্য ইহাদের নাম রাখা হইয়াছে 'মুরজিয়া' অর্থাৎ ইহারা ঈমানের সঙ্গে আমল-এ আশা ও শৈথিল্যের প্রবক্তা। যেমন তাহারা বলে, যদি ঈমান সঠিক হয়, তাহা হইলে পাপ কোন ক্ষতি করিতে পারে না, যেমন কুফ্‌র থাকিলে আনুগত্য কোন কাজে আসে না (আত-তাবসীর, পৃ. ৬০)।

মুরজিয়াদের আবির্ভাবের প্রথম কারণ ছিল রাজনৈতিক; কেননা ইহাদের প্রকৃত আলোচ্য বিষয় ইমামাত এবং ইহা 'আলী (রা) ও

মু'আবিয়া (রা)-এর পরস্পরের বিরোধ পর্যন্ত উপনীত হয়। তাহারা দেখিল যে, খারিজীগণ কবীরা গুনাহকারীদেরকে কাফির বলে। তাহাদের মতে 'আলী (রা), 'উছমান (রা) ও শী'আগণ কাফির। কেননা তাঁহারা ইমাম ও ইমামের আনুগত্যকে ঈমানের অংশ বলিয়া থাকেন। এই কথা পরে বর্ণনা করা হইবে। কারণ মুরজিয়াগণ খোদ ঈমান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে যে, ঈমান কি? এবং এই সম্পর্কে নিজেদের বিখ্যাত মত প্রতিষ্ঠিত করে এবং ইহার ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের কাহাকেও তাহারা কাফির বলে না। কিন্তু যেহেতু তাহারা খারিজীদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল, সেইহেতু এই উভয় দলের মধ্যে চরম মতবিরোধ ছিল। কেননা খারিজী ও মু'তাযিলা উভয় দল 'আমলকে ঈমানের এমন এক অংশ হিসাবে চিহ্নিত করে, যাহা ব্যতিরেকে ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

ঐসব দলের অনেকেই নিজ নিজ মাযহাবের সহায়তা ও বিরুদ্ধবাদীদের সমুচিত প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইব্নু'ন-নাদীম বর্ণনা করেন, খারিজীদের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের খারিজী নেতা আল-য়ামান ইব্ন রাবাব কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন, ঐ গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি মু'তাযিলাদের সম্পর্কে লিখেন। তিনি এই গ্রন্থে ভাগ্য (কাদ্‌র) সম্পর্কে আলোচনা করেন [কিতাব 'আলাল-মু'তাযিলা ফি'ল-কাদ্‌র] এবং অপর একটি গ্রন্থ মুরজিয়াদের বিরুদ্ধে লিখেন [কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলা'ল-মুরজিয়া] (আল-ফিহ্‌রিস্ত, ২৫৮, [(Flugel কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮২])। ইসলামী দলসমূহের মধ্যে ইহার অনেক উদাহরণ রহিয়াছে।

(৬) সর্বশেষে আমরা বৃহৎ ৬টি দলের মধ্যে ৬ষ্ঠ দল শী'আদের সম্পর্কে আলোচনা করিব। আমরা প্রথমেই এই সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি যে, খিলাফাতের বিষয়টি এমন জটিল বিষয়সমূহের একটি যে, ইহা দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম বজ্রপাত হয় এবং এই মতপার্থক্যের কারণে তিনটি বৃহৎ দল খারিজী, শী'আ ও মুরজিয়াদের উদ্ভব ঘটে।

'শী'আ' শব্দটির মূল অর্থ কোন ব্যক্তির অনুসরণকারী ও সাহায্যকারী। এইজন্য প্রথমে এক দলকে আলী (রা)-এর সাহায্যকারী এবং অপর দলকে মু'আবি'য়া (রা)-এর সাহায্যকারী বলা হইত। হযরত 'আলী (রা)-এর ইনতিকালের পর যখন হযরত ইমাম হাসান (রা) খিলাফাত হইতে বঞ্চিত হন তখন শী'আ শব্দটি কেবল হযরত 'আলী (র) ও তাঁহার অনুসারীদের বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এইখানে আমরা কেবল ইমামাতের সংশ্লিষ্ট গুরুত্ববহ ও মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করিব, যাহাকে ইহারা ধর্মের পোশাক পরিধান করাইয়াছে এবং এইভাবে ইহা কালামশাস্ত্রের মাস'আলায় পরিণত হইয়া যায় (ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, ৩৬৮; মাকাসিদ, ২খ, ১৯৯-২০০)। ইমামাতের বিষয় ব্যতীত কালামশাস্ত্রের অন্যান্য অনেক বিষয়ে তাহারা মু'তাযিলাদের সঙ্গে একমত।

শী'আদের অনেক দল রহিয়াছে। কিন্তু প্রায় সব দল নিম্নোক্ত দলসমূহের অনুরূপঃ (১) গালিয়া, ইহারা হযরত 'আলী' (রা)-র গুণ সম্পর্কে সীমার বাহিরে বাড়াবাড়ি করিয়াছে এবং তাঁহার সম্পর্কে এমন সব কথা বলা হয় যাহার প্রতি হযরত 'আলী (রা) কর্ণপাত করেন নাই। (২) কায়সানিয়্যা,ইহা মুখতার ইব্ন 'উবায়দ আছ-ছাকাফীর সৈন্যদলের প্রধান কায়সান নামীয় দল। মুখতার হযরত হুসায়ন (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রুখিয়া দাঁড়ান এবং মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হানাফিয়া (র)-এর দা'ঈ (আহ্বায়ক) ছিলেন। (৩) যায়দিয়্যা, এই দল যায়দ ইব্ন 'আলী ইব্ন যায়নু'ল'আবিদীন ইবনু'ল-হু'সায়ন (রা)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। (৪) ইমামিয়্যা, যাহারা 'আলী ইব্ন যায়নু'ল- 'আবিদীন (র)-এর ইনতিকালের পর তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ আল- বাকিরকে খিলাফাতের যোগ্য মনে করিত (যায়দ ইব্ন 'আলী যায়নুল-আবিদীনকে মানিতেন না)। ঐ বৃহৎ দলসমূহ হইতে অনেক কলহকারী শাখাদল সৃষ্টি হয়। ইহারা পরস্পর বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্যে উপনীত হইত, যদিও উহাদের সকলের একমাত্র লক্ষ ছিল ইমামাত ও নবী কারীম (স)-এর সাহাবাদেরকে পরস্পরের উপর মর্যাদা দান করা (ইব্ন হায্‌ম, আল-ফিসাল, ২খ, ১১৩; আরও তু. ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, ১৫৬ প.)।

শী'আগণ ইমামাতকে ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ মনে করিত। কারণ তাহাদের 'আকীদা এই ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এই সম্পর্কে অবহেলা করিতে পারেন না এবং এই বিষয়টিকে উম্মতের দায়িত্বে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেন না যে, তাহারা ইচ্ছামত ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) নির্দিষ্ট করিবে। তাঁহার জন্য অপরিহার্য ছিল উম্মতের নিমিত্ত স্বয়ং একজন ইমাম নির্দিষ্ট করিয়া যাওয়া এবং এই 'আকীদার সঙ্গে আরও সংযোজন করিয়া বলে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এই সম্মানিত পদের জন্য 'আলী (রা)-কে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার দলীল তাহারা আল্লাহর এমন নির্দেশের উপর নির্ভর করে, যাহা তাহাদের নিকট প্রচলিত... (দ্র. ইব্ন খালদূন আল-মুকাদ্দিমা, ১৫৫; আল-মাকাসিদ, ২খ. ২০৭)। এই কারণেই আহ্‌লু'স-সুন্নাত ইমামাতের প্রশ্নটিকে কালামশাস্ত্রের একটি আলোচ্য বিষয় হিসাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত শী'আগণ ইমামাতকে ঈমানের স্তম্ভ বলিতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের এই 'আকীদাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে (আল- মাকাসিদ, ২খ, ১৯৯-২০০) সা'দু'দ-দীন আত-তাফতাযানী এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং শীআদের দলীল বর্ণনা করিয়া ইহাদের যুক্তি খণ্ডন করেন (আল-মাকাসিদ, ২খ, ২১০ প.); যেমন কালামশাস্ত্রের 'আলিমগণের মধ্য হইতে দার্শনিকগণ বলেন, ইহা এক সহজ বিষয় যে, ঐ আলোচনাসমূহকে ইহাদের স্থানে অনুসন্ধান করিয়া অধ্যয়ন করা উচিত।

এই পর্যন্ত তাওহীদশাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, ইহার প্রাথমিক অবস্থা, ইহার বিকাশের কারণ ও পর্যায়সমূহ, ইহার বৃহৎ দলসমূহ এবং ইহাদের প্রতিটি মূলনীতি বর্ণনা করা হইল। ইহার পর এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দানের অপেক্ষা রাখে যে, ইহাদের কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে বিভক্তি সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা দেখিয়া ধর্মীয় 'আলিমগণের এই শাস্ত্র ('ইল্‌ম) সম্পর্কে কি ধারণা হইয়াছে। বিভক্তি ও পারস্পরিক মতানৈক্য কোন লুকানো বিষয় নহে।

যখন মুসলমানদের গ্রীক দর্শনের স্পর্শ লাগে এবং দর্শন গ্রন্থসমূহ আরবী ভাষায় অনূদিত হইতে থাকে, তখন মুসলমানগণ ইহা বুঝার জন্য মনোযোগ দেন। তাহাদের কেহ কেহ এমন ছিলেন, যাঁহারা গ্রীক দর্শন হইতে নিজেদের অথবা ধর্মের সংশোধনের প্রয়োজনে এমন বিষয়সমূহ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মুক্তবুদ্ধির চর্চার প্রবক্তা ছিলেন এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চার ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে উপনীত হওয়ার জন্য কোন সীমারেখা নির্দেশ করেন নাই। কেবল তাঁহাদের দ্বারা নির্দিষ্টকৃত যুক্তিবিদ্যার মৌলিক বিষয়ের সীমারেখার প্রতি গুরুত্ব দান করেন। ইহার ফলশ্রুতি উপরে বর্ণিত হইয়াছে– কালামশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে এমনভাব জড়িত হইয়া যায় যে, ইহার ফলে 'আকীদা'র উপর বিরাট প্রভাব পড়িতে থাকে। ধর্মের পতাকাবাহী 'আলিমগণ দর্শনকে অপসন্দ করিলেন এবং তাঁহারা দর্শনের ক্ষতিকর প্রভাব হইতে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করা সঙ্গত মনে করেন। কিন্তু এই বিষয়েও অনেক 'আলিম সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেন।

ইব্নুল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) ইমাম শাফি'ঈ-র একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। ইমাম শাফি'ঈ বলেন, 'শির্ক ব্যতীত মানুষ যদি আল্লাহ্ কর্তৃক নিষেধকৃত অন্য সব পাপকর্মে লিপ্ত হইয়া যায়, তবে তাহা কালামশাস্ত্রের চর্চায় জড়িত হওয়া অপেক্ষা উত্তম।' এইভাবে তিনি আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) বলেন, 'কালামশাস্ত্রের বিতর্কে আত্মনিয়োগকারী কখনও নিষ্কৃতি পাইবে না, কালামশাস্ত্রের অনুসারী 'আলিমগণ যিনদীক" (তালবীসু ইবলীস, আন-নাহদা সংস্করণ, মিসর ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৮২-৮৩; তাশকোপ্রপ্রা যাদা, মিফতাহু'স-সা'আদাত, ২খ, ২৬)।

'আল-মাক্রীযী (মৃ. ৮৪৫ হি.), আল-আশ'আরীর আবির্ভাবের পূর্বে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত 'আকীদাসমূহ সম্পর্কে এক পরিচ্ছেদে লিখেন, "অনেক মানুষ মু'তাযিলাদের বিদ'আতের অনুসরণকারী হইয়া রহিয়াছে, এইজন্য ইসলামের ইমামগণ উহাদের ঐ মতবাদ গ্রহণ করিতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করেন, কালামশাস্ত্রের সমালোচনা করেন এবং কালামশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনকারীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন" (আল-খিতাত; মিসর ১৩২৬ হি., ৪খ, ১৮৩)। এই লেখকই আলোচনার শেষ পর্যায়ে লিখেন, "ইহা আশ'আরীর মৌলিক 'আকীদার সার্বিক বিষয়, যাহার উপর ইসলামী দেশসমূহের জনসাধারণ বিশ্বাস করেন এবং যে কেহ তাহাদের এই 'আকীদার বিপরীত কোন 'আকীদার প্রকাশ করে, তাহাকে হত্যা করা হয়" (আল-খিতাত, ১৮৮)।

উপরোক্ত উভয় লেখকের পরে তাশকোপরূ যাদা (মৃ. ৯৬২ হি.) তাঁহার সময়কাল সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার সময়ের অধিকাংশ ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ (ফুকাহা) কালামশাস্ত্র অধ্যয়নকারী ও শিক্ষা দানকারীকে অত্যন্ত মন্দ বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্য ইহা প্রয়োজন যে, কালামশাস্ত্রে কুরআন-হাদীছ বিরোধী দর্শনশাস্ত্রের যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, যেমন মু'তাযিলা ও মুরজিয়াদের মত লোকদের কালামশাস্ত্র, সেইগুলিকে কালামশাস্ত্রের কুরআন হাদীছ ভিত্তিক মাস'আলাসমূহ হইতে পৃথক করা উচিত। সেইজন্য উভয় মতকে সম্মুখে রাখিয়া অপরের মুকাবিলায় কেবল প্রথমটির অস্বীকার ও সমালোচনা করা অপরিহার্য (মিফতাহু'স-সা'আদাত, ২খ, ২৩ প.)।

এই ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস রহিয়াছে যে, কালামশাস্ত্রের সমালোচনাকারী ব্যক্তিবর্গ ও তাঁহাদের বক্তব্য এই শাস্ত্রের সমালোচনা করায় এবং ইহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করায় অধিক বাড়াবাড়ি করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই বিশ্বাসও রহিয়াছে যে, এই মত অবলম্বন করার ব্যাপারে তাঁহাদের নিকট আপত্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐসব মতামতের প্রতি আমরা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছি। তবে ইহার পর মতামতটিও বর্ণনা করা সমীচীন, যাহাতে আমরা সকল ঐকমত্যে উপনীত হইয়াছি এবং এই মতামতটি 'আল্লামা শায়খ হুসায়ন ওয়ালী মারহূম-এর মতামত, যিনি আমাদের যুগের একজন বিখ্যাত 'আলিম।

মতামতটি এই যে, বর্তমানে 'আকাইদ-এর পরিচ্ছন্নতার জন্য কুরআন শিক্ষা করা এবং ইহার মধ্যে 'আকাইদের দলীলসমূহ অন্বেষণ করা কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন অপেক্ষা উত্তম। কেননা যখন নাস্তিক, যিনদীক', ধর্মবিরোধী ও বিদ'আতপন্থীদের মত ইসলামের শত্রুদের বক্তব্যসমূহ অগ্রাহ্য ও ভুল প্রমাণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন কালামশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু আজ আমাদের ঐ শত্রু বিলুপ্ত হইয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে নূতন শত্রুদল। ইহা কি সঙ্গত নহে যে, যেই শত্রু নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকেই বর্তমান শত্রু মনে করিবে এবং যাহারা বর্তমানে বিদ্যমান তাহাদিগকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করিবে? ইসলামের বর্তমান যুগের শত্রুদিগকে অগ্রাহ্য করিতে হইলে আল্লাহ্র কিতাব পবিত্র কুরআনকে আঁকড়াইয়া ধরা ব্যতীত আর কোন পদ্ধতি নাই। শর্ত এই যে, অগ্রাহ্যকারীর এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বর্ণনা করা উচিত। ইহা কেবল সংকল্প প্রতিষ্ঠার কথা নহে যে, মানুষ সারা জীবন ধারণাগত শত্রুদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে অতিবাহিত করিবে এবং যেইসব শত্রু বর্তমানে চতুর্দিকে ঘিরিয়া আছে এবং বাহির হইবার পথ দিতেছে না, তাহাদিগকে এমনিভাবে ছাড়িয়া দিবে। ইহার চেয়ে বড় কথা এই যে, কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে এমন অনেক মোটা পর্দা রহিয়াছে, যাহা আলোকরশ্মিকে অভ্যন্তরে আসিতে দেয় না, অন্ধকার করিয়া রাখে এবং অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, উত্তম বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া সঠিক ইসলামী বিশ্বাসকে স্থানচ্যুত করিয়া দেয়। একমাত্র আল্লাহ্ই সঠিক ও সরল পথে পরিচালনাকারী।

মুহাম্মাদ য়ূসুফ মূসা (দা. মা. ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহ্মাদ

তাকওয়া (تقوى) ঃ শব্দটি বিশেষ্য (اسم) কুরআন কারীমে ইহা পনের বার ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ধাতু (مادة) হইল و-ق-ى (وقى) এবং ক্রিয়ামূল (مصدر) وقاية। ইব্ন সীদাহ (ابن سيده)-এর বর্ণনামতে تقوى মূলে ছিল فعلى, قوى-এর ওযনে। প্রথম واو-টিকে تاء দ্বারা এবং ياء-কে واو দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। তবে ইহাকে فعل (ক্রিয়া)-এ রূপান্তরিত করিতে গেলে واو-টিকে বহাল রাখিতে হয়। যথা وقى يقى وقاية। আরবী ভাষায় এইরূপে واو-কে تاء দ্বারা পরিবর্তন করার বহু নজীর রহিয়াছে। যথা কুরআন কারীম-এ বলা হইয়াছে, وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلاً لَّمًّا (৮৯ ঃ ১৯) "এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদিগের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করিয়া ফেল"।

এইখানে تراث শব্দটি মূলে وارث ছিল। অনুরূপভাবে হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه (আবূ দাউদ, আত'ইমা, বাব ৪১, ৪খ, ১৭১) অর্থাৎ "যে কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ করিবে কিয়ামতের দিন সে তাহার দুই চোখের মধ্যখানে থু থু লইয়া উঠিবে"। এই স্থলে تجاه শব্দটি মূলে وجاه ছিল। উভয় স্থানেই واو-কে تاء দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে।

تقوى শব্দের ক্রিয়ামূল وقاية-এর অর্থ হইল রক্ষা করা, বাঁচিয়া থাকা। ইহা হইতেই যে ঘোড়া কাদা ও ধুলাবালু হইতে নিজ ক্ষুর বাঁচাইয়া রাখে তাহাকে فرس واق বলা হয়। একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কুরআন কারীম-এর আয়াত وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ (১৩ ঃ ৩৪) "আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার তাহাদের কেহই নাই।"

সুতরাং تقوى-এর আভিধানিক অর্থ হইল আত্মরক্ষা, ভীতি এবং কোনও প্রকার অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু হইতে নিজকে বাঁচাইয়া রাখা।

শারী'আতের পরিভাষায় ইহার অর্থ নির্ধারণে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন রকম বর্ণনা দিয়াছেন, যেইগুলির মধ্যে শাব্দিক কিছু পার্থক্য থাকিলেও বিষয়বস্তু ও মর্মার্থের দিক হইতে সবগুলি এক। বর্ণনাগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) تقوى-র শার'ঈ অর্থ হইল, আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিহার করিয়া ইসলাম নির্দেশিত পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

(খ) যেই কাজ করা বা পরিত্যাগ করার কারণে আল্লাহ্র শাস্তির যোগ্য হইতে হয় তাহা হইতে নিজকে রক্ষা করা;

(গ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত করুণা, ভালবাসা, দয়া ও অনুগ্রহ হারাইবার ভয় অন্তরে সদা জাগরিত থাকা।

'উমার (রা) একবার কা'ব আল-আহবার (র)-কে তাকওয়ার সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আপনি কি কখনও কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিয়াছেন? হযরত 'উমার (রা) বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, তখন আপনি কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন? হযরত 'উমার (রা) বলিলেন, আমি সতর্ক হইয়া কাপড় গুটাইয়া চলিয়াছি। হযরত কা'ব (র) বলিলেন, ইহাই তাকওয়া। ইব্‌ন আবি'দ-দুন্‌য়া আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই হাদীসটির মর্ম হইল, পৃথিবীতে পাপ-পংকিলতার কাঁটা ছড়ানো রহিয়াছে, তাহা হইতে সতর্কভাবে নিজকে বাঁচাইয়া চলার নাম হইল তাকওয়া। তাকওয়ার গুণে বিভূষিত ব্যক্তিকে বলা হয় মুত্তাকী। কুরআন কারীম-এর বিভিন্ন স্থানে মুত্তাকীগণের গুণাবলী ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করিয়া প্রকারান্তরে তাকওয়া-র পরিচয়ই বিধৃত করা হইয়াছে। কুরআন কারীম-এর আলোকে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হইল ঃ

অদৃশ্যে বিশ্বাস করা, সালাত কায়েম করা, আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবনোপকরণ হইতে ব্যয় করা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাব ও তৎপূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা এবং আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা (দ্র. ২ ঃ ৩-৪)।

ঈমান আনা আল্লাহ্‌র উপর, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণের উপর এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্মীয়-স্বজন, য়াতীম, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, অর্থসংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করা (দ্র. ২ ঃ ১৭৭)।

ধৈর্য ধারণ করা, সত্যবাদী হওয়া, আনুগত্য করা, ব্যয় করা এবং ঊষাকালে ক্ষমা প্রার্থনা করা (দ্র. ৩ ঃ ১৬-১৭)।

সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করা, ক্রোধ সংবরণ করা, মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া, কোন অশ্লীল কাজ করিয়া ফেলিলে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করিলে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং জানিয়া শুনিয়া কোনও অন্যায় কাজের পুনরাবৃত্তি না করা (দ্র. ৩ ঃ ১৩৪-১৩৫)।

না দেখিয়া আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং কিয়ামত সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা (২১ ঃ ৪৯)।

ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত তাকওয়ার স্তরে উপনীত হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্তরে সংশয় সৃষ্টিকারী কাজ পরিহার না করে (সাহীহ আল-বুখারী, ১খ, ৬, ঈমান)।

ইসলামী জীবনদর্শনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়ার পোশাক যে পরিধান করে তাহার দ্বারা কোনরূপ অন্যায় ও অসৎ কর্ম সংঘটিত হইতে পারে না। অপরদিকে ইসলামের মৌলিক ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে 'ইবাদত, সেই 'ইবাদত কবূলের জন্যও তাকওয়ার প্রয়োজন। তাকওয়া ছাড়া 'ইবাদত অসার ও মূল্যহীন। কুরআনুল-কারীমে এই কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। যথা হজ্জ সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (২ ঃ ১৯৭) ঃ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى "আর তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, তাকওয়াই শ্রেষ্ঠ পাথেয়।"

কুরবানী সম্পর্কে বলা হইয়াছে (২২ ঃ ৩৭) ঃ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ "আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না উহার (কুরবানীর পশুর) গোশ্‌ত ও (না উহার) রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।" সাওম সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ . (২ ঃ ১৮৩)

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হইল যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার।"

রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে দিরার জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন। কারণ ওয়াহ্‌য়ির মাধ্যমে তাঁহাকে জানানো হইয়াছিল যে, সেই মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর ছিল না (প্রকৃতপক্ষে ছিল ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি)।

তাকওয়ার মহত্ত্ব ও মহিমা অশেষ। রাসূলুল্লাহ (স) কুবা নামক মসজিদে জুমু'আর যে প্রথম খুতবা দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদিগকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিতেছি। কারণ এক মুসলমান অপর মুসলমানকে যেই উত্তম উপদেশ দিতে পারে তাহা হইল, আখিরাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং তাকওয়ার নির্দেশ দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন্ 'আমল মানুষকে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তিনি বলিলেনঃ আল্লাহ্‌র ভয় (তাকওয়া) এবং স্বভাব (তিরমিযী, ২খ, ২১)।

অপর হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বাধিক উত্তম কোন্ ব্যক্তি? তিনি বলিলেন ঃ যে আল্লাহ্‌কে বেশি ভয় করে এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখে।

আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের মর্যাদার মাপকাঠিও এই তাকওয়া। কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে (৪৯ ঃ ১৩) ঃ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ "তোমাদের ম্যধ্য সে-ই আল্লাহ্‌র নিকট বেশী মর্যাদাবান যে বেশী মুত্তাকী (তাকওয়ার অধিকারী)।"

এই তাকওয়ার গুণসম্পন্ন লোক তথা মুত্তাকীগণ আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা। তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (২ ঃ ১৯৪) وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ 'এবং জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সহিত থাকেন।" অন্যত্র (৯ ঃ ৪) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীগণকে ভালবাসেন।" وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ "আল্লাহ তো মুত্তাকীগণের বন্ধু" (৪৫ ঃ ১৯)।

ইমাম আল-গাযালী (র) তাকওয়ার চারিটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

(১) শারী'আতে যে সকল বস্তুকে হারাম করা হইয়াছে, আল্লাহ্‌র ভয়ে সেই সকল বস্তু হইতে বিরত থাকা। যথা মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়াখেলা ও সুদ খাওয়া প্রভৃতি হারাম কার্য হইতে আত্মরক্ষা করা। ইহা সাধারণ মু'মিনের তাকওয়া। এই শ্রেণীর মুত্তাকীকে বলা হয় মু'মিন।

(২) হারাম বস্তুসমূহ হইতে বিরত থাকার পর সন্দেহযুক্ত হালাল বস্তুসমূহ হইতেও দূরে থাকা। এই শ্রেণীর মুত্তাকীকে বলা হয় সালিহ (ব. ব. সুলাহা, সৎকর্মপরায়ণ)।

(৩) যাবতীয় হারাম বস্তু ও সন্দেহযুক্ত হালাল বস্তুসমূহ হইতে দূরে থাকার পর আল্লাহ তা'আলার ভয়ে অনেক সন্দেহবিহীন হালাল বস্তুও

পরিত্যাগ করা। এই শ্রেণীর মুত্তাকীকে বলা হয় মুত্তাকী (ব. ব. আতকিয়া')।

(৪) উপরোক্ত তিন শ্রেণীর তাকওয়া আয়ত্ত করার পর এমন সকল হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা যাহা 'ইবাদতে কোনরূপ সহায়তা করে না। এই শ্রেণীর মুত্তাকীকে বলা হয় সিদ্দীক।

'আল্লামা বায়দাবী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে তাকওয়ার তিনটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

(১) চিরস্থায়ী 'আযাব তথা জাহান্নামের ভয় করিয়া সকল প্রকার শির্ক হইতে বাঁচিয়া থাকা। ইহা হইল খালিস তাওহীদ। কুরআন কারীম-এর আয়াত (৪৮ ঃ ২৬) وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى (আর তিনি তাহাদিগকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করিলেন)-এর দ্বারা ইহার প্রতি ইংগিত করা হইয়াছে।

(২) সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ হইতে এমনকি (এক মতে) সগীরা গুনাহ হইতেও বিরত থাকা, শারী'আতের পরিভাষায় ইহাকেই তাকওয়া বলা হয়। কুরআন কারীমে ইহার কথাই বলা হইয়াছে, وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ "যদি সেই সমস্ত জনপদের অধিবাসীবৃন্দ ঈমান আনিত ও তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি তাহাদের জন্য আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করিতাম" (৭ ঃ ৯৬)।

(৩) আত্মা বা নাফসকে হক (সত্য) হইতে গাফিল রাখে এমন সকল বস্তু হইতে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং জাহির ও বাতিন (দেহ ও মন)-কে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করা। এই ধরনের তাকওয়ার কথাই বলা হইয়াছে কুরআন কারীম-এর এক আয়াতে يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ। "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় কর" (৩ ঃ ১০২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন মানজূর, লিসানু'ল-'আরাব, দারু'ল মা'আরিফ বৈরূত, তা. বি, ৬খ, ৪৯০১-৪৯০৪; (২) সায়্যিদ মুরতাদা আয-যুবায়দী, তাজু'ল-'আরূস, মিসর, তা. বি., ১০খ, ৩৯৬-৩৯৮; (৩) রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৫৩০-৩১; (৪) আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, বৈরূত তা. বি, ১খ, ৩৩-৩৪; (৫) কুরতুবী, আল-জামি'-লিআহকামি'ল কুরআন, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১৬২-৬৩; (৬) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরু'ল কুরআনিল-'আজীম, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৯-৪০; (৭) ফাখরুদ-দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল-কাবীর, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২০-২১; (৮) আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, বৈরূত তা. বি., ১খ, পৃ. ১০৮-১০৯; (৯) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ, মিসর, তা. বি., ১খ, পৃ. ৯১-৯৩; (১০) আল-বায়দাবী, আনওয়ারুত-তানযীল, দেওবান্দ (ইউ.পি.) তা.বি, ১খ, ১৬; (১১) সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ সম্পা., ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, করাচী তা. বি., পৃ. ৫২৪-২৫; (১২) আল-গাযালী, ইহ্‌য়া' 'উলূম, কীমিয়া-ই সা'আদাত, নির্ঘণ্ট; (১৩) তিরমিযী, আস-সুনান, দেওবান্দ (ইউ. পি.), তা. বি., ২খ, ২১; (১৪) আবূ দাউদ, আস-সুনান, বৈরূত তা. বি., ৪খ, ১৭১; (১৫) তাসাওউফ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী।

ড. আবদুল জলীল

তাকদীর (দ্র. কাদ্‌র)।

তাক্‌বীর (تكبير) ঃ আ., কাফ-বা'-রা' (ك-ب-ر) এই শব্দমূল হইতে গঠিত باب تفعيل -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। তাকবীর শব্দের অর্থ 'আল্লাহু আকবার' বলা। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উহা উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ "আর তোমার প্রতিপালক রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা কর" (৭৪ ঃ ৩); وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا "আর তাঁহার যথাযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা কর" (১৭ ঃ ১১১)। আল্লাহ্‌র এই সত্তাবাচক নাম ভিন্ন আল্লাহ তা'আলার অন্য কোনও নামের সহিত 'আক্‌বার' এই ইস্‌ম তাফদীল বা গুণের অধিকারীবাচক বিশেষণ পদটি প্রযুক্ত হয় না। আল্লাহু আকবার বাক্যের বিভিন্ন রূপ তাফসীরের জন্য দ্র. লিসানু'ল-'আরাব (কাফ-বা'-রা'-এই শব্দমূলের অধীনে)। কুরআন মাজীদে আর-রাব্‌ব (الرب) শব্দের সহিত বিশেষণরূপে আক্‌রাম (اكرم) (৯৬ ঃ ৩) ও আ'লা (اعلى) (৯২ ঃ ২০; ৮৭ ঃ ১)-এই উভয় ইস্‌ম তাফদীল পদই ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. লিসানু'ল-'আরাব ((على ও اكرم) শব্দদ্বয়ের অধীনে)।

আল্লাহু আকবার বাক্যটি, যাহা আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ততম রচনা বটে, ইসলামী যিন্দিগীর বিভিন্ন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য এবং তাঁহার দয়া ও রহমাতের কথা উপলব্ধি করিয়া মু'মিনগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাসূলুল্লাহ (স) ওয়াহয়ির মাধ্যমে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর ইনতিকালের সংবাদ পাইবার পর মাজলিসে উপস্থিত সাহাবীগণকে তৎসম্বন্ধে অবগত করাইয়া মুসাল্লায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে কাতারবন্দী করিয়া চারিবার তাক্‌বীর বলিয়াছিলেন (অর্থাৎ তিনি নাজাশীর জন্য গায়েবানা সালাতে জানাযা আদায় করিয়াছিলেন এবং উহাতে তিনি চারিবার তাক্‌বীর বলিয়াছিলেন; (বুখারী কিতাবুল জানাইয, ৪র্থ বাব, পৃ. ৫৫, ৬১)। বর্ণিত রহিয়াছে যে, অন্যান্য স্থানেও রাসূলুল্লাহ (স) সালাতুল'ল-জানাযায় চারিবার বা পাঁচবার তাক্‌বীর বলিয়াছেন (সাহীহ মুসলিম, কিতাবু'ল-জানাইয, ক্রমিক নং ৭২)। উহারই ভিত্তিতে সালাতু'ল- জানাযায় চারিবার তাক্‌বীর বলিবার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে (আশ-শীরাযী, কিতাবু'ত-তাম্‌বীহ, সম্পা. A. W. T. Juynboll. পৃ. ৪৭ প.)। অবশ্য শী'আ মাযহাবে সালাতু'ল জানাযায় পাঁচবার তাক্‌বীর বলিবার প্রথা প্রচলিত আছে (আল-কাফী, লক্ষ্ণৌ ১৩০২ হি., পৃ. ৯৫)। আযান (দ্র.) চারি তাক্‌বীর দিয়া আরম্ভ করা হয়।

হাদীছে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) হজ্জ পালন করিবার কালে কয়েক দফায় তাকবীর বলিতেন, অর্থাৎ তিনি তাওয়াফ শুরু করিবার কালে (আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, মুসনাদ, ২খ, পৃ. ৪৪), তাওয়াফ করিবার কালে (সাহীহ বুখারী, কিতাবুল-জিহাদ, ১৩২ ও ১৩৩ পরিচ্ছেদ, তবে অধিক উচ্চৈঃস্বরে নহে, উক্ত গ্রন্থের উক্ত অধ্যায়, ১৩১ পরিচ্ছেদ), তাওয়াফ শেষে (আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, মুসনাদ, ২খ, পৃ. ৫), কা'বা শারীফ দৃশ্যমান হইবার পর (ইব্‌ন হাম্বাল, ৩খ, পৃ. ৩২০), হাজ্‌র আস্‌ওয়াদের নিকটে গমন করিবার পর (ইব্‌ন হাম্বাল, ১খ., পৃ. ২৬৪) মিনা ও 'আরাফাতের মধ্যবর্তী স্থানে (বুখারী, কিতাবু'ল-জিহাদ, ৮৬ পরিচ্ছেদ), সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুইটির মধ্যে সা'ঈ করিবার সময় (ইব্‌ন হাম্বাল, ৩খ, পৃ. ৩২০) ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে তাক্‌বীর বলিতেন।

ইসলামী শারী'আত সালাত আরম্ভ করিবার কালে তাকবীর বলিবার বিধান দিয়াছে। উক্ত তাক্‌বীর তাকবীরাতু'ল-ইহরাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত ও অন্য সকল সালাতে এবং সালাতের বিভিন্ন

পর্যায়ে একাধিকবার তাক্‌বীর বলিতে হয়। যেমন রুকূ'তে যাইবার কালে, সিজদায় যাইবার কালে, সিজদা হইতে উঠিবার কালে এবং অনুরূপ আরও বিভিন্ন পর্যায়ে তাক্‌বীর বলিবার বিধান আছে। চারি তাক্‌বীর বলা কোনও বস্তুকে পরিত্যাগ করা–এই রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (দ্র. ফারাহাঙ্গ-ই আনন্দরাজ, তাকবীর শব্দ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বিভিন্ন আরবী অভিধান গ্রন্থ, কাফ-বা-রা- এই শব্দমূল; (২) Th. A. W. Handbook, Handleiding, পৃ. ৬১, ৬৫; (৩) A. J. Wensinck, A History of Early Muhammadan Tradition., তাক্‌বীর শিরো. দ্র.

A. J. Wensinck (দা. মা. ই.)/মু. মাজহারুল হক

তাকরীত (تكريت) ঃ প্রচলিত উচ্চারণে তিকরত (তু. য়াকূত), জাবাল হামরীন পর্বতমালার পাদদেশে এবং দিজলা নদীর দক্ষিণ তীরে সামাররা হইতে উত্তরে (Streck-এর বর্ণনা অনুযায়ী একদিনের পথের দূরত্বে) অবস্থিত একটি শহর (বর্তমান উচ্চারণ তিকরীত)। ভৌগোলিক দিক হইতে উহা ইরাকের উত্তর সীমান্ত নির্ধারক। এই অঞ্চলটি এখনও কিছু পরিমাণে বন্ধুর প্রকৃতির। পুরাতন শহরটি একগুচ্ছ অনুচ্চ পাহাড়ের উপর নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং নদীর পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ের উপর বর্তমান আধুনিক শহরটি অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে বেলে পাথরের খাড়াই তীর নদীর পানিতল হইতে ২০০ ফুট উঁচু। ইহার উপর এক সময়ে নির্মিত প্রাচীন নগর-দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি বর্তমান। প্রাচীন শহরের চিহ্নাবলী এই দুইটি পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ বৃত্তাকারে বিস্তৃত, যাহাতে ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, তাকরীত এককালে বিশাল ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। নেবুচাদ্‌নেজারের সময়ের একটি প্রস্তরফলকে এই শহরের নামটি শনাক্ত করা যাইতে পারে বলিয়া একটি অভিমত আছে (Strassmeyer, Streck কর্তৃক উদ্ধৃত, ২খ, পৃ. ১৩)। তবে এই প্রসঙ্গে প্রথম নিশ্চিত উল্লেখ পাওয়া যায় টলেমীর রচনায় (৫খ, ১৮, ১৯,)। তিনি ইহাকে বিরথা নামে অভিহিত করিয়াছেন (য়াকূত, ১খ, ৮৬১, ইহার অবস্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ প্রদানের ক্ষেত্রেও টলেমীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন)। Ammianus Mareellinus ইহাকে ভিরতা (Virta) নামে অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে যে পাহাড়ের উপর প্রাচীন নগর দুর্গটি অবস্থিত তাহা বর্তমানেও বুরছা নামে পরিচিত। সিরিয়াক ভাষার রচনাবলীতে শহরটির নাম তেগরীছ। ১১১৫ সালে আল-মাওসিলের বিশপের এলাকার সহিত সংযুক্তির পূর্বে ৪র্থ শতাব্দী হইতে ইহা একজন জ্যাকবীয় বিশপের ধর্মীয় এলাকারূপে বিবেচিত ছিল (Assemani, Bibliotheca Orientalis, ১খ, ১৭৪, ৪৬৫)। আরব গ্রন্থকারগণ এই শহরের প্রতিষ্ঠাতারূপে সাসানী রাজা আরদাশীরের পুত্র সাবূর-কে চিহ্নিত করেন। শহরটির নাম তাকরীত বিন্‌তে ওয়া'ইল নামক জনৈক খৃস্টান রমণীর নাম হইতে উদ্ভূত বলিয়া একটি প্রচলিত ঐতিহ্য রহিয়াছে। ইহার প্রতিষ্ঠার সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় কিংবদন্তী বিদ্যমান (য়াকূত, পূ. গ্র.; আবুল- ফিদা', তাকবীমু'ল-বুলদান, ২খ, ২৮৮)। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে শহরটি সাময়িক কালের জন্য আরব খৃস্টান গোত্র ইয়াদ কর্তৃক অধিকৃত ছিল (আল-বাকরী, মু'জাম, ১খ, ৪৬); তাহাদিগকে শহর হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। কিন্তু ইয়াদ গোত্র ইহার পরবর্তীতে বহুকাল পর্যন্ত শহরের নিকটস্থ অঞ্চলে থাকিয়া যায় (হামদানী, জাযীরাতু'ল-'আরাব, পৃ. ১৮০) এবং বিজয় অভিযানের সমকালে তাকরীতের সেনাশিবিরের ইয়াদ গোত্রভুক্ত সৈন্যরা গোপনে আরব বাহিনীকে সহায়তা করে (তু. ইয়াদ)। শহরটি প্রথম মুসলিম অধিকারে আসে সম্ভবত হি. ১৬ সালে, যখন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা) কর্তৃক প্রেরিত 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-মু'তাম দখল করেন। অতঃপর হি. ২০ সালে শহরটি পুনরায় আলোচনার মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে। প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহ এই দ্বিতীয় বিজয়ের গৌরব আন-নুসায়র ইব্‌ন দায়সাম অথবা তাঁহার সহকারী 'উকবা ইব্‌ন ফারকাদ অথবা মাস'ঊদ ইব্‌ন হুরায়ছ ইবনু'ল-আবজারের উপর অর্পণ করে। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন এই শহরের প্রথম গভর্নর এবং তিনি তথাকার জামি' মসজিদটি নির্মাণ করেন (য়াকূত, পূ. স্থা. ; আল-বালাযুরী, পৃ. ২৪৮-২৪৯)।

দশম শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত আরব ভৌগোলিকগণ প্রশাসনিক দিক হইতে তাকরীতকে আল-জাযীরার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিতেন (ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ, পৃ. ৯৪; ইব্‌ন রুসতা, পৃ. ১০৬; ইবনু'ল- ফাকীহ, পৃ. ১২৯; কুদামা, পৃ. ২৪৫, ২৫০; ইসতাখরী, পৃ. ৭২, ৭৭; ইব্‌ন হাওকাল, পৃ. ১৫৬; মাস'ঊদী, কিতাবু'ত তানবীহ, পৃ. ৩৬), কিন্তু আল-মাকদিসীর (পৃ. ৫৪, ১১৫) সময় হইতে শহরটি প্রায়শ ইরাকের অংশরূপে গণ্য হইতে থাকে (ইদ্‌রীসী ও দিমাশকী ইহার ব্যতিক্রম)। ইসলামী যুগের প্রাথমিক শতাব্দীসমূহে শহরটির প্রায় সর্বাংশেই ছিল খৃস্টানগণ। ইব্‌ন হাওকাল ও মাস'ঊদী (পূ. গ্র., পৃ. ১৫৫) এইখানকার আল-খাদরা' গির্জার কথা উল্লেখ করিয়াছেনঃ অদ্যাবধি শহর হইতে দক্ষিণে এই নামে পরিচিত একটি ধ্বংসস্তূপের অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এইখানে অন্যান্য খৃস্টান ভবনেরও অস্তিত্ব ছিল (উদাহরণস্বরূপ নদীর অপর তীরস্থ শা'আবার-এর মঠ [য়াকূত, ২খ, ৬৭৩] এবং দাইর মার য়ূহান্না, য়াকূত, ২খ, ৭০১)। পুরাতন শহর হইতে ১৫ মিনিটের দূরত্বের পথে অবস্থিত বিখ্যাত মুসলিম ধর্মীয় পবিত্র স্থান আল-আরবা'ঈনের নাম হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বকালে ইহা কোন খৃস্টান ভবনের স্থান ছিল। চুনা মাটির Stucco দ্বারা অলংকৃত দুইটি খিলানযুক্ত কক্ষ অদ্যাবধি দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এই সকল ভবনের নির্মাণ কাজ ১৩শ শতাব্দীর ন্যায় প্রাচীন কালের। তাকরীত ইহার পশুলোম হইতে প্রস্তুত পণ্যাদির জন্য বিখ্যাত ছিল (মাকদিসী)। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইহা একটি বৃহৎ শহররূপে বর্ণিত হইয়াছে (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২২৩; ইব্‌ন বাততূতা, ২খ, ১৩৩)। হামদআল্লাহ মুসতাওফী ইহাকে একটি মাঝারি আকারের শহররূপে উল্লেখ করেন। ইদ্‌রীসী (অনু. Jaubert, ২খ, ১৪৭) আল-জুজায়ল খালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা তাকরীতের নিকটে দিজলা নদী হইতে শুরু করিয়া বাগদাদ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্ভবত ইহা নাহরু'ল-ইসহাকী খালের সহিত অভিন্ন। শেষোক্ত খালটি আবুল-ফিদা'-র বর্ণনা অনুযায়ী আল-মুতাওয়াক কিলের শাসনকালে গ্রহণ করা হইয়াছিল (তু. হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, পৃ. ৪৩৪)। এই কালের কিছু কিছু চিহ্ন অদ্যাবধি বর্তমান রহিয়াছে; আওলিয়া চেলেবির বর্ণনা অনুযায়ী মুরতাদা পাশা ১৬৫৪ খৃ. এই খাল পুনঃ খনন ও পরিষ্কার করাইয়াছিলেন (Von Hammer কর্তৃক উদ্ধৃত, Wiener Jahrbucher, ১৮২১, ১৩খ, ২৩৫)।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাকরীত কখনও কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নাই। একাদশ শতাব্দীতে ইহা প্রায় স্বাধীন স্থানীয় অধিপতিগণের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ইহার অধিপতির মৃত্যুর সুযোগ গ্রহণ করিয়া সালজূক বংশীয় তুগরিল বেগ কর্তৃক ইহা অধিকৃত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থা অপরিবর্তিত ছিল (ইবনু'ল-আছীর, ৯খ, ৪৪৮)। ১১৪৯ খৃ. হইতে শহরটি বেগতেগীনীয় বংশের রাজ্যের অংশ হিসাবে গণ্য হইতে থাকে এবং ১১৯০ খৃ. ইহা 'আব্বাসী খলীফাগণের কর্তৃত্বে চলিয়া যায়। এই শহর গাযী সালাহুদ-দীনের জন্মস্থান; তাঁহার পিতা

নাজমু'দ-দীন আয়্যুবক সালজূক বংশের আমলে শহরের সেনা-অধিকর্তা নিয়োগ করা হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী তীমূর যখন এই শহর অধিকার করেন, তখন ইহা আরব দস্যুদলের হস্তগত ছিল (শারাফু'দ-দীন, অনু. Petis de la Croiz, ২খ, ১৪১-১৫৪)। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে ইহা একটি অখ্যাত ক্ষুদ্র শহর হিসাবেই থাকিয়া যায়। এই শহর প্রসঙ্গে খৃস্টানদের শেষ উল্লেখ পাওয়া যায় Tavernier-এর বর্ণনাতে (Voyages, ২খ, ৮৭)। তুর্কী শাসনকালে তাকরীত ছিল রাককা এয়ালেতের অন্তর্গত একটি সান্‌জাক (জিহাননুমা, পৃ. ৪৩৪), কিন্তু ১৯শ শতাব্দীতে সম্পাদিত সংস্কারসমূহের পর ইহার গুরুত্ব হ্রাস করিয়া ইহাকে সামাররা কাদার অন্তর্গত একটি নাহিয়ায় পরিণত করা হয় (বাগদাদ বিলায়াত-এর অন্তর্গত)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উহার জনসংখ্যা কখনও ৪,০০০ হইতে ৫,০০০-এর উর্ধ্বে ছিল না। এই এলাকা সফরকারী সকল পর্যটকের কেহই ইহা দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হন নাই। বর্তমান কালে ইহার অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই কেলেক-নৌযানসমূহের নাবিকরূপে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সকল নৌযান এই স্থানে উহাদের নাবিক বদল করে। পুরাতাত্ত্বিক দিক হইতে তাকরীত সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। Herzfeld এই স্থানে একটি আকর্ষণীয় শ্রেণীর মৃৎপাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা সাসানী যুগের এবং ইসলামী যুগের প্রারম্ভিক শতাব্দী নিদর্শন বলিয়া মনে করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Ritter, Erdkunde, ১০খ, ২১১ প., ১১খ, ৬৮০; (২) Petermann, Reisen im Orient, লাইপযিগ ১৮৬১ খৃ., ২খ, ৫৮; (৩) M. von Oppenheim, Von Mittelmeer zum Persischen Golf, বার্লিন ১৯০০ খৃ., ২খ, ২১৫-২১৭; (৪) M. Streck, Die alte Landschaft Babylonien nach den arabischen Geographen, লাইডেন ১৯০১ খৃ., ২খ, ১৭৫-১৮১; (৫) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, কেমব্রিজ ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৫৭; (৬) Sarre-Herzfeld, Archaologische Reise in Euphrat-und Tigrisgebiet, ১খ, বার্লিন ১৯১১ খৃ., পৃ. ২১৯-২১৩; (৭) G. Lowthian Bell, Amurath to Amurath, লণ্ডন ১৯২৪ খৃ., পৃ. ২১৬, ২১৭।

J. H. Kramers (E. I[2]) মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাকরূর (تكرور) ঃ Tuculor, (ফারসী Toucouleur) একটি নাম যাহা একটি নিগ্রো জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রযোজ্য, যাহারা সেনেগালীয় ফুতা (Fūta)-এর নিম্নভূমির অধিকাংশ এবং বুনদু (Bundu)-এর বৃহদাংশ জুড়িয়া বসবাস করে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দেশটি (ফুতা) সেনেগাল নদীর উভয় তীর বরাবর অবস্থিত, তবে নদীর বাম তীরে ইহার বিস্তৃতি অধিকতর। এই দেশটিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত ছয়টি প্রদেশ রহিয়াছে, তথা দিমার (Dimar), তারো (Toro), লাও (Lao), য়িরলাব (Yirlabe) বা ইরলাবে (Irlabe), বোসেয়া (Boseya), নগেনার (Ngenar) বা গানার (Ganar) ও দামগা (Damga)। দ্বিতীয় দেশ বুনদু ফালেমে (Faleme) নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য বহু অঞ্চলেও Tuculor গোষ্ঠীর উপনিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেনেগাল নদীর উজান অঞ্চলে অবস্থিত কায়েস (Kayes)-এর নয়োরো (Nyoro-সুদানী সাহেল অঞ্চল), সেগু (Segu-নাইজার নদীর তীর), পানজাগার (পূর্ব মাসীনায়) ও দিনগিরাই (ফুতা জাল্লোন-এর পূর্বদিক)-এ। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়ী বীর আলহাজ্জ 'উমার-এর ভাগ্যের সহযোগী সেনেগালীয় ফুতা-র অধিবাসিগণের দ্বারা এই সকল উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। নাইজার নদী ও শাদ (Chad)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, বিশেষভাবে সোকোটো (Sokoto) (দ্র.) এলাকাতেও উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়; এই শেষোক্ত গোষ্ঠী সেনেগালীয় ফুতা-র অপরাপর বাসিন্দাগণের বংশোদ্ভূত, যাহারা ঊনিশ শতকের প্রারম্ভে 'উছমান ফোজো (Fodjo)-র সহিত হাউসা (Hausa) এলাকা বিজয়ে আগমন করিয়াছিল।

আরবগণের লেখায় এই জনগোষ্ঠীর (Tuculor) নাম তাক্‌রূর (تكرور), বহুবচনে تكارير এবং জাতিবাচক পদ تكرورى হইতে জাতিবোধক ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সেনেগাল নদীর দক্ষিণ তীরস্থ মূর (Moor) গোষ্ঠীর মধ্যে শব্দটির এই রূপগুলির ব্যবহার প্রচলিত। মনে করা হয় যে, কোন এক সময়ে Tokoror বা তাক্‌রূর সেনেগাল নদীর নিকটস্থ একটি শহরের নাম ছিল; একাধারে ইহা সেনেগালীয় ফুতা-র সহিত অভিন্ন রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যের জনগণও একই নামে পরিচিত ছিল। মধ্যযুগের বাকরী, ইদ্‌রীসী প্রমুখ আরব ভৌগোলিক এই স্থানটিকে তাকরূর-এর অবস্থানরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কালক্রমে আরব গ্রন্থকারগণ (এবং তাঁহাদের অনুকরণে সুদানী কালপঞ্জী রচয়িতাগণ, যাঁহারা আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন) তাক্‌রূর শব্দটির প্রয়োগ আটলান্টিক উপকূল হইতে নীল নদের উপত্যকা পর্যন্ত (তবে ইহাকে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া) বিস্তৃত সম্পূর্ণ মুসলিম সুদান বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করেন। তাঁহারা "তাক্‌রূরী' শব্দটিকে সুদানী' শব্দের সমার্থক শব্দে পরিণত করেন। এই কারণেই দীর্ঘকাল পর্যন্ত য়ূরোপীয় মানচিত্র (atlas)-সমূহে সাহারার দক্ষিণ অঞ্চলকে "Tekrur বা সুদান" রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। কিন্তু তুক্‌রূর নামটির এই প্রকার সম্প্রসারিত ব্যবহার বাস্তবসম্মত নহে; তাক্‌রূর বা Tcoror প্রকৃত প্রস্তাবে tuculor গোষ্ঠীর প্রকৃত আবাসভূমি অর্থাৎ সেনেগালীয় ফুতা অঞ্চলের নাম। এই গোষ্ঠীর সম্ভাব্য উদ্ভব এবং তাহাদের ভাষা সম্পর্কে দ্র. TAKRUR প্রবন্ধ, E.I.[1], vol, viii, পৃ. ৬৩৩।

Tuculor জনগোষ্ঠী সাধারণত কৃষিজীবী, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবেই ছিল লড়াকু। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহারা সাফল্যের সহিত সেনেগালীয় ফুতা অঞ্চলে ফুলা গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিহত করে। পরবর্তী কালে তাহারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফরাসীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। তাহারা উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করে হাউসা এলাকায় পরিচালিত 'উছমান ফোজোর খৃ. ১৮০০ সনের অভিযানসমূহে এবং ১৮৪৮ হইতে ১৮৬৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মানদিনগো অঞ্চলে, বামবারা ও মাসীনা এলাকায় পরিচালিত আলহাজ্জ 'উমারের অভিযানসমূহে। Toro-এর অধিবাসী উভয় বিজয়ী বীরের সেনাবাহিনীকে তাহারা সেরা অফিসার ও শ্রেষ্ঠ সেনানী দানে সুসজ্জিত করে। তখন হইতে তাহারা বহু সংখ্যায় Senegal Tirailleurs বাহিনীতে যোগদান করে এবং ফ্রান্সের কৃষ্ণবাহিনীতে বিপুল সংখ্যক উচ্চমানের সাহসী সৈন্য ও বীর non-commissioned officer সরবরাহ করিয়াছে। Tuculor-দের মধ্যে অনেকগুলি বৃত্তি বা পেশামূলক (যথা জেলে, নাবিক, মুচি, কবি, অমাত্য ইত্যাদি) রহিয়াছে, যাহারা সম্ভবত অপর কোন উৎস হইতে উদ্ভূত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই গোষ্ঠীর সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা একই ভাষায় কথা বলে।

Tuculor জাতির সকল সদস্যই মুসলিম এবং সুদানের জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে যাহারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে, ইহারা তাহাদের অন্যতম। ১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষভাগে আল-মুরাবিত আন্দোলন শুরু হইলে উহার প্রভাবে ইসলাম সেনেগালীয় ফুতা অঞ্চলে প্রবেশ লাভ করে। আল-বাক্‌রী বলেন, এই অঞ্চলের প্রথম যে শাসক স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করেন, চতুর্দিকে ইহার বিস্তার সাধন করেন, তাঁহার নাম War-Dyabi অথবা War-Dyabe অথবা War-Ndyai (বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ)। তিনি খৃ. ১০৪১-৪২ সালে মৃত্যুবরণ

করেন। তাঁহার পুত্র Lebbi ১০৫৬ খৃ. লামতুনার বারবার গোত্রের আল্-মুরাবিত নেতা য়াহ্য়া ইব্ন 'উমারকে অপর বারবার গোত্র গোদালা-র বিরুদ্ধে যুদ্ধে একদল সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন। অন্যদিকে স্থানীয় প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী সেনেগালীয় ফুতা অঞ্চলে প্রথম ইসলাম প্রচারকরূপে যাঁহার উল্লেখ করা হয় তাঁহার নাম আবূ দারদাই, (Djolof-এর মিশনারী Ndyadyan-Ndyai নহে)। যাহা হউক, Tuculor গোষ্ঠী কখনও ইসলাম ত্যাগ করে নাই। পৌত্তলিক ফুলাদের প্রাধান্যের কালে Denianke রাজাদের কর্তৃত্ব উৎখাতের ব্যাপারে Tuculor গোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করিয়াছিল জাতীয়তাবাদী অনুভূতির সহিত ধর্মীয় উদ্দীপনা। ফুলা গোষ্ঠীর নাম যেমন পৌত্তলিকতা বুঝাইত, তদ্রূপ Tuculor নামটি মুসলিমের সমার্থক ছিল।

Tuculor গোষ্ঠীর মধ্যে Torodbe (এ. ব. Torodo) শাখা সকল সময়েই সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিল। এই শাখার সদস্য ছিলেন সুলায়মান বাল, যিনি ফুলা রাজন্যবর্গের কর্তৃত্ব উৎখাত করিয়াছিলেন এবং খৃ. ১৭৭৫-১৭৭৬ সালে তাঁহার মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে সেনেগালীয় ফুতা অঞ্চলে Tuculor-দের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। 'উছমান ফোজো ও আলহাজ্জ 'উমার ছিলেন Torodbe শাখার সদস্য।

তাকরূর বা সেনেগালীয় ফুতা অঞ্চল বহু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ১১শ ও ১৩শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সরাসরিভাবে দিয়ারা-এর Sarakolle রাজতন্ত্রের আশ্রিত রাজ্যের রূপ পরিগ্রহ করে...শাসনভার থাকে হয় Sarakolle গভর্নরদের হাতে অথবা Tuculor রাজন্যবর্গের উপর ন্যস্ত; এই সময়কালে Tuculor গোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ করে। খৃ. ১৭৭৬ হইতে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত এই দেশটি একটি মুসলিম ফেডারেল রাষ্ট্ররূপে Tuculor-দের শাসনাধীন ছিল। অতঃপর ইহা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইল এবং ধীরে ধীরে ফরাসী শক্তির আশ্রিত রাজ্যের (Protectorate) রূপ লাভ করিল (১৮৫৮-৯০ খৃ.)।

সেনেগালীয় ফুতা অঞ্চলে ১৭৭৬ খৃ. স্থাপিত মুসলিম রাষ্ট্রটি শাসিত হইত আল্মামি (আরবী আল-ইমাম হইতে) আখ্যায় পরিচিত ধর্মপ্রাণ একজন নেতা দ্বারা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা এই নেতা নির্বাচিত হইতেন অনেক ক্ষেত্রে স্বল্পকালের জন্য। ফুতার প্রথম ইমাম ছিলেন 'আবদু'ল-কাদির (১৭৭৬-১৮০৫)। তাঁহার ৩৩ জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে কয়েকজন একাধিকবার, যেমন য়ূসুফু নয়বার ক্ষমতাসীন হন। ইমাম মুহাম্মাদু বিরান জুলাই ১৮৪১ সালে প্রথম বারের মত শাসক নির্বাচিত হন এবং সেই বৎসরের অকটোবর ৭ তারিখে তিনি ফ্রান্সের সহিত একটি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সীবাওয়ায়হ-এর শাসনকালে (১৮৫৪-১৮৫৬) সেনেগালের গভর্নর Faidherbe কর্তৃক Toro-এর Podor নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। অতঃপর ফুতার পৃথক পৃথক প্রদেশসমূহকে কনফেডারেশন ত্যাগ করিয়া ফরাসী সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিবার ব্যাপারে Faidherbe নেতৃত্ব দান করেন। ইমাম মুসতাফার শাসনকালে (১৮৫৮-৫৯) দিমার গোত্র ফুতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফরাসী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮৫৯ খৃ. ইমাম বিরানি তাঁহার পঞ্চমবারের শাসনামলে Toro ও Damga-এর উপর তাঁহার অধিকার ছাড়িয়া দেন এবং পরবর্তী বৎসর এই দুই এলাকা ফরাসী আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে ফুতা কনফেডারেশনের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে কেবল Lao, Yirlabe, Boseya ও Ngenar। ২৪ অকটোবর, ১৮৭৭-এ ইমাম মুহাম্মাদ আহমাদু ফ্রান্সের নিকট Lao ও Yirlabe প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। শেষ পর্যায়ে ১৮৮১ সালে গভর্নর Briere de L'Isle ইমাম Sire Baba Lih-এর নিকট হইতে ফুতা ফেডারেশনের অবশিষ্ট Boseya ও Ngenar প্রদেশদ্বয়ের উপর ফরাসী সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায় করিতে সক্ষম হন। এই Sire Baba ছিলেন সর্বশেষ ইমাম। তিনি খৃ. ১৮৯০ সালে ইনতিকাল করেন। অতঃপর সাতটি প্রদেশ সম্বলিত সেনেগালীয় ফুতার Tuculor রাষ্ট্রটি ফরাসী সেনেগাল উপনিবেশের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

Bundu-এর Tuculor গোষ্ঠী তাহাদের দেশে একই প্রকার একটি রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিল, যাহা ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে উপনীত হয়। এই সময়ে Bundu অঞ্চলে ক্ষমতাসীন ইমাম বূ (আবূ) বাক্র মা'আদা গভর্নর Faidherbe-কে আলহাজ্জ উমারের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধসমূহে, বিশেষভাবে ১০৫৭ ও ১০৫৯ সালে প্রবল সমর্থন প্রদান করেন।

খৃ. ১৮০১ সালে Toro-এর অধিবাসী (স্পজো অর্থাৎ "জ্ঞানী ব্যক্তি" নামে পরিচিত) জনৈক মুহাম্মাদু-র পুত্র 'উছমান সেনেগালীয় ফূতা আঞ্চলে তাঁহার স্বগোত্রীয়দের মধ্য হইতে একটি সেনাবাহিনী গঠন করিয়া এবং তিনটি এলাকা, তথা মাসীনা, লিপতাকো ও সোনগোই হইতে সংগৃহীত সৈন্য দ্বারা বাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া হাউসা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা প্রদান করেন। কারণ Gober গোষ্ঠীভুক্ত পশুপালক শ্রেণী উক্ত প্রদেশের রাজার বিরুদ্ধে অত্যধিক হারে শুল্ক আদায়ের অভিযোগ করে। তিনি প্রথমে Gober-এর রাজধানী Tesawa এবং পরে সোকোতো, কাতসেনা, যিনদান, কানো, খারিয়া ও অন্যান্য হাউসা শহর দখল করেন এবং নাইজার নদী ও শাদ (Chad)-এর মধ্যে বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার রাজধানী স্থাপন করেন Sokoto-এর নিকটে Wurno নামক স্থানে। তিনি ক্রমে এই সাম্রাজ্যের সীমানা দক্ষিণ-পশ্চিমে Nupe এবং দক্ষিণ-পূর্বে Adamawa পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এমন কি তিনি Bornu পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮১০ খৃ. প্রখ্যাত Kanemi পুনরায় তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। ১৮১৫ খৃ. তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের (রাজধানী Gando) কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদু বেল্লো সোকোতো (Sokoto) নামক সাম্রাজ্যের মধ্যাঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন; অন্যপক্ষে Adamawa কার্যত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। মুহাম্মাদু বেল্লো (রাজত্বকাল ১৮১৫ হইতে ১৮৩৭) তাঁহার অধীনস্থ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন; ইহারা Tuculor প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পুনরায় পৌত্তলিক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে। তাঁহাকে বোরনু-এর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তিনি একজন উল্লেখযোগ্য আলিম ছিলেন এবং আরবী ভাষায় কতিপয় ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮২৮ খৃ. তিনি অভিযাত্রী Clapperton-কে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে ক্ষমতা লাভ করেন তাঁহার ভ্রাতা 'আতিকু' (১৮৩৭-৪৩) যিনি কঠোর আচার-নিষ্ঠার জন্য প্রখ্যাত ছিলেন এবং রাক্যে নৃত্য ও সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন Barth-এর আতিথ্যদাতা আলী (১৮৪৩-১৮৫৫) ছিরেন মুহাম্মাদু বেল্লোর পুত্র। তাঁহার নিয়ন্ত্রণ হইতে রাজকীয় ক্ষমতা বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরগণের হস্তে চলিয়া যায় এবং Sokoto-র শেষ পাঁচজন Tuculor-এর অধীনস্থ বৃটিশ সেনাদলের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন নাই এবং Lugard ১৯০৪ খৃ. Sokoto অধিকার করিয়া স্থানীয় রাজন্যবর্গের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাউসা এলাকায় Tuculor শাসনের অবসান ঘটান।

আলহাজ্জ উমার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঊনবিংশ শতাব্দীর অপর Tuculor সাম্রাজ্যটির স্থায়িত্ব ছিল স্বল্পতর। উমার আনু. ১৭৯৭ খৃ. Toro-এর অন্তর্গত Aloar নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, ১৮২০ খৃ. মক্কায় হজ্জ পালন করেন এবং সুদানের জন্য তিজানিয়্যা ভ্রাতৃসংঘের খলীফা পদে অভিষিক্ত হন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি Sokoto-তে তাঁহার স্বদেশবাসী মুহাম্মাদু বেল্লোর সহিত উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করেন। মুহাম্মাদু তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দেন। ১৮৩৮ খৃ. তিনি Futa Djallon-এ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই এলাকার প্রধানগণের শত্রুতার কারণে তিনি মানদিনগো এলাকার দক্ষিণে দিনগিরাই নামক স্থানে তাঁহার আবাস স্থাপন করেন। এই স্থানে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন, যাহার প্রধান দলগুলি তিনি সেনেগালীয় ফূতা অঞ্চল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিয়া তিনি মানদিনগো ও বাসবুক অধিকার করেন, বামবারা ও কারতা জাতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, উহাদের রাজ্য ধ্বংস করেন এবং ১৮৫৪ খৃ. বিজয়ীরূপে Nyoro-তে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি খাসো-র দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন যাহা ইতিপূর্বে ফরাসী শক্তির আশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, ফরাসী গভর্নর Faidherbe ইহার রাজধানী মাদীনাতে একটি ফরাসী ঘাঁটি স্থাপন করেন। ১৮৫৭ খৃ. 'উমার রাজধানী মাদীনা এবং ইহার ফরাসী ঘাঁটি অবরোধ করেন। মাদীনাস্থ ফরাসী দুর্গের অধিকর্তা Paul Holle এবং তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনী তিন মাস পর্যন্ত তিষ্ঠিয়া রহিলেন। ঠিক যে সময়ে খাদ্য ও গোলা-বারূদ নিঃশেষিত হয় এবং Paul-Holle রক্ষী বাহিনীসহ ঘাঁটি উড়াইয়া দিতে মনস্থির করিয়াছেন সেই সময়েই Faidherbe, যিনি সেনেগাল নদীর পানি হ্রাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার সেনাবাহিনীসহ মাদীনায় উপস্থিত হইলেন এবং আলহাজ্জ 'উমারের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিলেন। 'উমার অতঃপর বুন্দু গমন করেন। তথায় তাঁহাকে ইমাম আবূ বাকর মা'আদার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। পরে তিনি সেনেগালীয় ফূতা অঞ্চলে গমন করেন এবং তথাকার জনগণের একাংশকে তাঁহার সহিত Nyoro গমনে বাধ্য করেন। এইভাবে তাঁহার সেনাদল পুনর্গঠন করিবার পর তিনি সেগু-র বামবার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ১৮৬১ খৃ. সেগু শহর অধিকার করেন। ইহার পর তিনি মাদীনার ফুলা জাতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। মুসলিম হইলেও ফুলা গোষ্ঠী পৌত্তলিক বামবারা গোষ্ঠীকে সাহায্য করে। তিনি ফুলা-র রাজধানী হামদাল্লাহি অধিকার করেন; তিনি তাহাদের রাজ্য আহমাদু-আহমাদুকে বন্দী এবং ১৮৬২ খৃ. তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন। ইহার পরে তিনি তিমবাকতু লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। অতঃপর বিদ্রোহী ফুলা গোত্রের আক্রমণে তিনি একটি গিরিগুহায় আটক হইয়া পড়েন। তথায় ১৮৬৪ খৃ. ধূম্রজালে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটান হয়।

তাঁহার এক পুত্র আহমাদু, যাঁহাকে তিনি সেগু-তে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী হইতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু Dingirai, Nyoro ও Bandyagara (মাসীনা)-তে ক্ষমতাসীন তাঁহার ভ্রাতাগণ ও অন্য আত্মীয়বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার পিতার সাম্রাজ্য বিবদমান চারটি রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। আহমাদু তাঁহার ভ্রাতাগণ ও তাহাদের সহযোগীদিগকে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে উৎখাত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সার্বিক ক্ষমতা অর্জন অথবা ফুলা বামবারা গোষ্ঠীর ক্রমাগত বিদ্রোহ দমন—কোনটিই তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল না। ফরাসীদের সহিত আপোস আলোচনার সদিচ্ছা প্রকাশের পরও তিনি শত্রুতামূলক কার্যে লিপ্ত থাকেন এবং ফরাসী কর্তৃপক্ষ এই শাসকের উচ্ছেদ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আহমাদুর ভ্রাতা দিনগিরাই-এর রাজা 'আগীবু ইতিমধ্যেই ফরাসী পক্ষে যোগদান করেন। কর্নেল (পরবর্তীকালে জেনারেল) Archinard ১৮৯৩ খৃ. পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে পশ্চিম সুদান অঞ্চলের Tuculor সাম্রাজ্যের সমাপ্তি ঘটান। আহমাদু পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং Sokoto-র রাজা Moyasu-এর নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করেন। ১৮৯৮ খৃ. হাউসা অঞ্চলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Clapperton, Journal of a second expedition into the interior of Africa, ফিলাডেলফিয়া ১৮২৯ খৃ.; (২) H. Barth, Travels and Discoveries in Northern and Central Africa, লণ্ডন ১৮৫৮ খৃ., ৫ খ; (৩) E Mage, Voyage dans le Soudan occidental, প্যারিস ১৮৬৮ খৃ.; (৪) Berenger-Ferand, Les Peuplades de la Senegambie, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ.; (৫) Lasnet, Les races du Sengegal, (Une mission au Senegal গ্রন্থে), প্যারিস ১৯০০ খৃ.; (৬) P. Cultru, Historire du Senegal du XVeme siecle a 1870, প্যারিস ১৯১০ খৃ.; (৭) M. Delafosse, Haut-Senegal-Niger (Soudan Francais): le Pays les Peuples les langues, l'histoire les civilisation, প্যারিস ১৯১২ খৃ., ৩খ.; (৮) ঐ লেখক ও H. Gaden, Chronique du Fouta Sennegalais, প্যারিস ১৯১৩ খৃ.; (৯) A. Bonnel de Mezieres, Recherches de L'emplacement de Ghana et sur le site de Tekrour (Memoires Presentes par divers Savants a l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, ১২খ, ১৯২০ খৃ. প্রথম ভাগ); (১০) M. Delafosse, Les Noirs de l'Afrique, প্যারিস ১৯২১ খৃ.।

M. Delafosse (E. I.[2]) মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাকলীদ (تقليد) ঃ 'আ, "কণ্ঠে অথবা স্কন্ধে কোন কিছু ঝুলাইয়া রাখা,"। নিম্নলিখিত তিনটি ভিন্ন শব্দার্থবোধক একটি পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত ঃ

১। আরব দেশীয় পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ভূত একটি প্রাচীন রীতির নাম তাকলীদ। ইসলামের প্রাচীন যুগে এবং ফিক্‌হশাস্ত্রে টিকিয়া থাকা এই পারিভাষিক শব্দটির মক্কা নগরীর পবিত্র এলাকায় (হারাম) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশুর (হাদ্‌য়) গলায় বিশেষ কিছু বস্তু ঝুলান অর্থ প্রকাশ করে। (কিলাদা-এর ন্যায়, ব. ব. কালাইদ)। পবিত্র কুরআনের ৫ ঃ ২ ও ৯৭ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হজ্জ পালনের জন্য যে নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হাদ্‌য়া-এর সহিত কালাইদ-এর উল্লেখ রহিয়াছে। এই প্রথাটির উদ্দেশ্য ছিল হারামে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশুটিকে চিহ্নিত করিবার জন্য ইশ'আর (পশুর চামড়ায় হালকা আচড় দ্বারা চিহ্নিত করা) সম্পাদন এবং সেই সংগে ইহাকে এক প্রকার ইহরাম (দ্র.) প্রদান যাহা হজ্জযাত্রীর সম্পাদিত ইহরামের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যদিও সদৃশ নয়, ইহার সহিত সম্পর্কিত একটি রীতি হইতেছে মক্কা হইতে ফেরত যাত্রাপথে হজ্জযাত্রী ও তাহার বাহন পশুর কণ্ঠে কোন কোন বৃক্ষের বাকলের কণ্ঠহার ধারণ, যাহা একইভাবে কিলাদা নামে পরিচিত (এই প্রসংগে একটি বিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য অনুসারে বাকলের তৈরী কণ্ঠহার পরিধান মক্কা অভিমুখে যাত্রাকালে এবং প্রত্যাবর্তন যাত্রায় চুলের তৈরী কণ্ঠহার ব্যবহারের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রীতি অদ্যাবধি ইসলামে প্রচলিত আছে, তবে সাধারণত ফিক্‌হশাস্ত্রে

উহা প্রত্যাখ্যাত অথবা অবহেলা করা হয়। কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিলাদা ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কারণ ইহার জন্য হজ্জযাত্রীর পাদুকার একটি অথবা উভয়টি অথবা উহাদের অবর্তমানে এক খণ্ড চর্ম ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এইভাবে চিহ্নিত পশুটি হজ্জযাত্রীদের সাথে সাথে আরাফাতের ময়দান পরিভ্রমণসহ হজ্জ-এর সকল অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠানে লইয়া যাওয়া হয় এবং অতঃপর উহাকে মিনায় কুরবানী দেওয়া হয়। একটি হাদীছ রাসূলুল্লাহ (স)-এর এতদসংক্রান্ত সকল প্রকার বিস্তারিত বিবরণী সহকারে ইহার বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে, যদিও ইহা হয়ত সম্ভব যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) প্রকৃতপক্ষেই এই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। উক্ত হাদীছ ও পরবর্তীতে উল্লেখ্য অন্য হাদীছসমূহ কেবল প্রাথমিক যুগের ইসলামিক প্রচলন ও রীতির সাক্ষ্যরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। কুরবানীর জন্য মক্কায় পশু প্রেরণ ও উহার তাকলীদ সম্পাদন করার মাধ্যমে প্রেরক ব্যক্তি স্বয়ং হজ্জ পালন না করিলে তাহার সম্বন্ধে হুকুম কি? তবে এই প্রথাটি সম্পূর্ণভাবেই মুসলিম রীতি হইতে পারে যাহা জাহিলী আরবে অজ্ঞাত ছিল। কয়েকটি হাদীছ অনুসারে শুধু কুরবানীর তাকলীদ সম্পাদিত পশু যবেহ করার পূর্ব পর্যন্ত পশু প্রেরণকারীর উপর ইহরাম সংক্রান্ত যাবতীয় হুকুম প্রযোজ্য, বহু সংখ্যক হাদীছে (যাহার কোন কোনটি সুস্পষ্টভাবেই বিতর্কের সৃষ্টি করে) বলা হয় যে, এইরূপ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স) ইহরাম সম্পাদন করেন নাই। এই পর্যায়ে দেখা যায় যে, আল-বুখারী, আদাহী, বাব ১৫-এর হাদীছে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি উম্মুল-মু'মিনীন 'আইশা (রা)-কে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম এই যে, হাদ্য় প্রেরণ করিলেই কোন ব্যক্তি মুহরিম (ইহরাম পালনকারী) হয় না। আর ইহাই অধিকাংশ ফাকীহর মত। স্বেচ্ছায় ইহরামের সংকল্প করিলেই মুহরিম হইবে। উপরন্তু অপর একটি হাদীছ রহিয়াছে যাহাতে ইহরাম সম্পাদনের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিবিশেষের অভিপ্রায়ের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে (আন-নাসাঈ, হাজ্জ, বাব ৭০)। অতএব ফিক্‌হশাস্ত্রে শুধু হাদ্য় প্রেরণকারীর এই প্রকার ইহরামের আর কোন উল্লেখ নাই এবং ইহাকে বর্জন করা হইয়াছে। আশ-শাফিঈ ইহার কোন প্রকার যুক্তিসিদ্ধ প্রত্যাখ্যানের প্রয়োজন অনুভব না করিয়া সরাসরি বর্জন করিয়াছেন, (কিতাবুল-উম্‌ম, ২খ, ১৮৩)। ইহা নিশ্চিতভাবেই অতি প্রাথমিক যুগেই বর্জিত হইয়া থাকিবে। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) যাঁহাকে কোন প্রকার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ব্যতিরেকেই এই প্রকার ইহরাম পালনের পক্ষে একজন প্রখ্যাত কর্তৃপক্ষ বলিয়া মনে করা হয়, তিনি ছাড়াও 'উমার, 'আলী (ভ্রান্তিপূর্ণভাবে এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত) এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমারকে বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে উদ্ভূত করা হয়, এই মতামত শুধু কায়স ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন উবাদা, ইব্‌রাহীম আন-নাখঈ, আতা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়। ইহরাম ও তাকলীদ-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অপর একটি প্রমাণ হইতেছে সুফ্‌য়ান আছ-ছাওরী, আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ইস্‌হাক ও অন্যান্যের কথিত একটি মতামত। মক্কা অভিমুখী যাত্রিগণ কেবল তাকলীদ ধারণের মাধ্যমেই মুহরিম বিবেচিত হন এবং এই সম্পর্কিত অপর একটি মত যাহাতে হজ্জযাত্রী কর্তৃক তাকলীদ ধারণ তাহার জন্য ইহরাম পালন আবশ্যকীয় করে। মালিক ইব্‌ন আনাস বলেন যে, মক্কায় তীর্থযাত্রীদের জন্য তাকলীদকে ইহরাম-এর পালন হইতে পৃথক করা অন্ততপক্ষে অবাঞ্ছনীয় বিবেচনা করা উচিত। ফিক্‌হশাস্ত্রমতে উষ্ট্র অথবা গবাদি পশুর জন্য অথবা শাফিঈ, হাম্বালী, আবূ ছাওর ও দাউদ-এর মতানুযায়ী ক্ষুদ্রতর পশুর ক্ষেত্রেও কিলাদা (দুইটি পাদুকা, একটি পাদুকা অথবা একখণ্ড চর্ম) ঝুলান মুস্তাহাব বলিয়া বিবেচিত; হানাফী ও মালিকীগণ অবশ্য ইহা অনুমোদন করেন না। মালিকীগণ কুরবানীর জন্য (হাদ্য়) কোন প্রকার ক্ষুদ্র পশু ব্যবহার অনুমোদন করিতে সম্পূর্ণভাবেই অসম্মত। পশুটি কুরবানীর পর উহার কিলাদা উহার রক্তে সিক্ত করা হয়। হজ্জযাত্রিগণ যখন তাহাদের আবাসস্থল হইতে কুরবানীর পশু আনয়ন করা বন্ধ করেন এবং মিনায় এই উদ্দেশ্যে একটি পশু বাজার স্থাপন করা হয় তখন তাকলীদ সম্পূর্ণভাবেই বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহাও লক্ষণীয় যে, এই কিলাদা নামে পরিচিত একটি চর্ম নির্মিত কণ্ঠব্যাণ্ড, বিশেষত উহাতে যদিও একটি ঘণ্টা ঝুলন্ত থাকে, উটকে কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা করে বলিয়া উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lane, Arab-Engl. Lexicon, দ্র. শিরো.; (২) হাদীছসমূহের জন্য ঃ Wensinck, Handbook, দ্র. Victims; (৩) মালিক ইব্‌ন আনাস, 'আল-মুওয়াততা'; ৯৪) আয-যুরকানী, Kommentar zum, al-Muwatta; (৫) আত-তাহাবী, শারহু মাআনিল-আছার, লিথো, ১৩০০ হি., ১খ, ৪৩৯; (৬) ফিক্‌হ রচনাবলী; (৭) Gaudefroy-Demombynes, Le Pelerinage in la Mekke, পৃ. ২৭৯-২৮৫ (জাহিলী ও ইসলামী যুগের রীতিনীতির একটি পূর্ণ বিবরণ; যদিও উপরে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণে সামান্য বিষয়ে ভিন্ন মত বিদ্যমান)।

২। তাকলীদ শব্দ দ্বারা কোন সামরিক পদে নিযুক্ত হওয়াও নির্দেশ করে, এই পদ্ধতিতে তরবারিপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোমরে উহা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ইহা হইতে শব্দটি যে কোন প্রশাসনিক দফতরে (কাদীর দফতরসহ) সরকারীভাবে নিয়োগ লাভ অর্থ বহন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lane, Arab-Engl. Lexicon, দ্র. শিরো.; (২) Sprenger, Dictionary of the Technical Terms (Bibliotheca Indica), পৃ. ১১৭৮।

(৩) তাকলীদ শব্দ দ্বারা ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে "কর্তৃত্ব দ্বারা আবৃত" অর্থও নির্দেশ করা হয়। ইহা হইতেছে কোন প্রকার কারণ সন্ধান ব্যতিরেকেই অপর কাহারও বক্তব্য বা কর্মকে সম্পূর্ণ সঠিকরূপে বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করা (কিলাদা হইতে ইহার পারিভাষিক অর্থে ব্যবহারপ্রাপ্তি সঠিক নয়)। এই অর্থে তাকলীদ হইতেছে ইজতিহাদ (দ্র.)-এর বিপরীত অর্থবোধক। তাকলীদ-এর ঐতিহাসিক সূচনা ধর্মীয় আইনগত মাযাহিব (এ. ব. মাযহাব)-এর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই হয়, যাহা অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে, বিশেষভাবে খ্যাতিমান ফিকহশাস্ত্রের ইমামগণের প্রতি দৃঢ় আনুগত্য প্রকাশের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়। আশ-শাফিঈ তাঁহার রিসালা গ্রন্থে (পৃ. ৮, ১৮) শব্দটি পরবর্তীকালে যে অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে প্রায় সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু আত-তাহাবী ইহাকে হাদীছসমূহের নাকদ (পর্যালোচনা) অথবা ফিক্‌হ-এর মাসআলাসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন। মুজতাহিদ অর্থাৎ উৎসসমূহ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ফিক্‌হ আইনসমূহ গঠনের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে স্বীকার করিয়া সুনির্দিষ্ট ধারণা গঠিত হইবার পর এবং একই সংগে যখন হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হইতে সীমাহীন ইজতিহাদ-এর অবসান হয় এবং পরবর্তী সময়ে অপরাপর সকল প্রকার ইজতিহাদ-এর পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন হইতে পরবর্তী আলিমগণ ও সাধারণ জনগণের জন্য পূর্বতন কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিগণের তাকলীদ বা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক হইয়া পড়ে। সার্বিক প্রচলিত মুসলিম দৃষ্টিকোণ হইতে, বর্তমানে এবং বহু শতাব্দী যাবত, সকলেই তাহাদের পূর্বসুরিগণের দ্বারা প্রণীত কর্তৃপক্ষীয় অনুশাসন অনুকরণ করিতে থাকে; অতঃপর আর কেহই ফিক্‌হ শাস্ত্রের

ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের দ্বারা প্রদত্ত বিধান হইতে স্বতন্ত্র তাঁহার নিজস্ব কোন প্রকার ব্যাখ্যা বা রায় প্রদানে নিজেকে যোগ্যতাসম্পন্নরূপে বিবেচনা করিতেন না। পরবর্তী সকল ব্যক্তি হইতেছেন মুকাল্লিদ অর্থাৎ যাঁহারা তাকলীদ পালন করেন। তাকলীদের প্রতি এই অবিচল আস্থার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, কেবল ইসলামের প্রাথমিক শতকের ফাকীহগণের মধ্যেই মূল উৎস হইতে ফিকহী সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা এবং ইহা সম্পর্কে তাঁহাদের নিজস্ব একটি মতামত প্রদানের জন্য যথোপযুক্ত গভীর জ্ঞান ও প্রকৃত প্রজ্ঞা বর্তমান ছিল, যাহা পরবর্তী বংশধরের মধ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

মাযাহিব-এর মধ্যে পার্থক্য টিকাইয়া রাখিতে তাকলীদ ভূমিকা পালন করিয়াছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ফিক্‌হ-এর উন্নয়ন ও বিকাশধারার প্রেরণায় হ্রাসপ্রাপ্তির জন্য ইহাকে দায়ী করা যায় না।

যদিও এই বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই যে, সাধারণ মানুষ বা জ্ঞানী ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলেই তাকলীদ করিতে বাধ্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য ইহা ধর্তব্যরূপে বিবেচনা করা হয় যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের মুজতাহিদ-এর ইজতিহাদের সঠিকতা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে প্রায়শই যাহা হইতে দেখা যায়, যদি কতিপয় মুজতাহিদের ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত থাকে, তবে মুকাল্লিদ ইহাদের মধ্যে তাহার পছন্দ অনুসারে যে কোনটি অনুসরণ করিতে পারে (অবশ্যই এই ক্ষেত্রে পূর্ব অনুমোদন হইতেছে যে, সে ইজমা'-র সীমা লঙ্ঘন করিবে না, অর্থাৎ এমন কোন মুজতাহিদ পছন্দ করিবে না যাঁহার শিক্ষা বা উপদেশ এখন আর ইজমা' দ্বারা স্বীকৃত নয়, তাকলীদ-এর প্রতি বাধ্যবাধকতাও ইজমা'-এর দ্বারা স্বীকৃত)। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল ও ইব্‌ন শুরায়হ-এর মতে তাঁহাকে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে–কাহার প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করিতে এবং কাহার অনুসরণ করিতে হইবে (মতামতের এই বৈসাদৃশ্য প্রকৃতপক্ষে কেবল শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ)। তত্ত্বগতভাবে কোন মুকাল্লিদ তাহার জন্য প্রতিটি প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটি নূতন মুজতাহিদ নির্বাচন করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবে সে সাধারণত ৪টি স্বীকৃত মুজতাহিদের যে কোন একটির মাযহাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য মনস্থির করে। এক মাযহাব হইতে অপর মাযহাবে শরীক হওয়ার কয়েকটি উদাহরণ রহিয়াছে (তু. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, পৃ. ২৫; ২য় সং., পৃ. ৪৮-৫০)। তাত্ত্বিক দিক হইতে এইরূপ মত পরিবর্তন অনুমোদনযোগ্য কিনা সেই সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে (তু. Juynboll, Handleiding, ৩য় সং., পৃ. ২২)। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোন বিশেষ প্রশ্নে অপর কোন মাযহাবের অধিকতর সুবিধাজনক আইনটি অনুসরণ করা হয়; ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ধরনের তাকলীদের সম্ভাব্যতা প্রসংগে ইংগিত দান করা হইয়াছে; কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে নির্দেশ হইতেছে যে, কার্যটি উহার সমাপ্তি পর্যন্ত সম্পাদন করিতে হইবে এবং তাহা নির্বাচিত মাযহাবের নির্দিষ্ট আইন মান্য করিয়াই করিতে হইবে।

ফিক্‌হ-এর প্রশ্নে এই সকল বক্তব্যই তাকলীদের জন্য প্রযোজ্য। 'আকাইদ অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বের মৌল প্রশ্নাবলী (যথা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব) প্রসংগে তাকলীদ অবশ্য পালনীয় অথবা ইহা অনুমোদিত—এই মতামতের সংগে সংগে এই দৃষ্টিভঙ্গিও বিরাজমান যে, ইহা অনুমোদিত নয়। কারণ এই সকল প্রশ্নে জ্ঞানের প্রয়োজন রহিয়াছে, যাহা শুধু তাকলীদ দ্বারা অর্জন করা যায় না। মৌলিকভাবে মু'তাযিলী মতবাদী এই ধারণাটি আশ'আরী গোষ্ঠী দ্বারা ইসলামে বিস্তারিত প্রসার লাভ করে (তু. Goldziher, Vorlesungen, পৃ. ১২৩ এবং ১৩৬, টীকা ১০; ২য় সংস্করণ, পৃ. ১২১ ও ৩২৭, টীকা ৭২)।

আইনের ক্ষেত্রে তাকলীদ নীতি বিনা প্রতিবাদে মৌল ইসলামের প্রবর্তন করা যায় নাই; এমনকি পরবর্তী কালে এমন 'আলিমবর্গের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা ঘোষণা করেন যে, সর্বক্ষেত্রেই একজন মুজতাহিদ থাকিতে হইবে; যথা ইব্‌ন দাকীক আল-'ঈদ (মৃ. ৭০২/১৩০২) অথবা আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) অথবা অন্যত্র অনেকে তাঁহাদিগকে অসীম ইজতিহাদের অধিকারীরূপে দাবি করেন, যেমন আল-জুওয়ায়নী (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫) ও আস-সুয়ূতী। এমনকি কেহ কেহ মনে করেন যে, ইজতিহাদ পরবর্তী যুগের আলিমদের জন্য অবশ্য করণীয় এবং তাঁহারা তাকলীদ পদ্ধতির নিন্দা করিয়াছেন, যেমন দাউদ ইব্‌ন আলী, ইব্‌ন হাযম ও জাহিরী অপরাপর কর্তৃপক্ষগণ এবং ইব্‌ন তায়মিয়া ও ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যার ন্যায় কতিপয় হাম্বালী ফাকীহ, যাঁহাদের রচনায় সনাতনী ধারায় ইজতিহাদের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। ওয়াহ্‌হাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গি এই সকল হাম্বালীর সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ এবং ইঁহারা তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা ইব্‌ন আবদিল-ওয়াহ্‌হাব-এর সময় হইতেই তাকলীদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন (তু. হাম্বালী-ওয়াহহাবী গ্রন্থসমূহ ও কায়রোস্থ মানার মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত প্রচার-পুস্তিকাসমূহ এবং আল-কাওলুল-মুফীদ ফী আদিল্লাতিল-ইজতিহাদ ওয়াত-তাকলীদ, যাহাতে বিশেষভাবে ইজতিহাদ- তাকলীদ প্রশ্নটি আলোচিত হইয়াছে)।

হাম্বালীগণের ন্যায় তাহাদের চরম বিরুদ্ধবাদী, ইসলামী আধুনিকতাবাদিগণও যাঁহাদের ক্ষেত্রে ইহা সত্য যে, হাম্বালীগণ তাঁহাদের পথপ্রদর্শক, তাকলীদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং নূতনভাবে ইজতিহাদ করার রীতি প্রবর্তন করেন যাহা বিধিনিষেধের কড়াকড়ির দিক হইতে আইনগত বিকাশধারার প্রাথমিক পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উদার সময়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে (তু. Hartmann, Die Krisis des Islam এবং বিভিন্ন আধুনিকতাবাদী গোষ্ঠীর রচনাবলীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহ শারী'আ প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে)। আধুনিক কালে মিসরীয় ফাকীহগণ শারীআতের বিধিবিধানের প্রায়ই কিছু সংযোজন-বিয়োজন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের দাবি হইল যে, তাঁহারা যথাসম্ভব প্রাচীন মুজতাহিদগণের ফাতাওয়ার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহা করেন। হাম্বালী-ওয়াহ্‌হাবীগণের ন্যায় ইবাদী গোষ্ঠীও তাকলীদ পরিত্যাগ করেন, তদুপরি শীঈগণ তাকলীদের সনাতনী মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। ইছনা আশারী শীঈ মতে যে সময়ে "লুক্কায়িত ইমাম" লোকচক্ষুর অগোচরে থাকেন, সে সময়ে মুজতাহিদগণ বর্তমান থাকেন যাঁহারা ইমামের প্রতিনিধিরূপে বিশ্বাসিগণকে পথ প্রদর্শন করেন। যেহেতু ইহাদের জন্য সর্বসময়েই ধর্মীয় ব্যাপারে জীবন্ত শিক্ষক বর্তমান, তাই কোন মৃত ব্যক্তির অনুসরণে তাকলীদ পালন নিষিদ্ধ (তু. Frank, in Islamica, ২খ, ১৭১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উদ্ধৃত রচনাবলীর অতিরিক্ত ঃ (১) Lane, Arab-Engl. Lexicon; (২) Sprenger, Dictionary of the Technical Terms (Bibliotheca Indica), পৃ. ১১৭৮ (সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নয়); পরিভাষা সম্পর্কে (৩) উসূল গ্রন্থাবলী; (৪) Juynboll, Handleiding, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ২৩ ও টীকা ১; (৫) Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, ২খ, নির্ঘণ্ট।

J. Schacht (E.I. [1])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

তাকলীফ (تكليف) ঃ অর্থ কোন প্রকার বিধিনিষেধ, দায়িত্ব আরোপ করা; ইহাতে এমন কোন কার্য সম্পাদন করিতে হয় যাহা কষ্টসাধ্য (Lane, Suppl., পৃ. ৩০০২ গ.; Lisan, ১১খ., ২১৮)।

امرء بما يشق عليه এই মাস্‌দার হইতে গঠিত ক্রিয়াপদটি (যেমন لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا কুরআন মাজীদে সাতবার ব্যবহার করা হইয়াছে (২ ঃ ২৩৩, ২৮৬; ৪ ঃ ৪৬; ৬ ঃ ১৫৩; ৭ ঃ ৪০; ২৩ ঃ ৬৪; ৬৫ ঃ ৭) এবং বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ কাহারও উপর এমন দায়িত্বের বোঝা চাপান না, যাহা তাহার সামর্থ্য (وسع) বহির্ভূত। প্রায়োগিকভাবে ইহার অর্থ এই হয় যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি সকল জীবের জন্য তাহাদের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র কালামে নির্ধারিত পন্থায় বিশ্বাস ও কার্য করা ওয়াজিব। অধিকাংশ ফাকীহ তাকলীফ-এর এই ফিক্‌হী ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহাতে এমন কার্যের দায়িত্ব অর্পণ (الزام)-সূচিত হয় যাহা সম্পন্ন করিতে কষ্ট স্বীকার ও ত্যাগ প্রয়োজনীয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে শুধু আবশ্যিকভাবে করণীয় (واجب) ও নিষিদ্ধ (حرام) বা পরিত্যাজ্য কর্মের ক্ষেত্রেই ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু কোন কোন ফাকীহের ব্যাখ্যায় তাক্‌লীফ বলিতে বুঝায় একটি বিশ্বাসের ঘোষণা এবং তাহা এই যে, অর্পিত দায়িত্বটি শারীআত-এর বিধানভুক্ত। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাক্‌লীফ একাধারে সুপারিশকৃত কর্ম (المندوب), অপছন্দনীয় কর্ম (المكروه) এবং জাইয (Permitted-المباح) কর্মাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। অধিকন্তু মুকাল্লাফ (مكلف) কে এই প্রশ্নেও মতবিরোধ রহিয়াছে। ইহা স্বীকৃত যে, প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্ক (عاقل) ও সাবালক (بالغ) মানব (انسان) মাত্রই মুকাল্লাফ (Juynboll, Handbuch, পৃ. ৬৯)। কিন্তু মুহাম্মাদ (স)-এর রিসালাত-এর ক্ষেত্রে জিন (جن)-ও এই তাক্‌লীফ-এর অধীন; কারণ তাঁহাকে জিনদেরও নবীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে, অন্য নবীদের কেহই জিনদের প্রতি প্রেরিত হন নাই। একইভাবে ফেরেশ্‌তাগণের জন্যও এই তাক্‌লীফ প্রযোজ্য, যদিও ইহা শুধু তাহাদের বাধ্যতামূলক কর্মাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ বিশ্বাস (ঈমান) তাহাদের মধ্যে সহজাত এবং আবশ্যিকভাবে (ضرورى) বিদ্যমান। কেহ কেহ মনে করেন যে, যেহেতু তাহাদের সহজাত প্রকৃতি হইল আল্লাহ্‌র আনুগত্য, সুতরাং তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধির খাতিরেই (لتشريفهم) কেবল ফেরেশ্‌তাগণকে মুহাম্মাদী (স) শারীআতের এই তাকলীফের আওতাভুক্ত করা হইয়াছে (তু.) আল-ফাদালীকৃত কিফায়া সম্পর্কে আল-বায়্‌জুরীর অভিমত, কায়রো সং. ১৩১৫ হি, পৃ. ১৩)। কেহ কেহ এমনকি নির্জীবদের (আল-জামাদাত-الجمادات) প্রতিও এই তাক্‌লীফ প্রযোজ্য মনে করেন। কারণ মুহাম্মাদ (স)-এর কোন কোন অলৌকিক (মু'জিযাত-معجزات) ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায়, কিছু কিছু নির্জীব পদার্থে আল্লাহ চেতনা ও যুক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন যদ্দারা বস্তুগুলি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। তাকলীফ মা লা য়ুতাক (تكليف ما لا يطاق) "সাধ্যাতীত কোন কর্মের দায়িত্ব অর্পণ আল্লাহ করেন কিনা ইহা আর একটি বিতর্কিত বিষয়। মাতুরীদী মায্‌হাবের অনুসারিগণ কুরআন-এর উদ্ধৃতি দিয়া এই দাবি করেন যে, যাহা কোন প্রাণীর সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে (ما ليس فى وسعه) তদ্রূপ কর্মের দায়িত্ব কাহারও উপর আল্লাহ অর্পণ করেন না (তু. তাফতাযানী-র শারহ্‌সমেত, আকাইদ নাসাফী, পৃ. ১০৩)। আশ্‌আরী-র অনুসারী আল-ঈজী তাঁহার প্রণীত মাওয়াকিফ গ্রন্থে (বূলাক সং. ১২৬৬ হি., পৃ. ৫৩৫, ৫৩৭) আল্লাহ্‌র নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রসঙ্গে এই প্রশ্নটির আলোচনায় বলেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও কার্যকে কোনভাবেই সীমাবদ্ধ করা যায় না; তাঁহার উপর কোন কর্ম আবশ্যিক (واجب) নাই এবং তাঁহার নিকট হইতে উদ্ভূত কোন কিছুই দূষণীয় (কাবীহ-قبيح) নহে। মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে একটি ঐকমত্য (اجماع) রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ কোন কাবীহ কর্ম করেন না এবং প্রয়োজনীয় (ওয়াজিব) কাজ অসম্পূর্ণ রাখেন না। তাঁহার মতে আশ্‌আরীগণ মনে করেন যে, কাবীহ ও ওয়াজিব-এর সহিত আল্লাহ্‌র কোন সংশ্রব নাই। অন্যপক্ষে মু'তাযিলীগণ মনে করেন যে, যাহা করা কাবীহ আল্লাহ তাহা করেন না এবং যাহা তাঁহার অবশ্য করণীয় বা ওয়াজিব তাহা তিনি অবশ্যই করেন (আত-তাফ্‌তাযানী এবং আল-ঈজী-তে সুদীর্ঘ কালামশাস্ত্রীয় আলোচনা দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Dictionary of technical terms, "তাকলীফ" প্রবন্ধ, পৃ. ১২৫৫।

D. B Macdonald (E. 1.[1])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

আত-তাকাছুর (التكاثر) ঃ পবিত্র কুরআনের একটি সূরা, এক রুকূ'বিশিষ্ট এই সূরার আয়াত সংখ্যা তিন (সূরাটি মাক্কী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও আলিমগণের ইহাতে দ্বিমত রহিয়াছে), নামকরণ সূরার তৃতীয় শব্দটি হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহা পবিত্র কুরআনের প্রাচীন সূরাসমূহের একটি। ইহার অবতরণ ক্রমিক ষোল, তবে তিলাওয়াত ক্রমিকে [মুসহাফ-ই উছমানীতে বিদ্যমান রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত বিন্যাস অনুসারে] ইহার সংখ্যা এক শত দুই। বিষয়বস্তুর আলোকে নবূওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে ইহা নাযিল হয় বলিয়া কথিত।

ইসলাম ও আল-কুরআনের মৌলিক লক্ষ্যসমূহের অন্যতম পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও পার্থিব সম্পদের প্রতি মোহগ্রস্ত হওয়ার ক্ষতির বিবরণ ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে। মানবজাতিকে আখিরাতমুখী ও তথাকার বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহান্বিত করিয়া তোলা এই সূরার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ধারায় মুশরিকদের বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে গোটা মানবজাতিকে এই ব্যাপারে সতর্ক করা হইয়াছে যে, ধনসম্পদের আধিক্যের প্রতিযোগিতা এবং পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ তাহাদিগকে অত্যধিক মোহগ্রস্ত করিয়াছে। ফলে তাহারা আমৃত্যু উহাতে লিপ্ত রহিয়াছে এবং ধার্মিকতা ও নৈতিকতার দাবি হইতে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি তাহাদের এই অবস্থা অব্যাহত থাকিলে পরিণামে জাহান্নামের মুখ দর্শন করিবেই এবং জাহান্নাম ও ইহার আযাব এতই সুনিশ্চিত যে, মৃত্যুর সাথে সাথে উহার প্রত্যক্ষ স্থান লাভের পূর্বেই বিশ্বময় বিদ্যমান আলামতগুলি নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করিলে এই পৃথিবীতেই উহার সম্যক অবগতি লাভ করা যায়। শেষ আয়াতে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সকলের জন্য নি'মাতের জওয়াবদিহির কথা বলিয়া সাবধান করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশরাফ আলী থানাবী, বায়ানুল- কুরআন এবং অন্যান্য নূতন-পুরাতন প্রচলিত তাফ্‌সীর গ্রন্থ।

ইনায়াতুল্লাহ্ (দা. মা. ই.)/মুহাম্মদ ইসমাইল

তাকাশ (تكش) ঃ তুর্কী উচ্চারণ Tekesh ইবনুল-আর্‌সলান ছিলেন সর্বাপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল ও চতুর্থ খাওয়ারিয্‌ম শাহ্ (দ্র.) রাজবংশের একজন শাসক, যিনি ৫৬৭-৫৯৬/১১৭২-১২০০ সাল পর্যন্ত খাওয়ারিয্‌ম [দ্র.] শাসনকর্তা ছিলেন। রাজাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি সীর দারয়া [দ্র.]-র নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত জান্‌দ-এর গভর্নর ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই সুলতান শাহ-এর সহিত রাজক্ষমতা লাভের জন্য একাধিক যুদ্ধ করিতে হয়। সেই যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রথমে তাকাশ এবং পরবর্তীকালে তাঁহার ভাই সুলতান শাহ্ কারাখিতাঈ ([দ্র.]-এর সাহায্য লাভ করেন।

যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন তাকাশ বিজয়ী হন, তখন কারাখিতাঈ-এর সাহায্যে সুলতান শাহ নিজেকে মার্‌ব (Merw), সারাখ্‌স্ ও তূস্ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ৫৮৯/১১৯৩ সালে

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ভূখণ্ড নিজের অধিকারে রাখেন। এই সময়ের মধ্যে দুই ভাইয়ের সম্পর্ক থাকে কখনও বিরোধপূর্ণ আবার কখনও শান্তিপূর্ণ। ইতিপূর্বে ৫৮৩/১১৮৭ সালের রাবী'উল-আওয়াল কিংবা রাবী'উছ-ছানী মাসে তাকাশ খুরাসানের রাজধানী নীশাপুর দখল করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মালিক শাহ্‌কে উহার গভর্নর নিযুক্ত করেন। সুলতান শাহের ইনতিকালের পর মালিক শাহ্‌কে মারব-এর গভর্নর পদ হইতে অপসারণ করিয়া তাঁহার ভাই কুতবুদ-দীন মুহাম্মাদকে নীশাপুরের গভর্নর নিয়োগ করা হয়। ৫৯০/১১৯৪ সালে সুলতান দ্বিতীয় তুগরিল-এর সহিত যুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে পারস্য-ইরাকে (ইরাক 'আজামীতে) সালজূক শাসনের পতন ছিল অধিকতর গুরুত্বহ ঘটনা। এই বিজয়ের ফলে তাকাশের মর্যাদা একজন আঞ্চলিক রাজবংশ পত্তনকারী হইতে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন একজন "সুলতান"-এ উন্নীত হয়। অতঃপর তিনি তাঁহার মুদ্রায় নিজেকে খাওয়ারিযম শাহ-এর পরিবর্তে খাওয়ারিযম শাহ-এর পুত্র "সুলতান" আখ্যায় অভিহিত করিতে থাকেন। আর-রায় (Raiy)-সহ পারস্য-ইরাক ও হামাযান তাকাশের অধিকারভুক্ত হয় এবং তিনি তাঁহার পুত্র য়ূনুসকে হামাযানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আযারবায়জানের শাসক আবূ বাক্‌র-এর নিকট হামাযান হস্তান্তর করেন, যিনি তাঁহার ভাই ও অবশেষে উত্তরাধিকারী উজবেগ-কে সামন্ত শাসক হিসাবে তথায় প্রেরণ করেন। ৫৯২/১১৯৬ সালে খলীফা নাসির-এর একটি বাহিনী হামাযানে পরাজিত হয়। খলীফার দাবি ছিল, তাকাশ তাঁহার দখলকৃত এলাকা ছাড়িয়া পূর্ব দিকে সরিয়া যাইবেন। কিন্তু তাকাশ তাঁহার অধিকৃত এলাকা ছাড়িবেন না, এমনকি তিনি খলীফার নিকট খূযিস্‌তানও দাবি করেন। সুলতান দ্বিতীয় তুগ্‌রিলসহ পূর্ববর্তী অন্যান্য সালজূক শাসকের মতই বর্ণিত হয়, তাকাশ দাবি করেন যে, খলীফা বাগদাদের পার্থিব (secular) শাসন ক্ষমতা তাঁহার নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং নিজে নামমাত্র মুসলিম জাহানের কর্তৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। সেই দফায় এই বিরোধের নিষ্পত্তি হইল না, বরং তাকাশের উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদের শাসনকাল পর্যন্ত বিরোধ অব্যাহত থাকে।

তাকাশ ও কারা-খিতাঈ-এর মধ্যকার যুদ্ধসমূহ সম্পর্কে এখনও পূর্ণ তথ্য জানা যায় নাই। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ Tornberg, (১০খ, ৮৮ প.) ৫৯৪/১১৯৮ সালের ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অবশ্য মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুআয়্যাদ আল-বাগদাদী কর্তৃক সংগৃহীত হি. ৫৭৬-৫৭৯ সময়কালের রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রের মধ্যে এই ঘটনা সম্পর্কিত একটি দলীল পাওয়া যায়। সে যাহাই হউক, তাকাশ-এর সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং মুসলিম জাহানে একটি বিরাট ক্ষমতার অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও তাকাশ তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত কারা-খিতাঈ-এর অধীনে একজন সামন্ত হিসাবেই থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বিশেষভাবে তু. G. M S. xiv/i (হামদুল্লাহ কায্‌বীনী), পৃ. ৪৯১-৪৯৩; (২) ঐ পুস্তক, ১৬/২খ. (জুওয়ায়নী), পৃ. ১৭-৪৬; (৩) ঐ লেখক, New Series, ii (রাওয়ানদী), পৃ. ৩৭৫-৩৯৯; (৪) ইবনুল-আছীর, সম্পা. Tornberg, index; (৫) W. Barthold, Turkestan v epokhumongol, skago nashestviya, ii, 361-374; (৬) ঐ লেখক, Trukestan down to the Mongol Conquest, G. M. S. New Series, v. p. 337-349; (৭) নিবন্ধে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় কাগজপত্রাদির সংগ্রহ প্রসঙ্গে তু. Catal, Lugd., i, 169 প.; (৮) Excerpts in Barthold, op. cit., i. 73 প.।

W. Barthold (E. I. [1])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

তাকিয়্যা (تقية) ঃ আ, মাস্‌দার (ক্রিয়ামূল); শব্দমূল و-ق-ى; ব্যবহার وقى-يقى-تقى-قناء 'ওয়াও'-কে তা দ্বারা এবং 'হাম্‌যাহ্'-কে 'য়া' দ্বারা পরিবর্তিত করা হইয়াছে। অর্থ সতর্কতা, ভীতি, পরিত্রাণ, আত্মরক্ষা (দ্র. লিসানুল-আরাব, বৈরূত, ১৫খ,; কামূস; মাজ্‌মাউল-বাহ্‌রায়ন; وقى ধাতুমূল প্রসংগ)। শী'আ ফিক্‌হের পরিভাষায় "কাহারও ক্ষতিসাধন আশংকায় স্বীয় বিশ্বাস ও মতাদর্শের পরিপন্থী উক্তি বা কর্ম প্রকাশ করিয়া আত্মরক্ষা করা" (তাবারসী, মাজ্‌মাউল-বায়ান, ১খ, ১৭৪; শায়খ মুরতাদা, মুলহাকাতু কিতাবিল-মাকাসিব, রিসালা আত-তাকিয়্যা, ৩১৯; আল্-কালামু ফী সালাতিল-জুমুআ, পৃ. ৯৪১)। এইরূপ অনুমতি বা কর্মপন্থার বৈধতার অনুকূলে শী'আ মতাবলম্বিগণ নিম্নোক্ত কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করিয়া থাকে ঃ

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَيْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ .

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সহিত আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকিবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন" (৩ ঃ ২৮)।

এই আয়াতে تقة শব্দকে تقية রূপেও তিলাওয়াত করা হইয়াছে (দ্র. বুখারী, তৃতীয় চতুর্থাংশ, পৃ. ২১২, وقال الحسن لتقية الى يوم القيامة হাসান (বাস্‌রী) [র] বলিয়াছেন, তাকিয়্যা কিয়ামত পর্যন্ত চলিতে থাকিবে (বুখারী, চতুর্থ-চতুর্থাংশ, কিতাবুল-ইক্‌রাহ্, পৃ. ৩৩৫; মাজ্‌মাউল-বায়ান, ১খ, ১৭৪; আত্-তূসী, তাফসীরুত-তিব্‌য়ান, পৃ. ৩৫৬)।

দুই ঃ পবিত্র কুরআনে সূরা ঃ ১৬ ঃ ১০৬ আয়াত (অর্থ ঃ) "কেহ তাহার ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তাহার জন্য নহে, যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানের উপর অবিচলিত থাকে (اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِيْمَانِ)। এই আয়াতে বক্তব্য প্রকাশে কাফিরদের সংগে আনুকূল্য প্রকাশের ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির বৈধতা প্রদান করা হইয়াছে বা বিশেষ পরিস্থিতিতে মৌখিকভাবে কুফরী কথা উচ্চারণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে (মাজমাউল-বায়ান, ২খ, ৪৭; তিব্‌য়ান, তাবারী ইত্যাদি, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর প্রসংগ)।

তিন ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা ঃ ২ ঃ ১৯৫ আয়াত وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ "তোমরা নিজেরা নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।" এই আয়াতের প্রসঙ্গ আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা সম্পর্কিত হইলেও উহা ব্যাপক ও সার্বিক অর্থে প্রযোজ্য এবং এই কারণে আয়াতটি জান মাল ও ইয্‌যাত বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণরূপেও স্বীকৃত হইয়াছে (মাজমাউল-বায়ান, ১খ., ১১৮)।

চার ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা ৪০ ঃ ২৮ আয়াতে وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهُ "ফির'আওন বংশের এক ব্যক্তি, যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখিত, বলিল" (মাজমাউল-বায়ান, ২খ,

পৃ. ২১১; তিব্‌য়ান, ২খ, পৃ. ৫৩১; আস-সাফী, পৃ. ৪৭১; আল-বুরহান, ২খ, পৃ. ৯৫১)।

এই আয়াতে ঈমান গোপন করাকে স্পষ্টত প্রশংসার ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে যাহাতে বুঝা যায়, বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও সুষ্ঠুতা ও আল্লাহ্‌র ভয় যথাযথ থাকিলে মুখে ঈমানের পরিপন্থী কিছু বলা কিংবা কিছু করার বৈধতা রহিয়াছে। তবে এই বৈধতা সার্বিক ও নিঃশর্ত নহে, বরং ইহাতে প্রথম শর্ত এই যে, ক্ষতির আশংকা থাকিতে হইবে এবং অনিষ্ট প্রতিরোধ করা লক্ষ্য হইতে হইবে, অবশ্য সেই ক্ষতি জীবনের ও সম্পদের ক্ষতি হউক কিংবা ইয্‌যাত-আবরূর ক্ষতি হউক। শুধু উপকারিতা লাভ কিংবা স্বার্থ হাসিলের জন্য এই ধরনের উক্তি উচ্চারণ করিলে কিংবা কার্য সম্পাদন করিলে তাহাকে তাকিয়্যা বলা হইবে না।

দ্বিতীয় শর্ত এই যে, এই ধরনের উক্তি ও কর্মের সম্বন্ধ হইতে হইবে আল্লাহ্‌র অধিকার (حق الله) এবং ধর্মের ফরয ও আবশ্যকীয় বিষয়াদির সঙ্গে। সুতরাং বান্দার অধিকার (حق العباد), বিশেষত কোন মু'মিনের জীবননাশ হইতে পারে এই ক্ষেত্রে তাকিয়্যা ব্যবহার করা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে হাদীছে রহিয়াছে ঃ انما شرعت التقاه لحقن الدماء فاذا ابلغ الدم فلا تقية "তাকিয়্যা অনুমোদিত হইয়াছে জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে, সুতরাং যদি জীবননাশ পর্যন্ত উপনীত হয় তাহা হইলে কোন তাকিয়্যা (বৈধতা) নাই" (আল-কাফী; সাফীনাতুল-বিহার; রাসাইলু মুলহিকাতিল-মাকাসিব)। অনুরূপ নিজের ইজ্জত রক্ষার জন্য অন্যের ইজ্জত বিনষ্ট করা কিংবা স্বীয় সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে অন্যের সম্পদের ক্ষতিসাধন করিলে তাহা তাকিয়্যা হইবে না।

তৃতীয় শর্ত এই যে, তাকিয়্যার কারণে দীনের মৌলিক কোন বিষয় ক্ষতিগ্রস্ত যেন না হয়। যেমন কোন ফকীহ বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় ও বরেণ্য ব্যক্তির এমন কোন (কথা বলা বা) কর্ম সম্পাদন করা, যাহা সাধারণ মানুষের জন্য প্রমাণ ও সনদ সাব্যস্ত হইতে পারে–এইরূপ ক্ষেত্রেও তাকিয়্যা অনুমোদিত নহে। সুতরাং এই সকল কার্যকারণ ও শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে শীআ ফকীহগণ তাকিয়্যা ওয়াজিব, হারাম, মুস্‌তাহাব, মাক্‌রূহ ও অনুমোদিত (মুবাহ) হওয়ার ক্ষেত্রসমূহের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং তাকিয়্যার সংশ্লিষ্ট বিধি-উপবিধি বিন্যস্ত করিয়াছেন (শায়খ মুরতাদা, মুলহাকাতুল- মাকাসিব, তাকিয়্যা প্রসংগ, পৃ. ৩২২)।

তাকিয়্যা সুনিশ্চিতভাবেই কোন আকীদা-বিশ্বাস ও মতাদর্শগত বিষয় নহে, বরং ইহা পূর্ণাঙ্গরূপে ফিক্‌হী বিধিমালার অন্যতম বিধি যাহার অনুকূলে (ও প্রতিকূলে) পবিত্র কুরআন ছাড়াও হাদীছ ও সুন্নাহ ও উসূলুল ফিক্‌হ-এর আলোকে এবং যুক্তি ও বুদ্ধির দর্শনে স্ব স্ব ভংগিমা ও দৃষ্টিকোণ হইতে প্রমাণীকরণের প্রয়াস চালানো হইয়াছে। কখনও বা তাকিয়্যাকে উদার নৈতিকতা ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি অর্থেও প্রয়োগ করা হইয়াছে (সাফীনাতুল-বিহার, ২খ, ধাতুমূল প্রসংগ)।

শী'আ মতাবলম্বী পূর্বসুরীদের (মুতাকাদ্দিমীন) ফিক্‌হ ও কালামশাস্ত্রীয় রচনাবলীতে তাকিয়্যা কোন স্বতন্ত্র শিরোনাম ও পৃথক আলোচ্য বিষয়রূপে স্থান পাই নাই। উত্তরসুরি (মুতাআখখিরীন)-দের মাঝে শায়খ মুরতাদা আনসারী (মৃ. ১২৮১/১৮৬৪-৬৫) তাঁহার বিখ্যাত ও বহুল প্রচলিত গ্রন্থ আল-মাকাসিব-এর ভংগিতে তাকিয়্যা বিষয়টি উপস্থাপন করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে ফিক্‌হী প্রমাণীকরণ সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা লিখিয়াছেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে তাকিয়্যা ব্যাপারটি শী'আদের সংগে এই কারণে বিশেষভাবে সম্পর্কিত যে, শী'আ ভিন্ন অন্য মতাবলম্বী সরকারসমূহের যুগে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে ভ্রান্ত মতাবলম্বী মনে করা হইত। জনসাধারণের বিদ্রূপ-কটাক্ষ এবং অতি সাম্প্রদায়িক ও পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাবসম্পন্ন লোকদের কারণে তাহাদের নিজেদের মতাদর্শ ও কর্মপন্থার স্বাধীন প্রকাশে জান-মাল-ইজ্জতের ব্যাপারে আশংকা দেখা দিত। এই কারণে (শী'আদের ধারণায়) আহ্‌লুল বায়ত ইমামগণের শিক্ষা-দীক্ষায় তাকিয়্যা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়াছে (সায়্যিদ মুরতাদা হুসায়ন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ [প্রবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত (১) Goldziher, Z. D. M. G, ৬০খ. (১৯০৬ খৃ.), পৃ. ২১৩-২২৬ (যেইখানে আরও উদ্ধৃতি-উৎস উল্লিখিত রহিয়াছে)। ইসলামী গ্রন্থসমূহঃ (২) জাফার ইব্‌ন হুসায়ন আল-হিল্লী, শারাই'উল-ইসলাম, সেন্ট পিটার্‌সবার্গ ১৮৬২ খৃ., ১৪৯ প.; (৩) ইবনুল-মুতাহ্‌হার আল-আল্লামা আল-হিল্লী, মুখ্‌তালাফুশ-শী'আ, তেহরান ১২৩ হি., ২খ., ১৫৮ প.; (৪) Horovitz, Isl.-এ, ৩খ, ৬৩-৬৭; (৫) শায়খ মুরতাদা আন্‌সারী (মৃ. ১২৮১ হি.), মুলহাকাতু কিতাবিল-মাতাজির, (যাহা) আল-মাকাসিব নামে প্রসিদ্ধ, ইরানে মুদ্রিত ১৩১৪ হি., পৃ. ৩১৯, ৩২২; (৬) আল-কুলায়নী (মৃ. ৩২৮/৯৩৯), আল-কাফী ফী 'ইলমিদ-দীন, তেহরান ১৩৭৫ হি., ২খ...; (৭) মুহসিন আমীন আল-আমিলী (মৃ. ১৩৭৭ হি.), আ'য়ানুশ-শী'আ, ১/২খ., বৈরূত ১৩৭০/১৯৫১; (৮) শায়খ আব্বাস কুম্মী (মৃ. ১৩৫৯/১৯৪০), সাফীনাতুল-বিহার, নাজাফ ১৩৫৫ হি., ২খ., وقى শব্দমূল প্রসংগ; (৯) ফাখ্‌রু'দ-দীন মুহাম্মাদ তারীহ্ ইব্‌ন আলী নাজাফী (মৃ. ১০৫৮ হি.), মাজ্‌মা'উল-বাহরায়ন ওয়া মাতলা'উন-নায়্যিরায়ন (مجمع البحرين ومطلع النيرين), ইরানে মুদ্রিত, (وقى শব্দমূল প্রসংগ)।

যায়দী (শী'আদের) গ্রন্থসমূহ ঃ (১০) মাখ্‌তূতাত বার্লিন ৯৬৬৫, পাতা ৩৫-'ক', ৪৮৭৮, পাতা ৯৬ 'খ'; (১১) C. Van Arendonk, De opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen, লাইডেন ১৯১৯ খৃ. (নির্ঘণ্ট দ্র.); (১২) R. Strothmann, Das Staatsrecht der Zaiditen, স্ট্রাসবুর্গ ১৯১২ খৃ., পৃ. ৯০.। খারিজী গ্রন্থপঞ্জীঃ (১৩) আল-বাসীবী, মুখ্‌তাসার, যান্‌জিবার ১৩০৪ হি., পৃ. ১২৩; (১৪) জুমায়্যিল ইব্‌ন খামীস, কামূসুশ-শারী'আ, যান্‌জিবার ১২৯৭-১৩০৪ হি., পৃ. ১২৭ প. ও পৃ. ১৫৭।

দুরূযী (দ্রুজ) গ্রন্থসমূহ ঃ (১৫) বার্লিন ক্যাট. ৮১৪ Mg. (Ahlwardt-এ উল্লিখিত হয় নাই), পাতা ১১খ.। সুন্নী গ্রন্থসমূহ ঃ (১৬) হাসান ইব্‌ন মান্‌সূর আল্-জুন্‌দী (মৃ. ৫৯২ হি.), ফাতাওয়া-ই কাদী খান, লক্ষ্মৌ ১৯২৬ খৃ., ৪খ., ৮৩৪; (১৭) আবদুল-আলী বির্‌জান্‌দী (মৃ. আনু. ৯৩০/১৫২৪), শার্‌হু মুখ্‌তাসারিল-বিকায়া, নাওল কিশোর ১৩০১ হি., ৪খ., ১২৫; (১৮) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.), কিতাবুল- জামিইস্-সাহীহ, লাইডেন ১৮৬২-১৯০৮ খৃ.; (১৯) 'আয়নী (আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ, মৃ. ৭৬২ হি.), উম্‌দাতুল-কারী, শারহুল-বুখারী, শিরকাত্-ই সাহাফিয়্যা-ই উছমানিয়া, মু. ১৩০৮ হি., ৮খ., ৫১৩; (২০) আল-কুদূরী, মুখতাসার, কাযান ১৮৮০ খৃ., পৃ. ১৬২; (২১) আন-নাবাবী, মিনহাজুত-তালিবীন, Van den Berg, বাটাওয়াহ্ মু., ১৮৮২-১৮৮৪ খৃ., ২খ., ৪৩৩।

তাফসীর গ্রন্থসমূহ ঃ যথা (২২) আবূ আলী আল-ফাদল ইব্‌ন হাসান তাব্‌রাসী (মৃ. ৫৪৮ হি.), মাজমাউল-বায়ান ফী তাফ্‌সীরিল-কুরআন, তেহরান ১৩৮৬ হি.; (২৩) আবূ জাফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাসান তূসী (মৃ. ৪৬০ হি.), আত-তিবয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১৩৬৫ হি.

(সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ প্রসংগে); (২৪) আয্-যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮ হি.), আল-কাশ্‌শাফ, কলিকাতা ১৮৫৬ খৃ., পৃ. ১৩৩, ১৯৭; (২৫) আল-বায়দাবী (মৃ. ৬৮৫ হি.), পৃ. ১৬৩, আল-কুরআনুল-কারীম-এর হাশিয়া, মিসরীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত ১৩৫৫ হি.; (২৬) আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-খাযিন (মৃ. ৭৪১ হি.), লুবাবুত-তাবীল (তাফ্‌সীরুল-খাযিন), কায়রো ১৩৪৭ হি., ১খ, ২০১, ৩খ, ১৫১, ৪খ, ৫০; (২৭) আর-রাযী (মৃ. ৬০৬ হি.), মাফাতীহুল-গায়ব, ২খ, ৩২৪, ৬৪৪; ৫খ., ৩৫৫; ৭খ, ৩১৬; ৮খ., ৪১১; ইস্‌তাম্বুল ১৩০৭ হি.; (২৮) আবদুল-হাকক হাক্কানী (মৃ. ১৩৩৫ হি.), তাফসীরু ফাত্‌হিল-মান্নান (তাফ্‌সীর হাক্কানী), লাহোর ১৯৫১ খৃ., ৩খ., ১০৫; (২৯) ইব্ন হায্‌ম, আল-ফিসাল ফিল-মিলাল, কায়রো ১৩০৭ হি., ৩খ., ১১২ প., ৪খ, ৬; (৩০) আশ-শা'রানী, Balance de la loi musulmane, Perron, আল-জাযাইর মুদ্রণ ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ৪৫৬ প.।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমকালীন গবেষণা ঃ (৩১) মাহ্‌মূদ শুক্‌রী আলূসী, মুখ্‌তাসারুত-তুহ্‌ফাতিল-ইছনা আশারিয়্যা (مختصر التحفة الاثنا عشرية), বাগদাদ ১৩০১ হি., পৃ. ১৮৮-১৯৪।

R. Strothmann ও সায়্যিদ মুরতাদা হুসায়ন

[দুইটি সম্পূরক তথ্য পরিশিষ্ট]

দাইরাতুল-মাআরিফ কায়রো-তে সমকালীন বিশিষ্ট বিদ্বান আহ্‌মদ মুহাম্মাদ শাকির সংশ্লিষ্ট আলোচ্য বিষয়ে দুইটি টীকা সংযোজন করিয়াছেন। উহার তরজমা নিম্নে পত্রস্থ করা হইল ঃ

পরিশিষ্ট (১) ঃ আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের আলিমগণ ও তাহাদের অনুসারীবর্গের নিকট আত-তাকিয়্যা বিশেষ কোন পরিভাষার রূপ পরিগ্রহ করে নাই। এই কারণে বিভিন্ন ইলম ও বিষয়ভিত্তিক পরিভাষার জন্য রচিত গ্রন্থসমূহে এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইহা শী'আ বিদ্বানগণ ও তাঁহাদের অনুসারিগণের ব্যবহৃত পরিভাষা মাত্র।

পরিশিষ্ট (২) ঃ পবিত্র কুরআনের ৩ ঃ ২৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আল্লা বলেন ঃ

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ .

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেহ এইরূপ করিবে তাহার সহিত আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকিবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাহাদের নিকট হইতে আত্মরক্ষার জন্য 'সতর্কতা' অবলম্বন কর, আর আল্লাহ তাহার নিজের সম্বন্ধে তোমাদিগকে সাবধান করিতেছেন এবং আল্লাহ্‌র দিকেই প্রত্যাবর্তন"।

'তাকিয়্যা' (تقية) শব্দটি পবিত্র কুরআনের লিখন-রীতিতে تُقَاةً (তুকাতান) রূপে লিখা হইয়াছে। কুরআনের তিলাওয়াত বিশেষজ্ঞ চৌদ্দ কারীর তেরজনই শব্দটি تقة পড়িয়াছেন অর্থাৎ তা'-এ পেশ এবং কাফ-এ যবর-এর পরে আলিফ রহিয়াছে। (পক্ষান্তরে) ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবূ রাজা', কাতাদা, দাহ্‌হাক, আবূ হায়ওয়া, সাহ্‌ল, হুমায়দ ইব্ন কায়স (র) ও আসিম (র.)-এর রিওয়ায়াত অনুকরণে আল-মুফাদ্দাল ও চৌদ্দ কারীর অন্যতম য়া'কূব (র) প্রমুখ শব্দটি تقية পড়িয়াছেন, অর্থাৎ তা'-এ যবর, কাফ-এ যের ও যবরযুক্ত য়াতে তাশ্‌দীদ সহকারে। اتقى ও تقية উভয়ই (বাব افتعال) ক্রিয়ার মাসদার (ক্রিয়ামূল)। وقية মূলত تقاة ছিল। تجاة (মূল وجاة ও تكاة (মূল وقية)-এর ন্যায় ওয়াও-কে তা' দ্বারা পরিবর্তিত করা হইয়াছে এবং মাঝের য়া আলিফ হইয়া গিয়াছে। কেননা বর্ণ রূপান্তর বিধিতে রহিয়াছে যে, হারাকাতে (যাবর, যের, পেশ)-যুক্ত যা (বা ওয়াও)-এর পূর্বের হরফে যবর থাকিলে সে য়া' (বা ওয়াও) আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়। وقية-ও একটি মাসদার (ক্রিয়ামূল), যাহার মূল পরিমাপ (وزن বা موزن) فعلة হইল যথা التؤدة ও التخمة ইত্যাদি। فعل ও فعلة ওয়াযানে মাসদার অল্প সংখ্যক ব্যবহৃত হইয়াছে। تقية-فعلية পরিমাপের একটি মাস্‌দার (মূলত تقيئة ছিল)। বিধি অনুসারে হামযা-কে তাহার পূর্ববর্তী হরফের সমগোত্রীয় করার উদ্দেশ্যে য়া' দ্বারা পরিবর্তিত করার পর দুই য়া-কে সংযুক্ত ইদ্‌গাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে (অনুবাদক)। এই ওয়াযানেও মাস্‌দার অল্প ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা النميمة-আর افتعل-র জন্য তো এরূপ মাসদার অতি বিরল। এই ছিল উভয় কিরাআতের (পঠনরীতি) শাব্দিক বিশ্লেষণ। আবূ হায়্যান (র) আল-বাহ্‌রুল-মুহীত তাফসীর গ্রন্থে, ২খ, ৪২৪, অনুরূপ বিশ্লেষণই উপস্থাপন করিয়াছেন।

এই আয়াতের সংগে রহিয়াছে আর একটি আয়াত اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِيْمَانِ "তবে যাহাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত (তাহার জন্য শাস্তি নহে)" (১৬ ঃ ১০৬)। তাকিয়্যাতে বিশ্বাসিগণ এই দুই আয়াতের উপরেই তাহাদের নীতি দর্শন ও কর্মপন্থার ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী সময় উৎসাহী অনুগামী দল ইহার অর্থ নিয়া এত বেশী গবেষণায় লিপ্ত হইয়াছে যে, প্রকৃত অর্থ হয় বিকৃত হইয়াছে কিংবা অন্তত বিকৃতির একান্ত সন্নিকটে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

ইমাম ও পুরোধার সম্মানে অধিষ্ঠিত আলিমগণ ইহার যথার্থ উদ্দেশ্য নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অনুগামী সহচরগণ বলিয়াছেন, তাকিয়্যা আল্লাহ তাআলা-র পক্ষ হইতে একটি অবকাশবিশেষ (رخصة)। এই অবকাশ ও অনুমোদন অনুসারে আমল না করাই অধিক উত্তম এবং উহার যথেষ্ট মাহাত্ম্য রহিয়াছে। যেমন কাহাকেও জীবননাশের হুমকি দিয়া বাধ্য করা হইল, কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ কর, অন্যথায় তোমাকে শেষ করিয়া দেওয়া হইবে। এই অবস্থায় যদি সে কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ না করিয়া মৃত্যুবরণ করাকেই শ্রেয় মনে করে এবং পরিণামে তাহাকে হত্যা করা হয় তাহা হইলে এই ব্যক্তি জীবন বাঁচাইবার জন্য কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণের অবকাশ গ্রহণকারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ হইবে (এবং আল্লাহ্‌র কাছে ছাওয়াব পাইবে)। দীনের মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার সর্বক্ষেত্রের জন্য অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য অর্থাৎ দীনের ইজ্জত অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করা রুখ্‌সাত ও অবকাশ অনুমোদন অনুযায়ী আমল করিয়া জীবন রক্ষা করার চাইতে উত্তম ও প্রশংসনীয়।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্‌বাল (র)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি কেহ আপনার মাথার উপর তরবারি উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া যায়, তবে কি আপনি [তাহার কথা] মানিয়া নিবেন? তিনি বলিলেন, না। পরে তিনি বলিলেন, 'আলিম ব্যক্তি যদি তাকিয়্যার সুযোগ গ্রহণ করিয়া [চাপের মুখে নতি স্বীকার করে এবং প্রতিপক্ষের দাবি] মানিয়া নেয় আর অজ্ঞ, জাহিল ব্যক্তি তো জাহিলই বটে, তাহা হইলে সত্য প্রকাশ পাইবার উপায় ও পন্থা আর কি থাকিবে? উত্তরসূরিগণ পূর্বসূরিগণের সাহসিকতাপূর্ণ ঘটনাবলীর যে ধারাবিবরণী পরিবেশন অব্যাহত রাখিয়াছেন তাহাতে আমাদের ন্যায় নগণ্যদের কাছে মহান মনীষীদের

সম্বন্ধে অবিচ্ছিন্ন ধারায় এইরূপ বর্ণনাই উপস্থিত হইয়াছে যে, সাহাবা, তাবিঈন ও তাবে-তাবিঈন নিজেদের জীবন আল্লাহ্‌র জন্য কুরবান করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে ভর্ৎসনা ও তিরস্কারকারীদের বাক্যবাণ (বা দরদমাখা উপদেশ) তাঁহাদের উপর কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই কিংবা দুর্ধর্ষ অত্যাচারীর কঠোর আচরণ বা খড়্গ কৃপাণকে তাঁহারা একেবারেই তোয়াক্কা করেন নাই।

ইমাম রাযী (র.) [২খ, ৫৪৬] বলেন, তাকিয়্যা শুধু সেই সকল ক্ষেত্রেই বৈধ যাহাতে সত্য প্রকাশ ও দীনী বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু যেই সকল ক্ষেত্রে অন্য কাহারও জন্য অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বা কাহারও ক্ষতিসাধন করে, যথা কাহাকেও হত্যা করা, ব্যভিচার, সম্পদ অপহরণ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, সতী নারীর প্রতি যেনার অপবাদ উত্থাপন কিংবা শত্রুদিগকে (কাফির) মুসলমানদের (সামরিক ও অন্যান্য) দুর্বলতার ক্ষেত্র সম্বন্ধে অবহিতকরণ—এই সকল ক্ষেত্রে তাকিয়্যাঃ-র সুযোগ গ্রহণ নিশ্চতরূপেই অবৈধ হইবে।"

আমাদের উদ্ধৃত এই সকল বরেণ্য মনীষীর বাণী ও অন্যান্য আলিমের উক্তি-অভিমত যাহা গ্রন্থসমূহের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে–তদ্বারা স্পষ্টত ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাকিয়্যা একমাত্র চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে শুধু তেমন দুর্বলতম লোকের জন্য জাইয ও বৈধ হইবে, যে নিজের জীবন আযাব ও চরম সংকটের সম্মুখীন দেখিতে পায়। এইরূপ অবস্থায় সেই ব্যক্তি জুলুম-নিপীড়নের মাধ্যমে বাধ্যকারীর সামনে নিরুপায় অবস্থায় তাহার দাবি মানিয়া নিয়া সে যাহা বলিতে বাধ্য করে তাহা বাহ্যিক ও মৌখিকভাবে বলিতে পারে। তাহাও এই শর্তে যে, তাহার হৃদয়-মন ঈমান ও সত্যের প্রতি দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকিবে এবং বাহ্য শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে তাহার জীবন রক্ষা পাইবে ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধিত হইবে। সেই সাথে এই অপারগ ব্যক্তি সমাজের বুকে এমন মর্যাদা স্তরে অধিষ্ঠিত থাকিবে না যাহাকে অন্য লোকেরা অনুসরণ করিয়া থাকে। কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞাতদের কাছে সর্বদা সত্য প্রকাশ না পাওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। ফলে তাহাদের ঈমান দুর্বলতার শিকার হইবে এবং তাহার সত্য কথার সহায়তায় অগ্রগামী হইবে না। কেননা তাহারা নিজেদের পুরোধা–যিনি চাপের মুখে তাকিয়্যা করিয়া (অন্যায়) কথা মানিয়া নিয়াছিলেন, সত্য ও ন্যায় হইতে উদাসীন থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিবে। ইহা সেই ব্যাধি যাহা বিগত শতাব্দীগুলিতে মুসলমানদের দুর্বল করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের আলিম সমাজ, তাহাদের নেতৃবর্গ ও পুরোধাগণ জালিমদের প্রতিহত করিবার লক্ষ্যে তাহাদের উপরে কার্যকর আঘাত হানিতে সমর্থ হন নাই এবং যেইখানে সত্য প্রকাশের ক্ষেত্র ছিল সেইখানেও তাহারা নতজানু হইয়া পিছনে হটিয়াছেন। নিজেদের বড়দের এই দুরবস্থা দেখিয়া সাধারণ লোকেরা দ্রুত পতনের শিকার হইয়াছে। তাহাদের মানসিক শক্তি হ্রাস পাইতে থাকিল। শত্রুদের প্রভাব তাহাদের আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল এবং তাহারা সম্পূর্ণ অথর্ব হইয়া গেল। তাহাদের অবস্থার উপমা যেন প্লাবনের ঢল-বাহিত খড়কুটা ও আবর্জনার স্তূপ ও তাহার ভাসমান ফেনার তুল্য। অথচ তাহাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিগণ তেমন ছিলেন না। তাঁহারা তো আল্লাহ্‌র পথে বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ এবং কঠিন হইতে কঠিনতর সময়ে দুঃখ-কষ্ট সহিবার জন্য বুক টান করিয়া সামনে দাঁড়াইয়া যাইতেন। ভীরুতা ও কাপুরুষতা তাঁহাদের ধারে-কাছেও ঘেঁষিতে পারিত না এবং তাঁহারা শত্রুর সম্মুখ হইতে হটিবার নামও নিতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণের সীরাত ও জীবনাদর্শ এবং অতঃপর ইসলামের উজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের এ দাবির প্রধান সাক্ষী।

ইমামী শী'আদের নামে তাকিয়্যা সূত্রে যেসব অতিরঞ্জনমূলক ঘটনা সম্পৃক্ত করা হইয়াছে আমাদের ধারণায় সেইগুলির সবই সঠিক নহে, বরং সেইগুলির মাঝে অধিকাংশ এমন হইতে পারে যেইগুলিকে বিগত শতাব্দীসমূহে মুসলমানদের সার্বজনীন ও ব্যাপক দুর্বলতার তালিকায় পরিগণিত করা যায়। অবশ্য কতক সমস্যা ও মুসীবত এমনও হইতে পারে যেইগুলি কঠিন হামলা ঐ সকল মনীষীর জীবনে আগত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের কেহ কেহ সেইগুলি বরদাশ্‌ত করিতে অপারগ হইয়াছেন। শী'আদের সর্বপ্রাচীন অভিমতসমূহের মাঝে ইমাম, আলিম ও বাগ্মী কবি (আশ্‌) শারীফ আর-রাযী (মৃ.৮০৬ হি.,)-র উক্তি ঃ (বরাত-হাকাইকুত-তাবীল, নাজাফ ১৩৫৫ হি., ৫খ., ৭৪-৭৫) কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাকিয়্যার গ্রহণযোগ্য ক্ষেত্র এইরূপ যে, মু'মিন ব্যক্তি কাফিরদের মাঝে সম্পূর্ণ একাকী রহিয়াছে কিংবা এমনভাবে রহিয়াছে যে, তাহাকে পূর্ণ নিঃসংগ ও একাকী বলা যায়। যখন তাহার সাহায্যকারীর সংখ্যা নগণ্য, তাহার কেহ পৃষ্ঠপোষক-সহায়ক নাই, চতুর্দিকে কাফিরদেরই প্রাধান্য, তাহাদেরই সংখ্যাধিক্য, তাহাদেরই দেশ, তাহাদেরই বাড়ি-ঘর অর্থাৎ তাহাদেরই সব কিছু, এইরূপ ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে একজন মু'মিনের জন্য তাহার প্রতিপক্ষের সহিত নরম ব্যবহার (ও আনুকূল্য প্রদর্শন) করিবার অনুমতি রহিয়াছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাহার জন্য সেই স্থান ত্যাগ করিবার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং তাহার জন্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাকিয়্যার বৈধ রূপে ইহা নহে যে, কাফিরদের সংগে একেবারে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবে এবং হারাম কথা ও কাজে অংশগ্রহণ করিবে কিংবা হারামকে হালাল মনে করিতে শুরু করিবে। তাকিয়্যা হইবে শুধু মৌখিক কথায় ও শব্দের হেরফের করিয়া। তাহার জন্য শর্ত হইল, মনের মাঝে সেই বিশ্বাস স্থির ও সুদৃঢ় থাকিতে হইবে যাহা বাহ্য উচ্চারিত শব্দ ও কথার বিপরীত। তাঁহার পরবর্তী বক্তব্য–মুহাক্কিক (বিশেষজ্ঞ) আলিমগণ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তিকে কুফ্‌রী বাক্য (কলেমা) বলিতে বাধ্য করা হইল কিন্তু সে তাহা বলিতে স্বীকৃত হইল না, এমন কি তাহাকে হত্যা করা হইল, সে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম যে ব্যক্তি মুখ দ্বারা কুফ্‌রী বাক্য উচ্চারণ করিল, যদিও তাহার অন্তরে ঈমান লুক্কায়িত থাকিয়া থাকে।"

এই কথাগুলি এবং এই ধরনের অন্যান্য উক্তি আমাদের এই দাবির সমর্থন যোগায় যে, শী'আ সম্প্রদায়ের ইমামগণ তাহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত (তাকিয়্যা-র সীমাহীন ব্যবহারের) অভিযোগ হইতে মুক্ত। হাঁ, যদি তাহাদের কোন আলিম বা কোন সাধারণ ব্যক্তি কখনও ভুল করিয়া থাকে তাহাতে গোটা সম্প্রদায় বা কোন বিশেষ উপদলের দুর্নাম করা (এবং পাইকারী হারে দোষারোপ করা) সংগত নহে।

দা. মা. ই. (আরবী)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

তাকিয়্যুদ-দীন আল-আরাবী (تقى الدين العربى) ঃ মাওলানা ৭ম (শেষভাগ)/ ১৪শ শতকের প্রথমভাগে আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশ হইতে যেই সকল মহান সূফী সাধক, ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষাবিদ বাংলায় আগমন করেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত কিংবা জন্ম-মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার "আল-আরাবী" নিসবা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আরব দেশের, সম্ভবত হিজাযের, অধিবাসী ছিলেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফী দরবেশ মাখদূম শায়খ শারাফুদ-দীন ইব্‌ন য়াহ্‌য়া আল-মুনায়রীর পিতৃব্য-পুত্র শায়খ শু'আয়ব রচিত মানাকিবুল-আসফিয়্যা গ্রন্থ হইতে (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) অবগত হওয়া

যায় যে, মাওলানা আল-আরাবী সমসাময়িক যুগে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একজন বিশেষজ্ঞ আলিম ছিলেন। তিনি বর্তমান রাজশাহী জিলার অন্তর্গত মাহীসূন নামক স্থানে ইসলামী বিষয়সমূহের উচ্চ স্তরের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে একটি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপরোক্ত শিক্ষায়তনে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীরা মাওলানা তাকিয়্যুদ-দীনের সান্নিধ্যে থাকিয়া বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিত। এই সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে পরবর্তী জীবনে যাঁহারা যশ ও খ্যাতির অধিকারী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইলেন মাখদূম শায়খ শারাফুদ-দীন আল-মুনায়রীর পিতা সূফী সাধক শায়খ য়াহ্‌য়া আল-মুনায়রী।

উপরে উল্লিখিত 'মাহীসূন" একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগেই ইহা ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। সম্ভবত ইহা 'বারবাবাদ' পরগনার প্রধান শহর ছিল। বর্তমানে উক্ত স্থানটি রাজশাহী জিলার পাটনীতলা উপজিলার অন্তর্গত বিধ্বস্ত অঞ্চল যাহা মাহী সন্তোষ নামে খ্যাত এবং স্থানীয় জনগণের নিকট মহিগঞ্জ নামে পরিচিত। বর্তমানে সমগ্র মাহীসূন বা মাহী সন্তোষ এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চারিটি বিস্তৃত মসজিদের মিহরাব, দুইজন সূফী দরবেশের কবর ও ইমারতটির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে (দ্র. District Gazetteers, Rajshahi, pp. 370-71)।

মাওলানা তাকিয়্যুদ-দীন আল-আরাবীর প্রখ্যাত ছাত্র শায়খ য়াহ্‌য়া আল-মুনায়রী ৬৯০/১২৯১ সালে ইনতিকাল করেন। উপরিউক্ত তারিখ হইতে মাওলানা তাকিয়্যুদ-দীনের বাংলায় আগমন, অবস্থান এবং মাহীসূনের মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য অনুমান করা সম্ভব। এতদ্ব্যতীত মাহীসূনে আবিষ্কৃত কয়েকটি কবরের মধ্যে একটি কবরকে ইয্‌যুদ-দীন মুহাম্মদ শীরীনের কবর বলিয়া চিহ্নিত করা হয়, যিনি ইখতিয়ারুদ-দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজীর পর লাখনাওতীর (গৌড়ের) শাসনকর্তা ছিলেন এবং ৬০২-৫/১২০৫-৮ পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উপরিউক্ত তথ্যাদি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ৭ম (শেষ)/১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরে মাওলানা তাকিয়্যুদ-দীন আল-আরাবী ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বঙ্গে আগমন করেন এবং মাহীসূনকে কেন্দ্র করিয়া স্বীয় তৎপরতা পরিচালনা করেন। মাহীসূন বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের সীমান্তবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট হইতে মাত্র দুই মাইল পূর্ব দিকে ইহা অবস্থিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের ন্যায় মুসলিম আমলেও ইহা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। গৌড়ে বাখতিয়ার খালজী কর্তৃক সর্বপ্রথম মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাওলানা তাকিয়্যুদ-দীন যুক্তিসঙ্গতভাবেই মাহীসূনে সর্বপ্রথম ইসলামী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মাহীসূন মাদ্‌রাসায় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষার্থীরা সমবেত হইত। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা সমসাময়িক যুগে উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও ইসলামী শিক্ষাবিদ ছিলেন। বঙ্গে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার মূল্যবান অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মাওলানা তাকিয়্যুদ-দীন কখন কোথায় ইনতিকাল করেন সেই সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সম্ভবত তিনি মাহীসূনেই অধ্যাপনা ও ইসলাম প্রচারে সারা জীবন অতিবাহিত করেন এবং এইখানেই ইনতিকাল করেন। বস্তুত তাঁহার নেতৃত্বে ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই মাহীসূন ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাহ শু'আয়ব, মানাকিবুল-আসফিয়া, উদ্ধৃতি ঃ মাখদূম শায়খ শারাফুদ-দীন আল-মুনায়রীর পত্রাবলী ও সংকলন, য়াকূত বাত-ই সাফী, পৃ. ৩৩৯; (২) Bangladesh District Gazetteers Rajshahi, Dhaka 1976, pp. 370-76 (Mahisun); (৩) Muhammad Abdur Rahim, Social and Cultural History of Bengal, Karachi 1963, vol. I, pp. 180-81; (৪) Abdul Karim, Social History of the Muslim in Bengal, Chittagong 1985, p. 96

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

তাকীকাশী (تقی کاشی) ঃ তাকিয়্যুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শারাফুদ- দীন হুসায়নী কাশানী, পারস্য দেশীয় একজন জীবনীকার। তিনি কাশান শহরের অধিবাসী ছিলেন এবং ১০১৬/১৬০৭ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি ৯৮৫/১৫৭৭-৭৮ সালে খুলাসাতুল-আযকার ওয়া যুব্‌দাতুল- আফ্‌কার গ্রন্থখানা রচনা করেন এবং মুহতাশাম রচিত দীওয়ান-এর মুখবন্ধ লেখেন। শেষোক্ত ব্যক্তি শাহ্ ১ম ইসমাঈল এবং ১ম তাহ্‌মাস্‌প-এর যুগের একজন কবি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bland, J. R. A. S., ৯খ, ১২৬-১৩৪; (২) Sprenger, Catal, Oudh, পৃ. ১৩-৪৬; (৩) Rieu, Catal. of Persian Mss., পৃ. ১০৪৬; (৪) E. G. Browne, Literary History of Persia, ২খ, ৩৭০; (৫) W. Ivanow, Descriptive Catal. (কলিকাতা ১৯২৪ খৃ.), পৃ. ২৯৮, ৩০৫।

CL. Hurt (E.I.) মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাকী/তেকী খান (تقی خان) ঃ মির্‌যা তেকী খান আমীর-ই নিজাম উপাধিতে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি পারস্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। অতি সাধারণ এক পরিবারে তাঁহার জন্ম, তাঁহার পিতা ছিলেন একজন বাবুর্চি এবং পরবর্তী কালে মুহাম্মাদ শাহের প্রধান মন্ত্রী (قائم مقام)-র Maltre 'd' hotel-এর পদ লাভ করেন।

সেনাবাহিনী প্রধানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া তিনি দৌত্যকর্মে খুস্‌রাও মিরযার সহিত St. Petersburg-এ গমন করেন। দ্রুত পদোন্নতির মাধ্যমে তিনি আযারবায়জানের সেনাবাহিনীর উযীরের (vizier) পদ, এরযেরূম-এর সীমা নির্ধারণ কমিশনে পারস্যের প্রতিনিধিরূপে সদস্য পদ এবং ভাবী উত্তরাধিকারী নাসিরুদ-দীনের প্রধান কর্মকর্তার পদ লাভ করেন। ১৮৪৮ খৃ. সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর নাসিরুদ-দীন তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তিনি সাদর-ই আজাম (দ্র.) উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন এবং আমীর-ই নিজাম উপাধি গ্রহণ করেন।

যেই সকল অনাচার দেশকে ধ্বংস করিতেছিল তিনি তাহার প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অনাচারগুলির মধ্যে ছিল সরকারী কর বিক্রয়, অসংখ্য অযোগ্য ব্যক্তিকে বৃত্তি প্রদান, কর্মকর্তাগণের পক্ষে সৈন্যদের ক্ষতিকারক তহবিল তসরুফ প্রভৃতি। রাষ্ট্রের অর্থ ব্যবস্থার সুপরিচালনায় তিনি সফলকাম হন। তিনি পারস্যের শাহ্-এর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। কর্মকুশলতা অনেক শত্রু সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল কিন্তু যথাসময়ে এই

ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া যায়। তিনি বাবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এই নূতন মতবাদের প্রধানগণকে গ্রেফতার করেন এবং তাহাদের শাস্তি বিধানের জন্য রাষ্ট্রের কর্মকর্তাগণকে নির্দেশ দেন।

নিয়মিতভাবে বেতনপ্রাপ্ত সৈনিকগণ তাহাদের প্রধান তেকী খানের অনুগত ছিল, এই পরিস্থিতি নাসিরুদ্দ-দীনকে শংকিত করে, যাহার ফলে তিনি তেকী খানকে পদচ্যুত করেন। রাশিয়ার যার (Zar) তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, রুশমন্ত্রীর এই কথায় তিনি কাশান নামক স্থানে নির্বাসনে গমন করেন কিন্তু দুই মাস পর 'ফীন' নামক স্থানে অবস্থিত তাঁহার প্রাসাদে আততায়ীর দ্বারা তিনি নিহত হন (১৮৫১)। তাঁহার ন্যায় একজন যোগ্য ও উদ্যমী মানুষের মৃত্যুতে পারস্যের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) de Gobineau, Trois ans en Asie, Paris 1859, p. 238 প.; (২) E. G. Browne, History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924; (৩) P. M. Sykes, History of Persia, ii, 441, 442, 448, 449; (৪) Polak, Persien, Leipzig 1865, ii, 6প।

Cl. Huart (E.I.[1])/রুহুল আমীন রোকন

তাকিদ-দীন (দ্র. আল-মুজাফ্‌ফার)

তাকোরোন্না (تاكرنا) ঃ বর্তমানে Serrania de Ronda নামে পরিচিত। আন্দালুসিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত পর্বতস্তূপের প্রতি প্রযোজ্য মুসলিম স্পেনীয় নাম। ইহা নিশ্চিতভাবেই উত্তর আফ্রিকার নামসমূহে প্রায়শ প্রাপ্ত একটি বার্বার শব্দ তাকরুনা-এর 'ন'-এ দ্বিত্ব। বিভিন্ন গ্রন্থকার তাকোরোন্না-এর ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ রূপ প্রদান করিয়াছেন। বরাতসহ এইগুলি প্রদত্ত হইয়াছে একটি মূল্যবান সংযোজিত টীকায় W. Marcais ও আবদুর-রাহমান গোয়গে কর্তৃক Textes arabes de Takruna [Tunisia]-তে, ১খ, প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ৮ম ভাগ, টীকা ১। আরও তু. য়াকূত, মু'জাম, শিরো. শীরায, ইব্‌ন বাশকুওয়াল, আস-সিলা, সম্পা. Codera, B. A. H., পৃ. ১৮৫ ও ৩০২; ইব্‌ন আবদিল-মুন্‌'ইম আল-হিময়ারী, আর-রাওদুল-মি'তার, শিরো.। Dozy প্রথমত বার্বার উপসর্গ তা ও ল্যাটিন Corona-এর সংযোগে এই নামটির একটি ব্যাখ্যা প্রদানের মনস্থ করিয়া পরে বিজ্ঞতার সহিত তাহা পরিত্যাগ করেন। কারণ এই প্রকার শব্দতত্ত্ব কোনভারেই সমর্থন বা প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না (Hist. des Mus. d'Esp., ১খ, ৩৪৩, টীকা ২, ও ৪খ, ৩৩৯; আরও তু. Recherches, ২খ, ৪৩, টীকা ১)। তবে যাহা হউক, উক্ত গ্রন্থকারগণের কাহারও নিকট প্রস্তাবিত কোন শব্দতত্ত্বই সন্তোষজনক নহে।

তাকোরোন্না এলাকার এবং পরবর্তীকালে বানূ ঈফরান-এর ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের (সেভিল রাজ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবার পূর্ব পর্যন্ত) রাজধানী ছিল রোন্‌দা। মুসলিম শাসনামলে এই এলাকার ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য তু. প্রবন্ধ রোন্‌দা।

E. Levi-Provencal (E.I.[1])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

তাখ্‌তাজী (تختاجی) ঃ সাধারণ অর্থে 'কাঠুরে,' শী'আঃ প্রবণতাসম্পন্ন আনাতোলিয়ার অধিবাসী একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নাম। তাখ্‌তাজী গোষ্ঠী আনাতোলিয়ার জনসংখ্যার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় কিযিলবাশ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। F. Babinger (in Z. D. M. G. ৭৬ ঃ [১৯২২] ও (F. Taeschner), (ঐ, পৃ. ২৮২ প.) আরও দুইটি সম্প্রদায়কে কিযিলবাশদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, একটি হইল চেপনি বা চেতনি (১৪শ শতাব্দীর সমাপ্তির মত দূর অতীতেও ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়), অন্যটি যিবেক (Zeibek দ্র.)। জাতিতত্ত্ব ও ধর্মীয় ইতিহাসের বিচারে তাখ্‌তাজীদের উৎস অদ্যাবধি সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় নাই। ইহারা প্রধানত পশ্চিম এশিয়া মাইনর অঞ্চলের গ্রামসমূহে বাস করে এবং পশুপালন, কৃষিকার্য, কাষ্ঠ আহরণ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তাখ্‌তাজী নামটি কাষ্ঠ সংগ্রহের কারণে হইয়াছে কিন্তু তাহাদের উৎস অত্যন্ত অস্পষ্ট। F. von Luschan তৎকৃত Reisen in Lykien, Milyas und Kibyratis (Vienna ১৮৮৯, অধ্যায় ১৩) গ্রন্থে প্রধানত মস্তকের খুলির পরিমাপের ভিত্তিতে মনে করেন, তাখ্‌তাজী গোষ্ঠী এই অঞ্চলের আদি অধিবাসীদের অবশিষ্ট ভাগ, অন্যপক্ষে G. Jacob (তু. Islam, ২খ., ২৩২ প.) মনে করেন, তাখ্‌তাজীগণ " দেনদ্রোফোরি" ভ্রাতৃসংঘের অবশিষ্টাংশ (তু. F. Cumont in Pauly Wissowa, দ্র. Dendrophori, সেই সঙ্গে H. C. Maue, Die Vereine der Fabri, Centernarii und Dendrophoriim Romischen Reich, Frankfurt A. M, ১৮৯৬, Programm)। এই দুই মতের কোনটির তেমন কোন প্রমাণ নাই, বরঞ্চ তাখতাজী সম্প্রদায় ছিল ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে পারস্য হইতে পশ্চিম আনাতোলিয়ায় আগমনকারী ও বসতিকারী এবং সাফাবী সম্প্রদায়ের [দ্র.] অনুসারী। জানা যায়, তাহারা শাহ ইসমাঈল-এর উত্থানের পূর্বেই এশিয়া মাইনরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল (তু. F. Babinger, Schejch Bedr ed-Din, Leipzig ও বার্লিন ১৯২১ খৃ., পৃ. ৯১ প.)। শাহ ইসমাঈলের আমলে সাফাবী সম্প্রদায়ের ও তাখতাজীদের মধ্যে প্রচলিত রীতিনীতিসমূহের লক্ষণীয় সাদৃশ্য উক্ত মতের সমর্থন করে। কথিত আছে যে, তাহারা মদ্যপান ও শূকরের মাংস ভক্ষণ করিত এবং তাহাদের কতিপয় অনুষ্ঠান খৃস্টীয় ব্যাপ্টিজম কমিউনিয়ন-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মহিলাগণ কোন প্রকার পর্দা করে না এবং করিত না। পারস্যবাসী ও খৃস্টানগণ তাহাদের স্বাগত মেহমান, কিন্তু তুর্কীগণ নহে এবং তাহাদের মধ্যে আলী ও ইসমাঈল এই শী'ঈ নামদ্বয় বিশেষভাবে জনপ্রিয় (তু. W. Heffening, in Der Neue Orient, ৪খ, বার্লিন ১৯১৯ খৃ., পৃ. ২৬৪ প.)। বিশেষত উল্লেখযোগ্য যে, আদালিয়ার অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় Consul Tibor v. Pozl-এর রিপোর্ট অনুসারে (তু. Osterr. Monnatsschrift fur den Orient, ৪১খ., Vienna ১৯১৫ খৃ., পৃ. ৫০৬ ও F. Babinger, in Isl., ১২খ. [১৯২১], ১০৩) তাখতাজীগণ তুর্কী সরকারের কর্তৃত্বের বাহিরে বসবাস করিত এবং "অতি সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত তাহারা প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণে পারস্যের প্রজারূপে বিবেচিত হইত। এই সকল তথ্য হইতে মন হয়, সাফাবী রাজ্যের সহিত পূবর্তন সময়ে তাহাদের একটি নিবিড় সংযোগ ছিল। একই সূত্র অনুযায়ী, তেকের সানজাক (আদালিয়া-র চতুষ্পার্শ্বে)-এ তাখ্‌তাজীগণের সংখ্যা বিশেষভাবে অধিক; তাহারা শীতকালে উপকূলীয় অঞ্চলে অতিবাহিত করে এবং গ্রীষ্মকালে পশুপালসহ পার্বত্য এলাকায় প্রত্যাগমন করে। তথায় তাহারা তাঁবু ও জীর্ণ কুটিরে বসবাস এবং পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে উদ্ধৃত উৎসসমূহের অতিরিক্তরূপে তু. (১) J. H. Mordtmann, Vier Vortrage uber Vorderasiep und die heutige Turkei, বার্লিন ১৯১৭ খৃ., পৃ. ১০০ প.; (২) F. V. Luschan, in Archiv fur Anthropologie, ১৯খ.,

Braunschweig ১৮৯১, পৃ. ৩১ প.; (৩) F. Babinger কর্তৃক প্রদত্ত গ্রন্থাদি, Schejch Bedr ed-Din, পৃ. ৯৯ প.; তু. also. Isl. Xii. [1921], 103.

F. Babinger (E. I. [1])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাখাল্‌লুস (تخلص) ঃ আভিধানিক অর্থ বাহির হওয়া, অব্যাহতি পাওয়া, কিন্তু কবিদের পরিভাষায় ইহার ব্যবহার বিভিন্ন রকম ঃ (১) প্রাচীন (متقدمين) কবিদের নিকট ইহার অর্থ-কবিতার বিষয়ে পরিবর্তন আনয়ন করা, অর্থাৎ প্রণয়মূলক বর্ণনা (নাসীব-نسيب) হইতে প্রশংসামূলক বর্ণনা (মাদহ-مدح) ইত্যাদির দিকে অতি সূক্ষ্ম ও উত্তম পন্থায় প্রত্যাগমন করা এবং অতঃপর প্রশংসা ইত্যাদির বর্ণনা চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করা [ইব্‌ন রাশীক, মৃ. ৪৬৩/১০৭০-৭১, উমদা, কায়রো ১২২৫ হি., ১খ, ১৫৬] ইব্‌নুল-মু'তায্য (মৃ.২৯৬/৯০৮-৯), তাবাকাতুশ-শু'আরা, গিব্ মেমোরিয়াল প্রকাশনা, পৃ. ৮০, শেষ লাইন, التخلص من النسيب الى المدح-এর উল্লেখ করিয়াছেন। কুদামা ইব্‌ন জা'ফার (মৃ. ৩২৬ হি.)-এর "নাক্‌দুশ-শি'র" (সম্পা. Bonebakker, লাইডেন ১৯৫৬ খৃ.) গ্রন্থে এই পরিভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই শতাব্দীরও শেষে পরবর্তী শতাব্দীতেও ইহার অর্থ বাহির হওয়াই (الخروج) বুঝাইত (আবূ হিলাল আল-আসকারী (মৃ. ৩৯৫/১০০৪-৫) কিতাবুস-সিনা'আতায়ন, কায়রো ১৩২০ হি., পৃ. ৩৬১, যদিও তাখাল্‌লুস ও তাওয়াস্‌সুল শব্দদ্বয়ের প্রচলনও ছিল ('উমদা, পৃ. ১৫৮; উহাতে তাখাল্‌লুসের প্রকারগুলি দ্র.)। যাহা হউক প্রাচীনদের নিকট তাখাল্‌লুস শব্দটি আভিধানিক অর্থে অর্থাৎ বাহির হওয়া ও অব্যাহতি পাওয়া হিসাবে গাযাল বা প্রণয় হইতে অব্যাহতি লাভ ও প্রশংসায় প্রবেশ বা অন্য কিছুতে প্রবেশের অর্থে ব্যবহৃত হইত। কেননা ইহাতে গাযাল হইতে অব্যাহতি লাভ হয় (মু'আয়্যিদুল-ফুদালা, দ্র. শিরো., তু. আহ্‌মাদ নাগারী, জামিউল-উলূম, ১খ., ২৮১)। খাল্‌লাকুল-মাআনী, কামাল ইসমাঈল ইস্‌ফাহানী (মৃ. ৬৩৫/১২৩৭-৮), কুল্লিয়াত (বোম্বাই, তা. বি.), পৃ. ১৮৭ একটি গাযালের শেষে লিখেন ঃ (এক্ষণে অশ্বের প্রশংসা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম)।

تا تخلص كنم از وصف رخت بشناى (فلان...)

(অমুকের প্রশংসায়.....)

কাহারও মতে তাখাল্‌লুসের অর্থ প্রশংসাকারীর নিজের নাম কিংবা যাহার প্রশংসা করিতেছে তাহার নাম প্রশংসা বর্ণনায় উল্লেখ করা (তাহানাবী, মুস্‌তালাহাত, ১খ, ৪৩২; মু'আয়্যিদুল-ফুদালা, শিরো. (জামি'উস-সানাই' অনুসারে আরও দেখুন আওফী, লুবাবুল-আলবাব, হারিছী-র অনু., ১খ, ২১০)। কবি যদি মামদূহ বা যাহার প্রশংসা করিতেছে তাহার নাম উল্লেখ করিতে চায় তবে এই কথা বলে ঃ "تخلص الى فلان অমুকের দিকে তাখাল্‌লুস (প্রত্যাবর্তন) (تخلص الى-এর প্রমাণের জন্য দেখুন হামাসা, সম্পা. ফ্রেইটাগ, পৃ. ২২, শেষ লাইন; বাখারযী,, দুমায়াতুল-কাস্‌র, হালাব ১৩৪৯ হি., পৃ. ১৩৮, লাইন ৯ এবং ফারসীতে تخلص بفلان كردن-অমুকের প্রতি তাখাল্‌লুস, তু. শামস কায়স, পৃ. ৪৩৫)। মাখ্‌লাস শব্দও তাখাল্‌লুসের অর্থেই ব্যবহৃত হয়, Dozy, Supplement, শিরো.; Mehren, Die Rhetorik, der Araber-এর অনুসারে)। ওয়ারিস্‌তাহ, মাতলা'উস-সা'দায়ন, কানপুর ১২৯৭/১৮৮০, পৃ. ১৮-তে উল্লেখ আছে যে, কামাল ইসমাঈলও তাঁহার কবিতায় "মাখ্‌লাস" ঐ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন (কিন্তু প্রকাশিত দীওয়ানে ঐ কবিতা পাওয়া যায় নাই যাহা ওয়ারিস্‌তাই লিখিয়াছেন); আরও দ্র. পৃ. ১৭৫।

জাহিলী ও ইসলামী যুগের আরব কবিগণ তাখাল্‌লুস বা এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে গমনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করিয়াছেন এবং এইজন্য জোর প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। এই ক্ষেত্রে কবি মুতানাব্বী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আবূ হিলাল আসকারী (আস-সিনা'আতায়ন, পৃ. ৩৬১-৭০) খুরূজ মুত্তাসিল ও গায়র মুত্তাসিলের সত্তরের কিছু কম উদাহরণ দিয়াছেন। ফারসী কবিতায়ও এই জাতীয় তাখাল্‌লুস সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওয়াতওয়াত (হাদাইকুস-সিহ্‌র, তেহ্‌রান ১৩০৮ সৌর, পৃ. ৩১ প.) উনসূরীর তাখাল্‌লুসের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রে তিনি ইরানীদের নিকট সেই রকম যেই রকম আরবদের নিকট মুতানাব্বী।

(২) পরবর্তী যুগের লোকদের নিকট কবি নাম যাহা সাধারণত সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে কবি তাহা কবিতায় উল্লেখ করেন। এই অর্থে মনে হয়, তাখাল্‌লুস প্রথা ইরানী কবিদেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য (রূহী, দাবীরে 'আজাম, পৃ. ৭৪ প.)। তুর্কী ও উর্দু কবিতায় কবিনাম তথা তাখাল্‌লুস-এর প্রচলন ফারসীর অনুসরণেই হইয়াছে। ফারসী ভাষায় তাখাল্‌লুস ব্যবহারের প্রচলন ফারসী কবিতার সূচনা হইতেই দেখা যায়, কিন্তু এই কলমী নামকে তাখাল্‌লুস বলিয়া অভিহিত করা হয় পরবর্তীকালে। তাই দেখা যায়, শামস কায়স রাযী (হি. সপ্তম শতাব্দীর সূচনায়) ইহার উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষ দিকের কতিপয় পুস্তকে আমরা উহার উল্লেখ দেখিতে পাই। মাহমূদ গাওয়ান (মৃ. ৮৮৬/১৪৮১) লিখিয়াছেন, গাযালের শেষে কবির নাম উল্লেখ থাকা এই যুগে পসন্দনীয়। কিন্তু শায়খ সা'দী শীরাযী (মৃ. ৬৯০/১২৯১)-র পরেই ইহার প্রচলন হয় (প্রাচীনদের নিকট ইহার ব্যবহার সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হইবে)। জামী রচিত বাহারিস্‌তান (৮৯২/১৪৮৭/পৃ. ৮০)-এ ফিরদাওসী এই তাখাল্‌লুস কেন অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে। আরও দেখুন ঐ গ্রন্থে, পৃ. ৯৬ (باب معاصر كے تخلص كے; আরও দ্র. দাওলাত শাহ, তাযকিরাতুশ-শুআরা, সম্পা. Browne, পৃ. ৩১, ৫০। তুর্কী ভাষায়ও মাখলাস তাখাল্‌লুসের দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয় (দ্র. সামী, কামূসুল-'আলাম, ৩খ, ১৬৫৮, শিরো.; তাকী ইসফাহানী, ১৬৫৯, শিরো., তাকী কাশী, ইত্যাদি)।

ইহা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই যে, তাখাল্‌লুসের প্রথম অর্থের মধ্যে কখন হইতে পরিবর্তন দেখা দেয়। তবে এতটুকু বলা যায় যে, কবির নামের জন্য তাখাল্‌লুসের ব্যবহার বহু প্রাচীন (সূচনায় মামদূহের নামই উল্লেখ করা হইত)। এই প্রত্যাবর্তন-নিয়ম এখনও চালু আছে। প্রাথমিক যুগের কবিতায় এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, যেইখানে মামদূহের সাথে কবির নামেরও উল্লেখ আছে, যেমন উনসূরী ও ফাররুখীর কবিতায় (উদাহরণ দেখুন, রাসমে তাখাল্‌লুস, পৃ. ৬-এর পার্শ্বটীকা)। পরবর্তীকালে সম্ভবত ইহার ব্যাপক প্রচলন হইয়া যায়। শেষে যখন কাসীদা হইতে গাযাল এক স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে তখন মামদূহ-এর নাম বাদ হইয়া কেবল কবির নাম ব্যবহার করার প্রচলন অবশিষ্ট থাকে। এই মন্তব্যটি কেবল ধারণাপ্রসূত।

এখন প্রশ্ন হইল, তাখাল্‌লুসের প্রবর্তন কিভাবে হইয়াছে? এই সম্পর্কেও কেবল ধারণা ও যুক্তির উপরই নির্ভর করিতে হয়। তাখাল্‌লুস প্রথার ক্রমবিকাশের প্রতি লক্ষ করিলে কয়েকটি স্তর সম্মুখে পড়ে; জাহিলী ও ইসলামী যুগের বহু আরবী কবি বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত

ছিলেন। কোন কোন কবি এমনও আছেন যে, তাঁহাদের কবিতায় এমন একটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা তিনি ঐ উপাধিতে খ্যাত হইয়া গিয়াছেন; যথা আল-আ'সুর, আল-মুমায্‌যাক, আল-মুতালাম্‌মিস ইত্যাদি। ইব্‌ন দুরায়দ (মৃ. ৩২১/৯৩৩) আল-বিশাহ গ্রন্থে এইরূপ উপাধিবিশিষ্ট একান্নজন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন (আবদুল-কাদির আল-বাগদাদী, খিযানা, ৩খ, ২৬৬)। সুয়ূতী আটান্ন (আল-মুযহির, কায়রো ১৩২৫ হি., ২খ, ২৬৮-৭৬) ও ইব্‌ন কুতায়বা কিতাবুশ-শি'র-এ ষোলজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইব্‌ন কুতায়বা আরও উনিশজন এমন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যাঁহাদের উপাধি কোন কবিতার শব্দ দ্বারা হয় নাই, বরং অন্য কোন কারণে হইয়াছে; যথা আল-মুহাব্বির (তুফায়ল আল-গানাবী), যিয়াদুল-আ'জাম ইত্যাদি (আশ-শি'র, পৃ. ২৭৫, ২৫৭ ইত্যাদি)।

তবে আরবী কবিতায় তাখাল্‌লুস দ্বিতীয় অর্থে জাহিলী যুগেও ছিল না এবং ইসলামী যুগেও নহে। ঐ দুই যুগে হয়ত কোন কোন কবি স্বাভাবিকভাবে নিজের নাম কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন লাবীদ (দীওয়ান-ই লাবীদ, সম্পা. ব্রোকেলম্যান, পৃ. ৫২; সম্পা. আল-খালিদী, পৃ. ২৫), মুতালাম্‌মিস (আশ-শি'র, পৃ. ৮৫); আন-নামির ইব্‌ন তাওলাব (মুখাদরাম, কিতাবু নাকদিশ-শি'র, পৃ. ২৪), রাবীআতুর-রাকী (হারূনুর-রাশীদের যুগ, তাবাকাতু ইবনিল-মু'তায্য, পৃ. ৭১-৭৫ ও সায়ফুর-রাক্কী, পৃ. ৭৪ স্থা.), আল-কুতামী (মৃ. ১১০/৭২৮-৯), দীওয়ানুল-কুতামী, সম্পা. Barth, পৃ. ১০, শ্লোক ২৯)।

সায়ফুদ দাওলা (৩৩৩-৩৫৬/৯৪৪-৯৭৬) ও সামানীদের আমলে (২৭৯-৩৮৯/৮৯২-৯৯৯) শাম (৩০১ ইরাক) খুরাসান ও মা ওয়ারাউন-নাহারে কবিগণ তাখাল্‌লুসরূপী সুন্দর সুন্দর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, যথা আন-নামী, আন-নাশী (সায়ফুদ-দাওলার কবিদের), আয-যাহী, আন্‌-নাজিম, আত-তালি', আত-তাহির ও আজ-জাহির (আবূ আলী মুহাম্মাদ ইব্‌ন আলী আল-বালাখী তাঁহার অনুসরণে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি ইরাক ও সিরিয়া ভ্রমণ করিয়া নীশাপুরে আসিয়া বসবাস করেন) [য়াতীমাতুদ-দাহ্‌র, ৪খ; ২৯৬]।

ঠিক আরব কবিদের পদ্ধতি অনুসরণে সামানী ও গাযনাবী দরবারের প্রসিদ্ধ ফারসী কবিগণের কাব্যেও প্রথম প্রথম তাঁহাদের নাম কিংবা উপনাম পরিলক্ষিত হইত। পরে হি. ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর বিখ্যাত কবিদের মধ্যে নিম্নোক্তদের কবিতায় তাখাল্‌লুস ব্যবহৃত হয়; যেমন রূদাকী (মৃ. ৩২৯/৯৪০-১), দীওয়ান-ই রূদাকী, তেহরান ১৩১৫ হি., পৃ. ৭ ও ৭৫ এবং রাসমে তাখাল্‌লুস, পৃ. ১০ (যদি তাখাল্‌লুসবিশিষ্ট কবিতার রচয়িতা সম্পর্কিত বিবরণ সঠিক মনে হয়)। আরও দ্র. দীওয়ানে রূদাকীর ভূমিকা; ইহাতে বিভিন্ন কবি ইহাকে রূদাকীর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত ইনিই প্রথম ইরানী কবি যিনি তাখাল্‌লুসের দ্বারা প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন [সাঈদ নাফীসী, আহওয়াল ওয়া আশআর-ই রূদাকী, ২খ, ৪৬৬]; ফির্‌দাওসী (মৃ. ৪১১ বা ৪১৬ হি.) [মাছনাবীর মধ্যে]; 'উনসুরী (মৃ. ৪৩১ বা ৪৪১)' দীওয়ানে উনসুরী, তেহরান, তা. বি., পৃ. ৬৬, ১৬১ (কাসীদার মধ্যে), পৃ. ১৭৭ (গাযাল); প্রায় এই রকমই তাহার কাছাকাছি সময়ে মানূ চেহেরী; ফার্‌রুখী (মৃ. ৪৭০/১০৭৭-৮) [দীওয়ান-ই ফাররুখী, পৃ. ২৬৫, ২৬৮-৭০, ৩৬৯, ইত্যাদি কাসীদায়, বিশেষ করিয়া কাসীদার শেষের দিকে, তবে গাযালে নহে] এবং নাসির খুসরাও (মৃ. ৪৮১/১০৮৮-৯) কিত'আ, মাছনাবী ও কাসীদায় হুজ্‌জাত কিংবা নাসির খুস্‌রাও তাখাল্‌লুস গ্রহণ করিয়াছেন, দীওয়ান, শিরো. নাসির খুস্‌রাও, ইহাতে গাযাল মোটেই নাই; অতঃপর প্রায় ৬ষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধের ইরাকী কবিগণ (সালজূক রংশের শাসনামলে) কাসীদায় কোথাও কোথাও নাম অথবা তাখাল্‌লুস ব্যবহার করিয়াছেন (দেখুন আওফী, লুবাবুল-আলবাব, ২খ, ৩৯৯, ৪২৩); তাহার চেয়ে অধিক সানাঈ (মৃ. ৫২৫/১১৩০-৩১ অথবা ৫৩৫/ ১১৪০-৪১, কাসীদা ও গাযালে); মুখতারী গাযনাবী (মৃ. প্রায় ৫৩৫ হি., মাদিহ গায্‌নাবিয়া ওয়া সালাজিকা, দীওয়ান, তেহরান ১৩৩৬ সৌর এবং পৃ. ২১) অধিকাংশ কাসীদায়; সায়্যিদ হাসান গাযনাবী আশরাফ (মৃ. ৫৫৫/১১৬০ ও ৫৫৭/ ১১৬২-এর মধ্যে [দীওয়ান, শিরো হাসান] কাসীদা ও কিত'আর প্রারম্ভে বা মধ্যস্থানে কিংবা শেষে এবং বহু সংখ্যক গাযালের শেষে তাখাল্‌লুস সংযোজন করিয়াছেন। আনওয়ারী (মৃ. ৫৮৭/১১৯১) কাসীদায় কম কিন্তু গাযালে বারবার তাখাল্‌লুস ব্যবহার করিয়াছেন। খাকানী (মৃ. ৫৯৫ হি.) সর্বপ্রকার রচনায় গুরুত্ব সহকারে তাখাল্‌লুস সংযোজন করিয়াছেন। নিজামী (মৃ. ৬০০/১২০৩-৪) স্বীয় মাছনাবীর আরম্ভে ও শেষে তাখাল্‌লুস গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করিয়াছেন। হি. ৭ম শতাব্দীর শেষার্ধে, অষ্টম শতাব্দী ও উহার পর হইতে (শামস তাবরীযী, সা'দী, ইরাকী, খুসরাও ও হাফিজের কালে) তাখাল্‌লুসের ব্যবহার, বিশেষ করিয়া গাযালে সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়, যাহার অনুকরণ আজ অবধি কবিগণ করিয়া আসিতেছেন।

মোটকথা হি. ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে তাখাল্‌লুস ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে (এই সময়টা ছিল কাসীদা বা দীর্ঘ কবিতা রচনার যুগ)। হি. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইহার ব্যাপক ব্যবহার সাধারণ রীতিতে পরিণত হয় (তখন গাযাল পূর্বের তুলনায় বেশি রচিত হইতে থাকে) এবং সকল শ্রেণীর রচনায় তাখাল্‌লুস প্রয়োগ করা হয়। হি. সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে গাযালে তাখাল্‌লুস ব্যবহার অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়, অবশ্য অন্যান্য কবিতায়ও তাহার ব্যবহার চালু থাকে।

এই পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন কি ছিল? রাজদরবারে এবং একই সময়ে বহু কবি বিদ্যমান থাকার কারণে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্যকরণ নীতি প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদে কবি নাম প্রবর্তন করার নিয়ম চালু হয়। ইহার সাথে ব্যাপক পরিচিতির উদ্দেশ্যে কবির দেশ বা জন্মস্থানের উল্লেখপূর্বক সম্বন্ধবাচক (নিসবা) যুক্ত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এই নিয়ম প্রবর্তনের দ্বারা একজনের কবিতা অন্য কাহারও কবিতার সাথে মিশ্রণ হইতে বা প্রক্ষেপণ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে (তু. হুজ্‌বীরী, কাশফুল-মাহজূব, প্রথম ফাসল)। তাহা ছাড়া কবিতার মধ্যে কবির নাম যেহেতু বারবার উল্লেখ করা সম্ভব নহে, তাই নাম সংক্ষিপ্ত করার প্রয়োজনও ছিল।

এই পর্যায়ে তাখাল্‌লুসের শব্দ চয়নের ক্রমবিকাশের দিকটিও কম আকর্ষণীয় নহে। আসাদীর রচিত লুগাতুল-ফারস (৪৫৮/১০৬৬) হইতে জানা যায়, ঐ সময় পর্যন্ত কবি নামের বিভিন্ন আকৃতি প্রচলিত ছিল। যেমন নিজের নামকে নামের তাখাল্‌লুস হিসাবে ব্যবহার; হানজালা বাদগীসী, শাহীদ বালাখী, ফীরূয মাশরিকী ইত্যাদি। কেহ কুনয়াত বা উপনামে প্রসিদ্ধ হয় ঃ আবুল-আব্বাস, আবূ ইসহাক ইত্যাদি। কেহ বা জন্মস্থানের সম্পর্ক দ্বারা পরিচিতঃ রূদাকী ইত্যাদি। অবশ্য কতিপয় নাম পরবর্তী কালের আঙ্গিকে গঠিত; ইসতিগ্‌নাঈ, সারওয়ারী ইত্যাদি। কোন কোন তাখাল্‌লুস অবস্থার প্রতি নির্দেশক ঃ হাকীমে গামনাক, কারীউদ-দাহূর ইত্যাদি।

কবিগণ প্রথম প্রথম কাসীদায় তাখাল্‌লুস ব্যবহারে যত্নবান ছিলেন না (উল্লেখ করিলেও উহা যে শেষ শ্লোকেই উল্লেখ করিতে হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই)। উনসুরী, মানুচেহরী প্রমুখ কবিদের তুলনায়

মাসঊদ সা'দ সালমানের কাসীদায় তাখাল্লুসের ব্যবহার বেশি। হাকীম সানাঈ তো তাঁহাকে এই বিষয়ের প্রবর্তক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কিত্'আ ও কাসীদায় তিনি তাখাল্লুস বেশি ব্যবহার করিয়াছেন। তানকীদু শি'রিল-আজাম-এর লেখক বলিয়াছেন, "তাখাল্লুসের প্রচলন গাযালের মাক্তা'-এ সর্বপ্রথম তাঁহার কবিতায় পাওয়া যায়" (ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৭৪, আঞ্জুমানে তারাক্কীয়ে উর্দূ)। অবশ্য ইহাতে মাকতা'কে তাখাল্লুস-এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয় নাই। অন্য স্থানেও ইহা পরিকক্ষিত হয়। আত্তারের নীতিও এই রকমই ছিল (তান্কীদু শি'রিল-আজাম, পৃ. ৪৭৪)। তাহার পরে ইহা একটি বিধানে পরিণত হইয়াছে। সমসাময়িক তুর্কী কবিতার অবস্থাও ছিল এই রকম। কাসীদা, গাযাল ও কিত্আ ছাড়াও কোন কোন কবি রুবাঈর মধ্যেও তাখাল্লুস আনিয়াছেন, তবে ইহার জন্য কোন পঙক্তি নির্ধারিত নাই (দীওয়ান মাসঊদ সা'দ সালমান, দ্র. শিরো.; ওয়ারিস্তা, মাত্লাউস-সা'দায়ন, পৃ. ১০)।

প্রাথমিক পর্যায়ে তাখাল্লুস সরল ও কৃত্রিমতামুক্ত হইত। নাম, সম্বন্ধবাচক নাম, উপাধি অথবা প্রচলিত প্রথা হইতে কোন পরিচিত শব্দ গ্রহণ করা হইত। অতঃপর ইহাতেও নূতনত্বের আবির্ভাব হয়। কেহ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কেহ বাস্তব অবস্থা এবং কেহ বা কোন ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া তাখাল্লুস অবলম্বন করিতেন। সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ রাখা হইত (দাবীরে আজাম, পৃ. ৬০), কিন্তু দীর্ঘকাল যাবত নাম অথবা উপনাম হইতে তাখাল্লুস গ্রহণ করার প্রবণতা অব্যাহত থাকে। পরে কাব্যচর্চা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই অন্যান্য লক্ষণীয় বস্তু হইতে তাখাল্লুস গ্রহণ করা হইতে থাকে। যেমন পেশাগত সম্পর্ক, কোন মুরশিদ বা উস্তাদের সম্পর্ক, বংশ সম্পর্ক বা মাযহাবী মতবাদ কিংবা রাজা-বাদশাহদের সহিত সম্পর্ক হইতে। কোন তাখাল্লুস শুভ পরিণতির ইঙ্গিতবহ হইলে উহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইত (তু. দাবীরে আজাম, পৃ. ৭৫)। কোন কোন সময় শারীরিক অবস্থা হইতেও তাখাল্লুস গৃহীত হইত। যেমন নাযার, নাযুক ইত্যাদি। কাব্যিক ভাব ও মন-মানসিকতাও তাখাল্লুস নির্বাচনে বিবেচনার বিষয় হইত। যেমন গানী কাশমীরী (মিরআতুল-খিয়াল, পৃ. ১৬১), গুয়ূরী (মাআছিরে রাহীমী, পৃ. ৬৭৯) ইত্যাদি। কখনও এই বিবেচনায় হাস্যাস্পদ শব্দ হইতেও তাখাল্লুস গঠিত হইয়াছে।

এমন এক সময় আসে যখন তাখাল্লুস পদ্ধতি একটি বৈঠকী বিষয়ে পরিণত হয়। সাধারণত উস্তাদই তাখাল্লুস চয়ন করিতেন। কখনও শুভ পরিণতি (ফা'ল) হিসাব করিয়া তাখাল্লুস গ্রহণ করা হইত। যেমন সুহায়লী (দাওলাত শাহ, পৃ. ৫০৯)। তাখাল্লুসের প্রতি ভাবাবেগের সম্পর্ক এতই গভীর ছিল যে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই কবিদের মধ্যে বড় বড় ঝগড়া সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাখাল্লুসের মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কোন কোন কবি কবিতায় অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশের জন্য তাখাল্লুস ব্যবহার করিতেন। যেমন উর্দূ কবি মু'মিন তাখাল্লুস-এর দৃষ্টিকোণ হইতে অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করেন। বাস্তবতা, তত্ত্ব ও কবিত্ব ভাবের উর্দূ কবিদের তাখাল্লুস যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে (সালনামায়ে আদাব-ই লাতীফ, ১৯৪৬ খৃ., আখতার উরীনাবী ; গালিব কি বা'দ)। ফারসী ও উর্দূ কবিতার শেষ পর্যায়ে তাখাল্লুসে 'য়ায়ে নিসবাতী'র ব্যবহার খুব কমন পরিলক্ষিত হয়। তাখাল্লুসের সেই প্রাথমিক দিকের কঠোর নিয়মনীতি আর থাকে নাই, যদিও পদ্ধতি এখনও চালু আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত বরাত ব্যতীত নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী ঃ (১) দীওয়ান-ই উনসুরী, (তেহরান) তা. বি, নাসিরুদ-দীন শাহ-এর আমল (১২৬৪-১৩১৩/১৮৪৮-৯৬); (১) দীওয়ান-ই মানূচেহরী, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ.; (৩) দীওয়ান-ই ফাররূখী, তেহরান ১৩১১ সৌর; (৪) দীওয়ান-ই আশ'আর-ই হাকীম নাসির ইব্ন খুসরাও, তেহরান ১৩০৪-১৩০৭ সৌর, নির্ঘণ্ট; (৫) দীওয়ান-ই মাসঊদ সা'দ সালমান, তেহরান ১৩১৮ সৌর; (৬) হাকীম মুখতারী গাযনাবী, তেহরান ১৩৩৬ সৌর; (৭) কুল্লিয়াত-ই সানাঈ, তেহরান ১৩২০ সৌর; (৮) দীওয়ান-ই সায়্যিদ হাসান গাযনাবী, পদবী আশরাফ, তেহরান ১৩২৮ সৌর, নির্ঘণ্ট; (৯) কুল্লিয়াত-ই খাকানী, ২ খণ্ড, লক্ষ্ণৌ ১৮৭০ খৃ.; (১১) নিজামী, সিকান্দারনামাহ, কানপুর ১৮৭০ খৃ.; (১২) ঐ লেখক, হাফ্ত পায়কার, সম্পা. Ritter, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক, খামসা, তেহরান ১৩২১ হি.; (১৪) আওফী, লুবাবুল-আলবাব, লাইডেন ১৯০৬ খৃ.; (১৫) জামী, বাহারিস্তান, দিল্লী ১৩১৮হি.; (১৬) রূহী, দাবীর আজাম, লাহোর ১৯২৮ খৃ.; (১৭) সায়্যিদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, رسم تخلص کے دستور اور اسکے قاعدے ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাযিন, পরিশিষ্ট, মে ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ৩-২৯।

সায়্যিদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/
বোরহান উদ্দীন

তাগলিব (দ্র. ওয়াইল)

তাগলিব (تغلب) ঃ ও বাক্র প্রাচীন আরবের রাবী'আ গোত্রগোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুই শাখাগোত্র, একযোগে বানূ ওয়াইল নামে অভিহিত।

কথিত আছে যে, এই গোত্রের প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত নাম দিছার; একদা তাহার পিতা তাহাকে তাগলিব "তুমি বিজয়ী হইবে" শব্দ দ্বারা সাফল্য লাভের আশীর্বাদ করিলে এই নামটি তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু "সকল সামী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী" (তু. য়াশকুর, য়াযকুর, য়া'কূব, ইসহাক ইত্যাদি) ইহাকে মধ্যম পুরুষ পুং-লিঙ্গরূপে ব্যাখ্যা না করিয়া বরং স্ত্রী-লিঙ্গে প্রথম পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত। নামের লিঙ্গ হইতে দেখা যায় যে, গোত্রীয় নামটি ইহার পৌরাণিক আদি পুরুষ সংক্রান্ত উপকথা হইতে প্রাচীনতর। ইহা ভিন্ন আল-ফারাযদাকের কাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী যুগের কবিগণ বস্তুতপক্ষে তাগলিব-কে ওয়াইলের পুত্ররূপে বর্ণনা না করিয়া বরং তাঁহার কন্যারূপে বর্ণনা করিয়াছেন [Robertson Smith, Kinship, পৃ. ১৩ প., ২৫৩ প. (সাহিত্য-উদাহরণসহ)]; Lammens [Omayyades, পৃ. ২১৪; Noldeke, in Z. D. M. G., ৪০খ. (১৮৮৬ খৃ.), পৃ. ১৬৯] তাহা সত্ত্বেও মনে করেন যে, তাগলিবের ন্যায় এই প্রকার একটি সুস্পষ্ট ক্রিয়াবাচক নাম মূলত একটি যৌথ অভিব্যক্তি ছিল, যাহা দ্বারা সম্পূর্ণ গোত্রকে বিজয়ীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। জাওহারীর মতে তাগলিব গোত্র আল-গালাবা নামেও পরিচিত হইয়া থাকে (নিসবা গালবাবী; কালকাশান্দী ও সুওয়ায়দী. পূ. স্থা.)। ইহাদিগকে পৃথকভাবে নির্দেশ করিবার জন্য তাগলিব ইব্ন ওয়াইল (তাগলিবু ওয়ালিব্-রূপেও প্রচলিত) ব্যতীত য়ামানী তাগলিব ইব্ন হুলওয়ান, যাহা হইতে অন্যান্য গোত্রসহ আল-নামির (উপগোত্র মাশজা'আ, বালাযুরী, পৃ. ১১১) গোত্রের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কালব্ ইব্ন ওয়াবারা এবং তানূখ (দ্র.) গোত্র ও কিনানা ইব্ন বাক্র ইব্ন আওফ-কে তাগলিব আল-উলয়া নামেও উল্লেখ করা হইয়া থাকে (Wustenfeld, Register, পৃ. ৪৩৩)। ইহাদের প্রচলিত নিস্বা হইতেছে তাগ্লাবী, যদিও বহু ক্ষেত্রেই তাগলিবী [যেমন লিসানুল-আরাব, ২খ, ১৪৫; তাজুল-আরূস, ১খ,

৪১৪, ৩৪; Wright (Grammar, ১খ, ১৫৯)-এর মতে তাগলিবী অধিকতর গ্রহণযোগ্য। উপগোত্রসমূহের নাম নিস্‌বারূপে ব্যবহার করা হইত না; ইকদ ২খ, ৩৮-৩৯, ৪৬; Lammens, Moawia, পৃ. ৩৯৯] ব্যবহৃত হয়। মাসঊদী (মুরূজ, ৫খ, ১৪৮)-এর মতানুসারে তাগলিবিয়া হইতেছে আলীর এক স্ত্রী উমার ও রুকায়্যার মাতার নাম (অর্থাৎ আস-সাহবা, উম্ম হাবীব নামে পরিচিত, তু. Wustenfeld, ঐ, পৃ. ১৪৫; Lammens, ঐ, পৃ. ১১৮, নিম্নে দ্র.)।

ইহাদের বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ তাগ্‌লিব ইব্‌ন (বিন্‌ত) ওয়াইল ইব্‌ন কাসিত ইব্‌ন হিন্‌ব ইব্‌ন আফ্‌সা ইব্‌ন দুমী ইব্‌ন জাদীলা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন নিয়ার; ইহাদের ভ্রাতৃগোত্র ছিল বাক্‌র ও আনয্‌ (ইকদ্‌, ২খ, ৪৫, ২২; Robertson Smith, ঐ, পৃ. ১২ প.)। তাগ্‌লিবের তিন পুত্র ছিলেন ঃ ইমরান, আল-আওস ও গান্‌ম, যাহার পুত্র আমার ছিলেন মুআবিয়া ও হুবায়বার পিতা। মুআবিয়ার চার পুত্র আল-খান্‌নাকূন নামে পরিচিত (Wustenfeld, পৃ. ১২৯), বাক্‌র ইব্‌ন হুবায়বের ছয় পুত্র (ইকদ্‌, পূ. স্থা.; মালিক-এর উল্লেখ নাই) আল-আরাকিম (আখতাল, দীওয়ান, পৃ. ১২৭-এ; নামকরণের কারণ দ্র. নাকাইদ, পৃ. ২৬৬, ৩৭৩; Lyall, পূ. গ্র., পৃ.৫১; আল-আরাকিম দ্বারা বহু ক্ষেত্রেই সার্বিকভাবে তাগ্‌লিব অর্থ নির্দেশ করে; ইহাদের নামানুসারে দুইটি যুদ্ধ পরিচিত; নাকাইদ, পৃ. ৪০০, ৭৬১) নামে পরিচিত। তাগ্‌লিব গোত্রের প্রধান দুইটি শাখা হইতেছে (নাকাইদ, পৃ. ২৬৬, ৩৭৩-এ আর-রাওকান নামে অভিহিত) বানূ জুশাম ইব্‌ন বাক্‌র (বুয়ূতাতুল-আরাব-এ অন্তর্ভুক্ত; ইকদ, ২খ, ৩৭, ১১; Lammens, Moawia, পৃ. ৪০০)ও মালিক ইব্‌ন বাক্‌র ইব্‌ন হুবায়ব। হামদানী [দ্র.] বংশের আদি পুরুষ হামদান ইব্‌ন হামদূন, উসামা ইব্‌ন মালিকের সরাসরি বংশক্রমে আগত উত্তরসূরি। এই পরিবারের দুইজন সদস্য তাগ্‌লিব নাম ধারণ করেন ঃ আবূ ওয়াইল তাগ্‌লিব ইব্‌ন দাঊদ ইব্‌ন হামদান ও আবূ তাগ্‌লিব ফাদ্‌লুল্লাহ ইব্‌ন নাসিরুদ-দাওলা, যিনি আল-গাদানফার (দ্র.) নামে পরিচিত ছিলেন (Wustenfeld, পৃ. ৪৫৯ অথবা ৪৩৫)।

তাগ্‌লিবদের এলাকা ঃ গোত্রসমূহ পৃথক হইয়া যাইবার পর অন্যান্য রাবী'আ গোত্রের সহিত তাগলিব গোত্র নাজদ, হিজায ও তিহামার সীমান্ত অঞ্চলের উচ্চ এলাকায় বসতি গ্রহণ করে। মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে তাহাদের অভিবাসন ছিল একটি শ্লথ ও পর্যায়ক্রমিক, যাহা বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া চলিতে থাকে এবং তাহা কেবল মুসলিম যুগে এবং পরবর্তীকালে তথাকথিত দিয়ার রাবী'আ অঞ্চলরূপে পরিচিত এলাকায় সমাপ্তি লাভ করে। (খৃস্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে) বাসূস যুদ্ধ যে সময়ে সংঘটিত হয় তখন পর্যন্ত বাকর ও তাগলিব গোত্র নাজদ্‌ অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল, যেহেতু তাহাদের অভিবাসন আনুমানিক ৪৮০ খৃ., যূনুওয়াসের সময়ের ঘটনারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে যেই সকল স্থান বিখ্যাত হইয়া উঠে তাহা এই এলাকায় অবস্থিত; এলাকাটি দক্ষিণে বাহরায়ন ও আরিদ পর্বতমালা দ্বারা এবং উত্তর দিকে পরবর্তী কালের বসরার অক্ষাংশ দ্বারা বেষ্টিত (Blau, in Z. D. M. G, ২৩খ., ১৮৬৯ খৃ., পৃ. ৫৭৯ প.)। তাগলিব ও বাক্‌র গোত্রের মধ্যে সীমারেখা প্রসঙ্গে আমরা কেবল এইটুকু বলিতে পারি যে, প্রথমোক্ত গোত্র প্রধানত এই অঞ্চলের উত্তর অংশের মধ্যেই বসবাস করিত, যাহা সিরীয় সীমান্তের নিকটতর ছিল। Wustenfeld (ঐ, পৃ. ৪৩৪) "সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে" নিম্নলিখিত তাগলিব বসতিসমূহের (কেবল কবিগণের উদ্ধৃতিসমূহে প্রাপ্ত) নাম উল্লেখ করিয়াছেন (বাকরী হইতে) আল-আহফার, আল-আয়াগিব, আল-মুওয়াছছাজ, আলিম, উনাযা, কাছিরা, আনীয়া ও আল-নাহয় (নিহয়); ইহাদের মধ্যে শেষোক্তটি বাসূস যুদ্ধের একটি রক্ষণক্ষেত্ররূপে পরিচিত এবং তাহা (মারাসিদ, ৩খ, ২৫৫) বাহরায়ন ও য়ামামার মধ্যে অবস্থিতরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। পরবর্তী শতাব্দীতে (৬ষ্ঠ) তাগলিব গোত্র অংশত একই এলাকায় তাহাদের দখল অব্যাহত রাখে। তবে একই সঙ্গে তাহারা ধীরে ধীরে ফুরাত নদীর নিম্ন প্রবাহ অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। জাহিলী যুগে আল-আনবারের উত্তরে অবস্থিত কাবাছছিল তাগলিব গোত্রের একটি বাজার (মারাসিদ, ২খ, ৪৭৫)। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে তাহাদের আবাসস্থলের কেন্দ্রবিন্দু ছিল মধ্য মেসোপটামিয়া, উত্তরে কারকীসিয়া, সিন্‌জার, নাসীবীন ও আল-মাওসিল এবং দক্ষিণে আনা ও তিকরীতের মধ্যবর্তী খাবুর দিজলা ও ফুরাত নদী দ্বারা গঠিত একটি উপদ্বীপের ন্যায় এলাকা। ইহাদের মধ্যে একটি অংশ ফুরাত নদীর দক্ষিণ তীরে মানবিজে এবং আর-রুসাফায় (পরবর্তী কালে কিন্‌নাসরীন ও দামিশক-এর উপকণ্ঠ পর্যন্ত), আয়নুত তামর ও ইলাহা (লাহা) পর্বত পর্যন্ত দক্ষিণে বিস্তৃত এবং পুনরায় খাফ্‌ফান ও আল-উযায়বের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁবুতে বসবাস করিত। একই সময়ে ইহাদের অপর একটি অংশ দিজলা নদী অতিক্রম করিয়া আযারবায়জান গমন করে (Lammens, Chantre, পৃ. ৯৬ প., ১২১ প.; Moawia, পৃ. ৩৮১, ৩৯৮-৪০০; Omayyades, পৃ. ২১৪, ২৪০, ২৬৬ প.; Musil, বিশেষত Euphrates, পৃ. ৪২, ১৭০, ২৮৫, ৩৫৯; Palmyrena, পৃ. ১৭৫, ২৪৮, ২৮১ প.)। Musil-এর গ্রন্থসমূহ [গ্রন্থপঞ্জী দ্র.] তাগলিব গোত্র অধ্যুষিত এলাকাসমূহের ঐতিহাসিক ভূ-সংস্থানের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় তথ্য উৎস।

ইতিহাস ঃ তাগলিব গোত্র প্রসঙ্গে আমরা প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই ২য় শাপূরের আমলে, যিনি "পারস্য সাম্রাজ্য ও সিরিয়ার রোমানগণের Limes-এর মধ্যবর্তী" বাক্‌র ও তাগলিব গোত্রের আবাসভূমি আক্রমণ করেন এবং উহাদের কিছু সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে সম্ভবত উহাদিগকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য বাহরায়ন, কিরমান, তাওওয়াজ ও আল-আহওয়াযে বসতি প্রদান করেন (Woldeke, Sasaniden, পৃ. ৫৬ প., ৬৭)। নাজদের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাঁহার সামরিক অভিযানে, হিময়ার বংশীয় আব্‌রাহা (?) কালব্‌ গোত্রের যুহায়র ইব্‌ন জানাবকে বাক্‌র ও তাগলিব গোত্রের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন (আগানী, ২১খ., ৯৫; ইবনুল-আছীর, ১খ, ৩৬৭ প.)। অতঃপর উভয় গোত্র অন্যান্য মা'আদদ গোত্রসমূহের সহযোগে তাহাদের য়ামানী কর্তৃপক্ষীয় জোয়াল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করে এবং ইহার ফলে আস-সুল্‌লান ও খাযায (আ)-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয় (এই পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তু. Noldeke, Funf Moallaqat, ১খ., ৪৪, ৮৪) যাহাতে রাবী'আ ইব্‌নুল হারিছ অথবা তাহার পুত্র কুলায়ব [দ্র.] তাহাদের নেতা ছিলেন (ইকদ, ৩খ, ৬৬, ৩১; Reiske, পূ. গ্র., পৃ. ১৮২) শেষোক্ত ব্যক্তি গুপ্তঘাতক (?) দ্বারা নিহত হইলে তাহার ভ্রাতা মুহাল্‌হিল ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাক্‌র গোত্রের বিরুদ্ধে বিখ্যাত বাসূস (দ্র.) যুদ্ধের সূত্রপাত করেন (সংঘটিত যুদ্ধসমূহের নাম, সংখ্যা ও ক্রম প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিভিন্ন প্রকারের; তু. বাক্‌রী, পৃ. ৮৪২-৮৪৩; Reiske, পৃ. ১৬৪, ১৮১-১৯৮; আগানী, ৪খ, ১৪৩; ইবনুল-আছীর, ১খ, ৩৮৪-৩৯৭; Blau, পূ. স্থা.; উহাদের অবস্থান প্রসঙ্গে দ্র. Wetzstein, in Ztschr. f. allg. Erdk., NS, ১৮খ. [১৮৬৫ খৃ.], পৃ. ২৬২ প., ৪১৫; Musil, Palmeyrena, পৃ. ৬২ প.)। কিদ্‌(দ)ায় [য়াওমুত-তাহলাক, আত-তাহালুক অথবা আছ-ছানিয়্যা নামেও পরিচিত] তাহারা পরাজিত হইবার পর তাগলিব গোত্রসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়

বলিয়া কথিত রহিয়াছে [বাকরী, পৃ. ৫৬; ইকদ, ৩খ, ৬৯, ১৫; অন্যান্য "দিবস" ঃ ঐ, পৃ. ৬৮; যারবূ'দের সহিত ঃ (২য়) দিবস যারূদ ঃ ঐ, পৃ. ৫৯; তু. য়াকূত, ২খ, ৯২৮; রিয়াহ ইব্ন যারবূ'র সহিত ইরাকের দিবসঃ কুতামী, দীওয়ান, পৃ. ১৬; নাকাইদ, পৃ. ৭৬০ প.—সাধারণভাবে দেখা যায় যে, তাগলিব গোত্রের খুব নগণ্য সংখ্যক যুদ্ধ নথিভুক্ত হইয়াছে। ইহার হেতু (?) Lammens, Moawia, পৃ. ৩৯৯, টীকা ৬-এ দেওয়া হইয়াছে]। কিন্দা গোত্রের অধীনে তাগলিব গোত্রের পরবর্তী ইতিহাস প্রসঙ্গে এবং ইতিমধ্যে বর্ণিত বিষয় প্রসঙ্গে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. প্রবন্ধ 'বাক্র'। ৩য় মুনযিরের প্রচেষ্টায় যুল-মাজায-এ শান্তি স্থাপন করা হয়, ইহার পশ্চাতে সম্ভবত তাহার লক্ষ্য ছিল তাহার পরিচালিত আক্রমণসমূহের জন্য এই দুইটি বৃহৎ গোত্রকে সুলভ করিয়া তোলা [তু. সূক] (পণবন্দীসমূহ প্রসঙ্গে দ্র. Rothstein, পূ. গ্র., পৃ. ১৩৭)। ইহা প্রকৃতপক্ষেই একটি অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ছিল, কারণ ইহার পর আর কখনও আমরা গোত্রসমূহের মধ্যে কোন গুরুতর সংঘর্ষের ঘটনা দেখিতে পাই না (তু. Noldeke, Funf Moall, ১খ, ৫৩ প., ৭৩)। যদিও বাক্র গোত্র লাখমী গোত্রের প্রতি অনুরক্ত ছিল, তাগলিব গোত্র আমর ইব্ন হিন্দকে অনুসরণ করিতে অস্বীকৃত হয়। তিনি তাহার পিতা ৩য় মুনযিরের মৃত্যুর জন্য গাসসানী বংশের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি তাহাদের এই অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে তামীম গোত্রের আল-গাল্লাকের মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করেন (আল-আল্লাক নয় ঃ Noldeke, Funf Mo'all, পৃ. ৭৬)। তাগলিব ও বাক্র গোত্রের মধ্যে একটি নূতন বিবাদ মীমাংসার জন্য, নিজ নিজ গোত্রের প্রতিনিধিরূপে মুআল্লাকার কবি আমর ও হারিছ একই লাখমী ব্যক্তির নিকট গমন করেন (ঐ, পৃ. ৫১ প.; ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, তিনিই প্রথম বাসূস যুদ্ধে সমাপ্তি আনয়ন করেন, আগানী, ৯খ, ১৭৮-১৮০)। আমর ইব্ন কুলছূমের গর্ব তাহার জন্য অসহনীয় ছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তি যখন অপর কোন উপলক্ষে আমরকে অপমান করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্থানে তাহাকে হত্যা করেন (Rothstein, পৃ. ১০০ প., ১৩৫)। ইহার পর হইতে তাগলিব গোত্র স্বাধীন হইয়া যায় বলিয়া মনে হয়। এমনকি তাহারা তাহাদের সহিত খোলাখুলিভাবেই শত্রুতা করিতে থাকে। অবশ্য আমরের ভ্রাতা মুর্রা ইব্ন কুলছূম, নু'মান আবূ কাবূসের এক পুত্র লাখমী যুবরাজ মুনযিরকে হত্যা করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না (ঐ, পৃ. ১১২)। যুকার (দ্র.)-এর যুদ্ধে (উল্লিখিত স্থানসমূহের জন্য ঃ ঐ, পৃ. ১২১) তাগলিব গোত্র উহাদের দলপতি নু'মান ইব্ন যুর'আ (তাহার প্রসঙ্গেঃ দ্র. কুতামী, দীওয়ান, পৃ. ৩৩)-এর নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করে, তিনি কিভাবে সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে বাক্র গোত্রকে আকস্মিকভাবে আঘাত করা যাইতে পারে সেই প্রসঙ্গে খুসরাওকে উপদেশ প্রদান করেন (Noldeke, Sasaniden, পৃ. ৩৩৪; ইকদ, ৩খ, ৮১প.)। ইহা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে, আল-আখতাল (দীওয়ান, পৃ. ২২৬) পরবর্তী কালে পারসিক শক্তির বিরুদ্ধে বাক্র গোত্রের এই বিজয়কে এই দুই ভ্রাতৃগোত্রের জন্য সম-গৌরবের বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

খৃষ্টান প্রতিবেশী গোত্রসমূহের সহিত সংযোগ ও সংস্পর্শের মাধ্যমে খৃস্ট ধর্ম তাগলিব গোত্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করে, এই ঘটনা উহাদের মধ্যে ইসলামের অভ্যুদয়ের খুব বেশি পূর্বের নয় (আমর-এর মু'আল্লাকা গ্রন্থে খৃস্ট ধর্ম প্রসঙ্গে কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই, Noldeke, Funf, Moall., ১খ, ১৯, ৪৬; অপরপক্ষে দ্র. Cheikho, আন্-নাসরানীয়া, পৃ. ১২৫)। পূর্বে তাহারা বাক্র গোত্রের ন্যায় আওয়াল বা উওয়াল নামক দেবতার উপাসনা করিত। ইহার শব্দপ্রকরণ প্রসঙ্গে দ্র. Robertson Smith, পূ. গ্র., পৃ. ১৯৪)। যদিও তাহাদের মধ্যে এই নূতন ধর্মবিশ্বাস গভীরতা লাভ করে নাই (নিম্নে দ্র.), তথাপি ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীসমূহে তাহারা ধর্মান্তরিত না হইয়া ইহাকেই বজায় রাখে। কেবল একটি ক্ষুদ্র অংশ, সম্ভবত তাগলিব গোত্র যাহারা তায়্যি গোত্রের প্রতিবেশী ছিল (Sprenger, Mohammed, ৩খ, ৪৩৩ প.), তাহাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এই প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে, হিজরী ৯ সালে কিছু মুসলিম ও সোনালী ক্রুসচিহ্ন পরিহিত কিছু সংখ্যক খৃস্টান সম্বলিত তাগলিব গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করে এবং শেষোক্ত দল এই মর্মে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করে যে, তাহাদের ধর্মবিশ্বাস অপরিবর্তিত থাকিবে, কিন্তু তাহাদের সন্তানদের খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করিবে না। তবে সম্ভবত তাগলিব গোত্রের পক্ষ হইতেই এই প্রস্তাব প্রদান করা হয় যাহাতে তাহাদের জিয্যা (দ্র.) কর প্রদান করিতে না হয়। কারণ মহানবী (স) কখনও খৃস্টান জনগোষ্ঠীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন নাই (এই প্রসঙ্গে Wellhausen, Skizzen, ৪খ, ১৫৬)। পরবর্তীকালে উমার (রা) এই একই ভিত্তিতে তাগলিব গোত্রের সহিত চুক্তি করিতে বাধ্য হন বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহা নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের একটি উদ্ভাবন (নিম্নে দ্র.)। আগানীতে (১৬খ, ৫৩; Cheikho, ঐ, পৃ. ৪৫৪) প্রদত্ত যে কাহিনীতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) যায়দ আল-খায়লকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাগলিবী দলপতি আল-জার্রারকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিতে আদেশ করেন, তাহাও সমভাবেই সন্দেহজনক (In Sprenger, ৩খ, ৩৯১; আল-গাযযার)।

হিজরী ১১ সালে রিদ্দার কালে ভণ্ড মহিলা নবী সাজাহ [দ্র.] যেই তাগলিব গোত্রের মধ্যে খৃস্টানরূপে লালিত-পালিত হয়, তাগলিবী ও তামীমী গোত্র সহযোগে য়ামামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং কথিত আছে যে, মেসোপটেমিয়াতে তাহাদের মাঝেই তাহার মৃত্যু ঘটে (বালাযুরী, পৃ. ৯৯ প.; Lammens, Moawia, পৃ. ৩০৪)। কিছু সময়ের জন্য বিদ্রোহী শায়বান, তাগলিব ও আন-নামির গোত্রসমূহই জনৈক মাফরূকের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় (তাবারী, ১খ, ১৯৭৩)।

সাজাহ-এর সহিত যেই সকল তাগলিবী অভিবাসন করে তাহারা হিজরী ১২ সালে আয়নুত-তামরে পারসিক বাহিনীর সমর্থন করে; তথায় খালিদ ইব্নুল-ওয়ালীদ (রা) তাহাদিগকে হত্যা করেন, এমনকি তাহাদের দলপতি আককা ইব্ন আবী আককা প্রাণ হারায়। অতঃপর ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহারা যারমিহর ও রূযবিহ-এর নেতৃত্বে এই সময়ে পারসিক শক্তির দ্বারা ব্যাপক ক্ষেত্রে পরিকল্পিত সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করে। তাহাদের নেতা আল-হুযায়ল ইব্ন ইমরান আল-মুসায়্যাখ (বানিল-বারশা)-এ শিবির স্থাপন করে, তথায় আল-হুসায়দে পরাভূত পারসিক বাহিনী মাহবূযানের নেতৃত্বে তাহার সহিত যোগদান করে। খালিদ (রা) তিন ডিভিসন সৈন্যসহ তাহাদের উপর হামলা করেন এবং মাত্র নগণ্য সংখ্যক লোক প্রাণে রক্ষা পায়। অতঃপর তিনি আল-ছানী নামক স্থানে রাবীআ ইব্ন বুজায়র আত-তাগলিবীকে পরাস্ত করেন (যাহার বন্দী কন্যা আলী কর্তৃক ক্রীত হয়) এবং আল-যুমায়াল (আল-বিশর)-এ অপর একটি শিবিরে আকস্মিক আঘাত করেন, এই সময়ে হিলাল ইব্ন আককা আর-রূদাবে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। ফুরাতে নদীর তীরস্থ আল-ফিরাদ পর্যন্ত তাহার অগ্রাভিযানের ফলে পারসিক, বায়যানটাইন ও তাগলিব, ইয়াদ ও আন-নামির আরব গোত্রসমূহ, তাহাদের অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ

হয়; তাহারা ভয়ংকর এক শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। কথিত আছে যে, ইহাতে ১,০০,০০০ (?) জীবননাশ হয় (তাবারী, ১খ, ২০৬২-২০৭৫; Wellhausen, ঐ, ৬খ, ৪৫)। খালিদ (রা) যখন আবূ বাক্‌র (রা)-এর নির্দেশ অনুসারে সিরিয়া অভিমুখে ধাবমান, পথিমধ্যে আল-মুসায়্যাখ (ইহাই সঠিক পাঠ) ও আল-হুসায়দে তিনি রাবী'আ ইব্‌ন বুজায়রের নেতৃত্বাধীন স্বধর্মত্যাগী (মুরতাদ্দ) তাগলিবীগণের সাক্ষাত পান এবং তাহাদের পরাভূত করেন (বালাযুরী, পৃ. ১১০)। দুর্ভাগ্যজনক " সেতুর যুদ্ধ" ও খাফফান পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পর আন-নুসায়র ও হুযায়ফার নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী সেনাদল তিকরীত পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং পথে তাগলিব গোত্রকে পরাজিত করে বলিয়া কথিত আছে (ঐ, পৃ. ২৪৯)। যদিও এই সকল ঘটনার কালক্রম সকল ক্ষেত্রে সমভাবে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত নয় (তু. Wellhausen, ৬খ, ৪৬ প.; de Goeje, Memoires, No, ২, পৃ. ৩৮ প.; খালিদ (রা)-এর সময় অভিযানসমূহের ভূ-সংস্থান প্রসঙ্গে ঃ Musil, Euphrates, পৃ. ৩০০-৩১৪; ঐ লেখক, Arabia, পৃ. ৫৫৩-৫৭৩), তবুও এই সকল কাহিনী হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাগলিব গোত্র মুসলিমদের উপর আক্রমণ করিতে সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না যে, আল-বুওয়ায়বের যুদ্ধের পূর্বে বানুন-নামির ও তাগলিব গোত্রের অশ্বারোহী বাহিনী আল-মুছান্নাকে সাহায্য দানের প্রস্তাব করিয়াছিল (তাবারী, ১খ, ২১৮৯ প.)। এই ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভবত C. H. Becker (in Caetani, Annali, Year 14, শা. ৩২, টীকা খ)-এর সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিয়া সায়ফ ইব্‌ন উমার [দ্র.]-এর একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদনকে দায়ী করিতে হয়। এই একই বৎসর আল-মুছান্না আল-আনবার হইতে আল-কাবাছে শিবির স্থাপনকারী তাগলিবদের বিরুদ্ধে (উপরে দ্র.) একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। অতঃপর অপর একটি দস্তকে সিফফীনে তাগলিব ও আন-নামির গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, যাহারা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে (তাবারী, ১খ, ২২০৬-২২০৮; Wellhausen, ৬খ, ৬৯; Musil, Euphrates, পৃ. ৩২১; একটি ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, বাক্‌র ও তাগলিব গোত্রের মধ্যে বিরাজমান প্রাচীন শত্রুতা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া যায় নাই)।

হিজরী ১৬ সালে পারসিক, বায়যানটাইন ও ইয়াদ, তাগলিব, আন-নামির ও অন্যান্য আরব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী তিকরীতের একটি সুরক্ষিত অবস্থান দখল করিলে আবদুল্লাহ ইব্‌নুল-মু'তাম্ম ৫০০০ সৈন্য লইয়া তিকরীতে উপস্থিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী খণ্ডযুদ্ধ চলাকালে খৃস্টান আরবদের সহিত একটি গোপন চুক্তিতে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। কেবল বায়যানটাইন বাহিনী যুদ্ধে নিরুৎসাহিত হইয়া ফিরিয়া যাইবার পরেই খৃস্টানগণ তাঁহার এই প্রস্তাবে সাড়া দেয় এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাহাদের সহায়তা লাভ করিয়া তিনি একটি কৌশলে শত্রুভাবাপন্ন এই শিবির এবং সেই সঙ্গে আল-হিসনায়ন অধিকারে সফল হন (তাবারী, ১খ, ২৪৭৪-২৪৭৭)। আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক মদীনায় প্রেরিত প্রতিনিধি দলের সহিত তাগলিব গোত্রের একটি দল আগমন করিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে এবং তাহারা উমার (রা)-এর সহিত পৃথক একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল বলিয়া প্রচলিত আছে। তিনি তাহাদিগকে, হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব বিষয়ে অন্যান্য মুসলিমের সহিত সমতা লাভ করিতে অন্যথায় জিয়য়া প্রদান করিতে প্রস্তাব করেন। যেহেতু তাহারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই, উমার (রা) এই শর্তে তাহাদের উপর মুসলিমগণের সাদাকা-এর ন্যায় জিয়য়া কর আরোপে সম্মত হইলেন যে, তাহারা (ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী পিতা-মাতার) সন্তানদের (নবজাত) খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করিবে না [তাবারী, ১খ, ২৪৮২ অনুসারে] (তু. ইব্‌নুল-আছীর, ২খ, ৪১০)। মেসোপটেমিয়া বিজয় প্রসঙ্গে সায়ফ প্রদত্ত কাহিনীর কেবল সমাপ্তি পর্বে আগমন করিবার পরেই (Wellhausen, ৬খ, ৮৫ প.) আমরা তাবারীর গ্রন্থে (১খ, ২৫১০) আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন উকবার (তু. Wustenfeld, পৃ. ৪৬১ প.) গৃহীত ব্যবস্থার ফলে প্রতিষ্ঠিত "দ্বিগুণ সাদাকা" আরোপণ এবং তাগলিব গোত্রের উচ্চ-গর্ব, যাহারা জিয়য়া শব্দ ব্যবহারে প্রতিবাদ জানাইয়াছিল, প্রসঙ্গে বহুল প্রচলিত ভাষ্যটি (যেমন, তাজুল-আরূস, ১খ, ৪১৪, ৩২ ; ইব্‌ন কুতায়বা, মাআরিফ, পৃ. ২৮৩) দেখিতে পাই। এই সকল কাহিনীর পাশাপাশি বিস্তারিত বর্ণনায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাপর বহু সংখ্যক কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে (উদাহরণস্বরূপ Nau, পূ. গ্র., পৃ. ১১০ প., খৃস্ট ধর্মে দীক্ষা প্রদানের নিষেধ প্রসঙ্গে, এমনকি ১ম উমারকে ২য় উমাররূপে উল্লেখ করিয়াছেন)। এই ক্ষেত্রে আমরা সুস্পষ্টভাবেই বিভিন্ন সময়ের উপাখ্যানসমূহে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিতেছি, যাহা তাগলিব গোত্রের বিশেষ অবস্থান ও সামাজিক কাঠামোর এবং অন্যান্য সদস্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে (বালাযুরী, পৃ. ১৮১-১৮২; এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কাহারও জন্য নিজ গোত্রের পালিত গবাদি পশু আহার করা অথবা নিজ গোত্রের স্ত্রীলোক বিবাহ করা যাইবে না ঃ তাহারা আমাদের দলভুক্ত হয় অথবা আহলুল-কিতাবের নহে। অতিরিক্ত তথ্যাবলী Caetani, Annali, year 20, ৩৭-৪৯)।

প্রথম দিকে 'আলী (রা)-এর সহিত বন্ধুত্বমূলক মনোভাব পোষণ করিলেও শীঘ্রই তাগলিব গোত্র উমায়্যা বংশের অনুসারী হইয়া পড়ে এবং তাহারা সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে মুআবিয়া (রা) [যিনি উহাদের কৃপায় বসতি দান করেন, তাবারী, ১খ, ১৯২০, তু. ১খ, ২৪৮২, ২৪৮৮-২৪৯৫]-এর পক্ষে, হাররার যুদ্ধে য়াযীদের পক্ষে এবং মারজ রাহিতের যুদ্ধে মারওয়ানের পক্ষে যুদ্ধ করে (Lammens, Moawia, পৃ. ৪৯, ১১৮, ৩৮১, ৪০০, ৪৩৫; Yazid-1, পৃ. ২২৯-২৩১; Marwanides, পৃ. ৫৯ প.)। মুদারী ও য়ামানীদের মধ্যে সংঘটিত অন্তর্কলহে উদ্ভূত সংঘর্ষসমূহে তাহাদের অংশগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের খ্যাতি পুনরায় আর কাব্য সৃষ্টিতে স্মরণীয় হইয়া থাকে নাই [দ্র. রাবীআ]। কাল্‌ব গোত্রের বিরুদ্ধে তাহারা প্রথম পর্যায়ে কায়স গোত্রের মিত্র ছিল (W. Z. K. M., ১৫খ. [১৯০১ খৃ.], পৃ. ৬), প্রথমোক্ত গোত্র পরাভূত ও বিতাড়িত হইবার পর কায়স ও তাগলিব গোত্রের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। উন্মুক্ত যুদ্ধ শুরু হইয়া যায় যখন (৬৯-৭৩/৬৮৮-৬৯২) উমায়র ইব্‌নুল-হুবাব সুলায়মীদের সংগে খাবুরে বসতি পত্তন করেন এবং তথায় ইতিপূর্বেই বসতি স্থাপনকারী তাগলিব গোষ্ঠীর সহিত সংঘাতে জড়াইয়া পড়েন [দ্র. কায়স 'আয়লান]। প্রারম্ভিকভাবে ইতস্তত খণ্ড সংঘর্ষের পর মাকিসীন (মাকিস) নামক স্থানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহাতে তাগলিব ও আন-নামির একটি বৃহৎ পরাজয় বরণ করে। ইহার পর (৭০/৬৮৯) বেশ কিছু সংক্ষিপ্ত মুকাবিলার পর (আল-বালাযুরী, আনসাব, ৫খ, ৩১৩-৩২৮; ইবনুল-আছীর, ৪খ, ২৫৫-২৬৩-এর সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিয়া দিবসসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় আছ-ছারছার, আল-ফুদায়ন, আ-সুকায়র, আল-মা'আরিক, আশ-শারআবীয়া [তু. কুতামী, দীওয়ান, পৃ. ৫; W. Z. K. M., পূ. স্থা.], আল-বালীখ, কুতামী, পৃ. ৬ আন-নিস্‌ফ-এর উল্লেখ করিয়াছেন) আল-হাশশাকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যাহাতে উমায়র নিহত হন (নাকাইদ, পৃ. ৩৭৩, ৩৯৪, ৪০০ গ্রন্থে সিনজার-এর দিবস [উপরে

দ্র.] সহযোগে য়াওমূল-আরাকিম নামেও পরিচিত)। তাহার মৃত্যুর বদলা গ্রহণের জন্য যুফার ইবনুল-হারিছ আল-কুহায়লে তাগলিব পক্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। এই সংঘর্ষের একটি পরিণতি ছিল আল-বিশর [দ্র.]-এর দিবস (বা আর-রাহূব, য়াওম মুজাশিন [মুখাশিন নয়, বাকরী, পৃ. ১৭৯] যাহা য়াওম মারজ আস-সালাওয়াতাহ নামেও পরিচিত; কুতামী, পৃ. (১৪), টীকা ১; Wustenfeld, পৃ. ৪৩৪; সার্বিকভাবে দ্র. আগানী, ১১খ, ৫৭-৬৩; ২০খ, ১২৬-১২৮; Wellhausen, Das arabische Reich, পৃ. ১২৭-১৩০; Lammen, Chantre, পৃ. ৩৮১-৩৯৮; ঐ লেখক, Omayyades, পৃ. ২৫৬-২৬১; উল্লিখিত স্থানসমূহের অবস্থান প্রসঙ্গে Musil, Euphrates, পৃ. ৫৬ প. ও ৬০, ৮২-৮৪, ৩৩৬; ঐ লেখক Palmyrena, পৃ. ১৭২ প.)। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন সত্ত্বেও এই সকল 'দিবসসমূহ' কোনভাবেই জাহিলী যুগ হইতে পৃথকভাবে বিবেচনা করা যায় না। বস্তুতপক্ষে এই ক্ষেত্রে সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ছিল আরও নির্দয় ও নির্মম। তাই ইহা মোটেই বিস্ময়কর নহে যে, এই দলীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা বহুকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া যায় এবং মাঝে মাঝেই তাহা পুনরায় আক্রোশের সহিত বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

এই সংঘর্ষের মাধ্যমে তাগলিব গোত্র ইতিহাসের পাতায় উহাদের শেষ উল্লেখযোগ্য আত্মপ্রকাশ ঘটায়। ইহাদের পরবর্তী ইতিহাসের তুলনামূলকভাবে অধিকতর গুরুত্ববহ ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হারূনুর-রাশীদের সাদাকা সংগ্রাহকগণের একজন রাওহ ইব্ন সালিহ-এর সহিত প্রথম একটি সংঘাতের পর (যাহার মৃত্যুর জন্য তাহার ভ্রাতা হাতিম ইব্ন সালিহ ১৭১/৭৮৭ সালে তাগলিব গোত্রের উপর নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন), সাত বৎসর অতিবাহিত হইবার পর আল-ওয়ালীদ ইব্ন তারীফের নেতৃত্বে তাগলিব গোত্র একটি বিদ্রোহ সংঘটন করে। তাহাদের এই নেতা য়াযীদ ইব্ন মায়যাদ (যাহাকে খলীফা সাহায্য করিবার জন্য ডাকিয়া আনেন)-এর সহিত যুদ্ধ করিবার সময় নিহত হয় (ইবনুল-আছীর, ৬খ, পৃ. ৭৮, ৯৭-১০১; তাবারী, ৩খ, ৬৩১, ৬৩৮; Charles পূ. গ্র., পৃ. ৭৯; Wustenfeld, পূ. গ্র., পৃ. ৪৬২, ২৫৬)। আল-মা'মূনের শাসনকালে তাগলিবী মালিক ইব্ন তাওক ইব্ন আততাব, যিনি আর-রাহবা-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, প্রতিবেশী কায়স গোত্রকে দমন করেন; তাঁহার পুত্র আহমাদ এবং তাগলিবী জামান কর্তৃক বিদ্রোহ ঘোষণা (৩৩৬/৯৪৭-৪৮) প্রসঙ্গে প্রবন্ধ আর-রাহবা দ্র. (ইব্ন খালদূন, ইবার, ২খ, ৩০১; ইবনুল-আছীর, ৬খ, ২১৩; H. C. Kay, in F. R. A. S., NS., ১৮খ, ১৮৮৬, পৃ. ৫০৪; Musil, Euphrates, পৃ. ৩৪০ প.)। ২৫০/৮৬৪ সালে তাগলিবী আল-হাসান ইব্ন উমার ইব্ন খাততাব জাযীরাত ইব্ন উমার নির্মাণ করেন (য়াকূত, ২খ, ৭৯, তু. আল-বালাযুরী, পৃ. ১৮০)। তাগলিবী ইসহাক ইব্ন আয়্যূব ২৬৭/৮৮০ সালে ইসহাক ইব্ন কুনদাজীক)-এর বিরুদ্ধে তাগলিব, বাক্কর, রারীআ, য়ামানী ইত্যাদির একটি সম্মিলিত শক্তি গঠন করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার হাতে পরাজিত হন (তাবারী, ৩খ, ১৯৯১ প.; ইবনুল-আছীর, ৭খ, ২৩১ প.; আল-মাওসিলের তাগলিবী গোষ্ঠী প্রসঙ্গে প্রবন্ধ মাওসিল দ্র.)। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বিরাজমান বিশৃংখলার কারণে শেষ পর্যন্ত তাগলিব গোত্র এই অঞ্চল হইতে বসতি স্থানান্তর করে। তাহাদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি অংশ আর-রাহবা ও জাযীরাত ইব্ন উমারের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে থাকিয়া যায়; অপর একটি দল সম্ভবত বায়যানটাইন এলাকায় চলিয়া যায়। ৬ষ্ঠ/১০ম শতাব্দীতে আমরা প্রধান প্রধান তাগলিব গোষ্ঠীকে বাহরায়নে দেখিতে পাই। তথায় তাহারা সুলায়ম ও উকায়ল ইব্ন ..... ইব্ন আমির ইব্ন সা'সা'আ-এর সম্মুখীন হয় এবং শীঘ্রই কারমাতী বিদ্রোহ সংঘটনে যোগদান করে। (যেহেতু উমার-এর সময় হইতে আরব উপদ্বীপ এলাকায় শুধু ইসলাম ধর্ম অনুমোদিত ছিল [দ্র. তাবারী, ১খ, ২৪৮২; বাক্‌রী, পৃ. ৯ কিছু মাত্রায় এই প্রধানত প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধে গিয়াছেন], তাহারা ইতোমধ্যে নিশ্চিতভাবেই খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করে)। ৩৭৮/৯৮৮-৮৯ সালে কারমাতী শক্তি পরাজিত হইবার পর তাগলিবী নেতা আবুল-হাসান আল-আসফার উকায়ল গোত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সুলায়ম গোত্রকে বিতাড়িত করেন এবং ইহার পর তিনি উকায়ল গোত্রকে বসতি ত্যাগে বাধ্য করেন। পরবর্তীকালে শেষোক্ত গোত্র সালজূক শক্তি কর্তৃক পুনরায় বাহরায়নে বিতাড়িত হয় [দ্র. উকায়লী]। তথায় তাহারা এই সময়ে দুর্বল হইয়া পড়া তাগলিব শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে সমর্থ হয় (Kay, ঐ, পৃ. ৫০৫, ৫২৪ প.)। তাগলিব গোত্রের একটি অংশ সম্ভবত যথেষ্ট অতীত কালের ফারাসান দ্বীপপুঞ্জে [দ্র.] গমন করিয়াছিল (তু. Sprenger, Geogr., পৃ. ৩১, ২৫৪; য়াকূত, ৩খ, ৪৯৭, ৮৭৪; তাগলিব গোত্র হইতে কিবতী সম্প্রদায়ের উদ্ভূত হওয়া সংক্রান্ত কথিত দাবি প্রসঙ্গে দ্র. প্রবন্ধ রাবী'আ), অন্যদিকে ইহাদের অধিকাংশ পরবর্তী সময়ে সিরীয় মরুভূমি অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৬৮১/১২৮২ সালে হিমস-এ তখনও আমরা তাহাদের তাতার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ীরূপে যুদ্ধ করিতে দেখিতে পাই (Barhebareus, Tarikh, সম্পা. সালহানী, পৃ. ৫০৪) এবং আল-কালকাশান্‌দী এই একই সময়ে সিরিয়াতে তাহাদের অবস্থিতির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ৯ম/১৫শ শতাব্দী হইতে এই আকর্ষণীয় গোত্রটির নাম আর ইতিহাসে উল্লেখ হইতে দেখা যায় না (তু. তাঁহার Chantre গ্রন্থের শেষভাগে Lammens-কৃত গবেষণাসমূহ)। এই কারণে ইহা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য মনে হয় যখন দেখা যায় যে, একটি আধুনিক গোত্র তাহাদের উত্তরপুরুষরূপে তাগলিব গোত্রকে চিহ্নিত করে; উদাহরণস্বরূপ দাওয়াসির গোত্রের একটি অংশ এইরূপ দাবি করে (ফুআদ হামযা, কালব জাযীরাতিল-আরাব, মককা ১৩৫২ হি., পৃ. ১৫০) এবং শাম্‌মার গোত্রকে তাগলিব, আবস্ ও হাওয়াযিন গোত্রের একটি মিশ্রণ বলিয়া মনে করা হয় (Handbook of Arabia, ১খ, ৭৫; W. G. Palgrave, Narrative....., লণ্ডন ১৮৬৫ খৃ., ১খ, ১১৮ [উৎস? ; তু, ১খ, ৪৫০]ঃ জাবাল শাম্‌মারের অধিবাসীদের নিকট হইতে জানিতে পারেন যে, এই মিশ্রণ বাসূস যুদ্ধের পর [কিদদার যুদ্ধের পর ?; উপরে দ্র.] সংঘটিত হয়। "খৃস্টান একটি কীর্তি" অর্থাৎ তাগলিব ইত্যাদি গোত্ররূপে শাকীক (তু. রুওয়ালা-এর কূপ প্রসঙ্গে দ্র. Palgrave, ১খ, ৮৮)।

এই গোত্রের সামাজিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা তাহাদের নিজস্ব গোত্রীয় কবিগণের রচনা এবং তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর আক্রমণসমূহ দ্বারা প্রভূতভাবে অবগত রহিয়াছি। তাগলিবী নেতা আবদুল-মাসীহ খালিদকে জানান যে, তাহারা 'আরব' (অর্থাৎ বেদুঈন) গোত্রীয় নহে, বরং "আরবীয়কৃত নাবাতী" (অর্থাৎ বেদুঈন সংস্কৃতিসমৃদ্ধ কৃষিজীবী; দ্র. মাসঊদী, মুরূজুয-যাহাব, সম্পা. A. Sprenger, লণ্ডন ১৮৪১ খৃ., ১খ., ২৪৯; C. Ritter, Erdkunde, ১০খ, ৬৪ প.)। আল-আখতাল (পৃ. ২২২) তাহাদের খেজুর বৃক্ষের বাগান ও শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে উল্লেখ করেন

(Lammens, Chantre, পৃ. ৯৬); অশ্বপালকরূপে তাহারা অত্যন্ত খ্যতিমান ছিল (ঐ লেখক, Moawia, পৃ. ৩৯৮)। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তাহারা নাবিক [দ্র. সাফীনা]-রূপে দক্ষ ছিল এবং তাহাদের সমুদ্রবাহিত বাণিজ্য ছিল তাহাদের সম্পদ ও প্রভাবের অন্যতম উৎস (তু. আল-আখতাল, পৃ. ৩০৭; Lammens, Omayyades, পৃ. ২১৪ প., ২২৬, ২৬৫-২৬৮)। যদি ইহা স্মরণ রাখা হয় যে, ভারত অভিমুখী বাণিজ্য পথ তাহাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত ছিল এবং সার্বিকভাবে মেসোপটেমিয়া ছিল সর্বদিক হইতে আগত বাণিজ্য পথসমূহের সঙ্গমস্থল, তাহা হইলে আমর প্রণীত মুআল্লাকা প্রসঙ্গে তাবরীযী প্রণীত ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাহার মন্তব্য (সম্পা. Lyall, পৃ. ১০৮) "যদি ইসলামের আবির্ভাব আর সামান্য দেরীতে হইত, তবে বানূ তাগলিব সম্পূর্ণ মানবজাতিকে গ্রাস করিয়া নিত" (Lammens, Chantre, পৃ. ৯৭; Omayyades, পৃ. ২৬৭) অনুধাবনে আমাদের কোন সমস্যা হইবে না। ইহাতে এই গর্বিত ও শক্তিশালী গোত্রের সহিত উমারের ধৈর্যশীল আচরণের ব্যাখ্যা মিলে। পরবর্তীকালে অন্যান্য গোত্র তাহাদের এই বিশেষ অবস্থানের কারণে তাহাদের প্রতি কিছু মাত্রায় ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে লক্ষ করিয়া রচিত হাদীছসমূহ রচিত হয়। আলী (রা)-এর উক্তি বলিয়া কথিত ইহাদের মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঃ ইহাদের একটিতে তিনি তাগলিব গোত্রকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাঁহার কথিত ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কারণ উমারের সহিত তাহাদের সম্পাদিত চুক্তি সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের সন্তানদের খৃস্টধর্মে দীক্ষাদান অব্যাহত রাখিয়াছিল (বালাযুরী, পৃ. ১৮৩; তু. ইকদ, ৩খ, ২৫৬, ৪)। অপর একটি বহুল উদ্ধৃত মন্তব্যে তিনি বলেন, তাগলিব গোত্র খৃস্ট ধর্ম হইতে শুধু মদ্যপানের অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছে (৫ ঃ ৭ প্রসঙ্গে যামাখশারী ও বায়দাবী; তু. Caetani, Annali, year 20, শাখা ৩৭)। " গোত্রসমূহের বিশপ"-গণের মধ্যে শেষজন প্রকৃতপক্ষে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (বিশপগণের তালিকা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে দ্র. Charles, পূ. গ্র., পৃ. ৭৬-৮৩) এবং যদিও তাহাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল মূলত বাহ্যিক, যাহা সকল বেদুঈন জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (Goldziher, পূ. গ্র.; Lammens, Omayyades, পৃ. ২৩৬-২৩৯, ২৪৯), তাহারা বহু শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত উহা রক্ষা করার চেষ্টা করে (তাহাদের বিরোধিতামূলক উদ্দীপনার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ তাবারী, ১খ, ২৫১০; বালাযুরী, পৃ. ১৮১ প., তাহাদের মধ্যে শহীদ-এর সংখ্যা নগণ্য নহেঃ Lammens, Chantre, পৃ. ৪৩৮; Nau, পৃ. ১০৯ প.; Charles, পৃ. ৯৮-১০০)। এই গোত্রের পৃষ্ঠপোষক সন্ত ছিলেন সার্গিয়াস; তাহারা আর-রুসাফায় অবস্থিত তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করিত এবং তাঁহারা পতাকা উড্ডীন করিয়া যুদ্ধে গমন করিত, যাহার কারণে অন্যান্য গোত্রের কবি সম্প্রদায় বহুকাল পর্যন্ত তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছেন (Lammens, Musil, Palmyrena, পৃ. ২৬৭, ২৬৯; Cheikho, al.-Nasraniya, পৃ. ৯৯ প.)। তাহাদের মদ্যপানের অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্য তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা কিছুটা অবজ্ঞাভরে সমালোচিত (Goldziher, পূ. গ্র.; কুতামী, ৯খ, পৃ. ৯প.; সর্বোৎকৃষ্ট মদ উৎপাদক স্থানসমূহ প্রসঙ্গে দ্র. Lammens, Omayyades, পৃ. ২৫৩, ২৫৬) এবং অধিকতর বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয় হইল তাহাদের লোভ ও আতিথেয়তার প্রতি অনাগ্রহ (মাসঊদী, মুরূজ, ৬খ, ১৫১ প.; ইকদ, ৩খ, ৮৪, ৯৩, ২৩২, ২৩৬; আগানী, ৭খ, ১৮৬)। কবি জারীর তাঁহার বিদ্রূপাত্মক কবিতায় তাগলিব গোত্র সম্পর্কে এই ধরনের নিন্দাবাদমূলক মন্তব্য করিয়াছেন, তবে সেইগুলি কতদূর সত্যনিষ্ঠ তাহা প্রমাণসাপেক্ষ, অবশ্য তাগলিব গোত্রের সমৃদ্ধি ও গর্বিত আচরণ (যাহার প্রতিভূ ছিলেন কুলায়ব) তাহাদের প্রতিবেশী গোত্রসমূহকে কিছুটা ঈর্ষান্বিত করিয়াছিল তাহা হয়ত ঠিক।

তাগলিব গোত্রে বেশ কিছু সংখ্যক বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করেন। Cheikho, শুআরা, (পৃ. ১৫১-২০৪) গ্রন্থে কুলায়ব [দ্র.] মুহালহিল (তাগলিব গোত্রের মতে পরিপূর্ণ কাব্যস্রষ্টা প্রথম কবি; আল-আসমাঈর মতে তিনি প্রথম ৩০ পংক্তির কাসীদা প্রবর্তন করেন ঃ Fresnel, পৃ. ৭৬, ৮৪), আস-সাফ্ফাহ (অর্থাৎ সালামা ইব্ন খালিদ, আল-কুলাব [দ্র. বাক্র]-এ তাগলিব গোত্রের দলপতি), আল-আখনাস, ইব্ন শিহাব, উফনূন (সুরায়ম ইব্ন মা'শার-এর ডাকনাম), 'আম্র ইব্ন কুলছূম [দ্র.], জাবির ইব্ন হুনায় (দ্র. Noldeke, Funf Moall., ১খ, ১৯) এবং আমীরা ইব্ন জু'আয়ল (কুতায়বা আশ-শি'র, পৃ. ৪১১-তে উমায়রা-এর পাশাপাশি) প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন, ইহাদের সহিত আমরা কা'ব ইব্ন জুআয়ল (ঐ; Lammens, Chantre, পৃ. ১০২-১০৫, ১৩৪; Moawia, পৃ. ১৮৮, টীকা ৮), আল-আখতাল [দ্র.], আল-কুতামী [দ্র.], আল-আত্তাবী (আমরের একজন উত্তরসুরি, Noldeke, ঐ) এবং অন্যদের নাম যুক্ত করিতে পারি। ইব্ন দুরায়দ (আল-ইশতিকাক, পৃ. ২০২-২০৫), ইব্ন খালদূন (ইবার, ২খ, ৩০১ প.), ইকদ (২খ, ৪৫, ২৪প.) কর্তৃক অন্যান্য কবি এবং বিখ্যাত তাগলিবী ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রদান করা হইয়াছে (তু. Reiske, পূ. গ্র. পৃ. ১৬১, ২৬৯)।

গ্রীকদের সহিত তাহাদের অতি নৈকট্যের কারণে তাগলিব গোত্রের ভাষা অবিমিশ্র নহে বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে (Blau, পূ. গ্র., পৃ. ৫৯২; সুয়ূতী, মুযহির, বূলাক ১২৮২ হি., ১খ, ১০৫)। ইকদ (২খ, ৩৩, ২৬) গ্রন্থে তাহাদের কাশ্‌কাশা (ভাষার বিশেষ প্রয়োগ) ও বাক্র গোত্রকে কাসকাসা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুরূপ আরেকটি পরিচ্ছেদ অনুসারে (১খ, ২০৭) অবশ্য প্রথমোক্তটি বাক্র গোত্রের জন্য প্রযোজ্য এবং তাগলিব গোত্রের ক্ষেত্রে কাশ্‌কাশা প্রযোজ্য? (সুয়ূতী, ১খ, ১০৯ প.-এ ইহা নাই; কাশ্‌কাশা প্রসঙ্গে তু. লিসানুল-আরাব, ৮খ, ২৩৩, ১৭ প.; তাজুল-আরূস, ৪খ, ৩৪৫, ১১ প.; বিশেষভাবে A. Schaade, Sibawaihi's Lautlehre, লাইডেন ১৯১১ খৃ., পৃ. ৬২ প., ৭৯, ৮৪)। কবি আখতাল-এর ভাষাগত বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য দ্র, Noldeke, in W. Z. K. M., ৬খ. (১৮৯২ খৃ.), ৩৪৮ প.; আরও তু. G. W. Freytag, Finleitung....., বন ১৮৬১ খৃ., পৃ. ৭৫, ৯১।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধগর্ভে প্রদত্ত বরাতসমূহের অতিরিক্ত) ঃ আরবী অভিধান ও বংশতালিকা সংক্রান্ত হ্যাণ্ডবুকসমূহ ; (১) F. Wustenfeld, Register, পৃ. ৪৩৩-৪৩৬ ও Tabellen, গ এবং ২; (২) ইব্ন দুরায়দ, কিতাবুল-ইশতিকাক, সম্পা. Wustenfeld, গটিনজেন ১৮৫৪ খৃ., পৃ. ২০২-২০৫; (৩) আল-কালকাশানদী, নিহায়াতুল-আরাব ফী মা'রিফাত আনসাবিল-আরাব, বাগদাদ ১৩৩২ হি., পৃ. ১৫৯ প., ২৯৮ (সম্পূর্ণ পুস্তকে ছা'লাব-এর পরিবর্তে তাগলিব পাঠ করিতে হইবে), ৩৫৭; (৪) আস-সুওয়ায়দী, সাবাইকুয-যাহাব ফী

মা'রিফাত কাবাইলিল-আরাব, বোম্বাই ১২৯৬ হি. (লিথো), পৃ. ৪৪, ৫৪, ২৩; (৫) ইব্ন কুতায়বা কিতাবুল-মাআরিফ, সম্পা. Wustenfeld, গটিনজেন ১৮৫০ খৃ., পৃ. ৪৬ প, ২৮৩; (৬) W. Robertson-Smith, Kinship and Marriage in early Arabia, কেমব্রিজ ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ১২-১৪, ১৯৪, ২৫৩ প.; (৭) তাবারী; (৮) ইবনুল-আছীর; (৯) বালাযুরী (সম্পা. de Goeje); (১০) কিতাবুল-আগানী; (১১) নাকাইদ (সম্পা. Bevan); (১২) য়াকূত; (১৩) বাক্‌রী, মু'জাম (সম্পা. Wustenfeld) ও মারাসিদুল-ইততিলা' (সম্পা. T. G. J. Juynboll), নির্ঘণ্ট; (১৪) ইব্ন আবদ্ রাব্‌বিহি, আল-ইকদুল-ফারীদ, কায়রো ১৩১৬ হি., বিশেষভাবে ১খ, ২০৭; ২খ, ৩৩, ৩৭-৩৯, ৪৫প; ৩খ, ৫৯, ৬৬-৭০, ৮১-৮৪, ৯৩, ২৩২, ২৩৬, ২৫৬; (১৫) ইব্ন খালদূন, ইবার, বূলাক ১২৮৪ হি., ২খ, ৩০১-৩০৩; ২/২খ, প., ৮১-৮৩, ১০৭-১০৯। জাহিলী যুগ প্রসঙ্গে ঃ (১৬) Th. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, লাইডেন ১৮৭৯ খৃ., পৃ. ৫৬ প., ৬৭, ৩৩৩ প.; (১৭) ঐ লেখক, Fun Moallaqat, ১খ, in Sb. Ak. Wiss. Wien, Phil-hist. Cl., ১৪০/৭খ. (১৮৯৯ খৃ.), স্থা.; (১৮) G. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden, in al-Hira, বার্লিন ১৮৯৯ খৃ., ১০০ প., ১১২, ১২০-১২২, ১৩৫, ১৩৭; (১৯) J. J. Reiske, Primae lineae hist. regn. arab....., সম্পা. Wustenfeld, গটিনজেন ১৮৪৭ খৃ., পৃ. ১৬১-১৬২, ১৬৪, ১৮০-১৯৮; (২০) A. P. Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes...., প্যারিস ১৮৪৭-১৮৪৮ খৃ., ৩খ, নির্ঘণ্ট; (২১) F. Fresnel, Lettres sur l'histoire les Arabes, প্যারিস ১৮৩৬ খৃ., পৃ. ১৫-২৮, ৬৭-৮৪; [৪৬] প.; (২২) C. J. Lyall, Translations of Ancient Arabian Poetry, লণ্ডন ১৮৮৫ খৃ., নির্ঘণ্ট। ইসলামী যুগ প্রসঙ্গে ঃ (২৩) A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, বার্লিন ১৮৬৫ খৃ., ৩খ, ৩৯১, ৪৩৩ প.; (২৪) ঐ লেখক, Die alte Geographie Arabiens, বার্ন ১৮৭৫ খৃ., পৃ. ৩১, ২৫৪; (২৫) J. Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, ৪খ. (বার্লিন ১৮৮৯ খৃ.), পৃ. ১৫৬; ৬খ. (ঐ, ১৮৯৯ খৃ.), পৃ. ৪৫ প., ৬৯, ৮৫ প.; (২৬) ঐ লেখক, Das arabische Reich und sein Sturz, বার্লিন ১৯০২ খৃ., পৃ. ১৫, ১২৭-১৩০; (২৭) M. J. de Goeje, Memoires d'hist. et de geogr. orientales, No. 2 (Conquete de la Syrie)[2], লাইডেন ১৯০০ খৃ., পৃ. ৩৭-৫০; (২৮) A. V. Kremer, Culturgeschichte des Orients....., ভিয়েনা ১৮৭৫-১৮৭৭ খৃ., ১খ, ৬৩, ১০৫; (২৯) আল-বালাযুরী, আনসাবুল-আশরাফ, সম্পা. S. D. F. Goitein, ৫খ. (জেরুসালেম ১৯৩৬ খৃ.), পৃ. ৩১, ৩০৮-৩০৯, ৩১৩-৩৩১; (৩) আল-আখতাল, দীওয়ান, সম্পা. আ. সালহানী, বৈরূত ১৮৯১ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩১) আল-কুতামী, দীওয়ান, সম্পা. J. Barth, লাইডেন ১৯০২ খৃ., Einleitung এবং Noten, স্থা.; (৩২) ইব্ন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ-শুআরা, সম্পা. de Goeje, লাইডেন ১৯০৪ খৃ., নির্ঘণ্ট।

তাহাদের ধর্ম প্রসঙ্গে ঃ (৩৩) I. Goldziher, Muhamadanische Studien, হাল ১৮৮৮-১৮৯০ খৃ., ১খ, ১২, টীকা ৩; (৩৪) F. Nau, Les Arabes chretiens de Mesopotamie et de Syrie du VIIeme au VIIIeme siecle, প্যারিস ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১০৫, ১০৯-১১৩; (৩৫) H. Charles, Le Christianisme des Arabes nomades sur le Limes....., প্যারিস ১৯৩৬ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩৬) L. Cheikho, আন-নাসরানিয়্যা ওয়া আদাবুহা বায়নাল-আরাবিল-জাহিলিয়্যা, বৈরূত ১৯১২-১৯২৩ খৃ., পৃ. ৯৯ প., ১২৫., ৪২০, ৪৫৪; (৩৭) L. Cheikho, শুআরাউন-নাসরানিয়্যা, বৈরূত ১৮৯০ খৃ., পৃ. ১৫১-২০৪ (গ্রন্থের নামটি বিভ্রান্তিমূলক)। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তথ্যসমূহের জন্য দ্র. ঃ (৩৮) H. Lammens, Le chantre de Omiades, in F. A. ৯/৪খ. (১৮৯৪ খৃ.), পৃ. ৯৪-১৭৬, ১৯৩-২৪১, ২৮১-৪৫৯, স্থা.; (৩৯) ঐ লেখক, Etudes sur le regne du calife omajyade Moawialer, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৪০) ঐ লেখক, Etudes sur le sieole des Omayyades, বৈরূত ১৯৩০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৪১) ঐ লেখক, Ia Califat de Yazid Ier, in M. F. O. B., ৫খ. (১৯১১ খৃ.), পৃ. ২২৯-২৩১; (৪২) ঐ লেখক, Lavenement des Marwanides, ঐ, ১২খ. (১৯২৭ খৃ.), পৃ. ৫৯ প., ৯৯প., ৬২প., ১০২ প.। তাগ্‌লিব অঞ্চলসমূহের ভূ-সংস্থান সম্পর্কে ঃ (৪৩) A. Musil, The Middle Euphrates, নিউ ইয়র্ক ১৯২৭ খৃ.; এবং Arabia Deserta, ঐ, ১৯২৭ খৃ.; এবং Palmyrena, ঐ, ১৯২৮ খৃ., নির্ঘণ্ট, দ্র. তারলেব।

H. Kindermann (E. I.[1])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আত-তাগাবুন (التغابن) ঃ সূরা, একে অপরকে ধোঁকা দেয়া, হার-জিত; য়াওম আত্-তাগাবুন অর্থ লাভ-ক্ষতির দিন। সূরা নং ৬৪। দুই রুকূ' ও আঠার আয়াতবিশিষ্ট। প্রসিদ্ধ মতের অনুসরণে সূরাটি মাদানী (মদীনায় অবতীর্ণ) বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ করিলে উহাকে মাক্কী ও মাদানী যুগের সম্মিলিত বিষয়বস্তু সম্বলিত দেখা যায় বিধায় অনেকেই ইহাকে মাক্কী সূরা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাওলানা থানাবী (র) এই কারণে অনেকের ন্যায় ইহাকে মতভেদযুক্ত বলিয়াছেন (বায়ানুল-কুরআন, ২/১২ খ., ১০)। নাযিল বিন্যাসে সূরাটির ক্রমিক সংখ্যা এক শত আট।

নামকরণ ঃ সূরার ৯ম আয়াতে রহিয়াছে– يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ। "স্মরণ কর, যেই দিন তিনি (আল্লাহ) তোমাদিগকে সমবেত করিবেন 'সমাবেশ' দিবসে, সেই দিন হইবে (অতিশয়) 'লাভ-লোকসানের' দিন"। এই আয়াতে কিয়ামত দিবসকে "সমাবেশ দিবস" (যাহা ঐ দিন সম্পর্কে সহজ সুপরিচিত) ও তাগাবুন দিবস" বলা হইয়াছে। تغابن শব্দটির ধাতুমূল غبن এবং ইহার অর্থ ক্ষতি ও লোকসান। ইমাম রাগিব ইসফাহানী (মুফ্‌রাদাতুল-কুরআন)-এর মতে এই ধাতুমূলে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত ও বুদ্ধিমত্তার ঘাটতি–উভয় অর্থই বিদ্যমান। [ফিক্‌হ-এর পরিভাষায় ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত কম দামে বিক্রয় বা বেশি দামে ক্রয়কে 'গিবন' বলা হয়]। কিয়ামত দিবসটিতে ঈমানদারগণ অকল্পনীভাবে লাভবান হইবেন এবং তাঁহাদের প্রতিপক্ষ কাফিররা অচিন্তানীয় অন্তহীন ক্ষতির সম্মুখীন হইবে–এই কারণে দিনটিকে য়াওমুত্-তাগাবুন "পরম লাভ ও চরম ক্ষতির দিন" নাম দেওয়া হইয়াছে (দ্র. মাআরিফুল-কুরআন, ৮খ, ৪৬৫, মুফ্‌রাদাতুল-কুরআন ও অন্যান্য গ্রন্থের বরাতে)। এই আয়াতের এই শব্দটি হইতে সূরার নামকরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয় ঃ ইহার পূর্বেকার পরপর কয়েকটি সূরায় আখিরাতের শান্তির জন্য সাধনারত মু'মিনদের এবং আখিরাতবিমুখ কাফির বিভিন্ন দলের (মুশরিক, য়াহূদ ও মুনাফিক) আলোচনা ছিল, বিশেষত সংলগ্ন পূর্ববর্তী সূরার (মুনাফিকূন) শেষভাগে আখিরাতে

কল্যাণ হাসিল করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং আখিরাতের সাধনা বর্জনকারীদের ভীতি প্রদর্শনের বিবরণ ছিল। এই সূরায় আখিরাতপন্থী ও আখিরাতবিমুখদের প্রতিদানের বিশদ বিবরণ এবং পূর্বোক্ত উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের পরিপূরক বর্ণনা রহিয়াছে (বায়ানুল-কুরআন, ২/১২খ, ১০)। সূরার পূর্বাপর বর্ণনার প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে (পূর্বোল্লিখিত বিষয়টি) এইরূপ প্রতিভাত হইবে যে, ইহাতে দুই-তিনটি লক্ষ্যবস্তু সামনে রাখা হইয়াছে। প্রথম দিকের চার আয়াতে আল্লাহ তাআলার স্রষ্টা হইবার এবং তাঁহার অসীম ইল্‌মের বিষয়টি অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভংগিতে তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং তাঁহার পূর্ণাঙ্গ কুদরতের নিদর্শনস্বরূপ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও মানব জাতির সৃজনধারার প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। ইহার পরে কাফিরদের সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ নবী-রাসূলগণকে এবং আখিরাতের জীবনকে অস্বীকার করিয়া পরিণামে কিরূপ ভয়াবহ ও শিক্ষণীয় পরিণতির শিকার হইয়াছে তাহা স্মরণ কর। সুতরাং তোমরা কেন সেই সকল ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর না এবং কেনই বা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করিতেছ? আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (স) এবং নাযিলকৃত 'নূর' (আল্-কুরআন)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কেননা সমাবেশ দিবস নিশ্চয়ই পরম লাভ ও চরম লোকসানের দিন এবং ঐ দিবসে নেক্‌কার ঈমানদারদের অনন্তকালের জান্নাতে প্রবেশ করান হইবে এবং বদকার কাফিরদের অনন্তকালের জন্য জাহান্নামে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে। [অতঃপর বিপদাপদে মু'মিনদের ধৈর্য ধারণ করিবার উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে এই সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে যে, বিপদকে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে সতর্কীকরণ মনে করিবে, যাহা প্রকৃত বিচারে নি'মাত ও কল্যাণকর]। এই প্রসঙ্গে বিপদের কারণরূপে নেক আমলে অবহেলা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অবহেলার কারণরূপে স্ত্রী-পরিজন ও সম্পদের আকর্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মর্মে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, স্ত্রী-পরিজনও অনেক ক্ষেত্রে সম্পদের ন্যায় পরীক্ষার বিষয়, ফিত্‌না ও আপদ হইয়া থাকে। সুতরাং সম্পদ ও সন্তান এবং স্ত্রী ও প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসাকে সর্বোপরি প্রাধান্য না দিয়া উহাকে শারীআতের গণ্ডীতে সঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা কর্তব্য, দুনিয়ার মহব্বত যেন আল্লাহ্‌কে ভুলাইয়া না দেয়। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির চাহিদা পূরণে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রয়োজনে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং সম্পদের মোহ ও লোভলালসা নিয়ন্ত্রণ করিবার লক্ষ্যে মুক্ত হস্তে দান-খায়রাত করিবে। আল্লাহ্‌ভীতি এবং আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশাবলীর অনুশীলন মানুষকে সকল প্রকার অন্যায় ও পাপকার্য হইতে বিরত রাখে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্লামা মাহমূদ আল-আলূসী, রূহুল-মাআনী; (২) হাকীমুল-উম্মাহ আশরাফ আলী থানাবী, বায়ানুল-কুরআন, ২ (৫) ১২খ., ১০-১৩; (৩) মুফতী মুহাম্মদ শাফী', মাআরিফুল-কুরআন, ৮খ, ৪৬০-৪৭১ এবং অন্যান্য বহুল প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ।

ইনায়াতুল্লাহ (দা.মা.ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

তাগুস ঃ আরবী নাম ওয়াদী তাজাহ (وادى تاجه) ল্যাটিন তাগুস (Tagus), স্পেনীয় তাজ্যে, পর্তুগীজ তেজো, আইবেরীয় উপদ্বীপের অর্থাৎ স্পেন-পর্তুগালের দীর্ঘতম নদী, ৬,০০০ ফুট উচ্চতায় Serrania de Cuenca নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। লিসবনে মোহনা পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল (তন্মধ্যে ১৯০ মাইল পর্তুগীজ এলাকার ভিতরে পড়িয়াছে)। উজান হইতে ভাটির দিকে যাইতে ইহার উভয় পার্শ্বে যে বহু সংখ্যক স্থান পড়ে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, স্পেনে–আরানজুয়েস, আলগদোর, টলোডো ও তালাডেরা দ্য লা রেইনা এবং পর্তুগালে-আব্-রানতেশ, সানতারেস ও লিসবন।

আরব ভৌগোলিকগণ তাগুসকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া টলেডো ও লিস্‌বনের বিবরণ প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা আলকানতারা নামক স্থানে তাগুস নদীর উপরে রোম সম্রাট ট্রাজান (Trajan)-এর আদেশে ১০৫ খৃ. নির্মিত পাথরের বিখ্যাত পুলটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আরবরা সেই স্থানটিকে বলিত কানতারাতুস-সায়ফ। তু. পূর্বে ১খ, ২৫১; আরও দ্র. নিবন্ধ লিসবন ও টলেডো।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ইদরীসী, সিফাতুল-আনদালুস, পৃ. মূল পাঠের ১৮৭ ও অনুবাদের ২২৮; (২) E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb, আলজিয়ার্স ১৯২৪ খৃ., নির্ঘণ্ট।

E. Levi-Provencal (E..1. [1]) /হুমায়ুন খান

তাজ (تاج) ঃ আরবী শব্দ, অর্থ মুকুট, আরবী ভাষায় গৃহীত একটি ফার্সী ঋণাত্মক শব্দ, প্রাচীন ফার্সী তাজ (tag) হইতে উদ্ভূত; তুলনীয় আর্মেনীয় 'tag', আরামী শব্দ 'taga.' ইহা হইতে আরবীতে ভগ্ন বহুবচন (broken plural) গঠিত হইয়াছে تيجان এবং অনুরূপ ক্রিয়া توج (11) "মুকুট পরান," (v) ক্রিয়া 'মুকুট পরিধান করান হইবে" এবং تونج (tuidj) পরিধান করান হইয়াছে (Horn, Grundriss der neupersischen Etymologie, Strassburg 1893, p. 81, Siddiqi, Studien uber die Persischen Fremdworter im klassischen Arabisch, Gottingen 1919, p. 74. 84; Fraenkel, Die aramaischen Fremdworter im Arabischen, Leyden 1886, p. 62.)। নামের মতই বস্তুটিও প্রাচীন পারস্য হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন পারস্য দেশীয় রাজাদের মুকুটের গঠন যাহা তাঁহাদের মুদ্রা হইতে উত্তমরূপে জানিতে পারা যায়, আরবী সাহিত্যে অজানা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ মাসঊদী বলেন যে, তিনি একটি প্রাচীন পুস্তকে পারস্যের রাজাদের মুকুট পরিহিত রঙ্গীন ছবি দেখিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি উমায়্যা খলীফা হিশাম ইব্‌ন আবদুল-মালিক ইবনে মারওয়ান-এর জন্য আরবীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল (B. G. A., VIII, p. 106)। "সিয়ারুল-মুলূক", "কিতাবুত-তাজ" ও অনুরূপ শিরোনামসহ একটি সম্পূর্ণ পুস্তকসিরিজ বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে, সম্ভবত এইগুলির বিষয়বস্তু অনুরূপই ছিল। শেষোক্তটির জন্য তু. জাহিজ রচিত গ্রন্থ "কিতাবুত-তাজ" (কায়রো ১৩৩২/১৯১৪)-এর যাকী (Zeki) পাশাকৃত সংস্করণের ভূমিকা। ইহা অনুমেয় যে, অনুরূপ উৎসসমূহের উপর পারসিক মুকুট বিষয়ক বিবৃতিসমূহের ভিত্তি হামযা আল-ইসফাহানী, কিতাবু তা'রীখ সানী মুলূক্-আরদ ওয়াল-আম্‌বিয়্যা (Barlin, Kaviaini Press, p. 17, 24, প., 32. 35 প.) গ্রন্থে ও ফার্সী "মুজমিলুত-তাওয়ারীখ" গ্রন্থে এই সমস্ত ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাবারীতে বর্ণিত বিবরণও ইহাদের উৎসসমূহের সম্পর্কের ব্যাপারে তু. Noldeke, Geschichte der Pereser und Araber, Leyden

1879, ভূমিকা; পারসীয়দের মধ্যকার মুকুট বিষয়ে তু. বিশেষত পৃ. ৯৫, ২২১, ৩০৪, ৩৮৫, ৪৫৩; A. Christensen, L'Empire des Sasanides, Copenhagen 1907, p. 14, 89 প., 106; ঐ, Le Regne du Roi Kawadhl et le Communisme mazdakite, Copenhagen 1925, p. 22 প.)। আরবী আওয়াইল সাহিত্যে আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, সর্বপ্রথম যিনি তাজ পরিধান করেন তিনি ছিলেন দাহ্হাক (দ্র. কালকাশান্দী, সুবহুল-আ'শা, কায়রো ১৩৩১/১৯১৩, ১খ, পৃ. ৪১৫)।

মুসলিম ক্ষুদ্র চিত্রে (Miniatures), যেখানে প্রাচীন পারস্যের রাজাদের চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে, এই সকল রাজা নিয়মিতভাবে তাজ পরিহিত কিন্তু সেইগুলির (তাজ) গঠন অবশ্য কোনভাবেই প্রামাণিক নহে ক্ষুদ্র চিত্রে (কাল্পনিক) ফেরেশ্তাগণও তাজ পরিধান করিয়াছেন, ও বিশেষত নবী মুহাম্মাদ (স) ও বুরাকে তাজ পরিধান অবস্থায় মি'রাজ দৃশ্যে (দ্র. ক্ষুদ্র চিত্র Pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৮২ খৃ., সম্পা. উইগুর, মিরাজনামা সংস্করণ)।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মুকুটের সহিত আরবদের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল। কেননা পারস্য সম্রাটগণ কখনও কখনও তাহাদের আরব সামন্ত রাজাদের তাহাদের পদমর্যাদার প্রতীক হিসাবে তাজ প্রদান করিত অর্থাৎ লাখমীয় ইমরাউল-কায়সয়কে [মৃ. ৩২৮ খৃ., তু. Clermont-Ganneau, Recueil d'Archeol. Or. vi, 307; Le roi de "tous les Arabes" and vii, 176 প.; Le Tadj-dar Imro lu-Qais et la royaute generale des Arabes; Lidzbarski, Ephemeris, ii, 35, 375; ইকলীল ও তাজ-এর মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়ও রহিয়াছে, শেষোক্তটি (তাজ) শুধু সাধারণ পত্র-পুষ্প বা স্বর্ণনির্মিত মস্তকমালা (chaplet) অর্থেই ব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়। লাখমীয় ৩য় নু'মানকে (S. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in al -Hira, Berlin 1899, p. 128) এবং মুহাম্মাদ (স)-এর সময়কার য়ামামার খৃস্টান শাসনকর্তা যূ-তাজ হাওযা বিন আলীকে বলা হইয়া থাকে, যাঁহার নিকট নবী (স) ইসলাম গ্রহণের আহ্বানপত্র পাঠাইয়াছিলেন (ইব্ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৯৭১; কালকাশান্দী, ৬খ, পৃ. ৩৭৯; Frenkel, পৃ. ৬২; তাবারী, ১খ, পৃ. ৯৮৫; Noldeke, Gesch. d, Perser u. Araber, p. 258)। প্রায়শ মুকুট ও মুকুটধারিগণ কবিদের দ্বারা প্রশংসিত হইতেন (দ্র. সিদ্দীকী, পৃ. ৮৪; মুবার্‌রাদ, কামিল, পৃ. ২৮৯ প.; যেইখানে মুকুটকে য়ামানের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বলা হইয়াছে, সম্ভবত আবিসিনিয়াবাসী ও য়ামানের মধ্যকার প্রাচীন সম্পর্কের স্মৃতি; আবিসিনীয়দের মুকুট সম্পর্কে তু. Noldeke, Geschichte, পৃ. ২২৫ এবং ২৩৩)।

২য় খুসরাও-এর বিখ্যাত মুকুটটি টেসিফোনের (Ctesiphon) যুদ্ধে আরবদের লব্ধ গনীমতের অন্তর্ভুক্ত ছিল (Christensen, l'Empire, পৃ. ১০৬)। তথাপি আরবদের মধ্যে মুকুটের প্রচলনের বিষয়টি এক ধরনের বিজাতীয় ও বিরল হিসাবে অব্যাহত থাকে। একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, "আল-আমাইম তীজানুল-আরাব," "পাগড়ী হইল আরবদের মুকুট"। অর্থাৎ লিসানুল-আরাব অন্যত্র বর্ণিত সাধারণ ব্যাখ্যা অনুসারে ঃ পাগড়ী তাহাদের মধ্যে তেমনই বিরল যেমন বিরল মুকুট। কেননা অধিকাংশ লোকই পাগড়ী পরিধান করে না, বরং শুধু কালানিস (টুপি. তু. কালানসুওয়া নিবন্ধ) অথবা একেবারেই কোন মস্তক আচ্ছাদান ব্যবহার করে না।

বর্তমান ধারণা অনুযায়ী ইসলামে কোন নিয়মিত রাজমুকুট বা রাজ্যাভিষেক রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে পরিজ্ঞাত নহে। যেইখনে মুকুটের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা প্রাচীন পারস্যের মহান সম্রাটদের, খৃস্টান শাসকগণ প্রভৃতির ন্যায় বিদেশী শাসকগণ সম্পর্কিত। "তাজ আল-বাবা" হইল পোপের মুকুট, "তাজুল-উসকুফ" হইল বিশপের মুকুট। শুধু তথাকথিত তাজ আল-খালীফার ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম একজন মুসলিম শাসকের মুকুটের দেখা পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। খলীফার এই মুকুট যাহা সার্বভৌমত্বের প্রতীকসমূহের (আলাত আল-মুলূকিয়্যা) অন্তর্ভুক্ত আব্বাসী যুগের পূর্ব পর্যন্ত দেখা যায় নাই এবং ইহা বলা হইয়া থাকে যে, এই বংশ (আব্বাসী) প্রাথমিক খলীফাদের ও উমায়্যাদের বিপরীতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে প্রাচীন পারস্যের ঐতিহ্য অনুকরণ করিত (Noldeke, Geschichte, op. 453। খলীফা অনুষ্ঠান উপলক্ষে (মাওয়াকিব) ও মহাভোজ উৎসবের দিনে এই তাজ পরিধান করিতেন। কালকাশান্দী (৩খ, পৃ. ৪৭২ ও ৪৮৪; Wustenfeld, Calcaschandi, পৃ. ১৭২ এবং ১৮২) মিসরের ফাতিমী খলীফাদের মুকুটের বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে, ইহা একটি যথার্থ মুকুট ছিল না, বরং জাঁকালোভাবে রত্নখচিত একটি পাগড়ী। ইহাতে সাত দিরহাম ওজনের আল-য়াতীমা নামীয় একটি বৃহৎ রত্ন ছিল। ফাতিমীদের গৃহীত রঙ ছিল সাদা, পাগড়ী পেঁচাইবার জন্য (শাদ্দ আত-তাজ আশ-শারীফ) একজন বিশেষ কর্মকর্তা (শাদ্দ-কে পরবর্তীতে লাফ্ফাফ বলা হইত) নিযুক্ত ছিলেন (তু. Inostranev, The Ceremonial Procession of the Fatimid Caliphs, রাশান ভাষায়, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৬৪; ইবনুস-সায়রাফী, কানূন দীওয়ান আর-রাসাইল, Bahgat, সম্পা, পৃ. ২৭১)। হাফসী সুলতানও তাঁহার অনুষ্ঠানে একটি তাজ (মুকুট) পরিধান করিতেন (তু. ইব্ন ফাদলুল্লাহ, মাসালিক আল-আবসার, সংক্ষেপিত extract : ওয়াসফ ইফ্রীকীয়্যা ওয়াল-আনদালুস, হাসান হাসানী, আবদুল-ওয়াহ্হাব সম্পা., তিউনিস [আনু. ১৯২২ খৃ.], পৃ. ২৩, নম্বর ২)।

সম্মানসূচক খিলাৎসমূহের মধ্যে যাহা খলীফা বা সুলতান গভর্নরগণ বা রাষ্ট্রদূতগণ প্রভৃতিকে পাঠাইতেন উহাদের মধ্যে সাধারণত একটি তাজ বা মুকুট অন্তর্ভুক্ত থাকিত, যেমনটি প্রায়শ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন কালকাশান্দীর বর্ণনা অনুসারে (৮খ, পৃ. ৩৭৫ পৃ.), খলীফার সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি একটি গিল্টি করা মুকুট প্রদান করেন (তাজ মুরাসসা'; তু. Wustenfeld. Stathalter, ৩খ, পৃ. ৩৮)। অনুরূপ একটি তাজ মামলূক যুগের আমীরদের রাষ্ট্রীয় প্রতীকের চিহ্ন হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

উছমানী সুলতানদের শির-আচ্ছাদনের নামও তাজ দেওয়া হইয়াছিল। এমনকি কথিত আছে যে, ১ম উছমান একটি তাজ-ই খুরাসানী পরিধান করিয়াছিলেন (d'Ohsson, ii, 135)। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ী কর্তৃক পরিহিত মস্তক আচ্ছদানীর সঠিক রূপটি বেল্লিনি (Bellini)-এর ছবি হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি তাজসহ একটি লম্বা পাগড়ী পরিধান করিয়াছেন, এই পাগড়ীর মধ্যবর্তী টুপির

শীর্ষদেশ মোচাকৃতি ধরনের, সাধারণত লাল রঙের ও ঢেউ খেলান (সূচীকর্মযুক্ত)। ইহার চারিদিকে পাতলা কাপড়ের আসল পাগড়ী (সারীক) ফিরানো। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ-এর পাগড়ীর ধরন তাঁহার প্রতিকৃতিতে দেখা যায়, ইহা পদকেও দেখান হইয়াছে। পদকের গৌণ দিকে তিনটি নিয়মিত (regular) মুকুট দেখিলে মনে করা হইয়া থাকে যে, উহা উছমানী শাসনাধীনে একত্র এশিয়া, গ্রীস ও ত্রিবিযোন্দ—এই তিন রাজত্বের প্রতিনিধিত্বশীল। সম্ভবত ইহার সরল ব্যাখ্যা এই যে, পদকটি একজন য়ুরোপীয় শিল্পী কর্তৃক নক্‌শাকৃত এবং তৈরি করা হইয়াছিল (তু. G. F. Hill, in Numismatic Chronicle, 1926, p. 287-298 and pl. xiv)। কারাবাচেক উছমানী সুলতানদের তাজ সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে পার্সো-তুর্কী তাজ, আরবীভাষীদের প্রতিশব্দ তারতূর [তাতার] এক ধরনের উঁচু টুপি যাহা প্রথম খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দীর একটি প্যাপিরাসে অঙ্কিত দেখা গিয়াছে এবং সময়ের বিবর্তনে বিভিন্ন আকৃতি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সকল আকৃতির সহিত খৃ. ১৪শ-১৬শ শতাব্দীর ফ্রান্স ও স্পেনের মহিলাদের মস্তক আচ্ছাদনী (hen [n] in)-এর লক্ষণীয় সাদৃশ্য রহিয়াছে, যাহা কারাবাচেকেন-এর মতে সরাসরি প্রাচ্য হইতে আসিয়াছে (নামটি আরবী হানীনী ও মূল জিনিসটিও)। এই মস্তক আবরণীর বিশেষ বিশেষ ধরন বর্তমান কালের মহিলাদের মধ্যে এখনও বিদ্যমান অর্থাৎ লেবাননের দ্রুজদের মধ্যে এবং আলজিরিয়া ও তিউনিসে। ইহা হইতে আধুনিক মিসরে কুরস (Kurs) নামে মহিলাদের মস্তক আবরণী প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা স্বর্ণ ও মূল্যবান রত্নখচিত থালাসদৃশ অলঙ্কার, যাহা একটি উঁচ টুপির শীর্ষে সেলাই করিয়া লাগান হয় এবং কখনও কখনও বেশী ভারী হয়। এই কুরস মৃত মহিলাদের শবযানের উপর (শাহিদ) রাখা হয়, যেমন পুরুষদের ক্ষেত্রে পাগড়ী (তু. Lane, Manners and customs of the Modern Egyptians, Appendix A; Lane, Arabian Society in the Middle Ages, p. 218, 234)। বরের জন্য এক ধরনের বিশেষ মুকুটের ব্যবহার সারা বিশ্বেই দেখা যায়, সময়ে সময়ে মুসলিম বিশ্বে পরিলক্ষিত হয় (Lane, The Thousand and One Nights, i, 424; Lagarde, Arabes mitrati, Nachrichten....., Gottingen 1891, p. 160; পরবর্তী ও সুবিখ্যাত উপাধি "তাজ আল-'আরূস"; তু. পূর্ব তুর্কিস্তানের জন্য ঃ Brockelmann. in Asia Major, ii, 122)।

তাজ-কে মস্তক আবরণী হিসাবে দরবেশদের মধ্যে ধর্মীয় বিশিষ্টতা প্রদান করা হইয়াছে। তাজ গ্রহণ করা 'শাদ্দ' [নিবন্ধ দ্র.]-এর জন্য একটি অপরিহার্য অংশ। বিভিন্ন দরবেশ গ্রুপের [সিলসিলা] প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ধরনের ও রঙের তাজ রহিয়াছে; প্রায়শ ১২ জোড়সহ (terk) ইমামদের সংখ্যা হইতে অথবা ৯ জোড়, ৭ জোড়সহ প্রভৃতি এবং ইহাদের অসংখ্য নাম ও প্রতীকী ব্যাখ্যা রহিয়াছে (দ্র. আহমাদ রিফাত, মির'আতুল-মাকাসিদ, ইস্তাম্বুল ১২৯৩ হি., পৃ. ২১২-২১৫; Brown, The Darvishes, পৃ. ১৪৮; d' Ohsson-এ ছবি, ২খ, ২৯২; উক্ত পুস্তকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ১৪টি দরবেশ তারীকার ১টি বড় রঙ্গীন সারণীসহ তাহাদের স্ব-স্ব তাজের ছবি এবং পর্যায়ক্রমে প্রতিষ্ঠাতার বিবরণ রহিয়াছে, মাহমূদ বে-এর ইস্তাম্বুল প্রেসে মুদ্রিত এবং দিয়া বে-এর Sanai-inefise Resim-Khanesi কর্তৃক প্রকাশিত, তারিখ ১৫ শা'বান, ১৩১৪ হি.)। পারস্যে শায়খ হায়দার (নি. দ্র.; এই কারণে তাজ-ই হায়দারী) ও শাহ ইসমাঈল [নি. দ্র.]-এর শাসনামলে বাদশাহ, দরবার, সেনাবাহিনী ও কর্মকর্তাদের জন্য সরকারী মস্তক আচ্ছাদন হিসাবে সূফী-তাজ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রদান করা হইত; কিন্তু সম্ভবত ইহা তাহাদের পূর্বেও প্রচলিত ছিল (দ্র.. Karabacek, op. cit., p. 87; Babinger, ইসলাম, ১১খ., পৃ. ৮৪১, কিযিলবাশ শিরো.)।

রূপকালঙ্কার ব্যবহারসহ তাজ শব্দটির বিভিন্নমুখী প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাজ শব্দযুক্ত সম্মানসূচক নাম (আলকাব) পরবর্তী কালে অতি পরিচিত ছিল এবং সম্ভবত মামলূক যুগে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিল। প্রথমত তাহারা সৈনিকদের জন্য তাজুদ-দীন (কালকশান্দী, ৫খ., পৃ. ৪৮৮) অথবা খৃস্টান সচিবদের জন্য "তাজ আদ-দাওলা" (কালকাশান্দী, ৫খ, পৃ. ৪৮৭)-এর মত সরল উপধিতে সন্তুষ্ট ছিল, অতঃপর আদুদুদ-দাওলা ওয়া তাজ আল-মিল্লা (৫খ., পৃ. ৪৯২), তাজ আল-উমালা ওয়াল-হুক্কাম, কাদীদের জন্য (৬খ., পৃ. ৪১ প.) এবং অন্যান্য অনেক ধরনের দ্বিত্ব উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। (বিধর্মী) সম্রাটদের জন্য "বাকীয়াত আবনা আল-তুখুত ওয়াত-তীজান" (৬খ, ৮৫), "মুখায়্যিল আত-তুখুত ওয়াত-তীজান" (৬খ, ১৭৫), ওয়ারিছ আল-আসিররা ওয়াত-তীজান (৬খ, ১৭৭) জাতীয় সম্বোধন ব্যবহৃত হইত। সম্ভবত এই ব্যবহারে তাজ শব্দটির সহিত সম্বন্ধ পদীয় কারক যুক্ত করিয়া সৃষ্ট উপাধি সম্বলিত প্রদত্ত পুস্তকের অগণিত উদাহরণ রহিয়াছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাজ-ই সাদান অর্থ শনি, তাজ-ই জাব্বার আদম সুরতের নিকটস্থ একটি তারকা। তাজ 'আমূদ, স্তম্ভের শীর্ষভাগ (দ্র. Sarre-Herzfeld, Archaeol. Reise, ii, 185); মোরগের ও অনুরূপ পাখিসমূহের মাথার ফুলের নামও দেওয়া হইয়াছে তাজ। তাগুস (Tagus)-এর আরবী নামও হইল তাজ। খলীফার একটি বিখ্যাত প্রাসাদকে বলা হইত কাসর আত-তাজ। ইহা খলীফা মু'তাদিদ ও মুতকাফীর অধীনে মাদাইনের, বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম, একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে নির্মিত হইয়াছিল, ৫৪৯ হি, বজ্রপাতের ফলে পুড়িয়া যায়, পুনর্নির্মিত হয় কিন্তু অসম্পূর্ণ ছিল এবং ৫৭৪ হিজরীতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায় (য়াকূত, ১খ, পৃ. ৮০৬-৮০৯, অনুবাদ Z.D.M.G., ১৮খ, ৪০৩-৪০৬; Sacy, Chrestomathie, i, 74; v. Kremer, Kulturgeschichte, ii, 54; Sarre-Herzfeld, i, 92; ii, 63, 148)। কায়রোস্থ খলীফাদের প্রমোদ ভবনসমূহের (মানাজির) মধ্যে একটিকে বলা হইত মানজারাত আত-তাজ, বাদ্‌র আল-জামালী (দ্র.) কর্তৃক নির্মিত, মাকরীযীর সময়ে উহা ধ্বংস্তূপ ছিল (মাকরীযী, ১খ, ৪৮১, ২খ, ১২৯, য়াকূত, পরিশিষ্ট, ৫খ., ১৫; Sacy, Chrestomathie, i, 224 & 228)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নিবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ বরাতের অতিরিক্ত সাধারণভাবে তু. (১) Dozy, Dictonnaire des Vetements, দ্র. Tadj; (২) Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, দ্র. Crown; (৩) Karabacek, Abendlandische Kunstler in Konstantiopel im 15. u. 16. Fahrhundert, I. Italienische Kunstler am Hofe Muhammeds II. des Eroberes 1451-1481,

Den-kschriften d. k. Akad. d, Wiss.; (8) Wien, Ixii, vol. I, 1918.

(W. Bjorkman (E. I.[1])/ মোঃ রেজাউল করিম

তাজউদ্দীন আহমদ (تاج الدين احمد) ঃ জ. ২৩ জুলাই, ১৯২৫ সালে কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে। তাহার পিতার নাম মৌলবী ইয়াসিন খান এবং মা মেহেরুন্নেসা খানম। তাহারা ছিলেন চার ভাই ও ছয় বোন। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের সন্তান হিসাবে তাজউদ্দীন আহমদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় গ্রামের মকতবে। কাপাসিয়া এম. ই. স্কুলে থাকার সময় স্থানীয় দুইজন প্রবীণ বিপ্লবী নেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাজউদ্দীন আহমদ এবং তাহারা শিক্ষকদের কাছে এই ছাত্রকে ভাল স্কুলে পাঠাইবার সুপারিশ করেন। সেই সুবাদে তিনি কালিগঞ্জ 'নাগরী ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি স্কুলে' ভর্তি হন। এই স্কুলেও তাহার মেধা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে তিনি ভর্তি হন ঢাকার অভিজাত সেন্ট গ্রেগরিজ ইংলিশ হাই স্কুলে। উল্লেখযোগ্য, স্কুলে তাজউদ্দীন বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে দ্বাদশ এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন। ইহার পর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হইয়া পড়েন। সেই কারণে তাহার শিক্ষাজীবনে ছেদ পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী লাভ করিয়া এম.এ. পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই মুসলিম লীগ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে। অবশ্য পরে (১৯৬৫ খৃ.) তিনি আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন জেলে থাকাকালেই। রাজনীতি ও শিক্ষা তাহার হাতে হাত ধরিয়া চলিয়াছে।

১৯৫৪ খৃ. প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরূপে এম.এল.এ. নির্বাচিত হইয়াও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের ছাত্র হিসাবে নিয়মিত ক্লাস করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ তাজউদ্দীনের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সময়ে তিনি উপলব্ধি করেন, খাদ্যাভাবে আর যাহাতে কেহ মারা না যায়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গ্রামের লোকজনকে সংগঠিত করিয়া স্থাপন করেন "ধর্মগোলা", যাহা ছিল গ্রাম পর্যায়ে অশ্রুত এক প্রতিষ্ঠান। ফসল ওঠার মওসুমে ধনীদের নিকট হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া এ গোলায় জমা করা হইত, যাহাতে আপৎকালে ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া সম্ভব হয়। আর্তের সেবায় তাহার কোন ক্লান্তি ছিল না। ১৯৫৪ খৃ. তিনি যখন এম.এল.এ. তখন তাহার গ্রামের সাইফুদ্দিন দফাদারের পুত্র আবদুল আযিয (১৫) বন্দুকের গুলিতে আহত হয়। জনৈক হাসান ও অন্যদের মাধ্যমে তাহাকে ঢাকায় তাজউদ্দীনের কাছে আনা হয়। তিনি এম্বুলেন্সে করিয়া ঐ বালককে হাসপাতালে ভর্তি করান। তাহার জন্য নিজে ১০ আউন্স রক্ত দেন। পরে ঐ বালকের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া উদভ্রান্তের মত হাসপাতালে যান এবং পোস্টমর্টেমের ব্যবস্থা করেন। এই মৃত্যু তাহাকে গভীরভাবে মর্মাহত করিয়াছিল। ছাত্রজীবন হইতেই বাংলার মানুষের মুক্তির রাজনীতির সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের যোগাযোগ ঘটে। তৎকালীন মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই পূর্ব-অঞ্চলের মানুষের মুক্তির পথানুসন্ধান শুরু করেন।

১৯৪৭ খৃ.-এর দেশ ভাগের পরপর ভাষার অধিকার ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে চিন্তা ও কর্মের স্বাক্ষর তিনি রাখেন। ১৯৪৮ খৃ. হইতে ভাষার প্রশ্নে যে বিক্ষোভ ও প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতে থাকে তিনি ছিলেন তাহার সক্রিয় কর্মী। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তরুণ তাজউদ্দীন আহমদ সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।

১৯৫৩ খৃ. তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খৃ. সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে তরুণ তাজউদ্দীন পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ৯২-ক ধারা জারি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের মানুষের অধিকার হরণ করিতে চাহে, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে অন্যদের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদও কারাবরণ করেন। মুক্তিলাভের পর তাজউদ্দীন আহমদ সাংগঠনিক কাজে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৫ খৃ. তিনি আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ খৃ. আইয়ুবী সামরিক শাসন জারি করা হইলে তাজউদ্দীন আহমদ আবার কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৫৯ খৃ. মুক্তি পান। ১৯৬৪ খৃ. তিনি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই বৎসরই তিনি আবার গ্রেপ্তার হন।

১৯৬৬ খৃ. লাহোরে বিরোধী দলীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বাঙালির মুক্তিসনদ ৬ দফা ঘোষণা করেন এবং তাজউদ্দীন আহমদও ঐ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন। তাহার সাংগঠনিক দক্ষতা ও একনিষ্ঠতার গুণে তিনি ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বৎসরই তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৬ দফা প্রচারাভিযানের সময় ১৯৬৬ সালের ৮ মে তিনি গ্রেফতার হন এবং গণ-অভ্যুত্থানের ফলে মুক্তিলাভ করেন ১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। সত্তরের নির্বাচনী সংগঠনে তাজউদ্দীন ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

নির্বাচনী গণরায় অস্বীকার করিয়া বাঙালিদের অধিকার অর্জনের দাবি নস্যাতের ষড়যন্ত্রে ১ মার্চ, ১৯৭১ খৃ. সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলার সর্বস্তরের মানুষ প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে শুরু হয় অভূতপূর্ব অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগ আন্দোলনের সাংগঠনিক দিকসমূহ পরিচালনা ও জনগণের কর্তৃত্বের পরিপ্রকাশক নির্দেশাবলী প্রণয়নে এবং সামরিক শাসকদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন সহযোগী হিসাবে তাজউদ্দীন আহমদ অতুলনীয় দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন।

২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী গণহত্যাযজ্ঞ শুরু করিয়া বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করিলে শুরু হয় বাঙালির সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ। আওয়ামী লীগ সভাপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবে অর্পিত হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের উপর। তিনিই উদ্যোগী হইয়া ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং প্রবাসী সরকার গঠনের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। ১০ এপ্রিল প্রবাসী 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠিত হইলে তিনি সেই সরকারের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৭ এপ্রিল

মুজিবনগরের এই সরকার শপথ গ্রহণ করিয়াছিল চরম প্রতিকূলতা ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে। যুক্তিযুদ্ধের সামরিক-রাজনৈতিক সকল দিক সংগঠিত করিয়া তোলেন তাজউদ্দীন আহমদ। মুক্তিযুদ্ধে তাহার ত্যাগ, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও স্বদেশপ্রেম সকলকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। মুক্তিসংগ্রামের সফল নেতৃত্বদান তাজউদ্দীন আহমদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন অবধি সরকার পরিচালনা করেন তাজউদ্দীন আহমদ। ইহার পর তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। আত্মনির্ভর বিকাশমান অর্থনীতি গড়িয়া তোলার জন্য তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৭৪ খৃ. মতপার্থক্যের কারণে তিনি মন্ত্রিত্বের পদ হইতে সরিয়া দাঁড়ান।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানকারীদের ষড়যন্ত্রে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। আবারও কালো মেঘে ছাইয়া গেল বাংলার আকাশ। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা তাজউদ্দীন আহমদকে প্রথমে গৃহবন্দী ও পরে কারাবন্দী করে। ৩ নভেম্বর ঘটে ইতিহাসের আরেক কলঙ্কিত ঘটনা। কারাগারের অভ্যন্তরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় তাজউদ্দীন আহমদ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের অপরাপর নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামানকে (সর্ব দ্র.)। খোন্দকার মোশতাক ছাড়া বঙ্গবন্ধুসহ পুরা মুজিবনগর সরকারের নেতারা নিহত হন। তাজউদ্দীন ছিলেন বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, যিনি আজীবন জনগণের কল্যাণ লইয়া ভাবিয়াছেন এবং বাঙালি জাতির সুখী স্বাধীন জীবন গড়ার সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত ছিলেন। বাঙালি জাতির ইতিহাসে সদা-সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবেন তাজউদ্দীন আহমদ, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সদা অক্ষয় হইয়া থাকিবে তাহার অবদান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত্রিতে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পর হইতে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানের জিন্দানখানা হইতে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত দুঃসময়ে জটিল পরিস্থিতিতে বাঙালী জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সময় বাঙালী জাতির মুক্তির সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং বিজয়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের যাতাকল হইতে মুক্ত করিয়া বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা করেন যাহারা, তিনি তাহাদের অগ্রজ। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের বিজয় অভিযানের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরেই তাজউদ্দীন আহমদের নাম স্মরণীয়।

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর। তাজউদ্দীন আহমদ নিজের জীবন দিয়া প্রমাণ করিয়া যান যে, তিনি বঙ্গবন্ধুর কতখানি বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন আর সেই কারণেই তাহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ট্রাজেডির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আর অন্যতম প্রধান নায়ক তাজউদ্দীন আহমদ। দুইটি নাম ইতিহাসে একত্রে উচ্চারিত হইবে।

ডঃ রফিকুল ইসলাম

তাজ খান কার্‌রানী (تاج خان قرانی) ঃ বাংলার বিখ্যাত কার্‌রানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শের শাহের একজন প্রধান অমাত্য এবং তাঁহার পুত্র সালীম শাহের অধীনে উত্তর প্রদেশের সামভালের শাসনকর্তা ছিলেন। কার্‌রানীগণ আফগান তথা পাঠান জাতির একটি শাখা। তাহাদের আদি বাসস্থান ছিল বাঙ্গাশে (আধুনিক কুররম নামে পরিচিত)। ভারতে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কার্‌রানী বংশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তাজ খান কার্‌রানীই সর্বপ্রথম এই বংশকে বাংলার ইতিহাসে পরিচিত করেন। তাজ খান শের শাহের অন্যতম প্রধান অমাত্য হিসাবে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৯৪৫/১৫৪০ সালে হুমায়ূনের বিরুদ্ধে কনৌজের যুদ্ধে তাজ খান ও তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান খান কার্‌রানী বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। ফলে তাঁহারা উভয়ই বাংলা ও উত্তর বিহারের জায়গীর লাভ করেন (ডঃ আ. করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, পৃ. ৩৭০-৭১)। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে তাজ খান কার্‌রানী সেনাপতি ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতারূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইসলাম শাহের বালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী ফীরূযের সময় তাজ খান উযীর নিযুক্ত হন (আ. রহিম সম্পা., বাংলার ইতিহাস, পৃ. ২৯৪) ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর পাঠানগণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইলে তিনি দোয়াব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। ফীরূযকে হত্যা করিয়া তাঁহার মাতুল মুহাম্মাদ আদলী সিংহাসন দখল (৯৬০/১৫৫৩) করিলে তাজ খান আদলীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করিয়া গোয়ালিয়রে অবস্থিত তাঁহার রাজদরবার পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান উত্তর প্রদেশের গাঙ্গেয় অঞ্চলের একাংশ অধিকার করেন (মজুমদার, পৃ. ১১৪)। মুহাম্মাদ শাহ আদলী তাঁহার পশ্চাতে এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করেন। কনৌজের নিকটে চাপরামপুরে (ফারাক্কা বাঁধের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তাজ খান পরাজিত হইয়া চুনার অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি খাওয়াসপুর (তেলিয়াগরি মোহনার ১২ মাইল পশ্চিমে এবং কারাগোলার ১ মাইল দক্ষিণে), তানডায় (মালদা-এর প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে) এবং গঙ্গা তীরবর্তী কতিপয় গ্রামের জায়গীরদার তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ, ইমাদ, সুলায়মান ও ইলয়াসের সহিত মিলিত হন এবং সেইখানে প্রাধান্য স্থাপন করেন (Jadu Nath Sarker সম্পা. The History of Bengal, ২খ, পৃ. ১৮১)। রিয়াদুস-সালাতীনে উল্লেখ আছে যে, পথিমধ্যে তিনি মুহাম্মাদ শাহ আদলীর রাজস্ব আদায়কারীদের নিকট হইতে নগদ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য আদায় করেন। "ঐ সকল পরগনা হইতে এক শত হস্তীর এক হালকা" সংগ্রহ করেন (গুলাম হুসায়ন, রিয়াদুস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্দীন কর্তৃক, বাংলার ইতহাস, পৃ. ১১৭)। বহু আফগান বিদ্রোহীও ইহাদের দলে যোগদান করে। ইতিমধ্যে মুহাম্মাদ শাহ আদলী গোয়ালিয়র হইতে কার্‌রানীদের বিরুদ্ধে ৯৬১/১৫৫৪ সালে সেনাপতি হিমুর নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। হিমু তাহাদিগকে চুনারের সন্নিকটে এক সংঘর্ষে পরাস্ত করেন। অতঃপর তাজ খান ও সুলায়মান বাংলাদেশের দিকে গমন করেন। এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে আফগান নেতাদের মধ্যে দলাদলি ও সংঘর্ষ চলিতেছিল। সুযোগ বুঝিয়া তাজ খান কার্‌রানী দক্ষিণ-পূর্ব বিহার ও পশ্চিম বঙ্গের অনেকাংশ দখল করেন। বাংলার পশ্চিম সীমান্তে তাজ খানের প্রতিপত্তিতে বাংলার সুলতান তৃতীয় গিয়াছুদ-দীন নিজকে নিরাপদ মনে করিলেন না। ইতিমধ্যে তাজ খান ও তাঁহার ভ্রাতারা গৌড় আক্রমণ করেন এবং গিয়াছুদ-দীনকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া বাংলাদেশ জয় করেন। এইভাবে তাজ খান বাংলার কার্‌রানী বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলার সিংহাসনে আরোহণের পর তাজ খান কার্‌রানী বিদ্রোহী কোকার (Kokars)-দের দমনের জন্য হাজীপুর যাত্রা করেন। তাঁহার অবর্তমানে ভ্রাতা সুলায়মান কার্‌রানী বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মীমাংসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাজ খান কোকারদিগকে কঠোরভাবে দমন করেন। কিন্তু পাঠানদের অপর একটি শাখা তাজ খানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এইবার তাজ খান পরাজিত হইলেন। এই পরাজয়ের বেদনা অবশেষে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষমতা দখলের এক বৎসরের মধ্যে তিনি ইনতিকাল (৯৭১/১৫৬৩) করেন। অতঃপর তদীয় ভ্রাতা সুলায়মান কার্‌রানী বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের কোন শিলালিপি বা মুদ্রা পাওয়া যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদুস-সালাতীন-এর বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্দীন, বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৭৪, পৃ. ১১৭, ১২১, ১২২ দ্র.; (২) স্যার যদুনাথ সরকার সম্পা. The History of Bengal, The University of Dhaka, জুলাই ১৯৭২, ২খ, ১৮১; (৩) মুহাম্মদ মহর আলী, History of the Muslims of Bengal, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, প্রথম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৫, খ/A, ২৪২-২৪৩; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশন, ২খ.; (৫) রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৮৫, ২খ. (মধ্যযুগ), ১১৩-১১৪; (৬) ডঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ৩৭০-৩৭১; (৭) ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ২৯৪।

মুহঃ আবু তাহের

তাজমহল (تاج محل) ঃ সম্রাট শাহজাহান (দ্র.) কর্তৃক আগ্রায় তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর জন্য নির্মিত সুন্দর সমাধিসৌধ, পত্নীর নাম আরজুমান্দ বানূ বেগম, উপাধি মুমতায মাহাল, নামটি বিকৃত। তিনি সুবিখ্যাত নূরজাহান (দ্র.)-এর ভ্রাতা আসাফ খানের কন্যা এবং ১০ মে, ১৬১২ খৃ. উনিশ বৎসর বয়সে শাহজাহানের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি চৌদ্দটি সন্তানের জননী হন এবং ১৬৩১ খৃ. জুন মাসে একটি কন্যা সন্তান প্রসবের পর বুরহানপুরে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে বুরহানপুরের উপশহর যায়নাবাদ-এ সাময়িকভাবে দাফন করা হয়, কিন্তু তাঁহার স্বামী, যিনি তাঁহার জন্য গভীরভাবে শোকগ্রস্ত ছিলেন, যথোপযুক্ত একটি সমাধিসৌধ নির্মাণের মাধ্যমে তাঁহাদের প্রেমের স্মৃতি রক্ষার্থে স্থিরসংকল্প হন এবং তাঁহার লাশ আগ্রায় স্থানান্তরিত করা হয়। রাজা জয়সিংহের নিকট হইতে নীত একটি স্থানে পুনরায় তাঁহাকে সাময়িকভাবে কবর দেওয়া হয় এবং ঐ স্থানের উপরেই তাজ নির্মান করা হয়। সম্পূরক ইমারতাদিসহ উক্ত কাঠামো বাইশ বৎসরেও সমাপ্ত হয় নাই। উক্ত সময়কালে ২০,০০০ লোক এই কাজে নিয়োজিত ছিল। সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যবিদদের একটি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় এবং নকশাসমূহ জমা দেওয়া হয়। অবশেষে তুরস্ক অথবা শীরাযের অধিবাসী উস্তাদ ঈসার নকশা গৃহীত হয়। স্থপতি ছিলেন ভেনিসের জেরোনিমো ভেরোনিও, ফাদার মানরিক, ইতালীনিবাসী অগাস্টিনীয় ফ্রাইয়ার বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া প্রচলিত কাহিনীর কোন সমর্থন দেশীয় কোন ঐতিহাসিক বিবরণীতে অথবা পরিব্রাজক ট্যাভেরনিয়ার, বার্নিয়ার ও থেবেনটের লেখায় পাওয়া যায় না। শেষোক্ত ব্যক্তি ইমারতটিকে খাঁটি প্রাচ্যদেশীয় কাজ মনে করেন। অধিকন্তু ইহা অসম্ভব। যোধপুরের শ্বেত মর্মরে নির্মিত সমাধিসৌধ একটি সুউচ্চ ভিত্তির উপর স্থাপিত, ভিত্তিটিও শ্বেত মর্মর আচ্ছাদিত ১৮ ফুট উঁচু ও ৩১৩ বর্গফুট। ইহার প্রতিটি কোণে একটি করিয়া সুন্দর সমানুপাতিক মিনার রহিয়াছে, ১৩৩ ফুট উচ্চ তিনটি গ্যালারী দ্বারা বেষ্টিত এবং শীর্ষে একটি উন্মুক্ত ছত্রী আচ্ছাদিত। এই ভিত্তির কেন্দ্রস্থলে মাকবারা উপস্থাপিত, ১৮৬ ফুট বর্গাকার, কোণগুলি ৩৩ ফুট ৯ ইঞ্চি করিয়া কর্তিত, সম্মুখভাগ ভিত্তির উপর হইতে ৯২ ফুট ৩ ইঞ্চি উত্থিত। ইহার কেন্দ্রস্থলে প্রধান গম্বুজ শোভিত, ৫৮ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট এবং ছাদের উপর ৭৪ ফুট উত্থিত অথবা ভিত্তির উপর হইতে ১৯১ ফুট উঁচু। ইমারতের প্রতিটি সম্মুখভাগে (চার সম্মুখ ভাগ) একটি সুউচ্চ (খিলানবিশিষ্ট পোর্চ) 'ইওয়ান' রহিয়াছে এবং প্রতিটি ইওয়ানের অভ্যন্তরে উচ্চতায় দ্বিতল গম্বুজবিশিষ্ট্য [খিলানবিশিষ্ট] (domical) কক্ষ রহিয়াছে। প্রতিটির শীর্ষদেশে রহিয়াছে গম্বুজওয়ালা ছত্র। কেন্দ্রীয় বৃহৎ গম্বুজের চার কোণে সম্মুখভাগের পোর্চের পার্শ্বদিকে সর্বমোট চারিটি (অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গম্বুজ আচ্ছাদিত) ছত্রী রহিয়াছে এবং এই ছত্রীর প্রতিটির তিন বহির্দিকে ছয়টি খিলানযুক্ত কুলুঙ্গী (recesses) দ্বিতল স্থাপনায় স্থাপিত এবং জাফরি-কাটা গবাক্ষ-পথ দিয়া আলো আসিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই কুলুঙ্গীসমূহ ও বৃহৎ পোর্চসমূহ ভল্টযুক্ত (দুই খিলানযুক্ত)। প্রধান গম্বুজের নীচে, কেন্দ্রস্থলে, মুমতাজ মাহালের কবরের প্রতিরূপ (অলীক কবর -Cenotaph) রহিয়াছে এবং ইহার পার্শ্বেই তাঁহার স্বামীর কবরের প্রতিরূপ, উভয়টিই লিপিমালা দ্বারা অলংকৃত। সরাসরি ইহার নীচে ভূগর্ভস্থ কক্ষে, যাহা ভূমি সমতলে, সেইখানে আছে সত্যিকারের কবর, উপরিস্থ প্রতিরূপ কবরের চাইতে কম অলংকৃত। প্রতিরূপ কবরগুলি জাফরিকাটা কাজযুক্ত শ্বেত মর্মরের পর্দা (বেড়া) দ্বারা বেষ্টিত, "ভারতীয় শিল্পকলার (Masterpiece) শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য"। ইওয়ানগুলি আরবী লিপিধাঁচের অলংকৃত লিপিমালা (সজ্জিত) আয়তাকার প্যানেলের মাঝে স্থাপিত, পাইট্রাডোরা (ভিতরের কাজ?) কাজের সুষম অলংকরণ এবং পৌনঃপুনিক ব্যবহার দ্বারা সামগ্রিক সৌন্দর্য আরও বর্ধিত হইয়াছে, সমস্ত খিলানোপরি ত্রিকোণ অংশ (spandrels), কোণসমূহ ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যগত পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাপারগুলি মূল্যবান রত্ন, আকীক, মূল্যবান মণি, রক্তমণি (প্রভৃতি পান্না জহরত) এবং অনুরূপ প্রস্তর দ্বারা ভিতরে সজ্জিত। মালা, লতা-নকশা এবং অন্যান্য তরঙ্গায়িত নকশা খচিত। এইগুলি নক্‌শায় (design) যেমনই নিখুঁত ও চমৎকার তেমনই রঙের দিক হইতে সুন্দর। একমাত্র শ্বেত মর্মর পাথরের অপূর্ব নকশার জালি-কাজযুক্ত (ডবল) দ্বিত্ব পর্দার (গ্রিল) মাধ্যমে ভিতরে আলো আসিতে পারে, এই পর্দার একটি প্রাচীরের বহির্গাত্রে এবং অন্যটি অন্তর্গাত্রে স্থাপিত। সমাধিসৌধ ও ইহার ভিত্তিভূমির অদূরে দুইটি বাহু রহিয়াছে, যেইগুলির একটি হইল সুন্দর মসজিদ। "এই ইমারত গ্রুপ ৮৮০ ফুট বর্গাকার বাগিচা প্রাঙ্গণের একটি দিক নির্দেশ করে এবং ইহা ছাড়াও একই প্রশস্ততার আর একটি বহিঃপ্রাঙ্গণ রহিয়াছে কিন্তু ইহার গভীরতা মাত্র অর্ধেক।" শিল্পকলার পণ্ডিতগণ (Pedants) গ্রীক এবং গোথিক স্থাপত্যের নিয়মাবলীর সাহায্যে তাজের বিচারের প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। কিন্তু অনুরূপ তুলনা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। যেমন ফার্গুসন সত্যই বলিয়াছেন, "এত অধিক

সৌন্দর্যের সম্মিলন ও পূর্ণাঙ্গ রচনাশৈলী যাহাতে প্রতিটি জিনিস অন্যটির অধীনস্থ (অনুসঙ্গী) এবং এইগুলির সমন্বয়ে এমন এক সমগ্রতার সৃষ্টি যাহার তুলনা পৃথিবীতে আর নাই।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল-হামীদ লাহোরী, পাদশাহ-নামা, মূল, কলিকাতা ১৮৭২ খৃ.; (২) E. B. Havell, A Handbook to Agra and the Taj, London 1912; (৩) মুহাম্মাদ মুঈনুদ-দীন, The History of the Taj, আগ্রা ১৯০৫ খৃ.; (৪) James Fergussion, History of Indian and Eastern Architecture, ed. James Burgess and R. Phene Spiers, লণ্ডন ১৯১০ খৃ.; (৫) H. Yule and A. C. Burnell, Hobson-Jobson, ed. Wm. Crooke, লণ্ডন ১৯০৩ খৃ.।

T. W. Haig (E. I. [1])/ মোঃ রেজাউল করিম

তাজ্‌নীস (تجنيس) ঃ অথবা جناس (আরবী), Paronomasia শব্দের বৈশিষ্ট্য। 'ইল্‌মে বাদী' (অলংকার শাস্ত্র)-এর একটি পরিভাষা, যাহা শব্দের সৌন্দর্যের সহিত সম্পৃক্ত, অর্থাৎ একই বাক্যে এমন দুইটি শব্দ ব্যবহার করা যাহাদের অর্থ পৃথক, কিন্তু উচ্চারণ এক বা প্রায় একইরূপ। ল্যাটিন ভাষায় উহার উদাহরণ এই "amantes sunt amentes."

১। তাজ্‌নীস তাম্ম ঃ যখন দুইটি শব্দের অক্ষর সংখ্যা সমান ও এক জাতীয় এবং উহার গঠন ও সংযোজন একইরূপ হয়–

(ক) যদি দুইটি শব্দ একই শ্রেণীর হয় (যেমন উভয়টিই ইস্‌ম, ফি'ল কিংবা হারফ) তবে তাহাকে তাজ্‌নীস মুমাছিল বলে; যেমন ঃ

يَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ . مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ .

"যখন কিয়ামত (ساعة) অনুষ্ঠিত হইবে, তখন পাপীরা কসম করিয়া বলিবে যে, তাহারা (কবরে) এক ঘণ্টার (الساعة)) বেশি অবস্থান করে নাই" (সূরা ঃ ৩০ ঃ ৫৪, ৫৫)।

(খ) যদি দুইটি শব্দ দুই শ্রেণীর হয় অর্থাৎ একটি ইস্‌ম অন্যটি ফি'ল বা একটি ইস্‌ম অন্যটি হারফ কিংবা একটি ফি'ল অন্যটি হারফ, তবে তাহাকে তাজ্‌নীস মুসতাওফা বলে; যেমন আবূ তাম্মামের কবিতায় আছে ঃ

ما مات من كرم الزمان فانه * يحيا لدى يحيى بن عبد الله.

"যুগের দান-দাক্ষিণ্য যাহা মৃতবৎ হইয়াছে তাহা য়াহ্‌য়া (يحى) ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌র কারণে জীবিত (يحى) হইবে" (দীওয়ান আবূ তাম্মাম, বৈরূত ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৩৪১)।

(২) দুই শব্দের একটি মুরাক্‌কাব ও অপরটি মুফরাদ, কিন্তু লিখায় উভয়টিকে একরূপ দেখা গেলে তাহাকে জিনাসুত্‌-তারকীব বলে।

(ক) মুফ্‌রাদ ও মুরাক্‌কাব উভয় শব্দের লিখিত রূপ যদি একরকম হয় তবে তাহাকে তাজ্‌নীসে মুতাশাবিহ বলে, যেমন ঃ

اذا ملك لم يكن ذاهبة * فدعه فدولته ذاهبة .

"যদি বাদশাহ দানশীল (ذاهبة) না হয়, তবে তাহার রাজ্য চলিয়া যাইবে (ذاهبة), তাহাকে পরিত্যাগ কর" (আবুল-ফাতহ আল-বুস্তী)।

(খ) যদি শব্দদ্বয় লিখিতে সমরূপ না হয় তবে তাহাকে তাজ্‌নীস মাফরূক বলে [অর্থাৎ লিখিত রূপ ভিন্ন–যেমন মুখতাসারুল-মাআনী] ঃ

كلكم قد اخذ الجام ولا جام لنا * ما الذى ضر مدير الجام لوجام لنا .

["তোমরা সকলেই নিজ নিজ পাত্র লইয়া গিয়াছ, আমাদের জন্য কোন পাত্র (অবশিষ্ট) নাই" (ولا جام لنا)। পাত্র বণ্টনকারীর কি ক্ষতি ছিল সে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইত (لو جام لنا)] [আবুল-ফাত্‌হ আল-বুস্‌তী]।

১। যদি দুইটি শব্দ অক্ষরের গঠন বা হারাকাতের দিক দিয়া একটি অন্যটি হইতে ভিন্নরূপ হয়, তবে তাহাকে তাজ্‌নীস মুহার্‌রাফ বলা হয়। যেমন ঃ جبة البرد جناة البرد "ধারীদার চাদরের জুব্বা ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার ঢালস্বরূপ"। এইখানে برد ও برد শব্দে হারাকাতের বিভিন্নতা হইয়াছে। নিম্নের বাক্যে مفرط ও مفرط আর একটি উদাহরণ, যথা ঃ الجاهل اما مفرط او مفرط "মূর্খ লোক হয় অধিক সীমালংঘনকারী, না হয় সীমার বহু দূরে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে" (প্রকাশ থাকে যে, এই উদাহরণে তাশদীদের দ্বারা অর্থের কোন পার্থক্য করা হয় নাই)। البدعة شرك لشرك "ধর্মে বিদ'আত সৃষ্টি শির্কের (شرك) জাল (شرك))-বিশেষ"।

(২) যদি দুই শব্দের মধ্যে অক্ষরের সংখ্যা সমান না হয় এবং উভয়ের মধ্যে অক্ষর বেশী হয় তাহাকে তাজ্‌নীস নাকিস বলে। ইহা কয়েক প্রকার; যথা ঃ

(ক) বেশী অক্ষর কখনও শব্দের প্রথমে হইয়া থাকে, যেমন ঃ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (৭৫ ঃ ২৯)।

(খ) কখনও বা শব্দের মধ্যস্থলে হয়; যথা ঃ جدى جهدى "আমার ভাগ্য (جدى) আমার চেষ্টার (جهدى) উপর নির্ভরশীল।"

(গ) কখনও শব্দের শেষে হয়, যেমন আবূ তাম্‌মামের নিম্নলিখিত কবিতায় আছে ঃ

يدون من ايد عواص عواصم * تصول باسياف قواض قواضب

"তাহারা তাহাদের হস্ত সম্প্রসারিত করিয়া দেয়, যাহা তাহাদের শত্রুদের হত্যাকারী (عواص) ও বন্ধুদের রক্ষাকারী (عواصم)। তাহারা শত্রুদের উপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিয়া কর্তন করিয়া ফেলে (قواضب), যাহা তাহাদের জন্য মৃত্যুর শামিল" (দীওয়ান আবূ তাম্‌মাম, পৃ. ৪৩)।

(ঘ) কখনও দুইটি শব্দের মধ্যে একটি হইতে অন্যটির মধ্যে একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, যেমন খানসার নিম্নলিখিত কবিতায় ঃ

ان البكاء هو الشفا * من الجوى بين الجوانح .

"ক্রন্দন ঐ হা-হুতাশের নিরাময়, যাহা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে (جوانح) মিশিয়া আছে"। এই প্রকার জিনাসকে কখনও মুযায়্যালও বলা হয়।

(৩) যদি ভিন্ন জাতীয় অক্ষরের দ্বারা দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য হয় তবে এইরূপ পার্থক্যকারী অক্ষর একটির অধিক হইতে পারিবে না।

(ক) উপরিউক্ত শব্দদ্বয়ের পার্থক্য যদি কাছাকাছি হয় তবে তাহাকে মুদারি' (مضارع) বলা হয়। ইহাও তিন প্রকার, যথা ঃ

(১) এই পার্থক্য শব্দের গোড়ায় হইবে; যেমন ঃ بيتى وبين كنى ليل دامس وطريق طامس "আমার ও আমার বাড়ির মধ্যে অন্ধকার রাত (دامس) ও মুছিয়া যাওয়া রাস্তা (طامس) বিদ্যমান" (আল-মাকামাতুল-হারীরিয়্যা, মাকামা, ১৬, পৃ. ১৮৫)।

(২) পার্থক্যসূচক অক্ষর শব্দের মধ্যে হইবে, যেমন ঃ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْئَوْنَ عَنْهُ "তাহারা ইহা হইতে অন্যদিগকে ফিরাইয়া রাখে (ينهون) এবং নিজেরাও বাঁচিয়া থাকে (ينئون)" (৬ ঃ ২৬)।

(৩) পার্থক্যসূচক অক্ষর শব্দের শেষে হইবে, যেমন ঃ الخيل معقود بنواصيها الخير "ঘোড়ার (الخيل) ললাটে সৌভাগ্য (الخير) লিপিবদ্ধ" [সাহীহ্ হাদীছ]।

(খ) যদি দুইটি শব্দের পার্থক্যকারী অক্ষরদ্বয়ের উচ্চারণ স্থল নিকটবর্তী না হয় তবে তাহাকে জিনাসে লাহিক বলে। ইহাও তিন প্রকার; যথা ঃ

(১) সেই অক্ষর শব্দের প্রারম্ভে হইতে পারে, যেমন ঃ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ "ধ্বংস এমন প্রত্যেক লোকের জন্য যে সম্মুখে ধিক্কার (همزة) দেয় ও অগোচরে নিন্দা (لمزة) করিয়া বেড়ায়" (১০৪ ঃ ১)।

(২) সেই অক্ষর শব্দের মধ্যস্থলেও হইতে পারে, যেমন ঃ

ليس عن ثروة بلغت مداها * غيراني امرء كفاني كفافي .

"আমার এই মুখাপেক্ষীহীনতা ঐ ধন-সম্পদের কারণে নহে যাহা আমি প্রচুর পরিমাণে অর্জন করিয়াছি, বরং [আসল কথা এই যে,] আমি এমন এক ব্যক্তি যে, দৈনিকের খরচটাই (كفاني) আমার জন্য যথেষ্ট (كفافي) বলিয়া আমি মনে করি" (দীওয়ান বুহতুরী, বৈরূত ১৯১১ খৃ., ১খ, ৩৬৭)।

(৩) সেই অক্ষর শব্দের শেষ প্রান্তেও হইতে পারে, যেমন, وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ "যখন তাহাদের নিকট নিরাপত্তা (امر) কিংবা ভীতির (خوف) কোন সংবাদ আসে" (৪ ঃ ৮৩)।

(৪) যদি দুই শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের বিন্যাস একরূপ না হয় তবে তাহাকে 'তাজনীসুল-কাল্‌ব' বলা হয়, যেমন– حسامه فتح لاوليائه وحتف لاعدائه "তাহার তরবারি তাহার বন্ধুদের জন্য বিজয় (فتح) এবং শত্রুদের জন্য মৃত্যু (حيفت)"।

(ক) যদি সব কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ বিন্যাসে উলট-পালট হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বলে 'কাল্‌ব কুল'। যেমনঃ اللهم استرعوراتنا وامن روعاتنا "হে আল্লাহ! আমাদের দোষ-ত্রুটি (عورات) গোপন রাখুন এবং ভয়-ভীতি (روعات) দূর করিয়া নিরাপত্তা দান করুন" [আল-হাদীছ]।

(খ) যদি শব্দের কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে উলট-পালট হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বলে 'কাল্‌ব বা'দ'। এই অবস্থায় যদি শব্দদ্বয়ের একটি পংক্তির প্রথমে এবং অপরটি পংক্তির শেষে হয় তবে তাহাকে "মাকলূব মুজান্‌নাহ" বলে (যেন শব্দ দুইটি কবিতার দুই ডানায় অবস্থিত) [মুখতাসারুল-মাআনী]। যেমন ঃ

لاح انوار الهدى من كفه في كل حال .

"আমার প্রিয়ের বাহু হইতে সর্ব অবস্থায় হিদায়াতের আলো বিচ্ছুরিত"।

(গ) দুইটি তাজ্‌নীস শব্দের একটি যদি অন্যটির পরেই আসে তবে তাহাকে 'মুযাদাবিজ' বা 'মুরাদ্‌দাদ' বা 'মুকাররার' বলে। যেমন ঃ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ "আমি আপনার নিকট সাবা (سبا) হইতে সংবাদ (نبأ) লইয়া আসিয়াছি" (২৭ ঃ২২)।

(ঘ) "জিনাস" হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত দুইটি শর্ত আছে।

(১) উভয় শব্দ একই মূল (ماده) হইতে নির্গত (مشتق) হইবে, যেমনঃ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ "অতএব সরল দীনে তুমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর" (৩০ ঃ ৪৩)। এই আয়াতে "اقم" ও "قيم" يقوم-قام হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

(২) অথবা দুই শব্দের মধ্যে শিবহি ইশতিকাক হইবে, অর্থাৎ শব্দ দুইটির একটির সংগে অপরটির সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু উভয়ের মূল এক নহে। যেমন ঃ قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ "সে [লূত] বলিল, আমি তোমাদের কর্মকে ঘৃণা করি" (২৬ ঃ ১৬৮)। এই আয়াতে "قال" ও "قَالِيْنَ"-এর মূল এক নয়; কিন্তু উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

আবুল-ফাত্‌হ আল-বুস্‌তী "আত-তাজ্‌নীসুল-আনীস আল-বাদী'উত-তা'সীস" রচনা করিয়াছেন। ইহা জ্ঞানগর্ভ উক্তির একটি সংকলন যাহার মধ্যে বহু সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দ বা সাদৃশ্যের সমতুল্য অথচ বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দ রহিয়াছে (য়াতীমাতুদ-দাহ্‌র, দামিশ্‌ক ১৩০৪ হি, ৪খ, পৃ. ২০৬ [তু. কিতাবুল-মুতাশাবিহ লিছ্‌-ছাআলিবী, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিনের পরিশিষ্ট, লাহোর, মে ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৯]। য়াতীমা, ৪খ, ২৩৩ পৃষ্ঠায় আল-বুসতী লিখিয়াছেন যে, কাহারও অনুসরণে মুতাশাবিহ জানার প্রতি তাহার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, আরও দ্র. ঐ খণ্ড, পৃ. ৩, বুসতীর এক অনুসারীর বর্ণনা এবং পৃ. ৫২, ৭৬ প্রশংসা (মাদহ) ও নিন্দা (যাম্ম) তাজনীস সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। তাশকোপরূ যাদের কিতাব মিফতাহুস-সাআদা (১খ, ২২৯)-এর কথা ঐ কিতাব হইতে কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ আলী ইব্‌ন আলী আত-তাহানাবী, কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতিল-ফুনূন, কুস্‌তুনতিনিয়ি ১৩১৭ হি., পৃ. ২৪৮; (২) ফাখ্‌রুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার আর-রাযী, নিহায়াতুল-ঈজায ফী দিরায়াতিল-ই'জায, কায়রো ১৩১৭ হি., পৃ. ২৮; (৩) সালাহুদ-দীন আস-সাফাদী, জিনানুল-জিনাস, কুসতুনতিনিয়া ১২৯৯ হি.; (৪) জুরজানী, তা'রীফাত, কুসতুনতিনিয়া ১৩০৭ হি., পৃ. ৩৫; (৫) আশ-শারীশী, শারহুল-মাকামাত, বূলাক ১৩০০ হি., ১খ., ৩৬৯; (৬) D. Sacy [আল-মাকামাতুল-হারীরিয়্যা], Les seances de Hariri, প্যারিস ১৮৪৭-১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৮০, ২৬৮; (৭) আবুল-ফাত্‌হ নাসরুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদিল-কারীম আল-মাওসিলী, আল-মাছালুস-সাইর ফী আদাবিল-কাতিব ওয়াশ-শা'ইর, কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ৯৮; (৮) আবূ হিলাল আল-হাসান ইব্‌ন আবদিল্লাহ আল-আসকারী, কিতাবুস-সিনাআতায়ন, কুসতুনতিনিয়া ১৩২০ হি., পৃ. ২৪৯; (৯) য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হামযা ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-আলাবী আল-য়ামানী, কিতাবুত-তিরায, কায়রো ১৩৩২ হি., ২খ., ৩৫৫; (১০) আবূ য়া'কূব য়ূসুফ আস-সাক্‌কাকী, মিফতাহুল-উলূম,

কায়রো ১৩১৬ হি., পৃ. ১৮১, "জিনাস", "তাজনীস"; (১১) তাশকোপরু যাদে, মিফতাহুস-সাআদা, হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩২৯ হি., ১খ., ২২৯ ও ২খ, ৩৩৯; (১২) আবদুল-হাদী নাজাল-আবয়ারী, সুউদুল-মাতালি', বূলাক ১২৮৩ হি., ১খ, ৩০১; (১৩) ইব্‌ন রাশীক [আল-কায়রাওয়ানী], আল-উমদাঃ, কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ১খ, ২২০; (১৪) আবূ মানসূর আছ-ছাআলিবী, ফিক্‌হুল-লুগাহ ওয়া আসরারুল-'আরাবিয়্যা, কাসিম আল-বাকরাজী আল-হালাবী, হিলয়াতুল-বাদী' ফী মাদহিন-নাবিয়্যিশ-শাফী (স), হালব ১২৯৩ হি., পৃ. ১৪; (১৬) আবদুল-হামীদ কাদ্দাসা ইব্‌ন মুহাম্মাদ আলী ইবনুল-খাতীব, طالع السعد الرفيع فى شرح نور البديع على نظم البديع, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ১২; (১৭) ইব্‌ন হিজ্জাতিল-হামাবী, খিযানাতুল-আদাব, কায়রো ১৩০৪ হি., পৃ. ২০; (১৮) আবদুল-গানী আন-নাবুলুসী, নুযহাতুল-আযহার আলা নাসমাতিল-আসহার, বূলাক ১২৯৯ হি., পৃ. ১২; (১৯) জালালুদ-দীন আল-কাযবীনী আল-খাতীব, তালখীসুল-মিফতাহ মা'আ তা'লীকাত লি-আবদির-রাহমান আল-বারকূকী, কায়রো ১৩২২/১৯০৪, পৃ. ৩৮৭; (২০) সাদুদ-দীন আত-তাফাযানী, মুখতাসারুল-মাআনী, কুসতুনতিনিয়া ১৩১৮ হি., পৃ. ১৯৩; (২১) ঐ, আল-মুতবিয়াল, কুসতানতিনিয়া, ১৩০৪ হি., পৃ. ১৪৪৫.; (২২) "মাজামী"; (ক) সা'দুদ-দীন আত-তাফতাযানী, মুখতাসার আলা তালখীসিল-মিফতাহ; (খ) ইব্‌ন য়া'কূব আল-মাগরিবী, মাওয়াহিবুল-ফাত্তাহ ফী শারহি তালখীস; (গ) বাহাউদ-দীন আস-সুবকী, আরূসুল-আফরাহ ফী শারহি তালখীস; (ঘ) আল-খাতীব আল-কাযবীনী, আল-ঈদাহ; (ঙ) আদ-দাসূকী, হাশিয়া আলা মুখতাসারিত-তাফতাযানী, বূলাক ১৩১৭ হি., ৪খ., ৩২২; (২৩) শামসুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন কায়স আর-রাযী, আল-মু'জাম ফী মাআয়ীরি আশ্‌আরিল-আজাম, লাইডেন ১৩২৭/ ১৯০৯, পৃ. ৩০৯; (২৪) গারসা ডে টাসী, Rhetorique et Prosodie, des langues de l'Orient Musulman, প্যারিস ১৮৭৩ খৃ., পৃ. ১২০ প. [জিনাস-এর ফারসী উদাহরণের জন্য দেখুন শামসুদ-দীন ফাকীর, হাদাইকুল-বালাগাত, কানপুর ১৮৮৭ খৃ., পৃ. ৯৩ এবং উরদূ উদাহরণের জন্য দেখুন সাহবাই, তারজামা-ই হাদাইকুল-বালাগাত, ঐ সম্পা., পৃ. ১০৭]।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন চেনেব ও সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/বোরহান উদ্দীন

তাজ্‌বীদ (تجويد) ঃ আরবী, কুরআন পঠন বিদ্যাকে তাজ্‌বীদ বলে। [তাজ্‌বীদ শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ তাহ্‌সীন, অর্থাৎ উত্তমরূপে করা, সঠিকভাবে এবং সুন্দরভাবে সম্পাদন করা; পরিভাষায় ইহা কুরআন পঠন বিদ্যারই অপর নাম]। ইহার সাহায্যে কুরআনের অক্ষরগুলির উচ্চারণ শুদ্ধভাবে করা যায়। প্রতিটি অক্ষর তাহার উচ্চারণ স্থান (মাখরাজ) থেকে সহজ, সরলভাবে ও অনায়াসে যথাযথরূপে উচ্চারিত হইতে থাকে, স্বর অধিক উঁচুও হয় না এবং নীচুও হয় না, কোন প্রকার কৃত্রিমতা অবলম্বনে বেশি কর্কশ বা হালকা ভুলভ্রান্তি, মোটা ও সরু করা হইতে সংরক্ষিত থাকে। তাজ্‌বীদ তিন প্রকার; যথা ঃ (১) তারতীল (ترتيل), (২) হাদ্‌র (حدر) ও (৩) তাদ্‌বীর (تدوير)।

(১) তারতীল ঃ অর্থের প্রতি লক্ষ রাখিয়া ধীরস্থিরভাবে শব্দগুলি উচ্চারণ করা [ওয়ার্‌শ, আসিম ও হামযার মাযহাব]।

(২) হাদ্‌র ঃ দ্রুত ও ক্ষিপ্র গতিতে পড়া [ইব্‌ন কাছীর, আবূ উমার ও কালূনের মাযহাব]।

(৩) তাদ্‌বীর ঃ দ্রুতও নয়, ধীরেও নয়, বরং এই দুয়ের মাঝে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়া পড়া [ইব্‌ন আমির ও কিসাঈ-র মাযহাব]।

তাজ্‌বীদের ("হিলয়াতুল-কিরাআত") উদ্দেশ্য হইল কুরআন মাজীদকে নির্ভুলভাবে পাঠ করা। ইহাতে প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণের (Consonants) উচ্চারণ স্থান (মাখ্‌রাজ) শিক্ষা দেওয়া হয় এবং উহার মাশ্‌ক করান হয়। ইহা ছাড়া ওয়াকফ (বিরাম), ইমালা (আলিফকে য়ার ন্যায় পড়া)ও ইদগামের নিয়ম-কানূন শিক্ষা দেওয়া হয়।

মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থলের দিক দিয়া ব্যঞ্জনবর্ণ দুই প্রকার ঃ (১) মুস্‌তালিয়া (مستعليه) (উচ্চ উচ্চারণবিশিষ্ট অক্ষর) ঃ ঐসব অক্ষর যেইগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা উপরে তালুর দিকে উঠিয়া যায়। সেইগুলি হইল ঃ خ-ص-ض-ط-ظ-ع-غ ও ق এই অক্ষরগুলি তাফ্‌খীম (تفخيم) বা মোটা সুরে উচ্চারিত হয়। তন্মধ্যে ص-ض-ط ও ظ অক্ষরে তাফখীম বেশি হয়।

(২) মুস্‌তাফিলা (مستفلة) (নিম্ন উচ্চারণবিশিষ্ট অক্ষর), সেইসব অক্ষর যেইগুলি উচ্চারণের সময় জিহ্বা তালুর নীচে থাকে। মুস্‌তাফিলা অক্ষরগুলি তারকীক (ترقيق) করিয়া পড়িতে হয়, অর্থাৎ ইহার স্বর মোটা হয় না, সরু হয়। তবে রা (ر) ও الله শব্দের 'লাম' (ل) নিম্নে বর্ণিত অবস্থায় মোটা স্বরে পড়া হয়।

"ر" অক্ষরের উপর পেশ কিংবা যবর হইলে পোর বা মোটা করিয়া পড়িতে হয়, কিন্তু যের হইলে (اصل হউক বা عارضى) মোটা করিয়া পড়া যাইবে না। যদি "ر" সাকিন হয় এবং তাহার পূর্বের অক্ষরে আস্‌লী যের হয় অথবা "ر" সাকিনের পূর্বের অক্ষরে যের হয় এবং উভয়টা একই শব্দে হয়, কিন্তু "ر"-এর পরে মুস্‌তালিয়া অক্ষর না থাকে তখনও পোর পড়া যাইবে না।

اللهم ও الله শব্দের লাম অক্ষরের পূর্বে যদি পেশ বা যবর হয় তবে সর্বসম্মতভাবে পোর পড়িতে হইবে, যথা ঃ

قال اللهم- قال الله- يقول اللهم- يقول الله

শব্দের শেষের নূন (ن) ও তানবীন (تنوين) -এর উচ্চারণ ঃ ইহার পরে যদি হারফে হালকীর ছয়টি অক্ষরের ء-ه-ح-خ-غ-ع কোন একটি অক্ষর আসে তবে উহাকে ইজহার বা স্পষ্ট করিয়া পড়িতে হয়। "ر" সাকিন ও তানবীনের পরে যদি (يرملوم) ى-ر-م-ل-و-ن -এর কোন অক্ষর থাকে "ن" সাকিন ও তানবীন উহাতে (ইদগাম (ادغام) হইয়া যাইবে। "ر" ও "ل" ব্যতীত অন্য অক্ষরের ক্ষেত্রে ইদগামের সঙ্গে গুন্নাহ (غنه) -ও হইবে। "ن" সাকিন ও তানবীনের পরে যদি হারফ হালকী ব্যতীত অন্য কোন হারফ সাহীহ আসে তবে ইখ্‌ফা (اخفاء) হইবে [অর্থাৎ উহার আসল উচ্চারণ না হইয়া ইদগাম ও ইজহার (اظهار) -এর মাঝামাঝি উচ্চারণ হইবে]। মীম (م) সাকিনের পর যদি "م" আসে তবে উভয়কে ইদগাম করিয়া পড়িতে হয়। "ن" সাকিন অথবা তানবীনের পরে যদি হারাকাতবিশিষ্ট বা' (ب) হয় তবে "ن" সাকিন ও তানবীনকে "م" -এর ন্যায় উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে। ইহাকে ইক্‌লাব বলে (সুয়ূতী, ইত্‌কান, পৃ. ১৩৫ প.)। এই অবস্থায় মীম (م) সাকিনের উচ্চারণ ইখ্‌ফা সহকারে হইবে। অন্যান্য অবস্থায় [অর্থাৎ মীম (م) সাকিনের পর "م" ও "ب" ব্যতীত অন্য কোন অক্ষর আসিলে] মীম-এর উচ্চারণ স্বাভাবিকরূপেই হইবে।

ইদ্‌গাম দুই প্রকার ঃ (১) কাবীর ঃ এক জাতীয় দুইটি হার্‌ফ সাহীহ্‌ [অথবা মুতাজানিস (একই প্রকারের) কিংবা মুতাকারিব (কাছাকাছি) যদি পাশাপাশি আসে এবং উভয়ের উপর হারাকাত থাকে, যেমন مَا سَلَكَكُمْ তবে তাহাকে ইদ্‌গাম করিয়া পড়িবে অর্থাৎ مَا سَلَكُمْ (সূরা ঃ ৭৪ ঃ ৪৩)।

(২) সাগীর ঃ দুইটি হার্‌ফ সাহীহ্‌-এর প্রথমটি যদি সাকিন এবং দ্বিতীয়টি মুতাহার্‌রিক হয়, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, লাম তা'রীফ কেবল হার্‌ফ শামসিয়্যার সহিত ইদ্‌গাম হইবে। "ا"-"و" বা "ى" যখন সাকিন হয় এবং তৎপূর্বে অনুকূল হারাকাত হয়, তখন এইগুলি "হুরূফ মাদ্দ" (حروف مد) হইয়া যায় এবং স্বর দীর্ঘ করিয়া পড়িতে হয়। যদি "و" বা "ى" সাকিনের পূর্বে যবর হয় তবে তাহা হার্‌ফ লীন হইয়া যাইবে এবং দীর্ঘ করিয়া পড়া যাইবে না।

হাম্‌যার উচ্চারণ দুই প্রকার হয় ঃ (১) তাহ্‌কীক ও (২) তাখ্‌ফীফ। তাখ্‌ফীফ অবস্থায় উহার হারাকাত পূর্বের হার্‌ফ সাহীহ সাকিনকে দেওয়া হয়। হাম্‌যা যদি সাকিন হয়, কিন্তু ওয়াকফের কারণে সাকিন নয়, তবে ইহাকে সেই মাদ্দের অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা যায় যাহা পূর্ববর্তী অক্ষরের হারাকাতের মুওয়াফিক (অনুকূল) হয়। হাম্‌যার পূর্বে যদি আর একটা হাম্‌যা উচ্চারিত, হারাকাতবিশিষ্ট (ملفوظة متحركة) না থাকে তবে তাহার উচ্চারণ তাস্‌হীলের সহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাহার পূর্বে আর একটা হাম্‌যা মালফূজা মুতাহার্‌রাকা থাকে তবে দ্বিতীয় হাম্‌যার হারাকাত সাকিনের মতই মুশাবিহ্‌ হইবে এবং এই দ্বিতীয় হাম্‌যাটি পেশযুক্ত হইলে "و"-এর আকারে, যেরযুক্ত হইলে "ى"-এর আকারে এবং যাবার যুক্ত হইলে "ا"-এর আকারে লিখা হইবে ও তদনুযায়ী ইহার উচ্চারণ হইবে, যথা ঃ آ أنت ও اؤ نبئكم ايذا (ইতকান, পৃ. ১৪২, শেষ লাইন প.)।

যদি পাশাপাশি দুইটি হাম্‌যা (همزه) একত্র হয় আর উভয়টি যদি যবরযুক্ত হয় ও দুই শব্দের সহিত সম্পর্ক রাখে, অর্থাৎ প্রথম শব্দের শেষে একটি হাম্‌যা এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে আর একটি হাম্‌যা, তবে কোন কোন কারী দ্বিতীয় হাম্‌যাকে তাস্‌হীল করিয়া পড়েন, কেহ আলিফ দ্বারা ইহাকে পরিবর্তন করে, কেহ উভয়ের মধ্যে একটা আলিফ বৃদ্ধি করেন, আবার কেহ উভয়কে স্ব স্ব অবস্থায় উচ্চারণ করেন, যথা جاء اجلكم (ইতকান, পৃ. ১৪৩, ছত্র ৪)।

কুরআনের আয়াতসমূহ ওয়াক্‌ফের চিহ্ন দ্বারা যদিও খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে কিন্তু পড়িবার সময় প্রতিটি চিহ্নের দ্বারা থামিয়া যাওয়া অপরিহার্য নহে। পূর্ণাঙ্গ ওয়াক্‌ফ সেইখানেই হইবে যেইখানে অর্থ পূর্ণ হইয়া যায় এবং পরবর্তী কথার সহিত শব্দগত ও অর্থগত কোন সম্পর্ক থাকে না (তু. ইতকান, পৃ. ১২২, ছত্র ৭, নিম্নদিক হইতে)। নির্ভরযোগ্য প্রকাশনা হইতে মুদ্রিত, কুরআনের কপিগুলিতে ওয়াক্‌ফ চিহ্নের প্রবর্তিত নিয়মে আছে যে, যেই স্থানে ওয়াক্‌ফ করা নিষেধ সেই স্থানে "لا" লেখা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইখানে ওয়াক্‌ফ করা যাইবে না। তাশ্‌দীদযুক্ত অক্ষর, যেমন عم-مم-هن -এর উপর ওয়াক্‌ফ করিতে হইলে শেষে একটি সাকিন হা' (هاء) যুক্ত করিতে হয় (هاء السكت)।

কোন কোন কারী الفاظ منقوصه منكره-এর শেষের "ى" যাহা رفع ও جر -এর অবস্থায় উচ্চারিত হয় না, যথা ঃ هاد-داع ইত্যাদি, ইহাকে ওয়াক্‌ফের অবস্থায় পুনর্বহাল করিয়া দেয় এবং هادى-واقى ইত্যাদি পড়িয়া থাকে। আবার কেহ কেহ "ى" এবং ইহার পূর্বের হারাকাত ফেলিয়া দিয়া هاد-واق ইত্যাদি পড়ে। যদি কোন শব্দের শেষে হাম্‌যা থাকে এবং উহার পূর্বে "ى" বা "و" হয়, তবে হাম্‌যাকে পূর্বের অক্ষরের অনুরূপ অক্ষরে পরিবর্তন করিয়া উহাতে ইদ্‌গাম করিয়া পড়া হয়। যথা برىء-কে برى পড়া হয়। যদি হাম্‌যার পূর্বেও হাম্‌যা হয় তবে বিশেষভাবে এই নিয়ম পালন করা হয়। তানবীনের উপর نصب -এর অবস্থায় ওয়াক্‌ফ করা হইলে তাহা আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হইয়া যায়। الفاظ مفرده مونثه-তে তা'নীছ-এর পরিবর্তিত হইয়া সাকিন হা' (هاء) হইয়া যায়। শব্দের শেষ অক্ষর হারাকাতবিশিষ্ট (متحرك-মুতাহার্‌রাক) হইলে ওয়াক্‌ফ করার সময় শেষ অক্ষরের হারাকাত লোপ পায়। তবে رفع ও جر-এর অবস্থায় ইহার পেশ ও যেরকে কিছুটা প্রকাশ করা (روم) কিংবা ঠোঁটের দ্বারা ইংগিত করা (اشمام) যায়, বরং এইরূপ করা উত্তম বলিয়া গণ্য হয় (তু. ইতকান, পৃ. ১২৯, ছত্র ২ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুয়ূতী, ইত্‌কান (মাত্‌বা' আহমাদী, দিল্লী ১২৮০ হি., পৃ. ১৪৫), কায়রো ১৩০৬ হি., ১খ., ৮৭ ও ১০৫; (২) তাহানাবী, কাশ্‌শাফু ইস্‌তিলাহাত, কুস্‌তান্‌তীনিয়া সং, ১খ, ২১৬; কলিকাতা সং, ১খ, ১৯৬; (৩) আলী ইব্‌ন সুলতান আল-কারী, আল-মিনাহুল-ফিক্‌রিয়্যা 'আলা মাত্‌নিল-জাযারিয়্যা এবং উহার টীকা; (৪) যাকারিয়্যা আল-আনসারী, আদ-দাকাইকুল-মুহ্‌কামা ফী শার্‌হিল- মুকাদ্দামা [আল-জাযারিয়্যা], কায়রো ১৩৪৪ হি.; (৫) সুলায়মান আল-জামযূরী, ফাতহুল-আকফাল বি-শার্‌হ তুহ্‌ফাতিল-আত্‌ফাল এবং ইহার সঙ্গে অজ্ঞাতনামা এক লেখকের ফাত্‌হুর-রাহমান ফী তাজবীদিল- কুরআন, কায়রো ১৩৪৩ হি.; (৬) শায়খ তাহির আল-জাযাইরী, তাদ্‌রীবুল-লিসান আলা তাজবীদিল-বায়ান, ১৩২১ হি. সনে লিখা সম্পূর্ণ হয়, বৈরূত, তা. বি.; (৭) শায়খ মুতাওয়াল্লী, ফাত্‌হুল-মুতী' ওয়া গুনয়াতুল-মুকরী ফী শার্‌হ মুকাদ্দামাত ওয়ার্‌শ আল-মিসরী, কায়রো ১৩০৯ হি.; (৮) আবূ রীমা, হিদায়াতুল-মুস্‌তাফীদ ফী আহকামিত-তাজবীদ, কায়রো ১৩৪৪ হি.; (৯) জুরজানী, তা'রীফাত, শিরো. তায়তীল; (১০) বুস্‌তানী, মুহীতুল-মুহীত, শিরো. ১খ, ৩১৪; (১১) আবদুন-নাবী ইব্‌ন আবদির-রাসূল, জামিউল-উলূম, হায়দরাবাদ ১৩২৯ হি., ১খ, ২৭৪; (১২) ইবনুল-কাসিহ, সিরাজুল-কারী আল-মুবতাদী ওয়া তাযকারুল-কারিল-মুন্‌তাহী, শারহ হিরযিল-আমানী ওয়া ওয়াজহিত-তাহালী লিশ-শাতিবী, কায়রো ১৩৪১ হি., বিশেষত পৃ. ৩৬-১২০ [(১৩) য়ার মুহাম্মাদ ইব্‌ন খুদাদাদ সামারকান্‌দী, কাওয়াইদুল-কুরআন (ফারসীতে, আবুল-গাযী আবদুল্লাহ বাহাদুর খান-এর নামে উৎসর্গীকৃত), পাণ্ড. লাহোর]।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন শেনেব ও মারগূব আহমাদ তাওফীক
(দা. মা. ই.)/বোরহান উদ্দীন

তাজাম্মুল হোসাইন খান (تجمل حسين خان) ঃ মাওলানা, বৃহত্তর বরিশাল জিলার (বর্তমানে বিভাগ) পিরোজপুর মহকুমার (বর্তমান জিলা) অন্তর্গত ভাণ্ডারিয়া উপজিলার পশ্চিম পণ্ডরীবুনিয়া গ্রামে ১৩২৬/১৯০৮ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম। তাঁহার পিতার নাম মৌলবী রমযান আলী খান এবং মাতার নাম মতিয়া বেগম। তিনি ছিলেন তাঁহাদের সাত সন্তানের মধ্যে পঞ্চম।

সিপাইবাড়ী মক্তবে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তাঁহার দীনদার পিতা পুত্রের লেখা-পড়ার প্রতি অতি আগ্রহ ও উৎসাহ দেখিয়া দীনী শিক্ষা গ্রহণের জন্য ধাওয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করাইয়া দেন। ৩-৪ বৎসর উক্ত মাদ্রাসায় অধ্যয়নের পর বাড়ীর কাহাকেও না বলিয়া তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহার এক বন্ধুর সহিত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় চলিয়া যান। পরবর্তীতে পিতা-মাতার নারাজীর কারণে সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন এবং পূর্বোক্ত মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া ১৯২৬ খৃ. দাখিল পরীক্ষায় পাস করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার দুই সহপাঠী মোহাম্মদ আলী ও মোহাম্মদ উল্লাহ্-সহ তাহাদের উস্তাদ জনাব মাওলানা আবুল কাসিম দেওবন্দী সাহেবের সহিত তাঁহার বাড়ী নোয়াখালীতে চলিয়া যান এবং তাঁহারই পরামর্শে ভবানীগঞ্জের কারামাতিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯২৮ খৃ. উক্ত মাদ্রাসা হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত 'আলিম পাস করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার দুই সাথীসহ ১৯২৮ খৃ. কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৩০ সালে তিনি ফাযিল পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া সাফল্য অর্জন করেন এবং বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি উক্ত মাদ্রাসায়ই কামিল ফিক্হ গ্রুপে ভর্তি হন এবং ১৯৩২ খৃ. উক্ত পরীক্ষায় তিনি সমগ্র বঙ্গ আসামের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। অতঃপর তিনি প্রাইভেটভাবে ১৯৩৭ খৃ. বর্তমান এসএসসি মানের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, ১৯৩৯ খৃ. এইচএসসি পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি স্নাতক ক্লাসেও ভর্তি হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১৯৩০ সালে শর্ষিণার মরহুম পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র)-এর খলীফা ভান্ডারিয়া থানার তেলিখালী নিবাসী মৌলভী মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা ফাতেমা খাতুনের সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তিনি অনাড়ম্বর মধুর দাম্পত্য জীবন যাপন করেন।

কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে তিনি মাঝেমধ্যে ফুরফুরার পীর সাহেবের দরবারে আসা-যাওয়া করিতেন। তিনি তাঁহার হাতে প্রাথমিকভাবে বায়আত গ্রহণ করেন। অতঃপর ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ পদে চাকুরী নেওয়ার সুবাদে সেখানকার পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন সাহেবের সাহচর্যে আসেন এবং তাঁহার হাতে পুনরায় বায়আত গ্রহণ করেন এবং চার তরীকার মশ্ক করিয়া কামালিয়াত হাসিল করেন।

কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হইতে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের পর তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৩৩ সালে পটুয়াখালী মহকুমার (বর্তমানে জিলা) পাংগাশিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পর ১৯৩৫ সালে তিনি কাউখালী উপজেলাধীন কেউন্দিয়া নিউস্কীম মাদ্রাসার হেড মাওলানা বা আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন। এইখানেই ছারছীনার পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন (র)-এর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় ঘটে। পীর সাহেব তাঁহার যোগ্যতায় মুগ্ধ হন। ১৯৪৩ খৃ. তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় কলিকাতার বাহিরে সর্বপ্রথম শর্ষিণা মাদ্রাসায় কামিল ক্লাস খুলিবার অনুমতি লাভ করিবার পর এ.কে. ফজলুল হক সাহেবের সহিত সাক্ষাতকারের মাধ্যমে ৬০ টাকা বেতনে তাঁহাকে উক্ত মাদ্রাসার প্রথম প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগ দান করা হয়। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তিনি তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ খৃ. পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, ড. আনছার উদ্দীন, ড. আলী হায়দার, জনাব আখতার ফারুক, শরীফ মুহাম্মাদ আবদুল কাদিরসহ প্রবন্ধ লেখকও তাঁহার সরাসরি ছাত্র। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর তৎকালীন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা বোর্ড পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হইয়া পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা বোর্ড নামে একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করা হয়। তখন হইতেই তিনি উক্ত বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন। তাঁহার কর্মজীবনের ৩৩ বৎসরই তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন।

মাওলানা তাজাম্মুল হোসেন খান অনেক কিতাব প্রণয়ন করিয়াছেন। কতিপয় কিতাব বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদন লাভ করে। তন্মধ্যে জাওয়াহিরুল ফিক্হ, মিরকাতুত তরজমা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, তা'লীমে উর্দু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, খোলাসাতুল মিজান, মিরকাতুল আদবসহ প্রায় ৭-৮ খানা কিতাব অন্যতম। ইহা ব্যতীত তিনি হজ্জ ও জিয়ারত, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা), ইসলাম নীতি, বাংলা ফরায়েজের কিতাব; কাশফুল হক, চাঁদ দেখার মাসআলা, দাঁড়ি ও লেবাসসহ অনেক বিষয়ে কিতাব লিখিয়াছেন। তাঁহার বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

মাওলানা তাজাম্মুল হোসেন খান কোন রাজনৈতিক দলের সহিত ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন না। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন দেশবরেণ্য আলিম, ইলম বিতরণই ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য, তাই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সময় দেওয়ার মত অবসর তাঁহার ছিল না। তবে তিনি দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন সংগঠনের সহিত সম্পৃক্ত থাকিয়া যথাযথভাবে উহার দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন, তন্মধ্যে শর্ষিণা জমিয়তে হিযবুল্লাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত তিনি ও ড. মুহাম্মদ আইয়ুব আলীসহ পূর্ব বাংলা উলামায়ে ইসলাম নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, স্বল্পভাষী এবং সদালাপী। অপ্রয়োজনীয় কর্ম, কথাবার্তা ও চলাফিরা পরিহার করিতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীরস্থীর প্রকৃতির। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা ছিল অত্যন্ত প্রখর। শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির তাবলীগ পত্রিকার স্মারক সংখ্যায় তাঁহার সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন একজন নীরব সূফী সাধক। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়া তিনি ইবাদত করিতেন। তিনি নীতিতে অত্যন্ত অটল ছিলেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও মমতা ছিল অপরিসীম।

১৯৫২ ও ১৯৬৮ সালে মোট দুইবার তিনি হজ্জ পালন করেন। লুঙ্গি, লম্বা জামা ও গোলটুপি ছিল তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের পোশাক। জুমু'আ ও ঈদের দিন তিনি পাজামা ও পাগড়ী পরিতেন। তিনি মধ্যম মানের পোশাক পরিধান করিতেন এবং তাহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। তিনি পরিমিত আহার করিতেন। হাটে-বাজারে তাঁহাকে খুব একটা দেখা যাইত না। রাস্তায় দৃষ্টি অবনত রাখিয়া তিনি চলাফেরা করিতেন।

১৯৭৬ সালে শরীফ মুহাম্মদ আবদুল কাদির সাহেবের হাতে শর্ষিণা মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের যাবতীয় দায়িত্বভার সাময়িকভাবে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজ বাড়ীতে চলিয়া যান। ১৯৭৯ সালে ২৮ আগস্ট বুধবার রাত ১টা ২০ মিনিটে তিনি নিজ বাসভবনে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ নাতী-নাতনী ও অনেক গুণগ্রাহী রাখিয়া যান। তাঁহার পুত্র ও জামাতাগণ সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ জনাব তাজাম্মুল হোসাইন খান সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মাওলানা নূরুল আমীন কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ও তাহার প্রবন্ধঃ শর্ষিণা মাদ্রাসার প্রথম প্রিন্সিপাল মাওলানা তাজাম্মুল হোসাইন খান (অপ্রকাশিত)। যাহাদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহারা হইলেন ঃ মাওলানা এ,কে,এম মোসলেম উদ্দীন, মাওলানা আবদুল হালিম, মাওলানা আবদুল হামীদ আল-মাদানী, মাওলানা মোহাম্মদ মুস্তফা ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল বারী।

মোঃ আবদুর রব মিয়া

তাজীক (تاجيك) ঃ প্রাচীন রূপ 'তাযীক' অথবা তআযীক [TAZIK] (মাহমূদ কাশগারী, ১খ, পৃ. ৩২৪ঃ তেযিক [TEZIK] একটি জনগোষ্ঠীর নাম, মূলত 'আরব' অর্থে ব্যবহৃত হইত (পরবর্তী কালে এই অর্থ তাযীরূপে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে), পরবর্তী কালে 'তুর্কী-র বিপরীতে 'ইরানী' অর্থে ব্যবহৃত। শব্দটি আরব গোত্র-নাম তায়্য হইতে উৎপন্ন। ইরানীদের নিকটতম আরব গোত্র ছিল তায়্য। ফলে এই গোত্রের নাম সমগ্র আরব জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে থাকে। তায়্য গোষ্ঠীর নাম খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের প্রারম্ভে একজন এডেসাবাসী সমগ্র বেদুঈনদের প্রতিনিধি সারাসেনদের সংগে একত্রে উল্লেখ করেন (Cureton, Spicil. Syr., p. 16 ult. in Noldeke, Z. D. G., Ixix., 713)। 'আরব' অর্থবোধক পাহলাবী প্রতিশব্দ হইতেছে তাচীক, আরমেনীয় ভাষায় তাচিক (তু. Grundr. d. Iran. Phil. i., 2, 187), চীনা ভাষায় 'তাশি'। মুসলিম বিজয়িগণ সম্ভবত ঐ একই নামে মধ্য এশিয়ার ইরানী জনগণের কাছে পরিচিত ছিল; যেমন তৎকালীন প্রচলিত মতে একজন ইসলামে দীক্ষিত ইরানী একজন আরব হইয়া যাইত (তু. তাবারী, ২খ, ১৫০৮)। শব্দটি তুর্কীদের নিকট "মুসলিম, ইসলাম-ভূমির একজন লোক" এই অর্থে পৌঁছে; যেমন তুর্কীদের নিকট পরিচিত মুসলিমদের অধিকাংশ ছিল ইরানী, সেই কারণে 'তাজিক' শব্দটি তুর্কী ভাষায় ইরানী অর্থেই আসিয়াছে। মাহমূদ কাশগারী (পূ. গ্র.) 'তাজিক' শব্দটি 'ফারসী' হিসাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সমকালীন কুতাদগু বিলিক (বিশেষত ৮২)-এ 'তাজিক' গোষ্ঠীকে পারস্যবাসী হিসাবে আরবদের হইতে পৃথক করা হইয়াছে (তু. Radloff, Versuc heines Worterbuches der Turk-Dialecte, iii, 1096)। ইরানীগণ এমনকি নিজেরাই তাহাদের তুর্কী শাসকদের বিপরীতে নিজদিগকে 'তাযীক' আখ্যায়িত করিয়াছে (তু. বায়হাকী, সম্পা. Morley, পৃ. ৭৪৬)। তুর্কী ও তাজীক-এর মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপারে প্রায়শ জোর দেওয়া হয়। ইহা জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, একজন তুর্কী ও একজন তাজীকের মধ্যকার সম্পর্ক সর্বদা খারাপ রহিয়াছে এবং একজন তাজীক একজন তুর্কীর উপর কখনও আস্থা স্থাপন করিতে পারে না (জাহীরুদ-দীন মারআশী, সম্পা. Dorn, পৃ. ২৪৮ এবং ২৫৩)। 'সারত' ও তাজীক শব্দ দুইটির ব্যবহারে ব্যবসায়ী জাতি হিসাবে ইরানীদের গুরুত্ব স্পষ্টত প্রতীয়মান। 'সারত' শব্দটি তুর্কী ভাষায় প্রথমত একটি বিশেষ্য হিসাবে দেখা যায়, অর্থ "ব্যবসায়ী", পরবর্তী কালে ইরানীদের জাতিগত নামে পর্যবসিত হয়, যাহারা মূলত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হইতেন; পাল্টাভাবে তাজীক নাম পরে অন্ততপক্ষে ভো তীরবর্তী তাহাদের মাঝে 'ব্যবসায়ী' অর্থে ব্যবহৃত হইত। রুমদের দ্বারা ১৫৫২ খৃ. কাযান বিজয় সংক্রান্ত অন্যতম একটি মূল সূত্র অনুসারে (Prince Kurbskiy-এর বিবরণ) কাযানের দুর্গ তাযিকদের পরিখা ('ditch of the Tezik' [teziokiy বা "teshickiy" rov]) দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং তাযিক শব্দটি 'ব্যবসায়ী' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে (তু. Karamzin, Ist. gos....., Ross., viii, 110; p. Zarinskiy, Ocerk. drevney Kazani, 1877, p. 8)।

বর্তমানে কখনও কখনও তাজীক নামটি মূল পারসিকদের পরিবর্তে পূর্ব ইরানীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। আম্ভাবাদ (দ্র.) ও য়াযদ-এর মধ্যবর্তী সরু ভূখণ্ড তাজীক বসবাসের পশ্চিম সীমা বলিয়া ধারণা করা হয়। তুর্কিস্তানে তাজীকগণকে, বিশেষত উজবেক শাসনাধীনে ক্রমান্বয়ে সমতলভূমি হইতে পার্বত্য এলাকায় তাড়াইয়া দেওয়া হয়। রুশগণ 'তাজীক' নামে তুর্কিস্তানের সকল ইরানী লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে যাহারা আসল তাজীক অর্থাৎ সেই সমস্ত লোক যাহারা তাজীকী ভাষা বলে এবং পাঞ্জ-এর উচ্চভূমির (তু. আমু দরিয়া) ও উচ্চ যারাফশান-এর অধিবাসীবৃন্দ যাহারা একটি বিশেষ ভাষার অধিকারী। এই নামের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৯২৪ খৃ. স্বায়ত্তশাসিত তাজিকিস্তান প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার রাজধানী দুশানব (কাফির নিহান-এর উজানে)। সেই বৎসরের গণনা অনুযায়ী তাজীকদের সংখ্যা ছিল ৮,৭১, ৫৩২। লোকেরা নিজেরাই বিভিন্নভাবে তাজীক ব্যবহার করে। শুগনান ও রোশান জিলার ন্যায় অনেকগুলি পার্বত্য জিলার অধিবাসিগণ নিজদিগকে তাজীক বলে, অপরপক্ষে তাহারা তাহাদের তাজীকভাষী দারওয়ায-এর প্রতিবেশীদের "ফারসীভাষী" বলিয়া বর্ণনা করে (ফারসী গূয়)। ইহার বিপরীতে উচ্চ যারাফশানের লোকেরা যাহারা একটি ফারসী উপভাষা বলে, নিজেদের জন্য তাজীক নাম ব্যবহার করে এবং য়াগনুব নদী তীরবাসী লোকদের বলে "গালচা' যাহারা এক অদ্ভূত আঞ্চলিক ভাষা বলে। শেষোক্ত লোকেরা তাহাদের য়াগনুবী ভাষাকে তাজীক ভাষা হইতে পৃথক করে বলিয়াও মনে হয়।

মস্তক আচ্ছাদনী তাজ হইতে জাতিগত তাজীক-এর প্রাচীন উৎপত্তি (Grundr ii. 402-এ এখনও বিদ্যমান) ভাষাগত ও ঐতিহাসিক ভিত্তিতে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) N. de Khanikof, Memoire sur l'ethnographie de la Perse, Paris 1866 (Recueil de voyages et dememoires, viii); (২) A. Shishov, Tadziki Etnograficeskoyei antropologiceskoy izsliedovaniye, Tashkent 1911 (Srednyaya Aziya, God ii); (৩) W. Barthold, Tadziki. Istoriceskiy Ocerk (Tadzikistan, Tashkent 1925, p. 93-112); (৪) M. Andreyev, Po ethnografii tadzikov, Niekotoriye svedeniya (ঐ, পৃ. ১৫১-৭৮)।

W. Barthold (E. I. [1])/মোঃ রেজাউল করিম

তাজীকী (تاجیکی)) ঃ তাজীক (দ্র.) জাতির ভাষা। সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে তাজীকী ভাষার স্থান আধুনিক ফার্সী ভাষা হইতে কিছুটা দূরত্বে মনে হয়, " সেই দূরত্ব কম বা বেশি হইতে পারে বক্তা বা লেখকের শিক্ষার পরিমাপে"। এই ধরনের তাজীকী ভাষা যাহা ফার্সী বিদ্বজ্জনের সুরুচি প্রয়াসী ছিল 'আঞ্চলিক ভাষার রং অস্বীকার করা যায় না, বুখারা (দ্র.)-র উজবেকদের শাসনামলে সরকারী ও ব্যবসায়িক ভাষা ছিল এবং ১৯২০ খৃ. বিপ্লবের পর পর্যন্ত অনুরূপভাবে টিকিয়া থাকে; ১৯২৪ খৃ. হইতে এই খৃ. সালে প্রতিষ্ঠিত নূতন স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র তাজীকিস্তান এলাকায় ভাষাটি সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। গত কয়েক শতাব্দীতে কথ্য ভাষা হিসাবে তাজীকী ইহার প্রভাব বলয়ের একটি অংশ তুর্কী ভাষার প্রাবল্যে হারাইয়া ফেলে, অন্য পক্ষে পার্বত্য এলাকায় তাজীকী ভাষা অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার (যেমন য়াগনুবী) বিলোপে নিজ সীমানা সম্প্রসারিত করিয়াছে। ভাষাগত অবস্থান এবং তাজীকী ভাষার বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়াদির জন্য দ্র. Grundr. d. ir. Phil., i/ii, 407 প. এবং এই সংক্রান্ত মন্তব্য ঃ A. Freiman, in M. Andreyev Tadzikistan, তাশখন্দ ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১৬২।

W. Barthold (E. I. [1])/মোঃ রেজাউল করিম

তাজুদ-দাওলা (দ্র. তুতুশ)

তাজুদ-দীন (দ্র. আস-সুবকী)

তাজুদ-দীন আরস্‌লান খান সান্‌জার-ই চিশ্‌তী (تاج الدین ارسلان خان سنجر چشتی) ঃ লক্ষ্ণৌতির শাসক (৬৫৭/১২৫৯-৬৬৩/ ১২৬৫)। তিনি খাওয়ারিয্‌ম (খিভা)-এর জনৈক আমীরের পুত্র ছিলেন। অল্প বয়সে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়া ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রীত হন এবং বেশ কয়েকবার বিক্রয় হওয়ার পর শেষে সুলতান শামসুদ-দীন ইলতুৎমিশের হাতে আসিয়া পড়েন। শীঘ্রই তিনি স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভাবলে তাঁহার রাজদরবারে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হন। ইলতুৎমিশের অধীনে তিনি জামাহদার পদে নিয়োজিত হন। তিনি সুলতান শিহাবুদ-দীন গূরীর ক্রীতদাস বায়ানার মালিক বাহাউদ-দীন তুগরিলের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ তাঁহার মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই সিরাজের মতে তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা, যোগ্য ও অটল সাহসের অধিকারী ও যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহের ন্যায় (History of Bengal, সম্পা. J. N. Sarker, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২ খৃ., ২খ., ৫৫৪ দ্র.)। মালিক মাসউদ জানীর মত তাজুদদীন আরস্‌লান খান কয়েকবার বিদ্রোহ করেন এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া কড়া, কনৌজ, অযোধ্যা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন। পরে তিনি দিল্লীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করায় উলূগ খান বাল্‌বান তাঁহাকে ৬৫৭/ ১২৫৯ সালের প্রারম্ভে কড়া প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু কড়া প্রদেশের শাসনভার লইয়া তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি আরও বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের শাসন লাভের চেষ্টায় ছিলেন। লাখনৌতির দিকে সর্বদাই তাহার লোলুপ দৃষ্টি ছিল এবং তিনি লখনৌতির খবরাখবর রাখিতেন। এই সময় লাখনৌতির শাসক ছিলেন মালিক ইয়্যুদ-দীন বালবান-ই য়ুযবাকী। তিনি লাখনৌতি অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করিতে গেলে তাজুদ-দীন আরস্‌লান খান মারব ও কালিঞ্জর আক্রমণ করিবার ছুতায় লাখনৌতি আক্রমণ করেন। লাখনৌতির অধিবাসীরা তিন দিন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করে। আরস্‌লান খান নগর অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করেন। তাহার আক্রমণের খবর পাইয়া ইয়্যুদ-দীন বাল্‌বান ক্ষিপ্রগতিতে লাখনৌতি ফিরিয়া আসেন। তিনি আরস্‌লান খানের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

আরস্‌লান খান লাখনৌতির শাসক হওয়ার পর তিনি প্রশাসনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করেন। ৬৫৭/১২৫৯ সালে তিনি দিল্লীর সুলতান নাসিরুদ-দীনকে দুইটি হাতী ও অনেক মণিমুক্তা প্রেরণ করেন (আকবর উদ্দীন কর্তৃক রিয়াদুস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ. ৫৭৬)। আরস্‌লান খানের রাজত্বকাল সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিহারের বারদারী মহল্লাস্থ শাহ ফাদলুল্লাহ্‌র দরগাহে প্রাপ্ত ৬৬৩/১২৬৫ সালের উৎকীর্ণ একটি শিলালিপির সাহায্যে পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, তাজুদ-দীন আরস্‌লান খান বিহার ও বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন এবং ১৮ জুমাদা-১, ৬৬৩/৮ মার্চ, ১২৬৫ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তাতার খান বিহার ও লাখনৌতির শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদুস-সালাতীন-এর বাংলা অনু. বাংলার ইতিহাস, আকবর উদ্দীন অনূদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মে ১৯৭৪, পৃ. ৫৭; (২) The History of Bengal, সম্পা. Sir J. N. Sarker, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২ খৃ., ২খ, ৫৫-৫৭; (৩) মুহাম্মদ মোহর আলী, History of the Muslims of Bengal, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, রিয়াদ ১৪০৬/১৯৮৫, ২খ., ৯৮-৯৯; (৪) প্রফেসর আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জানুয়ারী ১৯৮৭, পৃ. ৯৪, ৯৭; (৫) বাংলাদেশের ইতিহাস, সম্পা. শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, ২খ, ১২, ১৩; (৬) অধ্যাপক কে. আলী, বাংলাদেশের ইতিহাস, আলী পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৮৬ খৃ., ১৪৮-১৪৯।

মুহাঃ আবু তাহের

তাজুদ-দীন ইব্‌ন আবদিল্লাহ আদ-দামীরী (تاج الدین بن عبد الله الدمیری)ঃ ৮ম/১৪শ শতাব্দীর মিসরের একজন প্রখ্যাত আলিম, শিক্ষাবিদ ও গ্রন্থকার। তাঁহার প্রকৃত নাম বাহরাম; কিন্তু তাজুদ-দীন উপাধিতেই তিনি পরিচিত। ৭২৪/১৩২৩ সালে মিসরের দামীরা নামক এলাকায় জন্ম। তিনি কায়রো শহরে লালিত-পালিত হন এবং বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার প্রখ্যাত শিক্ষকদের মধ্যে শায়খ খালীল ও শায়খ আশ-শারাফ আর-রাহূনী উল্লেখযোগ্য। তিনি মালিকী মাযহাবের একজন নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞ আলিম হিসাবে সম্মানিত হইতেন। হাদীছ, ফিক্‌হ, উসূল ও আরবী ভাষাতত্ত্বের একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ছিলেন। তিনি মিসরের কাদী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আশ- শায়খূনিয়্যা মাদরাসায় অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার প্রখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রহিয়াছেন শায়খ আল-আফকাহী, শায়খ আবদুর-রাহমান আল-বাকরী ও শায়খ আশ-শামস আল-বাসতী।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকখানা বহুল প্রচলিত ঃ (১) আদ-দামীরীর শিক্ষক শায়খ খালীল রচিত "আল-মুখতাসার" গ্রন্থের তিনটি শারহ কাবীর, মুতাওয়াস্‌সাত ও সাগীর, তন্মধ্যে শেষোক্ত দুইটি বহুল প্রচলিত, (২) ইব্‌ন মালিক-এর আল-আলফিয়্যা গ্রন্থের শারহ, (৩)

শারহুল-ইরশাদ, ৬ খণ্ডে, (৪) ইবনুল-হাজিব-এর মুখতাসার গ্রন্থের শারহ, (৫) স্বরচিত তিন হাজার কবিতার সংকলনঃ আদ-দুররাতুছ-ছামীনা, (৬) আশ-শামিল ফিল-ফিক্‌হ। শায়খ আদ-দামীরী ৮০৫/১৪০২ সালে কায়রোতে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন ইমাদ হাম্বালী, শাযারাতুয-যাহাব, মিসর, পৃ. ২৩৯; (২) আশ-শাজারাতুয-যাকিয়্যা, পৃ. ১০১; (৩) আহমাদ বাবা আত-তিম্বাকিতী, নায়লুল-ইবতিহাজ, নির্ঘণ্ট; (৪) আল-মুনজিদ ফিল-'আলাম, লেবানন ১৯৮২ খৃ., পৃ. ২৮৮।

ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

তাজুদ-দীন ইব্‌ন যাকারিয়া (تاج الدين بن زكريا) ঃ ইব্‌ন সুলতান আল-উছমানী (আল-কুরাশী) আল-আবশামী আন-নাকশবান্‌দী আল- হানাফী আল-সাম্ভালী মুহাজিরে মক্কী। তিনি সাম্ভাল শহরে (জিলা মুরাদাবাদ, এলাকা রোহীলখণ্ড) জন্মগ্রহণ করেন। সেইখানেই তিনি লালিত-পালিত হন, তথায় শিক্ষালাভ করেন, পরবর্তীতে তারীকাতের শায়খের অন্বেষণে বহু শহর, যথাঃ আজমীর [খাজা (র)-এর মাযারে এবং নাগোরে (শায়খ হামীদুদ-দীন নাগোরীর (র) মাযারে; আস-সূফী, আস-সুয়ালী মৃ. ৬৭৩ হি.)] এবং অন্যান্য স্থানে গমন করেন। দীর্ঘকাল যাবত তথায় যিকির তিনি মশগুল থাকেন, তৎপর কামিল শায়খের সন্ধানে বাহির হইয়া যান। অবশেষে শায়খ আল্লাহ বাখ্‌শ শাত্তারী গূড মুক্‌তীসিরী (র)-এর খিদমতে হাযির হন।

জনাব শায়খের এই নিয়ম ছিল যে, তারীকাত শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তিনি খিদমত ও কঠিন শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইতেন এবং এমন খিদমত গ্রহণ করিতেন যাহা দ্বারা আত্মার নমনীয়তা ও পবিত্রতা লাভ হইয়া যায়। এইরূপে শায়খ তাজুদ-দীনকে রান্নাঘরের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ এবং পানি ভর্তি করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিন মাস পর গুড্ডা মুকতীসিরী (র) তাঁহাকে ইশ্‌কিয়্যাহ তারীকাহ্ (শাত্তারীয়াহ)-এর শিক্ষাদান করেন। তিনি মুর্শিদের কাছে থাকিয়া এই তারীকার কাজে ব্যস্ত থাকেন। অবশেষে পূর্ণতার স্তর পর্যন্ত উপনীত হন এবং মুর্শিদ তাঁহাকে ইশ্‌কিয়্যাহ, কাদিরীয়্যাহ, চিশ্‌তীয়্যাহ ও মুদারীয়্যাহ্ তারীকার অনুমতি প্রদান করেন। তাজুদ-দীন দশ বৎসর পর্যন্ত শায়খ আল্লাহ বাখ্‌শ (র)-এর পবিত্র খিদমতে অবস্থান করেন। [এইভাবে শায়খ নাজমুদ-দীন কুবরা (র)-এর রূহানীয়াতের মাধ্যমে তিনি কুবরাবীয়াহ তারীকার অনুমতি লাভ করেন। (নুযহাত, ইদারা]।

দিল্লীর খাজা মুহাম্মাদ বাকী (র) সুলুকের প্রাথমিক স্তরে সর্বপ্রথম যখন ভারতে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত শায়খ তাজুদ-দীন (র)-র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যখন খাজা সাহেব দ্বিতীয়বার লাহোর আগমন করেন তখন শায়খ আল্লাহ্ বাখ্‌শ গুড্ডা মুকতীসিরী (র)-এর ইনতিকাল হয়। খাজা সাহেব শায়খ তাজুদ-দীনকে আহ্বান করিয়া তিন দিনের মধ্যে নকশাবন্দীয়াহ পদ্ধতির সকল স্তর অতিক্রম করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজের পক্ষ হইতে মুরীদ করার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি দশ বৎসর পর্যন্ত খাজা সাহেবের সংস্পর্শে থাকেন।

১০১২ হি. সালে খাজা সাহেবের মৃত্যুর পর জনাব শায়খ ভারতের বিভিন্ন শহর, ইরাক ও আরব দেশসমূহ ভ্রমণ করেন। অবশেষে পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থান গ্রহণ করেন।

ইবন ফাদ্‌লুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-মুহিব্বী খুলাসাতুল-আছার (خلاصة الاثر), কায়রো ১২৮৪ হি. (১খ, ৪৬৪)-এর মধ্যে তৎকৃত অনুবাদে এই সময়ের কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার মুরীদানের মধ্যে এইখানে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হইল ঃ (১) উস্তাদ আহমাদ আবুল-ওয়াফা, (২) শায়খ মুহাম্মাদ মিরযা ইবন মুহাম্মাদ আল-মা'রূফ আস-সারূজী আদ-দিমাশকী, (৩) আমীর য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আলী পাশা, (৪) শায়খ আবদুল-বাকী ইব্‌ন আয-যুজাজী আয-যুবায়দী, (৫) শায়খ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শায়খ আবদুর-রাহমান আল-হাদ্‌রামী আল-আয়দারূসী, (৬) শায়খ মুহাম্মাদ আল্লান, (৭) শায়খ ইবরাহীম ইব্‌ন হাসান আল-হানাফী আল-আহ্‌সাঈ, (৮) শায়খ আবূ বাক্‌র ইব্‌ন সাঈদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-হাদ্‌রামী, (৯) শায়খ 'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বাকী আদ-দিহলাবী (খাজা খুরদ্ নামে পরিচিত), (১০) সায়্যিদ মাহমূদ ইব্‌ন আশরাফ আল-হুসায়নী আল-আম্‌রূহী (তাঁহার শাগরিদ ও জামাতা), যিনি তাঁহার জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মুহিব্বী তারীকাতের ভিত্তিতে জনাব শায়খ-এর রচনাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ (১) নাফ্‌হাতুল-উন্‌স (نفحات الانس), জামীর আরবী অনুবাদ [দ্র. কাশফুজ্-জুনূন (كشف الظنون), প্রথম সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ২খ, ৬০৯, গ্রন্থের কপির জন্য ব্রোকেলম্যান-এর পরিশিষ্ট দ্র., ২খ, ২৮৬, রামপুরের পুস্তকাগারেও এক খণ্ড বিদ্যমান আছে; ইদারাঃ], (২) আলী ইব্‌ন হুসায়ন আল-ওয়ায়েজ আল-কাশিফীর তা'রীফু রাশাহাত আয়নিল-হায়াত (تعريف رشحات عين الحياة) (রাশাহাতের আরবী অনুবাদ), (৩) রিসালা-ই তারীকাতে নাক্‌শবান্‌দীয়্যাহ্ (رسالة طريقة نقشبنديه), ইহাতে হযরত খাজা আবদুল-খালিক গুজ্‌দুওয়ানীর প্রসিদ্ধ বাণীসমূহের উত্তম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, (৪) আস্-সিরাতুল-মুস্‌তাকীম, (৫) আন্-নাফ্‌হাতুল-ইলাহিয়্যা ফী মাওইজাতিন-নাফ্‌সিয্-যাকিয়্যা, (৬) জামিউল-ফাওয়াইদ, (৭) আরও একটি পুস্তিকা যাহাতে বিভিন্ন প্রকারের খাবার রান্নার পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, (৮) আরও একটি পুস্তিকা যাহাতে বৃক্ষ রোপণের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, (৯) বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ সম্বলিত পুস্তিকা, [(১০) রিসালাতু ফী বায়ানি সুলূকিন-কুব্‌রাবীয়্যা (মুহিব্বী, ১খ, ৪৬৯, নুযহা, ৫খ, ৯৯); পরিশিষ্ট, ব্রোকেলম্যান, ২খ, ৬১৮-এ "রিসালাতু ফী সুলুকি খাস্‌সাতিস্-সাদাত" নামক পুস্তিকা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উল্লিখিত পুস্তিকাসমূহের মধ্যে সম্ভবত কোন একটি হইতে পারে, ইদারা], (১১) আদাবুল-মুরীদীন, ব্রোকেলম্যান-এর পরিশিষ্ট, পৃ. স্থা., ইদারা।

শায়খ তাজুদ-দীন সাম্ভালী (র) তাঁহার সময়ে হারাম শারীফের শায়খ ছিলেন। হিজাযের অধিকাংশ মানুষ তাঁহার সংস্পর্শে থাকিয়া নাকশবান্‌দীয়্যা তারীকা দ্বারা উপকৃত হন। তিনি উচ্চ মানের লেখক ছিলেন। তিনি ১০৫০ হি. ১৮ জুমাদাল-উলা বুধবার মাগরিবের কিছু পূর্বে ইনতিকাল করেন, [খুলাসাতুল-আছার, ১খ, ৪৭০, ইদারা] এবং মক্কা মুআজ্‌জামার হারামে তিনি যে সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইখানে ১৯ জুমাদাল-উলা, বৃহস্পতিবার তাঁহাকে দাফন করা হয়। কিন্তু শায়খের (এলাকাবাসী "আস্‌রারীয়ার" লেখক মৃত্যুর সন ১০৫১

হি. উল্লেখ করিয়ছেন। তাঁহার কবর কুআয়কিআন পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত। শাহ্ ওয়ালিয়ুল্লাহ (র) তাঁহার কবর যিয়ারত করিয়াছেন (মাকতূবাতসহ মানাকিবু বুখারী, ফাদীলাতু ইব্ন তায়মিয়া, মাতবা' আহমাদী, দিল্লী, পৃ. ৩০)।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহ্লাবী (র) কতিপয় মাক্তূবাত-এ তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। একটিতে লিখিয়াছেন যে, শায়খ তাজুদ-দীন সাম্ভালী (র) খাজা মুহাম্মদা বাকী (র)-র প্রথম খলীফা ছিলেন। অবশেষে (আপন মুর্শিদের মৃত্যুর পর) পবিত্র মক্কা নগরীর বাসিন্দা হইয়াছিলেন এবং তথাকার মাটিতে শায়িত হন। আমি মক্কাবাসীর কাহাকেও ভারতের পরবর্তী দরবেশগণের প্রতি ততোধিক শ্রদ্ধাশীল পাই নাই, যেই পরিমাণ তাঁহার শায়খ তাজুদ-দীন (র)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মক্কাবাসী তাঁহার বহু কারামাত বর্ণনা করিয়া থাকেন। (শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) ও শায়খ মুহাম্মাদ ইকরাম অনূদিত মাকতূব রূদ-ই কাওছার-এর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃতি, করাচী সংস্করণ, তা. বি., পৃ. ১৪৫)।

অন্য একটি মাক্তূব-এ উল্লেখ আছে, শায়খ তাজুদ-দীন সাম্ভাল-এর অধিবাসী এবং উছমানী বংশের লোক ছিলেন। শায়খ আহ্মাদ সারহিন্দী (র)-এর পীরভাই খাজা মুহাম্মাদ বাকী দিহ্লাবী (র)-এর অন্যতম খলীফা ছিলেন। "আয্কারে নাক্শবান্দীয়্যা" যাহা শায়খ (র) লিখিয়াছেন, আমি আমার পিতা (হযরত শাহ আবদুর-রাহীম ফারূকী দিহ্লাবী (র)-র নিকট হইতে পড়িয়াছি, তিনি খাজা খুরদ্ (র)-এর নিকট হইতে এবং খাজা খুরদ্ (র) এই সমস্ত সরাসরি শায়খ তাজুদ-দীন (র)-এর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। রূমের বাদশাহ তাঁহার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করিতেন [মানাকিবু বুখারীসহ মাক্তূবাত, পূ. স্থা.]।

আল-ইন্তিবাহ্ ফী সালাসিলি আওলিয়াউল্লাহ্ (আহ্মাদী, দিল্লী ১৩১১ হি., পৃ. ৩৪)-এর মধ্যেও শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ দিহ্লাবী (র) তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন এবং নিজের একটি পূর্ণ পুস্তিকায় [যাহা তাসাওউফ সম্পর্কিত এবং যাহা শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) আপন পিতার নিকট এক এক পৃষ্ঠা করিয়া পড়িয়াছেন] অবিকল বর্ণনা করিয়াছেন।

মুজাদ্দিদ আল্ফ ছানী (র)-এর পত্রাবলীর মধ্যে শায়খ তাজুদ-দীনের নামেও একটি মাকতূব রহিয়াছে (মাক্তূবাতু ইমাম রাব্বানী, ১খ. ৩৫৬, মাতবা' আহমাদী, দিল্লী)।

আল্লামা সায়্যিদ মুরতাদা আল-বিল্গিরামী ও আয-যুবায়দী কামূস-এর ব্যাখ্যাকারী আন-নাফহাতুল-কুদ্দুসীয়্যাতে শায়খ তাজুদ-দীন সাম্ভালীর বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি বসরা, য়ামান, আহ্সা, নাজ্দ ও হিজায-এ নাক্শবান্দীয়্যা তারীকার বিস্তৃতি ঘটাইয়াছিলেন এবং এই সকল এলাকাতে তাঁহার বহু শাগরিদ ছিলেন (রূদ-ই কাওছার, করাচী, পৃ. ১৪৫)।

মাওলানা কিশ্মী (র) তাঁহার সারিহ্ নামক এক বন্ধুর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ১০৩৭ হি. হজ্জের সময় আরাফাতের মাঠে শায়খ তাজুদ-দীন (র)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে ইহরাম অত্যন্ত ময়লা ছিল, চেহারা ধূলিতে আচ্ছন্ন ছিল, চুল এলোমেলো দেখা যাইতেছিল, দাড়ি ছিল সাদা, ভ্রমণের কষ্টে বরং আধ্যাত্মিক মিলনের মত্ততার জন্য চেহারা লাল হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলাম (খাজা মুহাম্মাদ হাশিম কিশ্মী, আল-মাকামাত, পৃ. ৭৭, মাহ্মূদ প্রেসে মুদ্রিত, লাক্ষ্ণৌ)।

এক বর্ণনা অনুযায়ী বাদশাহ শাহজাহান শায়খ তাজুদ-দীন (র)-কে লিখিয়াছিলেন পবিত্র মক্কা নগরী হইতে আসিয়া সাক্ষাত দ্বারা সম্মানিত করার কথা। শায়খ উত্তরে লিখিয়াছিলেন, বাদশাহদের নিয়ম এই, তাঁহারা তাঁহাদের পক্ষ হইতে আল্লাহ্র পবিত্র গৃহে একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া থাকেন। আপনার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে এইখানে আমি অবস্থান করিব।

তাঁহার পুত্রের নাম মুহাম্মাদ হারিছ, যিনি পিতার পাঁচদিন পূর্বে ১০৫১ হি. পবিত্র মক্কা নগরীতে ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম মুহাম্মাদ মু'আয; তিনি ১০৬০ হি. সালে ভারতে আগমন করেন এবং শাহ্জাহানের কাছে মক্কার পবিত্র বস্তু প্রদান করেন। বাদশাহ অত্যন্ত আনন্দিত হন (আস্রারিয়্যা, পৃ. ২১৪ খ ও ২১৫ ক, প্রবন্ধ চিহ্ন রামপুর)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে বর্ণিত পুস্তকাদি ব্যতীত (১) সায়্যিদ মাহমূদ ইব্ন আশরাফ আল-হাসানী আল-আমরূহী, তুহ্ফাতুস-সালিকীন ফী যিক্রি তাজিল-আরিফীন (تحفة السالكين فى ذكر تاج العارفين) (একমাত্র শায়খের অনুবাদ যাহা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য); (২) হাকীম আবদুল-হায়্যি, নুয্হাতুল-খাওয়াতির (نزهة الخواطر), হোয়দরাবাদে মুদ্রিত, দাক্ষিণাত্য, ৫খ, (১৩৭৫ হি.), ৯৯; (৩) ব্রোকেলম্যান; G. A. L., ২খ, ৫৫২ ব্রোকেলম্যান-এর পরিশিষ্ট ২খ, ৬১৮ এবং ২৮৬; (৪) স্টৌরী, পৃ. ৯৫৬ ও ৯৬৫; (৫) সায়্যিদ মুহাম্মাদ কামাল ইব্ন সায়্যিদ মুহাম্মাদ লাল সাম্ভালী, আস্রারিয়্যা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রামপুর পুস্তকাগারে আছে। মুদ্রিত তালিকাতে বর্ণিত হয় নাই। ইহাতে মুদ্রিত সন ১০৬৮ এবং ১০৬৯ হি. উল্লেখ আছে; কিন্তু ইহাতে ১০৭৪ হি. পর্যন্ত ঘটনাবলী রহিয়াছে। উদ্ধৃতিসমূহ যাহা সম্ভবত আস্রারিয়্যা-এর এই পুস্তক হইতে লওয়া হইয়াছে, নিবন্ধকারের নিকট আছে যাহাতে আমরূহীর বুযুর্গদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ইদারা]।

নাসীম আহমাদ ফারীদী আমরূহী (E. I. [1])/মোঃ রইস উদ্দিন

তাজুদ-দীন কুরায়শী (تاج الدين قريشى) ঃ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারক আওলিয়ার অন্যতম। তদীয় মুরশিদ শাহ্ জালাল (র)-এর বিখ্যাত সাথী, উভয়েই ছিলেন কুরায়শ গোত্রীয়। তাজুদ-দীন কুরায়শী আবূ বাক্র সিদ্দীক (র)-এর বংশধর। পারিবারিক ঐতিহ্যগত ধর্মীয় জ্ঞানে এবং অধ্যাত্ম সাধনায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় ৬৫৬/১২৫৮ সালে শাহ্ জালাল (র) বাগদাদে ছিলেন। অতঃপর শাহ জালাল (র), তাজুদ-দীন প্রমুখ হজ্জের সফরে মক্কায় ছিলেন। কথিত হয়, শাহ জালাল (র) স্বপ্নে এই প্রত্যাদেশ পাইলেনঃ আল্লাহ্র ইচ্ছা, তুমি ভারতের পূর্ব প্রান্তে ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন করিবে এবং চিরস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করিবে। স্বপ্নের কথা তাঁহার মুর্শিদ বা মামাকে জানাইলে তিনি শাহ্ জালাল (র)-কে তাওহীদ প্রচারের লক্ষ্যে অবিলম্বে হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রার নির্দেশ দেন। হি. ৬৫৮ সালের কিছুকাল পরে তাজুদ-দীন কুরায়শী এবং কয়েকজন ওয়ালী শাহ জালাল (র)-এর নেতৃত্বে তাঁহার সফরসঙ্গী হন।

তাসাওউফ ও আত্মীয়তা উভয় সূত্রে তাঁহারা পরস্পর সম্পর্কিত ছিলেন। এই আওলিয়া দলটি য়ামান, বাগদাদ, শীরায, আফগানিস্তান, মুলতান ও বাদায়ূন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া শায়খ ফারীদুদ-দীন গাঞ্জশাক্‌র (র)-এর জীবদ্দশায় হি. ৬৬৪ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশে উপনীত হন। ৬০১/১২০৪ সালে বাখ্‌তিয়ার খাল্‌জী অত্যাচারী সেন রাজত্বের উৎখাত করিয়া মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। জনগণ তখনও কুফ্‌রীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। শাহ্ জালাল (র) ও তাঁহার সঙ্গিহণ পাণ্ডুয়া ও দেওতলাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমে পশ্চিমবঙ্গে ও পরে উত্তরবঙ্গে ২০ বৎসরেরও অধিক কাল প্রচার কার্য চালাইয়া যান। তৎপর তাঁহারা তৎকালীন বাংলার অন্যতম রাজধানী (Subsidiary Capital) সোনারগাঁও আসেন এবং ৭০৩/১৩০৩ সালে সিলেট বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তথায় প্রচার চালাইতে থাকেন। সুলতান ফীরুয শাহ্ (১৩০১-১৩২২ খৃ.)-এর আমলে সিকান্দার খান গাজী কর্তৃক ৭০৩/১৩০৩ সালে সিলেট বিজয়ের প্রমাণ হি. ৯১৮ সালের একটি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। শাহ্ তাজুদ-দীন এই সময় শাহ্ জালাল (র)-এর সঙ্গে সিলেটে আগমন করেন [দ্র. শাহ জালাল (র)] এবং তাঁহার নেতৃত্বে সঙ্গিসগণসহ সিলেটের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচারিত হয় ইহার পরে–কথিত ২২ আওলিয়া কর্তৃক। তাঁহারাও শাহ্ জালাল (র)-এর সঙ্গী কথিত ৩৬০ আওলিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ৭০৩/১৩০৩ সাল হইতে ব্যাপক প্রচারের ফলে বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে তাজুদ-দীনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে।

শাহ্ জালাল (র)-এর প্রবর্তিত ইসলামী হুকূমাতের সর্বপ্রথম কাদী (Justice of the Peace)-রূপে তাজুদ-দীন প্রসিদ্ধি লাভ করেন বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে কাদী তাজুদ-দীন নামে উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. সুহায়ল-ই য়ামান)। তিনি ইসলামী রাষ্ট্র সিলেটের দীওয়ান অর্থাৎ অর্থ ও রাজস্ব মন্ত্রীর পদও অলংকৃত করেন। এইজন্য তাঁহার নামের সহিত 'দেওয়ান' পদবীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। চৌকি-দীনারপুর প্রভৃতি পরগনার অধিকারী তদীয় বংশধরগণ প্রাচীনকাল হইতে 'দেওয়ান' পদবী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

প্রশাসনিক সুবিধার জন্য হি. ৭০৮ সালে শাহ্ জালাল (র)-এর নির্দেশে সিলেটকে কয়েকটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এই বিভক্তির ফলে সৃষ্ট এই জিলার উত্তর-পূর্ব এলাকাস্থিত চৌকি দীনারপুরের শাসনভার তাজুদ-দীনের উপর ন্যস্ত হয়। দীনারপুর অঞ্চল ছিল নানা ঐতিহাসিক গুরুত্বমণ্ডিত। এই সময়ে দীনারপুরের সীমানা নিম্নরূপে ছিলঃ

উত্তর-পূর্বে মুসলিম শাসিত সিলেট সদর অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমে হিন্দু শাসিত লাউড় রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্বে তৎকালীন ইহা প্রভৃতি সামন্ত রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে মুসলিম শাসিত 'তরফ' অঞ্চল এবং পশ্চিমে বাংলাদেশ। পশ্চিম দিকে সাবেক লাউড়ভুক্ত দীনারপুর অঞ্চলের পরিসীমা ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম দিকপাল শাহ্ জালাল (র)-র বিশিষ্ট খলীফা তাজুদ-দীন হি. ৭০৮ সালের দিকে শাসনকর্তা হিসাবে দীনারপুর আগমন করেন। শাহ্ জালাল (র) তাঁহাকে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিলায়াত বা আধ্যাত্মিক নেতৃত্বও প্রদান করেন। সূফী, প্রশাসক, ধর্মপ্রচারক, মুরশিদ-ই কামিল ও মুজাহিদ হিসাবে তাজুদ-দীন সমগ্র দীনারপুর অঞ্চলকে ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য উত্তর-পুরুষগণও এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী তাহ্‌যীব-তমদ্দুনের ধারা অব্যাহত রাখেন। জীবনের শেষদিকে তাজুদ-দীন (র) দীনারপুরের বর্তমান 'চৌকি' নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং ইনতিকালের পর চৌকিতে সমাহিত হন। তাঁহার মাযার বর্তমান চৌকি পরগনায় ধূলচাতল গ্রামে অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ্ জালাল (র), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., ৩৭০-৮২; (২) শামসুল আলম, হযরত শায়খ জালাল (র), ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., ১৮৩; (৩) এ. এন. এইচ. রিয্‌বী, সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ঢাকা ১৯৭০ খৃ., ৩৯৮; (৪) সৈয়দ মর্তুজা আলী, হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭০ খৃ., ৪৩; (৫) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., ৬৭-৭৪; (৬) সৈয়দ আব্দুল আগফর, তরপের ইতিহাস, ১২৯২ বাংলা, ৩৭; (৭) মুফ্‌তি আজহার উদ্দীন আহমদ, শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, ৮৬; (৮) নাসিরুদ্-দীন হায়দার, সুহায়ল-ই য়ামান (ফার্সী), ১৮৬০ খৃ.; (৯) মতিয়ার রহমান চৌধুরী, নবীগঞ্জের ইতিকথা, সিলেট ১৯৮৫ খৃ. ১৬; (১০) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., ২খ., ৩৭৭; (১১) দ. ন. আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ্ জালাল র), প্রকা. মোসাম্মাৎ কুলসুম আক্তার চৌধুরী ও সৈয়দা তাহেরা বেগম, গ্রাম ও পোঃ সদরঘাট, জিলা সিলেট ১৯৮১ খৃ. ৪৯-৫০; (১২) চৌধুরী মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, পাবনা ১৯৮৬ খৃ., ২২৪; (১৩) মুহম্মদ আখতারুজ্জামান [চৌধুরী], বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অন্যতম পথিকৃৎ হযরত শাহ্ তাজউদ্দীন কোরেশী (র), দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ২৫ আশ্বিন, ৮ এবং ১৫ কার্তিক ১৩৯৩ বাংলা; (১৪) আল ইসলাহ্, সিলেট (ক) শাহ্ জালাল (র) সংখ্যা, ১৩৬৪ বাংলা, ১০৭, (খ) ঐ, ফাল্‌গুন-চৈত্র ১৩৬৮ বাংলা ২৫১, (গ) ঐ, চৈত্র ১৩৭৪ বাংলা, ২৯৬ প্রভৃতি (নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত)।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

তাজুল ইসলাম (تاج الاسلام) ঃ মাওলানা, প্রখ্যাত আলিম, মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির, ফাকীহ ও সমাজসেবক, সদর সাহেব নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলার নাছিরনগর উপজিলাধীন ভুবন গ্রামে ১৩১৫/১৮৯৬ সালে (বঙ্গাব্দ ১৩০৩) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাওলানা আন্‌ওয়ার আলী (র) [ভিন্নমতে আনওয়ারুদ-দীন, নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৩৩৯] সেই যুগের একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। মাওলানা তাজুল ইসলামের মেধাশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রায় আট-নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে নিকটস্থ স্কুলে ভর্তি করাইয়া দেন। মাত্র নয় মাস স্কুলে লেখাপড়া করিয়া তিনি ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীর অংক, ইংরেজী ও ব্যাকরণসহ সমস্ত বই মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন (ফখরে বাঙাল, পৃ. ২)। অতঃপর তিনি কিছু দিন জেটাগ্রামের মাওলানা আবদুল করীম-এর নিকট প্রাথমিক দীনী কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি যথাক্রমে শ্রীঘর মাদ্‌রাসা ও সিলেট বাহুবল মাদ্‌রাসায় কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। বাহুবল মাদ্‌রাসা হইতে যথাসময়ে সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সিলেটের মাদ্‌রাসা আলীয়ায় ভর্তি হন। তখন সিলেট আলীয়া মাদ্‌রাসার

প্রধান অধ্যাপক ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম দারুল-উলূম দেওবান্দের সাবেক মুফতী আল্লামা সাহূল উছমানী ভাগলপুরী (র) [মৃ. ১৯৪৮ খৃ.], যিনি তাঁহাকে দেখামাত্রই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, এই যুবক উত্তরকালে একজন বড় আলিম ও বুযুর্গ হইবে। ১৩৩৭-৩৮ হি. সালে মাদ্‌রাসা আলীয়ার সর্বশেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ১৩৩৮ হি. দারুল-উলূম দেওবান্দে ভর্তি হন এবং তথায় চার বৎসর অধ্যয়ন করেন। দেওবান্দে তিনি বিশদভাবে হাদীছ, তাফসীর, ফিক্‌হ, আকাইদ ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছেন। তথায় তিনি সনদসহ কয়েক হাজার সাহীহ হাদীছ ও বিখ্যাত ফিক্‌হ গ্রন্থ হিদায়া সম্পূর্ণ মুখস্থ করিয়াছিলেন। দেওবান্দে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন তদানীন্তন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম আন্‌ওয়ার শাহ্ কাশমীরী (র) (১৮৭৫/১৯৩৩), আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উছমানী (র), শায়খুল-আদাব ইজায আলী (র), আল্লামা ইব্‌রাহীম বাল্‌য়াবী (র) ও সায়্যিদ আসগার হুসায়ন (র) প্রমুখ মহামনীষী। তাহা ছাড়া শায়খুল-ইসলাম সায়্যিদ হুসায়ন আহ্‌মাদ মাদানী (র)-এর কাছে তিনি ইল্‌মে মা'রিফাত শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁহার খলীফা হন (আজমী, ঐ, পৃ. ৩৩৯)। তদুপরি তিনি কাদী মুআজজাম (র) হইতেও ইজাযত হাসিল করিয়াছিলেন।

মাওলানা তাজুল ইসলাম-এর কর্মজীবন ছিল বিশাল বিস্তৃত। কর্মজীবনে তিনি দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। মাওলানা বলিতেন, চিন্তাভাবনার পর সত্যের পথে আমি যে নীতিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি, কোন প্রতিকূল অবস্থায়ই এই নীতি আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না (ফখরে বাঙাল, পৃ. ১৩)।

জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ব্যয় করিয়াছেন ইসলামী শিক্ষার খিদমতে, বিশেষ করিয়া মিথ্যা নবূওয়াতের দাবিদার মির্যা গুলাম আহ্‌মাদ কাদিয়ানীর মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে। ১৩৪২ হি. দেওবান্দ হইতে দেশে ফিরিয়া তিনি প্রথমে ঢাকায় এবং পরে কুমিল্লাস্থ জামিআ মিল্লিয়া-তে শায়খুল-হাদীছ হিসাবে যোগদান করেন। সেই সময় যুক্ত প্রদেশের প্রখ্যাত আলিম ও বুযুর্গ দারুল-উলূম দেওবান্দের মাজলিসে শূরার সদস্য মাওলানা য়ূনুস ১৩৩৮ হি. সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি দীনী মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৩৪৫ হি. সালে মাওলানা তাজুল ইসলাম উক্ত মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনতিকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২২ বৎসর তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত উক্ত দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। অধ্যাপনার সুদীর্ঘ সময়ে তিনি অসংখ্য প্রতিভাবান আলিম, দীনের মুবাল্লিগ তৈরি করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল ঃ

(১) বযলুর-রহ্‌মান দয়াপুরী (র), ঢাকা ফরিদাবাদ মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল ছিলেন; (২) মুফতী মহিউদ্দীন (র), ঢাকা বড় কাটারা মাদ্‌রাসায় প্রধান মুফতী পদে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করিয়াছেন; (৩) আলী আক্‌বর, বাংলাদেশে তবলীগ জামাআতের অন্যতম মুরব্বী; (৪) হাফিজ হাকীম আযীযুল ইসলাম, ঢাকাস্থ তিব্বিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল; (৫) অধ্যাপক আবদুর রকীব, বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ফখরে বাঙাল, পৃ. ২৩) প্রমুখ। মাওলানা তাজুল ইসলাম দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রাণ জনগণের সহযোগিতায় অনেক উচ্চ শ্রেণীর মাদ্‌রাসা ও শত শত মকতব এবং ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা কায়েম করিয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মাদ্‌রাসা হইল ঃ

মাদ্‌রাসার নাম	স্থান	জিলা
মাদ্‌রাসা আনওয়ারুল-উলূম	ভুবন	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
" তাজুল- উলূম	মালিহাতা	"
" মিফ্‌তাহুল-উলূম	চাঁদপুর	"
" ইসলামিয়া	আলীনর	"
" দারুল-উলূম ইসলামিয়া	হরষপুর	হবিগঞ্জ
ষাইট শালা মাদ্‌রাসা	ষাইট শালা	কুমিল্লা
" জামিআ আরাবিয়া	ওমেদনগর	হবিগঞ্জ
খরকী মাদ্‌রাসা	খরকী	"

(ফখরে বাঙাল, পৃ. ৩৯)

শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পরপরই তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের বিরুদ্ধেও তিনি ব্যাপক আন্দোলন করিয়াছিলেন। অনৈসলামী কার্যকলাপে বাধাদানের ও সর্বস্তরের জনগণকে ইসলামী আহ্‌কাম-আরকানের সাথে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার উদ্দেশে তিনি খৃস্টীয় ১৯৫০ দশকের শুরুর দিকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক একটি অরাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান "হিফাজত-ই ইসলাম" নামে এবং সাবেক বৃহত্তর কুমিল্লা ও সিলেটের কাওমী মাদ্‌রাসাগুলি লইয়া একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বোর্ডটির নাম এদারায়ে তালিমিয়া।

জাম্‌ইয়্যাত-ই উলামা-ই হিন্দের তিনি একজন নিঃস্বার্থ কর্মী ও নেতা ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে তিনি তাঁহার উস্তাদ আল্লামা শাব্বীর আহ্‌মাদ উছমানী (র)-এর অনুরোধে জাম্‌ইয়্যাত-ই উলামা-ই ইসলামে যোগদান করেন ও পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন (ফখরে বাঙাল, পৃ. ৫৫)।

মাওলানা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়া প্রামাণিক দলীল ও অকাট্য যুক্তির সাহায্যে তিনি কাদিয়ানীদেরকে পরাস্ত করিয়াছেন। উপস্থিত বুদ্ধি ও সৎসাহস তাঁহার জীবনের একটি প্রধান গুণ। পাকিস্তানের সামরিক শাসনামলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রিপাবলিক স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত এক ইসলামী সম্মেলনে মাওলানা তাঁহার সভাপতির ভাষণে প্রেসিডেন্ট আয়্যূব-এর কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন (১৯৫৮ খৃ.) [ফখরে বাঙাল, পৃ. ৭৯]।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ছিল তাঁহার অতি প্রিয়। তিনি দিনরাত যখনই অবসর পাইতেন, কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকিতেন (ফখরে বাঙাল, পৃ. ৯০)। ৩ এপ্রিল মুতাবিক ১৯৬৭ খৃ. ২০ চৈত্র, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ সোমবার দিন ৭১ বৎসর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি ইনতিকাল করেন। ঢাকাস্থ কাকরাইল মসজিদে তাঁহার প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঈদ্‌গাহ্ ময়দানে লক্ষাধিক মানুষ তাঁহার জানাযার সালাতে অংশগ্রহণ করেন। ইমামত করেন মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন ময়দানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার চার পুত্র ও দুই কন্যা; পুত্র সন্তানদের সকলেই আল-কুরআনর হাফিজ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ১৯৮৬ খৃ., পৃ. ৩৩৯; (২) মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, ফখরে বাঙাল, প্রকা. রায়হানা আখতার, হবিগঞ্জ ১৪০৯/১৯৮৯।

মুহাম্মদ ইয়াহ্‌য়া

তাজুল-মুলূক (দ্র. বূরী)

তাজুর নাজীবাবাদী (تجور نجيب ابادى) ঃ ১৮৯৪-১৯৫১, নাম ইহ্সানুল্লাহ খান, তাখাল্লুস তাজুর, জন্মস্থান নৈনিতাল, আবাসভূমি নজীবাবাদ (ভারতের উত্তর প্রদেশ), উর্দূ কবি, লেখক, আলিম ও সর্বোপরি দক্ষ সাংবাদিক। দেওবন্দে শিক্ষালাভ করার পর লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজ হইতে মৌলবী-ফাদিল ও মুন্শী-ফাদিল উপাধি লাভ করেন (১৯১৪ খৃ.)। প্রথমে লাহোর দয়াল সিং হাই স্কুলে প্রাচ্য বিষয়ের শিক্ষক ও কিছুকাল পরে দয়াল সিং কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি আজীবন বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা কার্য করেন। সর্বপ্রথম লুধিয়ানার আফ্তাব-ই উর্দূ নামক একটি মাসিক পত্রিকা (১৯১১) ও পরে তাজুল-কালাম (১৯১৪) নামক অন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। লাহোর আগমনের পর মাখযান পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৯১৬) এবং পাঁচ বৎসর উক্ত পদে বহাল থাকেন। মিঞা বশীরের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা হুমায়ূন তাঁহার সম্পাদনায় পরিচালিত হয়। হুমায়ূন-এ কিছুদিন কাজ করার পর তিনি স্বয়ং ছোটদের জন্য প্রেম নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা দেশ বিভাগের কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তিনি মাসিক পত্রিকা আদবী দুনিয়া (১৯২৯), শাহকার (১৯৩৪)-এরও প্রকাশক। তিনি সমালোচনামূলক ভূমিকা সহকারে দুইটি বৃহৎ খণ্ডে উর্দূ গদ্য ও পদ্যের চয়নিকা প্রকাশ করেন। তাঁহার কাব্যসংগ্রহ এখনও (১৯৭১) প্রকাশিত হয় নাই।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭০২

তাড়াশ ঃ সিরাজগঞ্জ জিলার একটি উপজিলা (সাবেক পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার থানা)। ০.৩ ব. কি. মি. নদ-নদীসহ উপজিলার মোট আয়তন ২৯৭.৩ ব. কি. মি. (১১৪.৮ ব. মাইল)। ইহা ২৪°২০ও ২৪°৩৪ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৯°১৫ও ৮৯°২৬ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বগুড়া জিলা, দক্ষিণে নবপ্রতিষ্ঠিত ভাঙ্গুড়া ও চাটমহর উপজিলা, পূর্বে একই জিলার রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া উপজিলা এবং পশ্চিমে নবগঠিত নাটোর জিলার সিংড়া ও গুরুদাসপুর উপজিলা অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ জিলা সদর হইতে তাড়াশ উপজিলা সদরের দূরত্ব ২৭ কি. কি. (১৮ মাইল) এবং সড়কই যোগাযোগের একমাত্র পথ।

নামকরণ ঃ তাড়াশ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কথিত আছে যে, বর্তমান উপজিলা অঞ্চলটিতে একদা চোর, ডাকাত, খুনী ও সন্ত্রাসী মানুষের তরাসে (ত্রাসে) লোকে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিত। এই তারাস শব্দ হইতে 'তারাশ' বা তাড়াশ শব্দের উৎপত্তি। ১৯১৩ খৃ. প্রশাসনিক সুবিধার্থে ইহাকে থানায় উন্নীত করা হয়।

১৯৮১ খৃ. বাংলাদেশ আদমশুমারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাড়াশ উপজিলার মোট জনসংখ্যা ১,০৮,৫৮৫ জন। তন্মধ্যে ৫৫,০১৩ জন পুরুষ ও ৫৩,৫৭২ জন মহিলা। মুসলমান ৯৪,০০০ জন, হিন্দু ১২,৯৭৭ জন, অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এই উপজিলায় মসজিদের সংখ্যা ২০৬টি এবং মন্দিরের সংখ্যা ৩৪টি।

তাড়াশ উপজিলায় শিক্ষার হার শতকরা ১৭.৬ শতাংশ, তন্মধ্যে পুরুষের শিক্ষার হার ২৫.০ এবং মহিলার শিক্ষার হার ৯.৯ শতাংশ। সমগ্র উপজিলায় ১টি কলেজ, ১৭টি মাধ্যমিক/নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৩টি মাদ্রাসা রহিয়াছে। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পাকা সড়কের মোট পরিমাণ ৮ কি.মি. এবং কাঁচা সড়কের মোট পরিমাণ ১০৬ কি. মি।

তাড়াশের জমিদার বনওয়ারী লাল রায় ও বনমালী রায় পাবনা জিলার বেশ কিছু জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহারা পাবনা শহরের বনমালী ইনস্টিটিউট, মহিলা হাসপাতাল, টেকনিক্যাল স্কুল, বনওয়ারী নগর হাই স্কুল ও সিরাজগঞ্জ বি. এল. হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ৫০,০০০ টাকা দান এবং আরও কতিপয় প্রতিষ্ঠান তাহাদের সুখ্যাতি ও স্মৃতি বহন করিতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইসলাম প্রচারার্থে তাড়াশে প্রখ্যাত সূফী সাধক যিন্দানী (র)-এর আগমন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৫২০ খৃ. বাংলার হোসেন শাহী সুলতান নুসরাত শাহের রাজত্বকালে ইরাকের যিন্দান শহর নিবাসী শাহ সূফী আবদুল-আলী বাকী শাহ শারীফ যিন্দানী বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তিনি বাংলার বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়া অবশেষে তাড়াশ উপজিলার নওগাঁয়ে আগমন করিয়া ইসলাম প্রচার করেন।

ঐতিহাসিক নিদর্শন ঃ অত্র উপজিলার নওগাঁ গ্রামে মুসলমান আমলের অনেক কীর্তির চিহ্ন বর্তমান। বাংলার সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসিরুদ-দীন নুসরাত শাহের আমলে ৯৩২/১৫২৬ সালে এইখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদটি নবগ্রাম "শাহী মসজিদ" বা "মামার মসজিদ" নামে পরিচিত। পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ এই মসজিদের বাহির দিকের আয়তন ৫০×৩২ ফুট এবং সামনের দিকের (পূর্ব দিকে) যে বারান্দাটি আছে উহার আয়তন ২৩--×১১ ফুট। মসজিদের গায়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মুবারাক খানের পুত্র জঙদার খান-ই মোয়াজ্জম মিঞা ও মোয়াজ্জম আজিয়াল মিঞা এই মসজিদ নির্মাণ করেন (আ.কা.মো. যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ২২৫)। এই মসজিদ সংলগ্ন পূর্বদিকে শাহ শরীফ যিন্দানী (র)-র মাযার অবস্থিত।

নওগাঁ শাহী মসজিদ বা মাযার মসজিদের প্রায় ২০০ গজ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছিল "ভাগ্নের মসজিদ" নামক একটি প্রাচীন মসজিদ। বর্তমানে ধ্বংস্তূপে পরিণত। সম্রাট আকবারের সময় তাঁহার সেনাপতি রাজা মানসিংহের ভ্রাতা এতদঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদের ভিটা, তাঁহার দীঘি ও জাঙ্গাল ধ্বংসপ্রাপ্ত। পুরাতন বাড়িঘর প্রভৃতি বর্তমানে ঐতিহাসিক নিদর্শন অতীতের গৌরবদীপ্ত কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh Population Census 1981, Community Tables of All thanas of Pabna District, January 1986, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning; (২) District Census Report, Pabna 1974, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Dhaka; (৩) Bangladesh District Gazetteers, Pabna, Cabinet Secretariat, Establishment Division, Dhaka; (৪) আ.কা.মো. যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪ খৃ., ২২৩-২৬৬; (৫) ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, ই.ফা.বা., পৃ. ৪৭-৪৯; (৬) চৌধুরী মহাম্মদ বদরুদ্দোজা, জিলা পাবনার ইতিহাস, লেখক কর্তৃক প্রকা., পাবনা ১৯৮৬ খৃ., ৩খ, ৮১-১০২।

মুহ. আবু তাহের

তাত (Tat) ঃ একটি তুর্কী শব্দ, যদ্বারা বুঝায় "তুর্কীদের দেশে বসতকারী বিদেশী জাতের লোক" (Thomsen)। শব্দটির পশ্চাতে কিঞ্চিত জটিল ইতিহাস রহিয়াছে ..... (দ্র. E. I.[1], vol. viii)।

দীওয়ান লুগাতিত-তুর্ক (৪৬৬/১০৭৫, ২খ, ২২৪)-এর বর্ণনানুযায়ী তাত (sic=মূল পাঠে যেমন আছে) শব্দটি দ্বারা তুর্কী জনগণের মধ্যে মিশ্রিত পারস্যবাসিগণকে (আল-ফারিসীয়্যূন) বুঝায়। অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে য়াগমা (Yaghma) ও তুখসি (Tukhsi) গোত্রদ্বয়ের মধ্যে এই শব্দ দ্বারা উইগুর (Uighur) গোষ্ঠীকে বুঝান হয়। উভয় ক্ষেত্রেই তাত একটি ঘৃণাব্যঞ্জন শব্দরূপে ব্যবহার করা হয় যাহা নিম্নোক্ত প্রবাদদ্বয়ে সুস্পষ্ট "কাঁটা (যুক্ত উদ্ভিদ)-কে তার ধরিয়া টান দাও এবং তাত-এর চোখে আঘাত কর", তাত যদি না থাকিত তবে কোন তুর্কীও থাকিত না, ঠিক যেমন মাথা না থাকিলে (উহা আবৃত করিতে) কোন মস্তকাবরণর প্রয়োজন হইত না।"

পরবর্তী সময়ে বিজয়ী তুর্কীদের ভাষায় তাতা শব্দ বিশেষভাবে বিজিত পারস্যবাসীদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এমনকি জালালুদ-দীন রূমী তাঁহার রচিত তুর্কী কবিতাসমূহে (Gibb, A Hist. of Ottomann Poetry, ১খ, ১৫০, বিশেষভাবে Martinovic, Zap., ২৪খ, ১৯১৭ খৃ., পৃ. ২২১) পারস্যের অধিবাসী উহাদের ভাষা নির্দেশ করিতে তাত (Sic) এবং তাত-জা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন.....(দ্র. E. I.[1], vol. viii)।

শায়খ সুলায়মান এফেনদী প্রণীত চাগাতাঈ উছমানী অভিধানে (সম্পা. Kunos, পৃ. ১৮৪) তাত শব্দের মৌলিক অর্থ ("অ-তুর্কী, বিদেশী") এইভাবে প্রদান করা হইয়াছে, " যেই সকল জাতি তুর্কী শাসনের অধীনে চলিয়া গিয়াছে, উদাহরণস্বরূপ, তাচীক জাতি" [১৭৯ পৃষ্ঠায় অবশ্য, এই গ্রন্থকারের মতে বিদেশী উৎস হইতে উদ্ভূত যে সকল জনগোষ্ঠী তুর্কী ভাষায় কথা বলে তাহারা তাত নামে এবং যাহারা ফারসী ভাষায় কথা বলে তাহারা তাজীক নামে পরিচিত। এই প্রেক্ষিতে যাকী ওয়ালিদীর বক্তব্য বিচার করা যাইতে পারে, যাহাতে তুর্কীস্তানের (১৪শ শতাব্দীতে?) মোঙ্গল বাহিনীর আগমনের পূর্বে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন তুর্কীসহ স্থায়ী বসতিতে অভ্যস্ত অপরাপর সকল জনগোষ্ঠীর জন্য তাত শব্দটি প্রয়োগ করা হইত]। আহমেদ ওয়েফীক (Lehdje-ji 'Othmani, Stanbul ১৩০৩ হি., পৃ. ২৮৬) প্রদত্ত এই শব্দের ব্যাখ্যাটি স্থানীয় উছমানী পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবান্বিত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, "তুর্কী শাসনের অধীনস্থ প্রদেশসমূহের প্রাক্তন কুর্দ ও পারসিক অধিবাসিগণ হইতেছে তাত।" Barbier de Meynard তাঁহার প্রণীত অভিধানে আহমেদ ওয়েফীকের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ধারণায় ইহা তুর্কিস্তানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইত।

চাগাতাঈ অভিধানসমূহে 'তাত' শব্দের গৌণ অর্থ প্রদান করা হইয়াছে, তথাঃ শহর সীমানার বাহিরে বসবাসকারী অধীনস্থ জনগোষ্ঠী? (তু. উপরোক্ত যাকী ওয়ালীদী), 'ভবঘুরে,' ইত্যাদি, বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন E. I. vol. viii।

তাতীভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিম তাত গোষ্ঠীই সংখ্যাগুরু এবং ইহারা বাকু (দ্র.) কুব্বা (দ্র.) শামাখী ও গোক-চাই জিলাসমূহে বসবাস করে। গাযনা প্রদেশে ও দাগিস্তানের দক্ষিণ অঞ্চলে (দারবানদের অব্যবহিত পশ্চিমে অবস্থিত কাইতাক-তাবাসারান জিলাসমূহে) ইহাদের কিছু সংখ্যক লোক দেখিতে পাওয়া যায় (তু. Kozubsky, Pamiat, knizka Dagestan, oblasti; তেমির খান থূরা, ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ৩১৪)।

তাত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ককেসাস পর্বতমালার পূর্ব প্রান্তস্থ উভয় ঢালে এবং আপশেরোন (আবশারান) উপদ্বীপের দক্ষিণ পর্বত প্রান্ত ব্যতীত এই উপদ্বীপে বসবাস করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. E. I.[1] vol. viii।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Berezine, Recherches sur les dial. Persans, কাযান ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ২-২৪ (তাতী ভাষার ব্যাকরণ); (২) Vsevolod F. Miller, Materiali dlia izuceniya yewreisko-tatskago yazika, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৯২ (গ্রন্থপঞ্জী, রুশ ভাষায় ৩০টি প্রবন্ধ); (৩) V. F. Miller, Ocerk fonetiki yewr. tat. nareciya, Trudi is vostak. Lazar. Instituta, fasc. iii, মস্কো ১৯০০ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, Ocerk morfologii yewr-tat narec, ঐ, fasc. ৭, ১৯০১ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Tatskiye etudi, প্রথম অংশ, ঐ, fasc. ১৪, ১৯০৫ খৃ. (পৃ. ১-১৯, লাহীজ-এর মুসলিম তাত জনগোষ্ঠীর উপভাষা ১১টি ইতিহাস, পৃ. ৩৩-৭৯; তাতী-রুশ শব্দকোষ); (৬) ঐ লেখক, দ্বিতীয় অংশ, ঐ, fasc., ২৬ ঃ ১৯০৭ (ব্যাকরণ); (৭) ঐ লেখক, Yewr-tat, mani, Zap., ১৯১৩ খৃ., ২১ ঃ, fasc. 8 ঃ, ০০১৭-০০২৯; (৮) Korsch, Sledi dialect, rhotacizma v srednepers. yazike, Drevnosti vostoo, ২/৩খ., মস্কো ১৯০৩ খৃ., পৃ. ১-১০। ককেসাস অঞ্চলের তাত গোষ্ঠী প্রসঙ্গে তু. (৯) Frckert, Der Kaukasus und seine Volker, Leipzig ১৮৮৭ খৃ., পৃ. ২২০; (১০) Kowalewski, O yuridiceskom bite Tatov, Izvestiya Obshc. Liubit, Yestestvoznariya, মস্কো ১৮৮৮ খৃ., ৪২, fasc. ২, পৃ. ৪২-৯; লাহীজ প্রসঙ্গে তু. (১১) Mamed Hasan -Efendiew, in Sborn, mater. ২৯, তিফলিস। পার্বত্য য়াহূদী জাতি প্রসঙ্গে তু. (১২) Miller-এর গ্রন্থপঞ্জী এবং H. Rosenthal, in Jewish Encyclop., ৩খ., ১৯০২ খৃ., পৃ. ৬২৮-৬৩১; (১৩) Kurdov, Gorskiye yewrei Daghestana, Russ, antropol. Journal, মস্কো ১৯০৫ খৃ., fasc. ও এবং 94, পৃ. ৫৭-৮৮; (১৪) ঐ লেখক, Gorks, yewrei Shemakh uyezda, ঐ, ১৯১২, fasc. ২ ও ৩, পৃ. ৮৭-১০০; (১৫) ঐ লেখক, Tati Daghestana, ১৯০৭ খৃ., fasc. ঐ ৩-৪, পৃ. ৫৬-৬৬, (রচয়িতা প্রদর্শন করেন যে, নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে দারবান্দ-এর পশ্চিমস্থ ৭টি গ্রামের তাতগণ, বাকু অঞ্চলের তাত ও পারস্য দেশীয় জনগোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তাহারা তুর্কীদের সহিত অধিকতর সাদৃশ্যসম্পন্ন [সংক্ষিপ্ত]।

V. Minorsky (E. I.[1])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাতার (تتار) ঃ তাতার (تاتار)-রূপেও লিখিত হয়, একটি জাতির নাম যাহার গুরুত্ব বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর তুর্কী ওরখোন উৎকীর্ণ লিপিসমূহে "ত্রিশ তাতার" ও "নয় তাতার" নামের দুইটি তাতার গোত্রের উল্লেখ রহিয়াছে Thomsen ধারণা করেন (Inscriptions de l'Orkhon, হেলসিংফর্স ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ১০৪) যে, উক্ত সময়েও এই নামটি মোঙ্গল জাতি অথবা উহাদের একটি শাখা নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হইত, কোন তুর্কী জাতি নির্দেশ করিতে নয়। Thomsen-এর মতানুসারে এই সকল তাতার বৈকাল হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেকটা Kerulen পর্যন্ত এলাকায় বসবাস করিত। কিতাই-এর সাম্রাজ্য (দ্র. কারা খিতায়) প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সাথে সাথে তুর্কীগণ আধুনিক মঙ্গোলিয়া হইতে বিতাড়িত হয়

এবং মোঙ্গল গোত্রসমূহ উহাদের স্থান গ্রহণ করে। ওরখোন শিলালিপিসমূহে তুর্ক জাতির আবাসস্থলরূপে বর্ণিত উতুকান এলাকা মাহমূদ কাশগারী (১খ, ১২৩)-এর বর্ণনা অনুসারে তাঁহার সময়ে (৫ম/১১শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) তাতার জাতির এলাকায় অবস্থিত ছিল। তাতার জাতির ব্যবহৃত ভাষা যে তুর্কী ভাষা হইতে ভিন্ন ছিল তাহা মাহমূদ কাশগারীর অজ্ঞাত ছিল না (পূ. গ্র., ১খ, ৩০)। বেশ কিছু সংখ্যক তাতার গোত্র তুর্কী জনগোষ্ঠীর সহিত মিলিত হইয়া আরও পশ্চিমে বসতি স্থাপন করে। অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত হুদূদুল-আলাম গ্রন্থে (তু. Zap., ১০খ, ১২১ প.) তাতারদের তুগুয্‌গুয (তু. গুযয) [তু. W. Barthold. Otcet o Poiezdkie v. Srednyunu Aziya. সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৩৪] জাতির গারদীযী কর্তৃক (পূ. গ্র., পৃ. ৮২ প.) ইরতিশ নদীর (দ্র.) তীরে বসবাসকারী কিমাক জাতির অংশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের গ্রন্থ মুজমিলুত্-তাওয়ারীখে (আনু. ৫২০/১১২৬) প্রদত্ত শাসক গোষ্ঠীর ব্যবহৃত উপাধিসমূহের একটি তালিকায় (Barthold-এর গ্রন্থে, Turkestan, ১খ, ২০) জনৈক তাতার শাসক সীমুন বুয়ূয (বা বীবী)? জায়ার-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা অপর কোন উৎসে উল্লিখিত হয় নাই। কিপচাক (দ্র.) জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত সুলতান মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাকাশ (দ্র. খাওয়ারিযম শাহ্)-এর সামরিক অভিযানসমূহের বর্ণনায় তাতার যূসুফ-এর পুত্র কাদির খানের বিরুদ্ধে ৬১৫/১২১৮-১৯ সালে তাঁহার পরিচালিত একটি সামরিক অভিযানের উল্লেখ রহিয়াছে (তাবাকাত-ই নাসিরী, অনু. Raverty, ১৮৮১ খৃ., ১খ, ২৬৭)।

৭ম/১৩শ শতাব্দীতে মোঙ্গল বাহিনীর বিজয় অভিযানের বিবরণীসমূহে বিজয়ী বাহিনীকে সর্বক্ষেত্রেই (চীন, মুসলিম বিশ্বে, রাশিয়া ও পশ্চিম য়ূরোপে) তাতার (চৈনিক তা-তা) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইবনুল-আছীর-এর গ্রন্থে (সম্পা. Tornberg, ১২খ, ১৭৮ প., ২৩৬ প.) চিন্‌গীয খান-এর পূর্বপুরুষ, কুলচুকের অধীনস্থ নাইমান (দ্র. কারা খিতায়) গোষ্ঠীকে এই একই নামে অভিহিত করা হইয়াছে; ইবনুল-আছীরের বর্ণনায় (পূ. গ্র., পৃ. ২১৭) ইহারাই ছিল "প্রথম তাতার" জাতি (আত-তাতারুল-উলা)। রাশীদুদ-দীন, যিনি আপাতদৃষ্টিতে মোঙ্গল যুগের পূর্বে 'তাতার' শব্দটির ব্যবহার এবং তাৎপর্য সম্পর্কে কোন কিছুই অবগত ছিলেন না, তাতার জাতি প্রসঙ্গে যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হইতে পারে, তাহারা মোঙ্গল জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি জাতি, যাহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল বুইয়ার নর (কেরুলেন-এর দক্ষিণ-পূর্বে)-এর তীরবর্তী এলাকায়। রাশীদুদ-দীন বলেন, চিন্‌গীয খানের বিজয় অভিযানসমূহের পর তাঁহার দ্বারা পরাভূত জনগোষ্ঠীর অনেকেই " মোগুল" (মোঙ্গল) নাম ধারণ করে। ইতিপূর্বে তাতার জনগোষ্ঠী সমভাবেই শক্তিশালী ছিল; বহু জনগোষ্ঠীই এই নামে পরিচিত ছিল। ইহার ফলে খিতায়, হিন্দুস্তান, চীন, মাচিন-এ, কিরগিয জনগণের মধ্যে, কেলার (পোল্যাণ্ড), বাশকিরদ (হাঙ্গেরী), কিপচাক জনগোষ্ঠীর স্তেপ (দাশত্) অঞ্চলে, উত্তরের দেশসমূহের বেদুঈন জনগোষ্ঠীর মধ্যে, সিরিয়া, মিসর ও মাগরিব-এর সকল প্রকার তুর্কী জনগোষ্ঠী আজও তাতার নামে পরিচিত (Trudi. Vost. Otd. Arkh. Obshc.-এর ভাষ্য, ৭খ, ৬৪)।

মোঙ্গল উৎস ও মোঙ্গলভাষী সকল জনগোষ্ঠী সাধারণত সকল সময়েই নিজেদের তাতাররূপে অভিহিত করিয়াছে। চিন্‌গীয খানের সময়ের পর মঙ্গোলিয়া ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলে এই নামটির স্থান 'মোঙ্গল' শব্দ গ্রহণ করে, যাহা চিন্‌গীয খান কর্তৃক সরকারীভাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল (মুসলিম পাণ্ডুলিপিসমূহে শব্দটি মোঙ্গল অথবা মোগুল ও আফগানিস্তানের মোঙ্গল বংশধরদের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত ভাষায় মোগোল–যাহারা অদ্যাবধি তাহাদের ভাষা অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন)। য়ূরোপীয় পর্যটকগণের বিবরণীতে আমরা দেখিতে পাই যে, মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ অংশেই মোঙ্গল শব্দটি কখনও প্রাধান্য লাভ করে নাই, যদিও ঐ সকল অঞ্চলেও উহা সরকারীভাবে প্রবর্তিত হইয়াছিল (John of Pian de Carpini ও William of Rubruck: Hakl. Soc., 1905, নির্ঘণ্ট, দ্র. শিরো.)। Golden Horde (দ্র. বাতূ খান ও বারকে) এবং একই অঞ্চলের পরবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহের জনগণ সব সময়েই 'তাতার' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। লেনিনগ্রাড পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বহু সংখ্যক দলীল-এ আমরা দেখিতে পাই, ক্রিমিয়া অঞ্চলের তুর্কীভাষী জনগগোষ্ঠী শুধুমাত্র উছমানীদের দ্বারাই 'তাতার' নামে অভিহিত হয় নাই (একইভাবে রুশদের দ্বারাও), বরঞ্চ তাহারা নিজেরাই নিজেদের তাতাররূপে পরিচয় দান করিত।

বিজয় অভিযানকালে মোঙ্গল বাহিনীর একটি দলকে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহাদের বংশধরগণ (যাহারা নিঃসন্দেহে তুর্কীতে পরিণত হইয়াছিল), "কৃষ্ণ তাতার" (কারা তাতার) নামে পরিচিত ছিল; তীমূর-এর সামরিক অভিযান চলাকালে ইহারা আমাসিয়া (দ্র.) ও কায়সারিয়া (দ্র.)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে যাযাবর জীবন যাপন করিতেছিল, ইহারা ছিল ৩০ হইতে ৪০ হাজার পরিবার (জাফার-নামাহ, ভারতীয় সং., কলিকাতা ১৮৮৮ খৃ., ২খ, ৫০২ প.)। ইব্‌ন আরাবশাহ (সম্পা. Manger, ২খ, ৩৩৮)-এর বক্তব্য অনুসারে, তীমূর সুলতান বায়াযীদ-এর পরামর্শে এই সকল 'তাতারকে' মধ্য এশিয়ায় বহিষ্কৃত করেন। তথায় কাশগার-এর ইসিক্‌কুল (দ্র.) হ্রদে অবস্থিত একটি দ্বীপে (যাহা বর্তমানে আর অবশিষ্ট নাই) এবং খাওয়ারিযমে তাহাদিগকে বসতি এলাকা প্রদান করা হয়। ইহাদের মধ্যে একটি অংশ Golden Horde শাসিত অঞ্চলে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। তীমূরের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ তাতার জনগোষ্ঠী পুনরায় এশিয়া মাইনরে প্রত্যাবর্তন করে। ১৪১৯ খৃ. তাহাদিগকে (অথবা তাহাদের মধ্যে একটি অংশকে) বলকানে প্রেরণ করা হয় এবং ফিলিপপোপোলিস-এর পশ্চিমে বসবাস করিতে দেওয়া হয়। তাতার-পাযারজিক শহরটি ইহাদের হইতে উহার নাম লাভ করিয়াছে (J. von Hammer, GOR^2, Pesth, ১৮৩৪ খৃ., ২৯২)।

পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে, রাশিয়ায় ও পশ্চিম য়ূরোপে একমাত্র উছমানীগণ ব্যতীত যে কোন তুর্কী জাতির ক্ষেত্রে প্রায় তাতার নামটি প্রয়োগ করা হয়। Radloff (Aus Sibirien, লাইপযিগ ১৮৮৪ খৃ., স্থা.)-এর রচনায় শব্দটির এই ধরনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চীনাদের অনুসরণে এই নামটি মোঙ্গলদের ও বিশেষভাবে মানচুদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হইয়াছে (তু. পিকিং শহরের "তাতার এলাকা")। কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নাম হিসাবে তাতার শব্দটি শুধু কাযান হইতে আসত্রাখান পর্যন্ত বিস্তৃত ভোলগা নদীর অরবাহিকা, ক্রিমিয়া ও সাইবেরিয়ার একটি অংশে বসবাসকারী তুর্কীভাষী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ১৯২৭ খৃ. প্রকাশিত সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যার তালিকায় (spisok) ক্রিমিয়ার তাতারদের, ভোলগা এলাকার তাতারদের, কাসিমোভ-এর তাতারদের এবং তাবোলস্ক-এর তাতারদের পৃথক পৃথক জাতিরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে; তদুপরি রহিয়াছে শ্বেত রাশিয়ার তাতারগণ, যাহাদের পূর্বপুরুষ ক্রিমিয়া হইতে যুদ্ধবন্দীরূপে পোল্যাণ্ডে নির্বাসিত হইয়াছিল। তাহারা শ্বেত রুশদের ভাষা গ্রহণ করিয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু অদ্যাবধি তাহারা মুসলিম। ক্রিমিয়ার জনগোষ্ঠী কর্তৃক অধুনা 'তাতার' নামটি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালের

গবেষণা অনুসারে আসত্রাখান অঞ্চলের তুর্কীভাষী জনগোষ্ঠী নোঘাই উৎস হইতে উদ্ভূত। ভোলগা নদীর তীরবর্তী প্রবাহের প্রধান এলাকায় 'তাতার' জনগোষ্ঠী সাধারণত তাহাদের খৃস্টান স্বদেশবাসী 'kryashen' (রুশ kresceniy খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হইতে)গণ কর্তৃক এই নামে অভিহিত হয় (Radloff, Worterbuch, ৩খ, ১০১ প.)। তাহারা নিজেরা নিজেদের তাতার-এর পরিবর্তে 'মুসলিম' নামে পরিচয় প্রদানে অধিকতর আগ্রহী। কারণ 'তাতার' নামটি তাহাদের বিধর্মী পূর্বপুরুষদের জন্যই অধিকতর যোগ্য ছিল, ঠিক যেইভাবে উছমানীগণ বহুকাল পূর্ব হইতেই 'তুর্কী' নামে পরিচিত হইতে পসন্দ করেন না। বিপ্লবের পূর্ববর্তী শেষ বৎসরেও, যখন জাতীয়তা সংক্রান্ত নীতি বিশেষ গুরুত্বের সহিত বিবেচিত হইতেছিল তখনও ইহারা 'তুর্কী' না 'তাতার' নামে পরিচিত হইবে–এই বিষয়ে তুমুল বিতর্ক বিদ্যমান ছিল (M. I., ১৯১২ খৃ., ১খ, পৃ. ২৭০ প.)। বর্তমানে 'তাতার' নামটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; ১৯২০ খৃ. হইতে একটি স্বায়ত্তশাসিত তাতার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। ইহার রাজধানী কাযান (দ্র.) এবং লোকসংখ্যা ২,৭৮০,০০০ যাহাদের মধ্যে অর্ধেকের কম সংখ্যক (১৩,০৬,২৯২) তাতার জনগোষ্ঠীর। তু. অধ্যাপক D. Zolotarev-এর জাতিতাত্ত্বিক জরিপ (ocerk) (Povolzye, ১৯২৬ খৃ., ভ্রমণকাহিনী, সংখ্যাসমূহের জন্য পৃ. ১২৩ ও ১২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রয়োজনীয় বরাত প্রবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

W. Barthold (E. I. [1]))/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাঁতীপাড়া মসজিদ ঃ বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে অবস্থিত। মালদহের ইংরেজ বাজার হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১১ মাইল। বাহির দিক হইতে ইহার আয়তন ৯১×৪৪ ফুট, ভিতরের আয়তন ৭৮×৩১ ফুট। প্রস্তর নির্মিত চতুষ্কোণ মসজিদটির অভ্যন্তরভাগ দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। চারি কোণে চারিটি অষ্টকোণ মিনার, মসজিদের প্রাচীর ৬ ফুট মোটা, দেওয়ালের বাহিরের পিঠ এবং চারি কোণের স্তম্ভগুলি নানাবিধ ফল-ফুল, লতাপাতার কারুকার্য দ্বারা সুশোভিত। মসজিদের ১০টি গম্বুজও কারুকার্যমণ্ডিত ছিল। গৌড়ের বর্তমান মসজিদসমূহের মধ্যে তাঁতীপাড়া মসজিদ বলা হয়। স্থানীয়ভাবে ইহা উমার কাদীর মসজিদ নামেও খ্যাত। উমার কাদী সম্ভবত মসজিদটির স্থপতি ছিলেন। মসজিদের পূর্বদিকে তাঁহার কবর বিদ্যমান এবং ইহার পার্শ্বে যুল-কারনায়ন নামে এক ব্যক্তির কবরও রহিয়াছে। মসজিদের উত্তর-পূর্বদিকে একটি বৃহৎ ইমারতের নিদর্শন Greighton লক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার মতে উক্ত ইমারত সম্ভবত একটি মেহমানখানা অথবা মাদ্‌রাসা গৃহ ছিল।

শিলালিপি হইতে অবগত হওয়ার যায়, তাঁতীপাড়া মসজিদটি গৌড়ের সুলতান শামসুদ-দীন আবুল-মুজাফ্‌ফার যূসুফ শাহের আমলে (৮৭৯-৮৬/১৪৭৪-৮১) খান-ই আজাম মিরসাদ খান আতাবেক কর্তৃক ১৮ রামাদানুল-মুবারাক, ৮৮৫/১৪৮০ সালে নির্মিত হয়। মসজিদের শিলালিপির পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

قال النبى ﷺ من بنى مسجدا لله بنى الله تعالى له سبعين قصرا فى الجنة . بنى هذا المسجد فى عهد السلطان بن السلطان بن السلطان شمس الدنيا والدين ابو المظفر يوسف شاه السلطان بنى هذا المسجد خان اعظم وخاقان معظم مرصاد خان اتابك رايت اعلى بتاريخ هزدهم ماه مبارك باربكشاه رمضان سنة خمس وثمانين وثمانمائة .

"নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একটি মসজিদ নির্মাণ করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহার জন্য জান্নাতে ৭০টি প্রাসাদ নির্মাণ করিবেন। এই মসজিদ নির্মিত হয়–সুলতান ইবনুস-সুলতান, ইবনুস-সুলতান শামসুদ-দুনয়া ওয়াদ-দীন (পৃথিবীর ও ধর্মের সূর্য) আবুল-মুজাফ্‌ফার যূসুফ শাহ আস-সুলতান ইব্‌ন সুলতান বারবাক শাহ ইবন্ সুলতান মাহমূদ শাহের আমলে। এই মসজিদ নির্মাণ করেন মহান খান, সম্মানটি প্রশাসক মিরসাদ খান, সমুন্নত পতাকার রক্ষক (আতাবেক); নির্মাণ তারিখ ১৮ রামদানুল-মুবারাক, ৮৮৫/১৪৮০।

উপরোক্ত শিলালিপি সর্বপ্রথম Greighton কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়; Cunninghaum তাঁতীপাড়া মসজিদ ও উহার শিলালিপি উদ্ধার সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রকাশ করেন [দ্র. A. S. R., vol, XV, pp 61-62; Raven Shaw তাঁহার Gour নামক গ্রন্থে ইহার পুনরাবৃত্তি করেন (p. 22, Plate 48, no. 6); Blockmann, শিলালিপির পাঠোদ্ধার ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন J. A. S. B., vol. VIII, 1873, p. 277 সাময়িকী দ্র.]। পূর্বোক্ত শিলালিপিসমূহের পাঠে কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। অবশেষে মুন্‌সী ইলাহী বাখশ জিহাননুমা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন এবং H. Beveridge উহা J.A.S.B., Vol. XIV, 1895. pp. 217-18-তে প্রকাশ করেন। অবশেষে H. E. Stapleton কর্তৃক তাঁহার সম্পাদিত Memoirs of Gour and Pandua গ্রন্থে উহা পুনরুদ্ধৃত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Abid Ali Khan, Memoirs of Gour And Pandua, Ed. Hr. Stapleton, Asian Publication Servic, New Delhi 1979 AD. 62-63 and 71-72; (2) Shamsuddin Ahmed, Inscriptions of Bengal, V. R. S, Rajshahi 1960, vol. 4, pp. 106-8; (৩) রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, ২খ, মালদহ ১৯০৯ খৃ., পৃ. পরিশিষ্ট ৯।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

তা'তীল (تعطيل) ঃ খৃস্টীয় ধর্মবিজ্ঞানে ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ যাহা দ্বারা খোদা সম্বন্ধে ধারণ হইতে সকল প্রকার গুণ বর্জিত করা বুঝায় (দ্র. "তাশ্‌বীহ" প্রবন্ধ)।

E. I.[1])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

তাদ্‌বীর (تدبير) ঃ (আ) دبر শব্দমূল, তাফ্‌ঈল বাব-এর ক্রিয়ামূল। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে ঃ ১। একটি অর্থ "নির্দেশনা, পরিচালনা"। আরবী অভিধান প্রণেতাগণ دبر শব্দটিকে دبر বিশেষ্য হইতে উদ্ভূত একটি ক্রিয়াপদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এই ক্রিয়াপদ বর্তমানে দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ঃ (ক) সর্বপশ্চাৎবর্তী, সর্বশেষ (কুবুল-এর বিপরীত), যেমন লিসান (৫খ, ৩৫৮)-এ বর্ণিত আছে ঃ সমাপ্তির প্রতি মনোযোগী হওয়া অথবা বিষয়ের শেষের প্রতি লক্ষ রাখা। এই ক্রিয়াপদটির এখন দুইটি প্রয়োগ লক্ষণীয় ঃ (ক) সরকার ও প্রশাসন অর্থে, যেমন ইব্‌ন আবির-রাবী' রচিত একখানি গ্রন্থের শিরোনামে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ সুলূকুল-মালিক ফী তাদ্‌বীরিল-মামালিক [তু. সিয়াসা] এবং (খ) যে অর্থে এইখানে আলোচনা করা হইতেছে অর্থাৎ ঘর-সংসারের কাজকর্মে নির্দেশ প্রদান, পরিচালনা-তাদ্‌বীরুল-মানযিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন ইব্‌ন খালদূন তাঁহার মুকাদ্‌দিমা (সম্পা, Quatremere, in N. E., xvi, 62; অনু. de Slane, in N. E., xix, 78) গ্রন্থে বলেন, "সিয়াসাতুল-মাদানিয়া হইতেছে ন্যায়নীতি

[আখ্‌লাক] অনুযায়ী ও বিচক্ষণতার সহিত একটি গৃহ বা রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা করা যাহাতে সমগ্র গৃহ বা রাষ্ট্র সুনিয়ন্ত্রিত (নাও') পথে পরিচালিত হইতে থাকে।"

তাদ্‌বীরুল-মানযিল হইতেছে ব্যবহারিক দর্শন শাস্ত্রের তিনটি উপ-বিভাগের অন্যতম; গ্রীকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত এই শাস্ত্র অধিগ্রহণ করিয়া মুসলিমগণ ইহার নিম্নরূপ বিভাগ পুনর্বিন্যাস করে, যথাঃ নীতিশাস্ত্র (ইল্‌মুল-আখ্‌লাক), অর্থনীতি (ইল্‌মু তাদ্‌বীরিল-মান্‌যিল) ও প্রশাসন নীতি (ইল্‌মুস-সিয়াসা)-সহ রাষ্ট্রনীতি (তু. ইব্‌ন সীনা, আক্‌সামুল-উলূমিল-আক্‌লিয়া, মাজ্‌মূআতুর-রাসাইল, কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ২২৯ প.); আল-কিফ্‌তী, তারীখুল-হুকামা, সম্পা. Lippert, পৃ. ৫২ এবং আরও অনেকে)। Ritter-ই সর্বপ্রথম গবেষক যিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ইসলামের অর্থনীতি সংক্রান্ত রচনাকর্ম নব্য পাইথাগোরীয়পন্থী Bryson রচিত Economics গ্রন্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে (ইহার গ্রীক মূল পাঠ বর্তমানে হারাইয়া গিয়াছে), তবে ইহার আরবী অনুবাদ (সম্পা. Cheilkho, in Machmiq, xix [1921], 161-81; ফিহ্‌রিস্‌ত, পৃ. ৩১৫, ইহার উল্লেখ আছে) সংরক্ষিত আছে; এই অনুবাদ হইতে ইহার হিব্রু (Munich, Cod. Hebr. 263, Ritter in Isl., vii [1917],12 sq.) ও ল্যাটিন (Galen-এর Dresden MS., Plessner ইহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন) অনুবাদও করা হইয়াছে। প্লেসনার সংশ্লিষ্ট সমস্ত তথ্য সম্পাদনা ও পর্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই গবেষণার ফল হইতে দেখা যায়, ইসলামে অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রসার হইয়াছে প্রধানত নিম্নরূপঃ হুবহু নকল ও অনুকরণ করা হইয়াছে (আদ-দিমাশ্‌কী, ইশারা ইলা মাহাসিনিত-তিজারা, সম্পা. Ritter, Isl., vii, I প.; ইব্‌ন আবির-রাবী', সুলূকুল-মালিক; ফাখ্‌রুদ-দীন আর-রাযীকৃত বিশ্বকোষ; ইব্‌নুল-ফানারী) তদুপরি ব্রাইসনের Economics গ্রন্থখানি নাসিরুদ্‌-দীন (তূসী) পৃথকভাবে সম্পাদনা করত তাঁহার আখ্‌লাক শিরোনামের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বিভিন্ন মুসলিম ও ফার্‌সী ধ্যানধারণা অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার সম্প্রসারণ করেন। তূসী রচিত এই অর্থনীতি গ্রন্থ এক সময় অর্থনীতিতে ইসলামের চূড়ান্ত আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই আখ্‌লাক-ই জালালী রচিত হয় এবং পরবর্তী কালে আল-গাযালী, আশ-শাহ্‌রাযূরী, আল-আমূলী (ইনি আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কিরূপ মনোভাব দেখাইতে হইবে সে সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযোজন করেন) ও আল-ঈজীর ন্যায় অর্থনৈতিক বিষয়ে গ্রন্থ রচয়িতাদের রচনাদিও প্রধানত তূসীর অর্থনীতি গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়।

এই সমস্ত অর্থনৈতিক রচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে ঃ সম্পত্তি (মাল) অর্জন, সংরক্ষণ ও উহার সুষ্ঠু ব্যবহার। দাস, স্ত্রীলোক ও শিশুদের প্রতি আচরণ, সব কিছুই সম্ভাব্য সর্বাধিক উপকারিতা অর্জন ও সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচিত হইয়াছে।

ফিহ্‌রিস্ত-এর ২৬৩ পৃষ্ঠায় অর্থনীতি সম্পর্কে দ্বিতীয় আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে; দৃশ্যত ইহা গ্রীক আমলে রচিত এবং পরবর্তীকালে আরবীতে অনূদিত হইয়াছে; ইহার শিরোনামঃ কিতাব রূফুস্‌ ফী তাদ্‌বীরিল-মান্‌যিল লিল-ওসওস (LWSWS-এর "অর্থনীতি সম্পর্কে রূফ্‌স্‌-এর গ্রন্থ")। এই প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম নিশ্চিতরূপে স্থির করা যায় নাই। কারণ খুব সামান্য সংখ্যক প্রাচীন অর্থনীতিবিদের নাম আমরা জানি। কেহ অনুমান করিতে পারেন যে, এই প্রাচীন লেখকের নাম ছিল হয়ত ফিলোডেমাস্‌ (Philodemus) বা ঐরূপ কোন নাম।

অর্থনীতি সংক্রান্ত সর্বপ্রথম প্রাচীন গ্রন্থখানিরও একটি আরবী অনুবাদ (বা সংক্ষিপ্তসার) সংরক্ষিত আছে, এ যাবৎ ভুলক্রমে এরিস্টোটল (Aristotle)-কে ইহার রচয়িতা বলিয়া ধরা হইত (বর্তমানে সাধারণত Theophratus-কে ইহার রচয়িতা বলিয়া গণ্য করা হয়)। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর একটি পাণ্ডুলিপিতে এই সারসংক্ষেপটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং Escorlial-এ [Casiri. No. 883] রক্ষিত আছে)। কিতাব আরিসতূ ফী তাদবীরিল-মানাযিল শিরোনামে এবং বৈরূতের একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় রক্ষিত কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন রচনা সম্বলিত আর একখানি পাণ্ডুলিপিতেও ইহা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; শিরোনামঃ ছিমার মাকালা আরিস্‌তূ ফী তাদ্‌বীরিল-মানযিল (তু. মালূফ, in Mach., xix [1921], p. 257-62)। তবে এই পাণ্ডুলিপি দুইখানি এখনও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। কিন্তু ফিহ্‌রিস্‌ত-এ অন্তর্ভুক্ত আবী উসায়বি'আ ও আল-কিফ্‌তীর রচনায় এই অর্থনীতি রচনাকর্মটির কথা আদৌ উল্লেখ করা হয় নাই (তু. এই সম্পর্কে Baumstark-এর মন্তব্য, দ্র. Syrisch-arabische Biographien des Aristoteles, Leipzig 1900, p. 53 প.)। অপরদিকে তাবাকাতুল-উমাম, কায়রো, তা. বি. (পৃ. ৩৯)-এর রচয়িতা আবুল-কাসিম সাইদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-আন্দালুসী (মৃ. ৪৬২/১০৬৯-৭০) বা তাঁহার তথ্যসূত্র এরিস্টোট্‌লের একখানি Economics (সিয়াসাতুল-মান্‌যিল) গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অনুবাদকর্মটি যেভাবে হস্তান্তরিত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে সম্ভবত এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, খৃস্টান আরবদের মধ্যেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। মা'লূফ কোন সূত্র উল্লেখ না করিয়া বলিয়াছেন যে, এই আরব অনুবাদক হইতেছেন আবুল-ফারাজ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আত-তায়্যিব (মৃ. ৪৩৫/১০৪৩-৪৪)। এই নিবন্ধের লেখক এই অর্থনীতি গ্রন্থখানির একটি সংস্করণ ও সমীক্ষা প্রণয়ন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জুরজী যায়দান, তা'রীখ আদাবিল-লুগাতিল-আরবিআ, কায়রো ১৯১২ খৃ., ২খ, ২৩২ প.; (২) Ritter, Ein. arab. Handbuck der Handelswi- ssenschaft, in Isl., vii (1917), 4-14; (৩) Plessner, Der des Neupythagoraers Bryson und sein Einfluss auf die islamisohe Wissenschaft, Breslau, Phil. Diss. 1925 (শুদ্ধ সারসংক্ষেপ; পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশের পথে)।

২। তাদ্‌বীর-এর আর একটি অর্থ হইতে পারে "ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্তিদান, যাহা কেবল মালিকের মৃত্যুর পর কার্যকর হয়" এই অর্থে। এই ক্ষেত্রে دبر ক্রিয়াপদটির উদ্ভব হইয়াছে دبر বিশেষ্য পদ হইতে যাহার অর্থ ("জীবনের) শেষ" অর্থাৎ মৃত্যু (তু. লিসান, ৫খ, ৩৫৮; মুতাররিযী, মুগ্‌রিব, দ্র. শিরো.)। আবূদ নিবন্ধের বিশদ বর্ণনার জন্য বিষয়বস্তুটির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হইয়াছে এই গ্রন্থে ঃ Santillana, Instituzioni di diritto musulmano malichita, Rome 1926, ১খ, ১২২।

Heffenign (E. I. [1])/ শায়খ ফজলুল রহমান

তাদলা (৪১৮) ঃ বা তাদিলা, Leo Africanus-এর বর্ণনায় Tedle, মরক্কোর একটি জিলা। ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে একটি মালভূমি, যাহা পশ্চিমদিকে ওয়াদী উম্মুর-রাবী' নামক উঁচু উপত্যকার পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত, মধ্য আতলাস (এটলাস) পর্বতমালার পশ্চিমের ঢাল, ওয়াদিল-আবীদ হইতে মুলূয়ার উৎসমুখ পর্যন্ত। তাদিলা হইতে প্রাচীন সম্বন্ধবাচক নাম (নিসবা) তাদিলী কেবল জিলাটির 'শুরাফা'

(অভিজাত শ্রেণী)-কে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়; জনপ্রিয় উৎপত্তিগত সম্বন্ধবাচক নাম তাদ্‌লাবী।

মালভূমির এই অঞ্চলটিতে আরব বংশোদ্ভূত ছয়টি অর্ধ-যাযাবর গোত্রের লোক বাস করেঃ উরদীগা, বানী খীরান, বানী যেম্‌মুর, সমালা, বানী আমের, বানী মূসা। উহাদের কেন্দ্র হইল ওয়াদ যেম, বুজাদ (বেজ্জাদ, সুপ্রাচীন আবুল-জাদ্‌-এর পরবর্তী নাম) ও দার উলদ যীদূহ।

উম্মুর-রাবী' (পুরাতন ওয়াদী ওয়ানসীফান) উচ্চ উপত্যকার মধ্য অঞ্চলে যে দলটি বসবাস করে উহাদের নাম আইত রাবো। সকল গোত্রই প্রায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং তাহারা মিশ্র আরব ও বার্বার বংশোদ্ভূত। সেইগুলি হইল গতায়া, সেমগেত, বানী মাদান ও বানী মেল্লাল। দুইটি প্রধান কেন্দ্র হইল কসবা তাদলা ও বানী মেল্লালগণের কসবা।

মধ্য এটলাসের পশ্চিম ঢালে উত্তর হইতে দক্ষিণে ক্রমে নিম্নলিখিত বার্বার গোত্রগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়; আইত সারী, আইত আত্তা, আইত বু-যীদ, আইত আইয়াত ও আইত আত্তাব।

পর্বতে বসবাসকারী বার্বার অধিবাসিগণ যানাগা দলীয় (সানহাজা)। সমভূমিতে প্রথমে ছিল যানাতা বার্বারগণ, উহারা মেকনাস, উম্মুর-রাবী' ও লাওয়াতার (যানারা) মধ্যবর্তী এলাকাতে যাযাবর জীবন যাপন করিত। এই অঞ্চলে আদি আরব গোত্র ছিল জুশামগণ (ইব্‌ন জাবির, যিরারা), অতঃপর আসে খুলতগণ; বানূ সা'দ, মাকিল গোত্রীয় লোকদেরকে প্রথমে এইখানে আনে।

সুপ্রাচীনকালে তাদলাতে যেই সকল লোক বাস করিত তাহারা খৃস্টান বা য়াহূদী ধর্মাবলম্বী ছিল বলিয়া মনে হয়। ২য় ইদ্‌রীস যখন ১৭২/৭৮৯ সালে এই অঞ্চল দখল করেন তখন (রাওদাতুল-কিরতাস অনুযায়ী) এইখানে তিনি স্বল্প সংখ্যক মুসলিম পান, কিন্তু খৃস্টান ও য়াহূদী ছিল অনেক। Leo Africanus খৃ. ১৬শ শতকের শুরুতে তাদলাতে ছিলেন, তিনি এইখানকার একটি বড় য়াহূদী উপনিবেশের কথা লিখিয়াছেন; তাঁহার সময়ে দেশটির রাজধানী তাফসাতে য়াহূদীদের প্রায় ২০০ ঘর ছিল, সকলেই ছিল ব্যবসায়ী ও ধনী কারুশিল্পী। বর্তমান সময়েও বুজাদে ও বানী মেল্লালের কসবাতে অনেক য়াহূদী বাস করে। এই শেষোক্ত স্থানটি প্রাচীন মাদীনাতু-উদাই নামের সঙ্গে অভিন্ন। উহা একটি আরবী বার্বার নাম। উহা দ্বারা য়াহূদীগণের শহর কথাটি বুঝায় বলিয়া মনে হয়। ২য় ইদ্‌রীসের পুত্রগণ যে প্রদেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন তাদলা সেইগুলির অন্যতম। রাওদাতুল-কিরতাস গ্রন্থের লেখকের মতে ইহা ছিল আহমাদের ভাগে কিন্তু আল-বাকরী লিখিয়াছেন যে, অঞ্চলটির রাজধানী দা'ঈ য়াহ্‌য়ার ভাগে পড়িয়াছিল।

কালক্রমে তাদলা, শাল্লার বানূ য়াফরান-এর সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১০ম/১৬শ শতক)। ৪৪৯/১০৫৭-৮ সালে আল-মুরাবিতগণ আগমাত দখল করিয়া লইলে তখন সেইখানে শাসনকারী মাগরাবী বংশীয় লাগ্‌গূত ইব্‌ন য়ূসুফ পলায়ন করিয়া আসিয়া তাদলার বানূ য়াফরান-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আল-মুরাবিতগণের নেতা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন য়াসীন সেইখানে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া প্রদেশটি জয় করিয়া লন। স্থানীয় একটি কিংবদন্তী অনুযায়ী দা'ঈ শহরটি আল-মুরাবিত সুলতান য়ূসুফ ইব্‌ন তাশফীন ধ্বংস করিয়া দেন। উহার পরিবর্তে তিনি তাগরারেত শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। উহার ধ্বংসাবশেষ সন্নিহিত স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাটি সম্ভবত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই, তবে অনুমেয় যে, এই ঘটনা তখনই হয় যখন য়ূসুফ ইব্‌ন তাশফীন তাদলার সংলগ্ন উত্তরে অবস্থিত ফাযায দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

৫২৬/১১৩১-২ সালে আল-মুওয়াহহিদ সুলতান আবদুল-মু'মিন তাদলা অবরোধ করেন এবং তখন হইতে প্রদেশটি ফাস ও মার্‌রাকুশের মাঝখানে উভয় স্থানের মধ্যে সরাসরি সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়াতে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এখানকার ইতিহাস হইল সেই সকল সংগ্রামেরই ঘটনা এবং এইখানে বসবাসকারী আরব বা বার্বার গোত্রসমূহের ক্রমাগত বিদ্রোহের কাহিনী।

৬৬০/১২৬১-২ সালে মারীনী শাসক য়া'কূব ইব্‌ন আবদিল-হাক্ক মার্‌রাকুশ আক্রমণ করিতে আসিলে আল-মুওয়াহহিদ সুলতান আল-মুরতাদা তাঁহার মুকাবিলা করিবার জন্য চাচাত ভাই আবূ দাব্বূসকে প্রেরণ করেন। মারীনী বাহিনী উম্মুর-রাবী'র ওয়াদীর নিকটে অবস্থান লইয়াছিল। উহারা উম্মুর-রিজলায়ন নামক স্থানে পরাজিত হয়, যেই স্থানটি সম্ভবত বর্তমানের উম্মুর-রাজিলাত-এর একটি অগভীর নদী।

৬৬৬/১২৬৭-৮ সালে মারীনী সুলতান য়া'কূব তাদ্‌লা জয় করিয়া ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেন। জুশাম গোত্রীয় আরব সুলতানগণ ছিল আল-মুওয়াহহিদগণের মিত্রশক্তি, সেই আরব গোত্রীয়গণের এলাকা লুণ্ঠন করিলে শেষোক্তরা উহাদের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের এক পর্যায়ে আরব মিত্র বানূ জাবির ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলে আল-মুওয়াহহিদগণ পরাজিত হয়। ৭৬১/১৩৫৯-৬০ সালে মারীনী সুলতান সালিম ইবরাহীম-এর মার্‌রাকুশস্থ গভর্নর উযীর আল-হাসান ইব্‌ন উমার নিজ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তাদ্‌লাতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেইখানে বানূ জাবির তাঁহাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু মারীনী সেনাবাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিলে তিনি পার্বত্য অধিবাসী যানাগাগণের নিকটে পলায়ন করেন। উহারা শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণকারিগণের নিকটে হস্তান্তর করে।

বানূ সা'দ আক্রমণ করিতে আসিলে পুনরায় তাদ্‌লার ওয়াদিল-আবীদের প্রান্তে অবস্থিত অগভীর নদী আবূ আকাবাতে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং সাফার ৯৪৩/জুলাই ১৫৩৬ সালে মারীনীগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। আল-মানসূর-এর শাসনামলে খৃ. ১৭শ শতকে তাদ্‌লা শাসন করিতেন এই সুলতানের পুত্র যায়দান। একই শতকের মাঝামাঝি সময়ে তাদ্‌লা বানূ সা'দ-এর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং যাবিয়া (زاوية) দিলার যানাগা বার্বারগণের রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হয়। উহাদের একজন মুহাম্মাদ ইবনুল-হাজ্জ ১০৫০/১৬৪০-৪১ সালে আবূ আকাবার অগভীর নদীর ময়দানে সাদী সুলতান মুহাম্মাদ আশ-শায়খকে পরাজিত করেন। এই অঞ্চলের উপরে দিলাঈগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়, পরে ১০৭৯/১৬৬৮-৬৯ সালে 'আলাবী সুলতান আর-রাশীদ উহাদের যাবিয়া ধ্বংস করিয়া দেন। ১০৮৪/১৬৭৩-৭৪ সালে আলাবী সুলতান ইসমাঈল আবূ আকাবাতে তাঁহার বিদ্রোহী ভাতিজা আহমাদ ইব্‌ন মুহরিযকে পরাজিত করেন।

১০৮৮/১৬৭৭-৭৮ সালে মাওলায় ইসমাঈলকে তাদ্‌লার যানাগাদের পরপর কয়েকটি গুরুতর বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। জনৈক দিলাই আহমাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ উহাদিগকে উস্কানি দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তোলে। ১০৯৯/১৬৮৭-৮৮ সালে তাঁহাকে আরও একটি যুদ্ধাভিযান করিতে হয়। উহার ফলেই আদাখসান (খনীফ্রা-এর নিকটে) তাদলা ও দিলা-তে কসবা নির্মিত হয়। ১১১১/১৬৯৯-১৭০০ সালে মরক্কোর প্রদেশসমূহ যখন বিভক্ত হয় তখন তাদলার শাসক হন মাওলায়

ইসমাঈল-এর পুত্র মাওলায় আহমাদ। তিনি উম্মুর-রাবী'র প্রান্তে তাঁহার পিতা কর্তৃক নির্মিত 'কসবা তাদলা' নামে পরিচিত কসবাতে থাকিতেন।

১১৪২/১৭২৯-৩০ সালে সুলতান মাওলায় 'আবদুল্লাহ্‌কে পুনরায় তাদলাতে যুদ্ধ করিতে হয় আইত যেমমূরগণের বিরুদ্ধে। উহাদিগকে তিনি নির্মূল করিয়া দেন। ১১৭৯/১৭৬৫-৬৬ সালে সুলতান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ বাধ্য হইয়া কিছু সময়ের জন্য উহাদিগকে ফাসের নিকটবর্তী জেবেল ফেলফাত-এ নির্বাসন দেন। সাময়িকভাবে উহাদের স্থলে গতায়া, সেমগেত ও মেজ্জাতগণ আসিয়া বাস করিতে থাকে। পরে উহাদিগকে গারব-এ ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ১১৯৯/১৭৮৪-৫ সালে এই শাসককেই বুজাফের যাবিয়া ধ্বংস করিয়া দিতে হয়। ইহার নেতা মুহাম্মাদ আল-আরাবী আশ-শারকাবীকে তিনি বন্দী করেন। ১২২২/১৮০৭-৮ সালে সুলতান মাওলায় সুলায়মান বানী মূসা, আয়ত আত্তাব, রুয়ায়লা ও বানী আয়ায়াতগণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। ১২২৪/১৮০৯-১০ সালে তাদলার বার্বারদের (আইতসারী) বিরুদ্ধে একটি এবং উব্‌দীগা আরবদের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। সুলতান মাওলায় সুলায়মান বুজাদের মসজিদটি এবং উম্মুর-রাবী'র উপরের পুলটি নির্মাণ করেন।

১২৬৯/১৮৫২-৩ সালে সুলতান আবদুর-রাহমান ইব্‌ন হিশাম বানী মূসাকে উহাদের গভর্নর আহমাদ ইব্‌ন যীদূহকে হত্যা করার দায়ে শাস্তি প্রদান করেন। ১২৮৯/১৮৭২-৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদির-রাহমান তাদলার আরব গোত্রসমূহ ও বানী মূসার বিরুদ্ধে (শ্বা'লা, বানী যেম্‌মূর, বানী উমায়র) সৈন্য প্রেরণ করেন যাহারা তাহাদের গভর্নদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল।

১২৯৫/১৮৭৮-৭৯ সালে সুলতান মাওলায় আল-হাসান এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বানী উমায়র ও বানী মূসার এলাকা লুণ্ঠন করেন। পরের বৎসর তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া আইত আত্তাবকে শাস্তি দেন। তিনি তাদলারই উম্মুর-রাবী'তে ১৩১১/জুন ১৮৯৪ সালে ইনতিকাল করেন। জেলাটির বড় ধর্মীয় কেন্দ্র হইল বুজাদের যাবিয়া যাহা খৃ. ১৬শ শতকে বানী যেম্‌মূর-এর জন্য মুহাম্মাদ আশ-শারকী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ শারকাওয়া (দ্র.)-র গুরুত্বপূর্ণ মুরাবিত-এর সদস্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Leo Africanus, Description de l'Afrique, সম্পা. Schefer, খ. ৫/১, পৃ. ২৮৯-৩১০; (২) Cap. Peyronnet, Tadla, Bull. Soc. Geogr. Alger.-এ প্রকাশিত, ১৯২২-২৩ খৃ.; (৩) J. Cimetiere, Notice sur Bou Djad, R. M. M., ১৯১৩ খৃ., ২৪খ, পৃ. ২৭৭-২৮৯; (৪) E. F. Gantier, Medinat-ou-Dai, Hesperis-এ প্রকাশিত, ৬খ. (১৯২৬ খৃ.), ৫-২৫।

G. S. Colin (E.I.[2]) হুমায়ূন খান

আত-তাদ্‌লীস (التدليس) ঃ উসূলুল হাদীছ শাস্ত্রের একটি পরিভাষা। শব্দটি বাব তাফঈল (تفعيل) -এর মাসদার (ক্রিয়ামূল), ইহার ধাতুমূল د-ل-س যাহার ক্রিয়াপদের অর্থ আলোর সাথে আঁধারের সংমিশ্রণ। হাদীছের পরিভাষায় বিশেষ ধরনের খুঁত গোপন করিয়া সঠিকবোধক ও সবল-দুর্বলে অস্পষ্টতা তথা আলো-আঁধারী সৃষ্টি করাকে তাদ্‌লীস বলা হয় (দ্র. ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, নুযহাতুল-ফিকর, আল-মাকতাবাতুত্‌-থানাবীয়্যা, দেওবন্দ, ভারত, পৃ. ৫২ প.)। মৌলিকভাবে শব্দটিতে দোষত্রুটি ও খুঁত গোপন করার অর্থ রহিয়াছে। ইবনুল-আছীর, নিহায়া নামীয় হাদীছের শব্দকোষ মতে তাদ্‌লীস অর্থ "ব্যবসায়িক পণ্যের ত্রুটি বা দোষ ক্রেতার দৃষ্টি হইতে গোপন করা।" মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় হাদীছের কোন দোষ-দুর্বলতা গোপন করা, যাহা হাদীছের মতন–মূল পাঠ অথবা রাবী পরম্পরা (সিলসিলা) অথবা উৎস তথা বর্ণনাকারীর শায়খ (যাঁহার নিকট হইতে রিওয়ায়াতটি গ্রহণ করা হইয়াছে)-এর সহিত সম্পর্কিত।

তাদ্‌লীস তিন প্রকার ঃ (ক) তাদ্‌লীল ফিল-ইসনাদ-সনদের তাদ্‌লীস, (খ) তাদ্‌লীস ফিল-মাতান ও (গ) তাদ্‌লীস ফিশ-শুয়ূখ। প্রথমটির সাত প্রকার হইতে পারেঃ (১) হাদীছ বর্ণনাকারী যে শায়খ-এর নিকট হইতে সাধারণত হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়া থাকেন তাহার নামযুক্ত সনদ উল্লেখ করিয়া কোন হাদীছ বর্ণনা করেন যাহাতে বুঝা যাইতে পারে যে, এই হাদীছটিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার শায়খ-এর নিকট শুনিয়াছেন। অথচ বাস্তবে তিনি তাহা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার নিকট হইতে শোনেন নাই, বরং এমন কোন ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি এই শায়খ-এর নিকট হইতে (মুদাল্লাস) হাদীছটি শুনিয়াছেন।

(২) হাদীছ বর্ণনাকারী কোন হাদীছের সূত্র, যাঁহাদের মাধ্যমে হাদীছটি তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে, উল্লেখ করেন। কিন্তু এই ধারাবিন্যাসে যাঁহার বা যাঁহাদের দুর্বল হওয়ার ধারণা বা বিশ্বাস থাকে তাঁহার বা তাঁহাদের নাম উহ্য করিয়া দেন কিংবা কোন নাবালেগ বা অনির্ভরযোগ্য রাবীর নাম লোপ করিয়া দেন।

(৩) বর্ণনাকারী (রাবী) তাঁহার নিজের শায়খের নামের সহিত আরও এক বা একাধিক নাম উল্লেখ করেন যাঁহাদের নিকট হইতে তিনি হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণিত হাদীছটি তিনি তাঁহার বা উল্লিখিত অন্যদের নিকট হইতে শোনেন নাই।

(৪) বর্ণনাকালে রাবী حدثنا (আমাদিগের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন) শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্ষণিক বিলম্ব করেন, পরে এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন যাহার নিকট হইতে তিনি হাদীছটি শোনেন নাই।

(৫) যাঁহার হাদীছ পাঠের ক্লাসে বর্ণনাকারী নিয়মিত ছাত্ররূপে উপস্থিত থাকেন নাই তবে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনার (ব্যাপক) ইজযাপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই ইজাযার ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়া দেন।

(৬) বর্ণনাকারী حدثنا বা اخبرنا বলেন না, বরং সনদ উল্লেখ করিয়া নিজের শায়খের নামে হাদীছটি সম্পৃক্ত করেন, যদিও তিনি শায়খ হইতে হাদীছটি শ্রবণ করেন নাই।

(৭) রাবী কোন প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত স্থানের নাম উল্লেখ করেন, যদিও সেই স্থানটি তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐ নামের অন্য কোন স্থান তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি ইহা এইজন্য করেন, যাহাতে লোকের ধারণা জন্মে যে, হাদীছ সংগ্রহের জন্য তিনি দূর-দূরান্ত সফর করিয়াছেন।

(খ) তাদ্‌লীস ফিল-মাতান (মূল পাঠে তাদ্‌লীস) মতন ও মূল পাঠে তাদ্‌লীস হইলে উহাকে মুদ্‌রাজ ফিল-মাতানও বলা হয়, অর্থাৎ মূল পাঠে সংযোজন বা অসংলগ্ন ইবারত প্রবিষ্ট করান। হাদীছ বর্ণনাকালে রাবী উহার মধ্যে নিজের বা অন্য কাহারও কোন কথা অন্তর্ভুক্ত করেন যাহাতে লোকের ধারণা হইতে পারে যে, এই কথাও মূল হাদীছের অংশ। এই ধরনের তাদ্‌লীস নিম্নে বর্ণিত তিন প্রকারে সাধিত হইতে পারে ঃ (১) প্রারম্ভে হইলে المدرج فى اول المتن (২) মাঝে হইলে

المدرج فى وسط المتن (৩) এবং শেষে হইলে তাহাকে المدرج فى اخر المتن বলা হয়।

(গ) তাদ্‌লীস ফিশ-শুয়ূখঃ ইহা এইভাবে যে, বর্ণনাকারী মুহাদ্দিছ বর্ণনা দেন যে, তিনি 'অমুক' হাদীছটি তাঁহার শায়খ হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু শায়খের ব্যাপক পরিচিত নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু তাঁহার ব্যক্তিনাম কিংবা কোন ডাকনাম (কুন্‌য়া) বা কোন অখ্যাত উপাধি উল্লেখ করেন। তিনি এই আশংকায় ইহা করিয়া থাকেন যে, তাঁহার শায়খ হয়ত বা দুর্বল, তিনি এই তাদ্‌লীসের মাধ্যমে তাঁহার শায়খের সম্ভাব্য ত্রুটি গোপন করিতে চাহেন, যাহাতে শ্রোতারা হাদীছটি প্রামাণিক ও সহীহ মনে করে।

সংযোজন ঃ সিব্‌ত ইবনুল-আজামী (মৃ. ৮৪১/৪৩৮) তাঁহার রচিত আত-তাব্‌য়ীনু লিআসমাইল-মুদাল্লিসীন-এ লিখিয়াছেন, ৩০০ হি. (৯১২ খৃ.)-এর পরে অতি নগণ্য পরিমাণেই তাদ্‌লীসের কোন ঘটনা ঘটিয়াছে। আল-হাশিম (মৃ. ৪০৫/১০১৪) বর্ণনা করিয়াছেন যে, পরবর্তী যুগে মুহাদ্দিছূন-এর মধ্যে তিনি একমাত্র আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান আল-বাগান্দী (মৃ. ৩১২/৯২৪) ব্যতিরেকে অন্য কেহ তাদ্‌লীস করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহেন।

তাদ্‌লীস প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়নকারী হইলেন আবূ আলী হাসান আল-কারাবীসী (মৃ. ২৪৫/৮৫৯)। তাঁহার পরে আন-নাসাঈ (মৃ. ৩০৩/৯১৫), আদ-দারা কুতনী (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫), আল-খাতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩/১০৭১), ও ইব্‌ন 'আসাকির (মৃ. ৫৭১/১১৭৬) প্রমুখ মনীষী এই বিষয়ে কলম ধরিয়াছেন। পরবর্তী লেখকদের (মুতাআখ্‌খিরীন) মধ্যে যাঁহারা এই বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন তাঁহারা হইলেন আয-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৮), আল-আলাঈ (মৃ. ৭৬১/১৩৫৯) প্রমুখ। এই বিষয়ে রচিত পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আয-যাহাবী তাদ্‌লীস বিষয়ে পদ্যে একটি রিসালা লিখিয়াছিলেন (এই রিসালার কিছু অংশ আস-সুব্‌কী রচিত আত-তাবাকাতুল-কুব্‌রা, ৫খ, ২১৮-তে পাওয়া যায়)। এই বিষয়ে আল-আলাঈ গদ্যে কিতাবুল-মুদাল্লিসীন নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি আয-যাহাবীর পুস্তিকায় উল্লিখিত তালিকার সহিত নূতন নামও সংযোজন করেন। আয-যাহাবীর শাগরিদ আল-হাফিজ আবূ মাহমূদ আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-মাকদিসী আয-যাহাবীর রিসালার সহিত আল-আলাঈর রচনা হইতে গৃহীত কিছু তথ্য সংযোজন করিয়া উহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। যায়নুদ-দীন আল-ইরাকী (মৃ. ৮০৬/১৪০৩) আল আলাঈর কিতাবের হাশিয়ায় আরও কতিপয় নাম সংযোজন করিয়াছেন। একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে এই ধরনের আর একটি পরিশিষ্ট রহিয়াছে যাহা আবূ যুরআ (মৃ. ৮২৬/১৪২২)-এর নামে সম্পৃক্ত। সিব্‌ত ইবনুল-আজামী শেষোক্ত পরিশিষ্টের সহিত আরও কতিপয় নাম সংযোজন করিয়া আত-তাব্‌য়ীন লিআস্‌মাইল-মুদাল্লিসীন নামে আর একটি পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৯) তাবাকাতুল-মুদাল্লিসীন বা তা'রীফু আহলিত-তাক্‌দীসি লি মারাতিবিল-মাওসূফিয়্যীন বিত-তাদ্‌লীস (تعريف اهل التقديس لمراتب الموصوفين بالتدليس) নামে একখানি কিতাব লিখিয়া উহাতে আরও নূতন নাম সংযোজন করত মুদাল্লিসদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন।

আল-আলাঈর কিতাবে এই ধরনের নামের সংখ্যা ছিল ৬৮। আবূ যুরআ উহাতে আরও ১৩টি নূতন নাম যুক্ত করিয়াছেন। সিব্‌ত ইব্‌নুল-আজামীর সংযোজিত নামের সংখ্যা ৩২ এবং ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী আরও ৩৯টি নাম যোগ করিয়াছেন। এই সকল সংযোজনের সম্মিলিত সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৫২। ইব্‌ন হাজার তাঁহার তাবাকাতুল-মুদাল্লিসীন কিতাবে এই মুহাদ্দিছগণের একটি বিশদ তালিকা প্রদান করিয়াছেন, যাহা ১৩২২ হিজরীতে মিসরে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই বিষয়ে 'আল্লামা নাওয়াবী ও শায়খ আবদুল-হাক্‌ক মুহাদ্দিছ দিহলাবীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁহাদের মতে ইহা মাক্‌রূহ। মুদাল্লিসের রিওয়ায়াত গ্রহণে আলিমগণ মতভেদ করিয়াছেন। মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের একটি দল এই অভিমত পোষণ করিয়াছেন যে, তাদ্‌লীস একটি 'জারহ', হাদীছের জন্য খুঁত ও অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ এবং ইহাতে অভ্যস্ত ব্যক্তির হাদীছ নিঃশর্তরূপে অগ্রাহ্য হইবে। পক্ষান্তরে কাহারও কাহারও মতে উহা গ্রহণযোগ্য। তবে জামহূর মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের অভিমত এই যে, যাঁহার সম্বন্ধে এই মর্মে অবগতি থাকিবে যে, তিনি শুধু আস্থাভাজন (ثقة) শায়খ হইতে বর্ণনাকালেই তাদ্‌লীস করিয়া থাকেন, যেমন ইব্‌ন উয়ায়না —তাঁহাদের তাদ্‌লীস (যুক্ত রিওয়ায়াত) গৃহীত হইবে। আর যাঁহারা সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সকলের নিকট হইতে রিওয়ায়াতে তাদ্‌লীস করেন তাঁহারা স্পষ্টত সরাসরি শ্রবণ জ্ঞাপক শব্দযোগে বর্ণনা না করিলে তাঁহাদের রিওয়ায়াত গৃহীত হইবে না। প্রথম যুগের মুহাদ্দিছগণ কোন অসৎ উদ্দেশ্যে তাদ্‌লীস করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের তাদ্‌লীস শাস্ত্রীয় অপরাধ নহে। পক্ষান্তরে পরবর্তী সময় কিছু স্বার্থান্বেষী ও বিদআতীরা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া তাদ্‌লীসের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাদের তাদ্‌লীসই জঘন্য অপরাধ এবং ইহাদের বর্ণিত রিওয়ায়াত পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাফরুল-আমানী ফী মুখতাসারিল-জুরজানী (ظفر الامانى فى مختصر الجرجانى), পৃ. ২১৩ প.; (২) J. A. S. B., ১৮৫৬ খৃ., পৃ. ২১৮, ২খ., ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১ প.; (৩) স্যালিসবারী (Salisbury), J. M. O. S., ৭খ, ১৮৬২ খৃ., পৃ. ৯২, ১.; (৪) Risch, Commentar des Izz ad-Din uber d. Kunstausdrucke der Traditions wissenschaft nebst Erlauterungen (লাইডেন ১৮৮৫ খৃ.), পৃ. ২০; (৫) Springer, Mohammad, ৩খ, ৯৯; (৬) Goldziher, Muhammedanische Studien, ২খ, ৪৮; (৭) তাহানাবী, ১খ, ৪৮১; (৮) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, নুযহাতুন-নাজার ফী তাওদীহি নুখবাতিল- ফিকার, আল-মাক্‌তাবাত-থানাবীয়্যা, দেওবন্দ, ভারত; (৯) আস- সায়্যিদ আশ-শারীফ, আলী আল-জুরজানী আর-রিসালা ফী ফান্‌নি উসূলিল-হাদীছ, জামিউত-তিরমিযীর শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ মুদ্রিত, কুতুবখানাহ-ই রাশীদিয়াহ, দিল্লী; (১০) আল্লামা আন-নাওয়াবী, আল-মুকাদ্দিমা, (শারহ সাহীহ মুসলিম-এর ভূমিকা–মুসলিম শরীফের শুরুতে মুদ্রিত), পৃ. ১৮; (১১) শায়খ আবদুল-হাক্‌ক মুহাদ্দিছ দিহলাবী, ফী বায়ানি বা'দ মুসতালাহাতিল-হাদীছ, মুকাদ্দিমা, মিশকাতুল-মাসাবিহ-এর শুরুতে মুদ্রিত।

হিদায়াত হুসায়ন (দা. মা. ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

তাদাল্লীস্/তাদেল্লীস্ (تدليس/تدلس) ঃ দেলিস-Dellys, আলজিরীয় উপকূলবর্তী একটি শহর, রাজধানী আলজিয়ার্সের ৭০ মাইল পূর্বে, কাবিলিয়া এলাকার প্রধান নদী যেবাউর মোহনা হইতে ৪ মাইল পূর্বে অবস্থিত; ইহা কেপ বিউগুত (Cape Beugut) পর্যন্ত প্রসারিত পর্বত-স্তূপ কাবিলিয়া হইতে শহরটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ৫৫°২০ উত্তর অক্ষাংশ ও ৩৩°৫৫′ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত এই শহরটি দুইটি ভিন্ন মহল্লায় বিভক্তঃ দেশী বা আলজিরীয়

মহল্লা, এই রাস্তাগুলি সংকীর্ণ। আর য়ূরোপীয় মহল্লা—সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৭৫ ফুট উচ্চ একটি মালভূমি এলাকায় নির্মিত সুবিন্যস্ত ভবনশ্রেণী। মালভূমি এলাকাটির নিম্নভাগে অবস্থিত পোতাশ্রয়টি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহের প্রচণ্ডতা হইতে সুরক্ষিত বলিয়া এইখানে জাহাজগুলি বেশ নিরাপদে নোঙর করিতে পারে। কিন্তু এইখানে খুব কম সংখ্যক ছোট বাণিজ্য জাহাজই ভিড়িয়া থাকে। ইহার চতুর্দিকস্থ গ্রামীণ এলাকা দীর্ঘ বৃক্ষরাজি ও সযত্নে লালিত বাগ-বাগিচায় আবৃত। ইহার মোট লোকসংখ্যা মাত্র ৩,৮৮৪; তন্মধ্যে ২,৫০৮ জন স্থানীয় বাসিন্দা। ইহা কাবিল (Kabyl) বংশোদ্ভূত, তবে ঐ অঞ্চলটির বেশীর ভাগ উপজাতিগুলির ন্যায় ইহারাও শুধু আরবী ভাষায় কথা বলে।

রোমান আমলে দেলিসের অবস্থানস্থল দখল করিয়াছিল রুসুকুরু নামক শহরটি, ইহার কতিপয় নিদর্শন (তথা প্রাচীর, চৌবাচ্চা, ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ) আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরব বিজয়ের সময় সম্ভবত শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার পর বহুকাল ইহা জনবসতিবিহীন ছিল। আল-বাক্‌রী (Description de l'Afriqe, অনু. de Slane, p. 135) মারসাল্-হাজ্জাজ-এর পূর্বে অবস্থিত একটি বন্দরের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহার নাম দিয়াছেন বানী জান্নাদের শহর, কিন্তু এই স্থানটির সহিত দেলিস অপেক্ষা কেপ জিনেত (জিনেত অন্তরীপ)-এর অধিক মিল রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

হাম্‌মাদী (তু. হাম্‌মাদী বংশ) নৃপতিগণ বুগি শহরের রাজধানী স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত দেলিস নামের ছাদাল্লাস্‌ত [Thadellast] ও ছাদেল্লিস্‌থ [Thadellisth] ("কুটিরগুচ্ছ")-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। না। দেলিসের বিশেষ অবস্থানের দরুন সিবাউ উপত্যকার অধিবাসীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন সহজ হওয়ায় ক্ষুদে শহরটি বেশ কিছুটা বাণিজ্যিক ও সামরিক গুরুত্ব অর্জন করে; হাম্‌মাদী শাসনামলে এইখানে একজন গভর্নরও নিযুক্ত হন (৪৯৬/১১০২-৩ সালে সুলতান আল-মানসূর আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণকারী জনৈক আলজিরীয় শাহযাদাকে এই পদটি প্রদান করেন)। ইদ্‌রীসী (পৃ. ১০৪) তাদাইলীসকে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত মজবূত প্রাচীরবেষ্টিত একটি শহররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূমির উর্বরতা, জীবনযাত্রার স্বল্প ব্যয় এবং গবাদি পশুর প্রাচুর্যের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; শহরের সন্নিহিত অঞ্চলে এইসব পশু রফতানী করা হইত। হাম্‌মাদী বংশের পতনের পর দেলিস্ শহরটি আল-মুওয়াহ্‌হিদূন বংশের অধীনে চলিয়া যায় এবং য়াহ্‌য়া ইব্‌ন গানিয়া ইহা অধিকার করেন (৬২২/১২২৬-২৭)। অতঃপর ইহার অধিকার লইয়া আল-মুওয়াহ্‌হিদূন, য়ায়্যানী, হাফ্‌সী ও মারীনীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং ১৩৯৪ খৃ. মারীনীরা শহরটি অধিকার করে। লিও আফ্রিকানাসের (Leo Africanus) বর্ণনামতে (BK. iv., অনু. Schefer iii, 69) খৃ. ১৫শ শতাব্দীতে দেলিস্ শহর আলজিয়ার্সের সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিল। সমুদ্র উপকূলবর্তী সব শহরের ন্যায় দেলিসেও স্পেন হইতে বেশ কিছু মুহাজিরের আগমন ঘটে। তাহারা শহরটির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবশ্যই নিজেদের অবদান রাখিয়াছে। লিও আফ্রিকানাস্ (পূ. স্থা.) বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা কাপড় রং করার কাজ করিত। তাহারা সফল ব্যবসায়ী এবং দক্ষ বীণাবাদক হিসাবে সুনামের অধিকারী। দেলিসবাসীদের বেশভূষা সম্পর্কে তিনি বলেন, তাহারা জাযাইরবাসীদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করিত। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে আলজিরীয়রা স্পেনের বশ্যতা স্বীকার করিলে দেলিসবাসিগণ তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, কিন্তু ১৫১৭ সালে আরূজ (দ্র.) ইহা পুনর্দখল করেন। তুর্কীরা দেলিসে একটি স্থায়ী সেনাদল মোতায়েন করে এবং শহরটিকে সেবাউ উপত্যকার উপজাতিগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে থাকে। দেলিসবাসী সমুদ্রপথে আলজিয়ার্সের সহিত সদাসর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলেও তুর্কী শাসনাধীনে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয়, একঘেয়ে জীবন যাপন করিত। ৭ মে, ১৮৪৪ সালে যখন ফরাসীরা শহরটি দখল করে তখন ইহা একটি দুর্দশাগ্রস্ত পল্লীর পর্যায়ে অবনমিত হইয়া গিয়াছিল। দুই বৎসর পরে এইখানে একটি য়ূরোপীয় মহল্লা স্থাপিত হয়। কাবিলীয়া ফরাসী দখলে চলিয়া যাওয়ার পর তেইযি উযন [Teizi Uzon] ও ফোর্ট ন্যাশন্যালে [Fort National] সামরিক সদর দফ্‌তর স্থানান্তরিত হইলে দালিসের উন্নয়নের পথ রুদ্ধ হয়। ১৮৭১ খৃ. গণবিদ্রোহের সময় স্থলভাগের দিক হইতে কাবিলীয়রা দেলিস অবরোধ করে (এপ্রিল-মে), কিন্তু সমুদ্রপথে ইহা নিজস্ব যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখে, যাহাতে অভ্যুত্থানকারী বিদ্রোহীরা ইহা দখল করিতে ব্যর্থ হয়। ইহার পর শহরটির শান্তি-শৃঙ্খলা আর বিঘ্নিত হয় নাই বটে কিন্তু সীমান্ত এলাকায় অবস্থান ও যোগাযোগের অসুবিধার দরুন শহরটির জীবনে গতি সঞ্চার হয় নাই এবং এইখানে ব্যাপক য়ূরোপীয়ানদের বসতিও গড়িয়া উঠে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) S. A. Boulifa, Le Djurjura a travers l'histoire, Algiers 1925; (২) Robin, Notes sur Porgantsation militaire des Turcs dans la Grande Kabylie (R. Afr., 1873); (৩) আরও তু. Algeria ও Kabylia নিবন্ধদ্বয়ের গ্রন্থপঞ্জী।

G.Yver (E.I[1])/শায়খ ফজলুর রহমান

তান্‌গা/তান্‌গ্‌চা ঃ TANGA or TANGCA, একটি ক্ষুদ্র রৌপ্য মুদ্রা। ইহা ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষে ও ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রধান মুদ্রা ছিল। ইহার ওজন ছিল ২০ হইতে ৩৫ গ্রেন (১.৩-১.৯৫ গ্রাম)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরবর্তীতে এই মুদ্রাটি অংকন (mint) করিয়াছিলেন ঈলখানীগণ, Golden Horde-এর খান শাসকগণ, ক্রিমিয়া (Crimea)-র প্রথম দিককার খান শাসকগণ ও প্রথম দিকের তীমূরীগণ। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে মোঙ্গলদের নিকট হইতে রুশগণ এই মুদ্রাটি ও ইহার মূল্যমান গ্রহণ করে এবং তখন ইহার নাম হয় 'ডেনগা'। ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত রাশিয়ার ' ডেনগা' (পরবর্তী কালে তামা দ্বারা) মুদ্রিত হইত। তান্‌গা শব্দটি প্রায় ৫০ গ্রেন (৩.২৫ গ্রাম) ওজনের ক্ষুদ্রাকার রৌপ্যমুদ্রার নাম হিসাবে মধ্য এশিয়ায় টিকিয়া থাকে। এই মুদ্রাটি মুদ্রিত করাইতেন গত শতাব্দী পর্যন্ত পারস্যের শাহগণ, খোকান্দ-এর খান শাসকগণ ও বুখারার আমীরগণ। তান্‌গা তুর্কী শব্দ তাম্‌গা-এর সহিত সম্পৃক্ত, যাহা একটি সরকারী পদবীর প্রতীক বা একটি ছাঁচ (তু. সিক্কা-سكة) কিন্তু ভারতীয় তংকা (দ্র.)-এর সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

J. Allan (E.I[1])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

তান্‌জিয়ার (تنجير) ঃ প্রাচীন তিনজিস (Tingis), আরবী তানজা (طنجة) (প্রাচীন জাতিগত তানজী; আধুনিক জাতিগত তানজাবী) মরক্কোর একটি শহর। ইহা Spartel অন্তরীপের ৭ মাইল পূর্বে, যেইখানে আটলান্টিক উপকূলের শুরু, জিব্রাল্টার প্রণালীর তীরে অবস্থিত। শহরটি পূর্ব দিকে মালাবাতা অন্তরীপ (রা'সুল-মানার) এবং পশ্চিম দিকে দুর্গ (কাসবা) দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি উৎকৃষ্ট উপসাগরকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমুদ্রের দিকে ইহার ঢালগুলি স্থানবিশেষে মোটামুটি

খাড়া। শহরটি প্রাচীরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় বিভক্ত। প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগের ১৪টি আবাসিক এলাকা সমন্বয়ে প্রকৃত শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে (মাদীনা, অধিক প্রচলিত মদীনা) প্রাচীরের বাহিরের প্রধান আবাসিক এলাকাগুলির মধ্যে সিদি বুক নাদেল (সায়্যিদী আবূ কানাদীল), মারশান (সমুদ্র বরাবর শহরটির পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত ১,৩০০ গজ দীর্ঘ একটি বৃহৎ মালভূমি), এদ্-দ্রাদের (আদ-দারাদির অর্থাৎ 'ঢালসমূহ'), হাসসূনা, সূক আল-বাররা, সুফাসিল (আস-সাফাসিফ, "ঝাউ বন" বা সানফ্রানসিস্কো), আল-মসাইলা (আল-মুসাল্লা), আস-সুওয়ানী (আল-সুওয়ানী, the norias) প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। তানজিয়ারের অব্যবহিত নিকটবর্তী এলাকায় তানজিয়ারের ফাহস গোত্রের সরল ও সাদাসিধা লোক দ্বারা অধ্যুষিত শারফ এবং তানজা আল-খালিয়্যা গ্রাম দুইটি অবস্থিত। শহরটিতে তুলনামূলকভাবে মসজিদ স্বল্প সংখ্যক। এইগুলির মধ্যে সাতটি জামে' মসজিদ এবং ছয়টি স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন মসজিদ রহিয়াছে। প্রধান মসজিদটি পর্তুগীজ আধিপত্যের সময় গির্জায় পরিণত করা হইয়াছিল। ১৬৮৪ খৃ. মুসলিমগণ কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর পুনরায় ইহা মসজিদে পরিণত হয়। প্রকৃত অর্থ শহরটি প্রস্তর নির্মিত ২,০০০ গজের অধিক দীর্ঘ দুর্গ প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। অধিকাংশের মতে ইহার নির্মাণকার্য পর্তুগীজ আধিপত্যের সময় (১৪৭১-১৬৬১ খৃ.) হইতে শুরু হয়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে ইহা মেরামত করা হয়। দুর্গ প্রাকারের গাত্রে কয়েকটি তোরণ স্থাপন করা হইয়াছে যেইগুলির অধিকাংশই আধুনিক কালের। দুর্গ প্রাকারের উভয় পার্শ্বের বুরূজ (বোরজ)-সমূহ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। উহাদের মধ্যে য়ূরোপে নির্মিত ২৯টি ব্রোঞ্জনির্মিত কামানসহ বোরজ আল-নাআম, আইরিশ বুরূজ, বোরজ দারুল-বারূদ (ইংরেজ আমলের ইয়র্ক-ক্যাসল) ও বোর্জুস-সালাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিসৌধগুলির মধ্যে রহিয়াছে দুর্গের পূর্বাংশে অবস্থিত শারীফী রাজপ্রাসাদ। এই স্থানেই কয়েক শতাব্দী যাবত শহরটির প্রশাসন সংস্থা অবস্থিত রহিয়াছে। ইংরেজগণ তাহাদের আধিপত্যকালে ইহাকে Upper Castle বলিত। এই Upper Castle-এর ধ্বংসস্তূপের উপরেই খৃ. ১৭৪৩ সনের পূর্বে পাশা আহমাদ ইব্ন আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ আত-তামসামানী আর-রীফী কর্তৃক বর্তমান প্রাসাদটি নির্মিত হয়। এই বৎসরেই আল-কাসরুল-কাবীর (দ্র. আলকাযার কুইভার)-এর নিকটে এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

তানজিয়ারে বর্তমানে প্রায় ৫০,০০০ অধিবাসীর একটি মিশ্রিত জনসংখ্যা রহিয়াছে, যাহাতে ৩০,০০০ মুসলিম, ১২,০০০ য়াহূদী এবং একটি য়ূরোপীয় উপনিবেশ রহিয়াছে। উপনিবেশটিতে অতি সাম্প্রতিক কালের পূর্ব পর্যন্ত স্পেনীয়গণ প্রভাবশালী জনসংখ্যারূপে পরিগণিত হইত। খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে শহরটি মরক্কোর সুলতানের দরবারে প্রেরিত বিদেশী প্রতিনিধিদের আবাসস্থল ছিল। শারীফী সাম্রাজ্যে অবস্থানরত রাষ্টদূতদের কর্মস্থল হিসাবে ইহার যে ভূমিকা রহিয়াছে তাহা ইহাকে একটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। বর্তমানে ইহা এই নামে একটি আন্তর্জাতিক এলাকার প্রধান কেন্দ্র; সম্প্রতি এই এলাকার গুরুত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

তানজিয়ারের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কাহিনী চালু রহিয়াছে। এইখানে সেইগুলি বর্ণনা করার অবকাশ নাই। সর্বপ্রথম ফিনিসীয়গণ এই স্থানটি সম্পর্কে অবগত হয় এবং এইখানে বসতি স্থাপন করে। ইহার পর প্রাচীন কার্থেজ নগরের ঔপনিবেশিকগণ ইহার সম্পর্কে অবগত হয় এবং এইখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। Hanno (৫৩০ খৃ. পূ.)-এর পেরিপ্লাস-এ তানজিয়ারের উল্লেখ আছে। প্রতীয়মান হয় যে, বিভিন্ন সময় শহরটি ছোট ছোট রাজার রাজধানী ছিল। এই সকল রাজার মধ্যে প্রধান একজন ছিলেন প্রথম বোক্কুস (আনু. ১০৫ খৃ. পূ.)। তৃতীয় বোককুস (খৃ. পূ. ৩৮ সনে)-এর রাজত্বকালে ইহা একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এবং রোমকগণ কর্তৃক মুক্ত নগরী বলিয়া ঘোষিত হয়। অতঃপর ক্লকিয়াস (খৃ. পূ. ৪২৭)-এর রাজত্বকালে Julia Traducta নাকে ইহাকে Colonia-এর মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং Mauretania Tingitania-এর রাজধানীতে পরিণত করা হয়। ২৯১ খৃ. Dicoletian-এর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারকালে Mauretania Tingitania যখন Dretica-এর বিশপের এলাকার সহিত যুক্ত হয় তখন তানজিয়ার বেসামরিক প্রশাসনের জন্য একজন Comes ও একজন Praeses-এর আবাসস্থলে পরিণত হয়। অতঃপর তানজিয়ার বায়যানটাইনের শাসনাধীনে চলিয়া যায়। কিন্তু কন্সটান্টিনোপলের সম্রাটের প্রতিনিধির বাসভবন সিউটা (Ceuta)-তে থাকিয়া যায়।

খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তানজিয়ার মুসলিম শাসনাধীনে আনীত হয়। ইহা বিখ্যাত সেনাপতি মূসা ইব্ন নুসায়র (দ্র.) কর্তৃক অধিকৃত হয়। তিনি তাঁহার সেনাপতিদের একজন, তারিক ইব্ন যিয়াদ্ আল-লায়ছী (দ্র.)-র হাতে ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে শহরটির নিকটবর্তী একটি স্থানে সমবেত করেন যে বাহিনী ৭১১ খৃ. সিউটা হইতে স্পেনে প্রথম মুসলিম অভিযান পরিচালনা করেন। প্রাচ্যের খলীফাদের দ্বারা নিযুক্ত শাসনকর্তাদের শাসনামলে তানজিয়ার Grand Atlas পর্যন্ত মরক্কোর রাজধানীতে পরিণত হয় এবং এই কারণে আস-সূসুল-আকসা (দ্র.)-এর পরিবর্তে আস-সূসুল-আদনা এই নামটি প্রচলিত হয়। তানজিয়ারে ৭৩২ খৃ. যে প্রথম শাসনকর্তা নিজের বাসস্থান স্থাপন করেন তিনি ছিলেন উমার ইব্ন উবায়দিল্লাহ আল-মুরাদী। অল্প কাল পরে তানজিয়ারের নিকটবর্তী উপকণ্ঠে মায়সারার বিদ্রোহ শুরু হয়। মায়সারা ছিলেন বার্বার জাতির লোক। তিনি খারিজী বিদ্রোহের সুযোগে মরক্কোকে আরব শাসন হইতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বার্থে বহু সংখ্যক অনুগামীকে ব্যবহার করিতে সক্ষম হন এবং ৭৪০ খৃ. তানজিয়ার অধিকার করেন। তাঁহার সৃষ্ট গোলযোগ ৭৮৫ খৃ. পর্যন্ত চলিতে থাকে।

১ম ইদ্রীস পূর্বাঞ্চল হইতে আগমন করিয়া এই তানজিয়ারেই আশ্রয় গ্রহণ করেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অভিমত প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সমগ্র দেশের অধিপতি হন। শহরটির অবস্থান যথেষ্ট কেন্দ্রীয় নহে বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তিনি ইহাকে কখনও তাঁহার রাজধানী করার চিন্তা করেন নাই। ফলে তানজিয়ার মরক্কোর প্রধান শহর হিসাবে ইহার মর্যাদা হারায়। আর কখনও তানজিয়ার ইহার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয় নাই। ৮২৯ খৃ. ইদ্রীসীদের রাজত্ব দাবিদারদের মধ্যে বণ্টন করা হইলে তানজিয়ার আল-কাসিমের অধিকারে যায়। অল্প কাল পরে তিনি তাঁহার ভ্রাতা উমার কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। খৃ. ৮৩৫ সনে উমার ইনতিকাল করেন। মরক্কোর সমগ্র উত্তর-পশ্চিম এলাকা ইতিপূর্বেই এই শাসকের হাতে চলিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পিতা হইতে পুত্র ক্রমে এক শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া প্রায় স্বাধীনভাবে স্পেনের উমায়্যা খলীফাদের সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হয়। তাঁহারা এই স্থানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, যাঁহাকে যুগপৎ মরক্কোর, যাহার মর্যাদা এই সময়ে কর্ডোভার একটি সামন্ত অঞ্চলে অবনত হইয়াছিল, প্রশাসনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইদ্রীসী বংশীয় আলী ইব্ন হামমূদ খলীফা সুলায়মান আল-মুস্তাঈন বিল্লাহ কর্তৃক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইহা ঘটে ১০১৬ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহের পূর্বে, যে বিদ্রোহ

তাঁহাকে কর্ডোভার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করে। উমায়্যা খিলাফাতের শেষদিকে সকল বিদ্রোহই এই তানজিয়ার নিকটবর্তী সিউটা ও দেশীয় বার্বার সম্প্রদায়ের উপর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে এবং প্রণালীর অপর পারে কি ঘটিতে যাইতেছে তাহার উপর বারবারগণের সদা সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য হাম্মূদীদের শুধু নামমাত্র অধিপ্রভুত্বের অধীনে তানজিয়ারের বারগাওয়াতা (দ্র.) গোত্রের রিয্কুল্লাহ্‌কে ও সিউটাতে সুক্কূতকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

আল-মুরাবিতগণ কর্তৃক ৪৭০/১০৭৭ সালে তানজিয়ার অধিকৃত হয়। এই স্থানেই ১০৯০ খৃ. স্বনামধন্য আল-মু'তামিদ (দ্র.) অবতরণ করেন। তিনি ছিলেন Seville-এর আব্বাদী বংশের শেষ ব্যক্তি। তিনি য়ূসুফ ইব্‌ন তাশফীন কর্তৃক মরক্কোতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। আলমুরাবিত বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শহরটি আল-মুওয়াহহিদ বংশের অধিকারে চলিয়া যায়। প্রথম খলীফা আব্‌দুল-মু'মিন ইব্‌ন আলী (দ্র.)৫৪২/১১৪৭ সালে ইহা অধিকার করেন। বংশটির শাসনকালের পূর্ণ সময় শহরটি একটি উন্নতিশীল শহর হিসাবে এবং স্পেনের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে খুব ব্যস্ত একটি বন্দর হিসাবে ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখে।

উত্তর-পশ্চিম মরক্কোর অবশিষ্টাংশের ন্যায় আল-মুওয়াহহিদদের পতনে মারীনী বংশের শাসন তানজিয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। সিউটার বানুল-আযাফী বংশের স্থানীয় রাজাদের শাসনাধীনে চলিয়া গেলে তানজিয়ার আবুল-হাজ্জাজ য়ূসুফ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনিল-আমীর আল-হামাদানীকে ইহার প্রধান নেতারূপে গ্রহণ করে। তিনি নিজেকে প্রথমে ইফ্‌রীকিয়ার হাফসীদের এবং পরে পূর্বাঞ্চলের আব্বাসীদের সামন্ত হিসাবে ঘোষণা করেন, এবং ৬৬৫ (১২৬৬-১২৬৭ খৃ.) হিজরীতে নিহত হন। মারীনী সুলতান আবূ য়ূসুফ য়া'কূব ইব্‌ন আবদিল-হাকক কর্তৃক তিন মাস অবরোধের পর তানজিয়ার অধিকৃত হয়। পরবর্তী শতাব্দী ছিল শহরটির জন্য গোলযোগের কাল এবং ইহা মারীনী সাম্রাজ্যের শেষ যুগ সূচনাকারী বিভিন্ন বিদ্রোহে জড়াইয়া পড়ে।

তানজিয়ার মুসলিম দেশ হওয়ার পর খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রথম বারের মত য়ূরোপীয় রাজ্যসমূহের লোলুপ দৃষ্টি ইহার উপর পতিত হয়। ১৪১৫ খৃ. হইতে সিউটার শাসক ছিল পর্তুগীজগণ, যাহারা ৮৪১/১৪৩৭ সালে স্থলপথে তানজিয়ার অধিকার করার চেষ্টা করে। কিন্তু এই অভিযান ১৪৫৮ ও ১৪৬৪ সালের অভিযানের ন্যায় নিষ্ফল হয়। অবশেষে প্রথম অল্‌ফনসোর রাজত্বকালে ২৮ আগস্ট, ১৪৭১ সালে তাহারা শহরটি অধিকার করে।

তানজিয়ারে পর্তুগীজ আধিপত্য ছিল ১৪৭১ হইতে ১৬৬১ খৃ. পর্যন্ত। প্রায় দুই শতাব্দীকাল পর্তুগীজগণ কর্তৃক অধিকৃত মরক্কোর অন্যান্য স্থানের ন্যায় স্পেনের সহিত পর্তুগাল একীভূত হইবার পর তানজিয়ার ২য় ফিলিপের রাজত্বকালে ১৫৮১ খৃ. নামেমাত্র স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। কিন্তু ইহাতে তাহার নিজস্ব প্রশাসনও পর্তুগীজ সেনাবাহিনী বজায় রাখে। ১৬৪৩ খৃ. পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। একটি বিপ্লবের পর পুনর্বার তানজিয়ার বারগানযা (Barganza) বংশের নূতন পর্তুগীজ রাজা ৪র্থ যোহনের কর্তৃত্ব মানিয়া লয়।

১৬৬১ খৃ. তানজিয়ার রবারগানযার ইনফান্টা ক্যাথেরিনের সহিত দ্বিতীয় চার্লস-এর বিবাহ উপলক্ষে পর্তুগীজ রাজ্যাংশ রাজকুমারীর যৌতুকের অংশ হওয়াতে ইহা পর্তুগীজদের অধিকার হইতে ইংরেজদের অধিকারে চলিয়া যায়। লর্ড স্যাণ্ডউইচের নেতৃত্বে একটি ইংরেজ সৈন্যদল শহরটির অধিকার গ্রহণের জন্য আগমন করে এবং একই বৎসর নভেম্বরের শেষদিকে একটি সৈন্যবাহিনী সেইখানে অবতরণ করে, অপর পক্ষে সৈন্যবাহিনী ও প্রায় সকল পর্তুগীজ নাগরিক তাহাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

তানজিয়ার শহরটি ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত হওয়ার পূর্বে পর্তুগীজগণ সকল প্রকার বিপদের মধ্য দিয়া শুধু নিজেদের অবস্থান বজায় রাখিয়াছিল। জিহাদ-এর একজন নেতা, বানূ গুরফাতে গোত্রের সদস্য, আল-খাদির (আল-খিদর-এর মরোক্কীয় রূপ) গায়লান ইব্‌ন আলীর উৎসাহে শহরের উপকণ্ঠে মুজাহিদদের সহিত অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে বিরতিহীনভাবে বিব্রত থাকিতে হয় এবং প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহারা ইহার অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইংরেজ শাসনাধীনেও একই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। শাসনকর্তা the Earl of Peterborough প্রথমে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুজাহিদদের সহিত একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু শহরটির দুর্গ প্রাকারের নীচে মুসলিমগণ বাধাপ্রাপ্ত হইলে শুধু ১৬৬৩-৬৪ খৃ. এই দুই বৎসর এই সন্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর চুক্তি ভংগ করা হয় এবং নূতন শাসনকর্তা the Earl of Teviot ৩ মে, ১৬৬৪ সালে তানজিয়ারের নিকটে একটি আকস্মিক আক্রমণের শিকার হন এবং তাঁহার ৪০০ জনেরও অধিক সৈন্যসহ তিনি নিহত হন।

দলপতি গায়লান নিজেকে নূতন আলাবী সুলতান মাওলায় আর-রাশীদ (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে একজন দাবিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ তাঁহাকে তাহাদের স্বার্থানুকূল্যে আনিতে সক্ষম হয়। ১৬৬৬ খৃ. তাঁহার ও শাসনকর্তা Baron Bellasyse-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আর-রাশীদের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় গায়লান মরক্কোর উত্তরাঞ্চলে তাঁহার সকল তৎপরতা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। ১৬৭৩ খৃ. এই দলপতির মৃত্যু পর্যন্ত তানজিয়ারে ইংরেজগণ যুদ্ধ তৎপরতা হইতে সাময়িক বিরতি ভোগ করে এবং দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার একটি মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ও একটি প্রকাণ্ড বাঁধ নির্মাণের জন্য এই বিরতিকে কাজে লাগায়। কিন্তু অন্যান্য কারণসহ এই সকল কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা তানজিয়ার অধিকারের বিষয়টিকে ইংল্যাণ্ডে অজনপ্রিয় করিয়া তোলে। এইরূপ অত্যন্ত অনুকূল অবস্থায় আলাবী সুলতান মাওলায় ইসমাঈল শহরটি অবরোধ করিতে মনস্থ করেন। অবরোধটি অন্যূন ছয় বৎসর কাল স্থায়ী হয়। শহরটি অবরোধ করিয়া রাখার জন্য একটি সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ১৬৭৮ খৃ. হইতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অগ্রবর্তী ঘাঁটিসমূহে আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হইতে থাকে। অবরোধটি অতি মাত্রায় মারাত্মক আকার ধারণ করিতে থাকিলে ইংরেজগণ প্রকাণ্ড বাঁধটি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ উড়াইয়া দিয়া শহরটি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৬৮৪ খৃ. ৬ ফেব্রুয়ারী সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণ শেষ শাসনকর্তা লর্ড ডার্টমাউথ (Dart-mouth)-সহ জাহাজে আরোহণ করে এবং তানজিয়ার পুনর্বার একটি মুসলিম শহরে পরিণত হয়।

আবুল-হাসান আলী ইব্‌ন আবদিল্লাহ আত-তামসামানী আর-রীফী নামে মরক্কোবাসী গভর্নর তানজিয়ারের শাসন পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনতিবিলম্বে ইংরেজগণ কর্তৃক ধ্বংস্তূপরূপে পরিত্যক্ত শহরটির পুনর্গঠনে মনোযোগ দিলেন। তিনি ও তাঁহার পর তাঁহার পুত্র অল্প সময়েই গোটা এলাকায় মাওলায় ইসমাঈলের উত্তরাধিকারী মাওলায় 'আবদুল্লাহ্‌কে প্রতিহত করিতে এবং বংশটির

বিরুদ্ধবাদীদের আশ্রয় দিতে সমর্থ হইবার উপযোগী পর্যাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। পরবর্তী কালেও প্রায় একই বংশের অন্তর্ভুক্ত তানজিয়ারের শাসনকর্তাগণ সময়ে সময়ে সুলতানদের আধিপত্য অস্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। খৃস্টীয় ১৯শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মাখযেনদের সহিত এই সকল শাসনকর্তার সম্পর্কের ইতিহাসই তানজিয়ারের ইতিহাস।

১৮৪৪ খৃ. ৬ আগস্ট Prince de Joinville-এর নেতৃত্বে পরিচালিত একটি ফরাসী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক তানজিয়ারে গোলা বর্ষিত হয়। আট দিন পরে মরক্কোর সেনাবাহিনী Isly-এর যুদ্ধে পরাজয়বরণ করে। ১৯২৭ খৃ. তানজিয়ার হইতে ফাস ও রাবাত পর্যন্ত একটি রেলপথ চালু হইয়াছে। য়ূরোপীয় শক্তিবর্গ ও মরক্কোর মধ্যে সম্পাদিত পর্যায়ক্রমিক চুক্তিসমূহ এই স্থলে উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয়। এই সকল চুক্তিরই ফলশ্রুতিতে যে সংবিধান রচিত হয় উহা মুতাবিক মরক্কোর স্পেন এবং ফ্রান্স প্রভাবিত এলাকাসহ তানজিয়ার তৎকালে শাসিত হইয়াছে। ১৯৫৬ খৃ. মরক্কো ফরাসী প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় এবং একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমানে তানজিয়ার (তানজা) একটি সমৃদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র ও বন্দর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) "Villes et tribus du Maroc," Documents et renseignements publies par la Section Sociologique de la Residence Generale de la Republique Francaise au Maroc, Paris, 1921-এর সপ্তম খণ্ডে "Tanger et sa zone" শিরোনামে তানজিয়ার সম্পর্কে দলীলাদি, পরিসংখ্যান, চিত্রমালা ও মানচিত্রসহ একটি উত্তম নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; (২) 'Archives Marocaines' Paris 1904-1920-এর মধ্যেও তানজিয়ার সম্পর্কে কিছু সংখ্যক দলীল রহিয়াছে; (৩) পর্তুগীজ আধিপত্যের জন্য প্রধান সমসাময়িক উৎস "D. Fernando de Menezes, Historia de Tangere'. Lisbon 1732; (৪) খৃস্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে তানজিয়ার বহু পর্যটকের ভ্রমণকাহিনীর (প্রধানত ইংরাজী) বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল; (৫) Playfair-এর Bibliography of Morocco, London 1892-এর মধ্যে একটি তালিকা পাওয়া যাইতে পারে; (৬) তানজিয়ারের নাগরিকদের ব্যবহৃত আরবী উপভাষাটি William Marcais-এর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ, Textes arabes de Tanger, Paris 1911-এর বিষয়ে পরিণত হয়। উক্ত গবেষণাগ্রন্থটি Luderitz, Meissner. Blanc, Marchand এবং Kampffmeyer-এর গ্রন্থসমূহের ভিত্তিতে রচিত হয়। এই গ্রন্থগুলিতে ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা ব্যতিরেকে তানজিয়ারের সমাজ ও গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। (৭) World Muslim Gazetteer, Motamar al-Alam al-Islam, Karachi 1985, pp. 448-59.

E. Levi-Provencal (E. I. [1])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

তান্‌জীমাত (تنظيمات) ঃ অর্থাৎ তান্‌জীমাত-ই খায়রিয়া (কল্যাণকর বিধানসমূহ), কথাটির উৎস হইল কানূন তান্‌জীম এতমেক (অর্থাৎ আইনের খসড়া প্রস্তুত করা)। তান্‌জীমাত বলিতে বুঝান হইত কতগুলি সংস্কার ব্যবস্থা যেইগুলি সুলতান আবদুল-মাজীদ-এর রাজত্বের শুরু হইতে তুরস্কের উছমানী সাম্রাজ্যের সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থাতে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং গুলখানের খাত্‌তী-ই শারীফ নামে সাধারণভাবে পরিচিত সনদ দ্বারা উহার উদ্বোধন করা হইয়াছিল। তান্‌জীমাত খায়রিয়া কথাটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায় সুলতান ২য় মাহমূদ-এর শাসনের শেষ বৎসরগুলিতে। ইহার আয়ুষ্কালের শেষ প্রান্ত ধরা হয় খৃ. ১৮৮০ সালের দিকে যখন ২য় আবদুল হামীদ-এর সার্বভৌম শাসন শুরু হয়।

তান্‌জীমাত ছিল সুলতান ৩য় সেলীম ও ২য় মাহমূদ-এর কর্মের ধারাবাহিকতা, উক্ত কর্মতৎপরতা ছিল ভিতরে ও বাহিরে ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়া উছমানী রাষ্ট্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যে। ২য় মাহমূদ দেশের ভিতরে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এবং জেনিসারী বাহিনীর মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাত হইতে রেহাই পাওয়া ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হইলেন, কিন্তু গ্রীস ও মিসর তাঁহার হাতছাড়া হইয়া যায়। তবে তাঁহার কর্মগুলি গঠনমূলক ছিল না। গঠনমূলক করিবার দায়িত্ব তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের জন্য বা উত্তরাধিকারিগণের অধীনস্থ বড় বড় রাষ্ট্রনায়কের জন্য রক্ষিত ছিল। কারণ স্বয়ং সুলতানগণের পক্ষে সংস্কার কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই সেই কাজ সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব বর্তায় তুর্কী কর্মকর্তাগণের মধ্যকার সংস্কারবাদী দলের কর্মকর্তাদের উপর। ১৮৩৯ খৃ. হইতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হইবার সময় পর্যন্ত এই সংস্কার আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন মুসতাফা রাশীদ পাশা (দ্র. মৃ. খৃ. ১৮৫৮) যিনি ছয়বার সাম্রাজ্যের প্রধান উযীর হইয়াছিলেন; দ্বিতীয় পর্যায়ে খাতত-ই হুমায়ূন নামে পরিচিত সনদের উদ্বোধন হয়। ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ সংস্কারবাদিগণের কার্যক্রম পরিচালনা করেন আলী পাশা (দ্র. মৃ. খৃ. ১৮৭১) ও ফু'য়াদ পাশা (দ্র. মৃ. খৃ. ১৮৬৯); তৃতীয় পর্যায়ে ১৮৭১ খৃ. হইতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন সুপ্রসিদ্ধ মিদহাত পাশা (দ্র. মৃ. খৃ. ১৮৮৩)

গুলখান-এর খাতত-ই শারীফ কোন নূতন ধারণার জন্য বিশিষ্ট ছিল না; ইহাতে সুলতান ঘোষণা করেন যে, (১) তখন হইতে তিনি সকল প্রজার সম্মান ও সম্পদের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, (২) খাজনা বৃদ্ধি (ইলতিযাম) রীতি রহিত করা হইবে, (৩) সেনাবাহিনীর জন্য লোক নিয়োগ অধিকতর পদ্ধতিগত করা হইবে, (৪) সকল অপরাধীর বিচার করা হইবে মুক্ত আদালতে এবং বিশেষভাবে বিধিবদ্ধ করা হয় যে, (৫) সকল ধর্মের সকল প্রজা (আহ্‌ল-ই ইসলাম ওয়া মিল্লাতে সাইর) আইনের দৃষ্টিতে সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে, কোন পার্থক্য থাকিবে না। প্রয়োজনীয় আইনগত বিধি-বিধান প্রণয়নের পূর্ব হইতে বিদ্যমান সংস্কার কাউন্সিলকে (মাজলিস-ই আহ্‌কাম-ই আদালিয়া) আরও কয়েকজন সদস্য যোগ করিয়া বড় করা হইবে। দলীলের মুখবন্ধে যদিও বলা হইয়াছিল যে, উছমানী সাম্রাজ্যের পূর্বেকার সমৃদ্ধির মূলে ছিল কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কিন্তু দলীলের শেষ প্রান্তে বলা হয় যে, নূতন ব্যবস্থাসমূহ পুরাতন রীতিসমূহকে (উসূল-ই আতীকা) সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিবে। বস্তুত খাত্‌ত-ই শারীফ প্রণয়নে রশীদ পাশার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ, তথা য়ূরোপীয় শক্তিবর্গকে সন্তুষ্ট করা (তুরস্কের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল, ব্যাপারগুলি, যথা গ্রীক সমস্যার সমাধান, মুহাম্মাদ আলীর সঙ্গে আপোস এবং একই সংগে অভ্যন্তরীণ সরকারের উপর আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা। সাময়িকভাবে সেই যুগ্ম লক্ষ্য অর্জিত হয়। কিন্তু যেইমাত্র সংস্কার বাস্তবায়নের কাজে হাত দেওয়া হয় তখনই নানা সমস্যা দেখা দিতে থাকে। প্রকৃত ব্যাপারটির স্বরূপ ছিল এইরূপ ঃ (১) নূতন প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি রচিত করা হয় য়ূরোপীয় দেশসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিশেষত ফ্রান্সের ব্যবস্থার আদলে এবং সেইগুলি প্রবর্তনের বেলায় রাষ্ট্রের মধ্যে নানারূপ সমস্যা ও ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়; পুরাতন পদ্ধতিতে কখনও তদ্রূপ ভীতিজনক সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। (২) সংস্কার প্রচেষ্টা সম্মুখীন হইয়াছিল চারিটি দলের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের। দলগুলি ছিল ঃ (ক) বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাগণ যাঁহারা পূর্বেকার ব্যবস্থায় সুলতানের

গোলাম ছিলেন, (খ) স্বাধীন মুসলিম প্রজাগণ, তন্মধ্যে উলামা ছিলেন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, (গ) অমুসলিম প্রজাগণ ও (ঘ) বিদেশিগণ। প্রথম দুইটি দলকে সমন্বিত করা কঠিন ছিল না। কারণ ইসলাম তাঁহাদিগকে একত্র করিয়াছিল এবং সুলতান ২য় মাহমূদ ও সুলতান আবদুল-মাজীদ সরকারী কর্মকর্তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুলতান ২য় মাহমূদ সামন্ত (feudal) প্রথার অবসান ঘটাইয়াছিলেন এবং ইহাও মুসলিম সংহতির অনুকূল ছিল। কিন্তু খৃস্টান ও য়াহূদী প্রজাগণকে মুসলিমদের সমান অধিকার প্রদানের ফলে শেষোক্তগণের তথা খৃস্টানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়, দিগ্বিজয়ী সুলতান ২য় মুহাম্মাদ-এর আমল হইতে খৃস্টানগণ যে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল সেই অধিকারে আঘাত লাগে। মুসলিম ধর্মীয় প্রধানগণকে তাঁহাদের অধিকার ও প্রশাসন ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিবার প্রচেষ্টা এবং সেনাবাহিনীতে অমুসলিমগণকে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত সমস্যাবলী অচিরেই প্রমাণিত করিল যে, অমুসলিম জনগণ এই সমানাধিকার প্রদানকে তাহাদের জন্য অবিমিশ্র কোন উপকার বা সুযোগ সৃষ্টি করে নাই বলিয়া মনে করিল এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন মুসলিম সমাজের মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ ও শত্রুতা এই ব্যবস্থায় এবং পূর্বাপেক্ষা বেশী জাগিয়া উঠে। সেই বিভেদ প্রায় ক্ষেত্রেই অমুসলিম ও মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ অপেক্ষা গুরুতর রূপ ধারণ করিতে থাকে। সবশেষে বিদেশিগণ সংখ্যায় কম হইলেও capitulation (জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল শর্তসাপেক্ষে জাতীয় সম্পদ বিদেশী শক্তির হাতে তুলিয়া দেওয়া, যথা তৈল উত্তোলনের অধিকার প্রদান)-এর ফলে প্রাপ্ত অধিকার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভের কারণে তাহারা বরং অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। বিদেশী শক্তিবর্গ এই অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করিত শুধু নিজেদের লাভের জন্যই নহে, বরং অমুসলিম প্রজাগণের স্বার্থ রক্ষাকারী হিসাবেও। যাহাতে অমুসলিমগণ নিজেদের সুযোগ-সুবিধাগুলি রক্ষার সংগ্রামে সফল হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ফ্রান্স capitulation-এর শক্তিতে আর রুশগণ কুচুক কাইনারজি-র সন্ধির ফলে সুযোগ গ্রহণ করিত। সংস্কারের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা। কিন্তু বিপরীতক্রমে বিদেশিগণের বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থান (যাহা extra-territoriality নামে অভিহিত হইত) বিদ্যমান থাকাতে সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন বহুলাংশে অলীক, অবাস্তবই থাকিয়া যাইত। এই কারণেই তানজীমাতের প্রধান প্রধান অসুবিধা প্রজাপুঞ্জের সমস্যাকেন্দ্রিকই থাকে যাহাতে কয়েকটি স্থানে (ক্রীট, বসনিয়া, হারযেগোভিনা, লেবানন ও বুলগেরিয়া) বিদ্রোহ ঘটে এবং বরাবর বিদেশী শক্তিগুলি (তন্মধ্যে ছিল Holy See) হস্তক্ষেপ করে, প্রতিবারই একইরূপ পরিণতি ঘটিত। এই কারণেও খোদ তুরস্কে একটি দলের উৎপত্তি হয়, যাহারা তানজীমাত-কে তুর্কী সাম্রাজ্যের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিতে থাকে। কিন্তু রাশীদ পাশা যে পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। কারণ খোদ পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি এখন আর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (গ্যারান্টি) দিতে পারিতেছিল না। যাহা হউক, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে তানজীমাতের বিরুদ্ধে তেমন কোন বড় প্রতিবাদের কথা শোনা যায় নাই; শায়খুল-ইসলাম খাত্‌ত-ই শেরীফ ঘোষণা পাঠের সময়ে উপস্থিত ছিলেন, যদিও ইহার ফলে যে বিভিন্ন আইন জারি করা হইয়াছিল সেইগুলির অনুমোদনকল্পে তিনি কোন ফাতওয়া প্রচার করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। অপরপক্ষে খোদ সংস্কারবাদী উযীরগণ সর্বদা শারী'আতে বিধিবদ্ধ আইনের কোন ধারা (যথা ইসলামত্যাগীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা আদালতে কোন অমুসলিমের সাক্ষ্য অগ্রহণীয় ইত্যাদি) নাকচ (repeal) করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেন, যদিও যেই সকল ব্যাপারে শারী'আতে কোন বিধান পাওয়া যায় না, তেমন ক্ষেত্রে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে তাহারা সদা প্রস্তুত থাকিতেন।

ফলে খুবই অশান্ত পরিস্থিতির মধ্য দিয়া তানজীমাতকে বাস্তবায়িত করিতে হইতেছিল। উযীর-আযামগণ কদাচিৎ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে কর্মতৎপরতা চালাইয়া যাইতে পারিতেন; হঠাৎ তাঁহারা ক্ষমতাচ্যুত হইতেন এবং প্রায়শ একইরূপে অপ্রত্যাশিতভাবে আবার পূর্ব পদে ফিরিয়া আসিতেন। রাশীদ পাশা ১৮৪৬ হইতে ১৮৫৮ খৃ.-এর মধ্যে ছয়বার উযীর-ই আজাম হইয়াছিলেন, যদিও সুলতান আবদুল-মাজীদ সংস্কারের পক্ষেই ছিলেন। সুলতান আবদুল-আযীয-এর সময়েও একইভাবে প্রধান মন্ত্রী পদে রদবদল হইতে থাকে, যদিও তিনি পূর্ববর্তী সুলতানের তুলনায় অনেক বেশি খেয়ালী প্রকৃতির ছিলেন। মিদ্‌হাত পাশা ১৮৭৩ খৃ. মাত্র তিন সপ্তাহের জন্য উযীর-ই আজাম ছিলেন এবং দ্বিতীয় বারে ছিলেন সাত মাসের জন্য (১৯ ডিসে., ১৮৭৬-৫ ফেব্রু., ১৮৭৭)। এমনও সময় গিয়াছে যখন বিদেশী হস্তক্ষেপের কারণে হঠাৎ নূতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছে, বিশেষত প্যারিস শান্তি সম্মেলনের পূর্ববর্তী আলোচনাকালে অবস্থাটা ছিল সেইরূপ। তুরস্কের মিত্রশক্তিসমূহ তখন চাহিয়াছিল যে, সুলতান একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় তখন পর্যন্ত স্থগিত সংস্কারকর্ম চালাইয়া যাইবার জন্য দায়বদ্ধ হউন। উহার ফলেই ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ খাত্‌ত-ই হুমায়ূন জারি করা হয়, উহা শুধু নামেমাত্র সুলতানের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টা ছিল। ৩০ মার্চ, ১৮৫৬-এর প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী শক্তিসমূহ চুক্তিপত্রের নবম ধারাতে খাত্‌ত-ই হুমায়ূন-এর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কার ভাষায় লিপিবদ্ধ করে যে, উহার ফলে তাহারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। সোজা কথায় খাত্‌ত-ই হুমায়ূন ছিল খৃ. ১৮৩৯ সালে প্রদত্ত অমুসলিম প্রজাগণের সমঅধিকারমূলক প্রতিশ্রুতিরই সুবিস্তারিত অনুমোদনবিশেষ। ইহাতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হয় যে, মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যকার মামলাগুলির বিচারের জন্য মিশ্র বিচারকমণ্ডলী (tribunal) গঠন করা হইবে এবং সেই সংক্রান্ত আইনের ধারাসমূহ যথাশীঘ্র সম্ভব বিধিবদ্ধ করা হইবে। এই চুক্তির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারায় বিদেশী শক্তিবর্গকে তুরস্কের অভ্যন্তরে ভূসম্পত্তি অর্জনের অধিকার প্রদান করা হয়। তাহা সত্ত্বেও খৃ. ১৮৫৬-র পরেও য়ূরোপীয় শক্তিসমূহের হস্তক্ষেপ বন্ধ হয় নাই; খৃ. ১৮৫৯-এ তাহারা য়ূরোপীয় প্রদেশগুলি সংক্রান্ত একটি বিষয়ে তদন্ত দাবি করে। খৃ. ১৮৬৭-তে বৃহৎ শক্তিবর্গ পুনরায় উছমানী সরকারকে কোন ব্যাপারে দায়ী করে, কিন্তু কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেই বিষয়ে শক্তিবর্গ নিজেরাই একমত হইতে পারে নাই; রাশিয়া সর্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণের পদ্ধতি গ্রহণের দাবি করে, ফ্রান্স সকল শ্রেণীর নাগরিককে একীভূত করিবার নীতি গ্রহণে উৎসাহ দান করে। সাময়িকভাবে শেষোক্ত মতটিই বলবৎ হয়। ফলে ফরাসী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য গালাতা সেরাইয়ে-র মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি খোলা হয়। ১৮৭০ খৃ. পরে য়ূরোপের ঘটনাবলীর (ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ) কারণে বৈদেশিক চাপ দুর্বল হইয়া আসে; ঠিক এই সময়টাতে তুরস্কে বিকেন্দ্রীকরণের শক্তিশালী প্রবণতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের ধারাটি বড় শক্তিবর্গ বা প্রজাগণ কাহারও জন্য সন্তোষজনক ছিল না। এই নীতির কিছু পরিমাণ সাফল্যও ছিল, উদাহরণস্বরূপ ত্রিপোলিতানিয়া ও তিউনিসিয়াতে উছমানী শক্তি দৃঢ়তর হয়। প্রতিক্রিয়াটি দীর্ঘকাল অনুভূত হয় নাই। খৃ. ১৮৭৫ সালে স্লাভ প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহের ফলে কন্সটান্টিনোপলে ১৮৭৬ খৃ. য়ূরোপীয় সম্মেলন হয় এবং পরের বৎসর রাশিয়ার সংগে মারাত্মক যুদ্ধের পরিণামে

রুমানিয়া ও সার্বিয়া তুর্কী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রায় স্বাধীন বুলগেরিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় (বার্লিন চুক্তি, ১৩ জুলাই, ১৮৭৯)। তুরস্ক যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করিয়া পূর্বাহ্নে এই হস্তক্ষেপটি ঠেকাইতে চাহিয়াছিল তাহা ছিল, ১৩ ডিসেম্বর, ১৮৭৬ উছমানী শাসনতন্ত্র জারি, সেই দিনটি ছিল য়ূরোপীয় সম্মেলনেরও প্রথম দিন। এই প্রতিষেধকটিকে নূতন সুলতান আবদুল-হামীদ ইতোমধ্যেই অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং ইহা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিতেও পারে নাই। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী মিদ্‌হাত পাশাকে দুই মাস পরে বহিষ্কার করা হয় এবং অল্প দিনের মধ্যে স্বয়ং সুলতান শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পরে সুদীর্ঘ "হামীদিয়া" আমলে সংস্কারকর্ম একেবারে স্থগিত থাকে নাই; ১৮৭৯ খৃ. আইনগুলি, বিশেষত বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং সেইগুলি দ্বারা তানজীমাতের কানুনগুলি পূর্ণতা পাইয়াছিল বলা যায়।

এইবারে বিভিন্ন সংস্কারকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ প্রদান করা হইল ঃ সর্বোচ্চ বিচার কাউন্সিলের (Grand Council of Justice, যাহা তানজীমাতের কাউন্সিল নামেও পরিচিত ছিল), রূপ পরিবর্তন করা হয় কয়েকবার–১৮৫৪ ও ১৮৬১ খৃ.। সবশেষে ১৯৬৮ সালে যখন উহার কার্যাবলী সুনিশ্চিতভাবে দুই ভাগে তথা প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগে বিভক্ত করা হয় অর্থাৎ একটি হইল রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাউন্সিল (Council of State-শূরা-ই দাওলাত, ১৯১৮ খৃ. পর্যন্ত উহার এই কাঠামো বিদ্যমান ছিল), অপরটি হাইকোর্ট (দীওয়ান-ই আহ্‌কাম-ই আদলিয়্যা)। ১৯৩৯ সালের পরেপরেই রাশীদ পাশা ফ্রান্সের নমুনায় প্রদেশগুলিতে নূতন এক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন ও ইলতিযাম রহিত করেন। এই ব্যবস্থা অত্যধিক কেন্দ্রীভূত প্রমাণিত হয় এবং ১৮৫২ সালে গভর্নরগণের ক্ষমতা পুনরায় বৃদ্ধি করা হয়; কৃষিজমি ইজারা দান (farming out) ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তিত হয়। কারণ সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে কর আদায়ের ব্যবস্থায় সরকারের কোষাগারে যথেষ্ট অর্থ জমা হইতেছিল না। ১৮৬৪ খৃ. বিলায়েত বিষয়ক আইন, যাহাকে ১৮৭১ সালের অপর একটি আইন দ্বারা পঙ্গু করা হয়, প্রাদেশিক শাসন পদ্ধতিকে পূর্ণতা প্রদান করে এবং উহা ১৯১৮ খৃ. পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ১৮৬৪ সালের এই আইন আরও একটি কারণে লক্ষণীয়, ইহাতে প্রতিটি প্রদেশে কাদীর বিচারালয় হইতে পৃথক নূতন ট্রাইবুনাল-এর ব্যবস্থা ছিল, যদিও বিচারক প্রায়শ উলামাই হইতেন।

এমন কি ১৮৬৪ সনের পূর্বেও কন্সটান্টিনোপলে ও অন্যান্য বড় বড় প্রাদেশিক শহরে একটি বাণিজ্যিক আদালত এবং উছমানী ও বিদেশীদের মধ্যকার মামলা নিষ্পত্তির জন্য একটি ক্ষুদ্র আদালত বিদ্যমান ছিল। ১৮৬০ খৃ. এই দুই প্রকার আদালতকে একীভূত করা হয়, কিন্তু ১৮৭৫ ও ১৮৭৯ খৃ. আইন পাস হইবার পূর্বে ধর্মনিরপেক্ষ মিশ্র আদালতগুলিকে বিচার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন করা হয় নাই। প্রথম সাধারণ (Common) আইন ছিল ১৮৫০ খৃ. বাণিজ্যিক বিধিমালা (Code); প্রধানত উহা ফরাসী আইনের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল; তদ্রূপ সাধারণ আইন ছিল ১৮৫৮ খৃ. দণ্ডবিধান (Penal Code), ১৮৬৩ খৃ. সামুদ্রিক বাণিজ্যবিধান এবং ১৮৬১ খৃ. বাণিজ্যিক বিধিমালা (Procedure)। অপরপক্ষে ১৮৬৯ খৃ. দেওয়ানী বিধান (المجلة-Civil Code) ছিল সম্পত্তি বিষয়ক এবং অধিকারের নিশ্চয়তা বিধায়ক হানাফী মাযহাবভিত্তিক আইনকে গ্রন্থিত (Codify) করার একটি প্রয়াসবিশেষ। আহমাদ জাওদাত পাশার সভাপতিত্বে একটি কাউন্সিল কর্তৃক গ্রন্থিত এই আইনের ধারাগুলি বাধ্যতামূলক ছিল না, বরং যেই সকল বিচারক মুসলিম আইন অধ্যয়ন করেন নাই তাঁহাদের উহা ছিল সহায়ক বই (manual)-স্বরূপ। রায় বাস্তবায়নের আইন এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন উভয়ই ১৮৭৯ খৃ. প্রণীত হয়, বিদেশী নাগরিকগণ সেইগুলি মানিত না, সেইহেতু মিশ্র আদালতে প্রয়োগ করা হইত না।

বিভিন্ন অমুসলিম সমাজের জন্য আইন প্রণয়ন ছিল অত্যন্ত জটিল কাজ। ১৮৬০ খৃ. প্রকাশিত Organic regulations, যেইগুলি সংখ্যাগুরু অধিবাসীর জন্য বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল, উহার প্রবণতা ছিল প্রশাসনের অ-যাজকীয় শ্রেণীকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান, কিন্তু উহার ফলে যাজক শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। সম্প্রদায়গুলি সাধারণত নিজেদের আইনগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখিয়াছিল। উছমানী সরকারকে প্রায়ই বিভিন্ন সমাজের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করিতে হইত এবং রোমান ক্যাথলিকগণের ও Holy See (পোপ)-এর সহিত 'সংযুক্ত' প্রাচ্য মতবাদিগণের মধ্যকার বিবাদ মিটাইতে হইত। এই ক্ষেত্রেও আবার য়ূরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের সকল সুযোগ ছিল। রাশিয়ার, বিশেষত তুরস্কের গ্রেগরীয় আর্মানী (Gregorian Armenian) গির্জার প্রাধান্যের প্রশ্নে এবং গোঁড়াপন্থী বুলগারদের মধ্যকার দল-উপদলের (Schisms) প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করিত, শেষোক্তগণকে ১৮৭০ খৃ. একটি স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। খৃ. ১৮৫৫ সালে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অমুসলিমগণকেও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হইবে, তখন সরকারীভাবে খারাজ তুলিয়া দেওয়া হয়; তান্‌জীমাতের কালে সেই বিষয়টি চাপা পড়িয়া থাকে। খারাজের স্থলে বাদাল (بدل) নামে একটি মওকূফী কর আরোপিত হয়।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে Capitulations রহিতকরণের যে সকল প্রচেষ্টা প্যারিস কংগ্রেসে শুরু হইয়াছিল তাহা নিষ্ফলই থাকিয়া যায়। ১৮৭৩ খৃ.-এর আইন পাসের সময়ে সামান্য নীতিগত পরিবর্তন করা হইয়াছিল, যাহাতে বিদেশিগণকে তুরস্কের স্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা হইয়াছিল।

১৮৪৫ খৃ. হইতে শিল্পক্ষেত্রে সংস্কার আইনের বিস্তারিত ধারা-উপধারা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত একটি কাউন্সিল (মাজলিস-ই মা'আরিফ) কাজ শুরু করে। উহার সভাপতি ছিলেন ফু'য়াদ পাশা, পরবর্তীকালে জাওদাত পাশা। এই ক্ষেত্রটিতে ধর্মীয় শিক্ষা দানের ঐতিহ্যটির মুকাবিলা করিতে হইয়াছিল। ১৮৪৫ খৃ. একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন সরাসরি প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই, কিন্তু মাধ্যমিক (রুশদিয়্যা) ও প্রাথমিক (ইদাদিয়্যা) বিদ্যালয় স্থাপনের সময়ে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সর্বশেষ যখন গালাতা সারায় নামক স্থানে ১৯৬৮ খৃ. একটি ফরাসী মাধ্যমিক স্কুল (Lycee) স্থাপন করা হয়, যাহাতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফরাসী ভাষা, তখন বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের অজুহাতে প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ১৯শ শতকের শেষাশেষি সময়ের পূর্বে এই ব্যবস্থাগুলি ফলপ্রসূ হয় নাই।

তানজীমাতের কালে গৃহীত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহ ছিল তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা বরাবরই ছিল শোচনীয়। বৈদেশিক ঋণ (১৮৫৪ সাল হইতে) এবং সুলতান আবদুল আযীয-এর অপরিমিত ব্যয় ক্রমেই পরিস্থিতিকে অধিকতর শোচনীয় করিতে থাকে। ফলে জাতীয় ঋণের উপর বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ ঘটে, কিন্তু ১৮৭৯ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিবার পূর্বে এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। ২৮ মুহাররাম, ১২৯৯ (২০ ডিসে., ১৮৮১, দ্র. Young, ৫খ., পৃ. ৬৯) International Council of the Ottoman Debt গঠিত হয়।

তানজীমাতের কাল ব্যাপিয়া তুরস্কের মুসলিমগণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ উদ্যোগ সৃষ্টি হয়। ফলে নূতন তুর্কী সংস্কৃতি রূপ লাভ করে। এই কালেই শিনাসী, নামিক কামাল ও আহমাদ ওয়াফীক প্রমুখ সংস্কারবাদী তাঁহাদের কর্মজীবন যাপন করেন, তাঁহারা তুর্কী সাহিত্যের ভাষাকে নবরূপ দান করেন। এই একই আমলের ছিলেন আহমাদ জাওদাত পাশা যিনি ঐতিহাসিত, সাহিত্যিক ও আইনপ্রণেতা হিসাবে অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তি (দ্র. Fatime Aliye, Ahmad Djewdet Pasha We-Zemani, কন্সটান্টিনোপল ১৩৩২ হি.)। আধুনিক তুর্কী জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক রূপকার যিয়া গোকআল্‌পও স্বীকার করিয়াছেন যে, তুর্কী চিন্তাধারার গঠনে তাঁহার তানজীমাত আমল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল [দ্র. (১) Turk-djulyin Esaslari, আঙ্কারা ১৩৩৯ হি., পৃ. ৬; (২) খালিদা আদীব, Memoirs, লণ্ডন ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১৩৮ প.]।

E. I.[1]-এ প্রদত্ত দীর্ঘ তালিকাটি দেখুন, যাহাতে তানজীমাত-এর অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলির সন-তারিখ ও সূত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃ. পর্যন্ত প্রবর্তিত আইনসমূহের সংকলন (দাস্‌তূর)-এ যেই সকল আইন অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, উহাদের সূত্র হইল Young, Corps de droit ottoman (Oxford 1905-6) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে প্রায় সমুদয় আইনের ফরাসী ভাষায় অনূদিত মূল পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। মূল পাঠ দেওয়া হয় নাই এইরূপ ক্ষেত্রে বন্ধনীতে সূত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় সকল সূত্র গৃহীত হইয়াছে Engelhardt, La Turquie et les tanzimat (Paris 1884) গ্রন্থটি হইতে। যদিও শেষোক্ত গ্রন্থের বিবরণ খুব নিখুঁত নহে, তবে সংস্কারগুলির, বিশেষত প্রথম দিককার সংস্কারগুলির সাধারণ জরীপের চিত্রটিকে পূর্ণাংগ করিবার ব্যাপারে গ্রন্থটি সহায়ক হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রণীত আইনগুলির তুর্কী পাঠ (১) দাস্‌তূর গ্রন্থে রহিয়াছে, ফরাসী অনুবাদের জন্য দ্র. Aristarchi Bey, Legislation Ottomane, কন্সটান্টিনোপল ১৮৭৩-৪ খৃ.; সংযোজন ১৮৭৮ খৃ.; (২) G. Young, Corps de droit ottoman, ১-৬খ, অক্সফোর্ড ১৯০৫-৬ খৃ.; (৩) A. Heidborn, Droit public et administratif de l'Empire Ottoman, Leipzig ১৯০৮ খৃ.। বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে দ্র. (৪) Gabriel Effendi Noradounghian, Recueil d'Actes Internationaux de l'Empite Ottoman, tome ii-iv, প্যারিস ১৯০০-১৯০৩ খৃ.।

তানজীমাত সম্বন্ধে তুর্কী ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ অপ্রতুল। দ্র. (৫) আহমাদ লুত্‌ফী, তারীখ, ৬-৮খ, কন্সটান্টিনোপল ১২৯০-১৩২৮ হি., ব্যাপ্তি হি. ১২৫৫-১২৬৫ সাল পর্যন্ত. (৬) উছমান নূরী, আবদুল-হামীদ ছানী ওয়া দাওর-ই সালতানাত, ১খ., কন্সটান্টিনোপল ১৩২৭ হি.; তানজীমাত বিষয়ে লিখিত কোন গ্রন্থ নাই। য়ূরোপীয় রচনাসমূহে ঃ(৭) Ed. Engelhardt, La Turquie et les tanzimat. vol. i-iii, প্যারিস ১৮৮৪ খৃ.; (৮) Chertier, Les reformes en Turquie, প্যারিস ১৮৬৮ খৃ.; (৯) A. Ubicini, Lettres sur la Turquie, প্যারিস ১৮৫৫ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, La constitution ottoman, প্যারিস ১৮৭৯ খৃ.; (১১) Millingern, La Turquie sous le regne d'Abdul Aziz, প্যারিস ১৮৬৮ খৃ.; (১২) Rosen, Geschichte der Turkei, vol. ii, Leipzig ১৮৬৭ খৃ.; (১৩) Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, vol. v, Gotha ১৯১৩ খৃ.; (১৪) আলী হায়দার মিদ্‌হাত, The Life of Midhat Pasha, লণ্ডন ১৯০৩ খৃ.; (১৫) Padel and Steeg, La Legislation fonciere ottomane, প্যারিস ১৯০৪ খৃ.; (১৬) G. Pelissie du Rausas, Le regime des Capitulations dans l'Empire Ottoman, vol. i, প্যারিস ১৯১০ খৃ.; (১৭) Savvas Pacha, Le Tribunal Musulman, প্যারিস ১৯০২ খৃ.; (১৮) A. Mandelstam, La justice ottomane dans ser rappoats avec les puissances etrangeres, প্যারিস ১৯১১ খৃ. (সংক্ষেপিত)।

J. H. Kramers (E.I.[1])/হুমায়ুন খান

তানতা (طنطا) ঃ নীল নদের Rosetta ও Damietta শাখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী মিসরীয় ব-দ্বীপের একটি রেল জংশন, কর্মচঞ্চল ও অনাকর্ষণীয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শহর যাহা আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত। শহরটি গারবিয়্যা প্রদেশের রাজধানী। ইহার খৃষ্টান-মিসরীয় (Coptic) নাম Tantaoo হইতে আরবী তান্‌দিতা 'তানতা' এবং তানতা রূপের উৎপত্তি। পূর্বে ইহা একটি বিশপ-শাসিত (episcopal) শহর ছিল। বর্তমানে স্থানটি মিসরের মুসলিম সাধকদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতনামা আহমাদ আল-বাদাবী [দ্র.]-এর মাযার ও মসজিদের কারণে বিখ্যাত। বৎসরব্যাপী এই সাধকের কমপক্ষে তিনটি মাওয়ালিদ বা জন্মদিন উৎসব পালিত হয়, যাহাতে প্রকাণ্ড মেলা বসে এবং সকল অঞ্চল হইতে দলে দলে যিয়ারতকারিগণ আগমন করেন। বিপুল সংখ্যক স্থানীয় জনগণের উপস্থিতি এবং স্থানটির প্রতি যে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় তাহাতে ইহা যুগপৎভাবে ধর্মানুরাগ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। যেই সকল স্থানে পূর্বে কোন খৃষ্টান সাধকের প্রতি ভক্তি প্রদর্শিত হইত, পরে তদস্থলে কোন মুসলিম সূফী তাপসের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইতে থাকে, তানতা এইরূপ স্থানগুলির অন্যতম।

বর্তমানে শহরটি নির্মিত হইয়াছে মিসরের প্রাকৃতিক ভূদৃশ্যের বৈশিষ্ট্য, কর্দম কুটিরের পুঞ্জীভূত ধ্বংসাবশেষে গঠিত অসংখ্য স্তূপের একটির উপর। প্রথম আব্বাসের অধীনে পুনঃনির্মিত আহমাদিয়্যা মসজিদটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান ইমারত। বর্তমানে ইহা দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। একটি গ্রন্থাগার ১৯৯৮ খৃ. স্থাপিত হয়। ইহাতে ১,০০০টি পাণ্ডুলিপিসহ প্রায় ৯,০০০ গ্রন্থ আছে। তানতা ইনস্টিটিউটের সহিত জড়িত অধ্যাপকের সংখ্যা ১০০ জনের উর্ধ্বে; ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ২,৬০০ জন। কতিপয় বৃহৎ সরকারী স্কুল ব্যতীত সেইখানে একটি সুসজ্জিত আমেরিকান মিশন হাসপাতাল আছে, কিন্তু শহরের ভিতর দিয়া দুর্গন্ধময় কর্দমাক্ত খাল প্রবাহিত থাকায় জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নুল-জীআন, আত-তুহ্‌ফাতুস-সানীয়া, পৃ. ৮৫; (২) ইব্‌ন দুকমাক, কিতাবুল-ইন্‌তিসার, ৫খ., ৯৪, আরও ৮২; (৩) ইব্‌ন হাওকাল, B. G. A., ২খ, ৯২; (৪) E. L. Butcher, The Church of Egypt, ১খ, ২৬৯; (৫) Van Berchem, C. I. A., ১খ, ৬৮৪; (৬) Amelineau, Geographie de l'Egypte, পৃ. 480; (7) Quatremere, Memoires, ১খ, ৩৫৬ প.; (৮) Boinet Bey, Dictionnaire geographique, পৃ. ৫১৭; (৯) Baedeker, Egypt, index; (১০) Egyptian Government Almanac : Moslem World, July 1917, Jan, 1914; (১১)

Napoleon. Description de l'Egypte, সম্পা. Panckoucke, ১৫খ, ২১৫ প.; (১২) Banchard, in Harvard African Studies, ১৯১৭ খৃ., ১খ, অন্যান্য সূত্র আহমাদুল-বাদাবীতে দ্র.।

J. Walker (E. I. [1])/মুহঃ আবু তাহের

তান্‌তাবী (طنطاوى) ঃ মুহাম্মাদ আয়্যাদ (তাঁহার পূর্ণ নাম আশ-শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন সুলায়মান আয়্যাদ আল-মারহূমী আত-তান্‌দিতাঈ আশ-শাফিঈ) ১৩শ/১৯শ শতাব্দীর একজন আরব বিজ্ঞ 'আলিম। তিনি ১২২৫/১৮১০ সালে নিজ্‌রীদ-এ (মিসরের অন্তর্গত তানতা-এর নিকটে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম) জন্মগ্রহণ করেন এবং সেন্ট পীটার্সবার্গে ২৯ অক্টোবর, ১৮৬১ খৃ. ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ী, যিনি মাহাল্লাত মারহূম-এ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে তাঁহার নিসবা হয় আল-মারহূমী। ছয় বৎসর বয়সে তিনি তানতায় অবস্থিত একটি মক্তবে ভর্তি হন। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি কায়রোতে তাঁহার পিতৃব্যের নিকট গমন করেন এবং আল-আয্‌হারে অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে বিখ্যাত ইব্‌রাহীম আল-বাজুরী-র (মৃ. আনু. ১২৭৬ হি., Brockelmann, G. A. L. ২খ, ৪৮৭) তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব ছিল (দ্র. তান্‌তাবী কর্তৃক তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত কবিতা, A. D., M. G. ৪খ, ২৪৫-২৪৬)। তিনি কবি হাসান আল-আত্তার (মৃ. আনু. ১২৫০ হি.; Brockelmann, পূ. গ্র., ২খ, ৪৭৩, নং ১)-এর নিকটও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক সতীর্থ পরবর্তী কালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু রিফা'আত আত-তান্‌তাবী (Brockelmann, ২খ, ৪৮১, নং ৬), যিনি মুহাম্মাদ আলী পাশা কর্তৃক প্রথম বৈজ্ঞানিক মিশনের (১৮২৫-১৮৩১ খৃ.) দলপতি হিসাবে প্যারিসে প্রেরিত হন, নব্যসাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ইব্‌রাহীম আদ-দাসূকী (১৮১১-১৮৮৩ খৃ.) ছিলেন Lane-এর প্রথম শিক্ষক (Brockelmann, ২খ, ৪৭৮, নং ৪)। ১২৪৩/১৮২৭ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তান্‌তাবীকে তান্‌তায় দুই বৎসর অবস্থান করিতে হয়। সেইখানে তিনি তাঁহার গবেষণা ও পঠন-পাঠনের কার্য অব্যাহত রাখেন। কায়রো প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আয্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্যে যোগদান করেন; সেইখানে তিনি ছিলেন প্রথম সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ আলোচনাকারীদের অন্যতম। তিনি কিছু দিনের জন্য একটি ইংরেজী স্কুলেও শিক্ষক ছিলেন। F. Fresnel-ই প্রথম তাঁহার খ্যাতি সম্পর্কে য়ূরোপীয়দের অবগত করান (তু. F. A., ৩য় সিরিজ, ৫খ, ১৮২৮ খৃ., পৃ. ৬০প.)। তাঁহার পরে বহু তরুণ পণ্ডিত তান্‌তাবীর নিকট অধ্যয়ন করেন (G. Weil, Pruner, A. Perron,R. Frahn, সেন্ট পীটার্সবার্গের এশিয়াটিক মিউজিয়াম-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম পরিচালকের পুত্র)। শেষোক্ত ব্যক্তি রাশিয়ায় তাঁহার খ্যাতি প্রচার করেন এবং ১২৫৬/১৮৪০ সালে Institute des Langues Orientale-এর আরবী ভাষার শিক্ষক হিসাবে সেন্ট পীটার্সবার্গে আহূত হন। ১৮৪৮ খৃ. তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত অধ্যাপক এবং ১৮৫৪ খৃ. সাধারণ অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। রাশিয়ায় তাঁহার শিক্ষার প্রায়ই কোন প্রভাব ছিল না। য়ূরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিতে তাঁহার শিক্ষাদান পদ্ধতি পরিবর্তিত করা হয় নাই। তাঁহার ছাত্রদের (১৮৪০-১৮৪২) মধ্যে অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন বিখ্যাত আরবীয় পর্যটক, পরবর্তীতে Helsingfors-এর অধ্যাপক, ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসী G. A. Wallin (১৮১১-১৮৫২ খৃ.)। তিনি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত আত-তান্‌তাবীর সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন (দ্র. K. Tallquist, Bref och. Dagboksanteckningar of G. A. Wallin, Helsingfors, ১৯০৫ খৃ.)। গুরুতর অসুস্থতার জন্য ১৮৬১ খৃ. আত-তান্‌তাবী ছুটি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং ঐ বৎসরই ইনতিকাল করেন। লেনিনগ্রাদে তাতার সমাধিক্ষেত্রে রুশ ও আরবীতে উৎকীর্ণ শিলালিপিসহ তাঁহার কবরটি অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেন্ট পীটার্সবার্গে গমনের পূর্বে তাঁহার সাহিত্যকর্ম প্রায়ই একচেটিয়াভাবে পুরাতন ধরনের বিদ্যাচর্চায় সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি অনেক নাজম, শাহ্‌র, হাশিয়া ও খাত্‌ম রচনা করেন। ঐগুলি পাণ্ডুলিপি আকারে কায়রো ও লেনিনগ্রাদে (বিশ্বদ্যিালয় গ্রন্থাগারে) রক্ষিত আছে। তাঁহার রচিত এই ধরনের মৌলিক রচনাগুলির মধ্যে ছিল তাঁহার লাযীযুত-তারাব ফী নাজাম বুহুরিল-আরাব (কায়রোতে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত) এবং তাঁহার নিজস্ব ভাষ্যসহ উরজূযা মুশ্‌তাহাল-আলবাব আলা মুনতাহাল-আরাব ফী উলূমিল-ইর্‌ছ ওয়াল-জাব্‌র ওয়াল-হিসাব (Leningrad পাণ্ডু., প্রাচ্য ৮২০)। রাশিয়ায় অবস্থানকালে তিনি তাঁহার কার্যকর গ্রন্থ Traite de la langue arabe vulgaire, লাইপযিগ ১৮৪৮ খৃ. রচনা করেন। ইহাতে অনুশীলনীসমূহ ছাড়াও বহু সংখ্যক পত্র ও স্বরচিত কবিতা আছে (তু. Fleischer's observation's, Z. D. M. G., ১খ, ১৮৪৭ খৃ., ২১২-২১৩; ৩খ, ১৮৪৯ খৃ., ৪৭৪-৪৭৫)। য়ূরোপীয় সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচিতি এবং ফরাসী ভাষায় তাঁহার দখল তাঁহাকে কৌতূহলোদ্দীপক সমালোচনামূলক পর্যালোচনার সামর্থ্য প্রদান করিয়াছিল (তু. E. A., ৪র্থ সিরিজ, ৯খ, ১৮৪৭ খৃ., ৩৫১-৩৫৪; Melanges Asiatiques, সেন্ট পীটার্সবার্গ, ১খ, ১৮৫১ খৃ., পৃ. ৪৭৪-৪৯৫; ২খ., ১৮৫৫ খৃ., ৪৬৬-৪৮৬)। তাঁহার রচিত আরবী ভাষায় অনেক নিবন্ধ তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যমান (উদা. মিসরীয় পর্বসমূহ বিষয়ক একটি নিবন্ধ, পাণ্ডু. Or, ৮৩৮, পত্র ৫০-৬০; মিসরের কথ্য আরবীতে লেখা গল্প ও কাহিনীসমূহের একটি সংকলন, পাণ্ডু. Or. ৭৪৫; Comptes-rendus de l'Academie des Sciences, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ২৩-২৬; তিনি সা'দীর-গুলিস্তা আরবীতে অনুবাদ শুরু করিয়াছিলেন, Comptes-rendus de l'Academie des Sciences de Russie, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১০২ প.); তাঁহার তুহফাতুল-আষকিয়া বি-আখবার বিলাদ রূসিয়া গ্রন্থের ১২৬৬/১৮৫০ সালে স্বহস্তে লিখিত একটি কপি কনস্টান্টিনোপলে পাওয়া গিয়াছে (দ্র. Rescher, Z. S., ৩খ., ১৯২৪ খৃ., পৃ. ২৫২; Comptes-rendus de l'Academie des Sciences, ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১৮১ প.)।

তাঁহার সংগৃহীত বিরাট পাণ্ডুলিপি (আনু. ১৫০) সংগ্রহের জন্য তিনি খ্যাতির অধিকারী; এই সংগ্রহটি তাঁহার মৃত্যুর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে (তু. C. Salemonn ও V. Rosen, Indices alphabetici codicum manuscriptorum Persicoum turcicorumarabicorum qui in Bibliotheca Imperialis Litterarum Universitatis Petropolitanae adservantur, সেন্ট পীটার্সবার্গ ১৮৮৮ খৃ.)। বহু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি তিনি স্বয়ং নকল করিয়াছেন অথবা বিভিন্ন কপি মিলাইয়া সংশোধন করিয়াছেন (তু. Zapiski, ৬খ, ৩৮৪-৩৮৮)। সংগ্রহটিতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সংখ্যা স্বল্প হইলেও ইহাতে অনেক মূল্যবান ও একমাত্র পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, ইহাদের অধিকাংশই মিসরীয় (দ্র. উদা. Zapiski, ২২খ, ২৮৩ প., Zapiski[2], ১খ, ২৯১ প., Comptes-rendus de l'Academie des Sciences, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১০১ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তান্‌তাবীর আত্মজীবনী (তাঁহার রাশিয়ায় অবস্থানকাল পর্যন্ত) Kosegarten, জার্মান অনুবাদসহ প্রকাশ করেন, W. Z. K. M., ৭খ, ১৮৫০ খৃ., ৪৩-৬৩, ১৯৭-২০০; (২) G. Gottwaldt কর্তৃক Z. D. M. G.-তে (৪খ, ১৮৫০ খৃ., ২৪৩-২৪৮) গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন, সংযোজন করা হইয়াছে। য়ূরোপীয় নিবন্ধগুলি অত্যন্ত অপ্রতুল এবং সঠিক নহে (Brockelmann, G. A. L., ২খ, ২৭০); (৩) Huart, Litterature arabe^2, পৃ. ৪২০; (৪) Cheikho, La litterature arabe au XIXe siecle, ২খ, ৫৯; (৫) আহমাদ তীমূর কর্তৃক মাজাল্লাতুল-মাজমা'ইল-ইলমী আল-আরাবী, ৪খ, ১৯২৪ খৃ, ৩৮৮-৩৯১ (Ign.Kratschkovsky কর্তৃক সংশোধিত, ৪খ, ৫৬২-৫৬৪); (৬) মুহিবুদ-দীন আল-খাতীব, আল-যাহ্‌রা-তে, ১খ, ১৩৪৩ হি., ৪১৭-৪২৮ (ছবিসহ), ৫৫৪। সম্প্রতি লেনিনগ্রাদে আত-তান্‌তাবীর পাণ্ডুলিপির বিবরণসহ তাঁহার জীবনীগ্রন্থ Ign. Kratschkovsky প্রণয়ন করিতেছেন।

Ign. Kratschkovsky (E. I.[1])/মুহঃ আবু তাহের

তানতাবী, শায়খ (طنطاوى شيخ) ঃ ইব্‌ন জাওহারী আল-মিসরী। তাঁহাকে আল-উস্তাযুল-হাকীম (দার্শনিক অধ্যাপক) ও আল-ফায়লাসূফুল-ইসলামী (ইসলামী দার্শনিক) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মিসরের আশ-শারকিয়্যা প্রদেশের অন্তর্গত "কার্‌য়াত আওদিল্লাহ হিজাযী" নামক গ্রামে ১২৮৭/১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন (মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ৫খ, ৪২)। গ্রামের এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁহার শিক্ষাদীক্ষাও শুরু হয় ধর্মীয় পদ্ধতিতে এবং তাঁহাকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। শায়খ তানতাবী যেহেতু প্রকৃতিগতভাবেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল-কুরআনিল-কারীম, ২খ, ২প.) সেহেতু কিছুকাল আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পর আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির এক সরকারী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেইখানে তিনি প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও সরাসরি বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং আধুনিক সাহিত্য অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ইংরেজী ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন (আর-রিসালা, কায়রো)।

শিক্ষা সমাপন করিবার পর শায়খ তানতাবী কর্মজীবনে পদার্পণ করেন এবং মিসরের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পর মিসরের বিখ্যাত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ "মাদ্‌রাসাত দারিল-উলূম"-এ শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ইহা ছাড়া এই সময়ে তিনি মিসরের একমাত্র সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আল-জামিআতুল-মিসরিয়্যা (বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়)-এ প্রভাষক হিসাবেও কাজ করেন (আল-আলাম, ৩খ, ৩৩৩; মাজিল্লাতুর-রিসালা, কায়রো; আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল-কুরআন আল-কারীম, ১খ, ১)।

শায়খ তানতাবী শিক্ষাদীক্ষা ও অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে মিসরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নেও অংশগ্রহণ করেন। জাতিকে জাগ্রতকরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক নেতৃত্ব দানের লক্ষ্যে তিনি মিসরের বিভিন্ন সাময়িক ও দৈকি পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লেখেন। নাহদাতুল-উম্মাহ ওয়াহায়াতুহা (نهضة الامة وحياتها) নামক তাঁহার একখানি গ্রন্থ এই বিষয়ে একটি অবদান। এই গ্রন্থে তিনি জাতির জীবন যাপন পদ্ধতি এবং স্বাধীন থাকিবার উপায়সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা ছাড়াও উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার উপকরণ সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাধারা ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থটি প্রথমে তখনকার বিখ্যাত মিসরীয় দৈনিক "আল-লিওয়া" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে এইগুলিকে একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয় (আল-আলাম, ৩খ, ৩৩৩; আর-রিসালা, কায়রো, ৭খ, ১৮৮)।

শায়খ তানতাবী জাওহারী জীবনের শেষ দিকে সর্বক্ষণ গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত থাকেন। এই সময়ে তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং শারিউল-আবিদীন, মাহাল্লা আস-সায়্যিদা যায়নাব, কায়রোতে অবস্থান করেন (আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল-কুরআন আল-কারীম, ২৫খ, ২৮৫)। শায়খ তানতাবীর অধিকাংশ গ্রন্থের নাম খুবই দীর্ঘ ও জটিল। এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার সমসাময়িকদের বিপরীতে (ইহারা তাঁহাদের গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ও সহজ নামকরণ করিতেন) উলামা-ই মুতাআখ্‌খিরীন -এর পন্থা অবলম্বন করেন। [তাঁহার রচনাবলীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদিগকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদিগকে এই কথা অবহিত করা যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য আধুনিক বিদ্যা এবং য়ূরোপের আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির সাহায্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত তাহাদের এই অবনতি ও অধঃপতন দূর হইবে না (মাজাল্লা মা'আরিফ, আজামগড়, ৪১খ. (ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮)]। কুরআন ও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁহার "আত-তাজুল-মুরাস্‌সা বিজাওয়াহিরিল-কুরআন ওয়াল-উলূম" নামক গ্রন্থখানি খুবই জনপ্রিয়। গ্রন্থখানির উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী শায়খ তানতাবীর স্মৃতিবহ হইয়া রহিয়াছে ঃ

(১) জাওয়াহিরুল-উলূম, (২) আন-নিজাম ওয়াল-ইসলাম, (৩) আয-যুহ্‌রা, (৪) নিজামুল-আলাম ওয়াল-উমাম, (৫) আল-আরওয়াহ, (৬) আয়নাল-ইনসান, (৭) আসলুল-আলাম, (৮) জামালুল-ইল্‌ম, (৯) আল-হিকমা ওয়াল-হুকামা, (১০) সাওয়ানিহুল-জাওহারী, (১১) মীযানুল-জাওয়াহির, (১২) ফী আজাইবিল-কাওন, (১৩) আল-ফারাইদুল-জাওহারিয়্যা ফিত-তুরুকিন-নাহবিয়্যা, (১৪) আল-মূসীকাল-আরাবিয়্যা, (১৫) মুযাক্‌কিরাত ফী আদাবিয়্যাতিল -লুগাত আল-আরাবিয়্যা (আল-আলাম, ৩খ, ৩৩৩; মু'জামুল-মু'আল্‌লিফীন, ৫খ, ৪২)।

শায়খ তানতাবী জাওহারীর এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ও আবিষ্কার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কুরআন কারীম ও ইসলামী শিক্ষায়ও তিনি এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতিগত আকর্ষণের কারণেই তিনি ছিলেন একজন জন্মগত দার্শনিক। তিনি তাঁহার তাফসীর গ্রন্থখানা আরম্ভই করিয়াছেন এই বাক্য দিয়াঃ فانى خلقت يغر ما بالعجائب الكونية معجبا بالبدائع الطبيعية "তিনি জন্মগতভাবেই সৃষ্টি রহস্যের প্রেমিক ও প্রকৃতির অদ্ভুত ব্যাপারসমূহে বিমুগ্ধ" (আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল-কুরআন আল-কারীম, ১খ, ২)। সম্ভবত এই কারণেই তানতাবী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে এক নূতন ও অদ্ভূত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, যাহা প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সকল মুফাস্‌সির-এর পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি কুরআন-এর শাব্দিক ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং বর্তমান কালের অন্যান্য বিদ্যার সাহায্য পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীর ভাষায়ঃ এই তাফসীর গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তিনি বর্তমান সময়ের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুকাবিলায় ঠিক তদ্রূপ অবদান রাখিয়াছেন যেইরূপ অবদান রাখিয়াছিলেন আজ হইতে আট শত বৎসর পূর্বে ইমাম ফাখরুদ-দীন রাযী প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুবাকিলায়। এইজন্য

শায়খ তানতাবীর তাফসীর ১৯শ খৃ. শতকের তাফসীর কাবীর (মা'আরিফ, আজামগড়, ৪১ খ, ফেব্রু. ১৯৩৮ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সারকীস, মু'জামুল-মাতুবূআত আল-আরাবিয়্যা ওয়াল-মু'আর্‌রাবা, কায়রো ১৯২৮ খৃ.; (২) ঐ লেখক, জামিউত-তাসানীফ, কায়রো সং; (৩) ইসমাঈল পাশা আল-বাগদাদী, ঈদাহুল-মাকনূন, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.; (৪) ব্রকেলম্যান, পরিশিষ্ট (৩খ, ১৯৫, ৩২৭-৩২৯); (৫) তানতাবী জাওহারী, আল-জাওয়াহির ফী তাফসীরিল-কুরআন আল-কারীম, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, আত-তাজুল-মুরাসসা', কায়রো সং; (৭) উমার রিদা কাহহালা, মু'জামুল-মু'আল্‌লিফীন, দামিশ্‌ক; (৮) খায়রুদ-দীন আয-যিরিক্‌লী আল-আলাম, কায়রো ১৯৬৬ খৃ.; (৯) মাজাল্লা আর-রিসালা, কায়রো, ৭খ, ১৮৮, ৩২৬-৩২৯; (১০) দারুল-কুতুব আল-মিসরিয়্যার ক্যাটালগ, ২খ, ১৪৫, ৩খ, ৭৯, ৩৪৬, ৬খ, ২০৪,২০৭, ২১৩; ৭খ, ১১৮, কায়রো সং; (১১) মাজাল্লা-ই মা'আরিফ, আজামগড়, ৪১ খ., ফেব্রু. ১৯৩৮।

জাহুর আহমাদ আজহার ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/ড. আবদুল জলীল

তানযীল (দ্র. ওহী)

তানরী ঃ (তুর্কী) স্বর্গ, দেবতা। প্রাচ্য উপভাষায় উচ্চারণটি সাধারণভাবে তালব্য ঃ চাগতাই, তানগির (tangir) [লিখিত تینکری) এবং অন্যান্য উপভাষায় অনুরূপ গঠন। Teleut (tanara) ও Altai উপভাষা (tanari)-এর ত্রিস্বরবিশিষ্ট গঠন উল্লেখযোগ্য। Kasan উপভাষায় তানগরি (দেবতা)-র পাশাপাশি একটি শব্দ রহিয়াছে তারি (tari) সন্তের প্রতিমূর্তি, বিগ্রহ (এইখানে আমরা ব্যক্তিনাম তানরিবিরদি উল্লেখ করিতে পারি যাহাতে তারি দেবতা অর্থ জ্ঞাপন করে)। উছমানী তুর্কী ভাষায় একটি অতালব্য উচ্চারণ তানরী (tanrı) রহিয়াছে, যেমন রহিয়াছে য়াকূতী ভাষায় যাহাতে অতিরিক্ত একটি ত্রিস্বরবিশিষ্ট গঠন (tanara) বর্তমান।

আভিধানিক উপাদানের জন্য তু. Pavet de Courteille, D.i. ctionnaire Turc-Oriental, দ্র. শিরো.; W. Radloff, Versuch eines Worterbuches der Turkdialekte, ৩খ, ৮২৩, ১০৪৩ প., ১০৪৭ প., ১০৬৫; O. Bohtlingk, Uber die Sparche der Fakuten; Fakutischdeutsches Worterbuch, পৃ. ৯০; H. Vambery, Etymologisches Worterbuch der Turko-Tatarischen Sprachen, পৃ. ১৬৮ প. এবং সর্বশেষে আল-কাশগারী (দীওয়ান লুগাতিত-তুর্ক, কন্সটান্টিনোপল ১৩৩৩-১৩৩৫ হি., ৩খ, ২৭৮প.), যিনি বলেন, "তান্‌গরি অর্থ আল্লাহ্; অবিশ্বাসিগণ অবশ্য স্বর্গকে তানগরি বলে এবং অনুরূপভাবে যাহা কিছু তাহাদিগকে প্রভাবিত করে, যেমন একটি উচ্চ পর্বত অথবা একটি বিশাল বৃক্ষ তাহাকেও তানগরি নামে অভিহিত করে। তাহারা এইরূপ বস্তুর পূজা করে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে তানগরিকান (tangrikan) নামে অভিহিত করে।"

এই তানগরিকান শব্দটি একটি প্রাচীন তুর্কী উপাধি হিসাবেও দেখা যায় (তু. Radloff, Worterbuch, ৩খ, ১০৪৮; F. W. K. Muller, Uigurica, পৃ. ৪৭ঃ তানগরিকান-শাসক)। 'দেবতা' অর্থে [মানিকীয় (Manichaean) মতবাদে] তানগরিকান শব্দটি, উদাহরণস্বরূপ মানিকীয় মতবাদে পাপের স্বীকারোক্তির মধ্যে দৃষ্ট হয় (Chuastuanift, সম্পা. A. Von le Coq., ১৯১১ খৃ., পৃ. ১০)। তানগরিম শব্দটি (অর্থাৎ উত্তম পুরুষের সর্বনাম সংক্রান্ত বিভক্তিসহ তানগরি) তুরকান মূল পাঠে রাজকুমারী ও রমণীদের উপাধির মধ্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া অনুমিত হয় (তু. F. W. K. Muller, Uigurica, পৃ. ৪৮, যিনি খানিম ও বেগামের আধুনিক প্রয়োগের তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন)।

আমরা এইখানে তানগরি হইতে কয়েকটি প্রকৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ উল্লেখ করিতে পারি ঃ তানগরিচি মানিকীয় মতবাদে পাপের স্বীকারোক্তির মধ্যে, তু. J. R. A. S., ১৯১২ খৃ., ২৮৯, ২৯৯-যাজক নির্বাচিত ব্যক্তি (শাব্দিক অর্থে সাধু পুরুষ); কুমান, তেওরিলিক-'ঐশ্বরিক'; উইগুর, তেনগরিলিক—'ধার্মিক'। মোঙ্গল তাগরি (ঐশ্বর) শব্দটি তুর্কী ভাষা হইতে একটি ধার করা শব্দ (এই গঠনের জন্য তু. Bibl. Buddhica, ১২খ, ৫১)।

তুর্কী শব্দটির জন্য প্রস্তাবিত শব্দপ্রকরণ (যেমন Vambery and Barbier de Meynard, দ্র. শিরো.) অপ্রয়োজনীয়। তুর্কী ভাষার সর্বাধুনিক মধ্য এশীয় উপভাষাসমূহ তানগরি দুইটি অর্থ রহিয়াছেঃ "ঈশ্বর" ও "স্বর্গ" অপরপক্ষে উছমানী তুর্কী ভাষায় শব্দটির (অনেকটা অপ্রচলিত) স্পষ্টত শুধু "ঈশ্বর" অর্থটি রহিয়াছে। তানরির বাগবৈশিষ্ট্যসম্মত সংযুক্তির জন্য, যেমন tanrı dewedjeyi সহস্র পদী, তু. the Dictionaries of Radloff and Barbier de Meynard (দ্র. শিরো.)।

তানগরি শব্দে নিহিত ধারণা সংজ্ঞায়িত করিতে হইলে তুর্কী বার্বার জাতিসমূহের বিশ্বাস হইতে যতদূর প্রতিভাত হয়–প্রথমে প্রাচীন তুর্কী শিলালিপি এবং পরে Teleut ও আলতাই শামানবাদ হইতে আধুনিককালে সংগৃহীত উপাদানসমূহ আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে।

শিলালিপিসমূহে তানরি শব্দটি প্রায় সর্বদাই পৌত্তলিক বিশ্বাসভিত্তিক ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্থে ব্যবহৃত, তাহার ইচ্ছাতেই রাজা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন; রাজা স্বয়ং "তানরিতুল্য" এবং "তানরিজাত" (Tanritag Tanrida bölmish) ও তানরি কর্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত (Tanriyaratmish)। তানরি তুর্কী জনগণকে রক্ষা করেন, জাতি হিসাবে তাহাদের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করেন এবং তুর্কী প্রধানদের তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। তুর্কী জনগণের বিশেষ রক্ষাকর্তার এই গুণের জন্য তিনি তুর্ক তানরিসি হিসাবে বর্ণিত হন। স্বর্গের দেবতার পাশাপাশি আমরা দেখিতে পাই যে, জনগণ ও ব্যক্তির ভাগ্যের উপর একটি বিশেষ ক্ষমতা মাটি ও পানি (য়ির-সুব)-র দেবতাকে অর্পণ করা হইয়াছে। সর্বপ্রধান দেবতা অবশ্য তানরি।

যাহা হউক এমন কিছু সংখ্যক অনুচ্ছেদ রহিয়াছে যাহাতে তানরি শব্দটি কোন বাস্তব ব্যক্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে না। "ঊর্ধ্বলোকের নীল স্বর্গ" (oza kok tanrı) নিম্নলোকের কৃষ্ণ মর্ত্য" (আসরায়াগীয় য়ির) এবং মানব জাতির মতই সৃষ্ট। কে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা হয় নাই। একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ (V. Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon, পৃ. ১১২) বর্ণনা করে যে, একটি ওগুয বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, "কারণ স্বর্গ ও মর্ত্য বিশৃংখলায় পতিত হইয়াছিল"। এই স্থলে আমরা স্পষ্টভাবে বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে চীন দেশীয়দের ধারণার, একটি তত্ত্ব যাহাকে de Groot "Universis mus" নামে অভিহিত করিয়াছেন, প্রভাব দেখিতে পাই। ইহাতে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। যেহেতু তুর্কী গোত্রপতিগণ, যাঁহারা Orkhon-লিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহারা চৈনিক সংস্কৃতি প্রভাবিত এলাকায় বাস করিতেন।

আধুনিক তুর্কী শামানবাদে (অর্থাৎ প্রধানত Teleut ও আলতাই তুর্কীদের মধ্যে) তানরির ধারণা সম্পর্কে তু. H. Vambery, Die Primitive Cultur des Turko-Tatarischen Volkes, ১৮৭৯ খৃ., পৃ. ১৫০ প.; W. Radloff, Aus Sibirien, ১৮৮৪, ২খ, ১প. ও Rodloff কর্তৃক তাঁহার Proben der Volksliteratur der turkischen Stamme Sud-Sibiriens-এর প্রথম খণ্ডে সংগৃহীত মূল পাঠসমূহ। এই পৌত্তলিকতা যেমন প্রত্যাশিত, বিদেশী অর্থাৎ খৃস্টান ও বৌদ্ধ প্রভাব হইতে তেমনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকিতে পারে নাই। যখন উদাহরণস্বরূপ একজন শামানের জাদুমন্ত্রে Pyrkan Tengre ও Pyrkan Kan (Radloff, Aus Siberien, ২খ, ৩৩, ৪৪) অভিব্যক্তি সম্পর্কে দেখিতে পাই, তখন Pyrkan-এ মোঙ্গল (প্রাচীন তুর্কীও) শব্দ বুরখান-বুদ্ধ -এর সন্ধান পাওয়া স্বাভাবিক। সৃষ্টি সম্পর্কিত পৌত্তলিক তুর্কী পুরাণ কাহিনীতে য়াহূদী, খৃস্টান ও বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন যে দৃষ্ট হয় তাহা Radloff স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন (পূ. গ্র., ২খ, ৫প.)। যখন ইহা বলা হয় যে, দুষ্ট আত্মা এরলিক স্বর্গস্থ দেবতার ন্যায় নিজের জন্য একটি স্বর্গ সৃষ্টি করে তখন যে কেহ যোরোস্ট্রীয় প্রভাবের বিষয় চিন্তা করিতে প্রলুব্ধ হয় (আহরিমানের "প্রতিসৃষ্টি")।

তুর্কী শামানবাদ অনুসারে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী দেবতা তেনগেরি কাইরা কান স্বর্গসমূহ এবং দুষ্ট আত্মা এরলিক দেবতাগণ মানব জাতি ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তেন্‌গেরি রূপটি Radloff-এর বানান অনুসারে) Teleut তানারা ও আলতাই তানরির অনুরূপ। কাইরাকান অবশ্যই আলতাই কাইরাক কান (তু. Radloff, Worterbuch, ২খ., ২২)-এর সহিত অভিন্ন। কাইরাক কান শব্দটি দেবতা ও আত্মা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তেনগেরি কাইরা-কান "স্বর্গের দেবতা"।

স্বর্গে পর্যায়ক্রমিকভাবে একটির উপর আর একটি এইভাবে স্থাপিত ১৭টি পৃথক এলাকা রহিয়াছে। এইখানেই শিষ্ট আত্মাসমূহ অবস্থান করে। এই সকল ছোট দেবতার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাই-উলগুন, কয়সাগান (Kysagan) তেনগেরি ও মেরজেন (Mergen) তেনগেরী। স্বর্গের দেবতা, যেমন পৃথিবী ও পানির দেবতার নিকট সরাসরি আবেদন নিবেদন করা যায় না, কিন্তু পূর্বপুরুষদের আত্মার মাধ্যমে করা যায় অর্থাৎ এই কাজের জন্য একজন শামান (কাম)-এর প্রয়োজন হয়। একজন Teleut শামানের প্রার্থনায় (Radloff, Volksliteratur, ১খ, ২৩৮) স্রষ্টারূপে ঊর্ধ্বের স্বর্গলোকের প্রার্থনা জানান হইয়াছে। একটি আলতাই পুরাণ কাহিনীতে (Radloff, ঐ, ১খ., ৬১ প.) একজন বীর পুরুষ স্বর্গের দেবতা তামান উকুর কন্যার পাণি প্রার্থনা করিয়াছেন।

কাসান উপভাষায় বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়বৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়, "স্বর্গস্থ বৃদ্ধ লোকটি (তানরি বাবাই) তর্জন-গর্জন করিতেছে"—ইহা প্রাচীন পৌত্তলিক ধারণার নিদর্শন বহন করে (তু. Radloff, Worterbuch, ২খ, ১৪২৫; ৩খ, ১০৪৭; ৪খ, ১৫৬৪)।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহা বলা যায় যে, বিদেশী প্রভাব হইতে যতদূর সম্ভব মুক্ত হইলে তুর্কী ধ্যান-ধারণায় তানরি স্বর্গস্থ একটি মৌলিক শক্তি এবং স্বর্গে রাজত্বকারী আত্মারূপেও বিবেচিত হয়। এই আত্মাকে সম্ভবত প্রাথমিকভাবে এক ধরনের শক্তি হিসাবে ধারণা করা হইয়াছিল–ইহা এমন একটা কিছু যাহাকে আধুনিক জোতির্বিদ্যায় মানা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। স্বর্গে একজন প্রতিজনিক দেবতার ধারণা অবশ্যই ইহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

তুর্কী গোত্রসমূহ অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে তানরি শব্দটি এই সকল ধর্মের দেবতা বা উচ্চতর সত্তার নামে পরিণত হয়। "স্বর্গের এই অর্থ স্বাভাবিকভাবেই অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। স্বর্গের ধারণা বহন করার জন্য কোক (উছমানী গোক) শব্দটি ব্যবহৃত হইত যাহা মূলত একটি রংয়ের নাম (তু. Radloff, Worterbuch, ২খ, ১২২০)। প্রাচীন তুর্কী ভাষায় আমরা কোক কালীক, নীল ঈথরে দেখিতে পাই (Uigurica, পৃ. ৮, ১৮; Radloff, Worterbuch, ২খ, ২৪০)।

বৌদ্ধ প্রাচীন তুর্কী গ্রন্থে তানগরি সংস্কৃত ভাষার দেব "দেবতা"-এর সমার্থক; বৌদ্ধ পৌরাণিক কাহিনীতে এই ধারণাটিতে "দেবদূত" শব্দ দ্বারা উত্তমরূপে ব্যক্ত করা হয়। কারণ এই সত্তায় এমন কিছু গুণের অভাব রহিয়াছে যাহা আমাদের দৃষ্টিতে " দেবতা"-এর ধারণার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। স্ত্রীলিংগাত্মকতুল্য শব্দ দেবীর সমার্থক শব্দ তানগরি খাতুন; দেব কন্যা (দেবকন্যা) [পবিত্র কুমারী, অপ্সরা]-এর জন্য তুর্কী শব্দ তানগরি কীয। দেবতাদের রাজা (দেবরাজ) ইন্দ্র হন তানগরিলার ইলিকি খোরমুযদা; ব্রহ্মা, আযরুআ তানগরি নামে অভিহিত হন। এই সত্তাসমূহের অনুরূপ ইরানী নামও রহিয়াছে, ওহরমাযদ ও (সম্ভবত) যারওয়ান। দেবী Cri-কে বলা হয় কুত তানগরি খাতুনী অথবা (খাতুন ব্যতিরেকে) কুত তানগরিসি। কুত তানগরিসি নামটি কুবেরাকেও প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় (যেমন Muller, Uigurica, পৃ. ৪৫)। ভ্রমণকারীদের জন্য dharani-র একটি সংকলন, The Tisastvustik (সম্পা. W. Radloff ও A. v. Stael-Holstein, St. Petersburg 1910-Bibl. Buddhica, ১২খ.)-এর তানগরি দাম নামে একজন দেবতাকে পাই, Radloff যাহাকে কুবেরা বলিয়া মনে করেন, সুতরাং শেষোক্ত দেবতার আরও একটি তুর্কী নাম রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সন্দেহজনক। কারণ এই গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদে (পৃ. ২২) কুবেরা (কুপিরি)-কে তাহার নামে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অল্প পরেই তানগরিদাম স্বতন্ত্র একজন দেবতা হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মূল গ্রন্থের কোথাও কোথাও অসংগতি রহিয়াছে (তু. যেমন তুর্কী মূল গ্রন্থ, পৃ. ২৩ প.)। এই গ্রন্থে কুবেরার জন্য তু. আরও পৃ. ৯৭, নোট ২; বুদ্ধ স্বয়ং প্রায়শ তানগরি তানগরিসি নামে অভিহিত হইয়াছেন। তুর্কী ভাষায় স্বর্গ দেবলোক)-এর দেবতা তানগরি য়ির নামে অভিহিত হয় এবং বৈমানিক (Vaimanika) দেবতাগণ, যাহারা জৈন পৌরাণিক কাহিনীর সহিত সচরাচর জড়িত, কিন্তু আবার দৃষ্টান্তস্বরূপ Tisatvastile-তে দৃষ্ট হয় এবং Waimanuki-tangrilar নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মানিকীয় তুর্কী পরিভাষা যাহা বৌদ্ধ পরিভাষা দ্বারা প্রভাবিত (তু. Chuastuanift, সম্পা. A. v. Le Coq., বার্লিন ১৯১১ খৃ., পৃ. ৫; ১৯১১ খৃ., পৃ. ২৭৮) শব্দটির নিম্নরূপ প্রয়োগ প্রদর্শন করেঃ তানগরি এই স্থলে ইরানী য়ায্‌দ (বাগ) শব্দের সমার্থক; প্রথমত ইহার অর্থ মানিকীয় পদ্ধতির সর্বপ্রধান নীতি এবং দ্বিতীয়ত অপদেবতা (য়াকলার)-দের বিপরীত আলো অথবা দেবতাদের

অধীনস্থ উপদেবতা (য়ারুক তানগরিলার)। প্রথম মানবকে বলা হয় বিশ তানগরি, পশু দেবতা (মানিকীয় পৌরাণিক কাহিনী হইতে জ্ঞাত তাহার পাঁচটি উপাদান হইতে ঈথর, বায়ু, আলো, পানি ও আগুন)। পঞ্চ উপাদানকেও এই নামে অভিহিত করা হয়, উদাহরণত উত তানগরি-অগ্নি দেবতা। 'স্বর্গ' অর্থেও তানগরি দৃষ্ট হয় (উদাহরণত Chuastuanift, পৃ. ১৬; F.R.A.S., 1911, p. 291, 1, 167)। Paradise-কে বলা হয় তানগরি য়ির। এই মানিকীয় পরিভাষা বৌদ্ধ পরিভাষার সহিত যথার্থরূপে মিলিয়া যায়। তথাপি একটি বা দুইটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা যাইতে পারে ঃ ইতিপূর্বে উল্লিখিত তাগরিকান

পরিভাষাটি (Chustuanift, পৃ. ১০; F.R.A.S., 1911, p. 281, 1, 22) একটি দেবতার নামে (আযরুআ তানগরি-রূপে) ব্যবহার Vonla Coq, (F.R.A.S., পূ. স্থা.) যাহা 'Azrua the Lord'-রূপে অনুবাদ করিয়াছেন আরয়োন য়ির তানগরি এবং বিশেষ যৌথ ব্যবহার Arkhon Yir Tangri, "আরচোন ভূমি দেবতা," যাহাতে তানগরি শব্দটি সম্ভবত অন্ধকারের অন্যতম শক্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (তু. F.R.A.S., 2911, পৃ. ৩০৩, টীকা ৩১)।

খৃষ্টীয় তুর্কী ব্যবহার তানগরি-ঈশ্বর; তানগরি-ওগলি-"ঈশ্বরের পুত্র" এবং মৃশিখা তানগরি-প্রভু যিশু। F.W.K. Muller কর্তৃক Uigurica-তে প্রকাশিত খৃষ্টীয় খণ্ড গ্রন্থসমূহে আমরা তানগরিদাম শব্দটিও পাই যাহা প্রায়শ বৌদ্ধ তুর্কী পরিভাষাতে পাওয়া যায়। এই খৃষ্টান মূল পাঠসমূহে ইহা দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং প্রতীয়মান হয় যে, ইহা শুধু 'ঈশ্বর' অর্থ প্রকাশ করে। কুমান বাগধারা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু প্রদর্শন করে না।

প্রাথমিক মুসলিম পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী গ্রন্থাদিতে আরবী ও ফারসী পরিভাষা (আল্লাহ, খোদা) স্বাভাবিকভাবেই তুর্কী তানগরির সহিত প্রতিযোগিতায় অবতরণ করে। কুতাদগু বিলিক-এ আমি যতদূর অবহিত রহিয়াছি 'ঈশ্বর'-এর আরবী নাম খুব বিরল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে (বাস্তবে শুধু আরবী উদ্ধৃতিতে)। এই পাঠে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা তানগরি শব্দ দ্বারা পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয় না, বরং অন্য তুর্কী শব্দ, যথা বায়াত ব্যবহৃত হয়। তানগরি শব্দটি এইখানেও তা'আলা সহযোগে ব্যবহৃত হয়। বাবুরনামাতে উদ্ধৃতি ব্যতীত দেবতা বুঝাইতে তানগরি সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দ; এইখানেও আরবী বাগধারা মত আমরা কখনও কখনও তানগরি তাআলা দেখিতে পাই (উদাহরণ পৃ. ৪০৮, সম্পা. Ilminsky)। পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী ভাষায়, আরবী ও ফারসী পরিভাষায় তানগরি শব্দটি যে বিলুপ্ত হইতেছে তাহা সম্ভবত Shaw-এর মন্তব্য হইতে অনুমান করা যায় (A Sketch of the Turkish Language. ২খ., ৬৯)। ফারসী খুদাদাদা ও খাদাবান্দা-এর নামের মডেলে তানগরি-বিরদি, তানগরিকুলী ব্যক্তিনামসমূহ গঠিত হইয়া থাকিতে পারে।

V. F. Buchner (E. I.[1])/ মোঃ গোলাম সরওয়ার

তানসেন কলাওন্ত (تنسين كلاونت) ঃ একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। তাঁহার সম্পর্কে শায়খ আবুল-ফাদল (আক্‌বারনামাহ, ৩খ, ৫৩৭) বলেন, চলিতে সহস্রাব্দে সম্ভবত তাঁহার ন্যায় মিষ্টভাষী সুকণ্ঠ শিল্পী বিরল [তু.আঈন-ই আক্‌বারী, সম্পা. সায়্যিদ আহ্‌মাদ খান, ১খ, ২০৯]। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে যুগের অতুলনীয় শিল্পী বলিয়াছেন এবং মনে করেন, কোন যুগে তাঁহার মত শিল্পীর আবির্ভাব হয় নাই (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)। মা'আছিরুল-উমারা (১খ, ৫০৯)-এর লেখকের মন্তব্যানুযায়ী কবিতা (হিন্দী কবিতা) এবং দ্রুপদির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সংগীত বিশেষজ্ঞদের শীর্ষস্থানীয়। বলা হয় যে, মিষ্টি কণ্ঠ ও সূক্ষ্ম কল্পনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না।

তানসেন গোয়ালিয়র-এর অধিবাসী ছিলেন এবং পান্না (আঈন-ই আকবারীর অধিকাংশ কপিতে এই নাম রহিয়াছে, অথবা ভট্টাহ অর্থাৎ রীওয়া, যেমন মা'আছিরুল-উমারাতে রহিয়াছে)-র রাজা রামচান্দ বাঘীলা-র অধীনে চাকুরীরত ছিলেন। রাজা তাঁহার অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, এক সময়ে রাজা তাঁহাকে এক কোটি তংকা পুরস্কার দিয়াছিলেন [বাদায়ূনী, ২খ, ৩৩৫, ইদারা ৪]। সুলতান ইব্‌রাহীম সূরী তাঁহাকে আগ্রায় আনয়নের অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। সম্রাট স্বীয় সহচর ও ঘনিষ্ঠ সভাসদ জালাল খান কূরচী-কে রামচান্দের নিকটে পাঠাইলেন তানসেনকে লাভ করিবার জন্য। রামচান্দ সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করিতে সাহসী হইলেন না। সুতরাং তিনি তানসেনকে বিপুল উপঢৌকন সহকারে আকবারের দরবারে প্রেরণ করিলেন, যদিও বাদায়ূনীর বর্ণনানুযায়ী (উল্লিখিত স্থান) তানসেন অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি আকবারের রাজত্বের সপ্তম বৎসর (খৃ. ১৫৬২-৬৩) দরবারে উপনীত হইলেন এবং প্রথম বৈঠকেই যে গান গাহিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া আকবার তাঁহাকে তৎকালে প্রচলিত দুই লক্ষ রুপিয়া পুরস্কার দিলেন [মা'আছিরুল-উমারা]। আকবারের দরবারে অবস্থানকালে তিনি সংগীত পরিবেশন এবং সংগীত রচনায় বিপুল উন্নতি সাধন করিলেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনা আকবারের নামে উৎসর্গিত এবং এখনও জনগণের কণ্ঠে গীত হয়। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে "শু'আরা-ই হিন্দ" অর্থাৎ সর্বভারতীয় পর্যায়ের গায়করূপে গণ্য করেন এবং তাঁহার কতিপয় হিন্দী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

তানসেন পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৫ জুমাদা ছানী, ৯৯৭/২৬ এপ্রিল, ১৫৮৯ ইনতিকাল করেন। আকবারের নির্দেশে সকল গায়ক তাঁহার দাফনের সময় উপস্থিত ছিলেন। আকবার বলেন, তাঁহার মৃত্যু যেন গানেরই মৃত্যু (আকবারনামা, ৩খ ৫৩৬)। তাঁহাকে গোয়ালিয়ারে মুহাম্মাদ গাওছ গুয়ালিয়ারী-র কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়।

তানসেনের রচিত পুস্তক "বুধ্‌পরকাশ"-এর ফারসী অনুবাদ করিয়াছেন হাকীম মুহাম্মাদ আকবার আর্‌রাযানী "তাশ্‌রীহুল-মূসীকী" শিরোনামে। উহার পাণ্ডুলিপি পেশোয়ারের দারুল-উলূম ইসলামিয়া পাঠাগারে রহিয়াছে (ফিহ্‌রিস্ত দারুল-উলূম, পৃ. ৩৭৮, সংখ্যা ১৯৬৬, ইদারা)।

তানসেনের এক পুত্র তান তারাং খানও আকবারের দরবারের গায়ক ছিলেন। বস্তুত গোয়ালিয়র গায়কদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আকবারের আঠারজন গায়কের মধ্যে এগারজন ছিলেন গোয়ালিয়রের অধিবাসী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শায়খ আবুল-ফাদল, আক্‌বারনামা, ২খ, ১৮১, ও অনুবাদ H. Beveridge, ২খ, ২৮০; (২) আঈন-ই আকবারী, অনুবাদ Blochmann এবং Jarrett; (৩) তূযাক-ই জাহাঙ্গীরী, সায়্যিদ আহ্‌মাদ, আলীগড় ১৮৬৪ খৃ., ২০৪, ২৬১; (৪) শাহ নাওয়ায খান, মা'আছিরুল-উমারা, ১খ, ৫০৯, ২খ, ১৩৪; (৫) আব্‌দুল-হামীদ লাহোরী, পাদ্‌শাহনামা; উক্ত গ্রন্থগুলি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর Bibliotheca Indica series-এর অন্তর্ভুক্ত; (৬) সায়্যিদ গুলাম হুসায়ন খান তাবাতাবায়ী, সিয়ারুল-মুতাআখ্‌খিরীন; (৭) V. A. Smith, Akbar the Great Moghal, অক্সফোর্ড ১৯১৭ খৃ.; (৮) মুহাম্মাদ আক্‌রাম ইমাম খান, মা'দানুমুসীকী (রচনা ১২৭২ হি.), লক্ষ্ণৌ ১৯২৫ খৃ., ২৩, ১৪৭, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৯, ২৪২ প.; (৯) Gwalior State annual Administration, Report of the Archaeological Department for 1936-37, পৃ. ৫)।

T. W. Haig ও সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/আ. ন. ম. রফীকুর রহমান

আত-তানাবুতী (التناوتى) ঃ ইবাদী (ابادى দ্র.) তারীকার বহু সংখ্যক শায়খ-এর নিসবা (نسبة -বংশ, জন্মস্থান, তারীকা ইত্যাদি সম্পর্কবাচক উপাধি)। পঞ্চম/ একাদশ শতাব্দীর কয়েকজন তানাবুতী শায়খের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আবূ য়াকূব য়ূসুফ ইব্ন মুহাম্মাদ আত-তানাবুতী যিনি পরবর্তী উপাখ্যানগুলিতে প্রায়শ উল্লিখিত। তাঁহার পুত্র ইস্মাঈল, তদপেক্ষা অধিক তাঁহার গোত্র আবূ য়া'কূব য়ূসুফ ইব্ন ইস্মাঈল নিষ্ঠাবান এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তানাবুতী নামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাহক ছিলেন শেষোক্ত শায়খের পুত্র আবূ 'আম্মার আব্দুল-কাফী আত-তানাবুতী। তিনি আবূ য়া'কূব য়ূসুফ ইব্ন ইব্রাহীম আস-সাদ্রাতী আল-ওয়ার্জালানীর সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। আবূ আম্মার ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং তিউনিসে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তিনি বাৎসরিক ১,০০০ দীনার ভাতা পাইতেন, যাহার অধিকাংশ তিনি তাঁহার শিক্ষকগণকে দিতেন। জ্ঞান আহরণে (বিশেষত আরবী ভাষাতত্ত্বে) তাঁহার এতই আগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতৃ প্রেরিত অর্থের সহিত আগত চিঠিগুলি পাঠ করিবার সময় করিতে পারিতেন না। তিউনিস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে চিঠিগুলি খুলিয়া একটিতে তিনি তাঁহার পিতার এবং অন্য একটিতে তাঁহার মাতার মৃত্যু সংবাদ জানিতে পারিলেন।

'আকাইদ-এ তাঁহার প্রধানতম শিক্ষক ছিলেন আবূ যাকারিয়্যা য়াহ্য়া ইব্ন আবী বাক্র আল-ওয়ারজালানী (দ্র.), যিনি আবূ য়া'কূব-এরও শিক্ষক ছিলেন। আবূ আম্মার প্রধানত ওয়ারগলায় (ওয়ার্জালান) বাস করিতেন। বসন্তকালে তিনি তাঁহার পশুপালসহ সুদূর দক্ষিণে Mzab-এর মরূদ্যানসমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার স্বধর্মীয়গণ তাঁহাকে ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী (محى الدين)-দের অন্যতম গণ্য করিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। খলীফা আলী (রা) প্রসংগে ইবাদীদের যে মৌলিক প্রশ্নটি ছিল, সেই সম্পর্কে তিনি সহিষ্ণুতার পক্ষপাতী ছিলেন। অপরপক্ষে আরব বেদুঈন অধিবাসীদের (immigrants) সম্বন্ধে তিনি সর্বসাধারণ বার্বারদের মতই তিক্ত মনোভাব পোষণ করিতেন (তু. হিলাল)। তিনি ঘোষণা করেন যে, মাগরিব-এ আরবগণ যে সম্পত্তি অর্জন করিয়াছে তাহা লুণ্ঠিত (গাস্ব) সম্পদের শামিল এবং তিনি তাঁহার বন্ধু আবূ য়া'কূবের ন্যায় হিজাযে হজ্জের সময় তথাকার বেদুঈনদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্কের ব্যাপারে একটি বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হন। প্রশ্নটি হইল, তাঁহারা আল-মাগ্রিবে আরবদের সহিত সর্বপ্রকার সামাজিক সম্পর্ক, এমনকি বাণিজ্যিক লেনদেন পর্যন্ত সতর্কতার সহিত পরিহার করিতেন। এমতাবস্থায় তাঁহারা হিজাযে কিভাবে এই বেদুঈনদের নিকট হইতে সামগ্রী ক্রয় করিবেন? আদিকাল হইতে হিজায আরবদের অধিকারভুক্ত ছিল, এই বলিয়া তাঁহারা নিজদিগকে সান্ত্বনা দিলেন।

আবূ আম্মারের প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ (১) আল-মূজিয ফী তাহ্সীদিস-সুওয়াল "সত্যের সকল শত্রুর মতবাদের খণ্ডন," অর্থাৎ ঐ সকল ফারক (فرق-পার্থক্য) বর্ণনামূলক পুস্তকাদির অন্যতম; ইবাদীগণ এই প্রকার গ্রন্থাদিতে সযত্ন প্রয়াসে প্রমাণ করিতে চাহিত যে, তাহারা অন্য সকল সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র; (২) শারহুল-জাহালাত; (৩) সীরাহ (سيرة-জীবনী)..., এই গ্রন্থটি, বিশেষত আস্যাব নেতৃবৃন্দের আধ্যাত্মিক সংঘ এবং তাঁহাদের হাল্কা (حلقة)-ভুক্ত শাগরিদদের জন্য একটি মৌলিক অবদান। দীর্ঘকাল রোগাক্রান্ত থাকায় আবূ আম্মার, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইবাদীদের পার্থক্য সম্পর্কে তাহাদের মতবাদ সংক্রান্ত আবদুল-ওয়াহ্হাব ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন গালিব ইব্ন নুমায়র আল-আনসারী কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নমালার জওয়াব কখনও দিতে পারেন নাই। তাঁহার ও প্রশ্নকর্তা আবদুল-ওয়াহ্হাবের মৃত্যুর পরই কেবল আবূ য়া'কূব আল-ওয়ার্জালান দিয়াছিলেন প্রশ্নগুলির উত্তর যেইগুলি তৎকৃত কিতাবুদ-দালীল-এর অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থানুসারে আবূ আম্মার ৫৭০/১১৭৪ সনের পূর্বে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মতবাদ প্রচার অব্যাহত রাখা হইয়াছিল এবং এই কর্মে তাঁহার পরবর্তী আবূ য়া'কূব য়ূসুফ ইব্ন মুহাম্মাদ আত-তানাবুতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তিনি ছিলেন এই নিবন্ধের প্রারম্ভে উল্লিখিত ব্যক্তির সহিত সম-নামধারী। ইবনুল-লু'লু' আত-তানাবুতী (যিনি কিছুকাল জেরবা দ্বীপে বসবাস করেন) আক্রমণকারী আরবদের দ্বারা নিহত ওয়ারগলা-র প্রথম ব্যক্তি বলিয়া কথিত। তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন উম্মুল-মু'মিন-এর পিতা। একজন মহিলা তাঁহার অলৌকিক কার্যকলাপের জন্য শ্রদ্ধা অর্জন করেন। উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মতই জীবনীকারগণের আগ্রহ সৃষ্টি করেন। দুই ভ্রাতা-য়াহ্য়া ও আবুর-রাবী' সুলায়মান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আম্র আত-তানাবুতী। জীবনীকারগণ এই দুই ব্যক্তির ধর্মনিষ্ঠা ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের সবিস্তার বর্ণনা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বার্রাদী, আল-জাওয়াহিরুল-মুনতাকাত, কায়রো ১৩০৬ হি.; (২) আবুল-আব্বাস আশ-শাম্মাখী, কিতাবুস-সিয়ার-এ (কায়রো ও কনস্টানটাইন ১৩০১ হি., পৃ.৪৪১ প., ৪৯৮ প., ৫১৩.,৫৬৯) প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ব্যবহার করিয়াছেন; (৩) আবূ য়া'কূব য়ূসুফ ইব্ন ইব্রাহীম আল-ওয়ারজালানী, আদ-দালীল, কায়রো ১৩০৬, ১খ, ৫৪ প., ৩খ., ২৮; (৪) Masqueray, Chronique di Abou Zakaria, আলজিয়ার্স ১৮৭৮ (অথবা ৭৯), Ixxvi এবং পৃ. ১৪০, ১৭৭, ২৩৫, বিশেষভাবে ২৫৩ প. প্রদত্ত নোটসমূহ; (৫) ঐ লেখক, Formation des cited chez les populations sedentaires de l'Algerie, প্যারিস ১৮৮৬, পৃ. ২১৬; (৬)A. de Motylinsk,i in Recueil de Mem. Ne Congr. d. Orient, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৫৪৫।

R. Strothmann (E. I. [1])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

তানাস (দ্র. তেনেস)

আত-তানাসী (التنسى) ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন আবদিল-জালীল আবী আবদিল্লাহ, খৃ. ১৫শ শতাব্দীর একজন মাগরিবী ঐতিহাসিক। তিনি Tlemcen-এর যায়্যানী শাসকদের দরবারী এবং তাঁহাদের সরকারী ইতিহাস সংকলক ছিলেন। জুমাদা উখরা ৮৯৯/ফেব্রুয়ারী ১৪৯৪ সনে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বর্তমানে বিলুপ্ত কয়েকখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও আল-ওয়ানশারীশী-র রচিত মি'য়ার গ্রন্থে তৎকর্তৃক সন্নিবেশিত কয়েকটি ফাতওয়া ব্যতীত আত-তানাসী প্রণীত তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদের একখানা ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থখানার শিরোনাম নাজমুদ-দুর্র ওয়াল-ইক্য়ান ফী শারাফ বানী যায়্যান [সম্পা. ও আংশিক অনু. Barges, Histoire des Beni Zayan, rois de Tlemcen, Paris 1852 এবং Complement de l'histoire des Beni Zeiyan, rois de Tlemcen, ouvrage du cheikh ...al-Tenesy, Paris 1887]। ইহা শুধু একখানা ইতিহাস গ্রন্থই নহে, বরং যুগধর্মানুসারে কবিতা সংকলন (anthology), সাহিত্য, নীতিবাক্য ও উপদেশমূলক ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহমাদ বাবা, নায়লুল-ইব্তিহাজ, ফাস ১৩১৭ হি., পৃ. ৩৫৩; (২) ইব্ন মারয়াম, বুস্তান, আলজিয়ার্স ১৩২৬/১৯০৮,

পৃ. ২৪৮ প.; (৩) Brockelmann, G.A.L., ২খ, ২৪১; (৪) Ben Cheneb, Idjaza, প্যারিস ১৯০৭, পৃ. ১৫৪, শাখা ১০৫।

E. Lavi-Provencal (E. I.[1])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

তানাসুখ (تناسخ) ঃ জন্মান্তরবাদ, আত্মার ভিন্ন দেহে প্রবিষ্ট হওয়া, মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি। ভারতীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুল প্রচারিত একটি বিশ্বাস। এই বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনাকারী মুসলিম লেকখগণ ইহাকে পিথাগোরীয়গণ অপেক্ষা ভারতীয়গণের মতবাদ বলিয়া উল্লেখ করেন। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা একটি ভিত্তিহীন কাল্পনিক মতবাদ।

শাহরাস্তানী তাঁহার "People of metempsychosis" নিবন্ধে শব্দটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ইহার অর্থ, এই বিশ্বজগতের পরম্পরাগত জীবন এবং পুনর্জন্ম সংক্রান্ত মতবাদ। তিনি বলেন, যে সকল জাতি মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে তাহাদের মধ্যে ভারতীয়গণই সর্বাগ্রগণ্য। তাহারা ফিনিক্স (Phoenix)-এর কাহিনী বর্ণনা করিয়া থাকে এবং পরে বলে যে, বিশ্বের ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আবর্তনের পর গগনমণ্ডল, নক্ষত্ররাজি সবই একই অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাহাতে বিশ্বজগতের জীবনধারার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই আবর্তন কালের দৈর্ঘ্য কাহারও মতে ৩০,০০০ বৎসর আবার অন্যদের মতে ৩,৬০,০০০ বৎসর। এই মহা-আবর্তন সম্পর্কে মাসঊদী (মুরূজ, ১খ, ১৬৩)-ও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই আবর্তনের স্থিতিকাল ৭০,০০০ বৎসর। গ্রীক জ্যোতির্বিদদের নিকট এই ধারণা সুপরিচিত ছিল। তাহারা ইহাকে "মহাবৎসর" হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

অন্য মতে, তানাসুখের অর্থ আমাদের জগতের সত্তাসমূহের মধ্যে পরমাত্মার পরিব্যাপ্তি ও বিভাজন। শাহরাস্তানীর মতে চরমভাবাপন্ন শী'ঈ গুলাতগণ কোন কোন মানুষের মধ্যে পরমাত্মার পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক তানাসুখ এবং অবতরণ অথবা দেহ ধারণ (হুলূল) সংক্রান্ত তত্ত্বে বিশ্বাস করে। বহু জাতির মধ্যে এই ধরনের তানাসুখে বিশ্বাস দেখা যায়। তাহারা ইহা মাযদাকী মেজাই (Mazdaki/Magi), ভারতীয় ব্রাহ্মণ, দার্শনিক ও প্রাচীন য়ামানী (Sabaeans)-দের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সূফীদের একটি সম্প্রদায়ের সহিত হুজবীরী পরিচিত ছিলেন, যাহাদিগকে তিনি হুলী নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তাহারা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকে, শুধু একটি মাত্র আত্মা রহিয়াছে যাহা চিরন্তন ও ঐশী, ইহাই পরিব্যাপ্ত হয় এবং বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করে। হুজবীরী বলেন, এই ধারণাটি অনেক খৃস্টানের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, যদিও তাহারা ইহা স্বীকার করে না। সাধারণত ভারতীয়, তিব্বতী এবং চীন দেশীগণও এই ধারণা পোষণ করে এবং শী'ঈ কারমাতী ও ইসমাঈলীদের মধ্যেও ইহা দৃষ্ট হয়। মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির চারিটি পর্যায় রহিয়াছে ঃ নাস্‌খ, মাস্‌খ, ফাস্‌খ ও রাস্‌খ।

কয়েকটি শী'ঈ সম্প্রদায় দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশের প্রচলিত অর্থে মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তরে প্রবেশে বিশ্বাস করে। শাহরাস্তানীর মতে, মু'তাযিলী সম্প্রদায়ভুক্ত আহমাদ ইবন হাইতের শিষ্যগণ শিক্ষা দিতেন, আল্লাহ প্রথম এক ধরনের-বেহেশতে সত্তাসমূহ সৃষ্টি করেন-পরে, তাহাদের মধ্যে যাহারা কোন প্রকার অবাধ্যতার কারণে অপরাধী হয় তাহাদিগকে তিনি তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে মানুষ ও পশুর আকারে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তারপর তাহাদের পাপের কালিমা মুছিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাহারা দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিতে থাকে।

ইসমাঈলীগণ পশুদেহে আত্মার প্রবেশের ধারণায় আস্থাশীল নহে। কিন্তু তাহারা ইমামকে স্বীকার না করা পর্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর এই পৃথিবীতে আত্মার পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণের ধারণায় আস্থা প্রকাশ করে। অতঃপর আত্মাসমূহ আলোর জগতে আরোহণ করে।

নূসায়রীগণ বিশ্বাস করে, তাহাদের ধর্মের পাপীগণ য়াহূদী, সুন্নী মুসলিম অথবা খৃস্টানরূপে এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিবে। যেসব অবিশ্বাসী আলীকে চিনিতে পারে নাই তাহারা উট, খচ্চর, গাধা, কুকুর অথবা অন্য প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। নুসায়রীদের মতে আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির সাতটি স্তর রহিয়াছে। বিশ্বাসী আত্মা, যাহা এই সাতটি স্তর অতিক্রম করিয়াছে, সেই নক্ষত্র জগতে আরোহণ করে-আদিতে যে জগত হইতে ইহা অবতরণ করিয়াছিল। আন্‌য এবং দুস্‌সাউদ মতবাদ অনুসারে (মৃত্যুর চল্লিশ দিন পর) সাতটি বেহেশতের মধ্য দিয়া আত্মা উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে। এই মতবাদটি ব্যাবিলনিয়ায় উদ্ভূত হইয়া পারসিক ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং পরে নব্য প্ল্যাটোনীয় ও প্রাচীন আধ্যাত্মিক রহস্যবাদী খৃস্টানদের ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করে। দ্রুয (Druse)-গণ তাহাদের সাধারণ বিশ্বাসের কিছু কিছু নুসায়রীদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছে, যদিও তাহাদের মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হামযা উহাদের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। তাহারা বিশ্বাস করে আলীর শত্রুদের আত্মাসমূহ কুকুর, বানর ও শূকরীর দেহে প্রবেশ করিবে। কুর্দী এবং য়াযীদীগণ মৃত্যুর পর আত্মার মানুষ ও পশুর দেহ গ্রহণে এবং ৭২ বৎসরের ব্যবধানে পৃথক পৃথক পর্যায়ক্রমিক জীবন ধারণে বিশ্বাসী। সায়্যিদ শারীফ জুরজানী (তা'রীফাত)-এর মতে তানাসুখ হইল দেহের প্রতি আত্মার আকর্ষণ হেতু মৃত্যুর পর আত্মার নূতন দেহে প্রবেশ করা।

মাসখ (নাসখ-এর অন্য একটি প্রকার) সম্পর্কে আস-সামারকান্দী কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে, যে সকল ব্যক্তি রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে শূকর এবং অন্যান্য প্রাণীর উদ্ভব ঘটিয়াছে। অনুরূপভাবে নক্ষত্র সুহায়ল এবং গ্রহ যুহরা (শুক্র গ্রহ) একজন রাজা ও রাজকুমারী ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত এবং কিছুটা অযৌক্তিকভাবে নক্ষত্রসমূহের মধ্যে স্থাপিত। পরিশেষে এক হাজার এক রাত্রি (আল্‌ফ লায়লা) এবং অন্যান্য গল্পে দৃষ্ট রূপান্তরের কাহিনী উল্লেখ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ শাহরাস্তানী, কিতাবুল-মিলান ওয়ান-নিহাল, সম্পা. Cureton, লণ্ডন ১৮৪২ খৃ., ২খ, ২৯৭ এবং স্থা.; (২) হুজবীরী, কাশফুল-মাহজূব, অনু. R.A.Nicholson, G.M.S. লাইডেন এবং লন্ডন ১৯১১ খৃ., পৃ. ২৬০ প.; (৩) R. Dusasud Histoire et religion des Nosaris, প্যারিস ১৯০০ খৃ., পৃ. ১২০ প.; (৪) W. Anz, Zur Frage nach dem Uroprung des Gnostizemus in Texte und Undersuchungen by v. Gebhardt, und Harnack, ১৫খ, লাইপযিগ ১৮৯৭ খৃ.; (৫) St. Guyard, Un grand Maitre des Assassins autempsde Saladin. J.A.,, প্যারিস ১৮৭৭ খৃ. (গল্পসমূহ); (৬) শায়খ নাসর ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আস-সামারকান্দী, বুস্তানুল-আরিফীন, মক্কা ১৩০০ হি., পৃ. ২৪০; (৭) J. Menant, Les yizidis in Annales du Musu Guimed, প্যারিস ১৮৯২ খৃ., পৃ. ৮৭।

B. Carra de Vaux (E. I.[1])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

তানূখ (تنوخ) ঃ একটি প্রাচীন আরব গোত্র-সংঘ। এই গোত্র-সংঘ একটি অভিন্ন বংশতালিকা গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই কারণে সাধারণত একটি গোত্ররূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

নামটির উৎপত্তিও তানূখ গোত্রের প্রাথমিক ইতিহাস এমন গভীরভাবেই উপাখ্যান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে, উহা হইতে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য উদ্ধার করা বর্তমানে অসম্ভব এবং ইহাদের প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহ হইতে প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিকরূপে বিবেচিত হইতে পারে এইরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। এই সকল ঐতিহ্যের আবার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যদি কিতাবুল-আগানী, ১১খ, ১৫৯ প.-এর ভাষ্যকে ভিত্তিরূপে বিবেচনা করা যায় (অনুরূপভাবে ইব্ন খালদূন, ইবার, ২খ, ২৪০ প.; বাক্‌রী, মু'জাম, পৃ. ১৬-১৭ ও Wustenfeld, Register, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫) তাহা হইলে নিম্নোক্ত চিত্র পাওয়া যায়ঃ কুদা'আ গোত্রসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সময়, তিহামা হইতে তাহাদের বিতাড়িত হইবার ঘটনা ইহার পূর্বের, তায়মাল্লাহ (দ্র. তায়মাল্লাত-এর সাথে সাথে) ইব্ন আসাদ ইব্ন ওয়াবারা ইব্ন তাগলিব [দ্র.] ইব্ন হুলওয়ান.....ইব্ন কুদাআ ও রুফায়দা ইব্ন ছাওর ইব্ন কাল্‌ব ইব্ন ওয়াবার-এর একটি অংশ (য়াকূত, ২খ, ২৮৮, শুক্‌ম আল-লাত ইব্ন রুফায়দার উল্লেখ করিয়াছেন) এবং আশআর গোত্রের একটি অংশ নাজদ্ হইতে বাহির হইয়া যায়। গোত্রটি বাহরায়নের হাজার অঞ্চলে গমন করে; এই অঞ্চল হইতে তাহারা তথায় ইতিপূর্বে বসতি স্থাপনকারী নাবাতীয় গোত্রকে বিতাড়িত করে। তাহাদের গোত্র-প্রধানগণের একজন মালিক ইব্ন যুহায়র, ইব্ন ফাহম্ ইব্ন তায়মাল্লাহ্‌র ভগ্নী, তাহাদের গোত্রীয় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা (কাহিনা দ্র.) আয-যারকা-র একটি ভবিষ্যদ্বাণী হইতে এই গোত্রসমূহ উহাদের তানূখ নাম লাভ করে। উক্ত মহিলা তাহাদিগকে একটি দাঁড়কাক যাত্রা শুরু করিবার জন্য ইঙ্গিত না দেওয়া পর্যন্ত "যাত্রাবিরতি এবং সাময়িক বসতি স্থাপনের" (মুকাম ওয়া-তানূখ, তুনূখ-এর পরিবর্তে; নিম্নে দ্রষ্টব্য) জন্য উপদেশ দেন। এই সময়ে তাহাদের সহিত আয্‌দ গোত্র যোগদান করে এবং তাহারা ইহার পর হইতে তাহাদের সহিত থাকিয়া যায়। দুই বৎসর পর ভবিষ্যদ্বাণীর দাঁড়কাক আবির্ভূত হইলে তাহারা ইরাম গমন করে এবং তথায় তাহারা তাহাদের নেতা মালিক [দ্র.]-এর নেতৃত্বাধীন আল-হীরা নামক শহর প্রতিষ্ঠা করে। তাহারা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিবার পর চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার ঘৃণ্য অধিবাসীদের বহু সংখ্যক (মাওয়াকিত) তাহাদের সহিত সংযুক্ত হইতে চাহে। শাপূর আল-আকবার (যুল-আকতাফ) তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং যেহেতু তাহাদের রণ-হুঙ্কার ছিল আল-ইবাদ আল্লাহ, তাহারা অতঃপর ইবাদ নামে পরিচিত হয়। তাহাদের পরাজয়ের পর তাহাদের মধ্যে বৃহত্তর অংশ আদ-দায়যাম ইব্ন মুআবিয়া আত-তানূখীর নেতৃত্বে মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের আল-হাদর গমন করে। আস-সাতিরূন আল-জারমাকানী ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় তাহারা শাহযাদী আল-যাব্বার-এর অধীনে দায়িত্ব লাভ করে এবং আমর ইব্ন আদী কর্তৃক শাহযাদী নিহত হইবার পর তাহারা ক্ষমতা দখল করে; শেষ পর্যন্ত তাহারা অবশ্য গাসসানী [দ্র.]-দের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয়।

এই ভাষ্য ও তাবারী কর্তৃক প্রদত্ত সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ (১খ, ৭৪৪প.) এবং ইব্ন খালদূন, 'ইবার, ২খ, ২৩৭ প. ; য়াকূত, ২খ, ৩৭৫ প.ও ইবনুল-আছীর, ১খ, ২৪৩ প. কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত রূপের অপর একটি ভাষ্যের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যটি বিরাজমান তাহা হইল, তিহামা হইতে বাহরায়ন অঞ্চলে যে সকল জনগোষ্ঠী অভিবাসন করিয়াছিলেন তাহাদের তালিকা। উপরে উল্লিখিত ভাষ্যে যেইখানে শুধুমাত্র য়ামানী গোত্রসমূহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (আশআর গোত্র, আয্‌দ গোত্রের ন্যায় কাহলান গোষ্ঠীর অন্তর্গত; তু. ইব্ন আবদিল-বার্‌র, পৃ. গ্র., পৃ. ১০২, ১১৫), শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রধানত শুধু মা'আদ্দ গোত্রের উল্লেখ রহিয়াছে, যদিও বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বেই উল্লিখিত মালিকের পাশাপাশি মালিক এবং আমর ইব্ন ফাহম ইব্ন তায়মাল্লাহ ও তাহার জনগণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে সকল কানাস সহকারে আল-হায়কার..... ইব্ন কানাস ইব্ন ম্য'আদ্দ এবং ইয়াদ ইব্ন নিযার ইব্ন মা'আদ্দ-এর তিনটি গোষ্ঠী (য়াকূত শুধু গাতাফান ইব্ন আম্‌র ইবনুত-তামাছান ইব্ন আওয মানাত ইব্ন য়াকদুম ইব্ন আফসা ইব্ন দুমী ইব্ন ইয়াদ-এর উল্লেখ করিয়াছেন; অপর দুইটির ক্ষেত্রে নামসমূহের পাঠ নিশ্চিত নহে এবং তাবারী ও ইব্ন খালদূনে প্রদত্ত নামে পার্থক্য রহিয়াছে; অতি. তু. Blau, পৃ. গ্র., পৃ. ৫৬৭)।

বাহরায়নে এই সকল গোত্র ও গোষ্ঠী আত্মরক্ষা অথবা আক্রমণ পরিচালনার জন্য সকলে একত্র হইয়া একটি গোত্র-সংঘ গঠন করে এবং তানূখ নাম ধারণ করে। তাবারী ও ইবনুল-আছীরের মতে নুমারা ইব্ন লাখম্-এর গোষ্ঠীসমূহও এইখানে তাহাদের সহিত যোগদান করে। জাযীমা আল-আবরাশ [দ্র.]-এর নেতৃত্বাধীন আয্‌দ গোত্র, তাহার সহিত মালিক ইব্ন যুহায়রের এক ভগ্নী লামীসের বিবাহ সম্পাদনের মাধ্যমে মৈত্রী বন্ধনে আনীত হয়। এই ভাষ্যে আয-যারকার উল্লেখ করা হয় নাই এবং দাঁড়কাক সংক্রান্ত কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে বাদ গিয়াছে। আরব গোত্রসমূহ ইরাকের উর্বর চাষাবাদসমৃদ্ধ ভূমির প্রতি প্রবল আগ্রহী হইয়া পড়ে এবং এই অঞ্চলে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিবার ক্ষেত্রে তাহারা মুলূকুত-তাওয়াইফের মধ্যে বিরাজমান সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করে। স্থানান্তরিত হইবার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে কানাস সহকারে আল-হায়কার গোত্র এবং অন্যরা; তাহারা আরামানী আরদাওয়ানী গোত্রের সম্মুখীন হয় এবং যুদ্ধের মাধ্যমে তাহাদের ভূমি অধিকার করিয়া লয়, পরবর্তীকালে তাহারা আল-আনবার ও আল-হীরার আরব জাতিসমূহের একটি উপাদান গঠন করে। তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া তায়মাল্লাহ ও ইয়াদ তাহাদের মিত্র গোত্রসমূহ সমভিব্যাহারে আল-আনবার অঞ্চলে এবং অতঃপর নুমারা ইব্ন কায়স ইব্ন নুমারা? (অথবা এবং নুমারা ইব্ন লাখম্?) কিন্দা গোত্রসমূহ এবং অন্যান্য গোত্র (তাবারীর গ্রন্থে বারংবার; মালিক ও আমর ইবন ফাহম) আল-হীরা অঞ্চলে গমন করে। বিভিন্ন গোত্রের যে সকল তালিকা বর্তমান উহাতে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির অবকাশ রহিয়াছে। য়াকূত ইহাদের সরাসরি তানূখ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহাদের সহিত আল-হীরা অঞ্চলে তুব্বা' আস'আদ আবূ কারিব কর্তৃক এই অঞ্চল হইয়া তাহার গমনকালে রাখিয়া যাওয়া দক্ষিণ আরবীয় জাতিসমূহ অঙ্গীভূত হয়। তাহার বর্ণনা অনুসারে তানূখ গোত্রের অধিকাংশ আল-আনবার ও আল-হীরার মধ্যবর্তী স্থানে পূর্বদিকে ফুরাত নদী দ্বারা এবং পশ্চিম দিকে মরুভূমি দ্বারা বেষ্টিত একটি এলাকায় বসতি স্থাপন করে। ইহারা আরাবুদ-দাহিয়া (পদযাত্রী আরব) নামে পরিচিত। তাহারা লোম-বস্ত্র দ্বারা নির্মিত কুটির ও তাঁবুতে বসবাস করে এবং কর্দম নির্মিত গৃহে নহে (নিম্নে দ্র.)। ইহার পর তিনি ইহাদের নৃপতিদের একটি তালিকা দিয়াছেন; ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ছিলেন মালিক ইব্ন ফাহম্। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার ভ্রাতা আমর্ এবং শেষোক্তের উত্তরাধিকারী হন জাযীমা আল-আবরাশ (কিন্তু উপরে দ্র.! জাযীমের পরবর্তী উত্তরাধিকারী প্রসঙ্গে তু. Rothstein, পৃ. গ্র., পৃ. ৩৮ প., যাহাতে বিভিন্ন ঐতিহ্য প্রদান করা হইয়াছে); ইহাদের

রাজ্য আল-হীরা, আল-আনবার, বাক্কা, হীত, আইনুত-তামর্ আল-গুময়র, আল-কুতকুতাম্ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এবং উহা অতিক্রম করিয়া গঠিত ছিল। তাহার উত্তরাধিকারী তাঁহার ভগ্নীর পুত্র আমর ইব্ন আদী ইব্ন নাসর (নুমারা ইব্ন লাখম্ গোত্রের সদস্য) ক্ষমতা লাভ করিলে গোত্রীয় ক্ষমতা লাখমীয় [দ্র.] বংশের হস্তে চলিয়া যায়। য়াকূত পরবর্তীকালে তাবারী কর্তৃক (১খ, ৮২১) বর্ণিত কাহিনী দ্বারা তাঁহার বর্ণনা অব্যাহত রাখেন; আরদাশীর ইব্ন পাপাক যখন ইরাকে তাঁহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তানূখ গোত্রের অনেকেই তখন তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে স্বীকৃত হয় নাই এবং সিরিয়া গমন করিয়া তাহারা তথায় বসতি স্থাপনকারী কুদাআর আশ্রয় গ্রহণ করে। হাম্যা আল-ইসফাহানী কর্তৃক প্রদত্ত অপর একটি পৃথক ভাষ্য অনুসারে (সম্পা. Gottwaldt, পৃ. ৯৪ প.) মালিক ইব্ন ফাহম ইব্ন তায়মাল্লাহ তাহার কুদাআসহ ও মালিক ইব্ন ফাহম ইব্ন গানাম্ ইব্ন দাওস ইব্ন উদছান (আদনান-এর পরিবর্তে এইভাবে পড়িতে হইবে!) আল-আযদী আযদ্ গোত্র লইয়া বাহরায়নে একটি হিলফ্ (মৈত্রী) সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তানূখ নাম গ্রহণ করে। ইহার পর আযদ্ গোত্র ইরাকে এবং কুদাআ গোত্র সিরিয়ায় গমন করে। এই "পশ্চিম তানূখ" রাজ্য আল-যাব্বা-এর মৃত্যুর পর (উপরে দ্র.) তিনজন রাজা কর্তৃক শাসিত হয়; আল-মাসঊদী, মুরূজ, ৩খ., ২১৫; ইব্ন খালদূন, ইবার, ২খ, ২৪৯-২৭৮ অনুসারে ইহারা হইল, আন-নু'মান ইব্ন আমর ইব্ন মালিক, তাঁহার পুত্র আমর এবং তাঁহার পর তাঁহার পুত্র আল-হাওয়ারী ইবনুন-নু'মান (ইব্ন খালদূন-এর গ্রন্থে ভ্রমবশত ইব্ন আমর)। অতঃপর এই এলাকায় আধিপত্য প্রথমে সালীহের হস্তে এবং পরে গাসসানী বংশের নিকট চলিয়া যায়।

অধিকতর বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করা অথবা প্রচলিত বিভিন্ন ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে একটি সংহতি স্থাপনের যে কোন প্রচেষ্টা কোন উদ্দেশ্য সাধনে সফল হইবে না। তানূখ জাতির প্রারম্ভিক ইতিহাস লাখমী ও গাসসানী বংশের ইতিহাসের ন্যায় একই প্রকার অস্পষ্ট এবং এই কারণে তাহাদের প্রাথমিক ইতিহাসে ইহাদিগকে একটি ভূমিকা প্রদানের প্রচেষ্টা তাই আরও সহজ হইয়া পড়িয়াছে (কিন্তু এমনকি এই বিষয়েও কোন প্রকার মতৈক্য দেখা যায় না। তু. Rothstein, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯ ও Caussin de perceval, পূ. গ্র., ২খ, ২০০)। Noldeke, পূ. গ্র., পৃ. ২৩, টীকা ২, সঠিকভাবেই মালিক ও অন্যান্য ব্যক্তিত্বকে "সন্দেহজনক ঐতিহাসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব"-রূপে বর্ণনা করেন। তানূখ জাতির প্রকৃত উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নটি, উপরন্তু, সার্বিকভাবে দক্ষিণ আরবীয় গোত্রসমূহের অভিবাসন সংক্রান্ত বিশাল সমস্যার অংশবিশেষমাত্র। সম্ভবত ইহারা, Goldziher, Muh. Stud., ১খ, ৬৬, যেইভাবে প্রস্তাব করেন, বহু সংখ্যক আরব গোত্রসমূহের একীভূত হইবার প্রাচীনতম উদাহরণ, তিনি অতঃপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, "যাহা কিছু ঐতিহাসিক, এই গোত্র-সংঘ সম্পর্কে দ্বিতীয় শতাব্দীর ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাচীন তাত্ত্বিকদের আবিষ্কৃত সকল কিছু পরিষ্কার করিবার পর, গোত্রসমূহের এই সংঘের মূল সত্য অবশিষ্ট থাকে, ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্য ও কাহিনীসমূহের বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক কেন্দ্ররূপে"। তাহাদের মধ্যকার বন্ধনের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব যে বাস্তবতার মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহা হইল এই যে, গোত্র-সংঘ একটি নূতন গোত্রীয় নাম ধারণ করে ঃ তাবারী, ১খ,৭৪৬-য়াকূত, ২খ, ৩৭৭ ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছে, "তাহারা জনসাধারণের উপর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তানূখ নামটি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং এই নাম লাভের ফলস্বরূপ তাহারা নিজেদের অপর একটি নূতন গোত্ররূপে পরিচয় দিতে থাকে" (একই প্রকার অন্যান্য অবস্থা এবং সার্বিকভাবে হিলফ সংঘ প্রসঙ্গে Rothstein, পৃ. ৩২-এ উদ্ধৃত গ্রন্থাবলী এবং অধুনা বিশেষভাবে E. Braunlich, in Islamica,, ৬খ., [১৯৩৪], পৃ. ১৯১-২০৬ দ্র.; ইব্ন খালদূন, ২খ, ২৪৯-৫০-সুওয়ায়দী, পূ. গ্র., পৃ. ১০১ অপরাপর কিছু গোত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন যাহারা একই পূর্বপুরুষ হইতে আসেন নাই; বাকরী, পৃ. ৩৭২ এমন কি তানূখ জাতির একটি গোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন সাতি')। এইভাবে গঠিত নূতন গোত্রটির জন্য একজন অভিন্ন পূর্বপুরুষকে গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে তানূখী নিসবা তাহারা গোত্রীয় নামের স্থান গ্রহণ করে। এই নিসবা ধারণকারী অন্যান্য অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি প্রসঙ্গে তু. A. Wiener, in Isl., ৪খ, ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৩৮৭)। মুকাম (উপরে দ্র.) দ্বারা তানূখ-এর ব্যাখ্যা প্রদান অতি অবশ্যই অর্থহীন (একইভাবে অভিধানসমূহে লিসানুল-আরাব, ২খ, ৪৮৭, ১১ প.; ইব্ন দুরায়দ, ২খ, ৮খ, ১৪. ঃ ত-ন-খ হইতে এই অর্থ নির্দেশে ১ঃ অথবা ৫ ঃ; জাওহারীতে [তু. তাজুল-আরূস, ২খ, ২৫৪, ৬ প.] এবং হামাসা, পৃ. ২৩৭ ন-ওয়া-খ হইতে তাগলিব-এর ন্যায় রূপে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ শুধু একটি বিশেষ্য মুকাম-এর সহিত স্থান পাইতে পারে)। যাহাই হউক না কেন, নামটি যথেষ্ট প্রাচীন এবং ইহা টলেমীর (Ptolemy) গ্রন্থে বিভিন্ন গ্রীক রূপায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় (ইংরেজী প্রতিবর্ণায়নে ঃ THANOÜITAL,-EITAI-NGAI, THANITAI; A. Sprenger, Geogr., পৃ. ২০৮; Blau, পূ. গ্র., পৃ. ৫৭৬)। তানূখ গোত্রের অঙ্গ-গোত্রসমূহ প্রসঙ্গে কোন প্রকার মাত্রার মতৈক্য কেবল যেই বিষয়ের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইল, উপরে উল্লিখিত তায়মাল্লাহ এবং এই বক্তব্য যে, তাহারা ইরাকে আগমনের পূর্বেই হিলফ্ সংঘে যোগদান করে (ইব্ন খালদূন ও সুওয়ায়দী, ঐ অনুযায়ী সিরিয়া গমনের পূর্বে ইহা ঘটে নাই)। ইহাও সম্ভব যে, ইরাকে তাহাদের বসতি স্থাপন ও ক্ষমতা লাভ কয়েকটি পর্যায়ে সংঘটিত হইয়াছিল। যাহাই হউক না কেন, সকল প্রচলিত ঐতিহ্যে আল-হীরা রাজ্যের উৎপত্তির সহিত তানূখ নামের সংযোগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহারা এই সময় হইতে ইহার ঐতিহাসিক ভিত্তি বর্তমান এই অঞ্চলের জনসংখ্যার একটি প্রধান অংশ গঠন করিয়াছে। হিশাম ইবনুল-কালবী (তাবারী, ১খ, ৮২২; একইভাবে য়াকূত, ২খ, ৩৭৯; ইব্ন খালদূন, ২খ, ১৭০; হামযা, পৃ. ৯৮ প.) প্রথম সাসানীয়, আরদাশীরের সময়কালে আল-হীরার জনসংখ্যার মধ্যে তিনটি প্রধান অংশ শনাক্ত করেন (অর্থাৎ তিনি প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী কালের পরিস্থিতিকে এই সময়কালের জন্য প্রযোজ্য করিয়াছেন) ঃ (১) তানূখ জাতি যাহারা ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে আল-আনবার ও আল-হীরার মধ্যবর্তী এলাকায় এবং আরও উজান এলাকায় বসবাস করিত, ইহারা লোম-বস্ত্র দ্বারা নির্মিত তাঁবুতে বাস করিত (সম্পূর্ণভাবে স্থায়ী বসতিতে অভ্যস্ত গোত্রসমূহের ন্যায় কর্দম নির্মিত গৃহে নয় [উপর দ্র.]; ইহারা বেদুইন ও কৃষিজীবী শ্রেণীর অন্তর্বর্তী একটি পর্যায়ভুক্ত জাতি ছিল ঃ দ্র. Noldeke, পূ. গ্র., পৃ. ২৪, টীকা, ৩; (২) ইবাদ গোত্র, ইহারা আল-হীরা অঞ্চলের প্রকৃত অধিবাসী ছিল এবং তথায় তাহারা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং (৩) আশ্রয়ভুক্ত গোত্রসমূহ (আহলাফ) যাহারা তানূখ অথবা ইবাদ গোষ্ঠীর কোনটির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত না হইয়া আল-হীরা অঞ্চলের গোত্রসমূহের সহিত নিজেদের সংযুক্ত করিয়াছিল এবং তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। সাধারণভাবে অবশ্য ইবাদ গোত্রকে অধিকতর সঠিকভাবে আল-হীরা অঞ্চলের খৃস্টান গোত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে যাহারা বিভিন্ন

গোত্রের উৎস হইতে আগত (উদাহরণস্বরূপ লিসানুল-আরাব, ৪খ, ২৬২, ৬; তাজুল-আরূস, ২খ, ৪১২; ২৬)। অন্যদিকে অল্পকাল পূর্বেই আহলাফ গোত্রকে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের নিজ গোত্রে এমন কোন দুষ্কর্ম সাধন করিয়াছিল অথবা তাহারা খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং এই কারণে তাহারা আল-হীরা অঞ্চলে অভিবাসন করে—এই সকল সংজ্ঞায় তানূখ জাতিকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাদ দেওয়া যায় না। আস-সুওয়ায়দীর মতে আহলাফ গোত্র প্রকৃতপক্ষে তানূখ গোত্রের একটি অংশমাত্র; ইবাদ গোত্র সম্ভবত বেশীর ভাগ ইহাদের মধ্য হইতেই আগত। এই শ্রেণীকরণ অবশ্য কোনভাবেই সুস্পষ্টরূপে গণ্য হইতে পারে না এবং ইহা আপাতদৃষ্টিতে একটি কৃত্রিম ছকের ন্যায় মনে হয় (ইবাদ জাতি প্রসঙ্গে এই নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়, এইজন্য দ্রষ্টব্য Rothstein-এর মন্তব্য, পৃ. ১৮-২৮; সার্বিকভাবে "প্রাচ্য খৃস্টান"-দের একটি অসাধারণ নামের জন্য মাসঊদীর Historical Encyclopaedia, অনু. Sprenger, লণ্ডন ১৮৪১ খৃ., পৃ. ২২৭, তু. ২৫১)। তানূখ গোত্র যে এই অঞ্চলের জনসংখ্যার মধ্যে একটি অগুরুত্বহীন অংশ ছিল না তাহা তাবারীর, ১খ, ৮৫৩; আগানী, ২খ, ৩৯, ৫ প. মন্তব্য হইতে সুস্পষ্টভাবেই দেখা যায়ঃ পারশিকগণের রাজা ১ম নু'মান (Noldeke, পৃ. ৮৩, টীকা ৩, মনে করেন যে, ২য় নু'মান অধিকতর সম্ভব) দুইটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রদান করেন: ইহারা ছিল দাওসার (ইবনুল-আছীর, ১খ, ২৮৭, অন্যদিকে ইহাকে দাওসরূপে উল্লেখ করেন) এবং আশ-শাহবা (মায়দানী, Proverbia, ১খ, ১৯৮-তে আল-আশাহিব), প্রথমটি তানূখ ও দ্বিতীয়টি পারসিক সৈন্য দ্বারা গঠিত ছিল; ইহাদের সমভিব্যাহারে তিনি সিরিয়া অঞ্চলে তাঁহার অভিযান পরিচালনা করেন। এই দুইটি সৈন্যবাহিনী অন্যান্য লাখ্‌মী অধিপতির ব্যাপারেও উল্লিখিত হইয়াছে (তু. Rothstein, পূ. গ্র., পৃ. ১৩৪-১৩৬; Blau, পৃ. ৫৭৫; ধারণাকৃত শব্দপ্রকরণের জন্য মায়দানী, ঐ, দ্র.)। বাক্‌রী, পৃ.৭২৮ কুহাদে (১৮৯) অনুষ্ঠিত একটি সংঘর্ষের উল্লেখ করেন (যাহা ইরাকে একটি স্থান বলিয়া কথিত) যাহাতে কাবূস ইবনুল-মুনযির-এর নেতৃত্বাধীন তানূখ বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় (Rothstein, পৃ. ১০৫)। তাহাদের প্রসঙ্গে অধিকতর বিখ্যাত অপর কোন যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবুল-ফিদা অত্যন্ত সার্বিকভাবে লাখমীগণের সহিত তাহাদের সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (সম্পা. Fleischer, পৃ. ১৮৪)। ঠিক কোন সময়ে তাহাদের মধ্যে খৃস্ট ধর্মের প্রবেশলাভ ঘটে তাহা জানা যায় নাই (Nau, পূ.গ্র.,পৃ. ১৬, Patrol. Orient., ৩খ, ১৯ প. হইতে প্রাপ্ত তথ্যভিত্তিতে ৫৫৯ ও ৫৭৫ খৃ. অব্দের মধ্যে তাহাদের ধর্ম-প্রচারকরূপে আহূদেম্মেহ-এর উল্লেখ করেন; আল-হীরার প্রথম বিশপের উল্লেখ পাওয়া যায় ৪১০ খৃ., অব্দে ঃ Rothstein, পৃ. ২৩ প.; Cheikho, পূ. গ্র., পৃ. ৭৮, ১৩৪ কর্তৃক ইবাদ নামের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত ধারণা ও প্রস্তাবনাসমূহ অবশ্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নহে)।

ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন বিজয় অভিযানে তানূখ গোত্রকে প্রধানত বাহ্‌রা, কাল্‌ব, সালীহ, গাসসান ইত্যাদির ন্যায় আংশিক খৃস্ট ধর্মাবলম্বী সীমান্ত গোত্রসমূহের মিত্ররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। খালিদ ইবনুল-ওয়ালীদ (রা) হি. ১২ সালে আয়নুত-তাম্‌র বিজয় করিবার পর দূমাতুল-জানদালের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এই স্থানে তাহাদের মধ্যে বহু সংখ্যক তাহাদের গোত্রপ্রধানদের, উদাহরণস্বরূপ জাবালা ইবনুল-আয়হামের নেতৃত্বে গাসসান ও তানূখ গোত্রের কিছু দল অধীনে সম্মিলিত হইয়াছিল এবং ইয়াদ ইব্‌ন গানম্‌কে প্রচণ্ড চাপের মুখে রাখিয়াছিল। মুসলিম বাহিনী দুইটির উপর আরব গোত্রসমূহের দ্বারা চালিত একটি ঝটিকা আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় এবং কেবল একটি অংশ দুর্গে প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হয়। ইহার স্বল্পকাল পরেই দুর্গটির পতন ঘটে এবং নারী ও শিশু ব্যতীত উহার অপরাপর সকল বাসিন্দাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (তাবারী, ১খ, ২০৬৫ প.; এই অভিযানের সহিত সংশ্লিষ্ট দূমা ও উকায়দির সংক্রান্ত সমস্যা প্রসঙ্গে Caetani, Annali, দ্বাদশ বর্ষ, শাখা ২৩২-২৩৪-এর পূর্ণাঙ্গ ও গভীর ব্যাখ্যা এবং এই সঙ্গে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ দ্র.)। একই বৎসর যখন খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) সিরিয়াতে একটি আক্রমণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন এবং এই লক্ষ্যে তায়মায় একটি বিশাল সেনাবাহিনী সংগঠিত করিতেছিলেন, বায়যানটাইনগণ ইহা জানিতে পারিয়া তানূখ গোত্রসহ পদযাত্রী জাতিসকল আরব গোত্রকে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান করে। কোন প্রকার প্রতিরোধ না করিয়াই যীযা হইতে তিন দিনের যাত্রা দূরত্বে দক্ষিণে শিবির স্থাপনকারী খৃস্টান আরব বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং খালিদের সহিত যোগদান করে। তিনি অতঃপর বিজয়ীরূপে বালকা প্রবেশ করেন (তাবারী, ১খ, ২০৮০ প.; ইবনুল-আছীর, ২খ, ৩০৮)। য়ারমূক নদীর তীরে সংঘটিত যুদ্ধের পর, যে যুদ্ধে তানূখ গোত্র একটি গাস্‌সানী নেতৃত্বের অধীনস্থ ছিল (Blau, পৃ. ৫৭১, ৫৭৫), আবূ উবায়দা ইব্‌নুল-জাররাহ (রা) হিমস ও কিন্নাস্‌রীনের প্রতি লক্ষ্য স্থির করেন এবং ঐগুলি অধিকার করিবার পর তিনি এই অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্বের স্থায়ী বসতিতে অভ্যস্ত হাদির কিননাস্‌রীন নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। এই স্থানে তানূখী জনগোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং তাহারা সিরিয়া অঞ্চলে আগমনের পর হইতে আবাসস্থলের জন্য তাঁবুর পরিবর্তে গৃহে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে কিছু অংশ ধর্মান্তরিত হয়। অন্যরা খৃস্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে; শেষোক্ত অংশের মধ্যে সালীহ গোত্রের সদস্য ছিল সর্বাধিক। আবূ উবায়দা তানূখ ও হাদির হালাবে অন্যদের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই তাহাদের উপর জিয়্‌যা কর ধার্য করেন (বালাযুরী, পৃ. ১৪৪-১৪৫; য়াকূত, ২খ, ১৮৫)। হিজরী ১৭শ সালে যখন রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস সিরিয়া পুনরুদ্ধারের জন্য এক বিশাল অভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন তখন কিননাস্‌রীন ও হালাবের জনগণ এবং সেই সঙ্গে দুই হাদির-এর তানূখ ও সালীহ গোত্রভুক্ত জনগোষ্ঠী তাহার সহিত যোগদান করে; কিন্তু ইরাকী সৈন্য মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে প্রেরণের দ্বারা উমার (রা) কর্তৃক পরিচালিত একটি দৃষ্টি-বিভ্রমী কৌশল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার দ্বারা যাযাব রাবী'আ [দ্র.] জাতি ও তানূখ গোত্রের উপর আক্রমণ পরিচালনা, খৃস্টান আরব গোত্রসমূহের সংঘর্ষ হইতে প্রত্যাহৃত হইবার জন্য প্রভাবিত করিতে যথেষ্ট প্রমাণিত হয় এবং ইহার অব্যবহিত পরেই তানূখ ও সালীহ গোত্র দ্বারা অপ্রত্যাশিতভাবে পরিত্যক্ত বায়যানটাইন বাহিনী একটি প্রচণ্ড পরাজয়ের শিকার হয়। বায়যানটাইন বাহিনীর কিছু খণ্ড-বিখণ্ড অংশ এবং সেই সঙ্গে কিছু সংখ্যক গাস্‌সানী, ইয়াদ ও তানূখ, যাহারা হেরাক্লিয়াসের সহিত সংযুক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছিল, মায়সারা ইব্‌ন মাসরূক আল-আবসী (রা)-র নিকট ধরা পড়ে এবং নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় (তাবারী, ১খ, ২৪৯৮-২৫০৩; ইবনুল-আছীর, ২খ, ৩৮৬, ৪১৩; য়াকূত, ২খ, ৭৩; ১খ, ৯২৮-বালাযুরী, পৃ. ১৬৪)। মুসলিম যুগের এই সকল তথ্য হইতে ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হইয়া উঠে যে, তানূখ গোত্র আল-হাদর হইতে অগ্রসর হইয়া বহু পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং আল-হামদানী বস্তুতপক্ষে ইহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণভাবে তাহাদের আবাসস্থলকে নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করেন ঃ (সিফা, পৃ. ১৩২,

১১); বাহরা হইতে বাম অভিমুখে (তু. Blau, পৃ. ৫৭১), [ভূমধ্যসাগর] সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তানূখ গোত্রের বাস। তথায় ফুদাইদগণের বাসস্থান? (বিভিন্ন রূপসমূহ দ্রষ্টব্য!), যাহারা তানূখ গোত্রের অধিপতি ও রক্ষাকর্তা (Sprenger, Geogr., পৃ. ২০৯, যোগ করিয়াছেন "অর্থাৎ Qacyc [মূল পাঠ!!]-গণ ইহাদের মধ্যে যোদ্ধৃশ্রেণী গঠন করিয়াছে" [?])। সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত আল-লাযিকিয়া ইহাদের অধিকারভুক্ত।" ইহা অসম্ভব নহে যে, নাজ্‌দ অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহারা তায়্যি-এর জাদীলা গোত্রের আবাসভূমির কিছু অংশ দখল করিয়া নিয়াছিল (আনু. ৬২৫?; Caussin de Perceval, ২খ, ৬২৯-৬৩২; ৩খ, ৪৯৪ প.; তু. হামাসা, পৃ. ১৭৫-১৭৭; ইবনুল-আদীম, পূ. গ্র., পৃ. ১, ৪৫)।

অন্যান্য খৃস্টান গোত্রের ন্যায় (উদাহরণস্বরূপ তাগলিব) তাহারা সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে মু'আবিয়ার পক্ষে এবং মারজ রাহিত-এর যুদ্ধে মারওয়ানের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল (মাসঊদী, মুরূজ, ৪খ, ৩৫২; ইবনুল-আছীর, ৩খ, ২৬১; ৪খ, ১২৩=তাবারী, ১খ, ৩,৩২৪; ২খ, ৪৭৮, ৪৮৪; Lammens, Moawia, পৃ. ৪২৭, ৪৩৫)। গৃহযুদ্ধের কালের সংঘর্ষে তাহারা বিশেষভাবে উল্লেখ্য কোন প্রকার ভূমিকা পালন করে নাই। কিন্তু দক্ষিণ আরবীয় গোত্র হিসাবে তাহারা য়ামানীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল; অপরপক্ষে সম্ভবত এই সহানুভূতির কারণেই বংশতালিকা সংকলকগণ তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অবস্থানের তুলনায় অনেকাংশে অধিকতর য়ামানী রক্তসমৃদ্ধরূপে চিহ্নিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন (তু. Goldziher, পূ. গ্র., ১খ, ৯৭)।

আল-মাসাঊদী, ঐ, ৬খ, ৮৪-তে দেখা যায়, ২য় মারওয়ান যখন তাঁহার কায়স [দ্র. কায়স-আয়লান]-সহ কিননাস্‌রীন ও খুনাসিরা অঞ্চল হইয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন ঐ এলাকার তানূখ গোত্র তাহার সেনাবাহিনীর পশ্চাদ-দলকে আক্রমণ করে (১৮৭=৭৪৪-৭৪৫), Barhebraeus-এর বর্ণনা অনুসারে (Chr. syr., পৃ. ১৩২ প., Chabot কর্তৃক F. A., ৯খ/১৬ [১৯০০], পৃ. ২৮৭-তে প্রকাশিত উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা সমর্থিত), খালীফা আল-মাহদী (১৫৮-১৬৯/৭৭৫-৭৮৫) আলোপ্পোর চতুষ্পার্শ্বে তাঁবুতে বসবাসকারী তানূকায়ে গোত্রকে শক্তি প্রয়োগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাহাদের গির্জাসমূহ ধ্বংস করান। হারূনুর-রাশীদের মৃত্যুর পর যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় তাহাতে বিদ্রোহী বাহিনী আলেপ্পোর নিকটে তাহাদের বসতির উপর হামলা চালায়। Michael Syrus-এর বর্ণিত কাহিনীতে (Chron., ৩খ, ২১-৩০; in Nau, পূ. গ্র., পৃ. ১০৮-১০৯) যোগ করা হইয়াছে যে, তাহাদের আবাস এলাকা অত্যন্ত বিস্তৃত হইবার কারণে তাহাদের কোন প্রতিরক্ষা প্রাচীর ছিল না। কিন্তু তাহাদের উৎপাদিত পণ্য ও ব্যবসার কারণে তাহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই সংঘর্ষ প্রায় দশ দিন পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে চলিতে থাকে। ইহার পর তানূখগণ রাত্রির অন্ধকারে গোপনে কিননাসরীন অভিমুখে যাত্রা করে এবং তাহাদের গৃহসমূহ, যাহাতে প্রভূত পরিমাণে ধন-রত্ন রক্ষিত ছিল, লুণ্ঠন করে ও ধ্বংস করে। আল-বালাযুরী, পৃ. ১৪৬ প্রদত্ত বর্ণনা অনুসারে তাহারা কিননাসরীন পুনরায় তাহাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ফলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তিকরীত, আর্মেনিয়া ও অন্যান্য স্থানে চলিয়া যায়।

এমনকি এই সময়কালেও বিভিন্ন তানূখ বসতির মধ্যকার বন্ধন স্পষ্টতই অত্যন্ত শিথিল ছিল অথবা তাহারা অন্যান্য গোত্রের মধ্যে শেষোক্ত ধারণাই সমর্থন করে। পরবর্তীকালে তাহাদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া যাওয়া এবং প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে একক গোষ্ঠীসমূহের অঙ্গীভূত হইয়া যাওয়া, যাহা তাহাদের ধর্ম পরিবর্তনের একটি স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ছিল, তাহাই অনুসরণ করা অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইব্‌ন আবদুল-বার্‌রের (পূ. গ্র., ৩০) মতে কিছু কিছু বায়যানটাইন কুদাআ, অর্থাৎ তানূখ, বাহরা ও সালীহ গোত্র হইতে আগত, যাহারা হেরাক্লিয়াস-এর সহিত (উপরে দ্র.) সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল এবং তাহারা সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জাবাল শামমার আধুনিক অধিবাসীদের মধ্যকার খৃস্টান গোত্রসমূহের (তায়্যি, তানূখ ও তাগলিব [দ্র.] অস্পষ্ট স্মৃতিসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য একইভাবে বিবেচনার যোগ্য নহে। সিরীয়া অঞ্চলে অদ্যাবধি তানূখ গোত্রের কিছু অংশ টিকিয়া আছে এই মর্মে ফু'আদ হামযার বক্তব্য (কালব জাযীরাতিল-আরাব, মক্কা ১৩৫২ হি., পৃ. ২৩৩) অধিকতর গুরুত্ব লাভের যোগ্যতাসম্পন্ন। কারণ M. Hartmann-এর বক্তব্য অনুসারে এই নামটি অদ্যাবধি দ্রুজ গোষ্ঠীর মধ্যে সন্ধান পাওয়া যায় (দ্র. A. Wiener, পূ. গ্র.)। ২১ (৬২৪) সালে আম্‌র ইবনুল-আস (রা)-এর সহিত যে সকল গোত্র মিসরে প্রবেশ করে এবং আল-ফুসতাত-এর বিশাল মসজিদের চতুষ্পার্শ্বে বসতি স্থাপন করে, তাহাদের মধ্যেও তানূখ গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্র. ইব্‌ন আবদুল-হাকাম, ফুতূহ মিসর, সম্পা. Torrey, পৃ. ১১৩-১১৪, ১১৯-১২০-১২৯)।

তানূখ গোত্রের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের মাত্রা ইবাদ গোত্রের তুলনায় নিম্নতর ছিল (এই প্রসঙ্গে Rothstein, পূ. গ্র., পৃ. ২৪-২৮, যথাযথ আলোচনা করিয়াছেন)। অর্ধ-যাযাবর একটি জাতি হিসাবে মরুভূমি অঞ্চলে তাহাদের নিকট লিখন-শিল্প সম্ভবত আল-হীরা শহরের তুলনায় কম পরিচিত ছিল (তু. G. Jacob, Beduinerleben, পৃ. ১৬২), কিন্তু Michael Syrus-এর বক্তব্য অনুসারে তাহারা আকূলায়ে ও তূ'আয় গোত্রের সহিত আরবী ভাষায় গসপেলের অনুবাদ কর্মে অংশগ্রহণ করে (দ্র. Caetani, year 17, শাখা ১৪৫; Nau, পূ. গ্র., পৃ. ১০৬)। পরিশেষে ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তানূখ ও ইবাদ নামসমূহের ব্যবহার হইতে খুব বেশি কিছু তথ্য বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না এবং এই পর্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ইবাদ গোত্র প্রসঙ্গে যাহা কিছু তথ্য রহিয়াছে তাহা সার্বিকভাবে তানূখ গোত্রের ক্ষেত্রেও সত্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধগর্ভে বরাতসমূহ ব্যতীত) আরব অভিধানসমূহ ও বংশক্রম সংক্রান্ত হ্যাণ্ডবুকসমূহ ঃ (১) F. Wustenfeld, Register, পৃ. 888-885 এবং Tabellen, ২; (২) আল-কালকাশান্দী, নিহায়াতুল-আরাব ফী মা'রিফাতি আনসাবিল-আরাব, বাগদাদ ১৩৩২ হি. পৃ. ১৬১; (৩) আস-সুওয়ায়দী, সাবাইকুয-যাহাব ফী মা'রিফাত্ কাবাইলিল-আরাব, বোম্বাই ১২৯৬ হি. (লিথো), পৃ. ১০১; (৪) ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবুল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, গটিনজেন ১৮৫০ খৃ., পৃ. ৫১, ৫৩; (৫) ইব্‌ন আবদুল-বার্‌র, আল-ইনবাহ আলা কাবাইলির-রুওয়াহ, কায়রো ১৩৫০ হি., পৃ. ৩০, ১২২; (৬) তাবারী, ইবনুল-আছীর, বালাযুরী (সম্পা. de Goeje), মাসঊদী (মুরূজ), কিতাবুল-আগানী, য়াকূত (মু'জাম), নির্দেশনাসমূহ; (৭) বাক্‌রী, মু'জাম, পৃ. ১৪-১৮=F. Wustenfeld, Die Wohnsitze und Wanderunger der arabischen Stamme, in Abh. Ges.; Wiss; Gott., ১৪ খ. (১৮৬৮-১৮৬৯), পৃ. ১০৭-১১৩; ইহার অতিরিক্তরূপে; (৮) O. Blau, in Z.D.M.G., ২৩খ (১৮৬৯), পৃ. ৫৬৭-৫৭১, ৫৭৫-৫৭৭, (তু. ঐ লেখক, পূ. গ্রন্থ, ২২খ. [১৮৬৮], পৃ. ৬৬০, ৬৬৩, ৬৬৭, ৬৭০); (৯) ইব্‌ন খালদূন, ইবার, বূলাক ১২৮৪ হি. হি., ২খ, ১৭০, ২৩৭-২৪৮-২৫০, ২৫৯, ২৭৮; ২/২ খ, পৃ. ৮২-৮৪,

১০৭ প.; (১০) ইবনুল-আদীম, in G.W. Freytag, Selecta ex historia Halebi, প্যারিস ১৮১৯ খৃ. পৃ. ১-৩, ৯, ৪৫; (১১) আল-বাতানূনী, আর-রিহলা আল-হিজাযিয়া, কায়রো ১৩২ হি., পৃ. ১৯-২০; (১২) A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, বার্ন ১৮৭৫ খৃ., পৃ. ২০৮-২০৯, ২৮৮-২৯১; (১৩) Th.. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, লাইডেন ১৮৭৯ খৃ, পৃ. ২৩-২৫, ৩৩-৩৫, ৮৩; (১৪) G. Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden in Al-Hira, বার্লিন ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ১৮, ২৮-৪০, ৬৭, ১০৫, ১৩৪-১৩৬ (প্রাচীনতর কালের জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পর্যালোচনা); (১৫) A. P. Caussinde Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes. প্যারিস ১৮৪৭-১৮৪৮, ২খ, ৫-৩৪, ৪২,৪৬, ১৮৬, ১৯৯-২০৪; ৩খ, ৪২২ প., ৪৯৪-৪৯৮, ৫১১-৫১৫; (১৬) J.J. Reiske, Primae lineae hist. regn. arab....., সম্পা. F. Wustenfeld, গটিনজেন ১৮৪৭ খৃ., পৃ. ৮-২৯, ৬৯ প.; (১৭) A. von Kremer, Uber die sudarabische Sage, লিপযিগ ১৮৬৬, পৃ. ৪৯, ৫৮ প., ৮৩, ১৩৭। উহাদের খৃষ্ট ধর্ম প্রসঙ্গে ঃ (১৮) আহমাদ ইব্ন হানবাল, মুসনাদ, ৪খ, ৭৫; (১৯) L. Cheikho, আন-নাসরানিয়া ওয়া আদাবুহা বায়না আরাবিল-জাহিলিয়্যা, বৈরূত ১৯১২-১৯২৩, পৃ. ৭৮, ৯৯, ১২৫, ১২৭, ৪৫৩-৪৫৬; (২০) H. Lammens, Etudes sur le regne du calife omaiyade Maawia ler, প্যারিস ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৫৩, ২৯২, ২৯৫, ৪২৭, ৪৩৫; (২১) ঐ লেখক Etudes sur le siecle des Omayyades, বৈরূত ১৯৩০ খৃ., S. ১৮, ২৪২; (২২) F. Nau, Les Arabes chretiens de Mesopotamie et de syrie du VIIeme au VIIeme siecle, প্যারিস ১৯৩৩ খৃ., পৃ.১৫-১৭, ১০৬-১০৯; (২৩) H. Charles. Le Christianisme des Arabes nomades sur le Limes, প্যারিস ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৩-৪, ৫৫, ৭৭-৭৮।

H. Kindermann (E. I.[1], Suppl.)/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আত-তানূখী (التنوخى) ঃ আবূ আলী আল-মুহাস্‌সিন আল-কাদী (ابو على المحسن القاضى) জনৈক আরব গ্রন্থ প্রণেতা, সাহিত্যিক, কবি ও সাংবাদিক। বস্‌রা শহরে তাঁহার জন্ম, তাঁহার নিজ বর্ণনানুসারে জন্মতারিখ (তৎপুত্র কাদী আলী কর্তৃক তাঁহার নিকট হইতে বর্ণিত) রাবী (১)৩২৭/জানুয়ারী ৯৩৯ (তা'রীখ বাগ্‌দাদ), ইব্ন খাল্লিকান-এরও এই একই মত; য়াকূতের মতে তাঁহার জন্ম ৩২৯/৯৪০-৪১ সনে। তাঁহার পিতা বস্‌রার জনৈক বিজ্ঞ কাদী (ও দীওয়ান রচয়িতা কবি) আবুল-কাসিম আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (মৃ. ৩৪২/৯৫৩) [তু. সাম্‌আনী, দ্র. শিরো. আত-তানূখী ও উক্ত নিবন্ধে তাঁহার বংশতালিকা; এতদ্ব্যতীত দেখুনঃ ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, ১খ., ৪৪৫]। আত-তানূখী তাঁহার প্রথম জীবনে আস-সূলী (দ্র.), আবুল-ফারাজ আল-ইস্‌ফাহানী (দ্র.) ও অন্যান্য আলিমের নিকট বস্‌রা ও বাগ্‌দাদে ইল্‌ম শিক্ষা করেন এবং অতঃপর তিনি আমৃত্যু বাগদাদেই বসবাস করেন। তিনি বিচার বিভাগে নিযুক্ত থাকিতে পসন্দ করেন এবং পদোন্নতি লাভ করিতে করিতে ক্রমে কাদীর পদে সমাসীন হন। তিনি প্রথমে বাগদাদের ও পরে আহওয়াযের কাদী নিযুক্ত হন। ৯৬৯-৭০ খৃ. বাগ্‌দাদের খলীফার মন্ত্রী সভায় রদবদল ঘটিবার ফলে তিনি পদচ্যুত হন এবং তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করা হয়। তিনি তিন বৎসর ধরিয়া পদচ্যুত থাকেন। অনুমিত হয় যে, ঐ সময়ে তিনি প্রধানত বাগদাদেই অবস্থান করেন। তিনি উক্ত সময়ে মিসরও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পর তিনি স্বীয় পূর্ব পদে পুনর্বহাল হন; কিন্তু সুলতান আদ্‌দুদ্‌দ-দাওলা বুওয়ায়হী (দ্র.)-র শাসনামলে ৯৮১-৮২ খৃ. তিনি পুনরায় সরকারের রোষানলে পতিত হন। কথিত আছে যে, ইমাম শাফিঈ (র) ও তাঁহার অনুসারীদের সমালোচনা করিবার কারণে তিনি কিছুকাল কারারুদ্ধও ছিলেন। মুহার্‌রাম ৩৮৪/মার্চ ৯৯৪ সনে বাগদাদে তাঁহার ইনতিকালের পূর্বে তাঁহাকে আরও অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

তানূখী কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলীঃ (১) দীওয়ান, বর্তমানে বিলুপ্ত। তাঁহার পিতা কর্তৃক রচিত দীওয়ান অপেক্ষা কলেবরে বৃহত্তর (য়াতীমা দ্র.)। (২) তিনখানা গল্পগ্রন্থ ঃ (ক) কিতাবু নাশ্‌আরিল-মুহাদারা ওয়া আখ্‌বারিল-মুযাকারা। উহার রচনাকার্য আরম্ভ হইয়াছিল ৩৬০ হি.। তিনি গার্‌সুন-নি'মা, কিতাবুর-রাবী নামে উহার একখানা পরিশিষ্ট রচনা করিয়াছেন (মু'জামুল-উদাবা, ৬খ., ৬৫১)। (খ) আল-মুস্‌তাজাদ মিন ফাআলাতিল-আজ্‌ওয়াদ। (গ) আল-ফারাজু বা'দাশ-শিদ্দাহ। উহা আত-তানূখীর প্রসিদ্ধ রচনা বটে। গ্রন্থখানা ৯৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বের রচনা নহে। উহাতে প্রবাদবাক্য, বচন ও কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে যাহার সাধারণ বিষয়বস্তু কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য। আনুমানিক দেড় শত বৎসর পূর্বে মাদাইনী উক্ত বিষয়ে একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর ইব্ন আবিদ-দুন্‌য়া ও কাদী আবুল-হুসায়নও উক্ত বিষয়েই অনুরূপ গ্রন্থাবলী রচনা করেন। আত-তানূখী তাঁহার এই গ্রন্থের রচনায় উক্ত গ্রন্থাবলী এবং অন্যান্য সাহিত্য গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করা ব্যতীত লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী ও আখ্যান হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থখানায় বর্ণিত কাহিনীসমূহের মধ্য হইতে কতকগুলি কাহিনী তো লেখক তাঁহার পিতা ও উস্তাদগণের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত উহাতে তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ও উপস্থাপিত করিয়াছেন। তবে গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়াবলীর অধিকাংশই (যাহা তিনি সাহিত্য গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করেন নাই) তিনি সচিব, লেখক ও কাদীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা রহিয়াছে যাহাতে তাঁহার পূর্ববর্তীদের রচনাবলীর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বিভিন্নরূপ পৃথক পৃথক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকাংশ কাহিনীর প্রারম্ভে সংক্ষেপে উহাদের উৎসের উল্লেখ রহিয়াছে। বর্ণিত কাহিনী ও উহার বর্ণনারীতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থটিকে মোট চৌদ্দটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইব্ন আবিদ-দুন্‌য়ার গ্রন্থে নৈতিকতার শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু তানূখীর গ্রন্থে সূক্ষ্ম ও রসাত্মক বিষয়ের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থখানা জনপ্রিয় হইয়াছে। উহার পাঠক সংখ্যা বহু ছিল এবং উহার বহু অনুলিপিও করা হইয়াছে। পরবর্তী যুগে ফারসী, তুর্কী ও য়াহূদী সাহিত্যকে উহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। কাসিম ইব্ন মুহাম্মাদ লালে লী আল-ফারাজ গ্রন্থটি তুর্কীতে অনুবাদ করিয়াছেন (দ্র. ব্রকেলম্যান, পরিশিষ্ট, ১খ, ২৫৩)। উহার দুইটি ফারসী অনুবাদ রহিয়াছেঃ প্রথমটি সাদীদুদ-দীন মুহাম্মাদ আল-আওফী (মৃ. ৬৪০/১২৪২-এর দিকে; দ্র. আওফী মুহাম্মাদ) এবং দ্বিতীয়টি হুসায়ন ইব্ন আস্‌আদ ইব্ন হুসায়ন আদ-দিহিস্‌তানী আল-মুআয়্যাদী করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, হুসায়ন ইব্ন আসআদ দুসতূর-ই আজাম আবুত-তায়্যিব ইয়্যুদ-দীন তাহির ইব্ন যাঙ্গী আল-ফারিয়ুমাযী (মৃ. ৬৭৬ হি.)-র সচিব ছিলেন। আর ইয়্যুদ-দীন, সুলতান উর্‌গূন আকার-পক্ষ হইতে খুরাসান ও মাযান্দারান-এর শাসনকর্তা ছিলেন, যিনি ইবনুল-ফুওয়াতী (জ. ৬৪২ হি., মৃ. ৭২৩ হি.; দ্র. তাল্‌খীসু মাজ্‌মাইল-আদাব, লাহোর, ৫খ., ৮৩)-এর বর্ণনামতে খুরাসানের স্বল্প

সংখ্যক অবশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। আল্লামা নাসীরুদ-দীন তূসী ইবনুল-ফুওয়াতীর নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইয়্যুদ-দীন তাহির, তাহির ইবনুল-হুসায়ন আল-খুযাঈর বংশধর ছিলেন। তিনি বড় জ্ঞানী ও প্রতিপত্তিশালী শাসনকর্তা ছিলেন। দীবাচাহ-ই জামিউল-হিকায়াত গ্রন্থে (গিব ওয়াক্‌ফ্‌ সংস্থা কর্তৃক মুদ্রিত, পৃ. ১৮ প.) যে ইয়্যুদ-দীন ইব্‌ন তাহির-এর উল্লেখ আছে তিনি সেই ব্যক্তি নহেন। ইনি ইবনুল-ফুওয়াতীর বর্ণিত ইয়্যুদ-দীন তাহির যাঁহার সম্বন্ধে আল-ফারাজু বা'দাশ-শিদ্দাতি ওয়াদ-দীকাহ গ্রন্থের অনুবাদের একখানা প্রাচীন অনুলিপির ভূমিকায়ও উল্লেখ করা হইয়াছে (উক্ত তারিখবিহীন অনুলিপিখানা মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী-র ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে)। উক্ত গ্রন্থের আরও কোন কোন পাণ্ডুলিপিতেও তাঁহার নাম ইয়্যুদ-দীন তাহিররূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

তানূখীর পুত্র কাদী আবুল কাসিম 'আলীও একজন সাহিত্যিক, কবি ও কাব্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল-মা'আররী-র ছাত্র ছিলেন। তিনি মুহাররম ৪৪৭/এপ্রিল ১০৫৫ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার জীবনীর জন্য দেখুন ইব্‌নুল 'ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ১১৩।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Wiener, Die Farag ba das-Sidda Literatur, Isl., iv, ১৯১৩ খৃ., পৃ. ২৭০-২৯৮, ৩৮৭-৪২০, বিশেষত পৃ. ৩৯৩-৪১৩; পূর্ণ উৎস গ্রন্থাবলীর জন্য দেখুনঃ পৃ. ৩৯৩, টীকা ২ এবং পৃ. ৩৯৮, টীকা ১; (২) য়াকূত, ইর্‌শাদুল-আরীব, সম্পা. D.S. Margoliouth (গিব ওয়াক্‌ফ্‌ সংস্থা), ৬খ, ২৫১-২৬৭; (৩) মু'জামুল-বুলদান, দ্র. শিরো.; (৪) আল-ফারাজু বা'দাশ-শিদ্দাহ, দুই খণ্ডে, কায়রো ১৯০৩-১৯০৪ খৃ.; (৫) তা'রীখ বাগ্‌দাদ, ১৩খ, ১৫৫; (৬) আছ-ছাআলিবী, য়াতীমাতুদ-দাহ্‌র, প্রথম প্রকাশ, ২খ, ১০৫, ২খ, ১০৫; (৭) ইব্‌নুল খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ৪৪৫; (৮) ইব্‌ন ইমাদ, শাযারাত, ৩খ, ১১২; (৯) যাকী মুবারাক, আন- নাছরুল-ফান্নী, ১খ, ৩১৫; (১০) মুহাম্মাদ নিজামুদ-দীন, Introduciton to the Jawami al-Hikayat, গিব ওয়াক্‌ফ্‌ সংস্থা, নব পর্যায়, সংখ্যা ৮, পৃ. ৯০, ২খ. (বরাতের উল্লেখসহ); (১১) ব্রকেল্‌ম্যান, ১খ., ১৬১ প., পরিশিষ্ট, ১খ, ২৫২ প. (উৎস গ্রন্থের বিশদ তালিকাসহ)।

R. Parret ও সম্পাদনা-পরিষদ (দা.মা.ই.)/মু. মাজ্‌হারুল হক

তানোর (تنور) ঃ রাজশাহী জিলার অন্যতম উপজিলা, সাবেক থানা। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন এইখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপজিলার বিহরাইলে একটি ভগ্ন বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বিহরাইল ও ধানোর-এ বৌদ্ধবিহারের ভগ্নস্তূপ আছে। পারিশা গ্রামে একটি পাথরে বরাহ অবতারের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। এইখানে অনেকগুলি পুরাতন দীঘি ও পুকুর আছে। বিখ্যাত কুমারী বিলটি এই উপজিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ স্থান।

উপজিলা ২৪°৩৮´ হইতে ২৪°৪৮´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। উত্তরে নিয়ামতপুর, নাচোল ও নবাবগঞ্জ সদর উপজিলা, দক্ষিণে গোদাগাড়ি ও পবা এবং পূর্বে মোহনপুর ও মাণ্ডা উপজিলা। উপজিলার মোট আয়তন ১১৫ বর্গ মাইল। ১৯৮১ খৃ.-এর আদমশুমারি অনুসারে উপজিলার জনসংখ্যা ১,১৩,২৩৯। জনবসতি প্রতি বর্গমাইলে ৯৮৩। ১৯৮১ খৃ. আদমশুমারি অনুযায়ী রাজশাহী জিলার মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা হার ৮৮.৬। তানোর উপজিলার মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় অনুরূপ।

উপজিলার শিক্ষার হার ১৭.৮%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৭, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭, মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩ ও মাদরাসার সংখ্যা ৩। উপজিলা ৬টি ইউনিয়নে বিভক্ত। মোট মৌজার সংখ্যা ২১২। গ্রাম ও মৌজার সংখ্যা একই। উপজিলার ৭৩৮ মাইল সড়কের সবটাই কাঁচা। রাজশাহী ও আমনুরার সহিত সড়ক যোগাযোগ রহিয়াছে।

ইতিহাস ঃ তানোরসহ সমগ্র রাজশাহী অঞ্চল এক সময় পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই রাজ্যের ইতিহাস এখনও অনেকটা অনুদ্‌ঘাটিত। এই অঞ্চলের প্রামাণিক ইতিহাস হিসাবে পাল শাসনই প্রথম। তাহাদের সাম্রাজ্য বাংলা হইতে দক্ষিণ বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পালগণ ৭৫০ হইতে ১১৫০ খৃ. পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় ছিল। অতঃপর সেনগণ বরেন্দ্র ভূমিসহ এই অঞ্চলে হিন্দু সাম্রাজ্য বিস্তার করে। ১২০৪ খৃ. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খালজী নদীয়ার লক্ষণ সেনকে বিতাড়িত করিয়া এই অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩৮ খৃ. পর্যন্ত দিল্লীর নামমাত্র আনুগত্যে এই অঞ্চল এক রকম স্বাধীনভাবেই শাসিত হইতে থাকে। ফাখরুদ-দীন মুবারাক শাহ প্রথম বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া এই অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন (১৩৩৮ খৃ.)। মুগল আমলে এই অঞ্চল কতকগুলি চাকলায় পৃথক পৃথক হিন্দু জমিদারের অধীনে ছিল। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" এই অঞ্চলের উপর দেওয়ানী লাভ করে। এই উপজিলার ইসলাম প্রচারের ইতিহাসের জন্য দ্র. রাজশাহী প্রবন্ধ। স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভবের (১৯৭১ খৃ.) পর তানোর উপজিলায় উন্নীত হয় (১৯৮৫ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Population Census of Pakistan, 1961, District Census Report, Rajshahi, Parts I-V, তা. বি., ঢাকা, pp. 1-6, 1-7, 1-8, V-55-V-167; (২) Bangladesh Population Census Report, 1981, District Rajshahi, Dhaka, December 1984, pp. XXIII-XXIV, LV-LXXI,5; (৩) কাজী মোহাম্মাদ মিছের, রাজশাহীর ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৫ খৃ.; (১৩৭২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১০০-২১৫; (৪) ঐ লেখক, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩-২১২; (৫) রাজশাহী পরিচিতি, বরেন্দ্র একাডেমী, রাজশাহী, পৌষ ১৩৮৬ (জানুয়ারী ১৯৮০), পৃ. ১-৬২, ১৭০-১৯৫, ১৯৬-২২১; (৬) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৫ খৃ., ৭০৫; (৭) Rajshahi District Statistics, 1983, Bangaldesh Bureau of Statistics, Statistical Division, Ministry of Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, pp. 3-5, 81-85, 91-92, 95-96, 100-102, 105, 113-116; (৮) Bangladesh District Gazetteers Rashahi, Dacca 1976, pp. 382, 384, 387, 388.

শেখ মাহবুবুল আলম

তাফ্‌তাহ (تافتة) ঃ ফা, অর্থ 'পাকান',এক ধরনের রেশমী কাপড়, যাহাকে য়ূরোপীয় ভাষাসমূহে টাফেটা (taffeta) বলা হয়। ক্যাস্টীল-এর রাজা ৩য় হেনরীর দূত ক্লাভিয়ো (Calvijo) তাব্‌রীয, সুল্‌তানিয়্যা ও সামারকান্দের বাজারসমূহে এই রেশমী বস্ত্র দেখিতে পান। তিনি লিখিয়াছেন যে, tafetanes সেই দেশেই বোনা হইত। মধ্যযুগের শেষদিকে পাশ্চাত্য দেশসমূহে তাফ্‌তাহ-এর প্রচলন ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. Devic, Dict. des mots francais d'origine orientale, পৃ. ২১৪; (২) Clavijo, Narrative, পৃ. ১০৯, ১১৪, ১৯০; (৩) W. Heyd, Hist. du Commerce du Levant, ফরাসী সং., প্রণীত Raynaud, লাইপর্যিগ ১৮৮৬ খৃ., নির্ঘণ্ট।

Cl. Huart (E.I. [1])/হুমায়ুন খান

আত-তাফতাযানী (التفتازانى) ঃ সা'দুদ-দীন মাসঊদ ইব্ন উমার, অলঙ্কারশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, ফিক্‌হ এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাচ্য দেশের মাদ্‌রাসাসমূহে পাঠ্য কয়েকখানি মূল্যবান বইয়ের রচয়িতা, খুরাসানের নাসা-র নিকটবর্তী তাফ্‌তাযান নামক এক বড় গ্রামে সাফার ৭২২/ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৩২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আদুদুদ-দীন আল-ঈজী (দ্র. Brockelmann, GAL, ২খ, ২০৮) ও কুতবুদ-দীন (দ্র. সম্ভবত আর-রাযী আত-তাহতানী, দ্র. Brockelmann, ২খ, ২০৯)-এর ছাত্র ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থে নাম (কিছুটা বিভিন্নতাসহ) রচনাকাল ও স্থানের উল্লেখসহ পাওয়া যায়ঃ (১) মুজমাল-ই ফাসীহী, ৭৮৭ হি. সালের অন্তর্গত অংশ; (২) রাওদাতুল-জান্নাত, পৃ. ৩০৯ (সন-তারিখের হেরফের বেশ অনেক); (৩) আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা, পৃ. ১৩৭; (৪) Ahlwardt, বার্লিন ক্যাটালগ নং 1959। বিভিন্ন স্থানে তাঁহার গমন সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। তাঁহার সর্বপ্রথম গ্রন্থ শারহুত-তাসরীফিল-'ইয্‌যী তিনি মাত্র ষোল বৎসর বয়সে শা'বান ৭৩৮/১৩৩৮ সালে ফারয়ুমাদে থাকিতে রচনা করেন বলিয়া কথিত আছে। মুতাওওয়াল, মুখতাসারুল-মাআনী ও তালবীহ ৭৪৮, ৭৫৬ ও ৭৫৮ হি., হারাত, গুজদুওয়ান ও গুলিস্তানে রচিত হয়। ইব্ন আরাব শাহ-এর মতে আত-তাফাতাযানী, কুতবুদ-দীন আর-রাযীর মত পশ্চিম কীপচাকের মোঙ্গল রাজসভাতে আহূত পণ্ডিতগণের অন্যতম ছিলেন। মুখতাসারুল-মাআনী ৭৫৬ হি. গুজদুওয়ানে সমাপ্ত হয়, উহা মাহমূদ জানী বেগ-এর নামে উৎসর্গ করা হয়। খাওয়ানদামীর লিখিয়াছেন যে, তিনি খাওয়ারিযমে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা এই তথ্যের ভিত্তিতে যে, ৭৬৮, ৭৭০ ও ৭৭৮ হিজরীতে সমাপ্ত তাঁহার বইগুলি সেইখানে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। খাওয়ানদামীর লিখিয়াছেন যে, ৭৭৯/১৩৭৭-৮ সালে তিনি আল-জুরজানীকে ফারসের মুজাফ্‌ফারী শাসক শাহ শুজা'-এর নিকটে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন (দ্র. Brockelmann, GAL, ২খ, ২১৬)। একই লেখক বলিয়াছেন যে, তৈমূর (বা তীমূর) যখন ৭৮০-৮১/১৩৭৯ সালে খাওয়ারিয্‌ম জয় করেন তখন মালিক মুইয্যুদ-দীন হুসায়ন কুর্‌ত-এর পুত্র মালিক মুহাম্মাদ সারাখ্‌সী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পীর মুহাম্মাদ ইব্ন গিয়াছুদ-দীন পীর আলী, যিনি সেই সময়ে তৈমূর-এর অনুচরবৃন্দের একজন ছিলেন, তাঁহাকে তৈমূর-এর সম্মতি লইয়া আত-তাফাযানীকে সারাখ্‌সে প্রেরণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। তৈমূর সম্মত হন। কিন্তু পরে যখন তিনি আত-তাফতাযানীর বিরাট বিদ্যাবত্তার কথা জানিতে পারেন তখন তিনি তাঁহাকে সামারকান্দে আগমন করিতে অনুরোধ করেন। আত-তাফযানী প্রথমে শীঘ্রই হিজায সফরে যাইতেছেন সেই অজুহাতে না যাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার আহ্বান আসিলে তখন তিনি সামারকান্দে গমন করেন। সেইখানে তৈমূর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন। তৈমূর ৭৮৯/১৩৮৭ সালে শীরায জয় করিলে তখন তাঁহার পুরাতন পরিচিত আস-সায়্যিদ আশ-শারীফ আল-জুরজানীও সামারকান্দে আসেন। উভয়ের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি হয় এবং মতবিরোধ ও সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। উহার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় আল-জুরজানী কর্তৃক আত-তাফতাযানীর মতামতের সমালোচনাতে। আল-জুরজানীর কোন কোন গ্রন্থে সেইগুলি রহিয়াছে। আত-তাফতাযানী ৭৯১/১৩৮৯ সালে সামারকান্দে ইনতিকাল করেন (দ্র. বুগয়াতুল-উ'আত) বা ২২ মুহাররাম, ৭৯২/১০ জানু., ১৩৯০ (দ্র. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা, পৃ. ১৩৫) বা ২১ মুহাররাম, ৭৯৩/৩০ ডিসেম্বর, ১৩৯০ (আল-জুরজানীর রচিত বলিয়া কথিত ঘটনাপঞ্জী অনুযায়ী, দ্র. খেদিবী লাইবেরী ক্যাটালগ, ২খ, ২৪২) বা ৭৯৭/১৩৯৪-৫ সালে (দ্র. হাবীবুস-সিয়ার)। ফাসীহী যে তারিখ দিয়াছেন ৭৮৭ হি. উহা তাঁহার রচিত কোন কোন বাইয়ের কথিত তারিখের সঙ্গে এবং ৭৮৯ হি. শীরায অধিকারের পরে তিনি ও আল-জুরজানী যে বিবরণ মিলিতভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন উহার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁহাকে সারাখ্‌সে দাফন করা হয়।

আত-তাফতাযানীর কোন ছাত্র খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। রাওদাতুল-জান্নাত-এ যে দুইজনের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা হইলেন হুসামুদ-দীন আল-হাসান ইব্ন আলী আল-আবীওয়ার্দী যিনি রাবীউল-জিনান ফিল-মা'আনী ওয়াল-বায়ান নামক বইয়ের রচয়িতা এবং বুরহানুদ-দীন হায়দার (দ্র. তাশকোপ্রুযাদা, আশ-শাকাইকুন-নু'মানীয়া, অনু. Rescher, পৃ. ৩৩ এবং Isl., xi, 61)।

আত-তাফতাযানীর প্রতিভা ইব্ন খালদূনকে প্রভাবিত করে। তিনি মিসরে তাঁহার কয়েকখানি বই পান এবং নিজের মুকাদ্দিমা গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন (অনু. de Slane, iii, 129)। তিনি হানাফী ও শাফিঈ উভয় মাযহাবের ফিকহ বিষয়ে লিখিয়াছেন এবং কোন কোন লেখক (যথা আল-কাফ্‌ফাবী হাসান চেলেবী) বলিয়াছেন যে, তিনি শাফিঈ মাযহাবভুক্ত ছিলেন। আবার কেহ কেহ (যথা ইব্ন নুজায়ম ও আলী ইব্ন সুলতান মুহাম্মাদ আল-কারী) তাঁহাকে হানাফী বলিয়া লিখিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল (এই সকল বইয়ের যে তারিখ রাওদাতুল-জান্নাতে দেওয়া হইয়াছে, যেইগুলি অন্যত্র দেয়া তারিখ হইতে ভিন্ন, সেইগুলি সকল ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয় নাই। পাণ্ডুলিপি ও টীকাভাষ্য ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের জন্য দ্র. Brockelmann, GAL।

১। ব্যাকরণ

১। শারহুত-তাসরীফিল-'ইয্‌যী (ভারত উপমহাদেশে এইখানিকে প্রায়শ বলা হয় সাদিয়্যা), আয-যানজানীর (ইয্যুদ-দীন আবদুল-ওয়াহহাব ইব্ন ইব্‌রাহীম, দ্র. Brockelmann, GAL, 283) আরবী শব্দের ব্যাকরণগত রূপ বিষয়ে টীকাগ্রন্থ, বইখানি লেখা শেষ হয় ফারয়ুমাদে শা'বান ৭৩৮/১৩৩৮-এ, তখন লেখকের বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর। পাণ্ডুলিপি বার্লিনে (Ahlwardt, No. 6617-6618), তুরিনে (দ্র. Nallion, No. 39) এবং অন্যান্য স্থানে। সংস্করণ ঃ কন্সটান্টিনোপল ১২৫৩ হি., তেহরান ১২৭০/১৮৮৪ (একটি মাজমূ'আতে), দিল্লী ১২৮৯, ১২৯৫ হি. (আহমাদ ইব্ন শাহগুল-এর মিফতাহুস-সা'দীয়্যার সঙ্গে একত্রে), ১৮৮৬ খৃ. (মিফতাহুস-সা'দীয়ার সঙ্গে), ১৩১৯ হি. (মিফতাহুস-সাদীয়ার সঙ্গে), বোম্বাই ১২৯২ হি., লক্ষ্ণৌ ১৩০৬ হি., কায়রো ১৩০৭ হি.। উপরে উল্লিখিত

মিফতাহুস-সা'দীয়া ব্যতীত অন্যান্য টীকাভাষ্যের মধ্যে দেদে খালীফার গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে (বূলাক ১২৫৫ হি.)।

২। আল-ইরশাদ বা হাজ্জী খালীফা যেইরূপ লিখিয়াছেন [আল-?] ইরশাদুল-হাদী, তাঁহার পুত্রের জন্য লিখিত আরবী বাক্য গঠনরীতির বই, ৭৭৪ বা ৭৭৮ হি. খাওয়ারিধমে লেখা শেষ হয়। ভিয়েনাতে একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে (Flugel, No. 206)। হাজ্জী খালীফা কয়েকখানি টীকাগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে রহিয়াছে মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আল-জুরজানীর (আস-সায়্যিদ আশ-শারীফ-এর এক পুত্র) ও শামসুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বুখারীর ভাষ্য, সেইগুলি যথাক্রমে বার্লিনে (Ahlwardt No. 6754-6755 ও Escurial-এ (Derenbourg, No. 181) রক্ষিত আছে।

২। অলঙ্কারশাস্ত্র

অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক আত-তাফতাযানীর তিনখানি বইয়ের সবগুলিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিষয়টির চিরায়ত প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেইরূপ আস-সাক্কাকীর মিফতাহ্'ল-উলূম-এর তৃতীয় খণ্ডে (কিসম) বর্ণিত হইয়াছে (নীচে আস-সাক্কাকী ও Brockelmann, GAL, i. 294 দ্র.), উহাদের মধ্যে দুইটি তালখীসুল-মিফতাহ-এর সংক্ষিপ্তসারের টীকা, মূল গ্রন্থখানির রচয়িতা আল-কাযবীনী (মুহাম্মাদ ইব্ন আবদির-রাহমান যিনি খাতীব দিমাশক নামে পরিচিত ছিলেন; (দ্র. Brockelmann, ২খ., পৃ. ২২)।

১। আল-মুতওওয়াল ঃ সচরাচর এই নামেই পরিচিত বা আশ-শারহ আল-মুতাওওয়াল বা শারহ'ত-তালখীসিল-মুতাওওয়াল, সাফার ৭৪৮/১৩৪৬-এ তিনি হারাতে ইহার রচনা সমাপ্ত করেন।

সংস্করণ ঃ কন্সটান্টিনোপল ১২৬০ হি., ১২৮৯ হি., (আল-জুরজানীর টীকাসমেত), লক্ষ্ণৌ ১২৬৫ হি. (শুধু প্রথম খণ্ড), ১২৮৭ হি. (শুধু প্রথম খণ্ড)/১৮৭৮ খৃ., ১৩০০ হি/১৮৮৯ খৃ. (তুরাব আলীর ইযালাতুল-'উদাল সমেত, উহা উদ্ধৃত কবিতাসমূহের ব্যাখ্যা), তেহরান (?) ১২৭০ হি., দিল্লী ১৩২৬ হি. (আল-মু'আওওয়ালসমেত, উহা মুহাম্মাদ আবদুর-রাহমানকৃত টীকা ও ব্যাখ্যা)। একখানি ফার্সী সং., ১২৭৪ হি. উল্লিখিত রহিয়াছে খেদিব লাইব্রেরীতে, ৪,১৫৩ (উহার টীকা লিখিয়াছেন আল-ফানারী, আল-জুরজানী, আস-সামারকান্দী ও মুহাম্মাদ রিদা গুলপায়াগানী)। আল-জুরজানীর টীকা লক্ষ্ণৌ হইতেও ১৩১২ হি. প্রকাশিত হয় এবং আবদুল-হাকীম শিয়ালকোটীর টীকাগ্রন্থ ১২৬৬ হি., কন্সটান্টিনোপল হইতে প্রকাশিত হয়।

২। মুখতাসারুল মা'আনী ঃ বর্তমানে এই নামেই বইটি পরিচিত, অন্যান্য নাম মুখতাসার শারহ তালখীসিল-মিফাতাহ বা ইখতিসার শারহ আত-তালখীস বা আশ-শারহ'ল-মুখতাসার বা শুধু আল-মুখতাসার (স্বয়ং লেখক এইখানির কোন নাম দেন নাই)-এর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা গ্রন্থ ৭৫৬/১৩৫৫-৬-এ গুজদুওয়ানে লেখা সমাপ্ত হয় এবং মাহমূদ জানী বেগকে উৎসর্গ করা হয়। মুতাওওয়ালের মত এই বইখানিও প্রাচ্য দেশসমূহের মাদরাসাতে এখন পর্যন্ত পাঠ্য। পাণ্ডুলিপি যথেষ্ট রহিয়াছে এবং কয়েকটি সঠিক সংস্করণও পাওয়া যায়।

সংস্করণ ঃ কলিকাতা ১৮১৩ খৃ.; লক্ষ্ণৌ ১২৬১, ১৩১২ হি. (আল-বুনানীর টীকাসমেত), বূলাক ১২৭১ হি. (আদ-দাসূকীর টীকাসমেত) [১৮৬০ খৃ.?], ১২৮৫ হি. (আল-বুনানীর টীকাসমেত), কানপুর ১২৮৫-৬ হি. [আল-খাতাইর (আল-খুত্তাইর?) টীকাসমেত], ১২৯৬ হি. (একই টীকাসমেত), মীরাট ১২৮৫ হি., কন্সটান্টিনোপল ১৩০১ হি. (আদ-দাসূকীর টীকাসমেত), লাহোর ১৩০৬-৭ হি., দিল্লী ১২৮৬, ১৩২৪ হি.। এই বইখানি হইতে উদ্ধৃত অংশসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন Mehren,তাঁহার Die Rhetorik der Araber গ্রন্থে, কোপেনহ্যাগেন ও ভিয়েনা ১৮৫৩ খৃ.।

৩। আত-তাফাযানীর অলঙ্কারশাস্ত্র বিষয়ক তৃতীয় বই শারহুল-কিসমিহ-ছালিছ মিনাল-মিফতাহ হইতেছে মিফতাহুল উলূম বইয়েরই তৃতীয় খণ্ডের টীকা। ইহা তাঁহার শেষ সময়কার রচনা, সামারকান্দে শাওওয়াল ৭৮৭/১৩৮৫ বা ৭৮৯/১৩৮৭ সালে রচনা সমাপ্ত হয়। এইখানি মুখতাসারুল-মা'আনী ও মুতাওওয়ালের মত ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে Escurial (Derenbourg, No. 26), ইণ্ডিয়া অফিস (Loth, No, 847-8), লাইডেন (de Goeje and Houtsma, No. 198), ট্রিনিটি কলেজ, কেমব্রিজ (Palmer, No. 18) ও অন্যান্য স্থানে।

৩। যুক্তিবিদ্যা

১। শারহ আর-রিসালাতিশ-শামসিয়্যা বা শারহু'শ-শামসিয়্যা (ভারত উপমহাদেশে এই বইখানিকে শারহ আত-তাসরীফিল-ইয্যীর ন্যায় প্রায়শ সা'দীয়া বলা হয়)। ইহা আল-কাতিবীর (নাজমুদ-দীন আলী ইব্ন উমার আল-কাযবীনী; দ্র. Brockelmann, GAL, ১খ. পৃ. ৪৬৬) যুক্তিবিদ্যার সারগ্রন্থের টীকা, জাম-এ জুমাদা ছানী, ৭৫২/১৩৫১ (দ্র. মুজমাল বা ৭৫৭/১৩৫৬ (দ্র. আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা) বা ৭৬২/১৩৬১ (দ্র. Ahlwardt, No. 1959 (বা ৭৭২/১৩৭০-১ (দ্র. রাওদাতুল-জান্নাত) ইহার রচনা সমাপ্ত হয়। পাণ্ডুলিপি বার্লিনে (Ahlwardt, No. 5266-68) ও অন্যান্য স্থানে রক্ষিত আছে। সংস্করণ ঃ লক্ষ্ণৌ ১৩২৬/১৯০৫।

২। তাহযীবুল-মানতিক ওয়াল-কালাম নামেই সচরাচর পরিচিত, লেখক ভূমিকাতে বইটির নাম লিখিয়াছেন গায়াত তাহযীবিল-কালাম ফী তাহরীরিল-মানতিক ওয়াল-কালাম, ইহা যুক্তিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের একটি সারগ্রন্থ, রাজাব ৭৮৯/১৩৮৭ সালে রচনা সমাপ্ত হয়। বইটির দ্বিতীয় খণ্ডকে হাজ্জী খালীফা বর্ণনা করিয়াছেন মাকাসিদ-এর সংক্ষিপ্তসার বলিয়া। এইখানির অনুলিপি হইতেছে, তবে কম (এবং বাস্তবিক বর্তমানে যেই সকল পাণ্ডুলিপির ক্যাটালগ রহিয়াছে সেইগুলিতে নিশ্চিতভাবে কোন কপি তালিকাভুক্ত নাই), প্রথম খণ্ড যুক্তিশাস্ত্র বিষয়ে, উহা একটি জনপ্রিয় পাঠ্য বই, প্রায়শই প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্করণ ঃ কলিকাতা ১২৪৩ হি. (আল-য়াযদীর টীকাসমেত) ১৩২৮ হি. (একটি উর্দূ অনুবাদসহ), ১৩৩৩ হি. (একই উর্দূ অনুবাদসহ); লক্ষ্ণৌ? ১৩৬০ হি. (প্রথম রহিয়াছে ঈসাগুজী), লক্ষ্ণৌ ১৮৬৯ খৃ. (একখানি মাজমুআ-ই মানতিক), ১২৮৮ হি. (শুধু ভূমিকাংশ, আদ-দাওওয়ানীর ভাষ্য এবং মীর ফাহিদ ও আবদুল হায়্যি লক্ষ্ণোবীর টীকাসমেত), ১২৯৩ হি. (ঐ একই সমেত), ১২৩১ হি. (ঐ একই সমেত), ১৩৯০ হি. (আল-য়াযদীর টীকা এবং সেই সম্বন্ধে আবদুল-হায়্যি লক্ষ্ণোবীর ভাষ্যসমেত), ১২৯২ হি. (একই টীকা ভাষ্যসমেত), ১৩১১ হি. (ঐ একই সমেত), ১৮৭৭ খৃ. (মুহাম্মাদ ইব্ন মাহমূদ আস-শাহরাস্তানীর ফারসী টীকাসমেত), ১৮৮৪ খৃ. (ঐ একইসমেত), ১৩২৩ হি. (মাজমুআ-ই বিস্ত রাসাইল-ই মানতিক-এ); দিল্লী ১২৬৪ হি., ১২৭৬ হি. ১২৮৩/২৮৬৯, ১২৮৬ হি. (এই সকল দিল্লী সংস্করণেই আল-য়াযদীর টীকা রহিয়াছে); কানপুর ১২৭৮-৯ হি., (মাজমূআ-ই মানতিক), ১২৯১ হি. (আল-য়াযদীর টীকা ও ইলাহী বাখশ

ফায়দাবাদীর তুহফাত-ই শাহ জাহানী শীর্ষক ভাষ্যসমেত), ১২৯৬ হি. (ঐ একই টীকা ও ভাষ্যসমেত), ১৮৮১ খৃ. (মাজমূআ-ই মানতিক), ১৯১৫ খৃ. (আশ-শাহরাস্তানীর ফারসী টীকাসমেত); বেনারস ১৮৯৯ খৃ. (উর্দূ অনু. সমেত)।

৪। অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব

১। আল-মাকাসিদ, অধিবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সহায়ক গ্রন্থ, লেখকের নিজস্ব ব্যাখ্যাসহ যুলকা'দা ৭৮৪/১৩৮৩ সালে সামারকান্দে রচনা সমাপ্ত হয় (রাওদাতুল-জান্নাত অনুযায়ী সমাপ্তি সাল ৭৭৪ হি.)। কন্সটান্টিনোপলে ১২৭৭ হি. একটি সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া খেদিবী লাইব্রেরীর ক্যাটালগে (২খ, ২৬) উল্লিখিত রহিয়াছে, বৃটিশ লাইব্রেরী (Ellis-Edwards, p. 9), ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর (Loth, NO. 461-4) এবং অন্যত্রও পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। উপরে যেইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, হাজ্জী খালীফা উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহযীবুল-মানতিক ওয়াল-কালাম-এর দ্বিতীয় খণ্ড (কিসম) এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

২। তাহযীবুল-মানতিক ওয়াল-কালাম। ইহার বিষয়ে উপরে যুক্তিবিদ্যা অংশ দ্র.।

৩। শারহু'ল আকাইদিন-নাসাফিয়্যা, শা'বান ৭৬৮/১৩৬৭ সালে খাওয়ারিযমে রচনা সমাপ্ত হয়, ইহা উমার ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নাসাফী (মৃ. ৫৩৭/১১৩২-৩; দ্র. Brockelmann, i, 427) কর্তৃক রচিত ইসলামী আকাইদ সম্পর্কিত ক্ষুদ্র পুস্তিকার ভাষ্য। ইহা একটি জনপ্রিয় পাঠ্য বই এবং ইহার কয়েকটি সুন্দর ভাষ্যও রহিয়াছে।

সংস্করণ ঃ কলিকাতা ১২৪৪ হি., দিল্লী (১৮৭০ খৃ.), ১৯০৪ খৃ, লক্ষ্ণৌ ১৮৭৬ (১৮৮৮ খৃ.), ১৮৯০ (১৮৯৪ খৃ.); কন্সটান্টিনোপল ১২৯৭ হি. (কাসতালী ও আল-খায়ালীর ব্যাখ্যা এবং শেষোক্তটির উপরে বিহিশতীর টীকাসমেত); কায়রো ১২৯৭ হি. (আল-খায়ালীর ব্যাখ্যা এবং উহার উপরে কারা খালীল-এর টীকাসমেত); কানপুর ১৯০৩ খৃ., ১৩৩০ হি.। কিছু উদ্ধৃতির ফরাসী অনুবাদ রহিয়াছে d'Ohsson-এর Tableau general de l'Empire Othoman, vol. i-এ এবং একটি জার্মান অনুবাদ রহিয়াছে JT Plant-এর Birgilu Risale, oder Elementarbuch der Muham-medanischen Glaubenslehre-এ (ইস্তাম্বুল ও জেনেভা ১৭৯০ খৃ.)।

ভাষ্যসমূহের মধ্যে আল-খায়ালী রচিত ভাষ্য দিল্লী হইতে ১৮৭০ খৃ. এবং (আবদুল-হাকীম শিয়ালকোটীর টীকাসমেত) ১৩২৯ হি., লক্ষ্ণৌ হইতে ১৮৭৬ খৃ., ১৩১৩ হি. (আবদুল-হাকীম শিয়ালকোটীর টীকাসমেত) ১৩২৬ হি. (ঐ একই টীকাসমেত); কন্সটান্টিনোপল হইতে ১২৯৭ হি. (আল-কাসতালীর ও বিহিশ্তীর টীকাসমেত); বিহার হইতে ১৩২৮ হি. ও দিল্লী হইতে রামাদান এফেন্দীর টীকাসতে ১৩২৭ হি.।

৪। ইব্নুল আরাবীর ফুসূসুল-হিকাম-এর কতক বিষয়ের উপর আক্রমণ, পাণ্ডুলিপি বার্লিনে রক্ষিত (Ahlwardt, No. 2891), উহার fol. Ib-তে সন্দেহজনক শিরোনাম লেখা ফাদিহাতুল-মুলহিদীন।

৫। উসূলুল-ফিকহ

১। আত-তালবীহ ইলা কাশ্ফ হাকাইকি'ত-তানকীহ, ২৯ যুলকা'দা, ৭৫৮/১৩৫৭ সালে গুলিস্তানে লেখা সমাপ্ত হয়। ইহা কনিষ্ঠ সাদরু'শ-শারীআ-এর (উবায়দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ আল-মাহবূবী, মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬-৭) তানকীহুল-উসূলের ভাষ্য; দ্র. Brockelmann, ২খ., পৃ. ২১৪।

সংস্করণ ঃ দিল্লী হইতে ১২৬৭/১৮৫১ (সাদরুশ-শারী'আর নিজস্ব টীকা আত-তাওদীহসমেত; লক্ষ্ণৌ হইতে ১২৮১/১৮৬৪ (তাওদীহসমেত), ১৮৭১ খৃ. (তাওদীহসমেত), ১২৯২/১৮৭৬ (তাওদীহসমেত ও তালবীহ সম্বন্ধে হাসান চেলেবি, মোল্লা খুসরাও ও যাকারিয়া আল-আনাসারীর ভাষ্যসমেত) এবং কাযানে ১৩০১/১৮৮৪ (তাওদীসমেত)।

২। শারহু শারহিল-মুখতাসার ফিল-উসূল বা শারহু'শ-শারহ, যুলহিজ্জা ৭৭০/১৩৬৯ সালে খাওয়ারিযমে রচনা সমাপ্ত হয়, ইহা ইবনুল-হাজিব তাঁহার রচিত (মুনতাহাস-সুআল ওয়াল-আমাল ফী ইলমিল-উসূল ওয়াল-জাদাল-এর একটি সংক্ষিপ্তসার মুখতাসারুল-মুনতাহা নামে রচনা করেন। আল-ঈজী উহার টীকা রচনা করেন। উপরিউক্ত গ্রন্থটি এই টীকা গ্রন্থের ভাষ্য মুহাম্মাদ বিন চেনেব কর্তৃক ইবনুল-হাজিব শীর্ষক নিবন্ধে ইহার ১৩১৬-১৯ হিজরীতে প্রকাশিত একখানা বূলাক সংস্করণের কথা জানা যায়। পাণ্ডুলিপি বার্লিনে (Ahlwardt, No. 4376), ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (Loth, No. 302-4) এবং অন্যান্য স্থানে রহিয়াছে।

৬। ফিক্হ

১। আল-মিফতাহ, ইমাম শাফিঈ (র)-র ফুরূ' সম্বন্ধে রচিত। বার্লিনে একখানি পাণ্ডুলিপি (Ahlwardt, No. 4604) রক্ষিত আছে। এই বইখানি ছাড়া তৎকর্তৃক রচিত হানাফী ফাতাওয়া-র একখানি সংকলনের কথাও জীবনীকারগণ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উহার কোন কপি পাওয়া যায় না।

২। ইখতিসার শারহ তালখীসিল জামিইল-কাবীর, ইহা হানাফী ফুরূ' সম্পর্কে আশ-শায়বানী যে নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন আল-জামিউল-কাবীর নামে, উহার আল-খিলাতীকৃত সারসংক্ষেপে যে ভাষ্য মাসউদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-গুজদুওয়ানী রচনা করিয়াছিলেন ইহা তাহার অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার (দ্র. Brockelmann, GAL, ১খ., পৃ. ১৭২ এবং H. Kh, ২খ., পৃ. ৪০১)। রাওদাতুল-জান্নাত অনুযায়ী এই বইখানির রচনা তিনি শুরু করিয়াছিলেন সারাখ্সে ৭৮৫ হি.। য়েনি জামি'-তে ইহার একখানি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে (No, 428 bis)।

দিল্লীতে ১৮৭০ খৃ. (?) মুকাদ্দিমাতুস-সালাত বা খুলাসা-এর একখানি সংস্করণ প্রকাশিত হয়, উহা সালাত বিষয়ক একখানি গ্রন্থ। কাহারও মতে উহার রচয়িতা ছিলেন আল-কায়দানী (দ্র. হাজ্জী খালীফা, ৬খ., পৃ. ৮৩), টীকা আল-জুরজানী এবং আত-তাফতাযানী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু আত-তাফতাযানীর সময়ে খুলাসা বইখানি ছিল কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

৭। তাফসীর

১। কাশ্ফুল-আসরার ওয়া উদ্দাতুল-আবরার, কুরআন শারীফের একখানি ফারসী তাফসীর (দ্র. H. Kh., v., No. 10674)। য়েনি জামি'তে একখানি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে বলিয়া জানা যায়।

২। শারহ (বা হাশিয়া আলা) আল-আশ্শাফ, H. Kh., v., No. 1872, আয-যামাখশরীর তাফসীরের টীকা (দ্র. Brockelmann, GAL, i, 290), সামারকান্দ, রাবী' (২), ৭৮৯ লেখা শুরু হয় বলিয়া কথিত, রচনা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। ১-১০, ৫৮ ও ৩৮-৫৪ সংখ্যক সূরার ব্যাখ্যা। পাণ্ডুলিপি বার্লিনে (Ahlwardt, No. 793), বৃটিশ

লাইব্রেরীতে (Ellis-Edwards. p.3), ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে এবং অন্যান্য স্থানে রহিয়াছে।

৮। ভাষাতত্ত্ব

১। আন-নি'আমুস-সাওয়াবিগ ফী শারহিল-কিলামিন-নাওয়াবিগ, ইহা আয-যামাখশারীর আল-কিলামুন-নাওয়াবিগ-এর ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যাগ্রন্থের কিছু নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করেন H. A. Schultens তাঁহার Anthologia sententiarum arabicarum গ্রন্থে (লাইডেন ১৭৭২ খৃ.) এবং ১২৮৭ হি. উহা কায়রোতে মুদ্রিত হয়।

২। শায়খ সা'দীর বূস্তান-এর একখানি তুর্কী কাব্যানুবাদ, ৭৫৫ হি. কৃত (দ্র. EGW Gibb, A History of Ottoman Poetry, i,. 202)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আরাবশাহ, আজাইবুল-মাকদূর, সম্পা. Golius, ৩খ, পৃ. ৪২২; (২) ফাসীহী, মুজমাল (৭৮৭ হি. অন্তর্গত, দ্র. E. G. Browne, Le Museon-এ প্রকাশিত, ৩য় সিরিজ, ১খ., পৃ. ৫৭); (৩) আস-সুয়ূতী, বুগয়াতুল-উ'আত, পৃ. ৩৯১; (৪) সুলতান হুসায়ন ইব্ন মানসূর, মাজালিসুল-উশ্শাক, পৃ. ২৮৭; (৫) আল-কাফ্ফাবী, ই'লামুল-আখয়ার; (৬) খওয়ান্দামীর, হাবীবুস-সিয়ার, ৩খ., পৃ. ৩, ৮৭; (৭) মুহাম্মাদ বাকির খাওয়ানসারী, রাওদাতুল-জান্নাত, পৃ. ৩০৯; (৮) আবদুল-হায়্যি লাক্ষ্ণৌবী, আল-ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যা, পৃ. ১২৮-৩০, ১৩৪-১৩৭; (৯) Brockelmann, GAL, ii, 215; (১০) Browne, Litt. Hist. of Persia, iii, 353-4; (১১) হিদায়াত হুসায়ন, Catalogue of the Arabic MSS. in the Buhar Library, p. 436-38।

C. A. Storey (E. I. [1])/হুমায়ুন খান

তাফদীল (تفضيل) ঃ ফাদ্দালা (বাব তাফঈল)-এর ক্রিয়ামূল (nomen actionis), অর্থ "সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল, বা ছিল," "অতিরিক্ত প্রয়োগ হইয়াছিল" বা "বাহুল্যস্বরূপ হইয়াছিল।" ব্যাকরণে ইহা বিশেষণের তুলনামূলক রূপে ব্যবহৃত হয়। ইস্মুত-তাফ্দীল, "মাত্রার অধিক বা অত্যুৎকৃষ্ট"-বোধক বিশেষ্য, দুইয়ের তুলনামূলক এবং সর্বোচ্চ মান বুঝাইবার জন্য ইহা বিশেষ্য, বিশেষণ বা বর্তমানে সচরাচর যাহাকে বলা হয় elative degree। ইহাকে আফআতুল-তাফদীলও বলা হয়। কারণ সব সময়ে ইহা আফআল ছাঁচে (ওয়াযান) গঠিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যে কোন ভাল মানের আরবী ব্যাকরণ; (২) Wright-de Goeje, A Grammar of the Arabic Language, কেম্ব্রিজ ১৮৯৬-৯৮ খৃ., ১খ, ১৪০-৪১; (৩) de Sacy, Grammaire arabe, প্যারিস ১৮৩১ খৃ.।

T. W. Haig (E.I. [1])/হুমায়ুন খান

আত-তাফ্ফ (الطف) ঃ কুফার পশ্চিমে অবস্থিত ফোরাত নদীর পলিগঠিত সমভূমি সংলগ্ন মরুময় অঞ্চল। নদীর তীরবর্তী নিম্নভূমি অপেক্ষা ইহা উঁচু যাহা এইখান হইতে ক্রমে আরব মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। য়াকূত (৩খ, ৩৫৯) যেই সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই সকল অনুযায়ী আত-তাফ্ফ দ্বারা চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকা হইতে অধিকতর উঁচু কোন জায়গা বুঝায়; খৃ. ১৩শ শতকের পরে শব্দটির ব্যবহার আর পাওয়া যায় না। জিলাটিতে কয়েকটি ঝরনা রহিয়াছে, সেইগুলির পানি দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত (ইব্নুল-ফাকীহ, পৃ. ১৮৭)। এই কূপগুলির মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিতটি হইল আল-উযায়র। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এই আত-তাফ্ফেই প্রথম আরব ও পারস্যিকগণের মধ্যকার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল [দ্র. (১) তাবারী, ১খ, ২২১০, ২২৪৭; ইবনুল-আছারী, ৩খ, ৩৪৫, ৩৫১]। সাসানী সম্রাটগণ এইখানে সীমান্তের সামন্ত শাসকগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; রক্ষাব্যবস্থার জন্য এইখানে দুর্গসমূহ (মাসলাহা) নির্মাণ এবং বিশাল পরিখা (খন্দক) খনন করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিখাটি শুরু হইয়াছিল হিত হইতে (ইব্ন রুস্তা, পৃ. ১০৭)। আত-তাফ্ফেই ছিল বিখ্যাত আল-কাদিসিয়া (দ্র.) ও কারবালা যেইখানে ইমাম আল-হুসায়ন (রা) শহীদ হইয়াছিলেন [দ্র. (১) য়াকূত, পূ. স্থা.; (২) বাকরী, মু'জাম, ২খ, ৪৫৬]। শেষোক্ত জনকে আল-মাকতূল বিত-তাফ্ফ-ও বলা হইয়া থাকে [তু. (১) আল-মুখতার; (২) ইবনুল-আছীর, ৪খ, ১৪০; (৩) য়াকূত, পূ. স্থা. এবং ইবনুল-আছীর, ৪খ, ২৬৭ কর্তৃক উদ্ধৃত একটি কবিতা]। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে আত-তাফ্ফের উল্লেখ অতি কদাচিৎ পাওয়া যায় (যেমন ইব্নুল-আছীর, ৭খ, ৩৭৯ কারমাতীয় গোলযোগ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন)। আরব ভোগৌলিকগণের অধিকাংশের লেখাতে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে বরাত উল্লিখিত হইয়াছে।

H. H. Kramers (E. I. [1])/হুমায়ুন খান

তাফ্বীদ (تفويض) ঃ অধিকার প্রদান, মুসলিম বিবাহ আইনের একটি বিশেষ অর্থবোধক শব্দ, এতদ্বারা স্বামী স্ত্রীকে যে কোন সময়ে নিজের বিবাহ বিচ্ছেদের (তালাক দানের) অধিকার প্রদান করে। বিবাহ বিচ্ছেদে স্বামীর যে একক অধিকার থাকে, এতদ্বারা স্ত্রীকেও আইনানুগভাবে সেই অধিকার প্রদান করা হয়। আজকাল উদারপন্থী শিক্ষিত সমাজে বিবাহের (চুক্তিপত্র) কাবীননামায় এইরূপ শর্তের উল্লেখ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় হইয়া পড়িয়াছে (দ্র. তালাক)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭০৭

তাফ্সীর (تفسير) ঃ আ, বহুবচনে তাফাসীর (تفاسير)), অর্থ ব্যাখ্যা, ভাষ্য, ক্রিয়াপদ রূপ ফাস্সারা (فسر) অর্থ ব্যাখ্যা করা। তাফ্সীর নামটি বৈজ্ঞানিক ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক রচনাবলীর ভাষ্যসমূহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইহা 'শারহ' শব্দের সমার্থক; এরিস্টোটল-এর রচনাবলীর গ্রীক ও আরবী ভাষ্যসমূহের ক্ষেত্রে ইহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি ইব্নুল-কিফ্তী রচিত তা'রীখুল-হুকামা (تاريخ الحكماء) হইতে গৃহীত হইয়াছে ঃ বানাস আর-রূমী Al-magesta (المجسطى)-এর উপর একটি তাফ্সীর এবং ইউক্লিড-এর দশম পুস্তকের উপর অপর একটি তাফ্সীর রচনা করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা আবুল-ওয়াফা আল-বুযজানী Diophantes (ديو فنطس)-এর রচনা সিনাআতুল-জাব্র (صناعة الجبر)-এর উপর এবং আল-খাওয়ারিযমী Algebra (كتاب الجبر والمقابله)-এর উপর একটি তাফ্সীর রচনা করেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা আর-রাযী প্লেটোর Timaeus (طيماؤس) [plutarch] (فلوطوخس) প্রণীত ভাষ্যের একটি ভাষ্য রচনা করেন (তাফ্সীরুত-তাফসীর)। খৃষ্টীয় পণ্ডিত হুনায়ন ইব্ন ইসহাক অনুবাদ ও তাফ্সীর রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গ্রীক বিজ্ঞানের অধিকাংশ বিখ্যাত রচনাবলীর এবং আরব বিজ্ঞানের কতিপয়

রচনাবলীর ভাষ্য রচিত হইয়াছে; এইগুলি হয় আরবী ভাষায় লিখিত না হয় আরবীতে অনূদিত।

ইসলাম ধর্মে তাফ্সীর শব্দটি বিশেষত কুরআন-এর ভাষ্য এবং এই পবিত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। বিজ্ঞানের এই শাখাটি যাহা (علم القران والتفسير) "কুরআন ও ইহার ভাষ্য সম্পর্কীয় বিজ্ঞান" নামে অভিহিত, হাদীছ শাস্ত্রের একটি বিশেষ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ইহা মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাফ্সীর বিষয়ে কুরআন সম্পর্কে কতিপয় সাধারণ গ্রন্থ রহিয়াছে যেইগুলি নিয়মিত পদ্ধতিতে রচিত হয় নাই; তবে অধিকাংশই ধারাবাহিক ব্যাখ্যা, যাহাতে পবিত্র গ্রন্থে মূল পাঠ নিয়মিত অনুক্রমে বাক্যগত এবং সময়ে সময়ে শব্দগত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সকল ভাষ্য বহু সংখ্যক; এইগুলির মধ্যে তাবারী, যামাখ্‌শারী ও বায়দাবী-র ভাষ্যসমূহ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.) একজন সর্বপ্রধান ঐতিহাসিক, তৎকর্তৃক রচিত কুরআনের ভাষ্য একটি অতি বৃহৎ রচনা। সনদের প্রাথমিক সিলসিলা (ইসনাদ) দ্বারা হস্তান্তরিত বহু সংখ্যক হাদীছ ইহাদের অন্তর্ভুক্ত আছে। যামাখ্‌শারী (মৃ. ৫৩৮ হি.) একজন তীক্ষ্ণ ধীশক্তির অধিকারী নৈতিক চরিত্রবান ব্যক্তি এবং নিখুঁত দক্ষতাসম্পন্ন ভাষাবিজ্ঞানী। তাঁহার ভাষ্য (আল-কাশ্‌শাফ–একখানা খুবই মূল্যবান গ্রন্থ এবং পালাক্রমে তাফ্তাযানী (মৃ. ৭৯২ হি.) ও সায়্যিদ শারীফ জুরজানীর (মৃ. ৮১৬) ন্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্ববিদ ব্যক্তিগণ কর্তৃক ইহার পুনঃভাষ্য প্রণীত হইয়াছে। আল-বায়দাবী (মৃ. ৬৮৫ হি.)-এর ভাষ্য সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং ইহা বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দান করা হয়। ইহার বদৌলতে পবিত্র গ্রন্থ কুরআনের ব্যাখ্যার ব্যাপারে ধার্মিক মুসলমানদের ধর্মমত অটল হইয়াছে এবং বিভিন্ন সময়ে ইহার টীকা প্রণীত হইয়াছে। অন্যান্য ভাষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ফাখ্‌রুদ-দীন আর-রাযীর (মৃ. ৬০৬ হি.) ভাষ্য যাহা বৃহৎ তাফ্সীর (التفسير الكبير) নামে অভিহিত এবং বুর্সার অধিবাসী ইসমাঈল হাক্কীর ভাষ্য, যিনি তুর্কীদের অতীব শ্রদ্ধেয় একজন গ্রন্থকার (মৃ. ১১২৭ হি.)। ইহা লক্ষণীয় যে, এই সকল বিদগ্ধ ব্যক্তির অধিকাংশই পারস্য অঞ্চলের অধিবাসী।

তাফ্সীরশাস্ত্র প্রাচীন কালের এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি.) একজন নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং একটি তাফ্সীর তাঁহার রচনা বলিয়া মনে করা হয় (ইস্তাম্বুলের হামীদিয়্যা লাইব্রেরী)। ধর্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম গবেষণা এবং কাহিনী ও ভাষ্যতত্ত্বের জন্যই ইহাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের কালে একজন বিদগ্ধ মিসরীয় শায়খ তানতাবী (মৃ. ১৯৪০ খৃ.) তাফ্সীর অধ্যয়নে নবজীবন সঞ্চার করিতে সচেষ্ট হন। তিনি আল-জাওয়াহির ফী তাফ্সীরিল-কুরআনিল-কারীম (الجواهر فى تفسير القران الكريم) নামক যেই ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে তিনি দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান হইতে গৃহীত বহু ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন (তু. অধিকন্তু তা'বীল)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাফ্সীর শিরোনামের অধীনে আরবী বই ও পাণ্ডুলিপির তালিকাসমূহ ঃ (১) সুয়ূতী, কিতাব তাবাকাত আল-মুফাসসিরীন, সম্পা. Weyes, লাইডেন ১৮৩৯ খৃ.; (২) Goldziher, Muhammedanische Studien, Helle ১৮৯০ খৃ., ২খ, ২০৬; (৩) ঐ, Die Richtungen der islamischen Loranaus legung, লাইডেন ১৯২০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৪) Carra de Vaux, Les Penseurs de l'Islam, ৩খ, প্যারিস ১৯২৩ খৃ., অধ্যায় ১১।

B. Carra de Vaux (E. I.[2])/মোহাম্মাদ আবদুল বাসেত

(২) **তাফ্সীর** (تفسير) ঃ [মূল তাফ্সীর নিবন্ধের অসম্পূর্ণতা, অসংলগ্নতা ও সংক্ষিপ্ততা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আরবী ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদ উস্তায আমীন আল-খাওলী দ্বারা তাফ্সীর সম্পর্কে একটি বিশদ নিবন্ধ রচনা করাইয়া মূল নিবন্ধের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। নিম্নে উহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

(ক) ফা-সীন-রা (ف–س–ر) ও সীন-ফা-রা (س–ف–ر) এই উভয় শব্দমূল উন্মুক্তকরণ ও যবনিকা অপসারণের অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু শেষোক্ত শব্দমূল সাধারণত বাহ্য ও জড় বস্তুর উন্মোচন অর্থে এবং প্রথমোক্ত শব্দমূল অভ্যন্তরীণ ও অজড় বস্তুর উন্মোচন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাফসীর শব্দটি প্রথমোক্ত শব্দমূল (ف–س–ر) হইতে গঠিত। ইহা تفعيل باب-এর মাস্‌দার অর্থাৎ অসমাপিকা ক্রিয়া। ইহার অর্থ কোনও বাক্য ও কথার অর্থ সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করা।

প্রাচীন ভাষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণের অভিমত অনুসারে যেই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচলিত অর্থে বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্যাসমূহ (علوم عمليه) বা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান (علوم) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, সেই অর্থে অভিধান, তাফ্সীর ও হাদীছ শাস্ত্রসমূহের জ্ঞানভাণ্ডারকে বিজ্ঞান (علوم) বলা যায় না। এই কারণে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তাফ্সীরশাস্ত্রের কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণ অথবা উহার আলোচ্য বিষয়বস্তুর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কারণ তাফ্সীরশাস্ত্র এই জাতীয় কতগুলি নির্দিষ্ট বিধি-বিধান ও প্রজ্ঞার নাম নহে যাহা অনুসরণ, অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে অর্জন করা হয়। তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে। এই কারণে তাফ্সীরশাস্ত্রের পরিচয় প্রদানে এই কথা বলাই যথেষ্ট যে, তাফ্সীর আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ও বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা করিবার নাম অথবা তাফ্সীরশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইতেছে কুরআন মাজীদের শব্দাবলী ও বাক্যসমূহের অর্থের ব্যাখ্যা বর্ণনা করা, (আল-মাবাদিউন-নাস্‌রিয়্যা, আল-খায়্‌রিয়্যা কর্তৃক মুদ্রিত, ১৩২০ হি., পৃ. ২৫-২৬)। কেহ কেহ তাফ্সীরশাস্ত্রের একটি সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাসঙ্গিকভাবে অন্য কয়েকটি শাস্ত্রেরও উল্লেখ করিয়াছেন, যেইগুলি তাফ্সীরশাস্ত্রের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। যেমন কিরাআতশাস্ত্র। এতদ্ব্যতীত কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম বুঝিবার জন্য যেই সকল শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, যেমন ফিকহ্, নাহ্‌ও-সারফ (ব্যাকরণশাস্ত্র) ও অলংকারশাস্ত্রের, সংশ্লিষ্ট কিয়দংশও তাফ্সীরশাস্ত্রের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তবে তাফ্সীরশাস্ত্রের প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটিই সহজবোধ্য। উক্ত সংজ্ঞা বিভিন্ন জটিলতা ও দীর্ঘ বর্ণনা হইতে মুক্ত।

প্রাচীন ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের স্বভাবসুলভ রীতিতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাসমূহকে কোনও না কোনও দিক দিয়া একটি সূত্রের অধীনে একত্র করিয়া দিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে তাফ্সীরশাস্ত্রও একটি স্বতন্ত্র বিদ্যারূপে বিবেচিত হইয়াছে। ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বলেন, "শারী'আত সম্পর্কিত ইল্‌ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেই শাখায় কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে–উহার নাম ইলমুল-কিরাআত, ইলমুত-তাজবীদ

অর্থাৎ গঠনশাস্ত্র এবং যেই শাস্ত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছসমূহকে উহাদের শব্দাবলী ও সনদসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করা হইবে, উহার নাম ইলমুল-হাদীছ ও উসূলুল-হাদীছ। যেই জ্ঞান-শাখায় কুরআন মাজীদের মর্মার্থ ও তাৎপর্যসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে উহার নাম ইল্মুত-তাফ্সীর।" এই পন্থায় তাঁহারা শার'ঈ ইল্মের (ধর্মশাস্ত্রের) সকল শাখাকে পৃথক সংজ্ঞাধীন করিয়াছেন (শায়খুল-ইসলাম আহ্মাদ ইব্ন য়াহ্য়া ইব্নুল-হাফীদ, কায়রো ১৩২২ হি., পৃ. ২)।

তাফ্সীরের আলোচনায় তা'বীল (تاويل) শব্দও উল্লিখিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে তাফ্সীর ও তা'বীল শব্দদ্বয় সমার্থবোধক। আবার কেহ কেহ বলেন, তাফ্সীর শব্দটি তা'বীল শব্দ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এতদ্সম্পর্কে আরও কতগুলি অভিমত প্রচলিত রহিয়াছে। তবে এই স্থলে আমি এতদ্সম্পর্কিত আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করিব না। আমার ধারণা এই যে, তাফ্সীর প্রসঙ্গে তা'বীলের উল্লেখ এই কারণে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে যে, স্বয়ং কুরআন মাজীদেই তা'বীল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উসূলশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ উহার জন্য একটি বিশেষ পরিভাষা নির্ধারিত করিয়াছেন। এতদ্সহ বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী লেখক ও দার্শনিকগণের মধ্যে মুতাকাল্লিমূন বা যুক্তিবাদী মুসলিম ধর্মবেত্তাগণ তা'বীল শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমার ধারণামতে আল্লামা রাগিব আল-ইস্ফাহানী তাঁহার মুকাদ্দিমাতু তাফ্সীর পুস্তিকায় হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় তা'বীল শব্দের যেই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই সঠিক। উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইস্ফাহানীর উক্ত পুস্তিকাটি তান্যীহুল কুরআন আনিল-মাতাইন (تنزيه القران عن المطاعن) গ্রন্থের সহিত সংযোজিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে (রিসালাতুর-রাগিব, আল-আয্হারিয়্যা ১৩২৯ হি., পৃ. ৪২)। ইমাম ইব্ন তায়্মিয়া তাঁহার আল-ইকলীল ফিল-মুতাশাবিহ ওয়াত-তা'বীল (الاكليل فى المتشابه والتاويل) গ্রন্থে আল্লামা ইস্ফাহানীর উক্ত পুস্তিকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন (ইমাম ইব্ন তায়্মিয়া-র উক্ত গ্রন্থ তাঁহার "মাজ্মূ'আতুর-রাসাইলিল-কুব্রা" নামীয় সংকলন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৩২৩ হি. আল-মাত্বাআতুশ-শার্কিয়্যায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে)। অবশ্য আমি উক্ত গ্রন্থের কোথাও আল্লামা ইস্ফাহানী কর্তৃক বর্ণিত তা'বীল শব্দের ইহাই ব্যাখ্যা–এইরূপ কোনও ইঙ্গিত দেখিতে পাই নাই। তবে এই কথা সত্য যে, তা'বীল শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত ইমাম ইব্ন তায়্মিয়া (র)-এর চিন্তাধারার মূল কথা এতদ্সম্পর্কিত আল্লামা ইস্ফাহানীর চিন্তাধারার মূল কথারই অনুরূপ।

এই স্থানে তাফসীর ও তা'বীল-এর পার্থক্য সম্পর্কে ইমাম আবূ মানসূর আল-মাতূরীদীর অভিমত উল্লেখ্য। তাঁহার মতে আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়ে সঠিক বর্ণনা হইল-তাফ্সীর ও লেখকের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে প্রদত্ত ব্যাখ্যা হইল তা'বীল (দ্র. তা'বীলাত আহলিস-সুন্নাহ, মুকাদ্দিমা)। তাঁহার এই অভিমত পরবর্তী অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংকলিত আল-কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহকে তা'বীল নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(খ) তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

ইব্ন খাল্দূন তাঁহার মুকাদ্দিমায় তাফ্সীর সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে লিখিয়াছেন, "কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় নাযিল হইয়াছে এবং আরববাসীদের বালাগাত বা অলংকারশাস্ত্রের সৌকর্য রীতিই উহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কারণে সকল আরববাসীই কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝিত এবং উহাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও বাক্যসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য তাহাদের নিকট স্পষ্ট ছিল।" সকল আরববাসীই কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝিত–এ কথাটিতে অত্যন্ত ব্যাপকতা রহিয়াছে। এইজন্যই পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণও ইব্ন খাল্দূনের (৭৩২-৮৪/১৩৩২-৮২) উক্ত অভিমতের সহিত একমত নহেন। ইব্ন খাল্দূনের কয়েক শতাব্দী পূর্ববর্তী ইব্ন কুতায়্বা-র (৩য়/৯ম শতাব্দী) কথাই ধরা যাক। তিনি তাঁহার আল-মাসাইলু ওয়াল-আজ্বিয়া (المسائل والاجوبة) গ্রন্থে (পৃ. ৮) বলেন, "কুরআন মাজীদের সকল গারীব (স্বল্প প্রচলিত শব্দ বা বাক্য) মুতাশাবিহ্ (রূপকার্থবোধক অথবা অনিশ্চিতার্থবোধক শব্দ বা বাক্য)–এর অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে সকল আরববাসী সমান নহে, বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে তাহাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী।" স্বয়ং ইব্ন খাল্দূন তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের অল্প পরে যেই মন্তব্য করিয়াছেন উহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, তিনিও কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে আরবদের যোগ্যতার পার্থক্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদের কতকগুলি স্থানে অর্থ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়া থাকে।" তিনি আরও বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিশদ করিয়া দিতেন, সাহাবীদিগকে নাসিখ (রহিতকারী) ও মান্সূখ (রহিত) বিধানের পার্থক্য বলিয়া দিতেন এবং ইহার ফলে সাহাবীগণ সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্ম বুঝিতে পারিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী জানিবার ফলে সাহাবীগণ বিভিন্ন আয়াত নাযিল হইবার কারণ ও উপলক্ষ সম্বন্ধে এবং নাযিল হইবার উপলক্ষ ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে নির্ধারণযোগ্য বিভিন্ন আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্যক্রূপে অবগত হইতেন।" উপরোক্ত বিষয়াবলীসহ অন্যান্য কারণে, যাহা ব্যাখ্যাযোগ্য বটে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতেই কুরআন মাজীদের তাফ্সীর ও ব্যাখ্যা বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দেয়।

আলোচ্য যুগে দীনের প্রতি মুসলিম জনগণের অধিক গুরুত্ব প্রদান, তাহাদের বোধশক্তির বিকাশের স্তর, জীবনের প্রয়োজনাদির সীমাবদ্ধতা এবং এতদ্সহ তাহাদের এই উপলব্ধি যে, তাফ্সীর বর্ণনা করা প্রকৃতপক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদান করিবারই নামান্তর যে, আল্লাহ্ তা'আলার এই কালামের অর্থ ও তাৎপর্য ইহাই, এই সকল কারণ নিজ বুদ্ধির ভিত্তিতে নহে, বরং শুধু রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবীগণ ও তাবিঈগণের নিকট হইতে বর্ণিত বাণীর ভিত্তিতেই তাফ্সীর বর্ণনা করিতে লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই কারণেই দেখা যায় যে, তাফ্সীর হিসাবে যাহা সর্বপ্রথম লোকসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল উহা ছিল রিওয়ায়াত বা সূত্র-পরম্পরায় বর্ণনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাফ্সীর। উক্তরূপ তাফ্সীর তাফ্সীরুল-মা'ছূর (تفسير الماثور) বা তাফ্সীর আছারী নামে অভিহিত হইয়াছে। সর্বপ্রথম প্রকাশিত তাফ্সীর রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর ছিল বলিয়াই হাদীছবিশারদ উলামা-ই কিরামকেই তাফ্সীর বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইতে দেখা যায়। উহার ভিত্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসের অনুসন্ধানকারী গবেষকগণ যখন তাঁহাদের প্রচলিত রীতি অনুসারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার ভিত্তি

যেইরূপে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থকে বিভিন্ন অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হইয়া থাকে, কুরআন মাজীদকে সেইরূপেও বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হয় নাই। যেমন কোন কোন ধর্মীয় গ্রন্থে জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ভিত্তিতে অধ্যায়গুলি কায়েম করা হয় ও প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম একেকটি ঘটনা দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে অথবা উহাতে কোনও ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনায় উহার একেকটি অংশকে একেকটি ঘটনার বর্ণনার জন্য নির্ধারিত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ উহাদের নাযিল হইবার কালপরম্পরা অনুযায়ী বিন্যস্ত নহে।

উহার বিপরীতে কুরআন মাজীদের নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র বিন্যাস-পদ্ধতি রহিয়াছে। কুরআন মাজীদে বহু সংখ্যক বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু একটি বিষয়বস্তুও এইরূপ নহে যে, তৎসম্পর্কিত যাবতীয় বক্তব্যকে উহার নির্দিষ্ট একটি স্থানে একত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআন মাজীদ প্রতিটি আলোচ্য বিষয়কে উহার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে। সকল শারী'আতী আইন-কানুন তথা ফিক্‌হী বিধিবিধান উহার এক স্থানে নহে, বরং বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে মৌলিক 'আকীদাসমূহ একাধিক স্থানে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ একই কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত দেখা যায়। ফলে পাঠক একই সূরায় বিভিন্নরূপ উদ্দেশ্য সম্বলিত বিভিন্ন বক্তব্য এবং বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বলিত একই কাহিনী বর্ণিত দেখিতে পায়। আর এক স্থানে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য অন্য স্থানে বর্ণিত একই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যের পরিপূরক হইয়া থাকে। যদি বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিভিন্ন বিবরণকে একত্র করত উহাদের উদ্দেশ্যাবলীর পারস্পরিক তুলনা করা হয়, তবে উহাতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সমগ্র অংশের ধারণা মানসপটে সম্পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। বস্তুত কুরআন মাজীদের বর্ণনারীতি ও উপস্থাপনা পদ্ধতি এক বিশেষ তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যের অধীন। কুরআন মাজীদের অধ্যয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে যে স্থানে উহার সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে, সেখানে উক্ত বিষয় আলোচিত হইবে।

কুরআন মাজীদের নিজস্ব বিন্যাস পদ্ধতি উহার তাফসীরের পদ্ধতিকে এবং উহার অর্থ ও উদ্দেশ্যাবলী বুঝিবার প্রয়োজন চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রকে কিরূপে প্রভাবিত করে, এই স্থলে আমরা শুধু সে বিষয়েই আলোচনা করিব। চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, সূরা ও আয়াতসমূহ কুরআন মাজীদে যেইরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে, উহাদিগকে সেইরূপে গ্রহণ করিয়া তাফসীর বর্ণনা করিলে কুরআন মাজীদকে সূক্ষ্মভাবে বুঝাও যাইতে পারে না আর উহার অর্থ ও উদ্দেশ্যাবলী সঠিকরূপে স্পষ্টও হইতে পারে না। কুরআন মাজীদের অর্থ ও উদ্দেশ্যাবলী সঠিকরূপে উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি এই যে, তাফসীরকার উহাতে বর্ণিত একটি বিষয়বস্তুতে থামিয়া তৎসম্বন্ধে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে যাহা যাহা বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে একত্র করত উহাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া এবং তুলনা করিয়া দেখিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূরা বাকারাতে প্রথম দিকেই মু'মিনগণ ও তাঁহাদের পরিচয়ের বর্ণনা পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার ধারণামতে এই পরিচয়ের সঠিক জ্ঞান একমাত্র তখনই অর্জিত হইতে পারে যখন সূরা মু'মিনূনে বিবৃত তাহাদের পরিচয়কে সূরা বাকারাতে বিধৃত পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া দেখা হইবে। উহার পরে উহাতে মুনাফিকগণের অবস্থা ও পরিচয় বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরিচয়কেও যথাযথভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝা যাইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সূরা মুনাফিকূনে বিধৃত তাহাদের পরিচয়কে সূরা বাকারাতে বিধৃত তাহাদের পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া দেখা হইবে। এইরূপে সূরা বাকারাতে বিধৃত আদাম (আ)-এর ঘটনার তাফসীর একমাত্র তখনই বুঝা যাইতে পারে যখন সূরা আ'রাফ, সূরা হিজর, সূরা কাহ্‌ফ প্রভৃতি সূরায় বিধৃত তৎসম্পর্কিত ঘটনাকে উহার সহিত মিলাইয়া দেখা হইবে।

চিন্তা করিলে এ কথা আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল বিধান একই বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও উহারা একই সময়ে নাযিল না হইয়া বরং বিভিন্ন সময় নাযিল হইয়াছে, উহাদের অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিক ও সূক্ষ্মরূপে বুঝা একমাত্র তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন উহাদের কোন্‌টি পূর্বে নাযিলকৃত এবং কোন্‌টি পরে নাযিলকৃত, তাহা ভালরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া লওয়া হইবে, বিশেষত যখন উক্তরূপ বিধানাবলী নাযিল হইবার কালের মধ্যে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের নাযিল হইবার কালের ন্যায় অধিক ব্যবধান, যাহার পরিমাণ এমনকি কয়েক বৎসরও হইতে পারে, থাকে, তখন উহাদের কোনটি পূর্বে এবং কোন্‌টি পরে নাযিল হইয়াছে তাহা জানা ও বুঝা অধিকতর প্রয়োজনীয়। আর উক্তরূপ বিধানাবলীর অর্থ ও ব্যাখ্যা যেই সকল অবস্থা, ঘটনা, কারণ ও সম্পর্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, উহাদিগকে জানা ও বুঝাও তাফসীরকারের জন্য জরুরী। কারণ উক্ত প্রেক্ষাপট, ঘটনা, কারণ ও সম্পর্ক হইতেছে এইরূপ আলোকবর্তিকা যাহাদের সহায়তা ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের অর্থ ও উহাতে বিধৃত বিধানাবলীকে সঠিকরূপে বুঝা সম্ভব নহে।

কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতসমূহের নাযিল হইবার কালপরম্পরা অনুযায়ী উহাদিগকে উহাতে বিন্যস্ত করা হয় নাই। মাক্কী আয়াতসমূহের মধ্যে মাদানী আয়াতসমূহ আসিয়া গিয়াছে এবং মাদানী আয়াতসমূহ উহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এইরূপ দেখা যায়। আবার মাদানী আয়াতসমূহের মধ্যে মাক্কী আয়াতসমূহ যাহা মাদানী আয়াতসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এইরূপও দেখা যায়। ফলে কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস অর্থাৎ কুরআন মাজীদের বিভিন্নরূপ অনুলিপিতে অনুসৃত বিভিন্ন যে কোনও বিন্যাস উহার অর্থ বুঝিতে কোনও ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে পারে না, বরং সঠিকভাবে উহার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্য জরুরী হইতেছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নির্দিষ্ট বিশেষ কোনও বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থান হইতে চয়ন করা ও উহাদিগকে এইরূপ বিশেষভাবে বিন্যস্ত করা, যাহাতে সঠিক তাফ্‌সীর বর্ণনার জন্য যে সকল দিক ও বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা তাফ্‌সীরকারের জন্য জরুরী বলিয়া ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, সে সকল দিক ও বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হয়। বস্তুত উক্ত পদ্ধতিতেই কুরআন মাজীদের সঠিক ও সূক্ষ্ম মর্ম উপলব্ধি করা তাফ্‌সীরকারের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে।

সারকথা এই যে, কুরআন মাজীদে উহার সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিন্যাসরীতি আদৌ অনুসৃত হয় নাই এবং উহাতে সূরা ও আয়াতসমূহের নাযিল হইবার কালপরম্পরা অনুযায়ী উহাদিগকে বিন্যস্ত করিবার রীতিও অনুসৃত হয় নাই। উহাতে একই বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে উহাদের পারিপার্শ্বিকতা ও পূর্বাপর সম্পর্ক বিভিন্নরূপ দেখা যায়। উক্ত অবস্থাবলীর দাবি এই যে, কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর উহাতে বিধৃত বিষয়াবলীর ভিত্তিতে করা উচিত। এতদুদ্দেশ্যে উহাতে বিধৃত বিষয়াবলীর মধ্য হইতে নির্দিষ্ট কোনও বিষয়বস্তুকে বাছিয়া লইয়া তৎসম্পর্কিত সকল আয়াতকে বিভিন্ন স্থান

বর্ণনাকারী ছিলেন না। এমন কি একদল সমালোচক তাঁহার বিরুদ্ধে হাদীছ জাল করিবার অভিযোগও উত্থাপন করিয়াছেন..... (আত-তায্হীব, পৃ. ৩০৬; আল-ইত্কান, পূর্বোক্ত স্থান)।

মুহাম্মাদ ইব্ন মার্ওয়ান আস-সুদ্দী আস-সাগীর (السدى الصغير), যিনি পূর্বোক্ত মুহাম্মাদ ইব্নুল কাল্বী হইতে তাফ্সীর বর্ণনা করিয়াছেন, সম্বন্ধে সমালোচকগণ ধারণা করেন যে, তিনি হাদীছ জাল করিতেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীছ বাজে ও পরিত্যক্ত এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সনদ সূত্রপরম্পরা নিম্নোক্তরূপ হইলে সনদটি মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে ঃ "সুদ্দী আস-সাগ্রী বর্ণনা করিয়াছেন কাল্বী হইতে, তিনি ইব্ন সালিহ্ হইতে, তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে" (আল-ইত্কান, পূর্বোক্ত স্থান; আত-তায্হীব ও উহার পাদটীকা, পৃ. ৩৩১)।

প্রসিদ্ধ তাফসীর বর্ণনাকারী মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান আল-আয্দী আল-খুরাসানী (مقاتل بن سليمان الازدى الخراسانى-মৃ. ১৫০ হি.) সম্বন্ধে ইমাম আশ-শাফি'ঈ (র) বলেন যে, তাফ্সীরশাস্ত্রের জনগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এতদ্সত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি মুজাহিদ হইতে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে মুজাহিদ হইতে কিছুই শুনেন নাই। এইরূপে তিনি আদ-দাহ্হাক (الضحاك) হইতে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নিকট হইতেও কিছুই শোনেন নাই। কারণ তাঁহার জন্মের চারি বৎসর পূর্বে দাহ্হাক ইন্তিকাল করেন। কতিপয় সমালোচক তাঁহাকে মিথ্যা বর্ণনাকারী বলিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার বর্ণিত তাফ্সীরকে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে দুর্বল সমালোচক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সমালাচকগণ আরও বলেন, "তাঁহার বর্ণিত তাফ্সীর কতই না উত্তম, তবে তিনি যদি একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীও হইতন!!!" তাঁহার সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি য়াহূদীদের নিকট হইতে তাহাদের ধর্মীয় কিতাবের জ্ঞান অর্জন করিতেন (আল-ইত্কান, পূর্বোক্ত স্থান দ্র.)।

সর্বশেষে আবূ খালিদ আবদুল-মালিক ইব্ন আবদিল-আযীয ইব্ন জুরায়জ-এর কথা ধরা যাক। যাঁহারা সর্বপ্রথম পবিত্র হাদীছকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বহু আয়াতের তাফ্সীর বিষয়ক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্সত্ত্বেও কোনও কোনও সমালোচক তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি তাফ্সীরের ক্ষেত্রে শুধু সাহীহ রিওয়ায়াত বর্ণনা করিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন না, বরং তিনি বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে যেই সকল রিওয়ায়াত লাভ করিয়াছেন সত্যাসত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়া তাহাই সংকলিত করিয়াছেন।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা আরও অনেকে করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর তথাকথিত একটি বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছেন, তিনটি বিষয়ের কোনও সন্দেহাতীত সনদ নাই ঃ (ক) তাফ্সীর, (খ) যুদ্ধ-বিগ্রহ ও (গ) গাযওয়াহ্ বিষয়ক অনেক রিওয়ায়াত। কারণ অধিকাংশ সনদই হইতেছে বিচ্ছিন্ন (ইব্ন তায়্মিয়া, মুকাদ্দিমা ফী উসূলিত-তাফ্সীর, দামিশকে মুদ্রিত, পৃ. ১৪)। ইমাম ইব্ন তায়্মিয়া (র) কয়েকজন চিহ্নিত ব্যক্তি কর্তৃক হাদীছ জাল করিবার ইতিহাস বর্ণনা করিবার পর লিখিয়াছেন, তাফ্সীরশাস্ত্রেও জাল হাদীছের অংশ বর্তমান রহিয়াছে।

উপরোদ্ধৃত বিরূপ সমালোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তাফ্সীর বিষয়ক সকল রিওয়ায়াতই দৃঢ় সনদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তবে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ এই জাতীয় রিওয়ায়াতসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। পূর্ব যুগীয় সমালোচকদের মন্তব্য আমরা জানিয়াছি। তাই আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য লেখক Carra de Vaux-এর নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, পরবর্তী যুগীয় সমালোচকগণ তাফ্সীরশাস্ত্রের সমালোচনার ক্ষেত্রে নূতন কোনও অবদান সংযোজন করিয়াছেন। Carra de Vaux বর্ণনা করিয়াছেন, "আধুনিক যুগের সমালোচকগণ (যেমন প্রাচ্যবিদ গোল্ডযিহার, লামেন্স্ প্রমুখ সমালোচক) বৃহদায়তন হাদীছ গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত তাফ্সীর বিষয়ক হাদীছসমূহের প্রামাণিকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পর্যন্ত এইরূপ কোনও অভিমত প্রাপ্ত হন নাই, যদ্বারা উক্ত হাদীছসমূহের বিশুদ্ধতা অধিক পরিমাণে সমর্থিত হয়।" ইসলাম-বিদ্বেষীরূপে পরিণত উপরিউক্ত সমালোকদের বর্ণনায় কোনও নূতন তথ্য নাই। কেননা আমাদের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কাররূপে জানা গিয়াছে যে, তাফ্সীর বিষয়ক হাদীছসমূহের বিরূপ সমালোচনা পূর্ব যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

তাফ্সীর গ্রন্থসমূহে কিছু সংখ্যক ভিত্তিহীন রিওয়ায়াত বর্ণিত হইবার পশ্চাতে আরেকটি বিষয় সক্রিয় ছিল। উহা এই যে, যেই সকল ধর্মীয় কাহিনী বিজিত দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বর্ণিত হইয়া মুসলিম সমাজে পৌঁছিয়াছিল, ইসলামী রিওয়ায়াতসমূহ উহা দ্বারাও প্রভাবিত হইতেছিল। য়াহূদী সম্প্রদায় মিসর হইতে ফিলিস্তীনে চলিয়া আসিবার কালে উহার দীর্ঘ মিসরীয় জীবনের ঐতিহ্য, আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরাট অংশ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। ফিলিস্তীন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর তাহারা বন্দীদশায় আরও পূর্বদিকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়। অতঃপর বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর যখন তাহারা পুনরায় ফিলিসতীনে ফিরিয়া গেল, তখন তাহাদের সংগ্রহ-ভাণ্ডারের মিসর ও ব্যাবিলনের জ্ঞানভাণ্ডার ও কুসংস্কারসমূহ হইতে বহু কিংবদন্তী ও ভিত্তিহীন কাহিনীও সঞ্চিত হইয়াছিল। ইসলামী আরবীয় জ্ঞানভাণ্ডারে উপরোক্ত য়াহূদী রিওয়ায়াতসমূহের কিয়ৎ পরিমাণ প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল।

এতদ্ব্যতীত আরব উপদ্বীপে য়াহূদী ব্যতীত অন্য যেই সকল জাতি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারাও তাহাদের ধর্মীয় কাহিনী ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান নিজেদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল এবং উহা সোৎসাহে সারা দেশে ছড়াইয়া দিয়াছিল। আরব উপদ্বীপের অধিবাসী মুসলিমগণ, যাঁহারা কুরআন মাজীদের অধ্যয়নকারী ও উহার অর্থ অনুধাবনকারী ছিলেন, বিজয়-অভিযাত্রী হিসাবে উক্ত উপদ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পৌঁছিবার পূর্বেই উক্ত রিওয়ায়াতসমূহ সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহারা আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যান্য দেশে পৌঁছিলেন এবং সেই সকল দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে বসবাস করিতে লাগিলেন তখন তাহারা স্থানীয় রিওয়ায়াত ও ধ্যান-ধারণাসমূহ সম্পর্কেও অবহিত হইলেন। এই সকল বিজাতীয় লোক-কাহিনী ও রিওয়ায়াতের মধ্য হইতে য়াহূদী রিওয়ায়াত ও লোকাচারসমূহই সর্বাধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কারণ প্রথমত, তাহাদের সংখ্যা ছিল অধিক; দ্বিতীয়ত, তাহাদের কার্যাবলী ছিল সুস্পষ্ট। এই কারণেই রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীরে (তাফ্সীর মাছূর) য়াহূদী সূত্র হইতে যেই সকল

ইসলামী জীবনের সহিত কুরআন মাজীদের কত গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, মুসলমানগণ উক্ত পবিত্র গ্রন্থ হইতে ইসলামী বিধিবিধান ইত্যাদি জানিবার প্রতি কত গভীর মনোযোগ প্রদান করিত এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় সমস্যাবলী এই দিকে তাহাদিগকে কত কঠোরভাবে বাধ্য করিত এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি, তবে এইসব আমাদিগকে পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিবে যে, কুরআন মাজীদের তাফ্সীরের পশ্চাতে আত্মনিয়োগ করা এবং প্রতিটি সূরা ও প্রতিটি আয়াতের পূর্ণ তাফ্সীর রচনা করার অভ্যাস ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। আমি এই অভিমত সঠিক বলিয়া মনে করি না যে, এইরূপ বিন্যস্তভাবে তাফ্সীর বর্ণনার ধারা অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছিল। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে লোকেরা এইরূপ বিন্যস্ত পদ্ধতিতে তাফ্সীর রচনার কার্য আরম্ভ করিয়াছিল। দুহা'ল ইসলাম (২খ.,পৃ. ১৪১) গ্রন্থের লেখক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আল-ফার্‌রা' (মৃ. ২০৭ হি.)-কেই আলোচ্য রীতিতে তাফসীর বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি মনে করা উচিত। সর্বপ্রথমে তিনিই কুরআন মাজীদে অনুসৃত বিন্যাস রীতি মুতাবিক পরম্পরাগতভাবে প্রতিটি আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। এই তথ্য তিনি ইবনুন-নাদীম-এর ফিহরিস্ত গ্রন্থের একটি স্পষ্ট বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আল-ফার্‌রা'-র মা'আনি'ল-কুরআন গ্রন্থখানা আমাদের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাতে আয়াতসমূহকে কুরআন মাজীদের সূরাগুলিতে ইহার বিন্যাস অনুসারেই বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এই দিক দিয়া আবূ 'উবায়দা' (মৃ. ২০৯ হি. অথবা উহার কাছাকাছি) রচিত মাজায়ু'ল-কুরআন গ্রন্থের সহিত উহার মিল রহিয়াছে; কারণ উহাতেও সূরাগুলিকে কুরআন মাজীদে অনুসৃত বিন্যাসরীতি মুতাবিক গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর প্রতিটি সূরার যে সকল আয়াত রূপকার্থবোধক হওয়ায় উহাদের ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন, সেইগুলির ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ফার্‌রা'-ই ছিলেন আলোচ্য বিন্যাস রীতিতে তাফ্সীর রচনাকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি, একথা সঠিক নহে, বরং অনুমিত হয় যে, সেই যুগে তাফ্সীর রচনার আলোচ্য রীতিই প্রচলিত ছিল। যদি আলোচ্য যুগের পূর্ববর্তী যুগে রচিত কোনও তাফ্সীর গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইত, তবে উহা দ্বারা প্রমাণ করা যাইত যে, কুরআন মাজীদে আয়াতসমূহ যেরূপে বিন্যস্ত সেইরূপে বিন্যস্ত রাখিয়া তাফ্সীর রচনা করিবার রীতি ফার্‌রা ও আবূ উবায়্‌দার যুগের পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। তাফ্সীর রচনার এই ধারা প্রথম যুগ হইতেই সাধারণভাবে প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল।

অতঃপর এমন যুগের সূচনা হয়, যখন তাফ্সীর রচয়িতাগণ কুরআন মাজীদের বিশেষ বিষয়ে তাফ্সীর রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁহারা একটি নির্দিষ্ট বিষয় বাছিয়া লইয়া উহাকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইতেন। যেমন আমাদের সম্মুখে আল-জাস্‌সাস (মৃ. ৩৭০ হি.)-এর তাফ্সীর গ্রন্থ আহআমুল-কুরআন রহিয়াছে। উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থের মূল লক্ষ্য হইতেছে কুরআন মাজীদ হইতে ফিক্‌হ্‌শাস্ত্র বিষয়ক বিধানগুলি বাহির করিয়া দেখান। তিনি উহাকে রচনার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখেন, তৎসত্ত্বেও সূরা ও আয়াতসমূহকে উল্লেখ করিবার ক্ষেত্রে প্রাচীন বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পরবর্তী যুগে এইরূপ তাফ্সীরকারদের আবির্ভাব ঘটে, যদিও তাঁদের সংখ্যা ছিল অল্প, যাঁহারা কুরআন মাজীদের সহিত সম্পর্কিত কোন একটি বিষয়কে বাছিয়া লইয়া তৎসম্পর্কিত আয়াতসমূহকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থান হইতে চয়ন করিয়া সংকলিত করেন। এইরূপ একটি তাফ্সীর গ্রন্থ হইল শামসু'দ-দীন ইব্‌নুল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.) রচিত আত-তিব্‌য়ান ফী আক্‌সামি'ল- কুরআন। উহাতে লেখকদের উদ্দেশ্য হইতেছে একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা। আর সেই বিশেষ বিষয়টি হইতেছে কুরআন মাজীদে উল্লিখিত বিভিন্ন রকমের কসম বা শপথ। উক্ত গ্রন্থে তিনি কুরআন মাজীদে বিভিন্নরূপ "কসম" ব্যবহৃত হওয়া সম্পর্কিত সাধারণ মতবাদসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে উহাতে তিনি বিভিন্নরূপ কসমের পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করেন নাই। আর এইগুলির সমাধান বিরোধী তাফসীরের প্রেক্ষিতেও প্রদান করেন নাই যেই পদ্ধতিতে কুরআন মাজীদের একাংশের সাহায্যে অন্য অংশের ব্যাখ্যা উদ্ধার করা যায়। যদি তিনি উক্ত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতেন, তবে উহার বিভিন্ন নজীর ও দৃষ্টান্তের পারস্পরিক তুলনা ও উহার সাহায্যে উহাদের অর্থ উদ্ধাদের পদ্ধতিতে কসমসমূহের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের নীতির একটি বিশেষ মতবাদ গড়িয়া উঠিত এইভাবে যে, কসম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে ইহার সবগুলি আয়াতকে একত্র করিয়া সামগ্রিকভাবে উহাদের সকলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। তিনি এই বিষয়ে সামান্য যাহা করিয়াছেন, তাহাও ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে করিয়াছেন। আর উহা সন্তোষজনক নহে।... কুরআন মাজীদের সূরাসমূহ ও আয়াতসমূহ উহাতে যেইরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে, সেইরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে উহাদের মধ্য হইতে যেই সকল আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করা প্রয়োজন, সেই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। তাফ্সীর বর্ণনার আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উহা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

তাফ্সীর বর্ণনার আধুনিক পদ্ধতি ঃ প্রাচীন যুগের মুসলিম মনীষিগণ ক্রমোন্নতির দিক দিয়া ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (ক) এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাহা অত্যন্ত পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে এবং প্রোজ্জ্বল ঃ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র (نحو) এবং ফিকহ্ বিষয় মূলনীতি শাস্ত্র (اصول فقه) উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; (খ) এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাহা অত্যন্ত পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে কিন্তু প্রোজ্জ্বল নহে, যেমন ঃ ফিক্‌হ্‌শাস্ত্র ও হাদীছ শাস্ত্র ; (গ) এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাহা পরিপক্কতাও লাভ করে নাই আর প্রোজ্জ্বলও নহে ঃ অলংকারশাস্ত্র (علم البيان) এবং তাফসীরশাস্ত্র ...। আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা আমি যেন মিসরের প্রথম ফুআদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য অনুষদের অধীনে সর্বপ্রথমে শেষোক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের সেবার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হই। ... 'উক্ত শাস্ত্রদ্বয় এখনও পরিপক্কতা লাভ করে নাই'– প্রাচীন যুগের মুসলিম মনীষিগণের এই মন্তব্যই উক্ত শাস্ত্রদ্বয়কে পরিপক্কতা প্রদান ও উহাদের বিকাশ সাধনের নিমিত্ত নবপর্যায়ে প্রচেষ্টা চালাইবার স্পষ্ট অনুমতি প্রদানেরই নামান্তর। নবপর্যায়ে এই প্রচেষ্টা চালাইবার উদ্দেশ্যে আমি কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। আর এতদ্বিষয়ে নিজের জন্য আমি এই নীতি গ্রহণ করিয়াছি ঃ প্রচেষ্টার প্রথম মানযিল এই যে, উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের প্রাচীন স্বরূপকে সম্যকরূপে জানিতে হইবে।" আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছায় নবায়নের এই প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা সর্বপ্রথমে আরবী ইসলামী বিশ্বকোষে বালাগাত (بلاغة) শিরোনামের অধীনে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ইসলামী বিশ্বকোষে প্রথমবারের এই নূতন প্রচেষ্টার মূলনীতিসমূহ তাফ্সীর নিবন্ধের অধীনে নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে ঃ

(১) কুরআন মাজীদ আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম উচ্চাঙ্গ গ্রন্থ। বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, উহার অধীনে একথাও আসিয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেক তাফ্সীরকারের তাফ্সীর রচনার পশ্চাতে একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। তাফ্সীরকার উক্ত লক্ষ্য ও

তাফ্সীর গ্রন্থে যেই সকল ভাষাগত ও যুক্তিগত কারণের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের আয়াতের বিভিন্ন অর্থ ও তাৎপর্যের একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দিয়াছেন, উহা উক্ত গ্রন্থে তৎকর্তৃক সংকলিত বর্ণনাভিত্তিক রিওয়ায়াতসমূহ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক দ্বিতীয় তাফ্সীর গ্রন্থখানা (পাশ্চাত্যের) আবূ মুহাম্মাদ আবদুল-হাক্ক্ ইব্ন আবী বাক্র গালিব ইব্ন আতিয়্যা আল-গার্নাতী আল-আন্দালুসী (মৃ. ৫৪১ হি.) কর্তৃক রচিত। উহা আল-মুহার্‌রারুল-ওয়াজীয ফী তাফ্সীরিল-কিতাবিল-আযীয (المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) নামে বিখ্যাত। স্পেনীয় উক্ত লেখক সম্বন্ধে ইব্ন খাল্দূন তাঁহার মুকাদ্দিমায় লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার তাফ্সীর গ্রন্থে রিওয়ায়াত ভিত্তিক সকল তাফ্সীর গ্রন্থের সারসংক্ষেপ সংকলন করিয়াছেন। তিনি রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্য হইতে শুধু বিশুদ্ধতম রিওয়ায়াতসমূহকেই গ্রহণ করত উহাদিগকে প্রশংসনীয় রচনাশৈলী ও বিন্যাসরীতিতে স্বীয় গ্রন্থে বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানা স্পেন ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচলিত ও জনপ্রিয় রহিয়াছে।" উহা পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপির কয়েকটি খণ্ড দারুল-কুতুবিল-মিসরিয়্যায় ও কুতুবখানা-ই তায়মূরিয়্যায় সংরক্ষিত রহিয়াছে (দ্র. ব্রক্লম্যান, ১খ., পৃ. ৪১২; তাক্লিমা, ১খ, পৃ. ৭৩২)। প্রথম লেখক উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করিয়াছেন। উহাতে আলোচ্য তাফ্সীর গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, লেখক কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া উহার ভাষাগত নজির উপস্থিত করিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিয়াছেন এবং স্বীয় ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে অহেতুক দীর্ঘ করেন নাই, ব্যাকরণগত বিষয়াবলীর আলোচনার প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। তিনি উহাতে বিভিন্ন কিরাআতের আলোচনার প্রতি যতটুকু মনোযোগ দিয়াছেন, ওয়াকফ্ বা বিরতি সম্পর্কিত আলোচনার প্রতি তত মনোযোগ দেন নাই। তিনি বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্য হইতে শুধু বিশুদ্ধ হিসাবে খ্যাত রিওয়ায়াতসমূহকেই উহাতে স্থান দিয়াছেন। তিনি তাবারী হইতে রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু কখনও কখনও তাবারীর রিওয়ায়াতের সমালোচনাও করিয়াছেন।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক (তাফ্সীর মা'ছূর) তৃতীয় তাফ্সীর গ্রন্থখানা মিসরে রচিত। এই প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল হইতে মিসরের ভূমিকা বর্ণনা করা সমীচীন মনে হয়। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) বলিয়াছেন, মিসরে আলী ইব্ন আবী তাল্হা আল-হাশিমী কর্তৃক বর্ণিত একখানা তাফ্সীর গ্রন্থ (সাহীফা) রহিয়াছে। আলী ইব্ন আবী তাল্হা হইলেন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তাফ্সীর বর্ণনার একটি বিশ্বস্ত ও উৎকৃষ্ট মাধ্যম। যদি কোনও ব্যক্তি শুধু উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থের উদ্দেশে মিসর ভ্রমণ করেন, তবে উহা কোনও বিস্ময়ের ব্যাপার হইবে না। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সাহীহ্ গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তাফ্সীর বিষয়ক রিওয়ায়াতসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবার কালে উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থখানার উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছেন। সাহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইব্ন হাজার হইতে উক্ত তথ্যটি বর্ণিত হইয়াছে (আল-ইত্কান, ২খ., পৃ. ২২৩)। ইব্ন হাজার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "প্রকৃতপক্ষে আলী ইব্ন আবী তাল্হা সরাসরি নিজে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তাফ্সীর বর্ণনা করেন নাই, বরং তিনি শুধু মুজাহিদ অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়্র-এর নিকট হইতে শুনিয়া উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং যেহেতু তাঁহার রিওয়ায়াতের মাধ্যম ছিল নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত, বর্ণিত তাফ্সীর সরাসরি সেই কারণে ত্রুটিহীন বলিয়া বিবেচিত"।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক তৃতীয় তাফ্সীর গ্রন্থটি হইতেছে ইমাম জালালুদ-দীন আস-সুয়ূতী আল-মিস্রী (মৃ. ৯১১ হি.) রচিত আদ-দুর্‌রুল-মানছূর ফিত-তাফ্সীরিল-মা'ছূর (الدر المنثور فى التفسير بالمأثور) নামীয় তাফ্সীর গ্রন্থ। উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে উপরিউক্ত তিনখানা তাফ্সীর গ্রন্থের নামোল্লেখ এইজন্য করা হইয়াছে যে, উহারা রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর গ্রন্থ (তাফছীর মা'ছূর) এবং এই শ্রেণীর তাফ্সীরই তাফ্সীরশাস্ত্রের সকল শাখার মধ্যে সর্বপ্রথমে উদ্ভূত হয়। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত অনুমান এই যে, হি. তৃতীয় শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে উপরিউক্ত শ্রেণীর তাফ্সীর গ্রন্থাবলীর মূল্য ও মর্যাদা এবং অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তাফ্সীরশাস্ত্রের ইতিহাস রচনাকারীদের দৃষ্টির সম্মুখে এই সকল পরিবর্তন স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছে।

(গ) তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি

এই স্থলে তাফ্সীরশাস্ত্রের ইতিহাস অথবা উহার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, বরং তাফ্সীরশাস্ত্র উহার দীর্ঘ যাত্রাপথে যেই সকল গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন, নিদর্শন ও মাইলফলক রাখিয়া আসিয়াছে, সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে আলোকপাত করা হইবে। কারণ যতদিন না আমরা উপরিউক্ত সুদীর্ঘকালে রচিত তাফ্সীরশাস্ত্র সম্পর্কিত সকল ইতিহাস গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, ততদিন পর্যন্ত আমরা সঠিক অর্থে তাফ্সীরশাস্ত্রের ইতিহাস রচনার কথা চিন্তা করিতে পারি না। উক্ত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা এত অধিক ও বৃহৎ কলেবর এবং এত ব্যাপক ও বহুবিধ উদ্দেশ্যে সেইগুলি রচিত হইয়াছে যে, উহার বর্ণনা, ব্যাপকতা ও উহাদের রচয়িতাদের মহান মর্যাদার কথা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হি. দ্বিতীয় শতাব্দীতে শায়খুল-মু'তাযিলা আমর ইব্ন উবায়দ (মৃ. ১৪৪/৭৬১), শাখয় আল-হাসান বাস্রী (২১-২১০/ ৬৪২-৭২৮) হইতে শ্রবণ করিয়া একখানা তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন (ইব্ন খাল্লিকান, মিসর, ১খ., পৃ. ৪৮৬)। তাফ্সীর বর্ণনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দুই মহান ব্যক্তিত্ব অধিকতর বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত।

ইমামুল-মুতাকাল্লিমীন আবুল-হাসান আল-আশ্আরী (২৬০-৩২৪/ ৮৭৪-৯৩৬) কিতাবুল-মুখ্তাযান (كتاب المختزن) নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্আতী ও বাতিলপন্থিগণ কুরআন মাজীদের যেই সকল আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিত, উক্ত গ্রন্থে তিনি সেই সকল আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াত দ্বারা তাহারা যেই বিষয়টিকে প্রমাণিত করিতে চাহে, আয়াতের সহিত উহার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতকেই হকপন্থীদের আকীদা-বিশ্বাসের সপক্ষীয় প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ দেখিয়াছেন এবং

হইতে চেষ্টা করিবে। বলা বাহুল্য, আরবী ভাষায় এইরূপ সুযোগ-সুবিধার অবকাশ অনেক বেশী পরিমাণে রহিয়াছে।

তাফ্‌সীর বর্ণনাকারী ব্যক্তি যেই যুগেরই হউন না কেন এবং তাঁহার তাফ্‌সীর বর্ণনার রীতি ও পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, উপরোক্ত নীতি অনুসারে তাঁহার তাফসীরে তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ অবশ্যই থাকিবে, তাফসীর রিওয়ায়াতভিত্তিক হউক আর বুদ্ধিভিত্তিক হউক উভয় প্রকারের তাফসীরেই এই ছাপ সমভাবে পড়িবে ; এই ছাপ রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরের উপর আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান না হইলেও এই বিষয়টি চিন্তা করিলে উক্ত ছাপ তৎক্ষণাৎ দৃশ্যমান হইবে যে, রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর বর্ণনাকারী ব্যক্তি বিশেষ কোন আয়াতের অধীনে শুধু সেই সকল রিওয়ায়াতকেই একত্র করেন যেইগুলিকে তিনি উক্ত আয়াতের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করেন। আর আপাতদৃষ্টিতে উক্ত রিওয়ায়াতসমূহের যেই অর্থ তাঁহার মানসপটে উদিত হইবে, তিনি উহা হইতে সেই অর্থই গ্রহণ করেন। আর ভাসাভাসা দৃষ্টি এই অর্থই তাঁহার সামনে পেশ করিবে। পরবর্তী সময়ে ধীরেসুস্থে তিনি সেই আয়াত এবং উহার অধীনে একত্রীকৃত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে যোগসূত্র ও সম্পর্ক স্থাপন করেন। যেইরূপ নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে তিনি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী উক্ত একত্রীকৃত রিওয়ায়াতসমূহকে গ্রহণ করিবার ও ইহাদের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবার ব্যাপারে অথবা সেইগুলি তাঁহার নিকট অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে সেইগুলিকে রদ করিবার ও উহাদের প্রতি মনোযোগ প্রদান না করিবার ব্যাপারে সমভাবে প্রভাবান্বিত হন। উক্ত নীতি অনুসারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে, যেমন ইব্‌ন খালদূন আমাদের পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এইরূপ রিওয়ায়াতসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, যেইগুলির প্রতি তাঁহাদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল এবং যেইগুলির প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ আদি সৃষ্টির বিবরণসমূহ এবং মানব জাতির ইতিহাসের আদি যুগে সংঘটিত ভয়াবহ বিপদ এবং ঘটনাবলীর বিস্তারিত কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এইরূপ কাহিনীগুলি ত্বরিতে গ্রহণ করিবার কারণ ছিল তাঁহাদের অজ্ঞতা, কিসসা-কাহিনীর স্বল্পতা। ফলে তাফসীর গ্রন্থাবলীতে ইসরাঈলী (য়াহূদী) রিওয়ায়াতসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এইসব রিওয়ায়াত ও ঘটনাবলীর বর্ণনায় প্রাথমিক যুগের মন-মানসিকতার ছাপ বিদ্যমান।

উপরোক্ত কারণেই আমরা বলিতে পারি যে, প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থেই, এমনকি রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও উহার রচয়িতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মন-মানসিকতার ছাপ অংকিত থাকে। বস্তুত তাফসীর-রচয়িতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মন-মানসিকতাই তাফসীর রচনার একটি স্বতন্ত্র ধারাকে প্রবর্তিত করিবার কারণ হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

আবার যখন রচিত তাফসীর গ্রন্থ রিওয়ায়াতভিত্তিক নহে তখন উহার উপর রচয়িতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মন-মানসিকতার ছাপ অধিকতর স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়। ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করিয়াছি যে, তাফসীরকারের কৃষ্টি তাঁহার রচিত তাফসীরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। কেননা তাফসীরকারের কৃষ্টি ব্যক্তিগত ও তাঁহার জ্ঞানের প্রকৃতিই তো তাঁহার উদ্দেশ্যের গতিপথ, তাঁহার কার্যকলাপের সীমা নির্ধারিত করিয়া দেয়। সে ব্যক্তি কোনও আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অন্যগুলিকে ত্যাগ করত নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে। আর তাহার উক্ত ব্যাখ্যাই অন্য সব ব্যাখ্যার উপর প্রাধান্য লাভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুত তাঁহার তাফসীর এইসব বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। অতঃপর তাঁহার তাফসীর বিপুলভাবে প্রচলিত, পঠিত ও সমাদৃত হইলে উহা দ্বারা স্বয়ং এই শাস্ত্রের ইতিহাস প্রভাবিত হইয়া পড়িবে এবং উহাদের ভিত্তিতে রচিত তাফ্‌সীরও প্রভাবিত হইবে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাফসীরের সহিত তাফসীর রচনাকারীর নিজস্ব মানস প্রকৃতির পূর্বোল্লিখিত সংমিশ্রণের বিবেচনায় তাফসীর অনিবার্যভাবে সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়– যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত তাফসীরকার কোন আয়াতের ব্যাখ্যা দানকালে জড়িত হইয়া পড়েন এবং তাফসীর রচনায় ইহাদের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেন। অন্যদিকে তাফসীরের সহিত উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে ইহাদের সমৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে, যাহার প্রভাব এইসব শাস্ত্রের (علوم) ইতিহসের উপর পতিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন আরবী ব্যাকরণবিদ কুরআন মাজীদের উপর কারক-বিভক্তির সূত্র ও নিয়ামাবলী অনুযায়ী তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন এবং উহার ব্যাখ্যা অনুধাবনের জন্য উক্ত সূত্র ও নিয়ামাবলী হইতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তই সঠিক বলিয়া মনে করেন এবং উহার তাৎপর্যের সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর এইরূপে তিনি তাফসীরশাস্ত্রকে তাঁহার অধীনস্থ বিশেষ শাস্ত্রের রঙে রঞ্জিত করিয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি ব্যাকরণশাস্ত্র ও ব্যাকরণশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত তাফসীরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের জীবনের পটভূমির উপর উক্ত সংযোগ ও সম্পর্কের কতগুলি নিদর্শন রাখিয়া যান, যাহার ফলে এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রভাবিত হয় এবং এই শাস্ত্রের ইতিহাস জানিবার জন্য উক্ত নিদর্শনাবলীর অনুসন্ধান দরকার হইয়া পড়ে।

এইরূপে তাফসীরশাস্ত্র বিভিন্নরূপ মন-মানসিকতার রঙে রঞ্জিত হইয়া আসিয়াছে এবং বিভিন্ন তাফসীরকারের বিভিন্নরূপ কৃষ্টি ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থই স্বতন্ত্র রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। আপনারা সম্ভবত জানেন যে, বিখ্যাত ইসলামী কালামশাস্ত্রবিদ আবুল-হাসান আল-আশ'আরী আল-মুখ্‌তাযান (المختزن) নামে খ্যাত তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ প্রতিটি আয়াত সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন—যাহাকে কোন বিদ'আতপন্থী স্বীয় ভ্রান্ত 'আকীদার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছে এবং তিনি প্রথমে উক্ত আয়াত দ্বারা বিদ'আতী ব্যক্তির 'আকীদাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়াছেন। অতঃপর উক্ত আয়াত দ্বারাই ন্যায়পন্থী আহ্‌লুস-সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের আকীদাকে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি লোকেরা স্বীয় গ্রন্থের প্রশংসায় স্বয়ং আশ'আরীর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "এই গ্রন্থে বিরোধী মতাবলম্বীদের এইরূপ অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে যাহা কালামশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা কখনও এইগুলি সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্নও করেন নাই, এইগুলি তাহাদের গ্রন্থাবলীতে আলোচিত হইতেও দেখা যায় না, আর কখনও ইহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগকে আমার প্রশ্ন করিবার খেয়ালও হয় নাই। কিন্তু আমি এই প্রশ্নাবলীর উত্তর আল্লাহ্‌ তা'আলার মদদে প্রদান করিয়াছি (ইব্‌ন 'আসাকির, তাব্‌য়ীন কিয্‌বিল-মুফ্‌তারী, দামিশ্‌ক সং, পৃ. ১৩৩; এইখানে শুধু সর্বনামগুলির স্থলে উহাদের বিশেষ্যগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে)। ..... আর ইমাম ফাখ্‌রু'দ-দীন রাযী তাঁহার তাফ্‌সীর গ্রন্থে যে বহু দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং তাঁহাদের অনুসারী কালামবিদদের বিপুল সংখ্যক উক্তির সমাবেশ ঘটাইয়াছেন, ফলে তাঁহার তাফ্‌সীরগ্রন্থ সম্বন্ধে যেই মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আশ'আরী ও ইমাম রাযী কর্তৃক অনুসৃত তাফ্‌সীর রচনারীতিকে এবং অনুরূপ অন্যান্য তাফ্‌সীর রচনাকে

অপরাধী হইবেন যিনি উপরোক্ত শর্তাবলী হইতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মতবাদ ও নিজ বুদ্ধি অনুসারে তাফ্‌সীর বর্ণনা করেন। নিঃসন্দেহে অনিবার্যভাবে তাহার তাফ্‌সীর হইবে অনুমানভিত্তিক ও অনিশ্চিত ধারণানির্ভর। বস্তুত উক্তরূপ তাফ্‌সীর বর্ণনাই হইতেছে প্রকৃত অর্থে তাফ্‌সীর বির-রায়, যাহা সাহীহ হাদীছে নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে [আর-রাগিব আল-ইস্‌ফাহানী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪২৫]।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, তাফ্‌সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে দুইটি ধারা পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে এবং উক্ত দুইটি ধারার মধ্যবর্তী স্থানে এইরূপ কতগুলি ধারাও রহিয়াছে, ধারাদ্বয়ের কোনও একটির সহিত যাহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। যেই ধারা পদ্ধতিটি সর্বপ্রথমে অস্তিত্ব লাভ করে তাহা নিম্নরূপঃ কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বর্ণনায় নিজ বুদ্ধিতে কোনও কিছু বলা হইতে বিরত থাকা উচিত। উল্লেখ্য যে, উক্ত মতবাদ ইসলামের প্রাথমিক যুগ ও তৎসন্নিহিত যুগের বিজ্ঞ জনগণ পোষণ করিতেন। উক্ত মতবাদের অনুসারীদের বহু ঘটনার বিবরণ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ এই সকল ঘটনার মধ্য হইতে মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট হইবে। ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র), যাঁহাকে প্রাথমিক যুগের লোকেরা হাদীছ শাস্ত্রের একজন সংকলকও বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্‌নুল-মুসায়্যাব-এর নিকট কুরআন মাজীদের কোনও আয়াতের তাফ্‌সীর জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিতেন, আমি কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বর্ণনায় কোনও কথা বলি না (ইব্‌ন তায়মিয়া, উসূলুত-তাফ্‌সীর, পৃ. ৩১)।

তাফ্‌সীর বর্ণনার অপর ধারাটি সম্পর্কে ইমাম রাগিব-এর পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনায় ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। এই ধারার সমর্থকদের মতে কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করা প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির জন্যই জাইয। ইনাম আল-গাযালী (র) তাঁহার ইহ্‌য়া' উলূম গ্রন্থে (আবূ হায়্যান, আল-বাহ্‌রুল-মুহীত, ১খ, পৃ. ৩৪১) দলীল-প্রমাণ দ্বারা এই অভিমতকে বাতিল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বর্ণনায় রিওয়ায়াত ভিত্তিক তথা উদ্ধৃতিমূলক কথা ভিন্ন অন্য কোনও কথা বলা কাহারও জন্য জাইয নহে। অতএব এই অভিমত ভুল ও বাতিল বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, কুরআন মাজীদের অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনায় শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যক্তিদের নিকট হইতে শ্রুত অর্থ ও ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করা জাইয। এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক সুযোগ্য ব্যক্তির জন্য তাঁহার জ্ঞান ও বিবেচনার পরিমাণ এবং বিবেক-বুদ্ধির সীমা অনুযায়ী কুরআন মাজীদের মমার্থ ও তাৎপর্য অনুশীলন ও উদ্ধার করা জাইয। এইরূপ তিনি ইহার পূর্বে লিখিয়াছেন, "কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক এবং উহা একটি বিশাল ও অতি প্রশস্ত বিচরণক্ষেত্র। পূর্ববর্তী লোকদের নিকট হইতে কুরআন মাজীদের যেই বাহ্য তাফ্‌সীর বর্ণিত রহিয়াছে, তাফ্‌সীর বুঝিবার ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান ও বোধশক্তি উহাতেই শেষ হইয়া যায় নাই।"

বাহ্যত তাফ্‌সীর শাস্ত্রের উপরোক্ত দুইটি ধারা পরস্পর বিরোধী। উক্ত দুই ধারার মধ্যবর্তী পর্যায় অনেকগুলি অন্তর্বর্তী ধারা রহিয়াছে, যাহা তাফ্‌সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। উক্ত ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ প্রথমদিকে এইরূপে ছিল যে, অনেক বিদ্বান ব্যক্তিই তাফ্‌সীর বর্ণনায় নীরবতা অবলম্বন করিতেন। অতঃপর রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্‌সীর বর্ণনার সূচনা হয়। রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্‌সীরের পরিমাণ প্রথমদিকে অল্প ছিল। অতঃপর কাল পরিক্রমায় উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরবর্তী কালে কিছু সংখ্যক অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি ও বর্ণনা উহার সহিত আসিয়া মিলিত হয়। অতঃপর কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া যাহা কিছু অনুমান করিতেন, উহাও উহাদের সহিত শামিল হইতে লাগিল।

প্রথমদিকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন শব্দের অর্থ আভিধানিক সম্পর্কিত উক্তিসমূহকেই গ্রহণ করা হইত। অতঃপর কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বুদ্ধিপ্রসূত অভিমতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই সকল অভিমত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে। এমন কি কোনও কোনও তাফ্‌সীর গ্রন্থে এইরূপ অনেক দীর্ঘ বর্ণনা স্থান লাভ করিতে থাকে–তাফ্‌সীর বর্ণনায় যাহাদের কোনওরূপ প্রয়োজনই ছিল না। উদাহণস্বরূপ ইমাম আর-রাযী (র) রচিত তাফ্‌সীর গ্রন্থে বর্ণনাতিশয্য উল্লেখ করা যায়। উক্ত তাফ্‌সীর গ্রন্থ সম্বন্ধে জনৈক চরমপন্থী আলিমের একটি অতিরঞ্জিত উক্তি প্রচলিত রহিয়াছে, "ইমাম রাযী রচিত তাফ্‌সীর গ্রন্থে তাফ্‌সীর ব্যতীত অন্য সব কিছুই বিদ্যমান রহিয়াছে" (আবূ হায়্যান, আল-বাহ্‌রুল-মুহীত, হালার-এ প্রকাশিত, ১খ., পৃ. ২৬১)।

ইমাম আর-রাগিব আল-ইস্‌ফাহানী (৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) শুধু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্তৃত্ব প্রদান করিলে উহার অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটিবার আশংকা আছে। অতঃপর ইমাম আবূ হায়্যান ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, ইমাম আর-রাযী প্রমুখ ব্যক্তি তাঁহাদের তাফ্‌সীর গ্রন্থসমূহে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণত একজন বৈয়াকরণের কার্যমাত্র। উক্ত বৈয়াকরণ তাঁহার তাফ্‌সীর গ্রন্থে কোনও শব্দের পরিবর্তিত আলিফ বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়ে তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।" অতঃপর ইমাম আবূ হায়্যান মন্তব্য করেন, "জ্ঞানগর্ভ আলোচনার ক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি উপরিউক্ত রূপ পন্থার অনুসারী, তিনি প্রাসংগিক-অপ্রাসংগিক বক্তব্যাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাইবার কার্যে এবং অন্ধভাবে হাত-পা ছুঁড়িবার কার্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন (আবূ হায়্যান, পূর্বোক্ত স্থান দ্র.)....। প্রাসংগিক-অপ্রাসংগিক বক্তব্যসমূহ সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে তাফ্‌সীরকারগণের মধ্যে কাহারও অংশ ছিল অল্প এবং কাহারও ছিল অধিক; কিন্তু উক্তরূপ সংমিশ্রণকার্য হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন–এইরূপ তাফ্‌সীরকারের সংখ্যা অল্প।

তাফ্‌সীর বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের ক্ষেত্রে যেইরূপে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, তাফ্‌সীর গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও সেইরূপে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। মিসর প্রভৃতি দেশে প্রথমদিকে একখানা তাফ্‌সীর গ্রন্থের কলেবর হইত এক পাতা পরিমাণ। অল্পকাল পরে সংকলিত তাফ্‌সীর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া এক খণ্ড অথবা কয়েক খণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। এই সময়ে উহাতে শুধু সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত

(১) শব্দগত ও ভাষাগত দিক ঃ বিভিন্ন শব্দের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে এবং উহাদের অর্থের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সংঘটন সম্বন্ধে গবেষণা শব্দের অর্থের মধ্যে যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উহার সময়সীমা নির্ণয়ের জন্য এবং একেকটি শব্দের বিভিন্নরূপ অর্থের মধ্য হইতে একটি অর্থে উহার ব্যবহার আরম্ভ হইবার ইতিহাসকে ও উক্ত অর্থে উক্ত শব্দের ব্যবহৃত হইবার আয়ুষ্কালকে জানিবার যেই উপকরণ প্রয়োজন, যদি আমাদের নিকট উহা বর্তমান থাকে তবে উহাতে আমরা এইরূপ তথ্যাবলী লাভ করিব- যাহা কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিবার ক্ষেত্রকে বিস্ময়কররূপে ব্যাপক ও প্রশস্ত করিতে আমাদিগকে বাধা প্রদান করিবে এবং উক্ত তথ্যাবলী কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর জন্য এইরূপ অর্থ নির্ধারণ করিবার অনুমতি প্রদান করিবে না-যাহা ইতিপূর্বে উহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল না এবং যে অর্থে উহারা ইতিপূর্বে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। আর যদি উহারা সেই অর্থে কখনও কোনরূপে ব্যবহৃত হইয়াও থাকে, তবে উহা হইয়াছে কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার কয়েক শতাব্দী পর মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে উদ্ভূত নূতন কোনও পরিভাষার ভিত্তিতে। এই নিবন্ধে ভবিষ্যতে যেই স্থানে আমরা আধুনিক যুগের তাফসীর তথা তাফ্‌সীর রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব, সেইখানে আমাদের উক্তির বিশদ বিবরণ দেওয়া হইবে।

(২) সাহিত্যগত বা বালাগাতগত (অলংকারশাস্ত্রগত) দিক ঃ বালাগাত (بلاغة) শব্দের বহুল প্রচলিত অর্থ কোন উক্তির স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া (مطابقة الكلام لمقتضى الحال)। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কুরআন মাজীদের এই বালাগাতশাস্ত্র অনুযায়ী তাফ্‌সীর, যাহা পরবর্তী কালে প্রণীত হইয়াছে, কি এমন একটি বাণী যাহা সেই যুগের লোকদের প্রতি প্রযোজ্য যাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে, আর তদ্বারা এই সব বালাগাতগত তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ রাখা হইয়াছে, অথচ এইসব সূক্ষ্ম অর্থের সহিত লোকেরা অনেক যুগ পরে পরিচিত হইয়াছে, যাহা তাহাদের জ্ঞানের উন্নতির পরিচায়ক? যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, বর্তমানে তাফ্‌সীর করিয়া কুরআন মাজীদ হইতে যেই সকল বৈজ্ঞানিক অর্থের দাবি করা হইতেছে, সেই অর্থ ও ভাবগুলি কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার কালেও বিধৃত ছিল, তবে আবার প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তৎকালীন আরবী ভাষার পণ্ডিত লোকেরা সেই অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিনা এবং উক্ত অর্থ কি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন? যদি বলা হয় যে, উক্ত সূক্ষ্ম অর্থ তাঁহারা হৃদঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন তবে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, জীবন ধারণের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা হইল না কেন এবং এই সকল আয়াতের ভিত্তিতে যেইগুলিতে জীবন ধারণের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতবাদগুলির বাখ্যা পাওয়া যায় এবং ইহাদের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর প্রকাশ পায়, উহাদের ভিত্তিতে এই প্রচেষ্টা ত্বরিতে গ্রহণ করা হয় নাই কেন? আর যদি বলা হয় যে, তৎকালীন লোকেরা এবং আরবী ভাষার পণ্ডিতেরা এই আয়াতসমূহ হইতে এইরূপ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম ছিল না (আর বাস্তব ঘটনাও ছিল তাহাই), তবে এইরূপ দাবি করা কিরূপে সংগত হইতে পারে যে, আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এই অর্থই বুঝাইয়াছিলেন? আর এই সকল আয়াতকে যেইগুলি দ্বারা উক্তরূপ সূক্ষ্ম অর্থ তৎকালীন লোকদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, কিরূপে বালাগাতের নিয়মানুসারে স্থান, কাল ও পাত্রের অবস্থার অনুকূলধর্মী কালাম বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়?

(৩) একটি ধর্মীয় ও আকীদাগত দিকও আছে। তাহা হইতেছে এইরূপ একটি দিক, যাহা একটি দীনী কিতাবের মূল ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে এবং উহার পরম লক্ষ্যকে বর্ণনা করে এবং বলে, এই দীনী কিতাব কি মানুষের বুদ্ধি ও মানসিক যোগ্যতার সম্মুখে বিশ্ব-জগতের কঠিন সমস্যাবলীর সমাধান ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীকে উপস্থাপিত করার জন্য? এইরূপ সমাধানসমূহ ও বৈজ্ঞানিক রহস্যাবলী মানুষের পার্থিব জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে কিরূপে সাহায্য করিতে পারে, আর উহারা কি মানব জীবনের চলিবার পথের এইরূপ মযবূত ও শক্তিশালী মূলনীতি ও পথনির্দেশক হইতে পারে, যদ্বারা আস্‌মানী রাসূল প্রেরণকার্যের সমাপ্তি ঘটান যায়? যেমন উহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে কুরআন মাজীদের আগমনের মাধ্যমে। অধিকন্তু বলা যায় যে, ইসলামের অনুসারী ব্যক্তিগণ দীনী কিতাব কর্তৃক বর্ণিত উক্ত সমাধানসমূহ ও বৈজ্ঞানিক রহস্যাবলীকে জানিবার ক্ষেত্রে উহাদের কোনও একটি নির্দিষ্ট সীমায় গিয়া থামিয়া যান না তো? তবে চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতিশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন রূপ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলিও কুরআন মাজীদ হইতে বাহির করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেমন কোন কোনও চিন্তাবিদের এরূপ সম্ভাবনার সপক্ষে অভিমতগুলি আপনারা ইতিপূর্বে এই নিবন্ধে পাঠ করিয়াছেন। অথচ বিভিন্নরূপে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির কতক বিষয় এমন যে, হয়ত আজ কেহ এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু আগামী কাল অথবা পরশু সে উহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিবর্জন করিতে বাধ্য হয়। উহাদের অনেকগুলি মতবাদ অতীতের লোকেরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, আর সেইগুলির সেই অতীতেই অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী যুগে ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

সত্য ও আসল কথা এই যে, মানব জীবনের সমস্যাবলীর পার্থিব দিকের সমাধান পেশ করিবার দীনী কিতাবের উপর বর্তায় না আর উহা মানব জীবনের উক্ত দিকটির সমস্যাবলীর সমাধানের দায়িত্বও নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে না। এই দীনী কিতাব মানুষকে তাহার জীবনের সমস্যাবলীর পার্থিব দিকের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কষ্ট হইতে বাঁচাইবার প্রয়াস পায় না যে, সে যেন উহার মধ্যে উক্তরূপ সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজিয়া বাহির করে এবং উহাকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের মনগড়া মতবাদ ও মূলনীতিসমূহের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বিবেচনা করে।

কোন কোন সরল বিশ্বাসী ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তির দীনী কিতাব এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইবার প্রচেষ্টার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, উহা দ্বারা তাঁহারা উক্ত কিতাবের সত্যতা, অলৌকিকতা ও চিরস্থায়িত্ব প্রমাণে সফলতা লাভ করিবেন। তবে কথা হইল যে, এইরূপ পন্থা অবলম্বন করায় দীনী কিতাবের সম্ভবত লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই হইবে বেশী। যদি এই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের অনুসারিগণ ধর্ম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ দূর করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার মনে করেন, তবে এইজন্য সম্ভবত ইহাই যথেষ্ট হইবে এবং ইহাতেই পূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে যে, তাঁহারা যেন প্রমাণ করিয়া দেখান যে, এই দীনী কিতাবে এইরূপ কোন বিশেষ উক্তি পাওয়া যায় না, যাহা গবেষণা দ্বারা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত বিশ্ব-প্রকৃতির নিশ্চিত বিধানাবলীর কোনও বিধানের সহিত বিরোধপূর্ণ। বস্তুত শুধু এইরূপ সামঞ্জস্য বিধানই এই দীনী কিতাবের চিরস্থায়িত্বের প্রমাণের জন্য, বিজ্ঞানের সহিত ইহার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইহাকে বিরূপ সমালোচনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে।

আছে এবং বর্তমান মানব জীবন রহস্যবাদী ও গূঢ় ভাবধারার প্রভাব হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে। আমরা সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন শিল্প ও জ্ঞান-শাখা সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং কুরআন মাজীদের সহিত উহাদের সম্পর্ক বর্ণনার জন্য সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রশস্ততর ক্ষেত্র মনে করিয়া এতদ্‌সম্পর্কিত আলোচনা হইতে বিরত রহিয়াছি, তবে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত কুরআন কারীমের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি। কারণ বিভিন্নরূপে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বর্ণনা করিবার প্রতি এবং কুরআন মাজীদ হইতে বিভিন্নরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিবার প্রতি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের মনীষীবৃন্দ সমভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। আর এই কারণেই আমরা অধ্যাপক Carra de Vaux কর্তৃক স্বীয় তাফ্‌সীর নিবন্ধে প্রকাশিত নিম্নোক্ত মন্তব্যকে সঠিক মনে করি না, "কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীরের মধ্যে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের চিন্তাধারাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া আধুনিক যুগের আধুনিকতাবাদীদের মস্তিষ্কের উদ্ভাবন বটে! বস্তুত উহা দ্বারা তাঁহারা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তাফ্‌সীর অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।" তাঁহার উপরোক্ত অভিমত বাস্তব সত্য ও সঠিক তথ্যের পরিপন্থী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নহে। কুরআন মাজীদ, দর্শনশাস্ত্র ও বিভিন্ন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অতি পূর্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

(ঙ) তাফ্‌সীর 'ইলমী (تفسير علمى) বা বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক তাফসীর ঃ তাফ্‌সীর ইল্‌মী হইতেছে এইরূপ তাফ্‌সীর যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষাসমূহ কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর মধ্যে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিবার বিষয়কে প্রমাণিত করা হয় এবং বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য কুরআন মাজীদ হইতে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কুরআন মাজীদের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের জন্য দীনী ইল্‌মের (ধর্মশাস্ত্রের) বিভিন্ন শাখায় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও তাফ্‌সীর রচনার উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত তাফ্‌সীর রচনার উক্ত পদ্ধতিকে এইরূপ অধিক ব্যাপক রূপদান করা হইয়াছে যে, কুরআন মাজীদ সংক্ষেপে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। উহাতে মৌলিক আকীদা-ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত বিদ্যা, বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কিত (আইন শাস্ত্রসহ) বিভিন্ন বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিদ্যা, গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক বিদ্যা ইত্যাদি নানাবিধ দীনী ইল্‌ম-এর পাশাপাশি সকল প্রকারের বৈষয়িক বিদ্যাও বর্তমান রহিয়াছে। সম্ভবত ইমাম আল-গাযালী (র) 'কুরআন মাজীদ সকল বিদ্যার বাহক ও ধারক'–এই মতবাদের ব্যাখ্যা বর্ণনায় সকলের মধ্যে অগ্রগামী ও শীর্ষস্থানীয় রহিয়াছেন। তিনি ইহ্‌য়া' উলূম গ্রন্থে (হাল্‌বী, ১খ., ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৫৯-২৬৪; শিরোনামঃ "কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝা ও রিওয়ায়াতের উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে বুদ্ধির ভিত্তিতে উহার তাফ্‌সীর বর্ণনা করা") দাবি করিয়াছেন, "বিভিন্ন প্রকৃতির মতবাদ ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেই সকল বিতর্কিত দুরূহ বিষয় অনুধাবন বিশেষজ্ঞদের জন্যও কষ্টসাধ্য কুরআন মাজীদে উহাদের ইঙ্গিত ও দিকনির্দেশনা বর্তমান রহিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কুরআন মাজীদে সকল প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়াবলীর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) তাঁহার জাওয়াহিরুল-কুরআন গ্রন্থে (মাতবা' ইল্‌মী, মিসর ১৩২৯ হি.) উপরোক্ত বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ তিনি-ইহ্‌য়া' উলূমিদ-দীন রচনার পর রচনা করিয়াছিলেন (আল-গাযালী, জাওয়াহিরুল-কুরআন, পৃ. ২৮-২৯)। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অনুচ্ছেদে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতি ও পন্থা অনুসরণ করিতে সকল প্রকারের ধর্মীয় বিদ্যা (দীনী ইল্‌ম) কুরআন মাজীদ হইতে কিরূপে নির্ণয় করা যায় (ইসতিম্বাত-استنباط) তাহা বর্ণনা করেন। অতঃপর পঞ্চম অনুচ্ছেদে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, সকল প্রকারের দীনী ইল্‌ম ব্যতীত সকল প্রকারের প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানও মূলত কুরআন মাজীদ হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইমাম আল-গাযালী (র) তাঁহার উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের দীনী ইল্‌মের নামোল্লেখ ও দীনী ইল্‌মসমূহ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্নরূপ ভাষাবিদ্যার নামোল্লেখ এবং অতঃপর চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, বিশ্ব-প্রকৃতিবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণবিদ্যা, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি প্রচলিত বিদ্যার নামোল্লেখ করিবার পর বর্ণনা করিয়াছেন যে, এতদ্ব্যতীত এইরূপ কতগুলি বিদ্যাও রহিয়াছে–যাহাদের নাম জানা রহিয়াছে এবং যাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনকারী ব্যক্তিগণ হইতে পৃথিবী একেবারে শূন্য নহে।

এতদ্ব্যতীত এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যাও রহিয়াছে যেইগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু যাহাদের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে বর্তমান রহিয়াছে এবং যাহাদিগকে আবিষ্কার করা ও আয়ত্ত করা মানুষের আয়াসসাধ্য। এতদ্ব্যতীত এইরূপ কতগুলি বিদ্যাও রহিয়াছে যেইগুলি অতীতে লোকদের নিকট জ্ঞাত ছিল, কিন্তু বর্তমানে যাহাদের নাম-নিশানা দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনকারী কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব বর্তমানে দুনিয়াতে নাই। ইহা ছাড়াও এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যাও রহিয়াছে যেইগুলিকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করা মানবীয় জ্ঞানের সাধ্যাতীত। অবশ্য অতি নৈকট্যলাভী ফেরেশ্‌তাদের কেহ কেহ উহাদিগকে অর্জন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।...অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) বলেন, "উপরে আমি যে সকল জ্ঞানশাখার নামোল্লেখ করিয়াছি অথবা যে সকল জ্ঞানশাখা উক্ত তালিকার বাহিরে রহিয়া গিয়াছে, উহাদের কোনটিই কুরআন মাজীদে বর্ণিত মৌলিক নীতিমালা ও বিষয়াবলী হইতে বাহিরে নহে। কারণ উহাদের সবগুলিই আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাতের মহাসমুদ্র-সমূহের মধ্য হইতে বাহরু'ল-আফ্'আল (কার্যাবলীর মহাসমুদ্র) নামক একটি মহাসমুদ্র হইতে নিঃসৃত ও নির্গত জ্ঞানশাখা বটে। আর আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, জ্ঞানের উক্ত মহাসমুদ্র হইতেছে একটি অকূল, অতল মহাসমুদ্র। উহার বাক্যাবলী লিখিবার উদ্দেশ্যে যদি পৃথিবীর সকল মহাসাগরের পানিও কালিরূপে ব্যবহৃত হয় তথাপি উহাদের লিখন শেষ হইবার পূর্বে উক্ত সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হইয়া যাইবে।"

অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলীর বর্ণনা প্রদান করেন এবং উহা অনুধানের জন্য যেই সকল বিদ্যা অর্জন করা অপরিহার্য উহাদের নামোল্লেখ করেন। যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যে রোগব্যাধি দেন এবং আরোগ্য দান করেন, তাঁর উক্ত কার্যাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান চিকিৎসাবিদ্যা ব্যতীত অন্য

উহা শুধু উহার মৌলিক বিষয়গুলির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। তবে উহা উহাদের জন্য কোনও নাম নির্দিষ্ট করিয়া দেয় না (পূ. গ্র., পৃ. ১৬৪)।

যে সকল লেখক তাঁহাদের তাফ্সীর গ্রন্থাবলীতে কুরআন মাজীদে বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলী বর্ণিত হইবার বিষয়ে সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং এতদসম্পর্কে অনেক তথ্য স্বীয় গ্রন্থাবলীতে উপস্থাপন করিয়াছেন, শায়খ তান্তাবী জাওহারী মারহুম তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রচিত তাফ্সীর গ্রন্থের সহিত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত হইতেছে এইরূপ গ্রন্থাবলী-যাহাদের লেখকগণ আলোচ্য বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দান করিয়াছেন এবং যাহাদের রচয়িতাগণের তাফ্সীর রচনার উদ্দেশ্যই হইতেছে–কুরআন মাজীদ ও বিভিন্নরূপ প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারস্পরিক সাযুজ্যকে বর্ণনা করা। উক্তরূপ রচনাবলীর উদাহরণ হিসাবে সৃষ্টিজগতের নির্ধারিত অপরিবর্তনশীল নিয়মাবলী এবং অনুরূপ বিতর্কিত বিষয়াবলীর বর্ণনায় উস্তায মুহাম্মাদ তাওফীক সিদ্কী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতামালা এবং অনুরূপ অন্যান্য রচনার নামোল্লেখ করা যায়।

(চ) বিজ্ঞানভিত্তিক তাফসীরের বিরোধিতা ঃ একদিকে যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক তাফ্সীর রচনার প্রবণতা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পরবর্তী যুগে উহার তাফ্সীরকারকদের কিছুটা মনোযোগ অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে– যদিও বর্তমান যুগে সংস্কৃতিবান লোকদের মধ্যে সম্ভবত ইহার প্রচলন তুলনামূলকভাবে খুব কম, অন্যদিকে এইরূপ তাফ্সীরের বিরোধিতাও প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ স্পেনের বিজ্ঞ 'আলিম শারীআতের মূলনীতিশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মূসা আশ-শাতিবী (মৃ. ৭৯০ হি. [ব্রকেলম্যান, পরিশিষ্ট, ২খ, ৩৭৪]) তাঁহার আল-মুওয়াফাকাত গ্রন্থে (আস্-সালাফিয়্যা সং, ১৩৪১ হি., ২খ, পৃ. ৪৬ প.) কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এতদ্সম্পর্কিত আলোচনাকে এইভাবে আরম্ভ করেন, "এই পবিত্র ও মুবারক শারীআতটি হইতেছে একটি উম্মী শারীআত (অর্থাৎ বুদ্ধিগত ও অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই)। কারণ স্বয়ং শারীআতের প্রবর্তক রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন উম্মী (নিরক্ষর)।"

অতএব শাতিবী এই শারীআতকে কল্যাণভিত্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শারীআত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া উহার সপক্ষে কতগুলি দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি একটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন — আরবদের মধ্যে বিশেষ কতগুলি বিদ্যার প্রতি, ঐতিহাসিকগণ এইগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষ মনোযোগ ও আকর্ষণ ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন তাহারা উন্নত নৈতিক চরিত্রকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন এবং নিজেদের মধ্যে সদগুণাবলীর চর্চা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। ইসলামী শারীআত আসিয়া উক্ত গুণাবলীর মধ্য হইতে যেই সকল গুণ প্রকৃতপক্ষে সৎ গুণ ছিল, সেইগুলিকে বহাল রাখিল এবং উহাদের সহিত অন্যান্য সৎ গুণের সংযোজন করিল, আর উহাদের মধ্যে যেইগুলি অন্যায় ও দূষণীয় ছিল সেইগুলিকে বাতিল ঘোষণা করিল। উহাদের মধ্যে যেই সকল বিষয় ছিল কল্যাণকর, শারীআত উহাদের বিভিন্নরূপ কল্যাণকর দিকের কথা বর্ণনা করিল এবং ইহাদের মধ্যে যেই সকল বিষয় ক্ষতিকর ছিল, সেইগুলির ক্ষতিকর দিকগুলি বর্ণনা করিল। আরবদের মধ্য যেই সকল বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ছিল, শাতিবী উহাদের মধ্য হইতে নিম্নোক্ত বিদ্যাগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন ঃ জ্যোতিষশাস্ত্র (علم النجوم), বৃষ্টি বর্ষণের সময় নিরূপণ; মেঘ সৃষ্টি ও মেঘ পরিচালনাকারী বায়ু বিষয়ক বিদ্যা (علم الانواء), ইতিহাসশাস্ত্র এবং অতীতের জাতিসমূহের ঘটনাবলী বিষয়ক বিদ্যা (علم التاريخ) ; চিকিৎসাবিদ্যা (علم الطب) ও অলঙ্কারশাস্ত্র (علم البلاغة)। উক্ত শাস্ত্রসমূহ "সঠিক বিদ্যা"-র শ্রেণীভুক্ত। শাতিবী নিম্নোক্ত বিদ্যাগুলিকে "ভ্রান্ত বিদ্যা"-র শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ পাখির উড্ডয়ন হইতে শুভ-অশুভ লক্ষণ গ্রহণবিদ্যা (علم العيافة والزجر), ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যা (علم الكهانة), মাটির উপর রেখা টানিয়া অদৃশ্য গণনা এবং প্রস্তর নিক্ষেপে শুভ-অশুভ লক্ষণ গ্রহণবিদ্যা (علم الرمل)। ইসলামী শারীআত উক্ত বিদ্যাগুলিকে বাতিল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

অতঃপর শাতিবী বলেন, সঠিক বিদ্যাগুলিকে গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে এবং ভ্রান্ত বিদ্যাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষেত্রে ইসলামী শারীআত শুধু সেই সকল বিদ্যাকেই বিবেচনায় রাখিয়াছে, যেই সকল বিদ্যা আরবদের নিকট জ্ঞাত ছিল। ইহা আরবদের নিকট জ্ঞাত বিদ্যাসমূহ ভিন্ন অন্য কোনও বিদ্যার বিষয়ে কোনরূপ বিধান দেয় নাই। শাতিবী তাঁহার উপরোক্ত মতবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বলেন, "উপরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শারীআতের ভিত্তি "উম্মীত্বের উপর স্থাপিত হইয়াছে এবং উহা প্রচলিত হইয়াছে এমন লোকদের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনের প্রেক্ষিতে যাহাদিগকে ইহা প্রদান করা হইয়াছে (অর্থাৎ আরবদের প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত)। এই বিষয়টি হইতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। উহাদের একটি এই যে, কোন কোন ব্যক্তি কুরআন মাজীদের প্রতি কতকগুলি বিষয়কে আরোপিত করিবার ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করিয়াছেন। তাঁহারা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান বলিয়া কথিত প্রতিটি শাস্ত্রকেই; এই সকল শাস্ত্র প্রাচীন যুগের অথবা পরবর্তী যুগের, যেমন–যাবতীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, বর্ণমালাবিদ্যা এবং বুদ্ধির চর্চা হইতে উদ্ভূত সকল প্রকারের বিদ্যাই কুরআন মাজীদ হইতে উদ্ভূত বিদ্যাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বস্তুত তাঁহাদের উক্ত ধারণাকে আমার উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বিচার করিয়ে সঠিক বলা যায় না।"

অতঃপর শাতিবী পূর্বযুগীয় 'উলামা কর্তৃক কুরআন মাজীদের তাফসীর বিষয়ে গৃহীত ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং উহা দ্বারা স্বীয় দাবির সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এতদ্ব্যতীত এই বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, পূর্বযুগীয় নেককার 'উলামা' অর্থাৎ সাহাবীগণ, তাবিঈগণ ও তাবিঈগণের অনুসারীরা কুরআন মাজীদ এবং উহার 'ইল্ম ও রহস্যাবলী সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু "সকল প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআন মাজীদ হইতে উদ্ভূত"– এই দাবির সপক্ষে তাঁহাদের কেহ কোনরূপ কথা বলিয়াছেন বা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া কেহ আমাদিগকে অবহিত করেন নাই। [ইমাম গাযালী (র) তাঁহার ইহ্য়া' 'উলূম গ্রন্থে (১খ., পৃ. ২৬১) হযরত 'আলী (রা) হইতে যে বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন, শাতিবী-র উক্ত মন্তব্যের কারণে সেই বাণী আমাদের স্মরণে আসে। হযরত আলী (রা) বলেন, "যেই ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তি উহার সাহায্যে সকল প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে সক্ষম।" শাতিবীর উক্ত মন্তব্যের ফলে অনেক কথাই আমাদের মনে উদিত হয়]। আর যদি তাঁহারা এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়াও থাকেন, তবে যাহা আমি উপরে বর্ণনা করিয়াছি, শুধু তাহাই বলিয়াছেন অথবা তাঁহারা শুধু মানুষের

উহা শুধু উহার মৌলিক বিষয়গুলির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। তবে উহা উহাদের জন্য কোনও নাম নির্দিষ্ট করিয়া দেয় না (পূ. গ্র., পৃ. ১৬৪)।

যে সকল লেখক তাঁহাদের তাফ্‌সীর গ্রন্থাবলীতে কুরআন মাজীদে বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলী বর্ণিত হইবার বিষয়ে সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং এতদসম্পর্কে অনেক তথ্য স্বীয় গ্রন্থাবলীতে উপস্থাপন করিয়াছেন, শায়খ তান্‌তাবী জাওহারী মারহুম তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রচিত তাফ্‌সীর গ্রন্থের সহিত নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত হইতেছে এইরূপ গ্রন্থাবলী-যাহাদের লেখকগণ আলোচ্য বিষয়টির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দান করিয়াছেন এবং যাহাদের রচয়িতাগণের তাফ্‌সীর রচনার উদ্দেশ্যই হইতেছে-কুরআন মাজীদ ও বিভিন্নরূপ প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারস্পরিক সাযুজ্যকে বর্ণনা করা। উক্তরূপ রচনাবলীর উদাহরণ হিসাবে সৃষ্টিজগতের নির্ধারিত অপরিবর্তনশীল নিয়মাবলী এবং অনুরূপ বিতর্কিত বিষয়াবলীর বর্ণনায় উস্তায মুহাম্মাদ তাওফীক সিদ্‌কী কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতামালা এবং অনুরূপ অন্যান্য রচনার নামোল্লেখ করা যায়।

(চ) বিজ্ঞানভিত্তিক তাফসীরের বিরোধিতা ঃ একদিকে যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক তাফ্‌সীর রচনার প্রবণতা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং পরবর্তী যুগে উহার তাফ্‌সীরকারকদের কিছুটা মনোযোগ অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে- যদিও বর্তমান যুগে সংস্কৃতিবান লোকদের মধ্যে সম্ভবত ইহার প্রচলন তুলনামূলকভাবে খুব কম, অন্যদিকে এইরূপ তাফ্‌সীরের বিরোধিতাও প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উদাহরণস্বরূপ স্পেনের বিজ্ঞ 'আলিম শারীআতের মূলনীতিশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা আশ-শাতিবী (মৃ. ৭৯০ হি. [ব্রকেলম্যান, পরিশিষ্ট, ২খ, ৩৭৪]) তাঁহার আল-মুওয়াফাকাত গ্রন্থে (আস্-সালাফিয়্যা সং, ১৩৪১ হি., ২খ, পৃ. ৪৬ প.) কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এতদ্‌সম্পর্কিত আলোচনাকে এইভাবে আরম্ভ করেন, "এই পবিত্র ও মুবারক শারীআতটি হইতেছে একটি উম্মী শারীআত (অর্থাৎ বুদ্ধিগত ও অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই)। কারণ স্বয়ং শারীআতের প্রবর্তক রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন উম্মী (নিরক্ষর)।"

অতএব শাতিবী এই শারীআতকে কল্যাণভিত্তিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শারীআত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া উহার সপক্ষে কতগুলি দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি একটি অনুচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন— আরবদের মধ্যে বিশেষ কতগুলি বিদ্যার প্রতি, ঐতিহাসিকগণ এইগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন, বিশেষ মনোযোগ ও আকর্ষণ ছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন তাহারা উন্নত নৈতিক চরিত্রকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন এবং নিজেদের মধ্যে সদগুণাবলীর চর্চা করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। ইসলামী শারীআত আসিয়া উক্ত গুণাবলীর মধ্য হইতে যেই সকল গুণ প্রকৃতপক্ষে সৎ গুণ ছিল, সেইগুলিকে বহাল রাখিল এবং উহাদের সহিত অন্যান্য সৎ গুণের সংযোজন করিল, আর উহাদের মধ্যে যেইগুলি অন্যায় ও দূষণীয় ছিল সেইগুলিকে বাতিল ঘোষণা করিল। উহাদের মধ্যে যেই সকল বিষয় ছিল কল্যাণকর, শারীআত উহাদের বিভিন্নরূপ কল্যাণকর দিকের কথা বর্ণনা করিল এবং ইহাদের মধ্যে যেই সকল বিষয় ক্ষতিকর ছিল, সেইগুলির ক্ষতিকর দিকগুলি বর্ণনা করিল। আরবদের মধ্য যেই সকল বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ ছিল, শাতিবী উহাদের মধ্য হইতে নিম্নোক্ত বিদ্যাগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন ঃ জ্যোতিষশাস্ত্র (علم النجوم), বৃষ্টি বর্ষণের সময় নিরূপণ; মেঘ সৃষ্টি ও মেঘ পরিচালনাকারী বায়ু বিষয়ক বিদ্যা (علم الانواء), ইতিহাসশাস্ত্র এবং অতীতের জাতিসমূহের ঘটনাবলী বিষয়ক বিদ্যা (علم التاريخ) ; চিকিৎসাবিদ্যা (علم الطب) ও অলঙ্কারশাস্ত্র (علم البلاغة)। উক্ত শাস্ত্রসমূহ "সঠিক বিদ্যা"-র শ্রেণীভুক্ত। শাতিবী নিম্নোক্ত বিদ্যাগুলিকে "ভ্রান্ত বিদ্যা"-র শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ পাখির উড্ডয়ন হইতে শুভ-অশুভ লক্ষণ গ্রহণবিদ্যা (علم العيافة والزجر), ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যা (علم الكهانة), মাটির উপর রেখা টানিয়া অদৃশ্য গণনা এবং প্রস্তর নিক্ষেপে শুভ-অশুভ লক্ষণ গ্রহণবিদ্যা (علم الرمل)। ইসলামী শারীআত উক্ত বিদ্যাগুলিকে বাতিল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে।

অতঃপর শাতিবী বলেন, সঠিক বিদ্যাগুলিকে গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে এবং ভ্রান্ত বিদ্যাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করিবার ক্ষেত্রে ইসলামী শারীআত শুধু সেই সকল বিদ্যাকেই বিবেচনায় রাখিয়াছে, যেই সকল বিদ্যা আরবদের নিকট জ্ঞাত ছিল। ইহা আরবদের নিকট জ্ঞাত বিদ্যাসমূহ ভিন্ন অন্য কোনও বিদ্যার বিষয়ে কোনরূপ বিধান দেয় নাই। শাতিবী তাঁহার উপরোক্ত মতবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে গিয়া বলেন, "উপরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শারীআতের ভিত্তি "উম্মীত্বের উপর স্থাপিত হইয়াছে এবং উহা প্রচলিত হইয়াছে এমন লোকদের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনের প্রেক্ষিতে যাহাদিগকে ইহা প্রদান করা হইয়াছে (অর্থাৎ আরবদের প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত)। এই বিষয়টি হইতে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয়। উহাদের একটি এই যে, কোন কোন ব্যক্তি কুরআন মাজীদের প্রতি কতকগুলি বিষয়কে আরোপিত করিবার ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করিয়াছেন। তাঁহারা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান বলিয়া কথিত প্রতিটি শাস্ত্রকেই, এই সকল শাস্ত্র প্রাচীন যুগের অথবা পরবর্তী যুগের, যেমন-যাবতীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, বর্ণমালাবিদ্যা এবং বুদ্ধির চর্চা হইতে উদ্ভূত সকল প্রকারের বিদ্যাই কুরআন মাজীদ হইতে উদ্ভূত বিদ্যাসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বস্তুত তাঁহাদের উক্ত ধারণাকে আমার উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বিচার করিয়ে সঠিক বলা যায় না।"

অতঃপর শাতিবী পূর্বযুগীয় 'উলামা কর্তৃক কুরআন মাজীদের তাফসীর বিষয়ে গৃহীত ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং উহা দ্বারা স্বীয় দাবির সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এতদ্ব্যতীত এই বিষয়টিও উল্লেখ্য যে, পূর্বযুগীয় নেককার 'উলামা' অর্থাৎ সাহাবীগণ, তাবিঈগণ ও তাবিঈগণের অনুসারীরা কুরআন মাজীদ এবং উহার 'ইল্‌ম ও রহস্যাবলী সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু "সকল প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআন মাজীদ হইতে উদ্ভূত"- এই দাবির সপক্ষে তাঁহাদের কেহ কোনরূপ কথা বলিয়াছেন বা আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া কেহ আমাদিগকে অবহিত করেন নাই। [ইমাম গাযালী (র) তাঁহার ইহ্‌য়া' 'উলূম গ্রন্থে (১খ., পৃ. ২৬১) হযরত 'আলী (রা) হইতে যে বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন, শাতিবী-র উক্ত মন্তব্যের কারণে সেই বাণী আমাদের স্মরণে আসে। হযরত আলী (রা) বলেন, "যেই ব্যক্তি কুরআন মাজীদকে বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তি উহার সাহায্যে সকল প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা প্রদান করিতে সক্ষম।" শাতিবীর উক্ত মন্তব্যের ফলে অনেক কথাই আমাদের মনে উদিত হয়]। আর যদি তাঁহারা এই সম্বন্ধে কিছু বলিয়াও থাকেন, তবে যাহা আমি উপরে বর্ণনা করিয়াছি, শুধু তাহাই বলিয়াছেন অথবা তাঁহারা শুধু মানুষের

আছে এবং বর্তমান মানব জীবন রহস্যবাদী ও গূঢ় ভাবধারার প্রভাব হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত হইয়াছে। আমরা সাহিত্য বিষয়ক বিভিন্ন শিল্প ও জ্ঞান-শাখা সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং কুরআন মাজীদের সহিত উহাদের সম্পর্ক বর্ণনার জন্য সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রশস্ততর ক্ষেত্র মনে করিয়া এতদসম্পর্কিত আলোচনা হইতে বিরত রহিয়াছি, তবে বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত কুরআন কারীমের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি। কারণ বিভিন্নরূপে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বর্ণনা করিবার প্রতি এবং কুরআন মাজীদ হইতে বিভিন্নরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিবার প্রতি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগের মনীষীবৃন্দ সমভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। আর এই কারণেই আমরা অধ্যাপক Carra de Vaux কর্তৃক স্বীয় তাফ্‌সীর নিবন্ধে প্রকাশিত নিম্নোক্ত মন্তব্যকে সঠিক মনে করি না, "কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীরের মধ্যে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের চিন্তাধারাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া আধুনিক যুগের আধুনিকতাবাদীদের মস্তিষ্কের উদ্ভাবন বটে! বস্তুত উহা দ্বারা তাঁহারা নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তাফ্‌সীর অধ্যয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন মাত্র।" তাঁহার উপরোক্ত অভিমত বাস্তব সত্য ও সঠিক তথ্যের পরিপন্থী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নহে। কুরআন মাজীদ, দর্শনশাস্ত্র ও বিভিন্ন ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অতি পূর্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

(ঙ) তাফ্‌সীর 'ইল্‌মী (تفسير علمى) বা বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক তাফসীর ঃ তাফ্‌সীর ইল্‌মী হইতেছে এইরূপ তাফ্‌সীর যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পরিভাষাসমূহ কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর মধ্যে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান থাকিবার বিষয়কে প্রমাণিত করা হয় এবং বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য কুরআন মাজীদ হইতে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হয়। কুরআন মাজীদের সঠিক অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের জন্য দীনী ইল্‌মের (ধর্মশাস্ত্রের) বিভিন্ন শাখায় প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও তাফ্‌সীর রচনার উক্ত পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। বস্তুত তাফ্‌সীর রচনার উক্ত পদ্ধতিকে এইরূপ অধিক ব্যাপক রূপদান করা হইয়াছে যে, কুরআন মাজীদ সংক্ষেপে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। উহাতে মৌলিক আকীদা-ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত বিদ্যা, বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কিত (আইন শাস্ত্রসহ) বিভিন্ন বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিদ্যা, গূঢ় তত্ত্ব বিষয়ক বিদ্যা ইত্যাদি নানাবিধ দীনী ইল্‌ম-এর পাশাপাশি সকল প্রকারের বৈষয়িক বিদ্যাও বর্তমান রহিয়াছে। সম্ভবত ইমাম আল-গাযালী (র) 'কুরআন মাজীদ সকল বিদ্যার বাহক ও ধারক'–এই মতবাদের ব্যাখ্যা বর্ণনায় সকলের মধ্যে অগ্রগামী ও শীর্ষস্থানীয় রহিয়াছেন। তিনি ইহ্‌য়া' উলূম গ্রন্থে (হালবী, ১খ., ৪র্থ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৫৯-২৬৪; শিরোনামঃ "কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝা ও রিওয়ায়াতের উদ্ধৃতি ব্যতিরেকে বুদ্ধির ভিত্তিতে উহার তাফ্‌সীর বর্ণনা করা") দাবি করিয়াছেন, "বিভিন্ন প্রকৃতির মতবাদ ও বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেই সকল বিতর্কিত দুরূহ বিষয় অনুধাবন বিশেষজ্ঞদের জন্যও কষ্টসাধ্য কুরআন মাজীদে উহাদের ইঙ্গিত ও দিকনির্দেশনা বর্তমান রহিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কুরআন মাজীদে সকল প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়াবলীর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) তাঁহার জাওয়াহিরুল-কুরআন গ্রন্থে (মাতবা' ইল্‌মী, মিসর ১৩২৯ হি.) উপরোক্ত বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ তিনি-ইহ্‌য়া' উলূমিদ-দীন রচনার পর রচনা করিয়াছিলেন (আল-গাযালী, জাওয়াহিরুল-কুরআন, পৃ. ২৮-২৯)। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অনুচ্ছেদে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতি ও পন্থা অনুসরণ করিতে সকল প্রকারের ধর্মীয় বিদ্যা (দীনী ইল্‌ম) কুরআন মাজীদ হইতে কিরূপে নির্ণয় করা যায় (ইসতিম্বাত- استنبات) তাহা বর্ণনা করেন। অতঃপর পঞ্চম অনুচ্ছেদে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, সকল প্রকারের দীনী ইল্‌ম ব্যতীত সকল প্রকারের প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানও মূলত কুরআন মাজীদ হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইমাম আল-গাযালী (র) তাঁহার উক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকারের দীনী ইল্‌মের নামোল্লেখ ও দীনী ইল্‌মসমূহ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্নরূপ ভাষাবিদ্যার নামোল্লেখ এবং অতঃপর চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, বিশ্ব-প্রকৃতিবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণবিদ্যা, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি প্রচলিত বিদ্যার নামোল্লেখ করিবার পর বর্ণনা করিয়াছেন যে, এতদ্ব্যতীত এইরূপ কতগুলি বিদ্যাও রহিয়াছে–যাহাদের নাম জানা রহিয়াছে এবং যাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনকারী ব্যক্তিগণ হইতে পৃথিবী একেবারে শূন্য নহে।

এতদ্ব্যতীত এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যাও রহিয়াছে যেইগুলি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু যাহাদের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে বর্তমান রহিয়াছে এবং যাহাদিগকে আবিষ্কার করা ও আয়ত্ত করা মানুষের আয়াসসাধ্য। এতদ্ব্যতীত এইরূপ কতগুলি বিদ্যাও রহিয়াছে যেইগুলি অতীতে লোকদের নিকট জ্ঞাত ছিল, কিন্তু বর্তমানে যাহাদের নাম-নিশানা দুনিয়া হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনকারী কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব বর্তমানে দুনিয়াতে নাই। ইহা ছাড়াও এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যাও রহিয়াছে যেইগুলিকে উপলব্ধি ও আয়ত্ত করা মানবীয় জ্ঞানের সাধ্যাতীত। অবশ্য অতি নৈকট্যলাভী ফেরেশ্‌তাদের কেই কেহ উহাদিগকে অর্জন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ...অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) বলেন, "উপরে আমি যে সকল জ্ঞানশাখার নামোল্লেখ করিয়াছি অথবা যে সকল জ্ঞানশাখা উক্ত তালিকার বাহিরে রহিয়া গিয়াছে, উহাদের কোনটিই কুরআন মাজীদে বর্ণিত মৌলিক নীতিমালা ও বিষয়াবলী হইতে বাহিরে নহে। কারণ উহাদের সবগুলিই আল্লাহ্ তা'আলার মা'রিফাতের মহাসমুদ্র-সমূহের মধ্য হইতে বাহরু'ল-আফ্‌'আল (কার্যাবলীর মহাসমুদ্র) নামক একটি মহাসমুদ্র হইতে নিঃসৃত ও নির্গত জ্ঞানশাখা বটে। আর আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, জ্ঞানের উক্ত মহাসমুদ্র হইতেছে একটি অকূল, অতল মহাসমুদ্র। উহার বাক্যাবলী লিখিবার উদ্দেশ্যে যদি পৃথিবীর সকল মহাসাগরের পানিও কালিরূপে ব্যবহৃত হয় তথাপি উহাদের লিখন শেষ হইবার পূর্বে উক্ত সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হইয়া যাইবে।"

অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলীর বর্ণনা প্রদান করেন এবং উহা অনুধানের জন্য যেই সকল বিদ্যা অর্জন করা অপরিহার্য উহাদের নামোল্লেখ করেন। যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যে রোগব্যাধি দেন এবং আরোগ্য দান করেন, তাঁর উক্ত কার্যাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান চিকিৎসাবিদ্যা ব্যতীত অন্য

(১) শব্দগত ও ভাষাগত দিক ঃ বিভিন্ন শব্দের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে এবং উহাদের অর্থের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সংঘটন সম্বন্ধে গবেষণা শব্দের অর্থের মধ্যে যে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উহার সময়সীমা নির্ণয়ের জন্য এবং একেকটি শব্দের বিভিন্নরূপ অর্থের মধ্য হইতে একটি অর্থে উহার ব্যবহার আরম্ভ হইবার ইতিহাসকে ও উক্ত অর্থে উক্ত শব্দের ব্যবহৃত হইবার আয়ুষ্কালকে জানিবার যেই উপকরণ প্রয়োজন, যদি আমাদের নিকট উহা বর্তমান থাকে তবে উহাতে আমরা এইরূপ তথ্যাবলী লাভ করিব- যাহা কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিবার ক্ষেত্রকে বিস্ময়কররূপে ব্যাপক ও প্রশস্ত করিতে আমাদিগকে বাধা প্রদান করিবে এবং উক্ত তথ্যাবলী কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর জন্য এইরূপ অর্থ নির্ধারণ করিবার অনুমতি প্রদান করিবে না-যাহা ইতিপূর্বে উহাদের জন্য নির্ধারিত ছিল না এবং যে অর্থে উহারা ইতিপূর্বে কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। আর যদি উহারা সেই অর্থে কখনও কোনরূপে ব্যবহৃত হইয়াও থাকে, তবে উহা হইয়াছে কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার কয়েক শতাব্দী পর মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে উদ্ভূত নূতন কোনও পরিভাষার ভিত্তিতে। এই নিবন্ধে ভবিষ্যতে যেই স্থানে আমরা আধুনিক যুগের তাফসীর তথা তাফ্‌সীর রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব, সেইখানে আমাদের উক্তির বিশদ বিবরণ দেওয়া হইবে।

(২) সাহিত্যগত বা বালাগাতগত (অলংকারশাস্ত্রগত) দিক ঃ বালাগাত (بلاغة) শব্দের বহুল প্রচলিত অর্থ কোন উক্তির স্থান, কাল ও পাত্রের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া (مطابقة الكلام لمقتضى الحال)। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কুরআন মাজীদের এই বালাগাতশাস্ত্র অনুযায়ী তাফ্‌সীর, যাহা পরবর্তী কালে প্রণীত হইয়াছে, কি এমন একটি বাণী যাহা সেই যুগের লোকদের প্রতি প্রযোজ্য যাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে, আর তদ্বারা এই সব বালাগাতগত তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ রাখা হইয়াছে, অথচ এইসব সূক্ষ্ম অর্থের সহিত লোকেরা অনেক যুগ পরে পরিচিত হইয়াছে, যাহা তাহাদের জ্ঞানের উন্নতির পরিচায়ক? যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, বর্তমানে তাফ্‌সীর করিয়া কুরআন মাজীদ হইতে যেই সকল বৈজ্ঞানিক অর্থের দাবি করা হইতেছে, সেই অর্থ ও ভাবগুলি কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার কালেও বিধৃত ছিল, তবে আবার প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তৎকালীন আরবী ভাষার পণ্ডিত লোকেরা সেই অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিনা এবং উক্ত অর্থ কি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন? যদি বলা হয় যে, উক্ত সূক্ষ্ম অর্থ তাঁহারা হৃদঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন তবে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, জীবন ধারণের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা হইল না কেন এবং এই সকল আয়াতের ভিত্তিতে যেইগুলিতে জীবন ধারণের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মতবাদগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং ইহাদের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীর প্রকাশ পায়, উহাদের ভিত্তিতে এই প্রচেষ্টা ত্বরিতে গ্রহণ করা হয় নাই কেন? আর যদি বলা হয় যে, তৎকালীন লোকেরা এবং আরবী ভাষার পণ্ডিতেরা এই আয়াতসমূহ হইতে এইরূপ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম ছিল না (আর বাস্তব ঘটনাও ছিল তাহাই), তবে এইরূপ দাবি করা কিরূপে সংগত হইতে পারে যে, আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এই অর্থই বুঝাইয়াছিলেন? আর এই সকল আয়াতকে যেইগুলি দ্বারা উক্তরূপ সূক্ষ্ম অর্থ তৎকালীন লোকদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, কিরূপে বালাগাতের নিয়মানুসারে স্থান, কাল ও পাত্রের অবস্থার অনুকূলধর্মী কালাম বলিয়া আখ্যায়িত করা যায়?

(৩) একটি ধর্মীয় ও আকীদাগত দিকও আছে। তাহা হইতেছে এইরূপ একটি দিক, যাহা একটি দীনী কিতাবের মূল ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে এবং উহার পরম লক্ষ্যকে বর্ণনা করে এবং বলে, এই দীনী কিতাব কি মানুষের বুদ্ধি ও মানসিক যোগ্যতার সম্মুখে বিশ্ব-জগতের কঠিন সমস্যাবলীর সমাধান ও প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীকে উপস্থাপিত করার জন্য? এইরূপ সমাধানসমূহ ও বৈজ্ঞানিক রহস্যাবলী মানুষের পার্থিব জীবনের প্রয়োজন মিটাইতে কিরূপে সাহায্য করিতে পারে, আর উহারা কি মানব জীবনের চলিবার পথের এইরূপ মযবূত ও শক্তিশালী মূলনীতি ও পথনির্দেশক হইতে পারে, যদ্দারা আস্‌মানী রাসূল প্রেরণকার্যের সমাপ্তি ঘটান যায়? যেমন উহার সমাপ্তি ঘটিয়াছে কুরআন মাজীদের আগমনের মাধ্যমে। অধিকন্তু বলা যায় যে, ইসলামের অনুসারী ব্যক্তিগণ দীনী কিতাব কর্তৃক বর্ণিত উক্ত সমাধানসমূহ ও বৈজ্ঞানিক রহস্যাবলীকে জানিবার ক্ষেত্রে উহাদের কোনও একটি নির্দিষ্ট সীমায় গিয়া থামিয়া যান না তো? তবে চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতিশাস্ত্র ও রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন রূপ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলিও কুরআন মাজীদ হইতে বাহির করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? যেমন কোন কোনও চিন্তাবিদের এরূপ সম্ভাবনার সপক্ষে অভিমতগুলি আপনারা ইতিপূর্বে এই নিবন্ধে পাঠ করিয়াছেন। অথচ বিভিন্নরূপে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলির কতক বিষয় এমন যে, হয়ত আজ কেহ এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, কিন্তু আগামী কাল অথবা পরশু সে উহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া পরিবর্জন করিতে বাধ্য হয়। উহাদের অনেকগুলি মতবাদ অতীতের লোকেরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, আর সেইগুলির সেই অতীতেই অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং পরবর্তী যুগে ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

সত্য ও আসল কথা এই যে, মানব জীবনের সমস্যাবলীর পার্থিব দিকের সমাধান পেশ করিবার দীনী কিতাবের উপর বর্তায় না আর উহা মানব জীবনের উক্ত দিকটির সমস্যাবলীর সমাধানের দায়িত্বও নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে না। এই দীনী কিতাব মানুষকে তাহার জীবনের সমস্যাবলীর পার্থিব দিকের সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কষ্ট হইতে বাঁচাইবার প্রয়াস পায় না যে, সে যেন উহার মধ্যে উক্তরূপ সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজিয়া বাহির করে এবং উহাকে বিভিন্ন বিজ্ঞানের মনগড়া মতবাদ ও মূলনীতিসমূহের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বিবেচনা করে।

কোন কোন সরল বিশ্বাসী ও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তির দীনী কিতাব এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইবার প্রচেষ্টার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, উহা দ্বারা তাঁহারা উক্ত কিতাবের সত্যতা, অলৌকিকতা ও চিরস্থায়িত্ব প্রমাণে সফলতা লাভ করিবেন। তবে কথা হইল যে, এইরূপ পন্থা অবলম্বন করায় দীনী কিতাবের সম্ভবত লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই হইবে বেশী। যদি এই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিগণ ও তাঁহাদের অনুসারিগণ ধর্ম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ দূর করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার মনে করেন, তবে এইজন্য সম্ভবত ইহাই যথেষ্ট হইবে এবং ইহাতেই পূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে যে, তাঁহারা যেন প্রমাণ করিয়া দেখান যে, এই দীনী কিতাবে এইরূপ কোন বিশেষ উক্তি পাওয়া যায় না, যাহা গবেষণা দ্বারা নির্ভুলভাবে প্রমাণিত বিশ্ব-প্রকৃতির নিশ্চিত বিধানাবলীর কোনও বিধানের সহিত বিরোধপূর্ণ। বস্তুত শুধু এইরূপ সামঞ্জস্য বিধানই এই দীনী কিতাবের চিরস্থায়িত্বের প্রমাণের জন্য, বিজ্ঞানের সহিত ইহার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইহাকে বিরূপ সমালোচনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট হইবে।

অপরাধী হইবেন যিনি উপরোক্ত শর্তাবলী হইতে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মতবাদ ও নিজ বুদ্ধি অনুসারে তাফ্সীর বর্ণনা করেন। নিঃসন্দেহে অনিবার্যভাবে তাহার তাফ্সীর হইবে অনুমানভিত্তিক ও অনিশ্চিত ধারণানির্ভর। বস্তুত উক্তরূপ তাফ্সীর বর্ণনাই হইতেছে প্রকৃত অর্থে তাফ্সীর বির-রায়, যাহা সাহীহ হাদীছে নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে [আর-রাগিব আল-ইস্ফাহানী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪২৫]।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে দুইটি ধারা পাশাপাশি চলিয়া আসিয়াছে এবং উক্ত দুইটি ধারার মধ্যবর্তী স্থানে এইরূপ কতগুলি ধারাও রহিয়াছে, ধারাদ্বয়ের কোনও একটির সহিত যাহাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে। যেই ধারা পদ্ধতিটি সর্বপ্রথমে অস্তিত্ব লাভ করে তাহা নিম্নরূপঃ কুরআন মাজীদের তাফ্সীর বর্ণনায় নিজ বুদ্ধিতে কোনও কিছু বলা হইতে বিরত থাকা উচিত। উল্লেখ্য যে, উক্ত মতবাদ ইসলামের প্রাথমিক যুগ ও তৎসন্নিহিত যুগের বিজ্ঞ জনগণ পোষণ করিতেন। উক্ত মতবাদের অনুসারীদের বহু ঘটনার বিবরণ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ এই সকল ঘটনার মধ্য হইতে মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট হইবে। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র), যাঁহাকে প্রাথমিক যুগের লোকেরা হাদীছ শাস্ত্রের একজন সংকলকও বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইব্নুল-মুসায়্যাব-এর নিকট কুরআন মাজীদের কোনও আয়াতের তাফ্সীর জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিতেন, আমি কুরআন মাজীদের তাফ্সীর বর্ণনায় কোনও কথা বলি না (ইব্ন তায়্মিয়া, উসূলুত-তাফ্সীর, পৃ. ৩১)।

তাফ্সীর বর্ণনার অপর ধারাটি সম্পর্কে ইমাম রাগিব-এর পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনায় ইংগিত প্রদান করা হইয়াছে। এই ধারার সমর্থকদের মতে কুরআন মাজীদের তাফ্সীর বিষয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করা প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তির জন্যই জাইয। ইনাম আল-গাযালী (র) তাঁহার ইহ্য়া' উলূম গ্রন্থে (আবূ হায়্যান, আল-বাহ্রুল-মুহীত, ১খ, পৃ. ৩৪১) দলীল-প্রমাণ দ্বারা এই অভিমতকে বাতিল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন যে, কুরআন মাজীদের তাফ্সীর বর্ণনায় রিওয়ায়াত ভিত্তিক তথা উদ্ধৃতিমূলক কথা ভিন্ন অন্য কোনও কথা বলা কাহারও জন্য জাইয নহে। অতএব এই অভিমত ভুল ও বাতিল বলিয়া প্রমাণিত হইল যে, কুরআন মাজীদের অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনায় শুধু ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যক্তিদের নিকট হইতে শ্রুত অর্থ ও ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করা জাইয। এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে, প্রত্যেক সুযোগ্য ব্যক্তির জন্য তাঁহার জ্ঞান ও বিবেচনার পরিমাণ এবং বিবেক-বুদ্ধির সীমা অনুযায়ী কুরআন মাজীদের মমার্থ ও তাৎপর্য অনুশীলন ও উদ্ধার করা জাইয। এইরূপ তিনি ইহার পূর্বে লিখিয়াছেন, "কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক এবং উহা একটি বিশাল ও অতি প্রশস্ত বিচরণক্ষেত্র। পূর্ববর্তী লোকদের নিকট হইতে কুরআন মাজীদের যেই বাহ্য তাফ্সীর বর্ণিত রহিয়াছে, তাফ্সীর বুঝিবার ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান ও বোধশক্তি উহাতেই শেষ হইয়া যায় নাই।"

বাহ্যত তাফ্সীর শাস্ত্রের উপরোক্ত দুইটি ধারা পরস্পর বিরোধী। উক্ত দুই ধারার মধ্যবর্তী পর্যায় অনেকগুলি অন্তর্বর্তী ধারা রহিয়াছে, যাহা তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। উক্ত ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ প্রথমদিকে এইরূপে ছিল যে, অনেক বিদ্বান ব্যক্তিই তাফ্সীর বর্ণনায় নীরবতা অবলম্বন করিতেন। অতঃপর রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর বর্ণনার সূচনা হয়। রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীরের পরিমাণ প্রথমদিকে অল্প ছিল। অতঃপর কাল পরিক্রমায় উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরবর্তী কালে কিছু সংখ্যক অবিশ্বস্ত ও অনির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি ও বর্ণনা উহার সহিত আসিয়া মিলিত হয়। অতঃপর কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁহাদের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া যাহা কিছু অনুমান করিতেন, উহাও উহাদের সহিত শামিল হইতে লাগিল।

প্রথমদিকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন শব্দের অর্থ আভিধানিক সম্পর্কিত উক্তিসমূহকেই গ্রহণ করা হইত। অতঃপর কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের অর্থ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বুদ্ধিপ্রসূত অভিমতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এই সকল অভিমত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে। এমন কি কোনও কোনও তাফ্সীর গ্রন্থে এইরূপ অনেক দীর্ঘ বর্ণনা স্থান লাভ করিতে থাকে–তাফ্সীর বর্ণনায় যাহাদের কোনওরূপ প্রয়োজনই ছিল না। উদাহণস্বরূপ ইমাম আর-রাযী (র) রচিত তাফ্সীর গ্রন্থে বর্ণনাতিশয্য উল্লেখ করা যায়। উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থ সম্বন্ধে জনৈক চরমপন্থী আলিমের একটি অতিরঞ্জিত উক্তি প্রচলিত রহিয়াছে, "ইমাম রাযী রচিত তাফ্সীর গ্রন্থে তাফ্সীর ব্যতীত অন্য সব কিছুই বিদ্যমান রহিয়াছে" (আবূ হায়্যান, আল-বাহ্রুল-মুহীত, হালার-এ প্রকাশিত, ১খ., পৃ. ২৬১)।

ইমাম আর-রাগিব আল-ইস্ফাহানী (৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) শুধু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কর্তৃত্ব প্রদান করিলে উহার অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটিবার আশংকা আছে। অতঃপর ইমাম আবূ হায়্যান ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, ইমাম আর-রাযী প্রমুখ ব্যক্তি তাঁহাদের তাফ্সীর গ্রন্থসমূহে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণত একজন বৈয়াকরণের কার্যমাত্র। উক্ত বৈয়াকরণ তাঁহার তাফ্সীর গ্রন্থে কোনও শব্দের পরিবর্তিত আলিফ বর্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময়ে তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন।" অতঃপর ইমাম আবূ হায়্যান মন্তব্য করেন, "জ্ঞানগর্ভ আলোচনার ক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি উপরিউক্ত রূপ পন্থার অনুসারী, তিনি প্রাসংগিক-অপ্রাসংগিক বক্তব্যাবলীর সংমিশ্রণ ঘটাইবার কার্যে এবং অন্ধভাবে হাত-পা ছুঁড়িবার কার্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন (আবূ হায়্যান, পূর্বোক্ত স্থান দ্র.)....। প্রাসংগিক-অপ্রাসংগিক বক্তব্যসমূহ সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে তাফ্সীরকারগণের মধ্যে কাহারও অংশ ছিল অল্প এবং কাহারও ছিল অধিক; কিন্তু উক্তরূপ সংমিশ্রণকার্য হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন–এইরূপ তাফ্সীরকারের সংখ্যা অল্প।

তাফ্সীর বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের ক্ষেত্রে যেইরূপে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, তাফ্সীর গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও সেইরূপে ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। মিসর প্রভৃতি দেশে প্রথমদিকে একখানা তাফ্সীর গ্রন্থের কলেবর হইত এক পাতা পরিমাণ। অল্পকাল পরে সংকলিত তাফ্সীর গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়া এক খণ্ড অথবা কয়েক খণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। এই সময়ে উহাতে শুধু সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত

হইতে চেষ্টা করিবে। বলা বাহুল্য, আরবী ভাষায় এইরূপ সুযোগ-সুবিধার অবকাশ অনেক বেশী পরিমাণে রহিয়াছে।

তাফ্সীর বর্ণনাকারী ব্যক্তি যেই যুগেরই হউন না কেন এবং তাঁহার তাফ্সীর বর্ণনার রীতি ও পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, উপরোক্ত নীতি অনুসারে তাঁহার তাফসীরে তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ছাপ অবশ্যই থাকিবে, তাফসীর রিওয়ায়াতভিত্তিক হউক আর বুদ্ধিভিত্তিক হউক উভয় প্রকারের তাফসীরেই এই ছাপ সমভাবে পড়িবে ; এই ছাপ রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরের উপর আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান না হইলেও এই বিষয়টি চিন্তা করিলে উক্ত ছাপ তৎক্ষণাৎ দৃশ্যমান হইবে যে, রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীর বর্ণনাকারী ব্যক্তি বিশেষ কোন আয়াতের অধীনে শুধু সেই সকল রিওয়ায়াতকেই একত্র করেন যেইগুলিকে তিনি উক্ত আয়াতের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করেন। আর আপাতদৃষ্টিতে উক্ত রিওয়ায়াতসমূহের যেই অর্থ তাঁহার মানসপটে উদিত হইবে, তিনি উহা হইতে সেই অর্থই গ্রহণ করেন। আর ভাসাভাসা দৃষ্টি এই অর্থই তাঁহার সামনে পেশ করিবে। পরবর্তী সময়ে ধীরেসুস্থে তিনি সেই আয়াত এবং উহার অধীনে একত্রীকৃত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্যে যোগসূত্র ও সম্পর্ক স্থাপন করেন। যেইরূপ নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে তিনি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী উক্ত একত্রীকৃত রিওয়ায়াতসমূহকে গ্রহণ করিবার ও ইহাদের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবার ব্যাপারে অথবা সেইগুলি তাঁহার নিকট অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে সেইগুলিকে রদ করিবার ও উহাদের প্রতি মনোযোগ প্রদান না করিবার ব্যাপারে সমভাবে প্রভাবান্বিত হন। উক্ত নীতি অনুসারে মুফাস্সিরগণের মধ্যে, যেমন ইব্ন খালদূন আমাদের পূর্বোল্লিখিত উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এইরূপ রিওয়ায়াতসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, যেইগুলির প্রতি তাঁহাদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল এবং যেইগুলির প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ আদি সৃষ্টির বিবরণসমূহ এবং মানব জাতির ইতিহাসের আদি যুগে সংঘটিত ভয়াবহ বিপদ এবং ঘটনাবলীর বিস্তারিত কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এইরূপ কাহিনীগুলি ত্বরিতে গ্রহণ করিবার কারণ ছিল তাঁহাদের অজ্ঞতা, কিসসা-কাহিনীর স্বল্পতা। ফলে তাফসীর গ্রন্থাবলীতে ইসরাঈলী (য়াহূদী) রিওয়ায়াতসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এইসব রিওয়ায়াত ও ঘটনাবলীর বর্ণনায় প্রাথমিক যুগের মন-মানসিকতার ছাপ বিদ্যমান।

উপরোক্ত কারণেই আমরা বলিতে পারি যে, প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থেই, এমনকি রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও উহার রচয়িতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মন-মানসিকতার ছাপ অংকিত থাকে। বস্তুত তাফসীর-রচয়িতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মন-মানসিকতাই তাফসীর রচনার একটি স্বতন্ত্র ধারাকে প্রবর্তিত করিবার কারণ হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

আবার যখন রচিত তাফসীর গ্রন্থ রিওয়ায়াতভিত্তিক নহে তখন উহার উপর রচয়িতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও মন-মানসিকতার ছাপ অধিকতর স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হয়। ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করিয়াছি যে, তাফসীরকারের কৃষ্টি তাঁহার রচিত তাফসীরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়া থাকে। কেননা তাফসীরকারের কৃষ্টি ব্যক্তিগত ও তাঁহার জ্ঞানের প্রকৃতিই তো তাঁহার উদ্দেশ্যের গতিপথ, তাঁহার কার্যকলাপের সীমা নির্ধারিত করিয়া দেয়। সে ব্যক্তি কোনও আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অন্যগুলিকে ত্যাগ করত নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রয়োগ করে। আর তাহার উক্ত ব্যাখ্যাই অন্য সব ব্যাখ্যার উপর প্রাধান্য লাভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুত তাঁহার তাফসীর এইসব বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। অতঃপর তাঁহার তাফসীর বিপুলভাবে প্রচলিত, পঠিত ও সমাদৃত হইলে উহা দ্বারা স্বয়ং এই শাস্ত্রের ইতিহাস প্রভাবিত হইয়া পড়িবে এবং উহাদের ভিত্তিতে রচিত তাফ্সীরও প্রভাবিত হইবে, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাফসীরের সহিত তাফসীর রচনাকারীর নিজস্ব মানস প্রকৃতির পূর্বোল্লিখিত সংমিশ্রণের বিবেচনায় তাফসীর অনিবার্যভাবে সেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়- যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত তাফসীরকার কোন আয়াতের ব্যাখ্যা দানকালে জড়িত হইয়া পড়েন এবং তাফসীর রচনায় ইহাদের সাহায্য তিনি গ্রহণ করেন। অন্যদিকে তাফসীরের সহিত উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে ইহাদের সমৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে, যাহার প্রভাব এইসব শাস্ত্রের (علوم) ইতিহসের উপর পতিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন আরবী ব্যাকরণবিদ কুরআন মাজীদের উপর কারক-বিভক্তির সূত্র ও নিয়ামাবলী অনুযায়ী তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন এবং উহার ব্যাখ্যা অনুধাবনের জন্য উক্ত সূত্র ও নিয়ামাবলী হইতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তই সঠিক বলিয়া মনে করেন এবং উহার তাৎপর্যের সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর এইরূপে তিনি তাফসীরশাস্ত্রকে তাঁহার অধীনস্থ বিশেষ শাস্ত্রের রঙে রঞ্জিত করিয়া ফেলেন। অতঃপর তিনি ব্যাকরণশাস্ত্র ও ব্যাকরণশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত তাফসীরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এবং ব্যাকরণশাস্ত্রের জীবনের পটভূমির উপর উক্ত সংযোগ ও সম্পর্কের কতগুলি নিদর্শন রাখিয়া যান, যাহার ফলে এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রভাবিত হয় এবং এই শাস্ত্রের ইতিহাস জানিবার জন্য উক্ত নিদর্শনাবলীর অনুসন্ধান দরকার হইয়া পড়ে।

এইরূপে তাফসীরশাস্ত্র বিভিন্নরূপ মন-মানসিকতার রঙে রঞ্জিত হইয়া আসিয়াছে এবং বিভিন্ন তাফসীরকারের বিভিন্নরূপ কৃষ্টি ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থই স্বতন্ত্র রঙে রঞ্জিত হইয়াছে। আপনারা সম্ভবত জানেন যে, বিখ্যাত ইসলামী কালামশাস্ত্রবিদ আবুল-হাসান আল-আশ'আরী আল-মুখ্তাযান (المختزن) নামে খ্যাত তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ প্রতিটি আয়াত সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন—যাহাকে কোন বিদ'আতপন্থী স্বীয় ভ্রান্ত 'আকীদার স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছে এবং তিনি প্রথমে উক্ত আয়াত দ্বারা বিদ'আতী ব্যক্তির 'আকীদাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করিয়াছেন। অতঃপর উক্ত আয়াত দ্বারাই ন্যায়পন্থী আহ্লুস-সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের আকীদাকে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কি লোকেরা স্বীয় গ্রন্থের প্রশংসায় স্বয়ং আশ'আরীর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন; "এই গ্রন্থে বিরোধী মতাবলম্বীদের এইরূপ অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে যাহা কালামশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা কখনও এইগুলি সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্নও করেন নাই, এইগুলি তাহাদের গ্রন্থাবলীতে আলোচিত হইতেও দেখা যায় না, আর কখনও ইহাদের সম্বন্ধে তাহাদিগকে আমার প্রশ্ন করিবার খেয়ালও হয় নাই। কিন্তু আমি এই প্রশ্নাবলীর উত্তর আল্লাহ্ তা'আলার মদদে প্রদান করিয়াছি (ইব্ন 'আসাকির, তাব্য়ীন কিয্বিল-মুফ্তারী, দামিশ্ক সং, পৃ. ১৩৩; এইখানে শুধু সর্বনামগুলির স্থলে উহাদের বিশেষ্যগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে)। ..... আর ইমাম ফাখ্রু'দ-দীন রাযী তাঁহার তাফ্সীর গ্রন্থে যে বহু দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং তাঁহাদের অনুসারী কালামবিদদের বিপুল সংখ্যক উক্তির সমাবেশ ঘটাইয়াছেন, ফলে তাঁহার তাফসীরগ্রন্থ সম্বন্ধে যেই মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম আশ'আরী ও ইমাম রাযী কর্তৃক অনুসৃত তাফ্সীর রচনারীতিকে এবং অনুরূপ অন্যান্য তাফ্সীর রচনাকে

তাফ্সীর গ্রন্থে যেই সকল ভাষাগত ও যুক্তিগত কারণের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের আয়াতের বিভিন্ন অর্থ ও তাৎপর্যের একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দিয়াছেন, উহা উক্ত গ্রন্থে তৎকর্তৃক সংকলিত বর্ণনাভিত্তিক রিওয়ায়াতসমূহ অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক দ্বিতীয় তাফ্সীর গ্রন্থখানা (পাশ্চাত্যের) আবূ মুহাম্মাদ আবদুল-হাক্ক্ ইব্ন আবী বাক্র গালিব ইব্ন আতিয়্যা আল-গার্নাতী আল-আন্দালুসী (মৃ. ৫৪১ হি.) কর্তৃক রচিত। উহা আল-মুহার্‌রারুল-ওয়াজীয ফী তাফ্সীরিল-কিতাবিল-আযীয (المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز) নামে বিখ্যাত। স্পেনীয় উক্ত লেখক সম্বন্ধে ইব্ন খাল্দূন তাঁহার মুকাদ্দিমায় লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার তাফ্সীর গ্রন্থে রিওয়ায়াত ভিত্তিক সকল তাফ্সীর গ্রন্থের সারসংক্ষেপ সংকলন করিয়াছেন। তিনি রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রিওয়ায়াতসমূহের মধ্য হইতে শুধু বিশুদ্ধতম রিওয়ায়াতসমূহকেই গ্রহণ করত উহাদিগকে প্রশংসনীয় রচনাশৈলী ও বিন্যাসরীতিতে স্বীয় গ্রন্থে বিন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানা স্পেন ও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচলিত ও জনপ্রিয় রহিয়াছে।" উহা পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। পাণ্ডুলিপির কয়েকটি খণ্ড দারুল-কুতুবিল-মিসরিয়্যায় ও কুতুবখানা-ই তায়মূরিয়্যায় সংরক্ষিত রহিয়াছে (দ্র. ব্রক্লম্যান, ১খ., পৃ. ৪১২; তাক্লিমা, ১খ, পৃ. ৭৩২)। প্রথম লেখক উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করিয়াছেন। উহাতে আলোচ্য তাফ্সীর গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, লেখক কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া উহার ভাষাগত নজির উপস্থিত করিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিয়াছেন এবং স্বীয় ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে অহেতুক দীর্ঘ করেন নাই, ব্যাকরণগত বিষয়াবলীর আলোচনার প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন। তিনি উহাতে বিভিন্ন কিরাআতের আলোচনার প্রতি যতটুকু মনোযোগ দিয়াছেন, ওয়াকফ্ বা বিরতি সম্পর্কিত আলোচনার প্রতি তত মনোযোগ দেন নাই। তিনি বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্য হইতে শুধু বিশুদ্ধ হিসাবে খ্যাত রিওয়ায়াতসমূহকেই উহাতে স্থান দিয়াছেন। তিনি তাবারী হইতে রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু কখনও কখনও তাবারীর রিওয়ায়াতের সমালোচনাও করিয়াছেন।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক (তাফ্সীর মা'ছূর) তৃতীয় তাফ্সীর গ্রন্থখানা মিসরে রচিত। এই প্রসঙ্গে রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল হইতে মিসরের ভূমিকা বর্ণনা করা সমীচীন মনে হয়। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) বলিয়াছেন, মিসরে আলী ইব্ন আবী তাল্হা আল-হাশিমী কর্তৃক বর্ণিত একখানা তাফ্সীর গ্রন্থ (সাহীফা) রহিয়াছে। আলী ইব্ন আবী তাল্হা হইলেন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তাফ্সীর বর্ণনার একটি বিশ্বস্ত ও উৎকৃষ্ট মাধ্যম। যদি কোনও ব্যক্তি শুধু উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থের উদ্দেশে মিসর ভ্রমণ করেন, তবে উহা কোনও বিস্ময়ের ব্যাপার হইবে না। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সাহীহ্ গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তাফ্সীর বিষয়ক রিওয়ায়াতসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবার কালে উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থখানার উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছেন। সাহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইব্ন হাজার হইতে উক্ত তথ্যটি বর্ণিত হইয়াছে (আল-ইত্কান, ২খ., পৃ. ২২৩)। ইব্ন হাজার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "প্রকৃতপক্ষে আলী ইব্ন আবী তাল্হা সরাসরি নিজে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তাফ্সীর বর্ণনা করেন নাই, বরং তিনি শুধু মুজাহিদ অথবা সাঈদ ইব্ন জুবায়র-এর নিকট হইতে শুনিয়া উহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং যেহেতু তাঁহার রিওয়ায়াতের মাধ্যম ছিল নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত, বর্ণিত তাফ্সীর সরাসরি সেই কারণে ত্রুটিহীন বলিয়া বিবেচিত"।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক তৃতীয় তাফ্সীর গ্রন্থটি হইতেছে ইমাম জালালুদ-দীন আস-সুয়ূতী আল-মিস্রী (মৃ. ৯১১ হি.) রচিত আদ-দুর্‌রুল-মানছূর ফিত-তাফ্সীরিল-মা'ছূর (الدر المنثور فى التفسير بالماثور) নামীয় তাফ্সীর গ্রন্থ। উহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে উপরিউক্ত তিনখানা তাফ্সীর গ্রন্থের নামোল্লেখ এইজন্য করা হইয়াছে যে, উহারা রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর গ্রন্থ (তাফছীর মা'ছূর) এবং এই শ্রেণীর তাফ্সীরই তাফ্সীরশাস্ত্রের সকল শাখার মধ্যে সর্বপ্রথমে উদ্ভূত হয়। অবশ্য আমার ব্যক্তিগত অনুমান এই যে, হি. তৃতীয় শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে উপরিউক্ত শ্রেণীর তাফ্সীর গ্রন্থাবলীর মূল্য ও মর্যাদা এবং অবস্থার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। তাফ্সীরশাস্ত্রের ইতিহাস রচনাকারীদের দৃষ্টির সম্মুখে এই সকল পরিবর্তন স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়াছে।

(গ) তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতি

এই স্থলে তাফ্সীরশাস্ত্রের ইতিহাস অথবা উহার সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, বরং তাফ্সীরশাস্ত্র উহার দীর্ঘ যাত্রাপথে যেই সকল গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন, নিদর্শন ও মাইলফলক রাখিয়া আসিয়াছে, সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে আলোকপাত করা হইবে। কারণ যতদিন না আমরা উপরিউক্ত সুদীর্ঘকালে রচিত তাফ্সীরশাস্ত্র সম্পর্কিত সকল ইতিহাস গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, ততদিন পর্যন্ত আমরা সঠিক অর্থে তাফ্সীরশাস্ত্রের ইতিহাস রচনার কথা চিন্তা করিতে পারি না। উক্ত গ্রন্থসমূহের সংখ্যা এত অধিক ও বৃহৎ কলেবর এবং এত ব্যাপক ও বহুবিধ উদ্দেশ্যে সেইগুলি রচিত হইয়াছে যে, উহার বর্ণনা, ব্যাপকতা ও উহাদের রচয়িতাদের মহান মর্যাদার কথা পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত হই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হি. দ্বিতীয় শতাব্দীতে শায়খুল-মু'তাযিলা আমর ইব্ন উবায়দ (মৃ. ১৪৪/৭৬১), শাখয় আল-হাসান বাস্রী (২১-২১০/ ৬৪২-৭২৮) হইতে শ্রবণ করিয়া একখানা তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন (ইব্ন খাল্লিকান, মিসর, ১খ., পৃ. ৪৮৬)। তাফ্সীর বর্ণনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দুই মহান ব্যক্তিত্ব অধিকতর বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত।

ইমামুল-মুতাকাল্লিমীন আবুল-হাসান আল-আশ্আরী (২৬০-৩২৪/ ৮৭৪-৯৩৬) কিতাবুল-মুখ্তাযান (كتاب المختزن) নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্আতী ও বাতিলপন্থিগণ কুরআন মাজীদের যেই সকল আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করিত, উক্ত গ্রন্থে তিনি সেই সকল আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট আয়াত দ্বারা তাহারা যেই বিষয়টিকে প্রমাণিত করিতে চাহে, আয়াতের সহিত উহার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতকেই হকপন্থীদের আকীদা-বিশ্বাসের সপক্ষীয় প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত গ্রন্থের কিয়দংশ দেখিয়াছেন এবং

ইসলামী জীবনের সহিত কুরআন মাজীদের কত গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, মুসলমানগণ উক্ত পবিত্র গ্রন্থ হইতে ইসলামী বিধিবিধান ইত্যাদি জানিবার প্রতি কত গভীর মনোযোগ প্রদান করিত এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় সমস্যাবলী এই দিকে তাহাদিগকে কত কঠোরভাবে বাধ্য করিত এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি, তবে এইসব আমাদিগকে পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিবে যে, কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীরের পশ্চাতে আত্মনিয়োগ করা এবং প্রতিটি সূরা ও প্রতিটি আয়াতের পূর্ণ তাফ্‌সীর রচনা করার অভ্যাস ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। আমি এই অভিমত সঠিক বলিয়া মনে করি না যে, এইরূপ বিন্যস্তভাবে তাফ্‌সীর বর্ণনার ধারা অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছিল। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে লোকেরা এইরূপ বিন্যস্ত পদ্ধতিতে তাফ্‌সীর রচনার কার্য আরম্ভ করিয়াছিল। দুহা'ল ইসলাম (২খ.,পৃ. ১৪১) গ্রন্থের লেখক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আল-ফার্‌রা' (মৃ. ২০৭ হি.)-কেই আলোচ্য রীতিতে তাফসীর বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি মনে করা উচিত। সর্বপ্রথমে তিনিই কুরআন মাজীদে অনুসৃত বিন্যাস রীতি মুতাবিক পরম্পরাগতভাবে প্রতিটি আয়াতের তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন। এই তথ্য তিনি ইবনুন-নাদীম-এর ফিহরিস্‌ত গ্রন্থের একটি স্পষ্ট বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। আল-ফার্‌রা'-র মা'আনি'ল-কুরআন গ্রন্থখানা আমাদের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাতে আয়াতসমূহকে কুরআন মাজীদের সূরাগুলিতে ইহার বিন্যাস অনুসারেই বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এই দিক দিয়া আবূ 'উবায়দা' (মৃ. ২০৯ হি. অথবা উহার কাছাকাছি) রচিত মাজায়ু'ল-কুরআন গ্রন্থের সহিত উহার মিল রহিয়াছে; কারণ উহাতেও সূরাগুলিকে কুরআন মাজীদে অনুসৃত বিন্যাসরীতি মুতাবিক গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর প্রতিটি সূরার যে সকল আয়াত রূপকার্থবোধক হওয়ায় উহাদের ব্যাখ্যা প্রদান করা প্রয়োজন, সেইগুলির ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব ফার্‌রা'-ই ছিলেন আলোচ্য বিন্যাস রীতিতে তাফ্‌সীর রচনাকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি, একথা সঠিক নহে, বরং অনুমিত হয় যে, সেই যুগে তাফ্‌সীর রচনার আলোচ্য রীতিই প্রচলিত ছিল। যদি আলোচ্য যুগের পূর্ববর্তী যুগে রচিত কোনও তাফ্‌সীর গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইত, তবে উহা দ্বারা প্রমাণ করা যাইত যে, কুরআন মাজীদে আয়াতসমূহ যেরূপে বিন্যস্ত সেইরূপে বিন্যস্ত রাখিয়া তাফ্‌সীর রচনা করিবার রীতি ফার্‌রা ও আবূ উবায়্‌দার যুগের পূর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া আসিয়াছিল। তাফ্‌সীর রচনার এই ধারা প্রথম যুগ হইতেই সাধারণভাবে প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল।

অতঃপর এমন যুগের সূচনা হয়, যখন তাফ্‌সীর রচয়িতাগণ কুরআন মাজীদের বিশেষ বিষয়ে তাফ্‌সীর রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তাঁহারা একটি নির্দিষ্ট বিষয় বাছিয়া লইয়া উহাকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থান হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইতেন। যেমন আমাদের সম্মুখে আল-জাস্‌সাস (মৃ. ৩৭০ হি.)-এর তাফ্‌সীর গ্রন্থ আহআমুল-কুরআন রহিয়াছে। উক্ত তাফ্‌সীর গ্রন্থের মূল লক্ষ্য হইতেছে কুরআন মাজীদ হইতে ফিক্‌হ্‌শাস্ত্র বিষয়ক বিধানগুলি বাহির করিয়া দেখান। তিনি উহাকে রচনার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে রাখেন, তৎসত্ত্বেও সূরা ও আয়াতসমূহকে উল্লেখ করিবার ক্ষেত্রে প্রাচীন বিন্যাস-পদ্ধতি অনুসরণ করেন। পরবর্তী যুগে এইরূপ তাফসীরকারদের আবির্ভাব ঘটে, যদিও তাঁদের সংখ্যা ছিল অল্প, যাঁহারা কুরআন মাজীদের সহিত সম্পর্কিত কোন একটি বিষয়কে বাছিয়া লইয়া তৎসম্পর্কিত আয়াতসমূহকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থান হইতে চয়ন করিয়া সংকলিত করেন। এইরূপ একটি তাফ্‌সীর গ্রন্থ হইল শামসু'দ-দীন ইব্‌নুল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১ হি.) রচিত আত-তিব্‌য়ান ফী আক্‌সামি'ল- কুরআন। উহাতে লেখকদের উদ্দেশ্য হইতেছে একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা। আর সেই বিশেষ বিষয়টি হইতেছে কুরআন মাজীদে উল্লিখিত বিভিন্ন রকমের কসম বা শপথ। উক্ত গ্রন্থে তিনি কুরআন মাজীদে বিভিন্নরূপ "কসম" ব্যবহৃত হওয়া সম্পর্কিত সাধারণ মতবাদসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে উহাতে তিনি বিভিন্নরূপ কসমের পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করেন নাই। আর এইগুলির সমাধান বিরোধী তাফসীরের প্রেক্ষিতেও প্রদান করেন নাই যেই পদ্ধতিতে কুরআন মাজীদের একাংশের সাহায্যে অন্য অংশের ব্যাখ্যা উদ্ধার করা যায়। যদি তিনি উক্ত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতেন, তবে উহার বিভিন্ন নজীর ও দৃষ্টান্তের পারস্পরিক তুলনা ও উহার সাহায্যে উহাদের অর্থ উদ্ধাদের পদ্ধতিতে কসমসমূহের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের নীতির একটি বিশেষ মতবাদ গড়িয়া উঠিত এইভাবে যে, কসম সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে ইহার সবগুলি আয়াতকে একত্র করিয়া সামগ্রিকভাবে উহাদের সকলের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। তিনি এই বিষয়ে সামান্য যাহা করিয়াছেন, তাহাও ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে করিয়াছেন। আর উহা সন্তোষজনক নহে।... কুরআন মাজীদের সূরাসমূহ ও আয়াতসমূহ উহাতে যেইরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে, সেইরূপে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে উহাদের মধ্য হইতে যেই সকল আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করা প্রয়োজন, সেই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। তাফ্‌সীর বর্ণনার আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উহা ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা রহিল।

তাফ্‌সীর বর্ণনার আধুনিক পদ্ধতি ঃ প্রাচীন যুগের মুসলিম মনীষিগণ ক্রমোন্নতির দিক দিয়া ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (ক) এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাহা অত্যন্ত পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে এবং প্রোজ্জ্বল ঃ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র (نحو) এবং ফিকহ্‌ বিষয় মূলনীতি শাস্ত্র (اصول فقه) উক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; (খ) এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাহা অত্যন্ত পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে কিন্তু প্রোজ্জ্বল নহে, যেমন ঃ ফিক্‌হ্‌শাস্ত্র ও হাদীছ শাস্ত্র ; (গ) এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, যাহা পরিপক্কতাও লাভ করে নাই আর প্রোজ্জ্বলও নহে ঃ অলংকারশাস্ত্র (علم البيان) এবং তাফসীরশাস্ত্র ...। আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছা আমি যেন মিসরের প্রথম ফুআদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য অনুষদের অধীনে সর্বপ্রথমে শেষোক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের সেবার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হই। ... 'উক্ত শাস্ত্রদ্বয় এখনও পরিপক্কতা লাভ করে নাই'– প্রাচীন যুগের মুসলিম মনীষিগণের এই মন্তব্যই উক্ত শাস্ত্রদ্বয়কে পরিপক্কতা প্রদান ও উহাদের বিকাশ সাধনের নিমিত্ত নবপর্যায়ে প্রচেষ্টা চালাইবার স্পষ্ট অনুমতি প্রদানেরই নামান্তর। নবপর্যায়ে এই প্রচেষ্টা চালাইবার উদ্দেশ্যে আমি কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। আর এতদ্বিষয়ে নিজের জন্য আমি এই নীতি গ্রহণ করিয়াছি ঃ প্রচেষ্টার প্রথম মানযিল এই যে, উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের প্রাচীন স্বরূপকে সম্যকরূপে জানিতে হইবে।" আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছায় নবায়নের এই প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা সর্বপ্রথমে আরবী ইসলামী বিশ্বকোষে বালাগাত (بلاغة) শিরোনামের অধীনে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ইসলামী বিশ্বকোষে প্রথমবারের এই নূতন প্রচেষ্টার মূলনীতিসমূহ তাফ্‌সীর নিবন্ধের অধীনে নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে ঃ

(১) কুরআন মাজীদ আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম উচ্চাঙ্গ গ্রন্থ। বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, উহার অধীনে একথাও আসিয়া গিয়াছে যে, প্রত্যেক তাফ্‌সীরকারের তাফ্‌সীর রচনার পশ্চাতে একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। তাফ্‌সীরকার উক্ত লক্ষ্য ও

বর্ণনাকারী ছিলেন না। এমন কি একদল সমালোচক তাঁহার বিরুদ্ধে হাদীছ জাল করিবার অভিযোগও উত্থাপন করিয়াছেন..... (আত-তায্হীব, পৃ. ৩০৬; আল-ইত্কান, পূর্বোক্ত স্থান)।

মুহাম্মাদ ইব্ন মার্ওয়ান আস-সুদ্দী আস-সাগীর (السدى الصغير), যিনি পূর্বোক্ত মুহাম্মাদ ইব্নুল কাল্বী হইতে তাফ্সীর বর্ণনা করিয়াছেন, সম্বন্ধে সমালোচকগণ ধারণা করেন যে, তিনি হাদীছ জাল করিতেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীছ বাজে ও পরিত্যক্ত এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীছের সনদ সূত্রপরম্পরা নিম্নোক্তরূপ হইলে সনদটি মিথ্যা বলিয়া মনে করিতে হইবে ঃ "সুদ্দী আস-সাগ্রী বর্ণনা করিয়াছেন কাল্বী হইতে, তিনি ইব্ন সালিহ্ হইতে, তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে" (আল-ইত্কান, পূর্বোক্ত স্থান; আত-তায্হীব ও উহার পাদটীকা, পৃ. ৩৩১)।

প্রসিদ্ধ তাফসীর বর্ণনাকারী মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান আল-আয্দী আল-খুরাসানী (مقاتل بن سليمان الازدى الخراسانى-মৃ. ১৫০ হি.) সম্বন্ধে ইমাম আশ-শাফি'ঈ (র) বলেন যে, তাফ্সীরশাস্ত্রের জনগণ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। এতদ্সত্ত্বেও তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি মুজাহিদ হইতে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে মুজাহিদ হইতে কিছুই শুনেন নাই। এইরূপে তিনি আদ-দাহ্হাক (الضحاك) হইতে তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নিকট হইতেও কিছুই শোনেন নাই। কারণ তাঁহার জন্মের চারি বৎসর পূর্বে দাহ্হাক ইন্তিকাল করেন। কতিপয় সমালোচক তাঁহাকে মিথ্যা বর্ণনাকারী বলিয়াছেন এবং যাঁহারা তাঁহার বর্ণিত তাফ্সীরকে উত্তম ও গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগকে দুর্বল সমালোচক বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। সমালাচকগণ আরও বলেন, "তাঁহার বর্ণিত তাফ্সীর কতই না উত্তম, তবে তিনি যদি একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীও হইতন!!!" তাঁহার সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি য়াহূদীদের নিকট হইতে তাহাদের ধর্মীয় কিতাবের জ্ঞান অর্জন করিতেন (আল-ইত্কান, পূর্বোক্ত স্থান দ্র.)।

সর্বশেষে আবূ খালিদ আবদুল-মালিক ইব্ন আবদিল-আযীয ইব্ন জুরায়জ-এর কথা ধরা যাক। যাঁহারা সর্বপ্রথম পবিত্র হাদীছকে গ্রন্থাকারে সংকলিত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বহু আয়াতের তাফ্সীর বিষয়ক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্সত্ত্বেও কোনও কোনও সমালোচক তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি তাফ্সীরের ক্ষেত্রে শুধু সাহীহ রিওয়ায়াত বর্ণনা করিতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন না, বরং তিনি বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে যেই সকল রিওয়ায়াত লাভ করিয়াছেন সত্যাসত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করিয়া তাহাই সংকলিত করিয়াছেন।

রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা আরও অনেকে করিয়াছেন। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর তথাকথিত একটি বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছেন, তিনটি বিষয়ের কোনও সন্দেহাতীত সনদ নাই ঃ (ক) তাফ্সীর, (খ) যুদ্ধ-বিগ্রহ ও (গ) গাযওয়াহ্ বিষয়ক অনেক রিওয়ায়াত। কারণ অধিকাংশ সনদই হইতেছে বিচ্ছিন্ন (ইব্ন তায়মিয়া, মুকাদ্দিমা ফী উসূলিত-তাফ্সীর, দামিশকে মুদ্রিত, পৃ. ১৪)। ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) কয়েকজন চিহ্নিত ব্যক্তি কর্তৃক হাদীছ জাল করিবার ইতিহাস বর্ণনা করিবার পর লিখিয়াছেন, তাফ্সীরশাস্ত্রেও জাল হাদীছের অংশ বর্তমান রহিয়াছে।

উপরোদ্ধৃত বিরূপ সমালোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তাফ্সীর বিষয়ক সকল রিওয়ায়াতই দৃঢ় সনদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তবে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ এই জাতীয় রিওয়ায়াতসমূহ স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। পূর্ব যুগীয় সমালোচকদের মন্তব্য আমরা জানিয়াছি। তাই আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য লেখক Carra de Vaux-এর নিম্নোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, পরবর্তী যুগীয় সমালোচকগণ তাফ্সীরশাস্ত্রের সমালোচনার ক্ষেত্রে নূতন কোনও অবদান সংযোজন করিয়াছেন। Carra de Vaux বর্ণনা করিয়াছেন, "আধুনিক যুগের সমালোচকগণ (যেমন প্রাচ্যবিদ গোল্ডযিহার, লামেন্স্ প্রমুখ সমালোচক) বৃহদায়তন হাদীছ গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত তাফ্সীর বিষয়ক হাদীছসমূহের প্রামাণিকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এই পর্যন্ত এইরূপ কোনও অভিমত প্রাপ্ত হন নাই, যদ্দারা উক্ত হাদীছসমূহের বিশুদ্ধতা অধিক পরিমাণে সমর্থিত হয়।" ইসলাম-বিদ্বেষীরূপে পরিণত উপরিউক্ত সমালোকদের বর্ণনায় কোনও নূতন তথ্য নাই। কেননা আমাদের আলোচনা দ্বারা পরিষ্কাররূপে জানা গিয়াছে যে, তাফ্সীর বিষয়ক হাদীছসমূহের বিরূপ সমালোচনা পূর্ব যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

তাফ্সীর গ্রন্থসমূহে কিছু সংখ্যক ভিত্তিহীন রিওয়ায়াত বর্ণিত হইবার পশ্চাতে আরেকটি বিষয় সক্রিয় ছিল। উহা এই যে, যেই সকল ধর্মীয় কাহিনী বিজিত দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বর্ণিত হইয়া মুসলিম সমাজে পৌঁছিয়াছিল, ইসলামী রিওয়ায়াতসমূহ উহা দ্বারাও প্রভাবিত হইতেছিল। য়াহূদী সম্প্রদায় মিসর হইতে ফিলিস্তীনে চলিয়া আসিবার কালে উহার দীর্ঘ মিসরীয় জীবনের ঐতিহ্য, আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরাট অংশ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। ফিলিস্তীন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর তাহারা বন্দীদশায় আরও পূর্বদিকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়। অতঃপর বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর যখন তাহারা পুনরায় ফিলিসতীনে ফিরিয়া গেল, তখন তাহাদের সংগ্রহ-ভাণ্ডারের মিসর ও ব্যাবিলনের জ্ঞানভাণ্ডার ও কুসংস্কারসমূহ হইতে বহু কিংবদন্তী ও ভিত্তিহীন কাহিনীও সঞ্চিত হইয়াছিল। ইসলামী আরবীয় জ্ঞানভাণ্ডারে উপরোক্ত য়াহূদী রিওয়ায়াতসমূহের কিয়ৎ পরিমাণ প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল।

এতদ্ব্যতীত আরব উপদ্বীপে য়াহূদী ব্যতীত অন্য যেই সকল জাতি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারাও তাহাদের ধর্মীয় কাহিনী ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান নিজেদের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল এবং উহা সোৎসাহে সারা দেশে ছড়াইয়া দিয়াছিল। আরব উপদ্বীপের অধিবাসী মুসলিমগণ, যাঁহারা কুরআন মাজীদের অধ্যয়নকারী ও উহার অর্থ অনুধাবনকারী ছিলেন, বিজয়-অভিযাত্রী হিসাবে উক্ত উপদ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পৌঁছিবার পূর্বেই উক্ত রিওয়ায়াতসমূহ সম্বন্ধে অবগত হইয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহারা আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়া অন্যান্য দেশে পৌঁছিলেন এবং সেই সকল দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে বসবাস করিতে লাগিলেন তখন তাহারা স্থানীয় রিওয়ায়াত ও ধ্যান-ধারণাসমূহ সম্পর্কেও অবহিত হইলেন। এই সকল বিজাতীয় লোক-কাহিনী ও রিওয়ায়াতের মধ্য হইতে য়াহূদী রিওয়ায়াত ও লোকাচারসমূহই সর্বাধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কারণ প্রথমত, তাহাদের সংখ্যা ছিল অধিক; দ্বিতীয়ত, তাহাদের কার্যাবলী ছিল সুস্পষ্ট। এই কারণেই রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীরে (তাফ্সীর মাছূর) য়াহূদী সূত্র হইতে যেই সকল

যেইরূপে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থকে বিভিন্ন অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হইয়া থাকে, কুরআন মাজীদকে সেইরূপেও বিভক্ত ও বিন্যস্ত করা হয় নাই। যেমন কোন কোন ধর্মীয় গ্রন্থে জীবনের বিভিন্ন ঘটনার ভিত্তিতে অধ্যায়গুলি কায়েম করা হয় ও প্রতিটি অধ্যায়ের শিরোনাম একেকটি ঘটনা দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে অথবা উহাতে কোনও ব্যক্তির জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনায় উহার একেকটি অংশকে একেকটি ঘটনার বর্ণনার জন্য নির্ধারিত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতসমূহ উহাদের নাযিল হইবার কালপরম্পরা অনুযায়ী বিন্যস্ত নহে।

উহার বিপরীতে কুরআন মাজীদের নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র বিন্যাস-পদ্ধতি রহিয়াছে। কুরআন মাজীদে বহু সংখ্যক বিষয়বস্তু আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু একটি বিষয়বস্তুও এইরূপ নহে যে, তৎসম্পর্কিত যাবতীয় বক্তব্যকে উহার নির্দিষ্ট একটি স্থানে একত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুরআন মাজীদ প্রতিটি আলোচ্য বিষয়কে উহার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে। সকল শারী'আতী আইন-কানুন তথা ফিক্‌হী বিধিবিধান উহার এক স্থানে নহে, বরং বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে মৌলিক 'আকীদাসমূহ একাধিক স্থানে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ একই কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত দেখা যায়। ফলে পাঠক একই সূরায় বিভিন্নরূপ উদ্দেশ্য সম্বলিত বিভিন্ন বক্তব্য এবং বিভিন্ন সূরায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্বলিত একই কাহিনী বর্ণিত দেখিতে পায়। আর এক স্থানে বর্ণিত বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য অন্য স্থানে বর্ণিত একই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যের পরিপূরক হইয়া থাকে। যদি বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিভিন্ন বিবরণকে একত্র করত উহাদের উদ্দেশ্যাবলীর পারস্পরিক তুলনা করা হয়, তবে উহাতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সমগ্র অংশের ধারণা মানসপটে সম্পূর্ণরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। বস্তুত কুরআন মাজীদের বর্ণনারীতি ও উপস্থাপনা পদ্ধতি এক বিশেষ তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যের অধীন। কুরআন মাজীদের অধ্যয়নের আলোচনা প্রসঙ্গে যে স্থানে উহার সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে, সেখানে উক্ত বিষয় আলোচিত হইবে।

কুরআন মাজীদের নিজস্ব বিন্যাস পদ্ধতি উহার তাফসীরের পদ্ধতিকে এবং উহার অর্থ ও উদ্দেশ্যাবলী বুঝিবার প্রয়োজন চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রকে কিরূপে প্রভাবিত করে, এই স্থলে আমরা শুধু সে বিষয়েই আলোচনা করিব। চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, সূরা ও আয়াতসমূহ কুরআন মাজীদে যেইরূপে বিন্যস্ত রহিয়াছে, উহাদিগকে সেইরূপে গ্রহণ করিয়া তাফসীর বর্ণনা করিলে কুরআন মাজীদকে সূক্ষ্মভাবে বুঝাও যাইতে পারে না আর উহার অর্থ ও উদ্দেশ্যাবলী সঠিকরূপে স্পষ্টও হইতে পারে না। কুরআন মাজীদের অর্থ ও উদ্দেশ্যাবলী সঠিকরূপে উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি এই যে, তাফসীরকার উহাতে বর্ণিত একটি বিষয়বস্তুতে থামিয়া তৎসম্বন্ধে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে যাহা যাহা বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে একত্র করত উহাদিগকে পরস্পরের সহিত মিলাইয়া এবং তুলনা করিয়া দেখিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সূরা বাকারাতে প্রথম দিকেই মু'মিনগণ ও তাঁহাদের পরিচয়ের বর্ণনা পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার ধারণামতে এই পরিচয়ের সঠিক জ্ঞান একমাত্র তখনই অর্জিত হইতে পারে যখন সূরা মু'মিনূনে বিবৃত তাহাদের পরিচয়কে সূরা বাকারাতে বিধৃত পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া দেখা হইবে। উহার পরে উহাতে মুনাফিকগণের অবস্থা ও পরিচয় বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের পরিচয়কেও যথাযথভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝা যাইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সূরা মুনাফিকূনে বিধৃত তাহাদের পরিচয়কে সূরা বাকারাতে বিধৃত তাহাদের পরিচয়ের সহিত মিলাইয়া দেখা হইবে। এইরূপে সূরা বাকারাতে বিধৃত আদাম (আ)-এর ঘটনার তাফসীর একমাত্র তখনই বুঝা যাইতে পারে যখন সূরা আ'রাফ, সূরা হিজর, সূরা কাহ্‌ফ প্রভৃতি সূরায় বিধৃত তৎসম্পর্কিত ঘটনাকে উহার সহিত মিলাইয়া দেখা হইবে।

চিন্তা করিলে এ কথা আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে সকল বিধান একই বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও উহারা একই সময়ে নাযিল না হইয়া বরং বিভিন্ন সময় নাযিল হইয়াছে; উহাদের অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিক ও সূক্ষ্মরূপে বুঝা একমাত্র তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন উহাদের কোন্‌টি পূর্বে নাযিলকৃত এবং কোন্‌টি পরে নাযিলকৃত, তাহা ভালরূপে জানিয়া ও বুঝিয়া লওয়া হইবে, বিশেষত যখন উক্তরূপ বিধানাবলী নাযিল হইবার কালের মধ্যে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতের নাযিল হইবার কালের ন্যায় অধিক ব্যবধান, যাহার পরিমাণ এমনকি কয়েক বৎসরও হইতে পারে, থাকে, তখন উহাদের কোনটি পূর্বে এবং কোন্‌টি পরে নাযিল হইয়াছে তাহা জানা ও বুঝা অধিকতর প্রয়োজনীয়। আর উক্তরূপ বিধানাবলীর অর্থ ও ব্যাখ্যা যেই সকল অবস্থা, ঘটনা, কারণ ও সম্পর্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, উহাদিগকে জানা ও বুঝাও তাফসীরকারের জন্য জরুরী। কারণ উক্ত প্রেক্ষাপট, ঘটনা, কারণ ও সম্পর্ক হইতেছে এইরূপ আলোকবর্তিকা যাহাদের সহায়তা ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের অর্থ ও উহাতে বিধৃত বিধানাবলীকে সঠিকরূপে বুঝা সম্ভব নহে।

কুরআন মাজীদের সূরা ও আয়াতসমূহের নাযিল হইবার কালপরম্পরা অনুযায়ী উহাদিগকে উহাতে বিন্যস্ত করা হয় নাই। মাক্কী আয়াতসমূহের মধ্যে মাদানী আয়াতসমূহ আসিয়া গিয়াছে এবং মাদানী আয়াতসমূহ উহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, এইরূপ দেখা যায়। আবার মাদানী আয়াতসমূহের মধ্যে মাক্কী আয়াতসমূহ যাহা মাদানী আয়াতসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এইরূপও দেখা যায়। ফলে কুরআন মাজীদের সূরাসমূহের বিন্যাস অর্থাৎ কুরআন মাজীদের বিভিন্নরূপ অনুলিপিতে অনুসৃত বিভিন্ন যে কোনও বিন্যাস উহার অর্থ বুঝিতে কোনও ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে পারে না, বরং সঠিকভাবে উহার অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝিবার জন্য জরুরী হইতেছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নির্দিষ্ট বিশেষ কোনও বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থান হইতে চয়ন করা ও উহাদিগকে এইরূপ বিশেষভাবে বিন্যস্ত করা, যাহাতে সঠিক তাফসীর বর্ণনার জন্য যে সকল দিক ও বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা তাফসীরকারের জন্য জরুরী বলিয়া ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে, সে সকল দিক ও বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হইয়া প্রতিভাত হয়। বস্তুত উক্ত পদ্ধতিতেই কুরআন মাজীদের সঠিক ও সূক্ষ্ম মর্ম উপলব্ধি করা তাফসীরকারের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে।

সারকথা এই যে, কুরআন মাজীদে উহার সূরা ও আয়াতসমূহের বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ভিত্তিক বিন্যাসরীতি আদৌ অনুসৃত হয় নাই এবং উহাতে সূরা ও আয়াতসমূহের নাযিল হইবার কালপরম্পরা অনুযায়ী উহাদিগকে বিন্যস্ত করিবার রীতিও অনুসৃত হয় নাই। উহাতে একই বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে উহাদের পারিপার্শ্বিকতা ও পূর্বাপর সম্পর্ক বিভিন্নরূপ দেখা যায়। উক্ত অবস্থাবলীর দাবি এই যে, কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর উহাতে বিধৃত বিষয়াবলীর ভিত্তিতে করা উচিত। এতদুদ্দেশ্যে উহাতে বিধৃত বিষয়াবলীর মধ্য হইতে নির্দিষ্ট কোনও বিষয়বস্তুকে বাছিয়া লইয়া তৎসম্পর্কিত সকল আয়াতকে বিভিন্ন স্থান

অর্থাৎ গঠনশাস্ত্র এবং যেই শাস্ত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছসমূহকে উহাদের শব্দাবলী ও সনদসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যাচাই-বাছাই ও পর্যালোচনা করা হইবে, উহার নাম ইলমুল-হাদীছ ও উসূলুল-হাদীছ। যেই জ্ঞান-শাখায় কুরআন মাজীদের মর্মার্থ ও তাৎপর্যসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে উহার নাম ইল্মুত-তাফ্সীর।" এই পন্থায় তাঁহারা শার'ঈ ইল্মের (ধর্মশাস্ত্রের) সকল শাখাকে পৃথক সংজ্ঞাধীন করিয়াছেন (শায়খুল-ইসলাম আহ্মাদ ইব্ন য়াহ্য়া ইব্নুল-হাফীদ, কায়রো ১৩২২ হি., পৃ. ২)।

তাফ্সীরের আলোচনায় তা'বীল (تاويل) শব্দও উল্লিখিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে তাফ্সীর ও তা'বীল শব্দদ্বয় সমার্থবোধক। আবার কেহ কেহ বলেন, তাফ্সীর শব্দটি তা'বীল শব্দ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক অর্থবোধক। বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এতদ্সম্পর্কে আরও কতগুলি অভিমত প্রচলিত রহিয়াছে। তবে এই স্থলে আমি এতদ্সম্পর্কিত আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করিব না। আমার ধারণা এই যে, তাফ্সীর প্রসঙ্গে তা'বীলের উল্লেখ এই কারণে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে যে, স্বয়ং কুরআন মাজীদেই তা'বীল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উসূলশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ উহার জন্য একটি বিশেষ পরিভাষা নির্ধারিত করিয়াছেন। এতদ্সহ বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী লেখক ও দার্শনিকগণের মধ্যে মুতাকাল্লিমূন বা যুক্তিবাদী মুসলিম ধর্মবেত্তাগণ তা'বীল শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমার ধারণামতে আল্লামা রাগিব আল-ইস্ফাহানী তাঁহার মুকাদ্দিমাতু তাফ্সীর পুস্তিকায় হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় তা'বীল শব্দের যেই অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাই সঠিক। উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইস্ফাহানীর উক্ত পুস্তিকাটি তান্যীহুল কুরআন আনিল-মাতাইন (تنزيه القران عن المطاعن) গ্রন্থের সহিত সংযোজিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে (রিসালাতুর-রাগিব, আল-আয্হারিয়্যা ১৩২৯ হি., পৃ. ৪২)। ইমাম ইব্ন তায়্মিয়া তাঁহার আল-ইকলীল ফিল-মুতাশাবিহ ওয়াত-তা'বীল (الاكليل فى المتشابه والتاويل) গ্রন্থে আল্লামা ইস্ফাহানীর উক্ত পুস্তিকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন (ইমাম ইব্ন তায়্মিয়া-র উক্ত গ্রন্থ তাঁহার "মাজ্মূ'আতুর-রাসাইলিল-কুব্রা" নামীয় সংকলন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৩২৩ হি. আল-মাত্বাআতুশ-শার্কিয়্যায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে)। অবশ্য আমি উক্ত গ্রন্থের কোথাও আল্লামা ইস্ফাহানী কর্তৃক বর্ণিত তা'বীল শব্দের ইহাই ব্যাখ্যা–এইরূপ কোনও ইঙ্গিত দেখিতে পাই নাই। তবে এই কথা সত্য যে, তা'বীল শব্দের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত ইমাম ইব্ন তায়্মিয়া (র)-এর চিন্তাধারার মূল কথা এতদ্সম্পর্কিত আল্লামা ইস্ফাহানীর চিন্তাধারার মূল কথারই অনুরূপ।

এই স্থানে তাফসীর ও তা'বীল-এর পার্থক্য সম্পর্কে ইমাম আবূ মানসূর আল-মাতুরীদীর অভিমত উল্লেখ্য। তাঁহার মতে আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়ে সঠিক বর্ণনা হইল-তাফ্সীর ও লেখকের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে প্রদত্ত ব্যাখ্যা হইল তা'বীল (দ্র. তা'বীলাত আহলিস-সুন্নাহ, মুকাদ্দিমা)। তাঁহার এই অভিমত পরবর্তী অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সংকলিত আল-কুরআনের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহকে তা'বীল নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন।

(খ) তাফ্সীরশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

ইব্ন খাল্দূন তাঁহার মুকাদ্দিমায় তাফ্সীর সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে লিখিয়াছেন, "কুরআন মাজীদ আরবী ভাষায় নাযিল হইয়াছে এবং আরববাসীদের বালাগাত বা অলংকারশাস্ত্রের সৌকর্য রীতিই উহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কারণে সকল আরববাসীই কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝিত এবং উহাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও বাক্যসমূহের অর্থ ও তাৎপর্য তাহাদের নিকট স্পষ্ট ছিল।" সকল আরববাসীই কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝিত–এ কথাটিতে অত্যন্ত ব্যাপকতা রহিয়াছে। এইজন্যই পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞগণও ইব্ন খাল্দূনের (৭৩২-৮৪/১৩৩২-৮২) উক্ত অভিমতের সহিত একমত নহেন। ইব্ন খাল্দূনের কয়েক শতাব্দী পূর্ববর্তী ইব্ন কুতায়্বা-র (৩য়/৯ম শতাব্দী) কথাই ধরা যাক। তিনি তাঁহার আল-মাসাইলু ওয়াল-আজ্বিয়া (المسائل والاجوبة) গ্রন্থে (পৃ. ৮) বলেন, "কুরআন মাজীদের সকল গারীব (স্বল্প প্রচলিত শব্দ বা বাক্য) মুতাশাবিহ্ (রূপকার্থবোধক অথবা অনিশ্চিতার্থবোধক শব্দ বা বাক্য)–এর অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে সকল আরববাসী সমান নহে, বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে তাহাদের একজন অন্যজন অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী।" স্বয়ং ইব্ন খাল্দূন তাঁহার পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের অল্প পরে যেই মন্তব্য করিয়াছেন উহা দ্বারাও বুঝা যায় যে, তিনিও কুরআন মাজীদের অর্থ বুঝিবার ক্ষেত্রে আরবদের যোগ্যতার পার্থক্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেন, কুরআন মাজীদের কতকগুলি স্থানে অর্থ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়া থাকে।" তিনি আরও বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিশদ করিয়া দিতেন, সাহাবীদিগকে নাসিখ (রহিতকারী) ও মান্সূখ (রহিত) বিধানের পার্থক্য বলিয়া দিতেন এবং ইহার ফলে সাহাবীগণ সংশ্লিষ্ট আয়াতের মর্ম বুঝিতে পারিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী জানিবার ফলে সাহাবীগণ বিভিন্ন আয়াত নাযিল হইবার কারণ ও উপলক্ষ সম্বন্ধে এবং নাযিল হইবার উপলক্ষ ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে নির্ধারণযোগ্য বিভিন্ন আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্যক্রূপে অবগত হইতেন।" উপরোক্ত বিষয়াবলীসহ অন্যান্য কারণে, যাহা ব্যাখ্যাযোগ্য বটে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতেই কুরআন মাজীদের তাফ্সীর ও ব্যাখ্যা বর্ণনার প্রয়োজন দেখা দেয়।

আলোচ্য যুগে দীনের প্রতি মুসলিম জনগণের অধিক গুরুত্ব প্রদান, তাহাদের বোধশক্তির বিকাশের স্তর, জীবনের প্রয়োজনাদির সীমাবদ্ধতা এবং এতদ্সহ তাহাদের এই উপলব্ধি যে, তাফ্সীর বর্ণনা করা প্রকৃতপক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদান করিবারই নামান্তর যে, আল্লাহ্ তা'আলার এই কালামের অর্থ ও তাৎপর্য ইহাই, এই সকল কারণ নিজ বুদ্ধির ভিত্তিতে নহে, বরং শুধু রাসূলুল্লাহ (স), সাহাবীগণ ও তাবিঈগণের নিকট হইতে বর্ণিত বাণীর ভিত্তিতেই তাফ্সীর বর্ণনা করিতে লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। এই কারণেই দেখা যায় যে, তাফ্সীর হিসাবে যাহা সর্বপ্রথম লোকসমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল উহা ছিল রিওয়ায়াত বা সূত্র-পরম্পরায় বর্ণনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাফ্সীর। উক্তরূপ তাফ্সীর তাফ্সীরুল-মা'ছূর (تفسير الماثور) বা তাফ্সীর আছারী নামে অভিহিত হইয়াছে। সর্বপ্রথম প্রকাশিত তাফ্সীর রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফ্সীর ছিল বলিয়াই হাদীছবিশারদ উলামা-ই কিরামকেই তাফ্সীর বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হইতে দেখা যায়। উহার ভিত্তিতে আমরা দেখিতে পাই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসের অনুসন্ধানকারী গবেষকগণ যখন তাঁহাদের প্রচলিত রীতি অনুসারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার ভিত্তি

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরই তাঁহাদের তাফ্‌সীরের ভূমিকায় কুরআন মাজীদের অবতরণ, উহার সংকলন ও উহার কিরাআত সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্য হইতে যাঁহারা উক্ত বিষয়াবলী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁহারা কুরআন মাজীদের উক্ত আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন এবং এতদ্বিষয়ে গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ রচয়িতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হইতেছেন জার্মান পণ্ডিত Noldeke ; তিনি কুরআনের ইতিহাস (Geschichte des Qurans) নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের পর্যালোচনায় এবং উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতকরণে কয়েকজন জার্মান পণ্ডিত অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে Schwally, Heinrich Zimmern ও Begstrasser-এর ন্যায় পণ্ডিতবর্গ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন। আমাদের আরবী সাহিত্য বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র কর্তৃক উক্ত গ্রন্থখানা আরবীতে অনূদিত হইয়াছে।

উক্ত অনুবাদকার্যে সাহিত্য অনুষদের জার্মান অধ্যাপকবৃন্দ এবং জার্মান ভাষাবিদ ব্যক্তিবর্গ তাহাকে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কতগুলি ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধকতার কারণে উক্ত অনুবাদ গ্রন্থখানা মুদ্রিত হইতে পারে নাই। আধুনিক যুগের উপরোক্ত পণ্ডিতবর্গ আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা চালাইতে গিয়া উহাকে এইরূপ নূতন রঙে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন, যাহা নির্ভুল, অভ্রান্ত ও অভিযোগমুক্ত না হইলেও উহাতে পর্যালোচনা ও সূক্ষ্ম গবেষণার আলো দেদীপ্যমান, এই ধরনের গবেষণার প্রয়োজনও আছে।

মোটকথা উপরে কুরআন মাজীদের যেই সকল আনুষঙ্গিক জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বর্ণনার পূর্বে সেইগুলি অধ্যয়ন করা জরুরী। যদি কোনও ব্যক্তি উল্লিখিত বিষয়াবলী সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী না হয়, তবে কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীরের বর্ণনা তাহার জন্য আদৌ সমীচীন হইবে না। কারণ কুরআন মাজীদের সাহিত্য-শৈলী ও সুষমা সঠিকভাবে শুধু তখনই অনুধাবন করা যাইতে পারে যখন উহার অর্থ ও মর্ম বুঝিবার জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিষয়াবলীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়।

কুরআন মাজীদের আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী ও উহার সহিত সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়াবলী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার অর্থ হইতেছে, কুরআন মাজীদ যেই পার্থিব ও নৈতিক পরিবেশে নাযিল হইয়াছে, উহা বিদ্যমান ও সংরক্ষিত রহিয়াছে, সংকলিত লিপিবদ্ধ ও পঠিত হইয়াছে এবং স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়াছে, সেই সকল পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও উহা পর্যালোচনা করা। উপরোক্ত পরিবেশের অধিবাসিগণ যাহাতে কুরআন মাজীদের মহাপয়গাম পৃথিবীর সকল জাতির নিকট পৌছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হয়, এতদুদ্দেশ্যে এই মহাগ্রন্থ সর্বপ্রথমে তাহাদিগকেই সম্বোধন করিয়াছে এবং উহা সর্বপ্রথমে তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছে। অতএব কুরআন মাজীদের প্রাণসত্তা, উহার প্রকৃতি, উহার ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি সবকিছুই হইতেছে আরবীয় ("আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত"– আল কুরআন ৩৯ : ২৮)। কুরআন মাজীদের মর্মাভ্যন্তরে প্রবেশ মানুষের পক্ষে একমাত্র তখনই সম্ভব হইতে পারে যখন সে উহার উক্ত আরবীয় প্রাণসত্তা, আরবীয় প্রকৃতি, আরবীয় বর্ণনাভঙ্গি ও ভাবধারা সম্বন্ধে সঠিক ও পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে এবং উহাদের সহিত তাহার পূর্ণ একাত্মতা অর্জিত হয়। নিঃসন্দেহে কুরআন মাজীদের অর্থ, মর্ম, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যাবলী সমগ্র মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর, সুদূরপ্রসারী ও চিরন্তন; কিন্তু উক্ত সকল বিষয়ই মানব জাতির নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে আরবীয় লেবাসে ও আরবী ভাষার মাধ্যমে। আর আরবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও স্পষ্ট ধারণা লাভই হইতেছে একমাত্র পথ, যাহা উক্ত বিষয়াবলী বুঝিবার জন্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত রহিয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বর্ণনার জন্য উল্লিখিত আরবীয় পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। আরবের মাটি, পাহাড়-পর্বত, প্রস্তর-ভূমি, মরুভূমি, মাঠ-প্রান্তর, আকাশ, মেঘমালা, নক্ষত্ররাজি, উদ্ভিদরাজি উহার তৃণলতাহীন শুষ্ক মরুর প্রশস্ততা, শীত-গ্রীষ্ম, ঘূর্ণিঝড়, মৃদুমন্দ বায়ু, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অবস্থাবলী, দুর্ভিক্ষ, ফলন ও ফলাদির প্রাচুর্য, ভূমির উর্বরতা-অনুর্বরতা ইত্যাদি যাহা আরবীয় পার্থিব জীবনের সহিত সম্পর্কশীল, তৎসমুদয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া আরবী ভাষার মূল কুরআন মাজীদকে বুঝিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। এতদসহ যেই আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা তৎকালীন আরবদের জীবনধারার সহিত সম্পর্কিত ছিল, উহাও ব্যাপক পরিধিতে জানা মহাগ্রন্থ কুরআন মাজীদ বুঝিবার জন্য অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আবরবদের দূর অতীতের ইতিহাস, তাহাদের জ্ঞাত ইতিহাস, তাহাদের পরিবার, গোত্র ও বংশসমূহের সামাজিক ব্যবস্থা, তাহাদের সরকার ও শাসনব্যবস্থা, ভ্রান্ত-অভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস, শিল্পকলা, কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ ইত্যাদি যেই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আরবদের মানবীয় জীবন আবর্তিত হইত, তৎসমুদয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া মহান গ্রন্থ কুরআন মাজীদকে বুঝিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর অন্যতম। আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার জন্য আরবী ভাষা ও আরবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কুরআন কারীম সম্পর্কে, যাহা সমগ্র আরবী সাহিত্যের মুকুটসমান ও হৃৎপিণ্ডস্বরূপ এই কথা অধিকতর প্রযোজ্য। কোনও মুফাস্‌সির যতক্ষণ পর্যন্ত না আরবীয় জীবনের ও সামগ্রিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা ও বৈশিষ্ট্যাবলী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই মহাগ্রন্থের সঠিক সাহিত্য শৈলী ও বৈশিষ্ট্যাবলী অধ্যয়ন ও অনুধাবন তাহার পক্ষে কোনওক্রমে সম্ভব হইবে না। কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত উপমা, উদাহরণ ও প্রবাদবাক্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ অপরিহার্য।

আল-কুরআনে বর্ণিত আল-হিজর, আল-আহ্‌কাফ, আল-আয়কা, মাদ্‌য়ান, ছামূদ জাতির আবাসভূমি, 'আদ জাতির আবাসস্থল ইত্যাদি সম্পর্কে জাতি, গোত্র ও জনপদসমূহ সম্পর্কে এবং যেই উদ্দেশ্যে উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে জ্ঞানার্জনও তাফসীর বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয়।

কুরআন মাজীদ সকল ঐশী গ্রন্থের (আসমানী কিতাবের) মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বাধুনিক ঐশী গ্রন্থ। উহা যেই ভাষায় নাযিল হইয়াছে, সেই ভাষা একটি জীবন্ত ভাষারূপে প্রচলিত রহিয়াছে। কোটি কোটি মানুষ উক্ত ভাষায় কথা বলিয়া থাকে। উহার সাহিত্য শুধু একটি জাতির নহে, বরং এইরূপ অনেক জাতির সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। অধিকন্তু আরবী ভাষা বিশ্বের অনেক ভাষা-উপভাষার মূল উৎস, যাহাদের সঠিক অধ্যয়ন আরবী ভাষার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলা অসমীচীন হইবে না যে, কুরআন মাজীদের সাধারণ আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহকে ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করাও জরুরী। কারণ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ কুরআন মাজীদ অপক্ষা শত শত বৎসরের অধিক প্রাচীন। উহাদের আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহের নিদর্শনাবলীও

বহু যুগ পূর্বে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সেই সকল ধর্মগ্রন্থের মূল ভাষাসমূহ উহাদের মূল পারিপার্শ্বিকতাকে অনেক পূর্বেই বিদায় দিয়াছে, কারণ উহারা নিজেরাই ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরতরে বিদায় লইয়াছে। সেই সকল ধর্মগ্রন্থের আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলী বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও নিদর্শনাবলী আমরা দেখিতে পাই যে, সেই সকল ধর্মগ্রন্থে প্রাণী, অপ্রাণী সম্পর্কিত ঘটনা বা তথ্য উল্লেখ রহিয়াছে, উহাদের প্রতিটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করত উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ বৃহৎ গ্রন্থ ও শব্দকোষ রচনা করা হইয়াছে, যাহাতে জ্ঞাতব্য প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, ধর্মীয়, আইনগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে সেই সকল ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে গভীর ও তুলনামূলক আলোচনা-পর্যালোচনা করা হইয়াছে। এই স্থলে আমরা সেই সকল ধর্মগ্রন্থ ও উহাদের বিষয়ে রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। কারণ উক্ত বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ আর এতদসম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থানও ইহা নহে। তবে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে যে গবেষণা ও প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে, উহার পরিপ্রেক্ষিতে মহান গ্রন্থ কুরআন মাজীদ সম্বন্ধে পরিচালিত গবেষণা ও প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্যই হইয়াছে, বিশেষত যখন আমরা দেখি যে, কুরআন মাজীদ আরবী ও আরবীয়তার সকল সাহিত্যিক নিদর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, প্রাচীনতম ও অধিকতম বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন, তখন এই স্বল্পতা আমাদের বিবেক ও অনুভূতিকে তীব্রভাবে দশংন করে।

উপরে কুরআন মাজীদের আনুষঙ্গিক ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াবলীর অধ্যয়ন সম্পর্কে যেই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উহার কয়েকটি অংশ রহিয়াছে ঃ (১) কুরআন মাজীদের শব্দাবলী ও আয়াতসমূহের বাহ্য দিক এবং উহাদের বিকাশের ইতিহাস অধ্যয়ন ; (২) যেই ব্যাপক পারিপার্শ্বিক অবস্থাবলীর মধ্যে কুরআন মাজীদ নাযিল হইয়াছে, উহাতে আলোচিত হইয়াছে এবং যেই পরিবেশে উহা পরিক্রমণশীল রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।

(খ) খোদ কুরআন মাজীদের অধ্যয়ন ঃ কুরআন মাজীদের অধ্যয়নের প্রাথমিক স্তর হইতেছে উহার শব্দাবলীর অর্থ জানা, ইহাতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থের মধ্যে কিরূপ পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ও পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তির অধিকারী হওয়া। উক্ত পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ও পরিবর্তন বিভিন্ন যুগে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক কার্যাবলী ও ঘটনাবলী এবং মুসলিম উম্মাহ্‌-এর তমদ্দুন ও সংস্কৃতি দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইয়াছে– এই বিষয়ে ও অনুরূপ অন্যান্য বিষয় ও ঘটনাবলী সম্বন্ধেও সঠিক ও সম্যক জ্ঞান লাভ। যেই সকল জাতির মধ্য দিয়া আরবী ভাষার শব্দাবলী ইসলামী জাগরণের সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, যাহার ফলে ইসলামী রাষ্ট্র পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং একটি কল্যাণকর সভ্যতা, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও তমদ্দুনিক বিপ্লব জন্মলাভ করিয়াছে তৎসম্পর্কে জ্ঞান লাভও বাঞ্ছনীয়। উল্লিখিত ঘটনাবলী সংঘটিত হইবার কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের অনেক জাতি আরবী ভাষা গ্রহণ ও ব্যবহার করিয়াছিল। ইহার ফলশ্রুতিতে আরবী ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয় এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে উহাতে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন ও পরিবর্তন সাধিত হয়। কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম বুঝিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে শব্দাবলীর অর্থের পর্যায়ক্রমিক সংঘটিত বিবর্তন ও পরিবর্তনের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। "কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার কালে উহার শব্দাবলী হইতে যেই অর্থ বুঝা হইত এবং উহার সর্বপ্রথম তিলাওয়াতকারী (রাসূলুল্লাহ স.)-এর সহচরবৃন্দ উহা যেই অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাফসীর বর্ণনাকারীর পক্ষে শুধু সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভই যথেষ্ট নহে। বস্তুত শব্দাবলীর অর্থ ও তাৎপর্য সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত রহিয়াছে। আর যদি ইহা মানিয়া লওয়া হয় যে, যুগ বিবর্তনের সঙ্গে উহাদের অর্থ ও তাৎপর্যের মধ্যে ব্যাপকতা ও প্রশস্ততা আসিতে পারে, তথাপি উক্ত সম্ভাব্য বিভিন্নরূপ অর্থ ও তাৎপর্যের মধ্য হইতে শুধু সেই অর্থ ও তাৎপর্যকেই কুরআন মাজীদের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বলিয়া নির্দেশ করা সমীচীন হইবে যাহা আরবী ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা ও রুচিবোধের সহায়তায় বোধগম্য এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্যশীল হয়। বস্তুত যে মূল অর্থ ও তাৎপর্য কুরআন মাজীদের নাযিল হইবার কালে উহা হইতে সর্বপ্রথমে জানা ও বুঝা গিয়াছিল, সেই মূল অর্থ ও তাৎপর্যই হইতেছে উহার শব্দাবলীর বিভিন্ন রূপ সম্ভাব্য অর্থ ও তাৎপর্যের মধ্য হইতে গ্রহণযোগ্য সঠিক অর্থ ও তাৎপর্যের দিকে পথনির্দেশকারী উপায় ও মাধ্যম।

উপরোক্ত বিষয়টিই যখন কুরআন মাজীদের শব্দাবলীর সঠিক অর্থ বুঝিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মৌলিক নীতি বলিয়া স্থির হইল, তখন উহা অর্জন করিবার উপায় সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। প্রচলিত অভিধান গ্রন্থাবলী উক্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করে না। সর্ববৃহৎ যেই আরবী অভিধান গ্রন্থ আমাদের নিকট বর্তমান রহিয়াছে, উহা হইতেছে ইব্‌ন মান্‌জূর আল-ইফরীকী রচিত লিসানুল-আরাব। উহা প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সুবিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি ও রচনাবলী হইতে গৃহীত উদ্ধৃতির সমষ্টি। উহাতে এইরূপ অনেক উদ্ধৃতি বাক্য লিখিত দেখা যায়, যাহাদের লেখকগণের জীবনকালের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ইব্‌ন দুরায়দ ছিলেন হিজরী ৩২১ সনের একজন লেখক ও ইবনুল আছীল হইলেন হিজরী ৬০৬ সনের লেখক। অথচ উক্ত গ্রন্থে তাঁহাদের উভয়কে পরস্পরের পাশাপাশি উপবিষ্ট দেখা যায় (অর্থাৎ উহাতে তাঁহাদের উক্তিকে পরস্পর সন্নিহিত অবস্থায় উদ্ধৃত দেখা যায়)। অথচ প্রথমোক্ত লেখকের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষনামূলক উক্তি শেষোক্ত লেখকের ধর্মতাত্ত্বিক গবেষণামূলক উক্তি হইতে পৃথক ও ভিন্নতর দেখা যায়।

অনুরূভভাবে অভিধান গ্রন্থ আল-কামূসুল-মুহীত-এর কথা উল্লেখ করা যায়। উক্ত অভিধান গ্রন্থে অনেক পরস্পরবিরোধী ও পরস্পর বিপরীত চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত বিভিন্নরূপ তত্ত্বকথা পৃথক পৃথকভাবে স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে এক দিকে রহিয়াছে বুদ্ধিভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্ব ও অন্যদিকে রহিয়াছে ব্যবহারিক চিকিৎসাশাস্ত্র। আবার উহাতে একদিকে রহিয়াছে সাহিত্যিক ও ভাষাগত অর্থ ও বিষয়াবলীর বর্ণনা ও অন্যদিকে রহিয়াছে সাহিত্যিক ও ভাষাগত অর্থ ও বিষয়াবলীর বর্ণনা ও অন্যদিকে রহিয়াছে ধর্মীয় ও 'আকীদাগত অর্থ ও বিষয়াবলীর বর্ণনা...।

আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থে যেই পর্যায়ক্রমিক বিবর্তন ও পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কেও গবেষণার ক্ষেত্রে প্রচলিত অভিধানগ্রন্থসমূহ আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে না। এমতাবস্থায় যদি কোনও তাফসীর বর্ণনাকারী ব্যক্তি কুরআন হাকীমে ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রাথমিক অর্থ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক হন তবে তাঁহাকে নিজের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিভিন্নরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া গবেষণা করিবার এবং উহাদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করিবার কালে বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণায়ক আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহাকে যথাসম্ভব অবগত

থাকিতে হইবে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত থাকিলে তিনি বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি ও বংশপরিচয় এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অবহিত হইয়া "গবেষণাধীন শব্দটি মূলত আরবী শব্দ অথবা দাখীল অর্থাৎ বহিরাগত শব্দ"– তৎসম্বন্ধেও নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারিবেন।

মুফাসসির পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে কুরআন মাজীদের কোনও শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থসমূহ পর্যালোচনা করিবার পর কুরআন মাজীদ উক্ত শব্দটি বিভিন্ন স্থানে কোন্ কোন্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছে, তাহাকে উহা নির্ণয় করিতে হইবে। কুরআন মাজীদের জীবনকালের বিভিন্ন যুগে পরিবর্তনশীল পরিবেশে উক্ত শব্দের অর্থ অপরিবর্তিত রহিয়াছে অথবা পরিবর্তিত হইয়া উহা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে– তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে পর্যালোচনা করিতে হইবে। যদি উহার অর্থ পরিবর্তিত হইয়া গিয়া থাকে, তবে কুরআন মাজীদ উক্ত শব্দকে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছে, তাফ্‌সীরকার উক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অথবা অর্থসমূহের সাহায্যে উহার অথবা উহাদের সন্ধান লাভের পথ পাইবেন। উপরিউক্তরূপ চেষ্টা-সাধনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার মাধ্যমে তাফ্‌সীরকার যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, উহার আলোকে তিনি পর্যালোচিত শব্দটি কুরআন মাজীদের যেই আয়াতে ব্যবহৃত হইয়াছে, নির্দ্বিধায় সেই আয়াতের তাফ্‌সীর বর্ণনা করিতে পারিবেন।

এখন হইতে আনুমানিক এক হাজার বৎসর পূর্বে ইমাম আর-রাগিব আল-ইস্‌ফাহানী কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দাবলীর একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র অভিধান গ্রন্থে সংকলিত করেন। তিনি উহাতে উপরোক্ত পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে অথবা নিজস্ব ধ্যান-ধ্যারণা প্রসূত পদ্ধতিতে কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত শব্দাবলীকে এবং উহাদের সহিত সম্পর্কিত তথ্যাবলীকে একত্রে সংকলিত করিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার সংকলন গ্রন্থে শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করেন নাই। আর তিনি উহাতে কুরআন মাজীদের একাধিক স্থানে এক শব্দের ব্যবহৃত হইবার ক্ষেত্রে যথাযোগ্যভাবে উহাদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা প্রদর্শনও করেন নাই। এতদ্ব্যতীত আমাদের যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নূতন করিয়া যে গবেষণা-সমালোচনা হইয়াছে তাঁহার যুগ উহা হইতে বঞ্চিত ছিল। এই কারণে উক্ত গবেষণা-সমালোচনা ও উহার ভাষাতাত্ত্বিক ফলাফল হইতে উপকৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও ইমাম রাগিব রচিত মুফ্‌রাদাতু'ল-কুরআন গ্রন্থখানার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। উহাকে অনুসরণ করিয়া একটি আধুনিক স্বতন্ত্র ও ব্যাপক কুরআনী শব্দকোষ প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়।

কুরআন মাজীদের সাহিত্যশৈলী সম্পর্কিত তাফ্‌সীর বর্ণনাকারীকে উহার একক ও যুক্ত শব্দাবলীর ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে প্রচেষ্টা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে। এই কার্যের জন্য তাহাকে ভাষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিদ্যা ও শাস্ত্রের ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদির সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। কুরআন মাজীদের সাহিত্যগত তাফ্‌সীর বর্ণনার কার্যে উক্ত গুণ ও যোগ্যতা সহায়ক হইবে। অন্যদিকে খোদ আলোচ্য পন্থায় তাফ্‌সীর বর্ণনার ধারাই ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার আন্দোলনকে উপকৃত করিবে। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর সংকলন সংক্রান্ত বিষয়টিকে আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করিতেছি ঃ

মনস্তত্ত্বভিত্তিক তাফ্‌সীর সংকলন ঃ আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বালাগাতশাস্ত্র (অলংকারশাস্ত্র) মনস্তত্ত্ববিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত [দ্র."আল-বালাগাতু ওয়া 'ইল্‌মুন-নাফ্‌স্" নিবন্ধ মাজাল্লা-ই কুল্লিয়াতিল-আদাব, ১৯৩৯ খৃ., ৪খ., দ্বিতীয় অংশ]। এতদ্বারা কুরআন মাজীদ যে মনস্তাত্ত্বিক রহস্যাবলীর বর্ণনায় অনন্য ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ, উহা প্রমাণিত হইবে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে কুরআন মাজীদের তাফ্‌সীর বর্ণনা করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মনস্তত্ত্ব বিদ্যাভিত্তিক তাফ্‌সীরের ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত যথাসম্ভব এইরূপ তথ্যাবলীর উপর, যাহা মনস্তত্ত্ববিদ্যায় সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং এইরূপ তথ্যাবলীর উপর, যাহা দ্বারা "কুরআন মাজীদ মানব জাতির সম্মুখে জ্ঞান-রাজ্যের যে বিশাল ময়দান উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, উহাতে মানব মনের মনস্তাত্ত্বিক কার্যকলাপের কিরূপ ভূমিকা ও কি কি রহস্য রহিয়াছে", তৎসম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। কুরআন মাজীদ কর্তৃক উন্মুক্ত জ্ঞান-রাজ্যের সেই বিশাল ময়দান কী? উক্ত ময়দান হইতেছে কুরআন মাজীদ কর্তৃক উপস্থাপিত দীনী দাওয়াত, 'আকীদা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা, আত্মিক অনুভূতিসঞ্জাত সত্য-দর্শন ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগ– এই সকল বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত। জ্ঞান-রাজ্যের উক্ত বিশাল ময়দান পৌত্তলিক জনগণকে তাহাদের পরিচিত প্রাচীন আচার-আচরণ ও রসম-রেওয়াজ হইতে, যাহা তাহারা পুরুষানুক্রমে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়া আসিতেছিল, মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে তাওহীদবাদী ঈমানে শক্তিশালী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। উহার ফলে তাহাদের প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কার ও ধ্যানধারণাসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল সমূলে উৎপাটিত হয়। ... কুরআন মাজীদ কিরূপ কার্যকর সুষ্ঠু প্রক্রিয়ায় উপরোক্ত রূপ বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তনের মহান কার্য সম্পাদিত করিয়াছে, উপরে উল্লিখিত আধ্যাত্মিক ও মনোগত উদ্দেশ্যাবলীকে অর্জন করিবার লক্ষ্যে কি কি মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলীকে প্রয়োগ করিয়াছে এবং দীনী দাওয়াতের সাফল্য উক্ত প্রয়োগ দ্বারা কিরূপে ও কি পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে – এই সকল বিষয় স্পষ্ট ও পরিজ্ঞাত হওয়া দরকার। এতদ্বারা জানা যায় যে, মনস্তত্ত্ববিদ্যাভিত্তিক তাফ্‌সীর একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর উক্ত ভিত্তি হইতেছে এই যে, বিষয়বস্তুর বর্ণনা পদ্ধতি মানব মনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত রহিয়াছে এবং সকল প্রকারের শিল্পকলা, যাহাদের মধ্য সাহিত্যও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে মানব মনের অন্তর্নিহিত অনুভূতি ও উপলব্ধিসমূহেরই বহিঃপ্রকাশ বটে। মনস্তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম বিষয়ে গবেষণা করিলে অনেকগুলি তীব্র মতবিরোধকে সম্ভবত অতি শক্তিশালী পদ্ধতিতে নিরসন করা যাইতে পারে। উক্ত মতবিরোধগুলি তাফ্‌সীরকারগণের মধ্যে শাখা-প্রশাখাসহ বিস্তৃত রহিয়াছে এবং উহাদের জন্য তাঁহারা বহু সংখ্যক শক্তিশালী চিন্তামূলক দলীল ও যুক্তিশাস্ত্রীয় বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ফাখরু'দ-দীন রাযী রচিত তাফ্‌সীর, সুরাতু'শ-শুআরা'-এর ১৯৩-১৯৫ আয়াতসমূহের তাফ্‌সীর; 'আল্লামা যামাখ্‌শারী রচিত আল-কাশ্‌শাফ্‌, বূলাক, ২খ., পৃ. ১৩২-এ বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতসমূহের তাফ্‌সীর। উহাতে তাফ্‌সীরকারদ্বয়ের তাফ্‌সীর বর্ণনা পদ্ধতির পারস্পরিক পার্থক্য সম্পূর্ণত স্পষ্ট হইয়া হইয়া যাইবে। আর 'আল্লামা যামাখ্‌শারী মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আয়াতসমহের তাফ্‌সীর বর্ণনার মাধ্যমে উহাতে আলোচিত জটিল বিষয়সমূহের মীমাংসা কত সহজে নিশ্চিতরূপে করিয়া দিয়াছেন, উক্তরূপ তুলনায় তাহাও জানা যাইবে। এতদ্বারা জানা যায় যে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যখন

কোনও আয়াতের গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করা হয় এবং যেই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় উক্ত আয়াত নাযিল হইয়াছে, উহাকেও উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সহিত যুক্ত করিয়া লওয়া হয়, তখন উহার অর্থ, মর্ম ও সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতার দিক দিয়া অনেক অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি উহাকে মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া দেখা না হয়, তবে উহার অর্থ ও মর্ম দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া যায়।

তাফসীরশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞান (علم التفسير وعلم الاجتماع) ঃ মুফ্তী মুহাম্মদ আবদুহু বলেন, "মানব সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান হইতেছে এইরূপ জরুরী বিষয়, যাহা ব্যতীত তাফ্সীরশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। যাহারা কুরআন মাজীদ সম্পর্কে গবেষণা করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের জন্য জরুরী হইতেছে, প্রথমেই মানব সমাজের ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিবর্তনের বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন স্তরের প্রেক্ষিতে তাহাদের বিভিন্নরূপ সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করা এবং "মানব সমাজের বিভিন্ন রূপ অবস্থা, যেমন উহার শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা, উহার সম্মান ও লাঞ্ছনা, উহার জ্ঞান ও অজ্ঞতা, উহার ঈমান এবং কুফ্র ও উহাদের বিভিন্নতার কারণ কি কি ছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা" (ভূমিকা, সূরা ফাতিহা-এর তাফ্সীর, পৃ. ১৬)।

উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যতীত তাফ্সীরশাস্ত্রের জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করে না। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, "তাফ্সীর বর্ণনাকারীর জন্য জরুরী হইতেছে– বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জগতের বিভিন্নরূপ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। বৃহত্তর ও ব্যাপকতর জগতের মধ্যে আধ্যাত্মিক জগৎ ও জড় জগৎ উভয়বিধ জগৎ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত জগৎদ্বয়ের জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য অনেক প্রকারের শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাখা সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এই সকল প্রয়োজনীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাখার মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা হইতেছে ইতিহাস বিজ্ঞান, উহার সকল প্রকারের শাখা-প্রশাখাসহ।"

কুরআন মাজীদের সাহিত্যগত অধ্যয়ন ও মর্মোপলব্ধি যেই সকল বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের অধ্যয়নের উপর নির্ভরশীল, আমাদিগকে সেই সকল বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। বস্তুত কুরআন মাজীদ হইতে যেই সকল বিষয় লাভ করা যাইতে পারে, কুরআন মাজীদের সাহিত্যগত অধ্যয়নের শর্ত তৎসমুদয়ের অর্জনের পূর্বে পূর্ণ করিতে হইবে। সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কুরআন মাজীদের অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিবার পরই শুধু উহা হইতে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা (যেমন মানব জাতির হিদায়াত অথবা তাহাদের অবস্থার সংস্কার ও সংশোধন অথবা তাহাদের জন্য একটি শারী'আত কায়েমকরণ ইত্যাদি বিভিন্নরূপ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা) সম্ভব হইতে পারে। উক্ত বিষয়াবলীকে অত্যন্ত শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত আর সেই শক্তিশালী ভিত্তি হইতেছে কুরআন মাজীদের সাহিত্যগত দার্স বা শিক্ষা। উক্ত সাহিত্যগত দার্স-এর প্রাথমিক ও সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে কুরআন মাজীদের মনস্তাত্ত্বিক উচ্চ পর্যায়ের বিষয়াবলীর সহিত। পরবর্তী পর্যায়ে উহা কুরআন মাজীদের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সহিতও, যেমন সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির সহিতও সম্পর্কিত হইতে পারে।

পূর্বযুগীয় 'উলামায়ে কিরামও উক্ত লক্ষ্যসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাঁহারা তাফ্সীরশাস্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁহাদের উক্ত সচেতনতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাজও করিয়াছেন। আধুনিক যুগের 'উলামায়ে কিরাম তো উক্ত উদ্দেশ্যাবলীকে তাঁহাদের তাফ্সীর শাস্ত্র বিষয়ক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী ও সাহিত্যিক গ্রন্থাবলীকে সম্পূর্ণরূপে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাফ্সীরশাস্ত্রে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তাঁহাদিগকে কুরআন মাজীদের তাফ্সীরের সহিত সম্পর্কিত বিষয়াবলীর দার্স প্রদানের বিশাল ময়দান উন্মুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীতঃ (১) আমীন আল-খাওলী, মাদ্খালুন লিদারসি'ত-তাফ্সীর ওয়া বায়ানু'ল-মান্হাজিল-জামি'ঈ ফীহ্। কতগুলি বক্তৃতার সংকলন, পাণ্ডুলিপি, কুল্লিয়াতুল-আদাব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ; (২) ঐ লেখক, দিরাসাতুন লিবা'দি মাওদূ 'আতিল-কুরআন, উক্ত গ্রন্থে কুরআন মাজীদে উল্লিখিত ও আলোচিত কতগুলি বিষয় সম্বন্ধে, যেমন ঃ বিভিন্ন কাহিনী, প্রবাদ, উপমা ইত্যাদি আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানা কুল্লিয়াতুল-আদাব গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে; (৩) ঐ লেখক, আখ্লাকুল-কুরআনি ওয়া মান হাদাল-কুরআন, উক্ত গ্রন্থখানায় পঞ্চাশের কিছু অধিক নিবন্ধ রহিয়াছে। নিবন্ধগুলি মনস্তত্ত্ব ভিত্তিক ও সমাজবিজ্ঞান ভিত্তিক তাফ্সীরের ভাবধারায় রচিত। উহাতে ভাষাগত বিবেচনা হইতে এবং কুরআন মাজীদের প্রাথমিক যুগীয় সাহিত্যগত পারিপার্শ্বিকতা হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, রেডিও মিসরের পত্রিকায় (১৯৪১-১৯৪২ খৃ.) প্রকাশিত হইয়াছে [তাফ্সীর নিবন্ধটি কায়রো হইতে প্রকাশিত আরবী দা.মা.ই.হইতে গৃহীত]।

আমীন আল-খাওলী (দা. মা. ই.)/মু. মাজ্হারুল হক

(৩) ভারতীয় উপমহাদেশে তাফ্সীর রচনার ইতিবৃত্ত ঃ কুরআন মাজীদ যেহেতু আরবী ভাষায় নাযিল হইয়াছে, আরবী ভিন্ন অন্য যে কোন ভাষায় উহার অর্থ ও মর্ম প্রকাশে প্রাথমিক ও জরুরী পর্যায়ে হইতেছে উহাকে অনূদিত করা। অনুবাদে যেহেতু কুরআন মাজীদের অর্থ, অর্থের ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ব্যাখ্যা, শব্দার্থ ও শব্দ সংযোজন প্রক্রিয়ার বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাই উহাকে এক অর্থে তাফ্সীরও বলা যায়। এই কারণে ফারসী, উর্দু, হিন্দী, বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় আরবী তাফ্সীরের পদ্ধতিতে যেই সকল তাফ্সীর রচিত হইয়াছে, উহাতে সাধারণত অনুবাদকে গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে তাফ্সীর রচনার পটভূমি ঃ উপমহাদেশে আরবী-ফারসী ভাষাদ্বয় মুসলমানদের সঙ্গে আসিয়াছিল। মুসলিমগণ ২য়/৮ম শতাব্দীতে উপমহাদেশে পৌঁছিয়া ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাসসমূহ প্রচারে এই দেশের স্থানীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত এতদ্দেশীয় জনগণও ইসলামকে বুঝিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের ভাষায় কুরআন-হাদীছকে তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করিতে মুসলমানদের নিকট দাবি জানাইয়াছিল। যেমন কথিত আছে যে, মাহ্রুক ইব্ন রাইক, তাজ্দার আর-রা'ও (আরবী, অধিপতি) নামীয় জনৈক ভারতবর্ষীয় রাজার অনুরোধে ২৭০/৮৮৩ সনে মান্সূরা-এর শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার ইব্ন 'আব্দুল-আযীয (ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন-এর ক্রোড়পত্র, লাহোর, মে ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৫৩ প.) জনৈক ইরাকী বংশোদ্ভূত ভারতবর্ষীয় আলিম ভারতবর্ষেই লালিত হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন ভারতবর্ষীয় ভাষা জানিতেন, যাঁহার মাধ্যমে হিন্দিয়া' ভাষায় (হিন্দী ভাষায়?) কুরআন মাজীদের একখানা তাফ্সীর রচনা করাইয়াছিলেন। উক্ত তাফ্সীরের রচনাকার্য সূরা ইয়াসীন পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল (বুযুর্গ ইব্ন শাহ্রিয়ার, কিতাবু 'আজাইবি'ল-হিন্দ, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ., ১৮৮৬ খৃ., পৃ ৩)। ৫ম/১১শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত

সময়কালে সিন্ধু, রাজপুতনা ও পাঞ্জাবী 'উলামা' ও সূফীগণ কুরআন মাজীদের দার্‌স প্রদান ও মৌখিকভাবে তাফসীর বর্ণনা করিতেন। তবে তাফসীর গ্রন্থ রচনায় তাঁহাদের অবদান সম্পর্কে ইতিহাস শুধু ইঙ্গিতই প্রদান করে। গায্‌নীর শাসনাধীন (৩৫১-৫৮২/৯৬২-১১৮৬ সন) লাহোর শহর ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। জীবনী লেখকগণ আলোচ্য যুগের তাফসীর বর্ণনাকারী 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইস্‌মাঈল বুখারী (মৃ. ৪৪৮/১০৫৬)-এর নাম বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করিয়াছেন (তায্‌কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ১৭৯; হাদাইকুল-হানাফিয়্যা, পৃ. ১৯৪)। পরবর্তী যুগে 'আল্লামা যামাখ্‌শারী (মৃ. ৫৩৮/১১৪৩), ইমাম রাযী (মৃ. ৬০৬/১২০৯) ও 'আল্লামা বায়দাবী (মৃ. ৭১৬/১৩১৬) কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিতে উপমহাদেশে দার্শনিক ও সূফীসুলভ ভাবধারায় তাফসীর রচনার ধারা সূচিত হয়। শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (মৃ. ১১৭৬/১৭৬২)-ই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাফসীর রচনায় অনুকরণমূলক পন্থার পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হন এবং তাফসীরশাস্ত্র বিষয়ক মূলনীতিসমূহের বর্ণনায় আল-ফাওদু'-ল কাবীর নামে একখানা মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী যুগে স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান (মৃ. ১৩১৬/১৮৯৭) তাফসীর বিষয়ক মূলনীতিসমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করেন (মুকাতাবাতু'ল-খুল্লান, মুহাম্মাদ 'উছমান মাকবূল কর্তৃক মুদ্রিত, ১৯১৫ খৃ.; মাকাতীব-ই স্যার সায়্যিদ, লাহোর ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৩১)। তিনি এতদ্বিষয়ে তাহ্‌রীরুন ফী উসূলি'ত-তাফসীর (আগ্রা ১৮৯২ খৃ.) নামীয় একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ ও স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান কর্তৃক তাফসীরশাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থাবলী রচিত হইবার পর উপমহাদেশে তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে ও বিপুল পরিমাণে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়বিধ কার্য চলিতে থাকে। মাওলানা মুহাম্মাদ 'আবদুল-হাক্কা হাক্কানী দিহলাবী, মির্যা হায়রাত, নাওওয়াব সায়্যিদ সিদ্দীক হাসান খান প্রমুখ তাঁহাদের রচিত তাফসীর গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকায় এবং স্বতন্ত্রভাবে রচিত গ্রন্থাবলীতে তাফসীর সম্পর্কিত মূলনীতি বিষয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু জামালুদ-দীন আফগানী (মৃ. ১৩১৪ (?)/১৮৯৭) ও মুফতী মুহাম্মাদ 'আবদুহু (মৃ. ১৩২৩/১৯০৫)-এর ইসলামী আন্দোলন উপমহাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের ফলে কুরআন মাজীদের তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রেও এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মাওলানা (আহমাদ) আবুল-কালাম আযাদ (মৃ. ১৩৭৭/১৯৫৮) তাঁহার রচিত তাফসীর গ্রন্থ তারজুমানু'ল-কুরআন-এর ভূমিকায় (পৃ. ৯-১৯) বর্ণিত চৌদ্দটি মূলনীতিতে তাফসীর ক্ষেত্রে এক নূতন গবেষণামূলক মৌলিক পথনির্দেশনার মাধ্যমে তাফসীর রচনাকারীদের জন্য এক নূতন পথ রচনা করেন। এইরূপে খাজা 'আব্‌দুল-হায়্যি, হামীদুদ-দীন ফারাহী এবং কিয়ৎ পরিমাণ ভিন্নতর পন্থায় 'আলী নাকী লাখ্‌নাবী [মুকাদ্দিমা-ই তাফসীর (উর্দু), ১৩৬০/১৯৪১ ; ঐ গ্রন্থ (আরবী), ১৩৫৪/১৯৩৫] তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে অনুরূপ পন্থায় ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী যুগে জাতীয় প্রয়োজনে জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারিতকরণ এবং বিশ্বজনীন ইসলামী দাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম বর্ণনার সহজতর ও স্পষ্টতর পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য চেষ্টা করা হয় (দ্র. মাযাহির্‌ত-তাফসীরিল-ইসলামী, মিসর ১৩৭৪/১৯৫৫, পৃ. ৩৪৬), বিশেষত ইংরেজি ভাষায় তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে উপমহাদেশে যথেষ্ট ভূমিকা পালিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে যখন মুসলিম জাহান তাফসীরশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও কুরআন মাজীদের অর্থ ও মর্ম বুঝিবার জন্য যত্নবান রহিয়াছে– এই উপমহাদেশেও চিন্তাবিদ 'উলামায়ে কিরাম এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট সচেষ্ট ও সক্রিয় রহিয়াছেন।

উপমহাদেশে রচিত তাফ্সীর গ্রন্থাবলী ঃ ঐতিহাসিক দিক দিয়া উপমহাদেশে তাফ্সীর রচনার বর্তমান ধারা আরম্ভ হয় আরব ও ইরানে তাফ্সীর রচনার ধারার আরম্ভ হইবার অনেক পরে। তাফ্সীর গ্রন্থাবলীর সংখ্যাধিক্যের কারণে এবং কোনও কোনও তাফ্সীর গ্রন্থের রচনাকাল অজ্ঞাত থাকিবার কারণে এই উপমহাদেশে রচিত তাফ্সীর গ্রন্থসমূহের রচনা সনওয়ারী আলোচনা করা কঠিন। এই কারণে আমরা সংক্ষেপে নিম্নে আরবী, ইংরেজী এবং ভারতবর্ষীয় অনান্য ভাষায় উপমহাদেশে রচিত তাফ্সীর গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে কতগুলি অতি বিখ্যাত তাফ্সীর গ্রন্থের উল্লেখ করিতেছি।

(১) আরবী ভাষায় রচিত তাফ্সীর ঃ আমাদের জানামতে উপমহাদেশে সর্বপ্রথমে রচিত আরবী ভাষার তাফ্সীর গ্রন্থ হইতেছে গারাইবুল-কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান (غرائب القران ورغائب الفرقان) [তেহরান ১২৮০/১৮৬৪]। উহার রচয়িতা নিজামুদ-দীন হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন শাফিঈ কুম্মী, যিনি আন-নিজামুল-আ'রাজ নামে (বুগ্‌য়াতুল উআ, পৃ. ২৩০) অথবা নিজাম নিশাপূরী দাওলাতাবাদী নামে পরিচিত ছিলেন। উহার রচনাকার্য দাওলাতাবাদে (দাক্ষিণাত্য) সমাপ্ত হয়। প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডদ্বয়ের রচনাকার্য ৭৩০/১৩৩০ সনে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাকার্য ১১ মুহাররম, ৭২৮/১৩২৭ সনে সমাপ্ত হয় (দ্র. তেহরানে মুদ্রিত গ্রন্থ; উহার প্রতিটি খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত তথ্য)। গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দ্র. রাওদাতুল-জান্নাত, ১ম সং, পৃ. ২২৫; হাদাইকুল-হানাফিয়্যা, পৃ. ৩১৯; ফিহ্‌রিস্‌ত-ই কিতাবখানা-ই আস্‌তানা-ই কুদ্‌স্-ই রিদ্‌বী, ৪খ., পৃ. ৪৩৬; ব্রকেল্‌ম্যান, তাকমিলা, ২খ., পৃ. ২৭৩।

'গারাইবুল-কুরআন' উহাতে বর্ণিত বিষয়বস্তুসমূহ ও উহাদের বিন্যাসের দিক দিয়া একখানা উৎকৃষ্ট তাফ্সীর গ্রন্থ। নিঃসন্দেহে উহা কাশ্‌শাফ ও তাফ্সীর কাবীর-এর সমপর্যায়ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য। নিজাম নিশাপুরী যদি উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থখানা উপমহাদেশে থাকিয়া রচনা করিয়া থাকেন, তবে উহা অমাদের জানামতে কুরআন মাজীদের সর্বপ্রথমে রচিত ফারসী অনুবাদও বটে। উহাতে প্রথমে আয়াতের অনুবাদ (মিসরে মুদ্রিত ১৩২১/১৯০৩ সন; তাফ্সীর তাবারী-এর প্রান্তে মুদ্রিত গারাইবুল-কুরআনে ফারসী অনুবাদ মুদ্রিত নাই), তৎপর কিরাআত, ওয়াক্‌ফ বা যতি, বালাগাতশাস্ত্রীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, রূপক অর্থ, 'আকীদাসমূহ, শাফিঈ মাযহাবের ফিক্‌হ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা স্থান পাইয়াছে। উহার বর্ণনারীতি সাধারণভাবে সহজ, সরল, সাবলীল ও জটিলতামুক্ত।

নিজাম নিশাপূরী-র উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থের পর ভারতবর্ষে প্রথমে যেই আরবী তাফ্সীর রচিত হয়, উহা হইতেছে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত সূফী শায়খ যায়নুদ-দীন (আলাউদ-দীন) 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-মাহাইমী আল-হিন্দী, যিনি মাখ্‌দূম 'আলী নামে পরিচিত, কর্তৃক রচিত তাব্‌সীরু'র-রাহ্‌মানি ওয়া তায়্‌সীরু'ল-মান্নান বিবা'দ মা য়ুশীরু ইলা ই'জাযিল–কুরআন নামক তাফসীর গ্রন্থ, যাহা তাফসীর রাহ্‌মানী ও তাফ্সীর মাহাইমী নামে সমধিক পরিচিত। শায়খ মাখ্‌দূম আলী ভারতের বোম্বাই প্রদেশের মাহাইম অঞ্চলের (?) অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মনীষী ছিলেন। তিনি মুহ্‌য়িদ-দীন ইব্‌নুল-আরাবী কর্তৃক প্রচারিত ওয়াহ্‌দাতুল-উজূদ বা অদ্বৈত মতবাদের ব্যাখ্যাতা ও শাফিঈ মাযহাবের ফিক্‌হ-এর 'আলিম ছিলেন। যেহেতু শায়খ মাখ্‌দূম 'আলী মাহাইমী-এর মৃত্যু সন হইতেছে ৮ জমাদাল আখিরা ৮৩৫/১৪৩১ সন

(হাদাইকুল-হানাফিয়্যা, পৃ. ৩১৭; তায্কিরা 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ১৪৭; যুবায়দ আহমাদ, The Contribution of India to Arabic Literature, পৃ. ১৫; এক্সীর, পৃ. ৫৯), তাই তাফসীর মাহাইমী সম্ভবত গারাইবুল কুরআন-এর কিছুকাল পূর্বে (?) রচিত হইয়াছে। তায্সীরুর-রহমান সহজ-সরল আরবীতে রচিত একখানা মধ্যম আকৃতির নাতিদীর্ঘ তাফ্সীর গ্রন্থ। উহাতে আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, সূরাসমূহের ধারাবাহিকতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক, তাসাউফ বিষয়ক তত্ত্বকথাসমূহ ও ফিক্হ বিষয়ক মাস্আলাসমূহ যথোপযুক্ত বর্ণনারীতিতে বর্ণিত হইয়াছে (আনওয়ার শাহ্, মুশ্কিলাতুল-কুরআন, পৃ. ২৬; মাজ্মূআ-ই তাফাসীর ফারাহী, পৃ. ৫৮)। তাফ্সীর রহ্মানী ভারতবর্ষ ও মিসরে (১২৯৫/১৭৭৮ সন) মুদ্রিত হইয়াছে। উপমহাদেশে রচিত তৃতীয় আরবী তাফ্সীর গ্রন্থ হইতেছে মুহাম্মাদ ইব্ন আইমাদ মিয়াঁজী (মৃ. ৯৮২১/১৫৪৭) কর্তৃক রচিত আত-তাফ্সীরুল মুহাম্মাদী। উহাতে আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে (যুবায়দ আহমাদ, পৃ. ১৬)।

এদস্থলে শায়খ মুবারাক ইব্ন শায়খ খিদ্র নাগোরী (মৃ. ১০০১/১৫৯২ সন) কর্তৃক রচিত তাফ্সীর গ্রন্থেরও নামোল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষভাগে মান্বাউ নাফাইসিল 'উয়ূন নামে চারিটি বৃহৎ খণ্ডে সমাপ্ত একখানা তাফসীল গ্রন্থ রচনা করেন। আয়তনে উহা যেন ইমাম রাযী রচিত তাফ্সীর কাবীর (বাদাউনী, ৩খ., পৃ. ৭৪)। মাআছিরুল-কিরাম গ্রন্থে (পৃ. ১৯৭) উহাকে মানবাউল-মাআনী নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রন্থখানার কোনও পাণ্ডুলিপির সন্ধান আমাদের জানা নাই।

উপমহাদেশে রচিত পঞ্চম আরবী তাফ্সীর গ্রন্থ হইতেছে আবূ সাঈদ আহ্মাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-হানাফী আল-মালিকী (মৃ. ১১৩০/১৭১৭) কর্তৃক রচিত। তিনি মুল্লা জীওন (ملا جيون) নামে সমধিক পরিচিত এবং লাক্ষ্ণৌ জিলার অন্তর্গত আমেঠী (আমেথী) অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। গ্রন্থটি "আত-তাফ্সীরাতুল আহমাদিয়া ফী বায়ানিল-আয়াতিশ-শারইয়্যা নামে পরিচিত। তাফ্সীর গ্রন্থখানা অত্যন্ত খ্যাতি, সমাদর ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। লেখক উহার রচনাকার্য ১০৬৪/১৬৫৪ সনে আরম্ভ করেন এবং ১০৬৯/১৬৫৯ সনে আমেথীতে উহার রচনাকার্য সমাপ্ত করেন। গ্রন্থখানা কলিকাতা, কাযান প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত হইয়াছে (ব্রকেলম্যান, তাক্মিলা, ২খ., পৃ. ৬১৬; হাদাইকুল হানাফিয়্যা, পৃ. ৪৩৬; এক্সীর, পৃ. ৩৪)।

উপমহাদেশে রচিত ষষ্ঠ আরবী ভাষার তাফ্সীর গ্রন্থ কাদী ছানাউল্লাহ পানীপাতী হানাফী (মৃ. ১ রাজাব, ১২২৫/১৮১০ সন) কর্তৃক রচিত। গ্রন্থকার তাঁহার মুরশিদ মির্যা মাজ্হার জান-ই জানান দিহলাবী (মৃ. ১১৯৫/১৭৮০ সন)-এর নামানুসারে উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থের নামকরণ করেন "আত-তাফ্সীরুল-মাজ্হারী" (দিল্লীতে মুদ্রিত)। 'উলামায়ে কিরাম উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থে বর্ণিত তাসাউফ বিষয়ক তত্ত্বকথাসমূহ ও ফিক্হশাস্ত্রীয় সূক্ষ্ম বিষয়াবলীকে অত্যন্ত পসন্দ করিয়াছেন (মুশকিলাতুল-কুরআন, পৃ. ২৬; এক্সীর, পৃ. ১০৪; তায্কিরা-ই 'উলামায়ে হিন্দ, পৃ. ৩৮)। অতঃপর নাওয়াব সায়্যিদ সিদ্দীক হাসান খান (মৃ. ১৩০৭/১৮৮৯ সন) ফাতহুল-বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন নামক একখানা আরবী তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন (ভূপাল ১২৯১/১৮৭৪ সন, আট খণ্ড, বূলাক ১৩০০/১৮৮৩ সন)। লেখক নিজেই তারজুমানুল-কুরআন বি লাতাইফিল বায়ান (ترجمان القران بلطائف البيان) নামে উহার উর্দু অনুবাদকার্য অসমাপ্ত রাখিয়া যান। অতঃপর ভূপালের সাদ্রুস সুদূর যুল-ফিকার আহমাদ (যিনি ১৩০৭ হি. সনেও জীবিত ছিলেন) উহার অনুবাদকার্য সমাপ্ত করেন (১৩০৬ হি. মুদ্রিত)। নাওয়াব সায়্যিদ সিদ্দীক হাসান খান "নায়লুল-মারাম ফী আহ্কামিল-কুরআন" নামক আরেকখানা অসম্পূর্ণ আরবী তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন। উহা ভারতবর্ষ ও মিসরে একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। ১৩৪৭/১৯২৯ সনে মিসরে মুদ্রিত উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থে উহাকে "নায়লুল-মারাম মিন তাফ্সীরি আয়াতিল-আহ্কাম" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ১৩২১/১৯০৩ সনে ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (মৃ. ১৯৪৮ খৃ.) রচিত "তাফ্সীরুল-কুরআন বিকালামি'র রহমানি" নামক আরবী তাফ্সীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থ তাঁহার রচিত তাফ্সীর ছানাঈ নামক উর্দু তাফ্সীর গ্রন্থ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে ভিন্নতর এবং উহা কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্নরূপ জ্ঞানালোচনামূলকও বটে। লেখক উহাতে আয়াতসমূহের তাফ্সীর বর্ণনা প্রসঙ্গে একেকটি আয়াতের অধীনে উহার সহিত সম্পর্কিত আয়াতসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। উপরোক্ত তাফ্সীর গ্রন্থাবলী ব্যতীত সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত তাফ্সীর গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে মালিকুশ-শুআরা' ফায়দী (মৃ. ১০০৮/১৫৯৫ সন) রচিত সাওয়াতিউল-ইল্হাম (سواطع الالهام) (রচনাকাল ঃ ১০০২ হি; লাক্ষ্ণৌতে মুদ্রিত ১৩০৬/১৮৮৮ সন) নামীয় নুক্তাবিহীন (অর্থাৎ যাহাতে ব্যবহৃত শব্দাবলী নুক্তাবিহীন বর্ণ দ্বারা গঠিত) আরবী তাফ্সীর গ্রন্থখানার নাম উল্লেখ করা যায়। এইরূপে 'আবদুল-আহাদ ইব্ন ইমাম 'আলী ইলাহাবাদী (যুবায়দ আহমাদ, পৃ. ২৫; তু. Ellis, Cat. of Arabick Books in the Br. Mus., ৭৪৭ স্তম্ভ; উহাতে 'আবদুল-আহাদ ইব্ন ইমাম আলী এই নামের স্থলে ইমাম আলী উল্লিখিত হইয়াছে) আমপারা'র তাফ্সীর বর্ণনায় জাব্বা শাগাব (جب شغب) অথবা ফায়দুন গায়ব (فيض غيب) নামক একখানা নুক্তাপূর্ণ আরবী তাফ্সীর গ্রন্থ (এলাহাবাদে মুদ্রিত, ১৩০৭/১৮৯০ সন, পৃ. সংখ্যা ২০৭) রচনা করেন। শেষোক্ত উভয় তাফ্সীরই উহাদের রচনাকারীদের রচনাশক্তি ও আরবী ভাষার জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে। তবে মুফতী মুহাম্মাদ 'আব্বাস (মৃ. রাজাব ১৩০৬/১৮৮৮ স, [যুবায়দ আহমাদ, পৃ. ২৫] কর্তৃক রচিত "রাওয়াইহুল কুরআন ফী ফাদাইলি উমানাই'র- রাহ্মান" (লাক্ষ্ণৌ, ১২৭৭/১৮৬১ সন) [ফিহ্রিস্ত-ই কুতুবখানা-ই আস্তানা-ই রিদ্বিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৮৮; তাজাল্লিয়াত, পৃ. ৩৮০] ও হামীদুদ-দীন ফারাহী (মৃ. ১৯ জুমাদাল আখিরা, ১৩৪৯/১২ নভেম্বর, ১৯৩০ সন) কর্তৃক রচিত "নিজামুল কুরআন ওয়া তা'বীলুল ফুরকান বিল-ফুরকান"—এই দুইখানা তাফ্সীর গ্রন্থ সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি ও গবেষণাশক্তির নিদর্শন হওয়া ছাড়াও আরবী সাহিত্য রচনা রীতির উৎকৃষ্টতম নিদর্শন বটে। অসমাপ্ত অথবা বিষয়বস্তুভিত্তিক আরবী তাফ্সীর গ্রন্থসমূহের মধ্য হইতে সায়্যিদ আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (মৃ. ১৩৫১/১৯৩১ সন) কর্তৃক রচিত "মুশ্কিলাতুল কুরআন" নামক তাফ্সীর গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরোল্লিখিত তাফ্সীর গ্রন্থাবলী ব্যতীত কুরআন মাজীদের কঠিন আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনায়, 'আকীদাসমূহের ব্যাখ্যা বর্ণনায় এবং একক সূরাসমূহের ব্যাখ্যা বর্ণনায় উপমহাদেশে অনেক সমাপ্ত ও অসমাপ্ত আরবী তাফ্সীর রচিত হইয়াছে। উপরিউক্তরূপ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করা এবং বিখ্যাত আরবী তাফ্সীর গ্রন্থসমূহের সহিত আরবী টীকা সংযুক্ত করা উপমহাদেশীয় 'উলামায়ে

কিরামের প্রিয় কর্মধারা হইয়া রহিয়াছে। এই স্থলে উহার বিশদ বিবরণ প্রদানের অবকাশ নাই।

(২) **ফারসী ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থাবলী** ঃ মুসলিম শাসনামলে ফারসী ভাষা উপমহাদেশের সরকারী ও জ্ঞানচর্চার ভাষা ছিল। এই কারণে অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর রচনায় যেমন, তাফ্সীর গ্রন্থাবলীর রচনায়ও তেমনি ফারসী ভাষা ব্যবহৃত হইত। নিজাম নিশাপূরী রচিত পূর্বোক্ত আরবী তাফ্সীর গ্রন্থে সংযোজিত ফারসী অনুবাদ উহার প্রথম দৃষ্টান্ত। অতঃপর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ উরফে খাজেগী সীরাযী ফারসী ভাষায় একখানা সংক্ষিপ্ত তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন। উহা প্রকৃতপক্ষে মাজ্মাউল-বায়ান (তাবারসী, মৃ. ৫৪৮/১১৫৩ সন) নামক তাফ্সীর গ্রন্থের সারসংক্ষেপ বটে [মুকাদ্দিমা তাফ্সীরুল-কুরআন (উর্দু), পৃ. ২৩১; এতদ্ব্যতীত দ্র. উক্ত গ্রন্থের আরবী সংস্করণ, পৃ. ৯২]। উত্তর ভারতে সর্বপ্রথম ফারসী ভাষায় রচিত তাফ্সীর গ্রন্থ হইতেছে বাহ্র-ই মাওওয়াজ (بحر مواج , লাক্ষ্ণৌ ১২৯৭/১৮৭৯ সন)। উহার রচয়িতা ছিলেন মুল্লাহ খাজেগী-এর ছাত্র মালিকুল উলামা কাদী শিহাবুদ-দীন আহ্মাদ ইব্ন শামসুদ-দীন ইব্ন উমার যাবিলী গায্নাবী দাওলাতাবাদী [(মৃ. ৮৪৯/১৪৪৫ সন) স্টোরী, ১খ., পৃ. ১০, ১১৯৩]। তিনি জৌনপুরের কাদী ছিলেন। উক্ত বৃহৎ তাফ্সীর গ্রন্থ জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহীম শাহ্ শার্কী-এর নামে উৎসর্গীত হইয়াছিল (তায্কিরা 'উলামা'-ই হিন্দ, পৃ. ৮৮ ; হাদাইকুল-হানাফিয়্যা, পৃ. ৩১৯; এক্সীর, পৃ. ৪৮, ১১৩ ; আল-বালাগুল-মুবীন, ৩খ., পৃ. ৮২-৮৫)। বাহ্র-ই মাওওয়াজ তাফ্সীর গ্রন্থে ব্যাকরণ সম্পর্কিত শব্দ সংযোজন-রীতি, ফিক্হ্ শাস্ত্রীয় মাস্আলাসমূহ ও 'আকীদা-বিশ্বাস বর্ণিত হইয়াছে। উহা উপমহাদেশে রচিত তাফ্সীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। বাহ্র-ই মাওওয়াজ রচিত হইবার পর হাকীম ফাত্হুল্লাহ শীরাযী (মৃ. ৯৯৭/১৫৮৮ সন) একখানা ফারসী তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন (তায্কিরা 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ১৬০; এক্সীর, পৃ. ১১৩)।

সম্রাট আওরঙ্গযেব (মৃ. ১১১৮/১৭০৭ সন)-এর রাজত্বকালে উপহাদেশে কয়েকখানা ফারসী ভাষায় তাফ্সীর গ্রন্থ রচিত হয়। উহাদের মধ্যে মুহাম্মদ আমীন সিদ্দীকী (স্টোরী, পৃ. ১৯) কর্তৃক রচিত তাফ্সীর-ই আমীনী এবং মির্যা নূরুদ-দীন আলী (নি'মাত খান, মৃ. ১১২১/১৭০৯ সন) কর্তৃক রচিত নি'মাত-ই উজ্মা (نعمت عظمى) এই দুইখানা তাফ্সীর গ্রন্থের বিবরণ পরিজ্ঞাত [স্টোরী, পৃ. ১৯২০; মুকাদ্দিমা তাফ্সীর-ই কুরআন (উর্দু), পৃ. ২৩৩; মুকাদ্দিমা তাফ্সীর-ই কুরআন [আরবী], পৃ. ৯৩] ১১৫১/১৭৩৮ সনে শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ (মৃ. ১১৭৬/১৭৬২ সন) "ফাত্হ্'র রাহ্মান বিতারজামাতিল-কুরআন" (فتح الرحمن بترجمة القران) নামক একখানা ফারসী অনুবাদসহ তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন [গ্রন্থটি একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে (স্টোরী, পৃ. ২০)]। পরবর্তী কালে তাঁহার পুত্র শাহ্ 'আবদুল-আযীয় দিহ্লাবী (মৃ. ১২৩৯/১৮২৪ সন) ফাত্হুল-'আযীয নামক একখানা ফারসী তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন যাহা তাফ্সীর আযীযী নামে সমধিক পরিচিত। উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থখানা ১২৪৮-১২৪৯/১৮৩২-১৮৩৪ সনে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় [স্টোরী, পৃ. ২৪; তায়কিরা 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ১২২; এক্সীর, পৃ. ৮৯; [উর্দু অনু. শেষ দুই পারা, বোম্বাইতে মুদ্রিত; প্রথম সূরা ও দ্বিতীয় সূরা-এর ১৮০ আয়াত পর্যন্ত বুস্তানুত-তাফসীর নামে বোম্বাইতে মুদ্রিত ১৩১৬/১৮৯৮ সন)]। পরবর্তী যুগে সায়্যিদ আবুল-কাসিম রিদ্বী কাশ্মীরী লাহোরী (মৃ. ১৩২৪/১৯০৯ সন) লাওয়ামিউত-তান্যীল ওয়া সাওয়াতি'উত-তা'বীল (لوامع التنزيل ونسواطع التاويل) নামে একখানা বৃহদায়তন ফারসী তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থখানা প্রকৃতপক্ষে কতগুলি তাফসীর গ্রন্থ, তাফ্সীর বিষয়ক বিভিন্ন বিতর্ক ও আলোচনা এবং আহ্লুস-সুন্নাহ ও শী'আ সম্প্রদায়ের মুফাস্সিরগণের তাফসীর বিষয়ক বিভিন্নরূপ উক্তি ও মতামতের সমষ্টি। লেখক প্রতিটি পারার তাফ্সীর খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে শুরু করেন। তাঁহারা পুত্র সায়্যিদ 'আলী হাইরী (মৃ. ২ জুমাদাল-আখিরা, ১৩৬০/২৮ জুন, ১৮৪১ সন) চতুর্দশ খণ্ড হইতে উহার রচনা কার্য আরম্ভ করেন। উহা ছিল তাঁহার জীবনের শেষ দিকের রচনা (স্টোরী, পৃষ্ঠা ৩০)।

(৩) **উর্দূ ভাষার তাফসীর গ্রন্থাবলী** ঃ উর্দূ ভাষার সর্বপ্রথমে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করেন হাকীম মুহাম্মাদ শারীফ খান (মৃ. ১২২২/১৮০৭ সন) ইবন মুহাম্মাদ আক্মাল খান (হামিদ হাসান, দাস্তান-ই তারিখ-ই উর্দূ, ২য় সং, ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৪৪)। ১২০৫/১৭৯০ সনে শাহ্ 'আবদুল-কাদির (মৃ. ১২৩০/১৮১৫ সন) ইব্ন শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ "মূদিহু'ল-কুরআন (موضح القران) নামক একখানা উর্দু তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে তাঁহার অনুজ শাহ্ রাফী'উদ-দীন (মৃ. ১২৩৩/১৮১৮ সন) উর্দু ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন (১ম মুদ্রণ ১২৫৪ হি., ২য় মুদ্রণ ১২৬৬ হি.)। ১২৫৩/১৮৩৭ সনে সায়্যিদ 'আলী মুজ্তাহিদ (মৃ. ১২৫৯/১৮৪৩ সন) ইব্ন সায়্যিদ দিল্দার 'আলী "তাওদীহুন মাজীদ ফী তানকীহি কালামিল্লাহ্হিল-হামীদ (توضيح مجيد فى تنقيح كلام الله الحميد) নামক একখানা সহজ-সরল উর্দু তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন। উহা লাক্ষ্ণৌতে মুদ্রিত হয় [সায়্যিদ আহ্মাদ, ওয়ারাছাতুল-আম্বিয়া', পৃ. ৪১; সিবতুল-হাসান, আল-ওয়াইজ সাময়িকী, পৃ. ১৮; 'আলী নাকী, মুকাদ্দিমা তাফ্সীরুল কুরআন (উর্দু), পৃ. ২৪৩; ঐ, মুকাদ্দিমা (আরবী), পৃ. ৯৯]। দাক্ষিণাত্যে কাদী বাদরুদ-দাওলা (মৃ. ১২৮০/১৮৬৩ সন) ইব্ন শ্যারাফুল-মুল্ক "ফায়দুল-কারীম" (فيض الكريم) নামক একখানা উর্দু তাফ্সীর গ্রন্থ রচনা করেন (দাস্তান-ই তারীখ-ই উর্দু, পৃ. ৪৬)।

আলোচ্য যুগটি কুরআন মাজীদের অনুবাদ ও তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেই যুগে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে 'উলামায়ে কিরাম কুরআন কারীমের অনুবাদ লিখন ও তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন। কারণ খৃস্ট ধর্ম প্রচারকগণ তাহাঁদের ধর্ম প্রচারের কলাকৌশল পরিবর্তন করত কুরআন মাজীদের বিকৃত অনুবাদ ও অপব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাবলী রচনায় তৎপর ছিল। সেই যুগে পাঞ্জাবে ইমামুদ-দীন খৃস্টান অমৃতসরী (মৃ. ১২৬০/১৮৪৪ সন) কুরআন মাজীদের বিকৃত উর্দু অনুবাদ লিখেন যাহা রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। ১৮৯৪ খৃ. পাদরী 'ইমামুদ-দীন রচিত কুরআন মাজীদের উর্দু অনুবাদটি ১৯০০ খৃ. রোমান হরফে লাক্ষ্ণৌতে মুদ্রিত হয়। সম্ভবত উক্ত কারণেই মুসলমানদের মধ্য হইতে তাজুল-উলামা' আলী মুহাম্মাদ (মৃ. ১৩১২ হি.) কর্তৃক লিখিত উর্দু অনুবাদকে (কুরআন মাজীদের আরবী পাঠ ব্যতীত) নাওয়াব হাজ্জী মুহাম্মাদ কুলী খান কানপুরী ১৩০৪/১৮৮৬ সনে লাক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ করেন।

সহজেই অনুমেয়, খৃস্টান ধর্মপ্রচারক ও পাদ্রীগণ তাহাদের অনুবাদসমূহ প্রকাশ করিবার পর অধিকতর সাহসী ও উৎসাহী হইয়া গিয়াছিল। খৃস্টান মিশনারীরা মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে খৃস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইসলাম ধর্মের অপবাদ প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে মু'জিযা, হাদীছ ও তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে তর্ক করিত। সম্ভবত উক্ত কারণেই স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ খান (মৃ. ১৩১৫/১৮৯৮ সন) "তাফসীরুল-কুরআন" নামক একখানা তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১২৯৭/১৮৮০ সনে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। উহার ছয় খণ্ড (সূরা আম্বিয়ার শেষ পর্যন্ত; ১৮৯৫ খৃ.) প্রকাশিত হইলে সমগ্র উপমহাদেশে উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইতে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সূরা জিন-এর তাফসীর, তাফসীরু'স-সামাওয়াত, ইযালাতুল-গায়ন 'আন কিস্‌সাতি যিল-কারনায়ন, তারকীমুন ফী কিস্‌সাতি আস্‌হাবিল-কাহ্‌ফি ওয়ার-রাকীম প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করেন।

'উলামায়ে কিরাম তাঁহার চিন্তাধারা, 'আকীদা-বিশ্বাস মতবাদ সম্বলিত রচনাবলীর বিরুদ্ধে উর্দু ভাষায় সমালোচনামূলক গ্রন্থাবলী, বিশষত তাফসীর গ্রন্থাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে সুনীপথের ধনাঢ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি 'আম্মার আলী (মৃ. সাফার ১৩০৪/অক্টোবর ১৮৮৬ সন) কর্তৃক "উম্‌দাতুল-বায়ান (عمدة البيان) নামক তাফসীর গ্রন্থ, দিল্লী ১৩০৭ হি., ৩খ. (A. S. Fulton ও A.G. Ellis, Suppl. Catal. of Arabic Printed Books, লন্ডন ১৯২৬ খৃ., স্তম্ভ ২৫১); রউফ 'আহ্‌মাদ নাক্‌শ্‌বান্দী কর্তৃক রচিত "তাফসীর রাউফী" (লাক্ষ্ণৌ ১৩০৫/১৮৮৭ সন); আমীর 'আলী রচিত "মাওয়াহিবু'র-রাহ্‌মান" (জামিউল-বায়ান) (লাক্ষ্ণৌ ১৩১৯/১৯০২ সন) ও 'আবদুল-হাক্‌ক হাক্‌কানী (মৃ. ১৩৩৫/১৯১৬ সন) রচিত "ফাত্‌হুল-মান্নান" (তাফসীর হাক্‌কানী, দিল্লী ১৮৮৮-১৮৯৩ খৃ.) নামক তাফসীর গ্রন্থ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তাফসীর হাক্‌কানীতে আয়াতসমূহের উর্দু তরজমা, শানে নুযূলের ব্যাকরণগত বর্ণনা এবং বিশদ তাফসীরসমূহ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উহাতে অন্তর্ভুক্ত তাসাউফ বিষয়ক তত্ত্বাবলী, উপদেশমূলক বর্ণনারীতি ও তার্কিকসুলভ যুক্তিরীতি অনুসরণের কারণে উক্ত তাফসীর গ্রন্থখানা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। পরবর্তীকালে নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন, ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, মুহাম্মাদ ইহ্‌তিশামুদ-দীন মুরাদাবাদী, তাফসীরুল কুরআন বিল-কুরআন (১৩১৮/১৯০১ সনে মুদ্রিত) ও হামাইলুত তাফসীর (১৯০৫ খৃ. মুদ্রিত) এই দুইখানা তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা 'আবদুল-হাকীম খান (মৃ. ১৯৪০ খৃ.) ও ওয়াহীদুয-যামান খান হায়দারাবাদী উর্দু ভাষায় তাফসীর গ্রন্থাবলী রচনা করেন এবং মির্যা হায়রাত, ইনশাউল্লাহ্‌ খান লাহোরী, ফাত্‌হ মুহাম্মাদ খান জলন্ধরী, ফীরূযুদ-দীন সিয়ালকোটী ও দারসুল-কুরআন নামক তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা মীর মুহাম্মাদ সাঈদ হায়দরাবাদী উর্দু ভাষায় কুরআন মাজীদের অনুবাদ করেন ও ব্যাখ্যামূলক টীকা লিখেন; কিন্তু তাঁহারা যে জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই, ডেপুটি নাযীর আহমাদ (মৃ. ১৩৩১/১৯২২ সন) স্বীয় অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরের কল্যাণে সেই জনপ্রিয়তা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। উক্ত তাফসীর গ্রন্থের দশম সংস্করণ কিয়ৎ পরিমাণ বিশদ আকারে "জামিউল-মাসাহিফ" (جامع المصاحف) নামে ১৩২৭/১৯০৯ সনে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য যুগের শীআ মতবাদী উর্দু তাফসীর (অনুবাদসহ) গ্রন্থ হইতেছে সায়্যিদ মুহাম্মাদ হুসায়ন (মৃ. ১২৯৪/১৮৭৭ সন) কর্তৃক রচিত তানবীরুল-বায়ান (تنوير البيان)। উহার প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল ও মুদ্রণালয়ের নাম উল্লিখিত হয় নাই। প্রথম সংস্করণের পর উহার দুইটি সংস্করণ আগ্রায় (১৮৯৫ খৃ. ও ১৯০৪ খৃ.) মুদ্রিত হইয়াছে। হাফিজ ফারমান 'আলী (মৃ. ১৩৩৪/ ১৯১৫ সন) কর্তৃক রচিত কুরআন মাজীদের সংক্ষিপ্ত টীকা (অনুবাদসহ) ১৩৩০/১৯১১ সনে প্রকাশিত হইলে উহা সকল মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতঃপর ১৩৩৫/১৯১৬ সনে হাজ্জী মাকবূল আহমাদ দিহলাবী (মৃ. ১৩৪০/১৯২১ সন)-এর অনুবাদ ও তাফসীর অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করে। মির্যা আহমাদ আলী, মুহাম্মাদ বাশীর, যূসুফ হুসায়ন, 'আলী নাকী ও মুহাম্মাদ সাদিককৃত অনুবাদ ও তাফসীরসমূহ সাম্প্রতিক কালের রচনা।

শায়খুল-হিন্দ মাহ্‌মূদুল হাসান (মৃ. ১৩৩৮/১৯১৯ সন) ও মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উছমানী (মৃ. ১৩৬৯/১৯৪৯ সন) কৃত তরজমা ও তাফসীরদ্বয় সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক হইবার কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। আফগান সরকার উচ্চ পর্যায়ের বিশেষ ব্যবস্থায় উক্ত তাফসীরদ্বয়ের ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (মৃ. ১৩৬৩/১৯৪৩ সন)-কৃত তরজমা এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীর, সায়্যিদ আবুল-আলা মাওদূদী রচিত তাফহীমুল কুরআন এবং মুফতী শফী' রচিত মা'আরিফুল কুরআন মনোজ্ঞ বর্ণনা রীতি ও বিষয়াবলীর উৎকর্ষের কারণে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই শেষোক্ত তিনখানা তাফসীর বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং বাংলাভাষী পাঠক মহলে ইহাদের পাঠক সংখ্যা সর্বাধিক।

উপরিউল্লিখিত তাফসীরসমূহ প্রকৃতপক্ষে রিওয়ায়াত ভিত্তিক তাফসীর এবং প্রকৃতপক্ষে পূর্বযুগীয় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে রচিত। উল্লিখিত তাফসীরসমূহের রচনাকাল ও উহাতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর বিভিন্নতার কারণে উহাদের প্রতিটির মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্য ও বৈচিত্র রহিয়াছে, তবে অতি আধুনিক মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারার প্রভাব উহাতে পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুত স্যার সায়্যিদ আহমাদ খানই সর্বাগ্রে স্বাধীন চিন্তা ও মন-মানসিকতার নিদর্শন প্রদর্শন করেন। [অবশ্য হককানী উলামায়ে কিরামের মতে তাঁহার তাফসীর গ্রন্থের বহু স্থানেই ইসলামী 'আকীদার পরিপন্থী বিবরণ রহিয়াছে] এবং অতঃপর মাওলানা আবুল-কালাম আযাদ, হামীদুদ-দীন ফারাহী, খাজা 'আবদুল হায়্যি; 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (মৃ. ১৯৪৪ খৃ.) ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই ক্ষেত্রে নূতনত্ত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। বস্তুত বর্তমানে উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদগণ যেই ধারণাগত বৈচিত্র্য ও গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে কুরআন মাজীদের তরজমা ও তাফসীর রচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন, আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে উহা তাফসীর বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকতর ফলপ্রদ ও কল্যাণকর বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

বর্তমান তাফসীর গ্রন্থাবলীর বিপুল সমাহার দেখিয়া সহজেই বলা যায় যে, উপমহাদেশে তাফসীর রচনার ক্ষেত্রে অল্পকালের মধ্যে যথেষ্ট কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। উপমহাদেশে কবিগণ কাব্যে কুরআন মাজীদের পূর্ণ তাফসীরও রচনা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ 'আবদুস-সালাম (মৃ. ১৩৫৭/১৯৩৮ সন) কর্তৃক রচিত যাদুল-আখিরাত (زاد الاخرة) (লাক্ষ্ণৌ; হাদাইক, পৃ. ৪৭৩) ও আগা শা'ইর কিযিলবাশ দিহলাবী (মৃ. ১৩৫৯/১৯৪০ সন) কর্তৃক রচিত কাব্যে তাফসীর (লাহোর ও

দাক্ষিণাত্যে মুদ্রিত)-এর নাম উল্লেখ্য। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকজন কবি কাব্যে কুরআন মাজীদের তাফসীর রচনার চেষ্টা করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বর্তমানেও উহার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইতেছেন।

(৪) **ইংরাজী ভাষায় তাফসীর গ্রন্থাবলী ঃ** বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মুসলিম সমাজে কুরআন মাজীদ ইংরাজীতে অনূদিত করিবার কার্য আরম্ভ হয়। আমাদের জানামতে সর্বপ্রথম ১৮৯৯ খৃ. কুরআন মাজীদের একটি ইংরাজী অনুবাদ শিয়ালকোট হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে অনুবাদকের নাম মুদ্রিত ছিল না (A.S. Fulton ও A.G. Ellis, ৫২৬ স্তম্ভ)। অতঃপর ১৩১৩/১৯০৫ সনে ড. 'আবদুল-হাকীম খান পাতিয়ালাবী তাঁহার রচিত ইংরেজী তাফসীর (অনুবাদসহ) প্রকাশ করান। উক্ত তাফসীর রচনায় তিনি কুরআন মাজীদের সাহায্যে কুরআন মাজীদের তাফসীর বর্ণনা করিবার নীতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। ১৩৩০/১৯১১ সনে মির্যা আবুল-ফাদ্ল এলাহাবাদী – J.M. Rodwell ও Noldeke-এর বিন্যাস পদ্ধতি ও তাফসীর বর্ণনার রীতি অনুসরণে কিয়ৎ পরিমাণ পার্থক্য সহকারে কুরআন মাজীদের সূরাসমূহকে উহাদের অবতরণের কালানুক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করত উহার ইংরাজী তরজমা ও সংক্ষিপ্ত টীকা প্রকাশ করেন (আজমাল খান, তারতীব-ই নুযূলে কুরআন মাজীদ, পৃ. ২৭)। তাঁহার উক্ত কার্য কোনও কোনও 'উলামা' মহল কর্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় (ড. আবদুল-হালীম আন-নাজ্জার, মাযাহিবুত-তাফসীরিল-ইসলামী, পৃ. ৩৪৬, কায়রো ১৩৭৪/১৯৫৫ সন)।

অতঃপর কুরআন মাজীদের আরও কয়েকটি ইংরাজী তরজমা প্রকাশিত হয় (দ্র. 'আবদুল্লাহ্ য়ূসুফ 'আলী, মুকাদ্দিমা তারজামা ওয়া তাফ্সীর, পৃ. ১৪)। ১৩৫০/১৯৩১ সনে বাদশাহ্ হুসায়ন সীতাপুরী কৃত ইংরেজী তর্জমা ও তাফ্সীর লাক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হয়। বাদ্শাহ্ হুসায়নের ইনতিকালের পর বিচারপতি সায়্যিদ ইফ্তিখার হুসায়ন (মৃ. ১৩৭১/১৯৫১ সন) শেষ পনের পারার ইংরাজী তরজমাসহ তাফ্সীর রচনাকার্য সম্পূর্ণ করেন। ১৩৫৩/১৯৩৪ সনে 'আবদুল্লাহ্ য়ূসুফ আলী (মৃ. ১৩৭৩/১৯৫৩ সন) রচিত বিশদ ইংরাজী তাফ্সীর (আরবী পাঠসহ) লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭-১৯৪৮ খৃ. শের আলী আহ্মাদী (মৃ. ১৩৬৬/১৯৪৭ সন) রচিত পনের পারার বিশদ ইংরাজী তাফ্সীর (আরবী পাঠ ও ইংরাজী তরজমাসহ) লাহোর হইতে প্রকাশিত হয় (অবশিষ্টাংশ হয়ত এতদিনে প্রকাশিত হইয়াছে)। খাদিম রাহ্মানী নূরীকৃত ইংরাজী তরজমা (টীকাসহ) লাহোর হইতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে (১৯৫৮ খৃ.)। মুহাম্মাদ মার্মাডিউক পিকথলকৃত ইংরাজী তরজমা (টীকাসহ) হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য হইতে ১৩৫৭/১৯৩৮ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত তরজমা ও তাফ্সীর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। শেঠ মুহাম্মাদ 'আলী জেব (মৃ. ১৩৭৮/১৯৫৯ সন)-কৃত ইংরাজী তরজমা (টীকাসহ) করাচীতে মুদ্রিত হইয়াছে। তবে মাওলানা 'আবদুল-মাজিদ দর্য়াবাদীকৃত ইংরেজী তরজমা ও তাফ্সীর যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

কুরআন মাজীদের উপরিউল্লিখিত ইংরেজী তর্জমা, টীকা ও তাফ্সীরসমূহ আধুনিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে রচিত। প্রত্যেক লেখকই নিজ নিজ চিন্তাধারা বিতর্কমুক্ত সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উহাতে তাফ্সীর গ্রন্থাবলীতে সাধারণত প্রচলিত দীর্ঘ কাহিনী অথবা দর্শনশাস্ত্রের জটিল তত্ত্বাবলী বর্ণিত হয় নাই। উহাতে বরং আধুনিক মনমানসিকতা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে আধুনিক চিন্তাধারার অনুসারী লোকদিগকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে সহজ সরল বর্ণনা-রীতিতে সহজ-সরল কথা, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বর্ণিত হইয়াছে। ১৯৩৯ খৃ. সাদ্রুদ-দীন আহমাদী কর্তৃক বার্লিন হইতে প্রকাশিত কুরআন মাজীদের জার্মান অনুবাদ ও ব্যাখ্যামূলক টীকাসমূহের কথাও এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য।

(৫) **অন্যান্য ভারতবর্ষীয় ভাষায় রচিত তাফ্সীর গ্রন্থাবলীঃ** উপমহাদেশে রচিত কুরআন মাজীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিন্দী তরজমা ও তাফ্সীর হইতেছে খাজা হাসান নিজামী (মৃ. ১৯৫৫ খৃ.) কর্তৃক প্রকাশিত তরজমা ও তাফ্সীর (দুই খণ্ডে সমাপ্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা বড় আকৃতির ৮৭২)। উক্ত তরজমা ও তাফ্সীরের বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার আরবী পাঠ হইতেছে সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত কুরআন মাজীদের অনুলিপির প্রতিলিপি বা প্রতিচ্ছবি। আরবী পাঠের পাশাপাশি মাওলাবী নাযীর আহমাদকৃত উর্দু তরজমা (হিন্দী বর্ণমালায়) এবং নিম্নে উহার হিন্দী তাফ্সীর প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দী তাফ্সীর কয়েকজন হিন্দী ভাষাবিদ পণ্ডিতের সহযোগিতায় রচিত হইয়াছে (দিল্লীতে মুদ্রিত)। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হিন্দী ও বাংলা তরজমার বিবরণ Sup. cat. of Ar, Printed Books in the Br. Mus., ১খ, ৩৮৮-৫২৮ স্তম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও কতগুলি তরজমা ও তাফ্সীর রচিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে ও পশ্চিম বঙ্গে বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের তাফ্সীর রচনার প্রতি পূর্ব হইতেই বিশেষ মনোযোগ প্রদান করা হইয়াছে। তামিল, মারাঠী, গুজরাটি, তেলেগু ও সিন্ধী ভাষায়ও তরজমা ও তাফসীর লিখিত হইয়াছে (সিবতুল হাসান, আল-ওয়াইজ সাময়িকী, পৃ. ১৭)। উক্ত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে 'আযীযুল্লাহ্ মুতাওয়াল্লী কর্তৃক সিন্ধী ভাষায় রচিত তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তাফ্সীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। উক্ত তাফ্সীর গ্রন্থ ১২৯৩/১৮৭৭ সনে বোম্বাইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরেকটি তাফ্সীরের নাম Sup. Cat. of Ar. Printed Books in the Br. Mus., ১খ., ৫৩৭ স্তম্ভ-তে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত তাফ্সীর ১৩১৭/১৯০০ সনে বোম্বাইতে মুদ্রিত হইয়াছে।

পশতু ভাষায় রচিত মাখাযিনু'ত-তাফ্সীর (সিবতুল-হাসান, আল-ওয়াইজ সাময়িকী, পৃ. ১৭), মুহাম্মাদ ইব্ন বারিকুল্লাহ্ কর্তৃক পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত তাফ্সীর মুহাম্মাদী (মুদিহ-ই ফুরকান) [১২৮৮-১২৯৭/১৮৭১-১৮৮০ সনে লাহোরে মুদ্রিত] (A.G. Ellis, Cat. of Ar. Books in the Br. Mus., ১খ., ৮৭৯ স্তম্ভ) এবং হিদায়াতুল্লাহ্ রচিত (পাঞ্জাবী?) অনুবাদ ও টীকার কথাও উল্লেখ করা যায়। উক্ত তরজমা ও তাফসীরসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (এতদ্সম্পর্কিত আরও তথ্যাবলীর জন্য দ্র. A.G. Ellis, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১খ., ৮৬৯ স্তম্ভ প.)। বাংলা ভাষায় আল-কুরআন-এর অনুবাদ ও তাফ্সীর গ্রন্থ সম্পর্কে দ্র. ই. বি. ৮খ (আল-কুরআন নিবন্ধ), ৬৭৪-৬৮৫।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A.G. Ellis, Catalogue of Arabic Books in the British Museum, লন্ডন ১৮৯৪ খৃ., বিভিন্ন স্থান দ্র. ; (২)

Alexander S. Fulton and A.G. Ellis, Supplementary Catalogue of Arabic Printed books in the British Museum. লন্ডন ১৯২৬ খৃ., বিভিন্ন স্থান দ্র.; (৩) C.A. Story, Persian Literature 1927 A.D., ১খ., পৃ. ১ প. ; (৪) যুবায়দ আহমাদ, The Contribution of India to Arabic Literature, এলাহাবাদ ১৯৪৬ খৃ. ; (৫) সায়্যিদ সিব্‌তুল-হাসান হানসাবী, মুখতালিফ মামালিক মে কুরআন কী ইশাআত আওর উস্‌কে তারাজিম, আল-ওয়াইজ সাময়িকীতে প্রকাশিত, লাক্ষ্ণৌ ডিসেম্বর ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৯-১৮; (৬) 'আলী নাকী, মুকাদ্দিমা তাফসীর-ই কুরআন (উর্দু), লাক্ষ্ণৌ ১৩৫৯-১৩৬০/১৯৪০-১৯৪১ সন; (৭) 'আলী নাকী, মুকাদ্দিমা তাফসীর-ই কুরআন (আরবী), লাক্ষ্ণৌ ১৩৫৪/১৯৩৫ সন; (৮) নাওয়াব সায়্যিদ মুহাম্মাদ সিদ্দীক হাসান খান, ইকসীর ফী উসূলিত-তাফসীর, কানপুর ১২৯০/১৮৭৩ সন; (৮) রাহমান আলী, তাযকিরা 'উলামায়ে হিন্দ, লাক্ষ্ণৌ ১৩১২/১৮৯৪ সন; (১০) ফকীর মুহাম্মাদ ঝীলামী, হাদাইকুল-হানাফিয়্যা, লাক্ষ্ণৌ ১৩২৪/১৯০৬ সন ; (১১) সায়্যিদ মুহাম্মাদ আহমাদ রিদা, মুকাদ্দিমাতু মুশ্‌কিলাতিল-কুরআন (আরবী), দিল্লী ১৩৫৭/১৯৩৮ খৃ.।

সায়্যিদ মুরতাদা হুসায়ন ও 'আবদুল মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/ মু. মাজ্‌হারুল হক

তাফীলাল্‌ত (تافيلالت) ঃ ফীলালী শব্দজাত, দ. পূ. মরক্কোর একটি জিলার নাম, ওয়াদী যীয উপত্যকা ক্রমে প্রশস্ত হইয়া ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ১২ মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল প্রশস্ত একটি পলিগঠিত সমভূমি ইহার অন্তর্গত; উহার বিভিন্ন স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে ২০০ কাসুর (বা কাদা দ্বারা নির্মিত সুরক্ষিত ঘর), সেইগুলির চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে বাগিচা ও চাষাবাদের জমি। যেইখানে কূপের পানি দিয়া সেচ সম্ভব সেইখানে মাটি আশ্চর্য উর্বরা। তাফীলাল্‌ত-এর প্রধান উৎপন্ন ফসল হইল খেজুর এবং যে শিল্পকারখানাটি সবচেয়ে বেশী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা হইল ছাগলের চামড়া পাকা করা, যাহা এক প্রকার গাছের বাকলের রস দ্বারা করা হয়। ফীলালী চামড়া বিখ্যাত এবং সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় উহার চাহিদা রহিয়াছে। জনসংখ্যা ঘন, তাফীলাল্‌তের কাসুরে ১৯২০ খৃ. প্রায় ১৫০০০০-২০,০০,০০০ লোক বাস করিত। তাফীলাল্‌ত -এর ঐতিহাসিক রাজধানী হইল সিজিলমাসা (তাফীলাল্‌ত-এর রাজনৈতিক ইতিহাস জানিবার জন্য উহা দ্র.)। এইখানে শুধু সংক্ষেপে বলা যায়, জিলাটি ছিল মরক্কোর 'আলীপন্থী শারীফ রাজবংশের উত্থান স্থান। উক্ত বংশকে ফীলালী শারীফও বলা হয়। এই পরিবারই এখন পর্যন্ত মরক্কো শাসন করিতেছে। এই পরিবারের অনেক শারীফ তাঁহাদের বংশে সিংহাসন লাভের পরে তাফীলাল্‌তে থাকিয়া যান অথবা আবার এইখানে ফিরিয়া আসেন, যাঁহাদের কয়েক হাজার এইখানে বর্তমানেও বসবাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বসবাস করেন মরক্কোর সুলতানের খলীফা যিনি মাখযেন কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি যীয উপত্যকাতেও সুলতানের প্রতিনিধি। সিজিলমাসা-র বর্তমানে শুধু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছোট ছোট শহর হইল তাফীলাল্‌ত, বুয়ামের কাসর যেইগুলি জিলার বাণিজ্য কেন্দ্র এবং তীগমারত, সেইখানে খৃ. ১৯শ শতকের শেষে সুলতান মাওলায় আল-হাসান এর আদেশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দ্র. নিবন্ধ জিসিলমাসা; (২) সাধারণ বিবরণ ও মানচিত্রের জন্য P. Ricard, Les Guides Bleus : Maroc. প্যারিস ১৯১৯ খৃ., পৃ. ২৮৫-৮৮।

E. Levis Proveucal (E.I. [1])/হুমায়ুন খান

তাব্‌রীয (تبريز) ঃ ইরানের সর্ব-উত্তর-পশ্চিমে একটি পলিমাটিসমৃদ্ধ সমতলভূমির (আয়তন ঃ ৩০ মাইল ×২০ মাইল) পূর্বকোণে তাব্‌রীয শহরটি অবস্থিত। এই সমতলভূমি পর্বতবেষ্টিত, তবে অদূরবর্তী উর্‌মিয়া হ্রদের উত্তর-পূর্ব কোণে ঈষৎ ঢালু। এই সমভূমির উপর দিয়া কতিপয় ছোট নদী বহমান, তন্মধ্যে প্রধানটির নাম আজি-চাই ("লোনা নদী"); ইহার পানি লবণাক্ত। আজি-চাই সাওয়ালান পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিত গাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া কারাজাদাগ পর্বত বরাবর প্রবাহিত সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়া তাব্‌রীযের উত্তর-পশ্চিম দিকের শহরতলীর পাশ দিয়া প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উরমিয়া হ্রদে (Lake Urmya) পড়িয়াছে। আজি-চাই-এর পূর্ব তীরবর্তী উপনদী মিহ্‌রান-রূদ (বর্তমানে ময়দান-চাই) সরাসরি শহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রুশ মানচিত্র অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তাব্‌রীযের বিভিন্ন মহল্লার উচ্চতা ৪,০০০ ফুট হইতে ৫,০০০ ফুট; শহরের সন্নিকটে উত্তর-পূর্ব দিকে 'আইনালি-যাইনালি (আওন ইব্‌ন আলী ও যায়দ ইব্‌ন আলীর যিয়ারাত) পর্বতের শৃঙ্গগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; সুউচ্চ (৬,০০০ ফুট) এই শৃঙ্গরাজি উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে প্রসারিত কারাজাদাগ পর্বতমালা এবং সাহান্দ পর্বতের পার্শ্বশৃঙ্গরাজির সহিত একটি সংযোগ রচনা করিয়াছে (শহর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে)। সাহান্দ-এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলির উচ্চতা ১১,৫০০ ফুট। যেহেতু কারাজাদাগ একটি খুবই বিরান ও পর্বতসংকুল এলাকা এবং সাহান্দ-এর বিশাল পর্বতস্তূপ তাব্‌রীয ও মারাগার মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা জুড়িয়া প্রসারিত, সেই কারণে তাব্‌রীয হইতে পূর্বে, পশ্চিমে ও উত্তরে যোগাযোগের একমাত্র উপযুক্ত সড়ক হইতেছে তাবরীযের উপর দিয়া। এই যোগাযোগ সড়কগুলি হইতেছে পূর্বে আস্তারা [কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী], আর্‌দাবীল, তাব্‌রীয ও তেহরান-কায্‌বীন-মিয়ানা-তাব্‌রীয, পশ্চিমে ত্রেবিযোন্দ-এর্‌যেরূম খোই-তাবরীয, উত্তরে তিফ্‌লীস-এরীওয়ান-জুল্‌ফা] মারান্দ-তাবরীয। ইহা ছাড়া যেহেতু উর্‌মিয়া হ্রদের পূর্ব তীরে প্রসারিত সাহান্দ পর্বতের শৃঙ্গগুলি হ্রদের কিনারে খুবই সংকীর্ণ স্থান খালি রহিয়াছে, সেইজন্য উত্তর (ট্রান্সককেসিয়া, কারাজাদাগ) ও দক্ষিণের (মারাগা, কুর্দিস্থান) মধ্যকার যোগাযোগ সড়কেরও তাব্‌রীযের উপর দিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এই সৌভাগ্যপূর্ণ অবস্থান তাব্‌রীযকে তুরস্ক ও রুশ-ট্রান্সককেসিয়ার মধ্যবর্তী বিশাল ও সম্পদশালী অঞ্চল আযারবায়জানের কেন্দ্রবিন্দুতে এবং কনস্টান্টিনোপ্‌ল ও পাকিস্তানের মধ্যে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ নগরীতে পরিণত করিয়াছে (কেবল তিফ্‌লীস, তেহরান, ইস্‌ফাহান ও বাগ্‌দাদ এই পর্যায়ে পড়ে)। ১৯৮৬ সালে তাব্‌যীযের লোকসংখ্যা ছিল ৯,৭২,০০০।

তাব্‌রীযের একটি বৈশিষ্ট্য হইল এইখানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে ২৪৪/৮৫৮ সালে ও ৪৩৪/১০৪২ সালে; এই শেষোক্তটির কথা নাসির-ই খুস্‌রাও তাঁহার সাফারনামা-এ

উল্লেখ করিয়াছেন এবং জ্যোতির্বিদ আবূ তাহির শীরাযী এই ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেন)। ১৬৪১ খৃ. (তাব্‌রীযের আরাকেল [Arakel of Tabriz], পৃ. ৪৯৬); ১৭২৭ খৃ.; ১৭৮০ খৃ. (Ousely, iii, 436; Ritter, ix. 854) ইত্যাদি। ২২-২৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৪ ও অক্টোবর ১৮৫৬ সংঘটিত ভূমিকম্পের বর্ণনা দিয়াছেন খানাইকাও (Khanaykow) তাঁহার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে, দ্র. Bull. Hist. Phil. de l'Acad.de Pelersburg,1855, p. 251; 1858, p. 337-52. হাল্‌কা ধরনের কম্পন তাব্‌রীযে নিত্য দিনের ঘটনা। এইসব কম্পন সাহান্দ পর্বতের আগ্নেয় ক্রিয়াকলাপের দরুন হইতে পারে, তবে খানাইকাও মনে করেন ভূ-স্তরের স্থানচ্যুতিই ইহার কারণ।

কাজার বংশীয় সুলতান নাসিরুদ-দীন শাহের রাজত্বকালে (১৮৪৮-১৮৯৬ খৃ.) তাব্‌রীয নগরীর দুর্গ-প্রাকারাদি ভাঙ্গিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া ফেলা হয় (মিরাআতুল-বুলদান, ১খ, ২৪৩)। ফলে শহরের কাল'আ নামে অভিহিত অংশটি [চার-মিনার, সুর্‌খাব, দাওয়াচি, ওয়াইজুয়া (সাধারণ ওয়ারজী), মিহান-মিহীন (সাধারণত মিয়ার-মিয়ার), নাওবার, মাক্‌সূদিয়া প্রভৃতি অঞ্চল] এখন আর পূর্বেকার প্রাচীরের অপর পার্শ্ববর্তী অংশ [আহ্‌রাব, লাইলাবাদ (সাধারণ লিলাভা), চারান্দাব, খিয়াবান, বাগমেশা প্রভৃতি অঞ্চল] পৃথক নাই। ইহা ছাড়া পশ্চিম দিকের আমীরখীয্‌, চুস্‌ত-দুযান, হুকামবা (সাধারণত হুক্‌মাওয়ার), কারা-মালিক, কারা-আগাজ, আখুনী, কূচাবাগ, খাতীব এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকের মারালান শহরতলীও শহরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাব্‌রীযে এখন পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তাব্‌রীয বর্তমানে পূর্ব আযারাবাইজান প্রদেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র এবং সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম আযারবাইজানের বিরাট অঞ্চলের অর্থনৈতিক কেন্দ্র। যুক্ত আযারবাইজান প্রদেশের বিভাগগুলি ছিল আর্‌দাবীল (আস্‌তারা, মুগান, প্রভৃতিসহ), কারাজাদাগ (প্রশাসনিক কেন্দ্র আহার), মারান্‌দ (জুল্‌ফা ও গারগারসহ), খোই, মাকূ, সালমাস, উরমিয়া (উশ্‌নুসহ), সাইন-কালআ, মারাগা, হাশ্‌তারূদ ও গার্‌মারূদ (প্রশাসনিক কেন্দ্র মিয়ানা), প্রারাব ও কেন্দ্রীয় তাব্‌রীয জিলা।

১৪শ শতাব্দীতে হামদুল্লাহ (তু. আওলিয়া, ২খ, ২৫৭) কেন্দ্রীয় তাব্‌রীয় জিলা (তুমান)-এর অন্তর্গত মহকুমাগুলির নিম্নোক্ত তালিকা দিয়াছেনঃ মিহ্‌রান-রূপ, শহরের পূর্বদিকে, সার্‌দারূদ, শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক, বাবিল-রূদ(?), সারদারূদ-এর দক্ষিণে (খুস্‌রাও-শাহ্‌ উস্‌কূয়া ও মীলান পল্লীগুলিসহ), আর্‌ওয়ানাক; উর্‌মিয়া হ্রদের উত্তর-পূর্বে (শাব্‌িসতার, সোফিয়ান প্রভৃতি গ্রামসহ), রূদকাব (?), খানুম-আবাদ(?) ও বাদূস্‌তান (?)–তিনটিই শহরের উত্তরদিকে অবস্থিত। ২০শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত পুরাতন কেন্দ্রীয় তাব্‌রীয জিলার এই সীমানা অপরিবর্তিত ছিল।

নাম ঃ য়াকূতের (১খ, ৮২২) মতে এই নগরীর নামের উচ্চারণ তিব্‌রীয। এই মতের সপক্ষে প্রমাণস্বরূপ য়াকূত জনৈক আবূ যাকারিয়্যা আত-তাব্‌রীযী-র [আবুল-'আলা' আল-মাআর্‌বী-র (হি. ৩৬৩-৪৪৯) ছাত্র] নাম উল্লেখ করিয়াছেন ; তাঁহার সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি স্থানীয় ইরানী কথ্য ভাষায় কথা বলিতে পারিতেন (তু. আস্‌-সাম্‌আনী, কিতাবুল-আন্‌সাব, G.M.S; দ্র. নিবন্ধ তানূখী ও সায়্যিদ; আহমাদ কিসরাবী তাব্‌রীযী আযারী য়াসাবান-ই বাস্‌তান-ই আযারবাইযান, তেহরান ১৩০৪ হি., পৃ. ১১)। 'তিব্‌রীয' উচ্চারণ এই কথ্য ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হইবে নিশ্চয়ই, 'কাসপিয়ান" (Caspian) বলিয়া অভিহিত কথ্য ভাষাগুলির সহিত এই ইরানী কথ্য ভাষাটির সম্পর্ক রহিয়াছে। শব্দটির একমাত্র আধুনিক উচ্চারণ হইল ঃ তাব্‌রীয (অথবা তাব্‌রীয; শব্দের অক্ষর ও ধ্বনির স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন শব্দ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া বর্তমানে সমগ্র আযারবায়জানে সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রভাবশালী তুর্কী কথ্য ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য)। আর্মেনীয় উৎসহসমূহে জবর ( ) দ্বারা শহরের নামের উচ্চারণ, অর্থাৎ তাব্‌রীয সমর্থিত হইয়াছে। বায়যানটিয়ামের ফাউস্টাস (Faustus of Byzantium, খৃ. ৪র্থ শতাব্দী) থাভ্‌রেশ ও থাভরিশ (Thavrez and Thavresh), আসোলিক (Asolik) [খৃ. ১১শ শতাব্দী]-থাভ্‌রিয (Thavrez), ভার্দান (Vardan) [খৃ. ১৪শ শতাব্দী]-থাভ্‌রিয ও দাভরিয (Thavrez and Davrvez) উচ্চারণ উপস্থাপন করিয়াছেন ; দাভ্‌রিয' রূপটিতে দৃশ্যত একটি জনপ্রিয় আর্মেনীয় শব্দপ্রকরণ অনুসৃত হইয়াছে। উহা হইল daivrez, "that is for vengeance" অর্থাৎ "ইহা সমুচিত প্রতিশোধের জন্য"; তু. Camcan, History of Armenia, Venice 1784, i, 365; Habschmann, Armen, Gramm., i, 42; ঐ, Persian Stud., p. 179.। সুতরাং দেখা যাইতেছে, খৃ. ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে আর্মেনিয়ায় এই শহরটির নাম ছিল থাভ্‌রিয, ফার্‌সী তাভ্‌রিয হইতে, Thavrez<Pers. Tavrez (Hubschmann)। প্রচলিত ফার্‌সী শব্দপ্রকরণ অনুসারে 'তাব্‌রীয' শব্দের অর্থ জ্বর কমান (=অদৃশ্য হওয়া)। (আওলিয়া চেলেবিঃ sitma dokudju)। তবে ইহাও সম্ভব যে, সাহান্‌দ পর্বতের অগ্ন্যুৎপাত ক্রিয়ার সহিত কোনরূপ সম্পর্কযুক্ত করিয়াই এই তাব্‌রীয নাম রাখা হইয়াছে, যাহার অর্থ হইল "যাহা তাপকে অদৃশ্য করে বা উহার অবসান ঘটায়" (তু. বায়াযীদ ও ভ্যান-এর মধ্যবর্তী গিরিপথটির নাম ঃ তাপারীয)। আর্মেনীয় বানানে ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় পাহ্‌লাবী ভাষার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। যথা তাপ হইতে তাও (taw<tap) বিশেষত রিচ (rez)-এর পরিবর্তে rez। ইহাতে মনে হয়, তাব্‌রীয নামের মূল উৎস হয়ত আরও প্রাচীন হইতে পারে, প্রাক্‌-সাসানী এবং সম্ভবত প্রাক-আরসাকীও হইতে পারে (বারংবার তুর্কী আক্রমণের ফলে আযারবাইজানে যে সমস্ত ভাষাগত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ঐ সম্পর্কে দ্র. নিবন্ধ TAT, E.I.)।

ইতিহাস ঃ তাব্‌রীযকে কোন প্রাচীন নগরী মীডিয়া (Media) সনাক্ত করায় ইতিহাসবিদদের মধ্যে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে (তু. Rither, ix, 770-779-এ প্রদত্ত সংক্ষিপ্তসার)। উপরে তাব্‌রীয নামটির রূপের যে বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে উহার ফলে টলেমির (Ptolemy, vi, ch. 2) বর্ণনা অনুসারে [Tabriz (gabriz), from Tabriz] তাব্‌রীয ও গাব্‌রীয' অভিন্ন হওয়ার সম্ভাব্যতা হ্রাস পাইয়াছে। রাওলিনসন (Rawlinson, Memoir on the site of the Atropatenian, Ecbatena, F.R.G.S., 1840, x, p.107-111) তাঁহার বিশ্লেষণে তাব্‌রীয ও গান্‌জা আল-শীয (ganza-al Shiz)-এর মধ্যকার বিভ্রান্তি চূড়ান্তরূপে অপসারণ করিয়াছেন (আর্মেনীয় ভাষায় "গান্‌দযাক শাহাস্‌তান" ও 'যাভরিয'-এর বিভিন্নতা দেখাইয়াছেন বায়যানটিয়ামের ফাউস্টাস)।

১৪শ শতাব্দীর আর্মেনীয় ঐতিহাসিক ভার্দান (Vardan)-এর মতে প্রথম সাসানীয় (Sasanian) বাদশাহ আরদাশীর (Ardashir,

২২৪-২৪১ খৃ.) শেষ পার্থিয়ান (Parthian) বাদশাহ আর্‌দওয়ান (Artabanus)- কে হত্যা করায় আর্দাশীর-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্বরূপ আশরাকী বংশীয় আর্মেনীয় নৃপতি খোস্‌রো (Arshakid Armenian Khosraw, ২১৭-২৩৩ খৃ.) পারস্যের ভূখণ্ডে তাব্‌রীয নগরী প্রতিষ্ঠা করেন; তু. St. Martin, Memorres sur l'Marmenie, i, 423, এই কাহিনী কোন প্রাচীন তথ্য-উৎসে পাওয়া যায় না, সম্ভবত উপরে বর্ণিত 'তাব্‌রীয' শব্দের সুপ্রচলিত শব্দপ্রকরণই এই কাহিনীর উৎস। বায়যানটিয়ামের ফাউস্টাসের গ্রন্থে (অনু. Lauer, iv, Ch. 25, 39; v, Ch. 2) শুধু বলা হইয়াছে যে, আর্মেনিয়ার দ্বিতীয় আরশাকের (Arshak II) রাজত্বকালে (খৃ. ৩৫১-৩৬৭) আর্মেনীয় সেনানায়ক ওয়াসাক (Wasak) যাভ্‌রিযস্থিত শিবিরে অবস্থানরত সাসানী বাদশাহ দ্বিতীয় শাপুরকে (৩০৯-৩৭৯ খৃ.) আক্রমণ করেন। পরে ওয়াশাক সেইখানে পারস্য সেনাপতি বয়েকান (Boyekan)-কে হত্যা ও শাহী প্রাসাদে অগ্নিদগ্ধ করেন এবং তথায় স্থাপিত পারস্যের বাদশাহের মূর্তি তীরবিদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে ওয়াসাকের পুত্র মুশেগ (Musheg) তাব্‌রীযে পারসিক সৈন্যদিগকে পরাজিত করেন।

খৃ. ৬১৪ সালে সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius) গানযাকা (Ganzaka) বিধ্বস্ত করার পর থেবারমেইস (Theophamus) নামক যে শহর ও উহার অগ্নিমন্দির অগ্নিদগ্ধ করেন, থাভ্‌রিসের সহিত উহার (অর্থাৎ থিবারমেইস-এর) নামের কোন বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে কিনা তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই।

আরব শাসনামল ঃ আরবদের আযারবায়জান বিজয়কালে (২২/৬৪২ সালের কাছাকাছি) তাহাদের মুখ্য অভিযানগুলি পরিচালিত হয় আর্‌দাবীলের বিরুদ্ধে। এই সময় পারসিক নেতা মার্‌যুবান যে সমস্ত শহর হইতে তাঁহার সৈন্য সংগ্রহ করেন উহাদের মধ্যে তাব্‌রীযের উল্লেখ নাই (বালাযুরী, পৃ. ৩২৬) । ফাউস্টাস যে ধ্বংসযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেন উহার পর তাব্‌রীযের অবস্থা নিশ্চিতরূপেই একটি গ্রামের পর্যায়ে নামিয়া গিয়াছিল (তু. য়াকূত)। পরবর্তীকালে খলীফা হারূনুর-রাশীদের স্ত্রী যুবায়দা কর্তৃক ১৭৫/৭৯১ সালে তাব্‌রীয 'নির্মাণের' কাহিনীর (নুযহাতুল কুলূব, ৭৩০/১৩৪০) ভিত্তি সম্ভবত এই যে, উমায়্যাদের জায়গীরসমূহ ভাগ-বাটোয়ারার ফলে যুবায়দা ওয়ারছান (আযারবায়জানে আরাস নদী তীরবর্তী) এলাকাটি লাভ করেন। বালাযুরী (পৃ. ৩৩১) ও ইব্‌নুল-ফাকীহের (পৃ. ২৮৫) মতে (তু. য়াকূত, ১খ, ৮২২) তাব্‌রীয পুনঃনির্মাণ আর-রাওওয়াদ আল-আযদীর পরিবারের, বিশেষত আর-রাওয়াদ আল-আযদী-র পুত্র ওয়াজ্‌না ও অন্যান্য পুত্রের কীর্তি ; শহরের চারদিকে বেষ্টনী প্রাচীর তাঁহারাই নির্মাণ করেন। তাবারী, (৩খ, ১১৭১=ইবনুল-আছীর, ৬খ, ৩১৫) বাবাক (হি. ২০১-২২০)-এর বিদ্রোহের বর্ণনা প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ ইব্‌ন বা'ঈছ নামের জনৈক বিজেতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন দুইটি দুর্গ-প্রাসাদের মালিক। উহাদের একটি হইল শাহী, যাহা তিনি আল-ওয়াজ্‌না-র নিকট হইতে অধিকার করেন ; অপরটি তাব্‌রীযী (ইহার সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ দেওয়া হয় নাই)। 'শাহী' প্রাসাদটির পরিসর ছিল ২ ফারসাখ (১ ফারসাখ=প্রায় ৬ কিলোমিটার)। ইহা ছিল তাব্‌রীয প্রসাদ অপেক্ষা বেশী মজবুত [তু. তাব্‌রীযের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উর্‌মিয়া হ্রদের তীরবর্তী উপদ্বীপটির নাম শাহ্ বা শাহী; কিন্তু বালাযুরীর মতে, পৃ. ৩৩০, বাঈছ-এর জায়গীর ছিল মারান্‌দ]।

ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহের গ্রন্থের (পৃ. ১১৯) রচনাকালে (২৩২/৮৪০ সাল) তাব্‌রীযের মালিক ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্‌নুর-রাওওয়াদ। হি. ২৪৪ সনে এক ভূমিকম্পে শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; তবে খলীফা আল-মুতাওয়াক্‌কিলের শাসনকাল (হি. ২৩২-২৪৭) শেষ হওয়ার পূর্বেই উহা পুনর্নির্মিত হয়। তাব্‌রীয এই সময় কয়েকবার হাতবদল হয় বলিয়া মনে হয়। কারণ আল-ইসতাখ্‌রী-র (পৃ. ১৮১) বর্ণনানুসারে (হি. ৩৪০ সালের কাছাকাছি) তাব্‌রীয, জাব্‌রাওয়ান (বা হিদ-খার্‌রাকান?) ও উস্‌নূহ (দ্র.) লইয়া গঠিত। ইহার শাসক উপজাতির নামানুসারে ভূভাগটির নাম হয় বানূ রুদাইনী। কিন্তু ইব্‌ন হাওয়াকালের (পৃ. ২৮৯) সময়ের (হি. ৩৬৭ সনের কাছাকাছি) পূর্বেই বানূ রুদাইনী অদৃশ্য হইয়া যায়। এইসব ভূস্বামী কার্যত স্বাধীনভাবে তাঁহাদের ঐ সমস্ত এলাকা শাসন করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কারণ যে সাজিদিয়া বংশ হি. ২৭৬-৩১৭ পর্যন্ত আযারবায়জানের অধিপতি ছিলেন তাঁহাদের ইতিহাসে তাব্‌রীযের ব্যাপারে তাঁহাদের হস্তক্ষেপের কোন উল্লেখ নাই (তু. Defremery, Mem. sur La famile des Sadjides, F. A., 1847)। এই বংশের রাজধানী ছিল প্রথমে মারাগা, পরে আরদাবীল (ঐ গ্রন্থ, পুনর্মুদ্রণ, পৃ. ২৫, ৪১, ৪৭, ৫৭, ৭৭)।

সাজিদীয়দের অন্তর্ধানের পর আযারবায়জান বহু বিরোধের রণাঙ্গনে পরিণত হয়। যিয়ারী বংশীয় শাসকদের মার্‌দাবীজের আমলের জনৈক প্রাক্তন গভর্নর লাশ্‌কারী ইব্‌ন মার্‌দী হি. ৩২৬ সনে প্রদেশটি অধিকার করেন। কুর্দী নেতা দায়সাম (Daisam, [তু. কুর্দী উপজাতিগোষ্ঠী) কর্তৃক তিনি বিতাড়িত হন। অচিরেই দায়লামী মুসাফিরী (দ্র.)-দের সহিত দায়সামের বিরোধ বাধে। তাব্‌রীযের জনসাধারণ দায়সামকে তাহাদের শহরে আমন্ত্রণ জানাইলে মুসাফিরী বংশীয় আল-মারজুবান অবিলম্বে শহরটি অবরোধ করেন। অবশেষে দায়সাম তাব্‌রীয ছাড়িয়া যান এবং আযারবায়জানের সকল শহরে আল-মার্‌জুবানের শাসন জারি করা হয় (হি. ৩৩০ সনের কাছাকাছি)।

মুসাফিরী বংশের শাসনের কিভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে তাহা খুব স্পষ্ট নহে। হুয়ার্ট (Huart) তাঁহার Les Musafirides de 1. Adharbaidjan, in Volume ... presented to E.G. Browne, Cambridge 1922 শিরোনামের রচনাকর্মে বলিয়াছেন যে, হি. ৪৩৮ সালেই মুসাফিরীদের শাসনের সর্বশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় তারোম (Tarom) নামক স্থানে ; কিন্তু স্যার ই.ডি.রস (Sir E.D. Ross) তাঁহার গ্রন্থে (On 3 Muhamm. dynasties, Asia Major, 1925, ii. p. 212-215) মুসাফিরীদের সহিত রাওয়াদী পরিবারকে সম্পর্কযুক্ত করিয়াছেন, হি. ৪৪৬ সন পর্যন্ত যাহাদের তাব্‌রীযে উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ইহাও সম্ভব যে, এই রাওয়াদীরা হয়ত তাব্‌রীয পুনর্নির্মাতার পিতার আল-রাওওয়াদ আল-আয্‌দীর বংশধর ছিল এবং (অন্তর্বিবাহ ব্যতীত) দায়লামী মুসাফিরীদের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক ছিল না। নিম্নোক্ত ঘটনাবলী এই রাওয়াদীদের সহিত সম্পর্কযুক্ত ঃ হি. ৪২০ সালে ওয়াহ্‌সুদানে ইব্‌ন মাহ্‌লান (মাম্‌লান?) বহু সংখ্যক গুয্য সরদারকে তাব্‌রীযে হত্যা করান (ইবনুল-আছীর, ৯খ, ২৭৯), হি. ৪৩৪ সনে এক ভূমিকম্পে তাব্‌রীয ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার আমীর (সম্ভবত একই ব্যক্তি) আল-গুয্য আস্‌-সাল্‌জূকীয়ার ভয়ে সদলবলে তাঁহার অন্যান্য দুর্গে সরিয়া যান (ঐ গ্র., পৃ. ৩৫১)। হি. ৪৩৮ সনে নাসির-ই খুসরাও তাবরীযে এক নৃপতির সাক্ষাত পান। তাঁহার নাম সায়ফুদ দাওলা ওয়া শারাফুল মিল্লা আবূ মানসূর ওয়াহ্‌সুদান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (মামলান?)-মাওলা আমীরুল মুমিনীন' হি. ৪৪৬ সালে তাবরীয অধিপতি আল-আমীর আবূ মানসূর ইবন মুহাম্মাদ আল-রাওয়াদী-র সুলতান তুগরিযের বশ্যতা স্বীকার করেন (পৃ. গ্র., ৯খ., ৪১০)।

হিজরী প্রথম কয়েক শতাব্দীতে তাবরীয খুররাদাযবিহ (পৃ. ১১৯), বালাযুরী (পৃ. ৩৩১), তাবারী (পৃ. ১১৭১), ইবনুল-ফাকীহ (পৃ. ২৮৫) এবং এমনকি আল-ইসতাখরী (পৃ. ১৮১) তাবরীযকে আযারবায়জানের একটি ক্ষুদ্র শহর বলিয়া উল্লেখ করিলেও অপরদিকে আল-মুকাদ্দাসী এই শহরের প্রশংসা করিয়াছেন। আর তাঁহার সমসাময়িক ইবন হাওকাল (৩৬৭/৯৭৮ সালের কাছাকাছি) তাবরীযকে আরমানীর (আর্মেনিয়ার) শিল্পজাত পণ্যের বাজার ও ব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে আযারবায়জানের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী নগরী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইবন মিসকাওয়ায়হ (মৃ. ৪২১/১০৩০) তাবরীযকে একটি মজবুত প্রাচীরবেষ্টিত, বনরাজি ও বাগ-বাগিচায় ঘেরা মহান নগরী এবং ইহার বাসিন্দাদিগকে "সাহসী, রণনিপুণ ও সম্পদশালী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। নাসির-ই খুসরাও-এর বর্ণনা অনুসারে হি. ৪৩৮ সনে তাবরীয শহরটির আয়তন ছিল ১,৪০০×১,৪০০ পদক্ষেপ অর্থাৎ এক বর্গমাইলের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা।

সালজূকী আমল ঃ সুবিখ্যাত সালজূক বংশীয়দের ইতিহাসে তাবরীযের উল্লেখ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এই শহরের নিকটে সুলতান তুগরিল খলীফার কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহোৎসবের আয়োজন করেন (রাহাতুস-সুদূর, পৃ. ১১১)। স্বীয় ভ্রাতা মুহাম্মাদের সহিত বিরোধের সময় সুলতান বারকিয়ারুক হি. ৪৯৪ সালে তাবরীযের দক্ষিণ পার্বত্য অঞ্চলে সরিয়া যান। কিন্তু দুই ভ্রাতার মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার শর্ত হিসাবে তাবরীয মুহাম্মাদের অধিকারে আসে। মুহাম্মাদ জনৈক সা'দুল-মুলককে তথায় উযীর নিযুক্ত করেন (হি. ৪৯৮)। হি. ৫০৫ সনে আল-আমীর সুকমান আল-কুতবীকে তাবরীযের অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ ইনি ছিলেন আরমেনিয়ায় শাহী বংশের (শাহ আরমান) প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের নৃপতিগণ হি. ৪৯৩-৬০৪ সাল পর্যন্ত আখলাতে রাজধানী স্থাপন করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

হামাদানে রাজধানী স্থাপনকারী সালজূক বংশের ইরাকী শাখার অধীনে আযারবায়জান অধিকতর গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করে। হি. ৫১৪ সালে সুলতান মাহমূদ তাবরীযে আসিয়া কিছুকাল অবস্থান করেন এবং জর্জিয়াবাসীদের একাধিক আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত তাবরীযীগণকে অভয় দেন। এই সময় আযারবায়জানের আতাবেক (সুলতান অনুমোদিত অর্ধ-স্বাধীন শাসক) ছিলেন কুন-তোগদি। তাঁহার ইনতিকালের (হি. ৫১৫ সাল) পর মারাগার আমীর আক-সুনকুর আহমাদীলী সুলতানের ভ্রাতা তুগরিলের নিয়ন্ত্রণ হইতে তাবরীয ছিনাইয়া লওয়ার এক প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু এই ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হয়। মাহমূদ মাওসিলের আমীর জুয়ূশকে আযারবায়জানে নিয়োগ করেন। কিন্তু হি. ৫১৬ সালে তাবরীযের ফটকে জুয়ূশ নিহত হন। হি. ৫২৫ সালে সুলতান মাহমূদের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা তাবরীয অধিকার করেন। কিন্তু মাহমূদের পুত্র দাউদ সেইখানে তাঁহাকে অবরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত দাউদ নিজেকে তাবরীযে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন এবং এই শহর হইতে আযারবায়জান, আররান ও আর্মেনিয়া লইয়া গঠিত এক বিশাল জায়গীর শাসন করেন (হি. ৫২৬-৫৩৩)। পরে আযারবায়জান ও আররানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় প্রথম তুগরিলের পুরাতন ভৃত্য আতাবেগ কারা- সুনকুরের উপর। মনে হয়, তাঁহার রাজধানী ছিল আরদাবীলে (ইবনু'ল-আছীর, ১১খ, ৫২)। হি. ৫৩৫ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর আমীর জা'উলী (=চাওলি) আত-তুগরিলী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন; কিন্তু অচিরেই দেখা গেল আতাবেগ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইলদিগীয আযারবায়জানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এই বংশ হি. ৬২২ সাল পর্যন্ত এই প্রদেশ শাসন করে। প্রথমত ইলদিগীযদের শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল আযারবায়জানের উত্তর-পশ্চিমে, তখন তাবরীয মারাগা-র আহমাদীলী আমীরদের দখলে ছিল। অতঃপর হি. ৫৭০ সালে আতাবেগ পাহলাওয়ান ইবন ইলদিগীয তাবরীযকে আক-সুনকুর ইবন আহমাদীলীর পৌত্র ফালাকু'দ-দীনের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া তাঁহার ভ্রাতা কিযিল আরসলানকে অর্পণ করেন। কিযিল আরসলান আতাবেগ থাকাকালেই (৫৮২-৫৮৭ হি.) তাবরীয নিশ্চিতরূপে আযারবায়জানের রাজধানীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

হি. ৬২০ সালে আমীর কারা-সুনকুর 'আলা'উদ-দীন আহমাদীলী আরদাবীলের আতাবেগের সহিত যোগসাজশে কিযিল আরসলানের উত্তরসুরি আমূদে আবূ বাকর-এর নিকট হইতে তাবরীয পুনরাধিকারের চেষ্টা চালান। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং কারা- সুনকুর মারাগা হারান।

নিজামী ও খাকানীর ন্যায় প্রতিষ্ঠিত কবিদের রচিত ইলদিগীযীদের প্রতি নিবেদিত প্রশস্তিমূলক কবিতা হইতে ধারণা করা যায় যে, এই বংশের শাসকগণ খুব আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের আমলের ভবনাদির মধ্যে শুধু নাখচিওয়ানে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষের কথা জানা যায়। তাঁহাদের বংশধররা যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খুব দুর্বল ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় জর্জিয়ার ইতিবৃত্তে বর্ণিত ৬০৫-৬০৮/১২০৮-১২১০ সালের একটি ঘটনার বিবরণ হইতে। ইহাতে বলা হইয়াছে, রানী থামার (Thamar)-এর দুই সেনাপতি ইওয়ান (Iwane) জাখারে (Zakhare) এক ঘোরতর বিপজ্জনক লুণ্ঠন অভিযানে বাহির হইয়া সমগ্র উত্তর পারস্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া জুরজান-এ পৌছান। মারান্দ হইতে আগত জর্জীয় সৈন্যরা তাবরীযের (Thawrez=থাওরিয) জনসাধারণের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করে, তবে অন্য কোনভাবে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নাই। লুণ্ঠনকারী সৈন্যরা ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র সেনাদল তাবরীয শহরে অপেক্ষা করিতে থাকে। কোন মুসলিম উৎসে এই ঘটনার উল্লেখ নাই, তবে ঘটনাটি যেইরূপ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কিছুটা বিশ্বাস জন্মে (তু. Brosset, Histoire de la Georgie, i, 470)।

মোংগল আক্রমণঃ হি. ৬১৭ সালের শীতকালে মোংগল আক্রমণকারীগণ তাবরীযের প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। অযোগ্য আতাবেগ উযবেক ইবন পাহলাওয়ান বিপুল অর্থ মুক্তিপণ দিয়া তাহাদের প্রস্থান নিশ্চিত করেন। পরের বৎসর মোংগলরা পুনরায় হানা দেয়। আতাবেগ নাখচিওয়ানে পলায়ন করেন। কিন্তু সাহসী বীর শামসু'দ-দীন আত-তুগরা'ঈ এক প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন, মোংগলরা মুক্তিপণ লইয়া প্রস্থান করিলে উযবেক তাবরীযে ফিরিয়া আসেন। হি. ৬২১ সালে মঙ্গোলিয়া হইতে আগত নূতন একদল মোংগল আক্রমণকারী উযবেকের নিকট দাবি জানায় তাবরীযে অবস্থানকারী সকল খাওয়ারিযমীকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে; উযবেক দ্রুত এই দাবির নিকট নতি স্বীকার করেন।

জালালুদ-দীন ঃ এই পরিস্থিতিতে খাওয়ারিযম-শাহ জালালু'দ-দীন শীঘ্র মারাগা হইতে তাবরীযে আসেন এবং ২৭ রাজাব, ৬২২ সালে উযবেক কর্তৃক পুনরায় পরিত্যক্ত শহরটিতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন। নগরবাসীরা জালালু'দ-দীনের ন্যায় একজন সাহসী রক্ষক পাইয়া খুবই আনন্দিত হয়, বিশেষত শীঘ্রই তিফলিসের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক অভিযানে এবং আইওয়া (আল-আইওয়া'ইয়া) উপজাতির লুটেরা তুর্কমানদের শাস্তি বিধানের মধ্য দিয়া প্রকাশিত তাঁহার তেজস্বিতা দেখিয়া। জালালু'দ-দীন উযবেকের প্রাক্তন স্ত্রী মালিকাকে বিবাহ করেন

এবং ৬ বৎসর তাবরীয নগরী দখলে রাখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার একাধিক ব্যর্থতা ও ব্যক্তিগত অন্যায় আচরণ (ইবনুল আছীর, ১২খ, ৩২৩) তাঁহাকে গুরুতরভাবে দুর্বল করিয়া ফেলে। হি. ৬২৭ সালেই কুশ-য়ালওয়া (?) উপজাতির জনৈক তুর্কমান সরদার (মারাগার নিকটবর্তী রূয়ীনদিযের প্রধান) তাবরীযের আশেপাশে লুটতরাজ চালাইতে সাহসী হয়। হি. ৬২৮ সনে জালালু'দ-দীন আযারবায়জান ছাড়িয়া যান এবং মোংগলরা তাবরীয নগরীসহ সমগ্র প্রদেশটি জয় করিয়া লয়-যে "তাবরীয হইল দেশের অন্তস্থল (আসল); [কারণ] সকলেই ইহার ও ইহার বাসিন্দাদের উপর নির্ভরশীল" (ইবনুল আছীর, ১২খ, ৩২৮)। মোংগলদের 'মালিক' (জুরমাগুন-নইন) আযারবায়জানের আমীর-উমারাকে তাঁহার দরবারে ডাকিয়া পাঠান (একমাত্র শামসু'দ-দীন আত-তুগরা'ঈ এই আহ্বানে সাড়া দেন নাই), তাঁহাদের নিকট হইতে মোটা অংকের খেসারত আদায় করেন, মহান বাদশাহের (=উগেদি) ব্যবহারের জন্য তাঁতীদিগকে খাতা'ঈ বস্ত্র বয়নের নির্দেশ দেন এবং দেয় বার্ষিক করের পরিমাণ ধার্য করেন। মোংগল নেতা গুয়ুক- এর সময় হইতেই আররান ও আযারবায়জানের শাসনভার কার্যত মোংগলদের পারসিক মিত্র মালিক সাদরু'দ-দীনের হস্তে ন্যস্ত ছিল (তু. জাহানগুশা, সম্পা. এম.কাযবীনী, G.M.S, ii, 255)।

মোংগল ঈলখানী বংশঃ ৬৫৪/১২৫৬ সালে বাগদাদ দখলের পর মোংগল নেতা হূলাগূ আযারবায়জানে গিয়া মারাগায় (দ্র.) স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ৬৬১/১২৬৩ সালে উত্তর ককেসাস অঞ্চলে বেরকাই-এর সৈন্যদের হাতে পরাজিত হওয়ার পর হূলাগূ তাবরীযে ফিরিয়া আসিয়া কিপচাক বংশোদ্ভূত স্থানীয় ব্যবসায়ীদিগকে হত্যা করেন। ৬৬২/১২৬৪ সালে রাজ্যের জায়গীর বণ্টনের সময় হূলাগূ তাবরীযের গভর্নর পদে মালিক সাদরু'দ-দীনের নিয়োগ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন।

ঈলখানী সম্রাট আবাকার শাসনামলে (৬৬৩-৬৮০ হি.) তাবরীয সরকারীভাবে ঈলখানী সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। সম্রাট উলজায়তু-র ক্ষমতারোহণ পর্যন্ত এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। ৬৮৮/১২৮৯ সালে সম্রাট আরগূনের শাসনামলে য়াহূদী উযীর সা'দুদ-দাওলা তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা আবূ মানসূরকে তাবরীযে নিয়োগ করেন। সম্রাট কায়খাতুর আমলে তাবরীয প্রদেশের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ দীনার (=৮০ তুমান; ১ তুমান=১০ হাজার দীনার, স্বর্ণমুদ্রা, বর্তমানে আর চালু নাই)। কাগজের নোট (=চাও) চালু করার প্রতিবাদে ৬৯৩/ ১২৯৪ সালে তাবরীযে এক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ঈলখানী মুগান সম্রাট গাযান খানের রাজত্বকালেই তাবরীয নগরী তাহার গৌরবোজ্জ্বল সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে। এই নৃপতি ৬৯৪/১২৯৫ সালে শহরের পশ্চিমে প্রবাহিত আজি- চাই নদীর বাম তীরে শাম নামক পল্লীতে সম্রাট আরগূন কর্তৃক নির্মিত একটি প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে থাকেন (ফারসী 'শ্যাম' নামের প্রাচীন রূপ হইল শানব অর্থাৎ "গুম্বজ" (Quatremere, N.E, xiv, p. 31ঃ "শীর্ষদেশে গুম্বজযুক্ত ভবন"), কিন্তু খৃ. ১৪শ শতাব্দীতেই নামটি 'শামরূপে উচ্চারিত হইতে থাকে তু. নুযহাতু'ল-কুলূব)। গাযানের আগমনের পর অবিলম্বে সকল দেবমন্দির, গির্জা ও সিনাগগ [য়াহূদীদের প্রার্থনাগার] এবং অগ্নিপূজার বেদী ধ্বংস করিয়া ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। কথিত আছে, আর্মেনিয়ার বাদশাহ হেথামের (Hethum) অনুরোধে পর বৎসর এই নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। ৬৯৯/১২৯৯ সালে এক অভিযানশেষে ফিরিয়া আসিয়া সম্রাট গাযান একটি পূর্ণাঙ্গ ভবনশ্রেণী নির্মাণের কাজ শুরু করেন। মৃত্যুর পর তিনি উক্ত শাম পল্লীতেই সমাধিস্থ হইতে চাহিয়াছিলেন। শামে এমন একটি ভবন নির্মিত হইল যাহা তৎকালীন মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ ভবনরূপে বিবেচিত মারবস্থিত সুলতান সানজারের গুম্বজ অপেক্ষাও অধিক উচ্চ ছিল। এই সমাধিসৌধের শীর্ষে একটি গুম্বজ স্থাপিত হয় এবং ইহার পার্শ্বেই একটি মসজিদ, দুইটি মাদরাসা (একটি শাফিঈ, একটি হানাফী মাযহাবপন্থী শিক্ষাকেন্দ্র), সায়্যিদগণের জন্য একটি হোস্টেল (দারুস সিয়াদা)। একটি হাসপাতাল, মারাগার মানমন্দিরের অনুরূপ একটি মানমন্দির, একটি গ্রন্থাগার, মূলপাঠ দস্তাবেয সংরক্ষণাগার, এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য একটি ভবন, একটি পানির চৌবাচ্চা এবং গরম পানি সরবরাহের ব্যবস্থাসহ কতিপয় হাম্মাম নির্মিত হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য ১০০ তুমান (=১০ লক্ষ দীনার স্বর্ণমুদ্রা, বর্তমানে চালু নাই; ১ তুমান=১০ হাজার দীনার) আয়ের সম্পত্তি পৃথক করিয়া ওয়াকফ করিয়া রাখা হয়। এই নব প্রতিষ্ঠিত শহরের প্রতিটি প্রবেশপথে একটি সরাইখানা, একটি বাজার ও কয়েকটি হাম্মাম নির্মিত হয়। দূরদেশ হইতে ফলের চারা আনিয়া এই শহরে রোপণ করা হয়।

খোদ তাবরীয শহরেও বিরাট উন্নয়ন সাধিত হয়। পূর্বে ইহার বেষ্টনী প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৬০০০ গ্রাম (=পদক্ষেপ; জিহাননুমা, কুলাজ='বাঁও'=২ গজ)। গাযান ইহার চতুর্দিকে ২৫,০০০ গ্রাম (=৪১.২ ফারসাখ=৬ কিলোমিটার) দীর্ঘ একটি নূতন প্রাচীর নির্মাণ করেন। নিকটবর্তী সমস্ত বাগ-বাগিচা এবং কুহ-ই ওয়ালিয়ান ও সানজারান মহল্লাগুলি শহরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এই নব-নির্মিত প্রাচীরের অভ্যন্তরে কুহ-ই ওয়ালিয়ান (বর্তমানে কুহ-ই সুরখাব বা 'আইনালী-যাইনালী)-এর ঢালে খ্যাতনামা উযীর রাশীদু'দ-দীন একটি সুরম্য সৌধশ্রেণী নির্মাণ করেন। সেইজন্য এই মহল্লাটি রাব'-ই রাশীদী (নুযহাতু'ল-কুলূব, পৃ. ৭৬) নামে পরিচিত হয়। রাশীদু'দ-দীন কর্তৃক তাঁহার পুত্রের নিকট লিখিত একখানি সংরক্ষিত পত্র হইতে জানা যায়, এই নূতন মহল্লার একটি পল্লীতে বসতি গড়িয়া তুলিবার মানসে তিনি রূম হইতে ৪০ জন যুবক-যুবতী পাঠাইতে বলেন (তু. Browne, A Hist. of Pers. Liter, iii, 82)।

এই সময় ঈলখানী সাম্রাজ্য অক্সাস (Oxus) নদী হইতে মিসর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃত কেন্দ্রস্থল ছিল তাবরীয; যেন এই কথাটিই গুরুত্ব সহকারে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সাম্রাজ্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এবং মাপ (কীলা, গায) তাবরীযের মান অনুযায়ী প্রমিত করা হয় (D'Ohsson, iv, 144, 271-77, 350, 466-69)।

৭০৩/১৩০৪ সনে সম্রাট গাযান খানকে সাড়ম্বরে শামের সমাধিসৌধে দাফন করা হয়।৭০৫/১৩০৭ সালে তাঁহার উত্তরসুরি সম্রাট উলজায়তু সুলতানীয়া (দ্র.) নামক স্থানে একটি নূতন রাজধানী গড়িয়া তোলার কথা চিন্তা-ভাবনা করেন। তবে শহরের বাসিন্দাগণকে স্থানান্তরিত করা সহজসাধ্য ছিল না; তাই ৭১৫/১৩১৫ সালেও দেখা যায়, কিপচাকের উযবেকদের রাষ্ট্রদূত সংক্ষিপ্ত মুগান-আরদাবীল-সুলতানীয়া পথের পরিবর্তে তাবরীযের পুরাতন পথেই যাতায়াত করিতেছেন। আরও লক্ষণীয়, ৭১১/১৩১২ সাল হইতে উযীর পদে সমাসীন তাজু'দ-দীন 'আলী শাহ তাবরীযে (মিহাদ-মিহীন মহল্লার বাহিরে) একটি বিরাট মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন।

৭১৭/১৩১৭ সালে সম্রাট আবূ সাঈদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিদায়ী উযীর রাশীদু'দ-দীন তাবরীযে গমন করেন এবং পরের বৎসরই

তাবরীয ত্যাগ করিয়া আপন ভাগ্য বরণ করেন। তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় এবং রাব'-ই রাশীদী লুণ্ঠিত হয় (Browne, iii, 71)। তাঁহার পুত্র গিয়াছুদ-দীনকে স্বয়ং আবূ সা'ঈদ উযীর পদে নিয়োগ করেন; গিয়াছুদ-দীন নিজে রাব'-ই রাশীদী-র সম্প্রসারণ চালাইয়া যান। রাজধানী এই সময় সুলতানীয়াতেই চালু হইয়া গিয়াছিল মনে হয়। কারণ সম্রাট আবূ সা'ঈদের আদেশে সুলতানীয়ায় নির্মিত একটি সমাধিসৌধেই তাঁহাকে (সম্রাটকে) দাফন করা হয় (D'Ohsson, 720)।

আবূ সা'ঈদের উত্তরাধিকারী আরপা ৭৩৬/১৩৩৬ সালে তাগাতু-র যুদ্ধে পরাজিত হইলে বিজয়ী 'আলী বাদশাহ কিরাত তাঁহার উযীর গিয়াছু'দ-দীনকে হত্যা করেন। রাশীদু'দ-দীনের পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি তাবরীযের লোকেরা লুণ্ঠন করে। এই সময় বহু মূল্যবান সংগ্রহ ও গ্রন্থাবলী খোয়া যায়।

জালাইরী ও চোবানী বংশঃ এই সমস্ত ঘটনার পরবর্তী পর্যায়ে দেশে যে অরাজকতা দেখা দেয় উহার মধ্যেই জালাইরী (ঈলখানী) বংশের অভ্যুদয় হয়; তাবরীযের সহিত ইহাদের ভাগ্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। ৭৩৬/১৩৩৬ সালে হাসান বুযুর্গ জালাইর তাবরীযের সিংহাসনে স্বীয় মনোনীত প্রার্থী সুলতান মুহাম্মাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনা অল্প কাল স্থায়ী হইলেও ইহা দ্বারা এই পুরাতন রাজধানীর প্রাধান্য পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু চোবানী বংশীয় হাসান কুচিক অচিরেই তাঁহার নিজস্ব প্রার্থীদের লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। হাসান বুযুর্গ বাগদাদে ফিরিয়া যান এবং হাসান কুচিক ৭৪০/১৩৪০ সালে সুলায়মান খানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার উপর ইরাক 'আজাম, আযারবায়জান, আররান, মুগান ও জর্জিয়ার শাসনভার অর্পণ করেন। হাসান কুচিকের উত্তরাধিকারী তদীয় ভ্রাতা আশরাফ ৭৪৪/১৩৪৪ সালে আনুশিরওয়ান নামক একজন নূতন মোসাহেবকে সুলতানীয়ায় পাঠাইয়া দেন এবং নিজে প্রকৃত শাসনকর্তারূপে তাবরীযে অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি ফারস পর্যন্ত স্বীয় কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করেন। তাঁহার নিষ্ঠুর কার্যকলাপ ও বলপূর্বক অর্থাদি আদায় মোঙ্গল "ব্লু হোর্ড" ("Blue Horde") প্রাচ্য কিপচাক বংশীয় জানীবেগ খানকে আযারবায়জানের ব্যাপারে "মানবতার স্বার্থে হস্তক্ষেপ" করিতে প্ররোচিত করে। আশরাফ খোই মারান্দ-এ পরাজিত হন; তাঁহার ছিন্ন মস্তক তাবরীযের একটি মসজিদের দরজার উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয় (৭৫৬/১৩৫৫ সাল)। জানীবেগ তাঁহার উযীর আখিজুককে আযারবায়জানের দায়িত্বে রাখিয়া গেলে বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহার কর্তৃত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়। বাগদাদ হইতে আগত জালাইরী নেতা ওয়াইস ইবন হাসান বুযুর্গ সাময়িকভাবে তাবরীয দখল করেন। আখিজুক তাঁহাকে বহিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে ফারসের মুজাফফারী বংশীয় নৃপতি মুবারিযু'দ-দীন মুহাম্মাদ ব্লু হোর্ডের জানীবেগের সহিত কলহে লিপ্ত হন (জানীবেগ মুবারিযু'দ-দীনকে স্বীয় সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন) এবং শীরায হইতে আসিয়া মিয়ানীয় আখিজুক'কে পরাস্ত করিয়া ৭৫৮/১৩৫৭ সালে তাবরীয দখল করেন। দুই বৎসর পরে ওয়াইসের প্রত্যাবর্তনের মুখে মুবারিয সরিয়া যান (তু. তা'রীখ-ই গুযীদা, G.M.P., 677-79,715-17)। ওয়াইস অচিরেই তাবরীয পুনর্দখল করেন এবং আখিজুককে হত্যা করেন।

সুলতান ওয়াইস-এর ইনতিকালের (৭৭৬/১৩৭৭) সংবাদ ফারসে পৌঁছিলে মুবারিযু'দ-দীনের উত্তরসুরি শাহ শুজা তাবরীয দখলের উদ্দেশ্যে শীরায হইতে রওয়ানা হন; ওয়াইসের পুত্র হুসায়ন পরাজিত হন এবং শুজা' তাবরীয দখল করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস পরে উজান-এ বিদ্রোহ দেখা দিলে শুজা' তাবরীয হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য হন এবং হুসায়ন সম্পূর্ণ বিনাযুদ্ধে শহরটি পুনর্দখল করেন। উত্তর-পশ্চিমে সুলতানীয়া শহরই মুজাফফারীদের রাজ্যের শেষ সীমা ছিল বলিয়া মনে হয় (তা'রীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৭২৩-২৫)। ৭৮৪/১৩৮২ সালে সুলতান হুসায়ন জালাইর তাবরীযে নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা সুলতান আহমাদ আযারবায়জানে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন; কিন্তু তাঁহার শাসনকাল ছিল স্বল্পস্থায়ী। কারণ শীঘ্রই দিগ্বিজয়ী বীর তীমূর রণাঙ্গনে আবির্ভূত হইলেন।

জালা'ইরীদের শাসনামলের নানা উত্থান-পতন সত্ত্বেও তাঁহারা তাবরীযবাসী জনসাধারণের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন। শীরওয়ান-অধিপতিবৃন্দ ও কারা-কোয়ুনলু তুর্কমানরা পরোক্ষভাবে তাঁহাদের অধিকার মানিয়া লইয়াছিলেন। তাবরীযে জালাইরীদের নির্মিত ভবনাদির মধ্যে দিমিশকীয়া সমাধিসৌধ এবং সুলতান উয়াইস কর্তৃক নির্মিত একটি সুবৃহৎ ভবনের কথা জানা যায়; ক্লাভিজোর (Clavijo, Sreznewski, p. 169) বর্ণনানুসারে এই ভবনটিতে ২০,০০০ কামরা ("camaras apartadas) e'aparta mientos") ছিল এবং ইহাকে বলা হইত দাওলাতখানা ("Tolbatgana.....la casa de la ventura"); () Markow, Katalog Djalair. monet, St. Petersburg 1897, p.i.- xliv: History of the Djata'irs-জালাইরীদের টঙ্কনকৃত নিম্নোক্ত বিভিন্ন সনের মুদ্রার কথা জানা যায়ঃ হাসান বুযুর্গ, হি. ৭৫৭; উয়াইস, হি. ৭৬২ ৭৬৩, ৭৬৪ ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৯, ৭৭০; হুসায়ন, হি. ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯-৭৮০, ৭৮১, আহাম্মদ, হি. ৭৮৫, ৮১০।

তীমূরের আমল ঃ তীমূর তাঁহার প্রথম পারস্য আক্রমণকালে (হি. ৭৮৬ সাল) সুলতানীয়া অধিকারের পর স্বদেশ সামারকানদে ফিরিয়া যান। তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোংগল "গোল্ডেন হোর্ড" নেতা তোক তামিশ খান অবিলম্বে দারবানদের পথে আযারবায়জানের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাভিযান প্রেরণ করেন (৭৮৭/১৩৮৫)। আমীর ওয়ালী (তীমূর কর্তৃক বহিষ্কৃত জুরজানের প্রাক্তন অধিপতি [তু. তুগা-তীমূর] ও খালখালের খানের দুর্বল প্রতিরক্ষার মুখে মোংগল আক্রমণকারী দল তাবরীয অধিকার করে, শহরবাসীর ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং অনেককে (কবি কামাল খুজানদীসহ) বন্দী করিয়া দারবানদে ফিরিয়া যায় (জাফারনামা, ১খ, ৩৯২; Browne, Hist. Pers. Lit, iii, 321)।

সুলতান আহমাদ জালাইর মোঙ্গল গোল্ডেন হোর্ড বাহিনীর হাত হইতে তাবরীয পুনরুদ্ধারের পরপরই তীমূর কর্তৃক তিনি পুনরায় বিতাড়িত হন (হি. ৭৮৮)। মুসলিম বাসিন্দাদিগকে রক্ষার জন্য তীমূর এই অভিযান পরিচালনা করেন বলিয়া দাবি করেন; তীমূর শাম-গাযানে শিবির স্থাপন করিয়া তাবরীযের বাসিন্দাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ (মাল-ই আমান) আদায় করেন (তু. জাফারনামা, ১খ, ৩২৬, আল-'আয়নীতে তীমূর সম্পর্কে আরও বিরূপ মন্তব্য করা হইয়াছেঃ তু. Markov, Catalogue, p. xxvii)।

৭৯৬/১৩৯২ সালে আযারবাজান, রায়, গীলান, শীরওয়ান দারবানদ ও এশিয়া মাইনরের এলাকাসমূহ লইয়া গঠিত "হুলাগূ জায়গীর"(তাখত-ই হুলাগূ) তীমূর তনয় মীরানশাহকে দেওয়া হয় (ঐ গ্রন্থ, ২খ, ৬২৩)। এই বিশাল এলাকার রাজধানী হইল তাবরীয। কিন্তু ৩ বৎসর পরে এই শাহযাদার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তিনি অনেকগুলি উন্মাদসুলভ দুষ্কর্ম করিয়া বসেন (যথা নিরপরাধ লোকজন হত্যা, ভবনাদির ধ্বংস সাধন, ঐ গ্রন্থ, ২খ, ২০০, ২১৩ এবং Browne, (পৃ.

গ্র., iii, 71)। ভারত অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তীমূর অবিলম্বে আযারবায়জান যাত্রা করেন এবং মীরানের দুষ্কর্মের সহযোগীদিগকে হত্যা করেন।

হি. ৮০৬ সালে মীরান শাহের পুত্র মীরযা 'উমারকে "হূলাগূর জায়গীর" এবং পশ্চিমে তীমূর-বিজিত অঞ্চলসমূহের শাসনভার দেওয়া হয়। তাঁহার পিতা মীরান শাহ (আররানের দায়িত্বপ্রাপ্ত) ও ভ্রাতা আবূ বাকরকেও (মেসোপটেমিয়ার দায়িত্বে নিযুক্ত) 'উমারের অধীনে রাখা হইল। তীমূরের ইনতিকালের পর 'উমার ও আবূ বাকর-এর মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ শুরু হয়। হি. ৮০৮ সালে আবূ বাকর তাবরীয হইতে ২০০ ইরাকী তুমান স্বর্ণমুদ্রা (২০ লক্ষ দীনার) কর আদায় করিয়া লইলেন। 'উমার তাবরীযে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার তুর্কমান সৈন্যরা জনসাধারণকে হয়রান করিতে থাকায় আবূ বাকর শহর পুনর্দখল করিতে সমর্থ হইলেন। আবূ বাকর তাবরীয ত্যাগ করিতে না করিতেই তুর্কমান বিদ্রোহী নেতা বিসতাম জাগীর শহরে প্রবেশ করেন, কিন্তু শীরওয়ান (দ্র.)- এর শায়খ ইবরাহীমের আগমন সংবাদ পাইয়া দ্রুত পশ্চাদপসরণ করেন। হি. ৮০৯ সালে শায়খ ইবরাহীম তাবরীয নগরী ইহার প্রকৃত মালিক সুলতান আহমাদ জালাইরের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলে জনসাধারণের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বহিয়া গেল। তু. মাতলাউ'স-সা'দায়ন, অনু. Quatremere, N.E. xiv, p. 109, ঐ বৎসর ৮ রাবী'-১ আবূ বাকর পুনরায় শাম-গাযানে আসিয়া হাযির হইলেন, কিন্তু ঐ সময় শহরে প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না।

এই শেষোক্ত ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে ক্যাস্টাইলের রাজা তৃতীয় হেনরীর (Henry III of Castile) দূত ক্লাভিজো (Clavijo) তাবরীযে কিছুকাল অবস্থান করেন (১১-২০ জুন, ১৪০৪ এবং মাঝে মাঝে কিছুদিন বাদে ২৮ ফেব্রুয়ারী-২২ আগস্ট, ১৪০৫ অর্থাৎ হি. ৮০৬ সালের শেষ হইতে ৮০৮ শুরু পর্যন্ত)। নানা দুর্যোগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াও ঐ সময় শহরটি ছিল দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ একটি ব্যস্ত বাণিজ্য কেন্দ্র। ক্লাভিজো সমকালীন তাবরীযের রাজপথ, বাজার ও দালান-কোঠার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

কারা-কোয়ুনলু বংশঃ আরাস (=Araxes) নদীতীরে সুপ্রতিষ্ঠিত কারা কোয়ুনলু বংশীয় তুর্কমান নেতা কারা য়ূসুফ ১ জুমাদা উলা, ৮০৯ তীমূর বংশীয় আবূ বাকরকে পরাজিত করিলে আবূ বাকর পশ্চাদপসরণকালে তাবরীয তাঁহার সৈন্যদের হাতে ছাড়িয়া দেন; তাহাদের লুণ্ঠনযজ্ঞের হাত হইতে কিছুই রেহাই পায় নাই (মাতলা'উ'স-সা'দায়ন,পৃ. ১১০)। কারা-য়ূসুফ সুলতানীয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং এই শহরের লোকজনকে তাবরীয, আরদাবীল ও মারাগায় ধরিয়া লইয়া যান। আবূ বাকর অচিরেই আযারবায়জানে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু বিসতামের সহায়তায় কারা য়ূসুফ সারদারূদে (তাবরীযের ৫ মাইল দক্ষিণে) তাঁহাকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে তীমূর-পুত্র মীরান শাহ নিহত হন, তাবরীযের সুরখাব গোরস্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

সুলতান আহমাদ ও কারা য়ূসুফ একত্রে মিসরে নির্বাসনে থাকাকালে রাজ্য পুনর্বণ্টন সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মতৈক্যের কথা স্মরণ করিয়া কারা য়ূসুফ তাঁহার সহিত আচরণে একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। বিপুল জাঁকজমক সহকারে সুলতান আহমাদের দত্তক পুত্ররূপে বিবেচিত স্বীয় পুত্র পীর-বুদাগকে তিনি তাবরীযের সিংহাসনে বসাইলেন (মাতলাউস-সা'দায়ন-এর বর্ণনামতে কারা য়ূসুফ হি. ৮১৪ সাল পর্যন্ত পীর-বুদাগকে "খান" উপাধি প্রদান করেন নাই। বাহ্যত সুলতান আহমাদ এই ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন বটে, কিন্তু কারা য়ূসুফের আর্মেনিয়া অবস্থানকালে তিনি তাবরীয দখল করিয়া লইলেন। তাবরীয হইতে ২ ফারসাখ (১ ফারসাখ=৬ কিলোমিটার) দূরে আসাদ-এর যুদ্ধে সুলতান চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইলেন (২৮ রাবী'ছানী, ৮১৩=১৪১০) কারা য়ূসুফ তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দিমাশকীয়ায় স্বীয় পিতা (সুলতান উয়াইস)ও মাতার সমাধি পার্শ্বেই সুলতান আহমাদ সমাহিত হন। জালা'ইর বংশীয় শেষ নৃপতির জীবনাবসানে পুনরায় তাবরীযবাসী সমবেদনা প্রকাশ করিল (তু. Huart, Lafin de la dynastie des llkhaniens, Fourn. As, Oct. 1876, p. 316-362)।

তাবরীয নগরী হইতেই কারা য়ূসুফ নিয়মিত তাঁহার বিভিন্ন আক্রমণাভিযান পরিচালনা করিতেন বলিয়া জানা যায়। কারা য়ূসুফের প্রভাব বৃদ্ধিতে ভীত হইয়া তীমূরী শাসক শাহরুখ হি. ৮১৭ সালে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণাভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তিনি আর-রায় শহর অতিক্রম করেন নাই (মাতলা'উস-সা'দায়ন, পৃ. ১৩৮, ২৫০)। ৮২৩/১৪২০ সালে শাখরুখ খান কারা য়ূসুফকে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি লইতেছিলেন। ঐ সময় কারা য়ূসুফের মৃত্যুর (৭ যুল-কা'দা, ৮২৩/১২ নভেম্বর, ১৪২০) সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছায়। তুর্কমান শিবিরে অরাজকতা দেখা দেয় এবং এক সপ্তাহ পরে মীরযা বায়সুনগুর তাবরীয দখল করেন (তু. Price, Chronological Retrospect of the Events of Mahom, History, London 1821, iii, 541, রাওদাতুস-সাফা ও খুলাসাতুল-আখবারে প্রদত্ত বিবরণী অনুসারে)। আর্মেনিয়ায় কারা য়ূসুফের পুত্রগণকে পরাজিত করিয়া ৮২৪/১৪২১ সালের গ্রীষ্মকালে শাহরুখ তাবরীযে পৌঁছান। হি. ৮৩২ সালে কারা য়ূসুফ-তনয় ইসকানদার সুলতানীয়া দখল করেন। শাহরুখ পুনরায় সসৈন্যে শাম-গাযানে আসিয়া সালমাসে কারা- কোয়ুনলু নেতা ইসকানদারকে পরাজিত করিলেন। হি. ৮৩৩ সালে শীতকালে কারা য়ূসুফের পুত্র আবূ সা'ঈদ শাহরুখের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিতে আসিলে তাঁহাকে আযারবায়জানের শাসনভার দেওয়া হয়; কিন্তু পরের বৎসর স্বীয় ভ্রাতা ইসকানদারের হাতে তিনি নিহত হন। ৮৩৮/১৪৩৮ সালে শীতকালে শাহরুখ তৃতীয়বারের মত আযারবায়জানে আসিলে ইসকানদার দূরে সরিয়া পড়াই বিবেচিত মনে করিলেন। কিন্তু তদীয় ভ্রাতা জাহান-শাহ কালবিলম্ব না করিয়া শাহরুখের সহিত যোগ দিলেন। ৮৩৯/১৪৩৬ সালের গ্রীষ্মকাল শাহরুখ তাবরীযেই কাটাইয়া দিলেন এবং শীতের আগমনে জাহানশাহকে আযারবায়জানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিলেন।

এইরূপে শুরু হইল এমন এক নৃপতির জীবন, যিনি তাবরীযকে এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের রাজধানীর মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যাহার আয়তন এশিয়া মাইনর হইতে পারস্য উপসাগর ও হেরাত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাবরীযের সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৌধ "নীল মসজিদ" (গোক-মাসজিদ") এই জাহানশাহেরই (বেরেযিন [Berezin]-এর মতে তাঁহার স্ত্রী বেগম খাতুনের) কীর্তি। সম্ভবত জাহানশাহের আমল হইতেই তাবরীযের সুরখাব ও চাবানদাব মহল্লয় আহল-ই হাক ধর্মীয় সম্প্রদায় উপস্থিত হয় (জাহানশাহের কথিত ধর্মবিরোধী মতামত সম্পর্কে তু. মুনেজ্জিমবাশি, ৩খ, ১৫৪)।

আক-কোয়ুনলু বংশঃ ১২ রাবী'ছানী, ৮৭২/১০ নভেম্বর, ১৪৬৭ জাহানশাহ আর্মেনিয়ায় অবস্থানকালে এক অতর্কিত হামলার শিকার হইলেন এবং আক-কোয়ুনলু তুর্কমান সরদার উযুন হাসান বায়ানদুরী

কর্তৃক নিহত হইলেন। ইসকানদারের দুই কন্যা তখন তাঁহাদের দারবীশ ভ্রাতা হুসায়ন "আলীকে তাবরীযে ক্ষমতাসীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু জাহানশাহের বিধবা পত্নী তাঁহাদের এই পরিকল্পনা ভণ্ডুল করিয়া দিলেন। তবে জাহানশাহের বিকৃত-মস্তিষ্ক পুত্র হুসায়ন 'আলী (অপর এক স্ত্রীর গর্ভজাত) তাবরীয দখল করিয়া বিমাতা বেগম খাতুন ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করেন (মুনেজ্জিম-বাশি)।

তীমূর বংশীয় আবূ সা'ঈদের সহায়তা সত্ত্বেও হাসান 'আলী মারানদ-এ পরাজিত হন। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত স্বয়ং আবূ সা'ঈদের মৃত্যু ঘটায়। ৮৭৩/১৪৬৮ সালে উযুন হাসান তাবরীয দখল করিয়া এই শহরকে তাঁহার রাজধানী করিলেন। 'উছমানী সুলতানের নিকট প্রেরিত এক পত্রে উযুন হাসান তাঁহার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান (ফারীদুনবে, মুনশাআত)।

উযুন হাসানের রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বিবরণের জন্য ভেনিসীয় উৎসগুলি খুবই মূল্যবান। তাবরীযে প্রেরিত প্রথম ভেনিসীয় কনসাল (খৃ. ১৩২৪) ছিলেন মার্কো দা মলিনো (Marco da Molino)। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ভেনিস প্রজাতন্ত্র কর্তৃক তাবরীযে প্রেরিত দূত গিওসাফা (Giosafa Barbaro) সমকালীন তাবরীয নগরীর প্রাণোচ্ছল জীবনধারার বর্ণনা দিয়াছেন। এইখানে বিশ্বের সব দেশ হইতেই দূতগণের আগমন হইত। দূত বার্বারোকে বিশাল শাহী প্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি মঞ্চে অভ্যর্থনা জানানো হয়; এই প্রাসাদকে তিনি 'আপতিসতি" (Aptisti") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। খৃ. ১৫১৪ সালে (?) যে অজ্ঞাতনামা ভেনিসীয় সওদাগর তাবরীয সফর করেন তিনিও উযুন হাসানের রাজত্বকালের জাঁকজমকের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন, "পারস্যে ঐ সময় পর্যন্ত তাঁহার পুত্র য়া'কূবও এইখানেই সমাধিস্থ হন। য়াকূবের ১২ বৎসরের (হি. ৮৮৩-৮৯৬) অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে শাহী দরবারে বহু সুধীজন আকৃষ্ট হন (কুর্দী ইতিহাসেও ইদরীস তাঁহার সচিব ছিলেন); হি. ৮৮৮ সালে তিনি সাহিব-আবাদের বাগিচায় 'হাশত-বিহিশত" প্রাসাদ নির্মাণ করেন (তু. ফাদলুল্লাহ ইবন রূযবিহান রচিত য়া'কূব-এর ইতিহাস, ফ্রান্সের Bibl. Nat. de Paris-এ সংরক্ষিত একখানি অসাধারণ পাণ্ডুলিপি, ancien fonds pers. [=পারস্যের প্রাচীন রাজধানী] 101,fol.105r)। উপরে বর্ণিত অজ্ঞাতনামা ভেনিসীয় সওদাগরও এই প্রাসাদের (Astibisti) বর্ণনা দিয়াছেন ঃ ইহার বিরাট হলঘরের ছাদের তলার পিঠে পারস্যের সকল বড় বড় যুদ্ধ, দূতাবাস ইত্যাদির ছবি অঙ্কিত ছিল। হাশতবিহিশত-এর পার্শ্বে ছিল মহিলাদের জন্য নির্ধারিত এলাকা, একটি বিশাল ময়দান, একটি মসজিদ এবং ১,০০০ শয্যার একটি হাসপাতাল (তু. আওলিয়া, ২খ., ২৪৯)।

সাফাবী বংশ ও তুর্কী-পারসিক যুদ্ধঃ আক-কোয়ুনলু নেতা মীরযা আলওয়ানদের বিরুদ্ধে শারুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর সাফাবী বংশীয় নৃপতি প্রথম ইসমা'ঈল ৯০৬/১৫০০ সালে তাবরীয অধিকার করেন। শহরের ২-৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সুন্নী মতাবলম্বী ছিল বলিয়া শোনা যায়। কিন্তু নূতন শাসক অচিরেই তাহাদের উপর শী'আ মতবাদ চাপাইয়া দিতে চাহিলেন এবং ইহাতে যাহারা আপত্তি করিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল (আলাম-আরা, পৃ. ৩১)। ইসমা'ঈল আক-কোয়ুনলু বংশীয়দিগকে এতই ঘৃণা করিতেন যে, তিনি তাঁহার পূর্বসূরী এইসব শাসকদের দেহাবশেষ কবর হইতে তুলিয়া আনিয়া অগ্নিদগ্ধ করেন (য়া'কূব-এর ইতিহাস-লেখক, পত্রক ২০৬ v; G.M. Angiolello)। এই যুবক আক-কোয়ুনলু নৃপতির অমিতাচারের ফলে কয়েকটি অভিজাত পরিবারে যে হতাশা নামিয়া আসে উপরোক্ত অজ্ঞাতনামা ভেনিসীয় সওদাগর উহারও উল্লেখ করিয়াছেন। ইসমা'ঈল আলওয়ানদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আরযিনজানের উদ্দেশে রওয়ানা হইলে আলওয়ানদ স্বল্পকালের জন্য তাবরীযে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হন এবং স্থানীয় ধনীদের উপর নির্যাতন চালান" (আলাম-আরা, পৃ. ৩১)।

২ রাজাব, ৯২০/২৩ আগস্ট, ১৫১৪ তারিখে সংঘটিত চালদিরানের যুদ্ধে বিজয় 'উছমানীদের জন্য তাবরীযের পথ খুলিয়া দিল। ৯ দিন পরে তুর্কী উযীর দুকাগিন-ওগলু ও দাফতার-দার (অর্থ সচিব) পীরী তাবরীয নগরী দখল করিলেন; ৬ সেপ্টেম্বর সুলতান সেলিম বিজয়ী শোভাযাত্রা সহকারে নগরীতে প্রবেশ করিলেন। তাবরীযে অবস্থানকালে তুর্কীরা সংযত আচরণ করিল (Browne, pers.Lit, in Mod.Times, p. 77); কিন্তু পারসিক নৃপতিগণ কর্তৃক সংগৃহীত বিপুল ধনরত্ন তাঁহারা হস্তগত করে এবং ১,০০০ দক্ষ কারিগরকে কনস্টান্টিনোপলে ধরিয়া লইয়া যায়। সুলতান সেলিম মাত্র এক সপ্তাহ তাবরীযে অবস্থান করেন। কারণ তুর্কী জানিসারী বাহিনী (The Janissaries) এই অভিযান আর চালাইয়া যাইতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয় (তু. Hammer, G.O.R.2, i, 720)।

খৃ. ১৫১৪ সালের ঘটনাবলী ছিল পারসিকদের জন্য এক গুরুতর বিপদসংকেত। তাই শাহ প্রথম তাহমাসপের শাসনকালে রাজধানী অনেক দূরে পূর্বে কাযবীনে স্থানান্তর করা হয়। ভেনিসীয় রাজদূত আলেসান্দ্রি (Alessandri)-এর মতে লিপ্সার জন্য শাহ তাহমাসপ আক-কোয়ুনলুদের পুরাতন রাজধানী তাবরীযে জনপ্রিয় ছিলেন না।

তেক্কি-র তুর্কমান উপজাতীয় নেতা স্বপক্ষত্যাগী উলামা-র পরামর্শে 'উছমানী সুলতান প্রথম সুলায়মানের সৈন্যরা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী (Grand Vizier) ইবরাহীম পাশার নেতৃত্বে ৭৪১/১৩ জুলাই, ১৫৩৪ তাবরীয দখল করিয়া আসাদাবাদে (**সা'ঈদআবাদ?**) গ্রীষ্মকালীন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইবরাহীম তাবরীযের শাম-গাযানে একটি দুর্গ নির্মাণ শুরু করিলেন। আযারবায়জানের শাসনভার ন্যস্ত হইল 'উলামার উপর। তাহামাসপের অধীনেও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ২৭ সেপ্টেম্বর তুর্কী সুলতান সুলায়মান স্বয়ং তাবরীযে আগমন করিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি সুলতানীয়া পর্যন্ত এক তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছিলেন এবং বাগদাদ অধিকার করিলেন। অতঃপর তাবরীযে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুলতান সুলায়মান ১৪ দিন প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত রহিলেন। এই সময় শীতের প্রচণ্ড প্রকোপে তুর্কী বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইলে পারসিক সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান পর্যন্ত অগ্রসর হইল। শাহ তাহমাসপ-এর ভ্রাতা আল-কাস মীরযার প্ররোচনায় ৯৫৫/১৪ জুলাই, ১৫৪৮ সুলতান সুলায়মান পুনরায় তাবরীয দখল করিলেন, কিন্তু তিনি এইবার মাত্র ৫ দিন শহরে অবস্থান করেন। পারসিকদের কৌশলটি ছিল হানাদার তুর্কীদের জন্য জীবন ধারণের সকল উপকরণ ধ্বংস করিয়া দেওয়া। ফলে দুর্ভিক্ষের চাপে তুর্কীরা পুনরায় পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইল। হাফত ইকলীমের বিবরণ অনুসারে সুলতান সুলায়মান আপন সৈন্যদের নিকট হইতে ৩ দিন পর্যন্ত কোন বিজিত শহর লুণ্ঠনে সৈন্যদের অধিকার খরিদ করিয়া লন (যাহাতে তাহারা আর লুটতরাজে লিপ্ত না হয়)। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাবরীযবাসীরা গোপনে তুর্কীদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। তাবরীযের বাসিন্দাদিগের সকলকেই হত্যা বা বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য আলকাস মীরযা-র প্রস্তাব সুলতান সুলায়মান প্রত্যাখ্যান করেন। রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের (Francis-I) দূত

এম. ডি.' আরামন (M. D. Aramon) তুর্কীদের এই তাবরীয দখলের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তিনি শহর রক্ষার্থে সুলতানের প্রচেষ্টার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়াছেন (Voyage, p. 83)। ৯৬২/২৯ মে, ১৫৫৫ আমসিয়ায় তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে প্রথম শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ৩০ বৎসর কাল স্থায়ী হয় (v. Hammer, ii, 120, 269; 'আলাম-আরা, পৃ. ৪৯-৫৯)।

৯৯৩/১৫৮৫ সালে 'উছমানী সুলতান তৃতীয় মুরাদের প্রধান মন্ত্রী ওযদেমির-যাদা 'উছমান পাশা ৪০,০০০ সৈন্য লইয়া তাবরীয পুনরাধিকারে ব্রতী হন। ওয়ান প্রদেশের গভর্নর চিগালা-যাদা ৬,০০০ সৈন্যসহ তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। চালদিরান ও সোফিয়ান হইয়া তুর্কীরা শাম-গাযানের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। পারসিক গভর্নর 'আলী কুলী খান এক দুঃসাহসী অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া চিগালা-যাদার ৩,০০০ সৈন্য হত্যা করিয়া রাত্রির অন্ধকারে সরিয়া গেলেন। সেপ্টেম্বরে তুর্কীরা শহরটি দখল করিল। কিছু সংখ্যক তুর্কী সৈন্য হত্যার শাস্তিস্বরূপ তুর্কীরা শহরটি বিধ্বস্ত করিল এবং বহু লোককে হত্যা করিল।

পারসিক প্রধান মন্ত্রী হামযা মীরযা শহরের চতুর্দিকে সক্রিয় রহিলেন। তিনি কয়েকবার আক্রমণ চালাইয়া তুর্কী বাহিনীর বহু লোক ক্ষয় করিলেন। তাবরীযের প্রতিরক্ষার জন্য 'উছমান পাশা-যাদা মাত্র ৩৬ দিনে শহরের অভ্যন্তরে ('আলাম-আরা' পুরাতন দাওলাতখানার অবস্থানের উপর"; আওলিয়া শাহের খিয়াবানের চতুর্দিকে") একটি বর্গাকার দুর্গ নির্মাণ করিলেন। ইহার প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ছিল ১২,৭০০ এল (১ এল=প্রায় ১ গজ, ইংলিশ এল=৪৫", দেশভেদে ইহার তারতম্য হয়) [আওলিয়া, মি'মার-ই মেককি আরশুনি]। ৪৫,০০০ সৈন্যর একটি গ্যারিসন এই দুর্গের প্রহরায় নিয়োজিত হয়। এই সময় জা'ফার পাশা তাবরীযের গভর্নর নিযুক্ত হন। ২৯ অকটোবর, তুর্কী প্রধান মন্ত্রী 'উছমান পাশা ইনতিকাল করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি চিগালা-যাদাকে তুর্কী সৈন্যদের সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া যান। চিগালা-যাদা সাফল্যের সহিত পারসিকদিগকে পরাস্ত করিলেন বটে, কিন্তু অচিরেই তাহারা তুর্কীদেরকে শহরের অভ্যন্তরে অবরোধ করিল। ৪৮টি লড়াইয়ের পর ফারহাদ পাশা তুর্কীদেরকে নিশ্চিতরূপে অবরোধমুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন (V. Hammer, ii. 354)। অতঃপর ৯৯৮/১৫৯০ সালে দুই দেশের মধ্যে এক সর্বনাশা শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হইলঃ ইহার ফলে শাহ 'আব্বাসকে ট্রান্স-ককেসিয়ার বিজিত এলাকা এবং পশ্চিম ইরান তুর্কীদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। এই সময় হইতে তুর্কীরা তাবরীয দখলের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিল। পর্যটক আওলিয়া তাবরীয ও ইহার আশেপাশে তুর্কীদের, বিশেষত জা'ফার পাশা নির্মিত বহু ভবনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে পারসিকরাও তাহাদের প্রাচীন রাজধানীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিল।

খৃ. ১৬০৩ সালে তুর্কী সিপাহীদের মধ্যে যে গোলযোগ দেখা দেয় উহার ফলে তুর্কী সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ঐ বৎসর হেমন্তে শাহ 'আব্বাস অপ্রত্যাশিতভাবে ইসফাহান ত্যাগ করিলেন এবং ১২ দিন পরে তাবরীযে প্রবেশ করিলেন। শহর হইতে ২ ফারসাখ (=১২ কিলোমিটার) দূরে হাজ্জী হারামী নামক স্থানে তুর্কী সেনাপতি 'আলী পাশা পরাজিত হইলে তুর্কী দুর্গ আত্মসমর্পণ করিল। শাহ 'আব্বাস পরাজিত শত্রুর সহিত সদয় ব্যবহার করেন (তু. ঐ সময় তাবরীযে অবস্থানরত তেকতেন্দার [Tectander]-এর সাক্ষ্য; কিন্তু শী'আদের মধ্যে ধর্মান্ধতা জাগ্রত হওয়ায় ২০ বৎসরের তুর্কী শাসনামলে গড়িয়া উঠা আত্মীয়তা বা বন্ধুত্বের বন্ধন অগ্রাহ্য করিয়া তাবরীযের বাসিন্দারা শহরে ও উহার আশেপাশে নির্বিচারে বহু তুর্কীকে হত্যা করিল। শাহ প্রথম 'আব্বাসও জনসাধারণকে তুর্কী শাসনের সমস্ত নাম-নিশানা মুছিয়া ফেলিতে আহ্বান জানাইলেন; "কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা তুর্কীদের নির্মিত দুর্গ, তাহাদের ঘর-বাড়ী, দালানকোঠা, বসতিস্থল, সরাইখানা, দোকানপাট, গোসলখানা ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল" ('আলাম-আরা, পৃ. ৪৪১, ৪৫১)।

১০১৯/১৬১০ সালে দুর্বলচেতা' উছমানী সুলতান তৃতীয় আহমাদের রাজত্বকালে তুর্কীরা পুনরায় তাবরীয আক্রমণের চেষ্টা চালায়। 'উছমানী প্রধান মন্ত্রী মুরাদ পাশা সসৈন্যে অপ্রত্যাশিতভাবে তাবরীযের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তবে শাহ 'আব্বাস যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় পাইলেন, তাবরীযের গভর্নর পীর-বুদাক খান শহরের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত রহিলেন, আর শাহ স্বয়ং সুরখাব পর্বতের উত্তরে তাঁহার সৈন্যদলসহ অবস্থান গ্রহণ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ হইল না, গ্রামাঞ্চলে খাদ্য দ্রব্যাদির অভাবে তুর্কীরা ভয়ানক কষ্টে পড়িল। কারণ পারসিকরা আগেভাগেই গ্রামাঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ৫ দিন পরে তুর্কী বাহিনী পিছনে হটিতে শুরু করিল। এদিকে শাহ 'আব্বাস ও মুরাদ পাশা পরস্পর দূত-বিনিময় করিয়া চলিলেন। এই তুর্কী আক্রমণের ফলে তাবরীযে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ ত্বরান্বিত করিল। পুরাতন তুর্কী দুর্গের স্থান মিহরান-রূদ নদীর বন্যার পানিতে প্লাবিত হইত বলিয়া উহা দুর্গের জন্য অনুপযুক্ত বিবেচিত হইল। নূতন দুর্গটি নির্মাণ করা হইল সুরখাব পর্বতের ছায়াতলে রাব'-ই রাশীদী মহল্লায়। এই নির্মাণকার্যে ব্যবহারের জন্য পুরাতন ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে, বিশেষত শাম গাযানের ইমারতসমূহের ধ্বংসাবশেষ হইতে, মাল-মসলা সংগ্রহ করা হয় (আলাম-আরা, পৃ. ৫৮৪, ৬০১)। অপরদিকে মুরাদ পাশার এই আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় ১০২২/১৬১২ সালে তুরস্ক ও ইরানের মধ্যে একটি নূতন চুক্তি সম্পাদিত হইল, যাহার শর্ত অনুসারে পারসিকরা শাহ তাহমাসপ ও সুলতান সুলায়মানের সময়কার অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল (আলাম-আরা, পৃ. ৬০০, ৬১১; v. Hammer, ii. 736, 745)। তবে সরেজমিনে সীমানা চিহ্নিতকরণে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। ১০২৭/১৬১৮ সালে ক্রিমিয়ার কতিপয় তাতারী খানের প্ররোচনায় ওয়ানের তুর্কী সৈন্যরা (৬০,০০০) হঠাৎ আযারবায়জানে এক ব্যাপক আক্রমণ চালায়। পারসিকরা এই আক্রমণের মুখে তাবরীয ও আরদাবীল হইতে পশ্চাদপসরণ করে। খাদ্যদ্রব্যাদির ঘাটতি থাকায় তুর্কীরা তাবরীয হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া সারাবের দিকে অগ্রসর হয়; তাবরীযের সিপাহসালার কারচকাই খান এইখানে তুর্কীদের বিরুদ্ধে এক চমকপ্রদ বিজয় হাসিল করেন। অতঃপর হি. ১০২২ সনে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত পুনঃসমর্থন করিয়া একটি নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল ('আলাম-আরা, পৃ.৬৫৬-৬৬১; v Hammer, ii, 773)।

শাহ প্রথম 'আব্বাসের মৃত্যুর পর তুর্কী ও পারসিকদের মধ্যে পুনরায় ব্যাপক আকারে যুদ্ধ শুরু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী শাহ সাফী-র রাজত্বকালে 'উছমানী সুলতান চতুর্থ মুরাদ ১০৪৫/১৬৩৫ সালে আযারবায়জান আক্রমণ করেন। রাজ্য জয় অপেক্ষা বরং ধন-সম্পদ লুণ্ঠনই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। মুরাদ তাঁহার সৈন্যদিগকে শহরটি ধ্বংস করিয়া ফেলার আদেশ দিলেন। এইরূপে "তাবরীযকে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া" (Ewliya, eyidje orse-leyip)। মুরাদ আসন্ন শীতের আগমনে দ্রুত ওয়ানে ফিরিয়া যান। তিনি মাত্র ৩ দিন তাবরীযে অবস্থান করেন। পরবর্তী বসন্তকালে পারসিকরা এরিওয়ান পর্যন্ত তাহাদের সমস্ত এলাকা পুনর্দখল করে। অতঃপর ১০৪৯/১৬৩৬ সালে সম্পাদিত চুক্তির

মাধ্যমে তাহারা তুর্কীদের নিকট হইতে যে সীমানা নির্ধারণ করিয়া লয় উহার মুখ্য রেখা অদ্যাবধি অপরিবর্তিত রহিয়াছে।

হাজ্জী খলীফা ১০৪৫/১৬৩৫ সালের তুর্কী অভিযানের একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তাঁহার মতে মুরাদের নির্দেশিত ধ্বংসযজ্ঞের পর শহরের পুরাতন বেষ্টনীপ্রাচীর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। শুধু এইখানে-ঐখানে পুরাতন ভবনের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা যায় (জিহাননুমা, পৃ. ৩৮১)। এমনকি শাম্‌-গাযান প্রাসাদকেও রেহাই দেওয়া হয় নাই; একমাত্র উযুন হাসানের মসজিদটি অক্ষত রাখা হয়। সৈন্যরা ফলের গাছও কাটিয়া সাবাড় করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু গাছ-গাছালির সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তাহারা মাত্র এক-দশমাংশ ধ্বংস করিতে সক্ষম হয়।

এইরূপ দুর্দশায় নিপতিত হইবার কয়েক বৎসর পরে বহু বিদেশী পর্যটক তাবরীয সফরান্তে বলিয়াছেন যে, শহরটির এক চমৎকার পুনরুজ্জীবন হইয়াছে। শাহ দ্বিতীয় 'আব্বাসের রাজত্বকালে ১০৫৭/১৬৪৭ সালে আগত পর্যটক আওলিয়া চেলেবি তাঁহার আকর্ষণীয় ভ্রমণ কাহিনীতে তাবরীয নগরীর বিশদ পরিসংখ্যান তুলিয়া ধরিয়াছেন, যথাঃ শহরে মাদরাসার সংখ্যা ৪৭টি, সাধারণ বিদ্যালয় ৪০০টি, সরাইখানা ২০০টি; খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বাড়ি ১,০৭০টি, দারবীশদের তাকীয়া ১৬০টি, বাগ-বাগিচা ৪৭,০০০। হাজ্জী খলীফার মতে শহরের খোলা চত্বরগুলিতে প্রাণচঞ্চল নগরবাসীর সমাগম লাগিয়াই থাকিত। একই আমলে পর্যটক ট্যাভার্নিয়ারের (Tavernier) কথায় সুলতান মুরাদ কর্তৃক শহরটির ক্ষতি সাধিত হইলেও ইহা "প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পুনর্নির্মিত হইয়াছে"। সারডিনের (Chardin, ii. 328) মতে খৃ. ১৬৭৩ সালে শাহ প্রথম সুলায়মানের শাসনামলে তাবরীযের লোকসংখ্যা ছিল ৫,৫০,০০০ (এই সংখ্যা অতিরঞ্জিত মনে হয়), ঘরবাড়ির সংখ্যা ১৫,০০০ আর দোকানপাট ১৫,০০০। ইহা ছিল "সত্যেই একটি সুবৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ শহর। এখানে জীবনযাত্রার সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; যে কেহ স্বল্প ব্যয়ে এইখানে বেশ ভালভাবেই বসবাস করিতে পারে।" তাবরীযে খৃস্টান ফ্রান্সিসকান তারীকার কাপুসিন সন্ন্যাসীদের একটি ধর্মশালা ছিল। কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতেন। তাবরীযে বেগলার-বেগী (=গভর্নর)-এর অধীনে ছিল কারস; উর্মিয়া, মারাগা ও আরদাবীলের খানগণ (স্থানীয় প্রশাসক) এবং ২০ জন "সুলতান" (=স্থানীয় সরদার)।

সাফাবী বংশের অবসান ও নাদির শাহ ঃ আফগানদের পারস্য আক্রমণের ফলে পারস্যে চরম অরাজকতা দেখা দেয়। পারস্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাহমাসপ ইসফাহান হইতে পলায়ন করিয়া তাবরীযে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদশাহ ঘোষণা করা হয় (১১৩৫/১৭২২)। ১২ সেপ্টেম্বর, ১৭২৩ সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে দ্বিতীয় তাহমাসপ কাস্পিয়ান সাগরসন্নিহিত প্রদেশগুলি রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিলে তুরস্ক ঘোষণা করিল যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সে তাবরীয ও এরিওয়ানের মধ্যবর্তী সীমান্ত জিলাগুলি দখল করিবে, এরিওয়ান, নাখচিওয়ান ও মারানদের পতনের পর তুর্কীরা সের-'আসকার (প্রধান সেনাপতি) 'আবদুল্লাহ পাশা কোপরুলুর নেতৃত্বে ১১৩৭/১৭২৪ সালের হেমন্তে তাবরীযের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা দেবেচি ও সুরখাব মহল্লা [যেখানে তুর্কী সুলতান প্রথম সেলীম একদা (৬ সেপ্টেম্বর, ১৫১৪) শিবির স্থাপন করেন] দখল করিয়া লইল। পারসিকরা শাম-গাযানে তাহাদের ঘাঁটি স্থাপন করিয়া প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতে লাগিল। তুর্কীরা কতিপয় এলাকায় সাফল্য লাভ করিলেও আসন্ন শীতের আগমনে মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। পরবর্তী বসন্তকালে কোপরুলু ৭০ হাজার সৈন্য লইয়া তাবরীয নগরী অবরোধ করিলেন। এই অবরোধ মাত্র ৪ দিন স্থায়ী হয়, ৭টি সুরক্ষিত মহল্লায় লড়াই ছিল খুবই প্রচণ্ড। এই যুদ্ধে পারসিকরা ৩০ হাজার সৈন্য আর তুর্কীরা ২০ হাজার সৈন্য হারাইল; পারসিকদের যে ৭ হাজার সৈন্য প্রাণে রক্ষা পাইল তাহারা বিনা বাধায় আরদাবীলে সরিয়া গেল (আলী হাসান, সম্পা. Balfour. p.153, Hanway, ii, p. 229)।

১১৪০/১৭২৭ সালে আফগান নেতা আশরাফের সহিত সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে 'উছমানীগণ সুলতানীয়া ও আবহার পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম পারস্য দখলে রাখিবার অধিকার লাভ করে। দুই বৎসর পরে পারস্য সেনাপতি নাদির তাবরীযের নিকট সুহায়লানে (সাধারণত সাওয়ালান) বা সিনিখ-কোপরু) মুসতাফা পাশার বাহিনীকে পরাজিত করেন। ৮ মুহাররাম, ১১৪২/১৭২৯ শহরে প্রবেশ করিয়া তিনি হাশতারূদের গভর্নর রুসতাম পাশাকে বন্দী করেন।

তুরস্কের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইতে অতি আগ্রহী হইয়া শাহ তাহমাসপ পুনরায় তুর্কীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেন। কিন্তু হামদানের নিকট কুরিজানের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন; ১১৪৪/১৭৩১ সালের শীতকালে তুর্কী সের-'আসকার (=প্রধান সেনাপতি) 'আলী পাশা তাবরীযে ফিরিয়া আসিয়া এইখানে একটি মসজিদ ও একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। অল্পকাল পরে ১৬ জানুয়ারী, ১৭৩২ দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে পারসিকরা আরাস (=Araxes) নদীর উত্তর দিকে সমগ্র এলাকা তুরস্ককে ছাড়িয়া দিল, তবে তাবরীয ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলি নিজেদের অধিকারে রাখিল। 'আলী পাশা যেহেতু তাবরীয দখল করিয়া লইয়াছিলেন, সেই কারণে তুরস্ক সরকার খুবই অনিচ্ছায় ইহা পারসিকদিগকে ফিরাইয়া দিতে সম্মত হয়; তবে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার দরুন তুর্কী প্রধান মন্ত্রী পদচ্যুত হন (V. Hammer, iv, 281)। অপরদিকে পারস্যের ট্রান্স-ককেসীয় প্রদেশগুলি তুরস্কের নিকট ছাড়িয়া দেওয়ার অজুহাতে সাফাবী সেনাপতি নাদির দ্বিতীয় তাহমাসপকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অতঃপর বাগদাদের নিকট নাদিরের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করিবার পর ওয়ানের গভর্নর রুসতাম পাশা তাবরীয পুনর্দখল করিলেন। ১৭৩৪ সালে নাদির তাবরীয অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ট্রান্সককেসিয়ায় একাধিক যুদ্ধে বিজয় লাভের ফলে ১১৪৯/১৭৩৬ সালে সম্পাদিত এক নূতন তুর্কী-পারসিক চুক্তি অনুসারে দুই পক্ষের মধ্যে ১০৪৯/১৬৩৯ সালের অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

নাদিরের রাজত্বের শেষভাগে যখন পারস্যে পুনরায় অরাজকতা শুরু হইতেছিল তখন তাবরীযের জনসাধারণ সাম মরীযা নামক জনৈক অখ্যাত সিংহাসন দাবিদারকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করে। ১১৬০/১৭৪৭ সালে নাদিরের মৃত্যু হইলে তুরস্কের জন্য পারস্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের একটি সম্ভাব্য সুযোগ উপস্থিত হয়, বিশেষত যখন তাবরীযের দৃওয়ান-বেগী (অর্থ সচিব?) ফাতহ 'আলী খানের পুত্র রিদাখান তুরস্কের এরযেরূমে আসিয়া পারস্যের সিংহাসনের জন্য একজন প্রার্থীর পক্ষের তুর্কী সমর্থনের আবেদন জানান (V. Hammer, iv, 474); কিন্তু তুরস্ক এই ব্যাপারে পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। নাদির শাহ আযারবায়জানের দায়িত্ব অর্পণ করেন তাঁহার বীর জ্ঞাতিভ্রাতা আমীর আরসলান খানের উপর; তাঁহার অধীনে ৩০,০০০ সৈন্য ছিল। নাদিরের মৃত্যুর পর এই সেনাধ্যক্ষ নাদিরের ভ্রাতুষ্পুত্র ইবরাহীম খানকে তাঁহার ভাই আদিল শাহকে (সুলতান আলী শাহ) পরাজিত করিতে সাহায্য করে; কিন্তু ইবরাহীম অবিলম্বে তাঁহার মিত্রের বিরোধী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। অতঃপর ১,২০,০০০ সৈন্য লইয়া ইবরাহীম ৬

মাস তাবরীযে অবস্থান করেন এবং নিজেকে সেইখানে (৭ যুল-কা'দা, ১১৬১) বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করাইয়া লন, কিন্তু অচিরেই নাদির পৌত্র শাহরুখের হস্তে তিনি নিহত হন।

কারীম খান যানদের বংশের শাসনামলে আযারাবায়জানের ইতিহাস অদ্যাবধি যৎসামান্যই জানা গিয়াছে। আফগান নেতা আযাদ খান প্রথমে এই প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ১১৭০/১৭৫৬ সালে মুহাম্মাদ হুসায়ন খান কাজার ইহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। পরের বৎসর কারীম খান উরমিয়া-র ফাতহ আলী খান আফশারকে পরাজিত করেন এবং আযারবায়জানের অধিকাংশ ভূমিকম্পে তাবরীয দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাজার বংশঃ ১২০৫/১৭৯০ সালের শেষভাগে কাজার বংশের প্রতিষ্ঠাতা আকা মুহাম্মাদ আযারবায়জান দখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতপ্রার্থী গভর্নরদের মধ্যে ছিলেন খোই-এর বংশগত অধিপতি হুসায়ন খান দুমবুলী (তু. নিবন্ধ Kurds, ii, 1145, E. I.)। আকা মুহাম্মাদ তাঁহার জায়গীরের সহিত তাবরীযও জুড়িয়া দিলেন। ১২১১/১৭৯৬ সালে প্রথম কাজার শাহের হত্যার পর আযারায়জানে গোলযোগ বাধিয়া গেল। শীকাকী উপজাতির (দ্র.) নেতা সাদিক খান সর্বময় ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় তাঁহার ভাই মুহাম্মাদ আলী সুলতানকে তাবরীযের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এই অভ্যুত্থান দমনের জন্য দুমবুলী খানরা সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং ইহার প্রতিদানে ফাতহ আলী শাহ তাবরীযের গভর্নর পদে জা'ফার কুলী খান দুমবুলীর নিয়োগ স্থায়ীভাবে অনুমোদন করেন। তাবরীযে আসিয়াই (১২১৩/১৭৯৮) জা'ফার কুলী খান সাদিক খানের (সাদিক ইতোমধ্যেই নিজেকে সারাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিলেন) ও উরমিয়ার আফশার বংশীয় খানের সহিত একটি জোট গঠন করেন এবং "সেই পরাধীনতা ছিল নিরঙ্কুশ স্বাধীনতারই নামান্তর " উহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া শাহের প্রতিনিধিগণকে তাবরীয হইতে বিতাড়িত করেন। জা'ফার খানের বিরুদ্ধে শাহী সৈন্য পাঠান হয়, কুর্দীদের সহায়তায় তিনি কিছুকাল খোই-এ প্রতিরোধ চালাইয়া যান (তু. H. J. Brydges, the Dynasty of the Kajars., London 1833, p 50, 84 ইত্যাদি)। ১২১৪/১৭৯৯ সালে পারস্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আব্বাস মীরযা তাঁহার বেগলারবেগী (প্রধান সেনাপতি)-রূপে মারাগার আহমাদ খান মুকাদ্দামের সহায়তায় তাব্‌রীযে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্রোহী জা'ফার খান রাশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন (তু. শেককী), তবে দুমবুলী পরিবারের অন্যান্য সদস্য তাবরীযে আরও কিছুকাল শাসন চালাইয়া যান। ১২২৪/১৮০৯ সালে নাজাফ কুলী খান দুমবুলী তাবরীয দুর্গ পুনঃনির্মাণ করেন (মিরআতুল বুলদান, ১খ, ৩৪৩, S. Wilson, p. 325), ১২৪১/১৮২৫ সালে 'আব্বাস মীরযা ইহার চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন ।

১৮০১ খৃ. জর্জিয়াকে রাশিয়ার সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার পর রাশিয়া ও পারস্যের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাবরীয পারস্যের কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। 'আব্বাস মীরযা পারসিক সেনাবাহিনীকে য়ুরোপীয়করণের জন্য কৃতসংকল্প হন। পারস্যে খনিজ সম্পদ সন্ধানের খুবই খ্যাতনামা কতিপয় অনুসন্ধানকারীসহ (Ousely iii, 199; Ritters, ix, 876-880) একটি গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজী মিশন তাবরীযে তাহাদের সদর দফতর স্থাপন করে। বৃটিশ ও রুশ কূটনৈতিক মিশনগুলিও তাবরীযে 'আব্বাস মীরযার দরবারে আগমন করে (রুশ কূটনৈতিক মিশনের সচিব ও পরে দূতাবাস প্রধান ছিলেন প্রসিদ্ধ লেখক গ্রাইবয়েডভ (Griboyedov)। এই তেজস্বী ভবিষ্যত বাদশাহ অনেকগুলি অস্ত্রাগার, কামান-বন্দুকের কারখানা, গোলা-বারুদের ডিপো ও ওয়ার্কশপ নির্মাণ করেন। তবে বারবার অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া তাবরীয নগরী সারডিনের (Chardin) দেখা জাঁকজমকপূর্ণ নগরীর একটি ছায়ামাত্রে পরিণত হইয়া পড়ে। পর্যটক ট্যানকয়নি (Tancoigne, ১৮০৭ খৃ.) ইহার লোকসংখ্যা কতিপয় আর্মেনীয় পরিবারসহ ৫০-৬০ হাজার ধরিয়াছেন। ডুপ্রির "Dupre (১৮০৭ খৃ.) মতে ৫০টি আর্মেনী পরিবারসহ তাবরীযবাসীর সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। কিন্নিয়ার (Kinneir) তাবরীযকে চরম দুর্দশাগ্রস্ত শহরগুলির অন্যতম বলিয়া ইহার লোকসংখ্যা মাত্র ৩০,০০০ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। মোরিয়ার ((Morier) তাঁহার প্রথম সফরকালে (১৮০৯ খৃ.) তাবরীযের লোকসংখ্যা ২,৫০,০০০ ও ঘরবাড়ীর সংখ্যা ৫০,০০০ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার সফরের পর তিনি শুধু এইটুকু বলেন যে, তাবরীয উহার পূর্বেকার গৌরবময় ঐশ্বর্যের এক-দশমাংশ মাত্র বজায় রাখিতে পারিয়াছে, আর এইখানে কোন উল্লেখযোগ্য সরকারী ভবন নাই।

রুশ-ইরান যুদ্ধঃ রুশ-ইরান যুদ্ধের ঘটনাবলী ১৮২৮ খৃ. পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। খৃ. ১৮২৭ সালের সামরিক অভিযান চলাকালে রুশ সেনাপতি প্রিন্স এরিস্টাও (Prince Eristow) কিছু সংখ্যক বিক্ষুব্ধ স্থানীয় সরদারের (খান) সহায়তায় ৩০০০ সৈন্যসহ তাবরীযে প্রবেশ করেন (৩ রাবী' ছানী ১২৪৩)। এই সময় 'আব্বাস মীরযা দেশের বাহিরে ছিলেন এবং শহরের জনসাধারণ রুশ আক্রমণকারীদের ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। আল্লাহ য়ার খান আসাফুদ দাওলা রুশদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাইয়া যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ইমাম মীরযা ফাত্তাহ নামক জনৈক বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা আত্মসমর্পণের পক্ষে জিদ ধরিলেন এবং রুশদের জন্য শহরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন (শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর মীরযা ফাত্তাহকে দেশত্যাগ করিয়া ট্রান্স-ককেসিয়ায় গিয়া আশ্রয় লইতে হয়)। অতঃপর রুশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কাউন্ট পাসকেভিচ (Count Paskevic) তাবরীযে আসিয়া দিহ-খাররাকানে 'আব্বাস মীরযার সহিত সাক্ষাত করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু তেহরান সরকার ইহার শর্তসমূহ অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিলে রুশরা পুনরায় আক্রমণ শুরু করে এবং উরমিয়া, মারাগা ও আরদাবী দখল করিয়া লয়। অতঃপর তুর্কমান চাই শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের (৫ শা'বান, ১২৪৩/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৮) মাধ্যমে আরাস (Araxes) নদী দুই দেশের সীমারেখা নির্ধারিত হয় এবং ইরানে রুশ দখলদারীর চূড়ান্ত অবসান ঘটে। এই সব ঘটনা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য তু. মিরআতুল-বুলদান, ১খ., ৪০৪-৪১০। Miansreov, Bibliographia caucacic, St. Petersburg 1874-1876, p. 743-747; Details sur le qui sest Passe a Tauris du 24 octobre au 5 novembre 1827, in Nouv. Annales de Voyages, Paris 1828, i. 38, p. Zubow, Kartini voyis Persiyei 1826-1827, St Petersburg 1834, Persidskaya voina St. Petersburg 1837; Osten Saken, Administration de 1. Abharbaidjan Pendant la guerre persave de 1827-1828 (রুশ ভাষায়) in Russki Inwalid. 1861, No. 79.

'আব্বাস মীরযার সময় হইতেই পারস্য সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর সরকারী বাসভবন তাবরীযেই ছিল। ১২৫০/১৮৩৪ সালে মুহাম্মাদ শাহের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত বৃটিশ ও রুশ কূটনৈতিক মিশনগুলি অধিকাংশ সময় তাবরীযেই অবস্থান করিত (Fraset Travels in Koordistan, ii, 247)। তাবরীয হইতে তাহাদের তেহরানে স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে কাজারদের রাজনৈতিক রাজধানীও নিশ্চিতরূপে তেহরানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাবরীযে সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা বড় একটা ঘটে নাই। তবে ২৭ শা'বান, ১২৮৬/৮ জুলাই, ১৮৭০ তাব্‌রীযের অস্ত্রাগার (জাবা-খানা) -এর প্রবেশপথে 'বাবী' ধর্মীয় মতবাদ (তাহ্‌রীক-ই বাব) আন্দোলনের নেতা সায়্যিদ আলী মুহাম্মাদ বাবের (১২৩৫/১৮১৯-১২৬৬/১৮৫০) প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয় (তু. Wilson, Persian Life., ৬২ পৃষ্ঠায় এই ভ্রম সংশোধনী দ্র.)। খৃ. ১৮৮০ সালে শায়খ উবায়দুল্লাহর নেতৃত্বে কুর্দীদের আসন্ন আগমনের সংবাদে (তু. শামদীনান) তাবরীযের জনসাধারণ ভীষণ আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। বিভিন্ন মহল্লায় মাঝে মাঝে ফটক নির্মাণ করিয়া প্রয়োজনবোধে কুর্দী হানাদারদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু কুর্দীরা বিনাব (নদী?) অতিক্রম করে নাই।

দেশে কাজারদের ক্ষমতা সুসংহত হওয়ায় আযারবায়জানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাবরীয ক্রমশ তাহার ক্ষয়ক্ষতি কাটাইয়া উঠিতে থাকে। ১৮৩০ খৃ. সালের কলেরা ও মহামারীর ভয়ঙ্কর ছোবল সত্ত্বেও ১৮৪২ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, তাবরীয শহরে পরিবারের সংখ্যা ৯,০০০ অর্থাৎ লোকসংখ্যা ১ লক্ষ হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার (Berzin)। ১৮৯৫ খৃ. লোকসংখ্যা দেড় লাখ হইতে দুই লাখ বলিয়া হিসাব করা হয়; তন্মধ্যে ৩,০০০ আর্মেনীয় (Wilson, পূ. গ্র., p. 53)। ২০ বৎসর পরে এই সংখ্যা নিশ্চিতরূপে ২ লাখ ছাড়াইয়া যায়; এই সময় তাবরীযের পৌর প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধাদি খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল বটে, কিন্তু শহরটিতে সমৃদ্ধির সকল লক্ষণ ছিল সুস্পষ্ট। বহুদিন মন্দা চলিবার পর ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে, বিশেষত ১৮৩৩ ও ১৮৩৬ সালের মধ্যে। তবে ১৮৩৭ খৃ. আমদানি অত্যধিক হওয়ায় এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ট্রান্স-ককেসিয়া হইয়া (পোতিবাকু) নয়া বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হওয়ায় ইহার সমান্তরাল ত্রেবিযনদ-তাবরীয পথের সহিত বেশ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। ১৮৮৩ খৃ. রুশ সরকার ট্রান্স-ককেসিয়ার মধ্য দিয়া চালু পথটি বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে উত্তর পারস্যের বাজারগুলিতে রুশ বাণিজ্য উৎসাহিত হয়; তবে ইহার দরুন ত্রেবিযনদ-তাবরীয পথে (পশ্চিমাভিমুখী একমাত্র পথ) পণ্য চলাচলও বৃদ্ধি পায়।

বিংশ শতাব্দী ঃ ১৯০৪ সাল হইতে তাবরীযের ইতিহাস খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। গুয্য, মোঙ্গল, তুর্কমান প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী ও ইরানীদের মধ্যে আন্তবিবাহের ফলে সৃষ্ট কর্মচঞ্চল ও আবেগপ্রবণ তাবরীযী তুর্কীরা ইরানের জাতীয় ও বিপ্লবী আন্দোলনে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। ২৩ জুন, ১৯০৮ যেই দিন তেহরানে পার্লামেন্ট ভবনে গোলাবর্ষণ করা হয়, ঐ দিন তাবরীয প্রকাশ্য বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়ে। তাবরীযের বীরোচিত প্রতিরক্ষার সহিত শহরের আমীর খীয় মহল্লার সরদার ও প্রাক্তন অশ্ব ব্যবসায়ী সাত্তার খান ও তাঁহার সহকর্মী বাকির খানের নাম ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অবশ্য তাঁহাদের চরিত্রের কিছু খারাপ দিকও লক্ষ্য করা যায় (E. G.Browne, The pers. Revolution, p. 491-492)। সরকারী সৈন্যরা শাহযাদা আয়নু'দ দাওলার নেতৃত্বে শহরটি ঘিরিয়া ফেলে এবং ১৯০৯ খৃ. ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিকে ইহাকে পুরাপুরি অবরোধ করে। ২০ এপ্রিল লন্ডন ও সেন্ট পিটার্সবার্গের মন্ত্রিসভাদ্বয় "শহরে প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহের সুবিধার্থে বিদেশী কনসাল অফিস ও বিদেশী নাগরিকগণকে রক্ষার জন্য এবং শহর ত্যাগেচ্ছু লোকজনকে শহর ত্যাগে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাবরীযে একটি রুশ সেনাদল প্রেরণ করিতে সম্মত হয়। রুশ সৈন্যদের জেনারেল স্নারস্কির (Snarski) ৩০ এপ্রিল, ১৯০৯ তাবরীযে প্রবেশ করেন (Browne, পূ. গ্র., পৃ. ২৭৪)। রুশ সেনাদের অপসারণ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা ১৯১১ খৃ. পর্যন্ত চলে। ঐ সময় রুশরা তেহরান সরকারকে যে চরমপত্র দেয় উহার ফলে ইরানে নূতন করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২১ ডিসেম্বর তাবরীযের ফিদাঈ সম্প্রদায়ের লোকেরা শহরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অল্প সংখ্যক রুশ সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের বেশ ক্ষতিসাধন করে। ইহার ফলে অবিলম্বে তাব্‌রীযে পূর্ণ এক ব্রিগেড রুশ সৈন্য প্রেরিত হয়। ইহাদের নেতৃত্বে ছিলেন ভরোপ্যানভ (Voropanov)। নববর্ষের প্রারম্ভে এই সেনাদল তাবরীযে আসিয়া উপস্থিত হয়। রুশদের স্থাপিত সামরিক ট্রাইব্যুনাল কয়েকজন তাবরীযবাসীর প্রাণদণ্ডাদেশ দেয় (ইহাদের অন্যতম ছিলেন শায়খী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা ছিকাতুল-ইসলাম)। ১৯১২ অকটোবর আযারবায়জানের পশ্চিমে বিরোধীয় জেলাগুলি হইতে দখলদার তুর্কী সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু রুশ-তুর্কী সীমান্ত প্রশ্নটি (তু. নিবন্ধ KURDS, তখনও অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। ফলে ১৯১৪ খৃ. বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রুশরা আযারবায়জানে অবস্থান করে।

১৯১৪ খৃ. ডিসেম্বরের শুরুতে 'উছমানী অফিসারদের নেতৃত্বে অপেশাদার কুর্দী সৈন্যরা সাওজ-বুলাক হইতে মারাগা ও তাবরীযের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। একই সময় সারি-কামিশের (কারস-এর দক্ষিণে) উপর আনওয়ার পাশার আক্রমণের মুখে ককেসাস অঞ্চলের সমগ্র রুশ বাহিনী বিপদের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে আযারবায়জান হতে রুশ সৈন্যদিগকে পশ্চাদপসরণের আদেশ দেওয়া হয়। ১৭ ডিসম্বর, ১৯১৪ ও ৬ জানুয়ারী, ১৯১৫ তারিখের মধ্যে সমস্ত রুশ সেনা এবং তাহাদের দেখাদেখি স্থানীয় খৃস্টান অধিবাসীদের অধিকাংশই তাবরীয ত্যাগ করে। ৮ জানুয়ারী, ১৯১৫ একদল কুর্দীকে লইয়া আহমাদ মুখতার বে শামখাল শহরে প্রবেশ করেন, কিন্তু অকস্মাৎ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। ৩১ জানুয়ারী রুশরা দলে দলে ফিরিয়া আসিয়া তাবরীয পুনর্দখল করে (তু. তাবরীযের প্রাক্তন জার্মান কন্সাল ডব্লিউ লিটেন (W. Litten) রচিত গ্রন্থে প্রদত্ত বিশদ বিবরণ (Persische Flitterwochen, Berlin 1925, p. 8-127)।

১৯০৬ খৃ. হইতে তাবরীযের সহিত রুশ সীমান্তের (জুলফা, রুশ রেলওয়ের শেষ স্টেশন) সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি রুশ সরকারী কোম্পানী একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করে। এজন্য ইরান (পারস্যের বর্তমান নাম) সরকারের অনুমতি লওয়া হয়। পরে এই রাস্তাটি রেলপথে রূপান্তরিত করিয়া ১৯১৬ সালের মে মাসে চালু করা হয়। ৮০ মাইল দীর্ঘ (তাবরীয-জুলফা) এই রেলপথটি ইরানী ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম রেলপথ। ইহার একটি ২৫ মাইল দীর্ঘ শাখা লাইন সোফিয়ান হইতে লেক উরমিয়া পর্যন্ত গিয়াছে।

১৯১৭ খৃ. রুশ বিপ্লব শুরু হইলে ইরানী সীমান্তে মোতায়েন রুশ সেনাবাহিনী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ১৯১৮ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে তাহারা আযারবায়জান হইতে চলিয়া যায়। ইরানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, এমন কি যুবরাজও সারাক্ষণ তাবরীযে নিজ নিজ দফতরে অবস্থান করিতেন। কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮ যখন রুশ সৈন্যের

সর্বশেষ দলটি তাবরীয ছাড়িয়া গেল তখন প্রকৃত ক্ষমতা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্থানীয় কমিটি ও উহার প্রধান ইসমাঈল নাওবারীর হাতে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে তুর্কীরাও তাহাদের নিষ্ক্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত রুশদের পরিত্যক্ত সীমান্ত এলাকাগুলি দখন করিয়া লইল। ১৮ জুন, ১৯১৮ 'উছমানী অগ্রগামী প্রহরী বাহিনী তাবরীযে প্রবেশ করে। ৮ জুলাই জেনারেল 'আলী ইহসান পাশা এবং ২৫ আগস্ট সেনাবাহিনী কোর কম্যান্ডার কাজিম কারাবেকির পাশা আসিয়া পৌছিলেন। 'উছমানী কর্তৃপক্ষ নাওবারীকে নির্বাসিত করিলেন এবং আযারবায়জানের গভর্নর পদে মাজ্‌দুস সুলতানের নিয়োগ সমর্থন করিলেন। এক বৎসর পর্যন্ত পরিস্থিতি এইরূপ গোলযোগপূর্ণ রহিল। কেবল নূতন গভর্নর-জেনারেল সিপাহসালারের তাবরীয আগমনের (জুন ১৯১৯) পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইতে শুরু করিল। আযারবায়জানে পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় রিদা খানের শাসনাধীনে; তিনি প্রথমে সমরমন্ত্রী ও পরে ইরানের শাহানশাহ হন (১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৫)। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট সরকার ইরানে তাহাদের সকল পুরাতন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ত্যাগ করে। এইরূপে রুশ-নির্মিত তাবরীয-জুলফা রেলপথ ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

পুরাকীর্তি ঃ তাবরীযে বর্তমানে বিদ্যমান সর্বপ্রাচীন সৌধরাজি মোঙ্গল আমলের (খৃ. ১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) কীর্তি, তবে এই বিষয়ে অদ্যাবধি কোন সুসংবদ্ধ গবেষণা হয় নাই । এই শহরের প্রাচীন ভবনাদি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার প্রধান কারণ দুইটি ঃ বারবার ভূমিকম্প এবং পূর্বসূরী বা প্রতিপক্ষের আমলে নির্মিত ভবনাদির প্রতি শীআ উত্তরসুরিদের অবহেলা, তবে এই সবের কিছু কিছু নিদর্শন এখনও টিকিয়া আছে।

শানব/শাম পল্লীতে (বর্তমানে কারামলিক উপশহর) ঈলখানী সম্রাট গাযান খান নির্মিত বিশাল সৌধরাজি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে শাহ 'আব্বাস শাম-গাযানের ধ্বংস্তূপ হইতে মাল্-মসলা সরাইয়া লইয়া ঐগুলি একটি নয়া দুর্গ নির্মাণে ব্যবহার করেন। ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৬৪১ তারিখের ভূমিকম্পে তাবরীয শহরের আরও ধ্বংস সাধিত হয় (Arakel of Tabriz, p. 496)। আওলিয়া চেলেবি (২খ, ২৫৬) তাঁহার সফরকালে গাযান খান নির্মিত সমাধিসৌধের সুউচ্চ টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পান। ইহা দেখিয়া তাঁহার গালাতার (galata) টাওয়ারের কথা মনে পড়ে (জিহাননুমায় একই মন্তব্য করা হইয়াছে)। মাদাম ডিউলাফয় (Mme. Dieulafoy) ও সারি (Sarre) উভয়ই শাম-গাযানের ঢিবি পরিদর্শন করেন। বর্তমানে ঐ ঢিবিই ঐ আমলের বিশাল সৌধরাজির একমাত্র নিদর্শন, সেইখানে এখনও ঐ আমলে চিত্রিত ও চকচকে মৃৎপাত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই বিস্ময়কর ভবনের একটি বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে বাদরুদ-দীন আল-আয়নী (মৃ. ৮৩৫-১৪৩১) রচিত ইকদুল জিমান গ্রন্থে। ঈলখানী সম্রাট আবূ সাঈদের শাসনকালে মামলূক সুলতান আন-নাসিরের দূতাবাস মারফত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাদরুদ-দীনের বিবরণী রচিত হয়। ইহার মূল পাঠটি অনুবাদ করেন ব্যারন টাইসেনহাওসেন (Baron Tiesenhausen, Zap, i, 1886, P 114-118)। কথিত আছে, এইখানকার মসজিদটির আয়তন টেসিফোনস্থিত চসরোজ প্রাসাদের (Palace of Chosroes at Ctesiphon) কেন্দ্রীয় ধনুকছাদ হলঘরের সমতুল্য। হামদুল্লাহ্‌র (১৩৪০ খৃ.) মতে মসজিদটি সাত তাড়াতাড়ি নির্মিত হয় বলিয়া উহা তত মযবূত ছিল না এবং সেইজন্য উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। কিন্তু সারডিন (Chardin, ii, 323) কেবল উহার নিম্নাংশ (মেরামতকৃত) ও টাওয়ারটি দেখিতে পান, যদিও ভেনিসীয় সওদাগর (১৫১৪ খৃ.) খুবই আগ্রহ সহকারে ইহার ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা দিয়াছেন। বর্তমান তাক-ই আলী শাহ (আলী শাহের ধনুক-ছাদ) নামে অভিহিত হয় শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পুরাতন মিহাদ-মিহীন (সাধারণত মিয়ার-মিয়ার) মহল্লার প্রবেশপথে দণ্ডায়মান ভগ্নদশাগ্রস্ত বিরাট ইটের তৈরী প্রাচীন ভবনটি (তু. Berezin)। সম্ভবত প্রাচীন মসজিদ ও নিকটবর্তী দুর্গটি শনাক্তকরণে বিভ্রান্তি ঘাটিয়াছে। প্রাচীন মসজিদটি এখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, নিকটবর্তী দুর্গের সাহিত মসজিদের জ্ঞাত বিবরণের কোনরূপ মিলও নাই। দুর্গটি নির্মাণের তারিখ সম্পর্কেও নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। ইহা ক্যাস্টিল-দত ক্লাভিজো বর্ণিত বিশাল দাওলাতখানা (তোলবাতগানা) হইতে পারে যাহার বিষয় আলাম-আরায় বলা হইয়াছে (উপরে দ্র.)। দুর্গটিকে 'আব্বাস মীরযা একটি অস্ত্রাগারে পরিণত করেন। বর্তমানে ইহাই তাবরীযের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রাচীন সৌধ।

পর্যটক ট্যাভারনিয়ার (Tavernier) ও সারডিন (Chardin) বর্ণিত জাহান-শাহের সুদৃশ্য নীল মসজিদটি টেক্সিয়ার (Texier) মাদাম ডিউলাফয় (Mme. Dieulafoy) ও অধ্যাপক সারি (Sarre) পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। বর্তমানে ইহাতে ধ্বস নামিয়াছে। সম্ভবত ইহার প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আক-কোয়ুনলু বংশীয়রা ধর্মবিরোধী মতবাদ আনার ফলেই মসজিদটি পরিত্যক্ত হয়। পর্যটক আওলিয়া চেলেবি "সুলতান হাসানের মসজিদ" সম্পর্কে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই মসজিদ-গাত্রে হস্তাক্ষরবিদ য়াকূতই মুস্তাসিমী অঙ্কিত শিলালিপি এবং নাজদ হইতে সংগৃহীত পাথরের অলঙ্করণ শোভা পাইতেছে। ইহার মিহরাবের দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া ৪টি স্তম্ভ অম্বর-সদৃশ দুষ্প্রাপ্য পাথরের তৈরী। এই মসজিদটি উস্তাদ-শাগ্‌রিদ (শিক্ষক-ছাত্র) মসজিদ নামে অভিহিত, হাসান কুচিক চোবানী (মৃ. ৭৪২/১৩৪০) ইহার প্রতিষ্ঠাতা (যীনাতুল-মাজালিস, মির'আতুল বুলদান, পৃ. ৩৪১, সারডিন)। এস. উইলসনের (S. Wilson) মতে পুরাতন অবস্থানস্থলে নির্মিত এই নামের (উস্তাদ-শাগ্‌রিদ") মসজিদটি পশমের বাজারের নিকট অবস্থিত। এই মসজিদ উযুন হাসানের মসজিদ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। উযুনের মসজিদ সম্পর্কেও অতি সামান্যই জানা গিয়াছে।

আওলিয়া চেলেবি বলেন, শাহ 'আব্বাসের মসজিদটি ছিল উস্তাদ-শাগ্‌রিদ মসজিদের বিপরীত দিকে। সাফাবী আমলের আরও একটি কীর্তি হইল শাহ সাফী এভিনিউ (খিয়াবান, তু. আওলিয়া) কাজার আমলের কীর্তির মধ্যে আছে গভর্নর জেনারেলের বাসভবন আল-কাপি (লাল দরওয়াজা) বাগ-ই শিমাল বা "উত্তরে বাগিচার" সুদৃশ্য বাগ-বাগিচাশ্রেণী (আসলে এই বাগিচাগুলি শহরের দক্ষিণে অবস্থিত) শাইগোলীর (শাহের হ্রদের) বেদী–ইহা শহরের ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত (Berezin, p. 80) ইত্যাদি।

তাবরীযের ঐতিহাসিক সৌধরাজির একটি তালিকা আওলিয়া চেলেবির Travels (ভ্রমণকাহিনী)-এ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। চারডিনকৃত তাবরীযের দৃশ্য (Atlas, pl. xi) ছবিতে সরকারী ভবনাদি দৃশ্যমান, ভূ-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য ইহা মূল্যবান। মিরআতুল বুলদান, ১খ., পৃ. ৩৪৬-৩৪৮ এবং আমেরিকান মিশনারী উইলসন (Wilson) রচিত গ্রন্থখানিতে বহু উপযোগী বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৮৮০ সালে তাবরীয সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের তৈরী একটি শহর পরিকল্পনা (স্কেলঃ ১ঃ ৮, ৮২০) ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় (তু.

Houtum-Schindler. Geogr. Fourn, 1895. p. 104)। বেরেজিন (Berezin, p. 52) শহরের মহল্লাগুলির একটি স্কেচ আঁকিয়াছেন। ইরানীদের তৈরী একটি ক্ষুদ্র শহর পরিকল্পনা ব্রাউনের গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে (Brown, The Persian Revolution, p. 284)। ১৯১২ খৃ. তিফলীসে তাবরীযের একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তু. নিবন্ধ Adharbaidjan; তাবরীয সম্পর্কে প্রাচীন লেখকদের রচনাকর্মের জন্য তু. এই নিবন্ধে প্রদত্ত বরাতসমূহ; (২) য়াকূত, ১খ, ৮২২; (৩) যাকারিয়া কায্‌বীনী, আছারুল বিলাদ, সম্পা. Wustenfeld, p. 227 (বিশদ বিবরণ যৎসামান্য); (৪) হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহাতুল কূলূব, ৭৪০/১৩৪০ খৃ., সম্পা. Le Strange, G.M.S.P. 75-79 (ইহা হইতে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা পরবর্তীকালীন লেখকগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন); (৫) ইব্‌ন বাতূতা, সম্পা. Defremery, ১খ, ১৭১; ২খ., ৭১, ১২৭-১৩১; (৬) কাদী আহমাদ গাফফারী, নিগারিস্তান, ৯৫৯/১৫৫২ সাল, পাণ্ডু. Bibl. Nat. Paris, Suppl. Pers. 887. fol. 464 r. (নুযহাতুল-কুলূব-এর বর্ণনামতে তাব্‌রীয), = (ইল্‌দিগীযী বংশ); (৭) আহ্‌মাদ রাযী, হাফ্‌ত ইক্‌লীম, ১০০২/১৫৯৪, পাণ্ডু. Bib. Nat. Paris, Supp. Pers. 356, fol. 464 v.-479. (তাবরীযের খ্যাতিমান স্থানীয় বাসিন্দাদের বিশদ তালিকা); (৮) হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, ৩৮০-৮৩; (৯) ইসকান্দার মুন্সী, আলাম-আরা, ১০৩৭/১৬২৫, তেহরান ১৩১৪ হি., পৃ. ৩০-৩১, ৪৯-৫০, ৪৪৪, ৫৮৪ (বহু মূল্যবান তথ্যসম্বলিত); (১০) Arakel of Tabriz, Livre d'histoires (আর্মেনীয় ইতিহাস ১৫৭৪-১৬৬৫ খৃ.), ফরাসী অনু. Brosset, Coll d'historiens armeniens, St. Petersburg 1874, i. 176, 294, 312, 496, 572, ও স্থা.; (১১) আওলিয়া চেলেবী (১০৫৭/১৬৪৭ সালের কাছাকাছি), ২খ., ২৪৫-৭৬ (বিশদ ও আকর্ষণীয় তথ্যাবলীসমৃদ্ধ); (১২) মাহমূদ লেবীহ, তুরবেতুল লেবীব, ১১৩৮/১৭২৫; তাবরীযের বিখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দের কবর সম্পর্কে একখানি রচনাকর্ম, অদ্যাবধি পুনরাবিষ্কৃত হয় নাই। Hammer G.O.R. 525; Babinger, Die Geschichte schreiber der Ismanen, Leipzing 1927, p. 237); (১৩) যায়নুল আবিদীন শিরওয়ানী, হাদাইকুস সিয়াহাত, পাণ্ডু. Bib. Nat. Paris, Suppl. Pers. fol. 1305, f. 86 r; (১৪) ঐ লেখাক, বুসতানুস সিয়াহাত (রচনাকাল ১২৪৭ হি.), পূর্ববর্ণিত গ্রন্থে পরিবর্ধিত সং. তেহরান ১৩১৫ হি., পৃ. ১৮৬-৮৮; (১৫) মুহাম্মাদ হাসান খান সানীউদ দাওলা, মিরআতুল বুলদান, তেহরান ১২৯৪ হি., ১খ, ৩৩৭-৪১৯ (অপ্রকাশিত তথ্যসম্ভারের সাহায্যে সংকলন পূর্ণ করা হইয়াছে); (১৬) Marco Polo Chap. xxvi. Toris, Tauriz, Thoris ইত্যাদি (রামুসি [Ramusi]-ও তাবরীয অঞ্চলে যে বার্‌সামো [Barsomo]-র মঠের কথা বলিয়াছেন উহা সম্ভবত মাকূ (দ্র.) শহরে অবস্থিত সেন্ট বার্থিলেমির [St. Barthelemy] মঠ; (১৭) Clavijo (A.D. 1405-06) Vida y hazanas del gran Tamorlan, Sevilla 1582 Chap. lxxxiii, cxliv. ইত্যাদি (সম্পা.) Sreznewski. St Petersburg 1881. P. 167-72, 358-76, ভেনিসীয় পর্যটকগণের বিবরণী (পর্যটকগণ ঃ Barbaro Contarini C. Zeno Angilello. অজ্ঞাতনামা সওদাগর V. Alessandri) এক খণ্ডে সংগৃহীত, সম্পা. C. Grayfor. The Hakluyt Society, London 1873; (১৯) আরও তু. Cornet, Letters di G. Barbaro, Vienna 1852 এবং Berohet, La repubblica di Venezia et la Persia, Turin 1865; (২০) J. Chesneau, Le Voyage de M. d' Aramon (1547), সম্পা. Schefer, Paris 1887, P. 83, 282; (২১) Kakasch de Zalonkemevy, (তদীয় সচিব Tectander), Iter persicum (1603), সম্পা. Schefr, Paris 1877, p. 47-51; (২২) Olearius (1636-37), Ausfuhrliche Beschreibung ইত্যাদি, 1663, pat v. Chap. 2; (২৩) Tavernier (1638), Les. six voyages, Paris 1679, i, 56-63; (২৪) A. Poulet Nouveles Relations du Levabt, Paris 1661-64 (দুইটি মসজিদের বিবরণ); (২৫) Petis de la Crox (1670), Extrait des voyages, Relation de Dourry Efendi-এর পরিশিষ্ট, Paris 1810, p. 141-45; (২৬) Chardin (1673), Voyages, সম্পা. Langles, ii, 319-60, Atlas pl. xi (আইন-ই আলী হইতে গৃহীত দৃশ্য); (২৭) John Bell (1716), Travels from St. Petersburg, ফরাসী অনু. Jean Bell d'Antermony, Voyages depuis St. Petersburg, Paris 1766, iii, p. 99-107; (২৮) P Villate, Voyage d'un missionnaire de la compagnie de Jesus en Tarquie, en perse (ইত্যাদি), Paris 1730 ,P. 176-77; (২৯) Hanway, The Revolution of Persea, London 1754, ii 237; (৩০) Jaubert, Voyage en Armenie (1805), Paris 1821, p. 155-64, 358; (৩১) P. Tancoigne (1807-8),. Lettres sur la Perse, Paris 1819, i, 121; (৩২) J. P. Morier, A Journey through Persia (1809) London 1812, p. 275-91; (৩৩) A. Drupe (1809), Voyage en Perse, Paris 1819; (৩৪) M kinneir, A geogr. Memoir of the Persian Empire, London 1813, p. 150-52 377, 380; (৩৫) J. P. Morier (1810-16), A Second Journey through Persia, London 1818, p. 211-33, 391 p. 225: তাবরীযের একটি দৃশ্য; (৩৬) Ker Porter Travels in Georgia (1819), London 1822, ii. 506; (৩৭) J. B. Fraser, Travels in Kurdistan, তা. বি., .. 1-45, ii., 312; (৩৮) W. K. Stuart (1835), Journey of a Residence in Northern Persia, London 1854; (৩৯) Texier (1839), Description de l'Armenie, Paris 1852, i, Plate no 41 (সাধারণ দৃশ্য), 42-52 (নীল মসজিদ), ii, 43-59; (৪০) Wilbraham, Travels in the Transcaucasian Provinces, London 1839; (৪১) Ritter, Erdkunde, ix (1840), 770-79, 852-84; (৪২) Berezin (1842), Puteshestwiye po Sever.Persu, Kazan 1852, p. 55-96; (৪৩) Flandin, Voyage en Perse, Paris 1851, i, 146-81; (৪৪) Lycklama a Nijeholt (1869) Voyage en Russie, Paris 1873, ii, 40-79; (৪৫) Gobineau, Trois ans en Asie, Paris 1859, p. 508-09; (৪৬) Von Thielmann (1872), Streifzuge im Kaukasus, Leipzig 1875, p. 179-98; (৪৭) Bakulin, Ocerk torgowli Adharbaidjana 1870-71, Wost. Sbornik, St, Petersburg 1877, i, 205-69; (৪৮) Heyd, Gesch. des Levantehandels, Stuttgart 1879, ফরাসী অনু. Leipzig 1886, ii, 107-40 এবং স্থা; (৪৯) Curzon, Persia, London 1892, i, 518-22 ও অনুক্রমণী; (৫০) St. Martin, Nouveau diet. de geographie universelle, Paris 1894, vol. vi; (৫১) Madame Dieulafoy, La Perse, Paris 1887, p. 44-67 (নীল মসজিদ, শাম, গাযান পরিদর্শন); (৫২) de Morgan, Mission Etudes Geogr, Paris.1894; i, 32-34; (৫৩) S. G. Wilson Persian Life and Customs, London 1896,.

P. 52-70 323-25 এবং স্থা. (আকর্ষণীয় বিশদ বিবরণীসম্বলিত); (৫৪) Lehmann Haupt (1898), Armenien einst und jetz, Berlin 1910, i, 189-99; (৫৫) Barthold, Istor.-geogr. obzor Irana, St. Petersburg 1903, P. 145-48; (৫৬) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate. London 1905, p 159-63; (৫৭) Frengian, Atrpatakan (আর্মেনীয় ভাষায়), Tiflis 1905, p. 60-65; (৫৮) A. V. W. Jackson, Persia Past and Present, New York 1906, p. 39-56; (৫৯) Sarre, Denkmaler, Persischer Baukunst. Berlin 1910, P. 5-7, 25-32, Plates 23-29; (৬০) Brit,. Mus. Or. Coins, vol. X, P. cxxiii-iv; (৬১) ঐ, Shahs of Persia, P. 293-94.

V. Minorsky (E.I.[1]) শায়খ ফজলুর রহমান

আত-তাবরীযী (দ্র. মুহাম্মাদ হুসায়ন ইবন খালাফ)

আত-তাবরীযী (التبريزى) ঃ আবূ যাকারিয়্যা য়াহয়া ইব্ন আলী ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল-হাসান (য়াকূত যুক্ত করিয়াছেন—ইবন মুহাম্মাদ ইবন মূসা) ইবন বিসতাম আশ-শায়বানী আল-খাতীব ছিলেন অন্যতম সুবিখ্যাত আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ। তিনি ৪২১/১০৩০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উস্তাদগণের মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত ছিলেন কবি আবুল-'আলা আল-মাআররী (দ্র.) ও আবূ মানসূর আল-আযহারী (Brockelmann , G. A. L., ১খ., ১২৯; তু Bergstrasser. Z. S., ২খ., ১৮৯, নং ২৪) রচিত Kitab al-Tahdhib fillugha নামক অতি বৃহৎ পুস্তকটি তাবরীযীর হস্তগত হয়। তিনি উক্ত কিতাব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ অধ্যয়নের নিমিত্তে একজন সুযোগ্য শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করেন। এইজন্য তাঁহাকে উপরোক্ত কবির সান্নিধ্যে গমনের পরামর্শ দেওয়া হয়। তাবরীযী অশ্বারোহণে অক্ষম ছিলেন। এই কারণে বহু খণ্ডে সমাপ্ত কিতাবখানি তিনি পশুখাদ্যের একটি বস্তায় ভরিয়া স্বীয় স্কন্ধে চাপাইয়া তাবরীয় হইতে মা'আররা গমন করেন। তাঁহার শরীর নিঃসৃত ঘামে বস্তা ভিজিয়া কিতাবের খণ্ডগুলির মধ্যেও স্যাঁতসেঁতে দাগ পড়িয়া যায়। ইব্ন খাল্লিকান (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)-এর অনুসরণে ইবনুল কিফতী (দ্র.) তাঁহার হারানো কিতাব K. Akhbar al-Nuhat হইতে অতি সাবধানতার সহিত মন্তব্য করেন যে, তিনি বাগদাদ ওয়াক্ফ লাইব্রেরীগুলিতে উক্ত ঘর্মসিক্ত কিতাবের কতিপয় খণ্ড দেখিতে পান। মনে হইল গ্রন্থগুলি যেন পানির মধ্যেই পতিত হইয়া ভিজিয়া গিয়াছিল।

আত-তাবরিযীর অন্যান্য উসতাদ এবং মুরব্বীগণের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন– আবুল কাসিম উবায়দুল্লাহ ইবন আলী আর-রাককী (মৃ. ৪৫০/১০৫৮), আবূ মুহাম্মাদ (অনুরূপ ইবন খাল্লিকান, য়াকূত আল-হাসান ইবন রাজা ইবন) আদ-দাহহান (মৃ. ৪৪৭/১০৫৫), আবুল ফাতহ সুলায়ম (সুলায়মান) য়াকূত প্রমুখ সালীম ইবন আয়্যূব আর-রাযী (তাযারের শাফিঈ ফাকীহ তু. ইবন খাল্লিকান নং ২৬৮)। আবুল কাসিম আবদুল কারীম ইবন মুহাম্মাদ আল-সায়ারী, De Slane দ্র. গ্রন্থপঞ্জী [মূল গ্রন্থে আল-সাওবী [য়াকূত অনুরূপ লিখিয়াছেন, ভিন্ন উচ্চারণ আল-সায়্যাদীও লিখিয়াছেন] আল-বাগদাদী; ইবন বুরহান আল-মুফাদ্দাল আল-কাসাবানী এবং আবদুল কাহির আল-জুরজানী (G. A. L., ১খ., ২৮৭) এবং সুপ্রসিদ্ধ কাদী আবুত-তায়্যিব তাহির ইবন আবদুল্লাহ আত-তাবারী (তু. আস-সামআনী, ৩৬৭ক, ১খ., ২১ প.) এবং আবুল হাসান আত-তানূখী (ঐ, ১১০খ, ১খ., ৪২) তাবরীযী আল মাআররা ব্যতীত তায়র এবং দামিশকেও অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যৌবনকালেই তিনি কায়রো গমন করেন এবং তথায় তিনি ইবন বাবাশায-এর নিকট শিক্ষালাভ করেন (Brockelmann, G.A.L., ১খ, ৩০১)। অতঃপর তিনি বাগদাদে গমন করেন। তথায় তিনি কাদীর পদ অলঙ্কৃত করেন। ইহাই G.A.L. ২০শ খণ্ডের Katin-এর যথার্থ ও শুদ্ধ পাঠ (Kadi) আস-সামআনীর পাণ্ডুলিপি, ইস্তাম্বুল Koprulu, ১০১০। অতঃপর বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Adab (সাহিত্য) বিষয়ের অধ্যাপক এবং গ্রন্থাগারিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মঙ্গলবার ২৮ জুমাদা ছানী, ৫০২ হি. (২ ফেব্রুয়ারী, ১১০৯) তারিখে ইনতিকাল পর্যন্ত তাবরীযী উপরোক্ত দুইটি পদের গুরুদায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। (এইরূপ ইবন খাল্লিকান, য়াকূত, ১খ, সপ্তাহের দিনের নামের ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখ ভুল বলিয়া প্রমাণিত)। তাবরীযীর মাকবারা বাগদাদের আবরায নামক প্রবেশদ্বারে অবস্থিত। তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত শাগরিদগণের মধ্যে বিভিন্ন সূত্রে বাগদাদের ঐতিহাসিক আল-খাতীব আল-বাগদাদীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য (Brockelmann G.A.L. ১খ, ৩২৯)। সামআনী প্রথম উক্ত মত পেশ করিয়াছেন এবং য়াকূত (Mu'djam (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.), ইবন খাল্লিকান ইহা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা অবশ্যই একটি ভুলের কারণে করিয়া থাকিবেন—কারণ আল-খাতীব আল-বাগদাদী তাবরীযী হইতে বয়সে ত্রিশ বৎসর বড় ছিলেন। ইবন খাল্লিকান (দ্র.) তাবরীযীর রচিত আল-খাতীব আল-বাগদাদী নামক নিবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উক্ত নিবন্ধে তিনি এতদুভয়ের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে কোন প্রামাণ্য সূত্রের উল্লেখ করেন নাই (নং ৩৩)। অপরপক্ষে য়াকূত স্বয়ং আল-খাতীব আল-বাগদাদীর Irshad (প্রমুখাৎ)-এর মাধ্যমে একটি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তাবরীযী এই Jnisba উল্লেখ করেন নাই। ফলে ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, আবূ যাকারিয়া য়াহয়া ইবন আলী আল-খাতীব আল-লুগাবী বলিতে আমাদের সুবিখ্যাত তাবরীযীকেই বুঝানো হইয়াছে। বিশেষত বংশ-লতিকার মধ্যে আবুল ফাদল নাসীর আস-সালামী তাবরীযীর অন্যতম শাগরিদ ছিলেন। সেই ক্ষেত্রে সম্ভবত ভুলবশত পুত্রের নাম পিতার নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি একাধারে তাবরীযীর শাগরিদ এবং আস-সামআনীর উস্তাদও ছিলেন দ্র. Bergstrasser, in Z.S., ২খ. ২০৫, নং ১৫৪)।

তাবরীযীর প্রথম কর্মক্ষেত্রে অবস্থানকালে তাঁহার পিতা ছিলেন নিতান্তই অপরিচিত। ফলে তাঁহার কুন্য়া আবুল ফাদল হওয়া অসম্ভব বলিয়া অনুমিত হয়। বর্ণনাকারীর দারিদ্র্যও একটি বিশেষ কারণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ গল্পের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে হইলেও কতকে প্রসঙ্গক্রমে দারিদ্র্যকে আনয়ন করেন। বিশেষত তাবরীযীর দারিদ্র্যদশার সহিত গল্পটি খাপ খাইয়া যায়। তাঁহার আল-মা'আররা ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা তাবরীযীর দুঃসহ দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারি। এমনভাবে তিনি অবশ্যই দামিশকে পৌঁছিয়াছিলেন এবং আল-খাতীব আল-বাগদাদীর নিকট আদাব-এর পাঠ গ্রহণ করিয়ছিলেন। উক্ত কাহিনীর মধ্যে তাঁহার জ্ঞান-তুফার বিবরণী সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। তাবরীযী বাগদাদের বৃহত্তম মসজিদের মিনারার ক্ষুদ্র কুঠরীতে (ইহাও তাঁহার দারিদ্র্যের প্রমাণ) সংগোপনে বাস করিতেন। একদিন আল-খাতীব স্বয়ং শাগরিদের সেই নির্জন কুঠরীতে গিয়া এক ঘণ্টাকাল কথোপকথন করেন। বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে আল-খাতীব কলম খরিদ করিবার অনুরোধসহ উপহারস্বরূপ কাগজের মোড়কে কিছু দ্রব্য শাগরিদকে প্রদান করেন। তাবরীযী মোড়ক খুলিয়া পাঁচটি মিসরীয় স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। আল-খাতীব দ্বিতীয়বার প্রিয় শাগরিকে সাক্ষাত দান করিয়া প্রথমবারের অনুরূপ অথবা উহার অধিক পরিমাণ অর্থ প্রদান

করিয়া কাগজ খরিদ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। য়াকূতের এই কাহিনী তাবরীযী সম্পর্কে তাঁহার স্বরচিত এবং Irshad পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ দ্বারাও সর্বশেষে সমর্থিত হইয়াছে। ফলে ইহা সুনিশ্চিত সত্য যে, খাতীব আল-বাগদাদী যথার্থই তাবরীযীর উস্তাদ ছিলেন। অতএব মু'জাম-এর তথ্য যথার্থ নহে। অন্যথায় আল-বাগদাদী তদীয় T'arikh Baghdad-এর মধ্যে তাবরীযীর নামে নিশ্চয়ই কোন নিবন্ধ উৎসর্গ করিতেন। তাবরীযীর শাগরিদগণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবন নাসীর আস-সালামী (৪৬৭-৫৫০/ ১০৭৪-১১৫৫, তু. উপরোক্ত), আবুল হাসান সা'দ আল-খায়রি ইবন মুহাম্মাদ ইবন সাহল (দ্র আল-মাককারী ১খ., ৮৯৫; সা'দ) আল-আনসারী আল-আন্দালুসী (আল-গাযালীর শাগরিদ, বাগদাদে মৃ. ৫৪১/১১৬৬), আবূ তাহির মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদিল্লাহ আস-সিন্‌জী (৪৬৬-৫৪৮, মার্ভ শহরে বসবাসকারী) এবং সর্বশেষ নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাবরীযীর স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী আল্লামা আল-জাওয়ালীকী (দ্র.)। তাঁহার চারিত্রিক ব্যবহার উত্তম ছিল না (কথিত আছে, তিনি মদ্য পান করিতেন, রেশমী পোশাক পরিধান করিতেন এবং স্বর্ণের কারুকার্যখচিত শিরস্ত্রাণও ব্যবহার করিতেন। অতএব তিনি পরবর্তীকালে ধনশালী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও প্রখরতা ছিল তর্কাতীত এবং সর্বজনস্বীকৃত।

তাবরীযীর সুপরিচিত রচনাবলীর মধ্যে প্রতিটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। কিন্তু ইবন খাল্লিকান তাবরীযীর রচিত দুইটি মাত্র কবিতা পংক্তি এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে রচিত আল-ইমাদ আল-ফায়ায-এর কবিতার কাব্যিক প্রত্যুত্তরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীর নিম্নে প্রদত্ত তালিকার মধ্যে যেগুলি Brockelmann (G.A.L., ১খ, ২৭৯ প.) উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শুধুমাত্র ঐগুলির নাম পুনরায় লিখিত হইল, যেইগুলি সম্পর্কে আরও মন্তব্য সম্ভব।

কবি আবূ তাম্মাম (দ্র.)-এর হামাসা-এর উপরে তাবরীযী তিনখানি ব্যাখ্যা পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রথমখানিতে প্রতিটি বায়ত-এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়খানি সামগ্রিকভাবে কাব্য-সম্ভারের ব্যাখ্যাকারে লিখিত। Freytag দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পুস্তকের সম্পাদনাকালে তাঁহার স্বরচিত ভূমিকায় উল্লিখিত নীতি সূত্রের অনুকরণ করিয়াছেন। তাবরীযীর স্বহস্তলিখিত মু'আল্লাকাত-এর একখানি ব্যাখ্যাপুস্তক য়াকূত-এর নিকট রক্ষিত ছিল। তিনি কবি আল-মুতানাব্বীর দীওয়ান মুফাদ্দালিয়াত-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও করিয়াছেন (G.A.L, ১খ, ৮৮) এবং কাসীদা Banat Suaad (কলা-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, কা'ব ইবন যুহায়র); ইব্‌ন দুরায়দ [দ্র.]-এর Maksura, ইবন জিন্নী (দ্র.) রচিত K. al-Lam' fil-Nahw (অধিকন্তু হাজ্জী খালীফা-এর অনুসরণে Nihayat al-Wusul ila Ilmal-usul—জনৈক অপরিচিত আহমাদ ইবন আলী ইবন আস-সাআতী আল-বাগদাদীর (Brockelmann-এর মতানুসারে এই নামের লেখক তাবরীযীর পরবর্তী কালের জীবিত লেখক, ১খ, ৩৮২) রচনার ভাষ্য লিখিয়াছেন। তিনি আল-কুরআনের ব্যাখ্যাও লিখিয়াছিলেন। এই একই সূত্র হইতে আমরা এই তথ্যও প্রাপ্ত হই যে, তিনি ইবন সিককীত (দ্র.)-এর Kitab Islah al-Mantik-এর সম্পাদনাকালে উহার বিশুদ্ধ পাঠান্তর নিরূপণ করিয়া উহার al-Tahdhib নামকরণ করেন (পাণ্ড. ইস্তাম্বুল, আতীফ নং ২৭১৬, তু. Rescher M.F.O. বৈরূত ১৯১২ খৃ., পৃ. ৪৯৫), মুদ্রণ কায়রো তা. বি. । কিন্তু ঐ একই লেখকের কিতাবুল আলফাজ নামে বৈরূতে (১৮৯৫ খৃ.) প্রকাশিত অন্য একখানি পৃথক ভাষ্যও আছে।

Kafi fillmai al-Arua Wal-kawafi-এর সারসংক্ষেপকে সম্ভবত Madjmu min Muhimmat alMutun, কায়রো ১৩২৩ খৃ., পৃ. ৫৫০ প.-এর সংগৃহীত খণ্ডগুলির মধ্যেই সংযোজিত করা হইয়াছিল। উহাতে কোন গ্রন্থকারের নাম ছিল না। কিন্তু Brockelmann -এর মতানুসারে সূচীপত্র দ্র.। কাফী ইহার সম্ভাব্য লেখক হিসাবে কমপক্ষে আরও দুইজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। Rescher, Z.A., ২৭খ, ১৫৬; Risala fil-Arua, ইস্তাম্বুল পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত হামীদীয় ১১২৭ নামে ভিন্ন একখানা ছন্দ প্রকরণ সম্পর্কিত পুস্তকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক Brockelmann -এর উল্লিখিত উপরোক্ত দুইখানি পুস্তকের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয় না। Rescher ইমরাউল কায়স রচিত দীওয়ান-এর উপর তাবরীযী রচিত ব্যাখ্যাপুস্তকের একখানি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। Z.D.M.G., ৬৮তম সংখ্যা, পৃ. ৬৩; কিন্তু তথ্যসূত্রে উক্ত পুস্তক সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। বর্তমানে অজ্ঞাত তাবরীযীর অন্যান্য পুস্তক সম্পর্কে ইবনুল আনবারী এবং য়াকূত উল্লেখ করিয়াছেন— Tahdhib gharib al-Hadith. য়াকূত, মুকাদ্দিমা ফিন-নাহু নামে একখানি ব্যাকরণের নামও উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (নিবন্ধের মধ্যে সম্ভবত যেসব বরাত উল্লেখ হয় নাই) (১) আস-সামআলী, আনসাব, সম্পা. Margoliouth ১৯১২ খৃ., G. M. S., ২০খ., পত্রক ১০৩খ. (২) আবুল বারাকাত ইবনুল-আনবারী, নুযহাতুল আলিববা ফী তাবাকাতিল উদাবা, কায়রো ১২৯৮ হি., ৪৪৩-৪৮; (৩) ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, সম্পা. Wustenfeld, নং ৮১০; (৪) উক্ত গ্রন্থের De slane কৃত ইংরেজী সংস্করণ, ৪খ, ১৮৭১, পৃ. ৭৮ প. (মূল্যবান টীকা সম্বলিত); (৫) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, (১খ., ৮২২ প.; (৬) ঐ লেখক, ইরশাদ, সম্পা. Margoliouth G.M.S., ৬খ/১ ২৫৪প., ৬খ/৭, ২৮৬ প.; (৭) Seckis, Dictionnaire encyclopedique de Bibliographie arabe. পৃ. ৬২৫।

M. Plessner (E.I.[1])/(মুহম্মাদ শওকত আলী

তাবরীযী/তিবরীযী (تبريزى) ঃ সাধারণ্যে শাম্‌স তিবরীযী নামে পরিচিত; জামী (নাফহাতুল- উনস, সম্পা. Lees., পৃ. ৫৩৫)-র মতে তাঁহার নাম শাম্‌সুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মালিকদাদ-ই তাবরীযী। তিনি ছিলেন একজন সূফী এবং জালালুদ-দীন রূমী (দ্র.)-র আধ্যাত্মিক শিক্ষক। রূমী তাঁহার আধ্যাত্মিক গাযালসমূহের অধিকাংশ দীওয়ান-ই শামস-ই তিবরীয' শিরোনামে সংকলন করিয়াছেন। তিনি তাবরীয শহরে জন্মগ্রহণ করেন যেথায় তাঁহার পিতা কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। বলা হয় যে, তিনি শায়খ আবূ বাকর যানবীল বাফ (সাল্লাবাফ) শায়খ রুকনুদ-দীন রূমীর শাগরিদগণ তাবরীযীর প্রতি তাঁহাদের উস্তাদের মুরশিদ ও বন্ধুসুলভ গভীর অনুরাগের কারণে ক্ষিপ্ত হইয়া তাবরীযীকে শহর ছাড়িতে বাধ্য করেন। বলা হয় যে, দামিশকে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর তিনি জালালুদ-দীন রূমীর পুত্র বাহাউদ-দীন সুলতান ওয়ালাদ (যিনি তিবরীযী সন্ধানের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন)-এর সঙ্গে কোনিয়ায় ফিরিয়া আসেন। ৬৪৩ হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি রহস্যজনকভাবে উধাও হইয়া যান। বলা হয় যে, সরকারী অনুচরগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল অথবা দুষ্কৃতিকারীদের (জালালুদ-দীন রূমীর এক পুত্রসহ) হস্তে তিনি নিহত হন, কিন্তু কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে, যথা 'মাছ্‌নাবীয়াত-ই সুল্‌তান ওয়ালাদ" এবং ফারীদুন ইব্‌ন আহ্‌মাদ প্রণীত রিসালা-ই সিপাহ্‌সালার (যাহাতে আনু. হি. ৭২০

সালে ফারসী ভাষায় জালালুদ-দীন রূমী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের বিবরণ লিখিত রহিয়াছে), ইত্যাদি সূত্রসমূহে এই কাহিনীর কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। আধুনিক কালের কতিপয় গবেষকের মতে শামস তাবরীযী কবি জালালুদ-দীন রূমীর কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি, বাস্তবে তাঁহার কোন অস্তিত্ব ছিল নাঃ "C'est son propre genie inspirateur" (রিদা তাওফীক Textes Houroufis, G.M.S., ৪খ, ৯৭০, টীকা ১) জীবনীকারদের প্রদত্ত তারিখগুলি এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিবরণাদিকে যদি কল্পিত (এবং তাবরীযীকে কল্পিত ব্যক্তিত্ব) মনে করা হয় তবে এই প্রতিপাদ্য হইবে অতি দুর্বল ভিত্তির উপর স্থাপিত। শামস তিবরীযীকে অনন্য ব্যক্তিত্বরূপে প্রমাণ করা সম্ভব নহে, বরং তাঁহার সমান্তরাল পর্যায়ে একাধিক ব্যক্তিত্ব রহিয়াছেন। রূমী তাঁহার দীওয়ান-ই শামস তাবরীযী-এ যেইরূপ ইলাহী বৈশিষ্ট্যের (deification) আরোপ তিবরীযীর প্রতি করিয়াছেন, অনুরূপ বৈশিষ্ট্য মাছনাবীতে হুসামুদ-দীন-এর প্রতি এবং একটি গাযাল-এ আর এক 'প্রিয় বন্ধু' সালাহুদ-দীন যারকূব-এর প্রতি আরোপিত হইয়াছে। ভাষার এই ঐকতান প্রমাণ করে যে, জালালুদ-দীনের এই তিন প্রেরণাদাতা (তাবরীযী, হুসামুদ-দীন এবং সালাহুদ-দীন যারকূব) হয় একই সংগে ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর থাকিবেন অথবা যুগপৎ বিদায় গ্রহণ করিবেন। যাহারা Dante-এর রচনাবলী পাঠ করিয়াছেন তাহাদের কাছে ইহা বিস্ময়কর মনে হইবে না যে, এই অনন্যসাধারণ সূফী কবি রূমী তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত অনুভূতিকে এমন ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার সর্বেশ্বরবাদী দর্শন প্রতিফলিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফারীদুন ইবন আহমাদ, রিসালা-ই সিপাহসালার, কানপুর ১৯০১ খৃ., পৃ. ৬৩ প., মিদহাত বাহারী হুসামীকৃত তুর্কী অনুবাদ, কন্সটান্টিনোপল ১৯১৩ খৃ., পৃ, ১৬৪ প.; (২) আফলাকী, মানাকিবুল আরিফীন, Cl Huart কৃত অনুবাদ, in Les saints des derviches tourneures, প্যারিস ১৯১৮ খৃ. এবং J. W. Redhouse কৃত অনুবাদ, in The Mesnevi, ১খ,, লন্ডন ১৮৮১ খৃ.; (৩) R. A. Nicholson, Selected Poems from the Diwan-i Shams- Tabriz, ক্যামব্রিজ, ১৮৯৮ খৃ. ।

R. A. Nicholson (E. I.[1]) / এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

তাব্‌ল (طبل) ঃ ঢাক গোষ্ঠীভুক্ত যে কোন প্রকার বাদ্যযন্ত্র নির্দেশক একটি বর্গীয় নাম। ইসলামী প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহে তুবাল ইবন লামাক-কে ইহার আবিষ্কারকরূপে গণ্য করা হইয়াছে (মাস'উদী, প্যারিস, ৮খ., ৮৮-৮৯), অন্যদিকে অপর একটি উপাখ্যান অনুসারে বলা হইয়া থাকে যে, মুসতারিবা (দ্র.) আরবগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হযরত ইসমাঈল (আ) প্রথম ইহার সুর সৃষ্টি করেন (আওলিয়া চেলেবি, Travels, ১/২খ., ২৩৯)। এই শব্দটি অ্যাসিরীয় তাব্বালু এবং সম্ভবত মিসরীয় তাবল-এর সহিত সমার্থক বিবেচনা করা যাইতে পারে। আল-ফায়্যূমী (১৩৩৩-৩৪)-র বর্ণনা অনুযায়ী তাবল শব্দটি একটিমাত্র পর্দা (জিল্‌দ) সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার ঢাক এবং একই সঙ্গে দুই পর্দাসম্বলিত অপর এক প্রকার ঢাকের জন্য সমভাবে প্রয়োগ করা হইত। অবশ্য ইহাদের মধ্যে দুফফ বা তাম্বুরীন (দ্র.) অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাবুল পরিবারের যন্ত্রসমূহকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথাঃ ১। চোঙ্গাকৃতি শ্রেণী ও ২। গামলা বা বড় বাটি শ্রেণী ।

১। চোঙ্গাকৃতি শ্রেণীর যন্ত্রসমূহ ঃ এই শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে দুইটি পৃথক প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ঃ (ক) এক পর্দাবিশিষ্ট ও (খ) দুই পর্দাবিশিষ্ট। প্রথমোক্ত প্রকারের বেশ কয়েকটি পৃথক পৃথক আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও সার্বিকভাবে এইগুলির দেহজ গঠন (জিসম) হয় চোঙ্গা অথবা পানপাত্রের আকৃতির ন্যায়। একটি মাত্র পর্দাসম্পন্ন চোঙ্গাকৃতি ঢাকের জন্য ব্যবহৃত প্রাচীনতম নামটি হইল আপাতদৃষ্টিতে খুব সম্ভবত কাবার যাহা য়া'কূব আল-মাজিসতূন (মৃ. ৭৮০-৮১ খৃ.)-এর কালেই উল্লেখ লাভ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় (ইব্‌ন খাল্লিকান, ৪খ., ২৭০)। আল-মুফাদ্দাল ইব্‌ন সালামা (মৃ. ৯২০ খৃ.) কর্তৃক ইহা একটি ঢাকরূপে (ইস্তাম্বুল, MS. fol 38) চিহ্নিত করা হইয়াছে এবং ইবন খাল্লিকান (৪খ., ২৭২) এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, ইহার মাত্র একটি পর্দা ছিল। আরবী অভিধানবেত্তাগণ এই শব্দটি বিভ্রান্ত করিয়া ফেলেন (তু. The Glossarium Latino-Arabicum, পৃ. ৮৫. ৫৬২ এবং Farmer, Studies, পৃ. ৫৯)। নামটি সম্ভবত আমহারিক ভাষার কাবারো হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং এই প্রসঙ্গে জানা যায় যে, আরবগণ আবিসিনিয়া হইতে অন্ততপক্ষে একটি ঢাকবাদ্যের আমদানী করিয়াছে (Lane, Lexicon, col. 2013)। এই নির্দিষ্ট শ্রেণীর ঢাকবাদ্যের পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে একটি অধিকতর সুনির্দিষ্ট সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইবে আশা-শাকুন্দী (মৃ. ১২৩১-৩২ খৃ.) প্রণীত রচনায়, যাহাতে আকওয়াল নামে পরিচিত একটি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে (আল-মাককারী Analectes, ২খ. ১৪৪)। মাগরিব অঞ্চলে ইহা অদ্যাবধি বর্তমান। Dozy বলেন যে, ইহা একটি বারবার ভাষাভুক্ত শব্দ এবং Meaken ইহাকে আগওয়াল্লরূপে লিখিয়াছেন। Host ইহার সচিত্র বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি অবশ্য ইহাকে একটি পানপাত্র আকৃতির ঢাকরূপে চিত্রিত করিয়া আকওয়াল নামে বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ. ২৬২. tab.xxxi, ৯)। বর্তমানকালে ইহা আলজিরিয়া অঞ্চলে গুল্লাল নামে পরিচিত এবং ইহা সাধারণত প্রায় ৬০ সে.মি. উচ্চতাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ত্রিপলীতানিয়া অঞ্চলের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাবদাবা নামে পরিচিত একটি অনুরূপ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Delphin et Guin, পৃ. ৩৯; Lavignac, পৃ. ২৭৯৪, ২৯৩২)।

উল্লিখিত পানপাত্র আকৃতির বাদ্যযন্ত্রটি আল-মুফাদ্দাল ইবন সালামা (পৃ. গ্র., fol. 21)-র ন্যায় অন্যান্য প্রাচীনতর আরবী গ্রন্থকারগণের উল্লেখকৃত দিররীজ যন্ত্র হইতে পারে, যদিও তিনি উহাকে একটি pandore (তুনবুর) বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং বহু সংখ্যক আরবী অভিধানবেত্তা একই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। আল-মায়দানী (মৃ. ১১২৪ খৃ.)-র সূত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, উহা প্রকৃতপক্ষেই একটি ঢাকবাদ্য ছিল। ইব্‌ন মুকাররাম (মৃ. ১৩১২ খৃ.)-এর মতানুসারে ইহার যথাযথ উচ্চারণে এবং তৎসহ উহার স্থানীয় কথ্য পরিবর্তনসমূহ সহকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে। Crosby Brown, ৩খ, ৫১ , ৫৩; A. M., ২৯খ., ২৩৯)। আল-মাক্‌কারী প্রদত্ত (Analec., ১খ, ১৪৩ ও Gayangos-কৃত ইহার অনুবাদ) كريم ও كريم প্রকৃতপক্ষে নকলনবীস কর্তৃক دريم -এর ভুল অনুলিপির ফসলমাত্র। মরক্কো হইতে পূর্বদিকে এই বাদ্যযন্ত্র একটি নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলিতানিয়া অঞ্চলে ইহা বহুকাল পূর্ব হইতেই দারবুকা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে (Salvador-Daniel, পৃ ৭৯; Christianowitsch, পৃ. ৩১; Delphin ও Guin, পৃ. ৪৩; Laffage, ৬খ, ৩২; Lavignac, পৃ. ২৯৩৫)। অপরদিকে সিরিয়া ও মিসরে ইহা দারবুক্কা (দ্র.) দারাবুক্কা, দরিবিক্কা, দিরবাশ বা দারাবুক্কা নামে পরিচিত (Villoteau, পৃ. ৯৯৬; Lane, Mod. Egypt., ১৮শ অধ্যায়; দারবীশ মুহাম্মাদ, পৃ. ১৩; El Hefny, পৃ. ৬৬০)। Dozy ও Brockelmann -এর মতে শব্দটি সিরিয়াক ভাষার আরদাবকা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আল্‌ফ লায়লা ওয়া

লায়লা (১খ., ২৪৪) গ্রন্থে যে دابلة-এর উল্লেখ রহিয়াছে তাহা সম্ভবত دربكة-এর জন্য প্রযোজ্য হইবে। এই সকল বাদ্যযন্ত্রের চিত্রাবলীর জন্য উপরে উদ্ধৃত কর্তৃপক্ষীয় সূত্রসমূহ দ্র.। অধিকাংশ যাদুঘরেই ইহাদের নমুনার সন্ধান পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে প্যারিস (নং ৯৫৪-৯৫৭. ১৪৫৭), ব্রাসেল্‌স (নং ১১২, ৩৩০-৩৩৪, ৬৮০) ও নিউ ইয়র্ক (নং ৩৩৫, ৩৪৫ ইত্যাদি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন কোন অঞ্চলে দারবূকা তাবলা নামে পরিচিত Farmer, Studies, ১খ., ৮৬)।

পারস্যদেশে বাদ্যযন্ত্র দুনবাক অথবা তানবাক নামে পরিচিত, যদিও অভিধানবেত্তাগণ উহাকে ভ্রান্তিপূর্ণভাবে এক প্রকার ব্যাগ-পাইপরূপে উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. Advielle, পৃ. ১৩ ও প্লেট; Kaempfer পৃ ৭৪২, চিত্র ৬; Lavignac, পৃ. ৩০৭৬)।

দ্বি-পর্দাসম্বলিত ঢাকবাদ্যসমূহ একইভাবে বহু প্রকার আকৃতিসম্পন্ন হইতে দেখা যায়। কূবা নামক একটি বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়; বালি-ঘড়ির ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন এই ঢাকবাদ্য আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) (মৃ, ৬৩৯ খৃ.)-এর সময়ের ন্যায় প্রাথমিক পর্যায়েই মুসলিমগণের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল। নিকৃষ্ট চরিত্রের জনগোষ্ঠীর সহিত ইহার সংস্রবের কারণে ইবন আবিদ দুনয়া (মৃ. ৮৯৪ খৃ.)-সহ বেশ কিছু সংখ্যক ফকীহ ইহার নিন্দা করিয়াছেন (Berlin MS, নং ৫৫০৪, পত্রক ৫৮)। ইখওয়ানুস সাফা (খৃ. ১০ম শতাব্দী) গ্রন্থে ইহাকে তাবলুল মুখান্নাছ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে (১খ, ৯১)। আল-জাওহারী (মৃ. আনু. ১০০২ খৃ.)-র বর্ণনা অনুসারে ইহা ছিল "মধ্যভাগে কৃশকায় একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ঢাক", যদিও আল-গাযালী (র) [মৃ. ১১১১ খৃ.]-এর কথায় ইহা ছিল দীর্ঘাকৃতি (ইহ্‌য়া, ২খ, ১৮৬)। পালের্মোর ১২শ' শতাব্দীর কাষ্ঠকর্মে (B. Z., ২খ, ৩৮৪) আল-মাওসিল হইতে প্রাপ্ত একটি ১৩শ' শতাব্দীর বাটীতে (Victoria and Albert Museum, লণ্ডন ১৮৫৬ খৃ., নং ২৭৩৪/৫৬) ও কনস্টানটিনোপলে রক্ষিত আল-জাযারী প্রণীত (১৩৫৪ সালের তারিখাংকিত) একটি পাণ্ডুলিপিতে (Martin, Miniature Painting and Painters of Persia, ২খ, প্লেট ২) মধ্যযুগের কূবাযন্ত্রের নকশাসমূহ দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। ঐকতান সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি ছন্দময় বাদ্যযন্ত্ররূপে যে তাবল বাদ্যের উল্লেখ কিতাবুল-আগানী গ্রন্থে (৮খ, ১৬১; ৯খ, ১৬২) বারংবার উক্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ছিল সম্ভবত কূবা অথবা দির্‌রীজ (=দারবূকা)। একমাত্র ভারতের ব্যতিক্রম ভিন্ন ইহা বর্তমান কালে মুসলিম প্রাচ্য অঞ্চলে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চোঙ্গাকৃতি অথবা পিপা আকৃতির ঢাকবাদ্য তুলনামূলকভাবে অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ইহাদের প্রথমোক্ত শ্রেণী ছিল সম্ভবত প্রাথমিক যুগের রণ-ঢাকের আকৃতি যাহা সম্পর্কে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর আব্বাসী বংশের বিবরণীসমূহে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (আগানী, ১৬খ, ১৩৯)। খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে রচিত আল-জাযারী কর্তৃক প্রণীত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সংক্রান্ত কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে (Schulz, Die Persisch-islamische Miniaturma'erei, tab. ২খ.; The Legacy of Islam, চিত্র ৯১)। এই দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট চোঙ্গাকৃতি ঢাকবাদ্য খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং Host (tab. xxxi) ও Niebuhr (tab xxvi)-এ ইহাদের নকশার সন্ধান পাওয়া যাইবে। Villoteau (পৃ. ৯৯৬) ইহাকে তাবলুত-তুরকী নামে অভিহিত করেন। মধ্যযুগ হইতেই ইহা একটি কিম্ভূতকিমাকার আঁকাবাকা ঢাককাঠি দ্বারা বাদন করা হইয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর উন্মেষ লগ্নে দ্বিতীয় একটি বাদন সরঞ্জাম, একটি ছড়ি ব্যবহারের প্রচলন হয়। আধুনিক কালে এই ঢাকের স্থলে খর্বাকার দেহবিশিষ্ট অপর এক প্রকার ঢাক ক্রমশ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। প্রাচীনতর সময়ে এই ঢাকটি পারস্যদেশে এবং আরবী ভাষাভাষী দেশসমূহে দুহুল নামে পরিচিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহা নাসির-ই খুসরাও (মৃ. ১০৬০-৬১ খৃ.) কর্তৃক ফাতিমী বংশের ব্যবহৃত সামরিক বাদ্যযন্ত্রসমূহের অন্যতম (সেফেরনামেহ, পৃ. ৪৩, ৪৬, ৪৭,) এবং আজ-জাহিরী কর্তৃক (মৃ. ১৪৬৮ খৃ,) মামলূক সুলতানগণের মধ্যে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্ররূপে (আল-মাকরীযী, ১/১খ, ১৭৩-১৭৪) উল্লেখ করা হইয়াছে। নাসির-ই খুসরাও ও জালালুদ-দীন রূমী (G.M.S., N.S., ৪/৩খ., পৃ. ২৫৯) উভয় সূত্র হইতেই জানিতে পারা যায় যে, ইহা তাবল হইতে ভিন্নতর একটি বাদ্যযন্ত্র। আধুনিক কালের মিসরে ইহা তাবলুল-বালাদী নামে পরিচিত (Villoteau, পৃ, ৯৯৬; Lane পৃ. গ্র. ,১৮শ অধ্যায়)। ব্রাসেলস (নং ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৪১) ও নিউইয়র্কে (নং ৪১৭, ১৩২১) ইহার নমুনাসমূহ সংরক্ষিত রহিয়াছে। Kaempfer (নং ৭৪০ চিত্র ৪) পারস্যের চোঙ্গাকৃতি ঢাকবাদ্যকে দানবাল নামে অভিহিত করিয়া উহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাখত-ই বুসতানের ভাস্কর্য কার্যসমূহে এই একই বাদ্যযন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় (Flandrin Coste, Voyag en Perse, প্লেট ১০, ১২)। ফিরদাওসী বর্ণিত তাবীর বাদ্যযন্ত্র সম্ভবত অনুরূপ শ্রেণীভুক্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতে ব্যবহৃত 'ঢোল' দ্র.। আওলিয়া চেলেবী (Travels, '১/২খ, ২২৬) কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে, তুরস্কে দাউল প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল উরখান গাযী (১৩২৬-৫৯ খৃ.) কর্তৃক, কিন্তু তাঁহার পূর্বসূরী ১ম উছমানের সময়েই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আরবদের ন্যায় তুর্কীগণও এই প্রকার ঢাক বাদনের জন্য একটি কাঠি (চানগাল) এবং একটি ছড়ি (দায়নাক) ব্যবহার করিত।

আধুনিক যুগে পারস্য দেশের ডোহোল বাদ্যযন্ত্রটি হইল একটি পিপা আকৃতির ঢাক (Advielle, পৃ, গ্র Lavignac, পৃ, ৩০৭৬; তু. Kaempfer, পৃ ৭৪৩, চিত্র ১২)। আরবীয় তাবল অথবা পারস্যের তাবীর হইতে য়ুরোপীয় tabel, atabal, tabor, tambour ইত্যাদির উদ্ভব হইয়াছে।

২। গামলা (বা বড় বাটী) শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রসমূহ। এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী বাদ্যসমূহ হইল নাকাড়া (Kettledrum)। যদিও প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহে বলা হইয়া থাকে যে, ভারতীয় অধিবাসী বাবা সাবিনদীক কর্তৃক হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পরিচালিত যুদ্ধসমূহে নাকাড়া বাদ্য (কুস, নাককারা) বাদন করা হইয়াছিল (আওলিয়া চেলেবী, Travels, ১/২ ২২৬), তথাপি ইহা অধিকতর সম্ভাব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, ইবন খালদূনের বক্তব্য অনুসারে (N. E., ১৭খ, ৪৪) এই সময়ে যুদ্ধ অভিযানে আরবগণ কোন প্রকার ঢাক বাদ্য ব্যবহার করিত না। প্রাথমিক যুগের মুসলিম ফাকীহগণ তাবলুল হারব (রণ-ঢাক) তাবলুল হাজ্জ (হজ্জযাত্রার ঢাক) ও তাবলুল লাহওয়া (বিনোদনমূলক ঢাক)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটির ব্যবহার অনুমোদন করা হইত, কিন্তু শেষোক্তটি অনুমোদিত ছিল না (আল-গাযালী, ২খ. ১৮৬)। প্রথমোক্ত দুইটি বাদ্যযন্ত্র সন্দেহাতীতভাবেই আধুনিক যুগের নাককারা ও তাবলুশ শামীর সহিত অভিন্ন ছিল।

মুসলিম জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত নাকাড়াসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ উদাহরণ ছিল কূরগা এবং কূরগা যাহা মুগল রাজন্যবর্গের অত্যন্ত বিস্তৃত সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইহা ছিল রাজকীয় ঢাকবাদ্য যাহা দ্বারা আদেশ ও নির্দেশ জারি করা হইত। ইবন বাত্তূতা কর্তৃক উল্লেখকৃত (২খ.,

১২৭) তাবলুল কাবীর ছিল নিঃসন্দেহে কুরগা বাদ্য। আ'ঈন-ই আকবারী (Blocklemann, ৯খ, ৫০-৫২) হইতে এই ঢাকবাদ্যের আকার-আকৃতি প্রসঙ্গে একটি ধারণা করিতে পারা যায়। এই গ্রন্থে ইহাকে প্রায় এক মানুষ সমান উচ্চতাসসম্পন্নরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবদুল ফাদল বলেন যে, কূরগা ও দামামা ছিল এক ও অভিন্ন বাদ্যযন্ত্র (১খ. ৫০)। কিন্তু ভারতে প্রচলিত দামামা হইল অনেকাংশে ক্ষুদ্রতর নাকাড়া (নিউ ইয়র্ক-এর নমুনা দ্র., নং ২৬)। আবদুর-রাযযাক আস-সামারকানদী (মৃ. ১৪৮২ খৃ.) সুস্পষ্টভাবে কুরগা, 'দামামা ও নাক্‌কারা-এর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন (N.E., ১৪খ., ১২৯, ৩২১, দ্র. Farmer, Studies, ২খ., ১২-১৩)।

আকারের দিক হইতে ক্রমানুসারে পরবর্তী নাকাড়া ছিল কূস। ইহা ছিল খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর আরব জনগণের ব্যবহৃত নাকাড়া বাদ্যযন্ত্রসমূহের মধ্যে বৃহত্তম (ইখওয়ানুস সাফা, ১খ, ৯১)। এই বাদ্যযন্ত্রটিও ছিল একটি সময় বাদ্যযন্ত্র এবং ইহার ব্যবহার প্রসঙ্গে দ্র. প্রবন্ধ তাবলখানা। Schulz. (পৃ. গ্র. প্লেট ৮) কর্তৃক পুনঃমুদ্রিত একটি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর আরবী পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে যাহাতে তিন জোড়া কূসাত-এর চিত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে। সুপ্রচলিতভাবে পরিচিত নাকাড়া বাদ্যটি ছিল যাহা ইখওয়ানুস সাফা গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী তাবলুল মারকাব (Mounted drum) নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহাদের বক্তব্য অনুসারে ইহাতে উৎপন্ন সুর ছিল তাবলুল-কূস-এর সুর হইতে কোমলতর। এই ঢাকের জন্য ব্যবহৃত অপর একটি প্রারম্ভিক নাম হইল দাবদাব অথবা দাবদাবা। পরবর্তী সময়ে ইহা নাক্‌কারা নামে পরিচিতি লাভ করে, এই শব্দটি ও ইহার সহিত এই যন্ত্রটি য়ূরোপে প্রচলন লাভ করিয়াছিল এবং naker, nacaire ইত্যাদি নাম ধারণ করে। অন্যদিকে পারস্যের তিনবাল য়ূরোপীয় ব্যবহারে timbale, tymbala-রূপ গ্রহণ করে। নাক্‌কারা-এর মধ্যযুগীয় নকশা ও রূপের জন্য দ্র. schulz (পৃ. গ্র., tab. ২খ.). The Legacy of Islam (চিত্র ৯১), কিতাবুল বুলদান (Bodleian MS. or. 133. fol. 38) ও জামিউত তাওয়ারীখ (এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, fol. 54, 157)। এই প্রসঙ্গে আরও দ্র. প্রবন্ধ তাবলখানা। আধুনিক কালের উদাহরণসমূহ Villoteau (পৃ. ৯৯২-৯৯৩) কর্তৃক বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, অন্যদিকে ইহার প্রকৃত নমুনাসমূহ ব্রাসেলস্ (নং ৩৩৫) ও নিউ ইয়র্ক (নং ১২৩২-এ সংরক্ষিত আছে। তুর্কী দুনবালাক অথবা তাবলাগ প্রসঙ্গে তথ্যের জন্য নিবন্ধকারের F.R.A.S., ১৯৬৩-এর প্রবন্ধটি দ্র.)।

একটি মধ্যম আকারের নাকাড়া বাদ্য Villoteau নাকরাযান (মূল পাঠ) নামে অভিহিত করিয়াছেন। তুরস্কে এই আকারের একটি বাদ্যযন্ত্রকে কুদূম নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে এবং বলা হইয়া থাকে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) ও খাদীজা (রা)-এর বিবাহ অনুষ্ঠানে এই বাদ্য বাদন করা হইয়াছিল (আওলিয়া চেলেবি, ১/২খ., ২৩৪)। দারবীশ গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ইহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

নাকাড়া বাদ্যসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র সংস্করণ হইল নুকায়রা বা তুবায়লা। ইহা ঐকতান বাদনে ব্যবহৃত হয়। মুসলিম স্পেনের আব্বাদীগণ (সম্পর্কিত বিবরণে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী) ইহাদের প্রথমটির উল্লেখ পাওয়া যায় (Dozy, Abbad, ২খ, ২৪৩) এবং Vocabulista Aravigo (১৫০৫ খৃ.) গ্রন্থে এই শব্দটি স্পেনীয় atabalia-এর সমার্থকরূপে গণ্য হইয়াছে। Russel প্রণীত Aleppo গ্রন্থে (১৭৯৪ খৃ.) নাক্‌কারা (=নুকায়রা)-এর একটি নকশা (প্লেট ৪) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং Host (tab. xxxi, 10) ও Christianowitseh (পৃ. ৩২, প্লেট ৯২)-এর গ্রন্থে অন্যান্য নমুনা দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। শেষোক্ত উদাহরণ পরবর্তীকালে Fetis (২খ, ১৮৩) ও Lavignac (পৃ. ২৭৯৩) কর্তৃক অনুকৃত করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে মিসর প্রসঙ্গে বক্তব্যে Villoteau বেশ কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্রাকার হস্ত-নাকাড়ার উল্লখ করিয়াছেন, কিন্তু কেবল তাবল-ই বায নামে পরিচিত একটি বাদ্য ব্যতিরেকে এই সকল নামের অধিকাংশই বর্তমান কালে অপরিচিত (Villoteau, পৃ. ৯৯৪)। সুস্পষ্টভাবেই ইহা ছিল পাখী প্রলুব্ধ করিতে অথবা শিকারী শ্যেন (বায)-কে ফিরিয়া আসিবার নির্দেশ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত একটি ঢাক। অপরপক্ষে ইহা রামাদানের সময় ঘোষকগণের পসন্দসই বাদ্যরূপে গণ্য হয় এবং দারবীশ সম্প্রদায়সমূহের নিকটও ইহা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বস্তুতপক্ষে ইহা তাবলাতুল-মুসাহহিরা নামে পরিচিত ছিল। ব্রাসেলস (নং ৩২৯) ও নিউ ইয়র্কে (নং ৪২১, ২৬৬১) ইহার নমুনা রহিয়াছে। ইহাকে এক হাতে ধরিয়া রাখিয়া অপর হাতে একটি খর্বাকৃতি বাদন-কাঠি দ্বারা বাদন করা হইত। ইহা হইতে সামান্য বৃহৎ একটি বাদ্যযন্ত্র হইল তাবলুল-মিজরী (মূল পাঠ) । এই বাদ্যটি একটি চর্ম স্ট্র্যাপ দ্বারা বাদন করা হইত।

অগভীর শ্রেণীর নাকাড়া বাদ্যযন্ত্রসমূহের মধ্যে ছিল তাবলুশ-শামী ও কাস'আ। ইহাদের প্রথমোক্তটি ছিল সম্ভব তাবলুর হাজ্জ-এর সহিত অভিন্ন। ফকীহগণ বহু ক্ষেত্রেই ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা গলা হইতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত এবং ইহার মস্তক বা পর্দা উল্লম্ব অবস্থানে থাকিত। বডলিয়েন লাইব্রেরীতে (Bodleian Library, or 430, Fol. 15) এই সকল ঢাক সহকারে তীর্থযাত্রীদের একটি চিত্র সংরক্ষিত রহিয়াছে (খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী)। আধুনিক কালের নকশা এবং বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Villoteau (পৃ. ৯৯২-৯৯৪) ও Lane (Mod.-Egypt, অধ্যায় ২, ৬, ১৮)। নিউ ইয়র্কে (নং ৩৮৬, ৪৯৪) ইহার নমুনা রহিয়াছে। মাগরিব অঞ্চলের কাস'আহ বর্তমান কালে থালার (কাস'আতুন) ন্যায় সমতল তলদেশসম্পন্ন বিধায় ইহা এই নাম লাভ করিয়াছে। ইহা মাতারিক নামে পরিচিত দণ্ড দ্বারা বাদন করা হয় (Delphin ও Guin., পৃ. ৪৪; Lavignnc, পৃ. ২৯৩২)। অতীত কালে ইহা একটি সমর বাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত (কিতাবুল ফাখরী, মূলপাঠ পৃ. ৩০। ইহার ফরাসী অনুবাদে কিসা'রকে cymbales-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ A. M., ১৬ খ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুফাদদাল ইবন সালামা, কিতাবুল-মালাহী (ইস্তাম্বুল পাণ্ড); (২) Host, Nachrichten von Marokos und Fes; (৩) Delphin ও Guin, Notes sur la poesie et de la musique arabes; (৪) Lavignac. Encyclopedie.de la musique arabes; (৫) Crosby Brown, Catalogue of the Crosby Brown Coll. of Musical Instruments...., নিউ ইয়র্ক; (৬) Salvador Daniel, La musique Arabe, ১৮৭৯; (৭) Christianowitsch, Esquisse historique de la musique arabe; (৮) Laffage, La musique arabe, তিউনিস; (৯) Villoteau. in Description de l'Egypte, etat moderne, fol ed., ১খ.; (১০) দারবীশ মুহাম্মাদ আল-হারীরী, সাফা আল-আওকাত, কায়রো; (১১) El-Hefny, 'Congres de musique arabe, কায়রো; (১২) Kaempfer, Amoenitatum exoticarum; (১৩) Mahillon, Catlogue descr..du Muse, Instrumental du conservatoire royal de Musique de Bruxelles; (১৪) Chouquet, Le musec du Eonservatotir National de Musique, প্যারিস; (১৫) ইখওয়ানুস সাফা, রাসাইল,

সং. বোম্বাই; (১৬) আল-গাযালী, ইহয়া, কায়রো ১৯০৮ খৃ.; (১৭) কিতাবুল আগানী, সং. বূলাক; (১৮) Niebuhr, Voyage en Arabic; (১৯) Advielle, La Musique chez les persans; (২০) Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments. ১খ; (২১) Fetis, Hist. gen. de la Musique; (২২) Sachs Rellexikon der Musikinstrumente.

H. G. Farmer (E.,1.[1])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাবলখানা (طبل خانه) ঃ নাককারখানা, নাককারাখানা, নাওবাখানা আক্ষরিক অর্থে 'ঢাকবাদ্য গৃহ', 'নাকাড়া বাদ্যগৃহ', 'সামরিক বাদ্যগৃহ'। এই হইল ইসলামী দেশসমূহে সামরিক বাদ্যযন্ত্রী দল এবং শিবির অথবা শহরে উহাদের আবাসিক এলাকা নির্দেশক নাম। এই সকল নাম সামরিক বাদ্যযন্ত্রী দলসমূহের প্রধান বাদ্যযন্ত্র সমাহার গঠনকারী ঢাকবাদ্যের নাম (তাবলা, নাককারা) হইতে এবং এই প্রকার যন্ত্রীদল কর্তৃক বাদনকৃত বিশেষ ধরনের যন্ত্রসঙ্গীতের (নাওবা) জন্য প্রযোজ্য নাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মূলত নাককারখানা অথবা তাবলখানা কেবল ঢাকবাদ্য সমন্বয়ে গঠিত হইত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাতে শুধু নির্দিষ্ট কোন প্রকার ঢাকবাদ্য অন্তর্ভুক্ত হইত। কতিপয় সংখ্যক কর্তৃপক্ষীয় সূত্র হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। ইবন তাগরীবিরদী (মৃ. ১৪১২) নাকাড়া (দাবাদিব) অর্থাৎ তাবলখানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। আল-জাহিরী (মৃ. ১৪৬৮) তাবলখানা-এর তিনটি বিন্যাস (আহমাল) ও দুইটি শিঙ্গা" প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন ইয়াস (মৃ. আনু. ১৫২৪ খৃ.)-এর রচনায় তাবলখানা ও বৃহৎ নাকাড়া বাদ্য (কূসাত) প্রসঙ্গে একটি নির্দেশনা দেখিতে পাওয়া যায় (আল-মাকরীযী, Hest. des Sultans Mamlouks de l'Egypte, অনুবাদ Quatremere, প্যারিস ১৮৪৫ খৃ., ২খ./১, ১২৩; ২খ./২. ২৬৮; আল-খাযরাজী, The Pearl-Strings, in G. M. S., ৩খ., লণ্ডন, ১৯০৬-১৯১৮, ৩খ/৫, ১৩৫, ২২৯)। নাওবা প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ইহা ছিল একটি বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীতকর্ম, যাহা পরবর্তীকালে কয়েকটি লয় ও গতি (ফুসূল) সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং রাজন্যবর্গ কর্তৃক দিবসের পাঁচবার প্রার্থনা (দ্র. সালাত) সমাপনের সময় নাককারাখানা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। তবে আবশ্যিক তিন প্রার্থনার সময় তাহা নিম্নতর পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা দ্বারা সম্পাদন করা হইত। নাওবা সঙ্গীতের বাদন ব্যবস্থা যে শুধু সার্বভৌমত্ব পরিচায়ক একটি বৈশিষ্টরূপে অত্যন্ত কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হইত তাহাই নহে, ইহার বাদন চলাকালে ইহার শ্রোতাবৃন্দকে আবশ্যিকভাবে সম্মানসূচক নীরবতা পালন করিতে হইত (ইবন বাতূতা; সং প্যারিস, ২খ, ১৮৮ Von Hammer, Hist. de l'Empire ottoman, প্যারিস ১৮৩৫, ১খ., ৭৫)। বলা হইয়া থাকে যে, নাওবা সঙ্গীতের রীতিটি মহান আলেকজাণ্ডারের সময়কাল হইতে বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে (আন-নাসাবী Hist. du Sultan Djelal ad-Din Mankobirti, in P.E.L.O.V., প্যারিস ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ২১)।

প্রাচীন জনগোষ্ঠীসমূহ ঃ স্মরণাতীত কাল হইতেই তাহাদের সামরিক শক্তি ও শৌর্য প্রদর্শনের জন্য প্রাচ্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর নিকট ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রসমূহ বিশেষভাবে সমাদৃত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গ্রীকগণ, যাহারা স্বয়ং সমরক্ষেত্রে শুধু শিঙ্গা ও বাঁশী ব্যবহার করিত, তাহারা মনে করিত যে, ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রসমূহ অসংস্কৃত অসভ্য জাতির ঐতিহ্য। তথাপি "History of Alexander the Great"-এর Pseudo-Callesthenes-এর সিরিয়াক ভাষার ভাষ্যটি (অনু. Budge, পৃ. ৯৬) হইতে দেখা যায় যে, বিশ্ব বিজয়ী তাঁহার সামরিক বাদ্যদলে ঢাক সংযুক্ত করিয়াছিলেন। অপরদিকে কিতাবুস-সিয়াসা (৮ম-৯ম শতাব্দী) নামক Pseudo Aristotelian আরবী প্রবন্ধ আরবী ভাষাতেই রচিত মূরিসতুস [দ্র.] -এর সমসাময়িক কালের রচনাসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আলেকজাণ্ডার তাঁহার বাহিনীতে সৈনিকদের প্রতি সংকেত প্রেরণ করা এবং শত্রু বাহিনীর মধ্যে আতংক ও শংকা সৃষ্টির জন্য মাধ্যমরূপে পানিবাহী (Hydraulis) শ্রেণীর এক প্রকার অতি বৃহৎ অর্গান বাদ্যও (উরগানুম) প্রবর্তন করিয়াছিলেন (Farmer, The Organ of the Ancients. লণ্ডন ১৯৩১, পৃ. ১১৯-১৩৮)। Strabo (খৃ. পূ. ১ম শতাব্দী)-এর বর্ণনামতে পারস্য দেশের যুবকদলকে পিতল নির্মিত যন্ত্রের শব্দে অস্ত্র ধারণ করিতে আহ্বান করা হইত এবং ভারতের রাজন্যবর্গ ঢাক ও করতালের বাদ্যের সঙ্গে জনসাধারণ্যে আবির্ভূত হইতেন (Geogr., ১৫খ/১, ৫৫, ১৫খ/৩, ১৮)। Plutarch (মৃ. আনু. ১২০ খৃ.) উল্লেখ করেন যে, পার্থীয়গণ শত্রুদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য নাকাড়া বাদ্য ব্যবহার করিত (Crassus, ২৩খ, ১০)। ফিরদাওসী (মৃ. ১০২০ খৃ.) প্রণীত শাহনামা গ্রন্থের পত্রে পত্রে প্রাচীন যুগের পারস্যের সামরিক বাদ্য ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে বহুল বিস্তারিত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে শিঙ্গা ও ভেরী শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রসমূহ (কাররানায়, শাইপুর, বুক) নল-খাগড়া ও পিতলের বাঁশী (নায়, রুবীন নায়) ঢাক ও বৃহৎ নাকাড়া (তাবিরা, কূস) এবং সেইসঙ্গে ভারতীয় ঘণ্টা, Sonette ও করতাল (হিন্দী দারায়, যানগ, সিন্‌জ)-এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

জাহিলীয়া যুগের আরব জাতি ঃ Clement of Alexandria (খৃ. ২য় শতাব্দী)-র বর্ণনামতে প্রাক-ইসলামী যুগের আরবজাতি সমরক্ষেত্রে করতাল (Paedagogos) ব্যবহার করিত। কিন্তু আরবী গ্রন্থকারগণ কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে গায়িকা-কন্যা (কিয়ান) ও উহাদের নেতৃদের ব্যবহৃত তাম্বুরীনের (দুফফ) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহুদ ও বদরের যুদ্ধে কেবল ইহারই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও ইহা অত্যন্ত সম্ভাব্য যে, এই সময়কালে নল-খাগড়ার বাঁশী (মিযমার) সামরিক সঙ্গীতে একটি বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হইত (Farmer, Hist. of Arabian Music, ১৯২৯, পৃ. ১০-১১; কিতাবুল আগানী, সং. বূলাক, ২খ, ১৭২)। অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণরূপে বিবেচিত সেই তুর্কী গ্রন্থকার আওলিয়া চেলেবি (মৃ. আনু. ১৬৮০) দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়কালে তাঁহার নেতৃত্বাধীন সামরিক অভিযানে ভেরী অথবা বাঁশী কোনটিই সমর সংকেতরূপে ব্যবহার করা হয় নাই, বরঞ্চ এইজন্য ব্যবহৃত হইত শুধু বৃহৎ নাকাড়া (কূস; Travels, অনু. von Hammer, লণ্ডন ১৮৪৬ খৃ., ১খ/২, ১৯৪); ইহার বিপরীতমতে ইবন খালদূন (মৃ. ১৪০৬) বলেন যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ শিঙ্গা (আবওয়াক) অথবা ঢাক (তুবূল, N. E., ১৭খ., ৪৪) কোনটিই ব্যবহার করিত না। ইহা নিশ্চিত যে, যদিও আরবগণ সামাজিক জীবনে শিঙ্গা (বূক) ব্যবহার করিত, তবে তাহা তাহাদের জন্য একটি সামরিক বাদ্যযন্ত্ররূপে বিবেচিত ছিল না, যেহেতু ইহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত রহিয়াছে যে, ৯ম শতাব্দীর সময়কালে ইহা খৃষ্টানদের দ্বারা ব্যবহৃত হইত (আল-জাওহারী, সিহাহ)।

উমায়্যা ও আব্বাসী বংশ ঃ উমায়্যা বংশের শাসনকালে (৬৬১-৭৫০ খৃ.) ঢাক ও নাকাড়া যন্ত্র সামরিক সঙ্গীত ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয় বলিয়া মনে হয় এবং তাহা নল-খাগড়ার বাঁশীর (মিযমার) সহিত সঙ্গতি সাধনের তুলনায় অধিকতর ক্ষেত্রে তাম্বুরীনের (দুফফ) তুলনার অধিকতর সুবিধাজনকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে (Seyyid Ameer Ali, Short Hist. of the Saracens, লণ্ডন ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ৬৫)।

পারসিক প্রভাব, যাহা প্রাথমিক যুগের 'আব্বাসী শাসকবর্গের শাসনকালে (৭৫০-১২৫৬ খৃ.) অত্যন্ত শক্তশালীরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহার ফলশ্রুতিতে তুলনামূলকভাবে আদিম মিযমারের স্থলে পারস্যের নল-খাগড়া বাঁশী (সুরনায়) প্রচলিত হয় (আগানী, ১৬খ., ১৩৯, তবে سرناب -এর স্থলে سرنى পাঠ করিতে হইবে)। পারস্যবাসিগণ সুরনায় (সুরয়ানাই)-এর সহিত ঢাক ব্যবহার করিত (তাবল; আল-মাসঊদী, প্যারিস ১৮৬১-১৮৭৭, ৮খ, ৯০)।

১০ম শতাব্দীতে কয়েক শ্রেণীর নাকাড়া বাদ্য সামরিক বাদ্য সমন্বয়ে ব্যবহৃত হইতে শুরু হয়; এইগুলির মধ্যে ছিল তাবলুল-মারকাব অথবা "Mounted drum" যাহা সম্ভবত দাবদার অথবা দাবদাব-এর সহিত অভিন্ন ছিল এবং নাককারা ও একটি বৃহৎ শ্রেণীর বাদ্য বৃহদাকার নাকাড়া বা কূস (রাসাইল ইখওয়ানিস সাফা, সং বোম্বাই, ১খ., ৯১)। এইগুলি জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার করা হইত এবং অশ্ব বা উষ্ট্রের গলার উভয় পার্শ্বে ঝুলন্ত অবস্থায় বহন করা হইত। এই একই সময়কালের মধ্যে বূক বা শিঙ্গাও সামরিক সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও মূলত ইহা তুলনামূলকভাবে আদিমতর কারন্-এর ন্যায় কোন প্রকার প্রাণীর স্বাভাবিক শৃঙ্গ হইতে প্রস্তুত করা হইত, পরবর্তী সময়ে তাহা ধাতু দ্বারা নির্মিত হইতে থাকে এবং আওলিয়া চেলেবির মতে এই ধাতব শিঙ্গার ব্যবহার (পিরিন্জ বূক) সালজূক বংশীয় শাসক আল্প আরস্লান (মৃ. ১০৭২) কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল (Travels, ১/২খ, ২৩৮)। প্রকৃত শ্রেণীর তৈরী বাদ্য ছিল নাফীরা। এই বাদ্যযন্ত্র প্রথমে বূক আন-নাফীর বা সামরিক বূক নামে পরিচিত ছিল (ইবনুত-তিকতাকা আল-ফাখরী, সং Derenbourg, পৃ. ৩০)।

বুওয়ায়হী বংশঃ দশম শতাব্দী পর্যন্ত নাককারখানা বা তাবলখানা—যাহা এই সময়কালের মধ্যে নাকাড়া, ঢাকবাদ্যসমূহ, ভেরী, শিঙ্গ ও নল-খাগড়ার বাঁশী লইয়া গঠন করা হইতে থাকে, যাহা ছিল খলীফার পদমর্যাদাসূচক প্রতীক চিহ্নের (মারাতিব) অংশবিশেষ এবং তাহা নাওবাসহকারে কেবল বিশ্বাসীবর্গের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকিত (ইবন খালদূন, in N. E., ১৭খ, ৪২; Quatremere, Hist. des Mongls. পৃ. ৪১৮)। খিলাফাত ব্যবস্থার ক্রমঅবক্ষয় এবং যত্রতত্র নগণ্য শ্রেণীর শাসক অধিপতিবর্গের উত্থান লাভের সাথে সাথে কোন প্রকার বিচার-বিবেচনা বা যোগ্যতা ব্যতিরেকে সকলেই নাককারাখানা ও নাওবা-এর গৌরব লাভের জন্য দাবিদার হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে একটি প্রথার উদ্ভব ঘটে; এই প্রথা অনুসারে যখন খলীফা কোন অনুগত শাসককে রাজকীয় মর্যাদা দ্বারা ভূষিত করিতেন তখন খলীফা কর্তৃক প্রকৃত সনদ, পতাকা অথবা ধ্বজার ন্যায় অন্যান্য কর্তৃত্ব প্রকাশক প্রতীক ও ব্যবস্থাবলীর সাথে সাথে সাধারণত একটি ঢাকবাদ্য অথবা নাকাড়া প্রেরণ করা হইত। প্রেরিত বাদ্যযন্ত্রের প্রকার উহার সংখ্যা ও নাওবা-এর সুনির্দিষ্ট ব্যবহার নির্ধারণ করা হইত প্রাপক শাসকের পদমর্যাদার ভিত্তিতে। বুওয়ায়হী বংশীয় আমীর মুইয়্যিদ দাওলা (মৃ. ৯৬৭) খলীফা আল-মুতী' (মৃ. ৯৭৪)-এর নিকট হইতে নাককারখানা অধিকার লাভের প্রার্থনা করেন কিন্তু তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়। তথাপি ৯৬৬ সালে এই একই খলীফা জনৈক সেনানায়ককে একটি অভিযান পরিচালনাকালে নাকাড়া (দাবাদিব) বাদ্য বাদনের অনুমতি প্রদান করেন। এই সম্মান শেষোক্ত ব্যক্তি পরবর্তী কালে অব্যাহতভাবে সংরক্ষণ করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অবশ্য ইহা কথিত রহিয়াছে যে, প্রথম যে যুবরাজ এই পরম লোভনীয় সঙ্গীতে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন তিনি হইলেন বুওয়ায়হী আমীর আবদুদ-দাওলা (মৃ. ৯৮৩)। ৯৭৯ খৃ. খলীফা আত-তাঈ' কর্তৃক তাঁহাকে নাককারাখানা-এর সম্মান অর্পণ করা হয়। কিন্তু তাঁহাকে শুধু প্রার্থনার জন্য আবশ্যিক সময়কালে তিন মাত্রার নাওবা বাদনের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল, পাঁচ মাত্রার নাওবা কেবল খলীফার জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। বুওয়ায়হী বংশীয় একজন আমীর আবূ কালীজার (মৃ. ১০৪৮), বাগদাদে উক্ত পাঁচ মাত্রার নাওবা সম্মান পরিগ্রহ করেন এবং যদিও খলীফা কর্তৃক তাঁহাকে শুধু তিন মাত্রার নাওবা দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য আদেশ করা হয় তিনি উক্ত আদেশ অস্বীকার করেন। তথাপি লক্ষণীয় যে, ইতোপূর্বেই খলীফা অন্যান্য ব্যক্তিকে এই বিশেষ সম্মান অথবা স্বয়ং পরিগ্রহ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। ১০০০ খৃ. খলীফা আল-কাদির-এর শাসনকালে জনৈক মন্ত্রীকে পাঁচ মাত্রার নাওবার জন্য একটি ঢাকবাদ্য (তাবল) বাদনের অনুমতি দেওয়া হয় এবং ১০১৭ খৃ. বুওয়ায়হী বংশীয় সুলতানুদ দাওলাকে একটি অনুরূপ সম্মান লাভের অনুমতি দেওয়া হয় অথবা তিনি স্বয়ং তাহা পরিগ্রহ করেন (Quatremere, পূ. গ্র., পৃ. ৪১৮; Margoliouth, The Eclipse of the Abbaside Caliphate, ২খ, ২৬৪, ৩৯৬; ৩খ, ৩৪৫)।

সালজূক বংশঃ এই বংশের শাসকবর্গের অধীনে নাককারাখানা সংক্রান্ত বিশেষ সম্মানসূচক সুবিধাসমূহ বহুলভাবে বিস্তার লাভ করে। খলীফা আল-মুকতাদী (মৃ. ১০৯৪) কোন দেশের জন্য একজন গভর্নর নিয়োগ করিবার সময় তাঁহার জন্য বৃহদাকার নাকাড়াবাদ্য (কূমাত) অনুমোদন করিতেন, উক্ত গভর্নর তাঁহার কর্তৃত্বাধীন প্রদেশের অভ্যন্তরে পাঁচ মাত্রার নাওবা বাদনের অনুমতি পান। তবে তাঁহার কর্তৃত্বাধীন প্রদেশের বাহিরে তিনি মাত্র তিন মাত্রার নাওবা বাদন করিতে পারিতেন। ১১০১ সালে যখন দুই সালজূক যুবরাজ বারকিয়ারূক ও মুহাম্মাদ যথাক্রমে সুলতান ও মালীক উপাধি ধারণ করেন তখন তাঁহার এই সকল পদের সহগামীরূপে যথাক্রমে পাঁচ ও তিন মাত্রার নাওবা সঙ্গীত ব্যবহার করিতেন (ইবনুল জাওযী, Bibl. Nat., প্যারিস, MS. No 1506, fol. 105; আল-বুনদারী, Bibl. Nat., প্যারিস, MS. No. 2127, fol. 206)।

আরব জনগোষ্ঠীসমূহ ঃ ৯ম শতাব্দীকালে য়ামান অঞ্চলে কারমাতী আল-মানসূর ইবন হাসান ত্রিশটি ঢাকের (তুবূল) অধিকারী ছিলেন এবং বানূ নাজাহ গোত্রের সাঈদ আল-আহওয়ালের (মৃ. ১০৮৯) শিঙ্গা (বূকাত) ও ঢাকবাদ্য (তুবূল) ছিল। পরবর্তীকালে তাবলখানায় বৃহদাকার নাকাড়া (কুসাত) ও নাকাড়া বাদ্যসমূহের (নাককারাত) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (Kay, Yaman. its Early Mediaval History, লন্ডন ১৮৯২ খৃ., পৃ. ৮৪; আল-খাযরাজী, পূ. গ্র, ৩খ/১, ১০৩, ১৬০, ৩খ/২, ৩, ৭৫, ৩খ/৩, ৫২)। উমানের অন্তর্গত জাফার নামক স্থানে ১৪শ শতাব্দীতে স্থানীয় সুলতান তাঁহার তোরণদ্বারে নল-খাগড়ার বাঁশী (সুরনায়াত), শিঙ্গা (বূকাত), ভেরী (আনফার) এবং ঢাকবাদ্য (তুবূল)-সমূহ মোতায়েন রাখিতেন। আল-হিল্লা নামক স্থানের সামরিক সঙ্গীত ব্যবস্থা শিঙ্গা শিক্ষা (বূক) ও নাকাড়া (দাবদাব) ব্যবহার পছন্দ করিত (F.R.A.S., ১৯০১, পৃ. ৭৫৫, ৭৮৫)। অন্যদিকে অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাস'আ নামক একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অগভীর নাকাড়াবাদ্য ব্যবহার করা হইত। আলফ লায়লা ওয়া লায়লা উপন্যাসে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ সামরিক সঙ্গীত প্রদর্শনী নলখাগড়া বাঁশী (যুমূর) শিঙ্গা (বূকাত, ভেরী (আনফার) ঢাকবাদ্য (তুবূল) ও করতাল (কাসাত, কুউস) সহকারে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকতর সচরাচর বাদ্যযন্ত্র সমন্বয়ের ক্ষেত্রে শিঙ্গা (বূকাত) ও ঢাকবাদ্য (তুবূল) অথবা করাতল (কাসাত) ও ঢাকবাদ্য (তুবূল) অথবা শিঙ্গা (বূকাত), ঢাক

(তুবূল) ও নাকাড়াবাদ্য (কুসাত) অথবা শুধুমাত্র ঢাকবাদ্য (তুবূল) বা নাকাড়া (কুসাত) স্বতন্ত্রভাবে বাদন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

মিসর ঃ ফাতিমী বংশের শাসকগণ বাগদাদের খলীফাগণের অনুসৃত নীতির প্রায় অবিকল অনুকরণে তাঁহাদের অনুগত শাসকবৃন্দের জন্য সঙ্গীত সম্মান আরোপ করিতেন (তাবাকাত-ই নাসিরী, অনু. Raverty, লন্ডন ১৮৮১ খৃ., ২খ., ৬১৬; আল-বাদাউনী মুনতাখাব আত-তাওয়ারীখ, অনু. Lowe and Ranking, কলিকাতা ১৮৮৪–১৮৯৮, ১খ., ৯৪, ৩১০)। আল-আযীয (মৃ. ৯৯৬) যখন সিরিয়াতে সসৈন্যে উপস্থিত হন তখন তাঁহার সহিত পাঁচ শত শিঙ্গা (আবওয়াক, tambours, নহে, N. E., ২খ. ৫১) উচ্চকিত হইতেছিল (N.E., ১৭খ, ৪৫)। একটি উপলক্ষে ফাতিমী রাজকীয় প্রাসাদে যথেষ্ট বৃহৎ আকারের একটি সামরিক সঙ্গীত দল কর্তৃক নাওবা সঙ্গীত পরিবেশন প্রসঙ্গে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নাসির-ই খুসরাও ফাতিমী বংশের সামরিক সঙ্গীত দল (আনু. ১০৪৭) প্রসঙ্গে বর্ণনায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহা শিঙ্গা (বূক)। নল-খাগড়ার বাঁশি (সুরনা) দুই প্রকার ঢাক (তাবল ও দুহুল, শেষোক্তটি ছিল একটি পারস্যদেশীয় উদাহরণ), নাকাড়া (কূস) ও করতাল (কাসা)-এর ন্যায় বাদ্যযন্ত্র সমন্বয়ে গঠিত হইত। (সাফারনামা, সম্পা. Schefer, প্যারিস ১৮৮১, পৃ. ৪৩, ৪৬, ৪৭)। ১১৭২ খৃ. যখন নূরুদ্দীন ও সালাহুদ্দীন একই সঙ্গে দামিশ্‌ক নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন প্রথমোক্তজন যিনি শেষোক্তজনের জন্য সার্বভৌম ছিলেন, পাঁচ মাত্রার নাওবা বাদন করেন, একই সময়ে শেষোক্তজন তিন মাত্রার নাওবা বাদনের দ্বারা সন্তুষ্ট থাকেন (Quatremere, পূ, গ্র., পৃ. ৪১৯)। মামলূক বংশীয় সুলতানবর্গের শাসনকালে সামরিক বাদ্যযন্ত্রী দলসমূহ অধিকতর বিস্তারিত ও সম্প্রসারিত বিন্যাসে সংগঠিত করা হয় এবং ইবন ইয়াস সূত্রে জানিতে পারা যায় যে, আল-ইরাক ও আল-মাগরিব অঞ্চলের প্রচলিত রীতিনীতির অনুরূপভাবে উহা পতাকা, ধ্বজা, নিশান ও অনুরূপ অন্যান্য কর্তৃত্বসূচক প্রতীকসমূহের সহিত সংযুক্ত হয় (আল-মাকরীযী, ১খ/১, ২২৬)। আজ-জাহিরীর বর্ণনা অনুসারে সুলতান প্রথম বায়বারসের (মৃ. ১২৭৭) সামরিক সঙ্গীত দল চল্লিশটি বৃহৎ নাকাড়া (কূসাত) ৪টি ঢাক (দুহুল), ৪টি নল-খাগড়ার বাঁশী (যুমুর) ও বিশটি ভেরী (আনফার) সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তাঁহার বক্তব্য অনুসারে দুহুল ও যুমুর বাজনাদ্বয় ছিল সাম্প্রতিক কালের সংযোজন। কিন্তু ইতিপূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, ফাতিমী বংশের শাসনকালেই এগুলি ব্যবহৃত হইত। যামর ও সুরনা উভয়ই প্রকৃতপক্ষে নল–খাগড়ার বাঁশী। ইবন তাগরীবিরদীর বক্তব্য অনুসারে কালাউনের (মৃ. ১২৯০ খৃ.) শাসনকালে একজন উযীর একটি তাবলখানার অধিকারী ছিলেন এবং ১৪১৮ খৃ. অনুরূপ বিশেষ সম্মান বা সুবিধা লাভের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও ইহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, এই প্রকার রীতি মোটেই সচরাচর ছিল না। ইবন খালদূন উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেক আমীর ও সেনাধ্যক্ষকে বৃহৎ নাকাড়া (কূসাত) ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইত (N.E., ১৭খ, ৪৬)। তথাপি ইবন তাগরীবিরদীর মতে ইহা শুধু যে সকল উমারাগণ এক সহস্র সৈন্যের নেতৃত্ব দান করিতেন তাহাদের এই সম্মান দেয়া হইত। আজ-জাহিরীর বর্ণনা অনুসারে একজন আমীরের তাবলখানায় যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হইত উহাদের মধ্যে ছিল ঢাক অথবা দুহুল (দুইটি), নলখাগড়ার বাঁশী বা যামর (দুইটি) ও ভেরী বা নাফীর (৪টি)। কিন্তু তাহাতে বৃহৎ নাকাড়া (কূস) থাকিত না। একজন আতাবাক এই সংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক বাদ্যযন্ত্রের অধিকারী হইতে পারিতেন, অন্যদিকে একজন আমীর মুকাদ্দাস কেবল একটি শিঙ্গা বা বূকের অধিকারী হইবার অনুমতি লাভ করিতেন। ১৫শ শতাব্দীর আগমনকালের মধ্যে অবশ্য চল্লিশজন অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ আমীরকে একটি তাবলখানা রক্ষণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হইত; তবে কিছুকালের জন্য তিনি শুধু কর্তব্যরত অবস্থায় থাকাকালীন তাহা বাদন করিতে পারিতেন। ১৫১৭ খৃ. উছমানলী তুর্কীগণ মিসর অধিকার করিয়া লইলে উমারাগণের সঙ্গীত দলসমূহ বাতিল করা হয় (Quatremere, ap. al-Makrezi, ১খ/১, ১৭৩-১৭৪, ১খ/২, ২৭২)। ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর মিসরে প্রচলিত সামরিক সঙ্গীতে ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ প্রসঙ্গে দ্র. Niebuhr, Voyage en Arabic ১৭৭৬, ১খ, ১৪৫-১৪৬, tab. xxvi; Niebuhr, Description de l'Egypte, Etat moderne, fol. ed., ১খ, ৭০১-৭০৩ ৯৩১-৯৪০, ৯৪৮-৯৪৯, ৯৭৬-৯৯৭ ও প্লেটসমূহ।

মাগরিব অঞ্চল ঃ ইব্‌ন খালদূনের বক্তব্য অনুসারে জাহিলিয়া যুগের আরব উপদ্বীপের আরব জাতির ন্যায় ঠিক একইভাবে উক্ত আফ্রিকার যাযাবর আরব গোত্রসমূহ একজন উপস্থিত গায়ক (মানশিদ) নিয়োগ করিত যে সৈন্যবাহিনীর সম্মুখভাগে গান করিতে থাকিত। মরক্কোর বানূ যানাতা বংশ (৯৯০-১০৬৯) এই প্রথাটি অনুকরণ করে। মিসরের মামলূক সুলতানবর্গ ও মুগল ঈলখানগণের জাবীশ এই রীতির একটি অবশেষ হইতে পারে। পশ্চিম অঞ্চলের ইসলামী দেশসমূহের প্রাথমিক যুগের শাসকগণ আপাতদৃষ্টিতে তাবলখানা সংক্রান্ত রাজকীয় অধিকার অপরাপর অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সমান তীব্রতার সহিত সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং এইজন্য ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহের অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ব্যয়বহুল নিমাণকার্য হইত। উদাহরণস্বরূপ আল-আনদালুসের অধিপতি দ্বিতীয় আল-হাকামের (মৃ. ৯৭৯) স্বর্ণমণ্ডিত শিঙ্গাসমূহের (বূকাত) উল্লেখ করা যাইতে পারে (আল-মাককারী, Mohammedan Dynasties in Spain, অনু. P. de Gayangos, লন্ডন ১৮৪০-১৮৪৩ খৃ., ২খ, ১৫৮)।

তাবলখানার বাদ্যযন্ত্রসমূহ শত্রুহস্তে নিপতিত হইবার ঘটনা সাধারণত একটি অত্যন্ত গুরুতর আঘাতরূপে বিবেচনা করা হইত। ৮৬২-৮৬৩ সালে সিসিলিতে এক যুদ্ধে জনৈক আগলাবী সেনাপতি তাহার ঢাকবাদ্যসমূহ শত্রুর হস্তে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইবার ঘটনা হইতে এই প্রসঙ্গে অবহিত হওয়া যায়। অপরদিকে বিজয়ী পক্ষ সব সময়ই এই ধরনের বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নসমূহকে দুর্লভ বিবেচনা করিত ও সগৌরবে প্রর্দশন করিত (আ-মাকরীযী, পূ. গ্র.)। বানূ যানাতা বংশ তাহাদের তাবলখানায় দশ হইতে বিশটি ঢাক (তুবূল) রক্ষা করিত, তবে সময়ের প্রবাহে এই প্রকার ঢাকবাদ্য ব্যবহারের অধিকার গভর্নর ও অন্যদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ করা হয়। আল-মুওয়াহহিদ বংশ (১১৩০-১২৬৯) এই সকল রাজকীয় বংশবহির্ভূত বাদক দলসমূহের অবলুপ্তি সাধন করিয়া তাবলখানার ব্যবহার শুধু রাজকীয় ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা করে (N.E., ১৭খ., ৪৫-৪৬)। সামরিক ধ্বজা (বুনূদ) সহকারে ইহা একটি পৃথক দলের আদলে সংগঠিত করা হয় এবং তাহা সাকা নামে পরিচিতি লাভ করে। আল-মুওয়াহহিদ বংশের প্রথম সুলতান আবদুল মু'মিনের (মৃ. ১১৬৩) বাহিনীতে দুই শতের অধিক ঢাক (তুবূল) বাদ্য ছিল এবং সেইগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক এত অতি বৃহৎ আকারের বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেইগুলি বাদন করিলে চতুর্দিক প্রকম্পিত ও ভূতল কম্পিত হইয়া উঠিত (আল-মাররাকুশী, Hist. des Almohades, সম্পা. Dozy, লাইডেন ১৮৮১ খৃ., পৃ. ১৬৫)। মারীনী বংশের (১২১৭-১৫৫৪) অধিকারে এই শ্রেণীর একটি বৃহৎ ঢাক ছিল এবং তাহা কালক্রমে সা'দী বংশের (১৫১১) অধিকারে

চলিয়া যায়। ইহা ছিল একটি অতি প্রকাণ্ড বাদ্যযন্ত্র এবং বহু দূর হইতে ইহার উচ্চ নিনাদ শ্রুত হইত (নুযহাতুল হাদী, সম্পা. Houdas, প্যারিস ১৮৮৮-৮৯ খৃ., পৃ. ১১৭)। ১৮শ শতাব্দীতে মরক্কো অঞ্চলের সামরিক সঙ্গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহের নির্মাণ কৌশল ও নকশার জন্য দ্র. Host. Nachrichten von Marokos und Fes (1787, tab. xxxi, পৃ. ২৬১)।

সূদান ঃ ১৪শ শতাব্দীতে ইব্ন বাত্তূতা পূর্বাঞ্চলীয় সূদানের মাকদাশাও নামক স্থানে অবস্থান করিবার সময় সেইখানে সুলতানের তাবলখানার সঙ্গীত শ্রবণ করেন। এইগুলি নল-খাগড়ার বাঁশী (সুরনায়াত), শিঙ্গা (আবওয়াক), ভেরী (আনফার) ও ঢাক (আতবাল) সমন্বয়ে গঠিত ছিল। অন্যান্য দেশের ন্যায় এই স্থানেও নাওবা পরিবেশনকালে সম্মানসূচক নীরবতা পালন করা হইত এবং "কেহই নড়াচড়া বা স্থানান্তরে গমন করিত না।" পশ্চিম সূদানের মাল্‌লী অঞ্চলে সুলতান-এর সামরিক বাদ্যদল শিঙ্গা (আবওয়াক) ও ঢাকবাদ্য (আতবাল) সমন্বয়ে গঠিত ছিল। প্রথমোক্তটি হস্তিদন্ত হইতে নির্মাণ করা হইত (২খ, ১০৮; ৪খ., ৪০৩)। গাও (Gao)-এর সংঘয় (Songhoy) বংশীয় (১৩৩৫-১৪৯০) সুন্নী শাসকবর্গের অন্যতম শেষোক্ত আলী (মৃ. ১৪৯২) তাঁহার কর্তৃত্বের প্রতীকস্বরূপ একটি ঢাকবাদ্য ব্যবহার করিতেন। ইহাদের উত্তরসুরি আসকিয়া রাজবংশ (১৪৯৩-১৫৯০) ঢাক ব্যবহার অব্যাহত রাখে এবং আসকিয়া আলহাজ্জ মুহাম্মাদের শাসনকালে ১৪৯৩ সালে ঢাক বাদ্য (তাবল) বাজাইয়া সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করা হইয়াছিল। ১৫০০-১৫০১ সালে Songhoy -এর অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক কাকাকি নামে পরিচিত এক প্রকার বৃহৎ ভেরী নির্বাচন করা হয়। আসকিয়া বংশীয় মুহাম্মাদ বুনকান (মৃ. ১৫৩৭) ফুতুরিকু নামে পরিচিত এক প্রকার শিঙ্গা আবিষ্কার করেন। গাবতান্দা নামে পরিচিত একটি ঢাকবাদ্যেরও অস্তিত্ব ছিল এবং এই ঢাক ও ফুতুরিকু উভয় বাদ্যই গাও অঞ্চলে ব্যবহার করা হইত। তিনি শহরের বহির্ভাগে একটি সীমানা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, যাহার অভ্যন্তরে কেবল রাজকীয় ঢাক (তাবলুস-সুলতানা) ব্যতীতে অপর কোন ঢাক বাজানো অনুমোদিত ছিল না। এই রাজকীয় ঢাক এই রাজবংশের সমাপ্তিকাল পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ব্যবহৃত হইত। ১৫৯০ খৃ. মরক্কো কর্তৃক বিজিত হইবার পর এবং স্থানীয় রাজাগণের স্থলে পাশাবর্গের শাসনের অধীনে সামরিক সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। পাশা আহ্‌মাদ আল-খালীফার শাসনকালে (১৬৯৪-১৬৯৫) নল-খাগড়ার বাঁশী (গায়াত), ঢাক (আতবাল) এবং স্থানীয় তাম্বুরীনের (দুফ্‌ফুল-আসাকী) সঙ্গে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র পাশা দরবারের সামরিক বাদ্যযন্ত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বামবারা গোত্রের দলপতিসমূহের সমরবাদ্যের মধ্যে ছিল শিঙ্গা (বুকাত) ও তাম্বুরীন (দুফ্‌ফ) এবং ইহাদের মধ্যে একজন দলপতির নিকট প্রকাণ্ড আকারের শিঙ্গা (বূকাতুল কিবার) ছিল। ইহা এক মানুষ সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হইত (তা'রীখুল-ফাততাশ, সম্পা. Houdas and Delafosse, in P.E.L.O.V., প্যারিস ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৪৯, ৫৪-৫৫, ৭০, ৮৪, ১৫৩; তাযকিরাতুন নিসয়ান, সম্পা. Houdas, , in P.E.L.O.V., প্যারিস ১৯০১, পৃ. ৪৩, ৪৫, ৯৩, ১২০, ১৫২; তা'রীখুস-সূদান, সম্পা. Hoodas, in P.E.L.O.V., প্যারিস ১৯০০ খৃ., ৭৯, ১২২, ১৯৭)।

মুগল বংশ ঃ প্রাথমিক পর্বের মুগল ঈলখানগণের শাসনকালে রাজবংশীয় যুবরাজগণকে নাকাড়া বাদ্যসমূহ এবং একটি ঢাক ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইত; অপরপক্ষে একজন উযীর শুধু একটি নাকাড়ার অনুমতি পাইতেন। সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ককে ঢাকবাদ্যসমূহ প্রদান করা হইত এবং ১০,০০০ (?) সৈন্যসম্পন্ন কোন আমীর ও সেই সঙ্গে অনুগত রাজ্যপালগণ একটি ঢাক (নাকাড়া) রক্ষণের অনুমতি লাভ করিতেন (d'Ohsson, Hist. des Mongols, ৩খ, ৫৮১, ৪খ, ৯৬, ১৮৭, ৫৬৬, Howorth, History of the Mongols, লণ্ডন ১৭৭৬-১৭৮৮, ৩খ, ২৯৬)। ইবন বাত্তূতা বাগদাদের ঈলখান আবূ সাঈদের (মৃ. ১৩৫৫) সামরিক সঙ্গীত ব্যবস্থার একটি বিস্তারিত চিত্রপট বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ইহা ঢাকবাদ্য [ও নাকাড়া] (তুবূল), ভেরী (আনফার), শিঙ্গা (বূকাত), নল-খাগড়ার বাঁশী (সুরনায়াত) এবং গায়ক দল লইয়া গঠিত ছিল। এই পর্যটক গ্রন্থকারের বর্ণনা অনুসারে উমারাগণ শিঙ্গা (বূকাত) ও একই সঙ্গে ঢাকবাদ্য (তুবূল) ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং প্রত্যেক রাজবংশীয় শাহযাদী (খাতূন) একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রকাণ্ড নাকাড়া ব্যবহার করিতেন, যাহাকে ইবন বাত্তূতা তাবলুল-কাবীর (বৃহৎ ঢাক) নামে অভিহিত করিয়াছেন, তবে মুগলদের নিকট তাহা কুরগা নামে পরিচিত ছিল (তুহফা, ২খ., ১২৬)। কুরগা বাদ্যযন্ত্রটি ছিল ঈলখানের ব্যক্তিগত সঙ্গীত প্রতীক এবং মুগল সভার ঐতিহাসিক রাশীদুদ-দীনের বর্ণনা অনুসারে ঈলখানের মৃত্যু হইলে উক্ত বাদ্যযন্ত্রটি ধ্বংস করিয়া ফেলা হইত। ইহা ভিন্ন শোক প্রকাশকালে নাওবা সঙ্গীত বাদন হইতে বিরত থাকা প্রচলিত রীতিরূপে স্বীকৃত ছিল। ইহা ছিল একটি প্রাচীন রীতি এবং খলীফা আল-মুকতাদীর শাসনকালের ন্যায় অতীতেই ইহার প্রয়োগ দেখিতে পাই। তিনি ১০৮৭ সালে তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদের মৃত্যুর পরপর সালাতের সময় ইহার বাদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন (ইবনুল জাওযী, Bibl Nat,, প্যারিস MS. No. 1506, fol. 198)। অনুরূপভাবে সালাহুদ-দীন খৃস্টান বাহিনীর হস্তে একদা একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইবার পর পুনরায় বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত তাঁহার নাওবা বাদন পরিত্যাগ করেন (আল-মাকরীযী, সুলূক, ১খ, ৪২)। তীমূরীয় শাসনকালের অপ্রামাণিক তুযযূকাতের (Institutes) বর্ণনা অনুসারে সামরিক সঙ্গীতদলকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা হইত এবং তাহা শাসক শক্তির প্রতীকের অংশরূপে বিবেচিত হইত। ইহার মধ্যে তূক শ্রেণীর পতাকা ও ধ্বজাসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। একজন বেগলারবেগ একটি নাকাড়া (নাককারা) ও একটি শিঙ্গার (বুরগূ بورغوى-এর স্থালে بورغو পাঠ করিতে হইবে) অধিকারী হইতেন এবং আমীরুল উমারা ও চার লেজবিশিষ্ট তূক-এর একজন আমীর কেবল একটি নাকাড়ার অধিকার লাভ করিতেন। একজন মিনগ্ পাশা লাভ করিতেন একটি ভেরী (নাফীর) এবং একজন য়ূস পাশা ও উন পাশা একটি ঢাক (তাবল), অপরপক্ষে উয়মাক (গোত্র অধিপতি) মর্যাদার ব্যক্তিবর্গ একটি শিঙ্গা লাভ করিতেন (বুরুগ্.; Institutes, Political and Military, সম্পা. Davy and White, অক্সফোর্ড ১৭৮১ খৃ., ২৯০-২৯২)।

ভারতে মুগল শক্তি তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতীকসমূহের অন্যতমরূপে নাককারখানা প্রচলিত রাখে। ইব্ন বাত্তূতা উল্লেখ করিয়াছেন যে, মদীনা শারীফের আবূ গুররা যখন ভারত সফর করেন তখন তিনি তাঁহার ঢাকবাদ্য (তুবূল) ও ভেরী (আনফার) ব্যবহার করিয়া প্রবল অস্বস্তি ও ভীতির উদ্রেক করিয়াছিলেন। কারণ আল-'ইরাক, মিসর বা সিরিয়া-এর বৈপরীত্যে এই অঞ্চলে স্বয়ং রাজা ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই নাককারখানা ব্যবহার করিতে পারিতেন না (১খ, ৪২২-৪২৪)। আল-'উমারী (মৃ. ১৩৪৯) তাঁহার মাসালিকুল আবসার গ্রন্থে দিল্লীর সুলতানের পাঁচ মাত্রার নাওবা সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বাদনে দুই শত জোড়া নাকাড়া (নাককারাত), চল্লিশ জোড়া বৃহৎ নাকাড়া (কুরাতুল-কিবার), বিশটি শিঙ্গা (বূকাত) এবং দশ জোড়া করতাল ব্যবহার করা হইত (সুনূজ; N.E. ১৩খ,, ১৮৯)।

মহামতি সম্রাট আকবারের (মৃ. ১৬০২) নাককারখানার কথা আবুল ফাদল আল্‌লামী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা দানবাকার নাকাড়া, যাহা কুওয়ারগা বা কুরগা নামে পরিচিত ছিল (প্রায় ১৮ জোড়া), নাকাড়া বা নাককারা (প্রায় ২০ জোড়া), ঢাক বা দুহুল (চারটি), নল-খাগড়ার বাঁশী বা সুরনা (নয়টি, ভারতীয় ও পারসিক উভয় প্রকারের), কার্‌রানা বা কারনা নামে পরিচিত বৃহৎ আকৃতির তৈরী (চারটি বা ততোধিক), ভেরী বা নাফীর (ভারতীয়, পারসিক ও য়ূরোপীয় শ্রেণীর), শিঙ্গা বা সিনগ্‌ (দুইটি) ও করতাল বা সিনজ্‌ (তিন জোড়া) সহযোগে গঠিত ছিল (আঈনই আকবারী, অনু. Blochmann, কলিকাতা ১৮৭৩-১৮৯৪, ১খ, ৫০-৫২)। শেষোক্ত এই রচনায় নাওবা সঙ্গীত প্রসঙ্গে একটি বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই কালের মধ্যে কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে উচ্চ সরকারি অথবা সামরিক কর্মকর্তাগণের জন্য সম্মানসূচক নাকাড়াবাদ্য অনুমোদন করা হইত। কিন্তু এই সম্মান লাভের জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে অন্ততপক্ষে দুই হাজার সুওয়ারসম্পন্ন পদমর্যাদার অধিকারী হইতে হইত এবং তাহাদের বাদ্য সম্রাটের উপস্থিতিতে অথবা তাঁহার বাসস্থান হইতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের অভ্যন্তরে বাদন করার অনুমোদন ছিল না। এই বিশেষ সম্মান লাভের ক্ষেত্রে প্রাপক তাঁহার কণ্ঠের চতুষ্পার্শ্বে অতি ক্ষুদ্র আকৃতির ঢাক মালার ন্যায় ধারণ করিতেন (Thorn, Memoir of a War in India, 1818, পৃ. ৩৫৬ ; F.A.S.B., ১৮৭৯, পৃ. ১৬১)। ১৭শ শতাব্দীর অন্যান্য নাককারাখানা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণীসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য Bernier Travels in the Mogul empire, 1665-1668, সম্পা. Constable, পৃ. ৩৬৩; Manucci, Storia do Mogor or Mogul India, 1653-1708, অনু. Irvine, পরবর্তী কালের তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Irvine, The Army of the Indian Moghuls, লন্ডন ১৯০২, পৃ. ৩০, ১৯৬, ২০৭; Day, The Music and Musical Instruments of Southern India, লন্ডন ১৮৯১, পৃ. ৯৬; Meadows-Taylor, Proceedings, Royal Irish Academy, ৯/১ খৃ.।

'উছমানী তুর্কী বংশ ঃ তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তুর্কী জাতি তাহাদের সামরিক সঙ্গীত ব্যবস্থাকে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করিত, যাহা মুগল বংশের ন্যায় তাহারা নিশান, ধ্বজা, পতাকা ও তূকসমূহের ন্যায় প্রতীক চিহ্নসমূহের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল। এই শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ১ম 'উছমান যখন ১২৮৯ খৃ. 'আলাউদ-দীন কর্তৃক একজন যুবরাজরূপে নিয়োগ লাভ করেন, তখন তাঁহার জন্য একটি ঢাকবাদ্য, পতাকা ও তূক প্রদান করা হয়। অভিষেক অনুষ্ঠান চলাকালে, যখন নাওবা সঙ্গীত পরিবেশ করা হয় তখন কঠোরভাবে পরম নীরবতা পালন আবশ্যকরূপে গণ্য করা হয়। শেষোক্ত এই রীতি ১ম মুহাম্মাদের (মৃ. ১৪২১) শাসনকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, অতঃপর তাঁহার আমলে তিনি নীরবতা পালন অবলুপ্ত ঘোষণা করেন (von Hammer, পূ. গ্র., ১খ., ৭৫)। দুহুল নামক ঢাকবাদ্য প্রবর্তন করিবার সম্মান সুলুতান ওরখান (মৃ. ১৩৬০)-এর প্রাপ্য বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে (আওলিয়া চেলেবী, Travels, ১খ/২, ২২৬)। ১ম 'উছমানের (মৃ. ১৩২৬) শাসনামলে কূসাত নামে পরিচিত এক প্রকার বৃহৎ নাকাড়াবাদ্য ব্যবহার করা হইত। এই সময়ে তাহা কোন কোন উপলক্ষে হস্তীপৃষ্ঠে বহন করা হইত, আওলিয়া চেলেবী, যিনি শেষোক্ত এই তথ্য উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বর্ণনায় ১৭শ শতাব্দীর সামরিক সঙ্গীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (পূ. গ্র., ১খ, ২২৫-২২৬, ২৩৬-২৩৯)। ৪র্থ মুরাদ (মৃ. ১৬৪০) পারস্য হইতে আমদানিকৃত কারনা নামক বৃহদাকার ভেরী ব্যবহার প্রবর্তন করেন। এই শতাব্দীকালে নিয়মিতভাবে সামরিক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান সংগঠন করা হইত এবং তুর্কী সামরিক বাদ্যযন্ত্রী দলে বৃহৎ নল-খাগড়ার বাঁশী বা কাবা যূরনা (দুইটি), ক্ষুদ্র নল-খাগড়ার বাঁশী বা জুরা যূরনা (তিনটি), সাধারণ বাঁশী বা নাই (একটি), বৃহৎ ঢাক বা কাবা দুহুল (একটি), নাকাড়া বা নাককাড়া (দুইটি), করতাল বা যিল্‌ল (একটি বৃহৎ ও দুইটি ক্ষুদ্র জোড়া) ও "Jingling Johnny" বা চাগানা (দুইটি) লইয়া গঠিত হইত (Mahillon, Catalogue... du Musee Instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles, ২য় সংস্করণ, ২খ, ১৮৪)। Coeck তাঁহার প্রণীত Les Moeurs... de Turoz (১৫৫৩) গ্রন্থের The Turks in 1553 নামে ১৮৭৩ খৃ. W.S. Maxwell কর্তৃক সম্পাদিত) নল-খাগড়ার বাঁশী ও নাকাড়াবাদ্য দ্বারা সম্মুখে শোভিত একটি জানিসারি সৈন্যদলের চিত্রসম্বলিত একটি কাষ্ঠ খোদাই প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীর কালে তিনি লেজবিশিষ্ট পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন পাশা নলখাগড়ার বাঁশী বা যূরনা (পাঁচটি), ভৈরী বা রূরূ (সাতটি), নাকাড়া বা নাক্‌কারা (দুই জোড়া) ও করতাল বা যিল্‌ল্‌ (দুই জোড়া)-সম্পন্ন বাদ্যদলের অধিকারী হইতেন (de Marsigli, Stato militaire dell' imperio Ottomanno, ১৭৩২, ২খ, ৫৪-৫৫ এবং প্লেট ১৮। d'Ohsson, Tableau general de l'Impire Ottoman, প্যারিস ১৭৮৭-১৮২০, ৭খ, ১৫৫; এবং Russell, Natural History of Aleppo, লন্ডন ১৭৯৪ খৃ., ১খ, ১৫১ প্রদত্ত সংখ্যাসমূহ এবং বর্ণনা উপরে উল্লিখিত তথ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়)। সুলতানের সামরিক সঙ্গীত দল বাষট্টিজন গায়ক ও বাদক লইয়া গঠিত ছিল এবং তাহারা মীর মেহতার তাবল ওয়া 'আলাম নামে পরিচিত একজন অফিসারের অধীনে থাকিত। এই বাদকদলের ব্যবহৃত যন্ত্র সমাহার ছিল নিম্নরূপ ঃ নল-খাগড়ার বাঁশী বা যুরনা (১৬টি), ভেরী বা বূরূ (১১টি), ঢাকবাদ্য বা দুহুল (১৬টি), নাকাড়া বা নাককারা (৮টি), বৃহৎ নাকাড়া কূস (৪টি) ও করতাল বা যিল্ল (সাত জোড়া)। যুদ্ধের সময় এই যন্ত্রবিন্যাসকে দ্বিগুণ মাত্রায় বৃদ্ধি করা হইত (d' Ohsson, Tableau general...., ৭খ, ১৩)। এই প্রসঙ্গে অতিরিক্তরূপে দ্রষ্টব্য Wittman, Travel in Turkey, Asia Minor, Syria, ১৮০৩-এর মুখবন্ধে প্রদত্ত সামরিক বাদ্যদল এবং Toderini, Letteratura Turchesca, ১৭৮৭, ১খ, ২৩৮-২৩৯ ও Laviganc, Encyclopedie de la musique, ৫খ, ২৯৮১-তে প্রদত্ত তথ্যাবলী।

পারস্য ঃ মুগল বংশের উত্থান লাভের পূর্বকালে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে নাককারাখানা এবং নাওবা সঙ্গীত কি মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত ছিল সেই সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। গুরী বংশের গিয়াছুদ-দীনের (মৃ. ১২০২) বাহিনীতে স্বর্ণনির্মিত বিশাল আকৃতির নাকাড়াবাদ্য (কূসাত) ছিল যাহা একটি রথে বহন করা হইত (তাবাকাত-ই নাসি'রী, ১খ, ৪০৪)। খাওয়ারিযমের শেষ শাহ জালালুদ-দীন মানকবিরতী (মৃ. ১২৩১) তাঁহার নাওবা সঙ্গীত বাদনে ২৭টি ঢাকবাদ্য ব্যবহার করিতেন। বহুমূল্য রত্নখচিত স্বর্ণ নির্মিত এই সকল ঢাকবাদ্য তাঁহার অনুগত অন্যান্য শাসকের পুত্রদের দ্বারা বাজানো হইত (আন্‌-নাসাবী, পূ.গ্র., পৃ. ২১)। দাগিস্তান হইতে প্রাপ্ত কিন্তু সম্ভবত পারস্য দেশে নির্মিত চমৎকার নির্মাণশৈলীর এক জোড়া ব্রোঞ্জনির্মিত নাকাড়াবাদ্য ১৯৩১ খৃ. লণ্ডনে অনুষ্ঠিত International Exhibition of Persian Art-প্রদর্শনীতে সামরিক সঙ্গীত সংক্রান্ত অপরাপর বহু সংখ্যক প্রদর্শনী নমুনা অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাহার মধ্যে বিশেষভাবে নং ১৭৪, G (১৩শ শতাব্দী); ৪৫৭, b (১৪শ শতাব্দী); ৬২৯ (১৬শ শতাব্দী) অন্যতম। পারস্যের মুগল প্রভাবান্বিত সামরিক সঙ্গীত ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তথ্যের জন্য উপরে উদ্ধৃত

উৎস দ্রষ্টব্য। পারস্যের শিল্পকলায় সামরিক বাদ্যযন্ত্রী দলসমূহের বহুল ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা যায় (দ্রষ্টব্য Bibilography; Iconography)। Chardin, Voyages du Chev. Chardin en Perse, ১৭৩৫; Kaempfer, Amoenitatum Exoticarum..., ১৭১২, পৃ. ৭৪০; Poullet, Nouvelles relations du Levant, 1668, ২খ, ১৪৭ গ্রন্থসমূহ হইতে ১৭শ শতাব্দীতে পারস্যে প্রচলিত নাক্কারাখানা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। শেষোক্ত উৎস হইতে ইহা প্রতীয়মান হইতে পারে যে, তুরস্কের ন্যায় পারস্য দেশেও ইংলন্ডীয় ভেরী বাজনা সুপরিচিত ছিল (আওলিয়া চেলেবি, Travels, ১/২খ, ২৩৮)। এই সকল গ্রন্থ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পারস্যের সামরিক সঙ্গীত দলে যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হইত তাহাদের অন্যতম ছিল নল-খাগড়ার বাঁশী (সুরনা বা সুরনায়), বৃহৎ আকৃতির ভেরী (কারনা), ভেরী (নাফীর), শিঙ্গা (শাখ), বৃহৎ আকৃতির নাকাড়া (কূস), সাধারণ নাকারা (নাককারা) ও ঢাকবাদ্য (দুহুল)। আধুনিক যুদের বাদ্যযন্ত্রসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য উৎস Laborde, Essia sur la musique, ১৭৮০; Jourdain, La Perse..., 1814; Ousely, Travels in various Countries in the East, 1819; Fetis, Hist. generale de la musique, ২খ. ; Adveille, La musique chez les Persans en 1885; Lavignac, Encyclopedie la musique, পৃ. ৩০৭৩-৩০৭৭।

আধুনিক কালের পরিস্থিতি ঃ বর্তমান কালে পাশ্চাত্য ধারার সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রসার লাভের ফলে প্রায় সকল ইসলামী দেশে সামরিক সঙ্গীত দলসমূহে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। য়ুরোপীয় নির্মাণশৈলীর ও সম-লয়বিশিষ্ট পিতল ও নল-খাগড়া বা বাঁশের তৈরী বাদ্যযন্ত্রসমূহ ধীরে ধীরে নাক্কারাখানা সংক্রান্ত প্রচলিত ধারণাসমূহ অপসারণ করিয়া দিতেছে। অথচ স্মরণ করা যাইতে পারে যে, মধ্যযুগে ইহার বিপরীত অবস্থানে, বরঞ্চ য়ুরোপই মুসলিমগণের নিকট হইতে এই ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ঐতিহ্য গ্রহণ করিত। য়ুরোপের খৃষ্টান সেনাবাহিনীসমূহ অতি শীঘ্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, সামরিক শৃংখলা রক্ষা, মহরা, অনুশীলন ও কৌশলের ক্ষেত্রে নাক্কারাখানা একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রত্যক্ষ সমরক্ষেত্রে ইহা ছিল সংহতি সংগঠনের জন্য কেন্দ্রবিন্দু এবং যুদ্ধকালে সমরবাদ্যদলের নীরবতা ইহারই ইঙ্গিত বহন করিত যে, তাহাদের ধ্বজা ও নিশানসমূহ শত্রু দ্বারা হুমকির সম্মুখীন। স্বল্প এবং অন্ততপক্ষে ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত সেনাদলসমূহের নিজস্ব পতাকা ও সমরবাদ্য একই সঙ্গে রাখা হইত (Fortescue, History of the Britisth Army, লন্ডন ১৮৯৯ খৃ., ১খ, ১৪ প.; Farmer, Rise and development of Military Music, লন্ডন ১৯১২ খৃ., পৃ. ১৩)। পাশ্চাত্য দেশসমূহ একই সঙ্গে প্রাচ্য হইতে নাককারা শব্দ naker, nacaire ইত্যাদিরূপে, তাবলকে tabel, tabor ইত্যাদিরূপে, তিনবালকে timbale- রূপে, কাস'আকে caisse-রূপে, [আল-] বূক'-কে alboque-রূপে, [আল-] নাফীর-কে anafil-রূপে গ্রহণ করে, অপরদিকে fanfare ও tucket-এর ন্যায় শব্দসমূহ খুব সম্ভবত আনফার ও তুকা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে (দ্র. Farmer, Historical Facts for the Arabian Musical influence, লন্ডন ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৮-১৯)। য়ুরোপের আধুনিক সামরিক সঙ্গীত দলসমূহে ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রসমূহের আবির্ভাব ঘটে ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে তুরস্ক হইতে এবং সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতে (তারবিশিষ্ট যন্ত্র) ইহার প্রবেশ লাভের বহুকাল পর এই পর্যন্ত শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্র "তুর্কী সঙ্গীতরূপে" পরিচিত ছিল।

ইংল্যান্ডের "Jingling Johnny" (ফরাসী chapeau chinois, জার্মান Schellenbaum) এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অশ্ব-লেজ অদ্যাবধি ইহার তুর্কী নামে চাগানা (Jhonny)-এর একটি অবশেষ বহন করিতেছে। বহনযোগ্য glockenspiel বর্তমানে উহার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। য়ুরোপের সামরিক বাদ্যযন্ত্রী দল অদ্যাবধি reveille (সূর্যোদয়) ও retreat (সূর্যাস্ত)-কালে সঙ্গীত বাদন করিয়া থাকে এবং ইহারা তৎসহকারে এই সকল সঙ্গীতের অন্তিমে যে সংকলিত সংক্ষিপ্ত খণ্ডাংশ দীর্ঘ লয়ে বাদন করা হইয়া থাকে, তাহা অতি সম্ভাব্যভাবেই মধ্যযুগের প্রাচ্য দেশীয় রীতির অবশেষ হইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নাককারখানা এবং নাওবা সঙ্গীত প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে সন্ধান পাওয়া যাইবে ঃ (১) Walley, Year Book of Oriental Art 1924-25, 1929; (২) আল-মাকরীযী, Hist. Des Sultans Mamlouks, উদ্ধৃতিরূপে; (৩) ইব্‌ন খালদূন, Prolegomena (N.E. ১৭খ.), উদ্ধৃতিরূপে; (৪) আল-'উমারী, মাসালিকুল আবসার ফী মামালিক আল-আমসার, অনু. Gaudefroy-Demombynes, প্যারিস ১৯২৭ খৃ., ৫৬-৫৮; (৫) Quatremere, Hist. Des Mongols, উদ্ধৃতিরূপে; (৬) Irvine, The Army of The Indian Mughuls, উদ্ধৃতিরূপে; (৭) Farmer, Hist. of Arabian Music, ১০৯, ১৫৪, ২০৬-২০৮। Iconography প্রসঙ্গে মুদ্রিত পুস্তকসমূহ ঃ প্রাচ্য দেশীয় অংকন ও শিল্পকলা প্রসঙ্গে প্রাপ্য অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে বহু উদাহরণেই সামরিক সঙ্গীত দল ও নাককারখানা আবাসিক এলাকার চিত্র অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে ঃ (৮) Martin, the Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey from the viiith to the xviiith Century, ১৯১২ খৃ., ২খ, প্লেট ১২, ১৮৩; (৯) Brown, Indian Paintings under the Mughuls, পৃ. ১৩৬, প্লেট ৩১, ৪৬; (১০) N.C. Mehta, Studies in Indian Painting, বোম্বাই ১৯২৬ খৃ,, পৃ. ৩১, প্লেট ৩৮; (১১) Ars Asiatica, ১৩শ খণ্ড, প্লেট ১, ২৯, ৫৫। পাণ্ডুলিপিসমূহ চিত্রিত প্রাচ্য দেশীয় পাণ্ডুলিপির সকল বিখ্যাত উন্মুক্ত সংগ্রহে সামরিক সঙ্গীত দল এবং নাককারাখানার আবাসিক এলাকা উভয় প্রসঙ্গেই বহু সংখ্যক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। যুক্তরাজ্যে অবস্থিত নিম্নলিখিত সংগ্রহসমূহ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্নঃ বৃটিশ মিউজিয়াম, Add 27302, fols, 53, 112, 184, 223, 285; add. 5600. fol, 295; Add. 25900, fol. 231, add. 18188, fol. 60; Add. 24944, fols. 77, 315; royal Asiatic Society, No. 29, fol, 144, 154, 267, 428; Edinburg University Library, No, 265, fols. 142, 186. No. 20, fols. 54, 157; Bodleian Library, Or. 133, fol, 38; Eliot, No. 19, fols, 12, 34; Trinity College, Dublin, No. M. 2. 1., fols, 29, 58, 95. বাদ্যযন্ত্রসমূহ ঃ নাককারাখানায় ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রসমূহের তালিকার জন্য দ্র. মিযমার, তাবল ও বূক প্রবন্ধসমূহের সহিত সংযুক্ত গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখকৃত বিভিন্ন যাদুঘর সংগ্রহসমূহের ক্যাটালগ।

H. G. Farmer (E. I. [1])/ মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

তাবাকাত (طبقات) ঃ একই সিরিজের গ্রন্থাবলী। যখন স্থান সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তখন ইহার অর্থঃ 'সদৃশ, একটির উপর অপরটি অবস্থিত"

এবং সময় সম্পর্কে ব্যবহৃত হইলে "সদৃশ, একটির পরবর্তী অপরটি"; উদাহরণস্বরূপ সপ্তাকাশ সম্বন্ধে সূরা ৬৭ঃ৩ ও ৭১ঃ১৫-এ একটির উপর অপরটির অবস্থান উল্লিখিত; কোন বাড়ির 'তলা'-ও একটি অপরটি উপর অবস্থিত (দ্র. ইদরীসী শব্দপঞ্জী; Description de l'Afrique, ed. Dozy and de Goeje, Leyden ১৮৬৬, পৃ. ৩৩৮; Sobernheim, inser., no. 41, in M. I. F. A. O., ২৫; Fagnan, Additions, দ্র.)। তাবাকাতু'ল-'আয়ন "চোখের আনুক্রমিক চর্মস্তরসমূহ" (খাওয়ারিযমী, মাফাতীহ, পৃ. ১৫৪)। সময় কাল সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে 'বংশধর' অর্থ বহন করে (অভিধান রচয়িতাগণ ইহার সমার্থক শব্দরূপ কারন (قرن) -এর উল্লেখ করিয়া থাকেন)। হামযা আল-ইসফাহানী (সম্পা. Gottwaldt, পৃ. ৮) প্রমুখ পারস্যের প্রাচীন রাজবংশের জন্য তাবাকাত শব্দ ব্যবহার করেন। তাবাকাতু'শ-শু'আরা' ইত্যাদির ন্যায় পুস্তকসমূহের শিরোনামগুলি নির্দেশ করে যে, এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহে কবি, গায়ক, ফকীহ (ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি), হাদীছবেত্তাগণ প্রমুখের পর্যায়ক্রমিক স্তরসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে অর্থাৎ সমসাময়িক যুগের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিগণ একটি বংশ বা একটি স্তর বা শ্রেণী গঠন করে। হাদীছশাস্ত্রে এই ধারণা আরও সংকীর্ণভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, সেই মতে হাদীছের সমালোচনায় ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সামান্য পরিমাণ পার্থক্য প্রবর্তিত হইয়াছে যে, একই তাবাকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ ঐ সকল ব্যক্তি যাঁহারা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে হাদীছসমূহ শুনিয়াছেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের পরবর্তী স্তরের বর্ণনাকারিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ইবনুস সালাহ, 'উলূমুল হাদীছ, আলেপ্পো ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৪১৩, উদাহরণস্বরূপ বয়স ও ইসনাদ অনুসারে "একই যুগের লোকদের" (আল-কাওমু'ল মুতাশাবিহূন) জন্য একটি অভিব্যক্তিরূপে তাবাকার ব্যাখ্যা করেন (তু. নাওয়াবী, তাকরীব, In F. A., ser. ৯, ১৮, ১৪৪; সুয়ূতী, তাদরীব, কায়রো ১৩০৭ হি., পৃ. ২৬৭)।

এই শব্দার্থের ইতিহাস হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাবাকাত সাহিত্য Loth-এর ধারণামতে হাদীছ সমালোচনার আবশ্যকতা হইতে উদ্ভূত হয় নাই, তবে উক্ত জ্ঞানের শাখায় ইহার একটি বিশেষ প্রয়োগ রহিয়াছে। বংশতালিকা ও জীবনচরিতের ক্ষেত্রে আরবদের আগ্রহের কারণেই ইহার উৎপত্তি। কারণ ইতঃপূর্বে অথবা অন্তত সমসাময়িক কালের লোক ইব্ন সা'দ (মৃ. ২৩০/৮৪৫)-এর তাবাকাত রচনাবলীর অনুক্রম ও "স্তরসমূহের গ্রন্থ"-এর সহিত সুপরিচিত ছিল যেইগুলির অধিকাংশ বর্তমানে টিকিয়া নাই। উহাতে কারী (কুরআনের পাঠ বিশেষজ্ঞগণ), ফুকাহা (আইনবিশারদ), কবি ও গায়কগণের জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই প্রাথমিক যুগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে ওয়াসিল ইব্ন 'আতা' (মৃ. ১৩১/৭৪৮-৪৯)-এর তাবাকাত আহলি'ল-ইল্‌ম ওয়া'ল-জাহ্‌ল (য়াকূত, ইরশাদ, সম্পা. Margoliouth, ৭খ, ২২৫; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০, ২খ., ১৭১)-এর রচনাবলী ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের অন্যতম ছিল ইসমাঈল ইব্ন আবী মুহাম্মাদ আল-য়াযীদী (আনু. ২০০/৮১৫-১৬), তাবাকাতুশ শু'আরা (ইব্নুন-নাদীম, ফিহরিস্‌ত, পৃ. ৫১; য়াকূত, ২খ, ৩৫৯)। আল-হায়ছাম ইব্ন 'আদী (মৃ. ২০৭/৮২২-২৩), তাবাকাতুল ফুকাহা' ওয়াল-মুহাদ্দিছীন ও তাবাকাতু মান রাওয়া 'আনিন-নাবিয়্যি (ফিহ্‌রিস্‌ত, পৃ. ৯৯; য়াকূত, ৭খ, ২৬৫; ইব্ন খাল্ল., ২খ, ২০৪); আবূ 'উবায়দা (মৃ. ২০৮/৮২৩-২৪), তাবাকাত আল-ফুরসান; সম্ভবত কবিগণ সম্পর্কে, (য়াকূত, ৭খ, ১৬৯); মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ (মৃ. ২২০/৮৩৫), তাবাকাতু'ল-ফুকাহা' (আদ-দাব্‌বী, বুগয়া, নং ১০১); খালীফা ইব্ন খায়্যাত (মৃ. ২৩০/৮৪৪-৪৫ অথবা ২৪০/৮৫৪-৫৫), তাবাকাতু'ল কুর্‌রা' (ফিহরিস্‌ত, পৃ. ২৩২; ইব্ন খাল্ল. ১খ, ১৭২); মুহাম্মাদ ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী (মৃ. ২৩১/৮৪৫-৪৬), তাবাকাতু'শ-শু'আরা' (সম্পা. Hell, Leyden ১৯১৬ খৃ.); 'আবদুল-মালিক ইব্ন হাবীব আস-সুলামী (মৃ. ২৩৮-৮৫২-৫৮), তাবাকাতুল-ফুকাহা ওয়াত-তাবিঈন (ইবনুল ফারাদী, তারীখ, নং ৮১৪); আবূ হাস্‌সান আয-যিয়াদী (মৃ. ২৪৩-৮৫৭-৫৮), তাবাকাতুশ শু'আরা' (ফিহ্‌রিসত, পৃ. ১১০; সম্ভবত কেবল জুমাহীর রচনার একজন বর্ণনাকারী); ইব্ন 'আলী আল-খুযা'ঈ (মৃ. ২৪৬/৮৬০-৬১), তাবাকাতু'শ শু'আরা' (ফিহরিস্‌ত, পৃ. ১৬১; য়াকূত, ৪খ, ১৯৭), মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব (মৃ. ২৪৭/৮৬১-৬২), কিতাবু আখবারি'শ শু'আরা' ওয়া তাবাকাতিহিম (كتاب اخبار الشعراء وطبقاتهم) (ফিহ্‌রিস্‌ত, পৃ. ১০৬)। বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্ডিত ও পেশাজীবিগণ অন্যান্য জীবনী গ্রন্থসমূহের আলোচনা এ স্থলে অতিরিক্তভাবে দীর্ঘ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু বংশক্রমের বিন্যাস প্রয়োগ করা কঠিন এবং কোন্ ব্যক্তি কোন্ প্রজন্মের তাহা চিহ্নিত করা অসম্ভব হইবে। ফলে পরবর্তী কালে বিন্যাসকে পরিকল্পিত ছকে আনয়ন করা হয়; সমদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট (দশক, শতক) সময়কে একত্রে বিবেচনা করিয়া একটি পদ্ধতি বিন্যাস করা হয় যাহাতে সাধারণত বর্ণনানুক্রমিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিন্যস্ত করা হয়। এই প্রকারের প্রাচীনতম উদাহরণ হইতেছে আস-সুলামী (মৃ. ৪১৪/১০২২-২৩)-এর তাবাকাতু'স-সুফিয়্যা। একই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে আস-সুবকী (মৃ. ৭৭১/১৩৬৯-৭০)-এর তাবাকাতুশ-শাফিইয়্যা, ইবনুল-মুলাককিন (মৃ. ৮০৪/১৪০১-০২) ও ইব্ন দুকমাক (মৃ. ৮০৯/১৪০৬-০৭) যাহাতে শতাব্দীর ভিত্তিতে বিন্যাস করা হইয়াছে এবং ইব্ন কাদী শুহবা (মৃ. ৮৫১/১৪৪৭-৪৮), যিনি ২০ বৎসর সময় কালের স্তর ব্যবহার করেন।

এই সকল সমস্যা পরিহারের সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসাবে এক শ্রেণীর তাবাকাত গ্রন্থে সর্বত্র বর্ণানুক্রমিক ব্যবস্থা ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা অবশ্য তাবাকা-এর প্রকৃত অর্থ হইতে সম্পূর্ণভাবেই বিচ্যুত। ইহা প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণত গ্রন্থের শিরোনামে কোন প্রকার অতিরিক্ত নাম ব্যবহার করা হইত। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম রচনাটি হইতেছে সম্ভবত বর্তমানে লুপ্ত 'উছমান ইব্ন সা'ঈদ আদ-দানী (মৃ. ৪৪৪/১০৫২-৫৩) [ইব্ন খায়র, ফিহরিস্‌ত, পৃ. ৭২] রচিত তা'রীখ তাবাকাল-কুররা। একই পদ্ধতি অনুসরণে রচিত হয় ইব্নু'ল-জাযারী (মৃ. ৮৩৩/১৪২৯-৩০), গায়াতুন-নিহায়া ফী তাবাকাতি'ল-কুর্‌রা' (সম্পা. Bergstrasser and Pretzl, লাইপযিগ ১৯৩৩-১৯৩৫); আল-কুরাশী (মৃ. ৭৭৫/১৩৭৩-৭৪), জাওয়াহিরু'ল-মুদী'আ ফী তাবাকাতি'ল-হানাফিয়্যা ও অন্যান্য গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Loth, Ursprung und Bedeutung der Tabakat, in Z. D. M. G. ২৩খ (১৮৬৯), ৫৯৩-৬১৪; Flugel, Die Classen der haneftitschen Rechtsgelehrten, in Abh. G. W. Gott., ৮খ. (১৮৬০), ২৭০ প.। তাবাকাত রচনাবলীর অসম্পূর্ণ সংগ্রহসমূহ নিম্নরূপ ঃ হাজ্‌জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, সম্পা. Flugel, ৪খ, ১৩২-১৫৫; (২) Hammer Purgstall, Literaturgeschichte der Araber, Vienna ১৮৫০ খৃ, ১খ, ১৭২ প. (inaccurate!); (৩) Bergstrasser, Die Quellen von Taqut's Irsad, in ZS, ২খ. (১৯২৪), ১৮৪-২১৮; (৪)

Katalog der Handbibliothek der Orientalischen Abteilung der Preuss. Staatsbibliothek, Leipzig ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৩৪-৪২। নিম্নবর্ণিত গ্রন্থ, বিশেষত শাফি'ঈ আইনবিশারদসম্বলিত ঃ Wustenfeld, Der Imam el-Schafi'i, in Abh. G. W. Gott. ৩৬০ খৃ. (১৮৯০), ৭ প.। কুরআনের পাঠ বিশেষজ্ঞগণ Noldeke-Bergstrasser, Geschichte des Qorans, Leipzig ১৯২৯ খৃ., ৩খ, ১৫৭-১৬০।

Heffening (E.I. [1]) আবদুল বাসেত

তাবারকা (TABARKA) ঃ তিউনিসিয়া উপকূলের একটি শহর, তিউনিসের ৭৫ মাইল পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং আলজিরিয়া সীমান্তের ১০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। 'আয়ন দরাহাম (খুমিরিয়া) পর্বতমালা হইতে অবতরণকারী ওয়াদি'ল-কাবীর-এর জলধারা সিঞ্চিত একটি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ উর্বর উপত্যকার প্রবেশপথে পাহাড় ঘেরা একটি বালুকাময় উপসাগরের উপর শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। উপকূলের পৌণে এক মাইল দূরে ২,০০০ গজ লম্বা ও ৫০০ গজ চওড়া একটি শিলাময় ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে। এই দ্বীপ ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে জাহাজ নোঙ্গরের একটি স্থান রহিয়াছে। নোঙ্গরস্থলের পূর্বদিক হইতে মধ্যম আকৃতির জাহাজসমূহ প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত পশ্চিম দিকে শুধু ক্ষুদ্র নৌযানের প্রবেশ সম্ভাব্য। ব্যবসায়ের পরিমাণ অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু এ্যানকোভি (anchovy) ও সার্ডিন (sardine) নামক সামুদ্রিক মৎস্যাদি শিকারের লোভে মার্চ হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে ২০০-৩০০ জন ইতালীয় মৎস্যজীবী এই স্থানটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। একটি নাগরিক নিয়ন্ত্রিত সমাজের রাজধানী এই গ্রামটির জনসংখ্যা হাজারখানেক, অর্ধেক ফরাসী এবং অর্ধেক ইতালীয়, সন্নিহিত সমভূমিতে কতিপয় য়ুরোপীয় স্থাপনাদি নির্মিত হইয়াছে।

তাবারকা-এর অবস্থান-ভূমির সহিত রোমান ও বায়যান্টাইন আমলের সমৃদ্ধিশালী শহর তহাবরাচা (Thabraca)-এর অবস্থানের সাদৃশ্য রহিয়াছে। Medjerda নদীর বাম তীরবর্তী Simithu (Chemtou)-এর পাথর খনি হইতে আহরিত নুমিদিয়ান (Numidian) মার্বেল পাথর রফতানির বন্দর ছিল ইহা। আল-বাক্‌রীর কালেও প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল (Description, অনু. de Slane, পৃ. ১২১); খৃস্টান আমলের কতিপয় চৌবাচ্চা ও ভবনের চিহ্ন ব্যতীত প্রায় সমস্তই বিলুপ্ত। অপরপক্ষে ইহার সন্নিকটে লুপ্ত খৃস্টান সমাধিক্ষেত্রসমূহ অনাবৃত হইয়াছে। আল-বাক্‌রীর কালেও তাবারকার ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল উল্লেখযোগ্য; অবশ্য পুরাতন বন্দর বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং জাহাজাদি নোঙ্গর ফেলিত খোদ ওয়াদি'ল-কাবীরের মোহনায়। তথাকার প্রবাল সম্পদ পরবর্তী কালে Provencal ও ইতালীয় নাবিকগণকে আকৃষ্ট করে। খৃ. ১৫৪০ সালে Genoa-র অধিবাসী Lomellini সম্প্রদায় বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে প্রবাল সম্পদ আহরণের একাধিকার এবং দ্বীপটিতে একটি রক্ষী সেনানিবাস স্থাপনের অধিকার লাভ করে। দ্বীপটি দুই শতাব্দী (১৫৪০-১৭৪১ খৃ.) যাবৎ Lomellini-গণের অধিকারে ছিল; তাহারা তথায় একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করে এবং একটি আবাসিক অঞ্চল (Colony) স্থাপন করে স্বদেশবাসিগণের জন্য, যাহাদের সংখ্যা ছিল কমবেশি এক হাজার। তুর্কগণ পালাক্রমে তিউনিসিয়ার অধিপতি হইয়া মূল ভূখণ্ডে তুর্কী Janissary সেনাদলের একটি দুর্গ স্থাপন করে। খৃস্টানগণের উপস্থিতির কারণে দ্বীপটি একটি মার্কেটে পরিণত হয়। সেইখানে স্বল্পমূল্যে ক্রীত তথাকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি (মোম, পশুচর্ম, খাদ্যশস্য) ও য়ুরোপীয় পণ্যদ্রব্যের বিনিময় চলিত (তু. Savary de Breves, Relation, পৃ. ২৫৪)। একই সঙ্গে দ্বীপটি দাস ব্যবসায়ের একটি ডিপো তথা খৃস্টান ক্রীতদাসদিগের অন্তর্বর্তীকালীন বন্দীখানারূপে ব্যবহৃত হইত। তাহাদের মুক্তিপণের ধার্য অর্থাগমের জন্য অপেক্ষা করা হইত। Genoa-বাসিগণ এই লেনদেনে দৃশ্যত মধ্যবর্তীর ভূমিকা পালন করিত। Lomellion গোষ্ঠী কর্তৃক আহরিত এই মুনাফা (যাহা দ্বীপটির যুদ্ধ কৌশলগত মূল্য হইতে কোন অংশেই কম ছিল না) আলজিরিয়ান উপকূলে স্থাপিত ফরাসী কোম্পানীগুলির ধন-লিপ্সা জাগরূক করিল। খৃ. ১৬৩৩ সনে Sanson Napollon (Bastion de France-এর গভর্নর) দ্বীপটি দখলের চেষ্টায় তাহাতে অবতরণ করা মাত্রই নিহত হন। খৃ. ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ ও ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্বীপটির স্বত্ব ত্যাগ আদায়ের লক্ষ্যে ফরাসী সরকার ও Lomellion-দের মধ্যে কয়েকবার আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। যেইমাত্র তাহারা একটি সমঝোতায় উপনীত হইল ঠিক তখনই বে 'আলী ইহা অবহিত হন এবং দ্বীপটি দখলের জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন (জুন ১২, খৃ. ১৭৪১)। Genoa-বাসীদের স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করা হয়। অধিবাসিগণের একাংশ পলায়নে সক্ষম হয় এবং Sardinia উপকূলের অদূরে San Pictro দ্বীপে বসতি স্থাপন করে। অপরাংশের লোকজনকে তিউনিসে আনয়ন করা হয় যেইখানে তাহাদের বংশধরেরা দীর্ঘকাল যাবৎ তাবারকান (Tabarkan) গোষ্ঠী নামে পরিচিত ছিল। ইহার ফলে ফ্রান্স ও অন্তর্বর্তীকালীন তুর্কী শাসক (regent)-এর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং ফরাসী নৌবাহিনী M. de Saurins নামক একজন অফিসার ২ জুলাই, ১৭৪২ সনে তাবারকার উপর একটি ব্যর্থ আক্রমণ পরিচালনা করেন; ১০০ ব্যক্তি নিহত এবং অভিযানের নেতাসহ ২২৪ ব্যক্তি তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়। এই ঘটনার পর হইতে দ্বীপটিতে তিউনিসীয়দের দখল অব্যাহত থাকে। তাহারা ফরাসী ও অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির Concessions (সুবিধাদি)-এর দাবি প্রত্যাখ্যান করে। প্রবাল সম্পদ আহরণ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও Tabarka-এর বাণিজ্যিক গুরুত্ব নষ্ট হয়। তিউনিসিয়া অভিযানের শুরুতে ফরাসিগণ তুর্কী বাহিনীর সম্মুখভাগের উপর গোলাবর্ষণ করে এবং ২৬ এপ্রিল, ১৮৮১ সালে Tabarka-তে অবতরণ করে। সেই সময় হইতে এইখানে একটি য়ুরোপীয় কেন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে এবং Khumiria পর্বত স্তূপের ভিতর দিয়া নির্মিত একটি রাস্তা দ্বারা উপকূলের সহিত Medjerda উপত্যকার সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানের কারণে শহরটির বিকাশের গতি মন্থর। Mateur ও Beja পর্যন্ত একটি সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ এবং অঞ্চলটিতে আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদের আহরণ নিঃসন্দেহে শহরটির উন্নতির পথে অবদান রাখিবে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) Desfontaines, Voyages..., সম্পা. Dureau de la Malle, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ., ২৩৬ প; (২) B. Girard, Tabarca (Thabraca), Bulletin, Societe de Geographieet d'Archeologie d'Oran, খৃ. ১৮৮৪; (৩) মুহাম্মাদ সাগীর ইব্‌ন য়ূসুফ, Mechra el-Melki, অনু. V. Serres and M. Lasram, প্যারিস ১৯০০ খৃ., অধ্যায় ২৯; (৪) Plantet, Correspondence des Beys de Tunis avec la cour de France, বৃহৎ গ্রন্থ, ২খ.; (৫) Podesta, L'Isola de Tabarca e la Peschiera di corallo, in Atti della Societa ligura di Storia Patria, Genoa ১৮৮৪ খৃ.।

G. Yver (E.I. [1])/ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তাবারিস্তান (طبارستان) ঃ মুদ্রার গায়ে পাহলাবী লিপিতে লিখিত হইয়াছে তাপূরিস্তান অর্থাৎ তাপুরদের দেশ, পারস্যের মাযান্দারান প্রদেশকে আরবরা এই নাম দিয়াছিল। অঞ্চলটি আলবুর্য পর্বতের উত্তরে অবস্থিত। একটি পরিচিত ব্যুৎপত্তি দ্বারা নামটির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, অর্থ খাগড়া বা শর জাতীয় উদ্ভিদ তাবারের অঞ্চল [দ্র. (১) আবুল ফিদা', Geography. মূল পাঠের পৃ. ৪৩২; (২) মেহরেন, Cosmography, পৃ. ৩১৪], কারণ এলাকাটি গভীর বনভূমিতে পূর্ণ এবং অধিবাসিগণের প্রধান পেশা হইতেছে কাঠ কাটা। ইহার উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে আলবুর্য পর্বতমালা, পূর্বে জুরজান এবং পশ্চিমে গীলান। এখানকার জমিন উর্বরা ও পানিবিধৌত, ফলমূল প্রচুর জন্মে, কিন্তু পানি জমিয়া থাকে বলিয়া এলাকাটি স্বাস্থ্যকর নহে। কয়েকটি ছোট নদী, হেরহায, তালার ও তেজেন এইখান দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান শহর আমোল, সারী, শালুস, রুয়ান ও বারফুরূশ। এইখানে বসবাসকারী উপজাতীয় লোকেরা যুদ্ধভাবাপন্ন, উচ্ছৃঙ্খল এবং লুটতরাজ ও খুন-খারাবিতে অভ্যস্ত। অধিবাসিগণের প্রধান প্রধান পেশা হইল মাছ ও জলচর পাখি ধরা, ধান, শন ও গাঁজার চাষ করা (দ্র. মুকাদ্দাসী, পৃ. ৩৫৪)।

ইতিহাস ঃ মুসলিম বিজয়ের সময়ে এই জিলা শাসন করিতেন ইসপাহবায উপাধিধারী বংশানুক্রমিক শাসকগণ (ফার্সী শব্দটির অর্থ সেনাবাহিনীর একজন প্রধান)। খলীফা 'উছমান (রা)-এর শাসনামলে ২৯/৬৫০ সালে কুফার গভর্নর সা'ঈদ ইবনু'ল-'আসী (রা) তাবারিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। মু'আবিয়া ১ম-এর শাসনকালে সেনাপতি মাসকালা ইব্ন হুবায়রা ১০,০০০ বা ২০,০০০ সৈন্য লইয়া এইখানে প্রবেশ করেন। কিন্তু বিভিন্ন গিরিপথে শত্রুরা উপর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া অধিকাংশ সৈন্যকে ধ্বংস করে। পরে আরও একটি ব্যর্থ অভিযান করেন মুহাম্মাদ ইবনু'ল-আশ'আছ। সুলায়মান ইব্ন 'আবদুল মালিক-এর সময়ে য়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাব এই আক্রমণ করেন; ইসপাহবায সন্ধি করেন এবং প্রতিশ্রুত হন যে, তিনি প্রতি বৎসর করস্বরূপ ৪৭,০০,০০০ দিরহাম, ৪০০ গাধা বোঝাই জা'ফরান এবং ৪০০ জন করিয়া লোক পাঠাইবেন, উহাদের প্রত্যেকে একটি ঢাল, একটি রূপার পেয়ালা এবং রেশমের তৈরী ঘোড়ার গদি লইয়া যাইবে। অধিবাসিগণ মারওয়ান ইব্ন মুহাম্মাদ-এর সময়ে বিদ্রোহ করে। আবু'ল-'আব্বাস আস-সাফ্ফাহ প্রেরিত গভর্নর উহাদিগকে স্বল্প কালের জন্য দমন করেন। খলীফা আল-মানসূর উহাদের বিরুদ্ধে খাযিম ইব্ন খুযায়মা আত-তামীমী ও রাওহ ইব্ন হাতিম আল-মুহাল্লাবীকে প্রেরণ করেন। 'উমার ইবনু'ল-'আলা' দায়লামের পার্বত্য এলাকা আক্রমণ করেন। তাঁহার (প্রপৌত্র মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা ইব্ন হাফ্স ও মায়াযদায়ার ইব্ন কারিন ঊষর পার্বত্য অঞ্চল শারবীন জয় করেন। আল-মা'মূন কারিনকে ইসপাহবায উপাধি প্রদান করেন। তিনি যখন আল-মু'তাসিম-এর শাসনের ৬ষ্ঠ বৎসরে বিদ্রোহ করেন তখন তাঁহারই চাচাত ভাই, খুরাসানের গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির কর্তৃক প্রেরিত সেনাপতি হুসায়ন ইব্ন হাসান-এর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন, তাঁহাকে সামার্‌রাতে প্রেরণ করা হয়। সেইখানে ২২৫/৮৪০ সালে চাবুকের আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার মৃতদেহ বাবাক আল-খুর্‌রামীর দেহের পাশাপাশি টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। তাবারিস্তানের শাসক হন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন তাহির।

২৪০/৮৫৪ ইস্পাহবায কারিন ইব্ন শাহরিয়ার, যিনি পার্বত্য অঞ্চল শাসন করিতেন, ইসলাম কবূল করেন। ২৪৭-৮/৮৬১-২ সনে 'আলীপন্থী মুহাম্মাদ ইব্ন যায়দ এই প্রদেশটি অধিকার করেন। তিনি বুওয়ায়হী শাসক আদুদু'দ-দাওলা ফান্না খুসরাওর নিকটে প্রতিশ্রুতি দেন যে, শী'আবাদ প্রচার করিতে দিবেন এবং 'আলী (রা)-এর পরিবারের সদস্যদের মাযারসমূহ মেরামত করিয়া দিবেন। তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির প্রেরিত জনৈক ব্যক্তির হাতে নিহত হন। তাঁহার এক ভাই হাসান ইব্ন যায়দ ২৫০/৮৬৪ সালে বিদ্রোহ করেন; ২৭০/৮৮৪ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার এক ভাই মুহাম্মাদ উত্তরাধিকারী হইয়া আদ-দা'ঈ'ল-কাবীর (মহান প্রচারক) উপাধি গ্রহণ করেন এবং সামানী ইসমা'ঈল ইব্ন আহমাদ-এর সেনাপতি মুহাম্মাদ হারূন-এর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন (২৮৭/৯০০); ইসমা'ঈল দেশটি অধিকার করেন। ২৯৭-৮/৯১০-১১ সালে রুশগণ জলপথে আসিয়া আবাসকূন ও সারী লুটপাট ও ধ্বংস করিয়া দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থানীয় অধিবাসিগণ তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। ফিরিবার পথে রুশ নৌবহরের যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা খাযারদের রাজা কাড়িয়া নিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়। 'আলী বংশীয় আরেকজন আল-হাসান ইব্ন 'আলী যিনি আন-নাসিরু'ল-কাবীর নামে পরিচিত ছিলেন, আমূলে সামানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন (৩০১/৯১৪) ; মৃত্যুকালে (৩০৪/৯১৭) তিনি নিজ জামাতা আদ-দা'ঈ ইলা'ল-হাক্ক নামে পরিচিত আল-হাসান ইবনুল-কাসিমকে উত্তরাধিকার দিয়া যান। তিনি আবু'ল-কাসিম জা'ফার ইব্নু'ন নাসির-এর সঙ্গে এবং তাঁহার ভাড়া করা বাহিনীর সেনাপতি মাকান ইব্ন কাকীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করিয়া পার্বত্য অঞ্চলে অদৃশ্য হইয়া যান। অবশেষে তিনি আসফার ইব্ন শীরূয়্যার সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত মারদাবীজ-এর গদার আঘাতে 'আলীয়াবাদে নিহত হন। এইভাবে আসফার তাবারিস্তানের শাসক হন, কিন্তু তিনিও ৩১৯/৯৩১ সনে মারদাবীজ-এর হাতে নিহত হন। শেষোক্তজনের ভাই উশমগীর অতঃপর শাসন করিতে থাকেন, কিন্তু ৩২৯/৯৪০ ইসহাকাবাদের যুদ্ধে মাকান ইব্ন কাকী নিহত হন এবং উশমগীর-এর সেনাবাহিনী বিধ্বস্ত হইয়া যায়; শেষোক্তজন মন পরিবর্তন করিয়া সামানীগণের করদ শাসক হন এবং কখনও জুরজানে, কখনও তাবারিস্তানে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁহার পরবর্তী দুইজন উত্তরাধিকারী কাবুস ১ম এবং মিনূচিহরও সেইরূপই ছিলেন; শেষোক্তজন গাযনাবীগণের আধিপত্য মানিয়া নেয়। প্রদেশটিতে অতঃপর সালজূকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু বাওয়ান্দ বংশীয় ইসপাহবাযগণ দীর্ঘকাল যাবত বস্তুত স্বাধীনই ছিলেন, বিশেষ করিয়া পার্বত্য এলাকাতে; আলা'উ'দ-দাওলা 'আলী ইব্ন শাহরিয়ার ইব্ন কারিন ছিলেন গাযনাবী ৩য় মাস'ঊদ-এর সমসাময়িক; নুসরাতু'দ-দীন রুস্তাম তাজু'ল-মুলূক 'আলী ইব্ন মারদাবীজ ছিলেন সালজূক সানজার-এর সমসাময়িক; 'আলাউদ-দাওলা হাসান ইব্ন রুস্তাম ইব্ন 'আলী; হুসামু'দ-দাওলা ওয়া'দ-দীন আরদাশীর ইব্ন হাসান ছিলেন ২য় সোগ্রীল ইব্ন আরসলান-এর সমসাময়িক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, সম্পা. de Goeje, ৩৩৫-৪০; (২) F. C. Murgotten, The Origins of the Islamic State, নিউইয়র্ক ১৯২৪ খৃ., ২খ, পৃ. ৩৯-৪৮; (৩) মুকাদ্দাসী, B. G. A., ৩খ, পৃ. ৩৫৪; (৪) জাহীরু'দ-দীন, তা'রীখ তাবারিস্তান, সম্পা. Dorn, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৫০ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৫) মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হাসান ইব্ন ইস্ফান্দিয়ার (সংযোজিত ইং অনুবাদ E.G. Browne, G. M. S., লন্ডন ১৯০৫ খৃ.), পৃ. ১৪ এবং স্থা.; (৬) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ, পৃ. ৫০১; (৭) Barbier de Meynard, Dict. de le Perst, পৃ. ৩৮০; (৮) Fr. Spiegel, Eran. Altrothumskunde, ১খ, পৃ. ৬৬; (৯) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, কেম্ব্রিজ

১৯০৫ খৃ., পৃ. ৩৬৮, ৩৭৬; (১০) British Museum, Catalogue of Oriental Coins, vol. ix, পৃ. ২৫৭; (১১) H. Porter, Numismatic Chronicle-এ লিখিত, ১৯০১ খৃ., পৃ. ৩২৭ প.।

Cl. Huart (E.I.^{2})/ হুমায়ুন খান

আত-তাবারী (الطبرى) ঃ তাবারিসতান-এর রাজদানী আমুল-এর অধিবাসী, তাই নিস্‌বা (সম্বন্ধবাচক নাম) আত-তাবারী উক্ত নিসবা বহনকারীদের অধিকাংশই আমুল-এর অধিবাসী। ভুলবশত এই নিসবা-র সঠিক শব্দ আত-তাবারী-র পরিবর্তে তাবারীয়াও ব্যবহার করা হইয়া থাকে (তু. সাম'আনী, আনসাব, পত্র ৩৬৬ b; তাজু'ল-'আরূস, ৩খ, ৩৫৫)।

১. **আবুত-তায়্যিব আত-তাবারী** (ابو الطيب الطبرى) তাহির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন তাহির, শাফি'ঈ ফকীহ এবং আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী ও আল-খাতীব আল-বাগদাদীর শিক্ষক। আশ-শীরাযী দশ বৎসরেরও অধিক কাল তাঁহার শিক্ষা সংক্রান্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন।

আত-তাবারী ৩৪৮/৯৫৯-৬০ সালে আমুলে জন্মগ্রহণ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার নিজ শহরে ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ৩৭১/৯৮১-৮২ সালে আবূ বাক্‌র আল-ইসলামা'ঈলীর নিকট শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জুরজান গমন করেন। কিন্তু সেইখানে তাঁহার পৌঁছিবার পরের দিনই আল-ইসমা'ঈলী ইনতিকাল করেন।

দীর্ঘ চারি বৎসর যাবৎ তিনি 'আবুল-হাসান আল-মাসারজিসী (মৃ. ৩৮৩/৯৯৩)-র নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আত-তাবারী বাগদাদে আবূ মুহাম্মাদ আল-বাফী (মৃ. ৩৯৮/১০০৭-০৮), আবুল-হাসান আদ-দারা কুতনী (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫), প্রসিদ্ধ শাফি'ঈ আবূ হামিদ আল-ইসফারাইনী (মৃ. ৪০৬/১০১৫-১৬) ও ঐতিহাসিক আত-তাবারী-র মাযহাবের অনুসারী আবু'ল ফারাজ আল-মু'আফা ইব্‌ন যাকারিয়া আন-নাহরাওয়ানী (মৃ. ৩৯০/১০০০)-র নিকট তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তিনি বাগদাদে অবস্থান করিয়া ব্যক্তিগত অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকেন।

৪২২/১০১৩ সালে তিনি কাদিল-কুদাত আবূ 'আবদিল্লাহ (মৃ. ৪৪৭/১০৫৫-৫৬)' কর্তৃক বাগদাদের লেখ্য প্রমাণক (শাহিদ) নিযুক্ত হন (ইব্‌নু'ল-আছীর, কামিল, ৯খ, ২৮৭)।

বুওয়ায়হী জালালুদ-দাওলা ৪২৯/১০৩৭-৩৮ সালে যখন তাঁহার খুতবায় "মালিকু'ল-মুলূক" উপাধি গ্রহণের ইচ্ছা করেন তখন আবু'ত-তায়্যিব আত-তাবারী ঐ সমস্ত ফকীহ্‌র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁহাদের নিকট খলীফা ফাতওয়া তলব করিয়াছিলেন। আত-তাবারী এই উপাধি গ্রহণকে অনুমোদনযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন (ইব্‌নু'ল-আছীর, ৯খ., ৩১২)।

বাবু'ত-তাক এলাকার (ইব্‌নু'ল-আছীর, ৯খ, ৩৬০) বিচারপতির দায়িত্ব ছাড়াও তিনি ৪৩৬/১০৪৪-৪৫ সালে হানাফী আবূ 'আবদিল্লাহ আস-সায়মারী-র পরে আল-কারখ-এর বিচারপতির পদও লাভ করেন। ১০২ বৎসর বয়সেও তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে সক্রিয় শক্তিসম্পন্ন ও তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখনই তিনি ৪৫০ হি. সনের ১৯ রাবী'উ'ল-আওওয়াল রোজ শনিবার (১৬ মে, ১০৫৮) ইনতিকাল করেন। জামি'উ'ল-মানসূর-এ তাঁহার জানাযার সালাত সম্পন্ন হয় এবং বাব হারব-এর কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত আত-তাবারী খলীফার রাজপ্রাসাদের অভ্যর্থনায় উপস্থিত ছিলেন। খাতীব-এর বর্ণনানুসারে তিনি উসূল (মূল বিষয়) ও ফুরূ' (আনুষঙ্গিক) উভয়বিধ শাখায় অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং তিনি মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, উত্তম চরিত্র ও ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

তিনি 'ইলমুল-ফিকহে অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি রচনা হইল ঃ মুযানী-র 'মুখতাসার' গ্রন্থের একটি ভাষ্য (শারহ), যাহার পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি কায়রোতে রহিয়াছে (Brockelmann, G. A. L., i, 180); আবূ বাক্‌র ইব্‌নু'ল হাদ্‌দাদ আল-মিসরী (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬-৫৭)-র ফুরূ' নামক পুস্তকের একটি ভাষ্য (ইব্‌ন খাল্লিকান, ১খ, ২৩৪; সুবকী, ২খ, ১১৩; ৩খ, ১৯৫; আরও দ্র. হাজ্জী খালীফা, নং ৯০৩৬); কিতাবু'ল-মিনহাজ (সুবকী, ৩খ, ১৭৬), কিতাবু'ত-তা'লীকা দশ খণ্ডে সমাপ্ত (সুবকী, ৩খ, ১৯৫; হাজ্জী খালীফা, নং ৩১২০), মুখতাসার ফী মাওলিদি'শ-শাফি'ঈ এবং ইহার সহিত তাঁহার অনুসারীদের জীবনী (হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ১৪১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশ-শীরাযী, তাবাকাতু'ল-ফুকাহা, নং ২০৬; (২) আল-খাতীব আল-বাগদাদীর তা'রীখ, আন-নাওয়াবীর তাহযীবে, পৃ. ৭৩৫, পরবর্তী উৎসসমূহ প্রধানত এই দুইটি উৎসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (ক) আস-সাম'আনী, আনসাব, G.M.S., xx., fol, 367r; (৩) আন-নাওয়াবী তাহযীব, সম্পা. Wustenfeld, p. 734-736; (৩) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ২৩৩ প.; (৪) আস-সুবকী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা আল-কুবরা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৩খ, ১৭৬-১৯৭; (৫) Wustenfeld, Der Imam al-Schafii, No, 393 (-Abh. G. W. Gott, xxxvii, 1891).

২ **মুহিব্‌বু'দ-দীন আত-তাবারী** (محب الدين الطبرى) ঃ আবু'ল 'আব্বাস আহমাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র, তিনি মক্কার একজন হাদীছবিদ ও শাফি'ঈ ফিকহশাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি ৬১৫/১২১৮-১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৯৪/১২৮৪-৯৫ সালে ইনতিকাল করেন। ইব্‌নু'ল জুমমায়যী (মৃ. ৬৪৯/১২৫১-৫২, সুবকী, ৫খ, ১২৮), মাজদু'দ-দীন আল-কুশায়রী (মৃ. ৬৬৭/১২৬৮-৬৯; য়াফি'ঈ, ৪খ, ১৬৬) এবং আরও অনেকেই তাঁহার শিক্ষক ছিলেন।

রাসূলী আদীব আল-মুজাফ্‌ফার (৬৪৭-৬৯৪/১২৫০-১২৯৫) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তাঁহাকে য়ামানে আহ্বান করিয়াছিলেন (আল-খায্‌রাজী, 'উকূদ, in G. M. S., iii./iv. 277; তু. আরও দ্র. হাজ্জী খালীফা, নং ১১৫৩৩)।

তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন আবূ মুহাম্মাদ আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-বিরযালী (মৃ. ৭৩৯/১৩৩৮-৩৯) যিনি শামসু'দ-দীন যাহাবীর অন্যতম শায়খ ছিলেন। তিনি "গায়াতু'ল-আহকাম ফিল-আহাদীছ ওয়া'ল-আহকাম" গ্রন্থ রচনা করেন; ইহাতে তিনি 'দুর্বল' হাদীছসমূহ চিহ্নিত না করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। ব্রকেলম্যান তাঁহার যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়াছেন তদ্ব্যতীত তাঁহার নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ

১. মুখতাসার ফি'ল-হাদীছ (সুবকী);

২. কিতাব ফী ফাদল মাক্‌কা (সুবকী);

৩. ইসতিকসা' আল-বায়ান ফী মাসআলা শাযারওয়ান (হাজ্জী খালীফা, নং ৬১৭);

৪. খায়রু'ল-কিরাফী যিয়ারাতি উম্‌মি'ল-কুরা (য়াফি'ঈ; হাজ্জী খালীফা, নং ৪৮২৩)।

৫. আরবা'ঈন ফি'ল-হাজ্জ (হাজ্জী খালীফা, নং ৪০৬);

৬. 'আওয়াতিফুন-নুসরা ফী তাফদীলি'ত-তাওয়াফ ওয়া'ল-'উমরা (হাজ্জী খালীফা, নং ৮৪০২, ১১৮৫৯);

৭. সিফাতু হাজ্‌জি'ন-নাবিয়্যি (স) (হাজ্জী খালীফা, নং ৭৭৮; ব্রকেলম্যান-এর বর্ণনার সহিত না মিলিলে "নং ৪' হইবে।

৮. ওয়াজীযাতু'ল-মা'আনী [ফী] কাওলিহি (স) মান রা'আনী ফি'ল-মানাম ফাকাদ রা'আনী (হাজ্জী খালীফা, নং ১৪১৭৬);

৯. মানসূর লি'ল-মালিক আল-মানসূর (হাজ্জী খালীফা, নং ১৩১৪২);

১০. আস-সিমতুছ-ছামীন ফী মানাকিব উম্মিহাতি'ল-মু'মিনীন (হাজ্জী খালীফা, নং ৭২৫০, ১৩০৩৮);

১১. তাকরীবু'ল-মারাম ফী গারীবি'ল-কাসিম ইব্ন সাল্‌লাম (মৃ. ২২৩/৮৩৭) (বর্ণমালার ক্রমানুসারে উল্লিখিত, দ্র. হাজ্জী খালীফা, নং ৩৪৬৫ এবং ৪খ, ৩২৫);

১২. ইব্নু'ল-আছীর-এর জামিউ'ল-উসূল-এর দুর্বোধ্য শব্দসমূহ (হাজ্জী খালীফা, ২খ, ৫০৬);

১৩. শিহাবু'দ-দীন আস-সুহরাওয়ারদী (মৃ. ৬৩২/১২৩৪)-র 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ ফি'ত-তাসাওউফ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ (Brockelmann, G. A. L., i. 440; হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ২৭৬);

১৪. শীরাযী রচিত 'তানবীহ' গ্রন্থের দশ খণ্ডে সমাপ্ত ভাষ্য (সুব্‌কী; য়াফি'ঈ; হাজ্জী খালীফা, ২খ, ৪৩৫);

১৫. উপরোক্ত তানবীহ গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ (য়াফি'ঈ);

১৬. তিরাযু'ল মাযহাব ফী তাল্‌খীসি'ল-মুযাহ্‌হাব, শীরাযী লিখিত মুহাযযাব সারসংক্ষেপ দুই খণ্ডে সমাপ্ত (হাজ্জী খালীফা, ৪খ, ২৭৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, হায়দরাবাদ তা, বি., ৪খ, ২৬৪; (২) আস-সুব্‌কী, তাবাকাতু'শ-শাফি'ইয়্যা আল-কুবরা, কায়রো ১৩২৪ হি., ৮খ.; (৩) আল-য়াফি'ঈ, মির'আতুল জিনান, হায়দরাবাদ ১৩৩৯ হি., ৪খ, ২২৪ প.; (৪) Brockelmann, G. A. L., i, 361.

Heffening (E.I.[1]) রুহুল আমীন রোকন

আত-তাবারী (الطبرى) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর, প্রখ্যাত আরব ঐতিহাসিক ও কুরআনের ভাষ্যকার, তাবারিসতান প্রদেশের রাজধানী আমুল শহরে তিনি ২২৪ কিংবা ২২৫/৮৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

আত-তাবারী সাত বৎসর বয়সকালে কুরআন শারীফ হিফজ করিয়াছিলেন। নিজ শহরে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিবার পর তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে হাদীছশাস্ত্র শিক্ষা করেন। মুসলিম জ্ঞানজগতের সমুদয় কেন্দ্রভূমি পরিদর্শন করিবার ব্যয়ভার বহনে তিনি সক্ষম ছিলেন। প্রথমত আবূ জা'ফার রায় এবং ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শিক্ষা সফর করেন। ইহার পর তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বালের নিকট শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাগদাদ গমন করেন; কিন্তু তাঁহার বাগদাদে পৌছিবার কিছু দিন পূর্বে আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র) ইনতিকাল করেন। কিছু দিন বসরা ও কূফায় অবস্থান করিবার পর তিনি পুনরায় বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় কিছু দিন জ্ঞানার্জন করেন। অতঃপর তিনি শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্যে মিসর যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে হাদীছ অধ্যয়নের অভিপ্রায়ে সিরিয়ার শহরগুলিতে পরিভ্রমণ করেন। মিসরে পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত বিদ্বান হিসাবে পরিগণিত হন।

মিসর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় বাগদাদে আগমন করেন এবং ৩১০/৯২৩ সালে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন; তবে বাগদাদে অবস্থানকালেই তিনি দুইবার তাবারিস্তান সফর করিয়াছিলেন (দ্বিতীয় সফরের সময়কাল ছিল ৯০২-৯০৩ খৃ.)।

তাবারী সম্পূর্ণরূপে পণ্ডিতোচিত মনমানসিকতা এবং পুণ্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। জীবনের প্রথম বৎসরগুলিতেই তিনি আরব ও মুসলিম ঐতিহ্যের উপাদান সংগ্রহে তাঁহার সকল শক্তি নিবেদিত করেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার সব সময় প্রধানত শিক্ষাদান ও গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যয় করেন। যদিও তাঁহার জীবিকা নির্বাহের জন্য আয় যথেষ্ট ছিল না, তবুও তিনি সকল অর্থনৈতিক সুবিধা এবং উচ্চ পদ এমন কি লোভনীয় সরকারী চাকুরিসমূহ প্রত্যাখ্যান করেন। এমনিভাবে তিনি প্রচুর পরিমাণে ফলপ্রসূ ও বহুমুখী সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান বিষয়সমূহ, যেমন ইতিহাস, ফিক্‌হ, কুরআনের ভাষ্য ও হাদীছ ব্যতীত তিনি কবিতা, অভিধান রচনা, ব্যাকরণ, নীতিশাস্ত্র এবং এমন কি গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

মিসর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দশ বৎসর যাবত তিনি শাফি'ঈ মাযহাব অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিজস্ব ফিকহী মতবাদ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অনুসারীরা তাঁহার পিতার নামানুসারে নিজদিগকে 'জারীরীয়া' বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই মাযহাব শাফি'ঈ মাযহাব হইতে বাস্তব প্রয়োগের তুলনায় মূলনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে একটি পৃথক মতবাদ বলিয়া মনে হইত না। ফলে ইহা বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হয়।

আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর সহিত তাঁহার মতপার্থক্য ছিল মৌলিক। তিনি আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-কে একজন হাদীছ-এর নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন, ফকীহ হিসাবে নহে। ফলে তিনি হাম্বালীদের রোষাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সূরা ১৭ ও ৮১-এর হাম্বালীপ্রদত্ত ব্যাখ্যা আক্রমণ করিয়া তিনি তাহাদের বিশেষ শত্রু হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ক্রুদ্ধ জনতার রোষানল হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে তাঁহার বাড়িতে আত্মগোপন করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য জারিকৃত পুলিশের কঠোর আদেশেই তিনি বাড়িতে শান্তিতে বসবাস করিতে সক্ষম হইলেন। এই শত্রুরা তাঁহাকে আইনের মাধ্যমে আঘাত করিতে সচেষ্ট হইয়া উঠে। তাহারা সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে তাঁহাকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদী হিসাবে অভিযুক্ত করে।

তাবারীর গ্রন্থাবলী আমাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে পৌছায় নাই, উদাহরণস্বরূপ তাঁহার সেই সকল পাণ্ডুলিপি, যেইগুলিতে তিনি তাঁহার মাযহাবের মূলনীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার জামি'উ'ল-বায়ান ফী তাফসীরি'ল-কুরআন গ্রন্থে কুরআন ব্যাখ্যার সনাতনী নিয়ম-নীতির উপর প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেন, যাহা পরবর্তী যুগের কুরআন ব্যাখ্যাকারীদের জন্য একটি নমুনা গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয় এবং অদ্যাবধি ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইতেছে।

তাবারীর গ্রন্থের মধ্যে তাঁহার লিখিত পৃথিবীর ইতিহাস (তা'রীখু'র-রুসুল ওয়াল-মুলুক) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সুবিখ্যাত লাইডেন সংস্করণ তাঁহার বিশাল গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কথিত আছে যে, এই সংক্ষিপ্তকৃত গ্রন্থটির তুলনায় মূল গ্রন্থটি দশ গুণ বৃহত্তর। অথচ এই সংক্ষিপ্তকৃত গ্রন্থটি সাড়ে বার খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি এই সারগ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয় নাই, বরং পরবর্তী যুগের যে সমস্ত লেখক তাঁহার বিশ্ব ইতিহাস ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারাই বিভিন্ন মহলে সেই অসমাপ্ত অংশের কার্যের পরিপূরক রচনা করিয়াছেন।

একটি ভূমিকা লিপিবদ্ধ করিবার পর তাবারী তাঁহার ইতিহাসের শুরুতে ধর্মযাজক, নবী-রাসূল এবং প্রাথমিক যুগের শাসকগণের জীবনী উল্লেখ করিয়াছেন (১/১ খ.)। ইহার পর সাসানী যুগের (১/২ খ.) এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) ও প্রথম খলীফা চতুষ্টয়ের ইতিহাস (১/৩-৬ খ.) বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর উমায়্যা যুগের (২/১-৩ খ.) আলোচিত হইয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর যুগের সূচনা হইতে হিজ্‌রী এবং বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী ইতিবৃত্ত সংগ্রহের পদ্ধতিতে তাঁহার লেখার উপাদান সংগ্রহ করা হইত। ৩০৩/৯১৫ সনে তাঁহার ইতিহাস রচনায় সমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালে অন্য ঐতিহাসিকগণ এই কর্ম চালাইয়া যান। পরবর্তী যুগের উল্লেখযোগ্য পরিশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) তাবারীর শাগরিদ আবূ মুহাম্মাদ আল-ফারগানী রচিত আল-মুযায়্যিল অথবা সিলাতু'ত-তা'রীখ। এই পুস্তকটি পরবর্তীতে পাওয়া যায় নাই।

(২) আবু'ল-হাসান মুহাম্মাদ আল-হামাযানী (মৃ. ১১২৭) রচিত পুস্তক যাহা ১০৯৪ সন পর্যন্ত সমাপিত। ইহার সমস্ত খণ্ড বিলুপ্ত হইয়াছে; কেবল প্রথম খণ্ডটি অবশিষ্ট ছিল, যাহার রচনা ৯৭৭-৯৭৮ সনে সমাপ্ত হয়।

পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিকগণ, যথা ইব্ন মিসকাওয়ায়হ ও ইব্নু'ল-আছীর তাঁহাদের ইতিহাস রচনার সময় তাবারী সংগৃহীত উপাদানসমূহ কাজে লাগান। কিন্তু এই কার্য তাঁহার অনেক পরে সাধিত হয়, যাহাতে একটি দৃষ্টিকোণ হইতে তাহারা তাঁহার ইতিহাস রচনার কাজ ৯৭৯-৯৮০ অথবা ১২২৫ সাল পর্যন্ত চালাইয়া যান। ইবনুল আছীর তাবারীর অবদানকে স্বীয় রচনায় প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করেন এবং বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে একটি সংগতি স্থাপন করেন এবং এতদসহ অন্যান্য সূত্রের দ্বারা শূন্য স্থান পূরণ করা হয়।

De Goeje সম্পাদিত স্পেনীয় 'আরব 'আরবি (৯০৩-৯৩২)-এর অসম্পূর্ণ অংশ একটি স্বাধীন অনুবাদ এবং তাবারীর ইতিহাসের ধারাবাহিকতা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। সামানী উযীর আবূ 'আলী মুহাম্মাদ আল-বাল'আমীর আদেশে তাবারী রচিত ইতিহাস ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। ইহা একটি সংক্ষিপ্তসার; তবে অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাচীন যুগের উপর ইহার একটি পরিশিষ্ট ফারসী ভাষায় অনূদিত। এই ফারসী গ্রন্থটি তুর্কী ও আরবী ভাষায়ও অনূদিত হয়।

তাবারী তাঁহার তা'রীখু'র-রিজাল গ্রন্থে ঐ সমস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত করেন যাঁহাদেরকে তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনাকারী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। মূলত এই কার্যটি তাবারীর ইতিহাসের পরিশিষ্ট (যায়ল) হিসাবে প্রচলিত ছিল। এই অসমাপ্ত সারগ্রন্থটি তাবারীর ইতিহাসের লাইডেন সংস্করণের শেষ প্রান্তে প্রকাশিত হইয়াছিল (৩খ, ২২৯৫-২৫০১)।

বিশ্ব ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার সময় তাবারী তাঁহার লেখার উপাদান মৌখিক বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ইল্‌ম অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বনামধন্য পণ্ডিতগণের সাহচর্য লাভের আশায় তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি ইতিহাসের উৎস গ্রন্থসমূহকেও ব্যবহার করেন, যেমন (১) আবূ মিখনাফ রচিত পুস্তক, (২) 'উমার ইব্ন শাব্বা রচিত কিতাব আখবার আহলি'ল-বাসরা, (৩) নাসর ইব্ন মুযাহিম-এর ইতিহাস (X. S., iv, 6), (৪) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক-এর সীরা এবং একই বিষয়ে লিখিত আল-ওয়াকিদী, ইব্ন সা'দ, মুহাম্মাদ ও হিশাম আল-কালবী, আল-মাদা'ইনী, সায়ফ ইব্ন 'উমার, ইব্ন তায়ফুর প্রমুখ মনীষীর লিখিত পুস্তকাবলী। সাসানী ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার সময় তিনি ফারসী ভাষায় লিখিত 'Book of Kings'-এর আরবী অনূদিত গ্রন্থ ব্যবহার করেন। এই পুস্তকখানির আংশিকভাবে ইবনু'ল-মুকাফফা' কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

তাবারী সংগৃহীত উপাদান ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সম্পৃক্ত বিবরণীতে গড়িয়া তোলেন নাই, বরং তিনি লভ্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী বর্ণনা নথিবদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। এইজন্য তিনি তাঁহার সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপাদানের বিশ্বাসযোগ্যতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। ফলে আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে তাবারীর অবদানের মূল্য অসামান্য, বিশেষত যখন ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলীর পুনর্গঠনের প্রশ্নটি আসিয়া দাঁড়ায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann. G. A. L., i. 142 প.; (২) য়াকূত, ইরশাদু':ল-আরীব, সম্পা. Margoliouth, ৪খ, ৪২৩-৪৬২, G. M. ., ৪খ, ৬; (৩) সাম'আনী, কিতাবু'ল আনসাব, fol. 367a; i. 4-12 f., G. M. S., xx; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, অনু. de Slane, ii, Paris-London 1843, p. 597 f.; (৫) Fihrist, ed. Flugel, p. 234 প. ; (৬) I. Goldziher, Die Literaraische Tatigkeit des Tabari nach Ibn 'Asakir, W. Z. K. M., ix, 1895, p. 359-371; (৭) Annales quot scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari, ed. M. J. de Goeje (i, 1-6; ii, 1-3; iii, 1-4; Indices, Introductio, Glossarium, Addenda et Emmendanda), Leyden, 1879-1901; (৮) H. Zotenberg, Chronique de Abou-Djafar-Mohammed-ben Djarir-ben Yezid Tabari, Traduite sur la version persane d'Abou-'Ali Mohammed Bel'ami, 4 vols., Paris 1867-1874; (৯) Th. Noldeke, Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, Aus der arab. Chronik des Tabari uber-setzt und mit ausfuhrl, Erlauterungen und Erganzungen verschen, Leyden 1879; (১০) Arib, Tabari Continuatus, ed. M. J. de Goeje, Leyden 1897; (১১) C. Brockelmann, Das Verhaltnis von Ibn el-Atirs Kamil fit-ta'rih zu Tabaris Ahbar er-rusul wal muluk, Strasburg 1890; (১২) H. F. Amedroz, Konkordanz zwischen Tabari's Annalen und Ibn Mis Kawaih's Tagarib el-umam (Isl., ii, 105-114); (১৩) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী, জামি'উ'ল বায়ান ফী তাফসীরি'ল-কুরআন, কায়রো ১৩৩১ হি., ৩০ অংশ; (১৪) O. Loth, Tabari's Korancommenton, Z. D. M. G, xxxv., 1881, P. 588-628; (১৫) Noldeke-Schually, Geschichte des

Qorans, ii. Leipzig 1919, p. 139-142, 171-173, 184; (১৬) I. Goldiher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leyden 1920. P. 85-98, 101 প.।

R. Paret (E.I[1])/ রুহুল আমীন রোকন

তাবারিয়্যা (طبرية) ঃ টাইবেরিয়ান হ্রদের (গ্যালিলী সাগর) পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি শহর। হ্রদটির আরবী নাম বুহায়রাতু'ত-তাবারিয়্যা। উহার মধ্য দিয়া জর্দান নদী দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। মৎস্যসমৃদ্ধ এই হ্রদটি ১৩ মাইল দীর্ঘ, ৬ মাইল প্রশস্ত এবং ভূমধ্যসাগর পৃষ্ঠ হইতে ৭০০ ফুট নীচে অবস্থিত। শহরটি আকারে দীর্ঘ ও সরু। কারণ ইহার পশ্চিম দিক কয়েকটি খাড়া পাহাড় দ্বারা বন্ধ। এই পাহাড়শ্রেণী উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও পানির কিনারা পর্যন্ত প্রসারিত। শহরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হেরোদ (Herod) পর্বত। এই এলাকাতেই সম্ভবত Old Testament-এ উল্লিখিত সুপ্রাচীন আদি তাবারিয়্যার ক্ষুদ্র শহরটি ছিল (উষ্ণ প্রস্রবণের অবস্থিতির কারণে কেহ কেহ হাম্মাতকে সেই স্থান বলিয়া চিহ্নিত করেন, দ্র. Joshua, ১৯ খ, ৩৫); কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু প্রমাণিত হয় নাই। শহরটি প্রথম গুরুত্ব লাভ করে যখন Herod Autipas আনু. ২৬ খৃ. ইহার পত্তন করিয়া রোমান সম্রাট Tiberias-এর নামে উহার নামকরণ করেন Tiberius। গ্রীক (Hellenistic) রীতিতে অত্যন্ত জাঁকালভাবে মন্দির, থিয়েটার এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক ভবন সজ্জিত করিয়া শহরটি নির্মাণ করা হইয়াছিল। Josephus বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাজার সুদৃশ্য প্রাসাদ ছিল হেরোদ পর্বতের উপরে যাহার চতুর্দিকে ছিল প্রাচীন নগর দেওয়াল। G. Schumacher ঐ দেওয়ালের চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন।

গোঁড়াপন্থী য়াহূদীগণ শহরটিতে বাস করে নাই, সুতরাং অধিবাসিগণ ছিল বহু জাতের মিশ্রণ। কিছু লোককে Herod সেইখানে বসবাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; আর কিছু লোক গিয়াছিল বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনে। পরবর্তী সময়ে শহরটির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, যখন Tiberias একান্তভাবে য়াহূদীদের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ইহা য়াহূদী ধর্মীয় আইন (Talmud) পঠন-পাঠনেরও পীঠস্থান হইয়া উঠে। এইখানেই আনু. ২০০ খৃ. মিশনা (Mishna) নামক আইনের সংকলন সম্পাদিত হয় এবং আরও পরে খৃ. ৪র্থ শতকের শুরুতে প্যালেস্টীনীয় Gemara (তথাকথিত জেরুসালেম, তালমুদ) রচিত হয় এবং খৃ. ৮ম-৯ম শতকে টাইবেরীয় পদ্ধতির সাধারণ ব্যবহারের চিহ্নসমূহ (notation) প্রতিষ্ঠিত হয়। Jerome -এর হিব্রু শিক্ষক ছিলেন টাইবেরিয়াসের একজন য়াহূদী। এইখানে যেই সকল য়াহূদী পণ্ডিত কাজ করিয়াছিলেন অনেকগুলি তাঁহাদের স্মৃতি বহন করে, তন্মধ্যে ছিল R. Johanan b. Zakkai ও R. Akiba -এর বাবরদ্বয়। একটি নূতন সড়ক নির্মাণকালে শহরের পশ্চিম দরজার সন্নিকটে কয়েকটি শিলালিপিযুক্ত শবাধার সমেত অপর একটি প্রাচীন য়াহূদী সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রোমান সম্রাট Constantine the Great-এর পরে খৃষ্ট ধর্ম ধীরে ধীরে হইলেও গ্যালিলীতে প্রবেশ করিতে থাকে এবং যাজক-সভার (synod) তালিকাতে টাইবেরিয়াসের কয়েকজন বিশপের নাম পাওয়া যায়। সম্রাট হাড্রিয়ান (Hadrian) এই শহরে একটি মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করিয়াছিলেন। পরে উহাকে পূর্ণাঙ্গ মন্দিরে পরিণত করা হয়।

শহরটির ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীর সম্রাট জাস্টিনিয়ান পুনর্নির্মাণ করান। ৬১৪ খৃ. পারস্য বাহিনীর আক্রমণের সময়ে এইখানকার য়াহূদীগণ (অন্যান্য স্থানের যেমন) শত্রুদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ১৩/৬৩৫ সনে টাইবেরিয়ান মুসলিম অধিকারে চলিয়া যায়। উরদুন প্রদেশের কয়েকটি শহর শক্তিবলে দখল করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাবারিয়্যা আরব সেনাপতি শুরাহবীল-এর নিকটে আত্মসমর্পণ করে। শুরাহবীল (রা) সকল নাগরিকের জীবন এবং অর্ধেক সংখ্যক ঘরবাড়ি ও গির্জা রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। প্রতি জারীব ভূমির জন্য বার্ষিক এক জারীব গম বা যব এবং প্রতিটি গবাদি পশুর জন্য এক দীনার হারে কর নির্ধারিত হয়। খলীফা 'উছমান (রা)-এর শাসন আমলে টাইবেরিয়াসের অধিবাসীগণ সেই চুক্তি ভঙ্গ করে। কিন্তু 'আমর ইবনু'ল-'আস (র) (মতান্তরে শুরাহবীল) তাহাদিগকে পরাস্ত করেন এবং পুরাতন চুক্তির ভিত্তিতে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে। ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হইলে তাবারিয়ার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। জায়গীর হিসাবে ইহা Tancred-কে প্রদান করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ত্রিপোলীর Raymond ইহার অধিকার লাভ করেন। বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ১১৮৭ (৫৮৩ হি.) সুরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও শহরটি সুলতান সালাহুদ-দীন আয়্যূবী অবরোধ করিয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অধিকার করেন, অতঃপর উহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। খৃষ্টান বাহিনী সাফ্ফূরিয়্যাতে শিবিরে অবস্থান করিতেছিল; Raymond -এর জরুরী সতর্কতা সত্ত্বেও দাম্ভিক Grand Templar Gerard -এর প্ররোচনায় অবরুদ্ধ শহরটিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে শোচনীয়ভাবে হাত্তীন (দ্র.)-এর যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই পরাজয় পর্যায়ক্রমে জেরুসালেম দখলের সহায়ক হয় এবং ফ্রাংকগণের শক্তির পতন ঘটে। পরবর্তী কালে ১২৪০ খৃ. শহরটি পুনরায় খৃস্টানদের অধিকারভুক্ত হয়। Odo of Montbelliard ইহা দখল করেন, কিন্তু ১২৪৭ খৃ. পুনরায় খাওয়ারিয্‌মী শক্তির অধিকারে আসে এই শহর এবং সেই সময় হইতে ফিলিস্তীনে তুর্কী শাসনের সমাপ্তি পর্যন্ত ইহা বরাবর মুসলিম শাসনাধীনে থাকে। খৃ. ১৭শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শহরটি শায়খ জাহির'ল-'আম্‌র -এর অধীনে ছিল। তিনি ইহাকে সুরক্ষিত করেন। ১৭৫৯ খৃ. ভূমিকম্পে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ১৮৩৭ খৃ. ভূমিকম্প ছিল মারাত্মক। উহাতে শহরের অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু গোসলখানাগুলি রক্ষা পায়। ১৭৯৯ খৃ. স্বল্প সময়ের জন্য নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী শহরটি দখল করিয়াছিল।

আরব ভৌগোলিকগণের রচনায় উরদুন প্রদেশের রাজধানী তাবারিয়্যা সম্বন্ধে কম-বেশি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। য়া'কূবীর (২৭৮/৮৯১-২) বর্ণনায় শহরটির অবস্থান পর্বতের পাদদেশে এবং একটি বড় হ্রদের পারে, যাহার মধ্য দিয়া জর্দান নদী প্রবাহিত। ইসতাখরী (৩৪০/৯৫১) হ্রদটির দৈর্ঘ্য ১২ মা. এবং প্রস্থ ২-৩ মা. লিখিয়াছেন (প্রকৃত দৈর্ঘ্য ১৩ মা. ও প্রস্থ ৬ মা.)। মুকাদ্দাসী (৩৭৫/৯৮৫) লিখিয়াছেন, বাড়ি-ঘরগুলি পর্বত হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত, শহরটি আকারে সরু এবং গ্রীষ্মকালে গরম ও অস্বাস্থ্যকর। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মাইল কিন্তু প্রস্থ অতি সামান্য। বাজারটি এক দরজা হইতে আর এক দরজা পর্যন্ত প্রসারিত, কবরস্থানও একটি পাহাড়ের উপরে। বাজারের জামে' মসজিদটি বৃহৎ ও সুন্দর। হ্রদের চারিদিকে গ্রাম ও খেজুর গাছ এবং হ্রদে জাহাজ চলাচল করে। হ্রদে প্রচুর মাছ, পানি সুস্বাদ। ইরানী পর্যটক নাসির-ই খুসরাও ৪৩৮/১০৪৭ তাবারিয়্যা সফর করেন। তিনি হ্রদের দৈর্ঘ্য ৬ মা. ও ৩ মা. লিখিয়াছেন। শহরটি পাঁচিলবেষ্টিত, কিন্তু হ্রদের দিকে খোলা; পানির নীচের শিলাময় স্থানে অনেক বাড়িরই ভিত্তি প্রথিত। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত জামে' মসজিদ ব্যতীত পশ্চিমদিকে আরও একটি মসজিদ রহিয়াছে, নাম

মাসজিদু'ল-য়াসমীন (ইয়াসমীন?)। সেখানে অবস্থিত নূন-এর পুত্র জওয়ার (Joshua) কবর এবং ইসরাঈলীগণের হাতে নিহত ৭০ জন নবীর কবর। আবূ হুরায়রা (রা)-এর কবরও সেইখানে। অধিবাসিগণ নলখাগড়ার মাদুর তৈরি করে; শহরের পশ্চিমে পাহাড়ের উপরে প্রস্তর নির্মিত একটি প্রাসাদ রহিয়াছে। উহাতে হিব্রু উৎকীর্ণ লিপি রহিয়াছে। ইদ্‌রীসী ১১৭৪ খৃ. ক্রুসেডার (Crusader) -গণের শাসনকালীন তাবারিয়্যার বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, হ্রদের পড়ে উঁচু পাহাড়ের উপরে নির্মিত ইহা একটি আকর্ষণীয় শহর। হ্রদের পানি সুস্বাদু। উহা ১২ মাইল লম্বা এবং সমপরিমাণ প্রশস্ত (!)। নৌকাযোগে পণ্য সরবরাহ করা হয়। তিনি নলখাগড়ার মাদুরের গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কথাও লিখিয়াছেন। য়াকূত ৬২৩/১১২৫ সালে তাঁহার পূর্ববর্তী কয়েকজন পর্যটকের বর্ণনারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন; অন্যান্য আরব ভৌগোলিকের ন্যায় তিনিও লিখিয়াছেন যে, তাবারিয়্যা শহরটি নির্মাণ করিয়াছেন Tiberius। আবু'ল-ফিদা' (মৃ. ৭৩২/১৩৩১) লিখিয়াছেন যে, শহরটি ধ্বংস করিয়াছিলেন সালাহু'দ-দীন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তখনও পর্যন্ত ইহা ধ্বংসাবস্থায় ছিল এবং ইব্‌ন বাত্তূতার বর্ণনা হইতে (৭২৫/১৩২৫) জানা যায় যে, পরেও অবস্থা অনুরূপই ছিল।

যতদিন গোসলখানাগুলি (হাম্মামাত) বিদ্যমান ছিল ততদিন পর্যন্ত উহাদের গরম ঔষধি গুণসম্পন্ন পানি শহরবাসিগণের জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেইগুলির অবস্থান ছিল শহর হইতে ৪০ মিনিটের পথ দক্ষিণে এবং সম্ভবত এইগুলির আকর্ষণেই Herod এই স্থানটিকে তাঁহার রাজধানীর জন্য নির্বাচন করিয়াছিলেন। Josephus ঠিকই বলিয়াছেন যে, সেইগুলি ছিল Tiberias-এর নিকটেই একটি গ্রামে যাহার স্থানীয় নাম হাম্মাত। এই উক্তির সহিত মিল দেখা যায় অপর একটি ব্যাপারের তথা Schumacher যে প্রাচীন নগর দেওয়াল আবিষ্কার করিয়াছেন উহা হোবোথ পর্বত হইতে হ্রদের কিনারা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল; কিন্তু গোসলখানাগুলি বেষ্টন করে নাই (দ্র. Vita, পৃ. ৮৫; Bell, ২ খ., ১৬১৪)। এমন কি Pliny (দ্র. Nat. Hist., ৫খ, পৃ. ১৫)-এর সময়কালে এবং Talmud-এ প্রায়শ এই গোসলখানাগুলি উল্লিখিত হইয়াছে; আরব ভৌগোলিকগণ সকলেই লিখিয়াছেন যে, উহারা বিনা আগুনেই উষ্ণ ছিল। য়া'কূবী লিখিয়াছেন যে, শহরে গরম পানি আনা হত নল দ্বারা এবং ইস্‌তাখ্‌রী সেই সঙ্গে যোগ করিয়াছেন যে, উষ্ণ প্রস্রবণ শহর হইতে ২ পারাসাঙ দূরে থাকা (অবাস্তব কথা) সত্ত্বেও পানি গোসলখানায় প্রবেশের পরেও এত গরম থাকিত যে, উহাতে পশু চর্ম নিক্ষেপ করিলে লোম উঠিয়া যাইত; ফলে ঠাণ্ডা পানি না মিশাইয়া উহা ব্যবহার করা যাইত না। মুকাদ্দাসী একটি ফুটন্ত টগবগে প্রস্রবণের কথা লিখিয়াছেন, যথা হইতে প্রায় সবগুলি গোসলখানাতে একযোগে পানি সরবরাহ করা হইত এবং উহার বাষ্পে ভবনগুলি গরম হইত। নাসির-ই খুসরাও বলেন, শহরের মাঝখানে অবস্থিত একটি মসজিদের দরজার উপরে নির্মিত গোসলখানাটি নাকি হযরত সুলায়মান (আ) নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইদ্‌রীসী দামাকির নামক একটি বড় গোসলখানার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। উহার লোনা পানির তাপে ছাগল ও হাঁস-মুরগী এবং ডিম সিদ্ধ করা হইত; আল-লু'লু' নামক একটি গোসলখানার গরম পানি লোনা ছিল না; কিন্তু যাহাকে ছোট 'গোসল-খানা" বলা হইত একমাত্র উহার পানি আগুন জালাইয়া সিদ্ধ করা হইত; জনৈক মুসলিম শাসক শেষোক্তটির উপরে নিজ পরিবারের জন্য একটি গোসলখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে উহা তিনি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেন। এই স্থানের দক্ষিণ দিকেও অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল। কথিত হয়, সকল এলাকা হইতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, যখমপ্রাপ্ত এবং বক্ষ পীড়ায় আক্রান্ত লোকগণ এই সকল প্রস্রবণে আসিয়া তিন দিন পানিতে থাকিলে আল্লাহ্‌র রহমতে আরোগ্য লাভ করিত। এই সকল বিবরণের যথার্থতা ও স্পষ্টতার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, বিশেষত শহর হইতে প্রস্রবণ ও গোসলখানাগুলির অত্যধিক দূরত্ব বর্ণনার কারণে। ১৭০৩ খৃ. কিছু সময়ের জন্য প্রস্রবণগুলি শুকাইয়া গিয়াছিল (দ্র. Reland, Palastina, পৃ. ৭০৩)। পুরাতন গোসল সংস্থাপনা (establishment)-টি বিনষ্ট হইয়া গেলে খৃ. ১৯শ শতকের শুরুতে নূতন একটি স্থাপিত হয়। Burkhardt ইহার বিবরণ দিয়াছেন। কাজটি ছিল খুবই সহজসাধ্য এবং ইব্‌রাহীম পাশা ১৮৩৩ খৃ. অধিকতর সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় আরও একটি গোসলখানা নির্মাণ করেন। ১৮৯০ খৃ. তৃতীয় পর্যায়ে আরও কিছুটা দক্ষিণে আরও একটি নির্মাণ করা হয়। Robinson লিখিয়াছেন যে, চারিটি ঝর্ণা বা প্রস্রবণ হইতে সেইখানে পানির সরবরাহ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একটি ছিল পুরাতন গোসল সংস্থার আওতাধীন। তাঁহার পরিমাণ অনুযায়ী পানির উষ্ণতা ছিল ৬০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। Frei পানির রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রদান করিয়াছেন।

নূতন রাজনৈতিক অবস্থায় নিঃসন্দেহে Tiberias-এ সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে, প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Robinson Palestine, ৩খ, পৃ. ৩৯৯ প.; (৩) Guerin, Galilee, ১খ, পৃ. ২৫০ প.; (৩) G. Schumacher, Palestine Exploration Fund Quarterly Stab., 1887, পৃ. ৮৫ প. (৪) Schurer, Gesch. djud, Volke[4], ৩খ, পৃ. ২১৬ প.; (৫) P. Thomsen, Loca saneta, ৩খ; (৬) ইবনু'ল-আছীর, ed. Tornberg, ২খ., পৃ. ৩৫১ প.; (৭) Rohricht, Geshichte des Konigreichs Jerusalem, 1898, পৃ. ৪৩১ প.; (৮) ইসতাখরী, B. G. A., ১খ., পৃ. ৫৮; (৯) মুকাদ্দাসী, পূ. গ্র., ৩খ., পৃ. ১৫৪, ১৬১, ১৮৫; (১০) নাসির-ই খুসরাও, অনু. G. Le Strange, in Palestine Pilgrim Texts 1888, পৃ. ১৬; (১১) ইদ্‌রীসী Z. D. P. V., ৮খ., পৃ. ১২৮ (মূল পাঠ, পৃ. ১০); (১২) য়াকূত, মু'জাম, Ed. Wustenfeld, ৩খ, পৃ. ৫০৯-১৩; (১৩) Geographie d'Aboulfeda, tr. Reinaud and de Slane, ii/ii, পৃ. ২১; (১৪) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ৩৩৪-৪১। ঔষধ গুণসম্পন্ন গোসলখানা বিষয়ে দ্র. (১৫) Dechent, Z. D. P. V., ৭খ, পৃ. ১৭২ প.; (১৬) Frei, পূ. গ্র., ৯খ, পৃ. ৮২ প. (মানচিত্রসমেত)।

F.R. Buhl (E.I[1])/ হুমায়ুন খান

তাবালা (تبالة) ঃ মক্কা শরীফের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় সাত দিনের পথ দূরে 'আসীরের অভ্যন্তরভাগে উত্তর য়ামানের পশ্চিম দিকে একটি স্থান। আরবদের মধ্যে ইহার উর্বরতা ছিল প্রবাদতুল্য। তাবালা ও তুরাবার উপত্যকা প্রায়শ আখদার ('সবুজ'; তু. আল-হামদানী, জাযীরা, সম্পা. D. H. Muller, Leiden 1884, পৃ. ১৬৫; য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ১৬৪) নামে অভিহিত হয়। Burckhardt, Travels in Arabia (লণ্ডন ১৮২৯ খৃ., ১খ, ৪৪৫)-তে হজ্জযাত্রী কাফেলাসমূহের ভ্রমণ পথ প্রদর্শিত হইয়াছে যাহা মক্কা হইতে হিজায ও য়ামানের সীমান্ত এলাকা অতিক্রম করিয়া সান'আ' পৌঁছিয়াছে। Berghaus প্রণীত Arabien und das Nilland--এর ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থে এই পথের মানচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে (Gotha 1835, তু. বিশেষভাবে পৃ. ৬৯ এবং আরও দ্র. Ritter's map [1852, সম্পা. H.

Kiepert])। তাবালা ছিল শুমরান গোত্র অধ্যুষিত এলাকায় ষোড়শতম বিরতিস্থল। আল-ইদ্‌রীসী ইহাকে একটি সুন্দর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যাহা ছিল মক্কা শারীফের অধীন (দেখুন Jaubert, Geographie d'Edrisi, Paris 1836, ১খ, ১৪৮)। ইহাতে স্থায়ী পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল এবং শস্যক্ষেত্র ও খেজুর বৃক্ষের আধিক্য ছিল [দ্র. ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ, B.G.A., ৬খ, ১৩৫, ১৮৮, ১৯২; দ্র. সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে আল-হামদানী, পৃ. ২৫৮; খেজুর বৃক্ষ ও ইহার সম্পদ সম্পর্ক, আল-হামদানী, পৃ. ২৫৮; আল-আয্‌রাকী (সম্পা. Wustenfeld), পৃ. ২৬২; ইহার উর্বরতা সম্পর্কে বাকরী, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ১৯১ প. এবং পরবর্তী কালে বেদুঈনগণ কর্তৃক সাধিত ইহার ক্ষতি সম্পর্কে হামদানী, পৃ. ২৫৮]। আল-ইদরীসী আরও বলেন যে (পৃ. গ্র.), খলীফা ইব্‌ন মারওয়ানের সেনাবাহিনী তাবালা অধিকার করে। কিন্তু ইহাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ইহার জন্য নিযুক্তিপ্রাপ্ত শাসনকর্তা আল-হাজ্জাজ পদটি গ্রহণ করার জন্য যাওয়া প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই, যে ঘটনা হইতে রচিত হইয়াছে প্রবাদবাক্য "আল-হাজ্জাজের পক্ষে তাবালা অপেক্ষা অধিকতর জঘন্য" (এই বিষয়ের উপরে আরও তথ্যের জন্য য়াকূত, পৃ. গ্র., ১খ, ৮১৬; Freytag, Proverbia, ২খ, ৯৮১; তাহা ছাড়া লিসান, ১৩খ, ৮০প.; তাজ, ৭খ, ২৩৯ প.)। আল-ইদরীসীর মতে তাবালা মক্কা হইতে ৪ দিনের এবং 'উকাযের বাজার হইতে ৩ দিনের যাত্রাপথ দূরে। তাবালা তাঁহার দ্বারা উল্লিখিত মক্কা হইতে সান'আ'গামী পথে (দ্র. Jaubert, পৃ. গ্র., পৃ. ১৪৩, সংখ্যা ৬; তাহা ব্যতিরেকে Ritter, Erdkunde, ১২খ, পৃ. ১৬৮ প., ১৯৭) মক্কা হইতে ৬ষ্ঠ বিরতিস্থল এবং ইহাকে একটি উপত্যকায় একটি খাদে অবস্থিত শহর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাইফ ও য়ামানের পাহাড়গুলির পাদদেশ হইতে শুরু হওয়া এই নিম্ন ভূখণ্ডে পানির প্রচুর সরবরাহ রহিয়াছে এবং তুরাবা ও বীশা শহরদ্বয়ও ইহাতে অবস্থিত (য়াকতান; তু. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammed, ৩খ, ২৯৭)। তাবারা ও সা'দার মধ্যে অবস্থিত উল্লিখিত নয়টি বিরতিস্থলের মধ্যে তাবালার পরবর্তী বিরতিস্থলটি বীশা (য়াকতান) বলিয়া কথিত। Sprenger তাঁহার পূর্ববর্তী বানানের সহিত বৈপরীত্য প্রদর্শন করিয়া বীশা বাত'আন (হামদানী, পৃ. গ্র., পৃ. ১১৮, ১২৭ এবং মক্কা হইতে সান'আ' ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পৃ. ১৭৮ এবং ১৬৫; ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ, পৃ. গ্র., পৃ. ১৩৪) নামের প্রস্তাব করেন (Z. D. M. G., 1888, xlii, 321)। একই লেখকের মতে তাবালা (১৪তম) বিরতিস্থল মাহজারার ৮ বিরতিস্থল উত্তরে অবস্থিত। মাহজারাতেই সেই বৃক্ষটি (তালহাতু'ল-ম্যালিক) দণ্ডায়মান যাহা মক্কা ও য়ামানের মধ্যস্থ সীমানা নির্দেশ করিতেছে বলিয়া বিবেচনা করা হয় (খুর্‌রাদাযবিহ, পৃ. গ্র., ৬খ, ১৩৫)। আধুনিক লেখকগণ মক্কা হইতে তা'ইফ ও তুরাবা হইয়া রানিয়া (আল-ইদরীসীতে শেষোক্তটির পরিবর্তে আর-রুওয়াছা, Burckhardt-এ রেহেয়তা, অন্যান্য লেখকের রচনায় রোহে (ই) তা) এবং তাবালা অভিমুখী অন্য একটি রাস্তাকে প্রধান রাস্তা হিসাবে উল্লেখ করেন (তু. Burckhardt, পৃ. গ্র., পৃ. ৪৫১; Ritter, পৃ. গ্র., পৃ. ২০০)। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ-পশ্চিম আরব উপকূলের বড় মানচিত্র শীট নং ৭, ওয়াদী বীশা (১৯১৭ খৃ. কৃত জরিপকার্য হইতে, Geographical Section General Staff-এর জন্য সংকলিত) হইতে পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতে পারে। ইহাতে স্থানটি (তেবাল্লা) ১৯°৩৫,৫ উত্তর অক্ষাংশ, ৪২°৩১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, গ্রীনউইচ-এ দেখান হইয়াছে। ইহা একই নামের ওয়াদীতে অবস্থিত। উক্ত ওয়াদীটি আস-সিলমে ও হিল্‌বা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের রাস্তার সহিত তা'ইফ হইতে বি'রু'ল-গাযাল হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকগামী প্রধান রাস্তার উপর অবস্থিত বানবু'ল-কাবনদের এলাকার উত্তর সীমানা গঠন করে। আস-সিলমে ও হিলবার দক্ষিণ-পূর্বদিকের রাস্তাটিও তা'ইফ হইতে দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। সুতরাং Die alte Geographie Arabiens, (Bern 1875, P. 47)-এ আল-হামদানীতে ওয়াদী বাইশ ও বীশার কয়েকবার উল্লেখের তুলনামূলক বিচার হইতে সিদ্ধান্তকৃত Sprenger-এর দাবি যে, আল-হামদানী ভাবিয়াছিলেন যে, ওয়াদী বীশা ও যাহা প্রায়ই বাইশের সহিত তালগোল পাকায়, তারজ ও তাবালায় পানি সরবরাহ করে বা অতি আধুনিক লেখকদের অনুমান যে, তাবালা ওয়াদী বীশাতে অবস্থিত, গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ওয়াদী তাবালা (আল-হামদানী, পৃ. ১৭৩-এ তারাফা হইতে একটি উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত [দীওয়ানে নহে; দ্র. হামদানী D. H. Muller-এর সংস্করণ, ২খ, ১৮৩] ওয়াদী বীশাতে পতিত হয়। আল-হামদানী, বীশা ও তারজ সম্পর্কিত ভূ-সংস্থানমূলক বিবরণে প্রায়শ তাবালা সম্পর্কে উল্লেখ করেন (পৃ. ২৭, ৪৯, ৮৪, ১২৭ তাবালয় সিংহের বাসস্থানের কথা কবিতায় উল্লেখ সম্পর্কিত, তু. Sprenger, পৃ. গ্র., পৃ. ১৬৫, ২৫৭ এবং য়াকূত, পৃ., গ্র., ১খ, ৮৩৫, ৭৯১; ৪খ, ১০০৬; ইব্‌ন হাওকাল, B. G. A., ২খ, ৩৫; বাক্‌রী)। হামদানী যে নির্দিষ্ট দূরত্বের বর্ণনায় (পৃ. ১৮৭, ১৮৯) তাবালার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কবিতার উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত (পৃ. ১৭৩, ২০৭, ২১৫, ২৫৮)। 'আর্‌রাম ইবনু'ল-আসবাগ আস-সুলামী (য়াকূত, মু'জাম, ২খ, ৯১৮) যাবিয়্যা (যাহা অন্য লেখকদের মতে রনিয়্যা)-কে তাবালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (তু. Sprenger, পৃ. গ্র., পৃ. ২৪০ এবং (পৃ. ২৩৯ আল-হামদানীর তথ্য হইতে প্রস্তুত তাঁহার এই অঞ্চলের মানচিত্র)। আল-হামদানী (পৃ. ১৬৫) তাবালাকে রানিয়াসহ উল্লেখ করেন (D. H. Muller-এর সংস্করণে রুনিয়া উচ্চারণ সঠিক নহে; পাণ্ডুলিপিসমূহে স্বরচিহ্ন প্রদান করা হয় নাই; য়াকূত, পৃ. গ্র., ২খ, ৮২৬; আল-মুকাদ্‌দাসী, B. G. A., ৩খ., ১১২ এবং আল-হামদানী, পৃ. গ্র., পৃ. ২১৫ এবং ২৫৯-এর ন্যায় বাক্‌রী রানিয়ারূপে উল্লেখ করেন; দেখুন D. H. Muller, ২খ, ৩২; Sprenger, পৃ. গ্র., পৃ. ২৪০ এবং Z. D. M. G, পৃ. স্থা, ও আধুনিক ভৌগোলিকগণ)।

Sprenger-এর ধারণা (পৃ. গ্র., পৃ. ১৫৬, ২৫৩), টলেমি (৬খ, ৭, ৩৩)-এ উল্লিখিত থুমতা, থুমালা-এর বিকৃত নাম এবং প্লিনীর Nat. Hist., ৬খ, ১৫৪-তে উল্লিখিত T(h)omala-এর সহিত অভিন্ন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার দাবি যে, 'তোমালা; শুধু তোবালার বাচনগত একটি ভিন্নরূপ। অশিক্ষিত লোকেরা ইহাকে বলে তোবালা এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা 'তাবালা', এই মন্তব্য যথার্থ মনে হয় না। হাদরামাওত হইতে হজ্জযাত্রার প্রাচীন পথগুলি সম্পর্কে আল-হামদানীর বর্ণনা [যাহাতে তাঁহার প্রস্তুত করা নকশা অনুসারে (পৃ. গ্র., পৃ. ১৫৬, ১৬১) পথগুলি তাবালাতে মিলিত হইয়াছে] Sprenger- কৃত ব্যাখ্যা ও M. Hartmann (Die arabische Frage, Liepzig 1909, পৃ. ৪২০) কর্তৃক প্রয়োগকৃত শনাক্তকরণ দ্বারা সমর্থিত নহে। প্লিনী Thobala-কে সাবাঈদের একটি শহর হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন (আরও দেখুন, Pauly Wessowa, দ্র. Saba, Col. 1328)। তাবালা মূলত Minaean অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, Sprenger-এর এই অনুমানও (পৃ. ২৫৩) ভ্রমাত্মক। তাঁহার দ্বারা নির্দেশিত Minaean-দের অবস্থানস্থল সম্পূর্ণরূপে প্রমাদপূর্ণ (দ্র. Realencycl, col, 1316 প.)।

তাবালা নামের একজন 'আমালিকা মহিলার নাম হইতে শহরটির নামের ঐতিহ্যগত উৎপত্তি সংক্রান্ত মতটি (হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, পৃ. ৫২০-তে তেলালেত) মূল্যহীন; তবে ইহা সত্য যে, শহরটি অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (য়াকূত, পূ. গ্র., ১খ, ৮১৬)। জাহিলী যুগে যুল-খালাসা (খুলাস) নামে একটি সাদা পাথরকে দেবতারূপে পূজা করা হইত। হযরত মুহাম্মাদ (স) ইহাকে ধ্বংস করেন (ইব্ন হিশাম, সীরা, ১খ., ৫৫প.; খাছ'আমগণ, যাহারা সেখানে এই ধর্মমতের অনুসারী ছিল বলিয়া উল্লিখিত, যাহা হামাদানী একাই উল্লেখ করিয়াছেন, পৃ. ১১৯ এবং দ্র. য়াকূত, পূ. গ্র., ২খ, ৪৬১ প. ৩খ, ৬০৮, ৮৫০, তাবালা সম্পর্কে)। যেই শ্লোকগুলিতে তাবালার এই দেবতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তীর ছুড়িয়া ভাগ্য নিরূপণ করার প্রথার উল্লেখসহ সেইগুলি ইমরু'ল-কায়সের প্রতি আরোপিতকরণ ইব্ন হিশাম-এর মতে ঠিক নহে (তু, লিসান, ৮খ., ২৯৫; তাজ, ৪খ, ৩৮৯-তে মূর্তি সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য পৌত্তলিকতার এলাকা হিসাবে তাবালার বিবরণ, তু. Wellhausen, Reste arabischen Heidentums[2], পৃ. ৪৫ প.)। ইব্ন রুসতা (B. G. A., ৭খ, ৩১৬, ৩২০) খাছ'আমগণকে মোটামুটিভাবে তাবালার অধিবাসী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে তুরাবা, বীশা ও তাবালার পশ্চাদ্বর্তী এলাকার অধিবাসী, অপরপক্ষে তাবালা সদরের অধিবাসিগণ বানূ মাযিন গোত্রভুক্ত (Wustenfeld, Die Wohnesitze und Wanderunegen der arabischen Stamme, xiv, of the Abhands, D. Kon, Gesellsch d. Wissensch, Gottingen 1868, পৃ. ৮৪. ৫৮, বাক্‌রী অনুসরণে)। কুদামার বর্ণনা অনুসারে তাবালার চতুষ্পার্শ্বে কায়সীদের তাঁবু খাটাইয়া বসবাস করার স্থান ছিল (ইব্ন খুররাদাযবিহ, পূ. গ্র., পৃ. ১৮৮)। ইব্ন খালদূন-এর বর্ণনানুসারে (সম্পা. Kay য়ামান, পৃ. ১২৯ প.) তাবালা বানূ নাহ্‌দদের এলাকা। যু'ল-খালাসা (আরও দ্র. বাক্‌রী, পৃ. ৩১৬, ইবনু'ল-কালবী, কিতাবু'ল-আসনাম, কায়রো ১৩৩২/১৯১৪ [যাহা য়াকূত-এর উৎস গ্রন্থ], তু. Wellhausen, পূ. গ্র., পৃ. ১০ প. এবং য়াকূত, পূ. গ্র., ২খ., ৪৬১ প., D. Nielsen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde, Copenhagen- Paris-Leipzig 1927, পৃ. ২৩১, ২৩৪)-কে অনেকে আরব ভেনাস দেবীরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। একটি ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে তাবালায় একটি বাজারও ছিল, হামদানী ঐ স্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ২৫৮)। ইসলামের ইতিহাসে তাবালা ঐ শহরগুলির অন্যতম যেইগুলি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করে (Golius, Alfraganus, Elements Astronomica, Amsterdam 1669, kp. 85)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত Burckhardt, Sprenger, Wellhausen, Ritter এবং আরব ভৌগোলিক ও অভিধান প্রণেতাদের (আল-হামদানী, য়াকূত, বাক্‌রী, আল-ইদরীসী) গ্রন্থাবলী; ইহা ছাড়াও (১) J. V. Hammer-Purgstall, Jahrbucher der Litteratur, Vienna 1840, vol, 92, p. 55 (জিহাননুমাতে সান'আ' হইতে মক্কার ভ্রমণ পথ সম্পর্কে) এবং vol. 94, p. 94; (২) Sprenger. Die Post und Reiscrouten des Orients, Abhandb f. d. Kunde des Morgenl, Leipzig 1864. III/iii 125. প., ১৩৮ প. (আল-হামদানীর ভ্রমণকাহিনী সম্পর্কে), ১২৮ প. (কুদামা, ইব্ন খুররাদাযবিহ ও ইব্ন মুজাবির-এর ভ্রমণ কাহিনী সম্পর্কে)।

J. Tkatsch (E.I.[1])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

তাবাশীর (طباشير) ঃ প্রাচ্যে উচ্চ সমাদৃত ঔষধ তৈয়ারীর একটি উপাদান, ইহার পরিবৃদ্ধি নুড়িসদৃশ, যাহা বন্য Bambusa arudinaria-র পর্বতসমূহে উৎপন্ন হয়। কাযবীনী (২খ, পৃ. ৮২) অথবা মুহালহিল-এর মতে গাছটির নলখাগড়া ভস্মীভূত করিয়া বস্তুটি পাওয়া যায় এবং সুপ্রাচীনকাল হইতে ইহা সর্বদাই একটি মূল্যবান বাণিজ্য সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত, যাহা গ্রীকদের নিকট পরিচিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. O. von Lippmann, Geschichte des Zuckes, লাইপযিগ ১৮৯০ খৃ., পৃ.৭৬-৮০; (২) B. Laufer, Sino-Iranica, শিকাগো ১৯১৯ খৃ., পৃ. ৩৫০-৩৫২; (৩) E. Wiedeminn, Beitr., ৪০খ, পৃ. ১৮৭; (৪) ইবনু'ল-বায়তার, অনু. Leclerc, N. E., ১খ, পৃ. ৩৯৯-৪০১; (৫) Seligmann, আবূ মানসূর মুওয়াফ্‌ফাক, পৃ. ১৭০ এবং এই সমস্ত রচনাতে উদ্ধৃত মূল সূত্রাদি।

J. Ruska (E.I.[1])/মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তাবাস (طبس) ঃ পারস্যের একটি শহর, খুরাসান প্রদেশে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা দুইটি শহরকে বুঝায় বলিয়া আরব ভৌগোলিকগণ ইহার নামের দুইটি ব্যবহার করিয়াছেন ঃ তাবাসানি। প্রথমটি তাবাসুল-'উন্‌নাব নামে পরিচিত, "কুল গাছের তাবাস" (ফারসী ভাষায় তাবাস-মাসমীমান) এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে তাবাসু'ত-তাম্‌র, "খেজুর গাছের তাবাস" (আস-সুফলা, মুকাদ্দাসী), ফারসী ভাষায় তাবাস-গিলাকী (কুরী, কুরীন)। প্রথমটির দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু কোন দুর্গ নাই। দ্বিতীয়টি একটি দুর্গ-শাসিত; এইখানে একটি ছোট বাজার ও একটি সুন্দর মসজিদ রহিয়াছে; মুক্ত খালসমূহের (জাহিরা) জলপ্রবাহপুষ্ট জলাধারসমূহ হইতে স্থানটিতে খাবার পানি সরবরাহ হইয়া থাকে। এই শহর দুইটি কূহিসতান জিলার সদর কাইত-এর অন্তর্গত; উহাদিগের দ্বারা খুরাসানে দক্ষিণ সীমান্ত রচিত হইয়াছে। খলীফা 'উছমান (রা)-এর শাসনামলে শহর দুইটি ছিল এই প্রদেশে প্রথম মুসলিম বিজয়, কারণ উক্ত স্থানদ্বয় এই দেশটিতে প্রবেশের ফটকরূপে গণ্য হইত। উহারা 'আবদুল্লাহ ইব্ন বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাকা কর্তৃক অধিকৃত হয়। হাসান সাব্বাহ কর্তৃক আলামূত দখলের পর উহারা ইসমাঈলীগণের কেন্দ্রস্থলের রূপ পরিগ্রহ করে। সালজূক বিজয়সমূহে চাগরীর পুত্র কাওয়ারূদ উহাদিগের শাসন কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ১০০৬/১৫৯৭ সনের পূর্বে শাহ ১ম 'আব্বাস-এর রাজত্বকালে উযবেকগণ কর্তৃক শহর দুইটির ধ্বংস সাধিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, ৩খ, ৫১৩; (২) Barbier de Meynard, Dict. de la Perse, পৃ. ৩৮৮; (৩) ইসতাখ্‌রী, B. G. A, ১খ, ২২৯, ২৭৩, ২৮৬; (৪) ইব্ন হাওকাল, B. G. A., ২খ, ২৭৩, ২৮৬, ২৯১, ৩২৪, ৩২৫; (৫) মুকাদ্দাসী, ৩খ, ২৪, ৩২১; (৬) আবুল-ফিদা', Geographie, সম্পা. Reinaud ও de Slane, পৃ. 888-889; (৭) Mehren, Cosmographie, পৃ. ৩১৩; (৮) সাম'আনী, আনসাব, G.M.S.,f° 367v0; (৯) হামদুল্লাহ মুস্তাওফী, নুযহাতু'ল-কুলূব, সম্পা. Le Strange, G. M. S. পৃ. ১৪৫; অনু. পৃ. ১৪১, ১৪৩; (১০) P.M. Sykes, Journal R. Geogr, Soc, ১৯০৫ খৃ., ২৬খ, এবং History of Persia, ২খ, ১০৯; (১১) E.G. Browne, Literary Hist. of Persia, ২খ, ১৭২; (১২) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, পৃ. ৩৫৯-৩৬১, ৩৬২-৩৬৩।

CL. Huart (E.I.[2])/মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তাবি'উন (تابع) ঃ আ., ব. ব. তাবি'উন (تابعون)। তাবি'ঈ শব্দের অর্থ অনুসারী, কোনও নেতার অনুসারী বা ভৃত্য, কোনও উস্তাদের শাগরিদ, কোনও 'আকীদায় বিশ্বাস স্থাপনকারী باب مفاعله হইতে গঠিত সমাপিকা ক্রিয়া تابع (সে কাহারও) অনুসরণ করিয়াছে। যেমন تابع جالينوس সে (চিকিৎসাশাস্ত্রে) জালীনূসকে অনুসরণ করিয়াছে।

তাবি' শব্দটি হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রে বিশেষ গুরুত্বহ একটি পরিভাষা। কারণ হাদীছ শাস্ত্রে তাবি' বলা হয় এইরূপ মুসলিমকে যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোনও সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। যেই সকল মু'মিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর দর্শন লাভে সৌভাগ্যবান হইয়াছেন, তাঁহারা সাহাবা। পক্ষান্তরে যেই সকল মু'মিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমসাময়িক হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে পারেন নাই, তবে কোনও সাহাবীর দর্শন লাভে সৌভাগ্যবান ছিলেন, তাঁহারা তাবি'উন নামে পরিচিত (দ্র. নিবন্ধের শেষদিকে সন্নিবেশিত প্রথম টীকা)।

তাবি'ঈগণের পরবর্তী পর্যায়ের মু'মিনদিগকে, যাঁহারা কোনও তাবি'ঈ-এর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাবি'উত-তাবি'ঈন (تابعون تابعين) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এইরূপে নিম্নতর বংশধারার মু'মিনগণ উচ্চতর বংশধারার তাবি'ঈন বলিয়া অভিহিত। হাদীছের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রায়ই এই বিষয়ের ভিত্তিতেও নির্ধারিত হইয়া থাকে যে, উহা কি অধিকতর পূর্ববর্তী পর্যায়ের তাবি'ঈর মাধ্যমে অথবা অল্পতর পূর্ববর্তী পর্যায়ের তাবি'ঈর মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে এবং উহার গুরুত্ব ও মর্যাদা কখনও কখনও এই বিষয়ের ভিত্তিতেও নির্ধারিত হইয়া থাকে যে, সংশ্লিষ্ট হাদীছের বর্ণনাকারী তাবি'ঈ, যিনি হাদীছের প্রথম বর্ণনাকারী হইয়া থাকেন, কি অধিকতর বিশ্বস্ত ও বিখ্যাত অথবা অল্পতর বিশ্বস্ত ও বিখ্যাত ব্যক্তি? এই কারণেই এইরূপ হাদীছকেই মাশ্হূর তথা বিখ্যাত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে, যাহা প্রথম পর্যায়ের কোনও তাবি'ঈ কর্তৃক বর্ণিত হইয়া দ্বিতীয় পর্যায়ের একাধিক তাবি'ঈ ও তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে (হাদীছ নিবন্ধ দ্র.; এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় টীকাও দ্র.)। এইরূপে কুরআন মাজীদের কিরাআত ও তাসাওউফ সম্পর্কিত হাদীছসমূহের বর্ণনাকারীদের মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায় রহিয়াছে। প্রথম পর্যায়ের তাবি'ঈগণের মধ্য হইতে অন্যতম বিখ্যাত তাবি'ঈ ছিলেন হযরত হাসান আল-বাস্রী (র) [তৃতীয় টীকা দ্র.]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম আল-বুখারী, মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিছ কর্তৃক সংকলিত হাদীছ গ্রন্থাবলী; (২) B. Carra De Vaux, Les Penseurs de l'Islam, প্যারিস ১৯২৩ খৃ., ৩খ, পৃ. ১৭৬ প., ২৮২ প.; (৩) আল-হুজ্বীরী, কাশ্ফু'ল-মাহ্জূব, অনু. আর. এ. নিকল্সন, লাইডেন-লণ্ডন ১৯১১ খৃ.; (৪) দা. মা. ই., ৬খ, পৃ. ২-৩।

B. Carra de Vaux (দা.মা. ই.)/মু. মাজহারুল হক

দা. মা. ই. আ. (৪খ., ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৪৩৬-৪৩৭) হইতে গৃহীত টীকাসমূহ।

প্রথম টীকা ঃ তাবি'ঈগণ সাহাবীগণের পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে শামিল রহিয়াছেন। তাবি'ঈগণের মধ্য হইতে একক এক ব্যক্তিকে তাবি' অথবা তাবি'ঈ বলা হইয়া থাকে। তাবি'ঈগণ আবার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ঃ কেহ কেহ ছিলেন সেইরূপ তাবি'ঈ, যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহাকে দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার কোনও সাহাবীকে দেখিয়াছেন। কেহ কেহ ছিলেন এইরূপ তাবি'ঈ, যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের পরবর্তী যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার কোনও সাহাবীকে দেখিয়াছেন। আবার এইরূপ কিছু সংখ্যক তাবি'ঈও রহিয়াছেন, যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করিলেও বয়সের স্বল্পতার কারণে তাঁহার নিকট হইতে শ্রুত হাদীছকে স্মরণ রাখিবার যোগ্যতা রাখিতেন না। এইরূপ তাবি'ঈগণ যেই সকল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, উহাদের সমুদয়ই সাহাবীগণের নিকট হইতে গৃহীত।

দ্বিতীয় টীকা ঃ নিবন্ধকারের উক্ত মন্তব্যের অর্থও স্পষ্ট নহে এবং উহা হাদীছ শাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এতদ্সম্পর্কিত নিয়ম-কানূনের সহিত সংগতিপূর্ণও নহে। তাবি'ঈ যেই হাদীছকে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করেন অর্থাৎ যাঁহাকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তিনি উহাকে যেই সাহাবী হইতে শুনিয়াছেন, তাঁহার নাম উহ্য রাখেন, সেই হাদীছকে "আল-হাদীছু'ল-মুরসাল" নামে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। উক্তরূপ হাদীছ শারী'আতী কোনও বিধান প্রমাণে দলীল হইতে পারে কি না, সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। একদল বিশেষজ্ঞ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, উক্তরূপ কোন হাদীছ যদি প্রথম পর্যায়ের এইরূপ কোনও তাবি'ঈ কর্তৃক বর্ণিত হইয়া থাকে, যিনি বিপুল সংখ্যক সাহাবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন এবং যদি উহা অন্য কোনও তাবি'ঈ কর্তৃকও বর্ণিত হইয়া থাকে, যাহাতে উহার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়, তবে উহা দলীলরূপে গৃহীত হইবে। উক্ত অভিমত পোষণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ (র)-ও শামিল রহিয়াছেন। তিনি উক্ত বিষয়টিকে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থলে উহার সবিস্তার বর্ণনার অবকাশ নাই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইমাম শাফি'ঈ (র) রচিত কিতাবু'র-রিসালা, যাহা এই টীকাসমূহের সংকলক আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির-এর সম্পাদনায় সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, এর ১২৬৩-১৩০৮ বাক্য দ্র.। পক্ষান্তরে কোনও কোনও হাদীছ শাস্ত্রবিদ এই বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈ (র)-র অভিমত হইতে ভিন্নতর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের রায় এই যে, মুর্সাল হাদীছ কোনও অবস্থাতেই দলীল হইতে পারে না। বক্ষ্যমাণ টীকাসমূহের সংকলক আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির কিতাবু'র-রিসালার ৪৬৫ পৃষ্ঠার টীকায় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দেখুন ঃ ইবনু'স-সালাহ্ রচিত কিতাবু 'উলূমি'ল-হাদীছ (আল-হাফিজ আল-'ইরাকী রচিত ব্যাখ্যাসহ), পৃ. ৫৫-৬২; ইব্ন কাছীর কর্তৃক প্রণীত ইখ্তিসারু 'উলূমি'ল-হাদীছ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির কর্তৃক রচিত গ্রন্থের পৃ. ৩৭-৪১; ইব্ন হায্ম রচিত আল-ইহ্কাম লি-উসূলিল আহ্কাম, ২খ, পৃ. ২-৬ এবং হাদীছ বিষয়ক মূলনীতিশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ।

তৃতীয় টীকা ঃ ইমাম হাসান আল-বাস্রী বিখ্যাত তাবি'ঈ এবং কিরাআতশাস্ত্রের অন্যতম ইমাম ছিলেন। এইরূপে তিনি হাদীছ, ফিক্হ ও তাসাওউফেরও ইমাম ছিলেন। তিনি ২১/৬৪৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১০/৭২৮ সনে ইন্তিকাল করেন। নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীতে হাসান আল-বাস্রীর জীবনী বর্ণিত রহিয়াছে। ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৭খ, ১ম অংশ, পৃ. ১১৪-১২৯; আবূ নু'আয়ম, হিল্য়াতু'ল-আওলিয়া', ২খ, পৃ. ১৩১-১৬১; ইব্নুল-জাযারী, তাবাকাতুল-কুর্রা', ১খ., পৃ. ৩৫; আত-তাহ্যীব; ইব্ন খাল্লিকান রচিত গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থ। সূফীগণ তাসাওউফের সনদসমূহকে হাসান বাস্রী পর্যন্ত পৌছাইয়া থাকেন; কিন্তু উক্ত সনদসমূহ হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের নিকট দলীল বলিয়া পরিগণিত নহে।

আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির (দা. মা. ই.)/ মু. মাজ্হারুল হক

তা'বীয (تعويذ) ঃ বাংলায় সাধারণত তাবিজ, প্রায় সকল দেশেই মুসলমান সমাজে রোগব্যাধি ও আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তা'বীয ধারণের রীতি প্রচলিত আছে। তা'বীয সাধারণত কাগজে লিখিয়া ধাতুনির্মিত কোন রকম আধারে পুরিয়া গলায় বা হাতে ধারণ করা হয়। ধাতুর পাতে খোদিত তা'বীযেরও প্রচলন আছে। কুরআনের আয়াত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য চিহ্ন দ্বারা তা'বীয লেখা হয়। পানিতে জাফরান গুলিয়া সেই রং দ্বারা তা'বীয লেখা প্রশস্ত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কালি দ্বারাই তা'বীয লেখা হইয়া থাকে। প্রাচীন কালের অনেক রাজা-বাদশাহও নিজেদের গৌরব-মহিমা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার কামনায় তা'বীয ধারণ করিতেন। মুসলমানদের মত বিশ্বের অন্যান্য জাতির মধ্যেও এই প্রকার তা'বীয ধারণের রীতি বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে। ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু সমাজে তা'বীয 'কবচ' (যথা "রক্ষাকবচ") নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র মাদল বা ঢোলের আকৃতিবিশিষ্ট কবচের নাম "মাদুলি"।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ/৭০৭

তা'বীর (দ্র. রু'য়া)

তা'বীল (تاويل) ঃ আরবী, ধাতুমূল ا-و-ل (ব্যবহার ال يؤل اى رجع الى اصله)। আভিধানিক অর্থ ঃ স্বীয় মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। আরবী ভাষায়, বিশেষত পবিত্র কুরআনে শব্দটি মূল তত্ত্বের বিবরণ প্রদান, প্রকৃত অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তন, অর্থের বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা প্রদান কিংবা ইহার সমার্থ শব্দের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তাফসীর (تفسير) ও তা'বীল (تاويل) শব্দদ্বয় সমার্থবোধক ছিল এবং কিছুকাল যাবত (প্রায় তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতক পর্যন্ত) তা'বীল শব্দটি তাফসীর অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যেমন ইব্ন কুতায়বার (মৃ. ২৭৬ হি.) কিতাব "তা'বীল মুশকিলি'ল-কুরআন" এবং মাতুরীদীর (মৃ. ৩৩৩ হি.) কিতাব "তা'বীলাতু'ল-কুরআন" নামক তাফসীরশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় ইহার সমর্থনে উপস্থাপন করা যাইতে পারে। সুতরাং পবিত্র কুরআনে শব্দটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিলকৃত ওয়াহ্য়ি বা কুরআন সম্পর্কে ব্যবহার করা হইয়াছে। এইরূপ দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ পবিত্র কুরআনে শব্দটি হয়ত "কুরআনের আয়াতসমূহের প্রকৃত অর্থ" বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন ঃ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ اِلاَّ اللّٰهُ "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই ইহার ব্যাখ্যা জানে না" (৩ ঃ ৭) কিংবা কোন ঘটনার প্রকৃত অবস্থা অর্থে [যেমন ঃ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا "যে বিষয় তুমি (মূসা) ধৈর্য ধারণ করিতে পার নাই আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি" (১৮ ঃ ৭৮)]। কিংবা স্বপ্নের ব্যাখ্যা অর্থে, যেমন ঃ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاوِيْلِه "আমি ইহার তাৎপর্য তোমাদিগকে জানাইয়া দিব", (১২ ঃ ৪৫) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই পবিত্র আয়াতসমূহে শব্দটি মূল আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যতদিন পর্যন্ত তা'বীল শব্দটি তাফসীর-এর প্রায় সম-অর্থে ব্যবহৃত হইতেছিল ততদিন পর্যন্ত 'আলিমগণ এই শব্দদ্বয়ের অর্থে সাধারণত এইভাবে পার্থক্য করিতেন যে, "তাফসীর" পদটি পৃথক পৃথক ও জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যার জন্য এবং তা'বীল শব্দটি বাক্যের ও ভাবের অস্পষ্টতা নিরসনের জন্য ব্যবহৃত হইত। তবে এই পার্থক্যকরণ সকল বিজ্ঞ আলিমের নিকট স্বীকৃতি লাভ করে নাই, যেমন ইব্ন কুতায়বা-র পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ হইতে প্রতীয়মান হয়। কেননা উল্লিখিত গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং প্রায়শ জটিল শব্দসমূহের ব্যাখ্যাসম্বলিত। পরবর্তী যুগে ফকীহগণ ও 'আলিমগণ "তা'বীল" পদটি ভিন্ন এক অর্থের পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করেন, অর্থাৎ ইহা কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীছের এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাহা বাহ্যিক অর্থের বিপরীত। অতএব প্রখ্যাত 'আলিমদের লেখায় এইরূপ ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, "এই আয়াতটি বা এই হাদীছটি এতই সুস্পষ্ট (صريح) যে, ইহা ব্যাখ্যা (تاويل)-এর অবকাশ রাখে না।" অর্থাৎ ইহাতে এমন কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নাই যাহা ইহার বাহ্যিক অর্থের পরিপন্থী। এই কারণে কোন বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ এবং উহার ব্যাখ্যাতে (তা'বীলকৃত) অর্থের মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয়টি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কোন প্রমাণ কিংবা ইঙ্গিতের দরকার হইবে। 'আলামত ও ইঙ্গিতের উপস্থিতির কারণে যদি বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করা হয় তবে এই নূতন অর্থটি রূপক (مجازى) অর্থের সমতুল্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

পরবর্তী যুগে মুসলমানদের মধ্যে এমন কতকগুলি দলের উদ্ভব হয় যাহারা সুন্নাহ্র পথ হইতে সরিয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূফীদের কতক দল, ইখওয়ানু'স-সাফা', শী'আদের কোন কোন দল ইত্যাদি। ইহারা নিজেদের ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও স্বার্থান্ধ মতবাদের বৈধতা প্রমাণ করিবার লক্ষ্যে "তা'বীল"কে অতি উত্তম হাতিয়াররূপে ব্যবহার করিয়াছে। এমন কি তাহারা পবিত্র কুরআনের শুধু রূপক ও উপমাভিত্তিক তাফসীর করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের নিকট কুরআনের বাহ্যিক অর্থ এবং রিওয়ায়াতভিত্তিক তাফসীরসমূহ অগ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহারা "তা'বীল"-এর অর্থের ও উহার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিক সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া 'মুতাশাবিহ (রূপক) আয়াতসমূহের বিভিন্ন রকমের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়। তাহাদের দাবি এই যে, পবিত্র কুরআনের একটি বাহ্যিক অর্থ আর একটি গূঢ় অর্থ রহিয়াছে এবং এই গূঢ় অর্থসমূহ তাহাদের মনোজগতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। ইহারা এমন একটি সম্প্রদায়ের লোক যাহাদের বিস্ময়কর ও অভিনব ধরনের অর্থ বর্ণনা করার উদ্‌গ্র শখ ছিল যাহার অজুহাতে তাহারা শারী'আতের কষ্টসাধ্য বিধানসমূহ এড়াইয়া যাইতে পারে। তাহাদের অধিকাংশ মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ইসলামের পরিপন্থী ছিল। কিন্তু তাহারা ঐ ধরনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়া নিজেদের মতামতকে ইসলামের নামে প্রচলিত করিবার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এই ধরনের লোকদের পরিচয় প্রদানের নিমিত্ত পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ "যাহাদের অন্তরে সত্য লংঘন-প্রবণতা রহিয়াছে শুধু তাহারাই ফিত্না ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যাহা রূপক তাহার অনুসরণ করে" (৩ ঃ ৭)।

এইখান হইতেই সূফীদের কোন কোন ভণ্ড উপদল তা'বীলের ছত্রছায়ায় নিজেদের জন্য পৃথক পৃথক পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এমন কি অনেকে কুরআনী বিধানের বাধ্যবাধকতাকেও অপ্রয়োজনীয় মনে করে। ইসলাম হইল একটি স্পষ্ট, সমুজ্জ্বল ধর্ম এবং রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানদের একটি পরিচ্ছন্ন ও সুপরিসর রাজপথের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন– যাহারা সেই রাজপথ হইতে হটিয়া যাইবে তাহারা নিশ্চিতই "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসানু'ল-'আরাব, ১৩খ, ৩৪ প.; (২) তাজু'ল-'আরূস, ৭খ, ২১৫; (৩) Lane, An Arabic-English Lexicon, পৃ. ১২৬ প.; (৪) জালালু'দ-দীন আস-সুয়ূতী, আল-ইত্কান, কায়রো ১২৮৭ হি., ২খ, ২০৪-২০৬; (৫) Goldziher, Die Richtungen der Islamischen Koran Auslegung. (Veroffentlichungen der "De Goeje-Stiftung, No. vi), লাইডেন ১৯২০ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Streitschrift das Gazali gegen die Batinijja-Sekte

(Veroffentl. Der "De Goeje-Stiftung, No. iii), লাইডেন ১৯১৬ খৃ., পৃ. ৫০ প. এবং আরবী মূল পাঠ, নং ১০; ((৭) কুল্লিয়াত আবি'ল-বাকা', ইস্তাম্বুল সং; ১২৮৭ হি., পৃ. ১৮৭; (৮) কাশ্‌শাফ ইস্‌তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ভারতীয় সং, পৃ. ১১১৬-১১১৭; (৯) শারীফ মুরতাদা, হাকাইকু'ত-তা'বীল, বাগদাদ ১৩৫৫ হি., পৃ. ৭-১৪ এবং অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ ইত্যাদি]।

R. Paret, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, 'আবিদ আহমাদ আলী (দা. মা.ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

তাবীল (طويل) ঃ 'ইল্‌ম-ই 'আরূদ (কাব্যশাস্ত্র)-এর একটি ছন্দ (বাহ্‌র)-এর নাম। ইহা কেবল আরবী কবিতারই বৈশিষ্ট্য। আরবীর অনুকরণে কেহ কেহ ফারসী কবিতার ক্ষেত্রে তাবীল ছন্দের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ব্যাপকতা লাভ করে নাই। তাই এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উর্দূ ভাষায় উহার ব্যবহার এতই নগণ্য যে, তাহা উল্লেখেরও যোগ্য নহে। সেই কারণে ছন্দবিদগণ ব্যতীত সাধারণ লোক ঐ মুদা'আফ বাহ্‌রকে বাহ্‌রে তাবীল বলিয়া থাকেন যাহার মধ্যে অনেকগুলি ছন্দতাল (ارکان) থাকে। উদাহরণস্বরূপ ঃ (یہ سحر کیسی ہے پر نور کہ جمہور ہیں مسرور ہر اک باغ میں معمور ہے سامان بہار) ইহার চেয়ে দশ গুণ দীর্ঘ এক এক পংক্তিও উর্দূ কবিতায় পাওয়া যায় (দেখুন ঃ ইন্‌শা ও নাযীর কুল্লিয়াত)।

বাহ্‌র-ই তাবীলের ছন্দতাল আটটি (مثمن) এবং ইহার ছন্দ পূর্ণরূপে (وافی হিসাবে) ব্যবহৃত হয়। উহার ছন্দতালগুলি (ارکان) হইল فعولن مفاعیلن (চারবার)। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে 'আরূদ (مقبوض) একটি ও দুরূব (محذوف-مقصور-سالم) চারটি। এতদসত্ত্বেও 'আরূদকেও চারটিই ধরা হয়ঃ (১) মাকবূদ, বিধানমতে 'আরূদকে যদিও মাকবূদ লওয়াই আবশ্যক, কিন্তু (২) সালিম ও (৩) মাহযূফও কোন কোন সময় গ্রহণ করা হয় ও (৪) মাত্‌লা'-এর ক্ষেত্রে 'আরূদকে দার্‌বের সাথে মিল করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে অর্থাৎ মাত্‌লা'- এর মধ্যে দার্‌ব যদি মাক্‌সূর হয় তবে 'আরূদকেও কেবল মাতলা'র মধ্যে মাক্‌সূর করা অপরিহার্য। কাফিয়া বা অন্তমিল রক্ষা করার জন্য দার্‌ব অপরিহার্য, এইভাবে 'আরূদও চারটিই হইল।

এই বাহ্‌র (ছন্দে)-এ সাদরকে মাকবূদ, আছলাম ও আছরাম ও হাশ্‌বকে মাকবূদ ও মাকফূফ এবং ইবতিদাকে মাকবূদ লওয়া যায়। অবশ্য ইবতিদাকে কখনও আছলাম ও আছরামও আনা হয়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হাশ্‌ববিশিষ্ট مفاعیلن-এর মধ্যে মু'আকাবা রহিয়াছে অর্থাৎ یاء উহ্য হইলে نون উল্লেখ থাকিবে, আর যদি نون উহ্য হয় তবে یاء-কে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। یاء ও نون-কে একত্রে উহ্য রাখিয়া مفاعل বানান যাইবে না।

আরবী কবিতায় এই ছন্দের (বাহ্‌র) চৌদ্দটি ওযন আছে ঃ

১। কেবল 'আরূদ মাক্‌বূদ হইবে ঃ

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

২। 'আরূদ ও দার্‌ব মাক্‌বূদ হইবে ঃ

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن

৩। 'আরূদ মাক্‌বূদ, দার্‌ব মাহযূফ ঃ

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن
فعولن مفاعیلن فعولن فعولن

৪। 'আরূদ ও ৪র্থ হাশ্‌ব মাকবূদ এবং দার্‌ব মাহযূফ হইবে।

فعلولن مفاعیلن فعولن مفاعلن
فعولن مفاعیلن فعول فعولن

৫। সাদ্‌র, দ্বিতীয় হাশ্‌ব ও দারব মাক্‌বূদ হইবে এবং অবশিষ্ট আরকানসহ 'আরূদ সালিম হইবে ঃ

فعولن مفاعیلن فعول مفاعیلن
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن

৬। প্রতিটি فعولن মাক্‌বূদ এবং প্রতিটি مفاعیلن 'আরূদ-সহ সালিম হইবে ঃ

فعول مفاعیلن فعول مفاعیلن
فعول مفاعیلن فعول مفاعیلن

৭। দ্বিতীয় ও চতুর্থ হাশ্‌ব ও দার্‌ব মাক্‌বূদ এবং 'আরূদ মাহযূফ হইবে ঃ

فعولن مفاعیلن فعول فعولن
فعولن مفاعیلن فعول مفاعلن

৮। সাদ্‌র, ইবতিদা, 'আরূদ ও চতুর্থ হাশ্‌ব মাক্‌বূদ এবং দার্‌ব মাকসূর হইবে ঃ

فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن
فعول مفاعیلن فعول مفاعیل

৯। দার্‌ব সালিম ও অবশিষ্ট সকল আরকান মাক্‌বূদ হইবে ঃ

فعول مفاعلن فعول مفاعلن
فعول مفاعلن فعول مفاعیلن

১০। সমুদয় আরকান মাক্‌বূদ হইবে ঃ

فعول مفاعلن فعول مفاعلن
فعول مفاعلن فعول مفاعلن

১১। সাদ্‌র আছরাম, প্রথম ও তৃতীয় হাশ্‌ব মাকফূফ ও 'আরূদ মাক্‌বূদ হইবে ঃ

فعلن مفاعیل فعولن مفاعلن
فعولن مفاعیل فعولن مفاعیلن

১২। সাদ্‌র ও ইব্‌তিদা আছলাম এবং 'আরূদ মাক্‌বূদ হইবে ঃ

فعلن مفاعیلن فعولن مفاعلن
فعلن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

১৩। সাদ্‌র আছরাম ও 'আরূদ' মাক্‌বূদ হইবে ঃ

فاع مفاعیلن فعولن مفاعلن
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن

১৪। ইবতিদা আছরাম, দ্বিতীয় হাশ্‌ব, 'আরূদ ও দার্‌ব মাক্‌বূদ হইবে ঃ

فعولن مفاعیلن فعول مفاعلن
فاع مفاعیلن فعولن مفاعلن

হাদী 'আলী বেগ (দা.মা. ই.)/বোরহান উদ্দীন

তাবীলা (طويلة) ঃ দক্ষিণ আরবের একটি শহর। পূর্বকালে এই শহর ছিল কাওকাবান-এর কাদা-র কাইম মাকাম (قائم مقام)-এর সদর দফতর; Nibuhr-এর সময়ে শহরটি কাওকাবানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওয়াদী লা'আ'র বাম অন্তে জাবান-ই দুলা'র পার্শ্বস্থ এক জিহ্বাকৃতি spur (অভিক্ষিপ্তাংশ)-রূপী পাথরের পাহাড়ের উপর তাবীলা শহরটি অবস্থিত। ওয়াদী লা'আ' চারটি শিলাশৈলীর সমবায়ে গঠিত, যেইগুলি পরস্পর সংলগ্ন। এই শৈলশ্রেণীর দ্বিতীয়টির (পূর্ব দিক হইতে) নাম আল-হুসনা। শহরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অনধিক ৫০০ গজ নিচে

রহিয়াছে মাসজিদু'জ-জাহির, যাহা এখন ধ্বংসস্তূপ প্রায়। ইহার একটি চমৎকার চৌবাচ্চা রহিয়াছে। এই চৌবাচ্চা হইতে একটি সুনির্মিত পাকা সড়ক পূর্বাভিমুখে শহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষের বড় জোর ২০০ গজের মধ্যেই রহিয়াছে, বলা যায় এই ধ্বংসাবশেষেরই পাথরে গড়া, কৃষ্ণ প্রস্তরের এক বিরাট ইমারত। এই ইমারত হইতে অন্য একটি পাকা সড়ক শহরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। শহরটি আয়তনে ক্ষুদ্র, প্রাচীরবেশিষ্টত নহে। তবে এই শহরের বাজারটি উল্লেখযোগ্য। তুর্কী শাসনামলের প্রশাসনিক ইমারতগুলি শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ভ্রমণকারী E. Glaser ১৮৮৩ সনের ২-৩ ডিসেম্বর এই স্থানটি পরিদর্শন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Niebuhr, Beschreibung von Arabian, Copenhagen 1772, P. 258; (২) E. Glaser, Geographische Forschungen Yemen 1883-84, fol. 59, 60; (৩) A. Deflers, Voyage au Yemen, Paris 1889,

A. Grohmann (E. I. [1])/ আফতাব হোসেন

তাবীলা ঃ একটি দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রা (দ্র. লারিন নিবন্ধ)

আত-তাবুযাবী (দ্র. মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল)

তাবূক (تبوك) ঃ দামিশক হইতে হজ্জযাত্রীদের অনুসৃত রাস্তায় ও দামিশক-মদীনা রেলপথে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। (য়াকূতের মতে আল-হিজ্‌র হইতে তাবূক ছিল ৪ দিনের পথ, আর মদীনা শারীফ হইতে ১২ দিনের পথ)। একটি বালুকাময় প্রান্তরের সামান্য তরঙ্গায়িত স্থানে শহরটি অবস্থিত; এইখানে খুবই উৎকৃষ্ট মানের একটি সুপেয় পানির কূপ আছে। আরব লোককাহিনীতে সম্ভবত এই কূপটির কথাই বলা হইয়াছে। তাবূকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ভবন হইল হাজ্জী দুর্গ। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে ১০৬৪/১৬৫৪ সালে ভবনটি নির্মিত হয়। ইহার প্রাচীন অংশ এবং পরবর্তী আমলের মেরামত করা অংশের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। হাজ্জী দুর্গের পার্শ্বে কাটা পাথরের তৈরী একটি সুদৃশ্য আধুনিক মসজিদ আছে। পর্যটক ইউটিং [Euting] ১৯১৪ খৃ. কাছাকাছি সময়ে স্থানটি শুধু ৫ জন সৈনিক ছাড়া জনশূন্য দেখিতে পান। জসেন [Jaussen] ও স্যাভিন্যাক [Savignac] তাঁহাদের প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে আসিয়া [তা. বি.] এখানকার ৪০টি বাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, বাড়িগুলির দেওয়াল রোদে শুকানো ইটের তৈরী, আর গাছের ডালপালার উপর কাদা মাটির চাপ দিয়া ঘরগুলির ছাদ তৈরী। ফলের গাছগুলিকে তাঁহারা খুবই অবহেলিত অবস্থায় দেখিতে পান।

রাসূল কারীম (স)-এর সময় তাবূক ছিল আরবের উত্তর সীমান্তবর্তী একটি শহর; ইহার অপর দিকেই বায়যানটীয় সাম্রাজ্যের এলাকা শুরু হয়। হি. ৯ম সনে সম্রাট হেরাক্লিয়াস কর্তৃক মদীনা আক্রমণের ঘোষণার প্রেক্ষিতে ইহার প্রতিরোধকল্পে উত্তরাঞ্চলে রাসূল কারীম (স)-এর যুদ্ধাভিযান শুরু হইলে তাবূক ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া ইহার গ্রীক, 'আমিলা, লাহ্‌ম ও জুযাম বাসিন্দারা সকলেই ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। অভিযানের বিপুল ব্যাপ্তি ও আকস্মিকতায় হতবিহ্বল বায়যানটীয় সম্রাট যুদ্ধের সংকল্প পরিত্যাগ করিলে কোনরূপ বহিরাক্রমণ না হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া রাসূলুল্লাহ (স) এই অভিযান পরিত্যাগ করেন। মাত্র ১০ দিন এইখানে অবস্থানের পর তিনি সদলবলে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এই সময়টুকু একেবারে নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া রাসূল (স) ঐ অঞ্চলের আইলা, আযরুহ ও মাক্না-র অধিবাসীদের সহিত আলাপ-আলোচনায় রত হন; ইহার ফলে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৮২৪ প.; (২) ইব্ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৯০২ প.; (৩) তাবারী, সম্পা. De Goeje, ১খ, পৃ. ১৬৯২ প.; (৪) ওয়াকিদী, অনু. V. Wellhausen, P. 390 sqq; (৫) বালাযুরী, সম্পা. de Goeje, পৃ. ৫৯; (৬) Doughty, Travels in Arabia Deserta, 1923, i, 172 sq.; (৭) Euting, Tagebuch einer Reise in Innerarabien 1914, ii. 180-85; (৮) Jaussen and Savignac, Mission archeologique en Arabe, i 57-70.

Fr. Buhl (E.I. [1])/শায়খ ফজলুর রহমান

তাবূক যুদ্ধ ঃ (দ্র. হযরত মুহাম্মাদ (স))

তাবূর (طبور) ঃ তুর্কী পূর্ব তুরস্কে, তাপকূর (تقور), বৃত্তাকারে বা আয়তাকারে সজ্জিত মালগাড়ি দ্বারা তেরী বেষ্টনী; টহলদারির জন্য প্রেরিত লোকজনের দল, একজন বিনবাশি (=এক হাজার সৈন্যের নেতা)-এর নেতৃত্বাধীন প্রায় এক হাজার সেনার একটি সেনাদল বা বড় স্থল বাহিনী (ব্যাটালিয়ন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Radlof, Opyt, iii, 953. 978; (২) Pavet de Courteille, Dict. turk-oriental, p. 192; (৩) সুলায়মান এফেন্দি, লুগাত-ই জাগাতাই, পৃ. ৯৭; (৪) আহ্‌মাদ ওয়াফীক পাশা, লেহ্‌জে-ই 'উছমানী, ২খ., ৭৩৯; (৫) Barbar de Meynard, Dict. Turc-francais, ii, 250; (৬) Vambery, Caghataische Sprachatudien, p. 253.

CL Huart (E. I. [1])/শায়খ ফজলুর রহমান

তামগ্রুত (تمگرت) ঃ ওয়াদী দার'আ (দ্রা [দ্র.])-এর তীরবর্তী প্রধান শহর। ইহা মরক্কোর দক্ষিণে অবস্থিত এবং নাসিরিয়্যা ধর্মীয় ভ্রাতৃসম্প্রদায় [দ্র.]-এর মূল যাবিয়ার কেন্দ্রস্থল। ওয়াদী দার'আর বাম তীরবর্তী তালবন ও ফলবান বৃক্ষশোভিত লোহিত মৃত্তিকার গৃহাদিসম্বলিত ইহা একটি মধ্যম আয়তনের শহর। আনুমানিক ৩০০ গজ ব্যবধানে অবস্থিত শৈল শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীটির প্রস্থ এইখানে ১২০ হইতে ২৫০ ফুট, গভীরতা নাই বলিলেও চলে। তামগ্রুত-এর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাচীরে চারিটি ফটক রহিয়াছে ঃ উত্তরে ফুমমু'স (দ্রুপদী ফাম=মুখ) সূক, উত্তর-পূর্বে ফুম্ম তা'উরীরত, দক্ষিণ-পশ্চিমে বাবু'র-রিযক ও পূর্ব দিকে ফুমমু'স-সূর। সেইখানে প্রতি শনিবারে একটি বৃহৎ হাট বসে।

তামগ্রুত-এর যাবিয়া সকল খ্যাতির জন্য শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন নাসিরের নিকট ঋণী। ইহা ওয়াদী দার'আর একটি মুরাবিত পরিবারের জনৈক সদস্য সায়িদু'ন-নাস-এর যাবিয়া হইতে আগত আবূ হাফ্‌স 'উমার ইব্ন আহমাদ আল-আনসারী কর্তৃক ৯৮৩/১৫১৫-৭৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তামগ্রুত-এর যাবিয়াতে বসবাসকারী সায়্যিদী আব্দুল্লাহ ইব্ন হুসায়ন ও সায়্যিদী মুহাম্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম নামক দুইজন তাপসের আধ্যাত্মিক খ্যাতিই ১০১৫/১৬০৩ সনে ইগলান-এ জন্মগ্রহণকারী সূফী শিক্ষার্থী মুহাম্মাদ ইব্ন নাসিরকে তথায় বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করে। সায়্যিদী আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীমের ইনতিকালের পর তিনি যাবিয়ার প্রধান হন এবং প্রত্যক্ষভাবে আশ-শাযিলী [দ্র.]-র শিক্ষার ভিত্তিতে তথায় তাঁহার তারীকা প্রতিষ্ঠিত করেন। এইখানে তিনি সাফার ১০৮৫/মে ১৬৭৪-এ ইনতিকাল করেন এবং তদবধি তাঁহার বংশধরগণ অবাধে পুরুষানুক্রমে যাবিয়ার প্রধান নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। তামগ্রুতের যাবিয়াতে মুহাম্মাদ ইব্ন নাসির ও উত্তরসুরিগণের সম্মিলিত একটি সমাধিসৌধ রহিয়াছে। এক অগ্নিকাণ্ডের পর সমাধিসৌধটিকে ১৮৬৯ খৃ.

পুনর্নির্মাণ করা হইয়াছে; ইহার উপরিভাগ সবুজ টালির একটি পিরামিডাকৃতি গুম্বজ শোভিত, তদুপরি তিনটি সোনালী বলসম্বলিত একটি জামুর (মাস্তুল) বিদ্যমান। কথিত আছে যে, এইখানে একটি ভাল গ্রন্থাগার রহিয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অদ্যাবধি ইহা ক্যাটালগ করার উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

তামগ্রূত-এর যাবিয়া এবং উহার তাপসগণ সম্পর্কে কিতাবু'ল ইসতিকসার লেখক আহমাদ ইব্ন খালিদ আন-নাসিরী আস-সাবী [দ্র.] তাল'আতু'ল-মুশ্তারী ফি'ন-নাসবি'ল-জা'ফারী (২ খণ্ড, লিথো, ফাস তা. বি. [১৩০৯) ১ শীর্ষক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তামগ্রূত বানূ সা'দ রাজসভার বিখ্যাত কর্মকর্তা আবু'ল-হাসান আত-তামগ্রূতীর জন্মস্থানও বটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) De Foucauld, Reconnaissance an Maroc, প্যারিস ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ২৯৩; (২) Depont and Coppolani, Les Confreries Religieuses Musulmanes, আলজিয়ার্স ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৪৬৭; (৩) H. de Castries, Notice sur la region de L'Oued-Draa, Bulletin de la Societe de Geographie de Paris-এ, খণ্ড ২০, ১৮৮০ খৃ., পৃ. ৪৯৭ প.; (৪) de Segonzac, Au cour de L'Atlas, প্যারিস ১৯১০ খৃ., পৃ. ৮৯-৯৮; (৫) M. Bodin, La zaouia de Tamegrout, Archives Berberes-এ, প্যারিস ১৯১৮ খৃ., পৃ. ২৫৯-২৯৫; (৬) E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Essai sur la litterature historique et biographique au Maroc du XVIeme au XXIeme siecle, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ৯৯, নোট ১ ও পৃ. ৩৫৪।

E. Levi-Provencal (E. I. [1])/মোঃ আবুল কালাম আজাদ

আত-তামগ্রূতী (التمگروتی) ঃ আবু'ল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ। একজন মরক্কোবাসী লেখক, তামগ্রূত [দ্র.]-এ জন্ম, ১০০৩/১৫৯৪-৯৫ সনে মার্‌রাকুশ-এ ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে কাদী 'ইয়াদ-এর পবিত্র ভূমিতে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন সা'দিয়ান সুলতান আবুল 'আব্বাস আহমাদ আল-মানসূর আয-যাহাবীর (৯৮৬-১০১২/১৫৭৮-১৬০২) দরবারে একজন পদস্থ রাজকর্মচারী। এই শাসক তাঁহাকে আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-ফিশ্তালী নামক অন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ কনস্টান্টিনোপলে সুলতান মুরাদ (৩য়)-এর নিকট প্রেরিত দূতাবাসের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন, তা. ১০২১/১৬১২-১৩। আত-তামগ্রূতী তাঁহার একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত (রিহলা) প্রস্তুত করেন। তিনি ইহার নামকরণ করেন আন-নাফাহাতু'ল-মিসকিয়্যা ফি'স-সিফারাতি'ত-তুরকিয়্যা। পরবর্তীতে ইহা নুযহাতু'ল-হাদী গ্রন্থের রচয়িতা আল-ইফরানী (অথবা উফরানী [দ্র.] কর্তৃক এক উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মার্‌রাকুশ রাজসভার চিত্তাকর্ষক বিবরণাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। H. De Castries ১৯২৭ খৃ. তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে একটি অনুবাদসহ আত-তামগ্রূতী রচনাবলীর একটি সংস্করণের ঘোষণা দিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ইফরানী, সাফওয়াত মান ইনতাশার, ফাস তা. বি., পৃ. ১০৬; (২) আল-কাদিরী, নাশর আল-মাছানী, ফাস ১৩১০ খৃ., ১খ, পৃ. ৩১ (অনুবাদ Archives Marocaines-এ, খণ্ড ১৬, প্যারিস ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৭০); সঠিক অনুলিপিকার ইব্নুল- মুওয়াককিত, আস-সা'আদাত আল-আবাদীয়া, ফাস ১৩৩৬ খৃ., ১খ, পৃ. ৯০-৯১; (৩) E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Essai sur la litterature historique et biographique au Maroc du XVI eme au XX eme siecle, পৃ. ৯৮-৯৯)।

E. Levi-Provencal (E.I. [1])/মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তাম্তাম (تمتام) ঃ একজন মুহাদ্দিছ ও হাফিজুল হাদীছ। মূল নাম মুহাম্মাদ ইব্ন গালিব, উপনাম আবূ জা'ফার। তিনি বানুদ-দাব্‌র গোত্রের লোক এবং বসরার অধিবাসী, পরবর্তী কালে বাগদাদে বসবাস করেন। তিনি একজন খর্জুর ব্যবসায়ী (التمار) ছিলেন। হাদীছশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বিধায় 'আল-হাফিজ' ও 'আল-ইমাম' আখ্যায় ভূষিত হন। তিনি আবূ নু'আয়ম (র), মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র), 'আফ্ফান (র), আল-কা'নাবী (র), 'আবদু'স-সামাদ ইবনুন-নু'মান (র), আবূ হুযায়ফা আন-নাহদী (র), 'আমর ইব্ন মারযূক (র), মুসাদ্দাদ (র) প্রমুখ খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইব্নু'ল-বাখ্তারী (র), ইস্মা'ঈল আস-সাফ্ফার (র), 'উছমান ইব্নু'স-সিমাক (র), আবূ সাহ্ল আল-কাত্তান (র), আবূ বাক্‌র আশ-শাফি'ঈ (র) ও আবূ বাহ্‌র আল-বারবাহারী (র) উল্লেখযোগ্য। হাদীছ- বিশারদগণের মতে তাম্তাম (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। আদ-দারা কুত্নী বলেন, তাম্তাম একজন নির্ভরযোগ্য (ثقة), বিশ্বস্ত (مامون) ও উত্তম (مجود) রাবী; তবে কদাচিৎ তাঁহার দ্বারা ভুল-ভ্রান্তিও সংঘটিত হইয়াছে। তাম্তাম (র) একজন হাদীছ সংকলক ও গ্রন্থকারও ছিলেন। তিনি হি. ২৮৩ সালে রামদান মাসে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জার্‌হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৮খ, ৫; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, লিসানুল-মীযান, বৈরূত ১৩৯০/১৯৭১, ৫খ, ৩৩৭; (৩) ইবনু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্কী, শাযারাতুয-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ১৮৫; (৪) আয-যাহাবী, তায্কিরাতু'ল হুফ্ফাজ, বৈরূত ১৩৭৪/১৯৫৪, ২খ, ৬১৫; (৫) ঐ লেখক, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ১৩খ, ৩৯০-৩৯৩।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাম্মাম ইব্ন নুজায়হ (تمام بن نجيح) ঃ (র) দামিশক নিবাসী জনৈক মুহাদ্দিছ ও তাব্'উ'ত-তাবি'ঈন। পরবর্তী কালে হালাব (আলেপ্পো)-এ নিবাস গ্রহণ করেন। তিনি বানু'ল-আসাদ গোত্রের লোক। হাসান আল-বাস্‌রী (র), 'আতা' ইব্ন আবী রাবাহ (র), 'উমার ইব্ন 'আবদিল-'আযীয (র), কা'ব ইব্ন যুহল (র) প্রমুখ খ্যাতনামা তাবি'ঈ হইতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে বহু মুহাদ্দিছ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিশ্‌র ইব্ন ইসমা'ঈল (র), বাকিয়্যা (র) ও ইসমা'ঈল ইব্ন 'আয়্যাশ (র) উল্লেখযোগ্য। ইমাম আল-বুখারী 'রুকূ' করার সময় রাফ্'উল-য়াদায়ন" সম্পর্কিত এবং ইমাম আবূ দাউদ ও আত-তিরমিযী তাঁহাদের সুনান গ্রন্থদ্বয়ে তাম্মাম বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীছ বিশারদগণের মধ্যে তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম আল-বুখারী (র) তাঁহার সূত্রে 'উমার ইব্ন 'আব্‌দি'ল-'আযীয (র)-এর রুকূ'কালে রাফ'উ'ল-য়াদায়নের রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করার পর বলেন, فيه نظر অর্থাৎ তাঁহার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে। ইব্ন 'আদী বলেন, সাধারণভাবে তাঁহার রিওয়ায়াতসমূহ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) তাঁহার সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ য়াহ্য়া ইব্ন

মা'ঈন ও আবূ তাওবা তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। আল-বায্যার এক স্থলে তাঁহাকে 'শক্তিশালী নয়' বলিয়া মন্তব্য করিলেও ইমাম তিরমিযী তাঁহার সূত্রে আনাস (রা)-এর যেই হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন উহার শেষে তিনি (বায্যার) বলেন, هو صالح الحديث "তিনি গ্রহণযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী"। অপরদিকে আবূ যুর'আ, আবূ হাতিম, ইব্ন 'আদী, ইব্ন হিব্বান প্রমুখ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইমাম আন-নাসাঈ বলেন, لا يعجبنى حديثه "তাঁহার বর্ণিত হাদীছ আমার পছন্দ হয় না"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, তাহযীবুত তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ, ৪৪৮; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবু'ত তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ৪৯; (৩) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২খ/১, ১৫৭; (৪) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ১খ, ৪৪৫; (৫) 'আবদুল হায়্যি লাখ্নাবী, আর-রাফ' ওয়া'ত-তাক্মীল ফি'ল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, টীকা 'আবদুল-ফাত্তাহ আবূ গুদ্দা, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ. ৩৮৯।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তামাত্তু' (দ্র. ইহরাম, মুতা')

তামীম (تميم) ঃ (রা) মাওলা খিরাশ ইব্নু'স-সিম্মা আল-আনসারী, একজন সাহাবী। খিরাশ ইবনু'স-সিম্মা (রা) (দ্র.)-এর মুক্তদাস। স্বীয় মনিবের সহিত তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে 'উতবা ইব্ন গাযওয়ান (রা) (দ্র.)-এর মুক্তদাস খাব্বাব (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাঁহার সম্পর্কে আর তেমন কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৬, সংখ্যা ৮৫২; (২) ইব্নুল আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ, ২১৭; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫৭০; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ১খ, ১৯৪, সংখ্যা ২৩৬; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৯, সংখ্যা ৫৫৫।

ড. আবদুল জলীল

তামীম ইব্ন উসায়দ (تميم بن اسيد) ঃ (রা) ইব্ন 'আব্দি'ল 'উয্যা ইব্ন জু'উনা ইব্ন 'আম্র আল-খুযাঈ একজন সাহাবী। কাহারও মতে তাঁহার পিতার নাম আসাদ। ইব্ন সা'দ বলেন, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তিনি হারাম শারীফের সীমা নির্ধারক খুঁটিগুলির সংস্কার করিয়াছিলেন। এই নির্দেশসম্বলিত হাদীছটি ইব্ন সা'দ ও আবূ নু'আয়ম হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সনদ হাসান। হাদীছটিতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম ('আ) জিবরাঈলের নির্দেশ অনুযায়ী হারাম শারীফের উক্ত সীমানা নির্ধারক খুঁটিগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। মুহাদ্দিছ আল-ফাকিহী এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-আস্ওয়াদ-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, তামীম ইব্ন উসায়দ 'আবদুর-রাহমান ইবনু'ল-মুত্তালিবের পিতামহ ছিলেন। ইব্ন ইসহাক তাঁহার কিতাবু'ল মাগাযীতে হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছে ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের দিন একটি জন্তুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মক্কায় প্রবেশ করেন এবং উক্ত বাহনে চড়িয়া তাওয়াফ করেন। ইব্ন 'আব্বাস (রা) ইহাও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) যেই প্রতিমার প্রতি ইঙ্গিত করিতেন তাহাই চিৎ হইয়া পড়িয়া যাইত। এই সম্বন্ধে তামীম ইব্ন আসাদ আল-খুযা'ঈ বলেন ঃ

لمن يرجو الثواب او العقاب × وفى الاصنام معتبر وعلم

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ছাওয়াব লাভের আশা অথবা শাস্তি পাওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য এই সকল প্রতিমার মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের বিষয় রহিয়াছে।"

ইব্ন মান্দা হাদীছটি ভিন্ন রকম বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ ইহা একটি দুর্বল হাদীছ। এই হাদীছটি য়া'কূব ইব্ন মুহাম্মাদ আয-যুহ্রী একাই বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৩; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৮; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৪২ হি., ১খ, ২১৪।

আহমদ মায়মূন

তামীম ইব্ন জুরাশা আছ-ছাকাফী (تميم بن جراشة الثقفى) ঃ (রা) আরবের প্রসিদ্ধ বানূ ছাকীফ গোত্রীয় একজন সাহাবী। ইব্ন মাকূলা বলেন, তিনি বানূ ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল (রামাদান, ৯ হি.)-এর সদস্য ছিলেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুতায়্যিন আল-কাবীর তাঁহাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিকট হইতে একটি হাদীছও বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীছে তামীম ইব্ন জুরাশা বলেন, "আমি বানূ ছাকীফের প্রতিনিধি দলের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করি, অতঃপর কয়েকটি শর্তসম্বলিত একটি বিধানপত্র লিখিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি" (এই হাদীছটির সনদ দুর্বল)। শর্তগুলি ছিল এই ঃ (১) সালাত মাফ করিয়া দিতে হইবে; (২) তাহাদের নিকট সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান দেব-মূর্তি 'লাত'-কে তাহাদের হাতে ধ্বংস করাইবেন না।

রাসূলুল্লাহ (স) প্রথম দুইটি শর্ত মানিয়া লইতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন ঃ لا خير فى دين لا صلوة فيه "সালাতহীন ধর্মে কোন কল্যাণ নাই।" তবে তিনি তৃতীয় শর্তটি মানিয়া লইতে সম্মত হন। তাহারা সকলে ঐকমত্য পোষণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে এবং আপন আবাসভূমিতে ফিরিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর পরামর্শে উক্ত প্রতিনিধি দলের সবচেয়ে কম বয়স্ক সদস্য 'উছমান ইব্ন আবিল-'আস (রা)-কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করেন। কেননা তিনি ইসলামের বিভিন্ন মাসাইল সম্পর্কিত 'ইল্ম ও কুরআন শিখিতে আগ্রহী ছিলেন (দ্র. যুরকানী, ৪খ., ৫-৬; ইদরীস কানধালাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, দেওবন্দ ১৪০০/১৯৮০, ৩খ, ১০৭-১০৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৪; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৭; (৩) ইবনুল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ, ২১৬।

আহমদ মায়মূন

তামীম ইব্ন তারাফা (تميم بن طرفة) ঃ (র), একজন তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। তিনি বানূ তাঈ গোত্রের লোক, কূফার মুসায়লাহ মহল্লায়

বাস করিতেন। জাবির ইব্ন সামুরা (রা), 'আদী ইব্ন হাতিম (রা), ইব্ন আবী আওফা (রা), আদ-দাহ্হাক ইব্ন কায়স প্রমুখ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে সিমাক ইব্ন হার্ব (র), আল-মুসায়্যাব ইব্ন রাফি' (র) ও 'আব্দু'ল-'আযীয ইব্ন রুফায়' (র)-সহ বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তিনি একজন ছিকাহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। ইমাম আন-নাসাঈ (র), ইব্ন সা'দ (র), আবূ দাউদ (র), আল-'ইজ্‌লী প্রমুখ তাঁহাকে একজন নির্ভরযোগ্য রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সাহীহ মুসলিম, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু'ন-নাসাঈ ও সুনানু ইব্ন মাজা গ্রন্থে তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে। অবশ্য ইমাম আশ-শাফি'ঈ (র) তাঁহাকে মাজ্‌হূল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন অর্থাৎ যাহার নির্ভরযোগ্যতা বা অনির্ভরযোগ্যতা অজ্ঞাত। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে তিনি قليل الحديث অর্থাৎ অল্প সংখ্যক হাদীছের রাবী। হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফের শাসনামলে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। আবূ হাস্‌সান আয-যিয়াদী প্রমুখ বলেন, ৯৪ হি. ইব্ন আবী 'আসিম বলেন ৯৫ হি. এবং ইব্ন কানি' বলেন ৯৩ হি.। ইব্ন হিব্বান সংশয়ের সহিত ৯৩ বা ৯৪ হি.-কে তাঁহার মৃত্যুসন বলিয়া উল্লেখ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ, ৪৫০, ৪৫১; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবুত তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ৪৯; (৩) ইব্ন হিব্বান, কিতাবুছ ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৮৫; (৪) মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্‌মা'ঈল আল-বুখারী, আত-তারীখুল কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/১খ, ১৫১; (৫) ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জার্‌হ ওয়া'ত তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ১খ, ৪৪২; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৬খ, ২৮৮।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তামীম ইব্ন মুর্র (تميم بن مر)ঃ একটি আরব উপজাতি, তাহাদের বংশ-তালিকা (Geneal. Tabellen K. L.) হইল ঃ তামীম ইব্ন মুর্র ইব্ন উদ্‌দ ইব্ন তাবিখা ইব্ন আল-য়াস ইব্ন মুদারী। এই বংশ তালিকা তামীমকে মুদার গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে, যখন মুদার প্রথম স্থান অধিকার করে।' প্রকৃতপক্ষে কায়স ও রাবী'আ গোষ্ঠীর বিপরীতে প্রায়শ তাহাদের নাম সমগ্র মুদার গোত্রের সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কায়স ও রাবী'আ-এর মধ্যে শেষোক্তগণই তামীম গোষ্ঠীর সহিত অধিকতর সম্পর্কযুক্ত; যাহা সুসংবদ্ধ বংশ-তালিকাসমূহে আপাতত দৃশ্যমান নহে (অথচ কায়স গোষ্ঠী মুদার উপজাতি হইতে সমদ্ভূত, কিন্তু রাবী'আ গোষ্ঠী তদ্রূপ নহে)। কিন্তু আল-জুফ্‌ফান (লিসানুল-'আরাব, ১০খ, পৃ. ৩৭৩), জাতের দ্বিবচন একত্রে তামীম ও বাক্‌র ইব্ন ওয়া'ইল গোষ্ঠীদ্বয়কে বুঝায় (শেষোক্তগণ রাবী'আ গোষ্ঠীর প্রধান শাখা), সেই দৃষ্টিকোণ হইতে তাহা সত্য। যে কোন বিচারে, তামীমগণ ভৌগোলিক ও একইভাবে ঐতিহাসিক দিক দিয়া কিনানা (দ্র.) গোষ্ঠী অপেক্ষা তামীম, কায়স ও রাবীআ গোষ্ঠীদ্বয়ের অধিকতর নিকটবর্তী; কিন্তু ঐতিহ্যগত বংশতালিকা তামীমকে নিবিড়ভাবে কিনানা গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়াছে।

আরব উপদ্বীপের বর্ণনা প্রদানকারী গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ যেহেতু তামীম গোষ্ঠী সংক্রান্ত কোন বর্ণনা দেন নাই, সেই কারণে তাহাদের প্রাথমিক ইতিহাস তাহাদের দেশজ কাহিনীর উপর নির্ভরশীল, তাহাদের প্রাচীন ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ের বর্ণনা সম্পৃক্ত হইয়াছে কতিপয় পৌরাণিক কাহিনীর সহিত [যথা মার্‌রান-এ অবস্থিত গোত্রের কল্পিত পূর্বপুরুষ তামীম-এর সমাধি, ইব্ন কুতায়বা আল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৩৭; য়াকূত, মু'জাম, ৪খ, পৃ. ৪৭৯; তাঁহার তিন পুত্রের (যায়দ মানাত, 'আম্‌র ও আল-হারিছ) জন্ম ও দুঃসাহসিক কাহিনী; ইব্ন দুরায়দ; কিতাবু'ল ইশ্‌তিকাক, পৃ. ৫ ইত্যাদি]। এই সকল কাহিনীর সত্যতা নির্ণয় করা অসম্ভব। তাহাদের ইতিহাস যখন ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হয়, তখন তামীমগণ একটি সুবৃহৎ উপজাতি, বিশাল ভূখণ্ডের মালিক; আরবের পূর্ব উপকূলের বৃহদাংশ, প্রায় সমগ্র নাজ্‌দ, বাহ্‌রায়নের একাংশ ছিল এই উপজাতির কর্তৃত্বাধীন। দক্ষিণে তাহাদের ভূসীমা আদ-দাহনা'-র স্তেপ (Steppe= শুষ্ক, তৃণাবৃত, বৃক্ষলতাহীন প্রান্তর)-সমূহ এবং উত্তর-পূর্বে ইউফ্রেটিস নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তরে তাহাদের প্রতিবেশী ছিল আসাদ গোষ্ঠী, দক্ষিণ-পশ্চিমে বাহিলা ও গাতাফান (দ্র.) গোষ্ঠী। তাহাদের নিজস্ব অঞ্চলে তাহারা ছিল 'আব্দু'ল-কায়স ও হানীফা গোত্রদ্বয়ের অংশগুলির সহিত বহুলাংশে মিশ্রিত (বিশেষত পূর্ব এবং দক্ষিণ উপকূলে) এবং উত্তরে বাক্‌র ও তাগ্‌লিবগণের সহিতও তাহাদের মিশ্রণ ছিল। মূলত যাযাবর সুতরাং প্রকৃত অর্থে তাহাদের কোন শহর ছিল না ঃ উৎসসমূহে উল্লিখিত শহর, যথা আল-আহ্‌সা' ও আল-জার্'আ-তে বাজার ও মেলা উপলক্ষে তাহারা প্রায় উক্ত শহরগুলিতে যাতায়াত করিত। কিন্তু তাহারা ঐগুলির মালিক ছিল না (তু. হামদানী, জাযীরাতু'ল-'আরাব, পৃ. ১৩৬; Noldeke, Gesch. D. Perser und Araber, পৃ. ৫৬); যদিও কথিত আছে, তাহারা কখনও কখনও এই সমস্ত শহর দখল করিয়াছিল এবং কিছুকাল দখলে রাখিয়াছিল। ঐ শহরগুলির সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছিল সম্ভবত বেদুঈনসুলভ অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে শান্তি ও শত্রুতা উভয়কালে হয়রানি ও মুক্তিপণ আদায় করা। তামীমদের প্রার্থনার ধরনের মধ্যে তাহাদের সংস্কৃতির অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। এই সম্পর্কে আমাদের ধারণা অতি সামান্যই। ব্যক্তি নামে ও শপথ বাক্যসমূহে তিন দেবী–আল-লাত, আল-মানাত ও আল-'উয্‌যা-র নামের উল্লেখ হইতেই আমরা তামীমগণের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে অবগত হই; সূর্য পূজার তথ্যও লাভ করি য়াকূত (মু'জাম, ৩খ, ১৯)-এর একটি সংক্ষিপ্ত নোট হইতে। খৃস্টান উপজাতি বানূ বাক্‌র ও বানূ তাগলিবের প্রতিবেশী হইলেও তামীমগণের মধ্যে খৃস্ট ধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই (তু. Caetani, Annali dell' Islam, A. H. 9, শাখা ৩)।

তামীম অধ্যুষিত ভূখণ্ডের বিশালতা তাহাদিগের অসংখ্য শাখা-উপশাখায় বিভক্তিকে ত্বরান্বিত করে। অবশেষে তাহাদের প্রতিটি শাখাই একেকটি স্বায়ত্তশাসিত উপজাতিতে পরিণত হয় এবং তাহাদের মধ্যে কখনও দৃঢ় ঐক্যবোধ জন্মলাভ করে নাই। ইহা খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে যখন দেখা যায় যে, একই তামীম উপজাতির দুই শাখার দুই সদস্য কবি জারীর ও ফারাযদাক কবিত্ব প্রতিযোগিতায় একে অপরের গোত্রকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আক্রমণে অপমানিত করিয়াছেন। তামীমের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ চলিত; কখনও জোটবদ্ধ হইলেও তাহা হইত হিল্‌ফ (মৈত্রীচুক্তি)-এর মাধ্যমে, যাহাতে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে (নাকা'ইদ, সম্পা. Bevan, পৃ. ৬৯৯, ৭৫২)।

প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে ইসলাম-পূর্ব তামীমী গোত্রবর্গের উত্থান-পতনের ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদান সম্ভব নহে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাদি অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ এবং অন্য আরব উপজাতিদের ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত তথ্যাদি হইতে পরিমাণে অধিক; ইহার সর্বপ্রধান কারণ হইল তামীম গোত্রে বহু সংখ্যক বিখ্যাত কবির জন্ম এবং তাহাদের রচনাবলী। পরবর্তী কালে

ভাষাতত্ত্ববিদগণ ঐ সমস্ত কবিতা সংগ্রহ করেন এবং তাহার টীকা-ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই কবিতাবলীকে কেন্দ্র করিয়াই তামীমগণের ইতিহাস আবর্তিত হয়। তামীমী আয়্যাম (ايام-দিনগুলি, যুদ্ধকালীন দিনগুলি)-এর ঐতিহাসিক রেফারেন্সসমূহের বৃহদাংশের সংরক্ষণের জন্য আমরা বিশেষত আবূ 'উবায়দা (দ্র.)-এর উৎসাহ ও পাণ্ডিত্যের নিকট ঋণী (অধিকন্তু তু. আয়্যামু'ল-'আরাব)। অন্যান্য রেফারেন্সের বেলায় ইবনু'ল-কাল্‌বী (দ্র.)-এর অবদানও স্বীকার্য। এই ঐতিহাসিক বিষয়টির জন্য আমরা প্রধানত জারীর ও ফারাযদাকের নাকা'ইদ-এর গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যের নিকট ঋণী (সম্পা. A. A. Bevan, Leyden ১৯০৫-১২ খৃ.)।

'কিতাবুল আগানী-তে ও স্বল্পতর পরিসরে ইব্ন 'আবদি রাব্বিহীকৃত (ইক্‌দ, খণ্ড ৩)-এর আয়্যামু'ল-'আরাব বিষয়ক অধ্যায়সমূহে এবং ইবনুল আছীর কৃত কামিল (খণ্ড-১) গ্রন্থে তামীম উপজাতির প্রথম দিকের ইতিহাসের কিছু বিবরণ সংরক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থের পাঠ হইতে প্রাপ্ত বিবরণকে উক্ত বিবরণের সহিত সংযুক্ত করা যাইতে পারে। তবে তামীমগণের যুদ্ধগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে ও ঐতিহাসিক পরম্পরায় বিন্যস্ত করা সুকঠিন কর্ম এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যাহা হউক, প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দুইটি ব্যাপার সুস্পষ্ট ঃ (এক) প্রতিবেশী বাক্‌র ইব্ন ওয়া'ইল (বিশেষত তাহাদের ক্ষুদ্রাংশ 'আমির ইব্ন সা'সা'আ) গোষ্ঠীর সহিত তামীম গোত্রের অব্যাহত প্রতিদ্বন্দ্বিতা; (দুই) পারস্যের সাসানী রাজগণের সহিত তামীম গোত্রের বৈরী সম্পর্ক। সাসানী রাজগণ বাক্‌র ও তাগলিব গোত্রদ্বয়কে তাহাদের প্রভাবাধীন করিবার পর তামীমগণের উপর প্রভাব সম্প্রসারণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কারণ তামীমগণের অবস্থান ছিল স্থলপথে আরবের পূর্ব উপকূল এবং য়ামান-এর সহিত পারস্যবাসীদের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অবিচ্ছেদ্য হুমকিস্বরূপ। সাসানীদের সহিত তামীমগণের সম্পর্কের বিষয়ে দুইটি কাহিনী ঐতিহ্যগতভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেঃ (এক) হাজার-এ দ্বিতীয় শাপূরের অভিযান (Noldeke, Gesch. der Perser und araber, পৃ. ৫৬) এবং (দুই) খুসরাও ২য় পারভেয-এর প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত তামীমীদের রক্তক্ষয়ী শাস্তি। কারণ একটি পারস্য কাফেলা য়ামান হইতে Ctesiphon (মাদায়েন)-এ গমনের পথে যখন তামীমদের ভূখণ্ড অতিক্রম করিতেছিল তখন তামীমগণ উহাকে আক্রমণ করে (য়াওমু'ল-মুশাককার; Noldeke, Gesch. d. Perser und Araber, পৃ. ২৫৬ প.)। এই জাতীয় ঘটনা বিশেষ গুরুত্ববহ নহে; কারণ সাসানীদের ঔপনিবেশিক নীতির ফলে অনিবার্যভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরূপ ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। পালাক্রমে যখন শান্তির সময় আসিত তখন পারস্য রাজগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ আল-হীরার লাখমী সামন্তগণ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় (Concession) প্রদান করিয়া বেদুঈন উপজাতিগণকে হাত করার চেষ্টা করিত। এমন একটি সামরিক ও আর্থিক রকমের ছাড় (রিদাফা)-এর নজির ইতিহাসে দৃষ্ট হয়। তৃতীয় মুনযির-এর শাসনামলে য়ারবূ' গোষ্ঠীকে এই রিদাফা মঞ্জুর করা হয় (৫৪৪ খৃ.) এবং তিখ্‌ফা-এর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এই কারণে যে, ৩য় মুনযির এই রিদাফা য়ারবূ' গোষ্ঠী হইতে ছিনাইয়া তামীম গোত্রের অন্য শাখা দারিম-কে প্রদানের সংকল্প করিয়াছিলেন (Rothstein, Die Dynastie der Lahmiden, পৃ. ১১২-১১৩, ১৩৩; নাকা'ইদ, পৃ. ৬৬, ২৯৯), (নাকা'ইদ-এর নির্ঘণ্ট হইতে সংকলিত যুদ্ধগুলির তালিকার জন্য দ্র. E. I.; ইহাতে তামীম-এর মিত্র ও শত্রু গোত্রগুলির পরিচয় পাওয়া যাইবে)।

অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় উপজাতির মত তামীমগণ প্রথমদিকে মদীনার মুসলিম রাষ্ট্রের প্রভাববলয়ের বাহিরে থাকে। প্রতিবেশী উপজাতিগুলির উপর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিজয় এবং মধ্য আরবের উপর মুসলিম রাষ্ট্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মৈত্রীবন্ধন স্থাপনের সুবিধা অনুধাবন করে এবং দৃশ্যত ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকেই হি. ৮ সনে তামীম গোত্র মদীনাতে প্রতিনিধি দল প্রেরণপূর্বক হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর সর্বপ্রথমে তামীমগণই তাহাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পায়। রিদ্‌দা (ردة-ইসলাম ত্যাগ)-এর হাঙ্গামায় তামীমগণের যোগদান এবং নবূওয়াতের মহিলা দাবিদার সাজাহ (দ্র.)-এর ইহাতে অংশগ্রহণ কুখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা। খালিদ (রা) ইব্নু'ল-ওয়ালীদের সাহসী সামরিক অভিযান তামীমগণকে পুনরায় ইসলামের গণ্ডীতে ফিরাইয়া আনে এবং অব্যবহিত পরবর্তী কালে বিজয় অভিযানসমূহে তামীমদের সমরকুশলতার প্রকাশ ঘটে (তু. Caetani, Annali dell' Islam, ১খ. ও ২খ.-তে প্রদত্ত নির্ঘণ্ট)। ঘটনাপ্রবাহে অধিকাংশ তামীমী যোদ্ধা পারস্য অভিমুখে গমন করে এবং প্রথমত কূফা ও বস্‌রার বিখ্যাত সেনানিবাসদ্বয়ে বসতির পর তাহারা খুরাসানে গমন করে, যেইখানে 'আব্বাসী আমলে তাহারাই ছিল আরব জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু অংশ। তাহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসের আদি সূত্র তামীম গোত্রের সদস্য সায়ফ্ ইব্ন 'উমার (দ্র.)-এর বর্ণনায় কিছু অতিরঞ্জনের আশঙ্কা থাকিলেও এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, জাহিলিয়্যা যুগে তামীম গোত্র যোদ্ধাজাতরূপে যে কৃতিত্বের অধিকারী ছিল, ইসলাম গ্রহণের পরও তাহারা তাহা বজায় রাখিয়াছিল। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, তাহাদের বেদুঈন চরিত্র ছিল প্রকৃতিগতভাবেই সকল কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং এই কারণেই উমায়্যা শাসনামলে তাহারা সকল বিদ্রোহমূলক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিল। কায়স ও কাল্‌ব গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যকার সংগ্রামে তাহারা সামান্যই অংশগ্রহণ করিয়াছিল। তবে খারিজী (দ্র.) আন্দোলনে তাহারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। বস্তুত তামীমদের মধ্যেই খারিজী বিদ্রোহের প্রথমদিকের অধিক সংখ্যক অতি উৎসাহী বিদ্রোহীকে দেখা যায়। আযারিকা গোত্রের প্রধান কাতারী ইব্নু'ল-ফুজা'আ (দ্র.) স্বয়ং এবং তাহার অধিকাংশ অনুসারীই ছিল তামীম। খুরাসানে 'আব্বাসী দা'ওয়া (دعوة-আন্দোলন, প্রচার)-এর অনুসারিগণের মধ্যেও সমভাবে তাহারাই ছিল সংখ্যাগুরু। পরিশেষে তামীমের সদস্য ইব্‌রাহীম ইব্ন আগ্‌লাব-এর নাম উল্লেখ্য; তিনি ছিলেন আফ্রিকার আগ্‌লাবী (দ্র.) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ব্যাকরণবিদ ও অভিধানবিদগণ তামীমী উপভাষার বৈশিষ্ট্যের বহু সংখ্যক নিদর্শন সংরক্ষণ করিয়াছেন (দ্র. E. I.[1]-এর 'তামীম' শিরোনামে প্রবন্ধ)।

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, তামীম উপজাতির dialect (কায়স ও বাক্‌র গোষ্ঠীর উপভাষাসহ) ছিল সুপ্রাচীন আরবের উপভাষাসমূহের পূর্বাঞ্চলীয় গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এবং এই গ্রুপ পশ্চিমের উপভাষা গ্রুপ হইতে সুস্পষ্টভাবেই স্বতন্ত্র (তু. Vollers, পৃ. গ্র., পৃ. ৪ প.)। অধিকন্তু প্রকৃত আরবী ভাষার কবিতা ও বাগ্মিতার গচ্ছিত ভাণ্ডারের রক্ষক (Depository)-রূপেও তামীম গোত্র খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এই গোত্রে জন্মলাভ করিয়াছিলেন সমগ্র প্রাচীন 'আরবী সাহিত্যের ধারক কতিপয় সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল কবি, যথা আওয়া ইব্ন হাজার, সালামা ইব্ন জানদাল, সুলায়ক ইব্ন সুলাকা, 'আবদা ইব্ন তাবীর, 'আদী ইব্ন যায়দ মালিক (অন্যত্র মুতাম্মিম) ইব্ন নুওয়ায়রা, আল-মুখাল্লাব; উমায়্যা শাসনামলে প্রসিদ্ধ দুই কবি জারীর ও আল-ফারাযদাক ব্যতীত দেখা যায় কবি আল-বা'ঈছ, কুছায়্যির ছ্যাবিত কুত্‌না আওস ইব্ন মাগরা', আল-'আজ্জাজ, কবি রু'বা প্রমুখ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wustenfeld, Register, পৃ. ৪৪২-৪৪৩; (২) ইব্ন দুরায়দ, কিতাবু'ল-ইশ্‌তিকাক, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ১২৩-১৬০; (৩) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৩৭-৩৮; (৪) ইবনু'ল-কালবী, জামহারাতু'ল-আনসাব (পাণ্ডুলিপি Br, Museum Add., 23, 297), f. 62r-96r; (৫) নাকা'ইদু'ল-জারীর ওয়া'ল-ফারাযদাক, সম্পা. Bevan, স্থা.; (৬) Caussin de Perceval, Essai sur l'historire des Arabes, ২খ, পৃ. ৪৬১-৪৮৪, ৫৬৯-৬০৪।

G. Levi Della Vida (E. I.[1])/ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তামীম ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন তুম্‌গাজ (تميم بن محمد بن طمغاج) ঃ হাদীছের রাবী। উপনাম আবূ 'আবদি'র-রহ্‌মান। খুরাসানের অন্তর্গত তূস নগরীতে তাঁহার জন্ম। হাদীছ- এর সন্ধানে তিনি খুরাসান, হিজায, শাম, মিসর, ইরাক প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার উস্‌তাদগণের মধ্যে ইমাম আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বাল, ইসহাক ইব্ন রাহ্‌ওয়ায়হ্‌, শা'বান ইব্ন ফার্‌রূখ ইব্‌রাহীম ইব্নু'ল-হাজ্জাজ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্ন যুহায়র, 'আলী ইব্ন জাম্‌শিদ আল-'আদ্‌ল, আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্নু'ল-আখ্‌রাম আরও কয়েকজন। হাদীছ বিশারদদিগের দৃষ্টিতে তামীম ইব্ন মুহাম্মাদ একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। আয-যাহাবী তাহাকে 'আল-হাফিজ' 'আছ-ছিকাহ, আখ্যায় উল্লেখ করেন। আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হাকিম বলেন, 'তামীম ইব্ন মুহাম্মাদ আত-তূসী একজন উচ্চস্তরের রাবী, "আল-মুসনাদুল কাবীর" নামে তাঁহার একটি হাদীছ গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়। ২৯০ হি.-র পর তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামু'ল-বুল্‌দান, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৪খ, ৫০; (২) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', বৈরূত ১৪০০৬/১৯৮৬, ১৩খ, ৪৯৬; (৩) ঐ লেখক, তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফাজ, বৈরূত ১৩৭৪/১৯৫৪, ২খ, ৬৭৫, ৬৭৬; (৪) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশ্‌ক, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৩খ, ২৭৫।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তামীম ইব্ন যায়দ আল-আনসারী (تميم بن زيد الانصارى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর একজন সাহাবী। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আসিম আল-মাযিনী-র সহোদর ভাই ছিলেন। ইব্ন সা'দ-এর অনুসরণ করত আদ-দিময়াতী দৃঢ়তার সহিত বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ ছিলেন তাঁহার বৈপিত্রেয় ভাই। তামীম (রা)-এর পিতার নাম গাযিয়্যা ইব্ন 'আব্‌দ 'আম্‌র ইব্ন 'আতিয়্যা। 'আব্বাদ ইব্ন তামীম তাঁহার পিতা হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। তাহাতে তামীম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছি যে, তিনি উযূ করিবার পর পানি দ্বারা পা মুছিতেছেন। এই হাদীছের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইমাম বুখারী (র) স্বীয় আত-তা'রীখ গ্রন্থে এবং ইমাম আহমাদ (র), ইব্ন আবী শায়বা (র), ইব্ন আবী 'উমার (রা), বাগাবী (র), তাবারানী, বাওয়ারদী (র) প্রমুখ এই হাদীছটি আবু'ল- আসওয়াদ-এর সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেবল আবূ 'উমার হাদীছটিকে দুর্বল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম বাগাবী ও তাঁহার কিছু অনুসারী বলেন, আমাদের জানামতে 'আব্বাদ এই হাদীছটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন নাই। তবে ইমাম বাগাবীর এই মন্তব্যটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে নহে। কেননা ইব্ন মান্‌দা তাঁহার সনদে আরও দুইটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমটি হাদীছে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া সম্বন্ধে। এই হাদীছটিতে ইব্ন লাহীআ-র ভ্রম হওয়ায় উহা 'আব্বাদের পিতৃব্য হইতে বর্ণিত হাদীছ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় হাদীছটি 'আব্বাদ তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য উভয় হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-কে চিৎ হইয়া শুইতে দেখিয়াছেন। এই হাদীছটিও কেবল তাঁহার পিতৃব্য হইতে বর্ণিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তবে 'আব্বাদ এই হাদীছটি উভয়ের নিকট হইতে শুনিয়া বর্ণনা করেন নাই–এই কথাও বলা যায় না। মুহাদ্দিছ বাওয়ারদী হাদীছটিকে ইমাম যুহরী হইতে সন্দেহসূচক অব্যয় সংযোগে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে এইভাবে বলা হইয়াছে ঃ 'আব্বাদ তাঁহার পিতা অথবা পিতৃব্য হইতে এই হাদীছটি বর্ণনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, বৈরূত তা, বি., ১খ, ১৮৭; (২) ইব্ন 'আব্‌দি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, আল-ইসাবা-র হাশিয়া-য়, বৈরূত, ১খ, ১৮৭-৮৮; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৭; (৪) ইব্ন হিব্বান, কিতাবুছ ছিকাত, হায়দরাবাদ ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ৪১; (৫) ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২১৭।

আহমদ মায়মূন

তামীম ইব্ন য়া'আর আল-আনসারী (تميم بن يعسار الانصارى) ঃ (রা) একজন আনসার সাহাবী। মদীনার প্রখ্যাত খাযরাজ গোত্রে জন্ম। প্রামাণিক সূত্রে জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ তামীম ইব্ন য়া'আর ইব্ন কায়স (মতান্তরে নাস্‌র) ইব্ন 'আদী ইব্ন উমায়্যা ইব্ন খাদরা (মতান্তরে জিদারা, হাদরা) ইব্ন 'আওফ ইব্নি'ল-হারছ (মতান্তরে হারিছ) ইবনি'ল-খাযরাজ। মাতার নাম যুগায়বা বিন্‌ত রাফি' যিনি ছিলেন খ্যাতনামা সাহাবী সা'দ ইব্ন মু'আয (দ্র.) ও আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা) [দ্র.]-এর খালা। এই সূত্রে তামীম (রা) ছিলেন ইঁহাদের খালাতো ভাই। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী যুদ্ধগুলিতে তিনি শরীক ছিলেন কিনা বা তখন আদৌ তিনি জীবিত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। রিব্‌'ঈ ও জামীলা নামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল যাঁহাদের মাতা ছিলেন বানূ 'আমর ইব্ন ওয়াক্‌শ আশ-শা'ইর গোত্রের মহিলা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫৩৮; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৬, সংখ্যা ৮৫১; (৩) ইব্নু'ল আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি, ১খ ২১৯; (৪) ইব্ন-'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ১খ, ১৯২, সংখ্যা ২৩১; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৬০, সংখ্যা ৫৬৬।

ড. আবদুল জলীল

তামীম ইব্ন য়াযীদ (تميم بن يزيد) ঃ (রা) বা ইব্ন যায়দ আল-আনসারী রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী। আবূ হাশিম আল-জু'ফী বলেন, আমরা একদা কুবা মসজিদে গেলাম। তখন ভোর খুব ফর্সা হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) মু'আয (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তাহাদিগকে লইয়া সালাত আদায় করিবার জন্য। ইব্ন মানদাঃ এই হাদীছটি বর্ণনা করিবার পর বলেন, হাদীছটি এইভাবেই পাওয়া যায়। তবে ইব্ন হাজার বলেন, এই হাদীছের সনদের মধ্য হইতে রাবীর নাম ছুটিয়া গিয়াছে। 'উমার ইব্ন শাব্‌বাহ হাদীছটি ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আবূ হাশিম বলেন, তামীম ইব্ন যায়দ আল-আন্‌সারী মসজিদে কুবায় গমন করেন। তখন তিনি

তাহাদিগকে (সালাত আদায় করিতেছে না দেখিয়া) বলিলেন ঃ তোমরা সালাত আদায় করিতেছ না কেন? তাহারা উত্তরে বলিল, আমরা মু'আয-এর অপেক্ষা করিতেছি, ...এই হাদীছে মু'আযের তাহাদের সহিত সালাত আদায়, তাঁহার বিরুদ্ধে মু'আযের অভিযোগ এবং ইমাম কোথাও আবদ্ধ হইয়া পড়িলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ও রহিয়াছে। তাহাতে আরও আছে যে, মু'আয বলেন, "যেই কোন ভাল কাজের প্রতিযোগিতায় তামীম আমার চেয়ে অগ্রগামী থাকিত। শাহাদাত লাভের জন্যও আমি ও তামীম প্রতিযোগী ছিলাম। কিন্তু সে শহীদ হইয়াছে, আর আমি বাঁচিয়া আছি"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৫-৬; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ, ৫৭; (৩) ইব্নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ, ২১৮।

আহমদ মায়মূন

তামীম ইব্ন রাবী'আ (تميم بن ربيعة) ঃ (রা) ইব্ন 'আওফ ইব্ন জারাদ আল-জুহানী, রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী। হিশাম ইবনু'ল-কালবী বলেন, তিনি ইসলামের সূচনাকালে ইসলাম কবূল করেন। ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং জিহাদের সংকল্প ব্যক্ত করিয়া বৃক্ষের নীচে অন্যান্য সাহাবীর সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনিও হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য সাহাবীর ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে ইহকালে চিত্তপ্রশান্তি, আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পাশাপাশি জান্নাত প্রাপ্তির সুসংবাদও এই জগতেই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিল, তখন আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন; তাহাদিগকে তিনি দান করিলেন প্রশান্তি এবং তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যাহা উহারা হস্তগত করিবে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (সূরা আল-ফাত্হ ঃ ১৮, ১৯)। তাঁহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ বায়'আত রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী কেহ জাহান্নামে যাইবে না (দ্র. মুফ্তী মুহাম্মাদ শাফী', মা'আরিফু'ল-কুরআন, করাচী, তা. বি., সূরা আল-ফাত্হ', ৮খ, ৯৫)। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইব্ন শাহীন ও ইব্ন ফাতহূন তাঁহার নাম বৃক্ষতলে অনুষ্ঠিত বায়'আতু'র-রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৪; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৭; (৩) ইব্নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ, ২১৭।

আহমদ মায়মূন

তামীম ইব্ন সালামা (تميم بن سلمة) ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলাম যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে উঠিয়া যাইতেছে। আমি ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি লক্ষ করিলাম যে, লোকটির মাথায় পাগড়ী বাঁধা, পাগড়ীর এক প্রান্ত পৃষ্ঠের উপর ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি জিব্রাঈল। ইহা ছাড়াও 'আলী ইব্ন সা'ঈদ আল-'আস্কারী রুকূ' বা সিজদা হইতে ইমামের পূর্বে মাথা উত্তোলনকারী সম্বন্ধেও একটি মারফূ' হাদীছ সহীহ সনদে তামীম ইব্ন সালামা-র সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ইব্ন হাজার বলেন, আমার ধারণামতে হাদীছটি মারফূ' নহে, মুরসাল। কেননা তামীম ইব্ন সালামা কূফা নগরীর অধিবাসী একজন প্রখ্যাত তাবি'ঈ। যিয়াদ ইব্ন ফায়্যাদ প্রমুখ তাঁহার নিকট হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। যিয়াদ ইব্ন ফায়্যাদ কোন সাহাবী হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৫; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৭; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২১৭-২১৮।

আহমদ মায়মূন

তামীম ইব্ন সালামা (تميم بن سلمة) ঃ কূফা নিবাসী জনৈক তাবি'ঈ মুহাদ্দিছ। বানূ সালামা গোত্রের লোক। তামীম ইব্ন সালামা নামক অপর একজন মুহাদ্দিছ আছেন, যিনি বানূ খুযা'আ গোত্রের লোক। ইব্ন হিব্বান উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। আলোচ্য তামীম বিখ্যাত সাহাবী জাবির ইব্ন সামুরা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 'উর্ওয়া ইবনু'য-যুবায়র (র), সুলায়মান ইবনুয- যুবায়র (র), কাদী শুরায়হ ইবনু'ল-হারিছ (র) ও 'আবদুর রাহ্মান ইব্ন হিলাল আল-'আব্সী (র) হইতেও তিনি হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে সুলায়মান আল-আ'মাশ (র), মানসূর ইব্নু'ল-মু'তামির (র), তালহা ইব্ন মুসার্রিফ (র) ও আবূ সাখরা জামি' ইব্ন শাদ্দাদ উল্লেখযোগ্য। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য (ثقة) রাবী ছিলেন। য়াহ্য়া ইব্ন মা'ঈন (র), ইমাম আন-নাসাঈ (র), ইব্ন সা'দ (র) প্রমুখ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যয়ন করিয়াছেন। আল-বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, আন-নাসাঈ ও ইব্ন মাজা তাঁহাদের হাদীছ গ্রন্থে তামীম ইব্ন সালামা বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব ইহা তাঁহার নির্ভরযোগ্যতারই প্রমাণ বহন করে। তিনি খলীফা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর খিলাফতকালে ১০০ হি. সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, তাহ্যীবুত তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ, ৪৫০; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবুত তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ৪৯; (৩) ইব্ন হিব্বান কিতাবুছ ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৮৬; (৪) আল-বুখারী, আত-তা'রীখুল কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/১খ, ১৫৩; (৫) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ১খ, ৪৪১; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুব্রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৬খ, ২৮৭।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তামীম ইব্ন হাজার আল-আসলামী (تميم بن حجر الاسلمى) ঃ উপনাম আবূ তাওস, পিতার নাম আওস ও পিতামহের নাম হাজার। কখনও পিতামহের নামের সহিত সম্পর্কিত করিয়া তাঁহার নাম উল্লেখ করা হয়। ইব্ন হিব্বান ও তাবারানীর মতে তিনি সাহাবী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তামীম ইব্ন হাজার হইতে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। ইব্ন সা'দ-এর উদ্ধৃতি দিয়া ইব্ন মান্দা বলেন, "তামীম

ইব্ন আওস ইব্ন হাজার আল-আসলামী আল-'আরজ নামক স্থানের উপকণ্ঠে বাস করিতেন। তিনি ছিলেন মুহাদ্দিছ বুরায়দা ইব্ন সুফয়ান-এর পিতামহ।" ইব্ন মান্দা এই উক্তিটি উল্লেখ করিয়া বলেন, "ইহা ঠিক নহে। তাহার প্রকৃত নাম আবূ তামীম আওস ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন হাজার" (দ্র. ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, আওস ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন হাজার শিরো., বৈরূত, ১খ, ৯৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১৮৬; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৭; (৩) ইব্ন হিব্বান, কিতাবুছ ছিকাত, হায়দরাবাদ ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ৪১; (৪) ইব্নুল আছীর, উসদুল গাবা বৈরূত তা. বি., ১খ, ২১৬।

আহমদ মায়মূন

তামীম ইব্ন হায্লাম (تميم بن حزلم) ঃ তাবি'ঈ ও বানূয-যাব্ব গোত্রের লোক এবং কূফার অধিবাসী। উপনাম আবূ সালামা মতান্তরে আবূ হায্লাম। প্রাক-ইসলামী যুগে তাঁহার জন্ম। আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা)-এর আমলে মদীনায় সফর করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-এর অন্যতম শাগরিদ। তামীম ইব্ন হায্লাম একজন ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী ছিলেন। ইব্রাহীম আন-নাখ্'ঈ (র), সিমাক ইব্ন সালাম আয-যাব্বী (র) এবং তাঁহার পুত্র আবুল-খায়র ইব্ন তামীমসহ বহু মুহাদ্দিছ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবন সা'দ বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, তবে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ স্বল্পসংখ্যক। তাঁহার বর্ণিত হাদীছ সহীহ আল-বুখারী ও জামি'উ'ত-তিরমিযীতে রহিয়াছে। তিনি ১০০ হি. সনে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, তাহ্যীবুত তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ, ৪৪৯, ৪৫০; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবুত তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ৪৯; (৩) ঐ লেখক, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১৮৯; (৪) ইব্ন হিব্বান, কিতাবুছ ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৮৫; (৫) আল-বুখারী, আত-তা'রীখুল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/১খ, ১৫২; (৬) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ১খ, ৪৪২; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুব্রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৬খ, ২০৬।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তামীম ইব্ন হারিছ (تميم بن حارث) ঃ (রা) ইব্ন কায়স ইব্ন 'আদী ইব্ন সা'দ আল-কুরাশী, একজন মুহাজির সাহাবী কুরায়শ গোত্রের বানূ সাহম শাখায় জন্ম বলিয়া তাঁহাকে আস-সাহমীও বলা হয়। আল-ওয়াকিদী তাঁহার নাম নুমায়র (نمير) উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ছয় ভাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু'ল-আসওয়াদ তাঁহার নাম হাবশা-য় হিজরতকারীদের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম যুহরীও ইহাতে ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত তাঁহার দুই ভাই সা'ঈদ ইবনু'ল-হারিছ ও আবূ কায়স ইবনু'ল-হারিছও হাবশা-য় হিজরত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইব্ন ইসহাক তামীম ইব্ন হারিছ-এর নাম হাবশায় হিজরতকারীদের তালিকায় উল্লেখ করেন নাই। বালাযুরীর মতে তিনি হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হিজরতের সফরে তাঁহার সহিত বানূ তামীম গোত্রীয় মা'বাদ নামক এক ব্যক্তিও সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁহার চতুর্থ ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল হারিছ তা'ইফ-এর যুদ্ধে শহীদ হন। পঞ্চম ভাই আস-সা'ইব ইবনু'ল-হারিছ তা'ইফ-এর যুদ্ধে আহত হন এবং রোমানদের সহিত সংঘটিত ফিহ্ল (দ্র. য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, ৪খ, পৃ. ২৩৭)-এর যুদ্ধে শহীদ হন। ষষ্ঠ ভ্রাতা আল-হাজ্জাজ ইবনু'ল হারিছ বদ্র-এর যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়া মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পিতা হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আদী মুসলমানদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের দলভুক্ত ছিলেন। তাহারা বলিত بل نحن مستهزؤن "আমরা তো তাহাদের সহিত ঠাট্টা-তামাশা করি' (২ ঃ ১৪)। তাহাকে তাহার বানূ কিনানা গোত্রীয় মাতার নামানুসারে ইবনু'ল-গায়তালা বলা হইত।

তামীম ইব্ন হারিছ শামের আজনাদায়ন (বা আজনাদীন, দ্র. য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, ১খ, পৃ. ১০৩) নামক স্থানে মুসলিম ও রোমান বাহিনীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে শহীদ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১৮৬; (২) ইব্ন 'আব্দিল-বার, আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবা-র হাশিয়া-য়), বৈরূত তা. বি., ১খ, ১৮৫-১৮৬; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৭; (৪) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২১৬।

আহমদ মায়মূন

তামীম ইবনু'ল-মু'ইয্য (تميم بن المعز) ঃ বানূ যীরীর সানহাজা পরিবারের পঞ্চম শাসক, যিনি ৪৫৪/১০৬২ সন হইতে ৫০১/১১০৮ সন পর্যন্ত পূর্ব বার্বারী (উত্তর আফ্রিকা) শাসন করেন। তিনি আল-কায়রাওয়ান-এর নিকটবর্তী সাবরা মানসূরীয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন 'ইযারী তাঁহাকে লম্বাকৃতি সুন্দর চেহারার সুপুরুষ হিসাবে বর্ণনা প্রদানপূর্বক তাঁহার জীবনযাত্রার কতিপয় অপূর্ব বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি উঁচু মানের সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সিংহাসনের অধিকারী কবিগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও স্মরণীয় হইয়া আছেন।

যখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর ছিল ৪৪৫/১০৫৩ তাঁহার পিতা আল-মু'ইয্য তাঁহাকে আল-মাহদীয়া (দ্র.)-এর গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইহা ছিল বানূ হিলাল আরবগণের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই যখন ইতিমধ্যে তাহারা আল-মু'ইয্য-এর সেনাবাহিনীকে দুই-একটি চরম পরাজয় বরণে বাধ্য করিয়া ইফ্রীকিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করিয়াছিল। চার বৎসর পরে ৪৪৯/১০৫৭ সনে আল-মু'ইয্য তাঁহার রাজধানী কায়রাওয়ান ত্যাগ করেন। কারণ তথায় তাঁহার শাসন আর অব্যাহত রাখা সম্ভবপর ছিল না। তিনি আল-মাহদীয়াতে তামীম-এর শরণার্থী হিসাবে সসম্মানে গৃহীত হন। এই সময় হইতে তামীম রাষ্ট্রের কাজকর্ম একাই পরিচালনা করিতেন এবং আল-মু'ইয্য-এর ইনতিকাল (৪৫৪-১০৬২)-এর পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশে সিংহাসনে আরোহণ করা সত্ত্বেও তামীম খুব উল্লেখযোগ্য শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিকভাবে তাঁহার অধিরাজ্য মাহদীয়া শহর হইতে তিনি প্রাক্তন গভর্নরগণ, আরব আমীরগণ অথবা সামান্য অভিযানকারিগণ কর্তৃক স্বাধীন রাজশাসিত রাষ্ট্রসমূহে বিভক্ত ইফ্রীকিয়া রাজত্বের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়বর্গের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। শেষোক্তগণ ছিলেন কাল'আ-র বানূ হাম্মাদ, যাহারা আল-কায়রাওয়ানের দুর্বল রাজতন্ত্রের সমস্যাবলীর সুযোগ গ্রহণের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। এমতাবস্থায় তিনি আরবদের বিভিন্ন দলের মধ্যে

বৈরিতার সুযোগ গ্রহণপূর্বক সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বানূ রিয়াহগণের সহযোগিতা অর্জনে সক্ষম হন। ঝুঁকিপূর্ণ এই মৈত্রী বন্ধনের সাহায্যে তিনি আল-মাহদীয়ার বিরুদ্ধে হাম্মাদী আন-নাসির-এর পরিকল্পনাসমূহকে নস্যাত করেন।

তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা, অন্যভাবে, প্রধানত উপকূলীয় শহরগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি ঐগুলির বিরুদ্ধে অনেক অভিযান প্রেরণ করেন, যাহার সাফল্য ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। তিনি সূস পুনর্দখলে সক্ষম হন, তিউনিসের বানূ খুরাসানকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং গাবেস-এর নিকট ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি ইহা অধিকার করেন, সফাক্স-এর শহরতলী ধ্বংস করেন এবং অতঃপর ইহাতে প্রবেশ করেন। তাঁহার আল-মাহদীয়া ঘাঁটিই প্রবল হুমকির সম্মুখীন হয়। ১০৮৪ খৃ. আরবগণ ইহাকে অত্যন্ত প্রবলভাবে অবরোধ করে।

উপকূলীয় শহরসমূহ দখলের পরিকল্পনা তামীমকে সমুদ্রাভিমুখে পরিচালিত করে। আর ইত্যবসরে স্থলভাগসমূহ তাঁহার হাতছাড়া হইতে থাকে। এই প্রসঙ্গে তাঁহার পিতার অনুসরণে তিনি নর্মানগণ কর্তৃক সিসিলি বিজয় রোধে সচেষ্ট হন। উহাতে ব্যর্থ হইয়া তিনি জলদস্যুসুলভ আক্রমণাদি জোরদার করেন। খৃষ্টান পক্ষে, ইহা জেনোয়াবাসী এবং পিসানদের মধ্যে একটি মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয় যাহারা ৬ আগস্ট, ১০৮৭ সনে মাহদীয়া দখলপূর্বক শহরটিকে লুণ্ঠন করে। ১১০৪ খৃ. রোমানগণ (?) শহরটিকে পুনরায় আক্রমণ করে, যাহা তাহাঁদিগের জন্য দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি বহিয়া আনে। চার বৎসর পরে ১১০৮ খৃ. তামীম ৭৮ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে মোনাসতিরে কাসরু'স-সায়্যিদাতে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, অনু. de Slane (Biographical Dictionary), ১খ, পৃ. ২৮১-২৮৪; (২) ইব্ন 'ইযারী, বায়ানু'ল-মুগরিব, সম্পা. Dozy, ১খ, পৃ. ৩০৭-৩১৩; (৩) অনু. F. Fagnan, ১খ, পৃ. ৪৪৪-৪৫৪; (৪) ইব্ন খালদূন, Hist. des Berberes. সম্পা. de Slane, ১খ, পৃ. ২০৬-২০৭; (৫) অনু., ২খ., পৃ. ২২-২৪; (৬) ইবনু'ল-আছীর, কামিল, সম্পা. Tornberg, ৯খ., পৃ. ৩৮৯; (৭) ১০খ., পৃ. ১০, ১৯, ৩০, ১০৫, ১০৯-১১০, ১১৯, ১৩২-১৩৩, ১৭৫, ৩১৪-৩১৫; (৮) অনু. F. Fagan (Annales du Maghreb), পৃ. ৪৬০. ৪৭০ প., ৪৮৬ প., পৃ. ৪৯০, ৫০১, ৫০৯-৫১০, ৫১৫-৫১৭; (৯) ইব্ন আবী দীনার (আল-কায়রাওয়ানী), মু'নিস, অনু. Pellissier and Remusat, পৃ. ১৪৫-১৪৭; (১০) আত-তীজানী, রিহ্লা, অনু. Rousseau, F. As. -এ, ১৮৫২ খৃ., ২খ., পৃ. ১৩০ প.; (১১) ১৮৫৩, ১খ, পৃ. ৩৭০ প.; (১২) Mas Latrie, trates des paix, ১খ., পৃ. ২৯-৩০; (১৩) হাসান 'আবদু'ল ওয়াহ্হাব, আল-মুনতাখাবাতুত তূনিসীয়া, তিউনিস ১৩৩৭ খৃ., পৃ. ১০১-১০৪; (১৪) G. Marcais, Les Arabes en Berberie, পৃ. ১২৪-১২৫, ১৩৪-১৩৯, ১৪২-১৪৩।

G. Marcais (E. I. [1])/ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তামীম ইব্নুল মু'ইয্য (تميم ابن المعز) ঃ পঞ্চম ফাতিমী খলীফা আল-'আযীযের ভ্রাতা। কথিত আছে যে, তিনি আনু, ৩৩৭/৯৪৮-৪৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে তিনি তাঁহার সংস্কারমুক্ত ও সুকুমার সাহিত্যপ্রীতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যের নায়ক। বিশুদ্ধ সংস্কৃতি চেতনা ও নৈপুণ্যে সমসাময়িকগণের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছিল। খিলাফাতের ভাবী উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি মনোয়ন লাভে ব্যর্থ হন। এই ব্যাপারে তাঁহার ভ্রাতা আল-'আযীযকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। কায়রোয় যুল-কা'দা ৩৭৪/এপ্রিল ৯৮৫ সনে তাঁহার মৃত্যুতে আল-'আযীযের মনস্তাপে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আল-'আযীয তামীমের খুব অনুরক্ত ছিলেন। কারাফা সমাধিক্ষেত্রে জানাযা সালাতের পর তাঁহার লাশ রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে দাফন করা হয়। কিন্তু তাঁহার ইনতিকালের সঠিক বর্ষ সম্পর্কে মতপার্থক্য রহিয়াছে। ইব্ন তাগরীবিরদীর বর্ণনা অনুসারে ইহা ৩৬৮ হি. সনে ঘটিয়াছিল। ইব্ন খাল্লিকান তাঁহার ওয়াফায়াতুল-'আয়ান গ্রন্থে তামীমের কবিতাবলীর নমুনা প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, অনু. de Slane, ১খ, পৃ. ২৭৯ প.; (২) ইব্ন দুকমাক, কিতাবুল ইনতিসার, ৪খ, পৃ. ৮৫; (৩) আবূ সালিহ, Churches ana Monasteries of Egypt, অনু. Evetts, পত্রক ৪১ক; (৪) ইব্ন তাগরীবিরদী, Annals, সম্পা. Popper, পৃ. ২৩, ৮; (৫) ইব্ন সা'ঈদ, কিতাবু'ল-মুগরিব, অনু. Tallquist, ১খ, ৯১ প.; (৬) য়াকূত, Geogr., সম্পা. Wustenfeld, ৪খ, পৃ. ৮৬৫।

J. Walker (E.I. [1])/ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তামীম ইব্নুল-মুন্তাসির (تميم بن المنتصر) ঃ (র) ইব্ন তামীম ইব্নু'স-সালত ইব্ন তাম্মাম ইব্ন লাহিক আল-হাশিমী, একজন মুহাদ্দিছ। তিনি হি. ১৭৬ মতান্তরে ১৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার পিতা আল-মুন্তাসির, সুফ্য়ান ইব্ন 'উয়ায়না, মুহাম্মাদ ইব্ন যায়দ, ইস্হাক ইব্ন য়ূসুফ আল-আয্রাক, য়াযীদ ইব্ন হারূন, শায়য ইব্ন য়াযরা প্রমুখ হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে তৎপুত্র আল-মুন্তাসির ও তাঁহার ভাগিনেয় আসলাম ইব্ন সাহ্ল, বাকিয়্যি ইব্ন মাখলাদ, জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আহ্মাদ, ইব্ন আবি'দ-দুন্য়া ও ইব্ন জারীর উল্লেখযোগ্য। হাদীছবিশারদগণের দৃষ্টিতে তামীম ইব্নু'ল-মুন্তাসির (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ, আন-নাসাঈ, আল-জি'আবী প্রমুখ তাঁহার নাম একজন ছিক্বাহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সুনানু আবী দাউদ, সুনানু'ন-নাসাঈ ও সুনানু ইব্ন মাজা গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি হি. ২৪০ বা ২৪৪ সালে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৬৯ বা ৬৮ কিংবা ৭৬ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, তাহ্যীবুত তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ, ৪৫১, ৪৫২; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবুত তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ৪৯, ৫০; (৩) ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ১খ, ৪৪৪।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তামীম আল-গানামী (تميم الغنمى) ঃ (রা), মাওলা গানাম ইব্নুস-সিল্ম ইব্ন মালিক ইব্নু'ল-আওস ইব্ন হারিছা আল-আনসারী আল-আওসী একজন দাস সাহাবী। তিনি ছিলেন গানাম ইব্নুস সিল্ম-এর মুক্তদাস। হিশাম-এর বর্ণনামতে তিনি সা'দ ইব্ন খায়ছামা (রা)-এর মুক্তদাস। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইব্ন আবী শায়বা সূত্রে বর্ণিত, জাবির (রা) বলেন, ছয়জন অনারব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, বিলাল ও তামীম তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৬, সংখ্যা ৮৫৪; (২) ইব্নুল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ, ২১৯; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৪৮৩; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ১খ, ১৯৩, সংখ্যা ২৩৪; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৯, সংখ্যা ৫৬১।

ড. আবদুল জলীল

তামীম আদ-দারী (تميم الدارى) ঃ (রা) সাহাবী, নিসবা আদ-দারী।

বংশ পরিচয় ঃ তামীম দারী (রা) য়ামানী, কাহতানী আরব, লাখ্ম ইব্ন 'আদিয়্যির শাখা আদ-দার ইব্ন হানী ইব্ন হাবীব ইব্ন নুমারা ইব্ন লাখ্ম গোত্রের ছিলেন যাহা জুযাম ও কিন্দা গোত্রের সমগোত্রীয়। লাখ্ম ও জুযাম-এর গোত্র য়ামান হইতে বাহির হইয়া সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তামীম (রা)-এর খান্দান ফিলিস্তীনে বসবাসরত ছিল। তাঁহার আদ-দারী নিসবা আদ-দার ইব্ন হানী হইতে এবং আদ-দায়রী দায়র (মঠ) হইতে। ইহা এইজন্য যে, ৯ হি.-তে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি এক দায়র-এ রাহিব (راهب-সন্ন্যাসী) ছিলেন [আন-নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা' (Wustenfeld), ১৭৮ (কায়রো সং., ১খ, ১৩৮, ইসাবা)]।

তামীম (রা)-এর পৈতৃক বংশ পরিচয় নিম্নরূপ ঃ তামীম ইব্ন আওস ইব্ন খারিজা (ইসাবায় হারিছা ইব্ন সূদ, ইসতী'আব-এ সাওয়াদ, ইব্ন খুযায়মা (ইসাবা ও তাহযীব-এ জাযীমা) ইব্ন যিরা' (ইসাবায় দিরা' এবং তাহযীব-এ বিদা') ইব্ন 'আদিয়্যি ইব্ন আদ-দার (তু. Wustenfeld, Gen, Tabellen, পৃ. ৫, লা. ২৫; তাবারী, সম্পা. de Goeje, ৩খ., ২৫৪২, ২৫৪৫; ইব্ন সা'দ, ২/৭খ, ১২৯-৩০; সাম'আনী, ২১৮ খ.)। নামের বিভিন্নতা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নহে। কেননা লেখার মধ্যে বর্ণশুদ্ধি হইয়া থাকিবে। তাঁহার এক কন্যার নামে তাঁহার কুন্য়া (ডাকনাম) ছিল আবূ রুকায়্যা, তাঁহার আর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

সাধারণ অবস্থা ঃ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁহার সমগ্র গোত্রের মতই খৃস্টান ছিলেন ও তাঁহার জীবন ছিল নিষ্ঠাবান ধার্মিকের। অনন্তর তিনি ফিলিস্তীনীদের মধ্যে রাহিব ও 'আবিদ ছিলেন। তাহযীবু'ত-তাহযীব নামক গ্রন্থে এই তথ্য প্রদান করা হইয়াছে যে, তিনি ওল্ড টেস্টামেন্ট (পুরাতন নিয়ম) ও নিউ টেস্টামেন্ট (নূতন নিয়ম)-এর অনুসারী অর্থাৎ য়াহূদ ও নাসারার অন্যতম 'আলিম ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তাবূক যুদ্ধ হি. ৯ সালে রাজাব মাসে সংঘটিত হয়। তিনি এই যুদ্ধের পূর্বে ঐ বৎসরেই সিরিয়া হইতে মদীনা আগমন করেন। সঙ্গে তাঁহার গোত্রের কয়েকজন লোক ছিল। সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী যুগে মদীনাতেই অবস্থান করেন। ইব্ন হিশাম (পৃ. ৭৭৭) দারীদের এই প্রতিনিধি দলের নয়জন সদস্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) খায়বারের ভূমিতে ওসিয়াত করিয়াছিলেন।

ইব্ন ইসহাকের বরাতে ইসাবার রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, তামীম দারী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর মাত্র একটি যুদ্ধই হইয়াছে সেইজন্য অনুমিত হয় যে, তাবূক যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তামীম দারী (রা) হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতকাল পর্যন্ত মদীনাতেই অবস্থান করেন এবং সেই আমলে সংঘটিত ফিতনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর হি. ৩৫ সালের পর সিরিয়ায় বসবাস করেন।

সিরিয়ায় কোন্ শহরে তিনি ছিলেন? উসদু'ল-গাবায় রহিয়াছে যে, তিনি ফিলিস্তীনে অবস্থান করেন। তাহযীবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বায়তু'ল-মাকদিসে তিনি অবস্থান করেন যাহা ফিলিস্তীনেরই একটি শহর। বায়তু'ল-মাকদিসের নিকটবর্তী একটি বিখ্যাত গ্রাম রহিয়াছে, উসদু'ল-গাবা উক্ত গ্রামের নাম 'আয়নুন বলিয়াছে। গ্রন্থকারের মতে, তামীম (রা)-কে উক্ত গ্রামটি রাসূলুল্লাহ (স) জায়গীরস্বরূপ দান করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য একটি পত্রও লিখাইয়া দিয়াছিলেন।

ইসাবা গ্রন্থে (আবূ হিন্দ দারী শিরো.) ইহার ব্যাখ্যা এইভাবে করা হইয়াছে যে, তামীম এবং তাঁহার সঙ্গী-সাথীবৃন্দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দরখাস্ত পেশ করেন যে, "তাঁহাদিগকে সিরিয়ায় একখণ্ড ভূমি প্রদান করা হউক।" তিনি তাহাদের নামে একটি ফরমান লিখাইয়া দেন। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাত আমলে এই সমস্ত লোক উক্ত ফরমান লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি আবূ 'উবায়দা (রা)-এর নামে নির্দেশ পাঠান যে, "ফরমান অবিলম্বে পালিত হউক।" হাফিজ ইব্ন হাজার-এর বর্ণনা যে, মুবারক ফরমানটি অত্যন্ত মশহূর এবং তাহা তামীম (রা)-এর বংশধরদের নিকট আছে এবং আমি ইহা সম্পর্কে একটি পুস্তিকা লিখিয়াছি যাহার নাম البناء الجليل بحكم بلد الخليل। সিরিয়া বিজয়ের বহু পূর্বে এই ভূমি সম্পর্কে ফরমান প্রদান নবূওয়াতী বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। আবূ হিন্দ দারী (রা) যাঁহার জীবনীতে উক্ত ফরমানের প্রাক্তন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণিত, ইসারা (তামীম শিরো.)-র দৃষ্টিতে তামীম (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন।

সিরিয়া বিজয়ে বেশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। ফিলিস্তীনের উপর হামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) হযরত 'আম্র (রা) ইব্নু'ল-'আসকে নির্দেশ দিয়াছিলেন কিন্তু এই এলাকা সিদ্দীকী খিলাফাত আমলে বিজিত হয় নাই। সম্ভবত এতদুদ্দেশেই তামীম (রা) প্রমুখ মদীনায় অবস্থান করিতে থাকেন। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলে বায়তু'ল-মাকদিস বিজিত হইবার পর হুকূমাত সুসংহত হইবার সুযোগ লাভ করে। ১৯ হি. শাওওয়াল মাসে হযরত মু'আবিয়া (রা) যখন কায়সারিয়া জয় করিয়া ইহাকে ইসলামী শাসনাধীনে আনয়ন করেন তখন সিরিয়া পরিপূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া যায়। বিজয় সম্পূর্ণ হইবার পর হযরত 'উমার (রা) অথবা হযরত 'উছমান (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফরমান মুতাবিক তামীম (রা)-কে 'আয়নুন (عينون) নামক গ্রামখানি জায়গীর হিসাবে দিয়া থাকিবেন এবং যেহেতু ইহা বায়তু'ল-মাকদিসের নিকটবর্তী ছিল সেইজন্য তামীম (রা) দীন ও 'ইলম-এর খিদমতের জন্য বায়তু'ল-মাকদিসেই স্বীয় বাসকেন্দ্র স্থাপন করেন।

তামীম (রা)-এর জীবন নববী যুগে এবং খিলাফাত (রাশিদা) আমলে একইভাবে অতিবাহিত হয়। মদীনা ও সিরিয়া এই উভয় স্থানেই তিনি সংসারবিরাগী (زاهدانه) জীবন যাপন করেন। মদীনায় অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওসিয়াত মুতাবিক [ইব্ন হিশাম, ৭৭৬; এই ওসিয়াত নবী (স) মৃত্যুশয্যায় করিয়াছিলেন] খায়বার হইতে যাহা কিছু পাইতেন এবং সিরিয়া পৌঁছিবার পর 'আয়নুন গ্রামের আমদানি বাবদ যাহা মিলিত তাহা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। অবশিষ্ট সময় 'ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত হইত। কখনও কখনও ওয়া'জ -নসীহতও করিতেন। 'ইবাদতের অবস্থা ছিল এই যে, কতক

মুহূর্তে এক রাক'আতেই পুরা কুরআন মাজীদ খতম করিতেন (ইব্ন হাজার, তাহযীব)। অত্যধিক তাহাজ্জুদ সালাত পড়িতেন। একবার কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ পাঠের মধ্যে গোটা রাত কাটাইয়া দেন। বারবার রুকূ' করিতেন, সিজদা করিতেন এবং ক্রন্দন করিতেন (উসদু'ল-গাবা)।

হযরত 'উমার (রা)-এর যুগ হইতেই তিনি ওয়া'জ শুরু করিয়াছিলেন। লিখিত আছে যে, ইসলামে প্রথম কাসস্ (ওয়া'ইজ) ছিলেন তিনি (اول من قص)। এইজন্য তাঁহাকে "কাস্য" বলা হইত (তু. Goldziher, Muh. stud., ২খ., পৃ. ১৬১, শিরো.; নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা', পৃ. ১৭৮, কায়রো সং, পৃ. ১৩৮। প্রকৃতপক্ষে কিসসা (দ্র.)-র এই সাহিত্যিক কাহিনীর মধ্যে সেই সমস্ত কিসসাও শামিল, যেই সমস্তের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া, দাজ্জাল (দ্র.) এবং জাস্যাসা (জাসসাসা-অত্যধিক লোমযুক্ত বিকট মাদী প্রাণী যাহার ঘন দীর্ঘ লোমের দরুন আগাপাছা নির্ণয় দুষ্কর) (মুসলিম, ১৮খ, ৩ বাব, পৃ. ৮১, ৮২, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৭২ খৃ., দাজ্জালের মতই ঘৃণিত)-এর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় [নাওয়াবী উল্লিখিত স্থানে সহীহ মুসলিমের বরাতে লিখিয়াছেন যে, নবী (স)-এর নিকট তামীম (রা) জাসসাসার কিসসা বর্ণনা করেন এবং এই গৌরবময় প্রশংসায় অপর কেহ তামীম (রা)-এর সহিত শরীক নয়] (উসদু'ল-গাবাতে লিখিত হইয়াছে যে, তামীম দারী (রা) ওয়া'জ করিবার জন্য হযরত 'উমার (রা)-এর নিকট হইতে অনুমতি লইয়াছিলেন)।

তামীম (রা)-এর একটি দীনী খিদমত এই যে, তিনিই মসজিদে নববীতে প্রদীপ জ্বালান। এতদসম্পর্কে উসদু'ল-গাবা পুস্তকে (সিরাজ শিরো.) এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'তামীম (রা) মসজিদে নববীতে কিনদীল (প্রদীপ, লণ্ঠন) টাঙাইয়া যায়তুন তৈলের প্রদীপ জ্বালান। অপরাপর সাহাবীদের প্রদীপ ছিল এই যে, খর্জুর বৃক্ষের শাখায় মশাল জ্বালাইয়া আনিতেন। ইহার অর্থ হইল, রাত্রিকালে মসজিদে নববীতে আগেও আলো থাকিত, কিন্তু তাহা লণ্ঠনের ভেতর নয়; বরং তখন মশাল জ্বলিত। তামীম (রা) আলোকের উৎসকে একটি নিয়মিত এবং অধিকতর উপযোগী রূপ দান করেন। ইহার পর হইতে লণ্ঠনের সাধারণ রেওয়াজ হইয়া যায় যাহা পরবর্তী কালে ঝাড়বাতি এবং ফানূস আকারে দেদীপ্যমান হয়" [তু. Clermont-Ganneau, R. H. R. সংখ্যা ৮১, (১৯২০ খৃ.), পৃ. ২৪৭ প; Recueil d'Archeologie Orientale; ৮খ, ২১৬ প.; La lampe et L'ovivier dans le Coran]।

হযরত তামীম দারী (রা)-র মৃত্যুসন তাহযীব ব্যতিরেকে আর কোথাও উল্লেখ নাই। হাফিজ ইব্ন হাজার উল্লিখিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কেহ বলেন যে, তাঁহার কবরের উপর এইটুকু পাওয়া গিয়াছে যে, "তিনি ৪০ হি-তে ইনতিকাল করিয়াছেন।" সম্ভবত কেহ তাঁহার সমাধির উপর শিলালিপি লাগাইয়া দিয়া থাকিবে। তাঁহার ওফাত ফিলিস্তীনের একটি শহর বায়ত জীরীন নামক স্থানে হইয়াছে (ইসাবা)।

তামীম দারী (রা) বিশেষ স্বভাবের বুযুর্গ ছিলেন। 'আবিদ ('ইবাদতগুযার, উপাসক) ও যাহিদ (ধর্মনিষ্ঠ, সাধক) হইবার কারণে তিনি সাধারণ সাহাবীদের ব্যতিক্রম কোন সাধকসুলভ রীতিনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার উল্লেখ সুস্পষ্ট ও খোলাখুলি করা হইয়াছে كان له هيئة ولباس (তাঁহার ছিল বিশেষ চেহারা ও পোশাক) (উসদু'ল-গাবা)।

তামীম দারী (রা) যদিও বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্বীয় প্রাচীন ধর্মের অন্যতম 'আলিম ছিলেন বিধায় এই নূতন ধর্মে প্রবেশের পরও তাঁহার জ্ঞান-স্পৃহা পূর্ববৎ কায়েম থাকে এবং তাঁহাকে ইসলামের 'আলিমগণের মধ্যে পরিগণিত করা হইতে থাকে। বহু সাহাবী তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব সাহাবীর মধ্যে হযরত ইব্ন 'উমার, ইব্ন 'আব্বাস, আবূ হুরায়রা, আনাস ইব্ন মালিক, যুরারা ইব্ন আওফা (রা) এবং তাবি'ঈদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাওহাব, সুলায়ম ইব্ন 'আমির, শুরাহবীল ইব্ন মুসলিম, কাবীসা ইব্ন যুওয়ায়ব, 'আতা' ইব্ন য়াযীদ লায়ছী, রাওহ ইব্ন যিন্বা', শাহর ইব্ন হাওশাব, 'আবদুর-রাহ্মান ইব্ন গানাম (র) প্রমুখ শামিল ছিলেন।

এইসব বর্ণনার মধ্যে একটি বিশেষ বর্ণনা আছে, যাহা রাসূলুল্লাহ (স) তামীম হইতে উদ্ধৃত (নকল) করিয়াছেন। এইজন্য হাদীছের 'আলিমগণ এই মূলনীতি নির্ধারণ করিয়াছেন যে, যাঁহার আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয় এমন ব্যক্তি (متبوع) তাঁহার অনুগত ও অনুসরণকারী ব্যক্তি (تابع) হইতে অথবা জ্ঞানীর (فاضل) পক্ষে জ্ঞানের জগতে তদপেক্ষা নিম্ন স্তরের লোক (مفضول) হইতে রিওয়ায়াত জা'ইয। দ্বিতীয় যে মূলনীতি পাওয়া যায় তাহা এই যে, খাব্র-ই ওয়াহিদ (দ্র.) গ্রহণ করা যাইতে পারে। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই বৈশিষ্ট্য যে, রাসূলুল্লাহ (স) একজন সাহাবীর রাবী (দ্র.) তাহা তামীম (রা)-এর বিরাট মর্যাদার পরিচায়ক।

এই রিওয়ায়াত হযরত ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা) হইতে সাহীহ মুসলিম (كتاب الفتن واشراط الساعة : باب فى خروج الدجال)-এ উদ্ধৃত হইয়াছে সেইখানে ইহা দেখা যাইবে। প্রায় একই শব্দসমষ্টি রহিয়াছে আবূ দা'উদ (৪খ, ১১৮), ইব্ন মাজা (২খ, ২৬৩) এবং মুসনাদ আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (৬খ, ৪১১)-এ, কিন্তু সাহীহ বুখারী, তিরমিযী এবং নাসা'ঈতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না] (সা'ঈদ আনসারী)।

পরবর্তী কালে উক্ত রিওয়ায়াতকে নবী কারীম (স)-এর ওফাত-পরবর্তী ঘটনা হিসাবে অভিহিত ও অন্যভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ ইহা সামুদ্রিক তুফানে জাহাজের ধ্বংস ছিল না, যাহার কারণে তামীম (রা) অপরাপর জগতের রহস্যসমূহ অবগত হন, বরং তাঁহাকে রাত্রিবেলা একটি জিন ঘর হইতে উঠাইয়া লইয়া যায়। তিনি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন অজ্ঞাত দেশের উপর দিয়া অতিক্রম করেন। ঐ সমস্ত দেশে অত্যাশ্চর্য ও বিস্ময়কর রকম মাখলুকের বসবাস ছিল। মোটকথা, কয়েক কিসিমের বিস্ময়কর ও অত্যদ্ভুত বিষয়ের সম্মুখীন করিবার পর যন্মধ্যে আদ-দাজ্জাল ও আল-জাসসাসার সাক্ষাত শুধুমাত্র একটি বিরল ও ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হইবার দাবি রাখে, একজন ফেরেশ্তা তাঁহাকে মেঘের উপর আরোহণ করাইয়া তাঁহার গৃহে ফিরাইয়া আনেন।

তিনি মারা গিয়াছেন এই ধারণায় তাঁহার স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী সমস্যায় পড়েন। তামীম (রা) এই সমস্যাটি খলীফা 'উমার (রা)-এর সামনে পেশ করেন এবং তিনি ('উমার) মামলাটি হযরত 'আলী (রা)-কে সোপর্দ করেন। তিনি বলেন যে, নবী কারীম (স)-এর পূর্বেই জানা ছিল যে, তামীম-এর উপর কী আপতিত হইবে এবং এই সিদ্ধান্ত দেন যে, মহিলা উভয় স্বামীর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারে। মহিলা তাহার পূর্ব-স্বামী তামীম (রা)-এর নিকট ফিরিয়া যাওয়াকেই উত্তম বিবেচনা করে। বর্ণনার এই রূপ যন্মধ্যে দুইটি উপাদান রহিয়াছে অর্থাৎ অত্যদ্ভুত শহরসমূহ পরিভ্রমণ এবং সেই ব্যক্তির প্রত্যাবর্তন, যাহাকে মৃত মনে করা হইয়াছিল–দূর-দূরান্তে গিয়া পৌঁছে এবং ইহার তুর্কী, মালয় ও

স্পেনীয় রূপ বিদ্যমান। আরবী মূল পাঠ (متن)-এর একটি পাণ্ডুলিপি যাহা হইতে উল্লিখিত বর্ণনা লওয়া হইয়াছে R. Basset "Les aventures merveilleuses .de Temim el-Dari নামে Giorncle della Societa Italiana, ৫খ, (১৮৯১ খৃ.), ৩-২৬-এ আলজিরিয়ার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে যাহার খোঁজ তিনি প্যারিস, অক্সফোর্ড ও লাইডেন, তিউনিসে করিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত আরও পাণ্ডুলিপিসমূহ যোগ করা যাইতে পারে। ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১০৪৪, (৮) বার্লিনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৯০৬৬ ও ৯০৭০, ৯১০৫-৯১২২। এই মূল পাঠ (متن) কায়রোতেও একটি লোকপ্রিয় প্রেসে ছাপা হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, ইহা বলা অসম্ভব যে, এই বর্ণনা কবে বাস্তব রূপ লাভ করিয়াছে। Basset লিখিতেছেন যে, আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭২৭ হি.) এই কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন যাহা অনেকাংশে আমাদের মূল পাঠের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ (اعجائب البر والبحر, Mehren সং., ১৪৯) [কিতাব খানাহ পাঞ্জাব য়ুনিভার্সিটি (মাজমূ'আহ শীরানী, সংখ্যা ২৮২)-তে ফারসী ভাষার একটি গদ্য পুস্তিকা রহিয়াছে। ইহাতে তামীম আনসারী (রা)-র "কিসসা" স্থান পাইয়াছে, বিষয়বস্তু কমবেশি তাহাই যাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'আদ-দারী" নিসবাত-এর পরিবর্তে আছে 'আনসারী"। ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত Ethe সংকলিত পাণ্ডুলিপির তালিকাসূচির ৮৫৯ সংখ্যা, ক, (১)-এর উপরও ইহার সদৃশ মূল পাঠ বিদ্যমান। অধিকন্তু দ্র. উল্লিখিত তালিকাসূচী, সংখ্যা ৮৫৮, মাজমূ'আ (সংক্ষিপ্তসার) শীরানী, সংখ্যা ১৩৫০, দাখানী উর্দূর একটি (ناقص الاخر-শেষাংশহীন) মাছনাবী আছে যাহা এই কিসসা-কাহিনীসম্বলিত। কবির তাখাল্লুস (কবি নাম) গুলামী (ইহার জন্য দেখুন সায়্যিদ মুহ্‌য়ি'দ-দীন কাদিরীকৃত উর্দূ শাহপারে, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯২৯ খৃ, পৃ. ১৭০; য়ূরোপে নাসীরু'দ-দীন হাশিমীকৃত দাখানী মাখ্‌তূতাত, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য (১৩৫০ হি., ৬৬৭ হি.)। গুলামীর ভাষ্যে এই তাখাল্লুস তিনি কিসসাতে ব্যবহার করিয়াছিলেন, মারছিয়্যা (শোকগাঁথা)-র ক্ষেত্রে তাঁহার তাখাল্লুস গুলাম রাসূল, রেখতায় মাতলাব এবং প্রশংসা ও স্তুতির ক্ষেত্রে আনওয়ার। জন্মসূত্রে তিনি সূরাটী এবং বসবাস সূত্রে কুনবায়াতী। আসিফিয়্যা যুগের এই কবি কাব্যক্ষেত্রে ফিদার শাগরিদ, যিনি আসল ফারসী গদ্য কিসসা গুলামীকে প্রদান করেন এবং গুলামী উহা হিন্দী ভাষায় ভাষান্তরিত করেন]।

ভিন্ন এক ধরনের অন্য একটি ঘটনাও তামীম আদ-দারী (রা)-র খ্যাতির কারণ হয় (যাহার আলোচনা উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে)। নবী (স)-এর খিদমতে তিনি হাযির হইয়া তাঁহার সমীপে দরখাস্ত পেশ করেন যে, হেবরন, আল-খালীল (দ্র.) যেইখানে তামীম বাল-বাচ্চাসমেত থাকেন উহা যেন তাহাকে ও তাহার বংশধরকে জায়গীর (কাতী'আ, তু. ইকতা' শিরো.) হিসাব দেওয়া হয়। নবী (স) তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। অথচ তখনও ফিলিস্তীন (রোমান অর্থাৎ) বায়যান্টীয়দেরই দখলে ছিল। কিন্তু এই দান দস্তাবীযের মাধ্যমে সত্যায়িত করিয়া দেওয়া হয় এবং যখন ফিলিস্তীন বিজিত হয় তখন তামীম (রা) এই ফরমান পেশ করেন। [তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা নু'আয়ম-এর ওয়ারিছ (উত্তরাধিকার)-দের (তামীম-এর কেবলমাত্র একটি কন্যাই ছিল) হেবরনের প্রান্তে (অপর এক পাঠে হিবরায়) আল-মারতূম, অপর পাঠে মাত্‌লূন, মারতালূন, আর-রুতূম এবং মারতূন আছে, এইগুলির ভেতর সম্ভবত শেষোক্ত রূপটিই সঠিক যন্মধ্যে আল-মারতূল বাক্যটি পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে স্বাভাবিকভাবে ل-এর জায়গায় ن গ্রহণ করিয়াছে; যেমন জিবরীল স্থলে জিবরীন প্রভৃতি] বায়ত 'আয়নূন এবং বায়ত ইবরাহীম-এর দখল পান। এই স্থাবর সম্পত্তি কাছাকাছি সময় পর্যন্ত তাঁহার বংশে ও পরিবারেই থাকে এবং অদ্যাবধি খুদ্দাম হারাম আল-খালীল-এর দাবি অনুযায়ী উহা তামীম আদ-দারীর বংশধরের হাতেই রহিয়াছে। এই দানের গুরুত্ব দ্বিমুখী। সর্বপ্রথম তো এই যে, ইহা নবী কারীম (স.)-এর অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এবং দ্বিতীয়ত এই ইকতা' অর্থাৎ নিয়ম মাফিক দান বা উপহার জায়গীর-এর প্রাচীনতম উল্লেখ। এই ফরমানের (منشور) আসল 'ইবারাত হযরত 'আলী (রা)-এর হস্তলিখিত (যদিও কতক বর্ণনায় হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফয়ান (র)-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে) এবং এই 'ইবারাত দুইটি বর্ণনায় আমাদের সময় পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রথমটি কিছুটা সংক্ষিপ্ত এবং ইহাতে কেবলমাত্র হিবরায় এবং 'আয়নূন-এর উল্লেখ আছে এবং ইহার উপর কেবল হযরত 'আলী (রা)-এর দস্তখত রহিয়াছে (ইব্‌ন সা'দ, ১/২খ, পৃ. ২১, ২৭ লা.হইতে পৃ. ২২, লা. ৩; আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, বূলাক ১৩০ হি., পৃ. ১৩২)। দ্বিতীয় মতন (মূল পাঠ) দীর্ঘতর এবং এই বাক্য দ্বারা শুরু ঃ هذا ما انطى (আরও একটি কিরা'আত ঃ اقطع) এবং ইহা محمد الخ كتاب الانطاء-র ফরমান নামে কথিত (কিতাবু'ল-ইশতিকাক, পৃ. স্থা. الذيل)। ইহাতে চারটি জায়গার নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহার উপর খুলাফায়ে রাশিদীন-এর প্রথম তিন খলীফা আবূ বাক্‌র, 'উমার ও 'উছমান (রা)-এর নাম সাক্ষী হিসাবে মুদ্রিত। এই দীর্ঘ মূলপাঠ (متن) দারীগণ খুবই সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। যখনই কোন স্থানীয় 'আমলা তাহাদের বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কে তাহাদের সহিত ঝগড়ায় লিপ্ত হইয়াছে তখনই তাহারা ইহা পেশ করিয়া দিয়াছে। ইব্‌ন ফাদলিল্লাহ আল-'উমারী হারাম আল-খালীলী যিয়ারতের সময় ৭৪৫ হি.-তে ইহা দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলেন (মাসালিকু'ল-আবসার ফী মামালিকি'ল-আমসার, কায়রো ১৩৪২ হি., ১'খ, ১৭২-৭৫)। ইহা হযরত 'আলী (রা)-এর একটি পুরাতন মোজার চামড়ার উপর কূফী হস্তলিপিতে লিখিত ছিল। শব্দগুলি প্রায় মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, কেবলমাত্র কতিপয় মিটমিটি লেখার চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। কিন্তু এক পাতায় ইহার বিশুদ্ধতার সমর্থনে খলীফা আল-মুসতাদী (৫৬৬-৫৭৫ হি.)-র মূল পাঠের উদ্ধৃতিসহ সাক্ষী সনদ বর্তমান ছিল [ইব্‌ন আল-'উমারীর ভাষ্যমতে খলীফার পত্র প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়]। এই ফরমান একটি রেশমী গিলাফ এবং কালো রঙ-এর শক্ত কাষ্ঠ নির্মিত সিন্দুকের ভিতর রক্ষিত ছিল [ইব্‌ন আল-'উমারী আসলটিও পাঠ করেন এবং উহা আল-মুসতাদীর উদ্ধৃতি (কপি) মুতাবিক পান]। মুজীরু'দ-দীন আল-'উলায়মী প্রায় দেড় শত বৎসর পর [তু. আল-'উমারী, আল-উন্‌স আল-জালীল, (রচনাকাল ৯০০-১ হি.), কায়রো ১২৮৩ হি., পৃ. ৪২৮-২৯] ইহা দেখেন এবং তিনিও কার্যত এই তথ্যই প্রদান করেন। অবশ্য সাক্ষ্য সনদ সম্পর্কে তাঁহার ভাষ্য এই যে, লেখা খলীফা আল-মুসতানজিদ (৫৫৫-৬৬ হি.)-এর। ইহার পর 'উছমানিয়া সালতানাতের যুগে তাকিয়্যু'দ-দীন দারী এই দস্তাবীয সুলতান মুরাদকে সোপর্দ করিয়া দেন। তিনি ইহা সুলতানী গ্রন্থ ভাণ্ডারে দাখিল করিয়া দেন এবং তাকিয়্যু'দ-দীনকে পুরস্কার হিসাবে কায়রোয় কাদী নিযুক্ত করেন। এই সুলতান মুরাদ, সুলতান মুরাদ ৩য় হইতে পারেন (৯৮২-১০০৩/১৫৭৪-৯৫) অথবা মুরাদ ৪র্থ (১০৩২-৪৯/১৬২৩-৪০)। কেননা এই ঘটনার উল্লেখ ইব্‌ন দুরায়দ-এর কিতাবু'ল-ইশ্‌তিকাক (ed. Wustenfeld, ২২৬ টীকা)-এর একজন টীকাকার করিয়াছেন। এই টীকাকার হইলেন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার যিনি (আল-ইশতিকাক, উল্লিখিত সং., পৃ. ২১১ খ) বলেন যে, তিনি মুহিব্বু'দ-দীন ইব্‌ন আশ-শিহনা ঐতিহাসিকের (মৃ. ৯৮০/১৪৮৫)

বংশধর (তু. ভূমিকা [কিতাবু'ল-ইশ্‌তিকাক] ৭); Wustenfeld-এর এই ধারণা ভুল যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার মুহিব্বু'দ-দীন-এর পৌত্র [মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার-এর ভাষ্যানুযায়ী মুহিব্বু'দ-দীন তাঁহার পিতামহ]। দীর্ঘতর মূ. পা. (متن) য়াকূত তদীয় মু'জামু'ল-বুলদান গ্রন্থে, Wustenfeld সম্পা., ২খ, ১৯৫ এবং ইব্‌ন 'আসাকির তদীয় আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, দামিশ্‌ক ১৩৩১ হি., ৩খ, ৩৪৪-৫৭ গ্রন্থেও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন 'আসাকির সংক্ষিপ্ততর মূ. পা. ও তামীম (রা)-এর পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত তরজমায় নকল করিয়াছেন যাহার উপর আল-কালকাশান্‌দী পরিপূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিয়াছেন (সুবহু'ল-আ'শা, কায়রো ১৩৩৭ হি., ১৩খ, ১১৮-২২)। ইহার পর নিবন্ধকার জোর দিয়াছেন যে, আলোচ্য দস্তাবীয জাল (তু. Caetani, Annali dell' Islam, ২খ, ২৮৮-৯১, [৯ হি., ৬৯, টীকা ১; ৭০, টীকা ২]; Krenkow, Islamica, ১খ, [১৯২৫ খৃ.], পৃ. ৫২৯-৩২)। তাঁহার ধারণায় দুইটি বর্ণনার অস্তিত্ব ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মূলপাঠ (متن) পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাবিত ও মনগড়া। সনদ (وثيقة) আবূ য়ূসুফ, আল-ওয়াকিদী এবং ইরনুল-কালবী (তু. উপরিউল্লিখিত লাইনসমূহ) তিনজনই উদ্ধৃত করিয়াছেন অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে বর্তমান ছিল। আর যদি বালাযুরীর কাহিনী (ফুতূহ, de Goeje সম্পা., পৃ. ১২৯, ১৩ ও ১৪ লা.) ইব্‌ন আল-কালবীর সূত্রে (জামহারাতু'ল-আনসাব, Escorial সং., পৃ. ১৭০ ক ও'খ-তেও ইহা বর্তমান) যথার্থ হয় তবে সনদ বা চুক্তি প্রথম শতাব্দীর শেষেও বর্তমান ছিল। কাহিনী এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদি'ল-মালিক "দারী"-দের জায়গীরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিবার কালে সেইখানে থামেন নাই "এই ভয়ে, না জানি মহানবী (স)-এর বদদু'আ তাহার লাগিয়া যায়।" প্রকাশ থাকে যে, এই ইঙ্গিত সংক্ষিপ্ত متن -এর শেষ লাইনের দিকে فمن ظلمتم او اخذ من احد منهم شيئا فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين ইব্‌ন 'আসাকির, ৩খ, ৩৫৩]। অতঃপর অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, যেই অনুসারে মহানবী (স) কেবলমাত্র ওয়া'দা করিয়াছিলেন যে, হারূনের ভূমিখণ্ডটি তামীম-এর খান্দানকে দেওয়া হইবে এবং সনদ বা চুক্তিপত্র (وثيقة) কেবলমাত্র বিজয়ের পর হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর পক্ষ হইতে প্রণীত ও সম্পাদিত হয় (ইব্‌ন সা'দ, ১/২খ, ৭৫; ইব্‌নু'ল-কালবীর বর্ণনানুসারে। এই বর্ণনা স্বভাবত অন্যান্য লেখকও তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন)। [Welhausen (skizzen u. Vorarbciten, ৪খ, ১২৬; টিকা ১)-এর মতের বিপরীত যিনি ইহাকে পরবর্তী সংশোধন মনে করেন। নিরন্ধকারের অভিমত এই যে, এই বর্ণনা পূর্বেকার। ইহার পর তিনি বলেন,] ইহা খুব সহজেই উপলব্ধিতে ধরা পড়িতে পারে যে, মুসলমানগণ ফিলিস্তীন জয়ের পর দেখিতে পায় যে, হেবরন-এর হারাম-ই খালীলী খৃষ্টান লাখমীদের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, যাহারা সম্ভবত ইহাকে আমদানির মাধ্যম বানাইয়া লইয়াছিল এবং দর্শনার্থী ও পর্যটকদের নিকট হইতে টাকা-পয়সা আদায় করিত। আদ-দারী নিসবতের দিক দিয়া কাবীলার দিক সম্বন্ধযুক্ত হইবে না। বিশেষত এইজন্য যে, আদ-দার নামক কোন গোত্র [তামীম পরিবার অথবা সেই সমস্ত লোক যাহারা মহানবী (স)-এর খেদমতে আগত প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহাদের ভিন্ন] আমাদের জানা নাই। অবশ্য এই নিসবত খুবই যথার্থতার সঙ্গে দার অর্থাৎ হারাম-এর উপর প্রযোজ্য হইতে পারে (দার' ইহার অর্থ সম্পর্কে দ্র. কুসায়্যি শিরো.)। এই লাখমীগণ ইসলাম কবুল করেন এবং সম্ভবত হারাম-ই ইবরাহীম-এর সেবায়েতগিরী করিতে থাকেন। এই জায়গাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্র হইয়া যায় যেমন ইহার পূর্বে য়াহূদী ও খৃষ্টানদের জন্য ছিল। এই সব সেবায়েত নিজেদের দাবির ভিত্তিতে এই জায়গীরের উপর তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকিবে যাহা মহানবী (স) তাহাদের ধারণা মুতাবিক তাহাদের সর্দারকে দান করেন। তামীমু'দ-দারী-এর খ্যাতি বিস্তার লাভ করিতে থাকে, এমনকি তাঁহাকে ইসলামের প্রাথমিক কালে পরকালীন বিশ্বাস এবং দীন (ইসলাম)-এর রীতিনীতি ও পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নসমূহের (شعائر) ইলহাম (আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে প্রেরণা)-প্রাপ্ত হিসাবে পেশ করা হইতে থাকে।

[সমকালীন মনীষী আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, দাইরাতু'ল মা'আরিফিল ইসলামিয়্যা (আরবী), ৫খ, ৪৮৫-তে উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছেন উহার সার কথা এই যে, ইকতা' ঐসব উৎসের নিরিখে যাহার বরাত নিবন্ধকার দিয়াছেন– প্রমাণিত। এতদ্ভিন্ন বিশুদ্ধ উৎসসমূহেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে যন্মধ্যে আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম ইব্‌ন সাল্লাম (মৃ. ২২৪ হি.)-এর কিতাবু'ল-আমওয়াল গ্রন্থ (কায়রো ১৩৫৩ হি.) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই ইকতা' সম্পর্কে 'নসসমূহের রিওয়ায়াত হিফ্‌জ-এর মাধ্যমে হয়। ইহার কোন কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় শব্দের পার্থক্য ও অস্তিত্ব রহিয়াছে উহার কোন প্রতিকার নাই। অনন্তর নিবন্ধকারের সন্দেহ পোষণ কোন তাত্ত্বিক বা জ্ঞানগত মূল্য বহন করে না। সিরিয়ায় তামীম-এর বংশধরদের নিকট যেই সমস্ত 'নস' রহিয়াছে সেই সমস্তের ঐতিহাসিক মূল্য জানা নাই। ঐ সমস্ত 'নস' যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাহারা বলিয়াছেন যে, উহার হস্তলিপি (বা হস্তরেখা) অস্পষ্ট। এইজন্য সম্ভবত বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ইহা পাঠ করিয়াছেন। কেবলমাত্র এই পার্থক্য ইহার জাল হইবার দলীল হইতে পারে না, যদিও ইহার বিশুদ্ধতা ও মৌলিকত্বের উপরও অকাট্যভাবে রায় দেওয়া যাইতে পারে না]।

[হাদীছের বর্ণনা ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ তামীম (রা.)-এর উল্লেখ বিশুদ্ধ সনদযুক্ত হাদীছসমূহে করিয়াছেন। তামীম আদ-দারী এবং তদীয় ভ্রাতা নু'আয়ম-এর অস্তিত্ব, তাঁহাদের সাহাবী হইবার উল্লেখ, তাবূক যুদ্ধের পূর্বে দারিয়্যান-এ মহানবী (স)-এর খিদমতে তাঁহার হাযির হওয়া–এই সমুদয় ব্যাপার ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণিত, যাহারা ইসলামের ইতিহাস, ইহার বর্ণনা-পদ্ধতি, হাদীছ-ই নাবাবী (স) ও হাদীছ-ই আসহাব (রা) এবং ইহার প্রমাণ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তাহাদের নিকটও ইহা প্রমাণিত]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ঐ সমস্ত উৎস ও গ্রন্থকার যাহাদের উল্লেখ এই শিরোনামে করা হইয়াছে তদ্ভিন্ন তু. (১) ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, Gottingen, ১৮৬০; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, ইস্‌তী'আব, হায়দরাবাদ ১৩৩৬ হি.; (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, মাতবা'আ ওয়াহ্‌বিয়া; ১২৮০ হি.; (৪) ইব্‌ন হাজার, ইসাবা, কায়রো ১৩২৮ হি.; (৫) ইব্‌ন হাজার, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৭ হি.; (৬) নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত; (৭) Wustenfeld, Register, পৃ. ৪৪১-৪২; (৮) Sprenger, Das Leben und die Lethe des Mohammad, ১খ, ৪০৮, ৪৬০; ৩খ, ১৩, টীকা ৪৩২; (৯) Caetani, Annali dell Islam, ১০খ, ৫৪৪-৪৬ (৪০ হি., ৪০০-৪), (G. Levi Della Vida এবং আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির-এর পরিশিষ্ট হইতে সংক্ষেপিত)।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই./আবু সাইদ মুহাম্মাদ ওমর আলী

তাযকিরা (تذكرة) ঃ আরবী শব্দ ذكر হইতে গঠিত, যাহার অর্থ স্মরণ করা, স্মারক, সুখ্যাতি, স্মারকলিপি, প্রার্থনাপত্র ইত্যাদি। ذكر এবং تذكرة এই দুই শব্দ সমভাবে কুরআন মাজীদকে বুঝাইবার জন্য এই

পবিত্র গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা اَءُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا (৫৪ ঃ ২৫); انْ هُوَ الاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ (১২ ঃ ১০৪); বহু বিখ্যাত রচনার শিরোনামে তাযকিরা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, যথাঃ নাসীরু'দ-দীন তূসী বিরচিত The Memorandum (تذكرة) of Astronomy; ফারীদু'দ-দীন 'আত্তারকৃত তায্কিরাতু'ল-আওলিয়া' অর্থাৎ "ওয়ালী (দরবেশ)-দের স্মরণিকা", তায্কিরাতু'শ শু'আরা', "কবিদের স্মরণিকা", যাহা পারস্যের জনপ্রিয় কবিদের জীবনীমূলক গ্রন্থ।

প্রশাসনিক পরিভাষায় ইহার অর্থঃ টিকিট, স্মারকলিপি, অনুমতিপত্র। ভ্রমণকারীদের পাসপোর্ট অর্থে ইহার ব্যবহার রহিয়াছে, যেমন তুর্কী শব্দ Yol tadhkiresi, তুর্কী কাস্টম হাউজ হইতে নির্গমনের ছাড়পত্র (exit)-কে বলা হয় murur tadhkiresi, (আরবী অনুবাদ ঃ তায্কিরাতু'ল-মুরূর)। কাদীদের উপর কার্যভার অর্পণের সনদে শব্দটি আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য [ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রীদের সনদের সাধারণ নাম বারা'আ]। প্রাচীন তুর্কী সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে দুইজন তায্কিরেজী (tadhkiredji)-এর পদ ছিল, একটি বড় ও অন্যটি ছোট। এই দুই পদের অধিকারিগণ ছিলেন তায্কিরা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত সরাসরি কাদী 'আস্কার (দ্র.) অর্থাৎ প্রধান কাদীর নির্দেশাধীন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা এবং প্রধান উযীরের সহিত সরকারী ভোজে অংশগ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The dictionaries and M. d'Ohsson, Tableau general de l'Empire Ottoman, Paris 1791, iv, 539, 597।

B. Carra De Vaux (E.I. [1])/ মোঃ রেজাউল করিম

তাযবীজ (দ্র. নিকাহ)

তাযা (تازا) ঃ মরক্কোর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিখ্যাত শহর। ইহফাস নগরী হইতে পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। মরক্কোর মধ্য ভূভাগে অবস্থিত "তাযার দীঘল ভূখণ্ড" নামে অভিহিত সুবিশাল অনুচ্চ ভূমিকে পশ্চাদভূমি করিয়া এই শহরের অবস্থান। মধ্যযুগের কোন কোন গ্রন্থকারের মতানুসারে (Istibsar, al- Marrakushi) এই 'তাযা' নগরী মরক্কোর পশ্চিম ভূভাগ এবং মধ্যস্থ কেন্দ্রীয় ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী সীমারেখা হিসাবে চিহ্নিত হইত। মরক্কোর পূর্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাভিমুখী অতি গুরুত্বপূর্ণ সুদীর্ঘ প্রাকৃতিক রাজপথ এই তাযার দীঘল ভূমির উপর দিয়াই প্রসারিত। যুদ্ধ-বিগ্রহের কালে সবিশেষ নিরাপদ, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী নানান পেশাজীবী জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কেন্দ্রস্থল এবং সঙ্কীর্ণ এক গিরিসঙ্কট দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চলে অবস্থান প্রভৃতি দিক নিশ্চয়ই 'তাযা' শহর নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশসহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক কালের জনগণের বসবাসের চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হয় এবং যে খাড়া পর্বতের উপর নগর পত্তন করা হইয়াছিল তথায় নির্মাণকালের তারিখবিহীন অনেকগুলি সমাধিস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মধ্যযুগের প্রথম ভাগে (৮ম-১০ম শতাব্দী) 'তাযা' ছিল এতদঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ। তখন উহা মিকনাসা জনগোষ্ঠীর এক শাখা-গোত্র অর্ধ যাযাবর জাতীয় বার্বারদের অধিকারে ছিল। ইব্ন খালদূনের মতানুসারে তাহারাই 'তাযা' নগরীর 'ribat' নির্মাণ করিয়াছিল। যদিও 'তাযা' কদাচ 'ribat' বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, তথাপি ইহা একদা 'কায়রাওয়ান'-এর ফাতিমীগণের পক্ষে ইদরীসীগণের প্রতিরোধ প্রচেষ্টায়, অতঃপর কর্ডোভার উমায়্যাদের পক্ষে ফাতিমীগণের বিরোধিতার কেন্দ্র হিসাবে সবিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।

মোটকথা, 'তাযা' একটি সুরক্ষিত নগর একটি 'ribat' হিসাবে আল-মুওয়াহ্হিদগণের যথার্থ কেন্দ্রস্থল ছিল। ৫২৮/১১৩৩ সনে 'আব্দু'ল-মু'মিন সমুচ্চ এবং কেন্দ্রীয় ভূখণ্ডের (ATLAS) স্বঘোষিত অধিপতি হিসাবে 'তাযার' দীঘল ভূখণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই বিজয়ী বীর এই নগরীতে উপনীত হইয়া তাঁহার অগ্রযাত্রা স্থগিত করেন। অনতিকাল পরেই তিনি অত্র শহর হইতে 'Rif'-এর পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু আল-মুরাবিত বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করিতে সমভূমিতে অবতরণ করেন নাই। যাহা হউক, তিনিই এই নগরীকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলিয়া মনে করিতেন এবং তথায় সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের জন্য সেনানিবাস হিসাবে সুরক্ষিত নগর-প্রাকারের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ করেন।

আল-মুওয়াহ্হিদ সাম্রাজ্যের এই সীমান্তবর্তী শহর সংরক্ষণের দায়িত্ব যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইত, স্বাভাবিকভাবেই তাঁহারা 'ribat'-এর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত হইতেন (আমরা জানি, আল-মুওয়াহ্হিদ বিরোধী সংগ্রাম জনসমক্ষে ধর্মযুদ্ধ বা 'জিহাদ' হিসাবে আকর্ষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত)। নূতন দুর্গকে 'ribat' নামে আখ্যায়িত করা হইলে ইহার সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত হওয়া অন্যতম পুণ্য কর্ম হিসাবে বিবেচিত হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে 'তাযা' কদাচ 'ribat'-রূপে ধর্মীয় ভূমিকা পালন করে নাই। ইহা পূর্বের ন্যায় ফাস'গামী রাজপথ প্রহরার জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক ঘাঁটি হিসাবেই অবস্থিত ছিল। 'আবদু'ল-মু'মিন কর্তৃক নির্মিত দুর্গ প্রাচীরের এক বৃহদাংশ সম্ভবত আজও বিদ্যমান। ইহা বৃহদাকৃতির বিচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্মিত–পার্শ্ববর্তী স্থানে অসম আকৃতির বুরুজসমূহ নির্মিত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখভাগে স্থানে স্থানে বহিঃপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষও দৃষ্ট হয়।

প্রতিরোধকারিগণের ক্ষমতাবশত 'তাযা' নগরে অবস্থানকারী আল-মুওয়াহ্হিদগণ ৬১৩/১২১৬ সালে মারিনীগণের বিজয়ীর বেশে অনুপ্রবেশকালে কোন প্রকার বাধা দান করিতে পারে নাই। তাযা-র নব্য অধিকারিগণও ইহার প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। শহরের সর্বাগ্রগণ্য মসজিদকে তাঁহারা দুই দুইবার সংস্কার করেন (১২৯৪ ও ১৩৫৩ হি.) এবং উক্ত সুবিশাল মসজিদকে বহুমূল্য কার্পেট দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে অন্তত একবারের জন্য হইলেও গিরিপথে প্রহরা প্রদানের ক্ষেত্রে তাযাবাসিগণ তাহাদের যথার্থ কর্তব্য সম্পাদন করেন–যখন উহা Tlemcen-এর সুলতান দ্বিতীয় আবূ হাম্মূদ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। ৭৮৪/১৩৮২ সনে তিনি সপ্তাহকাল অত্র নগরী অবরোধ করিয়া রাখেন, কিন্তু অচিরেই পশ্চাদগমনে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের 'তাযা' নগরীর একটি বিবরণী আমরা লিও আফ্রিকানাস-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি ইহাকে সাম্রাজ্যের তৃতীয় নগরী হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। ফাস-এর ওয়াত্তাসী সুলতানের দ্বিতীয় পুত্রকে বরাদ্দকৃত অঞ্চল বলিয়া ইহা এক জাতীয় apanage হিসাবে শাসিত হইত। তৎকালে অত্র নগরীর বাসগৃহসমূহে অনেক য়াহূদীসহ বসবাসকারীদের সংখ্যা ছিল ৫,০০০ (পাঁচ সহস্র)। চতুষ্পার্শ্বের পার্বত্য অঞ্চলের দুর্ধর্ষ বাসিন্দাদের সার্বক্ষণিক উপদ্রবের মধ্যেই তাহাদের দিন গুযরান করিতে হইত।

শহরে খাবার পানি পরিবেশনের উৎসমূল প্রাকৃতিক ঝরনার উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষার প্রয়োজনে এবং আলজিরীয় তুর্কীদের আক্রমণকালে স্বীয় নিরাপত্তা বিধানকল্পে অন্যতম সা'দী শারীফ' সম্ভবত আহমাদ আল-মানসূর অত্র শহরে একটি bastiun নির্মাণ করেন। উক্ত পুরাকীর্তি অদ্যাবধি দুর্গ-মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দণ্ডায়মান।

"যাহা হউক, ইহা সবিশেষ উল্লেখ্য যে, 'তাযা' নগরীর এই কেল্লা পূর্বদিক হইতে আগত শত্রুদের আক্রমণকালে কোনদিনই প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় আদৌ কোন সহায়তা করে নাই, বরং 'মাখযান'দের নির্মিত এই কেল্লা অত্র অঞ্চলে তাহাদেরই বিরুদ্ধে মিথ্যা দাবিদার সকল বিদ্রোহীর জন্যই মনোরম ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল।" (H. Basset ও Champardou) উপরোক্ত উক্তির যথার্থ প্রমাণ আমরা পাই ১৫৯৬ খৃ., যখন আল-মানসূরের জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র নাসীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া 'তাযা' নগরীকে তাঁহার সৈন্য পরিচালনার কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্যবহার করেন। অনুরূপভাবে ১৬৬৪ খৃ. প্রথম 'আলাবী সুলতান আর-রাশীদ 'ফাস' নগরীর উপর আক্রমণকালে এই তাযাকেই তাঁহার কেন্দ্রীয় সেনানিবাস হিসাবে ব্যবহার করেন। ১৭৭৩ খৃ. আহমাদ ইব্ন মুহ্‌রিয্ স্বীয় পিতৃব্য সুলতান মাওলায় ইসমা'ঈলকে তথায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সর্বশেষ ১৯০২ খৃ. বিদ্রোহী আবূ হামারা 'আবদু'ল-'আযীয-এর সহিত সংঘর্ষকালে এই তাযা নগরীকেই তাহার রাজধানী হিসাবে ব্যবহার করেন। ১৯১৪ সনের ১০ মে ইহা ফরাসী সৈন্যগণ দখল করিয়া লয় (বর্তমানে 'তাযা' স্বাধীন মরক্কোর একটি বিখ্যাত শহর)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বাকরী, Description de l'Afrique septentrionale, আলজিয়ার্স ১৯১১ খৃ., পৃ. ১১৮, ১৪২; (২) অনু. de Slane, ১৯১৩ খৃ, পৃ. ২৩১, ২৭২; (৩) K. al-Istibsar, অনু. E. Fagnan, in Recucil de al Soc. archeol. de Constantine, ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ১৩৪-১৩৫; (৪) 'আবদু'ল-ওয়াহীদ আল-মাররাকুশী, Hist. des Almohades, সম্পা. Dozy, পৃ. ১৮৪, ২৬০; (৫) অনু. E. Fagnan, পৃ. ২২১, ৩০৬; (৬) ইব্ন খালদূন, Hist. des Berbires, অনু. de Slane, ১খ, ২৬৬ এবং স্থা.; (৭) ইব্ন আবী যার', Kirtas, স্থা.; (৮) লিও আফ্রিকানাস, সম্পা. Ramusio, ভেনিস ১৮৩৭ খৃ., পৃ. ১০০; সম্পা. Schefer, ২খ, ৩৩৯; (৯) মার্মল, Description general de Africa, গ্রানাডা ১৫৭৩ খৃ., ২খ, পত্রক ১৬১ প.; (১০) রোল্যাণ্ড ফ্রেমাস, Relation d'un voyage fait en Mauritanie, প্যারিস ১৬৭০ খৃ., পৃ. ১২৩ প.; (১১) লেফটেন্যান্ট ক্যাম্পারদৌ, La Necropole de Taza, in Bull. de la soc. de gcogr, d'Oran xxxviii, ১৯১৭ খৃ.; (১২) ক্যাম্পারদৌ এবং এইচ বাসেত, Le Bastioun de Taza, in Archives berberes, ১৯১৯ খৃ.; (১৩) রিচার্ড, Le Maroc (Guide bleu); (১৪) G. Marcais, Manuel d'art musulman, পৃ. ৩৫১, ৪৭৬ প., ৭২৮ প.।

Georges Marcais (E.I.[1])/ মুহাম্মাদ শওকত আলী

তা'যিয়াহ (تعزيه) ঃ আ, শব্দমূল ع-ز-ى অর্থ সান্ত্বনা, সমবেদনা। ব্যবহার মুজার্‌রাদ (ধাতুমূলের অধিক হর্‌ফবিহীন) عزى يعزى-عزاء-বিপদে ধৈর্য ধারণ করা। تعزيه (تفعيلة ওয়াযানে বাবে تفعيل-এর মাসদার ক্রিয়ামূল) মাযীদ ফীহ্ (অতিরিক্ত হর্‌ফযুক্ত), সকর্মক ক্রিয়া-সবর ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া, সান্ত্বনা প্রদান করা, বিপদে খোঁজ-খবর লইয়া সমবেদনা প্রকাশ করা।

কাহারও কাহারও মতে পবিত্র কুরআনে এই শব্দটির উল্লেখ আছে সূরা আল্-মা'আরিজ-এর ৩৭ আয়াত عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ (عزى [মাযী] সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছে, এই ক্রিয়াপদ হইতে কর্তৃবাচ্য বহুবচন সমবেদনা প্রকাশকারিগণ; [তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সির শব্দটি এই অর্থে গ্রহণ করেন নাই)। ফিক্‌হ ও হাদীছ গ্রন্থসমূহে নিম্নোক্ত অধ্যায়সমূহে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়-'ইবাদত, জানাইয, সবর ও সান্ত্বনার উপদেশ দান ইত্যাদি। ফারসী সাহিত্য ও ইতিহাসে تعزيه (তা'যিয়াহ্) শব্দটি মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছ আত্মীয়-স্বজনের কাছে দুঃখ ও সহমর্মিতা প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন মাওলানা রূমী-র মাছনাবী (ওয়াকফিয়্যা-ই গিব্, মূ. ৫খ, ১৩৭, পংক্তি নং ২১৫২)-তে রহিয়াছে ঃ

سرسية چون نامه هاى تعزيه- پر معاص متن ان با حاشيه

[তা'যিয়াহনামাহ (সমবেদনা পত্র)-সমূহের ন্যায় মাথা (শিরোনাম) কালবর্ণ মাতান ও হাশিয়া (মূল পাঠ ও টীকা অভ্যন্তর বাহির) পাপের কালিমা ভরা]।

উর্দু ভাষায় (শী'আ সম্প্রদায়ের নিকট) তা'যিয়াহ অর্থ ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাযারের প্রতিকৃতি যাহা স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঠ, বাঁশ, কাপড়, কাগজ ইত্যাদির সাহায্যে বানানো হয়। কখনও বা শোক, মাতম ও মুহার্‌রামের 'আলামতরূপে এই প্রতিকৃতি সহকারে শোভাযাত্রার আকারে বাহির হইয়া থাকে। আবার কখনও বাড়ি-ঘরে, ইমামবাড়ায় কিংবা ইমাম সাহেবের 'চক' নামে অভিহিত প্রশস্ত ও বিশিষ্ট চত্বরসমূহে তা'যিয়াহ স্থাপন করা হয়।

হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য)-এ তা'যিয়া বলিতে কফিন মাতম এবং বুক পেটানোকে বুঝান হয়। তা'যিয়াহ করা অর্থ মাতম করা; তা'যিয়াহ্‌দার (تعزيه دار) অর্থ মাতমওয়ালা; বুকে চপেটাঘাত করিয়া মাতমকারী, সেই ব্যক্তি যাহার বাড়িতে তা'যিয়াহ রাখা হয় এবং মজলিস অনুষ্ঠিত হয়, হুসায়ন (রা)-এর প্রেমিক শী'আ ইত্যাদি।

গঠন ও কারুকার্যের বিচারে তা'যিয়াহ শিল্প নৈপুণ্যের উল্লেখযোগ্য নমুনা হইয়া থাকে এবং তা'যিয়াহ নির্মাতাগণ উহার আকার, আকৃতি ও নির্মাণশৈলীতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও শৈল্পিক নিপুণতার নমুনা উপস্থাপন করিয়া থাকেন। এই কারণে কোনও কোনও তা'যিয়াহ এক এক বৎসর এবং দুই দুই বৎসর ধরিয়া তৈরি হইতে থাকে। এই সকল তা'যিয়াহ-র ভিন্ন ভিন্ন নামও রহিয়াছে। যথা ঃ (১) দারীহ (ضريح-সৌধ) ঃ উহার আবার বিভিন্ন উপ-প্রকার রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দারীহ হইল যাহা ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাযারের অবিকল প্রতিকৃতি হয়। দাক্ষিণাত্যের নিজাম, রামপুরের ওয়ালী, মাহমূদাবাদের রাজার 'আযা খানাহ ও করাচীর কোনও কোনও 'আযা খানাহ-য় এই ধরনের দারীহ রহিয়াছে। লাখনৌ-এর হুসায়নআবাদে শাহী আমল হইতে মোম নির্মিত একটি দারীহ-এর প্রচলন রহিয়াছে। (২) বাংলা বা কুঠী (بنكله) ঃ এই তা'যিয়াহ উটের পিঠের হাওদা কিংবা হাতীর পিঠের হাওদার অনুকরণে তৈয়ার করা হয় এবং সাধারণত লাখনৌ শহরে কিংবা লাখনৌ-এর শহরতলীতে নির্মিত হইয়া থাকে। সম্ভবত এই নক্‌শাটি সেই হাওদা, ডুলী বা পাল্‌কী ইত্যাদির হইয়া থাকে যেইগুলিতে তাবাররুক রাখিয়া দিল্লীর বাদশাহগণ লাল কিল্লা হইতে জামে' মসজিদ পর্যন্ত লইয়া যাইতেন (দ্র. বায্‌ম-ই আখির, পৃ. ৫০); (৩) মোমের তা'যিয়াহ ঃ বাঁশের চটির দ্বারা কবর কিংবা বাংলো কিংবা অন্য কোনও আকৃতির কাঠামো তৈরি করিয়া উহার উপরে মোম চড়ান হয় এবং শিল্পনৈপুণ্যের উৎকর্ষতার প্রকাশ ঘটান হয়। (৪) যব-এর তা'যিয়াহ ঃ কাঠামোর উপরে মাটির একটি অগভীর পলেস্তরা জমাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর গম বা যবের দানা বিন্যস্ত ও সারিবদ্ধভাবে বসাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে দশ হইতে চল্লিশ দিনের মধ্যে অংকুর উদগম হয় এবং সম্পূর্ণ তা'যিয়াহটি অভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই ধরনের তা'যিয়াহ্-য় শোভাযাত্রার সময় অবিরাম পানির ছিটা দেওয়া হয়।

তা'যিয়ার গঠন, আকৃতি ও অংশ বিশ্লেষণ নিম্নরূপ ঃ নিচের মেঝস্বরূপ তক্তা বা গদি, চারি পাশের বেষ্টনী (হাজীবাহ্) কবর বা সৌধ (এবং গুম্বয), পতাকা (দারীহ-এর ক্ষেত্রে গুম্বয)। পাকিস্তান, কাশ্মীর, নেপাল, ভারত ও আফ্রিকায় সাধারণত দারীহ ও তা'যিয়ার মাঝে পূর্বোল্লিখিত ব্যবধানের প্রতি লক্ষ রাখা হয় না। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রের বিশেষ সম্বন্ধের কারণে ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত দৃষ্টিকোণ হইতে শী'আ, কোনও কোনও সুন্নী এবং অনেক হিন্দুর কাছেও সমপর্যায়ের ভক্তি-সম্মানের পাত্র হইয়া থাকে। লাখ্নৌ প্রভৃতি এলাকায় নিচের পাটাতন (গদি)-এর উপরে এবং বেষ্টনী (হাজীবাহ)-এর মাঝে দুইটি 'তুরবাত' অর্থাৎ কবরের আকৃতিও (পাশাপাশি) স্থাপন করা হয়। ইহাদের একটি সবুজ বর্ণের–ইমাম হাসান (রা)-এর এবং দ্বিতীয়টি লাল বর্ণের ইমাম হুসায়ন (রা)-এর। এইরূপ করিবার কারণে ধারণা করা হয় যে, তা'যিয়াহ এমন কোনও হাওদা বা পাল্কী ('ইমারী=হাতীর পিঠের পাল্কী)-র অনুকরণে তৈয়ার করা হইয়াছে যাহাতে কোনও কোনও মুগল বা অন্য কোনও রাজবংশের রাজা-বাদশাহগণ 'তুরবাত' (কফিন) রাখিয়া শোভাযাত্রার সহিত এক স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতেন।

সাধারণত ২৯ যুল-হিজ্জা হইতে ৯ মুহাররাম পর্যন্ত তা'যিয়াহ সাজাইয়া কোনও বিশেষ ও নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়। স্থানটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা 'আযাখানাহ্, তা'যিয়াহখানাহ্, ইমামবাড়াহ, 'আশূর খানাহ্, ইমাম খানাহ্, চাবুতারাহ্ চাওরু (চক)-ই ইমাম সাহিব ইত্যাদি। তা'যিয়াহ স্থাপিত এই সকল স্থানে মাতম (মাতম) সভা, সূর্য-খানী (মর্মবিদারী কবিতা-গাযাল পাঠ), মারছিয়াহ্ খানী (শোকগাঁথা পাঠ), রাওয়াযাহ্ খানী (সমাধিগাঁথা পাঠ), ওয়াকি'আহ খানী (কাহিনী পাঠ), নাছছারী (গদ্য কাব্য ও পুঁথি পাঠ) এবং ওয়া'জের মজলিস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ওয়া'জ অনুষ্ঠান বক্তা-ওয়া'ইজগণ প্রথমে কুরআনী রহস্য-তত্ত্ব ও ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনার পর আহলে বায়ত (নবী পরিবার, এক্ষেত্রে 'আলী-র বংশধর)-এর মাহাত্ম্য-কৃতিত্বের বিবরণ এবং তাহাদের সীমাহীন ও অবর্ণনীয় বিপদাপদ ও কারবালা-র ঘটনাবলী বর্ণনার মাধ্যমে বক্তৃতা সমাপ্ত করিয়া থাকেন। অতঃপর বসিয়া কিংবা দাঁড়াইয়া (সম্মিলিতভাবে) নাওহাহ্খানী করিয়া ও বুক চাপড়াইয়া মাতমও (অর্থাৎ হায় হাসান, হায় হুসায়ন বলিয়া সশব্দে চিৎকার দিয়া শোক পালন করা) হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে সুন্নী (-দের মাঝে তা'যিয়াহভক্ত)-রা শাহাদাতনামাহ (কারবালার পুঁথি) ইত্যাদি এবং হিন্দুরা 'কারবালা কথা' ইত্যাদি দোহা আবৃত্তি করিয়া থাকে। এই প্রসংগে তা'যিয়াহ প্রথার অনুকূলে নিম্নের ঘটনাবলীও উদ্ধৃতি মূলে প্রমাণীকরণ করা হয়।

১। উহুদ যুদ্ধে (৩ হি.) হামযা (রা) ইব্ন 'আবদি'ল-মুত্তালিব ও অন্যান্য সাহাবী শাহাদাত বরণ করিলে শহীদদের আত্মীয়-স্বজন তাহাদের জন্য কান্নাকাটি করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের ক্রন্দনের আওয়ায শুনিয়া বলিলেন ঃ কিন্তু হামযা (রা), তাহার জন্য কোন ক্রন্দনকারিণী নাই! এই কথা শুনিয়া সা'দ (রা) ইব্ন মু'আয ও উসায়দ (রা) ইব্ন হুদায়র তাঁহাদের স্বগোত্র বানূ 'আবদি'ল-আশ্হাল-এর নারীদিগকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর এখানে পাঠাইয়া দিলেন যাহারা আসিয়া হামযা (রা)-এর জন্য মাতম করিয়া গেল (তাবারী, লাইডেন, ১/৩খ, ১৪২৫; ইব্ন সা'দ, কিতাবু তাবাকাতি'ল-কুবরা, লাইডেন, পৃ. ৩১)।

২। এই ধরনের ঘটনা হইতে যেমন ইব্ন 'আব্বাস (রা) স্বপ্নে দেখিলেন যে, হযরত নবী আকরাম (স) খালি মাথায় রহিয়াছেন এবং তাঁহার হাতে একটি শিশি যাহাতে রক্ত রহিয়াছে কিংবা হযরত নবী কারীম (স)-এর ওফাতের পরে বুরায়দা ইব্নু'ল-খুসায়ব (রা) [যিনি উসামা (রা) বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন]-এর উল্লিখিত পতাকাটি নবী কারীম (স)-এর মুবারক দরজায় গাড়িয়া দেওয়া–যাহা নিম্নের গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃত স্থানসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে। (ক) মিশকাত, দিল্লী ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৫৭২ (মানাকিবু আহলি'ল-বায়ত অধ্যায়); (খ) ঐ, পৃ. ৫৭০; (গ) ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আল-মুসনাদ (মিসরীয় প্রাচীন মুদ্রণ), ১খ, ২৪২, লাইন ৯; (ঘ) তিরমিযী', লাক্ষ্ণৌ ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৬২৪; (ঙ) য়ানাবী'উ'ল-মুওয়াদ্দা, বোম্বাই, অধ্যায় ৬০, পৃ. ২৬৫; (চ) হিবারু'ল-আন্ওয়ার (ইরানে মুদ্রিত, ১২৭০ হি.), পৃ. ১৬৯ (বাবু ইখবারিল্লাহি'ল-আম্বিয়া ওয়া'ন-নাবিয়্যানা বিশাহাদাতিহি) (باب اخبار الله الانبياء والنبيين بشهادته), (ছ) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৫৬ হি., ৩খ, ৩০৩। (জ) মাকতালু ইবনি নি'মা, পৃ. ৬; (ঝ) ইবনু 'আবি'ল-হাদীদ, শারহ নাহ্জি'ল-বালাগা, মিসর, ১খ, ৫৩।

৩। ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের পরে মদীনায় 'আব্বাস ইব্ন 'আলী (রা)-এর মাতা উম্মু'ল-বানীন (রা) জান্নাতু'ল বাকী' কবরস্তানে গমন করিতেন এবং কারবালায় শাহাদাতপ্রাপ্ত তাঁহার চার পুত্রের স্মরণে মর্মবিদারী কান্না কাঁদিতেন। সেইখানে লোকেরা সমবেত হইত এবং পুত্রহারা মায়ের কান্না শুনিয়া তাহাদের অনেকে কাঁদিত (মাকাতিলু'ত-তালিবীন, মিসর ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৮৫)।

৪। ইমাম যায়নু'ল-'আবিদীন, ইমাম মুহাম্মাদ বাকির, ইমাম জা'ফার সাদিক, ইমাম 'আলী রিদা এবং অন্যান্য ইমাম মুহাররামের চাঁদ দেখিবার পরে শোকানুষ্ঠান উদ্যাপন করিতেন (দ্র. বিহারু'ল আনওয়ার, ১০খ, ২৬৮)।

৫। আবু'ল-আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী (মৃ. ৬৯ হি.) সুলায়মান ইব্ন কাত্তা, কুমায়ত, আবূ দাহ্বাল (আল-জুমাহী), ফারাযদ্বাক, দি'বিল প্রমুখ সমাবেশসমূহে মারছিয়া (শোকগাঁথা) আবৃত্তি করিতেন এবং আহলে বায়ত-এর ইমামগণ তাহাদিগকে বখশিশ (সিলা) প্রদান করিতেন এবং তাহাদের মারছিয়া শ্রবণ করিয়া কাঁদিতেন [দ্র. আস-সাওয়াই'কু'ল-মুহরিকা, পৃ. ১১৫; তা'রীখু'-শী'আ, নাজাফে মুদ্রিত, পৃ. ৩২) 'আযাদারী (শোক প্রকাশ) এবং হুসায়ন (রা)-এর জন্য শোক প্রকাশ হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই প্রক্রিয়াই প্রচলিত ছিল। কিন্তু হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে আসিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারবালা-র ঘটনাবলী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়ায় বর্ণনার রূপ পরিগ্রহ করে। ফলত উহাতে শী'আ ও অ-শী'আগণ এই পরিমাণ প্রভাবিত ও উদ্দীপিত হয় যে, তাহারা হাসানী সায়্যিদগণের আন্দোলন মুখতার ও আবূ মুসলিম খুরাসানীর বিদ্রোহকালে তাহাদের এই উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটায়।

৩৫২/৯৬৩ সালে বাগদাদে দায়লামীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উল্লিখিত বর্ষে 'আশূরা (১০ মুহাররাম) দিবসে আদেশ জারি করিয়া বাগদাদের বাজার বন্ধ রাখা হয় এবং পুরুষদের মাতম করিবার হুকুম দেওয়া হয়। সেই সাথে নারীদের 'আযা (তা'যিয়াহ) শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। মোটকথা, সরকারীভাবে এই বৎসর শোক পালন করা হয় (ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৩৫২ হি. ঘটনাবলী প্রসংগ; ইব্ন কাছীর, তা'রীখ, মিসর, ১১খ, ২৩৪ ও অন্যান্য)।

৩৬৬/৯৭৭ সালে ফাতিমী শাসক 'আযীযুল্লাহ ফাতিমী মিসরে হুসায়ন দিবস উদ্যাপন করিলেন (সামরিক বিপ্লবের পূর্বকাল পর্যন্ত মিসরের মাশহাদু রা'সি'ল-হুসায়ন-এ বড় বড় 'আলিম ও জনতা, এমনকি শাহ ফারূক নিজেও মাযারে সবুজ গিলাফ পরাইবার জন্য

শোভাযাত্রার সহিত গমন করিতেন এবং শোক পালন করিতেন (দ্র. মুজতাবা হাসান ও আয-যুবায়রী, মিসর কা মুহাররাম)। ঐ যুগের কাছাকাছি সময় গূর-এ শান্‌সাব বংশীয়গণ আহ্‌লে বায়তের ভক্ত-অনুরক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (দ্র. ফিরিশ্‌তাহ্‌, তারীখ, লাখনৌ ১২৮১/১৮২৪, ১খ, ৫৪) এবং সিন্ধুর মুসলমানগণ ইসমা'ঈলী (আগা খানী) মাযহাবের সংগে সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, বরং অনেক সায়্যিদ পরিবার অন্যান্য অঞ্চল হইতে হিজরত করিয়া এইখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। দায়লাম ও ইরাকে শী'আগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে এইসব এলাকায় ব্যাপক হারে 'আযাদারী হইতে থাকে। এইসব প্রথা এতই প্রসার লাভ করে যে, সাহিত্যে এবং উহার উপমা ও রূপক বর্ণনায় উহার ব্যবহার হইতে থাকে [দ্র. মাছনাবী-ই রূমী (রচনা ৬৭০ হি. পূ.), সম্পা. নিকলসন, ৬খ, ৩১৭; তদ্রূপ হারীরী (৫১৬ হি.), মাকামা নং ১০; হামীদু'দ-দীন, মাকামাতু হুমায়দী (রচনা ৫৫১ হি.), মাকামা নং ২৩, রুযউ'ল-হুসায়ন]। এই ব্যাপকতা ও প্রসারের কারণে এই সকল প্রথা অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং বংশীয় ও সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যের অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে।

বাদায়ূনীর বক্তব্যমতে সম্রাট হুমায়ূন-এর যুগে ভারতে আগন্তুক জনৈক ইরানী কবির তা'যিয়াহ বিষয় সম্বলিত নাক্‌শ (বিশেষ ধরনের কবিতা) রচনা করেন, 'আশূরা-র দিনগুলিতে যাহা বিভিন্ন আখড়া-অনুষ্ঠানে (মা'আরিকে)[১] আবৃত্তি করা হইত (মুনতাখাবু'ত তাওয়ারীখ, কলিকাতা ১৮৬৮ খৃ., ২খ, ৪৮১)। সম্রাট আকবারের যুগেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। যেহেতু আজ পর্যন্ত আগ্রার দুর্গ হইতে এই তা'যিয়াহ বাহির হইয়া থাকে যাহাকে আকবারী যুগের সহিত সম্পৃক্ত করা হয় এবং মুগল তা'যিয়াহ নামে অভিহিত করা হয়।

(কথিত আছে) সম্রাট জাহাঙ্গীরের যুগে সায়্যিদ মু'ঈনু'দ-দীন মুসাবী আজমীরীর 'আযাখানাহ্‌ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইহেতু আজ পর্যন্ত এই 'আযাখানাহ্‌টি ওয়াকফসমেত তারাগড়ে বিদ্যমান রহিয়াছে ('আযাদারী কী তারীখ)। বাদশাহ 'আলামগীরের যুগেও তা'যিয়াহ ও তা'যিয়ার শোভাযাত্রার প্রচলন ছিল। 'আলামগীর-ই তা'যিয়াহ মিছিলে তলোয়ার-লড়াই নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইহার পর হইতে এই ধরনের শোভাযাত্রায় (তলোয়ার খেলার পরিবর্তে) বাঁক-বিন্‌নাওট (এক প্রকার ফৌজী প্রশিক্ষণ/লাঠিখেলা)-এর প্রচলন শুরু হয়, যাহা কোন কোন অ-শী'আ মিছিলে বর্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে ('আবদু'ল-ওয়াহিদ ফিরিংগী মাহাল্লী, ইযালাহ্‌-ই আওহাম, 'আযাদারী কী তারীখ, পৃ. ৩৫)।

পরবর্তী যুগে দিল্লীর বাদশাহ 'আযা উদ্‌যাপনে এত অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন যে, মুহাররামের সাত তারিখ হইতে দশ তারিখ পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকরূপে নায়র (বাদশাহকে প্রদত্ত নযরানা) ও দর্শনী (কারবালার স্মরণে ও অনুকরণে) ভিস্তি, ফাকীর ও কয়দী হওয়ার প্রথা পালন (অভিনয়) করা হইত (বায্‌ম-ই আখির, লাহোর ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৫৬প.; 'আলাম-ই হায়দারী ওয়া শাওকাত-ই হায়দারী, লাখনৌ ১২৭০ হি.; 'আযাদারী কী তারীখ, পৃ. ৪৩; বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. নিবন্ধকারের প্রবন্ধ বাহাদুর শাহ জাফার কী 'আযাদারী, আসাদ (সাময়িকীতে মু.) লাহোর, মুহাররাম ১৩৭৮ হি.)।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি প্রায়ই শী'আ মতাবলম্বী ছিল। এই কারণে এইখানে 'আযাদারী যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। মাতম, মজলিস, তা'যিয়াহ মিছিল ও ইমাম বাড়াহ্‌ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহাররামে শোক উদ্‌যাপিত হইতে থাকে (ইব্‌রাহীম যুবায়রী, তারীখ-ই বীজাপুর, পৃ. ২৩০ ও ৪৩৩; নাসীরু'দ-দীন হাশিমী, দাকান মেঁ উরদূ, ৩য় অধ্যায়, পৃ. ২২৩; তারীখ-ই বীজাপুর, মুহয়ি'দ-দীন যোর, সুলতান কুতব শাহ, (ইহা ছাড়া শী'আ সাময়িকীসমূহের মুহাররাম সংখ্যা)। কুতবশাহ, গাওয়াসী, নুসরাতী প্রমুখের মারছিয়াহ্‌ (শোকগাঁথা)-সমূহ, (য়ূরোপ মেঁ দাখ্‌নি মাখ্‌তূতাত, হায়দরাবাদে মুদ্রিত) ও প্রাথমিক যুগের স্মৃতিবাহক। হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ও রাজপুতানার রাজ্যসমূহ (বিশেষত জয়পুর)-এর জন্য তুহফাতু'ল-'আলাম (রচনা ১২১৬/১৮০১), হায়দরাবাদ ১২৯৪ হি., পৃ. ৩৫৯ প.)।

১৩শ/১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত তা'যিয়াহদারী গোটা দেশে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। অযোধ্যায় 'আযাদারীর প্রসার এবং তা'যিয়াহ-র প্রচলন হইয়াছিল বাহ্যত আসিফু'দ-দাওলার যুগে (মৃ. ১২১২/১৭৯৭) (দ্র. তুহফাতু'ল-'আলাম, পৃ. ৩৪৮ ও ৩৫৯), তবে বাহরাইজে সায়্যিদ সালার মাস'উদ গাযীর মাযারের তা'যিয়াহ, সীতাপুরে বাওয়ান ডান্‌ডুঁ কা তা'যিয়াহ (যথাক্রমে) হি. পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর সংগে সম্পৃক্ত (মুহাম্মাদ আক্‌বার সীতাপূরী, সীতাপূর কী 'আযাদারী, সারফারায (সাময়িকী), মুহাররাম ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৬৪)। অযোধ্যার নাওয়াব ওয়াযীর আসিফু'দ-দাওলা (তাঁহার পিতা) শুজা'উ'দ-দাওলার পরে ১১৮৯/১৭৭৫-এ ফায়যাবাদ পরিত্যাগ করিয়া লাখনৌ-এ রাজধানী স্থাপন করিলেন। ফলে ফায়যাবাদ ও দিল্লীর আমীর-উমারা', রাঈস ও শাহযাদাগণও এইখানে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সকলেই দিল্লী ও ফায়যাবাদে তা'যিয়াহদার ছিলেন। কিন্তু আসি'ফু'দ- দাওলা রাজ্যের ক্ষমতাসীন শাসক হওয়া সত্ত্বেও তা'যিয়াহদারীতে অতিশয় আসক্ত ও অনুপ্রাণিত ছিলেন। পথিমধ্যে যে কোন স্থানে তিনি তা'যিয়াহ্‌ দেখিতে পাইলে বাহন হইতে অবতরণ করিতেন এবং তা'যিয়াহ্‌দারকে ইন্‌'আম (বখশিশ) দিতেন। ১১৯৯/১৭৪৮ সালে তিনি ইমামবাড়া নির্মাণ করিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর শাহযাদাহ্‌গণ এবং অন্যান্য আমীর-উমারাও 'আযাখানাহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইভাবে লাখনৌ তা'যিয়াহদারীর কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়। গাযি'দ-দীন হায়দার ও নাসীরু'দ-দীন হায়দারের যুগে ইহার প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়। অনেকগুলি দাম দারীহ বিলাত হইতে ফরমায়েশ দিয়া তৈয়ার করাইয়া আনা হয় এবং ইহাতে শৈল্পিক নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটানোর সাথে সাথে আড়ম্বর ও জাঁকজমক শুরু হইয়া যায়। [আসিফী যুগে প্রথমবারের মত লাল পাথুরে ও ধাতব) এবং বিল্লৌরী (স্বচ্ছ কাচের) তা'যিয়াহ য়ূরোপ হইতে তৈয়ারি হইয়া আসে। স্বর্ণ-রৌপ্যের দারীহ (সৌধ প্রতিকৃতি)-ও নির্মিত হইতে থাকে। আমীরগণ ও জনসাধারণ অভিনবত্ব সৃষ্টি করে এবং শিল্প-দক্ষতার পরিচয় দেয়। এইগুলির মধ্যে শাহ নাজাফের ও হুসায়ন আবাদের 'আযাখানাহসমূহের স্বর্ণ-রৌপ্যের দারীহগুলি ছাড়াও মোমের দারীহ দর্শনীয় ছিল যাহা এক বৎসরের অধিক সময় ব্যাপিয়া নির্মিত হইত এবং রাজকীয় শোভাযাত্রার সহিত বাহির হইত।

ইহা ছাড়া হিন্দু রাজ্যসমূহ এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিতে তথাকার বাসিন্দারা নিয়মিতভাবে তা'যিয়াহ্‌দারী করিত। স্যার টমাস ব্রাউটন (Sir Thomas Broughton, Letters written in a Maharatta Camp during the years 1809-1892) তাঁহার পত্র নং ৭-এ মারাঠা যুগের এবং মুহাম্মাদ লাতীফ তাঁহার তারীখ-ই লাহোর (ইংরেজী,

(১) মূল গ্রন্থে মা'আরিক (معارك) শব্দ রহিয়াছে, বাহ্যত উহার অর্থ আখড়া বা আড্ডাসমূহ। Ronking বাদাউনীর অনু. (কলিকাতা ১৮৯৮ খৃ, ১খ, ৬৪২) তরজমা করিয়াছেন।

নূতন সংস্করণ, লাহোর)-এর শিখদের যুগের 'আযাদারীর ও মহারাজ শের সিংহের তা'যিয়াহ্‌র উল্লেখ করিয়াছেন। মুহাম্মাদ লাতীফ তাঁহার পুস্তকের ২৭১ পৃষ্ঠায় মহারাজা শের সিংহের তা'যিয়াহ ও 'যু'ল-জানাহ (ময়ূরপংখী)-এর চিত্রও দিয়াছেন। তদ্রূপ দ্রষ্টব্য, মাসিক 'মাহ্‌-ই নাও, 'ইসতিকলাল, সংখ্যা ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৫০ ('আযাদারী কী তারীখ, পৃ. ২৩)।

শী'আ রাজ্যগুলি তো যেভাবেই হউক–ইহাকে ফরয মনে করিত; কিন্তু সুন্নী নওয়াবগণও সাওয়াবের নিয়াতে তাযিয়াহ রাখিতেন, ইমামবাড়াহ্‌ প্রতিষ্ঠা করিতেন এবং ইহার জন্যভূসম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া দিতেন। ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যের নওয়াবের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মহলে আজ অবধি তা'যিয়াহ ও তা'যিয়াহ-খানাহ্‌ বিদ্যমান রহিয়াছে। অমুসলিম রাজ্যসমূহের মধ্যে ইন্দোর, ধোলপুর, দত্য (দাত্যিয়াহ্‌) কাপুরতলা ছাড়াও গোয়ালিয়ার ও জয়পুরের মহারাজার তা'যিয়াহ্‌র প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। এই সকল রাজ্যে তা'যিয়াহদারীর জন্য সরকারী আওকাফ রহিয়াছে (আল-'আরাব সাময়িকী, বোম্বাই, মুহার্‌রাম ১৩৬০ হি. সংখ্যা, 'আযাদারী কী তারীখ, পৃ. ২১)।

ইরানে অবশ্য তা'যিয়াহ্‌র প্রচলন নাই। তবে উহার তামছীল (অভিনয়)-এর প্রচলন রহিয়াছে। ইরাকে আলান (পতাকা/কাল পতাকা) ও যু'ল-জানাহ (ময়ূরপঙ্খী) বাহির হইতে দেখা যায় এবং এই ধরনের শোভাযাত্রাকে 'মাওকির' বলা হয়। কাশ্‌মীর, নেপাল ও আফ্রিকায় তা'যিয়াহদারী হইয়া থাকে এবং সেইখানকার ধরন-ধারণ বহুলাংশে পাকিস্তানে প্রচলিত পন্থার অনুরূপ হইয়া থাকে।

উপমহাদেশের সর্বত্র তা'যিয়াহ্‌র ব্যাপক প্রচলন রহিয়াছে। তা'যিয়াহ মিছিল, যাহাতে তা'যিয়াহদারের আঞ্চলিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটানো হয়, যথা লাখনৌ, রামপুর, জয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের তা'যিয়াহ্‌ জুলুস (মিছিল) এমনভাবেই বাহির করা হয় যেন তাহাদের বাড়ি হইতে কোন শ্রদ্ধার্হ সম্মানিত মৃত ব্যক্তির জানাযা বাহির হইল অর্থাৎ উহার সংগে 'শাহী মারাতিব' (রাজকীয় শোভাযাত্রার সম্মুখে বিশেষ মর্যাদার চিহ্নধারী বাহন, বর্তমানের গার্ড রেজিমেন্ট), হাতি, উট, ঘোড়া, সামরিক বাদ্যদল, ছোট ছোট শোক-পতাকা ও ইউনিফর্ম পরিহিত সৈনিক দল, বারকান্দায (তোপ বা কামান বাহিনী), 'আসা বারদার (ব্যক্তিগত দেহরক্ষী) এবং সেই মাতম ওয়ালা, তা'যিয়াহ্‌দার খালি মাথা, শোকের পোশাক পরিহিত, মাথায় ধুলা মাটি মাখানো, বুকে হাত ও চোখে রুমাল রাখিয়া অশ্রু প্রবাহিত করিতে করিতে ধীরগামিতায় চলিতে থাকে। এই শোভাযাত্রার পিছনে একজন ঘোষক এইভাবে ঘোষণা দিতে থাকে ঃ

سواری ھے شہ کرب وبلا کی–سواری ھے ھمارے بادشاہ کی .

"এই অশ্বারোহী কারব ও বালা (কারবালা-বিপদ ও মুসীবত)-এর বাদশাহের; এই আরোহী আমাদের রাজাধিরাজের" কিংবা এই কথাটিকে খণ্ড কবিতাকারে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকে। তখন অগ্রাভিযানের নাকারাহ্‌ (ফৌজী বাদ্যবিশেষ) বাজিতে থাকে। নিজেরা কাঁদে ও অন্যদের কাঁদাইতে থাকে। কোন কোন শোভাযাত্রায় শোকের বাদ্য বাজিতে থাকে, মাতমের দলটি সীনায় চপেটাঘাত করিতে করিতে এবং হাতুড়ী পেটানো ও শিকল পেটাপেটি চলিতে থাকে। আবার কোনও কোনও শোভাযাত্রা থাকে সম্পূর্ণ নীরব ও মৌন। রাজা-মহারাজা, নওয়াব, শাহযাদাহগণও সাধারণ জনতার ন্যায় আদবের সহিত পদব্রজে এই মৌন মিছিলে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সময় রাজকর্মচারীদের জন্য আদব ও দরবারী রীতিনীতির বাধ্যবাধকতা রহিত হইয়া যায়।

সাধারণ তা'যিয়াহ্‌ বাহনের নিয়ম এই যে, তা'যিয়াহদার তা'যিয়াহ্‌টি মাথায় অথবা কাঁধে তুলিয়া লইয়া নীরবে কারবালা-র উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে কিংবা 'শোকদল' বা মর্মবিদারী কবিতা পাঠকারীরা নিজেদের সংগে কফিন, ময়ূরপঙ্খী বা 'আলী আসগারের দোলনার প্রতিকৃতি লইয়া অশ্রু প্রবাহিত করিয়া বুকে হাত মারিতে মারিতে চলিতে থাকে এবং কারবালা তথা কবরস্থানে পৌছিয়া দাফনযোগ্য তা'যিয়াহ্‌গুলি দাফন করিয়া দেয়। দাফনযোগ্য না হইলে তাহা অন্যান্য তাবাররুকের সহিত পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া সংরক্ষণ করে।

তা'যিয়াহদারীর এই ধারা ২৮/২৯ যু'ল হিজ্জা হইতে ৮ রাবী'উ'ল-আওওয়াল পর্যন্ত চলিতে থাকে। পাকিস্তান, নেপাল, কাশ্‌মীর ও আফ্রিকায় সাধারণত ১০ মুহার্‌রাম [ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত লাভের দিন] তা'যিয়াহ দাফন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতের কোনও কোনও স্থানে, বিশেষত লাখনৌতে এই ধারাবাহিকতা ৮ রাবী'উ'ল-আওওয়াল (ইমাম হাসান 'আসকারীর শাহাদাত দিবসে) সমাপ্ত হইয়া থাকে। আর মৌন ও নীরব তা'যিয়াহ (যেহেতু উহার মিছিলে পূর্ণাংগ নীরবতা ও মৌনতা পালন করা হয়)-কে শেষ তা'যিয়াহ মনে করা হয়।

ইমাম হুসায়ন (রা)-এর মাযারের সংগে সম্বন্ধিত হওয়ার কারণে এবং একটি সম্মানিত নিদর্শন হওয়ার কারণে শী'আ মতালম্বিগণের দৃষ্টিতে তা'যিয়াহকে কা'বা ঘরের গিলাফ এবং মিসরীয় মাহমিল (হাওদা/পাল্কী)-এর ন্যায় সম্মানযোগ্য মনে করা হয়। কিন্তু ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের কারণে ইহাকে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সত্ত্বেও ধর্মত উহার পূজা করাকে তাহারা হারাম মনে করে।

(সংযোজন) (ক) বাংলাদেশ ঃ মুগল আমল হইতেই ঢাকা নগরী (তৎকালীন জাহাঙ্গীর নগর) পূর্বাঞ্চলের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করিয়া আসিয়াছে যাহার ফলে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় এইখানেও মুহার্‌রামের শোক উদ্‌যাপন ও তা'যিয়াহ মিছিল প্রচলিত রহিয়াছে। মুগল যুগের শেষ দিকে মুর্শিদাবাদের (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার) নওয়াবগণ ছিলেন শী'আ মতাবলম্বী, ঢাকায় তাঁহাদের নাইব নাজিম থাকিতেন। সম্ভবত তাঁহাদের মাধ্যমেই ঢাকায় তা'যিয়াহ্‌র প্রচলন ঘটে। পরবর্তী সময় বৃটিশ যুগেও ঢাকার নওয়াবগণ, যাঁহারা বাহ্যত শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন, তা'যিয়াহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আহলে বায়তের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি মহব্বাতের তাকীদে অনেক সুন্নী মুসলিমও তা'যিয়াহ মিছিলে অংশগ্রহণ করিতেন। বর্তমানে তা'যিয়াহ্‌র বিষয়টি মোটমুটি ১০ মুহার্‌রামের শোভযাত্রা (যাহাতে রং ছিটান, তলোয়ার লড়াই ও হায় হুসায়ন, হায় হুসায়ন ধ্বনিসহ) উহার পূর্বে ও পরে আনুষংগিক কতক অনুষ্ঠানে সীমিত রহিয়াছে। ঢাকায় এই তা'যিয়াহ অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হইল হুসায়নী দালান (রখশী বাজারের নিকটে) এবং মুহাম্মদপুরের ইমামবাড়া। এই উপলক্ষে হুসায়নী দালানে একটি মেলাও বসিয়া থাকে। ঢাকার শী'আগণ ইহাকে তা'যিয়াহ মিছিল এবং সাধারণ জনগণ মুহুর্‌রাম মিছিল বলিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে তাওয়ারীখে ঢাকা-এর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

হোসেনী দালান ঃ হোসেনী দালান এই শহরের একটি প্রসিদ্ধ ইমারত, শাহ শুজা'র সুবাদারীর আমলে তদানীন্তন নিজামাতের নেওয়াড়ের দারগাহ্‌ মীর মুরাদ ১০৫২/১৬৪২ সালে এই ইমারত নির্মাণ করেন। ...ইহাতে দুইটি মিনার...পশ্চিমে তা'যিয়াহ প্রভৃতির ঘর

রহিয়াছে। চারিদিকে দেওয়াল এবং দক্ষিণদিকে একটি দেউড়ি। মুহাররাম মাসে দেওয়ালের তাকের উপর প্রদীপ দিয়া আলো জ্বালান হয় এবং দালানের উপর মিহরাব ও মিনারের উপর আয়নার ঢাকনা লাগাইয়া আলো জ্বালান হয়।... মীর মুরাদের পর ঢাকার নাইব নাজিমগণ এই ইমামবাড়ার মুতাওয়াল্লী হইতে থাকেন। তাঁহারা ইহার ব্যয় বাবদ নিজামাত হইতে বৎসরে আড়াই হাজার টাকা খরচ বরাদ্দ করিতেন যাহা আজকাল (লেখকের যুগে) সরকার হইতে পাওয়া যায়। ...১৮৯৭ খৃ. ভূমিকম্পে এই ইমারতের অধিকাংশ ভাংগিয়া পড়িয়া গেলে নওয়াব স্যার আহসানুল্লাহ বাহাদুর আনুমানিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহা নূতনভাবে নির্মাণ ও মেরামত করিয়া দেন (দ্র. মুন্‌শী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারীখে ঢাকা, বাংলা অনু. ডক্টর আ. ম. ম. শরফুদ্দীন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৪০৫/১৯৮৫, পৃ. ২০০)। বাংলাদেশের অনেক কবি মারছিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। তা'যিয়াহ বাংলা সাহিত্যেও স্থান করিয়া নিয়াছে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের মুহাররাম সম্পর্কিত অনেক কবিতার একটিতে রহিয়াছে ঃ

কারবালা যেন নাহি আসে আর মোহররমের চাঁদে
তাজিয়া মিছিলে একি কাজিয়ার খেলা দেখে প্রাণ কাঁদে।

(অনুবাদকের সংযোজন সমাপ্ত) [পরবর্তী সংযোজন শারী'আতের দৃষ্টিতে তা'যিয়াহ, গ্রন্থপঞ্জীর পরে]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাজমু'দ-দীন জা'ফার ইব্‌ন নাজীবি'দ-দীন মুহাম্মাদ (মৃ. ৬৪৫ হি.), মুছীরুল-আহ্‌যান, মাকতাল ইব্‌ন নি'মা নামে প্রসিদ্ধ, ইরানে মুদ্রিত ১৩১৮ হি.; (২) মিরযা ইবরাহীম যুবায়রী, তারীখ-ই বীজাপুর, বাসাতীনু'স-সালাতীন, মাতবা'-ই সায়্যিদী, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, তা. বি.; (৩) মুহাম্মাদ হুসায়ন আল-মুজাফ্‌ফারী, তা'রীখু'শ-শী'আ, নাজাফ ১৩৬৭/১৯৪৭; (৪) 'আবদু'ল-লাতীফ শূসতারী, তুহফাতু'ল-'আলাম, হায়দরাবাদ, দক্ষিণাত্য; (৫) সায়্যিদ সিবতু'ল-হুসায়ন হানসাবী, 'আযাদারী কী তারীখ, ২য় মুদ্রণ, নিজামী প্রেস, লাখনৌ ১৯৪১ খৃ.; (৬) মুহাম্মাদ হাদী হাসান হুসায়নী, নুকূশ-ই রাহ্‌ (মাওজূদা 'আযাদারী কা জাইযাহ্‌), করাচী, অনুরূপ, তাযিয়াহদারী কা রাওয়াজ, রিযাকার (সাময়িকী), মুহাররাম সংখ্যা, ১৩৭৮/১৯৫৮, পৃ. ৩২; (৭) মিরযা হায়দার শিকূহ তায়মূরী শাওকাত-ই হায়দারী (মাছনাবী), সুলতানু'ল-মাতাবি', লাখনৌ; (৮) মুরতাদা হুসায়ন, 'আযাদারী দার 'আহ্‌দ রানী উমায়্যাহ্‌ ওয়া 'আহ্‌দ রানী 'আব্বাস (عزاداری در عهد بنی امیة وعهد بنی عباس), রিযাকার (সাময়িকী), ১৩৭৮/১৯৫৮, খৃ. ৯৭; ও আসাদ (সাময়িকী), লাহোর, মুজাহিদ-ই আ'জাম, সংখ্যা ১৩৭৮/১৯৫৮; (৯) বিলাল যুবায়রী, মা'রাকাহ-ই মুহাররাম, রিযাকার, মুহাররাম সংখ্যা, ১৩৭৮/১৯৫৮, পৃ. ১৩৭; (১০) হাফিজ যু'ল-ফাকার 'আলী শাহ, তা'যিয়াহ, যু'ল-জানাহ্‌ ওয়া 'আলাম, রিযাকার, লাহোর, মুহাররাম সংখ্যা, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১১৭; (১১) বিভিন্ন শহর, অঞ্চল ও দেশের এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির তা'যিয়াহ্‌র বিবরণের জন্য দ্র. নিম্নের প্রবন্ধসমূহ ঃ জাইস-এর জন্য, কাল্‌ব-ই মুসতাফা, পায়াম-ই ইসলাম, মুহাররাম সংখ্যা, ১৩৬৮ হি.; হায়দরাবাদ (সিন্ধু)-এর জন্য আঁসাহ এফ. 'আলী নওয়াব বেগ, আসাদ, লাহোর, আরবা'ঈন সংখ্যা, ১৩৭৪ হি., পৃ. ৩৭; ইরানের জন্য মাস'উদ হাসান আদীব, পায়াম-ই ইসলাম, মুহাররাম সংখ্যা, ১৩৬৮ হি.; আরদাবীল-এর জন্য জনৈক ইংরেজ, আসাদ, মুজাহিদ-ই আ'জাম সংখ্যা ১৯৫২.; ইরাকের জন্য সায়্যিদ কাইম মাহ্‌দী, রিযাকার আরবাঈন সংখ্যা, ১৩৭১/১৯৫১ এবং 'আবদু'স-সামাদ, শী'আ, লাহোর, আরবা'ঈন সংখ্যা, ১৯৫৮ খৃ.; সীতাপুরের জন্য মুহাম্মাদ আমর, সারফারায, লাখনৌ, মুহাররাম সংখ্যা ১৯৫২ খৃ.; ডেরাহ্‌ ইসমা'ঈল খান-এর জন্য হাদী হুসায়ন, রিযাকার, লাহোর, আরবা'ঈন সংখ্যা, ১৩৭৭/১৯৫৫; মিসরের ফাতিমী যুগের জন্য মুজতাবা হাসান কামূপুরী, রিযাকার, লাহোর, আরবা'ঈন সংখ্যা ১৯৫৩ খৃ.; হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য)-এর জন্য সায়্যিদ কামাল আসগার, সারফারায, লাখনৌ, ৯ নভেম্বর, ১৯৫৭ খৃ.; রিয়াসাত-ই ডুমরাওঁ (-এর জন্য), ফিদ্‌য়াহ্‌-ই মুজতাবা, ইসতিক্‌লাল, লাখনৌ, মুহাররাম সংখ্যা, ১৯৫১ খৃ.; আল-মুসলিমুনা ফি'ল-হিন্দ (-এর জন্য) 'আবদু'ল মুন'ইম আল-'আদাবী, আল-'আরাব (সাময়িকী), বোম্বাই, ২খ, সংখ্যা ৯০; বাহাদুর শাহ জাফার-এর জন্য মুরতাদা হুসায়ন, শী'আ, লাহোর, মুহাররাম নামাহ্‌ ১৯৫৮ খৃ.; তায়মূর ও তায়মূর বংশীয়দের সহিত সম্পৃক্ত বর্ণনা ঐতিহ্যের জন্য রিদাকার, মুহাররাম সংখ্যা, ১৩৭৮ হি.; মুহাম্মাদ হায়দার শিকূহ তায়মূরীর জন্য 'আলাম-ই হায়দারী, লাখনৌ ১২৭০ হি., পৃ. ১৫; 'আযাদারী কী তারীখ, পৃ. ৪৮, ২৪ ও ৫০ (হা); আরও দ্রষ্টব্য মুরতাদা হুসায়ন, ইসলাম কী বাগ-ই হায়াত, 'আযাদারী-ই সায়্যিদু'শ-শুহাদা' (اسلام کی باگ حیات : عزاداری سید الشهداء) পায়াম-ই 'আমাল, লাহোর, মুহাররাম ১৩৭৮/১৯৫৮ এবং শায়খ তাসাদ্দুক হুসায়ন, লাখনৌ কে মাআছিরে মুতাবাররাকাহ, রাওশনী (সাময়িকী), লাখনৌ, মুহাররাম সংখ্যা, ১৩৭২/১৯৫২; ঐ লেখক, মুহাররাম কা তামাদ্দুনী পাহ্‌লু, সারফারায, লাখনৌ, মুহাররাম সংখ্যা ১৯৫২ খৃ.; আখ্‌তার হুসায়ন, হিন্দুস্তান কে গায়র মা'রূফ মাআছিরে মুতাবাররাকাহ্‌ (هندوستان کی غیر معروف مآثر متبرکه), সারফারায, মুহাররাম ১৩৭১/১৯৫১ সংখ্যা।

মুরতাদা হুসায়ন ফাদিল (দা.মা.ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

আরও কতিপয় উৎসগ্রন্থ E. I. তুর্কী হইতে ঃ (১) W. Litten, Das Drama in Parsian, বার্লিন ১২২৯ খৃ.; (২) A. Chodzko, Theatre Persan, প্যারিস ১৮৭৮ খৃ.; (৩) Lewis Pelly, The Miracle play of Hasan and Hussain, ২ খণ্ডে, লন্ডন ১৮৯৭ খৃ.; (৪) Ch. Virolleaud, La passion de Imam Hosseyn, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.; The Glory of the Shiah World, অনু. ও সম্পা. P. M. Sykes ও খান বাহাদুর আহমাদ দীন খান, লন্ডন ১৯১০ খৃ.; (৫) J. Morier, Second Voyage en Perse, প্যারিস ১৮১৮ খৃ.; (৬) M. de Gobinean, Les religionset Les Philosophies dans L'Asie Centrale, ২য় মুদ্রণ, প্যারিস ১৮৬৬ খৃ.; (৭) J. Lassy, The Muharram Mysterise among the Azerbeijan Turks of 'Caucasia, Helsingfors ১৯১৬ খৃ.; (৮) E. G. Browne, A History of Persian Literature in Modern Times, কেমব্রিজ ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১৭২ প. এবং উহার পরিশিষ্ট, H. Retter, Isl-এ. ১৫খ. (১৯২৬ খৃ.), ১০৭; (৯) B. D. Eerdmans, Der Ursprung der Ceremonien des Hosein-Festes (Z. A. ১খ.); (১০) G. van Vloten, Les drapeaux en usage a la fete de Hucein a Teheran (Internationales Archiv fur Ethnogra-vii {1892} 3) Phie; (১১) E. Aubin, Le Chsme et la nationalite Persane, RMM-এ, ৪খ., ১৯০৮ খৃ.।

R. Strothmann (দা. মা. ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

সংযোজন (খ) ঃ ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে তাযিয়াহ ঃ ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম অর্থাৎ মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা ইসলামের দৃষ্টিতে স্বীকৃত। তবে শারী'আতের মূল বিধিমালা স্বভাব (তথা কুপ্রবৃত্তি)-এর অকল্যাণকর চাহিদাগুলি নিয়ন্ত্রিত করে এবং কল্যাণকর (তথা সুরুচিসম্পন্ন) চাহিদাগুলি পূরণের বাস্তবসম্মত পন্থার অনুমোদন করে।

তা'যিয়াহ্‌কে প্রথমত 'ইবাদতের তালিকাভুক্ত করিবার উপায় নাই। কেননা 'ইবাদতের প্রধান লক্ষ্য হইল বান্দার চরম দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য ও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি হাসিল করা। সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে এই লক্ষ্য অর্জনকারী বিষয়গুলি উদ্দিষ্ট (মাক্‌সূদা) 'ইবাদত (যেমন সালাত, সাওম ইত্যাদি) এবং এই ধরনের 'ইবাদতের জন্য সহায়ক ও আনুষংগিক বিষয়গুলি অনুদ্দিষ্ট, পরোক্ষ (গায়র মাক্‌সূদা) 'ইবাদত (যেমন উযূ, তায়াম্মুম ইত্যাদি)। শারী'আতে 'ইবাদাতের মূলনীতি নির্ণীত রহিয়াছে। কুরআন, সুন্নাহ (হাদীছ) ও ইহাদের অনুকূল ইজমা' এবং এই তিনটির আলোকে সম্পাদিত কিয়াস কোন কার্যকে 'ইবাদত সাব্যস্ত করিতে পারে। শারী'আতের নির্ণীত এই মানদণ্ডে তা'যিয়াহ্‌কে 'ইবাদত বলিবার অবকাশ নাই। কেননা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিল করাকে ইহার লক্ষ্য বলিয়া দাবি করা যায় না। [প্রসংগত মূল নিবন্ধে উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য বিবরণ নহে। কেননা হামযা (রা)-এর জন্য বানূ 'আবদি'ল-আশহাল নারীদের ক্রন্দন প্রথমত যথাযথ প্রামাণিক নহে। তাহা ছাড়া ঐ ক্রন্দন সাব্যস্ত হইলেও প্রচলিত তা'যিয়াহ উহার সহিত কোনরূপ সামঞ্জস্য রাখে না। আর স্বপ্নের ঘটনা দ্বারা যে কোন বিধান সাব্যস্ত করা যায় না তাহা বলাই বাহুল্য। পতাকা গাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপার তথৈবচ। অন্যান্য উদ্ধৃতি অত্যন্ত দুর্বল। যেহেতু শারী'আতের দৃষ্টিতে এইগুলি কোন কিছুকে 'ইবাদত সাব্যস্ত করিতে পারে না। উপরন্তু এসব ঘটনা ও প্রচলিত তা'যিয়াহ-তে সামান্য মিল খুঁজিয়া পাওয়াও মুশকিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি এই ধরনের দুর্বল প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইতে পারে]? যদি বলা হয় যে, ইহা যেহেতু আহ্‌লে বায়তের জন্য শোক প্রকাশ ও মহব্বত প্রকাশের মাধ্যম এবং আহ্‌লে বায়তের প্রতি মহব্বত ছাওয়াবের কাজ, সুতরাং উহা 'ইবাদত হইবে, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য– শারী'আত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-সব রকমের 'ইবাদতের প্রক্রিয়া নির্ণয় করিয়া দিয়াছে। মৃতের জন্য, বিশেষত আপন ও প্রিয়জনের জন্য এবং বিশেষভাবে আহ্‌লে বায়তের জন্য শোক প্রকাশ ও মমত্ববোধ অবশ্যই উত্তম কার্য এবং প্রিয়জনের জন্য শোক প্রকাশ তথা মনের এই আবেগ-উদ্বেলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান একটি স্বভাবজাত বিষয় বিধায় শারী'আত উহার অনুমতি দিয়াছে। যেমন স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর শোক পালন ইত্যাদি। কিন্তু শারী'আতে উহার মেয়াদ ও পন্থা নির্ণীত রহিয়াছে। যেমন, উম্মু'ল-মু'মিনীনগণ তাঁহাদের (স্বামী ব্যতীত অন্যান্য) আত্মীয়দের মৃত্যুতে তিন দিন পরে সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন না থাকিলে শুধু শোক ভংগ করা প্রকাশ করিবার জন্য উহা ব্যবহার করিতেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (স)-এর এই বাণীর উদ্ধৃতি দিতেন যে, তিনি বলিয়াছেন, لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد فوق ثلاث الا على زوج "আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনকারিণী কোন নারীর জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন হালাল নহে; তবে স্বামীর জন্য..." (সাহীহ মুসলিম, দিল্লী ১৩৭৬ হি., ১খ, ৪৮৬প.; তদ্রূপ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)। অনুরূপ হযরত নবী কারীম (স) পুত্র ইব্‌রাহীম (ও কোন দৌহিত্র)-এর মৃত্যুতে অশ্রু প্রবাহিত করিয়া বলিলেন ঃ তোমার বিরহে, হে ইব্‌রাহীম! আমরা দুঃখ-ভারাক্রান্ত, তবে আমরা মুখে এমন কথাই বলিব যাহা আমাদের প্রতিপালক পসন্দ করেন [দ্র. হাদীছ গ্রন্থসমূহে ইব্‌রাহীম (রা)-এর মৃত্যু প্রসংগ এবং মৃতের জন্য ক্রন্দন প্রসংগ] [অর্থাৎ আমরা এমন কিছু বলিব না বা করিব না যাহা আল্লাহ পসন্দ করেন না]।

মোটকথা, মৃতের জন্য শোক পালন ও উহার প্রকাশ শারী'আতসম্মত বিষয়। তবে শারী'আতই উহার পন্থা-প্রক্রিয়া ও সময়সীমা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে, যাহার লংঘন অবৈধ ও হারাম। যেমন হাদীছ শারীফে রহিয়াছে ঃ اثنتان فى الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على الميت "মানুষের মাঝে দুইটি বিষয় তাহাদের জন্য কুফ্‌রী; বংশসূত্রের বিষয় অপবাদ দেওয়া, মৃতের জন্য বিলাপ করিয়া কাঁদা" (পূ. গ্র., ১খ, ৫৮)। অনুরূপ ليس منا من ضرب الخدود اوشق الجيوب او دعا بدعوى الجاهلية "যাহারা (শোকে মাতম করিয়া) গাল চাপড়ায়, বুক ছিঁড়ে কিংবা জাহিলী যুগের অনুরূপ (বাগাড়ম্বর) চিৎকার জুড়িয়া দেয় তাহারা আমাদের (ঈমানদার জামা'আতের) অন্তর্ভুক্ত নহে" (পূ. গ্র., ১খ, ৭০)।

তদ্রূপ আরব নারীরা মৃতের জন্য বিলাপের সহিত ক্রন্দন করিত, চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া, হায় কী হইল রে, ওরে পাহাড় (واجهلاه) ইত্যাদি বলিয়া চিৎকার করিত, আবার বিভিন্ন সুরে শোকগাঁথা গাহিয়া সম্মিলিত নারীকণ্ঠে বিভিন্ন পন্থায় শোক প্রকাশ করিত। এমনকি তৎকালে 'আরবদেশে শোক পালনের জন্য পরিবারে পরিবারে ক্রন্দনের সহযোগিতা বিনিময়েরও প্রচলন ছিল অর্থাৎ এক পরিবারের নারীদের শোকের সময় অন্য পরিবারের নারীরা আসিয়া কাঁদিয়া যাইত এবং পরবর্তী সময় দ্বিতীয় পরিবারটির শোক পালনকালে প্রথম পরিবারের নারীরা দ্বিতীয় পরিবারের জন্য কাঁদিত। লক্ষণীয় যে, এইসব ক্ষেত্রে পুরুষদের বিশেষ কোন ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। হযরত নবী কারীম (স) শোক প্রকাশের এইসব লোক দেখানো, আন্তরিকতা বর্জিত ও রুচিহীন প্রথাকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এমনকি ইসলামে নব দীক্ষার সময় নারীদের বায়'আত গ্রহণকালে নবী (স) অন্যান্য শর্তের সহিত (দ্র. সূরা আল-মুমতাহানা) "এবং তাহারা বিলাপের পরে আহাজারী করিবে না" (وان لا ينحن) -এই শর্তটিও আরোপ করিতেন (দ্র. হাদীছ গ্রন্থসমূহে নারীদের বায়'আত ও বিলাপে নিষেধাজ্ঞা অধ্যায়)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শোক প্রকাশের এই জাহিলী পন্থা উচ্ছেদ করাও শারী'আতের লক্ষ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, 'ইবাদতরূপে তা'যিয়াহ জাতীয় শোক প্রকাশ কুরআন-সুন্নাহ্‌ কর্তৃক অনুমোদিত নহে। তদ্রূপ ইহাকে শুধু প্রথাগত বিষয় বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলিবারও কোন উপায় নাই। কেননা প্রথমত, শারী'আত মুসলমানদের জীবনের যাবতীয় প্রথা ও উৎসব-অনুষ্ঠানকেও নিয়ন্ত্রণ করে এবং উহাকে 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেয় [যথা 'ঈদ অনুষ্ঠান, 'আকীকা (জন্ম উৎসব), জানাযা ইত্যাদি]। দ্বিতীয়ত, এই অভিনব প্রথাটির কোনও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা ও সার্থকতা নাই। সামাজিক কল্যাণেও ইহার কোন কার্যকারিতা নাই, বরং ইহাতে রহিয়াছে অযথা সময় ও সম্পদের অপচয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন করিবার কারণও হইয়া থাকে। তদুপরি শুধু হায়...হায়...করিয়া ভক্তি প্রেম প্রকাশের ভান করা সঙ্গত হইতে পারে না। ইহা আহলে বায়তের প্রতি আন্তরিক মহব্বত যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনেরও সঠিক পন্থা হইতে পারে না। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাত লাভ কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনা হইতে ইসলামী আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ও সমাজ জীবন হইতে অন্যায় ও

অবিচার উচ্ছেদের জন্য ত্যাগ, জিহাদ ও শাহাদাতের প্রেরণা লাভ ও শিক্ষা গ্রহণ তা'যিয়াহ্‌র মাধ্যমে অর্জিত হয় না।

উপসংহার ঃ এই সম্পর্কে লাখনৌ-এর বরেণ্য 'আলিম ও ফাকীহ মাওলানা 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী (র)-এর ফাতওয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

ايا ان يشتغل فى يوم عاشورا- بيدع الرفضة من الندب النياحة والحزن اذ ليس ذاك من اخلاق المؤمنين والا كان يوم وفاته صلى الله عليه اولى بذالك واجرى .

"আশূরা দিবসে রাফিদীদের অনুসৃত চিৎকার-ক্রন্দন, বিলাপ-মাতম ইত্যাদিতে নিমগ্ন হওয়ার ব্যাপারে অতি সাবধান! কেননা ইহা মু'মিনদের নীতি ও চরিত্র নহে। অন্যথায় নবী কারীম (স)-এর ওফাত দিবস এই সব কর্মের জন্য অধিক উপযোগী ও অধিক উত্তম হইত" (আস-সাওয়া'ইকু'ল-মুহরিকা-র বরাতে)।

মুহাম্মাদ ইসমাইল

তা'যীর (تعزير) ঃ শব্দটির উৎপত্তি ধাতুমূল ع-ز-ر হইতে। عزر ও تعزير শব্দদ্বয় প্রায় অভিন্ন অর্থবোধক অর্থাৎ নিষেধ করা, বিরত রাখা, অনুযোগ করা, দোষারোপ করা [শক্তি যোগান দেওয়া, সবল করা] ইত্যাদি। দ্বিতীয় পর্যায়ে শব্দটির অর্থ আদব শিক্ষা দিয়া, সতর্ক করিয়া এবং মারধর করিয়া কাহাকেও হুকুম (শারী'আতের বিধিবিধান) ও নিয়ম-নীতি পালনের অভ্যাসে স্থির করা (التوقيف على الفرائض والاحكام)। ইসলামী ফিকহের পরিভাষায় যেই বিশেষ স্বার্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা হইল, যেই পাপের জন্য কোন নির্দিষ্ট শাস্তি (حد) নিরূপিত হয় নাই সেই ধরনের পাপের জন্য প্রদত্ত 'আদাব' ও সাজা (عقوبة)। এই শাস্তি সাধারণত হাদ্দ (আভিধানিক অর্থ সীমা)-এর তুলনায় লঘু হইয়া থাকে। অপরাধীকে অপরাধের পুনরাবৃত্তি হইতে বিরত রাখা (ان يمنع الجانى ان يعاود الذنب) এবং আইন মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত করাই তা'যীর-এর লক্ষ্য।

তা'যীর ও তা'দীব (تاديب) প্রায় সমার্থক শব্দ। তা'যীর পারিভাষিক ব্যবহারে শাস্তি বুঝায় এবং আমীরু'ল-মু'মিনীন বা তাহার প্রতিনিধি শারী'আতসম্মতভাবে তা'যীর নির্ধারণ ও প্রদান করিতে–এমনকি আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। অন্যপক্ষে তা'দীব (تاديب) অর্থাৎ শিষ্টাচার (ادب) শিক্ষার কোন আইনগত ব্যাপার নহে; পিতা তাহার সন্তানকে কিম্বা শিক্ষক তাহার ছাত্রকে যে ধরনের শিষ্টাচার শিক্ষা দানের প্রয়োজনবোধে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করেন তাহাকে তা'দীব বলা হয়।

ইসলামী শারী'আতে তিন প্রকারের শাস্তির বিধান রহিয়াছে। (১) যেই সকল শাস্তি আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন অথচ উহাদের বাস্তবায়ন ব্যক্তিগতভাবে বান্দার উপরে অর্পণ করিয়াছেন অর্থাৎ বাহিরের কোন শক্তি বা কর্তৃপক্ষ (যথা সরকার কিংবা শাসনকর্তা) উহাতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। এই ধরনের শাস্তির পারিভাষিক নাম কাফ্‌ফারা (كفارة-ক্ষতিপূরণ), যথা শপথ (قسم) ভংগের কাফ্‌ফারা (দ্র. ৫ ঃ ৯২)। (২) যেই সকল দণ্ড ও শাস্তি আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবী (স)-এর সুন্নাহ-তে হাদ্দ (حد) (দ্র.) নামে অভিহিত হয়; এইগুলির ক্ষেত্রে বিচারক বা শাসনকর্তার মতামতের কোন অবকাশ বা অধিকার থাকে না। অন্যপক্ষে মুসলিম সমাজ কর্তৃপক্ষ এই হাদ্দ জারি রাখার দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য, যেমন ব্যভিচারের হাদ্দ, মদ্যপানের হাদ্দ ইত্যাদি। (৩) যেসব শাস্তি ও দণ্ড কিতাব বা সুন্নাহ-তে নির্ণীত হয় নাই, বরং ক্ষেত্রের বিচারে ও প্রয়োজন অনুসারে ক্ষমতাসীন শাসক কিংবা তাহার পক্ষে কাযীগণ ইহা নির্ণয় ও জারি করিতে পারেন। এই ধরনের শাস্তির ক্ষেত্রে সরকারের আইন প্রণয়নের অধিকার রহিয়াছে। এই ধরনের শাস্তিকে তা'যীর বলা হয়।

হাদ্দ ও তাযীর-এর মধ্যে আর একটি পার্থক্য রহিয়াছে। হাদ্দ হইল হাক্‌কুল্লাহ তথা আল্লাহ্‌র হক বা অধিকার (الحد هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى) আর তা'যীর বান্দার হক (হাক্‌কু'ল-'ইবাদ)। হাদ্দ-এর ক্ষেত্রে বান্দা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। অন্যপক্ষে তা'যীরের ক্ষেত্রে বান্দা দুইভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। প্রথমত, শাস্তির পরিমাণ কম-বেশি করা যাইতে পারে কিংবা ইহার ধরনও প্রকরণ পরিবর্তন করা যাইতে পারে, যথা, বেত্রাঘাত করা, আর্থিক জরিমানা, তিরস্কার, অপমান করা, কারাদণ্ড দান এবং উহার সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ণয় করা ইত্যাদি। অপরাধের ক্ষেত্র, পাত্র ও স্থান-কালভেদে তা'যীরের বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ইহা যেহেতু বান্দার হাক্‌ক ও অধিকাররূপে স্বীকৃত, সুতরাং মজলুম (নিপীড়িত ব্যক্তি/বাদী)-এর অধিকার রহিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে অপরাধী (বিবাদী)-কে ক্ষমা করিয়া দিতে পারে। এই বিবেচনায় কিসাস হাদ্দরূপে পরিগণিত হইবে না। কারণ ইহাও বান্দাহ্‌র হাক্‌করূপে স্বীকৃত। কিসাস অংশত আল্লাহ্‌র হাক্‌ক এবং অংশত বান্দার হাক্‌ক। কুরআন মাজীদে কিসাস-এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে এবং বান্দাকে অপরাধ ক্ষমা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং উৎসাহ দান করা হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১৭৮); দ্র. আল-বাহ্‌রু'র-রা'ইক, ৫খ, ২)।

ইসলামী শারী'আতে দণ্ডের (عقوبة) প্রথম লক্ষ্য আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে অপরাধীদের সৃষ্ট ফিতনা (বিপর্যয়) হইতে রক্ষা করা। ইসলাম পৃথিবীতে বিশৃংখলা (فساد) এবং মুসলিম সমাজে বিপর্যয় (فتنة) পসন্দ করে না (শারহু ফাত্‌হি'ল-কাদীর, ৪খ, ১১১)। দ্বিতীয় লক্ষ্য হইল প্রত্যেক মানুষের স্বকীয় সংস্কার ও সংশোধন, যাহাতে অপরাধীদের অপরাধপ্রবণতা বদ্ধমূল ও দৃঢ় না হইতে পারে (ঐ, পৃ. ২১১)। সংস্কার-সংশোধন উদ্দেশ্যটির বিস্তৃত পরিসরে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় পক্ষই শামিল। কিন্তু শারী'আতের বিধিবদ্ধ দণ্ডের কল্যাণে মুসলমানগণ পরকালের শাস্তি হইতে রেহাই পাইতে পারেন যেহেতু উহাতে পাপ হইতে পবিত্রতা অর্জিত হয়। এই কারণেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাপে লিপ্ত মুসলিম অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদানের মাধ্যমে নিজেই দণ্ড গ্রহণের দাবি করিত।

কিসাস ও তা'যীরে দণ্ডবিধান আইনে মানুষের স্বভাবজাত প্রতিশোধস্পৃহার প্রতিও লক্ষ রাখা হইয়াছে এবং এই প্রতিশোধস্পৃহাকে ক্ষমা ও বদান্যতায় রূপান্তরিত করিবার উৎসাহ দান করিয়া ইসলাম উন্নত মানের নৈতিকতা ও উচ্চ স্তরের চারিত্রিক গুণের উন্মেষ ঘটাইবার প্রয়াস পাইয়াছে। মোটকথা ইসলামী দণ্ডবিধিতে একাধারে নিহিত রহিয়াছে নীতিশাস্ত্রে (Ethics) স্বীকৃত তিনটি মূল লক্ষ্যই, তথা (ক) প্রতিশোধ গ্রহণ (Retributive), (খ) ভীতি প্রদর্শনে প্রতিরোধ (Deterrent) ও (গ) সংশোধন (Reformative) ব্যক্তি পর্যায়ে ও পারস্পরিক পর্যায়ে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতিরেকে ঃ (১) হাদীছ ও ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ল-হুদূদ অর্থাৎ হাদ্দ অধ্যায়, বিশেষত কাসানী, بدائع الصنائع কায়রো ১৯১০ খৃ., ৭খ, ৬৩; (২) খালীল, আল-মুখতাসার, অনু. (ইংরেজী) Santillana, মিলান ১৯১৯ খৃ., ২খ, ৭৪২; (৩) মাওয়ারদী, আল-আহকামু'স সুলতানিয়্যা ঃ Enger

সং, Bonn ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৩৯৯ প., অনু. Fagnan, আল-জাযা'ইর ১৯১৫ খৃ., পৃ. ৪৬৯ প.; (৪) শা'রানী, আল-মীযান, কায়রো ১৯২৫ খৃ., ২খ, ১৭৫ প.; (৫) Kresmarik, Beitrage zur Beleuchtnug des Islam Strafrechts, in Z. D. M. G., ৫৮ খ., ১৯০৪ খৃ., ৬৫, ৫৫৬ প.; হাদীছ-সমূহের জন্য দ্র. (৬) Wensinck, Handbook of Early Muhammadan Tradition, লাইডেন ১৯২৭ খৃ., Punishment শিরো.।

Heffening ও 'আবিদ আহ্‌মাদ 'আলী (দা. মা. ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

তায়ম ইব্ন মুর্‌রা (تيم بن مرة) ঃ মক্কার কুরায়শ বংশের একটি শাখা। এই গোত্র ছাড়াও আরবের আরও কতিপয় গোত্র এই একই নামে অর্থাৎ 'তায়ম ইব্ন মুর্‌রা" নামে পরিচিত। এই নামের অর্থ 'দাস'। ইহা খুব সম্ভব প্রাচীন ধর্মভিত্তিক নাম, যেমন তায়মাল্লাহ্-তায়ামাল্লাত [দ্র.] এবং বিভিন্ন শিলালিপিতে উল্লিখিত নাম ঃ তায়ম মানাত, তায়ম রুদা প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত রূপ (তু. Wellhausen, Reste^2, p. 7; Lidsbarski, Handbuch d. nordsem, Epigrahik, p. 385)। তায়ম ইব্ন মুর্‌রা কুরায়শ আল-বাতাইহ্ অর্থাৎ মক্কার প্রভাবশালী গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাহাদের কোনও রজনৈতিক প্রভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। অথচ অন্যদিকে তাহাদের নিকট সম্পর্কীয় মাখ্‌যূম [দ্র.] গোত্র (মাখযূম ইব্ন য়াকজা ইব্ন মুররা-এর গোত্র) প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে কুসায়্যি-এর বংশধরদের সমকক্ষ ছিল। মক্কার প্রাক-ইসলামী যুগের ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ নাই বলিলেই চলে (তু. সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন Caetani, Annali dell' Islam, Index, vol. i-ii., p. 1506)। ইসলামের আবির্ভাবকালে এই গোত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জুদ'আন। তিনি তাঁহার দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার গৃহেই কুরায়শ গোত্রসমূহ তাহাদের মৈত্রী সংঘ গঠন করিয়াছিল (হিল্‌ফু'ল-ফুদূল; তু. Caetani, Annali, Introduction, শা. ১৪৭)। ইসলামের যুগেও তাঁহার সম্পর্কে এই কথাটি উল্লেখ করা হইত। তিনি কবি উমায়্যা ইব্ন আবি'স-সাল্‌তের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন (আগানী, ৮খ, ২-৫; তু. Schulthess, Orientalische Studien, Th. Noldeke... gewidmet, i, 73 প.; Goldziher, al-Hutai'a, Z. D. M. G., xlvi, 7)।

ইতিহাসে তায়ম ইব্ন মুর্‌রা গোত্র সম্পূর্ণরূপে এই কারণে বিখ্যাত যে, এই গোত্র হইতে ইসলামের দুই বিখ্যাত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছেঃ আবূ বাক্‌র (রা) ও তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ (রা)। তায়ম ইব্ন মুর্‌রা গোত্র মক্কায় যে এলাকায় বসবাস করিত, আল-আযরাকী উহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (Chron. d. Stadt Mekka, সম্পা. Wustenfeld, i, 468)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wustenfeld, Geneal. Tabellen, R 16 (Register, P. 447); (২) ইব্ন দুরায়দ, কিতাবু'ল-ইশতিকাক, সম্পা. Wustenfeld, p. 59 প.।

G. Levi Della Vida (E,1.^{1})/মোঃ মনিরুল ইসলাম

তায়মা' (تيماء) ঃ উত্তর আরবে পানির প্রাচুর্যে ভরা এক মরূদ্যানের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনবসতির নাম। দূমাতু'ল-জান্‌দাল হইতে দক্ষিণ দিকে ইহার দূরত্ব চারি দিনের পথ এবং মুকাদ্দাসীর মতে হিজ্‌র হইতে তিন দিনের পথ আর ওয়াদি'ল-কুরা হইতে চারি দিনের পথ। এই জনবসতি অপেক্ষাকৃত এক নিম্নভূমিতে অবস্থিত, যাহার দৈর্ঘ্য ২ মাইল এবং প্রস্থ ৫০০ গজ বলিয়া Jaussen এবং Savignac উল্লেখ করিয়াছেন। এই পর্যটকদ্বয় আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, এইখানে ভূ-গর্ভস্থ পানি সঞ্চিত হইয়া প্রবল বেগে ফাটিয়া ৪০-৪৫ ফুট গভীর ও ৬০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি কূপের সৃষ্টি করিয়াছে। কীলকাকৃতির বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপিতে এবং বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এ একটি বিখ্যাত সরাইখানা হিসাবে তায়মা-র কথা উল্লিখিত হইয়াছে [যিশাইয় (Jsaaih), ২১ ঃ ১৪; যিরমিয় (Jeremiah), ২৫ঃ ২৩; ইয়োব (Job), দ্র. ১৯]। Euting যে প্রাচীন আরামীয় (Aramaic) উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন পারস্য যুগের এবং ইহা তায়মা'র- সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। প্রাচীন আরব কবিগণ তাঁহাদের কবিতায় এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ইমরুউল কায়স, মুআল্লাকা, শ্লোক ৭৬; "এই (ঝড়বৃষ্টি)-তে তায়মা-র কোন খেজুর গাছ কিংবা পাথর নির্মিত নহে এমন কোন ঘর-বাড়ি রক্ষা পায় নাই।' উত্তর আরবের অন্যান্য মরূদ্যানের মত এই স্থানেও বহিরাগত য়াহূদী কিংবা ধর্মান্তরিত য়াহূদীগণ বসতি স্থাপন করে। এই বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে ছিল আব্‌লাক আল-ফার্‌দ দুর্গের অধিপতি সামাওয়াল [দ্র.]। আ'শা এবং অন্যান্য কবিগণ এই সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। তায়মা'-র এই য়াহূদী অধিবাসীরা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না, কিন্তু যখন তাহারা ওয়াদি'ল-কুরায় বসবাসকারী তাহাদের স্বধর্মাবলম্বী য়াহূদীগণ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি শত্রুতা করিয়া কি পরিণতি ভোগ করিয়াছে তাহা জানিতে পারিল, তখন তাহারা স্বেচ্ছায় নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইল। ফলে বার্ষিক একটি কর প্রদানের বিনিময়ে তাহারা ভূমির অধিকার ও সেইখানে থাকার অনুমতি লাভ করিল। তবে খলীফা হযরত 'উমার (রা)-র সময়ে আরবদেশের অন্যান্য য়াহূদীদের মত এই তায়ামা'-র য়াহূদীদিগকেও সেই স্থান হইতে বহিষ্কার করা হয়। খৃ. দশম শতাব্দীতে ইব্ন হাওকাল তায়মা'-কে তাবূক অপেক্ষা অধিক ঘন জনবসিতপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মুকাদ্দাসী তাঁহার বর্ণনায় এক বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিতে তায়মা'-র অবস্থানের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় সেইখানে একটি ঝরনা ও অনেকগুলি কূপসহ (ইহাদের অনেকগুলি ধ্বসিয়া গিয়াছে) পানির প্রাচুর্য, সুন্দর সুন্দর বাগান, চমৎকার খেজুরগুচ্ছে পূর্ণ অসংখ্য খেজুর গাছের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যদিকে তিনি ইহার অধিবাসীদের লোভ-লালসার নিন্দা করিয়াছেন এবং এই শহরবাসীদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্তী শতাব্দীতে আল-বাক্‌রী এই শহরের যেই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ঘন বসতিপূর্ণ এই শহরে একটি ছোট নদীর তীর ঘেঁষিয়া এক ফারাসাঙ্গ (فرسنك) প্রলম্বিত একটি প্রাচীর ছিল এবং সেই স্থানে খেজুর, ডুমুর, আঙ্গুর প্রভৃতি ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। আধুনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে Euting এই শহরের একটি সুন্দর বর্ণনায় ইহার অপ্রশস্ত রাস্তাঘাট এবং ফলের বাগান ঘেরা বাড়ি-ঘরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন কালের নিদর্শনগুলির মধ্যে তিনি বিভিন্ন উপাসনালয় (Temples) এবং চারিকোণে বুরুজবিশিষ্ট একটি চতুর্ভুজাকার ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান কিন্তু তিনি আব্‌লাক দুর্গের কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই; তবে য়াকূতের বর্ণনা অনুযায়ী উহার ধ্বসাবশেষ তাঁহার যুগেও সেইখানে দেখিতে পাওয়া যাইত [দ্র. আব্‌লাক]। Jaussen ও Savignac কতকগুলি অদ্ভুত প্রকৃতির গোলাকার মাটির স্তূপের বর্ণনা দিয়াছেন, যাহাদের পার্শ্বদেশ সিঁড়ির মত

এবং সেই সিঁড়ি একটি ছোট চতুষ্কোণ ভবন পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। বর্তমানে তায়মা'-র সর্বত্র ধ্বংস ও ক্ষয়ের নিদর্শন বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযুরী, সম্পা. de Goeje, পৃ. ৩৪ প.; (২) B. G. A., সম্পা. de Goeje, ১খ, ২২; ২খ, ২৯; ৩খ, ১০৭, ২৫০, ২৫২; ৭খ, ১৭৭; ৮খ, ৫৮৪; (৩) বাক্‌রী, Geogr, Worterb., সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ২০৮ প.; (৪) য়াকূত, Geogr. Worterb., সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৯০৭ প.; (৫) Doughty, Travels in Arabia, ১খ; ২৮৫, ৫৩৩, ৫৪৯ প.; (৬) Euting, Tagebuch einer Reise in Innnerarabien, ২খ, ১৪৮ প., ১৯৯ প.; (৭) Jaussen and Savignac, Mission archeologique, ২খ, Texte, ১৩৩-১৬৩, Tafel, ৬১-৬৪।

F. R. Buhl (E. I. [1])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

তায়মাল্লাহ ইব্ন ছা'লাবা (تيم الله بن ثعلبه) ঃ একটি আরব গোত্র। ইহা 'আদনানবাসী গোত্রসমূহের রাবী'আ ইব্ন নিযার শাখার অন্তর্গত এবং বিখ্যাত বাক্‌র ইব্ন ওয়াইল গোষ্ঠীর অংশ। এই গোত্রের বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ তায়মাল্লাহ্ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন 'উকবা ইব্ন স'াব ইব্ন 'আলী ইব্ন বাক্‌র ইব্ন ওয়া'ইল। কোন কোন বর্ণনায় এই নামটি "তায়মাল্লাত"-রূপে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই গোত্র আরবদেশের অন্য কতিপয় গোত্রের মতই রীতিমত ছা'লাবা বংশেরই অন্য এক শাখা 'বানূ কায়স ইব্ন ছা'লাবা'-এর সহিত মৈত্রী (হিল্‌ফ) স্থাপন করে এবং উভয় গোত্রই অপর দুই গোত্র বানূ 'ইজ্‌ল ও বানূ 'আনাযা-র সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এই গোত্র-সংঘ 'আল-লাহাযিম' নামে পরিচিত (অভিধান সংকলকদের মতে 'লিহযিমা' শব্দ দ্বারা কানের পিছনের একটি গোলাকার অস্থিকে বুঝায় এবং ইহা সংঘের ঐক্যের দৃঢ়তা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী সময়ে এই সংঘ আরও সম্প্রসারিত হয় এবং ইহাতে বানূ মাযিন ইব্ন সা'ব ও এমনকি বিখ্যাত বাক্‌রী বংশভুক্ত বানূ যুহ্‌ল ও বানূ শায়বানও শামিল হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরও একটি বাক্‌রী গোত্র বানূ হানীফা এই সংঘে যোগদান করে (আল-মুবার্‌রাদ, কামিল, সম্পা. Wright, p. 276, 1-2; নাকা'ইদ, সম্পা. Bevan, p. 47, 1. 10; পৃ. 305, 1.9, p. 764. 1.9 এবং বিশেষভাবে P. 725. 15; Wustenfeld সম্ভবত মনে করেন যে, 'আল-লাহাযিম' শব্দ শুধু তায়মাল্লাহ গোত্রের সহিতই সম্পর্কিত এবং তাঁহার এইরূপ ধারণা হওয়ার কারণ সম্ভবত তিনি ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৪৮-এর বর্ণনা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন; আরও তুলনীয় Reiske, Primae Lincae, p. 253 note, p. 255 note h)। তায়মাল্লাহ্ গোত্র অন্যান্য মিত্রদের সহিত মিলিয়া তামীমদের বিরুদ্ধে বাক্‌র ইব্ন ওয়া'ইল-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বিশেষভাবে যুবালা, নিবাজ, তায়ছাল, জাদূদ ও আল-ওয়াকীত-এর যুদ্ধসমূহে সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া দেখা যায় (শেষোক্ত দুইটি যুদ্ধ ইসলামী যুগে সংঘটিত হয়)। তবে তাহারা বিশেষ কোন দুঃসাহসী বা শ্রেষ্ঠ কার্য দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিল কিংবা তাহাদের কোন নেতা বিশেষ কোন খ্যাতিমান ব্যক্তি ছিলেন এমন মনে হয় না। শেষোক্ত দুইটি যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন যথাক্রমে আল-হাওফাযান ইব্ন শারীক ও আবজার ইব্ন জাবির। উভয়েই ছিলেন বানূ 'ইজল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আরও দূরবর্তী অতীতে তায়ামাল্লাহ্ অন্যান্য বাকরী গোত্রসমূহের সহিত একত্রে আল-হীরার লাখমী গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যাহার উল্লেখ 'য়াওম উমারা'-এর গল্পে বর্ণিত হইয়াছে।

বাক্‌র ইব্ন ওয়া'ইল বংশভুক্ত সকল গোত্রের মত তায়মাল্লাহ্ গোত্রও খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ছিল (তু. তাবারী, Annales, i, 2032, শেষ পংক্তি), কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগেই তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং ইসলামের বিজয় অভিযানে অংশগ্রহণ করে। মুসলমানদের গৃহযুদ্ধে তাহারা জড়িত থাকে এবং উদাহরণস্বরূপ তাহাদের একজন ইয়াস ইব্ন আব্‌লা খলীফা হযরত 'উছমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে (নাকা'ইদ, সম্পা. Bevan, p. 918 প.)। তায়মাল্লাহ্‌গণ প্রধানত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের ইতিহাসে হিজরী প্রথম দুই শতাব্দীতে কিছু ভূমিকা পালন করে। এই গোত্রের সদস্যদের মধ্যে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জনকারী সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন 'আওস ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন যুফার ইব্ন ওয়াদী'আ, যিনি কবি হিসাবেও পরিচিত ছিলেন (ইব্ন হাজার, ইসাবা, কায়রো ১৩২৫ হি., ১খ, ৮২,-এর বর্ণনা, দি'বিল-এর তাবাকাতু'শ-শু'আরা' হইতে এবং আল-মারযুবানী-এর মু'জামুশ-শু'আরা' হইতে উদ্ধৃত; পালমীরা-র দুইটি প্রাচীন মূর্তি সম্পর্কিত কবিতাবলী, যেইগুলি য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৮৩০-এ উল্লিখিত); তিনি খুরাসানের গভর্নর ছিলেন। ৬৫ হিজরী সনের গৃহযুদ্ধের সময় খুরাসানের বাক্‌র ইব্ন ওয়া'ইলভুক্ত সকল গোত্রের সমর্থনে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিনের নেতৃত্বে পরিচালিত মুস'আব ইবনুয যুবায়র-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত লড়াই করিয়া হিরাত রক্ষা করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ এক বৎসর তাহা অধিকারে রাখেন (তাবারী, Annales, ২খ, ৮৮৪-৪৯০; বালাযুরী, ফুতূহ্, সম্পা. de Goeje, p. 414-415)। তায়মাল্লাহ্ গোত্রের অন্য একজন কবি ছিলেন নাহার ইব্ন তাওসি'আ, তিনি খুরাসানে বাক্‌র গোত্রসমূহের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের যুদ্ধাভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন, যাহাকে তিনি ব্যঙ্গ করিয়া এক সময় কবিতা লিখেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার সহিত যোগদান করেন (তু. ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র, সম্পা. de Goeje, p. 342 প.; হামাসা, সম্পা. Freytag, p. 431 প; নাকা'ইদ, সম্পা. Bevan, p. 359 প., 364 প., 368; তাবারী, Annales, ii, Passim; আল-কালী, আমালী, ২খ, ২০১ প. ইত্যাদি)।

আরবদেশে, বিশেষত দক্ষিণ অঞ্চলে আরও কতকগুলি গোত্র ছিল, যেইগুলি তায়ামাল্লাহ্ (কিংবা তায়মাল্লাত) নামে পরিচিত ছিল। ইব্নু'ল-কালবী নিম্নোক্ত গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ তায়মাল্লাহ্ ইব্ন আসাদ ইব্ন ওয়াবারা; তায়মাল্লাহ্ ইব্ন যাহ্‌উ (?) ইব্ন মুর্‌রা ইবনু'ল-গাওছ ইব্ন তায়্যি; তায়মাল্লাহ্ ইব্ন হিকাল...ইব্ন মাযিন ইবনুল আযদ; তায়মাল্লাহ ইব্ন রুফায়দা ইব্ন ছাওর ইব্ন কাল্‌ব; তায়মাল্লাহ ইব্ন 'আমির আল-আজদার...ইব্ন কালব; তায়মাল্লাহ্ ইবনু'ন-নামির ইব্ন কাসিত; তায়মাল্লাহ্ ইব্ন ওয়াদ্‌ম ইব্ন ওয়াহ্‌বিল্লাত...ইব্ন কাল্‌ব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wustenfeld, Geneal. Tabellen, B 17 (Register, p. 447); (২) ইবনু'ল-কাল্‌বী, জামহারাতু'ল- আনসাব, পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম, Add., 23, 297, fol, 270b-229b; (৩) ইব্ন দুরায়দ, কিতাব ইশ্‌তিকাক, ed. Wustenfeld, p. 212 প.।

G. Levi Della Vida (E.I. [1])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

তায়াম্মুম (تيمم) ঃ ইসলামের কতিপয় 'ইবাদতের জন্য পবিত্রতা (طهارة) হাসিলের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে পানির অভাবে মৃত্তিকা বা বালুকা ব্যবহার করার নাম 'তায়াম্মুম'। কুরআন মাজীদের ৪ ঃ ৪৩ ও ৫ ঃ ৭ এই দুই আয়াতে তায়াম্মুমের বিধান রহিয়াছে।

প্রথমোক্ত আয়াতের শেষাংশের অর্থ নিম্নরূপ ঃ "...যদি তোমরা জানাবাতের (جنابة) অবস্থায় থাক তবে গোসল করিয়া লও (فاطهروا), আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা মুসাফিরীতে থাক অথবা তোমাদের মধ্যে কেহ ইস্‌তিঞ্জা (الغائط) হইতে আগমন করে অথবা তোমরা স্ত্রীসঙ্গম করিয়া থাক (لامستم النساء), অতঃপর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পাক মাটি (صعيدا طيبا) দ্বারা তায়াম্মুম করিয়া লও, তথা মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসহ (فامسحوا) কর; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় মার্জনাকারী ও ক্ষমাপরায়ণ।" শেষোক্ত আয়াত (৫ ঃ ৭)-এর শেষাংশে তায়াম্মুমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় ঃ "আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ইহা নহে যে, তিনি তোমাদের উপর কোন অসুবিধা (حرج) চাপাইয়া দিবেন, বরং তাঁহার ইচ্ছা তোমাদিগকে পরিচ্ছন্ন রাখেন এবং তোমাদের জন্য স্বীয় নি'মাত্ পূর্ণ করেন যেন তোমরা শোক্‌রগুযারী কর।" উভয় আয়াতে তায়াম্মুমের বিধান ও পদ্ধতি অভিন্ন বচনে ব্যক্ত হইয়াছে। পার্থক্য শুধু منه ("ইহা দ্বারা"); আয়াত ৫ ঃ ৭-এই হা-র উল্লেখ রহিয়াছে, অপর আয়াতে নাই। শাফি'ঈদের মতে (দ্র. বায়দাবী, ৪ ঃ ৪৬) منه-তে ইংগিত রহিয়াছে যে, হস্ত-তালুর মধ্যে অবশ্যই কিঞ্চিৎ বালু মাটি থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে হানাফী মায্‌হাব মতে পরিচ্ছন্ন ও মসৃণ প্রস্তরখণ্ডে হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া তদ্বারা মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাসহ্ করিলে তায়াম্মুম বৈধ হইবে।

আশ-শা'রানী (الميزان الكبرى, কায়রো ১২৭৯ হি, ১খ, ১৪৩ প.) বিভিন্ন 'মাযহাবের' মধ্যে তায়াম্মুম সম্পর্কিত বিধি-বিধানে মতভেদে ১৪টি দফার (Point) উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ঃ (ক) উপকরণ (মৃত্তিকা, বালুকা) সম্পর্কীয় মতভেদ, (২) পানি অন্বেষণের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে মতভেদ, (গ) মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় উপরোক্ত বৈধ উপকরণ দ্বারা মাস্‌হ করিবার বৈধ সীমা ও মাত্রার পরিমাণ সম্পর্কে মতপার্থক্য; (ঘ) তায়াম্মুম করিয়া সালাত আরম্ভ করার পর পানি উপস্থিত হইলে মুসল্লীর কর্তব্য কি? (ঙ) একবারের তায়াম্মুম দ্বারা দুইটি ফরয সালাত আদায় করা যায় কিনা? (চ) তায়াম্মুমকারী পানি দ্বারা উযুকারিগণের ইমামতি করিতে পারে কিনা? (ছ) মুসাফির না হইলে 'ঈদ-এর সালাত ও জানাযার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম বৈধ কিনা? (জ) মুসাফির না হইলে সালাত আদায়ের জন্য পানির অন্বেষণে যথার্থ অর্থে কত সময় ব্যয় করিতে হইবে? পানি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই কি তায়াম্মুমকারী আদায়কৃত সালাত পুনরায় সম্পন্ন করিবে? (ঝ) প্রাপ্ত স্বল্প পরিমাণ পানি দ্বারা আংশিক উযূ সম্পাদনের পরে বাকি অঙ্গুলির তায়াম্মুম করা বৈধ হইবে কি না? (ঞ) আঘাতজনিত কারণে ক্ষত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করিবার পদ্ধতি কি? (ট) তায়াম্মুম করিয়া আদায়কৃত সালাত কি চারিটি ক্ষেত্রে পুনরায় আদায় করিতে হইবে?

এতদসম্পর্কে সকল মাযহাব-এর ঐকমত্য এই যে, অপবিত্রতার কারণ (حدث দ্র.) যাহাই হউক, বড় (যথা স্ত্রীসঙ্গম) হউক বা ছোট (যথা পেশাব-পায়খানা) হউক, পবিত্রতা অর্জনের জন্য তায়াম্মুমস্বরূপ মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় একবারমাত্র মাস্‌হ করিলেই যথেষ্ট হইবে, উযূ বা গোসলের ক্ষেত্রে কি করিতে হয় তাহা তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নহে (ইমাম আন-নাওয়াবী, সাহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা, কায়রো ১২৮৩ হি., ১খ, ৪০৬)।

বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'ঊদ (রা) ও 'উমার (রা) জানাবাত-এর ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করিয়া সালাত সম্পন্ন করার বৈধতা সম্পর্কে সংশয় পোষণ করিতেন (দ্র. বুখারী, তায়াম্মুম, বাব ৭; মুসলিম (حيض), হাদীছ নং ১১০)। পক্ষান্তরে সাহাবী আবূ যার (রা)-এর বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূলে কারীম (স) তাঁহাদের এই জাতীয় সংশয়কে নির্মূল করিয়া দিয়াছেন তাঁহার এই উক্তির দ্বারাঃ "কোন লোক যদি সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল যাবৎ পানির অন্বেষণে ব্যর্থ হয় তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের জন্য পবিত্র বালুকা উৎকৃষ্ট উপকরণ হইবে" (আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল, মুস্‌নাদ, ৫খ, ১৪৬ প.)।

কুরআন মাজীদে তায়াম্মুমের বিধান সম্বন্ধে রিওয়ায়াত আছে যে, একদা হযরত 'আইশা (রা)-র হৃত কণ্ঠহার অনুসন্ধানের সময় ক্ষেপণের মুসলিম বাহিনীর যাত্রা ব্যাহত হয়। ফলে ঐ বাহিনীর সঞ্চিত পানি নিঃশেষ হইয়া যায় এবং এই উপলক্ষে তায়াম্মুম সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হয়।

Talmud-এ (Berakot, fol. 15a) পানির অভাবে বালুকা ব্যবহারের এই প্রকার অনুমতি বিদ্যমান। Cedrenus (Annales, সম্পা. Hylander, Basle ১৫৬৬, পৃ. ২০৬) বর্ণনা দিয়াছেন, মরুপথে ভ্রমণকালে কিভাবে বালুকা দ্বারা খৃষ্টীয়তে baptism সম্পাদিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. (১) তাফসীর গ্রন্থসমূহে ৪ঃ৪৩ ও ৫ঃ৭-এর ব্যাখ্যা; (২) Noldeke-Schwally, Geschichte des Korans, ১খ, ১৯৯; (৩) A. Geiger, Was hat Moh. aus dem Fudenthume aufgenommen? পৃ. ৮৬; (৪) Th. W, Juynball, Hadleiding etc., Leyden ১৯২৫, ৫৮; (৫) A. J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, দ্র. Tayammum.

A. J. Wensinck (E. I. [1])/ মুহম্মদ শওকত আলী

আত-তায়ালিসী (الطيالسى) ঃ সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ইব্‌ন আল-জারূদ আবূ দা'ঊদ ছিলেন হাদীছ সংগ্রাহক ও একখানি 'মুসনাদ'-এর সংকলক। তায়লাসান-এর বহুবচন তায়ালিসা শব্দ হইতে এই হাদীছবেত্তার সম্বন্ধবাচক নাম (নিসবা) গৃহীত হইয়াছে। ইহার অর্থ ক্ষুদ্রাকৃতির পরিচ্ছদ যাহা প্রায়শ শিরস্ত্রাণ হিসাবে আবার কখনও বা স্কন্দদ্বয় আচ্ছাদনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত (দ্র. Dozy, Dictionaire detaille des noms des vetements chez les arabes, পৃ. ২৭৮ প.)।

আত-তায়ালিসী ১৩৩/৭৫০-৫১ সালে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৩/৮১৮-১৯ সালে ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, তিনি ৭২ বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি শু'বা, সুফয়ান আছ-ছাওরী এবং অন্যান্য সুবিখ্যাত হাদীছ বিশারদের ন্যায় বিশ্বস্ত মুহাদ্দিছদের নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র), 'আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবী শায়বা প্রমুখের নিকট হাদীছের নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি ৩০ হাজার হাদীছের হাফিজ ছিলেন এবং সেইগুলি রিওয়ায়াত করিবার কালে কোন প্রকার লিখিত স্মারকের প্রয়োজন বোধ করিতেন না। স্মরণশক্তির ভ্রান্তি-বিস্মৃতির কিছু প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার বিশ্বস্ততার জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রায়শ বালাযুর ব্যবহারের ফলে 'শ্লীপদ' বা গোদজাতীয় রোগ তাঁহার শরীরে সংক্রামিত হইয়াছিল। আত-তায়ালিসীর হাদীছ সংগ্রহ মুসনাদ-এর মূল পাঠ ১৩২১ হিজরীতে হায়দরাবাদে মুদ্রিত হয়।

রিওয়ায়াতকারিগণের পর্যায়ক্রমিক নামসমূহ নিম্নরূপ ঃ আবূ বিশ্‌র য়ূনুস ইব্‌ন হাবীব, আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার ইব্‌ন আহমাদ

ইব্ন ফারিস, আবূ নু'আয়ম আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইসহাক, আবূ 'আলী আল-হাসান ইব্ন আহমাদ ইব্ন আল-হাসান আল-হাদদাদ আল-মাককারী, আবু'ল-মাকারিম আহমাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কায়স আল-লাব্বান (মৃ. ৫৯৭/১২০০-১)।

আত-তায়ালিসীর হাদীছের একমাত্র সংগ্রহ পুস্তক মুসনাদ-এ ছয় শত সাহাবী (রা) হইতে রিওয়ায়াতকৃত হাদীসমূহ এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায়ই বিন্যস্ত করা হয়। উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাদীছের সংখ্যা ২,৭৬৭। ফলে ইহার সংগ্রহ সংখ্যার পরিমাণ দাঁড়ায় সাহীহ বুখারী শারীফের এক-দশমাংশ এবং ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (রা)-এর মুনসাদ-এর মাত্র ১/২৫ ভাগ।

. সর্বোৎকৃষ্ট ও সুপ্রচলিত হাদীছের প্রায় সবগুলিই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং স্বল্প পরিমাণে হইলেও কতিপয় বিষয়ের ক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ ইহাতে পেশ করা হইয়াছে। ইহা সবিশেষ লক্ষণীয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিভিন্ন কার্যকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন তদ্রূপ কতিপয় ব্যক্তির জীবনোপকরণ এই গ্রন্থে অন্য হাদীছের তুলনায় অতিশয় নগণ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, হযরত খাদীজা, যায়নাব বিন্ত জাহ্শ, আবূ সুফয়ান, 'আম্র ইব্নু'ল-'আস, আবূ মূসা আল-আশ'আরী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম, ইব্ন সায়্যাদ, কা'ব ইব্ন মালিক, খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ, সা'দ ইব্ন মু'আয, সালমান আল-ফারিসী (রা) প্রমুখের রিওয়ায়াতকৃত কোন হাদীছই অত্র হাদীছ সংগ্রহে উল্লিখিত হয় নাই।

সুপ্রচলিত হাদীছ গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত হয় নাই তেমন কোন হাদীছ কদাচিৎ অত্র গ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। অতি নগণ্য সংখ্যক ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য হাদীছের মর্মার্থ উপলব্ধির প্রয়োজনে অত্র 'মুসনাদে' উদ্ধৃত হাদীছের শব্দ প্রয়োগ সবিশেষ সহায়ক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ বিশ্র মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আদ-দূলাবী, কিতাবু'ল-কুনা ওয়া'ল-আসমা', হায়দরাবাদ ১৩২২ হি., ১খ, ১৬৯; (২) যাহাবী, মীযানু'ল-ই'তিদাল, কায়রো ১৩২৫ হি., ১খ, ৪১৩; (৩) ঐ লেখক, তাবাকাতু'ল-হুফফাজ, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৭৬ প.; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ ১৩২৫ হি., ৪খ, ১৮২ প.; (৫) ইব্ন খাতীব আদ-দাহশা, তুহ্ফাত যাবি'ল-'আরাব, সম্পা. T. Mann, পৃ. ১৭০; (৬) আস-সাম্'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব, G.M.S., xx., পত্রক ৩৭৪।

A.J. Wensinck (E.I. [1] /মুহাম্মাদ শওকত আলী

তায়্যি' (طيىء) ঃ প্রাচীন আরবের একটি য়ামানী গোত্র। বংশতালিকাবিদদের মতে এই গোত্রের পূর্বপুরুষ জুলহুমা ইব্ন উদাদ, যাঁহার উপনাম ছিল তায়্যি, কাহ্তান-এর অধস্তন বংশধর এবং বিরাট কিনদা গোত্রের পূর্বপুরুষ মুর্রা ও মাযহিজ-এর ভ্রাতা। আদিতে তাহারা দক্ষিণ আরবীয় জাওফ-এর সেই অংশে, যেইখানে সান'আ' হইতে মক্কাগামী পথের উপর হুনাকা অবস্থিত, সেইখানে বেশ স্বচ্ছন্দেই বসবাস করিত। মা'রিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে এবং আরবদের চিরাচরিত যাযাবরী প্রথা অনুযায়ী আয্দ ও অন্যান্য দক্ষিণ আরবীয় গোত্রের মত তায়্যি' গোত্রও স্বদেশভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশে পাড়ি জমায়। তাহারা আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে গিয়া নাফূদ মরুভূমির দক্ষিণে শাম্মার পর্বতের নিকটে বসতি স্থাপন করে। এমন কি হাইল-এর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আজা' ও সালমা পাহাড় দুইটি তায়্যি গোত্রের পাহাড় বলিয়া অভিহিত হইত। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই এলাকার উপর যুগ যুগ ধরিয়া তায়্যি গোত্রের আধিপত্য বিরাজমান ছিল। হা'ইল ও তায়মা'-র প্রায় মাঝপথে অবস্থিত জাবাল 'আওজা' ও তায়মা' [দ্র.] তায়্যি' গোত্রের অধিকারে ছিল।

তায়্যি' গোত্রের অভিবাসনের ফলে বানূ আসাদ বংশের মুদার গোত্রকে তাহাদের ভূখণ্ডের অংশবিশেষ হারাইতে হয়। তথাপি পরবর্তীকালে দুই গোত্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এমন কি বর্ণিত হইয়াছে যে, এই দুই গোত্রের মিলিত শক্তি একত্রে তামীম বংশের বানূ য়ারবূ' গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া উক্ত গোত্রকে রিজ্লাতু'ত্-তায়স নামক স্থানে পরাজিত করে।

তায়্যি' গোত্রের নিম্নলিখিত শাখা বা উপগত্র ছিল ঃ ছুআল, জাদীলা, জারম, 'আদী, গাওছ, মা'ন, নাবহান ও 'ছা'আলিব তায়্য" নামে পরিচিত তিনটি শাখা ঃ ছা'লাবা ইব্ন জুহ্ল, ছা'লাবা ইব্ন রূমান, ছা'লাবা ইব্ন জাদ'আ'। এইরূপ নামকরণ দ্বারা তাহাদিগকে বানূ বাক্র-এর ছা'লাবা উপগোত্র হইতে পৃথক করা হইয়াছে।

জাহিলী যুগে তায়্যি' গোত্র 'ফিল্স' নামের এক দেবতার পূজা করিত। আজা' পর্বতের উপর এই দেবতার মন্দির অবস্থিত ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আদেশে হযরত 'আলী (রা) ইব্ন আবী তালিব ১৫০ জন আনসারসহ এক অভিযানে এই মন্দির ধ্বংস করেন। এই অভিযানে হাতিম আত-তা'ঈ-র এক কন্যাকে বন্দী করা হয়। তায়্যি' গোত্রের অপর এক দেবতার নাম ছিল রুদা।

অন্তত কিছু সময়ের জন্য হইলেও আল-হিরা-র লাখমী বংশীয় আত্মীয়দের সহিত তায়্যি' গোত্রের সুসম্পর্ক বজায় ছিল। ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সর্বশেষ শাসনকর্তা, ৪র্থ আন-নু'মান-এর দুইজন স্ত্রী ফার'আ বিন্ত সা'দ ও যায়নাব বিন্ত আওস তায়্যি' গোত্রভুক্ত হারিছা ইব্ন লাম-এর পরিবারের মেয়ে ছিল। সে যাহাই হউক, আন-নু'মান যখন পারস্যরাজ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পলাইয়া তায়্যি' গোত্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন তখন গোত্রের লোকেরা তাঁহাকে আতিথ্য প্রদানে অস্বীকার করে সম্ভবত এই কারণে যে, পারস্যবাসীদের সহিত তাহাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং সেই সম্পর্কও বাহ্যত একেবারে ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির ছিল না। আন-নু'মানের মৃত্যুর পর তায়্যি' গোত্রের ইয়াস ইব্ন কাবীসা আল-হীরার গভর্নর নিযুক্ত হন (৬০২-৬১১ খৃ.); তিনি 'যূকার'-এর যুদ্ধে বানূ বাক্র গোত্রের বিরুদ্ধে পারস্য ও আরব বাহিনী পরিচালনা করেন। তাবারী ও অন্যান্য গ্রন্থকার ইয়াসকে অন্যতম একজন 'ইবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ তিনি খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

নবম হিজরী সনে তায়্যি' গোত্রের লোকেরা মদীনায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই দলভুক্ত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন কায়স ইব্ন জাহদার, যিনি তাহাদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং যিনি একজন সাহাবী হিসাবে পরিগণিত (তু. উস্দু'ল-গাবা, ৪খ, ২১০)।

তায়্যি' গোত্রের নিসবা আত-তা'ঈ। এই গোত্রের কবি হাতিম আত-তা'ঈ এই নিসবা বা বংশীয় নামে বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন (তাঁহার দীওয়ান কাব্যগ্রন্থ Schulthess কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে)। তাঁহার প্রবাদখ্যাত বদান্যতাকে উপজীব্য করিয়া অসংখ্য উপাখ্যান ও গল্প-কাহিনী লিখিত হইয়াছে। তায়্যি' গোত্রের অন্য আরও কয়েকজন কবির নাম উল্লেখযোগ্য ঃ 'আরিক আত-তাঈ, যায়দ আল-কায়ল, আবূ যুবায়দ যিনি খৃষ্টান ছিলেন, 'আমর ইব্ন মিলকাত, 'আমর ইব্ন সায়্যার

ইব্ন কিরওয়াশ এবং ইসলামের আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ের খারিজী আত-তিরিম্মাহ্ যাঁহার দীওয়ান Krenkow কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে (G. M. S., xxv, 1928)। অভিধান ও দীওয়ানসমূহে তায়্যি' গোত্রের উপভাষার নমুনা সংরক্ষিত হইয়াছে, যেমন বাকিয়্যা শব্দের স্থলে বাকা, ফানিয়া স্থলে ফানা, বাজাহা স্থলে মাজাহা, জালিতু স্থলে জালতু ও জাদীদ স্থলে 'আয়্যিন। সুরয়ানী ভাষায় 'তা'ঈ' আরব ও মুসলিম অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি শব্দে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন দুরায়দ, কিতাবু'ল-ইশতিকাক, সম্পা. Wustenfeld; (২) আল-বাক্‌রী, সম্পা. Wustenfeld; (৩) Wustenfeld. Geneal. Tabellen and Register; (৪) Sprenger. Die alte Geographie Arabiens।

H. H. Bran (E.I. [1])/মোঃ মনিরুল ইসলাম

তায়্যিব, কারী মুহাম্মাদ (طيب قارى محمد) ঃ খ্যাতনামা 'আলিম, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, দক্ষ প্রশাসক ও দেওবান্দ দারুল-'উলূম মাদরাসার সাবেক মুহতামিম (অধ্যক্ষ)। মুহার্‌রাম ১৩১৫/জুন ১৮৯৭ সালে ভারতের এক ঐতিহ্যবাহী 'আলিম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দীনী প্রতিষ্ঠান দারুল-'উলূম দেওবান্দের প্রতিষ্ঠাতা ও ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের আযাদী আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার মাওলানা কাসিম নানাতুবী ছিলেন তাঁহার দাদা। পিতা হাফিজ মুহাম্মাদ আহমাদও একজন প্রখ্যাত 'আলিম ছিলেন।

১৩২২ হি. তাঁহার সাত বৎসর বয়সের সময় উপমহাদেশের খ্যাতনামা 'আলিম ও বুযুর্গ শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান, মুফতী 'আযীযু'র-রাহমান, মাওলানা হাবীবু'র-রাহমান ও পিতা হাফিজ মুহাম্মাদ আহমাদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা জীবনের শুরু হয়। মাত্র দুই বৎসরেরও কম সময়ে তিনি তাজবীদসহ কুরআন কারীম হিফজ সম্পন্ন করেন। 'আল্লামা কাসিম নানাতুবীর পৌত্র ও তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র হওয়ার কারণে তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণের বিশেষ তত্ত্বাবধানে হাদীছ, তাফসীর, ফিকহ, কালাম প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর নিকট তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করেন। ১৩৩৭/১৯১৮ সালে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তিনি দারুল-'উলূমের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং ১৩৪৩/১৯২৪ সালে সহ-অধ্যক্ষ (নাইব মুহতামিম) পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৩৪৮/১৯২৯ সালে তিনি অধ্যক্ষ (মুহতামিম)-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশী সময় অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। ছাত্রজীবনেই তিনি একজন জনপ্রিয় বক্তা হইয়া উঠেন। অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উপস্থিত বিষয়েও তিনি একাধারে ২/৩ ঘণ্টা বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইহাতে তিনি কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিতেন না। শিক্ষিত মহলে (বিশেষ করিয়া আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত) তাঁহার বক্তৃতার কদর ছিল বেশী। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার বক্তৃতার একটি সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে।

লেখনীর জগতে তিনি এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি 'আল-কাসিম' পত্রিকায় লিখিতে শুরু করেন এবং আমৃত্যু নিরলসভাবে তিনি কলম চালাইয়াছেন। ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই পর্যন্ত তাঁহার পঞ্চাশাধিক গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি একাডেমী তাঁহার লেখা প্রকাশের দায়িত্ব পালন করিতেছে। আত-তাশাব্বুহ ফিল-ইসলাম, ইসলাম মেঁ আখলাকে নিজামী, ইসলাম আওর মাগরিবী তাহ্যীব, ইসলামী মুসাওয়াত, মাসআলা-ই তাকদীর, আফতাব-ই নুবূওয়াত, দীন ওয়া সিয়াসাত, 'ইলমে গায়ব, আল-ইজতিহাদ ওয়া'ত-তাকলীদ, শানে রিসালাত, মাশাহীর-ই উম্মাত, কারবারা আওর য়াযীদ প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কবিতা রচনায়ও তিনি বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন। তাঁহার বহু কবিতা মাছনাবী ও কাসীদা দারু'ল-'উলূম ও আল-কাসিম পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেশ কিছু উচ্চাঙ্গের কবিতা পৃথকভাবে 'ইরফান-ই 'আরিফ নামে প্রকাশিত হইয়াছে।

'ইলমে তাসাওউফেও তিনি অত্যন্ত কামালিয়াত লাভ করেন। ১৩৩৯ হি. তিনি শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসানের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁহার ইনতিকালের পর মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর হাতে এবং পরে ১৩৫০/১৯৩১ সালে মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (র)-এর নিকট হইতে খিলাফাত লাভ করেন। দেশ বিদেশে তাঁহার বহু শাগরিদ ছড়াইয়া রহিয়াছে।

দা'ওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের বহু দেশ, যথা পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বার্মা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুই, কেনিয়া, রোডেশিয়া, য়ামান, কুয়েত, হিজায, ইথিওপিয়া, মিসর, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি সফর করেন। ১৯৭২ খৃ. তিনি অল ইণ্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড বোম্বাই'-এর সভাপতি মনোনীত হন। ইহা ছাড়া মু'তামার 'আলাম ইসলামী, কায়রো এবং রাবিতা 'আলাম ইসলামী, মক্কায় কয়েকবার যোগদান করেন। ১৯৮৩ সালের ২৫ জুলাই, ৮৬ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সায়্যিদ মাহবূব রিদবী, তারীখ দারু'ল-উলূম, দেওবানদ, ইউ. পি.. ১ম সং, ১৩৯৮/১৯৭৮, ২খ, ১৩৩-১৩৬; (২) 'আবদু'র-রাশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসালমান, লাহোর (পাকিস্তান) তা. বি., ভূমিকা, পৃ. ৫৩-৫৪; (৩) কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব, আফতাব-ই নুবূওয়াত, অনু. আবদুল জলীল, নবী ভাস্কর, ই. ফা. বা. ১৯৮৬ খৃ., ভূমিকা দ্র.; (৪) ঐ লেখক, দারুল-'উলূম কী সো সালাহ্ যিনদিগী, দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ প্রকাশিত, তা. বি.; (৫) হাফিজ কারী ফুয়ূদু'র-রাহমান, মাশাহীর 'উলামায়ে দেওবানদ, লাহোর ১৩৯৬/১৯৭৬, ১ম সং., ১খ., ৫২৮-৫৩৩।

ড. আবদুল জলীল

আত-তায়্যিব আদ-দারী (الطيب الدارى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী। তিনি আদ-দার ইব্ন হানি' ইব্ন হাবীব ইব্ন নুমারা ইব্ন লাখম গোত্রের লোক। প্রখ্যাত সাহাবী আবূ হিন্দ আদ-দারী তাঁহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাঁহার পিতার নাম 'আবদুল্লাহ মতান্তরে বারর কিংবা আল-বারাআ। তাবূক যুদ্ধশেষে রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন শাম হইতে বানু'দ-দার-এর একটি প্রতিনিধি দল তাঁহার সহিত সাক্ষাত করে। আত-তায়্যিব আদ-দারী ছিলেন ছয় সদস্যবিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলের সদস্য। অপর সদস্যগণ হইলেন ঃ আত-তায়্যিবের ভ্রাতা আবূ হিন্দ আদ-দারী, তামীম ইব্ন আওস ও তাঁহার ভাই নু'আয়ম ইব্ন আওস, য়াযীদ ইব্ন কায়স ও রিফআ 'ইবুন'ন-নু'মান। দলের সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) আত-তায়্যিবের নূতন নামকরণ করেন 'আবদুল্লাহ মতান্তর 'আবদুর-রাহ্‌মান। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট শামের একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করিলে তিনি

তাঁহাদিগকে উহা দান করেন এবং তাঁহাদের জন্য একটি দলীল লিখাইয়া দেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২৮৮; (২) ইব্ন 'আবদি'ল বার্র, আল-ইস্তী'আব (আল-ইসাবা, ২খ, ২৩২ পৃ.-র টীকা দ্র.); (৩) ইব্নু'ল-আছীর, উস্দুল গাবা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৬৯; (৪) আয-যাহাবী, তাজ্রীদু আস্মা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা, বি., ১খ, ৬৮০; (৫) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ২০৪; (৬) ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাযী, আল-জার্হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৯৭; (৭) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন নাবাবিয়্যা, মিসর ১৩৫৫/১৯৩৬, ৩খ, ৩৬৮, ৩৬৯।

আ. র. ম. সাইফুল ইসলাম

তায়্যিবা ঃ (দ্র. মদীনা)

তারকীব বান্দ (تركيب بند) ঃ পাঁচ হইতে এগার শ্লোকের স্তবকসহ রচিত কবিতা। গাযালের ন্যায় প্রতিটি স্তবকের নিজস্ব অন্তমিল আছে। অন্তমিলযুক্ত প্রতিটি অনুগামী শ্লোকের প্রথম দুই পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বের পরস্পরের মিল হয়, কিন্তু স্তবকের অন্তমিল বিভিন্ন, যদিও সমগ্র কবিতার ছন্দ একই থাকিতে হয়। প্রতিটি স্তবকের পর অবশিষ্ট কবিতার ন্যায় অনুরূপ ছন্দের একটি শ্লোক থাকে, তবে নিজস্ব অন্তমিলে এবং দুইটি পর্বের পরস্পরের অন্তমিল রাখিয়া। প্রতিটি স্তবকের পর যখন ধুয়া হিসাবে একই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন সেই কবিতাকে বলা হয় তারজী বান্দ, কিন্তু প্রাচীন ছান্দসিকগণ এই ধরনের সব কবিতার ক্ষেত্রেই এই নাম প্রয়োগ করিতেন, শ্লোকের পুনরাবৃত্তি হউক বা বিভিন্ন হউক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন কায়সুর-রাযী, আল-মু'জাম ফী মা'আয়ির আশ'আরু'ল-'আজাম, সম্পা. মীর্যা মুহাম্মাদ ও E. G. Browne, G. M. S.; (২) নাসীরু'দ-দীন আত-তূসী, সিয়ারু'ল-আশ'আর, মুফতী মুহাম্মাদ সা'দুল্লাহ মুরাদাবাদী, লক্ষ্ণৌ ১২৮৩ কৃত লিথোগ্রাফ সং.; (৩) Garcin de Tassy, Rhetorique et prosodie des Langues de l' Orient Musulman, Paris 1873, 2nd edition.

T. W. Haig (E.I. [1])/ আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তারজুমান (ترجمان) ঃ আরবী তারজুমান শব্দ হইতে (তু. মুহাম্মাদ হাফীদ, আল-গালাতাতু'ল-মাশ্হূরা, পৃ. ১১০) তুর্কী ভাষায় রূপান্তরিত, উহার অর্থ ব্যাখ্যাকারী, Aramaic ভাষা হইতে উদ্ভূত শব্দটি প্রথমদিকেই আরবী ভাষায় প্রবেশ করে। ব্যাখ্যাকারীরা অবশ্য বিদেশী জনগণের সহিত ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখিবার জন্য সর্বদা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ পরিষ্কার ঐতিহাসিক আলোকে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে হি. ৬ষ্ঠ (১২শ) শতাব্দীতে। ঐ সময় হইতে ভূমধ্যসাগরের তীরস্থ দেশসমূহের মুসলিম শাসনকর্তাদের সহিত খৃষ্টান শহর এবং রাষ্ট্রসমূহের প্রথমদিকের সন্ধিসমূহ সম্পাদিত হইতে থাকে। de Mas Latrie কর্তৃক অধীত ও প্রকাশিত উত্তর আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পন্ন সন্ধি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, "torcimani" তৎকালীন অন্যান্য বহু ল্যাটিন ও Romance (দক্ষিণ য়ুরোপে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ ভাষায় লিখিত রূপের জন্য তু. de Mas Latrie, Introduction, p. 189 প.) দূতাবাসের বাণিজ্যিক দফতরের অত্যাবশ্যক কর্মচারীর একটি শ্রেণী ছিল, তাহাদিগকে 'দাউআনে' (দীওয়ান হইতে) [দোভাষী] বলা হইত। তাহারা সামুদ্রিক বন্দরে থাকিত এবং সেইখানে বিদেশী বাণিজ্যের শুল্ক সংগ্রহের জন্য তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল। প্রায় সকল বাণিজ্যিক কাজ-কারবার এই দোভাষীদের মাধ্যমে সাধিত হইত। তাহাদের এক প্রকার স্তরভেদ ছিল এবং তাহাদের প্রদত্ত সাক্ষ্য সর্বত্র গৃহীত হইত। তাহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পণ্যদ্রব্যের উপর বিশেষ শুল্ক ধার্য করা হইত। মূলত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই দোভাষিগণ নিযুক্ত হইত; তাহারা হইত মুসলমান, খৃষ্টান ও য়াহূদী। কতিপয় স্থানে বিশেষ দোভাষীকে বিশেষ জাতির সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হইত। এই কর্মচারীদের কাহাকেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও উপস্থিত থাকিতে হইত, যথা সন্ধি চূড়ান্ত করার জন্য এবং প্রয়োজনে সন্ধি ব্যাখ্যা করিতে, যখন কোন মূল বাক্য সম্বন্ধে কোন জটিলতা দেখা দিত। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারীদের নাম সন্ধির মূল অংশে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইত। এই সমস্ত মূল সূত্র হইতে অনুরূপভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের কেহ কেহ স্থানীয় শাসনকর্তাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সিরিয়ায় এই দোভাষীদের অস্তিত্ব Crusade-গুলির বিষয়ে লিখিত ফরাসী উৎসগুলিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শাসনামলে দোভাষীদের অবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ কার্যত পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে যেমন ছিল অদ্রূপই ছিল। কিন্তু যেহেতু বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক সংখ্যায় ও গুরুত্বে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই কারণে উত্তম ও বিশ্বাসযোগ্য দোভাষীর প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে আমরা ঐতিহাসিক সূত্রগুলিতে ক্রমশ ইহাদের অধিকতর উল্লেখ দেখিতে পাই। য়ূরোপীয় সূত্রগুলিতে তাহাদের সর্বাপেক্ষা সাধারণ নাম ইতালীয়ান ভাষায় "দ্রোহমান" অথবা "দ্রাগোমান", ইহার পার্শ্বে ফরাসী "truchement" দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। তুর্কী দেশস্থ অনেক সামুদ্রিক বন্দরে সমস্ত সরকারী অফিসে উহাদের দ্রাগোমানরা ছিল, যেমনটি ছিল সেইখানে স্থাপিত বিদেশী প্রতিনিধিদের বাসস্থানসমূহে। রাজধানীতে দ্রাগোমানদের মর্যাদা স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল; বিদেশী দূতগণের বাসভবনের অনেকেই তাঁহাদের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

যাহা হউক, তুর্কী সরকারের অধীনে দ্রাগোমান-এর পদটি ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। একজন বিশেষ অফিসার হিসাবে সম্ভবত দ্বিতীয় মুহাম্মাদের পূর্বেই ছিল; কিন্তু রাজসভায় সুবাশী 'আলী বেগ প্রথম দ্রাগোমান ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি খৃ. ১৫০২ সনের শান্তিচুক্তি ভেনিসে আনয়ন করেন। তাঁহার পরে আসেন য়ূনুস বেগ। তিনি হি. ৯৪৮ সনে ইনতিকাল করেন (১৫৪১-১৫৪২); তিনি প্রায়ই গুপ্তচর হিসাবে ভেনিসে যাইতেন; তিনি Constantinople-এ দুরুগমান মাসজিদি (সিজিলল-ই 'উছমানী, ৪খ, ৬৭৭; হাদীকাতু'ল-জাওয়ামি', নং ২২৬) নামক মসজিদের নির্মাতা ছিলেন। য়ূনুস বেগ একজন গ্রীক ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী আহমাদ মূলত ছিলেন ভিয়েনাবাসী Heinz Tulman নামক এক জার্মান। ১৬শ শতাব্দীতে আর একজন দ্রাগোমান মুরাদ বেগ ছিলেন রাজসভায় কর্মরত। তিনি ছিলেন একজন হাঙ্গেরীয়; তিনি মোহাকস (Mohacs)-এর যুদ্ধে অবরুদ্ধ হন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে লিখিত একখানি দোষখণ্ডক গ্রন্থ প্রণেতা, বিশেষত তুর্কী, ল্যাটিন ও হাঙ্গেরীয়

ভাষায় একখানি ত্রিভাষিক স্তোত্র পুস্তকের লেখক হিসাবে পরিচিত ছিলেন (১৯২৭ খৃ. Berlin হইতে Literaturdenkmaler aus Ungarns Turkenzeit; তু. আরও এই পুস্তকের পৃ. ৩৮ প.; রাজসভার দ্রাগোমানদের ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য)। সম্ভবত এই সময়ে সেইখানে পূর্ব হইতে রাজদরবারে কতিপয় দ্রাগোমান নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন বাশতারজুমান; তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন খৃস্টান (গ্রীক, জার্মান, ইতালীয়)। যেহেতু তুরস্ক সাম্রাজ্যের সহিত বৈদেশিক সম্পর্ক অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই কারণে রাজদরবারে দোভাষীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮শ শতাব্দীতে রাজদরবারে দ্রাগোমানদের পদমর্যাদা Mavrogordato ও Ghiko-এর শক্তিশালী গ্রীক পরিবারসমূহে প্রায় বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা একটি প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল যে, দ্রাগোমানের চাকুরী লাভ করিলে তাহারা যে কোন একটি Danube রাষ্ট্রের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে নিযুক্ত হইতেন। যেহেতু তখন পর্যন্তও তুর্কীদের পক্ষে য়ূরোপীয় ভাষা শিক্ষা বিরল ও ব্যতিক্রম ছিল, তাই বৈদেশিক নীতির উপর দোভাষীদের প্রভাব ছিল বিশেষ শক্তিশালী; অপরদিকে পূর্ববর্তী প্রধান দোভাষীদের প্রাণদণ্ডও বিরল ছিল না। কেবল ২য় মাহমূদের রাজত্বকালে রাঈস আফানদি [দ্র.]-এর কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তুর্কী সরকার নিজেকে এই সমস্ত সন্দেহভাজন কর্মচারীর সাহায্য হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তুর্কী নীতির উপর রাজদরবারে দ্রাগোমানদের ভূমিকার বিশেষ অধ্যয়ন এখনও পর্যন্ত করা হয় নাই। von Hammer, G. O. R., Vii, 627 কর্তৃক তাঁহাদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

দূতাবাস ও রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের আবাসিক দ্রাগোমানদের প্রভাবও কম শক্তিশালী ছিল না। তাহারা সাধারণত একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন অর্থাৎ স্থানীয় খৃস্টানগণ, যাহারা তুরস্কের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সন্ধিচুক্তি ও সুলতান প্রদত্ত নিরাপত্তার আশ্বাস (বারাত) মারফত জাতি কর্তৃক তাহাদিগকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছিল, যাহারা রাষ্ট্রপ্রতিনিধির বাসস্থান বা দূতাবাসে কার্য করিত। তাহাদের বিশেষ সুবিধার মধ্যে একটি প্রকাশ্যভাবে সন্ধিশর্তে উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা বিদেশস্থ প্রতিনিধির অধিকার হইতে খারিজ করিয়া তাহাদের দ্রাগোমানদের দ্বারা পরওয়ানার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট তুর্কী বিচারালয়ের সামনে উপস্থিত করিবার সুবিধা। এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে মধ্যযুগ হইতে দ্রাগোমানদের ভূমিকা হইতে। যাহা হউক, ১৮শ শতাব্দী হইতে তুরস্কে য়ূরোপীয় শক্তিসমূহের এবং তাহাদের প্রতিনিধিবর্গের প্রভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তুর্কীর কার্যকলাপে দ্রাগোমানদের হস্তক্ষেপ রাজদরবারের কাছে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু রাষ্ট্রপ্রতিনিধিগণ তুর্কীর প্রজাগণকে দ্রাগোমান নিযুক্ত করার ব্যাপারে তাহাদের অধিকারের অতিরিক্ত ব্যবহার করিত। ফলে তাহারা নিজস্ব সরকারের কর্তৃত্ব হইতে তাহাদিগকে প্রত্যাহার করিয়া লইত। রাজদরবারে বাদানুবাদের ফলে ১৮৬৩ সনে বিদেশী মিশনসমূহের সহিত একটি চুক্তি হইল, উহা দ্বারা দূতাবাস ও রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের দেশী দ্রাগোমান নিযুক্ত করার ক্ষমতা সীমিত করা হইল। যাহা হউক, এই সময়ে অধিকাংশ য়ূরোপীয় সরকার তাহাদের নিজেদের প্রজা লইয়া একটি বিশেষ দোভাষীর পদ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল, যাহার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Constantinople-এর বিশেষ ক্ষমতাশালী দূতাবাসের প্রধান দ্রাগোমানরা তখনও পর্যন্ত রাজদরবারের সহিত সর্বপ্রকারের কর্ম পদ্ধতি চালাইবার জন্য, বিশেষত সন্ধিশর্তের ব্যাখ্যা এবং ঐ সমস্ত সন্ধিসমূহ হইতে উদ্ধৃত বিশেষ অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় অধিকারসমূহের প্রয়োগের জন্য স্বীকৃত কর্তৃপক্ষ ছিল। যাহা হউক, তখন ১৯১৪ খৃ. তুর্কী সরকার সন্ধিশর্তে আত্মসমর্পণ বিলোপ করিয়া দিয়াছিল। একই সময়ে ইহা বিদেশী কূটনীতি বা রাষ্ট্রপ্রতিনিধি সম্পর্কীয় কর্মপদ্ধতি দ্রাগোমান পদবীর সহিত অনুমোদন করিতে প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং তুর্কীতে ঐ উপাধি আর সরকারীভাবে ব্যবহার করা হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. De Mas Latrie, Traites de paix et de commerce et documents divers concernnant les relations des chretiens avec les Arabes de L'Afrique septentrionale, Paris 1866, p. 186 প., 285 প.; (২) von Hammer, G.O.R., index; (৩) Martens-Skerst, Das Consularwesen und die Consulrrjuridiction im orient, Berlin 1874; (৪) G. Pelissie du Rausas, Le Regime des capitulations dans l'Empire Ottoman[2], Paris 1910; (৫) H. Almkvist, Ein Dragoman-Diplom aus dem vorigen Yahrhundert, Upsala 1891.

J. H. Kramers (E.I. [1])/ মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

তারজুমান (ترجمان) ঃ তুর্কী অতীন্দ্রিয়বাদের সংজ্ঞাশাস্ত্রে ইহার দুইটি অর্থ আছেঃ

১। একটি তারীকার একজন সদস্য যিনি দীক্ষা গ্রহণ করার সময় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকারী হিসাবে একজন নবদীক্ষিতের সঙ্গ গ্রহণ করেন। যখন কোন মুরীদ বেকতাশী তারীকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন দুইজন তারজুমান তাহাকে শায়খ-এর এবং এগারজন ইমামের এগারজন প্রতিনিধির নিকট লইয়া যায়। উৎসবের সময় তারজুমানরা তাহাকে পরিচালনা করে এবং তাহার যে সূত্র আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা তাহার পক্ষে তাহারা বলিয়া দেয় (দ্র. J. P. Brown, The Darvishes or Oriental spiritualism, সম্পা. H. A. Rose, London 1927, p. 206 প.)।

এই তারজুমানদের কাজ এক শ্রেণীর ইসলামী সমাজ গঠনকারী বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারীদের অনুরূপ, ফাত্ওয়া গ্রন্থানুসারে তাঁহাদিগকে নাকীব ও তারজুমান আল-কাদামও বলা হয়। সমাজে একজন নূতন সদস্যকে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের সময় এই তারজুমানরা বেকতাশীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই একই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে (দ্র. Thorning, Beitrage zur Kenntnis des islamischen Vercinswesens, Berlin 1913, p.106 প.)।

২। বেকতাশীদের কাছে তারজুমানের অর্থ প্রার্থনাও হয়। কেবল বিশেষ প্রার্থনা, বিশেষ প্রয়োজনে যাহা আবৃত্তি করা হয় তাহাকে তারজুমান বলা হয়। ইহাকে বেকতাশীদের গোপনীয় শব্দ বা বাক্যাংশের নামও বলা হয় (তু. Brown, The Darvishes, p. 140. 199)।

J. H. Kramers (E.I. [1])/ মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

তারতূস (طرطوس) ঃ পূর্বেকার Antartus ও প্রায়শ Antarsus নামে অভিহিত (তারসূস-এর সহিত সাদৃশ্যের কারণে) সিরিয়ার উপকূলে একটি শহর। Arados দ্বীপের (আ. জাযীরাত আরওয়াদ, আরওয়ায-এইভাবেও লিখিত হয়; বর্তমানে রুওয়াদ) বিপরীতে প্রাচীন কালের Antarados। রোমক সাম্রাজ্যের আমলে

Antarados -এর নাম ছিল Constantia তবে Constantia -র সহিত প্রাচীন নামটিও প্রচলিত থাকে ও পরিশেষে Constantia নামটি আবার লুপ্ত হয়।

হি. ১৭ সনে (৬৩৮ খৃ.) মুসলমানগণ 'উবাদা (রা) ইব্ন সামিতের নেতৃত্বে তারতূস দুর্গ জয় করে। ঐ অভিযানে শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে তারতূস দীর্ঘকাল বিরান ও জনহীন অবস্থায় থাকে। মু'আবিয়া (রা) শহরটি পুনঃনির্মাণ করিয়া ইহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুরক্ষিত করিয়া এইখানে জনবসতি স্থাপন করেন। ইহা ছাড়া সন্নিহিত মারাকীয়া ও বুলুনিয়াসেও জনবসতি স্থাপন করা হয়। তিনি সৈন্যদের মধ্যে জমি বিতরণ করেন। Cyprus বিজয়ের পরই কেবল মু'আবিয়া (রা) গ্রীকদের নিকট হইতে আরওয়াদ দ্বীপ জয়ে সক্ষম হন (দিমাশক, সম্পা. Mehren, পৃ. ১৮৬; Theophanes, Chronicle, সম্পা. de Boor, পৃ. ৩৪৪)। খলীফা উছমান (রা)-এর কুরআন শরীফটি এই তারতূসে রাখা হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ইব্ন খুররাদাযবিহের মতে তারতূস জিলাটি (কূরা) হিম্স প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। য়া'কূবীর (B. G. A., vii, 325) মতে এই শহরের অধিবাসীরা কিন্দা গোত্রের লোক (এখানে ভ্রমাত্মকভাবে আনজারজুস–এই নামে লিখিত; তু. M. Hartmann, Z. D. P. V., xxii, 163, No. 24)।

৩৫৭-৩৫৮ সনে (৯৬৮ খৃ.) Nicephorus -এর নেতৃত্বে বায়যান্টীয়গণের উত্তর সিরিয়ায় বিজয়াভিযানের সময় এই শহরটি জোরদার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কারণে বায়যান্টীয়দের পদানত হয় নাই বলিয়া সমসাময়িক আরব ঐতিহাসিক ইব্ন হাওকালের বিবরণে (B. G. A., ii., 116) জানা যায়। অন্যদিকে আবার আনুমানিক এক পুরুষ পরে আনতাকিয়ার য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদের বর্ণনামতে সম্রাট Nicephorus তারতূস, মারাকীয়া ও হিসন জাবালা (য়াহ্য়া, সম্পা. Krackovskij ও Vasiliev, Patrol, Orient., xviii, 816) দখল করেন। ৩৮০ সনে (৯৯৫-৯৯৬ খৃ.) সম্রাট ২য় বাসিল (Basil) এই শহরটি পদানত করেন (য়াহ্য়া ও জামালু'দ-দীন ইব্ন জাফির, in Rosen, Zapiski Imp. Akad. Nauk, xliv. 32, 35 প., 241; schlum-berger, L'Epopee Byzantine, ii, 95 প.; এই লেখক ভুলক্রমে Tortosa হইতে তারতূস আলাদা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)।

১০৯৯ সনের প্রারম্ভে ক্রুসেডারগণ তারতূস পদানত করিলেও উহার অল্পদিনের মধ্যেই শহরটি তাহাদের হাতছাড়া হয়। ৪৯৫/১১০২ সনে Toulouse-এর Raimund-এর (Rohricht, Gesch, d. Kgr, Jerusalem, p. 33, van Berchem, voyage, p. 322) অধীনে ক্রুসেডারগণ চূড়ান্তভাবে এই শহর অধিকার করিতে সক্ষম হয়। Raimund-এর মৃত্যুর পর Cerdagne -এর Count William জায়গীর হিসাবে তারতূস ও জাবালা প্রাপ্ত হন (Weil, Gesch. D. Chalifen, iii, 176)। চুক্তির শর্তানুযায়ী (সেপ্টেম্বর ১১০৮) অন্যান্য স্থানের সহিত আরওয়াদ দ্বীপ ও তারতূস বায়যান্টীয় সম্রাট Alexius Comnenus-কে (Anna comnena, সম্পা. Bonn, ২খ., ২৪১; insuls Antharidus in Antonin, Placent, ed. Geyer, p. 159; cf. Dussaud, topogr. hist. de la syrie, p. 124) প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়। পরে শহরটি ত্রিপোলির কাউন্টের দখলে চলিয়া যায় (উল্লেখের জন্য দ্র. Van Berchem, Voyage, স্থা.)।

মিসরীয় উযীর আল-মালিক আস-সালিহ আবু'ল-গারাত তালা'ই ইব্ন রুযযীক কর্তৃক উসামা ইব্ন মুনকিযকে উৎসর্গিত এক কবিতায় জানা যায় যে, এই শহরটি সুনিশ্চিতভাবেই ১১৫৩ সনের আগেই Templar ক্রুসেডারদের করায়ত্ত হইয়াছিল (Derenbourg, Ousama, p. 293)। ১১৮৮ সনের জুলাইয়ে সুলতান সালাহ্'দ-দীন শহরে অগ্রাভিযান চালান ও দেখিতে পান যে, ক্রুসেডার টেম্পলারগণ শহর হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া শহর প্রতিরক্ষা প্রাচীরের উপর নির্মিত দুইটি শক্তিশালী বুরুজে আশ্রয় লইয়াছে। সালাহ্'দ-দীন এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে শহরটি দখল করেন। উল্লিখিত দুইটি প্রতিরক্ষা বুরুজের একটিতে সালাহ্'দ-দীনের একজন সামন্ত ও ইরবিলের মালিক আক্রমণ চালান। সালাহ্'দ-দীন বুরুজটি ভাঙ্গিয়া উহার ধ্বংসাবশেষ সাগরে নিক্ষেপ করেন। অন্য যে বুরুজটি বিশাল প্রস্তরখণ্ড খোদাই করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল উহা ছিল পানি যোগানের সুব্যবস্থাসম্পন্ন উদ্যান পরিবেষ্টিত। টেম্পলারদের অধিনায়ক এতই সাহসিকতার সহিত আক্রমণ প্রতিরোধ করেন যে, সালাহ্'দ-দীন উহার চারিদিক হইতে অবরোধ তুলিয়া লন এবং আপাতত বিখ্যাত Church of the Virgin (van Berchem, J. A., 1902, p. 424 প.; Voyage en Syrie, i. 322 প.) ও প্রাচীর ধ্বংস করিয়া ক্ষান্ত হন।

১২০২ সনের মে মাসের ভূমিকম্পে গোটা সিরীয় উপকূল প্রচণ্ড রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কথিত আছে, ঐ ভূমিকম্পে তারতূস ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও নাকি ঐ Church of the Virgin রক্ষা পায়। এই গির্জাটি ১১৮৮ সনে নির্মিত হইয়াছিল (Van Berchem, voyage, i. 323, 332)। এই গির্জাটি অনেক অলৌকিক ঘটনার ও রোগ নিরাময়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহাতে কুমারী মেরীর একটি মূল্যবান মূর্তি ছিল। আর তাই ইহাকে সিরিয়ায় কুমারী মেরী-র প্রাচীনতম অধিবাসস্থল মনে করা হয় (দিশামকী, সম্পা. Mehren, পৃ. ২০৮)। দৃশ্যত ইদরীসী এই বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলিয়াই মনে হয় (তিনি ১১৫৪ সনে বা পরবর্তী সময়ে (?) এই বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, তু. Pardi, Rivista geogr-ital, xxiv., 1917, p. 308 প.) যদিও তিনি এই গির্জার অবস্থানস্থল ভুলক্রমে আরওয়াদ দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Dussaud, Rev. Archeol, 1896, i, 317, note 3; van Berchem, pk. 331 প.)।

৬১১ সনে (১২১৪-১২১৫ খৃ.) Antioch-এর ৪র্থ Bohemund-এর পুত্র ত্রিপোলির Count Raimund -কে ইসমা'ঈলীগণ হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের বদলা হিসাবে ৪র্থ Bohemund খাওয়াবী দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন (কামালু'দ-দীন, অনু. Blochet, R. O. L., v. 48; ইব্ন ফুরাত, in Rohricht Gesch. d. Kgr. Jerus., P. 271, note 1, 715, note 4)। ১২৬৫ সনের ২৬ এপ্রিল Tortosa-র বিশপ William -কে লিখিত পোপ Clement IV-এর পত্রের একটি বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, 'Church of the Virgin'ঈসা ('আ)-এর অন্যতম শাগরিদ Andrew-র পবিত্র আবাসস্থলের গণ্ডীর মধ্যেই অবস্থিত ছিল (Sbaraglia, Bullar. Francisc., iii, Rome 1759. p. 4, note 6)। সম্রাট Frederick ও সুলতানের মধ্যে সম্পাদিত ১২২৯ সনের চুক্তিতে তারাবলুস, হিসনু'ল-আকরাদ, সাফীছা, মারকাব, তারতূস ও আনতাকিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তবে সন্ধির শর্তানুসারে কথা থাকে যে, সম্রাট এই স্থানগুলির সহিত মুসলমানদের যুদ্ধের ক্ষেত্রে সম্রাট নিরপেক্ষ থাকিবেন (Rohricht, Beitrage Z. Gesch. D. Kreuzzuge, i, 41, 77 প.; ঐ লেখক, Gesch, d. Kgr, Jerusalem, p. 785)। ৬৬৬ (১২৬৭-৮খৃ.) সনে সুলতান বায়বার্স যখন তারাবলুস হইয়া Antioch অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন

সাফিছা হইতে টেম্পলার ক্রুসেডারদের একাধিক দূত নানাবিধ উপহার ও সাম্প্রতিক কালে বন্দী ৩০০ মুসলমান লইয়া বায়বারস সকাশে উপস্থিত হইলে সে যাত্রা টেম্পলারগণ তাহাদের রাজ্য বায়বার্‌স বাহিনীর হাত হইতে রক্ষায় সমর্থ হয় (আল-মাকরীযী, in Quatremere, Hist. des Sultans Mamlouks, 1/ii, 52k; Rohricht, Gesch. d. kgr. Jerus., p. 953)। সুলতান ৬৬৯ (১২৭০-১খৃ.) সনে তারতূস ও অন্যান্য শহরে এক অভিযান চালাইলেও তাহাতে কোনও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয় নাই (মাকরীযী, পূ. গ্র, ১/২খ., ৮৪; মুফাদ্দাল ইব্‌ন আবিল-ফাদাইল, Histoire des sultans mamelouks, সম্পা. Blochet, in Patrol, Orient. xii, 528)। অবশ্য পরে টেম্পলারগণ নিজেরাই সুলতানের সহিত এক সন্ধিচুক্তি করিতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী তাহাদের নিজস্ব অধিকারভুক্ত অঞ্চল এবং মারকাব ও বানিয়া দুই পক্ষের মধ্যে ভাগ করিয়া লয় (মাকরীযী, পূ. গ্র., ১/২খ., ১৫১; মুফাদ্দাল, পূ. গ্র., ১২খ., ৫৩৬; ১৫খ., ৪৪৫; Rohricht, পৃ. ৯৫৩)। টেম্পলারদের প্রভু Beaujeu-র William (de Bellojoco) ৬৮১ সনে তারতূস ও উহার সংলগ্ন অঞ্চলের জন্য ১০ বৎসর দশ মাস মেয়াদী এক চুক্তি আল-মালিক আল-মানসূরের সহিত সম্পাদন করেন (১৫ এপ্রিল, ১২৮২ হইতে)। আর এই সঙ্গে দুই পক্ষের অধিকারভুক্ত অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমান্তগুলি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। তারতূসের এলাকাভুক্ত হয় 'আরাইমা' (বর্তমান কালা'ত 'আরাইমে) ও মী'আরের (বর্তমানে বুরজমি'আর) চতুর্দিকের ৩৭টি জিলা (মাকরীযী, ১১/১খৃ., ১৭৭ পরবর্তী., ২২১-২২৩; Rohricht, Regesta regni Hierosolym., P. 377, No. 1447; ঐ লেখক, Gesch. d. Kgr. Jerus., P. 984।

'আককা' জয়ের পর সুলতান খালীল ফ্রাঙ্কদের নিকট হইতে তারতূস দখল করেন। ৫ শা'বান, ৬৯০/৩ আগস্ট, ১২৯১ সনে এই বিজয় সম্পন্ন হয়। এই সময়ে সুলতান ফ্রাঙ্কদের নিকট হইতে সর্বশেষ যেসব শহর জয় করেন তারতূস ছিল সেইগুলির অন্যতম (মাকরীযী, sult. moml, 11/i, 126; আবুল-ফিদা', Annales Muslem, সম্পা. Reiske, v. 98; Recueil des hist. or. d. Crois, i, 164; Weil, Gesch. d. Chalifen, iv, 181, note; Rohricht, Gesch. d. Kgr. Jerus., p. 1026 প; van Berchem, Voyage, p. 234)। টেম্পলারগণ আবারও ১৩০০-১৩০২ সন নাগাদ সাময়িকভাবে তারতূস দখলে সক্ষম হয়। তাহারা ঐ সময়ে আরওয়াদ (A. Trudon des Ormes, Maisons du Temple en Orient..., R. O. L., v. 1897, p. 426-528; van Berchem., a. a.' O.) দ্বীপ হইতে আক্রমণ চালায়। আল-মালিক আন-নাসিরের শাসনামলে ৭০২ সনে (১৩০২-৩) আরওয়াদ দ্বীপ পুনরায় মুসলিম অধিকারে আসে। ঐ দ্বীপের খৃস্টানদের হয় হত্যা করা হয় অথবা উহাদেরকে বন্দী করা হয়। দ্বীপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলি মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয় (মাকরীযী, Sult. Maml., 11/2, ১৯৫; আবু'ল-ফিদা', সম্পা. Reiske, ৫খ, ১৮০; আল-ইদরীসী, cod. Bodl, No. 887, in marg., Le Strange, Palestine, p. 40; Weil, Gesch. d. Chal., iv. 256)।

উহার পর হইতে তারতূস তারাবলুসের নাইবের শাসনাধীনে (কালকাশান্দী, সুবহু'ল-'আ'শা', in Gaudefroy-Demombynes, La Syrie, P. 116, 228; 'উমারী, তা'রীফ, পৃ. ১৮২, in R. Hartmann, Z. D. M. G., lxx., 1916, p. 86, note 14)। অতঃপর শহরটির অবক্ষয় দ্রুততর হয়। ক্রুসেডের সময় নির্মিত বিভিন্ন দুর্গ প্রাসাদগুলিতে ঐ জনপদে সামান্য যাহা কিছু লোক বাস করে তাহারা আবাস গড়িয়াছে। ইহাই তারতূস বা Tortosa-র বর্তমান অবস্থা। Church of the Virgin' আজিও তাহার পরবর্তী কালের কাঠামোতে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে (এই বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. van Berchem, Voyage, i, 329-334; তু. Enlart, in Syria, ii, 1921, p. 333; M. Pillet, in Syria, vii, 1926, p. 420), দুর্গ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য দ্র. সিরিয়া, ৩খ, ১৯২২, পৃ. ২৬৯ পরবর্তী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ইসতাখরী, B. G. A., i, 61; (২) ইব্‌ন হাওকাল, B. G. A., ii, ১১৬; (৩) ইব্‌ন খুররাদাযবিহ, B. G. A., ৬খ, ৭৬; (৪) কুদামা, B. G. A., vi, 230, ২৫৫; (৫) আল-ইদরীসী, সম্পা. Gildemeister, in Z. D. P. V., ৮খ, ১৮৮৫খৃ., পৃ. ২০-২২; (৬) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ., ৩৮৮ (দ্র. আনতারতূস); ৩খ., ৫২৯ (দ্র. তারতূস); (৭) সাফীউদ-দীন, মারাসিদুল ইত্‌তিলা', সম্পা. Juynboll, ১খ., ৯৮ (Ant.); ২খ., ২০১ (তুরতূস); (৮) আদ-দিমাশকী, সম্পা. Mehren, পৃ. ২০৮; (৯) আবুল ফিদা, সম্পা. Reinaud, পৃ. ২২৯; (১০) Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ৩৯৪ প., ৫৪৪; (১১) G Rey, Etude sur les monuments de L'architecture militaire des Croises en Syrie et dans L'ile de Chypre, p. 69 প., 211 প. , pl. viii, xx; R. Dussaud, Rev. archeol. 1896, i. 315 প.; 1897 i. 331 প.; (১২) M. van Berchem. E. Fatio. Voyage en Syrie, 320-334; Gaudefroy Demombynes, La Syire a l'Epoque des Mamelouks, Paris 1923, p. 116, 228, note; (১৩) Daussaud, Topographie histor,.de la Syrie antique et medievale, Paris 1927, p. 121-125।

E. Honigmann (E.I[1] /আফতাব হোসেন

তারবিয়া (ترويـة) ঃ ('আ), ৮ যু'ল-হিজ্জা (য়াওমু'ত-তার্‌বিয়া) তারিখের নাম। এই তারিখে মুসলিমদের হজ্জ অনুষ্ঠান শুরু হয়। এই দিবসে হজ্জ পালনকারী মুসলিমগণ মক্কা হইতে মিনায় যান। ঐ দিন মিনায় অবস্থান করেন এবং পরের দিন ভোরে 'আরাফাত ময়দানে গমন করেন। বিভিন্ন রচনায় য়াওমু'ত-তারবিয়া বলিতে সাধারণত ঐ দিন হজ্জযাত্রিগণ পানিবিহীন এলাকার মধ্য দিয়া যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি হিসাবে তাহাদের পশুগুলিকে যে প্রচুর পানি যোগানোর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন কিংবা পশুদের সহিত নিজেদের জন্যও পানি সংগ্রহ করত 'আরাফাতে যাইবার যে ব্যবস্থা করেন তাহাকে বুঝায়। তবে যথার্থ অর্থে তারবিয়ার অর্থ পশুদেরকে পানি যোগান বা খাওয়ান নহে, বরং পানি ছিটান কিংবা 'কাহারও সঙ্গে' পানি লইয়া যাওয়া। ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, তারবিয়া কথাটি বলিতে এক ধরনের সহানুভূতিসূচক বর্ষণমূলক সম্মোহক অনুষ্ঠানকে বুঝাইত, যদ্বারা প্রাচীনকালে হজ্জের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত বলিয়া মনে করা হয়। এই তার্‌বিয়ার সহিত পবিত্র যমযম কূপের পবিত্র পানি উত্তোলন ও ছিটাইবার তুলনা করা যাইতে পারে যাহা ৫৭৯/১১৮৩ সনের শা'বান মাসে মক্কাবাসীদের মাঝে ইব্‌ন জুবায়র করিয়াছিলেন এবং ১৯০৯ খৃ. হজ্জের সময় বেদুঈনদের মাঝে আল-বাতানূনীও ইহা করিয়াছিলেন (হজ্জ নিবন্ধ দ্র.) অথবা হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) তাঁহার পুত্র ইসমা'ঈল ('আ)-কে কুরবানী করিবার জন্য (স্বপ্নে) আদিষ্ট হইয়া সেই দিন উহা বাস্তবায়িত করার বিষয় চিন্তা-ভাবনা

(রাওয়া-৬৯) করিয়াছিলেন (Hughes, Dictionary of Islam, New Delhi 1977, p. 628)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসানু'ল-'আরাব, ১৯খ, ৬৫; (২) তাজু'ল 'আরূস, ১০খ, ১৫৯; (৩) ইবনু'ল-আছীর, নিহায়া, ২খ, ১১৩; (৪) Lane, An Arabic-English Lexicon, p. 1195; (৫) R. Dozy, Die Israeliten zu Mekka, Aus dem Holländischen ubersetzt, Leipzig-Haarlem 1864, p. 110-11 (এখানে হিব্রু ভাষা হইতে যে ব্যাখ্যার অবতারণা করা হইয়াছে তাহা আর গ্রহণযোগ্য নহে); (৬) Houtsma, Het Skopelisme en het steenwerpen te Mina (Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 4 reeks, 6. Deel, 1904. p. 185-217, p. 211 প.); (৭) Snouck Hurgronje. Het Mekkaansche Feest, Leyden 1880 (Verspreide Geschriften, i., I প), P. ১২৬-১২৮; (৮) A. J. Wensinck. in Acta Orientalia, i., ১৯২৩, p. 164; (৯) ঐ লেখক, Arabic New Year and the Feast of Tabernacles (Verh. A. W. Amsterdam. Letterk, N. R., xxv. 2), Amsterdam 1925, p. 28; (১০) Gaudefroy -Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, Paris 1923, p. 101, 236 and note 4; also p. 83-85, 88; (১১) W. R. Smith, Lectures or the Religion of the Semites[3], 1927, p. 231 প.; (১২) ইব্ন জুবায়র, রিহলা, পৃ. ২৩৯; (১৩) মুহাম্মাদ লাবীব আল-বাতানূনী, আর-রিহলা আল-হিজাযিয়্যা, ১০৪; (১৪) ইবরাহীম রিফ'আত পাশা, মিরআতু'ল-হারামায়ন, কায়রো ১৩৪৪/১৯২৫, ১খ, ৩৫, ৩১৩।

R. Paret (E.I[1]) আফতাব হোসেন

তাররাগোনা (تراگونه) ঃ ('আ). ভূমধ্যসাগর উপকূলে উত্তর-পূর্ব স্পেনের একটি ক্ষুদ্র শহর এবং একই নামের প্রদেশের রাজধানী। এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ২৩,৩০০। শহরটি প্রাচীন Tarraca দুর্গ নগরীর অবস্থানস্থলে গড়িয়া উঠে। Tarraca ছিল স্পেনে রোমক আধিপত্যের অন্যতম কেন্দ্র। রোমক শাসক Augustus-এর আমল হইতে ইহা ছিল Hispania tarraconensis প্রদেশের রাজধানী। মুসলিম পদানত হইলে এই জনপদ উহার পুরাতন নাম ফিরিয়া পায়। মুসলিম বিজয়িগণ ৭২৪ খৃ. তাররাগোনা জয়ের পর উহা কর্ডোভার উমায়্যা খিলাফাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য জনপদটিকে পদানত রাখিতে মুসলমানদেরকে দুইবার খৃস্টান অধিকার হইতে ইহাকে ছিনাইয়া লইতে হয়। খৃস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম এই ধরনের অভিযানটি অনুষ্ঠিত হয় Aquitaine-এর Louis-এর আমলে এবং দ্বিতীয়বার ইহা Catalnia শাসক Ramon Beranger-এর নিকট হইতে বিজিত হয়। ১২২০ খৃ. Alfonso el Batellador চূড়ান্তভাবে মুসলিমদের নিকট হইতে তাররাগোনা জয় করেন।

আরব ভৌগোলিকগণ অনেক ক্ষেত্রে তাররাগোনা শহরকে গ্রানাডা শহরের মত "য়াহূদী প্রধান শহর" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ শহরের অধিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল য়াহূদী। তাররাগোনা গির্জা (Cathedral)-এর আচ্ছাদিত গমনাগমন পথের একটি বদ্ধ খিস্টানশ্রেণীর এক মর্মর কুলঙ্গিতে ৩য় আবদুর-- রাহমানের নাম খচিত একটি শিলালিপিতে ৩৪৯/৯৬০ সন উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল-ফিদা', তাকবীমু'ল-বুলদান, সম্পা. Reinaud, ২খ, ৩৭ ও ২৬১; (৩) য়াকূত, মু'জামুল-বুলদান, দ্র. শিরো.; (৪) E. Fagnan, Extriats inedits relatifs au Maghreb, Algiers 1924, নির্ঘণ্ট; (৫) ইব্ন 'আবদি'ল মুন'ইম আল-হিময়ারী, আর-রাওদুল-মি'তার ফী 'আজাইবি'ল-আকতার (স্পেন), পাণ্ডু. নং ৭৬; (৬) G. Marcais, Manuel d'art musulman, i, p. 260.

E. Levi-Provencal (E.I. [1])/ আফতাব হোসেন

তারসূস (طرسوس) ঃ এশিয়া মাইনর-সিরিয়া সীমান্তবর্তী একটি শহর। এই শহর 'ঈসা ('আ)-এর ১২ জন শাগরিদের অন্যতম Paul-এর জন্মস্থান। এই জনপদের অবস্থান অত্যন্ত উর্বর সমতল ভূমিতে যাহার মধ্য দিয়া একটি নদী (Cydnos, পরবর্তী কালে নাহ্র বারাদীন) প্রবাহিত। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের মিলনস্থলে ও সুমদ্রের অদূরে অবস্থিত এই শহর অতি প্রাচীন কালেও বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হেলেনীয়-গ্রীক আমলে এই শহরের মনীষীদের জ্ঞানচর্চায় ও মনীষায় খোদ শহরটি এক বিশিষ্টতা অর্জন করে। অতি প্রাচীন কালেই এই জনপদে খৃস্ট ধর্ম প্রসার লাভ করে। তৎকালের খৃস্টীয় পরিষদের কার্যবিবরণীতে তারসূসের বিশপ ও Metropolitan-গণের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। অঞ্চলটি আরবদের পদানত হইলে উমায়্যাগণ শহরের দুর্গ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণ করেন এবং বায়যান্টীয় সীমান্তবর্তী অন্যান্য শহরও পুনঃ নির্মাণ করা হয়। এই শহরগুলি সম্মিলিতভাবে একটি বেষ্টনী তৈয়ার করে আর তাই পরবর্তী কালে এই শহর-জনপদগুলি 'রক্ষাকারী' (আল-'আওয়াসিম দ্র.) নামে অভিহিত হয়। আরব প্রশাসনিক বিভাগ অনুযায়ী এই শহরগুলি সাম্রাজ্যের সর্বউত্তর জুনদ-এর অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও খলীফা হারূনু'র-রাশীদ এই শহরগুলিকে উল্লিখিত জুনদ হইতে পৃথক করেন। শহরগুলির অবস্থান ছিল শত্রু আক্রমণের দিক হইতে অত্যন্ত নাযুক ও বিপজ্জনক, বিশেষ করিয়া তারসূস এক সমৃদ্ধ বাণিজ্য শহর হওয়ার কারণে এই শহরটি বারংবার মুসলিম ও বায়যান্টীয়দের ক্রমাগত যুদ্ধের শিকার হয়। ফলত দুই পক্ষেরই সেনাদল প্রায়ই এই শহরে আক্রমণ চালাইয়া শহরটি একবার এইদিক, আরেকবার অন্যদিক হইতে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে। আর এই কারণে শহরের অধিবাসিগণ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর এই শহরে বিজেতা পক্ষ বাহির হইতে লোকজন আনিয়া শহরে বসতি স্থাপন করায়। ১৬২/৭৭৯ সনে তায়্যি হাস্সান ইব্ন কাহতাবা খলীফার নিকট বিধ্বস্ত তারসূস-এর এক বিবরণ পেশ করেন। ঐ বিবরণে তিনি এই মর্মে তাঁহার অভিমত পেশ করেন যে, শহরটিতে ১০০,০০০ অধিবাসীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। পরে খলীফা হারূনুর-রাশীদ যখন জানিতে পারেন যে, বায়যান্টীয়গণ শহরটি পুনঃনির্মাণ করিতে চায় তখন তিনি বায়যান্টীয়দের পূর্বেই উহা পুনঃনির্মাণের আদেশ দেন। ফলে ১৭২/৭৮৮ সনে শহরটি পুনর্নির্মিত হয়। এই শহরে আরব বসতি স্থাপিত হয় ও একটি মসজিদও নির্মিত হয়। সম্ভবত শহরটি অচিরেই মুসলমানদের হাতছাড়া হয়। তবে পরে মুসলমান ও বায়যান্টীয়দের মধ্যে একটি সাময়িক যুদ্ধ বিরতিকালে খলীফা আল-মা'মুন ২১৫/৮৩০ সনে 'আওয়াসিম-এর বিরুদ্ধে এক অভিযানে বহির্গত হন। ফলে তারসূস এবং তারসূসের পূর্বদিকে Mopsuhestia তাঁহার পদানত হয়। খলীফা মা'ম"ন ইনতিকাল করিলে তারসূসে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার এই মাযারটি পরবর্তী কালে বেশ কিছুকাল ঐ শহরে বিদ্যমান ছিল। এই আমলে

তারসূসের কয়েকজন মুসলিম বিচারক বা কাদীর উল্লেখ পাওয়া যায় (ইব্‌ন সা'দ, ৭খ., ৯৩, ৩)। ২৬৯/৮৮২ সনে ইব্‌ন তূলূন সীমান্তবর্তী জনপদটি জয় করেন। তবে এখানে তূলূনী শাসন খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ৪র্থ/১০ম শতকের মাঝামাঝি তারসূস হামদানীদের অধিকারে চলিয়া যায়। ঐ সময় সায়ফুদ-দাওলা উত্তর সিরিয়া জয় করেন। তবে উহার অল্পকালের মধ্যেই বায়যান্টীয় সম্রাট (৩৫৪/৯৬৫) Nicephorus, Mopsuhestia ও 'আওয়াসিমের অন্যান্য শহর দখলে সক্ষম হন। অতঃপর তারসূস বেশ দীর্ঘকাল খৃস্টান অধিকারভুক্ত থাকে। সম্রাট Nicephorus পবিত্র কুরআন পোড়াইয়া দেন, মসজিদ ধ্বংস করেন এবং তারসূসের মুসলমান অধিবাসীদেরকে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করা, ঐ জনপদ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া অথবা জিযয়া (দ্র.) কর প্রদান করিয়া শহরে থাকিয়া যাওয়া–এই তিন বিকল্পের যে কোনও একটি বাছিয়া লইবার আদেশ দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দেশত্যাগের পথ বাছিয়া লয়। তবে কেহ কেহ খৃস্ট ধর্মও গ্রহণ করে (?)

এই পরিস্থিতির মাঝে যে আমলটি অতিবাহিত হয় সেই আমলে তারসূসের সমৃদ্ধি ঘটে। কেননা এই সময় তারসূস ও ইহার আশপাশের উর্বর অঞ্চলটিকে প্রচুর শ্রমে শস্য-শ্যামলা করিয়া তোলা হয়। সন্নিহিত অঞ্চল হইতে এইখানে ঐ সময়ে ক্রমাগত অধিবাসী আগমনের ফলে তারসূসের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহারা ইসলামের আদর্শে ছিল উদ্বুদ্ধ ও নিবেদিতপ্রাণ। উহারা ইসলামের স্বার্থে জিহাদে অংশ লইয়া অনেকেই শাহাদাত বরণ করিতে আগুয়ান হয়। এই আমলের শেষের দিকের বিবরণ দিয়াছেন কতিপয় আরব ঐতিহাসিক। ইহাদের মধ্যে মাস'ঊদী বলিয়াছেন যে, এই শহরের সেনানিবাসে আদতে ৮,০০০ সৈন্য ছিল এবং সেনানিবাসের দুর্গের অন্যতম প্রবেশদ্বারের নাম ছিল বাবু'ল-জিহাদ। কারণ অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাহারা বিজয় শেষে এই দ্বারপথেই ফিরিয়া যায়। ৩৪০/৯৫১ সনে ইসতাখরী তারসূসকে একটি বড় শহর হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা জোড়া প্রাচীরবেষ্টিত ও যে শহরের দুর্গে ১০০,০০০ সেনা মোতায়েন। ইহাদের মধ্যে ছিল পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয় শ্রেণীর সৈনিক। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মানুষ এই শহরে আসে এবং সাধারণত তাহাদের বেশীর ভাগই এই শহরে বসতি স্থাপন করে। ইব্‌ন হাওকালও (৩৬৭/৯৭৮) অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তবে কিছু অতিরিক্ত তথ্যও সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী সুনির্মিত এই শহরের জনসংখ্যা ছিল বিরাট। এই অধিবাসীদের কয়েকজন তাঁহাদের জ্ঞান ও মনীষার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে ধার্মিক ও পুণ্যবান ব্যক্তিরা এখানে আগমন করেন। এই শহরের অন্যান্য জনপদের মত 'দার' (বাসস্থান) ছিল যেখানে ঐসব পুণ্যবান ও ধার্মিক ব্যক্তিরা বাস করিতেন এবং তাঁহারা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত গোটা দেশ হইতে তাঁহাদের জন্য প্রেরিত উপহার দ্রব্যে জীবন যাপন করিতেন। তারসূস Nicephorus-এর পদানত হওয়ার পর ইব্‌ন হাওকাল ঐ শহরের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব নহে, বরং অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূত্র হইতে গৃহীত। পক্ষান্তরে একই বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত মুকাদ্দাসী এই বিষয়ে বলেন যে, শহরটি বায়যান্টীয়দের দখলে রহিয়াছে বিধায় তিনি ঐ শহরের কোনও বিবরণ দিবেন না।

খৃস্টান ক্রুসেডারগণ 'আওয়াসিমকে Antioch রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। ইদ্‌রীসীর বর্ণনা অনুসারে তারসূস ছিল জোড়া প্রাচীরবেষ্টিত উর্বর অঞ্চলে অবস্থিত এক বড় শহর। য়াকূত পরিষ্কার মন্তব্যে বলিয়াছেন, তাঁহার সময় তারসূস বায়যান্টীয় (৭ম/১৩শ শতকের সূচনাপর্বে) অধিকারভুক্ত ছিল। তিনিও ঐ শহরের জোড়া প্রাচীরবেষ্টনী, প্রাচীরে ছয়টি প্রবেশদ্বার ও প্রাচীর ঘিরিয়া প্রশস্ত পরিখার উল্লেখ করিয়াছেন। বায়যান্টীয় বিজয়ের আগে শহরটি ছিল অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধ। এই শহরে তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও মনীষাসম্পন্ন বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। ১২৭৫ খৃ. মামলূক সুলতান বায়বার্‌স তারসূস ও আদানা অঞ্চল লুণ্ঠন করেন এবং পরে সায়ফু'দ-দীন কালা'উন ইহা জয় করেন। ৯ম/১৫শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তারসূস অঞ্চল হালাব-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া খালীল আজ-জাহিরীর বর্ণনায় জানা যায়। ঐ সময়ে শহরটি প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। একটি দুর্গ প্রাসাদও ছিল। শহরটির চতুর্দিকে কয়েকটি গ্রাম ছিল।

বর্তমান কালে তারসূস একটি বিধ্বস্ত অবহেলিত ক্ষুদ্র শহর। এই জনপদের গৌরবময় ইতিহাসের স্মারক বিদ্যমান নাই। বারাদীন নদী এই জনপদ হইতে কিছু দূরে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর বন্যার কারণে জনপদের উপকণ্ঠ বর্তমানে জলায় পর্যবসিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Bohlich, Die Geisteskultur von Tarsus im augustaischen Zeitalter, 1913; (২) বালাযুরী, ফুতূহ, সম্পা. de Goeje, পৃ. ১৬৩, ১৬৯, ১৭১ প.; (৩) মাস'ঊদী, মুরূজ, Paris, ৮খ, ৭২; (৪) de Goeje, B. G. A., i, 64, 69, ii, 122; iii, 152; vi, 72; (৫) তাবারী, Annales, সম্পা. de Goeje, ৩খ., ২; 1103, 1440, 1942, 2163; (৬) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ., ৫২৬-৫২৮; (৭) Rohricht, Gesochte des Konigreiches Jerusalem, P. 679, 934, 967।

Fr. Buhl (E.I.[1])/ আফতাব হোসেন

তারা মসজিদ ঃ ঢাকার অন্যতম আকর্ষণীয় ও অলংকৃত মসজিদ। পুরাতন ঢাকার আরমানীটোলায় আবুল খয়রাত রোডে মসজিদটি অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মতান্তরে শেষার্ধে মুগল স্থাপত্য রীতিতে জনৈক মীর্যা গোলাম পীর কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত। শিলালিপির অভাবে সঠিক নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। গম্বুজ ও গাত্রালংকারে অসংখ্য তারার প্রতিকৃতি থাকায় মসজিদটি তারা বা সিতারা মসজিদ নামে খ্যাত। পূর্বে ইহা মীর্যা সাহেবের মসজিদ নামেও পরিচিত ছিল। ১৯২৬ ও ১৯৮৭ খৃ. মসজিদটির সংস্কার, সম্প্রসারণ ও অলংকরণ করা হয়।

আয়তাকারবিশিষ্ট আদি মসজিদটির আয়তন ভিতরের মাপে ৩৫.২+ ১৩.৫′, চার কোণায় চারটি অষ্টকোণা বুরূজ। সম্মুখ দেওয়ালে তিনটি প্রবেশপথ, উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে একটি করিয়া প্রবেশপথ। সম্মুখ প্রবেশপথগুলি ভিতরের দিক খিলানযুক্ত ও খাঁজ কাটা (Cusped)। দুইটি ধনুকাকৃতির খিলান (Lateral arch) দ্বারা মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে তিন ভাগে (Bays) বিভক্ত। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী দুইটি হইতে অপেক্ষাকৃত বড়। গম্বুজশীর্ষ প্রস্ফুটিত পদ্ম পাপড়ির নকশা দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদে আযানের জন্য মিনার এবং খুতবার জন্য কোন মিম্বার নাই। মূলত মসজিদটি ছিল অলংকারবিহীন, অনাড়ম্বর ও সাদাসিধা প্রকৃতির। ১৯২৬ খৃ. ঢাকার জনৈক আলীজান বেপারী মসজিদটি সর্বপ্রথম সম্প্রসারণ ও অলংকরণ করেন। মিনার ও বুরূজগুলির শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ (Cupola) দ্বারা ঢাকা। কেন্দ্রীয় মিহরাব শীর্ষে আরবী লিপি উৎকীর্ণ। গম্বুজগুলির উপরিভাগ সাদা চীনামাটির বাসনের টুক্‌রা দ্বারা আচ্ছাদিত। তাহার মধ্যে নীল রংয়ের অসংখ্য তারার প্রতিকৃতি প্রাধান্য পাইয়াছে। নক্সালংকারে নীল, সোনালী, খয়েরী ও উজ্জ্বল বাদামী রংয়ের কাচের টুক্‌রার ব্যবহার মসজিদটিকে সুদৃশ্য ও আকর্ষণীয় করিয়াছে। ১৯৮৫ খৃ. হইতে ১৯৮৭

খৃ.-এর মধ্যে মসজিদের পরবর্তী সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ হয়। এই সম্প্রসারণে মসজিদ পরিকল্পনার ব্যাপক রদবদল ঘটে। সম্প্রসারিত অংশে অতিরিক্ত দুইটি গম্বুজ নির্মাণ করায় পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদে পরিণত হয়। শিল্পী নূর মোহাম্মদ বিক্রমপুরী বর্ধিত অংশের নক্সালংকার করেন। মসজিদের সাহান (সম্মুখের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ) সাদা মার্বেল পাথর দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশপথের সামনে একটি বড় তারকা আকৃতির ফোয়ারা নির্মিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh District Gazetteer, Dhaka 1969 (1975), p. 462; (2) Dr. S. M. Hasan, Muslim Monuments of Bangladesh, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. 2nd ed, 1980, p. 59; (৩) ঐ লেখক, Dacca, Gateway to the East, Dacca 1982, p. 14; (৪) আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৪৪৮-৪৯; (৫) ঐ লেখক, বাংলাদেশের প্রাচীন কীর্তি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., ২খ, ৮৬-৮৭।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

তারাইল ঃ বাংলাদেশের সাবেক ময়মনসিংহ জিলার একটি উপজিলা। ময়মনসিংহ জিলা সদর হইতে ইহার দূরত্ব ৯৮ কি. মি. (৬১ মাইল)। এই জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমাকে জিলায় উন্নীত করিবার সময় তারাইল থানাকে কিশোরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নরসুন্দা নদীর তীরে অবস্থিত তারাইল উপজিলা একটি পাট উৎপাদন ও বাণিজ্য কেন্দ্র।

উপজিলাটি 'তারাইল' নামকরণের তিনটি মত প্রচলিত আছে। যথাঃ (১) অতীতে বর্তমান থানার সন্নিকটে বিল অঞ্চলে একটি তারকাপাত (উল্কাপাত) হয়। এই ঘটনা হইতে স্থানটির নাম হয় 'তারাইল', (২) বর্তমান থানা এলাকায় অতীতকালে প্রচুর পরিমাণ তারাফুলের সমারোহ ছিল বলিয়া স্থানটির নাম হয় 'তারাইল', (৩) এই অঞ্চলের জমিদার কন্যা তারেশ্বরীর স্মৃতি রক্ষার্থে অঞ্চলটির নামকরণ করা হয় 'তারাইল'। তবে অনেকের ধারণা, এই স্থানটির আদি নাম ছিল 'তারাগড়। যতদূর জানা যায়, ১৯০৯-১০ খৃ. এইখানে প্রথম থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই উপজিলা ২৪·৩০° উত্তর অক্ষাংশ হইতে ২৪·৪৭° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০·৪৯০° দ্রাঘিমাংশ হইতে ৯০·৫৯° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১৪০·৯ বর্গ কি. মি. (৫৪·৪ বর্গমাইল)। তন্মধ্যে ০·৪ বর্গ কি. মি. নদী অধিকৃত এলাকা রহিয়াছে।

তারাইল উপজিলার সীমা উত্তরে নেত্রকোণা জিলার কেন্দুয়া ও মদন উপজিলা, দক্ষিণে করিমগঞ্জ উপজিলা, পূর্বে ইটনা উপজিলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ জিলার নান্দাইল উপজিলা। তারাইল উপজিলা ৭টি ইউনিয়ন, ৭৩টি মৌজা ও ১০৩টি গ্রাম লইয়া গঠিত।

এই উপজিলার ভূ-প্রকৃতি সমতল। সমগ্র উপজিলার দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদপ্লাবিত গাঢ় ধূসর বর্ণের পলিমাটি দ্বারা এবং অবশিষ্ট অঞ্চল ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারা নদী প্লাবিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। মৃত্তিকা দোআঁশ প্রকৃতির। আবহাওয়া মোটামুটি স্বাস্থ্যকর।

বাংলাদেশের ১৯৮১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী তারাইল উপজিলার মোট জনসংখ্যা ১,১০,২৭২ জন। তন্মধ্যে মুসলমান ১,০২,৪২০, হিন্দু ৬,৬৩৭ এবং অবশিষ্ট অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এইখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৮৩ জন লোকের বাস। অত্র উপজিলায় ১৫২টি মসজিদ ও ৩টি মন্দির রহিয়াছে।

উপজিলার জনগণের আর্থিক অবস্থা প্রায় সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ কৃষিজীবী। প্রধান ফসল ধান ও পাট।

উপজিলার জাওয়ার নামক গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। উক্ত শিলালিপিটি হইতে জানা যায় যে, ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান হোসেন শাহের পুত্র গিয়াছু'দ-দীন মাহ্মূদ শাহের আমলে এই গ্রামে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদটি নির্মাণ করেন রাহাতের পুত্র খান-ই মু'আজ্জাম নূর খান। মসজিদটির কোন অস্তিত্ব নাই।

তারাইল উপজিলায় কখন কিভাবে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে সেই সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। প্রতীয়মান হয় যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে সুলতান ফাখরু'দ-দীন মুবারাক শাহের বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল বিজয়ের অব্যবহিত পরে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমীর কল্যাণে অত্র অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। তিনি বলয় হইতে এক শত বিশজন শাগ্‌রিদসহ মদনপুর গ্রামে আস্তানা স্থাপন করেন। মদনপুর তারাইল উপজিলার উত্তরে অল্প দূরে অবস্থিত। তারাইল উপজিলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে তাঁহার এবং তাঁহার শাগ্‌রিদগণের বিশেষ অবদান রহিয়াছে। মদনপুর গ্রামে তাঁহাদের মাযার রহিয়াছে। তারাইল উপজিলা বৃহত্তর ময়মনসিংহ জিলার একটি প্রসিদ্ধ পাট ব্যবসা কেন্দ্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh Population Census 1981, Community tables of all Thanas of Mymenshing District, Part l, July 1985, Bangladesh Bureau of Statistics, Govt of Bangladesh, Tarail Thana, Page no, xcvii_ciii; (2) Bangladesh District Gazetteers, Mymenshing, 1978, Establishment Divn. Govt. of Bangladesh, Page No. 374; (৩) ময়মনসিংহের সাহিত্য ও সংস্কৃতি, প্রকাশক জেলা বোর্ড ময়মনসিংহ, মার্চ ১৯৭৮, পৃ. ৬৪৯; (৪) গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফীসাধক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সংস্করণ, জুন ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ১৫৭; (৫) আ. কা. মোঃ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, ডিসেম্বর ১৯৮৪ সংস্করণ, পৃ. ৪৮৭; (৬) খান বাহাদুর আ. হাকিম সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, পৃ. ৭১১।

খন্দকার মাহবুবুর রহমান

তারাগঞ্জ (تارا گنج) ঃ রংপুর জিলার একটি উপজিলা। জিলা সদর হইতে ২৪ কি. মি. দূরে অবস্থিত। ১৯৭৭ খৃ. তারাগঞ্জ থানা গঠিত হয়। স্থানীয় জনসাধারণের মতে অতীতে তারা বীবীর মাযারের পার্শ্বে একটি হাট গড়িয়া উঠে। তারা বীবীর নামানুসারে হাটের নাম তারাগঞ্জ হয়। বর্তমান উপজিলা সদর উক্ত হাটের নিকট গড়িয়া উঠায় উহার নাম তারাগঞ্জ হইয়াছে।

অবস্থান ঃ উপজিলা ২৫°৪৪ হইতে ২৫°৫০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫৭ হইতে ৮৯°০৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

সীমা ঃ উত্তরে কিশোরগঞ্জ ও সহিদপুর উপজিলা, পশ্চিমে সাইদপুর উপজিলা, দক্ষিণে বদরগঞ্জ উপজিলা এবং পূর্বে কোতোয়ালী উপজিলা দ্বারা সীমায়িত।

আয়তন ঃ তারাগঞ্জ উপজিলার মোট আয়তন ১২৮.৭ বর্গ কি. মি. (৪৯.৭ বর্গমাইল)। ইহার মধ্যে ১.০ বর্গ কি. মি. নদী এলাকা। ১৯৮১ খৃ. আদমশুমারি অনুসারে উপজিলার মোট জনসংখ্যা ৮৩,৫০৯। ইহার ৪২,৭৫৭ জন পুরুষ ও ৪০,৭৫২ জন স্ত্রীলোক। ১৯৮১ সনের শুমারি মুতাবিক উপজিলার ৫ বৎসর ও তদূর্ধ্ব শিক্ষার হার ১৫.৩%। ইহার মধ্যে ২৩.১% পুরুষ ও ৭.১% মহিলা। সব বয়সের সাক্ষরতার হার ১২.৪%।

উপজিলায় মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১, মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১২, মাদরাসা ৬ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৮।

উপজিলায় মোট মুসলমান সংখ্যা ৭১,৬৩৬, হার ৮৫.৮%, হিন্দু ১১,৮০০, হার ১৪.১%, বৌদ্ধ ১৩ ও অন্যান্য ৬০। তারাগঞ্জের মসজিদ সংখ্যা ১৪৬, মন্দির ২৩ ও ডাকঘর ৬।

সড়ক ও যোগাযোগ ঃ উপজিলায় মোট সড়কের দৈর্ঘ্য ৭২.৪ কি. মি. (৪৫ মাইল)। ইহার মধ্যে পাকা ১৬.১ কি. মি. (১০ মাইল) এবং কাঁচা ৫৬.৩ কি. মি. (৩৫ মাইল)।

কুটির শিল্প ঃ তাঁত, বাঁশের কাজ, মৃৎপাত্র নির্মাণ, পাটের কাজ ইত্যাদি শিল্প যথাক্রমে ২,৮৪,১০৩ ও ৫০৩টি আছে।

ঐতিহাসি নিদর্শন ঃ এইখানকার প্রাচীনতম মসজিদটি জয়-ই মসজিদ নামে পরিচিত। অবশ্য ইহার ইতিহাস অজ্ঞাত। ইহা ছাড়া হযরত ইবরাহীম বালখী (র) এবং তারা বীবীর মাযার এখনও অক্ষত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh Population Census, 1981, Part 1, December 1986, pp. CIX, 103-104; (২) Poplation Census of Pakistan 1961, District Census Report Rangpur, Dacca, pp. 1-6, 1-7; (৩) Bangladesh Population Census 1981, District Rangpur, Dhaka, December 1984 pp. LV-LXXI, 5.

শেখ মাহবুবুল আলম

তারান্‌চি (ترنچی) ঃ প্রাচ্য তুর্কী ভাষার এই শব্দটি দ্বারা কৃষিজীবিগণকে বোঝানো হইয়া থাকে; অধিবাসীর নাম হিসাবে খৃ. ১৮শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে চীন সরকার কর্তৃক কাশগারিয়া হইতে ইলি উপত্যকাতে আনাইয়া অধিবাসন করা লোকদিগকে বুঝায়; তু. Radloff, Worterbuch, ৪খ, ৮৪১। যাহা হউক, এমন কি ইলি উপত্যকাতেও বলা হইয়া থাকে যে, তারান্‌চিগণ নাকি নিজেদেরকে স্থানীয় অধিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে (Yarlik, তু. Radloff, ২খ., ৩৪৩)। সংখ্যায় ইহারা ছিল ৬,০০০ পরিবার, তন্মধ্যে ৪,১০০ পরিবার ইলি নদীর ডান তীরে এবং ১,৯০০ পরিবার বাম তীরে বসবাস করিত। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিবার জন্য তু. Radloff, Aus Sibirien, ২খ, ৩৩১ প.। ১৮৩৪ খৃ. আদমশুমারি অনুযায়ী ইহাদের পরিবারের সংখ্যা বাড়িয়া ৮,০০০ হয়। কাশ্‌গারিয়াতে মুসলিম বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত তারান্‌চিদের ভাগ্য বেশ ভালই ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু উহাদের মধ্য হইতে প্রায়শ সেনাবাহিনীতে লোক নিয়োগের ফলে অতঃপর অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে। ১৮৬৩ খৃ. পরে ইলি উপত্যকাও বিদ্রোহী আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়ে; কঠোর যুদ্ধের পরে তারান্‌চিদের একটি স্বশাসিত ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, শাসক হন সুলতান আবু'ল-'আলা' বা 'আলা' খান (দ্র. নিবন্ধ কুলজা)। ১৮৭১ খৃ. রাশিয়া এই রাজ্যটি দখল করিয়া নেয় এবং ১৮৮১ খৃ. পর্যন্ত ইহা রুশ অধিকারে থাকে। তখন তারান্‌চিরা সংখ্যায় ছিল ৫১,০০০, তন্মধ্যে ৪৫,৩৭৩ জন রাশিয়ার এলাকাতে চলিয়া যায় এবং ইলি উপত্যকা পুনরায় চীনকে ফেরত দেওয়া হয় (সেন্ট পিটার্সবার্গের সন্ধি, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৮১)। উহাদিগকে সেমিরাইয়েচাই (Semiryen-censkaya Oblast) অঞ্চলে বসত করান হয়। এই মুহাজিরগণের নেতা ছিলেন একজন ধনী সওদাগর, নাম ওয়ালী আখূন য়ুলদাশেভ। তারান্‌চিরা জারকন্দ শহরের জনসংখ্যার প্রধান অংশ ছিল, শহরটি এই সময়েই স্থাপিত হয় (১৯১১ খৃ. ২৫,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ইহারা ছিল ১৬,০০০)। ১৮৮৭ খৃ. পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রদত্ত জমি কয়েকবার কাড়িয়া লইয়া রুশ-কসাকদেরকে দেওয়া হয়। ফলে তারান্‌চিরা অন্যান্য স্থানে চলিয়া যায়। তারান্‌চিদের মর্যাদা শুধু ভাল কৃষিজীবী ও বাগিচা নির্মাতা হিসাবেই নহে, দক্ষ কারুশিল্পী ও শ্রমিক হিসাবেও ইহারা মূল্যবান। মৃৎশিল্পেও ইহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া কথিত আছে। ১৮৯৭ খৃ. আদমশুমারি অনুযায়ী ইহাদের সংখ্যা ছিল ৫৫,৯৯৯। পরবর্তী কালে ৮৩,০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ১৯২০ খৃ. আদমশুমারিতে লোকসংখ্যা ছিল ৬২,৩০৩ জন। কারা-কিরগীযগণের উত্থানের কারণে এবং রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলীহেতু তারান্‌চিদের সমৃদ্ধি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ১৯১৭ খৃ. প্রশাসনিক জিলা জারকন্দের বিভিন্ন শহরে বসবাসকারী তারান্‌চিগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৬,০০০; এই হ্রাস ছিল অত্যধিক। সোভিয়েত রাশিয়াতে তারান্‌চিগণ এককভাবে কোন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী নহে, ইহারা কাযাকিস্তান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রে বাস করে; তুর্কমেনিস্তানের বায়রাম-'আলীতেও একটি তারান্‌চি উপনিবেশ রহিয়াছে। তারান্‌চিগণ ও তুর্কোমানগণ (কাশগারলিক) যাহারা পরবর্তীতে কাশগারিয়্যা হইতে আসিয়াছিল, সকলেই দাবি করে যে, তাহারা জাতিতে উইগুর। এই ধারণা ভুল, কারণ ইতিহাসের উইগুরগণ কখনও এত পশ্চিমে আসে নাই।

চীন ভূখণ্ডে যাহারা রহিয়া গিয়াছিল সেই তারান্‌চিদের সংখ্য খৃ. ২০শ শতকের শুরুতে ছিল প্রায় ৮,২০০। যাহারা রাশিয়াতে চলিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে মূল বাসভূমিতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চীনা কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিয়াছিল এবং ইহাতে কিছুটা সফলও হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W Radloff, Aus Sibirien, ২য় সং, লাইপযিগ ১৮৯৩ খৃ., ২খ, ৩৩১ প.; (২) W Masal'skiy, Turkestankiy Krai, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৪০৩ প.; (৩) Aziatskaya Rossiya (সরকারী প্রকাশনা), সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১৪ খৃ., ১খ, ১৭৪ প.; (৪) Materiali po obsliedovaniyu tuzemnago i russkago zemlepol'zovaniya v Semiryecenskoi Oblasti (সরকারী প্রকাশনা); (৫) T. V. Taranci, Cast l. Tekst. Cast II. Tablici, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১৪ খৃ.; আরও তু. কুলজা নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী; তারান্‌চিগণের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার জন্য; (৬) Spisok narodnostei Soyuza Sov. Soc. Respublik, Zpod redakciei I. I. Zarubina, লেলিনগ্রাড ১৯২৭ খৃ. (একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত), পৃ. ৩৪, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে; (৭) W Radloff, Proben der volkslitteratur der turkischen Stamme, ৬খ, Dialect der Tarantschi, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৮৬ খৃ.; (৮) N.N. Pantusow, Tarancinskiya piesni, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৯০ খৃ. (Zap. Imp. R. Geogr, Obshc. no. otdel etnogr., t. xvii, vip. l)।

W. Barthold (E.I.[1]) হুমায়ুন খান

তারাফা (طرفة) ঃ ইব্ন 'আবদি'ল-বাক্‌রী, প্রাক-ইসলামী বিখ্যাত আরব কবি। আরব সমালোচকগণ সর্বসম্মতভাবে তাঁহাকে উক্ত যুগের অন্যতম প্রধান কবি এবং মু'আল্লাকাত নামে পরিচিত কাব্যসমূহের দীর্ঘতমটির রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিই আবার সেই আমলের প্রাথমিক যুগের কবিগণের অন্যতম, যাঁহাদের রচিত কবিতা সংরক্ষিত হইয়াছে। মু'আল্লাকাত এবং তাঁহার কাব্যসংগ্রহের সম্পাদকগণ সাধারণত একটি পূর্ণ বংশতালিকা প্রদান করেন যাহা হইতে শুধু এইটুকু নিশ্চিতভাবে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ওয়া'ইল বংশের বাক্‌র গোত্রের সদস্য ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল আল-'আবদ ইব্ন সুফ্‌য়ান। আরব লেখকগণ যে জীবনী তথ্য প্রদান করিয়াছেন সেইগুলি সন্তোষজনক নহে; তাঁহার কাব্য হইতেই সচরাচর সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। ইহা নিশ্চিত বলিয়া মনে হয় যে, আল-হীরার বাদশাহগণের দরবারে তাঁহার যাতায়াত ছিল, বিশেষত রাজা 'আমর ইব্ন হিন্দ-এর দরবারে। 'আমর আনু. খৃ. ৫৫৪ হইতে ৫৬৮ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কবির স্বগোত্রীয়গণের বাসভূমি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব আরব-এর বাহরায়ন ও য়ামামাতে। নির্ভরযোগ্য তথ্যানুযায়ী মনে হয় এই অঞ্চল ছিল সর্বপ্রাচীন আরব কবিগণের বাসভূমি এবং খুব সম্ভব আরবী কবিতার যে সংগ্রহ বিদ্যমান তাহা দেশের এই অংশ হইতেই বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

জনশ্রুতিতে তারাফার সঙ্গে আরও পূর্বেকার কবি আল-মুসায়্যাব ইব্ন 'আলাস-এর যোগাযোগের উল্লেখ দেখা যায়, যেমন উক্ত কবি নিজের একটি কবিতার কোথাও ভুল করিলে তারাফা উহা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণভাবে আরব প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রাহকগণ তারাফাকে একজন অসাধারণ বাল্য প্রতিভা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং একটি কবিতা (দ্র. Ahlwardt, No. 1) হইতে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে তিনি নিতান্ত বালক ছিলেন এবং তাঁহার মাতা ওয়াদা-র প্রতি তাঁহার পিতৃব্যগণের অন্যায় আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি কবিতা রচনা করিতে শুরু করেন। অল্প বয়সে কবির মৃত্যুর বিবরণ পাওয়া যায়। শেষোক্ত বিবরণটি গ্রহণ করা হইয়াছে আল-খিরনিক-এর রচিত কয়েকটি কবিতা হইতে। তিনি কবির ভগ্নী ছিলেন বলিয়া দাবি করা হয় এবং উল্লিখিত কবিতাগুলিতে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুকালে কবির বয়স হইয়াছিল মাত্র ২৬ বৎসর। তিনি হিফ্‌ফান নামক জনৈক ব্যক্তির কন্যা ছিলেন বলিয়া জানা যায় এবং এই কারণে অধিকতর সম্ভাব্য এই যে, তিনি অপর কোন অল্প বয়সে মৃত অজ্ঞানা ব্যক্তির মৃত্যুতে যে শোকগাঁথা রচনা করিয়াছিলেন তাহা তারাফা সম্বন্ধে রচিত বলিয়া অনুমান করা হয়।

সমসাময়িক ইতিহাস পর্যালোচনা (দ্র. E. I., তারাফা প্রবন্ধ) করিলে মনে হয়, তারাফা অতি অল্প বয়সে মারা গিয়াছিলেন; এই কথাটি অসম্ভাব্য। তিনি আল-হীরার রাজদরবারে গিয়াছিলেন 'আমর-এর সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে, সম্ভবত তাঁহার নিজ গোত্রের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধিরূপেই। কয়েকটি বৎসর তিনি দক্ষিণ আরবে অতিবাহিত করেন। অন্যান্য শায়খের তুলনায় তিনি হয়ত অল্পবয়স্ক হইয়া থাকিবেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কোন মত প্রকাশ করা দুঃসাহসিক হইবে। তাঁহার ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁহার কবিতা হইতে শুধু এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমকালীন জড় বা পৌত্তলিক অদৃষ্টবাদের পোষক ছিলেন।

কবি হিসাবে তাঁহার মূল্যায়ন করিতে গিয়া আমরা কেবল উল্লেখ করিতে পারি তাঁহার স্বদেশীয় সমালোচকগণের একটি অমীমাংসিত বিতর্কের কথা যে, তারাফা কি শুধু প্রাক-ইসলামী পৌত্তলিক যুগেরই শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, নাকি ছিলেন সকল যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। মু'আল্লাকাতে তিনি উটের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা যথার্থই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত এবং এ বিষয়ে সম্ভবত আর কোন আরব কবি তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রচিত বলিয়া বর্ণিত কবিতাগুলির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণ Ahlwardt ও Geiger-এর সিদ্ধান্তগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন। তবে আমি বরং বলিব, এই দুই বিশেষজ্ঞ যেইসব কবিতার বিশুদ্ধতা স্বীকার করিয়াছেন তদপেক্ষা বেশিই সম্ভবত বিশুদ্ধ। আল-মুতালামমিস্, আল-আ'শা, আল-আ'শা-র রাবী 'উবায়দ, সিমাক ইব্ন হারব, হাম্মাদ আর-রাবিয়া, আল-হায়ছাম ইব্ন 'আদী প্রমুখ বর্ণনাকারী সত্যিই যদি তাঁহার কাব্যগুলি পরবর্তীদের নিকট হস্তান্তর করিয়া থাকেন তবে আশা করা যায় যে, তাঁহার কবিতাগুলি অবশেষে বৈয়াকরণগণের টীকা সমালোচনা সময় পর্যন্ত বিশুদ্ধভাবে হস্তান্তরিত হইয়াছিল এবং বেশ খাঁটি অবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। কবি সম্বন্ধে সর্বোত্তম বিবরণ পাওয়া যাইবে তাঁহার দীওয়ানের ইব্নু'ছ-সিক্‌কিত-এর পাঠে (recension)। তবে দুঃখের বিষয় যে, সম্পাদক সেইখানে শেষোক্ত ব্যক্তির টীকার সঙ্গে আল-আ'লাম-এর টীকাকে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন। ইব্নুল আনবারী কৃত মু'আল্লাকার ভূমিকায়ও কবি সম্পর্কে বিবরণ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Diwans of the six ancient Arabic poets, ed. W. Ahlwardt, London 1870; (2) Diwan de Tarafa, ed. M. Scligsohn With the commentary of Al-A'lam, Paris 1901; (৩) শারহু দীওয়ান-ই তারাফা, সম্পা. আহমাদ ইব্ন আমীন আল-শিন্‌কীতি, কায়ান ১৯০৯ খৃ., ইব্নু'স সিক্‌কিত-এর পাঠ (recension); (৪) L. Cheikho, Poetes Chritiens, বৈরূত ১৮৯০; (৫) ইব্নু'শ-শাজারী, মুখ্‌তারাত, কায়রো ১৮৮৮ (এবং নূতন সং. ১৯২৪); (৬) Tharaphae Moallakah, ed. Reiske, লাইডেন ১৭৪২ খৃ.; (৭) Jones, The Moallakat, লণ্ডন ১৭৮৩ খৃ.; (৮) A. Th. Hartmann, Die hellstrahlenden Munster ১৮০২; (৯) J. Vullers, Tarafae Moallaca cun Zuzenii scholiis, Bonn ১৮২৯ খৃ.; (১০) P. Wolff, Die sieben Preisgedichte, Rotweil ১৮৫৭; (১১) F. A. Arnold, Septem Mo'allacat, Leipigisso; (১২) Abel, Die sieben mu'allakat, বার্লিন ১৮৯১ খৃ.; (১৩) C. J. Lyall, The ten ancient Arabic poems, কলিকাতা ১৮৯৪ (তিবরিযীর টীকাসমেত); (১৪) জামহারাতু আশ্‌আরি'ল-'আরাব, কায়রো ১৮৯০ খৃ.; (১৫) O. Rescher, Tarafa's Mo'allaqa mit dem Kommentar des Abu Bkr....Ibn al-Anbari, ইস্তাম্বুল ১৩২৯; (১৬) B. Vandenhoff, Nonnulla Tarafae Poetae carmina, etc., বার্লিন ১৮৯৫ খৃ.; (১৭) B. Geiger, Die Mu'allaqa des Tarafa ubersetzt und erklart, W. Z. K. M., vol, xix and xx; (১৮) W. Ahlwardt, Bemerkungen uber die Echtheit der alten arabischen Gedichte, Greifswald ১৮৭২; (১৯) G. Jacob, Studien in arabischen Dichtern, বার্লিন ১৮৯৩; তারাফার কবিতা এবং খণ্ডাংশ অগণিত গ্রন্থে উদ্ধৃত রহিয়াছে; লিসানু'ল-'আরাব গ্রন্থে ২৬৪ জায়গাতে এই কবির উদ্ধৃতি পাওয়া যায় (প্রবন্ধ লেখকের তৈরী সেই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী) [সংক্ষেপিত]।

F. Krenkow (E.I.[1])/ হুমায়ুন খান

তারাব (দ্র. মূসীকী)

তারাবীহ (تراويح) ঃ (আ.), প্রচলিত একবচন তারবীহাতুন-এর বহুবচন, রামাদান মাসের রাত্রিতে আদায়কৃত সালাত। হাদীছে উল্লিখিত আছে যে, মুহাম্মাদ (স) পরম শ্রদ্ধার সহিত এই সালাত আদায় করিতেন; তবে এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন যাহাতে উহা আদায় করা বাধ্যতামূলক বলিয়া প্রতীয়মান না হয় (বুখারী, তারাবীহ, trud. 3)। কথিত আছে যে, 'উমার (রা) মদীনার মসজিদে যাঁহারা একক বা সংঘবদ্ধভাবে সালাত আদায় করিতেন তাঁহাদিগকে একজন কারী-এর পশ্চাতে সর্বপ্রথম সমবেত করেন (পূ. স্থা, trud. 2)। ইহাও কথিত আছে যে, এই পবিত্র সালাতের জন্য তিনি রাত্রির প্রথম ভাগ পসন্দ করেন।

ধর্মীয় বিধি সালাতু'ল-'ইশা'-এর সামান্য সময় পরে তারাবীহ আদায় করার জন্য অনুমোদন দান করিয়াছে। উক্ত সালাত প্রতিটি দুই রাক'আতবিশিষ্ট ১০ সালাত-এর সমষ্টি। প্রতি চারি রাক'আত পর পর বিরতি অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবেই তারাবীহ "বিরতি" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মালিকী মতে তারাবীহ সালাত ৩৬ রাক'আত-এর সমন্বয়ে। তারাবীহ সালাত সুন্নাত সালাতের অন্তর্ভুক্ত এবং রামাদান [দ্র.]-এর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনও অনুষ্ঠানের মত জনপ্রিয়। শী'আ ফিক্হ রামাদান সমগ্র মাসব্যাপী প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক হাজার রাক'আত সালাত আদায় করার পক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

মক্কাতে একজন ইমাম [দ্র.]-এর পশ্চাতে ১০ হইতে ১৫০ জনের দলে অন্তর্ভুক্ত হইয়া সমবেত হন। তিনি সরকারীভাবে নিযুক্ত হইলেও এক্ষেত্রে তিনি বেসরকারীভাবে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। এই সালাতে কুরআন হইতে তিলাওয়াত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। খুব ব্যস্ত ব্যক্তিবর্গ এই সালাতও সময়ের স্বল্প পরিসরে আদায় করিতে পারেন। জামা'আতবদ্ধ ব্যক্তিগণ রামাদানের রাত্রিগুলিতে তাঁহাদের ইমামের পশ্চাতে থাকিয়া এক বা একাধিকবার তাঁহারা কুরআন আবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন। এমন কি তারাবীহ্র পরেও বহু ব্যক্তি আল্লাহ্র 'ইবাদতের জন্য মসজিদে অবস্থান করেন।

আতচীন (Atchin)-এ তারাবীহ আদায়ের জন্য প্রতি রাত্রিতে বিপুল সংখ্যক লোক সমবেত হন। স্বাভাবিকভাবে অবশ্য তারাবীহ সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে শুধু Tonku-ই কার্যকর ভূমিকা পালন করেন, অন্যেরা আমীন ও মহানবীর উপর দরূদ পাঠে সম্মানজনক অংশগ্রহণের মধ্যে তাহার তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে। Tonku তাঁহার শ্রমের পারিশ্রমিকস্বরূপ যাকাতু'ল-ফিতর পাইয়া থাকেন। Wensinck তাঁহার "Arabic New Year" (Verk. Ak Amst, new Ser. xxv. N. 2) গ্রন্থে পৌত্তলিক যুগের ন্যায় প্রাচীন কালেও রামাদানের রীতি ছিল বলিয়া দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, মন্তব্যসহ তারাবীহ; (২) মালিক, মুওয়াততা', সালাত ফী রামাদান, যুরকানী-এর মন্তব্যসহ; (৩) আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী, তানবীহ, সম্পা. Juynboll, পৃ. ২৭; (৪) আল-রামলী, নিহায়া, কায়রো ১২৮৬, ১খ, ৫০৩ প.; (৫) ইব্ন হাজার আল-হায়ছামী, তুহফা, কায়রো ১২৮২, ১খ, ২০৫ প.; (৬) আবু'ল-কাসিম আল-হিল্লী, শারা'ই' আল-ইসলাম, কলিকাতা ১২৫৫, পৃ. ৫১; (৭) Caetani, Annali, ১৪ হি., ২২৯ প; (৮) Juynboll, Handleiding. Leyden 1925. register; (৯) Snouce-Husgronje, Mekka, ২খ, ৮৪ প.; (১০) ঐ লেখক, Mekkanische. Sprichwairter Nb, ৪৯; (১১) ঐ লেখক, De Afjehert. ১খ. ২৪৭ প.; (১২) d'Ohsson, Tableau gesirnt de l'empire ethaman, প্যারিস ১৭৮৭ খৃ., ১খ, ২১৪ প. (সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে); (১৩) Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, লণ্ডন ও Paisley ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ৪৮১।

A.J. Wensinck (E.I. [1])/ মুহ. আবু তাহের

তারাবীহ (التراويح) ঃ রমযান মাসের রাত্রিসমূহে ইশার ফরয ও সুন্নাত সালাত আদায়ের পর হইতে তারাবীহ সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহা আদায় করা যায়। এই নামায রমযান মাসের পরে পড়ার নিয়ম নাই। বহুবচনের এই শব্দটির অর্থ 'আরাম করা', এ.ব. তারবীহাতু (الترويحة)। তাহাজ্জুদ (দ্র.) সালাত হইতে ইহা একটি স্বতন্ত্র নামায, যদিও তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত সারা রাত্রি, সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। 'তারাবীহ' পরিভাষাটির ব্যবহার কখন হইতে শুরু হইয়াছে তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তবে 'সাহীহ' বুখারীসহ প্রাথমিক যুগের হাদীছের কিতাবসমূহে ও তৎপরবর্তী পর্যায়ে ফিক্হ-এর কিতাবসমূহে পরিভাষাটি লক্ষ করা যায় [দ্র. সহীহ বুখারী (৩১), كتاب صلاة التراويح কিতাবুস সাওম-এর শেষে, পৃ. ১৫৬, রিয়াদ সং.]। রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসের রাত্রিসমূহের এই বিশেষ সালাতকে 'কিয়ামুল-লায়ল'রূপে নামকরণ করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يايها الناس قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من الف شهر جعل الله صيامه فريضة قيام ليلته تطوعا .

"হে জনগণ! একটি মহামহিমান্বিত ও বরকতময় মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে। উহাতে একটি রাত্রি আছে যাহা সহস্র মাস অপেক্ষাও উত্তম। আল্লাহ উহার রোযা ফরয করিয়াছেন এবং উহার রাত্রে দণ্ডায়মানকে নফল করিয়াছেন" (বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান)।

তিনি আরও বলেন ঃ

ان الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রমযানের সিয়াম তোমাদের উপর ফরয করিয়াছেন এবং আমি তোমাদের জন্য সুন্নাত করিয়াছি উহাতে নৈশ ইবাদত" (ইব্ন মাজা, কিতাব ইকামাতিস-সালাত, বাব ১৭৩, নং ১৩২৮; নাসাঈ, কিতাবুস সিয়াম, বাব ৪০, নং ২২১২; মুসনাদ আহ্মাদ, ১খ., পৃ. ১৯১ ও ১৯৫, নং ১৬৬০ ও ১৬৮৮)।

عن ابى هريرة قال كان رسول الله ﷺ يرغب فى قيام رمضان من غير ان يامرهم بعزيمة ثم يقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غُفرله ما تقدم من ذنبه .

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে (রাত্রিবেলা) কিয়াম করিতে (তারাবীহ সালাত আদায় করিতে) উৎসাহ প্রদান করিতেন, তবে তাহাদিগকে শক্তভাবে নির্দেশ দিতেন না। অতঃপর তিনি বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত এবং পুণ্য লাভের বাসনায় রমযান মাসে কিয়াম করে তাহার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করা

হয়" (আবূ দাউদ, কিতাবুত-তাতাওউ', বাব তাফরী' আবওয়াবি শাহরি রামাদান, নং ১৩৭১; মুসলিম, সালাত, বাব তারগীব ফী কিয়ামি রামাদান, নং ১৭৮০/১৭৪; তিরমিযী, সাওম, বাব ঐ, নং ৮০৮; নাসাঈ, সাওম, বাব ছাওয়াবি মান কামা রামাদান, নং ২২০০ (প্রথমাংশ); বুখারী, ঈমান, বাব... কিয়ামি রামাদান মিনাল ঈমান, নং ৩৭ (প্রথমাংশ)।

অতএব রমযান মাসে রাত্রিসমূহে জাগ্রত থাকিয়া সালাত আদায় করাকে হাদীছে 'কিয়ামে রামাদান' পরিভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে, যাহা পরবর্তী কালে 'সালাতুত-তারাবীহ' নামে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হইয়াছে। রমযান মাসে এই নামায আদায় করাকে আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য তাতাব্বু' (ঐচ্ছিক) হিসাবে ধার্য করিয়াছেন (প্রথমোক্ত হাদীছ দ্র.)। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (স) ইহাকে সুন্নাত সালাতরূপে ঘোষণা করিয়াছেন (দ্বিতীয় হাদীছ দ্র.)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায়ই মসজিদে নববীতে লোকজন বিচ্ছিন্নভাবে তারাবীহ নামায পড়িত। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বাহির হইয়া দেখিলেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রমযান মাসে মসজিদের এক পাশে নামায পড়িতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি করিতেছে? বলা হইল, ইহারা একদল লোক যাহাদের কুরআন মুখস্থ নাই। উবায়্য ইব্ন কা'ব (রা) নামায পড়িতেছেন এবং তাহারা তাঁহার সহিত (জামা'আতে) নামায পড়িতেছে। নবী (স) বলেন, ইহারা যথার্থই করিতেছে এবং যাহা করিতেছে তাহা খুবই উত্তম (আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাব ফী কিয়ামি শাহ্‌রি রামাদান, নং ১৩৭৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসের রাত্রিতে নামায পড়ার জন্য যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়াই লোকজন মসজিদে গিয়া তাঁহার উপস্থিতিতেই জামা'আতে তারাবীহ নামায পড়িয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-ও বিশেষত রমযান মাসের শেষ দশকের রাত্রিসমূহে যথাসাধ্য নামাযে রত থাকিতেন। 'আইশা (রা) বলেন, "নবী (স) রমযান মাসের শেষ দশকে সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিতেন, তহবন্দ শক্ত করিয়া বাঁধিতেন এবং তাঁহার পরিবারের লোকজনকেও (ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার জন্য) জাগাইয়া দিতেন" (বুখারী, কিতাবুল কাদ্‌র, বাবুল-'আমালি ফী 'আশরিল আওয়াখিরি মিন্ রামাদান, নং ২০২৪; মুসলিম, ই'তিকাফ, বাবুল-ইজতিহাদ ফী আওয়াখিরি মিন রামাদান..., নং ২৭৮৭/৭; আবূ দাউদ, কিতাব শাহ্‌রি রামাদান, বাব ফী কিয়ামি শাহ্‌রি রামাদান, নং ১৩৭৬; নাসাঈ, কিয়ামুল লায়ল, বাব ১৭, নং ১৬৪০; ইব্ন মাজা, সিয়াম, বাব ৫৭, নং ১৭৬৮)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে তারাবীহ নামায

দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ার পর কোনও এক রমযান মাসে, সম্ভবত তাঁহার জীবনের শেষ রমযান মাসে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইমামতিতে লোকজন তিন রাত্রি তারাবীহ নামায আদায় করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) বলেন, "নবী (স) মসজিদে (নববীতে) নামায পড়িলেন এবং লোকজনও তাঁহার সহিত নামায পড়িল। পরের রাত্রেও তিনি নামায পড়িলেন এবং অনেক বেশী লোক একত্র হইল। পরের (তৃতীয়) রাত্রেও লোকসমাগম হইল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বাহির হইয়া তাহাদের নিকট গমন করেন নাই। ভোরবেলা তিনি বলিলেন, তোমরা কি করিয়াছিলে তাহা আমি অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে তোমাদের উপর ফরয করিয়া দেওয়া হইতে পারে এই আশঙ্কায় আমি তোমাদের নিকট আসি নাই। ঘটনাটি রমযান মাসের" (বুখারী, কিতাবুল জুমু'আ, বাব ২৯, নং ৯২৪, আরও দ্র. নং ৭২৯, ১১২৯ ও ২০১২; মুসলিম, সালাত, বাব ফী কিয়ামি রামাদান, নং ১৭৮৩/১৭৭ ও ১৭৮৪/১৭৮; আবূ দাউদ, সালাত, বাব ফী কিয়ামি শাহ্‌রি রামাদান, নং ১৩৭৩; নাসাঈ, কিয়ামিল-লায়ল, বাব কিয়ামি শাহ্‌রি রামাদান, নং ১৬০৫)।

আবূ যার (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে রমযান মাসের রোযা রাখিলাম। তিনি সম্পূর্ণ মাস আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া (নফল) নামায পড়েন নাই। যখন মাসের মাত্র সাত দিন অবশিষ্ট রহিল তখন তিনি আমাদিগকেসহ নামাযে দণ্ডায়মান হইলেন এবং রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ সময় নামাযে অতিবাহিত হইল। পরের রাত্রিতে তিনি আমাদের সহিত নামায পড়েন নাই। আবার পঞ্চম রাত্রে তিনি আমাদিগকে লইয়া নামাযে দণ্ডায়মান হইলেন এবং এই অবস্থায় অর্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হইল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি রাত্রির বাকি অংশও আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া নামায পড়িতেন! তিনি (স) বলিলেন, কোনও ব্যক্তি যখন ইমামের সহিত নামায পড়িতে থাকে, যতক্ষণ না তিনি ক্ষান্ত হন, এই অবস্থায় তাহার সমস্ত রাত্রিই নামাযরত হিসাবে গণ্য হয়। রাবী বলেন, আবার যখন চতুর্থ রাত্রি আসিল, তিনি নামাযে দণ্ডায়মান হন নাই। অতঃপর তৃতীয় রাত্রি আসিলে তিনি (স) তাঁহার পরিবার-পরিজন, স্ত্রীগণ ও অপরাপর লোকজনকে একত্র করিলেন এবং আমাদিগকে লইয়া এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া নামায পড়িলেন যে, আমরা 'ফালাহ' হারাইবার আশঙ্কা করিলাম। জুবায়র ইব্ন নুফায়র (র) জিজ্ঞাসা করিলেন, ফালাহ কি? আবূ যার (রা) বলিলেন, 'ভোর রাত্রির আহার গ্রহণের সময়'। ইহার পর তিনি মাসটির অবশিষ্ট রাত্রিগুলিতে আমাদেরকে সঙ্গে লইয়া নামায পড়েন নাই" (আবূ দাউদ, সালাত, বাব ফী কিয়ামি শাহ্‌রি রামাদান, নং ১৩৭৫; তিরমিযী, সাওম, বাব ঐ, নং ৮০৬; নাসাঈ, কিতাব কিয়ামিল লায়ল, বাব ঐ, নং ১৬০৬; ইব্ন মাজা, ইকামাতিস সালাত, বাব ঐ, নং ১৩২৭)।

নু'আয়ম ইব্ন যিয়াদ আবূ তালহা (র) বলেন, আমি নু'মান ইব্ন বাশীর (রা)-কে হিম্‌স (দ্র.)-এর মসজিদের মিম্বার হইতে বলিতে শুনিয়াছি, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত রমযান মাসের ২৩তম রাত্রে প্রথম প্রহরে এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি নামাযরত অবস্থায় কাটাইলাম। অতঃপর আমরা তাঁহার সহিত ২৫তম রাত্রে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত নামায পড়িলাম। অতঃপর আমরা ২৭তম রাত্রে তাঁহার সহিত নামায পড়িলাম (প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত)। এমনকি আমরা ধারণা করিলাম, আমরা সাহ্‌রী গ্রহণের সময় পাইব না" (নাসাঈ, কিতাব কিয়ামিল লায়ল, বাব ৪, নং ১৬০৭)।

উপরোক্ত হাদীছসমূহে লক্ষ করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) মোট তিন রাত্রি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে সঙ্গে লইয়া জামা'আতে তারাবীহ নামায পড়িয়াছেন। উক্ত রমযান মাস ত্রিশ দিনের হইলে শেষ দশকের সপ্তম দিন শুরু হয় ২৪ রমযান এবং উনত্রিশ দিনের হইলে ২৩ রমযান। সম্ভবত তিনি ২৩, ২৫ ও ২৭তম রাত্রিতে উক্ত নামায পড়িয়া থাকিবেন। ১ম রাত্রে এক-তৃতীয়াংশ, ২য় রাত্রে অর্ধেক এবং ৩য় রাত্রে প্রায় সমস্ত

রাত্রি তাঁহারা নামায পড়েন। হয়ত এই শেষোক্ত রাত্রিতে তাঁহারা বিশ রাক'আত তারাবীহ আদায় করিয়া থাকিবেন, যাহা আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর হাদীছে উক্ত হইয়াছে। নু'মান (রা)-এর হাদীছে সুনির্দিষ্টভাবে তারিখ উক্ত হইয়াছে। লক্ষণীয় যে, তিনটি হাদীছের বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়মিত তারাবীহ না পড়ার কারণ

রাসূলুল্লাহ (স) মাত্র তিন দিন জামা'আতে তারাবীহ নামায পড়িয়াছেন, যদিও একান্তে বা একাকী নিয়মিতই তিনি রমযানের রাত্রিসমূহে ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করিতেন, যদি ইহা নিয়মিত জামা'আত সহকারে পড়া হয় তবে এক পর্যায়ে তাহা ফরয হইয়া যাইতে পারে। ফলে উম্মতের উপর একটি অতিরিক্ত দুর্বহ বোঝা চাপিতে পারে। তিনি বলেন ঃ

لكنى خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها .

"কিন্তু আমি তাহা তোমাদের জন্য ফরয করিয়া দেওয়া হয় কিনা এই আশঙ্কা করিলাম, তাহা হইলে তোমরা উহা আদায় করিতে অপারগ হইয়া পড়িবে" [আইশা (রা) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছের অংশ]। আইশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) নিয়মিত কোনও আমল করিতে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও কেবল এই আশঙ্কায় উহা ত্যাগ করিয়াছেন যে, উক্ত (ঐচ্ছিক) আমলটি (তাঁহার দেখাদেখি) লোকজনও করিবে। ফলে উহা তাহাদের জন্য ফরয হিসাবে ধার্য করা হইবে"। অপর বর্ণনায় আছে "কিন্তু আমি ভয় পাইতেছি যে, তাহা তোমাদের জন্য ফরয হিসাবে ধার্য হয় কিনা। অতএব তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে কষ্ট স্বীকার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ (পুরস্কার প্রদানে) অবসন্ন হন না, যতক্ষণ না তোমরা অবসন্ন হইয়া পড়" (বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব ৫, নং ১১২৮)।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় জামা'আতে তারাবীহ নামায

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া জামা'আতে তারাবীহ নামায পড়িতেন এবং কোনও কোনও সাহাবী উহা একাকী পড়িতেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারূক (রা) তাঁহার আমলে সর্বপ্রথম সরকারী উদ্যোগে ১৪ হিজরীতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একজন ইমামের পিছনে জামা'আতে তারাবীহ নামায পড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং এই সংক্রান্ত একটি ফরমান রাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রেও প্রেরণ করেন (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ই'তিসাম, ১খ., পৃ. ৩০-এর বরাতে হাদীস ও মাসাইলে আহ্নাফ, পৃ. ৬৬০)।

আবদুর রহমান-ইব্ন আবদুল কারী (র) বলেন, "রমযান মাসের এক রাত্রে আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সহিত মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখা গেল, লোকজন বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কেহ একাকী নামায পড়িতেছিল, আবার কেহ নামায পড়িতেছিল এবং কতক লোক তাহার ইমামতিতে নামায পড়িতেছিল। উমার (রা) বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি মনে করি, আমি যদি ইহাদের সকলকে একজন কারীর (ইমামের) সহিত একত্র করিয়া দেই তবে তাহা কতই না উত্তম হইবে! অতঃপর তিনি তাহাই করিতে সংকল্পবদ্ধ হইলেন এবং সকলকে উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা)-র ইমামতিতে একতাবদ্ধ করিলেন। পরে আর এক রাত্রে আমি তাঁহার সহিত বাহির হইলাম এবং তখন লোকজন তাহাদের কারীর (ইমামের) সহিত নামায পড়িতেছিল। (এই দৃশ্য দেখিয়া) 'উমার (রা) বলিলেন, ইহা কতই না চমৎকার নূতন পন্থা! যাহারা (রাত্রির প্রথম ভাগে) নামাযে দাঁড়ায় তাহাদের তুলনায় যাহারা দাঁড়ায় না (অর্থাৎ রাত্রির শেষভাগে নামায পড়ে) তাহারা অধিক উত্তম" (বুখারী, কিতাব সালাতিত তারাবীহ, বাব ১, নং ২০১০; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুস সালাত ফী রামাদান, বাব মা জাআ ফী কিয়ামি রামাদান, নং ৩)।

আস-সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (র) বলেন, "উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) উবায়্যি ইব্ন কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে যেন লোকজনকে সঙ্গে লইয়া এগার রাক্আত (তারাবীহ) নামায পড়েন। কারী এক শত আয়াত পরিমাণ (প্রতি রাক্আতে) পাঠ করিতেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিবার কারণে লাঠিতে ভর দিতাম। আমরা ভোর হওয়ার সামান্য পূর্বে বাড়িতে ফিরিয়া আসিতাম" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, ঐ, নং ৪)।

তারাবীহ নামাযের রাক্আত সংখ্যা

হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বালী মাযহাবমতে তারাবীহ নামায বিশ রাক্আত। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আমি আমাদের শহর মক্কা মুআজ্জমায় লোকজনকে বিশ রাক্আত তারাবীহ নামায পড়িতে দেখিয়াছি (জামে' আত-তিরমিযী, সাওম, হাদীছ নং ৮০৬-এর অধীন)। হাম্বালী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, উমার (রা) বিচ্ছিন্নভাবে তারাবীহ আদায়কারীদিগকে উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা)-র ইমামতিতে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়াইতেন। হযরত আলী (রা)-ও রমযান মাসে এক ব্যক্তিকে বিশ রাক্আত তারাবীহ পড়াইবার জন্য ইমাম নিয়োগ করেন। সুতরাং বিশ রাক্আতের অনুসরণ করাই উত্তম (ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী, কিতাবুস-সালাত, তারাবীহ-এর রাক্আত সংখ্যা, ১খ., পৃ. ৮৩৫)। ইমাম মালিক (র) বিশ রাক্আতের সহিত আরও ষোল রাক্আত যোগ করিয়া মোট ৩৬ রাক্আত পড়িবার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (আল-মুদাওয়ানা আল-কুবরা, কিয়ামু রামাদান অধ্যায়, ১খ., পৃ. ১৯৩; ফাতহুল বারী, ৩খ., পৃ. ৫৩)।

মালিকী মাযহাবের ছত্রিশ বা একচল্লিশ রাক্আত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, মসজিদুল হারামে প্রতি চার রাক্আত অন্তর মুসল্লীগণ বিশ্রাম গ্রহণের সময় একবার কা'বাঘর তাওয়াফ করিতেন। কিন্তু মসজিদে নববীর মুসল্লীগণের জন্য এই সুযোগ না থাকায় তাহারা তাওয়াফের বিকল্প হিসাবে তারাবীহ্র সহিত অতিরিক্ত ষোল রাক্আত নামায পড়িতেন। ইহাতে বুঝা যায়, তাহাদের তারাবীহ নামাযও ছিল বিশ রাক্আত (তাহাজ্জুদ নামায ও তারাবীহ নামায, পৃ. ৩৬)। আর হানাফী মাযহাবমতে উক্ত নামায যে বিশ রাক্আত তাহা সুপ্রসিদ্ধ। অতএব চারটি প্রধান মাযহাবের মত অনুসারে মূল তারাবীহ নামায বিশ রাক্আত। হাদীছে আছে ঃ

عن ابن عباس قال كان النبى ﷺ يصلى فى شهر رمضان فى غير جماعة بعشرين ركعة والوتر .

"ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, "নবী (স) রমযান মাসে জামাআতবিহীন বিশ রাক্আত ও এক রাক্আত বেতের পড়িতেন" (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, বাব মা রুবিয়া ফী আদাদি রাক্আতিল

কিয়াম ফী শাহ্‌রি রামাদান, ২খ., পৃ. ৪৯৭; ইব্‌ন আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ২খ., পৃ. ৩৯৪; তাবরানী আল-মু'জামুল কাবীর)। বিশ রাক্‌আত সম্বলিত একটি হাদীছ মুওয়াত্তা ইমাম মালিক হইতে ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে।

আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র খিলাফতকালে লোকজন রমযান মাসে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ নামায পড়িতেন। উহাতে তাহারা দাঁড়ান অবস্থায় (প্রতি রাক্‌আতে) দুই শত আয়াত পর্যন্ত পড়িতেন। তাহারা উছমান (রা)-র খিলাফতকালে দীর্ঘ কিয়ামের কষ্টের কারণে তাহাদের লাঠিতে ভর দিতেন" (বায়হাকীর সুনান আল-কুবরা, ২খ., পৃ. ৪৯৬; আরও দ্র. মা'রিফাতুস সুনান)। ইমাম নববী, ইমাম যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী ও ইমাম সুয়ূতী (র) উপরোক্ত হাদীছের সুনান আল-কুবরার সনদসূত্রকে এবং তাজুদ্দীন আস-সুবকী ও মোল্লা আলী আল-কারী মা'রিফাতুস সুনান-এর সনদসূত্রকে সহীহ বলিয়াছেন।

আবুল খাত্তাব (র) বলেন, সুওয়ায়দ ইব্‌ন গাফালা (রা) রমযান মাসে আমাদের ইমামতি করিতেন এবং পাঁচ সালামে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ নামায পড়াইতেন (ইব্‌ন আবূ শায়বা, আল-মুসান্নাফ, ২খ., পৃ. ৩৯৯)। হযরত আলী (রা)-র সহচর শুতায়র ইব্‌ন শাকল (র) রমযান মাসে লোকজনের ইমামতি করিতেন এবং বিশ রাক্‌আত তারাবীহ ও তিন রাক্‌আত বেতের পড়াইতেন (ঐ, পৃ. ২৯২-৩)। আবূ আবদির রহমান আস-সুলামী (র) বলেন, হযরত আলী (রা) রমযান মাসে কারীগণকে ডাকিয়া আনেন এবং তাহাদের একজনকে লোকজনকে সঙ্গে লইয়া বিশ রাক্‌আত নামায পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)।

নাফে' ইব্‌ন উমার (র) বলেন, ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র) রমযান মাসে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিশ রাক্‌আত নামায পড়িতেন (ঐ, পৃ. ৩৯৩)। উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব (রা) মদীনায় লোকজনকে সঙ্গে লইয়া বিশ রাক্‌আত নামায পড়িতেন এবং বেতের পড়িতেন তিন রাক্‌আত (ঐ)। আল-হারিছ (র)-ও একই নিয়মে নামায পড়িতেন (ঐ), আবুল বাখতারী (র)-ও তাহাই করিতেন (ঐ)। আতা' (র) বলেন, আমি লোকজনকে বেতেরসহ তেইশ রাক্‌আত তারাবীহ আদায়রত পাইয়াছি (ঐ; উপরোক্ত পৃষ্ঠায় আরও হাদীছ দ্র.)।

১৪ হি. সালে উমার (রা)-র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ তিনটি মসজিদের দুইটিতে, যথা মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে বিশ রাক্‌আত তারাবীহ-এর জামা'আত অদ্যাবধি অব্যাহত রহিয়াছে। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, বিশ রাক্‌আত সংক্রান্ত মতই অধিক শক্তিশালী ও স্থান-কালের ব্যাপ্তিতে ব্যাপকভাবে গৃহীত।

তাহাজ্জুদ নামায ও তারাবীহ নামায

তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ দুইটি স্বতন্ত্র নামায। মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) তারাবীহ নামায পড়িতেন মধ্যরাত্রি অতিবাহিত হইবার পর হইতে সুবহে সাদিক (দ্র. শাফাক)-এর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। তাহাজ্জুদ সালাত (দ্র.) সংশ্লিষ্ট হাদীছসমূহে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহারা তারাবীহ নামায পড়িতেন ইশার ফরয ও সুন্নাত নামায আদায়ের পর হইতে সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। তবে রমযান মাসে তাঁহাদের তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ নামাযের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এই মাসে উভয় নামায একাকার হইয়া যাইত।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাত্রিকালীন নফল নামাযের রাক্‌আত সংখ্যা

একদল লোকের মতে রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসেও আট রাক্‌আতের অতিরিক্ত নফল নামায পড়েন নাই। তাই তাহারাও রমযান মাসে আট রাক্‌আতই পড়িয়া থাকেন। একটি হাদীছে উক্ত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে এবং রমযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে রাত্রিবেলা আট রাক্‌আতের অতিরিক্ত নফল নামায পড়েন নাই। আবূ সালামা ইব্‌ন আবদির রহমান (র) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায কিরূপ বা কেমন ছিল? তিনি বলিলেন ঃ

ما كان رسول الله ﷺ يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة .

"রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাসে এবং ইহা ব্যতীত অন্য সময়ে এগার রাক্‌আতের অধিক বাড়াইতেন না..." (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ১৬, নং ১১৪৭; তারাবীহ, বাব ১, নং ২০১৩; মানাকিব, বাব ২৪, নং ৩৫৬৯; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, বাব ১৭, নং ১৭২৩/১২৫; আবূ দাউদ, কিতাবুত-তাতাব্বু', বাব ২৬, নং ১৩৪১; তিরমিযী, সালাত, বাব ২০৮, নং ৪২৯; নাসাঈ, কিয়ামিল লায়ল, বাব ৩৬, নং ১৬৯৮; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সালাতিল লায়ল, বাব ২, নং ৯; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৬খ., পৃ. ৩৬, নং ২৪৫৭৪; আরও দ্র. নং ২৪৯৫০ ও ২৫২৩৯)।

হাদীছখানি সনদগত বিবেচনায় সহীহ হইলেও ইহার বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত অনেকগুলি সহীহ হাদীছ বিদ্যমান আছে। স্বয়ং আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) বিভিন্ন অবস্থায় রাত্রিবেলা আট-এর অধিক বা কম সংখ্যক রাক্‌আত নামায পড়িয়াছেন। মাসরূক (র) বলেন, "আমি আইশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাত্রিকালীন নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, সাত, নয় ও এগার (রাক্‌আত), ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) ব্যতীত" (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ১০, নং ১১৩৯)।

আইশা (রা) আরও বলেন, "রাত্রিবেলা রাসূলুল্লাহ (স) তের রাক্‌আত নামায পড়িতেন, অতঃপর যখন ফজরের আযান শুনিতেন তখন সংক্ষেপে দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামায পড়িতেন" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সালাতুল লায়ল, বাব সালাতিন নাবিয়্যি (স) ফিল বিত্‌র, নং ১০; ইব্‌ন মাজা, ইকামাতিস সালাত, বাব ১৮১, নং ১৩৫৯)। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ "নবী (স) রাত্রিবেলা তের রাক্‌আত নামায পড়িতেন, বেতের ও ফজরের দুই রাক্‌আত (সুন্নাত) নামাযও উহার অন্তর্ভুক্ত" (তাহাজ্জুদ, বাব ১৬, নং ১১৪০)।

মুওয়াত্তা ও ইব্‌ন মাজার বর্ণনা মোতাবেক বেতের তিন রাক্‌আত হইলে তাহাজ্জুদ দশ রাক্‌আত, আর এক রাক্‌আত হইলে তাহাজ্জুদ বার রাক্‌আত। বুখারীর বর্ণনা মোতাবেক বেতের এক রাক্‌আত হইলে তাহাজ্জুদ দশ রাক্‌আত, তিন রাক্‌আত হইলে তাহাজ্জুদ আট রাক্‌আত এবং বেতেরের পরে বসা অবস্থায় আদায়কৃত দুই রাক্‌আত অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহাজ্জুদ হয় ছয় রাক্‌আত। আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত আট

রাক্আত তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত হাদীছে এক সালামে চারি রাক্আত করিয়া আদায় করার কথা উল্লেখ আছে। অথচ সেই বুখারীতেই ইব্ন উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে যে, নবী (স) তাহাজ্জুদ নামায এক সালামে দুই রাক্আত করিয়া পড়িতেন এবং বেতের পড়িতেন এক রাক্আত (কিতাবুত তাহাজ্জুদ, বাব ২, নং ৯৯৫; আরও দ্র. নং ৪৭২, ৯৯০, ৯৯৩ ও ১১৩৭)।

অতএব রাসূলুল্লাহ (স) "রমযান মাসে ও অন্যান্য মাসে রাত্রিবেলা আট রাক্আতের অতিরিক্ত তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন না" এই বক্তব্য অকাট্য নয়। অনন্তর আইশা (রা) বলেন, "ঘুমের প্রাবল্য অথবা অসুস্থতার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) রাত্রিবেলা (তাহাজ্জুদ) নামায না পড়িলে দিবাভাগে বার রাক্আত নামায পড়িতেন" (নাসাঈ, সালাতুল লায়ল, বাব ৬৪, নং ১৭৯০)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, "এক রাত্রে তিনি তাঁহার খালা উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)-র নিকট ঘুমাইলেন। আমি বিছানায় আড়াআড়িভাবে শয়ন করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ ও তাঁহার স্ত্রী লম্বালম্বি শয়ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিদ্রামগ্ন থাকিলেন। শেষে যখন অর্ধ-রাত্রি অথবা উহার কিছু কম-বেশী অতিবাহিত হইল তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে ঘুমের রেশ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলেন। অতঃপর তিনি সূরা আল ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করিলেন। ইহার পর পানির মশকের নিকট গিয়া উহার পানি দ্বারা উযূ করিলেন, অতঃপর দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে লাগিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তখন আমিও উঠিলাম এবং তিনি যাহা যাহা করিলেন, আমিও তাহাই করিলাম, অতঃপর তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আমার মস্তকের উপর স্থাপন করিলেন এবং আমার কান ধরিয়া টানিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়িলেন দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্আত, পুনরায় দুই রাক্আত, পুনরায় দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্আত, আবার দুই রাক্আত, ইহার পর বেতের পড়িলেন, অতঃপর বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার নিকট মুআযযিন আসিলে তিনি উঠিয়া সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়িলেন, অতঃপর বাহির হইয়া (মসজিদে গিয়া) ফজরের নামায পড়িলেন" (সহীহ বুখারী, আবওয়াবুল বিত্র, বাব ১, নং ৯৯২; মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, বাব ২৬, নং ১৭৯৪/১৮৭; আবূ দাউদ, সালাত, বাব ২৬, নং ১৩৬৭; ইব্ন মাজা, ইকামাতুস সালাত, বাব ১৮১, নং ১৩৬৩; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সালাতিল লায়ল, নং ১১)।

যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, "আমি মনস্থ করিলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাত্রিবেলার (তাহাজ্জুদ) নামায অবশ্যই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব। অতএব আমার মস্তক তাঁহার ঘরের চৌকাঠ অথবা তাঁবুর দরজায় স্থাপন করিয়া শুইয়া থাকিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) সংক্ষেপে দুই রাক্আত নামায পড়িলেন, পরে দুই রাক্আত পড়িলেন—দীর্ঘ, দীর্ঘ, দীর্ঘ, ইহার পর পড়িলেন দুই রাক্আত, ইহা ছিল পূর্বের দুই রাক্আতের তুলনায় কম দীর্ঘ। আবার পড়িলেন দুই রাক্আত, ইহা ছিল পূর্বের দুই রাক্আতের তুলনায় স্বল্প দীর্ঘ, পুনরায় পড়িলেন দুই রাক্আত, তাহা ছিল পূর্বের দুই রাক্আতের তুলনায় সংক্ষিপ্ত, আবারও পড়িলেন পূর্বের তুলনায় কম দীর্ঘ দুই রাক্আত, অতঃপর বেতের পড়িলেন। এই হইল মোট তের রাক্আত" (মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরী, বাব ২৪, নং ১৮০৪/১৯৫; আবূ দাউদ, সালাত, বাব ২৬, নং ১৩৬৬; ইব্ন মাজা, ইকামাতিস সালাত, বাব ১৮, নং ১৩৬২; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বিত্র, নং ১২)।

উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ে স্পষ্টভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) উক্ত দুই রাত্রে বার রাক্আত তাহাজ্জুদ নামায পড়িয়াছেন। অতএব প্রতি রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাহাজ্জুদ নামায আট রাক্আতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উপরোক্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, রমযান মাসের তারাবীহ নামাযকে আট রাক্আতে সীমাবদ্ধ করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রসিদ্ধ চারটি সুন্নী মাযহাবের ইহাই অভিমত।

শী'আ মতাবলম্বীগণ তারাবীহ নামাযকে শরীআত অনুমোদিত মনে করে না। তাহারা এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সংশ্লিষ্ট সুন্নাতে মুআক্কাদা সালাতসমূহকেও স্বীকার করে না। শী'আ সমাজে বসবাসকারী সুন্নীদেরকে তাহারা তারাবীহ নামায পড়িতে নিরুৎসাহিত করিয়া থাকে, ক্ষেত্রবিশেষে বাধা প্রদান করে। মিসরে শী'আ মতাবলম্বী ফাতিমী শাসনামলে সরকারীভাবে সুন্নীদের জন্য তারাবীহ নামায নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া গোলযোগও সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য ঐ গোষ্ঠীর কোনও কোনও শাসকের আমলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা শিথিলও করা হইয়াছে (দ্র. শিরো. ফাতিমী, ই.বি., ১৪শ খণ্ড)। বর্তমান ইরানে সুন্নীদের প্রতি শী'আ শাসক গোষ্ঠীর আচরণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা সম্ভব হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সিহাহ সিত্তার হাদীছসমূহের ক্রমিক নম্বর সৌদী আরব হইতে প্রকাশিত আল-মাওসূআতুল হাদীছিশ-শারীফ, আল-কুতুবুস সিত্তাহ, ৩য় সং, রিয়াদ ১৪২১ হি./২০০০ খৃ. হইতে গৃহীত; (২) অন্যান্য কিতাবের পূর্ণাঙ্গ বরাত প্রবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে; (৩) মুহাম্মদ মূসা, তাহাজ্জুদ নামায ও তারাবীহ নামায, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা ১৪২৭/২০০৬; (৪) লেখকমণ্ডলী, হাদীস ও মাসাইলে আহ্নাফ, গবেষণা বিভাগ, ই.ফা.বা., প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৪২৭ হি./২০০৬ খৃ.।

মুহাম্মদ মূসা

তারাবুলুস (طرابلس) ঃ বা আতরাবুলুস, সিরিয়ার বিখ্যাত ত্রিপোলী শহরের আরবী নাম, গ্রীকদের দেয়া নাম Tripolis, ভূমধ্যসাগরের উপকূলের নিকটে জুবায়ল-এর উত্তরে অবস্থিত, ইহা একটি পাহাড়ের অংশত উপরে এবং অংশত পার্শ্বে অবস্থিত, পাহাড়টি অবস্থিত একটি গভীর গিরিখাতের শেষ প্রান্তে। সেই খাতটির মধ্য দিয়া একটি নদী প্রবাহিত হইয়াছে, নাম নাহ্র কাদীশা (আরবী নাম আবূ 'আলী)। ইহার পশ্চিমে একটি অত্যন্ত উর্বর সমভূমি বিস্তৃত। উহা বনভূমিতে পূর্ণ। উহা শেষ হইয়াছে একটি উপদ্বীপে যাহাতে অবস্থিত আল-মীনা বন্দর। পোতাশ্রয়টি সামনের কয়েকটি শিলাময় ছোট ছোট দ্বীপ দ্বারা এবং একটি প্রাচীন দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ দ্বারা সুরক্ষিত। শহরটির যেই সুপ্রাচীন ফিনিশীয় নামের প্রথম উল্লেখ হইয়াছিল পারস্য যুগের সেই নামটি জানা যায় না। ইহার গ্রীক নাম হইয়াছিল তিনটি বিভক্ত অংশে, তথা Tyrian, Sidonian ও Aradian হইতে, প্রতিটি অংশ দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত ছিল। প্রাচীন শহর বর্তমান বন্দর এলাকাতে অবস্থিত ছিল। অবস্থানগত কারণেই শহরটি সুরক্ষিত ছিল, তদুপরি প্রতিটি অংশের স্বতন্ত্র রক্ষা ব্যবস্থাও ছিল, বহিঃশক্তির পথে ইহা দখল

করা ছিল খুবই কঠিন। কিন্তু স্থলভাগের দিক হইতে বাহিরের দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার এবং পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হইবারও ভয় সর্বক্ষণ ছিল। ইহা প্রমাণিত হয় যখন হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে আমীর মু'আবিয়া (র) এই স্থানে সুফ্য়ান ইব্ন মুজীব আযাদী-র নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন যিনি শহরটিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে একটি কিল্লা নির্মাণ করেন। অধিবাসিগণের দুরবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়া পৌছায় যে, তাহারা বায়যানটীয় সম্রাটের নিকট আবেদন জানায়, তিনি যেন তাহাদের সাহায্যার্থে অতি দ্রুত জাহাজ প্রেরণ করেন। সম্রাট জাহাজ পাঠাইলে ত্রিপোলীর লোকেরা রাত্রের অন্ধকারে জাহাজে চড়িয়া পলাইয়া যায়। শূন্য শহরে আবার জনবসতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মু'আবিয়া (রা) সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক য়াহূদীকে (বালাযূরী, কিন্তু য়া'কূবীর মতে অনেক পারস্যবাসীকে) সেই স্থানে বসত করান। বলা হইয়া থাকে যে, মু'আবিয়া (রা) প্রতি বৎসর সেইখানে একজন 'আমিল-এর অধীনে কিছু সৈন্য পাঠাইতেন, যখন নৌচলাচল বন্ধ হইয়া যাইত তখন একজন 'আমিল এবং স্বল্প সংখ্যক সৈন্য থাকিত, বাদবাকীরা ফিরিয়া আসিত। ভূগোলবিদ য়া'কূবী (২৭৮/৮৯১) লিখিয়াছেন যে, এই চমৎকার পোতাশ্রয়টিতে এক হাজার জাহাজের স্থান হইত। পঞ্চাশ বৎসর পরে ইসতাখরী তারাবুলুসকে দামিশক-এর পোতাশ্রয়রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জিলাটির অত্যন্ত উর্বরতার কথা, এইখানকার খেজুর বাগান ও ইক্ষুক্ষেতের কথা এবং অধিবাসিগণের উন্নত জীবন মানের সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। নাসির-ই খুস্রাও (৪৩৮/১০৪৭) ফাতিমীগণের অধীনস্থ এই শহরটির চমৎকার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সমগ্র গ্রাম অঞ্চল জুড়িয়া ছিল ফসলের মাঠ ও বাগিচা, সেইখানে ইক্ষু, কমলা, মৌসাম্বি ইত্যাদি লেবু জাতীয় ফল, কলা, খেজুর ফলিত; শহরটি তিনদিকে সাগর দ্বারা এবং স্থলের দিকে একটি দেওয়াল ও পরিখা দ্বারা রক্ষিত ছিল, মাঝখানে ছিল একটি অতি সুন্দর মসজিদ। শহরের ২০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশ ছিল শী'আ। ইহার এলাকায় অনেকগুলি গ্রাম ছিল। সুলতানের নগর রক্ষীবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ হইত বন্দরে সমাগত জাহাজের উপরে ধার্য কর (toll) হইতে, আর সুলতানের নিজের জাহাজসমূহও এই বন্দর হইতে বিভিন্ন ভূমধ্যসাগরীয় বন্দরে যাতায়াত করিত।

ক্রুসেডের যুদ্ধের সময়ে দখলকারী খৃস্টানগণ এইখানে একটি কাউন্টি (County) সৃষ্টি করিয়া Raymond of Toulouse-কে তাহা অর্পণ করে, কিন্তু খোদ রাজধানীটি তখনও পর্যন্ত মুসলিমদের অধিকার মুক্ত করা হয় নাই। Reymond ৪৯৩/১১০১ সনে অবরোধ শুরু করেন এবং শহরটিকে কার্যকরভাবে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশে কাদীশা গিরিখাতের (ravine) উপরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের উপরে দুর্গ নির্মাণ করেন। উহার নাম ছিল Mons Peregrinus (আরবী নাম সান্‌জীল, St. Giles)। এই দুর্গের পাদদেশে কালক্রমে একটি ছোট শহর গড়িয়া উঠে। ৪৯৯/১১০৫ সনে নিরাশ হৃদয়ে এই দুর্গেই Raymond মারা যান এবং ১২ জুলাই, ৫০৩/১১০৯০০-এর পূর্বে শহরটি আত্মসমর্পণ করে নাই। ইদরীসী খৃ. ১১৫৪ সনে লিখিয়াছেন "দুর্গটি নির্মাণ করিয়াছিলেন (Frank) ইব্ন সিনজীল।" তিনি তারাবুলুসের অন্তর্গত শহর ও গ্রামগুলির নাম এবং পোতাশ্রয়ের অদূরে অবস্থিত শিলাময় ছোট ছোট দ্বীপেরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১১৭০ খৃ. শহরটি এক মারাত্মক ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১১৮৭ খৃ. জেরুসালেম মুসলিমগণের অধিকারভুক্ত হইবার পরেও এক শতাব্দীকাল যাবৎ তারাবুলুসে একটি গুরুত্বপূর্ণ খৃস্টান ঘাঁটি থাকে; অবশেষে ৬৮৮/১২৮৯ সনে মাম্‌লূক সুলতান আল-মানসূর কালাউন-এর আক্রমণে ২৬ এপ্রিল তারিখে শহরটি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর শহরটির ভাগ্যে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটিল। অতীত ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সুলতান পূর্বতন শহরটি ধ্বংস করিয়া হাজ্জী পাহাড়ে এক নূতন ত্রিপোলিস শহর গড়িয়া তোলেন এবং পুনরায় তারাবুলুস একটি অখ্যাত ক্ষুদ্র পোতাশ্রয়ে পরিণত হয়। উহার নাম হয় আলমীনা। দিমাশ্‌কী আনু. খৃ. ১৩০০ সনের দিকে ইহার বর্ণনায় শহরে প্রচুর পানি সরবরাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তদুপরি সকল দিকেই নলযোগে প্রবহমান পানি সরবরাহের জন্য নির্মিত হইয়াছিল ২০০ ইল (ell=45 English) দীর্ঘ, ৭০ ইল উঁচু একটি আধার এবং বাগ-বাগিচাতে সুমিষ্ট ফল ছিল প্রচুর। তিনি তারাবুলুসের অন্তর্গত বিভিন্ন মহল্লার নামও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা বোত্‌রায়স, বুকায়'আ ও নুসায়রিয়া পাহাড়শ্রেণী। সালাহুদ্দীন আয়্যূবীর সাম্রাজ্য তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে যে রাজ্যগুলি মামলুকাতে বিভক্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি ছিল তারাবুলুস রাজ্য, কিন্তু সেই বিভাগকে স্বল্পকাল পরেই পরিবর্তিত করিয়া পাঁচটি প্রদেশে ভাগ করা হয়, তখন তারাবুলুসকে দামিশ্‌কের অংশে উহার বন্দররূপে দেওয়া হয়। বর্তমানে এই শহরটি তুলনামূলকভাবে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। কারণ চতুর্দিকে রহিয়াছে উর্বর এলাকা, বন্দরে জাহাজ চলাচল নগণ্য নহে, তদুপরি রহিয়াছে রেশম শিল্প। অমুসলিম অধিবাসিগণের মধ্যে orthodox গ্রীকগণ সংখ্যাগুরু। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা বরাবর অনেকগুলি বুরূজ (tower)-শ্রেণী শহরটির অতীত যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দেয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Pietschmann, Geschichte der phonizier, ১৮৮৯ খৃ, পৃ. ৪১ প; (২) বালাযুরী, সম্পা. de Goeje, পৃ. ১২৭; (৩) H. Probst, Die Geographischen Verhal tnisse Syriens und palastinas nach Wilhelm v. Tyrus, ১৯২৭, ১খ, পৃ. ২৮ প.; (৪) Rohricht, Geschichte des Konigreiches Jerusalem, পৃ. ৩৩ প., ৪৬, ৫৪, ৫৮, ৮১, ১০০০, ১০০২; (৫) ইবনু'ল-আছীর, সম্পা. Tornberg, ১০খ, পৃ. ২৮৪ প., ৩৩৪; (৬) B.G.A. সম্পা. de Goeje, ৭খ, পৃ. ৯৭, ৩২৭, ১খ, পৃ. ৬১, ৬৬প., ৩খ, পৃ.১৬০; (৭) নাসির-ই খুসরাও, অনু. G. Le Strange, Palest. Pilgrims Texts, ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ৬; (৮) ইদরীসী, Z.D.P. V-তে প্রকাশিত নিবন্ধ, ৮খ, পৃ. ১৩৫ প. (মূল আরবী পাঠ, পৃ. ১৭); (৯) দিমাশকী, Cosmographie, সম্পা. Mehren, পৃ. ২০৭, ২৫৩; (১০) R. Hartmann, Die geographischen Nachrichten uber Palastina und Syrien in Halil az-Zahiris Zubdat Kasf al-Mamalik, পৃ. ৫৭ প., ৮৯; (১১) Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ৩৪৮ প.।

Fr. Buhl (E.I. [1])/ হুমায়ুন খান

তারায (طراز) ঃ মধ্য এশিয়ার একটি নদী এবং ইহার তীরে অবস্থিত নগর তালাসের আরবী নাম, সম্ভবত আধুনিক আওলিয়া আতা (দ্র.)-এর নিকটে। শহরটি প্রাক-ইসলামী, সম্ভবত সোগদীয় উৎসের বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। তারায ও বালাসাগুন (দ্র.)-এ ৫ম/১১শ শতাব্দীর মত পরবর্তীকালে সোগদীয় ও তুর্কী ভাষা ব্যবহৃত হইত (মাহমূদ কাশগারী, দীওয়ান লুগাতিত-তুরক, ১খ, ৩১)। ৫৬৮ সালে গ্রীক যেমার খোসের দৌত্যকার্যের বিবরণে (Fragm. Hist. Greac.

৪খ, ২২৮) সর্বপ্রথম শহর হিসাবে (খোরোন) তালাসের নাম উল্লিখিত হয়। আনুমানিক ৬৩০ খৃ. তালাস (Chin. Ta-lo-sse), Hiuen-Thsang কর্তৃক একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর হিসাবে বর্ণিত হয় (Memoires sur les contrees occidentales, Stan Julien কর্তৃক অনূদিত, প্যারিস ১৮৫৭ খৃ., ১খ, ১৪ ঃ les marchands des differents Pay sy habitent Pelemele)। মুহার্‌রাম ২৮০ (মার্চ-এপ্রিল ৮৯৩) সালে সামানী ইসমা'ঈল ইব্‌ন আহমাদ (দ্র.)-এর অভিযানের কালে প্রথম সেখানে ইসলাম প্রবর্তিত হয়; আমীর ও দিহকানগণকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়; প্রধান গির্জাটিকে (Kilisa-i buzurg) একটি মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় (নারশাখী, সম্পা. Schefer, পৃ. ৮৪)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইসলামের আগেই তারাযে খৃস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাবারী, ৩খ, ২১৩৮-তে প্রদত্ত এই অভিযানের বিবরণে শহরটির নাম দেওয়া হয় নাই; ইসমা'ঈল 'তুর্কীদের রাজার" শহরটি অধিকার করে। ইবনু'ল-আছীর, সম্পা. Tornberg, ৮খ, ৯৭, ৩১০ (৯২২-২৩) সালের বিবরণে তারায অঞ্চলের একজন দিহকান সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সামানীদের অধীনে ইসলামী রাজ্য এবং তুর্কী অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত তারায একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল (B. G. A., ২খ, ৩৯১, ৯)। ইলেকখানদের অধীনে তারাযে প্রথম মুদ্রা অংকিত (Minted) হয়। মোঙ্গল যুগে তারাযের পাশাপাশি য়াংগী (yangi) নামটি আল-'উমারী (N. E., xiii. 234)-তে প্রথম দৃষ্ট হয়। সেখানে য়াংগী, তারায বা তালাস হইতে পৃথক শহর হিসাবে দৃষ্ট হয়। তীমূর ও তাঁহার অব্যবহিত উত্তরাধিকারীদের অধীনে (জাফারনামা, ভারতীয় সংস্করণ, ১খ, ২২৯, যেইখানে ইহা ভুলক্রমে নাবকী বলা হইয়াছে; ২খ, ৬৩৩, যেইখানে তারাযকে ভুলক্রমে অক্ষিকাণ্ড এবং কাশগড়ের মধ্যে স্থাপন করা হইয়াছে) হাফিজ-ই আবরূ, দ্র. Cod. Bodl, Elliot, No. ৪২২ প., ১৫৫ খ; 'আবদু'র-রাযযাক সামারকান্দী, Cod, Univ, Petrop., No. ১৫৭, পৃ. ১৯০ ক), য়াংগী বারংবার এবং কখনও কখনও য়াংগী তারায যুক্তভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় (so মীরখাওয়ান্দ, in Barthold, Ulugbeg i ego vremya, St. Petersburg ১৯১৮, খৃ., মূল পাঠ, পৃ. ৮)। হায়দার মীরযা (দ্র.)-এর মতে তারাযের মোঙ্গল নাম য়াংগী। মা ওয়ারা'উ'ন-নাহরে কিছু লোক ছিল যাহারা মূলত য়াংগী হইতে আগত এবং "য়াংগীলিগ' নামে অভিহিত হইত। য়াংগী নামে সেইখানে কোন শহর ছিল না। একই অঞ্চলে বহু সংখ্যক ধ্বংসাবশেষ ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোন্ ধ্বংসস্তূপটি য়াংগী (বা তারায)-এর তাহা নিশ্চিত বলা সম্ভবপর ছিল না (তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. E.D. Ross, পৃ. ৩৬৪)। বর্তমানে তারায শহরের কোন চিহ্ন জানা নাই।

W. Barthold (E.I. [1])/ মুহ. আবু তাহের

আত-তারাসূসী (الطرسوسى) ঃ প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ। মূল নাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন য়াযীদ; কুন্‌য়া আবূ বাক্‌র। তিনি বানূ তামীম গোত্রের লোক। তারাসূস (শামের অন্তর্গত আন্‌তাকিয়া ও হালাব-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত)-এর বাসিন্দা ছিলেন বলিয়া আত-তারাসূসী আখ্যায় পরিচিত। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের একজন হাফিজ ও উচ্চ স্তরের মুহাদ্দিছ ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণের জন্য ইস্‌পাহান, খুরাসান, বাল্‌খ, হিম্‌স, নীশাপূর, মারব্‌, মক্কা, মদীনা প্রভৃতি স্থানে সফর করিয়াছেন এবং দিমাশ্‌কে সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান (র), সাফ্‌ওয়ান ইব্‌ন সালিহ (র), কূফায় আবূ নু'আয়ম (র), বসরায় সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র), মদীনায় 'ঈসা ইব্‌ন কালূন আল-মুক্‌রি (র)-সহ নানা স্থানের নানা মুহাদ্দিছ হইতে হাদীছ আহরণ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবূ বাক্‌র ইব্‌ন খুযায়মা (র), আবূ 'আওয়ানা আল-ইস্‌ফারাঈনী (র), আবুল-'আব্বাস আদ-দাগূনী (র), মাক্কী ইব্‌ন 'আবদান (র), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌নি'স সাবাহ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-মাহ্‌বূবী উল্লেখযোগ্য। হি. ২৫০ সালের পর তিনি নীশাপুরে গমন করেন এবং সেইখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। এই সময় তথাকার মুহাদ্দিছগণ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তিনি মার্‌ব-এ যান [হি. ২৬০] এবং সেইখানেও কিছুকাল অবস্থান করেন। মার্‌ববাসী মুহাদ্দিছগণই তাঁহার সূত্রে অধিক পরিমাণে হাদীছ রিওয়ায়াত করেন। হাদীছ বিশারদদের দৃষ্টিতে হাফিজ আত-তারাসূসী (র) একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন। আল-হাকিম বলেন, হাদীছ সন্ধানের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশ ভ্রমণে, হাদীছের উপলব্ধি ও সংরক্ষণে এবং বর্ণনাধিক্য ও নির্ভরযোগ্যতায় আত-তারাসূসী একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ। তিনি হি. ২৭৬ সালে বাল্‌খে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স নব্বইয়ের ঊর্ধ্বে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামু'ল-বুলদান, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৪খ, ২৯; (২) আয-যাহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, বৈরূত ১৩৭৪/১৯৫৪, ২খ, ৬০১, ২০০২।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তারি (تری) ঃ একটি স্বর্ণমুদ্রা, দীনারের এক-চতুর্থাংশ। ফাতিমীগণ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে সিসিলী অধিকার করিয়া সেইখানে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিকি দীনার (রুবা') মুদ্রণ করে। এই মূল্যমানের মুদ্রা ছিল মুসলিমদের মুদ্রার ক্ষেত্রে নূতন একটি সংযোজন এবং ফাতিমীগণ সিরিয়াতেও ইহার প্রবর্তন করে। এই ঘটনায় বুঝা যায় যে, ইহা বায়যানটীয় Tremissis--এর স্থানান্তর হওয়ার জন্য প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই মূল্যমানের মুদ্রার প্রচলন নরম্যান ডিউকগণ, যাহারা ফাতিমীদের পরে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, অব্যাহত রাখে। একটি ইটালীয় মুদ্রা হিসাবে তারি ইতিহাসের জন্য, যাহার এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নয়, দ্র. নিবন্ধ tareno, E. Mastinori, La Moneta, vocabolario Generale, Rom 1915. শব্দটির কোন সন্তোষজনক উৎপত্তিমূলক ব্যাখ্যা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সচরাচরভাবে ইহা দিরহামের সহিত সংযুক্ত।

J. Ajlan (E.I. [1])/ মুহঃ আবু তাহের

আত-তারিক (الطارق) ঃ সূরা, আভিধানিক অর্থ করাঘাতকারী, রাত্রিকালে আগমনকারী মেহমান; রাতের মুসাফির (তু. তাফ্‌সীরুল-মারাগী, ৩০খ, ১০৯; আল-কাশ্‌শাফ, ৪খ, ৭৩৪; লিসানুল-'আরাব, ধাতু طرق, আল-কুরআনু'ল-কারীমের একটি সূরার নাম। ক্রমিক নং ৮৬, আয়াত সতেরটি। সর্বসম্মতিক্রমে সূরাটি মাক্কী। খালিদ আল-'আদ্‌ওয়ানী (রা) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একবার রাসূলুল্লাহ (স)-কে ছাকীফের বাজারে দেখিয়াছিলাম। তিনি তখন আবূ ছাকীফের সহায়তা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। তিনি ধনুক বা যষ্ঠিতে ভর করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। আমি তাঁহাকে সূরাতু'ত-তারিক তিলাওয়াত করিতে শুনিয়াছিলাম। তিনি যখন সূরাটি সমাপ্ত করেন তখন তাহা আমার মুখস্থ হইয়া যায়। উহা ঐ সূরা যাহা আমি জাহিলিয়াতের যুগে মুখস্থ করিয়া লইয়াছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর সূরাটি আমি পুনরায় পাঠ করিয়া লই। অতঃপর বানূ ছাকীফ

আমাকে ডাকিয়া লয় এবং জিজ্ঞাসা করে, তুমি ঐ ব্যক্তির নিকট কী শ্রবণ করিয়াছ? আমি সূরাটি পাঠ করিয়া তাহাদিগকে শুনাইলাম। বানূ ছাকীফের সঙ্গে কুরায়শদের যেই সকল লোক উপস্থিত ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, এই লোকটি আমাদেরই জ্ঞাতি। যদি আমাদের জানা থাকিত যে, সে সত্য কথা বলে তাহা হইলে আমরাও তাহার অনুসরণ করিতাম (ফাত্হ'ল-বায়ান, ১০খ, ৩০৩)। আস্বাবু'ন-নুযূল (পৃ. ২৫৩) প্রণেতার বর্ণনানুসারে একদিন আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। হঠাৎ একটি নক্ষত্র স্খলিত হয়, যাহা দ্বারা গোটা এলাকা আলোকিত হইয়া উঠে। আবূ তালিব হতচকিত হইয়া যান। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ইহা একটি নক্ষত্র, যাহাকে স্খলিত করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর একটি। শুনিয়া আবূ তালিব বিস্ময় প্রকাশ করেন। তখন এই সূরাটি নাযিল হয় [আছ-ছা'লাবী, আল-ওয়াকিদী ও আয-যামাখ্শারী এই রিওয়ায়াতটি সনদবিহীন উদ্ধৃত করিয়াছেন]।

মুফাস্সিরগণ পূর্ববর্তী সূরার সহিত ইহার যোগসূত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী সূরা (আল-বুরূজ) যেমন আসমানের শপথ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে তেমনিভাবে এই সূরার সূচনাও উহা দ্বারাই হইয়াছে। পূর্বের সূরায় ঐ সকল কাফিরদের অবস্থা তুলিরা ধরা হইয়াছে, যাহারা আল-কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করে। এইবারে এই সূরায় আল-কুরআনের গুণাবলী উল্লেখ করিয়া (যে, ইহা মীমাংসাকারী বাণী এবং ইহা নিরর্থক নহে) ঐসব প্রত্যাখ্যানকারীদের উক্তি খণ্ডন করা হইতেছে (রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ, ৯৪; তাফ্সীরু'ল-মারাগী, ৩০খ, ১০৯)। সূরাতু'ত-তারিকে সর্বপ্রথম বলা হইয়াছে যে, সকল মানুষের কাজকর্মের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রহিয়াছে। অতঃপর এই কথা প্রমাণাকারে তুলিয়া ধরা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেমন তুচ্ছ শুক্র বিন্দু হইতে মানব সৃজনে সক্ষম তেমনিভাবে তাহাকে হাশ্রের দিন পুনরুত্থানেও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। ইহাতে জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে আল-কুরআন যে সত্য কিতাব এবং মুহাম্মাদ (স) যে সত্য নবী তাহা প্রমাণ করা হইয়াছে। সর্বশেষে রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, আপনি ঐ সময়ের অপেক্ষা করুন যখন ঐ সকল কাফির ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি আল্লাহর 'আযাব নাযিল হইবে (পূ. গ্র.)। রাসূলুল্লাহ (স) একবার মু'আয (রা)-কে সালাতু'ল-মাগ্রিবে সূরাতু'শ-শাম্স ও সূরাতু'ত-তারিক পাঠের নির্দেশ দিয়াছিলেন (তাফ্সীর আবি'ল-ফিদা', ৪খ, ৪৯৭)। অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি সূরাতু'ত-তারিক তিলাওয়াত করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে পরিমিত পুণ্য দান করিবেন (আল-কাশ্শাফ, ৪খ, ৭৩৭; তাফ্সীরু'ল-বায়দাবী, ২খ, ৩৯৭)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আস-সুয়ূতী আল-ইত্কান, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২) আবু'ল-হাসান 'আলী আন-নীসাবুরী, আসবাবু'ন-নুযূল, কায়রো ১৯৬৮ খৃ.; (৩) সিদ্দীক হাসান খান, ফাত্হ'ল-বায়ান; (৪) আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী; (৫) আয-যামাখ্শারী, আল-কাশ্শাফ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৬) আল-মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৭) আল-বায়দাবী, তাফসীরুল-বায়দাবী; (৮) আবু'ল-ফিদা' আদ-দিমাশ্কী, তাফ্সীরু'ল-কুরআনি'ল-'আজীম, বৈরূত ১৯৬৯ খৃ.; (৯) মুহাম্মাদ জাহির আল-কুর্দী, তারীখু'ল-কুরআন, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.; (১০) আবূ হায়্যান আল-গারনাতী, আল-বাহ্রু'ল-মুহীত, আর-রিয়াদ; [(১১) আমীর 'আলী, মাওয়াহিবু'র রাহ্মান, ৩০খ.]।

জাহূর আহ্মাদ আজ্হার (দা. মা. ই.)/আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তারিক ইব্ন 'আব্দির-রাহ্মান (طارق بن عبد الرحمن) ঃ (র), কূফা নিবাসী জনৈক তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। তিনি বানু'ল-আহ্মাস গোত্রের লোক। আনমার ইব্ন আরাশের উম্ম ওয়ালাদ রাজীলা বিন্ত সা'ব ইব্ন সা'দের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ায় তাঁহার গোত্রের লোকেরা আল-বাজালী নামে আখ্যাত। তিনি বিখ্যাত সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আওফা আল-আস্সামী (রা) ছাড়াও সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (র), যায়দ ইব্ন ওয়াহব (র), সা'ঈ ইব্ন জুবায়র (র), 'আসিম ইব্ন 'আম্র আল-বাজালী (র), 'আমির আশ-শা'বী (রা) প্রমুখ প্রবীণ খ্যাতনামা তাবি'ঈ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ (রা), সুলায়মান ইব্ন মিহ্রান আল-আ'মাশ (রা), ইস্রাঈল ইব্ন য়ূনুস (র), সুফ্য়ান আছ-ছাওরী (র), আবু'ল-আহ্ওয়াস (র), আবূ 'আওয়ানা (র), 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-মুবারাক (র), ওয়াকী' ইবনু'ল-জার্রাহ (র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য, ইস্মা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ (র) ও ইমাম আ'মাশ হইলেন তাঁহার সমাময়িক মুহাদ্দিছ। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তারিক ইব্ন 'আবদি'র-রাহ্মান আল-বাজালী (র) একজন নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। য়াহ্য়া ইব্ন মা'ঈন (র), আল-'ইজ্লী (র), আন-নাসাঈ (র), ইব্ন 'আদী (র), আদ-দারা কুত্নী (র), য়া'কূব ইব্ন সুফয়ান (র), ইব্ন নুমায়র প্রমুখ তাঁহাকে একজন নির্ভরযোগ্য (ছিকা) রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য য়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান (র)-এর দৃষ্টিতে তিনি আবূ হার্মালা-র নিম্নে এবং ইবরাহীম ইব্ন মুহাজিরের সমপর্যায়ভুক্ত রাবী ছিলেন। ইমাম আহ্মাদ (র) তাঁহাকে মুখারিক ইব্ন খালীফা-র নিচে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু আবূ হাতিম বলেন, তারিকের মধ্যে কোন অসুবিধা নাই, তাঁহার হাদীছ লিখনযোগ্য এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীছ মুখারিক বর্ণিত হাদীছের সমমানের। ইবনুল-বারকী তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন, য়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ তাঁহার সম্পর্কে তরল মন্তব্য করিলেও মুহাদ্দিছগণ এই ব্যাপারে তাঁহার সহিত মতবিরোধ করেন এবং তাঁহারা তারিকের নির্ভরযোগ্যতা সমর্থন করেন। সিহাহ সিত্তার প্রণেতাগণ তারিক বর্ণিত হাদীছ তাঁহাদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্কালানী, তাহ্যীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ৫, ৬; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবু'ত-তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ. ১৫৬; (৩) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৩৯৫; (৪) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জার্হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৮৫; (৫) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৫৩; (৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ৪খ, ১৭৪; (৭) মাওলানা মুহাম্মাদ য়ূসুফ কান্ধ্লাবী, আমানি'ল-আহবার, মুলতান তা. বি., ১খ, ৩২৭।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তারিক ইব্ন 'আব্দিল্লাহ (طارق بن عبد الله) ঃ আল-মুহারিবী (রা), একজন সাহাবী, কূফায় বসবাস করিতেন। তিনি বলেন, একদা আমি মদীনা শারীফে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গমন করিয়াছিলাম। তখন নবী কারীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তিনি মিম্বারে উপবিষ্ট হইয়া খুত্বা দিতেছেন এবং বলিতেছেন, "তোমরা দান কর, উহাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে। দাতার হাত গ্রহীতার হাত হইতে উত্তম।" উক্ত হাদীছটি ইমাম নাসাঈ ও অন্যান্য

মুহাদ্দিছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ শা'ছা', রিব'ঈ ইব্ন হিরাশ, আবূ দাম্‌রা প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি হিজরতের পূর্বেও যুল-মাজায নামক স্থানে নবী কারীম (স)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার মদীনায় গমনকালে তাঁহার নিকট হইতে একটি লাল উষ্ট্র ক্রয় করিয়াছেন এবং তাহার বিনিময়ে খেজুর প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২২০; (২) ইব্নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪৯; (৩) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৬খ, ৪২; (৪) শাম্‌সুদ-দীন যাহাবী, সিয়ার আ'লামি'ন-নুবালা', বৈরূত ১৯৮৬/১৪০৬, ৩খ, ৪৮৫; (৫) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবুত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৯৮৪/১৪০৪, ৫খ, ৪।

মোহাম্মদ আলী

তারিক ইব্ন 'আমর (طارق بن عمرو) ঃ (রা), কূফা নিবাসী জনৈক তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। তিনি খলীফা 'উছমান (রা)-এর মুক্তদাস ছিলেন। এই সূত্রে তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ উমাবী বংশ পরিচয়ে পরিচিত। হি. ৭২ সালে উমাবী শাসক 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মার্‌ওয়ান (মৃ. ৮৬ হি.) তাঁহাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময় তালহা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আওফ হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্নু'য-যুবায়র (রা)-এর পক্ষ হইতে তথাকার গভর্নর ছিলেন। তারিক তাঁহাকে বহিষ্কার করেন। ইতিপূর্বে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু'য-যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফের অভিযান ও হারাম শরীফ অবরোধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারিক বেশী দিন তাঁহার এই পদে বহাল থাকিতে পারেন নাই। হি. ৭৩ মতান্তরে ৭৪ সালে তিনি পদচ্যুত হন এবং মদীনার শাসনভার হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফের উপর ন্যস্ত হয়। ঐতিহাসিকগণ তারিক ইব্ন আম্‌রকে একজন অত্যাচারী শাসক হিসাবে মূল্যায়ন করেন। বর্ণিত আছে, আঞ্চলিক শাসক হিসাবে হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ, কুব্‌রা ইব্ন শারীফ ও তারিক ইব্ন 'আম্‌র প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (র) মন্তব্য করিয়াছিলেন, পৃথিবী জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) বলিতেন, আমি যখন চিন্তা করি তখন বিস্মিত হই যে, 'উছমান (রা)-এর খিলাফাতের প্রতি যাহাদের আক্রোশ ছিল তাহাদের সকলেই তাঁহার মাওলা তারিকের হাতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাহাও রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বারে বসিয়া। অপরদিকে হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তারিক একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। আবূ যুরআ ও আবূ হাতিম তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যয়ন করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদ 'উম্‌রা (কাহাকেও তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত ভোগের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি) সম্পর্কিত তারিক ইব্ন 'আম্‌রের একটি মীমাংসা তাঁহাদের হাদীছ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তারিক এই মীমাংসাটি জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা)-এর সূত্রে প্রাপ্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি ফয়সালা অনুযায়ী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরে তিনি খলীফা 'আবদু'ল মালিককে ইহা অবগত করিলে তিনিও ইহা সমর্থন করেন। সুলায়মান ইব্ন য়াসার প্রমুখ তাঁহার এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। হুমায়দ ইব্ন কায়স আল-'আরাজ তারিকের সূত্রে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানীর স্তরবিন্যাস অনুসারে তারিক তৃতীয় স্তরের রাবী। তিনি হি. ৮০ সালের দিকে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ৬, ৭; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৬; (৩) ইব্ন সা'দ, আত্-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৫খ, ২২৮; (৪) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ৮খ, ৩২১, ৩২৯, ৩৩০, ৩৪৭, ৯খ, ৩; (৫) মুসলিম ইব্নু'ল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস-সাহীহ, দিল্লী তা. বি., ২খ, ৩৮; (৬) আন-নাওয়াবী, শারহু সাহীহ লি-মুসলিম (দিল্লী তা. বি.), ২খ, টীকা ৩৮; (৭) ইব্ন 'আসাকির, তাহ্‌যীব তা'রীখ দিমাশ্‌ক, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭১, ৭খ, ৪১; (৮) তাকী 'উছমানী, তাক্‌মিলাত ফাত্‌হি'ল-মুল্‌হিম, করাচী ১৪০৭/১৯৮৭, ২খ, ৯০।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তারিক ইব্ন আশ্‌য়াম ইব্ন মাস্‌'উদ (طارق بن اشيم بن مسعود) ঃ (রা), একজন সাহাবী। তাঁহার পুত্র আবূ মালিক আল-আশ্‌জা'ঈ একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আব্বাজান! আপনি রাসূলুল্লাহ (স), আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা)-এর পিছনে ফজরের সালাত পড়িয়াছেন। তাঁহারা কি ফজরের সালাতে কুনূত পড়িতেন?" তিনি বলিলেন, "হে বৎস! ইহা বিদ্'আত।" উক্ত হাদীছটি ইব্ন মাজা ও তিরমিযীতে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে সরাসরি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন কিনা উহাতে মতবিরোধ রহিয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার পুত্র আবূ মালিক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২১৯; (২) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪৯।

মোহাম্মদ আলী

তারিক ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন মাস্‌'উদ (طارق بن عبيد بن مسعود) ঃ (রা) আল-আনসারী, একজন সাহাবী। বদরের যুদ্ধের দিন তিনি, আবু'ল-য়াসার ও মালিক ইব্নু'দ-দুখ্‌শুম বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যেই ব্যক্তি (যুদ্ধে) কাহাকেও হত্যা করিবে সে ঐ ব্যক্তির পরিত্যক্ত মালামালের অধিকারী হইবে এবং আমরা সত্তর ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছি ইত্যাদি।" তখন এই প্রসঙ্গে সূরা আন্‌ফাল-এর يسئلونك عن الانفال আয়াতটি নাযিল হয়। তিনি ও আবু'ল-য়াসার দুইজনে মিলিয়া বদরের দিন হযরত 'আব্বাস (রা)-কে বন্দী করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২২০-১; (২) ইবনুল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪৯।

মোহাম্মদ আলী

তারিক ইব্ন যিয়াদ (طارق بن زياد) ঃ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, স্পেন বিজয়ী এবং উহার প্রথম গভর্নর (শাওওয়াল ৯২/জুলাই ৭১১-জুমাদা'ল-উলা ৯৩/মার্চ-এপ্রিল ৭১২)। তিনি ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেনাপতিগণের অন্যতম। স্বল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া তিনি য়ূরোপের বিশাল সাম্রাজ্য স্পেন (দ্র. আল-আন্দালুস) জয় করেন এবং সেই দেশে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি য়ূরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অবিস্মরণীয় অবদান

রাখেন। মানুষ হিসাবে তিনি মুত্তাকী, দায়িত্বসচেতন এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তাঁহার উত্তম চরিত্রের কারণে জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীর সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিত।

তাঁহার বংশপরিচয় সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। আল-ইদরীসীর মতে তিনি যিনাতা-এর বার্বার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এইজন্যই ইব্ন খালদূন তাঁহাকে তারিক ইব্ন যিয়াদ আল-লায়ছী বলিয়াছেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত এবং হামাদান-এর বাসিন্দা ছিলেন। ইব্ন 'আযারা তাঁহার পূর্ণ বংশ-লতিকা লিখিয়াছেন এবং তাঁহার সম্পর্ক বানূ নাফ্যা (নাফ্যাও)-এর সহিত মিলাইয়াছেন। মোটকথা ইহা নিশ্চিত যে, তিনি মূসা ইব্ন নূসায়র (দ্র.)-এর আযাদকৃত দাস (مولى) এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত (نائب)) ছিলেন। তারিক ইব্ন যিয়াদ-এর শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালন মূসা ইব্ন নূসায়র-এর ন্যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ রণকৌশলী এবং মহান সেনাপতির তত্ত্বাবধানে হয়। তারিক যুদ্ধবিদ্যায় খুব শীঘ্রই সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার বীরত্ব, রণকৌশলে দক্ষতা ও পারদর্শিতার কথা লোকমুখে আলোচিত হইতে থাকে। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা ছিলেন। স্পেন আক্রমণের পূর্বে তারিককে প্রশাসনিক যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে তানজার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

আফ্রিকার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য স্পেনের নৌশক্তির পক্ষ হইতে বিপদের আশঙ্কা ছিল। ইহা ছাড়া আরও বিভিন্ন সমস্যার কারণে মূসা ইব্ন নুসায়র স্পেন জয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাই তিনি শত্রুদের শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য জানিবার জন্য রামাদান ৯১/জুলাই ৭১০ সালে চারি শত মুজাহিদ-এর একটি বাহিনী সেইখানে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন তারীফ ইব্ন মালিক আন-নাখ'ঈ। তারীফ যেই স্থানে অবতরণ করেন পরবর্তীতে উহার নাম হইয়া যায় জাযীরা-ই তারীফ (Tarif)। এইখান হইতে তিনি জাযীরা-ই খাদরা' আক্রমণ করেন এবং উহা জয় করেন। এই অভিযানে কৃতকার্য হওয়ার পর মূসা ইব্ন নুসায়র তাঁহার না'ইব তারিক ইব্ন যিয়াদকে সাত হাজার (কোন কোন বর্ণনামতে বার হাজার) সৈন্য দিয়া স্পেন বিজয়ের জন্য প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনীতে বার্বারদের সংখ্যা ছিল বেশী। এই অভিযানে তারিক Count Julian-এর নৌজাহাজও ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহা তিনি একটি চুক্তির ভিত্তিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মুসলিম বাহিনী ৫ রাজাব, ৯২ হি. সোমবার স্পেনের উপকূলে অবতরণ করেন এবং তিনি পর্বতের নিকটে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তারিক-এর নামে নামকরণ হইয়া ইহা জাবালু'ত-তারিক নামে অভিহিত হয়, যাহাকে য়ূরোপীয় ভাষাসমূহে বিকৃত করিয়া জিব্রাল্টার Gibralter বলা হয়। অতঃপর তিনি কারতাজান্না দুর্গ অধিকার করেন।

তারিক যুদ্ধের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করেন যাহা সামরিক দিক হইতে মুসলিম সেনাদলের জন্য সুরক্ষিত ছিল। তাহার সন্নিকটে পানি ও রসদপত্রের সুব্যবস্থা ছিল। এই স্থানটি রিবাত উপত্যকার প্রান্তে অবস্থিত ছিল, ইহার অপর নাম বাক্র উপত্যকা। মুসলিম বাহিনীর পশ্চাতে ছিল La Janda নামক একটি হ্রদ যাহাকে আল-বাহীরা নামে অভিহিত করা হইত (আরও অধিক তথ্যের জন্য দ্র. আল আনদালুস)। তারিক তাঁহার সেনাবাহিনীকে দেওয়া তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের সম্মুখে শত্রু এবং পশ্চাতে সমুদ্র" ইহার দ্বারা উক্ত হ্রদের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই তারিক-এর জাহাজ ছিল, যাহা তিনি যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে জ্বালাইয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছিলেন, যাহাতে সেনাবাহিনীর নিকট বাস্তবিকই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই বিদেশ-বিভূঁইয়ে তাঁহাদের সম্মুখে দুইটি পথই খোলা আছে ঃ হয় বিজয়, না হয় মৃত্যু। মূল যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বেই তারিক-এর সেনাবাহিনী আশেপাশের মহল্লা ও শহরগুলি দখল করিয়া নেন এবং সেইখান হইতে সৈন্যদের জন্য যথেষ্ট রসদপত্র সংগ্রহ করেন। এই সকল এলাকার গভর্নর ছিলেন Theodomir। তিনি স্পেনের পশ্চিমা Gothic বাদশাহ Roderic (আরবী, লাযরীক অথবা রুযরীক)-কে সংবাদ পাঠান। রডারিক বিশাল বাহিনী লইয়া মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হন এবং রাবাত নদীর তীরে তাঁবু স্থাপন করেন। ইতিমধ্যেই মূসা ইব্ন নুসায়র প্রেরিত অতিরিক্ত পাঁচ হাজার সৈন্যের একটি সাহায্যকারী দল তারিক-এর নিকট পৌঁছিয়াছিল। যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে তারিক তাঁহার বাহিনীকে যে উত্তেজনাপূর্ণ ও উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দেন, ইসলামী সাহিত্যে উহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আট দিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, অবশেষে স্পেন বাহিনী পরাজিত হয় (২৮ রামাদান, ৯২/১৯ জুলাই, ৭১১) এবং সম্রাট রডারিক পলায়ন করেন। কিন্তু তাঁহার পরিণাম সম্পর্কে জানা যায় না।

এই যুদ্ধ এই দিক দিয়া চূড়ান্ত মীমাংসাকারী ছিল যে, ইহার পর আর কোথাও স্পেনীয় বাহিনী একত্র হইয়া সফলভাবে মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করিতে সক্ষম হয় নাই। বিজয়ী তারিক-এর জন্য তখন আর কোন বাধা রহিল না। তিনি স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া কাদিস প্রদেশের বিখ্যাত শহর শাযূনা এবং ইহার পর হিস্নু'ল-মুদাওওয়ার, কারমুনা, ইশবীলিয়া, ইসতাজা, কর্ডোভা (এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি তারিক-এর নির্দেশে মুগীছ ৯৩ হি. প্রথমদিকে, অক্টোবর ৭১১ সালে জয় করেন), মালিকা, আলবীরা, রিয়্যা, আরইউলা ও তুলায়তিলা অধিকার করেন। এই সকল অঞ্চল বিজয়ের পর তারিক উত্তর স্পেনের দিকে অগ্রসর হন এবং জুলায়কিয়া প্রদেশ জয় করেন। বর্ণিত আছে যে, এই সকল অভিযানে তারিক বিপুল পরিমাণে গনীমতের মাল হস্তগত করেন, যাহার মধ্যে নবী সুলায়মান ('আ)-এর দস্তরখান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Gothic বাদশাহ রডারিক-এর পরাজয় এবং তারিক-এর বিস্ময়কর বিজয়ের সংবাদ শুনিয়া আফ্রিকার গভর্নর মূসা ইব্ন নুসায়র (৯৩/৭১২-৯৫/৭১৪) [দ্র.] তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া তিনি স্বয়ং আঠার হাজার সৈন্য লইয়া রামাদান ৯৩/জুন ৭১২ সালে ঐ স্থানের নদী পার হইয়া স্পেনের জাযীরাতু'ল-খাদরা'-এ অবতরণ করেন। তিনি যে পাহাড়ের নিকট অবতরণ করেন উহা জাবাল মূসা নামে খ্যাতি লাভ করে। তাঁহার সেনাবাহিনীতে বেশীর ভাগ ছিল আরব ও সিরিয়ার সৈন্য। তিনি তারিক-এর বিজিত ও অধিকৃত অঞ্চল বাদ দিয়া অবিজিত অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হন এবং শাযূনা, কারমূনা, ইশবীলিয়া ও মারদা জয় করেন।

৯৪/৭১৩ সালে মূসা ও তারিক তুলায়তিলায় মিলিত হন। উভয় সেনাপতি বিজিত অঞ্চলসমূহের শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। অভ্যন্তরীণ কর্মপদ্ধতির একটি চিত্র এবং আরও অধিক বিজয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। তারিক আরও অধিক অভিযানে বাহির হইবার পূর্বে স্বীয় সেনাবাহিনীর প্রতি বেশ কিছু হুকুম জারি করেন, যাহা সামরিক সাহিত্যে খুবই গুরুত্ববহ। ইহা ছাড়া তিনি আরবী ও ল্যাটিন ভাষায় মুদ্রা চালু করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী উভয় সেনাপতি নূতন অভিযান শুরু করেন এবং উত্তর- পূর্ব স্পেন ছাড়াও দক্ষিণ ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হইয়া আরবূনা, লুদূন ও আবীনূন নামক তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহর

দখল করেন। ইহার পর তাঁহারা স্পেনের উত্তর-পশ্চিমাংশে আক্রমণ পরিচালনা করেন।

মূসা ও তারিক-এর বিজয়ের ধারা অব্যাহত ছিল। ইতিমধ্যেই খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক-এর দূত দামিশক হইতে মূসা ও তারিক উভয়কেই অতি শীঘ্র রাজধানী দামিশক পৌঁছিবার নির্দেশনামা লইয়া আসিল। মূসা আরও কয়েকটি বিজয়ের জন্য খলীফার হুকুম পালন করিতে বিলম্ব করিলেন। সমগ্র স্পেন প্রায় বিজিত হইয়া গিয়াছিল। তখন মূসা দামিশকে উপস্থিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার বীর ও যোগ্য পুত্র 'আবদু'ল-'আযীযকে, যিনি বহু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন স্পেনের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং নিজে তারিক-এর সহিত ৯৫/৭১৪ সালে বিপুল পরিমাণ গনীমতের মাল লইয়া স্পেন হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। দামিশ্ক পৌঁছিয়া মূসা ইব্ন নুসায়র ও তারিক ইব্ন যিয়াদ-এর ন্যায় মহান বিজয়ী সেনাপতিদ্বয়ের সামরিক জীবনের অবসান ঘটে এবং নিতান্ত বিস্মৃত অবস্থায় তাঁহারা পৃথিবীর বুক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। তারিক ও মূসা যদি দামিশ্ক দরবারের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত হইতে মুক্ত থাকিতেন তাহা হইলে শুধু স্পেনের ইতিহাসই ভিন্ন হইত না, বরং য়ূরোপ আজ মুসলিম জাহানেরই অংশ হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., ১খ, ৮; (২) Dozy, Recherches, ৩য় সং, ১খ, ১-৮৩; (৩) E. Saavedra. Estudio. Sobre la invasion de los Arabes en Espana. মাদ্রিদ ১৮৯২ খৃ.; (৪) দা. মা. ই., পাঞ্জাব য়ুনিভার্সিটি, লাহোর, আল-আনদালুস শিরো., ৩খ, ৩৩৭-৩৩৮ প.; (৫) নাসীর আহমাদ নাসির, তারীখ-ই হিসপানিয়াহ, লাহোর ১৯৬৯ খৃ.; (৬) সায়্যিদ রিয়াসাত 'আলী, তারীখ-ই আনদালুস, ২খ, আ'জামগড় ১৯৫০ খৃ., ১৯৫১ খৃ.; (৭) G. C. Murphy, History of the Mahometan Empire in Spain. লণ্ডন ১৮১৬ খৃ.; (৮) Conde, History of the domination of the Arabs in Spain. ইংরাজী অনু. Mrs. Jonathan Foster. ৩খ, ১৮৫৪-১৯০০ খৃ.; (৯) Dozy, Spainish Islam. অনু. F. G. Stokes. ১৯১৩ খৃ.; (১০) S. P. Scott, History of the Moorish Empire in Europe. লণ্ডন ১৯০৪ খৃ.; (১১) George Power, History of the Empire of the Musulmans in Spain and Portugal. লণ্ডন ১৮১৫ খৃ.; (১২) H. E. Watts, Spain. ১৯২০ খৃ.; (১৩) ইব্ন 'আবদি'ল-হাকাম, ফুতূহ মিসর, সম্পা. C. Torrey. yale Oriental Series. ১৯২২ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১৪) আখবার মাজমূ'আ ফী ফাতহি'ল-আনদালুস, মাদ্রিদ ১৮৬৭ খৃ., মূল পৃ. ৪প.' অনু. পৃ. ১৮প.; (১৫) ইবনু'ল-কূতিয়্যা, ইফতিতাহ'ল-আনদালুস, মাদ্রিদ ১৯২৬ খৃ. (Historia de la conquista de Espana de Abenalcota el Cordebes. অনু. J. Ribera), মূল পৃ. ৩ প.; (১৬) আদ-দাব্বী, বুগয়াতু'ল-মুলতামিস, Bibliotheca Arabico-Hispana. ৩খ, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ., সংখ্যা ৮৬৪, পৃ. ৩১৫; (১৭) ইব্ন 'ইযারী, আল-বায়ানু'ল-মুগরিব, সম্পা. Dozy. ২খ, ৪-২৩প.; (১৮) আল-ইদরীসী, সিফাতু'ল-মাগরিব, পৃ. ১৭৬; (১৯) E. I.[2], লাইডেন, তারিক শিরো.; (২০) আল-মুকরী, নাফহু'ত-তীব, ১খ, ১০৮; (২১) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৪খ, ২১২ প.; আরও দ্র. ইব্ন 'আসাকির, আত-তাবারী, ইব্ন খালদূন।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

তারিক ইব্ন শিহাব ইব্ন 'আব্‌দি শাম্‌স (طارق بن شهاب بن عبد شمس) ঃ (রা) ইব্ন সালামা ইব্ন হিলাল ইব্ন 'আওফ ইব্ন জুশাম ইব্ন 'আম্‌র ইব্ন লুআয়্যি, একজন সাহাবী। তিনি রাসূল কারীম (স)-কে কোথাও গমনকালে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কোন হাদীছ শ্রবণ করেন নাই; তবে মুরসাল (مرسل) হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উছমান, 'আলী, বিলাল, খালিদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদ, ইব্ন মাস্‌'ঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন।

কায়স ইব্ন মুস্‌লিম, সিমাক ইব্ন হার্‌ব, 'আল্‌কামা ইব্ন মার্‌ছাদ, সুলায়মান ইব্ন মারছানা, ইসমা'ঈল ইব্ন আবী খালিদ, মুখারিক ইব্ন 'আব্‌দিল্লাহ প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রা)-এর খিলাফাত যুগে ত্রিশেরও অধিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ৮৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (৯১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২২০; (২) ইব্নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪৮৯; (৩) ইব্ন সা'দ, আত্‌-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮ হিজরী, ৬খ, ৬৪; (৪) শাম্‌সু'দ-দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৩খ, ৪৮৬; (৫) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ৪।

মোহাম্মদ আলী

তারিক ইব্ন সুওয়ায়দ (طارق بن سويد) ঃ (রা)-আল-হাদরামী আল-জু'ফী একজন সাহাবী। তাঁহাকে সুওয়ায়দ ইব্ন তারিকও বলা হয়। ইমাম বুখারী, আহমাদ, ইব্ন মাজা, বাগাবী, ইব্ন শাহীন (র) প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাম্‌মাদ ইব্ন সালামা-এর সূত্রে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের দেশে প্রচুর আঙ্গুর হয়। আমরা উহা দ্বারা শরাব বানাইয়া পান করিতে পারি কি?" রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "না"। উক্ত হাদীছটি আবূ দাউদও তারিক ইব্ন সুওয়ায়দ-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, বৈরূত ১৩২৮ হি., ২খ, ২১৯; (২) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৪৮; (৩) ইব্ন সা'দ, আত্‌-তাবাকাতুল-কুবরা', বৈরূত ১৯৬৮/১৩৮৮, ৬খ, ৬৪; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৯৮৪/১৪০৪, ৫খ, ৪।

মোহাম্মদ আলী

তারিফা (طريف) ঃ আরবীতে জাযীরাত তারীফা "তারীফের দ্বীপ"। ইহা মূসা ইব্ন নুসায়রের অনুচর আবূ যুর'আ তারীফ [দ্র.] নাম হইতে উদ্ভূত। তিনি স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে প্রথম মুসলিম সেনাবাহিনীসহ এইখানে অবতরণ করেন। ইহা Sierra e la luna নামক পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে জিব্রাল্টার প্রণালীর উত্তর তীরে অবস্থিত আন্দালুসিয়ার একটি শহর এবং য়ূরোপীয় মহাদেশের প্রায় সর্বদক্ষিণ অংশ। মুসলিম শাসনামলে Algeciras (আল-জাযীরাতু'ল-খাদরা'; তু. ১খ, পৃ. ২৭৭ ক) ও জিব্রাল্টার (জিবাল তারিক; তু. ২খ, পৃ. ১৬৯ প.)-সহ তারিফার প্রণালীর অপর পারে অবস্থিত মরক্কোর সমুদ্র

বন্দরগুলির সহিত সর্বদাই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। আল-ইদরীসীর মতে ইহা একটি শুষ্ক প্রস্তর দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তারিফা দুর্গের (castillo) একটি তোরণের উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৩৪৯/৯৬০ সালে ৩য় 'আবদু'র-রাহমানের নির্দেশে ইহাতে একটি টাওয়ার (বুরূজ) নির্মিত হয়। ১২৯২ খৃ. Castile-এর রাজা ৪র্থ সাকো (Sancho) মুসলমানদের নিকট হইতে তারিফা অধিকার করেন, দুই বৎসর পরে তাহারা ইহা পুনরাধিকার করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। এই সময়ে Leon-এর Guzman Bueno কর্তৃক প্রশংসনীয়ভাবে ইহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ইদরীসী, সিফাতু'ল-আনদালুস, পৃ. ১৭৬-২১২; (২) ইব্ন 'আবদু'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী, রাওদু'ল-মি'তার ফী 'আজা'ইবি'ল-আকতার (স্পেন) সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে, নং ৭৭।

E. Levi-Provencal (E. I. [1])/ মুহঃ আবু তাহের

তারিম (تريم) ঃ স্থানীয় (তুর্কী) উচ্চারণ তেরিম, আধুনিক চীনা তুর্কিস্তানের প্রধান নদী (দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ মাইল)। ইহা সম্ভবত টলেমির ওইখারদেশ (৬খ, পৃ. ১৬)। ১ম/৭ম শতাব্দীতে নদীটি চীনা তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় সি-তো (সংস্কৃত সীতা) নামে স্থান লাভ করিয়াছে (Hiouen-Thsang), Memoires. অনু. স্ট্যান জুলিয়েন (Stan Julien. ২খ, পৃ. ২২০)। ৫ম/১১শ শতাব্দীতে মাহমূদ কাশগারী (১খ, পৃ. ১১৬) নদীটিকে উসমী তারিম নামে অভিহিত করিয়াছেন, "যাহা মুসলিম দেশের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া উইগুরদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে এবং তথাকার বালুকারাশির মধ্যে বিলীন হইয়াছে।" একই সূত্র অনুসারে (পূ. গ্র., পৃ. ৩৩২) উসমী-তারিম ছিল উইগুরদের ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী কুচার সন্নিকটে একটি স্থান, যাহার পাশ দিয়া নদীটি প্রবাহিত হইত। বর্তমানের ন্যায় তৎকালেও তারিম নামটি দৃশ্যত নদীটির নিম্নতর গতিপথকে নির্দেশ করিত; ইহার উচ্চতর গতিপথে, প্রায়শ ইহার মোহনা পর্যন্তও, চীনা তুর্কিস্তানে রাজধানীর নাম অনুসারে ইহা য়ারকান্দ দরিয়া নামে পরিচিত। য়ারকান্দ দারয়ার উৎপত্তিস্থল হইল ভারত সীমান্তবর্তী কারাকোরাম পর্বতমালাস্থ রাসকেম-দারয়া। তীমূরের ইতিহাসে (জাফারনামা, কলিকতা ১৮৮৭-১৮৮৮ খৃ., ২খ, পৃ. ২১৯), তারিম নামক একটি স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা বাই ও কূসান (কুচা) হইতে বেশী দূর নহে। তুরফান, লোব ও কাতাকসহ একটি জিলার নাম হিসাবে তারিমের বর্ণনা মুহাম্মাদ হায়দারের তা'রীখ-ই রাশীদীতেও (অনু. E. D. Ross, পৃ. ৬৭) স্থান লাভ করিয়াছে; এই সমস্ত সূত্রে নদীটির নামোল্লেখ করা হয় নাই। তা'রীখ-ই রাশীদী (পূ. গ্র, পৃ. ১১) অনুসারে লোব-কাতাক শহর (অথবা লোব ও কাতাক শহরদ্বয়) ৮ম/১৪শ শতাব্দীর একটি মরুঝড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সভেন হেদিন (Through Asia, লণ্ডন ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ৮৫০) যদ্রূপ নিরূপণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্যাবধি বিলুপ্ত শহর কাতাকের ("শাহর-ই কাতাক অথবা অন্যবিধ নাম শাহর-ই কাতাক") কল্প কাহিনী বিদ্যমান রহিয়াছে, যদিও কেহই এই শহরটির ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করে নাই। তারিমের প্রবাহের নিম্নতর গতিপথে ইহার একটি শাখা কেতেক-তারিম নামে পরিচিত (Kornilow, কাশগারয়া, তাশখন্দ ১৯০৩ খৃ., পৃ. ১৬৪)। মাহমূদ কাশগারীর আমলেও ইসলাম দৃশ্যত তারিমের প্রবাহের নিম্নতর গতিপথ অবধি বিস্তার লাভ করে নাই। অপর পক্ষে মার্কো পোলো লোবের শহর ও মরুভূমির অধিবাসিগণকে মুসলিম হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন (অধ্যায় ৫৭)।

কারচুন গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া য়ারকান্দ-দারয়া পর্বতমালা পরিত্যাগ করিয়া সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে এবং বাম তীরে কীযীল-সুবা কাশগার দারয়া, আকসু বা আকসু-দারায়া, মুযারতা বা শাহ্য়ার দরায়া ও কোনচে-দারয়া ও ডান তীরে তিযনাব, খাতন দ্বারয়া ও কেরয়া-দারয়ার সহিত মিলিত হইয়াছে। ডানদিকের শাখা নদীগুলির প্রবাহ শুধু বন্যাপ্লুত হইলেই তারিমে পৌঁছে। আকসু-র মোহনার নিম্নে তারিম প্রায় ৪০০ গজ প্রশস্ত; এই অঞ্চলে ইহা কতিপয় শাখা নদীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রধান শাখা উগেন-দারয়া তেরেকের নিকটে ১৭০ গজ প্রশস্ত, সভেন হেদিন শেষোক্ত স্থানে শাখা নদীটি পার হইয়া গিয়াছিল। পৃথক শাখা নদীগুলির লোব বা লোব-নোর (মোঙ্গল হ্রদ লোব) পর্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছে, যাহাতে চেরচেন দারয়াও মিলিত হইয়াছে। সুলি-হো পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া ইহাতে পড়িয়াছে। লোপ (বা লোব), সভেন হেদিনের মতে (Through Asia, পৃ. ৮৭১) অধুনা উত্তরে উগেন-দারয়া এবং তারিম-এর মোহনা হইতে দক্ষিণে চারমলিক (চেরচেনা-দরিয়ার দক্ষিণ) পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের নামকরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Pelliot (Journ. As., সিরিজ ১১, খণ্ড ৭, পৃ. ১১৯) মনে করেন, একই শব্দ 'লোপ' বর্তমানে চীনা ভাষায় লেওউ-লান শব্দ দ্বারা অবিকল পুনর্ব্যক্ত হইয়াছে। লোপ-নোর ও তারিমগোল (গোল, মোঙ্গল ঃ নদী; শেষোক্তটি J. Klaproth-কৃত ১৮২৯ খৃস্টাব্দের ম্যাপে) শব্দ দুইটি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হ্রদ পর্যন্ত এবং তারিমের প্রবাহের নিম্নতর গতিপথের প্রাচীনতম বিবরণাদি মোঙ্গল (বা কালমূক) সূত্রাদি হইতে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের নিকট পৌঁছিয়াছিল। আধুনিক কালে অসংখ্য অভিযানে তারিমের প্রবাহের নিম্নতর গতিপথের ভৌগোলিক অবস্থা এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির উপর অনুসন্ধান করা হইয়াছে এবং বর্তমান স্থানসমূহের পুঁথিগত বিশেষ চীনা সূত্রাদির, সংযোগ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। Sir Aurel Stein-এর আধুনিক অনুসন্ধান অভিযান অনুসারে (১৯১৪ খৃ.; তু. Geogr. Journ.. আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ১৯১৬ খৃ.) বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণ শুষ্ক লোবের তলদেশে সম্ভবত একটি বৃহৎ ব-দ্বীপ থাকিতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক কালের তেমন কোন বড় হ্রদ নহে।

ইহার উপমহাদেশীয় আবহাওয়ার কারণে তারিম দক্ষিণাঞ্চলীয় অবস্থান সত্ত্বেও বৎসরের প্রায় তিন মাস বরফাবৃত থাকে। তারিমের ভাটিতে তথাকার অধিবাসিগণ (লোপ্লীক) বিশেষভাবে নির্মিত নৌকায় মৎস্য শিকার করে। সভেন হেদিন অনুরূপ একটি নৌকাতে চড়িয়া লোব-নোর অঞ্চলে অনুসন্ধানকর্ম পরিচালনা করেন; তবে তারিম নদীতে প্রকৃতপক্ষে কখনও কোন নৌযান চলাচল করে নাই। মাহমূদ কাশগারীর আমলের ন্যায় হ্রদের তলদেশে পৌঁছানোর পূর্বেই মরুভূমি নদীটিকে গ্রাস করিয়াছে; কুম-চাপগানের মৎস্যজীবী গ্রামকে হেদিন (পূ. গ্র., পৃ. ৮৮৪) "তারিমের সমাধিদ্বার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) অতি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাদির একটি বিশেষ পরিপূর্ণ বিবরণের জন্য দ্র. Kornlow, Kashgariya, তাশখন্দ ১৯০৩ খৃ., পৃ. ১৫৭ প., তাঁহার নিজস্ব গবেষণাদি এবং Przewalski, Hedin, Pievtzow, Kozlow প্রমুখের বর্ণনা হইতে।

W. Barthold (E.I. [1])/ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তারীকা (طريقة) ঃ আরবী, ব. ব. তারা'ইক। অর্থ রাস্তা, পথ, মায্হাব, অবস্থা। ইসলামী আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের পরিভাষায় ইহা দুইটি আনুক্রমিক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেঃ (১) আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নৈতিক মনস্তত্ত্বের

প্রণালীকে খৃস্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তারীকা বলা হইত; (২) একাদশ শতাব্দীর পর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ইহা ধর্মানুষ্ঠানাদির পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতির রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলিমদের ধর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরের শ্রেণীভেদ এই শতাব্দীতেই আরম্ভ হয় এবং এই ধর্ম জীবন পরিচালনার জন্যই তখন ধর্মানুষ্ঠানাদির পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি প্রণীত হয়।

প্রথম অর্থে (দ্র. জুনায়দ, হাল্লাজ, সার্‌রাজ, কুশায়রী, হুজ্‌বীরীকৃত গ্রন্থসমূহ) 'তারীকা' শব্দটি এখনও অস্পষ্ট এবং ইহা তাত্ত্বিক ও আদর্শ পদ্ধতি বুঝায়। এই পদ্ধতি দ্বারা আধ্যাত্মিক সাধক তাঁহার মুর্শিদের নির্দেশিত পথে শারী'আতের বিধিসমূহ যথাযথ পালন করিয়া বিভিন্ন মাকামের (মনস্তাত্ত্বিক পর্যায়ের) মাধ্যমে পরম সত্যের দিকে পরিচালিত হইতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জগতের স্তরসমূহ আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের (শারী'আতের) বাস্তব রূপায়ণেরই নামমাত্র–এই সকল দাবির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার উদ্ভব হইল এবং তদুপরি ব্যবহারশাস্ত্রবিদগণের নির্যাতনও আরম্ভ হইল।

এক কারণে সুলামী ও মাক্কী হইতে ইব্‌ন তাহির মাক্‌দিসী (সাফ্‌ওয়া) ও গাযালী পর্যন্ত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবিদগণ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং অধিকতর নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা নিজেদের কার্যকলাপ প্রচলিত ধর্মমতানুসারে সংযত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এতদ্ব্যতীত সন্দেহ নিরসনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিধানাবলী সংকলন করিলেন (আদাবু'স-সূফিয়্যা)। প্রকৃত সত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে (ফাত্‌হ) তাঁহাদের সাধনার চরম লক্ষ্য হিসাবে ঠিক রাখিয়া বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সঙ্গীতের আসরে (সামা') যোগদানের স্বাধীনতা তাঁহারা ক্রমশ বর্জন করিলেন। কারণ সঙ্গীত যে শুধু উন্মাদনার সৃষ্টি করে তাহাই নহে, বরং ইহার ফলে শ্রোতা অধিকাংশ সময় এমন উক্তি করে যাহা ধর্মের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সুতরাং তৎপরিবর্তে কুরআনে উক্ত প্রার্থনা বাক্যের (যিকির) নিয়মিত আবৃত্তিতে তাঁহারা মগ্ন থাকেন। এইরূপে সাধক একাগ্রতা (তাফাক্কুর)-এর এমন এক পর্যায়ে উপনীত হন যাহার ফলে আবৃত্ত শব্দের আবরণ উন্মোচন করিয়া বিভিন্ন জ্যোতি (আন্‌ওয়ার) তাঁহার নিকট নির্জনে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তাহার হৃদয় ইহাতে উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় উপনীত হইলে সেই ব্যক্তি তখন যিকিরের অনুপম মাধুর্য অনুভব করিয়া থাকেন (যিক্‌রু'য-যাত বিতাজাওহুর নূরু'য-যিক্‌র ফি'ল-কাল্‌ব্, সুহ্‌রাওয়ার্দী, 'আওয়ারিফ, ২৭শ অধ্যায়, ২খ, ১৯১)।

পরিশেষে তারীকা বলিতে সাধারণ জীবন যাপন প্রণালী (মু'আশারা) বুঝায়। সাধারণভাবে পালনীয় ইসলামের কার্যাবলীর অতিরিক্ত এই জীবন পদ্ধতি কতকগুলি বিশেষ বিধানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণীত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সিদ্ধি লাভ (ফকীর-দরবেশ) করিতে হইলে ধর্মসাধককে (মুরীদ, গান্‌দূয্) পীরের (শায়খু'স্-সাজ্‌জাদা, ফার্সী-পীর; তুর্কী-বাবা; মুর্শিদ, মুকাদ্দাম, নাকীব, খালীফা, তুর্জুমান, ফার্সী–রিন্দ, রাহ্‌বার ইত্যাদি) নিকট দীক্ষা (বায়'আত, তাল্‌কীন, শাদ্দ) গ্রহণ করিতে হয়। ভ্রাম্যমাণ পর্যায়ের সাধক হইলেও (সিয়াহা) তাহাকে পীরের খানকাহে (রিবাত; যাবিয়া; ফার্সী... খান্‌কাহ, তুর্কী Tekkiye) সময় সময় হাযিরা দিতে হয় ('উয্‌লা, কাল্‌ওয়া, আরবা'ঈনিয়া, ফার্সী-চিহিল্ বা চিল্লাহ)। এই খানকাহের ব্যয়ভার পুণ্যের নিয়াতে প্রদত্ত দান (হাদিয়া) দ্বারা বহন করা হইয়া থাকে। এমন খানকাহ সাধারণত কোন সম্মানিত সূফী সাধকের সমাধির সন্নিকটে তৈয়ার করা হয়; প্রতি বৎসর সেই সমাহিত সাধকের বার্ষিক উৎসব (মাওলিদ, 'উরস) উদ্‌যাপন করা হয় এবং লোকেরা তাঁহার আশিস (যিয়ারা, বারাকা) প্রার্থনা করিয়া থাকে।

খান্‌কাহে আগত এই সকল ধর্মভাইয়ের (ইখ্‌ওয়ান, তুর্কী আখীলের, ইহা দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত একটি আনাতোলীয় শব্দ; ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে কেবল মিসর ও সিরিয়াতে নারীদের জন্য খান্‌কাহে গৃহ তৈয়ার করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল) সাধারণ জীবন যাপনের বৈশিষ্ট্য ছিল অতিরিক্ত আরাধনা, রাত্রি জাগরণ (সাহ্‌র), রোযা (সিয়াম), দু'আ' বা যিকির (বির্‌দ, যেমন য়া লাতীফ এক শত বা হাজার বার বলা), তাস্‌বীহ্ (যিকির, হিয্‌ব), বিশেষত কোন কোন উৎসব উপলক্ষে (বারাআ, রাগাইব, কাদ্‌র-এর ইবাদাতাদির জন্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদিতে; তদুপরি কোন কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম হইতে অব্যাহতি (রুখ্‌সা), দান-খয়রাত সংগ্রহ (কাশ্‌কুলে সংগৃহীত কাসামাঃ) এবং গোপন সম্মেলন (হাদ্‌রা, ওয়াজীফা, যের্‌দা)। এই সকল গোপন সম্মেলন নির্জনে তাস্‌বীহ্-তাহ্‌লীল-এর জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ধর্ম-সাধকের বাস্তব আনুষ্ঠানিক দীক্ষা কার্‌মাতীদের বাণিজ্য সংঘের দীক্ষাসদৃশ। Kahle বলেন, সম্ভবত কার্‌মাতীদের নিকট হইতেই খৃ. দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে (Taeschner, Islam, vi, 169-172, Published a Turkish miniature of the xviith century representing the scene)। ১২২৭ খৃ. হইতে প্রচলিত (ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূন'ল-আনবা', ২খ, ২৫০ দ্র.) দীক্ষার উপাধিপত্র (ইজাযা) হাদীছ শাস্ত্রবিদগণের সনদপত্রের অনুকরণ। এই প্রকার সনদপত্র দ্বারা নবদীক্ষিত ব্যক্তিকে তারীকায় অন্তর্ভুক্তির ও দীক্ষা দানের অনুমতি (সিল্‌সিলা, শাজারা) দেওয়া হয়। এতদসঙ্গে তাহাকে এক জোড়া আল্‌খিল্লাও (খির্‌কাতু'ল বিরদ ও খির্‌কাতু'ত-তাবার্‌রুক) প্রদান করা হইয়া থাকে। এই খির্‌কাদ্বয় তাঁহার দ্বিবিধ শপথ গ্রহণের ('আহ্‌দু-য়াদ ওয়া'ল-ইক্‌তিদা-তাল্‌কীন ও 'আহ্‌দু'ল-খির্‌কা), দ্বিবিধ পরিচয় গ্রহণের, তাঁহার উপদেশ দান অধিকারের (বিধিনিষেধের মৌখিক তা'লীমের) এবং আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভের (আত্মিক জ্যোতি প্রাপ্তির) পরিচায়ক। আজ্ঞাবহ থাকার প্রতিশ্রুতি দানের কারণেই তিনি এই খির্‌কাদ্বয়ের অধিকারী হইয়া থাকেন।

তারীকার মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ে যে নূতন নূতন প্রথার (বিদ্'আত) উদ্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সনাতনপন্থী ফকীহগণ অবিরাম বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া আসিয়াছেন। নূতন প্রথাসমূহ এই ঃ তারীকা অবলম্বিগণের অতিরিক্ত উপাসনা অর্চনা এবং কতিপয় প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান হইতে তাহাদের অব্যাহতি, তাহাদের বিশেষ বেশভূষা (বৈশিষ্ট্য)-মূলক বিভিন্ন রঙ্গের শিরস্ত্রাণ (কুলাহ, তাজ ইত্যাদি), তাহাদের উত্তেজক দ্রব্য (কফি ইত্যাদি) ব্যবহার, তাহাদের ভোজবাজি, তালকীন ও বারাকাতে ঈপ্সিত ফল দানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস (ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এবং দায়িত্বহীন ধর্মনেতার বিভ্রমধর্মী শিক্ষা)। দীক্ষা সনদের সমালোচনামূলক ইতিহাসের প্রতি এই সব ফকীহ্ গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন এবং তারীকাতপন্থীদের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতির উল্লেখ করেন (তাসাওউফ প্রবন্ধ দ্র.)। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা ইস্‌নাদ ইলহামীর বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন। নিতান্ত রহস্যময় ও অমর আল-খিদির (দ্র.) নামক এক পুণ্যাত্মার অপচ্ছায়ার উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন তারীকার বিশেষ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক তারীকাতপন্থীই আল-খিদিরকে তারীকার অবিসংবাদিত নেতা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। কারণ হযরত মূসা

('আ)-কে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া (কুরআন, ১৮ ঃ ৬৫-৮২) তিনি আধ্যাত্মিক সাধককে পরম সত্যের (হাকীকাত) দিকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।

শী'আদের সহিত সাহচর্যের কারণে তুরস্ক সরকার তারীকাতপন্থিগণকে প্রায়ই নির্যাতন করিয়া আসিয়াছে। 'আবদু'ল-হামীদ যখন প্যান-ইসলামিক মতবাদ প্রচার করিতেছিলেন তখন তাহাদিগকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর নির্যাতন স্বল্পকালের জন্য স্থগিত থাকে। কিন্তু অনতিবিলম্বে ১৯২৫ খৃ.-এ প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের দায়ে তাহাদিগকে নির্মূল করা হয়। নীতি (ভারত) বা যুক্তির (আল্‌জিরিয়া) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চলিলেও অন্য সকল মুসলিম দেশেই তাহাদের পতন অব্যাহত রহিয়াছে। তারীকাতপন্থী কিছু সংখ্যক নিম্ন পর্যায়ের ধড়িবাজ ব্যক্তির ভেল্‌কিবাজি এবং তাহাদের নেতৃবৃন্দের অনেকের নৈতিক অধঃপতনের কারণে ইহাদের বিরুদ্ধে আধুনিক মুসলিম জগতের বিদ্বানমণ্ডলীর এত বিরূপতা ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে।

যাহাই হউক, তারীকাকে একেবারে উপেক্ষা করা চলে না। প্রাথমিক যুগের সূফীগণ যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন ইহার তুলনায় বর্তমান যুগের কতিপয় তারীকাতপন্থীদের সাধারণ নৈতিক মান বহু নিম্নে হইলেও তাঁহারা মুসলিম সমাজের দৈনন্দিন জীবনের উপর অবিরত যে অসামান্য ও অর্থপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছেন গবেষকগণ তাঁহাদের বিধিবিধান ও রচনাবলী সম্যক্ পর্যালোচনা করিলে এতদ্‌বিষয়ে তাঁহারা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ইহাদের মধ্যে সর্বেশ্বরবাদী এবং ইসলাম পরিপন্থী অন্য বহু মতবাদ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তারীকাসমূহের প্রামাণিক ইতিবৃত্ত হইতে তুলনামূলক লোককাহিনী ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও কিছু জানিবার আছে (Mel. R. Basset, 1923, i, 259-270 and Journal de Psychologie. 1927, p. 163-168 দ্র.)।

তারীকাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ যথাযোগ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই তালিকাকে সন্নিবেশিত করিতে গেলে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক যে, ইসলামে সাধারণ এক জীবন পদ্ধতি (তাসাওউফ প্রবন্ধ দ্র.) নির্ধারণের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। ফলে মাত্র ৮১৪ খৃ. ইহার সুদক্ষ অনুসারিগণ শ্রেণীগতভাবে 'সূফিয়া' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন আলেকজান্দ্রিয়া, কূফা)। ৮৫৭ (মুহাসিবী) সনের পর আধ্যাত্মিক সাধকের সকলকেই ইরাকে সাধারণভাবে এই নামে অভিহিত করা হইত (ইরাকে সমধিক দলবদ্ধ ব্যক্তি সমষ্টিকে সালিমিয়া, হাল্লাজিয়া বলা হইত)। তৎপর সূফী শব্দ বৈষম্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দুই শতাব্দীর অধিক কাল যাবৎ "মালামাতিয়্যা" নামের পাশাপাশি ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। খুরাসানের অধিকতর সক্রিয় ও নিষ্ঠাবান মরমীবাদীকে 'মালামাতিয়্যা' বলা হইত। তাঁহারা নিন্দা-ভর্ৎসনার প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন এবং নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা ও সঙ্গীতপ্রিয়তার জন্য সূফীগণকে তিরস্কার করিতেন।

এই প্রাচীন যুগের জন্য নিম্নোক্ত তালিকা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ মুসলিম ধর্মগ্রন্থ প্রণেতাগণ খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে কৃত্রিম উপায়ে এইসব তালিকা সংকলন করিয়াছেন (সুতরাং তারিখ বা কাল সম্পর্কে এইগুলি নির্ভুল নহে) এবং এই তালিকায় প্রামাণিক মতবাদের ধারক দলসমূহের নামও সংযোজিত করিয়াছেন, তবে ভুলবশত এইগুলিকে ধর্মের বিভিন্ন শ্রেণীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকন্তু ইমামী ধর্মতত্ত্ববিদগণের কল্পিত মতবাদসমূহের নামও ইহাতে সংযুক্ত করা হইয়াছে। অপরপক্ষে তালিকায় প্রদত্ত দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্তী তারীকাসমূহ নির্ভুলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নরূপ ঃ সূফিয়া খাফীফিয়া তারীকার অন্তর্গত কাযারূনিয়া তারীকার উদ্ভব হয় (১৩০৪) এবং সূফিয়া জুনায়দী তারীকা হইতে শ্রেষ্ঠ মহামনীষিগণের (জুর্জানী, ফার্মাযী, নাস্‌সাজ, আহ্‌মাদ গাযালী) পরিচালনাধীনে এক বৃহত্তর তারীকার উদ্ভব হয়; পরিশেষে ইহাই আবার ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথা খাওয়াজা গান (য়ূসুফ হামাযানী, মৃ. ১১৪০), কুব্‌রাবীয়া (কুব্‌রা, মৃ. ১২২১) ও কাদিরিয়্যা (যদিও শেষোক্ত শাখার প্রতিষ্ঠাতা ১১৬৬ খৃ.-এ পরলোকগমন করেন, অর্ধ শতাব্দী পর তাঁহার নামানুসারেই এই শাখার নামকরণ হইয়াছিল)। পরবর্তী দুইটি শাখার সহিত আহ্‌মাদ ইবনু'ল-কাদী (কাওয়া'ইদ ওয়াফিয়্যা, তু. Laleli MS. 1478 দ্র.) আরও তিনটি শাখা যোগ করেন, যথা রিফা'ইয়্যা, মাদানিয়্যা, (ভাবী শাযিলিয়্যা) ও চিশ্‌তিয়া। এইরূপে এই তিনটি শাখা প্রাচীন পাঁচ ফিরকায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

অনতিবিলম্বে অন্যান্য আরও বহু তারীকার উদ্ভব হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কালান্দারিয়্যা, আহ্‌মাদিয়্যা, মাওলাবিয়্যা তারীকা প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে বিক্‌তাশিয়্যা, নাক্‌শাবান্দিয়া, সাফাবিয়্যা, খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার উদ্ভব হয় এবং এইগুলি আবার বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাযূলী মাগ্‌রিবে সংস্কার সাধন করেন। সেই সময় সুমাত্রা ও পাক-ভারতে শাত্তারিয়া তারীকার উদ্ভব হয়। পরিশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাগ্‌রিবে কাদিরিয়্যা ও শাযিলিয়্যা তারীকার সংস্কার সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তিজানিয়্যা, দারকাওয়া ও সানূসিয়্যা তারীকার সৃষ্টি হয়।

সানূসিয়্যা ও মাওলাবিয়্যা তারীকা ব্যতীত অপর কোন বৃহৎ তারীকাই বর্তমানে এক কেন্দ্রের অধীন নহে। যে বন্ধন দ্বারা তারীকাতপন্থিগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহা তত মযবুত ও স্থায়ী নহে, বরং প্রায়ই ইহা অত্যন্ত শিথিল। সাধারণত তারীকাতপন্থিগণের সংখ্যা কোন মুসলিম দেশেই সেই দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনের অধিক নহে। বর্তমানে সর্বাধিক বিস্তৃত তারীকাসমূহ এই ঃ কাদিরিয়্যা (ইরাক, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাক-ভারত, তুর্কিস্তান, চীন, নুবিয়া, সূদান, মাগ্‌রিব); নাক্‌শ্‌বান্দিয়্যা (তুর্কিস্তান, চীন, তুরস্ক, বাংলাদেশ, পাক-ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ), শাযিলিয়্যা (মাগ্‌রিব, সিরিয়া); বিক্‌তাশিয়্যা (তুরস্ক, আলবেনিয়া); তিজানিয়্যা (মাগ্‌রিব, ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, শাদ); সানূসিয়্যা (সাহারা, হিজায); শাত্তারিয়্যা (পাক-ভারত, মালয় দ্বীপপুঞ্জ)।

'আবদু'ল-হামীদের যুগে বিভিন্ন তারীকাকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করা হয়। ফলে অদ্ভুত এক পীর-সংঘের সৃষ্টি হয়। এই সংঘের চারিজন সার্বজনীন সদস্য; যথা রিফা'ঈ (সভাপতি), জীলানী, বাদাবী ও দাসূকী; তৎসঙ্গে সমসাময়িক 'আব্‌দাল ও কুত্‌বও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত।

এই গ্রন্থে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত সকল তারীকা সম্বন্ধে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। এইজন্য প্রধান প্রধান তারীকার নাম, ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা ও পুনর্বিভাগ, ইহার ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর তারিখ (খৃস্টাব্দ) সম্বলিত একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। তারকাচিহ্নিত তালীকাসমূহ বর্তমান কালেও প্রচলিত আছে (প্রধান তারীকাগুলির নিম্নে রেখাচিহ্ন দেওয়া হইল)। যে গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে নিম্নলিখিত তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে ঃ হুজ্‌বীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌জূব, ed. Shukovski

1926. p. 218_340 এবং অনুবাদ Nicholson, ১৯১১, পৃ. ১৭৬, ২৬৬ (১১ নাম); 'উজায়মী (মৃ. ১৮৫৯) সাল্‌সাবীল মু'ঈন, পাণ্ডুলিপি, Massignon (৪০ নাম); মা'সূম 'আলী শাহ্, তারা'ইক্‌'ল-হাকা'ইক; lith. Teheran 1319. ii. 136 প. (১৭ নাম); d'Ohsson, Tableau general de l'empire Othoman. Paris 1788. ii. 294_316 (in Hughes, Dictionary of Islam, p. 117; Brown, Darwishes, ed. Rose, 1927, p. 267_271 (32 names)} : Gumush khani, Djami usul.....Cairo 1319, P. 3প. (40 names); L. Rinn, Marabouts et Khouan. Algiers 1885 (31 names) (তু. also Le Chatelior. Confreries musulmanes deu Hedjaz. Paris 1887; Depont Coppolani. Confreries religiouses musulmanes. Algiers 1897; Montet in Encyclopaedia of Religion and Ethics. x. 719-26); Malcolm, History of Persia. 1815. ii. 271 (5 names); Massignon, Annuaire de Monde Musulman, 2nd. ed. 1926.

তালিকা

আদাহামিয়া–তুরস্ক ও সিরিয়া দেশের পঞ্চদশ শতাব্দীর কৃত্রিম সনদযুক্ত জনৈক সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (মৃ. ৭৭৬)।

আহ্‌মাদিয়্যা– মিসর দেশীয় তারীকা (তান্‌তা বাদাবী, মৃ. ১২৭৬), ইহা বহু শাখায় বিভক্ত; যথা শিন্নাবিয়্যা, মারাযিকা, কান্নাসিয়্যা, আন্‌বাবিয়্যা, হাম্‌মূদিয়্যা, * মানাইফিয়্যা, সাল্লামিয়্যা, হালাবিয়্যা, যাহিদিয়্যা, শু'আয়বিয়্যা, তাস্‌কিয়ানিয়্যা, 'আরাবিয়্যা, *সুতূহিয়্যা, বূন্দারিয়্যা, মুস্‌লিমিয়্যা (=শুরুনবুলা-লিয়া), * বায়্যুমিয়্যা।

'আয়দারূসিয়্যা– কুব্‌রাবিয়্যা তারীকার য়ামান দেশীয় শাখা (পঞ্চদশ শতাব্দী)।

আক্‌বারিয়্যা-হাতিমিয়্যা।

'আলাবিয়্যা কৃত্রিম সনদযুক্ত চতুর্থ খলীফার সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

* 'আলাবিয়্যা–দারকাওয়া তারীকার আলজিরিয়া দেশীয় শাখা (মুস্তগানেম–বিন আলিওয়া, ১৯১৯ হইতে)।

* আমীর, গানিয়্যা– ইদ্‌রীসিয়্যা তারীকার নুবিয়া দেশীয় শাখা (মৃ. ১৮৫৩)।

* 'আম্মারিয়্যা–কাদিরিয়া তারীকার আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* আরূসিয়া–কাদিরিয়া তারীকার ত্রিপলী দেশীয় শাখা (Zliten, ১৯শ শতাব্দী)।

* 'আশিকিয়্যা –ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

আশ্‌রাফিয়্যা–কাদিরিয়া তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (ইযনিক) (মৃ. ১৪৯৩)-ওয়াহিদিয়্যা।

* আওয়ামিরিয়্যা– 'ঈসাবীয়া তারীকার তিউনিসীয়া দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* আয্‌যূযিয়্যা– তিউনিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকা (১৯শ শতাব্দী)।

বাবা'ঈয়্যা–তুরস্ক দেশীয় তারীকা (আদ্রিয়ানোপল) (মৃ. ১৪৬৫)।

বাদাবিয়্যা– আহ্‌মাদিয়্যা।

* বায়রামিয়্যা– সাফাবিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (আন্‌গোরা, মৃ. ১৪৭১)। প্রশাখাসমূহ হাম্‌যাবিয়্যা, শায়খিয়্যা, খাওয়াজা, হিম্মাতিয়্যা।

বায়্যুমিয়্যা– আহমাদিয়্যা তারীকা দ্র.।

* বাক্‌কাঈয়্যা– কাদিরিয়া তারীকার সুদান দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫০৫)। শাখাসমূহ (কুন্তা); ফাদ্‌লিয়্যা, আল-সীদিয়্যা।

বাক্‌রিয়্যা–সিদ্দীকিয়্যা তারীকা তু.।

বাক্‌রিয়্যা–কোন কোন সময় বায়তু'ল-বাক্‌রীকে প্রদত্ত নাম (১৬শ শতাব্দী হইতে কায়রোর শুয়ূখু'স-সূফিয়্যা)।

বাক্‌রিয়্যা–শাযিলিয়্যা তারীকার সিরিয়া ও মিসর দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫০৩)।

বাক্‌রিয়্যা– খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার মিসর দেশে সংস্কার সাধিত তারীকা (মৃ. ১৭০৯)।

বানাওয়া–দাক্ষিণাত্যে কাদিরিয়া তারীকার শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* বিক্‌তাশিয়্যা– আনাতোলিয়া (১৩৩৬ খৃ.-এর পূর্ব পর্যন্ত) ও বলকান দেশীয় তারীকা (১৯২২ খৃ. হইতে আলবেনীয় দেশীয় স্বতন্ত্র শাখা, আকসি হিসার)।

* বীবারিয়্যা– সিলিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকা (১৯২৪)।

বিস্‌তামিয়্যা–১৫শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সনদযুক্ত (তায়ফুলিয়্যা তারীকা তু.)।

* নু'আলিয়্যা– কাদরিয়া তারীকার আলজেরিয়া ও মিসর দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* বুনুহিয়্যা–(বুনিয়্যিন) দক্ষিণ মরক্কো দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকা (RMM. lviii. 141তু.)।

বুরহানীয়া (বা বুরহামিয়্যা)–মিসর দেশীয় তারীকা (ইব্‌রাহীম দাসূকী, মৃ. ১২৭৭)। শাখাসমূহ – শাহাবিয়্যা, শারানিবা।

দার্‌দীরিয়্যা–খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার মিসর দেশীয় শাখা (১৭৮৬)।

* দারকাওয়া– জাযূলিয়্যা তারীকার আলজেরিয়া ও মরক্কো দেশীয় শাখা (মৃ. ১৮২৩)। শাখাসমূহ বুযীদিয়া, কিত্তানিয়্যা, হার্‌রাকিয়্যা, 'আল্লাবিয়্যা।

দাসূকিয়্যা–বুর্‌হানিয়্যা।

যাহাবিয়্যা–কুব্‌রাবিয়্যা তারীকার পারস্য দেশীয় নাম। জাহ্‌রিয়্যা–য়ামান দেশীয় তারীকা (১৫শ শতাব্দী)।

* জাহ্‌রিয়্যা–চীন ও তুর্কিস্তানে যে তারীকা (কাদিরিয়্যা) প্রকাশ্য যিকিরের অনুমতি প্রদান করে; তু. খাফীয়া তারীকা– (১৯শ শতাব্দী)।

* জালালিয়্যা– বুখারিয়্যা– সুহ্‌রাওয়ার্দীয়া তারীকার পাক-ভারতীয় শাখা (মাখ্‌দূম-ই জাহানিয়ান, মৃ. ১৩৮৩)।

* জালওয়াতীয়া– সাফাবিয়্যা তারীকার তুর্কী শাখা, (ব্রুসা, পীর উফতাদা মৃ. ১৫৮০) শাখাসমূহ হাশিমিয়্যা, রাওশানিয়্যা, ফানাঈয়া, হুদাঈয়্যা।

জামালিয়্যা–সুহ্‌রাওয়ারদিয়্যা তারীকার পারস্য দেশীয় শাখা (আরদিস্তানী, মৃ. ১৫শ শতাব্দী)।

জামালিয়্যা–তুরস্ক দেশীয় তারীকা– ইস্তাম্বুল (মৃ. ১৭৫০)।

* জার্‌রাহিয়্যা– খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৭৩৩)।

জাযূলিয়্যা– শাযিলিয়া তারীকার সংস্কার সাধিত মরক্কো দেশীয় রূপ (মৃ. ১৪৬৫)। ইহার শাখাসমূহ দার্‌কাওয়া, হামাদিশা, 'ঈসাবিয়্যা, শার্‌কাওয়া, তায়বীয়া।

জিবাবিয়্যা–সা'দীয়া।

জীলালা– কাদিরিয়া তারীকার মরক্কো দেশীয় নাম।

জুনায়দিয়্যা–একাদশ শতাব্দীতে বাগদাদে যে সূফী মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা (মৃ. ৯০৯); এই তারীকা হইতে খাওয়াজাগান, কুব্‌রাবিয়্যা ও কাদিরিয়্যা তারীকার উদ্ভব হয়। ১৬শ শতাব্দীতে কৃত্রিম সনদের একটি যিকিরের জন্য জুনায়দিয়্যা তারীকা পুনর্জীবিত হয়।

ফির্‌দাওসিয়্যা– কুব্‌রাবিয়্যা তারীকার পাক-ভারতীয় নাম।

* গাওছিয়্যা–শাওরিয়্যা তারীকার পাক-ভারতীয় শাখা (গাওছ; গোয়ালিয়র মৃ. ১৫৬২)।

গাযালিয়্যা– গাযালীর মতবাদ অবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ১১১১)।

গাযিয়্যা–দক্ষিণ মরক্কো দেশে শাযিলিয়্যা তারীকার শাখা (মৃ. ১৫২৬)।

* গুল্‌শানিয়্যা–রাওশানিয়্যা।

* গুর্‌য়ুমার–কাদিরিয়া তারীকার পাক-ভারতীয় শাখা।

* হাবীরিয়্যা–তাফিলেল্‌ত-এর শাযিলিয়্যা তারীকার শাখা (মৃ. ১৭৫২)।

* হাদ্দাওয়া– তাগ্‌যির্ত-এ (১৯শ শতাব্দী) মরক্কো দেশের ভ্রাম্যমাণদের তারীকা।

* হাফ্‌নাবিয়্যা– খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার মিসর দেশীয় শাখা (মৃ. ১৭৪৯)।

হায়দারিয়্যা–কালান্দারিয়্যা তারীকার পারস্য দেশীয় শাখা (১২শ শতাব্দী)।

* হায়দারিয়্যা– খাক্‌সার! পারস্য দেশীয় কারিগরদের সংঘ (১৯শ শতাব্দী)।

হাকীমিয়্যা–হাকীম তির্‌মিযীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ৮৯৮)।

হাল্লাজিয়্যা–হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর আল-হাল্লাজের মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ৯২২); ১৩শ শতাব্দীতে যিকিরের কৃত্রিম সনদের জন্য এই নাম পুনর্জীবিত হয়।

হামাযানিয়্যা–কুবরাবিয়্যা তারীকার কাশ্‌মীরী শাখা (আলী হামাযানী, মৃ. ১৩৮৫)

হামাদিশা–যেরহুনে প্রচারিত জাযূলিয়্যা তারীকার মরক্কো দেশীয় শাখা (১৮শ শতাব্দী)। ইহার প্রশাখাসমূহ এই ঃ দাগূগিয়্যা, সাদ্দাকিয়্যা, রিয়াহিয়্যা, কাসিমিয়্যা, মেকনীন ও সেলী অঞ্চলে।

হাম্‌যাবিয়্যা– বায়রামিয়্যা ও মালামিয়্যা তারীকা দুইটির মিশ্রণে গঠিত।

* হান্‌সালিয়্যা– উরান ও মরক্কো দেশীয় একটি ক্ষুদ্র তারীকা (মৃ. ১৭০২)।

হান্‌সালিয়্যা–নাসিরিয়্যা তারীকার শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

হারীরিয়্যা– রিফা'ইয়্যা তারীকার হাওয়ারিয়্যা শাখা (মৃ. ১২৪৭)।

হাতিমিয়্যা– ইব্‌ন 'আরাবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ১২৪০)। হুদাইয়্যা–জাল্‌ওয়াতিয়্যা।

হুলুমানিয়্যা–দশম শতাব্দীর হুলূলিয়্যা সম্প্রদায়।

হুলূলিয়্যা– ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

হুরূফিয়্যা– ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

ইবরাহিয়্যা– ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

* ইদ্‌রীসিয়্যা– 'আসীরে অবস্থিত খাদিরিয়্যা তারীকার শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

ইগিত-বাশিয়্যা– খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫৪৪)।

ইগ্‌তিশাশিয়্যা– কুব্‌রাবিয়্যা তারীকার খুরাসান দেশীয় শাখা (ইসহাক খোত্তালানী, মৃ. ১৫শ শতাব্দী)।

* 'ঈসাবিয়্যা– মেক্‌নিসে জাযূলীয়া তারীকার মরক্কো দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫২৪)।

ইশ্‌রাকিয়্যা-সুহ্‌রাওয়ারদী হালাবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ১১৯১)।

* ইস্‌মা'ঈলিয়্যা– কুরদুফানে নুবিয়্যা দেশীয় তারীকা (১৯শ শতাব্দী)।

ইত্তিহাদিয়্যা–ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

* কাদিরিয়া– জুনায়দীয়া তারীকা হইতে উদ্ভূত বাগদাদের তারীকা ('আবদু'ল-কাদির জীলানী, মৃ. ১১৬৬); ইহা বহু শাখায় বিভক্ত; যথা য়ামান ও সোমালিয়া দেশে য়াফি'ঈয়্যা (১৪শ শতাব্দী), মুশারি'ঈয়্যা 'উরাবিয়্যা, পাক-ভারত ও বাংলাদেশে; বানাওয়া ও গুরয্‌মার; আনাতোলিয়ায় আশ্‌রাফিয়্যা, হিন্দিয়্যা, খুলূসিয়্যা, নাবুলুসিয়্যা, রুমিয়া ও ওয়াস্‌লাতিয়্যা; মিসরে ফারীদিয়্যা ও কাসিমিয়্যা (১৯শ শতাব্দী); মাগরিবে আম্মারিয়্যা, 'আরূসিয়্যা, বু'আলিয়্যা ও জিলালা; পশ্চিম সুদানে বাক্‌কাইয়্যা।

* কালান্দারিয়্যা– পারস্য দেশে উদ্ভূত ইতস্তত ভ্রমণকারী লোকদের তারীকা (সাবিজী, মৃ. ১২১৮); সিরিয়া ও পাক-ভারত-বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে (১৪শ শতাব্দী হইতে ১৬শ শতাব্দী)।

* কার্‌রা'ইয়্যা– তিউনিসিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকা (১৯শ শতাব্দী)।

* কার্‌যাযিয়্যা– তাফিলেল্‌ত-এ শাযিলিয়্যা তারীকার শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

কাস্‌সারিয়্যা– নবম শতাব্দীর মতবাদের সম্প্রদায় মালামাতিয়্যা।

কাযারূনিয়্যা–শীরাযে খাফীফিয়্যা তারীকা হইতে উদ্ভূত পারস্য দেশীয় তারীকা (মৃ. ১০৩৪)।

খাদিরিয়্যা– (খিদ্‌রিয়্যা) মরক্কো দেশীয় তারীকা (ইব্‌নু'দ-দাব্বাগ, মৃ. ১৭১৭)। ইহা হইতে আমীরানিয়্যা ইদ্‌রীসিয়্যা ও সানূসিয়্যা শাখাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

খাফীফিয়্যা–ইব্‌ন খাফীফের মতাবলম্বী দল (মৃ. ৯৮২), একটি কৃত্রিম ইস্‌নাদের জন্য পুনর্জীবিত হয়।

কাফিয়্যা–চীন ও তুর্কিস্তানে নাক্‌শবান্দিয়্যা তারীকার উপনাম (১৯শ শতাব্দী)। জাহ্‌রিয়্যা তারীকা দ্র.।

* খালীলিয়্যা–তিউনিসিয়্যা দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকা (১৯শ শতাব্দী)।

* খালাওয়াতিয়্যা– সুহ্‌রাওয়ারদিয়্যা তারীকার শাখা। খুরাসানে ইহার (জাহীরুদ-দীন, মৃ. ১৩৯৭) উদ্ভব হয় এবং তুরস্কে ইহা বিস্তার

লাভ করে। বহু প্রশাখায় ইহা বিভক্ত; যথা আনাতোলিয়ায় জার্‌রাহিয়্যা, ইগিত্‌বাশিয়্যা, 'উশ্‌শাকিয়্যা, নিয়াযিয়্যা, সুন্‌বুলিয়্যা, শামসিয়্যা, গুল্‌শানিয়্যা ও গুজা'ইয়্যা; মিসরে দায়ফিয়্যা, হাফ্‌নাবিয়্যা, সাবা'ইয়্যা, সাবিয়্যা, দার্দূ'ঈয়্যা, মাগাযিয়্যা, নুবিয়া, হিজায ও সোমালিয়ায় সালিহিয়্যা; কাবায়লিয়ায় রাহ্‌মানিয়্যা।

*খাম্‌মুসিয়্যা–তিউনিসিয়া দেশীয় তারীকা (১৯শ শতাব্দী) খার্‌রাযিয়্যা– আবূ সা'ঈদ খার্‌রাযের (মৃ. ৮৯৯) মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের তারীকা, তৎপর ১৫শ শতাব্দীতে তুরস্কের কৃত্রিম সনদে পরিচিত।

খাওয়াতিরিয়্যা–মাদানিয়্যা তারীকার হিজাযী শাখা (ইব্‌ন 'আর্‌রাক, মৃ. ১৫৫৬)।

খাওয়াজাগান–জুনায়দিয়্যা তারীকা হইতে উদ্ভূত পারস্য দেশীয় তারীকা; তুর্কিস্তানে (য়াসাবিয়্যা) ইহা বিস্তার লাভ করে (য়ূসুফ হামাযানী, মৃ. ১১৪০)।

কুব্‌রাবিয়্যা– জুনায়দিয়্যা তারীকা হইতে উদ্ভূত খুরাসান দেশীয় তারীকা (নাজ্‌ম কুবরা, মৃ. ১২২১); শাখাসমূহ 'আয়দারূসিয়্যা, হামাযানিয়্যা, ইগ্‌তিশাশিয়্যা, নূরবাখ্‌শিয়্যা, নূরিয়্যা, রুক্‌নিয়্যা।

কূনিয়াবিয়্যা–সাদর রূমীর (মৃ. ১২৭৩) মতাবলম্বী সম্প্রদায়, হাতিমিয়্যা তারীকা হইতে ইহা উদ্ভূত।

কুশায়রিয়্যা– কুশায়রীর (মৃ. ১০৭৪) সহিত সম্বন্ধযুক্ত ১৬শ শতাব্দীর কৃত্রিম সনদ। মাদানিয়্যা–শাযিলিয়্যা তারীকার প্রাথমিক নাম।

* মাদানিয়্যা–মিসুরাতায় দার্‌কাওয়া তারীকার ত্রিপলী দেশীয় শাখা (মৃ. ১৮২৩)।

মাদারিয়্যা–গৃহত্যাগী পাক-ভারতীয় ভ্রাম্যমাণ লোকদের তারীকা (শাহ মাদার, মাকানপুরে মৃ. ১৪৩৮)।

মাগ্‌রিবিয়্যা– সম্ভবত পারস্য কবি মাগ্‌রিবীর শাগরিদগণের সম্প্রদায় (মৃ. ১৪০৬)।

মালামাতিয়্যা–খুরাসানের একটি সম্প্রদায় (৯ম-১১শ শতাব্দী), ইহা ইরাকের সূফিয়্যা তারীকার বিরোধী। ১৬শ শতাব্দীতে কৃত্রিম সনদের জন্য এই নাম পুনর্জীবিত করা হইয়াছে।

মালামিয়্যা– (হাম্‌যাবিয়্যা) তুরস্কের বায়্‌রামিয্যা তারীকার শাখা (মৃ. ১৫৫৩)।

মানসূরিয়্যা–হাল্লাজিয়্যা।

মারাযিকা– আহ্‌মাদিয়্যা তারীকার শাখা (১৪শ শতাব্দী)।

মাশীশিয়্যা– মরক্কো দেশের সিদ্ধ পুরুষ ইব্‌ন মাশীশের শাগরিদগণের সম্প্রদায় (মৃ. ১২২৬); প্রথমে শাযিলিয়্যা তারীকার সহিত মিলিত ছিল। তৎপর ১৬শ শতাব্দীতে পৃথকভাবে দলবদ্ধ হইয়াছে।

* মাত্‌বুলিয়্যা–মিসর দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকা (মৃ. ১৪৭৫)।

মাওলাবিয়্যা– আনাতোলিয়ার তারীকা (জালালু'দ-দীন রূমী, কোনিয়ায় মৃ. ১২৭৩)। শাখাসমূহ পুস্তিনিশীনিয়্যা, ইর্শাদিয়্যা।

মিস্‌রিয়্যা–নিয়াযিয়্যা

মুহাম্মাদিয়্যা– কোন মধ্যস্থতা ব্যতীত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত ধর্মপরায়ণ সম্প্রদায়ের কৃত্রিম উপাধি। ১৬শ শতাব্দীতে 'আলী খাওওয়াস ও শা'রানী এই তারীকা ব্যবহার করেন। জাযূলীকৃত 'দালা'ইল' আবৃত্তি প্রসঙ্গে এই তারীকার উল্লেখ করা হয়।

মুহাসিবিয়্যা– হারিছ মুহাসিবীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ৮৫৯)।

মুরাদিয়্যা–ইস্তাম্বুলের তুরস্ক দেশীয় শাখা।

মুশারি'ইয়্যা–কাদিরিয়্যা তারীকার য়ামানী শাখা, ১৫শ শতাব্দী। মুতাবি'আ-আহমাদিয়্যা।

নাক্‌শাবান্দিয়্যা–তায়ফূরিয়্যা তারীকা হইতে উদ্ভূত বলিয়া কথিত তুর্কিস্তানের তারীকা। ইহার শাখাসমূহ চীন, তুর্কিস্তান, কাযান, তুরস্ক, পাক-ভারত ও জাভায় প্রচলিত আছে (বাহা'উদ-দীন, মৃ. ১৩৮৮)।

নাক্‌শবান্দিয়্যা– খালিদিয়্যা। তুরস্কে সংস্কার সাধিত (১৯শ শতাব্দী)।

* নাসিরিয়্যা– শাযিলিয়্যা তারীকার দক্ষিণ মরক্কো দেশীয় শাখা, তামগ্রুতে (১৭শ শতাব্দী) ইহার তিউনিসিয়া দেশীয় শাব্‌বীয়া প্রশাখাও প্রচলিত আছে।

* নি'মাতাল্লাহিয়্যা– কির্‌মান দেশে পারস্য দেশীয় শী'আ সম্প্রদায়ের একমাত্র তারীকা। কাদিরিয়া–য়াফি'ইয়া তারীকা হইতে উদ্ভূত (মৃ. ১৪৩০)।

নিয়াযিয়্যা–খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৬৯৩)।

নুবূবিয়্যা– সিরিয়া দেশে কারিগরদের তারীকা (১২শ শতাব্দী)।

নূরু'দ-দীনিয়্যা–জার্‌রাহিয়্যা।

নূরবাখ্‌শিয়্যা–কুব্‌রাবিয়্যা তারীকার খুরাসান দেশীয় শাখা (মুহাম্মাদ নূরবাখ্‌শ, মৃ. ১৪৬৫)।

নূরিয়্যা– নূরীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (মৃ. ৯০৭)।

নূরিয়্যা–রুক্‌নীয়া তারীকার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী শাখা (১৫ শতাব্দী)।

নূরিয়্যা– ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

পীর-হাজাত-আফগান দেশীয় তারীকা; এই তারীকাবলম্বিগণ নিজদিগকে আন্‌সারী হারাবীর (মৃ. ১০৮৮) তারীকাবলম্বী বলিয়া মনে করে।

* রাহ্‌হালিয়্যা– মরক্কো দেশীয় ভেলকিবাজদের তারীকা (১৬শ শতাব্দী)।

* রাহ্‌মানিয়্যা– কাবিলিয়ার খালওয়াতিয়্যা তারীকার শাখা (১৭৯৩)।

* রাশীদিয়্যা–আলজেরিয়া দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকা। য়ূসুফিয়্যা তারীকার বিরুদ্ধাচরণে ইহা গঠিত হইয়াছে (১৯শ শতাব্দী)।

* রাসূলশাহিয়া–গুজরাটের ভারতীয় তারীকা (১৯শ শতাব্দী)। রাওমানিয়্যা–তুরস্ক ও কায়রোর খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার শাখা (গুল্‌শানী, মৃ. ১৫৩৩)।

রাওশানিয়্যা–সুহ্‌রাওয়ার্‌দিয়্যা তারীকার আফগান শাখা (বায়াযীদ আনসারী, ১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে মৃত্যু)।

রিফা'ইয়্যা–দক্ষিণ ইরাক দেশীয় তারীকা (মৃ. ১১৭৫), ইহার বসরাস্থ কেন্দ্র হইতে দামিশ্‌ক ও ইস্তাম্বুলে পরিব্যাপ্ত। সিরিয়া দেশীয় শাখা হারীরিয়্যা, সা'দিয়্যা, সায়্যাদিয়া; মিসর দেশীয় শাখা বাযিয়্যা, মালিকিয়্যা ও হাবীবিয়্যা (১৯শ শতাব্দী)।

রুক্‌নিয়্যা–কুব্‌রাবিয়্যা তারীকার বাগ্‌দাদী শাখা ('আলাউ'দ-দাওলা সিম্‌নানী, মৃ. ১৩৩৬)।

রূমিয়্যা–আশ্‌রাফিয়্যা।

সাব'ঈনিয়্যা–ইব্ন সাব'ঈনের (মৃ. ১২৬৮) মতাবলম্বী গৃহত্যাগী সম্প্রদায়।

* সা'দিয়্যা–রিফা'ইয়্যা তারীকার সিরিয়া দেশীয় শাখা (সা'দুদ'-দীন বিজাবী, মৃ. ১৩৩৫)। শাখাসমূহ 'আবদু'স- সালামিয়্যা, আবু'ল-ওয়াফাইয়্যা।

* সাফাবিয়্যা–আর্দবীলের সুহ্‌রাওয়ারদিয়্যা তারীকার আযেরী শাখা (মৃ. ১৩৩৪)। ইহা হইতে পারস্য দেশীয় সাফাবী রাজবংশের কিযিলবাশীয় তারীকা উদ্ভূত হয়। অধিকন্তু ইহা হইতে তুরস্ক দেশীয় আরও বহু তারীকার উৎপত্তি হয়।

সাহ্‌লিয়্যা–সাহ্‌ল তুস্তারীর মতাবলম্বী সম্প্রদায় (সাহ্‌ল তুস্তারী, মৃ. ৮৯৬)। কৃত্রিম সনদের জন্য ১৬শ শতাব্দীতে এই নাম পুনর্জীবিত করা হয়।

সাকাতিয়্যা–১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সনদ (সাকাতী, মৃ. ৮৬৭)।

সালামিয়্যা– 'আরূসিয়্যা।

সালিমিয়্যা– সাহ্‌লিয়্যা (প্রথম অর্থে)।

* সাম্মানিয়্যা– শাযিলিয়্যা তারীকার মিসর দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* সানানিয়্যা–ক্ষুদ্র তারীকা (১৯শ শতাব্দী)।

* সানূসিয়্যা–সৈন্যদের তারীকা পূর্ব দেশীয় সাহারায় প্রথমে জাগ্‌বূব ও তৎপর কুফরায় খাদিরিয়্যা তারীকা হইতে উদ্ভূত (মৃ. ১৮৫৯)।

সাসানিয়্যা–সিরিয়া ও আনাতোলিয়া দেশে কারিগরদের তারীকা (১২শ-১৬শ শতাব্দী)।

সায়্যারিয়্যা–দশম শতাব্দীর মতাবলম্বী তারীকা।

* শা'বানিয়্যা–কাস্তমুনির খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫৬৯)।

* শাযিলিয়্যা– তেল্‌মসেনবাসী আবূ মাদ্‌য়ান (মৃ. ১১৯৭) ও তিউনিসবাসী 'আলী শাযিলী (মৃ. ১২৫৬) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তারীকা। মাগ্‌রিবের শাখাসমূহ গাযিয়্যা, হাবীবিয়্যা, কার্যাযিয়্যা, নাসিরিয়্যা, শায়খিয়্যা, সুহায়লিয়্যা, য়ূসুফিয়্যা, যাররূকিয়্যা ও মিয়ানিয়্যা; মিসর দেশীয় শাখাসমূহ বাক্‌রিয়্যা, খাওয়াতিরিয়্যা, ওয়াফাইয়্যা, জাওহারিয়া, মাক্‌কিয়্যা হাশিমিয়্যা, সাম্মানিয়্যা, আফীফিয়্যা, কাসিমিয়্যা, আরূসিয়্যা, হান্দুশিয়্যা, কাউকজিয়্যা; ইস্তাম্বুল, রুমানিয়া নুবিয়া ও কোমেরেসেও ইহার কতিপয় শাখা প্রচলিত আছে।

শাহ্ মাদারিয়্যা–মালাঙ্গ-মাদারিয়্যা।

* শায়খিয়্যা– শাযিলিয়্যা তারীকা-কে প্রদত্ত নাম ওরানিয়ার উলাদ সীদী শায়খ (১৯শ শতাব্দী)।

মাম্‌সিয়্যা–খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৬০১)=নূরিয়্যা-সীওয়াসিয়্যা।

* শারকাওয়া–বুজাদের জাযূলিয়্যা তারীকার মরক্কো দেশীয় শাখা (১৫৯৯)।

মারকাবিয়্যা–খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার মিসর দেশীয় শাখা (১৮শ শতাব্দী)।

শাত্তারিয়্যা–পাক-ভারত, সুমাত্রা ও জাভা দেশের তারীকা ('আবদুল্লাহ শাত্তার, মৃ. ১৪১৫ বা ১৪২৮)। শাখাসমূহ গাওছিয়্যা, 'উশায়কিয়্যা।

শূযিয়্যা– সাব'ঈনিয়্যা তারীকার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শতাব্দীর স্পেন দেশীয় গৃহত্যাগীদের তারীকা।

সিদ্দীকিয়্যা–প্রথম খলীফার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কৃত্রিম সানাদ (১৩শ শতাব্দীতে ইব্ন 'আতা'উল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ভাবিত)।

সিনান-উম্মিয়্যা– তুরস্ক দেশীয় তারীকা (মৃ. ১৬৬৮)।

সুহায়লিয়্যা– শাযিলিয়্যা তারীকার আলজিরিয়া দেশীয় শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

* সুহ্‌রাওয়ারদিয়্যা– 'আবদু'ল-কাহির সুহ্‌রাওয়ার্‌দী (মৃ. ১১৬৭) ও 'উমার সুহ্‌রাওয়ার্‌দী (মৃ. ১২৩৪) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাগদাদী তারীকা। প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়কে সিদ্দীকিয়্যা অর্থাৎ প্রথম খলীফার বংশধর বলা হয়। আফগানিস্তান ও পাক-ভারতে এই তারীকা, জামালিয়্যা, খাল্‌ওয়াতিয়্যা, রাওশানিয়্যা, সাফাবিয়্যা ও যামনিয়্যা।

* সুলতানিয়্যা– তুর্কিস্তানের তারীকা (১৯শ শতাব্দী)।

* সুন্‌বুলিয়্যা– খালওয়াতিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫২৯)।

* তাব্বাইয়্যা– তিউনিসিয়া দেশীয় তারীকা (১৯শ শতাব্দী)।

* তায়বিয়্যা–উয়েযানে অবস্থিত জাযূলিয়্যা তারীকার মরক্কো দেশীয় শাখা (মৃ. ১৭২৭)।

* তায়ফূরিয়্যা– দাসিতানী ও খুর্কানী মতাবলম্বী সম্প্রদায় (১১শ শতাব্দী)। প্রতিষ্ঠাতাগণ আবূ য়াযীদ তায়ফূর বিস্‌তামীর (মৃ. ৮৭৭) বংশসম্ভূত।

* তালিবিয়্যা–সেলীর (sale) মরক্কো দেশীয় ক্ষুদ্র তারীকা (১৯শ শতাব্দী; RMM. lviii. 143 তু.)।

তাল্‌কীনিয়্যা– ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

* তিজানিয়্যা– আলজিরিয়া ও মরক্কো দেশীয় তারীকা (মৃ. ১৮১৫)। তেমাসিম ও 'আয়ন মাহ্‌দী হইতে ইহা পূর্ব ও পশ্চিম সুদানে প্রসারিত।

* চিশ্‌তিয়্যা– ভারত ও আফগান দেশীয় তারীকা, আজমীরে ইহার কেন্দ্র (মৃ. ১২৩৬)।

তুহামিয়্যা-তায়বিয়্যা।

'উল্‌ওয়ানিয়্যা–১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সনদ। ৮ম শতাব্দীর জিন্দাদ জনৈক সাধক পুরুষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

উম্মী-সিনানিয়্যা–তুরস্ক দেশীয় তারীকা (মৃ. ১৫৫২)।

'উরাবিয়্যা–কাদিরিয়া তারীকার শাখা (১৬শ শতাব্দী)।

'উশায়কিয়্যা– শাওরিয়্যা তারীকার পাক-ভারতীয় শাখা (আবূ য়াযীদ 'ইশ্‌কী, মৃ. ১৫শ শতাব্দী)।

* 'উশ্‌শাকিয়্যা– খাল্‌ওয়াতিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (মৃ. ১৫৯২)।

উওয়ায়সিয়্যা– ১৬শ শতাব্দীর তুরস্ক দেশীয় কৃত্রিম সনদ, জনৈক সাহাবীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

* ওয়াফাইয়্যা– শাযিলিয়্যা তারীকার সিরিয়া ও মিসর দেশীয় সংস্কার সাধিত তারীকা (মৃ. ১৩৫৮)।

ওয়াহদাতিয়্যা– ইসলাম বিরোধী মতবাদ-উজুদিয়্যা-হাতিমিয়্যা।

ওয়ারিছ "আলী শাহিয়্যা–১৯শ শতাব্দীর শেষদিকের পাক-ভারতীয় তারীকা। অযোধ্যা প্রদেশে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

উসূলিয়্যা– ইসলাম বিরোধী মতবাদ।

য়াসাবিয়্যা–তুর্কিস্তানে খাওয়াজাগান তারীকার শাখা (য়াসাবী, মৃ. ১১৬৭);

য়ূনুসিয়্যা–সিরিয়া দেশীয় গৃহত্যাগীদের তারীকা (শায়বানী, মৃ. ১২২২)।

* য়ূসুফিয়্যা–মিলিয়ানার শাযিলিয়্যা তারীকার মাগ্‌রিবী শাখা (১৬শ শতাব্দী)।

য়ার্‌রূকিয়্যা–ফেজের শাযিলিয়্যা তারীকার শাখা (মৃ. ১৪৯৩)।

যায়নিয়্যা– ব্রুসার সুহ্‌রাওয়ারদিয়্যা তারীকার তুরস্ক দেশীয় শাখা (খাওয়াফী, মৃ. ১৪৩৫)।

* যিয়ানিয়্যা– শাযিলিয়্যা তারীকার মাগরিবী শাখা (১৯শ শতাব্দী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধগর্ভে প্রদত্ত বরাতসমূহ ছাড়া (১) G. Pfannmuller. Handbuch der Islam-Literature, 1923, p. 292-315। বেক্‌তাশিয়্যা, চিশ্‌তিয়্যা, দের্‌কাবিয়্যা দার্‌বেশ, যিক্‌র, ফুতুওয়া, হাল্লাজ, কাদিরিয়া, কালান্দারিয়্যা, কাযারূনী, মাওলাবিয়্যা, নাক্‌শ্‌বান্দ, নুরবাখ্‌শিয়্যা, রাহ্‌মানিয়্যা, রিফা'ঈ, সা'দিয়্যা, সালিমিয়্যা, সানূসী, শাদ্দ, শাযিলিয়্যা, শাত্‌হ, শাত্তারিয়্যা, তীজানিয়্যা, যাবিয়্যা প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্র.।

L. Massignon (S.E I.[1])/আবদুল খালেক

তা'রীখ (تاريخ) ঃ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা ঃ (১) সাধারণভাবে ইতিহাস অর্থে, যেমন ঐতিহাসিক বিবরণী (annals), সময়ানুক্রমিক ও ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ (Chronicles)। অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক রচনাবলীর শিরোনামে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যথা তাক্‌মিলাতু তা'রীখি'ত-তাবারী [তাবারী-র ঐতিহাসিক বিবরণীর সংযোজন supplement)]; তা'রীখু বাগদাদ, তা'রীখু মক্কা, তা'রীখু'ল আন্দালুস (স্পেনের ইতিহাস) ইত্যাদি। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের গ্রন্থসমূহের শিরোনামেও এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা ভারতের জ্ঞান জগতের অবস্থান সম্পর্কে রচিত আল-বিরূনীর তা'রীখু'ল-হিন্দ বা বিশেষ ধরনের চরিতাভিধান, যথা ইবনু'ল-ক্বিফ্‌তী রচিত তা'রীখু'ল-হুকামা' যাহাতে প্রাচীন দার্শনিকগণ ও গ্রীক ঐতিহ্যের আরব অনুলেখকগণের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জীমূলক বিবরণ রহিয়াছে। (২) তা'রীখ অর্থে বুঝায় অব্দ, গণনা (Computation), তারিখ ইত্যাদি। নিজস্ব হিজরা [দ্র.] অব্দ ব্যতিরেকে মুসলিমদের মধ্যে অন্য কয়েকটি অব্দ প্রচলিত আছে, যেমন সৃষ্টির বা পৃথিবীর অব্দ (তা'রীখু'ল-'আলাম)। এই অব্দটি কাল গণনার পক্ষে খুবই অনিশ্চিত। এই ব্যাপারে অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে য়াহূদী, খৃস্টান ও Magi (মাজূসী)-দের মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল-বীরূনী ও খৃস্টান ঐতিহাসিক আবু'ল-ফারাজ (Bar-Hebraeus) য়াহূদীগণের এইজন্য নিন্দা করিয়াছেন যে, তাহারা পৃথিবী সৃষ্টির পরবর্তী বৎসরগুলির সংখ্যা এমনভাবে হ্রাস করিয়াছে যাহাতে যীশুর জন্ম তারিখ তৎসম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ না থাকে। এইভাবে য়াহূদীগণ আদমের পুত্র Seth (শীছ)-এর জন্ম তারিখ ১০০ বৎসর অগ্রে নির্ধারণ করিয়াছে এবং Abraham (ইব্‌রাহীম) পর্যন্ত অন্যান্য কুলপতি (Palriarch)-র ক্ষেত্রেও একই পন্থা অনুসরণ করা হইয়াছে যাহাতে Torah-তে প্রদত্ত সৃষ্টি অব্দ হইতে Messiah (মাসীহ)-এর যুগ পর্যন্ত বৎসর সংখ্যা ৫,৫৮৬-এর স্থলে ৪,২১০ বৎসর নির্দেশ করা হইয়াছে।

আল-বীরূনীর মতে য়াহূদীগণ আলেকজান্দ্রীয় অব্দের ১৩৩৫ সালের শেষে মাসীহ-এর আবির্ভাব প্রত্যাশা করিতেছিল; সেই হিসাবে সাধারণ্যে প্রচলিত মতে এই অব্দের ৩১১ সালে মাসীহ জন্মগ্রহণ করেন। নূহ (আ)-এর সময়কার মহাপ্লাবনের অব্দ সম্পর্কেও য়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই প্রসংগে ফরাসী বিজ্ঞানী Maurice Bucaille-এর "The Bible, the Qur'an and Science (The Holy Scripture examined in the Light of Modern Knowledges, Taj Company, Delhi 1985) গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ এই গ্রন্থকারের একটি বাক্য উদ্ধৃত করা যথেষ্ট মনে হয়; সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে Old Testament-এর Genesis অধ্যায়ে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেই সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ "It's a masterpice of inacuracy from a Scientific Point of view." অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহা সেরা ভ্রমাত্মক বিবরণ" (পৃ. ৪০)। Bucaille স্পষ্টাক্ষরে বলেন, (পৃ. ১৬) "পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের আনুমানিক কোন তারিখ আমাদের জানা নাই। যাহা হউক, আমরা মনুষ্যকর্মে এমন কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছি যাহার তারিখ নিঃসন্দেহে খৃ. পূ. দশ শতাব্দীর পূর্বে... বিজ্ঞান ভবিষ্যতে আমাদিগকে নির্ভুল গণনার তথ্য সরবরাহ করিবে; কিন্তু আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, খৃ. ১৯৭৫ সনের Hebruic Calender-এ যেমন বলা হইয়াছে, ৫,৭৩৬ বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ আত্মপ্রকাশ করে, এইরূপ ভুল তথ্য বিজ্ঞান সরবরাহ করিবে না।

জ্যোতির্বিদ আবূ মা'শার তাঁহাদের কানূন গ্রন্থে আলেকজান্দ্রীয় অব্দের ব্যবহার করিয়াছেন Ptolemy অনুষঙ্গীরূপে (Concurrently) Callipus-এর Cycles-এর সহিত Nebuchadnezzar (প্রথম বুখ্‌ত্‌নাসার-এর অব্দ তাঁহার Almagesta-তে ব্যবহার করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার Theon তাঁহার কানূনে আলেকজাণ্ডারের পিতা Philip Arrhidaeus-এর অব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর বার বৎসর পর Seleucus Nicator-এর ব্যবিলনে প্রবেশের তারিখ হইতে যাহার গণনা শুরু হয়, মাসগুলির গ্রীক নামসমেত সেই আলেকজান্দ্রীয় অব্দ বা সেলুসীয়দের (Seleucids) অব্দ সিরীয়দের ও য়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে (era of the Contracts)। সামান্য পরিবর্তনসহ রূমীগণও ইহার ব্যবহার করিতেন। মুহাম্মাদ (স) আলেকজান্দ্রীয় অব্দের ৮১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। Augustus-এর একটি অব্দ যাহা Antonius-এর অব্দ ছিল, তারকাসমূহের অবস্থান সংক্রান্ত ভুল সংশোধনের জন্য Ptolemy কর্তৃক এই অব্দ ব্যবহৃত হয়। পারস্যে ও Zoroastrian (মাজূসী)-দের মধ্যে Yezdedjird III-এর দুইটি অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, একটি তাঁহার সিংহাসন আরোহণের, অপরটি তাঁহার মৃত্যুর দিন হইতে শুরু হইয়াছে।

মুসলিম শাসনাধীন পারস্যে বর্ষপরবীতে একটি আকর্ষণীয় সংস্কার সাধিত হয়। খলীফা আল-মু'তাদিদ নাওরোয বা পারসিকদের নববর্ষের আমদানি করেন। Intercalation (পঞ্জিকার দিনগুলির মধ্যে অতিরিক্ত দিন যোগ করা) রহিত করার দরুন এই অব্দটিকে অত্যধিক পশ্চাদগামী করা হয় যাহাতে ইহা কৃষিকার্যের সহিত অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ হয়। ঈল্‌খানীদের অব্দ (খানিয়ান) পারস্যে প্রবর্তিত হয় গাযান মাহ্‌মূদ কর্তৃক রাজাব ১, খৃ. ৭০১ সালে। ইহা ছিল একটি সৌর অব্দ। অন্য সংস্কারটি ছিল সাল্‌জূক সুলতান মালিক শাহের। তিনি জালালী অব্দের প্রবর্তন করেন। 'উছমানীগণ ১ মার্চ, ১৬৭৬ (পুরাতন পদ্ধতিমতে) জুলিয়ান (Julian) বর্ষপঞ্জীভিত্তিক একটি সৌর বর্ষপঞ্জী গ্রহণ করেন এবং উহাকে 'উছমানী "আর্থিক বর্ষপঞ্জী" নামে অভিহিত করেন। Julian বর্ষ চান্দ্র বৎসরের প্রায় ১১ দিন পূর্বে শুরু হইত এবং ইহার তারিখসমূহ

হিজরী সনের তারিখের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ থাকিত না। বাদশাহ আকবার তাঁহার রাজত্বকালের ৩০তম বর্ষে ইলাহী অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ৫ রাবী'-২, ৯৬৩/১৯ ফেব্রু, ১৫৫৬ তাঁহার সিংহাসনারোহণের দিন হইতে গণনা করা হয়; ইহার বর্ষগুলি সৌর বর্ষ। আধুনিক কালে মুখ্‌তার পাশা গাযী লক্ষণীয় সূক্ষ্মতাসম্পন্ন অপর একটি সৌর পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন। ইহাতে ১০০ শতাব্দীতে মাত্র দিনের ০.২৮ অংশের ভুল থাকিবে। ১৯২৬ সালে কামালপন্থী তুর্কীগণ হিজ্‌রী বর্ষপঞ্জী বর্জন করিয়া য়ুরোপীয় পদ্ধতি গ্রহণ করে।

সন-তারিখ সম্পর্কে বলিতে গেলে জুম্মাল (Chronogram)-এর কথা উল্লেখের দাবি রাখে; সাহিত্যধর্মী রচনায় কখনও কখনও ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আবজাদ (ابجد) হিসাবে অক্ষরসমূহের সাংখ্যিক মানের যোগফলের মধ্যে সন নিহিত থাকে, যেমন نجاة الخلق من الكفر بمحمد (মুহাম্মদের কল্যাণে কুফ্‌র হইতে মানবতার মুক্তি) বাক্যটিতে অক্ষরগুলির সংখ্যাগত মান যোগ করিলে হয় ১৩৩৫ (আল-বীরূনী হইতে একটি উদাহরণ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বীরূনী, Chronology of ancient nations, সম্পা. ও অনু. E. Sachau, লণ্ডন ১৮৭৯ খৃ., ৩খ ও স্থা.; (২) আবু'ল-ফারাজ, তা'রীখ মুখ্‌তাসারি'দ-দুওয়াল, সম্পা. সালহানী, বৈরূত ১৮৯০ খৃ.; (৩) E. Lacoine, Table de Concordance des dates des Calendriers arabe, copte, gre'gorien, isroelite ইত্যাদি, প্যারিস ১৮৯১ খৃ.।

B. Carra De Vaux (E.I. [1])/ মুহঃ আবু তাহের

তা'রীখ (تاريخ) ঃ (দ্বিতীয় নিবন্ধ), আ., যুগ, হিসাব, সময় নির্ধারিতকরণ (তারিখ, date)। তা'রীখ শিরোনামযুক্ত প্রথম নিবন্ধের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট زمان (যুগ, সময়) শিরোনামে আসিয়াছে এবং তা'রীখ শিরোনামযুক্ত প্রথম নিবন্ধটি 'যামান' শিরোনামযুক্ত নিবন্ধের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলেই সঠিকভাবে উপকৃত হওয়া যাইবে। এই শিরোনামটিকে 'তা'রীখ' শিরোনামযুক্ত প্রথম নিবন্ধ এবং 'যামান' শিরোনামযুক্ত দ্বিতীয় নিবন্ধ অর্থাৎ এই উভয় নিবন্ধের পরিশিষ্ট মনে করিতে হইবে। ইহার মধ্যে সময়ে সময়ে আমরা এই বিষয়ের জন্য অপরিহার্য অন্যান্য অনেক শিরোনামের উদ্ধৃতি দিব।

তা'রীখ শব্দটি و-ر-خ শব্দমূল হইতে নির্গত, ইহার ব্যবহার সকল সামী ভাষায় দৃষ্ট হয়। যেমন হিব্রু ভাষার শব্দ يارے اح 'চন্দ্র' ও يبرح মাস-এ এই শব্দমূল বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অনুমান করিলে তা'রীখ-এর অর্থ হইবে 'মাস নির্দিষ্ট করা"। একদিকে যেমন তা'রীখ-এর অর্থ কোন ঘটনার সময় নির্দিষ্ট করা এবং ঘটনাবলীর কার্যবিবরণী, অপরদিকে ইহার অর্থ ঘটনাসমূহের তা'রীখ (Date), যুগ (era) ও কালক্রম নির্ধারণ (Chronology)। এই সম্পর্কে আল-বীরূনী'র বর্ণনায় একটি মনোজ্ঞ বিবরণ বিদ্যমান (আল-আছারু'ল বাকিয়্যা, সম্পা. Sachau, পৃ. ২৯)। অনুরূপ বিবরণ আল-খাওয়ারিয্‌মী-র "মাফাতহু'ল- 'উলূম'-এ বিদ্যমান (সম্পা. van vloten, ৭৯), কিন্তু এই বিবরণ পূর্ববর্তী বিবরণকে সরাসরি খণ্ডন করে। এই বর্ণনা অনুযায়ী 'তা'রীখ' শব্দটি ফারসী ভাষার শব্দ "ماه روز"-এর আরবী রূপ। ইহার মধ্যেও একটি সন্দেহজনক বিষয় লক্ষণীয় যে, এই শব্দটিকে 'মাস'-এর শুরুর শনাক্তকরণে ব্যবহার করার মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক অবশ্যই রহিয়াছে। সম্ভবত এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঐ বর্ণনার সংযোগ রহিয়াছে, যে বর্ণনায় (অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনাটি উধৃত করিয়াছেন) দেখা যায় যে, ইসলামী সালের হিসাব হিজরতের বৎসর হইতে আরম্ভ করার জন্য আল-হুরমুযান (দ্র.) হযরত 'উমার (রা)-কে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও তু. আল-বীরূনী, পৃ. স্থা.।

'যামান' শীর্ষক নিবন্ধে আল-বীরূনী হইতে গৃহীত মাসসমূহের প্রাচীন আরবী নাম Sachau সম্পাদিত আবছার গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে লওয়া হইয়াছে। এই নাম সামান্য পরিবর্তনসহ, যাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা যায় না, ঐ গ্রন্থের পৃ. ৬০ হইতে পৃ. ৬২-এ উল্লিখিত তালিকা ও কবিতাতেও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ইহার পর গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় আল-বীরূনী ছামূদ জাতির মাসসমূহের নাম উল্লেখ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আবূ সাহ্‌ল 'ঈসা ইব্‌ন য়াহ্‌য়া আল-মাসীহী (এই সম্পর্কে তু. Sachau-এর ভূমিকার উপর 'আল-আছারু'ল-বাকিয়্যা, পৃ. ৩২; আরও তু. ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, সম্পা. Muller, ১খ, ৩২৭ প. ও ব্রুকেলম্যান G.A.L., ১খ, ২৩৮) কর্তৃক মাসের ঐ নামসমূহের সমন্বয়ে রচিত ও সহজে মুখস্থযোগ্য কবিতার কথাও উল্লেখ করেন। ঐ কবিতায় মাসসমূহের প্রতিদিনের নামও ছিল, তু. আল-বীরূনী, পৃ. ৬৪।

সপ্তাহের সাত (৭) দিনের প্রাচীন 'আরব নাম সম্পর্কে তু. Fischer, Z. D. M. G., ৫০ খ, ২২০-২২৬। ২৪ ঘণ্টার একক সময়কে একদিন (য়াওম= يوم) বলা হয় এবং রাত (ليل) হইতে পার্থক্য করার জন্য বলা হয় নাহার (نهار) "য়াওম ওয়া লায়লা" (يوم وليلة)-এর শব্দবিন্যাসে য়াওম (يوم) শব্দটি সকল সময় লায়লা (ليلة) শব্দের পূর্বে বসে। কিন্তু নাহার (نهار) শব্দটি সকল সময় লায়ল (ليل) শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ Fischer নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেন, "tag und Nacht im Arabischen und die semit. tagesberechnung" (Abh. Phil-hist. KL. d. Sachs, ges d. Wiss. zvii, No. 21), ১৯০৯ খৃ.। 'য়াওম ওয়া লায়লা' (দিন ও রাত্রি) প্রাচীন সামী গণনাবিধি অনুযায়ী হয় যাহার হিসাবে এক সূর্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সূর্যাস্ত পর্যন্ত একদিন গণনা করা হয়। কিন্তু রাত্রি ও দিনের (লায়ল ওয়া নাহার-ليل ونهار) এই গণনা পদ্ধতি পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ এক সন্ধ্যা হইতে পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত যাহা চান্দ্রবর্ষের সঙ্গে সম্পর্কিত। يوم -কে এক সার্বিক পরিভাষা মনে করা হয় এবং এইজন্য ইহাকে আগে রাখা হয়। কিন্তু নাহার (نهار)-এর দ্বারা সময়ের এমন এক ধারণা বুঝায়, যাহা দিবস (يوم)-এর রূপ কেবল ঐ অবস্থায় পরিগ্রহ করে যখন ইহা রাত্রি (ليل)-এর সহিত একসঙ্গে উল্লিখিত হয়। ফলে বিন্যাসগত কারণে ইহা দ্বিতীয় স্তরে এবং এই বিন্যাসকেই সঠিক মনে করা হইত।

আয়্যামু'ল-ফিজার (ايام الفجار)-এর অর্থ "আয়্যাম গাদ্দারী" (বিশ্বাসঘাতকতার দিন) নহে, বরং ইহার অর্থ পবিত্র মাসসমূহের অসম্মান করা অর্থাৎ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা [দ্র. ফিজার (فجار), অবশ্য একটি বৎসরের নাম "আমু'ল গাদ্‌র (عام الغدر) ছিল, আল্-বীরূনী, পৃ. ৩৪, পংক্তি ৮; Ginzel, Handbuch der Chronologie, ১খ, ২৫১-এ ইহা বিশদভাবে উল্লিখিত হয় নাই]। আল-বীরূনী প্রদত্ত তারতীব অনুযায়ী (পৃ. গ্র., পংক্তি ১০) এই বিশ্বাসঘাতকতা 'আমুল-ফীল (عام الفيل-হস্তির বৎসর)-এর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল, তথাপি 'ফিজার' সংক্রান্ত ঘটনার সাধারণত যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা মহানবী (স)-এর যৌবনকালের ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হিজরত ও ইসলামী বর্ষপঞ্জী সম্পর্কে দ্র. 'হিজরত' ও 'নাসী' (نسيء) প্রবন্ধদ্বয়। প্রথম হিজরীর মুহাররাম মাসের ১

তারিখ কোন্ দিন ছিল, বিষয়টি অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে মীমাংসিত হয় নাই এবং Buhl-এর গ্রন্থেও (Buhl, Das Leben Muhammeds, অনু. H. H. Schaeder, ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৯৬) এমন কোন তথ্য সন্নিবেশিত হয় নাই যাহার মাধ্যমে ইহার নিরসন হইতে পারে। Babinger, G. O. W. (তু. M. O. G., 2U, 269)-এর অনুসরণ করিয়া J. Mayr এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ১৫ জুলাই, ৬২২ খৃ. প্রকৃতপক্ষে প্রথম হিজরী বর্ষের প্রথম দিন ছিল। পরবর্তী সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে সমস্যার সৃষ্টি হইলে ইহা দূরীভূত করার লক্ষ্যে হিন্দী গণনায় প্রতি তিন বৎসরে, বৎসরের অতিরিক্ত দিনসমূহ সংযোজিত করিয়া তৈরীকৃত ত্রয়োদশ মাসের মত কোন দিন সংযোজন না করিয়া ঐ ১৫ জুলাই তারিখকে ১৬ জুলাই তারিখে পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়। Babinger এক সংযোজনে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ১ম সালীম-এর সময় পর্যন্ত ১৫ জুলাই তারিখকেই ১ মুহাররাম তারিখ হিসাবে মান্য করা হইত। 'আশিক পাশা যাদা, পৃ. ২৭৩, পংক্তি ৯-এ যে বৃহস্পতিবারের কথা লিখিয়াছেন, ইহা দ্বারা তাহাই বুঝা যায়। মিসর বিজয়ের পর ১৬ জুলাই হইতে ১ মুহাররাম গণনা করা আরম্ভ করা হয়, কিন্তু এই তথ্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। Wustenfield ও Muller-এর (Vergleichungstabellen) বর্ণনায় হিজরী বর্ষ ১৬ জুলাই হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও Muller নিজে ইহা সঠিক বলিয়া মনে করেন না (তু. ২য় সংস্করণ, ১৯২৬ খৃ.-এর ভূমিকা; আরও তু. প্রবন্ধ যামান)। যাহা হউক এই আলোচনা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোন ইসলামী তারিখ ঐ সময়ে নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট হইতে পারে, যখন জানা যায় যে, ঐ দিন সপ্তাহের দিনগুলির কোন্ দিন ছিল; কেননা ১৫ জুলাই, ৬২২ খৃ. বৃহস্পতিবার ছিল এবং ১৬ জুলাই শুক্রবার ছিল (আরও তথ্যের জন্য দ্র. Ginzel, ১খ, ২৫৮ প.)।

ইসলামী মাসসমূহের নাম (তু. যামান) মরক্কো এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্তন কোথাও আংশিক, কোথাও সম্পূর্ণ, তু. Ginzel, ১খ, ২৫৩ (মরক্কো) এবং ৪১৭ (জাভা) এবং ৪২৭ (অন্যান্য দ্বীপ)। মাদাগাস্কারে (দ্র.) মাসসমূহের জন্য ১২টি পশুর নাম ব্যবহৃত হয়, যাহা পালাক্রমে বিন্যস্ত করা হইয়াছে এবং কখনও কখনও এমন সকল নাম রাখা হইয়াছে যাহা সংস্কৃত হইতে গৃহীত অন্যান্য তথ্যের জন্য মাসসমূহের নাম সম্পর্কে আলোচনা সম্বলিত বিভিন্ন নিবন্ধ দ্র.।

প্রতি মাসের প্রারম্ভ যদি চন্দ্র দর্শনের দ্বারা নিরূপণ করা হয় তাহা হইলে "কাশ্‌শাফু ইসতিলাহাতি'ল-ফুনুন" (সম্পা. Sprenger, শিরো. তা'রীখ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী অধিক হইলে চারি মাস ৩০ দিন করিয়া এবং তিন মাস ২৯ দিন করিয়া একের পর এক পর্যায়ক্রমে আসা সম্ভব। ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য সৌর বৎসর চালু করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাহার সম্পর্কে তু. Ginzel, ১খ, ২৬৪ প.; আল-বীরূনী, ৩১প, এবং ৬৮; (A. V. Gutschmid); Kl. Schr. ii (১৮৯০ খৃ.); ৪১৫, ৫১৩, ৭৫৭।

হযরত নূহ ('আ.)-এর তুফান হইতে শুরু হওয়া তারিখের জন্য (তারীখু'ত-তূফান, তু. শিরো. তা'রীখ), দ্র. আল-বীরূনী, পৃ. ২৩ প. ও তালিকা, পৃ. ১৩৭, তাঁহার বক্তব্য অনুযায়ী জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ ঐ বৎসরের প্রারম্ভকে শনি গ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের প্রথম সম্মিলনের সময় হইতে নির্দিষ্ট করেন, যাহা হযরত নূহ ('আ)-এর তুফান হইতে ২২৯ বৎসর ও ১০৮ দিন পূর্বে হইয়াছিল। রাজা ১ম বুখ্‌তনাস্‌র হযরত নূহ ('আ)-এর তুফানের ২,৬০৪ বৎসর পরে সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন (কিন্তু তালিকাতে উভয় যুগের মধ্যে ৮,৬০,১৭৩ দিনের পার্থক্য বিদ্যমান। এইজন্য ২,৬০৪ বৎসর দৃশ্যত শনি গ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের সম্মিলনের তারীখ হইতে গণনা করা হইয়াছে)। বুখ্‌ত নাস্‌র ও হামতি আলেকজাণ্ডার অর্থাৎ Seleucid যুগের মধ্যে ৪৩৬ বৎসরের ব্যবধান বিদ্যমান। আবূ মা'শার-এর মতে হযরত নূহ ('আ.)-এর তুফান এমন সময় আসে, যখন সকল তারকা শেষ মীন এবং ১ম মেষ রাশিতে ছিল অর্থাৎ ২,৭৯০ সৌর বৎসর ৭ মাস ২৬ দিন আলেকজাণ্ডারীয় তারীখ হইতে পূর্বে। আল-বীরূনী (পৃ. ২৫) উভয় গণনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। যদি উপরে উল্লিখিত ২,৬০৪ বৎসরের গণনা শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের সম্মিলন হইতে গণনা করা হয় (অর্থাৎ ঐ তুফান, বুখ্‌ত নাস্‌র-এর ২,৬০৪-২২৯-২,৩৭৫ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়) তাহা হইলে প্রায় একই রকম ফল পাওয়া যায়।

বুখ্‌ত নাসর (দ্র.)-এর তারিখকে প্রাচীন কিব্‌তী তারিখও বলা হয় (কাশ্‌শাফু ইস্‌তিলাহাতিল ফুনূন, ১খ, ৫৯, পংক্তি ১২), এই বর্ষের প্রারম্ভ Seleucid পঞ্জীর শুরু [অর্থাৎ ২৬ ফেব্রুয়ারি, ৭৪৭ খৃ. পূ., Ginzel-এর মতে ১খ, ১৪৩] হইতে আল-বীরূনীর মতে ১,৫৯,২০২ দিন পূর্বে এবং Schram-এর মতে ১,৫৯,৪৩৬ দিন পূর্বে হয় অর্থাৎ উপরে উল্লিখিত ৪৩৬ বৎসর অনুযায়ী এই সনসমূহে মাসের নাম 'কিব্‌তী'। বৎসরে ১২টি মাস এবং প্রতি মাসে ৩০ দিন। ইহা ব্যতীত অধিবর্ষের মত শেষ মাসে অতিরিক্ত পাঁচদিন যোগ করা হইত। Philippic বৎসর ও মাসসমূহ এই নিয়ম অনুযায়ী গণনা করা হয়। কিন্তু ৪২৪ বৎসর (=১, ৫৪, ৭৬০ দিন আল-বীরূনীর মতে, পৃ. ১৩৭) পরে আরম্ভ হইয়াছে (Ginzel, ১খ, ১৪৭), ইহা প্রারম্ভ খৃ. পূ. ৩২৪ অব্দের ১২ নভেম্বর।

আলেকজাণ্ডারীয় তারিখকে নব্য কিব্‌তী বৎসরও বলা হয় (কাশ্‌শাফু ইস্‌তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১খ, ৫৮)। ইহার প্রারম্ভ Seleucid যুগ হইতে ২,১৭,২৯১ দিন, কিন্তু আল-বীরূনী-র মতে (আছার, পৃ. ১৩৭) ২,১৯,২৪২ দিন ও তাফহীম' [পৃ. ১৭৪] ২,১৭,৪১৫ দিন এবং Schram-এর মতে ২,১৭,৩২১ দিন পর। Seleucid পঞ্জীর অর্থ Diocletion-এর আমলের Seleucid তারিখ অর্থাৎ Ginzel-এর Diocletion-এর তারীখ (তু. আল-আছারু'ল-বাকিয়্যা, ১খ, ২২৯, আরম্ভ ২৯ আগস্ট, ২৮৪ খৃ.), প্রকৃতপক্ষে আলেকজাণ্ডারীয় যুগ সিজার অগাস্টাস-এর শাসনকাল হইতে আরম্ভ হয় (Ginzel, ১খ, ২২৪ প.) এবং এই মতে ইহার প্রারম্ভিক কাল খৃ. পূ. ২৭ অব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি।

Seleucid যুগের প্রারম্ভ, কাশ্‌শাফু ইস্‌তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১খ, ৫৭-এর তথ্য অনুযায়ী হিজরতের ৩,৪০,৭০০ দিন, আল-বীরূনী-র মতে ৩,৪০,৭০১ দিন, Schram-এর মতে ৩,৪০৭৩১ দিন পূর্বে ছির এবং Ginzel-এর মতে (৩খ, ৪১) ঐ দিনটি খৃ. পূ. ৩১২ অব্দের ১ সেপ্টেম্বর [তু. উপরোল্লিখিত পংক্তিসমূহ] ছিল। এই তারিখ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর (খৃ. পূ. ৩২৩ অব্দ) পূর্ণ ১২ সৌর বৎসর পরে এক সোমবারে আরম্ভ হয়, কিন্তু অন্যদের মতে আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনারোহণের ছয় বৎসর পরে আরম্ভ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, আলেকজাণ্ডারের শাসনকালের প্রথমে এই সনের আরম্ভ হয় (ইহা ঐ সাধারণ ভুল, যাহার ভিত্তিতে মহামতি আলেকজাণ্ডার ও ৪র্থ আলেকজাণ্ডার Aigos-কে পরস্পরে তালগোল পাকাইয়া দেওয়া হয়)। আল-বীরূনী'র মতে (পৃ. ২৮) মহামতি আলেকজাণ্ডার যখন দারা-এর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করার মানসে গ্রীসের শহর হইতে বাহির হন,

তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ২৬ বৎসর। তিনি বায়তু'ল-মাকদিসে আসিয়া হযরত মূসা ('আ) ও হযরত দাউদ ('আ)-এর বর্ষপঞ্জী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ২৭ বৎসর বয়স (আলেকজাণ্ডারের) হইতে এক নূতন বর্ষপঞ্জী আরম্ভ করার জন্য য়াহূদীদেরকে নির্দেশ দান করেন। য়াহূদীরা তাঁহার নির্দেশ পালন করিল। কিন্তু নূতন বর্ষপঞ্জী গণনা আরম্ভ করিল আলেকজাণ্ডারের ২৪ বৎসর বয়স হইতে। কেননা ধর্মযাজকদের পক্ষ হইতে হযরত মূসা ('আ)-এর পরে প্রতি এক হাজার বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর তারিখ পরিবর্তন করার অনুমোদন তাহাদের ছিল এবং আলেকজাণ্ডারের ২৪ বৎসর বয়সে এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল (আরও তু. Ginzel, ১খ, ১৭৬, ২৬৩, মাসসমূহের জন্য পৃথক শিরোনাম দ্র.)।

ইরানী পঞ্জিকার বিশ্লেষণ এখনও সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। ইহা সঠিক যে, প্রাচীন ইরানী বৎসরসমূহও ১২ মাসসম্বলিত সৌর বৎসর ছিল। এই বৎসরসমূহের ১২ মাসের প্রতিটি মাস ৩০ দিনে হইত এবং ইহা ব্যতীত বৎসরে অতিরিক্ত পাঁচ দিন যোগ করিয়া ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হইত। প্রতি মাসের দিনসমূহের নাম নির্দিষ্ট ছিল। নামসমূহের ঝান্দ ও পাহলাবী পদ্ধতি Ginzel, ১খ, ২৮১-এ বর্ণিত রহিয়াছে এবং বর্তমান ইরানী নাম আল-বীরূনীর (আল-আছারু'ল-বাকিয়্যা)-এ বিদ্যমান। প্রতি মাসের ৮ম, ১৫তম, ২৩তম দিনের একই নাম হইত (নিম্নের বর্ণনা দ্র. আল-বীরূনীর মতে, পৃ. ৪৬ প., সুগদী ও খাওয়ারিয্‌মীদের মধ্যেও অনুরূপ বিধি প্রচলিত ছিল, দ্র. Ginzel, ১খ, ৩০৭ প.; খাওয়ারিয্‌মীদের পঞ্জিকা সম্পর্কে দ্র. খাওয়ারিয্‌ম প্রবন্ধ)। মাসসমূহের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল (ঐ সকল দিনের নাম পৃথক পৃথক উপাদান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের এই প্রবন্ধে যেই সকল নামের মূল বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল নামে * তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে ঃ- * ফারওয়ারদীন, (فروردين) (১৯); * মুরদায (مرداذ) (৭); * আযার (اذر) (৯) * উরদী বিহিশ্‌ত, (اردى بهشت) (৩); * শাহরীর (شهريور) (৪); *দায় (دے) (৮, ১৫, ২৩); * খুরদাদ (خرداد) (৬); * মিহ্‌র (مهر) (১৬); * বাহ্‌মান (بهمن) (২); তীর (تير) (১৩); "আবান (ابان) (১০); ইসফান্দারমুয (اسفندارمذ) (৫); ঐ নামসমূহের অর্থের জন্য দ্র. Ginzel, ১খ, ২৭৮ প.।

মাসসমূহের সকল নাম দিনসমূহের নামের আকারেও পাওয়া যায়। যেমন, ঐ দিনের সংখ্যা, যাহা মাসেরও নাম দুই বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে উহাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য মাস অর্থ হইলে নামের শেষে ماہ শব্দ এবং দিন অর্থ হইলে শব্দের শেষে روز শব্দটি বর্ধিত করিয়া দেওয়া হয়। যে দিন ও মাসের নাম এক, সেই দিনকে উৎসবের দিন মনে করা হইত; তু. Ginzel-এর আলোচনা, ১খ, ২৮৯ প.।

যেহেতু ৩৬৫ দিনের সৌর বৎসর ট্রপিক (tropic) বর্ষ হইতে প্রায় ৬ ঘণ্টা কম হয়। এইজন্য বিভিন্ন ঋতুর সঙ্গে ইহার সংযোগ তখনই অপরিবর্তনীয় থাকিতে পারে, যখন প্রতি চারি বৎসর পরে একদিন বর্ধিত করিয়া দেওয়া হয় অথবা প্রতি ১২০ বৎসর পরে এক মাস বর্ধিত করিয়া দেওয়া হয়। বর্ণিত আছে (তু. Ginzel, ১খ, পরিচ্ছেদ ৬৭-৬৮) যে, শেষোক্ত পদ্ধতি ব্যবহৃত হইত; কিন্তু ইহার যথাযথভাবে অনুসৃত হইত না। গ্রন্থসমূহে এই বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যে, তাকবীস অর্থাৎ অতিরিক্ত মাস এবং অতিরিক্ত দিন সংযোগ করার কাজ ১,৪৪০ বৎসর কালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে এক মাসের পর অন্য মাসের করা হইত। এইভাবে সম্পূর্ণ চক্র শেষ হওয়া পর্যন্ত বৎসর ধরিয়াই এই কাজ জারি থাকিত এবং ১,৪০০ বৎসরে এক বৎসর বর্ধিত হইয়া যাইত। যে মাসের পরে অতিরিক্ত মাস বর্ধিত করা হইত সেই মাসকে অতিরিক্ত মাস বলা হইত এবং উহার প্রথমে دوم অর্থাৎ দ্বিতীয় শব্দটি সংযোজন করা হইত। এই বর্ণনার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণ A. V. Gutschmid এইভাবে করেন (Uber das iranische Jahe, Kl. Schr. -এর সংকলনে, ৩খ, ১৮৯২ খৃ., পৃ. ২০৫ প.) যে, বর্ষপঞ্জীর গণনা দুই ধরনের করা হইত অর্থাৎ একটি পরিবর্তনশীল এবং অপরটি নির্দিষ্ট, প্রতি ১২০ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর নির্দিষ্ট বৎসরের সঙ্গে এক অতিরিক্ত মাস সংযোজন করা হইত। প্রথম সংযোজন পর্যন্ত অতিরিক্ত দিনটি বৎসরের শেষে আসিত। প্রথম অতিরিক্ত দিন সংযোজন হইতে ১২১ পরিবর্তনশীল বর্ষের ফারওয়াদীন (فروردين) মাস ১২০ নির্দিষ্ট বর্ষের দ্বিতীয় ফারওয়ারদীন মাসের সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। অতিরিক্ত সংযোজন কাজটি উভয় ধরনের বর্ষ গণনা অনুযায়ী ঐ একই মাসেই সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং পরবর্তী ১২০ বৎসরের নির্দিষ্ট বৎসরের ইসফান্দারমুয মাসের পরে থাকে, যাহা পূর্ববর্তী পরিবর্তনশীল বর্ষের ফারওয়ারদীনের সঙ্গে সমন্বিত হয়। এখন পরবর্তী ১২০ বৎসরযুক্ত সময়ের পর অতিরিক্ত মাস চলন্ত বর্ষ ২৪১ বৎসরের উরদী বিহিশ্‌ত (اردى بهشت) মাসের সঙ্গে সমন্বিত হয় এবং এই মাসের নাম হয় দ্বিতীয় উরদী বিহিশ্‌ত। অতিরিক্ত দিন ইহার পরেই আসে এবং ইহার পরবর্তী ১২০ বৎসর সময়ে পরিবর্তনশীল বর্ষের উরদী বিহিশ্‌ত মাসের সঙ্গে অথবা এইভাবে বলা যায় যে, পূর্বের নির্দিষ্ট বৎসরের ইসফান্দারমুয-এর শেষে থাকে। নির্দিষ্ট বর্ষে অতিরিক্ত মাস এবং অতিরিক্ত দিন সর্বশেষে সর্বদা আসিত, কেবল পরিবর্তনশীল বর্ষে উহার নাম ও স্থান পরিবর্তিত হইত, যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব যেহেতু একটি অতিরিক্ত যুগ আনূশিরওয়ান-এর শাসনকালে আসিয়াছে, যাহার মধ্যে অতিরিক্ত দিন 'আবান' মাসের পর আসে। সুতরাং এই সময়ে (অর্থাৎ প্রায় ৫৩০ খৃস্টাব্দ) সর্বপ্রথম অতিরিক্ত সংযোজনের উপর ১২০×৮=৯৬০ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়া থাকিবে। অতএব এই কাল অবশ্যই খৃ. পূ. ৪৩০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে আরম্ভ হইয়া থাকিবে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Ginzel, ১খ, ২৯৭)।

আনূশিরওয়ান-এর যুগে ঐ অতিরিক্ত মাস সংযোজনের পর দ্বিতীয় সংযোজন আনুমানিক ৬৫০ খৃ. আরম্ভ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত ইরানীগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যেহেতু ইরানে কোন নির্দিষ্ট বর্ষপঞ্জী অথবা তারিখ ছিল না, বরং প্রত্যেক নূতন বাদশাহের শাসনামলে এক নূতন তারিখের প্রবর্তন করা হইত এবং ইরানের বাদশাহদের শাসনামলে তৃতীয় য়ায্‌দজির্‌দ পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়া যায়। এইজন্য ইরানীরা তাঁহার শাসনামল (অর্থাৎ ৬৩২ খৃ.) হইতে তাহাদের বর্ষপঞ্জী গণনা করিতে থাকে এবং এইভাবে য়ায্‌দজির্‌দ বর্ষের প্রবর্তন হয়। এই বর্ষের নাম নির্দিষ্ট ঐ শাসকের নামেই রাখা হয়, যাঁহার শাসনকালে এই সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই যুগ ১৬ জুন, ৬৩২ খৃস্টাব্দের মঙ্গলবার দিন হইতে আরম্ভ হয়-১৯,৫২,০৬৩ দিন জুলিয়ানী পঞ্জিকা অনুযায়ী, (Julian) [Sohram]= হিজরত হইতে ৩,৬২৩ অথবা ৩,৬২৪ দিন পর (তু. Ginzel, ১খ, অধ্যায় ৬৯; কাশ্‌শাফু ইস্‌তিলাহাতি'ল-ফুনূন, ১খ, ৫৮)। যেহেতু য়ায্‌দজির্‌দ বর্ষপঞ্জীর প্রথম শতাব্দীগুলিতে অতিরিক্ত মাসের ব্যবস্থা ছিল না, এইজন্য অতিরিক্ত দিন পরিবর্তনশীল বৎসরের আবান মাসের শেষে সর্বদা আসিতে থাকে। এইজন্য য়াযদজির্‌দ বর্ষপঞ্জীর গণনা অনুযায়ী তারিখ গণনার জন্য ইহা

জানা আবশ্যক যে, যে গ্রন্থকার এই তারিখ দিয়াছেন, তিনি অতিরিক্ত মাস (দিন) কিভাবে সংযোজন করিয়াছেন। Schram তাঁহার গ্রন্থে (Kalendariographischen Tafeln) ইসকানদারমুয মাস এবং অনুরূপভাবে আবান মাস এই উভয়ের শেষে অতিরিক্ত দিনসমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

সংযোজনের উল্লিখিত বিলুপ্তকরণের ফলাফল এই হইয়াছিল যে, যায্দজির্দ-এর গণনা অনুযায়ী নাওরূয-এর তারিখ ক্রমান্বয়ে পশ্চাতে হটিতে থাকে। ইহা সালজূক সুলতান জালালু'দ-দীন মালিক শাহ ইব্ন আলপ আরসালান কর্তৃক পঞ্জিকা সংশোধন করা পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল। এই বৎসর সম্পর্কে দ্র. শিরো. "জালালী"। কাশ্শাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন, ১খ, ৫৯, অনুযায়ী এই তারিখ শুক্রবার দিন ১৮ ফারওয়ারদীন, প্রাচীন পঞ্জিকা = দিন ১,৬৩,১৭৩ য়াযদজির্দীতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহাকে প্রথম ফারওয়ারদীন জালালী মাস (অর্থাৎ নূতন পঞ্জিকা অনুসারে) গণনা করা হইয়াছে। এই তারিখ ১০ রামদান, ৪৭১ হি. (১৫ মার্চ, ১০৭৯; তু. Ginzel, ১খ, অধ্যায় ৭০) অনুযায়ী। এই কাল হইতে পরবর্তী প্রতি চারি বৎসর পরে একটি অতিরিক্ত দিন সংযুক্ত হইতে থাকে এবং কোন কোন সময় এক বৎসর ছাড়িয়াও দেওয়া হইত, আরও তু. শিরো. নাওরোয (نوروز)।

এই পঞ্জিকায় ঈলখান বংশীয় শাসক গাযান মাহমূদ (দ্র.) এক নূতন সংস্কার সাধন করেন। (Ginzel (১খ, ৩০৪), হাম্দুল্লাহ্ মুস্তাওফী কাযবীনী (দ্র. কাযবীনী)-র উদ্ধৃতি সহকারে লিখেন যে, এই ঈলখানী বর্ষপঞ্জী বৃহস্পতিবার ১৩ রাজাব, ৭০১ হি. (১৩ মার্চ, ১৩০২ খৃ.) হইতে আরম্ভ হয়। Wustenfeld ও Muller এর অভিমতের বিপরীতে আমরা ১৫ জুলাই, ৬২২ খৃ.-কে যদি হিজরী সালের প্রারম্ভিক তারিখ মানিয়া লই, তাহা হইলে এই উভয় তারিখ পরস্পরে মিলিয়া যায়, কিন্তু দিন মিলে না। কেননা ১ রাজাব, ৭০১ হি. বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার ছিল এবং ১৩ তারিখকে মঙ্গলবার অথবা বুধবার ধরা যায়। এই জটিলতার সূত্র এই যে, "কাশ্শাফু ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন" (১খ, ৫৯)-এ এই তারিখের প্রারম্ভকে সোমবার অভিহিত করা হইয়াছে এবং এই বৎসরের আরম্ভ ২২৪ জালালী সাল হইতে করা হইয়াছে, যাহা ১৩০২ খৃ. মুতাবিক। ঈলখানী তারিখ-এর বিশদ বিবরণের পূর্ণ ব্যাখ্যা অদ্যাবধি হয় নাই, অবশ্য এই তারিখ তেমন অধিক গুরুত্বপূর্ণ নহে।

সম্রাট আকবারের পঞ্জিকা সম্পর্কে দ্র. Ginzel, ১খ, পরিচ্ছেদ ১০৮-১০৯।

"কাশ্শাফু ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন", ১খ, ৬০-এ প্রাচীন তুরকান-এর পঞ্জিকার সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা দ্বারা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বর্ধিত হয়। যখন এই গ্রন্থের গ্রন্থকার আমাদেরকে বলেন যে, তুর্কীদের বৎসর প্রকৃতপক্ষে সৌর বৎসর ছিল ("কাশ্শাফু ইস্তিলাহাতি'ল-ফুনূন", ১খ, ৭২২, শিরো. سنة), তখন ইহার অর্থ, সৌর-চান্দ্র বৎসর (দ্র. আশ-শামস, الشمس) অর্থাৎ ১২টি চান্দ্র মাসের বৎসর, যাহার মধ্যে ৩৫৪ অথবা ৩৫৫ দিন হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে সৌর বৎসরের অতিরিক্ত মাস বর্ধিত করিয়া সৌর বৎসরের সহিত সমন্বিত করা হইত এবং ইহা এক সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী করা হইত। অতিরিক্ত বর্ষ সম্পর্কে তিনি লিখেন যে, প্রতি ৩০ বৎসরকালে এই রকম বৎসর ১১টি "যেমন আরবদের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে"; ইহা দ্বারা ইসলামী বর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, যাহা ৩৫৫ দিনে হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত বিষয় এই যে, ১৯ বৎসর কালে অতিরিক্ত মাস দৃশ্যত কেবল সাতবার অন্তর্ভুক্ত করা হইত, যেমন ছিল চীনের অধিবাসীদের রীতি। এই চীনাদের নিকট হইতে প্রাচীন তুর্কীগণ তাহাদের পঞ্জিকা গ্রহণ করিয়াছিল (Ginzel, ১খ, পরিচ্ছেদ ১৩৬; প্রাচীন তুর্কী শিলালিপির ঐতিহাসিক বিন্যাস, Thomsen Altturkische Inschriften aus der Mongolei, Z. D. M. G-এ, সংখ্যা ৭৮ ঃ ১৩২ প.) এবং যেমন য়াহূদীদের রীতি; কিন্তু ফলাফল একই থাকে; কেননা ১১/৩০ ও ৭/১৯-এ কেবল ৫৭০/১-এর পার্থক্য দাঁড়ায়। মাসসমূহের যে নাম গ্রন্থকার দিয়াছেন, তাহা উইগুর জাতির মাস অনুযায়ী, যেমন Ginzel, ১খ, ৫০৩-এ উলুগ বেগ-এর উদ্ধৃতি হইতে প্রদান করেন যাহা চীনাদের অতিরিক্ত মাস/বৎসর গণনা অনুযায়ী প্রচলিত ছিল (Ginzel, ১খ, ৪৬৭ প.)। চীনাদের পদ্ধতিতে এক বৎসরকে ২৪ ভাগে (K'i ও Tsie) ভাগ করা হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্য হইতে প্রতি মাসে দুইটি অংশ আসিত। যদি দ্বিতীয় অংশের কিছু অংশ পরবর্তী মাসে আসিয়া যাইত, তখন ঐ মাসকে অতিরিক্ত মাস ['যাইদ' তুর্কী ভাষায় শূন আয় (شون اى) অর্থাৎ চীনাদের জুন (Jun), Ginzel, ১খ, ৪৭৪] মনে করা হইত। ইহা দ্বারা স্পষ্ট যে, অতিরিক্ত মাস বৎসরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে আসিত না, বৎসরের প্রারম্ভ ১৬ স্তরের আদ-দাল্ও (الدلو) দ্বারা হইত। ইহাও চীনাদের গণনা অনুযায়ী [Ginzel, ১খ, ৪৭০ প.]। এক বৎসরের সময়ের পরিমাণ ২৪৩৬; ৩৬৫ দিন [(১০০০০ দিন-৮ ৬৪ সেকেণ্ড-এক ফানাক (فنك)] গণনা করা হইয়াছে= ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা শূন্য (صفر) মিনিট ৪৬ ৯৮ সেকেণ্ড। এই অনুমান সুস্পষ্টভাবে ভুল, পাঠের ত্রুটির জন্য নহে। কেননা নিম্নোক্ত বর্ণনার দ্বারা ইহার সত্যায়ন হয় যে, বৎসরকে সমান ২৪ ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতি অংশে ১৫ দিন ২১৮৪ ৫/৬ ফানাক (فنك) হয়। মাস প্রকৃত চান্দ্র মাস অর্থাৎ নক্ষত্রের সংযোগপূর্ণ চান্দ্র মাস, ইহার মধ্যে প্রতিবার প্রকৃত মিলন অর্থাৎ নক্ষত্রের পরিক্রমণের সময় হইতে আরম্ভ হয় (দ্র. শিরো. আল-কামার)। অতিরিক্ত সময়ে কোন বৎসরের স্থানকে নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি এই যে, য়াযদজির্দ-এর তারিখ সমকালীন বৎসর হইতে ৬৩২-কে পৃথক করিয়া অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৩০টি অংশে বিভক্ত করা হয় এবং ৩৬৫ দিনে এক বৎসর গণনা করা হয়। বিভক্ত করার সময় যদি ৩০-এর কম অবশিষ্ট থাকে এবং যদি ইহা ২ অথবা ৫ অথবা ৭ অথবা ১০ অথবা ১৩ অথবা ১৬ অথবা ১৮ অথবা ২১ অথবা ২৪ অথবা ২৬ অথবা ২৯ সংখ্যাবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা অতিরিক্ত বর্ষজ্ঞাপক বলিয়া গণ্য হইবে। অতিরিক্ত মাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এই গণনা পদ্ধতি ৩৫৫তম দিনের সঙ্গে অধিক সম্পর্কযুক্ত। ৬৩২ য়াযদজিরদী সাল ১২৬৪ খৃ. আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন তুর্কীদের দেশাচার হইতে গ্রন্থকার এই কথা জানিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, চীনাগণ সম্পূর্ণ দিনকে দুই, দুই ঘণ্টা সময়ে ('চাগ' দ্র. Redhouse, শিরোনামযুক্ত শব্দ চীন, schi, তু. Ginzel, ১খ, ৪৬৫) বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আবার এই দুই ঘণ্টা সময়কে ৮ ক্ষণ (ক্ষণা? চৈনিক 'Ko' দ্র. Geinel, পূ. স্থা.)-এ বিভক্ত করা হইয়াছিল। গ্রন্থকার তুর্কীদের মাধ্যমে চীনের অধিবাসীদের ষাট অংশযুক্ত সময় (الدور الستونى) সম্পর্কেও অবহিত, যাহা 'আশারী যুগ ও ইছনা 'আশারী যুগ সংযোগে গঠিত ছিল (Ginzel, ১খ, ৪৫১ প.)। তিনি ইছনা 'আশারী যুগ প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহাদের নাম পশুদের বিখ্যাত নাম অনুসারে ছিল এবং এই নাম অনুসারে বৎসরের নামকরণ করা হইত (Ginzel, ১খ, ৪৫২)। কোন বিশেষ দিন নির্বাচনের জন্য ('ইখ্তিয়ার' দ্র. "ইল্ম

আহ্‌কাম নুজূম' নিবন্ধ) ১২ দিনের একটি পরিক্রমা ছিল, যাহার প্রতিটি দিন এক বিশেষ রঙের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল।

বিশ্বলোকের সৃষ্টি হইতে তা'রীখ-এর যাত্রা শুরু করা হয়। যেমন ৮৬০ য়াযদজিরদী সালে বিশ্ব সৃষ্টির ৮,৮৬৩ শতাব্দী এবং ৯৯৬৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই বিশ্ব ৩,০০,০০০ কারন পর্যন্ত অস্তিত্বশীল থাকিবে এবং প্রতি কারন (قرن)-এ সময়ের পরিমাণ হইবে ১০,০০০ বৎসর।

তুরস্কে যে পঞ্জিকা ব্যবহৃত হয়, তাহার জন্য দ্র. শিরো. সালনামাহ।

ইসলামে বর্ষ গণনা পদ্ধতি অনেকাংশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনুসারে হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহের জ্ঞান যাহা পবিত্র কুরআনের দ্বারা বিশ্লেষিত, ইহা সম্পর্কে গবেষণা এখনও বিশেষভাবে হয় নাই। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বর্ষপঞ্জীর হাওয়ালায় Nallino রচিত গ্রন্থ "ইল্‌মু'ল-ফালাক তা'রীখুহু 'ইন্‌দা'ল-'আরাব ফি'ল-কুরূনি'ল-উস্‌তা' (علم الفلك تاريخه عند العرب فى القرون الوسطى) (রোম ১৯১১ খৃ.) ৮৪, ১০৪-১১২- এ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে, আরও তু. শিরো. 'আল-মানাযিল" (المنازل), 'নাসী' (نسئ) ও M. Plessner -এর নিবন্ধ, Der Islam সাময়িকী, ২১ সংখ্যা, ২২৬-২২৮। ইহাও উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, আল-বীরূনীর "কিতাবু'ল-আছারি'ল-বাকিয়্যা" (ইহার ইংরাজী অনুবাদ "Chronology of Ancient Nations" নামে লণ্ডন হইতে ১৮৭৯ খৃ. প্রকাশিত) বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটি নূতন সংযোজন। কেননা ইহাতে প্রথমবারের মত এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে যে, সকল জ্ঞাত জাতিসমূহের সকল ইতিহাস একত্র করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে উহাদের বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা করা যাইতে পারে এবং পুনরায় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে ইহাদের পরস্পর তুলনামূলক বিচার করা যায়। আল-বীরূনী স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থ "কিতাবু'ত-তাফহীম লি আওয়াইলি সিনা'আতি'ত তানজীম" (كتاب التفهيم لاوائل صناعة التنجيم), পত্রক ১৬১ হইতে ১৯৩-এ "আল-আছার" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাফ্‌হীম গ্রন্থের অবিকল ইংরেজী অনুবাদ, R. Ramsay Wright, The Book of Instruction in the Elements of the art of Astrology নামে লণ্ডন হইতে ১৯৩৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। বৃটিশ মিউজিয়ামের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা Or 8349 হইতে নকল করা হইয়াছে। উপরোক্ত উভয় গ্রন্থের গণনার মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য রহিয়াছে।

বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থসমূহের ভূমিকায়ও এই জাতীয় কিছু তথ্য পাওয়া যায়; যেমন আত-তাবারী, ১খ, ৩ প.-এ। ইহার তুলনায় অধিকতর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ইব্‌নু'ল-আছীর, ১খ, ৯ প.-এ রহিয়াছে। ঐ সকল ইতিহাস গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে এই পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, য়াহূদীদের মতে ইহার পরিমাণ প্রায় ৪৩৪২ বৎসর, কিন্তু এই অনুমান য়াহূদীদের পঞ্জিকা অনুসারে নহে। গ্রীকদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাহাদের মতে সৃষ্টির প্রথম হইতে হিজরত পর্যন্ত ৫,৯৯২ বৎসর ১ মাস অতিবাহিত হইয়াছে এবং অগ্নি উপাসকদের মতে গায়ুমারত (পারস্যের প্রথম শাসক)-এর শাসনামল হইতে হিজরত পর্যন্ত আনুমানিক ৩,১৩৯ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছে।

সৃষ্টির গঠনতত্ত্বের (Cosmography) গ্রন্থসমূহেও অনেক মূল্যবান তথ্য বিদ্যমান; যেমন আল-কাযবীনীর 'আজা'ইবু'ল- মাখলূকাত" (عجائب المخلوقات), Wustenfeld কর্তৃক প্রকাশিত, ৬২ হইতে ৮৭ পৃষ্ঠায়; আন-নুওয়ায়রী'র 'নিহায়াতু'ল- আরিব" (نهاية الارب), ১খ, ১৫৭ হইতে ১৯৭ পৃষ্ঠায়ও সাহিত্যিক ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যায়; উদাহরণস্বরূপ "নিহায়াত", পৃ. ১৬৭ ও ১৬৮-এ ৮ম হিজরী ও ৯৪ হিজরীর মধ্যবর্তী [সাত ইদারা] বৎসরসমূহের এক তালিকা রহিয়াছে। ঐ তালিকায় উপরোক্ত সময়ে সংঘটিত অনেক ঘটনার বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যালোচনা, যাহা গণনার কাজে বিশেষত ঋতু গণনার কাজে প্রয়োজন হয়, তাহা "রাসা'ইলু ইখওয়ানি'স-সাফা" (رسائل اخوان الصفاء), ১খ, ৫৬ প., ২খ, ১৬ প.-এ পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নিবন্ধনগর্ভে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত (২) জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিভিন্ন প্রবন্ধ; (৩) Sarton, Introduction to the History of Science, ১৯২৭ খৃ. প., বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সম্পর্কিত আলোচনা; (৪) আল-বাত্তানী, আরবী পাঠ আয-যীজু'স-সাবী (Opus astronomicum), ল্যাটিন অনু. ও সম্পা. (C. A. Nallino), ১৮৯৯, ১৯০৭ খৃ.; (৫) Wensinck, Handbook, শিরো. Calendar; (৬) Gray, Grund. der Ir. Phil., ২খ., ৬৭৫-৬৭৮ (ইহা কেবল এইজন্য প্রয়োজনীয় যে, এই আলোচনার সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা ইহাতে দেওয়া হইয়াছে); (৭) আবু'ল-ফাদ্‌ল, আঈন-ই আকবারী, সম্পা. Blockmann, ১খ, ২৬৫-২৭৯, অনু. Jarre, ২খ., দ্বিতীয় সং, পৃ. ১-৩২, সম্পাদনা পরিষদ।

M. Plessner (দা.মা. ই.)/সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তা'রীখ (تاريخ) ঃ ([তৃতীয় নিবন্ধ]='ইল্‌মু'ত-তা'রীখ) ঃ সাহিত্যের একটি পরিভাষা, ইহার মধ্যে বর্ষপঞ্জী (বর্ষানুক্রমিক সংঘটিত ঘটনাপঞ্জী, বর্ষবিবরণ) এবং জীবনী উভয়টি অন্তর্ভুক্ত (কিন্তু কার্যত ইহার মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাস সংযুক্ত করা হয় না)। আরবী-ফারসী ইতিহাস চর্চার বিকাশ নিম্নের চারিটি শাখায় বিভক্ত করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হইল ঃ

(১) ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া হিজরী তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত।

(২) হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হইতে হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত।

(৩) হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ হইতে হিজরী ১০ম শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত।

(৪) ১০ম হিজরী শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত।

'উছমানী তুর্কীদের ইতিহাসের জন্য দ্র. শিরো. তুর্ক, (খ) ও 'উছমানিয়্যান- ৩ ঃ (ক) তুর্কী ইসলামী সাহিত্য, ১৫শ শতাব্দী; এবং যেই সকল ঐতিহাসিক তথ্য মালয় (ملاى) ভাষায় লেখা হইয়াছে, তাহার জন্য দ্র. শিরো. 'মালায়া" (ملايا) নিবন্ধের শেষ অংশ।

(ক)

আরবী ভাষায় ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হয় কিভাবে, অদ্যাবধি এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। জাহিলী যুগের আরবদেশের প্রাচীন কিচ্ছা-কাহিনী, প্রাত্যহিক সাধারণ বর্ণনা ও উপাখ্যানসমূহ এবং তুলনামূলকভাবে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর জ্ঞানগর্ভ ও সূক্ষ্ম চিন্তাপূর্ণ ইতিহাস চর্চার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান, যাহা আজ পর্যন্ত অপসারণ করা সম্ভব হয় নাই। বর্তমান যুগের কতিপয় গ্রন্থকারের ধারণা এই যে, এই ক্রমবিকাশে ফারসী গ্রন্থ "শাহ্‌নামা"-র নিদর্শনের পূর্ণ প্রভাব

পড়িয়াছে [দ্র. পরিচ্ছেদ আলিফ/ ৪ শিরো. (পৃ. ৫৪ আলিফ)], কিন্তু প্রায় নিশ্চিত ধারণা এই যে, আরবী ভাষায় ইতিহাস চর্চা বিভিন্ন প্রকারের ঐতিহাসিক ও নিম-ঐতিহাসিক স্রোতধারার আদান-প্রদান ও সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয়। সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য আমরা ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনা করিব।

(১) জাহিলী যুগের ঐতিহাসিক বর্ণনা ঃ প্রত্যাশা ছিল যে, য়ামান, যেই স্থানে এক প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার লালনক্ষেত্র ছিল, যাহার নিদর্শন আজ পর্যন্ত মা'নী (Minean), সাবা'ই ও হিম্য়ারী উৎকীর্ণ লিপিতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাই ইহার মধ্য হইতে কোন না কোন লিখিত ঐতিহাসিক বর্ণনা হস্তগত হইবে। কিন্তু এই পর্যন্ত আমাদের নিকট যাহা কিছু পৌছিয়াছে, তাহাতে কেবল মৌখিক বর্ণনার নিদর্শন বিদ্যমান অর্থাৎ কতিপয় প্রাচীন বাদশাহ্র নাম, দূর অতীতের অস্পষ্ট ও অতিরঞ্জিত গল্প-কাহিনী এবং ইসলাম আগমনের পূর্ববর্তী শতাব্দীর তুলনামূলকভাবে সঠিক অথচ অস্পষ্ট ঘটনার বিবরণ [দ্র. সাবা' ও আবরাহা]। হিজরী প্রথম শতাব্দীতে ঐসব মৌখিক বর্ণনাসমূহ খেয়াল-খুশিমত অতিরঞ্জিত করিয়া গল্প-কাহিনীর আকারে বর্ণনা করা হইত এবং এইসব উপাখ্যানকে প্রাচীন 'আরবের ইতিহাস মনে করা হইত। এই উপাখ্যানসমূহ ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (দ্র.) ও 'আবীদ ('উবায়দ) ইব্ন শার্য়া-এর প্রতি আরোপ করা হইত। উপরোল্লিখিত উভয় ব্যক্তির গ্রন্থসমূহে এই বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান ছিল যে, প্রাচীন আরবদের মধ্যে ঐতিহাসিক অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব ছিল এবং এই ত্রুটি ঐ সময়ও বিদ্যমান ছিল, যখন তাহারা তাহাদের ঐ যুগের ঘটনাবলীর বর্ণনা করে (দ্র. F. Krenkow, The Two Oldest Books on Arabic Folklore, Islamic Culture-এ, খ. ২)। যাহা হউক, পরবর্তী বংশধর এই বর্ণনাসমূহকে সাধারণভাবে সঠিক মনে করিতে থাকে এবং ঐতিহাসিকগণ ও গ্রন্থকারগণ ঐ ঘটনাসমূহকে নিজেদের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন। ইব্ন ইসহাক (আরও দ্র. নিম্ন শিরো.), 'উবায়দ-এর বর্ণনাকারীদের একজন ছিলেন এবং 'আবদু'ল মালিক ইব্ন হিশাম (দ্র.) ওয়াহ্ব-এর গ্রন্থ "কিতাবু'ত-তীজান"কে উহার উপস্থিত আকারে প্রকাশ করার জন্য বিন্যস্ত করেন ও 'তাফ্সীরু'ত তাবারী"-র মত বিখ্যাত গ্রন্থেও ঐ গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে তথ্য ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা সত্য যে, ইব্ন খালদূন ইহাদের মধ্য হইতে অনেক য়ামানী বর্ণনাসমূহের য়াহূদী ঘেঁষা ভাবধারাকে গুরুত্বহীনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন (১খ, ১৩, ১৪), কিন্তু পরবর্তীতে তিনিই ঐসব বর্ণনাকে তাঁহার দৃষ্টান্তসমূহের প্রমাণের জন্য উপস্থাপন করেন। মোটকথা, ঐসব বর্ণনার সারাংশ আরবদের ইতিহাস চর্চায় বরাবর অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং অনুভূতিমূলক সমালোচনার বিকাশ ও প্রাচীন ইতিহাসের প্রশ্নসমূহকে উত্তমরূপে বুঝার ব্যাপারে ইহা প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

আরবের উত্তর অংশের অধিবাসীদের কিছুটা ভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। যদিও ঐ স্থানে প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব বর্ণনাসমূহ সংরক্ষিত হইত, যাহা অনেক পদ্ধতিতে গোত্রীয় পরিমণ্ডল হইতে উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে বংশমর্যাদা সম্পর্কে এমন সার্বিক ধারণাবলীও অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল, যাহা সকল আরববাসীকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। কিন্তু ঐ বর্ণনাসমূহে সম্পূর্ণরূপে এমন কোন কথা পরিদৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, 'উত্তর আরবের অধিবাসীদের কোন একক অথবা যৌথ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যও ছিল। গোত্রীয় বর্ণনা যে রূপ পরিগ্রহ করে তাহাও অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার। অধিকন্তু ঐসব বর্ণনা "আরবের যুদ্ধ" (ايام العرب) সংক্রান্ত ছিল, যখন এক গোত্র অথবা ইহার কোন এক শাখা অপর কোন গোত্র অথবা শাখার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইত [দ্র. আয়্যামুল 'আরাব]। ঐ ঘটনাবলী সম্পৃক্ত বর্ণনাসমূহে সাধারণত কবিতাও উদ্ধৃত হইত। বর্ণনাসমূহে এই গদ্য ও পদ্যের পারস্পরিক অনুপাত সকল সময় এক রকম থাকে নাই। কোন উদাহরণ এমন, যাহার কবিতাংশ ছিল কেবল কোন ঘটনাকে অবিস্মরণীয় রাখার একটি উপায়। অপরাপর ক্ষেত্রে ইহা স্পষ্ট যে, গদ্যের বর্ণনা কেবল কবিতাসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণজ্ঞাপক, কিন্তু উভয় পদ্ধতিতে কেবল কবিতাংশই বর্ণনাসমূহকে চলমান রাখিয়াছে। ফলে সেইসব প্রাচীন কবিতা বিস্মৃত হইতে থাকে, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীও বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং গোত্রীয় ইতিহাসের নিকটবর্তী ঘটনাসমূহ নূতন কবিতার আকারে স্থান দখল করিয়া নেয়। এমন সব গোত্রীয় বর্ণনা অবশ্যম্ভাবীরূপে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট, ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বিন্যাসের দিক হইতে অস্পষ্ট এবং অধিকাংশ সময় অতিরঞ্জিত গালগল্পে পরিণত হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐসব গল্প সম্পূর্ণ বাস্তবতা বর্জিত ছিল না এবং অনেক সময় ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সত্য তথ্য বিদ্যমান থাকিত। ইসলামী বিজয় গোত্রীয় বর্ণনাসমূহের পদ্ধতি পরিবর্তিত করিয়া দিলেও ইহাদের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া কোন পরিবর্তন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। নূতন বর্ণনার দৃষ্টিকোণ সম্প্রসারিত হইলেও গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ যথারীতি বিদ্যমান এবং পূর্বের মত বর্ণনাসমূহে অতিরঞ্জনও রহিয়াছে। তাহা ব্যতীত অপ্রাসঙ্গিকতা, ভ্রান্তি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবও রহিয়াছে। ইহার প্রভাব ইসলামী ইতিহাসশাস্ত্রের উপরও পড়ে। কারণ গোত্রীয় বর্ণনাসমূহের মধ্যেই এই উপাদান বিদ্যমান ছিল, যাহা পরবর্তী কালের সংকলনকারিগণ খিলাফাতে রাশিদা ও বানূ উমায়্যার ইতিহাস রচনার জন্য ব্যবহার করেন (দ্র. পরিচ্ছেদ আলিফ/৩-এর পরে [পৃ. ৫১ খ])।

গোত্রীয় বর্ণনাসমূহের মধ্যে অপর উপাদান ছিল গোত্রের বংশ পরিচয় সংরক্ষণ। কিন্তু বানূ উমায়্যার প্রথম যুগে বিচার বিভাগ (حكيم ديوان) প্রতিষ্ঠিত করার ফলে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আরব গোত্রসমূহের সাহায্যকারীদের আন্দোলনে বংশপরিচয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের তৎপরতায় "ইলমু'ল-আনসাব" (علم الانساب) -এ অভিনব ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয় (দ্র. Goldziher, Muh. St., ১খ, ১৭৭-১৮৯)।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে গোত্রীয় বর্ণনার ক্ষেত্র যাহা এই পর্যন্ত বর্ণনাকারী (রাবী) এবং বংশবিদগণের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, তাহা ভাষা বিশেষজ্ঞদের অনুশীলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাঁহারা প্রাচীন কাব্য ও গদ্যের যাহা কিছু ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন; এই বিরাট তথ্যভাণ্ডার সংগ্রহ এবং পৃথক পৃথক আকারে বিন্যস্ত করিয়া তাঁহারা ইতিহাসশাস্ত্রের গৌরবময় সেবা করেন। এই ধরনের তৎপরতার নিদর্শন আবূ 'উবায়দা (দ্র., ১১০-২০৯/৭২৮-৮২৪) উপস্থাপন করেন। তিনি ইরাকী বংশোদ্ভূত মুক্তদাস (مولى) ছিলেন। তিনি আনুমানিক দুই শত একক বিষয়ক (২০০) পুস্তিকা রচনা করেন বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে তাঁহার নামের একটি গ্রন্থও আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছে নাই, যদিও ইহাদের মধ্য হইতে অনেক তথ্য পরবর্তী রচনাসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইসব গ্রন্থ উত্তর আরবের পরিপূর্ণ ইতিবৃত্তের ধারক ইহাদের সহজ তথ্যাবলী বিভিন্ন শিরোনামের আওতায় বিন্যস্ত করা হইয়াছে। যেমন একক গোত্রসমূহের বর্ণনা এবং বংশপরম্পরা গোত্রীয় বর্ণনাসমূহ ও আরবের যুদ্ধ (ايام العرب) সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ একত্র করিয়া বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এই ধারাবাহিকতা ইসলামের আবির্ভাবের পরের বর্ণনাসমূহেও অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উহার মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ বিজয়, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও যুদ্ধ সম্পর্কিত ঘটনাবলীও ছিল। উপরন্তু বিভিন্ন দল-উপদল সম্পর্কিত বর্ণনা, যেমন

বসরা-র মীমাংসা, খাওয়ারিজ ও মাওয়ালী ইত্যাদি। আবূ 'উবায়দার উপর অভিযোগ ছিল, তিনি শু'উবিয়্যা (দ্র.) আন্দোলনের (ইসলাম আগমনের পর আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে অনারব মুসলিমদের আন্দোলন) পক্ষপাতিত্ব করিয়া আরবদের সমালোচনা করেন, কিন্তু আরোপিত অভিযোগ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝা যায় যে, তিনি বরং নিরপেক্ষ ছিলেন।

এমন কিছু সমীক্ষা হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কাল্‌বীও (মৃ. আনু. ২০৪/৮১৯) [দ্র. শিরো. আল্-কাল্‌বী ও তাবাকাতু ইব্ন সা'দ-এর ভূমিকা, ৩খ, ২১-২৩ এ Sachau-এর বর্ণনা] সম্পাদন করিয়াছেন। যে সকল তথ্য তাঁহার পিতা (মৃ. ১৪৬/৭৬৩) 'আওয়ানা ও আবূ মিখনাফ (দ্র. নিম্নের পংক্তি) সংগ্রহ করেন, হিশাম ঐসব তথ্য বিন্যস্ত করেন এবং উহার প্রসার ঘটান। তাঁহার একক প্রবন্ধসমূহও অনেক ক্ষেত্রে আবূ 'উবায়দার প্রবন্ধসমূহের অনুরূপ ছিল। কিন্তু বিশেষত্ব এই যে, তিনি লিখিত তথ্যপঞ্জী হইতে আল-হীরা শহর এবং হীরা রাজ্যের রাজন্যবর্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ ও একত্র করেন। এই রচনা সম্পর্কে ইহা বলা যায় যে, তাঁহার উপাদানসমূহ আল-হীরার গির্জার স্তম্ভ ও ইরানী তথ্য হইতে সংগৃহীত ছিল। ঐ তথ্যসমূহ হিশাম অনুবাদ করাইয়া ব্যবহার করেন। শিক্ষণীয় ইতিহাস রচনার দিক হইতে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এবং যদিও ইহার তথ্যসমূহের কেবল সংকলনসমূহই রক্ষিত, তথাপি ইহার বর্ণনার সাধারণ শুদ্ধতা বর্তমান যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বলা হয় যে, তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধেও হিশাম একই পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং গ্রন্থরাজি ও অন্যান্য লিখিত তথ্য যাহা কিছু তিনি পাইয়াছেন, ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রাচীন পদ্ধতির অধিক সংরক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের হাত হইতে ইহা রক্ষা পায় নাই এবং অনির্ভরযোগ্য ও জালিয়াতি করার অভিযোগ ইহার উপর তীব্রভাবে আপতিত হইতে থাকে।

(২) সাদ্‌রু ইসলাম ঃ হিশাম আল-কাল্‌বী হীরা হইতে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা উপকৃত হওয়া ব্যতীত আরবী ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয় মহানবী (স)-এর জীবনী ও কর্মতৎপরতার পর্যালোচনার মাধ্যমে। এইজন্য এই শাস্ত্রের উৎপত্তির সন্ধান মহানবী (স)-এর হাদীছসমূহের মধ্যে পাওয়া যায় (দ্র. শিরো. হাদীছ) এবং বিশেষ করিয়া মহানবী (স)-এর গাযাওয়াত (যুদ্ধ) সম্পর্কিত হাদীছসমূহের সঙ্গে ইহার সংশ্লিষ্টতা অধিক [যেমন এই সম্পর্কে এক সাধারণ পরিভাষা "মাগাযী" ("সামরিক কর্মকাণ্ড") প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এই পরিভাষা ইসলামের প্রথম যুগের জীবনী গ্রন্থসমূহে ব্যবহৃত হইতে থাকে]। যুদ্ধের ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করার এই প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল প্রথমে ছিল মদীনায় এবং হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে যুদ্ধের ইতিহাস (মাগাযী) রচয়িতাদেরকে মদীনা ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্রেও দেখা যাইতে থাকে। যেহেতু 'ইল্‌মু'ল-মাগাযী-র সংশ্লিষ্ট 'ইল্‌মু হাদীছ ছিল, সেইহেতু ইতিহাস রচনা পদ্ধতির উপর সনদ ব্যবহারের গভীর প্রভাব পড়ে। এই কারণেই ঐ সময় হইতে আরবদের ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলীতে এবং ঐ জ্ঞানের সমালোচনামূলক সঠিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। এই পর্যায়ে উপনীত হইয়া প্রথমে এই অনুমান হয় যে, আমরা ইতিহাসশাস্ত্রের বিচারে এমন এক যমীনে দণ্ডায়মান, যে যমীনে আর কোন স্থান নাই। যদিও কোন কোন বিষয়ে আমাদেরকে এই কথা মানিতে হয় যে, মনগড়া হাদীছসমূহে [অর্থাৎ যেইসব হাদীছ প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন নাই, বরং পরবর্তী কালে কিছু লোক নিজেদের বানানো কথাকে রাসূল (স)-এর হাদীছ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে] এমন সন্দেহপূর্ণ উপাদান বিদ্যমান, যাহা মহানবী (স)-এর মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে যাপিত জীবন সম্পর্কে সম্পৃক্ত [এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. শিরো. "সীরাত"]।

এই উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর লোকজন এত অধিক সারাংশ সংগ্রাহক নহেন, যতটুকু তাঁহারা তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত। অবশ্য এমন সব লোকের মধ্যে দুই ব্যক্তি, আবান ইব্ন 'উছমান (দ্র.) ও 'উরওয়া ইব্নু'য-যুবায়র (দ্র.)-কে 'মাগাযী গ্রন্থ' সমূহের রচয়িতা বলা হয়। কিন্তু পরবর্তী কালের গ্রন্থসমূহে ঐ গ্রন্থের উদ্ধৃতিসমূহ বিলুপ্ত। পরবর্তী শতাব্দীতে মাগাযীর হাদীছ সংগ্রহকারী কতিপয় মুহাদ্দিছ বিখ্যাত ছিলেন, বিশেষ করিয়া মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব আয্-যুহ্‌রী (দ্র.)। ইনি ২য় 'উমার (র) অথবা হিশাম-এর অনুরোধক্রমে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন এবং হাদীছের এই সংকলন খলীফাদের ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু পরে ইহা বিনষ্ট হইয়া যায়। আয্-যুহ্‌রী এমন যোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তিনিই প্রথম বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক হাদীছসমূহ একত্র করিয়া একটি পর্যায়ক্রমিক বর্ণনার আকারে বিন্যস্ত করেন (তু. যেমন হাদীছু'ল-ইফক)। ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে ইহাও একটি উন্নততর পদক্ষেপ ছিল। যদিও ইহার মধ্যে এই আশংকা ছিল যে, স্বল্প সতর্ক মুহাদ্দিছ ইহার দ্বারা অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিত।

পরবর্তী প্রজন্মের তিনজন সংকলক যুহ্‌রী সংকলিত হাদীছসমূহের ভিত্তিতে মাগাযী সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। ঐসব গ্রন্থের মধ্যে দুইটি গ্রন্থ এবং যুহ্‌রীর সংগৃহীত হাদীছের ভিত্তিতে রচিত নহে এমন আরও দুইটি গ্রন্থ, হয় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যায় অথবা কেবল ইহাদের কতিপয় বিচ্ছিন্ন অংশ পাওয়া যায়। অবশ্য তৃতীয় বিখ্যাত গ্রন্থটি অর্থাৎ "সীরাতু মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন য়াসার" (দ্র. ইব্ন ইসহাক) [মৃ. ১৫১/৭৬৮] ইহার সমসাময়িক রচনাবলীর তুলনায় একটি বিস্তৃততর প্রকল্প ছিল। কেননা ইহার মধ্যে মহানবী (স)-এর জীবনীই লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, বরং নবুওয়াতের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা হইয়াছে। মূলত এই গ্রন্থের তিনটি বৃহৎ অংশ ছিল ঃ ১ম– "আল-মুবতাদা", এই অংশে সৃষ্টির প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া জাহিলী যুগের ইতিহাস লিখিত হয়। এই গ্রন্থের রচনাকার্যে ওয়াহ্‌ব ইব্ন মুনাব্বিহ [দ্র. উপরে বর্ণিত পংক্তিসমূহ] ও ইসরাঈলী অর্থাৎ য়াহূদীদের নিকট হইতে সহায়তা নেওয়া হইয়াছে। ২য়–"আল্ মাব'আছ", এই অংশে মহানবী (স)-এর জীবনকাহিনী ১ম হিজরী সন পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত এবং ৩য়–"আল-মাগাযী"–এই অংশে মহানবী (স.)-এর তিরোধান পর্যন্ত তাঁহার পবিত্র জীবনের ঘটনাবলী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে, অনিশ্চিত ও জাল হাদীছ এবং কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু কেহ কেহ এই গ্রন্থকে জাহিলী ও ইসলামী যুগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ হিসাবে অভিহিত করেন। জানা যায়, এই গ্রন্থের একাধিক পাঠ বিদ্যমান ছিল। আক্ষেপের কথা এই যে, পরবর্তীতে ইরাকী সংকলকদের দ্বারা ব্যবহৃত এই গ্রন্থের উৎকৃষ্টতর খণ্ডসমূহ [তু. আল-খাতীব আল-বাগদাদী, ১খ, ২২১, পংক্তি ৬-৮] বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলে এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণের প্রয়োজন দেখা দেয়, যাহা একজন মিসরী সংকলক 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন হিশাম (দ্র., মৃ. আনু. ২৭৮/৮৩৩) বিন্যস্ত করেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মাগাযী বিষয়ের এই সকল লেখকই মাওয়ালী (মুক্তদাস) ছিলেন। যদিও ঐ যুগেও প্রত্যেক দাস অনারব হইবে, তাহা অপরিহার্য ছিল না; কিন্তু ইব্ন ইসহাক প্রকৃতপক্ষে ইরাকী ছিলেন।

তাঁহার দাদা ১২ হি. (৬৩৩ খৃ.) সালে ইরাকে গ্রেফতার হন। তাহা সত্ত্বেও যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ইব্ন ইসহাক এই গ্রন্থ সংকলন করেন ইহাতে যুগ পরিবর্তনের প্রভাব ব্যতীত অন্য প্রকার ইরানী প্রভাব অন্বেষণ করা নিরর্থক। তাঁহার এই রচনা ও ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ-এর রচনার মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা একদিকে এবং মদীনায় হাদীছ শিক্ষণের পীঠস্থানের পাঠ্য অপরদিকে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, এই রচনা খাঁটি আরবী রচনা ও ইহার সংকলন ও সম্পাদনায় আরবী হাদীছ শাস্ত্রের রীতিনীতি অনুসৃত।

পরবর্তী শতাব্দীতে ইতিহাসের অনুশীলন ও ইতিহাস লিখনের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়। "কিতাবু'ল-খুলাফা" নামক একটি গ্রন্থও ইব্ন ইসহাকের প্রতি আরোপ করা হয়। কিন্তু জানা যায় যে, ইহা একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য সারগ্রন্থ। তাঁহার বিখ্যাত উত্তরসুরিদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার আল-ওয়াকিদী (দ্র.) [১৩০-২০৭/৭৪৭-৮২৩] কেবল নবী কারীম (স)-এর মাগাযী বিষয়েই গ্রন্থ রচনা করেন নাই, বরং পরবর্তী কালের ইসলামী ইতিহাসের কতিপয় ঘটনার উপর কিছু বিবরণ লিখেন এবং ইহা ব্যতীত হারূন-এর শাসনকাল পর্যন্ত "কিতাবু'ত তা'রীখি'ল-কাবীর' নামে এক বিরাট ইতিহাস গ্রন্থও লিখেন। এইভাবে হাদীছশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট ইতিহাসশাস্ত্র ঐসব ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা উপকৃত হইতে থাকে, যাহা ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ একত্র করেন যদিও তথ্য উপস্থাপনে হাদীছের বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হইতে থাকে। আল-ওয়াকিদীর রচনাসমূহের মধ্যে কেবল তাঁহার "কিতাবু'ল-মাগাযী" অবিকল অবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। কিন্তু ওয়াকিদীর তথ্যাবলীর এক বিরাট অংশ তাঁহার লিপিকার (কাতিব) মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ (দ্র.) [মৃ. ২৩০/৮৪৪-৮৪৫] মহানবী (স), তাঁহার সাহাবা (রা) ও তাবি'ঈন (র)-এর জীবনী রচনায় ব্যবহার করেন। তাঁহার গ্রন্থটি "তাবাকাতু ইব্ন সা'দ" নামে বিখ্যাত। ইতিহাসশাস্ত্রের চর্চার ক্ষেত্রে এই ধরনের বিরাট জীবনী গ্রন্থ ইতিহাস শাস্ত্রের নব উন্নতির এক বিরল প্রমাণ এবং এই গ্রন্থ প্রমাণ করে যে, ঐ যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের সঙ্গে হাদীছশাস্ত্রের কত নিবিড় সম্পর্ক ছিল! কেননা এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তথ্য ও সূত্র একত্র করা।

ইব্ন সা'দ তাঁহার সীরাতু'ন-নাবী (স) অর্থাৎ মহানবী (স)-এর জীবনী অংশ শেষবারের মত স্বয়ং বিন্যস্ত ও সম্পাদনা করেন এবং ইহার যুগান্তকারী গুরুত্ব রহিয়াছে (সংস্করণকৃত গ্রন্থের খ. ১ ও ২)। মাগাযী অংশে তিনি মহানবী (স)-এর আদেশ ও নিষেধ এবং মানচিত্রসমূহ সংযোজন করেন। এই বর্ণনার জন্য (ওয়াকিদী-র অনুকরণে) তাঁহার হস্তগত সনদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের দ্বারা উপকৃত হন। ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদসমূহের নাম "সিফাতু আখলাকি'ন্-নাবী (স)" (صفة اخلاق النبى) ও "আলামাতুন'নুবূওয়াত" (علامات النبوة)। এইসব পর্যায়ক্রমে পরবর্তীকালে "শামাইল ও দালা'ইল' গ্রন্থসমূহের ভিত্তি বলিয়া প্রমাণিত হয়। এই উন্নতির ফলে আরও এক ধাপ অতিক্রম করা সম্ভব হয়। সাহীহ হাদীছসমূহের উপাদানের সঙ্গে অপর এক ধরনের হাদীছের সংযোগ ঘটিয়াছে (যাহা আমরা ইব্ন ইসহাক কর্তৃক রচিত 'সীরাত' গ্রন্থে দেখিয়াছি এবং যেইগুলিকে মুহাদ্দিছগণ কঠোর পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত করিয়াছেন)। এই দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণিত হাদীছ কাহিনীকারদের নিকট প্রস্তুত ছিল [দ্র. শিরো. কিস্সা قصة]। এইভাবে এক ধরনের জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে, যাহা ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ্-এর রচনাবলীর মধ্যে ছিল। 'সীরাত' সাহিত্য যে নূতন গতি অবলম্বন করে [পরবর্তী কালে মহানবী (স)-এর সকল জীবনীকার এই পন্থার অনুকরণ করেন], তাহার ফলে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টির দ্বারা 'সীরাত' রচনা ইতিহাস রচনার উন্নতিতে যেইভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

(৩) খিলাফতের ইতিহাস ঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর তিরোধানের পর হইতে বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে একক গ্রন্থ রচনার যে রীতি প্রচলিত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা পূর্বের পরিচ্ছেদসমূহে আসিয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই তৎপরতা ইরাক পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। সিরিয়া (শাম), আরব অথবা মিসরে প্রথম দুই শতাব্দীতে 'আলিমগণ এই ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইহার ফলে ইরাক ও ইহার বিবৃতিসমূহের পক্ষে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ সম্ভব হয়। খুলাফায়ে রাশিদীনের শাসনকালের ইতিহাসের জন্য অবশ্য মদীনার হাদীছ ও বর্ণনাসমূহের সুবাদে রচনাকারীদের (যেমন ওয়াকিদী) এমন সব তথ্য সহজলভ্য হইতে থাকে, যেইগুলির সঙ্গে মদীনার হাদীছ কেন্দ্রের সরাসরি সংযোগ ছিল। এই বিষয়টি সন্দেহপূর্ণ যে, মদীনায় কিছু নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল, যদিও মদীনার হাদীছের মধ্যে বৎসরের ক্রম অনুযায়ী যে তথ্য দেওয়া হইয়াছে, ইহার শুদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয় যে, এই ধরনের তথ্য অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে, বানূ উমায়্যার যুগে এই ধরনের নির্ভরযোগ্য তথ্যের বিদ্যমানতা দামিশ্ক ও ইরাক উভয় স্থানে অসংখ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রমাণিত (দ্র. বিশেষত A Grohmann : Allgemeine Einfuhrung in die arabischen Papyri, ভিয়েনা ১৯২৪ খৃ., পৃ. ২৭-৩০)। অধিক সম্ভাবনা এই যে, এই ধরনের তথের সাহায্যে পরবর্তী কালের গ্রন্থকারদের পক্ষে বাৎসরিক ক্রমের একটি সঠিক কাঠামো তৈরি করা সহজসাধ্য হয়, যাহার মধ্যে গভর্নর, হজ্জের আমীর প্রমুখদের বাৎসরিক তালিকা বিদ্যমান ছিল।

এই তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাস সংকলন করার জন্য যুগপৎ মুহাদ্দিছ ও ভাষা বিশেষজ্ঞগণের পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। উহাদের মধ্যে অধিক স্পষ্ট ছিল ইরাকের আরব গোত্রসমূহের বর্ণনা (রিওয়ায়াত)। উহাদের মধ্যে একটি গোত্রের নাম ছিল আয্দ (ازد)। এই গোত্রের বর্ণনাকে (অন্যান্য গোত্রের বর্ণনার সঙ্গে) আবূ মিখনাফ (মৃ. ১৫৭/৭৭৪) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং হিশাম আল-কাল্বী [দ্র. পৃ. ৪৯ ক] মন্তব্য করেন ঃ 'ইহা কূফা'র বর্ণনা। ইহা 'আলী (রা)-র পক্ষে এবং সিরীয়দের বিরুদ্ধে ছিল। কাল্বী-র বর্ণনা, যাহা 'আওয়ানা ইবনু'ল-হাকাম (মৃ. ১৪৭/৭৬৪ অথবা ১৫৮/৭৭৫) উপস্থাপন করিয়াছেন এবং যাহার বর্ণনাকারী একই হিশাম আল-কালবী বলিয়াছেন, এই বর্ণনা হযরত 'আলী (রা)-র বিরুদ্ধে ছিল এবং ইহার মধ্যে মিসরীয়দের প্রতি সহায়তার (পক্ষপাতিত্বের) মিশ্রণ পাওয়া যায় (ঐসব তথ্যপঞ্জীর জন্য দ্র. Wellhausen : Das arabische Reich, ভূমিকা)। তৃতীয় একটি তামীমী বর্ণনার প্রচার ও প্রসার সায়ফ ইব্ন 'উমার (দ্র.) (মৃ. আনু. ১৮০/৭৯৬-এ) ইসলামী বিজয়সমূহের এক ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। এই কাহিনীর অধিকাংশ কবিতা সীমাবদ্ধ, ইহার গদ্য রূপও প্রায় একই ধরনের, যেমন আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহ সংক্রান্ত সাহিত্যে বিবৃত হইয়াছে। অপরাপর গোত্রের বর্ণনার অংশবিশেষও পাওয়া যায়, যেমন কুতায়বা ইব্ন মুসলিমের যুদ্ধ সম্পর্কে বাহিলা-র বর্ণনা। সকল সীরাত ও প্রাণবন্ত বর্ণনা ও ঘটনাসমূহের নির্ভীক বিশ্লেষণের কারণে গোত্রীয় বর্ণনাসমূহে এবং উহাদের সমসাময়িক অথবা পরবর্তী কালের গ্রন্থকারদের বর্ষক্রমিক ইতিহাসসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়, যদিও এই গোত্রীয় বর্ণনাসমূহ সমর্থনকারী ও পক্ষপাত

ধরনের, কিন্তু এই বর্ণনাসমূহ এমন নহে যে, ইতিহাসশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে উহাদের কোনই মূল্য নাই। কারণ বিশেষ করিয়া উহাদের মাধ্যমে ইসলামী ইতিহাসের প্রথম শতাব্দীর অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের উপর আলোকপাত করা হয়। অতঃপর ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় যে, গোত্রীয় বর্ণনাসমূহ সংগ্রাহকগণ যেহেতু সনদের নিয়ম-কানূনে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেন, এইজন্য বাহ্যিক আকারের ভিত্তিতে ইহা সার্বিকভাবে হাদীছশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া যায় এবং সত্যিকার অর্থে এই তৎপরতার উদ্‌গাতা হিসাবে কূফার বিখ্যাত মুহাদ্দিছ আশ-শা'বী (দ্র.)-র (আনু. ১১০/৭২৮) নাম সম্পৃক্ত করা যায়। ইহার পদ্ধতি অথবা খোদ আলোচ্য বিষয়ে কোন প্রকার বাহ্যিক প্রভাব দৃষ্ট হয় না। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সাহিত্যিক তৎপরতায় বস্তুবাদী সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমাগত প্রসারে এবং কাগজ আবিষ্কার এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ইহার প্রভাব সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় পড়ে। কাগজ তৈরীর প্রথম কারখানা ১৭৮/৭৯৪-৭৯৫ সালে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীনতম সাহিত্যিক রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি, যাহা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, ঐ যুগেই লিখিত হয়। লেখার এই পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও মৌখিক বর্ণনার রীতি তাৎক্ষণিকভাবে শেষ হইয়া যায় নাই, বরং এই শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এইজন্য এই কথা নিশ্চিত নহে যে, বস্‌রার 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মাদা'ইনী (দ্র.) [মৃ. ২২৫/৮৪০]-এর নামে যে ২৩০টি একক পুস্তিকা রচনার কথা বলা হয়, উহাদের মধ্যে কয়েকটি তাঁহার জীবদ্দশায় লিখিত আকারে প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে সম্ভবত কেবল আবূ উবায়দার সংকলনসমূহের সংশোধিত অনুলিপি বাহির হইয়াছিল। অবশ্য ঐ পুস্তিকাসমূহের তুলনায় তাঁহার খিলাফত সম্পর্কিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল অথবা বসরা বা খুরাসানের ইতিহাস সম্বলিত তাঁহার একক পুস্তকটিও বিখ্যাত ছিল। তিনি ইরাকী বর্ণনাসমূহের সারাংশসমূহকে মদীনার সঠিক মূলনীতির সাহায্যে যাচাই করেন। কারণ তাঁহার রচনাসমূহ বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এত খ্যাতি অর্জন করে যে, পরবর্তী কালের সংকলনসমূহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইতে থাকে এবং সমসাময়িক কালের অনুসন্ধান ও গবেষণায়ও ঐ সকল তথ্য ব্যাপকভাবে সঠিক বলিয়া স্বীকৃত হয়।

ইতিহাসশাস্ত্রের এই উন্নতি ও বিবর্তনের মধ্যে সুস্পষ্ট বিষয়টিকে সংক্ষেপে এইভাবে বর্ণনা করা যায় যে, যদিও প্রথম যুগের কোন কোন ধর্মীয় 'আলিম "সংবাদ লিপিবদ্ধকরণ"-এর কাজের বিরোধিতা করেন, তথাপি ইসলামী উম্মাহ্‌র মধ্যে ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। এই উপলব্ধি সৃষ্টিকরণে কুরআন পাকের ঐতিহাসিক প্রমাণাদি, ক্রমাগত বিজয়ের গৌরব সৃষ্টি, সঠিক গৌরব এবং আরব গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা নিঃসন্দেহে প্রবল সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু এই পর্যায়ে এক চিত্তাকর্ষক বিষয় এই যে, ভাষাবিদগণকে বাদ দিলে ঐতিহাসিক বর্ণনা সংগ্রাহক ব্যক্তিবর্গের প্রায় সকলেই ধর্মীয় 'আলিম ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, উপরোক্ত কারণসমূহ ব্যতীত ঐতিহাসিক উপলব্ধির ব্যাপারে আরও কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদ্যমান ছিল। ধর্মীয় জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে মানব জাতির রাজত্বের জন্য আল্লাহ্‌-র কার্যপ্রণালী প্রকাশক একমাত্র ইতিহাস। যদিও প্রথম দিকের শতাব্দীসমূহে ঐতিহাসিক লক্ষ্যবস্তু, নবী-রাসূলগণের পর্যায়ক্রমিক আগমনের ভিত্তিতে, যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময়ে পরিসমাপ্তি ঘটে, আল্লাহ্‌র কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা সত্ত্বেও ইসলামের সকল মতবাদ এই সম্পর্কে একমত যে, আল্লাহ্‌র কার্যক্রম পরিচালনা কেবল রাসূল প্রেরণেই সীমাবদ্ধ নহে। আহলু'স্‌-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতের মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় যে, এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অব্যাহত পরিচালন ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র উম্মাহ্ অর্থাৎ মুসলিমদের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। কারণ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশ (ওয়াহ্‌য়ি) ও হাদীছসমূহের পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য পরিণতি হইল মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসও পর্যালোচনা করা। ইহা ব্যতীত আহ্‌লুস্‌ সুন্নাহ্‌র-রাজনৈতিক মতাদর্শের মৌলিক ভিত্তির একটি অন্যতম বিষয় এই যে, "ইতিহাসের গতি চলমান" ইহা বিশ্বাস করা। শী'আ জামা'আতের মতে আল্লাহ্‌র হুকুমাতের (শাসনকার্যের) ক্রমাগত প্রতিচ্ছবি ইমামগণের মধ্যে চালু থাকিবে এবং যে সকল বর্ণনা সংগ্রাহকদের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজন শী'আ বর্ণনাকারী আবূ মিখনাফ, যিনি কূফার শী'আ আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে গভীর মনোযোগ দান করেন এবং তিনি ঐ মতবাদের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এইসব বিশ্বাসের কারণে ইতিহাসশাস্ত্রের বিভিন্ন মতাদর্শগত চিন্তাধারায় এক বিশেষ স্থান নিশ্চিত হয় এবং এই সম্পর্কে আরও অধিক শক্তিশালী এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, শক্তিশালী, দ্ব্যর্থবোধক ও মাযহাবী আলোচনা কেবল পক্ষপাতমূলক ও প্রতিরোধমূলক নহে, বরং তাহা যুক্তিসিদ্ধ পরিবর্তনের দ্বার খুলিতে শুরু করে। তাহার চমৎকার উদাহরণ সায়ফ ইব্‌ন 'উমার তাঁহার অপর এক রচনা, যাহা হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাত সম্পর্কে রচিত, সেই গ্রন্থে উল্লেখ করেন। ঐ যুগের পর হইতে ইতিহাস রচনা ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। রোম উপসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহে প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের স্থলাভিষিক্ত হয় নূতন তথ্যপঞ্জী অথবা উহাদেরকে ইসলামী ছাঁচের ভিত্তিতে নূতনভাবে ঢালিয়া সাজান হয় এবং সুসভ্য প্রাচ্য দেশসমূহের যে স্থানে কোন লিখিত ইতিহাস বিদ্যমান ছিল না এবং অনুন্নত আফ্রিকায় যেখানে শিক্ষা-দীক্ষার কোন নাম-নিশানা পর্যন্ত ছিল না, এই উভয় অঞ্চলের যেই স্থানে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, সেই স্থানসমূহে ইতিহাসশাস্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(৪) ব্যাপক অর্থে ঐতিহাসিক রচনাবলীর উন্মেষ ঘটে তৃতীয় হিজরী শতকের মধ্যভাগ হইতে। ব্যাপকতার অর্থ এই যে, সীরাত-এর উপরোল্লিখিত তথ্যপঞ্জী, একক পুস্তকাদি এবং অন্যান্য তথ্যপঞ্জী একত্র করিয়া ইহাদের দ্বারা সমন্বিত ঐতিহাসিক বর্ণনা বিন্যস্ত করা হয়। এই শ্রেণীর সর্বপ্রথম গ্রন্থকার আহ্‌মাদ ইব্‌ন য়াহ্‌য়া আল বালাযুরী (দ্র., মৃ. ২৭৯/৮৯২) "ক্লাসিক পদ্ধতি" অর্থাৎ প্রাচীন কালের বর্ণনা পদ্ধতি অব্যাহত রাখেন। তিনি ইবন সা'দ ও আল-মাদা'ইনী উভয়ের ছাত্র ছিলেন। বর্তমানে প্রাপ্তব্য তাঁহার দুইটি গ্রন্থে কেবল তাঁহার শিক্ষকগণের প্রভাবই লক্ষণীয় নহে, বরং ঐ যুগের উপভোগ্য উত্তম সমালোচনার নিদর্শনও পাওয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও ঐ যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা হইল বিশ্বের ইতিহাস, যাহার মধ্যে সৃষ্টির প্রথম হইতে বিশ্বের সকল ইতিহাসের সারসংক্ষেপ ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ আঙ্গিকে খাঁটি ইসলামের ইতিহাসের ভূমিকার ভিত্তিতে উল্লিখিত। ইহা কোন নূতন ধারণা নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা ইব্‌ন ইসহাকের রচনাবলীর দৃষ্টিভঙ্গির সম্প্রসারণ, যাহার মধ্যে ইসলামী উম্মাহ্‌-র ইতিহাসের সঙ্গে জাহিলী যুগের ইতিহাসের এক ব্যাপক অংশ সংযোজিত করা হইয়াছে। এইজন্য এই বিশ্ব ইতিহাস সঠিক অর্থে এই পর্যায়ের বিশ্বের সার্বিক ইতিহাস নহে। ইসলামের

আবির্ভাবের পর হইতে ইতিহাস রচনাকারীদের নিকট অন্যান্য জাতির ইতিহাস রচনার অধিক আগ্রহ অবশিষ্ট থাকে নাই।

এই পর্যায়ে উপনীত হইয়া প্রথমে (কেবল হিশাম আল-কাল্‌বী-র রচনা ইহার ব্যতিক্রম) ইতিহাস রচনা রীতিতে ইরানী বর্ণনাসমূহও অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, যদিও ইহা নিঃসন্দেহ যে, "ইরানী খোদায়ে নামা"-এর অনুবাদ এক শতাব্দী কালেরও অধিক সময় পূর্বে ইবনু'ল মুকাফ্‌ফা' (দ্র., মৃ. আনু. ১৩৯/৭৫৬) 'আরবী ভাষায় সম্পন্ন করেন। যেমন প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইসরাঈলিয়াত অর্থাৎ য়াহূদী ও নাসরানী গল্প-উপাখ্যানসমূহ অনেক পূর্বেই তাফসীরের আবরণে আরবী ভাষার ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়, যাহা সম্পূর্ণরূপে উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলিয়াও প্রমাণিত হয় নাই, এইভাবে ইরানী বর্ণনাসমূহের প্রভাবও অনুপযোগী থাকিয়া যায়। ইহার কারণ এই ছিল যে, যে যুগে ইতিহাস হাদীছ শাস্ত্রের অনুবর্তী ছিল, ঐ সময়ে আরবদের ত্বরিত বিশ্বাসের সমাধান ও তাহাদের মস্তিষ্ক হইতে খৃষ্টবাদের নেশাভঙ্গকারী অম্বল ও জ্ঞান এই ছিল, যাহা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা অর্জিত হয় এবং ইহা এমন পর্যায়ে ছিল যে, পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের যোগ্যতা 'আরবদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল এবং ঐ যোগ্যতা এমন অপরিহার্য যে, ইহা ব্যতিরেকে কোন সঠিক ইতিহাস লেখা কিছুতেই সম্ভব নহে। কিন্তু যেই সকল ইতিহাস খাঁটি ইসলামী সীমারেখার বাহিরে পদার্পণ করিয়াছে, উপাখ্যান, গল্প-কাহিনী ও ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে পার্থক্য করার অসুবিধাসমূহে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতাও প্রত্যাবর্তিত হইয়াছে যে, যে তথ্যপঞ্জীই হস্তগত হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার উপর বিশ্বাস করিতে হইবে। এই প্রবণতার ক্ষেত্রে ঐ তথ্যপঞ্জীসমূহের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে শক্তি অর্জিত হয়, যেই সব তথ্যপঞ্জীর দ্বারা আরব গ্রন্থকারগণ ইরান ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য প্রয়োজনীয় মাল-মসলা সংগ্রহ করেন। খোদ "খোদায়েনামা"-এর আদি পরিচ্ছেদসমূহ উপাখ্যান সম্পর্কিত ব্যক্তিত্ব অগ্নি উপাসনা সংক্রান্ত চিন্তাধারা, অশ্লীল উপাখ্যানসমূহ এবং আলেকজাণ্ডারের কাহিনীর প্রতিধ্বনি সম্বলিত ছিল। সাসানী রাজ্যসমূহের আলোচনায় সঠিক বিবরণের মধ্যেও অনেক সময় মহাকাব্য ও কাল্পনিক উপাদানের স্তর জমা হইয়া যায় (দ্র. Th. Noldeke, Das Iranische Nationalepos, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯২০ খৃ.)। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সুরয়ানী ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা নবজীবন লাভ করে এবং এই কারণে য়াহূদী, নাস্‌রানী ও গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীরও হৃদয়গ্রাহীতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু এই চিত্তাকর্ষণের জন্য যে পুঁজি সংগৃহীত হয়, তাহা কোনক্রমেই "খোদায়েনামা"-এর জন্য অধিক উপযোগী ছিল না। যেমন উহার মধ্যে আরামীয় ভাষার রচনা "মাগারা-ই গাঞ্জ" (Mearat gazze)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই ধরনের তথ্যপঞ্জী হইতে এমন পুঁজি সংগ্রহ করা হইয়াছে যাহা ইসলামের ইতিহাসের লিখিত সংক্ষিপ্তসারে আবূ হানীফা আদ-দীনাওয়ারী (দ্র., মৃ. ২৮২/৮৯৫) ও ইব্‌ন ওয়াদিহ্ আল-য়া'কূবী (দ্র., মৃ. ১৮৪/৮৯৭)-এর মত গ্রন্থকারগণ অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আল-য়া'কূবী-র গ্রন্থের ক্ষেত্র এত ব্যাপক যে (তিনি উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী ও চীনের অধিবাসীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেন), আমরা তাঁহার এই রচনাকে বিশ্বের ইতিহাস হিসাবে আখ্যায়িত করার স্থলে এক প্রকার ঐতিহাসিক বিশ্বকোষ হিসাবে আখ্যায়িত করিতে পারি। এই শ্রেণীর রচনাসমূহের মধ্যে মুহাদ্দিছ' ইব্‌ন কুতায়বার (দ্র., মৃ. ২৭৬/৮৮৯) "কিতাবু'ল মা'আরিফ" এবং ইহার পূর্বের শতাব্দীর হামযাতু'ল ইস্‌ফাহানীর (দ্র., মৃ. আনু. ৩৬০/৯৭০) এবং আল-মাস'ঊদী (দ্র.)-র (মৃ. আনু. ৩৪৫/৯৬৬) অবশিষ্ট তথ্যসমূহও অন্তর্ভুক্ত। আল-মাস'ঊদী সম্পর্কে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনাকারীদের অন্যতম। কিন্তু তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে বিদ্যমান রচনাসমূহ কেবল তাঁহার ধ্বংসপ্রাপ্ত বিস্তারিত রচনাসমূহের সংক্ষিপ্তসার মাত্র। এইজন্য ইহার সঠিক রচনা ও সংকলন পদ্ধতির মূল্যায়ন করা দুষ্কর।

এই ধরনের রচনা পদ্ধতি হইতে ইহা স্পষ্ট যে, আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক নূতন চিন্তাধারা অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এই নূতন উপাদানকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় যে, কেবল জ্ঞানের জন্যই এই জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ছিল। এই সূক্ষ্ম বিষয়টিও স্মরণযোগ্য যে, আল-য়া'কূবী ও আল-মাস'ঊদীর মত গ্রন্থকারগণ কেবল ঐতিহাসিকই ছিলেন না, বরং তাঁহারা ভূগোলবিদও ছিলেন এবং তাঁহাদের এই ভৌগোলিক জ্ঞান দীর্ঘ ভ্রমণের ফলে অর্জিত হইয়াছিল। ইতিহাস চর্চার এই উন্নতির ক্ষেত্রে আমরা নিঃসন্দেহে গ্রীক সংস্কৃতির সংমিশ্রণও দেখিতে পাই যাহা হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ইসলামের প্রতিটি জ্ঞানচর্চা ও তৎপরতায় অন্তর্ভুক্ত হইতেছিল। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্পর্ক বিদ্যমান, গ্রীক সভ্যতার অধিক প্রভাব বিস্তার ঘটিতে পারে নাই। কিন্তু এই পন্থায় ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাকে পরবর্তী কালের গ্রন্থকারগণও পর্যায়ক্রমে 'উছমানী শাসনকাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন [আরও দ্র. শিরো. ভূগোল, جغرافية]।

ইসলামের ইতিহাস উপরোক্ত সংমিশ্রণ কবলিত হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত্-তাবারী (দ্র., মৃ. ৩১০/৯২৩)-এর সুবিখ্যাত রচনা "তা'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলক" এই ধরনের অবান্তর উপাদান হইতে মুক্ত (এই গ্রন্থের "ইরানের ইতিহাস" অংশ ব্যতিক্রম)। ইহার মধ্যে প্রাচীন ঐতিহাসিক বর্ণনা সর্বাধিক দৃষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, প্রথম দিকে তাবারী একজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার ইতিহাসে এই উদ্দেশ্য পোষণ করেন যে, ইতিহাসের মাধ্যমে তিনি ইসলামের ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এমন বিবরণ ও পর্যালোচনার অনুসরণ করিবেন, যেমন তিনি তাঁহার তাফসীরসমূহে পূর্বে অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং এইভাবে স্বরচিত ইতিহাসকে পবিত্র কুরআনের তাফসীরের পরিশিষ্টে পরিণত করিবেন। এই গ্রন্থ যে আঙ্গিকে আমাদের নিকট পৌছিয়াছে, তাহা স্পষ্টত পূর্বের বিরাট গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার মাত্র। অবশ্য তাফসীর গ্রন্থে যে স্থানে রচনাকারীর পর্যালোচনা সরাসরি, সেই স্থানে ইতিহাসে তাহা পরিপূরক। এই ইতিহাস গ্রন্থে এমন কিছু দুর্বল বিবরণ পাওয়া যায়, যেসব বর্ণনার বিশ্বাস স্বাভাবিকভাবে কোন মুহাদ্দিছ হইতে হওয়া সম্ভব ছিল। ইহার একটি উদাহরণ এই যে, তাবারী, সায়ফ-এর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে এমন রচনাকে আল-ওয়াকিদী'র ইতিহাসের উপর প্রাধান্য দিয়াছেন। এই প্রাধান্য দানের কারণ এই যে, ওয়াকিদী-কে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে সন্দেহপূর্ণ মুহাদ্দিছ মনে করা হইত; কিন্তু ঐ সকল বিষয়ের মুকাবিলায় তাবারী'র ইতিহাস গ্রন্থের চমৎকারিত্ব ও পূর্ণ সৌন্দর্যকেও আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত, যাহাদের যুক্তিগ্রাহ্যতা ও সার্বিকতা এমন ছিল যে, সেই ইতিহাস রচনা পদ্ধতির যুগের অবসান হইয়াছে। পরবর্তী কালের গ্রন্থকার ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কিত ঐসব তথ্য নূতনভাবে একত্র করার ও যাচাই করার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই। গ্রন্থকারগণ হয়ত আত্-তাবারীর ঐ তথ্যাদির সংক্ষিপ্তসার তৈরী করিয়া নিয়াছেন (যাহার মধ্যে কোন কোন সময় আল-বালাযুরীর তথ্যাদিও

সংযোজন করা হইয়াছে) অথবা আত্-তাবারী যেই স্থানে তাঁহার ইতিহাস সমাপ্ত করিয়াছেন, সেই স্থান হইতে তাহাদের ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন।

কিন্তু আত-তাবারীর গ্রন্থের শেষ অংশের দৈন্য ও অপ্রতুলতা হইতে নির্ণিত হয় যে, ইতিহাস রচনায় মুহাদ্দিছ সুলভ বর্ণনা পদ্ধতির উপর নির্ভরতার যুগ সমাপ্ত হইয়াছে। দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনার কারণে কর্মচারী ও রাজ্যসভার লোকজন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাওয়ায় রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যবস্থাপনা ধর্মীয় 'আলিমদেরকে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়াছে। ফলে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে আরবী ইতিহাস রচনার এক যুগের অবসান ঘটিয়াছে এবং দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ হইয়াছে।

(খ)

ইতিহাস যখন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন হইতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ইহার বিস্তার ঘটিতে থাকে এবং তৃতীয় ও ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের মধ্যবর্তী সময়ে যেই সব ঐতিহাসিক রচনা প্রকাশিত হয়, ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, ঐ যুগের কেবল সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যায়ন ব্যতিরেকে বিস্তারিত বিবরণ দান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

(১) হিজরী তৃতীয় শতকে এই প্রথা চালু হইয়া যায় যে, বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতবর্গ স্ব স্ব স্থানীয় তথ্যসমূহ একত্র করিতে আরম্ভ করেন। "তা'রীখ মাক্কা" [দ্র. আল-আযরাকী] ব্যতীত যাহা অপরিহার্যরূপে সীরাত সংক্রান্ত রচনাবলীর আওতাভুক্ত, তন্মধ্যে প্রাচীনতম ইতিহাস গ্রন্থ মিসর ও মাগরিব বিজয়ের ঘটনাবলীর বিবরণ সম্বলিত 'আবদুর রাহমান ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'আব্দি'ল হাকাম কর্তৃক (দ্র., মৃ. ২৫৭/৮৭১) লিখিত ইতিহাস। এই বিষয়টি নিরীক্ষণযোগ্য যে, এই গ্রন্থেও ইতিপূর্বে উল্লিখিত সাধারণ ইতিহাসসমূহে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্যপঞ্জী বিদ্যমান। কিন্তু ঐ সকল ইতিহাসের সূক্ষ্মদর্শী মূল্যায়ন এই গ্রন্থের পাতায় অনুপস্থিত। বিজয় সম্পর্কিত ঘটনাবলীর উল্লেখ অধিকতর মদীনাকেন্দ্রিক এবং অবিশ্বাসযোগ্য স্থানীয় বর্ণনাসম্বলিত। এই গ্রন্থের ভূমিকা প্রকৃত ও খাঁটি মিসরী তথ্যপঞ্জী হইতে গ্রহণ করা হয় নাই, বরং ঐসব তথ্য মদীনাকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে য়াহূদী তথ্যপঞ্জী ও আরবী বর্ণনা হইতে গৃহীত। অনুরূপভাবে উপাখ্যান এবং কম-বেশী নির্ভুল বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাই ব্যতিরেকে মিলাইয়া দেওয়ার রীতি আন্দালুসী প্রাথমিক ইসলামী যুগের ইতিহাসেও অনুসরণ করা হয়, যেমন 'আব্দু'ল মালিক ইব্ন হাবীব (দ্র., মৃ. ২৩৮/৮৫৩) এবং আল-হামদানীর (দ্র., মৃ. ৩৩৪/৯৪৫-৯৪৬] "আল-ইকলীল" এই রীতির অনুসারী বলিয়া মনে করা হয়; এই "আল-ইকলীল" য়ামানী স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিশ্বকোষ। তৃতীয় হিজরী শতকে বিভিন্ন শহরের স্থানীয়ভাবে লিখিত ইতিহাসসমূহ সম্ভবত অধিক চিন্তাপ্রসূত ও বাস্তবতানির্ভর। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ 'তা'রীখ বাগদাদ'-এর একটি খণ্ড ব্যতীত (দ্র. শিরো. ইব্ন আবী তাহির তায়ফূর) ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এই ধরনের স্থানভিত্তিক ইতিহাসের ক্রমাগত আধিক্য দৃষ্ট হয়। ঐ সকল ইতিহাসে গ্রন্থকারের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী জীবনীর উপর জোর দেওয়া হইত [দ্র. পরিচ্ছেদ খ/৪ নিম্নে, পৃ. ৫৮খ] অথবা কোন সময় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উপরও জোর দেওয়া হইত। আমাদের যুগে প্রাপ্তব্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধকৃত ইতিহাস গ্রন্থসমূহ রোমক উপাদান দ্বারা সর্ব বিষয়ে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত না হইলেও ইহাদের মধ্যে এমন মূল্যবান তথ্যাদি অবশ্যই বিদ্যমান, যেসব তথ্য বৃহৎ বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই এবং এই দৃষ্টিকোণ হইতে ঐসব গ্রন্থ বিশেষ গুরুত্ববহ (দ্র. যেমন আন-নারশাখী, ইব্নু'ল-কূতিয়্যা, 'উমারা, ইব্ন ইস্ফানদিয়ার)। যেমন রচনা পদ্ধতি ও রীতির পরিপ্রেক্ষিত ঐসব লেখক নিজ নিজ অঞ্চলের ও সময়ের সাধারণ দেশাচারের অনুসারী ছিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে এই স্থানে অধিক আলোচনা করা যাইতেছে না। অবশ্য ইহা মনে রাখা উচিত যে, এই স্থানীয় ইতিহাসসমূহ আরবী ও ফার্সীতে ইসলামী ইতিহাস রচনার তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ নহে [এই পর্যায়ে একটি গ্রন্থ "মাজহার শাহজাহানী", গ্রন্থটি য়ূসুফ ইব্ন মীরাক ইব্ন আবি'ল কাসিম আল-হুসায়নী, বাদশাহ শাহজাহানের সিংহা- সনারোহণের ৭ম বৎসরে রচনা করেন (১০৪০/১৬৩০)]। [শীরানী সংকলিত গ্রন্থ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রন্থের দুইটি অংশের মধ্যে দ্বিতীয় অংশে সিন্ধুর ইতিহাস নিম্নলিখিত চারিটি পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইয়াছে ঃ (১) বাহ্কার, (২) সীবী, (৩) থাট্টা, (৪) সাহওয়ান-ইদারা]।

(২) তাহা সত্ত্বেও হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর সাধারণ ইতিহাস ও স্থানীয় ইতিহাসের মধ্যে কোন পার্থক্য অব্যাহত রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ঐ যুগ হইতে খাঁটি ঐতিহাসিক রচনাসমূহের সাধারণ পদ্ধতি স্ব স্ব যুগের এক বার্ষিক ঘটনাপঞ্জীর রূপ পরিগ্রহ করে যাহার সঙ্গে অনেক সময় বিশ্বের ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্তসারও ভূমিকা আকারে সংযোজিত করা হইত। এই ধরনের বর্ষপঞ্জীর মধ্যে গ্রন্থকারের রুচিবোধ ও জ্ঞান কোনক্রমেই "বিশ্বব্যাপী" (عالمگیر) হইত না, বরং এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে পরিদৃষ্ট হইত, যেইখানে গ্রন্থকারের অবস্থান। তিনি দূর-দূরান্ত অঞ্চলে সংঘটিত খুব বিরল ঘটনা সম্পর্কেই আলোচনা করিতে পারিতেন। অনুরূপভাবে দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা চিন্তাজগতে দূর ইসলামী ঐক্যের বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়, সেই প্রশ্ন বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও আলোচনার যোগ্য। আমাদের জন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার দায়িত্ব সরকারী কর্মচারী ও পারিষদবৃন্দের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এই পরিবর্তনের ফলে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ও ইহার মূল প্রাণ, মোটকথা সব কিছুর উপর একই ধরনের প্রভাব পড়িয়াছে। নিপুণ লেখক ও লিপিকারের (সচিবদের) জন্য ইহা একটি সহজ ও আকর্ষণীয় কাজ ছিল যে, তিনি পর্যায়ক্রমে ঘটনাবলীর লিপিবদ্ধকরণের দায়িত্ব পালন করিতেন। তাহাদের অভিজ্ঞতার অপরিহার্য তথ্যপঞ্জী সরকারী দলীলপত্র, জাতীয় পর্যায়ে মিলিত হওয়া ও দেখা-সাক্ষাত এবং কর্মচারী ও পারিষদবৃন্দের পরস্পরের সাধারণ আলাপ-আলোচনা আকারে বিদ্যমান ছিল। এইজন্য ইতিহাস লিখনের পদ্ধতিতে এই পরিবর্তন সাধিত হয় যে, এখন বিস্তারিত সনদের স্থলে সংক্ষিপ্ত তথ্যপঞ্জীর উল্লেখ করা হয়। এমন কি পরবর্তী কালের গ্রন্থকারগণ অধিকাংশ সময়ে সনদের উল্লেখ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টিও কর্তব্য বিধায়ক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের ঘটনাসমূহের বিবরণের সময় তাহাদের নিজ নিজ শ্রেণীর সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কারসমূহ ও সংকীর্ণতাও প্রতিফলিত হইতে হইবে। যে কারণে প্রাচীন ধর্মীয় ধারণায় ইতিহাসশাস্ত্রের গৌরব ও বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয় এবং বর্ষপঞ্জী পদ্ধতির ইতিহাস লিখনের প্রবণতা কেবল কোন শাসনকর্তা ও তাঁহার দরবারে তৎপরতায় সীমাবদ্ধ থাকে। পক্ষান্তরে লেখকদের ঐ সকল ইতিহাস হইতে–এই কথা ধরিয়া নিয়াও যে কোন গ্রন্থকার তাঁহার বিস্তৃত সীমারেখা অতিক্রম করিতে পারেন না–এই যুগের বাহ্যিক রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তাহা সাধারণত নির্ভরযোগ্য। সমসাময়িক বর্ষপঞ্জী, যাহা ইব্ন মিসকাওয়ায়হ্ [দ্র., মৃ.

৪২১/১০৩০] অথবা হিলাল আস্-সাবী [দ্র. আস্-সাবী] (মৃ. ৪৪৮/১০৫৬) লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থদ্বয়ে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, তাঁহারা বিশুদ্ধতার মাপকাঠি কঠোরভাবে সমুন্নত রাখিয়াছেন এবং রাজনৈতিক গোঁড়ামি হইতে তুলনামূলকভাবে নিজেদেরকে মুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের এই মাপকাঠিকে সকলেই মানিয়া নিয়াছেন, ইহা 'উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ আল-মুসাব্বিহী (মৃ. ৪২০/১০২৯)এবং ইব্নু'ল-হায়্যান আল-কুরতুবী (মৃ. ৪৬৯/১০৭৬-৭৭)-এর মিসর ও আন্দালুসিয়ার ইতিহাসের যে অংশ বর্তমানে পাওয়া যায়, সেই অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং আমরা সম্পূর্ণ বিবরণ না দিয়া কেবল দুইটি অত্যন্ত বিখ্যাত নামের উল্লেখ করিব।

ভূমণ্ডলীয় পদ্ধতির উপর ইতিহাস রচনার সুবাদে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির উদ্ভব হয়। প্রাথমিক যুগে ইতিহাস চর্চা মাযহাবী ও ধর্মীয় কারণে প্রয়োজনীয় বলা হইত। বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ ইহার স্থলে বলেন যে, সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইতিহার চর্চা অপরিহার্য। ইতিহাস ভাল ও মন্দ কর্মকাণ্ডের চিত্র ধরিয়া রাখে এবং ভবিষ্যত বংশধরদের সুস্থ সামাজিক সংস্কৃতি বিনির্মাণের জন্য ঐ সব চিত্রকে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করে [তু. ইব্ন মিসকাওয়ায়হ-এর রচনা "তাজারিবু'ল-উমাম" (تجارب الامم) ও হিলাল আস্-সাব-র গ্রন্থ 'আল'উযারা" (الوزراء)-এর ভূমিকা]। এই ধরনের দাবি বহু নিষ্ঠাবান ও চারুকলায় অতি উৎসাহী মহলে অসীম জনপ্রিয়তা অর্জন করে অর্থাৎ ইতিহাস যদি কেবল নীতিশাস্ত্রের একটি শাখাই হয় এবং পৃথক একটি শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের সমর্থিত ঐতিহাসিক উদাহরণসমূহের মাধ্যমে ইহাদেরকে নিজ উদ্দেশ্যের বাহন হিসাবে ব্যবহার করায় কেন দ্বিধাগ্রস্ত হইবেন? 'আদাব' (ادب) ও "মারায়া'ল-উমারা" (مرايا الامراء) -এর মত গ্রন্থসমূহ এই ধরনের বিকৃতিতে পরিপূর্ণ। এইসব গ্রন্থের দ্বারা সাধারণ মানুষের রুচি ও বিচারশক্তি বিকৃত হওয়ার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে এবং এই সংক্রামক রোগের দ্বারা ঐতিহাসিক ও ঘটনা বর্ণনাকারী পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ থাকিতে পারেন না।

(৩) এই পর্যায়ে ঐ যুগে বা কিয়ৎ পরে আবির্ভূত কতিপয় জাল ঐতিহাসিকের উল্লেখ করা সমীচীন মনে হয়। সায়ফ ইব্ন 'উমার-এর গ্রন্থাবলীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে [পরিচ্ছেদ ক ৩, উপর-এ (পৃ. ৫২ ক)], উহাদের মত মিথ্যা অপবাদকারীদের মধ্যে এমন কিছু ঐতিহাসিক আছেন, যাহাদেরকে সম্পূর্ণভাবে জাল বলা যায় না, বরং তাহাদের বর্ণনা সঠিক ভিত্তির উপর, কিন্তু ইহাদেরকে জনসাধারণ্যে গ্রহণযোগ্য, রোমাঞ্চকর উপাখ্যান এবং পক্ষপাতী প্রচারণার সঙ্গে এমনভাবে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইহাদের মাধ্যমে কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অথবা ধর্মীয় অভিপ্রায় পূর্ণ করাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য (উদাহরণসমূহের জন্য দ্র. শিরো. ইব্ন আ'ছাম, ইব্ন কুতায়বা, আল-মুরতাদা আশ-শারীফ, আল-ওয়াকিদী)।

(৪) যদিও রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার জন্য মুহাদ্দিছ ও পণ্ডিতগণ সরকারী কর্মচারীদের জন্য নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু নবী জীবনীমূলক ইতিহাস (সীরাত) রচনার বিস্তৃত ময়দান তাঁহাদের আয়ত্তেই ছিল। এই বিষয়টিও যেমন আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ক্লাসিক্যাল বর্ণনার একটি শাখা ছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রাজনৈতিক ইতিহাসকে যখন রাজ-রাজড়াদের কর্মতৎপরতার বর্ষপঞ্জীতে পরিণত করিয়া দেওয়া হয়, তখন 'আলিমগণ 'সিয়ার' রচনার প্রাচীন ধ্যান-ধারণাসমূহকে অধিক সুবিবেচনা ও সততার সঙ্গে সংরক্ষণ করেন। কেননা তাহাদের দৃষ্টিতে "ওয়ারাছাতু'ন-নাবী" অর্থাৎ নবী কারীম (স)-এর উত্তরাধিকারী 'উলামা'গণের আলোচনা (অনেক সময় আল্লাহ্র পরিচয়) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আলোচনার তুলনায় যমীনের উপর বসবাসকারী আল্লাহ্র উম্মাতের সঠিক ও প্রকৃত ইতিহাস অধিক সততার সঙ্গে উপস্থাপন করিতে পারেন। বিভিন্ন মাযহাবের মুহাদ্দিছ ও ফিক্হবিদগণের শ্রেণীগত তালিকার (দ্র. তাবাকাত) সঙ্গে সঙ্গে, যাহাদের মাধ্যমে কেবল একটি পারিভাষিক প্রয়োজন পূর্ণ হইত এবং প্রকৃত অর্থে উহাদেরকে 'সিয়ার'-এর অন্তর্ভুক্তই করা যায় না, বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যও প্রাচীন রীতিতে পৃথক সংক্ষিপ্তসারের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করিতেছে। এই পর্যায়ের প্রাচীনতম রচনাসমূহের মধ্যে যেইগুলি অদ্যাবধি সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, 'খলীফা উমার (২য়) ইব্ন 'আব্দি'ল-'আযীয (র)-এর সীরাত অন্যতম। এই সীরাত গ্রন্থটি উপরোল্লিখিত ইব্ন 'আব্দি'ল-হাকাম-এর ভ্রাতা রচনা করেন। লেখকের বর্ণনামতে এই গ্রন্থের কিছু তথ্য দলীল-দস্তাবিযের মাধ্যমে এবং কিছু তথ্য অধিক সময় মদীনায় বসবাসকারী মুত্তাকী সম্মানিত ব্যক্তিগণের বর্ণনা হইতে গৃহীত। সাধারণ রীতি এই যে, এই ধরনের রচনাবলীর মধ্যে একটি দল অথবা একই ধরনের মানুষের বিস্তারিত বিবরণ আসিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সূফীদের অনেক রচনা এমন রহিয়াছে, যাহা আল্লাহ্র আওলিয়াগণের জীবনের অবস্থা বর্ণনার জন্য নির্দিষ্ট, বিশেষ করিয়া আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী (দ্র.)-এ (মৃ. ৪৩০/১০৩৮) বৃহৎ রচনা "হিলয়াতু'ল-আওলিয়া' (حلية الاولياء)। অনুরূপভাবে শী'আ 'আলিম ও তাঁহাদের রচনাসমূহ (দ্র. আত-তূসী), যেইগুলি কেবল শী'আদের মধ্যেই প্রচলিত নহে, বরং সাধারণ্যেও প্রচলিত। এই রচনাসমূহ হযরত 'আলী (রা)-এর পরিবার-পরিজনদের মধ্যে যাঁহারা শহীদ হন তাঁহাদের সম্পর্কে রচিত ছিল। ঐ যুগের এক বিশেষ রচনা পদ্ধতি 'উলামা' ও মাশাহীরগণের জীবনী সম্বলিত অভিধান, এই রচনা কোন এক শহর অথবা প্রদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। ইহা স্থানীয় 'আলিমগণই রচনা করিতেন এবং অনেক সময় এইসব গ্রন্থ অত্যন্ত বৃহদাকারের হইত। উদাহরণস্বরূপ আল-খাতীব আল-বাগদাদী (দ্র., মৃ. ৪৬৩/১০৭১)-র রচনার কথা উল্লেখ করা যায়, তাঁহার রচনা মুদ্রিত ১৪ খণ্ড সম্বলিত ছিল। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ রচনা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইব্ন 'আসাকির (দ্র., মৃ. ৫৭১/১১৭৬)-এর রচনা দামিশ্কের 'ইতিহাস' ("তা'রীখ"), যাহা সম্ভবত আরবী সাহিত্যে এই ধরনের অত্যন্ত পরিপূর্ণ গ্রন্থ, এই গ্রন্থ অদ্যাবধি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে আন্দালুসিয়াবাসীর জীবনী গ্রন্থের (দ্র. ইব্নু'ল-ফারাদী, ইব্ন বাশ্কুওয়াল ও ইব্নু'ল-আব্বার) একটি পর্যায়ক্রমিক প্রকাশনা ও কতিপয় সংক্ষিপ্ত জীবনী সংক্রান্ত অভিধানও বিদ্যমান রহিয়াছে।

যেমন ধারণা ছিল জীবনী সাহিত্য অন্যান্য মাধ্যমেও সংগ্রহ করা হয়। ইহাদের মধ্যে একটি ফলদায়ক মাধ্যম ছিল "ফিক্হু'ল লুগাত ((Philology)। ইহার মধ্যে একটি সংকীর্ণতর শাখা এবং সাহিত্য সম্পর্কিত বিস্তৃত অপর এক শাখা অর্থাৎ এই উভয় শাখা অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম বিষয়ের অধীনে আরবী ব্যাকরণবিদদের স্তরবিন্যাস এবং বিখ্যাত ও অভিজ্ঞ ভাষাতাত্ত্বিকদের জীবনী লিখিত হয়। দ্বিতীয় বিষয়ের আওতায় কবি ও সাহিত্যিকগণের জীবনী সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তৃত সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে (দ্র. ইব্ন কুতায়বা ও আছ-ছা'আলিবী)। এই ধরনের গ্রন্থ অন্যান্য নিপুণ পেশাজীবীর জন্যও নির্দিষ্ট ছিল। যেমন চিকিৎসক ও গণকদের শ্রেণী এবং সঙ্গীতজ্ঞদের বিবরণ। যেমন সঙ্গীত সম্পর্কে হিজরী প্রথম শতকসমূহে অতি বৃহৎ গ্রন্থ "কিতাবু'ল-আগানী" লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের লেখক ছিলেন আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী (দ্র., মৃ. ৩৫৬/৯৬৭)।

পক্ষান্তরে আত্মজীবনীমূলক রচনা তেমন প্রসার লাভ করে নাই এবং ঐ যুগের কেবল দুইটি গ্রন্থ সংরক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ মুওয়ায়্যাদ ফি'দ-দীন (দ্র., মৃ. ৪৭০/১০৭৭-১০৭৮) এবং 'উছমান ইব্ন মুরশিদ ইব্ন মুনকিয (দ্র. মৃ. ৫৮৪/১১৮৮)-এর আত্মকথন। এই প্রকারের সকল সীরাত গ্রন্থ এবং পরবর্তী কালের ইসলামী সীরাত রচনায় কিছু মিল পাওয়া যায়। সনদ পদ্ধতির অনুসরণ সাধারণত অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে করা হইয়াছে। ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক তথ্যপঞ্জী (বিশেষ করিয়া মৃত্যুসন) অত্যন্ত শুদ্ধরূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং গ্রন্থকারের জীবনের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণ ইতিহাসসমূহ কেবল ঐসব আলোচ্য বিষয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তি যদি লেখক হন, তাহা হইলে তাহার রচনাবলীর তালিকা এবং কবি হইলে তাঁহার রচনার উদ্ধৃতি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অবশ্য অধিক দীর্ঘ জীবনীসমূহের বেশির ভাগ অংশ এমন অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা ও কাহিনীতে ব্যয় করা হয়, যাহাদের বিন্যাস স্পষ্টত বর্ষক্রমিকও হয় না অথবা বিষয়ভিত্তিকও হয় না। এই ধরনের রচনার মধ্যে আলোচ্য ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনেক সময় সম্পূর্ণ স্পষ্ট একটি চিত্র ধ্যানধারণায় অঙ্কিত হইয়া যায়। কিন্তু কখনও এই চিত্রে বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হইয়া যায়, বিশেষ করিয়া যে স্থানে কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার কোন সনদ না থাকে। তাহা সত্ত্বেও এই ধরনের সাহিত্যে দুর্বলতা পাওয়া যায় এবং ইহার মধ্যে জল্পনা-কল্পনা জাতীয় বিষয়াদিও অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেহেতু উহা মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, ইহার মধ্য হইতে রাজনৈতিক বর্ষপঞ্জীর জন্য এক প্রকারের পরিশিষ্ট ও সংশোধনের তথ্য অপরিহার্যরূপে ব্যবস্থিত হইয়া যায়।

(৫) প্রারম্ভিক যুগেই 'সীরাত' ও ইতিহাসের সংমিশ্রণের দ্বারা "সীরাতনির্ভর ইতিহাস" লিখিত হইতে থাকে। এই পদ্ধতি মন্ত্রীদের ইতিহাসের জন্য সুস্পষ্টরূপে উপযোগী ছিল; যেমন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদূস আল-জাহাশিয়ারী (মৃ. ৩৩১/৯৪২-৪৩), পূর্বে উল্লিখিত হিলালু'স-সাবী (মৃ. ৪৪৮/১০৫৬) এবং 'আলী ইব্ন মুনজিবি'স-সায়রাফী (মৃ. ৫৪২/১১৪৭-৪৮) লিখিত গ্রন্থসমূহের জন্য উপরোক্ত বক্তব্য প্রযোজ্য। তাঁহাদের মধ্যে সায়রাফী ফাতিমী খলীফাগণের শাসনকালে "তারীখু'ল-ওয়াযারা" লিখিয়াছেন। অনুরূপভাবে এই পদ্ধতি বিচারকদের (কাদী) জীবনী লিখনের জন্যও উপযোগী ছিল। আলোচ্য বিষয়ে প্রাচীনতম রচনাবলীর মধ্যে মিসরের বিচারকগণের উপর মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আল-কিন্দীর (দ্র., মৃ. ৩৫০/৯৬১) এবং কর্ডোভার বিচারকগণের উপর মুহাম্মাদ ইব্ন হারিছ আল-খুশানী (মৃ. ৩৬০/৯৭০-৭১) রচিত গ্রন্থ রহিয়াছে। আস-সূলী [দ্র., মৃ. ৩৩৫/৯৪৬) রচিত 'আব্বাসী যুগের ইতিহাস "কিতাবু'ল-আওরাক" রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক রচনার এক অনুপম সংমিশ্রণ। রাজবংশসমূহের শ্রীবৃদ্ধি হইলে তাহাদের সম্পর্কেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অবশ্য হিজরী ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এই ধরনের রাজবংশীয় ইতিহাস কার্যকরভাবে বর্ষক্রমিক বর্ণনায় স্থান প্রাপ্ত হয় এবং অন্ততপক্ষে প্রাচ্য অঞ্চলে বর্ষক্রমিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির সমাপ্তি ঘটায়। ইহা একটি ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ ছিল। কেননা ব্যক্তিগত উপাদানের প্রাবল্যের দরুন উহা অত্যধিক গুরুত্ব পাইতে থাকে, বিশেষত যখন শাসক ব্যক্তিগতভাবে নিজ শাসনকালের ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নির্দেশ দেন এবং স্বয়ং এই বিষয়ে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন। এইভাবে ইতিহাস রচনা কেবল হাস্যাস্পদ প্রহসনে পরিণত হইয়া যায় এবং সরল বর্ণনার স্থলে প্রস্তুতিহীন জটিল রচনা (দ্র. সাজা') উহার স্থান গ্রহণ করে। এই নূতন পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনার উদ্ভাবক ছিলেন ইব্রাহীম আস-সাবী (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪, দ্র. আস-সাবী)। ইনি বুওয়ায়হী রাজবংশের ইতিহাস আত-তাজী (التاجي) নামে লিখেন, এই গ্রন্থটি বর্তমানে বিলুপ্ত। এই পদ্ধতিতে রচিত সমপর্যায়ের ইতিহাস 'কিতাবু'ল-য়ামীনী" জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আল-'উত্বী (দ্র.) মৃ. আনু. ৪২৭/১০৩৫) সাবুক্তিগীন ও মাহ্মূদ গায্নাবী সম্পর্কে এই "কিতাবু'ল য়ামীনী" লিখিয়াছিলেন। সম্ভবত প্রাচ্যে ফারসী ভাষার পুনরুজ্জীবন এবং ইরানী ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের নূতনত্বের সহিত [দ্র. পরিচ্ছেদ ক/৪খ, উপরে (পৃ. ৫৪ ক)] এই নূতন ইতিহাস রচনা পদ্ধতির সংযোগ রহিয়াছে এবং ইহাও সম্ভব যে, ইরানী বীরত্ব গাঁথার প্রভাবের ফল, যাহা ঐ যুগে বিকশিত হইতেছিল (দ্র. দাকীকী ও ফিরদাওসী)। এই ধরনের 'সরকারী ইতিহাস' লেখকদেরকে যদি মিথ্যা উপাখ্যান রচনা এবং সত্য গোপন করার দায় হইতে অব্যাহতিও দেওয়া হয়, তবু তাহাদের বাচালতা, অনর্থক কথন ও বিচার-বুদ্ধির অনুপস্থিতি অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ধরনের অনেক রচনা এবং উহাদের পরবর্তী কালের রচনাবলী সাহিত্যের পরিমণ্ডলে এত অধিক খ্যাতি লাভ করে যে, সাধারণভাবে মানুষ ইহাদেরকে ইসলামী ইতিহাসের বিশুদ্ধ উদাহরণ বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় এই যে, এই দৃষ্টান্তের দ্বারা ইতিহাসশাস্ত্রের প্রতি অবিচার করা হয়, যে শাস্ত্রকে প্রথম হিজরী শতকের মুসলিম 'আলিমগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্রমান্বয়ে উন্নতি দান করিয়াছিলেন।

(৬) এই বিরূপ পরিবেশে পুনরায় ফারসী ভাষায় ইতিহাসের গ্রন্থ লিখিত হইতে থাকে। এই কথাটি মনে রাখার মত যে, ইহাদের মধ্যে অনেক প্রাচীনতম গ্রন্থ আরবী রচনাবলীর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তসার ছিল এবং এই প্রক্রিয়া আত-তাবারীর ক্লাসিক ইতিহাসের স্বীয় পসন্দকৃত সংক্ষিপ্তসার তৈরির মাধ্যমে আরম্ভ হয়। ইহা ৩৫২/ ৯৬৩ সালে মন্ত্রী আবূ 'আলী আল-বাল্'আমী (দ্র.) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি স্থানে স্থানে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করিলেও (দ্র. যেমন শিরো. আল-গারদীযী) ঐ যুগে স্থানভিত্তিক ও শাসক বংশের যেসব ইতিহাস ফারসী ভাষায় লেখা হয়, উহাদের মধ্যে বিরল কোন একটি সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং উহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের কোনই কারণ নাই, যাহা দ্বারা উহাদের মধ্যে এবং ঐ যুগের প্রাচ্যের দেশসমূহে আরবী ভাষায় লিখিত ইতিহাসসমূহের মধ্যে কোন পার্থক্য প্রকাশিত হইতে পারে। কতিপয় গ্রন্থকার, যেমন আন-নাসাবী (দ্র.), যিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কখনও আরবী ভাষায় আবার কখনও ফারসী ভাষায় লিখিতেন, অবশ্য এই স্তরের সকল গ্রন্থের তুলনায় আবু'ল-ফাদ্ল বায়হাকীর [দ্র.] (মৃ. ৪৭০/১০৭৭) বিখ্যাত এক ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থে বিস্তারিত ও নিরপেক্ষ দিনপঞ্জীতে পাওয়া যায়, যাহা মুগল-পূর্ব যুগের সাহিত্যের এক অনুপম রচনা।

সাহিত্যের ভাষা হওয়ার সুবাদে ফারসীর পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা হিজরী ৪র্থ শতাব্দীতে (খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দী) ইরানী বংশসমূহের রাজত্বকালে আরম্ভ হয়, কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীসমূহে তুর্কী শাসকগণও এই সম্পর্কে অনেক কিছু করিয়াছেন। কেননা তাঁহারা সাধারণত আরবী ভাষার বিরোধী ছিলেন। যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদের বিজয় প্রক্রিয়া পশ্চিম দিকে আনাতোলিয়া (আনাতূলী) পর্যন্ত এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত প্রসারিত হইতেছিল, ততদিন তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে ফারসী ভাষাকে নিয়া যান এবং হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর (খৃস্টীয় ১২শ শতাব্দীর) শেষ পর্যন্ত ঐসব বিজিত দেশেও ফারসী ভাষায় ইতিহাস রচিত হইতে থাকে। যেমন এশিয়া মাইনর-এ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আর-রাওয়ান্দী (আনু. ৬০০/১২০৩) এবং হিন্দুস্তানে ফাখ্রু'দ-দীন মুবারাক শাহ্ (মৃ. ৬০২/১২০৫-১২০৬-এর পর) ইতিহাস রচনা করেন। এই ফাখ্রুদ-দীন হিন্দী-ইরানী ঐতিহাসিকদের দীর্ঘ তালিকার শীর্ষস্থানীয়।

ইহার পরবর্তী যুগের আলোচনা করার পূর্বে সাহিত্য চর্চার আরও দুইটি শাখার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা সমীচীন মনে করি, উপরোক্ত শাখা দুইটি ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বর্ষক্রমিক পরিচিতির প্রক্রিয়ায় গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। এইসব আলোচনার নিদর্শন প্রাথমিক যুগের অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এই পর্যায়ে অত্যন্ত বিখ্যাত রচনা আবূ রায়হান আল-বীরূনী [দ্র.]-র (মৃ. ৪৪০/১০৪৮) আল-আছারু'ল-বাকিয়্যা। দ্বিতীয় আর এক প্রকারের গ্রন্থে ইতিহাসের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অধিক তথ্য রহিয়াছে। উহাদের আলোচ্য বিষয় হইল আরব গোত্রসমূহের বসতি সম্পর্কে, নূতন বিজিত দেশসমূহে তাহারা এই বসতি গড়িয়া তোলে। বিষয়ভিত্তিক বিবরণপূর্ণ ঐ গ্রন্থসমূহ "আদাবিয়্যাতু খিতাত" নামে অভিহিত এবং সম্ভবত ইরাকে ইহার সূচনা হয় [ঐ পদ্ধতির রচনাবলীর মধ্যে হায়ছাম ইব্ন 'আদী (মৃ. ২০৭/৮২২-২৩)-এর গ্রন্থটি সর্ববৃহৎ, যাহা বর্তমানে বিলুপ্ত]। তাঁহার এই "খিতাত" পদ্ধতির রচনার উন্নতি ও প্রসার ঘটে মিসরে (তু. শিরো. মিসর, পরিচ্ছেদ ৪)।

অতঃপর প্রাচ্যের খৃস্টান জাতির মধ্যে আরবী ভাষার প্রচলন হয়, তখন খৃস্টানদের গির্জার ইতিহাসও আরবী ভাষায় লিখিত হইতে থাকে। ইহাদের মধ্যে কখনও কখনও আরব ও বায়যানটীয়দের ইতিহাসকেও মিশ্রিত করিয়া ফেলা হইত। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে মিলকানী বিতরীক য়ূটিকিউস (Eutychius) [দ্র.] এবং য়া'কূবী উসকাফসীবীরস্, ইব্নু'ল-মুকাফ্ফা' (দ্র.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্যায়ে এক বিস্ময়কর রচনা "মিসর ও পশ্চিম এশিয়ার খৃস্টান উপাসনাগারের ইতিহাস" গ্রন্থটি একজন মুসলিম ঐতিহাসিক 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-শাবুশ্তী (মৃ. আনু. ৩৮৮/৯৯৮) রচনা করেন।

(গ)

হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দী (খৃস্টীয় ১২শ শতাব্দী) হইতে আরবী ও ফারসী ভাষায় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অধিক পার্থক্য সূচিত হইতে থাকে। প্রথম দিকে মুগল বিজয়ের কারণে এই পার্থক্য চূড়ান্ত হয়, যাহার ফলে ইরানী-তুর্কী সাংস্কৃতিক অঞ্চলে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে আরবীর স্থল ফারসী দখল করিতে থাকে। অন্যদিকে একই সময়ে হিন্দুস্তানেও ইসলাম প্রসারের ফলে ফারসীর প্রচলন হয়। এইভাবে এই অঞ্চলের সকল দেশে ফারসী ভাষায় ইতিহাস রচনার প্রচলন অত্যন্ত দ্রুত প্রসারিত হয়। তাহা সত্ত্বেও আরবী ভাষায়ও ইতিহাস রচনা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই প্রকারের বিস্তৃত জ্ঞানপঞ্জীর সুবাদে (১) আরবী ও (২) ফারসী ভাষায় যে ঐতিহাসিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্পর্কে পৃথক পৃথক আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

(১) এই যুগে আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনার জন্য নির্ধারিত মূলনীতি বিধিবদ্ধ থাকিলেও অনেক নিত্য নূতন বিষয়ের সংযোজনের ফলে ইহার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। ঐ পরিবর্তনসমূহের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত বৈশিষ্ট্য দুইটি ঃ (১) যেসব বৈশিষ্ট্য জীবনী সংক্রান্ত আলোচনা ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বলিত রচনার পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছে এবং (২) যাহা এমন তথ্যের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার উপর সাধারণ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ লিখিত ছিল। ঐ পরিবর্তনসমূহের ভিত্তির অংশসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ প্রথম পরিবর্তনের জন্য 'আলিম ঐতিহাসিক, সরকারী ঐতিহাসিক যুগপৎভাবে পুনরায় প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় পরিবর্তনের ফলে 'আরব ইতিহাস চর্চার ঠিকানা ইরাক হইতে প্রথমে সিরিয়ায় এবং ইহার পরে মিসরে পরিবর্তিত হয়।

(১) বর্ষপঞ্জীসমূহের মধ্যে যেই সব সুস্পষ্ট বিষয় দ্বারা এই নূতন যুগের সূচনা হয় তাহা এই যে, ইহার মধ্যে বিশ্বের ইতিহাস (সৃষ্টির প্রথম হইতে) এবং অনেক সময় বিশ্বের ইতিহাস (ইসলামের আবির্ভাবের পর হইতে)-এর পুনরুজ্জীবিত হয়। এইভাবে এই প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত অধিক মানবিক (humanistic) ধারণাপূর্ণ ইতিহাস উম্মতের ইতিহাসের অবস্থাসমূহেরই নাম। ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, যদিও প্রথম শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে কোন নূতন গবেষণা ও অনুসন্ধান হয় নাই। সাহিত্যিক উদ্দেশ্য এই প্রয়াসের দ্বারাও প্রতীয়মান হয়, যাহা বর্ষক্রমিক রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জী ও জীবনী লিখনকে একত্র করার জন্য করা হইয়াছে। যেমন কোন কোন প্রাচীনতর স্থানীয় ইতিহাসে করা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ইব্নু'ল-কালানিসী (দ্র., মৃ. ৫৫৫/১১৬০)-এর দামিশ্কের ইতিহাস। অবশ্য গ্রন্থকারের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী রচনার মধ্যে উপরোক্ত দুইটি উপাদানের আনুপাতিক পরিমাণ বিভিন্ন। কোন কোন ইতিহাসের মধ্যে (দ্র. ইব্নু'ল-জাওযী, আয-যাহাবী, ইব্ন দুক্মাক) মৃত্যু সংবাদ রাজনৈতিক ঘটনাবলী বর্ণনার উপর এমনভাবে আচ্ছন্ন যে, ঘটনাবলীর বর্ণনা কেবল কতিপয় আকস্মিক ও সংযোগবিহীন বাক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। কিন্তু 'ইয্যু'দ্-দীন ইবনু'ল-আছীর [দ্র.] (মৃ. ৬৩০/১২৩৩)-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কামিল'-এ এই অনুপাত বিপরীত। এই রচনাটি এই দৃষ্টিকোণ হইতেও মূল্যায়নযোগ্য যে, তিনি এই গ্রন্থে ইতিহাসকে অকল্পনীয় করার মানসে বর্ষক্রমিক কাঠামোর অভ্যন্তরে উপাখ্যানরূপে পেশ করার প্রয়াস পাইয়াছেন। গভীরতর দৃষ্টিতে রচনাটি যাচাই করিলে বুঝা যাইবে যে, তথ্য পরিবেশনায় কিছু ত্রুটি অবশ্যই রহিয়া গিয়াছে, তবুও এই রচনার সূক্ষ্মতা, সৌন্দর্য, অনুবাদ ও বর্ণনা কৌশলের জন্য উহা তাৎক্ষণিকভাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে এবং পরবর্তী কালের গ্রন্থকারগণ ইহাকে একটি উচ্চ মানের গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করিতে থাকেন।

স্পষ্টত এই ধারণা করা অমূলক নহে যে, ইতিহাস রচনায় এই বিশ্বকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করার ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন খিলাফাতের ধারণার পুনরুজ্জীবনেরও আংশিক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই পর্যায়ে যে উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত হয়, উহার অনুসরণ করা হয় অনেক পরে, কেহ কেহ করেন অত্যধিক নিষ্ঠার সহিত এবং অনেকের একমাত্র কারণ ছিল ইবনু'ল-আছীরের রচনা [দ্র. ইব্ন ওয়াসিল, সিব্ত ইব্নু'ল-জাওযী, ইবনু'ল-'ইবরী=Barhebraeus. আবু'ল-ফিদা', বায়বারস্ আল-মানসূরী, ইব্ন কাছীর, আল-য়াফি'ঈ] যদিও তাঁহারা ইব্ন আছীরের সাক্ষাত লওয়ার পর স্থানীয় এবং পরবর্তী কালের তথ্যও ব্যবহার করেন। শিহাবু'দ-দীন আন-নুওয়ায়রী [দ্র.] (মৃ. ৭৩২/১৩৩২), যিনি মিসরের বিশ্বকোষ (موسوعة) রচনাকারী ছিলেন এবং ইবনু'ল-ফুরাত [দ্র., মৃ. ৮০৭/১৪০৫] নিজ নিজ বর্ষপঞ্জীসমূহে অবশ্য ইবনু'ল-আছীর হইতে কিছুটা পৃথক হইয়া চলার চেষ্টা করিয়াছেন এবং খৃস্টান ঐতিহাসিক জিরজীস আল-মাকীন [দ্র. আল-মাকীন] (মৃ. ৬৭২/১২৭৩) সম্পূর্ণরূপে Eutychius-এর [দ্র. পরিচ্ছেদ খ/৭ (পৃ. ৬১খ)] অনুসরণ করিয়াছেন। পরবর্তী কালের সাধারণ আরবী ইতিহাসসমূহের মধ্যে সাধারণ ইতিহাস রচনার দৃষ্টিকোণ হইতে সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস রচিত হয় আন্দালুসিয়া ও আল-মাগরিবে। যদি এই ইতিহাসের সঙ্গে প্রাচ্যের দেশসমূহে রচিত সমসাময়িক ইতিহাস তুলনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আল-মাগরিবের গ্রন্থকারগণ অনেক সময় ব্যাপকতর ঐতিহাসিক বিবরণ উপস্থাপন করিতেন এবং ঐসব ইতিহাসে পক্ষপাতিত্বের প্রবণতা কম। ইব্ন সা'ঈদ আল-মাগ্রিবীর [দ্র.] (মৃ. ৬৭৩/১২৭৪) অনেক রচনার মধ্যে যে কয়েকটি বিদ্যমান আছে, তাহা

দ্বারা সহজেই ইহা প্রমাণিত হয় যে, এই রচনাবলী পূর্বের গ্রন্থসমূহের বিস্তারিত ও সঠিক অনুলিখনের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত ছিল। এই ব্যক্তি একজন বিরামহীন ভ্রমণকারী ও গবেষক ছিলেন। তিনি হালাকূ খানের মত ভীতিজনক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করার আবেদন করিতেও ভীত হন নাই। 'আবদুর রাহমান ইব্ন খালদূনের [দ্র.] (মৃ. ৮০৮/১৪০৬) বিশ্বখ্যাত ইতিহাস সম্পর্কে যথাযথ বিস্তারিত আলোচনা করা এই স্থানে সম্ভব নহে। ঐতিহাসিক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার এই রচনা অনেক সময় হতাশারও সঞ্চার করে। কিন্তু ইতিহাসের দর্শনের উদ্ভাবক হওয়ার কারণে প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা যায়, যদিও ইতিমধ্যে অনেক লেখাও হইয়াছে। ইসলামের ইতিহাস রচনার দৃষ্টিকোণ হইতে অদ্যাবধি এই বিশ্বাস কেবল অনুমান নির্ভরই রহিয়া গিয়াছে যে, মিসরের জাঁকজমকপূর্ণ ইতিহাস কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও যাহা পরবর্তী শতাব্দীসমূহে আলো বিতরণ করিয়াছে এবং তুরস্কে ইতিহাস শাস্ত্রের প্রতি গভীর মনোযোগদান করা সত্ত্বেও (সেই স্থানে হিজরী ১২শ শতাব্দী, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ইব্ন খালদূনের মুকাদ্দিমার অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছিল) কেন এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, যে নিদর্শনের দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে যে, তাঁহার স্থলাভিষিক্তদের মধ্য হইতে কেহই তাঁহার উপস্থাপিত মূলনীতিসমূহকে ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কখনও ইহাদের পর্যালোচনার কষ্টও স্বীকার করিয়াছেন।

(৬) সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চল ও বংশভিত্তিক ইতিহাস ও জীবনীমূলক অনেক ইতিহাস অধিক পরিমাণে রচিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ ইতিহাস রচনাকারিগণই এইসব ইতিহাসও লিখিয়াছেন। ইরান ও ইরাকে আরব সংস্কৃতি মুগলদের আক্রমণের কারণে প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, যেমন ঐ স্থানে তাজু'দ-দীন ইব্নু'স- সা'ঈ (মৃ. ৬৭৪/১২৭৫)-এর রচিত ইতিহাস 'আব্বাসী শাসনকালের পর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র কতিপয় ক্ষুদ্র ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই [দ্র. ইব্নু'ত-তিকতাকা]; কিন্তু ইহার পূর্বেই আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনার কেন্দ্রস্থল সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। সেই স্থানে যাঙ্গী ও আয়্যূবী বংশসমূহের উত্থানের ফলে ইতিহাস রচনায় এক পৃথক প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে যাহারা আকর্ষণ অনুভব করেন তাঁহাদের মধ্যে 'ইমাদু'দ-দীন আল-ইসফাহানীও ছিলেন [দ্র.] (মৃ. ৫৯৭/১২০১)। এই ব্যক্তি ইরান ও ইরাকের সাজা' পদ্ধতির সর্বশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু সিরীয়গণ এই সাজা' পদ্ধতির (আরবী ভাষা রীতির একটি রীতি, যেমন বাংলা ভাষার সাধু রীতি ও চলিত রীতি) স্থলে সহজ-সরল গদ্য রীতিকে ইতিহাস রচনায় অগ্রাধিকার দান করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে পরবর্তী যুগের আরবী ভাষার ইতিহাস অত্যন্ত উপকৃত হয়। বাহাউ'দ-দীন ইব্ন শাদ্দাদ [দ্র.] (মৃ. ৬৩২/১২৩৪) এবং আবূ শামা [দ্র.] (মৃ. ৬৬৫/১২৬৮)-এর এতদসম্পর্কিত রচনাবলী 'ইমাদু'দ-দীন-এর রচনাবলী হইতে শ্রেষ্ঠতর।

ইহা সত্য যে, সাজা' পদ্ধতির ইতিহাসও ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং মিসরীয় কাতিব (সচিব) ইব্ন 'আব্দি'জ-জাহির [দ্র.] (মৃ. ৬৯২/১২৯৩) তো এক নূতন পদ্ধতির পত্তন করেন অর্থাৎ তিনি সুলতান বায়বার্স-এর শাসনকালের ইতিহাস কবিতার মাধ্যমে লিখিয়া ফেলেন। কবিতার এই ব্যবহার বাদরু'দ-দীন ইব্ন হাবীব [দ্র.] (মৃ. ৭৭৯/১৩৭৭)-এর রচনায় সাজা' পদ্ধতির ব্যবহারের অনুরূপ ছিল। তাঁহাদের উভয়কে স্পষ্টত বাহ্যিক প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত বলা যায় না। কিন্তু ইব্ন আরাব শাহ্ দিমাশ্কী [দ্র.]-র (মৃ. ৮৫৪/১৪৫০) সাজা' পদ্ধতিতে লিখিত 'তারীখ তায়মূর" (যাহা অসম্মান ও অপমানজনক) নিঃসন্দেহে সমসাময়িক কালের ইরানী রচনাবলীর প্রভাবাধীনে লিখিত হয় (দ্র. পরিচ্ছেদ 11/2, নিম্নে (পৃ. ৬৭ খ)]। পক্ষান্তরে ফাতিমী বংশের শাসনকালের যে ইতিহাস 'উয়ূন'ল-আখবার নামে য়ামানী দা'ঈ 'ইমাদু'দ-দীন ইদ্রীস ইব্নুল-হাসান (মৃ. ৮৬২/১৪৫৭) বক্তৃতার আকারে লিখেন, ইহা পাঠ করার সময় মনে হয় যেন প্রাচীন সাসানী বর্ণনাসমূহের শেষ কণ্ঠের প্রত্যাবর্তন ঘটিয়াছে [দ্র. পরিচ্ছেদ ক ১/৪ প.]।

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আয়্যূবীদের যুগে যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হয়, তাঁহাদের পরবর্তী মামলূক সুলতানদের যুগেও উহা অব্যাহত থাকে। দামিশ্ক ও পরবর্তীতে হালাব ইতিহাস রচনায় অত্যন্ত সক্রিয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। কায়রোর সঙ্গে ইহাদের পারস্পরিক সংযোগ কিছুটা ছিল। কিন্তু এই স্থান, বিশেষ করিয়া জীবনী রচনায় একক শ্রেষ্ঠত্বে উদ্ভাসিত ছিল [দ্র. পরিচ্ছেদ গ-১/৩ নিম্নে (পৃ. ৬৫ খ)]। মামলূক সুলতানদের শাসনকালের শেষ শতকে কোথাও কোথাও মিসরীয় ইতিহাস রচনা পদ্ধতি একক বৈশিষ্ট্য ও একক মর্যাদা লাভ করে। এই পদ্ধতি ঐতিহাসিকদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করে, যাহা স্বীয় দীপ্তি প্রদর্শনের পর দৃষ্টি হইতে হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই ইতিহাস রচনা প্রক্রিয়া বহু গ্রন্থ রচনাকারী ব্যক্তিত্ব তাকিয়্যু'দ্-দীন আল-মাক্রীযী [দ্র.] (মৃ. ৮৪৫/১৪৪২) এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আল-'আয়নী [দ্র.] (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) হইতে আরম্ভ হয়। মাক্রীযী-র শাগরিদ আবু'ল-মাহাসিন ইব্ন তাগরী (তিংরী)-বির্দী, [দ্র.] (মৃ. ৮৭৪/১৪৬৯) এবং তাঁহার সমপর্যায়ের 'আলী ইব্ন দা'ঊদ আল-জাওহারী (মৃ. ৯০০/১৪৯৫), শামসু'দ-দীন আস-সাখাবী (মৃ. ৯০২/১৪৯৭), জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব জালালু'দ-দীন আস-সুয়ূতী [দ্র.] (মৃ. ৯১১/১৫০৫) এবং তাঁহার শাগরিদ ইব্ন ইয়াস [দ্র.] (মৃ. আনু. ৯৩০/১৫২৪) ইহা অব্যাহত রাখেন। ইহার পরবর্তী অংশে 'উছমানী বিজয় ইত্যাদি সম্পর্কিত অপর ঐতিহাসিক আহ্মাদ ইব্ন যুন্বুল (মৃ. ৯৫১/১৫৪৪) সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার সঙ্গে সংযোগ রাখিতেন। যদিও ঐ সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে প্রাথমিক যুগের বর্ষক্রমিক ঘটনাপঞ্জী লেখকদের মত এমন অনেক ত্রুটি বিদ্যমান ছিল, তবুও এই সকল ঐতিহাসিক এক সময় কেবল অবিমিশ্র 'আলিম ছিলেন এবং অপর সময় অবিমিশ্র দরবারী ছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা অধিক প্রসারিত দৃষ্টি ও সঠিক মতামতসম্পন্ন হইয়া যান এবং তাঁহাদেরকে কেবল স্মৃতি রচনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁহাদের রচনাবলীর সুস্পষ্ট বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদের সার্বিক দৃষ্টি মিসরের উপর নিবদ্ধ ছিল এবং এই আবেগ এমন প্রবল ছিল যে, এই ঐতিহাসিকগণও নিজেদের ইতিহাসকে ইহার মিসরীয় তথ্যের ছাঁচ অনুযায়ী বিন্যস্ত করিয়া সাধারণ ইতিহাসের কাঠামোতে সজ্জিত করিতেন। এই ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্ব আল-মাক্রীযী, অবশ্য শুদ্ধ বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে নহেন (কেননা তাঁহার বর্ণনার শুদ্ধতা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নহে), হাঁ, তবে তিনি তাঁহার পরিশ্রমের কারণে তাঁহার চিত্তাকর্ষক বিবরণে পরিমণ্ডলের বিস্তার এবং ইতিহাসের অধিক সার্বিকতা ও পরিব্যাপ্ত দৃষ্টিকোণ হইতে মনোযোগ দেওয়ার কারণে বিখ্যাত।

অন্যান্য অঞ্চলের আঞ্চলিক ঐতিহাসিকগণের রচনাবলী এবং তাঁহাদের রচনাসমূহে যে পার্থক্য তাহা পদ্ধতিগত অথবা ব্যক্তিপর্যায়গত ততটুকু নহে, যতটুকু পরিমাপগত পার্থক্য বিদ্যমান।

তদ্রূপ য়ামানী গ্রন্থসমূহ, যেমন ইব্নু'ল-ওয়াহ্হাস আল-খায্রাজী (মৃ. ৮১২/১৪০৯) অথবা ইব্নু'দ-দায়বা [দ্র.] (মৃ. ৯৪৪/১৫৩৭)-এর রচনাবলীর মধ্যেও মিসরের ইতিহাসের অনুরূপ তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু তাহা স্বল্প পরিমাণে। শাহী বংশ ও স্থানীয় ইতিহাস যাহা মাগরিব অথবা

স্পেনে লিখিত হইয়াছে, ইহাদেরও একই অবস্থা। কোন কোন ঐতিহাসিক, যেমন 'আবদু'ল-ওয়াহিদ আল-মার্‌রাকুশী (দ্র.), যিনি সপ্তম হিজরী শতকের (খৃস্টীয় ১৩শ শতক) ঐতিহাসিক অথবা ইব্‌ন আবী যার' (দ্র.) যিনি হিজরী ৮ম শতাব্দীর (খৃস্টীয় ১৪শ শতাব্দীর) ঐতিহাসিক মাগরিবের অন্যান্য ঐতিহাসিকের তুলনায় তথ্যপঞ্জী ও বর্ণনা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অগ্রগণ্য হইলেও ইহাদের মধ্যে কেবল একজন অর্থাৎ গ্রানাডার মন্ত্রী লিসানুদ-দীন ইবনু'ল-খাতীব [দ্র.] (মৃ. ৭৭৬/১৩৭৪) একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি রুচিবোধ, রচনাকৌশল ও বিষয়জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ এবং চূড়ান্ত মেধাসম্পন্ন (genius) স্তরে উপনীত হন। যদিও ইতিহাস সমালোচক হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার সমসাময়িক ইব্‌ন ইযারী (দ্র.) যতদূর পর্যন্ত উভয়ের বর্তমান রচনাবলীর ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, লিসানু'দ-দীনের অগ্রগামী না হইলেও তাঁহার সমপর্যায়ের অবশ্যই ছিলেন।

(৩) যদিও রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার উপর অনেক ঐতিহাসিক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তবুও আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনায় সঠিক প্রকৃতির ঘটনালিপির সন্ধানে নহে, বরং সীরাত রচনায় অধিকতর মনোযোগী দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ যুগের প্রায় সকল আরবী গ্রন্থকারের রচনায় বর্ষক্রমিক রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং জীবনী রচনায় সাধারণ সংযোগ স্থানীয় ইতিহাস–এই উভয়ের মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে আমরা ঐ বহুল পরিমাণের ঐতিহাসিক সাহিত্যের আলোচনা করিব যাহা স্পষ্টত অরাজনৈতিক জীবন কাহিনীর জন্য সংরক্ষিত ছিল।

হিজরী ৭ম শতাব্দীর (খৃস্টীয় ১৩শ শতাব্দী) প্রথম অর্ধাংশে ইহার পূর্বের যুগের বেশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রবণতা [দ্র. পরিচ্ছেদ খ/৪ (পৃ. ৫৮ খ)] জীবনীমূলক রচনার একাধিক সংগ্রহে সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, যাহা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। আরবী সাহিত্য চর্চার ছয় শতাব্দীকালীন বিশদ বর্ণনা গ্রীক বংশোদ্ভূত লেখক য়াকূত আর্‌-রূমী [দ্র.]-র (মৃ. ৬২৬/১২২৯) রচনা "ইরশাদু'ল-আরবি"-এ বিদ্যমান। প্রাথমিক যুগের সকল তৎপরতা যাহা ইসলামী জ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অর্জনে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার বর্ণক্রমিক প্রতিবিম্ব বিরাট বিশ্বকোষ ইবনু'ল-কিফ্‌তী আল-মিস্‌রী [দ্র.] (মৃ. ৬৪৬/১২৪৮) এবং ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ আদ-দিমাশ্‌কী [দ্র.] (মৃ. ৬৬৮/১২৭০) রচনা করিয়াছেন। অঞ্চল ভিত্তিক জীবনীগ্রন্থ রচনা প্রক্রিয়ায় কাদী কামালু'দ-দীন ইবনু'ল আদীম [দ্র.] (মৃ. ৬৬০/১২৬২) রচিত তা'রীখু হালাব" ও ইবনু'ল খাতীব রচিত "তা'রীখু গারনাতা (গ্রানাডার ইতিহাস) এবং এমনি অন্যান্য রচনায় অব্যাহত থাকে, যাহা এই শ্রেণীর প্রাচীন রচনাবলীর পরিশিষ্ট ছিল। তদ্‌ব্যতীত ফকীহগণের সাধারণ জীবনী 'তাবাকাত' [দ্র.] এবং হাদীছের যাচাই বাছাইয়ের গ্রন্থসমূহও রহিয়াছে; যেমন ঐতিহাসিক ইব্‌নুল আছীরের রচনা উসদু'ল-গাবা ফী মা'রিফাতি'স-সাহাবা [এই পর্যায়ভুক্ত; ইবনু'ল-ফুওয়াতী-র (মৃ. ৭২৩/১৩২৩) "মাজমা'উ'ল-আদাব ফী মু'জামি'ল-আলকাব", ইহার মধ্যে পদবীসমূহকে আভিধানিক ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করিয়া প্রতি যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনী বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা আলকাব নামেই পরিচিত ছিল। এই দুর্লভ গ্রন্থটি ৫০ খণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল (হাজ্জী খালীফা)। গ্রন্থকার নিজেই পরবর্তী সময়ে 'তাল্‌খীসু মাজমা'ই'ল-আদাব ফী মু'জামি'ল-আলকাব" নামে ৭ (সাত) খণ্ডে গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন। বর্তমানে কেবল ইহার ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড পাওয়া যায়। পঞ্চম খণ্ডটি (ক হইতে ম পর্যন্ত ك–قـ–م) "ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন" লাহোরে পার্শ্বটিকা ও সংযোজনসহ প্রকাশিত হয় (১৯৩৯ খৃ. প.)। চতুর্থ খণ্ড (ع–فـ–ق 'আয়ন হইতে কাফ পর্যন্ত) দামিশ্‌ক-এর জাহিরিয়্যা গ্রন্থাগারে রহিয়াছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইহার ফটোকপি সংগ্রহ করিয়াছে। বর্তমানে এই খণ্ডটি ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন ও ইহার পরিশিষ্টে প্রকাশিত। গ্রন্থটির ৬ষ্ঠ ও ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে অংশটি অত্যন্ত মূল্যবান। গ্রন্থকার সম্পর্কিত আলোচনার জন্য উল্লিখিত "ম্যাগাজিন"-এর মে ১৯৩৫ খৃ. এবং ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮ খৃ. সংখ্যা দ্র.।

এই প্রকারের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রচনা ব্যতীত সিরিয়ায় দুইটি নূতন ধরনের জীবনীমূলক অভিধান প্রকাশিত ও প্রচলিত হয়। প্রথমটির রচয়িতা ছিলেন ইব্‌ন খাল্লিকান [দ্র.] (মৃ. ৬৮১/১২৮২)। সঠিক সংবাদ পরিবেশন ও সুস্থ রুচিবোধের ফলে এই রচনাটি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। এই গ্রন্থের সঙ্গে ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী [দ্র.]-র (মৃ. ৭৬৪/১৩৬৩) পরিশিষ্টকে সংযোজন করার পরও খালীল ইব্‌ন আয়বাক আস-সাফাদী [দ্র.] (মৃ. ৭৬৪/১৩৬৩)-র গ্রন্থ ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর এবং প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই অদ্যাবধি প্রকাশিত হইতে পারে নাই। অতঃপর সাফাদী-র এই রচনার উপর ঐতিহাসিক আবু'ল মাহাসিন "আল-মানহালু'স-সাফী" নামে একটি পরিশিষ্ট রচনা করেন। অন্যান্য নূতন ধরনের চরিতাভিধানও অনেক বিস্তৃত। কিন্তু ইহা এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই পদ্ধতি সম্ভবত আয-যাহাবী [দ্র. পরিচ্ছেদ গ ১/১ উপর-এ (পৃ. ৬২ক)]-র সাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ইহার মধ্যে জীবনীসমূহকে ৭ম হিজরী শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ১০ বৎসর পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হইয়াছে এবং মূল ইতিহাস হইতে ইহাকে এক স্বতন্ত্র রচনা আকারেও গণ্য করা যাইতে পারে। এই ধরনের শত শত বৎসরের স্তরসমূহ বিন্যস্ত করার বিষয়টি সর্বপ্রথম সম্ভবত আয-যাহাবীর সমসাময়িক আল-বিরযালী [দ্র.] (মৃ. ৭৩৯/১৩৩৯) চিন্তা করেন। ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী [দ্র.] (মৃ. ৮৫২/১৪৪৯)-এর গ্রন্থ 'আদ-দুরারু'ল-কামিনা' রচিত হওয়ার পর এই নূতন পদ্ধতি অবলীলাক্রমে প্রচলিত হইয়া যায়। এই গ্রন্থে হিজরী ৮ম শতাব্দীর সকল বিখ্যাত ও পরিচিত পুরুষ ও মহিলা ব্যক্তিত্বের জীবনী বর্ণক্রমিক প্রক্রিয়ায় বিন্যস্ত করা হইয়াছে। মৃত্যু সংক্রান্ত রীতির শেষ নিদর্শন এই গ্রন্থে এমনভাবে রক্ষিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে শতাব্দীতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাকে সেই শতাব্দীর মনে করা হইয়াছে। এইভাবে ৯ম হিজরী শতাব্দীর অভিধান ইব্‌ন হাজর-এর শাগরিদ পূর্বে উল্লিখিত আস-সাখাবী (মৃ. ৯০২/১৪৯৭) আদ-দাওউ'ল-লামি' (الضوء اللامع) নামে রচনা করেন এবং এই প্রক্রিয়া পরবর্তী বংশধরগণ হিজরী ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন [দ্র. পরিচ্ছেদ খ, ১/২ (পৃ. ৭২ ক)] [আস-সাখাবী আল-ই'লান বি'ত্‌-তাওবীখ লিমান যাম্মা'ত-তা'রীখ" (الاعلان التوبيخ لمن ذم التاريخ) (কায়রো ১৩৪৯) গ্রন্থটি রচনা করেন, এই গ্রন্থটি ইসলামী যুগের ইতিহাস চর্চার ইতিহাস, ইদারা]।

(২/১) সপ্তম হইতে ১০ম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত ইরানী ইতিহাস রচনার ঐতিহ্য বহু বিচিত্র রঙে রঞ্জিত ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ভিত্তি অবশ্যই বিদ্যমান অর্থাৎ ইসলামের সাধারণ ইতিহাস যে বর্ণনারীতির উপর নির্ভরশীল, ফার্‌সী ভাষার ইতিহাস সেরূপ নহে। ফার্‌সী ইতিহাসসমূহের স্বাতন্ত্র্য এই যে, লেখকগণ স্বীকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া পরবর্তী ইতিহাসের অবয়ব নির্মাণ করেন। সাধারণ ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ ইরানে লিখিত হউক অথবা হিন্দুস্তানে লিখিত হউক, ইহাদের মধ্যে কেবল প্রাচীন তথ্যপঞ্জীর সংক্ষিপ্তসারের সঙ্গে রচনাকালের

যুগভিত্তিক অতিরিক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হইত। ফলে আরবী ভাষায় ইতিহাসের অনুকরণ ও তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিত। অধিকাংশের মধ্যে সমালোচনা নৈপুণ্য ছিল কিঞ্চিৎকর। এমন রচনা যেমন, মিনহাজু'দ-দীন জুযজানী [দ্র.] (মৃ. ৬৬৪/১২৬৫)-এর গ্রন্থ স্থানীয় ইতিহাস হিসাবে কিছু মূল্য থাকিলেও ইতিহাসশাস্ত্রের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক নহে। এইজন্য আমরা আমাদের মনোযোগ বিভিন্ন ধারার এমন সব রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিব, যাহা বিভিন্ন সময়ে ইরান ও হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অংশে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং যাহার ফলে কোন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে।

(২/২) পশ্চিম এশিয়ায় মুগল (মোঙ্গল) সালতানাত-এর প্রতিষ্ঠা ইতিহাস রচনার এমন অনুকূল পর্যায়ে, যাহার অগ্রদূত ছিলেন 'আলাউ'উ'দ-দীন 'আতা' মালিক জুওয়ায়নী [দ্র.] (মৃ. ৬৮১/১২৮৩)-এর একক ও মৌলিক ইতিহাস। ইহা স্বভাবত স্বয়ং "লেখকদের ইতিহাস" শ্রেণীর সঙ্গে কেন্দ্রীভূত ছিল। ইহার বর্ণনা পূর্বে করা হইয়াছে (পরিচ্ছেদ খ/২ উপরে উল্লিখিত (পৃ. ৫৭ ক)]। খাঁটি মুগল 'ঐতিহ্য'সম্পন্ন ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয় মন্ত্রী ফাদ্‌লুল্লাহ্ রাশীদু'দ-দীন তারীব [দ্র.] (মৃ. ৭১৮/১৩১৮-এর "জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ" রচনার মাধ্যমে। ইহা ঈলখানদের ইসলাম গ্রহণ করার ফলে রচিত হয়। রাশীদু'দ-দীনের এই গ্রন্থ ফারসী ও আরবী উভয় ভাষায় পর্যায়ক্রমে রচিত হয়। ইহার প্রথম অংশ বাদশাহী বংশের ইতিহাস; ইহা অধিকতর মুগল বর্ণনাভিত্তিক। পরবর্তী কালে উলজায়তু-এর শাসনকালের ইতিহাস দ্বারা এই অংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় অংশ আরব ইতিহাস রচনার বিস্তৃত শাখার সঙ্গে সম্পৃক্ত [গ্র. পরিচ্ছেদ ক/৪ (পৃ. ৫৪ক)] (ইহার উপর অনেক দিন পর্যন্ত কোন কিছু লেখা হয় নাই)। কেননা ইহার মধ্যে হিন্দুস্তান, চীন ও য়ুরোপের ইতিহাসের নিরীক্ষণসমূহ অন্তর্ভুক্ত। প্রথম দিকের গ্রন্থসমূহ হইতে ইহা এই কারণে বিভিন্ন যে, ইহার তথ্য সমসাময়িক কালের বর্ণনাকারীদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিহাস রচনার এই চিন্তাধারা প্রশংসার্হ ছিল, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসমূহের মতই পূর্ণতার প্রত্যাশী ছিল যাহা কার্যকরী হয় নাই; তবে যেইটুকু হইয়াছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। ইহা ব্যতীত এই রচনার বর্ণনা-সৌকর্য ও অন্যান্য গুণ, যথা গদ্যশৈলীর বলিষ্ঠতা, ঘটনাবলীর বাস্তবতা এবং সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এইসব গুণের স্বীকৃতি রাশীদু'দ-দীনের প্রাপ্য অথবা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলী কাশানী-র তাহা আমাদের মূল্যায়নে তেমন গুরুত্বই রাখে না। অর্থপূর্ণ কথা এই যে, রচনাটি অকুণ্ঠ খ্যাতি অর্জনের পর হঠাৎ ইহার প্রচার ও প্রসার রুদ্ধ হইয়া যায় এবং এই পদ্ধতির অন্যান্য গ্রন্থকারগণ, যাঁহারা রাশীদু'দ-দীনের অনুগামী ছিলেন, এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। অবশ্য বানাকাতী [দ্র.] (মৃ. ৭৩০/১৩২৯-১৩৩০) এবং হাম্‌দুল্লাহ্ মুস্তাওফী 'কায্‌বীনী [দ্র.] (মৃ. ৭৫০/১৩৪৯), যাঁহারা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনায় আগ্রহী, রাশীদু'দ-দীনের পদ্ধতি বর্জনকারীদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন। ঐ গ্রন্থকারদের মধ্যে অনেকেই ('কায্‌বীনীসহ) উপরোক্ত পদ্ধতির স্থলে দীর্ঘ বীরত্বগাঁথার ইতিহাস শাহ্‌নামা-র ছন্দে লিখিয়া ফিরদাওসীকে অতিক্রম করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কেবল একটি বিখ্যাত রচনা গদ্যে লিখিত হয়। ইহা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ফাদলুল্লাহ্ ওয়াস্‌সাফ [দ্র.] (মৃ. ৭১২/১৩১২)-এর বাগ্মিতা ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ রচনা এবং প্রাচীন নিদর্শনের এক "সরকারী ইতিহাস" [দ্র. পরিচ্ছেদ খ/৫ (পৃ. ৬০ক)]। এই গ্রন্থটিও ঐসব ইতিহাস গ্রন্থের মত প্রথম শ্রেণীর একটি গ্রন্থ হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকদেরকে অতিরঞ্জনে ব্যাপৃত রাখিতে পারে।

মুগল (মোঙ্গল) শাসনের শেষ এবং তায়মূরের উত্থানের যুগের মধ্যবর্তী সময়ে ইতিহাস রচনার গতি মন্থর ও বিশৃঙ্খল ছিল। তায়মূরের সঙ্গে সচিবদের কর্মচারী থাকিত। তাহাদের কাজ ছিল তায়মূরের যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাস রচনা করা। তায়মূর স্বয়ং ঐ লিখিত সম্পূর্ণ ইতিহাস শ্রবণ করার জন্য পড়াইতেন। ফলে তাঁহার যুগের একটি ইতিহাস তুর্কী ভাষায় "তারীখ খানী" নামে গদ্যাকারে লিখিত হইয়াছে এবং নিজামু'দ-দীন শামী একটি ইতিহাস ফারসী ভাষায় রচনা করেন। তাঁহাকে বিশেষভাবে পরামর্শ দেওয়া হয় শব্দবাহুল্য ও অলংকরণ পরিহার করিতে। যাহা হউক, তাঁহার রচিত "জাফারনামা" এই নামের অপর এক রচনার তুলনায়, যাহা শারাফু'দ-দীন (দ্র.) 'আলী য়ায্‌দী (মৃ. ৮৫৮/১৪৫৪) অলংকরণ ও উপমাপূর্ণ ভাষায় রচনা করেন, সম্ভবত ইহা বিস্মৃতির অন্ধকারে লুপ্ত হইয়াছে। "জাফারনামা-ই য়ায্‌দী' অদ্যাবধি বিখ্যাত এবং সূক্ষ্ম বর্ণনা ও সুন্দর রচনারীতির উত্তম নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃত। এই ঐতিহাসিক তৎপরতা তায়মূরের স্থলাভিষিক্তদের যুগে, বিশেষ করিয়া 'হিরাত প্রশাসনে' সর্বোচ্চ পূর্ণতায় উপনীত হয়। এই প্রশাসন তায়মূরের বংশধরের পৃষ্ঠপোষকতায় রাশীদু'দ-দীনের প্রতিষ্ঠিত বর্ণনাশৈলীকে পুনরুজ্জীবিত করে। শাহ্‌রুখ, হাফিজ আব্‌রুকে [দ্র.] (মৃ. ৮৩৩/১৪৩০) "জামিউ'ত-তাওয়ারীখ"-এর নূতন সংস্করণ প্রস্তুত এবং পাদটীকা লেখার নির্দেশ দান করেন [বর্তমান 'জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ"-এর ভূমিকায় হাফিজ আব্‌রু লিখেন, শাহ্‌রুখ যখন তাঁহাকে নির্দেশ দান করেন, "কিতাবু রাশীদী-র প্রথম অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা উদ্ধার কর, তখন হাফিজ আব্‌রু বায়সোনগোর (দ্র.)-এর জন্য তৎকর্তৃক লিখিত ইতিহাসের প্রথম অংশ অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ, যাহা হযরত আদাম ('আ)-এর সময় হইতে হযরত মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত লিখিত ছিল, অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া 'কিতাবু রাশীদী'-এর সঙ্গে সংযোজন করেন [ইদারা]। উপরোক্ত লেখকই শাহ্‌রুখ-এর পুত্র বায়সোন্‌গোর-এর জন্য অপর একটি সাধারণ ইতিহাস রচনা করেন। এই ইতিহাসে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই, কিন্তু ইহার বর্ণনা পদ্ধতি বলিষ্ঠ ও সরল। এই ধরনের গাম্ভীর্য ফাসীহু'ল-খাফী-এর "মুজমাল" (রচনা সংক্ষেপ, ৮৪৫/১৪৪১) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সবজান্তা (?) সুলতান উলুগ বেগ [দ্র.] (মৃ. ৮৫৩/১৪৪৯)-এর রচনা "তারীখু 'উলূমি'ল-আরবা'আ"-এ সম্ভবত এই গাম্ভীর্য পাওয়া যায়, যাহা বর্তমানে কেবল স্পষ্ট এক সংক্ষিপ্তাকারে রক্ষিত। কিন্তু যে পদ্ধতির রঙিন ও মূল্যবান সৌন্দর্যপূর্ণ গদ্য কাশিফী (দ্র.)-র মত সমসাময়িক গ্রন্থকারগণ লিখিয়াছেন, ইতিহাস রচনার জন্য উহাকে নিষিদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। যেমন তায়মূরী যুগের সাধারণ গ্রন্থকারদের অনুকরণীয় পদ্ধতির উপর এই লিখন পদ্ধতির জালে জড়াইয়া গিয়াছে এবং হিরাত-এর পরবর্তী যুগের রচনাবলী শব্দবাহুল্য ও অলংকরণের সমুদ্রে আরও অধিক নিমজ্জিত বলিয়া মনে হয়। 'আবদু'র-রায্‌যাক সামারকান্দী [দ্র.] (মৃ. ৮৮৭/১৪৮২) তুলনামূলকভাবে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহার রচনা, মীর খান্দ [দ্র.] (৯০৩/১৪৯৮)-এর 'রাওদাতু'স -সাফা"-এর কারুকার্যময় বর্ণনা পদ্ধতির মত গ্রহণযোগ্য হয় নাই। মীর খান্দ-এর দৌহিত্র খান্দআমীর (দ্র.) (মৃ. ৯৪২/১৩৩৫-১৩৩৬) হিরাতের রচনা পদ্ধতির এই সর্বশেষ পদ্ধতিটি হিন্দুস্তানে লইয়া যান এবং হিন্দুস্তানের মাটি এই পদ্ধতির অনেক উপযোগী ছিল।

(৩) হিন্দুস্তানে গূরী বিজয় এবং দিল্লীতে সুলতানদের ঠিকানা (রাজধানী?) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ইরানী পদ্ধতির ইতিহাস রচনার যে

সূচনা হয়, পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে [পরিচ্ছেদ খ/৬ (পৃ. ৬১ ক)] এবং পরবর্তী শতাব্দীসমূহে হিন্দী-ফারসী বর্ষপঞ্জীর দীর্ঘ প্রক্রিয়া একই ধারায় চলিতে থাকে। হাসান নিজামী (দ্র.)-এর (৬১৪/১২১৭-এর মধ্যে) রচিত "তাজু'ল-মাআছির"-এর পরে যিয়া'উ'দ-দীন বারানীর [দ্র.] (মৃ. ৭৫৭/১৩৫৭) রচনা গুরুত্বপূর্ণ, তিনি 'তারীখু জূযজানী"-এর টীকা লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত জীবনীভিত্তিক কতিপয় ইতিহাস বাদ দিলে অবশিষ্ট সকল রচনা "অতিরঞ্জন ও কৃত্রিমতায়" পরিপূর্ণ, আর কিছুই নহে। অবশ্য সিন্ধু প্রদেশে স্থানীয় বর্ণনাসমূহের কতিপয় নিদর্শন বিদ্যমান, যাহা হিজরী প্রথম শতাব্দী (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী)-র আরব বিজয় পর্যন্ত পৌঁছে। সম্ভবত এই ঐতিহাসিক উপাখ্যানসমূহ, যাহা হিজরী ৭ম শতাব্দীতে (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী) "চাচনামা" নামে প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার পটভূমি। এইভাবে গুজরাত ও দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ইতিহাস রচনার সম্পর্ক অন্যান্য স্থানের তুলনায় স্পষ্টত ফারিস-এর সঙ্গে অধিক ঘনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

(৪) এই যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তুর্কী ও 'উছমানী শাসনকালে যথারীতি ফারসী ঐতিহ্য প্রবল থাকে। সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ হইতে গদ্য রচনা এবং আনাতোলিয়ার সালজুকদের সম্পর্কে [দ্র. 'ইব্ন বীবী' (ابن بی بی) এবং তুর্ক ঃ ৩ ঃ ক] বীরত্বগাঁথার কাব্য গ্রন্থসমূহ নিরীক্ষাযোগ্য নহে। কিন্তু এই কারণে এইগুলি অবশ্য এই রচনাসমূহ নব্য তুর্কী ইতিহাস রচনার নিদর্শন হিসাবে চিত্তাকর্ষক। এই ক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে, সহজ-সরল বর্ণনা রীতি বিলুপ্ত না হইলেও অতিরঞ্জিত কৃত্রিম পদ্ধতিই অধিকতর গৃহীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় বায়াযীদের নির্দেশে ইদ্‌রীস ইব্ন 'আলী বিদলীসীর [দ্র.] (মৃ. ৯২৬/১৫২০) গদ্য রচনা 'হাশ্‌ত বিহিশ্‌ত" (هشت بهشت)-এ শব্দবাহুল্য ও কল্পিত ঘটনাবলীর ব্যবহার চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। তবে শূন্যগর্ভ শব্দবহুল ও কৃত্রিম বাক্য রীতিকে হীন ও জ্ঞানবর্জিত বলিয়া মনে করিলে তাহাও এক ধরনের উন্নাসিকতা বিবেচিত হইবে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্‌লীসী-র রচনায় ওয়াস্‌সাফ প্রমুখ অতিরঞ্জন ও শব্দবাহুল্যের ছত্রতলে কিছু চিন্তাপূর্ণ ও ঐতিহাসিক বিচারে মূল্যবান বর্ণনাও বিদ্যমান।

(৫) আরবী ও ফারসী ভাষায় ইতিহাস রচনায় সুস্পষ্ট পার্থক্য এই যে, ফারসী রচনাবলীতে সাহিত্যিক জীবনী রচনায় ব্যাপক উন্নতি ঘটিয়াছে বটে, তবে ঐতিহাসিক জীবনী রচনা প্রায় অনুপস্থিত। তবে অনেক সাধারণ ইতিহাসে প্রচলিত পদ্ধতির মৃত্যু সংবাদ এবং জীবনী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে অথবা এইসব গ্রন্থে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষত মন্ত্রী, কবি ও গ্রন্থকারদের সম্পর্কে পৃথক পরিচ্ছেদ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহাদের পরে আওলিয়া' ও সূফীগণের সিয়ার (জীবনী)-এর পালা আসে। ঐ সিয়ার দুই প্রকার ঃ (১) একক ব্যক্তির জীবনী, ইহাদের মধ্যে অধিক উল্লেখযোগ্য "সীরাতু শায়খ সাফিয়্যু'দ-দীন", যাহা তাওয়াক্কুল ইব্ন বায্‌যায [দ্র.] (৭৫০/১৩৪৯) রচনা করিয়াছেন। (২) সাধারণ অথবা বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর জীবনী (দ্র. 'আততার, জামী, মাওলাবী)। হিরাতের ইতিহাস রচনা প্রতিষ্ঠানের দুই গ্রন্থকার মন্ত্রীদের জীবনী রচনা করিয়াছেন। সায়ফু'দ-দীন ফাদ্‌লী 'আছারু'ল-উযারা' (যাহা ৮৮৩/ ১৪৭৮ রচিত হয়) এবং খাওয়ান্দআমীর "দাস্‌তূরু'ল উযারা' (যাহা ৯১৫/১৫০৯ লিখিত) রচনা করেন। কিন্তু দীর্ঘ পরবর্তী যুগ পর্যন্ত ফারসী ভাষায় লিখিত রচনাবলীর সঙ্গে সমসাময়িক কালে আরবী ভাষায় চরিত অভিধানের তুলনা করার সুযোগ আসে নাই। আমরা সুস্পষ্টভাবে ইহার কারণ ইতিমধ্যে জীবনীমূলক রচনা ও মাযহাবী আলোচনার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গভীর সম্পর্কের মধ্যে খুঁজিতে পারি। এই সূক্ষ্ম বিষয়টি মনে রাখার যোগ্য যে, সাফাবী শাসনের পূর্ব পর্যন্ত ধর্মীয় জ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানসম্বলিত রচনাবলী ইরান ও হিন্দুস্তানে আরবী ভাষায় লিখিত হইতেছিল। ফারসী ভাষার ব্যবহার কেবল কাব্য ও সাহিত্য রচনা এবং সরকারী ঘটনা লিপিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, ফারসী ভাষায় জীবনী রচনা বিরল কেন? কিন্তু ইহার কারণ বিশ্লেষণ করা এত সহজ নহে যে, তুর্কী ও ইরানী অঞ্চলসমূহের উপর আরবী ভাষায় জীবনী গ্রন্থ কেন লিখিত হয় নাই।

(ঘ)

হিজরী ১০ম শতাব্দী (খৃ. ১৬শ শতাব্দী)-এর প্রথম চতুর্থাংশে প্রায় সম্পূর্ণ ইসলামী বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নূতন করিয়া শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকরী হয়। 'উছমানী তুর্কীগণ পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় মরক্কোর সীমান্ত পর্যন্ত তাঁহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সাফাবীগণ ইরানের একটি স্বতন্ত্র শী'আ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। শায়বানীগণ মধ্য এশিয়ায় আয্‌রাকী রাজ্যসমূহ এবং মুগল বংশ হিন্দুস্তানে তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে। একটি নূতন অভিজাত বংশ মরক্কোতে স্পেনীয় ও পর্তুগীজদের প্রভাব প্রতিরোধকল্পে আক্রমণ পরিচালনা শুরু করে এবং নাইজার নদীর উপকূলের হাব্‌শী শহরসমূহ Songhoy বংশের অধীনে পৃথকভাবে ইসলামী শাসন চালু করে। ঐ সকল বিপ্লবের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে নূতন সাংস্কৃতিক জামা'আতবন্দী কার্যকরী হয় এবং সকল কর্মকাণ্ডের গতি নূতন পথে মোড় নেয় যাহার প্রভাব প্রতি প্রকারের সাহিত্য, বিশেষত ইতিহাসশাস্ত্রের উপর প্রতিফলিত হয়। আরবী ভাষার ইতিহাস রচনার উপর তো ইহার প্রভাব অধিক পরিমাণেই পড়িয়াছে। ফারসী ইতিহাস রচনায়ও ইরানের দলাদলির কারণে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে তুর্কী ভাষায় নূতন ও শক্তিশালী ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়, যাহা প্রথমে কেবল নিরেট সাহিত্যের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল, কিন্তু পরে স্বতন্ত্র খাতে চূড়ান্ত উন্নতি লাভ করে।

(১/১) মধ্য আরবের দেশসমূহ 'উছমানী সাম্রাজ্যের অধীনে আসার ফলে আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনায় স্থানীয় ঐতিহ্য, যাহার অনুসরণে তখন পর্যন্ত কাজ চলিতেছিল, বন্ধ হইয়া যাইতে থাকে। কতিপয় নিম্নমানের সাধারণ ইতিহাস (দ্র. আল-বাকরী, আদ-দিয়ারবাক্‌রী, আল-জান্নাবী) এবং অসম মানের কিছু স্থানীয় ইতিহাস অথবা 'সিয়ার' এই যুগে মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও 'আরবের খাঁটি ইতিহাস রচনার অকিঞ্চিতকর ফসল। এই অবস্থা হিজরী ১৩শ শতাব্দী (খৃ. ১৯শ শতাব্দী) পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং অবশেষে প্রাচীন পদ্ধতির আরবী ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। অবশ্য দুইজন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থকার এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ মিসরে 'আব্‌দু'র-রাহমান আল-জাবারতী [দ্র.] (মৃ. ১২৩৭/১৮২২) এবং লেবাননে হায়দার আহ্‌মাদ আশ-শিহাবী (১২৫১/১৮৩৫)। তাহা সত্ত্বেও মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ আরবে এই ধরনের ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়া শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (দ্র. দাহ্‌লান)। মাগরিবেও আন-নাসিরী আস-সুলাবী [দ্র.] (মৃ. ১৩১৫/১৮৯৭)-র মত ঐতিহাসিকদের জন্ম হয়, অবশ্য ঐ স্থানে উপরোল্লিখিত ধরনের নিম্ন পর্যায়ের ঐতিহাসিকদের

একটি পরম্পরা ইতিপূর্বেই ছিল (দ্র. আল-ওয়াররানী, আয-যাবারতী)। এই পরম্পরার ঐতিহাসিকগণের মধ্যে একমাত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হইলেন "নাফহু'ত-তীব"-এর গ্রন্থকার আল-মাক্কারী আত-তিলিম্‌সানী [দ্র.] (মৃ. ১০৪১/১৬৩২)। তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থ 'আন্দালুস' (Analects) ও 'সীরাতু ইব্‌নি'ল-খাতীব' মুসলিম আন্দালুসিয়ার শেষ শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই গ্রন্থের মাধ্যমে আন্দালুসিয়ার গৌরবময় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটে।

আরবী ঐতিহ্যে ইতিহাস রচনা স্বদেশে পতনোন্মুখ হয়। কিন্তু দুইভাবে ইহার ক্ষতিপূরণ হয়। যথা তুর্কী ভাষায় ইতিহাস রচনার প্রকৃত পন্থা সীমিতরূপে কার্যকরী হয়। মুনাজ্জিম বাশী (দ্র.) (১১১৩/১৭০২)-এর মূল্যবান সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ এই উন্নতির নিদর্শন। কতিপয় উন্নত ইতিহাস দূর-দূরান্তে পৌঁছে, যেইখানে ইসলাম সদ্য প্রবেশ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য বিশেষত পশ্চিম আফ্রিকা। ঐসব দেশে রচিত অনেক স্থানীয় ইতিহাসের মধ্যে দুইটি গ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ Songhoy যুগের ইতিহাস", 'আব্‌দু'র-রাহ্‌মান আস-সা'দী রচিত [দ্র.] (মৃ. ১০৬৬/১৬৫৬-এর পর) এবং ইমাম আহমাদ রচিত Bornu-এর গভর্নর ম্যায় ইদরীস শাসনকাল ৯১০-৩২/১৫০৪-২৬)-এর শাসনকালের ইতিহাস। পূর্ব আফ্রিকায় কিল্‌ওয়া (كلوه)-র প্রাচীন ইতিহাস এবং হাবশায় আহমাদ গ্রাঁ-র যুদ্ধসমূহের বর্ণনা সংরক্ষিত রহিয়াছে। আহমাদ সম্পর্কীয় গ্রন্থ আনু. ৯৫০ হিজরীতে (১৫৪৩ খৃ.) আরব ফকীহ শিহাবু'দ-দীন রচনা করেন। ইহা ব্যতীত 'উমান-এর ইবাদিয়্যা মতবাদের ভিত্তিতে পরবর্তী যুগে কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থ লিখিত হয়। আরব ও হিন্দুস্তানের পশ্চিম উপকূলের মধ্যে গভীর সম্পর্ক ছিল। এইজন্য এই স্থানেও, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ অংশে আরবী ভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভ করে, তু. দলীলপত্রাদি, যাহা Joda de Sousa (লিসবন, Lisbon ১৭৯০ খৃ., প্রকাশ করেন)। কারণ ইহা কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, পর্তুগীজদের যুদ্ধের ইতিহাস যায়নু'দ-দীন আল-মা'বারী [দ্র.] (মৃ. ৯৮৭/১৫৭৯) আরবী ভাষায় রচনা করেন। অবশ্য এই স্থান হইতে উত্তর দিকের দেশসমূহে আরবী ভাষার সঙ্গে ফারসী ভাষার মুকাবিলা হয় এবং আরবী ভাষায় মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার উলুখ খানী গুজরাতী (মৃ. ১০১৪/১৬০৫) কর্তৃক লিখিত আরবী ভাষার একটি মাত্র ইতিহাস সংরক্ষিত রহিয়াছে। তিনি তাঁহার রচনার অধিকাংশ তথ্য ফারসী ভাষার রচনাবলী হইতে গ্রহণ করেন। ইরানে কেবল দুই-একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আরবী ভাষায় লিখিত হয়।

২। ঐতিহাসিক বর্ণনার মুকাবিলায় জীবনী রচনা স্বীয় শক্তিতে, বিশেষ করিয়া সিরিয়ায় অব্যাহত থাকে। কেননা উহার উপর রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রভাব অতি অস্পষ্ট ছিল। দামিশ্‌কের পণ্ডিতগণ ১০ম, ১১শ ও ১২শ হিজরী শতাব্দীর গুণীজনের চরিতাভিধান রচনার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেন (দ্র. আল-বুরায়নী, আল-মুহিব্বী, আল-মুরাদী)। কতিপয় এমন গ্রন্থও লিখিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল কোন শহর অথবা অঞ্চলের 'আলিম ও সম্মানিত ব্যক্তিদের স্মৃতি সজীব রাখা। উহাদের সঙ্গে সঙ্গে মিসর ও সিরিয়ায় শ্রমসাধ্য ও দুর্বোধ্য গদ্যে জীবনী রচনার কাজও অব্যাহত থাকে। এইসব রচনার সঙ্গে উপরোক্ত রচনাসমূহের সম্পর্ক ছিল, যেমন সাজা' পদ্ধতিতে লিখিত ইতিহাসের সঙ্গে প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত 'সীরাত' গ্রন্থের সম্পর্ক। এই সাহিত্যিক গোষ্ঠীর উত্তম প্রতিনিধি ছিলেন শিহাবু'দ-দীন আল-খাফাজী আল-মিসরী [দ্র. আল-খাফাজী] (মৃ. ১০৬৯/১৬৫৯)। তাঁহার রচনার জনপ্রিয়তার এই প্রমাণ যে, ১০৮২/১৬৭১ 'আলী খান ইব্‌ন মা'সূম (দ্র. 'আলী খান আহ্‌মাদ) হিন্দুস্তানে উক্ত রচনার একটি ভাষ্য লিখেন। পূর্বে উল্লিখিত আল-মুহিব্বী (মৃ. ১১১১/১৬৯৯) ইহার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং আল-মুহিব্বী নিজেও ইহার দ্বিতীয় ভাষ্য লিখিয়াছিলেন।

তুর্কী ও ইরানী অঞ্চলেও গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসসমূহ আরবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইস্তাম্বুলের বিচারক (কাদী) আহমাদ ইব্‌ন মুসতাফা তাশকোপরূ যাদে [দ্র.] (মৃ. ৯৬৮/১৫৬১)-এর গ্রন্থ 'আশ-শাকাইকুন-নু'মানিয়্যা তুর্কীদের ইসলামী যুগের একটি মৌলিক ইতিহাস। পরবর্তী কালে আরবী ও তুর্কী উভয় ভাষায় ইহার ভাষ্য লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন আরব শী'আ দল এবং ইরান ও হিন্দুস্তানের শী'আ দলসমূহের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের প্রতিবিম্ব কেবল আরব লেখক রচিত চরিতাভিধানেই পরিলক্ষিত হইত না (দ্র. আল-হুর্‌রু'ল-'আমিলী), বরং ইরানী মুহাম্মাদ বাকির, মাওসূবী (খানসারী) এবং তাহার হিন্দুস্তানী সমসাময়িক লেখক সায়্যিদ 'ইজায হুসায়ন কানতূরী (মৃ. ১২৮৬/১৮৬৯) লিখিত অভিধানেও পরিলক্ষিত হইত। হিন্দুস্তানে সুন্নীগণও জীবনীমূলক কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন।

মাগরিব-এ জীবনী রচনার প্রক্রিয়া যথারীতি জারি থাকে (দ্র. আল-ওয়াফ্‌রানী)। এইখান হইতে উহা পশ্চিম সুদানে পৌঁছে। পশ্চিম সুদানে আহমাদ বাবা [দ্র.] (মৃ. ১০৩৬/১৬২৭) তিম্‌বুকতু একজন উৎকৃষ্ট চরিতকার ছিলেন। পূর্ব সুদানে ও ফুন্‌জ সালাতানাত যুগের ধার্মিক ও 'আলিমগণের পুণ্য স্মৃতি 'তাবাকাত' নামক রচনায় অমর করিয়া রাখেন মুহাম্মাদ ওয়াদ-(ওয়ালাদ-পুত্র) দায়ফুল্লাহ্‌ (মৃ. ১২২৪/১৮০৯)।

(২) ইরানে শী'আ মাযহাবকে সরকারী মাযহাব হিসাবে ঘোষণা করার পরও 'উছমানী সালাতানাত ও হিন্দুস্তানের সঙ্গে এই দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও এই মাযহাবগত পার্থক্যের ফলে ইরান ও হিন্দুস্তানে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। এই উভয় দেশের ইতিহাস রচনার সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা প্রায় সম্পূর্ণই সরকারী ঘটনা লেখক কর্মচারিগণ সম্পাদন করেন। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 'আলিম ক্বচিৎ দেখা যায় এবং ইতিহাসের ময়দান কেবল 'তোষামুদে লেখকদের করায়ত্ত হইয়া যায়। এই স্তাবক সরকারী লেখকগণ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়াদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহকে অতিরঞ্জন শব্দবহুল কৃত্রিমতায় বানোয়াটের বাচালতায় পূর্ণ এবং নিম্নমানের কবিতার নিম্নে চাপা দিয়া রাখে। তবে ইহার কতিপয় ব্যতিক্রম রহিয়াছে, যাহা অসংখ্য সাধারণ ঐতিহাসিকদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা প্রথম দলের সম্পূর্ণ বিপরীত, অতি সংক্ষিপ্ত ও সারল্যদোষে দুষ্ট। ফলে এই যুগের শাহী বংশ ও সাধারণ ইতিহাস রচনায় হিন্দুস্তান ও ইরান উভয় দেশেই গ্লানিকর একঘেয়েমী দেখা যায়। পরে এমন যুগও আসে যখন 'সীরাত'-এর আদর্শে উত্তম গ্রন্থাবলী কোন শাহী নেতার নির্দেশে লিখিত হইয়াছে যাহাতে অনেক সময় বিশেষ মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের ত্রুটি এই যে, এইসব গ্রন্থের লেকখগণ ইতিহাসকে স্তুতি রচনায় পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর।

(১) সাধারণ ইতিহাস ইরানে অথবা হিন্দুস্তানে লিখিত হউক, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নূতনত্ব ও সঙ্গতিহীন, ইহা কেবল স্ব স্ব যুগের অবস্থার

উপযোগী। এইসব ইতিহাস সাধারণত শাহী বংশের নির্দেশের ভিত্তিতে বিন্যস্ত। তদুপরি ইহাদের মধ্যে কতক এমন রহিয়াছে যে, সম্পূর্ণ একটি খণ্ড অথবা গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদ জীবনী আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং অনেক সময় উহাতে ভৌগোলিক পরিশিষ্টও থাকে। ঐ গ্রন্থসমূহের মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য রচনার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ নিজাম শাহী [দ্র.] (মৃ. ৯৭২/১৫৬৫)-র "তারীখু উল্‌ফী'; ইহা একটি মিশ্রিত ইতিহাস, আকবারের নির্দেশে হিজরতের এক হাযার বৎসর পূর্তি স্মরণে রচিত; "সুবহু সাদিক", মুহাম্মাদ সাদিক আযাদানী (মৃ. ১০৬১/১৬৫১), ঘটনা লেখক রচিত: খুল্‌দ বারীন (خلد برين) মুহাম্মাদ য়ূসুফওয়ালা রচিত (রচনা ১০৫৮/১৬৭৮); মুহাম্মাদ বাকা সাহারানপুরী রচিত গ্রন্থসমূহ [দ্র.] (মৃ. ১০৯৪/১৬৮৩); মীর 'আলী শেরকানি' (মৃ. ১২০২/১৭৮৭-এর পর) রচিত "তুহ্‌ফাতু'ল-কিরাম", ইহার সঙ্গে সিন্ধুর ইতিহাস সম্বলিত একটি পরিশিষ্ট [তৃতীয় খণ্ড] অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অতীত শতকের তিনটি ফারসী গ্রন্থ (দ্র. রিদা কুলী খান, সিপাহ্‌র, মুহাম্মাদ হাসান খান)। মুস্‌লিহু'দ-দীন লারী (৯৭৯/১৬৭২)-এর "মিরআতুল উদ্‌ওয়ার" (امرآة الادوار) চিত্তাকর্ষক হওয়ার কারণ, ইহা ফারসী ভাষায় রচিত 'উছমানী সালতানাতের সর্বশেষ রচনা এবং অনুরূপ হায়দার ইব্‌ন 'আলী রাযী (দ্র.)-র ইতিহাস, যাহা ১০২৮/১৬১৯ সালে রচিত হয়। গ্রন্থটির মৌলিক বিন্যাস এবং বেসরকারী হওয়ার কারণে গুরুত্বপূর্ণ। মধ্য এশিয়ার তুর্কমান রাজ্যসমূহেও সরকারীভাবে ইতিহাস রচনার জন্য ফারসী ভাষা ব্যবহৃত হইত। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে অনেক গ্রন্থ আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছিয়াছে (দ্র. আবু'ল-খায়র)।

(২) সাফাবী বংশ ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই শাহী বংশের ইতিহাস রচনায় নূতন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এইসব ইতিহাসের মধ্যে হাসান রূমলূ'র "আহ্‌সানু'ত-তাওয়ারীখ" গুরুত্বপূর্ণ। ইহা অধিকতর সংযম ও সতর্কতার সঙ্গে লিখিত হয় এবং ৯৮৫/১৫৭৭ সালে ইহার রচনা সম্পূর্ণ হয়। ইহা ব্যতীত শাহ্ 'আব্বাস (৯৯৫-১০৩৭/ ১৫৮৭-১৬২৭)-এর যুগ সম্পর্কিত দুইটি ইতিহাসও রহিয়াছে অর্থাৎ মুহাম্মাদ মুনাজ্জিম য়ায্‌দী রচিত "তারীখ-ই 'আব্বাসী" এবং ইস্কান্দার বেগ মুন্‌শী (দ্র.) রচিত "তারীখ-ই 'আলামআরা-ই 'আব্বাস" (تاريخ عالم ارای عباسی); এই শেষোক্ত গ্রন্থটি অত্যন্ত বিস্তারিত ইতিহাস। অনুরূপভাবে মাহ্‌দী খান আস্তারাবাদী [দ্র.] (মৃ. ১১৭৩/১৭৬০) দুইটি গ্রন্থের মাধ্যমে নাদির শাহ্-এর ইতিহাসকে স্মরণীয় করেন। এই দুইটি গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম "দুর্‌রা-ই নাদিরা"। মাহ্‌দী খানের নিজের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি এই গ্রন্থটি ওয়াস্‌সাফের অনুসরণে রচনা করেন। ইহা ব্যতীত নাদির শাহ্-এর শাসনকালের এক বৃহৎ ইতিহাস তিনি খণ্ডে মুহাম্মাদ কাজিম [ওয়াযীর মারব] রচনা করেন। নাদির শাহের কারণিক (মুস্তাওফী) মুহাম্মাদ মুহ্‌সিনও একটি সাধারণ ইতিহাস রচনা করেন, যাহাতে নাদিরের বিবরণ রহিয়াছে। কমপক্ষে তিনটি শাহী বংশের ইতিহাস এবং একটি সাধারণ ইতিহাস ফাতহ্ 'আলী শাহ্ (১২১২-১২৫০/১৭৯৭-১৮৩৪)-এর নির্দেশে লিখিত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই তালিকা কোনভাবেই ঐ যুগের স্থানীয় ও বংশীয় ইতিহাসের পরিপূর্ণ গ্রন্থতালিকা নহে। স্থানীয় ইতিহাসসমূহের মধ্যে (বিশেষ করিয়া নিজ নিজ অঞ্চল সম্পর্কিত ইতিহাস) অত্যন্ত মূল্যবান। ইহাদের বিশেষ মাধুর্য এই যে, ইহাদের বর্ণনা পদ্ধতি প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, ইতিহাস গ্রন্থসমূহের এই বিরাট সংখ্যার সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ইহার বিরাটত্বের মুকাবিলায় অত্যন্ত প্রতিকূল এবং হিন্দুস্তানে ঐ যুগে যে ইতিহাস লিখিত হয়, উহাদের তুলনায় ঐসব তথ্যের মূল্য অত্যন্ত অল্প।

(৩) মুগল যুগের প্রারম্ভে আমরা হিন্দুস্তানে তিনটি বিভিন্ন সাহিত্য ধারার সাক্ষাত পাই। ইহাদের মধ্যে একটি ছিল হিন্দী-ফারসী বর্ণনাধারা যাহা ছিল দুই ধরনের, স্থানীয় ও সাধারণ এবং পূর্ব হইতেই অব্যাহত (দ্র. পরিচ্ছেদ গ ২/৩, পৃ. ৬৯ খ)। দ্বিতীয়, 'হিরাত প্রতিষ্ঠান"-এর ঐতিহ্য ধারা [দ্র. পরিচ্ছেদ, গ, ২/২, পৃ. ৬৭খ]। তৃতীয়, নূতন পদ্ধতির ধারা, যাহা স্বয়ং মুগল সুলতানগণ প্রবর্তন করিয়াছেন। এই তিন ধারার সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র হিন্দী ইতিহাস রচনাধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। সম্ভবত কোন কোন হিন্দী লেখক দ্বারা ইরানে লিখিত সমসাময়িক ইতিহাস দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ১২শ/১৮শ শতাব্দী শেষ হইতে হিন্দুস্তানে অবস্থানকারী ইংরেজ পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদগণের দ্বারা একটি নূতন প্রভাব ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে।

সম্রাট আকবারের যুগেই (৯৬৩-১০১৪/১৫৫৬-১৬০৫) এই হিন্দী ঐতিহ্য মুসলিম হিন্দের সাধারণ ইতিহাসে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে, যাহার সূচনা গযনী শাসনযুগে করা হয় এবং নিজামু'দ-দীন আহ্‌মাদ (দ্র.) এবং 'আবদু'ল-কাদির বাদায়ূনী (দ্র.) সূচনা করিয়াছিলেন (এই উভয় গ্রন্থকার ১০০৪/১৫৯৫-৯৬ মৃত্যুবরণ করেন)। বাদায়ুনীর ইতিহাস সমালোচনাধর্মী মৌলিক ধারার জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদুপরি ইহা একটি বেসরকারী রচনা যাহাতে হিন্দুস্তানের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনী ও রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। পরবর্তী ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ কাসিম ফারিশ্‌তা [দ্র.] (মৃ. ১০৩৩/১৬২৩), হিন্দুস্তানে ইসলামী ইতিহাসের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, যদিও ইঁহাদের গবেষণা ও নিরীক্ষার দক্ষতা তুলনামূলকভাবে কম। প্রায় শতাব্দীকাল পরে এই দেশে ইতিহাস রচনা শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। যখন হিন্দু গ্রন্থকারগণ হিন্দী-ইরানী ঘটনা লেখকরূপে অবতীর্ণ হন [দ্র. সুজন রায়] এবং হিন্দু হিন্দুস্তানের ইতিহাসকেও ইসলামী হিন্দ-এর ইতিহাসের সহিত বিজড়িত করে। বর্ণনাকৃত কারণসমূহ ব্যতীত এই প্রক্রিয়া সহজবোধ্য হয় এই কারণে যে, সংস্কৃতের প্রাচীন ক্ল্যাসিক গ্রন্থসমূহ আকবার ও অন্যান্য মুগল বাদশাহের জন্য ফারসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শাহী যুগের একক ইতিহাসও সরকারীভাবে লিখিত হইতে থাকে এবং এই রীতি আকবারের যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে কেবল বৃহৎ কতিপয় রচনার উল্লেখ করা যায় ঃ "আকবারনামা", আবু'ল-ফাদ্‌ল 'আল্লামী-র রচনা [দ্র.] (মৃ. ১০১১/১৬০২), বিশেষ করিয়া তাঁহার এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটি (আঈন-ই আকবারী) অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, যেহেতু উহাতে আকবারী সালতানাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। জাহাঙ্গীরের শাসনকালের ঘটনাবলী তাঁহার আত্মজীবনী 'তুযুক' [দ্র. ফিকরা (৪) নিম্নে]-এ লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী মু'তামিদ খানও [দ্র.] (মৃ. ১০৪৯/১৬৩৯) লিখিয়াছেন। [বাদশাহ্ শাহজাহানের ইতিহাস প্রতি ১০ বৎসর করিয়া তিন দফ্‌তর-এ লিখিত হয়। প্রথম দুইটি দফতর 'আব্‌দু'ল-হামীদ লাহোরী (মৃ. ১০৬৬/১৬৫৬) সংকলন করেন এবং তৃতীয় দফতর তাঁহার শাগরিদ মুহাম্মাদ ওয়ারিছ [(মৃ. ১০৯১/১৬৮০)। সম্পাদনা] আওরাঙ্গযীব-এর শাসনকালের ইতিহাস মুহাম্মাদ কাজিম [দ্র.] (মৃ. ১০৯২/১৬৮১) এবং মুহাম্মাদ সাকী মুস্‌তা'ইদ

খান [দ্র.] (মৃ. ১১৩৬/১৭২৪) রচনা করেন। মুগল বংশের পতন এবং ইংরেজদের উত্থানের ইতিহাস গুলাম হুসায়ন খান [দ্র.] (মৃ. ১১৯৫/১৭৮১ পর্যন্ত) রচনা করেন এবং খায়রু'দ-দীন মুহাম্মাদ এলাহাবাদী (মৃ. ১২১১/১৭৯৬-এর পর) দ্বিতীয় শাহ্ 'আলাম-এর শাসনকালের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ হইতে মুহাম্মাদ হাশিম খাফী খান [দ্র.] (মৃ. আনু. ১১৪৫/১৭৩২) রচিত তায়মূর বংশের ইতিহাস অধিকতর সন্তোষজনক। আকবারের শাসনকালের মূল সূত্রভিত্তিক গবেষণামূলক ইতিহাস আমীর হায়দার হুসায়নী বিল্‌গিরামী ১২০০/১৭৮৫-এর দিকে "সাওয়ানিহ আকবারী" নামে রচনা করেন।

প্রতিটি স্বাধীন অথবা অর্ধ স্বাধীন শাহী বংশ এবং বাংলাদেশ হইতে কর্ণাটক পর্যন্ত হিন্দুস্তানের প্রতিটি প্রদেশের নিরন্তর ইতিহাস বিদ্যমান। বিস্তারিত বিবরণসম্বলিত না হইলেও মুগল ইতিহাস রচনার সার্বিক বৈশিষ্ট্যের ধারক। আমরা এই ক্ষেত্রে কেবল আফগানদের ইতিহাস উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে, যাহা নি'মাতুল্লাহ্ ইব্ন হাবীবিল্লাহ্ হারাবী [দ্র.] (মৃ. ১০২১/১৬১২-এর দিকে) এবং ইমামু'দ-দীন হুসায়নী (১২১৩/১৭৯৮-এর দিকে) রচনা করেন। পরবর্তী কালে মুহাম্মাদ 'আব্দু'ল-কারীম [দ্র.] (মৃ. ১২৬৩/১৮৪৭-এর পর) উপরোক্ত দুইটি ইতিহাস গ্রন্থের ভিত্তিতে তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন। আফগানিস্তান-এর ইতিহাস উত্তরাঞ্চলের দৃষ্টিকোণ হইতেও লিখিত হয়। এই ইতিহাসের গ্রন্থকার 'আব্দু'ল-কারীম বুখারী [দ্র.] (মৃ. ১২৪৬/১৮৩০-এর পর)। অবশ্য তিনি মধ্য এশিয়ার খান বংশের শাসনকাল সম্পর্কে তাঁহার এই ইতিহাস গ্রন্থ ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে রচনা করেন।

(৪) হিন্দী-ফারসী ইতিহাস রচনার সৃষ্টিধর্মী বৈশিষ্ট্য ঐ যুগে রচিত অসংখ্য 'তুযুক' (আত্মজীবনী, আত্মলিপি) দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহাদের ও সরকারী ইতিহাসসমূহের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এই রীতি তায়মূরীগণ আরম্ভ করিয়াছিল বলিয় জানা যায়। ইহার সর্বপ্রথম নিদর্শন "তুযুক বাবুরী" [দ্র. বাবুর] (৯৩৭/১৫৩০)। ইহা তুর্কী ভাষায় রচিত। কিন্তু বাবুর-এর চাচাত ভাই মীর্যা হায়দার দুগলাত [দ্র. হায়দার মীর্যা] (মৃ. ৯৫৮/১৫৫১)-এর 'তুযুক'-এর সঙ্গে পরবর্তী কালের চাগতা'ঈ ইতিহাসও অন্তর্ভুক্ত; ইহা "তা'রীখ-ই রাশীদী' নামে ফারসী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। হুমায়ূন (মৃ. ৯৬৩/১৫৫৬)-এর শাসনকালের ঘটনাবলী আফতাবাচী জাওহার লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু আকবারের নির্দেশে হুমায়ুনের সৎ ভগিনী গুলবদন বেগম [দ্র.] (মৃ. ১০১১/১৬০৩) রচিত "হুমায়ূননামা" শ্রেষ্ঠতর। ইহা ইসলামী ইতিহাসের স্বল্প সংখ্যক কতিপয় বিখ্যাত গ্রন্থের অন্যতম, যাহা নিবিড় আন্তরিকতাপূর্ণ দৃষ্টিকোণ হইতে রচিত। জাহাঙ্গীর (মৃ. ১০৩৭/১৬২৭) তাঁহার শাসনকালে প্রথম ১৭ বৎসরের ইতিহাস "তুযুক জাহাঙ্গীরী" নামে লিখেন যাহা Rieu-এর মতে সম্ভবত (ইদারা) জাহাঙ্গীরের পরবর্তী বাদশাহ শাহজাহান সংশোধন ও বিয়োজনান্তে পুনরায় প্রকাশ করেন। সম্ভবত ঐ যুগেই "তুযূকাত-ই তায়মূরী" নামে একটি জাল রচনা হিন্দুস্তানে তায়মূরী শাসনের সত্যায়িত ও অকৃত্রিম তুযুক-এর অনুসরণে প্রকাশিত হয়।

কেবল শাহী বংশের সদস্য ব্যতীত বহু বেসরকারী লোকও এই ধরনের 'তুযুক' রচনা করিয়াছেন। প্রাঞ্জল ভাষা ও অতিরঞ্জন বর্জিত ধারায় তাঁহারা চাক্ষুষ দেখা ঘটনাবলীর বিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের অধিক বিখ্যাত ও পরিচিত রচনাসমূহের মধ্যে শায়খ মুহাম্মাদ 'আলী হাযীন [দ্র.] (মৃ. ১১৮০/১৭৬৬)-এর রচনা "তাযকিরাতু'ল আহ্ওয়াল" এবং মীর্যা মুহাম্মাদ ইব্ন মু'তামিদ খানের 'ইবরাতনামা উল্লেখযোগ্য, যাহা ১১৩১/১৭১৮-১৯-এর দিকে রচিত। অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ ভ্রমণ কাহিনী যাহাতে ঐতিহাসিক তথ্য সামান্য।

(৫) এই যুগের ফারসী জীবনীতে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় কিছু উন্নতি দেখা যায়। প্রথম যুগের মত এই যুগেও সাহিত্যিক জীবনী রচনা (স্মরণিকা রচনা) প্রথম স্থানীয়, যাহা ইরান ও হিন্দুস্তানের বহু কবিদের স্মরণলিপি সম্বলিত, কতিপয় ঐতিহাসিক বিষয় সম্বলিত রচনাও রহিয়াছে; যেমন মীর 'আবদু'র-রায্যাক আওরাঙ্গাবাদী (মৃ. ১১৭১/১৭৫৮)-এর "মাআছিরু'ল-উমারা" (ماثر الامراء) ফারসী ভাষায় রচিত ইতিহাসের সর্বাধিক বিস্তারিত বক্তব্যসম্বলিত আমীন আহ্মাদ রাযী (দ্র.)-এর বলিষ্ঠ লেখনী'নিঃসৃত "হাফ্ত ইক্লীম" (هفت اقليم)। এই গ্রন্থটি ১০২৮/১৬১৯ [সংশোধন ১০০২/১৫৯৩-৯৪, তু. Starey ১ ঃ ২ঃ ১১৬৯, ইদারা] সালে সমাপ্ত হয়। গ্রন্থটির নাম হইতে যে সন বিশ্বের সপ্ত অঞ্চলের বর্ণনা ইহাতে অন্তর্ভুক্ত (ইদারা)। এই ধরনের অপর একটি গ্রন্থে হিন্দুস্তানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুরতাদা হুসায়ন বিলগিরামী হিজরী ১২শ শতাব্দীর শেষদিকে "হাদীকাতু'ল-আকালীম" নামে গ্রন্থটি রচনা করেন [সংক্ষেপক আনন্দ রাম, মৃ. ১১৬৪/১৭৫১-এর "বাদা'ঈ' ওয়াকা'ঈ" (দানিশগাহ, পাঞ্জাব-এর কপি)] গ্রন্থে লেখক তাঁহার জীবনের অনেক কাহিনী এবং তৎকালে উত্তর হিন্দ (ভারত)-এ ঘটিত অনেক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ উক্ত অভিনব পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ রচনা (ইদারা)।

পক্ষান্তরে বিস্তারিত চরিতাভিধান, যেমন আরবী ভাষায় পাওয়া যায়, ফারসী ভাষায় তাহা মোটেই নাই। প্রায় ইহার নিকটতম সদৃশ রচনা ফারসী ভাষায় যাহা রহিয়াছে তাহা শী'আ মতাবলম্বী ও শী'আ 'আলিম, সূফী বা আওলিয়া' সম্পর্কে রচিত। প্রথম শ্রেণীর রচনাসমূহের মধ্যে হিন্দুস্তানে রচিত "মাজালিসু'ল-মু'মিনীন" গ্রন্থটি নূরুল্লাহ্ ইব্ন শারীফ আল-মার'আশী [দ্র.] (মৃ. ১০১৯/১৬১০)-এর রচনা। এই গ্রন্থে শী'আ মতাবলম্বী ইতিহাস রচনায় আরবী ঐতিহ্য (দ্র. পরিচ্ছেদ খ ৪, পৃ. ৫৮ খ. নিম্নে)-সমূহকে বিকশিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে। মুহাম্মাদ ইব্ন সাদিক ইব্ন মাহ্দী "নুজূমু'স-সামা" রচনা করেন। এই গ্রন্থে হিজরী ১১শ ও ১৩শ শতাব্দীর শী'আ ইমামগণের আলোচনা রহিয়াছে। আওলিয়া' ও সূফীগণের জীবনী প্রত্যাশা মত কেবল হিন্দুস্তানেই লিখিত হয় এবং হিন্দুস্তানী অথবা হিন্দুস্তানের সঙ্গে সম্পর্কিত সূফী ও আওলিয়াগণের জীবনী বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই ধরনের বহু গ্রন্থের মধ্যে, যেসব গ্রন্থে কোন ওয়ালী-র জীবনী অথবা কোন মতবাদ (সিল্‌সিলা) অথবা গোষ্ঠী সম্পর্কে রচিত, তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এই ঃ [মুহাম্মাদ ইব্ন মুবারাক কিরমানী-র (হিজরী ৮ম শতাব্দী) "সিয়ারু'ল-আওলিয়া" (দিল্লী ১৩০২ হি.) ইদারা]; হামিদ ইব্ন ফাদলুল্লাহ (জামালী) [মৃ. ৯৪২/১৫৩৫-৩৬]-এর 'সিয়ারু'ল-'আরিফীন" [মুহাম্মাদ গাওছীর "গুলযার-ই আব্‌রার" জাহাঙ্গীরের শাসনকালের রচনা, ১০১৪ হি., এবং ১০২২ হি.-র মধ্যে, উরদূ অনুবাদ "আযকার-ই আবরার" নামে প্রকাশিত, আগ্রা ১৩২৬ হি., ইদারা]; 'আব্দু'ল হাক্কা বুখারী দিহ্‌লাবী [দ্র.] (মৃ. ১০৫২/ ১৬৪২)-এর 'আখবারু'ল-আখ্‌য়ার"; 'আবদু'র-রাহমান চিশ্‌তী'র" মিরআতুল-আসরার" একটি বৃহৎ গ্রন্থ যাহা ১০৬৫/১৬৫৫ রচিত হয়।

[উবায়দুল্লাহ খাবীশগী কাসূরীর মা'আরিজুল বিলায়া, রচনা ১০৯৪/১৬৮৩, ইদারা]। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে প্রতি যুগের সূফীগণের অবস্থা সম্বলিত বিশেষ চিত্তাকর্ষক রচনা সাফীনাতুল আওলিয়া, এই

গ্রন্থটি দুর্ভাগা শাহযাদা দারা শুকোহ (দ্র., মৃ. ১০৬৯/১৬৫৯) রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) [আস-সাখাবী, আল-ই'লান বি'ত-তাওবীখ লিমন যাম্মা'ত-তা'রীখ (কায়রো ১৩৪৯) ইদারা]; (২) ব্রুকেলম্যান, G. A. L., (খ. ১, Weimar সংস্করণ), ১৮৯৮ খৃ.; খ. ২, বার্লিন সংস্করণ ১৯০২ খৃ.; "তাকমিলা" (পরিশিষ্ট), লাইডেন ১৯৩৬ খৃ. প.); (৩) Wustenfeld, Die Geschichtsschreiber der Araber (গটিনজন ১৮৮২ খৃ.); (৪) (D.S.) Margoliouth, Lectures on Arabic Historians (কলিকাতা ১৯৩০ খৃ.); (৫) Pons Boigues, Ensayo Bibliografico su los Historiadoresy Geografos Arabigo-Espanoles, (মাদ্রিদ ১৮৯৮ খৃ.); (৬) C. A. Storey, Persian Literature, A Bio-bibliographical Survey, ২খ., (লণ্ডন ১৯৩৫ খৃ. প.); (৭) E. G. Browne, A Literary History of Persia (কেম্ব্রীজ ১৯৩০ খৃ.); (৮) Sir H. Ellit ও J. Dowson, The History of India as told by its own Historians (লণ্ডন ১৮৬৭-১৮৭৭ খৃ.); (৯) প্রাচ্য পাণ্ডুলিপি ভাণ্ডারের বৃহৎ তালিকাসমূহ (Catalogues); (১০) একক ঐতিহাসিকগণের পৃথক গ্রন্থসমূহের নাম ঐ ঐতিহাসিকদের জীবনীতে পাওয়া যাইবে; (১১) ঐতিহাসিকদের বিশেষ দলের জন্য দ্র. J. Horovitz -এর নিবন্ধ The Earliest Biographies of the Prophet, Islamic Culture -এ (হায়দরাবাদ ১৯২৮ খৃ.) ও E. Levi Provencal-এর Les Historiens des Chorfa (প্যারিস ১৯২২ খৃ.)।

H. A. R. Gibb (দা. মা. ই.)/ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তারীখ-ই জাহাঁ কোশা (تاريخ جهان كوشاى) ঃ ফারসী ভাষায় বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ। হালাকূ খানের অধীনে 'আলাউ'দ্-দীন বাগদাদের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি একজন উচ্চ শিক্ষাবিদ ছিলেন। তাতারদের সবচেয়ে বিস্তারিত ও প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস তিনিই রচনা করেন এবং উহাই তারীখ-ই জাঁহা কোশা নামে অভিহিত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭১৩

তারীখ-ই বাংলা (تاريخ بنغاله) ঃ নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত বাংলার ইতিহাস (১৭৬৩-৬৪)। তদানীন্তন বাংলার গভর্নর হেনরী ভ্যানসিটার্টের উৎসাহে রচিত। গ্ল্যাডউইনকৃত ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতা হইতে ১৭৮৮-এর প্রথম মুদ্রিত ও ১৯১৮-এ পুনর্মুদ্রিত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭১৩

তা'রীখুত-তাবারী (تاريخ الطبرى) ঃ আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর আত-তাবারী রচিত বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ (তারীখুল কবীর ও তারীখু'র-রুসূল ওয়া'ল-উমাম ওয়া'ল-মুলূক নামেও পরিচিত' বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে ইহা একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রারম্ভে একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ, যথা ইব্নু'ল-আছীর, ইব্ন খালদূন ও আবু'ল-ফিদা প্রমুখ লেখক এই গ্রন্থ দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছেন। সেই যুগের মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা কতখানি ছিল, তাহা তা'রীখুত-তাবারীর বিশালতা দ্বারা অনুমান করা যায়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭১৩

তারীফ (طريف) ঃ ৯১/৭১০ সালে স্পেনে অবতরণকারী প্রথম মুসলিম বাহিনীর নেতা। আরব ঐতিহাসিকগণ খ্যাতনামা সেনাপতি মূসা ইব্ন নুসায়র [দ্র.]-এর অনুচরের [সহকর্মীর (مولى) উৎপত্তি সম্পর্কে একমত হইতে পারেন নাই। কাহারও মতে তিনি বার্বার জাতিসম্ভূত, আবার কাহারও মতে আরব। আর-রাযী-এর মতে তাঁহার নাম আবূ যুর'আ তারীফ ইব্ন মালিকু'ল-মা'আফিরী এবং ইব্ন খালদূনের মতে তারীফ ইব্ন মালিকু'ন-নাখ'ঈ। ভ্রান্তিবশে কখনও তাঁহাকে মূসা ইব্ন নুসায়রের অন্য একজন সেনাপতি–তারিক ইব্ন যিয়াদ [দ্র.] বলিয়া মনে করা হয়।

আমরা অবগত আছি যে, Count Julian মূসা ইব্ন নূসায়রকে সেনাপতিসহ সমুদ্র পাড়ি দিয়া স্পেনে গমন করিতে অনুপ্রাণিত করিলে তিনি তাঁহার অধিকর্তা খলীফা আল-ওয়ালীদের সহিত পরামর্শ করেন। খলীফা তাঁহাকে ইবারীয় উপদ্বীপের দক্ষিণে কোন অভিযান প্রেরণের পূর্বে স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করিয়া সেই স্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেন। সুতরাং মূসা ইব্ন নুসায়র তারীফকে ৪০০ পদাতিক ও ১০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ সেইখানে প্রেরণ করেন। তাহারা সকলেই ছিল বার্বার। তারীফ এই ক্ষুদ্র সেনাদলসহ জিব্রালটার প্রণালী অতিক্রম করেন এবং উপদ্বীপে উপনীত হন। তখন হইতে ইহা তাঁহার নাম বহন করিতেছে (জাযীরাতু'ত-তারীফ, বর্তমানে তারিফা [দ্র.])। তিনি Algeciras আল-জাযীরাতু'ল-খাদরা' [দ্র.]-এর উপকণ্ঠে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং পর্যাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীসহ আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করেন। অভিযানার্থে এই প্রথম পরিদর্শন পরিক্রমা রামাদান ৯১ (জুলাই ৭১০) সালে পরিচালিত হয়। এই ঘটনার পরেই তারিক ইব্ন যিয়াদের বিখ্যাত অভিযানটি পরিচালিত হয়। ইহার পর হইতে তারীফ সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুসলিম স্পেনের আরব ঐতিহাসিকগণ, বিশেষ করিয়া আখবার মাজমূ'আ নামক বেনামী ইতিহাস, সম্পা. Lafuente y Alcanlara (Ajbar machmua) মাদ্রিদ ১৮৬৭ খৃ. পৃ. মূল আরবী গ্রন্থের ৬ ও অনুবাদের ২০ পৃ.; (২) ইব্ন ইযারী, আল-বায়ানু'ল-মুগরিব, সম্পা. Dozy, ২খ, ৫-৬; (৩) অনু. Fagnan, ২খ, ৬-৭; (৪) আল-মাক্কারী, Analectes, নির্ঘণ্ট; (৫) R. Dozy, Histoire de L'Espagne musulmane, ২খ, ৩২; (৬) Fournel, Les Berbers, প্যারিস ১৮৭৫, ১খ, ২৪০-২৪১; (৭) E. Saavedra, Estudio sobre la invasion de los arabes en Espana, মাদ্রিদ ১৮৯২ খৃ.।

E. Levi-Provencal (E.I. [1])/ মুহঃ আবু তাহের

তা'রীফ (تعريف) ঃ (আ.) ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা, বর্ণনা, 'আরাফা হইতে নিষ্পন্ন, জ্ঞাত হওয়া; উদা. তা'রীফ আয়া সূফিয়া, সেন্ট সোফিয়ার বর্ণনা; কিতাবু'ত-তা'রীফাত, সংজ্ঞার পুস্তক, সূফী পরিভাষা সংক্রান্ত সায়্যিদ শারীফ জুরযানী লিখিত একখানা সুপরিচিত গ্রন্থ।

প্রশাসনিক পরিভাষায় স্ত্রী লিঙ্গ বাচকরূপে তা'রীফা বা একটি হ্রস্ব ই সহ তা'রিফা-এর অর্থ শুল্ক, কর, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য, যানবাহনের মাশুল প্রভৃতি; উহা তুর্কী ভাষায় Gumruk ta'rifesi, আবগারী শুল্ক; Demir yol tarifeleri, রেলগাড়ির মাশুল।

ব্যাকরণে এই শব্দটি আরবী নির্দিষ্ট অব্যয় (Article) 'আল' বুঝায়। ইহাকে অধিসূচনের ধারা বা সংজ্ঞার 'লাম' বলা হয়ঃ হারফু'ত-তা'রীফ।

B. Carra De Vaux (E.I. [1])/ মুহঃ আবু তাহের

তারীম (تريم) ঃ (১), একটি প্রাচীন শহর যাহা এখনও উত্তর হাদরামাওত-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর। ইহা সেই প্রধান ওয়াদীর দক্ষিণে অবস্থিত যাহা সমগ্র হাদরামাওতে আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত এবং যাহা শিবাম-এর পূর্বে ওয়াদী মাশীলা বা ওয়াদী হাদরামাওত বা শুধু আল-ওয়াদী নামে অভিহিত। কেহ কেহ ওয়াদী মাসীলা ও ওয়াদী হাদরামাওতের মধ্যে পার্থক্য করেন, কিন্তু এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলের অবস্থান সম্পর্কে একমত নহেন (তু. Stieler's Handatlas'এর (Gotha ১৯০৫) ৬০ নং মানচিত্র এবং Th. Bent-এর Ern Arabia, লণ্ডন ১৯০০ খৃ., ৭০ পৃষ্ঠায় অন্তর্ভুক্ত হাদরামাওতের মানচিত্র (ইমাম শারীফ খান বাহাদুর জরিপকৃত)। হাদরামাওত সম্পর্কে, বিশেষত ইহার অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে আরব ভৌগোলিকদের বর্ণনা [Ritter তাঁহার Erdkunde, ১১খ.-এ (বার্লিন ১৮৪৬ খৃ.)] ইতিপূর্বে এবং M. de Goeje এই সম্পর্কে প্রাপ্ত সকল উৎস হইতে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁহার আংশিক ব্যবহার করেন। প্রণীত Hadramaut, Revue Coloniale Internationale, ২খ, ১৮৮৬ খৃ., পৃ. ১০১ প. গ্রন্থে তাঁহার সমালোচনাসহ সেইগুলিকে সন্নিবেশিত করেন। এই তথ্যগুলি খুবই সংক্ষিপ্ত ও সামান্য। এইগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণভিত্তিক বলিয়া মনে হয় না, বরং এইগুলি Wrede-এর পূর্ববর্তী পর্যটকগণ প্রদত্ত কিছু বিবরণী হইতে সংগৃহীত অথবা Wrede ঐ এলাকা স্বয়ং পরিদর্শনে সক্ষম না হইয়াও বিভিন্ন উৎস হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন কতকটা তাহারই অনুরূপ। আরব ভৌগোলিকগণ শিবাম-এর অবস্থান সম্পর্কে কোন বিশদ ব্যাখ্যা না দিয়া এইগুলি যে হাদরামাওত-এ অবস্থিত দুইটি (প্রধান) শহর শুধু তাহা বর্ণনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ য়াকূত (মু'জাম, ২খ, ২৮৪, ৩খ, ২৪৭; ১খ, ৭৪৬), আল-ইদ্‌রীসী [দ্র. Jaubert, Geographie d'Edrisi (প্যারিস ১৮৩৬ খৃ.), পৃ. ১৪৯ প. ও ৫৩] এবং অন্যান্য (নিম্নে দেখুন)। আল-হামদানী (জাযীরা, পৃ. ৮৭) তারীম-কে একটি বৃহৎ শহর হিসাবে অভিহিত করেন (যেমন তিনি শিবামের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত তারীম-কে বড় শহর বলিয়া উল্লেখ করেন) এবং শিবাম-কে অভিহিত করেন বৃহৎ রাজধানী হিসাবে (পৃ. ৮৬)। নিছক উল্লেখের কোন মূল্য নাই যেমন আল-হামদানী-র গ্রন্থে (পৃ. ১৭৭) তারিম ও তারীস-এর এবং অন্যান্য স্থানে শুধু তারীম-এর উল্লেখ আছে, আল-হামদানী ১৮২ পৃষ্ঠায় কবিদের উল্লেখও করা হইয়াছে; অনুরূপভাবে আল-বাকরী (পৃ. ১০৭, ১৮৪)-তে শুধু বরাতের উল্লেখ আছে। সুদূর ১৭৬৩ খৃ. K. Niebuhr সান'আ ও মাসকাত (দ্র. Beschreibung von Arabien, কোপেনহেগেন ১৭৭২ খৃ., পৃ. ২৮৬ প.) তারীম ও শিবাম সম্পর্কে আরবদের নিকট গল্প-কাহিনী শ্রবণ করেন। তাঁহার গ্রন্থের ২৮৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে "এই দুইটি বিখ্যাত শহরের উল্লেখ যাহা (১৬১৯ খৃ. প্যারিস হইতে প্রকাশিত আল-ইদরীসীর ল্যাতিন সংক্ষেপ Geographia Nubiensis এবং আবুল-ফিদা হইতে উদ্ধৃত)। Ritter ও অন্যগণ তারীমের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে ভ্রমাত্মক বর্ণনা প্রদান করেন; হাদরামাওত-এর প্রাপ্ত সর্বোৎকৃষ্ট মানচিত্র অনুসারে (L. Hirsch-এর ও) ইহা প্রায় ৪৯°৫৫´ পূ. দ্র. ও ১৬°৪৪ উ. অ.-এর মধ্যে অবস্থিত।

L. W. C. van den Berg বাটাভিয়ায় তাঁহার সরকারী পদমর্যাদার বদৌলতে হাদরামাওত হইতে আগত আরবদের জন্মভূমি সম্পর্কে অত্যন্ত পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। এই আরবগণ ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হিজরত করে যেমন তাহাঁদের দেশবাসিগণ এখনও করিয়া থাকে। তাঁহার অধিকাংশ তথ্য পরিবেশক শিবাম ও তারীমের মধ্যবর্তী প্রধান ওয়াদী জিলা হইতে আগত। এই সকল তথ্য তিনি তাঁহার Le Hadhramout et 1886)-তে ব্যবহার করেন (তু. C. Snouck Hurgronje, Arabic in Ost Indie (Leyden 1907, p. 19, Revue de l'Histoire des Rel. পত্রিকায় ১৯০৮ সালের ৫৭তম সংখ্যায় ৭৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ফরাসী অনুবাদ)। অন্যান্য অনেক তথ্যসহ তারীমের প্রথম অত্যধিক সঠিক অনুপুঙ্খ বিবরণের জন্য আমরা Van den Berg -এর নিকট ঋণী। তাঁহার মতে শহরটি ছিল প্রাচীন রাজধানী Maltzan। তাহার Reise -এর মানচিত্রে "তারীমকে হাদরামাওত-এর রাজধানী হিসাবে চিহ্নিত করেন; তাঁহার মতে সারউন (পৃ. ১৩) আধুনিক রাজধানী। ২৬ পৃষ্ঠায় তিনি উত্তরদিকে আল-ওতী পর্বতমালা হইতে নির্গত ওয়াদীগুলির বর্ণনা প্রদান করেন। ১৮ পৃষ্ঠায় প্রদান করেন আশ-শিহর হইতে তারীম পর্যন্ত সড়কের বিভিন্ন যাত্রাবিরতি স্থানসমূহের দূরত্ব। সর্বক্ষেত্রে সারউন তারীমকে অতিক্রম করে। এক সময় উহা জনসংখ্যা, ব্যবসায়ে ও শিল্পে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। সাধারণভাবেও উহা অধিক অগ্রসর একটি শহর। তারীম-এ কতিপয় বাসগৃহ ইতিমধ্যেই জনবসতিহীন হইয়া পড়িয়াছে, সড়ক জনশূন্য, বিরাট সংখ্যক মসজিদে কেহই হয়ত সালাতের জন্য যায় না নতুবা সংস্কারের অভাবে ধ্বংসোন্মুখ। কথিত আছে, গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে শহরের পতন আরম্ভ হয় এবং উপজাতিদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়শ বিবাদ ইহার ধ্বংস ডাকিয়া আনে। আরবী পত্রিকা আজ-জাওয়া'ইব-এর ১২৯৯ হিজরীর ১৮ রাবী'উ'ল আওওয়াল -এর সংখ্যায় (৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২, কনস্টান্টিনোপল) অনির্ভরযোগ্য এক প্রতিবেদন অনুসারে তারীমের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ২৫,০০০ (তু. Wrede-এর উক্তি)। Van den Berg -এর গবেষণালব্ধ তথ্য অনুসারে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০,০০০ (Wellsted-এর বক্তব্যের অনুরূপ)। পূর্বে তারীম হাদরামাওতের বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রস্থল ছিল, অবশ্য তাহা শুধু ব্যক্তিগত গৃহে পরিচালিত হইত এবং তাঁহার সময়ে (পৃ. ৭৮) ইহার গুরুত্ব বিরাজমান ছিল, যদিও য়ুরোপীয় প্রতিযোগিতার ফলে ইহার পতন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। Seetzen-এর ন্যায় সুপ্রাচীন লেখক (Zach's Menatl. Correspondences, ১৮১১ খৃ., ২৭খ, পৃ. ২৪০) অবহিত ছিলেন যে, জরির কারুকাজ করা রেশমী শাল তারীমে প্রস্তুত হইত। শহরটি এক সময় দেশের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল (ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব ও ফিক্‌হ) বর্তমানে এই ক্ষেত্রেও সারউন তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে (পৃ. ৮৮)।

দেশীয় লোকজনের মৌখিক বিবরণ হইতে সংগৃহীত C. Landberg-এর (Etudes sur les dialectes de L'arabie meridionale, i, Hadromout, Leyden 1901) হাদরামাওতী গল্প-কাহিনীর সংস্করণে তারীম উল্লিখিত হয় [পৃ. ১৭৫ (১৮৫) ৪৩২] (সঙ্কলনের শেষাংশে রাবাত তারীম নামক সেখানকার একটি বিদ্যালয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, ইহার পরও বিশদ বিবরণ ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্র.)।

শিবাম, সারউন ও তারীম (জুলাই ১৮৯৩) পরিভ্রমণকারী এবং শহরটির স্বীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রতিবেদন প্রদানকারী প্রথম য়ুরোপীয় ছিলেন (Leo Hisrsch, Ruseu in Sudarabien, Mahra-Laud und Hadramaut, Leyden 1897)। শিবাম হইতে তারীম (পৃ. ২০৯) পর্যন্ত তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং শেষোক্ত শহরটির

বিবরণ তথ্যসমৃদ্ধ। তাঁহার তৈরী দক্ষিণের ঢালু ভূমির মানচিত্র অনুসারে তিনি বলেন, তারীম ওয়াদী মাসিলের (শিবাম-এর দিক হইতে প্রবাহিত) বাম তীরে অবস্থিত। v. d. Berg -এর বক্তব্য ঃ Terim (Estsitue sur le versaut) de la chaine des montagnes septentrionales (পৃ. ২২), তাই সংশোধন করা উচিত। ২৭৭ পৃষ্ঠায় Hirsch শহরটির এবং উহার অবস্থানের অধিকতর পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন। এইখানে আমরা শুধু উল্লেখ করিব যে, শহরটির সমগ্র অংশ, বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ জনমানবশূন্য দৃশ্যের অবতারণা করে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ির v.d. Berg যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করেন, কিছু বৈশিষ্ট্যসূচক আকার-আয়তন এবং এগুলির সুষ্ঠু সংস্কারের অভাবে চিহ্নিত করা যায়। মসজিদের সংখ্যা ও চুনকাম করা পরিপাটি মিনারসমূহের সংখ্যা তাঁহার মতে খুব অধিক নয় (পৃ. ২২৯, v. d. Berg-এর মতে ৩০০-এর উপরে)। যে মাদরাসায় ধর্মতত্ত্ব ও আইনশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা রাবাত মসজিদের সংলগ্ন। তাঁহার এই উক্তির সঙ্গে আমরা উপরে উদ্ধৃত Landberg ও v. d. Berg-এর টীকা (পৃ. ৮৮) [যথা উচ্চ বিদ্যালয়, সারউন-এ ছাত্রাবাস, বৃহৎ মসজিদ সংলগ্ন অংশ রাবাত নামে আখ্যায়িত প্রভৃতির তুলনা করিতে পারি [তু. "দরিদ্র মুসলিম ছাত্রদের নিমিত্ত ছাত্রাবাস" অর্থে রিবাত)]। Landberg-এর তথ্যানুসারে তারীমের বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায় এবং সারউনের বিদ্যালয় তাহার স্থান অধিকার করে (আরও দ্র. v. d. Berg)। Hirsch শহরের একজন সায়্যিদের নিকট হইতে জানিতে পারেন (যিনি ইহার ক্রমবর্ধমান অবনতিতে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন) যে, ইহা প্রাচীনকাল হইতে পাঁচটি বিলাদ (অঞ্চল) সমন্বয়ে গঠিত ছিল এবং তখন ইহার জনসংখ্যা ছিল ৩,৮১০। শহরের সুলতানের নামমাত্র ক্ষমতা ছিল এবং বস্তুত প্রকৃত ক্ষমতা ছিল প্রভাবশালী সায়্যিদদের হাতে (পৃ. ২৩১)। সারউনের ন্যায় তারীম কাছীরী উপজাতি অধ্যুষিত ছিল; ইহার নিজস্ব রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ছিল (বার্লিন ও বৃটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহ); Hirsch-এর গ্রন্থের শেষাংশে কয়েকটি চিত্র মুদ্রিত; আরও দেখুন রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির মালয় শাখার পত্রিকার ৩য় খণ্ডের ১ম অংশে (এপ্রিল ১৯২৫) একটি চিত্রসহ প্রকাশিত Sir John A. Bucknill- এর A Note on some coins struck for use in Tarim, Southern Arabia. শহরবাসীর বৈরী মনোভাবের জন্য Hirsch-কে মাত্র কয়েক ঘণ্টা অবস্থানের পর তারীম ত্যাগ করিয়া পরদিন প্রভাতে শিবাম-এ প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। ফলে পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণের সময় তাঁহার ছিল না।

তাঁহার বক্তব্যের সঙ্গে প্রাচীন লেখকদের অমৌলিক তথ্যের তুলনামূলক আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, v. d. Berg-এর বক্তব্য হইতে ইতিপূর্বে প্রাপ্ত মতপার্থক্যের ইঙ্গিত ব্যতীত শেষোক্তদের মানচিত্র শিবাম হইতে তারীম পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানসমূহ অনেক পূর্বদিকে চিহ্নিত হইয়াছে এবং তিনিও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের আয়তন ও জনসংখ্যা সঠিক প্রদান করেন নাই। প্রায় ৬,০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত (Hirsch, পৃ. ১৯৮ ও Bent, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৮ অপরপক্ষে v. d. Berg ৪২ পৃষ্ঠায় বলেন মাত্র ২,০০০) বৃহত্তম শহর শিবাম আল-হামদানীর সময়েও তাই ছিল–একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে বিবেচিত এবং জীবন ও জীবিকার কেন্দ্র হিসাবে (Hirsch, পৃ. ২০৫) সারউন ও তারীম হইতে অনেক অগ্রসর (আনু. ৪,৫০০ অধিবাসী, অন্যদিকে v. d. Berg-এর মতে ১৫,০০০)। কিন্তু তিনি ইহার স্থান নির্দেশ করেন সারউনের অনেক নিম্নে, এমন কি গুরুত্বের দিক দিয়া তারীমেরও নিম্নে, অথচ ইহার সুলতান তারীমেও স্বীকৃত ছিলেন। D. S. Hogarth তাঁহার The Penetration of Arabia (লণ্ডন ১৯০৫ খৃ.) গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠায় বলেন, "ইহার সকল শহরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন এবং তাহাদের মধ্যে পরিবর্তন এত ঘন ঘন গটিত যে, ইহা অসম্ভব নয় যে, Van den Berg সেই মুহূর্তে সঠিক ছিলেন, যখন তিনি সারউনকে হাদরামাওতের রাজধানী হিসাবে বিবেচনা করেন এবং তারীম-কে মনে করেন ইহার একমাত্র সমকক্ষ"। অন্তর্বর্তী বিরতির হ্রস্বতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার এই মত কদাচিৎ যুক্তিসঙ্গত। W. Hein-এর রচনায় (Sudarabische Itinerarien, M. G. G.-W. lvii, (1914) পৃ. ৩৭ প. তাঁহার সাহিত্যকর্মের অবশিষ্টাংশ হইতে তাঁহার বিধবা স্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত। "গিশিন হইতে তারীম পর্যন্ত মু'আল্লিম 'আবূদ এর ভ্রমণ"-এর উল্লেখ আমরা এইখানে লক্ষ করিতে পারি। তদনুসারে সারউন তারীম অপেক্ষা বৃহত্তর এবং শিবাম এই শহরদ্বয় অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, কিন্তু অন্যান্য (পৃ. ৪৩) শহর অপেক্ষা বৃহত্তর, এই বক্তব্য v. d. Berg-এর অনুমানের সঙ্গে বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মতামত বিরোধী বক্তব্যানুসারে অবশ্য শিবাম তারীম হইতে ৭-৮ দিনের ভ্রমণ পথ (পৃ. ৪২), এইখানেও Hirsche -এর বর্ণনা অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। পরবর্তী বৎসরের জানুয়ারীতে Hirsch (১৮৯৪ খৃ.), Bent ও তাঁহার স্ত্রী শিবাম পৌঁছিতে সমর্থ হন; তাঁহারা তারীম গমন করেন নাই। v. d. Berg ও অন্যদের বিরুদ্ধে মতস্বরূপ Bent (পৃ. ১১৯) বলেন যে, সারউন ও তারীম সুলতানের শহরে বাহিরে কোন কর্তৃত্ব ছিল না (দক্ষিণ আরবের সুলতানী শাসনামল সম্পর্কে তু. C. Snouck Hurgronje, L'interdit seculier....en Hadhramott, Revue Africaine, 1905. p. 92)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাতসমূহসহ বিশেষত Hirsch, v. d. Berg, de Goeje, Hein, Sprenger, Wrede_Maltzan, Ritter এবং আরব ভৌগোলিকদের (আল-হামদানী, য়াকূত, আল-ইদ্‌রীসী, বাকরী)।

J. Tkatsch (E. I.[1])/ আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তারীম (تريم) ঃ (২) হাজ্জী খালীফা প্রণীত জিহাননুমা, পৃ. ৪৯০ অনুসারে (তু. Hammer-Purgstall, Uber die Geographie Arabiens, fahrbucher der Literatur, Vienna 1841, xciv, p. 93 এবং তাহার পরবর্তী Ritter, xii, 727) একটি দুর্গ, লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত উপকূলীয় শহর জীযান হইতে পূর্বদিকে "নেউইদিজে ও ফেলেকি" প্রাসাদ (v. Hammer-এর প্রতিলিপি অনুসারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত মনে হয় না) হইয়া যে সড়ক সা'দা পর্যন্ত গিয়াছে ইহা তাহার উপর অবস্থিত অর্থাৎ য়ামানের উত্তরাংশে। আল-হামদানী প্রণীত সিফাত, পৃ. ১৮২-তে উল্লিখিত কুছায়্যি-এর কবিতার চরণের উল্লেখ হইতে এবং ১৮৪ (তু. ১০৭) ও ১৯৬ পৃষ্ঠায় আল-বাকরীর উদ্ধৃতি হইতে স্থানটির অবস্থান সঠিক প্রতিপন্ন করা যায় না। আল-হামদানী মক্কা ও কারনের মধ্যে হুনায়নের অর্থাৎ দক্ষিণ হিজাযের একটি স্থান– অবস্থান উল্লেখ করিবার অব্যবহিত পরেই শুধু কুছায়্যিরের বরাতে বায়দাহ ও তারীমের উল্লেখ করেন, কিন্তু তারীমের অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলেন নাই। কবিদের বরাতে আল-বাকরী তিরয়ামের (পৃ. ১৯৫) উল্লেখ করেন (পৃ. ১৯৬) এবং আল-আ'শা ও কুছায়্যির-এ তারীম দৃষ্ট হয়; হয় ছন্দমিলের জন্য এই উচ্চারণ নতুবা ইহা অন্য স্থান এবং তৎপর তারীমু শিরোনামে হাদরামাওতের (তু. নং ১) অনুরূপ নামের একটি শহরের আলোচনায় অগ্রসর হন। তারীম-কে অবশ্যই তিয়াম হইতে পৃথক করিতে হইবে। চরণটি কেবল কাব্যিক উপমাস্বরূপ সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান ব্যতীতই তারীমের মরুভূমির

উল্লেখ করেন; কবিদের অনেক ভৌগোলিক স্থান উল্লেখের ন্যায়ই এই উল্লেখ একটি প্রচলিত প্রথা প্রতীয়মান হয়। কারণ কবিরা কখনও ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয়। কুছায়্যিরের ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চিত যে, হাদরামাওতের অনুরূপ নামের (নং ১ ও ২) দুইটি স্থান সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেন নাই। তারীমের অব্যবহিত পরেই একই চরণে তিনি আল-শু'আয়বার উল্লেখ করিয়াছেন। আল-বাক্‌রীর (১৮৪ পৃষ্ঠা) মতে য়ামান সড়কের উপর অবস্থিত একটি উপকূলীয় শহর; ইহা হামদানীর রীতির অনুরূপ, The vers of al-A'sha -এও যথার্থতা বিবেচনা ব্যতীতই তারীমের উল্লেখ করা হইয়াছে। য়াকূত তাঁহার মু'জামের ১ম খণ্ডের ৮৪৬ পৃষ্ঠায় ইহা হাদরামাওতের একটি শহর হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন, কুছায়্যির চরণের সঙ্গে আল-বাক্‌রী কবিদ্বয় (পৃ. ১৯৬, দ্র. তিরয়াম) উল্লিখিত তারীমের অবস্থান সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত না করিয়া ইহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তবে হাদরামাওতের তারীম সম্পর্কে আলোচনার সময় নয়। তাজুল 'আরূস (৮খ, ২১১) তারীম নামীয় আরও কয়েক স্থানের কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রথমেই হিসানু'ল-'আরাবের (১৪খ, ৩৩২) ন্যায় প্রায় একই শব্দরূপ তিরয়ামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (আল-জাওহারীর মতভিত্তিক, কামূস দ্র., শুধু এইরূপই অবগত) এবং তৎপর অন্যদের অনুসরণে তারয়াম (তু. আল-বাক্‌রী, পৃ. ১৯৫ প.) এবং এই মন্তব্য করেন যে, ইহা আন-নাকীর নিকটবর্তী একটি ওয়াদী। অনেকেই ইহা এই কারণে অস্বীকার করেন যে, আন-নাকী মদীনার নিকটবর্তী একটি ওয়াদী, বিরুদ্ধ মতানুসারে হিজাযের য়ানবু'-র নিকটবর্তী একটি ওয়াদী (তু. আল-হামদানী, পৃ. ১৮১ এবং য়াকূত, ১খ, ৮৪৬; তু. তদুপরি আল-বাক্‌রী, পৃ. ১৯৫ ও ৫৪৮)। যেভাবেই হউক, ইহা য়াকূত উল্লিখিত তিয়াম হইতে স্বতন্ত্র (পৃ. গ্র.), ইহা উত্তরদিকে মাদয়ানের নিকট (The Turiam of the Admiralty Chart; তদুপরি তু. Ritter, ১৩খ, ২৮২; Sprenger, পূ. গ্র., পৃ. ২৩)। তাজ অনুসারে তিরিয়াম বসরা মরুভূমির একটি স্থান। লিসান অপেক্ষা তিনি আরও অগ্রসর হইয়াছেন এবং তারীম হাদরামাওত-এ অবস্থিত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সিরিয়ায় একটি তারীম বিদ্যমান এবং তৎপর "য়ামানী শহর" সম্পর্কে আলোচনা করেন– Wustenfeld, Yemen im xi Fahrhundert (Abhandl, der kon, Ges. D. Wessensch., xxxii)। হাসান পাশার ইতিহাস প্রসঙ্গে আল-মুহিব্বী হইতে (Gottingen ১৮৮৫, পৃ. ৩৯-তে) শুধু উল্লেখ করেন যে, ১০০৬ সনে (১৫৯৭-৯৮) আমীর সিনান অধিকৃত দুর্গসমূহের তালিকায় তারীমের পরিবর্তে য়ারীম পড়া উচিত। ইহাই সঠিক, কিন্তু "তারীম হাদরামাওতে" অবস্থিত বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাহা ঠিক নয়। অবশ্য একটি য়ামানী তারীমও বিদ্যমান, কিন্তু সানআ' অঞ্চলের দুর্গসমূহের ভৌগোলিক অবস্থান প্রমাণ করে যে, ইহা আলোচ্য তারীম নয়। Stieler's Handatlas, ৯ম স., Gotha ১৯০৫, Karte von Arabien (Habenicht) সা'দার পশ্চিমে প্রায় ৪৩°২০' পূ. দ্রা. এবং ১৬°-৫৭' উ. আ. রেখার মধ্যে তারীম চিহ্নিত করে। জিহাননুমা-এর বক্তব্যের সঙ্গে ইহার মিল আছে; English general Staff-এর উপকূলের মানচিত্রে শীফত, সানা (১৯১৬) ইহা চিহ্নিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধগর্ভে প্রদত্ত।

J. Taktsch (E.I.[1])/ আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তারূদাঁন্ত (TaRUDANT) ঃ মারাকুশ হইতে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে আগাদির-এর ৪৫ ডিগ্রী পূর্বে মরক্কোর দক্ষিণে ওয়াদী সূস নদীর দক্ষিণ তীরে সূস জিলার প্রধান শহর। যা চলাচলের উপযোগী পথে তারূদাঁন্ত শহর হইতে মারাকুশ ও আগাদির শহর দুইটিতে পৌছানো যায়। তারূদাঁন্ত ৭,০০০ অধিবাসীর এক ক্ষুদ্র শহর। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির জন্য "আস-সূস আল-আকসা" শীর্ষক নিবন্ধ দ্র.।

E. Levi-Provencal (E.I.[1])/ আফতাব হোসেন

তারোম (تارم) ঃ কিযিল-উযান [তু., সাফীদ-রূদ]-এর তীরবর্তী একটি জিলা।

নাম ঃ আরবগণ ইহাকে তারম, তিরম (মুতানাব্বী), তীরম (B. G. A., ৬খ, ৪০৪, ৪০৮) প্রভৃতি নামে অভিহিত করিত। য়াকূত ইহাকে এক স্থানে তারম আর এক স্থানে তারাম নামে উল্লেখ করেন। মুসতাওফী আরবী দ্বিবচন তারুমায়ন ব্যবহার করেন–অর্থ দুই 'তারুম', আধুনিক ফারসী উচ্চারণ তারোম। যদিও তারোম বর্তমানে একটি জিলার নাম, কিযিল-উযান-এর দক্ষিণ তীরে তারোম নামের একটি ক্ষুদ্র শহরও বিদ্যমান (ওয়েনিসারা ও কাল্লাজ-এর মধ্যে); তারোম জিলার বাহিরে আরদাবীল হইতে মিয়ানাগামী সরাসরি সড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে অপর একটি তারিম (তারোম) গ্রাম অবস্থিত। তারোম-এ সংলগ্ন খালখাল-এর ন্যায় এখনও যথেষ্ট অনুসন্ধান পরিচালিত হয় নাই।

মিয়ানা-এর নিম্নে পারদালীস সেতুর নিকট কিযিল-উযান ইহার সর্বোত্তর সীমানায় পৌছিয়াছে। সেইখান হইতে বৃহত্তর শাহরূদ [দ্র.]-এর সঙ্গে ইহার সঙ্গমস্থান পর্যন্ত কিযিল-উযান (দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল) উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে সাধারণ পথ অনুসরণ করে। তারোম মোটামুটিভাবে নদীর মধ্যঅংশের তীরে অবস্থিত।

দক্ষিণ দিকে চিল্লাখানা প্রভৃতি পর্বত তারোমকে যানজান [দ্র.] হইতে বিচ্ছিন্ন করে। পূর্ব দিকে মানজীল সেতুর উপরে বৃহৎ শাহরূদ এবং কিযিল-উযান-এর সঙ্গমস্থল তারোম-এর সীমানা। উত্তর-পূর্বদিকে জীলান পর্বতমালা মাসূলা (জিলান) হইতে কিযিল-উযান-এর অববাহিকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে তারোম খালখাল সংলগ্ন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যানজান (কাগায-কুনান-এর প্রাচীন প্রসিদ্ধ এলাকা)-এর উপর নির্ভরশীল জিলাসমূহ ইহার সন্নিহিত।

ইহার উত্তর দিকের বাঁকে কিযিল-উযান ২,২০০ হইতে ২,৭০০ ফুট গভীর অনতিক্রম্য এক গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া পথ করিয়া নিয়াছে। খালখাল-এর চাষোপযোগী ভূমি ও গ্রামসমূহ গিরি সঙ্কটের পার্শ্বদেশের উপরে উচ্চ মালভূমি (৫,২০০-৬,০০০ ফুট উচ্চতে অবস্থিত। গিরিসংকটটি মিয়ানসারা পর্যন্ত ৬০ মাইল বিস্তৃত, সেইখানেই ক্ষুদ্র শাহরূদের (তালাকান হইতে আগত বৃহৎ শাহরূদ হইতে ইহা স্বতন্ত্র এবং মানজীলের পশ্চিমে দক্ষিণ তীরের নিকট কিযিল-উযান-এ পতিত) স্রোতধারা কিযিল-উযান-এ পতিত হইয়াছে। গিরিখাতের নিম্নে কিযিল-উযান উপত্যকা ৬০ মাইল প্রশস্ত এবং উভয় তীরে বহু গ্রাম অবস্থিত। দারবান্দ-এর নিকট পার্বত্য খাড়াই জলধারাকে সঙ্কীর্ণ করিয়াছে। কিন্তু পরে উপত্যকাটি মানজীল-এর (১২-১৩ মাইল) ঠিক পূর্ব পর্যন্ত পুনরায় প্রশস্ত হইয়াছে।

যেইখানে কিযিল-উযান তার গিরিখাত অতিক্রম করিয়াছে সেইখানেই তথাকথিত তারোম-এর প্রারম্ভ; দারবান্দ-এর গিরিখাত ইহাকে উচ্চ ও নিম্ন এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। তারোম-এর

জিলাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নুযহাতু'ল-কুলূব-এ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু গ্রামসমূহের নাম পাণ্ডুলিপিতে বিকৃত করা হইয়াছে।

(ক) জিলার উচ্চাংশে নিম্নলিখিত এলাকা (মহকুমা)-গুলি অন্তর্ভুক্ত ঃ (১) ২৫টি গ্রামসহ দিযাবাদ-ই সুফলা; গিরিখাতের মুখে কিযিল-উযান-এর উভয় পার্শ্বে নিমাহিল, গুলচিন ও কালাসার (কলহার?) প্রভৃতি গ্রাম ইহার অবস্থান প্রমাণ করে এবং আমরা আরও লক্ষ করি যে, একই বিভাগের উচ্চাংশ কাগায-কুনান (প্রাচীন খুনাজ)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল (দিযাবাদ-ই 'উল্যা, নুযহাত, পৃ. ৬৬)। তবে ইহার সঠিক অবস্থান নির্ণিত হয় নাই।

(২) তারোম-ই 'উল্যা সঠিক অর্থে (১০০ গ্রাম লইয়া) কিযিল উযান-এর উভয় তীরে অবস্থিত। কিযিল-উযান-এর দক্ষিণ তীরে আখগাদুব হইয়া যানজান হইতে আগত সড়কের দক্ষিণে অবস্থিত কালাত (তু. য়াকূত) এবং বাম তীরে দাররাম ইহার অবস্থান নির্দেশ করে। পাসবার (?)-এর সঙ্গে প্রথম নামের মিল ব্যতীত ৩ নং বিভাগ নসবার (?) এবং ব্রীদূন (?)-এর অবস্থান স্পষ্ট নয়, রুশ মানচিত্রে পাসবারকে দেখান হইয়াছে বাম তীরে Rawlinson উল্লিখিত ওবার-এর সন্নিকটে। শেষোক্ত জনের মতে উত্তর তারোম (তারোম-ই খালখাল বলা উচিত?) দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এক ফালি সঙ্কীর্ণ ভূমি লইয়া গঠিত এবং বাম তীর পৃশ্ত-ই কূহ (পশ্চাৎ পর্বত জিলান-এর বরাত) নাম ধারণ করে, নুযহাতু'ল-কুলূব ও Fortescue-এর বক্তব্য অবশ্য ইঙ্গিত দেয় যে, কিযিল-উযান-এর উভয় তীরে অবস্থিত কতিপয় গ্রাম তারোম-এর অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে দক্ষিণ তীরের ফালিটি খুব সঙ্কীর্ণ নয়; বিভিন্ন পর্বত হইতে নির্গত জলস্রোত যানজান-কে তারোম হইতে বিচ্ছিন্ন করে এবং কিযিল-উযান-এ পৌঁছিবার পূর্বে সেচ পয়ঃ-প্রণালীতে মিশিয়া যায়।

(খ) জিলার নিম্নাংশের বিভাগ চারটি; এইগুলি শামীরান দুর্গের (৫০টি গ্রাম) দৃষ্টিসীমার মধ্যে এবং উভয় তীরে অবস্থিত (দক্ষিণ তীরে এখনও নুযহাত উল্লিখিত কাল্লাজ গ্রাম বিদ্যমান; "আলওন, অবশ্যই আলতুন কুশ হইবে, ডান দিকের ক্ষুদ্র উপনদীর তীরে অবস্থিত, তু. মির'আতুল-বুলদান ও রুশ মানচিত্র ৫); ফিরদাওস দুর্গের মহকুমা (২০টি গ্রাম), সারদান গ্রাম (আলতুন-কুশ-এর উপরিভাগে একটি উপনদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত) ইহার অবস্থান নির্দেশ করে। নুযহাতু'ল-কুলূব-এর আর একটি অনুচ্ছেদ (পৃ. ২১৭) উল্লেখ আছে যে, ৬ নং মহকুমা বারাও, এইখানে শাহরূদ ও কিযিল-উযান পুনর্মিলিত হইয়াছে, তারোম-এর অন্তর্গত। 'আলামআরা-এর (পৃ. ৩৩৫) একটি অনুচ্ছেদ হইতে প্রমাণ মিলে যে, সাফাবী আমল শাহরূদ-এর পূর্বদিকস্থ মানজীল ও খারযাবীলও তারোম-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান কালে গুরুত্বপূর্ণ শহর মানজীল যাহা প্রাচীন হারকাম বলিয়া অনুমিত (য়াকূত, ৪খ, ৯৬৩), জীলান-এর অন্তর্ভুক্ত (Rabeno, R. M. M., ৩২ খ, ২৫৯); ইহা সায়ীদ-রূদ উপত্যকার পার্শ্বে জীলান-এর প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ করে। অবশেষে নুযহাতু'ল কুলূব (পৃ. ৬৭) অনুসারে ৭ নং এলাকা (মহকুমা) তীরাক (?) মরজমনান (?) ও আনদিজান-এর (তু. য়াকূত, আন্দিজান) রাজস্ব তারোম ও কাযবীন-এর মধ্যে বণ্টিত হইত। এই এলাকাসমূহ অবশ্যই য়ুযবাশি-চাই (মোল্লা 'আলী-র গিরিখাত)-এর উৎসমুখে অবস্থিত। ইহার জলপ্রবাহ বাম তীর হইতে শাহরূদ-এ পতিত হয় [আমরা লক্ষ করি রুশ মানচিত্রে এইখানে মারচিন ও আনদা প্রদর্শিত হইয়াছে]।

খালখাল ঃ খালখাল-এর দিকে তারোম-এর সীমান্ত প্রায় অজ্ঞাত। তারোম সাধারণত 'ইরাক-ই 'আজাম-এর অধীনস্থ উপনিবেশসমূহের অন্তর্গত (তু. Schwarz, পৃ. ৭৩৬ এবং নুযহাত, পৃ. ৬৫ প.) খালখাল আযারবায়জান-এর অংশ (বা আরও সঠিকভাবে ইহার 'তুমান', আরদাবীল-এর অংশ, নুযহাত, পৃ. ৮১)। য়াকূত (২খ, ৪৫৯)-এর পূর্বে খালখাল নামের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ট্রান্স-ককেশিয়া [তু. শেক্কী]-এর অন্তর্গত "Iti" জিলার প্রাচীন খালখাল শহরের সঙ্গে আযারবায়জান-এর খালখাল নাম অবশ্যই সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। গ্রীক ও আরমেনীয় গ্রন্থকারগণ উল্লেখ করেন যে, ইহা খৃস্টীয় দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আরমেনীয় এবং পরবর্তী কালে আলবেনীয় (আর্য) নরপতিদের শীতকালীন আবাসস্থল ছিল (তু. Marquart, Eransahr, পৃ. ১১৬)। সম্ভবত ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে আরদাবীল ও কিযিল-উযান-এর মধ্যবর্তী সমগ্র দেশ আল-বাব্‌র (এই পাঠ সম্পূর্ণ নিশ্চিত নহে; Noldeke Geschichte, পৃ. ৪৮১) নামে পরিচিত ছিল। এই প্রাচীন শব্দটি প্রায়শ তায়লাসান-তালিশ-এর পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় (তু. বালাযুরী, পৃ. ৩১৮, ৩২২, ৩২৭; ইব্‌ন খুর্‌রাদাযবিহ, পৃ. ৫৭, ১১৯; কুদামা, পৃ. ২৪৫, ২৬১; দীনাওয়ারী, পৃ. ১৯৭; মাস'উদী, মুরূজ, ১খ, ২৮৭)। কিযিল-উযান যোগাযোগের এক গুরুতর প্রতিবন্ধক, তাই ইহা আযারবায়জান ও 'ইরাক-ই 'আজাম-এর মধ্যে উপযুক্ত প্রশাসনিক সীমানা গঠন করিয়াছে। প্রাচীন কেন্দ্র ফিরূযান (বর্তমান কাবাখ) বিলুপ্ত হইবার পর খালখাল নামক যে শহর রাজধানীতে পরিণত হয় উহা হইতে খালখাল নামটি আসিয়াছে। খালখাল বস্তুত কিযিল-উযান-এর উপনদীর বাম তীরের উপত্যকার সমকালীন। নদীর অন্যতম শাখা উত্তর দিক হইতে আসিয়া (আরদাবীল-পারদালীস সড়কের উপর কিযিল-য়োকুশ গিরিপথ হইতে) সানজাওয়া গ্রাম অতিক্রম করে (য়াকূত, ৩খ, ১৬০; সিন্‌জবায বা সিনজাবায; নুযহাত, সম্পা. Le Strange, P. 180, 223, সানজিদা ইত্যাদি; Olearius [১৬৬৩ খৃ.], পৃ. ৪৭২ Sengoa)। অন্য শাখার উৎস তালিশ (বর্তমান রাজধানী খালখাল-এর সন্নিকটে; হেরোও <হীরাবাদ) পর্বতমালার পশ্চিম ঢালুর উপর উত্তর-পূর্ব দিকে (খালখাল-এর বর্তমান রাজধানীর নিকটে হেরাও <হীরাবাদ)। কূঈ গ্রামের নামানুসারে এই শাখার নামকরণ করা হয় (নুযহাত, সম্পা. Le Strange , পৃ. ২২৩, গাদীও, কাদপু, কিন্তু পৃ. ৮৪, কূ'ঈ)। এই দুই শাখা কাবাখ গ্রামের নিকট মিলিত হইয়াছে। প্রাচীন শহর খালখাল (উপত্যকায় বর্তমানে এই নামের কতিপয় গ্রাম বিদ্যমান) হইতে আগত স্রোতধারা অবশেষে এই নদীর বাম তীরে মিলিত হইয়া পাদলীস সেতুর সামান্য নিম্নে কিযিল-উযান-এ পতিত হয় (তু. নুযহাতু'ল-কুলূব, পৃ. ৮১ ঃ বারদালীস, পৃ. ১৮০ ঃ বারূলায)। কূ'ঈ নদী পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত একটি বাঁক সৃষ্টি করিয়াছে। হেরোও শহরের দক্ষিণে আখদাগ-এর উচ্চ শৃঙ্গের শাখা-প্রশাখাসমূহ কূ'ঈ উপত্যকাকে তারোম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। হেরোও-এর ঠিক দক্ষিণে মাজারা (বা বারান্দাক) গিরিপথের দক্ষিণ মুখ হইতে প্রবাহিত হইয়া ক্ষুদ্র নদী শাহরূদ (নুযহাত, পৃ. ২২৩; শালরূদ, এখনও বিদ্যমান শাল গ্রামের নাম হইতে গৃহীত) মিয়ান-সারা-এর

(যেইখানে কিযীল-উযান গিরিখাত ত্যাগ করিয়াছে) নিকট বাম পার্শ্ব দিয়া কিযিল-উযান-এ পতিত হয়। নুযহাত ৮২ পৃষ্ঠায় আরদাবীল-এর অধীনস্থ উপনিবেশসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্র শাহরূদ উপত্যকা (৩০টি গ্রাম) এবং দারমারযিন জিলার উল্লেখ করেন। দারমারযিন এখনও শনাক্ত করা যায় নাই। যেইভাবেই হউক, খালহাল, দারমারযিন ও শাহরূদ কিযিল-উযান-এর বাম তীরে অবস্থিত। তারোম-এর এলাকাদির জন্য সামান্য স্থানই অবশিষ্ট রাখিয়াছে।

যোগাযোগ ও উৎপন্ন দ্রব্য ঃ আরদাবীল ও যানজান-এর মধ্যবর্তী প্রধান পথ (কিযিল-উযান গিরিখাতের মধ্যভাগে প্রাচীন পারদালীস সেতুর পার্শ্ব দিয়া) খালখাল হইয়া তারোম-এর পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। যে সকল কাফেলা তারোম-এর (আরদাবীল হেরাও-বারান্দাক কালাত-আখগালদুক-যানজান) মধ্য দিয়া সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করে তাহাদিগকে নৌকাযোগে (কালাক) কিযিল-উযান অতিক্রম করিতে হয়। আরদাবীল ও যানজান-এর মধ্যে যানবাহন যাতায়াত গুরুত্বপূর্ণ নয়; পাহলবী রাজত্বকালে ফুমেন-কে (জিলান-এ) তারোম-এর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত একটি সড়ক দ্বারা যানজান-এর সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল।

য়াকূত-এর মতে তারোম অত্যন্ত পর্বতময়। কিন্তু তদ্‌সত্ত্বেও উর্বর (মা'আ যালিকা মু'শিবাতুন, 'লতাগুল্মে সমৃদ্ধ")। য়াকূত-এর মতে তারোম নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত উন্নত মানের তুলা অবশ্যই দিযাবাদ বিভাগ হইতে আসিত। কারণ তাহা না হইলে কাগায-কুনান-এর কারখানাসমূহের (আক্ষরিক অর্থ "যেইখানে কাগজ প্রস্তুত হয়") অস্তিত্বই থাকিত না। খালখাল-এর উচ্চ মালভূমি খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতেও শস্যাগারস্বরূপ পরিগণিত হইত, 'আব্বাস মীরযা তাঁহার গমের সরবরাহ এইখান হইতে গ্রহণ করিতেন। Rawlinson তারোম-এ অনেক ফলের উদ্যান লক্ষ করেন। কিন্তু ১৯২১ খৃ. এই জিলা সম্পর্কে Fortescue -এর অত্যন্ত খারাপ ধারণা ছিল। মিরআতুল-বুলদান অনুসারে তারোম-এ দস্তা, তাম্র ও গন্ধকের (যাজ) খনি ছিল।

শহর ও গ্রাম ঃ নুযহাত (পৃ. ৬৫) অনুসারে তারোম-এর রাজধানী প্রথমে ফীরুযাবাদ-এ ছিল (জিলার দক্ষিণাংশে এবং খালখাল-এর ফীরূযাবাদ হইতে স্বতন্ত্র)। মোঙ্গল যুগে আন্দার (?জিলার উত্তরাংশে) ইহার স্থলাভিষিক্ত হয়। Rawlinson-এর মতে দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ওয়েনিসারদ (রুশ মানচিত্র; ভেনিসারা) তারোম-এর কেন্দ্রস্থল ছিল; Fortescue -এর মতে ইহা হইতেছে বানরি (বাম তীর)। নূতন নূতন কেন্দ্র আরদাবীল-হেরো ও যানজান সড়কের দিকে গড়িয়া উঠিতেছে প্রতীয়মান হয়।

সামীরান দুর্গ (শামিরান) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল; মিস'আর ইব্‌ন মুহালহিল, নাসির-ই খুসরাও ও য়াকূত ইহা পরিভ্রমণ করেন। শামীরান-এর অবস্থান আবিষ্কৃত হয় নাই, তবে নাসির-ই খুসরাও-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তের বদৌলতে যথেষ্ট নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এই পর্যটক কাযবীন হইতে আগমন করিয়া খারযাবীল-এ (মানজিল-এর নিম্নে) পৌঁছেন; তথা হইতে তিন ফারসাখ অতিক্রম করিয়া তিনি তারোম-এর অধীনস্থ রাজ্য বরযাল খয়র (?) পৌঁছেন। তৎপর তিনি শাহরূদ-এর মোহনার নিকট অবস্থিত খান্দান গ্রামে আগমন করেন। খান্দান-এ নদী অতিক্রম করিবার জন্য আমীর (তারোম-এর) কর (বাজ) ধার্য করেন। এখন হইতে শামীরান নাসির-ই খুসরাও-এর হিসাবে তিন ফারসাখ; প্রকৃতপক্ষে খারযাবীল হইতে শাহরূদ-এর সরাসরি দূরত্ব অনধিক পাঁচ মাইল। শাহরূদ-এর পশ্চিমে আরও উন্মুক্ত পল্লী অঞ্চলে তিন ফারসাখ মাইল হিসাবে দীর্ঘতর দূরত্ব। য়াকূত-এর মতে শামীরান 'বৃহৎ নদীর তীরে' অবস্থিত ছিল; এই সকল বিশদ বর্ণনার ফলে আমরা দারবান্দ-এর সন্নিকটে শামীরান-এর অবস্থান নির্ণয় করিতে সক্ষম হই। বস্তুতপক্ষে Rawlinson সেইখানে একটি "বৃহৎ ও অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গের ধ্বংসাবশেষে"র উল্লেখ করেন (গিলিওয়ান-এর ৩ মাইল নিম্নে) এবং রুশ মানচিত্রে বাম তীরের খাড়াইয়ের উপর অবস্থিত "একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ" নির্দেশ করেন [শাহরূদ-এর মোহনার আনু. ৩৭ মাইল উপরে]। শামীরান-এর সামরিক চিহ্ন হইতে গুরুত্ব এই ছিল যে, ইহা ইহার সংকীর্ণতম স্থানে কিযিল-উযান-এর দিক হইতে তারোম-এর প্রবেশপথ প্রহরা দিত এবং যানজান-এর দিক হইতে তারোম-এর প্রবেশ পথ কালাত দুর্গের দৃষ্টিসীমার মধ্যে ছিল।

ইতিহাস ঃ তারোম জিলার প্রাচীন অধিবাসী কাহারা ছিল আমরা তাহা জানি না। Rawlinson কিযিল-উযান-এর এই অংশে প্রাচীন কাদুসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান নির্দেশ করেন এবং ইহার জন্য তিনি জাছানী-র (আশকালু'ল-'আলাম?) মতের উপর নির্ভর করেন। জাছানী তখন পর্যন্ত (খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দী?) সমগ্র জিলাকে কাদুস্তান নামে অভিহিত করিতেন। জঙ্গলাকীর্ণ ও দূরবর্তী তারোম-খালখাল রাজ্য মুসাফিরী বংশের [দ্র.] রাজত্বকালেই শুধু ইতিহাসে ভূমিকা পালন করে, এই বংশের রাজধানী ছিল শামীরান এবং তাঁহারা আযারবায়জান, আররান, জীলান ও সুদূর কাই শাসন করিতেন। সুদূর ৩১৬/৯২৮ সালে আমরা শামীরান-এর শাসনকর্তা সাল্লার ইব্‌ন আসওয়ার-এর সন্ধান লাভ করি (তু. ইব্‌নু'ল-আছীর, ৮খ, ১৪২)। মিস'আর ইব্‌ন মুহাল্‌হিল (য়াকূত কর্তৃক উদ্ধৃত, আনু. ৩৩০ হি.) বলেন, শামীরান-এ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র অট্টালিকার সংখ্যা ছিল ২,৮৫০। য়াকূত উদ্ধৃত (দ্র. শামীরান) বুওয়ায়হী উযীর সাহিব ইব্‌ন 'আব্বাদ তালাকানীর কৌতূহলোদ্দীপক পত্র হইতে প্রতীয়মান হয়, তারোম প্রথমে কাযবীন-এর অধীনে ছিল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসাফির সেইখান হইতে ইহা বিচ্ছিন্ন করেন; ইহার দুর্গের কারণে জিলোর প্রতি তাঁহার লোভ ছিল। সাহিব শামীরানকে "আলামূত দুর্গের ভগ্ন" অভিহিত করিয়া ইহার গুরুত্বের উচ্ছাসিত বিবরণ দান করেন (মুকাদ্দাসী, পৃ. ৩৬০) এবং সামী রূম (হুবহু পুনর্মুদ্রণ) দুর্গের অলঙ্করণের উল্লেখ করেন যাহা ছিল স্বর্ণের সিংহ, সূর্য ও চন্দ্রের প্রতিকৃতি। ৩৭৯ হি. বৈবাহিক মৈত্রী সূত্রে বুওয়ায়হীগণ শামীরান লাভ করেন, কিন্তু ফাখরু'দ-দাওলার ইন্‌তিকালের পর মুসাফিরী আমীর ইব্‌রাহীম যানজান, আবহার, সারজিহান (সা'ইন-কাল'আ= প্রাচীন কুহুদ-এর সন্নিকটস্থ আবহার-এর উত্তর দিকের জিলা) এবং 'শাহরিযূর' (পাঠ অনিশ্চিত, কিন্তু "শারযুরলারদ", শারূযলার-এর সঙ্গে স্থানটি শনাক্ত করা যায়; নুযহাতু'ল-কুলূব্ পৃ. ৬৫-তে উল্লেখ করেন যে, এইগুলি দক্ষিণ তারোম-এর অধীনস্থ রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত) অধিকার করেন। এই সকল রাজ্যের মধ্যে শামীরান-এর উল্লেখ নাই, তবে নাসির-ই খুসরাও ৪৩৮/১০৪৬ সালে শামীরান-এ (সামীরান) একজন মুসাফিরী যুবরাজ এবং ১০০০ সৈন্যের একটি সেনানিবাস দেখিতে পান। তিনি বলেন, পর্বত খাড়াইয়ের উপরস্থ দুর্গ হইতে শহরটি (কাসাবা) দৃষ্টিগোচর হয়; ইহা ত্রিপ্রাচীর পরিবেষ্টিত; পানি সংগ্রহের সুবিধার্থে ভূগর্ভস্থ একটি গোপন পথ (কারীয) নদী পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। য়াকূত-এর মতে এক অজ্ঞাত পরিস্থিতিতে ইসমাঈলীগণ দুর্গটি ধ্বংস করে। য়াকূত-এর সময় ইহা আলামূত-এর শাসনকর্তা কর্তৃক অধিকৃত হয়।

মোঙ্গলদের অধীনে, বিশেষত রাজধানী যখন সুলতানিয়্যা [দ্র.]-য় স্থানান্তরিত হয় তখন তারোম গুরুত্ব লাভ করে; নুযহাতু'ল-কূলুব (৭৪০/১৩৪০)-এ জিলার তৎকালীন প্রাপ্ত তথ্যের সঠিক প্রমাণ প্রদান করা হইয়াছে। উলজায়তুর অধীনে তারোম কোন এক শাহনা গিরায় (?) কর্তৃক শাসিত হইত, তিনি ৭০০/১৩০০ সালে (Dorn, Auszuge, পৃ. ১৩৯) জীলান-এ সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তায়মূরীগণের শাসনামলে খালখাল (তু. ৭৮৭/১৩৮৫ সালে তাবরীয) ও তারোম-এর (শায়খ যাহিদ তারোমী; Dorn, Auszuge, পৃ. ২২৯, ২৩১, ২৩৪, ৩৮২) খানগণ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবশ্য শামীরানও পুনর্নির্মিত হইয়া থাকিবে। কারণ জীলান-এর ঐতিহাসিকগণ বলেন কিভাবে য়া'কূব-এর ইন্তিকালের পর আক-কোয়ুনলু (৮৯৬ হি.), কারকিয়া মীরযা 'আলী কৌশলে দুর্গটি অধিকার করেন, পরে কোন এক মীর যায়নু'ল-'আবিদীন তারোমী মীরযা 'আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আক-কোয়ুনলু রুস্তাম বেগ-এর রাজত্বকালে (৮৯৭-৯০২ হি.) তাঁহার সেনাপতি দাদা বেগ ১০,০০০ সৈন্যের সাহায্যে "তারোম দুর্গ" পুনরাধিকার করেন, কিন্তু পরবর্তী কালে আক-কোয়ুনলু আলওয়ান্দ ও মুহাম্মাদী (৯০৫-৯০৬ হি.)-র মধ্যে কলহ-বিবাদের সময় কারকিয়া মীরযা আলী-র সেনাপতি "তুর্কী শাসন হইতে তারোম মুক্ত করেন" (তু. মির'আতু'ল-বুলদান, পৃ. ২৩৬)।

প্রথম ইসমা'ঈল-এর আমলে তারোম, কারকিয়াদের এলাকা (যেইখানে নূতন আমীর পলাতক ছিলেন) এবং আরদাবীল রাজ্য (তদীয় পরিবারের পূর্বপুরুষদের দেশ)-এর মধ্যবর্তী অত্যন্ত সুবিধাজনক পথের প্রান্তে অবস্থিত ছিল। ৯০৫ হি. ইসলাম'ঈল তাঁহার বিখ্যাত অভিযানে যেই পথ দিয়া গমন করেন তাহা ছিল তারোম-বারান্দাক-নাসায-কূঈ-হিফযাবাদ- আবারুক-আরদাবীল সড়ক (তু. E.D. Ross, The Early Years of Shah Ismail, F.R.A.S., 1895, p. 332)। তারীখ-ই 'আলামআরা-য় তারোম কয়েকবার উল্লিখিত হয়। সাফাবীগণ ৯২১ হি. সালের শীতকাল এইখানে অতিবাহিত করেন এবং শিকার করেন (১০০২, ১০০৩ হি.)। এইখান হইতে তাঁহারা জীলান-এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন।

তুর্কীগণ ক্রমান্বয়ে ইরানীদের (দায়লামী ও জীলানী) আত্মীকরণ করিয়া নেয়। নাদির-এর আমলে আমারলু কুর্দিগণ মানজীল ও তারোম-এর পুশ্ত-ই কূহ-এ বসবাস আরম্ভ করে। Rawlinson-এর মতে তাহারা লুলু গোত্রের (লোলো? উত্তর সিরিয়া [Le Coq] ও তেহরান-এর [Brugsch] নিকটে এখনও তাহাদের চিহ্ন পাওয়া যায়, ইত্যাদি)। কিন্তু তাঁহার সময় তাহারা ইতিমধ্যেই তুর্কীতে পরিণত হয়। Rabino অবশ্য (R. M. M., ৩২খ, ২৬১) ১ম 'আব্বাস কর্তৃক মানজীল-এর নিকট যাহাদের বসতি স্থাপিত হয় সেই রিশওয়ান্দ কুর্দ এবং নাদির-এর আমলে আগত 'আমারলূ তুর্কী (?)-দের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করেন। যেভাবেই হউক তারোম-এর জনগোষ্ঠী এখন তুর্কী; গিরিলওয়ান-এর অনুসরণে Fortescue বলেন, কৃষকগণ ফারসী বোঝে না, স্থানবিবরণেও একজন প্রকৃত তুর্কী ক্রমান্বয়ে প্রচীন ইরানী নাম বিস্মৃত হয় (তু. পারদালীস [পরদ হইতে, সেতু], নিমহিল, নিয়াব, গুলচীন প্রভৃতি)। আযারবায়জান-এর প্রাচীন ইরানী নামের সমীক্ষা এখনও হয় নাই, কিন্তু ইহা স্পষ্ট যে, স্থানীয় ভাষা "উত্তর-পশ্চিম" গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত [তু. টাট]।

মির'আতু'ল-বুলদান (পৃ. ৩৩৫) অনুসারে কাজারগণ তারোম-কে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করে এবং জায়গীরস্বরূপ (ইকতা' ওয়া তিয়ূল) মুহাম্মাদ খান দাওয়ালু, তদীয় পুত্র আল্লাহ-য়ার খান আসাফু'দ-দাওলা প্রমুখকে প্রদান করেন। রিদ শাহ-এর সিংহাসন আরোহণের পর খালখাল-এ একটি শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরিত হয় এবং কতিপয় স্থানীয় খানকে (রাশীদু'ল-মামালিক প্রভৃতি) ফাঁসি দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তু. সাফীদ-রূদ ও শাহরূদ প্রবন্ধসমূহ (শেষোক্তটিতে বারী এলাকার অবস্থান নির্ণয় সংশোধন করা উচিত); (২) হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহাতু'ল-কুলূব, সম্পা. Le Strange, পৃ. ৬৫, ৮১, ১৮০, ২২৩; (৩) হাজ্জী খালীফা, জিহান্নুমা, পৃ. ২৯৭; (৪) মুহাম্মাদ হাসান খান সানী'উ'দ-দাওলা, মির'আতু'ল বুলদান, তেহরান ১২৯৪ খৃ., ১খ., ৩৩৪-৩৩৭; (৫) Olearius, Moscowitische und persian : Reisebeschreibungen, Schleswig 1663, Chap. 28, p. 471-475 (Busun-Sengoa [=সানজাওয়া] পারদালীস); (৬) Morier, A Second Journey, London 1818, p. 256-258; (আরদাবীল-হেরোওপারাস-সামাউ আককান'দ- যানজান); (৭) Jaubert, Voyage en Armenie, Paris 1821, p. 195; আরদাবীল হিরিয-গেনজিআ (?) খালখাল-যানজান; (৮) Monteith, Journal of a Tour through Azerdhijan (হুবহু পুনর্মুদ্রণ), F. R. G. S., ১৮৮৩ খৃ., ৩খ, ১০-১২; মিয়ানা মানজীল কিযি'ল-উযান-এর (অনেকটা বিভ্রান্ত) বাম তীর বরাবর; (৯) Ritter, Erdkunde, ৮খ, ৬৩৩-৬৩৯; (১০) Rawlinson, Notes on a Journey from Tabriz, F.R.G.S., ১৮৪০ খৃ., ১০খ. (যানজান-আক-দাগ-কিশলাক-দাররাম-কাওকান্দ (বার-দারবান্দ-মানজীল); (১১) Sarre, Reise v. Ardabil nach Zendschna, Pet. Mitt, ১৮৯৯ খৃ., ৪৫খ, পৃ. ২১৫-২১৭ (কোরাইম-সানজাওয়া-চাইফো'আজি-আফশার- পারদালীস); (১২) de Morgan, Etudes Geographiques, ১খ, ১৮৯৪ খৃ., চিত্র ১৯৪, ৬১ এবং ৫৭ (Pont de Leis' পড়ুন ঃ পারদালীস); (১৩) Le Strange, The Lands of the East. Caliphate, পৃ. ১৭০, ২২৫-২২৬ (কতিপয় ভুলসহ); (১৪) Fortescue, The Western Elburz and Persian Azerbaijan, F. R. G. S., এপ্রিল ১৯২৪, পৃ. ৩০১-৩১৮ (মানজীল-বানারি-বারানদাক নিমাহিল- কারা-বুলাক-কাজাল-পারদালীস মিয়ানা); (১৫) Schwarz, Iran in Mittelalter (vib, ১৯২৬ খৃ.), পৃ. ৭৩৬-৭৩৯। (ইহার জন্য আরবী উৎস ব্যবহার করা হইয়াছে) খালখাল সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য তু. Khanikov, Map of Azerbaijan, in Zetschrift d. Allgem. geographie, 1863 xiv.

২। (১৬) ফারস-এর একটি শহর [য়াকূত ঃ তিরম; (১৭) ফারসনামা, সম্পা. Le Strange, তার (উ) কিরমান অংশের প্রদেশের সর্বপূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। শহরটি য়াউতিয়া (বেহিস্তান, ৩খ, ৭) রাজ্যের তারাভা-এর অনুরূপ প্রতীয়মান হয়। তারোম এখন বুলুক সাব'আর একটি নাহিয়া, তু. হাসান ফাসা'ঈ ফারসনামা-য়ি নাসিরী, তেহরান ১৩১৪ হি., পৃ. ২১৭-২১৮; তু. Dupre, Voyage en Perse, ১খ, ৩৭২-৩৭৬; (১৮) Ritter, Erdkunde, ৮খ, ৭৪৩; (১৯) সানী'উ'দ-দাওলা, মির'আতু'ল-বুলদান, পৃ. ৩৩৮; (২০) Preece, Journey from Shiraz to Fashk Supp. Papers, Proceed. R. Geogr. Soc. 1885, i, Part 3, p. 403-437; (২১) Le Strange, The Lands....., P. 292-295; (২২) Schwarz, Iran, ii (1910), p. 107-8; (২৩) Bartholomae, Altiran, Worterbuch, col. 648, 868, 908. 1854.

Minorsky (E.I.[1])/ আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তাল্‌ক ইব্‌ন 'আলী (طلق بن علی) ঃ (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবী, উপনাম আবূ 'আলী। তিনি য়ামামা-র অধিবাসী ও বানূ হানীফা গোত্রের লোক। বংশ-তালিকা নিম্নরূপঃ তাল্‌ক ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন তালক্‌ ইব্‌ন 'আমর/তাল্‌ক ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আবদি'ল-'উয্‌যা ইব্‌ন সুহায়ম ইব্‌ন মুররা ইব্‌নু'দ দুআল ইব্‌ন হানীফা। কেহ কেহ তাঁহার পিতার নাম 'আলীর পরিবর্তে ছুমামা বলিয়াছেন। য়ামামা হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে যেই প্রতিনিধিদল আগমন করিয়াছিল তাল্‌ক ইব্‌ন 'আলী তাঁহাদিগের অন্যতম। এই প্রতিনিধি দলের সকলেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত করত ইসলাম গ্রহণ করেন। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়া তাল্‌ক (রা) বলেন, বায়'আতের পর আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জানাইলাম, আমাদের এইখানে একটি গির্জা আছে। অতঃপর তাঁহার উজুর অবশিষ্ট পানি (বরকতের জন্য) প্রার্থনা করিলাম। তিনি তখনই পানি আনাইয়া উযু করিলেন এবং অবশিষ্ট পানি একটি পাত্রে ঢালিয়া বলিলেন ঃ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া গির্জাটি ভাঙ্গিয়া ফেলিও এবং এই পানি উহাতে ছিটাইয়া দিও। তিনি আরও নির্দেশ দিলেন ঃ যেন আমরা গীর্জার স্থলে মসজিদ নির্মাণ করি। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমরা তাঁহার নির্দেশ পালন করিলাম। গির্জার মঠবাসী (راهب) ছিল বানূ তায়্যি গোত্রের জনৈক ব্যক্তি। আমাদের নবনির্মিত মসজিদে যখন আযান ধ্বনিত হইল, তখন উহা তাহার কর্ণগোচর হইলে বলিয়া উঠিল, ইহা সত্যের আহ্বান বটে। এই বলিয়া সে আমাদের একটি টিলার দিকে গমন করিল। ইহার পর তাঁহার আর দেখা পাওয়া যায় নেই।

তাল্‌ক ইব্‌ন 'আলী (রা)-এর সূত্রে সালাতু'ল-বিত্‌র, ফজ্‌রের ওয়াক্ত, যৌনাঙ্গ স্পর্শকরণে উযূ ভঙ্গ না হওয়া প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত আছে। সুনান আবী দাউদ, সুনানু'ন-নাসাঈ, সুনানু'ত-তিরমিযী ও সুনানু ইব্‌ন মাজা গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ গৃহীত হইয়াছে। তৎপুত্র কায়স, কন্যা খালিদা, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন বাদ্‌র ও 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন শায়বান তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩৩৮ হি., ২খ, ২৩২-৩; (২) ঐ লেখক, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ২৯; (৩) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৫৮; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৬৩-৪; (৫) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদ আস্‌মাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৬৭৮; (৬) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ২০৫; (৭) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৫৮; (৮) ইব্‌ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৯০।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌ক ইব্‌ন গান্‌নাম (طلق بن غنام) ঃ (র), কূফা নিবাসী জনৈক মুহাদ্দিছ বানু'ন-নাখা' গোত্রের লোক, কুন্‌য়া আবূ মুহাম্মাদ। তিনি স্বীয় পিতা গান্‌নাম ইব্‌ন তাল্‌ক ইব্‌ন মু'আবিয়া ইবনি'ল-হারিছ (র), শায়বান ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান (র), কায়স ইব্‌নু'র-রাবী' (র), মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র), য়া'কূব আল-কুম্মী (র), যাইদা (র), কাদী শুরায়ক (র), ইসরাঈল (র), আল-মাস'উদী (র), 'আবদু'স-সালাম ইব্‌ন হারব (র), স্বীয় চাচাত ভাই হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াছ (র) প্রমুখ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি কাদী শুরায়কের কাতিব ছিলেন। তাঁহার সূত্রে বহু সংখ্যক মুহাদ্দিছ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ইমাম আল-বুখারী (র), 'উছ্‌মান ইব্‌ন আবী শায়বা (র), আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আদ-দাওরাকী (র), আল-হুসায়ন ইব্‌ন 'ঈসা আল-বিস্‌তামী (র), আল-হুসায়ন ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান আল-জারজারাঈ (র), আল-কাসিম ইব্‌ন যাকারিয়্যা ইব্‌ন দীনার (র) ও আবূ কুরায়ব (র) উল্লেখযোগ্য। হাদীছবিশারদদিগের দৃষ্টিতে তাল্‌ক ইব্‌ন গান্‌নাম একজন নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। ইব্‌ন সা'দ, আবূ দাউদ, আল-'ইজ্‌লী, আদ-দারা কুত্‌নী প্রমুখ তাঁহাকে একজন ছিকাহ রাবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'উছ্‌মান ইব্‌ন আবী শায়বা তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যয়িত করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, জ্ঞানরাজ্যে তিনি ততটা পারদর্শী ছিলেন না। আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন হায্‌মই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাল্‌ক ইব্‌ন গান্‌নামকে রাবী হিসাবে দুর্বল আখ্যায়িত করিয়াছেন, নতুবা আর সকলেই তাঁহার নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে রায় দিয়াছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও বিচারপতি হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াছ আন-নাখ'ঈর নায়েব হিসাবে তিনি কূফার কাযী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। হি. ২১১ সালের রাজাব মাসে তাঁহার ইনতিকাল হয়। সাহীহ আল-বুখারী ও আস-সুনানু'ল-আর্‌বা'আ (=সুনানু আবী দাউদ, সুনানু'ন-নাসাঈ, সুনানু'ত-তিরমিযী ও সুনান ইব্‌ন মাজা)-তে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ২৯, ৩০; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৮; (৩) ইব্‌ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৯১, ৪৯২; (৪) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১০খ, ২৪০; (৫) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৬খ, ৪০৫; (৬) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্‌কী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ২৭; (৭) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৬০।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌ক ইব্‌ন য়াযীদ (طلق بن یزید) ঃ (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবী। তাঁহার নাম নির্ণয়ে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। ফলে তাঁহারা তাল্‌ক ইব্‌ন য়াযীদ বলার সঙ্গে সঙ্গে অথবা "য়াযীদ ইব্‌ন তাল্‌ক" জুড়িয়া দেন। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র), ইব্‌ন আবী খায়ছামা (র), ইব্‌ন কানি' (র), আল-বাগাবী (র), ইব্‌ন শাহীন প্রমুখ শু'বা (র)-এর সনদে 'আসিম আল-আহ্‌ওয়াল (র) হইতে তিনি 'ঈসা ইব্‌ন হিত্‌তান (র) হইতে তিনি মুসলিম ইব্‌ন সালাম (র) হইতে এবং তিনি তাল্‌ক ইব্‌ন য়াযীদ অথবা য়াযীদ ইব্‌ন তালক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- ان الله لا يستحيى من الحق لا تاتوا النساء فى استاههن "আল্লাহ সত্য বলিতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা স্ত্রীদিগের পশ্চাদ্‌দ্বারে উপগত হইও না।" অপরদিকে মা'মারও এই হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় নিশ্চিতভাবে "তাল্‌ক ইব্‌ন 'আলী" বলা হইয়াছে এবং ইব্‌ন আবী খায়ছামা ইহাকেই সঠিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাল্‌ক (রা)-এর কন্যা খাল্‌দাও স্বীয় পিতার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌রাহীম আল-হারাবী 'আল-গারীব' গ্রন্থে

হাদীছটি এইভাবে উদ্ধৃত করেন, "তাল্‌ক বলেন, আমরা ওয়াবিআ মাহ্‌মা (وبئة محمه) নামক স্থানে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ اشربوا ما طاب لكم "তোমরা যে কোন পানীয় পসন্দ পান কর।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২২৪, ২২৫; (২) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৬৪; (৩) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৬৭৮।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীব (طلق بن حبيب) ঃ (র), একজন উচ্চ স্তরের তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। বানু'ল-'আনাযা গোত্রের লোক, বস্‌রায় বাস করিতেন। তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুয-যুবায়র (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌নি'ল-'আস (রা), জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা), জুন্‌দুব (রা), আবূ তুফায়ল (রা), আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), আল-আহ্‌নাফ ইব্‌ন কায়স (রা) প্রমুখ সাহাবী ও সা'ঈদ ইব্‌নু'ল-মুসায়্যাব (র) প্রমুখ তাবি'ঈ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রেও প্রচুর সংখ্যক মুহাদ্দিছ হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে তাউস ইব্‌ন কায়সান (র), সা'ঈদ ইব্‌নুল-মুহাল্লাব (র), আল-আ'মাশ (র), মানসূর ইব্‌নুল-মু'তামির (র), মুস্‌'আব ইব্‌ন শায়বা (র), সুলায়মান আত-তায়মী (র), য়ুনুস ইব্‌ন খাব্বাব (র), সা'ঈদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ও আল-মুখ্‌তার ইব্‌ন ফুল্‌ফুল (র) উল্লেখযোগ্য।

তাক্‌ওয়া-পরহেযগারীতে তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীবের স্থান ছিল অতি উচ্চে। ইবাদতপ্রেমিক 'আলিম হিসাবে তাঁহার খুবই সুখ্যাতি ছিল। তিনি বলিতেন ঃ তোমরা তাক্‌ওয়া দ্বারা বলীয়ান হও। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তাক্‌ওয়া কি? তিনি বলিলেন, "হৃদয়ে আল্লাহ্‌র রহমতের আশা লালন করিয়া, তাঁহার প্রদত্ত আলোকে হৃদয় উদ্‌ভাসিত করিয়া 'ইবাদত-আনুগত্যে থাকা এবং হৃদয়ে আল্লাহ্‌র 'আযাবের ভয় জাগরূক রাখিয়া, তাহার আলোয় হৃদয় উদ্‌ভাসিত করিয়া অন্যায়-অবাধ্যতা পরিহার করাই হইল তাক্‌ওয়া"। তিনি যখনই সালাত আদায়ের জন্য বাহির হইতেন, সঙ্গে কিছু না কিছু সদাকা করার জন্য লইতেন। তিনি বলিতেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলের সহিত কথা বলার পূর্বে সদাকা করিয়া লওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন, বলিয়াছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً .

"হে মু'মিনগণ! তোমরা রাসূলের সহিত চুপি চুপি কথা বলিতে চাহিলে তাহার পূর্বে সদাকা প্রদান করিবে" (৫৮ ঃ ১২) [পরবর্তী কালে এই হুকুমটি রহিত হয়-দ্র. ৫৮ ঃ ১৩]।

সালাত তো আল্লাহ্‌র সাথে চুপি চুপি কথোপকথন। এই সময় সদাকা করা আরও বেশি জরুরী (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৯খ, ১০৭) হাদীছ ও ফিক্‌হশাস্ত্রের বহু ইমাম তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আল-'ইজ্‌লী বলেন, তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীব তাঁহার যুগের সেরা 'ইবাদত-প্রেমিক। ইব্‌ন সা'দ, আবূ যুর'আ, 'আম্‌র ইব্‌ন দীনার প্রমুখ হাদীছ বর্ণনায় তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যয়ন করিয়াছেন। তবে 'আকীদাগত ব্যাপারে অনেকে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যানও করিয়াছেন। বলা হয়, তিনি আল-ইর্‌জা' [আমল ঈমানের অংশ নহে, ঈমানের ভিত্তিতেই মানুষ আখিরাতে মুক্তি পাইবে, 'আমল দ্বারা মর্যাদা উন্নীত হইবে] এই মতের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। ইব্‌ন কুতায়বা (আল-মা'আরিফ, পৃ. ২০৬), আশ-শাহ্‌রাস্‌তানী (আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, ১খ, ১৯৪) প্রমুখ একজন মুর্‌জি'আ নেতা হিসাবে তাঁহাকে উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই অভিযোগের কারণে রাবী হিসাবে তাঁহাকে অগ্রহণযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, এই অভিযোগ ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র), সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (র) প্রমুখ খ্যাতিমান ফাকীহ ও মুহাদ্দিছ তথা সর্বজনমান্য ইমামের উপরও উত্থাপিত হইয়াছিল এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বহু লেখালেখিও হইয়াছে। সারকথা হইল, উপরোক্ত ব্যাখ্যা হিসাবে আল-ইর্‌জা' কোন ভ্রান্ত মত নহে, বরং গবেষণালব্ধ বাস্তব ও সঠিক মত। হাঁ, যাহারা 'আমলকে নিরর্থক মনে করে, গুনাহের অপকারিতা স্বীকার করে না, তাহারা নিঃসন্দেহে বাতিলপন্থী। বলা বাহুল্য, তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীবসহ উপরোক্ত ইমামগণ এই প্রকারে মুর্‌জি'আ আদৌ ছিলেন না (বিস্তারিত দ্র. 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আর-রাফ্‌'উ ওয়া'ত- তাক্‌মীল, পৃ. ৩৫২-৩৭১)। সুতরাং আস-সুনানু'ল আরবা'আসহ সহীহ মুসলিম, আল-বুখারীকৃত আল-আদাবুল মুফ্‌রাদ প্রভৃতি গ্রন্থে তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীব বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে।

তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীব ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের একজন, যিনি আল-হাজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফের নির্যাতনের শিকার হইয়াছেন। হি. ৯৪ সালে খালিদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-কাস্‌রী, মুজাহিদ (র) [দ্র.], সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র [দ্র.]-ও তাল্‌ক ইব্‌ন হাবীবকে বন্দী করিয়া আল-হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু তাল্‌ক পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন। কেহ কেহ বলেন, হাজ্জাজ কর্তৃক তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। হাজ্জাজের মৃত্যুর পর তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং ওয়াসিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবুত তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ২৭ ২৮; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর ১০০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৫৮; (৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৯খ, ১০৬, ১০৭; (৪) ইব্‌ন কুতায়বা আল মা'আরিফ, করাচী ১৩৯৬/১৯৭৬, পৃ. ২০৬; (৫) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখ্‌নাবী, আর-রাফ্‌'উ ওয়া'ত-তাক্‌মীল ফি'ল-জারহ্‌ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ. ৩৫২-৩৭১; (৬) আশ-শাহরাস্‌তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহাল, বৈরূত, হি. ১৩১৭; (৭) মুসলিম ইব্‌নু'ল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আল-মুনফারিদাত ওয়া'ল-ওয়াহ্‌দান, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ. ২১৯ (টীকাসহ); (৮) ইব্‌ন আবী হাতিম, আল-জারহ্‌ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৯০, ৪৯১; (৯) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৪খ, ৬০১-৩; (১০) আবূ নু'আয়ম, আল-হিল্‌য়া, বৈরূত ১৩৫১ হি., ৩খ, ৬৩-৬৫; (১১) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৫৯; (১২) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৩৯৬; (১৩) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৭খ, ২২৭; (১৪) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আল-খাতীব,

আল-ইক্‌মাল ফী আসমাই'র-রিজাল (মিশকাতু'ল- মাসাবীহ, দিল্লী তা. বি.-এর সহিত সংযুক্ত, পৃ. ৬০১)।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তালখীস (تلخيص) ঃ ('আ), ইহা এক আরবী মাসদার, যাহার অর্থ সারসংক্ষেপকরণ। তুরস্কের সরকারী ভাষায় ইহার অর্থ এক ধরনের দলীলবিশেষ, যাহাতে সুলতানের কাছে পেশ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী সারসংক্ষেপ আকারে লিপিবদ্ধ করা থাকে। যেইসব কর্মকর্তা এই ধরনের কাগজপত্র প্রস্তুত করেন ও সুলতানের নিকট পেশ করেন তাঁহারা মহা-উযীর কিংবা শায়খুল ইসলাম পদমর্যাদার অধিকারী। তালখীসের গুরুত্ব পরিবর্তিত হওয়ার কারণে ইহা গালাতাত-ই মাশহূরার অন্তর্ভুক্ত হয় (তু. মুহাম্মাদ হাফীদ, আদ্‌-দুরারু'ল-মুনতাখাবাত আল-মানহূরা ফী ইসলাহ আল-গালাতাতু'ল মাশহূরা (১২২১ হি. খৃ., পৃ. ১১৫)।

J. H. Kramers (E.I. [1])/আফতাব হোসেন

তালখীসজি (تلخيصجى) ঃ বা সরকারী পরিভাষায় তালখীসী হইল একজন কর্মচারীবিশেষ যাঁহাকে তালখীস (দ্র.) নামে অভিহিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ তৈয়ারি করিয়া সুলতানের প্রাসাদে লইয়া যাওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়। ঐ তালখীস প্রাসাদের খোজা কর্মকর্তা প্রধানের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এই কারণে তালখীসজি হইলে মহা-উযীরের দফতরের একজন কর্মকর্তা। এই কর্মকর্তা বেশ কয়েকটি সরকারী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অন্তত পরবর্তীকালে হইলেও শায়খু'ল-ইসলামের তালখীসজি প্রাসাদের সহিত সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করিতেন না। তিনি যেইসব দলীল হস্তান্তর করিতেন সেইগুলি সর্বাগ্রে রা'ঈস এফেনদি ও মহা-উযীরের হাত ঘুরিয়া যথাস্থানে পৌঁছাইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) d'Ohsson, Tableau general de l'Empire Othoman, ii, 260; iii, 343; (2) von Hammer, Des osmanischen Reiches Staatsver fassung, i, 31, 475।

J. H. Kramers (E.I. [1])/ আফতাব হোসেন

তাল্‌বিয়া (تلبية) ঃ ('আ), লাব্বা (لبى) ক্রিয়াপদের দ্বিতীয় রূপের ক্রিয়ামূল, যাহা "লাব্বায়কা" পরিভাষা হইতে গঠিত হইয়াছে। ইহার অর্থ "লাব্বায়কা", "প্রার্থনা বাক্যটি উচ্চারণ করা" ইত্যাদি। আরব অভিধান লেখকগণ কর্তৃক 'লাব্বুন'-এর সহিত লাব্বায়কা-কে সংযুক্ত করা হইয়াছে। লাব্বুন-এর অর্থ "নিষ্ঠার সহিত 'ইবাদতে দৃঢ় থাকা"-যেইরূপ "লাব্বায়কা" "তোমার সমীপে উপস্থিত"। ব্যাকরণবিদগণের মতানুসারে লাব্বায় শব্দটি (অর্থ বারবার করা) দ্বিরচন (তাবীদের জন্য ব্যবহৃত)। লাব্বায় শব্দেরও সা'দায়ক-এর ন্যায় অন্যান্য অনুরূপ শব্দের ক্ষেত্রে 'আয়' (اى) প্রত্যয়টির গুরুত্ব কি তাহা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা কষ্টকর। Dozy (De Israelitente Mekka, Haarlem ১৮৬৪ খৃ., পৃ. ১২০) কর্তৃক হিব্রু হইতে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাটি বর্তমানে সাধারণত পরিত্যাজ্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

এই প্রার্থনা বাক্যটি বিভিন্ন রূপে এবং পৃথক পৃথক কারণে হইয়া থাকে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর তালবিয়াটি নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক, লাব্বায়ক লা শারীকা লাকা ইন্না'ল-হামদাওয়া'ন-নি'মাতা লাকা ওয়া'ল-মুলকা লা শারীকা লাকা" (বুখারী, হাজ্জ, বাব, ২৬), لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .

তবে অন্যান্য সংক্ষিপ্ততর রূপ নিম্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা ওয়া সা'দায়কা ইত্যাদি। ইহা সাধারণত আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত। হাদীছ-এ হযরত মুহাম্মাদ (স) অথবা তাঁহার সাহাবীগণ (রা)-এর প্রতিও ইহা সম্বোধিত হইয়াছে, তবে শুধু ইহার সংক্ষিপ্ততম রূপ লাব্বায়ক (উদাহরণ বুখারী, খুসূমাত, অধ্যায় ৪; মুসলিম, যাকাত, অনু. ৩২; তিরমিযী, সিফাতু'ল কিয়ামা, অধ্যায় ৩৬) এবং য়া লাব্বায়কা দ্বারা (মুসলিম, জিহাদ, অনু. ৭৬) হযরত আদাম ('আ) ও হযরত নূহ ('আ)-এর মত অতীত কালের ধার্মিকগণের মুখেও ইহা উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মুসলিম (হাজ্জ, অনু. ২২)-এর একটি হাদীছ অনুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সময়ে পৌত্তলিকগণ ইহার একটি ভ্রান্ত রূপ ব্যবহার করিয়াছিল। তালবিয়া, বিশেষভাবে হজ্জ সমাপনকালে ইহরাম-এর প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চারণ করা হয়, যাহাকে হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং অপরাপরগণ লাব্বায়কা বিহাজ্জাতিন ওয়া 'উম্‌রাতিন (বুখারী, হাজ্জ, অধ্যায় ৩৪) অথবা লাব্বায়কা বি-'উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিন (তিরমিযী, হাজ্জ, অধ্যায় ১১) অথবা শুধু হজ্জ-এর উল্লেখসহ উচ্চারণ করিতেন। 'উমরা-এর প্রারম্ভে 'আ'ইশা (রা) লাব্বায়কা বি'ল-'উমরাতি (আবূ দাউদ, মানাসিক, অধ্যায় ২৩) রূপটি ব্যবহার করেন বলিয়া বর্ণিত আছে।

তালবিয়া হজ্জ সমাপনকালে প্রস্তর নিক্ষেপ (উদাহরণ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ১খ, ১১৪) পর্যন্ত এবং উচ্চঃস্বরে (আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ৫খ, ১৯২) বারবার উচ্চারণ করা হয়।

তালবিয়া অবশ্য ফারদ (ফরয)। বা সুন্নাত কি না এই প্রশ্ন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য নাওয়াবী রচিত মুসলিম শরীফ-এর শারহ (ভাষ্য), কিতাবুল-হাজ্জ, অনু. ২২)।

A. J. Wensinck (E.I. [1])/ আবদুল বাসেত

তাল্‌হা ইব্‌ন 'আব্‌দিল-মালিক (طلحة بن عبد الملك) ঃ (র), জনৈক মুহাদ্দিছ ও তাবি'ঈ। তিনি লোহিত সাগরের অববাহিকায় অবস্থিত আয়লা (শামের সন্নিকটে, দ্র. য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামু'ল-বুল্‌দান, শিরো. ايلة) -এর অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে, আয়লাবাসী মুহাদ্দিছদিগের মধ্যে একমাত্র আল-হাকাম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ব্যতীত সকলেই হাদীছ বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তাল্‌হা আল-আয়লী খাতনামা মুহাদ্দিছ আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা) ও যুরায়ক ইব্‌ন হাকীম আল-আয়লী (র) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিছ আল-কাসিম ইব্‌ন মাব্‌রূর (র), ইমাম আল-আওযা'ঈ (র), ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র), য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সা'ঈদ আল-কাত্তান (র), 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (র) ও তৎভ্রাতা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (র) উল্লেখযোগ্য। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তাল্‌হা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মা'ঈন (র), আন-নাসা'ঈ (র), আবূ দাউদ (র), ইব্‌ন সা'দ (র), আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ আল-মিসরী (র), ইব্‌ন ওয়াদদাহ (র), আদ-দারা কুত্‌নী (র) প্রমুখ তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আস-সুনানুল-আর্‌বা'আ ও সাহীহ আল-বুখারীতে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ সংকলিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহযীবুত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৮, ১৯; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭; (৩) আস-সুয়ূতী, ইস্‌'আফু'ল-মুবাত্‌তা বি-রজালি'ল মুওয়াত্‌তা', মিসর তা.বি., (তান্‌বীরু'ল- হাওয়ালিক-এর টীকায়), পৃ. ২০; (৪) ইব্‌ন আবী হাতিম, আল-জার্‌হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৭৮; (৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৪৮।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন খাল্‌ফ (طلحة بن عبد الله بن خلف) ঃ (র), বসরা নিবাসী জনৈক মুহাদ্দিছ ও তাবি'ঈ, কুন্‌য়া আবু'ল-মুতার্‌রিফ, মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ। বানুল-খুযা'আ গোত্রের লোক। বংশতালিকা নিম্নরূপ, তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন আস্‌'আদ ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন বায়্যাদা। তিনি তাল্‌হাতু'ত-তাল্‌হাত (তাল্‌হাদিগের তাল্‌হা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তালহা) নামেই সমধিক খ্যাত। উল্লেখ্য, তাল্‌হা নামের কয়েক ব্যক্তি দান-খয়রাতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন খাল্‌ফ ছিলেন সকলের সেরা এবং সেইজন্যই তাঁহার এই উপাধি। তাল্‌হা হযরত 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ শুনিয়াছেন এবং তাঁহার সূত্রে তাঁহার মাওলা হুমায়দ আত-তাবীল হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি জামাল বা উষ্ট্রযুদ্ধে 'আ'ইশা (রা)-এর পক্ষে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হি. ৬৩ সালে সালাম ইব্‌ন যিয়াদ তাঁহাকে সিজিস্তানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে রচিত কবিতার একটি শ্লোক হইতেছে, (رحم الله اعظا دفنوها- بسجستان طلحة الطلحات) "আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক মহান তাল্‌হাতুত তালহা-র প্রতি, লোকেরা যাঁহাকে দাফন করিয়াছে সিজিস্তানে।" ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানীর স্তরবিন্যাস অনুসারে তিনি তৃতীয় স্তরের রাবী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৬; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭।

আ. ব. ম.সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আওফ (طلحة بن عبد الله بن عوف) ঃ (র), মদীনা নিবাসী জনৈক তাবিঈ ফকীহ ও মুহাদ্দিছ। বানূ যুহ্‌রা গোত্রের লোক এবং প্রখ্যাত সাহাবী 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্‌ন 'আওফ (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। কুন্‌য়া আবূ 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ। দাতা ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন বিধায় তিনি তালহাতু'ন-নাদী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃব্য 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্‌ন 'আওফ (রা) ছাড়াও 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা), সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা), 'আবদু'র-রাহ্‌মান ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন সাহ্‌ল (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা), আবূ হুরায়রা (রা), 'আ'ইশা (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে বহু সংখ্যক রাবী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীম (র), ইব্‌ন শিহাব আয-যুহ্‌রী (র), 'আম্মার ইব্‌ন য়াসির (রা)-এর প্রপৌত্র আবূ 'উবায়দা ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌নি'ল মুহাজির (র) উল্লেখযোগ্য। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তাল্‌হা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মা'ঈন (র), আবূ যুর'আ (র), আন-নাসাঈ (র), আল-'ইজ্‌লী (র), ইব্‌ন সা'দ (র) প্রমুখ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যয়ন করিয়াছেন। তিনি অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী মুহাদ্দিছগণের মধ্যে গণ্য; ইহা ছাড়া মীরাছ বণ্টন ও ফাত্‌ওয়া প্রদানেও দক্ষতা রাখিতেন। প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিছ খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (র)-এর ন্যায় ফাত্‌ওয়া গ্রহণ ও মীরাছ বণ্টনের জন্য মানুষ তাঁহারও শরণাপন্ন হইত। ইব্‌ন আবী খায়ছামা (র) বলেন, এই সকল ব্যাপারে তাঁহাদের দুইজনের মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা উভয়ে দলীল-দস্তাবেজ লিখনের কাজও করিতেন। 'আলী ইব্‌নু'ল-মাদীনী (র) তাল্‌হা-র নাম যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর শাগরিদবর্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি যায়দ (রা)-এর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। তিনি য়াযীদের শাসনামলে মদীনার বিচারক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি খুবই ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ সা'ঈদ ইব্‌নু'ল-মুসায়্যাব (র) বলিতেন, আমরা তাল্‌হাতুল্য কোন বিচারপতি পাই নাই। ইমাম মুসলিম ব্যতীত সিহাহ সিত্তার আর সকল গ্রন্থকার তাল্‌হা বর্ণিত হাদীছ তাঁহাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানীর স্তরবিন্যাস অনুসারে তিনি তৃতীয় স্তরের রাবী ছিলেন। হি. ৯৭ সালে বাহাত্তর বৎসর বয়সে তাঁহার ইনতিকাল হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৮; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৫৭; (৩) ইব্‌ন আবী হাতিম, আল-জার্‌হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ২খ, ৪৭৩; (৪) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আল-খাতীব, আল-ইক্‌মাল (মিশ্‌কাতু'ল মাসাবীহ-এর টীকা, দ্র. পৃ. ৬০১); (৫) মালানা মুহাম্মাদ য়ূসুফ কান্ধলাবী, আমানি'ল-আহ্‌বার, মুলতান তা. বি., ১খ, ২৬৯; (৬) ইব্‌ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশ্‌ক, ১৩৯৯/১৯৭৯, ৭খ, ৭২, ৭৩, ৭৪; (৭) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্‌কী, শাযারাতু'য-যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ১১২; (৮) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন নুবালা', বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৪খ ১৭৪, ১৭৫; (৯) ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবু'ল-মাআরিফ, করাচী ১৩৯৬/১৯৭৬, পৃ. ২৩৫; (১০) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল কুব্‌রা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৫খ, ১৬০; (১১) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ৮খ, ৩২১; (১২) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ২৯২; (১৩) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৪৫; (১৪) ইব্‌ন হাবীব আল-বাগ্‌দাদী, কিতাবু'ল-মুনাম্মাক, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৪/১৯৬৪, পৃ. ৪৭৮; (১৫) আল-হাকিম, আল-মুস্‌তাদরাক, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ১খ, ৩৫৮, ৩৮৬, ৩খ, ২৫, ৩৬৯।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উছমান (طلحة بن عبد الله بن عثمان) ঃ (র), মদীনা নিবাসী জনৈক তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ, বানূ তায়ম গোত্রের লোক। তিনি 'আ'ইশা (রা)-র সূত্রে হাদীছ বর্ণনা

করিয়াছেন। ইমাম শু'বা বলেন, তাল্‌হা হযরত 'আইশা (রা)-এর নিকট সরাসরি হাদীছ শুনিয়াছেন কিনা তাহা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত না করিলেও আমার ধারণা তিনি সরাসরিই শ্রবণ করিয়াছেন। ইমাম আল-বুখারী (র) [আল-জামি'উ'স-সাহীহ, কিতাবু'শ-শুফ্'আ, বাব-৩] হযরত 'আইশা (রা)-এর সূত্রে তালহা বর্ণিত হাদীছটি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

عن عائشة قلت يا رسول الله ان لى جارين فالى ايهما اهدى قال الى اقربهما منك بابا .

"আইশা বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার দুই প্রতিবেশী আছে। আমি তাহাদের মধ্যে কাহাকে উপঢৌকন দিব? তিনি বলিলেন ঃ যাহার দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী।"

উল্লেখ্য যে, সাহাহী আল-বুখারীতে তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আত-তায়মী হইতে এই একটি হাদীছই উদ্ধৃত হইয়াছে। কেহ কেহ এই তাল্‌হাকে তাল্‌হা আল-খুযা'ঈ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু হাফিজ আল-মিযী (المزى) নিশ্চিত করিয়া বলেন যে, ইনি তাল্‌হা আত-তায়মী। কেননা আল-বুখারী (র) এই হাদীছটিই হিবা অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেইখানে রাবী শু'বা পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ বানূ তায়ম ইব্‌ন মুররা গোত্রের লোক। উল্লেখ্য, এই গোত্রটি কুরায়শেরই একটি শাখা এবং এই গোত্রেই আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা)-এর জন্ম। ইমাম আবূ দাউদ (র) রোযাদারের চুম্বন (القبلة للصائم) সম্পর্কে হযরত আ'ইশা (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর ইমাম সুফ্‌য়ান আছ-ছাওরী হইতে, তিনি সা'দ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম হইতে, তিনি তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উছমান হইতে এবং তিনি 'আ'ইশা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আন-নাসাঈ (র)-ও এই হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাল্‌হা-র পিতৃপরিচয় উল্লেখ করেন নাই। আবার 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী (র)-ও এই হাদীছটি সুফ্‌য়ান আছ-ছাওরী (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাল্‌হা-র পিতৃপরিচয় দিয়াছেন...ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আওফ অর্থাৎ বানূ যুহ্‌রা গোত্রীয় তাল্‌হা। ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী 'আবদু'র রাহ্‌মান ইব্‌ন মাহ্‌দীর বর্ণনাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, যেহেতু নির্ভরযোগ্যতায় তাঁহার স্থান মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীরের ঊর্ধ্বে; তাল্‌হা আত-তায়মী একজন ছিকাহ রাবী ছিলেন। ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানীর স্তরবিন্যাসে তাঁহার স্থান তৃতীয় স্তরে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবুত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৮; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৫৭; (৩) ঐ লেখক, ফাত্‌হু'ল-বারী, বৈরূত, তা. বি., ৪খ, ৪৩৮; (৪) ইব্‌ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৭৩; (৫) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৩৯২; (৬) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২, ৩৪৫; (৭) বাদ্‌রুদ-দীন আল-'আয়নী, 'উমদাতু'ল কারী, বৈরূত তা. বি., ১২খ, ৭৫।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (طلحة بن عبد الله) ঃ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান (র), তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা)-এর প্রপৌত্র এবং সাহাবী তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা)-এর দৌহিত্র। মাতার নাম 'আ'ইশা। পিতা-মাতা ছাড়াও তিনি 'উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) ও আসমা' (রা) এবং অপরাপর সাহাবীদের মধ্যে মু'আবিয়া ইব্‌ন জাহিমা আস-সুলামী (রা) ও 'উফায়র ইব্‌ন আবী 'উফায়র (রা) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রপিতামহ আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা)-এর সূত্রে তিনি মুরসাল হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদে মধ্যে 'আত্তাব ইব্‌ন খালিদ (র) ও 'উছমান ইব্‌ন আবী সুলায়মান (র) উল্লেখযোগ্য। তাঁহার দুই পুত্র শু'আয়ব ও মুহাম্মাদও তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীছ বিশারদদের দৃষ্টিতে তিনি একজন গ্রহণযোগ্য (مقبول) রাবী ছিলেন। ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানীর স্তরবিন্যাস অনুসারে তিনি তৃতীয় স্তরের রাবী। একজন আমানতদার ও বিশ্বস্ত লোক হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। বর্ণিত আছে, একবার 'উরওয়া ইব্‌নুয-যুবায়র (র) শামের সফরকালে তাঁহার এবং আরও কতক লোকের কিছু মাল আমানত রাখিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর যখন উহা ফেরত চাহিলেন তখন কেহ কেহ অস্বীকার করিয়া বসিল, কিন্তু তাল্‌হা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ উহা যথাযথভাবে ফেরত দিয়াছিলেন। তখন 'উরওয়া ইব্‌নু'য-যুবায়র অতীব সন্তুষ্ট হন। আন-নাসাঈ (র), আবূ দাউদ (র) ও ইব্‌ন মাজা তাঁহাদের হাদীছ গ্রন্থে তাল্‌হা বর্ণিত হাদীছ সংকলন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৭; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবুত তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৫৭; (৩) ইব্‌ন হাবীব আল-বাগ্‌দাদী, কিতাবু'ল-মুনাম্মাক, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৪/১৯৬৪, পৃ. ৪৭৯; (৪) ইব্‌ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৫৫২, ৪খ, ৪৭৫; (৫) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবুছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণ্যতা) ১৩৯৭১৯৭৭, ৪খ, ৩৯২; (৬) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আত-তা'রীখুল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণ্যত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৪৫; (৭) আল-হাকিম, আল-মুসতাদ্‌রাক, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ২খ, ৪২।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তালহা ইব্‌ন আবী সা'ঈদ (طلحة بن ابى سعيد) ঃ (র), একজন তাব'উ তাবি'ঈন ও কুরায়শী মুহাদ্দিছ। উপনাম আবূ আবদিল-মালিক। তিনি ইসকান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া)-র অধিবাসী ছিলেন। এক বর্ণনামতে তাঁহার পূর্বপুরুষের বাস ছিল মদীনায়। তিনি কুরায়শদের মাওলা (মুক্তদাস) ছিলেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ সা'ঈদ আল-মাকবূরী (র), বুকায়র ইবনুল-আশাজ্জ (র), সাখ্‌র ইবনুল-আয়লা (র), খালিদ ইব্‌ন আবী ইমরান (র) প্রমুখের নিকট হইতে তিনি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন 'আবদুল্লাহ ইবনুল-মুবারাক (র) [মৃ. ১৮৯ হি.], আল-লায়ছ ইব্‌ন সা'দ আল-মিসরী (র) [মৃ. ১৭৫ হি.], আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আল-মিসরী (র) [মৃ. ১৯৭ হি.], হায়ওয়া ইব্‌ন শুরায়হ আল-মিসরী (র) [মৃ. ১৫৯ হি.] প্রমুখ মুহাদ্দিছ। হাদীছ বিশারদদের মতে তাল্‌হা ইব্‌ন আবী সা'ঈদ একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র), 'আলী ইবনুল-মাদীনী (র), আবূ যুর'আ (র), আবূ হাতিম (র), আবূ

দাউদ (র) প্রমুখ তাঁহার সপ্রশংস প্রত্যয়ন করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণিত হাদীছকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাল্‌হা (র) হি. ১৫৭ সালে ইনতিকাল করেন। ইব্ন হাজার আল-আস্‌কালানীর স্তরবিন্যাস অনুসারে তিনি ৭ম স্তরের রাবী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৫, ১৬; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবুত-তাহযীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭; (৩) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আত-তা'রীখুল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৮/১৯৬৮, ২/২খ, ২৫০; (৪) ঐ লেখক, 'আল-জামি' আস-সাহীহ, দিল্লী তা.বি., ১খ, ৪০০; (৫) ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৭৬।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তালহা ইব্ন 'আম্‌র (طلحة بن عمرو) ঃ (রা), বসরা নিবাসী জনৈক সাহাবী এবং সুফ্‌ফাবাসীদের একজন। মদীনায় আগমনের পর স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কেহ তাঁহার পরিচিত ছিল না বিধায় তিনি আহ্‌ল'স-সুফ্‌ফা-র মাঝেই অবস্থান করেন। তখনকার নিয়মই ছিল কেহ মদীনায় আসিলে পরিচিত জনের বাড়িতে থাকিতেন। আর যদি কেহ পরিচিত না থাকিত, তাহা হইলে সুফ্‌ফা (মসজিদের চত্বর)-এ অবস্থান করিতেন (আল-মুস্‌তাদরাক, ৪খ, ৫৪৮)। আহ্‌ল'স-সুফ্‌ফা-র মধ্যে খাদ্য বিতরণে তখনকার নিয়ম ছিল যে, প্রতি দুই জনকে দৈনিক এক মুদ্‌দ খেজুর দেওয়া হইত। আর পরিধানের জন্য খুনুফ (এক প্রকার শক্ত ও মোটা কাপড়)-এর ব্যবস্থা করা হইত। তালহা বলেন, এমনি করিয়াই আমাদরে দিন কাটিতেছিল। একদিনকার ঘটনা, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে কোন এক ওয়াক্তের সালাত আদায় করিলাম। তিনি সালাম ফিরাইবা মাত্র আমাদের মধ্য হইতে একজন (বর্ণনান্তরে বহুজন) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, খেজুর খাইতে খাইতে আমাদের উদর জ্বলিয়া গেল আর খুনুফ তো আমাদের দেহের চামড়া ছুলিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া আল্লাহর রাসূল মিম্বরে উপবেশন করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও প্রশংসা জ্ঞাপনের পর বলিলেন ঃ শোন! মক্কায় আমাদের একাধারে দশ-বার দিন এমনও অতিবাহিত হইয়াছে যে, বারীর (আরাক বৃক্ষের ফল)-এর মত নিকৃষ্ট খাবার ছাড়া কিছুই পাই নাই। তারপরে মদীনায় আমাদের আন্‌সার ভাইদের নিকট আসিলাম, কিন্তু তাহাদেরও শ্রেষ্ঠ খাবার হইল খেজুর। তাহারা আমাদিগকে ইহার সমান ভাগ দিয়াছে। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার থাকিত তাহা হইলে তোমাদিগকে রুটি-গোশ্‌তই খাওয়াইতাম। তবে শোন, সেদিন আর দূরে নয়, যখন তোমাদের বা তোমাদের ভবিষ্যত সন্তানদের ডেকচি পূর্তি খাদ্য থাকিবে। দেহে শোভা পাইবে কা'বা-র গেলাফতুল্য মহামূল্য বস্ত্র। কোন একজন জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সেই ভবিষ্যতই কি আমাদের জন্য শুভ, না আজিকার এই বর্তমান। তিনি বলিলেন, এই বর্তমানই শুভ। কারণ আজ তোমরা ভাই ভাই। আর সেই সমৃদ্ধির দিনে তোমরা পরস্পর শত্রু হইবে। একে অন্যের রক্ত বহাইবে। উল্লেখ্য, তৎকালে কা'বার গেলাফের জন্য য়ামান হইতে মহামূল্যবান কাপড় আমদানী করা হইত। আহ্‌মাদ, আত-তাবারানী, ইব্ন হিব্বান, আল-হাকিম প্রমুখ তালহা ইব্ন 'আম্‌র (রা)-এর সূত্রে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তবে 'আদী ইবনু'ল-ফাদ্‌ল ঘটনাটিকে 'উবায়দিল্লাহ ইব্নু'ল-ফুদ্‌লা-এর সূত্রে রিওয়ায়াত করেন, যাহা ইব্ন শাহীন তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী প্রথমোক্ত বর্ণনাকেই বিশুদ্ধ বলিয়াছেন। ইবনু'স-সাকান বলেন, তাল্‌হা ইব্ন 'আম্‌র (রা)-এর সূত্রে ইহা ছাড়া আর কোন হাদীছ বর্ণিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর তা, বি, ২খ, ২২২; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, মিসর তা. বি., ২খ, ৭৭০; (৩) আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল-কুব্‌রা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৪৪৫; (৪) আল-হাকিম, আল-মুস্‌তাদ্‌রাক, বৈরূত তা. বি., ৪খ, ৫৪৮, ৫৪৯; (৫) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৬২, ৬৩; (৬) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মাইস সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৬৭৮; (৭) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ২০৪; (৮) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৪৪; (৯) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৭২; (১০) মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আল-মুন্‌ফারিদাত ওয়া'ল-ওয়াহ্‌দান, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ. ৯৭, ৯৮।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ (طلحة بن عبيد الله) ঃ (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন খ্যাতনামা সাহাবী, [উপনাম আবূ মুহাম্মাদ] যিনি 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা-র অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সেই দশজন সাহাবীর মধ্যে গণ্য, যাঁহাদের সম্পর্কে জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা দুনিয়াতেই (একই বৈঠকে) প্রদান করা হইয়াছিল, [তিনি ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আট ব্যক্তির অন্যতম, আবূ বাক্‌র (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী পাঁচ ব্যক্তির অন্যতম এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর আট সদস্যবিশিষ্ট শূরা কমিটির অন্যতম সদস্য (তাহযীবু'ল-আসমা ওয়া'ল-লুগাত, ১খ, ২৫২)]। তিনি কুরায়শ গোত্রের বানূ তায়ম ইব্ন মুর্‌রা [দ্র.] গোত্রেও ছিলেন। তাঁহার বংশতালিকা হইল, তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন 'উছমান ইব্ন 'আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তায়ম ইব্ন মুর্‌রা। তাঁহার উপনাম ছিল তাঁহার পুত্রের নিসবা অনুযায়ী আবূ মুহাম্মাদ। তিনি তাঁহার সৎকর্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আর তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম কারীদের অন্যতম। পিতা-পুত্র উভয়েই ৩৬ হি. জামাল যুদ্ধে (দ্র.) শহীদ হন। তালহা (রা) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর সহিত কুরায়শদের হুমকি ও দুর্ব্যবহার সহ্য করেন। তিনি হযরত নবী কারীম (স)-এর নির্দেশে হিজরত করেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিশেষ পরামর্শদাতা এবং আত্মোৎসর্গকারী সাহাবীরূপে গণ্য হন। বদ্‌র যুদ্ধে (দ্র.) তাঁহাকে মাক্‌কাবাসীদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। এইজন্য তিনি সময়মত যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারেন নাই এবং যুদ্ধে শরীক হইতে পারেন নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাকে অন্যান্য মুহাজির সাহাবীর ন্যায় গানীমাতের মাল সমানভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। উহুদ (দ্র.)-এর যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন এবং বিপদপূর্ণ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স)-কে রক্ষা করিবার জন্য নিজের বুক পাতিয়া দেন। ইহাতে তাঁহার শরীরের চব্বিশ জায়গায় যখম হয়। একটি আঘাতে তাঁহার দুইটি আঙ্গুলের শিরা কাটিয়া যায়। ইহার ফলে তাঁহার হাত অকেজো হইয়া যায়। এই বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কারণে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁহার ইনতিকালের পরও তাঁহাকে খুবই সম্মান ও মর্যাদার চক্ষে দেখা হইত। উহুদ যুদ্ধের পরও তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সকল যুদ্ধে কৃতিত্বের সহিত অংশগ্রহণ করেন। বায়'আতুর রিদওয়ান-এও তিনি শরীক ছিলেন। মক্কা বিজয়ের

পর হুনায়ন-এর যুদ্ধেও তিনি অসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

তালহা (রা) যেই রকম ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন সেই রকম উদার ও দানশীলও ছিলেন। তাঁহার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তালহাতু'ল-খায়র (কল্যাণময় তালহা) উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি বিপুল পরিমাণে অর্থ প্রদান করিতেন। মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণের জন্য তিনি একটি পানির কূপ ক্রয় করিয়া ওয়াক্ফ করিয়া দেন। গাযওয়াতু'ল-'উসরায় সকল মুসলমানের খাবারের ব্যবস্থা করেন। তাবূক যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি মোটা অংকের অর্থ দান করেন। এই সকল অবদান ও ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তালহাতু'ল-খায়র ও তালহাতু'ল-ফ্যায়াদ (দানশীল তালহা) উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি তাঁহার উদারতা ও দানশীলতার পরিচয় বহন করে। কাবীসা ইব্ন জাবির (রা) বলেন, আমি বহুদিন পর্যন্ত তালহা (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি তাঁহার মত আর কাহাকেও না চাইতেইএত অধিক সম্পদ দানকারী দেখি নাই।

একবার তিনি হাদরামাওত হইতে সাত লক্ষ দিরহাম প্রাপ্ত হন। ইহার সম্পূর্ণ অর্থই তিনি মুহাজির ও আনসারদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। তাঁহার স্ত্রীর ভাগে মাত্র এক হাজার দিরহাম পড়ে। একবারের ঘটনা। এক বেদুঈন ভিক্ষুকের বেশে তাঁহার নিকট আসিল এবং কোন এক আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া তাঁহার নিকট কিছু চাহিল। তালহা (রা) বলিলেন, ইতিপূর্বে কখনও কেহ এই আত্মীয়তার সূত্র ধরিয়া আমার নিকট কিছু চাহে নাই। আমার নিকট একটি যমীন আছে। আর 'উছমান (রা) উহার পরিবর্তে তিন লক্ষ দিরহাম দিতে চাহিয়াছেন। তুমি চাহিলে উক্ত যমীন লইতে পার, আর চাহিলে উহার মূল্য। উক্ত বেদুঈন নগদ দিরহাম লইতেই পসন্দ করিল। এমনিভাবে একবার তিনি চার লক্ষ দিরহাম পান এবং সমুদয় অর্থই তিনি তাঁহার কাওমের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। হাসান বাসরী (র) বলেন, তালহা তাঁহাকে সাত লক্ষ দিরহাম দান করেন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের কারণে হাসান-এর সারা রাত ঘুম আসে নাই। অতঃপর সকাল বেলায় তিনি এই সমুদয় অর্থ আল্লাহ্র রাস্তায় বিতরণ করিয়া দেন (সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', ১খ, ১৮-২০)।

তালহা বানূ তায়ম গোত্রের দরিদ্র ও অসহায় লোকদের অভিভাবকত্ব করিতেন। তিনি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতেন এবং উক্ত বংশের দরিদ্র পরিবারের কন্যাদিগকে বিবাহ দিয়া দিতেন। তিনি উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত 'আ'ইশা (রা)-এর প্রতিও গভীর অনুরাগী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং প্রতি বৎসর তাঁহার খিদমতে দশ হাজার দিরহাম পেশ করিতেন। তালহা (রা) মেহমানদারীর জন্যও খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন (সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', ১খ, ২১)। [তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের, ঘন চুলের অধিকারী এবং সুদর্শন চেহারার এক সুপুরুষ। তিনি খুব দ্রুতবেগে হাঁটিতেন (সিয়ারু আ'লামি'ন নুবালা', ১খ, ৪০)।

তালহা (রা)-র জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। মদীনা মুনাওওয়ারায় আগমনের পর তিনি কৃষিকাজও শুরু করেন। খায়বার-এর জায়গীর ছাড়াও ইরাক ও আরবের বেশ কিছু ভূসম্পত্তির তিনি মালিক হন এবং কৃষিকার্যের বিশাল ক্ষেত্র তত্ত্বাবধান করেন। বিশটিরও অধিক উট তাঁহার ক্ষেত্রে পানি সরবরাহে নিয়োজিত থাকিত। এই সকল ক্ষেত্রের উৎপাদন কত অধিক ছিল তাহার অনুমান এই হিসাবটি দ্বারা করা যায় যে, গড়ে তাঁহার প্রতি দিনের উৎপাদন ছিল এক হাজার দিরহাম।

হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক ও হযরত 'উমার ফারূক (রা)-এর খিলাফাত আমলে তালহা (রা) তাঁহাদের বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তাঁহার পরামর্শকে খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হইত। 'উমার ফারূক (রা)-এর শাহাদাতের পর যে ছয়জন সাহাবীকে খলীফা নির্বাচনের জন্য নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পর তিনি ও হযরত যুবায়র (রা) উভয়েই হযরত 'উছমান-এর হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের দাবিতে সোচ্চার হন এবং ভুল বুঝাবুঝির ফলে পরিস্থিতি জামাল যুদ্ধ (দ্র.) পর্যন্ত গড়ায়। এই যুদ্ধেই ৩৬ হি. তালহা (রা) শাহাদাত লাভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল বাষট্টি অথবা চৌষট্টি বৎসর। তাঁহার শহীদ হওয়াতে হযরত 'আলী (রা) খুবই আফসোস করেন (সিয়ারু আ'লামি'ন নুবালা', ১খ, ২৩)। তালহা (রা) বহু জায়গীর ছাড়াও লক্ষ লক্ষ দিরহাম ও দীনার এবং বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য রাখিয়া যান (সিয়ারু আ'লামি'ন নুবালা', ১খ, ২৫)।

তালহা (রা) বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রীদিগের মধ্যে হামনা বিন্ত জাহশ, উম্মু কুলছুম বিন্ত আবী বাক্র আস-সিদ্দীক, সু'দা বিন্ত 'আওফ, উম্মু আবান বিন্ত শায়বা ইব্ন রাবী'আ ও খাওলা বিনতু'ল-কাকা' (রা)-এর নাম পাওয়া যায়। এই সকল স্ত্রীর গর্ভজাত দশ পুত্র এবং চার কন্যা ছিল। তাঁহার বংশধর কয়েক পুরুষ পর্যন্ত বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার এক কন্যা উম্মু ইসহাক বিন্ত তালহা (রা)-এর বিবাহ হয় হযরত হাসান ইব্ন 'আলী (রা)-এর সহিত এবং তাঁহার ইনতিকালের পর হযরত হুসায়ন ইব্ন 'আলী (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহারই গর্ভে ফাতিমা বিন্ত হুসায়ন (রা) জন্মগ্রহণ করেন (ইব্ন হাযম, জামহারাতু আনসাবি'ল- 'আরাব, পৃ. ১৩৮)। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর পৌত্র 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান ও হযরত মুস'আব ইব্নু'য-যুবায়র ইব্নু'ল-'আওওয়াম (রা)-ও তালহা (রা)-র জামাতা ছিলেন (ইব্ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, পৃ. ৬৬)। মক্কা মুকাররামায় তালহা (রা) ও হযরত সা'ঈদ ইব্ন যায়দ-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা হয় এবং মদীনা মুনাওওয়ারায় হযরত উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা)-এর সহিত।

[তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বহু হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। বাকী ইব্ন মাখলাদ-এর মুসনাদ-এ তাকরার (পুনরুল্লেখ)-সহ তাঁহার ৩৮টি হাদীছ রহিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যে বুখারী ও মুসলিম-এ যুগ্মভাবে দুইটি এবং এককভাবে বুখারীতে দুইটি ও মুসলিম-এ তিনটি হাদীছ স্থান পাইয়াছে। তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার পুত্র য়াহ্য়া, মূসা, 'ঈসা ও আস-সা'ইব ইব্ন য়াযীদ, মালিক ইব্ন আওস ইব্নু'ল-হাদছান, আবূ 'উছমান আন-নাহদী, কায়স ইব্ন আবী হাযিম, মালিক ইব্ন আবী হাযিম ও আবূ সালামা ইব্ন 'আবদি'র-রাহমান প্রমুখ তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ [সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', ১খ, ২৪; তাহযীবু'ল আসমা ওয়া'ল লুগাত, ১খ, ২৫২]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাদীছ-এর গ্রন্থসমূহ, মিফতাহু কুনূযিস-সুন্নাহ অবলম্বনে, শিরো.; (২) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩/১খ. ১৫২ প.; (৩) আয-যাহাবী, তা'রীখু'ল-ইসলাম, ১৬৩ প.; (৪) ঐ লেখক, সিয়ারু

আ'লামী'ন-নুবালা', ১খ, ১৫-২৬; (৫) আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ১খ, নির্ঘণ্ট; (৬) ইব্‌ন হাযম, জাওয়ামি'উ'স সীরাহ, নির্ঘণ্ট; (৭) ইব্‌নু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৩খ, ৫৯; (৮) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ৩খ, ২৯০; (৯) মু'ঈনু'দ-দীন নাদাবী, মুহাজিরীন, ১খ, (২য় সং.) আজমগড় ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৯৩ প.; (১০) ইব্‌ন হাযম, জামহারাতু আনসাবি'ল-'আরাব, পৃ. ১৩৮ প.; (১১) মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাবীব, কিতাবু'ল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) সং., পৃ. ৬৬; (১২) কাদী হাবীবু'র-রাহমান, 'আশারায়ে মুবাশ্‌শারা, লাহোর ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১৩৪-১৪৩।

Della Vida ও সম্পদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ড. আবদুল জলীল

তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন কুরায়য (طلحة بن عبيد الله بن كريز) ঃ (র), জনৈক তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। কুনিয়াত আবু'ল-মুতাররিফ। তিনি বানূ খুযা'আ গোত্রের লোক। বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন কুরায়য ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ ইব্‌ন যাতির। তিনি ছিলেন কূফার বাসিন্দা, কাহারও মতে মিসরের। তিনি হযরত 'আইশা (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা), আবু'দ-দার্‌দা' (রা), উম্মু'দ-দার্‌দা' আস-সুগ্‌রা (রা), ইব্‌ন শিহাব আয-যুহ্‌রী প্রমুখ হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রেও বহু সংখ্যক রাবী হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন, যাঁহাদের মধ্যে হুমায়দ আত-তাবীল (র), 'আসিম আল-আহ্‌ওয়াল (র), মূসা ইব্‌ন ছারওয়ান আল-মু'আল্লিম (র), আবূ হাযিম আল-আ'রাজ (র), ফুদায়ল ইব্‌ন গায্‌ওয়ান (র), হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র), ইস্‌হাক ইব্‌ন 'আজলান (র), ইবরাহীম ইব্‌ন আবী 'আবলা আশ-শামী (র) ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাওকা (র) উল্লেখযোগ্য। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তালহা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র), আন-নাসাঈ (র) প্রমুখ তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা প্রত্যয়ন করিয়াছেন। ইব্‌ন সা'দ তাঁহার নাম বসরানিবাসী তাবি'ঈদের দ্বিতীয় স্তরে উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি অল্প সংখ্যক হাদীছের রাবী। ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানীর স্তরবিন্যাস অনুসারে তিনি তৃতীয় স্তরের রাবী। সাহীহ মুসলিম ও সুনানু আবী দাউদে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ২০-২১; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭; (৩) আন-নাওয়াবী, তাহ্‌যীবু'ল-আসমা' ওয়া'ল-লুগাত, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৫৩; (৪) আল-হাকিম, আল-মুস্‌তাদরাক, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ, ৪৮; (৫) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৩৯২; (৬) আস-সুয়ূতী, ইস্‌'আফু'ল-মুবাত্‌তা বি-রিজালি'ল-মুওয়াত্‌তা', মিসর তা. বি., (তানবীরু'ল-হাওয়ালিকের টীকায়), পৃ. ২০; (৭) ইব্‌ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৭৪; (৮) কিতাবুল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৪৭; (৯) ওয়ালিয়্যু'দ-দীন আল-খাতীব, আল-ইক্‌মাল (মিশকাতু'ল-মাসাবীহ, দিল্লী তা. বি.-এর সহিত সংযোজীত), পৃ. ৬০১; (১০) ইব্‌ন হাযম আল-আন্‌দালুসী, জাম্‌হারাতু আন্‌সাবি'ল-'আরাব, বৈরূত ১৪০৩/ ১৯৮৩, পৃ. ৩৬।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ আত-তায়মী (طلحة بن عبيد الله التيمى) ঃ (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী। বানূ তায়ম গোত্রের লোক। বংশতালিকা নিম্নরূপ, তালহা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্‌ন মুসাফি' ইব্‌ন 'ইয়াদ ইব্‌ন সাখ্‌র ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন তায়ম ইব্‌ন মুর্‌রা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআয়ি। তিনি তাল্‌হা আল-খায়র নামে পরিচিত, যেমন 'আশারা-ই মুবাশ্‌শারা-র অন্যতম সাহাবী তালহা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা)-ও আল-খায়র বিশেষণে খ্যাত। উভয়ের নাম, পিতার নাম, বিশেষণ ও গোত্র (বানূ তায়ম) অভিন্ন হওয়ার কারণে অনেকে উভয়কে এক করিয়া ফেলিয়াছেন এবং আলোচ্য তালহা (রা)-এর কোন কোন ঘটনাকে জান্নাতে সুসংবাদপ্রাপ্ত তাল্‌হা (রা)-এর সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন। কথিত আছে যে, একদা জনৈক সাহাবী কোন এক উম্মু'ল-মু'মিনীনের নিকট গিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন। সম্পর্কে তাঁহারা চাচাত ভাই-বোন হইতেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া বলিলেন ঃ আজ হইতে আর কোনদিন যেন তোমাকে এই স্থানে দেখা না যায়। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি তাঁহার সহিত কোন অনুচিত কথা বলি নাই এবং তিনিও নহেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তাহা আমি জানি বৈকি! কিন্তু আল্লাহ তা'আলার আত্মমর্যাদাবোধ সর্বাধিক এবং মানুষের মধ্যে আমার তুলনায় অধিক আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী আর কেহ নাই। এই কথা শুনিয়া সেই সাহাবী (রা) তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর আমি উহাকে (বর্ণনান্তরে প্রকাশ, 'আইশা (রা)-কে) বিবাহ করিব। অনন্তর তাঁহাকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٖ.

"তোমাদিগের কাহারও পক্ষে আল্লাহ্‌র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নীদিগকে বিবাহ করা কখনও সংগত নহে" (৩৩ ঃ ৫৩)।

এই আয়াত নাযিল হইলে পর তিনি অনুতপ্ত হইয়া একটি গোলাম আযাদ করেন, দশটি উট বোঝাই মালামাল আল্লাহ্‌র রাহে দান করেন এবং পায়ে হাঁটিয়া হজ্জব্রত পালন করন। ইব্‌ন আবী হাতিম, আস-সুদ্দীর সূত্রে উদ্ধৃত করেন যে, আয়াতটি তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা) সম্পর্কে নাযিল হয় এবং তিনিই উপরোক্ত উক্তি করিয়াছিলেন। ইব্‌ন সা'দ, আবূ বাক্‌র ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হাযম (র)-এর সূত্রেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন (ছানাউল্লাহ পানীপথী, আত-তাফ্‌সীরু'ল-মাজহারী, ৭খ, ৩৭৩; ইব্‌ন কাছীর, তাফ্‌সীরু'ল-কুরআনি'ল-'আজীম, ৩খ, ৫০৬)। আবূ মূসা (র) ইব্‌ন শাহীনের সূত্রে এই ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া বলেন, একদল তাফ্‌সীরকারক এই ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া ভ্রান্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট তাল্‌হা (রা) 'আশারা-ই মুবাশ্‌শারা বা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীদিগের অন্যতম তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা) [আল-ইসাবা, ২খ, ২৩০]। বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনায় (দিরায়াত) উক্ত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কারণ একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পরেও কুরআনের একটি স্পষ্ট বিধান সম্পর্কে অনবহিত থাকিবেন তাহা কল্পনাও করা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২৩০; (২) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মাই'স সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৭৭; (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর,

উস্‌দু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৬২; (৪) ছানাউল্লাহ্‌ পানীপথী, আত- তাফ্‌সীরু'ল-মাজ্‌হারী, কোয়েটা (পাকিস্তান) ১৪০৬/১৯৮৬, ৭খ, ৩৭৩; (৫) ইব্‌ন কাছীর, তাফ্‌সীরু'ল-কুরআনি'ল-'আজীম, বৈরূত ১৩৮৮/ ১৯৬৮, ৩খ, ৫০৬।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা ইব্‌ন খিরাশ (طلحة بن خراش) ঃ (র), মদীনা নিবাসী জনৈক আন্‌সারী তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। তিনি খাযরাজ গোত্রের বানূ সালামা শাখার লোক। প্রখ্যাত সাহাবী জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) তাঁহার চাচাত ভাই। বংশতালিকা নিম্নরূপঃ তাল্‌হা ইব্‌ন খিরাশ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান ইব্‌ন খিরাশ ইব্‌নু'স-সিম্‌মা। তিনি জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) ও 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন 'আতীক (র) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে মূসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র), আদ-দারাওয়ারদী (র) ও য়াহ্‌য়া ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন য়াযীদ (র) উল্লেখযোগ্য। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তাল্‌হা একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। আন-নাসাঈ ও ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা সত্যায়িত করিয়াছেন। ইব্‌ন হিব্বান তাঁহার নাম কিতাবু'ছ-ছিকাত (নির্ভরযোগ্যদের তালিকা)-এ অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য আল-আয্‌দীর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি জাবির (রা)-এর সূত্রে যে সকল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন উহার সব গ্রহণযোগ্য নহে। মা'রিফাতু'স সাহাবা (সাহাবা পরিচিতি)-র পরিশিষ্টে আবূ মূসা তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার বর্ণিত হাদীছ মুরসাল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) হইতে শ্রবণকারী সাহাবীর নাম বর্ণনাসূত্র হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইমাম আত-তিরমিযী শ্রেষ্ঠ যিক্‌র, দু'আ' ও রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বপ্নে দর্শন সম্পর্কে এবং ইব্‌ন মাজা জাবির (রা)-এর পিতা আবদুল্লাহ (রা)-এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাল্‌হা বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইমাম আন-নাসা'ঈ প্রণীত 'আমালুল-য়াওম আ'ল-লায়লা" গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত হাদীছ স্থান পাইয়াছে। ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানীর স্তরবিন্যাস অনুযায়ী তাল্‌হা ইব্‌ন খিরাশ চতুর্থ স্তরের রাবী। তাহার মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৫; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭; (৩) ইব্‌ন আবী হাতিম, আল-জার্‌হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৭৪; (৪) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল আল-বুখারী, আত-তারীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, খ, ৩৪৭; (৫) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৩৯৪।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা ইব্‌ন নাফি' (طلحة بن نافع) ঃ (র), আল-কুরাশী আবূ সুফ্‌য়ান আল-ওয়াসিতী একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ ও প্রবীন তাবি'ঈ। তাঁহাকে মাক্‌কিয়ু'ল-ইশ্‌কাফও বলা হয়। তিনি জাবির ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ, আবূ আয়্যূব আল-আন্‌সারী, ইব্‌ন 'উমার, ইব্‌ন 'আব্বাস, ইব্‌নু'য-যুবায়র আনাস, 'উবায়দ ইব্‌ন 'উমায়র প্রমুখ সাহাবী হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে আ'মাশ, আবূ জা'ফার ইব্‌ন আবী ওয়াহশিয়া, মুছান্না ইব্‌ন সা'ঈদ, হুসায়ন ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্‌মান, ইব্‌ন ইসহাক, আবু'ল-বাশার, শু'বা প্রমুখ মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহ্‌মাদ, ইমাম নাসাঈ, ইব্‌ন 'আদী প্রমুখ হাদীছবেত্তা তাঁহার হাদীছ গ্রহণে কোন আপত্তি নাই (لا بأس به) বলিয়া মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইব্‌ন হিব্বান তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী (ثقة) রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, ভারত ১৩৮৪/১৯৬৪, ২খ, ৩৪৬; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ২৪; (৩) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর (পাকিস্তান) ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৫৭; (৪) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ৪খ, ৩৯৩; (৫) ইব্‌ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল্‌-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭৮/১৯৫২, ৪খ, ৪৭৫, সংখ্যা ২০৮৬।

মোহাম্মাদ আলী

তালহা ইব্‌ন নুদায়লা (طلحة بن نضيلة) ঃ (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী। কুন্‌য়াত আবূ মু'আবিয়া, বর্ণনান্তরে আবূ নুদায়লা বা আবূ নাদলা। কূফা নিবাসী সাহাবীদের তালিকায় তাঁহার নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ তাঁহার নাম 'আম্‌র, আবার কেহ 'আল্‌কামা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী উহা ভ্রান্ত সাব্যস্ত করিয়া তাল্‌হা নামকেই বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করেন। তাঁহার সূত্রে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ণয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলা হইল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য স্থির করিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রীতিনীতি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, আমি যাহার প্রচলন ঘটাইব, অথচ তিনি আমাকে ইহার নির্দেশ দেন নাই, বরং তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা কর।

ইব্‌নু'স-সাকান এই হাদীছটি আয়্যূব ইব্‌ন খালিদের সনদে ইমাম আল-আওযা'ঈ হইতে, তিনি সুলায়মানের সঙ্গী আবূ 'উবায়দ হইতে এবং তিনি তালহা ইব্‌ন নুদায়লা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন কানি' ও আত-তাবারানীও হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা তাল্‌হা (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই। অনুরূপ আবু'ল-মুগীরা মুহাম্মাদ ইব্‌ন জারীর, আবূ নাস্‌র আল-মুকাদ্দাসী, ইব্‌ন মান্দা প্রমুখও বিভিন্ন সনদে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই বর্ণনায় সাহাবীর নাম নির্ণয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ইব্‌নু'স-সাকান বলেন, তালহা (রা) হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে তালহা (রা)-র সরাসরি শ্রবণ ও তাঁহার উপস্থিতির কথা স্পষ্ট নাই। বস্তুত সাহাবীদের মধ্যে তিনি প্রসিদ্ধ নহেন। তবে আত-তাবারানীর রিওয়ায়াতে তাঁহার সাহচর্য লাভ ও সাহাবী হওয়ার কথা পরিষ্কার উল্লেখ আছে। ইহারই ভিত্তিতে ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী (আল-ইসাবা, ২খ, ২২৩) সাহাবীদের প্রথম স্তরে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা বৈরূত তা. বি., ২খ, ২২৩; (২) ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (আল-ইসাবা, ২খ, ২১৭, ২১৮ পৃ.-এর টীকা দ্র.); (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ২খ, ৬৩; (৪) আয-যাহাবী, তাজরীদু আস্‌মাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৬৭৮।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা ইব্‌ন মালিক (طلحة بن مالك) ঃ (রা), বসরা নিবাসী একজন সাহাবী। তাঁহার বংশ নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ তাঁহাকে বানূ খুযা'আ গোত্রের, কেহ বানূ লায়ছ গোত্রের, আবার কেহ বানূ সুলায়ম গোত্রের লোক হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম আল-বুখারী (আত-তা'রীখু'ল কাবীর, ২/২খ, ৩৪৪), ইব্‌ন আবী 'আসিম, আল-হারিছ, আল-বাগাবী, আত-তাবারানী, ইব্‌নু'স-সাকান প্রমুখ তাল্‌হা (রা)-র বাঁদী উম্মু'ল-হারীর (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আমার মনিবকে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কিয়ামতের একটি আলামত হইল আরবদের মৃত্যু। এই কারণেই কোন আরবের মৃত্যু সংবাদ আসিলে উম্মু'ল-হারীর অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিতেন। ইমাম তিরমিযী তাঁহার সুনান গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছটি উম্মু'ল-হারীর হইতে স্বীয় পুত্র মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী রাযীন এবং তাঁহার নিকট হইতে সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনু'স-সাকান বলেন, তাল্‌হা ইব্‌ন মালিক হইতে ইহা ব্যতীত আর কোন হাদীছ বর্ণিত হয় নাই এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী রাযীন হইতে সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব ব্যতীত অন্য কেহ এ হাদীছটি বর্ণনা করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি.; ২খ, ২৩১; (২) ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল বার্‌র, আল-ইসতী'আব, উক্ত আল-ইসাবার হাশিয়ায়, ২খ, ২২৫-৬; (৩) আত-তিরমিযী, আস-সুনান, দিল্লী তা. বি., ২খ, ২৩২; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৬৩; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৬৮; (৬) ইব্‌ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ২০৪; (৭) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৪৪; (৮) ইব্‌ন আবী হাতিম, কিতাবুল-জার্‌হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৭২; (৯) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ৩২; (১০) ঐ লেখক, তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তালহা ইব্‌ন মুসার্‌রিফ (طلحة بن مصرف) ঃ (র), আম্‌র ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন জুহ্‌দুব ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন সা'দ ইব্‌নি'ল হারিছ আবূ মুহাম্মাদ আল-হামদানী আল-কূফী। তিনি ছিলেন একজন তাবি'ঈ ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ। তাঁহার কুনিয়াত আবূ 'আবদিল্লাহ। ইব্‌ন মা'ঈন, আবূ হাতিম, আল-'ইজলী প্রমুখ একবাক্যে তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। কূফার কারীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আবূ মা'শার, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস ও 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন আব্‌জার তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

তিনি আনাস ইব্‌ন মালিক, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী 'আওফা, কুর্‌রা ইব্‌ন শুরাহবীল, খায়ছামা, ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান, যায়দ ইব্‌ন ওয়াহব, আবূ সালিহ আস-সাম্‌মান, সা'ঈদ ইব্‌ন যুবায়র, সা'ঈদ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহমান ইব্‌ন আব্‌যা, মুজাহিদ, 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন আবী 'আওসাজা প্রমুখ মুহাদ্দিছের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ ইসহাক আস-সাবী'ঈ, ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবী খালিদ, যুবায়দ ইবনু'ল-হারিছ আল-য়ামী, আ'মাশ, ইব্‌ন মুহাম্মাদ, মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল, মানসূর, 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন সা'ঈদ, ইদ্‌রীস ইব্‌ন য়াযীদ আল-আওদী, যুবায়র ইব্‌ন 'আদী, রাকাবা ইব্‌ন মাসকালা শু'বা প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আবূ না'ঈম, 'আম্‌র ইব্‌ন 'আলী, ইব্‌ন সা'দ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতে ১১২ হিজরী ও ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন নুমায়রের বর্ণনামত ১১৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। শু'বা বলেন, আমরা তালহা ইব্‌ন মুসার্‌রিফের জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তখন আবূ মা'শার তাঁহার প্রশংসায় বলেন, বর্তমানে তাঁহার মত লোক আর অবশিষ্ট নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাম্‌সু'দ-দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', বেরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৫খ, ১৯১; (২) ইমাম বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, ভারত ১৩৮৪/১৯৬৪, ২খ, ৩০৮; (৩) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাত, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৬খ, ৩০৮; (৪) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ২৩; (৫) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, লাহোর (পাকিস্তান) ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭; (৬) ইব্‌নু'ল-'ইমাদ আল-হাম্বালী, শাযারাতু'য যাহাব, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ১৪৫; (৭) ইব্‌ন হিব্‌বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, ভারত ১৩৯৮/১৯৭৮, ৪খ, ৩৯৩।

মোহাম্মাদ আলী

তাল্‌হা ইব্‌ন য়াহ্‌য়া (طلحة بن يحى) ঃ (র), ইব্‌ন নু'মান ইব্‌ন আবী 'আয়্যাশ আয-যুরাকী আল্‌-আন্‌সারী আদ-দিমাশ্‌কী। তিনি একজন তাব্‌'উ তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ; বাগ্‌দাদে বসবাস করিতেন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন আবী হিন্দ, য়ূনুস ইব্‌ন য়াযীদ আল-আয়লী, দাহ্‌হাক ইব্‌ন 'উছমান আল-হাযমী, 'আব্‌দু'ল-ওয়াহিদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র আছ-ছাকাফী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন আবী ফুদায়ক, য়া'কূব ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয্‌-যুহরী, 'আব্‌বাদ ইব্‌ন মূসা, 'উছমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী শায়বা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌বাদ আল-মাক্‌কী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। হাদীছবিদগণ তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইব্‌ন মা'ঈন ও ইব্‌ন হিব্‌বানের মতে তিনি শক্তিশালী (ثقة) রাবী। আবূ দাউদ তাঁহার হাদীছ গ্রহণে আপত্তি নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌ন আবী শায়বা তাঁহাকে অত্যধিক দুর্বল রাবী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, ভারত ১৩৮৪/১৯৬৪, ২খ, ৩৫০; (২) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ২৪; (৩) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর (পাকিস্তান) ১৪০৬/১৯৮৬, ৫৮।

মোহাম্মাদ আলী

তাল্‌হা ইব্‌ন য়াহ্‌য়া (طلحة بن يحى) ঃ (র), ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ আত-তামীমী একজন তাব'উ তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। তিনি ফাল্‌লাসের মতানুসারে ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম ইব্‌ন মা'ঈন, য়া'কূব, ইব্‌ন আবী শায়বা, আল-'ইজলী ও ইব্‌ন হিব্‌বানের মতানুসারে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁহার হাদীছ অগ্রাহ্য (منكر الحديث) বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ইমাম আবূ দাউদ, আবূ যুর'আ, নাসাঈ, আবূ হাতিম, য়াহ্‌য়া ইব্‌ন সা'ইদ আল-কাত্তানের মতে তিনি তেমন শক্তিশালী রাবী না হইলেও তাঁহার হাদীছ গ্রহণযোগ্য (صالح الحديث)।

তিনি তাঁহার পিতা, তাঁহার চাচা, চাচাত ভাই ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন তালহা ও মু'আবিয়া ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন তালহা,

'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উত্‌বা, মুজাহিদ ইব্ন জাব্‌র, 'আবূ বুরদা ইব্ন আবী মূসা প্রমুখ মুহাদ্দিছের সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

সুফ্‌য়ান ইব্ন 'উয়ায়না, সুফয়ান ছাওরী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইদরীস, 'আবদুল-ওয়াহিদ ইব্ন যিয়াদ, শারীক, আবূ উসামা, আল-খারীবী, ইসমাঈল ইব্ন যাকারিয়া, 'আবদা ইব্ন সুলায়মান, য়াহ্‌য়া আল-কাত্তান, ওয়াকী', য়াহ্‌য়া ইব্ন সাঈদ আল-উমাবী, 'আলী ইব্ন হাশিম ইব্ন বারীদ, ফাদ্‌ল ইব্ন মূসা আস-সিনানী, আবূ নুআয়ম প্রমুখ মুহাদ্দিছ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। য়াহ্‌য়া ইব্ন মা'ঈনের মতানুসারে তিনি ১৪৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। কাহারও কাহারও অভিমত যে, তিনি ইব্ন 'উমার (রা)-কে দেখিয়াছেন, তবে তাহা তত নির্ভরযোগ্য নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম বুখারী, আত-তা'রীখুল-কাবীর, ভারত ১৩৮৪/১৯৬৪, ২খ, ৩৪৬; (২) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্‌যীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ২৫; (৩) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্‌যীব, লাহোর (পাকিস্তান) ১৪০৬/১৯৮৬, পৃ. ১৪৮; (৪) ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযী, কিতাবুল-জারহ্‌ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭২/১৯৫২, ৪খ, ৪৭৭, সংখ্যা ২০৯৫।

মোহাম্মদ আলী

তালহা ইব্ন রুকানা (طلحة بن ركانه) ঃ (রা), কুরায়শ বংশীয় একজন সাহাবী। বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ তালহা ইব্ন রুকানা ইব্ন 'আবদ য়াযীদ ইব্ন হাশিম ইবনু'ল-মুত্তালিব ইব্ন 'আবদ মানাফ। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র) তাঁহার মুওয়াত্তা' গ্রন্থে হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সকল দীনেরই একটি বিশেষ চরিত্র রহিয়াছে। ইসলামের সেই চরিত্র হইল লজ্জাবোধ (حياء)। তাল্‌হা (র)-এর পুত্র য়াযীদ (রা) হইতে এই হাদীছটি সালাম ইব্ন সাফওয়ান বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। অবশ্য এই হাদীছটি য়াযীদ তাঁহার পিতা হইতেই বর্ণনা করিয়াছেন অথবা পিতার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একটি বিতর্কিত বিষয়। ওয়াকী' (র) প্রথম মতের সমর্থক। আদ-দারা কুত্‌নী প্রণীত আল-গারাইব গ্রন্থে সেই হিসাবেই হাদীছটি বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ইমাম দারা কুতানী স্বয়ং দ্বিতীয় মতের সমর্থক। তিনি হাদীছটিকে মুরসাল বলেন এবং য়াযীদের পর তালহা (রা)-এর নাম উল্লেখকে ওয়াকী'-এর বিভ্রান্তি সাব্যস্ত করেন। য়াহ্‌য়া ইব্ন মা'ঈনও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। য়াযীদ (রা)-ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২২৮; (২) আস-সুয়ূতী, ইস'আফু'ল-মুওয়াত্তা' (তান্‌বীরু'ল-হাওয়ালিক, মিসর তা. বি.- এর সহিত সংযুক্ত), পৃ. ২০।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তালহা ইবনুল-বারাআ (طلحة بن البراء) ঃ (রা), জনৈক আনসারী সাহাবী। বংশতালিকা নিম্নরূপঃ তালহা ইবনু'ল-বারাআ ইব্ন 'উমায়র ইব্ন ওয়াব্‌রা ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন গানাম ইব্ন সুরায়্যা ইব্ন সালামা ইব্ন উনায়ফ। কৈশোরে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা কৌতূহলোদ্দীপক। ঘটনাটি আবূ দাঊদ, ইব্নু'ল আছীর, আল-বাগাবী, ইব্ন খায়ছামা, ইব্ন আবী 'আসিম, আত-তাবারানী ইব্ন শাহীন, ইবনু'স-সাকান, আবূ নু'আয়ম প্রমুখ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ, তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসিয়া তাঁহার নিকটবর্তী হইতে হইতে একেবারে গা ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং পদচুম্বন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হস্ত প্রসারিত করুন; আমি আপনার কাছে বায়'আত করিব। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কিসের উপর? তিনি বলিলেন, ইসলামের উপর। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ যদি তোমাকে বলি, তোমার পিতাকে হত্যা কর, তবুও? তিনি বলিলেন, না। অতঃপর আবার বলিলেন, আপনার হস্ত প্রসারিত করুন; আমি বায়'আত করিব। এইবারও পূর্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। তিনি পিতৃহত্যার কাজে অস্বীকৃতি জানাইলেন। অনুরূপ তিনবার প্রশ্ন করা হইল। কিন্তু শেষবারে তিনি সম্মতি জানাইয়া বলিলেন ঃ হাঁ, পিতৃহত্যার নির্দেশ পাইলে। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত করিলেন। বায়'আতশেষে তিনি বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যাই খুশি আদেশ করিতে পারেন, আমি অমান্য করিব না। রাসূলুল্লাহ (স) অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেনঃ যাও, তোমার পিতাকে হত্যা কর। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পিতাকে হত্যা করিতে ছুটিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ক্ষান্ত করিলেন। বলিলেন ঃ হে তালহা! আমি রক্তবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য প্রেরিত হই নাই, তবে দীনের উপর তোমার যাহাতে কোন দুর্বলতা না থাকে তাহা পরীক্ষা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

ইহার কিছু দিন পরে তালহা অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ক্রমেই তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। দেখিলেন, অবস্থা আশংকাজনক। তিনি বলিলেন ঃ আমার মনে হয়, তাহার মৃত্যু আসন্ন। শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করা মাত্রই আমাকে তোমরা জানাইও, বিলম্ব করিও না। কেননা কোনও মুসলিমের মৃতদেহ তাহার পরিবারের মাঝে আটকাইয়া রাখা সমীচীন নহে। সেই রাত্রেই তালহা ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের পূর্বে তিনি ওসিয়াত করিয়া যান, তোমরা আমাকে তাড়াতাড়ি দাফন করিবে এবং আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছাইবে। এই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-কে ডাকিও না। পাছে য়াহূদীরা তাঁহার কোনও ক্ষতি করিতে পারে। তাহা ছাড়া সাপ-বিচ্ছুও তো রহিয়াছে। আমার কারণে তাঁহার কষ্ট হইবে, ইহা আমার সহিবে না। তাঁহাকে আমার সালাম বলিও। আরও বলিও, তিনি যেন আল্লাহ্‌র কাছে আমার মাগফিরাত কামনা করেন। সুতরাং রাত্রিকালেই তাঁহার দাফন সম্পন্ন করা হইল। ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সংবাদ জানান হইলে তিনি আসিয়া তাঁহার কবরের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সাহাবীগণও সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর তিনি হাত তুলিয়া বলিলেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তালহা-র সহিত এইভাবে সাক্ষাত করুন যে, আপনিও প্রফুল্ল, সেও প্রফুল্ল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২২৬, ২২৭; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (আল-ইসাবা, ২খ, ২২৬-এর টীকা দ্র.); (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ২২৭; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ৩খ. ৫৭।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা আয-যুরাকী (طلحة الزرقى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবী। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে বায়'আতু'র-রিদওয়ানে তিনি শরীক ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে তাল্‌হা ইব্‌ন আবী হাদ্‌রাদ পরিচয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন নূতন চাঁদ দেখিতেন তখন এই দু'আ পড়িতেন ঃ

اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ربى وربك الله.

"হে আল্লাহ! আমাদের উপর এই চাঁদের উদয় ঘটাও ঈমান ও নিরাপত্তা এবং ইসলাম ও শান্তির সহিত। হে চাঁদ! তোমার ও আমার প্রতিপালক আল্লাহ।"

আবূ নু'আয়ম এই হাদীছটি 'আম্‌র ইব্‌ন দীনারের সনদে তাল্‌হা আয-যুরাকী (র)-র পুত্র 'উবায়দ হইতে এবং তিনি স্বীয় পিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইমাম আত-তিরমিযী (র) একটি দুর্বল সনদে এই হাদীছটি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত প্রখ্যাত সাহাবী তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ (রা)-র সূত্রে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। ইব্‌ন 'আবদি'ল বার্‌র তাল্‌হা ইব্‌ন আবী হাদ্‌রাদ শিরোনামে যে জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাল্‌হা (রা)-কে আল-আস্‌লামী বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহার সূত্রে কিয়ামতের 'আলামত সম্পর্কিত একটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর, তা. বি., ২খ, ২২৪; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (আল-ইসাবা, ২খ, পৃ. ২১৭-এর টীকা দ্র.); (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৫৮; (৪) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৬৭৭।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তাল্‌হা আস-সুলামী (طلحة السلمى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ 'আকীলের পিতা। 'আকীল তাঁহার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তালহা (রা) শামে বাস করিতেন। শামনিবাসী মুহাদ্দিছগণ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইমাম আল-বুখারী, আল-বাগাবী, ইব্‌ন হিব্বান, ইব্‌ন আবী খায়ছামা, আবু'ল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী প্রমুখ একজন সাহাবী হিসাবে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ., ২২৪; (২) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (আল-ইসাবা, ২খ, পৃ. ২১৭-এর টীকা দ্র.); (৩) ইব্‌নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৬২; (৪) আয-যাহাবী, তাজরীদু আস্‌মাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৭৮; (৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ২৪৪; (৫) ইব্‌ন আবী হাতিম আর-রাযী, আল-জার্‌হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৭২।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তালা (৪৮) ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত সাতক্ষীরা জিলার মোট ৮৩,৩০৩ একর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ১২টি ইউনিয়ন, ১৫০টি মৌজা, ২২৪ খানি গ্রাম লইয়া গঠিত একটি উপজিলা। ১৯৮১ খৃস্টাব্দের হিসাবমতে ৩৩৭.১ ব. কি. মি. (=১৩০.২ ব. মা.) আয়াতনবিশিষ্ট উপজিলাটির ভৌগোলিক অবস্থান ২২°৩২´ ও ২২°৫০´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৯°০৫´ ও ৮৯°২০´ পূর্ব দ্রাঘিমা দ্বারা চিহ্নিত। ইহার উত্তরে কলারোয়া উপজিলা ও যশোর জিলার কেশবপুর উপজিলা, দক্ষিণে পাইকগাছা ও আশাশুনি উপজিলা, পূর্বে ডুমুরিয়া ও পাইকগাছা উপজিলা এবং পশ্চিমে সাতক্ষীরা থানা ও আশাশুনি উপজিলা। উপজিলা সদর তালা সাতক্ষীরা হইতে ২৪ কি. মি. (=১৫ মা.) দূরে অবস্থিত।

নামকরণ ঃ এখন যেই বাজার এলাকায় উপজিলা সদরের অবস্থান, সেইখানে বৃটিশ আমলে ১৯১৩ খৃ. একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাজারটির নামে থানার নাম 'তালা' রাখা হয়। কিন্তু বাজারটির স্থানীয় নাম 'তালা' রাখার কোন প্রাসঙ্গিক কারণ ছিল না। ভূ-জরিপ মানচিত্রে বাজারটি 'খাজরা' গ্রামে অবস্থিত, 'তালা' গ্রামে নহে। তাই 'তালা' নামটির উৎপত্তির ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। কেননা উলুগ খান-ই জাহান (=জগতের মহান অধিপতি যাহার প্রকৃত নাম শের খান)-এর কয়েক হাজার অনুচর তাঁহার প্রভাবশালী সহচর বুরহান খান (ওরফে বুড়ো খান) ও তৎপুত্র ফাত্‌হ খানের নেতৃত্বে উক্ত বাজার ও তৎপার্শ্ববর্তী বারুইহাটি প্রভৃতি গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য ২৮টি দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করেন। নেতৃস্থানীয় এই সকল অনুচরদের মাতৃভাষা এবং এই দেশের সরকারী ভাষা তখন ছিল ফার্‌সী। এই পরিস্থিতিতে খুব সম্ভব এলাকাটি তালাব এলাকা (অর্থাৎ পুকুর এলাকা) বলিয়া অভিহিত হয়। বৃটিশ আমলে এই দেশের বহু স্থানের আরবী-ফারসী নাম বিকৃত হইয়াছে। অতএব 'তালাব' নামটি তালা নামে রূপান্তরিত হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

১৯৮১ খৃ. অনুষ্ঠিত আদমশুমারি অনুযায়ী উপজিলাটির মোট লোকসংখ্যা ২,২১,০১৯ জন। উপজিলাটির মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১,৪৯,০৩৮ জন মুসলিম, ৭১,০৪৮ জন হিন্দু, ২২ জন বৌদ্ধ, ৫৫৫ জন খৃস্টান ও ৩৫৬ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এইখানে শিক্ষার হারের গড় ছিল ২২.৯%; তন্মধ্যে পুরুষের হার ৩১.৭% এবং স্ত্রীলোকের ১৩.৫%। এইখানে ২টি মহাবিদ্যালয়, ২৯টি মাধ্যমিক/নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ২৯টি মাদরাসা, ১৯৪টি মসজিদ, ১০৪টি ঈদগাহ, ৪০টি মন্দির ও ৫টি গির্জা ছিল।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ বিখ্যাত এলাহাবাদ লিপি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে এতদঞ্চল বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃ. ৪র্থ শতকের ইতিহাস সম্পর্কে দ্র. খুলনা ও সাতক্ষীরা প্রবন্ধদ্বয়।

ইসলাম প্রচার ঃ কপোতাক্ষ নদ তীরবর্তী তালা উপজিলায় সর্বাগ্রে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন খান-ই জাহান (র)-এর প্রভাবশালী সহচর বুরহান খান ও তৎপুত্র ফাত্‌হ খান। ইঁহারা কয়েক হাজার সঙ্গীসহ যশোরের মুড়লী কসবা হইতে সরাসরি দক্ষিণদিকে কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি ও মাগুরাঘোনা অতিক্রম করিয়া তালা উপজিলার ডাঙ্গানলতা গ্রামে উপস্থিত হন। যেই পথ দিয়া তাঁহারা যশোর হইতে সরাসরি তালা উপজিলায় আগমন করেন সেই পথের দূরত্ব প্রায় ৩০ কি. মি.। ডাঙ্গানলতা হইতে তালা উপজিলা সদর মাত্র দুই কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত। এই অঞ্চল তৎকালে লবণাক্ত জলাভূমি ছিল। খান জাহানের শাগরিদবর্গ তালা উপজিলার আটারই গ্রামে তিন গুম্বজবিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটিতে আরবী তুগরা লিপিতে যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভবপর হয় নাই। ওই গ্রামে হাজী দীঘি নামে একটি জলাশয় আছে। সেইখানে একটি প্রাচীন

বৃহৎকায় ভিটি ও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিটি আছে। গ্রামটিতে মাঝেমধ্যে পাকা রাস্তার চিহ্নও দেখা যায়। বুরহান খান (ওরফে বুড়ো খান) প্রমুখ খান-ই জাহানের অনুচরবৃন্দ তালা উপজিলার ডাঙ্গানলতা ও আগলঝাড়া গ্রামে কয়েকটি বৃহৎ বসতবাটি স্থাপন করেন। আগলঝাড়ায় তিনটি প্রকাণ্ড ইটের ধ্বংসস্তূপ বা বৃহদাকারের ভিটা আজিও বিদ্যমান।

ডাঙ্গানলতার দক্ষিণে বায়ড়া গ্রামে কয়েকটি বিশাল দীঘি আছে। উহার দক্ষিণে অর্থাৎ তালা উপজিলা সদরের উত্তর পার্শ্বে বারুইহাটি গ্রাম। ওই গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোট ২৮টি পুষ্করিণী খনন করা হয়। উহাদের কয়েকটি আজিও বর্তমান। জনসাধারণের ধারণা, এক জায়গায় এতগুলি বিরাটকায় পুকুর নিশ্চই জীন-পরীতে খনন করিয়াছে। তালা উপজিলা সদর হইতে প্রায় ৩ কি. মি. দূরে কপোতাক্ষ নদের দক্ষিণ তীরে মাগুরা গ্রামে পীর যায়নু'দ-দীন শাহ (পীর জয়ন্তী) নামক জনৈক ইসলাম প্রচারকের দরগাহ আছে। ইনি খান-ই জাহানের শাগরিদ ছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে বিতর্ক আছে। যাহা হউক ইনি এতদঞ্চলে খুবই সম্মানিত কামিল পীর ছিলেন। তাঁহার দরগায় আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর মেলা বসে। কপোতাক্ষ নৌপথে পূর্বাদিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই সুজনশাহ গ্রামে সুজনশাহের আস্তানা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই গ্রামে তাঁহার বসতবাটির চিহ্ন ও দীঘি আছে। ইনি খান-ই জাহানের অনুচর বুরহান খানের অনেক পরে এতদঞ্চলে আসিয়া ইসলাম প্রচার করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম শাহ শুজা'উ'দ-দীন।

আবার উল্লিখিত ডাঙ্গানল্বতা গ্রাম হইতে মাত্র এক কি. মি. পূর্বে ডুমুরিয়া উপজিলাধীন আরশনগর গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আছে। উহা বাংলার সুলতান 'আলাউ'দ-দীন হুসায়ন শাহ কর্তৃক ৯০৭/১৫০১ সনে নির্মিত হয়। মসজিদটির দক্ষিণ পার্শ্বে শায়খ শাহ আফযাল নামক জনৈক কামিল পীরের মাযার ও মসজিদের পূর্বপার্শ্বে ভরাট হইয়া যাওয়া বিশাল দীঘি বর্তমান শতকের চল্লিশের দশকে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত শায়খ শাহ আফযাল খান-ই জাহানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে তালা উপজিলা এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। তালার ৩ কি. মি. উত্তরে 'তেঁতুলিয়া' গ্রামে কাযীদের সুদৃশ্য মসজিদটি দেখিতে যেন আগ্রার তাজমহলেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। তেঁতুলিয়ার কাযী বংশ তালা উপজিলা এলাকায় ইসলামী সংস্কৃতি সংরক্ষণে অসামান্য অবদান রাখেন।

গত শতকের শেষাংশ হইতে যাঁহারা তালা এলাকায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে যশোরের মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহের উল্লাহ্‌র (১২৬৮ বাং/১৮৬১ খৃ.-১৩১৪/১৯০৭) নাম সর্বাগ্রগণ্য। তিনি তাঁহার একান্ত অনুগত মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন প্রমুখ শাগরিদসমেত তালা অঞ্চলে সভা-সমিতি অনুষ্ঠান করিয়া শারী'আতের রীতিনীতির সঠিক ব্যাখ্যা তুলিয়া ধরেন। তিনি এই অঞ্চলে ইসলামী সংস্কৃতি প্রচারে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেন ও মুসলমানগণকে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের বিপর্যয় হইতে রক্ষা করেন। অতঃপর এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নিবাসী মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র) [১৮৪৯-১৯৩৯ খৃ.] সাহেবের নাম। বশীর হাট নিবাসী মাওলানা রূহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫) ও কলারোয়া নিবাসী মাওলানা মুইজুদ্দীন হামিদী (১৮৯৫-১৯৬৬ খৃ.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ 'আলিম তালায়ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখিয়াছেন। সাতক্ষীরার কাজি মহল্লার সৈয়দ (সায়্যিদ) পরিবারও এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারে অশেষ অবদান রাখেন।

তালা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যাঁহার অবদান সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, তিনি ছিলেন কালিগঞ্জ উপজিলাধীন নলতা গ্রামের খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ (১৮৬৩-১৯৬৭ খৃ.)। তিনি প্রায় ৮০ খান পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাদের অধিকাংশই ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কিত। ইনি ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয় ছিলেন। তালা উপজিলার ইসলামকাটি ইউনিয়নের বারাত গ্রাম নিবাসী মাওলানা ইলাহী বখশ একজন কামিল পীর ছিলেন। তিনিও বিশ শতকে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিক যুগের স্রষ্টা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের পিতামহ রামনিধি দত্ত তালার অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র রাজনারায়ণ দত্তসহ অন্যান্য পুত্র-কন্যাকে লইয়া অদূরবর্তী সাগরদাঁড়ি গ্রামে (যশোর জিলা) গিয়া মামার বাড়িতে বসবাস করিতে থাকেন। পরবর্তী কালে তিনি উক্ত জমিদার বংশের উত্তরাধিকার লাভ করিয়া ভূস্বামীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই রাজনারায়ণই মাইকেল মধূসূদন দত্তের পিতা। তালা উপজিলার তেঁতুলিয়া গ্রামে বৃটিশ আমলের স্বাধীনতা সংগ্রামী অবিভক্ত বাংলার লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পীকার সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh Population Census 1981, Community Tables of All Thanas of Khulna District, Nov. 1985, P. CLXXIII etc.; (2) Bangladesh Bureau of Statistics, Upazila Statistics of Bangladesh, August 1988. PP. 13, 143 etc; (৩) দৈনিক ইনকিলাব, ১২ কার্তিক/২৮ অক্টোবর, ১৯৯১, পৃ. ৪. "কপোতাক্ষ তীরের দরবার স্তম্ভ" শীর্ষক প্রবন্ধ; (৪) আবুল কালাম মোহাম্মাদ যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, প্রকাশক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, অগ্রহায়ণ ১৩৯১/ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১২-১৮; (৫) এ. এফ. এম. আবদুল জলীল এডভোকেট, হযরত খান জাহান আলী, অগ্রহায়ণ ১৩৭৩/ডিসেম্বর ১৯৬৬, পৃ. ২৬-২৮; (৬) মুহম্মদ আবূ তালিব, খুলনা জেলায় ইসলাম, ঢাকা ১৯৮৮ খৃ., পৃ. ৯০-৯৪; (৭) গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪/জুন ১৯৮৭; (৮) খান সাহেব আবিদ আলী খান, Memoirs of Gaur and Pandua (গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্মৃতি), অনু. ও সম্পা. চৌধুরী শামসুর রহমান, পৃ. ১৯০-৯২; (৯) Bangladesh District Gazetteers, Khulna 1978 Edition, Govt. of the People's Republic of Bangladesh, p. 43--60; (১০) মেঘনাদবধ কাব্যের ভূমিকা, প্রকাশকাল তা. বি.।

মুহম্মদ ইলাহি বখশ

তালা'ই' ইব্ন রুয্যীক (طلائع بن رزيق) ঃ আল-মালিক আস-সালিহ, একজন ফাতিমী উযীর (৪৯৫-৫৫৬/১১০১-১১৬১)। খৃস্টীয় ১২শ শতাব্দীতে ফাতিমী খলীফা আজ-জাফির-এর ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ড (১১৫৪ খৃ.) ঘটে। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যেই সকল অব্যবহিত ঘটনা সংঘটিত হয় সেই প্রেক্ষিতে আবশ্যিকভাবে একজন শক্তিশালী নেতার ভূমিকা পালনের জন্য রাজকীয় পরিবারের মহিলা সদস্যদের অনুরোধে তাঁহাকে তাঁহার উশমুনায়ন-এর গভর্নর পদ পরিত্যাগ করিয়া আগাইয়া আসিতে হয়। মিসরের উজান এলাকা হইতে তাঁহার অনুসারী বাহিনী সমভিব্যাহারে কায়রো অভিমুখে তাঁর অগ্রযাত্রা

সাফল্য লাভ করে। অতঃপর 'আব্বাস-এর ক্ষমতাচ্যুতির পর তিনি ৫৪৯/১১৫৪ সালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক খলীফা আল-ফা'ইদ -এর উযীর পদে নিযুক্তি লাভ করেন। আল-ফা'ইদ আস-সালিহ বিল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হন। তালা'ই'-এর বিশ্বাসঘাতক পূর্বসূরী আব্বাস তাঁহার সকল ধন-সম্পদ লইয়া ফিলিসতীনে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি খৃস্টান ক্রুসেডারদের হস্তে নিপতিত হন। তালা'ই' শেষোক্ত পক্ষের সহিত তাহাদের হস্তে বন্দী 'আব্বাসকে হস্তান্তর করিবার ব্যাপারে আলাপ- আলোচনান্তে সমঝোতা হয়। সমঝোতা অনুযায়ী ১০,০০০ দীনার তাহারা প্রদান করে (ইব্ন ইয়াস, ১খ, ৬৬)। এই হস্তান্তর সম্পাদন করা হইলে 'আব্বাস ও তাঁহার পুত্র নাসর-কে কায়রোতে আনয়ন করা হয় এবং তথায় তাহাদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এই ধরনের একজন সেনানায়কের ক্ষেত্রে যেইরূপ আশা করা যায় ঠিক সেইভাবেই তালা'ই' সকল বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখেন।

অবসর সময়ে তিনি কাব্য রচনায় মনোযোগ দিতেন এবং তাঁহার এই কাব্যপ্রীতি এমন কি তাঁহার সামরিক বিষয়ে লিখিত পত্রাবলীর লেখন ভঙ্গিমার মধ্যেও প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। ইব্ন খাল্লিকান-এর রচনায় তাঁহার রচিত কাব্যের নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে (১খ, ৬৫৮)। যদিও তিনি জনগণকে করভারে জর্জরিত করিতে দ্বিধা করেন নাই, তথাপি তিনি শিল্প ও সাহিত্যের একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যেই মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন উহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি কায়রোর বাবু'য-যাবীলা-র নিকটে বর্তমান রহিয়াছে এবং তাহা ধর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচায়ক। তিনি ছিলেন ইসলাম'ঈলীগণের একজন সার্বক্ষণিক শক্তিশালী সমর্থক। খলীফা তাঁহার একাদশ বয়ঃক্রমে (১১৬০ খৃ.) মৃত্যুবরণ করিলে এবং তাঁহার উত্তরসুরিরূপে অপর একজন নাবালক, ফাতিমী বংশের শেষ সদস্য তাঁহার জ্ঞাতিভ্রাতা আল-'আদিদ ক্ষমতা লাভ করিলে তালা'ই' উযীররূপে তাঁহার পদে অপরিবর্তিত থাকেন এবং তাঁহার কন্যাকে নূতন খলীফার সহিত বিবাহ দেন।

যদিও তিনিই ছিলেন কার্যত দেশের শাসক, তথাপি তাঁহার রাজনৈতিক শত্রুদের দ্বারা তাঁহার ক্ষমতা বিপন্ন হওয়া ছিল কেবল সময়ের ব্যাপার। অন্যান্য হেতুর সঙ্গে রাজকীয় অন্দরমহলের উপর আরোপিত তাঁহার বিধিনিষেধ তাঁহার উপর খলীফার ফুফুর আক্রোশ ডাকিয়া আনে এবং তাঁহার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে উযীর গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা নিহত হন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তাঁহার অদম্য চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ষড়যন্ত্রী এই মহিলাকে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশে প্রদানের মাধ্যমে। ১৯ রামাদান, ৫৫৬/সেপ্টেম্বর, ১১৬১ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত কারাফা-র সমাধিক্ষেত্রে কবর দেওয়া হয়।

আবূ সালিহ-এর প্রণীত কালপঞ্জীতে (পৃ. ৮৯ খ.) একটি কাহিনী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহাতে মিসরের উজান অঞ্চলের একজন বৃদ্ধ খৃস্টান সাধু, তিনি যখন একজন প্রাদেশিক গভর্নর মাত্র ছিলেন, তখনই তালা'ই'কে এই মর্মে ভবিষ্যত বাণী প্রদান করেন যে, তিনি একদা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন হইবেন। এই ভবিষ্যত বাণী সত্য প্রমাণিত হইবার পর উযীর উক্ত মঠের জন্য অনুদানরূপে ভূমি প্রদান করেন বলিয়া কথিত আছে।

তিনি আর যাহাই হউন না কেন, তিনি সন্দেহাতীতভাবেই একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন। কূটনীতি আর্থিক উৎকোচ এবং সামরিক অভিযান দ্বারা ফিলিসতীন হইতে ক্রুসেডার বাহিনীকে বিতাড়িত করিতে তিনি তাঁহার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি সফল হইতে পারেন নাই প্রধানত দামিশকের সুন্নী মুসলিম শাসকের সহিত তাঁহার আলোচনা ব্যর্থ হইবার কারণে। কথিত আছে যে, তাঁহার মৃত্যুশয্যায় তাঁহার শেষ আক্ষেপ ছিল ফ্রাংকদের হস্ত হইতে জেরুসালেম পুনরাধিকারে তাঁহার ব্যর্থতার জন্য। কথিত আছে যে, তিনি উযীর থাকাকালীন আমালরিক মিসর আক্রমণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, অনু. de Slane, ১খ, ৬৫৭-৬৬১; (২) ইব্ন দুকমাক, কিতাবু'ল-ইনতিসার, ৪খ, ৫৬; ৫খ, ৪৫; (৩) আবূ সালিহ, Churches and Monasteries of Egypt, অনু. Evetts, নির্ঘণ্ট; (৪) ইব্ন ইয়াস, তা'রীখ মিসর, ১খ, ৬৬-৬৭; (৫) মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ২৯৪; (৬) H. Derenbourg, Oumara du Yemen, নির্ঘণ্ট; (৭) ঐ লেখক, Vie d'Ousma, পৃ. ১৭৭; (৮) Kay, Omarah's Hist. of Yaman, ৬খ, ৭৮; (৯) আস-সুয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাদারাহ, কায়রো ১৩২৭ হি., ২খ, ১৭; (১০) S. Lanepoole, Egypt in the Middle Ages, নির্ঘণ্ট; (১১) Wustenfeld, Geschichte der Fatimiden Chalifen, নির্ঘণ্ট; (১২) W. B. Stevenson, The Crusaders in the East, পৃ. ১৮৬।

J. Walker (E.I [1])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তালাক (طلاق) ঃ আভিধানিক অর্থ 'পায়ের বন্ধন খুলিয়া ফেলা', আতলাকা'ল-বা'ঈরা মিন ইকালিহি (সে উটের পায়ের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল)। তাল্লাকা'ল-মারআ (সে স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল)। হুওয়া তালিক (সে পায়ের বন্ধন হইতে মুক্ত)। ইহা হইতে রূপক অর্থে–তাল্লাকা'ল-মারআ (সে স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল)। তালিকা "বিবাহের বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত নারী" (আর-রাগিব, আল-মুফরাদাত, শিরো.)। শারী'আতের পরিভাষায় 'স্বামী কর্তৃক স্ত্রীক বিবাহের বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।" তালাক অথবা ইহার সমার্থবোধক শব্দ উচ্চারণপূর্বক স্ত্রীর সহিত স্বামীর সম্পর্কচ্ছেদ করা। ইহা ইসলামের পারিবারিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে স্বামী কর্তৃক "আনতি তালিকুন" বলা। তালিক শব্দের ক্রিয়াপদ তাল্লাকা, যাহার অর্থ (উটকে) বন্ধনমুক্ত করিয়া দেওয়া, স্ত্রীকে বিবাহের বন্ধন হইতে মুক্ত করা। তালিক শব্দের অর্থ দড়ির বন্ধনযুক্ত উট অথবা বিবাহের বন্ধন হইতে মুক্ত নারী (দ্র. লেন, মাদ্দুল-কামূস; লিসানু'ল-'আরাব, শিরো.)। ইসলাম ধর্মে ইহা নিজের বিবাহিত স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি শারী'আতসম্মত পন্থা।

১. জাহিলী যুগের আরব সমাজে কেবল পুরুষদের জন্য এই অধিকার সংরক্ষিত ছিল যে, সে যখন ইচ্ছা করিত বিবাহের বন্ধন শেষ করিয়া দিত। মহানবী মুহাম্মাদ (স)-এর বহুপূর্ব হইতে আরবে এই প্রকার তালাকের রেওয়াজ সাধারণভাবে বিদ্যমান ছিল। ইহার এই অর্থ মনে করা হইত যে, বিবাহের কারণে নারীর উপর পুরুষের যে অধিকারসমূহ রহিয়াছে, তাহা তৎক্ষণাৎ ও চূড়ান্তভাবে ত্যাগ করিতে পারিত [তু. Th. W. Juynboll. De Mohammedanische bruidsgave (লাইডেন, ডক্টোরিয়াল থিসিস), পৃ. ৪২, ৬৪. যাহা W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, ২য় সং, পৃ. ১১২ প. এবং Welhausen, Die Ehe bei den Nachrichten v. d. Konigl, Ges. d. wiss (Arabern, Gottingen ১৮৯৩ খৃ.) কর্তৃক গৃহীত মতের বিপরীত]। বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য নারীর অধিকার ও আবেদনের জন্য দ্র. শিরো. খুলা'।

২. কুরআন মাজীদ তালাকের এমন নীতিমালা নির্ধারণ করিয়াছে যাহা এই পদক্ষেপের প্রতিটি দিকের উপর পরিব্যাপ্ত। উহার ব্যাপকতার দ্বারা এবং ইহা অপেক্ষা অধিক উহার সঠিক বাস্তবায়নের অসংখ্য দিকনির্দেশনা হইতে এই কথা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, মহানবী (স) তালাক সম্পর্কে (কুরআন মাজীদের হিদায়াত মুতাবিক) নূতন বিধিমালা জারি করিতেছেন যাহা সম্পর্কে তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা তাঁহার পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। তিনি লক্ষ করিলেন যে, অভিভাবক অথবা স্বামী সাধারণভাবে এবং তালাকের ব্যাপারে বিশেষভাবে নারীর উপর অবৈধ চাপ প্রয়োগ করে এবং এই ব্যাপারটি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঘৃণিত মনে হয়। জোরপূর্বক তালাক (তালাক বি'ল-জাব্‌র) সম্পর্কে প্রথম যে বিধান নির্দিষ্ট হয় তাহা ছিল এই যে, তালাককে নারীর নিকট হইতে সম্পদ লাভের হাতিয়ার বানানো যাইবে না।

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا . وَكَيْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا .

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাহাদের একজনকে অগাধ সম্পদও দিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই ফেরত লইও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচার দ্বারা উহা গ্রহণ করিবে? কিরূপে তোমরা উহা গ্রহণ করিবে, যখন তোমরা একে অপরের সহিত সংগত হইয়াছ এবং তাহারা তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি লইয়াছে?" (৪ ঃ ২০-২১)।

ইহা হইতে জানা গেল যে, স্বয়ং তালাককে বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত আয়াত নাযিলের দিক হইতে ৩য়-৫ম বর্ষের সহিত সম্পর্কিত। নাযিলের সময়কাল সম্পর্কিত পূর্ণ বিবরণ পরবর্তীতে দেওয়া হইয়াছে (তু. Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans)। ইহার পূর্ববর্তী আয়াত নারীর অভিভাবক ও আত্মীয়-স্বজনদের অযথা বাড়াবাড়ির সহিত সম্পৃক্ত।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ .

"হে ঈমানদারগণ! নারীদিগকে জোরপূর্বক তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নহে। তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ তাহা হইতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিও না– যদি না তাহারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে" (৪ ঃ ১৯)।

ইহার পর তালাকের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও একটি আয়াত তালাকের একটি নূতন বিধান যোগ করিয়াছে অর্থাৎ অপেক্ষাকাল, ('ইদ্দাত)। ইহার দুইটি উপকারী দিক রহিয়াছে। (এক) তালাকপ্রাপ্তা নারীর কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার পিতৃত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকিবে না। (দুই) স্বামী তাহার তালাক প্রত্যাহার করিয়া নিজের তাড়াহুড়ার প্রতিবিধান করার অবকাশ পাইবে। অতএব কুরআন মাজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"তালাকপ্রাপ্তা নারিগণ তিন হায়য কাল প্রতীক্ষায় থাকিবে। তাহারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হইলে তাহাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তাহারা আপোস-নিষ্পত্তি করিতে চায় তবে উহাতে তাহাদের পুনঃগ্রহণে তাহাদের (তালাকদাতা) স্বামিগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে– যেমন আছে তাহাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (২ ঃ ২২৮)।

উপরোক্ত আয়াতে স্ত্রীকে 'ইদ্দাত কাল চলার মধ্যে ফিরাইয়া নেওয়ার অধিকার স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে (দ্র. আল-হিদায়া, লাখনৌ ১৩১৪ হি., কিতাবু'র-রাজআতি, পৃ. ৩৭৩)। এই যে অধিকার (অতীব বিচক্ষণতার সহিত) পুরুষদের দেওয়া হইল, তাহা পরবর্তী কালে কোন কোন লোকের হাতে অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে প্রয়োগ হইতে থাকে। 'ইদ্দাতকাল শেষ হওয়ার প্রায় কাছাকাছি হইলে স্বামী নিজ স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইত এবং তৎক্ষণাৎ নূতনভাবে তালাক দিত এবং এইভাবে সে সব সময় 'ইদ্দাত পালনরত অবস্থায় থাকিত। জাহিলী যুগে যেহেতু তালাকের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না, তাই যে কোন সময় স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া সম্ভব ছিল, তা দশবার তালাক দিলেও। তাই আয়াতে ভবিষ্যতে প্রত্যাহারযোগ্য তালাকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং তালাকের পরিবর্তে সম্পদ গ্রহণের পন্থাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে (দ্র. মুল্লা জিয়ুন, আত-তাফসীরাতু'ল-আহ্‌মাদিয়্যা, বোম্বাই ১৩২৭ হি., পৃ. ১৩২, আলোচ্য আয়াতের অধীনে; আরও দ্র. আল-জাসসাস, আহ্‌কামু'ল-কুরআন, ১খ, ৩৭৯, ছত্র ১৯)। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, স্ত্রী ইচ্ছা করিলে অর্থ প্রদানের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে অর্থাৎ হয় নিজের নেয়া মহরের অর্থ ফেরত দিবে অথবা অন্য কোন আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিবে। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا .

"এই (প্রত্যাহারযোগ্য) তালাক দুইবার; অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে। তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের যাহা প্রদান করিয়াছ তাহা হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নহে" (২ ঃ ২২৯)।

আয়াতে রাজ'ঈ শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও এইখানে রিজ'ঈ তালাকই বুঝানো হইয়াছে এবং এখানে রুজ'আত (প্রত্যাবর্তন) দ্বারা রাজ'আতের দুইটি পন্থাই বুঝানো হইয়াছে অর্থাৎ যে রাজ'আত নূতনভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান ছাড়াই হইয়া থাকে এবং যে রাজ'আত নূতনভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হইয়া থাকে। কারণ এই দুইবারের তালাক যদি খুলা' অথবা বা'ইন তালাকের আকারে হয় তবে সেই ক্ষেত্রে নূতনভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই কেবল রাজ'আত হইতে পারে এবং যদি খুলা' বা বা'ইন তালাক হিসাবে না হইয়া থাকে তবে দুই তালাকের সীমা পর্যন্ত পুনর্বিবাহ ছাড়াই রাজ'আত হইতে পারে। ইহার পর তৃতীয় তালাকের বিধান উভয় ধরনের তালাকের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য অর্থাৎ তৃতীয় তালাকের পর স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিবে না (আত-তাফসীরাতু'ল-আহ্‌মাদিয়্যা, পৃ. ১২৪)। ইহার পর ইহার সহিত সংযুক্ত ব্যতিক্রমিক বাক্যে (جملة اشنائيه) খোলার অনুমতি ব্যক্ত করা হইয়াছে–যাহার আলোকে স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজের

পক্ষ হইতে কিছু অর্থ প্রদানের বিনিময়ে স্বামীর নিকট হইতে তালাক আদায় করিতে পারে। এইখানে জোরপূর্বক তালাক আদায় করা যথারীতি নিষিদ্ধ। ইহার পর দুইয়ের অধিককবার তালাক দেওয়ার বিধান বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ

فَانْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَانْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجِعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .

"অতঃপর সে যদি (দুইবার তালাক দেওয়ার পর তৃতীয় বার) তাহাকে তালাক দেয় তবে ঐ স্ত্রী তাহার জন্য বৈধ হইবে না। তবে যদি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ হয় এবং সে তাহাকে তালাক দেয় এবং তাহারা উভয়ে মনে করে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তবে তাহাদের উভয়ের জন্য পরস্পরের দিকে ফিরিয়া আসায় কোন দোষ নাই। এইগুলি আল্লাহ্‌র সীমারেখা। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন" (২ ঃ ২৩০)।

খুব সম্ভব উপরোক্ত আয়াতের দ্বিতীয় অংশের প্রস্তাবক একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ তিন তালাকপ্রাপ্তা নারী এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল। পরে সেও তাহাকে তালাক দিল এবং তাহার মনে প্রথম স্বামীর সহিত পুনর্বিবাহের আগ্রহ সৃষ্টি হইল (দ্র. বুখারী, কিতাবু'ত-তালাক; আল-খাযিন, কায়রো ১৩২৮ হি, ১খ, ১৭০)। স্ত্রীকে ফিরাইয়া নেওয়ার সুবিধা হইতে অন্যায়ভাব লাভবান হওয়ার সুযোগ বন্ধ করার জন্য আরও বিধান দেওয়া হইয়াছে– যাহা দ্বারা পরিষ্কারভাবে স্ত্রীকে ফিরাইয়া নেওয়ার বাহানায় তাহাকে বিরক্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ সম্পদ আদায়ের নিকৃষ্ট প্রথার প্রতিরোধ করা হইয়াছে।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا .

"যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তাহারা 'ইদ্দাত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাহাদিগকে রাখিয়া দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু তাহাদের ক্ষতি করিয়া সীমা লংঘন উদ্দেশ্যে তোমরা তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না। যে ব্যক্তি তাহা করে সে নিজের উপর জুলুম করে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু বানাইও না"...(২ ঃ ২৩১)।

এইখানে পারস্পরিক সমঝোতার সুযোগ লইয়া স্ত্রীকে ফিরাইয়া নিয়া তাহাকে নিজের নিকট রাখিয়া এবং তাহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়া নিজেকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে মুক্ত করিয়া নিতে বাধ্য করিতে স্বামীকে নিষেধ করা হইয়াছে। ২৩২ নম্বর আয়াতে যাহা সম্ভবত ঐ যুগে নাযিল হইয়াছে– তালাকপ্রাপ্তা নারীদের অভিভাবকদিগকে অনুশাসন ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সূরা বাকারার ২৮৮ নম্বর আয়াতের পরে কিন্তু পঞ্চম হিজরীর কিছু পূর্বে তালাকের অন্যান্য বিধান সূরা তালাক-এও বিদ্যমান রহিয়াছে।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ اِلاَّ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا .

"হে নবী! তোমরা স্ত্রীলোকদের তালাক দিতে চাহিলে তাহাদের 'ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের তালাক দিও, 'ইদ্দাতের হিসাব রাখিও এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা তাহাদেরকে তাহাদের ঘর হইতে বহিষ্কার করিও না এবং উহারাও যেন বাহির না হয়–যদি না উহারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। এইগুলি আল্লাহ্‌র বিধান। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে সে নিজের উপরই অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়ত আল্লাহ ইহার পর কোন উপায় বাহির করিয়া দিবেন (অর্থাৎ স্ত্রীর ব্যাপারে স্বামীর মত পরিবর্তন হইবে এবং সে তাহাকে ফিরাইয়া লইবে)" (৬৫ ঃ ১)।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .

"তাহাদের ইদ্দাত পূরণের কাল আসন্ন হইলে তোমরা হয় যথারীতি তাহাদেরকে রাখিয়া দিবে, অন্যথায় যথাবিধি তাহাদের ত্যাগ করিবে এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখিবে, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিও। তোমাদের মধ্যে যে কেহ আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে–ইহা দ্বারা তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে" (৬৫ ঃ ২)।

আল্লাহ্‌র বিধান অনুসরণের জন্য আরও অধিক উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে ঃ

وَالّٰئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰئِىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولاَتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا .

"তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুবতী হইবার আশা নাই তাহাদের 'ইদ্দাত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদের 'ইদ্দাতকাল তিন মাস এবং যাহারা এখনও ঋতুবতী হয় নাই তাহাদেরও; এবং গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দাতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তাহার সমস্যার সমাধান সহজ করিয়া দিবেন" (৬৫ ঃ ৪)।

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُّجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَاِنْ كُنَّ اُولاَتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেই স্থানে বাস কর–তাহাদিগকে সেই স্থানে বাস করিতে দাও, তাহাদেরকে উত্ত্যক্ত করিও না সংকটে ফেলিবার জন্য। তাহারা গর্ভবতী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদের জন্য অর্থ ব্যয় করিবে" (৬৫ ঃ ৬)।

উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সন্তানকে স্তন দানকালীন সময়ের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। অত্র আয়াতে তালাকদাতা স্বামীর উপর কতিপয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইয়াছে– যাহা 'ইদ্দাতকালীন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোশ ও বাসস্থান সম্পর্কিত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। এইখানে পৌঁছিয়া তালাকের সেই বিধানের বর্ণনা সমাপ্ত ও পরিপূর্ণ হইয়াছে যাহাতে পুরুষগণ কর্তৃক নারীদের উপর অবৈধ চাপ

প্রয়োগ করিয়া অর্থ-সম্পদ আদায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে যাহা সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে শুরু করা হইয়াছিল। ৫ম হিজরীর শেষভাগে নিম্নোক্ত বিধান নাযিল হয় ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমানদার নারিগণকে বিবাহ করিবার পর তাহাদেরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পালনীয় কোন 'ইদ্দাত নাই যাহা তোমরা গণনা করিবে। তোমরা তাহাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সহিত তাহাদের বিদায় করিবে" (৩৩ ঃ ৪৯)।

এইখানে প্রদত্ত এই সাধারণ বিধানের আরও অধিক ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা এইভাবে দান করা হইয়াছে ঃ

لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ .

"তোমরা যে পর্যন্ত না তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করিয়াছ এবং তাহাদের জন্য মাহর ধার্য করিয়াছ, তাহাদিগকে তালাক দিলে তোমাদের কোন গুনাহ নাই। তোমরা তাহাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করিও; বিত্তবান তাহার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করিবে, ইহা সত্যপরায়ণ লোকদের কর্তব্য" (২ ঃ ২৩৬)।

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلاَّ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ . وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ তাহাদের মাহর ধার্য করিয়া থাক তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক—যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ করিয়া দেওয়াই তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার সম্যক দ্রষ্টা" (২ ঃ ২৩৭)।

মনে হয় যে, উক্ত বিধানও এমন কোন কারণে জারি হইয়াছে, যাহার ফয়সালায় সন্দেহের কারণে সযত্ন চিন্তার প্রয়োজন সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। বিবাহ সম্পন্ন করার সংকল্প পূর্ণ না করার বিষয়টি, যাহাকে এইখানেও স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ইহার কোন আইনগত গুরুত্ব আছে কি (তু. Juynboll, পূ. গ্র., পৃ. ৭৩)? পূর্বোক্ত আয়াত ছাড়াও তালাকের সহিত সংশ্লিষ্ট আরও আয়াত আছে। যেমন ৩৩ ঃ ২৮ আয়াত যাহা ৫ম হিজরীর শেষভাগে নাযিল হয় এবং ৬৬ ঃ ৫ আয়াত যাহা মাদানী যুগের শেষভাগে নাযিল হয়, অনন্তর ২ ঃ ২২৬ আয়াত যাহাতে ঈলা প্রসঙ্গে তালাকের উল্লেখ আছে।

তালাকের প্রসঙ্গটি কুরআন মাজীদে যেমন বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তেমনিভাবে হাদীছ শরীফেও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। যেসব হাদীছে কুরআনের বিধানের পুনরাবৃত্তি হইয়াছে তাহার উল্লেখ এইখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এমনও কতিপয় হাদীছ আছে যাহাতে তালাকের আরও অধিক বিধান বর্ণিত হইয়াছে। এমনও কতিপয় হাদীছ আছে যাহাতে তালাকের ব্যবহার সীমিত করা হইয়াছে এবং যাহা বিবেচনার দাবি রাখে। "হালাল জিনিসসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য হইল তালাক" (আবূ দাউদ, সুনান, কিতাবু'ত-তালাক, বাব ৩, নং ২০১৮; ইব্‌ন মাজা, সুনান, তালাক, বাব ১, নং ২৯৭৭-৮), সংশ্লিষ্ট হাদীছ তিরমিযীতে নাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্ধি করানোর জন্য দুইটি বিধান হওয়া উচিত (দ্র. 'আল-খাযিন, ১খ, ৩৭৬, ৪ ঃ ৩৫ আয়াতের অধীনে)। "সতীনকে তালাক দেওয়ার জন্য স্বামীকে বাধ্য করার অধিকার কোন স্ত্রীর নাই' (তিরমিযী, দিল্লী ১৩৪২ হি., ১খ, ১৪২, ছত্র ৫)। "যে নারী পর্যাপ্ত কারণ ব্যতিরেকে স্বামীর নিকট তালাক দাবি করে তাহাকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দিবেন" (আত-তাবারী, তাফসীর, কায়রো সং, ২খ, ২৬৬, ছত্র ১ প.)। ৬৬ ঃ ১ আয়াতের অর্থ সর্বসম্মতভাবে এই মনে করা হয় যে, স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ। এইরূপ তালাককে পাপ ও অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করা হইয়াছে (দ্র. ফাতহু'ল-বারী, কায়রো ১৩২৫ হি., ৯খ, ২৮৩, ছত্র ১ ও ২)। কিন্তু এই তালাক কার্যকর হওয়ায় সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণের অসম্মতি নাই। কতেকের মতে তাহা কার্যকর হইবে না (দ্র. তাফসীরাতু'ল-আহ্‌মাদিয়্যা, বোম্বাই সং, পৃ. ৭১১, ছত্র ৮, ৯)। কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে হায়য অবস্থায় তালাক দিলে তাহাকে ফিরাইয়া লওয়া তাহার জন্য বাধ্যতামূলক এবং ইহার পর যদি তালাক দিতে হয় তবে সুন্নাত তারীকা অনুযায়ী তালাক দিবে (আল-বায়দাবী, ২খ, ৩৩৮)।

একটি বিষয় যাহা কুরআন মাজীদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই তাহা এই যে, একই সময় দেওয়া তিন তালাকের বিধান কি? এই সম্পর্কে হাদীছের গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন রিওয়ায়াত আসিয়াছে (দ্র. আল-জাসসা, আহ্‌কামু'ল-কুরআন, ১খ, ৩৮৮, ছত্র ৫ প.)। এই প্রকারের তালাকের বৈধতার সাথে সাথে ইহাকে কঠোরভাবে অবাঞ্ছিত বলা হইয়াছে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৬০, নং ৩২৮০), বরং কোন কোন সময় ইহাকে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয় (মুল্লা জিয়ুন, পৃ. ১২৪)। সেই হাদীছও উহার সমর্থন করে যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত 'উমার (রা)-র খিলাফাতের প্রথম দুই বৎসর পর্যন্ত একসঙ্গে দেয়া তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হইত এবং হযরত 'উমার (রা)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ফিক্‌হের বিধানে নিজের এই রায় অন্তর্ভুক্ত করেন যে, এই প্রকারের তালাক তিন তালাকের সমান। উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ইহার নিকৃষ্ট পরিণতির ভয় দেখাইয়া তাহাদেরকে ইহা হইতে নিবৃত্ত করা (মুসলিম, ৪খ., ১৮৩; কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৬৩, নং ৩৩২৫)। (হানাফীসহ প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাবে একই সময়ে প্রদত্ত তিন তালাক দ্বারা তিন তালাকই কার্যকর হয়। কিন্তু আহ্‌লে হাদীছগণের মতে একই মজলিসে প্রদত্ত তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হয়)। হাদীছসমূহে তালাকুস-সুন্নাহ অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছের বিধান মুতাবিক তালাকের আরও একটি শর্ত বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই যে, যে তুহরে (নারীদের মাসিক ঋতুমুক্ত অবস্থা) স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় সেই তুহরে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে পারিবে না (আল-হিদায়া, পৃ. ৩৩৪, ছত্র ৩, শেষের দিক হইতে; মুল্লা জিয়ুন, পৃ. ২৪, ছত্র ৮)।

তাহ্লীল সম্পর্কিত হাদীছসমূহে কঠোরতা সহকারে তিরস্কার, বরং এই ধরনের কাজের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত করা হইয়াছে (দ্র. কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৮, নং ৩২২৯-৩০)। তাহ্লীল-এর পারিভাষিক অর্থ এই যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করা যাহাতে সে প্রথম স্বামীর সহিত পুনর্বিবাহের উপযুক্ত হইয়া যায় (দ্র. ২ ঃ ২৩০ নং আয়াত)। ইহার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট মনস্তাত্ত্বিক কৌশল রহিয়াছে যে, দ্বিতীয় স্বামীর সহিত বিবাহ কার্যে পরিণত (অর্থাৎ নির্জনবাস) হওয়ার পরই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হইতে পারে (আল-হিদায়া, লাখনৌ সং, পৃ. ৩৭৮, ছত্র ১১; কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৮, নং ৩২৩১-৩২)। তালাক শব্দটিকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করা হইতে বিরত রাখার জন্য ঠাট্টাচ্ছলে দেওয়া তালাককেও প্রকৃত তালাক গণ্য করা হইয়াছে (কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৫-৬, নং ৩১৬৬-৭০)। পক্ষান্তরে তালাকের অর্থ যেহেতু বিবাহ বাতিল করা, তাই বিবাহের পূর্বে তালাক দেওয়ার কোন গুরুত্ব নাই (কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৬, নং ৩১৭১-৮১; ১৬২, নং ৩৩০৬)।

যে নারীকে বাইন অথবা মুগাল্লাজা তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহার সম্পর্কে কুরআন মাজীদ হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায় না যে, 'ইদ্দাত চলাকালীন সে তালাকদাতা স্বামীর নিকট হইতে খোরপোশ ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী কি না। অবশ্য কতিপয় হাদীছে এই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে এবং ইহাতে বাহ্যিক বিরোধের কারণে ফকীহ্গণের মধ্যেও মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। কতেকের মতে সে খোরপোশ লাভের অধিকারিণী, কিন্তু বাসস্থান পাওয়ার অধিকারিণী নহে; কতেকের মতে উভয়টিই পাওয়ার অধিকারিণী এবং কতেকের মতে বাসস্থান পাইবে, কিন্তু খোরপোশ পাইবে না (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-জাসসাস; আহ্কামু'ল-কুরআন, ৩খ, ৪৫৯ প.; বাব আস-সুকনা লি'ল-মুতাল্লাকা)।

ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে তালাকের বিধান ও নীতিমালার জন্য দ্র. আল-জাসসাস, আহ্কামু'ল-কুরআন, বাব যিকরি'ল-ইখতিলাফ ..., ১খ, ৩৮৫)। হাদীছের আলোকে ক্রীতদাসদেরও (দ্র. গুলাম) তালাকের অধিকার আছে (কিন্তু অন্যান্য শার'ঈ বিধানের উপর কিয়াস করিয়া) মাত্র দুই তালাক এবং অনুরূপভাবে ক্রীতদাসীর ইদ্দাতকাল শুধু দুই কুরূ' (দ্র. ২ ঃ ২২৮ আয়াতের ব্যাখ্যা) সাব্যস্ত করা হইয়াছে (দ্র. আল-হিদায়া, ২খ, পৃ. ৩৩৮, ছত্র ২)।

কোন ব্যক্তির চারের অধিক স্ত্রী থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিলে সে মাত্র চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট স্ত্রীদিগকে তালাক দিতে হইবে (আল-খাযিন, ১খ, ৩৪৩, ছত্র ৮প.)। অনুরূপভাবে সে দুই সহোদরাকে বিবাহ করিয়া থাকিলে তাহাদের একজনকে তালাক দিতে হইবে (পূ. গ্র., ১খ, ৩৬৪, ছত্র ২২ প.)।

প্রাথমিক পর্যায়ের ফাকীহ্গণ (মাযহাবগুলির সংগঠিত রূপ ধারণের পূর্ব পর্যন্ত) হাদীছের ভিত্তিতে উপরোক্ত পন্থায় তালাকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিমতসমূহ নিম্নরূপ।

তাঁহারা অনুমোদিত পন্থায় তালাক দেওয়ার বিধান এবং ইহার তিনটি অপরিহার্য উপাদানের আরও অধিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। অন্যদের তুলনায় এক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রাখেন ইব্ন 'আব্বাস (রা), ইব্ন মাস'উদ (রা), ইব্ন 'উমার (রা), আদ-দাহ্হাক, হাম্মাদ, ইবরাহীম নাখ'ঈ, 'ইকরিমা, মুজাহিদ ও মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (র)। প্রাচীনতম ফাকীহ্গণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছে অন্তঃসত্তা অবস্থায় তালাক দেওয়ার সুস্পষ্ট বিধান মজুদ আছে। অবশ্য ইবরাহীম নাখ'ঈ (র)-এর যুগ হইতে এই বিষয়টি ঐতিহাসিক রূপ ধারণ করে। এই কথা নিম্নোক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অন্তঃসত্তা নারীকে প্রদত্ত তালাকও সুন্নাত তালাকের মধ্যে গণ্য (আত-তিরমিযী, কিতাবুত-তালাক, বাব ফী তালাকি'স-সুন্নাহ; আরও দ্র. আল-জাসসাস, আহ্কামু'ল-কুরআন, ১খ, ৩৭৯, ছত্র ২২ প.; কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৬, নং ৩১৯২)। ইহার জন্য 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা), জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা), হাম্মাদ, হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখ'ঈ (র)-কে সনদ হিসাবে পেশ করা হইয়াছে। একই বৈঠকে তিন তালাক দেওয়াকে পাপের কাজ মনে করা হইয়াছে (কানযু'ল-উম্মাল, ৫খ, ১৬৩, নং ৩৩২৬), কিন্তু উহাকে তিন তালাকই গণ্য করা হইয়াছে (পূ. গ্র., ৫খ, ১৬৩, নং ৩৩২৫। এই দুইটি মাস'আলার জন্য দ্র. আল-জাসসাস, আহ্কামু'ল-কুরআন, ১খ, ৩৮১, নীচে হইতে ছত্র ২ প.; অনন্তর কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৬৩, নং ৩৩৮০) এবং ইহার অনুকূলে অনেক অভিমতও আছে (আল-জাসসাস, পূ. গ্র., ১খ, ৩৮৩, ছত্র ১ প.), যাঁহাদের মধ্যে ইব্ন 'আব্বাস (রা), ইব্ন মাস'উদ (রা), ইব্ন 'উমার (রা), হাম্মাদ, হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখ'ঈ ও যুহ্রী (র)-ও অন্তর্ভুক্ত আছেন। কূফার ফাকীহ্গণের, আওযা'ঈ, মালিক (র) প্রমুখের অভিমতও তাহাই। ইমাম শাফি'ঈ (র) একই বৈঠকে দুই বা তিন তালাক প্রদান বৈধ মনে করেন এবং যত তালাক দিবে তাহা কার্যকর হইবে (দ্র. আল-জাসসাসা, পূ. গ্র., ১খ, ৩৭৯-৮০; হিদায়া, ২খ., কিতাবু'ত তালাক, লাখনৌ সং. পৃ. ৩৩৪ প.; স্ত্রীকে একই সময়ে তিন তালাক দেওয়ার বিষয়ে দ্র. 'আবদু'র-রাহমান আল-জাযীরী, কিতাবু'ল ফিক্হ 'আলা'ল মাযাহিবিল-আরবা'আ, ৪খ, ৩৪১, ছত্র ২ প.) এবং কখনও কখনও তো ইহাকে (তিন তালাক হইয়া যাওয়া) অগ্রগণ্য মত বলা হইয়াছে যেন ইহার বিপরীত মত বর্তমান নাই। কিন্তু পরবর্তী কালে তিন তালাককে শুধু এক তালাক গণ্য করার অভিমত ব্যক্তকারী লোকের সৃষ্টি হয় (কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৫, নং ৩১৫৭)। হযরত 'উমার (রা) এই তালাককে তিন তালাক সাব্যস্ত করিয়াছেন (দ্র. আল-জাসসাস, আহ্কামু'ল-কুরআন, ১খ, ৩৮৮, ছত্র ১২ প.; ই'লামু'ল মুওয়াক্কি'ঈন, ৩খ, ৩৪; ইব্ন মাজা, অনুচ্ছেদ–যে ব্যক্তি একই মজলিসে তিন তালাক প্রদান করে)।

শারী'আতসম্মত তালাক এই যে, এক তালাক দিয়াই ক্ষান্ত হইবে অথবা যদি একের অধিক তালাক দিতে হয় তবে পৃথক পৃথক তুহরে দিবে। একই সঙ্গে তিন তালাক দিলে তাহা শারীআতের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে এবং গুনাহগার হইবে। মক্কার মুফ্তী তাউস ইব্ন কায়সানের মাযহাব এই যে, এই ক্ষেত্রে এক তালাক পতিত হইবে। এই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা 'আল্লামা ইব্নু'ল কায়্যিম (র)-এর ই'লামু'ল মুওয়াক্কি'ঈন, ৩খ, ২৪-এ বর্তমান আছে, যেখানে তিনি মুসলিম-এর হাদীছ উল্লেখপূর্বক প্রমাণ করিয়াছেন যে, উপরোক্ত অবস্থায় এক তালাকই সংঘটিত হয়। ইব্ন মুকাতিল বলেন, এক তালাকও পতিত হইবে না। জমহূরের মতানুযায়ী তিন তালাক হইয়া যাইবে এবং তালাকের পন্থাটি বিদ'আত গণ্য হইবে। শাফি'ঈগণের মতে একত্রে একাধিক তালাক দেওয়া মুবাহ (বৈধ), তবে এইভাবে তালাক না দেওয়া উত্তম, কিন্তু যত তালাক দিবে ততটাই কার্যকর হইবে (মিশকাতু'ল মাসাবীহ, কানপূর সং, ২খ, ১৬, টীকা ২) জমহূর (সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ফাকীহ্গণ) [যাঁহারা তিন তালাককে, তাহা একবারেই দেওয়া হউক বা পৃথক পৃথকবাবে, তিন তালাকই মানেন] যাঁহাদের মধ্যে ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও আদ-দাহ্হাক (র)-ও রহিয়াছেন (দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর,

২খ, সূরা বাকারা, পৃ. ২৭০, ছত্র ৮, ১০), তাঁহাদের মতে যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে সে তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। তাহার সহিত ঐ নারীর পুনর্বিবাহ কেবল এই অবস্থায় হইতে পারে যে, স্ত্রীলোকটি অন্য পুরুষের সহিত যথারীতি (তালাকের শর্তে নয়) বিবাহ পূর্ণ (নির্জনবাস) করার পর তাহার নিকট হইতে তালাক লাভ করিলে। ইহা ছাড়া মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে অন্যান্য রাবীর বর্ণনা তাবারী (র) উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছেন। মূলত ইহা اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ (২ ঃ ২২৯) আয়াতের দ্বিবিধ তাফসীরের একটি যে, তিন তালাকের এই হুকুম ঐ আয়াতের অংশ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ হইতে নির্গত এবং ইহার পরের আয়াত ইহার ব্যাখ্যাস্বরূপ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এই যে, اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ তৃতীয় তালাকের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়, বরং দ্বিতীয় তালাকের পর যে কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে সেই সম্পর্কে এবং তাহা (فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ) রাজ'আত অর্থাৎ স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ার পর। তৃতীয় তালাকের বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে (فَاِنْ طَلَّقَهَا...) রহিয়াছে (আত-তাবারী, তাফসীর, ২খ, ২৫৯, ছত্র ২, নীচ থেকে)।

এইখানে বিভ্রান্ত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে যে, আয়াতের দ্বিবিধ ব্যাখ্যার কারণে বিধানের মধ্যেও কিছুটা পার্থক্য হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বিধান একই রহিয়া গিয়াছে। এইখানে পার্থক্য এই যে, তৃতীয় তালাক কি اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ-এর দ্বারা মনে করিতে হইবে না সামনের আয়াত فَاِنْ طَلَّقَهَا দ্বারা? এইখানে নিবন্ধকার (J. Schacht) ভুলের শিকার হইয়াছেন যে, তিনি মুজাহিদ (র)-কে তাবারীর অনুসারী বলিয়াছেন, অথচ তিনি প্রবীণ তাবি'ঈগণের অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি ১০৪ হি.-তে ইনতিকাল করেন, আর তাবারী (র) ২২৪ হি.-তে অথবা ২২৫ হি.-র প্রথমদিকে জন্মগ্রহণ করেন। স্বয়ং তাফসীরে তাবারীতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, ইমাম তাবারী (র) মুজাহিদ (র)-এর মত নকল করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী আয়াতের তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন (দ্র. য়াকূত, ইরশাদু'ল-আরীব, Gibb Memorial series, পৃ. ২৪২, ছত্র ৫, ৪২৩, ছত্র ১১)।

নিবন্ধকার এইখানে (ইংরেজী নিবন্ধে) দুইটি ভুল করিয়াছেন। (এক) তিনি মুজাহিদ (র)-এর সহিত এই কথা সংশ্লিষ্ট করেন যে, স্বামী যখন দ্বিতীয় তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইল না, বরং 'ইদ্দাত অতিবাহিত হইতে দিয়াছে এবং দ্বিতীয় তালাক পূর্ণ হইতে দিয়াছে, এই অবস্থায়ও তাহ্লীল (উপরে দ্র.) অত্যাবশ্যক। অথচ তাবারী (র) মুজাহিদ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, وَتَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ -এর অর্থ দ্বিতীয় তালাকের 'ইদ্দাত অতিবাহিত হইতে দেয়া নয়, বরং সুন্নাত নিয়ম অনুযায়ী তৃতীয় তালাক (তাবারী, তাফসীর, ২খ, ২৬০, ছত্র ১২)। অবশ্য তিনি সুদ্দী (র) ও দাহ্হাক (র)-এর যে অভিমত নকল করিয়াছেন তাহা হইতে এই সন্দেহ হয় যে, তাঁহাদের মতে দ্বিতীয় তালাকের 'ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার পর তাহ্লীল অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু তাবারী এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, তৃতীয় তালাক দেওয়ার পরই তাহ্লীল ওয়াজিব হয়। দ্বিতীয় তালাকের 'ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামী তাহাকে তাহ্লীল ছাড়াই পুনর্বিবাহ করিতে পারে এবং তাবারী (র) আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র)-এর মতকে অগ্রগণ্য মনে করেন। কারণ এই মতের মধ্যে সেই সন্দেহ নাই যাহার প্রতি সুদ্দী ও দাহ্হাক (র)-এর ঝোঁক রহিয়াছে বলিয়া মনে হয় (দ্র. তাবারী, তাফসীর, ১খ, ২৬০ প.; বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. মুল্লা জিয়ূন, আত-তাফসীরাতু'ল আহ্মাদিয়্যা, বোম্বাই সং, পৃ. ১২৪, ছত্র ৮, নীচ হইতে)।

(দুই) দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক ভুল যাহা উপরে আলোচিত হইয়াছে। তাবারী (র) মুজাহিদ (র)-এর কোন বক্তব্যের সংশোধন করিয়াছেন সেই সম্পর্কে দ্র. তাবারী, তাফসীর, ২খ, ২৭০, ছত্র ২০। স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়ার পর স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে, কিন্তু ফিরাইয়া লউক বা না লউক এবং তৃতীয় তালাক দিয়া দিলে তাহলীল ব্যতীত সে তাহাকে পুনর্বিবাহ করিতে পারিবে না। তাহলীলের প্রক্রিয়াকে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে যথার্থ ও অপরিহার্য বলিয়াছেন, যেমন ইব্ন 'আব্বাস (রা), ইবনু'ল-মুবারাক (র), ইব্ন 'উমার (রা), ইবরাহীম নাখ'ঈ (র), সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (র), যুহ্রী (র) প্রমুখ (তাবারী,তাফসীর, ২খ, ২৭১ ও ২৭২)।

হাসি-ঠাট্টা করিয়া তালাক দিলেও তাহা সত্য সত্যই পতিত হইবে। ইব্ন মাস'উদ (রা), হাম্মাদ (র) ও ইবরাহীম নাখ'ঈ (র) ইহা আলোচনা করিয়াছেন (তিরমিযী, তালাক, বাব মা জা'আ ফি'ল-জিদ্দি ওয়া'ল-হাযলি ফি'ত-তালাক; ইব্ন মাজা, তালাক, বাব মান তাল্লাকা...; কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৫, নং ৩১৬৬, পৃ. ১৫৬, নং ৩১৬৮, অনন্তর পৃ. ১৫৫, নং ৩১৫৪) এবং ইহাকে সাধারণভাবে সঠিক মনে করা হয়।

যেইখানে ইঙ্গিতমূলক শব্দে (كِنَايَة) তালাক দিলে ব্যবহারকারীর মত অনুযায়ী ইহার ফয়সালা হইবে–এই নীতি ঐক্যবদ্ধভাবে স্বীকৃত। অবশ্য কোন্ শব্দকে কিনায়া (ইঙ্গিত) হিসাবে গ্রহণ করা হইবে এবং কোন্‌টিকে হইবে না–এই ব্যাপারে মতভেদ আছে (কিনায়া শব্দের অর্থ ও বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে, বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. কিতাবু'ল-ফিক্হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ, ৪খ, ৩২১ প.)।

চাপের মুখে অথবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেওয়া তালাক পতিত হইবে কিনা ইহাও আলোচনার বিষয়। চাপের মুখে দেওয়া তালাক পতিত হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। হানাফীগণের মতে তাহা সাধারণত কার্যকর হইবে, শাফি'ঈগণের মতে তাহা সাধারণত কার্যকর হইবে না। ইমাম মালিক ও আহ্মাদ (র)-এর মতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাহা কার্যকর হইবে (কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৪, নং ৩১৬৪; ইব্ন মাজা, তালাক, বাব তালাকি'ল-মুকরিহি ওয়া'ন-নাসী, সর্বশেষ হাদীছ, পৃ. ১৪৮ এবং উক্ত পৃষ্ঠার টীকা ৪; কানযু'ল 'উম্মাল, ৫খ, ১৬৪, নং ৩২৯৬)। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেওয়া তালাকের ব্যাপারেও ফাকীহ্গণের মধ্যে মতভেদ আছে (দ্র. হিদায়া, ২খ, মুজাতাবা'ঈ সং, পৃ. ৩৩৭, ২য় খণ্ড)। এই সম্পর্কে হাদীছ হইতে উভয় মতের সমর্থন পাওয়া যায় (দ্র. কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৬০, নং ৩২৭৮, ৩২৭৯)।

বিবাহ হওয়ার পূর্বে (যেমন আমি অমুক বংশের অমুক নারীকে বিবাহ করিলে সে তালাক হইয়া যাইবে) প্রদত্ত তালাকের যথার্থতার বিষয়টি ইব্ন 'আব্বাস (রা), 'আলী (রা), 'ইকরিমা (র), মুজাহিদ (র), সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (র) প্রমুখের রিওয়ায়াতের ভিত্তিতে ঐকমত্য পোষণ করিয়া সকলে প্রত্যাখ্যান করেন (তিরমিযী, তালাক, বাব মা জা আ লা তালাকা কাবলা'ন-নিকাহ্; ইব্ন মাজা, তালাক; বাব ঐ; কানযু'ল 'উম্মাল, ৫খ, ১৫৫, নং ৩১৫৩, ৩১৫৯-৬০, ৩১৬৩)। বিবাহের শর্তের সহিত সংশ্লিষ্ট তালাককে (আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তবে তুমি

তালাক) ইব্ন মাস'উদ (রা), ইব্ন 'উমার (রা), ইবরাহীম নাখ'ঈ (র) ও যুহ্‌রী (র) সঠিক মনে করিলেও অপরাপর ফকীহগণ উহার যথার্থতা অস্বীকার করেন (তিরমিযী, তালাক, বাব মা জা'আ লা তালাকা কাবলা'ন-নিকাহ্; কানযু'ল-উম্মাল, ৫খ, ১৬৩, নং ৩৩২৮-২৯, পৃ. ১৬১, নং ৩২৯৮; অধিক ব্যাখ্যার জন্য দ্র. আত্-তাফসীরাতু'ল-আহ্‌মাদিয়্যা, পৃ. ৬২৪, ছত্র ১, টীকা ১; আল-জাসসাস, আহ্‌কামু'ল-কুরআন, ৩খ., ৩৬১, বাবু'ত'- তালাক কাবলা'ন-নিকাহ)।

বিবাহের পরে এবং সহবাসের পূর্বে যে তালাক দেওয়া হয় তাহা বা'ইন তালাক হিসাবে গণ্য হয় (দ্র. ২ঃ ২৩৬; ৩৩ ঃ ৪৯)। ইহার সমর্থনে ইব্ন 'আব্বাস (রা), হাম্মাদ, ইবরাহীম নাখ'ঈ (র) ও যুহ্‌রী (র)-এর নাম উল্লেখ করা যায়। এই বিধান নিঃসন্দেহে কুরআন মাজীদের বিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ (৩৩ ঃ ৪৯; কানযু'ল-উম্মাল, ৫খ, ১৫৬, নং ৩১৮৭; হিদায়া তালাক; আল-ফাসলু ফি'ত-তালাক কাবলা'দ-দুখূল)।

তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীর বাসস্থান ও খোরপোশ সম্পর্কে হাদীছসমূহে মতভেদ আছে তাহা এইখানে উল্লিখিত হয় নাই। নিবন্ধকার (J. Schacht) এইখানে বরাত উল্লেখ্য করেন নাই। তাঁহার এই বক্তব্যের ভিত্তি অজ্ঞাত। হাদীছ ও তাফসীরের গ্রন্থাবলীতে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, বাসস্থান ও খোরপোশের ব্যাপারটি 'ইদ্দাত পালনকারিণীর সহিত সংশ্লিষ্ট এবং 'এইখানে' দ্বারা সহবাসের পূর্বে তালাকের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কারণ তাহাকে 'ইদ্দাত পালন করিতে হয় না (দ্র. ৩৩ ঃ ৪৯)। তাই তাহার বাসস্থান ও খোরপোশ পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না (দ্র জাসসাস, আহ্‌কামু'ল-কুরআন, ৩খ, ৪৫৯, ছত্র ৮, পৃষ্ঠার শেষের দিক হইতে যেইখানে ما دامت فى العدة সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে)। 'ইদ্দাত পালনকারিণীর বাসস্থান ও খোরপোশ সম্পর্কে যে মতভেদ রহিয়াছে তাহার জন্য পূ. গ্র.-এ গোটা অনুচ্ছেদ باب السكنى للمطلقة বর্তমান রহিয়াছে। সেইখানে বিস্তারিত দ্র. (আরও দ্র. মুল্লা জিয়ুন, আত-তাফসীরাতু'ল-আহমাদিয়া, বোম্বাই সং., পৃ. ৭১৭, ৬৫ ঃ ৬ নং আয়াতের অধীনে, পৃ. ১১৭, ২২ ঃ ২৮ নং আয়াতের অধীনে, কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৫৭, নং ৩২০৪-৫, ৩২০৭-৮, ৩২১৪-১৬, পৃ. ১৬৪, নং ৩৩৪৭)। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), হাসান বাসরী (র) ও 'ইকরিমা (র)-এর মতে তাহার বাসস্থান ও খোরপোশ লাভের কোন অধিকার নাই। যুহ্‌রীর বক্তব্য অনুযায়ী (যাহা প্রথমোক্ত মতের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু খুব সম্ভব ভ্রান্তির কারণে) সে কেবল বাসস্থান পাইবে। 'উমার (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা), হাম্মাদ (র), ইবরাহীম নাখ'ঈ (র)-ও তাহাকে বাসস্থান ও খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী মনে করেন [নির্জনবাসের (خلوة صحيحة) পর যাহাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে এইসব মতভেদ তাহার সম্পর্কে। নির্জনবাসের পূর্বে যাহাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহার 'ইদ্দাত পালনের প্রয়োজন নাই, অতএব তাহার জন্য বাসস্থান ও খোরপোশের প্রশ্নই উঠে না]।

'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা), সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (র) ও যুহ্‌রী (র) গোলাম (ক্রীতদাস)-কে মাত্র দুই তালাক প্রদানের অধিকার দেন, স্ত্রী স্বাধীনই হউক বা ক্রীতদাসী। পক্ষান্তরে ইব্ন মাস'উদ (রা) ও ইবরাহীম নাখ'ঈ (র)-এর মতে তালাকের সংখ্যা স্ত্রীর অবস্থার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রীতদাসীর জন্য, তাহার স্বামী গোলাম হউক বা স্বাধীন, মাত্র দুই তালাকের বিধান রহিয়াছে (বিস্তরিত দ্র. আল-জাসসাস, আহ্‌কামু'ল-কুরআন, ১খ, ৩৮৫, বাব যিকরি'ল ইখতিলাফ ফি'ত-তালাক বি'র-রিজাল; কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ১৬৩, নং ৩৩২০, ৩৩৩১, ৩৩৩৪, ৩৩৩৬)।

কুরআনের শব্দ কুরূ' (قرء , ا. ব. وقروء ; ২ ঃ ২২৮)-এর অর্থ কাহারও মতে হায়য (মাসিক ঋতুকাল) এবং কাহারও মতে তুহ্‌র (ঋতু পরবর্তী পবিত্র অবস্থা)। প্রথমোক্ত মতের সপক্ষে রহিয়াছেন ইব্ন 'আব্বাস (রা), ইব্ন মাস'উদ (রা), 'উমার (রা), দাহ্‌হাক, হাম্মাদ, ইবরাহীম নাখ'ঈ, 'ইকরিমা (র) ও ইরাকের 'আলিমগণ। শেষোক্ত মতের অনুসারী ইব্ন 'উমার (রা), যুহ্‌রী [তিনি সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাবের সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা প্রথমোক্ত অর্থের পোষকতা করে (তাবারী, তাফসীর, ২খ, ২৪৯, ছত্র ৭, নীচে হইতে), কিন্তু এই কারণে ইহা তাঁহার অভিমত হওয়া অপরিহার্য নয়। সামনের পৃ. ২৫০, ছত্র ২-এ তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, তিনি যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর মত অনুযায়ী ফাতওয়া (দ্র.) দিতেন যিনি قرء -এর অর্থ তুহ্‌র করিতেন। তাই সঠিক কথা হইবে এই যে, প্রথমোক্ত মতের অনুকূল হাদীছও তাঁহার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে] এবং মদীনার অপরাপর 'আলিমগণের মধ্যে 'আলী (রা) ও সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (র)-এর উল্লেখ উভয় দলের মধ্যেই আসে। যুহ্‌রীর বর্ণনায় সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (র) 'আলী (রা)-এর বক্তব্য নকল করিয়াছেন (পূর্বোক্ত বরাত দ্র.)। কিন্তু তাহাতে ইহাও তাঁহার মত হওয়া জরুরী নয়। রিওয়ায়াত এক জিনিস আর অভিমত ভিন্ন জিনিস। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (২ঃ২২৮), অনন্তর ২ঃ ৩১ ও ৬৫ ঃ ২ আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় সামান্য মতভেদ আছে। এই বিষয়েও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, স্ত্রীর সম্মতি না থাকিলেও তাহাকে ফিরাইয়া লওয়ার (رجوع) অধিকার স্বামীর রহিয়াছে (হিদায়া, তালাক, বাবু'র-রাজ'আহ্; আত-তাফসীরাতু'ল-আহ্‌মাদিয়্যা, বোম্বাই সং., পৃ. ১৩৫, ছত্র ১৩; আল-বাহ্‌রু'র রা'ইক, ৪খ, ৪৯, ছত্র ১৫, নীচে হইতে, বাবু'র-রাজ'আ)। উদাহরণস্বরূপ এই বিষয়টি ইব্ন 'আব্বাস (রা), দাহ্‌হাক, হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখ'ঈ, 'ইকরিমা ও মুজাহিদ (র) খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তথাপি এই বিষয়ে মতভেদ আছে।

ফিক্‌হ-এর আলোচনা ঃ ৫. তালাক প্রসঙ্গে ফিক্‌হ-এর বিধানসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার স্বামীর রহিয়াছে। তালাক শব্দের পারিভাষিক অর্থ-اسقاط حق الملك عن البضع (সংগমের অধিকার বিলুপ্ত হওয়া)। এই কথা সুস্পষ্ট যে, স্বামীরই এই অধিকার রহিয়াছে। তাই উহা সে বিলুপ্ত করিতে পারে (তালাকের সংজ্ঞার জন্য দ্র. আল-বাহ্‌রু'র-রা'ইক' ৩খ, ২৩৫, ছত্র ৮-৯, নীচ হইতে, আল-জাওহারা হইতে উদ্ধৃত)। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ব্যতীত তালাক দেওয়াকে মাকরূহ্ বলা হইয়াছে। কারণ হাদীছে ইহাকে ابغض الحلال (সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বৈধ জিনিস) বলা হইয়াছে এবং হানাফীগণ তো ইহাকে হারাম বলেন। অবশ্য ইব্ন নুজায়ম (র) আল-বাহ্‌রুর-রা'ইক-এর এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন (দ্র. ৩খ, ২৩৬, ছত্র ৮ প. নীচ হইতে; হিদায়া, তালাক, বাব তালিক'ল-বিদ'আ)। বিদ'ঈ তালাকও হারাম অর্থাৎ যে তালাকে সুন্নী তালাকের (দ্র. পূ. গ্র.) প্রয়োজনীয় শর্তাবলী উপেক্ষা করা হইয়াছে (দ্র. হিদায়া, তালাক, বাব

তালাকি'ল-বিদ'আ), কিন্তু তথাপি তালাক হইয়া যাইবে। কারণ হারাম হওয়ার ব্যাপারটি তালাক সঠিক হওয়ার সহিত সম্পর্কিত নয়। তালাকের জন্য জরুরী শর্ত এই যে, তালাকদাতাকে সাবালক ও সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হইতে হইবে (হিদায়া, তালাক, ফাসল ওয়া য়াকি'উ...) নাবালেগের তালাকের বৈধতা ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) কর্তৃক বর্ণিত একটিমাত্র হাদীছ হইতে প্রমাণিত হয়। ইব্নু'ল-মুসায়্যাব (র) ও ইব্ন 'উমার (রা) হইতে অনুরূপই নকল করা হইয়াছে (বাহ্রু'র-রা'ইক, ৩খ, ২৪৯ প., قوله لا طلاق الصبى والمجنون -এর অধীনে), কিন্তু এই মতের যথার্থতা সমালোচিত, যাহা উপরোক্ত বরাতে উল্লিখিত আছে।

ইসলামী আইনের আলোকে যে স্বামীকে অযোগ্য সাব্যস্ত করা হইয়াছে তাহার স্থলে তাহার অভিভাবক কর্তৃত্বের অধিকারী। এই ধরনের অযোগ্য বলিতে খুব সম্ভব অযোগ্য হওয়ার অধিকারীদিগকে (حجر) বুঝানো হইয়াছে। অযোগ্য হওয়ার কারণ তিনটি ঃ নাবালকত্ব, দাসত্ব ও মস্তিষ্ক বিকৃতি। নাবালেগদিগের ব্যাপারসমূহের ব্যবস্থাপনা তাহাদের অভিভাবকগণ, ক্রীতদাসদের ব্যাপারসমূহের ব্যবস্থাপনা তাহাদের মনিব করিবে এবং প্রবলভাবে মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তির বিষয়াবলী না সে নিজে আর না তাঁহার অভিভাবকগণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করিতে পারে। তালাক ও দাসত্বমুক্ত করা এমন দুইটি বিশেষ প্রসঙ্গ যাহার ব্যবস্থাপনা না নাবালেগ ও পাগল স্বয়ং করিতে পারে আর না তাহাদের পক্ষ হইতে তাহাদের অভিভাবকগণ করিতে পারে। অবশ্য ইহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থাপনা নাবালেগের পক্ষ হইতে তাহার অভিভাবক করিতে পারে। এইখানে পাগলের ব্যাপারের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাহার অভিভাবকের অধিকার নাই (দ্র. হিদায়া, কিতাবু'ল-হাজর, পৃ. ৩৫০, ছত্র ৫, নীচ হইতে)।

তালাক একটি ব্যক্তিগত অধিকার। অন্যান্য বিষয়ের মত ইহাও কোন ব্যক্তি নিজেও করিতে (তালাক দিতে) পারে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমেও করিতে পারে (দ্র. বাহ্রু'র-রাই'ক, ৭খ, ১৩৯ প., কিতাবু'ল-ওয়াকালা)। এই অধিকার সে তাহার স্ত্রীকেও অর্পণ (تفويض) করিতে পারে। এই অবস্থায় স্ত্রী স্বয়ং নিজেকে তালাক দিতে পারে (দ্র. বাহ্রু'র-রা'ইক, ৩খ, ৩১০, বাব তাফবীদি'ত-তালাক, প্রথমাংশ)। তালাক তাফবীদের তিনটি অবস্থা রহিয়াছে ঃ তাওকীল (প্রতিনিধি নিয়োগ), তাখয়ীর (অধিকার প্রদান) ও তামলীক (মালিকানা)। তিনটি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত শব্দাবলী ও বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে (বিস্তারিত দ্র. 'আবদুর-রাহ্মান আল-জাযীরী, কিতাবুল-ফিক্হ্ 'আলাল-মাযাহিবিল আরবা'আ, কায়রো সং, ৪খ, ৩৭৬, ছত্র ২ প., নীচ হইতে)।

তালাকের অধিকার প্রয়োগের পূর্বে যথার্থ বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন (এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে, সেইখানে প্রদত্ত বরাত দ্র.)। শাফি'ঈ ও হাম্বালী মাযহাবে তালাককে বিবাহের শর্তের সহিত সংযুক্ত করা বৈধ নহে, কিন্তু হানাফী ও মালিকী মাযহাবে উহা বৈধ (হিদায়া, তালাক, বাবু'ল-আয়মান ফিত-তালাক)। তালাক যে বিষয়ের সহিতই সংযুক্ত হউক, বিবাহের অবস্থায় তাহা সঠিক, এই ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু হানাফী নীতি এই যে, মালিকানা বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও সংযুক্তকরণ বৈধ এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেও মালিকানা লাভের উৎসের সহিত সংযুক্ত করাও বৈধ। উল্লিখিত বাক্যের শেষোক্ত অংশ শাফি'ঈ ও হাম্বালীগণ অস্বীকার করেন এবং মালিকীগণ বিশেষ মালিকানার ক্ষেত্রে তাহা স্বীকার করেন, কিন্তু সাধারণ মালিকানার ক্ষেত্রে তাহা অস্বীকার করেন (আল-বাহ্রু'র রা'ইক, ৪খ, ৪, ছত্র ১৮)। মালিকীগণের মতে সাধারণভাবে সংযুক্ত করা বৈধ নহে, যেমন প্রত্যেক নারী, যাহাকেই আমি বিবাহ করিব, সে তালাক হইয়া যাইবে (পূ. গ্র., ৪খ, ৪, ছত্র ১৮প.)। প্রলাপ বকা অবস্থায় অথবা পাগল অবস্থায় তালাক দেওয়া বৈধ নহে (পূ. গ্র., ৩খ, ২৪৯ প., ছত্র ৫, নীচ হইতে)।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক প্রদানের বিষয়ে সব মাযহাবে উত্তপ্ত আলোচনার সৃষ্টি হইয়াছে। স্বয়ং হানাফীগণের মধ্যে আবুল-হাসান আল-কারখী (২৬০/৮৭৩-৩৪০/৯৫১) ও আবূ জা'ফার আত-তাহাবী (২৩৯/৮৫৩-৩২১৯৩৩) তালাক না হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন (হিদায়া, তালাক, পৃ. ৩৩২, ছত্র ৪, নীচ হইতে)। অপরাধমূলক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রদত্ত তালাক পতিত হওয়ার পক্ষেই অধিকাংশের মত (আল-বাহ্র, ৩খ, ৩৪৭, ছত্র ৪)।

হানাফীগণের মতে চাপের মুখে অর্থাৎ জোরপূর্বক যে তালাক আদায় করা হয় তাহা কার্যকর হইবে। কিন্তু মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বালীগণের মতে তাহা কার্যকর হইবে না (আল-বাহ্র, ৩খ, ২৪৫, ছত্র ৪ প., নীচ হইতে, যেইখানে ইহার বিস্তারিত আলোচনা ও উভয় পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান আছে)।

সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার বাক্যের প্রয়োগে প্রদত্ত তালাক (রিজ'ঈ) অবশ্যই কার্যকরী হয়, সেই বাক্য মুখ হইতে নির্গতকারীর উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন (হিদায়া, তালাক, বাবি ঈকা'ই'ত তালাক)। শাফি'ঈগণের মতে সারীহ (সুস্পষ্ট) দুই প্রকারের। উহার এক প্রকারের দ্বারা এক রিজ'ঈ তালাক এবং দ্বিতীয় প্রকারের দ্বারা এক বায়ন তালাক হইয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রে নিয়াতের কোন মূল্য নাই–তা যাহাই হউক। হাম্বালী মাযহাবে সারীহ তালাকের হুকুম হানাফী মাযহাবের অনুরূপ (বিস্তারিত দ্র. 'আবদু'র-রাহ্মান আল-জাযীরী, কিতাবু'ল-ফিক্হ্ 'আলাল-মাযাহিবি'ল আরবা'আ, কায়রো সং, ৪খ, ৩১৬ প., মাবহাছুস- সারীহ)। তালাকদাতা যদি সুস্পষ্ট ইংগিতপূর্ণ বাক্য (كنايات الظاهرة) ব্যবহার করে তবে হানাফী, হাম্বালী ও শাফি'ঈগণ তদনুযায়ী তালাকদাতার নিয়াত কি তাহা জানিতে চায়, কিন্তু মালিকীগণের নিকট নিয়াত ইত্যাদির কোন গুরুত্ব নাই। হাম্বালীগণ কিনায়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন ঃ প্রকাশ্য (ظاهرة) ও গোপন (خفية)। উভয় ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারের সময় নিয়াতের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। শাফি'ঈগণের মতে কিনায়ার কোন শ্রেণীবিভাগ নাই, তালাক পতিত হওয়ার জন্য নিয়াত অত্যাবশ্যকীয়। হানাফীগণের মতে কিনায়ার শব্দ তিনটি যাহার মাধ্যমে এক তালাক পতিত হয়, নিয়াত যাহাই হউক না কেন। অবশিষ্ট কিনায়াসমূহের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবিভাগ আছে, কোন কোন অবস্থায় নিয়াতের গুরুত্ব আছে এবং কোন কোন অবস্থায় নিয়াতের কোন গুরুত্ব নাই (বিস্তারিত দ্র. কিতাবু'ল- ফিক্হ, ৪খ, ৩২১, মাবহাছ কিনায়াতি'ত-তালাক, টীকা ১ প.)। ইশারাত ও কিনায়াত খাফীফার ক্ষেত্রে তালাকদাতার নিয়াতকেই সিদ্ধান্তকরী বিষয় মনে করা হয়। মালিকীগণও কিনায়াতকে দুইভাবে বিভক্ত করেন ঃ জাহিরা ও খাফিয়্যা। জাহিরার ক্ষেত্রে তিন তালাক পতিত হইবে, নিয়াতের কোন গুরুত্ব নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে যেই স্ত্রীর সহিত নির্জনবাস হইয়াছে তাহার উপর তিন তালাক পতিত হইবে এবং যাহার সহিত নির্জনবাস হয় নাই (غير مدخول بها) তাহার উপর এক তালাক পতিত হইবে। কিন্তু একাধিক তালাকের নিয়াত করিলে তদনুযায়ী তালাক হইবে। তৃতীয় শ্রেণীর

ক্ষেত্রে সংগমকৃত স্ত্রীর উপর তিন তালাক পতিত হইবে এবং নিয়াতের কোন গুরুত্ব নাই। অবশ্য কিনায়াত জাহিরার বেলায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়াতের কোন গুরুত্ব নাই (পূ. গ্র., ৪খ, ৩২৬-৮)। কিনায়াত খাফিয়্যার ক্ষেত্রে তালাক নিয়াতের উপর নির্ভরশীল (পূ. গ্র.)। যখন কোন ব্যক্তিগত ঘটনা আসে তখন উপরোক্ত বিবরণের দৃষ্টিকোণ হইতে মাযহাবগুলির মধ্যে ব্যাপক মতভেদের সৃষ্টি হয়। তালাককে কোন জিনিসের সহিত শর্তযুক্ত করার ব্যাপারে (উপরোক্ত অবস্থা ছাড়া) বিধানের ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নাই। হানাফী, শাফি'ঈ ও অপরাপর ইমামগণ এই প্রকারের তালাক অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য শর্ত পুরা হওয়া অত্যাবশ্যকীয় মনে করেন। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে কিছুটা মতভেদ আছে (দ্র হিদায়া, তালাক, বাবু'ল-আয়মান ফি'ত-তালাক; খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ সম্পর্কে বিস্তারিত দ্র. কিতাবুল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল আরবা'আ, ৪খ, ৩৫৬, টীকা ১)।

নারীদের 'ইদ্দাতকাল তালাক প্রাপ্তির পরপরই শুরু হইয়া যায়, 'ইদ্দাতের সংজ্ঞা হইতে ইহা পরিষ্কার হইয়া যায় (কিতাবু'ল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিব..., ৪খ, ৫১৩; হিদায়া ২খ, পৃ. ৩২, ছত্র ৩, নীচ হইতে)। নির্জনবাসের পূর্বে প্রদত্ত তালাক সব সময় 'বায়ন' হইয়া যায় (হিদায়া, ২খ, পৃ. ৩৫০, ছত্র ৫, নীচ হইতে)। এই প্রকারের তালাকপ্রাপ্তা নারী 'ইদ্দাত পালনে বাধ্য নয় (মুল্লা জিয়ূন, তাফ্‌সীরাতু'ল-আহ্‌মাদিয়্যা, পৃ. ৬২৪, ছত্র ১ প.) এবং মোহরের অর্ধেক প্রাপ্ত হয়–যদি তাহা পূর্বে নির্ধারিত হইয়া থাকে (হিদায়া, ৩০৪, ছত্র ৯)। মোহর পূর্বে পরিশোধিত হইয়া থাকিলে তালাকপ্রাপ্তা অর্ধেক মোহর ফেরত দিতে বাধ্য (আল-ফিক্‌হ্ 'আলা'ল-মাযাহির..., ৪খ, ১৪৫, ছত্র ১৫ প.)। মোহর নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে সে কেবল কিছু উপঢৌকন পাইবে যাহা পুরুষের মর্জির উপর নির্ভরশীল এবং যাহাকে মা'তা বলা হইয়াছে (হিদায়া, ২খ, পৃ. ৩০৬, ছত্র ৫, নীচ হইতে; দ্র. ২ ঃ ২৩৭)।

রিজ'ঈ ও বায়ন তালাকের মধ্যেও পার্থক্য করার প্রয়োজন আছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিবাহের আইনগত অস্তিত্ব ফলাফল ও পরিণতিসহ অবশিষ্ট থাকে এবং 'ইদ্দাতের পুরা সময়ে নারী যথারীতি বাসস্থান ও খোরপোশের অধিকারী থাকে (হিদায়া, ২খ, পৃ. ৩৭৮, ছত্র ৪ প.)। অপরদিকে 'ইদ্দাত চলাকালীন তাহাকে স্বামী ফিরাইয়া লইতে পারে (পূ. গ্র., পৃ. ৩৭৩ প., বাবু'র-রাজ'আ)। পুরুষ এই অধিকার 'ইদ্দাত চলাকালীন সময়ের মধ্যে প্রয়োগ না করিলে 'ইদ্দাতশেষে বিবাহ চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হইয়া যায় (অর্থাৎ নারীর উপর বায়ন তালাক হইয়া যায়); মোহর পরিশোধ না করা হইয়া থাকিলে তাহা পরিশোধ বাধ্যতামূলক হইয়া যায় (পূ. গ্র., পৃ. ৩০৫, ছত্র ৬, নীচ হইতে), যদি না তাহা পরিশোধের জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে কোন তারিখ নির্ধারণ করা হইয়া থাকে (পূ. গ্র., পৃ. ৩১৪, ছত্র ৩)। যদি ঐ সময় (অর্থাৎ রাজ'ঈ তালাকের 'ইদ্দাত অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর এবং দুই বায়ন তালাকের ক্ষেত্রে 'ইদ্দাত চলাকালীন ও 'ইদ্দাতের পর উভয় অবস্থায়) উভয় পক্ষ একত্র থাকার জন্য সম্মত হইয়া যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় তবে তাহাদেরকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে ঈজাব-কবূল (প্রস্তাব ও অনুমোদন) করিতে এবং মোহর নির্ধারণ করিতে হইবে (পূ. গ্র., পৃ. ৩৭৮, ফাসল ফীমা তুহিল্লু বিহি'ল-মুতাল্লাকা)।

পক্ষান্তরে তিন বায়ন তালাকের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ বিবাহ ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাতে একটি মাত্র ব্যতিক্রম আছে এবং তাহা এই যে, স্বামী যদি মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং স্ত্রীর 'ইদ্দাতকালের মধ্যেই মারা যায়, তবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তাহার উত্তরাধিকার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হয় না। হানাফী, শাফি'ঈ ও হাম্বালীগণ বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতভেদসহ এই বিষয়ে একমত। কিন্তু শাফি'ঈগণ ইহার বিপরীত রায়কে উত্তম মনে করেন। রিজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা অবশ্য 'ইদ্দাতের মধ্যে ওয়ারিছ হইবে–স্বামী সুস্থ অবস্থায় তালাক দিক অথবা মৃত্যুকালীন রুগ্ন অবস্থায়, এই বিষয়ে সকল ইমাম একমত। অবশ্য বায়ন (তিন তালাকই হউক না কেন) তালাকপ্রাপ্তা তখনই ওয়ারিছ হইবে যখন স্বামী মৃত্যুকালীন রুগ্ন অবস্থায় তাহাকে তালাক দিবে এবং তাহার 'ইদ্দাতকালের মধ্যে সে মারা যাইবে। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাফি'ঈ ভিন্নমত পোষণ করেন এবং অবশিষ্ট ইমামগণ একমত যে, 'ইদ্দাত চলাকালীন বায়ন তালাকপ্রাপ্তা ওয়ারিছ হইবে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-বাহ্‌রু'র-রাইক, ৪খ, ৪২ প., বাব তালাকি'ল-মারীদ; শাফি'ঈর মতভেদের জন্য দ্র. হিদায়া, তালাক; বাব তালাকি'ল-মারীদ)। তথাপি এই অবস্থায়ও তালাকপ্রাপ্তাকে 'ইদ্দাতকাল অবশ্যই পূর্ণ করিতে হইবে, এই সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং পূর্ব-স্বামীর নিকট হইতে বাসস্থানের অধিকারী হইবে। কিন্তু খোরপোশ কেবল সেই অবস্থায় পাইবে যদি সে অন্তঃসত্তা হইয়া থাকে। ইহা ইমাম শাফি'ঈর মতানুযায়ী; হানাফীদের মতে রিজ'ঈ ও বায়ন উভয় তালাকের ক্ষেত্রে সে বাসস্থান ও খোরপোশের অধিকারী হইবে (হিদায়া, তালাক)। হানাফী মতে গর্ভবতী ও গর্ভহীনার বিধান একই (বিস্তারিত দ্র. আল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিব..., ৪খ, ৫৭৪)। স্বামীকে সেইভাবে মোহর পরিশোধ করিতে হইবে—রাজ'ঈ তালাকের ক্ষেত্রে যেইভাবে তাহা পরিশোধ করিতে হয়। এখন তালাকপ্রাপ্তা যতক্ষণ যথারীতি অন্য স্বামী গ্রহণপূর্বক তাহার সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথম স্বামীর সহিত পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হইতে পারিবে না (দ্র. ২ ঃ ২৩০)।

স্বাধীন পুরুষের জন্য তৃতীয় তালাক পর্যন্ত (তু. ২ ঃ ২২৯) এবং ক্রীতদাসের জন্য দ্বিতীয় তালাক পর্যন্ত ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। স্বাধীন ব্যক্তি তিন তালাক এবং ক্রীতদাস দুই তালাক ভিন্ন ভিন্নভাবে অথবা একসাথে একই বিবাহে অথবা ভিন্ন ভিন্ন বিবাহে প্রদান করিতে পারে। তিন তালাক হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালে অন্য পুরুষের সহিত বিবাহ সম্ভব, যদিও এই বিষয়ে মতভেদ আছে যে, এই বিবাহের পরে যদি প্রথম স্বামীর সহিত বিবাহ হইয়া যায় তবে সে কি নূতনভাবে তিন তালাকের মালিক হইবে না পূর্বে যেই কয় তালাক দিয়াছিল তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট তালাকের মালিক হইবে। হানাফীগণের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ য়ূসুফের মতে পুনরায় তিন তালাকের অধিকারী হইবে এবং ইমাম মুহাম্মাদের মতে অবশিষ্ট তালাকের অধিকারী হইবে। ইমাম শাফি'ঈও এই মত পোষণ করেন (হিদায়া, ২খ, পৃ. ৩৭৯, ছত্র ৭, পৃষ্ঠার শেষদিক হইতে; তাফসীরাতু'ল-আহ্‌মাদিয়্যা, পৃ. ১৩৩, ছত্র ১২)। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একজন স্বাধীন ও অপরজন দাস বা দাসী হইলে স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী তালাকের সংখ্যা নির্ধারিত হইবে এবং ইহা ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহ্‌মাদের মত, কিন্তু হানাফীগণের মতে স্ত্রীর অবস্থানুযায়ী সিদ্ধান্ত হইবে। হানাফীগণের মতে তালাকের সংখ্যা নারীর অবস্থার উপর নির্ভরশীল, অবশিষ্ট তিন মাযহাবের ইমামগণের মতে পুরুষের অবস্থার উপর নির্ভরশীল, যদিও 'ইদ্দাতের জন্য আবার নারীর উপর নির্ভরশীল (আল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিব..., ৪খ, ৩৪১, মাবহাছ তা'আদ্দুদি'ত তালাক; হিদায়া, ২খ, পৃ. ৩৩৮, ছত্র ২)।

তালাকপ্রাপ্তা নারীর 'ইদ্দাতকাল তিন 'কুরূ' (قروء-২ ঃ ২২৮)। কোন নারী বিধবা হওয়ার বা তালাকপ্রাপ্তির তারিখ হইতে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হইতে পারে না। এই সময়কে 'ইদ্দাত বলা

হয়। ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ (র)-এর মতে তিন কুরূ' অর্থ তিন তুহ্‌র। এক হায়যের সমাপ্তিকাল হইতে পরবর্তী হায়য শুরু হইবার মধ্যবর্তী সময়কে তুহর (পবিত্র অবস্থা) বলে। হানাফীগণের মতে কুরূ' অর্থ হায়য (হিদায়া, তালাক, বাবু'ল-'ইদ্দাত)। তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী (স্বাধীন বা ক্রীতদাসী) হইলে সন্তান প্রসব হওয়ার সংগে সংগে 'ইদ্দাতকাল শেষ হইয়া যায় (পূ. গ্র., বাবু'ল-'ইদ্দাত)। যে ক্রীতদাসী অন্তঃসত্তা নয় এবং নিয়মিত হায়য হয় তাহার 'ইদ্দাতকাল দুই কুরূ' এবং যাহার হায়য হয় না তাহার 'ইদ্দাত দুই মাস (পূ. গ্র.)। সে যদি অন্তঃসত্তা হইয়া থাকে তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহার 'ইদ্দাতকাল (পূ. গ্র.)।

যে নারীকে বায়ন তালাক দেওয়া হয় নাই তাহার সহিত সহবাস করার ব্যাপারে হানাফীগণের মতে এবং হাম্বালীগণের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী কোন অনুমতি নাই। হানাফীগণের মতে রিজ'ঈ তালাক সহবাসের প্রতিবন্ধক নহে (পূ. গ্র.), কিন্তু স্বামী যদি হাসান (সুন্নী) তালাক দিতে চায় তবে যে তুহরে সে স্ত্রীকে তালাক দিবে সেই তুহরে তাহার সহিত সহবাস করিবে না (আল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিব..., ৪খ, ৪৪২; অনন্তর পূ. গ্র., মাবহাছ আত-তালাক আস-সুন্নী)। এই ক্ষেত্রে ইমাম আহ্‌মাদের মত হানাফীগণের অনুরূপ (আল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ, ৪খ, ৪৪২)। মালিকী, শাফি'ঈ (হিদায়া, ২খ, পৃ. ৩৭৮) এবং অপরাপর হাম্বালীগণের মতে সহবাস নিষিদ্ধ। স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ার (رجعة) উদ্দেশ্যে সহবাস করিলে তাহা বৈধ হইবে, অন্যথায় নহে (আল-ফিক্‌হ, ৪খ, ৪৩৬, ছত্র ১১)। প্রথমোক্ত মাযহাবদ্বয়ের (হানাফী ও হাম্বালী) মতানুযায়ী সহবাস অবশ্য ফিরাইয়া লওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়াই, মালিকীগণের মতে নিয়াত আবশ্যকীয় শর্ত, কিন্তু শাফি'ঈগণের মতে স্বামীর মৌখিক স্বীকারোক্তি ব্যতীত স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া সিদ্ধ হয় না (আল-ফিক্‌হ্..., ৪খ, ৪৪১)।

৬। শী'আ সম্প্রদায়ের তালাকের নিয়ম-কানুন সুন্নীগণের অনুরূপ, কেবল আনুষঙ্গিক ও অপ্রধান বিষয়ে মতভেদ আছে। কুরআন মাজীদের (৬৫ ঃ ২) বিধানের কিছুটা কঠোর ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক তাহাদের মতে দুইজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী উপস্থিত করা তালাকের বৈধতার জন্য নেহায়েত জরুরী। ৬৫ ঃ ২ নং আয়াতে তালাক ও রাজ'আত উভয়ের জন্য সাক্ষী রাখার নির্দেশ রহিয়াছে এবং ইহা আহ্‌লে সুন্নাতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী মুসতাহাব। অবশ্য শাফি'ঈগণের সম্পর্কে রাজ'আতের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার অপরিহার্যতা বর্ণিত আছে (বিস্তারিত দ্র. তাফসীরাতু'ল-আহ্‌মাদিয়্যা, পৃ. ৭১৩, ছত্র ১৫ প.)। সুন্নীগণ ইহা অপরিহার্য মনে করেন না। শী'আগণের মাযহাবে ইশারা-ইঙ্গিতমূলক কথাবার্তা, অস্পষ্ট অভিমত ইত্যাদির কোন গুরুত্ব নাই, বক্তার উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন।

তালাকের প্রসংগটি যেহেতু পারিবারিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাই ইহার বাস্তব প্রয়োগে সেইসব বিধানের অনুসরণ অপরিহার্য যাহা ইসলামী আইনে গুরুত্ব সহকারে এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। 'তালাক' শব্দটি প্রচুর পরিমাণে মুখে আসিয়া যাওয়ার রেওয়াজ, যাহার কারণসমূহ অধিকাংশই অর্বাচীনসুলভ ও অযৌক্তিক হইয়া থাকে, আবার একই বৈঠকে তিন তালাক দেওয়ার বাতিক—এই দুইটি বিষয় সেই বিধানের রেওয়াজের কারণে হইয়াছে যে, স্বামী-স্ত্রী যদি তৃতীয় তালাকের পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চায় তবে তাহারা এমন উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করে যে কিছু বিনিময় গ্রহণপূর্বক এই তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিবাহ করিতে এবং অতঃপর তাহাকে তৎক্ষণাৎ তালাক দিতে সম্মত থাকে। এই পন্থায় সে পূর্বতন স্বামীর জন্য হালাল হইয়া যায় এবং এই উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এই তাহ্‌লীলের হাতিয়ার হয় তাহাকে মুহাল্লিল বলে। এই উদ্দেশ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি বালক অথবা ক্রীতদাসকে অধিক পসন্দ করা হয়। এই প্রকারের কার্যক্রমের বৈধতার বিরুদ্ধে কোন দলীল (حجة) পেশ করা যায় না, যদি এই মধ্যবর্তী বিবাহ অনুষ্ঠানের (انعقاد) সময় তাহ্‌লীল (تحليل) শব্দটি পরিষ্কারভাবে ব্যবহার করা না হয়। হানাফীগণ ইহার বৈধতার পক্ষে, কিন্তু মালিকী ও শাফি'ঈগণ ইহার বিপক্ষে। হানাফীদের মতে তাহ্‌লীলের উদ্দেশ্যে বিবাহ বৈধ, তবে কতিপয় শর্তসহ (আল-ফিক্‌হ 'আলা'ল-মাযাহিব, ৪খ, ৭৯, ছত্র ১২প.)। মালিকীগণ তাহ্‌লীলের উদ্দেশ্যে কৃত বিবাহকে ফাসিদ (বাতিল) সাব্যস্ত করেন এবং তাহ্‌লীলের শর্ত নির্ধারণপূর্বক বিবাহ করিলে বিবাহই অনুষ্ঠিত হইবে না (আসল মাযহাব এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ৪খ, পৃ. ৮০, ছত্র ১৯)। হাম্বালীগণ তাহ্‌লীলের উদ্দেশ্যে কৃত বিবাহকে বাতিল সাব্যস্ত করেন (অত্র মাযহাবের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. পূ. গ্র., ৪খ, ৮৪, ছত্র ৯)। ইব্‌ন তায়মিয়া (র), যিনি হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাহ্‌লীলকে সাধারণভাবেই অবৈধ মনে করিতেন এবং নিজের একটি বিশেষ গ্রন্থে এই প্রথার কঠোর প্রতিবাদও করিয়াছেন (দ্র. Brookelmann, GAL, ২খ, ১৫৫, ছত্র ৩৮), কিন্তু ইহা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত মত মনে হয়। তাঁহার সুযোগ্য শাগরিদ ইবনু'ল-কায়্যিম (র)-এর মত এই যে, তাহ্‌লীল সাধারণত নিষিদ্ধ ও অসংগত কাজ, কিন্তু সাথে সাথে তিনি একসঙ্গে দেওয়া তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেন এবং তাঁহার উস্‌তাদেরও এই মত বলিয়া প্রবল ধারণা হয়। ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর মতে তাহ্‌লীল সম্পর্কিত আয়াতের উদ্দেশ্য তিন তালাকের প্রতিরোধ ছাড়া আর কিছুই নহে (এই আলোচনার জন্য দ্র. ই'লামু'ল-মুওয়াক্কি'ঈন, ৩খ, ৩৪ প.)। তাঁহার মতে তাহ্‌লীল যুগের পরিবর্তনের সহিত উদ্ভূত বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার ধারণামতে যে প্রকারের তালাকের কারণে তাহ্‌লীলের প্রয়োজন দেখা দেয় সেই ধরনের তালাকের প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। আর যদি কেহ তিন তালাক প্রদান করিয়া ফেলে তবে ইহার শাস্তি এই যে, সে কখনও ঐ নারীকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

শর্তের সহিত তালাকের সংযুক্তকরণের উদ্দেশ্য বিভিন্ন হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে অথবা নিজের স্ত্রীকে তালাকের ভয় দেখাইয়া (অর্থাৎ আমার স্ত্রী এই কাজ না করিলে সে তালাক) কোন কাজ করিতে বাধ্য করাইতে চায় অথবা কোন কাজ করা হইতে বিরত রাখিতে চায় অথবা নিজেদের কোন বক্তব্যকে শক্তিশালী করিতে চায়, তবে সে এই প্রকারের শর্তসাপেক্ষ তালাক দিতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বহু এলাকায় বিবাহ অনুষ্ঠানের পর শর্তের সহিত সংযুক্ত তালাকের সাধারণ প্রচলন হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহাকে খুব কমই উপেক্ষা করা যায়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকারসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় দায়দায়িত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে এবং ইহা নির্ধারণ করা হয় যে, স্বামী যদি এই সব দায়িত্ব আবশ্যিকভাবে পালন না করে তবে তাহার স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে (তু. Snouck Hurgronje, De Atjehers, ১খ, ৩৮২ প.; Verspreide Gesohrften, ১/৪খ, ৩০০ প., ২/৪খ, ৩৭০; Juynboll, Handleiding tot de Kennis van de mohammedaansche wet, ৩য় সং, পৃ. ২০৭ প.)।

শারী'আতের ঐতিহ্য এবং প্রচলিত স্থানীয় বিধানের অধীনে তালাকের যে বাস্তব পন্থাসমূহ বিভিন্ন দেশে বর্তমান কালে প্রচলিত আছে তাহার জন্য উদাহরণস্বরূপ দ্র. উত্তর আফ্রিকার জন্য Uback and

Rackow, sitte und Reort in Nordafrika, পৃ. ৩৭, ৯৭, ১৯৪, ২৭৭, ৩৭৯। মিসরের জন্য Lane, Manners and Customs of the modern Egyptians, অধ্যায় ৩, ৪। জর্দান ঃ A Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab, অধ্যায় ৩। উত্তর-পশ্চিম আরবের জন্য–ঐ লেখক, Coutumes des Fuquara, অধ্যায় ৪। ইন্দোনেশিয়ার জন্য পূ. গ্র., in juynboll, Handleiding, পৃ. ২০৭, টীকা ৩ এবং নৃতত্ত্ব ও পর্যটন সম্পর্কীয় সাধারণ গ্রন্থাবলী।

কেবল তুরস্ক এমন একটি মুসলিম দেশ যেইখানে ১৯২৬ খৃ. হইতে সুইজারল্যাণ্ডের দেওয়ানী আইন বলবৎ করিয়া তালাক নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (কামাল পাশার সরকার অন্যায়ভাবে অনেকগুলি ইসলামী আইনের ধারায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে)। ইসলামে তালাক সর্বাধিক ঘৃণ্য বৈধ বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই ইহার অনুমতি রহিয়াছে। যদি ইহাকে নিষিদ্ধ করা হয় তবে তালাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। মোটকথা তালাক কোন ফরয বা ওয়াজিব বিষয় নয়, বিশেষ কতিপয় অসুবিধা হইতে উত্তরণের উপায়মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে উদ্ধৃত বরাত এবং হাদীছ ও ফিক্‌হ-এর আরবী গ্রন্থাবলী ব্যতীত আরও দ্র. (১) Roberts, The Social Laws of the Quran, পৃ. ১৮ প.; (২) মিফতাহ্ কুনূযি'স-সুন্নাহ, শিরো. তালাক; (৩) তাহানাবী, কাশ্‌শাফ ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন, ৪খ, ৯২০-১; (৪) Juynboll, Handleiding, ৩য় সং., পৃ. ২০৩; (৫) Sachau, Muhammedanisches Recht anch Sachauschafitischer Lehre, ১ম অধ্যায়; (৬) Santillana, Istituzioni di diritto Musulmano malichita, ১খ, ২০১ প.; (৭) Hughes, Dictionary of Islam, দ্র. Divorce.

J. Schacht (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মদ মূসা

সংযোজন ঃ পূর্বেকার আসমানী শারী'আতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত মূসা (আ)-এর শারী'আতে তালাকের বিধানসমূহ পাওয়া যায়। যদিও তৎকালীন যুগের বিধানের কোন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আমাদের নিকট নাই, তথাপি বর্তমান তাওরাতে পুরুষকে তালাকের একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য তালাকের জন্য কেবল একটি পন্থাই উল্লেখ আছে যে, তালাকনামা লিখিতভাবে দিতে হইবে। বর্তমান তাওরাতের ভাষা এই যে–

"কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবার পর যদি তাহার মধ্যে কোন প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পায়, আর সেইজন্য সেই স্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাড়ি হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে। আর সেই স্ত্রী তাহার বাড়ি হইতে বাহির হইবার পর গিয়া অন্য পুরুষের স্ত্রী হইতে পারে। আর ঐ দ্বিতীয় স্বামীও যদি তাহাকে ঘৃণা করে এবং তাহার জন্য ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাড়ি হইতে তাহাকে বিদায় করে কিংবা বিবাহকারী ঐ দ্বিতীয় স্বামী যদি মরিয়া যায়– তবে যে প্রথম স্বামী তাহাকে বিদায় করিয়াছিল সে তাহার অশুচি হইবার পরে তাহাকে পুনর্বার বিবাহ করিতে পারিবে না। কারণ তাহা সদাপ্রভুর নিকট ঘৃণার্হ কর্ম" (দ্বিতীয় বিবরণ, ২৪ ঃ ১-৪)।

একই বিধান যিরমিয়ের পুস্তকেও বিদ্যমান। "লোকে বলে, কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে পর ঐ স্ত্রী তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যদি অন্য পুরুষের হয় তবে তাহার স্বামী কি পুনর্বার তাহার নিকট গমন করিবে? করিলে কি সেই দেশ নিতান্ত অশুচি হইবে না?" (যিরমিয়ে, ৩ ঃ ১)।

ইহার ভিত্তিতে মূল য়াহূদী ধর্মে পুরুষের তালাকের একচ্ছত্র অধিকারও ছিল, যদি পরবর্তী কালে, বিশেষত খৃ. ১১শ শতকে, য়াহূদী 'আলিমগণের পক্ষ হইতে এই অধিকারের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল (Encyclopaedia Britannica, সং ১৯৫০ খৃ., ৭খ, ৪৫৩, শিরো. Divorce)। কিন্তু বর্তমান বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, হযরত 'ঈসা ('আ) তালাকের অনুমতিকে খুবই সীমিত করিয়া দিয়াছেন এবং স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত না হইলে তাহাকে তালাক দেওয়া অবৈধ সাব্যস্ত করিয়াছেন। বাইবেলে হযরত 'ঈসা ('আ)-এর সহিত এই কথা সংযুক্ত করা হইয়াছে ঃ

"যে কেহ ব্যভিচার ভিন্ন অন্য কারণে আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করে সে তাহাকে ব্যভিচারিণী করে এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করে সে ব্যভিচার করে" (মথি, ৫ ঃ ৩২)।

"আর সে দুইজন (স্বামী-স্ত্রী) একাঙ্গ হইবে, সুতরাং তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একাঙ্গ। অতএব খোদা যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন মানুষ তাহার বিয়োগ না করুক...যে কেহ আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে সে তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। আর স্ত্রী যদি আপন স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একজনকে বিবাহ করে তবে সেও ব্যভিচার করে" (মার্ক, ১০ ঃ ৯-১১)।

একইরূপ বিধান মথি (১৯ ঃ ৯) ও লূক (১৬ ঃ ১৮)-এ বর্ণিত আছে। উহার ভিত্তিতে মূল খৃষ্ট ধর্মে পুরুষের তালাক দেওয়ার কোন এখতিয়ার ছিল না। কেবল স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভিত্তিতে সে গির্জার বিচারালয়ে তালাকের দাবি পেশ করিতে পারিত। কিন্তু কালক্রমে ব্যভিচারের অপরাধ ছাড়াও তালাকের দাবি উথাপনের জন্য আরও অধিক কারণসমূহ বিভিন্ন যুগে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ১৮৫৭ খৃ. পর্যন্ত তালাক দেওয়ার এখতিয়ার কেবল গির্জার নিকটই ছিল। ১৮৫৭ খৃ. ইংল্যাণ্ডের "বৈবাহিক মোকদ্দমা আইন" (Matrimonial Causes Act) এই এখতিয়ার গির্জা আদালতের পরিবর্তে একটি সাধারণ আদালতের নিকট অর্পণ করে যাহা বিশেষত এই উদ্দেশ্যে কায়েম করা হইয়াছিল। পরে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে তালাকের কারণসমূহের তালিকা আরও বর্ধিত করা হয়, এমন কি বর্তমানে তালাক লাভের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সমানভাবে ব্যাপক ও বিস্তারিত ভিত্তিসমূহ সহজলভ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Encyclopaedia Britannica, শিরো. Divorce)।

ইসলাম তালাক ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য ব্যাপক নৈতিক ও আইনগত নির্দেশনা দান করিয়াছে এবং ইহার কয়েকটি স্তর নির্ধারণ করিয়াছে। ইসলামের মূল লক্ষ্য এই যে, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থায়ী হউক এবং তাহা বিনষ্টের ঘটনা কমই ঘটুক। অতএব পুরুষকে তাকীদ করা হইয়াছে যে, সে যেন কেবল নারীদের খারাপ দিকটাই না দেখে। কারণ হয়ত তাহার মধ্যে অনেক ভালো দিকও রহিয়াছে (দ্র. ৪ ঃ ১৯)। ইহার পরও যদি বাস্তবিকই কোন অসহনীয় দোষ অনুভূত হয় তবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ তালাক দেওয়ার পরিবর্তে প্রথমে তাহাকে উপদেশ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিবে, অতঃপর শাসন করিবে। ইহা পর্যাপ্ত না হইলে অসন্তোষ প্রকাশের জন্য তাহার নিকট হইতে নিজের বিছানা পৃথক করিয়া নিবে। ইহাও অপর্যাপ্ত হইলে সৌজন্য শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে হালকা দৈহিক শাস্তির ব্যবস্থা করিবে (দ্র. ৪ ঃ ৩৪, এবং ইহার ব্যাখ্যা)। ইহার পরও সমঝোতা না হইলে স্বামীর পক্ষ হইতে একজন

এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে একজন করিয়া সালিশ নিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। তাহারা একত্রে বিবাদ মীমাংসার চেষ্টা করিবে। তাহারা সংশোধনের আকাঙ্ক্ষা করিলে আল্লাহ এইভাবে তাহাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করিয়া দিবেন (দ্র. ৪ ঃ ৩৫)। যদি এইসব পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায় তবে তালাকের অনুমতি এই কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট তালাক সর্বাধিক ঘৃণ্য (আবূ দাঊদ, সুনান, কিতাবু'ত-তালাক, বাব ৩, নং ২০১৮; ইব্‌ন মাজা সুনান, তালাক, বাব ১, নং ২৯৭৭-৮)।

ইহার পরও জরুরী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যেই তুহরে সহবাস হয় নাই সেই তুহরে তালাক দিতে হইবে। ইহার একটি উপকারী দিক এই যে, তালাক যেন ক্ষণস্থায়ী ঘৃণার কারণে সংঘটিত না হয়। অনন্তর তালাকের তিনটি পর্যায় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং একই সময়ে তিন তালাকের সাহায্যে এই তিনটি স্তর অতিক্রম করা নাজায়েয সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কারণ ইহার পরে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বার স্থাপিত হইতে পারে না, বরং এক তালাক দিয়া বিরত হওয়াকে উত্তম বলা হইয়াছে। কারণ যদি কোন সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টি হয় তবে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া অথবা নূতনভাবে বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহ, প্রয়োজনীয় হাদীছসমূহ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন নিম্নে কুরআন, হাদীছ, সাহাবীগণের ও তাবি'ঈগণের অভিমত এবং উম্মাতের কার্যক্রমের ভিত্তিতে উম্মাতের ফকীহ্‌গণ যে মৌলিক বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে।

১. তালাকের এখতিয়ার মূলত স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য সে অপর কোন ব্যক্তিকে তালাক প্রদানের জন্য উকীল (প্রতিনিধি) নিয়োগ করিতে পারে যাহাকে তালাকের উকীল বলা হয়। অনন্তর সে তাহার এই এখতিয়ার অপর কোন ব্যক্তিকে অথবা স্বয়ং স্ত্রীকেও দিতে পারে যাহাকে আইনের পরিভাষায় তালাক তাফবীদ (تفويض) বলা হয়। তাফবীদ তালাকের দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ এখতিয়ার ও মালিকানা, উভয়ের ভাষা ও বিধানের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে (বিস্তারিত দ্র. ইব্‌ন রুশদ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, মিসর ১৩৮৯ হি., ২খ ৭৭; ইবনুল-হুমাম, ফাতহু'ল-কাদীর, মিসরীয় সং, ৩খ, ৯৯ প.)।

তাফবীদ তালাকের বৈশিষ্ট্য ছাড়াও নারীকে এই অধিকার দেওয়া হইয়াছে যে, সে বিশেষ পরিস্থিতিতে আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বাতিল করাইতে পারে। এই দাবির বিভিন্ন কারণ থাকিতে পারে। স্বামীর (ক) নপুংসক হওয়া, (খ) নিখোঁজ হওয়া, (গ) ভরণ-পোষণের খরচ না দেওয়া, (ঘ) মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া (বিস্তারিত দ্র. আশরাফ 'আলী থানাবী, আল-হিলয়াতু'ন নাজিযা লি'ল-হিলয়াতি'ল-'আজিযা, পৃ. ৫৩-৮২, মাকতাবা ই'জাযিয়া, দেওবন্দ)।

২. উম্মাতের ফাকীহ্‌গণের ঐকমত্য অনুযায়ী তালাক প্রথমত তিন প্রকারের ঃ রাজ'ঈ, বা'ইন ও মুগাল্লাজা। যেই তালাকের পর স্বামী একতরফাভাবে ('ইদ্দাতের সময়সীমার মধ্যে) নিজের তালাক প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় স্ত্রীর সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে, তাহাকে রাজ'ঈ তালাক বলে (ইব্‌ন রুশদ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৬৫)। উম্মাতের ফকীহ্‌গণের ঐকমত্য অনুযায়ী রাজ'ঈ তালাক তখনই হয় যখন উহার মধ্যে তিনটি শর্ত পাওয়া যায় ঃ (ক) যেই নারীকে তালাক দেওয়া হইতেছে তাহার সহিত বিবাহের পর নির্জনবাস হইয়াছে; (খ) তিন তালাকের কম (এক বা দুই তালাক) দেওয়া হইয়াছে এবং (গ) তালাকের জন্য কোন আর্থিক বিনিময় নির্ধারণ করা হয় নাই। ইমাম আবূ হানীফা (র) ইহার সহিত আরও একটি শর্ত যোগ করেন এবং তাহা এই যে, সুস্পষ্ট বাক্যে তালাক দেওয়া হইয়াছে। কারণ তাঁহার মতে কিনায়ার অধিকাংশ শব্দেই রাজ'ঈ তালাক হয় না (ইবনু'ল-হুমাম, ফাতহু'ল-কাদীর, ৩খ, ৯৩)। রাজ'ঈ তালাকের 'ইদ্দাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীর ইচ্ছা ব্যতীতই স্বামী তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া লইতে পারে। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে ফিরাইয়া লওয়া কথার মাধ্যমেও হইতে পারে এবং কাজের মাধ্যমেও। কাজের মাধ্যমে ফিরাইয়া লওয়া এই যে, রাজ'ই তালাকপ্রাপ্তার সহিত নির্জনবাস করা অথবা এমন কোন কাজ করা যাহা কেবল স্ত্রীর সহিতই সংগত হইতে পারে। অবশ্য উত্তম পন্থা হইতেছে, মৌখিক বাক্যে ফিরাইয়া লওয়া এবং ইহার সাক্ষী রাখা। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে মৌখিক বাক্যেই কেবল রুজূ' করা যাইতে পারে এবং ইহার জন্য সাক্ষ্য বর্তমান থাকা শর্ত। তাঁহার মতে কাজের মাধ্যমে ফিরাইয়া লওয়া এবং একাকিত্বে সাক্ষ্যহীনভাবে ফিরাইয়া লওয়া গ্রহণযোগ্য নয় (আল-কাসানী, বাদা'ই'উ'স-সানা'ই', মিসরীয় সং. ১৩২৮ হি., ৩খ, ১৮১; ইব্‌ন রুশদ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৯২)। ইমাম আহ্‌মাদ (র) হইতে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত বর্ণিত আছে (ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, মিসরীয় সং. ১৩৬৭ হি., ৭খ, ২৮২)। এই ক্ষেত্রে শী'আ জা'ফারী ফিক্‌হ-এর মত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মালিক (র)-এর মতের অনুরূপ (আল-হিল্লী, শারা'ই'উ'ল-ইসলাম, বৈরূত সং. ১৯৩০ খৃ., ২খ, ৬০)।

বা'ইন তালাক ঃ পরিভাষায় এমন তালাককে বা'ইন তালাক বলে যাহার পরে স্বামী একতরফাভাবে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পারে না। অবশ্য স্ত্রী সম্মত হইলে তাহার সহিত পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। নিম্নোক্ত পন্থায় বা'ইন তালাক সংঘটিত হয় ঃ (ক) যে নারীকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত বিবাহের পর নির্জনবাস হয় নাই। এই অবস্থায় এক তালাকও বা'ইন তালাক হিসাবে গণ্য হইবে। এই ব্যাপারে ফাকীহ্‌গণের ইজমা' রহিয়াছে (আল-মুগনী, ৭খ, ২৪), (খ) তালাকদাতা পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছে যে, সে বা'ইন তালাক দিতেছে, (গ) তালাকের জন্য কোন বিনিময় নির্ধারণ করা হইয়াছে (বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৬৬)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বা'ইন তালাকের আরও একটি পন্থা এই যে, সুস্পষ্ট বাক্যের পরিবর্তে ইঙ্গিতমূলক বাক্যে (كناية) তালাক দেওয়া হইয়াছে (ফাতহু'ল কাদীর, ৩খ, ৯৩)।

মুগাল্লাজা তালাক ঃ মুগাল্লাজা তালাক সেই তালাককে বলা হয় যাহার পরে তালাকপ্রাপ্তার সহিত তালাকদাতা স্বামীর পুনর্বার বিবাহ হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মহিলার অপর কোন পুরুষের সহিত বিবাহ না হইবে এবং এই শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার সহিত নির্জনবাসের পর স্বেচ্ছায় তাহাকে তালাক দিবে, অথবা তাহার মৃত্যু হইবে, যাহাকে সাধারণত হালালা (حلالة) বলা হয়। এই তালাক কেবল তখনই সংঘটিত হয় যখন তালাকদাতা তিন তালাক দেয়, তাহা একই বৈঠকে তিন তালাক দেওয়া হউক অথবা বিভিন্ন সময়ে তিনের সংখ্যা পূর্ণ করা হউক (বিদায়াতু'ল- মুজতাহিদ, ২খ, ৬৬)। কখনও কখনও মুগাল্লাজা তালাককেও বা'ইন তালাক বলা হইয়া থাকে এবং বা'ইনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—বা'ইন গালীজা যেইখানে তাহ্‌লীল ব্যতীত পুনর্বিবাহ হইতে পারে না এবং বা'ইন খাফীফা যেখানে তাহ্‌লীল ব্যতীত পুনর্বিবাহ হইতে পারে (বাদা'ই'উ'স-সানা'ই', ১৩২৮ হি. সং, ৩খ, ১০৮, ছত্র ১৬)।

তাহ্‌লীল সম্পর্কে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, তাহ্‌লীলের শর্ত আরোপ করিয়া কোন ব্যক্তির নিকট বিবাহ দেওয়া কাহারও মতে বৈধ নহে। ইমাম মালিক (র)-এর মতে তো এই বিবাহ অনুষ্ঠিতই হয় না এবং ইমাম আবূ হানীফা (র) ও শাফি'ঈ (র)-এর মতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু পাপ হয় (বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৬৩)। দ্বিতীয় কথা এই যে, দ্বিতীয় স্বামী যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর নির্জনবাস না করিবে ততক্ষণ তাহলীল বৈধ হইবে না। অতএব তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সহিত প্রথম স্বামীর পুনর্বিবাহ কেবল তখনই বৈধ হইতে পারে যখন দ্বিতীয় স্বামী তাহার সহিত নির্জনবাসের পর তাহাকে তালাক দিবে। এই বিধানও ইজমা'ভিত্তিক এবং এই বিষয়ে সা'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (র) ব্যতীত আর কাহারও দ্বিমত নাই। জমহূর 'আলিমগণ তাঁহার মতের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন (আল-মুগনী, ৭খ., ২৭৪)।

ফকীহ্‌গণ পদ্ধতিগত দিক হইতে তালাককে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (ক) আহ্‌সান (احسن), হাসান (حسن) ও বিদ'ঈ (بدعى)। আহ্‌সান তালাক এই যে, স্ত্রীকে এমন তুহরে শুধু এক তালাক দেওয়া যখন তাহার সহিত সহবাস করা হয় নাই এবং অতঃপর 'ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত এই এক তালাকের সহিত আর কোন তালাক যোগ না করা, অতঃপর 'ইদ্দাত সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক আপনাআপনি সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়া যায়। এই পদ্ধতি সকল সাহাবী ও ফকীহ্‌গণের মতে তালাকের সব কয়টি পদ্ধতির তুলনায় সর্বাপেক্ষা উত্তম (ফাতহু'ল-কাদীর, ৩খ, ২৩; আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী, আল-মুহায্‌যাব, ২খ, ৭৯, মিসরীয় সং, ১২৭৬ হি.)। 'আলী (রা), তা'উস, আবূ কিলাবা, ইব্‌রাহীম নাখ'ঈ (র) প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা ইহাকে সুন্নাত তালাক সাব্যস্ত করিয়াছেন (ইব্‌ন আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, দাক্ষিণাত্য ১৩৯০ হি., ৫খ, ৩)।

হাসান তালাক এই যে, ভিন্ন তিন তুহরে পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক দেওয়া। এই পদ্ধতির জন্য স্বয়ং মহানবী (স) 'সুন্নাত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন (আল-যায়লা'ঈ, নাসবুর-রায়াহ, মাজলিস 'ইলমী ১৩৫৭ হি., ৩খ, ২২০, আদ-দারা কুতনী ইত্যাদির বরাতে) এবং ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-ও ইহাকে সুন্নাত তালাক বলিয়াছেন (আন-নাসাঈ, আস-সুনান, কানপুর সং. ১২৯৯ হি., পৃ. ৫৩৭)। কিন্তু এই পদ্ধতিকে সুন্নাত তালাক বলার অর্থ এই নহে যে, এইভাবে তালাক দেওয়া ছাওয়াবের কাজ বা কোন মুসতাহাব ও পসন্দনীয় কাজ, বরং অর্থ কেবল এই যে, এই পন্থাটি শারী'আতে নির্ভরযোগ্য এবং এইজন্য কোন শাস্তি হইবে না (আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, মাকতাবা রাশীদিয়া, লাহোর, ২খ, ১৩৬)।

বিদ'ঈ তালাক ঃ যেই তালাক শারী'আতবিরোধী কোন পন্থায় দেওয়া হইয়াছে তাহাকে বিদ'ঈ তালাক বলে। ইহার তিনটি পদ্ধতি রহিয়াছে ঃ (ক) হায়যগ্রস্ত অবস্থায় তালাক দেওয়া, (খ) এমন তুহরে তালাক দেওয়া যাতাতে সহবাস হইয়াছে এবং (গ) একই সময় তিন তালাক দেওয়া। হায়যগ্রস্ত অবস্থায় অথবা যেই তুহরে সহবাস হইয়াছে সেই তুহরে তালাক দেওয়া ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী বিদ'আত ও নাজা'ইয এবং নাজা'ইয হওয়া সত্ত্বেও তালাক অনুষ্ঠিত হইয়া যায় এই ব্যাপারেও ফাকীহ্‌গণ প্রায় একমত। অবশ্য এই অবস্থায় স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া স্বামীর কর্তব্য এবং ইহার পর তালাক দিতে চাহিলে সংগমবিহীন তুহরে দিবে। কারণ ইব্‌ন 'উমার (রা)-কে মহানবী (স) এই উপদেশই দিয়াছিলেন (তিরমিযী, তালাক, বাব ১)। ইমাম মালিক (র) তো বলেন যে, স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়া ওয়াজিব এবং ইমাম আবূ হানীফা, শাফি'ঈ, আহ্‌মাদ ও সুফ্‌য়ান ছাওরী (র) প্রমুখের মতে ওয়াজিব না হইলেও মুস্তাহাব (বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৭০)। শী'আ জা'ফারী ফিক্‌হ অনুযায়ী এই ধরনের তালাক সংঘটিত হয় না (আল-হিল্লী, শারা'ই'উ'ল-ইসলাম, ২খ, ৫৭)।

অবশ্য একই সাথে তিন তালাক দেওয়াকে ইমাম শাফি'ঈ (র) বিদ'ঈ তালাক বলেন না। তাঁহার মতে এইরূপ করা বৈধ এবং এইজন্য কোন গুনাহ হইবে না (আশ-শীরাযী, আল-মুহায্‌যাব, ২খ, ৭৯)। ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (র)-এর মতে ইহা বিদ'আত ও অবৈধ। তাঁহাদের দলীল সুনান নাসা'ঈতে মাহ্‌মূদ ইব্‌ন লাবীদের রিওয়ায়াত। তাহা এই যে, রিসালাত যুগে এক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়াছিল। মহানবী (স) এই ঘটনায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর সূত্রে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত ইমাম শাফি'ঈর অনুরূপ এবং অপরটি মালিকী ও হানাফীগণের অনুরূপ (আল-মুগনী, ৭খ, ১০২)।

৩. এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, একই সময় দেয়া তিন তালাক সংঘটিত হয় কি না? ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফি'ঈ, আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র)-সহ আহ্‌লে সুন্নাতের অসংখ্য 'আলিমের ঐকমত্য অনুযায়ী এই অবস্থায় তিন তালাকই সংঘটিত হয় এবং ইহা মুগাল্লাজা তালাক হিসাবে গণ্য হয়। অতএব তাহ্‌লীল ব্যতীত ঐ স্ত্রীর সহিত পুনর্বিবাহ বৈধ নহে (বাদা'ই'উ'স- সানা'ই', ৩খ, ৯৬; আন-নাওয়াবী, শারহ্ সাহীহ মুসলিম, দিল্লী সং, ১৩৪৯ হি., ১খ, ৪৭৮)। অবশ্য শী'আ জা'ফারী ফিক্‌হ-এর কতিপয় আহলে জাওয়াহির, যেমন ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া, ইমাম ইবনুল-কায়্যিম (র)-এর মত এই যে, একই তুহরে দেওয়া তিন তালাক, তিন সংখ্যক গণ্য হইবে না। আবার জা'ফারী ফিক্‌হ-এ এই ধরনের তালাককে সম্পূর্ণ অর্থহীন মনে করা হয় এবং একটিও কার্যকর হয় না (শারা'ই'উ'ল-ইসলাম, ২খ, ৫৭)। কিন্তু ইব্‌ন তায়মিয়া (র) ও ইবনু'ল-কায়্যিম (র) প্রমুখের মতে এক তালাক কার্যকর হইবে এবং অবশিষ্ট দুই তালাক অর্থহীন গণ্য হয় (আশ-শাওকানী, নায়লুল-আওতার, মিসরীয় সং. ১৩৫৭ হি., ৬খ, ২৩১; ইবনু'ল-কায়্যিম, যাদু'ল-মা'আদ, উর্দূ অনু., ৪খ.)।

যেইসব 'আলিম যুগপৎভাবে দেওয়া তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করেন তাঁহাদের বুনিয়াদী দলীল দুইটি ঃ (ক) হযরত রুকানা ইব্‌ন 'আব্‌দ য়াযীদ (রা)-র ঘটনা। তিনি একই বৈঠকে তাঁহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছিলেন। পরে তিনি এইজন্য অনুতপ্ত হইলে মহানবী (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কিভাবে তালাক দিয়াছিলে? তিনি বলেন, তিন তালাক দিয়াছিলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ একই বৈঠকে? তিনি বলিলেন, হাঁ। মহানবী (স) বলিলেন ঃ ইহা এক তালাক হইয়াছে। অতএব তুমি চাহিলে স্ত্রীকে ফিরাইয়া (رجوع) লইতে পার (আল-জাসসাস, আহ্‌কামু'ল-কুরআন, মিসরীয় সং. ১৩৪৭ হি., ১খ, ৪৫৯)। (খ) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত যে, মহানবী (স)-এর যুগে এবং আবূ বাক্‌র (রা)-এর যুগে, অনন্তর 'উমার (রা)-এর খিলাফাতের প্রথম দুই বৎসর পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হইত। অতএব তিনি উহা তিন তালাকরূপে কার্যকর করিলেন (মুসলিম, আস-সাহীহ; দিল্লী সং, ১৩৪৯ হি., ১খ, ৪৭৮)।

উপরোক্ত রিওয়ায়াতদ্বয়ের জওয়াবে চার ইমাম ও ফকীহগণের অধিকাংশের অভিমত এই যে, তিন তালাক দেওয়ার দুইটি পন্থা আছে। একটি এই যে, তালাকও তিনটি দেওয়া হইবে এবং নিয়াতও (উদ্দেশ্য)

তিন তালাকের হইবে। এই অবস্থায় কখনও তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হয় নাই। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, তালাকদাতা তো এক তালাকই দিতে চায়, কিন্তু এই এক তালাকের উপর অধিক জোর দেওয়ার জন্য সে তালাক শব্দটি তিনবার ব্যবহার করিয়াছে। এই অবস্থায় উমার (রা)-এর খিলাফাতের প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত রীতি এই ছিল যে, কোন ব্যক্তি যদি শপথ সহকারে জবানবন্দী দিত যে, তাহার তিন তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল না, বরং জোর দেওয়ার অভিপ্রায়ে শব্দটি তিনবার ব্যবহার করিয়াছিল, তবে তাহার জবানবন্দীর ভিত্তিতে উহাকে এক তালাক গণ্য করা হইত। রুকানা (রা)-র ঘটনায়ও তাহাই হইয়াছে। প্রথমত, রিওয়ায়াতের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে যে, তিনি কি তিন তালাক দিয়াছিলেন না আলবাত্তা (البتة) শব্দ প্রয়োগে তালাক দিয়াছিলেন? কিন্তু এই বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, মহানবী (স) তাঁহাকে শপথ দিয়া দুইবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ (?) ما اردت الا واحدة তুমি কি কেবল এক তালাকেরই নিয়াত করিয়াছিলে? ইহার উত্তরে রুকানা (রা) শপথপূর্বক বলিলেন, কেবল এক তালাক দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল। ইহার পর তিনি তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেন (তিরমিযী, তালাক, বাব মা জা'আ ফি'র-রাজুল তাল্লাকা ইমরা'আতাহু আলবাত্তাতা; আবূ দাউদ, তালাক, বাব ফি'ল-বাত্তাহ; ইব্ন মাজা, তালাক, বাব ফী তালাকি'ল বাত্তাহ, নং ২০৫১; দারিমী, তালাক, বাব ঐ)।

এই রিওয়ায়াতে যদি প্রমাণিত হয় যে, রুকানা (রা) নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছিলেন, তবে একথা সুস্পষ্ট যে, মহানবী (স) তাঁহাকে তখনই রুজু' করার অনুমতি দিলেন যখন তাঁহাকে শপথ করাইয়া নিশ্চিত হইলেন যে, এক তালাক দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং জোর দেওয়ার জন্য 'তালাক' শব্দটি বারংবার ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতএব তিন তালাকের উদ্দেশ্য নিয়াই তিন তালাক দিলে তাহাকেও এক তালাক গণ্য করার জন্য উপরোক্ত হাদীছ দলীল হিসাবে পেশ করা বৈধ নয়। অবশ্য উক্ত হাদীছ হইতে নিশ্চয়ই জানা যায় যে, মহানবী (স)-এর যুগে কোন ব্যক্তি যদি শপথ করিয়া বলিত যে, এক তালাকের উপর জোর দেওয়ার জন্যই 'তালাক' শব্দটি সে তিনবার ব্যবহার করিয়াছে তবে উহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

'উমার ফারূক (রা) যখন দেখিলেন যে, বিশ্বস্ততার মান কমিয়া যাইতেছে এবং লোকদের মিথ্যা যবানবন্দী দিয়া হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে, তখন তিনি সাহাবীগণের পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্দেশ জারি করিলেন যে, ভবিষ্যতে যে ব্যক্তিই 'তালাক' শব্দটি তিনবার ব্যবহার করিবে উহাকে যে কোন অবস্থায় মুগাল্লাজা তালাক সাব্যস্ত করা হইবে এবং এই ব্যাপারে জোর দেওয়ার ওজর বিচার বিভাগীয় পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর হাদীছে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। অন্যথায় যেখানে তিন তালাকের নিয়াতে তিন তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহাকে কখনও এক তালাক গণ্য করা হয় নাই। স্বয়ং মহানবী (স) হইতে এমন বিভিন্ন হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে যাহাতে তিনি একই বৈঠকে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন তালাকই সাব্যস্ত করিয়াছেন (ঐসব হাদীছের জন্য দ্র. ইব্ন কুদামা, আল-মুগনী; আশ-শাওকানী, নায়লু'ল-আওতার, ৬খ, ২৩২)। এইসব হাদীছের কতিপয়ের সনদ যদিও দুর্বল, কিন্তু সবগুলি হাদীছ একত্রে সাহাবীগণের সম্মিলিত কার্যক্রমের সহিত একত্র হইয়া অনস্বীকার্য হইয়াছে (বিস্তারিত দ্র. আন-নাওয়াবী, শারহ সাহীহ মুসলিম, ১খ, ৪৭৮; মুল্লা 'আলী আল-কারী, মিরকাতু'ল-মাফাতীহ, মুলতান ১৩৮৮ হি., ৬খ, ২৯৪ প.; যাদু'ল-মা'আদ; আহ্‌মাদ শাকির, আহ্‌কামু'ত-তালাক)।

'উমার (রা)-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলা যায় যে, ইহার সহিত কোন সাহাবীর মতবিরোধের কথা উল্লেখ নাই, বরং সকল ফকীহ সাহাবীর সূত্রে ইহার সমর্থনে অসংখ্য রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। এমন কি স্বয়ং ইব্ন 'আব্বাস (রা), যাঁহার রিওয়ায়াত ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ফাতওয়া দিতেছিলেন যে, তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করিতে হইবে (আবূ দাউদ, আস্-সুনান, করাচী সং. ১৩৬৯ হি., পৃ. ২৯৯)। তিনি ব্যতীত 'উছমান (রা), 'আলী (রা), ইব্ন 'উমার (রা), মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা), কাদী শুরায়হ (র) ও হাসান বাসরী (র) হইতেও এই ধরনের ফাতওয়া বর্ণিত আছে (ইব্ন আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, দাক্ষিণাত্য ১৩৯০ হি., ৫খ, ১২-৪)। ইহার পর হইতে স্বল্প সংখ্যক 'আলিম ব্যতীত ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ ফাকীহ এই মতের প্রবক্তা।

এই শেষ যামানায় কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র এমন বিধান অনুমোদন করে যেইখানে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হইয়াছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ১৯৬১ সালে জারিকৃত মুসলিম পারিবারিক আইনেও তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা পূর্ণরূপে ইব্ন তায়মিয়া (র) ও ইবনু'ল-কায়্যিমের অভিমতের সহিতও সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ তাঁহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন তিন তুহরে যদি তিন তালাক দেওয়া হয় তবে উহাকে তিনই গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইনে ইহাকেও তিন তালাক গণ্য করা হয় নাই। এইজন্য তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের 'আলিমগণ কর্তৃক ইহা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয় এবং তাঁহাদের পক্ষ হইতে সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, একই সময় তিন তালাক প্রদানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হউক (বিস্তারিত দ্র. তানযীলু'র-রাহ্‌মান, মাজমু'আ কাওয়ানীন ইসলাম, রাওয়ালপিণ্ডি ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৫০৯-৫৬২; মুহাম্মাদ তাকী উছমানী, হামারে 'আ'ইলী মাসা'ইল, করাচী ১৩৮২ হি., পৃ. ১৫৬-২০৭)।

৪. যেইসব শব্দ প্রয়োগে তালাক দেওয়া হয় উহার ভিত্তিতে তালাক দুই প্রকার ঃ সারীহ্ ও কিনায়া। সারীহ তালাক বলিতে এমন তালাককে বুঝায় যাহাতে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয় যাহা খোলাখুলিভাবে তালাকের অর্থ প্রদান করে, যেমন "আমি তোমাকে তালাক দিলাম।" কিনায়া তালাক হইল যাহাতে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয় যাহার মধ্যে তালাকের অর্থ থাকারও সম্ভাবনা আছে এবং ভিন্ন অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলিল, "তুমি স্বাধীন।" ইমাম মালিক (র) ও ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সারীহ তালাক কেবল 'তালাক' শব্দের প্রয়োগেই হইতে পারে। অবশিষ্ট সমস্ত শব্দ কিনায়া (ইব্ন রুশদ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৮০; ইবনু'ল-হুমাম, ফাতহু'ল-কাদীর, ৩খ, ৪৪)। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে 'তালাক' শব্দ ছাড়াও 'ফিরাক' (فراق-বিচ্ছিন্নতা) ও তাসরীহ্ (تسريح-ছাড়িয়া দেওয়া)-ও সারীহ তালাকের শব্দ এবং অবশিষ্ট শব্দসমূহ কিনায়া (আল-মুযানী, আল-মুখতাসার, পৃ. ১৯৬, শাফি'ঈর কিতাবু'ল-উম্ম-এর সহিত মুদ্রিত, ৮খ, মাকতাবাতু'ল কুল্লিয়াতি'ল আযহারিয়্যা, ১৩৮১ হি.)। ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর প্রসিদ্ধ মতও শাফি'ঈর অনুরূপ। অবশ্য ইব্ন হামিদ (র) প্রমুখ প্রথমোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন (আল-মুগনী, ৭খ, ১২১-২)। সারীহ (সুস্পষ্ট) শব্দ সম্পর্কে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা যে কোন অবস্থায় তালাক হইয়া যায়, শব্দ উচ্চারণকারী তালাকের নিয়াত করুক বা না করুক। কিন্তু কিনায়া (ইংগিতমূলক) শব্দে অধিকাংশ 'আলিমের মতে নিয়াত অথবা অবস্থার সমর্থন অত্যাবশ্যক (ফাতহু'ল-কাদীর, ৩খ, ৮৭)। অবশ্য ইমাম মালিক (র)

কিনায়াকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন ঃ জাহিরা (ظاهرة-সুস্পষ্ট) ও মুহতামিলা (محتملة-সম্ভাব্য)। জাহিরার ক্ষেত্রে সারীহ-এর মতই নিয়াতের উপস্থিতি আবশ্যক নয় (বিস্তারিত দ্র. বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৮২)। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কিনায়ার কতিপয় শব্দ বাদে অবশিষ্ট সকল কিনায়াত দ্বারা বা'ইন তালাক হইয়া যায় এবং অপরাপর ইমামের মতে এই ব্যাপারে সারীহ ও কিনায়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই (ফাতহু'ল-কাদীর, ৩খ, ৯৩)। এই গোটা আলোচনা আহ্‌লে সুন্নাতের মতানুযায়ী। শী'আ জা'ফারী ফিক্‌হ অনুযায়ী তালাক কেবল সুস্পষ্ট (صريح) শব্দের প্রয়োগেই সংঘটিত হয়, ইঙ্গিতমূলক শব্দের (كناية) প্রয়োগে তালাক হয় না, শব্দ উচ্চারণকারীর তালাকের নিয়াত থাকুক বা না থাকুক (শারা'ই'উ'ল-ইসলাম, ২খ, ৫৫)।

৫. ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী তালাক সঠিক ও যথার্থ হওয়ার জন্য তালাকদাতাকে অবশ্যই সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন, স্বাধীন ও যাহাকে তালাক দেওয়া হইতেছে তাহার স্বামী হইতে হইবে। অতএব পাগল, সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধিবঞ্চিত ব্যক্তি ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক কাহারও নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা ও শাফি'ঈ (র)-এর মতে তালাকদাতাকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক হইতে হইবে। অতএব নাবালেগের তালাক নির্ভরযোগ্য নয় (আশ-শীরাযী, আল-মুহায্‌যাব, ২খ, ৭৭; আল-কাসানী, বাদা'ই'উ'স-সানা'ই', ৩খ, ১০০)। ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর মতে যে বালক তালাকের অর্থ ও তার পরিণতি উপলব্ধি করিতে পারে তাহার তালাক নির্ভরযোগ্য। কোন কোন হাম্বালী ইহার সর্বনিম্ন বয়সসীমা দশ বৎসর নির্ধারণ করেন (আল-মুগনী, ৭খ, ১১৬ প.)। ইমাম মালিক (র)-এর অনুরূপ একটি মত বর্ণিত আছে (বিদায়াতু'ল- মুজতাহিদ, ২খ, ৮৮)। জা'ফারী ফিক্‌হ-এ সঠিক মত এই যে, সাবালকত্ব অত্যাবশ্যক (শারা'ই'উ'ল-ইসলাম, ২খ, ৫৩)।

ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহ্‌মাদ (র)-এর মতে অনন্তর জা'ফারী ফিক্‌হ্-এ আরও একটি শর্ত এই যে, তালাকদাতা স্বেচ্ছায় তালাক দিয়া থাকিবে। অতএব যে তালাক জোরপূর্বক আদায় করা হইয়াছে তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে বল প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে প্রদত্ত তালাকও গ্রহণযোগ্য (বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ ও শারাই'উ'ল ইসলাম)। অবশ্য হানাফী মাযহাবে বলপূর্বক আদায় করা তালাক কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হইবে–যদি তালাকদাতা 'তালাক' শব্দটি মুখে উচ্চারণ করিয়া থাকে। অবশ্য জোরজবরদস্তির কারণে তালাকনামা লিখিয়া দিলে এবং মুখে কিছু না বলিলে তালাক হইবে না (আশ-শামী, রাদ্দু'ল মুহতার 'আলা'দ-দুররিল-মুখতার, ইস্তাম্বুল সং. ১২৪ হি., ২খ, ৫৭৯)। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রদত্ত তালাক ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও অধিকাংশ ফকীহ্-এর মতে সংঘটিত হইবে। এই ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ ও আহ্‌মাদ (র)-এর দুইটি করিয়া মত বর্ণিত আছে, কিন্তু উক্ত মাযহাবদ্বয়ের ঝোঁক তালাক সংঘটিত হওয়ার দিকেই (বিস্তারিত দ্র. আল-মুগনী, ৭খ., ১১৫; আল-মুহায্‌যাব, ২খ, ৭৭)।

শী'আ জা'ফারী ফিক্‌হ অনুয়ায়ী তালাক সঠিক ও যথার্থ হওয়ার জন্য উপরোক্ত শর্তাবলী ছাড়া নিম্নোক্ত শর্তাবলীও অবশ্যই পূর্ণ হইতে হইবে ঃ (ক) বিদ'ঈ তালাক হইবে না, (খ) তালাকের শব্দাবলী সুস্পষ্ট হইতে হইবে, (গ) তালাকের শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ করিতে হইবে। অতএব লিখিত তালাক গ্রহণযোগ্য নয়– যদি স্বামী কথা বলিতে সক্ষম হয়, (ঘ) তালাক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। অতএব অন্য কোন ভাষায় উক্ত শব্দের অনুবাদ প্রতিশব্দ গ্রহণযোগ্য নয়, যদি স্বামী 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করিতে সক্ষম হয়, অবশ্য সক্ষম না হইলে অনুবাদ গ্রহণযোগ্য। (ঙ) দুইজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম সাক্ষীর উপস্থিতিতে তালাক দিতে হইবে এবং 'তালাক' শব্দটি তাঁহাদের স্বকর্ণে শুনিতে হইবে। সাক্ষ্যবিহীন তালাক গ্রহণযোগ্য নহে (শারা'ই'উ'ল-ইসলাম, ২খ, ৫৪-৬)। কিন্তু আহ্‌লে সুন্নাতের মতে ইহার কোন শর্তই তালাক সঠিক ও যথার্থ হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়।

৬. যে তালাক শর্তহীনভাবে তৎক্ষণাৎ কার্যকর সাব্যস্ত করার জন্য দেওয়া হয় তাহাকে মুনাজ্জিয (منجز) তালাক বলে এবং যে তালাককে শর্তযুক্ত করা হয় তাহাকে মু'আল্লাক (معلق) তালাক বলে। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিল, "তুমি যদি ঐ ঘরে প্রবেশ কর তবে তুমি তালাক হইয়া যাইবে"। এই শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সকলের ঐকমত্য অনুযায়ী তালাক অনুষ্ঠিত হইবে না। কিন্তু যদি সুনির্দিষ্ট সময়ের সহিত শর্ত যুক্ত করা হয়, যেমন "আগামী কল্য যদি সূর্য উদিত হয় তবে তুমি তালাক"; তবে ইহা ইমাম মালিকের মতে মুনাজ্জিয তালাক ও তৎক্ষণাৎ তালাক সংঘটিত হইবে এবং অপরাপর ইমামের মতে উহা মু'আল্লাক তালাক (বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৮৫)। ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী মু'আল্লাক তালাক শুদ্ধ হওয়ার জন্য 'তালাক' শব্দ বলার সময়ও এবং শর্ত পূরণ হওয়ার সময়ও সংশ্লিষ্ট নারীর তালাকদাতার স্ত্রী থাকা অত্যারশ্যক। এই প্রসংগে একটি বিশেষ বিষয় এই যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন বেগানা নারীকে বলে, "আমি তোমাকে বিবাহ করিলে তুমি তালাক", তবে ইহার বিধান কি? এই সম্পর্কে তিনটি মত প্রসিদ্ধ। (ক) এই ধরনের তালাক যে কোন অবস্থায় নিরর্থক এবং বিবাহ্ করার পরও তালাক পতিত হইবে না। ইহা ইমাম শাফি'ঈ, আহ্‌মাদ ও দাউদ জাহিরী (র)-এর মত। (খ) যে কোন অবস্থায় এই তালাক নির্ভরযোগ্য, অতএব সংশ্লিষ্ট নারীকে বিবাহ করার সঙ্গে সঙ্গে সে তালাক হইয়া যাইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত। (গ) এই প্রকারের কথা যদি একজন অথবা কতিপয় নির্দিষ্ট মহিলার সম্পর্কে বলা হয়, তবে উহা গ্রহণযোগ্য। আর সারা দুনিয়ার নারীদের সম্পর্কে বলিয়া দেওয়া হয় "আমি যে নারীকেই বিবাহ্ করিব সে তালাক", তবে ইহা অর্থহীন কথা হিসাবে গণ্য হইবে। ইহা ইমাম মালিক (র)-এর মাযহাব (বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ, ২খ, ৯১)। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর প্রসিদ্ধ দলীল নিম্নোক্ত হাদীছ لا طلاق قبل النكاح (বিবাহের পূর্বে তালাক নাই)। কিন্তু হানাফী 'আলিমগণের বক্তব্য এই যে, প্রথমত, উক্ত হাদীছের সনদসূত্র বিশৃংখল (مضطرب)। দ্বিতীয়ত, আলোচ্য অবস্থায় তালাক বিবাহের পরেই সংঘটিত হয়, তাই ইহা উপরোক্ত হাদীছের পরিপন্থী নয় (আল-জাসসাস; আহ্‌কামু'ল-কুরআন, ৩খ, ৪৪৭; আহ্‌মাদ শাকির, আহ্‌কামু'ত-তালাক)।

৭. যে নারীকে নির্জনবাসের (خلوة) পূর্বেই তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহাকে কুরআনের বিধান অনুযায়ী 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবে না। গর্ভবতী নারীর 'ইদ্দাতের সময়সীমাও কুরআনের বিধান অনুযায়ী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত; যে নারীর বালেগ না হওয়ার কারণে অথবা কোন রোগের কারণে হায়য (মাসিক ঋতু) শুরু হয় নাই, অথবা বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার কারণে হায়য বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার 'ইদ্দাত কুরআন মাজীদে পরিষ্কার ভাষায় তিন মাস বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব এই সব মাসআলার ক্ষেত্রে কোন মতবিরোধ নাই। অবশ্য যে নারী অন্তঃসত্তা নহে এবং নিয়মিত হায়য হয় তাহাকে সম্ভোগের পর তালাক দেওয়া হইলে কুরআন মাজীদ তাহার 'ইদ্দাত তিন কুরূ' (قروء) নির্ধারণ করিয়াছে। কুরূ' শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা, আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল, আওযা'ঈ, ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়ায়হ্ ও সুফ্‌য়ান ছাওরী (র) প্রমুখের মতে ইহার অর্থ তিন হায়যকাল এবং ইমাম মালিক,

শাফি'ঈ, যুহ্‌রী ও আবূ ছাওর (র) প্রমুখের মতে ইহার অর্থ তিন তুহর (বিস্তারিত দ্র. আল-মুগনী, ৭খ, ৪৫২ প.)। শী'আ জা'ফারী ফিক্‌হ-এও প্রসিদ্ধ মত এই যে, কুর' বলিতে তুহর (طهر) বুঝানো হইয়াছে (আল-হিল্লী, শারা'ই'উ'ল-ইসলাম, ২খ, ৬২)।

রাজ'ঈ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী 'ইদ্দাত চলাকালীন যথারীতি স্বামীর নিকট হইতে বাসস্থান ও খোরপোশ পাওয়ার অধিকারী থাকে। বা'ইন তালাকপ্রাপ্তা যদি গর্ভবতী অবস্থায় থাকে তবে সেও বাসস্থান ও খোরপোশের অধিকারিণী। এই দুইটি বিষয়ে 'আলিমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য যে বা'ইন তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নয় তাহার সম্পর্কে ফকীহ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফি'ঈ ও মালিক (র)-এর মতে সে খোরপোশ পাইবে, কিন্তু বাসস্থান পাইবে না। ইমাম আহ্‌মাদ, ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়ায়হ ও আবূ ছাওর আল-কালবী (র)-এর মতে সে খোরপোশ ও বাসস্থান কোনটিই পাওয়ার অধিকারী নয়; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও কুফাপন্থী 'আলিমগণের মতে সে উভয়টিই পাওয়ার অধিকারী (বিস্তারিত দ্র. ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, ফাতহু'ল-বারী, ৯খ, ৩৯৬ প., আল-মাতবা'আতু'ল-বাহিয়্যা, মিসর ১৩৪৮ হি.; আল-মুগনী, ৭খ, ৬০৬)। জা'ফারী ফিক্‌হ-এর মত এই ব্যাপারে ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর অনুরূপ (শারা'ই'উ'ল-ইসলাম, ২খ, ৬৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত বরাতের অতিরিক্ত দ্র. (১) আল-কুরআনু'ল-কারীম, ২ ঃ ২২৭-২৪১; ৬৫ ঃ ১-৭; ৬৬ ঃ ৫; ৪ ঃ ২০ এবং এসব আয়াতের অধীন তাফসীরসমূহ, বিশেষত (২) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহ্‌কামি'ল-কুরআন; (৩) আল কাসিমী, তাফসীরু'ল-কাসিমী; (৪) তাফসীরু'ল-মানার। উর্দূ ভাষায় রচিত তাফসীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে (৫) মুফতী মুহাম্মাদ শাফী', মা'আরিফু'ল-কুরআন, করাচী ১৩৮৯ হি., ১খ.; (৬) আমীর 'আলী, তাফসীর মাওয়াহিবি'র-রাহমান। হাদীসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে সিহাহ্ সিত্তা ছাড়াও (৭) আদ-দারা কুতনী, আস-সুনান; (৮) আল-হায়ছামী, মাজমা'উ'য-যাওয়াইদ ওয়া মানবা'উ'ল-ফাওয়াইদ, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., ৪ও ৫ খ.। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের মাযহাবসমূহ সম্পর্কে সিহাহ সিত্তার ভাষ্য গ্রন্থসমূহ ছাড়াও দ্র. ঃ (৯) জাফার আহ্‌মাদ 'উছমানী, ই'লাউ'স-সুনান, থানাভূন ১৩৫৬ হি., ১১ খ, ৯৫-১৬০। ফিক্‌হ-এর আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য দ্র. ঃ (১০) ইব্‌ন নুজায়ম, আল-বাহ্‌রু'র-রাইক শারহি কানযি'দ-দাকাইক, মিসরীয় সং, ৩ ও ৪ খ.। তালাক সম্পর্কে ভারতীয় উপমহাদেশের নিয়ম-কানূন সম্পর্কিত বিধানসমূহের জন্য দ্র. ঃ (১১) আশরাফ 'আলী থানাবী, ইমদাদু'ল-ফাতাওয়া, করাচী সং, ২খ.; (১২) মুফতী মুহাম্মাদ শাফী,' ফাতাওয়া দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ, করাচী ১৩৭৪ হি., ২খ. ও ৪খ.।

মুহাম্মাদ তাকী 'উছমানী (দা. মা. ই.)/মুহাম্মদ মূসা

আত-তালাক (سورة الطلاق) ঃ আল-কুরআনু'ল-কারীমের ৬৫তম সূরার নাম; অন্য নাম আন-নিসাউ'ল কুস্‌রা النساء القصرى-ছোট সূরা নিসা', রূহুল-মা'আনী, ২৮খ, ১২৮)। সর্বসম্মতিক্রমে সূরাটি মাদানী, আয়াত সংখ্যা বস্‌রা-র কারীদের মতে এগার, অধিকাংশের মতে বার (পূ. গ্র.)। সূরাটি নাযিলের কারণ সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ (১) যখন রাসূলুল্লাহ (স) উম্মু'ল-মু'মিনীন হাফ্‌সা (রা)-কে তালাক দেন, তখন এই সূরাতে তাঁহাকে রাজ'আত (رجعة -প্রত্যাগমন, তালাকদত্তাকে একটি কিম্বা দুইটি তালাকের পর পুনরায় গ্রহণ)-এর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয়, হাফ্‌সা (রা) সালাত ও সাওমের পাবন্দ এবং জান্নাতে যে আপনার পবিত্রাত্মা স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে (দ্র. আস্‌বাবু'ন-নুযূল, পৃ. ২৪৫; আল-বাহ্‌রু'ল-মুহীত, ৮খ, ২৮১); (২) হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) এবং আরও কতিপয় সাহাবী তাঁহাদের স্ত্রীগণকে হায়য (حيض-রজঃস্রাব) অবস্থায় তালাক দিয়াছিলেন। এই সূরায় তাঁহাদিগকে 'ইদ্দাত-এর বিধান অনুযায়ী তালাক দিবার নির্দেশ দেওয়া হয় (পূ. গ্র.); (৩) বিবাহ, তালাক, 'ইদ্দাত, রাদা'আত (رضاعة-স্তন্যপান) ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যান্য সূরায় যে বিধানগুলি রহিয়াছে, এই সূরাতে কিছু সম্পূরক বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে (দ্র. ইব্‌নু'ল-'আরাবী, আহ্‌কামু'ল-কুরআন, পৃ. ১৮১১ প.; আল- বাহ্‌রু'ল-মুহীত, ৮খ, ২৮১)।

অতি গুরুত্বপূর্ণ যেই সকল শার্'ঈ বিধান, যাহা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 'আদ্‌ল প্রতিষ্ঠার জন্য একান্ত জরুরী, এই সূরায় প্রবর্তিত হইয়াছে সেই বিধানগুলি সংক্ষেপে এইরূপ ঃ (১) তালাক দেওয়ার বেলায় 'ইদ্দাত-এর দিকে লক্ষ রাখিতে এবং 'ইদ্দাতের যথাযথ হিসাব রক্ষা করিতে হইবে। 'ইদ্দাতের কালে স্ত্রীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবে না, অবশ্য ব্যভিচারে অপরাধিনীর কথা স্বতন্ত্র (আয়াত ১)। (২) 'ইদ্দাত পূর্ণ হইলে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে স্ত্রীকে হয় রাখিবে অথবা বিদায় দিবে; এই ব্যাপারে দুইজন নির্ভরযোগ্য মুসলিম (ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ)-কে সাক্ষী রাখিবে (আ. ২); তালাকের 'ইদ্দাত হইবে, (ক) তিন মাস–ঋতুবতী হয় নাই কিম্বা ঋতু বন্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে এমন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে, (খ) সন্তান প্রসব হইবে গর্ভধারিণীদের বেলায় (আ. ৪)। 'ইদ্দাতকালে স্বামিগণ তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের খোরপোশ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবে, তাহাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য অঘটন ঘটাইবে না; গর্ভবতী হইলে প্রসবকাল পর্যন্ত তাহার প্রয়োজনানুযায়ী সর্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করিবে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী সন্তানকে স্তন্য দান করিলে তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে হইবে এবং ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পরামর্শক্রমে কাজ করিতে হইবে যাহাতে কার্পণ্য না হয় এবং শিশু মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত না হয় (আ. ৬)। বিত্তবান স্বামী তাহার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য 'ইদ্দাতকাল পর্যন্ত ব্যয় করিবে, সীমিত সম্পদ স্বামী আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হইতে যথাসম্ভব খরচ করিবে, সামর্থ্যের অধিক দায়িত্ব কাহারও উপর আল্লাহ্ অর্পণ করেন না (আ. ৭)। "আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য মুবাহ্ কর্ম তালাক" যেন পুনর্মিলনের দ্বার রুদ্ধ না করে, যেন গর্ভস্থ সন্তানকে বিপন্ন না করে। সেইজন্য আল্লাহ্ উপরোক্ত বিধানগুলি প্রবর্তন করিলেন–এই কথাটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে প্রথম আয়াতের শেষাংশে– لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا "তুমি ত অবগত নও সম্ভবত আল্লাহ্ ইহার (তালাকের) পর নূতন কোন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারেন (যাহাতে বিবাহ বন্ধন অটুট থাকিতে পারে)"। পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বিধানগুলিকে حدود الله (আল্লাহ্‌র নির্ধারিত গণ্ডী)রূপে উল্লেখ (আ. ১) করা হইয়াছে। আরও ইরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী মুত্তাকী মুতাওয়াক্কিল ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্, অশান্ত অস্বস্তিকর অবস্থা হইতে "পরিত্রাণের পথ করিয়া দেন" يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [আ. ২]; অপ্রত্যাশিত সূত্রে রিযিক দান করেন" يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ-[আ. ৩]; জটিল অবস্থার সহজ ব্যবস্থা করিয়া দেন يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا [আ. ৭] و و لْتَتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ [আ. ৬], আয়াতাংশে পরামর্শক্রমে কাজ করিবার নির্দেশ দান করা হইয়াছে উভয়কে।

৮ম হইতে ১১শ আয়াতে অবাধ্য পূর্ববর্তী কাওমগুলির পরিণতি উল্লেখের পর মু'মিনগণকে কুরআন মাজীদের অনুসরণের তাগিদ দেওয়া

হইয়াছে, যেমন প্রায় সূরাতে দৃষ্ট হয়। সূরার সমাপ্তিতে বলা হইয়াছে, "আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন আকাশমণ্ডলীর সাতস্তর (سَبْعَ سَمٰوٰتٍ) এবং পৃথিবীরও আকাশমণ্ডলীর অনুরূপ (وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ) স্তরসমূহ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সুয়ূতী, ইত্কান, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২) কাদী আবূ বাক্র ইব্নু'ল-'আরাবী, আহ্কামু'ল-কুরআন, কায়রো ১৯৫৮ খৃ., তিনি এই সূরার প্রথম সাতটি আয়াত হইতে ৪৪টি ফিক্হী বিধানের দলীল উদ্ভাবন করিয়াছেন; (৩) অন্যান্য প্রসিদ্ধ তাফ্সীর গ্রন্থ।

জাহূর আহ্মাদ আজহার (দা. মা. ই.)/আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তালাকান (طالقان) ঃ (তালকান, সামা'আনী, আনসাব, পৃ. ৩৬৩ খ), পারস্য দেশের দুইটি শহরের নাম।

১। বালখ ও মারব আর-রূয-এর মধ্যে তুখারিস্তানের অন্তর্গত একটি শহর, শেষোক্ত শহরটি হইতে তিন দিনের পথ। ইহা সমতল ভূমিতে অবস্থিত হইলেও পর্বতের অতি সন্নিকটে; তীরের পাল্লা গালওয়া ইহা প্রদেশের বৃহত্তম শহর ছিল এবং এইখানে একটি বিরাট বিপণীও ছিল; ইহা দুই নদী ঃ খুত্তাল-আব (de Goeje-এর সংশোধন) ও বার-আব দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। ইহা ৬১৭/১২২০ সনে চিঙ্গীস খান ধ্বংস করেন। চাচাকতূ-র নিকট ইহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

২। কাযবীন ও আবহারের মধ্যে অবস্থিত দায়লামের অন্তর্গত একটি শহর। ইহা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহরসমেত একই নামের একটি জিলার রাজধানী। ইহা বিখ্যাত প্রচারক সাহিব ইস্মা'ঈল ইব্ন 'আব্বাদের জন্মস্থান। তাঁহার পিতা আবু'ল-হাসান 'আব্বাদ ইব্ন আল-'আব্বাস-এর গোত্রীয় নাম ছিল তালাকানী। এই শহরের অধিবাসিগণ ইসমা'ঈলীদের বিরুদ্ধ মতাদর্শের অনুসারী ছিল বলিয়া সন্দেহ করা হইত। ইহার নিকটেই নদী কারাহ্-রূয ও বুহ্রূযে-র উপনদী এবং সাফীদ-রূয-এর উপনদী, শাহ্রূয নদীর দুইটি উৎসের একটি অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, ৩খ, ৪৯১- Barbier de Maynard, Dict. de la Perse, পৃ. ৩৭৬; (২) ইসতাখরী, B. G. A., ১খ., ২৭৮; (৩) মুকাদ্দাসী, B. G. A., ৩খ, ৩০৩; (৪) মুস্তাওফী, নুযহাতু'ল-কুলূব, সম্পা. Le Strange, G. M. S., লণ্ডন ১৯১৫, পৃ. ৬৫, ১৫৬, ২১৭, ২২০, ২২২-অনু. পৃ. ৭০, ১৫৩, ২১০, ২১৩, ২১৪; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, Biographical Dictionary, অনু. de Slane, প্যারিস ১৮৪২ খৃ., ১খ., ২১৬; (৬) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, পৃ. ২২৫; ৪৩২; (৭) আবু'ল-ফিদা', Geographie (সম্পা. Reinaud এবং de Slane, প্যারিস ১৮৪০), পৃ. ৪২০, ৪৫৮; (৮) Quatremere, Histoire des Mongols, ১খ., ২৭৮ টীকা।

CL. Huart (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

তালাবেরাহ (تلبيرة) ঃ স্পেনে কতিপয় শহরের নাম; ইহার আরবী রূপ তালাবীরা। শহরগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ ১ Talavera de La Reina রোমানদের নিকট Caesarobiga নামে পরিচিত। ১০,৬০০ অধিবাসীর শহর, টলেডোর (Toledo) প্রায় ১০০ মাইল ভাটিতে তাগাস (Tagus) নদীর তীরে Sierra de Gredos-এর প্রবেশদ্বারের উর্বর সমতল ভূমিতে অবস্থিত। 'Torres Albarranas' নামে পরিচিত। আরব অধিকৃত সময় কালের স্মারক স্তম্ভসমূহ এখানে অদ্যাবধি বিরাজমান। আরব ভৌগোলিকগণ এই শহরের হিসন-এর কাঠিন্য প্রসংগে গর্ববোধ করেন; ২। শেষোক্তটির আনু. ২০ মাইল দক্ষিণস্থ Talavera La Vieja, প্রাচীন Augustobriga, ৩।Talavera La Real, গদাজোয়ের ১২ মাইল উত্তরে গুয়াদিয়ানার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি ছোট শহর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ইদরীসী, সিফাতু'ল-আনদালুস, সম্পা. এবং অনু. Dozy ও de Goeje, মূল পাঠ, পৃ. ১৮৭, অনু, পৃ. ২২৭; (২) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, সং Wustenfeld, দ্র.; (৩) Fagnan, Extraits ineits relatifs ad Maghrueb, পৃ. ৯২)।

E. Levi-Proveeneal (E.I.[2])/ আবদুল বাসেত

তালিকোটের যুদ্ধ ঃ ১৫৬৫ খৃ., এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের গৌরব চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়। বিজয়নগরের তুলুব বংশের রাজা সদাশিব রায়ের রাজত্বকালে মন্ত্রী রামরাজা প্রকৃতপক্ষে সর্বেসর্বা ছিলেন। বিজাপুরের সুলতানদের সহিত মিলিত হইয়া রামরাজা আহমাদনগর আক্রমণ করেন এবং সেইখানে নৃশংস অত্যাচার চালান। তাঁহার নিষ্ঠুরতায় ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের মুসলমান মিত্রবর্গের প্রতি হীন ব্যবহারের ফলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর ও আহমাদনগরের সুলতানগণের সম্মিলিত বাহিনী বিজয়নগর আক্রমণ করেন। ১৫৬৫ খৃ. তালিকোটের সন্নিকটে [বর্তমান বিজাপুর জিলার অন্তর্গত, কর্ণাটক (সাবেক মহীশূর) রাজ্য, ভারত], উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘটিত তুমুল যুদ্ধে বিজয়নগর বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়; রামরাজা বন্দী ও নিহত হন। রাজধানী বিজয়নগর লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধের পরে রাজ্যের কিয়দংশ সুলতানগণ দখল করেন। বাকি অংশ স্থানীয় সর্দারগণের শাসনাধীনে থাকে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭১৬

তালিব আমুলী (طالب املى) ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ তালিব, 'আমুল' (মাযানদারান?)-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন 'হাকীম রুক্নু'দ-দীন মাসীহ্ কাশী"-এর প্রিয়জনদের অন্যতম। পনর-ষোল বৎসর বয়সে প্রকৌশল, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, তাসাওউফ ও সুন্দর হস্তলিপির ক্ষেত্রে তিনি খুব পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি প্রথম জীবনে 'মাযানদারান' হইতে কাশান গমন করেন এবং তথায় বিবাহ করেন। এইখানেই তাঁহার কাব্যচর্চা আরম্ভ হয়। তিনি কিছুদিন মারব (مرو)-এ অবস্থান করেন। মাল্কাশ খাঁ (অথবা বাকতাশ খাঁ [দ্র. মায়খানা গ্রন্থের পাদটীকা], যিনি শাহ 'আব্বাস সাফাবী-র প্রতিনিধিরূপে মারব-এর শাসনকর্তা ছিলেন)-র প্রশংসায় তালিব একটি কাসীদা রচনা এবং তাঁহারই নামে "খুস্রাও ও শীরীন"-এর ছন্দে একটি পূর্ণাঙ্গ মাছনাবী রচনা করেন (দ্র. মায়খানা)। উক্ত মাছনাবীর কয়েক পংক্তিতে তিনি তাঁহার প্রশংসিত মালকাশ খানের নিকট স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে বিদায়ের প্রার্থনা করেন; মালকাশ তাঁহার এই প্রার্থনা মঞ্জুরও করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশে না গিয়া বরং ভারতের দিকে রওয়ানা হন (মায়খানা-র বর্ণনায় তিনি প্রথমে কান্দাহার গিয়াছিলেন)। জানা যায়, প্রথমবার যখন তিনি ভারতে আসেন, তখন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, মুলতান ও সারহিন্দ পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে নিরাশ হইয়া মীরযা জানী বেক তুর্খান-এর পুত্র তৎকালীন কান্দাহারের সুবাহ্দার মীরযা গাযী বেক্ তুর্খান (কবিনাম وقارى)-এর নিকট গমন করেন (দ্র. শি'রু'ল-'আজাম)। ১০২০ হি.-তে তুরখান তাঁহার এক ভৃত্য কর্তৃক প্রদত্ত বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তালিব বাধ্য হইয়া পুনরায়

ভারতে আগমন করেন। প্রথমে আগ্রায় উপনীত হইলে খাজা কাসিম দিয়ানাত খান তাঁহার জন্য গুজরাটের প্রশাসক 'আবদুল্লাহ খান ফীরোয জংগ-এর নিকট সুপারিশ করেন। তালিব ফীরোয জংগ-এর নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করেন। অতঃপর শাহ্পুর তেহরানীর মাধ্যমে ই'তিমাদু'দ-দাওলা খাজা গিয়াছু'দ-দীন মুহাম্মাদ রাযী (নূরজাহানের পিতা)-র দরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করেন এবং তাকী আওহাদী-র বর্ণনানুযায়ী (দ্র.মাজ্মা'উ'ন-নাফা'ইস) খাজা গিয়াছু'দ-দীনের সংস্পর্শে কাব্য ক্ষেত্রে তিনি পারদর্শিতা লাভ করেন। দিয়ানাত খান' তালিবকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে বিশিষ্টভাবে পরিচিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তালিব এইবার উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হন (শি'রু'ল-'আজাম, ৩খ ১৭৩; আসী, ২য় মুদ্রণ)। অবশ্য দ্বিতীয়বার যখন ই'তিমাদু'দ-দাওলার মাধ্যমে তিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার কাব্যিক প্রতিভা অন্যদের তুলনায় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দরবারী কবিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং হি. ১০২৮-তে তাঁহাকে মালিকু'শ-শু'আরা' (কবি সম্রাট)-এর সম্মান প্রদান করেন (দ্র. তুযূক-ই জাহাঙ্গীরী, আলীগড়, ২৮৬, অনু. Rogers and Beveridge, ২খ, ১১৭; আরও দ্র. ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরী, ১৩২, ৩০৮)। তালিব সম্রাট শাহ্জাহানের আমলে 'কবি সম্রাট' উপাধি লাভ করেন–মুল্লা তাহির নাস্র আবাদীর এই বর্ণনা সঠিক নহে (দ্র. ফিহ্রিস্ত বাঁকীপূর; মাজমা'উ'ন-নাফা'ইস)। শ্মশ্রু মুণ্ডনের নির্দেশের কারণে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত তালিবের মনোমালিন্যের বর্ণনাও পাওয়া যায়। ১০২৯ হিজরীতে তাঁহার ফতেহপুর গমনের কথাও বর্ণিত আছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলের শেষভাগে ১৩৩৫/১৬২৫ সনে (আল্লাহপ্রেমে?) পাগল অবস্থায় তালিব মৃত্যুবরণ করেন (সামী বেক, কামূসু'ল-'আলাম; ফিহ্রিস্ত বাঁকীপূর; কিন্তু শাম' আন্জুমান ও শি'রু'ল-'আজাম গ্রন্থদ্বয়ে হি. ১০৩৬ সন উল্লিখিত)। মোল্লা শায়দা' "হাশরশ ব'আলী ইব্ন আবী তালিব বাদা" (-'আলী ইব্ন আবী তালিব-এর সহিত তাঁহার পুনরুত্থান হউক) এই কথায় আরবী আবজাদের হিসাবে তালিবের মৃত্যু ১০৩৫ হি. নির্ধারণ করিয়াছেন।

'মায়্খানা-র রচয়িতা মুল্লা 'আবদু'ন-নাবীর সহিত তালিবের প্রথম সাক্ষাত হয় আগ্রায় ১০২০ হি.। তিনি তালিবের অমায়িক ব্যবহার এবং দ্রুত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রবণতার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন (মায়্খানা, পৃ. ৩৮৬)। তালিব স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। ই'তিমাদু'দ-দাওলা তাঁহার উপর مهرداری বা সচিবের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা পালনে অক্ষম হইলেন এবং অল্প কালেই ইস্তফা দিলেন।

তালিব কাসীদা, গাযাল, খণ্ড কবিতা,গদ্যকবিতা ترکیب بند = বিশেষ ধরনের কবিতা, যাহার প্রতিটি বন্দের শেষ চরণ আলাদা) এবং কিছু মাছনাবী রচনা করিয়াছিলেন। Riau (৩খ, ১০০১) সম্রাট জাহাঙ্গীরের শিকারের প্রশংসায় রচিত তালিবের একটি মাছনাবী-র উল্লেখ করিয়াছেন। বাঁকীপুর ক্যাটালগার সুহুফ-ই ইব্রাহীম-এর সূত্রে তালিবের পাঁচ হাজার চরণ (بیت) সম্বলিত জাহাঙ্গীরনামা-র উল্লেখ করিয়াছেন (৩খ, ৫০)। তালিবের দীওয়ানের পাণ্ডুলিপি পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত আছে (দ্র. Riau, ২খ, ৬৭৯; Oxford-এর Bodleian লাইব্রেরী ক্যাটালগ, সংখ্যা ১০৯০, ১০৯২; ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ, সংখ্যা ১৫২৪-১৫২৯; বান্কিপুর ক্যাটালগ ৩খ, সংখ্যা ২৯২ হইতে ২৯৬; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাটালগ, সংখ্যা ৪৯১ ও ৮১২)।

অধিকাংশ জীবনী লেখক তালিবের কাব্য প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন। আযাদ বিলগিরামী তাঁহাকে "রুচিশীল কল্পনাকুশলী, উন্নত মানের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু এবং চিত্তাকর্ষক মুক্তা নিচয়ের ডুবুরী (شاعر خوش تخیل وجویاے معانی بلند وغواص لالی دل پسند) আখ্যা দিয়াছেন (খাযানা-ই 'আমিরা)। কবি আর্যু তালিবের কবিতাকে "লবণাকরসদৃশ" (অর্থাৎ সুমিষ্ট) উপমা (تمکسار استعارة) বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতাগুলি বর্ণাঢ্যতায় দুর্লভ, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাঁহার কাসীদা ও গাযালসমূহ প্রশংসার সংকীর্ণ গণ্ডির ঊর্ধ্বে স্থাপিত। প্রাচীনদের মধ্যে খাজা হাফিজকে যেমনভাবে "কবি উদ্যানরক্ষক" আখ্যা দেওয়া হয় (بلبل شعراء), তদ্রূপ মাজমা'উ'ন্-নাফাইস ও মির'আত-ই আফতাবনামা-র বর্ণনানুযায়ী তালিব-এর মনোমুগ্ধকর বর্ণনার কারণে লোকে তাঁহাকে "بلبل امل" আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল। সারখোশ তাঁহার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, মিরযা সা'ইবও তাঁহার শিষ্যত্বের কথা স্বীকার করেন। অবশ্য আতশ্কাদা গ্রন্থের রচয়িতা বলিতেন, কবির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল, তাঁহার বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট নহে।

তালিব খণ্ড কবিতা (قطعات) ও দীর্ঘ কবিতা (قصائد) রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূলত গাযাল (প্রেমগীতি)-এর জন্যই প্রধানত তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যাহার কিছু কিছু ছিল তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। বিষয়বস্তুর বিবরণে তালিব তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং নাজীর ও 'উর্ফী'-র কবিতার ন্যায় তাঁহার কবিতায় আবেগের গভীরতা নাই। তিনি শব্দের লালিত্য ও অর্থের গূঢ়ত্ব ও কল্পনায় বর্ণাঢ্যতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার কবিতায় জীবনবোধের ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য নাই। তাঁহার কবিতা সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলের উজ্জ্বল ও উন্নত পারিপার্শ্বিকতার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। ইহাই তালিবের একক বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুল্লা 'আব্দুন-নাবী, মায়্খানা, মুদ্রণে মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী, লাহোর ১৯২৬ খৃ., ৩৮৪-৩৮৯; (২) শিব্লী নু'মানী, শি'রু'ল-'আজাম, মুদ্রণে আন্ওয়ারু'ল-মাতাবি', লক্ষ্মৌ ১৯২২ খৃ., ১৩৫-১৫২; (৩) তূযুক-ই জাহাঙ্গীরী, আলীগড়, পৃ. ৬৪, ২৮৬; (৪) ইক্বাল নামা-ই জাহাঙ্গীরী, কলিকাতা ১৮৭০ খৃ., ১৩২-৩০৮; (৫) নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, শাম 'আন্জুমান, ১২৯৩ হি., ২৭২; (৬) খান আর্যূ, মাজ্মা'উ'ন-নাফা'ইস, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডু., পৃ. ২৩২ (ب), ২৩৫; (৭) সারখোশ; কালিমাতু'শ-শু'আরা', পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডু., পৃ. ৩২ (ب), ৩৪ (الف); (৮) আতশ্কাদা-ই আখ্র, বোম্বাই ১২৯৯ হি., ১২০; (৯) আহ্মাদ 'আলী, মাখ্যানু'ল-গারাইব, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডু., ১৯৯-২০১; (১০) হুসায়ন কুলী খান, নিশ্তার-ই 'ইশ্ক, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় পাণ্ডু., ৩০৯–৩১২; (১১) মাআছিরু'ল উমারা', ২খ, কলিকাতা ১৮৯০ খৃ., ৭৯১ (সংক্ষেপিত)।

সায়্যিদ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ (দা. মা.ই.)/মুহাম্মাদ সোলায়মান

আত-তালিব ইব্ন ছা'লাবা (التلب بن ثعلبة) ঃ (রা) ইব্ন রাবী'আ ইব্ন 'আতিয়্যা ইব্ন উফায়ফ আত-তামীমী আল-আনবারী, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মিলকাম বা হিলকাম (দ্র. ইব্ন হাজার, তাহযীবু'ত-তাহযীব, মিলকাম শিরো.)-এর পিতা বসরার অধিবাসী একজন সাহাবী। কাহারও মতে তিনি যায়নাব বিন্ত ছা'লাবা-র সহোদর ভাই ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার বংশপরম্পরা সম্পর্কে ভিন্ন মতও পোষণ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার নামের শেষ অক্ষরটি দ্বিত্ব উচ্চারণ করত আত-তালিব্বু পড়িয়া থাকেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শু'বা তাঁহার নামের

প্রথম অক্ষর "তা' (ت)-এর পরিবর্তে 'ছা' (ث) উচ্চারণ করত ছালিব পড়িতেন। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র) বলেন, শু'বা-র মুখে জড়তা ছিল বলিয়া তা'-এর পরিবর্তে 'ছা' উচ্চারণ করিতেন। ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে আত-তালিব ইব্ন ছা'লাবা বানূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তাঁহারা আপন গোত্রের বিচারক নিয়োগের আবেদন লইয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং সাক্ষাতের শিষ্টাচার সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে কক্ষের পিছন হইতে তাঁহাকে চিৎকার করিয়া ডাকিতে থাকেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ . وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ . وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"যাহারা কক্ষের পিছন হইতে আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে, তাহাদের অধিকাংশই বুঝে না। আপনি বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি তাহারা ধৈর্য ধারণ করিত, তাহাই তাহাদের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৪৯ ঃ ৪-৫; মুফতী মুহাম্মাদ শাফী', মা'আরিফু'ল-কুরআন, ৮খ, পৃ. ৯৮, ১০২, করাচী)।

ইব্ন হাজার তাকরীবু'ত-তাহযীব গ্রন্থে বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত হাদীছ মাত্র একটি। কিন্তু আল-ইসাবা গ্রন্থে লিখেন, তাঁহার বর্ণিত একাধিক হাদীছ রহিয়াছে। আত-তালিব ইব্ন ছা'লাবা বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি। কিন্তু গর্তে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ হারাম হওয়া সম্পর্কে কিছু শুনি নাই।" এই হাদীছটি ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইমাম নাসাঈ (র) তাঁহার সুনান গ্রন্থে আত-তালিব ইব্ন ছা'লাবা হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্ন আবী খায়ছামা বলেন, এখনও বসরায় তাঁহার বংশধর পাওয়া যায়। ইমাম আল-আযদীর মতে তাঁহার পুত্র ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শ্রবণ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জন্য তিনবার মাগফিরাতের দু'আ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন হাজার, তাযযীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ১খ, পৃ. ৪৪৭; (২) ঐ লেখক, আল-ইসাবা, বৈরূত, ১খ, ১৮৫; (৩) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ৪৯; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, আল-ইসাবার হাশিয়া-য়, বৈরূত তা. বি. ১খ, ১৮৫; (৫) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ৪২; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৭; (৭) আবূ দাউদ, সুনান, কিতাবু'ল-আত'ইমা, কলিকাতা তা. বি., ২খ., ১৭৬; (৮) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২১২।

আহমদ মায়মূন

(কবি) তালিম হোসেন (تعليم حسين) ঃ চল্লিশের দশকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিশিষ্ট কবি। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (দ্র.) যেমন দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় বাকশক্তিহীন ও চলৎশক্তিহীন হইয়া দিনাতিপাত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি তাহার ভক্ত অনুরক্ত কবি তালিম হোসেনও ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় দিন কাটাইয়াছেন।

নিঃসন্দেহে কবি তালিম হোসেন নজরুল পরবর্তী কালের অন্যতম প্রধান কবি। তিনিই কাজী নজরুল ইসলামকে এই দেশবাসীর নিকট তুলিয়া ধরিবার সার্বিক ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি নজরুল ইসলামের নামে ঢাকায় প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন 'নজরুল একাডেমী'র মত প্রতিষ্ঠান। নজরুল ইসলামের গানকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নজরুল সঙ্গীতের প্রামাণ্য স্বরলিপি সংকলন সিরিজ 'নজরুল স্বরলিপি' সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এইজন্য তিনি আপন কন্যা শবনম মুশতারী, পারভীন মুশতারী ও ইয়াসমীন মুশতারীকে নজরুল সঙ্গীতে পারদর্শী করিয়া গড়িয়া তোলেন। তাহারা এখন নজরুল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী।

বাংলাদেশে যে কয়জন কবি কাব্য সাহিত্যে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন, কবি তালিম হোসেন তাহাদের অন্যতম। তিনি ১৯১৮ (১৩২৫) খৃ. রাজশাহী জিলার নওগাঁ মহকুমার (বর্তমানে জিলা) বাদলগাছি থানার চাকরাইল গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা তৈয়বউদ্দীন চৌধুরীও (মৃ. ১৯৬৮ খৃ.) একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তাহার প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি, তাহার মধ্যে 'নকশা' (১৯৫২ খৃ.) ও 'ভিক্ষাদান' (১৩৫৩) কাব্যগ্রন্থ। ইহা ছাড়াও কবির পিতা তৈয়বউদ্দিন চৌধুরী গল্প, কবিতা, ইতিকথা, প্রহসন, গান, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদিও লিখিয়াছেন। কবি তালিম হোসেনের মাতার নাম গোলেজান নেসা (মৃ. ১৯৭২ খৃ.)।

তিনি লেখাপড়া আরম্ভ করেন গ্রামের স্কুলে। সেইখান হইতে মাইনর ক্লাস পাস করিয়া কীর্তিপুর হাই স্কুলে ভর্তি হন। পরে নওগাঁ কে.ডি. হাই স্কুল হইতে কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিক পাস করেন এবং রাজশাহী কলেজে আই.এ. ভর্তি হন। কিছু দিন পর তিনি রাজশাহী কলেজ ছাড়িয়া টাঙ্গাইলের করটিয়া সাদত কলেজে ভর্তি হন। ইন্টারমিডিয়েট পাস করিবার পর তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে বাংলা অনার্স-এ ভর্তি হন, কিন্তু পরে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং সেইখান হইতে ১৯৪৬ খৃ. বি.এ. (অনার্স) পাস করেন।

তালিম হোসেন তাহার সাহিত্যিক পিতার নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া সাহিত্যাঙ্গণে প্রবেশ করেন। কবির ভাষায়, "আমার বেলায় একটা বিশেষ অনুষঙ্গ সহায়ক হইয়াছিল, সেইটা হইতেছে সাহিত্য শিল্পে অনুরাগী বাবার পোষকতা ও গুণগ্রাহিতা"। কবির পিতা তৈয়বউদ্দিন চৌধুরী অল্প শিক্ষিত মানুষ হইলেও সাহিত্য সংগীতের একজন সমঝদার ব্যক্তি ছিলেন। বাড়িতে ছিল সমৃদ্ধ পাঠাগার। তৎকালে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা রাখিবার ব্যবস্থাও ছিল তাহাদের বাড়িতে।

তালিম হোসেনের প্রথম লেখা সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখিয়াছেন, "ছোট বেলাতেই আমি সাধারণ কথায় ছন্দ মিলাইয়া কবিতা লেখা শুরু করি। ক্রমেই দেখি আমি নিজে যতো ভারি নই, আমার কবিতার ভাব-ভাষা তাহার চাহিতে ভারি হইয়া উঠিতেছে। যেসব লেখা বাবাকে দেখাতে লজ্জা লাগিতো তাহা কখনো কখনো আমার প্রাইভেট মাস্টারকে দেখিতে দিতাম। তিনি প্রশংসা করিতেন। এইসব দেখিয়া শুনিয়া আমার শরীকের ভাই-বেরাদর এবং স্কুলের সঙ্গী-সাথীরা আমাকে বেশ সমীহ করিতো। আবার কেহ কেহ কবি হইয়া গিয়াছি বলিয়া ঠাট্টা করিতো। আমার বয়সের কিছু বড় এক চাচাত ভাই একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, দ্যাখো তো কবি, আমাদের গরুটা ঠিকমত দুধ দেয় না, একটা কবিতা-টবিতা লিখিয়া তুমি ঠিক করিয়া দিতে পার কি না। শুনিয়া রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম" (কিশোর জগৎ, মার্চ ১৯৮৫ খৃ.)।

কবির প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় এস. ওয়াজেদ আলী প্রতিষ্ঠিত গুলিস্তা পত্রিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে নববর্ষ সংখ্যায়। কবিতাটির শিরোনাম ছিলো 'গুলিস্তাঁ'। তাহার প্রথম কাব্য গ্রন্থের নাম 'দিশারী' (১৯৫৬ খৃ.)। ইহার পর 'শাহীন' (১৯৬২ খৃ.), নুহের জাহাজ (১৯৮৪ খৃ.), 'ইসলামী কবিতা' (১৯৮১ খৃ.), শিশু কিশোর কবিতা ধাইসিঁড়ি ধাইকি (১৯৮১ খৃ.) সম্প্রতি ১৯৯৮ খৃ. কবি পত্নী মাফরুহা চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে 'তালিম হোসেনের কাব্য সমগ্র'। ইহা ছাড়া গল্প, প্রবন্ধ, গান ইত্যাদিও লিখিয়াছেন। তিনি জন স্টাইনবেকের উপন্যাস 'স্বর্গচারণ' (১৯৫৯ খৃ.) এবং এন্ড্রু কার্ণেগী'র (১৯৬২ খৃ.) জীবনী অনুবাদ করিয়াছেন, সম্পাদনা করিয়াছেন পূর্বাচল, মাহে নও, মাসিক মোহাম্মদী ইত্যাদি পত্রিকা।

লেখালেখির সূত্রেই তালিম হোসেন সাংবাদিকতা শুরু করেন মাসিক মোহাম্মদীতে। তাহার সাংবাদিক জীবন সম্বন্ধে 'পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা' গ্রন্থের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লেখক নিতাই লিখিয়াছে, "কবিতা লেখার সূত্রে তিনি মাসিক মোহাম্মদীতে সাংবাদিকতা শুরু করেন। এক সময়ে তিনি মাসিক মোহাম্মদীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি 'মাহে নও' পত্রিকায় যোগদান করেন, প্রথমেই এই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মাসিক 'পূর্বাচল'-ও সম্পাদনা করিয়াছেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশনা বিভাগের সহকারী পরিচালক পদেও তিনি কিছুকাল নিয়োজিত ছিলেন"।

সুন্দর-সুপুরুষ, ব্যক্তিজীবনে সদালাপি ও নীতিনিষ্ঠ কবি তালিম হোসেন তাহার কাব্যে ও অন্যান্য লেখায় ইসলামের মহত্ত্ব, শৌর্য্য ও ঐতিহ্যকে ধারণ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে তিনি বাংলা কাব্যাকাশে ইসলামী ভাবধারা পুষ্ট প্রথম সারির একজন কবি।

তালিম হোসেন ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর কবি। তিনি একান্তভাবে কামনা করিতেন পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ প্রতিষ্ঠার। যে কারণে তিনি তাহার লেখালেখিতে বারবার জোর দিয়াছেন ইসলামের তাওহীদবাদ, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সাম্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার উপর। পাকিস্তানে সেই কাঙ্ক্ষিত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত আন্দোলনের পক্ষে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিশারী' তাহার বাস্তব প্রমাণ।

কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন, কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী চলিতে পারিলে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইবে, সাথে সাথে শোষণ-শাসন, সন্ত্রাস, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। যেমন

জিন্দেগানীর আজাদী-সনদ
এনেছি আল-কোরআন
এনেছি দিশারী আল-আমীনের
তাওহিদী ফরমান...
খুদীতে দৃপ্ত অভিযান সেই
আনন্দ বন্দরে...।

কবির আশা ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐসব অসঙ্গতি দূর হইবে। প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃত ইনসাফ, কুরআনী সমাজ। নেতৃত্বের ঝাণ্ডা ফেরাউন, শাদ্দাদ, হামান, কারুনের হাত হইতে চলিয়া আসিবে খালিদ, তারিক, মূসার হাতে। পুনরায় আবু বক্‌র, 'উমর, উছমান ও আলী (রা)-র সোনালী শাসনের যুগ ফিরিয়া আসিবে। প্রতিষ্ঠিত হইবে জুলুম-নির্যাতনের পরিবর্তে সাম্য-মৈত্রী, ন্যায়-ইনসাফ। তাহার বিভিন্ন কবিতায় এইসব আশাবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। 'পাকিস্তান' শিরোনামের কবিতাটিতে ইহা প্রকট। 'পাক ওয়াতান' কবিতাটির শেষাংশে কবি লিখিয়াছিলেন-

এবার হেথায় জালিমের দিন শেষ
এবার হেথায় মানুষের ইনসাফ;
এ পাক ওয়াতান চির-মানুষের দেশ,
এখানে তাহার তকদীর আফতাব।

তালিম হোসেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, হযরত মুহাম্মাদ (স)-ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং মানবতার প্রকৃত বন্ধু ও পথ প্রদর্শক। রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেখানো পথেই পৃথিবীতে শান্তি আসিতে পারে বলিয়াও তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন। তিনি তাহার ভালবাসা, প্রেম ও উদারনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে জাহিলিয়াতকে উৎখাত করিয়া যে শান্তির সমাজ কায়েম করিয়াছিলেন, কবিও তেমনি একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার পিয়াসী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

চাই বেঁচে যেতে চাই,
তেমন করিয়া আবার বাঁচিতে চাই
অনন্ত জ্ঞান অনন্ত প্রেম ল'য়ে,
সকল বিত্তে মহাধনাঢ্য হয়ে,
যেমন করিয়া প্রশান্ত প্রাণে তুমি বেঁচে আছো প্রিয়,
জীবন-মরণে মানব-স্মরণে হয়ে আছো বরণীয়। (দিশারী)

তাহার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'শাহীন' (১৯৬২ খৃ.), ভাবের দিক দিয়া সূক্ষ্ম পরিবর্তন ছাড়া পূর্বের কাব্যগ্রন্থ হইতে তেমন কোন পার্থক্য লক্ষ করা যায় না। 'দিশারী' কাব্যগ্রন্থে ইকবালের খুদীতত্ত্বের ব্যাপারে যে অস্ফুট ধারণা ছিলো, 'শাহীন'-এ আসিয়া তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। আকাশচারী শাহীন দিগন্তে ছুটিয়া বেড়ায় সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া, এই পাখিটিকে কবি মানবতাত্মার প্রতীক হিসাবে নির্বাচন করিয়াছেন, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য পূর্ণ প্রজ্ঞা অর্জন।

ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য পৃথিবীর মানুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূণ্য হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। নানা মতবাদ আর তন্ত্রমন্ত্রে ভারাক্রান্ত যখন পৃথিবী, মানুষ যখন কোথাও শান্তির নাম নিশানা খুঁজিয়া পাইতেছে না তখন কবি সর্ব মানবতাকে আহ্বান জানাইতেছেন চিরন্তন শান্তির পথ ইসলামের দিকে।

কবি তালিম হোসেনের ১৩টি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে ঃ ১. নাস্তির প্রহর (নতুন কবিতা); ২. চয়িতা (কাব্য সংকলন); ৩. দুশ্চর (ব্যঙ্গ কবিতা সংকলন); ৪. রৌদ্রের পিপাসা (সনেট সংগ্রহ); ৫. সুর লোক (গানের বই); ৬. জমজম (কিশোর কবিতা); ৭. কবির প্রিয়া (গল্প সংকলন); ৮. দিগ্বিদিক (প্রবন্ধ সংকলন); ৯. ইকবালের কবিতা (অনুবাদ); ১০. মনীষা (অনূদিত প্রবন্ধমালা); ১১. ফুলকি (শিশুদের ছড়া); ১২. ঘড়ি আর ঘোড়া (ছোটদের গল্প) ও ১৩. অনুগত (অনূ. কবিতা সংকলন)।

তাহার কাব্য-সাধনার বিরাট একটি অংশ জুড়িয়া আছে শিশু-কিশোর সাহিত্য। যেমন ধাই কিড়ি ধাই কি, জমজম, ফুলকি

প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। ইহা ছাড়া 'ঘড়ি আর ঘোড়া' নামে তাহার একটি অপ্রকাশিত কিশোর গল্প গ্রন্থ আছে।

তিনি ছিলেন কলিকাতার মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মী ও সংগঠক, ঢাকা 'পাকিস্তান মজলিস' নামে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, 'বাংলা একাডেমী'র প্রথম কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য, 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, 'ইসলামিক একাডেমী'র সদস্য, ঢাকার 'রওনক' সাহিত্য ও বিনোদন গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, 'নজরুল একাডেমী'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক ও পরে সভাপতি এবং নিজ জন্মস্থান নওগাঁ জেলার চাকরাইল গ্রামের মূল্যবান প্রাচীন সংগ্রহ সমৃদ্ধ 'রিজওয়ান লাইব্রেরী'র প্রতিষ্ঠাতা।

তালিম হোসেন বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার, পাকিস্তান সরকারের 'সিতারা-ই ইমতিয়ায' খেতাব ও স্বর্ণ পদক, একুশে ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পদক, পশ্চিম বঙ্গের চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর নজরুল পুরস্কার ও সংবর্ধনা, বাংলা সাহিত্য পরিষদ-এর গুণীজন সংবর্ধনা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও গোষ্ঠী প্রদত্ত সাহিত্য পদক ও পুরস্কার, সংবর্ধনা পাইয়াছেন। কবি তালিম হোসেন বেশ কিছু সময় জীবনমৃতাবস্থায় থাকার পর গত ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯, রোজ সোমবার ভোর পৌণে ৪টায় ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৮৩; (২) নিতাই দাস, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, জুন ১৯১৩; (৩) তালিম হোসেন কবিতা সমগ্র, সম্পাদনা ঃ মাফরুহা চৌধুরী, প্রকাশক আসাদ বিন হাফিজ, প্রীতি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ-জুলাই ১৯৯৮; (৪) নাসির হেলাল, তালিম হোসেন, একটি একান্ত সাক্ষাৎকার, দৈনিক সংগ্রাম ১৯৯০; (৫) কিশোর জগৎ, মার্চ ১৯৮৫; (৬) শিল্পতরু, সম্পাদক আবিদ আজাদ, মে ১৯৯০; (৭) কবি তালিম হোসেন ট্রাস্ট স্মারক, ১৯৯৮ খৃ.।

নাসির হেলাল

তালীশ (تليش) ঃ (ফা.) পারস্যের (ইরানের) গীলান (দ্র.) নামক প্রদেশের একটি জিলা ও জনগোষ্ঠীর নাম। গুলিস্তাঁ সন্ধির (শান্তিচুক্তি) [১২-২৪ অক্টো., ১৮১৩] পর হইতে রুশ ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। Marquart-এর বিবরণ অনুসারে (Marquart, Osteuropaische und Ostasiatische streif zuge, Liepzig 1903, p. 278 প.) এই নামটি (তালিশ–এই আকারে) সর্বপ্রথম আলেকজাণ্ডারের উপাখ্যানের আর্মেনীয় অনুবাদে পাওয়া যায় (অধ্যায় ১৯৪-২, ১৯, পৃ. ৭৬, সম্পা. C. Muller)। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আরব বিজয়ের ইতিহাসে (de Goeje, p. 327) অঞ্চলটিকে তাইলাসান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। য়াকূতের রচনায় আল-আসমা'ঈর (য়াকূত, ৩খ, ৫৭১, ১৯) বর্ণনা অনুযায়ী স্থানটির নামের ফারসী উচ্চারণ ছিল ঃ তালিশান (দৃশ্যত বহুবাচনিক আকার)। একই রচনায় (i, 812, 18) উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তালাশান (এইভাবেই মুখে উচ্চারিত) গীলান প্রদেশের একটি জিলা ('আমাল) ছিল। মুকাদ্দাসীর দেয়া বিবরণ অনুযায়ী (B. G. A., ii, 373) তাবারিসতান-গীলান সীমান্তের সালুস হইতে শেমাখার (তু. শীরওয়ান) মধ্যে গীলান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সর্বশেষ শহরের নাম কুহান-রূয। এই শহর কুর (দ্র.) হইতে দক্ষিণে ৪ দিনের পথ। হামদাল্লাহ কাযবীনী (G. M. S. xxxiii, 180 ult.) সুলতানিয়া ও আরদাবীলের মধ্যে আরদাবীল অভিমুখী সড়কে আরদাবীল হইতে ৬ ফারসাখ দূরে তালিশ নামে এক গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রাম সংশ্লিষ্ট জিলা (বিলায়েত) তাওয়ালিশ (পৃ. ১৬২, ১২) নামে অভিহিত হইত। রাশিয়া ও পারস্যের সহিত যুদ্ধের আগে তালীশ জনপদের তেমন বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। পারস্যের অধীনে এই জনপদটি একজন বিশেষ খান দ্বারা শাসিত হইত ও ইহার রাজধানী আজিকার মতই লেনকোরান নামের একটি শহর। তালীশের পাহাড়শ্রেণী বা আলপ্‌স ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ ভূমি অঞ্চলের জলবায়ু ইহার উত্তরের সমভূমির জলবায়ু (লেন-কোরানের বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫২ ইঞ্চি ও বাকুতে ১০ ইঞ্চি) অনেক বেশি আর্দ্র। ইহা ভৌগোলিকভাবে গীলান প্রদেশের অন্তর্গত। স্থানটি সমান উর্বর ও অস্বাস্থ্যকর এবং এইখানে নানা ধরনের বিচিত্র প্রাণীর বাস (বাঘসহ)। রুশগণ এই অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে "তালীশি" বা 'তালীশিনচী' বলিয়া অভিহিত করে। আর ঐ জনপদের অধিবাসীরা নিজেদেরকে 'তালীশ' নামে পরিচয় দেয়। ইহারা উত্তরে মুগান স্তেপভূমি অবধি অঞ্চলে বসবাস করে। এইখানে তাহাদের জীবনযাত্রা যাযাবর প্রকৃতির। দক্ষিণে রুশ সীমান্তের আনুমানিক ৩০ মাইল দক্ষিণেও ইহাদের বসবাস লক্ষ করা যায়। রুশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী তালীশের সংখ্যা ১৯২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ছিল ৭৫,৮২৪। গীলানের অধিবাসিদের মত তালীশগণও শী'ঈ মতাবলম্বী মুসলমান। তাহাদের ভাষার সহিত গীলানের ভাষার পার্থক্য অতি সামান্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Gr. Iran, Phil., I/ii, 345-এ প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী; (২) N. Talishi, Petrograd 1922, p. 24; (৩) G. Le Strange, The lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1905, p. 173 sq. ; (4) E. Weidenbaum, Putevoditel po Kavkazu, Tiflis 1888, নির্ঘণ্ট; (৫) Spisok Narodnostei s. s. S. R., Pod redakciei I. I. Zarubina, Leningrad 1927, p. 9.

W. Barthold (E. I. [1])/ আফতাব হোসেন

তালিসমান (দ্র. জামা'ইল)

তা'লীক (দ্র. 'আরাবিয়্যা)

তালূত (طالوت) ঃ বানী ইসরাঈল-এর প্রথম বাদশাহকে তাওরাত-এ শাউল বলা হইয়াছে এবং কুরআন কারীম-এ বলা হইয়াছে তালূত (২ ঃ ২৪৮-২৫০)।

পটভূমি ঃ হযরত মূসা ('আ)-এর ইন্তিকালের পর য়ূশা' ইব্‌ন নূন বানী ইসরাঈল-এর নেতা ও পথপ্রদর্শক নিযুক্ত হন। তাঁহারই নেতৃত্বে ফিলিস্‌তীনের অবরোধ শুরু হয়। ইহার পর বিচারকদিগের যুগ আসে (যাহাদের হাতে রাষ্ট্রনীতি ও শাসন ব্যবস্থার ভার অর্পিত ছিল তাঁহাদিগকে বিচারক বলা হইত)। ফিলিসতীনীদের সহিত প্রায় পৌনে দুই শত বৎসরব্যাপী যুদ্ধ চলিতে থাকে। কোনরূপ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা না থাকায় বানী ইসরাঈল-এর মধ্যে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না, যাহা শত্রুর মুকাবিলায় অতি জরুরী ছিল। কারণ ইহা ছাড়া ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তি সঞ্চয় হইত না। ফিলিস্‌তীনীদের সহিত যুদ্ধে বানী ইসরাঈলগণ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন কি ফিলিস্তীনীগণ তাহাদের নিকট হইতে তাবূত-ই সাকীনা (দ্র.)-ও ছিনাইয়া লয়, যাহাতে পবিত্র গ্রন্থ লিখিত কাষ্ঠফলকসমূহ এবং নবীগণের ব্যবহৃত পবিত্র

বস্তুসমূহ ছিল। কথিত আছে যে, এই সময়ে সামূঈল নবী ছিলেন। ইসরাঈলীগণ তাঁহাকে বলিয়া একজন বাদশাহ-এর ব্যবস্থা করাইল যাহাতে সমগ্র শক্তি একীভূত হইয়া যায়। অতঃপর শা'উল (তালূত)-কে বানী ইসরা'ঈল-এর বাদশাহ নিযুক্ত করা হয় (এম. এল. লিংগার, ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড হিস্টরী হইতে সংক্ষেপিত)। তিনি ফিলিস্তীনীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাবূত-ই সাকীনা উদ্ধার করিয়া আনেন। ফিলিস্তীনীদের বিখ্যাত সরদার ছিল জালূত নামক একজন বীর, যাহাকে এক মেষপালক যুবক সম্মুখসমরে আহ্বান করিয়া হত্যা করে। এই যুবক ছিলেন হযরত দাউদ ('আ)।

নামকরণ ঃ সামূঈল গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিনয়ামীন-এর গোত্রে কায়স ইব্ন আব ঈল... নামক এক ব্যক্তি ছিল । তাঁহার এক সুদর্শন যুবক পুত্র ছিল, যাহার নাম ছিল শা'উল। তিনি এত লম্বা ছিলেন যে, লোকজনের মাথা তাহার কাঁধ পর্যন্ত পৌছিত (সামু'ঈল, ১ম ৯/১-২)।

আতঃপর উল্লিখিত হইয়াছে যে, শা'উল যখন বাদশাহ হন তখন তাহার পার্শ্ববর্তী মুআবী, বানী 'আম্মুন, আদওয়ামী ও 'আমালীক প্রভৃতি বেদুঈন গোত্রের সহিত তাহার মুকাবিলা করিতে হয় (সামু'ঈল ১ম ১৪/৪৭-৪৮)। ধারণা করা হয় যে, আকৃতি লম্বা হওয়ার কারণে আরব গোত্রসমূহে শা'উল তালূত নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ছা'লাবী তালূত নামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন লম্বাকৃতি। আর ইহাই সঠিক।

তাফসীর বায়দাবীতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তালূত 'ইবরানী নাম। 'ইবরানী ভাষায় "তূল" শব্দের অর্থ লম্বাকৃতি (আরবীতে তালা)। জালূত আরামী ভাষার শব্দ। আরামী আরবীর সমন্বয়ে তালূত গঠিত হইয়াছে। আদওয়ামী ও 'আমালীকদের ভাষা ছিল আরামী আরবী।

পাচ্যবিদগণের ধারণা হইল যে, শা'উল-এর উচ্চারণ কুরআন কারীম-এ তালূত আকারে আসিয়াছে (আর্থার জিওফ্রে)। ইহা সঠিক নহে। আর ইহাও সঠিক নহে যে, জালূত-এর সহিত শাব্দিক মিল করার জন্য তালূত নাম আসিয়াছে (Goldziher)। তালূত আসল ও সাত্তিক নাম নহে, বরং ইহা প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ, যাহার অর্থ হইল 'লম্বাকৃতি'।

কুরআন কারীম ও তালূত ঃ কুরআন কারীম-এ তালূত-এর কাহিনী এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, "তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরা'ঈল প্রধানগণকে দেখ নাই? তাহারা যখন তাহাদের নবী (সামূ'ঈল)-কে বলিয়াছিল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাহাতে আমরা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করিতে পারি। সে বলিল, 'ইহা তো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হইলে তখন আর তোমরা সংগ্রাম করিবে না?' তাহারা বলিল, 'আমরা যখন স্ব স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি, তখন আল্লাহ্‌র পথে কেন সংগ্রাম করিব না?' অতঃপর যখন তাহাদের প্রতি সংগ্রামের বিধান দেওয়া হইল তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল এবং আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'আল্লাহ তালূতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন'; তাহারা বলিল, 'আমাদের উপর তাহার কর্তৃত্ব কিরূপে হইবে, যখন আমরা তাহা অপেক্ষা কর্তৃত্বের অধিক হকদার এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্য দেওয়া হয় নাই।' নবী বলিল, 'আল্লাহই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।' আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। এবং তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'তাঁহার কর্তৃত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত আসিবে যাহাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্তপ্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যাহা পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে; ফেরেশ্‌তাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে তোমাদের জন্য ইহাতে নিদর্শন আছে।"

অতঃপর তালূত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল সে তখন বলিল, 'আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন। যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে, আর যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না সে আমার দলভুক্ত; ইহা ছাড়া যে কেহ তাহার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করিবে সেও। অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহারা উহা হইতে পান করিল। সে ও তাহার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন উহা অতিক্রম করিল তখন তাহারা বলিল, 'জালূত ও তাহার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই। কিন্তু যাহাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্‌র সহিত তাহাদের সাক্ষাত ঘটিবে তাহারা বলিল, 'আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে।' আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন (২ ঃ ২৪৭-২৪৯)

ইসলামী রিওয়ায়াতসমূহ ঃ বুখারীর এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, আল-বারাআ ইব্ন 'আযিব (রা) বলেন, আমরা সাহাবীগণ ও রাসূলুল্লাহ (স) পরস্পর আলোচনা করিতাম যে, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা এবং তালূত-এর সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা সমান সমান (আল-বুখারী, কিতাবু'ল-মাগাযী)। তালূত সম্পর্কে কোন কোনও মুফাস্‌সির শুধু ইসরা'ঈলী বর্ণনার উপরই নির্ভর করিয়াছেন। অথচ এই সকল উপাখ্যানের জন্য কুরআন কারীম সঠিক ফায়সালাকারী হিসাবে নাযিল হইয়াছে, য়াহূদীদের গোমরাহী ও ভ্রান্তির সংশোধন করিয়াছে। আর সেই সকল কথাই তাফসীরে প্রবেশ করিয়াছে।

মুফাস্‌সিরগণ এই সকল তথ্য বাইবেলের সামূঈ'ল গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হইয়াছে। ঘটনাবলীতে সময়ের উলট-পালট তথা পূর্বাপরের বিভ্রান্তিও রহিয়াছে। ভ্যাটিকানের কপি সাব'ঈনিয়া-তে ১৭, ১৮ অধ্যায়-এর ৪৪ আয়াত বিলুপ্ত (Peaks Bible Commentary 280e)। তাওরাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পানি সম্পর্কিত পরীক্ষার এই ঘটনাটি শা'উল হইতে দুই শত বৎসর পূর্বে কাদী'উল'-কুদাত (প্রধান বিচারপতি) জাদ'উন-এর সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল (কাদিয়ূন ৪-৭)। কুরআন কারীম-এ এই পরীক্ষার ঘটনা তালূত (শা'উল)-এর প্রতি আরোপিত হওয়ায় পাশ্চাত্যবিদগণ আপত্তি করিয়াছেন। 'উলামা' ও পণ্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন যে, কোনও কোনও ঘটনা যাহা শাউল-এর বেলায় ঘটিয়াছিল, তাহা বানী ইসরা'ঈল-এর কাদিয়ূন-এর প্রতি আরোপ করত তাহার সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে (প্যাকস বাইবেল কমেন্ট্রী)। এমনিভাবে কাদিয়ুন ও সামূ'ঈল (বাইবেল-এর দুইটি গ্রন্থ) মিলিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় পণ্ডিতদের প্রচলিত প্রশ্ন তাওরাত-এর উপর হওয়াই উচিৎ, কুরআন কারীম-এর উপর নহে।

এমনিভাবে সামূ'ঈল গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তাবূত-ই সাকীনা শা'উল কর্তৃক ফেরত আনা হয় নাই, বরং ইহার পূর্বেই তাহা ফেরত আসিয়াছিল। এই ব্যাপারেও কুরআন কারীমের বিবরণ সঠিক। কারণ সামূ'ঈল গ্রন্থের পূর্বাপর বিভ্রান্তি সর্বজনস্বীকৃত। সাব'ঈনিয়্যা কপিতে সামূ'ঈল অধ্যায় অন্যান্য কপি হইতে ভিন্নতর। এই পরিবর্তিত ও

পরিবর্ধিত গ্রন্থকে সত্যের মাপকঠিরূপে নির্ধারণ করা যায় না। এই ব্যাখ্যার পর তাফসীর-এর রিওয়ায়াতসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তালূত-এর নাম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, সেই সময়ে ভবিষ্যৎ বাদশাহ-এর পরিচয় পাওয়া যাইত তাহার আকৃতি দ্বারা (ছা'লাবী)। সামূ'ঈল নবী বাদশাহ-এর পরিচয়ের মাপকাঠি বলিয়া দেন। কিন্তু তালূত ব্যতীত বানী ইসরা'ঈল-এর কেহই ততটুকু দীর্ঘ ছিল না। (বাদশাহ হিসাবে) তাঁহার নির্বাচন যে সঠিক এই ব্যাপারে একটি অলৌকিক ঘটনাও সংঘটিত হয়। বলা হইয়া থাকে যে, তালূত যখন তাঁহার হারানো গর্দভী সম্পর্কে পরামর্শের জন্য সামূ'ঈল-এর নিকট গমন করিলেন তখন রাজ্যাভিষেক তৈল টগবগ করিয়া ফুটিতে আরম্ভ করিল। তাবারীর তাফসীরে অন্য নিদর্শন অর্থাৎ প্রত্যাদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। "তালূত লোকজনের দৃষ্টিতে অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলেন"–কুরআন কারীমের এই ঘটনার ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, শাউল বিন্‌য়ামীন (Benjamin)-এর বংশধর ছিলেন অর্থাৎ তিনি য়াহূদী বংশের রাজগোত্রভুক্তও ছিলেন না। আবার লাবী বংশের 'আলিমগণের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না (ছা'লাবী)। তালূত-এর উপযুক্ততা প্রমাণে তাবূত-এর চিহ্ন সম্পর্কিত বর্ণনায় বিস্ময়কর কথার উল্লেখ রহিয়াছে। তাহা হইল, এই পবিত্র তাবূত (বাক্স) হযরত আদাম ('আ) হইতে লইয়া বংশপরম্পরায় হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর মাধ্যমে তাঁহার পুত্র কীদার-এর নিকট পৌঁছে। কীদার য়া'কূব-কে দেন। এই তাবূত-এ সাকীনা (প্রশান্তি)-ও ছিল। উহাতে নবীগণের অন্তর, শারী'আত-এর বিধিনিষেধ সম্বলিত কাষ্ঠফলক, মূসা ('আ)-এর লাঠি, হারূন ('আ)-এর পাগড়ি ও লাঠি ছিল (ছা'লাবী)। এই তাবূত 'আমালিকার বাদশাহ জালূত-এর হস্তগত হয়। 'আমালিকার মধ্যেও যখন মহামারি ছড়াইয়া পড়ে তখন একজন য়াহূদী বাঁদীর পরামর্শমত তাহারা এই তাবূত ফেরত দেয়। দুইটি চতুষ্পদ জন্তু (ষাঁড়) যাহাদিগকে ফেরেশতাগণ তাড়াইয়া আনে, পিঠে করিয়া এই তাবূত তালূত-এর নিক পৌঁছাইয়া দিয়া আবার চলিয়া যায়। অপর এক বর্ণনামতে ফেরেশতারাই তাবুতকে যমীন ও আসমানের মধ্য হইতে তালূত-এর নিকট লইয়া আসে। ইহাতে তালূত-এর উপযুক্ততা সম্পর্কে লোকজনের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

তালূত ও দাউদ-এর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা এই সকল রিওয়ায়াতে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তালূত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি জালূতকে হত্যা করিতে পারিবে তাহার সঙ্গে তিনি স্বীয় কন্যার বিবাহ দিবেন এবং রাজত্বের এক-তৃতীয়াংশ তাহাকে দান করিবেন।

ইহা সত্ত্বেও বিবাহের উপঢৌকন হিসাবে তালূত দুই শত দানবের মাথাও দাবি করেন। দাউদ-এর প্রতি যখন জনগণের ভক্তি–শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল তখন তালূত স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিলেন। তাঁহার স্ত্রী এই কথা দাউদকে জানাইয়া দিল এবং দাউদ নিজের বিছানায় মদের মশক রাখিয়া দিলেন। তালূত উহাতেই ছুরি চালাইয়া দিলেন। এবার দাউদ-এর জীবন এইভাবে রক্ষা পাইল যে, মাকড়সা গর্তের মুখে জাল বুনিয়া দিয়াছিল। দাউদ একবার তাঁহার সাহসিকতার পরিচয় এইভাবে দেন যে, তিনি তালূত-এর নিকট (ইব্‌ন'ল-আছীর-এর বর্ণনামতে) তীর রাখিয়া যান। অন্যবার তিনি তালূত-এর নিকট হইতে তাহার পিয়ালা, তাহার কলসী, তাহার অস্ত্র, তাহার পোশাকের একটি টুকরা এবং তাহার দাড়ির একটি চুল গ্রহণ করেন।

শাউল মৃত নবী সামূ'ঈলকে এক যাদুকরীর যাদুকর্মের দ্বারা আহ্বান করেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করেন (সামূ'ঈল ১খ, ২৮ অধ্যায়)। এই সকল ঘটনা ইসলামী রিওয়ায়াতে সম্পূর্ণ পালটাইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তিকে কবর হইতে উঠানো হয় তিনি কোথাও য়ূশা' ইব্‌ন নূন আর কোথাও সামূ'ঈল (নামে অভিহিত)। ফলে ইহার প্রতিকারের এই একটিই মাত্র পথ যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন বিলাইয়া দেওয়া। সুতরাং তালূত সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন এবং স্বীয় পুত্রদের সহিত আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন দিয়া দিলেন।

মুহাক্কিক 'আলিমগণ তাওরাত-এর এই ঘটনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ইব্‌ন কাছীর আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া (২খ, ৯) গ্রন্থে এই রিওয়ায়াত বর্ণনা করার পর লিখিয়াছেন, "এই ঘটনার কোনও কোনও অংশ জটিলতায় পূর্ণ এবং আপত্তিকর।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাবারী, de Goeje, ১খ, ৫৪৫-৫৬২, ৫৭০, ১২৯৭-১২৯৯, (বদর); (২) আত-তাবারী, তাফসীর, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৩৫৭-৩৭৫; (৩) আছ-ছাড্ডলাবী, কিসাসুল-আমবিয়া, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ১৬৭-১৭৩; (৪) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ১৫০; (৫) আল-কিসাঈ, কিসাসুল-আমবিয়া, Vitae Preophetarum, সম্পা. Eisenberg, লাইডেন ১৯২৩ খৃ., ২খ, ২৫০-২৫৮; (৬) Weil, Biblische segenden der Muselmanner, Frankfurt A/M ১৮৪৫ খৃ., পৃ. ১৯২-২০৮; (৭) Grunbaum, Neve Beitrage, পৃ. ১৮৫-১৮৯, লাইডেন ১৮৯৩ খৃ.; (৮) Noldeke, Schwally Gesch des Qorans, ১খ, ১৮৪, নাম সম্পর্কে; (৯) পৃ. ২৩২-২৩৪; (১০) য়ূসুফ হারূত, Hebrew Union Colleg Annual, ২খ, Cincinnati ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৯৬২ ও ৯৬৩; (১১) ঐ লেখক, Koranische Untersuchengen, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৮১-৮৯, ৯০৬-৯২৬; মাকড়সার জালের ঘটনা যাহাতে দাউদ-এর জীবন রক্ষা পায়; (১২) R. Basset, La Bordah du hheikh et Bouseri, প্যারিস ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৮৯-৮৬; (১৩) Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Quran, তালূত ও জালূত শিরো.; (১৪) Peak's Bible Commentary; (১৫) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৯, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (১৬) হিফজুর রাহমান, কাসাসুল-কুরআন, ২খ, ৩৮-৫৯, দিল্লী ১৯৫৯ খৃ.; (১৭) আমীর 'আলী, তাফসীর মাওয়াহিবুর-রাহমান, ২ ঃ ২৪৬-২৪৯ আয়াত দ্র.।

Bernhard Heller ও 'আবদুল-কাদির (দা.মা.ই.)/ড. আবদুল জলীল

তাল্ল/তেল্‌ল (تل) ঃ য়ূরোপীয় ভূগোলবিদগণ সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত উত্তর আফ্রিকার একটি জিলার নামরূপে ব্যবহার করিতেন। আরবী শব্দ তাল্ল আর্য-পাহাড়। তাল্ল এলাকাটি বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত একটি তরঙ্গায়িত এলাকা, যাহাতে বিভিন্ন আয়তন ও উচ্চতাবিশিষ্ট অর্তিকা মানচিত্রের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। আটলান্টিক মহাসমুদ্র ও ভূমধ্যসাগর হইতে আর্দ্র বায়ু প্রবাহের কল্যাণে তাল্ল এলাকাটি উত্তর আফ্রিকার সর্বাধিক পানিসমৃদ্ধ এলাকায় পরিণত হইয়াছে। মরুভূমি ও বৃক্ষহীন তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের তুলনায় এই তেল্‌ল এলাকা নিয়মানুগ কৃষি ও বনানীর অধিকতর উপযুক্ত। উত্তর আফ্রিকার পাহাড়সমূহের যে বিন্যাস তাহাতে তেল্‌ল এলাকাটির প্রস্থ সর্বত্র একরূপ নহে; আটলান্টিক মহাসাগর সংলগ্ন মরক্কোর দিকে ইহা খুবই প্রশস্ত অথচ আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ায় ইহা

অত্যন্ত সংকীর্ণ ভূখণ্ডে পরিণত [তু. প্রবন্ধসমূহ Algeria, Atlas, Berbers, Morocco, Tunisia]।

G. Yver (E.I. [1])/ রুহুল আমীন রোকন

তাল্ল আল-'আমারনা (দ্র. তেল্ল আল-আমারনা)

তাল্ল আল-কাবীর (দ্র. তেল্‌লু'ল-কাবীর)

তাল্ল আল-বাশীর (দ্র. তেলল বাশীর)

তাশকন্দ (تشقند) ঃ আরবী ও ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে সচরাচর লেখা হইয়াছে তাশকন্দ (বাংলাতে তাশখন্দও লেখা হইয়া থাকে, অনু.), মধ্য এশিয়ার একটি বড় শহর, চিরচিক মরূদ্যানে অবস্থিত, শীর দরিয়ার (দ্র.) ডান তীরের একটি উপনদী দ্বারা মরূদ্যানটি বিধৌত।

চিরচিকে জনবসতি কবে গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। গ্রীক ও রোমান তথ্য-উৎস অনুযায়ী Yazartes নদীর অপর পারে শুধু যাযাবর লোকেরা বাস করিত। সর্বপ্রাচীন চীনা গ্রন্থে (খৃ. পূ. ২য় শতক হইতে) য়ু-নি নামক দেশের কথা বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালে উহাকে তাশকন্দ অঞ্চল বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। আরও পরে এই দেশটিকে বলা হইয়াছে চো-চি বাচো-শি অথবা শুধু শি। সংশ্লিষ্ট চীনা অক্ষরটি পাথর অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং A. Chavannes (Documents Sur les Toukiue Occidentauz, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯০৩ খৃ., পৃ. ১৪০) উহার সঙ্গে পরবর্তী কালের তুর্কী নামটির যোগাযোগ দেখাইয়াছেন (তাশ-পাথর ও কন্দ-গ্রাম অর্থাৎ পাথরের জনপদ)। চীনা লিপি অন্তর অতি অবশ্যই স্থানীয় নাম চাচা-এর কাছাকাছি ছিল, মুসলিম আমলেও সেই নামটি পরিচিত ছিল। আরবরা এই ক্ষেত্রেও তাহাদের রীতি বা অভ্যাস অনুযায়ী চ-কে-শ লিখিয়াছে। আরবী রূপ শাশ ধীরে ধীরে লিখিত ও কথ্য উভয় রূপেই মূল নামটিকে অপসারিত করে। আধুনিক তুর্কী নামটি পাওয়া যায় ৫ম/১১শ শতক হইতে। ইহা চাচ বা শাশ-এর সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত কি না অথবা কিভাবে সম্পর্কিত, তাহা একটি সন্দেহের বিষয়। E. Polivanov যে একটি উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন (তাজকন্দ=তাজিকদের অর্থাৎ আরবদের শহর, দ্র. ইকদু'ল-জামান, for W. Barthold, তাশকন্দ ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৩৯৫) তাহা গৃহীত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। চাচ দেশটি এবং উহার রাজধানী শহরের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম পাওয়া যায় খৃ. ৩য় শতকের চীনা লেখা হইতে, রাজধানীর চতুঃসীমা ছিল ১০ লি পরিমাণ (তিন মাইলের কম)। হুয়ান-চুয়াও-এর সময়ে (Memoires sur les contrees occidentaux, ১খ, ১৮৫৭ খৃ., পৃ. ১৬) চাচ দেশটিতে অন্যান্য দেশের মতোই কোন একজন সার্বভৌম শাসক ছিলেন না। বিচ্ছিন্ন শহরগুলি তুর্কীদের দখলে ছিল। হি. ২য় শতকে (খৃ. ৮ম) আরবদের বিজয়াভিযানের যুদ্ধের ইতিহাসে প্রায়ই শাশ-এর রাজার (মালিক) উল্লেখ পাওয়া যায়; আল-বালাযুরী (de Goeje কর্তৃক সম্পা., পৃ. ৪২১) ও আত-তাবারী (২খ, পৃ. ১৫১৭ ও ১৫২১) দেশটির রাজধানীর নাম দিয়াছেন তারবান্দ, আরব ভৌগোলিক সাহিত্যের আর কোথাও এই নামটি পাওয়া যায় না। এইখানে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় সম্পাদক D. H. Muller যে Forma Contracta ধারণা করিয়াছেন তুরারবান্দ (দ্র. B. G. A., ৩খ, পৃ. ৬১) তাহা খুব বেশি সন্দেহজনক। শাসক পরিবার তুর্কী বংশোদ্ভূত বলিয়া ধারণা করা যায়। তুর্কী খানদের জায়গাতে কখনও কখনও চীনা আধিপত্য স্থাপিত হইত। ৭৫১ খৃ. চীনা গভর্নর কাউ সিয়েন-চি [দ্র. (১) chavannes, Documents etc., পৃ. ২৯৭ (২) F. Hirth, Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk, ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৭০) শাশ-এর শাসককে হত্যা করিলে তাঁহার পুত্র আরবদের নিকট সুবিচার ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেনাপতি আবূ মুসলিম (দ্র.) কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যিয়াদ ইব্‌ন সালিহ্ ১৩৩ সালের যু'ল-হিজ্জা (জুলাই ৭৫১) [দ্র. ইবনু'ল- আছীর, ৫খ., পৃ. ৩৪৪], তালাসের মাঠে (দ্র.) সংঘটিত যুদ্ধে চীনা বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং কাউ-সিয়েন-চি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের ফলেই মধ্য এশিয়াতে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনারা অতঃপর এই ক্ষমতার মুকাবিলা করিতে আর কোন চেষ্টা করে নাই।

খলীফাগণের শাসনামলে শাশ দেশটিকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে ইসলামের সীমানা বলিয়া বিবেচিত করা হইত; বিজিত বলিয়া মীমাংসিত এলাকাতে যাযাবরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি রহিয়াছে (দ্র. G. M. S., N. S., v, পৃ. ১৭২)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৯১ ৮০৬-৭ সালে সম্ভবত মাত্র অল্প সময়ের জন্য তুর্কীরা রাজ্যটি দখল করিয়াছিল। শাশ-এর একজন শাসক (সাহিব বা সাহেব) ও তাঁহার তুর্কী বাহিনীকে বিদ্রোহী রাফি' ইব্‌ন লায়ছ'-এর মিত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. আত-তাবারী, ৩খ., পৃ. ৭১২)। আল-মা'মূন-এর আমলে শাশ পুনরায় খলীফার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়; সেই সময়ে ২০৪/৮১৯ সাসানীগণ যখন মা ওয়ারাউ'ন-নাহরের বিভিন্ন জিলার গভর্নর নিযুক্ত হইতে থাকেন তখন তাহাদেরই একজন য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আসাদ শাশ-এর শাসনভার লাভ করেন (দ্র. নিবন্ধ সাসানীগণ; এই বিষয়ে অন্য যে সকল মতপার্থক্যের কথা জানা যায় সেইগুলি ভ্রান্ত প্রমাণিত করিবার জন্য উক্ত য়াহ্‌য়া-এর মৃত্যুর শুধু বৎসরই নহে, দিন-তারিখের তথ্যও পাওয়া গিয়াছে; মৃত্যু হয় বৃহস্পতিবার, ২৪১ হি. রাবী'-২ মাস শেষ হইবার পাঁচ দিন আগে (১২ সেপ্টেম্বর, ৮৫৫; দ্র. G. M. S.xx, 286 b)। ২২৫/৮৪০ সালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নূহ ইব্‌ন আসাদ সামানীগণের নিকটে ন্যস্ত দেশের জ্যেষ্ঠ গভর্নর ছিলেন ইসফিজাব (আধুনিক সাইরাস) জয় করিয়া দেশের সীমান্ত আরও উত্তরে বাড়াইতে সক্ষম হন। প্রায় একই সময়ে শাশের একটি খাল পুনঃখনন করানো হয়। উহা ইসলামের প্রাথমিক আমলে ভরাট হইয়া গিয়াছিল। খলীফা আল-মু'তাসিম (৮৩৩-৮৪২ খৃ.) এই খালগুলির সংস্কার কাজের জন্য ২০,০০,০০০ দিরহাম প্রদান করিয়াছিলেন (দ্র. আত-তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৩২৬)।

সামানীগণের আমলেই বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত শাশের প্রায় সকল ভৌগোলিক বিবরণ (এবং বস্তুত অধিকাংশ মুসলিম দেশের বিবরণই) রচিত হয়। সেগুলি হইতে মনে হয় যে, শাশ শুধু একটি দেশের নাম ছিল ও রাজধানীর নাম ছিল বিনকাছ; মুদ্রাতে টাকশালের নাম সব সময়ই শাশ লেখা থাকিত। ক্বচিৎ কখনও সঙ্গে বিনকাছ কথাটি থাকিত। এলাকা ছিল দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১ ফারসাখ (৩১/২ মাইল) পরিমাণ। আধুনিক তাশকন্দ আয়তনে অনেক বড়। কিন্তু বিনকাছের অবস্থান এবং আরব ভৌগোলিকগণ কর্তৃক প্রদত্ত দূরত্ব হইতে ইহাকেই মোটামুটিভাবে তাশকন্দ বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় (দ্র. W. Barthold, Turkestan, G. M. S., নূতন সিরিজ, ৫খ, পৃ. ৭১১; Le Strange-এর The Land of the Eastern Caliphate গ্রন্থে, [কেমব্রিজ ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৪৮০] এসকি তাশকন্দ যেখানে দেখানো হইয়াছে সেখানে নহে); তাশকন্দে এখনও পর্যন্ত শাফি'ঈ বিদ্বান আবূ বাকরু'ল-কাফ্‌ফাল আল-শাশীর (র) মাযার দেখানো হইয়া থাকে। তিনি ৩৬৫ বা ৩৬৬/৯৭৫-৯৭৭ ইনতিকাল করেন।

তুর্কীদের চূড়ান্ত বিজয়ের আগে তাশকন্দ নামটির ব্যবহার ছিল কিনা (সামানী রাজবংশ সম্পূর্ণ পতনের আগে ৩৮৬/৯৯৬ সমগ্র শীর দরিয়া অঞ্চল তুর্কীদের শাসনাধীনে দিয়া দেওয়া হয়) তাহা সন্দেহজনক। আমরা যতদূর জানি তাশকন্দ নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় আল-বীরূনীর লেখাতে (দ্র. তা'রীখু'ল-হিন্দ, সম্পা. Sachau, পৃ. ১৪৯, অনু. ১খ, পৃ. ২৯৮)। নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী আল-বীরূনী ভুলক্রমে উহাকে টলেমীর উল্লিখিত একটি স্থানের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন (দ্র. J. Marquart, Eransahr, বার্লিন ১৯০১ খৃ., পৃ. ১৫৫)। মাহমূদ কাশগারী (১খ., পৃ. ৩৬৯) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাশকন্দ ছাড়াও পাশের আর একটি নাম ছিল তেরকেন (এই নাম আর কোন সূত্র হইতে জানা যায় না)। তাশকন্দ নামটি মুদ্রার গায়ে প্রথম পাওয়া যায় মোঙ্গল আমলে। ৫ম/১১শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে মুদ্রা তৈরী করা হইত বানাকেত বা বানাকিত হইতে। উহা তাশকন্দের অতি নিকটে শীর দরিয়ার ডান তীরে অবস্থিত ছিল। এরূপ হওয়া সম্ভব যে, উক্ত সময়ে এই শহরটির গুরুত্ব তাশকন্দ অপেক্ষা বেশী ছিল। জুওয়ায়ানী মোঙ্গল অভিযানের যেই বিবরণ দিয়াছেন সেইখানে তাশকন্দের উল্লেখ নাই (দ্র. G. M. S., xvi, 70 sq.); শুধু লিখিত আছে যে, বানাকেত জয় করা হইয়াছে। মোঙ্গল শাসনামলে অজ্ঞাত কোন কারণে বানাকেত অপেক্ষা তাশকন্দ অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হয়। তাশকন্দ শহরের অস্তিত্ব টিকিয়া থাকে, খানগণ মাঝে মাঝে সেখানে যাইত (দ্র. নিবন্ধ বুবাক খান)। অপরদিকে তাশকন্দ হইতে যদিও মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ করা হয় নাই, তথাপি এই সময়ে ইহার ধ্বংস সাধিত হয় এবং অনেক পরে ১৩৯২ খৃ. তীমুর ইহার পুনর্নির্মাণ করিয়া নাম দেন শাহরুখিয়া।

চাগাতাঈ (দ্র.)-এর মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির পরে তাশকন্দ তীমূর ও তাঁহার বংশধরগণের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ৮৯০/১৪৮৫ সালে এই শহর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত যমিন মোঙ্গল খান য়ূনুসকে প্রদান করা হয়, তিনি ৮৯২/১৪৮৭ সালে সেখানেই মারা যান (দ্র. তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. Ross, পৃ. ১১৪)। তাঁহার মাযার শায়খ খাওয়ান্দ-ই তুহূর (জনপ্রিয় নাম শায়খানতাউর) নামক একজন স্থানীয় দরবেশের মস্‌জিদের ভিতরে রহিয়াছে। তাঁহার শাসনামল (৮ম-৯ম শতক) বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. A. Semenov কর্তৃক ProtokoliTurk, Kucika Ljub. Arkh-তে লিখিত নিবন্ধ, ২০খ, ১৯০৫ খৃ., পৃ. ২৯। খান য়ূনুস-এর পরে তাঁহার পুত্র মাহমূদ খান শাসনকর্তা হন; ১৫০৩ খৃ. পরে তাশকন্দ উযবেকগণের অধিকারে যায়, কিন্তু এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শায়বানী খান-এর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাহারা ইহা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন (দ্র. শায়বানী খান এবং শায়বানীগণ)। পরবর্তী শতকগুলিতে তাশকন্দ কখনও ছিল উযবেকদের শাসনাধীনে, কখনও কাযাকদের (দ্র. কিরগিয) এবং ১৭২৩ খৃ. কালমূকগণ ইহা দখল করে, কিন্তু সেই দখল একবারে করে নাই; শহর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত কাযাক বংশীয় একজন শাসকের অধীনে থাকে, তখন তিনি কালমূক শাসকগণের করদ ছিলেন। কখনও কখনও কিছুকাল খোজারা শাসন করিতেন। তাঁহারা ছিলেন একজন স্থানীয় দরবেশের বংশধর (দ্র. Z.D.M.G., xxxviii, 311)।

এই শতকগুলিতে তাশকন্দের অধিকার নিয়া প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। সেই সকল যুদ্ধের কিছু কিছু বিবরণ হইতে তৎকালীন ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায়। 'আবদুল্লাহ খান ইব্‌ন ইসকান্দার (দ্র.)-এর সময়ে সংঘটিত তাশকন্দের বিভিন্ন যুদ্ধের বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তখনও পর্যন্ত তাশকন্দ শহর বর্তমান রূপ লাভ করে নাই। ১২শ/১৮শ শতকের পূর্বে শহরটি চারিটি মহল্লা বা এলাকাতে (কুকচা, শায়খানতাউর, সিবযার বেশ-আগাচ) বিভক্ত হয় নাই, সেইখানে একটিই সাধারণ বাজার ছিল বলিয়া জানা যায়। মাঝে মাঝে প্রতিটি মহল্লার নিজস্ব একজন প্রধান (হাকিম) থাকিতেন; প্রতিটি মহল্লার আলাদা অস্তিত্ব ছিল এবং মাঝে মাঝে একটির সঙ্গে অপরটির যুদ্ধ বাধিত।

১৭৮০ খৃ. দিকে শায়খানতাউর মহল্লার হাকিম য়ূনুস খোজা সমগ্র শহরটিকে নিজের অধীনে একত্রীভূত করিতে সক্ষম হন। য়ূনুস খোজা কাযাকদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু 'আলিম খান-এর নেতৃত্বে খোকান্দের উযবেকদের নিকটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান খোজার আমলে, ১৮১০ খৃ. অল্পকাল আগে, তাশকন্দ খোকন্দের খানদের নিকটে ছাড়িয়া দিতে হয়। এই আমলের তাশকন্দের ইতিহাসের জন্য দ্র. খোকান্দ।

১৫-১৭ জুন, ১৮৬৫ সালে সেনাপতি সেরনিয়াইয়েভ-এর পরিচালনায় রুশ বাহিনী তাশকন্দ দখল করিয়া লয়। শীর দরিয়া অঞ্চলের রাজধানী এবং রুশীয় তুর্কিস্তানের গভর্নর জেনারেলের শাসনকেন্দ্ররূপে অতঃপর তাশকন্দের অনেক সমৃদ্ধি হয়। প্রাচীন এশীয় শহরের পাশাপাশি সরকারী কর্মকর্তাগণের বসবাসের জন্য নূতন রুশীয় শহর গড়িয়া উঠে এবং এই দুই অংশ ১৮৭৭ খৃ. হইতে এক শহরে পরিণত হয়, পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ যৌথভাবেই পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু রুশীয় শহর যদিও অধিবাসীর দিক হইতে এশীয় শহরের তুলনায় নগণ্য ছিল, তথাপি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করিত। কাজেই পুরাতন শহরের প্রতি সামান্যই নযর দেওয়া হইত। য়ূরোপীয় অর্থে নাগরিক জীবন বলিতে যাহা বুঝায় তাহা শুধু রুশীয় অংশের নাগরিকরাই ভোগ করিত; এইখানেই ছিল সরকারী অফিস-আদালত, স্কুল, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ ও সমিতিসমূহ সেই অংশেই অবস্থিত ছিল। ১৮৯৭ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী পুরাতন ও নূতন রুশীয় শহর মিলাইয়া সর্বমোট জনসংখ্যা ছিল ১,৫৫,৬৭৩।

১৯১৭ খৃ. বিপ্লবের পরে রুশীয় তাশকন্দ পুরাতন শহরের উপরে যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত সেইগুলি সব হারায়। মধ্য এশিয়াতে জাতীয়তাবাদের স্বীকৃতি প্রদান এবং জাতীয় প্রজাতন্ত্রসমূহ গঠনের পর হইতে তাশকন্দ সকল রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাইয়াছে। শহরটি উযবেকিস্তানের অন্তর্গত, আবার ইহার উত্তর দিকের শহরতলী এলাকাগুলি পড়িয়াছে কাযাকিস্তানে, উযবেকিস্তান সরকারের সদর দফতর সমরকন্দ। মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম শহর হিসাবে অবশ্য তাশকন্দ বাণিজ্যিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বটুকু রক্ষা করিয়াছে। এই স্থানে সমগ্র মধ্য এশিয়ার অর্থনৈতিক কাউন্সিলের অধিবেশন হয় ১৯২০ খৃ.। এইখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, একটি বিশাল মধ্য এশীয় (Central Asiatic) লাইব্রেরী মধ্য এশিয়ার প্রধান যাদুঘর (giavnly musei), রুশীয় ভূগোল সমিতির মধ্য এশীয় শাখা ইত্যাদি রহিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য অন্যান্য স্থানের মত এইখানেও ক্রমাবনতির দিকে কিন্তু জনসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. J. Dobrotsmislov,Tashkent v proshlm i nastoyasheem, তাশকন্দ ১৯১ খৃ.; (২) Fr. v. Schwartz Turkestan, ফ্রেইবার্গ, খণ্ড ১, Br., ১৯০০ খৃ., পৃ. ১৪০/প. (এইখানে ১৮৭৪-১৮৯০ খৃ. পর্যন্ত সময়ের কথা বলা হইয়াছে এবং সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত); (৩) V. Masalskiy, Turkestankiy Krai, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৬০৭ প.;

(৪) Tashkent 1877-1912, K tridcatipyatilietiyu gorodskoyo obshcestvennago upravleniya; (৫) W. Barthold, Istoriya Kulturnoi zizni Tukestana, সেন্ট পিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাদ) ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১৬৩ প.; (৬) Sredne-aziatskiy gosudarstvenniy universitet. K desyatiletnemu yubileyu oktyabrskoi revolucii, তাশকন্দ ১৯২৭ খৃ.। জাতীয়তার নীতি বিষয়ে জানিবার জন্য দ্র. ঃ (৭) J. Vareikis i S. Zeleuskiy, Nacional no gosudarstvennoie razmezvaniie Srednei Azii, তাশকন্দ ১৯২৪ খৃ.।

W. Barthold/(E.I.[1]) হুমায়ুন খান

তাশকোপ্রুযাদে (تشكيروجاده) ঃ একটি তুর্কী বিদ্যান পরিবারের নাম। তাঁহাদের গ্রাম তাশকোপ্রিল হইতে এই নামটি গৃহীত হয়। গ্রামটি তুরস্কের আনাতোলিয়া বা আনাদুলুর কাসতামুনী (দ্র.)-র নিকটে অবস্থিত, নাম তাশকোপ্রু (তু. কোপ্রুযাদে, উহাও পার্শ্ববর্তী গ্রাম ওয়েযীর কোপ্রু হইতে গৃহীত)।

১। মুসতাফার ইব্ন খালীলু'দ-দীন ৮৫৭/১৪৫৩ তাশকোপ্রু গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ব্রুস্সা ও ইস্তাম্বুলের উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্রুস্সাতে অধ্যাপক হন, পরে আঙ্গোরা, উসকুব ও আদ্রিয়ানোপলে অধ্যাপনা করেন, কিছু সময়ের জন্য শাহযাদা (পরবর্তীতে সুলতান প্রথম সালীম)-এর গৃহশিক্ষক ছিলেন। অতঃপর পুনরায় আমাসিয়া ও ব্রুসসাতে অধ্যাপনা করেন। তাঁহাকে আলেপ্পোতে বিচারকের পদ প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেইখানে যোগদান করেন নাই। ব্রুস্সাতে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকাকালে ৯৩৫/১৫২৮ তিনি ইনতিকাল করেন। মুসতাফা ইব্ন খালীল কয়েকখানি আইন গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যস্ত কর্মজীবনহেতু সেইগুলির চূড়ান্ত সংশোধন রূপ দিয়া যাইতে পারেন নাই।

২। আহমাদ ইব্ন মুসতাফা ইব্ন খালীল, উপরোক্ত (১ম) ব্যক্তির অতি বিখ্যাত 'উছমানিয়া বিশ্বকোষ রচয়িতা ও জীবনীকার, ব্রুস্সাতে ১৪ রাবী'উল আওয়াল, ৯০১/৩ ডিসে., ১৪৯৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে পিতার নিকটে আঙ্গোরা ও ব্রুস্সাতে লেখাপড়া করেন। পরে ইস্তাম্বুল ও আমাসিয়াতে শিক্ষা লাভ করেন। রাজাব ৯৩১-এর শেষভাগে/মে ১৫২৫ তিনি দিমোতিকাতে অধ্যাপক হন। ৯৩৩-এর শুরু অক্টোবর ১৫২৬ ইস্তাম্বুলে শিক্ষকতা এবং যু'ল-হিজ্জা ৯৩৬/জুলাই ১৫৩১ তিনি উসকুবে যান। পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় তিনি ইস্তাম্বুলে অধ্যাপক হন; ৪ যু'ল-কা'দা, ৯৪৫/২৫ মার্চ, ১৫৩৯ আদ্রিয়ানোপলে বদলী হন। কিন্তু সেই বৎসরই মুরুব্বী হিসাবে পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। আবার তিনি আদ্রিয়ানোপলে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। অতঃপর কতটা অনিচ্ছুকভাবে ব্রুস্সার কাযীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই আগের সেই অধ্যাপনার চাকুরীতে ফিরিয়া আসেন। ২৭ শাওয়াল, ৯৫৮/২৯ অক্টোবর, ১৫৫১ সালে তিনি ইস্তাম্বুলের বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিন বৎসর পরে তাঁহার চোখে রোগ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যান। ৯৬৮, রাজাব মাসের শেষ তারিখে ১৬ এপ্রিল, ১৫৬১ ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন এবং সেইখানেই 'আশিক পাশা মস্জিদ সংলগ্ন 'আশিক' পাশা মহল্লার গোরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। আহমাদ ইব্ন মুসতাফার বিশ্বকোষ রচনার মানসিকতা ও দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। আরবী ভাষায় তিনি শিল্পকলা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। পরবর্তীতে তাঁহার পুত্র (নীচে ৩ দ্র.) সেইখানি তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন। সেই আকারেই উহা মেদু'য়াতু'ল-'উলূম নামে প্রকাশিত হয় (ইস্তাম্বুল, পৃ. ১৩১৩, ৮৪৪ ও ৭১২ প.)। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের সংখ্যাও যথেষ্ট। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল শাকা'ইকু'ন-নু'মানিয়্যা। আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থখানিতে তিনি ৫২২ জন 'উল্যামা' ও শায়খ-এর জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিনি দশজন 'উছমানিয়া সুলতানের শাসনকাল অনুযায়ী দশটি শ্রেণীতে (তাবাকাত) বিভক্ত করিয়াছেন। সবশেষে তিনি নিজের জীবনী সংযোজন করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির রচনা ৩০ রামাদান, ৯৬৫/১৬ জুলাই, ১৫৫৮ সালে শেষ হয়। ইহাই সেই আমলে ধর্মীয় প্রজ্ঞার ইতিহাস জানিবার জন্য প্রধান তথ্য উৎস। বইখানি তুর্কী ভাষাতে কয়েকবার অনূদিত হয় এবং পরবর্তী কালে বিষয়বস্তুক্রমে প্রায় বর্তমান সময় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইয়াছে (দ্র. F. Babinger, g. O. W., p. 86 Fortsetzungen নিবন্ধ)। মূল গ্রন্থখানি আরবীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ধিত তুর্কী অনুবাদ করেন মাহমূদ (তুর্কী মেহমেদ)। সেইখানির নাম আদ্রিয়ানোপলের মাজিদী (মেজদী) এবং উহা ছাড়া 'আতা'ঈকৃত প্রথম পরিবর্ধিত সংস্করণও রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময় পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ধিত গ্রন্থটি পাণ্ডুলিপি আকারেই রহিয়াছে। 'উছমানিয়া জ্ঞানচর্চায় ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উৎসের প্রতি এই অবহেলা প্রায় অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। মুদ্রিত সংস্করণগুলির বিষয় জানিবার জন্য দ্র. (১) F. Babinger, G. O. W., পৃ. ৮৬ প.; (২) মূল গ্রন্থখানির জার্মান অনুবাদ, কনস্টান্টিনোপল হইতে ১৯২৭ খৃ. প্রকাশ করেন O. Rescher (iv. 361 pp., 4)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্মজীবনী, শাকা'ইক-এর শেষাংশে দ্র.; (২) জার্মান অনুবাদের জন্য দ্র. F. Wustenfeld, Die Geschichtsschreiber der Araber, পৃ. ২৪১ প.; (৩) Brockelmann, G. A. L.,২খ, পৃ. ৪২৫ প. (গ্রন্থপঞ্জীসহ); (৪) অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যাইবে F. Babinger-এর G. O.W.-তে, পৃ. ৮৪ প.।

৩। কামালুদ-দীন (তুর্কী কেমালউদ্দীন) মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ, উপরের ২ নং ব্যক্তির পুত্র, তুর্কী ঐতিহাসিক। কামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইস্তাম্বুলে ৯৫৯/১৫৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে অধ্যাপক এবং পরে কাযী পদে যথাক্রমে স্যালোনিকা, স্কুটারি, আলেপ্পো, দামিশ্ক, ব্রুস্সা, কায়রো ও গালাতা-তে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি ইস্তাম্বুলের কাযী হন এবং কয়েকবার আনাতোলিয়া বা রুমেলিয়ার কাযী 'আসকের -এর পদ অলংকৃত করেন। এই পদাধিকার বলে ওয়াল্লাসিয়া অভিযানে যোগদান করেন, সেইখানে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, ইস্তাম্বুলে ফিরিবার পথে ইসহাকচীতে (রুমানিয়াতে অবস্থিত Isaqci) ইনতিকাল করেন। তাঁহার লাশ রাজধানীতে নিয়া আসিয়া তাঁহার পিতার পাশে দাফন করা হয়। কবি হিসাবে তিনি কেমালি নামে লিখিতেন। তিনি একজন অনুবাদক (উপরের ২ দ্র.) এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। তা'রীখ-ই সাফ বা তুহফাতু'ল-আসহাব নামে তিনি সুলতান ১ম আহমাদ-এর সময়কাল পর্যন্ত (১৬০৩-১৭ খৃ. 'উছমানিয়া সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনা করেন। সেই বইখানি তিনি সুলতানকেই উৎসর্গ করেন। শাহানামে শিরোনামে তিনি একখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু বর্তমানে সেইখানির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না (দ্র. F. Babinger, G. O.W., পৃ. ১৪৯)। তাঁহার তা'রীখ-ই সাফ ইস্তাম্বুল হইতে ১২৮৭ হি. তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আতা'ঈ, পৃ. ৬৪১ প.; (২) রিয়াদী, তেযকিরে; সিজিল্লে-ই 'উছমানী, ৪খ., পৃ. ৮০; (৩) J, V. Hammer, G. O. D., ৩খ., পৃ. ৬০২, ৬৯৩ প.; (৪) M.O.G., ১খ, পৃ. ১৬৪ (F.

Babinger); (৫) ক্রসালি মুহাম্মাদ তাহির, 'উছমানলি মুয়েল্লিফলেরি, ১খ, পৃ. ৩৪৭; (৬) F. Babinger, G.O.W, পৃ. ১৪৯, সেইখানে অন্যান্য তথ্য গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে।

Franz Babinger (E.I[1])/ হুমায়ুন খান

তাশ্‌বীহ (تشبيه) ঃ আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে স্বীকৃত ও যথার্থভাবে প্রমাণিত বিশ্বাসসমূহ (আকাইদ)-এর বিরোধিতাকারী দলসমূহের মধ্যে যে দুইটি মতবাদ রহিয়াছে তাহাদের একটি তাশ্‌বীহ, অন্যটি তা'তীল। এইগুলি সঠিক 'আকীদা পোষণকারী মুসলিমগণের নিকট কাবীরা গুনাহ (১) তাশ্‌বীহ (Anthropomorphism) অর্থাৎ নরত্বারোপবাদ। এই মতবাদ অনুসারে আল্লাহ্‌কে মানবসদৃশ মনে করা হয়; (২) তা'তীল, যাহার অর্থ আল্লাহ্‌র গুণাবলী সর্বতোভাবে অস্বীকার করা। এই উভয় মতবাদ সম্পর্কে প্রবল বিতর্ক রহিয়াছে এবং ইহা দ্বারা মুসলিমদের 'আকীদার কেন্দ্রবিন্দু কুরআনও প্রভাবিত। ইহার কারণ এই যে, ইসলামে আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কিত বিষয়টি একটি বুনিয়াদী বা মৌলিক বিষয়। পরস্পর বিরোধী উভয় দল নিজেদের চিন্তাধারার সমর্থনে কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহের দ্বারা দলীল উপস্থাপন করিয়াছে যাহা একদিকে আল্লাহ্‌র তুলনাবিহীন একত্বের উপর জোর দেয়, অন্যদিকে আল্লাহ্‌র যে আকার-অবয়ব আছে, তেমন পরিভাষা প্রয়োগের মাধ্যম আল্লাহ্‌র গুণাবলী বর্ণনা করে, যেমন তাঁহার চেহারা চক্ষু ও হাত ইত্যাদির এবং তাঁহার কথা বলার ও উপবেশন করার ('আরবী استوى কুরআন মাজীদ, ৭ ঃ ৫২) কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তাফসীর গ্রন্থসমূহ, যেমন তাবারী গ্রন্থে আয়াতু'ল-কুরসী (২ ঃ ২৫৬) [আরও দ্র. Goldziher, Vorlesungen, ২য় সংস্করণ, হাইডেলবার্গ ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১০২ প.]-র বিভিন্ন ধরনের জটিল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল ব্যাখ্যার মধ্যে অধিকাংশের সত্যাসত্য প্রমাণের বর্তমানে কোন বাহ্যিক মাধ্যম বিদ্যমান নাই। ইহাদের মধ্যে কয়েকটিতে শব্দের শাব্দিক অর্থের উপর কোন চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই জোর দেওয়া হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহাদের ব্যাখ্যা, উপমা ও রূপকের মাধ্যমে দেওয়া হইয়াছে। 'তাশ্‌বীহ' শব্দটির ব্যবহার অনেক পূর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার অর্থ কেবল ইহাই নহে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার গুণ কেবল এইরূপ বাক্যে বর্ণনা করিতে হইবে, যাহা দ্ব্যর্থবোধক, যেহেতু সাধারণত মানুষের জন্যও এই গুণবাচক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়। হয়ত বা রাসূলুল্লাহ (স)-ও ঐ সকল গুণবাচক শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। তাশ্‌বীহ-এর স্থলে 'তামছীল' শব্দটিও ৪২ ঃ ১১ আয়াত হইতে গ্রহণ করা যায়। সেইখানে কোন বস্তু আল্লাহ্‌র অনুরূপ হওয়াকে অসম্ভব বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ)। 'তাশ্‌বীহ' শব্দটির শব্দমূল ش-ب-ه এবং ইহা بَاب تفعيل-এর ক্রিয়ামূল যাহা ৪ ঃ ১৫৭ আয়াতে কেবল ব্যবহৃত হইয়াছে (وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ), যেই স্থানে য়াহূদীদের এই দাবিকে খণ্ডন করা হয় ঃ তাহারা দাবি করে যে, তাহারা হযরত 'ঈসা ('আ)-কে শূলে দণ্ডিত করিয়া হত্যা করিয়াছে। ইহা সঠিক যে, এইরূপ ব্যাখ্যা তথা মানবীয় উপমাপূর্ণ শাব্দিক অর্থসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা তা'তীল (تعطيل) নীতি অবলম্বনের একটি উপায় এবং ইহার অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। কিন্তু সকল স্থানে এমন নহে, কেননা শব্দমূল (نصر-ينصر) باب تفعيل-এর যে تاويل ক্রিয়ামূল কুরআন মাজীদ-এ উহার প্রয়োগ নিন্দা বা তিরস্কার প্রকাশের জন্য হয় নাই। এই মাসআলা সম্পর্কে দুই ধরনের হাদীছ পাওয়া যায়। কতক এমন হাদীছ রহিয়াছে, যাহা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, কেবল বিতর্কের সময়ে সৃষ্ট এবং এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী এমন হাদীছও রহিয়াছে যাহা দ্বারা বিশেষ 'আকাইদ-এর সহায়তা করা উদ্দেশ্য ছিল না। [উদাহরণের জন্য দ্র. তাহানাবী, মুসতালাহাত, পৃ. ৮০৪] (Ritter, Islam -এ, ১৭খ. [১৯২৮ খৃ.], ২৫৭, আরও দ্র. ইহার প্রথম দিকের পৃষ্ঠাসমূহে পাণ্ডুলিপির বরাত)। তদুপরি এমন হাদীছও রহিয়াছে, যেইগুলির ব্যাখ্যা গভীর চিন্তা-ভাবনা না করিয়া লঘুভাবে করা হইয়াছে এবং সেইগুলিকে এই আলোচনায় প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। যেমন একটি হাদীছ ঃ "আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতি রাত্রে পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন।" যদিও এই হাদীছের দ্বারা মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক আবেগ, প্রেরণা ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা উপমা ও উৎপ্রেক্ষা এবং ইহাতে সূক্ষ্ম বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

আমাদের পক্ষে এই সমস্যা পর্যালোচনা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। কেননা আমরা যতদূর জানি, এমন কোন মুসলিম ধর্মীয় 'আলিম নাই যিনি আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কে ঐ উভয় 'আকীদার মধ্য হইতে কোন একটি 'আকীদা সম্পর্কে সরাসরি মত প্রকাশ করেন, বরং প্রত্যেক 'আলিম আল্লাহ্‌ (সকল অবয়ব সংক্রান্ত গুণাবলী) হইতে পবিত্র এই কথার দাবিদার ও প্রবক্তা এবং তাঁহাদের কেহই "তাশ্‌বীহ"-এর পৃষ্ঠপোষক নহেন এবং ইহার সঙ্গেই তানযীল (تنزيل) অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের ভিত্তিতে তাছবীত অর্থাৎ গুণের প্রতিষ্ঠাকরণের প্রবক্তা, তা'তীল (গুণের অস্বীকার করা)-এর প্রবক্তা নহেন। এই উভয় পরিভাষার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে আপেক্ষিক। প্রকৃতপক্ষে মু'আততালা অথবা মুশাব্বাহা নামের কোন বিশেষ দলের অস্তিত্ব নাই, বরং আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত চিন্তাধারায় যে মতানৈক্য রহিয়াছে, তাহা আল্লাহ্‌ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্যান্য বর্ণনার সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক নহে এবং অন্যান্য ধর্মীয় 'আকীদা ও ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পর্কিত মতানৈক্যের সঙ্গে উহাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। জা'দ ইব্‌ন দিরহাম সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি প্রথমে মু'আত্তিলী ছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়, তথাপি ইব্‌ন তায়মিয়া তাঁহার "আল-ফুরকান" গ্রন্থে (দ্র. মাজমূ'আতু'র-রাসা'ইলি'ল-কুবরা, কায়রো ১৩২৩ হি., ১খ, ১৩৭, লা. ১৪ প.) জা'দ-কে শেষ উমায়্যা খলীফার পতনের জন্য দায়ী বলিয়া চিহ্নিত করেন এবং উল্লিখিত খলীফাকে নিশ্চিতভাবে মারওয়ান আল-জা'দী বলা হইয়াছে। ইহার বিপরীতে ইব্‌ন তায়মিয়া এই জা'দীকে স্পষ্ট বৈপরীত্য সত্ত্বেও গুপ্ত হাশ্‌শাশীদের উত্থান এবং সিরিয়ার রাফিযীদের অস্তিত্বের যিম্মাদার বলিয়া চিহ্নিত করেন।

"তা'তীল" 'আকীদার আর একজন প্রচারক (এই প্রসঙ্গে যাহার অধিক উল্লেখ দেখা যায়) জাহ্‌ম ইব্‌ন সাফওয়ান আর-রাসিবী (দ্র.) যাহার বয়স জা'দ-এর তুলনায় কম ছিল। ১২৮/৭৪৫ সালে তাহাকে হত্যা করা হয়। তাঁহার সম্পর্কে শী'আ আলিম ইবনু'র-রাওয়ানদী বলেন যে, তিনি মু'তাযিলাপন্থী তাওহীদবাদী (মুওয়াহ্‌হিদ) ছিলেন এবং তাঁহাকে আবু'ল-হাসান আল-খায়্যাত মু'তাযিলী তাঁহার 'কিতাবু'ল-ইন্‌তিসার" (Nyberg সংকরণ, কায়রো ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১৩৩, শেষ পংক্তি, পৃ. ১৩৪, লা. ৪) গ্রন্থে "ইমামুল-মুশাব্বিহাত" হওয়ার কারণে মু'তাযিলা বলিয়া গণ্য করেন নাই (পৃ. ১৩৪)। উভয়ের মধ্যে বর্তমান একটি 'আকীদার ভিত্তি হইল আল্লাহ্‌ তা'আলার বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান কেবল বস্তু সৃষ্টি করার পরই লাভ হয় ('আকীদা-ই হাদাছু'ল-'ইল্‌ম)। কট্টর শী'আ [হিশাম] ইবনু'ল-হাকাম (পৃ. ১২৬, লাইন ১০) তাঁহাকে "শায়খু'ল মুজাস্‌সামা"-এর সঙ্গে একই দলে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আল-খায়্যাত মৌলিকভাবে তাশবীহ্‌ ও তাজসীম-এর 'আকীদাকে বিশেষত 'উছমানী-উমায়্যা দলের প্রতি নির্দেশ

করেন (পৃ. ১৪৫, লাইন ৯ প.)। ইব্‌ন হায্‌ম (ফিসাল, কায়রো ১৩২১ হি., ৪খ, ২০৪, লাইন ১৮ ও ২০), জাহ্‌ম ও আশ'আরী এই উভয়কে মুরজিআ দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শাহ্‌রাস্তানী (Cureton সং., পৃ. ৬০) ও ইবাদী আবূ সিত্তা মুহাম্মাদ আল-কাসরী জানাউনী, কিতাবু'ল-ওয়াদ্‌'-এর পার্শ্বটীকায়, কায়রো ১৩৩৫ হি., পৃ. ৭০) তাঁহাকে জাবারিয়্যা (দ্র.)-দের অন্তর্ভুক্ত করেন, যদিও জাহ্‌ম সম্পর্কে সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি মু'আত্‌তিলী; তাহা সত্ত্বেও যাহারা যিনদীক (প্রচলিত ধর্মমত বিরোধী) মতবাদ সম্পর্কে গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের বর্ণনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করিতে হইবে। খাশীশ আন-নাসাঈ (মৃ. ২৫৩/৮৬৭, দ্র. Massignon, La Passian D'al-Hallaj, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ৬৩৫ ও টীকা ২) জাহ্‌ম-এর বক্তব্যকে তাখ্‌মীম (আল্লাহ্‌কে সৃষ্ট জীবের গুণাবলী হইতে পবিত্র মনে করা) বলিয়া অভিহিত করেন এবং আশ'আরী 'মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন" গ্রন্থে (Ritter সংস্করণ, পৃ. ২৬৭) এবং অদ্রূপ বাগদাদী, আল্‌-ফারক্‌ বায়না'ল-ফিরাক" (কায়রো ১৩২৮ হি., পৃ. ১৯৯)-এ এই সম্পর্কে ইঙ্গিত করত বলেন যে, জাহ্‌ম তাশ্‌বীহ-এর ভয়ে এই কথা বলিতেন না যে, আল্লাহ্‌ কোন বস্তু (شيء)। ইব্‌ন হায্‌ম, আল্লাহ্‌ যে কোন বস্তু নহেন (لا شيء), জাহ্‌ম-এর এই মতেরও বর্ণনা করেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যেমন বস্তু (شيء) নহেন তেমনি আল্লাহ لا شيء (নিবস্তু)-ও নহেন (يقول ليس الله تعالى شيئا ولا هو ايضا لا شيء) ৪খ, ২০৫)। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইহারা تعطيل মতবাদ অথবা ইহার চেয়ে আরও গোঁড়া মতবাদ ابطال (ইবতাল)-এ উপনীত হওয়ার বিষয়ে ভীত। জাহ্‌ম-এর বিরুদ্ধে লিখিত বহু সংখ্যক পুস্তিকার মধ্যে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল-এর 'পুস্তক আর-রাদ্দ 'আলা'য-যানাদিকা ওয়া'ল-জাহ্‌মিয়্যা' (দ্র. ইলাহিয়্যাত ফীকলুত্‌সী মাজমূ'আসী, ফীকলুত্‌সীর অধিবিদ্যা সম্পর্কিত রচনা, ১৯১৭ খৃ., পৃ. ৩১৩-৩২৭) বিদ্যমান। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল তাঁহার বিরোধী পক্ষের বক্তব্য ও দলীল-প্রমাণ অনেক কম উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিরোধীদের কথিত দলীলের যথার্থতার উপর তখনই বিশ্বাস জন্মে, যখন অধিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। অবশ্য আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছ হইতে যে দলীল উপস্থাপন করা হয় তাহা খুবই স্পষ্ট। বর্ণিত হইয়াছে যে, নেক্‌কার বান্দাগণ জান্নাতে আল্লাহ্‌কে চর্ম চক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করিবেন [কুরআন মাজীদে لقاء অর্থাৎ সাক্ষাত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে] অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মূসা ('আ)-এর সঙ্গে কথা বলিয়াছেন অথবা 'আরশ-এর উপর তাঁহার আরোহণ" ইত্যাদি বিষয়। জাহ্‌ম এইগুলি অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জাহ্‌ম এই বক্তব্য হইতেও সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বিশেষ স্থানে রহিয়াছেন। তাঁহার এই ভীতিকে আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র) সম্পূর্ণ শাব্দিক ও দেহ সম্পর্কিত অর্থ পরিধান করান এবং বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি প্রতিটি স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন তাহা হইলে জাহ্‌মিয়াদের নিকট ইহার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা এই যে, তাহারা ইহা স্বীকার করেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা জাহ্‌মিয়াদের দেহে, শূকরের পেটে ও দুর্গন্ধময় স্থানেও বিদ্যমান। তাহা সত্ত্বেও স্বয়ং ইমাম ইব্‌ন হাম্বালকে মানুষের সমভিব্যাহারে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বা বিদ্যমানতা সম্পর্কে ৫৮ ঃ ৭-এ مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ "তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে আল্লাহ্‌ উপস্থিত থাকেন না" অথবা সূরা ২০ ঃ ৪৬-এ اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى "নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের সঙ্গে রহিয়াছি, সব কিছুই শুনিতেছি এবং দেখিতেছি" অথবা সূরা ঃ ৯ ঃ ৪০-এ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "চিন্তা করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন", ইত্যাদি আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে এবং এইগুলিকে রূপক বলিতে হইয়াছে। এই স্থান হইতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, সুন্নীদের শাব্দিক ব্যাখ্যা এবং মু'তাযিলীদের জটিল ব্যাখ্যার মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করার আশঙ্কা অত্যন্ত কম। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল-এর প্রতিপক্ষও এই সমালোচনা করেন যে, খৃস্টানরা যেমন তিন মৌলকে অর্থাৎ ত্রিত্ববাদকে এক ব্যক্তি এবং চিরন্তন মানিয়া নেয় তেমনি তাহারা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার চিরন্তন গুণাবলীকে একক ও চিরন্তন হিসাবে বর্ণনা করেন এবং ইহার জন্য তাহারা খেজুর বৃক্ষের উদাহরণ উপস্থাপন করেন যাহার মূল, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পাতা পৃথক পৃথক হইলেও সব কিছু মিলিয়া একক এক বৃক্ষ হিসাবে পরিচিত।

ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল তাশ্‌বীহ ও তা'তীল মতবাদের বিরোধিতাকারী হিসাবে সনাতন 'আকীদা পোষণকারী মানুষের নিকট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য দলীল ও সনদ। আল্‌-আশ'আরী (দ্র.) 'মাকালাত" (পৃ. ২৭৭)-এ তাঁহার নিজের 'আকীদার বর্ণনায় আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বালের উপরই নির্ভর করেন। তিনি এই বিষয়ে, বিশেষত আল্লাহ্‌কে চাক্ষুষ দেখার সম্ভাবনা সম্পর্কে নিজের মতামত অনেক পুস্তকে লিখিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার হাত, চেহারা ও 'আরশ-এ তাঁহার অবস্থান ও আরোহণকে বিনা বর্ণনায় (بلا كيف) মানিয়া নেওয়া উচিত এবং তাঁহার অনুসারিগণ পর্যায়ক্রমে এই মতবাদকে প্রচার করিতে থাকেন। ইব্‌ন হায্‌ম তাঁহার এই বক্তব্য সম্পর্কে বলেন, "এই বক্তব্য আল্লাহ্‌র শারীরিক আকার আছে এই মতের অন্তর্ভুক্ত", অবশ্য তিনি ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বালকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (২খ, ১৬৬)। স্বয়ং ইব্‌ন হায্‌ম মু'তাযিলীদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ইঁহারা অপব্যাখ্যার দ্বারা আল্লাহ্‌র ধারণাকে লঘু করিয়া দিয়াছেন, অথচ তিনি (ইব্‌ন হায্‌ম) নিজেই অনুরূপ অপব্যাখ্যা করিয়াছেন (তু. ২খ, ১৬৬, ১৬৭)। আল্‌-কাসিম ইব্‌ন সা'ঈদ আশ-শাম্মাখী তাঁহার গ্রন্থ "আল-কাওলু'ল-মাতীন ফি'র-রাদ্দি 'আলা'ল-মুখালিফীন (কায়রো ১৩২৪ হি., তু. বিশেষ করিয়া পৃ. ৬৭ প.)-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যে, 'ইবাদিয়া' মতাবলম্বিগণ আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কিত বিষয়ে আশআরী মতবাদকে সর্বদা 'তাশবীহ'-এর অনুরূপ মনে করিতেন। এই সম্পর্কে তাঁহার মতামত ইব্‌ন তূমার্ত আল-মুওয়াহ্‌হিদীর মত কঠোর, যাহাতে তিনি আল-মুরাবিতূন-এর তাশবীহ্‌-এর কথা প্রকাশ করিয়াছেন (দ্র. (Le livrs de Mohammad Ibn Thumert, সম্পা. Goldziher, আলজিরিয়া ১৯০৩ খৃ., ১খ, পৃ. ২৬১, ২৩২)।

মাতুরীদীগণ ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল-এর চিন্তাধারার সঙ্গে সহানুভূতি থাকার এবং 'তাশবীহ্‌'-এর সন্দেহ হইতে বাঁচিবার প্রচেষ্টায় এই মতের প্রতি অধিক জোর দিয়া বলিয়াছেন এইরূপে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সীমাবদ্ধ নহেন, সংখ্যা দ্বারা আবদ্ধ নহেন, বিভাজ্য নহেন, যৌগিক নহেন। আবূ হাফ্‌স আন্‌-নাসাফীও এই বক্তব্যের সমর্থক ছিলেন (তু. D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory, নিউইয়র্ক ১৯০৩ খৃ., পৃ. ৩০৯)। এই কারণেই তাঁহার প্রতি তা'তীল মতবাদের অভিযোগ আরোপিত হইয়াছিল, যেমন তাঁহার পূর্ববর্তী বিশ্‌র আল-মারীসী সম্পর্কে 'উছমান ইবন্‌ সা'ঈদ আদ-দারিমী এবং ইমাম গাযালী সম্পর্কে ইব্‌ন তায়মিয়া (পৃ. গ্র., ১খ, ৪২৫)-এর মত কট্টর হাম্বালী মাযহাব পন্থিগণ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু হাম্বালী মাযহাবের 'আলিমগণ এই ঐকমত্যে দৃঢ় থাকেন নাই। যেমন

ইবনু'ল-জাওযী তাঁহার গ্রন্থ দাফ্‌' শুব্‌হাতিত-তাশ্‌বীহ্‌ ওয়া'র-রাদ্দ 'আলা'ল- মুজাস্‌সিমা (সম্পা. হুসামু'দ-দীন আল-কুদ্‌সী, দামিশক ১৩৪২ হি., বিশেষ করিয়া পৃ. ৫প.)-এর তাঁহার তিন হাম্বালীপন্থী [আবূ 'আব্‌দিল্লাহ্‌ ইব্‌ন হামিদ, তাঁহার অনুসারী কাদী আবূ য়া'লা ও আয-যাগূনী (দা'ইরাতু'ল মা'আরিফি'ল-ইসলামিয়্যা)] সহযোগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তাঁহাদের চিন্তাধারা সঠিক ছিল না [এবং তাহারা মাযহাবকে ত্রুটিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন]। ইহার বিপরীতে ইব্‌ন তায়মিয়া ও তাঁহার মত আরও কতিপয় ব্যক্তি, যেমন আবূ 'আমির মুহাম্মাদ ইব্‌ন সা'দূন-আল-কুরাশী প্রমুখ কট্টর মুশাব্বাহপন্থীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। উপরন্তু ইব্‌ন তায়মিয়া সম্পর্কে ইব্‌ন বাত্‌তূতা বর্ণনা করিয়াছেন (এবং অনেকেই এই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন) যে, ইব্‌ন তায়মিয়া বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ পৃথিবীর আকাশের দিকে এমনভাবে অবতরণ করেন, যেমন আমি এক্ষণে মিম্বার হইতে অবতরণ করিতেছি (এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিম্বার হইতে নিম্নে অবতরণ করেন)। হুসামু'দ্‌-দীন [আল-কুদসী] (ইব্‌নু'ল-জাওযী, পূ. গ্র., পৃ. ৪৮, তা'লীকা) ইহা সম্পর্কে একটি মূল্যবান নিবন্ধ লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা স্বয়ং ইব্‌ন তায়মিয়া-র রচনাসমূহে বর্তমান। যেমন মুশাব্বিহা-এর সেই 'আকীদা بَصَرُهُ كَبَصَرِى وَيَدُهُ كَيَدِى 'তাঁহার দৃষ্টি আমার দৃষ্টির মত এবং তাঁহার হাত আমার হাতের মত" (রিসালাতু'ল ফুরকান, ১খ, ১১৯)। তদুপরি এই ব্যাখ্যা, যাহা তিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে করেন, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে একটি বৃদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা বলাই যথেষ্ট (১খ, ৪৫৬ প.) এবং অতঃপর তাঁহার এই অবিরত চেষ্টা যে, আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত সকল 'তাশবীহ'-যুক্ত বিবরণ শুধু আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যই খাস এবং সেইগুলি তাঁহার (আল্লাহ্‌র) এবং উপমাহীন ও তুলনাহীন গুণাবলী। ইব্‌ন তায়মিয়া-র এই মতামত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া এবং আল্লাহ্‌র শারীরিক অবয়বের ধারণাসম্বলিত সকল হাদীছ যিনদীকরা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে উদ্ভাবন করিয়াছে, যাহাতে আহলু'স্‌-সুন্নাতকে তাহারা হাস্যস্পদ প্রতিপন্ন করিতে পারে (১খ, ২৮০)। এমনইভাবে তাশ্‌বীহ ও তা'তীল সম্পর্কে তাঁহার ক্রমাগত আক্রমণ (১খ, ২৭০, ৩৯৫ ইত্যাদি) দ্বারা অন্ততপক্ষে তাঁহার উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসমূহের প্রকাশ ঘটিয়াছে।

আবূ মুহাম্মাদ হিশাম ইবনু'ল-হাকাম (মৃ. ১৯৯/৮১৪-এর শেষ প্রান্তে)-এর মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা আরও সমস্যাসঙ্কুল। কেননা তাঁহার কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। অবশ্য [ইমাম] আশ'আরী-র রচনায় (মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, পৃ. ২৯) তাঁহার সম্পর্কে যেসব বর্ণনা রহিয়াছে তাহাতে মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল বর্ণনা হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হিশাম 'প্রকৃত তাশ্‌বীহ' সম্পর্কে নির্দোষ ছিলেন, তবে তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট ইঙ্গিত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই মতামতের প্রতি তাঁহার সমর্থন ছিল। যেমন তিনি মনে করেন, একটি সংযোগ ও সংগতি (জুরজানী, শারহু'ল-মাওয়াকিফি'ল-ঈজী, সম্পা. Soerensen, লাইপযিগ ১৮৪৮ খৃ., পৃ. ৩৪৭; আত-তাশাব্বুহ্‌ ওয়া'ল মুশাব্বিহাত) সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ্‌র সম্পর্ককে সম্ভব করিয়া তোলে, তদুপরি সৃষ্টি সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জন এক অনুপ্রবেশকারী আলোকরশ্মির মাধ্যমে, যাহা তাঁহা হইতেই উৎসারিত হয়, সম্ভাব্য অস্তিত্ব লাভ করে। কেননা এই জ্ঞানের ধারণা এই পদ্ধতি ব্যতীত সম্ভব নহে। তাহা সত্ত্বেও [ইমাম] আশ'আরী "মুজাস্‌সিমা" সংক্রান্ত বর্ণনায় হিশাম সম্বন্ধে বলেন, "তাঁহারা মা'বূদকে মানব সদৃশ বলিয়া মনে করিত।" ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই, যাহা পরবর্তী কালে মাযহাবের ইতিহাস লেখক পণ্ডিতদের মধ্যে ব্যাপকভাবে হইয়া যায়। শী'আদের দীর্ঘ ও বিস্তারিত বর্ণনাও ত্রুটিমুক্ত নহে। এই দলের আরেক হিশাম ইব্‌ন সালিম আল-জাওয়ালীকী خلق الله ادم على صورته হাদীছের صورته (তাঁহার আকৃতিতে)-এর সর্বনামকে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করেন ও বলেন যে, আল্লাহ্‌রও চুল ও বাহু আছে (কাশ্‌শী, মা'রিফাতু আখবারি'র-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি., পৃ. ১৮৩; আস্‌তারাবাদী, মিনহাজু'ল-মাকাল ফী তাহকীকি'র-রিজাল, তেহরান ১৩০৬ হি., পৃ. ৩৬৭)। ইহার বিপরীতে হিশাম ইব্‌নু'ল-হাকাম ইছবাত (اثبات)-এর অনুসরণ এবং ابطال হইতে বাঁচার জন্য [যাহার কারণে তাঁহাকে সন্দেহযুক্ত শব্দ شيء (বস্তু)-এর সঙ্গে সঙ্গে جسم (শরীর)-এর পরিভাষা অবলম্বন করিতে হইয়াছে] তাশবীহ হইতে দূরে থাকার অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণভাবে 'তাজসীম'-কে অবলীলায় 'তাশ্‌বীহ'-এর সমকক্ষ আখ্যায়িত করা উচিত নহে। কারণ মুজাস্‌সিমাগণ, যাঁহাদের মধ্যে স্বয়ং হিশাম ইব্‌নু'ল-হাকাম অন্যতম, "আল্লাহ্‌র দেহ আছে" বলার সঙ্গে ইহাও বলিতেছিলেন, "কিন্তু দেহসমূহের মত দেহ নহে"। [পরবর্তী কালের শী'আগণ তাহাদের পূর্ববর্তী শী'আদেরকে এই কলঙ্ক হইতে বাঁচাইতে চেষ্টা করেন], কিন্তু তবুও আস্‌তারাবাদী হিশামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি আবূ শাকির "দায়সানী"র শাগরিদ। এই আবূ শাকিরের অবস্থা হিশামের চেয়েও অধিক কল্পকাহিনীতে আচ্ছন্ন। এই সম্পর্কে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য [ইমাম] আশ'আরীর (পৃ. ৩৩)। তিনি বলিয়াছেন যে, হিশাম ইবনু'ল-হাকাম এক বৎসরের মধ্যে আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তখনও 'ইলম কালাম একটি পৃথক শাস্ত্র হিসাবে গড়িয়া উঠে নাই। সেই যুগে ইমাম জা'ফার আস-সাদিকর-এর শিক্ষা মাজলিসের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক হইত। এই ধরনের বিতর্ক কখনও উভয় হিশাম-এর মধ্যেও অনুষ্ঠিত হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, খোদ শী'আদের মধ্যেই পারস্পরিক মতবিরোধ ছিল। নুসায়রী দল, যাহার নেতৃত্বে ছিলেন ইব্‌ন হামদান আল-খাসীবী, তাহাকেও 'মুশাব্‌বিহা'দের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়। সাধারণত বাতিনিয়াদের (যাহাদের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল), সমালোচনায় বলা হয় যে, যদিও তাহারা সব কিছুতেই অবিশ্বাসী (nihilists), তাহাদের মধ্যে মুশাব্‌বিহাদের নিদর্শনও বিদ্যমান। তাহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি নাসির-ই খুসরাও তাঁহার গ্রন্থ "যাদু'ল-মুসাফিরীন" (বার্লিন, পৃ. ১৫০ প.)-এ বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কে এমন 'আকীদার সমর্থন করেন, যাহাতে নরত্বারোপ-এর ধারণার প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য এইরূপ বলা সমীচীন যে, ইহা ঐ সকল মূলনীতি স্মরণ করাইয়া দেয়, যাহা বর্ণনা মুতাবিক হিশাম ইব্‌নু'ল-হাকামের সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য এই 'আকীদাকে 'আকাইদের এই ধারার শাখা হিসাবে অভিহিত করা যায় না। কারণ ইহাতে উল্লিখিত আছে বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র কোন স্থানে সীমাবদ্ধ হইয়া না থাকা এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা আল্লাহ ভিন্ন অন্য (গায়রুল্লাহ) এইগুলি।

ইহা ঠিক যে, ইছ্‌না 'আশারিয়্যা দল তা'তীল ও তাশ্‌বীহ-এর বিরুদ্ধে জোরালো সংগ্রাম করিয়াছ এবং ইছবাত (দ্র.)-এর উপর যথাযথ জোর দিয়াছে, তদুপরি তাহারা মু'তাযিলীদের মত তাশ্‌বীহ-কেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। কেননা ইহার দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার ত্রুটি ভাব প্রকাশিত হয়। এই অভিমতের জন্য দ্র. মাজলিসী, বিহারু'ল-আনওয়ার, ২খ, তেহরান ১৩০৬ হি., পৃ. ৮৯-১০৫; انكار از زمان ومكان حركت "ونقل مكان" কুলায়নী, ইব্‌ন বাবূয়াহ্‌ ও তূসী-র ইছ্‌না 'আশারিয়্যা সম্পর্কে বক্তব্য।

যে সমস্ত সংকট হইতে হিশাম ইবনু'ল-হাকাম ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় বাঁচার চেষ্টা করেন উহা দ্বারা কালামশাস্ত্রের সমস্যাসমূহের অনুমান করা যায়, যাহা তাশ্‌বীহ ও তা'তীল-এর দুই প্রান্তের মধ্যখানে সমুস্থিত হয়। এই প্রশ্নটি এমন সহজ নহে যে, ইহাকে সাধারণ শব্দে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। যেমন ইহা বলিয়া দেওয়া যায় যে, এই প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বাদানুবাদপূর্ণ, যাহার একদিকে রহিয়াছে আল্লাহ্ তা'আলার একটি আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব হিসাবে ধারণা এবং অপরদিকে তাঁহাকে একটি নির্দিষ্ট ও দেহধারী অস্তিত্ব হিসাবে ধারণা। যদি বিষয়টির ভাব এই হয়, তাহা হইলে এই পরিপ্রেক্ষিতে 'আশ'আরীর মত 'আলিমদের স্থান কি হইবে? ইসলামী 'আকাইদের ইতিহাস হইতে এই বিষয় বিশেষভাবে পরিষ্কার যে, আশ'আরী দলের প্রত্যেক অনুসারী তাহাদের ইমামকে এমন স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দুইটি ধারার মধ্য হইতে যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করিতে প্রতিবাদী হইবে। তাশ্‌বীহ এইজন্য পরিত্যাজ্য যে, ইহা মূর্তি পূজা ও কুফ্‌রীর দিকে লইয়া যায় এবং তা'তীলও পরিত্যাজ্য। কারণ ইহা নাস্তিকতা ও শিরকের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু ইহা অবশ্যই অনুভূত হয় যে, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন জাহ্‌ম-এর ধারণা অনুযায়ী বক্তব্য প্রকাশের জন্য উদর, জিহ্বা ও দুইটি ঠোঁট আবশ্যক অর্থাৎ দেহের আকৃতি আবশ্যক। সুতরাং ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল-এর বক্তব্য অনুযায়ী জাহ্‌ম আল্লাহ্'র 'কথন' (কালাম) সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ তা'তীল মতবাদের ভিত্তিতে অপব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইব্‌ন তায়মিয়াও তাঁহাকে মু'আত্তিল মুমাছছিল বলিয়াছেন (মাজমূ'আতুর রাসাইলিল কুব্‌রা, ১খ, ১২৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গাযালী, ইহ্‌য়া' 'উলূমি'দ-দীন, কিতাব ১/২ ঃ কাওয়া'ইদু'ল-'আকা'ইদ এবং কিতাব ৪/৫ ও ৬ ঃ আত-তাওহীদ ওয়া'ত-তাওয়াক্কুল ওয়াল-মুহাব্বাত; (২) H. Bauer, Die Dogmatik al-Chazales, Halle, ১৯১২ খৃ., পৃ. ৪৮ প.; (৩) J. Obermann, Der Philosophische und Religiose Subjectivismus Ghazale's, ভিয়েনা ১৯২১ খৃ., পৃ. ১৯৭-২০০, ১২৭; (৪) আবূ মানসূর 'আবদু'ল-কাহির আল-বাগাদী, উসূলু'দ-দীন, ইস্তাম্বুল ১৩৪৮ হি., ১খ, ৭৩-১৩০ (ইহা এই বিষয় সম্পর্কে রীতিসিদ্ধ কোন পুস্তিকা নহে, বরং এই গ্রন্থকারের গ্রন্থ আল-ফারক বায়না'ল-ফিরাক-এর মত ইহার মধ্যেও বিভিন্ন মতানৈক্যের বিবরণ রহিয়াছে)।

R. Strothmann এবং 'আবিদ আহমাদ আলী (দা. মা. ই.)/ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তাশরীক (تشريق) ঃ হজ্জের শেষ তিন দিনের (১১-১৩ যুলহিজ্জা) একটি বিশেষ নাম, আরবীতে বলা হয় আয়্যামু'ত-তাশরীক। এই সময়ে হাজ্জীগণ অন্যান্য বিধান পালন করিয়া মিনাতে অবস্থান করেন এবং সেইখানে তিনটি জামা'আত-এর প্রতিটিতে প্রতি দিন সাতটি করিয়া নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ১০ যু'ল-হিজ্জা তারিখে যে ফজরের সালাত আদায় হইত উহাকেও তাশরীক বলা হইত। শব্দটি সম্ভবত প্রাক-ইসলামী যুগের, ইসলামের পরেও রক্ষিত হইয়াছে। সেই কারণেই নিশ্চয়তার সঙ্গে ইহার অর্থ ব্যাখ্যা হয়ত করা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ খুব সহজবোধ্য যে ব্যাখ্যা হইতে শব্দটি গৃহীত বলিয়া বলা হয়, যু'ল-হিজ্জার কুরবানীর গোশ্‌ত টুকুরা টুকরা করিয়া কাটা হইত ও শুকানো হইত, তাহা হইতে তাশরীক শব্দ। একটি বর্ণনা রহিয়াছে যে, তাশরীক শব্দটি আসিয়াছে কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ হইতে, 'আশরিক ছাবীর কায়মা নুগীর (তু. তাহলীল, তালবিয়া, তাকবীর)। কাজেই ধরিয়া নিতে হইবে যে, এই ধর্মীয় রীতিটি আমাদের বর্তমানের জানামতে শুধু যে ১০ যু'ল-হিজ্জা ফজরের ওয়াক্তেই প্রয়োগ করা হইত তাহাই নহে, পরবর্তী দিনগুলিতে পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রেও করা হইত এবং একটি করণীয় কার্যের অংশ হিসাবে পরে উহা সমগ্র অনুষ্ঠানেরই নাম হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী এই পাথর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহু আকবার তাকবীর বলিতে হয়। সম্ভবত এই কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (র) তাশরীককে তাকবীর বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন (দ্র. তাজু'ল- 'আরূস, ৬খ, ৩৯৩; অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দ্র. নিবন্ধ হজ্জ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসানু'ল-আরাব, ১২খ, ৪২ প.; (২) তাজু'ল-'আরূস, ৬খ, ৩৯৩ প.; (৩) Lane, An Arabic-English Lexicon, পৃ. ১৫৪১; (৪) R. Dozy, Die Israeliten zu Mekka, লাইপযিগ-হারলেম ১৮৬৪ খৃ., পৃ. ১১৮-২৬ (শব্দটি হিব্রু হইতে আসিয়াছে বলিয়া যে ব্যাখ্যা উহা বর্তমানে বাতিল); (৫) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, লাইডেন ১৮৮০ খৃ. (Verspreide Geschriften, ১খ. প.), পৃ. ১৭১-৭৪; (৬) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums[2], পৃ. ৮০, ১৯০, টীকা ১; (৭) Th. W. Juynboll, Uber die Bedeutung des Wortes Taschrik (Z. A., xxvii, ১৯১২ খৃ., পৃ. ১-৭); (৮) Gaudefroy-Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, প্যারিস ১৯২৩ খৃ., পৃ. ২৭৩, ২৯১, ২৯৯, ৩০২ টীকা।

R. Paret (E.I. [1])/ হুমায়ুন খান

তাশরীহ (تشريح) ঃ ('আ) শারীরবিদ্যা (Anatomy) সাধারণ অর্থ খোলা, উন্মোচন করা। ইহার দুইটি বিশেষ অর্থ রহিয়াছে ঃ ১। কোন একটি জ্ঞানের শাখা উন্মোচন করা, যেমন বইয়ের টীকা শারহ রচনা; ২। শারীরবিদ্যা, যেখানে মানবদেহের গঠন ও ভিতরের বিভিন্ন অংশ বাহির করিয়া পরীক্ষা করা হয়। ইব্‌নু'ল-কিফতী মাত্র একটি বাক্যেই এই উভয় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, 'গ্যালেন' ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলস্বরূপ, ইহার বাসিত ও ইহার শারিহ অর্থাৎ তিনিই এই শাস্ত্রের উদ্যোক্তা, তিনিই ইহার টীকাও রচনা করেন...তাশরীহ বিজ্ঞানে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই এবং এই বিষয়ে তিনি ১৭ খানি বই রচনা করেন।" এইখানে মানবদেহ বিদ্যা বা শরীরবিদ্যার কথাই বলা হইয়াছে।

ইসলামে শারীরবিদ্যা চর্চা খুব জনপ্রিয় ছিল না। মানুষের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ বিধায় ধর্মীয় ও নৈতিক যুক্তিতে দেহ ব্যবচ্ছেদ ছিল কিছুটা আপত্তিজনক। এই মনোভাব যে শুধু মুসলমানগণের মধ্যেই ছিল তাহা নহে, প্রাচীন সকল দেশেরই এই এক অবস্থা ছিল, ব্যতিক্রম ছিল শুধু আলেকজান্দ্রিয়াতে। গ্যালেন (Galen) প্রাপ্ত সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়া শারীরবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তবে সাধারণভাবে তাঁহাকে বানরের দেহই ব্যবচ্ছেদ করিতে হইত। মুসলিম পর্যবেক্ষকগণও সুযোগমত এই বিজ্ঞান চর্চায় অংশগ্রহণ করিতেন। উহার একটি উদাহরণ পাওয়া যায় 'আব্দু'ল- লাতীফের সাফারনামা হইতে; লেখক ও তাঁহার বন্ধুগণ জানিতে পারেন যে, মিসরের মাকম নামক স্থানে মানুষের অস্থির পাহাড় জামা হইয়াছে। তাঁহারা তখন সেইখানে গিয়া অস্থিগুলি পরীক্ষা করেন এবং সেই বিষয়গুলি লিখিয়া রাখেন।

প্রকাশ্যে কাজ করিবার নানা অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন

আরব পণ্ডিত ব্যক্তি শারীরবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। সেই বিষয়ে তাঁহারা গ্রীকদিগকে অনুসরণ করেন, বিশেষ করিয়া গ্যালেন, ওরিবাসেস (Oribases) ও আয়টিয়সকে (Aetius)। গ্যালেনের কয়েকখানি গ্রন্থের সঙ্গে আরবদের পরিচয় ছিল, সেইগুলি আরবীতে অনূদিতও হইয়াছিল, যেমন De Anatomia, De Venae sectione, De Musculorum Dissectione, De Ossibus গ্রন্থসমূহ ও শিরা বিষয়ক একটি বই। এই পণ্ডিতের বিখ্যাত গ্রন্থ De Anatomicis administrationibus-এর ১০-১৫ পর্যন্ত অধ্যায় শুধু আরবীতেই রক্ষিত ছিল। সেই অংশের একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন Max Simon P. de Koning, আরবদের নিকটে পরিচিত শারীরবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের তিনখানি দীর্ঘ অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। একখানি ইব্ন সীনার, অপর একখানি 'আলী ইব্ন 'আব্বাস নামক পারস্য দেশবাসী (মৃ. ৩৮৪ হি.) একজন যারদাস্তী (পারসি বা অগ্নি উপাসক) চিকাৎসকের এবং শেষখানি আর-রাযীর (মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়া আর-রাযী, পাশ্চাত্যে Razes নামে বিখ্যাত, মৃ. ৩২০ হি.)। আর-রাযীর অধ্যায়গুলি লওয়া হইয়াছে তাঁহার আল-মানসূরী নামক গ্রন্থ হইতে; আর ইব্ন সীনার অংশটুকু তাঁহার বিখ্যাত কানূন নামক গ্রন্থ হইতে। 'আলী ইব্ন 'আব্বাস-এর অংশ তাঁহার আল-মালিকী নামক গ্রন্থ হইতে তিনটি গ্রন্থে একই রকমভাবে বিষয়বস্তু সাজানো হইয়াছে, উপস্থাপনা সহজ ও যুক্তিসম্মত, চিরায়ত লেখকগণের লেখাতে ইতিমধ্যেই সেই ধারাটি প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমেই তাঁহারা অস্থিবিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন ঃ শুরুতে হাড় বা অস্থি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা। অতঃপর মাথা হইতে পা পর্যন্ত মানবদেহ গঠনের বিস্তারিত আলোচনা, মাথার অস্থি, পেটের সংলগ্ন অস্থি, মেরুদণ্ডের, বুকের, দেহের উপরের অংশের এবং হাতের অস্থি, নিম্নাঙ্গের ও পায়ের অস্থি। দাঁতের হাড় ও চিকিৎসা তখন কোন আলাদা বিষয় ছিল না। উহার পরে ছিল মাংসপেশীর বিদ্যা (Myology)ঃ সেইগুলিও সংখ্যা নির্ণয় ও বিশ্লেষণ একই ক্রম অনুযায়ী ছিল। উহার পরে ছিল স্নায়ু ও শিরা বা রক্তনালীতন্ত্রীসমূহ; স্নায়ু, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ডের ভিতরের তরল পদার্থ, ধমনী বা শিরা (হৃদপিণ্ডে ও হৃদপিণ্ড হইতে রক্তপরিবাহী ধমনী এবং শিরা Artary and Vain))। উহার পরে দেহের বাহিরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা এবং দৃষ্টি, স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা, কর্ণ, কণ্ঠনালী, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র, যকৃত, প্লীহা, বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি, মূত্রাশয় ও যৌন অঙ্গাদি।

ইব্ন সীনার একই অধ্যায়ের পাশাপাশি বিপরীত পৃষ্ঠায় De Koning সেই একই বিষয়ক অধ্যায়গুলি গ্যালেন ও ওরিবাসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেইখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে কব্জির মাংসপেশী আঙ্গুল ভাঙ্গিবার ও সোজা করিবার মাংসপেশী, ফুসফুসের পেশী, হৃদপিণ্ডের বহির্ময়সমূহ, চোখের কনীনিকা (iris), এবং হৃদপিণ্ড সংলগ্ন হাড়।

এই সকল শারীরবিদ্যার চর্চা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল এবং বিশ্লেষণও বেশ হইয়াছিল; চূড়ান্ত ফলও নির্ণীত হয়; প্রতিটি হাড়, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি মাংসপেশীর কি কি উপযোগিতা সেইগুলি বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, আরব শারীরবিদ্যা প্রকাশের জন্য নিজস্ব আরবী শব্দই ব্যবহৃত হইত। চিকিৎসাশাস্ত্র ও উদ্ভিদবিদ্যার অনুরূপ, এই ক্ষেত্রে কোন ফার্সী বা গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয় নাই এবং অপরপক্ষে অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও আলকেমির অনুরূপ, আরব শারীরবিদ্যাতে কোন বিশেষায়িত শব্দও দেখা যায় না। মধ্যযুগের ল্যাটিন অনুবাদ গ্রন্থগুলিতে সেইরূপ কিছু কিছু শব্দ পাওয়া যায়। যেমন মেরি (meri), উহার আরবী শব্দটি হইতেছে মারি, খাদ্যনালী; মাইরাক (Myrach), উহা হইল আরবী মারাকক, তলপেট; সিফাক (Siphac), আরবীতে উহা ছিল সিফাক তলপেটের পিছনের দিকের একটি পাতলা আবরণ (Peritoneum); কিন্তু এই শব্দগুলি একালে আর ব্যবহৃত হয় না।

শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে আবু'ল-কাসিম আয্-যাহাবী (পাশ্চাত্যে Abul Casis নামে পরিচিত), যিনি কর্দোভার সুলতান ৩য় 'আবদু'র রাহমান-এর চিকিৎসক ছিলেন (৪র্থ/১০ম শতক) এবং সেভীলের ইব্ন যুহর, (মৃ. ৫৯৫ হি.) [পাশ্চাত্যে Avenzoar নামে পরিচিত]। এই দুইজন ছিলেন আরবদের মধ্যে বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। প্রথমোক্তজন আত-তাসরীফ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, উহার শারীরবিদ্যা শল্য চিকিৎসা অংশ লওয়া হয় প্রধানত ইজিনার পল-এর (Paul of Aegina) গ্রন্থ হইতে। শেষোক্তজন ছিলেন একজন বায়যান্টীয় লেখক, ইসলামের সূচনাকালের সমসাময়িক, তিনি আরব ভূমিতে সফর করিয়াছিলেন এবং দক্ষ শল্য চিকিৎসকরূপে আরবদের নিকট হইতে যতেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। আবু'ল-কাসিম শল্যা-চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি চিকিৎসা পদ্ধতির বিবরণ লিখিয়াছেন এবং যন্ত্রপাতির চিত্রও দিয়াছেন। এইভাবে চিত্রিত তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ এখনও বর্তমান। এই গ্রন্থখানি ক্রিমোনার জিরার্ড (Gerard of Cremona) কর্তৃক খৃ. ১২শ শতকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১৪৯৭ খৃ. ভেনিস হইতে, পুনরায় ১৭৭৮ খৃ. বাজলে (Basle) প্রকাশিত হয়। Guy de Chauliac (১৩০০-১৩৬৮ খৃ.) ইহার একখানি পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করিলে উহা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ইব্ন যুহর ছিলেন বিরাট দক্ষতাসম্পন্ন প্রগতিবাদী ও বাস্তব মানসিকতাসম্পন্ন চিকিৎসাবিদ। গ্যালেনের অনেক কিছু তিনি বাতিল করিয়া দিয়া নিজের অভিজ্ঞতা যোগ করেন (Arnaud de Villeneuve) এই বিষয়ে প্রধানত ইব্ন যুহর-এর নিকট ঋণী। সর্বশেষে আদি পাশ্চাত্য অনুবাদক Constantine Africanus-এর কথা (১০২০-১০৮৭ খৃ.) স্মরণ করা যায়। তিনিই 'আলী ইব্ন 'আব্বাস-এর কিতাব পাশ্চাত্যে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। আরবগণ চক্ষু চিকিৎসাকে একটি বিশেষ চিকিৎসাবিদ্যা বলিয়া জানিতেন। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর দেহ সংস্থান, শংকর প্রাণীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন দৈত্যাকার জন্তুর গঠন বিষয়ে পর্যাবেক্ষণজাত জ্ঞানের জন্য মানব সভ্যতা তাঁহাদের নিকটেই ঋণী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (1) P. de Koning, trois Traites d'anatomie arabe, মূল পাঠ ও অনুবাদ, লাইডেন ১৯০৩ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Traite sur le calcul dans les reins et dans la Vessie, Par Abu bekr.....Al-Razi (Razes), লাইডেন সং ১৮৯৬ খৃ.; (৩) Mote Simon, Sieben Bucher der Anatomie des Galen লাইপযিগ ১৯০৬ খৃ.; (৪) Donald Campbell, Arabian medicine and its influence on the Middle-Ages ২খ, লণ্ড ১৯২৬ খৃ.; (৫) Carra de Vaux, Penseurs de l'Islam, ২খ, প্যারিস ১৯২১ খৃ., পৃ. ২৭৬-২৮৯; (৬) Razes, Ad Almansorem libri X, সিলান ১৮৮৭ খৃ.; (৭) Avicenna, Canon, ভেনিস ১৫০৭ খৃ., ল্যাটিন ভাষায়, রোম

১৫৯৩ খৃ., আরবী ভাষায়; (৮) Chyrurgia of G. de Cauliaco (de Chauliae), ভেনিস ১৪৯৭ খৃ., Chyrurgia Abulcasis উহার অন্তর্ভুক্ত।

B. Carra de Vaux (E.I.[1])/ হুমায়ুন খান

তাশরী (দ্র. তেশরীন)

তাশাহ্হুদ (تشهد), تفعل -এর পরিমাপে গঠিত مصدر মূল ش-ه-د অর্থ কালিমা-ই শাহাদাত (كلمة الشهادت) পাঠ করা, বিশেষত সালাতে। মনে রাখিতে হইবে যে, তাশাহ্হুদ বলিতে কেবল شهادتين [দুইটি সাক্ষ্য আল্লাহ্ অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ্র রাসূল] নহে, বরং তৎপূর্বে পাঠ করিতে হয় ঃ (১) التحيات والصلوات والطيبات ; এবং (২) السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته ; (৩) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين এই তিনটি কথার পর আসে কালিমাঃ শাহাদাতের দুইটি সাক্ষ্য ঃ (১) (اشهد ان لا اله الا الله) ; (২) (واشهد ان محمدا عبده ورسوله ; সুতরাং তাশাহ্হুদ এই পাঁচটি কথার সমষ্টিকে বুঝায়। হাদীছে তাশাহ্হুদ সম্পর্কিত বর্ণনায় প্রথম কথাটিতে কিছু শাব্দিক তারতম্য দেখা যায়, যদিও অর্থ প্রকাশের বেলায় কোন পার্থক্য নাই। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় প্রথম কথাটি হইল ঃ التحيات البركات والصلوات- والطيبات لله (দ্র. মুসলিম, সালাত, হাদীছ নং ৬০); হযরত ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর বর্ণনায় الطيبات শব্দটি নাই (ঐ, ঐ, হাদীছ নং ৫৬; মুসনাদ আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, ১খ, ৪২২); হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বর্ণনায় কথাটি এইরূপ ঃ التحيات الطيبات الصلوات لله। হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় অবগত হওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীগণকে যেমন কুরআনের সূরাগুলি শিক্ষা দিতেন তদ্রূপ গুরুত্ব সহকারে তাশাহ্হুদও শিক্ষা দিতেন।

'উলামা ই ইসলামের মতে সালাতের মধ্যে তাশাহ্হুদের প্রথমাংশে বর্ণিত যে কোন শব্দ বিন্যাসে পাঠ করা যাইতে পারে; কোন্ বিন্যাসটি উৎকৃষ্ট এ সম্বন্ধে দ্র. شرح مسلم-النووى , মিসর ১৩৪৯ হি., ৪খ., ১১৫-১৬; তবে কোন মতৈক্যের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

দুই রাক'আতের সালাতে দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়িতে হয়, দুইয়ের অধিক রাক'আত সম্বলিত সালাতে দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠকে একবার এবং শেষ রাক'আতের বৈঠকে আবার তাশাহ্হুদ পাঠ করা কর্তব্য। তাশাহ্হুদ পাঠের পর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্য রাহমাত ও বারাকাত-এর দু'আ', অতঃপর কোন একটি দু'আ' মাছুরা (ماثورة- হাদীছে যাহার সাক্ষ্য বিদ্যমান) পাঠের পর সালামান্তে সালাত শেষ হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিক্হ-এর প্রামাণিক কিতাবাদি; (২) Wensinck. Handbook of Early Muhammadan Tradition, বিশেষত তিরমিযী-র বরাতে বর্ণিত অংশ; (৩) Lane, Mannners and Customs of the Modern Egyptians, chapter on Religion and Laws.

A. J. Wensinck (E.I.[1])/ আবদুল বাসেত

তাসকীন মীর হুসায়ন (تسكين مير حسين) ঃ ১৮০৩-৫১ জন্মস্থান দিল্লী, উর্দূ কবি, কবিনাম তাসকীন। কাব্য রচনায় প্রথমে শাহ্নসীর এবং পরে কবি মুমিনের শাগরিদ হন। আর্থিক সংকটে পড়িয়া মীরাট ও লখ্নৌতে কিছুকাল ঘোরাফেরা করিয়া অবশেষে রামপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার কোন কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় নাই। বিভিন্ন জীবনচরিত গ্রন্থে তাঁহার কবিতাবলীর উদ্ধৃতি তাঁহার চিত্তাকর্ষক বাচন ভঙ্গীর পরিচায়ক।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭১৮

তাসদীক ওয়া তাসাওউর (تصديق وتصور) ঃ ১) (দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার ফালসাফা ও মানতিক) পরিভাষায় তাসদীক ও তাসাওউর -এর অর্থ মুসলিম দার্শনিকগণের মতে যুক্তিবিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত (ক) তাসাওউর সম্পর্কিত জ্ঞান এবং (খ) তাসদীক সম্পর্কিত জ্ঞান। যুক্তিবিদ্যার উক্তরূপ শ্রেণীবিভাগ গ্রীক দার্শনিকগণের বর্ণনায় পাওয়া যায় না, বরং উহা সর্বপ্রথমে মুসলিম দার্শনিকগণের বর্ণনায়ই দেখা যায়। তাসাওউর-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ তাসাওউর হইল কোনও বস্তুর স্বরূপের প্রতি কোনও বিষয় আরোপ না করিয়া (Judgment) শুধু উহার স্বরূপকে উপলব্ধি করিবার নাম। তাসাওউরভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করিবার উপায় হইল–বস্তুর সংজ্ঞা নির্ণয় বা সংজ্ঞা প্রদান। যখন দুই বা ততোধিক তাসাওউরকে মাওদূ (موضوع-উদ্দেশ্য) ও মাহ্মূল (محمول- বিধেয়) হিসাবে দুইটি দিকরূপে স্থাপন করত উহাদের একটির প্রতি আরেকটির প্রযুক্ত হইবার অথবা না হইবার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন উহাকে (অর্থাৎ উক্তরূপ বর্ণনাকে) তাসদীক বলা হয়। তাসদীক কি উপায়ে অস্তিত্বপ্রাপ্ত হয় এই প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে মুসলিম দার্শনিকগণ অ্যারিস্টটলের সহিত ঐকমত্য পোষণ করেন; কারণ, তাঁহারা সাধারণ দার্শনিক মতবাদসমূহের ব্যাপারে অ্যারিস্টটলকেই অনুসরণ করিয়াছেন। অ্যারিস্টটলের মতবাদ অনুসারে তাসাওউরের অস্তিত্ব তাসদীকের অস্তিত্বের পূর্বে ঘটিয়া থাকে। মানুষের অন্তরে প্রথমে ধারণাগত তাসাওউর উদ্ভব হয় এবং অতঃপর উহাদিগকে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সম্পর্কারোপের মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কশীল করা হয়। কিন্তু যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক মতবাদসমূহ যেহেতু অন্যান্য জ্ঞান-শাখার মতবাদসমূহের ন্যায় প্রায়োগিক তথা বাস্তবানুগ মতবাদ, যে কারণে বাস্তবানুগ জ্ঞান ধারণাগত জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হওয়া জরুরী বটে, তাই যে সম্পর্কের দ্বারা ধারণার জগতে বিভিন্ন তাসাওউরকে পরস্পর সম্পর্কশীল করা হয় উহাকেও বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্যশীল হইতে হইবে। উক্ত প্রযুক্তির ভিত্তিতে এই কথা স্বীকৃত যে, বিভিন্ন তাসাওউরকে উপরিউক্তরূপে পরস্পর সম্পৃক্তকরণের কার্যে কোনরূপ বিশেষ মানসিক প্রবণতা বা ধারণার কোনরূপ প্রভাব থাকিতে পারিবে না। এই ক্ষেত্রে মানুষের বোধশক্তির কার্য শুধু এই যে, উহা তাসাওউরসমূহের বাস্তব মাওদূ'সমূহকে এবং উক্ত মাওদূ'সমূহের মধ্যকার বাস্তব সম্পর্ককে উপলব্ধি করিবে।

কিন্তু উপরিউক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন ও গুরুতর প্রশ্ন দেখা দেয়। উহা এই যে, একাধিক তাসাওউর-এর মধ্যে যে আরোপিত সম্পর্ক কায়েম হয় উহা কখনও বা নিশ্চিত এবং কখনও বা অনুমানভিত্তিক হইয়া থাকে। ধারণার সহিত বাস্তবের মিল থাকিতে হইবে–এই মতবাদ উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম। তাই অ্যারিস্টটলের পরবর্তী যুগে জেনোর (Zeno) দর্শনের Stoic Philosophy) অনুসারী দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি নূতন দার্শনিক মতবাদ জন্মলাভ করে। এই দর্শনের অনুসারী দার্শনিকগণের মতে যদিও কোনও দার্শনিক উক্তির (Proposition) তাসাওউরসমূহ বাস্তব জগৎ হইতে আসিয়া থাকে তবুও উক্ত তাসাওউরসমূহের মধ্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি করত উহাদিগকে তাসদীকে পরিণত করা চিন্তাশক্তির কার্য। জেনো অনুসারী দার্শনিকগণ চিন্তাশক্তির উক্ত কার্যকে তায়াক্কুন বা নিশ্চয়তা লাভ এবং

তাসদীক বা সত্যায়ন নাম দিয়াছেন। পরবর্তী যুগীয় মুসলিম দার্শনিকগণের মধ্যে উপরোক্ত উভয় মতবাদের সমাবেশ ঘটিয়াছে। উহার ফলে এতদসম্বন্ধে অত্যন্ত জটিল ও চিত্তাকর্ষক বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত মুসলিম দার্শনিকগণ এই বিষয়ে এরিস্টোটলের সহিত একমত যে, তাসদীকের মাওদূ' ও মাহমূল এবং উহাদের মধ্যকার ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সম্পর্ক বাস্তব জগতে অস্তিত্বশীল রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এই কথা মানিতে সম্মত নহেন যে, মানুষের বোধশক্তির কার্য মাওদূ', মাহ্‌মূল ও এতদুভয়ের মধ্যে বর্তমান ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সম্পর্ককে শুধু উপলব্ধি করা। তাঁহাদের প্রমাণ এই যে, যদি বোধশক্তির কার্য হয় বচন (قضية) বা তাসদীককে শুধু উপলব্ধি করা, তবে তাসাওউর ও তাসদীকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশকারী কোনও বৈশিষ্ট্য আর বর্তমান থাকে না। কারণ তাসাওউরও কোনও বস্তুকে উপলব্ধি করিবার নাম এবং এরিস্টোটলের মতে তাসদীকও কোনও বচনকে শুধু উপলব্ধি করিবার নাম। অতএব মুসলিম দার্শনিকগণের মতে, তাহাদের মধ্যে ইমাম ফাখরুদদীন রাযী অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি– তাসদীকের মাওদূ' ও মাহমূলের মধ্যে ইতিবাচক অথবা নৈতিবাচক সম্পর্ক থাকে, উহা সৃষ্টি করা মানুষের চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তির কার্য। এইরূপে মুসলিম দার্শনিকগণের আলোচনা এক সূক্ষ্ম বিষয়ের জন্ম দিয়াছে। ইহার ফলে একদিকে যেমন তাসাওউর ও তাসদীকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, অন্যদিকে তেমনি তাসদীক অর্থাৎ বচন এবং উহার মাওদূ' ও মাহ্‌মূলের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্যও সৃষ্টি হয়।

(২) ধর্মীয় পরিভাষায় তাসদীক-এর অর্থ ঃ ইসলামী পরিভাষায় তাসদীক হইল মহানবী (স)-এর ইসলামী দা'ওয়াতে সাড়া দিবার এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবার নাম। উক্ত অর্থ অনুযায়ী তাসদীক একটি অন্তরের কার্য, যাহা অন্তরের ঈমানী শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক ও 'উলামার মতে উহা একটি স্বাধীন কার্য, যাহা সম্পাদন করা বা না করা সম্পাদনকারীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার। তাঁহাদের মতে শুধু এইরূপ স্বাধীন ও ইচ্ছাধীন কার্যই ধর্মীয় দিক দিয়া গুরুত্বের অধিকারী। তাই তাঁহাদের মতানুসারে ধর্মীয় তাসদীক এবং সঠিক উপলব্ধি বা সুদৃঢ় জ্ঞানলাভ–এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে মু'তাযিলা ও সাধারণ দার্শনিকগণের মতে গ্রহণযোগ্য ধর্মীয় তাসদীক ও ঈমানের ভিত্তি হইল বুদ্ধিজাত জ্ঞান। খৃস্টান ধর্মযাজকদের, যেমন ঃ Origen ও Augustine আলোচনায় যেইরূপ উক্ত বিষয়টি চলিয়া আসিয়াছে, মুসলিম দার্শনিক এবং 'উলামার আলোচনায়ও সেইরূপে উহা চলিয়া আসিয়াছে। তাসদীক ও ঈমান বিষয়ক উক্ত মতবাদের প্রভাব দার্শনিক মতবাদের উপরও, যেইরূপে উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্ট হয়, পতিত হইতে দেখা যায়। কোনও কোনও দার্শনিক সম্ভবত উপরোক্ত রূপ মতাবাদসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মানব মনের বিশ্বাসকে জ্ঞানের প্রাথমিক স্তর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মহান মুসলিম দার্শনিক ইব্‌ন সীনা (দ্র.) আশা-শিফা', কিতাবু'ন-নাফ্‌স, ৫ নিবন্ধ, ৬ পরিচ্ছেদ; Avicenna's De Anima, লণ্ডন ১৯০৯ খৃ., পৃ. ২৩৯ প.) মানব মনের বিশ্বাসকে 'আক্‌ল-ই ফা'আল অর্থাৎ সক্রিয় বুদ্ধি এবং খাল্লাক-ই 'ইল্‌ম অর্থাৎ জ্ঞানের উৎপাদক ও উৎস নামে অভিহিত করিয়াছেন। "তাস্‌দীক, য়াকীন (বিশ্বাস) ও ঈমান–'ইল্‌ম (জ্ঞান) ও মা'রিফাত (তত্ত্বজ্ঞান)-এর পূর্বে অর্জিত হইয়া থাকে" এইরূপ মতবাদ হার্‌মাসীয় (هرمسى) (?) গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত দেখা যায়। আমার 'ইলম ও জ্ঞান আমার ঈমান ও বিশ্বাসের কারণ নহে; বরং আমার ঈমান ও বিশ্বাস আমার 'ইলম ও জ্ঞানের কারণ। দার্শনিক ধর্মযাজক Augustine-এর এই উক্তি এ স্থলে তুলনীয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মুসলিম দার্শনিকগণ এবং সাধারণ দার্শনিকগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত আরও দেখুন ঃ (১) জুরজানী, কিতাবু'ত-তা'রীফাত; (২) আত-তাহানাবী, কাশশাফু ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন, তাসদীক শব্দ দ্র.; (৩) মাওলানা 'আবদু'ল-হাকীম সিয়ালকোটী, কুত্‌বী গ্রন্থে লিখিত টীকা; (৪) বিশেষত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে প্রাক-ইসলামী যুগে বিদ্যমান তাসদীক-এর ব্যাখ্যার জন্য দ্র. ঃ H. A. Wolfson. Philosophy of the Church Fathers. Cambridge Mass., U. S. A. 1956 A. D.।

ফাদলুর-রাহমান (দা. মা. ই.)/মু. মাজহারুল হক

তাসনীম (تسنيم) ঃ ১। কুরআন শারীফের ৮৩ সংখ্যক সূরার ২৭ নং আয়াতে উল্লিখিত জান্নাতের একটি ঝর্নার নাম। বলা হইয়াছে যে, ইহার পানি শুধুমাত্র মুকাররাবূন, অর্থাৎ যাঁহারা আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভে সক্ষম হইবেন তাঁহারা পান করিতে পারিবেন এবং জান্নাতের সর্বসাধারণের পানীয়ের সঙ্গে ইহা মিশ্রিত করা হইবে। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে, তাসনীম কোন নামবাচক শব্দ কিনা। লিসান অনুযায়ী নামবাচক হওয়াটা শব্দটির দ্ব্যর্থবোধকতার সঙ্গে সাম স্যপূর্ণ নহে। মূল ধাতু 'সনম' হইতে আহৃত শব্দ কি না তাহাও নিশ্চিত নহে। মূলের অর্থ হয় উঁচু বা উন্নত হওয়া। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আয়াতটির অর্থ হয় ঃ "এবং ইহা (অর্থাৎ জান্নাতের বাসিন্দাগণের পানীয়) উচ্চ স্থান হইতে প্রবাহিত পানির সঙ্গে মিশ্রিত করা হইবে।" আত-তাবারী একটি তৃতীয় ব্যাখ্যা দিয়াছেন যে, ইহা হইবে জান্নাতবাসিগণকে সন্তুষ্টিদায়ক গোপন বস্তু।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বুখারী, তাফসীর, সূরা নং ৬৩; (২) আত-তাবারী, তাফসীর, ৩০খ, পৃ. ৫৯; (৩) ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী, মাফাতীহু'ল-গায়ব, ৬খ., ৫০২ এবং আল-কুরআনের অন্যান্য তাফসীর; (৪) লিসানু'ল'আরাব, ১৬খ., ১৯৯।

২। সনম-এর ২য় ক্রিয়ামূল ঃ কবরকে মাটির সমতা হইতে উঁচু করা। বলা হইয়া থাকে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর কবর মুসান্নাম ছিল (দ্র. বুখারী, জানা'ইয, বাব ৯৬, নং ১৩৯০-এর অধীন)। অপরপক্ষে এইরূপও বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার কবর যেন মাটির সমান রাখা হয় [দ্র. (১) মুসলিম, জানা'ইয, হাদীছ নং ৯২, ৯৩; (২) আহমাদ ইব্‌ন হাম্‌বাল, মুসনাদ, ৬খ., ১৮ bis, পৃ. ২১]। আশ-শাফি'ঈ (র) এইরূপ মত পোষণ করিতেন যে, কবর ঠিক ততটুকুই উঁচু করা উচিত যাহাতে উহাকে কবর বলিয়া চেনা যায় এবং লোক সেইখানে না বসে বা উহার উপর দিয়া না হাঁটে (দ্র. আত্‌-তিরমিযী, জানাইয, ৫৬)। মালিকীগণ আবার তাসনীম-এর পক্ষপাতী (দ্র. আন্‌-নাওয়াবীকৃত সাহীহ মুসলিম-এর ভাষ্য, কায়রো ১২৮৩ হি., ২খ, পৃ. ৩৪৪)।

A. J. Wensinck (E.I. [1])/ হুমায়ুন খান

তাস্‌বীর (تصوير) ঃ আ.; (১) তাস্‌বীর শব্দের অর্থ আকৃতি প্রদান করা, ছাঁচে ঢালিয়া বিশেষ আকার দেওয়া, নির্মাণ করা, প্রতীক, প্রতিকৃতি, ছবি, চিত্র, রূপ, আকৃতি, চিহ্ন, প্রতিচ্ছবি। চিত্রাঙ্কন ও মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ হইবার বিষয়ে মুসলিম ফকীহ্‌গণের মতামত জানিবার জন্য সূরাত এবং তাসবীর (২) নিবন্ধদ্বয় দ্র.। এই স্থলে মুসলিম বিশ্বের

চিত্রাংকন ও প্রতিকৃতি নির্মাণ চর্চা বিষয়ক বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। মুসলিম জাহানে যদিও চিত্রাংকন ও প্রতিকৃতি নির্মাণ চর্চা চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু 'উলামায়ে কিরাম উহাকে গর্হিত ও নিন্দনীয় কার্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রতিকৃর্তি নির্মাণের নিদর্শনাবলীর সংখ্যা নগণ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিসরে খুমারাওয়ায়হ্ তাঁহার নিজের, নিজের স্ত্রীদের এবং গায়িকা নারীদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। স্পেনে তৃতীয় 'আবদুর'-রাহ্‌মানও (দ্র.) স্বীয় প্রেয়সী স্ত্রী আয-যাহ্‌রা' -এর প্রতিকৃতি নির্মাণ করাইয়া তাঁহার-ই নামানুসারে তৎকর্তৃক নামকরণকৃত কাস্‌রু'য-যাহ্‌রা'-য় স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃ. চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকে পঞ্চম মুহাম্মাদের জন্য আল-হামরা' প্রাসাদে নির্মিত পানির ফোয়ারা মর্মর-প্রস্তর নির্মিত যে সিংহ-মূর্তিটির উপর স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সিংহ-মূর্তিটি এখনও সেইখানে বর্তমান রহিয়াছে। মধ্য এশিয়ার সালজূক শাসনকর্তাগণও রাজধানী কূনিয়ার (দ্র.) সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও শোভাবর্ধনের কার্যে ভাস্কর্য শিল্পীগণের শিল্পবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত শহরের যাদুঘরে এখনও সেই যুগের বহু সংখ্যক প্রস্তর নির্মিত মনুষ্য প্রতিকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতিকৃতি সংরক্ষিত রহিয়াছে। (মুসলমানদের নিকট চিত্র ও মূর্তির অস্তিত্ব বিষয়ক বিশদতর বিবরণ নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যাইবে ঃ আহ্‌মাদ তায়মূর পাশা, আতা-তাস্‌বীরু 'ইন্‌দা'ল-'আরাব, পৃ. ১১৯-১৩৯; যাকী মুহাম্মাদ হাসান, কুনূযু'ল-ফাতিমিয়্যীন, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.; ঐ লেখক, আল-ফুনূন্‌'ল-ঈরানিয়্যাতু ফি'ল-'আস্‌রি'ল-ইসলামী; ঐ লেখক, আল-ফান্‌ন'ল-ইস্‌লামিয়্যু ফী মিসর, কায়রো ১৯৩৫ খৃ.; এতদ্‌সহ তুলনীয় দাইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল-ইস্‌লামিয়্যায় যাকী মুহাম্মাদ হাসান কর্তৃক লিখিত পরিশিষ্ট, আত-তাস্‌বীর নিবন্ধের অধীনে, পৃ. ২৯৯। ভারতীয় উপমহাদেশে মুগল সম্রাটগণ কর্তৃক নির্মিত কতকগুলি প্রতিকৃতির বিবরণ জানিবার জন্য দেখুন ঃ V.A. Smith, Akbar the Great, অক্সফোর্ড ১৯১৭ (?) খৃ., পৃ. ৯৩ প. ; তুযাক-ই জাহাঙ্গীরী, পৃ. ৫০; 'আমাল-ই সালিহ', পৃ. ১৫। দারা শুকোহ্-র লাহোরস্থ উদ্যানে স্থাপিত প্রতিকৃতিসমূহের বিবরণ জানিবার জন্য দেখুন ঃ ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাযিন, লাহোর, আগস্ট ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৩২)। আমাদের জানামতে, মুসলিম শাসনকর্তাগণের যে প্রতিকৃতিসমূহ সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের দর্শনীয় স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল উহা ছিল ইস্‌মা'ঈল পাশা (দ্র.) কর্তৃক কায়রো শহরে স্থাপিত প্রতিকৃতিসমূহ। আধুনিক যুগে ইরান ও তুরস্কে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকৃতিসমূহ রাজপথ প্রভৃতি স্থানসমূহে স্থাপিত হইয়াছে। মিসরে ফাতিমী শাসনামলে বিপুল পরিমাণে কাঁসার কেতলী ও ধূপাধারসমূহ পশু-পাখির আকারে নির্মাণ করা হইয়াছিল। সেই যুগে নির্মিত বিল্লোরীয় পাত্রসমূহের উপরও সাধারণত বিভিন্ন প্রাণীর ছবি উৎকীর্ণ করা হইত। মাওসিল নগরের ধাতুশিল্পীগণ এবং তাহাদের যেই সকল সহশিল্পী নিজেদের শিল্পবিদ্যা লইয়া ইরান, সিরিয়া ও মিসরে পৌঁছিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাদের শিল্পকর্মের মাধ্যমে রাজা-বাদশাহদের দরবারী জীবনের সচিত্র আলেখ্য উপস্থাপন করিয়াছেন। তঁহাদের নির্মিত চিত্রসমূহের কোনটিতে বা সম্রাট তাঁহার সেবক ও খিদ্‌মতগারদের মধ্যে বসিয়া পানীয় গ্রহণে রত রহিয়াছেন, কোনটিতে বা তিনি পশু-পাখিকে ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোনটিতে বা তিনি পোলো খেলিতেছেন এবং কোনটিতে বা তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রহিয়াছেন। উল্লিখিত ধাতু শিল্পীগণের কেহ কেহ যদিও নিশ্চয়ই খৃস্টান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুসলিম শাসনকর্তাগণ। খৃ. দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীদ্বয়ে নির্মিত এইরূপ কতগুলি মৃৎপাত্র রায় শহরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাদের উপর অত্যন্ত জমকালো রংয়ের মাধ্যমে রাজা-বাদশাহ তথা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ, গায়ক-গায়িকাগণ, নৃত্য শিল্পীগণ ও বীর যোদ্ধাগণের ছবি এবং নানারূপ প্রকৃত ও কাল্পনিক প্রাণীর ছবি অংকিত রহিয়াছে। অন্যান্য কতগুলি শহরে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রসমূহের উপরও বিভিন্ন রূপ চিত্র অংকিত পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু, সে সকল চিত্রে পূর্বোল্লিখিত চিত্রসমূহের ন্যায় শিল্পীদের কল্পনা শক্তির তেমন আধিক্য ও প্রবলতা পরিলক্ষিত হয় না। কাঠের উপর উৎকীর্ণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর চিত্র বিশেষত মিসরের ফাতিমী ও মাম্‌লূক শাসনামলের শিল্পকর্মসমূহে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এইরূপে বিছানা, গদি, গজদন্ত ও কাচের দ্রব্যসামগ্রীসমূহের আলংকারিক নকশাসমূহেও বিভিন্নরূপ চিত্র অংকিত দেখা যায়। উপরোল্লিখিত চিত্রশিল্প বিষয়ক নিদর্শনাবলী, যাহা অতি উৎসাহী মূর্তি-ভঙ্গকারীদের অত্যাচারের হাত হইতে এবং বিভিন্ন সময়ে মুসলিম বিশ্বের উপর আপতিত ভয়াবহ বিপর্যয়ের ধ্বংসকারী হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, অতীতে মুসলমানদের নিকট যেই চিত্রকর্মের সমষ্টি বর্তমান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়, উহার সম্ভবত অতি ক্ষুদ্র অংশই হইবে।

বিশেষত ইরান, ভারতীয় উপমহাদেশ ও তুরস্কে যেই সকল চিত্র ও মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে মুসলিম বিশ্বে চিত্রকলার অস্তিত্ব এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মূর্তি নির্মাণের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমানদের রাজকীয় প্রাসাদসমূহের প্রাচীরগাত্রে আলংকারিক চিত্রাংকন (fresco-painting)-এর প্রথা প্রচলিত থাকিবার প্রমাণ উমায়্যা শাসনামলে নির্মিত "কুসায়র 'আম্‌রা" (দ্র.) হইতে এবং 'আব্বাসী শাসনামলে নির্মিত 'সামার্‌রা' হইতে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত প্রাসাদের দেওয়ালে সম্রাট, নৃত্যশিল্পী, গায়ক-গায়িকা ও বাজিকরগণের চিত্র এবং শেষোক্ত প্রাসাদের দেওয়ালে নৃত্যশিল্পী নারীগণ ও পশু-পাখির চিত্র অংকিত রহিয়াছে (দ্র. E. Herzfeld, Die Malereien von Samarra, বার্লিন ১৯২৭ খৃ.)। পরবর্তী যুগের মুসলিম সম্রাটগণের প্রাসাদসমূহ হইতে উক্ত প্রথার বিপুল পরিমাণ সাহিত্যিক প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃ. অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইরানী সম্রাটগণের জন্য অংকিত প্রাচীর-চিত্রসমূহের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে মুসলিম চিত্র শিল্পীগণের চিত্রকর্মসমূহের অধিকাংশই পাওয়া যায় হস্তলিখিত সচিত্র গ্রন্থাবলীতে এবং উহাদের কিয়দংশ পাওয়া যায় লিপি-শিল্পীদের বিভিন্নরূপ লিপি অনুশীলন পত্ররূপে। কাগজের উপর অংকিত খৃ. ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী যুগের চিত্রকর্মসমূহের কোনও নিদর্শন সম্ভবত সংরক্ষিত নাই। প্রাথমিক যুগে রচিত যেই সকল আরবী গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানের দৃশ্যের চিত্র অংকিত করা হইয়াছে, উহাদের মধ্যে "আল-মাকামাতু'ল-হারীরিয়্যা", "কালীলা ওয়া দিম্‌না" এবং জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও যন্ত্রবিদ্যা বিষয়ক কতকগুলি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ফারসী গ্রন্থাবলীকে সচিত্র করিবার দিকে চিত্রশিল্পীগণের দৃষ্টি তুলনামূলকভাবে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। এই কারণেই বিপুল সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের ফারসী গ্রন্থকে বিভিন্নরূপ চিত্রে চিত্রিত দেখা যায়। চিত্রশিল্পীগণ অধিকাংশ ফারসী কাব্য গ্রন্থকে সচিত্র গ্রন্থে রূপদান করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফির্‌দাওসী রচিত শাহ্‌নামা, নিজামী রচিত খাম্‌সা, শায়খ সা'দী রচিত কাব্য সংকলন 'কুল্লিয়াত-ই সা'দী' এবং অন্যান্য অনেক ফারসী কবির কাব্যগ্রন্থসমূহকে চিত্রশিল্পীগণ সচিত্র রূপ দান করিয়াছেন। ইতিহাস গ্রন্থাবলীর হস্তলিখিত সচিত্র অনুলিপির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এতদ্‌সত্ত্বেও রাশীদু'দ-দীন রচিত জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ, মীর খান্দ রচিত রাওদাতু'স-সাফা, শারাফু'দ-দীন 'আলী য়াযদী রচিত জাফারনামা এবং ভারতীয়

উপমহাদেশের ইতিহাস বর্ণনায় রচিত গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন অনুলিপিতে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। একাধিক লেখক কর্তৃক রচিত একাধিক কিসাসুল-আম্বিয়া' এবং সুল্‌তান হুসায়ন মীর্যা, যিনি নিজেও চিত্রশিল্পীগণের বদান্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কর্তৃক রচিত 'মাজালিসু'ল-'উশ্‌শাক' এই সকল গ্রন্থে অংকিত চিত্রাবলী এই কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, উহাতে মুসলিম চিত্রশিল্পীগণ ইস্‌লামী ইতিহাসের পবিত্রাত্মা বুযুর্গগণের জীবনের সচিত্র আলেখ্য উপস্থাপন করিয়াছেন। পরবর্তী যুগে গদ্য উপন্যাস গ্রন্থাবলীকে সচিত্র রূপ প্রদানের প্রথাও চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। মুসলিম চিত্রশিল্পীগণ আরবী-ফারসী গ্রন্থাবলীর হস্তলিখিত অনুলিপিসমূহ ব্যতীত চাগ্‌তাঈ শাসনামলে তুর্কী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীকে বিশেষত খৃ. পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে হেরাতে রচিত তুর্কী গ্রন্থাবলী, ভারতবর্ষীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী, পশতু ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী, এবং 'উছ্‌মানী শাসনামলে রচিত তুর্কী গ্রন্থাবলীকেও সচিত্র রূপ দান করিয়াছেন।

রাজা-বাদ্‌শাহ্‌ এবং ধনী ব্যক্তিদের জন্য প্রস্তুতকৃত হস্তলিখিত সচিত্র গ্রন্থানুলিপিসমূহের আলোচনার পর এই স্থলে এইরূপ কতকগুলি উদাহরণের উল্লেখ করাও প্রয়োজন, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি অংকন করিয়াছে। এই সকল উদাহরণের মধ্যে বিশিষ্টতম উদাহরণ হইতেছে পুতুল খেলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের চিত্র ও ছবি। উক্ত পুতুল খেলা জাভা, মিসর ও তুরস্কে অত্যন্ত জনপ্রিয়। দরিদ্র পরিবারসমূহের গৃহকে, বিশেষত মিসর দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাণীর এইরূপ নিম্নমানের ছবিসমূহ দ্বারা সজ্জিত করা হইয়া থাকে, যাহা কোনও হাজ্জীর হজ্জ পালনশেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান পালনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অংকিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত 'বুরাক' (দ্র.)-এর সস্তা ছবি তো সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলিমগণ কাহাদের নিকট হইতে চিত্রকলা গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না; তবে তাহাদের চিত্রসমূহে খৃস্টান (য়া'কূবীয় সম্প্রদায় ও নাস্‌তূরীয় সম্প্রদায়) চিত্রশিল্পীগণ, ইরানের মানি সম্প্রদায়ের সাসানীয় চিত্রশিল্পীগণ এবং চীনা চিত্রশিল্পীগণ অংকিত চিত্রসমূহের প্রভাব পতিত হইবার কিয়ৎ পরিমাণ চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ইরানে প্রাক-ইসলামী যুগে প্রচলিত চিত্রশিল্পগত ঐতিহ্যাবলী ইসলামী যুগে সৃষ্ট চিত্রকর্মসমূহে পুনরুজ্জীবিত হইতে থাকে। আবার ভারতবর্ষে হিন্দু চিত্রশিল্পীগণ মুসরিম সম্রাটগণের জন্য যেই সকল চিত্র অংকন করেন, উহাতে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় চিত্রকলার বৈশিষ্ট্যাবলীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সংযোজিত করেন।

মুস্‌লিম চিত্রশিল্পীগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার ধারা-বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নির্ণয়েরও কিছু কিছু চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের শ্রেণীবিভাগের বিভিন্নরূপ ভিত্তির মধ্য হইতে কোনও ভিত্তিই সর্বসম্মতরূপে গৃহীত হয় নাই। খৃ. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অংকিত প্রথম শ্রেণীর চিত্রসমূহ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। এইরূপে খৃ. পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইরানের মুগল শাসনকর্তাগণের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পীগণের চিত্রকর্মসমূহ এবং খৃ. পঞ্চদশ শতাব্দীর তায়মূরীয় শাসনকর্তাগণ, খৃ. ষোড়শ শতাব্দীর সাফাবী সম্রাটগণ এবং খৃ. ষোড়শ শতাব্দী ও সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষীয় মুগল সম্রাটগণ কর্তৃক চিত্রাংকনে নিযুক্ত চিত্রশিল্পীগণের চিত্রকর্মসমূহও পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী বিধায় উহারাও বিভিন্ন স্বতন্ত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর জীবনী সম্পর্কে অত্যন্ত অল্প তথ্যই আমরা জানিতে পারি। কেননা শিল্পীদের চিত্রকর্মসমূহের অধিকাংশের উপরই শিল্পীর নাম অংকিত নাই। আর যদি কোনও চিত্রে চিত্রকরের স্বাক্ষর প্রদত্তও দেখা যায়, তথাপি সাধারণত তাঁহার জীবনী সম্পর্কিত কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। এমনকি ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বেহ্‌যাদ (দ্র.) সম্বন্ধে যেই সকল তথ্য পাওয়া যায়, উহাদের ভিত্তিতে "তিনি কোন্ কোন্ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকের জন্য চিত্রাংকন করিয়াছেন", শুধু তাহাই বলা যায়; কিন্তু সমালোচকগণ তাঁহার স্বাক্ষর সম্বলিত চিত্রকর্মসমূহের মধ্য হইতে কোন্ কোন্‌টি বাস্তবিকপক্ষে তৎকর্তৃক অংকিত, তদ্বিষয়ে একমত নহেন। ইরানী চিত্রশিল্পীগণ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যাবলী খৃ. ষোড়শ শতাব্দীতে এবং ভারতবর্ষীয় ও তুর্কী চিত্রশিল্পীগণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী উহার কিছুকাল পরে ইতিহাস-গবেষকদের নিকট হস্তগত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কিত বিশদ বিবরণের অভাব এত অধিক যে, উক্ত অপর্যাপ্ত তথ্যাবলী হইতে নির্দিষ্ট কোনও চিত্রকর্মের পরিচয় লাভে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না।

যেই সকল মুদ্রায় মুসলিম সম্রাটগণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে, সর্বশেষে এই স্থলে উহাদের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই শ্রেণীর প্রাচীনতম মুদ্রাসমূহ সুস্পষ্টরূপে বায়যান্টাইনীয় মুদ্রার অনুকরণ বটে। ৭৭ হি. সনের দিকে খলীফা 'আবদু'ল-মালিক (দ্র.) যখন মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন, তখন ছবি উৎকীর্ণ মুদ্রা নির্মাণের প্রথার অবসান ঘটে। পরবর্তী যুগে প্রবর্তিত এইরূপ কতগুলি স্বতন্ত্র মুদ্রার সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাদের উপর 'আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিল, মুক্‌তাদির ও মুতী'-এর ছবি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অবশ্য মধ্য এশিয়ার সালজূক শাসনকর্তাগণ, দিয়ার বাক্‌র অঞ্চলের উরতুকীয় শাসনকর্তাগণ এবং হালাব অঞ্চলের যাঙ্গী শাসনকর্তাগণের শাসনামলে প্রবর্তিত সেই সকল দেশের মুদ্রাসমূহে মানুষের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। তবে সেই সকল মুদ্রাও প্রায় ক্ষেত্রেই ভিনদেশীয় মুদ্রার অনুকরণ ছিল। উক্ত মুদ্রাসমূহে যেই সকল সম্রাটের উপাধি উৎকীর্ণ ছিল, উহাতে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিসমূহ কোনক্রমেই সেই সকল সম্রাটের প্রতিকৃতি ছিল না। অবশ্য ভারতীয় উপমহাদেশে সম্রাট জাহাঙ্গীর (দ্র.) এইরূপ মুদ্রার প্রবর্তন করিয়াছিলন, যাহাতে তাঁহার নিজ প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ ছিল। এমনকি তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিকে এইরূপ অধিক আহত করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন যে, মুদ্রায় উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিতে তিনি নিজেকে মদ্যপানপাত্র হস্তে ধারণকৃতরূপে দেখাইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ ঃ (১) K. A. Inostrantsev এবং J. I. Smirnov, Materiali Dla Bibliographie Musulmanskoe Archeologie, সেন্ট পিটারস্‌বাগ ১৯০৪ খৃ.; (২) A. Creswell, A Provisional Bibliography of Painting in Muhammadan art, লণ্ডন ১৯২১ খৃ.; (৩) W. Bjorkman এবং E. Kuhnel, Kritische Bibliographie, Islamische Kunst 1914-1927 খৃ. (Isl. xvii), বার্লিন ১৯২৮ খৃ.। পরবর্তী কালে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে ঃ (৪) T.W. Arnold, Painting in Islam, অক্সফোর্ড ১৯২৮ খৃ.; (৫) A. Grohmann এবং T. W. Arnold, Denkmaler Islamischer Buchkunst, মিউনিখ ১৯২৯ খৃ.। নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীতে মুসলিম চিত্রকলা সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ রহিয়াছে ঃ (৬) E. Kuhnel, Islmische Kleinkunst, বার্লিন ১৯২৫ খৃ.;

(৭) E. Migeon. Manael d'art Musulman, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.।

T. W. Arnold (দা. মা. ই.)/মু. মাজ্‌হারুল হক

দা. মা. ই-তে প্রকাশিত তাসবীর নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত আরও কতিপয় গ্রন্থের নাম ঃ (৮) L. Binyon, Wilkinson and Gray, Persian Miniature Painting, অক্সফোর্ড ১৯৩৩ খৃ.; (৯) E. Blochet, Musulman Painting, লণ্ডন ১৯২৭ খৃ.; (১০) E. Diez. Die Kunst der Islamischen Volker, বার্লিন ১৯২২ খৃ.; (১১) M. Dimand, A Handbook of Muhammadan Decorative Arts, নিউ ইয়র্ক ১৯৩০ খৃ.; (১২) H. Cluck und Diez, Die Kunst des Islam, বার্লিন ১৯২৫ খৃ.; (১৩) E. Herzfeld, Die Malezeien von Samarra, বার্লিন ১৯২৭ খৃ.; (১৪) E. Kuhnel, Die Islamische Kunst, Published in A. Springer, Handbuch der Kunstgeschichte Band VI, S, 373-584, লাইপযিগ ১৯২৯ খৃ.; (১৫) E. Kuhnel, Miniatur-malerei im islamischen Orient, বার্লিন ১৯২৩ খৃ.; (১৬) E. Martin, The miniature Painting and Painter of Persia, India and Turkey from the VIII to XVIII Century, লণ্ডন ১৯১২ খৃ.; (১৭) L. A. Mayer, Annual Bibliography of Islam. Art and Archaeology, ৩খ., ১৯৩৫-১৯৩৭ খৃ.; (১৮) A Survey of Persian Art, published by A. V. Pope and Ph. Ackerman, অক্সফোর্ড ১৯৩৮ খৃ.; (১৯) A. Sakisian, La Miniature Persane du XII au XVII Siecle, প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (২০) Ph. W. Schulz, Die Persisch-Islamische Miniatur Malerei, লাইপযিগ ১৯১৪ খৃ.; (২১) L. Hauteooeur et G. Wiet, Les Mosquees Caire, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ১৬৩-১৮৩।

যাকী মুহাম্মাদ হাসান (দা. মা. ই.)/মু. মাযজারুল হক

চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ বিষয়ে ইসলামের বিধান

এই স্থানে আমরা চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ সম্বন্ধে ইসলামের বিধান বর্ণনা করিতে চাই। অধিকাংশ লেখক বিশেষত পাশ্চাত্য লেখকগণের নিকট বিখ্যাত এই যে, "ইসলামে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম হইবার বিধান কুরআন মাজীদে উল্লেখিত রহিয়াছে।' কিন্তু তাহাদের উক্ত ধারণা সঠিক নহে; কারণ প্রকৃতপক্ষে কুরআন মাজীদে এইরূপ কোনও আয়াত নাই, যাহা দ্বারা প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করা অথবা মূর্তি নির্মাণ করাকে হারাম করা হইয়াছে। যে আয়াত দ্বারা ভ্রান্তিবশত সাধারণত উক্ত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, উহার অর্থ এই ঃ "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি (الانصاب) এবং (জুয়ার) তীর অপবিত্র, শয়তানের কার্য বৈ কিছু নহে। অতএব তোমরা উহা হইতে দূরে থাক। উহাতে আশা করা যায়, তোমরা কামিয়াবী লাভ করিবে" (৫ ঃ ৯০)। কিন্তু তাফসীরকারগণ আয়াতে উল্লিখিত "আল-আনসাব" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ মূর্তিসমূহ বা প্রস্তরসমূহরূপে–যাহাদিগকে আরবগণ পূজা করিত অথবা যাহাদের উদ্দেশ্যে তাহারা কুরবানী করিত।

এতদসত্ত্বেও অধিকতর গ্রহণীয় অভিমত এই যে, কুরআন মাজীদের যেই সকল আয়াতে প্রতিকৃতি সৃষ্টি করাকে আল্লাহ্ তা'আলার কার্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইসলামে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম হইবার বিষয়টি সেই সকল আয়াতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তিনি হইতেছেন সেই সত্তা, যিনি জরায়ুতে তোমাদিগকে যেইরূপ চাহেন সেইরূপ আকৃতি-প্রতিকৃতি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোনও ইলাহ নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান" (৩ ঃ ৬)। তিনি আরও বলেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, আরও তোমাদিগকে আকৃতি প্রদান করিয়াছি, আরও আমি ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলাম, আদমকে সিজ্‌দা কর। উহাতে ইব্‌লীস ব্যতীত সকলেই সিজ্‌দা করিল। সে সিজ্‌দাকারীদের দলভুক্ত হইল না" (৭ ঃ ১১)। তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ্ হইতেছেন সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী বানাইয়াছেন, আকাশকে ছাদ বানাইয়াছেন, তোমাদিগকে আকৃতি প্রদান করিয়াছেন আর তিনি তোমাদিগকে কত সুন্দর আকৃতিই না প্রদান করিয়াছেন! এবং তিনি তোমাদিগকে পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে রিযিক প্রদান করিয়াছেন। সেই আল্লাহ্-ই তোমাদের প্রতিপালক প্রভু। অতএব জগৎসমূহের প্রতিপালক প্রভু আল্লাহ্ কতই না পবিত্র ও বরকতময়" (৪০ ঃ ৬৪)। তিনি আরও বলেন, "তিনি আল্লাহ্ সৃষ্টিকর্তা, পবিত্র, আকৃতিদাতা। তাঁহার সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। আকাশ ও পৃথিবীর সকল বস্তুই তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান" (৫৯ ঃ ২৪)। তিনি আরও বলেন, "তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগকে আকৃতি প্রদান করিয়াছেন আর তিনি কত সুন্দর আকৃতিই না প্রদান করিয়াছেন! আর তাঁহারই নিকট তো প্রত্যাবর্তন" (৬৪ ঃ ৩)।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে যেহেতু এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা এবং আকৃতিদাতা, তাই তাঁহার সৃজনক্রিয়া ও আকৃতি প্রদানক্রিয়া অনুকরণ হইতে দূরে থাকিবার ধারণাকে আমরা কোনক্রমে উপেক্ষা করিতে পারি না। উক্তরূপ ধারণা-ই ইমাম বুখারী (কিতাবু'ল-লিবাস, কিতাবু'ত-তাওহীদ, কিতাবু'ল-বুয়ূ' ও কিতাবু'ল-আদাব), ইমাম মুসলিম (কিতাবু'ল- লিবাসি ওয়া'ল-যীনাত), ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বাল প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক বর্ণিত কতকগুলি হাদীছ হইতে সুস্পষ্টভাবে লাভ করা যায়। নিম্নে কয়েকটি হাদীছের অনুবাদ প্রদত্ত হইতেছে ঃ "যাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃজনক্রিয়ার অনুকরণ করে, কিয়ামতের দিনে তাহারাই সর্বাধিক কঠিন শাস্তি ভোগ করিবে।" "যদি কোনও ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনও চিত্র অংকন বা মূর্তি নির্মাণ করে, তবে কিয়ামতের দিনে উহাতে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্য তাহাকে বাধ্য করা হইবে; অথচ সে উহাতে প্রাণ সঞ্চার করিতে সক্ষম হইবে না।" "উক্ত চিত্র ও মূর্তিসমূহের নির্মাণকারিগণ কিয়ামতের দিনে শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। সেই দিন তাহাদিগকে বলা হইবে, "তোমরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ উহাতে প্রাণ সঞ্চার কর।" কুদ্‌সী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, "আল্লাহ তা'আলা বলেন, যেই ব্যক্তি আমার ন্যায় সৃষ্টি করে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর জালেম (পাপী) কে হইতে পারে? তুমি একটি অণু সৃষ্টি কর তো! তুমি একটি শস্যকণা সৃষ্টি কর তো!! তুমি একটি যব সৃষ্টি করো তো!!!" "যে গৃহে কুকুর অথবা ছবি থাকে, সে গৃহে ফেরেশ্‌তা আসে না।"

উপরোক্ত রূপে আমরা দেখিতে পাই যে, পবিত্র হাদীছে চিত্রাকংন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম ঘোষিত হইয়াছে; কিন্তু ফকীহ্‌গণ এতদ্‌সম্পর্কিত হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা লইয়া মতভেদ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যকার মতভেদের ভিত্তিতে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, চিত্রাংকন অথবা মূর্তি নির্মাণ সর্বাবস্থায় হারাম নহে। পবিত্র হাদীছে উহার নিন্দায় যাহা কিছু বলা হইয়াছে, উহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকদিগকে মূর্তি পূজায় ফিরিয়া যাওয়া হইতে বিরত রাখা। ইমাম নাওয়াবী তাঁহার মুসলিম

শারীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে (দিল্লীতে মুদ্রিত, ২খ., পৃ. ১৯৯) ফকীহ্‌গণের পূর্বোক্ত মতভেদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।" "প্রাণীর চিত্র অংকন অথবা মূর্তি নির্মাণ হারাম হওয়া, বিছানা ইত্যাদিতে তাচ্ছিল্য-বর্জিত অবস্থায় চিত্রাংকন অথবা মূর্তি নির্মাণ হারাম হওয়া এবং যে গৃহে ছবি অথবা কুকুর থাকে, সে গৃহে ফেরেশতাগণ আসেন না"–এই শিরোনামের পরিচ্ছেদে তিনি বলেন "আমাদের মায্‌হাব (শাফি'ঈ মায্‌হাব)-এর ফকীহ্‌গণ ও অন্যান্য ফকীহ্‌ বলেন যে, প্রাণীর চিত্র অংকন অথবা মূর্তি নির্মাণ করা হারাম এবং উহা কাবীরা গুনাহ্‌; কারণ পবিত্র হাদীছে এতদ্বিষয়ে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। ছবি অংকন অথবা মূর্তি নির্মাণ করিয়া উহাকে অবমাননাকর স্থানে রাখা হউক অথবা অবমাননাহীন স্থানে রাখা হউক, উহা নির্মাণ করা সর্বাবস্থায় হারাম; কারণ উহা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃজনকার্যের অনুকরণ করা হয়। উহা পরিধেয় বস্ত্রে থাকুক, বিছানায় থাকুক, দিরহাম-দীনার ইত্যাদি মুদ্রায় থাকুক, পানাহার পাত্রে থাকুক, প্রাচীরে থাকুক অথবা অন্য কোথাও থাকুক, উহা সর্বাবস্থায় হারাম। অবশ্য বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি অপ্রাণী বস্তুসমূহের চিত্র অংকন অথবা আকৃতি নির্মাণ করা হারাম নহে।

উপরে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ কার্য বিষয়ক বিধান বর্ণিত হইল। এখন ছবির ব্যবহার বিষয়ক বিধান বর্ণিত হইতেছে। 'যদি প্রাণীর ছবি প্রাচীরে লটকানো থাকে অথবা পরিধেয় বস্ত্র, পাগড়ী ইত্যাদি এইরূপ বস্তুতে লাগান থাকে, যেইখানে উহার অবমাননা হয় না, তবে ছবির ব্যবহার হারাম হইবে। পক্ষান্তরে যদি উহা বিছানায়, যাহা পদদলিত হয় অথবা ছোট-বড় বালিশ বা গদিতে, যেখানে উহার অবমাননা করা হয়, লাগান থাকে, তবে ছবির ব্যবহার হারাম হইবে না। ছবির বস্তুটি ছায়াযুক্ত হউক অথবা না হউক, তাহাতে উপরোল্লিখিত বিধানে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিবে না। উপরের বর্ণনা ছবি সম্পর্কিত মাস্‌আলার বিষয়ে আমাদের মায্‌হাব (শাফি'ঈ মায্‌হাব)-এর সারসংক্ষেপ বটে। অধিকাংশ ফকীহ, সাহাবী, তাবি'ঈ, পরবর্তী ফকীহ্‌গণ, সুফয়ান ছাওরী, ইমাম মালিক, আবূ হানীফা প্রমুখ ব্যক্তিও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

পূর্বযুগীয় কোনও কোনও ফকীহ্‌ বলেন, "যেই সকল প্রাণীর চিত্র ছায়াযুক্ত পর্দায় আছে, শুধু সেই সকল প্রাণীর চিত্র অংকন অথবা মূর্তি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ; কিন্তু যেই সকল প্রাণীর চিত্র ছায়াযুক্ত পর্দায় নাই, উহার চিত্র অংকন অথবা মূর্তি নির্মাণে কোনরূপ বাধা নাই।" উক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ যে পর্দাটিতে অংকিত ছবির প্রতি রাসূলুল্লাহ (স) অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কে দাবি করিতে পারে যে, এতদ্বারা উহার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপিত হয় নাই? অথচ উহার উপর অংকিত ছবি ছিল সম্মুখে লটকানো পর্দায় প্রাণীর ছবি। এতদ্ব্যতীত ছবি সম্পর্কিত যেই সকল প্রাণীবিশেষের উল্লেখবিহীন সাধারণ ও ব্যাপকার্থক হাদীছ রহিয়াছে, সেই সকল হাদীছ তো পূর্বোক্ত হাদীছের অতিরিক্ত হাদীছ বটে। ইমাম যুহ্‌রী বলেন, 'ছবি তোলা ও ছবির ব্যবহার সর্বাবস্থায় হারাম। এইরূপে যেই বস্তুর উপর ছবি অংকিত থাকে, উহার ব্যবহার এবং যেই ঘরে উহা লটকানো থাকে, তাহাতে প্রবেশ করাও হারাম। ছবি কোনও বস্ত্রে মুদ্রিত হউক অথবা অন্য কোনও পদ্ধতিতে অংকিত বা চিত্রিত হউক, উহা প্রাচীরগাত্রে, বস্ত্রে অথবা বিছানায় অংকিত বা মুদ্রিত থাকুক, যে অবস্থায় উহা ব্যবহৃত হয়, তাহাতে উহার অবমাননা করা হউক বা না হউক, বিভিন্ন হাদীছের বিশেষত মুসলিম শারীফের কিতাবু'ল-লিবাস ওয়া'ল-যীনাত-এ বর্ণিত বালিশ বা তোষকের ছবি বিষয়ক বিখ্যাত হাদীছের বাহ্য অর্থ অনুযায়ী সর্বাবস্থায় উহার ব্যবহার হারাম। ইমাম যুহ্‌রী-র উক্ত অভিমতই শক্তিশালী বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ বলেন, "যেই ছবি বস্ত্রের উপর মুদ্রিত থাকে–উহা অবমাননাকর অবস্থায় ব্যবহৃত হউক অথবা অমাননাহীন অবস্থায় ব্যবহৃত হউক–একমাত্র উহার ব্যবহার-ই জাইয হইবে।" যেই সকল প্রাণী ছায়াযুক্ত পর্দায় আছে, উহাদের ছবিকে এবং প্রাচীরগাত্রে কিংবা অন্য কোনও বস্তুর উপর অংকিত, মুদ্রিত অথবা উৎকীর্ণ ছবির ব্যবহারকে উক্ত অভিমতের অনুসারিগণ মাক্‌রূহ্‌ বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহারা নিম্নোক্ত হাদীছকে তাঁহাদের অভিমতের সপক্ষে উপস্থাপিত করেন ঃ '.....কিন্তু কোনও বস্ত্রের উপর মুদ্রিত ছবি হারাম নহে।" ইমাম কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ উক্ত অভিমত পোষণ করেন। ফকীহ্‌গণ সর্বসম্মতরূপে এই অভিমত পোষণ করেন যে, "যেই সকল প্রাণীর ছায়া রহিয়াছে, উহাদের ছবি বানান হারাম এবং কোথাও এইরূপ ছবি থাকিলে উহাকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া ওয়াজিব।" কাদী 'ইয়াদ বলেন, "....কিন্তু ছোট বালিকাদের বস্ত্রনির্মিত ক্ষুদ্র পুতুল লইয়া খেলা করা জাইয–এই হাদীছের ভিত্তিতে বালিকাদের খেলনা হিসাবে বস্ত্র নির্মিত ক্ষুদ্র পুতুল নির্মাণ হারাম নহে।' কিন্তু ইমাম মালিকের মতে বালিকাদের জন্য খেলিবার পুতুল ক্রয় করা মাকরূহ্‌। কেহ কেহ বলেন, বালিকাদের জন্য পুতুল খেলা জাইয হইবার বিধান অন্যান্য হাদীছ দ্বারা রহিত করা হইয়াছে।

অনুমিত হয় যে, হি. চতুর্থ শতাব্দীর অধিকাংশ ফকীহের মতে শুধু পৌত্তলিকদের পূজার মূর্তির ন্যায় মূর্তি নির্মাণ করা হারাম বলিয়া বিবেচিত ছিল এবং উক্তরূপ মূর্তি ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিত্র অংকন বা মূর্তি নির্মাণ আল্লাহ্‌র গযব ও মুসলমানদের নিকট হইতে শাস্তি পাইবার মতো অপরাধমূলক কার্য বলিয়া বিবেচিত ছিল না। তাঁহারা যে উক্তরূপ অভিমত পোষণ করিতেন উহার সমর্থনে ব্যাকরণ শাস্ত্রবিদ আবূ 'আলী আল-ফারিসী (মৃ. ৩৭৭/৯৮৭) কর্তৃক রচিত আল-হুজ্জাতু 'আলাল-কিরাআত নামীয় গ্রন্থের একখানা হস্তলিখিত অনুলিপি হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি উপস্থাপন করা হইয়া থাকেঃ "যে ব্যক্তি গো-বৎসের মূর্তি নির্মাণ করিবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র গযব ও মুসলমানদের নিকট হইতে শাস্তি লাভের যোগ্য হইবে না।.....যদি কেহ বলে যে, "পবিত্র হাদীছে তো বর্ণিত হইয়াছে যে, "কিয়ামতের দিন চিত্রকর ও মূর্তি নির্মাণকারীদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইবে" এবং অন্য এক হাদীছে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের কথা বর্ণিত হইবার পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা যাহা নির্মাণ করিয়াছ উহাতে প্রাণ সঞ্চার কর", তবে উহার উত্তরে এই বলা যাইবে যে, "মূর্তি নির্মাণকারীদিগকে কিয়ামতের দিনে শাস্তি প্রদান করা হইবে"। পবিত্র হাদীছের এই সতর্কীকরণ বাণীর "মূর্তি নির্মাণকারীগণ" শব্দ দ্বারা এইরূপ মূর্তি নির্মাণকারীদিগকে বুঝান হইয়াছে, যাহারা আল্লাহ্‌ তা'আলার জড় মূর্তি নির্মাণ করে। এতদ্ব্যতীত সতর্কীকরণমূলক মূর্তি নির্মাণ বিষয়ক অন্যান্য হাদীছ খাবরে ওয়াহিদ। আর খাবরে ওয়াহিদ-এর উপর আমল করা যরূরীও নহে এবং উহা ইজ্‌মা' দ্বারা লব্ধ বিধানকে প্রভাবিতও করিতে পারে না। (যেই হাদীছের সনদের প্রত্যেক স্তরে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী রহিয়াছে, তাহাকে খাবরে মুতাওয়াতির বলা হয়। খাবরে মুতাওয়াতির ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের হাদীছকেই খাবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) বলা হয়।) (দ্র. ঃ বিশ্‌র ফারিস সির্‌রু'য-যুখরুফাতি'ল-ইস্‌লামিয়্যা, পৃ. ৩১-৩৩)।

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক মনে করেন যে, শী'আ সম্প্রদায়ের মতে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম নহে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে, চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ সম্পর্কিত যেই সকল হাদীছ রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল হাদীছ শী'আ সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলীতেও

উল্লিখিত রহিয়াছে (দ্র. ঃ Th. Arnold, Painting in Islam, পৃ. ১১-১৩; আরও দ্র. Ph. Walter Schulz, Die Persisch-Islamische Miniaturmalerie, পৃ. ২; উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত লেখক টমাস আর্‌নল্ডের পূর্বে বলিয়াছেন যে, শী'আ ও সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের মতে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ মাক্‌রূহ্‌)। আরও দেখুন যাকী মুহাম্মাদ হাসান কর্তৃক রচিত এবং দা. মা. ই.-এর পরিশিষ্টে প্রকাশি তাস্‌বীর নিবন্ধ।

কিন্তু একদল প্রাচ্যবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং একদল বিশেষজ্ঞ মুস্‌লিম ফকীহ্‌ মনে করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণকে অপসন্দও করেন নাই এবং উহা করিতে নিষেধও করেন নাই। চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ অপসন্দীয় ও নিষিদ্ধ হইবার ধারণা হি. দ্বিতীয়/খৃ. অষ্টম শতাব্দীর ফকীহ্‌গণের মধ্যে জন্মলাভ করে। এতদ্‌সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞামূলক ও সতর্কীকরণমূলক যেই সকল হাদীছ রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহাদের সমুদয়ই জাল ও মিথ্যা হাদীছ। যেই যুগে আলোচ্য হাদীছসমূহকে সংগ্রহ ও সংকলন করা হইয়াছিল, উক্ত ধারণাকে সেই যুগের অধিকাংশ ফাকীহের অভিমত মনে করা উচিত (H. Lammens, L'Attitude de L'Isalm primitif en face des arts figures, published in Journal Asiatique, September-October, ১৯১৫ খৃ., পৃ. ২৩৯-২৭৯; এতদ্ব্যতীত দেখুন A. Creswell, Early Muslim Architecture, ১খ., পৃ. ২৬৯-২৭১)। কিন্তু আমরা উক্ত অভিমতের সহিত একমাত নহি (দ্র. Zaky M. Hassen, The Attitude of Isalm Towards Painting, Published in Bulletin of the Faculty of Arts Found I University, ৭খ., জুলাই ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১-১৩)।

আমাদের মতে গ্রহণযোগ্য অভিমত এই যে, চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ কার্যের অপসন্দনীয় ও নিষিদ্ধ হইবার বিধানটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেই বর্তমান ছিল এবং উহা তখন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বস্তুত উক্ত বিধান মূর্তি পূজা ও আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃজন কার্যের অনুকরণের আশঙ্কার উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত বিধানের এতদ্ব্যতীত আরেকটি কারণ ছিল এই যে, সেই যুগে বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা অপসন্দনীয় ছিল, কারণ লোকদের জীবন তৎকালে আয়াস, পরিশ্রম ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অতিবাহিত হইত। অবশ্য আমরা মনে করি না যে, "নিষিদ্ধকরণের উক্ত বিধানকে সকল যুগের ও সকল জাতির লোকদের জন্য ব্যাপক করিয়া দেওয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশ্য ছিল।" চিত্রাঙ্কন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা রূর্ণনায় ফকীহগণের মধ্যে এইরূপ তীব্র মতভেদ রহিয়াছে যে, বর্তমান যুগের কোনও কোনও মুসলিম চিন্তাবিদ, যেমন মুফ্‌তী শায়্‌খ মুহাম্মাদ 'আবদুহু এবং শায়্‌খ 'আবদুল-'আযীয শাবীশ–পর্যন্ত চিত্রাঙ্কন ও মূর্তি নির্মাণকে জাইয বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিকৃতি (Statue) নির্মাণ এবং স্থাপনকেও জাইয মনে করেন। তবে তজ্জন্য শর্ত এই যে, উহাকে আল্লাহ্‌র ন্যায় পূজা ও সম্মান করা হইবে না (দ্র. সায়্যিদ মুহাম্মাদ রাশীদ রিদা, তা'রীখু'ল-উস্‌তায আল-ইমাম আশ-শায়্‌খ মুহাম্মাদ 'আবদুহু, ২খ., পৃ. ৪৯৯-৫১; আরও দ্র. চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ বিষয়ে প্রদত্ত ইসলামী বিধান বর্ণনায় উস্‌তায শায়্‌খ 'আবদু'ল-আযীয শাবীশ কর্তৃক রচিত নিবন্ধ, হিদায়া' সাময়িকী, মিসর ৩য় বর্ষ, পৃ. ৪৮৭-৪৯১)। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ক্যামেরায় ছবি তোলা ও মূর্তি নির্মাণ বিষয়ে বর্তমান যুগে মুসলিম বিশ্বে যে মতভেদ বর্তমান রহিয়াছে, উপরোক্ত অভিমতসমূহ উহার নিশ্চিত নিরসন ঘটাইতে পারে।

তবে মিসরীয় আলিমগণের অভিমত সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। তথাকার কোন কোন আলিম এমনকি বর্তমান কালে ব্যাংকে প্রচলিত সূদকে বৈধ বলিয়াছেন, যাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোন কোন আধুনিকতাপন্থী মুসলিম পণ্ডিত মনে করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে তাস্‌বীর হারাম হইবার বিষয়টি এতদ্‌সম্পর্কিত য়াহূদী ধর্মের বিধান দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল (কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'কুরআন বাইবেল অনুকরণেই রচিত হইয়াছে' বলিয়া যে ভিত্তিহীন বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ একটি অভিমত)। উল্লেখ্য যে, য়াহূদী ধর্মের তাস্‌বীর হারাম। এতদ্ব্যতীত য়াহূদী জাতি তাহাদের 'দশটি ওসিয়াত-এর মধ্য হইতে দ্বিতীয় ওসিয়াত (দ্র. যাত্রাপুস্তক, ২০ অধ্যায়, ৩-৫ শ্লোক))-এর যে ব্যাখ্যা প্রদান করে, তাস্‌বীর বিষয়ক ইসলামী বিধান উহা দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া তাহারা ধারণা করেন। বস্তুত এইরূপ ঘটা বিচিত্র নহে যে, তাস্‌বীরকে য়াহূদীদের হারাম মনে করা রাসূল (স)-এর নিকট মনঃপুত ও পসন্দনীয় বিবেচিত হইয়াছিল; কারা তাহাদের উক্ত বিধানের ফলে জনসাধারণ মূর্তি পূজা হইতে দূরে রহিয়াছে। বস্তুত যাত্রাপুস্তকে তাসবীর হারাম হইবার যেই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, লোকেরা মূর্তি নির্মাণ করিয়া উহাকে পূজা করিতে পারিবে না।

মূর্তি নির্মাণকে কেন্দ্র করিয়া মূর্তিপূজার প্রচলন হইবার যে আশঙ্কা করা হয় তাহা মোটেও অমূলক নয়। কোন কোন মুসলিম দেশে লক্ষ করা যায় যে, স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে স্থাপিত মূর্তির গলায় ও বেদিতে আজকাল পুষ্পমাল্য দেয়া হয়, পবিত্রতাজ্ঞানে নগ্নপদে বেদিতে দণ্ডায়মান হয়, ইহাই যে এক পর্যায়ে মূর্তিপূজায় পরিণত হইবে না তাহা কে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে?

তবে মুশকিল এই যে, যাহারা বলেন যে, "ইসলামে তাস্‌বীর নিষিদ্ধ হইবার বিধান আসিয়াছে ইতিপূর্বে বিদ্যমান মূর্তি ভাঙ্গা আন্দোলনের প্রভাবে" (দ্র. C. H. Becker, Christliche polemik und islamische dogmenbilung, published in Zeilschrift fur Assyrilogie Festschrift Goldziher, xxvi. ১৯১১ খৃ., পৃ. ১৯১; L. Hautecoeur এবং G. Wiet, Le Mosquees du Cairo, পৃ. ১৭৪-১৭৫), আমরা তাঁহাদের অভিমতে এই কারণে একমত ও সন্তুষ্ট হইতে পারি না যে, খৃষ্ট ধর্মে যাহারা তাস্‌বীর ও মূর্তির শত্রু, তাঁহারা গির্জা ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মূর্তিকে, বিশেষত হযরত ঈসা ('আ) ও খৃষ্টান সাধু পুরুষগণের মূর্তিকে ব্যবহার করা হারাম মনে করিলেও অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তির মূর্তি নির্মাণ অথবা শিল্পগত প্রয়োজনে চিত্রাংকন কিংবা মূর্তি নির্মাণকে হারাম মনে করেন না (দ্র. Ch. Diehl, Manuel D'Art Byzantine, ১খ, পৃ. ৩৬৫)। কেহ কেহ আবার বলেন, খৃষ্টানদের মধ্যে মূর্তি ভাঙ্গিবার ধারণা স্বয়ং ইসলামী শিক্ষার প্রভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে (দ্র. Miehel le Syrien, Chronique, ২খ., পৃ. ৪৯১; Ph. Hitti, History of the Arabs, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৩০০)।

মনে রাখা দরকার যে, ইসলামে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম হইবার বিধান মুসলমানদের মধ্যে চিত্রকলা ও মূর্তি নির্মাণ শিল্পের চর্চাকে

সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেয় নাই। তাহারা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ হইতেই ইমারতসমূহের প্রাচীরগাত্রে প্রাণীর চিত্র অংকিত করিয়া আসিয়াছে। কুসায়র 'আমরা এবং সামাররা প্রভৃতি ইমারতে তাহাদের উক্ত শিল্পচর্চার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়। চিত্রকল্প ও মূর্তিনির্মাণ শিল্প বিশেষত ইরানী ও ভারতবর্ষীয়দের হস্তে বিকাশ লাভ করিয়াছে। অবশ্য চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম হইবার কারণে মুসলমানগণ উক্ত শিল্পকে তাহাদের ধর্মীয় জীবনের কোনও অংশ হিসাবে মর্যাদা প্রদান করেন নাই। উক্ত কারণেই তাহারা কুরআন মাজীদে কোনরূপ প্রাণীর চিত্র অংকন করেন নাই এবং তাহারা ধর্মীয় ইমারতসমূহকে, যেমন মসজিদ ও মাযারসমূহকে চিত্রাদি হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। উক্ত রীতির ব্যতিক্রমমূলক উদাহরণ একেবারেই বিরল (দ্র. যাকী মুহাম্মাদ হাসান, আস-সুওয়ারু ওয়া'ন-নুকূশ ওয়া'ত-তামাছীলু ফি'ল-আদরিহাতি ওয়াল-মাসাজিদ, ছাকাফা সাময়িকীতে প্রকাশিত, কায়রো, ৯০ সংখ্যা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ খৃ.; Y. Godard, L'Imamzade Zaid d' Isfahan, Un Edfice Decore de paintures Religieuses Musulmanes, 'আছার-ই ঈরান' সাময়িকীতে প্রকাশিত, ২খ., ২য় (?) সংখ্যা, পৃ. ৩৪১-৩৪৮)। উহার বিপরীতে মুসলমানগণ প্রাণীর চিত্র অংকন ও মূর্তি নির্মাণ বহির্ভূত বিভিন্নরূপ সজ্জামূলক কারুশিল্পে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্থাপত্য শিল্প, ইমরাতাদির সুসজ্জিতকরণ এবং মূল্যবান ও সৌখিন দ্রব্যাদির উপর বৃক্ষাদি ও জ্যামিতিক নক্‌শাবলী অংকন করিবার শিল্পে মুসলমানগণ তাহাদের যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুশলী ছিলেন। তাহাদের অদক্ষতা ও অক্ষমতা শুধুমাত্র মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাহারা মূর্তি নির্মাণ ও অনুরূপ শিল্পসমূহের প্রতি মনোযোগই প্রদান করেন নাই। তবে চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম হইবার বিধান–লিপিবিদ্যা, বিভিন্ন বস্তুকে সোনালী রং-এ রঞ্জিতকরণ বিদ্যা এবং মূল্যবান হস্তলিখিত গ্রন্থাবলীর অনুলিপিসমূহ প্রস্তুতকরণের সহায়ক যাবতীয় শিল্পের উৎকর্ষ ও মর্যাদাকে অনেক উন্নত করিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে, চিত্রাংকন ও মূর্তি নির্মাণ হারাম হইবার কারণে ইসলামে চিত্রকলা ও মূর্তি নির্মাণ শিল্প নিশ্চল ও স্থবির রহিয়া গিয়াছে এবং উক্ত শিল্পদ্বয় পাশ্চাত্য দেশসমূহে যেইভাবে বিশেষত রেনেসাঁ পরবর্তী যুগে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, সেইরূপে মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাকী মুহাম্মাদ হাসান, আত-তাস্‌বীরু ফি'ল-ইসলামী 'ইন্‌দা'ল-ফুর্‌স্‌, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১৮-২৩; (২) ঐ লেখক, আল-ফুনূন'ল-ঈরানিয়্যাতু ফি'ল-'আস্‌রি'ল-ইসলামী, কায়রো ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৭৪-৮৩; (৩) ঐ লেখক, ফুনু'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৬৩-১৬৮; (৪) আহমাদ তায়মূর পাশা, আত-তাস্‌বীরু 'ইন্‌দা'ল-আরাব গ্রন্থে যাকী মুহাম্মাদ হাসান কর্তৃক লিখিত টীকাসমূহ, কায়রো ১৯৪২ খৃ., পৃ. ১১৯-১৩৯; (৫) বিশ্‌র ফারিস, সির্‌রু'য যুখ্‌রুফাতি'ল-ইস্‌লামিয়্যা, কায়রোতে অবস্থিত আল-মা'হাদু'ল ফিরান্‌সিয়্যু লি'ল-আছারি'শ-শার্‌কিয়্যা কর্তৃক মুদ্রিত, কায়রো ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৩১-৩৩; (৬) Th. Arnold, Painting in Islam, অক্সফোর্ড ১৯২৮ খৃ.; (৭) Th. Arnold, The Influence of Poetry and Theology on Painting, Published in A Survey of Persian Art, অক্সফোর্ড ১৯৩৯ খৃ., ৩খ., পৃ. ১৯০৭-১৯১০; (৮) Zaky M. Hassan, The Attitude of Islam Towards Painting, Published in Bulletin of Faculty of Arts' Fouad I Universtiy, ৭ জুলাই, ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১-১৫; (৯) K. A. Creswell, Early Muslim Architecture, ১খ., পৃ. ২৬৯-২৭১, অক্সফোর্ড ১৯৩২ খৃ.; (১০) K. A. Creswell, The Lawfulness of Painting in Early Islam, Published in Ars Islamica', ১১-১২ সংখ্যা (?), ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১৫৯-১৬০; (১১) K. A. Creswell, A Bibliography of Painting in Islam, Publication de l'Institut Francais d' Archeologie Orientale du Caire, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৮-৯; (১২) মুহাম্মাদ জা'ফার ফুলওয়ারুবী, ইসলাম আওর মুসাওবিরী, ছাকাফাত সাময়িকীতে প্রকাশিত, লাহোর, মার্চ ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৩-২৮।

যাকী মুহাম্মাদ হাসান (দা. মা. ই.)/মু. মাজ্‌হারুল হক

তাসবীহ (تسبيح) ঃ শব্দটি س-ب-ح ধাতু হইতে নির্গত। অর্থ সুবহানাল্লাহ (দ্র.) বলা।

তাস্‌ম (طسم) ঃ ইব্‌ন লূয্‌ ইব্‌ন সালাম ইব্‌ন নূহ, প্রাগৈতিহাসিক কালের আরবদের একটি কিংবদন্তীর গোত্র। জাদীস (جديس) গোত্রের সহিত তাস্‌ম গোত্রের সম্পর্ক ছিল বংশধারা, বাসস্থান (আল-য়ামামা), জীবনধারা (কৃষি ও পশু প্রজনন) এবং ইতিহাসের দিক হইতে ঘনিষ্ঠতা [দ্র. জাদীস], সুতরাং উভয় গোত্রের নাম একত্রে করা হয়, সর্বদা (জাদীস ইব্‌ন হাছির ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ)। আরবী সাহিত্যে এই উভয় ভ্রাতৃগোত্রের পতনের কারণ প্রায়শ যেইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে উহার প্রধান রূপরেখা এইরূপঃ এক সময়ে উহারা 'আম্‌লীক (বা 'আম্‌লূক) নামক একজন তাস্‌ম গোত্রীয় জালেম শাসকের অধীনে ছিল। হুমায়্‌লা নাম্নী জনৈক জাদীসী রমণীর বিবাহঘটিত আবেদনের প্রেক্ষিতে 'আম্‌লীক খামখেয়ালী রায় দেয়। মহিলার প্রতিবাদে 'আম্‌লীক ক্রুদ্ধ হইয়া দাবি করে যে, সকল জাদীস গোত্রীয় কনের সহিত সর্বপ্রথম রাত্রি যাপনে তাঁহার অধিকার।

চল্লিশ (!) বৎসর যাবৎ এই অত্যাচার চালাইবার পর 'আফীরা বিন্‌ত 'ইফার নাম্নী জনৈক উচ্চ বংশীয়া নারী একইভাবে নিগৃহীত হইবার পর সে তাহার গোত্রীয়গণকে প্রতিশোধ গ্রহণ এবং বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে। এই নারীর ভ্রাতা আল-আস্‌ওয়াদ অবশ্য কূট-পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং ভগ্নীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। ভগ্নির বিবাহ উপলক্ষে তিনি 'আম্‌লীক এবং তাঁহার গোত্রীয় লোকদিগকে দাওয়াত করিয়া আনেন। ভোজের সময়ে জাদীসগণ, ইতিপূর্বে বালুতে লুক্কাইত অস্ত্রধারণ করিয়া তাস্‌মগণকে আক্রমণ এবং তাহাদিগকে হত্যা করে।

মাত্র একজন, নাম রিয়াহ্‌ ইব্‌ন মুর, পলাইয়া হিম্‌য়ার বংশীয় শাসক হাস্‌সান ইব্‌ন তুব্বা'-র সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাঁহাকে জাদীসগণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক অভিযান করিতে উদ্বুদ্ধ করে। হাস্‌সানের সেনাবাহিনী যখন জাদীসগণের বাসস্থান জাউ-এর তিন দিনের দূরত্বে আসিয়া পৌছায় তখন রিয়াহ্‌ ইব্‌ন মুর এই পরামর্শ দেন যে, প্রত্যেক অশ্বারোহী যেন গাছের ডাল কাটিয়া পত্র-পল্লবে নিজকে

আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, কারণ জাদীস গোত্রে য়ামামা (বা যারকা) নাম্নী একজন জ্ঞানী নারী ছিল, যে তিন দিনের দূরত্বের মধ্যে যে কোন আগন্তুককে দেখিতে পাইত। এই দূরদৃষ্টিবলে য়ামামা পত্রাচ্ছাদিত অভিযাত্রী শত্রুসৈন্যদেরকে দেখিতে পাইয়া নিজ গোত্রীয়গণকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দেয়, কিন্তু উহারা তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ফলে শত্রুগণ অতর্কিত আক্রমণে সকল পুরুষকে হত্যা করে এবং য়ামামা সমেত সকল নারীকে বন্দী করে। হাসসান য়ামামার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া জাউয়ের সদর দরজাতে তাহার মৃতদেহ শূলিবিদ্ধ করে; তখন হইতে স্থানটির নাম হয় য়ামামা।

এই হইল কিংবদন্তী। অনেকাংশে ইহা পৌরাণিক কাহিনী, কিন্তু একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত অংশত সম্পৃক্ত হইতে পারে (দ্র. নিবন্ধ জাদীস)। এই কিংবদন্তীর খণ্ডাংশসমূহ প্রাচীন কবিতার উৎসের মধ্যে রক্ষিত হইয়া লোকগীতিরূপে গীত হইয়া থাকে; এইগুলি সম্ভবত লোকগীতিতে গাঁথা জনশ্রুতিমূলক কাব্যের বর্তমান অবশিষ্ট রূপ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাবারী, ১খ, পৃ. ৭৭১ প. ; (২) কিতাবু'ল-আগানী, ১০খ, পৃ. ৪৮ প.; (৩) হিম্য়ার কাসীদা-র নাশওয়ানকৃত টীকা, সেইখান হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন D. H. Muller, Sudarab. Studien, পৃ. ৬৭ প.; এতদ্ব্যতীত (৪) 'আ'শা মায়মূন-এর ১৩ সংখ্যক কবিতার ১৭ সংখ্যক পদের টীকাতে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে, সম্পা. R. Geyer; (৫) ঐ (পৃ. ৭৪, টীকা ১২), সেইখানে তাস্ম জাদীসগণের কাহিনীতে 'আরবী উৎস গ্রন্থাবলীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা রহিয়াছে।

H. H. Brau/(E.I.[1]) হুমায়ুন খান

তাসমিয়া (দ্র বাসমালা)

আত-তাসয়ীর (التسيير) ঃ (পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহে আতাযির, আতাচির, আতহাচির, Directio, Prorogatio, Theorie aphetique) হইল জ্যোতিষশাস্ত্রে যাহার ব্যবহার করা হয়, ভবিষ্যতে ঘটিতব্য শুভ অথবা অশুভ কোন ঘটনার সময় সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া বা ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য।

এই পদ্ধতি দ্বারা নির্ণীত জ্যোতিষশাস্ত্রীয় মাত্রা (magnitude) প্রাচীন কালের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এবং একইভাবে আরব ও পাশ্চাত্য অঞ্চলের জনগণের মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে তাঁহারা নির্ণয় করিতেন শুভ-অশুভ দিন, যথা বিবাহের জন্য, সফরে যাত্রার জন্য, রাজত্ব শুরুর জন্য, কোন নগরের ভিত্তি স্থাপনের জন্য শুভ দিন; তদ্রূপ কোন ব্যক্তির আয়ুষ্কাল নির্ধারণের জন্যও এই পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইত।

এই পদ্ধতির ব্যবহার দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর। ইহাতে সূক্ষ্ম এবং পরিপূর্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞান, দুরূহ গণনা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। জটিল গণনা বাদে পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য আরবগণ যান্ত্রিক (monographic) সাহায্য গ্রহণ করিতেন দুই উপায়ে ঃ (১) কতকগুলি Single Plane (আল-বীরূনীতে যাহা Plane of tasyir) যাহা astrolabe (اصطولاب)-এ স্থাপন করা; (২) অথবা একটি বিশেষ যন্ত্র ('Estrumente del Leuantamiento' in Alfonso of Castile) ব্যবহার, যাহা প্রধানত তাসয়ীর নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হইলেও অন্যবিধ গণনায় সাহায্য করিত।

তাসয়ীর অথবা তাস্য়ীর তল (Plane) সম্পর্কে আরবী ভাষায় প্রণীত গ্রন্থাদি প্রণেতাদের মধ্যে রহিয়াছেন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ইব্ন ফাররূখান (H. Suter, Die Mathematikar u. Astronomen der Araber etc., Abhdlg. Z. Gesch. d. math. Wissensch., ৪৫খ, Heft 10, ১৯০০, নং ৩৪); আল-বাত্তানী (Suter, No. 49); আবূ জা'ফার আল-খাযিন (Suter, No. 124); আল-বীরূনী (Suter, No. 218)। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তির জ্যোতিষশাস্ত্রীয়পূর্ণ পদ্ধতি বর্তমানে পাওয়া যায় না। ১০ম Alfonso-এর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থসমূহের অন্তর্ভুক্ত "Book of the Ataeir" Rabi Cag de Toledo (Issak ibn Sid) প্রণীত যিনি ছিলেন Alfonsine Tables-এর সম্পাদক। তবে ইহা কোন একটি আরবী মূল গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র বলিয়া মনে হয়।

ইবনু'ল-কিফ্তী প্রণীত "History of Scholars" গ্রন্থে নিম্নলিখিত জ্যোতির্বিদগণ, তাসয়ীর গণনায় তাঁহাদের বিশেষ দক্ষতার জন্য সম্মানের সহিত উল্লিখিত হইয়াছেন ঃ আল-হাসান ইব্ন মিসবাহ (পৃ. ১৬৩); আল-মারওয়াযী (পৃ. ১৭০, Suter, নং ২২); আল-খাকানী (পৃ. ১৮১, Suter, নং ২০৬); সিন্দ ইব্ন 'আলী (পৃ. ২০৬, Suter, নং ২৪); আল-'আব্বাস ইব্ন সা'ঈদ আল-জাওহারী (পৃ. ২১৯, Suter, নং ২১); ইব্ন য়ূনুস (পৃ. ২০৩, Suter, নং ১৭৮); ইবনু'ল-আ'লাম (পৃ. ২৩৫, Suter, নং ১৩৭); মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীম আল-ফাযারী (পৃ. ২০৭, Suter, নং ১); মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ আল-মারওয়াররূদী (পৃ. ২৮১, Suter, নং ৪৬); য়াহ্য়া ইব্ন আবী মানসূর (পৃ. ৩৫৭, Suter, নং ১৪); য়াহ্য়া ইব্ন সাহ্লু'স-সাদীদ আবূ বিশ্র আত-তিক্রীতী (পৃ. ৩৬৫); আবু'ল-ফাদল ইব্ন য়ামীন (পৃ. ৪২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বীরূনী, আল-কানূন'ল মাস'ঊদী, Cod. London, Brit, Mus, Or, 1997, এবং Berlin, Cat. Ahlwardt No, 5667; (২) ঐ লেখক, কিতাবু'ল ইস্তী'আব, Cod. Leyden, No. 1066 (E. Wiedemann কর্তৃক উভয় গ্রন্থ অনূদিত); (৩) A. Bouche-Leclerq, L'astrologie grecque, প্যারিস ১৮৯৯; (৪) M. Delambre, Histoire de l'astronomie bu. Moyen-age, প্যারিস ১৮১৯; (৫) J. G. Job, Anleitung zu denen curiosen Wissenschaften, Frankfurt এবং Leipzig ১৭৪৪ খৃ.; (৬) C. A. Nallino, al-Battani, sive Albateeni opus astronomicum, Milan ১৯০৩-৭; (৭) D. Man. Rico y Sinobas, Libros del saber de astronomia del Rey D. Alfonso x, de Castillia, মাদ্রিদ ১৮৬৩-৬৭; (৮) M. L. P. E. A. Sedilta, Prolegomenes de Tables astronomiques d'oloug-beg, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ.; (৯) E. Wiedemann, zur Geschichte der Astrologie, in Weltall, ১৯২২/৩, Berlin-Treplow; (১০) ঐ লেখক, Beitrage zur Geschichte der Naturwissenschaften XLVII, "uber die Astronomie nach den Mafatih al-Ulum, S.B.P.M. Soz, Erl, Erlangen ১৯১৫ খৃ.। (সংক্ষেপিত, চিত্রাদিসহ তাস্য়ীর পদ্ধতির পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্র. E.I.[1]-এ "তাসয়ীর প্রবন্ধ)।

O. Schirmer (E. I.[1])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তাসাওউফ (تصوف) ঃ (১) শব্দ প্রকরণ, শব্দটির ধাতুমূল صوف (ص-و-ف) অর্থ-পশম, উল) হইতে বাব تفعل-এর ক্রিয়ামূল (মাসদার) تصوف (অভ্যন্তরূপে) পশমী পোশাক পরিধান করা (لبس الصوف। [সাম'আনী]) অর্থ প্রকাশ করে। সুতরাং 'সূফী' হইয়া সূফী দরবেশের ন্যায় (মোটাসোটা পশমী) পোশাক পরিধান এবং নিজেকে কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ সূফীবাদী (متصوفانه) জীবন যাপনের জন্য নিবেদিত (ওয়াক্ফ) করাকে ইসলামী পরিভাষায় 'তাসাওউফ' নামে অভিহিত করা হয়, সংক্ষেপে ইহার অর্থ নিজেকে সূফীসুলভ জীবনের জন্য সমর্পিত করা। শব্দটি সম্ভবত সূফী বিশেষ্য হইতে সরাসরি তৈরি করা হইয়াছে যেইভাবে تنصر নাসারা (نصارى) শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। মোটকথা, ভাষাতত্ত্বের বিচারে সূফী শব্দটি সূফ-এর সম্বন্ধবাচক শব্দ। অনেক হাদীছে উদ্ধৃত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) পশমী বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন (বুখারী, কিতাবু'ল-লিবাস, ১খ.)। হযরত নবী কারীম (স) পশমী বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ইনতিকাল করেন (তিরমিযী, আব্ওয়াবু'ল-লিবাস, ১০; তু ইব্ন মাজা, বাবু'ল-লিবাস, ১খ.)। হাদীছ শারীফে রহিয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত মূসা ('আ)-এর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন তখন মূসা ('আ) আপাদমস্তক পশমী বস্ত্র পরিহিত ছিলেন (তিরমিযী, ঐ, স্থা.)।

তবে ইহাও উল্লেখ্য যে, সূফীসুলভ জীবন-যাপন ও বিশেষ ধরনের বস্ত্র পরিধানের পারস্পরিক সম্বন্ধ এতই অগভীর ও অপ্রয়োজনীয় যে, উহা দ্বারা ইসলামের সকল সূফী-দরবেশের জন্য ব্যাপকভাবে সূফী শব্দটি ব্যবহৃত হওয়ার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কুশায়রী (র) (রিসালা, বাবু'ত-তাসাওউফ) 'সূফ' শব্দের সহিত সূফী শব্দের সম্পর্ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ইহা শব্দটির মাত্র একটি দিক; কিন্তু সূফীগণ পশমী পোশাক পরিধান করাকেই তাহাদের বিশেষ পরিচিতি (শি'আর) সাব্যস্ত করেন নাই (ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف) এবং প্রায় সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ص-و-ف ধাতুমূলটি উচ্চারণ নির্দেশনা (ও ধ্বনি ব্যঞ্জনায়) এমনভাবে সমৃদ্ধ না হইলে 'সূফী' পরিভাষাটি কখনও এত অধিক ব্যাপকতর সাফল্য অর্জন করিত না। কিংবা (এইভাবেও বলা যায় যে,) বর্ণমালা বিদ্যা ('ইলমু'ল-হুরূফ), যাহাতে সূফীগণ অতিশয় পারদর্শী হইয়া থাকেন) অনুসারে এই বর্ণগুলির "সংখ্যা (তাত্ত্বিক) মান" ص-ف-و ধাতুমূলের সমান; ফলে ص-ف-و-এর শব্দমূলের সহিত ইহার গোপন সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, আর এই ص-ف-و ধাতুমূল হইতে এমন অনেক অনেক শব্দ নির্গত হইয়াছে যাহা তাসাওউফের কোন কোন মৌলিক দিক ও দৃষ্টিকোণ প্রতিভাত করে, যেমন সাফা' (صفاء-পরিচ্ছন্নতা/পবিত্রতা), সাফ্র=صفر-বিশিষ্ট মনোনীত ব্যক্তি/বাছাইকৃত), সাফী (صفى-অন্তরঙ্গ বন্ধু), মুসতাফা (মনোনীত, নির্বাচিত) ইত্যাদি (ইহা না হইলে হয়ত পরিভাষাটি এত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিত না)। বুন্দার ইব্ন হুসায়ন লিখিয়াছেন, (দ্র. কালাবাযী, তা'আর্রুফ, ২য় অধ্যায়) (من اختاره الحق لنفسه فصافاه... وصوفى على زنة عوفى اى عافاه ربه فعوفى "সূফী ঐ ব্যক্তি যাহাকে প্রকৃত সত্তা (আল্লাহ) নিজের জন্য মনোনীত ও পসন্দ করিয়া স্বীয় সান্নিধ্য প্রদত্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন"।

সূফী (صوفى) শব্দের রূপান্তর সম্পর্কে উপরোক্ত অভিমত ব্যতীত অন্যান্য যেই সকল অভিমত পেশ করা হইয়া থাকে (এইগুলির জন্য দ্র. দাইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল ইসলামিয়্যা, কায়রো, ৫/৭ খ, ২৭৬ প.) তাহা খণ্ডন করা যাইতে পারে। যেমন সূফিয়্যা (صوفية) 'সুফ্ফা'বাসীদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সুফ্ফার সহিত ইহার ধ্বনিগত কিছু মিলও রহিয়াছে, সুফ্ফাবাসিগণ হইলেন দুনিয়াত্যাগী সাহাবীগণের সেই জামা'আত যাঁহারা রিসালাত যুগে মদীনা মুনাওওয়ারা-র মাসজিদে নাবাবীর উত্তর প্রান্তস্থিত [কিব্লা-র বিপরীত দিক্কার] খোলা চত্বরে (صفة-তে) অবস্থান করিতেন কিংবা সূফী শব্দটি সাফ্ফ (صف-সারি) হইতে নিগৃত। অর্থাৎ সূফী শব্দটি প্রথম সাফ্ফ (صف اول)-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। [তাঁহারা মহান মহীয়ান আল্লাহ্র দরবারে প্রথম সারিতে রহিয়াছেন, কেননা তাঁহাদের আন্তরিক লক্ষ্য তাঁহারই দিকে নিবিষ্ট রহিয়াছে (তু. তা'আর্রুফ, মিসর ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৫)] কিংবা বানূ সূফা নামে একটি বেদুঈন গোত্রের সহিত [সাম'আনী] কিংবা বানু সুফা নামে একটি বেদুঈন গোত্রের সহিত; কিংবা সুফানা (তরকারী বা সব্জিবিশেষ) صفوة الففا—গ্রীবার রোমশ লোমগুচ্ছ-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। অনেক পূর্বকাল (খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দী) হইতে অতীতকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার এই শব্দটি 'সূফী' (পশমী কম্বল ইত্যাদি পরিহিত সাধু-সন্ন্যাসী-দরবেশ)-দের জন্য প্রচ্ছন্ন ইংগিতরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে কিংবা শব্দটি য়ূনানী (গ্রীক) শব্দ সোফোস-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত [এমনকি তাসাওউফ শব্দটিকে থিয়োসোফিয়া (Theosophia) হইতে নির্গত বলিয়া সাব্যস্ত করিবার প্রচেষ্টাও চালান হইয়াছে]। Noldeke (Z.D.M.G., ৪৮খ., ৪৫) এই শেষ রূপান্তটি এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যে, য়ূনানী (গ্রীক) Sigma হরফ আরবীতে সর্বদা س (সীন) আকৃতিতে লেখা হয় (ص-সাদ আকৃতিতে নহে)। ইহা ছাড়া আরামী ভাষায় এমন কোন শব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যাহাকে সোফোস ও সূফী (صوفى) শব্দদ্বয়ের মাঝে রূপান্তর-মাধ্যম সাব্যস্ত করা যাইতে পারে।

ইতিহাসের পাতায় 'আস-সূফী' শব্দটি উপাধি হিসাবে প্রথম কূফা নিবাসী জনৈক রসায়নবিদের জন্য ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। শী'আ মতাবলম্বী এই যাহিদ জাবির ইব্ন হায়্যান (আনু. ১৬০ হি.) 'যুহ্দ' (দরবেশী-আধ্যাত্মবাদ) সম্পর্কে একটি বিশেষ মতাদর্শ পোষণ করিতেন (তু. খাশীশ নাসাঈ, [মৃ. ২৫৩/৮৬৭ খৃ.], দ্র. ইস্তিকামা শিরো.)। তদ্রূপ অন্য একজন খ্যাতিমান সূফী আবূ হাশিম ইব্ন শারীফ কূফী-র নামের সহিতও ইহাকে যুক্ত করা হয় (আনু. ১৩০ হি.)। মোটকথা হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর সূচনা হইতে পরিভাষাটি ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইহার বহুবচনীয় রূপ সূফিয়া (صوفية) শব্দটি প্রথম বারের মত ১৯৯/৮১৪ সালে ইস্কান্দারিয়া (আলেক্জান্দ্রিয়া)-এর একটি সাধারণ হাংগামার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয় (আল-কিন্দী, কুদাত মিস্র, সম্পা. Guest., পৃ. ১৬২ ও ৪৪০)। মুহাসিবী (মাকাসিব, ফার্সী পাণ্ডু. পৃ. ৮৭) এবং জাহিজ (আল-বায়ান, কায়রো ১৩৩২ হি., ১খ, ১৯৫)-এর বর্ণনা অনুসারে প্রায় সমসাময়িক কালে শব্দটি কিছুটা শী'আ ভাবাপন্ন একটি মুসলিম দলের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল, যাহারা কূফায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং যাহাদের শেষ নেতা (ইমাম) ছিল 'আব্দাক আস্-সূফী। এই ব্যক্তি ছিল সবজীভোজী ও গোশ্ত পরিহারী এবং খিলাফাত মীরাছী অধিকারের প্রবক্তা। আনুমানিক ২১০/৮২৫ সালে বাগদাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। ফলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে 'সূফী' শব্দের ব্যবহার কূফাতে সীমাবদ্ধ ছিল।

তবে শব্দটির ললাটে লিখা ছিল এক ঐতিহ্যময় উজ্জ্বল ভবিষ্যত। তাই দেখা যায় যে, ৫০ বৎসরের ব্যবধানে শব্দটি (খুরাসানের 'মালামাতিয়্যা' আধ্যাত্মবাদীদের বিপরীতে) সমগ্র ইরাকের আধ্যাত্মবাদী (সূফী)-দের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং দুই শতাব্দীর মধ্যেই 'সূফিয়্যা' পরিভাষাটি সকল মুসলিম সূফী দরবেশ ও আধ্যাত্মবাদীর জন্য তেমনই ব্যবহার হইতে থাকে যেমন ব্যাপক হারে বর্তমান সময়ে আমরা 'সূফী', তাসাওউফ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই অন্তর্বর্তীকালীন অবসরে সূফ (صوف) বা সাদা পশমী খির্কা (আলখাল্লা ও পরিচ্ছদবিশেষ), যাহা ১০০/৭১৯ সনেও বিজাতীয় ও অপসন্দনীয় খৃস্টান পোশাকরূপে পরিগণিত হইত (এবং যাহা পরিধান করার কারণে হাসান বাস্‌রী (র)-এর বিশিষ্ট মুরীদ ফারকাদ আস-সাবাখীকে ভর্ৎসনাও করা হইয়াছিল [দ্র. আল-'ইক্‌দ, ১৩২১ হি., ১খ, ২০৩ (دع عنك نصر نيتك هذه তোমার এ খৃস্টানী ভাব পরিহার কর)]। কাজেই পশমী পোশাক পরিধানের জন্য নয়, তাঁহাদের নেক আমলের জন্যই তাঁহারা সূফী নামে পরিচিত।

২। **তাসাওউফের উৎসসমূহ ঃ** তাসাওউফের দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর গ্রন্থসমূহে অতি স্বল্প পরিজ্ঞাত হযরত নবী কারীম (স)-এর গোপনীয় সূফীসুলভ জীবন সম্পর্কিত তাঁহার যেই সকল হাদীছ পাওয়া যায় তাহা তুলনামূলকভাবে পরবর্তী যুগের বিধায় সন্দেহযুক্ত। তবে সূফীসুলভ দুনিয়াত্যাগী নির্মোহ জীবন-যাপনের প্রতি আগ্রহ-আকর্ষণ যাহা সর্বদেশে সর্ব জাতির মাঝে কিছু পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় তাহা ইসলামী যুগের প্রথম দুই শতকে আরবদেশেও অনুপস্থিত ছিল না। ইহা ছাড়া পরবর্তী সময়ের অগ্রহণীয় বর্ণনাসমূহ উপেক্ষা করা হইলেও দেখা যাইবে যে, জাহিজ ও ইবনু'ল-জাওযী (কুস্‌সাস/কাসসাসা) প্রমুখ ঐ যুগের চল্লিশের অধিক যাহিদ-সূফীদের নাম সংরক্ষিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বাহ্য 'ইবাদতসমূহের অন্তর্নিহিত রহস্য ও তাত্ত্বিক দিকসমূহকে যে পরিমাণ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সূফীবাদী জীবন যাপনের বৈশিষ্ট্যসমূহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এখন আর নিশ্চিতরূপেই এই দাবি পেশ করার অবকাশ নাই যে, হযরত নবী কারীম (স) ঘটনা সংঘটিত হইবার পূর্বেই আগাম অনুমান করিয়া (ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া) আধ্যাত্মবাদীদের ইসলামের পরিবৃত্ত হইতে বহির্ভূত ঘোষণা করিয়াছিলেন। উপরন্তু لَا رُهْبَانِيَّةَ فِى الْاِسْلَامِ (ইসলামে বৈরাগ্য নাই)-সূচক প্রসিদ্ধ হাদীছটি স্প্রেংগার (Springer) যাহাকে উপরোক্ত অর্থের ভূষণ পরিধান করাইয়াছেন, একটি অপ্রামাণ্য জাল হাদীছ এবং সম্ভবত ও সর্বাধিক তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে উহা জাল করা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (দাইরাতুল-মা'আরিফি'ল-ইসলামিয়্যা, আ, দারু'ল-ফিক্‌র, কায়রো তা. বি., ১০খ, ২৮১)। মুফাসসিরগণ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا [এবং সন্ন্যাসবাদ, ইহা তো যাহা তাহারা (খৃস্টান ধর্মীয় পুরোধাগণ) উদ্ভাবন করিয়াছিল) (৫৭ ঃ ২৭) তাফসীর প্রসংগে বলিয়াছেন যে, রাহ্‌বানিয়্যাত, যাহা হাদীছে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে উহা বৈধ ও মুবাহ বিষয়বস্তুসমূহ পরিত্যাগের অতি সাধুতা ও বাড়াবাড়িযুক্ত দরবেশীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রকৃত তাসাওউফ ও আধ্যাত্মবাদের ক্ষেত্রে নহে (দ্র. মুফ্‌তী মুহাম্মাদ শাফী', মা'আরিফু'ল-কুরআন, ৮খ., ৩২৩ প., সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর প্রসংগ)। যদিও পবিত্র কুরআনের রাহ্‌বানিয়্যাত ও বৈরাগ্যবাদের আলোচনা সম্পর্কিত (৫৭ ঃ ২৭) আয়াতটির নূতন ও প্রগতিবাদী তাফসীর করিয়া আধ্যাত্মবাদ ও সূফী তত্ত্বের নিন্দা করা যায় তবুও প্রথম তিন শতাব্দীর প্রখ্যাত মুফাসসিরবৃন্দ, যথা মুজাহিদ, আবূ উমামা আল-বাহিলী (রা) প্রমুখ (মৃ. ৮৬ হি.) (দ্র. নিবন্ধকারের নিবন্ধ Essaie, পৃ. ১২৩-১৩১) [এবং পূর্বসূরীগণের অনুগমনে উত্তরসূরি মুফাস্‌সিরবৃন্দ প্রায় সকলেই, দ্র. বহুল প্রচলিত তাফসীর গ্রন্থসমূহে ৫৫ ঃ ২৭ আয়াতের তাফসীর ও তাসাওউফ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ] এবং পূর্বসূরী সূফী আধ্যাত্মবাদীগণের মধ্যে অধিক সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনকারী মনীষীবর্গ (তু. জুনায়দ, দাওয়াউ'ল-আরওয়াহ) সর্বসম্মতভাবে এই আয়াতটি রাহ্‌বানিয়্যাত (তাসাওউফ ও আধ্যাত্মবাদ অর্থে)-এর বৈধতা বরং উহার স্তুতি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন (তাফসীরু'ত-তাবারীতে এই বৈধতা ও স্তুতি দেখা যায় না, তাফসীরু রূহু'ল-মা'আনীতে বৈধতা ও স্তুতির বিবরণ রহিয়াছে)। অবশেষে উহার প্রতিকূল তাফসীর প্রকাশিত হয় এবং (মু'তাযিলা মতবাদ প্রভাবিত) যামাখশারী উহার প্রসার ঘটান।

হুজবীরী (র) তাঁহার কাশ্‌ফু'ল-মাহজূব, অনু. নিকলসন, পৃ. ৪৪-৯) আবু'ল-হাসান আল-ফুশানজী (মৃ. ৩৪৮ হি.)-এর বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, "বর্তমানে তাসাওউফ সারতত্ত্ব (হাকীকাত)-বিহীন একটি নামসর্বস্ব বিষয়, কিন্তু বিগত যুগে উহা ছিল নাম-পরিচয়বিহীন একটি বাস্তব বিষয়।" এই প্রসংগে হুজবীরী (র) নিজের বক্তব্য সংযোজিত করিয়া বলিয়াছেন, সাহাবী এবং পুণ্যবান পূর্বসূরী (সালাফে সালিহীন)-দের যুগে এই নামের অস্তিত্ব ছিল না, অথচ উহার সারতত্ত্ব প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে ছিল দেদীপ্যমান।" এই ক্ষেত্রে 'প্রতিটি মানুষ' কথাটিতে অতিশয়োক্তি রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা নিতান্ত বাস্তব (এবং পূর্বসূরী ও উত্তরসুরি সকল শীর্ষস্থানীয় সূফী এই ব্যাপারে একমত) যে, যদিও উত্তরসুরিদের মধ্যেও সর্বদা পৃথিবীর সর্বত্র পূত-পবিত্র মনীষীবর্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন তবুও এই পূত-পবিত্রতা ইসলামের প্রথম যুগের ন্যায় আর কখনও এত সর্বব্যাপী ছিল না। তদুপরি ইহাও সন্দেহাতীত যে, প্রথম ওয়াহ্‌য়ি নাযিল হওয়ার পূর্বে রামাদান মাসে হযরত নবী কারীম (স) হেরা গুহায় নির্জনবাসের যে 'আমল করিতেন ঐতিহাসিক বিচারে উহাতেই তাসাওউফের মূল নিহিত রহিয়াছে। মাদানী জীবনের শেষ বর্ষগুলিতেও নবী কারীম (স) যখন অবিরাম কর্মরত ছিলেন এবং তাঁহার কতক সাহাবী (রা)-ও বিশেষ কর্মসূচীতে তাঁহার অনুগমন করিতে থাকেন তখনও 'যুহ্‌দ'-এর কর্মসূচী চালু ছিল। তদুপরি হযরত ইবরাহীম ('আ)-এর তাসাওউফ ও ইসলামী তাসাওউফের মধ্যেও সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

ইমাম গাযালী (র) (আল-মুন্‌কিয, পৃ., ৬০-৬৯) তাসওউফকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য' (সান্নিধ্য) এবং 'সুরুচি' (যাওক) অর্থাৎ প্রকৃত আত্মিক প্রত্যক্ষন ও আধ্যাত্মিক পরিদর্শন দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতিগতভাবে নূতন ধর্মের প্রতি জাতির সেই সকল লোকের মধ্যে সর্বাগ্রে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় যাহারা মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের অধিক বাসনা পোষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের কারণে নূতন ধর্মের ঐশী উৎসের পরিচিতি তাঁহারা সর্বাগ্রে হাসিল করিতে সক্ষম হন। মাক্কী যুগের প্রাথমিক সূরাসমূহের অনুসন্ধিৎসু অধ্যয়নে প্রতিভাত হয় যে, ঐ যুগেও এমন কিছু বিশিষ্ট পুণ্যবান ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন যাঁহাদের জীবন আগা-গোড়া আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ও সমর্পিত

ছিল এবং নির্দ্বিধায় তাঁহাদের 'ইবাদতের অনুপ্রেরণা সাধারণ মানব সাধ্যের পরিমাপ হইতে অনেক বেশী তীব্র ছিল। সেই যুগের মৌলিক অধ্যাত্ম আবেগ-উদ্দীপনার পরিচয় কুরআনের এই সকল আয়াতে পরিদৃষ্ট হয় فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ [সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র দিকেই ধাবিত হও] (৫১ ঃ ৫০), وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (১) [(আল্লাহ্ সমীপে) সিজদাবনত হও (অর্থাৎ সালাত আদায় কর) এবং (এইভাবে তাঁহার) নৈকট্য অর্জন কর] (৯৬ ঃ ১৯), وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا [এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (তাস্‌বীহ-তাহ্‌লীল পাঠ কর)] (৭৬ ঃ ২৬), قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا [('ইবাদাতে) রাত্রি জাগরণ করে (সারা রাত্রি না হউক) রাত্রির কিছু অংশ ব্যতীত (প্রায় সারা রাত্রি)] (৭৩ ঃ ২) এবং وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا [তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁহাতে মগ্ন হও] (৭৩ ঃ ৮)।

এক কথায় বলা যায়, মুসলিমদের ঐ সময়কার নীতি-কর্ম-দর্শন ছিল পরম ও শেষ পর্যায়ের সাধনা অধ্যবসায়ের খাঁটি সুফীসুলভ নীতি দর্শন এবং তখন পর্যন্ত ফিক্‌হ্ শাস্ত্রীয় সর্বনিম্ন 'ইবাদতের সীমা নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং ইহা কখনও বিস্ময়ের ব্যাপার নহে যে, সুফীগণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরে যে মহান সাহাবীগণ (রা)-কে নিজেদের আত্মিক-আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক মান্য করেন তাঁহাদের অনেকেই সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি যাঁহারা প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন চার খলীফা [বিশেষত আবূ বাক্‌র (রা) ও 'আলী (রা)] এবং ইহাদের সংগে আরও ছয়জন যাঁহাদের সমন্বিত সংখ্যায় গঠিত 'আশারা-ই মুবাশ্‌শারা' (রা) (দ্র.)-এর জামা'আত এবং অন্যান্য আরও অনেক সাহাবী (রা) যাঁহাদের মধ্যে সম্ভবত সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আবূ যার আল-গিফারী (রা) ও হুযায়ফা (রা)। আনসারীগণের মধ্যেও অনেক বিশিষ্ট মহাত্মা ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান ছিলেন যাঁহারা হযরত নবী কারীম (স)-এর রিসালাত যুগে প্রতিপালিত হইয়া বয়স্ক সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন।

চার খলীফা (রা)-র যুগ পর্যন্ত তাসাওউফ আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনের তীব্র বাসনা অর্থে এতই স্বাভাবিক ও সাধারণ বিষয় ছিল যে, উহা সমষ্টিগতরূপে গোটা উম্মাতের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং উহার ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া এতই সহজ ও অবচেতন রূপে বরং এমনও বলা যায় যে, স্বভাবজাতরূপে অনুভব করা যাইতে পারিত সেইভাবে কল্‌ব ও হৃদয়জাত 'আমলের প্রবাহ গোটা দেহে প্রবাহিত ও সম্প্রসারিত হইয়া থাকে এবং কতকটা (অবচেতনভাবে) এই কারণেও যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিচারে উন্নতি লাভ তখনও পর্যন্ত (অলিখিত রূপে) আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভে নিহিত ছিল। যদিও ঐ সময় কোন আদর্শিক জামা'আত বা কোন প্রকার সাংগঠনিক দল-উপদলের অস্তিত্বের প্রামাণ্যতা সুনিশ্চিত নহে, তবুও এই কথা সত্য যে, দ্বিতীয় যুগের লোকেরা (অর্থাৎ তাবি'ঈগণ) স্বতঃস্ফূর্তরূপেই নিজেদেরকে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর পরিমণ্ডলসমূহে সংযুক্ত করিয়া নিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে নুসসাক (নাসিক) এর ব. ব, 'আবিদ অর্থে), যুহ্‌হাদ (যাহিদ-এর ব. ব.), বাক্কাউন (بَكٍّ-এর ব. ব.) ক্রন্দনকারী, তাইবূন (তাইব-এর ব. ব.) এবং কুস্‌সাস (কাসসাস-সাধারণ জনতার মাঝে ওয়াজ-নসীহতকারী) ইত্যাদি নামে এই শ্রেণীর মানুষগুলি অভিহিত হইতে থাকেন। প্রথম দিকে ইঁহারা পরস্পর হইতে পৃথকরূপে অবস্থান করিতেন। কিন্তু সময়ের পরিসরে মুসলিমদের অন্যান্য মতবাদের অনুসারীদের ন্যায় ক্রমান্বয়ে ইঁহারাও স্বতন্ত্র দুইটি জামা'আতে বিতক্ত হন এবং [তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের দুই 'ইলমী কেন্দ্র] বস্‌রা ও কূফায় নিজ নিজ পরিমণ্ডল ও কেন্দ্র তৈরি করেন। বস্‌রায় নূতন বসতি স্থাপনকারী আরবরা ছিল প্রধানত তামীম গোত্রীয়, বস্‌রাবাসীদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ছিল তথ্যপ্রীতি ও বাস্তবতাবোধ এবং যে কোন বিষয়কে পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করিয়া দেখা। তাঁহারা সারফ ও নাহ্‌ও ('আরবী ব্যাকরণ)-এ মানতিক্ (যুক্তিবাদ), কাব্য রচনায় বাস্তবচিত্র অংকন, হাদীছ শাস্ত্রে পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 'ইল্‌মু'ল-কালাম (দ্র.)-এ মু'তাযিলা (দ্র.) ও কাদারিয়্যা (দ্র.) মতাদর্শের প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে সুন্নাতের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাসাওউফে তাঁহাদের প্রবীণ শুয়ূখ হচ্ছেন নিম্নের মনীষীবর্গ হাসান বাস্‌রী (মৃ. ১১০/৭২৮), মালিক ইব্‌ন দীনার, ফাদল আর-রাকাশী ঃ রাবাহ্ ইব্‌ন 'আম্‌র আল-কায়সী, সালিহ আল-মুররী এবং 'আবদু'ল-ওয়াহিদ ইব্‌ন যায়দ (মৃ. ১৭৭/৭৯৩) (র), যিনি 'আবাদান-এর প্রসিদ্ধ সাধুজনদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।

কূফায় নূতন বসতি স্থাপনকারী আরবরা প্রধানত য়ামান অঞ্চল হইতে আগত ছিল। তাঁহাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ছিল ভাববাদিতা ও কল্পনাপ্রবণতা (idealism) এবং ঐতিহ্য ও মূল্যবোধপ্রিয়তা (Traditionalism)। সারফ ও নাহ্‌ও শাস্ত্রে তাঁহারা বিরলতা (شاذ), কবিতায় ভাবাবেগপূর্ণ প্লেটোবাদ (Platonism) এবং হাদীছ-এর ক্ষেত্রে বাহ্য অর্থের অনুগমনে আসক্ত ছিলেন। তাসাওউফে তাঁহাদের অনুসরণীয় শুয়ূখ ছিলেন নিম্নের মনীষীবর্গ ঃ রাবী' ইব্‌ন খুছায়ম (মৃ. ৬৭/৬৮৬), আবূ ইসরাঈল আল-মুলাঈ [সাম'আনী, ৫৪৭ আলিফ] (মৃ. ১৪০/৭৫৭), জাবির ইব্‌ন হায়্যান, কুলায়ব সায়দাবী, মানসূর ইব্‌ন 'আম্মার, আবু'ল-'আতাহিয়্যা ও 'আব্‌দাক প্রমুখ। ইহাদের মধ্যে আবু'ল-'আতাহিয়্যা ও 'আব্‌দাক তাহাদের জীবনের শেষ অংশ বাগদাদে অতিবাহিত করেন, যাহা ২৫০/৮৬৪ সালের পরে ইসলামী তাসাওউফের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। উল্লিখিত বটেই বিভিন্ন মাযহাবী মুনাজারার (বিতর্ক-বাহাছ) হাল্‌কা (কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মসজিদসমূহে প্রথমবারের মত তাসাওউফের পাঠদানের সূচনা হইয়াছিল।

এই সময়েই সূফী ও ফকীহদের মধ্যকার মতবিরোধ প্রথমবারের মত প্রকাশ্য সংঘাতের রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাগদাদের কাযীর 'আদালতে (আবু'ল-ফায়দ) যুন্‌-নূন (ইব্‌ন ইব্‌রাহীম) আল-মিসরী (মৃ. ২৪০/৮৫৪), আবুল-হাসান (আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ) নূরী এবং আবূ হামযা (আল-বাগদাদী আল-বায্‌যায) (ইব্‌নু'ল-জাওযী, তালবীস, পৃ. ১৮৩-এর বর্ণনামতে ২৬২/৮৭৫ এবং ২৬৯/৮৮২-এর মধ্যবর্তী সময়ে) এবং (হুসায়ন ইব্‌ন মানসূর) হাল্লাজ (র) প্রমুখের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালিত হয় [নূরী ও আবূ হামযা-র মামলার জন্য দ্র. কাশফু'ল-মাহজূব, অনু. নিকলসন, পৃ. ১৯০]।

৩। ইসলামী দলসমূহের উপর তাসাওউফের প্রভাব ঃ প্রথমে যুগের সূফীগণ সম্ভবত এই বিষয়টি অনুমান করিতে পারেন নাই যে, কালক্রমে তাহাদিগকে ইসলামী হুকূমাত-এর মসনদাসীন কর্তৃপক্ষ ও বিদ্বান-বুদ্ধিজীবীদের সহিত মুখামুখি হইতে হইবে। কেননা তাঁহারা নেহায়ৎ-সজ্ঞানে নির্জনবাসে থাকিয়া ক্ষুধা ও দারিদ্র্য তৃষিত জীবন-যাপনকে প্রাধান্য দিলেও তাহা ছিল শুধু এই কারণে যে, যাহাতে কুরআন শারীফ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে চিন্তা-গবেষণা করার অবকাশ পাওয়া যায়; تفرّغ শব্দটি পূর্বকাল হইতেই تصوّف-এর প্রতিশব্দ ও

সমার্থকরূপে বিবেচিত ছিল (অর্থাৎ যথাসাধ্য কুরআনবিদ হও তবে সূফী হইতে পারিবে) এবং যাহাতে 'ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য অর্জনের সাধনা করিতে পারে। তাসাওউফের প্রতি মানুষের আকর্ষণ হয়ত বা অন্তর্লোকের সেই ক্ষোভ ও প্রতিকারের বহিঃপ্রকাশ, যাহা সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে করা হইয়া থাকে এবং আরও গভীরে এই প্রতিবাদ শুধু অন্যদের নিপীড়নের বিরুদ্ধেই হইয়া থাকে এমন নহে, বরং সর্বাগ্রে এবং বিশেষভাবে উহা হইয়া থাকে স্বীয় প্রবৃত্তির কদর্যতার বিরুদ্ধে; এবং তাহা এই কামনার সহিত (যাহা আত্মশুদ্ধি ও প্রবৃত্তি দলনের মাধ্যমে আরও সক্রিয় ও সবল হইতে থাকে) যে, সম্ভাব্য যে কোন পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলা-র মিলন (বিসাল)-এর সৌভাগ্য সূচিত হউক। হাসান বাসরী (র)-এর জীবনধারা ও তাঁহার ওয়াজ-নসীহত ও বাণীমালায় (মালফূজাত) এই সূক্ষ্ম রহস্যটিই পরিস্ফুটিত রহিয়াছে (তু. Schaeder, ISL, ১৪খ., ১-৭২; Massignon, Essai, পৃ. ১৫২-১৭৯) এবং যাহা দুইজন উঁচু স্তরের অধ্যাত্মবাদীর আত্ম-চরিত্রমূলক রচনা (অর্থাৎ মুহাসিবী-র ওয়াসায়া, অনু. Masignon, পৃ. ২১৬-২১৮ এবং ইমাম গাযালী (র)-এর আল-মুন্‌কিয মিনা'দ-দালাল, অনু. Barbier de Meynard [বাংলা অনু. মহাসত্যের সন্ধানে শিরোনামে] দ্বারা আরও স্পষ্টতর রূপে প্রতিভাত হয়, তবে ঐ সময় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত (রাষ্ট্রীয়) ব্যবস্থাপনার জন্য এই 'আকীদা ও জীবনাদর্শে কোন প্রকার আশংকা সৃষ্টি করে নাই, তাহাতে ক্ষমতাসীন শাসকের রীতিনীতি যতই অবিচারপূর্ণ ও নিপীড়নমূলক হউক না কেন। কিন্তু ফকীহবৃন্দ ও মুতাকাল্লিমগণের দৃষ্টিতে এই বিষয়টি অতিশয় অসহনীয় ছিল যে, লোকেরা পরস্পর আত্ম-বিশ্লেষণ (মুহাসাবা-ই নাফ্‌স)-এর খোলামেলা আলোচনায় লিপ্ত হইবে এবং এই গোপন জগতের আদালতে বিচারের মাধ্যমে একে অন্যের বিরুদ্ধে ফায়সালা প্রদান করিবে। কেননা কুরআন (ও সুন্নাহ)-এর মাধমে বিন্যস্ত শারী'আতের বিধিমালা তো শুধু মানুষের প্রকাশ্য 'আমল ও কার্যক্রমের হিসাব-নিকাশ করিয়াছে এবং তাহাদের প্রকাশ্য পাপ ও অপরাধের জন্য বিভিন্ন সাজা ও দণ্ড স্থির করিয়াছে। মুনাফিকীর ক্ষেত্রে কোন প্রকার দণ্ড স্থির করে নাই। সুতরাং ফকীহগণ এই কথা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন যে, সূফীদের কর্মপন্থার উপরে ভিত্তিকৃত জীবনধারার শেষ পরিণতি হইবে বক্রতা ও বিভ্রান্তি। কেননা সূফীদের মতে নিয়াত (সংকল্প) ও আনুগত্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নফল 'ইবাদতের প্রতিও তাঁহারা অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন।

ইসলামী ফিরকাসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে তাসাওউফের প্রতি শত্রুতার প্রকাশ ঘটে খারিজীদের পক্ষ হইতে হাসান বাস্‌রী (র)-এর ব্যাপারে। পরবর্তী কালে ইমামী (শী'আ) উপদলগুলি (যায়দী, ইছনা 'আশারী ও চরমপন্থী অন্যান্য শী'আ উপদল গুলাত, গালী-এর ব. ব.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে এই কারণে তাসাওউফের সহিত যে কোন ধরনের সম্পর্ক সংশ্রবের নিন্দা ও দুর্নাম করিতে থাকে যে, তাহাদের দৃষ্টিতে তাসাওউফ এক ধরনের অস্বাভাবিক জীবনের ধ্যান-ধারণা ও রীতি-নীতি উপস্থাপন করিয়া থাকে এবং তাহারা দ্বাদশ ইমামের মাধ্যমে ওয়াসীলা অবলম্বন ও ইমাম পদের সহায়তা-সুপারিশ গ্রহণের পরিবর্তে (প্রত্যক্ষভাবে) রিদা (বি'ল-কাদা' ও আল্লাহ্‌তে পূর্ণ আত্মসমর্পণ-তাসলীম)-এর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়।

আহ্‌লুস-সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আত সূফীগণের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশে তুলনামূলকভাবে ধীরস্থিরতার পরিচয় দিয়াছেন। তদুপরি তাসাওউফকে আক্রান্ত করিবার ব্যাপারে তাঁহারা কোন কালেই ঐকমত্য পোষণ করে নাই। সুন্নীদের মাঝে মাত্র দুইটি দল তাসাওউফকে তাহাদের সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছে। পথমত (রক্ষণশীল) হাশাবী [তা'রীল-ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সরাসরি বাহ্য অর্থ গ্রহণকারী মুহাদ্দিছগণ] [ইমাম] আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) এই কারণে [চরমপন্থী] আসাওউফকে অভিযোগের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তাসাওউফ (পন্থীরা) শারী'আতের নির্ধারিত বাহ্য 'ইবাদাতসমূহ সালাত-সাওম ইত্যাদির তুলনায় মুরাকাবা ও ধ্যানমগ্নতাকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে এবং আত্মা (রূহ)-এর জন্য অনাদি সত্তা (আল্লাহ্)-র সহিত সরাসরি (প্রত্যক্ষ) 'সত্তা-সংযোগ' (زالتي تقرب) ও অন্তরঙ্গতা (خلة)-র পন্থাসমূহ উদ্‌ঘাটিত করে। তাঁহার বিশিষ্ট শাগরিদ কাশীশ ও আবূ যুর'আ (র) তো তাসাওউফকে ধর্মহীনতার অন্যতম শাখা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের অন্য দলটি কতিপয় মু'তাযিলা ও জাহিরীদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তাঁহারা প্রেম ও 'ইশ্‌কের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত করার ধারণাকে অর্থহীন মনে করেন। কেননা এইরূপ ধ্যানধারণা আদর্শিক ও নীতিগত পর্যায়ে 'সাদৃশ্যতা' (অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সমতুল্যতা) এবং কার্যত (স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির) সহ-সংস্পর্শতা (পাশাপাশি অবস্থান ও স্পর্শ) ও 'হুলূল' (ও স্রষ্টায় সৃষ্টির অনুপ্রবেশমূলক) অনু মিশ্রণ ও মহাত্মায় একীভূত হওয়ার সমার্থক বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আহলু'স্-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আত অতিশয়তা ও বাড়াবাড়িমুক্ত 'পরিমিত' ও যথার্থ তাসাওউফকে কখনও ইসলামের বহির্ভূত সাব্যস্ত করে নাই; বরং চারিত্রিক আচার-ব্যবহার ও 'ইবাদতের ক্ষেত্রে তাঁহারা সব সময়ই ইব্‌ন 'আবি'দ-দুন্‌য়া (মৃ. ২৮১/৮১৪)-এর ক্ষুদ্রাকৃতির অনুপম ও সমাদৃত পুস্তিকাসমূহ, আবূ তালিব আল-মাক্‌কী (মৃ. ৩৮৬/৯৯৬)-র কূতু'ল-কু'লূব এবং বিশেষভাবে ইমাম গাযালী (র)-র ইহয়া' 'উলূম-এর ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ রচনাবলী দ্বারা হিদায়াত ও পথের দিশা অন্বেষণ করিয়াছেন। (তথাকথিত) তাসাওউফের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আহ্‌লু'স-সুন্নাহ্‌র বড় বড় বিদ্বানবর্গ, যেমন ইবনু'ল-জাওযী, ইব্‌ন তায়মিয়া এবং ইবনু'ল- কায়্যিম (র) প্রমুখ চরিত দর্শন ও নীতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গাযালী (র)-এর শীর্ষস্তরে অবস্থানকে শ্রদ্ধার নজরে দেখিতেন এবং নৈতিকতা দর্শনে তাঁহার প্রামাণ্য ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি প্রদান করিতেন। অবশ্য পরবর্তী সময় [শায়খ আকবার] ইবনু'ল-'আরাবী (র)-র অনুগামী ভক্তদের সর্বেশ্বরবাদ (ওয়াহদাতু'ল-উজূদ) মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কোন সুন্নী ফকীহ ক্রোধ ও উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন, যদিও ইহাতে তাঁহারা তেমন একটা সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই। তদ্রূপ ওয়াহ্‌হাবিয়্যা (খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ওয়াহ্‌হাবী নহে) উপদলের প্রতিষ্ঠাতা...যদিও তাসাওউফ বিরোধী ছিলেন তবুও তিনি হাতিম আল-আসাম্ম-এর নামে লিখিত সূফী শাকীক (র)-এর ওয়াসিয়াত-এর ব্যাখ্যা (শারহ্) লিখিয়াছিলেন।

৩ তাসাওউফে ইত্তিহাদী দর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে তাসাওউফের বুনিয়াদ ছিল নিম্নে বর্ণিত দুইটি মূলনীতিঃ (ক) মনের আগ্রহ ও উদ্দীপনার সহিত 'ইবাদাত সম্পাদন আত্মার মাঝে এমন কতকগুলি 'ফায়দা' (শুভ অবস্থা ও মহৎ বিষয়)-এর উন্মেষ ঘটায় যাহা 'অজড়' (দেহবিহীন) বটে, তবে আহরণ ও অনুধাবনযোগ্য তত্ত্ব

(হাশবিয়্যাগণ এই মূলনীতি স্বীকার করে না)। (খ) 'ইলমু'ল-কুলূব অর্থাৎ অন্তর্লৌকিক বিজ্ঞান দ্বারা আত্মা (রূহ) মা'রিফাত (আত্মিক জগতের পরিচিতি) অর্জন করে। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছাশক্তি শুভ অবস্থা (ফাইদা) হাসিল করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে (মু'তাযিলারা এই মূলনীতি প্রত্যাখ্যান করে, কেননা তাহারা আত্মার পরিচিতি লাভ [মা'রিফাতু'ন-নাফস]- এর তত্ত্বীয় স্তরে উপনীত থাকাকেই যথেষ্ট মনে করে)। সূফী সাধকদের মতে 'ইলমু'ল-কুলূব-এ একটি সচল ও উদ্বুদ্ধকারী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই 'ইলম্ অন্তর্লোককে আল্লাহ্ অভিমুখে পরিভ্রমণ (سفر الى الله)-এর মন্যিলসমূহের (মধ্যবর্তী স্টেশন) সন্ধান ও উপাত্ত সরবরাহ করে এবং এই পরিভ্রমণ পথের বারটি মাকাম ও অবস্থাক্রম নির্ণীত করে। এই পরিভ্রমণের মাধ্যমে কতিপয় 'ফাদাইল' (বিশেষ মর্যাদা স্তর) উপার্জিত হয় এবং কতিপয় 'ফাওয়াইদ' (সম্মানজনক অবস্থান প্রভুর মহাদানের ফলে) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মাকাম ও হাল (মাকাম-অধ্যাত্ম পথচারীর সাধনালব্ধ প্রশংসনীয় স্থিতি অবস্থা; হাল অধ্যাত্ম পথচারীর জন্য অদৃশ্য জগত হইতে এখতিয়ার বহির্ভূত বিশেষ ভাব-পরিস্থিতি) সম্পর্কিত বিশদ তালিকাবৃত্ত বিভিন্ন গ্রন্থকারের বর্ণনায় বিভিন্ন রহিয়াছে (তু. সার্‌রাজ, কুশায়রী, গাযালী (র) প্রমুখ)। তবে এই বিভিন্ন বিস্তারিত বর্ণনায়ও কতিপয় বিশেষ পরিভাষা, যথা তাওবা, সাব্‌র, তাওয়াক্‌কুল, রিদা' ইত্যাদির ব্যাপারে সর্বদা ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। সূফী সাধাকগণ সুলূক (আধ্যাত্মিক পথে পদচারণা মধ্যবর্তী নানা মান্‌যিল)-এর ব্যাপারে মতপার্থক্যকে গুরুত্ব প্রদান না করিয়া মুখ্য অভীষ্ট (মন্‌যিলে মক্‌সুদ)-এর ব্যাখ্যা-বিবরণ প্রদানকে নিজেদের লক্ষ্য মনোনীত করিয়াছেন। সেই মন্‌যিল যেখানে পৌঁছিয়া আত্মা জড় জাগতিক সর্বপ্রকার সম্বন্ধ সংশ্লিষ্টতা হইতে মুক্ত হয় ও 'প্রকৃত সত্তা' (যাত-ই হাক্‌ক)-এর সহিত মিলিত হয়, যাহার জন্যই সে উদগ্রীব ছিল। ("حق" শব্দটি হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং সম্ভবত কিতাবু'ল-ইলাহিয়্যাত [যাহা ভুলক্রমে এরিস্টোটল-এর নামে সম্পৃক্ত] হইতে আহরিত হইয়া থাকিবে)। তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আহ্‌লু'স্-সুন্নাহ্‌র স্বীকৃত বক্তব্য ধারায় এই উচ্চ মাকামের (সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম স্তরের) পরিচিতি কিরূপে প্রকাশ করা যাইবে যখন আত্মা তন্ময় অবস্থায় মহামিলনকালে মহান স্রষ্টার সহিত কথোপকথনে নিমগ্ন হয়, তখনকার এই মহানিমগ্নতা ও তন্ময়তার বিবরণ দিয়াছেন সর্বাগ্রে রাবি'আ, মুহাসিবী ও য়াহ্‌য়া রাযী (র)। ইহাই সেই মাকাম যেইখানে উপনীত হইলে আল্লাহ্‌র ফায়দ-এর প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করিয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র সহিত আলাপচারিতায় ধন্য হওয়ার (শাতহ সিকারো দ্র.) জটিল ও কঠিন সমস্যা দেখা দেয়।

ঐ সময় হইতে সূফীগণ প্রচলিত ধর্মীয় পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং তাঁহারা প্রচলিত ধর্মীয় পরিভাষা ভাণ্ডার হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিভাষাসমূহ আহরণ করিতে লাগিলেন এবং সেইগুলির অর্থে সামান্য রদবদল করিয়া কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ণীত না করিয়া (মোটামুটিভাবে নিজেদের মনঃপুত অর্থে) ব্যবহার করিলেন; যেমন শাকীক (র) 'তাওয়াক্‌কুল' শব্দটি, (যু'ন্-নূন) মিস্‌রী ও ইব্‌ন কার্‌রাম (র) 'মা'রিফাত' শব্দটি, যু'ন্-নূন মিস্‌রী ও বিস্‌তামী (র) "ফানা' শব্দটি (بقاء-বাকা'-এর বিপরীত; তু. পবিত্র কুরআনের ৫৫ ঃ ২৬-২৭ আয়াত (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ الخ) খার্‌রায 'আয়নু'ল-জাম্' (عين الجمع) শব্দটি এবং তিরমিযী (র) 'বিলায়া (বিলায়াত) শব্দটি। এইভাবে এই ধরনের অন্যান্য পরিভাষার উদ্ভব হয়। পরিভাষা ব্যবহারে এই (অপরিকল্পিত) পন্থা অনুসরণের পরিণতি এই দাঁড়াইল যে, প্রথম যুগের ইসলামী তাসাওউফ প্রথম যুগের কালাম শাস্ত্রবিদদের অতি জাগতিক (আত্মবিষয়ক) চিন্তাধারা (অর্থাৎ (جوهر الفرد) অবিভাজ্য পরমাণু মূল) তথা مادیت-জড়বাদ ও দেহতত্ত্ব এবং اتفاق-ঘটনাচক্র জাতীয় বিষয়সমূহের সহিত সামঞ্জস্যের কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেননা কালাম শাস্ত্রীয় চিন্তাধারা আত্মার অজড় হওয়াকে বরং উহার নিত্যতাকে অস্বীকার করে এবং এই চিন্তাধারা অস্তিত্বের এককত্ব (ontalogical unity) ও সংখ্যার এককত্বকে পরস্পরের সহিত বিজড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহাতে অনিবার্যভাবে ইসলামে সূফীকুলের প্রথম বিদ্যাপীঠের পরিচালিত ব্যাখ্যামূলক প্রচেষ্টাসমূহকে অনুপ্রবিষ্ট মহামিলন-এর সহিত সহাবস্থানের অবকাশ প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি কার্‌রামিয়্যাদের মতাদর্শ বিবেচনা করি তবে তাহারা এই বিষয়টিতে জোর দিতে চায় যে, প্রকৃতপক্ষে আত্মা ও রূহ্ সৃষ্টিতে আল্লাহ্ পাকের একটি বিশেষ মহিমার প্রকাশ ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে আশ'আরীগণ তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করেন যে, তাহারা (আল্লাহ্‌র) অনাদি-অবিনশ্বর সত্তায় ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর (عرض) বিষয় সংযোজিত করিয়াছে। কিংবা সালিমিয়্যাদের দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়, যাহারা এইরূপ বলিতে আগ্রহী যে, উচ্ছল প্রাণবন্ত আত্মাগুলির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত সান্নিধ্যে উপনীত ও 'মিলনরত' থাকা সম্ভাব্য ব্যাপার। অথচ তাহাদের বিপক্ষে হাম্বালীগণের অভিমত কি এই যে, আল্লাহ্‌র যিকির-ই মা'রিফাতে ইলাহী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভের উপায়। কিংবা হাল্লাজীদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা যায়, তাহারা 'আত্মার তন্ময়তা কালে আল্লাহ্‌র সংগে সরাসরি কথোপকথন'-এর সূত্র ধরিয়া কিংবা এই তন্ময়তা কালে তন্ময় ব্যক্তির আত্মার সুগভীরে যে অনুপম ভাব ও আবেগ জন্ম নেয়, উহার সূত্র ধরিয়া এই প্রতিফল আহরণ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক ওয়ালীগণের" (সূফী-দরবেশ ও আত্মহারা সাধক-বুযর্গগণের) প্রকৃতিতে তাঁহারা নিজেরই 'জীবন্ত' প্রত্যক্ষ নিদর্শন-পরিচিতি বহিঃপ্রকাশিত করিয়াছেন। (অথচ বাহ্যতই) এই মতবাদকে কুফরী ও নাস্তিক্যবাদ-এর অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া বলা হয় যে, (নিরাকার অনন্ত আল্লাহ্‌র এহেন শান্ত স্বাকার) বহিঃপ্রকাশ অসম্ভব। কেননা ইহার অর্থ তো এই যে, মানুষের নশ্বর (ও আকৃতিবান) দেহ (নিরাকার ও অবিনশ্বর) আল্লাহ্‌র আল্লাহী (খোদায়িত্ব) অপহরণ করিয়াছে। কারণ দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা [এবং তাহার একটি অনাদি অনন্ত স্রষ্টার এবং অন্যটি তাঁহারই সৃজিত সৃষ্টির] অভিন্ন মুহূর্তে অভিন্ন স্থানে অবস্থিতি গ্রহণ করিতে পারে না।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দর্শনের প্রতিপত্তির বদৌলতে যাহা প্রথম পর্যায়ের আদরিয়্যাহ্ কারামিতা (Gnostic) এবং তাবীব (চিকিৎসা বিজ্ঞানী) আর-রাযী হইতে শুরু করিয়া ইব্‌ন সীনা পর্যন্ত সমান্তরালভাবে অগ্রগতি লাভ করিতেছিল, আত্মা ও মনঃজগতের ভাববাদিতা (غير مارين) পরিব্যাপ্ত অনুধ্যান (عمومى تصورات) এবং মাধ্যমিক কার্যকারণ- পরম্পরা (سلس على ثانويه) সম্পর্কিত অধিক পরিশুদ্ধ অতি জাগতিক (আধিবিদ্যিক) পরিভাষাসমূহ গঠিত হইল। কিন্তু এই পরিভাষাগুলি পরবর্তী সময়ে এরিস্টোটলের বলিয়া কথিত কিতাবু'ল-ইলাহিয়্যাত, প্লেটোর মনস্তাত্ত্বিক ভাববাদ [Idealism এবং Plotinus -এর নির্গমন দর্শন (Emanation]- এর সহিত মিশ্রিত

হইয়া একাকার হইয়া যায় এবং এই পরিস্থিতি তাসাওউফের পরবর্তী ক্রমবিকাশে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। এই যুগের সূফী মাশাইখদের শীর্ষ মনীষীবর্গ সূফীবাদের একক সত্তা দর্শন (اتحاد) নিম্নে বর্ণিত তিনটি ব্যাখ্যা হইতে কোনটিকে গ্রহণ করিবেন সে ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন।

(ক) ইত্তিহাদিয়্যা ইব্নুন মাসার্‌রা ও ইখওয়ানু'স-সাফা হইতে ফারাবী ও ইব্ন কাসয়ী (Ibn Kasyi) পর্যন্ত এই মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, গ্রহীতা আত্মা (نفس منفعل- নিষ্ক্রিয় চিদাত্মা, প্রতিক্রিয়া গ্রহণকারী মানবাত্মা)-র উপরে দাতা সত্তা (عقل فعال আদি নীতি হইতে বিকীর্ণ চিদাত্মা বা করুণা বর্ষণকারী মূল সত্তা)-এর বিকীরণের ফলে সৃষ্ট (আধ্যাত্মিক) ভাবসমূহের বিশেষ বিশেষ আকৃতি পরিগ্রহ করাকে ইত্তিহাদ বলা হয়। عقل فعال-দাতা সত্তা বলিতে (স্রষ্টা আল্লাহ্‌র) ঐশী ফায়দ ও করুণাধারা (বিকীরণ) বুঝান উদ্দেশ্য এবং কারামিতা ও সালিমিয়্যাদের মতে নূরে মুহাম্মাদী (স)-ই হইল ঐশী ফায়দ।

(খ) ইশ্‌রাকিয়্যা-সুহ্‌রাওয়ারদী, হালাবী ও জিল্‌দাকী হইতে দাওওয়ানী ও সাদরু'দ-দীন শীরাযী (র) পর্যন্ত যাহারা রূহ্-এর সূক্ষ্ম অণুতুল্য দেহধারী হওয়া (تجوهر)-এর মতবাদ পোষণ করিতেন এবং বলিতেন যে, রূহ হইল ঐশী জ্যোতি (نور ايزدى)- এর সেই স্ফুলিংগ যাহার জীবন 'দাতা সত্তার', (সৃজনী চিদাত্মার) জ্যোতি বিকীরণে জ্যোতির্ময় হইয়া থাকে।

(গ) উসূলিয়্যা (اصوليه), ইব্ন সীনা হইতে ইব্ন তুফায়ল ও ইব্ন সাব'ঈন পর্যন্ত, যাহারা উহার ব্যাখ্যায় শুধু এতটুকু বলিয়া ক্ষান্ত দিয়াছেন যে, (সাধকের) রূহ-এর ঐশী সত্তার সহিত সাদৃশ্য সূচিত হয় এবং তখন এমন একটি মহা পরিব্যাপক সত্তার উপলব্ধি জন্মে যাহাতে সংখ্যা-পরিসংখ্যান (সংখ্যাবাচক হওয়া) বা অন্য কোন প্রকার অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নই অবশিষ্ট থাকে না (অর্থাৎ নিখিল অস্তিত্ব এক মহা অস্তিত্বে একাকার হইয়া যায়)। মোটামুটিভাবে এই বিষয়টিও দৃষ্টিতে রাখিতে হইবে যে, প্রথম পর্যায়ে ইব্ন সীনা কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদত্ত (নাজাত, কায়রো, পৃ. ৪০২ ও ৪৮১) এবং পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যাখ্যানকৃত (ইশারাত, অধ্যায় ৯, পৃ. ১১৮, তু. ইবনু'ল-আরাবী, তাজাল্লিয়াত) ইত্তিহাদিয়্যাদের এই মতাদর্শটি ইমাম গাযালী (র) (মাকাসিদু'ল-ফালাসিফা, পৃ. ৭৪) খণ্ডন করিয়াছেন। তদ্রূপ ইহাও লক্ষণীয় যে, ইব্ন সাব'ঈন, যিনি মৌল ধাতু-এর অনাদিত্ব ও অবিনশ্বরতার প্রবক্তা ছিলেন, তিনিও স্রষ্টার সত্তায় সৃষ্টিকুলের আকৃতি কিংবা তাহার একীভূত হওয়ার মূলনীতি ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই।

তাসাওউফ দর্শনের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতির তৃতীয় ও শেষ যুগের সূচনা ধরা হয় হি. সপ্তম (খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ) শতককে। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সূফী গোষ্ঠীটিকে তাহাদের প্রতিপক্ষরা যথার্থভাবেই সর্বেশ্বরবাদী নাম দিয়াছে। সর্বেশ্বরবাদ মতাদর্শের প্রবক্তাদের দাবি এই যে, ইহা কোন অভিনব মতবাদ নহে, বরং ইহার ইতিহাস অতি প্রাচীন। তাঁহারা এমনকি কুরআনের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা (তা'বীল)-ও নিজেদের অনুকূলে টানিয়া লইয়াছেন। যেমন ২ ঃ ১১৫ [যে দিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক, আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।]; এবং ২৮ ঃ ৮৮ [আল্লাহ্‌র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল ...]এবং ৫০ ঃ ১৬ [আমি তাহার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও তাঁহার নিকটতর] এবং এই ধরনের আরও কতক আয়াত। অনুরূপ তাঁহারা পূর্বসূরী আশ'আরী মুতাকাল্লিমদের এই অভিমতেরও ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে, সব ধরনের আত্মিক ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষরূপে ঐশী ক্রিয়াকর্ম। তদ্রূপ তাঁহারা প্রথম যুগের সূফী সাধক, যথা বিস্‌তামী ও হাল্লাজ (র) প্রমুখের অতিরঞ্জনযুক্ত বক্তব্য-বিবৃতিরও ব্যাখ্যা দেন। 'আয়নু'ল কুদাত হামাদানী যেইগুলির কিছু কিছু তাঁহার তাম্‌হীদাত কিতাবে সংকলিত করিয়াছেন। উহাতে উজূদ (وجود-সত্তা বা অস্তিত্ব)-কে ওয়াজ্‌দ (وجد-তন্ময়তা ও মত্ততা) হইতে রূপান্তরিত বলা হইয়াছে এবং হামাদানীও উহার অর্থ বলিতে সেই গুণাবলী বুঝাইয়াছেন যাহা আল্লাহ তা'আলা كن (কুন্) শব্দের বিপরীতে তাঁহার সৃষ্টিকে দান করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, এই মতাদর্শ হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং উহার উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, মুসলিম আদরিয়্যাদের (gnorticism), নূরে মুহাম্মাদীর মতাদর্শ হুবহু তদ্রূপ (ইব্ন রুশ্‌দও এই মতাদর্শের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। কেননা তাহাফুতু'ত-তাহাফুত্-এ তিনি এই কথার উপর জোর দিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র 'ইলমে অস্তিত্ববান হওয়া বিষয় (সত্তাসমূহের অস্তিত্বপ্রাপ্তির সর্বোচ্চ স্তর এবং আত্মাসমূহের ঐ 'ইলমের অধীনে এমনভাবে একীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় যেভাবে ক্রিয়া গ্রহণকারী গুণী সত্তা ক্রিয়াশীল গুণী সত্তার সহিত একীভূত হইয়া যায়)। ইবনু'ল-'আরাবীই (মৃ. ৬৭৮/১২৮০) সূফী জগতের প্রথম ব্যক্তি যিনি সর্বেশ্বরবাদের মূল ধারাসমূহ বিন্যস্ত ও বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ইব্নু'ল- 'আরাবীর মতে [ইব্ন তায়মিয়া (র) কর্তৃক প্রদত্ত যথার্থ বরাত অনুসারে] "সৃষ্টিকুলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে [হুবহু] স্রষ্টার অস্তিত্ব" (وجود المخلوقات عين وجود الخالق)। তাঁহার অভিমত এই যে, বস্তু নিচয় (সত্তা) আবশ্যিকরূপে স্রষ্টার জ্ঞান হইতে–যেইখানে তাহা শরীরী সত্তার আকৃতিতে অস্তিত্ববান (বিদ্যমান) ছিল, একটি ফায়দ (করুণা প্রবাহ)-এর আকারে আত্মপ্রকাশ করে; যাহা পাঁচটি স্তর কিংবা যুগক্রম অতিক্রম করিয়া উদ্ভাসিত হয়। এবং আর একটি অভিমত এই যে, প্রতিটি আত্মা (রূহ) একটি বিপরীতমুখী ও প্রতিআবর্তন (معكوس) পন্থায় এমন কতকগুলি স্তর অতিক্রম করিয়া (যেইগুলির মাঝে এক ধরনের যৌক্তিক [মানতিকী] ধারাবাহিকতা ও সংযোগ বন্ধন রহিয়াছে) পুনরায় ঐশী সত্তায় সম্মিলিত হয়। এই মতাদর্শটিতে, যাহা অদ্যাবধি বহু মুসলিম সূফী গ্রহণ করিয়াছেন, ফারগানী ও জীলী শুধু কয়েকটি সাধারণ উপধারা সংযোজিত করিয়াছেন। ফারসী ভাষার (মরমী) কবিগণ এই দর্শনটির অপূর্ণাংগ রূপকে তাঁহাদের কবিতায় একটি সহজ-সরল আকৃতিতে উপস্থাপন করিয়াছেন। এই সম্পর্কিত 'আত্তার ফারীদু'দ-দীন [মৃ. আনু. ১২৩০ খৃ.]-এর ধ্যান-ধারণাকে বিন্যস্ত করিয়া কাওনাবী [সাদরুদ-দীন, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক, মৃ. ৬৭৩/১২৭৫] এইভাবে বিবৃত করিয়াছেন, 'আল্লাহ্‌ই অস্তিত্ববান সত্তা, এই দৃষ্টিকোণ হইতে যে, তিনি সার্বিক-সমগ্র (كلى), অন্যের দ্বারা অস্তিত্ববান (قائم بالغير) নহেন, বরং স্বকীয় সত্তায় অস্তিত্ববান (قائم بالذات)। যেইভাবে সমুদ্র তাহার তরংগমালার অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইতে থাকে তদ্রূপ এই সমগ্র সত্তাটি নিখিল সৃষ্টির এককসমূহের চলমান (প্রকাশমান) আকৃতিসমূহের অভ্যন্তরে সর্বদা চলমান। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কাওরানী ইবরাহীম ইব্ন হাসান আশ্‌-শাহরাযূরী [মৃ. ১১০১/১৬৯০] এবং আন-নাবুলুসী ['আবদু'ল-গানী, ১১৪৩/১৭৩১] এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসী সুন্নী মুসলিমদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ ছড়াইয়া দিলেন যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে উহার সর্বাধিক শুদ্ধ

অর্থ ও প্রকৃত লক্ষ্য শুধু "ওয়াহদাতু'ল-উজূদ" (তথা একটি মাত্র সত্তার অস্তিত্ব থাকা) এই মতাদর্শের অধীনেই সম্ভবপর (তু. Massignon, Hallaj, পৃ. ৭৮৪-৭৯০)। তাঁহাদের মতে 'শাহাদাত' যাহার মাধ্যমে ইসলাম এক আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণরূপেই 'ওয়ারাউ'ল-ওয়ারা' (মহা গোপন ও "অতি নিকটবর্তী") হওয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নিজের সকল সৃষ্টির সহিত আল্লাহ্‌র সম্মিলন নিঃশর্ত ও সার্বিক সম্মিলন এবং সমগ্র অস্তিত্বময় জগত তাহাদের সার্বিক কর্মে যাহা তাহাদের দ্বারা প্রকাশমান ও সম্পাদিত হয় ঐশী বিকিরণ ক্ষেত্র মাত্র এবং সংগত এই যে, উহার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত সম্পন্ন করা হউক। তদ্রূপ স্থিরচিত্ততা (Quietigm- সুশান্ত আত্মা) দর্শনের মাধ্যমে–যাহা ফিক্‌হী ও শারী'আতী বিধিবিধানের ঊর্ধ্বে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা (ও তুষ্টির) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়–ইহা দ্বারাই সূফীবাদীদের সেই স্ববিরোধী ধ্যান-ধারণা বিন্যস্ত হইতে থাকে, যাহার একটি আওতায় ইবলীস শয়তানকে পর্যন্ত (আদামকে সিজদা করার নির্দেশ লংঘন করা সত্ত্বেও) আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত থাকার কারণে তাহার অসম সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ মহাবীর (فتوت-অপ্রতিরুদ্ধ ও অপরিমেয় তারুণ্য বা দুঃসাহসী আবদার) মর্যাদায় ভূষিত করিয়া পুনর্বহাল করা হইয়াছে (জীলী এই মতের সমর্থক ছিলেন)।

৫। তাসাওউফের আধ্যাত্মিক 'আমলসমূহের মধ্যে কতিপয় 'আমাল তো এমন রহিয়াছে যাহা মুসলমানদের জন্য ফরয এবং কতিপয় নফল (ঐচ্ছিক)। এই নফল 'আমলসমূহের মধ্যে 'ইস্‌মে যাত' অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের স্বকীয় সত্তা–নাম 'আল্লাহ্' যিকিরকে কুরআনে যাহার বারংবার তাকীদ দেওয়া হইয়াছে সূফীগণ সর্বযুগে আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্তির নিশ্চিত ও মোক্ষম মাধ্যম মনে করিয়াছেন, তাসাওউফের মাশাইখ অন্যান্য আসমাউ'ল-হুস্‌না (আল্লাহ্‌র গুণবাচক পুণ্য নামসমূহ)-এর যিকির (৭ ঃ ১৭৯), পবিত্র কুরআনের (সার্বক্ষণিক) তিলাওয়াত এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের বিরদ ও ওয়াজীফার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, যেইগুলি এখন বিভিন্ন আধ্যাত্মিক সিলসিলায় নির্ধারিত মা'মূল (দৈনন্দিন করণীয়)-রূপে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পূর্ণ একাগ্রতার সহিত 'ইবাদত (নফল) সম্পাদনের জন্য নির্জনতা ও একাকিত্ব সর্বাধিক সহায়ক হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে (নফল) সিয়াম পালন ইহাকে আরও সফলতা দান করে। অর্থাৎ উল্লিখিত অধ্যাত্ম সাধনার জন্য নির্জনবাস (খালওয়া বা ই'তিকাদ) (সিয়াম সহযোগে অধিক কার্যকর প্রমাণিত)। 'ইবাদাতে (আকর্ষণ ও পরিতৃপ্তি "লাভে)-র জন্য অন্যতম সহায়ক পন্থা তারীকাতের সহযাত্রীগণ (ইয়ারান-ই তারীকাত) সম্মিলিত হইয়া যিকির (-ই জালী)-এর মজলিস অনুষ্ঠান করা (দ্র. মুসলিম, যিক্‌র, অধ্যায় ৮)। মোটকথা (সূফীগণের যিকির ও শুগল কোন অভিনব বিষয় নহে, বরং) শেষ আয়াতটি নাযিল হওয়ার মুহূর্ত হইতে আজিকার এইক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী সূফীগণের যিকির-শুগলে কোনও মৌলিক রদবদল সূচিত হয় নাই।

৬। **তাসাওউফ মতাদর্শের বিন্যাস ও গঠন প্রক্রিয়া ঃ** অধ্যাত্ম জগতের সকল তথ্য ও তত্ত্ব যে সমগ্র মানব সমাজে প্রকাশ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে ইহা একটি বাস্তব সত্য। এই বিষয়টির বিভিন্ন ধর্মাধিকারিগণ বিভিন্নরূপে সমাধান করিয়াছেন। যেমন হযরত 'ঈসা ('আ) তাঁহার অনুগামীদের মাঝে বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্তদেরকে বলিতেছেন, "তোমাদের জন্য করুণা হইয়াছে যে, নভঃমণ্ডলের রাজত্বের রহস্য অবগত হইবে বটে, কিন্তু উহাদের জন্য এই করুণা হয় নাই" (মথি, ১৩ ঃ ১১)। সমগ্র মুসলিম মিল্লাতকে লক্ষ্য করিয়া পবিত্র কুরআনে বিষয়টি নিম্নরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ "আমি যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি, (পৃথিবীতে) প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের উপরে রহিয়াছে মহাজ্ঞানী" (১২ ঃ৭৬)।

হযরত 'ঈসা ('আ) যেইভাবে লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন উপমা ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেন, তদ্রূপ পবিত্র কুরআনও বড় ধরনের রহস্যাদি অলংকারপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণে উপস্থাপন করে। তদুপরি ইহা অবধারিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) ও অন্যান্য নবীগণ ('আ)-এর ন্যায় কোন কোন সময় বিশিষ্ট সঙ্গীদের এমন কতক বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকিবেন যাহা সাধারণ ঈমানদার শ্রেণীর জন্য অভীষ্ট ছিল না। এই ধরনের বিষয়সমূহের প্রতি ইংগিত করিয়াই হযরত 'আলী (রা) বলিয়াছেন, "মানুষদেরকে তাহাদের বোধশক্তির পরিমাণে হাদীছ ('ইল্‌মের কথা) শুনাইবে। তোমরা কি এমনটি পসন্দ কর যে, তাহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল (স.)-কে মিথ্যাভাষী প্রতিপন্ন করুক (বুখারী, 'ইল্‌ম অধ্যায়, ৭৯, ১খ, ২৭)? [তবে এইখানে ইহাও উল্লেখ্য যে, এই রহস্যাদি সাধারণভাবে শারী'আত পালনের জন্য অপরিহার্য কোন বিষয় নহে। কেননা দীন পালনকে আল্লাহ্ সহজ করিয়া দিয়াছেন (الدين يسر-বুখারী, ১খ, পৃ. ১০, কিতাবু'ল-ঈমান)।

অধ্যাত্মবিদগণের সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম মার্গ। প্রাচ্যবিদ (ওরিয়েন্টালিস্ট)-গণ সূফীবাদী সর্বেশ্বরবাদ (সবকিছুতে আল্লাহ্‌র বিরাজমানতা)-কে "Mystic union" নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহা মূলত আল-কুরআনে সর্বোচ্চ স্তরের আওলিয়া'র জন্য প্রদত্ত "আল-মুকার্‌রাবূন–"নৈকট্য প্রাপ্ত" উপাধিতে নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু এই উপাধিটিকে আল্লাহ্‌র 'নৈকট্য'-এর ব্যাখ্যার আলোকে অনুধাবন করিতে হইবে। نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ "আমি তাহার (মানুষের) গ্রীবাস্থিত, ধমনী অপেক্ষাও তাহার নিকটতর" (৫০ ঃ ১৬)। এই আয়াতটি দ্বারা সূফীদের ইত্তিহাদ ও ঐক্যের প্রকৃত অর্থও নির্ণীত হইয়া যায় যে, উহা নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতির তত্ত্বীয় কথা, যাহা (বস্তুগত জৈবিক ও আকারগত) উপলব্ধি নহে, (আত্মিক) অনুধাবন ও বোধ্যতা সম্ভবপর বিষয় এবং সেই সাথে এই সত্যায়ন ও বাস্তবতা যে, এই উপলব্ধি সূফীর নিজস্ব সাধনা-কীর্তি নহে, বরং আল্লাহ্ পাকের করুণা বর্ষণ, তাহা নিম্নের আয়াতে স্পষ্টত প্রকাশ করা হইয়াছে لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ "তিনি দৃষ্টিগুলির অধিগম্য নহেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিগুলি তাঁহার অধিগত" (অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের দৃষ্টি তাঁহাকে আহরণ অনুধাবন করিতে পারে না, কিন্তু (তাহাদের) দৃষ্টিগুলি তো তাঁহার আয়ত্ত-বিদিত)] (৬ ঃ ১০৩)।

এইভাবে বলা যায় যে, তাসাওউফের পূর্ণ রূপরেখা এই হাদীছে কুদসীতে সমন্বিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে (অনু.) ঃ 'আমার বান্দা নফল ('ইবাদাত)-সমূহ দ্বারা আমার নৈকট্য (তুষ্টি) অর্জন করিতে থাকে। এমন কি আমি তাহাদের ভালবাসিতে শুরু করি এবং আমি যখন তাহাদের ভালবাসিয়া ফেলি তখন আমি তাহার কান হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে শুনে এবং তাহার চক্ষু হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে দেখে এবং তাহার হাত হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে ধরে এবং তাহার পা হইয়া যাই যাহা দ্বারা সে হাঁটে (বুখারী, ৮১ (?) কিতাবু'র-রিকাক, ৩৮)।

যেই সকল ভাষ্যমূল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা জানিবার আমাদের কোন উপায় নাই। তবুও সাধারণভাবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রথম দুই শতক যাবত তাসাওউফ মতবাদ উপস্থাপনের জন্য যে সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী ব্যবহার করা হইত তখন সেইগুলিকে যথেষ্ট মনে করা হইত এবং (পরবর্তী) সূফীগণ এই বিষয়টির স্বীকারোক্তি দিয়াছেন যে, বর্ণনা দুঃসাধ্য তত্ত্বসমূহ প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় ঐ ধরনের বাক্যাবলীতে সীমাবদ্ধতা কম থাকিত, কিন্তু ক্রমান্বয়ে যখন দিনের পর দিন ধরিয়া এই মতবাদটির সূক্ষ্ম তথ্যমালার প্রসার ব্যাপক হইতে লাগিল এবং উহা অবিদ্বানসুলভ জ্ঞান-বিতর্কের আলোচ্যসূচীতে স্থান পাইতে লাগিল তখন সূফীবাদের মাশাইখ-এর জন্য নিজেদের আদর্শ-বিশ্বাস স্পষ্টতর ভাষায় ব্যক্ত করা অপরিহার্য হইয়া পড়িল। প্রাচীন সূফীগণের শিক্ষা ও নীতিবাক্য সংকলনকারীদের তালিকা শীর্ষে রহিয়াছেন মুহাসিবী (মৃ. ২৪৩ হি.) (র) যাঁহার গ্রন্থ আর-রি'আয়া (ওয়াক্‌ফিয়্যা-ই গিরমু.)-এ তিনি তাসাওউফ নীতি দর্শনের নিরীক্ষামূলক পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং উহাতে 'আত্মবিশ্লেষণ' (নিজের চব্বিশ ঘণ্টার সর্ব কর্ম নিজেই যাচাই-বাছাই ও হিসাব-নিকাশ করিবার ও 'স্বজওয়াবাদিহি'-র পদ্ধতি-মুহাসাবা)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই 'মুহাসাবা' দর্শনের কারণেই তিনি (ও তাঁহার অনুসারীবর্গ) 'মুহাসিবী' নামে অভিহিত হইয়াছেন [দ্র. সাম'আনী', সংশ্লিষ্ট শব্দ শিরো.]। তিনি নিজের জীবনের দ্বিতীয় (ও বৃহত্তর) অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন বাগদাদে, যাহা অনতিবিলম্বে তাসাওউফের বৃহত্তম কেন্দ্রগুলির অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যেইখানে জুনায়দ (র) [মৃ. ২৯৭ হি.] এক দীর্ঘ সময়য় তাঁহার মুরীদরূপে অবস্থান করেন। জুনায়দ (র) তাওহীদ এবং 'ফানা'-র মতাদর্শগুলি এমনভাবে বিশ্লেষণ করিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের 'আলিমগণ এই ব্যাপারে স্বস্তি লাভ করিলেন যে, তাসাওউফ মতবাদ সুন্নাতের অনুকূল। সূফীকুলের সকল সিলসিলার সনদ ও যোগসূত্র জুনায়দ পর্যন্ত উপনীত হয়।

৭। **তাসাওউফ সংক্রান্ত রচনাবলীর অধ্যয়ন ঃ** চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীকালে তাসাওউফ দর্শন আরও বিস্তৃত পরিসরে সংকলিত হইতে থাকে। এই সময়কার সংকলনের বৃহত্তম অংশ জুড়িয়া রহিয়াছে পরিভাষাসমূহের সংজ্ঞা ও পরিচিতি। ইহা ছাড়া উহাতে পূর্বসূরী সূফীগণ সম্পর্কে ঘটনাবলী ও তাঁহাদের রচনাবলীর [কিংবা মালফূজাত ও বাণীমালার] উদ্ধৃতিসমূহের মূল্যবান সংযোজন অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আবূ নাস্‌র সার্‌রাজ আত-তূসী (র) [মৃ. ৩৭৮ হি.] সম্ভবত তাঁহার কিতাবু'ল-লুমা' বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। কেননা জীবনে তিনি অনেকবার সুদীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কালাবাযী (র.) [মৃ. ৩৮০ হি.] তাঁহার কিতাবু'ত-তা'আর্‌রুফ লিখিয়াছিলেন বুখারায়; আবূ তালিব আল্‌-মাক্‌কী (র) [মৃ. ৩৮৬ হি.] 'তাঁহার কূতু'ল-কুলূব' লিখিয়াছিলেন যথাসম্ভব বাগদাদে; সুলামী 'তাবাকাতু'স-সুফিয়্যা' লিখিয়াছিলেন নীশাপুরে; হিল্‌য়াতু'ল-আওলিয়া' লিখিয়াছেন আবূ নু'আয়ম (মৃ. ৩৪০ হি.) আল্‌-ইস্‌ফাহানী ইসফাহানে; কুশায়রী (র) [মৃ. ৪৬৫ হি.] নীশাপুরে তাঁহার আর-রিসালা এবং হুজ্‌বীরী (র) [মৃ. ৪৭০ হি. (?)/ ৪৬৫ হি.] তাঁহার ফারসী গ্রন্থ কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌জূব লাহোরে [?] প্রণয়ন করেন। পঞ্চম হিজরী শতকের শেষভাগে বাগদাদের জন্য এই বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছিল যে, সেইখানে ইমাম গাযালী (র) [মৃ. ৫০৫ হি.]-এর শিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছিল ও তাঁহার রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার কতিপয় রচনা বিশেষত, ইহ্‌য়া' 'উলূমি'দ-দীন ও আল-মুনকিয' মিনা'দ দালাল-এ সমগ্র উম্মাতের প্রতি সম্বোধন রহিয়াছে। তিনি স্বরচিত আত্মজীবন-চরিত আল্‌-মুনকিয-এর মাধ্যমে এই চিন্তাধারার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন যে, তাসাওউফসমৃদ্ধ জীবন উচ্চতম জীবন। ইহা ছিল গাযালী (র)-এর লক্ষ্য, না বরং বলা উচিত তাঁহার জীবন ব্রত (وظيفه حيات)। তিনি চিন্তা চেতনার বিশৃংখলা ও অরাজকতার যুগেও নিজের অভীষ্টে সম্ভাব্য পরিমাণ সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি অধ্যাত্মবাদের প্রচলিত স্তরটিকে উন্নীত করেন এবং এইভাবে বলা যায় যে, ইসলামী মিল্লাতের মাঝে উহার (হারাইয়া যাওয়া) সূফীসুলভ প্রভাবসম্পন্ন মনমানসিকতা পুনর্বহাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শায়খ 'আবদু'ল-কাদির আল-জীলানী (র) [মৃ. ৫৬১ হি.] পূর্বসূরীর আরব্ধ কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবুও তাঁহার যেই সকল রচনা আমরা পাইয়াছি সেইগুলি দ্বারা ইসলামে সূফীবাদের মূল ধারা পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে অগ্রগামী ভূমিকায় অবতীর্ণ এই মহাপুরুষের জীবন সত্তা যেই পরিমাণ আলো বিকীরণ ও জ্যোতি বিচ্ছুরণ করিয়াছিল, তাহা দ্বারা উল্লিখিত ব্যাপারে একটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র করা যাইতে পারে। জনসাধারণে তিনি 'সুলতানু'ল-আওলিয়া' (ওয়ালীকুল সম্রাট) উপাধিতে খ্যাতিমান হইয়াছিলেন।

শায়খ 'আবদু'ল-কাদির আল্‌-জীলানী (র)-এর বিশিষ্ট রূহানী শাগরিদদের মধ্যে মুহ্‌য়ি'দ-দীন ইবনু'ল-'আরাবী (র) [মৃ. ৬৩৮ হি.] -এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সূফীগণ যাঁহাকে শায়খ-ই আক্‌বার (আশ্‌-শায়খু'ল-আক্‌বার) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। 'ওয়াহ্‌দাতু'ল-উজূদ মতাদর্শটি অবশ্য তিনিই প্রথম পুরাপুরি বিন্যস্ত ও বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূলত 'আকীদাটি পূর্বাপর তাসাওউফে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার পূর্বে তুস্‌তারী (মৃ. ২৮৩ হি.) ও সালিমিয়্যাপন্থিগণ বিষয়টি স্পষ্টরূপে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। হাল্লাজ (মৃ. ৩০৯ হি.), ইমাম গাযালী (র)-ও (মিশকাতু'ল-আন্‌ওয়ার-এ) এই 'আকীদার সমর্থক ছিলেন।

এই জগতের বাহিরে মহাবিশ্বে রহিয়াছে এক মহাকাল বা অনন্তকাল, যাহা সদা বর্তমান (বা নিরবচ্ছিন্ন বর্তমান)। সেই মহাকাল বা অনন্ত বর্তমান (Eternal Present)-এ এই নশ্বর বিশ্বের ধ্বংসশীল ও বিলীয়মান সকল কিছুই পূর্ব হইতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। শুধু মহান মহিমময় প্রতিপালকের সত্তাই অবিনশ্বর, কালোর্ধ, অনন্ত। এইভাবে সত্তা ও অস্তিত্বের ঐক্য (ওয়াহ্‌দাতু'ল-উজূদ)-এর পরিভাষাটি এই বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করিয়া দেয় যে, সৃজিত 'বহু'-র কাল্পনিক যবনিকার অন্তরালে শুধু একমাত্র বাস্তব 'এক' বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহার অর্থ এই নহে যে, আল্লাহ কতকগুলি অংশের সমন্বয় এবং "বিশ্ব সৃষ্টি'-র বহুবিধ ও দৃশ্যত পৃথক পৃথক 'দৃষ্ট সাকার'-এর পরিসীমার অপর দিকে 'অসীম ইলাহী (স্রষ্টাত্ব) পরিপূর্ণতা' স্বীয় ও স্বকীয় সংখ্যাতীত ও 'অবিভাজ্য ব্যাপকতা'য় বিদ্যমান (অস্তিত্বময়) রহিয়াছে। যদি এমন না হইত অর্থাৎ যদি এমন কোন অস্তিত্ব (উজূদ) থাকিত যাহা 'সদা বর্তমান'-এর 'বাস্তবতা'-র সহিত নিজেকে 'আল্লাহ ব্যতীত' (গায়রুল্লাহ)-রূপে প্রকাশ করিতে পারিত তাহা হইলে তো আল্লাহ অনন্ত অসীম হইতেন না। কেননা এইরূপ পরিস্থিতিতে 'অনন্ততা' ও 'অসীমতা' আল্লাহ (নামের সত্তা) এবং আলোচিত বিশেষ সত্তা–এই দুইকেই অন্তর্ভুক্ত করিত। নিঃসন্দেহে ইব্‌নু'ল'আরাবীর আংশিক লক্ষ্য ছিল [গ্রীক দর্শনজাত আল্লাহ অনন্ত সত্তার বিশ্বাসে ধূম্রজাল সৃষ্টি হইতে] "আল্লাহ তা'আলার অসীমত্ব ও অনন্ততার ধ্যান-ধারণার সমর্থন ও সংরক্ষণ করা, যাহা নিম্নের হাদীছে প্রকাশ করা হইয়াছে ঃ 'আল্লাহ ছিলেন, তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না" (বুখারী, ৫৯, খাল্‌ক; (১) এবং এই হাদীছের ব্যাখ্যায় খোদ নবী

কারীম (স) হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে– "তিনি এই মুহূর্তেও তেমনই রহিয়াছেন যেমন 'কখনও' ছিলেন (الان كما كان)। এই কারণেই ইবনু'ল- 'আরাবী এই 'আকীদাটির ব্যাপারে তাঁহার পূর্বসূরীদের তুলনায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কেননা দিনে দিনে তাওহীদ (একত্ববাদ) 'আকীদার বিশ্লেষণ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পরিষ্কার 'সংখ্যার মানদণ্ডে" অর্থাৎ 'এক' সংখ্যা দ্বারা করিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছিল [অথচ 'এক' একটি সীমিত সংখ্যা, আর আল্লাহ সসীম নহেন]। তবে 'একীভূত সত্তা'-য় অনমনীয়তা প্রদর্শনের একটি বিশেষ নীতিগত গুরুত্বও রহিয়াছে। কেননা ইহাতে তাসাওউফের সড়কে পদচারণাকারী যে কোন ব্যক্তি সকল সময় নিজেকে কার্যত না হইলেও নীতিগতভাবে অন্তত (তাৎক্ষণিকরূপে না হইলে যথাসময়ে) সদা বর্তমান ও অনন্ত অবস্থানে রাখিতে বাধ্য হইত যাহা তাসাওউফের সকল প্রকারেরই শেষ মনযিল এবং যাহা ব্যতীত এই মতাদর্শটি অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইব্নু'ল 'আরাবীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, "ধরুন যদি আপনি পায়খানা (মল) কিংবা কোন মৃতদেহ দেখিতে পান তবে কি আপনি সেই (ঘৃণ্য ও দুর্গন্ধযুক্ত বিষয়)-টিকে 'আল্লাহ' বলিবেন? তখন তিনি জওয়াব দিলেন, আস্তাগ্ফিরুল্লাহ! আল্লাহ ক্ষমা করুন। তাহা বলিতে যাইব কেন? আল্লাহ তেমন হইবেন কিরূপে? আমাদের বক্তব্যের ধারা তো সেই ব্যক্তির দিকে যে আবর্জনা-পায়খানাকে পায়খানারূপে এবং মৃতদেহকে মৃতদেহ হিসাবে দেখেই না। আমাদের বক্তব্যের বিষয় সেই ব্যক্তি যাহার 'দৃষ্টি' রহিয়াছে এবং জন্মান্ধ নহে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য মতাদর্শটি এতদসম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের (ওরিয়েন্টালিস্ট) ধারণাকৃত দার্শনিক সূত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সূফীবাদের অন্যান্য মাশাইখও অবিকল অভিন্ন লক্ষ্যে নিজেদের মুরীদগণকে এই শিক্ষা দিতেন, "বাকল ছুঁড়িয়া ফেল এবং মগয (মজ্জা) গ্রহণ কর।" ওয়াহদাতু'ল- উজূদ মতাদর্শের মনোহর বর্ণনা পাওয়া যাইবে ইবনু'ল-'আরাবীর সমসাময়িক দুই কবির রচনায় অর্থাৎ 'উমার ইব্নু'ল-ফারিদ মিসরী (মৃ. ৬৩২ হি.) ও জালালু'দ-দীন রূমী (মৃ. ৬৭২ হি.)-এর রচনাবলীতে। ইহা ছাড়া সেই যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অধিকাংশ মাশাইখের শিক্ষা ও রচনায়ও এই দর্শনটি আরও স্পষ্টতর হইয়াছে। ওয়াহদাতু'ল-উজূদ হইতে ভিন্ন ওয়াহদাতু'শ-শুহূদ নামে আর একটি মতবাদ শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (র) [দ্র.] প্রবর্তন করেন। ইহার অর্থ আল্লাহ হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি।

পূর্ণাংগ মানব (আল-ইনসানুল-কামিল)-এর ধারণাটি সুদূর অতীত হইতে সূফীগণের শিক্ষা-দীক্ষার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে অর্থাৎ এইরূপ ধারণা যে, পূর্ণাংগ মানব একটি বিশ্বজনীন ব্যক্তিত্বের বাহক (অধিকারী) হইয়া থাকেন, তিনি সূফীবাদী একতার প্রতিকৃতি হইয়া থাকেন এবং সর্বযুগে সূফীকুলের মতে উহার 'বাস্তব রূপ' হইলেন হযরত মুহাম্মাদ মুসতাফা (স)। হাল্লাজ (র) তাঁহার কিতাবু'ত -তাওয়াসীন-এ ও ইব্নু'ল-'আরাবী (র) তাঁহার ফুসূসু'ল-হিকাম-এ এই বিশ্বাসটি জোরদাররূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে পূর্ণ ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্টতার সহিত বিষয়টি উপস্থাপন করিয়াছেন 'আবদু'ল-কারীম আল্-জীলী (মৃ. ৮১০ হি. পরিসীমায়) তাঁহার রিসালা 'আল্-ইনসানু'ল কামিল-এ।

৮। তাসাওউফ ও মুসলিম মিল্লাতের অন্যান্য শাখা ঃ তাসাওউফ মূলত সুন্নী (আহ্লুস-সুন্নাহ) মুসলিমদের নীতি-আদর্শের আবশ্যিক (অবিচ্ছেদ্য) অংগ। ফিক্হ শাস্ত্রীয় ইমামদের অনেকে নিজেরাও তাসাওউফ-এর বিভিন্ন তারীকার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। যুন্-নূন মিসরী (মৃ. ২৪৫ হি.) ও হাল্লাজ (র)-এর বিরুদ্ধে বাগদাদের কাযীগণের আদালতে দায়েরকৃত মামলার কারণে সৃষ্ট যে টানাপোড়েন ও মতদ্বৈধতার তথ্য পাওয়া যায় তাহা শুধু ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিংবা শুধু 'আকীদা-বিশ্বাসের বিশেষ প্রকাশভংগীর সহিত সম্পৃক্ত [অর্থাৎ সূফীবাদের প্রতি অস্বীকৃতি কিংবা সূফীদের প্রত্যাখ্যান বা কাহারও প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে নহে, বরং একটি যথার্থ 'আকীদার প্রকাশ ধরন অসিদ্ধ বিবেচিত হওয়ায় তাঁহারা বিচারের সম্মুখীন হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা নৈতিকভাবে নির্দোষ হইলেও আইনের ধারা তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া অবকাশ দিতেছিল না]। যেমন ইব্নু'ল-জাওযীকেই ধরুন, তিনি তাঁহার তালবীসু ইবলীস গ্রন্থে তাসাওউফের কোন কোন প্রকাশ পন্থার সমালোচনা করিয়াছেন কিংবা ইব্ন তায়মিয়াকেই নিন, যিনি 'ওয়াহ্দাতু'ল-উজূদ' 'আকীদার সূত্রে ইবনু'ল-'আরাবীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছেন। এই দুইজনই পূর্বযুগের সূফীগণকে অত্যন্ত মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। অন্যদিকে ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর শাগরিদ ইব্নু'ল-কায়্যিম আল-জাওযী (র) জনৈক হাম্বালী সূফী 'আবদুল্লাহ আল-হারাবী (মৃ. ৪১৮ হি.)-এর কিতাব মানাযিলু'স-সাইরীন-এর ব্যাখ্যায় তিন ধরনের সূফীদের কথা আলোচনা করিয়াছেন এবং এইরূপ স্বীকারোক্তি দিয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীর সূফীদের সামনে শীর্ষস্থানীয় ফকীহ ও মুতাকাল্লিমগণের মাথাও অবনত হয়। তদ্রূপ অনেক পরবর্তী সময়ে (মুফ্তী) মুহাম্মাদ 'আবদুহ্ (মৃ. ১৩২৩ হি.) ব্যাপকভাবে যাঁহাকে তাসাওউফের কট্টর বিরোধী মনে করা হইত, অথচ তিনিও অতখানি বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না। ইহার প্রমাণ এই যে, মুদ্রিত 'মাকামাত'-এ (বৈরূত ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ২১, টীকা ৭) 'সূফী' শব্দ সংশ্লিষ্ট একটি পাদটীকায় লিখিয়াছেন, "সূফীগণের মধ্যে যে 'আরিফ (আল্লাহ্র মা'রিফাত ও পরিচয় লাভকারী) সুলূক ও অধ্যাত্ম সাধনার শেষ মনযিলে উপনীত হইয়াছেন, নবীগণ ('আ)-এর পরে তাঁহারাই মানবিক পূর্ণতার উন্নততর সোপানে উপনীত হওয়ার সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। সুন্নী মুসলিমদের (আহ্লুস-সুন্নাহ) মধ্যে যাঁহারা সামগ্রিকভাবে তাসাওউফের বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন 'আহ্লে হাদীছ জামা'আত (প্রাচীন জাহিরী), যদিও Massignon-এর বর্ণনামতে এই জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা নিজেই হাতিম আল-আসাম্ম (মৃ. ২৩৭)-এর নামে শাকীক আল-বালখী (মৃ. ১৯৪ হি.)-এর 'ওয়াসিয়াত'-র ব্যাখ্যা (শার্হ্) লিখিয়াছিলেন।

বহমান নিবন্ধের শুরুতে তাসাওউফের ছত্রছায়ায় শী'আবাদের সূচনা সম্পর্কে যাহা লিখা হইয়াছে উহার সহিত এই পরিবর্ধন সংযোজিত করা যায় যে, প্রথম দুই শতাব্দীতে দুই পক্ষের (সূফী ও শী'আ) মাঝে প্রতিটি স্বতন্ত্র বিষয়ে ব্যবধান ও মতপার্থক্য মোটেই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষণযোগ্য ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইমাম জা'ফার আস-সাদিক (র) [মৃ. ১৪৮ হি.] যাঁহার সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁহার সূত্রে এমন হাদীছ সমষ্টি বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে কুরআনের আয়াতসমূহের সূফীসুলভ পন্থায় ব্যাখ্যা (তাফসীর) করা হইয়াছে। প্রায় সুনিশ্চিত হইয়া বলা যায় যে, ঐ সকল হাদীছ শী'আবাদের তুলনায় তাসাওউফের নিকটতর ছিল। তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে শী'আ চিন্তাধারা বিন্যস্ত রূপরেখা পরিগ্রহ করে এবং তাহা এই যে, তাসাওউফ অকাট্যরূপে অপসন্দনীয় মতবাদ। ইহার প্রতিপক্ষে এই কথাও স্মরণ রাখিবার যোগ্য যে, সাফাবী তারীকা যদিও অন্যতম সুন্নী (শী'আ বিপরীতে) মনীষী সাফিয়্যু'দ-দীন ইসহাক (র) [মৃ. ৭৩৫ হি.] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ষষ্ঠ পুরুষে তাঁহার (রূহানী)

আওলাদ অর্থাৎ সাফাবীদের নেতৃত্বে পরিচালনায় এই তরীকার অধিকাংশ সদস্য তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রভাবশালী শী'আ মুজাহিদীনরূপে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন।

৯। **প্রাচ্যবিদগণের বক্তব্য বিবৃতি ঃ** তাসাওউফের প্রকরণই কতকটা এমন যে, বর্তমান যুগের গবেষকদের গবেষণা পদ্ধতি এবং তাঁহাদের সমানুপাতিক পর্যবেক্ষণ ও ধ্যানধারণা সম্ভবত বিষয়টিকে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় (অতি) অল্পই নিজেদের করতলগত করিতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের এই অবদান প্রশংসার্হ যে, তাঁহারা অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যায় তাসাওউফের কিতাবগুলিও ভাষান্তরিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের শ্রুটি-বিচ্যুতিও এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, সেইগুলির তালিকা উপস্থাপন করা যায়।

(ক) তাসাওউফের অর্থ [সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া উহার প্রসারতা নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিয়া] মর্ম প্রকাশে উহার প্রসারতাকে ক্ষুণ্নকারী পারিপার্শ্বিকতাযুক্ত ও একপার্শ্বিক অর্থ করিবার অবচেতন প্রবণতা, যাহার কারণে উহার ইংরেজী প্রতিশব্দ (পরিভাষা) Mysticism-এর মর্ম শুধু পশ্চিম য়ুরোপেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

(খ) তাসাওউফ মতবাদ ও একটি দার্শনিক ধারার মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে ব্যর্থতা।

(গ) ফলত এই কথাটি বুঝিতে ও অনুধাবনে অপারগতা যে, সূফীবাদ অনুসারী ব্যক্তি (সূফী/সালিক) প্রতিনিয়ত একটি লক্ষ্য ও দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করিয়া অন্য (পরবর্তী) লক্ষ্য ও দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করিতে থাকেন এবং প্রতিটি লক্ষ্যকে এমনভাবে মনপ্রাণ নিবেদিত করিয়া গ্রহণ করেন যে, শুধু 'সূফী'ই তাহা করিবার ও বুঝিবার যোগ্যতাধারী এবং তাহারা অধিকাংশ সময় (বিশেষত সে সূফী 'আরব দেশীয় হইলে) এমন নির্দ্ধিধায় ভাষা ও ভাবে সেই লক্ষ্য ও দৃষ্টিকোণের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন যে, যেন উহা ব্যতীত আর কোন লক্ষ্য সম্ভবই নহে।

(ঘ) বর্তমানের গবেষকবৃন্দ, যাঁহারা সর্বত্র দলবদ্ধতার ব্যাপারে অতিশয় আগ্রহী, তাহারা সূফীদের বাহ্য মতপার্থক্যের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া তাহাদিগকে দুইটি দল মনে করেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, বাহ্যত বিপরীতমুখী দুইটি সূফী মতাদর্শে মৌলিকভাবে যে আদর্শিক ও বিশ্বাসগত মিল বা সাজুয্য রহিয়াছে তাহা অনুধাবনে গবেষকগণ বিচ্যুতির শিকার হইয়া থাকেন।

(ঙ) গবেষকগণকে এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্ব প্রকারের তাসাওউফে 'নীরবতা' (আত্মপ্রকাশ না করা) অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা (গবেষকরা) এই বিষয়টিতেও ভুল করিয়া বসেন যে, তাসাওউফ বিষয়ের সাহিত্য ও তাসাওউফের ইতিহাস সমার্থক নহে [এবং লিখিত উপকরণ ও ভাষ্য কখনও তাসাওউফের অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের সঠিক রূপরেখা তুলিয়া ধরিতে পারে না]।

(চ) চার শতাব্দীব্যাপী অবিরাম গোষ্ঠীবিদ্বেষ সঞ্চিত হইতে থাকে। প্রথমে যাহার প্রবণতা ছিল 'মানবতাবাদ' (humanism)-এর প্রতি, পরে (ক্রম) বিবর্তনবাদ (evolutionism)-এর মতবাদ উহাকে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর করিয়া দেয়। সুতরাং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ এই বিষয়টি বুঝিতেই অপারগ ছিলেন যে, আধ্যাত্মিকতার এমন কোন রূপরেখাও থাকিতে পারে যাহাতে কোন প্রকার ক্রম-উন্নতির পন্থা ব্যতিরেকে প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই কোন কিছু তাহার পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হইতে পারে।

(ছ) ইহার পরিণতি এই হইয়াছে যে, খোদ সূফীগণ তাসাওউফের প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে যে ঐকমত্যের প্রকাশ ঘটাইয়াছেন প্রাচ্যবিদগণ তাহা একেবারে উপেক্ষা করিয়া থাকেন [এবং নিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যা প্রদানে সচেষ্ট হন]।

১০। **তাসাওউফের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং উহার উৎসমালার অধ্যয়ন ঃ** তাসাওউফ মতাদর্শের অন্য যে সকল বৈশিষ্ট্যের আলোচনা এই যাবত অবশিষ্ট রহিয়াছে সেইগুলি নিম্নরূপ ঃ (ক) ইসনাদ বা সূত্রপরম্পরা হাদীছশাস্ত্রের ন্যায় তাসাওউফের ক্ষেত্রেও এমন ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে যে, সূফীবাদের মাশাইখ-এর শিক্ষা-দীক্ষার আধ্যাত্মিক সিলসিলা (ধারাবাহিকতা) সরাসরি নবী কারীম (স)-এর শিক্ষা-দীক্ষার সহিত সম্পৃক্ত ও সম্পর্কযুক্ত রহিয়াছে। প্রাচীনতম ইসনাদ (উত্তরসুরিদের পরিভাষায় শাজারা) আমরা পাইয়া থাকি খুল্লাদীর (মৃ. ৩৪৮/৯৫৯) সূত্রে (ফিহ্‌রিস্‌ত, পৃ. ১৮৩)। তিনি নিম্নবর্ণিত মাধ্যম পরম্পরায় উহা নবী কারীম (স) পর্যন্ত পৌছাইয়াছেন। জুনায়দ (৭), সাকাতী (৬), মা'রূফ কারখী (৫), ফারকাদ (৪), হাসান বস্‌রী (৩), আনাস ইব্‌ন মালিক (২) (র)। ফিহ্‌রিস্‌ত-এ ইহার পরবর্তী বর্ণনায় শুধু রহিয়াছে এবং মালিক (র) সত্তর জন বদরী সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ "কোন ব্যক্তির নাম উল্লিখিত হয় নাই।...বিশ বৎসর পর দাক্কাক (র) (মৃ. ৪০৬ অথবা ৪১২ হি., তু. কুশায়রী, পৃ. ১১৮) ও তাঁহার সিলসিলায় এই নামগুলিই উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু এতটুকু পার্থক্য রহিয়াছে যে, তিনি কারখী (র)-এর পূর্ববর্তী নাম দাউদ আত্-তাই (কথিত আছে, তিনি তাব' তাবি'ঈ ছিলেন) [৪] বলিয়াছেন।"

(খ) সর্বশেষে খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে উপস্থাপিত সর্বসম্মত ইসনাদ (শাজারা) [ইব্‌ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূন, ২খ, ২৫০?] যাহা ঐ সময় হইতে অনেক প্রধান ও সুপরিচিত সিলসিলাপন্থিগণ কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে তাহা নিম্নরূপ–জুনায়দ (৭) রূয্‌বারী (৮) আবূ 'আলী আল-কাতিব অথবা আয্-যাজজাযী (৯), আল-মাগরিবী (১০), আল-জুরজানী (১১) এবং ঊর্ধ্ব অংশে দাউদ আত্-তাঈ (র) (৪) এর পূর্বে রহিয়াছেন হাবীব 'আজামী (র) (৩), হাসান বাস্‌রী (র) (২) এবং সবার শীর্ষে হযরত 'আলী (রা) (১)। ইবনু'ল জাওযী ও যাহাবী প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ইসনাদের (সূত্র) প্রথম চার সূত্র (অর্থাৎ ৪-১) 'মানহূল' (منحول-অর্থাৎ বাস্তবতাবর্জিত স্পষ্ট ভাষায় বলিলে 'জাল' বা বানোয়াট)। কেননা এই মনীষিগণের পারস্পরিক সাক্ষাত লাভ স্বীকৃত নহে। কোন কোন মাযহাবী সিলসিলা এমন একটি ইসনাদ প্রদর্শন করে যাহাতে মা'রূফ কারখী (র)-এর পূর্বে নয়জন শী'আ ইমাম রহিয়াছেন। এই ইসনাদটির প্রামাণিকতা আরও অধিক সন্দেহযুক্ত।

(গ) **তাবাকাতু রিজালি'ল-গায়ব–অদৃশ্য মহামনীষিগণের ইতিবৃত্ত ঃ** সূফীদের মতে পৃথিবী এই কারণে টিকিয়া রহিয়াছে যে, আল্লাহ্‌র ওয়ালীগণের একটি গোপন অথচ সুশৃংখল গোষ্ঠীর সুপারিশে পৃথিবীর বিপদসমূহ অপসৃত হইতে থাকে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র এই ওয়ালীগণের সংখ্যা [পরিসংখ্যান ও বিন্যস্ত পদমর্যাদা] নির্ণীত রহিয়াছে। দায়িত্বশীল কোন ওয়ালী ইনতিকাল করিলে অবিলম্বে অন্য একজন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া থাকেন। এই পরিসংখ্যানের পদবিন্যাস

নিম্নরূপ ঃ তিনশত জন নাকীব (ব ব নুকাবা'), চল্লিশজন আব্‌দাল,, সাতজন আমীন (ব ব উমানা'), চারজন 'আমূদ এবং সবার শীর্ষে তাঁহাদের কুত্‌ব (মতান্তরে পদমর্যাদা ১৩ স্তরে বিভক্ত) [কুত্‌ব হইল সেই বৃত্ত বা মেরু যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সূফীদের ধারণামতে পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা (অদৃশ্য ও তাক্‌বীনী) অবর্তিত হয়=গাওছ।

(ঘ) রুখাস (রুখস্‌াত-এর ব. ব.-বিশেষ সুবিধা ও অব্যাহতি)- যাহার উপরে ভিত্তি করিয়া সূফীদের সামগ্রিক জীবন পরিচালিত (তু. তারীকাত)। বিস্‌তামী, শিবলী ও আবূ সা'ঈদ (র)-এর যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক 'দায়িত্বহীন' ও দুর্নামের অধিকারী মাজ্‌যুবদের সম্পর্কে আমরা এমন ধরনের প্রশ্রয় ও অবৈধ সুবিধা দানের রীতি দেখিতে পাই যাহা পুনঃপুনঃ অস্বাভাবিক হওয়ার সাথে সাথে অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতার অনুমতি প্রদানের নামান্তর। সূফীগণ তাঁহাদের নিজেদের জল্‌সায় বিশেষ ধরনের কবিতা-গাযাল আবৃত্তি করিয়া থাকেন। কাব্যচর্চার এই ধারাটি, যাহা মুসলিম সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং সর্বত্র যাহা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি অর্জন করিযাছে, প্রায়শ একঘেয়েমি ও রুচিহীনতার ত্রুটি হইতে মুক্ত নহে। এই সাহিত্য ধারাটির একমাত্র লক্ষ্যই যে, রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনার মাধ্যমে আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া শ্রোতাদের মাঝে তীব্র আকর্ষণ ও আবেগের একটি অপ্রাকৃতিক (কৃত্রিম) অবস্থা সৃষ্টি করা।

কাব্যচর্চার এই ধারাটি তাসাওউফের উপভাষায় সুরা (মদ্য)-এর গুণ-কীর্তন করে। অথচ শারী'আত এই পৃথিবীর বুকে উহাকে হারাম সাব্যস্ত করিয়াছে। ...উহাতে উল্লেখ থাকে প্রেমের সেই মদিরা পাত্রের (كاس المحبة) যাহা সাকী চক্রাকারে পরিবেশন করিয়া থাকে। এই কাব্যধারাটি এমন প্রলম্বিত ও বিশদ উপমা ও প্রচ্ছন্নতায় পরিপূর্ণ যাহা অনেক ক্ষেত্রে গভীর উচ্ছ্বাস ও প্রবল উত্তেজনার সহিত উপস্থাপন করা হয় এবং যেইগুলি (বাস্তব কারণেই) অধিকাংশ য়ূরোপীয় ভাষান্তরকারীরা তাহাদের তরজমায় দূরদর্শিতা কিংবা যুক্তিসিদ্ধতার স্বার্থে লঘু করিয়া দেখাইয়া থাকেন। এই ধরনের কবিতা রচনায় নিম্নের সূফীগণ খাতির শীর্ষে রহিয়াছেন ঃ আরবীতে ইব্‌ন ফারিদ ও তুসতারীর কবিতাসমূহ; ফারসীতে আবূ সা'ঈদের রাবা'ইয়্যাত (চতুষ্পদী) এবং 'আত্‌তার ও রূমীর সুদীর্ঘ মাছনাবীসমূহ (দ্র. রূমীর ওয়াহ্‌দাতু'ল-উজূদ এর বর্ণনা (كيت انى؛توئى...) ওখানে কে.....ওহ্‌ তুমিই...!) হাফিজ-এর গাযালগুচ্ছ, জামীর বিভিন্ন ধরনের কবিতা; তুর্‌কীতে নাসীমী ও নায়াযীর রচনাবলী, উর্দূ ভাষা ও মালাঈ ভাষাসমূহে এই ধরনের সাহিত্য স্থান করিয়া লইয়াছে এবং তাহা অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে। (একটি উর্দূ নমুনা جدهر ديكهتا هون ادهر توبى توهى "যেদিকেই তাকাই শুধু তোমাকেই দেখিতে পাই"। বাংলা ভাষায়, বিশেষত প্রাচীন পুঁথিকাব্যে ইহার যথেষ্ট উপাদান রহিয়াছে। বাউল সংগীত, মা'রিফাতী (মারফতী) ইত্যাদি ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নমুনা, "যেমনি নাচাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ"! অবশ্য মধ্যপ্রাচ্যে এই কাব্যচর্চা এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে এবং সমকালীন মুসলিম সাহিত্যসেবিগণ দিন দিন উহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন। তাসাওউফের উৎসমূহের পর্যালোচনামূলক নিরীক্ষা এখনও পূর্ণতায় উপনীত হয় নাই।

তাসাওউফের প্রচলিত 'সর্বেশ্বরবাদ' এবং খাঁটি মুসলিম 'আকীদার মধ্যে মৌলিক বিরোধ রহিয়াছে দেখিয়া ইসলাম অধ্যয়নে আগ্রহী প্রথম যুগের (য়ূরোপীয়) গবেষক বিশেষজ্ঞগণ অনৈসলামিক উপাদানসমূহে তাসাওউফের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইয়াছির যে, এই মতাদর্শ সিরীয় রাহ্‌বানিয়্যাত হইতে আহরিত হইয়াছে কিংবা গ্রীকদের ইশরাকী দর্শন হইতে কিংবা ভারতীয় বেদান্ত দর্শন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে (ইহা Jnes-এর ধারণা)। আবার নিকলসনের গবেষণামতে তাসাওউফ দর্শনটি অন্য দর্শন হইতে ধার করা।

এই কাল্পনিক সকল অভিমত পূর্ণরূপে প্রমাণিত নয়, কাজেই গ্রহণীয়ও হইতে পারে না। কেননা ইসলামের প্রথম যুগ হইতেই লক্ষণীয়ভাবে ইসলামী সূফীবাদের বিশেষ চিন্তাধারার রূপরেখা তাঁহাদের মনঃজগতে পবিত্র কুরআন (অনবরত) তিলাওয়াত, হাদীছ শারীফের পাঠ ও চর্চায় নিমগ্নতা এবং কুরআন-হাদীছে অনুধ্যান-অধ্যবসায় এবং উহার গূঢ়ার্থ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানে গবেষণা-নিমগ্নতার ফলশ্রুতিতে ভিতরে ভিতরেই অংকুরোদ্‌গম করিতেছিল। উল্লেখিত চিন্তাধারার রূপরেখা নির্মাণে অবশ্য ইসলামী সমাজের মূল কেন্দ্রে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংঘটিত দুর্যোগ (সরকারী অনাচার ও নিপীড়ন) ও দুরবস্থাও ক্রিয়াশীল ছিল। "তাসাওউফের প্রাথমিক কাঠামো খাঁটি ইসলামী ও আরবীয় ছিল" এই মূল ধারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তবে সেই সকল উপাদান-উপকরণ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা একেবারেই অর্থহীন হইবে না যেইগুলি উল্লিখিত কাঠামোটির সৌন্দর্য ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংযোজিত করা হইয়াছিল এবং নূতন নূতন ক্ষেত্রে তাহা আরও জোরদার হইয়া উঠিয়াছিল। যেমন সমকালীন কোন কোন গবেষক (Asin Palacios, Wensinck, T. Andrae প্রমুখ) কিছু আধ্যাত্মিক সাধনা (রিয়াদাত)-এর উৎস খৃষ্টীয় রাহ্‌বানিয়্যাত-কে নির্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যাহা তথ্যনির্ভর নহে। তদ্রূপ গ্রীকদের একাধিক দার্শনিক পরিভাষা সুরয়ানী ভাষার মাধ্যমে সূফী রচনায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল বলিয়া যে অভিমত তাহাও গ্রহণীয় নয়। পারসিক সাদৃশ্যবাদ (Blochet যাহার আভাষ দিয়াছেন) এখনও পূর্ণাঙ্গরূপে অধ্যয়ন করা হয় নাই। অবশিষ্ট রহিল ভারতীয় উপাদানসমূহ। (Horten-এর চিন্তাধারা অনুসারে) আল্‌-বীরূনী ও দারা শুকোহ প্রাচীন অধ্যাত্মবাদের ধ্যানধারণা এবং উপনিষদ ও যোগশাস্ত্রের মাঝে সাদৃশ্য অবলোকনে যে গতানুগতিক অনুমানভিত্তিক চিন্তাধারা পেশ করিয়াছিলেন উহার অধিক কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য সংযোজিত করা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাসাওউফ সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের উৎস গ্রন্থসমূহের তালিকা ঃ যাহা pfannmuer অতি যত্নের সহিত Handbuch der Islam-Literature (লাইপযিগ ১৯২৩ খৃ., পৃ. ২৬৫-২৯২)-তে সুবিন্যস্তরূপে সংকলিত করিয়াছেন। এই দীর্ঘ তালিকায় সাধারণ অধ্যয়নের জন্য উত্তম গ্রন্থ আর.এ. নিকলসনের নিম্নে উল্লিখিত রচনাবলী ঃ (১) The Mystics of Islam, লণ্ডন ১৯১৪ খৃ.; (২) Studies in Islamic Mysticism, কেমব্রিজ ১৯২১ খৃ.; (৩) The Idea of Personality in Sufism, কেমব্রিজ ১৯২৩ খৃ.। বিশেষ আলোচ্য বিষয়ের জন্য নিম্নের রচনাবলী দেখা যাইতে পারে ঃ (৪) Goldziher, R. H. R, ৩৭খ, ৩১৪; (৫) W. Z. K. M., ১৩খ, ৩৫; (৬) Z. A., ২২খ, ৩১৭; (৭) Z. D. M. G., ৬৮খ, ৫৪৪; (৮) Isl., ৯খ, ১৪৪; (৯) Massignon, Essai sur les Orgines du Lexique Technique de la Mystique Husulmane, প্যারিস ১৯২২ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, La Passion D, al-Hallaj, Martyr Mystique de Islam, প্যারিস ১৯২২ খৃ., গাযালী সম্পর্কে; (১১) Asin Palacios, Algazel, Saragossa ১৯০১ খৃ.; তদ্রূপ (১২) Cultura espanola-তে, ১৯০৬ খৃ, পৃ. ২০৯; এবং (১৩) M.F.O., ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৬৭; (১৪) Obermann, Der Philosophische und Religiose Subjektivis mus Ghazalis, ভিয়েনা ১৯২১

খৃ.। ইব্‌নু'ল ফারিদ সম্বন্ধে ঃ (১৫) Nallino, (Di Matteo-এর জবাবে) R. S. O., ১৯১৯-১৯২০ খৃ.), ইব্‌নু'ল 'আরাবী সম্বন্ধে ঃ (১৬) Asin Palacios, El mistico Murciano Abenarabi, মাদ্রিদ ১৯২৫-১৯২৬ খৃ., তিন খণ্ডে। সপ্তদশ শতকের হিন্দুদের অধ্যাত্মবাদের জন্য ঃ (১৭) Von Kremer, J. A., ১৮৬৯ খৃ., পৃ. ১০৫। অধ্যাত্মবাদের সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক পন্থাসমূহের জন্য ঃ (১৮) আফ্‌লাকী কী দাস্‌তাবীযাত (তরজমা Huart, Les Saints des derviches tournenurs-তে, প্যারিস ১৯১৮ খৃ.); (১৯) D. B. Macdonald, Religious Attitude and Life in Islam, শিকাগো ১৯০৮ খৃ.; (২০) নিকলসনের (সম্পাদিত) সার্‌রাজ, আত্‌তার, ইব্‌ন আরাবী এবং রূমীর শ্রেষ্ঠ সংস্করণ এবং নিম্নবর্ণিত তরজমাসমূহে ঃ (২১) R., Hartmann (কুশায়রীর); (২২) Huart-এর দারা শুকোহ্‌, J. A. ১৯২৬ খৃ.-তে, পৃ. ২৮৫। তদ্রূপ ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ; (২৩) Gairdner-এর মিশ্‌কাতু'ল আনওয়ার-এর ব্যাখ্যা (Al-Ghazzalis Mishkat al-Anwar, লণ্ডন ১৯২৪ খৃ.); (২৪) Horten কৃত সুহ্‌রাওয়ারদী-হালাবী-র দর্শনের ব্যাখ্যা, (হাবারটন) Die Philosophie der Erleuchtung nach Suhrawardi, Halle ১৯১২ খৃ.। তুর্কী প্রাচীন সুফীবাদীদের সম্বন্ধে ঃ (২৫) কাপরুলো যাদাহ্‌ মুহাম্মাদ ফু'আদ, Turk Edebiyatenae ilk mutasawwifler, ইস্‌তাম্বুল ১৯১৯ খৃ. ও ইব্‌নু'ল-'আরাবী সম্বন্ধে; (২৬) Nyberg, (Kleinere Schriften des Ibn al-Arabi, লাইডেন ১৯১৯ খৃ.)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ। 'আরবী ভাষায় মৌলিক উৎসসমূহ ঃ (২৭) মুহাসিবী, মাক্কী-গাযালী-এর ইব্‌নু'ল-'আরাবী (র)-এর তাসাওউফের অনুকূলে ও সমর্থনে লিখিত রচনাবলী এবং শেষোক্তজনের দুই কট্টর সমালোচক অর্থাৎ (২৮) ইবনু'ল-জাওযী-র তালবীসু ইব্‌লীস, কায়রো ১৩৪০ হি. ও (২৯) ইব্‌ন তায়মিয়া (র)-এর রচনাবলী; (৩০) দাইরাতু'ল-মা'আরিফি'ল ইসলামিয়্যা, ৫খ, ২৭৫-২৯৮; (৩১) আসগার 'আলী রূহী, মা ফি'ল-ইসলাম, লাহোর ১৩৫০ হি., ২খ, ১৭৬-২৪২; (৩২)Arberry, Sufism, ১৯৫০ খৃ.; (৩৩) খার্‌রায, কিতাবু'স-সিদ্‌ক্‌ (অনু. ও সম্পা. Arberry, The Book of Truthfulness, অক্সফোর্ড ১৯৩৭ (খৃ.); (৩৪) জুনায়দ, কিতাবু'ল-ফানা, অনু., ও সম্পা. 'আলী 'আবদু'ল-কাদির, Islamic Quarterly-তে, ১ম ভলি., ৩য় সংখ্যা (লণ্ডন ১৯৫৪ খৃ.); (৩৫) ইবনু'ল-'আরাবী, আল-ফুতূহাতু'ল মাক্‌কিয়্যা (বূলাক ১২৯৩ হি.); (৩৬) তাফ্‌সীরু'শ-শায়খি'ল আক্‌বার, পবিত্র কুরআনের তাফসীর, (ইব্‌নু'ল-'আরাবীর প্রতি আরোপিত আবার 'আবদু'র-রায্‌যাক আল-কাশানীর প্রতিও (বূলাক ১২৮৩ হি.); (৩৭) আহমাদ ইব্‌ন মুসতাফা আল-আলাবী, রিসালাতু'ন-নাসির মা'রূফ, (দামিশ্‌ক্‌ ১৯৩১ খৃ.); (৩৮) ঐ লেখক, রিসালাতু'ল-কাওলি'ল-মা'রূফ, মুস্‌তাগানিম ১৩৬৭ হি.; (৩৯) মুহাম্মাদ মুসতাফা হিল্‌মী, আল-হায়াতু'র-রূহিয়্যা ফি'ল ইসলাম, (কায়রো ১৯৪৫ খৃ.); (৪০) আবূ বাক্‌র সিরাজু'দ-দীন, The Book of Certainty (লণ্ডন ১৯৫২ খৃ.); (৪১) Titus Burckhardt, [লাহোর ১৯৫৬ খৃ.)। নিম্নে উল্লিখিত তরজমা গ্রন্থসমূহও উল্লেখযোগ্য ঃ (৪২) কালাবাযী, The Doctrine of the Sufis, অনু. Arberry, কিতাবু'ত-তা'আর্‌রুফ-এর তরজমা, কেমব্রিজ ১৯৩৫ খৃ.; (৪৩) আল-গাযালী, মিশকাতু'ল আনওয়ার, (অনু. Gairdner, লণ্ডন ১৯২৪ খৃ.); (৪৪) Montgomery Watt, The Faith and Practice of Ghazali (গাযালীর আল-মুনক্বিয মিনা'দ-দালাল ও বিদায়াতু'ল-হিদায়া-র তরজমা, লণ্ডন ১৯৫৩ খৃ.); (৪৫) Burckhardt., La Sagesse des Prophetes ('ফুসূসু'ল হিকাম'-এর অংশবিশেষের তরজমা, প্যারিস ১৯৫৫ খৃ.); (৪৬) ইব্‌নু'ল-'আরাবী, রিসালাতু'ল আহাদিয়্যা, যাহা কিতাবু'ল-আজ্‌বিবা নামে খ্যাত; (৪৭) ঐ লেখক, কিতাবু'ল আলিফ্‌ (অনু. Weir, JRAS-তে, ১৯০১ খৃ., পৃ. ৮০৯-৮২৫; (৪৮) R.A. Nicholson, The Perfect Man, (আল-জীলী-র আল-ইন্‌সানু'ল কামিল-এর অংশবিশেষের তরজমা, Studies in Islamic Mysticism-এ, কেমব্রিজ ১৯২১ খৃ.); (৪৯) Burckhardt, De l'Homme Universel, আল-ইনসানু'ল-কামিল-এর অংশবিশেষের তরজমা, Lyon ১৯৫৩ খৃ.)।

আরও অন্যান্য গ্রন্থের জন্য নিম্নের উল্লিখিত নিবন্ধসমূহের গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্যঃ রাবি'আ আল-'আদাবিয়্যা, মুহাসিবী, হাল্লাজ, জুনায়দ, গাযালী, ইব্‌নু'ল-'আরাবী, 'উমার ইব্‌নু'ল-ফারিদ, 'আততার, শাযিলী, জালালু'দ-দীন আর-রূমী, সুহরাওয়ারদী (য়াহ্‌য়া), শা'রানী, সানূসী)!

Louis Massigon (E.I.[1]), আবূ বাক্‌র সিরাজুদ-দীন (দা. মা. ই.) ও সম্পাদনা পরিষদ/মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল

তাসীর মুহাম্মাদ দীন ঃ ১৯০২-৫০ খৃ. বিখ্যাত উর্দূ কবি। লাহোরে জন্ম। এম. এ. পাস করিয়া কিছুদিন লাহোর ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা করার পর বিলাত হইতে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। অমৃতসর এম. এ. ও. কলেজ, প্রতাপ কলেজ শ্রীনগর ও ইসলামিয়া কলেজ (লাহোর)-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। উচ্চ পর্যায়ের কবি ও সাহিত্যিক। বাল্যকাল হইতে কাব্যানুরাগী। বিখ্যাত সমালোচকও ছিলেন। মৃত্যুর প্রায় ৫ বৎসর পর তাঁহার কাব্য সংকলন আতশ্‌কাদাহ্‌ নামে প্রকাশিত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭১৯

তাসূজ (تسوج) ঃ ও তাস্‌সুজ (১) একটি বিশেষ ওজনের নাম, শব্দটি ফারসী তাসূ শব্দের আরবীকৃত রূপ, অর্থ বিশেষ মাত্রার একটি ওজনের ২৪ ভাগের ১ ভাগ (দ্র. Vullers, ১খ, পৃ. ৪৪৫)। ফারহাঙ্গ-ই শু'উরী অনুযায়ী দুই জাও-এক হাব্বা; দুই হাব্বা চারি তাসূজ; চারি তাসূজ-এক দাঙ; ছয় দাঙ-এক দীনার। কাসিমু'ল-আনওয়ারের দীওয়ান (Bib. Nat. de Paris, sup. Pers., 717, fol. 174)-এর একটি গাযালে তাসু শব্দটির সঙ্গে কিছুটা মরমী রহস্যযুক্ত। শব্দটি আর্মানী ও আরামাই ভাষাদ্বয়েও রহিয়াছে (দ্র. Hubschmann, Arm. gran. L/I, পৃ. ২৬৬)।

(২) তাসূজ একটি আঞ্চলিক বিভাগের নাম। Noldeke [Geschichte der Perser und Araber, পৃ. ১৬] তাসূক বা তাস্‌সূজ (অপিস) শব্দটি যে ইরাকের একটি জিলা বুঝায় উহার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন ইরানের ফার্‌স প্রদেশের একটি কুরা-র একটি বিভাগের (রুসতাক-Parish)। ইব্‌ন খুররাদাযবিহ ও কুদামার মতে ইরাক প্রদেশ ১২টি উস্তানে (ওস্তান?) বিভক্ত ছিল, উহাদের প্রতিটি কয়েকটি করিয়া তাসসূজে বিভক্ত ছিল (দ্র. Le Strange, Eastern Caliphate, পৃ. ৭৯)। তাসূজ শব্দটি সমগ্র ইরানে সুপরিচিত। ইব্‌ন রুস্‌তা (পৃ. ১১৫) ইসফাহানের অধীন এলাকাগুলির মধ্যে রূষ-এর একটি তাস্‌সূজের উল্লেখ করিয়াছেন। ফারস প্রদেশেও তাস্‌সূজ নামে

একটি জিলা রহিয়াছে (দ্র. ইস্তাখরী, পৃ. ১০২)। উহা বাখতিগান হ্রদের নিকটে কুর নদীর ডান তীরে অবস্থিত। কোন অঞ্চলকে তারসূজে যে বিভক্ত করা হইত তাহা ছিল নিশ্চয়ই সেচ ব্যবস্থাভিত্তিক ব্যবস্থা। [একটি নদীর পানি তাত্ত্বিকভাবে (in theory) ৬ দাঙ পরিমাণ হয়; সেই হিসাবে কারূন নদী গুশতারের নিকটে যে দুইটি ধারাতে বিভক্ত হইয়াছে (শুতাইত ও গারগার নদী) জাফারনামাতে (১খ., পৃ. ৫৯১ ও ৫৯৯) এই ধারাদ্বয়কে বলা হইয়াছে ৪ দাঙের নদী এবং ২ দাঙের নদী)। ১ দাঙের চারি ভাগের একভাগ পানি দ্বারা যে পরিমাণ ভূমিতে সেচ দেওয়া যায় সেই পরিমাণকে এক তাস্সূজ বলিয়া মনে হয়।

(৩) তাসূজ আরও বিশেষভাবে আযারবায়জানের একটি ছোট শহরের নাম, মিশৌ পর্বতমালার দক্ষিণে, উরমিয়া হ্রদের উত্তর তীরে অবস্থিত। ইহা গুনেই (Guney) জিলার সদর দফতর (তুর্কী ভাষায় গুনেই শব্দের অর্থ রৌদ্রোজ্জ্বল), উরমিয়া হ্রদের উত্তর তীর সেই জিলার অন্তর্গত। জিলাটির প্রাচীন নাম [আরওয়ানাক ওয়া-আনযাব] এখনও সরকারী দলীলপত্রে ব্যবহৃত হয়। আরওয়ানাক নামটি যেহেতু বিশেষভাবে জিলার পূর্বাংশকে বুঝাইয়া থাকে (দ্র. নুযহাতু'ল-কু'লূব, পৃ. ৭৯), কাজেই তাসূজ সম্ভবত আনযাব অংশে অবস্থিত ছিল। তাসূচ (তাস্বীচ) শহর হ্রদ হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত; কীযীলদাগ হইতে প্রবাহিত একটি পানিস্রোত দ্বারা উহা বিধৌত হইয়া থাকে। শহরটি বাগিচা দ্বারা বেষ্টিত। নিকটেই পাথুরে লবণের খনি। জিপশাম ও চুনা পাথরেরও খনি রহিয়াছে। জনসংখ্যা ১,০০০-এর বেশি নহে। অথচ শহরটি ১২টি মহল্লাতে বিভক্ত এবং সেইখানে ৫০টি (?) মসজিদ রহিয়াছে। ইহাতে শহরের অতীত গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্যই ইহা ইসলাম-পূর্বকালীন শহর হইবে। মোঙ্গল যুগে তাসূজের গুরুত্বের প্রমাণ এই যে, নুযহাতু'ল-কুলূব গ্রন্থে উরমিয়্যা হ্রদকে বরাবর দারয়া-ই শুর-ই তাসূজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জিলাটি হইতে অবশ্য ৫,০০০ দীনারের বেশি খাজনা আদায় হইত না; এই অর্থ খান আবূ সা'ঈদ-এর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত ছিল।

Clavijo ১৪০৪ খৃ. খোই' হইতে তাব্রীয গমনের পথে তাসূজ দর্শন করেন। তিনি শহরটির নাম 'কাযা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (তাঁহার বর্ণনায় ইহা ছিল সমভূমিতে অবস্থিত একটি জনবহুল সুন্দর শহর, চারিদিকে বহু বাগিচা, বহু পানিস্রোত হইতে পানি সেচ করা হয়; অনু. Le Strange, লণ্ডন ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১৫০ ও Caza-Taza সম্বন্ধে টীকা, পৃ. ৩৬২)।

আওলিয়া চেলেবি (২খ, পৃ. ২৪২; ৪খ., পৃ. ৩১৯) শহরটির নাম তাসূয়, এইখানকার নদীটির নাম হরিয (?) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা ছিল একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ সুলতানলিক, যাহাতে ৩,০০০ সৈন্য ও গোলন্দাজ মোতায়েন থাকিত। শহরে ৩০০০ ঘর, ৭টি মসজিদ ইত্যাদি ছিল। অধিবাসিগণ ছিল শী'আ মতাবলম্বী; আওলিয়ার বর্ণনামতে শহরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পারস্য সম্রাট য়াযদাযিরদ, তিনি তাঁহার পত্নী তাসূবান (?)-এর সম্মানার্থে ইহার পত্তন করিয়াছিরেন। বলা হয়, তৈমূর লঙ (দ্র. Clavjo) শহরটি ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন কারা-কোয়ুনলু রাজবংশের জিহানশাহ্। তাসূজের পূর্বে কুম্লা (খুম্লা) গ্রাম, ফারহাদ পাশা সুলতান ৩য় মুরাদ-এর রাজত্বকালে যখন তাব্রীয (দ্র.) জয় করেন, তখন ৯৯৮ হি. সেইখানে যে রক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করিয়াছিলেন (দ্র. আওলিয়া, -তুর্কী Ewliya Celebi) তাহাতে কুমলা-র পরিচয় মিলে। য়ুরোপীয় পর্যটকগণ খুব কমই তাসূজ ভ্রমণ করিয়াছেন (দ্র. E. G. Browne, A year among the Persians, পৃ. ৫৬)।

V. Minorsky (E.I. [1])/ হুমায়ুন খান

তাহ্মান ইব্ন 'আম্র আল-কিলাবী (تهمن بن عمرو الكلابى) ঃ ছিলেন একজন মামুলি আরব কবি; ঘটনাক্রমে তাঁহার কবিতা সংগ্রহ সংরক্ষিত হইয়াছে, যদিও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বহু কাব্য সংগ্রহ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত। তাহ্মানের জীবনকাল বেশ সঠিকভাবে জ্ঞাত; হারূরী নেতা নাজ্দা ইব্ন 'আমর আল-হানাফী এক অভিযানকালে তাহ্মানকে আটক করেন এবং তাঁহাকে পথ-প্রদর্শকরূপে নিয়োগ করেন। একদা রাত্রিকালে তাহ্মান পলায়নের উদ্দেশ্যে একটি উৎকৃষ্ট উটে চড়িয়া যাত্রা করেন। অশ্বারোহী পশ্চাদ্ধাবনকারিগণ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলে। চুরির শাস্তিতে হারূরী নেতা তাঁহার ডান হস্ত কর্তন করেন। পরে তিনি খলীফা 'আবদুল-মালিকের দরবারে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাটি আবৃত্তি করেন, যাহাতে তিনি তাঁহার হস্ত কর্তনের নিন্দা করিয়া খলীফার নিকট ক্ষতিপূরণের আবেদন জানান এই অজুহাতে যে, তাঁহার আচরণ ছিল একজন অনুগত নাগরিকের মত। সুতরাং একজন সাধারণ অপরাধীর শাস্তি তাঁহার প্রাপ্য নহে। অপর এক কাহিনী অনুযায়ী তাহ্মানের হস্ত আদৌ কর্তিত হয় নাই, বরং উক্ত কবিতাটি তিনি রচনা করেন শুধু হস্ত কর্তনের সাজা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তাহ্মান একটি মদের দোকানে অবস্থান করেন এবং মদ্যপানে মাতাল অবস্থায় দোকানীর ক্যাশবাক্স ভাঙ্গিয়া মদ্য বিক্রয়লব্ধ হারাম টাকা-পয়সা লইয়া পলায়ন করেন। এই কাহিনীমতে কবি তাহ্মানকে খলীফা আল-ওয়ালীদের দরবারে ('আবদু'ল-মালিকের নহে) হাযির করা হয়। কবি যে খলীফা ওয়ালীদের সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় আর একটি কবিতায় (পৃ. ৮২, ২), যাহাতে তিনি খলীফা ওয়ালীদের এবং সাধারণভাবে উমায়্যা বংশের প্রশংসা কীর্তন করেন। তাঁহার হস্ত কর্তনের কথার উল্লেখ অন্যান্য বিবরণী ও কবিতায়ও রহিয়াছে। মনে হয় দ্বিতীয় বিবরণের প্রক্ষেপণকারী ঐ সকল বর্ণনা ও কবিতার কথা জানিত না।

কর্তিত হস্তের ব্যাপারে তাহ্মান খুবই স্পর্শকাতর ছিলেন এবং সর্বদাই কর্তনের স্থানটি কাপড়ে জড়াইয়া রাখিতেন। একদা একটি পশুখাদ্য-পাত্রের (trough) নিকট আবূ রাবী'আ ইব্ন 'আব্দ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁহার কাটা হাতের আবরণখানি উল্টাইয়া দিলে কর্তিত স্থানটি উন্মোচিত হয়। তাহ্মান লোকটির বিরুদ্ধে আক্রোশ পোষণ করিতে থাকেন। অতঃপর একদিন ঐ লোকটি যখন হাঁটু গাড়িয়া কোন কাজ করিতেছিলেন তখন তাহ্মান তাহাকে তরবারির আঘাত করেন। লোকটি শুধু আহত হয়, কিন্তু সে নিহত হইয়াছে মনে করিয়া ভীত তাহ্মান য়ামানে আল-হারিছ ইব্ন কা'ব বংশীয় উপজাতীয়দের নিকট পলায়ন করেন এবং য়ামানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজাত গোষ্ঠী বানূ 'আব্দি'ল-মাদান-এর আশ্রয় লাভ করেন। অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের আনন্দ প্রকাশক কবিতা রচনা করিয়া এই স্থান হইতে তিনি প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত রমণী ঘটিত বিরোধের দরুন তাহমান গানী উপজাতির এক ব্যক্তিকে হত্যা করেন এবং য়ামামার দক্ষিণাঞ্চলে পলায়ন করত দুই বৎসর তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ে দিনের বেলা তিনি লুকাইয়া থাকিতেন আর রাত্রিকালে ডাকাতি করিতেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা এতই দুর্বিসহ হইয়া পড়িয়াছিল যে, একদা যখন তাঁহার গোষ্ঠী

কিলাব-এর কতিপয় ব্যক্তি এই স্থান হইয়া যাইতেছিল তখন তিনি কয়েক চরণ কবিতা আবৃত্তির মারফত তাহাদিগকে মদীনার গভর্নরের নিকট হইতে তাঁহার জন্য ক্ষমা মন্‌জুর করিয়া আনিবার অনুরোধ করেন। সুদায়্যি ইব্‌ন কায়স নামক এক ব্যক্তি আল-মদীনা হইতে ক্ষমা মঞ্জুর করাইয়া আনেন এবং নিহত গানী উপজাতীয় লোকটির আত্মীয়-স্বজনকে শোণিতপণ পরিশাধ করিয়া দেন।

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায় যে, কবি তাহ্মান হিজরী ১ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন। তাঁহার কতিপয় কবিতা নিছক প্রেমের, কতিপয় হারিছী অর্থাৎ দক্ষিণ আরবের স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে যাহা তাঁহার য়ামানে প্রবাসকালে রচিত। তাহ্মানের কবিতার ক্ষুদ্র দীওয়ান (সংকলন)-টি সম্ভবত আবূ সা'ঈদ আস-সুক্কারীর কবিতা সংগ্রহ "কিতাবু লুসূসি'ল-'আরাব" (বা 'আরব তস্করদের গ্রন্থ) গ্রন্থের অংশবিশেষ। ইহার একখানি জার্মান অনুবাদ (অনুবাদক ঃ O. Rescher), ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুদ্রিত হয় বলিয়া ইহার প্রকাশের তারিখ আমরা অজ্ঞাত। সংকলনটির আরবী মূল পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। W. Wright-এর Opuscula Arabica (Leyden 1859, পৃ. ৭৬-৮৯) গ্রন্থে তাহ্মানের কবিতার কতিপয় চরণ মাঝে মাঝে 'জনৈক দস্যু রচিত" আখ্যায় অন্যান্য রচনা কর্মেও উদ্ধৃত হইয়াছে। লিসানু'ল-'আরাব-এ মাত্র চারিটি স্থানে তাঁহার কবিতার উদ্ধৃতি স্থান পাইয়াছে (৩খ, ৪৯২; ২খ, ১৩২; ১১খ, ২৯৮; ১৩খ, ৪৩, ৪৩২); বাক্‌রী, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৪১৩; য়াকূত ও আল-কালী, নির্ঘণ্টে উল্লেখের স্থান দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে বরাত প্রদত্ত হইয়াছে।

F. Krenkow (E.I.[1])/ শায়খ ফজলুর রহমান

তাহ্মাস্প ১ম (طهماسپ اول) ঃ ইরানের সাফাবী বংশের দ্বিতীয় বাদশাহ, শাহ ১ম ইসমাঈলের জ্যেষ্ঠ পুত্র; জন্ম ৯১৯/১৫১৪ সাল। তিনি মাত্র ১০ বৎসর বয়সে ইরানের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৯৩০/১৫২৪); ফলে এই বালক নৃপতি ইরানের কিযিল্‌বাশ সরদারদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। ৯৩৪/১৫২৭ সালে তুর্‌বাত-ই শায়খ জাম-এর নিকট তাহ্মাস্প উযবেগদিগকে পরাজিত করেন। কাল্‌হুর কুর্দীদের সমর্থনপুষ্ট মুস্‌লু কুর্দী উপজাতীয় নেতা যু'ল-ফাকার-এর বিদ্রোহের দরুন তাহ্মাস্প বাগদাদে আহূত হন (৯৩৬/১৫৩০);তিনি সেইখানে দেখিতে পাইলেন যু'ল-ফাকার তাঁহার ভাইদের হাতে নিহত হইয়াছেন (এই কুর্দীরা নিজেদেরকে তুরস্কের সার্বভৌমত্বের আওতাধীন বলিয়া দাবি করিত)। ইহার পর তাহ্মাস্প দীর্ঘ ১৮ মাস যাবত উয্‌বেগদের দ্বারা অবরুদ্ধ হেরাত নগরীতে গমন করেন; তাঁহার আগমন-সংবাদে ভীত হইয়া উযবেগরা আগেভাগেই পশ্চাদপসরণ করে। ৯৪০/১৫৩৪ সালে 'উছমানীগণ মেসোপটেমিয়া ও তাব্‌রীয দখল করেন। তুর্কী সুলতান সুলায়মান স্বয়ং সুলতানীয়ায় গমন করেন; অতঃপর পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করত দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া বাগদাদ দখল করেন। ৪ বৎসর পরে সুলতান সুলায়মান ওয়ান অধিকার করেন। এই যাবত পারসিকরা সর্বদাই প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে। ১৫৪১ খৃ. ভারতের মুগল সম্রাট বাবূর-এর পুত্র সম্রাট হুমায়ূন এক বিদ্রোহের ফলে নিজ রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহ্মাস্প-এর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসফাহানের চিহিল-সুতূন দরবার চত্বরে রক্ষিত একটি দেওয়ালচিত্র হুমায়ূনের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; কিন্তু শাহ্ তাহ্মাস্প শী'আঃ মতবাদ গ্রহণের জন্য হুমায়ূনকে চাপ দিতে থাকায় সম্রাট বিচলিত হইয়া পড়েন।

শাহ্ তাহ্মাসপের ভ্রাতা ইখলাস মীরযা তুর্কীদের সহায়তায় বিদ্রোহ করায় (৯৫৪/১৫৪৭) শাহ্ তাহ্মাস্প শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না। একটি তুর্কী বাহিনী আযারবায়জান ও ইসফাহান দখল করিল, তবে ইখলাস অচিরেই স্বীয় মিত্রদের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইলেন এবং তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হইল। পরে তিনি ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৯৬১/১৫৫৪ সালে তুরস্কের সহিত ইরানের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং পরবর্তী বৎসর দুই দেশের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তুর্কী সুলতান সুলায়মানের পুত্র বায়াযীদ বিদ্রোহী হইয়া ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন (৯৬৩/১৫৫৬)। কিন্তু দুই বৎসর ধরিয়া আলাপ-আলোচনার পর তাঁহাকে তুরস্কের নিকট প্রত্যর্পণ করা হয়। জানা যায় যে, শাহ তাহ্মাস্প চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বায়াযীদকে হত্যার আদেশ দেন অথবা তাঁহাকে নিহত হইতে দেন।

তাহ্মাস্প শাসনের শেষ বৎসরগুলিতে খুরাসানে উয্‌বেগ আক্রমণ এবং রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ-মহামারী দেখা দেয় (৯৭৯/১৫৭১)। উস্‌তাজলু উপজাতির সরদার জনৈক হায়দারের মাতা কর্তৃক বিষ প্রয়োগের ফলে ৯৮৪/১৫৭৬ সালে তাহ্মাস্প মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রাজত্ব স্থায়ী হয় সুদীর্ঘ সাড়ে বায়ান্ন বৎসর। তিনি আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন; পি. হর্ন ইহা প্রকাশ করিয়াছেন (P. Horn, Denkurerdigkeiten, Z.D.M.G., xliv, 1890, p. 563-649;অনু. Strassburg 1891)। আত্মজীবনীখানির বিবরণী ৯৬৯/১৫৬১ সাল পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে, এই সময় বায়াযীদকে তুর্কীদের হস্তে প্রত্যর্পণ করা হয়। সমকালীন নৃপতিবৃন্দের নিকট লিখিত তাহ্মাস্পের বিভিন্ন সরকার পত্রের প্রতিলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে রক্ষিত আছে (Rieu, Catalogue, No, 390, 530, 809, 984)। তাঁহার রাজত্বকালে ইংরেজ রাজদূত Anthony Jenkinson [১৫৬২ খৃ.] ও ভেনীসীয় রাষ্ট্রদূত Vincentio D'Alessandri [১৫৭১ খৃ.] ইরান সফর করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রিদাকুলী খান, রাওদাতু'স-সাফা'-ই নাসিরী, তেহরান ১২৭৪ হি., ৮খ, পৃষ্ঠান্তরবিহীন; (২) E. G. Brawne, Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924, p. 81, 84-98; (৩) p. M. Syken, History of Persia[1], ii, 246-53; (৪) Curzon, Persia, ii, 35; (৫) Cl. Huart, Histoire de Bagdad dens les temps modernes, Paris 1901, P. 34-36; (৬) P. Horn, Geschichte Irans in islamitischer Zeit, in Grundrin d'iran, Philologie, ii, 582; (৭) L. Tenfal, Z. D. M. G., 1883, xxxvii, p. 113-125; (8) Malcolm, History of Persia, London 1815, i, 505-11.

তাহ্মাস্প ২য় (طهماسپ ثانی) ঃ ইরানের শাহ হুসায়নের ৩য় পুত্র, আফগানদের ইসফাহান অবরোধকালে (১৩১৫/১৭২১) তিনি ইরানের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষিত হন; তাহ্মাস্প ৬০০ সৈন্যসহ পলায়ন করেন এবং কায্‌বীনে সৈন্য সংগ্রহের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। এই সময় সবেমাত্র রাশ্‌ত ও বাকূ দখলকারী রুশ সম্রাট মহান

পিটার (Peter the great)-এর সহিত তাহ্মাস্প একটি চুক্তি সম্পাদন করেন (এই চুক্তি কোন কাজে আসে নাই)। কাজার সরদার ফাত্হ 'আলী খানের সমর্থনপুষ্ট হইয়া তাহ্মাস্প মাযান্দারানের অন্তর্গত ফারাহাবাদ হইতে প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতে থাকেন, পরে এইখানে ভবিষ্যৎ নাদির শাহ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন; নাদির তাহ্মাস্প কুলি খান (=খান, তাহ্মাস্প-এর গুলাম) নাম ধারণ করিয়া 'তাহ্মাস্প-এর সেনাবাহিনীর জন্য ৫,০০০ আফ্শার ও তুর্কী সৈন্য লইয়া আসেন। মাশহাদ-এর নিকট নাদির কর্তৃক ফাত্হ 'আলী খান নিহত হওয়ার পর নাদির পারসিক সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, মাশহাদ ও হেরাত দখল করেন এবং দামগানের নিকট মিহ্মানদস্ত -এ আফ্গানদের বিরুদ্ধে এক অসাধারণ বিজয় লাভ করেন (১১৪১/ ১৭২৯)। তাহ্মাস্পকে দামগানে রাখিয়া নাদির মূরচে খুর্ত-এ আরও একটি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইসফাহানে প্রবেশ করেন; পরে তাহ্মাস্প আসিয়া নাদিরের সহিত মিলিত হন; আফগানরা ইসফাহান ত্যাগের পূর্বে তাহমাস্প-এর পিতাকে হত্যা করে। তবে তাহ্মাস্প এইখানে তাঁহার মাতার সাক্ষাত পান। ৭ বৎসর কাল (১৭২২-২৯ খৃ.) তিনি দাসীর ছদ্মবেশে ইসফাহানে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহ্মাস্প তাঁহার সেনাপতির বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে সুলতান উপাধি প্রদান করত খুরাসান, সিজিস্তান, কিরমান ও মাযান্দারানের গভর্নরের পদে নিয়োগ করেন। নাদির স্বনামে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা তাঁহার সৈন্যদের বেতন দিতেন। স্বীয় সেনাপতির বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া তাহ্মাস্প সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের অভিলাষী হইলেন। তিনি এরিওয়ান অবরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন এবং হামাদানের নিকট কোরেজানে তুর্কীদের নিকট পরাজয় বরণ করিলেন (১১৪৪/১৭৩১)। পরের বৎসর তাহ্মাস্প তুর্কীদের সহিত একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিলেন এবং উহার শর্ত অনুসারে ট্রান্সককেসিয়া তুরস্ককে ছাড়িয়া দিলেন; তবে তাব্রীয ও ইহার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত এলাকা স্বীয় অধিকারে রাখিলেন। নাদির এই যুক্তির বিরোধিতা করিয়া দুর্বার গতিতে ইসফাহান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তাহমাস্পকে বন্দী করিয়া খুরাসানে আটক রাখার আদেশ দিলেন। তাহ্মাসপের ৮ মাসের শিশুপুত্রকে ৩য় শাহ 'আব্বাস উপাধি দিয়া সিংহাসনে বসানো হইল। এই শিশু শাহের মৃত্যু হওয়ায় নাদির (দ্র.) নিজেকে পারস্যাধিপতি বলিয়া ঘোষণা করাইয়া লইলেন (১১৪৮/ ১৭৩৬)। নাদিরের ভারত অবিযানকালে তাঁহার পুত্র রিদা কুলী সাবযাওয়ার-এ তাহ্মাস্পকে পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ হত্যা করেন (১১১১/১৭৩৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মীরযা মাহ্দী 'আলী খান, তা'রীখ-ই জাহান-গুশা-ই নাদীরী, বোম্বাই ১২৬৫ হি., পৃ. ৯-১১৪; তিব্রীয সং ১২৬৬ হি., পৃ. ৬-৬৭; (২) রিদা কুলী খান, রাওদাতু'স সাফা'-ঈ নাসিরী, তেহরান ১২৭৪ হি., ৮খ, পৃষ্ঠা নম্বরবিহীন; (৩) P. M. Sykes, History of Persia, ii, 317-344; (৪) E. G. Browne, History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924, p. 129-36; (৫) Malcolm, History of Persia, London 1815, i, 636-37, ii, 21-96.

CL. Huart (E.I[1])/শায়খ ফজলুর রহমান

আত্-তাহ্লীল (التهليل) ঃ বাব-ই তাফ'ঈল-এর মাসদার। শব্দটির পারিভাষিক অর্থ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। ইহার শব্দমূল ل-ل-ه, ইহা হইতে গঠিত ক্রিয়া هل-এর অর্থ صلح অর্থাৎ আওয়ায উঁচু করিয়াছে [চিৎকার করিয়াছে], যেমন 'আল্লামা মুরতাদা আয্যাবীদী هل শব্দমূলের অধীনে আল-আয্হারী-র এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছেনঃ ولا اراه ماخوذا الا من رفع قائله صوته "বক্তা কর্তৃক তাহার স্বর উচ্চ করা হইতেই ইহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি" [তাজুল-আরূস, ৮খ, ১৭১]; যেন আল-আয্হারীর মতে উচ্চৈঃস্বরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাকে তাহ্লীল বলা হইবে (اراد بالتهليل رفع الصوت بالشهادت) [পূ. গ্র.]। বস্তুত ইহা (অর্থাৎ একটি পূর্ণ বাক্যের এইরূপ সংক্ষিপ্তকরণ) শুধু এই বাক্যটির ক্ষেত্রেই সীমিত নহে, বরং আরবী ভাষায় একাধিক বাক্যের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তকরণের এইরূপ প্রক্রিয়া প্রচলিত রহিয়াছে যে, কোন বাক্যের কয়েকটি শব্দের (বর্ণবিশেষের) সমন্বয়ে নূতন শব্দ তৈরি করিয়া উহাকে পূর্ণ বাক্যের স্থলবর্তী মনে করা হয় (তু. حوقل-"লা হাওলা ওয়া কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলা; ليعل "হায়্যা 'আলা'স্-সালাহ্" বলা) [অনুরূপ سبح-'সুব্হানাল্লাহ' বলা كبر 'আল্লাহু আক্বার' বলা, حمد আল-হামদু লিল্লাহ বলা [এমন কি আধুনিক আরবীতে বিদেশী শব্দ হইতে গ্রহণ করিয়া تلفن-টেলিফোন করিয়াছে' বলা হয়]; বরং অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যে একটি মাত্র হরফ পূর্ণ কালেমা (শব্দে)-র স্থলবর্তী গণ্য হয়। যেমন কবির ভাষায়ঃ قلت لها قفى فقالت قاف "আমি তাহাকে (প্রেয়সীকে) বলিলাম, একটু দাঁড়াও। সে বলিল, কাফ (ق) অর্থাৎ দাঁড়াইলাম"। যেন শুধু "ق" (কাফ) হরফটি পূর্ণ وقفت (দাঁড়াইলাম)। শব্দের স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে (বায়দাবী, সম্পা. মুস্তাফা মুহাম্মাদ, কায়রো, ১খ, ৪৪)। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) এই মূল বিধির আলোকেই পবিত্র কুরআনের কোন কোন 'বিযুক্ত বর্ণসমষ্টি' (مقطعات))-এর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যেমন الم-এর অর্থ انا الله اعلم (আমি আল্লাহ্-ই সর্বাধিক বিজ্ঞ), ইহাতে انا-র আলিফ, الله-এর লাম ও اعلم-এর মীম নেওয়া হইয়াছে। আর-রাযী, আত্-তাফসীরু'ল-কাবীর, কায়রো ১৩০৮ হি., ১খ, ১৯১; তু. বায়দাবী, পূ. স্থা.]।

সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা বা পড়াকেই সংক্ষেপে 'আত্-তাহ্লীল' বলা হয়। উহাতে আওয়ায উঁচু করা, যাহা আল-আয্হারীর অভিমত জরুরী নহে। ইমাম রাগিব তাঁহার 'মুফ্রাদাত'-এ 'তাহ্লীল' শব্দের আলোচনায় লিখিয়াছেন ঃ ومن هذه الجملة [يعنى لا اله الا الله] ركبت هذه اللفظة كقولهم التبسمل والبسملة والتحولق والحولقة [والحوقل. (মুফ্রাদাত, ৪খ, ২৬৬, আন-নিহায়া-র টীকায়, [হারাকাতের পরিধর্নসহ সংস্করণ], মিসরে ১৩৩৩ হি.) অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হইতে তাহ্লীল শব্দটি সেইরূপেই গঠিত হইয়াছে যেইরূপে "বিস্মিল্লাহি'র-রাহ্মানি'র রাহীম" বলার জন্য تبسمل ও লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলার জন্য [تحوقل]) تحولق গঠিত হইয়াছে"।

আল্লাহ তা'আলার যিকিরের ক্ষেত্রে তাহ্লীলের স্থান অনেক উর্ধ্বে এবং হাদীছসমূহে উহার অনেক ফাযীলাত (মাহাত্ম্য) বিবৃত হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী আক্রাম (স) বলিয়াছেন ঃ الايمان اربعة وستون بابا ارفعها واعلاها قول لا اله الا الله "ঈমান-এর চৌষট্টিটি তোরণ, উহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নতটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু–কালেমা" (তু. মুসনাদু আহমাদ, ২খ, ৩৭৯; অন্যান্য বিভিন্ন শব্দের সত্তরের অধিক শাখা ৪১৪, ৪৪৫ তদ্রূপ মুসলিম, ১/৪৭)। অনুরূপ অন্য একটি হাদীছে অধিক পরিমাণে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করাকে ঈমানের تجديد (নবায়ন) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (তু. মুসনাদ আহমাদ, ২খ, ৩৫৯) এবং অন্য একটি হাদীছে ইহাকে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় চারটি বাক্যের অন্যতম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে (পূ. গ্র., ৫খ, ১০)। একটি হাদীছে ইহাকে জান্নাতের অন্যতম 'চারা গাছ' বলা হইয়াছে (দ্র. তিরমিযী, ২খ, ১৮০, আব্ওয়াবুদ-দা'ওয়াত)। [তাহ্লীল

বা কালেমা তায়্যিবাই ইসলাম ও মুসলিম জীবনের মূল বুনিয়াদ। হাদীছের ভাষ্যমতে ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদের প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য প্রদান (بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله দ্র. হাদীছ গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ল-ঈমান)। আবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' মানব জীবনের নিরাপত্তা বিধায়ক রক্ষাকবচ। যাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে তাহাদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন নিষিদ্ধ। এই কালেমা তাহাদিগকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। তবে কোন আইনগত ব্যাপারে উহাতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইলে উহা ভিন্ন কথা (মুসলিম, ১খ, ৩৭)। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চলাকালীন সঙ্গীন মুহূর্তেও কোন কাফির এই কালেমা উচ্চারণ করিলে সে জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা পাইবে এবং তখন তাহাকে (ভয় পাইয়া কালেমা পড়িয়াছে এই অজুহাতেও) 'হত্যা করা হারাম' হইবে (দ্র. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু উচ্চারণের পরে কাফিরকে হত্যা করা হারাম অধ্যায়, মুসলিম, ১খ, ৬৭ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ)]।

জাবির (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, افضل الذكر لا اله الا الله "(যাবতীয় যিকিরের মধ্যে) সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (মিশকাতু'ল-মাসাবীহ, কিতাবু'দ- দা'ওয়াত, পৃ. ২০০, তিরমিযী ও ইব্ন মাজা-এর বরাতে এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ)। বস্তুত তাহ্লীল বা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুসলিম জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন। পবিত্র কুরআন বিভিন্ন আংগিকে বিষয়টি উপস্থাপন করিয়াছে এবং তৎসংগে ইহাকে একাধিক সুন্দর আকর্ষণীয় নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যেমন সূরা ইবরাহীম (১৪ ঃ ২৪)-এ ইহাকে 'পবিত্র কালেমা' (كلمة طيبة) বলা হইয়াছে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) প্রমুখের মতে এই আয়াতে কালিমাতুন তায়্যিবাতুন দ্বারা কালেমা শাহাদাত اشهد ان لا اله الا الله উদ্দেশ্য। সূরা আল-ফাতির (৩৫ ঃ ১০)-এ রহিয়াছে, 'তাঁহারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ করে" (اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ)। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে الكلم الطيب-এর উদ্দেশ্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। সূরা আন'আমে (৬ ঃ ১১৫) ইহাকে সরাসরি প্রতিপালক (রব)-এর কালেমা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ)। আনাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হাদীছে নবী কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ এই আয়াতে রব্-এর কালেমা দ্বারা উদ্দেশ্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। সূরা আর-রা'দ (১৩ ঃ ১৪)-এ ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'সত্যের ডাক' (دعوة الحق)। 'আলী (রা) ও ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা তাওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বুঝান উদ্দেশ্য। সূরা আত্-তাওবা (৯ ঃ ৪০)-এ ইহাকে সরাসরি আল্লাহ্র কথা (كلمة الله) বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও পবিত্র কুরআন ইহাকে 'তাক্ওয়া-র কালেমা' (كلمة التقوى) (৪৮ ঃ ২৬); 'সঠিক ও যথার্থ বাক্য' (قولا سديدا) (৩৩ ঃ ৭০); 'সুন্দরতম কথা' (احسن القول) [৩৯ ঃ ১৮, ৪১ ঃ ৩৩] ইত্যাদি আরও বহুবিধ নামে অভিহিত করিয়াছে। পবিত্র কুরআনে অন্তত ৮৫টি আয়াতে আক্ষরিক ও প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে এবং আরও বহু আয়াতে পরোক্ষ বিষয়রূপে তাহ্লীল তথা কালেমা তায়্যিবার উল্লেখ রহিয়াছে (আরও বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. শায়খু'ল-হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়্যা, ফাযায়েলে যিকির, ২য় অধ্যায়)]।

তাল্হা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে নবী আকরাম (স) বলিয়াছেন ঃ

انى لاعلم كلمة لا يقولها احد عند حضرة الموت الا وجد روحه لها روحا حين تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة .

"আমি অবশ্যই এমন একটি কালেমা অবগত রহিয়াছি যাহা কোন মানুষ মৃত্যু উপস্থিতকালে পাঠ করিলে তাহাতে তাহার রূহ দেহ হইতে বাহির হওয়ার সময় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিবে এবং কিয়ামাতের দিন উহা তাহার জন্য নূর হইবে" (মুসনাদ আহ্মাদ, ১খ., ২৮ ও ৩৭, শব্দের বিভিন্নতা সহকারে)। অন্য রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, فرج الله عنه كربه واشرق لونه "আল্লাহ তাহার (মৃত্যু) যন্ত্রণা দূর করিয়া দিবেন এবং তাহার (চেহারার) বর্ণ উজ্জ্বল হইবে" (পূ. গ্র., ১খ., ১৬১)। রিওয়ায়াতটি শুনিবার পরে 'উমার (রা) তালহা (রা)-কে বলিলেন, সে কালেমাটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু [অর্থাৎ এই কথাটি হযরত তালহা (রা)-এর স্মরণ ছিল না]।

একটি হাদীছে এইরূপ আদেশ রহিয়াছে ঃ لقنوا موتاكم قول لا اله الا الله "তোমরা (শুশ্রূষাকারীরা) মৃত্যুপথযাত্রীদিগকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তালকীন করিবে (পড়াইয়া দিবে)" (মুসনাদু আহমাদ, ৩খ, ৩)।

নবুওয়াতপ্রাপ্ত হইলে নবী কারীম (স) বিভিন্ন সমাবেশে গমন করিতেন এবং সমবেত জনতাকে এই কালেমার প্রতি আহ্বান জানাইতেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি 'উকাজ' ও 'যুল-মাজায' মেলায় গমন করিলেন এবং উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ يا ايها الناس قولو الا اله الا الله تفلحوا "লোকসকল! বল, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, তোমরা সফল হইবে" (অর্থাৎ তোমাদের সফলতা তাওহীদ ও একত্ববাদের স্বীকৃতির সহিত সম্পর্কিত) [মুসনাদ আহ্মাদ, ৪খ, ৬৩; ৫খ, ৩৭১]।

'উমার (রা) ইহাকে ইখলাস (নিষ্ঠ)-এর বাক্য এবং তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতির বাক্য বলিয়াছেন (পূ. গ্র., ১খ, ৬৩)। একটি হাদীছ দ্বারা এইরূপ অবগতি লাভ করা যায় যে, দু'আ কবূল হওয়ার সঙ্গে এই কালেমার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে (পূ. গ্র., ২খ, ১৯৭)।

সূফীগণ লিখিয়াছেন যে, এই কালেমার প্রথম অংশ لا اله কালেমার তিনটি উপকারিতা রহিয়াছে। প্রথম, যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে (প্রকাশ্যে) উহা পাঠ করে আমরা তাহাকে মুসলিম বলি এবং তাহাকে শির্ক ও অংশীবাদের প্রতি অসন্তুষ্ট ও সম্পর্কহীন মনে করিয়া থাকি। দ্বিতীয়, যখন উহার লক্ষ্য ও দাবি অনুসারে বাস্তব ঈমান সম্পাদিত হইয়া যায় তখন এই প্রকারের মু'মিন ব্যক্তি পৃথিবীর যাবতীয় আসবাব-উপকরণকে তখনই 'মাধ্যম' (ও কার্যকারণ)-রূপে স্বীকার করে যখন সে দেখিতে পায় যে, 'আমার মাওলা' ঐগুলিকে 'মাধ্যম ও কার্যকারণ' বানাইয়াছেন এবং উহাতে 'ক্রিয়া' রাখিয়াছেন। তৃতীয়, সকল নবী ('আলায়হিমুস্-সালাম) ও সকল ওয়ালী একযোগে ও একবাক্যে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিয়াছেন যখন অধিক হারে এই কালেমা পাঠ করা হয় এবং মর্ম বুঝিয়া পুনঃপুনঃ উহা আবৃত্তি করা হয় তখন আল্লাহ্র সংগে মিলনের (وصال) পথের প্রতিবন্ধক পর্দাসমূহ ধীরে ধীরে এবং সহজভাবে উন্মোচিত বা অপসৃত হইতে থাকে। তদ্রূপ উহা গুনাহ দূর করিবার এবং তাহা হইতে হেফাজতে থাকিবার মোক্ষম উপকরণ।

কালেমার দ্বিতীয় অংশ الا الله–ইহা নেক ও পুণ্য অর্জনের উৎস ও মাধ্যম। লা ইলাহা-তে আল্লাহ ব্যতীত সব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ এবং সকল প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তু (মাতলূব ও মাহবূব)-এর প্রতি অস্বীকৃতি রহিয়াছে। আর কোন বিষয় যখন মানুষের দৃষ্টি ও বিশ্বাসের (ঈমানের) কাছে প্রিয়, পছন্দনীয় ও কাঙ্ক্ষিত রহিল না তাহা হইলে সে লোকটির এমন সব কাজের প্রতি যাহা গুনাহ ও পাপরূপে ঘোষিত–কিরূপে আকৃষ্ট হইতে পারে? এবং যেসব বিষয়বস্তু তাহার জন্য হালাল ছিল তাহাও যখন মুখ্য উদ্দেশ্য (مقصود بالذات) রহিল না তখন যাহা তাহার জন্য হারাম তাহার প্রতি কি করিয়া ধাবিত হইবে? মোটকথা, এইভাবে কালেমার প্রথম অংশ গুনাহ হইতে বাঁচিবার উপায় হইয়া থাকে। আর الا الله দ্বারা

নেক ও পুণ্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ এইভাবে সৃষ্টি হয় যে, মানুষ যখন পৃথিবীর সকল কামনা-বাসনা ও প্রিয় বিষয়কে ক্ষণস্থায়ী ও তুচ্ছ বিশ্বাস করিয়া পূর্ণ ও মহান গুণাবলীর অধিকারী আল্লাহ্র সহিত সংযোগ সৃষ্টি করিয়া নেয় তখন আল্লাহ্র তাজাল্লী (ও জ্যোতির বিকিরণ) মানুষের সব উদ্যোগ-আকর্ষণকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অধীন করিয়া দেয় এবং মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ-ই তাহার প্রকৃত প্রেমাস্পদ ও মুখ্য লক্ষ্য হইয়া যায়। পরে তো সে "আল্লাহকে না দেখিয়া" (হাদীছ বর্ণিত ان تعبد الله كانك تراه) কোন কিছুরই পদক্ষেপ গ্রহণ করে না অর্থাৎ একদিকে যেমন সে আল্লাহ্কে তাহার অবস্থা ও কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারীরূপে দেখিতে পায় তেমনি অন্যদিকে তাঁহার 'অনুমোদন' ও রিযামন্দী (তুষ্টি)-র প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং তাঁহার সন্তুষ্টির ক্ষেত্র দেখিতে পাইলে সাগ্রহে ও তৎপরতার সাথে উহার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়াও (১) বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবু'ল-ঈমান, ১৮, ২৩; কিতাবু'ল-'ইল্ম, ৩৩, ৪৯; কিতাবু'স-সালাত, ২৮, ৪৬; কিতাবু'ল-জানাইয, ১, ৮০, ৮৬; কিতাবু'ল-বুযূ', ৫০, ৬৮; কিতাবু'ল-জিহাদ, ১৩৩; কিতাবু'ত-তাফসীর, (সূরা) ৯ ঃ ১৬; ১৪ ঃ ২; ২৮ ঃ ১; কিতাবু'ল-আয়মান, ৫, ৭, ১৯; কিতাবু'ল-ফিতান, ৪, ২৮; (২) মুসলিম, আস্-সাহীহ, কিতাবু'ল-ঈমান, ১, ২২, ৩২৬; কিতাবু'ত-তাহারাত, ৪; কিতাবু ফাদাইলি'স-সাহাবা, ৩৪; কিতাবু'য্ যিক্র, ২৭, ২৯, ৩১, ৩২, ৪৫, ৮৮; কিতাবু'ত-তাতাওউ', ১৪; (৩) তিরমিযী, আস্-সাহীহ. কিতাবু'ল-বিত্র, ১৭; কিতাবু'দ-দা'ওয়াত, ৮৬; কিতাবু'ত্-তাফসীর, (সূরা) ১ ঃ ২, ১৫ ঃ ৫, ৩৮ ঃ ১; (৪) ইব্ন মাজা, আস্-সুনান, মুকাদ্দিমা, ৯; কিতাবু'ল কাফ্ফারাত, ২; (৫) ইমাম মালিক, মুওআত্তা', কিতাবু'স-সাফার, ৮৪; কিতাবু মাস্সি'ল-কুরআন, ২৩; সিফাতু'ন-নাবী (স), ২৪; (৬) গাযালী, ইহ্য়া' 'উলূমি'দ-দীন, ১খ, ৭৮, ২১১, মিসর ১৩২৬ হি.; (৭) মুরতাদা যাবীদী, ইত্হাফু'স-সাদা, ৫খ, ১০, মিসর ১৩১১ হি.; (৮) ইব্নু'ল আরাবী, আল্-ফুতূহাতু'ল-মাক্কিয়্যা, ১খ, ৩২৭, মাত্বা'উ দারি'ল-কুতুবি'ল-'আরাবিয়্যা, তা. বি.; (৯) ঐ লেখক, কিতাবু'ল- জালালা, হায়দররাবাদ ১৩৬১ হি. (রাসাইলু ইবনি'ল-'আরাবী, রিসালা ৪)।

'আবদুল-মান্নান 'উমার (দা. মা. ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

তাহ্সীন (تحسين) ঃ মীর মুহাম্মাদ 'আতা হুসায়ন খান, কবিনাম তাহ্সীন (মুরাস্সা' রাকাম مرصع رقم-উপাধিতেও তিনি প্রসিদ্ধ)। তিনি একজন ভারতীয় লেখক। তাঁহার পিতার নাম মীর মুহাম্মাদ বাকির খান, যাঁহার কবি নাম ছিল শাওক। তিনি একজন "তুগ্রা" হস্তলিপি বিশেষজ্ঞও ছিলেন। তাঁহারা আটাওয়া-এর অধিবাসী ছিলেন। তাহ্সীনের পুত্র সায়্যিদ কাসিম আলী খান একাধারে একজন কবি ও একজন সঙ্গীত-বিশারদ ছিলেন। তাহ্সীনের জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। কামূসু'ল-আ'লাম-এর বর্ণনামতে তাঁহার মৃত্যু সন ১২০০ হি.।

তাহ্সীনের পরিবার রিযবী নেতৃত্বের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিবারের সদস্যগণ ইংরেজদের বিশ্বাস অর্জন করিয়াছিল এবং তাঁহার পিতামহ হইতে শুরু করিয়া তাঁহার পৌত্র পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের কর্মচারী ছিলেন। তিনি পারিবারিক সূত্রেই কাব্য ও সাহিত্য চর্চার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি জেনারেল স্মিথের অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জেনারেল স্মিথের সঙ্গে লাক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত গঙ্গা নদী ভ্রমণ করেন। উত্তর ভারতে এই জেনারেলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং নওয়াব শাহ আলামের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অনেক উপাধি প্রদান করা হইয়াছিল। এক বৎসর পর জেনারেল স্মিথ তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নিলে তিনি তাহ্সীনের পক্ষে সুপারিশ করেন। ফলে তাহ্সীন পাটনার প্রশাসনিক কর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু সেইখানে তিনি বেশি দিন টিকিতে পারেন নাই, বরং তিনি ফায়যাবাদে ফিরিয়া আসেন। 'ইমাদু'স্ সা'আদাত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ১৭৭২ সালে ফায়যাবাদের আবাসিক ক্যাপ্টেন হারপার-এর অধীনস্থ একজন কর্মকর্তা ছিলেন। ক্যাপ্টেন হারপারের মাধ্যমে নওয়াব শুজা'উ'দ্ দাওলা (মৃ. ১১৮৮/ ১৭৭৫)-এর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং এইভাবে তিনি অযোধ্যার দরবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হইয়া পড়েন। পাটনায় অবস্থানকালে তিনি যে নাও মুরাস্সা' (نو مرصع) গ্রন্থের রচনা শুরু করিয়াছিলেন, শুজা'উ'দ-দাওলা-র প্রেরণা ও উৎসাহে তিনি ইহার রচনা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র আসাফুদ্-দাওলা (১১৮৯-১২১২/ ১৭৭৫-১৭৯৭)-এর শাসনামলে ইহার রচনা কাজ সমাপ্ত হয়। গ্রন্থটির রচয়িতা গ্রন্থের ভূমিকায় আসাফু'দ্- দাওলা-এর উদ্দেশ্যে একটি কাসীদা সংযোজন করিয়াছেন। বলা হয় যে, বিখ্যাত ভারতীয় কবি মির্যা মুহাম্মাদ রাবী' সাওদা (মৃ. ১১৯৫/১৭৮০)-এর কবিতা পাঠ করিয়া তাহ্সীনের মনে ভারতীয় সাহিত্যে অবদান রাখিবার আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছিল।

রচনাবলী ঃ গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই তাহ্সীনের বিচরণ ছিল। তিনি উর্দূ ও ফারসী উভয় ভাষায়ই কবিতা রচনা করিতেন। কবি হিসাবে সমসাময়িক কালে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি কবিদের আসরেও যোগদান করিতেন; কিন্তু তাঁহার কবিতার মধ্যে কেবল সেই সবই পাওয়া যায়, যাহা "নও তারয-ই মুরাসসা' (نوطرز مرصع) গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) নও তারয-ই মুরাস্সা' গদ্যাকারে ও কাব্যিক ভারতীয় অনুবাদ। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহা রচনার কাজ শুরু করেন এবং ১৭৭৫ সালের পরে সমাপ্ত করেন। তাহ্সীনের মতে তিনি ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা পরিভ্রমণ কালে তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে শ্রুত কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের বিষয়বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গ্রন্থটি ফারসী "কিস্সা-ই চাহার দারবীশ" অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। তবে গ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতা কে এই বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে। সাধারণভাবে গ্রন্থটির রচয়িতারূপে আমীর খুসরাও-এর নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রন্থটির বাচনভঙ্গি ও অন্যান্য সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আমীর খুসরাও ইহার প্রকৃত রচয়িতা নহেন (তু. মাকালাতে শীরানী ও আম্মান, মীর প্রবন্ধ)। কেহ কেহ গ্রন্থটির রচয়িতারূপে মুহাম্মাদ 'আলী মা'সূম-এর নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন। উক্ত গ্রন্থের একটি প্রাচীন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি মারহুম অধ্যাপক সায়্যিদ সাজ্জাদ কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৫২২৩ ও ৭৬৭৭ এবং বোডলিয়েন লাইব্রেরী, অক্সফোর্ড-এর পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৩৪৩৫-ও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। উক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ দ্বারা বইটির রচয়িতা বলিয়া কথিত মুহাম্মাদ 'আলী মা'সূম-এর পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। তবে ইহা সত্য যে, মুহাম্মাদ 'আলী মা'সূম হিন্দী ভাষা হইতে 'কিস্সা-ই চাহার দারবীশ'-এর ফারসী অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহসীন প্রণীত 'নও তারয-ই মুরাস্সা"-এর উপজীব্য হিসাবে এই অনুবাদটি গ্রহণ করা হয় নাই। তাঁহার অনুবাদটির মূল ভিত্তি বৃটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি কাহিনীর ধারাক্রম ছাড়াও উক্ত পাণ্ডুলিপির বর্ণনারীতির সঙ্গেও তাহ্সীনের অনুবাদের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কোনও কোনও স্থানে উক্ত পাণ্ডুলিপির পংক্তিসমূহের কেবল আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। এই পাণ্ডুলিপিটি সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপিটির ভাষা ও বাচনভঙ্গি দ্বারা অনুমিত হয় যে,

পাণ্ডুলিপি কোনও ইরানী কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে (ডঃ নূরুল-হাসান হাশিমী ও ডঃ জ্ঞান চান্দ জৈন-এর মতেও মুহাম্মাদ 'আলী মা'সূমের পাণ্ডুলিপিটি সাদৃশ্যপূর্ণ)। কিন্তু একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির আলোকে মি. Ousley ও শিপার নিগার যাহার বরাত দিয়াছেন, ইহার রচয়িতা মুহাম্মাদ আলী মা'সূমই। অতএব ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, তাহসীন প্রণীত নও তারয-ই মুরাস্সা'-এর মূল ভিত্তি মা'সূম প্রণীত কিস্সা-ই চাহার দারবীশ। বাদী'উ'ল-আছার হাজ্জী রাবী' মাগ্রিবী যাঁহার কবিনাম 'আনজাম', তাঁহার বর্ণিত অবস্থা এবং কাহিনীর বিষয়বস্তুর আলোকে ইহা ধারণা করা অমূলক হইবে না যে, তাহসীনের রচনার মূল ভিত্তির তিনিও একজন রচয়িতা।

নও তারয-ই মুরাস্সা' বিরল রচনারীতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কিস্সা-ই চাহার দারবীশ-এর অপর একটি অনুবাদ মীর আম্মান দিহলাবী ১২১৫/১৮০১ সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ১২১৭/১৮০৩ সালে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সেই অনুবাদটি 'বাগ ও বাহার" (باغ وبهار) নামে প্রসিদ্ধ। তাহসীনের "নও তারয্-ই মুরাস্সা" ১৮৪৬ সালে বোম্বাই, ১৮৬৯ সালে লাখনৌ এবং ১৮৭৪ সালে কানপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। নাও তারয-এর একটি সুলিখিত পাণ্ডুলিপি, যাহা রাজাব ১২১৩ সালে জেম্স মার্টিন-এর জন্য লিখিত হইয়াছিল, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। অপর একটি ভাল পাণ্ডুলিপি পেশোয়ারের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় অপর একজন লেখক 'আজমাতুল্লাহ-এর উপরও নাও তারয-এর সাহিত্যিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেই স্বীয় গ্রন্থ কিস্সা-ই রঙ্গীন গুফতার-এর ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার গ্রন্থের রচনারীতিতে তাহসীনের অনুসরণ করিয়াছেন। অপরদিকে ইণ্ডিয়া অফিসের একটি পাণ্ডুলিপিতে (ফিহ্রিস্ত, Blumhardt, সংখ্যা ১৩২) তাহ্সীনের অনুবাদের ভূমিকা ও প্রথম দারবীশের কাহিনীকে যথাক্রমে তৃতীয় দারবীশ ও শাহ আযাদ বাখ্ত-এর কাহিনীর সঙ্গে (যাহা অন্য একজন সাহিত্যিক মুহাম্মাদ হাদী হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন) মিলাইয়া ফেলা হইয়াছে।

নাও তারয-ই মুরাসসা'-এর একটি অব্যবহৃত পাণ্ডুলিপি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে এবং ১২৫০ হি. সালে সমাপ্ত অপর একটি উত্তম পাণ্ডুলিপি Preussische Staatsbliothet বার্লিনে সংরক্ষিত আছে।

২। নাও তারয ছাড়া তাহ্সীন ফারসী ভাষায় ইংরাজী ব্যাকরণের উপর 'দাওয়াবিতে ইংরেজী (ضوابط انكريزى) নামে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৩। তাওয়ারীখ কাসিমী (تواريخ قاسمى) নামে একটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। উহা একটি ইতিহাস গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়।

৪। তাহা ছাড়া 'ইন্শা-ই তাহ্সীন' নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন।

য়ূসুফ আলী খান তাঁহার তায্কিরা-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহ্সীন একজন প্রখ্যাত হাস্যরসিক ছিলেন (গুলাম মুহাম্মাদ, তায্কিরা-ই খুশনুওয়ায়আন, পৃ. ৬২)। মুহাম্মাদ হুসায়ন খান নামক অপর এক ব্যক্তিও তাহ্সীন কবিনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত না'তের একটি সংকলন ফারসী ও হিন্দী ভাষায় 'গুলিস্তান-ই নাও' নামে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে দিল্লী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। একইভাবে বিভিন্ন সূত্র হইতে সংকলিত মুহাম্মাদ হুসায়ন খান তাহ্সীনের না'তের একটি সংকলন "চমন মাদ্হ নাবী" (چمن مدح نبى) নামে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে দিল্লী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। নওয়াব বুরহানু'ল-মূলক সা'আদাত খান (নাজেমে লাক্ষ্ণৌ)-এর অধীনস্থ কর্মকর্তা মির্যা 'আবদু'ল-আলী কাশ্মীরী, শাহ ফাকীরুল্লাহ-এর শাগরিদ 'আবদু'ল-'আজীম লাহোরী, কাদী 'আবদু'র-রাহমান পানীপাথী (মৃ. ১২৯৪ হি.), তাঁহাদের সকলেরই কবিনাম ছিল তাহ্সীন; কামূসু'ল-'আলাম, ৩খ, ১৬২৯; মাস্হাফী 'আক্দছারিয়্যা, দিল্লী ১৩৩৪ হি., পৃ. ১৮।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Garcin de Tassy, Histoire de la Literature hindouie et hindoustanie, ২য় সং, ১খ, ২১২, ৩৫৬; ৩খ, ১৯৯ স্থা.; কারীমু'দ-দীন, তারীখে শু'আরা-ই উর্দূ, দিল্লী ১৮৪৮ খৃ., পৃ. ২১৮; (২) Groundriss der iran, Phil, ২খ, ৩২৪; (৩) শিপার নিগার, A Catalogue of the Manuscripts of the Libraries of the King of Oudh, ১খ, ২৯৪; (৪) J. F. Blumhart, Catalogue of the Hindustani manuscripts of the Library of the India Office, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৪২-৪৩, ৫১-৬৭ স্থা.; (৫) প্রাগুক্ত, Gatalogue of Hindustani Printed Books in the Library of the British Museum, ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ২৩১; (৬) Catal, India Office, দ্বিতীয়/২য়; (৭) Blumhardt, Hindustan Books, পৃ. ১২৪-১৪৬; (৮) বাগ ওয়া বাহার, সম্পা. D. Fooes, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২ প.; (৯) সামীবেক, কামূসু'ল-'আলাম, ৩খ, ১৬২৯; (১০) হাফিজ মাহমূদ শীরানী, মাকালাতে শীরানী, লাহোর ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২৪-৫৮; (১১) সায়্যিদ সাজ্জাদ দিহলাবী, ডক্টর কী ডক্টরী কে লিয়ে মাকালী (ইংরেজী), লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩০ খৃ.; (১২) প্রাগুক্ত, নও তারয-ই মুরাস্সা' (মুসাওওয়াদা বিল-দি'ল একাডেমী, পাঞ্জাব, লাহোর এই সংস্করণটি সংরক্ষিত আছে); (১৩) প্রাগুক্ত, নাও তারয-ই মুরাস্সা' কী তারীখে তাসনীফ কী বাহাছ, ইসলামিক কালচার, হায়দরাবাদ ১৯৩৯ খৃ.; (১৪) সায়্যিদ নূরুল-হাসান হাশিমী, নাও তারয-ই মুরাসসা', এলাহাবাদ ১৯৫৮ খৃ.; (১৫) জ্ঞান চান্দ জৈন, উর্দূ কী নাছরী দাস্তানী, (আঞ্জুমানে তারাককী উর্দূ পাকিস্তান), করাচী ১৯৫৪ খৃ.; (১৬) খায়রাতী লাল বে-জাগার, তায্কিরা (দ্র. Blumhardt, ফিহরিস্ত মাখ্তূতাতে ইণ্ডিয়া অপিস, সংখ্যা ৬৪)।

সায়্যিদ যাকির ই'জায (দা. মা. ই.), V. F. Buchness (E.I. [1])/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

তাহ্সীল (تحصيل) ঃ আরবী حصل ক্রিয়াপদ হইতে উদ্ভূত কর্মবাচক বিশেষ্য, ব্যবহারিক অর্থ মূলত 'সংগ্রহ', 'গ্রহণ' বা 'অর্জন'। বাংলাদেশ-পাক-ভারত উপমহাদেশে শব্দটির ব্যবহার ভূমি-রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে সীমিত। ভারতের উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও পাকিস্তানের কোনও কোনও অঞ্চলে জিলার অন্তর্গত প্রশাসনিক ও রাজস্ব ইউনিটগুলিকে তাহ্সীল (বোম্বাই প্রদেশে তা'আল্লুকা বা বিকৃতভাবে উচ্চারিত আলুকা) বলা হয়; তাহসীলগুলির আয়তন সাধারণত ৪০০-৬০০ বর্গ মাইল হইয়া থাকে; তবে ভারতের উত্তর প্রদেশে ইহা আরও কম হইতে পারে। আয়তনের দিক দিয়া তাহ্সীল মুগল সাম্রাজ্যের পরগনা ও সরকারের মধ্যবর্তী; ইহার দায়িত্বে ন্যস্ত কর্মকর্তাকে বলা হয় তাহ্সীলদার। মাদ্রাজ ব্যতীত ভারতের অন্যত্র তাহ্সীলদারগণ প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতার অধিকারী। তাহ্সীলদারেরা তাঁহাদের এলাকায় দুই বা ততোধিক তাহসীল লইয়া গঠিত মহকুমা প্রশাসকের অথবা সরাসরি জিলা প্রশাসকের অধীনে নিযুক্ত হন।

বাংলাদেশে তাহসীলদারের দায়িত্ব শুধু ভূমি-রাজস্ব আদায়ে সীমাবদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The Standard Lexica, যথা Chambers Twentieth century Dictionary, Revised Edition, 1959; (2) Imperial Gazetteer of India, Oxford 1909; (3) H. Yule ও A. C. Burnell, Hobson-Jobson, সম্পা. Wm. Crooke, London 1903.

T. W. Haig (E.I. [1])/শায়খ ফজলুর রহমান

তাহা (طٰهٰ) ঃ হুরূফে মুকাত্তা'আত (দ্র.)-এর অন্তর্গত, কুরআন মাজীদের একটি সূরার নাম। বিন্যাসক্রমের দিক দিয়া ইহা ২০তম সূরা যাহা সূরা মারয়াম-এর পর সূরা আল-আম্বিয়া'-র পূর্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাযিলক্রম হিসাবে ইহা ৪৫তম সূরা, যাহা সূরা মারয়াম-এর পর এবং সূরা আল-ওয়াকি'আর পূর্বে মক্কা মুকাররামায় নাযিল হয় (আল-ইতকান, পৃ. ১; আল-কাশ্‌শাফ, ৩খ, পৃ. ৪৯)। মক্কার কাফিরদের মধ্য হইতে আবূ জাহ্‌ল ও আন-নাদর ইব্‌নু'ল-হারিছ প্রমুখ বলিতে শুরু করিয়াছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মাদ (স)-এর উপর কুরআন মাজীদ নাযিল করিয়া তাঁহাকে (মা'আযাল্লাহ্) কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন (আন নায়সাবূরী, আসবাবু'ন-নুযূল, পৃ. ১৭৪; আস-সুয়ূতী, আসবাবু'ন- নুযূল, পৃ. ৫০০)। অনন্তর এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা উহার জওয়াব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কুরআন কাহারও কষ্টের জন্য নহে, বরং হিদায়াতের জন্য নাযিল হইয়াছে। 'তাহা' শব্দের উপর বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন ইমাম কুরতুবী (আল-জামি' লি-আহকামি'ল-কুরআন, ১১খ, পৃ. ১৬৫-৬৮)। এই সূরার অপর নাম আল-কালীমও (রূহু'ল-মা'আনী, ১৬খ, পৃ. ১৪৭)। অধিকাংশ (জামহূর) উলামা'র মতে এই সমগ্র সূরাটিই মাক্কী। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে ১৩০ ও ১৩১ নং আয়াত মাদানী। সূরা তাহায় ৮টি রুকূ' ও ১৩৫টি আয়াত রহিয়াছে।

বিগত সূরার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক এই যে, পিছনের সূরা মারয়াম নাযিলক্রম হিসাবেও ইহার পূর্বে নাযিল হয় এবং উভয়ের প্রারম্ভই হুরূফে মুকাত্তা'আত দ্বারা হইয়াছে। বিগত সূরার শেষে বিবৃত হইয়াছে যে, কুরআন মাজীদকে মানুষের জীবন সহজ ও হিদায়াতের জন্য আরবী ভাষায় নাযিল করা হইয়াছে। এখন এই সূরার শুরুতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহ্-ভীরুদের পথ প্রদর্শনের জন্য নাযিল করা হইয়াছে। বিগত সূরায় কয়েকজন আম্বিয়া'-ই কিরাম ('আ)-এর কাহিনী বিবৃত হইয়াছে; এই সূরায় তাঁহাদের মধ্যে হযরত মূসা ('আ)-র কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে (আল-মারাগী, তাফসীর, ১৬খ, পৃ. ৯৩; রূহু'ল-মা'আনী, ১৬খ, পৃ. ১৪৭; আল-বাহরু'ল-মুহীত, ৬খ, পৃ. ২২৩ প.)। সূরার সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে, কুরআন মাজীদকে উভয় জগতের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের নিমিত্ত নাযিল করিয়াছেন। হযরত মূসা ('আ)-এর বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে তূর-ই সায়নার উপর আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথাবার্তা বিনিময়, শুভ্র হস্ত, হযরত হারূন ('আ)-এর নবূওয়াতের জন্য হযরত মূসা ('আ)-এর দু'আ, ফির'আওনের উপর প্রভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সকাতর মিনতি, যাদুকরদের সত্যের সামনে সিজ্‌দাবনত হওয়া, মিসর হইতে বানী ইসরাঈল-এর নির্গমন, ফিরআওনের সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হওয়া এবং সামিরী কর্তৃক বানী ইসরাঈলের পথভ্রষ্টের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে; কুরআন মাজীদ হইতে বিমুখ হইবার পরিণতি, কিয়ামতে পাপীদের শাস্তি, আদাম ('আ)-এর কাহিনীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে বিমুখ ব্যক্তিদের পরিণতি, অতীত কালের বিধর্মীদের অবস্থা হইতে শিক্ষা গ্রহণ এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মুশরিকদের অবকাশের উল্লেখ রহিয়াছে। সর্বশেষে অবিশ্বাসীদের কষ্ট প্রদানের উল্লেখ করত রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাওহীদের উপর সুদৃঢ় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন থাকিবার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে (আল-মারাগী, ১৬খ, পৃ. ১৭১)।

কাদী আবূ বাক্‌র ইবনুল-আরাবী (আহকামুল-কুরআন, পৃ. ১২৪৪ প.) সূরা তাহা-র নয়টি আয়াত (১২, ১৪, ১৭, ১৮, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১১৫, ১৩০) হইতে বিশটি বিভিন্ন শার'ঈ আহকাম ও ফিকহী মাসাইল উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং ইমাম আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস (আহকামুল-কুরআন, ৩খ, প. ২১৯) এই সূরার কতক আয়াতের কতিপয় 'ইলমী মাসা'ইল ও ফিকহী দিক সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূরার ফাদা'ইল প্রসঙ্গে এই কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই সূরা হযরত 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হইয়াছিল (আল-কুরতুবী, ১১খ, পৃ. ১৬৩ প.; ফাতহু'ল-বায়ান, ২খ, পৃ. ৬২; আদ-দুররু'ল-মানছূর, ৪খ, পৃ. ২৮৮)। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টির দুই হাযার বৎসর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সূরা তাহা এবং সূরা য়াসীন পাঠ করিলে ফেরেশ্‌তাগণ এতদ্‌শ্রবণে বলিতে থাকে, যেই উম্মাত এই সূরা বক্ষে ধারণ এবং মুখে তিলাওয়াত করিবে, তাহারা ভাগ্যবান (পূর্বোক্ত বরাত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, আসবাবু'ন-নুযূল, কায়রো ১৯৬৪ খৃ; (৩) ঐ লেখক, আদ-দুর্‌র'ল মানছূর, কায়রো ১৩০৬ হি.; (৪) আবু'ল-হাসান আন-নায়সাবুরী, আসবাবু'ন-নুযূল, কায়রো ১৯৬৮ খৃ.; (৫) আল-কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামি'ল-কুরআন, কাযরো ১৯৪১ খৃ.; (৬) আল-মারাগী, তাফসীরু'ল-মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৭) সিদ্দীক হাসান খান, ফাতহু'ল-বায়ান, কায়রো সং.; (৮) আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, কায়রো সং.; (৯) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ, কায়রো, ১৯৪৬ খৃ.; (১০) আবূ হায়্যান আল-গারনাতী, আল-বাহরু'ল মুহীত, রিয়াদ সং.; (১১) আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস, আহকামু'ল কুরআন, কায়রো ১৩৩৫ হি.; (১২) কাদী আবূ বাক্‌র ইবনু'ল-'আরাবী, আহকামু'ল-কুরআন, কায়রো, ১৯৫৮ খৃ.।

জাহুর আহমাদ আজহার (দা.মা.ই.)/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

তাহা হুসায়ন, ডক্টর (طه حسين دكتر) ঃ আরব বিশ্বের অতিশয় বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক ও প্রবন্ধকারক লেখকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ এবং 'আরব বিশ্বের শিক্ষিত যুবকদের সুপ্রিয় লেখক। তাঁহার গ্রন্থসমূহ কেবল 'আরব বিশ্বেই নহে, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত আগ্রহ ও তৃপ্তির সহিত পঠিত হয়।

ডক্টর তাহা হুসায়ন ১৪ নভেম্বর, ১৮৮৯ খৃ. মিসরের মালভূমি অঞ্চলের একটি ছোট গ্রাম মাগাগা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন বহু সন্তানের জনক এবং একটি শর্করা কোম্পানীর কর্মচারী। তাহা হুসায়ন ২ (দুই) বৎসর মতান্তরে ৬ (ছয়) বৎসর বয়স হইতে চক্ষু ব্যাধির কারণে দৃষ্টিশক্তি হারাইতে থাকেন এবং ভুল চিকিৎসার ফলে তিনি চিরতরে অন্ধ হইয়া যান। নয় বৎসর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ হিফ্‌জ করেন। গ্রামের মকতবে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং বড় ভাইয়ের সহায়তায় তিনি আলফিয়া ইব্‌ন মালিকও মুখস্থ করিয়া ফেলেন।

১৯০২ খৃ. তিনি তাঁহার ভাইয়ের সহিত উচ্চ শিক্ষার্থে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আল-আযহার-এ তিনি ছয় বৎসর আরবী ব্যাকরণ (نحو), উসূলুল ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা (منطق), দর্শন ও সাহিত্যে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু তিনি সর্বাধিক জ্ঞান লাভ করেন শায়খ সায়্যিদ 'আলী আল-মুরসাফী (মৃ. ১৯৪৯ হি.)-এর নিকট হইতে। শায়খ নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে আগ্রহী ছাত্রদিগকে আয-যামাখ্শারীর আল-মুফাসসাল, আবূ তাম্মাম-এর দীওয়ানু'ল-হামাসা এবং আল-মুবার্রাদ-এর আল-কামিল পড়াইতেন। আল-আযহার-এ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন উস্তাদ আহমাদ হাসান আয-যায়্যাত, যিনি পরবর্তী কালে বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা আর-রিসালা প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব আজীবন অটুট ছিল, পরে যাহা আত্মীয়তার সম্পর্কে পরিণত হয় (আল-আয়্যাম, স্থা., কায়রো ১৯২৯ ও ১৯৩৯ খৃ.)।

১৯০৮ খৃ. মিসর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা হুসায়ন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠেও অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। এই সময়ে খ্যাতনামা ইতালীয় পাশ্চাত্যবিদ Guidi ইতিহাস ও ভূগোল এবং প্রফেসর Nallino আরবদের জোতির্বিজ্ঞান ও আরবী সাহিত্যের ইতিহাস পড়াইতেন। তাহা হুসায়ন এই সব শিক্ষকের আধুনিক চিন্তাধারা ও মতবাদের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এই সময়ে তিনি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করিবার পর তিনি আবু'ল-'আলা' আল-মা'আর্রী-র কাব্যচর্চা এবং তাঁহার দার্শনিক জীবন সম্পর্কে যিকরা আবি'ল-'আলা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

১৯১৫ খৃ. মিসর সরকারের পক্ষ হইতে উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁহাকে ফ্রান্সে পাঠানো হয়। সোরবোন-এর আর্টস কলেজে তিনি দুই বৎসর শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯১৮ খৃ. তিনি ইব্ন খালদূন-এর সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। প্যারিসে অবস্থানকালে তাঁহার স্মরণীয় ঘটনা হইল একজন ফরাসী মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ, যিনি প্রগাঢ় ভালবাসা, সততা ও নিষ্ঠার সহিত মন-প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছেন। লেখাপড়া ও জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সর্বদাই তিনি তাঁহার সাহায্য-সহায়তাকারিণী ও সঙ্গিনীরূপে পার্শ্বে রহিয়াছেন। তাই তাহা হুসায়ন তাঁহার স্ত্রীকে প্রশংসা ও অনুরাগবশত 'আমার চলার যষ্ঠি' (My Walking Stick) নামে ডাকিতেন।

১৯১৯ খৃ. শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি মিসর চলিয়া আসেন এবং মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন (গ্রীক ও রোমান) ইতিহাস-এর অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২৫ খৃ. সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কলেজে (আর্টস কলেজ)-এ 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ১৯২৬ খৃ. তিনি কিতাব ফি'শ-শি'রি'ল-জাহিলী নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি এমন সব মতামত তুলিয়া ধরিয়াছিলেন যাহা ছিল ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকৃত নিয়ম-নীতি ও মতবাদের বিপরীত।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেই মিসরের সাহিত্যিক ধর্মীয় মহলে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে সরকার উক্ত গ্রন্থের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৩০ খৃ. তিনি আর্টস কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ খৃ. তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সরকারীভাবে ইব্ন সীনার কিতাবু'শ-শিফা নামক গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ সংস্করণ ছাপা হয়। তাঁহার সময়ে লেখকের জন্য কপি রাইট (গ্রন্থস্বত্ব) মঞ্জুর করা হয়।

১৯৪২ খৃ. ওয়াফ্দ পার্টি ক্ষমতায় আরোহণ করিলে তাঁহাকে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫০ খৃ. ওয়াফ্দ পার্টি পুনরায় মন্ত্রী সভা গঠন করিলে তিনি শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার মন্ত্রিত্বের আমলে তিনি সমগ্র মিসরে মাধ্যমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বৈতনিক করিয়া দেন এবং আসয়ূত-এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তিনি এথেন্স য়ুনিভার্সিটি (গ্রীস)-তে 'আরবী ভাষার অধ্যাপকের পদ প্রবর্তন করেন এবং শেক্সপিয়ারের নাটকসমূহের 'আরবী অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে বর্তমান সময় পর্যন্ত শেক্সপিয়ারের আটটি নাটকের 'আরবী অনুবাদ করা হইয়াছে।

১৯৫১ খৃ. সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহাকে পাশা উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৫২ খৃ. সামরিক অভ্যুত্থানের পর তিনি কিছুটা নির্জনতা অবলম্বন করেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডে কোন ছেদ পড়ে নাই। তিনি মাজমা'উ'ল-লুগাতি'ল-'আরাবী, কায়রো ও মাজমা'উ'ল-'ইলমি'ল-'আরাবী, দামিশ্ক-এর সম্মানিত সদস্য। মাদ্রিদ ও ক্যামব্রিজ য়ুনিভার্সিটি তাঁহাকে ডক্টর অব লিটারেচার-এর অনারারী ডিগ্রী প্রদান করে। জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার মতামতকে মর্যাদা দেওয়া হয় (ইলা তাহা হুসায়ন ফী 'ঈদি মীলাদিহি'স-সাব'ঈন, 'আবদু'র-রাহমান বাদাবী সংকলিত, পৃ. ৮-২৮, কায়রো ১৯৬২ খৃ.)।

জ্ঞান-গরিমা ঃ তাহা হুসায়ন স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি, গবেষণা ও অধ্যয়ন, সাহিত্য ও রচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমগ্র 'আরববিশ্বে এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি 'আরববিশ্বে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য অধ্যয়ন এবং জ্ঞানের বিশালতার জন্য সমসাময়িক সকল সাহিত্যিকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন 'আরবী সাহিত্য, সীরাতে নাবাবী এবং ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে বিশদ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সাহিত্যে আল-জাহিজ, কিতাবু'ল আগানীর রচয়িতা আবু'ল-ফারাজ আল-ইসবাহানী ও আবূ হায়্যান আত-তাওহীদী ছিলেন তাঁহার প্রিয় লেখক। কবিদের মধ্যে তিনি আল-বুহতুরী, ইবনু'র-রূমী ও 'আবু'ল-'আলা' আল-মা'আররীর ভক্ত ছিলেন। আবু'ল 'আলা' আল-মা'আররীর কাব্যচর্চা ও জীবন দর্শনের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। কারণ তিনিও তাঁহার মত দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত ছিলেন। সেই অনুরাগ ও আন্তরিক আকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত আবু'ল 'আলা'র দীওয়ান সাকতু'য-যান্দ-এর ভাষ্য পাঁচট খণ্ডে প্রকাশ করেন (কায়রো ১৯৪৫-১৯৪৮ খৃ.)। তিনি মু'তাযিলাদের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট এবং তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুণগ্রাহী ছিলেন।

ডক্টর তাহা হুসায়ন ফরাসী সাহিত্য ও সংস্কৃতির গভীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যে খানদানী ফরাসী ভাষীদের ন্যায়ই দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং প্রচুর ফরাসী সাহিত্য সম্ভার তিনি 'আরবীতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও দর্শনের তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল, কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আধুনিক জীবনধারার দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত করেন নাই (সায়্যিদ আবু'ল-হাসান 'আলী নাদাবী, মুসলিম মামালিক মে ইসলামিয়াত আওর কাওমিয়াত কী কাশ্মাকাশ (سلم ممالك مين اسلاميت اور قوميت كى كشمش) লাখ্নৌ ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১১৯-১২৪)।

এক সময়ে মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তা, সীমাহীন প্রগতিবাদ এবং বিশেষ 'আকীদা পোষণের জন্য তাঁহার খুবই দুর্নাম ছিল। কিন্তু শেষ বয়সে তাঁহার মধ্যে সঠিক জ্ঞান, মধ্যম পন্থা এবং পরিপক্কতার সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীকমতে তিনি সীরাত ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনী সম্পর্কে ভক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'আলা হামিশি'স-সীরা ও মির'আতু'ল-ইসলাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু তিনি সাধারণ ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার ঘোর বিরোধী, বিশুদ্ধ 'আরবীর পক্ষপাতী এবং কুরআনভিত্তিক রাসমু'ল-খাত্ত (লিপি পদ্ধতি)-এর প্রবক্তা ও পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি কুরআন কারীম, উহার শিক্ষা ও প্রচলনকে 'আরব বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে প্রকৃত যোগসূত্র স্থাপনকারী বলিয়া মনে করিতেন (মির'আতু'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৬০-১৬২)।

তাঁহার এত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাঁহার ঐন্দ্রজালিক বর্ণনারীতি। তিনি এক স্বতন্ত্র রচনা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা, যাহাতে প্রা লতা, মাধুর্য, ভাষার বিশুদ্ধতা ও প্রাচীন 'আরবীর সৌন্দর্য সর্বসম্মতভাবে বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তদপেক্ষা বেশি প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর 'আরবী লেখক বর্তমান 'আরব বিশ্বে আর নাই। বর্ণনা পদ্ধতি এতই হৃদয়গ্রাহী যে, পাঠক স্বচ্ছন্দে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়া যায় এবং বিন্দুমাত্রও বিরক্তি বোধ করে না। তাঁহার বর্ণনা পদ্ধতিতে চরম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও পরিলক্ষিত হয়। তবে কখনও কখনও বাক্যের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য এবং একই শব্দের পুনরাবৃত্তি সুস্থ রুচিবোধকে আহত করে (Pierre Cachia, Taha Husayn, লণ্ডন ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ২২৫)। ডক্টর তাহা হুসায়ন-এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাঁহার পঞ্চান্ন বৎসরের সাহিত্যিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের খিদমতে অতিবাহিত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় আধুনিক আরবী ভাষা সর্বপ্রকার নূতন চিন্তাধারা ও আলোচনা প্রকাশের বাহন হওয়ার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। তিনি প্রায় সত্তরখানি ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উহা নিম্নরূপ ঃ

রচনাবলী ও শিক্ষা কার্যক্রম ঃ সাহিত্য সমালোচনা—ডক্টর তাহা হুসায়ন সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হওয়া ব্যতীত অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের সাহিত্য সমালোচকও ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্যের সাহিত্য সমালোচনার সহিত 'আরব বিশ্বকে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক কবি-সাহিত্যিকের রচনা আধুনিক সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াছেন এবং নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বিষয়বস্তুর সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক নবতর মৌলিক চিন্তাধারার ইঙ্গিত দিয়াছেন, যদিও তাঁহার নির্দেশিত পন্থা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণের অবকাশ রহিয়াছে।

১. যিকরা আবি'ল-'আলা' ঃ ডক্টর তাহা হুসায়ন এই গ্রন্থখানি মিসর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট-এর জন্য পেশ করেন। ইহাতে 'আরবের বিখ্যাত দার্শনিক কবি আবু'ল-'আলা' আল-মাআর্‌রীর জীবনী, কাব্যচর্চা ও জীবন দর্শন বিবৃত হইয়াছে। পরীক্ষকমণ্ডলী ইহা পসন্দ করিয়া তাহা হুসায়নকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' ডিগ্রী প্রদান করেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ তাজদীদ যিকরা আবি'ল-'আলা' শিরোনামে ১৯৩৭ খৃ. দারু'ল-মা'আরিফ, কায়রো প্রকাশ করিয়াছে। গ্রন্থখানিতে বিজ্ঞ লেখক আলা-মা'আর্‌রী ও আল-মুতানাব্বী-র হৃদয়গ্রাহী তুলনামূলক মূল্যায়ন করিয়াছেন (পূ. গ্র., পৃ. ২২৩-২২৫)।

২. ফি'শ-শি'রি'ল-জাহিলী ঃ এই গ্রন্থে তাহা হুসায়ন জাহিলী যুগের কাব্যচর্চা সম্পর্কে এমন সব মতামত ও বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন যাহা ইতিহাস ও সাহিত্যের সর্বজনস্বীকৃত মৌলনীতি ও মতবাদের পরিপন্থী। ১৯২৬ খৃ. এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বুদ্ধিজীবী ও ধার্মিক মহল হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে সরকার উহার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। ১৯২৭ খৃ. উহার দ্বিতীয় সংস্করণ ফি'ল-আদাবি'ল জাহিলী নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়। আনজুমান তারাককী-ই উরদূ, দিহলী ১৯৪৬ খৃ. উহার উর্দূ অনুবাদ প্রকাশ করে।

৩. মা'আ'ল-মুতানাব্বী ঃ ১৯৩৬ খৃ. তাহা হুসায়ন প্রখ্যাত কবি আল-মুতানাব্বী-র ব্যক্তিত্ব ও কাব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, যাহা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (কায়রো ১৯৩৭ খৃ.); (৪) ফুসূল ফি'ল-আদাব ওয়া'ন-নাকদ ইহার বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; (৫) হাফিজ ওয়া শাওকী প্রখ্যাত মিসরীয় কবি হাফিজ ও শাওকীর কাব্যের বিস্তারিত আলোচনা (কায়রো ১৯৩২ খৃ.); (৬) হাদীছু'ল-আরাবি'আ' (কায়রো ১৯৩৭ খৃ.); (৭) মিন হাদীছি'শ-শি'র ওয়া'ন-নাছর (দারু'ল-মা'আরিফ, কায়রো ১৯৪৮ খৃ.); (৮) মিন আদাবিনা'ল-মু'আসির (কায়রো ১৯৫৮ খৃ.), ইহা সাহিত্য ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধসমূহের একটি সংকলন। ইহার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) উপন্যাস ঃ তাহা হুসায়ন প্রায় অর্ধ ডজনের মত উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন। উহাতে মিসরীদের দারিদ্র্য, মূর্খতা, কুসংস্কার-প্রীতি, শ্রেণীগত কলহ-বিবাদ ছাড়াও সামাজিক জীবনের বহু চিত্র উদ্ভাসিত। নিম্নলিখিত উপন্যাসগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) দু'আউ'ল কারওয়ান (কোকিলের ডাক) [কায়রো ১৯৩৫ খৃ.], ইহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; (২) আদীব (=সাহিত্যিক) [১৯৩৫ খৃ.]; (৩) আল-হুবু'দ-দা'ই' (ব্যর্থ প্রেম), (কায়রো ১৯৩৭, ১৯৩৮ খৃ.); (৪) আহলামু শাহরি যাদ (=শাহর যাদার স্বপ্ন) [কায়রো ১৯৪৩ খৃ.]; (৫) শাজারাতু'ল-বু'উস (=দুঃখের বৃক্ষ) [কায়রো ১৯৪৪ খৃ.]; (৬) আল-ওয়া'দু'ল-হাক্ক (=সত্য প্রতিশ্রুতি) [কায়রো ১৯৫০ খৃ.], ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের সেই সকল ত্যাগী আত্মোৎসর্গীকৃত সাহাবীর বেদনাবিধুর ঘটনাবলী স্থান পাইয়াছে যাঁহারা কাফির কুরায়শদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মুখে অসীম ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া ইবরাহীম 'ইয়্যা'দ-দীন ১৯৫১ খৃ. একটি চলচ্চিত্রও নির্মাণ করেন, যাহা সমগ্র মিসরে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

(গ) নাটক ঃ (১) মিনা'ল-আদাবি'ত-তামছীলী আল-য়ূনানী, ২ খণ্ড (কায়রো ১৯৩৯ খৃ.)ঃ প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের কয়েকটি নাটকের 'আরবী অনুবাদ; (২) লাহাদাত; ২ খণ্ড (কায়রো ১৯৪২ খৃ.), সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যের ভিন্ন চিত্র এবং কয়েকটি নাটকের 'আরবী অনুবাদ।

(ঘ) শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ মুসতাকবিলুছ-ছাকাফা ফী মিসর (কায়রো ১৯৩৮ খৃ.); মিসরের শিক্ষা ব্যবস্তা সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও সুস্পষ্ট সমালোচনা এবং উহা সংস্কারের উপায়, ইংরাজী অনু. Sidney Glazer, The Future of Culture in Egypt, ওয়াশিংটন ১৯৫৪ খৃ.।

(ঙ) ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ ঃ (১) আল-আয়্যাম, প্রথমার্ধ (কায়রো ১৯৩৯ খৃ.), দ্বিতীয়ার্ধ (কায়রো ১৯৩৯ খৃ.) ঃ তাহা হুসায়ন-এর আত্মজীবনী যাহার রচনায় তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করা হইয়াছে। মি. H. A. R. Gibb এই গ্রন্থের সমালোচনা করিতে গিয়া ইহাকে মিসরের 'আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (H. A.R. Gibb, Studies in Contemporary Arabic Literature, in BSOS, ১৯২৯ খৃ., ৩খ, ৪৫৮)। এই গ্রন্থের ইংরাজী, উরদূ, ফারসী ও রুশ ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে; (২) 'আলা হামিশি'স-সীরাহ, ৩ খণ্ড (কায়রো ১৯৪১-১৯৪৩ খৃ.), রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের কিছু কিছু

ঘটনা, যাহা লেখক তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা পদ্ধতির বিশেষ ঢঙে গল্পের আঙ্গিকে লিখিয়াছেন। ইহার তথ্যসূত্র যদিও সীরাত ইব্ন হিশাম, তাবাকাত ইব্ন সা'দ ও তা'রীখ তাবারীর ন্যায় নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলী, তবুও ইহাতে গবেষণা ও যাচাই-বাছাইয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়; (৩) 'উছমান (আল-ফিতনাতু'ল-কুবরা-র প্রথমাংশ), (কায়রো ১৯৪৭ খৃ.); (৪) 'আলী ওয়া বানূহু (আল-ফিতনাতু'ল-কুব্‌রা-র দ্বিতীয়াংশ), (কায়রো ১৯৫৮ খৃ.) এই গ্রন্থের ফারসী ও উরদূ অনুবাদ হইয়াছে; (৫) আশ-শায়খান (কায়রো ১৯৬০ খৃ.), হযরত আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক ও হযরত 'উমার ফারূক (রা)-র জীবনী; (৬) মিরআতুল-ইসলাম (কায়রো ১৯৬১ খৃ.); বিজ্ঞ লেখক ইহাতে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস, ইসলামী দলসমূহ, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহ, কুরআন-এর অলৌকিকত্ব সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিতসুলভ আলোচনা করিয়াছেন এবং সুন্নাত সঠিকভাবে বুঝিবার উপর জোর দিয়াছেন (পূ., গ্র., পৃ. ৩০৯)।

দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির প্রকাশনা ঃ ডক্টর তাহা হুসায়ন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি প্রকাশেও উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। তিনি আবু'ল-'আলা' আল-মা'আররী-র ব্যক্তিত্ব ও জীবন-দর্শনমুগ্ধ ছিলেন। তাই তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আবু'ল আলার নির্ভরযোগ্য জীবনী এবং শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম প্রকাশ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রাচীন 'আলিমগণের লিখিত ঐ জীবনী ও তাঁহার রচনাবলী আত-তা'রীফু'ল-কুদামা' বি-আবি'ল-'আলা' নামে বিশাল দুই খণ্ডে কায়রো হইতে ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ খৃ. প্রকাশিত হয়। তাঁহার দীওয়ান সাকতু'য-যানদ-এর বিভিন্ন ভাষ্য গ্রন্থ একত্র করিয়া পাঁচটি বিশাল খণ্ডে শুরূহু সাকতি'য-যানদ নামে প্রকাশ করেন (কায়রো ১৯৪৫-১৯৪৮ খৃ.)। তাঁহার তত্ত্বাবধানে কবি ইবরাহীম আল-আবয়ারী-র দ্বিতীয় দীওয়ান লুযূমিয়াত-এর ভাষ্য রচনা করা হইতেছে। এই পর্যন্ত উহার তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৯৬৫ খৃ.)।

'আরবী ভাষার মহামূল্য অবদান কিতাবু'ল-আগানীর প্রতিও তাঁহার গভীর আকর্ষণ ছিল। আল-আগানীর বিশাল কলেবরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণ উহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করিয়াছিলেন। সেই ক্ষেত্রে ডক্টর তাহা হুসায়ন-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বাবধানে ইবনু'ল-ওয়াসিল আল-হামাবীর তাজরীদু'ল- আগানী-র ৫ (পাঁচ) খণ্ড (কায়রো ১৯৫৫-১৯৬০ খৃ.) এবং লিসানু'ল-'আরাব-এর লেখক ইব্ন মানজূর-এর মুখতারু'ল-আগানী ফি'ল-আখবারি ওয়া'ত-তিহানী ইবরাহীম আল-আবয়ারী-র সংশোধন ও প্রতিপাদনসহ আট খণ্ডে প্রকাশিত হয় (কায়রো ১৯৬৬-১৯৬৮ খৃ.)। ইহাতে সনদ, বিভিন্ন ধ্বনি ও ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে 'আরবী সাহিত্যের শিক্ষার্থিগণ সহজেই কিতাবু'ল-আগানীর সাহিত্য ভাণ্ডার দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন।

ড. তাহা হুসায়ন মু'তাযিলাদের চিন্তাধারা দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। মু'তাযিলাদের 'ইলমী অবদান সম্পর্কেও তিনি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার আল-মু'তাযিলী (মৃ. ৪১৫ হি.)-র মূল্যবান গ্রন্থ আল-মুগনী, যাহা মু'তাযিলা বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বিশ্বকোষ নামে খ্যাত, বিশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (কায়রো ১৯৬৮ খৃ.)। আফসোস, ইহার প্রথম তিন খণ্ড বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, লণ্ডন ১৯৩৩ খৃ., উরদু অনু., 'আবদু'ল-মাজীদ সালিক, লাহোর; (২) A.S. Arberry and Rom Landau, Islaam Today, লণ্ডন ১৯৪৩ খৃ.; (৩) Charles Issawi, Egypt, লণ্ডন ১৯৪৭ খৃ.; (৪) P. G. Vatikiotis, Egypt since the Revolution, লণ্ডন ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১৪৩-১৬০; (৫) H. A. R. Gibb, Modern Trends in Islam, শিকাগো ১৯৪৭ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Studies in Contemporary Arabic Literature, in BSOS, তৃতীয় খণ্ড, লণ্ডন ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৪৪৫-৪৬৬; (৭) Taher Khemiri and George Kempffmeyer, Leaders in Contemporary Arabic Literature, লাইপযিগ ১৯৩০ খৃ.; (৮) Pierre Cachisa, Thaha Husayn, লণ্ডন ১৯৫৬ খৃ., স্থা.; (৯) আমীন আল খাওলী, ফি'ল আদাবি'ল-মিসরী, কায়রো ১৯৪৩ খৃ.; (১০) সায়্যিদ কুতব, কুত্‌ব ওরা শাখসিয়াত, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (১০) সামী আল-কায়ালী, মা'আ তাহা হুসায়ন, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (১২) শাওকী দায়ফ, আল-আদাবু'ল-'আরাবী আল-মুআসির ফী মিস্‌র, কায়রো ১৯৬৮ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক, দিরাসাত ফি'ল-আদাবি'ল-'আরাবী আল-মু'আসির, কায়রো ১৯৬৯ খৃ.; (১৪) 'উমার আদ-দাসূকী, ফি'ল-আদাবি'ল-হাদীছ, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ.; (১৫) 'আবদু'র-রাহমান বাদাবী, ইলা তাহা হুসায়ন ফী 'ঈদি মলিাদিহি'স-সাব'ঈন, কায়রো ১৯৬২ খৃ.; (১৬) সায়্যিদ আবু'ল-হাসান 'আলী নাদাবী, মুসলিম মামালিক মেঁ ইসলামিয়াত আওর মাগরিবিয়াত কী কাশামকাশ, লাখ্‌নৌ ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১১৯-১২৪; (১৭) Salama Musa. Life and Works.

নাযীর হুসায়ন (দা. মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

তাহাজ্জুদ (تهجد) ঃ ধাতুমূল ه-ج-د হইতে تفعل বাবের মাসদার (ক্রিয়ামূল)। ইহার মুজার্‌রাদ (مجرد-ধাতুমূলে মৌলিক ক্রিয়া) রূপ هجد-يهجد-هجودا এবং تهجد বিপরীত অর্থবোধক অর্থাৎ একই ধাতুমূল "নিদ্রাগমন করা" ও "জাগ্রত থাকা", "বিনিদ্রিত থাকা" এই বিপরীতমুখী অর্থ বহন করে। তবে ব্যবহার ক্ষেত্রে تهجد শব্দের সাধারণ নেতিবাচক অর্থ অর্থাৎ নিদ্রা বর্জন করা বা বিনিদ্র থাকা (ও বিনিদ্র রজনী যাপন করা)-র অর্থ পাওয়া যায়। যেন তাহাজ্জুদ অর্থ ترك الهجود للصلوة [সালাতের জন্য] নিদ্রা পরিত্যাগ করা হইল (তু. تاثم-পাপ [اثم] বর্জন করিল; تحنث-গোনাহ্ (حنث) বর্জন করিল ইত্যাদি) (লিসান, هجد প্রসংগ; কাশ্‌শাফ, ১খ, ৬৮৭)। অনুরূপ কিছুক্ষণ ঘুমাইবার পরে জাগ্রত হওয়াকেও "তাহাজ্জুদ" (تهجد) বলা হয় (التهجد اليقظ بعد نومة من الليل "রাতের কিছুক্ষণ নিদ্রার পরে জাগ্রত হওয়া হইল তাহাজ্জুদ" [তাফসীরু'ত্-তাবারী, ১৫খ, ৮৯]।

শারী'আতের পরিভাষায় 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণ, বিশেষভাবে মধ্যরাত্রি ও ফজরের মধ্যবর্তী সময় সালাত (নফল) আদায় করাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। এই অর্থটির উৎস হইল পবিত্র কুরআনের আয়াত وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ "এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করিবে; ইহা তোমার জন্য একটি অতিরিক্ত কর্তব্য" (কুরআন মাজীদ, কায়রো ১৩৭১ হি. ১৭ ঃ ৭৯)। نافلة (ব.ব. نوافل) এবং نفل (ব. ব. انفال) বলা হয় গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদে; দান-অনুদান ও অতিরিক্ত কোন কিছুকে। এই ধাতুমূল হইতেই تنفل শব্দ গৃহীত হইয়াছে যাহার অর্থ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গানীমাত) বণ্টনকালে প্রাপ্য অংশের চাইতে অধিক গ্রহণ। সুতরাং নফল হইল সেই সকল 'ইবাদত যাহা ফর্‌যসমূহের অতিরিক্ত এবং স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষায় আদায় করা হয়। অর্থাৎ যেভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টিত হইবার সময় কেহ অধিক হিস্যা পাইবার চেষ্টা করিতে পারে, তদ্রূপ নেকী ও পুণ্য বণ্টিত হওয়ার সময় আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে অভ্যস্ত বান্দাহ অধিক নেকী

হাসিল করিতে যত্নবান হইবে। অর্থাৎ تنفل শব্দে যেন فاستبقوا الخيرات "কল্যাণ আহরণ প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হও"-এর গূঢ়ার্থ নিহিত রহিয়াছে। ইব্ন জারীরের তাফসীরে (১খ, ৮৯; অনুরূপ লিসান, نفل শিরো.)। نافلة لك-এর তাফসীর এইভাবে করা হইয়াছে যে, তাহাজ্জুদ সালাত নবী কারীম (স)-এর জন্য ফরয সালাতসমূহের অতিরিক্ত ফরয ধার্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অনুরূপ বায়দাবী, ৩খ, ১২৬-এ বলা হইয়াছে فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة "ফরয সালাতসমূহের অতিরিক্ত আপনার জন্য ফরয" কাশ্‌শাফ, ২খ, ৬৮৭-এ রহিয়াছে, ان التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة عليك خاصة دون غيرك "নিশ্চয়ই তাহাজ্জুদ তোমার জন্য ফরয সালাতসমূহের উপরে অতিরিক্ত করা হইয়াছে, বিশেষভাবে তোমার জন্য ফরযস্বরূপ, তুমি ব্যতীত অন্যের জন্য নহে" (ঐ, স্থা.) বিশেষভাবে অতিরিক্ত এই কারণে বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সমস্ত সৃষ্টির উপর মহত্ত্ব দান করিয়াছেন এবং 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণকে তাঁহার বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সাধারণ মুসলমানগণ যাহাদের জন্য নফলসমূহ গুনাহের কাফ্‌ফারা ও প্রায়শ্চিতস্বরূপ তাহাদের ব্যতিক্রমরূপে নবী (স) 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণের নিয়মানুবর্তিতা করিতে শুধু আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষায়। কেননা তাঁহার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার ওয়া'দা ছিল لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ "যেন আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন" (ঐ, ৪৮ ঃ ২; তু. আহকামু'ল- কুরআন, ২খ, ৪৫)।

পবিত্র কুরআন ও নবী (স)-এর হাদীছসমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, রিসালাত যুগে 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণ (قيام الليل) সাহাবা কিরামের সাধারণ কর্মসূচী ছিল। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যখন সূরা আল্-মুয্যাম্মিল-এর প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল হইল يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً "হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর" ('ইবাদাতের জন্য) কিছু অংশ ব্যতীত" [ঐ, ৭৩ ঃ ১, ২] তখন মুসলমানগণ 'ইবাদাতের জন্য রাত্রি জাগরণকে (তাহাজ্জুদ আদায় করাকে) ফরয মনে করিলেন এবং তাঁহারা নবী কারীম (স)-এর সংগে এত দীর্ঘ সময় রাত্রি জাগরণ (করিয়া 'ইবাদত) করিতেন যে, তাঁহাদের পদযুগল ফুলিয়া উঠিত (আবূ দাউদ, ২খ, ৬৫)। "আইশা (রা) হইতে বর্ণিম আছে যে, রাত্রিকালে যখন নবী কারীম (স) তাহাজ্জুদে দাঁড়াইতেন তখন তাঁহার সহিত অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অন্য লোকেরাও উপস্থিত হইত। কিন্তু তিনি এতই স্নেহশীল ও দয়াবান ছিলেন যে, তাঁহার এইরূপ আশংকা হইত যে, তাঁহারা এইভাবে নিয়মানুবর্তিতা করিতে থাকিলে আবার না রাত্রিকালীন ইবাদত উম্মাতের জন্য স্থায়ীরূপে ফরয হইয়া যায়। এই কারণে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, লোকেরা নিজ নিজ বাড়িতে তাহাজ্জুদ আদায় করিবে (আবূ দাউদ, ২খ, ৯৩)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন এবং এই সূরার শেষ দিকের আয়াত নাযিল করিলেন- عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ "তিনি জানেন যে, তোমরা উহার (দিন রাত্রির পরিমাণের) সঠিক হিসাব রাখিতে পার না। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হইয়াছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর" (৭৩ ঃ ২০)।

'আইশা (রা) বলেন, এই আয়াতগুলি প্রথম আয়াতসমূহের প্রায় এক বৎসর পরে নাযিল হইয়াছিল। এইভাবে রাত্রি জাগরণ করিয়া 'ইবাদত করার বিধান মুসলমানদের জন্য সহজীকরণ করা হইল। ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর সূত্রেও (ইব্ন জারীর, তাফসীর, ২৯খ, ৬৮ প.) প্রায় অনুরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মুয্যাম্মিলের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল করিয়া 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণ নবী কারীম (স) ও মুসলমানদের জন্য ফরয করিয়া দিয়াছিলেন (فَاَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ)। সুতরাং মুসলমানগণ প্রায় এক বৎসরকাল অতিশয় অবিচলতার সহিত 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করিতে থাকিলেন। কেহ কেহ ইহাতে সমর্থ হইতেছিলেন না (فَمِنْهُمْ مَنْ اَطَاقَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَّمْ يُطِقْهُ)।

তাবারী (র) আ'ইশা (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কখনও কখনও সাহাবীগণ (রা) নিজেদেরকে রশি দিয়া বাঁধিয়া নিতেন (حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق=ইব্ন জারীর, ২৯খ, ৬৮)। ইহার পরে আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াত নাযিল করিয়া অব্যাহতি অনুমোদন করিলেন। একটি রিওয়ায়াতে এইরূপও বিবৃত হইয়াছে যে, মুসলমানগণ দশ বৎসর যাবত রাত্রি জাগরণের নিয়ম পালন করিলেন। ইহা দ্বারা এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করা যায় যে, মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দীর্ঘ সময় রাত্রি জাগরণের আবশ্যকীয় (ফরয) (قم الليل الا قليلا) বিধান হইতে প্রায় এক বৎসর পূর্তির পরে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবুও তাঁহারা উহাতে অল্প-বিস্তর বরাবর নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিতে থাকিলেন যে, পর্যন্ত না হিজরতের তিন বৎসর পূর্বকালীন মি'রাজের সময় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হইল এবং রাত্রি জাগিয়া 'ইবাদত করা মুসলমানদের জন্য 'স্বেচ্ছাধীন' তাতাওউ' (নফল) সাব্যস্ত হইল (فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ; ইব্ন জারীর; অনুরূপ নাসাঈ, ৩খ, ২০০; মুসলিম, মুসতাফা আল-বাব, মিসর (মু.), ১০খ, ২৭৮)। আ'ইশা (রা)-র সূত্রেও ঐ ধরনের রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাতের কারণে আল্লাহ পাক রাত্রি জাগিয়া 'ইবাদতের বিধান লঘু করিয়া দিলেন' (خفف الله عنهم بالصلوات الخمس, আল-কুমী, গারাইবু'ল-কুরআন, ইব্ন জারীর-এর হাশিয়ায়, ২৯খ, ৬৮)। এই বিষয়টিও বিদিত যে, হিজরত-পূর্ব সময়ে মুসলমানদের জীবন পূর্ণাংগরূপে অতিবাহিত হইত সাধনা (রিয়াদাত) ও আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া)-মূলক কর্মসূচীতে। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল সেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচী যাহা মুসলমানদিগকে প্রদান করা হইতেছিল তাহাদিগকে মুত্তাকী ও আল্লাহ্‌ওয়ালাদের এমন একটি সুসংগঠিত জামা'আতরূপে গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে যাঁহারা হিজরত পরবর্তী সময় তাঁহাদের উপর অর্পিতব্য আমানত ও বিশেষ দায়িত্বের বোঝা বহনে সক্ষম হয়। সূরা আল-মুয্যাম্মিলের সমাপ্তি আয়াতে এই দিকে ইংগিত রহিয়াছে।

অধিকাংশ মুফাস্‌সির এই বিষয়টিতে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, সূরা আল-মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রাত্রিকালীন 'ইবাদত (তাহাজ্জুদ) যদিও মুসলিম জনতার জন্য স্বেচ্ছাধীন নফলে পরিণত হইয়াছিল, তবুও নবী কারীম (স)-এর জন্য বিশেষভাবে ফরয রহিয়া গিয়াছিল। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর রিওয়ায়াত রহিয়াছে যে, 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণ নবী কারীম (স)-এর জন্য ফরয ছিল (وكان قيام الليل فرضا عليه)। অন্য একটি বর্ণনায় রহিয়াছে, امر بقيام الليل وكتب عليه "কিয়ামু'ললায়ল-রাত্রি জাগরণে তিনি আদিষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার জন্য তাহা ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছিল" (ইব্ন জারীর, ১৫খ, ৯০; আল-বাহরু'ল-মুহীত, ৬খ, ৭১)। লুবাবু'ত-তা'বীল-এর গ্রন্থকার একটি বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন এই মর্মে যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করিয়া দেওয়ার পরে রাত্রিকালীন 'ইবাদত উম্মতের জন্য স্বেচ্ছাধীন সাব্যস্ত হইল। তবে وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ-এর মর্ম অনুসারে

নবী কারীম (স)-এর জন্য তাহা ফরয রহিয়া গেল (লুবাবু'ত-তা'বীল, ৪খ, ৩৪৯)। অনুরূপ ইব্ন জারীর, ২৯খ, ৬৮-তে রহিয়াছে, فردهم الى الفريضة ووضع عنهم النافلة الا ما تطوعوا به "তখন তাহাদিগকে ফরযের দিকে প্রত্যাবর্তিত করিলেন এবং তাহাদের যিম্মা হইতে রাত্রিকালীন নফল তাহাজ্জুদ রহিত করিলেন, তবে যাহা তাহারা স্বেচ্ছায় করিবে"।

কিয়ামু'ল-লায়ল-রাত্রি জাগরণ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, উহা তিনটি স্তর পরিক্রমণ করিয়াছেঃ (১) সূরা আল-মুয্যাম্মিলের প্রথম দিকের আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পরে 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণ মুসলমানদের সকলের জন্য ফরয ও অবশ্য পালনীয় হইল এবং মুসলমানগণ এত কঠিনরূপে এই বিধান বাস্তবায়িত করিলেন যে, সারা রাত্রি জাগিয়া তাঁহারা তাহাজ্জুদ আদায় করিতেন যেমন উপরে বিবৃত হইয়াছে। (২) সূরা আল-মুয্যাম্মিলের শেষ আয়াত নাযিল হওয়ার পরে রাত্রি জাগরণের বিধানে চাপ কমাইয়া দেওয়া হইল। فاقرؤا ما تيسر من القران [কুরআনের যতটুকু পাঠ করা (সালাতে) তোমাদের জন্য সহজ হয় ততটুকু পাঠ কর] ছিল এই সহজীকরণের সূত্র। তবে মূল ফরয তখনও যথারীতি অব্যাহত থাকিল। (৩) পাঁচ বারের সালাত ফরয হওয়ার পরে (অর্থাৎ মি'রাজের পরে যাহা হিজরতের তিন বৎসর পূর্বেকার ঘটনা ছিল) তাহাজ্জুদ উম্মতের জন্য স্বেচ্ছাধীন নফল হইল, কিন্তু নবী কারীম (স)-এর জন্য (যথারীতি) ফরয রহিয়া গেল।

তাহাজ্জুদে রাত্রি জাগরণ মুসলমানদের জন্য অবশেষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাব্যস্ত করা হইলেও অনেক হাদীছে উহার প্রতি জোর তাকীদ বিবৃত হইয়াছে এবং উহাকে শ্রেষ্ঠ 'আমল (افضل العمل) বলা হইয়াছে। জনৈক ব্যক্তি নবী কারীম (স)-এর নিকটে কোন্ 'আমল শ্রেষ্ঠ মর্মে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ طول القيام-দীর্ঘক্ষণ 'ইবাদাতে [রাত্রিকালীন সালাতে] দাঁড়াইয়া থাকা (আবূ দাউদ, ২খ, ৯৪)। অন্য একটি হাদীছে রহিয়াছে যে, নবী কারীম (স) বলিয়াছেন, افضل صلوة بعد الفريضة صلوة الليل "ফরয সালাতের পরে শ্রেষ্ঠতম সালাত রাত্রির সালাত" (কিতাবু'ল-ফিক্হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ, মুসলিম শারীফের বরাতে, ১খ, ৩৩৫)। তদ্রূপ রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদের অভ্যাস বর্জন করাকে নবী কারীম (স) অপছন্দ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ইব্নু'ল-'আস (রা)-এর সূত্রে রিওয়ায়াত রহিয়াছে যে, নবী কারীম (স) তাঁহাকে বলিলেন, "অমুকের মতন হইও না; সে রাত্রি জাগরণ করিত, এখন রাত্রি জাগরণ ছাড়িয়া দিয়াছে" [বুখারী, ১খ, ২৯১; আহ্কামু'ল-কুরআন, ২খ, ২৮৬]। 'আইশা (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী কায়স (রা) সাহাবীকে বলিয়াছিলেন যে, তাহাজ্জুদে জাগরণ বর্জন করিবে না; কেননা রাসূলুল্লাহ্ (স) কখনও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। যখনই তিনি অসুস্থ হইতেন কিংবা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেন তখনও বসিয়া বসিয়া তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করিতেন (আবূ দাউদ, ২খ, ৪৪)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলার নেক্কার বান্দাদের পরিচিতি বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا "এবং যাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজ্দাবনত হইয়া ও দণ্ডায়মান থাকিয়া" (ঐ, ২৫ ঃ ৬৪)। অনুরূপভাবে আরও বহু ক্ষেত্রে রাত্রি জাগরণ, তাসবীহ পাঠ ও আল্লাহ্র পবিত্রতা মহিমা বর্ণনায় নিমগ্ন থাকা এবং শেষ রাত্রে ক্ষমা প্রার্থনার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে। যথা وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا "এবং রাত্রির কিয়দংশ তাঁহার জন্য সিজ্দাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর" (৭৬ ঃ ২৬); وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ "এবং ঊষাকালে ক্ষমাপ্রার্থিগণ (প্রশংসার্হ)" [৩ ঃ ১৭]।

মোটকথা, কুরআন ও হাদীছে রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদের প্রতি এতই তাকীদ ও উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে যে, রাত্রি জাগরণ করিয়া 'ইবাদত করা তাহা পরিমাণে যতই কম হউক না কেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। তাবি'ঈ সা'ঈদ ইব্ন যুবায়র, ইব্ন সীরীন ও হাসান বাসরী (র) প্রমুখের নীতিদর্শন অনুরূপই। সম্ভবত এই অভিমতের সত্যায়নে নিম্নবর্ণিত হাদীছ উপস্থাপন করা হইয়া থাকে। হাদীছ لا بد من صلوة بليل ولو حلب شاة-"রাত্রে কিছু না কিছু সালাত অপরিহার্য, বক্রী দোহনের সময় পরিমাণ হইলেও" (আত-তাবারানী কর্তৃক মারফূরূপে বর্ণিত; বরাত আল-ফিক্হ 'আলা'ল-মাযাবিহি'ল-আরবা'আ, ১খ, ৩৩৫)।

ফিকহী পরিভাষায় তাহাজ্জুদ সালাত ফরয না হইলেও সুন্নাতের অনুসরণ প্রত্যেক মুসলমানের আদর্শ হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরিয়া বিপুল সংখ্যক মুসলমান রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদ পালনে অভ্যস্ত রহিয়াছে। فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَقُرْاٰنَ "যতটুকু সহজ হয় কুরআন পাঠ কর" [৭৩ ঃ ২০] এবং وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا "এবং (কায়েম করিবে) ফজরের কুরআন পাঠ; ফজরের পাঠ পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে" (১৭ ঃ ৭৮)-এ আয়াতদ্বয়ে (এবং অন্যত্র) কুরআন পাঠ (অনুরূপ রুকূ'-সিজ্দা) দ্বারা সর্বশ্রেণীর 'আলিম সমাজের মতে সালাত আদায় করাই উদ্দেশ্য। ইহা যেন অংশ বিশেষ দ্বারা পূর্ণ অংশ বুঝাইবার রূপক ব্যবহার। কেননা কুরআন পাঠ করা সালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ (রুকন)। لانها ركن كما سميت ركوعا وسجودا "কেননা কিরাআতও একটি রুক্ন যেমন সালাতকে রুকূ' ও সাজ্দা নামে অভিহিত করা হইয়াছে" (কাশ্শাফ, ২খ, ২৭৬, ৬৪৩)। সুতরাং আয়াতটির অর্থ দাঁড়াইল, যে পরিমাণ তোমাদের জন্য সহজ হয় সেই পরিমাণ সালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় কর (লুবাবু'ত-তা'বীল, ৪খ, ৩৫৯)। তদ্রূপ ইব্ন জারীর, ২৯ খ, ৭৬ রহিয়াছে, "রাত্রে পাঠ কর যতখানি কুরআন পাঠ তোমাদের সালাতে তোমাদের জন্য সহজ হয়" [তু. বায়দাবী, ৪খ, ২২৮, সূরা আল-মুয্যাম্মিল; আহকামু'ল-কুরআন, ২খ, ২৮৬]।

'আইশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী (রা) সূত্রে এমন অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে নবী কারীম (স)-এর তাহাজ্জুদ সালাত ও তাঁহার سبحه ليلا طويلا (রাত্রির দীর্ঘ সময় তাসবীহ-তাহলীল)-এর পরিমাণের ধারণা পাওয়া যায়। নবী কারীম (স) কখনও (প্রায়শ) তের রাক'আত (বুখারী, ১খ, ২৮৭) এবং কখনও এগার রাক'আত (আবূ দাউদ, ২খ, ৫৩) আদায় করিতেন। তাহার বিন্যাস ছিল এইরূপ ঃ 'ইশার সালাতের পর হইতে ফজরের পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে তিনি কখনও আট রাক'আত এবং কখনও দশ রাক'আত তাহাজ্জুদ, এক রাক'আত বিত্র (মতান্তরে আট রাক'আত তাহাজ্জুদ, তিন রাক'আত বিত্র-অনুবাদক) এবং দুই রাক'আত ফজরের সুন্নাত (মতান্তরে দুই রাক'আত সংক্ষিপ্ত নফল উপবিষ্ট হইয়া, দুই রাক'আত ফজর-সুন্নাত) আদায় করিতেন। সাধারণত তাহাজ্জুদ সালাত তিনি দুই দুই রাক'আত করিয়া এবং কোনও কোনও সময় চার চার রাকা'আত করিয়া আদায় করিতেন। সেই সালাতে তাঁহার দাঁড়ানো, কিরআত, রুকূ' ও সিজদা বেশ দীর্ঘ হইত। রব্বু'ল 'ইজ্জতের দরবারে তিনি এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া সিজদাবনত থাকিতেন, যতক্ষণ কেহ পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করিতে পারে (আবূ দাউদ, ২খ, ৫৪)। 'আইশা (রা) জনৈক সাহাবীকে নবী কারীম (স)-এর তাহাজ্জুদ সালাতের বিশদ বিবরণ

দেওয়ার পরে বলিয়াছিলেন, فلا تسئل عن حسنهن وطولهن "তুমি আমাকে সেই রাক'আতগুলির সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিও না" (আবূ দাউদ, ২খ, ৫৫)। তাহাজ্জুদের নফলসমূহের পরে তিনি (স) 'বিতর' আদায় করিতেন এবং এই বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (র) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী কারীম (স) বলিতেন ঃ اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا "তোমরা তোমাদের রাতের সালাতের সমাপ্তি বিতরকে (বেজোড়) বানাইবে"। অতঃপর নবী (স) কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতেন এবং মুআয্যিন ফজর সালাতের আযান দিলে তিনি উঠিয়া ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) সংক্ষিপ্তরূপে (ركعتين خفيفتين) আদায় করিতেন। অতঃপর তিনি মসজিদে গিয়া ফজরের (ফরয) সালাত আদায় করিতেন।

'আইশা (রা)-এর অন্য একটি রিওয়ায়াত হইতে জানা যায় যে, নবী কারীম (স) প্রথম দিকে তের রাক'আত আদায় করিতেন। কিন্তু পরে এগার রাক'আত (ثم انه صلى احدى عشرة ركعة وترك ركعتين) অর্থাৎ দুই রাক'আত কমাইয়া দিয়াছিলেন (আবূ দাউদ, ২খ, ৬৩)।

তাহাজ্জুদ সালাত সাধারণত দুই দুই রাক'আত করিয়া আদায় করিতে হইবে। হাদীছ শারীফে মুসলমানদের প্রতি এইরূপ করিবার তাকীদ রহিয়াছে। যদিও যেমন পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নবী কারীম (স) চার রাক'আত করিয়াও আদায় করিয়াছেন (يصلى اربعا ثم يصلى اربعا...) [আবূ দাউদ, ২খ, ৫৫, সালাতু'ল-লায়ল অনুচ্ছেদ); কিন্তু তিনি বলিয়াছেন– صلاة الليل مثنى مثنى "রাতের সালাত দুই দুই রাক'আত" (আবূ দাউদ, ২খ, ৫০)। রাতের সালাতের নিয়মরূপে ফিক্হ গ্রন্থসমূহে সর্বাধিক আট রাক'আত এবং সর্বনিম্ন দুই রাক'আতের বিধান রহিয়াছে (ফাতাওয়া 'আলামগীরী, ৪০)।

ইমাম গাযালী (র) তাঁহার ইহয়া, উলূম গ্রন্থে (১খ, ২২৮) কয়েকটি অধ্যায়ে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা-ভঙ্গিতে বিশদভাবে রাত্রের ওয়াজীফাসমূহ ও 'ইবাদতে রাত্রি জাগরণের ফযীলাতের বিবরণ পেশ করিয়াছেন। তিনি রাত্রি জাগরণকে দীর্ঘ করিবার সাতটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হইল সারা রাত্রিকে 'ইবাদতে 'প্রাণবন্ত' রাখা যাহা মুত্তাকী ও সূফীগণের অভ্যাস ছিল। তাঁহাদের নীতি ও পন্থা ছিল 'ইশার উযূ দ্বারা ফজর সালাত আদায় করা। মধ্যম স্তর হইল রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ 'ইবাদতে জাগরণ করা অর্থাৎ রাত্রের প্রথমার্ধ ও শেষের ষষ্ঠাংশ ঘুমাইবে এবং মাঝের (তৃতীয়াংশ) রাত্রি জাগরণ ও 'ইবাদত করিবে। সর্বনিম্ন স্তর হইল–দুই-চার রাক'আত কিংবা যেমন তাওফীক হয় "রাত্রি জাগরণ" (ও তাহাজ্জুদের নিয়াতে) আদায় করিয়া নিবে (রাত্রিকে একেবারেই 'ইবাদাত ও তাহাজ্জুদশূন্য রাখিবে না)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, আস-সাহীহ, Krehl মু., ২খ, ৪৮; (২) মুসলিম, আস-সাহীহ, নাওয়াবীর শারহ সহকারে (মিসর), ৬খ, ১৬; (৩) আবূ দাউদ, আস-সুনান (আবওয়াবু কিয়ামি'ল-লায়ল), কায়রো ১৯৩৫ খৃ., ২খ, ৩২; (৪) নাসাঈ, আস-সুনান (মিসর ১৩৪৮ হি.), ৩খ, ১৯৯; (৫) তাফসীর ইব্ন জারীর আত-তাবারী (সায়মানিয়্যা, মিসরে মুদ্রিত, সূরা আল-ইসরা'ও সূরা আল-মুয্যাম্মিল); (৬) আবূ হায়্যান আল-আন্দালুসী, আল-বাহরু'ল-মুহীত (কায়রো ১৩২৯ হি.), ৮খ, ৩৬৬; (৭) খাযিন, লুবাবু'ত-তা'বীল ফী মা'আনি'ত-তানযীল দারু'ল- কুতুবি'ল-'আরাবিয়্যাতি'ল-কুবরা, মিসর), ৪খ, ৩৪৯; (৮) আয-যামাখশারী, কাশ্শাফ (সূরা আল-ইসরা ও আল-মুয্যাম্মিল, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.); (৯) ইব্নু'ল-'আরাবী, আহকামু'ল কুরআন, (মিসর ১৩৩১ হি.), ২খ, ২৮৬; (১০) তাফসীরু'ল বায়দাবী, আল-মাকতাবাতু'ত-তিজারিয়্যাতু'ল-কুবরা, মিসর (সূরা আল-ইসরা' ও সূরা আল-মুয্যাম্মিল); (১১) আল-জাযাইরী, কিতাবু'ল-ফিকহ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল-'আরবা'আ (মিসর ১৩৫৮ হি.), ১খ, ১৩৩৫ (?); (১২) আল-গাযালী, ইহ্য়া' 'উলূম, কায়রো ১৩২৬ হি., ১খ, ইহয়াউ'ল-লায়ল প্রসংগ; (১৩) ফাতাওয়া 'আলামগীরী, কলিকাতা ১২৪৩ হি., ১খ, ১৫৭; (১৪) আল-কুম্মী, গারাইবুল কুরআন, তাবারীর হাশিয়া, আল-মাতবা'আতু'ল-মায়মানিয়্যা (মিসর), ২৯খ, ৬৮; উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতিরেকে তুলনীয় (১৫) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, ১খ, ৩২১ প.; (১৬) M. Th. Houtsma, lets over den dage lijkschen colat der Mohammedanen. theol. tijdschrift (অন্তর্গত) ১৮৯০ খৃ., পৃ. ১৩৭ প.; (১৭) R. Bell, The Origin of Islam in its Christian Environment, লণ্ডন ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১৪৩। ফিক্হের বিভিন্ন মাযহাব ও 'আকাইদ সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য তু. (১৮) খালীল (ইব্ন ইসহাক), আল-মুখ্তাসার I. Guidi, মিলান ১৯১৯ খৃ. মুদ্রিত, ১খ, ৯৭; (১৯) আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী, আত-তানবীহ (প্রকাশিত) (A. W. T. Juynboll), পৃ. ২৭; (২০) আর-রাম্লী, নিহায়াতু'ল-মুহতাজ, ১খ, ৪৮৮; (২১) ইব্ন হাজার আল-হায়তামী (হায়ছামী?, তুহফা, ১খ, ২০১ প.; (২২) আবু'ল-কাসিম আল-হিল্লী, কিতাবু শারাইল-ইসলাম, কলিকাতা ১৮৩৯ খৃ., ২৭; (২৩) A Querry, Droit Musulman, প্যারিস ১৮৭১ খৃ., ১খ, ৫২ প.।

['আবিদ আহমাদ 'আলী ও A. J. Wensick]/(দা. মা.ই.)/মুহাম্মাদ ইসমাইল

তাহাবী (طحاوى) ঃ আবূ জা'ফার আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক আল-আয্দী আত-তাহাবী আল-হাজরী। তাঁহার নিসবা তাহাবী দক্ষিণ মিসরে অবিস্থত তাহা নামক একটি গ্রামের নাম হইতে আসিয়াছে। তিনি মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ হানাফী ফকীহ হিসাবে গণ্য হন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণ মিসরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মাহদীর বিদ্রোহের সংবাদ যখন মিসরে পৌঁছিল তখন অন্যদের সহিত তাঁহার দাদা সালামাও খলীফা আল-মা'মূন-এর আনুগত্য অস্বীকার করেন। বিদ্রোহিগণ আস-সারী ইব্নু'ল-হাকাম-এর পরিবর্তে 'আবদু'ল-'আযীম ইব্ন 'আবদি'র-রাহ্মান আল-আয্দীকে তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করে। আস-সারী প্রথমে পলায়ন করেন; কিন্তু পরবর্তীতে ফিরিয়া আসিয়া 'আবদু'ল-'আযীযকে বন্দী করেন। সালামা মিসরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কিন্তু যুদ্ধশেষে তিনি বন্দী হন এবং ফুসতাত-এ প্রেরিত হন। মুক্তি লাভের পর তিনি পলায়ন করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় আল-জারাবীর সহিত মিলিত হন। বিদ্রোহীগণ সেইখানে কৃতকার্য হইলে সালামা দক্ষিণ মিসরে ফিরিয়া আসিয়া অনেক সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং শাসনকর্তাকে বিতাড়িত করেন। অবশেষে ২০৩/৮১৮ সালে সালামার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হয় এবং যুদ্ধশেষে তিনি ও তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম বন্দী হইয়া ফুস্তাত-এ প্রেরিত হন। সেইখানে তাঁহাদের দুইজনকেই হত্যা করা হয়।

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাহাবী মিসরের একটি নেতৃস্থানীয় পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁহার নিজের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ২৩৯/৮৫৩-৮৫৪ সালে (ইব্নু'ল-আছীর-এর মতে ২২৯/৮৪৩, আল-বিদায়া, ১১খ, ১৭৪) জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার মামা আবূ ইব্রাহীম ইসমাঈল (ইব্ন য়াহ্য়া) আল-মুযানী-র নিকট শিক্ষালাভ

করেন, যিনি ছিলেন ইমাম আশ-শাফি'ঈর প্রখ্যাত ছাত্রদের অন্যতম। যাহা হউক তাহাবী তাঁহার মামার নিকট সন্তোষজনকভাবে লেখাপড়ায় উন্নতি করিতে পারেন নাই। ফলে তাঁহার মামা তাঁহাকে একদিন বলেন যে, তিনি কখনও সুনাম অর্জন করিতে পারিবেন না।

ভাগিনেয় তাঁহার মামাকে পরিত্যাগ করেন এবং আবূ জা'ফার ইব্ন আবী 'ইমরান (আহমাদ ইব্ন মূসা ইব্ন 'ঈসা; তিনি আয়্যুব-এর অর্থমন্ত্রী থাকাকালে মিসরে আসেন এবং সেইখানে থাকিয়া যান)-এর নিকট হানাফী ফিক্‌হ-এর শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার মামা আল-মুযানী ২৬৪/৮৭৮ সালে মারা যান এবং তাঁহার নিকট হইতে তাহাবী আশ-শাফি'ঈ-র মুসনাদ গ্রহণ করেন, ব্রকেলম্যান যাহা ভুলক্রমে তাহাবী-র একটি মুসনাদ গণ্য করেন। এই মুসনাদ-এর অতি উত্তম পাণ্ডুলিপিগুলিতে যে ইসনাদ রহিয়াছে উহা অনুসারে তাহাবী ২৫২ হি.-তে ইহা শ্রবণ করেন এবং ৩১৭ হি.-তে পুনরায় তাঁহার ছাত্রদেরকে ইহা শুনান। ২৬৮/৮৮১-৮২ সালে তিনি সিরিয়া যান এবং সেইখানে হানাফী প্রধান কাদী আবূ খাদিম 'আবদু'ল-হামীদ ইব্ন জা'ফার-এর সহিত সাক্ষাত করেন। জেরুসালেম, গাযযা ও 'আসকালান-এ অন্যান্য 'আলিম-এর সহিতও সাক্ষাত করেন। কিন্তু পরবর্তী বৎসর তিনি মিসরে ফিরিয়া যান।

শৈশবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র, কিন্তু মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদাকে একজন পৃষ্ঠপোষক হিসাবে পান, যিনি ২৭৭ হইতে ২৮৩ হি. পর্যন্ত মিসরের প্রধান কাদী ছিলেন। তিনি তাহাবী-র প্রতি কি ধরনের অনুগ্রহ করিতেন, জীবনী লেখকগণ তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। এক ক্ষেত্রে তো তাহাবীকে তাঁহার প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত কাদী ও আরও দশজন সাক্ষীর জন্য নির্ধারিত পারিতোষিকের সমপরিমাণ পারিতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাবী প্রকৃতিগতভাবেই ফিক্‌হ-এর মাসআলা সম্পর্কে সঠিক রায় প্রদান সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও যাঁহারা আদালতে হাজির হইত তাহাদিগকে এই ধারণা দিতে চাহিতেন যে, তাঁহার প্রভুর (প্রধান কাযী) পদটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি তখনই প্রসিদ্ধি লাভ করেন, যখন আহমাদ ইব্ন তূলূন-এর পুত্র আবু'ল-জায়শ-এর একটি দলীলের সাক্ষীদের দস্তখত প্রদানের প্রয়োজন পড়ে। সাক্ষীগণ একটি সরকারী মন্তব্যের সমর্থনে দস্তখত দেন যাহা এইরূপ ছিলঃ "আমীর আবু'ল-জায়শ আমাকে সাক্ষী নিযুক্ত করিয়াছেন।' কিন্তু যখন ইহা তাহাবী-র নিকট দস্তখতের জন্য পেশ করা হয় তিনি লিখিলেন, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমীর আবু'ল-জায়শ এই দস্তাবেযের প্রতিটি শর্তের ব্যাপারে সম্মত আছেন", ...ইহাতে আমীর হতবাক হন এবং তাহাবীকে উপযুক্ত পুরস্কার দেন, যাহার ফলে অন্যান্য সাক্ষিগণের হিংসার উদ্রেক হয়। ফলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ওয়াকফ সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে অপব্যবহার ইত্যাদি দোষে তাঁহাকে দোষারোপ করে এবং তাঁহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

কতকাল তিনি সেইখানে ছিলেন তাহা জানা যায় নাই, তবে মাসলামা ইব্ন কাসিম আল-আন্দালুসী-র বর্ণনা হইতে ইহা জানা যায় যে, ৩০০ হি.-তে মিসর হইতে স্পেনে ফিরিয়া আসা তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে বলেন যে, তাহাবী ওয়াকফ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় যে অপব্যবহার করিয়াছেন তজ্জন্য মিসরের জনগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ, বিশেষত কিছু হাবশী গুলাম-এর ব্যাপারে আমীর আবু'ল-জায়শ-এর অনুকূলে তিনি যে সিদ্ধান্ত দেন উহাকে কেন্দ্র করিয়া। তিনি কখনও কাযীর পদ লাভ করেন নাই, তবে তিনি ছিলেন প্রধান বিচারক কর্তৃক সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী। এই যোগ্যতাবলে তিনি আবূ 'উবায়দ 'আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন হারব-এর অধীনে চাকুরী করেন, যিনি ২৯৩ হইতে ৩১১ হি. পর্যন্ত প্রধান বিচারক ছিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল যে, আবূ 'উবায়দ-এর সঙ্গে যখনই কোন মতবিরোধ দেখা দিত তখন তিনি বলিতেন যে, ইব্ন আবী 'ইমরান এই কথা বলিতেন। অবশেষে উক্ত কাযী ইহাতে বিরক্ত হইয়া বলেন যে, তিনি ইব্ন আবী 'ইমরানকে ভালভাবেই জানেন, কিন্তু চড়ুইগুলি তাহাবীর দেশে ঈগলে পরিণত হইয়াছে। তখন তাহাবী উহা বলা হইতে বিরত থাকেন। কাযীর উক্তিটি প্রবাদে পরিণত হয়।

শেষ জীবনে তিনি তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়াও ফাতাওয়াও দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি কাযীর সম্মুখে ফাতওয়ার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে ভদ্রতাবশত বলিতেন যে, ইহা কাযীর (বিচারকের) অভিমত; অবশ্য কাযী তাঁহাকে নিজ দায়িত্বে ফাতাওয়া দিতে অনুমতি দিলে একমাত্র তখন তিনি কাযীর উপস্থিতিতে নিজে ফাতাওয়া দিতেন। ঐতিহাসিক ইব্ন য়ূনুস-এর মতানুসারে তিনি ৬ যু'ল-কা'দা, ৩২১/৩১ অক্টোবর, ৯৩৩ সালে ইনতিকাল করেন, ইব্ন খাল্লিকান-এর মতে একই মাসের বৃহস্পতিবার রাত্রে। কারাফা কবরস্তানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। ফিহ্‌রিসত-এ ভুল করিয়া ৩২২ হি. উল্লেখ করা হইয়াছে।

তাহাবী প্রধানত একজন ফকীহ ছিলেন এবং বৈধ চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুতিতে তাঁহার দক্ষতার জন্য তিনি সর্বসম্মতভাবে প্রশংসনীয় হন, কিন্তু তিনি মুহাদ্দিছ হিসাবেও গণ্য হন। তাই তিনি আশ-শাফি'ঈ-র মুসনাদ-এর রিওয়ায়াত করেন। অন্যপক্ষে একাধিক বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হাদীছ তাঁহার আসল বিষয় ছিল না। এতদসত্ত্বেও তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থগুলিতে বহু হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, যদিও সেইগুলি বর্ণনার মুখ্য উদ্দেশ্য ফিকহী মাসা'ইল উপস্থাপন। তাঁহার রচনার সংখ্যা বহু, যেগুলির কিছু পাণ্ডুলিপি আকারে ও কিছু মুদ্রিত অবস্থায় সংরক্ষিত আছে। নিম্নলিখিতগুলি তাঁহার জীবনীকারগণ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে ঃ (১) শারহু মা'আনি'ল-আছার, ইহা তাঁহার প্রথম রচনা; বিশাল ৪ খণ্ডে টীকাসহ ইহা লাক্ষ্ণৌ-এ মুদ্রিত (১৩০০-১৩০২ হি.)। ইহার ভাষ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে মাহমূদ ইব্ন আহমাদ আল-'আয়নী (মৃ. ৮৮৫/১৪৮০)-র ভাষ্য মা'আনি'ল-আখবার শারহ মা'আনি'ল-আছার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মা'আনি'ল-আছার-এর একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন রুশ্‌দ (মৃ. ৫২০/১১২৬) প্রস্তুত করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-বাহিলী আল-মালিকী (মৃ. ৩২১/৯৩৩)-ও তাসহীহ মা'আনিল আছার (পাণ্ডু. বাঁকীপুরে সংরক্ষিত) প্রণয়ন করিযাছেন]; (২) ইখতিলাফু'ল 'উলামা' (পাণ্ডু, কায়রোতে); (৩) আহকামু'ল-কুরআন, ২০ কুররাসাতে; (৪) মুখতাসার ফি'ল-ফিকহ; এই গ্রন্থখানি লেখককে অত্যন্ত আনন্দ দেয়। কিন্তু ইহা বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। সর্বপ্রথম আহমাদ ইব্ন আলী আল-জাসসাস কর্তৃক ইহা সমালোচিত হয় (পাণ্ডু. কায়রোতে); (৫) শারহু'ল-জামি' আস-সাগীর; (৬) আশ-শুরূতু'ল কাবীর, ইহা কায়রোতে একটি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি হিসাবে সংরক্ষিত, যাহার একটি অংশ Schacht প্রকাশ করিয়াছেন (হাইডেলবার্গ ১৯২৬ খৃ.); (৭) আশ-শুরূতু'ল-আওসাত; (৮) আশ-শুরূতু'স সাগীর; (৯) মাহাদির, সিজিল্‌লাত, ওয়াসায়া এবং ফারাইদ; এইগুলি সম্ভবত কতিপয় পুস্তিকা, যেমন– কয়েকজন জীবনী লেখক ওয়াসায়াকে একটি পৃথক পুস্তিকা বলিয়া উল্লেখ করিযাছেন; (১০) শারহু'ল-জামি' আল-কাবীর; (১১) নাক্‌দ কিতাবি'ল-মুদাল্লিসীন, ইহা আল-কারাবীসী-র বিরুদ্ধে রচিত; (১২) আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, সম্ভবত ইহা ফকীহদের চরিতাভিধান, (১৩) মানাকিব আবী হানীফা, এক খণ্ডে; (১৪) কুরআন-এর উপর

একখানি গ্রন্থ, কাদী 'ইয়াদ কর্তৃক তাঁহার রচনা আল-ইকমাল-এ উল্লিখিত। তাহাতে প্রায় এক হাজার পাতা রহিয়াছে এবং সম্ভবত মুশকিলু'ল-আছার-এর সহিত অভিন্ন; (১৫) আন-নাওয়াদিরু'ল-ফিকহিয়্যা, ২০ কুররাসায় সমাপ্ত; (১৬) হুকুম আরাদী মাক্কা ওয়া কিসমু'ল-ফায় ওয়া'র-গানা'ইম; (১৭) আর-রাদ্‌দ 'আলা 'ঈসা ইব্‌ন আবান; 'ঈসা ইব্‌ন আবান-এর বই খাতাউ'ল-কুততাব-এর জওয়াব; (১৮) আর-রাদ্‌দ 'আলা আবী 'উবায়দ ফী মা আখতাআ ফী কিতাবি'ন-নাসাব; (১৯) ইখতিলাফু'র রিওয়ায়াত 'আলা মাযহাবি'ল-কূফিয়্যীন; (২০) মুশকিলু'ল- আছার, তাঁহার শেষ রচনা; ইহা তাঁহার অধ্যয়ন ও গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল; ১৩৩৩ হি. সালে বিশাল ৪ খণ্ডে হায়দরাবাদ-এ মুদ্রিত হয়, মালিকী ফকীহ ইব্‌ন রুশদ কর্তৃক ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; (২১) রিসালা ফী উসূলি'দ-দীন ('আকীদা আহলি'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত অথবা বায়ানু'স-সুন্নাত ওয়া'ল- জামা'আতও বলা হয়), ইহা ১৮৯৩ খৃ. ভারতে মুদ্রিত হয়; ইহা প্রায় দশ পাতাবিশিষ্ট একটি ছোট পুস্তিকা যাহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় সুন্নী 'আকীদা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ছোট পুস্তিকাটির অনেকগুলি ভাষ্য রচিত হইয়াছে (তু. ব্রকেলম্যান); (২২) আন-নাওয়াদির ওয়া'ল-হিকায়াত, ২০ কুররাসাতে; (২৩) কোন কোন জীবনী লেখক মুখতাসার শিরোনামে দুইটি গ্রন্থঃ মুখতাসারু'ল কাবীর ও মুখতাসারু'স-সাগীর তাঁহার রচনা বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রকাশ থাকে যে, শেষোক্ত গ্রন্থটির অর্থাৎ মুখতাসারু'স্-সাগীর-এর সাধারণত ভাষ্য রচনা করা হয়; (২৪) সাহীহু'ল আছার, পাণ্ড. খুদাবাখ্‌শ লাইব্রেরী, পাটনাতে সংরক্ষিত আছে; (২৫) মা'আলিমুল-আছার, কায়রোতে সংরক্ষিত একখানি পাণ্ড., তু. মা'আনিল আছার। যাওয়াহিরু'ল-মুদীআ গ্রন্থে তাঁহার আর একটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, যাহার বিষয়বস্তু সম্ভবত পদ হইতে বরখাস্তকরণ। তাহাবীর রচনাবলী এবং উহাদের ভাষ্যসমূহের পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. ব্রকেলম্যান, আরবী অনু. 'আবদু'ল-হালীম আন্-নাজ্‌জার।

হানাফী আইনের গ্রন্থগুলিতে ধারাবাহিকভাবে তাহাবী-র কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার ছাত্র ও যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভের আশায় মিসরে আসিতেন তাঁহাদের সংখ্যা অনেক। অধিকাংশের কথা জীবনী গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে, বিশেষ করিয়া জাওয়াহির ও লিসানু'ল-মীযান গ্রন্থে; তন্মধ্যে কয়েকজন হইলেন 'আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ আত-তামীমী যিনি পরবর্তীতে মিসরের কাযী নিযুক্ত হন এবং তাহাবী-র উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ছিলেন। মাসলামা ইবনু'ল-কাসিম আল-কুরতুবী; 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আলী আদ-দা'ঊদী যাঁহাকে তাঁহার সময়ে জাহিরীদের ইমাম হিসাবে গণ্য করা হইত। প্রখ্যাত কাযী ইব্‌ন আবি'ল-'আওয়াম, মু'জাম গ্রন্থের লেখক সুলায়মান ইব্‌ন আহমাদ আত-তাবারানী এবং আরও অনেক মনীষী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিহরিস্‌ত, সম্পা. Flugel, পৃ. ২০৭; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, No. 28, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ১৯; (৩) সাম'আনী, আনসাব, G. M. S., পৃ. ৩৬৮ ult, ৩৬৯ ; (৪) জাওয়াহিরু'ল-মুদীআ, হায়দরাবাদ, ১খ, ১০২-১০৫; (৫) যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ৩খ, ২৯; (৬) ইব্‌ন হাজার, লিসানু'ল-মীযান, ১খ, ২৭৪-২৮২; (৭) সয়ূতী, হুসনু'ল-মুহাদারা, ১খ., ১৬১; (৮) ইব্‌ন কুতলুবুগা, No. ১৫; (৯) লাখনাবী, আল-ফাওয়া'ইদু'ল-বাহিয়্যা, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ৩১-৩৪; (১০) ইব্‌ন তাগরীবির্‌দী, সম্পা. Juynboll, ২খ, ২৫৫ প.; (১১) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ, ৫১৬; (১২) য়াফি'ঈ, মির'আত, ২খ, ২৮১; (১৩) আল-কিন্‌দী, উলাতু মিসর, স্থা., এবং ভূমিকা, পৃ. ১৮; (১৪) Flugel, Classen der Hanefitschesn Rechtsgelehrten, 1861, পৃ. ২৯৬ প.; (১৫) Brockelmann, G. A.L., ১খ., ১৭৩; (১৬) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, স্থা., তু. No. ৪১৩১, হানাফী ফিকহ্-এর প্রায় সব বইতে তাঁহার উল্লেখ করা হয়।

F. Krenkow (E.I.[1])/ এস. এম. হুমায়ুন কবির

তাহার্‌ত ঃ তীহার্‌ত নামেও পরিচিত, আলজিরিয়ার একটি মধ্যযুগীয় শহর। ইহা বর্তমান ওরান প্রদেশের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ইদরীসীর মতে এই নামে দুইটি বৃহৎ শহর অতীতে সেইখানে বিদ্যমান ছিল। একটি হইল প্রাচীন তাহার্‌ত, একটি রোমীস্থান; ইহা সম্ভবত একটি আদিম রাজবংশের বা সামন্ত অথবা বায়যানটাইনের (Gsell) মিত্ররাজাদের রাজধানী ছিল। আধুনিককালে তাহার ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহার উৎপত্তি ঘটে এবং তিয়ারাতের রাজধানীতে পরিণত হয়। অন্যটি হইল নূতন তাহার্‌ত। ইহা তিয়ারেতের ৬ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এবং তাজদেম্‌পত (Tagdempt) হইতে বেশি দূরে নয়। শেষোক্তটি ছিল আমীর 'আবদু'ল-কাদির [দ্র.]-এর দুর্গসমূহের একটি। ইহার অতীত জাঁকজমকের সামান্য ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নাই।

নূতন তাহার্‌ত ১৪৭ বৎসর যাবৎ রুসতামী বংশের আবাদী ইমামদের (অথবা ইবাদী, [দ্র.]) রাজধানী ছিল। ইবনু'ল-আশ্‌-'আছ পরিচালিত আরব সৈন্যগণ ফিরিয়া আসার পর 'আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন রুসতাম কায়রাওয়ান হইতে পলায়ন করেন এবং কেন্দ্রীয় মাগরিবের যে অংশে খারিজীগণ সংখ্যায় অধিক ছিল সেইখানে আশ্রয় লন। তিনি ১৪৪/৭৬১ সালে তাহার্‌তের পত্তন করেন। স্থানটি পসন্দসই। তবে জলবায়ু কঠোর (আল-বাকরী এইখানকার শীতের কথা বর্ণনা করিয়াছেন), কিন্তু চতুর্দিকে ভূমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা ছিল এবং ইহাতে বেশ ভাল ভাল ফলমূল উৎপাদিত হইত। তাহার্‌তের সমৃদ্ধি প্রধানত ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য ছিল। ইহা জাবাল গেযযূল-এর পাদদেশে যাবারদের দেশের সহিত সম্পৃক্ত স্তেপ ভূমির উত্তর সীমান্তে টেল-এর নিকট অবস্থিত এবং আধুনিক তিয়ারেতের মত একটা বড় বাজারের উপযুক্ত ছিল। যাবাবরগণ এইখানে সমবেত হইত এবং ভাগ্যান্বেষণে ও খারিজী মতবাদের আকর্ষণে বিদেশী বিশেষ করিয়া পারস্যবাসীরা সেইখানে সমবেত হইত। তাহাদের ছিল সুন্দর আবাসিক গৃহ ও বাজার। তাহার্‌ত "ক্ষুদ্র 'ইরাক" হিসাবে পরিচিত ছিল। ধর্মীয় অনুশাসনে শাসিত রাজ্যের রাজধানী ছিল এই শহর, ফলে ধর্মীয় প্রভাব ছিল প্রবল। তাহার বিবরণ যেমন পাওয়া যায় তেমন ইহার 'ইমাম' ও তাহাদের অনুসারীদের বৃদ্ধিমত্তার কথা অবহিত হওয়া যায়। শহরটি ও ইহার প্রাসাদসমূহ দেখিতে কেমন ছিল তাহা জানা সম্ভব নয়; সম্ভবত প্রাসাদগুলি অনাড়ম্বর ছিল। আল-বাকরী এই শহরের চারটি তোরণ এবং নগর দুর্গ যাহা বাজার পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল উহাদের বর্ণনা দিয়াছেন। ২৯৬/৯০৮ সালে শী'ঈ প্রচারক আবূ 'আবদিল্লাহ তাহার্‌ত দখল করেন। ফলে ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহা বারবারদের ইতিহাসে অত্যন্ত নগণ্য ভূমিকা পালন করে। তিয়ারেত তাহার্‌তের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কিছু অংশ লাভ করে। খৃস্টীয় ৯ম শতকের শহরের ন্যায় তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে বন্দর হওয়ার কারণে যেমন এই শহর সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তেমনই আলজিরীয় শহর হিসাবেও ইহা পুনরায় সমৃদ্ধি লাভ করে। তদুপরি ইহার নিকটবর্তী সেরসূ মালভূমি গুরুত্বপূর্ণ ঔপনিবেশিক কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতেই ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-য়া'কূবী, Descriptio al-maghribi ed.

de Goeje, পৃ. ১৪; অনু., পৃ. ১০০-১০৭; (২) আল-বাকরী, আলজিয়ার্স ১৯১১ খৃ., প. ৬৬-৬৯; অনু. de Slane, ১৯১৩ খৃ., পৃ. ১৩৮-১৪১; (৩) আল-ইদরীসী, সম্পা. Dozy ও de Goeje, পৃ. ৮৭, অনু. পৃ. ১০০-১০১; (৪) ইব্ন 'ইয'ারী, বায়ানু'ল-মুগরিব, সম্পা. Dozy, ১খ, ২০৩ প., অনু. Fagnan, ১খ, ২৮৩ প.; (৫) ইব্ন সাগীর Chronique, সম্পা. ও অনু. G. Motylinski, Actes du XIVe Congres des Orientalistes, প্যারিস ১৯০৮ খৃ.; (৬) Gsell, Atlas Archeologique de l'Algerie. পত্রক ৩৩, নং ১৪।

Georges Marcais (E.I.[1])/ এস. এম. হুমায়ুন কবির

তাহারাত (طهارت) ঃ (আ), শব্দ রূপান্তর (صرف) প্রক্রিয়ায় طهر ধাতুমূলের ক্রিয়ামূল (মাসদার)। ব্যাপক অর্থে শব্দটি পবিত্রতা বা কোন বস্তু হইতে পংকিলতা দূর হইয়া যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয় (তাজু'ল-'আরূস)। ইব্ন ফারিস ইহার মৌলিক অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন পরিচ্ছন্নতা ও ময়লা-আবর্জনা দূরীভূত হওয়া (মাকাঈসু'ল-লুগাত)। শব্দটি কর্তৃসম্পন্ন (لازم)-এর ন্যায় কর্ম সম্পন্ন (متعدى)-রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন طهره طهره উভয়ই ابعده -তাহাকে দূরীভূত করিয়াছে অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে (তাজু'ল-'আরূস)।

তাহারাত বা পবিত্রতা প্রথমত দুই প্রকার ঃ দৈহিক তাহারাত ও আত্মিক তাহারাত। পবিত্র কুরআনে উভয় অর্থে শব্দটির প্রয়োগ ঘটিয়াছে। যেমন কুরআনের لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ "আল্লাহ্ তাহাদের হৃদয়কে পবিত্র ও পংকিলতামুক্ত করিবার ইচ্ছা করেন নাই" (৫ ঃ ৪১) আয়াতে হৃদয় ও আত্মার পবিত্রতার আলোচনা রহিয়াছে। আবার অন্যত্র وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ "তাহাদের [ঋতুবতী স্ত্রীদের] নিকটবর্তী হইও না [সহবাস করিও না] যতক্ষণ না তাহারা পবিত্র হয়; সুতরাং যখন তাহারা পূর্ণ পবিত্র হইবে..." (২ ঃ ২২২) আয়াতে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও দৈহিক পবিত্রতার কথা বলা হইয়াছে। [বাব বৈশিষ্ট্যের (خاصيت ابواب) ব্যবহারিক ধারায় طهرته -فطهر وتتطهر-এর অধীন] এই আয়াত يطهرن ও تطهرن দুইটি ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, নারীরা তাহাদের ঋতু শেষে যতক্ষণ গোসল সম্পাদন করিয়া (কিংবা পূর্ণ দশ দিনের মাথায় ঋতু বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে গোসল সম্পাদন ও সালাত শুরু করিবার পরিমাণ সময় অতিবাহিত করিয়া আইনগতভাবে এবং) পরিপূর্ণরূপে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন না করিবে ততক্ষণ তাহাদের সহিত সহবাস করা বৈধ নহে। অনুরূপ কুরআন সম্পর্কে বলা হইয়াছে لاَ يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ "অতি পবিত্রগণ ব্যতীত কেহ উহা স্পর্শ করিবে না" [৫৬ ঃ ৭৯]-এ আয়াতে উভয় প্রকার পবিত্রতা উদ্দেশ্য অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অপবিত্র হাতে স্পর্শ করা যাইবে না এবং পবিত্র কুরআনের তত্ত্ব ও তথ্য পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে শুধু সেই সকল লোকেরা যাহারা নিজেদের আত্মা ও অভ্যন্তরকে পংকিলতা হইতে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং নিজেদের মন-মস্তিষ্ককে সব ধরনের কৃত্রিমতা ও ময়লা-আবর্জনার মিশ্রণ হইতে সংরক্ষিত রাখে। অনুরূপ وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ "এবং তাহাদের জন্য সেইখানে-বেহেশতে রহিয়াছে পূত-পবিত্র সংগিনিগণ" (২ ঃ ২৫) আয়াতেও উভয় প্রকারের পবিত্রতা উদ্দেশ্য অর্থাৎ সব ধরনের পার্থিব ও জড়-জাগতিক অপবিত্রতা ও পংকিলতা (যাহা হায়য ও নিফাস-মাসিক-স্রাব ও প্রসবান্ত স্রাব ইত্যাদি) হইতে মুক্ত ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন হইবে এবং নিকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্র (হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ক্রোধ ইত্যাদি) হইতে পাক পবিত্র হইবে। অনুরূপ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এবং তোমার পরিধেয় পরিচ্ছদকে পাক কর" (৭৪ ঃ ৪)-এর অর্থও হইবে এইরূপ ঃ নিজের বাহ্যিক পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখ এবং আত্মা ও প্রকৃতিকে পংকিলতামুক্ত রাখ।

طهر শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় ইব্ন ফারিস-এর ভাষা নিম্নরূপ ঃ يدل على نقاء وزوال دنس "পরিচ্ছন্নতার ঔজ্জ্বল্য ও ময়লা-আবর্জনা বিদূরিত হওয়া নির্দেশ করে" (মাকা'ঈসু'ল-লুগাত)। তাহারাত-এর প্রতিশব্দ হইল তাযকিয়া (تزكية) (ধাতুমূল -زكى يزكى/زكا يزكو (ز-ك-و/ز-ك-ى); অনেক সময় শব্দ দুইটিকে (تزكيه ও تطهر-অনুরূপ طهارت ও زكواه-কে) সমার্থক মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়টিতে ব্যবধান রহিয়াছে। কেননা (ز-ك-و/ز-ك-ى) ধাতুমূলের আসল অর্থ বর্ধিত হওয়া, পরিবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করা। এই বর্ধন ও পরিবৃদ্ধি ইহলৌকিক ও বস্তুতান্ত্রিকরূপে যেমন হইতে পারে তেমনি পারলৌকিক ও অতিজাগতিক বিষয়ও হইতে পারে। যেমন বলা হয় زكا الزرع 'ফসল পরিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে' (মুফরাদাত) ازكى الله المال 'আল্লাহ্ সম্পদ বর্ধিত করিয়াছেন'। زكا الرجل (ও-زكى) লোকটির যোগ্যতা ও প্রতিভা উন্নীত ও বর্ধিত হইয়াছে; লোকটি সচ্ছন্দ ও পরিতৃপ্ত জীবনের অধিকারী হইয়াছে; তাহার জীবন শ্যামলিমাপূর্ণ ও প্রাণবন্ত হইয়াছে (তাজু'ল-'আরূস)। ইব্ন ফারিস বলিয়াছেন, কোন শব্দের ধাতুমূলে (ز) ও (ك) বর্ণদ্বয়ে সমন্বিত হইলে উহার মৌলিক অর্থ বর্ধন ও উন্নতি লাভ হইয়া থাকে (মাকা'ঈসু'ল-লুগাত)।

মোটকথা زكا-এর মূল অর্থ হইতেছে লালিত-পালিত হওয়া, পরিবর্ধিত হওয়া, ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়া, অগ্রগতি লাভ করা। সেই সংগে ইহাতে পবিত্রতার অর্থও বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্ভবত ইহা এই কারণে যে, গাছের পরিবৃদ্ধির জন্য তাহার ডালপালা ছাঁটিয়া দেওয়া ও পরিচ্ছন্ন করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। যাকাতকেও এই দুই দৃষ্টিকোণ হইতে যাকাত বলা হইয়াছে। উহাতে যেমন বরকত (ও অদৃশ্য পরিবৃদ্ধি) হইয়া থাকে তেমনি উহাতে (অর্থলিপ্সা হইতে) আত্মার পবিত্রতা অর্জিত হয় (মাকা'ঈসু'ল-লুগাত)। 'আল্লামা আল-বায়দাবী (র) الزكى শব্দের অর্থ করিয়াছেন– কল্যাণ সহকারে বর্ধনশীল; উত্তম যোগ্যতা-উপযোগিতার সহিত জীবনের এক ধাপ হইতে অন্য ধাপে উন্নতি লাভকারী। সূরা আল-কাহ্ফ-এ خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً (১৮ ঃ ৮১) দ্বারা বুঝানো হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে এমন একটি পুত্র দান করিবেন যে তাহার পূর্বের পুত্রদের অপেক্ষা অধিক অগ্রগামী ও অধিক যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী হইবে এবং সূরা মারয়ামে غُلاَمًا زَكِيًّا (১৯ ঃ ১৯)-এর অর্থ হইল এমন ছেলে যে লালন-পালনে পরিবৃদ্ধি লাভ করিবে ও উত্তম আচার-আচরণের অধিকারী হইবে। পবিত্র কুরআনে زكّها-এর বিপরীতে دسّها শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে (৯১ ঃ ৯-১০); دس يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ-১৬ ঃ ৫৯), অর্থ দমিত করিল, দাবাইয়া দিল, জীবন্ত সমাহিত করিল (তাহার পরিবৃদ্ধি রুদ্ধ করিয়া দিল। সুতরাং তাযকিয়া (تزكية) অর্থ হইবে সেই সব প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিয়া দেওয়া যাহা কাহারও উন্নতি-অগ্রগতি ও পরিবৃদ্ধির জন্য অন্তরায় হইতে পারে এবং তাহার ক্রমবর্ধন ও বিকাশ লাভের জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতিকে অনুকূল করিয়া দেওয়া।

পবিত্র কুরআনে একই আয়াতে ازكى ও اطهر শব্দদ্বয় একত্রে পাশাপাশি উল্লিখিত হইয়াছে اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُ (২ ঃ ২৩২) যাহাতে বুঝা যায় যে, শব্দ দুইটি সম্পূর্ণ সমার্থক নহে। এই আয়াতে اطهر শব্দটি دنس (ময়লা-পংকিলতা)-এর বিপরীত বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা বুঝাইবার জন্য এবং ازكى শব্দটি دنس-এর প্রতিকূলে পরিবর্ধন ও বিকাশ বুঝাইবার জন্য।

তাহারাত (বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পংকিলতা [غلاظت] হইতে পবিত্র হওয়া) একটি নেতিবাচক সৎ গুণ ও সৌন্দর্য অর্থাৎ মন্দ, অসুন্দর, অনিষ্টতা ও দুশ্চরিত্রতা হইতে দূরে থাকা এবং উহা হইতে আত্মরক্ষা করা। অথচ তাযকিয়া হইল ইতিবাচক সৌন্দর্য ও গুণ অর্থাৎ পংকিলতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এবং প্রতিবন্ধকসমূহ অতিক্রম করিয়া উন্নতি, অগ্রগতি লাভ করা; পরিবর্ধন ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া অধিক সৌন্দর্য ও সৎগুণ নিজের মধ্যে সংগৃহীত ও সঞ্চিত করা।

طاهر (পবিত্র), مطهر (পবিত্রকারী) ও متطهر (অতিশয় বা স্বতঃসিদ্ধ পবিত্র)-এর আলোচনাও অনুরূপ নিম্নে বর্ণিত হইল। طهرته فتطهر وهو متطهر "আমি তাহাকে পবিত্র করিয়াছি, ফলে সে পবিত্র (তাহারাত সম্পন্ন) হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যক্তি متطهر (পবিত্র) নামে অভিহিত হইবে"। পবিত্র কুরআনে وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ বলা হইয়াছে। এইখানে ক্রিয়ার দুইটি রূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। মুফাস্‌সিরগণ এই আয়াতের তাফসীরে লিখিয়াছেন যে, উভয় ক্রিয়াপদ (فعل) পাশাপাশি উল্লেখ করিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, নারিগণ তাহাদের মাসিক স্রাব শেষ হইবার পর যতক্ষণ গোসল সম্পাদন না করিবে ততক্ষণ তাহাদের সঙ্গে সহবাস বৈধ নহে। সুতরাং متطهر অর্থ এমন ব্যক্তি যে পবিত্রতাসম্পন্ন বস্তু কিংবা তাহার স্থলবর্তী হইতে পারে এমন কিছু ব্যবহার করিয়া পবিত্রতা হাসিল করিয়াছে।

يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (২ ঃ ২২২) [পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন] দ্বারা সেই সকল লোক উদ্দেশ্য যাহারা পাপ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধিকরণে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে এবং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার প্রতি পুরাপুরি লক্ষ রাখে।

রাগিব-এর মতে তাহারাত দুই প্রকার ঃ (১) দেহের তাহারাত; (২) আত্মার তাহারাত। পবিত্র কুরআনে এই ধাতুমূল হইতে নিষ্পন্ন শব্দমালা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (২ ঃ ২২২)-এ المتطهرين-এর অর্থ হইল التاركين للذنب والعاملين للصلاح "পাপ বর্জনকারী এবং আত্মশুদ্ধি ও কল্যাণের জন্য কর্ম সম্পাদনকারী" (মুফরাদাত, طهر ধাতুমূল শিরো.)।

অভিধানে তাহারাত অর্থ সব ধরনের অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা হইতে পবিত্র হওয়া (النظافة والنزاهة عن الاقذار والاوساخ) তাহা বাহ্যিক ও দেহ সম্পর্কীয় হউক কিংবা অদৃশ্য ও আত্মা সম্পর্কীয় হউক। তাহারাত-এর বিপরীত হইল নাজাসাত (দ্র.)। এই শব্দ হইতেই [انما المشركون نجس (نجاست)] 'মুশরিকরা তো অপবিত্র' [৯ ঃ ২৮]। অপবিত্র অর্থে এই কারণে তাহারাত বলিয়া সাধারণভাবে নাজাসাত না থাকা কিংবা বিদূরিত হওয়ার অর্থ গ্রহণ করা হয়।

শারী'আতের পরিভাষায় তাহারাতের সংজ্ঞায় খুঁটিনাটি বিষয় ফকীহ্‌গণের মাঝে কিছুটা মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে আল-জাযীরী-র বর্ণনামতে এই সংজ্ঞাটিকে ঐকমত্যসম্পন্ন বলা যায় ঃ

الطهارة شرعا صفة اعتبارية قدرها الشارع شرطا لصحة الصلوة وجواز استعمال الانية والاطعمة وغير ذلك. فالشارع اشترط لصحة صلاة الشخص ان يكون بدنه موصوفا بالطهارة ولصحة الصلاة فى المكان ان يكون المكان موصوفا بالطهارة ولصحة الصلاة بالثوب ان يكون موصوفا بالطهارة لحل واكل هذا الطعام ان يكون الطعام موصوفا بالطهارة.

"আইনত তাহারাত একটি আপেক্ষিক বিশেষণ, যাহা সালাতের বিশুদ্ধতা, পাত্র-উপকরণ ও খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহারের বৈধতার জন্য শারী'আত প্রবর্তক শর্তরূপে ধার্য করিয়াছেন। যেমন শারী'আত প্রবর্তক সালাতের বিশুদ্ধতার জন্য ব্যক্তির প্রতি শর্ত আরোপ করিয়াছেন যে, তাহার দেহ পবিত্র হইতে হইবে এবং কোন স্থানে সালাতের বিশুদ্ধতার জন্য স্থানটি পবিত্র হওয়া; সালাতের বিশুদ্ধতার জন্য পরিধেয় তাহারাত গুণে ভূষিত হওয়ার শর্ত আরোপ করিয়াছেন। অনুরূপ কোন খাদ্য আহার করিবার বৈধতার জন্য শর্ত আরোপ করিয়াছেন যে, খাদ্যদ্রব্য তাহারাত (ও হালাল) হইতে হইবে (আল-জাযীরী, কিতাবু'ল-ফিকহি 'আলা'ল মাযাহিবি'ল-আরবা'আ, প্রথম ভাগ, 'ইবাদত অংশ, কায়রো, পৃ. ৫)।

আল-জাযীরী লিখিয়াছেন যে, স্বীয় সত্তায় তাহারাতের তত্ত্ব ও মূল কথা অভিন্ন। তবে পরবর্তী স্তরে উহার বিভিন্ন বিভক্তি ও প্রকরণ রহিয়াছে (حدث কিংবা, বস্তুগত خبث কিংবা প্রকৃতিগত অন্য কোন আপেক্ষিক ও পরোক্ষভাবে)। ব্যাপকভিত্তিক অর্থ বিচারে তাহারাত যেহেতু নাজাসাত ও অপবিত্রতা হইতে পাক-পবিত্র হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেহেতু খোদ নাজাসাত -এর প্রকৃতি ও তত্ত্ব অবগত হওয়া সমীচীন। নাজাসাত দুই প্রকার ঃ (১) হুকমী– আইনগত, (২) হাকীকী–প্রকৃত ও বাস্তব। হুকমী বা আইনগত অপবিত্রতা হইল মানুষের সেই অবস্থা যাহাতে সালাত আদায়, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি 'ইবাদত করা বৈধ নহে। এই নাজাসাতের অপর নাম حدث (হাদাছ)। ইহা দুই প্রকার ঃ বৃহৎ (বা প্রকট) হাদাছ (الحدث الاكبر) এবং ক্ষুদ্র বা লঘু) হাদাছ (الحدث الاصغر)। প্রথম হইল মানুষের সেই অবস্থা যাহাতে গোসল করা ব্যতীত (কিংবা অপারগতায় তায়াম্মুম করা ব্যতীত) সালাত আদায় করা কিংবা কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ নহে। আর দ্বিতীয়টি সেই অবস্থা যাহাতে উযূ করা ব্যতীত (এবং অপারগতার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা ব্যতীত) সালাত আদায় করা যায় না। বড় হাদাছ হইতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ফরয। এইরূপ হাদাছ ও অপবিত্রতা সংঘটিত হয় চারটি কারণে ঃ (১) বীর্য স্খলন (সহবাস বা স্বপ্নদোষের মাধ্যমে); (২) স্ত্রী অঙ্গে পুরুষাংগ প্রবিষ্টকরণ; (৩) হায়য-মাসিক স্রাব (ইস্‌তিহাযা–অনিয়মিত ও ব্যাধিজাতক স্রাবের ক্ষেত্রে বিশদ বিধিমালা রহিয়াছে) এবং (৪) নিফাস– প্রসবান্ত স্রাব। হাকীকী নাজাসাত হইল মানুষ স্বভাবগত ঘৃণার কারণ নিজের দেহ, পরিধেয় কাপড়-চোপড় ও খাদ্য ইত্যাদিকে যাহার সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে (কিংবা সুরুচি ও সুস্থ বিবেক যাহা হইতে দূরে থাকার দাবি করে)। শারী'আতে উহা বিদূরিত করিবার আদেশ রহিয়াছে। উহা (প্রথমত) দুই প্রকার–গালীজা (غليظة-কঠিন ও গুরুতর) এবং খাফীফা (خفيفة-হালকা ও লঘু)। গালীজা ঐ নাপাক যাহার কদর্য হওয়া সুনিশ্চিত ও অকাট্য এবং দৃশ্যত ও বাহ্য বিচারে যাহা গুরুতর)। আর খাফীফা ঐ নাপাক যাহার কদর্যতা অকাট্যরূপে সাব্যস্ত নহে (এবং দৃশ্যত ও বাহ্য বিচারে যাহা লঘু)। অনুরূপ অন্য একটি দৃষ্টিকোণ হইতে নাজাসাত পুনঃ দুই প্রকার ঃ দৃশ্যমান–যাহা ইন্দ্রিয় তথা চক্ষু দ্বারা দর্শনযোগ্য এবং অদৃশ্যমান–যাহা দর্শনযোগ্য নহে।

এই সকল নাজাসাত হইতে পবিত্রতা লাভ (তাহারাত) করার ব্যাপারে বহুবিধ মাস'আলা রহিয়াছে এবং এইসব মাস'আলার উপবিধিসমূহে বিভিন্ন মাযহাবে (হানাফী, মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বালী) মতপার্থক্যও রহিয়াছে। সেই মাস'আলাগুলি একাধিক শিরোনামে আলোচিত হইয়াছে। যথা ঃ (১) সালাতের বিশুদ্ধতার জন্য তাহারাতের অপরিহার্যতার শর্তাবলী ও রূপরেখা; (২) কুরআন তিলাওয়াতের বৈধতা অনুমোদন সংক্রান্ত তাহারাতের অপরিহার্য শর্তসমূহ; (৩) পরিধেয় বস্ত্র ও সালাতের স্থানের পবিত্রতা সংক্রান্ত শর্তাবলী ও উপায়-উপকরণসমূহ;

(৪) আহার্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহ, জীব জন্তু, পাখপাখালী, জলজ (সামুদ্রিক) প্রাণী, উদ্ভিদজাত খাদ্যসমূহ ও সর্ববিধ পানীয়ের ক্ষেত্রে পবিত্র (ও হালাল) এবং অপবিত্র (ও হারাম) হওয়ার শর্তাবলী ও বিধিমালা।

তাহারাত প্রসংগে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, পানির طاهر ও مطهر (নিজে পবিত্র হওয়া–স্বকীয় পবিত্রতা ও অন্যকে পবিত্র করিবার উপযোগিতা গুণসম্পন্ন) হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা। ফিকহ গ্রন্থসমূহে ইহার শত শত ধারা-উপধারা বিবৃত হইয়াছে। পানি না থাকিলে (কিংবা উহা ব্যবহারে অপারগ হইলে) তায়াম্মুম (দ্র.) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাহারাতের অনুভূতিসম্পন্ন হওয়ার বিধান রহিয়াছে এবং অপারগতার কারণে এই প্রক্রিয়াটিও তাহারাতরূপে আইনগত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অর্থাৎ এই দৃষ্টিকোণ হইতে মাটিও এক ধরনের তাহির ও মুতাহ্হির (طاهر ومطهر) বস্তু (সংশ্লিষ্ট বিষয়টির বিশদ আলোচনা রহিয়াছে ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে) সব বিষয়ের জন্য সালাত, তায়াম্মুম, নাজাসাত, ইসতিনজা', মাসহ্; উযূ, গুসল (গোসল), সহবাস, হায়য, নিফাস ও তাআম (খাদ্য) (শিকার সহকারে) ইত্যাদি শিরোনামসমূহ দ্র.)]। এই সীমিত পরিসরে এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইসলাম ধর্মে দৈহিক ও আত্মিক তাহারাতের প্রতি প্রভূত তাকীদ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এই যে, হাদীছ ও ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে এই বিষয়টিকে সর্বাগ্রে সন্নিবেশিত করা হয়। এই তাকীদের ফলে ইসলামের অনুসারীদের জীবনে সর্বব্যাপী সুদূরপ্রসারী আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় এবং এই তাহারাত ইসলামী সমাজ জীবনের সর্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে; যে সমাজ সম্প্রদায়ের সদস্যরা সব ধরনের পংকিলতা ও অপবিত্রতা হইতে প্রথম মুহূর্ত ও সর্বপ্রথম অবকাশে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং দিবারাত্রিতে অন্তত পাঁচবার নিজেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টায় ব্রতী হয় এবং সালাত আদায়কালে (বিধান দৃষ্টে) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরিধানে নিয়মানুবর্তী হয়, তাহাদের তাহারাতের প্রতি আগ্রহ ও পবিত্রতার সুরুচি সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া বা তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মুসলমানগণ যে দেশেই গিয়াছেন তাঁহারা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা প্রেমের বলে পরিবেশ প্রতিবেশকে প্রভাবিত করিয়াছেন। তাহারা ভিন্ন জাতির লোকদিগকেও পবিত্রতার রীতিনীতি শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে গোসল করিবার উপকারিতা ও সুফল সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন।

তাহারাত বিষয়ে ফকীহগণের গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাধিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যেমন সরাসরি পানির বিষয়টিই ধরুন, উহার গবেষণা-বিশ্লেষণে চিকিৎসা এবং (পানি সম্বন্ধীয়) অনেক বৈজ্ঞানিক সূত্র স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পানিই সর্বাধিক নাজাসাত বিদূরক ও পবিত্রতা সম্পাদক দ্রব্য। এই কারণে ফকীহগণ এই তরল পদার্থটির সুগভীর বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্র ধরিয়া পানির মৌলিক অস্তিত্ব ও উহার রাসায়নিক (দ্রব্যগুণের) তথ্য আহরণ করিয়াছেন। প্রথমত, পানিকে দুই প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ (১) মুতলাক (সাধারণ) পানি এবং (২) মুকায়্যাদ (বিশেষ) পানি। মুতলাক হইল সর্বজনস্বীকৃত সাধারণ পানি (নদী-নালা, বৃষ্টি ইত্যাদির পানি) এবং মুকায়্যাদ হইল যাহাকে মানুষের ব্যবহারিক ভাষায় শুধু পানি নাম দেওয়া হয় না। যথা গোলাব (পানি), কেওড়া (পানি), রস, সিরকা ইত্যাদি কিংবা পানির সংগে যখন অন্য কিছু যুক্ত করিয়া বলা হয়। যেমন নারিকেলের পানি, তরমুজের পানি (রস)।

সাধারণ পানি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ (১) তাহির মুতাহ্হির গায়র মাকরূহ অর্থাৎ যে পানি নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করিবার উপযোগিতা রাখে এবং উহা দ্বারা উযূ, গোসল ইত্যাদি মাকরূহ (ও শারী'আতের অপসন্দনীয়তা) ব্যতিরেকেই সম্পাদিত হইতে পারে; (২) তাহির মুতাহ্হির মাকরূহ (ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন); (৩) তাহির গায়র মুতাহ্হির–নিজে পবিত্র হইলেও অন্যকে পবিত্র করে না এবং উযূ-গোসল সম্পাদনের উপযোগী নহে; (৪) মাশ্‌কূক–যাহার পবিত্রতা দ্বিধাযুক্ত; (৫) নাজিস্–নাপাক, যে পানি নিজেও নাপাক এবং শারী'আতের বিধান অনুযায়ী পান করিবার তো নয়-ই, এমন কি উহা দ্বারা উযূ' গোসল করাও জাইয নহে, বরং উহা পবিত্র জিনিসকেও অপবিত্র করিয়া দেয়।

পানির এই সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল বণ্টন বিভাগ একটি বিষয় স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করে যে, ইসলাম ধর্মে সালাত ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনে শুধু বাহ্যিক পবিত্রতাকে যথেষ্ট মনে করা হয় নাই। কেননা ময়লা আবর্জনা তো নাপাক পানি দ্বারাও অপসারণ করা যায় অর্থাৎ উহাতে পরিচ্ছন্নতার একটি দিক (বাহ্যিক) তো সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা (তাহারাত) ততক্ষণ সূচিত হইতে পারে না যতক্ষণ অভ্যন্তরীণরূপেও পংকিলতা ও অপবিত্রতার সর্বশেষ চিহ্নটুকুও বিদূরীত না হইয়া যায় অর্থাৎ পানি নিজে পবিত্র (তাহির) হওয়ার সংগে সংগে অন্যকে পবিত্র করিবার উপযোগী (মুতাহ্হির) হওয়াও অপরিহার্য। তাহারাতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে এইভাবে অভ্যন্তরীণ ও দৃশ্য-বহির্ভূত পবিত্রতা অর্জনের প্রতি এত অধিক গুরুত্ব প্রদান বস্তুত ইসলামের সেই সার্বিক রূপরেখার সহিত পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ– যাহাতে বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের সৌন্দর্যের সংগে সংগে আত্মা ও অভ্যন্তর জগতের গুণাবলী (ইখলাস ও নিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ, লিল্লাহিয়্যাত ও আল্লাহ্‌র জন্য সব কিছু করার মনোবৃত্তি এবং সর্বোপরি ঈমানের নূর) অর্জনকেও প্রান্তিক পর্যায়ের এবং অপরিহার্যরূপে জরুরী সাব্যস্ত করে। পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার মাঝে এই যে ব্যবধান ইহা ইসলামের তাহারাত প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

পানির বিভক্তি ও প্রকরণ নীতির পরিধি আরও সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া স্থির ও বহমান হওয়ার মানদণ্ডে পানির আরও কতিপয় প্রকার গণনা করা হইয়াছে। যথা ঃ (১) জারী-প্রবহমান ও স্রোতধারার পানি এবং (২) রাকিদ–স্থির বা বদ্ধ পানি। শেষোক্তটি আবার 'অধিক' ও 'অল্প' পরিমাণ হইবে। হানাফী মাযহাব অনুসারীদের মতে–অধিক পানি বলিতে বুঝায় এমন জলাধার যাহার এক প্রান্তে কোন অপবিত্র বস্তু পতিত হইলে অন্য প্রান্তে উহার কোন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ বর্ণ, স্বাদ ও ঘ্রাণে (পানির এই ত্রিবিধ গুণের ক্ষেত্রে) নাজাসাত ও অপবিত্র দ্রব্যের কোন লক্ষণ দেখা না যাওয়া এবং ইহার কোনটিতে পরিবর্তন সাধিত না হওয়া। আর তিনটির কোন একটিতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইলে তাহাকে অল্প পানি বলা হইবে (বিস্তারিত ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহ দ্র.)। এই বিষয়টিতে ফকীহগণের চুলচেরা বিশ্লেষণ শুধুই আধ্যাত্মিকতা বা 'ইবাদাতের মানদণ্ডে আদর্শ ও অনুসরণীয় অবদান নহে, বরং উহাতে বিজ্ঞানসুলভ বিশ্লেষণেরও কয়েকটি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছে।

এক্ষেত্রেও বুনিয়াদী ও মৌলিক নীতি ইহাই যে, যে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উদ্দেশ্য হইবে উহা প্রকৃত বিচারে পাক হইতে হইবে, অন্য কথায় উহাতে কোন প্রকার নাপাক বস্তুর অংশ ও ক্রিয়া অনুপস্থিত থাকিতে হইবে। আবার পানি পাক হওয়ার জন্য (নাপাক উপকরণের কারণে) উহা ব্যাধি সৃষ্টিকারী না হওয়াও একটি শর্ত। ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে স্থির পানির ক্ষেত্রে কূপের বিশ্লেষণ ও প্রকারভেদও বেশ

চিত্তাকর্ষক। তাই বলিয়া উন্মুক্ত স্থানের হাওয ও পুকুরের পানির পবিত্রতা, অপবিত্রতা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনায়ও যথেষ্ট জ্ঞান লাভের অবকাশ রহিয়াছে। আয়তন ও পরিধির মাপকাঠিতে হাওয ও পুকুর এক শত বর্গহাত হওয়া হানাফীগণের অভিমত অনুসারে জরুরী। কিন্তু ফিক্‌হ গ্রন্থসমূহে আরও কতিপয় দীর্ঘ ও মতভেদপূর্ণ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল আলোচনা অধ্যয়ন করিলে এই উপলব্ধি জন্মে যে, ফকীহগণের অধিকাংশ উদ্ভাবনের ভিত্তি হইতেছে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সমাজ-সভ্যতা তথা দেশ, কাল, পাত্রের স্বার্থ, কল্যাণ ও বাস্তবতা। যেমন অল্প পানির পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি পানি প্রাপ্তির সংগে সংযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা হইয়াছে, যাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বাস্তব ক্ষেত্রের অসুবিধা ও সমস্যাগুলিকে ফকীহগণ অলক্ষ্যে রাখিয়া বা এড়াইয়া যান নাই, বরং তাহারা الضرورة تبيح المحذورات [প্রয়োজন পরিত্যাজ্য (নিষিদ্ধ) বিষয়কে অনুমোদিত করিয়া দেয়] মূলনীতির আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন। এই সকল খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে ফকীহগণের গবেষণা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এক বিস্ময়কর ব্যাপার এবং তাহা তথ্য ও তত্ত্ব সন্ধানীদের জন্য বড় ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতি, চিকিৎসা ও আইন বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

তাহারাত সংক্রান্ত মাসআলাসমূহের আলোচনা ধারায় জীবজন্তু, পাখি এবং অন্যান্য জীবনধারী সৃষ্টির বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণের আলোচনাও পাওয়া যায়। কোন কিছু নাপাক (ও হারাম) হওয়ার ব্যাপারটি শুধু উপদেশমূলক (ওয়াজ-নসীহত) বা ব্যক্তিগত পসন্দ-অপসন্দের বিষয় নহে, বরং এইসব প্রাণী ও অন্যান্য বস্তুর বিষাক্ত ও ব্যাধি সংক্রান্ত উপকরণ কিংবা তাহাদের নিকৃষ্ট স্বভাবও কারণরূপে সাব্যস্ত হইয়া থাকে। ইহাকে মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। যেমন জন্তুজগতে শূকর জীবিত হউক কিংবা মৃত, নাপাক এবং কঠিন ধরনের নাপাক। কেননা উহাতে রোগ জন্মদাতা উপকরণ (এবং জঘন্য কুস্বভাব) বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। মাংসাশী (হিংস্র) জন্তু এবং বন্য প্রাণীর গোশ্‌ত দ্বারা উদর পূর্তিকারী পশু হারাম (ও নাপাক)। ইহার যুক্তি স্পষ্ট। অনুরূপ খুনী ও হিংস্র পাখীর ব্যাপারও। যে সকল প্রাণীর দেহে ধাবমান রক্ত রহিয়াছে সেগুলিও (যবহ্ করা বা শিকার করা ব্যতীত) স্বাভাবিক পন্থায় মরিয়া গেলে নাপাক সাব্যস্ত হয়। তবে পানির (জলজ) প্রাণী ইহার ব্যতিক্রম। অনুরূপ যেসব প্রাণীর মুখ লাগানো খাদ্য-পানীয় নাপাক উহাদের ঘাম ও মুখের লালাও নাপাক (কেননা উহার গোশ্‌তের নির্যাস রহিয়াছে)। মৃত প্রাণী নাপাক। এই সকল মাসআলা উদ্ভাবনে কুরআন-হাদীছের উদ্ধৃতিমূলক (নাকলী) প্রমাণের সহিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক ('আকলী) কারণও সংযুক্ত রহিয়াছে। প্রাণীকুলের বণ্টন বিভক্তি নিম্নরূপঃ স্থলে বসবাসকারী প্রাণী, পানিতে বসবাসকারী প্রাণী, রক্তধারী প্রাণী (তেজীয়ান), রক্তবিহীন প্রাণী। ইহাদের পৃথক পৃথক বিধিমালা রহিয়াছে। প্রাণীকুলের ক্ষেত্রে লোমকূপবিশিষ্ট ও লোমকূপবিহীন হওয়ার ব্যাপারটি যথেষ্ট বিজ্ঞানসুলভ ব্যাপার এবং উহা মানব চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসার কতিপয় নিয়ম বিশ্লেষণ ও গবেষণার পথ খুলিয়া দেয়।

আগেই বলা হইয়াছে যে, তাহারাত প্রসংগে গোসল (গুস্‌ল) (দ্র.), উযূ (দ্র.) ও তায়াম্মুম (দ্র.)-এর বিশদ বিধিমালা রহিয়াছে। তদ্রূপ ইসতিন্‌জা (প্রশ্রাব-পায়খানার পরে অপবিত্র স্থানটি পরিচ্ছন্ন করা সংক্রান্ত নিয়ম পদ্ধতি) সম্পর্কেও ফিক্‌হ্ গ্রন্থসমূহে রহিয়াছে বিশদ আলোচনা। তাহাতে পানির অপ্রাপ্তি বা ব্যবহার অপারগতার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা ইসতিন্‌জা করা পসন্দনীয় এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা অপসন্দনীয় এবং কোন্ কোন্‌টি দ্বারা মাক্‌রূহ ও অতীব অপসন্দনীয় তাহারও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। যেমন হাড় ইত্যাদি দ্বারা ইসতিন্‌জা করাকে অপসন্দনীয় সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইহাতে অন্যান্য রহস্য ও কল্যাণকারিতার সহিত এই বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, হাড়ের সাথে জীবাণু বিদ্যমান থাকার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে এবং তাহা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মাটির ঢিলা এক্ষেত্রে এই কারণে সর্বোত্তম যে, মাটি জীবাণু দুষণের আশংকা না থাকার পর্যায়ে।

এইখানে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দিহ্‌লাবী (র)-এর গবেষণা উপস্থাপন আশা করি অপ্রাসংগিক হইবে না। হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাহ্-তে তিনি লিখিয়াছেন যে, তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন মানব স্বভাবের অনিবার্য চাহিদা।' সেই কারণে বিগত যুগের নবীগণ ('আ)-ও নিজ নিজ পন্থায় এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। শাহ সাহেবের অভিমত অনুসারে হাদাছ ও আইনগত অপবিত্রতা হইতে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টি পাপ-পুণ্যের (البر والاثم) মূলনীতি হইতে আহরিত... হাদাছ হইতে পবিত্রতার অনুভূতি এবং তাহারাতের গূঢ় রহস্য অনুধাবন করা সেই সকল পবিত্র আত্মার (نفوس قدسيه) স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তির ফল যাহাদেরকে মালাকিয়্যাত (ফেরেশতা- সুলভ ও অতি জাগতিক) রঞ্জন আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।... তাহারাত দ্বারা মনঃজগত ও আত্মার প্রফুল্লতা ও স্ফূর্তি জন্ম নেয়।

শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র)-এর মতে তাহারাত তিন প্রকার ঃ (ক) গোসল ও উযুর মাধ্যমে হাদাছ ও আইনগত অপবিত্রতা বিদূরিত করা; (খ) দেহ, বস্ত্র বাসস্থান অপবিত্র হইলে (পানি ইত্যাদি দ্বারা) পবিত্র করা এবং (গ) দেহের সেই সব অতিরিক্ত বিষয় যাহা মানবদেহকে পংকিল করিয়া দেয়, যথা বগলের লোম, নাভির নীচের লোম, নখ ইত্যাদি এং দেহের বিভিন্ন স্থানে জমিয়া থাকা ময়লা ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করা। হযরত নবী কারীম (স) বলিয়াছেন, اكثر عذاب القبر من البول "কবরের 'আযাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশাবের কারণে হইয়া থাকে" (বুখারী ও ইব্‌ন মাজা এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ কিতাবু'ত তাহারাত, বাব ২৬, ক্রমিক নং ৩৪৮)। শাহ সাহেব (র) আরও লিখিয়াছেন যে, কয়েক প্রক্রিয়ায় তাহারাতের পূর্ণাংগতা সম্পাদিত হয়। যথা সুগন্ধি ব্যবহার করা, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা, আল্লাহ তা'আলার স্মরণে নিমগ্ন থাকা, যাহাতে মন ও মেধা উচ্চতর (অতি জাগতিক) তাহারাতের পরিসীমায় উন্নীত হয়। অনুরূপ কোন বরকতপূর্ণ ও পবিত্র স্থানে গমন করা, যাহাতে মেধা-মস্তিষ্কের ঊর্ধ্বগামিতা ও উন্নয়ন সাধিত হয়। তাহারাত এমন একটি গুণ যাহার বদৌলতে মানুষ ঊর্ধ্ব জগতের সংগে সাদৃশ্য অর্জন করিতে পারে এবং ফেরেশতাগণের ইলহাম (নেপথ্য ও মনঃজাগতিক পূর্বাভাষ) গ্রহণের প্রতিভা জাগ্রত হয় (অর্থাৎ মানুষ যত অধিক পবিত্র হয়, পবিত্র স্বভাব ফেরেশতাকুল ও ঊর্ধ্বজগতের সাথে তাহার সম্পর্কও তত গভীর ও সুদৃঢ় হয়)।

হযরত নবী কারীম (স) তাঁহার الطهور شطر الايمان/الطهور نصف الايمان "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক/অংশবিশেষ" ফরমান দ্বারা একজন ঈমানদারের পূত-পবিত্র জীবন যাপনের পূর্ণ রীতিনীতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ধরনের উজ্জ্বল হাদীছের আলোকে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) তাহারাতকে 'সৌভাগ্য' লাভের উপায় সাব্যস্ত করিয়াছেন। (বিশদ বর্ণনার জন্য দ্রষ্টব্য, হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগাহ, উরদূ তরজমা, 'আবদুর-রহীম, ১খ, ৩২৪ প., ২খ, ৭২ প.)।

শাহ সাহেব (র) বলিয়াছেন, তাহারাতের মাধ্যমে মানুষের আত্মা 'ইহসান' ('ইবাদাতে আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করার) স্তরের রং অতি দ্রুত গ্রহণ করিতে পারে। যেহেতু পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে–

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ "সেইখানে এমন লোকেরা রহিয়াছে যাহারা পবিত্রতা অর্জনকে পসন্দ করে এবং আল্লাহ অপবিত্রতা অর্জনকারীদের মহব্বত করেন" (৯ ঃ ১০৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের অভ্যন্তরে যথাস্থানে বরাত উল্লিখিত হইয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (দা. মা. ই.)/ মুহাম্মাদ ইসমাইল

(বাবা) তাহির (بابا طاهر) ঃ সূফী ও কবি, তাঁহার কবিতা একটি ফারসী আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর লেখক রিদা কুলী খানের মতে বাবা তাহির দায়লামী বংশীয় শাসনামলে জীবিত ছিলেন এবং ৪০১/১০৯০ সালে ইনতিকাল করেন; তবে তিনি এই তথ্যের কোন উৎস উল্লেখ করেন নাই। বাবা তাহির রচিত চতুষ্পদী শ্লোকগুলির একটি হেঁয়ালিপূর্ণ শ্লোক নিম্নরূপঃ "আমি সেই সমুদ্র (بحر) যাহা একটি পাত্রে প্রবেশ করিয়াছে, যেমন একটি নুকতা (বিন্দু) যাহা হরফে প্রবিষ্ট হয়। প্রতি আল্‌ফ ('হাজার' অর্থাৎ হাজার বৎসর)-এ আবির্ভূত হন একজন আলিফ-কাদ্‌দ (আলিফ হরফের ন্যায় খাড়া অবয়ব- বিশিষ্ট মানুষ)। এই আল্‌ফ (=সহস্র বৎসর)-এ আগত সেই আলিফ-কাদ্‌দ আমি।" মাহ্‌দী খান J. A. S., Bengal সাময়িকীতে এই চতুষ্পদীটির একটি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাখ্যা দিয়াছেন ঃ الف قد হরফগুলির মান হইতেছে ২১৫, যাহা ফারসী دريا শব্দের [আরবী بحر শব্দের সমার্থক] এবং কবির নাম তাহির শব্দের হরফগুলির মানের সমান। الف শব্দের (১১১) সহিত الف قد (২১৫) যোগ করিলে পাওয়া যাইবে ৩২৬, যাহা ফারসী هزار অর্থাৎ "সহস্র" শব্দে মানের সমান হইবে যদি শব্দটি এইভাবে বানান করা হয় ঃ) ر-ا-ز-ا, এইভাবে "এই আলিফ-এ একজন আলিফ কাদ্‌দ আসিয়াছেন" কথাটি হইতে বাবা তাহিরের জন্মসন ৩২৬ হিজ্‌রী পাওয়া যাইবে। তিনি সম্ভবত ৪০১ হিজ্‌রী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি ব্যাখ্যাকারীর উদ্ভাবনী দক্ষতার পরিচায়ক বটে, তবে একথা সত্য যে, বাবা তাহির সম্পর্কে আমাদের নিকট একটি মাত্র প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্য-উৎস রহিয়াছে, তাহা হইতেছে রাহাতুস্‌-সুদূর (৬০১/১২০৪ সালের কাছাকাছি, G. M. S., পৃ. ৯৮-৯৯); ইহার রচয়িতা "শুনিয়াছিলেন" যে, সালজূক সুলতান তুগ্‌রিল হামাদানে প্রবেশ করিলে (৪৪৭/১০৫৫) বাবা তাহির তাঁহাকে একটি মৃদু ভর্ৎসনাপূর্ণ বাণী প্রেরণ করিয়া বলেন, "ওহে তুর্কী! মুসলিমদের প্রতি তুমি কিরূপ ব্যবহার করিতে যাইতেছ?" তুর্কী বিজেতা ইহার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। এই কাহিনী হইতে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাবা তাহির ৪৪৭ হিজরীর পরে ইনতিকাল করেন; তবে তিনি দায়লামী বংশীয় শাসনামলে অর্থাৎ বুওয়ায়হী ও তাঁহাদের আত্মীয় কাকোয়ীদের আমলে কর্মতৎপর ছিলেন বলিয়া যে মন্তব্য করা হইয়াছে উহার সহিত ইহা মোটেই অসঙ্গতিপূর্ণ নহে। হামাদানে ইহাদের শাসন ৪৩৫ হিজরীতে ইব্‌রাহীম য়ানালের আক্রমণাভিযান পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বাবা তাহির বিশ্ববিখ্যাত মনীষী আবূ সীনার সমসাময়িক হইয়া থাকিবেন। আবূ সীনা ৪২৮/১০৩৭ সালে হামাদানে ইনতিকাল করেন; তবে যেই সমস্ত কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, বাবা তাহির ৫৩৩ হিজরীতে হামাদানের প্রখ্যাত সূফী 'আয়নু'ল-কুদাতের প্রাণদণ্ড প্রত্যক্ষ করেন এবং নাসিরুদ্‌-দীন তূসীর (মৃ. ৬৭২ হি.) সমসাময়িক ছিলেন ঐগুলি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

তথ্য উৎসগুলিতে বাবা তাহিরকে কখনও কখনও 'হামাদানী' (তু. 'সারানজাম' শিরোনামের প্যারিসের Bibl. Nat. লাইব্রেরীতে রক্ষিত আরবী পাণ্ডু. নং ১৯০৩), কখনও বা 'লুরী' (লুরী) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। লুর [দ্র.]-এর পরিবর্তে লুরী উপাধিটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর ঃ ইহা কি জন্য ব্যতীত বাবা তাহির ও লুরিস্‌তানের মধ্যে অন্য কোন সম্পর্ক নির্দেশ করে? এইখানে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে হামাদান ও লুরিস্‌তানের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধন বিদ্যমান ছিল এবং কবি বাবা তাহির হয়ত বা এই দুই স্থানেই জীবন কাটাইয়াছেন। খুর্‌রামাবাদের একটি মহল্লার নাম বাবা তাহির (তু. Edmonds, Geogr. Journal, June 1922, পৃ. ৪৪৩)। আহ্‌লে হাক্‌ক ফিরকার ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণায় লুরিস্‌তানের সহিত বাবা তাহিরকে সম্পর্কযুক্ত করাটাও গুরুত্ববহ। বাবা তাহিরের চতুষ্পদী কবিতাসমূহে (তু. দীওয়ান-এ অন্তর্ভুক্ত ১০২, ২০০ ও ২৭৪ নং কবিতা) হামাদানের রক্ষীরূপে দণ্ডায়মান আলওয়ান্দ পর্বত [Mount Alwand]-এর কথা বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে। বাবা তাহিরের মাযার শহরের উত্তর-পশ্চিমে বূন-ই বাযার মহল্লায় একটি ছোট পাহাড়ের উপরে অবস্থিত; বাবা তাহিরের কবরের পার্শ্বে তাঁহার বিশ্বস্ত সহচরী ফাতিমা [নীচে দ্র.] ও মীরযা 'আলী নাকী কাওছারীর (খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দী) কবর রহিয়াছে; সমাধিভবনটি ক্ষুদ্র ও আকর্ষণীয়। কবরটির কথা নুযহাতু'ল-কুলূব-এ (৭৪০/১৩৪০) (Gibb. Memoser., পৃ. ৭৫) উল্লেখ করা হইয়াছে (তু. Minorsky, Materiaux, Moscow 1911, p. xi-এ প্রকাশিত ছবি এবং William Jackson, A visit to the tomb of Baba Tahir at Hamadan, in volume presented to E. G. Browne, Cambridge 1922, p. 257-260)।

মাযানদারান প্রদেশের সহিত বাবা তাহিরের সম্পর্কের ব্যাপারে মাযানদারানে যে সমস্ত গল্প-কাহিনী শোনা যায় উহাদের কোন ভিত্তি নাই, লুরিস্তান হইতে আগত মুহাজিররা (লাক) এই সমস্ত কাহিনী আমদানি করিয়া থাকিবে। ইরানের সব যাযাবরই বাবা তাহিরকে নিজেদের গোত্রের লোক বলিয়া দাবি করিতে পসন্দ করে।

বাবা তাহিরের কবিতার ভাষা ঃ যেহেতু সকল তথ্য ও কাহিনীতে বাবা তাহিরকে হামাদান ও লুরিস্‌তানের সহিত সম্পর্কযুক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, তাঁহার কবিতার ভাষায় ইরানের এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই আঞ্চলিক ভাষাটি ফারসীর খুবই কাছাকাছি এবং বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তি বাবা তাহিরের মৌখিকভাবে প্রচারিত কবিতা সম্ভার আরও অর্থবোধক করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এই পরিস্থিতিতে বাবা তাহিরের কবিতার মূল বিশুদ্ধ আঞ্চলিক রূপ পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা করা নিরর্থক। আর ইহাও অসম্ভব নহে যে, বাবা তাহির সোজাসুজি এই সকল উপভাষায় দক্ষ ব্যক্তিদের ভাষাই অনুকরণ করিতে চাহিয়াছেন। বর্তমান যামানায় জনৈক কুর্দী খৃষ্টান কবি দাবি করিয়াছেন যে, আইন-ই হাক্‌ক লোকদের মধ্যে তাঁহার "বাণী পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য", তিনি নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার স্থলে একটি সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের আঞ্চলিক ভাষা গুরানীতে কবিতা রচনা করিয়াছেন (Dr. Sa'id Khan, in the Moslem World Jan. 1927, p. 40)।

হামাদান ও খুর্‌রামাবাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অদ্যাবধি বহু সংখ্যক আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। কিন্তু বাবা তাহিরের ভাষা ইহাদের নির্দিষ্ট কোনটির সহিত সম্পর্কযুক্ত না হইয়াও সকলগুলি হইতেই কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বাবা তাহিরের কবিতার বর্তমান মূল পাঠ যে ফারসী সাহিত্যিক ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত তাহা অনস্বীকার্য; অপরদিকে নাম হইতে নূম অর্থাৎ 'নাম' (نام > نوم), দাসতাম হইতে দাসতুম ("আমার হাত") (دستم > دستم), রাফ্‌তাম

হইতে রাফ্‌তুম ("আমি গিয়াছি") (رفتم > رفتم), দূর হইতে দীর (دیر > دور) [তু. Huart. xiy দীওয়ান নং ৮২]-এর ন্যায় পরিবর্তন লুর আঞ্চলিক ভাষাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য; ভাজ্ অর্থাৎ 'বলা', কার অর্থাৎ 'করা' শব্দমূলগুলি কুর্দী ও মধ্য অঞ্চলের ভাষাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য; মী-কার উ অর্থাৎ "তিনি করেন" এবং আয়-উ, 'তিনি আসেন" রূপগুলি আরও পশ্চিমে প্রচলিত, বিশেষত গূরানী আঞ্চলিক ভাষার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাবা তাহিরের ভাষায় কতিপয় বৈশিষ্ট্যের (দারাম হইতে দিরম) উপমা কেবল কায়ারূন-এ (শীরাযের নিকটবর্তী) দেখা যায়।

Hadank-কৃত বিশদ বিশ্লেষণে বাবা তাহিরের চতুষ্পদীতে ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলির এই মিশ্রণই পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, অন্তত বর্তমানে প্রাপ্তব্য চতুষ্পদীসমূহের রূপে। বাবা তাহিরের ভাষাকে "মুসলমানী পাহলাবী" বলিয়া অভিহিত করার যে প্রস্তাব হুয়ার্ট (Huart) [১৮৮৫ খৃ.] উত্থাপন করেন উহা সুধীমহলে গৃহীত হয় নাই।

বাবা তাহিরের চতুষ্পদী ও গাযালসমূহের প্রায় সবগুলির ছন্দ মিশ্র হাযাজ মুসাদ্‌দাস মাহ্‌যূফ ঃ V----। V-----। V--;এই কারণে তাঁহার দীওয়ানের নূতন সম্পাদক চতুষ্পদীগুলিকে রুবা'ঈ না বলিয়া দো-বায়তী (অর্থাৎ সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশক পর পর দুই শ্লোক) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; কারণ রুবা'ঈ কবিতা হাযাজ মাক্‌ফূফ মাকসূর ঃ -- v v --। v v --। v v।-ছন্দের সহিত অত্যধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। কতিপয় নিয়মিত ধরনের রুবা'ঈ সত্যসত্যই বাবা তাহিরের রচনা কি না সেই সম্পর্কে সন্দেহ আছে। লোকপ্রিয় সঙ্গীতেও বাবা তাহিরের ছন্দ দৃষ্ট হয় (মীরযা জা'ফার [Korsch], Gramm, Pers, Yayika, Moscow 1901, পৃ. ৩০৮)।

বাবা তাহিরের কবিতা ঃ ১৯২৭ খৃ. পর্যন্ত বাবা তাহিরের কবিতা সম্পর্কে যাহা কিছু জানা ছিল তাহা হইতেছে প্রধানত খৃস্টীয় ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীর বিভিন্ন সংকলনে প্রাপ্ত অল্প কিছু কবিতা। হুয়ার্টের গবেষণাকর্মের ফলে ১৮৮৫ খৃ. ৫৯টি চতুষ্পদী এবং ১৯০৮ খৃ. আরও ২৮টি চতুষ্পদী ও একটি গাযাল আবিষ্কৃত হয়। E. Heron Allen মাত্র ৩টি নূতন চতুষ্পদী খুঁজিয়া পান (এইগুলি বাবা তাহিরের রচনা কি না তাহাও সন্দেহজনক)। গবেষক Leszczynski (ইনি বার্লিনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছেন) ৮০টি চতুষ্পদী ও একটি গাযাল (হুয়ার্টের সংগৃহীত গাযালটি হইতে ইহা ভিন্ন) অনুবাদ করিয়াছেন। সর্বশেষ ফার্‌সী সমালোচনাপত্র আরমাগান-এর সম্পাদক হুসায়ন ওয়াহীদ দাস্‌তগির্‌দী ইস্‌ফাহানী ১৩০৬/১৯২৭ সালে তেহ্‌রানে বাবা তাহিরের ২৯৬টি দো-বায়তী ও ৪টি গাযালসম্বলিত একখানি দীওয়ান প্রকাশ করেন; সম্পাদক ইহার পরিশিষ্টরূপে বিভিন্ন কবিতা-সংকলনে প্রাপ্ত ৬২টি দো-বায়তী হিরন এ্যালেন প্রদত্ত ৩টি রুবা'ঈ ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন। এই দীওয়ানখানির চতুষ্পদীগুলি কবিতার অন্ত্যমিলে ব্যবহৃত হরফের ক্রমঅনুসারে বিন্যস্ত। দুঃখের বিষয়, সম্পাদক তাঁহার দীওয়ানে তিনি যেই পাণ্ডুলিপিগুলির ব্যবহার করিয়াছেন সেইগুলির কোন বিস্তারিত বিবরণ দেন নাই। নূতন চতুষ্পদীগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিতে বাবা তাহিরের নাম, আলওয়ান্‌দ ও মায়মান্‌দ (?) পর্বত ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়; ইহাতে বাবা তাহিরের কবিতার জ্ঞাত বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তিজনিত দোষে দুষ্ট হইয়া এইগুলি আরও একটু বেশি গতানুগতিক হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল চতুষ্পদীর অধিকাংশের ভাষারূপ দৃষ্টে এইগুলি সত্য সত্যই বাবা তাহিরের রচনা বলিয়া মনে হয়, তবে বাবা তাহিরের কবিতার বৈশিষ্ট্য অনুকরণ খুব একটা কঠিন কাজ নহে। বাবা তাহিরের বলিয়া কথিত চতুষ্পদীসমূহ প্রকৃতপক্ষেই তাঁহার রচনা কি না এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠে, যেমনটি তোলা হইয়াছিল 'উমার খায়্যামের বেলায়। Zukowski বলেন, বাবা তাহিরের চতুষ্পদীসমূহ মুল্লা মুহাম্মাদ সূফী মায়ান্‌দারানীর (হি. ১১শ শতাব্দী) দীওয়ানে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শাতির বেগ মুহাম্মাদ নামক জনৈক আধুনিক কবি নিজেকে বাবা তাহিরের রচিত বলিয়া বর্ণিত (তু. দীওয়ান, পৃ. ২১) কতিপয় "কুর্দী (পাহ্‌লাবী)" চতুষ্পদীর রচয়িতা বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

বাবা তাহিরের কবিতার বিষয়বস্তু খুবই সীমাবদ্ধ, তবে তাঁহার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের ছাপ কবিতাগুলিতে সুস্পষ্ট। হুয়ার্ট কর্তৃক প্রকাশিত ৫৯টি চতুষ্পদীর একটি বিশ্লেষণ নীচে দেওয়া হইল। ইহা পাঠককে কবির বৈশিষ্ট্য বিচারে সাহায্য করিবে। সাধারণত বাবা তাহিরের কবিতায়ও গূঢ় আল্লাহ প্রেম ও সাধারণ মানবীয় প্রেমের মধ্যে সঠিক পার্থক্য নির্দেশ করা দুরূহ; ৩৪টি চতুষ্পদীকে প্রায় সমানভাগে দুই ধরনের গীতি-কবিতার মধ্যে ভাগ করা যায়। দুইটি চতুষ্পদী সরাসরি আল্লাহ তা'আলার স্তুতিগান, অবশিষ্টগুলি অধিকতর ব্যষ্টিধর্মী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাবা তাহির প্রায়শই নিজের জীবনকে একজন ভবঘুরে দারবীশের জীবনের সহিত তুলনা করিয়াছেন, যাঁহার মাথার উপর কোন ছাদ নাই (অর্থাৎ যিনি গৃহহীন), যিনি বালিশের পরিবর্তে পাথরের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যান এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আধ্যাত্মিক উদ্বেগে কাতর থাকেন (৬, ৭, ১৪ ও ২৮ নং চতুষ্পদী)। দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা তাঁহাকে যন্ত্রণা দেয়; একমাত্র 'বিষাদের পুষ্প' তাঁহার হৃদয়ে দ্রুত বিকশিত হয়, এমন কি বসন্তের মনোহারিণী সৌন্দর্যও তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত অসুখীই রাখিয়া যায় (৩৪, ৩৫, ৪৭, ৫৪ নং চতুষ্পদী)। বাবা তাহির নিজেকে প্রকৃত সূফীর আদর্শের অনুসারী বলিতেন, স্বীয় পাপকর্মের কথা স্বীকার করিতেন এবং তজ্জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, নম্র আচরণের উপদেশ দিতেন এবং স্বীয় দুর্ভাগ্যের একমাত্র প্রতিকাররূপে ফানা' কামনা করিতেন (১, ১৩, ৪৫, ৫০, ৫৮ নং চতুষ্পদী)। একটি মানবিক দোষ ছিল বাবা তাহিরের বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যঃ তাঁহার চক্ষু ও হৃদয় দুনিয়ার আকর্ষণীয় বস্তু হইতে নিজেকে সহজে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে পারে না, তাঁহার বিদ্রোহপরায়ণ হৃদয় মরমে জ্বলে, তাঁহাকে মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম দেয় না, যন্ত্রণাকাতর কবি বলিয়া উঠেন, "হে আমার হৃদয়! তুমি কি সিংহ না বাঘ যে, আমার সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিতেছ? হে হৃদয়! তোমাকে হাতে পাইলে আমি তোমার রক্ত ঝরাইয়া দেখিব তোমার কি রং" (৩, ৮, ৯, ২৬, ৪২ নং চতুষ্পদী)।

বাবা তাহিরের মন-মানসিকতা লক্ষণীয়ভাবে 'উমার খায়্যামের বিপরীত। বাবা তাহিরের ধ্যান-ধারণায় খায়্যামের (মৃ. ৫১৭/১১২৩?) আনন্দবাদের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; মৃত্যুজনিত পরিবর্তনের ফলে খায়্যামের মধ্যে যে প্রশান্তির উদ্ভব হয় তাহাও বাবা তাহিরের মধ্যে অনুপস্থিত। অপরদিকে বাবা তাহিরের আধ্যাত্মিক তেজ ও উত্তাপ 'উমার খায়্যামে অনুপস্থিত (তু. Christensen, Critical Studies in the Rubaiyat of Umar-i-Khayyam. Copenhagen 1917, পৃ. 88)।

বাবা তাহিরের কবিতায় যাহা আনন্দায়ক তাহা হইতেছে তাঁহার ভাবের সজীবতা যাহা সূফী নিয়ম-কানূনের বেষ্টনীতে পড়িয়া বাঁধাধরা ছকে পরিণত হয় নাই, তাঁহার মানসচিত্রের স্বতঃস্ফূর্ততা আর মহাভীতি প্রকাশেও তাঁহার ভাষার সহজ-সরল রূপ। 'উমার খায়্যামের অনুবাদক ফিটজারাল্ড (Fitzgerald) মত কোন প্রতিভাশালী অনুবাদক বাবা তাহিরের কবিতা অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে 'উমার খায়্যামের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করিতে পারেন।

সূফী বাবা তাহির ঃ যুকোবস্‌কি যে সমস্ত ইরানী দারবীশের সহিত বাবা তাহির সম্পর্কে আলোচনা করেন তাঁহারা জানিতেন যে, তিনি ২২ খানি তাসাওউফ (দ্র.) বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা (আরও তু. রিদা কুলী খান)। কিন্তু য়ূরোপীয়রা শুধু Ethe ও Blochet-এর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন যে, অক্সফোর্ড ও প্যারিসে বাবা তাহিরের বাণীমালার একাধিক ভাষ্য সংরক্ষিত আছে। বাবা তাহিরের বাণী সমষ্টি আল-কালিমাতু'ল-কিসার ("সংক্ষিপ্ত বাণীসমগ্র") বর্তমানে ফারসী সমালোচনা সাময়িকী আরমাগান-এর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ৩৬৮টি আরবী বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐগুলি ২৩টি বিষয়ভিত্তিক ভাগে বিভক্ত, যথা জ্ঞান ('ইলম), আধ্যাত্মিক জ্ঞান (মা'রিফাত), অনুপ্রেরণা ও অন্তরানুভূতি (ইলহাম, ফিরাসা), যুক্তি ও আত্মা ('আক্‌ল, নাফ্‌স), ইহলোক ও পরলোক (দুন্‌য়া, 'উক্‌বা), সঙ্গীত চর্চা (সামা') ও যিকির, আন্তরিকতা ও আল্লাহ্‌র জন্য নিভৃতবাস (ইখ্‌লাস, ই'তিকাফ) ইত্যাদি।

বাবা তাহিরের বাণীর কতিপয় নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ ৮৬ নং বাণী ঃ "সজ্ঞা (intuition) হইতেছে প্রকৃত জ্ঞান, যাহার দ্বারা নিশ্চয়তার জ্ঞান অর্জিত হয়" (الحقيقة المشاهدة بعد علم اليقين)। ৯৬ নং বাণী ঃ "ভাবাবেগ হইতেছে বিদ্যমান বস্তুর (জ্ঞানের) অবসান এবং হারানো বস্তুর অস্তিত্বের অনুভব"। ৩৬৮ নং বাণী ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারিত নিয়তির সাক্ষী হইয়াছে সে নিশ্চল ও ইচ্ছাহীন অবস্থায় থাকে।' ৩০০ নং বাণী ঃ "অজ্ঞতা যাহাকে হত্যা করিয়াছে সে কখনও জীবিত নয়, আর যিক্‌র যাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহার মৃত্যু নাই।'

বাবা তাহিরের "সংক্ষিপ্ত বাণীসমষ্টি" সূফী মহলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বাণীসমষ্টি সম্পর্কে ইহার ফার্‌সী সম্পাদক নিম্নোক্ত ভাষ্য গ্রন্থগুলির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ'আয়নু'ল-কুদাত আল-হামাদানী (মৃ. ৫৩৩ হি., তবে প্রায়শই বাবা তাহিরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছেন) রচিত বলিয়া কথিত আরবী ভাষ্য। অপর একজন অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত আর একখানি আরবী ভাষ্য। মুল্লা সুলতান 'আলী গুনাবাদী রচিত আরবী ও ফার্‌সী ভাষ্য, ইঁহার ফার্‌সী ভাষ্যখানি ১৩২৬/১৯০৬ সালে মুদ্রিত হয়, তবে দুষ্প্রাপ্য। আর্‌মাগান সম্পাদক আশা করেন, তিনি অদূর ভবিষ্যতে উপরোক্ত কোন একটি ভাষ্যসহ বাবা তাহিরের "সংক্ষিপ্ত বাণীমালা" প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন।

প্যারিসের Biblitheque Nationale লাইব্রেরীতে রক্ষিত ১৯০৩ নং আরবী পাণ্ডুলিপিতে বাবা তাহিরের বাণীমালার প্রথম ৮টি অধ্যায় ভাষ্যসহ (পত্রক ৭৪ক-১০০ক) সংক্ষিপ্ত আকারে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, পত্রক ১০০খ–১০৫খ), শিরোনাম আল-ফুতুহাতু'র্‌-রাব্বানীয়া ফী ইশারাতি'ল-হামাদানীয়া।

এই পাণ্ডুলিপিখানি উহার অন্তর্ভুক্ত ভাষ্যের রচয়িতা জানী বেগ আল-আযীযীর হস্তলিখিত বলিয়া মনে হয়। তিনি শাওওয়াল ৮৮৯ সালে তাঁহার রচনাকর্ম শুরু করেন এবং ২০ শা'বান, ৮৯০ (১৪৮৫ খৃ.) সালে শেষ করেন। জনৈক শায়খ আবু'ল-বাকা-র অনুরোধে তিনি ভাষ্যখানি রচনা করেন; আবু'ল-বাকা ৮৫৩ হি. হইতে বাবা তাহিরের বাণীসম্বলিত ইশারাত গ্রন্থখানি সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিলেন। আবুল-বাকা ইশারাতের পাণ্ডুলিপিখানি মক্কায় যম্‌যম্‌ কূপে নিক্ষেপ করেন, কিন্তু অলৌকিকভাবে উহা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়। মূল পাঠটির জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার কারণে 'আলিম সমাজ তাঁহাকে ইহার ভাষ্য রচনা হইতে বিরত রাখেন। শেষ পর্যন্ত আবু'ল-বাকা উল্লিখিত জানী বেগকে এই কাজ সম্পন্ন করিতে নিয়োগ করেন। ভাষ্যখানিতে বাবা তাহিরের বাণীসমূহের মূল পাঠের প্রতিটি শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বাবা তাহির ওয়ালী ঃ অধিকাংশ সূফী কবির ('আত্তার, জালালুদ্‌দীন রূমী, হাফিজ) ন্যায় বাবা তাহিরের জীবনী ও কারামাত সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, একদা বাবা তাহির হামাদানের মাদ্‌রাসার ছাত্রদিগকে তাঁহাকে জ্ঞান অর্জনের পথ দেখাইয়া দিতে বলিলে ছাত্রগণ রসিকতাচ্ছলে তাঁহাকে এক শীতের রাত্রে একটি বরফ জমা পুষ্কিরিণীর পানিতে অবস্থান করিতে বলে। বাবা তাহির সত্যসত্যই ছাত্রদের এই উপদেশ কার্যকর করেন এবং পরদিন নিজেকে জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বুঝিতে পারিয়া আবেগে বলিয়া উঠেন, "গত রাত্রে আমি ছিলাম একজন কুর্দী, আর আজ প্রাতঃকালে আমি পরিণত হইয়াছি একজন আরবে" (امسيت كرديا واصبحت عربيا)। Zukwski তেহরানে ও Heron Allen-এর তথ্য সংগ্রাহক বূশীর-এ এই কাহিনী শুনিয়াছেনঃ কাহিনীটি হামাদানে বহুল প্রচলিত (তু. দীওয়ানের মুখবন্ধ, পৃ. ১৭ ও হামাদানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ)। উপরোক্ত আরবী বাণীটি জালালু'দ-দীন রূমীর মাছনাবীর উপক্রমণিকায় বর্ণিত হইয়াছে, তবে উহাতে বলা হইয়াছে যে, উর্‌মিয়ার তুর্কী বাসিন্দা ইব্‌ন আখীর জনৈক অজ্ঞাতনামা (সূফী) পূর্বপুরুষ ইহার রচয়িতা। জামীর নাফাহাতু'ল-উন্‌স (সম্পা. Nassau, Lees, পৃ., ৩৬২-৬৩)-এ বাণীটি আবূ 'আবদিল্লাহ বাবূনী-র রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

অন্যান্য ধর্মীয় কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, বাবা তাহির তাঁহার রূহানী শক্তির তেজস্বিতার দ্বারা আল্‌ওয়ান্‌দ পর্বতের বরফ গলাইয়া ফেলেন, তাঁহার নিকট উপস্থাপিত একটি জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান তিনি পায়ের আঙ্গুলের সাহায্যে দাগ কাটিয়া বাহির করিয়া দেন ইত্যাদি (Zukowski, Heron Allen, Leszczynski, দীওয়ানের মুখবন্ধ, হামাদান হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি)।

Gobineau (Trois ans en Asie, Paris 1859, p. 344) ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করেন যে, আহ্‌লে হাক্‌ক ফিরকার অনুসারিগণের অভ্যাস ছিল প্রখ্যাত সূফীদের, বিশেষত বাবা তাহিরের এবং তদীয় ভগিনী বিবি ফাতিমার নাম সর্বাগ্রগণ্য বিবেচনা করা ও তাঁহাদের অত্যধিক প্রশংসা করা; তদুপরি লুর আঞ্চলিক ভাষায় বাবা তাহিরের রচিত কবিতারও তাঁহারা উচ্চ প্রশংসা করেন। সারান্‌জাম শিরোনামের ধর্মীয় রচনাকর্মটি আবিষ্কারের ফলে আহ্‌লে হাক্‌ক-এর জন্মতত্ত্ব মতবাদে বাবা তাহিরের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। এই দলটি প্রভুর ৭টি বিভিন্ন রূপের বহিঃপ্রকাশে বিশ্বাসী (যাহার রূপক বর্ণনা নিম্নরূপঃ প্রথমত প্রাক-অনন্তকালে খাওয়ান্‌দিগার-এর প্রকাশ, দ্বিতীয়ত 'আলীর প্রকাশ, তৃতীয়ত বাবা খোশীন-এর, চতুর্থত সুলতান ইস্‌হাক-এর প্রকাশ)। ইহাদের প্রত্যেকের প্রকাশের সহিত ৪ জন করিয়া ফেরেশতা আবির্ভূত হন; তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। বাবা তাহিরকে গণ্য করা হয় বাবা খোশিনের অন্যতম ফেরেশ্‌তারূপে এবং 'আযরাঈল ও নুসায়র-এর অবতাররূপে। বাবা খোশীনের আমল যে অতীন্দ্রিয় পর্যায়ের সহিত মোটমুটি সঙ্গতিপূর্ণ তাহা হইতেছে মা'রিফাত।

এই কালচক্রের ঘটনাবলী সংঘটিত হয় লুরিস্‌তান ও হামাদানে। সারান্‌জাম-এর পাণ্ডুলিপিতে হামাদানে বাবা তাহিরের আস্তানায় "দুন্‌য়ার বাদশাহে"র আগমনের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। "দুন্‌য়ার বাদশাহ" কথার দ্বারা বাবা খোশীনকে বুঝান হইয়াছে, তবে কাহিনীটি রাহাতু'স-সুদূর-এ বর্ণিত তুগ্‌রিলের ঘটনাবলীর স্মৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কথিত আছে, বাবা তাহির ও বাবা শাহী গোত্রের (গুরান অঞ্চলে বসবাসকারী) ফাতিমা লারা ("শীর্ণকায়া") (বাবা তাহিরের সেবিকা) এক চারয়াক (এক মুষ্ঠি?) চাউল দ্বারা বাদশাহের সমগ্র সেনাবাহিনীর আহারের ব্যবস্থা করেন। বাদশাহ বাবা তাহিরকে

দুনিয়ার সমস্ত মূল্যবান সম্পদ দ্বারা প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি শুধু "বাদশাহের সৌন্দর্য" দর্শনের প্রত্যাশী। ফাতিমা দুনিয়ার বাদশাহের অনুগামিনী হইবার ইচ্ছা করেন; তিনি নিজের হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া দেহ ত্যাগ করেন। বাদশাহ বাবা তাহিরকে তাঁহার এই ক্ষতির জন্য সান্ত্বনা দেন এবং এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে, শেষ বিচারের দিনে তিনি তাঁহাকে ফাতিমার সহিত পুনর্মিলিত করিবেন তখন তাঁহারা হইবেন প্রেমিক যুগল লায়লা ও মাজনূনের ন্যায়। বাবা তাহিরের ১৩টি খণ্ড কবিতা (খণ্ডিত, তবে রচনাশৈলী বাবা তাহিরের মতই) সারানজাম-এর মূল পাঠটিতে ইতস্তত ছড়াইয়া আছে (তু. Minorsky, পৃ. ২৯-৩৩, ৯৯-১০৩), এই সমস্ত তথ্য Leszczynski কাজে লাগাইয়াছেন, (পূ. গ্র., পৃ. ১৮-২৫)। মূল পাঠে বর্ণিত ফাতিমা লারা বাবা তাহিরের পার্শ্বেই সমাহিত। বাবা তাহিরের মাযারের তত্ত্বাবধায়কদের মতে এই ফাতিমা এবং একই সমাধি ক্ষেত্রের অন্যত্র সমাহিত আর এক ফাতিমা ভিন্ন। Gobineau ও A.V.W. Jackson বাবা তাহিরের ভগিনী বিবি ফাতিমা বা ফাতিমা লায়লা-র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আযাদ-ই হামাদানী (দীওয়ান, পৃ. ১৬-২১) বাবা তাহিরের দায়া "সেবিকা"-এর কবরের উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় প্রত্যেকেই যেন ফাতিমার সহিত বাবা তাহিরের সম্পর্ককে প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলীতে রূপান্তরিত করিতে সচেষ্ট।

এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে উদ্ধৃত চতুষ্পদীটিতে (আল্‌ফ, আলিফ-কাদ্‌দ) হযরত বাবা তাহিরের কোন উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ক। বাবা তাহিরের চতুষ্পদী কবিতামালা সম্বলিত পাণ্ডুলিপিগুলি হইতেছে ঃ (১) Asiat. Soc, Bengal, Pers, No. 923, Catal. Ivanow, P. 424 (হি. ১০০০ [১৫৯২ খৃ.] সালের একখানি মাজমূ'আ বা রচনা সংগ্রহ); (২) Preuss. Staatsbibl, Catal, Peratsch, P. 727, No. 697 (১৮২০ খৃ. রচিত ও Leszczynski কর্তৃক ব্যবহৃত) ঃ ৫৬টি চতুষ্পদী; (৩) Bibl. Nat. de Paris, Pers, 174, Cat. Blochet, ii, 290-292 (বাখ্‌শ 'আলী কারাবাগী-র সংগ্রহ, তা. হি. ১২৬০ [১৮৪৪ খৃ.], ১৭৪টি চতুষ্পদী? ও একটি গাযাল; (৪) তেহরানের সিপাহসালার মসজিদের লাইব্রেরীতে Zukowski "হালাত-ই বাবা তাহির বা ইন্‌দিমাম-ই "আশ'আরাশ" শিরোনামের একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান, কিন্তু উহার বিষয়বস্তুর সহিত শিরোনামের কোন মিল নাই। খ। বাবা তাহিরের সূফীতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাকর্মের পাণ্ডুলিপিগুলি ঃ (৫) Bibl. Nat. de Paris, Arab 1903 (Blochet, o. 1. ii. 291) এবং (৬) Oxford Ms. Ethe, Cat. pers. Mss. Bodleian Lib., No. 1298, fol. 302b-343। গ। যেই সমস্ত সংকলনে কবি বাবা তাহির নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার কবিতা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ঐগুলি হইতেছে ঃ (৭) 'আলী কুলী খান ওয়ালিহ, রিয়াদু'শ-শু'আরা,' ১১৬১/১৭৪৮, তু. Leszczynski, p. 10; (৮) লুত্‌ফ 'আলী বেগ, আতাশকাদা, ১১৯৩/১৭৭৯, বোম্বাই ১২৭৭ হি., পৃ.২৪৭ (২৫টি চতুষ্পদী); (৯) 'আলী ইব্‌রাহীম শাহ, সুহুফ-ই ইবরাহীম, ১২০৫/১৭৯১, Preusstaatbibl., Pertsch, p. 627, No. 663; একটি অসাধারণ পাণ্ডুলিপি (Zukowski ও Leszczynski কর্তৃক ব্যবহৃত); (১০) রিদা কুলী খান, মাজ্‌মা'উ'ল-ফুসাহা, তেহরান ১২৯৫ হি., ১খ, ৩২৬ (১০টি চতুষ্পদী); (১১) রিদা কুলী খান, রিয়াদু'ল-আরিফীন, তেহরান ১৩০৩ হি., পৃ. ১০২ (২৪টি চতুষ্পদী); (১২) ১২৯৭ ও ১৩০৮ হিজরীতে বোম্বাইয়ে 'উমার খায়্যামের চতুষ্পদী সংগ্রহের সহিত প্রকাশিত বাবা তাহিরের ৫৭টি চতুষ্পদী; (১৩) ১৩০১ হিজরীতে বোম্বাইয়ে (আন্‌সারীর মুনাজাত-এর সহিত) প্রকাশিত ৩২টি চতুষ্পদী; (১৪) ১২৭৪ হিজরীতে তেহরানে ('উমার খায়্যামের চতুষ্পদীর সঙ্গে) প্রকাশিত ২৭টি চতুষ্পদী; (১৫) বাবা তাহিরের গাযাল অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ১২৯২ হিজরীতে তেহরানে প্রকাশিত শামস-ই মাগরিবীর দীওয়ানের পরিশিষ্টরূপে, পৃ. ১৫৮. আন্‌সারীর মুনাজাত-এর পরিশিষ্টরূপে, ইত্যাদি; (১৬) আর্‌মাগান পত্রিকার ৮ম বার্ষিকী সংখ্যার ক্রোড়পত্ররূপে (পৃ. ১-১২৪); (১৭) ১৩০৬/১৯২৭ সালে তেহরান হইতে বাবা তাহিরের দীওয়ান (তু. মূল পাঠ) প্রকাশিত হয় দীওয়ানের সম্পাদক লিখিত উপক্রমণিকা কালিমাত-ই কিসার, মাহমূদ 'ইরফান লিখিত জীবন বৃত্তান্ত; আযাদ-ই হামাদানী লিখিত বাবা তাহিরের মাযারের একটি বর্ণনা, ইত্যাদিসহ; (১৮) Huart, Les quatrains de Baba Tahir Uryan en pehlevi musulman, J.A., series viii., vol. vi, Nov.-Dec. 1885, পৃ. ৫০২-৪৫; (১৯) Zukowski, Koye cto o B. Tahire Golishe zap, 1900, xiii, পৃ. ১০৪-৮ (গ্রন্থপঞ্জী, ৩টি কাহিনী, ২টি নূতন চতুষ্পদী, তন্মধ্যে একটি দীওয়ানের ১৪৬ নং চতুষ্পদীর সহিত অভিন্ন), আরও তু. Zap., ii, পৃ. ১২; (২০) E. Heron Allen, The Lament of Baba Tahir, London 1902 (৬২টি চতুষ্পদীর মূল পাঠ, সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত এবং Elisabeth Curtis Brenton-কৃত কাব্যানুবাদ); (২১) E. G. Browne, A Lit, Hist, of Perscia, i. 83-87, ii. 259-61; (২২) মীর্‌যা মাহ্‌দী খান (কাওকাব), the quatrains of B. Tahir, J.A.S. Bengal, 1904, No. I, P. 1-29 (Heron Allen অনূদিত চতুষ্পদীগুলির নূতন সংস্করণ [একটি চতুষ্পদী] গুরুত্বপূর্ণ ভ্রম সংশোধন ও খুবই আগ্রহোদ্দীপক ভাষ্যসহ; (২৩) Huart, Nouveaux quatrains de Baba Tahir, in spiegel Memorial Volume, সম্পা. J.J.Modi, Bombay 1908, পৃ. ২৯০ ৩০২ (২৮টি চতুষ্পদী ও একটি গাযাল); ইহার ফলে ১৮৮৫ খৃ. আরব্ধ বাবা তাহিরের চতুষ্পদী সংগ্রহের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে; নবাবিষ্কৃত চতুষ্পদীগুলি সম্প্রতি কাশ্‌কূলুল-ফুকারা'-র [ইহার মূল পাঠটি কনস্টান্টিনোপ্‌লের মুহাম্মাদীয়া মসজিদে (ফাতিহ) রক্ষিত আছে] একটি সংক্ষিপ্তসারে, মাগ্‌রিবীর দীওয়ানে ও একটি এ্যালবামে পাওয়া যায়। হুয়ার্ট প্রকাশিত বাবা তাহিরের চতুষ্পদীর এই দ্বিতীয় সংকলনখানিতে খুবই অনিয়মিত কবিতা খণ্ডও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, ইহাদের অনুবাদও সঠিক কিনা বলা যায় না; (২৪) Minorsky, Materiali (Materiaux pour servir a l'etude des croyances de la secte persane dite les ahl-i Haqq on 'Ali-Ilahi"), vol, xxxiii, of the Trudi Lazarew. Institue, Moscow 1911, পৃ. ২৯-৩৩ (সারান্‌জাম হইতে কতিপয় ফারসী অনুচ্ছেদের অনুবাদ), পৃ. ৯৯-১০৩ (পরিস্থাপিত কবিতাগুলির ফার্‌সী মূল পাঠ ও টীকা); (২৫) G. L. Lesczynski, Die Ruba'eyat des Baba Tahir Uryan oder Die Gottestrianen des Herzens, aus d. west-medischen [sic] Originale, Munih 1920 (গ্রন্থপঞ্জী ও জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত, কাব্যানুবাদ); (২৬) K. Hadank, Die Murdarten v. Khunsar etc., in Kurd.-Pers, Forsch. V. O. Mann, series iii, vol, i., Leipzig 1926, Introduction p.xxxvii-lv. বাবা তাহিরের ভাষার প্রশ্নের পূর্ণ পর্যালোচনা, গ্রন্থপঞ্জী)।

V. Minorsky (E. I. [1])/ শায়খ ফজলুর রহমান

তাহির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (طاهر بن عبد الله) ঃ ইব্ন তাহির, ইব্ন 'উমার আত-তাবারী, একজন প্রখ্যাত ফকীহ, সাহিত্যিক, কবি ও কাদী, কুন্‌য়া (উপনাম) আবু'ত-তায়্যিব। তাবারিস্তানের রাজধানী প্রসিদ্ধ শহর আমূল (امل)-এ ৩৪৮/৯৫৯ সালে জন্ম, এইজন্য তাঁহার নিসবা আত-তাবারী ও আল-আমূলী। তিনি জন্মভূমি আমূলে শায়খ আবূ 'আলী আয-যুজাজী-র নিকট প্রচলিত বিষয়মূহের শিক্ষা লাভের পর বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে জুরজান, নীশাপুর ও বাগদাদ গমন করেন। জুরজানে তিনি শায়খ আবূ সা'দ আল-ইসমা'ঈলী, শায়খ আবু'ল-কাসিম ও শায়খ আবূ আহমাদ আল-গাতরীফ -এর নিকট ফিক্‌হ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর নীশাপুরে শায়খ আবু'ল-হাসান আল-মাসির জামী-এর নিকট চারি বৎসর অবস্থান করিয়া ফিক্‌হ বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। অবশেষে বাগদাদে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। বাগদাদে শায়খ মূসা ইব্ন জা'ফার, শায়খ আবু'ল-হাসান আদ-দারাকুতনী, শায়খ 'আলী ইব্ন 'উমার আস-সাক্কারী ও শায়খ আল-মু'আফী ইব্ন যাকারিয়া আল-জারীরী-র নিকট বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি শায়খ আবূ হামিদ আল-ইসফারাঈনী-র শিক্ষা মজলিসে যোগদান করিয়া কালাম ও অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন। শিক্ষাকাল সমাপ্তির পর তিনি বাগদাদেই অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন।

ইসলামী বিষয়সমূহে, বিশেষত ফিক্‌হ, উসূলুল-ফিক্‌হ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার গভীর বিদ্যাবত্তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। সমসাময়িক যুগে তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের একজন বিশেষজ্ঞ ফকীহ হিসাবে গণ্য হইতেন। তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রে বহু শিক্ষার্থীর সমাবেশ হইত। তাঁহার কৃতী ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন আবূ বাক্‌র আহমাদ আল-খাতীব আল-বাগদাদী, আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী, আবূ মুহাম্মাদ ইবনু'ল-আবনূসী, আবূ নাস্‌র আহমাদ ইবনু'ল-হাসান আশ-শীরাযী, আহমাদ ইব্ন 'আবদি'ল-জাব্বার আত-তুযূরী, আবু'ল-মাওয়াহিব আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ, আবূ নাসর মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-আকবারী, আবু'ল-'ইয্য আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ, আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-বাকী আল-আনসারী প্রমুখ। শায়খ আবূ ইসহাক আশ-শীরাযী তাঁহার শিক্ষক শায়খ আত-তাবারী সম্পর্কে বলেন, আমি তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রে দীর্ঘ ১৩ বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত করি এবং আমি তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ মুজতাহিদ, গভীর দৃষ্টি ও সূক্ষ্মবিচার-বিশ্লেষণের অধিকারী কাহাকেও দেখি নাই।

শায়খ আত-তাবারী বাগদাদে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা, ফাতওয়া ও গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি কারখ অঞ্চলে কাযী পদে নিয়োজিত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি ৪৫০/১০৫৮ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। জামি' আল-মাসসূরে তাঁহার জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাবু'ল-হারব মাকবারাতে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকখানা উল্লেখযোগ্য ঃ আল-মুযানী রচিত মুখতাসার গ্রন্থের শারহ; ফুরূ' আবী বাক্‌র ইব্ন হাদ্দাদ আল-মিসরী; ফিক্‌হ শাস্ত্রের বিতর্কিত বিষয়সমূহ উসূলু'ল-ফিক্‌হ ও তর্কশাস্ত্র বিষয়েও তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাতীব আল-বাদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, মিসর, ৯খ, ৩৫৮; (২) আস-সুবকী, তাবাকাত, মিসর, ৩খ, ১৭৬; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, ওফায়াতু'ল-আ'য়ান, মিসর ১৯৪৮ খৃ., ২খ, ১৯৫-৯৯; (৪) 'আবদুল্লাহ মুস্‌তাফা আল-মারাগী, আল-ফাতহু'ল-মুবীন, মিসর ১৯৪৮ খৃ., ১খ, পৃ. ২৩৮-৩৯।

ডঃ এ.কে. এম. আইয়ূব আলী

তাহির ইব্ন আবী হালা (طاهر بن ابى هالة) ঃ আত্-তামীমী আল-আসাদী উম্মু'ল-মু'মিনীন খাদীজা আল-কুবরা (রা)-এর পূর্ব স্বামীর পুত্র, সেই হিসাবে তিনি নবী কারীম (স)-এর সৎপুত্র ছিলেন। আবূ মূসা (র)-এর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহির ইব্ন আবী হালা, মু'আয, খালিদ ইব্ন সা'ঈদ, 'উক্কাশা ইব্ন ছাওর ও আবূ মূসাকে য়ামানের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি রিদ্দা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিহামা-র আযদ গোত্রকে পরাভূত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ২২২; (২) ইব্নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫০।

মোহাম্মদ আলী

তাহির ইব্ন আহমাদ (طاهر بن احمد) ঃ ইব্ন 'আবদি'র রাশীদ ইব্নি'ল-হুসায়ন আল-বুখারী, ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর একজন মুজতাহিদ ফকীহ। ইফতিখারু'দ-দীন উপাধিতে ভূষিত এবং ইফাতখারু'দ-দীন আল-বুখারী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

তিনি বুখারার এক প্রখ্যাত বিদ্বান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা, পিতামহ ও মাতুল সকলেই ইসলামী বিষয়সমূহের প্রথিতযশা 'আলিম ছিলেন এবং অধ্যাপনাই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার পিতা আহমাদের উপাধি ছিল কিওয়ামু'দ-দীন। শায়খ তাহির স্বীয় পিতার নিকট ইসলামী বিষয়াদির প্রচলিত পাঠ্য তালিকার শিক্ষা লাভের পর শায়খ হাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আস-সাফ্‌ফার ও স্বীয় মাতুল শায়খ জাহীরু'দ-দীন আল-হাসান ইব্ন 'আলী আল-মারগীনানী ও কাদী খান হাসান ইব্ন মানসূরের নিকট ফিকহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন।

শায়খ তাহির আল-বুখারী স্বীয় যুগে মধ্য এশিয়া অঞ্চলে হানাফী মাযহাবের নেতৃস্থানীয় 'আলিম হিসাবে বিবেচিত হইতেন। ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ফকীহ ও মুফ্‌তী হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। ফিকহ ও ফাতওয়া সম্পর্কে তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ বিদ্বান সমাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার বহুল প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকখানা হইল ঃ খিযানাতু'ল-ওয়াকি'আত; খুলাসাতু'ল-ফাতাওয়া এবং আন-নিসাব। কাশফু'জ জুনূন-এর বর্ণনানুসারে তিনি ৫৪২/১১৪৭ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুল্লা কাতিব চেলেবী, কাশফু'জ জুনূন, শিরো. খিযানাতু'ল-ওয়াকি'আত; (২) আবু'ল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদুল হায়্যি আল-লাকনাবী, আল-ফাওয়াইদু'ল-বাহিয়্যা ফী তারাজিমি'ল-হানাফিয়্যা, ১ম সং, কায়রো, ১৩২৪ হি., পৃ. ৪৪।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

তাহির ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম (طاهر بن محمد بن قاسم) ঃ ইব্ন আহমাদ আল-আনসারী আল-খাওয়ারিযমী, ৮ম/১৪শ শতকের একজন খ্যাতনামা ফিকহ ও উসূলশাস্ত্রবিদ। মুল্লা 'আলী আল-কারী ও অন্যান্য জীবনীকোষ (তাবাকাত) লেখকগণ শায়খ তাহিরের বংশতালিকা উপরোক্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুল্লা চেলেবী তাঁহার বংশতালিকা নিম্নোক্তরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ তাহির ইব্ন কাসিম ইব্ন আহমাদ।

শায়খ তাহিরের "আল-আনসারী" নিসবা হইতে অনুমিত হয়, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মদীনার আনসার গোত্রভুক্ত ছিলেন। পরে এই গোত্রের কোন সদস্য বর্তমান রুশীয় তুর্কিস্তানের খীবা (আল-খাওয়ারিযম) অঞ্চলে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। "আল-খাওয়ারিযমী" নিসবা হইতে প্রতীয়মান হয়, শায়খ তাহির তুর্কিস্তানেই জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশেই তিনি খ্যাতনামা 'আলিমদের নিকট ইসলামী বিষয়সমূহে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন আস-সায়্যিদ জালালু'দ-দীন ইব্ন শামসু'দ-দীন আল-খাওয়ারিযমী, আল-কিরলানী (দ্র.), যিনি আল-কিফায়া নামে প্রসিদ্ধ হিদায়া গ্রন্থের একটি জনপ্রিয় ভাষ্য রচনা করেন।

শায়খ তাহিরের নিজস্ব বর্ণনা হইতে অনুমিত হয়, শিক্ষা প্রাপ্তির পর তিনি হিজায, তুরস্ক ও মিসর পরিভ্রমণ করেন এবং শেষ জীবন মিসরেই অতিবাহিত করেন। তিনি ৬টি অধ্যায় সম্বলিত "জাওয়াহিরু'ল-ফিক্হ" নামে ফিক্হশাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্তসার (মুখতাসার) প্রণয়ন করিয়া সুপরিচিত হন। কাশফু'জ-জুনূন'-এর উদ্ধৃতি অনুসারে উপরোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেন, হজ্জ পালনের পর তিনি তুরস্ক (রুশ) গমন করেন। অতঃপর মিসর প্রত্যাবর্তন করিয়া ফিক্হশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থাদি অবলম্বনে তিনি "জাওয়াহিরু'ল-ফিক্হ ফি'ল-'ইবাদাত পুস্তকটি রচনা করেন। ১ রামাদান, ৭৭১/১৩৬৯ সালে রচনাকার্য সমাপ্ত হয়।

শায়খ তাহির-এর জন্ম-মৃত্যুকাল অজ্ঞাত। কিন্তু উপরোক্ত তারিখ হইতে প্রতীয়মান হয়, তিনি ৮ম/১৪শ শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ এবং শেষভাগে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুল্লা কাতিব চেলেবী, কাশফু'জ-জুনূন, শিরো. জাওয়াহিরু'ল-ফিক্হ; (২) আবু'ল-হাসানাত মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-হায়্যি আল-লাকনাবী, আল-ফাওয়াইদু'ল-বাহিয়্যা, কায়রো, ১ম সং, ১৩২৪ হি., পৃ. ৮৪-৮৫; (৩) 'আবদু'ল-কাদির আল-কুরানী ও মুল্লা 'আলী আল-কারী প্রমুখ রচিত তাবাকাতু'ল হানাফিয়্যা গ্রন্থ, নির্ঘন্ট।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

তাহির ইবনুল-হুসায়ন (طاهر ابن الحسين) ঃ খুরাসানের [দ্র.] তাহিরী রাজবংশের [দ্র.] প্রতিষ্ঠাতা, জ. ১৫৯/৭৭৫-৭৭৬ সালে, মৃ. জুমাদা'ল-উলা (তাবারী, ৩খ, ১০৬৫, ১৩) অথবা জুমাদা'ল-উখরা (ইব্ন খাল্লিকান) ২০৭/৮২২ সালে। তাহির পারস্যের এক পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং আরবের খুযা'আ [দ্র.] গোত্রের সঙ্গেও তাঁহার সম্পর্ক ছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষ রাযিক ছিলেন সীস্তানের শাসনকর্তা, আবূ মুহাম্মাদ তালহা ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-খুযা'ঈ-এর মাওলা (আশ্রিত)। সেনাপতি সুলায়মান ইব্ন কাছীর আল-খুযা'ঈ-এর সচিব (কাতিব) হিসাবে আবূ মুসলিমের অধীনে রাযিকের পুত্র মুস'আব উমায়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হিরাত [দ্র.] জিলার বুশান্জ [দ্র.] শহর ছিল মুস'আবের এবং পরে তাঁহার পুত্র আল-হুসায়ন (মৃ. ১৯৯/৮১৪-৮১৫)-এর অধিকারে। তাহির নিজেও হারূনুর-রাশীদের রাজত্বকালের আনু. ১৯৩/৮০৮-৮০৯ সালের শেষভাগে সামারকান্দের বিদ্রোহী রাফি' ইব্ন লায়ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪/৮১০ সালে মামূনের মন্ত্রী ফাদ্ল ইব্ন সাহ্ল [দ্র.] তাঁহাকে আল-আমীনের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলের সেনাপত্য অর্পণ করেন। শা'বান ১৯৫/মে ৮১১ সালে ইব্ন 'ঈসার নেতৃত্বাধীন শত্রু সেনাদল পরাজিত হয়। কথিত আছে যে, তাহির যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় হাতে তরবারি চালাইতে পারদর্শী ছিলেন এবং এইজন্য মা'মূন তাঁহাকে যু'ল-য়ামীনায়ন (দুই দক্ষিণ হস্তবিশিষ্ট) আখ্যায় ভূষিত করেন। বাগদাদ দখলের (১৯৮/৮১৩) পর তাহির সিরিয়া ও পশ্চিমাঞ্চলের সৈনাপত্যসহ আল-জাযীরা [দ্র.]-এর গভর্নর নিযুক্ত হন। মা'মূন যখন ৮১৯/২০৩-২০৪ সালে খুরাসান হইতে ইরাক যান তখন তিনি তাহিরকে রাক্কা ত্যাগ করিয়া নাহ্রাওয়ানে খলীফার সহিত সাক্ষাত করার আদেশ দেন। ২০৫/৮২০-৮২১ সালে তাহিরকে বাগদাদের পূর্বাংশে অবস্থিত সমস্ত ভূভাগের বিশেষত খুরাসানের শাসন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার রাজধানী মার্ব (Merw)-এ অকস্মাৎ ইনতিকাল করেন। এক শুক্রবারের জুমু'আর খুতবায় তিনি খলীফার নামোল্লেখ বাদ দিয়াছিলেন যাহা ছিল প্রকাশ্য বিদ্রোহের নামান্তর। ইহার অল্পকাল পর তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লিখিত হইয়াছে (তু. M. J. De Goeje, in Travaux de la ৩ eme Session du Congres International des Orientalistes a, St. Petersburg ১৮৭৬ খৃ., ২খ, ১৬৩ প.)।

যদিও তাঁহার মাতৃভাষা ছিল ফারসী (তু. তাঁহার প্রতি আরোপিত ফারসী বাক্যাবলী, ইবনু'ত-তাহির, সম্পা. Keller, পৃ. ১৩০ ও তাবারী, ৩খ, ১০৬৩ প. দ্র.), কিন্তু তাহির তাঁহার বংশধরদের মত আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিতে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্র নিকট ২০৬/৮২১-৮২২ সালে তিনি যে পত্র লিখেন তাহা ছিল এই পুত্রের দিয়ার রাবী'আ [দ্র.]-এর শাসনকর্তারূপে নিয়োগের উপলক্ষে। এই পত্র তাহির-এর সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যেও খুবই সমাদৃত হইয়াছিল [তু. (১) কিতাব বাগদাদ, সম্পা. Keller, পৃ. ৩৬ প. (জার্মান অনু. পৃ. ১৭ প.); (২) তাবারী, ৩খ, ১০৪৬ প. ; (৩) ইবনু'ল-আছীর, ৬খ, ২৫৮ প., রুশীয় অনু. A. Schmidt, Bulletin de l'Univ. De l'Asie Centrale, ৮খ, ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১২৯ প.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বিশেষভাবে ইব্ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, No, ৩০৮; (২) সম্পা. Do Slane, text,, পৃ. ৩৩১ প., অনু. ১খ, ৬৪৯ প.।

W. Barthold (I[1])/ এস. এম. হুমায়ুন কবির

তাহির 'উমার (দ্র. জাহীর 'উমার)

তাহির ওয়াহীদ (طاهر وحيد) মুহাম্মাদ 'ইমামুদ-দাওলা, কায্বীন -এর একজন ফারসী কবি। তিনি মীরযা তাকিয়্যু'দ-দীন মুহাম্মাদ ও খালীফা সুল্তান নামক দুইজন প্রধান মন্ত্রীর সচিব ছিলেন। ১০৫৫/১৬৪৫-৬ সালে দ্বিতীয় শাহ 'আব্বাসের সরকারী ইতিহাস সংকলক (Historiographer) নিযুক্ত হন এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে ১১০১/১৬৮৯-৯০ সালে মন্ত্রী হন। পরবর্তী কালে অবসর গ্রহণ করিয়া বেসরকারীভাবে জীবন যাপন করেন এবং খুব সম্ভব ১১১০/১৬৯৮-৯৯ সালে ৯০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। বৃটিশ মিউযিয়ামে তাঁহার ইতিহাস সংক্রান্ত রচনার পাঁচটি পাণ্ডু. সংরক্ষিত আছে। আতাশকাদা (বোম্বে ১২৭৭, পৃষ্ঠা সংখ্যাবিহীন) বলেন যে, তাঁহার কবিতাসমূহ প্রধানত গ্রন্থকারের পদমর্যাদার কারণেই প্রশংসনীয় ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Hammer, Gesch. Redek, Pers, পৃ. ৩৮০ (খণ্ড খণ্ড অনু.); (২) Rieu, Catalogue of Persian Mss..., পৃ. ১৮৯-১৯০; (৩) E. G. Browne, A History of Persian Literature in Modern Times (Cambridge ১৯২৪), ২৫৮, ২৬৪; (৪) Ivan w, Descriptive Cat. As. Soc. Bengal (কালিকাতা ১৯২৪), পৃ. ৩৭১; (৫) Ethe, Grundriss diran. Philologie, ২খ, ৩১২, ৩৪২।

CL. Huart (E.I[1])/ এস. এম. হুমায়ুন কবির

(শায়খ) তাহির আল-জাযাইরী (شيخ طاهر الجزائرى) ঃ তাহির ইব্ন সালিহ (বা মুহাম্মাদ ইব্ন সালিহ) ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাওহূব ইব্ন আবিল কাসিম ইব্ন মূসা আল-ওয়াফীসী আস-সাম'উনী আল-ইদ্‌রীসী আল-হাসানী আ-জাযা'ইরী, অতঃপর আদ-দিমাশ্‌কী, যাঁহাকে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী/খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একজন ভাষাবিদ, সাহিত্যিক, প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ, পুরাতন আরবী মাখতূতাহ (অনূদিত পাণ্ডুলিপি)-এর মর্যাদা দানকারী, ব্যুৎপত্তি অর্জনকারী ও সংরক্ষণকারী, শামে (সিরিয়া) ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের প্রথম ঝাণ্ডাবাহী এবং দামিশ্‌ক ও কায়রোতে 'ইলমী ও আদাবী (সাহিত্য) কেন্দ্রসমূহের প্রাণ মনে করা হইত (কুনূয'ল আজ্‌দাদ, পৃ. ৫ প., দামিশ্‌ক ১৯৫০ খৃ.; মাজাল্‌লা আল-হিলাল, কায়রো ৩৮ (১৯২০ খৃ.), ৪৫১ প.; মাজাল্‌লা আল-মাশরিক, বৈরূত ১৯২০ খৃ., ১৮শ সংখ্যা, ১৪৪; মাজল্‌লা আল-মাজ্‌মা'উ'ল'ইলমী আল-'আরাবী, দামিশ্‌ক ১৯২০ খৃ., ৮ম সংখ্যা, ৫৭৭ প.)। শায়খ তাহির আল-জাযা'ইরীর পরিবার ঐ সকল ইদরীসী সায়্যিদগণের অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা ইদরীস ইব্ন 'আবাদিল্লাহ আল-কামিল ইবনু'ল হাসান আল-মুছান্না ইবনু'ল-হাসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত এবং আফ্রিকা, স্পেন, আল-জাযা'ইর ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য শহরে বসবাস করিতেন। শায়খ তাহির-এর পিতা শায়খ সালিহ ইব্ন আহমাদ (মৃ. ১২৮৫/১৮৬৮)। যিনি একজন উচ্চস্তরের দীনী 'আলিম ও মালিকী ফিকহ-এ অভিজ্ঞ ছিলেন, ১২৩৩/১৮৪৬ আল-জাযা'ইর হইতে হিজরত করিয়া দামিশ্‌কে আগমন করেন এবং সিরিয়ায় মালিকী মাযহাবের মুফ্‌তী পদে নিয়োজিত হন। ১২৬৮/১৮৫২ সালে শায়খ-এর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যাহার নাম তাহির রাখা হয় (আল-হিলাল, ২৮ সংখ্যা, ৪৫১; কুনূয'ল-আজ্‌দাদ, পৃ. ৫)।

শায়খ তাহির দামিশকে বিভিন্ন শিক্ষাগারে প্রচলিত 'ইল্‌ম অর্জন করেন এবং স্বীয় যুগের সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডীর নিকট আরবী ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া তাবি'ইয়্যাত (পদার্থ বিজ্ঞান), রিয়াদী (গণিত শাস্ত্র), সৌর বিজ্ঞান, ইতিহাস ও পুরাতন নিদর্শনাবলীর জ্ঞানও অর্জন করেন। আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের সাথে সাথে তুর্কী ও ফারসী ভাষায়ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং হাবশী, যাওয়াবী (পশ্চিম আল-জাযাইর-এর কিছু কিছু গোত্রের ভাষা), সুরয়ানী ও 'ইবরানী ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে শায়খ 'আবদু'র-রাহমান আল-বুশনাকী ও শায়খ 'আবদু'ল-গানী আল-মায়দানী আল-গুনায়মী আল-ফাকীহ শারিহ (ভাষ্যকার) আল-মুখ্‌তাসারু'ল-কুদূরী-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য (পূ. গ্র.)। শায়খ তাহিরের আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা ১২৮৫/১৮৬৮ সালে ইনতিকাল করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা ও গবেষণা অব্যাহত রাখেন এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিতেই তিনি অতীত ও বর্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর পাণ্ডিত্য অর্জনপূর্বক কর্মজীবনে সুনামের সহিত পদার্পণ শুরু করেন (আল-হিলাল, ২৮ সংখ্যা, ৪৫২ প.; আল-মাশরিক; ১৮ সংখ্যা, ১৪৬ প.)।

শায়খ তাহির আল-জাযাইরীর কর্মজীবন তিনটি ধারায় বিভক্তঃ প্রথম ধারা কর্মজীবনে পদার্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২৫/ ১৯০৭ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত; দ্বিতীয় ধারা ১৩২৫/১৯০৭ সাল হইতে ১৩৩৮/১৯২০ সাল পর্যন্ত এবং তৃতীয় সংক্ষিপ্ত ধারা ১৯২০ খৃ. হইতে মৃত্যু পর্যন্ত। জীবনের প্রথমভাগে তিনি সিরিয়ায় বসবাস করেন এবং 'ইল্‌ম-আদাব (সাহিত্য) ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সিরিয়ার মিদহাত পাশার গভর্নরী আমলে শায়খ তাহির নিজ বন্ধু বাহা বেগ ও খ্যাতনামা ফকীহ (ইসলামী আইনশাস্ত্রজ্ঞ) শায়খ 'আলাউ'দ-দীন ইব্ন 'আবিদীন আশ-শামীর সহায়তায় সিরিয়ায় শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট কর্তব্যপরায়ণতা প্রদর্শন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মিদহাত পাশার পৃষ্ঠপোষকতায় "আল-জাম'ইয়্যাতু'ল-খায়রিয়্যা" নামে একটি কল্যাণমূলক আন্‌জুমান প্রতিষ্ঠা করেন যাহা শিক্ষার সংস্কার, উন্নতি ও বিস্তারকল্পে বহু অবদান রাখিয়াছে। ছাত্রদের জন্য নয়টি বিদ্যালয় এবং ছাত্রীদের জন্য দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া শায়খ তাহির শিক্ষার পাঠক্রমের প্রতিও দৃষ্টি দেন এবং নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী গ্রন্থ রচনা করেন। 'উছমানী প্রশাসন তাঁহাকে সিরিয়া প্রদেশের শিক্ষার ইনস্‌পেকটর জেনারেল নির্ধারণ করে। এই সময় শায়খ বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ ছাড়া পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের নিমিত্ত দামিশকে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন (আল-মাশরিক, ১৮ সংখ্যা, ১৪৬; কুনূয'ল-আজ্‌দাদ, পৃ. ৭ প.)।

কর্মজীবনের এই প্রথম পর্যায়ে শায়খ তাহির আরবী ভাষার পুরাতন অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপিরও বিরাট খিদমত আঞ্জাম দেন। দামিশকের সুবৃহৎ লাইব্রেরী আল-মাকতাবাতু'জ-জাহিরিয়্যা-এর ভিত্তি ও উন্নতি সাধনও তাঁহার কীর্তি। দামিশক ও সিরিয়ার অন্যান্য পাঠাগারে 'আরবী ভাষায় যে সকল পুরাতন মূল্যবান পাণ্ডুলিপি অরক্ষিত অবস্থায় বিনষ্ট হইতেছিল, সেইগুলি একত্র করার জন্য দামিশকের উমাবী জামে' মসজিদের সন্নিকটে কুব্‌বাতু'ল বিনাই'জ-জাহিরীতে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২৯৬ টিরও অধিক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি উহাতে একত্র করেন।

শায়খ তাহির-এর এই ধরনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইল বায়তু'ল মাকদিসে খালিদী 'ইলমী পরিবারের সহায়তায় আল-মাকাতাবাতু'ল খালিদিয়্যা-র প্রতিষ্ঠা (কুনূয'ল-আজদাদ, পৃ. ৭; আল-মাশরিক, ১৮ সংখ্যা, ১৪৬; আল-হিলাল, ২৮ সংখ্যা, ৪৫৩)। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ও আরব জাহান এবং ইস্তাম্বুল ও য়ূরোপ সফরকালে শায়খ আরবী ভাষার অসংখ্য পাণ্ডুলিপি প্রত্যক্ষ করিয়া উহা নকল করাইয়া খরীদ করেন। ঐ সকল পাণ্ডুলিপি দ্বারা শায়খ একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন যাহা দামিশক হইতে কায়রো গমনকালে আহমাদ তায়মূর পাশা ও আহমাদ যাকী পাশা ক্রয় করিয়া লন (আল-মাশরিক, ১৮ সংখ্যা, ১৪৭)। আরবী পাণ্ডুলিপির সহিত শায়খের আসক্তি ছিল ইশকের ন্যায়। তাই আজীবন তিনি সেইগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, তালিকা ও সূচী প্রণয়ন এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণে ব্যাপৃত থাকেন (কুনূয'ল-আজদাদ, পৃ. ৬; আল-মাশরিক, ১৮ সংখ্যা, ১৪৮; আল-হিলাল, ২৮ সংখ্যা, ৪৫৩)।

শায়খ তাহির-এর কর্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় কায়রোর 'ইলমী ও আদাবী কেন্দ্রসমূহে অতিবাহিত হয়। ১৩১৬/১৮৯৮ হইতে ১৩২০/১৯০২ সাল পর্যন্ত শিক্ষা-ইন্‌সপেকটর হিসাবে খিদমত আঞ্জাম দেওয়ার পর তিনি ফিলিস্তীনে সফর করিতেছিলেন, এমন সময় সরকার তাঁহার ভিটাবাড়ি বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়। এহেন দুর্ব্যবহারে শায়খ অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং তিনি দামিশ্‌ক হইতে কায়রো স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু মূল্যবান পাণ্ডুলিপির নিজস্ব পুঁজি স্থানান্তর করিতে তাঁহার চার-পাঁচ বৎসর সময় লাগিয়া যায়। ১৯০৫ বা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিয়মিত কায়রোতে বসবাস স্থাপন করেন। কায়রোতে অবস্থানকালে শায়খ পুরাতন আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের সংরক্ষণ ও চর্চাকে স্বীয় পেশা ও কর্মরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কয়েক দিনের জন্য তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের শেষে বৈরূতও গমন করেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষ কিংবা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত তিনি কায়রোতেই অবস্থান করেন। কিন্তু যখন তাঁহার হাঁপানী রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করিল, তখন তিনি কায়রো হইতে পুনরায় দামিশকে চলিয়া যান। এইখানেই তাঁহার

'ইলমী জীবনের তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই পর্যায়ে তিনি দামিশকের আরবী ভাষার একাডেমীর (আল-মাজমা'উ'ল-'ইলমী আল-'আরাবী) সদস্য হওয়া ছাড়া তৎপ্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরী "দারু'ল-কুতুব আজ-জাহিরিয়্যা-এর পরিচালকও নিযুক্ত হন। কিন্তু এই কার্যে তিনি খুব বেশি সময়-সুযোগ লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। কয়েক মাস পর ১৪ রাবী'উ'ল-আখির ১৩৩৮/১৯২০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন (আল-হিলাল, ২৮ সংখ্যা, ৪৫৪; আল-মাশরিক, ১৮ সংখ্যা, ১৪৭; কুনূয়ু'ল আজদাদ, পৃ. ১৪; মু'জামু'ল-মাতবূ'আতি'ল-'আরাবিয়্যা, পৃ. ৬৮৮; আয-যাহরা, ৩খ, ৪৬৩; আল-আ'লাম, ৩খ., ৩২০; মু'জামু'ল-মু'আল্লিফীন, ৫খ, ৩৫-৩৭)। শায়খ তাহির একজন অভিজ্ঞ ভাষাবিদের সহিত একজন দার্শনিক ও মুক্ত বুদ্ধির চিন্তাবিদও ছিলেন। তিনি গোত্রীয় প্রীতি ও দলাদলি হইতে নিরপেক্ষ থাকিয়া শুধু সত্য ও ন্যায়ের সমর্থন করিতেন ও অন্যায়-অসত্যের প্রতি আপোসহীন বিরোধিতা তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছিলেন উন্নতমনা, নির্ভীক ও দুঃসাহসী মানুষ (শায়খের আচার, অভ্যাস ও চরিত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণের জন্য মুহাম্মাদ কুরদ 'আলী প্রণীত কুনূয়ু'ল-আজদাদ, পৃ. ১২-২৭ অধ্যয়ন করুন)।

অনেক 'ইলমী চিঠিপত্র ও গবেষণমূলক প্রবন্ধ ছাড়া দুই ডজনের অধিক 'ইলমী ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহও শায়খের স্মৃতি বহন করিতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মুদ্রিত, তবে কিছু কিছু অমুদ্রিতও রহিয়াছে। মুদ্রিত রচনাসমূহের মধ্যে 'বাদী'উ'ত-তালখীস ওয়া তালখীসু'ল-বাদী', মুনয়াতু'ল- আযাকিয়া ফী কিসাসি'ল-আম্বিয়া, আল-ফাওয়াইদুল-জাসাম ফী মা'রিফাতি খাওয়াসসি'ল-আজসাম, 'উকূদু'ল-লাআলী ফি'ল-আসানীদি'ল 'আওয়ালী; মাদ্‌খালুত তুল্লাব ইলা ফান্‌নি'ল-হিসাব, মাদুদু'র- রাহা ইলা আখযি'ল-মাসাহা, তামহীদু'ল-'আরদ ইলা ফান্‌নি'ল 'আরূদ, ইতমামু'ল-ইন্‌স ফী 'আনরূদি'ল-ফারাস, আত-তামরীন 'আলা'ল-বায়ান ওয়া'ত-তাবঈন; তাদরীবু'ল-লিসান 'আলা তাজরীদি'ল-বায়ান; আল-জাওয়াহিরু'ল-কালামিয়্যা ফি'ল- 'আকাইদি'ল-ইসলামিয়্যা, তাসহীলু'ল-মাজায ইলা ফান্‌নি'ল-মু'আম্‌মা ওয়া'ল-ইলগায, ইরশাদু'ল-আলিম্বা ইলা তারীকি তা'লীমি আলিফ-বা, তাওজী-হু'ন-নাজার ইলা উসূলি 'ইলমি'ল-আছার ও আত-তাকরীব ইলা উসূলি'ত-তা'রীব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত "ইরশাদু'ল-কাসিদ ইলা আসনা'ল- মাকাসিদ, দীওয়ানু খুতুব ইব্‌ন নুবাতা, রাওদাতু'ল-'উকালা' ও আল-আবু'স-সাগীর প্রভৃতির সম্পাদনাও করিয়াছেন। শায়খ-এর অমুদ্রিত গ্রন্থাদির মধ্যে "আত-তাযকিরাতু'ত-তাহিরিয়্যাহ, আত-তাফসীরু'ল- কাবীর, আল-মু'জামুল-'আরাবী, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা ও জালাউ'ত- তাবা' ফী মা'রিফাতি মাকাসিদি'শ-শারা' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (আল-হিলাল, ২৮ সংখ্যা, ৪৫৫; আল-মাশরিক, ১৮ সংখ্যা, ১৪৮; কুনূয়ু'ল-আজদাদ, পৃ. ২৭ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ কুরদ 'আলী, কুনূয়ু'ল-আজদাদ, দামিশক ১৯৫০ খৃ.; (২) ঐ লেখক, আল-মুযাক্কিরাত, (২খ., ৬৪৩, ৩খ., ৭১৯-৭২১, ৭২৮-৭৩০), দামিশক ১৯৪৮-১৯৪৯ খৃ.; (৩) 'ঈসা ইস্‌কান্দার আল-মা'লূফ, মাকালা আশ-শায়খ তাহির আল-জাযাইরী আদ-দিমাশ্‌কী, মাজাল্‌লা আল-মাশরিক', বৈরূত, জানুয়ারী ১৯২০ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, আশ-শায়খ তাহির আল-জাযা'ইরী, মাকালা দর মাজাল্‌লা আল-হিলাল কায়রো, জানুয়ারী ১৯২০; (৫) সারকীস, মু'জামু'ল-মাতবূ'আত; (৬) সা'ঈদ আল-বানী, তান্‌বীরু'ল-বাসা'ইর বিসীরাতি'শ-শায়খ তাহির, দামিশ্‌ক তা. বি.; (৭) ইসমা'ঈল পাশা আল-বাগদাদী, হাদিয়্যাতু'ল-'আরিফীন, ইস্তাম্বুল ১৯৫৫ খৃ.; (৮) রিসালা আয-যাহরা, কায়রো (৩খ., ৪৬৩ প.), ১৯৩৭ খৃ.; (৯) খায়রু'দ-দীন আয-যিরিকলী, আল-'আ'লাম, শব্দমূল শিরোনামে; (১০) 'উমার রিদা কাহ্‌হালা, মু'জামু'ল-মু'আল্‌লিফীন, দামিশক ১৯৫৮ খৃ.; [(১১) সামী আল-কায়ালী, আল-আদাবু'ল-'আরাবী আল-মু'আসিরু ফী সূরিয়াহ, পৃ. ৭৮-৮০]।

জাহুর আহমাদ আজহার (দা. মা. ই.)/ আবদুল মতিন মাসঊদী

তাহির পাটানী, মুহাম্মাদ (طاهر پٹنی، محمد) ঃ আরবী ফাতানী, মালিকু'ল-মুহাদ্দিছীন 'আল্লামা জামালু'দ-দীন মুহাম্মাদ তাহির পাটানী ছিলেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদগণের অন্যতম। তিনি ৯১০/১৫০৪ সালে গুজরাট প্রদেশের এক প্রাচীন গ্রাম পাটনা (আরবী ফাতান)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি ধনবান বুহরা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মাতার দিকে ছিলেন হযরত আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর বংশধর [দ্র. India's Contribution to Hadith Literature (Dhaka, 1975), পৃ. ১২৪-২৫]। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। ঐ সময় পাটন (নাহ্‌রাওয়ালা) ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং ইহা প্রাচীন রাজধানী বিধায় 'আলিম ও সূফী সম্প্রদায়ের মিলনকেন্দ্র ছিল। মুহাম্মাদ তাহির শৈশবেই কুরআন মাজীদ হিফজ করেন এবং গুজরাটের শায়খ নাগুরী, উস্তাযু'য-যামান মুল্লা মাহতা ও অন্যদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পনর বৎসর বয়সে ইসলামী বিষয়সমূহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন (আল-'আইদারূস, আন-নূরু'স-সাফির, পৃ. ৩৬১-৩৬২, বাগদাদ ১৯৩৪ খৃ.; India's Contribution to Hadith Literature, পৃ. ১২৫)। হি. ৯৪৪ সালে তিনি 'ইল্‌মু'ল-হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে হিজায গমন করেন। তিনি প্রথমে মক্‌কা শারীফে হজ্জ সম্পন্ন করিয়া মদীনা শারীফে গমন করেন। অতঃপর মক্কা প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই যুগের প্রখ্যাত হাদীছ বিশারদ ইবনু'ল-হাজার আল-হায়ছামী মাক্কী এবং শায়খ 'আলী মুত্তাকী বুরহানপুরী, আবু'ল-হাসান আল-বাক্‌রী ও মুফতী কুতবুদ্‌-দীন নাহারাওয়ালী প্রমুখের নিকট হাদীছ অধ্যয়ন করেন। শায়খ 'আলী মুত্তাকীর স্থান 'ইলমু'ল-হাদীছে ছিল অতি উচ্চে। তিনি হাদীছের একটি বিশ্বকোষ সংকলন করিয়াছিলেন, যাহা কান্‌যু'ল-'উম্মাল ফী সুনানি'ল-আকওয়াল ওয়া'ল-আফ'আল (নূতন সংস্করণ, হালাব, ১৬ খণ্ডে) নামে প্রসিদ্ধ। শায়খ মুহাম্মাদ তাহির পাটানী তাঁহার শিক্ষা ও সান্নিধ্য হইতে বেশ উপকৃত হন এবং তাঁহার নিকট বায়'আতও হন। (সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী, হিন্দুস্তান মেঁ 'ইলমে হাদীছ, রিসালা মা'আরিফ, আজমগড়, অকটোবর ১৯২৮ খৃ. সংখ্যা দ্র.)।

মক্কা মুকাররামায় চারি-পাঁচ বৎসর অবস্থান করিবার পর শায়খ মুহাম্মাদ তাহির হি. ৯৫০ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়া'জ ও তাবলীগ-এ আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার স্বজাতি অর্থাৎ বুহরাদের মধ্যে কোন কোন বিদ'আতের প্রচলন ছিল, বিশেষত বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রে হিন্দুদের অনেক রীতিনীতির প্রচলন ছিল। শায়খ সেইগুলির মূলোৎপাটনের জন্য দৃঢ়সংকল্প হন, ইহাতে বুহ্‌রাদের মধ্যে গোলমাল বাঁধিয়া যায় ('আবদু'ল-হাক্‌ক, আখবারু'ল-আখয়ার, দিল্লী, পৃ. ২৮০)। শায়খ মুহাম্মাদ তাহির স্বজাতির ইসলাহ এবং শিক্ষা-দীক্ষাদানে স্বীয় সময় ব্যয় করিতেন এবং অবসর সময়ে হাদীছ গ্রন্থও রচনার কাজ করিতেন। সেই যুগে জনসাধারণ স্বার্থপরতা, মুনাফিকী, বিলাসিতা ও পরিণাম সম্পর্কে উদাসীনতায় বিভোর ছিল। আর তখন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছিলেন আত্মকলহে লিপ্ত।

গুজরাটের সর্বশেষ শাসক সুলতান মুজাফফার-এর প্রাথমিক যুগে হি. ৯৬৮ মাহ্দীবাদীগণ (মাহ্দাবী) গুজরাটে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিতেছিল। মাহদীবাদিগণ সায়্যিদ মাহদী জৌনপুরীর (মৃ. ৯১০/১৫০৪) অনুসারী ছিল এবং তাহাকে প্রতিশ্রুত মাহদী বলিয়া স্বীকার করিত। তাহারা মাহদীকে অস্বীকারকারী জনগণকে কাফির আখ্যায়িত করিয়া হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। শায়খ মুহাম্মদ তাহির মাহদীপন্থীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন এবং বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে তাহাদের 'আকীদাসমূহের ভ্রান্তি প্রমাণ করেন। ইহাতে মাহদী তাঁহার প্রকাশ্য শত্রুতে পরিণত হয়। মাহদীগণের ফিতনা-ফাসাদ বন্ধ না হওয়ায় তিনি স্বীয় মাথা হইতে পাগড়ী খুলিয়া রাখিয়া শপথ করিয়া বলেন, এই বিদ'আত নির্মূল না করা পর্যন্ত তিনি মাথায় পাগড়ী পরিধান করিবেন না ['আবদু'ল-হায়্যি, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৪৫ খৃ., ৪খ, ২৯৯-৩০০]।

৯৮০/১৫৭২ সালে মুগল সম্রাট জালালু'দ-দীন আকবর গুজরাট আক্রমণ করিয়া পাটনা অধিকার করেন। তিনি শায়খ মুহাম্মাদ তাহির-এর সহিতও সাক্ষাত করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন, স্বহস্তে তাঁহার মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দেন, তাঁহাকে শায়খু'ল-ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে, আগামীতে শারী'আত সম্পর্কীয় কার্যসমূহ শায়খের পরামর্শ অনুসারে করা হইবে। সম্রাট আকবর-এর দুধভাই খান আ'জাম মিরযা 'আযীয কূকা-এর সুবেদারীর সময় পাটানে শান্তি ও নিরাপত্তা বহাল থাকে এবং শায়খ মুহাম্মাদ তাহির আশ্বস্ত হইয়া শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নসীহত এবং গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত হন। যখন খান আ'জাম মিরযা কূকা-এর স্থলে 'আবদু'র-রাহীম খান-ই খানান সুবেদার নিয়োজিত হইলেন তখন মাহদীগণের ফিত্না পুনরায় মাথাচারা দিয়া উঠে। শায়খ মুহাম্মাদ তাহির ঐ ফিত্নার প্রতি গুজরাটের শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তৎপ্রতি কোনও দৃষ্টি দিলেন না। খান-ই খানান-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিও মাহদীর ফিতনার প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। এমতাবস্থায় শায়খ মুহাম্মাদ তাহির বাধ্য হইয়া স্বয়ং আগ্রা গমন করিয়া সম্রাট আকবর-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া মাহদী সম্প্রদায়ের মূলোৎপাটনের দৃঢ় সংকল্প করেন। ৯৮৬/১৫৭৮ সালে তিনি গুজরাট হইতে আগ্রার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন; মাহদীগণও তাঁহার পিছনে লাগিয়া যায়। তাহারা পথে সারঙ্গপুরের (উজজায়ন) নিকট শায়খের সাক্ষাত পায় এবং রাত্রিবেলা তাহাজুদের সালাতের মধ্যে শায়খকে শহীদ করে (৬ শাওয়াল, ৯৮৬/৬ ডিসেম্বর, ১৫৭৮) [(১) গুলাম 'আলী আযাদ বিলগিরামী, সুবহাতু'ল-মারজান, বোম্বাই, পৃ. ৪৪; (২) মাআছিরু'ল-কিরাম, পৃ. ১৯৬, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য]। কিছুদিন পর বাদশাহ আকবর-এর নির্দেশে শায়খ মুহাম্মাদ তাহির-এর লাশ সারঙ্গপুর হইতে পাটনা স্থানান্তরিত করিয়া তাঁহার বংশীয়গণের কবরস্থানে দাফন করা হয় (সায়্যিদ সিদ্দীক হাসান, আবজাদু'ল- 'উলূম, পৃ. ৮৯৬)।

বিদ্যাবত্তা ও মাহাত্ম্য ঃ শায়খ মুহাম্মাদ তাহির যাবতীয় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে দক্ষ ছিলেন। কিন্তু হাদীছ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহে তিনি সেই যুগে একজন ইমামের মর্যাদা রাখিতেন। তিনি আসমাউ'র-রিজাল, 'ইলমু'ল মাওদূ'আত ও গারীবু'ল-হাদীছে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে মাজমা'উ বিহারি'ল-আনওয়ার ফী গারা'ইবি'ত-তানযীল ওয়া লাতাইফি'ল-আখবার; আসমা'উ'র- রিজাল; আল-মুগনী ফী দাবতি'র-রিজাল; তাযকিরাতু'ল- মাওদূ'আত ও কানূনু'ল-মাওদূ'আত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাজমা' বিহারি'ল-আনওয়ার যদিও কুরআন মাজীদ ও হাদীছসমূহের কঠিন শব্দাবলীর অভিধান, কিন্তু হাদীছ-বিশারদ 'উলামা'-র স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উহা সিহাহ সিত্তার ব্যাখ্যা এবং মুসলিম ভারতের অন্যতম কীর্তি। উক্ত গ্রন্থখানিই নাওলকিশোর, লখনৌ কর্তৃক দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে ইহার একটি প্রামাণিক সংস্করণ হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্য হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; (২) তাযকিরাতু'ল-মাওদূ'আত, মাওদূ' (জাল) হাদীছসমূহের পর্যালোচনায় লিখিত; (৩) কানূনু'ল-মাওদূ'আত গ্রন্থে লেখক ঐ সকল বর্ণনাকারীর নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, যাহারা মাওদূ' হাদীছসমূহ বর্ণনা করিতেন। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় কায়রো হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে; (৪) কিফায়াতু'ল-মুফরিতীন, 'ইল্ম-ই সারফ-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শাফিয়া-এর ব্যাখ্যা; ইহার পাণ্ডুলিপি আহমদাবাদের পীর মুহাম্মাদ শাহ-এর দরগাহের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে (আবদু'ল-হায়্যি, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, পৃ. ৩০১, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৫৪ খৃ.; যুবায়দ আহমাদ, India's Contribution to Arabic Literature, নির্ঘণ্ট)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম 'আলী আযাদ বিলগ্রামী, সুবহাতু'ল-মারজান, বোম্বাই ১৮৮৫ খৃ.; (২) ঐ লেখক, মাআছিরু'ল-কিরাম, আগ্রা ১৩২৮ হি; (৩) সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদু'ল-উলূম, ভূপাল ১২৯৫-১২৯৬ হি.; (৪) ঐ লেখক, ইতহাফু'ন-নুবালা', কানপুর ১২৮৮ হি.; (৫) ঐ লেখক, আত-তাজু'ল-মুকাল্লাল, বোম্বাই ১৯৬৬ খৃ; (৬) 'আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, আত-তা'লীকাতু সানিয়াহ, কায়রো ১৩২৪ হি.; (৭) 'আবদু'ল-হায়্যি নাদাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৯৫৪ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, আছ-ছাকাফাতু'ল ইসলামিয়্যাহ ফি'ল-হিন্দ, দামিশক ১৯৫৬ খৃ.; (৯) মাওলাবী রাহমান 'আলী, তাযকিরা-ই 'উলামা'-ই হিন্দ (উর্দূ অনুবাদ), করাচী ১৯৬৬ খৃ.; (১০) 'আবদু'ল-কাদির আল-'আয়দারূস, আন-নূরু'স-সাফির, বাগদাদ ১৯৩৪ খৃ.; (১১) ইবনু'ল-'ইমাদ আল-হাম্বালী, শামাযারাতু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৫১ হি.; (১২) শায়খ 'আবদু'ল-হাক্ক, আখবারু'ল-আখয়ার (উর্দূ অনু.), করাচী তা. বি.; (১৩) মুফ্তী গুলাম সারওয়ার লাহোরী, খাযীনাতু'ল আসফিয়া', লাহোর ১২৮২ হি.; (১৪) 'আলী মুহাম্মাদ খান, মিরআত-ই আহমাদী, কলিকাতা ১৯২৮ খৃ.; (১৫) ফাকীর মুহাম্মাদ ঝিলামী, হাদাইকু'ল- হানাফিয়্যা, লাহোর, তা. বি.; (১৬) সারকীস, মু'জামু'ল-মাতবু'আত, কায়রো ১৯২৮ খৃ.; (১৭) Brocklmann, G. A. L., নির্ঘণ্ট, সংযোজিত পরিশিষ্টসহ, লাইডেন ১৯৩৭ খৃ.; (১৮) হাজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.; (১৯) ইসমা'ঈল পাশা আল-বাগদাদী, ঈদাহুল-মাকনূন, ইস্তাম্বুল ১৯৪৫ খৃ.; (২০) খায়রু'দ-দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, কায়রো ১৯৬৬ খৃ.; (২১) 'উমার রিদা কাহহালা, মু'জামু'ল-মুআল্লিফীন, দামিশক ১৯৬৬ খৃ.; (২২) ফিহ্রিস্ত, দারু'ল-কুতুবি'ল-মিসরিয়্যা, কায়রো ১৩০৫ হি.; (২৩) তারীখ-ই আদাবিয়্যাত মুসালমানান-ই পাক ও হিন্দ, লাহোর ১৯৭২ খৃ., ২খ, ২৪২-২৪৩; (২৪) M. Ishaq, India's Contribution to Hadith Literature, লাহোর ১৯৫৫, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ.।

জাহুর আহমাদ আজহার (দা. মা. ই.)/ যোবায়ের আহমদ

তাহিরপুর ঃ বর্তমান সুনামগঞ্জ জিলার একটি উপজিলা। নদী, হাওর ও বিলঝিলে পূর্ণ ৮টি ইউনিয়ন লইয়া এই উপজিলা গঠিত। অবশ্য উত্তরে আসামের গারো হিল এবং খাসিয়া ও জৈন্তা পাহাড়ী অঞ্চল পরিবৃত। ২৫°-১৪-৩০ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১°-১৮-৩০ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এই উপজিলার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগযোগ্য, বর্ষায় অথৈ

সমুদ্র। সীমা-উত্তরে আসাম, পূর্বে বিশ্বম্ভরপুর, দক্ষিণে জামালগঞ্জ ও পশ্চিমে ধর্মপাশা উপজিলা। ১৯৮১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী লোকসংখ্যা ১,২১,৫১১-এর মধ্যে ১,০৩,৩১১ জন মুসলিম। ১৯৭৪ সালে এই উপজিলার লোকসংখ্যা ছিল ৯৯,২৮২ ও ১৯৬১ সালে ৫৮,০০০ জন। ১৯৪২ সালে তাহিরপুর থানার সৃষ্টি হয় ঃ (১) তাহিরপুর, (২) বালিজুরী, (৩) বর্দল (দক্ষিণ), (৪) বর্দল (উত্তর), (৫) শ্রীপুর (দক্ষিণ), (৬) শ্রীপুর (উত্তর), (৭) বাদাঘাট (দক্ষিণ) ও (৮) বাদাঘাট (উত্তর) এই আটটি ইউনিয়ন লইয়া এই উপজিলা গঠিত। যাদুকাটা, পটলাই, মারাম প্রভৃতি নদী এই উপজিলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

১৯৮১ সালের হিসাব অনুযায়ী এই উপজিলায় ১৪৪টি মসজিদের মধ্যে জামে মসজিদ ৬৫টি। ১৯৯০ সালের হিসাব অনুযায়ী মসজিদের সংখ্যা ১২৬টি, ঈদগাহ ১০টি, মন্দির ৫টি ও গির্জা ১টি। মসজিদের ইমামদের মধ্যে উ'লা পাস মাত্র ২৩ জন। ইহার নিম্নে ১২০ জন, হাফিজ আছে ৫ জন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম মাত্র ৯ জন।

শিক্ষা ঃ তাহিরপুর উপজিলায় ৪টি হাইস্কুল আছে। ছাত্র সংখ্যা ৭২২ ও ছাত্রী সংখ্যা ২১১ জন এবং শিক্ষক ৪১ জন। ৫৭টি প্রাইমারী স্কুলে ৭,৩৭৮ জন ছাত্র ও ৪,৯৬০ জন ছাত্রী লেখাপড়া করে। শিক্ষক ১৩৯ জন এবং শিক্ষয়িত্রী ১৮ জন মাত্র। তাহিরপুর উপজিলায় ৭টি সাধারণ মাদ্‌রাসায় ৪২৭ জন ছাত্র অধ্যয়ন করে। শিক্ষকের সংখ্যা ৪৫ জন। কওমী বা খারিজী মাদ্‌রাসা মাত্র ১টি। ইহাতে ১২৫ জন ছাত্র লেখাপড়া করে। মকতবের সংখ্যা ১২৬টি। ছাত্র সংখ্যা ৪,১০৮ জন এবং ছাত্রী ৩,৭১৫ জন। ১৪২ জন শিক্ষক তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। ৫০ বৎসরের উর্ধ্বে বয়স্ক মোট ১৪,২৭৬ জন লোকের মধ্যে ১০,১৬১ জন পুরুষ ও ৪,১১৩ জন মহিলা শিক্ষিত। এই হিসাবে শিক্ষিতের হার খুবই কম। ১,২১,৫১১ জন বাসিন্দার মধ্যে মুসলিম ১,০৩,৩১১ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ৫৩,৩৬৭ জন।

অর্থনৈতিক কাঠামো ঃ তাহিরপুর উপজিলার আবাদী জমি ৪১,৫১৫ একর। এখানে বার্ষিক ৯,৭৫,৩৩৪ মেট্রিক টন ধান জন্মায়। ধানই এইখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। গম, আলু, পাট, সরিষা, ডাল, তরিতরকারি উৎপন্ন হয় উত্তরাঞ্চলে, উঁচু জায়গায়। প্রায় ৭২ একর জমিতে চা-এর চাষও হয় বলিয়া এক প্রতিবেদনে জানা যায়। এখানে এক হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি এল. এস. ডি. গুদাম আছে। এইখানকার হাওর ও বিলঝিলে প্রচুর মৎস্য উৎপন্ন হয়। তাহিরপুর উপজিলায় ৫৪টি জলমহাল আছে। ইহাতে প্রায় ২,০০০ মেট্রিক টন মাছ উৎপন্ন হয়। প্রায় ৮,০০০ মৎস্যজীবী এই অঞ্চলে বসবাস করে। মুসলমান মৎস্যজীবীরা মাহিমাল নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই উপজিলায় প্রায় ৫০,০০০ গরু, ৫০০ মহিষ এবং ১৫,০০০ ছাগল আছে। তাহিরপুর উপজিলায় ৭৭টি কৃষি সমবায় সমিতি, ৪টি মহিলা সমবায় সমিতি, কয়েকটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য আরও ২০টি সমবায় সমিতি আছে। এই উপজিলায় কয়েকটি ব্যাংকও স্থাপিত হইয়াছে। এই উপজিলার সদর তাহিরপুর বাজার, বাদাঘাট বাজার ও শ্রীপুর হাট প্রসিদ্ধ। তাহিরপুরের বাজারে বার্ষিক প্রায় ৫/৭ হাজার মণ ধান ও চাউল উঠে ও বিভিন্ন স্থানে রফতানি হয়। আশুগঞ্জ ও ভৈরব বাজারের সঙ্গে বর্ষাকালে নৌ-পথে ইহার যোগাযোগ আছে। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর জন্য চুনা পাথর তাহিরপুর উপজিলা হইতেও সরবরাহ হইয়া থাকে। পর্যটকদের জন্য এইখানে একটি ডাকবাংলো স্থাপিত হইয়াছিল। তাহিরপুর উপজিলার বউয়ার বিল, টাঙ্গুয়া হাওর, রূপাভূই, হানিয়া, শনির হাওর, মাটিআইল ও বলদা বিলে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। টাঙ্গুয়া, হানিয়া, রূপাভূই, কালামুইয়া প্রভৃতি বিল ও হাওরে শীতকালে প্রচুর অতিথি পাখির সমাগম হইত, এখন আর আগের মত পাখি আসে না। তাহিরপুর উপজিলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে লউড় গড় নামক একটি স্থান আছে। প্রাচীন লাউড় রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত এই স্থানে ঐ রাজ্যের গড় বা ফোর্ট রহিয়াছে। ইহাকে দেউলী বলে। এই উপজিলায় পণাতীর্থে হিন্দু মেলা বসে। বাহিরের বহু হিন্দুও এই মেলায় যোগদান করে। সম্ভবত 'তাহির' নামক কোন ব্যক্তির নামেই এই উপজিলার নামকরণ হইয়াছে তাহিরপুর। তাহিরপুরের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নবগ্রাম বা নওয়াগ্রাম শ্রী চৈতন্যের পার্ষদ অদ্বৈত মহারাজের জন্মভূমি। মহাভারতের অনুবাদক লাউড়িয়া শ্রীকৃষ্ণ লাউড়েই জন্মগ্রহণ করেন।

অন্যান্য উপজিলার মতই নীচু অঞ্চল তাহিরপুরেও অতিরিক্ত ব্যয়ে উপজিলা অফিসসমূহ, আদালত, হাসপাতালসহ বিভিন্ন দফতরের ইমারত নির্মিত হইয়াছে। এই সকল অফিস ভবন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বাসভবন নির্মাণে স্থানীয় লোকজন কাজ পাইয়াছে। উপজিলা সদর এখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেরও প্রধান কেন্দ্রস্থল।

তাহিরপুর উপজিলায় একটি গুচ্ছগ্রাম আছে। অনুন্নত এলাকা বিধায় এইখানে ২টি বিদেশী এন.জি.ও. এবং ১১টি স্থানীয় এন.জি.ও. কাজ করিতেছে। ইসলাম প্রচারকদের উচিত এই সকল সংগঠনের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা। এইখানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। ভরছড়ার চুনাপাথরের কুয়ারী হইতে বহু বৎসর ধরিয়া পাথর সংগ্রহ করা হইতেছে। তাহিরপুরের উত্তর সীমান্ত অঞ্চল হইতে বালু, বোল্ডার ও নুড়িপাথর সংগ্রহ করিয়া সারাদেশে সরবরাহ করা হইতেছে এবং সারাদেশের রাস্তাঘাট ও দালান-কোঠা নির্মাণে তাহা ব্যবহৃত হইতেছে। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। বর্ষাকালে নৌকাই একমাত্র সম্বল। এই কারণে শিক্ষা-দীক্ষায়ও এই অঞ্চল অনগ্রসর। এতদসত্ত্বেও এই উপজিলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক। প্রাচীন লাউড় রাজ্যে ও বর্তমান সুনামগঞ্জ জিলার ইসলাম প্রচারক ওয়ালী-দরবেশদের মাধ্যমেই এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। হযরত শাহ জালাল (র)-এর সঙ্গী দরবেশ শাহ্ আরেফীন (র)-এর নেতৃত্বে প্রাচীন লাউড় রাজ্যে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল। তাহিরপুর উপজিলাও উক্ত লাউড় রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী কালেও ওয়ালী-দরবেশ ও 'উলামায়ে কিরামের মাধ্যমে এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ধারা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এই উপজিলার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শাহেদ আলী ও মকবুল হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃতী সন্তান ঃ মকবুল হোসেন চৌধুরী ঃ তাহিরপুর উপজিলার বিন্নাকুনী গ্রামে ১৮৯৮ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট রাজনীতিক, সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন। তিনি খিলাফাত আন্দোলনে (দ্র.) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ২২-১২-১৯২০ খৃ. তারিখে নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত খিলাফাত কনফারেন্সে সিলেট হইতে যে ৫জন প্রতিনিধি যোগদান করেন মকবুল হোসেন চৌধুরী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাদের উপরই আসাম প্রাদেশিক খিলাফাত কমিটি গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। তদনুযায়ী ১৯২১ সালের ১৫-১৬ মার্চ তারিখে মৌলভীবাজার শহরের নিকটবর্তী বরহাটে আসাম প্রাদেশিক খিলাফাত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করায় তিনি কারাবরণও করেন। ১৯২৫ খৃ. তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং সিলেট হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক যুগবাণী পত্রিকার সম্পাদক

হন। ইহাই সিলেট হইতে মুসলিম পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র। পরে তিনি কলিকাতার দৈনিক সুলতান পত্রিকার সম্পাদক হন। ইহা বন্ধ হইয়া গেলে তিনি সিলেটের সাপ্তাহিক যুগভেরী পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনি ইহার প্রথম সম্পাদক। অবশেষে তিনি সিলেট পত্রিকার সম্পাদনা করিতেন।

১৯৩৭ খৃ. তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খৃ. পর্যন্ত তিনি এম. এল. এ. ছিলেন। আসামেম কুখ্যাত লাইন প্রথার বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করেন। ১৯৪৬ খৃ. সিলেটের রেফারেন্ডামে (দ্র.) তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও তত্ত্বকথা নিয়া ব্যাপক চর্চা করিয়াছিলেন। ইসলামের প্রতি অসাধারণ অনুরাগী ও নিষ্ঠাবান মকবুল হোসেন দৃঢ়চেতা, স্বাধীনতা প্রয়াসী, সদালাপী, সুরসিক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ঃ (১) খোলাফায়ে রাশেদীন, (২) কোরআন পরিচয়, (৩) ইসলামী জীবন দর্শন ও শাসন-নীতি, (৪) শেখ আবদুল কাদের জিলানী (র.), (৫) মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র), (৬) কুরআন শরীফের ইতিহাস, (৭) জ্ঞানবাণী প্রভৃতি (দ্র. ডক্টর গোলাম সাক্লায়েন, মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৩৭২-৩৮৮)।

অধ্যাপক শাহেদ আলী, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও ভাষা সৈনিক। ১৯২৫ সালের ২৬ মে তারিখে সুনামগঞ্জ জিলাধীন তাহিরপুর উপজিলার মাহমুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি সুনামগঞ্জ মুসলিম ছাত্রসংঘের সম্পাদক ছিলেন। এই সময়ে তিনি সুনামগঞ্জ মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনেরও সেক্রেটারী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায়ই মাসিক সওগাত ও মোহাম্মদী পত্রিকায় তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইতে থাকে। কলেজ জীবনে তিনি আসাম মুসলিম আন্দোলনের বিপ্লবী মুখপত্র প্রভাতীর সম্পাদক ছিলেন। সুনামগঞ্জ তথা সিলেট তখন আসামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পড়াশুনার চাইতে বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁহার নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। তিনি আল্-ইসলাহ ও কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সহিত জড়িত ছিলেন। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের নির্বাচন এবং ১৯৪৬ খৃ. সিলেটের রেফারেন্ডামে (দ্র.) তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিজ এলাকায় নেতৃত্ব দান করেন। পরবর্তী কালে তিনি তমদ্দুন মজলিস ও ভাষা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একজন ভাষা সৈনিক। সাপ্তাহিক সৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা (ত্রৈমাসিক) ও সবুজপাতা (মাসিক)-এরও খ্যাতিমান সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫১-৫৩ সালে তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি খিলাফাতে রব্বানী পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। তিনি ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক ছিলেন। তাঁহার কর্মজীবন বৈচিত্র্যময়। তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের পরিচালক ছিলেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী ঃ জিব্রাইলের ডানা, একই সমতলে, অর কাহিনী শনিখর, অতীত রাতের কাহিনী, হৃদয়নদী, সোনার গাঁয়ের সোনার মানুষ, নতুন জমিনদার, ইমাম আবু হানিফা, রুহীর প্রথম পাঠ, বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান, তরুণ মুসলিমদের ভূমিকা, তওহীদ, তরুণের সমস্যা, মুক্তির পথ, একমাত্র পথ, জীবন নিরবচ্ছিন্ন, সাম্প্রদায়িকতা, ফিলিস্তিনে রুশ ভূমিকা, সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া এবং বিপর্যয়ের হেতু প্রভৃতি। তাঁহার বিখ্যাত অনুবাদ গ্রন্থ মক্কার পথে ও ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি, Economic order of Islam, Islam in Bangladesh প্রভৃতি।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের সক্রিয় সদস্য হিসাবে তিনি জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

জনব শাহেদ আলী বাংলা একাডেমী পুরস্কার, তমঘায়ে ইমতিয়াজ (১৯৭০ খৃ.), নাসিরুদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৫ খৃ.), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৬ খৃ.) ও একুশে পদক (১৯৮৯ খৃ.)-সহ বহু পদক ও সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। ১৯৮১ সনে ভাষা আন্দোলন পদকে ভূষিত হন। তিনি বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ.; (২) ফজলুর রহমান, সিলেটের মাটি সিলেটের মানুষ, ঢাকা ১৯৯১ খৃ.; (৩) ইসলামী বিশ্বকোষ, নি. খিলাফাত আন্দোলন ও গণভোট; (৪) S. N. H. Rizvi, District gazetteer, Sylhet, 1975; (৫) Bangladesh Census of Mosques 1983; (৬) Bangladesh Population Census, 1981 Union statistics, 1983; (৭) Upazila Profile, 1990; (৮) শামসুল করিম কায়স, বাংলা সাহিত্যে সিলেট, ১খ, সিলেট ১৩৯৩ বাংলা; (৯) মুহাম্মাদ ফয়জুর রহমান (সম্পা.), বরেণ্য সিলেট, ১৯৯০ খৃ.।

দেওয়ান নূরুল আনোয়র হোসেন চৌধুরী

তাহিরী বংশ (طاهری) ঃ আল-ই তাহির খুরাসানের একটি রাজবংশ। এই বংশের ঊর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠাতা পুরুষের নাম তাহির ইবনু'ল-হুসায়ন। পরবর্তী কালে ইহা স্বীকৃত হয় যে, ১৯৪/৮১০ [৮১০ খৃ. (ব্রাউন, ২খ, ১০)] সালে যখন খলীফা আল-মা'মূন তাহিরকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন তখন হইতে এই বংশের শাসনকার্যের ভিত্তি রচিত হয়। এই হিসাবে উক্ত বংশ প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর (৮১০-৮৭৪ খৃ.) পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে (তু. ফাদ্‌ল ইব্‌ন সাহল শিরো. (দ্র.) তা'রীখ-ই ইব্‌ন খাল্লিকান, De Slane সং, ক্রমিক সংখ্যা ৪৫০, পৃ. ৭৭; অনু. ২খ, ৪৭৩ (ইহাতে ভুলবশত ৫৬ বৎসর লিখিত হইয়াছে [ও কায়রো সং, ১খ, ৪১৩]।

হিজরী নবম শতাব্দীর শুরুতে বাগদাদ-খিলাফাতের পতনের আলোচনা করিতে যাইয়া Gibbon বর্ণনা করেন, "তাহির নামক এক বীর পুরুষের বংশধর তাহিরী শাসকগণ প্রাচ্য এলাকায় ইরানীদের প্রথম সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন। এই বীর পুরুষ তাহির খলীফা হারূনু'র-রাশীদের সন্তানদের পারস্পরিক বিরোধের সময় খলীফা আল-মা'মূনের পক্ষে অত্যন্ত কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন" (এডওয়ার্ড গিবন, The Decline and Fall of the Roman Empire, ৯খ, ৩০২, নিউ ইয়র্ক)।

তাহির-এর উপাধি ছিল যু'ল-য়ামীনায়ন। তিনিই সর্বপ্রথম 'আব্বাসীদের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া একক অর্ধ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহির যু'ল-য়ামনায়ন ইব্‌ন হুসায়ন ছিলেন বুশান্‌জ শহরের একটি প্রাচীন গভর্নর পরিবারের সদস্য। এই শহরটি হিরাত প্রদেশে অবস্থিত। তাহির-এর পিতামহ মুস'আব ইব্‌ন রাযীক ছিলেন এই শহরের গভর্নর। মুস'আবের পিতা রাযীক ছিলেন আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (অর্থাৎ তালহাতু'ত-তালহাত) আল-খুযা'ঈ-র মুক্তদাস যিনি সালামা ইব্‌ন যায়দ (৮২/৬৮১/ ৮৪/৬৮৩) কর্তৃক নিযুক্ত সীস্‌তানের গভর্নর ছিলেন। 'আব্বাসীদের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলাকালে মুস'আব ছিলেন আবূ মুসলিম-এর সমর্থক একজন আমীরের সচিব (Barthold, Turkistan down to the Mongolin Invasion, পৃ. ২০৮)। মুস'আবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুসায়ন (১৯৯-২০০/৮১৪-৮১৫) বুশান্‌জ-এর গভর্নর নিযুক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র (তাহিরিয়্যা বংশের প্রতিষ্ঠাতা) তাহির গভর্নর হন (তারীখ-ই গুযীদাহ, ৩০৮, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭)।

ভিন্ন একটি বর্ণনামতে তাহিরিয়্যা বংশের ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ছিলেন রুস্তাম ইব্‌ন যাল সীস্‌তানী (আল-মাস'ঊদী, Bibl. Geog. Arab, ৮খ, ৩৪৮; Barthold, Turkistan down to the Mongolin Invasion, পৃ. ২০৮, টীকা)। তিনি ১৫৯/৭৭৫-৭৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কৈশোরকাল অজ্ঞাত অবস্থায় অতিবাহিত হয়। তবে ১৯৪-১৯৫/৮০৯ সালের পূর্বে তাহির রাফি' ইব্‌ন লায়ছ (আত-তাবারী, ৩খ, ৭৭৭)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাফি' ইব্‌ন লায়ছ সামারকান্দ এলাকায় বিদ্রোহ করিয়া খালীফা হারূন্‌র-রাশীদকে বিব্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ৮০৯ খৃ. খলীফা হারূনের ইনতিকালের পর তাহির আল-মা'মূনের সেনাবাহিনীতে শামিল হন। এই সেনাবাহিনী তখন খুরাসান প্রদেশের মারব নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিল। খলীফা হারূন তাঁহার দুই পুত্র আল-মা'মূন ও আল-আমীনকে তাঁহার সালতানাত বণ্টন করিয়া দেন। সালতানাতের উত্তম অংশ আল-আমীনকে দেওয়া হয়। একজন ইরানী দাসী (মুরাজিল)-এর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র আল-মা'মূন লাভ করেন পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ। উক্ত প্রদেশসমূহে খুরাসান প্রদেশও শামিল ছিল। কিন্তু আল-আমীন এই বণ্টনে সন্তুষ্ট হন নাই। ফলে উভয় ভ্রাতার মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ৮১১/১৯৬ সালে যখন আল-মা'মূন খলীফা-ই মাশরিক (অর্থাৎ প্রাচ্যের খালীফা) উপাধি ধারণ করেন, তাহির তখন অপরিচিতির গহ্বর হইতে মস্তক তুলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকেন (Sir William Muir, The Caliphate, its Rise, Decline and Fall, পৃ. ৪৮৬-৫১১)।

ইরানী মায়ের সন্তান হওয়ার কারণে আল-মা'মূন ইরানে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এই জনপ্রিয়তার আরও একটি কারণ ছিল এই যে, আল-মা'মূন ছিলেন ইরানী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী এবং শী'আ মতবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। মোটামুটিভাবে সমস্ত ইরানী ঐতিহাসিককে এই কথাটি বলিতে দেখা যায়, "মা'মূন আমাদের ভাগিনেয়। তিনি একজন আব্বাসী হিসাবে গৌরবান্বিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদেরই একজন।" আল-মা'মূনের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহির তাঁহার সৈনিক জীবন শুরু করেন এবং অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি লাভ করেন। ১৯৫-১৯৬/৮১০ সালে তিনি প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হন। এই মহান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বহু যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন।

আল-আমীন যখন নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিলেন যে, খুরাসানবাসিগণ তাঁহার ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকার করে না, তখন তিনি 'আলী ইব্‌ন 'ঈসাকে আল-মা'মূনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেন। এইদিকে আল-মা'মূন ছোট্ট একটি সেনাদল সহকারে তাহিরকে সীমান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ১৯৫-৯৬/৮১০ সালে "রায়"-এর নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে আল-আমীনের সেনাবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ঐতিহাসিক তাবারী লিখেন, যুদ্ধক্ষেত্রে এক পর্যায়ে তাহির ও 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা মুখামুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। উক্ত মুখামুখি যুদ্ধে তাহির দুই হস্তে তরবারি চালনা করিয়া এমন বীর বিক্রমে আক্রমণ করিলেন যে, মুহূর্তের মধ্যে প্রতিপক্ষ ধূলিতে লুটাইয়া পড়ে। ইহার পর হইতে তাহির যু'ল-য়ামীনায়ন উপাধিতে খ্যাত হন (পূ. গ্র., পৃ. ৪৮৯)। বিজয়ী হওয়ার পর তাহির আল-মা'মূনের নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করেন। এই বার্তাটি ছিল Julius Caeser-এর বার্তার ন্যায়, যাহা তিনি রোমের জাতীয় পরিষদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বার্তায় তাহির লিখেন, "আলী ইব্‌ন 'ঈসার মস্তক আমার সম্মুখে রহিয়াছে। তাহার আংটি আমার হস্তে পরিহিত এবং তাহার সেনাবাহিনী আমার সামনে পর্যুদস্ত হইতেছে।"

তাহির সেইখান হইতে হুল্‌ওয়ান অভিমুখে রওয়ানা হন। এই অঞ্চলটি বাগদাদ হইতে প্রায় এক শত পঁচিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই যাত্রাপথে আল-আমীনের পক্ষ হইতে তাঁহার মুকাবিলায় অবতীর্ণ সকল সেনাবাহিনীকে একের পর এক তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তাহির কাযবীন বিজয় করিয়া হুল্‌ওয়ান পৌঁছেন। আল-মা'মূন হারছামা নামক আরও একজন সেনাপতিকে একটি বড় সেনাবাহিনী এবং প্রচুর সমরাস্ত্র সহকারে তাহির-এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহির হুল্‌ওয়ান বিজয় করিয়া তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়া নিজে আহওয়ায ও সূস বিজয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন (পূ. গ্র., পৃ. ৪৯)। ঐতিহাসিক মাস'ঊদী বর্ণনা করেন, আল-আমীন যখন তাহিরের একের পর এক গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের সংবাদ শুনিতে পাইলেন, যাহা আল-আমীনের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে খর্ব করিয়া দিবার নামান্তর ছিল, তখন আল-আমীন তাহিরের নিকট একটি পত্র লিখেন। তাহাতে তিনি বলেন, 'তোমার এতটুকু বিবেচনা করা উচিত যে, যখন হইতে আমাদের সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন হইতে যে কেহ আমাদের জন্য অধিক আনুগত্য ও খিদমত করিয়াছে, তাহার মস্তক তরবারি দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। এখন তুমি ভাবিয়া দেখ, তুমি কি চাও।" তাহির এই বার্তার প্রতি এতটুকুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। যে কোন সেনাবাহিনীই তাহার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইত তাহাদেরই পরাজয় হইত। আহওয়ায বিজিত হওয়ার পর সিত-এর অধিবাসিগণও আল-মা'মূনের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। আল-আমীন তাহিরের সেনা অফিসারদিগকে তাঁহার সহায়তা না করার জন অর্থ লোভ দেখান। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রটিও ব্যর্থ হয়। অবশেষে বৎসরের ক্রান্তিলগ্নে তাহির বাগদাদ আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। তখন কেবল এই একটি মাত্র শহর মুকাবিলার জন্য অবশিষ্ট ছিল। তাহির 'আস্‌বার দরওয়াজার সম্মুখে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন। অপরদিকে হারছামা পূর্ব দিক হইতে আসিয়া নদীপথ অবরুদ্ধ করিয়া পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করিতে থাকেন।

এই অবরোধ কয়েক মাস পর্যন্ত চলিতে থাকে। বাগদাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। অপরদিকে কয়েকটি নদীর কারণে আক্রমণকারীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতেছিল। অবরুদ্ধ শহরবাসীর দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। প্রায় সময় বাজার ও অলিতে-গলিতে লড়াই বাধিয়া যাইত। শহরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইহার কারণ, তাহির দুর্গবন্দী সৈনিকদের দাজলা পথে আসা চিঠিপত্রের ডাক যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আল-আমীনের প্রধান সেনাপতিও তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করেন। পরিশেষে পূর্ণ বার মাসের কঠোর অবরোধের পর ৮১৩/১৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে এই শহরটিও বিজিত হয় (পূ. গ্র., পৃ. ৪৯১-৪৯৩)।

অবশেষে একটি দুর্গে আশ্রয়ী হতভাগা আল-আমীন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তবে তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন যে, তাঁহার পিতার সময়কার খ্যাতনামা সেনাপতি হারছামা-র হাতে তিনি আত্মসমর্পিত হইতে চান। কিন্তু তাহির ইহাতে এই বলিয়া আপত্তি করেন

যে, তাহা হইলে হারছামা-ই বাগদাদ বিজেতা বলিয়া গণ্য হইবে। পরে ইহা সিদ্ধান্ত হইল যে, আল-আমীন নিজে হারছামা-র হাতে আত্মসমর্পিত হইবেন। কিন্তু শাহী মুকুট ও বাদশাহীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাহিরের নিকট সমর্পণ করিবেন। এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও দুর্ভাগা শাহযাদার প্রাণ রক্ষা পায় নাই। আল-আমীন দুর্গ হইতে বাহির হইয়া নদীর কিনারায় পৌঁছেন। সেইখানে হারছামা একটি নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহিরের কতিপয় সিপাহী নৌকার উপর তীর ও প্রস্তর বর্ষণ শুরু করে। একটি প্রস্তরখণ্ড এত জোরে নৌকায় আঘাত হানে যে, নৌকা তৎক্ষণাৎই উল্টাইয়া যায়। নৌকার মাঝিরা হারছামা-কে মাথার চুল ধরিয়া প্রাণে রক্ষা করে। নিরুপায় আমীন সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিতে সমর্থ হন। শীতের তীব্রতায় তাঁহার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। পরে তাঁহাকে পার্শ্বের একটি ঘরে নেওয়া হয়। পরবর্তী রাত্রে তাহিরের সিপাহীরা তাঁহাকে সেইখানে হত্যা করে। বাগদাদের জনবসতি এলাকায় তাঁহার মস্তক প্রদর্শিত হয় যাহাতে সবাই জানিতে পারে যে, আল-আমীন মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অতঃপর এই খণ্ডিত মস্তক আল-মা'মূনের নিকট প্রেরণ করা হয় (তারিখ-ই গুযীদাহ, পৃ. ৩০৮, ৩০৯, ৩১০; সায়্যিদ আমীর আলী, A Short Hist. of the Saracens, পৃ. ২৬০-২৬২, ১৯৫১ খৃ.; উইলিয়াম ম্যুয়র, The Caliphate etc., পৃ. ৪৯৫-৫১১)।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহা দুই ভাইয়ের মধ্যকার কোন্দল হইলেও তাহিরের বিস্ময়কর সাফল্যের কারণে আরবদের উপর ইরানীদের এক রকম গৌরব অর্জিত হইয়া যায়। ফলে বংশীয় ও সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়া উঠে। আল-মা'মূনের বিজয় বিশেষত ইরানীদের স্বার্থানুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তখন সালতানাত-এর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে ইরানীদের হাতে আসিয়া যায় এবং মন্ত্রী, গভর্নর, সচিব ও দেহরক্ষী প্রায় ইরানীরাই হইতে থাকে।

তাহিরের বাগদাদ বিজয়ের ফলে আল-মা'মূন রাজমুকুট ও সিংহাসনের মালিক হইলেও প্রকৃত সত্য এই যে, তখন 'আব্বাসী সালতানাতের ভিত্তিমূল দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পরিশেষে এই বিপ্লবই তাঁহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন সরকারের যাবতীয় কাজকারবারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ইরানীদের হাতে আসিয়া যায়। কেননা আল-মা'মূন তাঁহার ক্ষমতা ও উন্নতি লাভের জন্য তাহাদের নিকট ঋণী ছিলেন। দিন দিন বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে খিলাফাতের সুদৃঢ় ঐক্য বিনষ্ট হইয়া যায়। খিলাফাতকে নড়বড় করিয়া দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হইল এই যে, আল-মা'মূন খুরাসান প্রদেশের শাসনভার স্থায়ীভাবে তাহির ও তাঁহার উত্তরসুরীদিগকে দান করেন। ফলে পূর্বের যেই সংবিধানের আলোকে বিভিন্ন প্রদেশে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গভর্নর বা সরকার প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইত, তাহা আর বহাল রহিল না।

ইহা একটি স্বাভাবিক বিষয় ছিল যে, তাহিরের অনন্য অবদানের কারণে আল-মা'মূনের নিকট তাহিরের বেশ মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে আল-মা'মূন তাঁহাকে ইরাক ও ইরানের গভর্নর, বাগদাদের প্রধান সেনাপতি ও সাওয়াদের অর্থ উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করেন (আত-তাবারী, ৩খ, ১০২৯)। তখনকার যুগে রাজবংশের লোকদিগকেই এই সকল প্রদেশের শাসনভার প্রদান করা হইত। ইহাই ছিল খলীফা প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আল-মা'মূন ২০২/৮১৭ সালের পূর্বে বাগদাদে প্রবেশ করেন নাই। তখন একাধারে চারি বৎসর পর্যন্ত (৮১৩-৮১৭ খৃ.) তাহির-ই ছিলেন বাগদাদের প্রশাসক।

আল-মা'মূন বাগদাদে আগমন করিবার পর তাহিরকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্বটিও প্রদান করেন। তখন এই পদটিকে বাগদাদ সরকারের সমান মর্যাদা বলিয়া গণ্য করা হইত। অতঃপর তাঁহাকে খুরাসানের শাসনভার অর্পণ করা হয়।

২০৪/৮১৯ সালে আল-মা'মূনের বোধোদয় হয়। ফলে তিনি তাহিরকে প্রাণে খতম করিয়া দিবার ইচ্ছা করেন। মীর খাওয়ান্দ ও হামদুল্লাহ আল-মুসতাওফী উভয় ঐতিহাসিক ইহাতে একমত যে, তাহিরের উপস্থিতিতে আল-মা'মূন তাঁহার নিহত ভ্রাতার মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতেন। তাহা ছাড়া তিনি এই আশংকাও করিতে থাকেন যে, তাহির তাঁহার একজন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ইতিমধ্যে একদিন তাহিরের আগমনে রাজদরবার সরগরম হইয়া উঠে। কিন্তু আল-মা'মূন কান্নাকাটি শুরু করিয়া দেন। তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমি যখনই তাহিরের চেহারা দেখি, তখনই আমার অন্তরে আল-আমীন ও তাহার হত্যার কথা স্মরণ হয় (মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতু'স-সাফা', ৪খ, ৩)।

তাহির ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি বাদশাহ্‌র ধ্যান-ধারণা বুঝিতে পারিয়া নিজের শক্তি দৃঢ় করিতে শুরু করেন। সেইমতে মন্ত্রী আবূ খালিদের যোগসাজশে খুরাসানের রাজত্ব নিজের নামে স্থায়ী করিয়া লইলেন। কিন্তু মনে হয় যে, আল-মা'মূনও জানিয়া-শুনিয়া এই পন্থা অবলম্বন করেন। কেননা তাঁহারও সর্বদা চিন্তা ছিল যে, এইরূপ ব্যক্তি হইতে কিভাবে পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

আল-মা'মূন ২০৫/৮২০ সালে খুরাসানের শাসনভার তাহিরের হাতে ন্যস্ত করেন। তাহির নীশাপুরে তাঁহার রাজদানী স্থাপন করেন এবং খলীফার অবাধ্য হইয়া উঠেন। খুতবা হইতে খলীফার নাম পর্যন্ত তুলিয়া দেন। সংবাদ সরবরাহকারী কুলছূম ইব্‌ন হামদাম তৎক্ষণাৎ এই নূতন সংবাদটি শাহী দরবারে পৌঁছাইয়া দেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার দুই দিন পরেই তাহির হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন (গারদীযী, যায়নু'ল-আখবার, পৃ. ৮১)। ইহা ৮২১ খৃ. সালের নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরে সংঘটিত হয়। সাধারণ ধারণা এই যে, তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছিল (Barthold, Turkistan etc, পৃ. ২০৮)।

ঐতিহাসিক মাস'ঊদীর বর্ণনায় ঃ আল-মা'মূন ইতিপূর্বে তাহিরকে একটি ভৃত্য দিয়াছিলেন। গোপনে তাহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহির যদি কোন সময় অনভিপ্রেত কাজে ব্রতী হয় তখন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করিবে (William Muir, Caliphate etc, পৃ. ৫০২)। অপরদিকে আল-মা'মূন আহমাদ ইব্‌ন আবূ খালিদের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনীকে তাহিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহিরের মৃত্যু সংবাদ আল-মা'মূনের কাছে আসিয়া পৌঁছে। জনৈক কবি লেখেন ঃ

يا ذا اليمينين وعين واحد × نقصان عين وعين زائدة .

"হে দুই ডান হস্ত ও এক চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি! এক চক্ষুর অভাব আবার একটি ডান হস্ত অতিরিক্ত" (মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতু'স-সাফা', ৪খ, ৩৪)।

তাহির ছিলেন একজন সুদর্শন যুবক। তবে তাঁহার একটি চক্ষু কোন এক যুদ্ধে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি উভয় হস্তে নৈপুণ্যের সহিত হাতিয়ার চালাইতে সক্ষম ছিলেন। রণাঙ্গনে তাঁহার রণকুশলতা কিংবদন্তীর ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল। বুদ্ধিমত্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও বদান্যতা ইত্যাদি ছিল তাঁহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি শিল্প-সাহিত্যের

পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ দিয়ার রাবী'আ-র গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁহাকে তিনি আরবী ভাষায় যে পত্র লিখেন তাহা তাঁহার সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে একটি সাহিত্যরত্ন হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে (তু. কিতাবু'ল-বাগদাদ, Keller সং, পৃ. ৩৬; আত-তাবারী, ৩খ, ১০৪৬; ইবনু'ল-আছীর, ৬খ, ২৫৮)।

তালহা-র দায়িত্বভার গ্রহণ (২০৭/৮২২) ঃ তাহিরের মৃত্যুর সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আবদুল্লাহ ইরাকে খারিজী সম্প্রদায়ের দমনে ব্যস্ত ছিলেন। মীর খাওয়ান্দের বর্ণনা অনুযায়ী, তাঁহার ছোট ভাই তালহাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা হয় (মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতু'স-সাফা', ৪খ, ৩); কিন্তু পরবর্তী ঘটনাসমূহ হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। ইহাও বর্ণনা করা হয় যে, তালহা পঁয়ত্রিশ লক্ষ দিরহাম উৎকোচ প্রদান করিয়া মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের সচিবকে তাঁহার দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন (উইলিয়াম ম্যুর, পৃ. গ্র.)। কিন্তু সঠিক তথ্য মনে হয় এই যে, তালহা তাঁহার ছোট ভাইয়ের সহিত যোগাসাজশ করিয়া রাজমুকুট ও সিংহাসন দখল করিয়া নেন।

তালহা-র শাসনামলে সীস্তানের বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বিদ্রোহ হাম্যার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। খুরাসানের পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত এই সীস্তান প্রদেশটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে হামযা খারিজী সম্প্রদায়ের সহায়তায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া একটি বিশাল এলাকা জুড়িয়া তাঁহার দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া নেয়। সীস্তান ছিল খুরাসানের আওতাধীন একটি প্রদেশ। তাই তালহা হামযা-র বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চালাইয়া তাহাকে পরাজিত করেন। এই অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি অসুস্থ হইয়া মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার পুত্র 'আলীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। 'আলী ইব্ন তালহা সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। সম্ভবত তিনি মাত্র কয়েক মাস শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কেননা একই সময়ে তাঁহাকে কয়েকটি বিরোধী শক্তির মুকাবিলা করিতে হয়। ফলে তিনি নীশাপুরের সন্নিকটে এক যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরও তীব্র ও ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিতে থাকে (মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতু'স-সাফা', ৪খ, ৩; গারদীযী, যায়নু'ল-আখবার, পৃ. ৫ প.)।

'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির (২১৩/৮২৮-২৩০/৮৪৪) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন তাহির ছিলেন তাহিরিয়্যা বংশের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী বাদশাহ। তিনি আপন সাহস ও বীরত্বপূর্ণ অবদানের কারণে একজন মহান ও খ্যাতনামা বাদশাহ হিসাবে প্রমাণিত হন। তিনি স্বীয় পিতা অপেক্ষা অধিক সুনাম অর্জন করেন। তিনি জন্মলগ্ন হইতেই একটি জনস্বীকৃত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ২০৭/৮২২ সালে তিনি সিংহাসন ও রাজমুকুট হইতে বঞ্চিত হন। অতঃপর ২১৩/৮২৮ সালে যখন 'আলী মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি খুরাসানের শাসনভার হাতে তুলিয়া নেন। খুরাসানের ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পূর্বে আল-মা'মূন তাঁহাকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তিনি সকল দায়িত্ব পূর্ণ যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন। খলীফা তাঁহাকে সালতানাতের সদস্য বলিয়া মনে করিতেন।

২০৫/৮২০ সালে 'আবদুল্লাহকে সিরিয়া ও মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া নাস্র ইব্ন শাব্ছ'-এর দমনকার্য তাঁহার উপর অর্পিত হয়। নাস্র ইব্ন শাব্ছ দীর্ঘদিন ধরিয়া পশ্চিম সীমান্তে বিদ্রোহ চালাইয়া আসিতেছিল। 'আবদুল্লাহ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া এশিয়া মাইনরের সীমান্তে অবস্থিত একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। অতঃপর একাধারে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের প্রাণপণ প্রচেষ্টার পর এই দুর্গ জয় করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত যুদ্ধে নাসরকেও বন্দী করা হয়। মনে হয় 'আবদুল্লাহ এই সকল অভিযানে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু সব সময় অভিযানে ব্যাপৃত থাকেন নাই (আমীর 'আলী, Hist. of the Saracens, পৃ. ২৬৯)।

৮২৭ খৃ. সালে স্পেনের মুহাজির বিদ্রোহ ও ৮২৮ খৃ. সালে বাবাক-এর বিরুদ্ধে ব্যর্থ অভিযান ঃ একদিকে 'আবদুল্লাহ নাস্র-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় ব্যস্ত ছিলেন, অপরদিকে মিসরে বিদ্রোহের দাবানল ছড়াইয়া পড়ে। স্পেনীয় মুহাজিরদের গণজোয়ারের ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া পড়ে। ইহা সত্ত্বেও 'আবদুল্লাহ তাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেন। ২১১/৮২৬ সালে এক যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। অতঃপর বিদ্রোহীদিগকে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। পরিশেষে তাহারা ইকরীতিশ-এ স্থানান্তরিত হইবার জন্য আবেদন করে ও তৎক্ষণাৎ ইকরীতিশ অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং সেইখানে পৌঁছিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া নিজেদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে (আমীর 'আলী, পূ. গ্র., পৃ. ২৬৯)।

মিসরে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করিবার পর 'আবদুল্লাহ বাবাক-এর প্রতি মনোযোগ দেন। বাবাক পঁচিশ বৎসর যাবৎ মাযান্দারান প্রদেশে সন্ত্রাস ও লুটতরাজ চালাইয়া আসিতেছিল। বাবাক প্রাচীন ইরানের খুররামী সম্প্রদায়ের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। সে মানুষের মধ্যে চরিত্র বিধ্বংসী মতবাদ, যেমন মাহরাম নারীর সহিত যৌন-সম্ভোগ ও পুনর্জন্মবাদ ইত্যাদি প্রচার করিয়া বেড়াইত। আযারবায়জান-এর সন্নিকটে মাযান্দারান-এর একটি দুর্গে তাহার আস্তানা ছিল। সে তথা হইতে আক্রমণ করিয়া সরকারী সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং অসংখ্য নারীকে গ্রেফতার করিয়া তাহার সহিত লইয়া যায়। অতঃপর সে বায়যানটীয় সম্রাট থিয়োফিলাস (Theophilus)-এর সহিত যোগসাজশ করিয়া মুসলিম নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আক্রমণ করে (ইবনু'ল-আছীর, Tornberg সং., ৬খ, ৩১৫, ৩২৬, ৩৩৭; ইব্ন খালদূন, আল-'ইবার, ৩খ, ২৫৮-২৬২)। 'আবদুল্লাহ তাহার মুকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'আলীর ইনতিকাল হওয়ায় খলীফা আল-মা'মূন তাঁহাকে খুরাসানের আমীর নিযুক্ত করেন।

খুরাসানে 'আবদুল্লাহ্র শাসনামল (২১৩/৮২৮-২৩০/৮৪৪) ঃ তালহা-র মৃত্যুর পর খুরাসানে ব্যাপক আকারে বিশৃংখলা ও গোলযোগ দানা বাধিয়া উঠে। সমগ্র খুরাসানে তখন যুদ্ধবিগ্রহ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তথাকার অবস্থা এক অবর্ণনীয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। খারিজী সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ফলে তথাকার পরিবেশ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর 'আবদুল্লাহ শান্তি-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সেইখানে 'আযীয ইব্ন নূহ-এর নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাপতি আপন লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়। তবে এই লক্ষ্য অর্জনে কতদিন সময় লাগিয়াছিল তাহা জানা যায় না।

মীর খাওয়ান্দ বর্ণনা করেন, হিরাত প্রদেশে একটি মসজিদের সম্মুখে জরথুস্ত্রের অনুসারীদের একটি অগ্নিকুণ্ড ছিল। তাহারা মুসলিম সরকারকে জিযয়া (কর) প্রদান করিত। একদিন জনৈক মুল্লা সাহেব তাঁহার অনলবর্ষী বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন। ইহাতে তাহারা উক্ত অগ্নিকুণ্ডকে ধূলিসাৎ করিয়া সেইখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। জরথুস্ত্রীয়গণ ইহা জানিতে পারিয়া সকলে একযোগে সম্রাটের দরবারে আসিয়া অভিযোগ পেশ করে। 'আবদুল্লাহ

হিরাতের গভর্নরের নিকট ইহার কৈফিয়ত তলব করেন। তদন্তের পর হিরাতের চারি হাজার বৃদ্ধ মুসলমান সাক্ষ্য প্রদান করিলেন যে, এইখানে আশেপাশে এমন কোন অগ্নিকুণ্ডই ছিল না। তাঁহাদের এই বিবৃতি গ্রাহ্য হয়। ফলে জরথুস্ত্রীয়দের দাবি খারিজ করিয়া দেওয়া হয় (মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতু'স-সাফা', ৪খ, ৩ প.)।

এই ঘটনাটি বর্ণনা করিতে যাইয়া কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক বেশ অতিরঞ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'আবদুল্লাহ্‌র শাসনামলে জরথুস্ত্রীয় ও অগ্নিপূজকদিগকে ব্যাপক হারে হত্যা করা হয়। মীর খাওয়ান্দ একজন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক। অথচ তিনি ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের কোথাও উল্লেখ করেন নাই। মীর খাওয়ান্দ যে ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন তাহারও সম্ভবত ইহাই উদ্দেশ্য যে, 'আবদুল্লাহ্‌র শাসনামলে ইসলামের বিজয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছিল যাহার ফলে মুসলমানগণ তখন বেশ প্রভাবশালী ছিল।

খলীফা আল-মু'তাসিম-এর সিংহাসনারোহণ ও 'আবদুল্লাহ্‌র প্রতি অসন্তোষ ঃ ৮৩৩ খৃ. সালে আল-মা'মূনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাই আল-মু'তাসিম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ঐতিহাসিক গারদীযীর বর্ণনা অনুযায়ী 'আবদুল্লাহ্‌র সহিত খলীফার সম্পর্ক সন্তোষজনক ছিল না। কেননা 'আবদুল্লাহ্‌র নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে আল-মু'তাসিম-এর ব্যক্তিত্বের জন্য অবমাননাকর কিছু কার্যকলাপ তাঁহার নিকট প্রকাশ পায়। ঘটনাটি এই যে, একদিন আল-মু'তাসিম কতিপয় ভৃত্য-চাকর লইয়া অসময়ে শাহী মহলে আল-মা'মূনের সহিত সাক্ষাত করিতে যান। আবদুল্লাহ্‌ বলিলেন, একে তো এখন সাক্ষাতের সময় নহে, দ্বিতীয়ত এতজন ভৃত্য-চাকর লইয়া খলীফার সহিত সাক্ষাত করিতে যাওয়া খলীফার জন্য অসম্মানজনক বলিয়া মনে হয়। ফলে ইহা লইয়া কথা কাটাকাটি হয়। আল-মা'মূন সংবাদ পাইয়া উভয়ের মধ্যে আপোসরফা করিয়া দেন। কিন্তু আল-মু'তাসিমের অন্তরে এই ঘটনার জের থাকিয়া যায়।

আল-মু'তাসিম সিংহাসনারোহণ করিবার পরপরই খুরাসানে 'আবদুল্লাহ্‌র শাসনভারের কথা ঘোষণা করিয়া দেন। কিন্তু গোপনে তাঁহার পতনের জন্য তদবীর করিতে থাকেন। আল-মু'তাসিম 'আবদুল্লাহকে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী দাসী উপঢৌকন পেশ করিয়াছিলেন। দাসীটিকে গোপনে এক প্রকার শক্তিশালী প্রাণ সংহারক বিষ দিয়া দেন যাহাতে সুযোগমত তাহা 'আবদুল্লাহ্‌র খাদ্যে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এই দাসীটি 'আবদুল্লাহ্‌র ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া পড়ে এবং আবেগের আতিশয্যে সকল গোপন তথ্য ফাঁস করিয়া দেয়। ফলে 'আবদুল্লাহও বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে শুরু করেন (গারদীযী, যায়নুল-আখবার, পৃ. ২, ৩)।

তাবারিস্তান (মাযান্দারান)-এ মাযিয়ারের বিদ্রোহ ও ৮৩৯ খৃ. সালে তাহার গ্রেফতার ঃ কাস্‌পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত তাবারিস্তান এলাকার স্থানীয় শাসক মাযিয়ার 'আবদুল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কর দিতে অস্বীকার করে। ঘটনাটি এই যে, বাগদাদের তুর্কী সেনাপতি আফশীন-এর সহিত 'আবদুল্লাহর ব্যক্তিগত কিছু মন কষাকষি ছিল। ফলে সে বিদ্রোহের কর্মসূচী বাস্তবায়নে মাযিয়ারের সহায়তা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। মাযিয়ারের দুর্নীতি সকলের জানা ছিল। সে খুর্‌রামী সম্প্রদায়কে সহায়তা করিত এবং মসজিদসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলিত। অধিকন্তু সে এমন কিছু আইন জারি করিয়াছিল, যাহা মুসলিম সমাজের অধিকার ক্ষুণ্ন করিত। মুসলিম জনগণ বাধ্য হইয়া বাদশাহ্‌র দরবারে অভিযোগ পেশ করে এবং মাযিয়ারকে উক্ত পদ হইতে বরখাস্ত করিবার পরামর্শ দেয়। ইতিমধ্যে মাযিয়ার-এর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিবার জন্য 'আবদুল্লাহ ও তাঁহার পিতৃব্য হাসান ইব্‌ন হুসায়ন-এর পক্ষ হইতে খলীফার নিকট একটি আবেদন করা হয়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন ইরাক প্রদেশ হইতে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম-এর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করা হয়। হাসান উক্ত সেনাবাহিনীর সহায়তায় মাযিয়ারকে বন্দী করেন। ইহাতে তাহার অধীনস্থ প্রজাগণও তাহার সহায়তা করে নাই। হতভাগ্য মাযিয়ারকে একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া খচ্চরের পৃষ্ঠে করিয়া ইরাকে পৌঁছান হয়। সিন্দুকটিতে বায়ু গমনাগমনের জন্য মাত্র দুইটি ছিদ্র ছিল। তা'রীখ-ই তাবারিস্তান-এর লেখক ইব্‌ন ইসফান্দিয়ার বর্ণনা করেন, একদিন 'আবদুল্লাহর উপস্থিতিতে মাযিয়ারকে উক্ত সিন্দুক হইতে বাহির করা হয়। মাযিয়ার কিছু ফল খাইতে ইচ্ছা করে। তাহার অবস্থা দেখিয়া 'আবদুল্লাহর দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি তাহাকে কেবল উক্ত ফলই দিলেন না, বরং ইহাও বলিলেন, হয়ত খলীফা তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। মাযিয়ার ইহার উত্তরে বলে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সুপারিশ কবুল করুন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ তাহার এই ধাঁধাতুল্য জওয়াব বুঝিতে না পারিয়া উহার সঠিক তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের উদ্দেশ্যে তাহাকে মদ পান করাইয়া নেশাগ্রস্ত করিয়া ফেলেন। তবে মাযিয়ার খুব সতর্কতার সহিত উত্তর দেয়, কয়েক দিন পর তুমি নিজেই জানিতে পারিবে। 'আবদুল্লাহ মাযিয়ার ও মাযিয়ার-এর সহযোগীদিগকে বিপদে ফেলিবে না–এই মর্মে শপথ করিবার পর তাহাকে উদ্বুদ্ধ করেন যে, সে যেন 'আবদুল্লাহ্‌কেও ষড়যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেয়। অতএব এই ফন্দির মাধ্যমে 'আবদুল্লাহ তাহার সকল ষড়যন্ত্রের তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া খলীফাকে অবহিত করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম মাযিয়ার-কে লইয়া খলীফার দরবারে পৌঁছিলে খলীফা তাহাকে চারি শত কষাঘাত লাগাইতে নির্দেশ দেন। ফলে উক্ত কষাঘাতের যন্ত্রণায় সেই দিনই তাহার মৃত্যু ঘটে। অতঃপর তাহার মৃতদেহ বাবাক-এর মৃতদেহের সহিত ঝুলাইয়া দেওয়া হয় (দ্র. মাযিয়ার; আরও দ্র. ইব্‌ন ইসফান্দিয়ার, অনু. ব্রাউন, পৃ. ১৪–১৫৪; ইবনু'ল-আছীর, ৬খ, ৩৫১, ৩৬২-৩৬৪)।

৮৪২ খৃ. আল-মু'তাসিম-এর ইনতিকালের পর তাঁহার স্থলে তৎপুত্র আল-ওয়াছিক খিলাফাতের সিংহাসন অলংকৃত করেন। তিনিও 'আবদুল্লাহকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। কিন্তু অল্প কিছু কাল পর 'আবদুল্লাহও আটচল্লিশ বৎসর বয়সে ২৬ নভেম্বর, ৮৪৪ খৃ. সনে ইনতিকাল করেন।

স্বভাব-চরিত্র ঃ 'আবদুল্লাহ বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি আপন অধীনস্থ প্রদেশসমূহের গভর্নরদিগকে অলসতার নিদ্রা হইতে তুলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কাজের স্পৃহা ও স্বাধীন চিন্তার গুণাবলী সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের সহিত তাঁহার সমবেদনা ও বদান্যতা প্রসিদ্ধ ছিল। নৈতিক ও ধর্মীয় প্রভাবের ফলে তিনি সাধারণ লোকদের উপর কোন রকম জুলুম ও অবিচার করার বিরোধী ছিলেন। 'আবদুল্লাহ এই প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন যে, সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য জ্ঞান শিক্ষার সুবন্দোবস্ত থাকা চাই। তাহা কেবল সুবিধাভোগী সামান্য কিছু লোকের উত্তরাধিকার নহে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন উঁচুদরের 'আলিম ছিলেন। 'আরবী ভাষায় বহু কবিতা তাঁহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি ছিলেন ইসলামী 'আকীদা-বিশ্বাসে একজন দৃঢ় আস্থাবান মুসলিম। তৎকালীন ধর্মবিরোধী সাহিত্যের তিনি বিরোধী ছিলেন (যায়নু'ল-আখবার, পৃ. ২, ৩)।

দাওলাত শাহ স্বীয় গ্রন্থ তাযকিরাতু'শ-শু'আরা'-য় ফারসী সাহিত্যের আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে, একদা এক ব্যক্তি

নীশাপুরে পৌঁছিয়া ফারসী ভাষায় রচিত একটি পুরাতন কিতাবের কপি তাঁহার খিদমতে পেশ করে। 'আবদুল্লাহ উক্ত কিতাবের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি উত্তরে বলে, "এই কিতাবে ওয়ামিক ও 'আযরা'-র প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ ইহা রচনা করিয়া ইরানের বাদশাহ নাওশেরওয়ানে 'আদিল (৫৩১-৫৭৯ খৃ.)-এর দরবারে পেশ করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া 'আবদুল্লাহ বলিলেন, "কুরআন কারীম ও হাদীছ থাকিতে ধর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্য অন্য কোন কিতাবের প্রয়োজন নাই। কুরআন ও হাদীছ-ই তাহাদের জন্য যথেষ্ট।" তখনকার সময় মুসলমানগণ কুরআন ও হাদীছের নিয়ম-নীতিতে ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেন। কেননা তখন মুসলিম সমাজে বিজিত এলাকাসমূহে প্রাচীন অনৈসলামিক ভাবধারা ও 'আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষতিকর প্রভাব পড়িবার আশংকা ছিল।

'আবদুল্লাহ মাযিয়ার-কে নিজের সমমনা বানাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সমব্যথী হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের কর্মকুশলতা মুতাবিকই করা হইয়াছিল। তিনি খলীফার সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রাণ ও সম্মান সব কিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কেননা তখন পর্যন্ত 'আব্বাসী খলীফাগণকে সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের কেন্দ্রীয় নেতা মনে করা হইত।

মীর খাওয়ান্দ বলেন, 'আবদুল্লাহ্‌র দরবারে কবিদের ভীড় লাগিয়া থাকিত। তাঁহার শাসনামলে খুরাসানের অধিবাসিগণ বেশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে। 'আবদুল্লাহ নিজে একজন বুদ্ধিমান ও অর্থনীতিতে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কারণে ক্রমশ আয়ের খাতগুলির উন্নয়ন করিতে থাকেন। সালতানাত-এর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি খুরাসানের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপন পিতা অপেক্ষা অধিক অবদান রাখেন। ঐতিহাসিক আল-য়া'কূবী লিখেন, তাঁহার পূর্বে খুরাসানে অন্য কোন আমীর তদপেক্ষা ভাল শাসন পরিচালনা করেন নাই।

দ্বিতীয় তাহির (২৩০/৮৪৪-২৪৮/৮৬২) ঃ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হাসান ইব্‌ন হুসায়ন 'আবদুল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাবারিস্তান -এর প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ৮৪২ খৃ. ইনতিকাল করেন। তাহির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ তাঁহার স্থলে প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাহির সেইখানে নিজ পিতার ইনতিকাল পর্যন্ত প্রায় এক বৎসর তিন মাস শাসন পরিচানা করেন। অতঃপর খলীফা আল-ওয়াছিক তাহির-এর পিতা ও পিতামহের মহান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাহিরকে খুরাসানের আমীর নিযুক্ত করেন। তাহির স্বীয় ভাই মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহকে তাঁহার স্থলে তাবারিস্তানের আমীর-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দুই বৎসর শাসন পরিচালনার পর খলীফা আল-ওয়াছিক ৮৪৭ খৃ. ইনতিকালে করেন। তাঁহার স্থলে তাঁহার ভাই আল-মুতাওয়াক্‌কিল খলীফা হন। তিনিও তাহির-এর দায়িত্ব ও পদ বহালের পূর্ণ সমর্থন করেন। তাহির স্বীয় ভাই মুহাম্মাদকে খলীফার দরবারে প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁহাকে পুলিশ প্রধানের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। তিনি ২৩৭/৮৫১-২৫৩/৮৬৭ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্বে বহাল থাকেন। খলীফা তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে তাবারিস্তান ও দায়লাম-এর আশপাশের এলাকাও মুহাম্মাদকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন (রাওদাতু'স-সাফা', পৃ. ৪, ৫; যায়নু'ল-আখবার, ৪খ, ৪)।

তাহির-এর শাসনামলে সীস্‌তান এলাকার বুস্ত নামক স্থানের অধিবাসী দিরহাম ইব্‌ন নাস্‌র ইব্‌ন সালিহ বিদ্রোহ করে। ৮৫২ খৃ. সে সীস্‌তানের একটি বিরাট এলাকা দখল করিয়া নেয়। দিরহাম-এর অধীনে য়া'কূব ইব্‌ন লায়ছ নামক এক ব্যক্তি ছিল। পরবর্তী কালে সে সাফ্‌ফারিয়্যা বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দ্বিতীয় তাহির দিরহাম-এর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয় নাই।

৬৬১ খৃ. সনে য়া'কূব ইব্‌ন লায়ছ ক্ষমতা দখল করিয়া সমগ্র এলাকার মালিক হইয়া বসেন। ইব্‌ন খাল্লিকান-এর বর্ণনামতে ইহা ২২ মার্চ, ৮৬১/৬ মুহার্‌রাম, ২৪৭ সালে সংঘটিত হয় (Barthold, Turkestan, etc, পৃ. ২১৬)।

আঠার বৎসর শাসন পরিচালনা করিবার পর দ্বিতীয় তাহিরও ইনতিকাল করেন। তাঁহার শাসনামলে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু সংঘটিত হয় নাই। নীশাপুর ছিল তাঁহার রাজধানী। তিনি ন্যায়নীতি ও সুবিচারের সহিত দেশ শাসন করেন। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে ইহা বুঝা যায় যে, তিনি একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজের রাজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত রাজত্ব নিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। গারদীযী তাঁহার তাকওয়া ও ধর্মানুরাগের উদাহরণ দিতে গিয়া বলেন, একদিন তাঁহার নামে একটি পত্র পৌঁছে। তাহাতে লেখা ছিল-"যদি আপনার রায়-ই রাশীদিয়্যা হয়, তবে ...' এই শব্দগুলি পড়িয়াই তিনি যেন কিছু ভাবিতে থাকেন। অতঃপর বলেন, আমি চাই না, কেহ আমাকে 'রাশীদ" বলিয়া সম্বোধন করুক। কেননা রাশীদ (সঠিক পথপ্রাপ্ত) তাহারাই যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা রাশীদ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন (গারদীযী, যায়নু'ল-আখবার, পৃ. ২)। তাহির সাদাসিধা জীবন-যাপন করিতেন এবং জাঁকজমকের বিরোধী ছিলেন। সকল ঐতিহাসিক ইহাতে একমত যে, তিনি একজন উপযুক্ত শাসক ও যোগ্য উত্তরসুরি ছিলেন। তাঁহারা 'আবদুল্লাহকে যেমন সম্মানের উপযুক্ত মনে করিতেন, তাঁহাকেও তেমনই সম্মানের উপযুক্ত মনে করেন।

তাহিরিয়্যা বংশের সর্বশেষ শাসক মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাহির (৮৬২-৮৭৩ খৃ.) ঃ ৮৬২ খৃ. সনে তাহির-এর পুত্র মুহাম্মাদ সিংহাসনারোহণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মন্তব্য যে, তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালের ঘটনাবলী হইতে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না। কেননা তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সালতানাত-এর বিভিন্ন কার্য নিজেই আঞ্জাম দিতে শুরু করেন। মোটকথা তখনকার শাসনামল সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে তৎকালীন খিলাফাত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সকল রাজ্যে বিদ্যমান অরাজকতা ও সন্ত্রাসের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া ভাল বলিয়া মনে হয়। এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়টি ছিল ২৪৭/৮৬১ সন।

ডিসেম্বর ৮৬১ খৃ. সনে খলীফা আল-মুতাওয়াক্‌কিল নিহত হওয়ার পর প্রশাসনের সর্বস্তরে বিশৃংখলা দেখা দেয়। মিসরের গভর্নর আহমাদ ইব্‌ন তূলূন মিসরে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। সেনাবাহিনী তাহাদের বেতন দাবি করিয়া বসে। অথচ সরকারী কোষাগার শূন্য হওয়ার কারণে এই দাবি পূর্ণ করা তখন অসম্ভব ছিল। ফলে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে এবং ক্ষুব্ধ হইয়া খলীফা আল-মু'তায্য (দ্র.)-কে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। এইদিকে ৮৬৭ খৃ. মুহাম্মাদ ইব্‌ন তাহির-এর স্থলে তাঁহার ভাই সুলায়মান ইব্‌ন তাহির বাগদাদের ক্ষমতায় বসেন। তখন তাঁহাকে এই সকল তুর্কী বিদ্রোহীদের মুকাবিলা করিতে হয়। তাহিরিয়্যা বংশ হইতে যিনি বাগদাদের গভর্নর নিযুক্ত হইতেন তাহাকে বাগদাদের কোষাগারের পরিবর্তে মারব-এর কোষাগার হইতে বেতন দেওয়া হইত। সুলায়মান জানিতে পারিলেন যে, মারব-এর কোষাগার সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া গিয়াছে। এই কারণে তিনি বাধ্য হইয়া

সেনাবাহিনীকে বাগদাদের 'আমিরা কোষাগার হইতে বেতন পরিশোধ করিয়া দেন। ইহার ফলে শহরবাসিগণ ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করিয়া বসে। সম্ভবত এই বিদ্রোহের সুযোগে তুর্কী, ইরানী ও অন্যান্য বিদ্রোহী সৈন্যগণ বাগদাদের উপর আক্রমণ করে। প্রতিটি জায়গায় কিছু কিছু সৈনিক ভাগ্য পরীক্ষার লোভে নেতা সাজিয়া বসে। এই সুযোগে য়া'কূব ইব্ন লায়ছ তাহিরিয়্যা বংশের নিয়ন্ত্রণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় (Muir, The Caliphate, etc., পৃ. ৫৩৩)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাগদাদের গভর্নর হিসাবে মুহাম্মাদ ইব্ন তাহিরকে তাবারিস্তানের আশেপাশে বাদশাহ্র ব্যক্তিগত কিছু সম্পত্তি জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হয়। মুহাম্মাদ তাঁহার খৃষ্টান মন্ত্রী জাবির ইব্ন হারূন-কে সেইখানে কর আদায় করিবার জন্য প্রেরণ করেন। জাবির সেইখানে পৌঁছিয়া কিছু অনাবাদী ভূমিও দখল করিয়া নেয়। এই সকল জমি তথাকার অধিবাসিগণ গোচারণ ভূমি হিসাবে ব্যবহার করিত। ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়ে এবং তথাকার অধিবাসিগণ হাসান ইব্ন যায়দ নামক হযরত 'আলী (রা)-র বংশধর এক ব্যক্তির নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়া বসে। ইহার ফলে হাসান তাবারিস্তান (দ্র.)-এ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন (আত-তাবারী, de Geoje সং., ৩খ, ১৫২৩-১৫৩৩, ১৫৮৩-১৫৮৬ -সহ আরও বহু স্থানে; ইবনু'ল-আছীর, টর্নবার্গ সং. পৃ. ৮৫-৮৮, ১০৯, ১৩৮, ১৬৬, ১৭১, প.)।

মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির-এর অন্য একজন পিতৃব্য সুলায়মান ইব্ন 'আব্দিল্লাহ তাবারিস্তানের গভর্নর হাসানের মুকাবিলা করিতে সমর্থ না হইয়া মাযান্দারান এলাকার আস্তারাবাদে পলায়ন করেন। কিন্তু পলায়ন করিবার পূর্বে তিনি একজন বার্তাহকের হাতে মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির-এর নিকট একদল শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিবার জন্য একটি পত্র পাঠাইয়াছিলেন। মুহাম্মাদ তাঁহার সাহায্যার্থে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। এইদিকে ইসপাহবাযতান ইব্ন শাহরিয়ার-এর সামরিক সহায়তাও আসিয়া পৌঁছে। ফলে সুলায়মান কিছু আশার আলো দেখিতে পান এবং পুনরায় হাসান ইব্ন যিয়াদ-এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। হাসানের সেনাবাহিনী সুলায়মান-এর সামরিক শক্তি বেশি দেখিয়া জুলুস (জুলূস)-এর দিকে পশ্চাদপসরণ করে। এই স্থানটি আমূল হইতে পঁচিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ইহা ছিল তখন তাবারিস্তানের কেন্দ্রস্থল। কিছুদিন পর ইসপাহ্বায-এর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী হইতে চারি হাজার দায়ালামী সৈনিক হাসান ইব্ন যায়দ-এর দলে চলিয়া যায়। যুদ্ধে সুলায়মান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং তাবারিস্তানে প্রত্যাবর্তনের সকল আশা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। ইহার ফলে তাবারিস্তান ও দায়লাম-এর শাসন ক্ষমতা তাহিরিয়্যা বংশের হস্তচ্যুত হইয়া হাসান ইব্ন যায়দ-এর চলিয়া যায়। হাসান-এর বংশ সেইখানে ৯০০ খৃ. পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করে। উক্ত বংশের শাসকদিগকে যায়দী ইমাম বলিয়া অভিহিত করা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধগর্ভে উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ ছাড়াও দ্র. Grundriss d. Iran. Phil, ২খ, ৫৫৯ প.।

'আতা মুহয়িদ-দীন (দা. মা. ই.)/আহমদ মায়মূন

তাহির সায়ফুদ্-দীন (طاهر سيف الدين) ঃ সায়্যিদানা, ডক্টর, ১৮৮৫? ১৯৬৫, দাঊদী বোহ্রা সম্প্রদায়ের ইমাম (১৯১৫-১৯৬৫) ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার (১৯৫৪-৬৫); পঞ্চাশ বৎসর (১৯১৫-৬৫) যাবৎ কৃতিত্বের সহিত উক্ত সম্প্রদায়ের ৫১তম 'দা'ঈ'ল-মুতলাক' (داعى المطلق)-এর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার অনুসারীদিগকে উন্নতি ও প্রগতির পথে পরিচালিত করেন। তিনি আরবী ভাষায় সমকালীন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদদের অন্যতম; দর্শন, ইতিহাস, আইনশাস্ত্রেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সহযোগিতায় সুরাটের আরবী বিশ্ববিদ্যালয় (আল-জাম'ইয়্যাতু'স-সায়ফিয়া)-এর উন্নতি সাধন ও নানা স্থানে বহু স্কুল ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন। ভারতীয় উপমহাদেশ, বার্মা, সিংহল ও এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি ঐ সকল স্থানে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধ জাগাইয়া তোলেন। একজন আদর্শ মুসলমান হিসাবে তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেন। আরবী ভাষায় লেখা তাঁহার অনেক মূল্যবান রচনা রহিয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭২০

তিউনিস (تيونس) ঃ আরবী উচ্চারণ তুনূস বা তুনসি, তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্রের (দ্র.) রাজধানী, ৩৬·৪৭ ৩৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ১০·১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। ফরাসী আশ্রিত রাজ্য থাকাকালে শহরটি দুই পাশাপাশি কিন্তু খুবই আলাদা ধরনের এলাকা মিলাইয়া গঠিত ছিল ঃ একটি ছিল স্থানীয়গণের কিন্তু একান্তই মুসলিম শহর নয়, অতীতের শতাব্দীগুলিতে যেমন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার প্রায় অপরিবর্তিত রূপ এবং সাম্প্রতিক সময়ে গড়িয়া উঠা একটি য়ূরোপীয় শহর, অত্যাধুনিক রূপ; পুরানা শহর তিউনিস হ্রদ বা বাহিরা (আল-বুহায়রা) উপহ্রদের (লেগূন) শেষ প্রান্ত হইতে প্রায় তিন পোয়া মাইল দূরে অবস্থিত। এই শহর ক্রমে পূর্ব হইতে পশ্চিমে সম্প্রসারিত হইয়া একেবারে অগভীর, প্রায়শ শুষ্ক লবণ উপহ্রদ সাবাখালু'স-সিজূমী পর্যন্ত গিয়াছে; এইদিকে নগর দেওয়ালের বাহিরেই মান্নূবীয়্যার সর্বোচ্চ স্থান। সেখান হইতে বহু দূরে দৃষ্টি যায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিকটেই সীদী বেল হাসানের উচ্চভূমি এবং জাবাল জাল্লূদ, আরেকটু দূরে বির কাস্সার পাহাড়সমূহ; উত্তরে বেলভেডিয়ার ও রাস তাবিয়ার উচ্চভূমি এবং তাহার পরে জাবাল আহমার ও জাবাল নাহেলি। এই সামান্য উচ্চ-নীচু ভূমি থাকা সত্ত্বেও তিউনিসের সঙ্গে একদিকে মোরনাগ সমভূমি ও ওয়াদ মিলিয়ানে উপত্যকা এবং অপর দিকে মানূবা সমভূমি ও মেজেরদার সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া লেগুনের উত্তর তীর দ্বারা গৌলেত ও কার্থেজের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক রক্ষাব্যবস্থা ভালই, যদিও খুব চমৎকার নহে (প্রায় সময়েই তেমন কোন কষ্ট ব্যতীতই তিউনিস বিজিত হইয়াছে)। সংরক্ষণাগারের ব্যতীত আর সকল পানীয় জল দূর হইতে আনিতে হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অবস্থান খুবই সুবিধাজনক, মধ্য তিউনিসিয়ার বহির্মুখে, বেশ উর্বর যমিনে ও অঞ্চলে এবং সমুদ্রেরও এমন যথেষ্ট কাছে যে, নিকটবর্তী য়ূরোপীয় উপকূলভূমির সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

আরব লেখকগণ তিউনিস শব্দটি মূল আরবী শব্দ হইতে রূপ লাভ করিয়াছে বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা করিতে সময় ব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। একে অপরকে অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহারা একই রকম দুর্বলতার সঙ্গে মূল শহরটিকে বাইবেলোক্ত তারশীশ-এর সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। গ্রহণযোগ্য একটি ব্যুৎপত্তি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই; কিন্তু খোদ শহরটির মত নামটিও পিউনিক যুগের বলিয়া বলা হইয়া থাকে, আরও আগেরও হইতে পারে। ডিওডরোস উল্লেখ করিয়াছেন যে, টাইনেস (Tynes) বেশ বড় শহর, রক্ষাপ্রাচীরের ভিতরে নির্মিত। সন্দেহ নাই যে, উহা লেগুন হইতে কিছু

দূরবর্তী বর্তমান কাসবা, সেই সময়ে চমৎকার নৌ-চলাচলের উপযোগী ছিল। একের পরে এক ইহা অবরোধ ও জয় করিয়াছিলেন লিবীয়গণ। উহারা খৃ. পূ. চতুর্থ শতকে বিদ্রোহ করে। আগাযনেলিস ও রেগুলাস বিদ্রোহী ভাড়াটিয়া সৈন্যগণের ইহা ছিল সদর দফতর। পরবর্তীকালে ইহা স্কিপিও আফ্রিকানাস কর্তৃক বিজিত হয়। ইহা সম্ভবত স্কিপিও এমিলিয়ারাস কর্তৃক বিনষ্ট হয় (দ্র. Gsell, Hist. Anc de l'Afr. du Nord, ১খ., ২, ৩, উহার সর্বত্র)।

এই টাইনেস, ভবিষ্যৎ তিউনেস, ইহাকে অপর এক টাইনেসের (বলা হয় "সাদা", বন অন্তরীপে অবস্থিত) সঙ্গে অভিন্ন মনে করিলে ভুল হইবে কি, Tissot যেইরূপ ধারণা করিয়াছেন, আদিবাসী জাতির প্রধান কেন্দ্র লিবীয়গণের চমৎকার শহর যাহার সমতুল্য ছিল ফিনিশীয় উপনিবেশ অর্থাৎ কার্থেজ?

সে যাহাই হউক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুউজ্জ্বল প্রতিদ্বন্দ্বী শহর দ্বারা ইহার গৌরব ম্লান হইয়াছিল, বহুকাল পরেই কেবল ইহা পুনরায় প্রথম শ্রেণীর শহরের মর্যাদা অর্জন করে। রোমান, ভ্যান্ডাল ও বায়যানটাইন যুগে ইহার বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না। রোমান যুগের একটি সড়ক দ্বারা ইহা কার্থেজের সঙ্গে যুক্ত ছিল; ভৌগোলিক ও ধর্মীয় অল্প কয়েকটি উল্লেখ মাত্র হইতে মাঝে মধ্যে ইহার অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে। Saint Olive-এর জীবনীকে কিভাবে গ্রহণ করা যাইবে, ইতিহাস নাকি জনশ্রুতিরূপে? তাঁহার নাম হইতেই জামি'উ'ল যায়তূনা বড় মসজিদের নামকরণ হইয়াছে, ১৪০২ খৃ. আরাগন রাজা সরকারীভাবে তাঁহার দেহাবশেষ দাবি করিয়াছিলেন।

মুসলিম বিজয়ের পরে তিউনিস হঠাৎ করিয়া আবছায়া হইতে আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইতিহাসে ইহা মুসলিম শহররূপে, কতকটা কার্থেজের উত্তরাধিকারীরূপে এবং অল্পকালের মধ্যে কায়রাওয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। হাসসান ইবনু'ন-নু'মান ৬৯৮ খৃ. যখন প্রাচীন রাজধানী কার্থেজ জয় ও ধ্বংস করেন তখন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হয় লেগুনের প্রান্তবর্তী ছোট শহরটিকে একটি নৌঘাঁটিতে পরিণত করা, যেইখান হইতে নৌবহরসমূহ আরও দূরবর্তী স্থানসমূহে অভিযানে যাইতে পারিবে এবং একই সঙ্গে তিনি কোন আকস্মিক বায়যানটাইন নৌ-আক্রমণ হইতেও নিরাপদে থাকিবেন। তিউনিসে তিনি একটি অস্ত্রাগার (দারু'স-সিনা'ও) নির্মাণ করেন এবং সম্ভবত মিসর হইতে এক হাজার কপটিক পরিবার আনাইয়া বসত করান এবং এই নূতন সমুদ্র বন্দর ও জাহাজ নির্মাণ কারখানাতে দক্ষ কারিগর সরবরাহ করেন। মূল শহরটির বিষয়ে এই সময় পর্যন্ত খুব নিশ্চিতভাবে কিছু জানিতে পারা যায় নাই। শুধু সাধারণ একটা ধারণা করা যায় যে, কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অধিবাসী সেখানে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল ঃ সর্বপ্রথমে অবশ্যই খৃস্টান ব্যবসায়ী ও কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ, কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্রমেই বেশি সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী স্থানীয়গণ, সেই সঙ্গে আরব সৈনিকগণ উদ্ধত, লোভী ও অধীর। প্রথম ধর্মীয়, যথার্থ মুসলিম নির্মাণ কাজ, বড় জামি' মসজিদ যাহা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া নগর জীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ছিল, নির্মাণ করিয়াছিলেন উমায়্যা গভর্নর ইবনু'ল-হাবহাব (নির্মাণকাল ১১৪/৭৩২)। তিনিই অস্ত্রাগারটিও পুনর্নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু নগর দেওয়াল কে নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না; এই প্রাচীরটি আল-য়া'কুলার মতে কাদা (তীন) দিয়া রৌদ্রে শুকানো ইট (লিবন) গাঁথিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল, শুধু উপহ্রদের একেবারে নিকটবর্তী এলাকাতে পাথর কাটিয়া (হিজার) গাঁথা হইয়াছিল। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কায়রাওয়ানের মত তিউনিসে কোন নিয়মিত নির্মাণ কাজ হয় নাই, হঠাৎ হঠাৎ উন্নয়ন হইয়াছিল, বিরাট গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সকল পরিবর্তন ঘটনাক্রম ইহাকে যে নূতন ভূমিকা প্রদান করে এবং বিজয়ী বীরের দূরদৃষ্টিও যে ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিল সেই সকলের গ্রহণশীলতা আপাতদৃষ্টিতে যেইরূপ মনে হয় সম্ভবত তাহা অপেক্ষা ধীরে ধীরেই এইগুলি হইয়াছিল।

৮ম ও ৯ম খৃ. শতাব্দীতে তিউনিসের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বিকশিত হইতে থাকে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ইহার প্রধান খ্যাতি ছিল আইন ও ধর্মীয় শিক্ষা দানের কেন্দ্ররূপে। কায়রাওয়ানের সুখ্যাতি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার আগেই তিউনিসে সুবিখ্যাত উস্তাদগণ শিক্ষা দান করিতেছিলেন। ধর্মীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাঁহারা দেশটিকে ইসলামীকৃত করিতেছিলেন; ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন হাদীছবেত্তা 'আলী ইব্ন যিয়াদ ও 'আব্বাস ইবনু'ল-ওয়ালীদ আল-ফারিসী। ফাতিমী শাসনামলের শুরুতে আবু'ল-'আরাব আত-তামীমী তিউনিসীয় 'আলিমগণের প্রথমদিকের ব্যক্তিত্বগণের একখানি প্রয়োজনীয় বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন (কিতাব তাবাকাত 'উলামা' তূনুস, সম্পা. ও অনু. মুহ. ইব্ন চেনেব, Lists of Savants of Ifrikiya" -এর সহযোগে)। বড় জামি' মসজিদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আরও অন্যান্য অংশ সংযোজিত হয় এবং নানারকমভাবে উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অবশ্যই সাধন করিয়া থাকিবেন আগলাবী বংশের বিখ্যাত নির্মাতা আহমাদ। একটি শিলালিপি 'আব্বাসী খলীফার নামে স্থাপন করা হইয়াছে, উহার তারিখ ২৫০/৮৬৪, সেই অংশ হইল মিহরাবের সামনের গম্বুজ। এইখানে বেসামরিক বা ধর্মীয় যে কোন ভবন নির্মাণের জন্য পাথর ও মার্বেল সহজলভ্য ছিল। কার্থেজ ইহার নিকটেই অবস্থিত–সেই ধ্বংসাবশেষের নির্মাণ উপকরণাদি প্রচুর পরিমাণে ভবন, স্তম্ভ ইত্যাদিতে লাগানো হইত।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তিউনিস বিরোধী শক্তির প্রধানকেন্দ্র ছিল বলিয়া মনে হয়। কায়রাওয়ান হইতে যে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হইত তিউনিস তাহা প্রতিহত করিত। তামীমী জুনদ শহর প্রাচীরের ভিতরেই বাস করিত। উহারাই সকল বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ সৃষ্টি করিত। অধিকাংশ অভ্যুত্থানেই এই শহর শরীক থাকিত। উমায়্যাগণ, 'আব্বাসী গভর্নরগণ এবং পরবর্তী কালে আগলাবী আমীরগণ সেইগুলি দমন করিতেন। মানসূর আত্-তুনবুযীর মহাবিদ্রোহের সঙ্গেও ইহা জড়িত ছিল এবং ১ম যিয়াদাত উল্লাহ-র সেনাবাহিনী আসিয়া ২১৮/৮৩৩ সনে ইহা দখল করিয়া নগর প্রাচীর ধ্বংস করিয়া দেয়। এই রকম একটি অভ্যুত্থানের পরে ২য় ইবরাহীম আসিয়া গুরুতর শাস্তি প্রদান করেন ও ইহা নিয়ন্ত্রণে রাখিবার উদ্দেশ্যে ২৮১/৮৯৪ সনে নিজ দরবার এখানে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; সেই প্রয়োজনে এইখানে কয়েকটি ভবন নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে একটি হইতেছে আল-কাসাবা। কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি আবার রাককাদাতে ফিরিয়া যান এবং তাঁহার পুত্র ২য় 'আবদুল্লাহ আবার তিউনিসেই আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিবার সংকল্প করিলে ২৯০/৯০৩ সনে সেইখানেই নিজের জন্য নবনির্মিত প্রাসাদে তিনি নিহত হন। তাঁহার দুইজন গুপ্তঘাতককেই পরে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, একজনকে (উপদ্বীপের অর্থাৎ কেপ বনের) আল-জাথীরা দরওয়াজাতে, অপরজনকে কায়রাওয়ান দরওয়াজাতে। তিউনিস তখন পর্যন্ত ইফরীকিয়্যার রাজধানী হইবার উপযোগী হইয়া উঠে নাই।

ফাতিমীগণ ও তাঁহাদের সানহাজা উত্তরাধিকারিগণের রাজধানী ছিল কায়রাওয়ানে অথবা মাহদীয়্যাতে, তাঁহারাই সেইখানে কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তিউনিসকে অবহেলা করেন। এই শহর

গোঁড়াপন্থী রীতিনীতির প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া যায়। একটি বিষয় কিছু কম গুরুত্বের নহে যে, এইখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ যে দরবেশ, যিনি শহরের রক্ষক-দরবেশ এবং অদ্যাবধি সর্বাধিক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় তিনি খৃ. ১০ম শতকে জীবিত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সরকারী শী'আবাদ ও বিদ্রোহী খারিজীবাদের মধ্যে ইফরীকিয়ার আধিপত্য লইয়া মারাত্মক দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলিতেছিল; সীদী মাহরিয (র) (মুহরিয ইব্ন খালাফ) ছিলেন প্রেরণাদানকারী, তিনিই বিখ্যাত ইব্ন আবী যায়দ (র)-এর রিসালা পাইয়াছিলেন (৩২৭/৯৩৯)। তিনি ছিলেন উত্তর আফ্রিকার মালিকী মাযহাবপন্থিগণের মূল প্রেরণা (দ্র. ইব্ন নাজি, মা'আলিমু'ল-ঈমান, ৩খ., পৃ. ১৩৮)। তিনিই ৩৩২/৯৪৪ আবূ য়াযীদ কর্তৃক স্বল্পকালীন কিন্তু ধ্বংসাত্মক দখলের পরে জনসাধারণের মনে সাহস ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহাদিগকে শহরের চতুর্দিকে একটি মযবুত দেওয়াল নির্মাণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং আরও সংগঠিত পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন। রেশম ব্যবসায়িগণের পুরানা চত্বরটি (ফুন্দুকু'ল-হারাইরিয়্যা) যাহা তাঁহার যাবিয়ার প্রায় উল্টা দিকে এবং শহরের অন্যতম প্রধান দরওয়াজার একটু পরে অবস্থিত, সম্ভবত তাঁহার আমলের এবং ছোট বাজারও সম্ভবত সেই একই আমলের, উহা হইতেই দরওয়াজাটির নাম হইয়াছে ঃ বাব সৌকা (বাবু'শ-সুওয়ায়কা)। সকল জনশ্রুতি মতেই সীদী মাহরিয নিজ যাবিয়া হইতে বড় মসজিদমুখী সামান্য দূরে হারা নামে পরিচিত য়াহূদী মহাল্লাটি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সেইখানে বিশেষভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে দক্ষ কিছু অধিবাসী থাকুক, তাহাতে শহরের সমৃদ্ধি ঘটিবে।

খৃ. ১০ম শতকে শহরটির যে উন্নতি ঘটিয়াছিল উহার পরিচয় পাওয়া যায় ইবন হাওকালের বিবরণী হইতে। তিনি এইখানকার উৎপাদিত সম্পদের প্রাচুর্য, এইখানকার চমৎকার অবস্থান এবং অধিবাসিগণের ধন-সম্পদের প্রশংসা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তিনি এইখানকার মৃৎশিল্পের এবং শহরের চতুর্দিকের বাগিচাগুলিতে কূপ হইতে চাকার সাহায্যে পানি তুলিয়া সেচ দেওয়ার ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। পরের শতকে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন আল-বাক্‌রী নগর দেওয়াল ও পরিখা, পাঁচটি দরওয়াজা, যথা দক্ষিণ দিকের বাবু'ল-জাযীরা পোতাশ্রয়ের দিকের বাবু'ল বাহর ও পূর্বদিকের বাব কারতাজান্না (কার্থেজ-এর), বাবু'শ্ শাকা'ইন (ভিস্তিগণের দরওয়াজা; স্পষ্টতই ইহা ও বাবু'সসৌকা উভয়ই এক), ইহা উত্তর দিকে এবং পশ্চিম দিকে বাব আরতা। পোতাশ্রয়ের প্রবেশমুখ বন্ধ করিয়া দিবার জন্য একটি শিকল টানিয়া দেওয়া যাইত। উত্তর দিকে প্রতিরক্ষার জন্য একটি দেওয়াল ছিল এবং দক্ষিণ দিকে ছিল একটি পাথরের প্রাসাদ, শিকলের প্রাসাদ (কাসরু'স-সিলসিলা)। আল-বাক্‌রী বড় মসজিদের প্রশংসা করিয়াছেন। পূর্বদিক দিয়া ইহার প্রবেশপথে তখনকার মতই বারোটি ধাপযুক্ত সিঁড়ি ছিল, দ্রব্যাদিতে পূর্ণ বাজার ছিল অনেক, পনেরটি গোসলখানা ছিল, মাছ, ফল, ইত্যাদির প্রাচুর্য ছিল; তিনি মাটির তৈরী জিনিসপত্রেরও প্রশংসা করিয়াছেন। ভিন্ন অধ্যায়ে তিনি তিউনিসীয়গণের মধ্যে ফিকহশাস্ত্র পঠন-পাঠনের সাফল্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

কাজেই তিউনিসে প্রায় এক শত বৎসর যাবত শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অতঃপর খৃ. ১১শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ঘটে ভয়ঙ্কর ঘটনা, যাহার ফলে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায় ঃ উহা ছিল হিলালী আরবগণের বিজয়াভিযান। অসহায় যীরীগণ বিজয়ী সেনাদলের বিরাট সংখ্যা দেখিয়া মাহদিয়্যাতে আবদ্ধ হইয়া থাকে আর কিছু সময়ের জন্য তিউনিস রিয়াহী নেতা 'আবিদ ইব্ন আবি'ল গাছয়-এর অধিকারভুক্ত হয় (৪৪৬/১০৫৪)। কিন্তু নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য কিছুকাল পরে শহরবাসিগণ স্বেচ্ছায় আল-কাল'আর হাম্মাদী শাসক আন-নাসির-এর অধীনতা মানিয়া নেয়। তিনি সেইখানকার গভর্নররূপে ৪৫১/১০৫৯ সনে সানহাজী বংশীয় 'আবদু'ল-হাকক ইব্ন খুরাসানকে প্রেরণ করেন। শেষোক্তজন অল্প দিনের মধ্যেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এইভাবেই তিউনিসে প্রথম রাজবংশের পত্তন হয়। এই বংশ মাঝখানে ২০ বৎসর কাল (১১২৮-৪৮ খৃ.) সময় বাদে একেবারে আল-মুওয়াহ্হিদ বিজয় পর্যন্ত ঠিক এক শত বৎসর স্থায়ী হয়।

প্রথমে রিয়াহী বানূ 'আলীগণের অত্যাচার চলিতে থাকে। উহারা কার্থেজের মু'আল্লাকাতে (La Malga) প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে লুণ্ঠন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উহাদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া নেয়; বার্ষিক করের চুক্তিতে উহারা এই জিলার অধিবাসিগণকে আর আক্রমণ না করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। অতঃপর উহারা এমন কি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়রূপে তিউনিসের বাজারে পর্যন্ত যাতায়াত করিতে থাকে। মাহদীয়্যার যীরীগণ কর্তৃক এবং সিসিলির নরমানগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে এই শহরবাসিগণ উহা প্রতিহত করে; কিন্তু অভ্যন্তরীণ নানা গোলযোগে, যথা প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহের কোন্দল, সূফীগণের মধ্যে মারামারি ও লড়াই, বিভিন্ন মহল্লার লোকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে আবার ইহার সবচেয়ে গোলযোগের সময়েই সমুদ্রপথে বাণিজ্য সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়; ইতালীর সঙ্গে বাণিজ্য সংগঠিত হয় ও বিকাশ লাভ করে; খৃস্টানদের সঙ্গে যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ক্রমেই বেশি করিয়া উৎসাহ পাইতেছিল উহা অপ্রত্যাশিতভাবে বিরাট সুযোগ লাভ করে। বানূ খুরাসানীগণ নিজেরাই তিউনিসের সমৃদ্ধিকে উৎসাহ দানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আহমাদ খৃ. ১২শ শতকের প্রথমার্ধে ইহাকে সুরক্ষিত করেন; আল-ইদরীসী যে মাটির কাজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহা তিনিই নির্মাণ করেন। তিনিই আল-কাসর বা নগর দুর্গটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। বর্তমানে এল-কসার নামে পরিচিত মসজিদটি আদিতে উহার সঙ্গেই যুক্ত ছিল। এই মহল্লাতেই, সিদি বৌ ক্রিস্‌সান সড়কের নিকটে, উহা সম্ভবত মূল নামটির বিকৃত রূপ, এখনও পর্যন্ত বানূ খুরাসানীগণের কবর রহিয়াছে, আদিতে সম্ভবত উহা আল-সিলিসিলার সঙ্গে যুক্ত ছিল (সাদিকী হাসপাতাল এলাকাতে)। বড় মসজিদের প্রধান দরওয়াজাটি এই রাজবংশের আমলেই নির্মিত হইয়াছিল। দুইটি শহরতলী এলাকা, বাব সৌকা ও বাবু'ল জাযীরা ইতিমধ্যেই মূল শহরের (আল-মাদীনা) উত্তরে ও দক্ষিণে সম্প্রসারিত হইতে থাকায় তিউনিস এখন নির্দিষ্ট সীমানার গঠনরূপ লাভ করে। ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব লাভের কারণে এখন হইতে ইহা হয় ইফরীকিয়্যার রাজধানী। 'আবদু'ল-মু'মিনের আমল হইতে (৫৫৪/১১৫৯) বর্তমান সময় পর্যন্ত ইহা দেশের রাজধানী রহিয়াছে এবং এই সময় হইতে ইহার রাজনৈতিক ইতিহাস তিউনিসিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে এক হইয়া যায়।

৫৯৫/১১৯৯ সনে 'আবদুল-কারীম আর-রাগরাগির ব্যর্থ আক্রমণের ফলে ভয়ঙ্কর ভীতির সঞ্চার হয়। ১২০৩-৪ খৃ. শেষ আল-মুরাবিত য়াহ্‌য়া ইব্ন গানিয়্যার অতি স্বল্পকাল স্থায়ী শাসনের পরে হাফসীগণ আসিয়া তিউনিসে নিরাপত্তাবোধ ফিরাইয়া আনেন এবং বিভিন্ন প্রাসাদ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ দ্বারা ইহাকে যথার্থ রাজধানীর মর্যাদা দান করেন। আবূ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী হাফস, যিনি তখনও পর্যন্ত মার্‌রাকুশের

খলীফার নামে শাসন করিয়া আসিতেছিলেন, বাব সৌকা মহল্লাতে (এল-হালফাইউন সড়কে) একটি জামি' মসজিদ নির্মাণ করেন, তাঁহার নামের একটু বিকৃত রূপ বাই-মুহাম্মাদ নামে উহা পরিচিত। কিন্তু এই বংশের প্রথম স্বাধীন শাসনকর্তা, নিষ্ঠাবান আবূ যাকারিয়্যা-র নির্মাণ কাজগুলি হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই শহরে একটি নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। ১২৩০ খৃ. তিনি শহরের বাহিরে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, সুরক্ষিত মুসাল্লা (জামি' আস্-সুলতান) নির্মাণ করেন। ইব্ন বাত্তূতা পরবর্তী শতকে উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কাসাবা বা কসবা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া নির্মাণ করেন। উহার এক পার্শ্বে তিনি নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন; উহাই আল-মুওয়াহ্হিদ মসজিদ বা কাসাবা মসজিদ বা কসবা মসজিদ। উহার মিনারটি খাঁটি আল-মুওয়াহ্হিদ রীতিতে নির্মিত। ইহার বহির্ভাগে একটি অতি সুন্দর শিলালিপি রহিয়াছে, তাহাতে নির্মাণ তারিখ রামাদান ৬৩০ (মার্চ ১২৩৩) বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে (দ্র.O. Houdas and R. Basset, Mission scientif. en Tunisie, আলজিয়ার্স ১৮৮২ খৃ., পৃ. ৫-৯)। তিনি অত্যন্ত চমৎকার একটি কুতুবখানা বা লাইব্রেরী গড়িয়া তোলেন, কিন্তু তাঁহার একজন উত্তরাধিকারী ইব্নু'ল-লিহয়ানী উহার কিতাবগুলি বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া ফেলেন। তিউনিসে তিনি প্রাচ্য দেশের মাদ্‌রাসা প্রবর্তন করেন, পুরাতন সৌকুশ্-শামমা'ইনের নিকটে (বর্তমান সূক এললাগজিয়া) শামমা'ইয়্যা মাদ্‌রাসা। পরবর্তী কালে উহা সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা হয়, উহাই ছিল উত্তর আফ্রিকার প্রথম মাদ্‌রাসা। তিনিই য়াহ্য়া ইব্ন গানিয়্যার তিন কন্যাকে একটি প্রাসাদে আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে উহা কাসরু'ল-বানাত নামে পরিচিত হয়। সবশেষে উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই বড় মসজিদের চতুর্দিকের সূক মহল্লাগুলি সংগঠিত করেন এবং সূকু'ল-'আততারীন (তৈল ও আতর ব্যবসায়িগণের) এবং সম্ভবত সূকু'ল-কুমাশ (কাপড় ব্যবসায়িগণের) নির্মাণ করেন।

এই বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় বিষয়ে অনুরাগের স্থলে তাঁহাদের পুত্র আল-মুসতানসির বিল্লাহ্ ছিলেন বিলাস-ব্যসনপ্রিয় সৌখিন খলীফা, আরাম-আয়েশ ও বৈভবপ্রিয়। তিনি ১২৫৩ খৃ. কাসাবা বা কসবার সামনের খোলা চত্বরে কুব্বা আসারাক নামক একটি 'দীওয়ানে আম' নির্মাণ করেন, সংলগ্ন শহরতলীতে বারদোগামী সড়কের উপরে রা'সু'ত-তাবিয়্যা (রাস-তাবিয়া) নামক প্রমোদ উদ্যান নির্মাণ করেন এবং আবূ ফিহরেও অপর একটি প্রমোদ বাগিচা তৈরি করেন (সঠিক স্থানটি নির্ণয় করা অনিশ্চিত, যদিও ইব্ন আবী দীনার ইহাকে আল-বাত্তূম বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; এইচ. 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাব ইহা আল-আবিয়ানার নিকটে, জাবালু'ল-আহমারে ছিল বলিয়া বলিয়াছেন (দ্র. ইব্ন ফাদলুল্লাহ-এর সংস্করণ, পৃ. ১২, নং ১)। ইব্ন খালদূন একটি বিবরণ দিয়াছেন, উভয় প্রমোদ উদ্যান কাসাবা বা কসবার সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সড়ক দ্বারা যুক্ত ছিল। মহিলাগণ সেইখান দিয়া এমনভাবে চলাফেরা করিতে পারিতেন যে, বাহিরের কেহ দেখিতে না পায়। ৬৬৫/১২৬৭ আল-মুসতানসির কার্থেজের পুরাতন পানি প্রবাহ ব্যবস্থার (আন-হানায়া aqueduct) পুনঃসংস্কারের কাজ শেষ করেন। ইব্ন হাযিম কবিতাতে উহার প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। তিনি আবূ ফিহরের বড় পুকুরের এবং সেইখান হইতে বড় মসজিদে পানি আনয়নের ব্যবস্থাও করেন।

তাঁহার মা'আতিফ ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ শাসকের যোগ্যা বিধবা। তিনি জামি'উ'ত-তাওফীক বা আল-হাওয়ার সংলগ্ন দ্বিতীয় একটি মাদ্‌রাসা, তাওফীকিয়্যা, নির্মাণ করেন, উহাও এই একই আমলের। হাফসী শাসনের প্রথম শতকে আরও দুইটি মসজিদ নির্মিত হয় ঃ জামি'উ'য-যায়তূনা আল-বার্‌রানী (১২৮৩ খৃ.), বাবু'ল-বাহরের বাহিরে অবস্থিত। ইহা ভুয়া আল-ফাদলের আদেশে নির্মিত হয়। আগে এইখানে একটি ফুন্দুক ছিল, সেইখানে মদ বিক্রি হইত, সেইখানেই মসজিদটি তৈরি করা হয়। অপরটি হইল জামি'উ'ল-হিলাক (আংটি বা বেড়), ইহাও মুসাল্লার সেই একই মহল্লাতে অবস্থিত। তৃতীয় একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদরাসাতু'ল-মা'রিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন সুলতান আবূ ইসহাকের পুত্র আবূ যাকারিয়্যা' সূকু'ল-কুতুবিয়্যীন বা বইয়ের বাজারে। ইহাও মদ্যপায়ী লোকদের যাতায়াতের স্থানে একটি ফুন্দুকের জায়গাকে পবিত্রতা দানের জন্য সেইখানে নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে ইহার আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। সবশেষে নগর দেওয়াল অন্তত আংশিকভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়। সেই সঙ্গে বাব জাদীদ (নূতন দরওয়াজা), বাবু'ল-মানারা) (ইশারার দরওয়াজা) এবং সম্ভবত বাবু'ল-বানাত-ও, উহাও বর্তমানে আর নাই।

খৃ. ১৩০০ শতকের তিউনিস ছিল আজিকার স্থানীয় তিউনিস শহরের অনুরূপ। মদীনা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রসারিত, উহার পশ্চিমে কাসাবা বা কসবা, শাসকের সুরক্ষিত প্রাসাদ (তিনি শহর ও লা মানুবা সমভূমি–উভয় এলাকাতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন) এবং পূর্ব দিকে সর্বাপেক্ষা নিম্নাঞ্চলে বাবু'ল-বাহর, উহার ভেতর দিয়া প্রথমে অস্ত্রাগার এবং সেইখান হইতে লেগুনা বা উপহ্রদে যাইবার পথ। এই সড়কের মাঝামাঝি স্থানে এবং একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বড় মসজিদ। ইহার দরজা বরাবর নূতন সূকসমূহ চতুর্দিক ঘিরিয়া রহিয়াছে ঃ বাবু'ল-বুহূর (বাহর) নামটি দেওয়া হইয়াছে উত্তরের দরওয়াজাকে, কিন্তু পশ্চিমের দরওয়াজাকে আগে হইতেই বলা হইত বাবু'শ-শিফা'? প্রতিটি সূক প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সন্ধ্যা হইলেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাবু'র-রাব' এই একই নামীয় সূকের নিকটে অবস্থিত ছিল, বর্তমানেও সেইরূপই রহিয়াছে। উহা এই মহল্লা হইতে বাহির হইবার দক্ষিণের পথ। মদীনার চতুর্দিকে এবং প্রধান দরওয়াজাগুলির বাহিরে কিছু সংখ্যক শ্রমজীবী ব্যবসায়ীর শ্রেণীবিভক্ত দোকান ও প্রতিষ্ঠান বাবু'ল-জাযীরার ভিতরে ধোলাই ও রং-রিপুর কারিগরগণ, বাবু'ল-জাদীদে স্বর্ণ-রৌপ্যকার ও কর্মকারগণ, বাবু'ল-মানারাতে ঘোড়া ও উটের আসন নির্মাণকারিগণ। বাবু'ল-বাহরের সন্নিকটে নিঃসন্দেহে কয়েকটি ফুনদুক ছিল। সেইগুলির বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছিল খৃস্টান বণিকদিগকে। কিন্তু শেষোক্তগণ অধিকতর প্রশস্ত জায়গা পাইবার জন্য দরওয়াজার বাহিরে নিজেদের ছোট মহল্লা বা শহরতলী এলাকা গড়িয়া লইতে থাকে। উহাই ছিল য়ুরোপীয় মহল্লার প্রথম পরিকল্পনা। এই শহরের ঘরবাড়িগুলি একটির সঙ্গে আর একটি খুবই কাছাকাছি লাগানো ছিল। একটু খালি জায়গাও ফেলিয়া রাখা হয় নাই। বাজার নির্মাণের জন্য বা সভা-সমাবেশ করিবার জন্যও কোন একটু জায়গা ছিল না। ইব্ন মারদুমের বাতহা' সড়ক সংযোগ ছাড়া অন্য কোন কিছু ছিল না।

বাহিরের মহল্লাগুলি অবশ্য অধিকতর আধুনিক এবং সেইখানে লোকের ভিড়ও কম। সেইখানে বড় খোলা জায়গাতেই বাজার। মৃৎশিল্প ও আলফা ঘাসের জন্য বাব সৌইকা মহল্লা, পশুর জন্য (ঘোড়া ঃ আল-মুরকাদ; ভেড়ার জন্য ঃ রাহাবাতু'ল-গানাম) এবং সম্ভবত শস্যের জন্য বাবু'ল-জাযীরা মহল্লা। এই প্রতিটি মহল্লাই একেকটি বহিঃদেওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত। উহা গিয়া শেষ হইয়াছে কাসাবা বা কসবাতে; এই প্রথম প্রতিরক্ষা সারির দরওয়াজাগুলি হইল দক্ষিণের মহল্লাগুলির (কাবাদ) জন্য ঃ বাব খালিদ (আদিতে নিঃসন্দেহে ছিল বাবুল-মানসূর) পশ্চিমের; বাবু'ল-জুরজানী' দক্ষিণের; বাবু'ল-ফাল্লাক (ইহার বাহিরের দিকে একটি

কায়সারিয়্যা) এবং বাব 'হাওয়া (বাব আল্লেউয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে; উত্তরের মহল্লাগুলির জন্য, উত্তর-পূর্ব দিকে বাবু'ল-খাদরা', উত্তর-পশ্চিম দিকে বাব [আবী] সা'দূন এবং পশ্চিমে বাবু'ল-আকওয়াস, সম্ভবত বাবু'ল 'উলুযের সঙ্গে অভিন্ন, উহার প্রথম উল্লেখ পরে হয়। এই শেষ দরওয়াজার পার্শ্বেই 'উলূজদের রাবাদ অবস্থিত ছিল। উহাদিগকে বলা হইত রাবাতিন। তিউনিসের শাসকের অধীনে নিযুক্ত খৃস্টান ভাড়াটিয়া সৈন্য, যদি অবশ্য Leo Africanus একেবারে বিশেষভাবে বাবু'ল-মানারার বাহিরে নির্দেশ না করিয়া থাকেন। মূল কাসাবা বা কসবা সম্বন্ধে বলা যায় যে, উহার দুইটি দরওয়াজার মধ্যে একটি খুলিত গ্রাম এলাকার দিকে, বাবু'ল-গাদর (বা গাদ্দার=বিশ্বাসঘাতক), অপরটি খুলিত শহরের দিকে, বাব ইন্তাজামী (তু. তেল্‌মসেনের বাব ঈমাযতাজমি; দ্র. বুগয়াতু'র-রাওওয়াদ, সম্পা. Bel, ১খ., পৃ. ৩৪)।

বাব 'ইলাওয়া ও বাবু'ল-খাদরা'র মাঝখানে ছিল সকল খোলা নর্দমা (খান্দাক) যেইগুলিতে ছোট ছোট ড্রেন গিয়া পড়িত। সেইগুলি পূর্বমুখী প্রবাহিত হইয়া গিয়া হ্রদে পড়িত। গোরস্থান শহরের চতুর্দিকে ছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরতলী এলাকা ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতে থাকিলে কবরস্থানও ক্রমেই বাহিরের দিকেই সম্প্রসারিত হইতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিমে অধিকতর জনবিরল বিস্তীর্ণ জেল্লায (আল-যাল্লাজ) সূফী আবু'ল-হাসান আশ-শাযিলীর (পাশ্চাত্যে সিদি বেলহাসেন Sidi Belhassen নামে পরিচিত) স্মৃতি রক্ষিত আছে। তিনি শাযিলিয়্যা তারীকার প্রতিষ্ঠাতা, খৃ. ১৩শ শতকের প্রথমার্ধে তিনি এইখানে বাস করিতেন। বাবু'ল-জুরযানীর নিকটে, হিনতাতাগণের কবরস্থানের পার্শ্বে (আল-মাকবারা আল-হিনতাতিয়্যা) অনেক আওলিয়া-দরবেশের কবর রহিয়াছে। তাঁহাদের মানাকিব বা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের বিবরণীর অধিকাংশই এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়াছে। সেইগুলিতে হাফসী আমলের তিউনিসিয়ার মূল্যবান ভৌগোলিক বিবরণ রহিয়াছে। এই সকল তথ্য আল-যারকাশী বা ইবনু'শ্ -শামমা'র প্রদত্ত তথ্যের পরিপূরক। বিখ্যাত লাল্লা মান্নুবিয়্যা [দ্র.] (দ্র. J. A., 1899, p. 485-494 ও কিতাব মানাকিবি'স-সায়্যিদা 'আ'ইশা আল-মান্নূবিয়্যা, তিউনিস ১৩৪৪ খৃ.) ১২৬৭ খৃ. মারা যান, তাঁহার নামানুসারে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখামুখি একটি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। অনেক মহিলা এখনও সন্তান কামনায় এই মহিলা দরবেশের মাযারে গিয়া আল্লাহ্‌র কাছে মানত করিয়া থাকে।

এই সকল বিভিন্ন তারীকার প্রতিষ্ঠাতা আওলিয়া-দরবেশ বা মুরাবিতগণের রাজনৈতিক প্রভাব অনস্বীকার্য, সেইরূপ একজন ছিলেন আবূ মুহাম্মাদ আল-মারজানী। ইনি ভবিষ্যত খলীফা আবূ 'আসীদার শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু শহরে ক্রমেই বেশি সংখ্যায় আইনজীবী, বিদ্বান, পণ্ডিতজন ও ছাত্রদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আল-আবদারী ১২৮৯ খৃ. বর্ণনা করিয়াছেন যে, ধর্মীয় বিজ্ঞানসমূহ সেইখানে বিকাশ লাভ করে। খৃ. ১৩শ শতকের শেষভাগে কাদী ইবন যায়তূনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এইখানকার রম্যরচনা এবং মালিকী আইন বিকাশের ক্ষেত্রে স্পেন হইতে বিতাড়িত মুসলিম মুহাজিরগণ মূল্যবান অবদান রাখেনঃ ইবনু'ল-আব্বার ও কাদী'ল-কুদাত ইবনু'ল-গাম্‌মায ভ্যালেন্সিয়া হইতে আগমন করিয়াছিলেন; সেভীল হইতে আসিয়াছিলেন বানূ উসফূর ও বানূ খালদূনগণ। এই শেষোক্তগণ ছিলেন উত্তর আফ্রিকার সবচেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিকের পূর্বপুরুষ (জন্ম ১৩৩২ খৃ.)।

খৃ. ১৪শ শতক, যাহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন পর্যটক খালিদ আল-বালাবী (১৩৩৫-৪০ খৃ.), ছিল আইনবেত্তা ও ব্যাখ্যাতাগণের স্বর্ণযুগ; ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাদী'ল-কুদাতগণ ইব্‌ন 'আবদু'র-রাফী', ইব্‌ন 'আবদু'স-সালাম, 'ঈসা আল-গুবরীনী, কাদী ইব্‌ন রাশীদ আল-গাফসী, মুফতী ইব্‌ন হারূন ও বিশেষভাবে সুবিখ্যাত ইমাম ইব্‌ন 'আরাফা। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে শাসকগণের দুর্বলতা, অসন্তোষ ও নিরাপত্তাহীনতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। যাযাবর আরবরা তেমন কোন বাধার মুকাবিলা ছাড়াই রাজধানী আক্রমণের হুমকি প্রদর্শন করিতে থাকে। মারীনীগণ দুইবার তিউনিস দখল করিয়া লয়। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে নগর সম্প্রসারণ পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে যেইরূপ ব্যাপক উদ্যোগের সঙ্গে করা হইয়াছিল, এই শতাব্দীতে আসিয়া উহাতে স্থবিরতা দেখা দেয়, বরং বলা যায়, ক্ষয়িষ্ণুতাই লক্ষ করা যায়। তবে দুইটি মাদরাসা স্থাপিত হয়, একটি স্থাপন করেন ১৩৪১-২ খৃ. খলীফা আবূ য়াহ্‌য়া আবূ বাক্‌রের ভগ্নী, 'উনকীয়্যা মাদরাসা, পরবর্তীতে উহার সংস্কার সাধন করা হয়; অপর মাদরাসাটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন খলীফার ব্যক্তিগত কর্মচারী ইব্‌ন তাফরাগীন। কিন্তু সময়ের একটি চিহ্ন এই সময়ে দেখা দেয় যে, সামরিক প্রয়োজনে স্থাপত্যকার্যের উন্নতি হয়ঃ মারীনী আবু'ল হাসান ১৩৪৮ খৃ. কায়রাওয়ানে পরাজিত হইয়া আসিয়া তিউনিসের নগর দেওয়াল মেরামত করেন এবং উহার চতুর্দিকে পরিখা খনন করান। ইব্‌ন তাফরাগীন বাহিরের দেওয়াল অধিকতর মযবুত করেন এবং ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট হুবূস গঠন করেন। খৃ. ১৪শ শতকের পরে ১৫শ শতকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকখানি স্থিতিশীলতা লাভ করে। এই সময়ে নির্মাণকাজের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়, তবে খুব বড় আকারের কোন কিছু নির্মিত হয় নাই। আবূ ফারিস ও তাঁহার নাতি আবূ 'আমর 'উছমান-এর দীর্ঘ শাসনামলে তাঁহারা দুইটি লাইব্রেরী এবং কয়েকটি মাদরাসা স্থাপন করেন। উভয়েই দানশীল কাজে অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন। সেইগুলি হইল ঃ তিউনিসিয়ার সর্বপ্রাচীন মুসলিম হাসপাতাল (মারিস্তান), উহা ৮২৩/১৪২০ সালে নির্মিত হয় এবং শহরতলীতে অগণিত যাবিয়া নির্মিত হয় যেইগুলিতে দিনে ও রাত্রে অনুরাগী মানুষ আশ্রয় লইতে পারে। তাহা ছাড়া ছিল পানির ব্যবস্থা, এইগুলিও ধর্মীয় অনুভূতি হইতেই উৎসারিত ছিল ঃ মুসাল্লাতে বিরাট জলাধার (মা'জাল), সূক্‌'ল-'আত্তারীনে ৮৫৪/১৪৫০ নির্মিত একটি উযুখানা (মীদা'আ), পানীয় জলের চৌবাচ্চা (সিকায়া) এবং এক ধরনের সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী পানীয় জলের চৌবাচ্চা। সেইখান হইতে সরু নল দ্বারা (মাসসাসা) শুষিয়া পানি পান করা হইত। এই সকলের মধ্যেই একটা দুর্বল দয়ার্দ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, বিশাল শক্তিময় কিছু করিবার ক্ষমতা যেন তখন আর নাই, ধর্ম তখন ক্রমেই মুরাবিতগণের এবং বিভিন্ন তারীকাপন্থিগণের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলিয়া আসিতেছিল। এই আমলে কালজানী পরিবার ও বানূ আর-রাসসা' পরিবারের নাম পাওয়া যায় যাঁহারা আইনবেত্তা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। ১৪৫১ খৃ. বাব সৌইকার দেওয়ালের ঠিক বাহিরে তিউনিসের অষ্টম খুতবা প্রচলিত হয়; কিন্তু এই আমলের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন সীদী ইব্‌ন 'আরূস (দ্র. তাঁহার মানাকিব, তিউনিস ১৩০৩ খৃ.)। তিনি মরক্কো হইতে আগমন করিয়াছিলেন এবং ১৪৬৩ খৃ. নিজের যাবিয়াতে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন "আরূসীয়্যা তারীকার প্রতিষ্ঠাতা । সীদী কাসিম আল-জালীজী ছিলেন স্পেন হইতে আগত (মৃ. ১৪৯৭ খৃ.)। বাব খালিদের নিকটে তাঁহার মাযার-যাবিয়া এখন হইতে বাব সীদী কাসিম নামে পরিচিত হয়, স্প্যানিশ রীতিতে উহার টালির তৈরী ছাদ এবং সীদী মানসূর ইব্‌ন জিরদান। তিনি ১৪৯৯ খৃ. ইনতিকাল করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বহু ঘটনা সত্ত্বেও য়ুরোপের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষিত হয় এবং এমন কি ঘনিষ্ঠতরও হয়; আবূ ফারিসের আমলে, এমন কি তিনি তাহাদিগকে সকল কর মওকুফ (মাজবা) করিয়া দিবার আগেও কারখানা ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের গুরুত্ব কি পরিমাণ ছিল তাহা বুঝা যায় ১৪২০ খৃ. তুহফাতু'ল-আরাবী গ্রন্থ হইতে। উহার লেখক ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত ক্যাটালান Era Anselm turmeda. তিনি 'আবদুল্লাহ আল-তুরজুমান নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মাযার-সৌধ এখন পর্যন্ত আবুল-মানারার ভিতরে বর্তমান রহিয়াছে। প্রধান প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্রের মূল্যায়নে দেখা যায় যে, তৈল, শাক-সব্জি ও কাঠ-কয়লার ফুন্দুক ছিল, পিতলের কারুশিল্পিগণের একটি সূক ছিল (সূকু'স-সাফ্ফারীন), ঝুড়ি-টুকরি নির্মাণকারিগণের একটি সূক ছিল (সূকু'ল-আয্যাফিন), এখনও বর্তমান রহিয়াছে এল-আযাফিন এবং সাম্প্রতিক কালের সূকু'ল-কাশ্শাশিন (ইট বিক্রেতাগণ)। ইবনু'শ্-শাম্মা'-এর মতে সরকারীভাবে ১৩৬১ খৃ. বাড়ির সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৭০০০০; আর Leo Africanus-এর মতে ১৫১৬ খৃ. তাহা ১০.০০০-এ উন্নীত হয়। পর্যটক van Ghistele ১৪৮৫ খৃ. তিউনিসে খৃস্টানদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল সেই সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যাদি প্রদান করিয়াছেন। শাসকগণ তাঁহাদের পূর্ববর্তিগণের ঐতিহ্যকে আরও বর্ধিত করিয়া শহরের বাহিরে বসবাস করিতেন। প্রায়শ তাঁহাদের বারদো তা'লুকে থাকিতেন। এই সকল তিউনিসীয় "Prado"-এর উল্লেখ ১৪১০ খৃ. হইতেই পাওয়া যায়, প্রায়শ এইগুলির পরিবর্তন সাধন করা হইত, অল্পকালের মধ্যেই এক একটিতে বহু প্রাসাদ নির্মিত হইয়া যাইত। মারসার 'আবদাল্লীয়্যা প্রাসাদ ও বড় মসজিদের সংলগ্ন একই নামের কুতুবখানা (লাইব্রেরী) শেষ স্বাধীন হাফসী শাসক আবূ 'আবদুল্লাহ ১৫০০ খৃ. নির্মাণ করিয়াছিলেন।

খৃ. ১৬শ শতক ছিল এই হতভাগ্য শহরটির জন্য গোলযোগে পূর্ণ, তুর্কী ও স্প্যানীশগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের এই পর্যায়ে তিউনিস ছিল উভয়ের প্রধান লক্ষ্যস্থল। ১৫৩৪ খৃ. খায়রু'দ-দীন (দ্র.)-এর নৌবাহিনী এই শহর দখল করে। পরের বৎসর ৫ম চার্লসের বিজয়ী বাহিনী শহরটি লুণ্ঠন করে। খৃস্টান বাহিনী আসিয়া প্রবেশ করিবার পূর্বে শহরবাসিগণ বাবু'ল-ফাল্লাক দিয়া একযোগে পলায়ন করে। সেই কারণে পরবর্তী কালে সেই দরওয়াজাটির নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় বাবু'ল-ফাল্লাক (উচ্ছেদের দরওয়াজা)। হাফসী শাসকগণ অবস্থার যতটুকু উন্নতি করেন এবং যে অবস্থা বজায় রাখিতে সক্ষম হন তাহা অবশ্যই শহরটির উন্নয়নের জন্য খুব অনুকূল ছিল না। শাসকগণের সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল রক্ষাব্যবস্থার দিকে, সেই সঙ্গে পরিপূরক ছিল la Goulette-এর মেরামত ও নির্মাণ কাজ এবং এমন কি সেই সকল কাজও ১৫৭৩ খৃ. শরৎকালের আগে শেষ হয় নাই, উহার মধ্যেই অস্ট্রিয়ার ডন জন তিউনিসের গভর্নর কা'ইদ মারাদানকে সেইখান হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। রামাদান চারি বৎসর যাবত য়ূউনুস 'আলী কর্তৃক সেইখানে গভর্নর নিযুক্ত ছিলেন। কাসাবা বা কসবাকে অনেক মযবূত করা হয়, বিশেষ করিয়া অস্ত্রাগারের দিকে বেশি শক্তিশালী করা হয়। কারণ সম্ভবত কিছুকাল আগে উহা ধ্বংস করা হইয়া থাকিবে (দ্র. Grandchamp, R. T., 1914, পৃ. ৯-১০)। লেগূনের তীরে তারকা আকৃতির একটি কিল্লা নির্মাণ করা হয় এবং দুইটি ভূগর্ভস্থ পথ দ্বারা উহার সঙ্গে নগর দেওয়ালের সংযোগ করা হয়। ইহা ছিল ইব্ন আবূ দীনারের বুরূজ, ইহার নক্শা ১৫৭৫ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছিল (দ্র. Mochicourt, Essai bibl. sur les plans imprimes de...Tunis-Goulette au XVIeme siecle, R. Afr. 1925, p. 31)। কিন্তু সেই পরিশ্রম বৃথা যায়। স্প্যানিশ সেনাবাহিনী লুণ্ঠনের জন্য আসিতে থাকিলে অধিবাসিগণ শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় (দ্র. R. T., 1914, পৃ. ১২) এবং সেপ্টেম্বর ১৫৭৪ খৃ. তুর্কীরা এই বুরূজ দখল করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। সিনান পাশা তিউনিসে যথেষ্ট স্থিতিশীল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। উহার অল্পকাল পরে সেইখানে স্থাপত্যের নূতন বিকাশ ঘটিতে থাকে।

স্পেন হইতে মুহাজিরগণের আগমন কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু ১৬০৯ খৃ. রাজা ৩য় ফিলিপ সেইখানকার খৃস্টানকৃত মুসলমানগণকে (Moriscoes) ব্যাপকভাবে বিতাড়িত করিয়া দিলে তখন এই অভিবাসন অকস্মাৎ বিরাটভাবে বৃদ্ধি পায়; দে'উছমান উহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। যাহারা নগর জীবনে অভ্যস্ত ছিল তাহারা দুইটি আঞ্চলিক ভাগে তিউনিসে বসতি স্থাপন করে; স্প্যানিশদের সড়কে (মদীনার দ. প.) এবং স্প্যানিশ মহল্লাতে (হাওমাতু'ল-আন্দালুস, হালযাউমে প্রসাদের নিকটে)। স্পেন হইতে আগত এই মুসলিমগণই লাল টুপি বা শামীয়্যা তৈরি করিত। Peyssonnel-এর মতে উহারা বৎসরে ৪০,০০০ ডজন টুপি তৈরি করিত এবং ১৫,০০০-এর বেশি লোক এই পেশাতে নিয়োজিত ছিল। এই স্প্যানিশ মুসলমানগণ সেই সঙ্গে প্রাচ্য হইতে আগত হানাফী তুর্কীগণ এবং য়ুরোপীয় বংশোদ্ভূত দলছুটগণের আর জলদস্যুগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মিলিয়া খৃ. ১৬শ শতকের তিউনিসকে এক বিশেষ রূপদান করে। দে ১ম য়ূসুফ প্রথম জনকল্যাণমূলক কাজ করিয়া সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার কার্যাবলীর একটি তালিকা দিয়াছেন ইব্ন আবী দীনার, বাবু'ল-বানাতের চতুর্দিকে একটি বাণিজ্যিক এলাকা সৃষ্টি এবং সেই একই এলাকাতে পশমী বস্ত্রের একটি সূকের (আল-গাযল) সংস্কার কাজ, জেরবার সওদাগরগণের জন্য একটি সূক নির্মাণ, অন্যান্য কয়েকটি সুকের উন্নয়ন সাধন, হাফসী সূক উত্তর দিকে আরও সম্প্রসারণ, সুকু'ল-বাসামিকীয়্যা (তুর্কী পাজামা তৈয়ারকারিগণ, সীদী ইব্ন যিয়াদ সড়ক), সূকু'ল-বিরকা, এইখানে নিগ্রো দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হইত এবং সূক আত-তুর্ক, ইহা ছিল তুর্কী দরজীগণের বাজার; একটি কফিখানা স্থাপন, শহরের বিভিন্ন স্থানে পানি সরবরাহ, যেমন বড় মসজিদ সংলগ্ন এলাকা এবং সূকু'ত-তুর্কের উপরের এলাকা। সেইখানে তাঁহার প্রিয় 'আলী ছাবিত ১৬২০ খৃ. সুদৃশ্য মীদাআটি নির্মাণ করেন। বর্তমানেও উহা বেলভেডিয়ারের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি বাবু'ল-জাযীরার পুরাতন মসজিদটিরও সংস্কার সাধন করেন। বড় মসজিদের পূর্বদিকের দরওয়াজাটিও (বাবু'ল জানাইয) সম্ভবত এই সময়ে পুনঃনির্মিত হইয়া থাকিবে। য়ূসুফ ১৬২২ খৃ. সীদী ইব্ন যিয়াদ সড়কে একটি হানাফী মাদরাসা ও একটি হানাফী মসজিদ নির্মাণ করেন। উহার মিনার আটকোণা, সেই মসজিদের পাশেই তাঁহার মাযার। তাঁহার কালের পরেই দে-গণের ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়িতে থাকে। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে আর কেহ বড় কোন নির্মাণ কাজে হাত দেন নাই। আহমাদ খোজা (১৬৪০-৪৭ খৃ.) আশ্-শাম্মা'ইয়্যা ও আল-'উনকীয়্যা মাদরাসা দুইটি পুনঃ নির্মাণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন। মুহাম্মাদ লায ১৬৪৯ খৃ. আল-কাসর মসজিদের সংলগ্ন অদ্ভুত আকৃতির মিনারটি নির্মাণ করেন; ১৬৫৩ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হইলে কাসাবা চত্বরে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য একটি মাযার (তুরবা) নির্মাণ করা হয়।

মুরাদী বে-গণ যথেষ্ট নির্মাণ কাজ করেন; য়ূসুফ দে-এর মসজিদের একই নির্মাণ রীতিতে এবং উহার খুবই নিকটবর্তী সড়কের উপরে হাম্মুদা সীদী ইব্ন 'আরূস হানাফী মসজিদ নির্মাণ করেন (১৬৫৪ খৃ.)। উহার

পাশেই একটি পারিবারিক মাযার-সৌধও নির্মাণ করেন। বড় মসজিদের মিনারটিও তিনি পুনঃ নির্মাণ করেন। এল-আযাফিন সড়কের উপর তিনি একটি হাসপাতাল (মারিস্তান) নির্মাণ করেন এবং পানি প্রবাহ ব্যবস্থাটির (Aquaduct) পুনঃনির্মাণ শুরু করেন। তাঁহার পুত্র মুরাদ কাপড়-চোপড়ের সূকে ১৬৭৩ খৃ. মাদরাসা আল-মুরাদীয়া স্থাপন করেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মুহাম্মাদ আল-হাফসী শাশীয়্যার সূক স্থাপন করেন, আর তাঁহার নাতি মুহাম্মাদ এই শহরে সীদী মুহরিযের আদি মসজিদটি (১৬৭৫ খৃ. পরে) দান করেন। বলা হইয়া থাকে যে, ফরাসী স্থপতি Daviler গম্বুজগুলির পরিকল্পনা করিয়া দিয়াছিলেন। ১৬৬৬ খৃ. দিকে Chevalier d' Arvieux-এর স্মৃতিকথা হইতে (প্যারিস, ৪খ., ১৭৩৫ খৃ.) আমরা তিউনিসের চমৎকার বিবরণ পাই। ক্ষমতা খর্ব হইবার পূর্ব পর্যন্ত পাশাগণ প্রথমে কাসাবায় বাস করিতেন। উহার দুইটি প্রধান ভবন ছিল ঃ প্রথমটিতে দে-এর রক্ষীবাহিনী, কর্মকর্তাগণ ও তাঁহাদের পরিবার থাকিতেন; অপরটি ছিল উহার পিছনে, একটি দীর্ঘ হলঘর (আস-সাকীফা)। সেইখান হইতে দে সৈনিকগণকে দর্শন দিতেন। উহার দূরবর্তী অংশে ছিল তাঁহার ব্যক্তিগত বাসস্থান। দীওয়ানে আগা সেনাবাহিনীর কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। ইহা ছিল বড় আয়াতাকার চত্বর (ইহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. La Condamine in 1731, R. T., 1898, p. 86); চারাআ (আল-শার')-এর ধর্মীয় বিচারালয় এখনও এইখানে বসে। মদীনার পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিকের জিলা (বিশেষ করিয়া Ru du Pacha এলাকা) অভিজাত এলাকা, আসল তুর্কী মহল্লায়। দে-গণের এবং অন্যান্য উচ্চ অভিজাতের বিলাসবহুল ভবনগুলিতে মার্বেল বসানো ছিল, সবগুলিরই মাঝখানে থাকিত একটি চত্বর। সেইখানে কোথাও কোথাও আরামদায়ক তাঁবু, আবার কোনখানে ছোট পুকুর থাকিত। আসবাবপত্র ও সাজসজ্জাতে ইতিমধ্যেই নিম্ন মানের ইতালীয় অনুকরণ দেখা দিয়াছিল।

জলদস্যুগণের কার্যকলাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধির সঙ্গে খৃস্টান ক্রীতদাসগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে (১৬৫৪ খৃ. ৬,০০০, তাহাদের জীবন সম্বন্ধে জানিবার জন্য দ্র. Rignon, R. T., 1930, p.18)। ফলে উহাদের অদ্ভুত জেলখানাগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেইগুলির ভিতরে যে ক্ষুদ্র উপাসনালয় থাকিত সেইগুলি যে খৃস্টান সাধুর নামে উৎসর্গীকৃত হইত, জেলখানাগুলিও সেই নামেই পরিচিত হইত। ফাদার ড্যানের নামে ১৬৩৫ খৃ. ৯টি ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সেইখানে মোট ১৩টি হয়। P. Grandchamp-এর সঙ্গে (দ্র. La France en Tunisie au XVII evne siecle, Avantpropos dest. VI et VII, Tunis 1928-9) একমত হইয়া যদি St. Vincent de Paul মে ১৬০৫-০৭ খৃ. পর্যন্ত তিউনিসে বন্দী থাকার গল্পকে জনশ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে অপরপক্ষে লাযারীয় Julien Guerin যে ১৬৪৫-৪৮ খৃ. পর্যন্ত এইখানে প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে দে আহমাদ খোজার পুত্র মুহাম্মাদ চেলেবীকে (বিখ্যাত Don Philip) ধর্মান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই ঘটনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। অপর একজন ধর্ম প্রচারক Jean le Vacher, যিনি ১৬৪৮-৫৩ খৃ. এবং ১৬৫৭-৬৬ খৃ. পর্যন্ত ফ্রান্সের কনসাল ছিলেন তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথাও স্মরণে রাখিতে হইবে (দ্র. R. Gleizes, Jean la Vacher, Paris 1914 and in Revue der questions histor. July 1928)। তাঁহার সময়েই কনসুলেটে প্রথম সর্বসাধারণের প্রার্থনার জন্য একটি চ্যানেল নির্মিত হয় এবং উহা সেন্ট লুই-এর নামে উৎসর্গ করা হয়। তিনিই প্রথম রোমান ক্যাথলিক গোরস্থানের মাঝখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত সেন্ট এন্টনী গির্জাটি পুনঃনির্মাণ করান, উহার চতুর্দিকে উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করান। উহা ছিল বাবু'ল-বাহারের বাহিরে, বর্তমানে যেইখানে ক্যাথেড্রাল সেইখানে। তিনিই জেলের বন্দীগণের জন্য উপাসনার ব্যবস্থা করেন, তিনিই দীওয়ানেরর নিকট হইতে অনুমতি ও যমিন লাভ করিয়া নূতন একটি ফরাসী কনসুলেট বা "ফরাসীগণের ফুনদুক" নির্মাণ করান। উহা শেষ হয় ১৬৬১ খৃ. (rue de l'Ancienne-Douane, Grandchamp পূ. গ্র., ৬খ., পৃ. ২২-৩২)। ১৬৭২ খৃ. হইতে ইতালীয় ক্যাপুচিনগণ মিশনের দায়িত্বে ছিলেন, আনু. ১৭৩০ খৃ. St.Gervais তাঁহাদের বাড়িগুলির বিবরণ প্রদান করেন (দ্র. Memoires Historiques, প্যারিস ১৭৩৬ খৃ., পৃ. ৮৬)। তিনি গ্রীক চার্চ এবং সুসজ্জিত খৃস্টান ত্রিত্ববাদিগণের হাসপাতালেরও বর্ণনা দিয়াছেন। প্রোটেস্টান্টগণকে কবর দেওয়া হইত বাব কারতাজান্নার বাহিরে সেন্ট জর্জ গোরস্থানে। বর্তমানে সেইখানে ইংলিশ গির্জা অবস্থিত। দূতাবাসের আশ্রয় পাওয়া সত্ত্বেও খৃস্টান ব্যবসায়িগণ কখনও সংখ্যায় খুব বেশি হইতে পারে নাই। ফরাসী 'জাতি' দীর্ঘকাল পর্যন্ত মাত্র ছয়জন ব্যবসায়ীর মধ্যে সীমিত ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত য়াহূদীগণের হাতে নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে স্পেন ও পর্তুগাল হইতে আসা আশ্রয় গ্রহণকারিগণ (১৪৯২ ও ১৪৯৬ খৃ. বিতাড়িত) যাহারা সরাসরি অথবা ইতালী হইয়া আসিয়াছিল তাহাদিগকে পুরানা তিউনিসীয়গণ হইতে (তাওয়ানসা) আলাদা করিয়া গণ্য করা হইত; পর্তুগীজ বা লিভনীজগণ (গ্রানা) শেষ পর্যন্ত একটি আলাদা সমাজ গঠন করে; তাহাদের নামেই সূক এল-গ্রানা-এর নামকরণ হয়। য়াহূদী গোরস্থান ছিল নগর দেওয়ালের বাহিরে, বাব সূইকা মহল্লার পূর্বদিকে, বর্তমান Rue Sidi Sifiane-এর নিকটে। অতঃপর উহা দক্ষিণদিকে প্রসারিত হয়।

খৃ. ১৭শ শতকের শেষ এবং ১৮শ শতকের শুরুতে যে রাজনৈতিক গোলযোগ চলিতে থাকে সেই সময়ে আলজিরীয়গণ দুইবার তিউনিস দখল করে (১৬৬৬ এবং ১৬৯৪ খৃ.)। উভয়বারই বিশৃঙ্খলা ও রক্তপাত হয়। নগর দেওয়াল প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে নাই। উহারা কোন প্রতিরক্ষা রীতি অনুসরণ করে নাই। কেননা দেওয়ালের সঙ্গে কিছু পরে পরে চতুষ্কোণাকার বুরুজগুলিকে উহারা কোন প্রতিরক্ষা বলিয়াই মনে করে নাই। পুনরায় এমন কি হুসায়নীগণের শাসনাধীনে থাকিবার সময়েও তিউনিস আবার আলজিরীয়গণের দ্বারা অধিকৃত হয়। শেষোক্তগণ ১৭৩৫ খৃ. এই শহর লুণ্ঠন করে; ১৭৩৬ খৃ. উহাদিগকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে তিউনিসীয়গণ 'আলী পাশা ও তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদের সহায়তায় বৃথাই অতি দ্রুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নির্মাণ করে; পরিখা খনন করা হয়, ইহার সঙ্গে ছিদ্র পথ ও জাবাল জেল্লাম ও মান্নুবীয়্যাতে সাম্প্রতিক কালে নির্মিত দুইটি কিল্লার সংযোগ একটি পরিখা করা হয়। কাসাবার পিছনে একটি সুরক্ষিত রক্ষা দেওয়ালও নির্মিত হয়। এই আমলের আরও দুইটি কিল্লার উল্লেখ পাওয়া যায়, উত্তর-পশ্চিমে কিঞ্চিৎ উচ্চ ও দৃশ্যমান স্থানে প্রায় মুকুটস্বরূপ সেই দুইটি অবস্থিত ছিল। নিঃসন্দেহে এইগুলি হইতেছে বুরুজ আসা-সাওয়ারা বা তাহূনাতু'র-রীহ্ (অর্থাৎ হাওয়া কলের; ইহা স্প্যানিশগণের দুর্গ) ও বুরুজ আল-রাবিতা (বে-গণের খাদ্যগুদামের ইহাই রাবতা), একটু দূরে ইহার পার্শ্বে নির্মিত হইয়াছে ছোট বুরুজ ফিলফিল (দ্র. Plantet, Corresp..Tunis, ২খ., পৃ. ৫০১ এবং ১৮২৯ খৃ. জন্য ঃ Monchicourt, Relations inedites... Filippi.., পৃ. ৪৭ ও ৯১)।

শান্তির অবকাশের সময়ে এই শহরটি অন্যান্য সুদৃশ্য ভবন দ্বারাও সমৃদ্ধ হয়। নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হুসায়ন ইব্ন 'আলীর

শাসনামলে দে 'উছমান-এর নাতনী শাহযাদী 'আযীযা 'উছমানা ১৭১০ খৃ. মারা যান এবং তাঁহাকে মাদরাসা আশ-শাম্মাইয়্যার কাছে সমাহিত করা হয়। এই দানশীলা নারীর উদার দানশীলতায় অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। হুসায়ন নিজেও একজন বড় নির্মাতা ছিলেন। তিনি মদীনার দক্ষিণাংশের মহল্লাতে জামি'উ'ল-জাদীদ (ধোলাই ও রঙকারকগণের মসজিদ) নির্মাণ করেন। উহার মিনারটি আটকোণা। সূকু'স-সাক্কাজীন (সাজসরঞ্জাম নির্মাণকারী) সংলগ্ন সড়ক ও ভবনসমূহের পরিকল্পনা তিনিই করেন। তাঁহার শাসনামলেই আল-কাসর মসজিদের পার্শ্বে দে কারা মুসতাফার মাযার সৌধটি নির্মাণ করা হয়। তিনিই সরকারের শাসনকেন্দ্র বারদোতে স্থানান্তর করেন। বিগত শতকে ধর্মীয় শিক্ষার যে অগ্রগতির প্রশংসা করিয়াছিলেন ইব্ন আবী দীনার (দ্র. পৃ. ৩৯৯; অনু. পৃ. ৫০৬), এই শতকে উহার পতন সূচিত হইলেও তিনি মাদরাসা নির্মাণে যথার্থ আগ্রহ দেখান, যথা মাদরাসাতু'ন-নাখলা (খেজুর মাদরাসা), মাদরাসা আল-হুসায়নিয়্যা, মাদরাসা আল-জাদীদা। তাঁহার ঠিক পরবর্তী শাসক 'আলী পাশা তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া চারিটি মাদরাসা স্থাপন করেন। বই বিক্রেতাগণের সূক আল-বাশিয়্যা, তাঁহার মৃত পুত্রের স্মৃতিতে আস-সুলায়মানিয়্যা, বি'র আল-হিজার মাদরাসা এবং হাওয়ানীত 'আশুর মাদরাসা; কিছুকাল পরে 'আলী বে আরও একটি মাদরাসা জাদীদা স্থাপন করেন। এই একই 'আলী বে ধোলাই ও রংকারকগণের মসজিদের নিকটে হুসায়নীগণের মাযার (তুরবাতু'ল-বে) এবং অসহায় বৃদ্ধগণের একটি আবাস আত-তাকিয়্যা নির্মাণ করেন (১৭৭৫ খৃ.)। ১৮০০ খৃ. দিকে বিখ্যাত উযীর ও দস্তিদার য়ূসুফ সাহিব আত্-তাবা' হালফাবীন চত্বরে নিজ নামের মসজিদটি নির্মাণ করেন, সম্ভবত উঁচু, বাহিরের সারি হইতে যেইরূপ বুঝা যায়, উহা নির্মিত হইয়াছিল মাসজিদু'ল-মু'আল্লাক 'আলা'ল-হালফাবিয়ীন যেইখানে অবস্থিত ছিল সেইখানে। ইব্ন নাজী খৃ. ১৪শ শতকে সেই মসজিদের উল্লেখ করিয়াছিলেন (দ্র. ৪খ., পৃ. ১৪৯)। একই মহল্লাতে তিনি ১৮০৪ খৃ. বাব সীদী 'আবদু'স সালামের ভিতরে হালফাবীন চৌবাচ্চা নির্মাণ করেন এবং শহরের অপর প্রান্তে বাব আল্লেওয়াতে একটি বড় জলাধার নির্মাণ করেন।

তাঁহার সার্বভৌম শাসক হাম্মূদা পাশা কাসাবার একটু উপরে দারু'ল-বে নির্মাণ শেষ করিয়াছিলেন (১৮১৬ খৃ. Caroline Brunswick সেইখানে অবস্থান করিয়াছিলেন), তিনি সামরিক নির্মাণ কাজ ও সেনা ছাউনি নির্মাণেই নিজের সকল শক্তি নিয়োজিত করেন, বিশেষ করিয়া আলজিরীয় আক্রমণ হইতে তিউনিসকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি একজন ওলন্দাজ কারিগর দ্বারা বাহিরের দেওয়াল পুনঃনির্মাণ করেন। দরওয়াজা সংলগ্ন বুরূজের গায়ের শিলালিপি অনুযায়ী এই নির্মাণ কাজ ১৭৯৭ হইতে ১৮০৪ খৃ. পর্যন্ত চলে। দক্ষিণ দিকে ইহার কাজ কখনও শেষ হয় নাই (দ্র. H. Hugon, R. T., 1905, p. 373; and G. Dolot; R. T., 1908, p. 298)। এই দিকে তাঁহারা নিশ্চিত ছিলেন যে, 'আলী পাশা যে সম্মুখভাগে খন্দক খনন করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঘর-বাড়িগুলির বাহিরের দেওয়ালগুলি একের সঙ্গে অপরটি লাগিয়া থাকাতে একটানা রক্ষা দেওয়ালের মতই হইয়া গিয়াছিল এবং উহাকেই প্রতিরোধের বিষয়ে যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়। হাম্মূদা ১৭৯৮ খৃ. আল-মানৌবাতে নিজের সুবিশাল প্রাসাদ সংলগ্ন এলাকাতে ছাউনি নির্মাণ করেন এবং জীবনের শেষ প্রান্তে ১৮১৪ খৃ. সূকু'ল-'আত্তারীনের মধ্যস্থলে অন্যান্য ছাউনি নির্মাণ করেন (পরে সেইখানে Bibliotheque Publique ও Direction des Antiquites; দ্র. M. Hondas, Note sur trois inscriptions de Tunis, in Bull, Archeol, 1911)। একই আমলে মদীনাতে আরও অনেক ছাউনি নির্মিত হয়; Rue de al Caserne (আল-কাশলা, পরে সেইখানে Societe Francaise de Bienfaisance স্থানান্তরিত হয়), Rue de l'Eglise (পরে সেইখানে হাবূসগণের প্রশাসনিক দফতর হয়), Rue des Moniquettes, rue sidi B. Ziyad; কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় ছিল ১ম রেজিমেন্টের ছাউনি (বিরিনজি আলায়, পরে উহা হয় Caserne Saussier)। উহা নির্মিত হয় যুরকাদের নিকটে, সাবেক মুসাল্লা যেইখানে ছিল সেইখানে। নির্মাণ করিয়াছিলেন বে হুসায়ন ইব্ন মাহমূদ, পরে তাঁহার ভাই মুসতাফা (১৮৩৫-৬ খৃ.)। একটি গোলন্দাজ ডিপো (পরে উহা হয় Gaserne Forgemol) ১৮৩৯ খৃ. শহরের বাহিরে নির্মাণ করিয়াছিলেন আহমাদ বে, তিনিই ছিলেন তিউনিসীয় সেনাবাহিনীর স্রষ্টা। 'আলী পাশা সেইখানে দুইবার (১৭৪৩ ও ১৭৪৪ খৃ.) ফ্রান্সের তুঁলো হইতে ঢালাইকার আনাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা একটি জরুরী কারখানাতে কয়েকটি কামান মেরামত করিয়াছিল। হাম্মূদা পাশার আমলে হাফসিয়া প্রসাদের একাংশে কয়েকজন ফরাসীর স্থায়ী তত্ত্বাবধানে একটি নিয়মিত ঢালাইখানা গড়িয়া তোলেন; প্রাসাদটি হাফসিয়া নামে পরিচিত; এই একই নামের সড়কের উপরে অবস্থিত। সবশেষে উল্লেখ করা যায় দবদবার (দাবদাবা) কথা (দ্র. R. T., 1922, p. 276), সেইখানে সেনাবাহিনীর জন্য রুটি ও তৈল উৎপাদন করা হইত (Rue Dabdaba, দারু'ল-বে এবং Rue des Teinturies-এর সামান্য উত্তরে)।

এই সকল সামরিক নির্মাণ কাজ যখন তিউনিসকে একটি সামরিক শহরে রূপান্তরিত করিতেছিল বলিয়া মনে হইতেছিল তখন য়ূরোপীয় উপনিবেশ, যেইগুলি ফ্রান্স কর্তৃক আলজিরিয়া দখল (১৮৩০ খৃ.) এবং বে-এর সংস্কারের ফলে প্রতিদিনই অধিকতর স্বাধীনতার সঙ্গে সম্প্রসারিত হইতেছিল, মদীনাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিল। খৃস্টানগণ দোকান খুলিতে থাকে। পুরানা চার্চ অব দি হোলি ক্রস (Rue de la Kasbah; ১৮৩৩ খৃ. ত্রিত্ববাদিগণের Rue de l'Eglise, পুরানা হাসপাতালে উঠিয়া যায় ১৮৩৩ খৃ.) ছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় ভবন নির্মিত হইতে থাকে, সেইগুলিতে রক্ষিত রেজিস্টারসমূহ তিউনিসিয়াতে রোমান ক্যাথলিকবাদের ইতিহাসের জন্য বিশেষ মূল্যবান। ১৮৩১ খৃ. সুলেমাতে ইতালীয় স্কুল খোলা হয়, য়াহূদীগণের স্কুল খোলা হয় ১৮৪০ খৃ. মোরপারগোতে। ১৮৪১ খৃ. বোরগাদে কলেজ খোলা হয় যানাকাতু'ল-বাবাসে (Impasse de Missionaire)। Place de la Bourse (পরবর্তী কালে নামকরণ Place du Cardinal Lavigerie)-এর সমগ্র এলাকা, সেই সঙ্গে Rue de l'Ancienne-Douane, Des glacieres এবং de la Commission সম্পূর্ণ য়ূরোপীয় হইয়া গিয়াছিল। নগর দেওয়ালের বাহিরে আধুনিক শহর হ্রদের দিকে সম্প্রসারিত হইতে থাকে; ফরাসী কনস্যুলেট ১৮৬১ খৃ. যে ভবনে স্থানান্তরিত হয় পরবর্তী কালে উহা হয় রেসিডেন্স জেনারেল। অন্যান্য দূতাবাসও, যথা স্পেনের দূতাবাস (Rue Sidi el-Buni), গ্রেট ব্রিটেনের Place, du Cardinal Lavigerie, ইতালীর Rue Zarkoun, দীর্ঘকাল শহরের ভিতরে থাকে। পরে সেইগুলি স্থানান্তরিত হয়।

য়ূরোপীয় প্রভাব ক্রমেই এত প্রবল হইতে থাকে যে, শেষ পর্যন্ত উহা শহরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। হাফসীগণের আমলে দুইটি Fauboargs-এর প্রতিটিতে একজন করিয়া শায়খ ছিলেন, সম্ভবত শায়খু'ল-মাদীনার অধীনে ঃ এই তিনজন কর্মকর্তাকে তুর্কী

শাসনামলেও রাখা হয়। তাঁহাদিগকে সহায়তার জন্য নাগরিকগণের পালাক্রমে পাহারার ব্যবস্থা ছিল (লাওয়াজা)। তাহাদের দায়িত্ব ছিল দেখা যে, রাত্রে দরওয়াজা বন্ধ হইয়া যাইবার পরে শহরে পুলিশের ব্যবস্থা থাকে। তাঁহাদের নীচে মুহাররিকগণ ছিলেন মহল্লার প্রধান। হুসায়নীগণের আমলে দিবা পুলিশের ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল দাওলাতলীর । এই বেচারা দে-এর অধীনে ছিল ৫০ জন হানবা এবং ৫৫ জন কাবিজী (দ্র. E. Pellissier, Descr, de la regence de Tunis, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৫২-৩)। তিনি পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটরূপে সীদী ইব্ন 'আরূস সড়কে দ্রিবা নামে পরিচিত সুদীর্ঘ হলঘরে বসিতেন। কাসাবা আলাদাভাবে শাসন করিতেন একজন আগা। ১৮৫৮ খৃ. একটি মিউনিসিপাল কাউন্সিল গঠন করা হয় (একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি, একজন সচিব এবং বারোজন বিশিষ্ট নাগরিক)। উহার বাজেটের উৎস ছিল মদের উপরে আরোপিত করা। ১৮৬০ খৃ. দাওয়ালতলীর স্থলে একজন সেনাপতি (ফারীক) দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহার অধীনে দাবিতীয়্যাগণ থাকিতেন। শহরটিকে আধুনিক করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, আলজিয়ার্সে একটি টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয়, লা গৌলেত পর্যন্ত রেল সড়ক বসানো হয়; নর্দমার ব্যবস্থা করা হয়; ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার Colin-এর দায়িত্বে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়। এই সময়ে পানির উঁচু টাওয়ার নির্মিত হয়। আগে ছিল মুখ ঢাকা জলাধার (খাজনা), পূর্বের শতকে খাজনা অবস্থিত ছিল বাহিরের দেওয়ারের বা সীদী 'আবদুল্লাহ-এর সংলগ্ন স্থানে, কাসাবার সঙ্গে।

এই ধরনের আধুনিক কাজ করিবার ফলে বড় কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ভবন নির্মাণের সুযোগ আর খুব বেশি ছিল না; তবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হইল সীদী ইবরাহীম আর-রিয়াহীর যাবিয়া (ওফাত ১৮৫০ খৃ.; দ্র. R. T., ১৯১৮ পৃ. ১২৪ এবং হুসায়নী আমলের আইনবেত্তাগণের বিষয়ে আস-সানূসী, মুসামারাতু'জ-জারীফ, তিউনিস, তা. বি.), ইনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পরে আর কখনও সেই শ্রদ্ধাবোধ কমে নাই। ১৮৭৫ খৃ. সাদিকী কলেজ স্থাপন করা হয় De l'Eglise-এর ছাউনিতে। বে মুহাম্মাদ আস-সাদিক-এর নামে নামকরণ হয়। ১৯৮০ খৃ. সাদিকী হাসপাতাল নির্মিত হয়। বড় অট্টালিকার মধ্যে, যার্রূক প্রাসাদে (Rue des Juges) প্রথমে বে-গণ বাস করিতেন। দার হুসায়ন (পরে নাম Palais de la Division) খৃ. ১৮শ শতকে বে-এর জনৈক মন্ত্রী কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৮৭৬ খৃ. উহার সংস্কার করা হয়; খায়রু'দ-দীন প্রাসাদ পুরানা হাফসিয়া প্রাসাদের সম্প্রসারণ আশ্রিত রাজ্য হইবার প্রথম দিকে কিছুকাল বিচারালয় ছিল Rue du Tribunal); মুসতাফা ইব্ন ইসমা'ঈল প্রাসাদ ছিল Rue du pasha-তে; খাজনাদার প্রাসাদে (হালফাবীন প্রাসাদ, Ru du Palais) য়াহূদী হাসপাতাল, দীর্ঘদিন উহা অব্যবহৃত পড়িয়াছিল। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত শতকের মাঝমাঝি সময়ে 'আলী পাশার বিরুদ্ধে হুসায়ন ইব্ন 'আলীর পুত্রগণ যখন বিদ্রোহ করেন তখন হালফাবীন মহল্লাতে বসবাসরত বিশ্বস্ত হুসায়নিয়াগণ বে-এর অনুগ্রহভাজন ছিলেন, তাহা বাবু'ল-জাযীরার মহল্লাবাসিগণের স্বার্থের বিরোধী ছিল। উহা ছিল বাশীয়্যাগণের বিরোধী সাফগণের শক্তিকেন্দ্র (দ্র. R. T. ১৯১৮ খৃ., পৃ. ৩১৪)

১৮৮১ খৃ. ফরাসী অধিকারের পর হইতে তিউনিসে ব্যাপক উন্নয়ন কাজ চলিতে থাকে। য়ূরোপীয় শহর অংশ Porte de France (সাবেক বাবু'ল-বাহর) হইতে লেগূন বা উপহ্রদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, সেইখানে অবতরণের ঘাটিসমূহ ছিল ঃ এই এলাকা প্রসারিত ছিল বেলভেডিয়ার ভবন হইতে জেল্লায় পর্যন্ত। অতঃপর দক্ষিণের মহল্লাগুলির দক্ষিণ দিকে দেওয়ালের ভিতরে কিছু, বাহিরে কিছু, Montflurey-এর সমগ্র উঁচু এলাকা ব্যাপিয়া। বাহিরের দেওয়াল অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। মদীনার দেওয়ালের অল্প কয়টি দরওয়াজা ছাড়া বাদবাকি সবই অদৃশ্য হইয়াছে। কাসাবা সম্পূর্ণ পুনঃনির্মিত হয়, কিছুকাল উহা ছাউনিরূপে ব্যবহৃত হয়। দারু'ল-বে ভবনে Direction de l'Interieur ছিল; অন্যান্য অফিস ভবন, নূতন সাদিকী কলেজ (১৮৯৭ খৃ.) এবং Palais de Justice পরবর্তী কালে নির্মিত ভবন, এগুলি বাব বেনাত বুলভার ধরিয়া Place de la Kasbah হইতে বিস্তৃত। একটি বৈদ্যুতিক ট্রামপথ মদীনার চতুর্দিক দিয়া চলাচল করে। কিন্তু মদীনার ভিতরে লাইন যায় নাই। শহরটির প্রাচ্যদেশীয় রূপ রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হয়। কয়েকটি ভবন আদিতে যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল পরে পরাধীনতার যুগে সেইগুলি ভিন্ন প্রয়োজনেও ব্যবহার করা হয়, কিন্তু শহরটির সাধারণ রূপ সেই যুগেও পঞ্চাশ বৎসর আগের মতই ছিল। ধর্মীয় শিক্ষা বড় মসজিদেই কেন্দ্রীভূত থাকে, উহার মিনারাটি ১৮৯৪ খৃ. সম্পূর্ণ পুনঃ নির্মিত হয়; ১৮৯৬ খৃ. রেসিডেন্ট মিল্লাত সূকু'ল-আত্তারীনে খালদূনিয়্যা স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য ছিল তরুণ মুসলমানদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দান করা। সূকগুলি স্থানীয় ব্যবসায়কে গীল্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়, প্রতি গীল্ডের প্রধান হন একজন আমীন। ইহাদের কোন কোনটিতে যথেষ্ট সংখ্যক পর্যটকের আগমন ঘটে এবং তখন "প্রাচ্যদেশীয়" বিভিন্ন সামগ্রীর যথেষ্ট ক্রয়-বিক্রয় হয়, যেমন সুগন্ধি দ্রব্যাদি, গালিচা ও চামড়ার দ্রব্যাদি। বই-কিতাবের সূকে ও সূক'ল-বেরকাতে কর্মচারিগণ হাঁকিয়া ডাকিয়া বই ও অলংকার বিক্রয় করিয়া থাকে। য়াহূদী বসতিগুলির খুবই দুরবস্থা ছিল। সেইখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে যাহাদের যথেষ্ট সম্পদ ছিল তাহারা Place des Potiers-এর নিকটে বা য়ূরোপীয় মহল্লাতে গিয়া বসবাস করিতে থাকে। পরবর্তী কালে সেই পুরাতন মহল্লাগুলিতে প্রশস্ত সড়ক ও আধুনিক ভবনসমূহ নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ফরাসী শাসনামলে মুসলিমগণ পুরানা শহর এলাকাতেই বাস করিত, কিছু সংখ্যক মাত্র ধনী পরিবার অভিজাত এলাকাতে, যথা ঃ Avenue de Paris-এ গিয়া বিলাসবহুল ভিলাতে থাকিতেন এবং নূতন ভবনসমূহের কিছু সংখ্যক আমীন নূতন গ্রাম এল ওমরানে থাকিতেন (বেলভেডিয়ারের দ.প.)। সবশেষে একটু দূরবর্তী শহরতলী এলাকাগুলির ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার উল্লেখ অবশ্যই করিতে হয় (যথা রাদেস ও কার্থেজ লা মারসা)। সেই সকল এলাকাতে য়ূরোপীয়, মুসলিম ও য়াহূদীগণ সকলে এক ও অভিন্ন তিউনিস গঠন করে।

অক্টোবর ১৮৮৩ খৃ.-এর একটি ফরমান দ্বারা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয়। পরে ১৮৮৮ ও ১৯১৪ খৃ. ফরমান দ্বারা আশ্রিত রাজ্যটির কম্যুনগুলি পুনর্গঠন করা হয়। পৌর কাউন্সিলের একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি (আগে দুইজনই ফরাসী হইতেন) এবং ১৭ জন সদস্য ফরমান দ্বারা নিযুক্ত হইত (আগে ছিলেন ৮ জন য়ূরোপীয়, ৪ জন মুসলিম ও ১ জন তিউনিসীয় য়াহূদী)। ১৯২৬ খৃ. আদমশুমারি অনুযায়ী তিউনিস শহরের মোট অধিবাসী ছিল ১,৮৫,৯৯৬ জন, বিভক্ত ছিল এইভাবে ঃ ফরাসী ২৭,৯২২ অন্যান্য য়ূরোপীয় ৫১,২১৪ জন, স্থানীয় মুসলিম ৮২,৭২৯ জন; তিউনিসীয় য়াহূদী ২৪,১৩১ জন।

[ফ্রান্সের অধীনতা হইতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পরে তিউনিসিয়া এবং রাজধানী তিউনিস শহর ও বন্দরের অত্যন্ত দ্রুত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। একটি রাষ্ট্রীয় ফরমানবলে দেশের সকল

এলাকার উপর হইতে বিদেশী অধিকার বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ফরাসী, ইতালীয় এবং অন্যান্য য়ূরোপীয়গণের প্রায় সকলে এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়, য়াহূদীগণেরও অনেকে চলিয়া যায়। রাজধানী শহরের ইতিপূর্বেকার দেশীয় ও য়ূরোপীয় এলাকার বিভেদ ঘুচিয়া সমগ্র তিউনিস শহর ও বন্দর এক ও অভিন্ন একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের আধুনিক রাজধানীতে পরিণত হয়। নূতন নূতন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে শহরের অতি দ্রুত অগ্রগতি সাধিত হইতে থাকে। বন্দরের উন্নয়ন, নৌশক্তি বৃদ্ধি, নগরের সকল অত্যাধুনিক কল্যাণকর ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে তিউনিস এখন একটি ক্রমবর্ধমান আধুনিক শহর। ১৯৮১ খৃ. আদমশুমারি অনুযায়ী এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ৬,০০,০০০। তাহাদের অধিকাংশই মুসলিম। এই পরিবর্তনের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যের জন্য নীচের নিবন্ধ তিউনিসিয়া দ্র., অনু.]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সালাহুদ-দীন, Tunis Kairouan, প্যারিস ১৯০৮ খৃ. (মন্তব্যসমূহ যাচাই করিয়া নিবার প্রয়োজন রহিয়াছে); (২) Dessort (অন্যের সঙ্গে মিলিতভাবে), Histoire de la ville de Tunis, আলজিয়ার্স ১৯২৪ খৃ. (বইখানির একমাত্র প্রয়োজনীয় অধ্যায় হইতেছে উহার যেইখানে পরাধীনতার আগে ১৯শ খৃ. তিউনিসে য়ূরোপীয়গণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে); (৩) G. Marcais, Manuel d'art musulman, L'Architecture, ২খ., প্যারিস ১৯২৬-৭ খৃ. (বইখানিতে প্রধান প্রধান স্থাপত্যকীর্তির চমৎকার বর্ণনা রহিয়াছে, পৃ. ৮৭১-৫, এইখানি তিউনিসের মুসলিম প্রাসাদসমূহের আলোচনা গ্রন্থ)। নিবন্ধের মূল পাঠেও কিছু কিছু বরাত দেওয়া হইয়াছে, তিউনিসিয়া নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীও দ্র.।

Robert Brunschrvig (E.I.[1])/ হুমায়ুন খান

তিউনিসিয়া (تونسيا) ঃ উত্তর আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরের উপকূলে লিবিয়া ও আলজিরিয়ার মাঝখানে অবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র। বার্বারীর পূর্বের ঢাল অঞ্চল লইয়া গঠিত, মধ্যযুগে আরবদের নিকটে ইফরীকিয়্যা নামে যাহা পরিচিত ছিল তাহা মোটামুটিভাবে এই অঞ্চল। এইখানেই ছিল প্রাচীন কার্থেজ নগরী ও রাজ্য, ১৮৮১ খৃ. হইতে ইহা তিউনিস রিজেন্সী বা ফরাসী আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়, ১৯৫৬ খৃ. পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে (সাম্প্রতিক তথ্যের জন্য নীচে সংযোজন অংশ দ্র.)।

ভৌগোলিক বিবরণ ঃ তিউনিসিয়ার অবস্থান ৮° ও ১১° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ৩২° ও ৩৭° উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত, আয়তন ১,২৫,১৮০ ব. মা.। ইহার পশ্চিম সীমান্ত ধরিয়া আলজিরিয়ার কনস্ট্যান্টাইন জিলা, দক্ষিণে সাহারা মরুভূমি, সুদূর দক্ষিণ-পূর্বে লিবিয়া (সাবেক ত্রিপোলিতানিয়া)। ভূমধ্যসাগর ইহার তীরভূমি ধৌত করে, তীর প্রায় ক্ষেত্রে উত্তর ও পূর্বদিকে নীচু। আবহাওয়া সামগ্রিকভাবে সহনীয় গরম; কিন্তু বৃষ্টিপাত জিলাভেদে এমন কি বৎসরভেদে ভিন্নরূপ হইয়া থাকে এবং একদিকে সমুদ্র ও অপরদিকে সাহারা মরুভূমির নিকটবর্তী হইবার কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণভেদ অক্ষরেখা এবং উচ্চতাভেদে খুব বেশি। দেশটির গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে খুব বেশি না হইলেও ভূদৃশ্য খুবই বৈচিত্র্যময়। পর্বতমালাগুলি আলজিরিয়ার পর্বতেরই বর্ধিতাংশ এবং শেষাংশ, সাধারণভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রসারিত।

উত্তর-পশ্চিমে খুমিরিয়া ও মোগোদ পর্বত চুনা ও বেলেপাথরে তৈরী, আলজিরিয়ার দিকে কদাচিৎ ৩,০০০ ফুটের বেশি উঁচু। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া সেইগুলি ওক ও ছোট ছোট ঝোপ দ্বারা আচ্ছাদিত। এইখানে দস্তা ও লোহার খনি রহিয়াছে (দ্র. Duaria)। এই পর্বতগুলি উপকূলভূমির সমান্তরালে প্রসারিত, সেইখানে একের পরে এক দেখা যায় ছোট বন্দর তাবারকা, নেফযার বালিয়াড়িসমূহ, নিগ্রো অন্তরীপ এবং ছোট সের্‌রাত উপদ্বীপ। পূর্বদিকে উচ্চতা ক্রমেই কমিয়া গিয়া পাহাড়ে পরিণত হইয়াছে এবং বিযারতা ও মাতিয়ুর পলি-সমভূমিকে বেষ্টন করিয়াছে, উভয়টিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং গম যথেষ্ট উৎপাদিত হয়। বিযারতা লেগূন বা উপহ্রদ হইতে একটি সরু প্রণালী দ্বারা সাগরের সঙ্গে নৌ-চলাচল ও যোগাযোগ রক্ষিত হয়, সেইখানে গভীর পানির জায়গাতে চমৎকার একটি পোতাশ্রয় রহিয়াছে, উহার বিপরীত দিকে সিসিলি খুব বেশি দূরে নহে। মাহিউর সমভূমি বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণই মাটিতে ভরিয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকটি জলাজায়গা এখনও দেখা যায়। সেইখানে অদ্ভুত আকারের জাবাল আসকিউল মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। আরও পূর্বে গারু'ল-মিলহ (Porto-Farina)-এর উপরে রা'স সীদী 'আলী আল-মাক্কী দ্বারা উত্তর দিকে তিউনিস উপসাগর বাধাপ্রাপ্ত ও শেষ হইয়াছে। উহা মেজেরদা ওয়াদ মিলিয়ানে বাহিত পলি দ্বারা ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছে। ইউতিকা (Utica) ছিল রোমান আমলের একটি বন্দর, বর্তমানে সমুদ্র হইতে ৬ মাইল ভিতরে অবস্থিত। কার্থেজ উপদ্বীপ আগে দ্বীপ ছিল, এখন একটি যোজক দ্বারা মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং উহা দ্বারা তিউনিস উপহ্রদ হইতে সেবখা এল-রিয়ানা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই উপহ্রদের শেষ প্রান্তেই দেশের রাজধানী তিউনিস শহর অবস্থিত, উপহ্রদ (লেগূন) হইতে সাগরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা হয় হাল্‌কু'ল-ওয়াদ নামক প্রণালী দ্বারা। তিউনিস জিলাতে বৃষ্টিপাত খুব বেশি হয় না, খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য খুব উপযোগী নহে। তবে আঙুর এবং অন্যান্য ফল ভাল জন্মে।

মেজেরদা নদী উত্তর তিউনিসের ভিতর দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত। ইহাই সমগ্র তিউনিসিয়ার একমাত্র যথার্থ নদী এবং গ্রীষ্মকালে উহার পানির সমতা খুবই নীচু থাকে, নভেম্বর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত নদী ভরা থাকে এবং খুবই খরস্রোতা হয়। ইহার নিম্নস্রোত, মেজেয্‌'ল-বাব, (তবুরবা) তেসতুর নামক গিরিসংকট দ্বারা মধ্যস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন, সেইখানে ইহা দ্বারা দাখলা নামক পলিগঠিত বিশাল নিম্নসমভূমি বিধৌত হয় (সূক এল-আরবা ও সূক এল-খেমিস অঞ্চল), সেইখানে সন্নিহিত বেজা চুনাপাহাড় এলাকার মতই প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় এবং চারণভূমিও যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহার উপত্যকার উত্তরে বেজাওয়া ও তেবুরসুক নামক চুনাপাহাড়, আর দক্ষিণে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম তিউনিসিয়ার বন্ধুর ভূদৃশ্য, কোথাও গোলাকৃতির চুনাপাহাড়, কোথাও বিশাল প্রান্তর, উহা আলজিরিয়ার সাহারা আতলাস (বা এটলাস-Atlas) পর্বতমালারই বর্ধিত অংশ ঃ এই উচ্চভূমি (Tell) [তেবুরসুক, কেফ, সেরস, এব্‌বা-কসুর ও থালা জিলা] আলেপ্পো পাইনের স্বাভাবিক বনভূমি দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহা ছাড়া রহিয়াছে দীর্ঘ গুল্ম ও বিশাল চারণভূমি। উহার প্রায় সর্বত্রই গমের চাষ হয়, শুধু দক্ষিণ-পশ্চিমের অধিকতর শুষ্ক এলাকাতে যব হয়, বিশেষ করিয়া আলজিরিয়া সীমান্তের কাছাকাছি তিউনিসের এই অংশ খনিজ সম্পদে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ (জেরিস্‌সা ও স্নাতাতে লোহা, কালাতা-জেরদা ও কালার এস্‌-সেনামে গন্ধক)। মেজেরদা নদীর উপনদীসমূহ (ওয়াদী মেল্লেগু, ওয়াদী তেস্‌সা, ওয়াদী সিলিয়ানা) এবং ওয়াদী মিলিয়ানা (ফাহস ও মোরনাগ সমভূমি অঞ্চলে) সরাসরি তিউনিস উপসাগরে পড়িয়াছে।

উঁচু ভূমি (High Tell) ঃ দক্ষিণ হইতে উঠিয়াছে সর্বাপেক্ষা দৃশ্যমান পর্বতের সারি। তিউনিসিয়ার মেরুদণ্ড বলিয়া পরিচিত এই পর্বতমালা তেবেস্‌সার নিকট হইতে জাবাল যাগওয়ান পর্যন্ত (৪,৩০০ ফুট উঁচু, তিউনিস হইতে ৩০ মাইল) এবং জাবাল রাসাস ও বু

কারনায়ন পর্যন্ত প্রসারিত। এইখানেই রহিয়াছে সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলি ঃ শামবি (৫,১৫০ ফুট), এবং সেমামা এই দুইটি বায়যাসিন পর্বতমালাতে, মাকতার, সেরজ, বারগৌ, কিরিন ও যেউগিতানিয়া পর্বতসমূহ। কিন্তু কয়েকটি গিরিপথ রহিয়াছে বলিয়া এইগুলির মধ্য দিয়া সহজে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, বিখ্যাত গিরিপথটির নাম কসুর-সাবিবা। অপরপক্ষে দক্ষিণের ঢালে যে ছোট নদীগুলি রহিয়াছে, যেমন ওয়াদী মেরগুয়েল্লিল, যেরুদ, এল হাতাব (এইগুলি দ্বারা গামুদা সমতল অঞ্চল বিধৌত হয়), এইগুলিতে মাঝে মাঝে পানির প্রবাহ থাকে, আবার মাঝে মাঝে বন্ধ হইয়া যায়। প্রবাহ থাকাকালে সেবখাস নামে পরিচিত লোনা গহ্বরময় স্থানে গিয়া নিঃশেষিত হয়, যেমন সেবখাস কেলবিয়া, সেবখাস সিদি এল-হানি। এইগুলি কায়রাওয়ানের সমভূমিতে অবস্থিত। এইগুলি সবই বিস্তীর্ণ তৃণাবৃত (Kteppe) অঞ্চলে অবস্থিত, সেইখানে উট চরিয়া বেড়ায়। এই অঞ্চল একেবারে গাফসা পর্যন্ত প্রসারিত, মাঝে মাঝে শুধু কয়েকটি চুনাপাথরের পাহাড় দেখা যায়। কোনটিই তেমন উঁচু নহে। পশ্চিম দিকে আলফা বা সাদা আরতেমিসিয়া (artemisia) ও জুজুব গাছ দ্বারা আবৃত; পূর্বদিকে ক্রমেই ঢালু হইয়া সফাক্স পশ্চাৎভূমির জলপাই বাগিচার এলাকা পর্যন্ত গিয়াছে, তবে সেইখানে বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র ও পশুচারণের উপযোগী এলাকাও রহিয়াছে। কায়রাওয়ান ছাড়া এইখানে আর যে সকল ছোট শহর রহিয়াছে সেই সকলই মেরুদণ্ডস্বরূপ পর্বতমালার গিরিপথের বহির্মুখের নিকটে অবস্থিত সাবেলতলা, কাসসেরিরা ও ফেরিআনা। কিন্তু আরও দক্ষিণে গেলে বৃষ্টিপাতের অভাবহেতু ক্রমেই মরুময় হইয়া গিয়াছে এবং গাফসা, মেতলাবি ও রেদেয়েফের লবণ খনির অঞ্চল পার হইয়া শোতসের নিম্ন অঞ্চল পার হইয়া (শোতেল-গারসা, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০ ফুট গভীর, শোতেল-জেরিদ, শোতেল-ফেজেজ, এইগুলি জাবাল-শেরব ও জাবাল-তেবোগা দ্বারা বেষ্টিত) গিয়া জেরিদ মরূদ্যানে (তোজেউর, নেফতা) ও নেফরেওয়া মরূদ্যানে (কেবিলি, দউয) শেষ হইয়াছে, সেইখানে খেজুর উৎপাদিত হয়। এইখান হইতেই সাহারা মরুভূমি শুরু হইয়াছে। আরও দক্ষিণ-পূর্বে চুনাপাথর দ্বারা গঠিত জাবাল দাহার (১,৩০০-২,০০০ ফুট) এবং মাতমাত স্তূ-পর্বত, এইগুলি সাহারা মরুভূমির বিশাল এক গভীরতার পূর্ব সীমান্ত।

দেশের উত্তর-পূর্ব উপকূলে সমৃদ্ধিশালী খামারসমূহ স্থাপিত হইয়াছে, সেইখানে দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ যে পর্বতমালা উহার বর্ধিতাংশে গুরুত্বপূর্ণ বোন (Bon) অন্তরীণ তিউনিস উপসাগর ও হাম্মামেতের মধ্যে অবস্থিত উহার উপকূলীয় সমভূমি দুইটি গিরিপথ দ্বারা যুক্ত, যাগওয়ানে (ফুমু'ল-খারূবা ও গোমবালিয়া)। অতঃপর নাহিউল ও হাম্মামেত আঙ্গুর বাগিচার দক্ষিণে সুসার সাহেল, উহার উপত্যকাসমূহ যথেষ্ট পানি পায় বলিয়া সেইখানে জলপাই ফল ও অন্যান্য ফসল জন্মে; সেইখানে জনসংখ্যা যথেষ্ট। তাহারা বড় বড় সুরক্ষিত গ্রামে বাস করে ঃ কালা কাবিরা, কালা সারিরা, মাসাকেন, মাকনিনে ইত্যাদি একটানা উপকূলরেখা দুইটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপ মোনাসতির ও মাহদিয়া দ্বারা কিঞ্চিত বিঘ্নিত হইয়াছে।

তীরভূমি রাস কাপুদিয়া হইতে শুরু হইয়া (এই স্থানটি মোটামুটিভাবে এল জেউরের সমান সমতলে) ভিতরমুখী হইয়াছে, সফাক্স উপসাগরে তীরের নিকটবর্তী দ্বীপসমূহ হইল কেরকেননা দ্বীপ ও তীরের মাঝখানে পানি অগভীর, সেইখান হইতে গাবেস উপসাগর ধরিয়া (ইহার প্রাচীন নাম Little Syrtes) অগ্রসর হইয়াছে। এই অঞ্চলে অধিবাসিগণের আয়ের একটি বড় উৎস সাগর হইতে স্পঞ্জ আহরণ। উপসাগরের শেষপ্রান্তে Palmes of Gabs নামক জোড়াপর্বতশৃঙ্গ উঠিয়াছে। উহাদের ও শত্-এর সঙ্গে যুক্ত এলহেম্মা মরূদ্যানের মাঝখানে পড়িয়াছে তিউনিসিয়ার কেন্দ্রীয় বা পূর্বদিকের সমভূমি হইতে একেবারে দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত খোলা জায়গা; আরাদ, উহার অদূরেই অবস্থিত বড় সমতল, সবুজ দ্বীপ জেরবা, জেফারা, উহার প্রান্তেই অল্প পানির হ্রদ; যারযিস ও বেন-গারদেনের চতুর্দিকে কিছু সংখ্যক জলপাইয়ের বাগান রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Aug. Bernard এবং de Flotte de Roquevaire, Atlas d'Algerie et de Tunisie; (2) Directions generales de l'Agriculture, The Travaux Publics ও Station Oceanographique of Salammbo-এর প্রকাশনাসমূহ বিষয়ে ঃ (৩) Ph. Thomas ও Pervinquiere-এর বই, এবং M. Solignac-এর গ্রন্থসমূহ। আবহাওয়া বিষয়ে (৪) G. Ginestous-এর বই। জীবজন্তু বিষয়ে ঃ (৫) L. Lavauden-এর বই। উদ্ভিদ বিষয়ে ঃ (৬) R. Maire, Corte phytogeographique do l'Algerie et de la Tunisie, আলজিয়ার্স ১৯২৬ খৃ.।

আঞ্চলিক ভূগোল পঠন-পাঠন ঃ (৭) F. Bonniard, La Region de Bizerte (Ann. Geogr, 1925); (8) Ch. Monchicourt, La Region de Tunis (Ann. Geogr., 1904); (৯) ঐ লেখক, La Steppe Tunisienne Chez Les Frechich et Les Majeur, তিউনিস ১৯০৬ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, La Region du Haut-Tell en Tunisie, প্যারিস ১৯১৩ খৃ; (১১) J. Weyland, Le Cop Bon, তিউনিস ১৯২৬ খৃ.; (১২) P. Burollet, Le Sahel de Sousse, তিউনিস ১৯২৭ খৃ.; (১৩) J. Despois, Kairouan (Ann. Geogr., 1930); (১৪) R. Blanchet, Le Djebel Demmer (Ann. Geogr., 1897); (১৫) Violard, La Tunisie du Nord, তিউনিস ১৯০৫-৬ খৃ., L'Extreme-Sud Tunisien, তিউনিস ১৯০৬ খৃ.; (১৬) A. Joly, Notes Geographiques Sur Le Sud tunisien (Bull, soc. geogr. Alger, 1907) (১৭) L. Pervinquiere, Le Sud tunisien (Revue de Geogr. Annuelle, 1909; (১৮) M. Jeloux, Notes, surle Nefzaoua (Ann. Geogr., 1902); (১৯) J. Thomas, A travers le Sud Tunisien, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.।

২। ইতিহাস

বর্তমান তিউনিসিয়া নামে পরিচিত দেশটি জয় করিতে আরবদের অন্তত অর্ধেক শতাব্দী সময় লাগিয়াছিল। আরবরা অভিযান করিয়াছিল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে এবং স্থানীয় বার্বারগণ ও বায়যানটীয় গভর্নরগণের পক্ষ হইতে মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল। পূর্ব আফ্রিকার মত উত্তর আফ্রিকাতেই ইসলামের সঙ্গে বায়যানটিয়ামের গুরুতর সংঘর্ষ বাঁধিয়াছিল। কিন্তু খৃ. ৭ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে আফ্রিকার বায়যানটীয় প্রাদেশিক গভর্নর-শাসিত রাজ্যের পরিস্থিতি বিশেষ করিয়া বিজয়িগণের জন্য বিশেষ অনুকূল হয়ঃ ধর্মীয় বিভেদ পূর্বদিকে একটি সুদূর, কিন্তু অতি বিশ্বস্ত একটি একত্ববাদী ধর্মীয় মতবাদের প্রতিধ্বনি তখন কার্থেজের খৃস্টান সমাজে গিয়া পৌঁছাইয়াছিল এবং তাহাদিগকে কড়াকড়িভাবে গোঁড়াপন্থিগণ বায়যানটিয়াম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল; গভর্নরগণের উপরে সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল বিধায় তাঁহাদের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল এবং বাধ্য হইয়া তাঁহারা স্থানীয় গোত্রগুলির নেতাগণের

সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল হইয়া পড়েন এবং গোত্রগুলিও এই অবস্থার সুযোগ লইয়া ধীরে ধীরে বায়যান্টীয় কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে থাকে, এক সময়ে একেবারে সম্পূর্ণই অস্বীকার করে। ফলে মুসলিম বিজয়াভিযানের সময়ে বায়যাসিনের দক্ষিণের সকল অঞ্চল বস্তুত কার্থেজের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল।

১৮ বৎসরের ব্যবধানে আবদের প্রথম দুইটি অভিযান ছিল রায্যিয়া বা লুণ্ঠনমাত্র, কিন্তু সেই দুইটির ফলে পরবর্তীতে পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত অভিযান দ্বারা দেশটি অধিকারের পথ সুগম হয়। তদুপরি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার যোগাযোগ ছিল যে, বিজেতাগণ যখন আক্রমণ করিতে গিয়াছে তখন বায়যানটীয় আফ্রিকাতে রাজনৈতিক সঙ্কট লাগিয়াছিল; ৬৪৭ খৃ. প্যাট্রিসিয়াস গ্রেগরী যখন সবেমাত্র সম্রাটের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া বার্বারদের মধ্যে নিজের অবস্থান দৃঢ় করিয়াছেন এবং উহা উপকূল হইতেও অনেক দূরে, সেই সময়ে মিসরের গভর্নর 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ তাঁহাকে শেইতলার নিকটে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং অতঃপর জেরিদ ধ্বংস করিবার জন্য অগ্রসর হন। ৬৬৫ খৃ. কার্থেজের অধিবাসিগণ অপ্রত্যাশিতভাবে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেই সময়ে মু'আবিয়া ইব্ন হুদায়জ বায়যাসিন ধূলিসাৎ করিয়া গিয়া জালুলা শক্তিকেন্দ্র দখল করেন।

মাগরিবের সরকার কি ৬৬৭ খৃ. মিসরের সরকারের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল? প্রকৃত দখল শুরু হয় ৬৬৯-৭৭৫ খৃ. হইতে, যখন 'উকবা ইব্ন নাফি' যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কায়রাওয়ানের ভিত্তি স্থাপন করেন; ইহাই ছিল নিশ্চিতভাবে বায়যাসিন অধিকারের ও বার্বার গোত্রসমূহকে ইসলাম কবূল করাইবার সময়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল একটি নূতন নগর, একটি মুসলিম শহর স্থাপন, একটি অস্ত্রাগার, কারাভাঁ সরাই নির্মাণ এবং একটি বাজার প্রতিষ্ঠা, সেইখানে তখন হইতেই একটি মসজিদ নির্মাণ, সমতল জায়গাতে উহার চতুর্দিকের দেওয়াল নির্মাণ, উহার সামনেই ছিল মধ্য তিউনিসিয়ার উচ্চভূমি এবং সেই স্থান তখন পর্যন্ত সারিবদ্ধ বায়নানটীয় দুর্গ দ্বারা রক্ষিত ছিল।

আবুল-মুহাজিরের পর যাঁহার শাসনকাল সম্বন্ধে অল্প তথ্যই জানা যায়, ৬৮১ খৃ. 'উকবা প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই একটি অভিযানে তিনজিতানিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হন, সেইখান হইতে ফিরিবার পথে তাহুদার পূর্বে যাবে পরাজিত হন। সেইখানে বিজেতাগণের বিরুদ্ধে স্থানীয় অধিবাসিগণের এক মারাত্মক বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং উহার ফলে তিনি নিহত হন। এই উত্থান প্রথমে আওয়াসে শুরু হয়, ক্রমে কায়রাওয়ানেও প্রসারিত হয়। ইহার নেতা কুসায়লা বায়যান্টাইনের সমর্থন লাভ করিয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া এক বিশাল বার্বার রাজ্য শাসন করেন। সেই রাজ্যটি হইতে সর্বশক্তি দিয়া নূতন আরব আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। তিনি নিজে ৬৮৮ খৃ. সাবীবা জিলাতে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। যুহায়র ইব্ন কায়স আল-বালাবী সেই একই জিলার অধিবাসী ছিলেন বলিয়া বলা হয়। যাহা হউক, কেবল ৬৯৩ খৃ. সালে যখন উমায়্যাগণের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ স্থিতিশীল হয় যে, রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি পুনরায় গ্রহণ করা সম্ভব, তখনই হাস্সান ইবনু'ন-নু'মান ৪০,০০০ সৈন্য লইয়া বায়যাসিন অভিযানে বাহির হন এবং অত্যন্ত দ্রুত গতিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া বায়যানটাইন বাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া দেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া আওরাসের রুক্ষ বার্বারদিগকে তিনি মুকাবিলা করিতে থাকেন। তিনি ৬৯৫ খৃ. কার্থেজ দখল করেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে John-এর নিকটে পরাজিত হইয়া উহা হারান এবং পুনরায় কিংবদন্তীর কাহিনার (দ্র.) নেতৃত্বে বার্বার বাহিনীর নিকটে বাগালের যুদ্ধে পরাজিত হন। তিনি বারকাতে পশ্চাদপসরণ করেন এবং পরের বৎসর জল ও স্থল উভয় পথে একযোগে আক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত কার্থেজ জয় করেন। ৬৯৮ খৃ. শেষ পর্যন্ত আরবরা প্রায় সমগ্র তিউনিসিয়াই বার্বার ও বায়যানটাইন শক্তির নিকট হইতে দখল করিয়া লয়। হাস্সান তিউনিস শহরের পত্তন করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী মূসা ইব্ন নুসায়র যাগওয়ান দখল করেন। অতঃপর ইফরীকিয়্যার বার্বারদিগকেই ঐক্যবদ্ধ করিয়া পশ্চিমমুখে বিজয়াভিযান পরিচালনা করেন।

বায়যানটাইন উপনিবেশের অধিবাসিগণের বড় অংশ প্রধানত সমুদ্রপথে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়, প্রায়ই সিসিলি ও মাল্টাতে গিয়া আশ্রয় লয়। যাহারা রহিয়া গিয়াছিল তাহাদের অধিকাংশই শ্রুত ইসলাম কবুল করে, স্বল্প সংখ্যকমাত্র খৃস্টান (আফারিক) বা য়াহূদী থাকিয়া যায়। কিন্তু এমন কি ইসলাম গ্রহণের পরেও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য জায়গার লোকদের মত ইফরীকিয়্যার বার্বারগণ গতানুগতিক ধর্মীয় আনুগত্যহীনতার দাবিতে কয়েকবারই নিজেদের স্বাধিকার ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করে। খৃ. ৮ম শতকের সমগ্র ইতিহাসই বিদ্রোহ দ্বারা চিহ্নিত, খারিজীবাদের নামে স্থানীয় অধিবাসীগণ আরব শাসকগণের বিরুদ্ধে উত্থিত হয় এবং তাহা ছাড়া আরব সৈন্যরাও বিদ্রোহ করে। মাঝে মাঝেই তাহারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিত।

হানজালা ইব্ন সাফওয়ান প্রথমে সুফরী উকাশার উত্থান দমন করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বিদ্রোহী 'আবদু'র রাহমান ইব্ন হাবীব আল-ফিহরী যখন কায়রাওয়ান দখল করিয়া লন তখন তিনি পূর্বদিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। শেষ উমায়্যা শাসকগণ যখন হাতছাড়া হইয়া যাইবার অবস্থায় এই দূরবর্তী প্রদেশটি পুনর্দখল করিতে গিয়া ব্যর্থ হন তখন 'আব্বাসীগণ স্পেনকে আধিপত্য অস্বীকার করিতে দেখিয়া ইফরীকিয়্যাকে ইবাদী শাসক আবুল-খাত্তাব-এর নিকট হইতে আবার অধিকার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবনু'ল-আশআছ কায়রাওয়ান পুনরায় দখল করিয়া চতুর্দিকের দেওয়াল মেরামত করেন এবং নিজে গভর্নররূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাহা দীর্ঘদিনের জন্য নহে। আরব সৈন্যগণ তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া ৭৬৫ খৃ. তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-আগলাব ইব্ন সালিম আত্-তামীমী ছিলেন 'আব্বাসী প্রচারক আবূ মুসলিমের পূর্বাঞ্চলের একজন পুরাতন সহচর। তিনিও বিদ্রোহী মুদারগণের বিরুদ্ধে টিকিতে পারেন নাই। ৭৬৭ খৃ. বিদ্রোহে তিনি নিহত হন এবং পরবর্তী পাঁচ বৎসর পর্যন্ত সেইখানে অরাজকতা বিরাজ করিতে থাকে।

৭৭২ হইতে ৭৯৪ খৃ. পর্যন্ত ইফরীকিয়্যা শাসন করেন মুহাল্লাবী নামে পরিচিত একটি ছোট রাজবংশ। তাঁহারা খিলাফাতের কর্মকর্তা ছিলেন এবং আদিতে য়ামানী বংশোদ্ভূত, তাঁহারা অল্প সময়ের জন্য দেশে কিছুটা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। য়াযীদ ইব্ন হাতিম ৪০,০০০ নূতন সৈন্য লইয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত ইবাদী আবুল হাতিমকে পরাজিত ও হত্যা করিতে সক্ষম হন। তিনি ৭৭৪ খৃ. কায়রাওয়ানের বিশাল মসজিদটি পুনর্নির্মাণ করেন এবং রাজধানীর বিভিন্ন সংস্থা গঠন করেন। তাঁহার পুত্র দাউদ ৭৮৮ খৃ. কেফে ওয়ারফাজুমা বারবার সম্মিলিত শক্তিকে পর্যুদস্ত করেন; তাঁহার ভাই রাওহ, যিনি পরে গভর্নর হন, তিয়ারেতের ইবাদী ইব্ন রুস্তামের সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করিলে অতঃপর ইফরীকিয়্যার বার্বারগণের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব প্রশমিত হয়।

তখন হইতে একমাত্র আরব সৈনিকগণই দেশটির অভ্যন্তরীণ শান্তির প্রতি আশঙ্কার কারণ হয়। শেষ মুহাল্লাবী আল-ফাদলের মৃত্যুর পরে আবার কিছু কালের জন্য রক্তপাত ও গোলযোগ চলিতে থাকে। শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রবীণ সেনাপতি হারছামা ইব্ন আ'য়ানকে সেইখানে প্রেরণ করা হয়। তিনি বাগদাদের খলীফার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন এবং মোনাসতিরের রিবাতটি নির্মাণ করেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদ ইব্ন মুকাতিল আল-'আক্কীকে তিউনিসের তামীমী সৈন্যগণ সেই পদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। সৈন্যগণ তাঁহার কৌশলহীনতার কারণেই বিদ্রোহী হইয়াছিল (অক্টোবর ৭৯৯)। এই সময়ে ৭৬৭ খৃ. নিহত গভর্নরের পুত্র ইবরাহীম ইবনুল আগলাব তাঁহার যাব প্রদেশে হঠাৎ করিয়া 'আব্বাসী বিজয়ী বীররূপে আবির্ভূত হন। তিনি ইব্ন মুকাতিলকে কায়রাওয়ানে ফিরাইয়া আনেন। উহার পুরস্কারস্বরূপ এবং অবশেষে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে খলীফা হারূনুর রাশীদ উপদেষ্টাগণের পরামর্শক্রমে তাঁহাকে ইফরীকিয়্যার করদ আমীররূপে নিযুক্ত করেন। ইবরাহীম জুলাই ৮০০ খৃ. তাঁহার নিয়োগপত্র লাভ করেন। অতঃপর ৯০৯ খৃ. পর্যন্ত এক শতাব্দীর অধিক কাল যাবত কোনরূপ বাধা-বিপত্তিহীনভাবে ক্ষমতা তাঁহার পরিবারের মধ্যেই থাকে।

আগলাবী (দ্র.) রাজবংশ তিউনিসিয়ায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাচ্যদেশের খলীফার প্রতি বাহ্যিক আনুগত্যের অধীনে বস্তুত স্বাধীন ও বংশানুক্রমিক আমীরগণ শান্তিবাদী, সাংগঠনিক ও প্রসারতার নীতি অনুসরণ করিতে থাকেন। তামীমীগণের বিরুদ্ধবাদ চলিতেই থাকে, উহাদের কেন্দ্র ছিল তিউনিসে। ইবরাহীম নিজে যদিও একজন তামীমী ছিলেন, তিনি সেই সকল মুদার যোদ্ধার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে বাধ্য হন। কারণ উহারা দূরে হউক বা কাছে হউক 'আব্বাসী কর্তৃত্ব সহ্য করিতে পারিত না। কেননা 'আব্বাসীগণ উহাদের পুরাতন য়ামানী প্রতিদ্বন্দ্বিগণের বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া একটি অনারব সৈন্যদলের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সেইখানে অনেক খুরাসানী সৈনিক ছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য তিনি নবগঠিত নিগ্রো প্রহরী সৈনিকদের উপরে এবং কাসরুল-কাদীম (বা আল-আব্বাসিয়া) রক্ষা ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করিতেন। উহা তিনি ৮০১ খৃ. কায়রাওয়ানের এক লীগ দক্ষিণে নির্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত সেইখানেই তিনি সম্রাট শার্লাম্যানের দূতকে সাক্ষাত দান করিয়াছিলেন। ৮০২ খৃ. তিনি তিউনিসিয়াতে উত্থিত একটি বিদ্রোহ দমন করেন, ৮০৫ খৃ. ত্রিপোলীতে উত্থিত একটি বিদ্রোহ এবং ৮১০-১১ খৃ. তাঁহার নিজ সেনাপতি ইম্‌রান ইব্ন মুখাল্লাদ বিদ্রোহী হইয়া কায়রাওয়ান অবরোধ করিয়া বসিলে তাঁহাকে দমন করেন। তাঁহার শাসনামলেই দেশের পূর্ব উপকূলে মাহরিস নামে পরিচিত ছোট ছোট সামরিক ঘাঁটি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলা হয়। ৮১২ খৃ. তাঁহার মৃত্যুকালে ত্রিপোলীতে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহ দেখা দেয়।

তাঁহার পুত্র যিয়াদাতুল্লাহ (৮১৭-৩৮ খৃ.) কর্মতৎপরতার জন্য খ্যাত হইলেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির। তাঁহাকে শক্তিশালী বিরুদ্ধ শক্তির মুকাবিলা করিতে হয়। মানসূর আত-তুনবুযী তাঁহাকে উৎখাত করিতে সদা উদ্যত ছিলেন এবং কয়েক বৎসর পর্যন্ত তিউনিসসমেত সমগ্র উত্তরাঞ্চল আমীরের সম্পূর্ণ হাতছাড়া ছিল। কিন্তু যিয়াদাতুল্লাহ নিজ প্রতিভাবলে সিসিলিতে প্রচণ্ড যুদ্ধরত সৈন্যদের লইয়া ৮২৭ খৃ. সূসাতে আসিয়া অবতরণ করেন। তাঁহার উৎসাহী সেনাদল পরিচালনা করিতেছিলেন সুবিখ্যাত কাযী আসাদ ইবনু'ল ফুরাত। ৮৩১ খৃ. পালারমো অধিকৃত হয়; মেমিনার পতন ঘটে ১২ বৎসর পরে। যিয়াদাতুল্লাহ ৮২১ খৃ. সূসার রিবাত নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইবারে তিনি আরও শান্তিপূর্ণ ধরনের কাজে মনোযোগ দিতে সক্ষম হইয়া কায়রাওয়ানের বিখ্যাত বড় মসজিদটি নির্মাণ করেন। তাঁহার স্থাপত্য কীর্তিসমূহের ধারাকে পরবর্তী কালে আরও সমৃদ্ধতর ধারায় অনুসরণ করেন তাঁহার উত্তরাধিকারী। ৮৫০ খৃ. সূস ও সফাক্সের বিশাল মসজিদ দুইটি নির্মিত হয়, বিশেষ করিয়া আমীর আহমাদ আনু. ৮৬০ খৃ. এই উভয় শহরের চারিদিক দেওয়াল দিয়া ঘিরিয়া দেন এবং বিখ্যাত আগলাবী জলাধার নির্মাণ করেন। এই বিশাল জলাধার হইতেই কায়রাওয়ান শহরে পানি সরবরাহ হইত।

৮৭৪ খৃ. এই বংশের শেষ বিখ্যাত শাসক ২য় ইবরাহীম তাঁহার ভাই মুহাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হন। সারস পাখি শিকারে তাঁহার এত বেশি উৎসাহ ছিল যে, লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল আবু'ল গারানিক। তিনি কাসরুল-কাদীম প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া একটি নূতন আবাসিক শহরে যান এবং সরকারী অফিসসমূহ সেইখানে লইয়া যান। কায়রাওয়ানের ৫ মাইল দক্ষিণে রাক্কাদা নামক সেই স্থানটি এখনও বেশ পরিচিত; কিন্তু ৮৯৪ খৃ. হইতে তিউনিসে বিদ্রোহ দেখা দিলে এবং আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা উহা পুনর্দখল করিবার পরে আমীর প্রায়শ এই পুনর্বিজিত শহরেই তাঁহার দরবার করিতেন। ইহার উপরে তিনি ভালভাবে নজর রাখিতে চাহিতেন। তাঁহার শাসনের বৈদেশিক নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ঘটে। প্রথমটি হইল দক্ষিণ-পূর্বে আল-'আব্বাস ইব্ন আহমাদের গোলযোগপূর্ণ অভিযান। তিনি ছিলেন প্রথম তূলূনীর পুত্র। পিতার বর্তমানেই তিনি ৮৮০ খৃ. ইফরীকিয়্যা জয়ের উদ্দেশ্যে মিসর হইতে ত্রিপোলী অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেইবারে নাফূসা বার্বারগণ ত্রিপোলী রক্ষা করেন; ইবরাহীম যথাসময়ে আসিয়া তূলূনী দীনারের ধনভাণ্ডার দখল করেন। সেই অর্থ দ্বারা পরে তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। তবে সেই উন্নয়ন স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল। কারণ শতাব্দীর শুরুতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থামাইতে এবং পরে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের কারণে কোষাগার যে প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল তাহা আর পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। ৮৯৩ খৃ. যে ভয়াবহ বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তাহার সাদাসিধা কারণ হইল অভাবী সরকারের উপকারার্থে গামুদা সমভূমিতে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ক্রীতদাস ও অশ্ব বলপূর্বক অধিকার করা। অপরদিকে ৮৭৮ খৃ. সাইরেকিউজ এবং ৯০১ খৃ. তাওরামিনা দখল দ্বারা সিসিলি বিজয় সমাপ্ত হয়। ইবরাহীম যখন সর্বদা শত্রু ভাবাপন্ন তিউনিসীয় জনগণের অভিযোগক্রমে খলীফার আদেশে নিজ পুত্র 'আবদুল্লাহ্‌র পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিতে সম্মত হন, অতঃপর একজন মুজাহিদেরই ন্যায় তিনি সেই বৎসরেরই ২৫ অক্টোবর ক্যালাব্রিয়ার কজেনযার সামনে ইনতিকাল করেন।

ইতিমধ্যে পশ্চিম দিকে ধর্মীয় বিপ্লবের সূচনা হয়। ইহা পরবর্তী কালে সমগ্র ইফরীকিয়্যাতে ছড়াইয়া পড়ে। খৃ. ৯ম শতকে সমগ্র বারবার দক্ষিণাঞ্চল (হাওয়ারা, লাওয়াতা, মিকনাসা) আওরাস হইতে জেরবা ও ত্রিপোলী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, বিশেষ করিয়া নাফূসাগণ গাবেসের দক্ষিণে সড়ক বন্ধ করিয়া দিয়া পূর্বদিকে আসিবার পথে বাধার সৃষ্টি করে। অতঃপর ৮৯৬ খৃ. ২য় ইবরাহীম তাহাদিগকে কচুকাটা করেন। কিন্তু দেশের বৃহত্তর অংশে গোঁড়াপন্থিগণ যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল খারিজীবাদ তাহা রোধ করিতে পারে নাই; গোঁড়াগণের মধ্য হইতেই অনেক সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যেমন ইবনুল-আশআছের সহচর কাদী আবদুর রাহমান ও দরবেশ বাহলূল (তিনি খৃ. ৮ম শতকে জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন)। আগলাবী আমল ছিল আইন আলোচনার স্বর্ণযুগ। সেই একই আমলে ইসলামের মাযহাবগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হাদীছের প্রধান প্রধান সংকলন সংগ্রহ করা হয়, সেই

সময় মিসরের বিখ্যাত মালিকী আইন বিশেষজ্ঞ ইবনু'ল কাসিমের দুই ছাত্র আসাদ ইবনুল ফুরাত (খুরাসানী পরিবারের সন্তান, ৮২৮ খৃ. সিসিলিতে ইনতিকাল করেন) এবং তাঁহার ছাত্র সাহনূন (ইব্ন সা'ঈদ আত্-তানূখী). সিরিয়াতে জনৈক ভাড়াটে সৈনিকের পুত্র; তিনি ৮৫০ খৃ. কায়রাওয়ানের কাযী পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে মালিকী মাযহাবের বিজয় সূচনা করেন। কিন্তু হানাফী মাযহাবপন্থী কয়েকজন শিক্ষকের কর্মতৎপরতার ফলে সেই বিজয়াভিযানে ভাটা পড়ে; তাঁহার মুদাওয়ানা এখন পর্যন্ত একখানি চিরায়ত ধর্মীয় গ্রন্থ। মালিকীবাদ গতিরুদ্ধ হইয়া পড়িলেও এখন পর্যন্ত তিউনিসিয়ার প্রধান মাযহাব। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষকগণ যে প্রাচ্যে জন্মগ্রহণকারী ছিলেন এবং মতবাদগুলিও ছিল সেইরূপই, তাহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই প্রাচ্য এলাকা হইতেই প্রচারক (দা'ঈ) আবূ 'আবদুল্লাহ্ ৮৯৩ খৃ. ইকজানের কিতামা কাবাইলে (বাবোরসের পূর্বদিকে ছোট কাবাইলিয়া) আসিয়া স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে শীআ মাহদী 'উবায়দুল্লাহ-এর মতবাদ প্রচার করেন।

৯০২ খৃ. কিতামাগণের বিরুদ্ধে একটি আগলাবী অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু তেমন কোন সাফল্য অর্জিত হয় নাই। ৩য় যিয়াদাতুল্লাহ ৯০৩ খৃ. নিজ পিতা মু'তাযিলী 'আবদুল্লাহকে হত্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনামলে শী'আ সমস্যা প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। ৯০৫ খৃ. মাহদী সিরিয়া হইতে দ্রুত উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। সিজিলমাসাতে গিয়া তিনি উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন, আর তাঁহার বিশ্বস্ত দা'ঈ আমীরের সেনাবাহিনীকে নির্মমভাবে হত্যা করিতে থাকেন। ঘটনা দ্রুত পরিবর্তিত হইতে থাকে; যিয়াদাতুল্লাহ ত্রিউনিসে একটি সম্মেলন আহ্বান করিয়া সেইখানে ধর্মীয় নেতাগণকে দিয়া শী'আবাদকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়া কোন সুবিধা অর্জন করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি 'আব্বাসী শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেন; ৯০৭ খৃ. বসন্তকালে বাগাইয়ার পতন ঘটে; ৯০৯ খৃ. মার্চ মাসে লরবিউসের পতনের পরে যিয়াদাতুল্লাহ বাগদাদে পলায়ন করেন এবং দা'ঈ গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় নেতাগণের নীরব বিরোধিতার মধ্য দিয়া রাক্কাদাতে প্রবেশ করেন। শেষ পর্যন্ত সেই বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসে মাহদী স্বয়ং কায়রাওয়ানে প্রবেশ করিয়া জনগণের আনুগত্য গ্রহণ করেন। এইভাবেই একমাত্র কিতামার কাবিল পদাতিক বাহিনীর চেষ্টায় ইফরীকিয়্যাতে ধর্মান্ধ ফাতিমী ('উবায়দী) খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার ফলে সমগ্র উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অতঃপর পুনরায় উহারা প্রাচ্যের মূল বাসভূমিতে ফিরিয়া আসে।

প্রথম হইতেই নূতন রাজবংশের দৃষ্টি ছিল মিসরের দিকে এবং সেইখানে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও ক্রমাগত বিজয়াভিযানের জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করিতেছিল। জানুয়ারী ৯১১ খৃ. 'উবায়দুল্লাহ যে আবূ 'আবদুল্লাহ-এর বদৌলতে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাকেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ঠিক যেমন নাকি 'আব্বাসী খলীফা আল-মানসূর তাঁহার নিজেরই সমর্থক -প্রচারক আবূ মুসলিমকে হত্যা করাইয়াছিলেন। ৯১৩ খৃ. তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ফায়্যুম দখল করে। অপর একটি সেনাদল আলেকজান্দ্রিয়া অধিকার করে এবং পূর্বদিকে সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা বাধা পাইবার পরেই মাহদী ইফরীকিয়্যাতে একটি রাজধানী স্থাপন করিতে মনস্থ করেন; তবে উহা ছিল সমুদ্রের উপকূলে। সুরক্ষিত মাহদিয়্যা শহর (দ্র.) হইতে নৌবহরসমূহ পূর্বদিকে অভিযান করিতে থাকে। অভ্যন্তরভাগ হইতে বার্বারগণের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্যও উহা ভাল আশ্রয়স্বরূপ ছিল (৯১৬-১৮ খৃ.)। কিন্তু ৯১৯ খৃ. আলেকজান্দ্রিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান প্রেরিত হয় এবং স্বল্প সময়ের জন্য উহা অধিকারেও থাকে। পশ্চিম দিকে সাফল্য ছিল একটানা। সিসিলিতে বিদ্রোহ দেখা দিলে উহার বশ্যতা আদায় করা হয় এবং ৯৩৪ খৃ. শুরুতে 'আবদুল্লাহ্ যখন মারা যান তখন সমগ্র মাগরিবে ফাতিমী আধিপত্য স্বীকৃত হয়। সেইখানকার ইবাদী রাষ্ট্র তিয়ারেত, ইদ্‌রীসী রাষ্ট্র ফাস এবং সিজিলমাসার সুফরীগণের একে একে পতন ঘটে।

আবুল-কাসিম নিযার (আল-কাইম বি-আমরিল্লাহ) যে বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছিলেন কোনক্রমে উহার নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন। সত্য যে, ৯৩৫ খৃ. তাঁহার নৌবহর জেনোয়া লুণ্ঠন করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু উহার গুরুত্ব ৮২৮ খৃ. Boniface of Lucca-এর অধীনে টাসকানগণ কার্থেজ লুণ্ঠনের চেয়ে তেমন বেশি কিছু ছিল না। অপরপক্ষে সাহিবুল-হিমার বা গাধার মালিক নামে পরিচিত ইফরানী নুক্কারী আবূ য়াযীদ ইব্ন কায়দাদের নেতৃত্বে যখন অপ্রতিরোধ্য অভ্যুত্থান হয় তখন তিনি উহার মুকাবিলা করিতে ব্যর্থ হন; আবূ য়াযীদ নিজেকে শায়খুল-মু'মিনীন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ধর্মের আবরণে পূর্ব আওরাসের হাওয়ারাগণকে নেতৃত্ব দিয়া ইফরীকিয়্যার বিভিন্ন শহর আক্রমণ করিতে থাকেন। খারিজী বারবারগণ বেজা, লোরবিউস, কায়রাওয়ান (৯৪৪ খৃ.) ও সূসা লুণ্ঠন করেন এবং যাব ও নাফূসা হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগে স্ফীত হইয়া (৯৪৫ খৃ.) মাহদিয়্যাতে গিয়া সদর দফতরে খলীফাকে ঘিরিয়া ধরেন। এক অতি বিপজ্জনক সময়ে আবুল-কাসিম প্রাণত্যাগ করেন (৯৪৬ খৃ.)। তাঁহার পুত্র ইসমাঈল (আল-মানসূর) জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিয়া বিজয়িগণের জুলুম-অত্যাচারের পরে আবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করিয়া আনেন; সে বিষয়ে বিশ্বস্ত কিতামাগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন। পর পর কয়েকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজয়ের পর আবূ য়াযীদের সমর্থকগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তিনি স্বয়ং মারাত্মকভাবে আহত হইয়া যেইখানে শত্রুর হাতে বন্দী হন সেইখানে পরবর্তী সময়ে (৯৪৭ খৃ.) বানূ হাম্মাদগণের কাল'আ নির্মিত হয়।

গোলযোগপূর্ণ সময়ের পরেই প্রশান্তি ও সমৃদ্ধির সময় আসে। আল-মানসূর নিজের শক্তির প্রকাশ হিসাবে বিলাসবহুল সাবরা (আল-মানসূরিয়া) শহর প্রতিষ্ঠা করেন। উহার জৌলুসের কাছে পার্শ্ববর্তী কায়রাওয়ানও খর্ব হইয়া যায় (৯৪৭ খৃ.)। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানার উন্নতি হয় এবং সমুদ্রে কাইদ রাশীক খৃস্টানগণের ভীতিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ৯৫৩ খৃ. আল-মু'ইয্য সিংহাসনে বসেন, তখন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সময়টি আসে ঃ কর্দোভার উমায়্যাগণের সমর্থনে মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ দেখা দিলেও সামগ্রিকভাবে মাগরিব শান্তই ছিল; ৯৫৬ খৃ. সূসা ও তাবারকার উপকূলে স্পেনের মুসলিমগণের লুণ্ঠনগুলি ছিল নিতান্তই প্রতিশোধস্পৃহা, কোন যথার্থ বিপদের সংকেত নয়। মিসর বিজয়ের আশা ঈখশীদীয় কাফুরের মৃত্যুর পরে দেশটি দুর্বল হইয়া পড়িবার কারণে সম্ভাব্য বলিয়াই ধারণা হয়। ৯৬৯ খৃ. জুলাই মাসে আযাদীপ্রাপ্ত গুলাম জাওহার কিতামাগণের নেতৃত্ব দিয়া আল-মুইয্যের পক্ষে গিয়া ফুসতাত দখল করেন, ঠিক যেমন নাকি আবূ 'আবদুল্লাহ তাঁহার মনিব মাহদীর পক্ষে গিয়া কায়রাওয়ান দখল করিয়াছিলেন। পরের বৎসর তাঁহার সেনাবাহিনী দামিশকে প্রবেশ করে। অতঃপর শাসকের নিজ পক্ষে কায়রো শহরটির পত্তন করিয়া তিনি তখনও পর্যন্ত পশ্চিমে অবস্থানরত মনিবকে দ্রুত আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া কারামাতিয়াগণের ভীতিজনক অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার অনুরোধ জানান। মাগরিবে শেষ যেনাতা বিদ্রোহ নির্মূল করিবার পরে ফাতিমী শাসক প্রাচ্য দেশের রীতিতে মুকুট ধারণ করেন এবং ৯৭২ খৃ. আগস্ট

মাসে প্রত্যাবর্তনে প্রস্তুত হন। ১০ জুন, ৯৭৩ তিনি কায়রোতে পৌঁছান। ইহা হয় তাঁহার বংশের নূতন রাজধানী।

চিরতরে ইফরীকিয়্যা ত্যাগ করিবার আগে আল-মুইয্য তাঁহার সরকারের দায়িত্ব (সিসিলি ব্যতীত) তাঁহার সর্বাপেক্ষা উপকারী সহায়ক বারবার আমীর বোলোগ্‌গিনের (বুলুক্কীন) উপরে দিয়া যান। তাঁহার পিতা যীরী ইব্‌ন মানাদ ছিলেন বিক্ষুব্ধ যেনাতাগণের বড় শত্রু। সব সময়েই তিনি তিত্তেরি ও মিডিয়া অঞ্চলের নিজস্ব সানহাজাগণকে 'উবায়দীগণের সমর্থনের জন্য রাখিতেন। বার্বার শাসকগণকে দিয়া বংশানুক্রমিকভাবে দেশটি শাসন করিবার এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হয়। যীরীগণ (দ্র.) নিয়মিতভাবে কায়রো হইতে অভিষেক আদেশ লাভ করিতেন। তাঁহাদের আমলে ইফরীকিয়্যাতে যথার্থ বাস্তব সমৃদ্ধি সূচিত হয়। কৃষি উন্নয়নের ফলে ও স্থানীয় শিল্পকারখানাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে (গালিচা, কাপড়, মৃৎশিল্প) এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ফলে দেশে সমৃদ্ধি আসে এবং জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিরও প্রাচুর্য দেখা দেয়। বড় বড় সরকারী উৎসবে অবাধ বিলাসিতা ও জৌলুস প্রদর্শিত হইত। আইন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের বিকাশ ঘটে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ফাতিমীগণের আমলে ইব্‌ন আবী যায়দ, ইসহাক ইব্‌ন সুলায়মান আল-ইসরাঈলী ও তাঁহার ছাত্র ইবনুল জায্‌যারের মত বিখ্যাত ব্যক্তিগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল; সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছিলেন কবি রাশীক। কায়রাওয়ানের য়াহূদী উপনিবেশে বিখ্যাত তালমুদীগণের আগমন ও বিকাশ ঘটে।

এই আমলের যে সমৃদ্ধি তাহা বিদ্রোহের কারণে খুব একটা বাধাগ্রস্ত হয় নাই। পশ্চিম দিকে যেনাতাগণের বিদ্রোহ যদিও ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করিতেছিল, উহারা কর্দোভার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে। হাম্মাদের বিচ্ছিন্নতাও বড় কোন ক্ষতির কারণ হয় নাই। তিনি তাঁহার ভাতিজা বাদীস ইবনুল মানসূরের শাসনামলে (৯৯৫-১০১৬ খৃ.) তাঁহার বিখ্যাত কাল'আতে এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (১০০৭ খৃ.)। অন্যদিকে আল-মুইয্য ইব্‌ন বাদীসের শাসনামলে খৃ. ১১শ শতকের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু এই আল-মুইয্য যিনি অত্যধিক চাকচিক্য ভালবাসিতেন, যাঁহাকে কায়রোর খলীফাগণ অত্যন্ত 'ইজ্জত করিতেন, সমগ্র মাগরিব ব্যাপিয়া যাঁহার সম্মান ছিল, তিনি এক মারাত্মক ভুল করিয়া বসেন। তিনি ধর্মীয় ঘৃণাবোধকে জাগাইয়া তোলেন, অথচ উহার নামেই উত্তর আফ্রিকার অধিবাসিগণ সব সময়ে তাহাদের প্রাচ্যের শাসকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আসিয়াছিল। কায়রাওয়ানের মালিকী শহরবাসিগণ তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়া একদিন তাঁহার চোখের সামনেই শীআগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। সেই মালিকীগণের সমর্থনবলেই তিনি বাগদাদের 'আব্বাসী খলীফাগণের প্রতি আনুগত্য পরিবর্তন করেন এবং ১০৫০ খৃ. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কয়েকটি পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রকাশ্যেই ফাতিমীগণের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

যাঁহার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল অতি মারাত্মক। মিসরের উযীরু'ল-য়াযূরী ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত বোধ করিয়া বিদ্রোহী করদ শাসকের বিরুদ্ধে লুণ্ঠনকারী যাযাবর হিলালী আরবদেরকে প্রেরণ করেন। উহারা নীল নদের পূর্বদিকে অবস্থিত সা'ঈদে বসবাস করিতেছিল। ১০৫১ খৃ., যে বৎসর প্রথম হিলালীগণ, বানূ রিয়াহ্‌গণ ইফরীকিয়্যাতে আসে উহা ছিল তিউনিসিয়ার ইতিহাসে একটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা। আল-মু'ইয্য দুইবার কায়রাওয়ানে পরাজিত হন। তাঁহার দ্রুততার সঙ্গে শহরটিকে সুরক্ষিত করিবার চেষ্টা কোন কাজে আসে নাই; ১০৫৭ খৃ. যাযাবরগণ যখন বিপুল সংখ্যায় দেশের নিম্নাঞ্চলে লুণ্ঠন চালাইতেছিল তখন গোপনে তিনি আরব আমীরগণের আশ্রয়ে মাহাদিয়্যাতে চলিয়া যান। সেই আমীরগণের নিকটে তিনি নিজ কন্যাদের বিবাহ দিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। বিজয়িগণ সংখ্যায় ছিল লক্ষ লক্ষ। উহারা অর্থনৈতিক, জাতিতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিকভাবে উত্তর আফ্রিকার চেহারা বদলাইয়া ফেলে। বার্বারগণকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, দেশটিকে আরবীকৃত করা হয়, যাযাবর জীবন ও নিরাপত্তাহীনতা প্রচলিত হয়, কৃষির সর্বনাশ ঘটে এবং কেন্দ্রীয় শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রধান প্রধান শহর আরবদের হস্তগত হয় বা বলা যায় যে, ছোট ছোট স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। সেইগুলির স্থানীয় শাসকগণ বা গভর্নরগণ নিজেদেরকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। কেহ কেহ এমন কি কালআর হাম্মাদীগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এইভাবে তিউনিসে বানূ খুরাসানীগণ, বিষারতাতে বানূ আলওয়ারদগণ, গাবেসে বানূ জামি'গণ, গাফসাতে বানূ আর-রান্‌দগণ ক্ষমতাতে প্রতিষ্ঠিত হয়; কেন্দ্রে অরাজক অবস্থা বিরাজমান থাকে।

সীমাহীন অসুবিধার মধ্যে যীরীগণ মাহদিয়্যাতে টিকিয়া থাকেন। সেইখান হইতে অতঃপর তাঁহারা সূসা ও গাবেসের মধ্যবর্তী উপকূলভূমি শুধু দখল করিয়া থাকেন। আল-মুইয্যের পুত্র ও উত্তরাধিকারী তামীম (১০৬৩-১১০৮ খৃ.) কোন কোন হারানো রাজ্যাংশ পুনর্দখল করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন; তিনি বানূ হাম্মাদগণের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু তিউনিসের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারেন নাই এবং মাহদিয়্যাতে আবদ্ধ থাকিয়া আরবদের উপর্যুপরি আক্রমণ করেন। তাহা ছাড়াও নূতন শত্রু খৃস্টানদের আক্রমণ সহ্য করিতে বাধ্য হন। ১০৮৭ খৃ. পোপের নির্দেশে Pantaleon of Amalfi-এর পরিচালনায় পিসানগণ ও জেনোয়ানগণ মাহদিয়্যা দখল করে। তামীমকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং তদুপরি বিজয়িগণের বাণিজ্যিক জাহাজকে বিনা শুল্কে প্রবেশ ও বাণিজ্যিক অধিকারের দাবি মানিয়া লইতে হয়। য়াহ্‌য়া ইব্‌ন তামীম (১১১৬ খৃ. মারা গিয়াছিলেন, সম্ভবত খুন হইয়াছিলেন), অতঃপর তাঁহার পুত্র 'আলী (তিনি ১১২১ খৃ. মারা যান), উভয়ে কায়রোর খলীফাগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা আরব সওদাগরগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন, স্থল ও নৌ-উভয় পথে তাঁহারা কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত দুর্যোগেরও সম্মুখীন হন। নরম্যানগণ ইতিপূর্বেই সিসিলি ও মাল্টা দখল করিয়াছিল। এইবারে উহারা ইফরীকিয়্যার দিকে হস্তক্ষেপ করে (১১১৮ খৃ.)। যীরীগণের সঙ্গে একটি সংঘর্ষ দেখা দিলে তাঁহারা সুদূর পশ্চিমে আল-মুরাবিতগণের নিকটে আবেদন জানান। আল-হাসান ইব্‌ন 'আলীকে প্রথমে সন্ধি করিতে বাধ্য করা হয়। তিনি বুগি (Bougie) হাম্মাদীগণের বিরুদ্ধে সিসিলির Roger-এর আশ্রয় মানিয়া লন। কিন্তু সিসিলির অ্যাডমিরাল George of Antioch ১১৪৮ খৃ. যখন তাঁহাকে মাহাদিয়্যা হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন তখন তাঁহাকে রোধ করিতে ব্যর্থ হন। Roger II, তৎপরে William I (তিনি ছিলেন জেরবার লর্ড এবং সূসা হইতে ত্রিপোলী পর্যন্ত উপকূলীয় শহরগুলিরও লর্ড বা অধিপতি), সেইখানে এক ধরনের সহনীয় আশ্রিত রাজ্য সংগঠন করেন, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক। উহা স্বল্পস্থায়ী হইয়াছিল; অধিবাসিগণ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে পুনরায় তাহাদের স্বাধীনতা অর্জন করে। শুধু সূসা ও মাহদিয়্যার স্বাধীন হইতে ১১৫৯-৬০ খৃ. পর্যন্ত সময় লাগে। সেই সময় আল-মুওয়াহ্‌হিদ 'আবদুল-মু'মিন মাগরিবের শেষ প্রান্ত হইতে আসিয়া ১১৫১ খৃ. সেতিফের যুদ্ধে রিয়াহী আমীর

মুহরিয ইব্ন যিয়াদের অধীনে সম্মিলিত ইফরীকিয়্যার আরবদিগকে পরাজিত করেন। তিনি সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্মূল করেন, কিল্লাগুলি দখল করিয়া লন, য়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করেন এবং পঞ্চাশ বৎসরের বেশি সময়ের জন্য উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক ঐক্য পুনরুদ্ধার করেন।

নূতন প্রভুগণের 'ইজ্জত সত্ত্বেও ইফরীকিয়্যার মার্‌রাকেশের খিলাফাত তখনও পর্যন্ত শান্ত দেখিতে পায় নাই। আল-মুওয়াহ্হিদ কর্তৃত্ব সরাসরি বোধগম্য না হইলেও তিউনিসে অবস্থানরত গভর্নরের মাধ্যমে উপলব্ধি করিতে হইত, ক্ষমতাসীন প্রতিনিধি সচরাচর হইতেন সার্বভৌম শাসকের একজন নিকট আত্মীয়। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রদেশে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন, সেইখানে আরবদের পক্ষ হইতে ভীতির আশঙ্কার সঙ্গে ১১৮৫ খৃ. হইতে আবার যোগ হয় আর্মানী ভাগ্য পরীক্ষাকারী কারাকুশের তুর্কোমান সেনাদল এবং বানূ সানতিয়্যা আল-মুরাবিত 'আলী (মৃ. ১১৮৮ খৃ.) এবং তাঁহার ভাই য়াহ্য়ার শেষ প্রচেষ্টা। দুইজন খলীফা নিজেরা সেনাবাহিনী লইয়া আসেন য়ূসুফ ১১৮০ খৃ. ও য়াকূব আল-মানসূর ১১৮৭ খৃ.। কিন্তু তাহাতেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয় নাই। য়াহ্য়ার ক্ষেত্রে ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছিল। ১২০০ খৃ. তিনি সাবেক মিত্র কারাকুশকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মাহদীয়্যার খলীফা 'আবদু'ল-কারীম আল-রাগরাগিকে সমর্থন দান করেন এবং জেরীদে অবস্থিত তাঁহার অভিযান কেন্দ্র হইতে আধুনিক সমগ্র তিউসিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেন। খলীফা আন-নাসির ১২০৫-০৭ খৃ. মধ্যে অভিযান করিয়া আল-মুরাবিতগণকে দমন করিলে য়াহ্য়া এক শোচনীয় অবস্থায় পতিত হন, সেইখানে খলীফা শক্তিশালী প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সরকারের দায়িত্ব প্রথমে দেওয়া হয় শায়খ 'আবদু'ল-ওয়াহিদ ইব্ন আবী হাফসকে (১২০৭-২১ খৃ.)। তিনি ছিলেন আলারকোজের বিজয়ী বীর। এইভাবে হাফসীগণ প্রথম তাঁহাদের ক্ষমতা লাভ করেন।

হাফসী পরিবারের (দ্র.) অপর একজন সদস্য ১১৮৪ খৃ. হইতে তিউনিসের গভর্নর ছিলেন। তাঁহারা হিনতাতা বার্বারগণের জনৈক সর্দারের বংশধর (হিনতাতাগণ মরক্কোর আতলাসের একটি মাসমূদা গোত্র), তাহারা মাহদী ইব্ন তূমার্তের নিত্যসঙ্গী হইয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়াছিলেন। ১২২৬ খৃ. তাহারা নিশ্চিতভাবে ইফরীকিয়্যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ গভর্নর নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে গভর্নর হন তাঁহার ভাই আবূ যাকারিয়্যা (১১২৮-৪৯ খৃ.)। শেষোক্তজন ধীরে ধীরে স্বাধীন হইতেছিলেন, তবে আমীর উপাধি লইয়া তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনিই তিউনিসিয়ার বিখ্যাত রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন। সেই বংশ নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া সাড়ে তিন শতাব্দীকাল ধরিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মু'মিনী আধিপত্য অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং মালিকী মাযহাবে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি হাফসীগণ সব সময়েই আল-মুওয়াহ্হিদ ঐতিহ্যের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিতেন ও নিজেদেরকে তাঁহাদের যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচনাও করিতেন। অল্প কয়েকটি সাধারণ পরিবর্তন ব্যতীত তাঁহাদের সরকার গঠনের পদ্ধতি প্রাথমিক যুগের আল-মুওয়াহ্হিদ গঠনতন্ত্রের কথাই মনে করাইয়া দেয়। এমন কি যখন দ্বিতীয় স্বাধীন আমীর আবূ যাকারিয়্যার পুত্র (যিনি আল-মুসতানসির নামে পরিচিত ছিলেন) তাঁহাকে ১২৫০ খৃ. দিকে মক্কা হইতে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, তখন সেই স্বাধীন শাসক গুরুত্বপূর্ণ আল-মুওয়াহ্হিদ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহারাই ছিলেন রাজনৈতিক গঠন কাঠামোর স্তম্ভস্বরূপ, সেনাবাহিনীরও মূল শক্তি এবং মুদ্রার গঠন প্রকৃতি ও ওজনের পরিমাণও ছিল আল-মুওয়াহ্হিদ রীতির অনুরূপ। সরকারী দফতরগুলি তিনটি বড় শাখায় সম্মিলিত ছিল। সেনাবাহিনী, কোষাগার (আল-আশগাল) ও প্রধান প্রশাসনিক দফতর। প্রাদেশিক গভর্ণরগণকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত পসন্দে নির্বাচন করা হইত, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বস্তুত শাসকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণের মধ্য হইতেই কেহ গভর্নর নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু উচ্চতর প্রশাসনিক পদে এবং দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজপরিবারের বাহিরের কেহ সুযোগ পাইতেন না বলিলে ভুল হইবে, সেইরূপ নিয়োগ অনেকেই লাভ করিতেন, বিশেষ করিয়া খৃ. ১৩শ শতকে খৃস্টানদের স্পেন পুনর্বিজয়ের পরে সেইখান হইতে বিতাড়িত আন্দালুসীয়গণের মধ্যে অগণিত মুসলমান এইখানে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন।

হাফসীগণকে ইফরীকিয়্যার পরিস্থিতি শান্ত রাখিবার জন্য ক্রমাগতই আরব সমস্যার মুকাবিলা করিতে হইত। যাযাবর বানূ সুলায়মগণ প্রতিদ্বন্দ্বী বানূ রিয়াহ্গণকে প্রতি-আক্রমণে বিতাড়িত করিয়া দেশের ভিতরে প্রাধান্য বিস্তার করে; তাহাদের বিভিন্ন উপগোত্র একে অপরের বিরোধী ছিল। উহারা দেশের জিলাগুলি হইতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ আদায় করিত। উহাদের মধ্যে কু'য়ূবগণ ছিল মাখযান গোত্রীয়। উহারা প্রায়ই রাজবংশগত বিবাদে হস্তক্ষেপ করিত। কখনও উহারা তিউনিস দখল করিবার জন্যই ভীতিস্বরূপ ছিল, কখনও নিজেদের পসন্দমত কাহাকে সমর্থন প্রদান করিয়া সিংহাসনের জন্য হুমকি সৃষ্টি করিত, শহরবাসিগণ ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া বাঁচিত। ১২৮৪ খৃ. উহারা যাঁহাকে সমর্থন দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিল সেই শাসকের নিকট হইতে একটি ইকতা' জায়গীর আদায় করিয়া লয় এবং উহার বলে কয়েকটি শহরের খাজনা আদায়ের মালিক হয়। উহাদের দুইটি শাখা আওলাদ আবিল-লায়ল এবং আওলাদ মুহালহালের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার 'কারণে খৃ. ১৪শ শতকে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাতে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

১২৭৭ খৃ. আল-মুসতানসিরের মৃত্যু পর্যন্ত ছিল এই রাজবংশটির গৌরবের কাল। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহ দেখা দিলেও তাঁহাদের শাসন ত্রিপোলী হইতে একেবারে আলজিরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং প্রধান প্রধান শহরে, যথা তিউনিস, কনস্টান্টাইন ও বুগিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেশের সম্মান উত্তর আফ্রিকার সীমানা অতিক্রম করিয়া যায়, স্পেন ও খৃস্টান য়ূরোপে ইহার আকর্ষণ অনুভূত হয়। এই সময়েই বারসেলোনা, মার্সাই, জেনোয়া, পিসা, সিসিলি ও ভেনিসের সঙ্গে নিয়মিত ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্যিক ও সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলের চুক্তিসমূহ স্বাক্ষরিত হয়, তিউনিসে খৃস্টান দেশসমূহের দূতাবাস স্থাপিত হয়, শুল্ক আদায়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে সেইখান হইতে আদায়কৃত অর্থ দ্বারাই তিউনিস হইতে সিসিলি ও পরবর্তীতে আরাগাঁতে প্রেরিত করের সঙ্কুলান হইত। হাফসী শাসকগণের জন্য একটি ভাড়াটিয়া খৃস্টান সেনাদল গঠন করা হয়, ১২৭০ খৃ. ক্রুসেডের যুদ্ধের সময়ে St. Louis কর্তৃক কার্থেজ আক্রমণকালে উহারা মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, পূর্ববর্তী দুই শতাব্দীর তুলনায় ইফরীকিয়্যা অধিকতর স্থিতিশীল হয় এবং বেশি সমৃদ্ধ শাসন ব্যবস্থাও লাভ করে, আইন বিষয়ক পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে নবজাগরণ দেখা দেয়, স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয় (দ্র. তিউনিস)। দুঃখের বিষয় যে, সিংহাসনের অধিকার দাবিতে যথার্থ রাজবংশীয়গণ এবং তথাকথিত রাজবংশীয়গণ, যেমন ১২৮৩ খৃ. দাবিদার ইব্ন আবী 'উমারা, ইহাদের মধ্যে যে বারবার সংঘর্ষ দেখা দেয় সেইগুলির ফলে

খলীফার কর্তৃত্ব খুব দ্রুত দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পরিণামে প্রজাসাধারণের যে নিরাপদ দৃঢ়বদ্ধ সমর্থন ছিল উহা ক্রমে লোপ পায় ও তাহা দ্বারা আরবগণ লাভবান হয়। আল-মুসতানসিরের সরাসরি বংশধারাতে ১২৭৯ খৃ. তাঁহার পুত্র আল-ওয়াছিকের বাধ্যতামূলক সিংহাসন ত্যাগের পরে আর মাত্র একজন শাসক ক্ষমতাসীন হন। আবূ 'আসীদা (১২৯৫-১৩০৯ খৃ.) ও তাঁহার পরেই এই রাজবংশ লোপ পায়। আবূ যাকারিয়্যার অপর এক পুত্র আবূ ইসহাক ইবরাহীম-এর (১২৭৯-৮৩ খৃ.) বংশধরগণ, তৃতীয় এক পুত্র আবূ হাফস-এর শাসন (১২৮৪-৯৫ খৃ.) এবং অতঃপর এক চাচাত ভাই আবূ য়াহ্য়া ইবনুল-লাহয়ানীর শাসনের পরে (১৩১১-১৭ খৃ.) শেষ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই ধারা শুরু হয় আবূ য়াহ্য়া আবূ বাকর হইতে (১৩১৮-৪৬ খৃ.)।

হাফসী শাসনের ঐক্য কিছু সময়ের জন্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন বুগি (Bougie) বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর হাফসী রাজ্য পুনর্গঠিত হয়। জেরবা ১২৮৪ খৃ. Roger of Loria কর্তৃক বিজিত হইবার পর হইতে খৃস্টান শাসনাধীনে ছিল, ১৩৩৭ খৃ. উহা পুনর্বিজিত হয়। 'আবদুল ওয়াদিদের পক্ষ হইতে যে ভীতি ছিল উহা এড়ানো হয় নূতন শক্তি অর্জনকারী মারীনীদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা। কিন্তু সেই মৈত্রীবন্ধনের মধ্যেই এক বিপদ লুকাইয়াছিল। কেননা অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মারীনী সুলতান আবুল-হাসান (যিনি ইতিমধ্যেই তেলেমসেন দখল করিয়াছিল) ১৩৪৭ খৃ. ইফরীকিয়্যা জয় করিয়া লইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। অতঃপর নিজে গিয়া তিউনিসে প্রতিষ্ঠিত হন, নিজ দরবার ও বিচার বিভাগ তিনি সেইখানে স্থানান্তর করেন। ১৩৫০ খৃ. হাফসীগণের পুনঃ ক্ষমতা লাভের জন্য একটি আরব অভ্যুত্থানের বিজয়ী হইবার প্রয়োজন ছিল এবং প্রায় সাত বৎসর পরে মারীনী আবূ 'ইনানের সৈন্যগণ পুনরায় তিউনিস দখল করিতে সক্ষম হয়। অবশ্য উহা ছিল খুবই স্বল্পকালের জন্য।

এই সময়েই আবূ ইসহাক ইবরাহীমের শাসনামলে (১৩৫০-৬৯ খৃ.) ষড়যন্ত্রপ্রিয় রাজদরবারের কর্মকর্তা ইব্ন তাফরাগীনের (মৃ. ১৩৬৪ খৃ.) ব্যক্তিত্ব অনুভূত হইতে থাকে; তবে সাম্রাজ্যের সকল অংশকে পুনরায় দৃঢ় সংহত করিবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। দক্ষিণাঞ্চল ক্রমেই খলীফার ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে। সেইখানে বিভিন্ন স্থানীয় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তোযেউরে বানূ য়ামলূলগণ, নেফরাতে বানূ মাক্কীগণ এবং ত্রিপোলীতে বানূ ছাবিতগণ। কিন্তু আবুল 'আব্বাস (১৩৭০-৯৪ খৃ.) যিনি কন্সটান্টাইনে কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। একের পর এক যুদ্ধ করিয়া তিনি বিদ্রোহিগণকে বশীভূত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে একটি ফ্রাঙ্কো-জেনোয়ার ক্রুসেড অভিযান পরিচালিত হয়, উহা ছিল জলদস্যুদের অত্যধিক উৎপাতের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি প্রতি- আক্রমণ, কিন্তু ১৩৯০ খৃ. মাহদীয়্যার সন্নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে উহা ব্যর্থ হয়।

তাঁহার পুত্র আবূ ফারিস (১৩৯৪-১৪৩৪ খৃ.) নৌবাহিনীর উন্নয়নের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং এমন কি ১৪২৮ খৃ. মাল্টার বিরুদ্ধে একটি নৌ-অভিযানও তিনি প্রেরণ করেন। কিন্তু অপর দিকে আবার তাঁহাকে ক্যাটালানগণ এবং উদারহৃদয় আলফনসোর সিসিলীয়গণের আক্রমণও প্রহিত করিতে হয়। উহারা ১৪২৪ খৃ. কেরকেন্না দ্বীপসমূহ দখল করিয়া লয় এবং ১৪৩২ খৃ. জেরবাতে বড় ধরনের আক্রমণ করে। উহাদের প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি রাস আদার, রাফরাফ ও হাম্মামেতে কিল্লা নির্মাণ করেন। ১৪২৪ খৃ. তিনি তেলেমসেন দখল করিয়া সেইখানে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

হাফসীগণের শাসনামলে খৃ. ১৫শ শতকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আযাদীপ্রাপ্ত গুলামগণকে কাইদ নাম দিয়া প্রাদেশিক গভর্ণর এবং সেনাবাহিনীর প্রধান পদে নিযুক্ত করা। এই কালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন আবূ 'আমর 'উছমান। তিনি ১৪৩৫ খৃ. হইতে ১৪৮৮ খৃ. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিউনিসীয় জলদস্যু বা বেসরকারী নৌ-সেনাদের তৎপরতা সত্ত্বেও বাহিরে য়ূরোপের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ক্যাটালানাগণ ও জেনোয়াবাসিগণকে তাবারিয়ার উপকূল অঞ্চলে কোরাল আহরণের এবং বন অন্তরীপ অঞ্চলে তানি (tunny) মাছ ধরিবার অনুমতি প্রদান করেন। দেশের ভিতরে পশ্চিম হইতে আগত মুরাবিত ধর্মীয় মতবাদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং চিরদিনের অশান্তি সৃষ্টিকারী যাযাবর আরবগণের যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে শান্তি বিরাজিত ছিল বলিয়া কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি সাধিত হয়।

'উছমানের মৃত্যুর পর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। অল্প সময়ের মধ্যে তিনজন খলীফা পরপর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর আবূ 'আবদুল্লাহর রাজত্বকালে (১৪৯৪-১৫২৬ খৃ.) বিভিন্ন গোত্রের বিদ্রোহের কারণে ভাঙন দেখা দেয়। সেই দুর্বলতার সময়ে এই অঞ্চলে বিভিন্ন তুর্কী বেসরকারী নৌবহরের অনুসরণ করিতে আসিয়া এই রাষ্ট্রে আঘাত করে। ১৫১০ খৃ. Pedro Navarro বুদি ও ত্রিপোলী দখল করেন। ১৫২০ খৃ. Hughes de Moncade কিছু সময়ের জন্য জেরবা অধিকার করেন। অবশেষে আগস্ট ১৫৩৪ খৃ. খলীফা 'আবদুল্লাহর পুত্র ও উত্তরাধিকারী আল-হাসান বিখ্যাত তুর্কী নৌ-সেনাধ্যক্ষ খায়রুদ-দীন বারবারোসার নিকটে পরাজিত হইয়া তিউনিস ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন।

জুলাই ১৫৩৫-এর আগে তিনি ফিরিয়া আসেন নাই, সেই সময় সম্রাট ৫ম চার্লস শহরটি দখল করিয়া লইলে তিনি তাঁহার সামন্তে পরিণত হন এবং স্পেনীয়দেরকে La Goulette কিল্লাটি স্থায়ীভাবে দিয়া দেন। করদ রাজ্যটির অবস্থা আরও খারাপ হয় যখন ১৫৪০ খৃ. Andrea Doria সফাক্স, সূসা ও মোনাসতির দখল করিয়া লন। ১৫৪২ খৃ. স্পেনীয়দের ব্যাপক বিপর্যয়ের পরে এবং কায়রাওয়ানের বিদ্রোহী সীদী আরাফার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে ও সমগ্র মধ্য তিউনিসিয়াতে প্রভাব বিস্তারকারী ধর্মীয় মুরাবিত সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দল শাব্বিয়াগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে তাঁহার নিজ সৈন্যগণ দলত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার ফলে আল-হাসান বাধ্য হইয়া সমর্থন লাভের জন্য য়ূরোপ গমন করেন, কিন্তু বিদেশে থাকাকালে নিজ পুত্র আহমাদ (হামীদা) কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত হন।

নিষ্ঠুর ও সাহসী হামীদা তাঁহার পিতার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। একজন নূতন বীরপুরুষ তুর্কী নৌ-সেনাধ্যক্ষ দারগুছ, যাঁহাকে তাবারকা দ্বীপের বিনিময়ে জেনোয়াবাসিগণের কাছ হইতে মুক্ত করা হইয়াছিল, ১৫৫০ খৃ. তিনি মাহদিয়্যা হইতে স্পেনীয়গণ কর্তৃক বিতাড়িত হন। কিন্তু পরবর্তী এপ্রিল মাসে তিনি চাতুর্যের সঙ্গে জেরবা গিরিপথে Andrea Doria-এর কাছ হইতে রক্ষা পান। অতঃপর তাঁহার শক্তিকেন্দ্র ত্রিপোলী হইতে ১৫৫৬ খৃ. শেষের দিকে তিনি গাফসা দখল করেন এবং ১৫৫৮ খৃ. প্রথম দিকে কায়রাওয়ান অধিকার করেন, সেইখানে তিনি সেনাপতি হায়দার পাশার অধীনে সেনাবাহিনী রাখিয়া যান। ১৫৬০ খৃ. সিসিলির গভর্নর Duke

of Melina-celi জেরবা দখল করিতে আসিলে তিনি সেই বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন; কিন্তু ১৫৬৫ খৃ. মাল্টা অবরোধকালে তিনি নিহত হন।

হামীদার সঙ্গে LA Gouldette-এর স্পেনীয় গভর্নরের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি সম্পাদিত থাকা সত্ত্বেও ক্রমাগত যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল, সেইগুলি দেখিয়াই আলজিয়ার্সের তুর্কী শাসক 'আলী পাশা ('ইউলজ 'আলী) ১৫৬৯ খৃ. শেষদিকে তিউনিস দখল করিয়া লন। তিনি সেইখানে একটি সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। ১৫৭৩ খৃ. শরৎকালে লেপান্তোর নৌ-যুদ্ধের বিজয়ী বীর অস্ট্রিয়ার ডন জন যখন তুর্কীদের নিকট হইতে পুনরায় তিউনিস দখল করিয়া লন তখন শেষবারের মত তিনি সেইখানে হাফসী শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মুহাম্মাদ আল-হাসানকে ক্ষমতায় বসান এবং তাঁহার উপদেষ্টারূপে Serbelloni- কে নিযুক্ত করেন। আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৫৭৪ খৃ. সিনান পাশার নৌবহরে করিয়া কন্সটান্টিনোপল হইতে আগত তুর্কী বাহিনী La Goulette ও তিউনিস দখল করিল তখন সেইখানে স্পেনীয় শাসনের অবসান ঘটে। সেই শাসন সব সময়েই সেইখানে ছিল সীমিতভাবে এবং নড়বড়েভাবে। তথাকথিত জাতীয় শাসক হাফসীগণের রাজত্বেরও অবসান ঘটে, অতীতের গৌরবময় শাসনামলের অবসানে তখন উহা এক অসহায় শক্তিহীন পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। ইহার শক্তিমত্তার শেষ একটু বিস্ফোরণ আর একবার দেখা গিয়াছিল ১৫৮১ খৃ., তখন হামীদা সসৈন্যে আসিয়া তিউনিসীয় স্তেপভূমি ও জেরীদ দখল করিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর অধিকারেও রাখিয়াছিল।

কনসটান্টিনোপলে ফিরিয়া যাইবার আগে সিনান তিউনিসিয়াকে একটি তুর্কী প্রদেশে পরিণত করেন, একজন পাশা উহার শাসক নিযুক্ত হন। প্রদেশটি প্রথমে ছিল আলজিয়ার্সের অধীনে, পরে ১৫৮৭ খৃ. হইতে সরাসরি তুরস্কের সুলতানের অধীনে। দখলকারী ৪,০০০ সেনাবাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন একজন আগা, উহাদের প্রতি ১০০ জনের সেনাপতি ছিলেন একজন দা'ঈ। কিন্তু ১৫৯১ খৃ. উচ্চতর পদের কর্মকর্তাগণের সমবায়ে গঠিত দীওয়ানের অত্যাচারের ফলে এক রক্তাক্ত বিপ্লব দেখা দেয়। উহা দমনের পরে চল্লিশজন দা'ঈর মধ্যে একজনকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেওয়া হয়। জেনিসারীগণ কর্তৃক নির্বাচিত দা'ঈদের শাসনাধীনে সুলতানের প্রতিনিধি পাশা কেবল সম্মানজনক মর্যাদাতেই আসীন ছিলেন। অপরদিকে দীওয়ানকে পুনর্গঠিত করা হয় এবং উহার ক্ষমতাও হয় বিরাট, বেসরকারী নৌবহরসমূহের যে সংস্থা (রা'ঈসগণের তা'ইফা) উহাও যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়। ধর্মীয় বিষয়ে হানাফী মাযহাব সরকারীভাবেই প্রাধান্য লাভ করে।

তৃতীয় দাঈ 'উছমানের আমলে (১৫৯৪-১৬১০ খৃ.) শাসন পরিষদ চূড়ান্তভাবে পুনর্গঠন করা হয়। তিনি মীযান নামে নূতন আইন ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেন এবং একজন বে-এর সাহায্যে সমগ্র দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। বে-এর দায়িত্ব ছিল দুইটি বার্ষিক পর্যায়ে খাজনা আদায় করা। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গে সৈন্য (মহল্লা) থাকিত। কাপুদান রা'ঈসগণের মধ্যস্থতায় রাষ্ট্র বহিঃসমুদ্রে জলদস্যুদেরকে নিয়ন্ত্রণ করিত এবং উহাদের আয়ের একটা বড় অংশও পাইত। সেই আয় অনেক বৃদ্ধি পায় যখন কিছু সংখ্যক জাহাজত্যাগী দলছুট, তন্মধ্যে বিখ্যাত একজন ছিলেন Ward নামক এক ইংরেজ, উহার বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছিল। স্পেন হইতে বহিষ্কৃত জোরপূর্বক খৃস্টানকৃত মুসলিমগণ (Moriscoes; ১৬০৯ খৃ.) তিউনিসিয়ার তিউনিস, কেপ বন (সোলিমান, গ্রোমবালিয়া) এবং অন্যান্য বিভিন্ন স্থানে (যথা তেবৌরবা, মেজেম, এল-বাব, তেসতৌর, গেল্লাত এল-আন্দালুস) বসতি স্থাপন করিয়াছিল। উহারা বাজারের সব্‌জি উৎপাদন ও শিল্প কারখানাতে (গেঞ্জি, কাপড় রং করা) যথেষ্ট অবদান রাখিতে থাকে। তুরস্কের প্রতি আনুগত্য এত বেশি শিথিল করা হইয়াছিল যে, ফ্রান্স, – তুরস্ক বাধ্যতামূলকভাবে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করাহেতু, সমগ্র তুর্কী সাম্রাজ্যেই এক বিশেষ সুযোগ ও মর্যাদা ভোগ করিতে থাকে, ১৫৭৭ খৃ. তাহারা তিউনিসে একটি দূতাবাস স্থাপন করে, ১৬০৬ খৃ. তিউনিসের ক্ষমতাসীনগণের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য রাষ্ট্রদূত S. de Breves-কে সেইখানে প্রেরণ করে।

'উছমানের জামাতা ও উত্তরাধিকারী য়ূসুফের শাসনামলে (১৬১০-৩৭ খৃ.) শাসন পরিষদ ত্রিপোলীর পাশার নিকট হইতে জেরবা পুনরাধিকার করে এবং সর্বশেষে একেবারে নূতন বিষয় হইল ১৬১৪ খৃ. ও ১৬২৮ খৃ. আলজিরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পর আলজিরিয়ার সঙ্গে সীমানা পুনঃ নির্ধারণ করিয়া লয়। পরবর্তী দা'ঈ উস্‌তা মুরাদ (১৬৩৭-১৬৬০ খৃ.) ছিলেন একজন দলছুট জেনোয়াবাসী এবং বেসরকারী নৌ-সেনাধ্যক্ষ বা জলদস্যু, তিনি Porto Farina-কে সুরক্ষিত করেন এবং সেইখানে স্পেনের মুরগণকে বসত করান। কিন্তু দা'ঈগণের কর্তৃত্ব ইতিমধ্যেই খর্ব হইতে শুরু হইয়াছিল এবং পরবর্তী ১৬৪০ খৃ. হইতে ১৭০২ খৃ. পর্যন্ত শাসনকর্তা (কোজা, লায় ও অন্যগণ) ২৪ জন দা'ঈ-এর শাসনকাল নিতান্ত ঘটনাবিহীন। তাঁহারা সকলেই ছিলেন বে-গণের হাতে ক্রীড়নক মাত্র এবং পরে সেই বে-গণই তাঁহাদের ক্ষমতা দখল করিয়া লন। বে মুরাদ (১৬১২-৩১ খৃ.) আদিতে ছিলেন একজন কসিকান, নাম ছিল পাশা। তিনি নিজ জীবনকালেই পুত্র মুহাম্মাদের (হাম্মুদা) নিকটে ক্ষমতা অর্পণ করেন। সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা তিনি নিজ পরিবারেই উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা ভোগ করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিয়া লন। হাম্মুদাকে (১৬৩১-৬৩ খৃ.) যথাসময়ে পাস করা হয় (১৬৫৯ খৃ.)। তিনি প্রধানত একদল সিপাহীর উপর নির্ভর করিতেন (দ্র. সাবাই'হিয়্যা)। তাহাদিগকে তিনি তিউনিস, কায়রাওয়ান, লে কেফ ও বেজাতে দায়িত্ব বিতরণ করিয়া দেন এবং তিনিই হন দেশের প্রকৃত মালিক। তিনি মুরাদী নামে পরিচিত শাসক বংশেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ, মুরাদ ও মুহাম্মাদ আল-হাফসী, তাঁহার নাতিগণ, মুহাম্মাদ, 'আলী ও রামাদান, কিন্তু তাঁহাদের শক্তি ক্রমাগতই নানা রকম বেসামরিক গোলযোগের কারণে (যেমন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শুকরের বিদ্রোহ) বাধার সম্মুখীন হইতেছিল। উহার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁহার প্রপৌত্র মুরাদ বু বালা ১৭০২ খৃ. গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন।

খৃ. ১৭শ শতকের প্রথমার্ধে য়ূরোপের সঙ্গে বাণি সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত করিয়া মার্সাই ও লিভর্নোর সঙ্গে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে, এই বিষয়ে বড় অবদান রাখে স্পেন ও ইতালীর য়াহূদী ও খৃস্টান ব্যবসায়িগণ। মার্সাইয়ের কোম্পানীগুলি কেপ নিগ্রো বা বিযারতাতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তাবারকাতে প্রতিষ্ঠিত জেনোয়াবাসী ব্যবসায়িগণের সঙ্গে কোরাল ব্যবসাতে প্রতিযোগিতা করিত এবং চামড়া ও খাদ্যশস্য রফতানি করিয়া লাভবান হইত। প্রতিনিধি শাসিত দেশটির বৈদেশিক সম্পর্কও সম্প্রসারিত হয়, ইংল্যাণ্ড ও নিম্নাঞ্চলীয় দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, জলদস্যুদের লুণ্ঠনের উপযুক্ত জওয়াব দিবার জন্য এবং তদুপরি মাল্টার নাইটগণের ঐতিহ্যগত অভিযানরূপেও য়ূরোপীয় নৌযুদ্ধজাহাজগুলি কয়েকবার উপকূলীয় অঞ্চলে কামানের গোলা নিক্ষেপ করে ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে।

দেশের ভিতরে অবস্থা প্রথমে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও বিকাশমান ছিল, সমগ্র দেশব্যাপী জনকল্যাণমূলক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ভবনসমূহ নির্মিত হয়

(তিউনিসে, বেজা ও কায়রাওয়ানে মাদরাসা ও মসজিদ নির্মিত হয়, তাহা ছাড়া সীদী সাহিবেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয়)। কিন্তু পরবর্তী কালের মুরাদীগণের আমলে ক্রমেই অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে, যাহার ফলে ১৬৮৫-৬ খৃ. ও ১৬৯৪ খৃ. আলজিরীয় বিজয়াভিযান সম্ভব হয়। বিভিন্ন গোত্র, তন্মধ্যে ছিল ভয়ঙ্কর আওলাদ সাঈদগণ, অবাধ্য হইয়া উঠে; দীর্ঘ সময়ের জন্য লে কেফ ছিল বানূ শান্নুফগণের দখলে এবং কালাত এস-সেনাম ছিল হানানশাগণের দখলে। ভাবাল ঔসেলাত ছিল দেশদ্রাহীদের আখড়া। প্লেগ রোগ মহামারীরূপে বারবার দেখা দিয়াও বহু প্রাণহানি ঘটায়।

ইব্‌রাহীম আশ্‌-শারীফের রক্তক্ষয়ী শাসনামলে (১৭০২-৫ খৃ.) প্রথমবারের মত সেনাবাহিনীর বে, পাশা, দা'ঈ ও আগা উপাধিগুলিকে একীভূত করা হয়। অতঃপর হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী তুর্কীকে ১০ জুলাই, ১৭০৫ নূতন করিয়া আলজিরীয় আক্রমণ চলাকালে বে বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তখন হইতে বহুকাল স্থায়ী হুসায়নী রাজবংশের সূচনা হয়। হুসায়ন শান্তি পুনঃস্থাপন করেন এবং যথেষ্ট নির্মাণ কাজও করেন (যেমন কায়রাওয়ানে); তিনি যখন নিজের সরাসরি বংশধরগণের ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যেও একটি রীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখনই নিজ ভাতিজা 'আলী পাশা কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন; 'আলী পাশাকে (১৭৩৫-৫৬ খৃ.) সমর্থন দান করিয়াছিল আলজিরীয়গণ। এইভাবে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়, 'আলীর পুত্র য়ূনুস ১৭৫২ খৃ. বিদ্রোহ করিলে তখন সমস্যা আরও জটিল রূপ ধারণ করে। অবশেষে আলজিরীয়গণ পুনরায় সমর্থন করিলে হুসায়নের পুত্র মুহাম্মাদ সিংহাসনে বসেন (১৭৫৬-৫৯ খৃ.) এবং মুহাম্মাদের ভাই 'আলী বে (১৭৫৯-৮২ খৃ.) ও তাঁহার পুত্র হাম্মুদার শাসনামলে (১৭৮২-১৮১৪ খৃ.) রাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়। ফলে তিউনিসিয়াতে যথার্থ সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে।

কৃষির মত বৈদেশিক বাণিজ্যেরও অগ্রগতি সাধিত হয়। বে যদিও ১৭৪১ খৃ. কেপ নিগ্রো ও তাবারকার ফ্যাক্‌টরীগুলি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি খৃস্টান শক্তিগুলির সঙ্গে তাঁহার পূর্বাপেক্ষা বেশি মাত্রায় সম্পর্ক স্থাপিত হয়; অনেক চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেইগুলি এখন হইতে করদ রাষ্ট্রটির পক্ষে স্বয়ং বে-ই স্বাক্ষর করিতেন। কেননা এই আমলে তিনিই ছিলেন নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ শাসকেরই মত। ফ্রান্স কয়েকবারই তিউনিসের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেও শেষ পর্যন্ত সেইখানে একজন কনসাল-জেনারেল নিয়োগ করে। ভেনিসের সঙ্গে একটি যুদ্ধ ৮ বৎসর স্থায়ী হয় (১৭৮৪-৯২ খৃ.)। 'আলী বে যিনি ১৭৬২ খৃ. জাবাল আউসলাতের বিদ্রোহিগণকে বশীভূত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি আলজিরীয়গণকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। উহারা এই সময় পর্যন্ত হাম্মুদাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা দিতেছিল। শেষোক্ত জন সাহিব আত-তাবা' য়ূসুফের সহায়তায় ১৮১১ খৃ. বিদ্রোহী জেনিসারিগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করিয়া সরকার পুনর্গঠন করেন।

খৃ. ১৯শ শতাব্দীতে করদ রাজ্যটির রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। প্রথমেই সাগরের বেসরকারী নৌ-সেনাদল ও জলদস্যুদের দমন করা হয়, উহারা রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎসস্বরূপ ছিল, য়ূরোপীয় শক্তিবর্গ ভিয়েনা কংগ্রেস ও আই লা চেপেলের চুক্তির পরে মাহমূদ-এর উপরে (১৮১৪-২৪ খৃ.) সেই শর্ত জোর করিয়া আরোপ করে। তদুপরি ফ্রান্স ১৮৩০ খৃ. আলজিয়ার্স দখল করিয়া নিলে বে হুসায়ন-এর আমলে (১৮২৪-৩৫ খৃ.) তখন রাষ্ট্রের আয় অপরিমেয় পরিণাম নামিয়া আসে। অর্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের মাধ্যমে নূতন সৃষ্ট অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিবার এবং শিথিল ও মাঝে মাঝে মালিকানা প্রতিষ্ঠাকারী 'উছমানিয়া শক্তির সঙ্গে মানাইয়া চলিবার য়ূরোপীয় খৃস্টান শক্তিবর্গ তাহাদের কন্সালের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টার মুকাবিলা করিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে।

তুরস্কের আধিপত্যকে গ্রেট বৃটেন উৎসাহ দান করে। ফ্রান্স তাহাতে বাধা দেয়; সেই আধিপত্যের পরিচয় ছিল সীমিত কয়েকটিমাত্র অভিষেক জাতীয় ফরমানে এবং যুদ্ধের সময়ে সৈন্য প্রেরণের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে (১৮৫৫ খৃ.) রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তিউনিসীয় সেনাবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ১৮২৭ খৃ. নাতারিনের যুদ্ধের সময়েও এক স্কোয়াড্রন তিউনিসীয় নৌবহর তুর্কী নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। অপরদিকে ফরাসী, ইংরাজ ও ইতালীয় প্রভাব ক্রমেই বেশ দৃঢ়ভাবে বিস্তৃত হইতেছিল। ইহা সত্য যে, ফরাসীরা তিউনিসীয় রাজপুরুষদেরকে আলজিরিয়াতে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। অপরপক্ষে এতকাল যাবত তিউনিসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করিবার জন্য খৃস্টান রাষ্ট্রগুলিকে যে কর দিতে হইত এখন আর সেই কর ধার্য করা হইত না। বে আহমাদ ছিলেন এক ধরনের সংস্কারমনা স্বেচ্ছাচারী (১৮৩৭-৫৫ খৃ.)। তিনি গুলাম বা ক্রীতদাস প্রথা রহিত করিয়া দেন, য়াহূদীদের মুক্তি মঞ্জুর করেন, তিউনিসীয় সেনাবাহিনীকে য়ূরোপীয় পদ্ধতিতে পুনর্গঠন করেন ও ফরাসী প্রশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি স্বয়ং ১৮৪৬ খৃ. প্যারিসে গিয়া লুইস ফিলিপের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। কিন্তু তাঁহার বিপুল ব্যয়ে পোর্টো ফারিনাতে অস্ত্রাগার নির্মাণ এবং মুহাম্মাদিয়্যাতে প্রাসাদসমূহ নির্মাণের কারণে ব্যয় বহু গুণ বাড়িয়া যায়। ফলে ইতিমধ্যেই স্বল্প পরিমাণে সংগৃহীত কোষাগার নিঃশেষিত হইয়া যায়। বাধ্য হইয়া নূতন কর বসাইতে হয়, যথা মাহসূলাত, জলপাই বাগানের উপরে কানূন এবং একচেটিয়া বাণিজ্যের উপরে ধার্য রাজস্ব।

তাঁহার চাচাতো ভাই মুহাম্মাদ (১৮৫৫-৫৯ খৃ.) মাজবা প্রবর্তন করেন। উহা ছিল ৩৬ পিয়াস্ত্রার একটি (পোল-ট্যাক্স) কর। উহা হইতে তিউনিস, সূসা, মুনাসতির, সাফাকস ও কায়রাওয়ান শহরগুলিকে মৌকুফ করা হয়। কিন্তু তাঁহার শাসনামলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল কনসালগণের চাপে মৌলিক চুক্তি অনুযায়ী ('আহদু'ল-আমান, ৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭) যাহা নাকি ছিল ১৮৩৯ খৃ. গুলখানের খাত্ত-ই শেরীফ (দ্র.)-এরই পুনঃপ্রবর্তন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিউনিসিয়ার সকল অধিবাসী আইন ও রাজস্বের বিষয়ে, বিবেকের স্বাধীনতায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের ও পেশাগত স্বাধীনতার বিষয়ে সমান অধিকার ভোগ করিবে এবং বিদেশীগণ যমিন ক্রয় করিতে পারিবে। তাঁহার ভাই মুহাম্মাদ আস-সাদিক (১৮৫৯-৮২ খৃ.) ২৬ এপ্রিল, ১৮৬১ একটি শাসনতন্ত্র জারি করেন। উহা তিনি সম্রাট ৩য় নেপোলিয়নকে দিয়া পূর্বেই অনুমোদন করাইয়া লন। প্রশাসনিক ক্ষমতা পুরুষানুক্রমিক, কিন্তু দায়িত্বশীল বে-এর নিকটে থাকিবে (সিংহাসন লাভ করিবেন হুসায়নী বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র); তাঁহাকে সাহায্য করিবেন একটি মন্ত্রীসভা। সেই উযীরগণকে তিনিই নির্বাচন করিবেন; আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভাগ করিয়া লইবেন বে এবং ৬০ জন মনোনীত সদস্যের একটি গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল। বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকিবে; আদালতগুলি দেওয়ানী ও ফৌজদারী তিউনিসীয় আইনের ধারাসমূহ অনুসরণ করিবে। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা কাইদগণের হাতে থাকিবে। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন নির্বাচিত শায়খগণ; বে-কে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং কর আরোপের রীতি-পদ্ধতি উদ্ভাবন বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়।

এই সকল সংস্কার সত্ত্বেও পরিস্থিতি খারাপই হইতে থাকে। আহমাদ বে-এর আমলে নিযুক্ত অর্থমন্ত্রী মুস্‌তাফা খাযনাদার যে মারাত্মক অর্থনৈতিক পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাহার ফলে ঋণ গ্রহণ ও প্রচলিত মাজবা কর বৃদ্ধি করা হয়। উহার ফলে ১৮৬৪ খৃ. 'আলী ইব্‌ন গাদাহুমের নেতৃত্বে বিভিন্ন গোত্রীয়গণ বিদ্রোহ করে এবং জুলাই ১৮৬১ একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কমিশন (তিউনিসিয়া, ফ্রান্স, ইতালী ও মাল্টার অংশগ্রহণ সমবায়ে) গঠন করিতে হয়। ১৮৬৪ খৃ. এই শাসনতন্ত্র স্থগিত ঘোষণা করা হয়। অক্টোবর ১৮৭৩ জেনারেল খায়রুদ-দীনকে খাযনাদার করা হয়। কিন্তু তাঁহাকেও পদচ্যুত করা হয়। তাঁহার মন্ত্রী থাকাকালে (তিনি জুলাই ১৮৭৭ পর্যন্ত মন্ত্রী ছিলেন) বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সংস্কার কাজসমূহ করা হয় এবং অবস্থার সামান্য উন্নতিও হয়। কিন্তু দেশের নিয়মিত সম্পদই এত কম ছিল এবং ঋণের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, অর্থনৈতিক কমিশন কিছুই করিতে পারে নাই। মুস্‌তাফা ইব্‌ন ইসমাঈলের কুশাসন (সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) ছিল অবস্থার প্রতি শেষ আঘাত। আর একই সঙ্গে ফরাসী ও ইতালীয় কনসাল Roustan ও Maccio-এর মধ্যে বিভিন্ন সরকারী দফতরে প্রভাব বৃদ্ধির জন্য তিক্ত দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে।

ফ্রান্স ১৮৭৮ খৃ. বার্লিন কংগ্রেসের পর হইতে গ্রেট বৃটেন ও জার্মানীর নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়া, অতঃপর হস্তক্ষেপ করে। খ্রুমিরগণ আলজিরিয়াতে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করিলে এবং আরও বিভিন্ন ঘটনার পরে মন্ত্রী জুল ফেরী (Jules Ferry) এপ্রিল ১৮৮১ তিউনিসিয়া জয় করিবার জন্য ৩০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ১২ মে তুর্কী প্রতিবাদ সত্ত্বেও জেনারেল ব্রেয়ার্ত (Breart) কিছুমাত্র বাধার সম্মুখীন না হইয়া সাদিককে কাসার-সাইদ চুক্তি (বারদো নামে পরিচিত) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। উহার ফলে এই প্রতিনিধি শাসিত দেশটির সামরিক, বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ বস্তুত ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। একজন ফরাসী আবাসিক মন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রথম ব্যক্তি ছিলেন Roustan। তাহার মাধ্যমেই বে-এর সঙ্গে ফরাসী সরকারের সকল কাজ সম্পাদিত হইত। এইভাবেই শব্দটি ব্যবহৃত না হইলেও ফরাসী আশ্রিত রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। উহা বাস্তবায়িত ও চূড়ান্ত হয় যখন কেন্দ্রে ও দক্ষিণে 'আলী ইব্‌ন খালীফার নেতৃত্বে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং দ্বিতীয় একটি ফরাসী অভিযান করিয়া দ্রুত উহা দমন করা হয়। ৮ জুন, ১৮৮৩ La Marsa-এর চুক্তি অনুযায়ী বে সম্মত হন যে, তিনি শুধু সেইরূপ প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় ও অর্থনৈতিক সংস্কারই বাস্তবায়ন করিবেন যেইরূপ ফরাসী সরকার প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবে।

ফরাসী আশ্রিত রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠার পরে তিউনিসিয়ার ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। মুসলিম বিজয়ের পর আর কোন রাজনৈতিক ঘটনা দেশটির সাংগঠনিক বিষয়ে বা অধিবাসীগণের জীবনের উপরে এমন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে নাই। রাষ্ট্রের যে আদি রূপ-কাঠামো নানা সমালোচনা সত্ত্বেও অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত টিকিয়া ছিল উহা একান্তই সরকারের পুরাতন রীতি-পদ্ধতির মধ্যে বাহ্যিকভাবে থাকিয়া যায়। উহার উপরে কেবল নূতন কাঠামো এবং নূতন প্রতিষ্ঠানাদি চাপাইয়া দেওয়া হয়।

হিজ হাইনেস বে রাজ্যটির নামেমাত্র শাসক হইয়া রহিলেন, তিনি ছিলেন তিউনিস রাজ্যের সাহিব (সাহেব); কিন্তু ফ্রান্সের আবাসিক মন্ত্রী যাঁহাকে ২৩ জুন, ১৮৫৫ হইতে বলা হইত রেসিডেন্ট জেনারেল, যিনি ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর অধীন ছিলেন এবং প্রতিনিধি শাসিত রাজ্যটির প্রজাতান্ত্রিক সার্বভৌম ছিলেন, প্রকৃত অর্থে তিনিই ছিলেন শাসক। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন বে-এর পররাষ্ট্র মন্ত্রী (বে তাঁহার মাধ্যম ছাড়া প্যারিসের সঙ্গে যোগাযোগ করিতে পারিতেন না) এবং তাঁহার কাউন্সিলের সভাপতি, বে-এর প্রচারিত ফরমানসমূহে তিনি প্রতিস্বাক্ষর করিতেন। জানুয়ারী ১৮৮৩ একটি ডিক্রি জারি করিয়া উহা বাধ্যতামূলক করা হয়। স্থল ও নৌবাহিনীর সেনাপতিগণ এবং সকল প্রশাসনিক চাকুরীর প্রধানগণ তাঁহার অধীনে ছিলেন। বে-এর দেহরক্ষীর সামরিক বাহিনী খুবই ছোট ছিল (৬০০ জন); তাঁহার প্রজাগণকে যে তিউনিসীয় বাহিনীতে চাকুরী করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল (১২ জানুয়ারী, ১৮৯২ জারিকৃত সেনা নিয়োগ বিষয়ক বে-এর ডিক্রিবলে) উহারা এক অর্থে ফরাসী সেনাবাহিনীরই অংশস্বরূপ ছিল। ১৯১৪-১৮ খৃ. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফরাসীদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে গিয়া ১০,০০০-এরও বেশি তিউনিসীয় সৈনিক মারা গিয়াছিল।

মন্ত্রী পরিষদে দুইজন, পরবর্তী কালে তিনজন দেশীয় মন্ত্রীর পাশাপাশি Directeurs বা ফরাসী বিভাগীয় প্রধানগণ থাকিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহা ছাড়াও দখলদার বাহিনীর জেনারেলগণও বিযারতার নৌবাহিনীর কমাণ্ডার থাকিতেন। তাঁহারা যুদ্ধমন্ত্রী ও অ্যাডমিরালটির মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিতেন। এই উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের প্রতিটি আইনের ধারা-উপধারা জারি করিতে পারিতেন। গোত্রগুলি যে কাইদাদে বিভক্ত ছিল সেইগুলিকে আঞ্চলিক বিভাগে পরিণত করা হয়; কাইদ-এর উপরে একজন ফরাসী বেসামরিক নিয়ন্ত্রণকারী (Controleur civil) নিযুক্ত হইতেন।

তিউনিসীয় শাসন পদ্ধতি একমাত্র তিউনিসিয়ার প্রতিই প্রযোজ্য, কখনও উহা সম্পূর্ণ মৌলিক হইত। শুধু রেসিডেন্ট জেনারেল, বেসামরিক নিয়ন্ত্রণকারীগণ এবং ফরাসী বিচারকগণের বিষয়াদি মীমাংসা হইত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের জারিকৃত ফরমান দ্বারা। রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পদ্ধতিসমূহ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এইগুলির যে প্রকৃত অবস্থা ছিল তাহাতে একটি সাম্প্রতিক মতামতেরই যেন যথার্থতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় যে, তিউনিসিয়াতে দ্বৈত প্রভুত্ব ছিল, ঐতিহ্যগত শাসক ছিলেন বে, আর সেই সঙ্গে ছিল আধুনিক ও গতিশীল ফরাসী শাসন।

আশ্রয়দাতা জাতির প্রথম বড় কাজ ছিল অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয়। এই দুই রকমের বিদেশী প্রভাব হইতে যতদূর সম্ভব বিদেশী হস্তক্ষেপ দূরীভূত করা। ফ্রান্স যখন তিউনিসীয় ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে তখন গ্রেট বৃটেন ও ইতালী অর্থনৈতিক কমিশন স্থগিত রাখিতে সম্মত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অক্টোবর, ১৮৮৪ বাস্তবায়িত হয়। পদ্ধতিগত অর্থনৈতিক প্রশাসন এবং স্বাভাবিক বাজেট প্রবর্তনের পরে তিউনিসিয়াতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়া আসে। বে-কে তাঁহার পারিবারিক ও দরবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভাতা মঞ্জুর করা হয়। ফরাসী সরকার কার্থেজের বিশপের প্রয়োজনে বাজেটে কাগজেপত্রেই একটা পরিমাণের গুরুত্বপূর্ণ অনুদান বরাদ্দ করিতেন। ১ জুলাই, ১৮৯১ হইতে সাবেক মুদ্রা পিয়াস্ত্রের পরিবর্তে ফ্রাঙ্ক চালু করা হয়।

১০ এপ্রিল, ১৮৮৩ পাস করা আইনের বলে এই আশ্রিত ও প্রতিনিধি শাসিত রাজ্যটিতে ফরাসী আদালতসমূহ সৃষ্টি করা হয় এবং ৫ মে, ১৮৮৩ জারিকৃত ফরমান দ্বারা বে মানিয়া লন যে, আগে যাঁহারা আত্মসমর্পণের সুযোগ লাভ করিয়া আসিতেছিলেন, নূতন আদালতে প্রয়োজনবোধে তাঁহাদিগকে বিচারাধীন করা যাইবে। বিদেশী শক্তিসমূহ একে একে তাহাদের দৌত্য অধিকারের মাত্রা কমাইতে থাকে (১৮৮৩-৮৪ খৃ.), ঠিক একই রকমভাবে ১৮৯৬-৯৭ খৃ. তাহাদিগকে

শুল্ক সুবিধাসমূহও ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্বে তিউনিসিয়ার আত্মসমর্পণের কারণে তাহারা সেই সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। শুধু ইতালী নিজের অধিকার রক্ষা করে এবং তিউনিসিয়ার সঙ্গে ১৮৬৮ খৃ. সম্পাদিত চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গেলেও ইথিওপিয়ার আদোয়াতে উহার পরাজয়ের পরে পরেই উহাকে আশ্রিত মর্যাদার বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, (তুরস্ক ১৯২০ খৃ. সেভরেস চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব পর্যন্ত সরকারীভাবে ইহা স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই); তথাপি এই প্রতিনিধি শাসিত রাজ্যটিতে উহার একটি বিশেষ সুবিধাজনক মর্যাদা ছিল। সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিবার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত হয় নাই। ফরাসীদের অপেক্ষা ইতালীয় নাগরিকগণ বেশি সংখ্যায় এই দেশে প্রবেশ করিত। ইতালীয় সংবাদপত্র (দৈনিক Unione), ব্যাংক ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে (স্কুল, বিভিন্ন সমিতি) প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। একটি চুক্তিবলে সেইগুলি ফরাসী নিয়ন্ত্রণের বাহিরে ছিল; তবে ইতালী কতগুলি সরকারী পদক্ষেপের সমালোচনা করিয়াছিল, যেইগুলি উহার অধিবাসিগণের জন্য অসুবিধাজনক ছিল। ১৯১৯ খৃ. ফ্রান্স একটি চুক্তিবলে গাত এবং গাদামেস মরূদ্যান দুইটিকে ইতালীর মালিকানাধীন বলিয়া মানিয়া লয় (ত্রিপোলিতানিয়া বা লিবিয়ার সঙ্গে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ করা হইয়াছিল ১৯১০ খৃ.)। কিন্তু তাহাতে তিউনিসিয়াতে ইটালীয় সমস্যার জটিলতার তেমন কোন সুরাহা হয় নাই।

আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদা স্বীকৃত হইবার পরে ফ্রান্স এই প্রতিনিধি শাসিত দেশটিতে (Regency) প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারের এবং আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক প্রয়োজনাদি মিটাইবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করে (হাসপাতাল, চিকিৎসাকেন্দ্র ও ডিসপেনসারী, চিকিৎসক, কল্যাণ সমিতি, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ইত্যাদি)। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং অধিকতর যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান ও পদ্ধতির ব্যবহারের ফলে উৎসাহব্যঞ্জক অর্থনৈতিক সুফল দেখা দেয়। মূলত কৃষিপ্রধান দেশটিতে খাদ্যশস্য, আঙ্গুর, জলপাই, শাক-সবজি ও খেজুর উৎপাদিত হয়, সেই সঙ্গে যোগ করা যায় ছিপিগাছ, যাহার বাকল হইতে ছিপি (cork) উৎপাদিত হয় এবং আলফা ঘাস, গবাদি পশু পালন করা হয়। তিউনিসিয়া ক্রমেই অধিক পরিমাণে লোহা, সীসা ও দস্তা রফতানী করিতে থাকে। সেই সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ফসফেট রফতানি (১৮৮৫ খৃ. Ph. Thomas ফসফেটের খনি আবিষ্কার করেন)। তিউনিসিয়া জ্বালানি তৈল, উষ্ণদেশীয় বিবিধ উৎপাদিত দ্রব্য এবং কিছু পরিমাণ শিল্প-উৎপাদিত দ্রব্য আমদানি করে। এই সময়ে দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক। সত্য যে, কয়েক বৎসর পর্যন্ত এইখানে বাণিজ্য ঘাটতি ছিল; পর্যটন হইতে যে আয় হয় তাহা ঘাটতি পূরণের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

য়ূরোপীয় উপনিবেশ গড়িয়া তোলার জন্য এবং ভূমি প্রশাসন আধুনিক করিবার জন্য ১ জুলাই, ১৮৮৫ ফরমানবলে তিউনিসিয়াতে Acte Torrens-এর ভিত্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ Loi Fonciere জারি করা হয়ঃ মিশ্র ভূমি প্রশাসন আদালতসমূহ গঠন করা হয় (তিউনিসে ৭ জন ফরাসী ও ৩ জন মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট, সূসাতে ৪ জন ফরাসী ও ২ জন মুসলিম)। এই সকল আদালত হইতে অনুকূল সিদ্ধান্ত পাইলে কেহ ইচ্ছা করিলে যমিন রেজিস্ট্রি করাইতে পারিবেন। ১৯২৪ খৃ. একটি ফরমান দ্বারা ভূমি জরীপ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফরাসী দখলের পরে প্রথম দিকে ফরাসী কৃষিবিদগণের উপনিবেশ স্থাপন প্রায় পুরাপুরিভাবেই ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফরাসী নাগরিকগণকে সেইখানে বসত করাইবার সরকারী নীতি ১৯০০ খৃ. হইতেই শুধু কার্যকরভাবে অনুসরণ করা হয়। সরকার যমিন ক্রয় করিয়া পরে খুব সহজে পরিশোধনীয় পদ্ধতিতে ফরাসীগণের নিকটে, বিশেষ করিয়া তিউনিসে স্থাপিত Ecole Coloniale d'Agriculture-এর সাবেক ছাত্রগণের নিকটে বিক্রি করে। ইতালীয়গণও ফরাসীগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে, তবে তাহাদের জনসংখ্যা যত বেশি ছিল কৃষি খামারগুলি তত বড় ছিল না।

ফরাসী নাগরিকগণ তেমন বেশী সংখ্যায় অভিবাসন না করায় ফরাসী সরকার ৮ নভেম্বর, ১৯২১ নাগরিকত্ব প্রদানের দুইটি ফরমান জারি করে। একটি ফরাসী প্রেসিডেন্টের এবং অপরটি বে-এর। কিন্তু গ্রেট বৃটেন সেই বিষয়ে দি হেগ-এর আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা দায়ের করিলে সেই ফরমানের পরিবর্তে ২০ ডিসেম্বর, ১৯২৩-এর ফরাসী আইন জারি করা হয়। তিউনিসিয়াতে আসিয়া বসতি স্থাপনকারী বিদেশী ও আগন্তুক ব্যক্তি নাগরিকত্বের আবেদন করিলে দ্বিতীয় পুরুষে স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাহা লাভ করিতেন (naturalisation) তবে সেইরূপ আবেদন প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতাও রক্ষিত ছিল), তৃতীয় পুরুষে নাগরিকত্ব গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। ইংল্যাণ্ড প্রধানত তাহার মাল্টার প্রজাগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই বিধিগুলির মূল বিষয়গুলি মানিয়া লয়। তবে ইতালীয়গণ তাহাদের চুক্তি দ্বারা বাধ্যতামূলক নাগরিকত্ব পরিহার করে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আবার স্বেচ্ছাকৃতভাবে নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। নূতন ফরাসীগণের মধ্যে (neo-francais) মুসলমানের সংখ্যা ২,০০০-এরও কম ছিল, কিন্তু য়াহূদী ছিল প্রায় ৫,০০০। উহাদের সংখ্যা ২০শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মোট ফরাসী অধিবাসীর এক-চতুর্থাংশ ছিল। য়ূরোপে জন্মগ্রহণকারী কয়েক হাজার য়াহূদী তাহাদের ইতালীয় জাতীয়তা রক্ষা করে, উহাদের অধিকাংশ স্থানীয় কর্তৃত্ব ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে বে-এর প্রজারূপে বসবাস করিতে থাকে, শুধু উহাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি মীমাংসার জন্য তিউনিসে একটি বিচারালয় (Tribunal Rabbique) স্থাপন করা হয় (নভেম্বর ১৮৯৮ ও নভেম্বর ১৯২৯ ফরমান দ্বারা উহাকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়)। তাহা ছাড়া Nataires israelites নামেও অপর একটি আদালত স্থাপিত হয় (শেষোক্তটির স্বীকৃতি দেওয়া হয় ফ্রেব্রুয়ারী ১৯১৮ এবং এপ্রিল ১৯২৭ জারি করা ফরমান দ্বারা)। তিউনিসীয় য়াহূদীগণ কোন সামরিক চাকুরী করে না এবং সাধারণভাবে সরকারী কর্মকর্তা হইতে পারে না। য়ূরোপীয় সভ্যতায় য়াহূদীগণের দ্রুত অগ্রগতির ফলে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয় যে, তাহাদের বিরাট সংখ্যক লোক ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। ৩০ আগস্ট, ১৯২১ ফরমান বলে তিউনিসের controle civile-এর আওতাভুক্ত সকল য়াহূদীর জন্য কোনরূপ জাতীয়তা নির্বিশেষ একটি কাউন্সিল গঠন করা হয় (Conseil dela Communaute)। ১২ সদস্যের সেই কাউন্সিলের সদস্যগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকগণের ভোট দ্বারা ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। উহার আওতাভুক্ত বিষয় ছিল ত্রাণ ও ধর্মীয় ইবাদত বা উপাসনা। অন্যান্য য়াহূদী সমাজের জন্য সরকার প্রশাসক নিযুক্ত করেন; সরকারই তিউনিসিয়ার প্রধান রাব্বীকে নিয়োগ দান করেন। তাহাদের ধর্ম পালনে নিষ্ঠার অভাব দেখা যায়, কিন্তু অপরপক্ষে আবার য়াহূদীবাদ যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

আশ্রিত রাজ্যটির সরকার কোনরূপ ধর্মবোধে আঘাত না দিয়া স্থানীয় প্রশাসনের এবং মুসলমানগণের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে (উপরে দ্র.)।[২] কোথাও সমস্যা অনেক বেশি থাকিলে তন্মধ্যে কোন কোনগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখা হইত, কাজের পরিমাণ সন্তোষজনক ছিল। পাশ্চাত্য জীবনধারা পদ্ধতি গ্রহণের যথেষ্ট বিরোধিতা হইতে থাকে, তথাপি তিউনিসিয়ার মুসলিমগণের জীবনে

যথেষ্ট পরিবর্তন আসিতে থাকে। দুসতূর আন্দোলন (তিউনিসীয় শাসনতান্ত্রিক দল, উহারা স্বায়ত্তশাসন দাবি করিত) যুদ্ধের পরে অগ্রগতি লাভ করে, রেসিডেন্ট-জেনারেল Lucien Saint অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উহা প্রতিরোধ করেন। পরবর্তী কালে স্থানীয় অধিবাসিগণ বিভিন্ন সংস্কার প্রচেষ্টাকে সন্তুষ্টির চোখেই দেখে। ১৯২০-৩০ খৃ. দশকে আশ্রিত রাজ্যটির অভ্যন্তরীণ নীতি সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়।

যেই সকল উদারনৈতিক ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তন্মধ্যে ছিল ১৯২২ ও ১৯২৮ খৃ. একটি গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল সৃষ্টি ও উহার পুনর্গঠন, দুইটি মৌলিক নীতি অনুসরণ স্থানীয়গণের আরও অধিক সংখ্যায় প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান এবং নির্বাচিত সংসদ সভাসমূহের আরও ক্ষমতা বৃদ্ধি। ফরাসী উপনিবেশগুলিতে নূতন নূতন অধিকার প্রদান করা হইতে থাকে। মিউনিসিপাল কাউন্সিলগুলিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় এবং সংবাদপত্রের অধিকতর স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। এই নিবন্ধ লিখিবার সময়ে তিউনিসিয়া আশ্রিত রাজ্য হইবার জুবিলি উৎসব পালনের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল।

ফরাসী অধিকারের পর হইতে বে-গণের তালিকা

মুহাম্মদ আস-সাদিক 'আলী (১৮৮২-১৯০২ খৃ.)

মুহাম্মাদ আলী-হাদী (১৯০২-০৬ খৃ.)

মুহাম্মাদ আন-নাসির (১৯০৬-২২ খৃ.)

মুহাম্মাদ আল-হাবীব (১৯২২-২৯ খৃ.)

আহমাদ (১৯২৯ –)

রেসিডেন্ট জেনারেলগণের তালিকা

Paul Cambon (নিযুক্তি, মার্চ ১৮৮২ খৃ.)

Massicault (নভেম্বর ১৮৮৬)

Rouvier (নভেম্বর ১৮৯৪)

Stephen Pichon (মার্চ ১৯০১)

Alapetite (ডিসেম্বর ১৯০৬)

Flandin (অক্টোবর ১৯১৮)

Lucien Saint (জানুয়ারী ১৯২১)

Manceron (জানুয়ারী ১৯২৯)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইসলামের সাধারণ ইতিহাস (Muller, Catani, ইত্যাদি) ও উত্তর আফ্রিকার ইতিহাস (Mercier, Faure-Biguet, ইত্যাদি) বাদ দিলে শুধু তিউনিসিয়ার ইতিহাস প্রায় ঘটনাবিহীন। যাহা হউক একটি ভাল পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ হইল (১) 'আবদু'ল-ওয়াহহাব, খুলাসাতু তা'রীখ তূনুস[২], তিউনিসি ১৩৪৪ খৃ.।

১। মধ্যযুগের জন্য

(ক) আরব ভৌগোলিক ও পর্যটকগণের বিবরণী ঃ তন্মধ্যে (২) য়াকূত, (৩) আবুল-ফিদা', (৪) ইব্ন বাতূতা, কিন্তু বিশেষভাবে দ্র. (৫) আল-য়া'কূবী, Descriptiona almaghribi, সম্পা. ও অনু. de Goeje, লাইডেন ১৮০০ খৃ.; (৬) ইব্ন হাওকাল, B. G. A., ২খ., অনু. J. A. ১৮৪২; (৭) আল-বাকরী, Description de L'Afrique septentrionale[2], অনু. আলজিয়ার্স ১৯১১-১৩ খৃ.; (৮) আল-ইদ্‌রীসী, নুযহাতু'ল-মুশতাক, সম্পা. ও অনু. লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.; (৯) কিতাবুল-ইসতিবসার, ভিয়েনা ১৮৫২ খৃ., অনু. Rec.. Constantine ১৮৯৯ খৃ.; (১০) আল-'আবদারী, রিহলা, অনু. J. A., ১৮৫৪ খৃ.; (১১) আত্-তিজানী, রিহলা, তিউনিস, অনু. J. A., ১৮৫২-৩ খৃ.; (১২) ইব্ন ফাদলুল্লাহ আল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আবসার, আংশিক সম্পাদনা 'আবদুল-ওয়াহ্হাব, তিউনিস তা. বি., অনু. Gaudefroy-Demombynes, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.।

(খ) মুসলিম ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলী ঃ (১৩) ইব্ন 'আবদু'ল-হাকাম, কিতাব ফুতূহ মিসর, সম্পা. Torrey, নিউ হ্যাভেন ১৯২২ খৃ., অনু. ঐ লেখক, Bibl. and S. Stuides-এ প্রকাশিত, নিউ ইয়র্ক ১৯০১ খৃ.; (১৪) ইব্ন হাম্মাদ, Histoire des rois Obaiddies, সম্পা. ও অনু. Vonderheyden, আলজিয়ার্স ১৯২৭ খৃ.; (১৫) ইবনুল-আছীর, Annales du Maghreb et de L'Espagne, অনু. Fagnan, আলজিয়ার্স, ১৯০১ খৃ.; (১৬) ইব্ন 'ইযারী, আল-বায়ানু'ল-মুগরিব, ২খ., সম্পা Dozy, লাইডেন ১৮৪৮-৫১ খৃ., ৩খ.; সম্পা. Levi'-Provencal, প্যারিস ১৯৩০ খৃ., অনু. Fagnan, ২খ., আলজিয়ার্স ১৯০১-৪ খৃ.; (১৭) আন-নুওয়ায়বী, Historia de los musulmanes de Espana y Africa, সম্পা. ও অনু. Gaspar Remiro, গ্রানাডা ১৯১৭-১৯ খৃ.; (১৮) আবূ যাকারিয়্যা, Chronique, অনু., আলজিয়ার্স ১৮৭৮ খৃ.; (১৯) ইবনু'ল-খাতীব, রাকমুল-হুলাল, তিউনিস ১৩১৬ খৃ.; (২০) ঐ লেখক, আম্ম'মলুল আলাম, সম্পা. 'আবদুল-ওয়াহহাব (Cent. Amarie-তে), পালার্মো ১৯১০ খৃ.; (২১) ইব্ন খালদূন, কিতাবুল-'ইবার[৩], বুলাক ১২৮৯ খৃ.; (২২) ঐ লেখক, আল-মুকাদ্দিমা, প্রায়শ সম্পা. এবং মুদ্রিত, বৈরূত ও কায়রো, অনু. de Slane, প্যারিস ১৮৬২-৬৮ খৃ.; (২৩) ঐ লেখক, Histoire des Berberes, অনু. de Slane, আলজিয়ার্স ১৮৫২-৫৬[২] খৃ., প্যারিস; (২৪) ইব্ন কুনফুয, আল-ফারিসীয়্যা, সম্পা. ও আংশিক অনু. J. A., ১৮৪৮-৫২ খৃ.; (২৫) সেইখানির লিথোগ্রাফ হয় প্যারিসে ১২৬৩ হি. (?), তিউনিস হইতেও একটি সং. প্রকাশিত হয়; (২৬) আবুল-মাহাসিন, Extraits relatifs au Maghreb, অনু. Fagnan, Rec. Constantine ১৯০৬ খৃ.; (২৭) আয-যারকাশী, তা'রীখুদ-দাওলাতায়ন, তিউনিস ১২৮৯ খৃ., অনু. Fagnan, কন্সট্যান্টাইন ১৮৯৫ খৃ.; (২৮) Extraits inedits relatifs au Maghreb, অনু. Fagnan, আলজিয়ার্স ১৯২৪ খৃ.।

(গ) জীবনীমূলক গ্রন্থাবলী ঃ (২৯) আবুল-'আরাব, তাবাকাত 'উলামা' ইফরীকিয়্যা, সম্পা. ও অনু. বেন চেনেব, প্যারিস–আলজিয়ার্স ১৯১৫-২০ খৃ.; (৩০) ইব্ন নাজি, মা'আলিমুল ঈমান, তিউনিস ১৩২০ খৃ. এবং তাহা ছাড়া দ্র. ইবনুল-আব্বার, ইব্ন খাল্লিকান, ইব্ন ফারহূন, আহমাদ বাবা।

(ঘ) য়ূরোপীয় ইতিহাস লেখকগণের অসংখ্য অনুচ্ছেদ ঃ তন্মধ্যে ক্রুসেডের ইতিহাস লেখকগণ, যেমন (৩১) St. Louis ক্রুসেডের লেখক (তু. Sternfeld, Ludwigs des Heiligen Kreuzzug nach Tunis, বার্লিন ১৮৯৬ খৃ.) এবং (৩২) Muntaner, Villani (তু. Schiaparelli, Dichiarazoine... Giov. Villani relativi alla storia dei Beni Hafs in Tunisi, রোম ১৮৯২ খৃ.), Cabaret d'Orreville, Froissart;

(ঙ) দলীলপত্রাদি ঃ (৩৩) সম্পা. Amari, I diplomi arabi del r. archivio fiorentino, ফলোরেন্স ১৮৬৩-৬৭ খৃ.; (৩৪) Mas-Latrie, Traites de paix et de commerce... de 1'Afrique septentionale au moyenage, প্যারিস ১৮৬৬-৭২.; (৩৫) Marengo, Genovae Tunisi (1388-1515), রোম ১৯০১ খৃ.; (৩৬) Gimenez Soler, Episodios...

relaciones entre la corona de Aragony Tunez, Inst. Est. Catalans Anurai 1908, বার্সেলোনা; (৩৭) ঐ লেখক, Documentos de Tunez, ib., 1909-1910; (৩৮) Cerone, Alcuni documenti sulla seconda spedizionc di Alfonso V contro l'isola Gerba, ib.; (৩৯) Ribera. Tratado de paz... eatre Fernando I... de Napoles y Abuamer Otman rey de Tunez, in Cent. Amari, পার্লেমো ১৯১০ খৃ.।

বিশেষ গবেষণা গ্রন্থসমূহ ঃ (ক) মুসলিম বিজয় বিষয়ে ঃ (৪০) Fournel, Les Berbers, প্যারিস ১৮৭৫--৮১ খৃ.; (৪১) Diehl, L'Afrique byzantine, প্যারিস ১৮১৬ খৃ.; (৪২) Caudel, Les premieres invasions arabes dans L'Afrique du Nord, প্যারিস ১৯০০ খৃ.।

(খ) মধ্যযুগ বিষয়ে ঃ (৪৩) E. F. Gautier, Les sieoles obscurs du Maghreb, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.; (৪৪) Vonderheyden, La Berberie orientale sous la dynastie des Benou 'L-Aghlab, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.; (৪৫) 'আবদুল ওয়াহ্হাব, রিসালাতুল-'আকীক ফী হাদারাতিল-কায়রাওয়ান, তিউনিস ১৩৩০ খৃ.; (৪৬) Chalandon, Historie de la domination normande en Italie et en Sieile (উহার সর্বত্র), প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (৪৭) G. Marcais, Les Arabes en Berberie du XIeme au XIVeme siecle, কন্সটন্টাইন-প্যারিস ১৯১৩ খৃ.; (৪৮) van Berchem, Titres califiens d' Occident, J. A., ১৯০৭ খৃ.; (৪৯) Schauble, Handelsges chichte der roman. Voler des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzuge (উহার সর্বত্র), মিউনিখ ১৯০৬ খৃ.; (৫০) Gimenez Soler, El comercio en tiera de infieles durante la edad media, Bol. R. Acad. Buenas Letras, বার্সেলোনা ১৯০৯-১০ খৃ.; (৫১) La Mantia, La Sicilia ed il suo dominio nell' Africa settentr., dal sec. XI al XV, Arch. Stor. Sicil, ১৯২২ খৃ.; (৫২) Sayous, Le commerce des Europeens a Tunis depuis le XLLeme siecle jusqu'a la fin du XVIeme, প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (৫৩) Boissonnade, Les relations commerciales de la France meridionale aveo L'Afrique du Nord du XIleme au XVemm sieole, Bull. geogt du Comite des tr. hist. 1929; (৫৪) Alemany, Milicias Christianas... del Almagreb, Homenaje a Codera-তে প্রকাশিত, সারাগোসা ১৯০৪ খৃ.; (৫৫) Delaville De Roulx, La France en Orient an XIV siecle, প্যারিস ১৮৮৬ খৃ.; (পৃ. ১৬৬-২০০); (৫৬) Cerone, lfonso il Magnanimo ed Abu Omar Othman, Arch. stor. Sicil, orient., 1912-13;

(২) পরবর্তী হাফসী শাসকগণের আমল এবং স্পেনের শাসামল বিষয়ে ঃ (ক) পর্যটক ও ভৌগোলিকগণের গ্রন্থাবলী ঃ (৫৭) van Chistele, Tvoyage... in lande... Barbarien (1485), গান্ড ১৫৫৭ খৃ.; (৫৮) Leo Africanus, Della desoripttione dell' Africa, সম্পা. Ramusio, ভেনিস ১৫৫০ খৃ., অনু. Temporal, প্যারিস ১৮৩০ খৃ., ২য় সং Schefer, প্যারিস ১৮৯৬ খৃ.; (৫৯) Marmol, Description general de Africa, গ্রানাডা ১৫৭৩ খৃ., অনু. Perrot d'Ablancourt, প্যারিস ১৬৬৭ খৃ.।

(খ) দলীলপত্রাদি ঃ (৬০) Begouen কর্তৃক প্রকাশিত। Notes et documents... histoire de la Tunisie, প্যারিস-তুর্লো ১৯০১ খৃ.; (৬১) Foucard, Relazioni dei duchi di Ferrara e di Modena coi re di Tunisi, মডেনা ১৮৮৯ খৃ.; (৬২) Odorici e Amari, Lettere di Muley Hassan a Ferrante Gonzaga, মডেনা ১৮৬৫ খৃ.; (৬৩) La Primaudaie, Documents inedits sur L'histoire de L'occupation espagnole en Afrique, R. A., 1875-1877; (৬৪) Grandchamp, Documents relatifs a la fin de l'occupation espagnole en Tunisie, R. T., 1914; (৬৫) Monchicourt, La Tunisie et l'Europe. Quelques documents relatifs aux XVIeme, XVIIeme et XVIIIeme siocles, R. T. 1905 এবং তাহা ছাড়া Col. de doc. ined. para la hist. de Espana, মাদ্রিদের মূল্যবান সংগ্রহের বিভিন্ন অংশ।

(গ) গবেষণাসমূহ ঃ (৬৬) Motylimski, Expedition... contre Djerba (1510), Actes XIVeme Congres Orient-এ প্রকাশিত, আলজিয়ার্স ১৯০৫ খৃ.; (৬৭) Muoni, Tunisi e la Spedizione di Carlo V. মিলান ১৮৭৬ খৃ.; (৬৮) Cat. De Caroli V in Africa rebus gestis, প্যারিস ১৮৯১ খৃ.; (৬৯) Medina, L'expedition de Charles-Quint a Tunis, R. T., ১৯০৬ খৃ.; (৭০) Monchicourt, Essai sur les plans imprimes de Tripoli, Djerba, Tunis-Goulette au XIVeme siecle, R. A., ১৯২৫ খৃ.; (৭১) ঐ লেখক, Episodes de la corriere tunisienne de Dragut. R. T., ১৯১৮ খৃ.; (৭২) Charles, La conquete de Mahdia (1551), Mach, ১৯২১ খৃ.; (৭৩) Monohicourt, L'Expedition espagnele de 1560 contre L'ile de Djerba, R. T., ১৯১৩-১৪ খৃ.; (৭৪) Brandel, Les Espagnols et L'Afrique du Nord de 1492 a 1577, R. A., ১৯২৮ খৃ. (টীকার সঙ্গে এবং সংযোজন অংশে খুব পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া, তিউনিসিয়া বিষয়ক দলীলপত্রাদি); (৭৫) Poinssot et Lantier, Les gouverneurs de La Goulette durant L'occupation espagnole R. T., ১৯৩০ খৃ. (টীকাতে বিভিন্ন তথ্য-উৎস উল্লেখ করা হইয়াছে)।

(৩) তুর্কী শাসনামল বিষয়ে

(ক) মুসলিম পর্যটকগণের বিবরণী ঃ (৭৬) আল-'আয়্যাশী, রিহলা, ফেয ১৩১৬ খৃ.; অনু. প্যারিস ১৮৪৬ খৃ., (Expl. scient. Algerie, খ. ৯); (৭৭) আহমাদ আন-নাসিরী, রিহলা, ফেয; (৭৮) আল-ওয়ারছিলানী, রিহলা, সম্পা. Ben Cheneb, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.।

(খ) মুসলিম ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলী ঃ (৭৯) ইব্ন আবী দীনার আল-কায়রাওয়ানী, কিতাবুল-মু'নিস, তিউনিস ১২৮৬ খৃ., অনু. প্যারিস ১৮৪৫ খৃ. (Expl. scient. Algerie, vol. VII); (৮০) আল-ওয়াযীরুস-সাররাজ, আল-হুলালুস-সুনদুসিয়া, তিউনিস ১২৮৭ হি. (?), অসম্পূর্ণ সং.; (৮১) মুহা. ইব্ন য়ূসুফ, আল-মাশরাউল-মালাকী (১৭০৫-৬৫ খৃ.), অনু. Serres and Lasram, তিউনিস ১৯০০ খৃ.;

(৮২) ইব্ন মাকদীশ, নুযহাতুল-আনযার, লিযো, তিউনিস ১৩২১ হি. (?); (৮৩) মুহা. আল-বাজী, আল-খুলাসা... ফী উমারা ইফরীকিয়্যা, তিউনিস ১৩২৩ হি. (?); (৮৪) ইব্ন 'আবদিল-'আযীয এবং ইব্ন আবীদ-দিয়াফ, অপ্রকাশিত।

(গ) য়ূরোপীয় লেখকগণের গ্রন্থাবলী ঃ (৮৫) Lan-freducci e Bosio, Costa e discorsi di Barberia (১৫৮৭ খৃ.), সম্পা. এবং অনু. Monchicourt-Grandchamp, R. A., ১৯২৫ খৃ.; (৮৬) Barker, A true and certain report of... captain Ward, লন্ডন ১৬০৯ খৃ.; (৮৭) Prevost de Beaulieu-Persao, Memoires, সম্পা. La Ronciere, প্যারিস ১৯১৩ খৃ., পৃ. ২২৮-২৬৪; (৮৮) Pijnacker, De reyse naer Africa, Tunis, Algiers... in den jare 1625, হার্লেম ১৬৫০ খৃ.; (৮৯) Savary de Breves, Relation de see voyages... aux royaumes de Tunis et Alger, প্যারিস ১৬২৮ খৃ.; (৯০) Attardo, Relazione della guerra... fra Algierie Tunisi quest'anno 1628, সম্পা. Roy, R. T., ১৯১৭ খৃ.; (৯১) Th. d'Arcos, Lettres inedites ectites de Tunis (1633-36), আলজিয়ার্স ১৮৮৯ খৃ.; (৯২) Dan, Histoire de Barbarie, প্যারিস ১৬৩৭ খৃ.; (৯৩) Thevenot, Voyages..., প্যারিস ১৬৬৪-৭৪ খৃ.; (৯৪) Pagni, Lettere... di quanto eqli vidde e opero in Tunisi, ফ্লোরেন্স ১৮২৯ খৃ.; (৯৫) D'Arvieux, Memoires (vol. IV), প্যারিস ১৭৩৫ খৃ. (১৬৬৬ খৃ. তিউনিসিয়া মাত্রা); (৯৬) Dapper, Naukeurige beschrijving der Afrikaensche gewesten, আমস্টারডাম ১৬৬৮ খৃ.; (৯৭) Galland, Relation de L'esolavage d'un marchand Cassis a Tunis, ed. in the Magasin encyclopedique, প্যারিস ১৮০৯ খৃ.; (৯৮) Coppin, Le bouclier de L'Europe, লায়ন ১৬৮৬ খৃ.; (৯৯) Histoire des dernieres revolutions duroyaume de Tunis, প্যারিস ১৬৮৯ খৃ.; (১০০) La Faye, Etat des royaumes de Barbarie, রোয়েন ১৭০৩ খৃ.; (১০১) Lucas, Goyage... Afrique (এখানির পরে পরেই প্রকাশিত হয় Memoire pour servir a l'histoire de Tunis), প্যারিস ১৭১২ খৃ.; (১০২) Laugier de Tassy, Histoire des Etats barbaresques, ফরাসী অনু., প্যারিস ১৭৫৭ খৃ.; (১০৩) Peyssonnel, Relation d'un voyage sur les cotes de Barbarie...en 1724, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ.; (১০৪) Shaw, Travels (1727), অক্সফোর্ড ১৭৩৮ খৃ.; (১০৫) Tollot, Nouveau voyage fait au Levant (1731), প্যারিস ১৭৪২ খৃ.; (১০৬) La Condamine, Voyage au Levant (1731), আংশিক সম্পা., R. T., ১৮৯৮ খৃ.; (১০৭) Godefroy, Comelin and La Motte, Etat des royaumes de Barbarie, রোয়েন ১৭৩১ খৃ.; (১০৮) Hebenstreit, Voyage a Alger, Tunis et Tripoli...en 1732, বার্লিন ১৭৮০ খৃ.; (১০৯) St. ervais, Memoires historiques... royaume de Tunis, প্যারিস ১৭৩৬ খৃ.; (১১০) Lettres sur l' histoire polituque de la Tunisie, dt 1728 a 1740, ed. Gandolphe, R. T., ১৯২৪-২৬ খৃ.; (১১১) Poiron, Memoires concernapt L'etat present du royaume de Tunis (1752), সম্পা. Serres, প্যারিস ১৯২৫ খৃ.; (১১২) Desfontaines, Fragments d'un voyage... Tunis et. Alger (1783-1786), প্যারিস ১৮৩৮ খৃ.; (১১৩) Stanley, Observations on the city of Tunis, লন্ডন ১৭৮৬ খৃ.; (১১৪) Poiret, Voyage en Barbarie, প্যারিস ১৭৮৯; (১১৫) Nyssen, Memoire sur Tunis (1788), সম্পা. Monchicourt, R. Hist. Col. Fr., ১৯২৩ খৃ.; (১১৬) Caroni, Ragguaglio del viaggio... in Barberia, মিলান ১৮০৫ খৃ.; অনু. Conor-Grandchamp, R. T., ১৯১৭ খৃ.; (১১৭) Chauteaubriand, Itineraire de Paris a Jerusalem (1807), প্যারিস ১৮১১ খৃ.; (১১৮) Maggil, An Account of Tunis গ্লাসগো ১৮১১ খৃ.; (১১৯) Blaquiere, Lettres from the Mediterranean, vol. 2, লন্ডন ১৮১৩ খৃ.; (১২০) Frank, Tunis (1816), in L'Univers pittoresque, vii, প্যারিস ১৮৫০ খৃ.; (১২১) Noah, Travels in... the Barbary States, নিউইয়র্ক ১৮১৯ খৃ.; (১২২) Filippoli, Fragmens.., sur la Regence de Tunis (1829), সম্পা, Monchicourt, R. Hist. Cal., Fr., ১৭২৪-২৬ খৃ.; (১২৩) আরও দ্র. Bauers-এর সংশোধন Relationes de Africa, vol. 3, মাদ্রিদ ১৯২২ খৃ.। ১৮৩০ খৃ. পরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে অসংখ্য নিবন্ধ ছাড়াও (যথা Le Tour du Monde, Revue de L'Orient, ইত্যাদি) বইও বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হইতে থাকে; (১২৪) Grenville-Temple, Excursions in the Mediterranean, Algiers and Tunis (1832-33), লন্ডন ১৮৩৫ খৃ.; (১২৫) Calligaris, Notice sur Tunez (1834), সম্পা. Monchicourt, T. Hist. Cat. Fr., ১৯২৮ খৃ.; (১২৬) Ewans, Reise... von Tunis (1835), নুরেমবার্গ ১৮৩৭ খৃ.; (১২৭) Puckler—Muskau, Semilasso in Afrika, স্টুটগার্ট ১৮৩৬ খৃ.; (১২৮) Niculy, Documenti sulla storial di Tunis, লিভোর্ব ১৮৩৮ খৃ.; (১২৯) Capitaine X, Une promenade a Tunis en1842, ১৮৪৪; (১৩০) Kennedy, Algeria and Tunisia in 1845, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ.; (১৩১) Barth, Wanderungen durch die Kustenlander des Mittelmeers n 1845-47, বার্লিন ১৮৪৯ খৃ.; (১৩২) Chassiron, Apercu pittoresque de la Regence de Tunis, প্যারিস ১৮৪৯ খৃ.; (১৩৩) Pellissier, Description de la Rigence de Tunis, প্যারিস ১৮৫৩ খৃ. (Expl. scient. Algerie, xv; আরও দ্র. R. d. Deux Mondes, May 1856); (১৩৪) Daumas, Quatorze ans a Tunis, আলজিয়ার্স ১৮৫৭ খৃ.; (১৩৫) Fnotti, La Regenza di Tunisi, মাল্টা ১৮৫৭ খৃ.; (১৩৬) Dunant, Notice sur la Regence de Tunis, জেনেভা ১৮৫৮ খৃ.; (১৩৭) Guerin, Voyage archeologique dans la Regence de Tunis, প্যারিস ১৮৬২ খৃ.; (১৩৮) Flaux, La Regence de Tunis au XIX eme siecle, প্যারিস ১৮৬৫ খৃ.; (১৩৯) Francois, Tunis et la Regence sous Mohammed el-Sadock Bey, প্যারিস ১৮৭ খৃ.; (১৪০) De Gubernatis, Lettere sulta Tunisia, ফ্লোরেন্স ১৮৬৭ খৃ.; (১৪১) Michel, Tunis, প্যারিস ১৮৬৭ খৃ.; (১৪২) Maltzan, Sittenbilder aus Tunis, u. Algerien, লাইপযিগ ১৮৬৯ খৃ.; (১৪৩) ঐ লেখক, Reise in den Regentschaften Tunis u. Tripolis, লাইপযিগ ১৮৭০ খৃ.; (১৪৪) Zaccone, Notes sur la Regence de Tunis, প্যারিস ১৮৭৫ খৃ.; (১৪৫) Rae, Barbary,

Journey from Tripoli to... Kairouan, লন্ডন ১৮৭৭ খৃ.; (১৪৬) Feraud. Notes sur un voyage en Tunisie et en Tripolitane, R. A., ১৮৭৭ খৃ.; (১৪৭) Nachtigal, Tunis, Deutsche Rundechau, ১৮৮১ খৃ.; (১৪৮) Pinchia, Richordi di Tunisi, তুরিন ১৮৮১ খৃ.।

(ঘ) দলীলপত্রের সংগ্রহ ঃ (১৪৯) Plantet, Correspondance des beys de Tunis et des consuls de France avce la Cour (1577-1830), 3 vol., প্যারিস ১৮৯৩-৯৯ খৃ.; (১৫০) Grand-champ, La France en Tunisie (1582-1700), 8 vol., তিউনিস ১৯২০-৩০ খৃ.; (১৫১) Heeringa, Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantschen Haudel (1590-1726), 3 vol., দি হেগ ১৯১০-১৭ খৃ.; (১৫২) Grandchamp, Documents relatifs aux corsaires tunisiens (1777-1814), তিউনিস ১৯২৫ খৃ.।

(ঙ) বিশেষ গ্রন্থাবলী ঃ (১৫৩) Rousseau, Annales tunisiennes, আলজিয়ার্স ১৮৬৪ খৃ.; (১৫৪) Fitoussi, L'Etat Tunisien (1525-1901), তিউনিস ১৯০১ খৃ., ২য় সং.; (১৫৫) Masson, Histoire des establissements et du commerce francais dans L'Afrique barbaresque (1560-1793), প্যারিস ১৯০৩ খৃ.; (১৫৬) ঐ লেখক, Les Compagnies du corail, প্যারিস-মার্সাই ১৯০৮ খৃ.; (১৫৭) La Ronciere, Histoire de marine francaise, 5 vols., প্যারিস ১৯০৯-১৯২০ খৃ.; (১৫৮) Conor, Les exploits d'Alonso de Contreras en Tunisie (1601-11), R. T., ১৯১৩ খৃ.; (১৫৯) Spont, Les Francais a Tunis de 1600 and 1789, R. Questions Hist., ১৯০০ খৃ.; (১৬০) Playfair, The Scourge of Christerdom, লন্ডন ১৮৮৪ খৃ.; (১৬১) Marchesi, Tunisi e la Repubbica Venezia net scoolo XVIII, ভেনিস ১৮৮২ খৃ.; (১৬২) Nallino, Venezia e Sfax nel secolo XVIII, in Cont. Amari, পালের্মো ১৯১০ খৃ.; (১৬৩) Grandohamp La mission de Plevillo-le-Pelley a Tunis (1793-94), তিউনিস ১৯২১ খৃ.; (১৬৪) ঐ লেখক, Le citoyen Guiraud, Proconsu de la Repablique francaise a Tunis (1796)m R. T., ১৯১৯ খৃ.; (১৬৫) Loth. Arn. Soler, charge d'affaires d'Espagne a Tunis (1808-10). R. T., ১৯০৫-৬ খৃ.; (১৬৬) Dupuy, Americaines et Barbar- esques (1776-1824), প্যারিস ১৯১০ খৃ.; (১৬৭) Hugon, Les emblemes... des beys de Tunis, ১৯১৩ খৃ.; (১৬৮) Serres, La politique turque en Afrique du Nord sous la monarohie de Jullet, প্যারিস ১৯২৫ খৃ.; (১৬৯) Rouard de Card, Les arrangements conclus par le general Clauzel avec le bey de Tunis (1830-31), প্যারিস ১৯২৭ খৃ.; (১৭০) Gonni, La regia marima sarda sullecosti di Barberia (1830), Boll, Ufficio stor., ১৯৩০ খৃ.; (১৭০) ঐ লেখক, Una squadra sardonapoletana a Tunisi (1833), ঐ; (১৭১) Ibid; Grandchamp, Le differend de la Tunisie avec la Sardaigne et Naples en 1833, R. T.; (১৭২) Monchiccourt, La mahalla d'Ahmed Zarroug dans le Sahel (1864), R. T., ১৯২৭ খৃ.।

(৪) ফরাসী আশ্রিত রাজ্য এবং তিউনিসিয়া বিষয়ক গ্রন্থাবলী ঃ ১৮৮১ খৃ. পর হইতে তিউনিসিয়া বিষয়ে এখন প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান গ্রন্থ নীচে উল্লেখ করা যায় ঃ

(ক) আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ (১৭৩) Documents diplomatiques, Affairs de Tunisie (1870-1881), প্যারিস ১৮৮১ খৃ.; (১৭৪) Estiyrbekkes de Constant; La politique francaise en Tunisie, ১৮৯১ খৃ.; (১৭৫) Crispi, Politica estera (1876-90), অনু. R. T., ১৯১৩ খৃ.; (১৭৬) Chuakam Pagine distoria contemporanea, vol. 2, Tunisi, তুরিন ১৮৯৫ খৃ.; (১৭৭) Broadley, The last Punic War, এডিনবরা-লন্ডন ১৮৮২ খৃ.; (১৭৮) L'expendition militaire en Tunisie, প্যারিস তা. বি.; (১৭৯) Cappello, La spedizione francese in Tunisia, সিত্তা দ্য কাস্তেল্লো ১৯১২ খৃ.; (১৮০) Rouard de Card, Traites de la France avec les pays de L'Afrique du Nord, প্যারিস ১৯০৬ খৃ.; (১৮১) ঐ লেখক La Turquie et la protectorat francais en Tunisie, প্যারিস ১৯২৬ খৃ.।

(খ) রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্বন্ধে, ১৯১৮ খৃ. হইতে ঃ (১৮২) La Tunisie martyre, ১৯২০ খৃ.; (১৮৩) Raynaud, La Tunisie sans les Francais, প্যারিস তা. বি.; (১৮৪) Jung, Les reformes en Tunisie, প্যারিস ১৯২৬ খৃ.; (১৮৮) Winkler, Essai sur la nationalite dans les protectorats de Tunisie et du Maroc. প্যারিস ১৯২৬ খৃ.; (১৮৫) Aguesse, Souverainete et nationalite en Tunisie, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; (১৮৬) Tumedei, La Questione tunisina e L'Italia, কেলোনা ১৯২২ খৃ.; (১৮৭) Sarfatti, Tunisiaca, রোম ১৯২৪ খৃ.; (১৮৮) Bonura, Gli Italiani in Tunisi, রোম ১৯২৯ খৃ.; (১৮৯) Bulletin du comite el'Afrique francaise-এ প্রকাশিত অসংখ্য নিবন্ধ, সেইগুলির কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ; (১৯০) Rodd Balek, La Tunisie apres la guerre (1919-21), প্যারিস ১৯২২ খৃ.; (১৯১) Cave, Sur les traces de Rodd Balek (1924-27), প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (১৯২) এবং একখানি Chronique de Tunisie (1922-28), তিউনিস ১৯২৮ খৃ.।

(গ) সাধারণ বিবরণ ঃ (১৯৩) Hesse-Wartegg, Tunis, ভিয়েনা ১৮৮২ খৃ.; (১৯৪) Graham and Ashbee, Travels in Tunisia, লন্ডন ১৮৮৭ খৃ. (ইহার সংযোজনীতে খুবই প্রয়োজনীয় তিউনিসিয়া বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া আছে, উহার সঙ্গে) (১৯৫) Rouard de Card, Livres fransais dee-XVIIeme et XVIIIeme siecles concernant les Btats barbaresques, প্যারিস ১৯১১, গ্রন্থে আর কিছুই যোগ করিতে পারেন নাই); (১৯৬) Lanessan, La Tunisie, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ১৯১৭ খৃ.; (২৯৭) Faucon, La Tunisie, ১৮৯৩ খৃ.; (২৯৮) La Tunise, Histoire et desoription, 4 vol., প্যারিস-ন্যান্সি ১৮৯৬ খৃ.; ১৯০০[২] খৃ.; (২৯৯) La Tunisie au debut du XXeme sieole, প্যারিস ১৯০৪ খৃ.; (২০০) Loth, La Tunisie et L'euvre du Protectorat francais, প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (২০১) Notice generale sur la Tunisie (1811-21), তুর্লো ১৯২২ খৃ.; (২০২) Despois, La Tunisie, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.।

(ঘ) সামাজিক জীবন ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে ঃ (২০৩) Lapie, Les civilisations tunisienes, প্যারিস ১৮৯৮ খৃ.; (২০৪) Canal, La litterature et la presse tunisienneso de L'Occupation a 1900, প্যারিস তা.বি.; (২০৫) Duhamel, Le prince Jaffar, প্যারিস ১৯২৪ খৃ.; (২০৬) Hubac, Les masques d'argile, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.। স্থানীয় অধিবাসিগণের বিষয়ে জানিবার জন্য আরও দ্র. ভাষা অংশে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলী ও Revue Tunisienne-এ প্রকাশিত অসংখ্য নিবন্ধ।

(৫) অমুসলিমগণের সম্বন্ধেঃ Darmon-এর সঙ্গে (ধর্মে অংশও দ্র.)

(ক) খৃস্টানগণ ঃ (২০৭) Mesnage, Le christianisme en Afrique, Eglise mozarabe, প্যারিস-আলজিয়ার্স ১৯১৫ খৃ.; (২০৮) Gleizes, Jean Le Vacher, প্যারিস ১৯১৪ খৃ.; (২০৯) ঐ লেখক, Captivie et auvres de St. Vincent de Paul en Barbarie, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; (২১০) Anselme des Ares, Memoires de la Mission des capucins de Tunisie (1624-1865), রোম ১৮৮৯ খৃ.; (২১১) Pons, La nouvelle Eglise d'Afrique (depuis 1830), তিউনিস ১৯৩০ খৃ.।

(খ) য়াহূদীগণ ঃ (২১২) Cazes, Essai sur l'histoire des Israelites de Tunisie, প্যারিস ১৮৮৯ খৃ.; (২১৩) Chalom, Les Israelites de la Tunisie, প্যারিস ১৯০৮ খৃ.; (২১৪) Arditti, Recuieil des testes legislatifs et juridiques concernant les Israilites de Tunisie (1857-1913), তিউনিস ১৯১৫ খৃ.; (২১৫) Tibi, Le Statut personnel... des Israelites Tunisieps, তিউনিস ১৯২৩ খৃ.; (২১৬) Stouschz, Un voyage d'etudes juives en Afrique, প্যারিস ১৯০৯ খৃ.; (২১৭) ঐ লেখক, Travels in North Africa, ফিলাডেলফিয়া ১৯২৭ খৃ.।

(৬) মুসলিম শিল্পকলার ইতিহাস সম্বন্ধে ঃ (২১৮) G. Marcais, Manual d'art musulman, L'architecture, প্যারিস ১৯২৬-২৭ খৃ.।

৩। শাসন ব্যবস্থা

(ক) ফরাসী শাসন ঃ আশ্রিত রাজ্যের শুরুতে এবং বে কর্তৃক ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খৃ. জারিকৃত ফরমানবলে রেসিডেন্ট জেনারেলকে তাৎক্ষণিক সহায়তা দানের জন্য তিউনিসিয়া সরকারের একজন মহাসচিব বা সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। সকল সরকারী চিঠিপত্র ও যোগাযোগ তিনি নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং বে-এর সঙ্গে রেসিডেন্ট জেনারেলের যে পদমর্যাদার সম্পর্ক ছিল প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁহারও সেই সম্পর্ক ও পদমর্যাদা ছিল। ১৪ জুলাই, ১৯২২ এই পদটি উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কতকটা এই স্থলেই সৃষ্টি করা হয় Delegate to the Residence-General-এর পদ। তাঁহার ক্ষমতা ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩ প্রেসিডেন্টের ফরমান দ্বারা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা ছিল খুবই ভিন্ন ধরনের এবং বাস্তবে তত বড় কিছুও নহে, যদিও তিনি মন্ত্রীসভায় ভাইস প্রেসিডেন্ট, Inspecteur des Controles, civils এবং রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। রেসিডেন্টের ১০ নভেম্বর, ১৯২৬ সিদ্ধান্তক্রমে রেসিডেন্টকে সহায়তা করিত একটি বেসামরিক এবং একটি সামরিক মন্ত্রীসভা।

১৯২৬ খৃ. এই একই সিদ্ধান্তের সমর্থনে একই দিনে যে কয়েকটি ফরমান জারি করেন, সেইগুলি দ্বারা রিজেন্সী বা প্রতিনিধি শাসিত রাজ্যটির প্রধান প্রধান সরকারী দফরতরে আকার ও পদ্ধতি পুনঃ নির্ধারণ করা হয় এবং প্রধান প্রধান দফতরের কার্যক্রম বিধিবদ্ধ করা হয়। দেশটি দখলের পর হইতে ফরাসীগণ সেই অনুযায়ীই উহার সংগঠন ও পরিচালনা করে। Direction Generale des Travaux Publics সৃষ্টি করা হয় ৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২, Direction Generale des Finances সৃষ্টি করা হয় একই বৎসরের ৪ নভেম্বর, Direction Generale de L'Instruction Publique et dos Beaux-Arts ৬ মে, ১৮৮৩, Direction Generale de L'Agriculture, du Commerece et de la Colonisation ৩ নভেম্বর, ১৮৯০ খৃ., Direction Generale de L'Interieue (উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল জনস্বাস্থ্য দফতর ও জনসহায়তা (Public assistance) দফতর। Direction de La Justice Tunisienne সৃষ্টি করা হয় ১৪ জুলাই, ১৯২২ (শেষোক্ত দুইটি দফতর সৃষ্টি করা হইয়াছিল সেক্রেটারী-জেনারেলের দফতর সঙ্কোচনের ফলে)। এইগুলির সঙ্গে যোগ করা যায় Office des Postes et Telegraphes; উহা সৃষ্টি করা হইয়াছিল ১১ জুন, ১৮৮৮। পরে ১৮ নভেম্বর, ১৯২৭ এক ফরমানবলে উহাকে স্বায়ত্তশাসিত Direction করা হয়।

দেশের দক্ষিণ অংশকে বাদ দিয়া উহাকে একটি সামরিক এলাকা বলিয়া ধরা হইত (রাজধানী মেদেনাইন=Medenine) এবং শাসিত হইত একটি Service des Affaires indigenes দ্বারা (উচ্চ মর্যাদার দুইজন কর্মকর্তা, ২০ জন ক্যাপ্টেন বা লেফটেনান্ট, ১১ জন সামরিক দোভাষী, সকলকে ফরাসী বাজেট হইতে বেতন দেওয়া হইত)। তিউনিসিয়াকে প্রশাসনিকভাবে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় (বিযারতা, তিউনিস, লে কেফ, সূসা ও সফাক্স,)। উহাদের প্রতিটি আবার কয়েকটি করিয়া Controles civils-এ বিভক্ত, সর্বমোট ২১টি, যথা বেজা, বিযারতা, তাবারক, সূক, এল-আরবা তিউনিস, যাগৌয়ান, গ্রোমবালিয়া, তেবৌরকুস, লে কেফ, মাসতার, মেজেয, এল বাব, সূসা কায়রাওয়ান, ছালা, সফাক্স, গাবেশ, গাফসা, তোয়েয়ুর ও জেরবা। Controleurs civils বা ফরাসী কর্মকর্তাগণ যাঁহাদিগকে ৪ অক্টোবর, ১৮৮৪-এর প্রেসিডেন্টের নির্বাহী আদেশবলে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়, তাঁহাদিগকে পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে প্রেসিডেন্টের বিশেষ আদেশ দ্বারা নিযুক্ত করা হইত। তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২২ জুলাই, ১৮৮৭ জারিকৃত সার্কুলার দ্বারা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। প্রধানত সেই দায়িত্ব ছিল স্থানীয়গণের শাসন তদারক করা এবং ফরাসী উপনিবেশবাদে সহায়তা করা। তাঁহাদের পদবী ছিল ভাইস কনসাল এবং তাঁহারা ফরাসী দূত-প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করিতেন। তাঁহাদের পদমর্যাদা নিয়ন্ত্রিত হইত ২৫ এপ্রিল, ১৯২২-এর রেসিডেন্ট কর্তৃক জারিকৃত সিদ্ধান্ত দ্বারা।

প্রতিনিধি শাসিত দেশটিতে ফরাসী আইন প্রথমে দুইটি ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হইত, একটি ছিল তিউনিসে (৪ কক্ষবিশিষ্ট), অপরটি সূসাতে এবং উহা ছাড়া ছিল ১৪টি নিয়মিত justices de paix। সেই সঙ্গে যোগ করা যায় justices foraines আদালতগুলিকে। এইগুলি বিভিন্ন সময়ে স্থানান্তরিত হইত। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আলজিয়ার্সের উচ্চ আদালতে আপীল করা যাইত। অপরাধ ও অসদাচরণের দায়ে ফৌজদারী আইনে বিচার করা হইত সংশোধনমূলক বিচারালয়ে। সেইগুলি ছিল আলজিরিয়ার juges de paix-এর অনুরূপ। অপরাধ বিচার করা হইত তিউনিস ও সূসার

ফৌজদারী আদালতে। প্রতিটি গঠিত হইত ৩ জন ফরাসী পেশাদার বিচারক এবং ৬ জন স্থায়ী বিচারক সমবায়ে। তাঁহাদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইত ২৯ নভেম্বর, ১৮৯৩ জারি করা প্রেসিডেন্টের ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যেই প্রদেশের হইত বিচারকগণকেও সেই অঞ্চল হইতেই লওয়া হইত; কোন জুরি থাকিত না। সকল ফরাসী ম্যাজিস্ট্রেটই সকল বিষয়ে আলজিরিয়ার ম্যাজিসেন্ট্রটগণের মতই ছিলেন। তাঁহারা Garde des Sceaux-এর সুপারিশক্রমে প্রেসিডেন্টের আদেশবলে নিযুক্ত হইতেন।

সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর বাজেট তৈরি করিত ফ্রান্স। নৌ জিলার (প্রিফেকচার) সদর দফতর করা হয় বিযারতাতে। সেইখান হইতে উত্তর আফ্রিকার সমগ্র উপকূলভাগ পর্যবেক্ষণে রাখা যায়। যে সেনাপতি (জেনারেল) অধিকৃত দেশের সেনাবাহিনীর (Division d'Occupation) দায়িত্বে ছিলেন, তিনি ১৯২৬ খৃ. Commandant superieur des troupes de Tunisie উপাধি গ্রহণ করেন।

তিউনিসিয়ার প্রধান প্রধান জনসংস্থার নাম পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য দুইটি কোম্পানীর নাম অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলিতে উহাদের বাণিজ্যের অধিকার ও সুবিধা ছিল। বিযারতা বন্দর ১৮৮৬ খৃ. স্থাপিত হয়, তিউনিস, সূসা ও সফাক্স ১৮৯৪ খৃ.। তাহা ছাড়া তিনটি রেলওয়ে কোম্পানী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঃ (ক) Bone-Guelma কোম্পানী, ২২ জুলাই, ১৯২২ কনভেনশনের পর হইতে ইহাকে বলা হইত Compagnie-Fermiere। ইহাই প্রায় সমগ্র ডিউনিসীয় রেলওয়ে ব্যবস্থা, প্রধানত ইহা উপকূলভূমি ধরিয়া সুদীর্ঘ এলাকাজোড়া বিস্তৃত, দুইটি লাইন তিউনিস-আলজিরিয়া রেলপথ মেজেরদা উপত্যকার মধ্য দিয়া এবং উচ্চ তেল্ল (Higle Tell)-র পাশ দিয়া গিয়াছে। একটি লাইন সূসা হইতে সবীতলার স্তেপভূমি ও ফেরিয়ানার উপর দিয়া গাফসার পশ্চিমে লবণ খনি পর্যন্ত গিয়াছে; (খ) Compagnie des phosphates de Gafrsa (সরু গজের লাইন দ্বারা সফাক্সের সঙ্গে গাবেস, রেদেয়েফ ও তোযেয়ুরকে যুক্ত করা হইয়াছে); (গ) তিউনিস ট্রামওয়ে কোম্পানী (শহরতলী এলাকাতে বিদ্যুতায়িত ব্যবস্থা ঃ দুইটি লাইন, তিউনিস-লা মারসা। তন্মধ্যে একটি লা গৌলেত ও কার্থেজ হইয়া গিয়াছে)।

সরকারী দফতরসমূহ ব্যতীত তিউনিসিয়াতে কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছামূলক সংসদ ছিল, কোনটি মনোনয়নমূলক, কোনটি নির্বাচিত। বাণিজ্য ও কৃষি সমিতিতে (Chambers of Commerce and Agriculture) শুধু ফরাসীরাই নির্বাচিত হইতে পারিত। প্রত্যেক সদস্য ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইত। প্রতি দুই বৎসর পরপর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিত। তিউনিস চেম্বার অব কমার্স বা বণিক সমিতি, তিউনিস কৃষি সমিতি, সূসা বাণিজ্য ও কৃষি সমিতি, সফাক্স বাণিজ্য ও কৃষি সমিতি, এই চারিটিই ১৮৯৫ খৃ. স্থাপিত হয়, বিযারতা বণিক সমিতি ১৯০২ খৃ. স্থাপিত হয়। মহিলাগণের ভোটাধিকার ছিল। কিন্তু কোন মহিলা সদস্য হইতে পারিতেন না। খনিজ সম্পদ বিষয়ক বণিক সমিতি তিউনিসে অবস্থিত, ১৫ জুলাই, ১৯২২ প্রেসিডেন্টের একটি আদেশবলে উহা সৃষ্টি করা হয়। সেইখানে সদস্যভুক্তির কোন জাতিগত বাছ-বিচার ছিল না, ফরাসী বা তিউনিসীয় খনি-মালিকগণ, পরিচালক, ম্যানেজার বা ইঞ্জিনিয়ারগণ উহার সদস্য হইতে পারিতেন। ইহার ১২ জন সদস্য ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন এবং প্রতি ৩ বৎসর পরে অর্ধেক সংখ্যক অবসর গ্রহণ করিতেন।

৬০টি স্থানে পৌরসভা স্থাপিত হয়। ১৪ জানুয়ারী, ১৯১৪ ও ১ জানুয়ারী, ১৯২৪ ফরমানবলে ৩ বৎসরের জন্য মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠিত হয়। প্রতি বৎসর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হইতেন। প্রেসিডেন্ট হইতেন স্থানীয় ব্যক্তি, এক বা একাধিক ফরাসী ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং বিভিন্ন সংখ্যক স্থানীয় বা য়ুরোপীয় কাউন্সিলার। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ্যে করা হইত। প্রধান মন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে সকল সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইত।

১৩ জুলাই, ১৯২২-এর ফরমান পরিবর্তিত করিয়া ২৭ মার্চ, ১৯২৮ নূতন ফরমান জারি করা হয় এবং উহা দ্বারা আঞ্চলিক কাউন্সিলসমূহ গঠন করা হয়। সেইগুলির সদস্যগণ ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। প্রথমে তাঁহারা একদিকে স্থানীয় পৌর কাউন্সিলারগণের প্রতিনিধি ও (স্থানীয়) কাইদাতের প্রতিনিধি এবং অপর দিকে কিঞ্চিত সংখ্যাগুরু ফরাসীগণ যাহারা ফরাসী মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার বা বণিক ও কৃষি সমিতির সদস্য, তাহাদের প্রতিনিধি; পরে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হন আঞ্চলিক রাজধানীর পৌরসভার একজন সহ-সভাপতি, সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের প্রতিনিধিগণ, খনিজ সম্পদ বিষয়ক সমিতির প্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় বণিক সমিতির সদস্যগণ। আঞ্চলিক কাউন্সিল ছিল অর্থনৈতিক বিষয়ের উপদেষ্টা পরিষদ। উহার অধিবেশন হইত বৎসরে দুইবার। প্রতি অধিবেশন সর্বাধিক ৬ দিনব্যাপী চলিত এবং তাহা হইত আঞ্চলিক রাজধানীতে। সভাপতিত্ব করিতেন একজন controleur civil। তাহাকে নিযুক্ত করিতেন রেসিডেন্ট জেনারেলের, তবে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিত না। ফরাসী সদস্যগণ একজন সহ-সভাপতি ও একজন সচিব বা সেক্রেটারী নির্বাচন করিতেন, অপর একজন সহ-সভাপতি ও একজন সচিব নির্বাচন করিতেন স্থানীয় সদস্যগণ।

১৮৯৬ খৃ. দেশে Conference Consultative গঠিত হইয়াছিল ১৩ জুলাই, ১৯২২ খৃ.। উহা বাতিল করিয়া গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল গঠন করা হয়। উহাই হয় দেশের প্রধান প্রতিনিধি পরিষদ, তৎপূর্বে প্রথমোক্তটি কয়েকবারই পুনর্গঠিত করা হয়। কয়েকটি ফরমান এবং মার্চ, ১৯২৮ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহার গঠন ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হইত। উহার একটি ফরাসী ও একটি দেশীয় বিভাগ ছিল। সেইগুলি নীতিগতভাবে আলাদাভাবেই কাজ করিত। ফরাসী বিভাগের সভাপতিত্ব করিতেন রেসিডেন্ট জেনারেল। সেইখানকার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫২; ২২ জন অর্থনৈতিক বিভাগসমূহ হইতে, ৬ জন নির্বাচিত হইতেন তিউনিস কৃষি সমিতি হইতে, ২ জন বিযারতা বণিক সমিতি হইতে, ৪ জন তিউনিস বণিক সমিতি হইতে, সূসার বিভিন্ন সমিতি হইতে ৪ জন, সফাক্স হইতে ৪ জন, খনি বণিক সমিতি হইতে ২ জন এবং ফরাসী কলোনী হইতে প্রতিনিধি ৩০ জন, যাহারা ফরাসী উপনিবেশের ২১ বৎসরের বেশি বয়স্ক এবং অন্তত ২ বৎসর যাবত তিউনিসিয়াতে বসবাসরত অধিবাসিগণের দ্বারা আঞ্চলিকভাবে নির্বাচিত হইতেন। বিযারতা হইতে ৬ জন, তিউনিস হইতে ১০ জন, লে কেফ হইতে ৪ জন, সূসা হইতে ৫ জন, সফাক্স হইতে ৫ জন এবং সকল territoires militoires গ্রাণ্ড কাউন্সিলের সদস্যগণ কমপক্ষে ২৫ বৎসর বয়স্ক হইতেন। তাহারা ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন। প্রতি ৩ বৎসর পরে পরে অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত হইতেন। কাউন্সিলই বাজেট পরীক্ষা করিয়া ভোট দিতেন। উহা নিজস্ব ইচ্ছাও প্রকাশ করিতে পারিত, তবে রাজনৈতিক বা শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত বিষয়াদি ব্যতীত সরকার কোন প্রশ্নে মতামত চাহিয়া পাঠাইলে কাউন্সিল মত দিত। আবার কাউন্সিলও সরকারের কাছে প্রশ্ন পাঠাইতে পারিত। কাউন্সিলের উপরে ফ্রান্সের প্রায় সর্বময় ক্ষমতা ছিল।

ইচ্ছা করিলে একটি ডিক্রি দ্বারা গ্র্যাণ্ড কাউন্সিল বাতিল করিয়া দিতে পারিত বা এমন কি বাজেট প্রশ্নেও কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারিত। গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের সাধারণ অধিবেশন বৎসরে একবার সর্বোচ্চ ২০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হইত। অন্যান্য সময়ে বিশেষ ধরনের অধিবেশন হইত। প্রতিটি বিভাগ নিজস্ব অফিসার নির্বাচন করিত এবং দুইজন গ্র্যাণ্ড কমিশন নিযুক্ত করিত। যথাঃ অর্থনৈতিক কমিশন ও অর্থনৈতিক কার্যপরিচালনা কমিশন। ফরাসী শাখা অর্থনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্র হইতে ৫ জন প্রতিনিধি এবং ফরাসী উপনিবেশ হইতে ৭ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন প্রকাশ্যে বসিত না। রেসিডেন্ট জেনারেলের সভাপতিত্বে একটি Commission Arbitrale উল্লিখিত উভয় শাখায় দ্বিমত পোষণকারী সকল প্রস্তাব বা ভোটের উপরে আলোচনা করিত। উহার ১৪ জন সদস্যের অর্ধেক নিযুক্ত হইতেন ফরাসী শাখা কর্তৃক আর অর্ধেক দেশীয় শাখা কর্তৃক। কোন ক্ষেত্রে ক্রমাগত মতবিরোধ চলিতে থাকিলে তখন রেসিডেন্ট জেনারেল এবং উপস্থিত মন্ত্রিগণ বা ডিরেক্টরগণ ভোট দান করিতে পারিতেন। অর্থাৎ দুই বিবদমান শাখার বিতর্কিত বিষয় মীমাংসার জন্য চূড়ান্ত ভোট দিতেন।

(খ) অর্থনৈতিক বিষয়াদি ঃ তিউনিসিয়ার আর্থিক আয়ের উৎসসমূহ আশ্রিত রাজ্য থাকিবার কালে ক্রমহ্রাসমান হারে প্রত্যক্ষ কর বা খাজনা হইতে আসিত ঃ (১) ব্যক্তি-কর (Taxe personnelle ইসতীতান) সাবেক মাজবা করের পরিবর্তে ধার্য করা হয় (দ্র. Barthes, Les empots arabes en Tunisie, আলজিয়ার্স ১৯২৩ খৃ.)। তিউনিসিয়ার ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক প্রতিজন অধিবাসীকে এই কর দিতে হইত; (২) ভূমিকরসমূহ (খেজুর গাছের উপরে কানুন, জলপাই গাছের উপরে কানুন, উৎপাদিত খাদ্যশস্যের উপরে উশর বা দশমাংশ কর, নূতন আবাদী যমিন হইলে প্রথম ৫ বৎসর পর্যন্ত এই খাজনা দিতে হইত না, জেরবা ব্যতীত অন্যান্য সকল অঞ্চলের ফলের বাগিচা এবং সেচ যমিনের উপরে খারাজী কর, জেরবার কৃষি যমিনের উপরে বিশেষ কর, ১৯১৮ খৃ. গবাদি পশুর উপরে ধার্য কর, ১৯১৯ খৃ. ধার্য আঙ্গুর বাগিচার উপরে কর, ১৯২৭ খৃ. ধার্য অনুন্নত যমিনের উপরে কর, প্রধানত কম্যুনের উপকারার্থে শহর ও শহরতলী এলাকার আদায়কৃত ভাড়া এবং ভাড়ার উপযোগী মূল্যের উপরে খাজনা; (৩) বাণিজ্যিক ও শিল্পকারখানার লাভের উপরে ধার্য কর (১৯২৭ খৃ. ধার্য লাইসেন্সের উপরে কর ও খনিজ কর); (৪) ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বন্ধকী ইত্যাদির আয়ের উপরে ১৯১৮ খৃ. সৃষ্ট কর এবং assimilees নামক আরও কয়েকটি কর।

পরোক্ষ করগুলি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; যথা ঃ (ক) স্ট্যাম্প ও নিবন্ধন (registration) কর; (খ) আবগারী শুল্ক, ইহা এমনভাবে হিসাব করিয়া ধরা হইত যাহাতে ফরাসী উৎপাদিত সামগ্রী বেশি সুবিধা পায়; (গ) বিভিন্ন সামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপরে কয়েক রকমের কর, পুরাতন রীতির মাহসুলাত খাজনার পরিবর্তে ১৯২০ খৃ. এইগুলি বসানো হয়। নাম দেওয়া হয় অপ্রত্যক্ষ চাঁদা (indirect contributions)। এইগুলি ব্যতীতও ছিল (ঘ) কয়েক ধরনের একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপরে ধার্য কর (যথাঃ তামাক, লবণ, দিয়াশলাই, খেলার তাস); (ঙ) ডাক বিভাগ হইতে প্রাপ্ত লাভ; (চ) বিভিন্ন শিল্প কারখানা হইতে প্রাপ্ত আয় এবং (চ) রাষ্ট্রের খাস যমিন হইতে প্রাপ্ত আয়।

(গ) স্থানীয় অধিবাসিগণের শাসন ব্যবস্থা ঃ স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্য হইতে ৩ জন মন্ত্রী থাকিতেন ঃ প্রধান মন্ত্রী (আল-ওয়াযীরুল-আকবার), তাঁহাকে সহায়তা করিতেন শিক্ষামন্ত্রী (উযীরুল-কালাম), তাঁহার সহায়ক হিসাবে থাকিতেন স্বরাষ্ট্র মহাপরিচালক; আইন ও বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী (উযীরুল-'আদলিয়্যা)। ইহা স্থাপিত হয় ২৬ এপ্রিল, ১৯২১, তাঁহার উপদেষ্টা থাকিতেন একজন ফরাসী Directeur de la Justice Tunisienne।

তিউনিসিয়ার আঞ্চলিক বিভাগসমূহের ভিত্তি হইল কাইদাত, ৩০-এর দশকে সমগ্র দেশ ৩৭টি কাইদাতে বিভক্ত ছিল ঃ বেজা, বিযারতা, মাতেয়ুর, আঈন দ্রাহাম, সূক এল-আরবা, সূক এল খেমিস, তিউনিস ভিলে, তিউনিস বানলিয়ু, যাগৌয়ান, সোলিমান, নাবেউল, তেবৌরসৌক; লে কেফ, তাজেরৌইন, আওলেদ-আয়ার, আওলেদ আউন, মেজেস, এল বাব, সূসা, মোনাসতির, মাহদিয়া, সৌয়াস্‌সি, কায়রাওয়ান, জেলাস, ফ্রেইচিচ, মাজেউর, সফাক্‌স, জেবেনিয়ানা, লাস্কিরা, আরাদ, গাফসা, হাম্মামা, জেরিদ, জেরবা, মাতমাতা, নেফাঈউয়া, ঐয়েরগেম্‌মা ও তাতাহৌয়িন তিউনিস। ভিলে কাইদ-এর পুরাতন নামই রক্ষিত ছিল, শায়খুল মাদীনা, কাইদ ফরমানবলে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার দায়িত্ব প্রশাসনিক বিচার বিষয়ক ও অর্থ বিষয়ক। তিনি সরকার ও জনগণের মধ্যস্থ ব্যক্তিরূপে কাজ করিতেন। তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকিতেন, অল্প গুরুত্বের দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা পরিচালনা এবং খাজনা আদায় করিতেন। তাঁহার অধীনে একটি স্থানীয় উজাক বাহিনী থাকিত। উহা গঠিত হয় কিছু সংখ্যক সিবাইহিয়্যা লইয়া। উহারা বকেয়া খাজনার জন্য জরিমানার অর্থ (খিদমা) আদায় করিত। কাইদ তাঁহার অধীনস্থগণের নিকট হইতে আদায়কৃত খাজনার একটা অংশ নিজে রাখিতেন। সেই অংশের পরিবর্তে নির্ধারিত অঙ্কের বেতন প্রদানের কথা বিবেচনা করা হইতেছিল এবং সেই লক্ষ্যে কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হইতেছিল।

কাইদগণকে সহায়তা করেন বা কখনও তাঁহাদের স্থলেই দায়িত্ব পালন করেন খলীফাগণ। ২৮ নভেম্বর, ১৮৮৯ জারিকৃত একটি ফরমানবলে তাঁহাদের নিযুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ৬৭, দুইটি শ্রেণী, তন্মধ্যে ২০ জন উপরের শ্রেণীর। ৪ জুন, ১৯১২ হইতে একদল করিয়া শিক্ষানবীশ কাইদ (কাহিয়্যা Kaids stagiaires) এবং বিশেষ শ্রেণীর খলীফা নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাঁহাদের সংখ্যা ১৬, তাঁহারা কোন কোন ক্ষেত্রে কাইদ-এর প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন।

প্রতিটি কাইদাত কিছু সংখ্যক শায়খ-এর অধীন এলাকাতে বিভক্ত। উহাদের সংখ্যা আগে ছিল ৬০৪। উহারা শায়খ-এর অধীনে থাকেন। কাইদ-এর সুপারিশক্রমে সরকার হইতে উহাদের নিয়োগ করা হয়। শায়খ জনজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকেন এবং খাজনা আদায় করেন।

১৯২২ খৃ. কয়েকটি ফরমান ও সিদ্ধান্ত ১৯২৮ খৃ. সংশোধন করিয়া (সামরিক এলাকা বাদে) কাইদাত কাউন্সিল স্থাপিত ও সংগঠিত করা হয়। উহার উদ্দেশ্য ছিল কাইদাতের আর্থিক প্রয়োজনাদি আলোচনা করা, সরকারের প্রেরিত প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া এবং আঞ্চলিক কাউন্সিলে প্রতিনিধি প্রেরণ করা। প্রতিটি শায়খ-এলাকা হইতে ৪ জন করিয়া প্রতিনিধি পাঠানো হয়; তন্মধ্যে ১ বা ২ জন মুখ্য, অন্যরা গৌণ, বয়স ৩০ বৎসর হইতে হইবে। শায়খগণের মধ্য হইতেই তাঁহাদের নির্বাচন করা হয়, মন্ত্রীর অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। বিশিষ্ট শায়খগণ

অর্থাৎ সম্মানিত খাজনা পরিশোধকারিগণ যাঁহাদের বয়স ২৫ বৎসরের উর্ধ্বে, যাঁহারা কম্যুনের বাহিরে শায়খ-এলাকার মধ্যে বাস করেন বা সেইখানে যমিনের মালিক, তাঁহারা এই নির্বাচন করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের তালিকা কাইদ তৈরি করেন। একটি কমিশন উহা সংশোধন করে। সেই কমিশনে বেসামরিক নিরীক্ষা-প্রধান এবং কাদীও বসেন। উকিল, সরকারী কর্মচারী বা পুলিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি হইতে পারেন না। তিন মাসে একবার সভা বসে, ২ দিন আলোচনা চলে। নির্বাচন হয় প্রতি ৬ বৎসর পরে পরে।

স্থানীয় অধিবাসিগণের জন্য বণিক ও কৃষি সমিতি সৃষ্টি করা হয় ১৯২০ খৃ., পুনর্গঠন করা হয় ১৯২৪ ও ১৯২৮ খৃ.: Chambre d' agriculture indigene du nord ইহার অন্তর্ভুক্ত একটি কৃষি শাখা (প্রতি কাইদাত হইতে ১ জন সদস্য, শায়খগণ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে সরকার তাঁহাকে নিযুক্ত করেন) এবং গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য একটি শাখা (দুইজন সদস্য, ম্যাট্রিকুলেট অথবা কৃষি ইঞ্জিনিয়ার, শায়খ-এলাকা হইতে প্রেরিত ৪ জন প্রার্থীর মধ্য হইতে সরকার নিযুক্ত করেন); Chambre de Commerce indigene du nord-এর অন্তর্ভুক্ত হইল একটি বাণিজ্যিক শাখা (১২ জন নির্বাচিত মুসলিম ও ৫ জন য়াহূদী) এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয়ের জন্য একটি শাখা (২ জন মুসলিম বা য়াহূদী সদস্য, নির্বাচকগণ কর্তৃক প্রেরিত ৪ জন প্রার্থীর মধ্য হইতে সরকার বাছাই করেন)। নির্বাচকগণের বয়স কমপক্ষে ২৫ এবং প্রার্থিগণের বয়স ৩০ হইতে হইবে।

১৯২৮ খৃ. হইতে নিয়ম করা হয় যে, দুইটি সংসদের সভা যৌথভাবে হওয়া উচিত এবং সেইখানে অনুরূপ ফরাসী সদস্য থাকিবেন। সূসা ও সফাক্স Chambre mixte-এর প্রতিটিতেও ৭ সদস্যের একটি করিয়া স্থানীয়গণের শাখা করা হয়।

পৌর কাউন্সিল ও আঞ্চলিক কাউন্সিলে স্থানীয় অধিবাসিগণের কি এবং কতটুকু অংশগ্রহণ ছিল সেই সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলে তাঁহাদের ২৬ সদস্যের একটি বিশেষ অংশই ছিল, তন্মধ্যে ১০ জন ছিলেন দেশের ৫টি অঞ্চলের প্রতিনিধি (প্রতিটি অঞ্চল হইতে ২ জন করিয়া), দক্ষিণ অঞ্চলের ৩ জন, উত্তরের স্থানীয় বণিক সমিতির ৪ জন, উত্তরের স্থানীয় কৃষি সমিতির ৪ জন, মিশ্র সমিতির স্থানীয়গণের শাখার প্রতিটি হইতে ২ জন করিয়া এবং তিউনিসের য়াহূদী সমাজের প্রতিনিধি ১ জন। গ্র্যাণ্ড কাউন্সিলের এই শাখার সভাপতিত্ব করিতেন সাধারণত রেসিডেন্ট জেনারেলের একজন প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি শাসিত রাজ্যটির কোন একজন উচ্চপদস্থ ফরাসী কর্মকর্তা। তাহাকে মনোনীত করিতেন রেসিডেন্ট, কদাচিৎ রেসিডেন্ট জেনারেল। দুই শাখা ইচ্ছা করিলে একযোগেও আলোচনা করিতে পারিত; সেইরূপ ক্ষেত্রে ভোট একটি সংসদের বলিয়াই গণ্য করা হইত।

তিউনিসিয়ার আইনের লিখিত রূপ গৃহীত হয় জানুয়ারী ১৯২৮ একটি ফরমান দ্বারা। উহাতে সতর্কতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর সর্বোচ্চে রহিয়াছে তিউনিসের উযারা' 'আদালত। ১৯২১ খৃ. হইতে উহার গঠনরূপ হইয়াছেঃ (ক) সমগ্র তিউনিসিয়ার জন্য এক ধরনের আপীল 'আদালত, উহার দুইটি 'আদালত, দেওয়ানী ও ফৌজদারীর প্রতিটিতে থাকেন ৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট; (খ) একটি ফৌজদারী 'আদালত, উহাতে প্রথমোক্ত ধরনের মামলার বিচার হয়, রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল নাই; (গ) একটি প্রকাশ্য 'আদালত; (ঘ) একটি কমিশন, এক ধরনের আপীল কোর্ট। আঞ্চলিক 'আদালত লইয়া উযারা পূর্ণাঙ্গ হয়। এইগুলিতে ৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। সফাক্স, গাবেস ও গাফসাতে 'আদালত সৃষ্টি করা হয় ১৮৯৬ খৃ., সূসা ও কায়রাওয়ানে সৃষ্টি করা হয় ১৯৯৭ খৃ., কেফে ১৮৯৮ খৃ., বেজাতে ১৯২৬ খৃ.। ১৯০৬ খৃ. সেইগুলির সঙ্গে Commissaires du gouvernement যুক্ত করা হয় অর্থাৎ আরবী জানা ফরাসী উকিল নিয়োগ করা হয়। উকিলগণ (ওয়াকীল, ব.ব. উকালা) বাদী বা বিবাদিগণের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিতেন। পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে, তিউনিসের আঞ্চলিক বিচারালয়কে বর্তমানেও দ্রীবা (Driba) বলা হয় এবং তিউনিসে ওরফ ('উরফ) নামক এক ধরনের 'আদালতও রহিয়াছে। সেইখানে ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক মামলা হয়, শায়খুল মাদীনার সভাপতিত্বে ১০ জন কর নির্ধারক সেইখানে বিচার পরিচালনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Zeys, Code annali de la Tunisie, 1901 (১৯১২ খৃ. পর্যন্ত প্রকাশিত বার্ষিক সংখ্যা); (২) Lagrange and Foutana, Codes et lois de la Tunisie, প্যারিস ১৯১২ খৃ. (১৯২৮ খৃ. পর্যন্ত সম্পূরক সংখ্যা); (৩) Journal Officiel tunisien; (৪) A. Girault, Principes de colonisation et de legislation coloniale (vol. v., La Tunisie et le Maroc, ৫ম সং., প্যারিস ১৯২৮ খৃ.)।

৪। ইসলাম ধর্ম

তিউনিসিয়ার একমাত্র জেরবা দ্বীপের অধিবাসিগণের ৩/৫ অংশ খারিজী, বাদবাকি দেশের লোকেরা অনেক আগেই মালিকী মাযহাব অনুসারী সুন্নীমত গ্রহণ করিয়াছিল। তুর্কীদের বংশধর বা যাহারা সেইরূপ দাবি করেন তাঁহারা হানাফী, সংখ্যায় কম হইলেও তাঁহারা অভিজাত শ্রেণী, বে পরিবারের সদস্য বলিয়া তাঁহারা সুযোগ-সুবিধাও বেশি লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

(ক) প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ শার', হাফসীগণের (দ্র.) শাসনামলে তিউনিসের সর্বোচ্চ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করিতেন কাদি'ল জামা'আ (সামাজিকগণের কাযী), আর বিবাহ পড়াইতেন কাদিল আনকিহা (নিকাহের কাযী), উভয়েই প্রধান মুফতী (দ্র.) বা খতীবের ন্যায় রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের নীচে ছিলেন একজন কাদি'ল-মুআমালাত ও একজন কাদি'ল-মাহিল্লা। কাদি'ল-মাহিল্লা ছিলেন সেনাবাহিনীর কাযী, তিনি যুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যাইতেন।

ইব্ন আবী দীনার (পৃ. ২৭৬, অনু. পৃ. ৪৭০) উল্লেখ করিয়াছেন যে, কাযী কিভাবে ধীরে ধীরে মুফতীর প্রভাবাধীনে আসেন এবং তাহা এতটুকু পর্যন্ত যে, তাঁহারা চারায়া আদালতের (শার', দ্র. Saint Gervais, পৃ. ৯৩-৯৫) সঙ্গে যুক্ত হন এবং তুর্কীদের আমলে হানাফী প্রধান মুফতী (বাশ-মুফতী) শায়খুল ইসলাম (দ্র.) উপাধি গ্রহণ করেন। উহা এখন পর্যন্ত রক্ষিত আছে; মালিকী বাশ-মুফতীর যে মর্যাদা তাহা সরকারীভাবে খুব উঁচু নহে, তবে কখনও কখনও তাঁহাকেও এই উপাধি দেওয়া হয়।

চারায়া কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় (দেওয়ানী আইন, বিবাহ, তালাক, ট্রাস্টী, অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার), দেশের অভ্যন্তরে প্রতিটি শহরে একটি মালিকী মজলিস কর্তৃক ইহা গঠিত হয়; একজন কাদী ও এক বা একাধিক মুফতী থাকেন। তিউনিসে মালিকীর পাশাপাশি একটি হানাফী মজলিস ও দীওয়ান বসে, উভয়টিতেই দেশের ভিতর হইতে দাখিলকৃত মামলা বা অন্যান্য কাযী কর্তৃক সেইখানে প্রেরিত মামলা গৃহীত হইয়া থাকে।

এই 'আদালতগুলি প্রথমে ১৮৫৬ খৃ. ও ১৮৭৫ খৃ. জারিকৃত ফরমান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। পরে ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খৃ. ফরমান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়; উহা মুরাসালাসমূহের কর্ম পদ্ধতি নির্ধারিত করিয়া দেয়। বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেয় সেইগুলি যেন নোটারীগণের রক্ষিত একটি নিবন্ধে রেকর্ডভুক্ত করা হয়। ৬ মার্চ, ১৯২৬ জারিকৃত ফরমানে একটি আইনগত সহায়তার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। উহা দ্বারা সেই বৎসরেরই ৩ মার্চ সৃষ্ট একটি ভর্তি ফি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরিশেষে নিবন্ধীকৃতগণকে ২৮ জানুয়ারী, ১৯৩০ এক ফরমানবলে নিযুক্ত করা হয়।

নোটারীগণ ঃ স্থানীয় নোটারীগণকে ('আদল, ব. ব. 'উদূল) বে-এর একটি ফরমান দ্বারা নিযুক্ত করা হয়। তাঁহাদের নিযুক্তি ও কার্যপদ্ধতি ৩০ যুল-কা'দা, ১২৯১ (৮ জানুয়ারী, ১৮৭৫) জারিকৃত একটি ফরমান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; কাদীগণের অনুমোদনক্রমে নিযুক্তি প্রদান করা হইত। সাবেক ছাত্র যাঁহারা বড় জামি' মসজিদ হইতে ডিপ্লোমা লাভ করিতেন তাঁহারা প্রায় আপনা হইতেই নোটারী নিযুক্ত হইতেন, সেই ক্ষেত্রে আর কোনরূপ আইনের ব্যবসা করিয়া আসিবার প্রয়োজন হইত না। ৮ মে, ১৯২৮ জারিকৃত ফরমান দ্বারা সাবেক রীতির যথেষ্ট সংস্কার সাধন করা হয়; ১ জুলাই, ১৯২৯ ফরমান দ্বারা পুনরায় নূতন বিধি চালু করা হয়। উহা ১ জানুয়ারী, ১৯৩১ কার্যকর হয়। অতঃপর মুসলিম নোটারীগণকে কমপক্ষে ২৪ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে, কোন নোটারীর অফিসে দুই-তিন বৎসরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন যে, তিউনিসীয় আইন বিষয়ক একটি পরীক্ষায় পাস করিয়া আসিতে হইবে। বড় মসজিদের সনদপত্র পাইলে তিনি প্রথম শ্রেণীর নোটারী পরীক্ষা দিতে পারেন এবং অতঃপর তিনি কোন বড় শহরে উক্ত ব্যবসায়িক পেশায় নিয়োজিত হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর নোটারীগণ সামান্য একটু ভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় পাস করিয়া কম গুরুত্বপূর্ণ শহরে সেই আইন ব্যবসা করিতে পারেন। বিচার মন্ত্রণালয় হইতে যে রেজিস্টার (রোজ-বিবরণী ও বিস্তারিত বিবরণী) সরবরাহ ও পরীক্ষা করা হয়, সেইগুলি নিয়মিতভাবে এবং গুরুতর পদ্ধতিতে পরিদর্শন করা হইয়া থাকে।

হুবূস ঃ ওয়াকফ (দ্র.) সম্পত্তিকে তিউনিসিয়াতে বলা হয় হাবৌস (হুবূস)। জনগণের হাবৌস ১৮৭৪ খৃ. খায়রু'দ -দীনের আমল হইতেই ব্যবস্থাপনা করা হইত একটি কেন্দ্রীয় দফতর হইতে (জামীআ)। উহা সংগঠিত হয় ১৯ মার্চ, ১৯২৪ একটি ফরমান দ্বারা; ইহার প্রধান হইলেন একজন পরিচালক ও একটি প্রশাসনিক কমিটি। ইহা কয়েকটি অফিসে বিভক্ত এবং দেশের প্রতিটি প্রধান কেন্দ্রে একজন করিয়া প্রতিনিধি (না'ইব) রহিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত ব্যবস্থাপক উকীল মনোনীত করেন। ১৭ জুলাই, ১৯০৮ জামী'আকে একটি conseil superieur des habous-এর অধীনস্থ করা হয়। উহা পরিচালনা করেন শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের মহাপরিচালক। ব্যক্তিগত হাবৌস পরিচালনা পরিদর্শনের অধিকার জামা'আর রহিয়াছে।

হাবৌস সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ আইন নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতির সাহায্যে চাতুর্যের সঙ্গে পরিচালিত হয় (তু. H. de Montety, Une loi agraire en Tunisie, Cahors 1927); (ক) ইনযাল (enzel) চুক্তি বা একটি চিরস্থায়ী ভাড়ার বিনিময়ে হাবৌস পরিবর্তনযোগ্য (২৬ মে, ১৮৮৬ ফরমান, পরে ঘন ঘন সংশোধিত ও সংযোজিত হইয়াছে; ১৯০৫ খৃ. হইতে ইনযালী ঋণগ্রহীতা ভাড়া পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন; যমিন বিক্রি হয় প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে (তবে ব্যতিক্রম রহিয়াছে যে, গ্রামের জমিদারগণের অধিকার রক্ষিত হইয়াছে); (ক) সম্পদ বা নগদ অর্থ বিনিময় করা যাইবে (জানুয়ারী ১১ এবং নভেম্বর ১৩, ১৯৯৮ জারিকৃত ফরমান); (গ) দীর্ঘকাল লীজ দেওয়া যাইবে (৩১ জানুয়ারী, ১৮৯৮)

বায়তুল-মাল জামী'আর নিয়ন্ত্রণাধীন। সেইখান হইতে দাতব্য প্রয়োজনে সাহায্য প্রদান করা হয়। কোথাও কোন জমিদারীর উত্তরাধিকার শূন্য পড়িলে বায়তু'ল-মালে সেই সম্পত্তি গ্রহণ করে।

আখওয়ান বা মুসলিম ভ্রাতৃসমাজ ঃ তিউনিসিয়ার মুসলিম ধর্মীয় ভ্রাতৃসমাজের সঠিক কোন সংখ্যা দেওয়া খুবই ঝুঁকির বিষয় হইবে (তু. Depont and Coppoani, Les confreries religieuses musulmanes, আলজিয়ার্স ১৮৯৭ খৃ., উহার সর্বত্র)। Annuaire du Monde Musulman-এ যেই সকল তথ্য দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি বিনা বিবেচনায় গ্রহণ করা যায় না। সেইখানে তৎকালে সর্বমোট অনুসারীর সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৫৮,১৪৩ জন। ইহা অবশ্যই অনেক বেশি। Residence Generale কর্তৃক ১৯২৪ খৃ. গৃহীত একটি অপ্রকাশিত সরকারী জরিপে দেখা যায় যে, একমাত্র লে-কেফ প্রশাসনিক জিলাতেই ১৮,০০০ ফুকারা ছিল, বেজা জিলাতে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই ছিল ফুকারা' ভ্রাতৃসমাজের লোক। আর সেই জিলাতে তখন মুসলমানের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৬৬,০০০ জন। একমাত্র তাতাহৌইন annexe-তেই তাঁহাদের সংখ্যা ছিল ১৩,০০০।

যে চারিটি তারীকার সবচেয়ে বেশি অনুসারী ছিল সেইগুলি হইল ঃ কাদিরিয়্যা ও রাহমানিয়্যা, অতঃপর ঈসাওয়া ও তিজানিয়্যা (দ্র.), 'আরূসীয়্যাগণও সংখ্যায় বেশ যথেষ্ট ছিল। তদুপরি নেফতার বু-'আওলিয়াগণের মত স্থানীয় দল ছাড়াও বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দল রহিয়াছে, যেমন মাদানীয়া, শাযিলীয়া ও তায়্যিবীয়া। তাবারকা ও ছা'লাব প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ একমত হইয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহাদের এলাকাতে রাহমানীয়া ও কাদিরিয়্যাগণের সংখ্যা হইবে যথাক্রমে মোট সদস্য সংখ্যার ৫০% ও ৪০%; তবে এই অনুপাত অন্যান্য জায়গাতে কম। সেইখানে প্রতিদ্বন্দ্বী তারীকাগুলি অধিকতর সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এইখানে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে সংগঠিত 'আলাবিয়্যা তারীকার উল্লেখ করা যায়। উহার উৎপত্তি হয় আলজিরিয়ার মুসতাগানেম হইতে এবং তিউনিসিয়াতে উহার কেন্দ্র ছিল মোনাসতিরের নিকটবর্তী খিতবে এল-মেদিঔনির যাবিয়াতে। তিউনিস, মেনযেল বৌ-যেলফা ও জেরীদে তারীকাপন্থিগণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, আর লে-কেফে ইহাদের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী মাতৃ-যাবিয়া। সত্য যে, এই সংস্থাগুলির কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই। তদুপরি এইগুলির ধর্মীয় প্রভাবও ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। যাবিয়াগুলির কোন প্রকার আশ্রয় দানের অধিকার ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়।

(খ) **শিক্ষা ঃ** কুরআন শিক্ষার মকতবগুলিকে বলা হয় কুত্তাব। এইগুলির সর্বোচ্চে রহিয়াছে মাদ্‌রাসা। এইগুলি পরিচালনা করেন বড় জামি' মসজিদের সনদপ্রাপ্ত সাবেক ছাত্রগণ। জামি'আ হইতে এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, পরিচালনা করেন জনশিক্ষা পরিচালক। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এইগুলি বস্তুত বড় মসজিদের ছাত্রদের হোস্টেলেই পরিণত হয়। খুব বেশি হইলে অল্প কিছু লেকচার মাত্র দেওয়া হয়। একমাত্র আল-'আসফূরিয়্যা মাদ্‌রাসাতেই মু'আদ্দিব বা কুত্তাবগুলির শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

বড় জামি' মসজিদ ঃ তুর্কী শাসনামলে বড় মসজিদটি ক্রমে ক্রমে সকল ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ইহার একক শ্রেষ্ঠত্ব

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় ২,০০০ ছাত্র এখানে শিক্ষা লাভ করিত। তিউনিসিয়া, ত্রিপোলিতানিয়া বা লিবিয়া, আলজিরিয়া এবং এমন কি কখনও কখনও মরক্কো হইতেও ছাত্রগণ এইখানে শিক্ষা লাভ করিতে আসিত। ইহার বর্তমান যে পাঠ্যসূচীর রূপদান ও গঠন তাহা অনেক আগে আহমাদ বে একটি নির্দেশ আকারে (মানশূর) জারি করিয়াছিলেন (২৭ রামাদান, ১২৫৮/১ নভেম্বর, ১৮৪২)। সেই নির্দেশটি আল-মু'আল্লাকা নামে পরিচিত হয়। কারণ উহা বড় মসজিদের বাবু'শ্ শিফা দরওয়াজাতে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রধান প্রধান ব্যবস্থা ছিল ঃ ৩০ জন শিক্ষক থাকিবেন ('আলিম, ব. ব. 'উলামা'), তন্মধ্যে ১৫ জন হইবেন মালিকী এবং ১৫ জন হানাফী, প্রতি দিন দুইটি করিয়া ক্লাস লইবেন, বৃহস্পতি ও শুক্রবার, দুই ঈদের দিন এবং রামাদান মাসে ছুটি; তাঁহাদের বেতন ছিল দৈনিক ২ পিয়াস্ত্রা করিয়া, যথোপযুক্ত কারণ ব্যতীত অনুপস্থিত থাকিলে বেতন দেওয়া হইবে না। মালিকী ও হানাফী দুইজন শায়খুল-ইসলামকে পরিদর্শক (নুজজার) নিযুক্ত করা হয়, উভয়ের বেতন ছিল মাসিক ১০০ পিয়াস্ত্রা করিয়া। তাঁহাদের কাজে সহায়তা করিবেন দুইজন কাদী, একজন মালিকী এবং একজন হানাফী। তাঁহাদের বেতন দৈনিক ৩ পিয়াস্ত্রা করিয়া। এই চারিজনে বায়তুল-মালের প্রশাসনের হিসাবও নিরীক্ষা করিতেন। উপরোক্ত বেতন সেইখান হইতেই পরিশোধ করা হইত। বায়ুত'ল – মালের সম্পদ যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হইলে তখন কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে তাহা সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করা হইত। শিক্ষকগণকে নিয়োগ করা হইত পরিদর্শকগণের এবং দুইজন কাদীর সুপারিশ অনুযায়ী বে-এর আদেশবলে (জাহীর)।

কিন্তু খায়রু'দ-দীনের সময় হইতেই কেবল অধিকতর বিস্তারিত সংগঠনের রূপ পাওয়া যায় ঃ ২৮ যুল'কা'দা, ১২৯২ (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৭৫)। তিনি সাদিক বে-কে দিয়া যে ফরমান (আমর আলী) জারি করান উহাতে ৬৭টি ধারাতে নির্দেশিত ছিল যে, কোন্ কোন্ বিষয় পড়াইতে হইবে, কোন্ কোন্ লেখকের বইকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে, ছাত্র, শিক্ষক ও পরিদর্শকগণের সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব কিরূপ হইবে, কুতুবখানা বা লাইব্রেরী ব্যবহারের নিয়মাবলী কি কি। পরবর্তী সময়ে কৃত কয়েকটি আংশিক সংশোধনের ফলে এই ফরমানটির পরিবর্তে ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ নূতন একটি ফরমান প্রচার করা হয়। উহার ৮১টি ধারা এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি সংযোজন দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইতে থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, কতকটা মিশ্র আকারে পুরাতন ধরনের শিক্ষারীতির পাশাপাশি সকল বিষয়ে শুদ্ধতা এবং সদাচরণের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং ১৯ নং ধারাতে 'উলামা' কর্তৃক ঐতিহ্যগতভাবে সমর্থিত রীতিনীতিতে সন্দেহ করাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

পাঠ্যসূচী আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭২ খৃ. বিধিতে শ্রেণীকৃত জ্ঞানের এগার শাখা অপেক্ষা সংখ্যায় ও প্রসারতায় অনেক বেশি করা হয়, ধারাতে উল্লিখিত ক্রম অনুযায়ী সেইগুলি ছিল ঃ (১) কুরআনের তাফসীর; (২) হাদীছ; (৩) সিয়ার বা জীবনী; (৪) তাওহীদ বা প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব; (৫) কুরআন পাঠ ও শুদ্ধ আবৃত্তি (কিরাআত, তাজবীদ); (৬) প্রযুক্তি বিদ্যা (মুসতালাহ); (৭) উসূলুল-ফিক্হ বা বিচারের রীতি-পদ্ধতি; (৮) ফিক্হ (ব্যবহার শাস্ত্র); (৯) উত্তরাধিকার আইন (ফারাইদ); (১০ তাসাওউফ বা সূফীবাদ; (১১) সালাতের সঠিক সময় নির্ধারণ; (১২) বাক্যগঠন রীতি (নাহউ); (১৩) ব্যাকরণগত শব্দের ব্যুৎপত্তি (সারফ); (১৪) বক্তৃতার কৌশল ও অলঙ্কার (মা'আনী, বায়ান); (১৫) রীতি-পদ্ধতি, রচনা কৌশল ও সাহিত্য (লুগা, ইনশা, আদাব); (১৬) ইতিহাস ও ভূগোল (তা'রীখ, জুগ্রাফিয়্যা); (১৭) অঙ্কন ও হস্তলিপি (রাসম, খাত); (১৮) কাব্যবিশ্লেষণ ('আরূদ); (১৯) যুক্তিবিদ্যা (মানতিক); (২০) আস্তি-নাস্তিমূলক ন্যায়শাস্ত্র; (২১) অঙ্কশাস্ত্র (হিসাব); (২২) জ্যামিতি (হানদাসা); (২৩) জ্যোতির্বিদ্যা (হাইয়া) ও (২৪) পরিমাপন। এই সকল বিষয়ের মধ্যে শেষোক্তগুলি কতকটা অবহেলিতই থাকে। বড় মসজিদে যে অত্যন্ত গোঁড়াপন্থী মনোভাব ও শিক্ষাদানের প্রাচীন পদ্ধতি সেইগুলি সাধারণ বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য বাধাস্বরূপ এবং ধর্মীয় বিষয়াদিতেও উদার মত বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইতিহাস ও ভূগোল কর্মসূচীতে সংক্ষিপ্ত মুসলিম ইতিহাস ব্যতীত আর মাত্র দুইটি বই পড়ানো হইতঃ ইবনু'ল খাতীবের রাকমূল হুলাল ও ইব্ন খালদূনের মুকাদ্দিমা, উভয়টি খৃ. ১৪শ শতকে রচিত। জ্যামিতি তখনও পর্যন্ত ইউক্লিডে সীমাবদ্ধ ছিল। তাহারা সিদ্ধান্তগুলি আত্-তূসীর (খৃ. ১৩শ শতক) অনুবাদের মাধ্যমে পড়ান হইত।

সকল পর্যায়ে বিনা বেতনে পড়ান হইয়া থাকে। শিক্ষা তিন স্তরে বিভক্ত, প্রতি স্তর হইতে পরীক্ষায় পাস করিয়া পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উঠিতে হয়। সর্বোচ্চ মানে ধর্ম ও ভাষা বিষয়ে যাহা যাহা পড়ান হয় সেইগুলির একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল (ধারা ৪)

তাফসীর ঃ আল-বায়দাবীর আসরারু'ত তানযীল, দুই জালালের টীকা;

মুওয়াত্তা', আয-যারকানীর টীকাসহ; সাহীহ আল-বুখারী, আল-কাসতাল্লানীর টীকাসহ;

হাদীছ ঃ ইমাম মুসলিম-এর সাহীহ; আন-নাওয়াবীর টীকাসহ; কাদী 'আয়াদ-এর শিফা', আশ-শিহাবু'ল-খাফাজীর টীকাসহ;

আল-কাসতাল্লানীর মাওয়াহিবু'ল -লাদুন্নিয়্যা, আয-যারকানীর টীকাসহ;

সিয়ার ঃ সীরা'ল-কিলা'ইয়্যা;

'আদুদুদ-দীন আল-ঈজীর মাওয়াকি ফের আল-জুরজানীকৃত টীকা;

তাওহীদ ঃ 'উমার আন-নাসাফীর 'আকাইদের আত-তাফতাযানীর টীকা;

শায়খ আস-সানূসীর কুবরা;

সাদরু'শ্-শারী'আ 'উবায়দুল্লাহ আল-মাহবুবীর তাওদীহ; ইবনুল-হাজিবের মুখতাসারের উপরে 'আদুদু'দ-দীন

উসূলু'ল ফিক্হ ঃ আল-ঈজীর টীকা;

'আবদু'ল-ওয়াহহাব আস্-সুবকীকৃত জাম'উ'ল-জাওয়ামি'র আল-মুহাল্লীর টীকা;

'উছমান আয-যায়লা'ঈ-এর তাবয়ীনু'ল-হাকাইক ('আবদুল্লাহ আন্-নাফাসীর কানযু'দ দাকাইক-এর টীকা);

ফিক্হ ঃ দুরার (গুরার-উপরে রচিত টীকা);

খালীলের মুখতাসারের সীদী 'আবদুল-বাকীকৃত টীকা; একই কিতাবের উপরে সীদী মুহাম্মাদ আল-খিরাশীকৃত টীকা;

তাসাওউফ ঃ আল-গাযালীর ইহ্য়া';

নাহ্উ ঃ ইব্ন হিশামের মুগনীউ'ল–লাবীব;

মা'আনী, য়ূসুফ আস্-সাক্কাকীর মিফতাহের তৃতীয় খণ্ড,

বায়ান ঃ আল-জুরজানীর টীকাসহ;

আত-তাফতাযানীর মুতাওয়াল;

আস-সুয়ূতীর মুযহির;

লুগাহ 'আবদু'ল-মালিক আছ-ছা'আলিবীর ফিকহু'ল ইনশা' লুগা; হামাসার আল-মারযুকীর টীকা; আদাব ইবনুল-আছীরের মাছালু'স-সা'ইর।

ত্রিশজন আদি শিক্ষক এবং সেই সঙ্গে তাজবীদের একজন শিক্ষক প্রথম শ্রেণীর মুদার্‌রিস উপাধি লাভ করেন। তাঁহারা উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষা দানের যোগ্য। মাঝামাঝি পর্যায়ে শিক্ষা দানের জন্য বারোজন শিক্ষক রহিয়াছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর, তন্মধ্যে অর্ধেক মালিকী ও অর্ধেক হানাফী। তাজবীদের জন্য অপর একজন শিক্ষক রহিয়াছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের ক্লাস গ্রহণ করেন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষকগণ (মুতাতাববী) অর্থাৎ সনদপ্রাপ্ত সাবেক ছাত্রগণ। তাঁহাদিগকে কোন বেতন দেওয়া হয় না (ধারা ৯)। শিক্ষকগণ বৎসরে দুই মাসের ছুটি পাইয়া থাকেন, জুলাই মাসের মাঝামাঝি হইতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং তাহা ছাড়া রামাদান মাস অতিরিক্ত। তাহা ছাড়া প্রতি শুক্রবার, দুই 'ঈদের দিন এবং প্রতি 'ঈদের পরে ৪ দিন করিয়া, 'আরাফার দিন ও উহার পূর্ববর্তী ২ দিন, ১০ মুহার্‌রাম, ১১, ১২, ১৩ রবী'-১ বন্ধের দিন (ধারা ২৯); বৃহস্পতিবার বিশেষভাবে কার্যদিবসরূপে রক্ষিত (ধারা ২৮)। প্রতিজন ছাত্রের সঙ্গে একটি হাজিরা বহি থাকে। শিক্ষকগণ প্রতি মাসে একবার উহা পরীক্ষা করিয়া স্বাক্ষর করেন এবং উহাতে লিখিয়া দেন যে, সেই ছাত্র যথারীতি তাহার পাঠ শিক্ষা করিয়াছে (ধারা ৩৩)। পরিদর্শকগণ কর্তৃক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কগণ শান্তি-শৃঙ্খলার নিশ্চয়তা বিধান করেন (ধারা ৪০)। এই পরিদর্শকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য মু'আল্লাকার বিধান অনুযায়ী সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (বিধি ৪৪)।

১১ নং বিধির একই তারিখে জারিকৃত একটি পরিপূরক ফরমান দ্বারা চূড়ান্ত পরীক্ষার শর্তাবলী নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই পরীক্ষায় পাস করিলে তাতবী ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। ফিক্‌হ-এর উপরে একটি লিখিত পরীক্ষায় সফল হইতে পারিলে পরবর্তী দুইটি সেশনের ক্লাসে ভর্তি হওয়া যায় (বিধি ৬)। মৌখিক পরীক্ষার জন্য ছাত্রগণ লাইব্রেরীর বই ব্যবহার করিয়া ছয় ঘণ্টা ধরিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে (বিধি ৭)। কুরআন পাঠ ও তিলাওয়াতের জন্য একটি বিশেষ তাতবীর ব্যবস্থা রহিয়াছে (ধারা ৯)।

১৯২৮ খৃ. হইতে মুতাতববী'ঈগণের মধ্য হইতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৫০ জন সহযোগী শিক্ষক (মু'আবিন 'আলা'ত-তাসরীস) নিযুক্ত করা হইতে থাকে। তাঁহাদের নির্ধারিত বেতন মাসিক ৫০০ ফ্রাঙ্ক। ১ জানুয়ারী, ১৯৩৯ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষকগণের বেতন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় ১৩,০০০ ফ্রাঙ্ক। আর প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন ১৬,০০০ ফ্রাঙ্ক। ১৯২৪ খৃ. হইতে তিউনিসিয়ার রাষ্ট্রীয় বাজেটে বড় মসজিদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখা হইয়া আসিতেছে। সেই বরাদ্দ ক্রমেই বৃদ্ধি করা হইতেছে। প্রথম বৎসরে এই বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক। ১৯২৭ খৃ. বাড়াইয়া করা হয় ২,৫০,০০০ ফ্রাঙ্ক। ১৯৩০ খৃ. বৃদ্ধি করা হয় ৭,৭০,০০০ ফ্রাঙ্কে।

১৯৩০ খৃ. দশকে মুসলিম নোটারী ব্যবস্থার পুনর্গঠনের ফলে ছাত্রগণের পক্ষ হইতে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হয়। কারণ তাহারা আর সরাসরি পাস করিয়া সেই পেশাতে প্রবেশ করিতে পারিত না এবং বড় মসজিদে পড়াশুনা করিয়া অতঃপর আরও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া তবেই তাহারা নোটারী পরীক্ষা দিতে পারিত। এইখানে ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কারের সম্পূর্ণ বিষয়টিই উত্থাপিত হয় বা অন্তত বড় মসজিদে আধুনিক আইন শিক্ষা প্রবর্তনের বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়। ১৯২৯ খৃ. ডিসেম্বর মাসে সরকার সংস্কারের সম্ভাবনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করে। উক্ত কমিশনকে কষ্টকরভাবে হইলেও একটি কর্মসূচী প্রণয়নের দায়িত্বও প্রদান করা হয়। লাইব্রেরীর ক্যাটালগ বা বইয়ের তালিকা আরবীতে প্রকাশিত হয়। ফরাসী ভাষায় প্রথম অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন B. Roy ও বেল খোজা (তিউনিস ১৯০০ খৃ.)।

আধুনিক শিক্ষা ঃ সাদিকী কলেজে (১৯২৮-২৯ খৃ. ছাত্র সংখ্যা ৪১৭) ফরাসী ও আরবী উভয় ভাষায় শিক্ষা দান করা হয়। এইখান হইতে প্রশাসনিক চাকুরীর জন্য ছাত্রগণকে তৈরি করা হয়। তরুণ মুসলিমগণ ক্রমেই অধিক সংখ্যায় ফরাসী স্কুলের দিকে ঝুঁকিতে থাকে। প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে ফরাসী আরব স্কুল ও মুসলিম মেয়েদের জন্য বিশেষ স্কুল, দ্র. R. M. M., ৬খ, পৃ. ১২৩-২৬) এবং মাধ্যমিক স্কুল (এইগুলি সকলের জন্য খোলা)। ২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৮ (তু. Statistique generale de le Tunisie; annee 1928) মুসলিম অধিবাসিগণ প্রতিনিধি শাসিত দেশটির ফরাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ২৫,৮৭৬ জন ছেলে ও ২,৯৩০ জন মেয়ে প্রেরণ করে (তদুপরি ৬৭ জন ছেলে ও ৬১৭ জন মেয়েকে প্রাইভেট স্কুলে), তিউনিসের Lycee Carnot-এ মোট ২,০০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৫৯ জন, কিন্তু মেয়েদের Lycee-তে ১,২০০-এর বেশি ছাত্রীর মধ্যে ছিল মাত্র ২৮ জন এবং সবশেষে তিউনিসের তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (College Alaui, Ecole normale di'Instituteurs, Ecole professionnelle E. Loubet) ৪৬১ জন।

তিউনিস শহরে একটি Ecole superieure de langue et litterature arabes য়ূরোপীয় ছাত্রছাত্রীকে কথ্য আরবী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। পরীক্ষার পরে সার্টিফিকেট দেওয়া হইত। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে লিখিত আরবীতে সার্টিফিকেট এবং আরবীর একটি উচ্চতর ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

রেসিডেন্সীর প্রভাবে আল-খালদীনিয়্যা মুসলিম সমিতিটি গঠিত হয়। উহা প্রায় ২০০ তরুণ সদস্যের জন্য সকল বিষয়ে আরবীতে জনপ্রিয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দান করিয়া থাকে।

সবশেষে তিউনিসে বিচার বিভাগ স্থানীয়গণকে আইন ব্যবসায়ের জন্য তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে আরবী ভাষায় আইন শিক্ষা দান করিয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ R. Darmon, La situation des cultes en Tunisie, ২য় সং, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.।

৫। জনসংখ্যা

জাতিতত্ত্ব ঃ পরাধীনতার আমলে তিউনিসিয়াতে স্থানীয় মুসলিম ও য়াহূদীগণ ছাড়াও য়ূরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান ছিল। ইতালী ও ফ্রান্স হইতেই সর্বাধিক সংখ্যক আগমন করিয়াছিল। ১৯২৬ খৃ. আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল সর্বমোট ২১,৫৯,৭০৮ জন (ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. ১৭.৩ জন)। তন্মধ্যে ১৯,৩২,১৮৪ জন ছিল মুসলমান এবং ৫৪,২৪৩ জন তিউনিসীয় য়াহূদী (যে সকল য়াহূদী য়ূরোপীয় জাতীয়তা গ্রহণ করিয়াছিল উহারা এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল না)। ১,৭৩,২৮১ জন য়ূরোপীয় অধিবাসীর বিতরণ নিম্নরূপ ছিলঃ ৭১,০২০ জন ফরাসী (৪১%), ৮৯,২১৬ জন ইতালীয় (৫১.৫%), ৮,৩৯৬ জন মাল্টীজ (ইংরেজদের প্রজা, ৪.৮%), ৪,৬৪৯ জন অন্যান্য

বিভিন্ন জাতীয় (২.৭%)। ইতালীয়গণ আসিয়াছিল প্রধানত সিলিলি ও সার্ডিনিয়া হইতে, উহারা ছিল রাজমিস্ত্রী, খনি-শ্রমিক (লে কেফ), কৃষি শ্রমিক ও ছোট ছোট আঙ্গুর বাগানের শ্রমিক (বেজা, মেজেয এল-বাব, গ্রোমবালিয়া, যাগৌয়ান)। ফরাসীরা ছিল প্রধানত কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী অথবা উপনিবেশবাদী।

য়ূরোপীয়গণের অধিকাংশই তিউনিস এলাকাতে বাস করিত (১,০৩,০০০ বা ৬০%) এবং তাহা ছাড়া উপকূলবর্তী শহরগুলিতে প্রায় ৬,৭০০ বিযারতাতে, ৪,১৫০ ফেরীভীলে, ৬,৯০০ সূসাতে এবং প্রায় সমসংখ্যক সফাক্সে। তিউনিসিয়ার য়াহূদীদের মধ্যে ২৮,১৪১ জন (অর্ধেকের বেশি) তিউনিস এলাকাতে, সূসাতে ৩,৭০০-এর বেশি এবং প্রায় ৩,৩০০ সফাক্সে। বিযারতা, বেজা ও নেবেউলেও বেশ যথেষ্ট সংখ্যায় য়াহূদী বাস করে, দেশের অভ্যন্তরভাগে কমই রহিয়াছে (সেরসের দিকে কিছু সংখ্যক য়াহূদী তাঁবুতে বাস করে, উহারা বাহূসীম নামে পরিচিত). কিছু দক্ষিণাঞ্চলে মোটামুটি সংখ্যক দল রহিয়াছে– গাবেসে প্রায় ২,৫০০, হৌমতসূকে (জেরবা) মোট ৪,৬৫৪ জন অধিবাসীর মধ্যে ৩,৮০০ জন এবং সামরিক এলাকাগুলিতে ২,৫০০-এরও বেশি।

রাজধানী তিউনিসের জনসংখ্যা ছিল ১,৮৫,৪৬৬ জন্য ১০,০০০-এর বেশি লোক বাস করে সেইরূপ ১২টি অন্যান্য শহরের জনসংখ্যা ছিল এইরূপ ঃ সফাক্স ২৭,৭২৩, সূসা ২১,২৯৮, বিযারতা ২০,৫৯৩, কায়রাওয়ান ১৯,৪২৬, মাসাকেন ১৬,৬২০, গাবেস ১৫,১১৯, নেফতা ১৩,২৫০, মোকনাইন ১২,১৯১, কাল'আকাবীরা ১১,৮৩০, তোযেউর ১১,০৫৬ ও বেজা ১০,৪৬৮। এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাসকেন ও কাল'আকাবীরা উভয় স্থানই সাহেলে অবস্থিত এবং শুধু মুসলমানগণই বসবাস করে।

(খ) গোত্র ঃ বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা সম্ভব নহে যে, তিউনিসিয়ার মুসলিম অধিবাসিগণের বর্তমান বিভাগগুলির বিবর্তন কিভাবে হইয়াছিল। শহর কেন্দ্রগুলি এবং অধিকতর ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলি (বিযারতা, বেজা, তিউনিস ও সূসা) যেইখানে বিভিন্ন ধরনের লোক একত্রে মিশিয়া বাস করে সেইগুলি ছাড়িয়া দিলেও বড় বড় গোত্র যেইগুলি দেশের ইতিহাসের বিভিন্ন আমলে পরিষ্কারভাবেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল, সেইগুলির গঠন খুব ভাল করিয়া বুঝা যায় না। অনেক গোত্রেরই উৎপত্তি জানা যায় না, এমন কি সেইগুলির বিলুপ্তিও অনেক সময়ে রহস্যময় থাকিয়া যায়।

দীর্ঘকাল যাবত আরব সৈনিকগণ সংখ্যায় এমন যথেষ্ট ছিল না যে, পুরাতন বার্বার গোষ্ঠীগুলিতে কোন যথার্থ পরিবর্তন আসে। কিন্তু বড় একটি নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন খৃ. ১১শ শতকে প্রথমে হিলালী আরবগণ ও পরে ১২শ ও ১৩শ শতকে সুলায়ম গোত্রীয় আরবগণ দেশটি জয় করিয়া লয়। তাহারা স্থানীয় বার্বারগণের অধিকাংশকে উচ্চ অঞ্চলে বিতাড়িত করিয়া দেয় এবং নিজেরা সমভূমি অঞ্চল দখল করিয়া লইয়া দেশটিকে সম্পূর্ণভাবে আরবীকৃত করিয়া নেয়। এই কথা সত্য যে, প্রায়ই স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আরবরা উহাদিগকে সম্পূর্ণভাবেই নিজেদের প্রভাবাধীনে লইয়া আসে। ফলে বর্তমানে কোন্‌টি আরব গোত্র আর কোন্‌টি বারবার গোত্র তাহা আর বিশেষভাবে চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। শুধু এই কথা বলিতে পারা যায় যে, সমগ্র উত্তর আফ্রিকার মধ্যে তিউনিসিয়াই সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশি আরবীকৃত দেশ।

খৃ. ১৪শ শতকে ইব্‌ন খালদূন তৎকালে বর্তমান বারবারদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সরবরাহ করিয়াছেন। একটি দল বাস করিত জেরবা দ্বীপে (খারিজী জারাবা) এবং দক্ষিণের পর্বতাঞ্চলে ঃ লাওয়াতাগণ (দ্র. Hist. des Berbers, অনু. ১খ, পৃ. ২৩৫) গাবেসের দক্ষিণের জাবালে উহাও এই গোত্রীয়গণের নামেই পরিচিত, মাতমাতাগণ (দ্র. ঐ, ১খ., পৃ. ২৪৬) যে জিলাতে ছিল এখনও পর্যন্ত সেইখানেই বাস করিতেছে। যানাতাগণ ত্রিপোলিতানিয়া হইতে বিতাড়িত হইয়া জাবাল দেমমেরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেইখানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল বারগাম্মা গোত্রসঙ্ঘ (দ্র. ঐ, ৩খ, পৃ. ২৮৮)। অন্যান্য যেনাতার মধ্যে বানূ বারতাজীনগণ (দ্র. ঐ, ৩খ, পৃ. ২০৪) আল-হাম্মা মরূদ্যানে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকে। আর মারানজীসা ইফরানীগণ (দ্র. ঐ, ৩খ, পৃ. ২২৫-২৬) আধা কৃষিজীবী, আধা-পশু পালক, তিউনিস ও কায়রাওয়ানের মাঝখানে থাকিবার ফলে কু'য়ূর আরবদের চাপ সহ্য করিতে বাধ্য হয়। সুমাতাগণের (দ্র. ঐ, ১খ, পৃ. ২৩১) কিছু অবশিষ্টাংশ এখনও পর্যন্ত কায়রাওয়ানের নিকটে বসবাস করিতেছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ঘনবদ্ধ বার্বার দল গঠিত হয় হাওয়ারাগণকে লইয়া (দ্র. ঐ, ১খ, পৃ. ২৭৮-৯), উহারা আংশিকভাবে যাযাবর, উহারা বাস করিত উচ্চ তেল (High Tell) অঞ্চলে; তেবেস্‌সার ওয়ানীফানগণ মারমাজান্নাতে (নিঃসন্দেহে উহারাই বর্তমানের বেরমাজনাগণ), কায়সারগণ এব্বা-কাসুর ও লোরবিউসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, তেবুরসুতকের বাসওয়াগণ জৌগারে। বাসওয়াগণ ইতিমধ্যেই একদল রিয়াহ আরবকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়াছিল। সেই আরবগণ উহাদের আত্মীয় বানূ হাবীবগণের প্রতিবেশী ছিল এবং একই রকমভাবে উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে মুদারের আরব বানূ হুযায়লগণও স্থানীয় বানূ সুলায়ম গোত্রের হাওয়ারীদ গোষ্ঠীর অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

আরব বিজয়িগণের মধ্যে হিলালীগণ আরও পশ্চিমে অগ্রসর হইয়া যাইবার সময়ে ইফরীকিয়্যাতে তিউনিসের নিকটে শুধু বানূ যুগবা গোত্রীয় কিছু সংখ্যক অধিবাসী রাখিয়া যায়। অপরদিকে সুলায়ম গোত্রের বানূ 'আওফগণ, আত-তিজানীর রিহলা (১৩০৬-৯ খৃ.) হইতে জানা যায় যে, সমগ্র পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলবর্তী জিলা দখল করিয়া লইয়াছিল। নাবেউল হইতে সূসা পর্যন্ত ছিল দাল্লাজগণ। অতঃপর একেবারে এল-জেম পর্যন্ত হাকীমগণ, পরবর্তী কালে তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয় তুরূদগণ (এই শেষোক্তগণ পরবর্তী কালে কারগলার দিকে অগ্রসর হইয়া যায়)। অতঃপর আল-মুবারাকা পর্যন্ত বসতি স্থাপন করিয়াছিল হিসন গোত্রের বানূ 'আলীগণ। দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাদের কু'য়ুব বংশীয় আত্মীয়গণ ও মনিবগণ। তন্মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সোফ, আওলাদ মুহালহাল ও আওলাদ আবি'ল-লায়লগণ, হাফসী রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, G. Marcais উহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে, মিরদাসে ইব্‌ন 'আওফগণ, উহাদের একটি বিচ্ছিন্ন শাখা আসিয়াছিল বেজাতে, নিয়মিতভাবে গিয়া কুয়ুবগণের শীতকালীন আবাসস্থল জেরীদে বাস করিত। সবশেষে আল-মুবারাকা হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল অপর সুলায়ম গোত্র দারবাবগণ; উহাদের মধ্যে অভ্যন্তরভাগে ছিল আওলাদ আহমাদগণ, তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করে বানূ য়াযীদ-এর সম্মিলিত বংশীয়গণ (সাহাবা, হামারনা, খারজা, আসাবি'আ) শারীদগণ ও যুগাবগণ; উপকূলীয় অঞ্চলে, নাওয়া'ইলগণ একেবারে গাবেস পর্যন্ত এবং ওয়াশাহ গোত্র সঙ্ঘের মাহামীদগণ একেবারে বর্তমান লিবিয়ার সীমান্ত জুড়িয়া ছিল।

এই নামগুলির মধ্যে কোন কোনটির উল্লেখ পাওয়া যায় ১৫৩৬ খৃ. প্রকাশিত B. de Mendoza-এর স্মৃতিকথা Les Arabes du Royaume de Tunis-এ (প্রকাশক La Primaudaie)। বানূ 'আলীগণই সবচেয়ে শক্তিশালী, Leo Africanus তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে তাহারা বিযারতা হইতে জেরবা পর্যন্ত উপকূলভূমিতে ছড়াইয়া ছিল। আওলাদ আবি'ল-লায়নগণ ছিল মাতিয়ুর ও বেজা জিলাতে; আওলাদ মুহালহালগণ আওলাদ 'আওনগণকে আত্মীকৃত করিয়া ফেলে। তাহারা বাস করিত কায়রাওয়ান ও বেজাতে। কিন্তু ইহাদের পাশাপাশি দেখা যায়, ভয়ঙ্কর আওলাদ সাঈদগণকে। তাহাদের উৎপত্তি জানা যায় না। তাহারা মুনাসতির হইতে কেপ বনের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত জুড়িয়া ছিল; আওলাদ য়াহয়াগণ ছিল তেবুরসুক অঞ্চলে এবং তেবেস্‌সার নিকটে ছিল সম্ভবত হাওয়ারী গোত্রীয় হানানশাগণ। উহাদের সরকার তাঁহার রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র কাল'আতু'স-সিনান হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন (তু. Feraud, Les Harar.... R. Afr., ১৮৭৪ খৃ.)।

গোত্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট মিশ্রণ ও ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ক্ষেত্রে উহাদের পুরাতন নামগুলি রহিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে যেইখানে বার্বারগণের বিকাশ ঘটিতেছে সেখানে গুহাবাসী মাতমাতা ও বারগাম্‌গাগণের দেখা পাওয়া যায়। উহাদের গোত্রগুলিই সমভূমি অঞ্চল পুনর্দখল করে ঃ যারযিসের 'আক্‌কারাগণ ফেব্রুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত তাঁবুতে থাকিয়া যব ফসল উঠায় এবং পশু পালন করে। তাওয়াযিনগণ আগে যাযাবর ছিল, বর্তমানে বাগ-বাগিচার অঞ্চল মেদেনাইন ও বেন-গারদেইনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। জাবালিয়্যাগণ বাস করে তাতাহৌইন-এর সংলগ্ন বর্ধিত এলাকাতে উচ্চভূমির গ্রামগুলিতে এবং ওয়াদারনাগণ অংশত যাযাবর ও অংশত স্থায়ী বাসিন্দা। দুইটি শায়খ শাসিত এলাকার নাম লাওয়াতা, একটি কাইদাত পশ্চিম 'আওনে এবং একটি কাইদাত বিযারজাতে। আলজিরিয়ার কাছাকাছি উচ্চ তেলের ওয়ানতাফা (র) বংশীয়গণের মধ্যে কয়েকটি গোত্র রহিয়াছে। তন্মধ্যে ওয়ারগা গোত্র উল্লেখযোগ্য (এই নামটি দ্র. Hist. des Berb, অনু., ১খ., পৃ. ২৭৫)। ওয়াশতাতাগণ বর্তমানে বেজা ও সুকূল-আরবা' অঞ্চলে বাস করে। উহা ইব্‌ন খালদূনের আমলেও পরিচিত ছিল (দ্র. পূ. গ্র.), ঠিক সেই রকমই নাফযাগণ (দ্র. ১খ., পৃ. ১৮২ ও ২৯০) বর্তমানে উত্তরের উপকূলীয় অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

আরব উদ্ভূত মধ্যযুগীয় গোত্রগুলির নাম দক্ষিণাঞ্চলে বেশ রক্ষিত হইয়াছে; নাবাইলগণ ও মাহামীদগণ অবশ্য বারগাম্‌মাগণের প্রতি-আক্রমণের ফলে লিবিয়াতে বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু তাতাহৌইনের সংলগ্ন বর্ধিতাংশের বার্বারীকৃত দাব্‌বাবগণ একটি শায়খ শাসিত এলাকা গঠন করিয়াছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বানূ যীদগণ (-য়াযীদ), যাহাদের একটি অংশ বর্তমানেও নিজেদেরকে খারজা বলিয়া থাকে, তাহারা এখনও পর্যন্ত গাবেশের নিকটবর্তী অঞ্চলে হামারনাগণের সঙ্গে যাযাবর জীবন যাপন করিয়া থাকে। বিচ্ছিন্ন ও ক্রমহ্রাসমান কিছু কিছু গোত্রীয় হইতে শায়খ শাসিত এলাকার নাম হইয়াছে, এইরূপও দেখা যায়, যথাঃ হেদিল বা বানূ হুযায়লগণ (আইন দ্রাহামা কাইদাত), তুরূদগণ (বিযারতা), হাকীমগণ (সূকুল-আরবা), আওলাদ মুহালহালগণ (আয়ার), কুয়ূব আওলাদ আল-হাজ্জগণ (জেলাস) (দ্র. Hist. des Berb., অনু. ১খ., পৃ. ১৪৩)। বেল্‌লিল বা আওলাদ আবি'ল- লায়লগণের মধ্যে কয়েকটি গোত্র বেজা সমভূমিতে এখনও টিকিয়া আছে এবং রিয়াহগণের কিছু যাগওয়ানে রহিয়াছে। খৃ. ১৭শ শতকেই মাত্র খুমিরগণ বা খুমাইরগণ গিয়া উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। উহার নিকটেই মোগোদগণ বা মুক'ইদগণ বাস করে, যাহাদের নাম হইতে অন্তত আরবী ধ্বনি পাওয়া যায়। আরসের ও উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকাতে অন্যতম মাখযেন গোত্ররূপে বাস করে দ্রীদ বা দুরাইদগণ, উহারা বানূ আছবাজ ইব্‌ন হিলালদের একটি শাখা। উহারা কিছু সময়ের জন্য আলজিরিয়া সীমান্তের অপর পারে বাস করিত। সফাক্‌সের অভ্যন্তরভাগে বসবাসকারী নাফ্‌ফাছগণকে আরব বলিয়া ইব্‌ন খালদূন উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. Hist. des Berb., অনু. ২খ., পৃ. ১০১ ও ২৯০)।

পরবর্তী হাফসীগণের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত দলগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক আওলাদ য়াহ্‌য়া টিকিয়া আছে তেবুরসুক কাইদাতে আওলাদ সা'ঈদগণ বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। কিন্তু তাহাদের প্রধান কেন্দ্র হইল এনফিদা অঞ্চল। আওন বা আওলাদ 'আওনগণ মাকতারের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মিলিয়ানার চতুর্দিকে একটি কাইদাতই গঠন করিয়া রহিয়াছে।

সবশেষে তিউনিসিয়ার বর্তমান গোত্রগুলির অবস্থানে, অনিশ্চিত উদ্ভবের কয়েকটি, যদি মুরাবিত ধর্মীয় মতাবলম্বী নাও হয় তথাপি উল্লেখ করিবার মত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; উপকূল হইতে বেশি দূরে নহে, এল জেমের দক্ষিণ হইতে গাবেসের উত্তরে পর্যন্ত বাস করে মাছালিছগণ, 'আগারবাগণ ও মাহযাবাগণ; অভ্যন্তরভাগে স্তেপভূমি অধিকার করিয়া থাকে জালাসগণ, সাওয়াসীগণ, ফ্রাশীশগণ, মাজিরগণ ও হামামাগণ। উহারা সকলেই সমসংখ্যক কাইদাত গঠন করিয়া রহিয়াছে; উচ্চ তেল অঞ্চলে ওয়ারতানগণ, আয়্যার বা আওলাদ 'আয়্যারগণ, গাওয়াযীগণ বাস করে; নেফযাওয়া ও তিউনিসীয় সাহারাতে গারিবগণ, মারাযীগণ, আদারাগণ ও আওলাদ য়া'কূবগণ বাস করে।

(গ) **জনজীবন ঃ** তিউনিসিয়াতে যাযাবর জীবন স্পষ্টতই শেষ হইয়া আসিতেছে। এখন আর আগের মত বড় আকারে বা বিপুল সংখ্যক লোক (সামালাস) যাযাবর হয় না, ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু খারাপ মওসুমে। সাধারণত গোত্রের অধিবাসীরা স্থায়ীভাবেই বাস করে এবং অল্প কয়েকজন পশুপালক পশুর পাল লইয়া দূরে যায়। পশুর পালই শুধু অন্যত্র যায় ঃ গবাদি পশু শীত কাটায় স্তেপ অঞ্চলে, গ্রীষ্ম কাটায় তেল অঞ্চলে; যে রাস্তা দিয়া প্রায়শ পার হয় উহা হইল শিবা-লে কেফের সরু চলাচল পথ; যাযাবরগণ গামৌদার সমভূমিতে কিছু সময় বিরতি দিয়া যায়। শুধু মাছালিছ গোত্রীয়রাই গ্রীষ্মকালে সুদূর বিযারতা পর্যন্ত এবং জালাস ও সওয়াসীগণ সুদূর বেজার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত গিয়া থাকে। নেফযাওয়া ও তিউনিসীয় সাহারা অঞ্চলে অবশ্য এখনও পর্যন্ত শুধু যাযাবরগণই থাকে।

ফরাসী সরকার স্থানীয়গণকে স্থায়ীভাবে বসতির জীবন অবলম্বনের জন্য কার্যকর নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, যমিনের মালিকানা লাভ সহজ করিয়া দিয়া তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কৃষির দিকে ধাবিত করিয়া দিয়াছিল। দেশে আগে পুরাতন খামাসা চুক্তি আইন প্রচলিত ছিল। উহা নিয়ন্ত্রিত হইত ১২৯৯ হি. জারি করা খায়রুদ-দীনের কানূনুল ফিলাহা দ্বারা (দ্র. Marcais, Takrouna. গ্রন্থপঞ্জী, পৃ. ২৫২); লবণাক্ত এলাকা বকেয়াতে বিক্রয় করা হইত (সফাকসের চতুর্দিকে প্রয় ৫০ পরিধি এলাকা জুড়িয়া), এবং মেরাহিলের হানশীর এলাকাতে অনুরূপ বিক্রয় (কায়রাওয়ানের নিকটে), এই এলাকা জলপাই চাষের উপযোগী ছিল (১৮৯২ ও ১৯০৫ খৃ. ফরমান)। এই সকল ক্ষেত্রে মুগারাসা নামে পরিচিত চুক্তি পদ্ধতি কার্যকর করা হয় ঃ যে স্থানীয় কৃষক তাহাকে প্রদত্ত সম্পূর্ণ যমিনে জলপাই গাছ লাগাইবার চুক্তি স্বাক্ষর করে সে গাছে ফল

ধরা শুরু করিলে তখন সেই যমিনের অর্ধেকের মালিকানা লাভ করে। হাবূস তালুক সংক্রান্ত বিষয়ে এইরূপ একটি আইন পাস করা হয় যে, (এইরূপ একটি ফরমান জারি করা হয় ১৭ জুলাই, ১৯২৬) ফরাসী অধিকৃত দেশটিতে যে কোনখানে কিছু সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী পরিবারকে বসত করানো যাইবে, সেইখানে তাহারা বসবাসকারীরূপে আইনগত ও নিশ্চিত অধিকার পাইবে। দক্ষিণের সামরিক এলাকাগুলিতে বিভিন্ন গোত্রের সম্পত্তির উপরে যৌথ মালিকানা বিশেষ বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেরূপ একটি ডিক্রি জারি করা হয় ২৩ ডিসেম্বর, ১৯১৮। পরে উহা সংশোধন করা হয় ১৯২৬ খৃ.। প্রতিটি যৌথ তালুক লইয়া একটি ইউনিট গঠিত হয়। উহার প্রতিনিধিত্ব করেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি কাউন্সিল; প্রতিটি কাইদাতের রাজধানীতে একটি করিয়া কাউন্সিল বসে (Counseil de tutelle locale)। উহার স্থানীয় কর্তৃত্ব রহিয়াছে এবং উহার সিদ্ধান্ত তিউনিসের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল পরিবর্তন করিতে পারে। যমিন হাত বদল হইবার সময়ে অথবা দীর্ঘমেয়াদী লীজ দিবার সময়ে অথবা অনুরূপ কোন উপলক্ষে এই সংস্থাগুলির কর্তৃত্ব সব সময়েই প্রয়োজন হয়। সব সময়েই স্থানীয়গণের মালিকানার স্বার্থ রক্ষা করা হয়। সবশেষে ফরাসী অধিকারের পরে প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্জন ছাড়াও তিউনিসীয় কৃষিবিদগণ সেচ কোম্পানীসমূহ গঠন করেন (২৫ মে, ১৯২০-এর ফরমান), স্থানীয় কৃষকগণের নিকটে চাষাবাদের জন্য যমিন বিতরণ করেন, স্থানীয়গণের জন্য কৃষি সমিতি গঠন করেন এবং স্থানীয়গণের জন্য একটি Office Public de Credit Agricole নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন (১০ জুন, ১৯২৫-এর ফরমান)।

১৯২৮ খৃ. স্থানীয় ও য়ূরোপীয়গণের অধিকারে পশুসম্পদ যথাক্রমে নিম্নরূপ ছিল ঃ ঘোড়া ৭৭,০০০ ও ১০,৫০০, গাধা ১,৫৭,০০০ ও ২,৫০০, খচ্চর ২৮,৫০০ ও ১১,৫০০, গরু ৪,৩০,০০০ ও ৫৫, ০০০, ভেড়া ২০,০০,০০০ ও ১,০৩,৫০০, ছাগল ১৩,৬০,০০০ ও ৩০,৫০০, শূকর ৬,০০০ ও ১৩,০০০, উট ১,৫১,৫০০০ ও ৩০০। স্থানীয়গণের অধিকারে খাজনা উশুল করা প্রায় ৯০,০০,০০০ জলপাই গাছ ছিল (য়ূরোপীয়দের ছিল ৮,৭৮,০০০), আর বিনা খাজনায় ৪৮,০০,০০০ (য়ূরোপীয়দের ১১,০০,০০০)। এই সঙ্গে যোগ করা যায় কয়েক হাজার স্থানীয় অধিবাসীকে, যাহারা মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

সমগ্র দেশ ব্যাপিয়াই তাঁবু ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, উহার স্থলে গৌরবি (gourbi) এমন কি বাড়ি নির্মিত হইতেছে। এইগুলিই নিষ্প্রিমাণ যে, অধিবাসিগণ স্থায়ী বসতি গড়িতেছে। দক্ষিণাঞ্চলে দুই বিশেষ ধরনের বসবাস রীতি লক্ষ করা যায় ঃ মাটির নীচে গুহাতে গৃহ নির্মাণ, মাতমাতা, মেডেনিন ও তাতাহৌয়িন জিলাতে এইরূপ বসতির সংখ্যা ৭,৫০০ এবং গুরফা কাসুর (কুসুর) (চ্যাপ্টা ধরনের পাকা ঘর, পার্শ্বগুলি বাঁকা, লম্বা, সরু ও নীচু, জিনিসপত্র রাখিবার ঘররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে), মেডেনিন ও মেতামেউরে এইগুলি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। শহরে বসবাসকারিগণের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসিগণই তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। পরাধীনতার সময়ে এই সংখ্যা ছিল ১৮%; তিউনিসিয়া সব সময়েই নগর জীবন উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। তিউনিস শহরে বিদেশী মুসলিমগণ (বাররানীয়্যা) কয়েকটি আলাদা আলাদা সমাজ দলরূপে বসবাস করিয়া থাকে।

স্থানীয়গণের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই অধিকতর আধুনিকীকৃত হইতেছে। উহার একটি লক্ষণীয় সাফল্য ছিল জেরবীয় মুদী ক্রেতাগণের সমবায়ভিত্তিক ক্রয়ের সংগঠন। উহারা বেশি সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত তিউনিস শহরে। স্থানীয় শিল্প-কারখানাগুলি পরাধীনতার যুগে য়ূরোপীয় দ্রব্যাদির সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকাল পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাও সত্য যে, সরকার শিল্পদ্রব্যাদি, বিশেষ করিয়া স্থানীয় শিল্প-দ্রব্যাদিকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিল। সেই উদ্দেশ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং বিশেষ ধরনের বা শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে উৎপাদন অধিকতর উন্নত করিবার জন্য দৃষ্টি দেওয়া হয়। বিভিন্ন মাড়াই কল, তৈল ও সাবান উৎপাদন ব্যতীত সেই সময়ের প্রধান প্রধান পুরাতন কারখানা ছিল কাপড়ের রং তৈয়ারির যাহা পরবর্তী কালে য়ূরোপ হইতে আমদানিকৃত কৃত্রিম রঙ-এর প্রাচুর্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পশম ও পশমী বস্ত্র প্রস্তুতের (বিভিন্ন জিলাতে ঃ জেরবা, গাফসা ও জেরীদে কম্বল তৈয়ারি হইত), কাপড় বয়নের (তিউনিসে), রেশম উৎপাদনের (তিউনিসে ও কসার-হেললালে), ছাগল ও উটের পশম উৎপাদনের (দক্ষিণ অঞ্চলে), গালিচা বয়নের (নারীরা বয়ন করিত, বিশেষ করিয়া কায়রাওয়ানে) এবং শাইয়াসের (তিউনিসে ও এল-বাথানে) এবং চীনামাটির দ্রব্যাদির (নাবেউলে)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্য ছিল ঝাঁজরী (তিউনিস, কায়রাওয়ান ও সূসাতে), মাদুর, ঝুড়ি ও ঘাস বুনাইয়া নানা দ্রব্য তৈয়ারি (নাবেউলে), চামড়া ও জুতা তৈয়ারি (তিউনিস, কায়রাওয়ান ও নাবেউলে), ঘোড়ার জিন তৈয়ারি (তিউনিসে), ছুরি-চামচ-তৈজসপত্র, ধাতব দ্রব্যাদি, পাথর ও কাঠের কাজ। টিনের কারিগরগণ সকলেই য়াহূদী, অনেক জুতার কারিগর দরজী এবং প্রায় সকল স্বর্ণকারই য়াহূদী।

বণিক সমিতিগুলির (ট্রেড-গীল্ড) মধ্যে তিউনিসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্পেনীয় বংশোদ্ভূত শাশিয়্যা উৎপাদনকারিগণের (শাওয়াশী) সমিতি। বে-এর ফরমান দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হইত; সেইখানে কোন য়াহূদীও সদস্য হইতে পারিত, আমীন সব সময়েই হইতেন একজন মুসলমান। শাওয়াশীগণের একটি সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল থাকিত, তাহাদের ট্রেড মার্ক (নিশান) সমর্থিত হইবার জন্য বে-এর ফরমান জারির প্রয়োজন হইত। বাহির হইতে আমদানির সঙ্গে প্রতিযোগিতা (ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়া হইতে) এবং তুরস্কের বাজার চলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও ১৯৩০ খৃ. দশকে শাশিয়্যা উৎপাদন তখনও পর্যন্ত শতাব্দীর প্রথম দিকের সমপরিমাণই ছিল। অর্থাৎ প্রায় ৫০,০০০ কিলোগ্রাম, উহার অর্ধেক পরিমাণ রফতানি হইয়া যাইত।

সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী, Direction de L'Agriculture কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, তিউনিসের গীল্ডগুলি নিম্নরূপভাবে গঠিত ছিল ঃ

	দক্ষ কারিগর	শ্রমিক
শাশিয়্যা নির্মাতা	২০০	৬০০
দরজী	৬০	১০০
বুরনুস (এক ধরনের টুপি) নির্মাতা	১২০	১৫০
মাড়াইকল	১০	৪০
রেশম কারখানা	৩০০	১,২০০
তুলা হইতে সুতা বুনন	১০০	৩০০
সুতা রঙ করিবার কাজ	৩০	৪৫
জুতা তৈয়ারি	২০০	৩০০
ঘোড়ার জিন তৈয়ারি ও চামড়ার কাজ	২০	৭০
স্বর্ণকার ও অলঙ্কার শিল্প	৪৫	৭০
সূত্রধর ও কাঠের কাজ	৯০	১২৫
কর্মকার ও ধাতুর কাজ	২০	৩৫
চিত্রকর ও গৃহসজ্জার কাজ	১০০	২৩০
চামড়া শোধন	২৫	৪৫

দক্ষ কারিগর ও/শ্রমিক মিলাইয়া মোট সংখ্যা হয় মাত্র ৪,৬৩০-এর মত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Nomenclature et repartitien des tribus de la Tunisie, chalons/Saone ১৯৩০ খৃ.; (২) Notes sur les tribus de la Regence, R. T., ১৯০২ খৃ.; (৩) Statistique generale de la Tunisie An., ১৯২৮ খৃ., তিউনিস ১৯২৯ খৃ.; (৪) Bertholon and Chantre, Recherches anthropologiques dans la Berberie orientale, Lyon ১৯১৩ খৃ.; (৫) আবদুল-ওয়াহহাব, Coup d'ail general sur les apports ethniques etrangers en Tunisie, R. T., ১৯১৭ খৃ.; (৬) Eudel. L'orfevrerie algerienne et tunisienne, আলজিয়ার্স ১৯০২ খৃ.; (৭) Atger, Les corporations tunisiennes, প্যারিস ১৯০৯ খৃ.; (৮) Bernard and Lacroix, L'evolution du nomadisme en Algerie, উহার বিভিন্ন স্থানে, আলজিয়ার্স-প্যারিস ১৯০৬ খৃ.; (৯) Decker-David, L'agriculture indigene en Tunisie, তিউনিস ১৯১২ খৃ.; (১০) Mzali, L'evolution economique de la Tunisie, তিউনিস ১৯২১ খৃ.; (১১) Aug. Bernard, Enquete sur L'habitation rurale des indigenes de la Tunisie, তিউনিস ১৯২৪ খৃ.; (১২) সুলতান, Essai sur Ia politique fonciere en Tunisie, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.।

৬। ভাষা

(ক) বার্বার ঃ বার্বার আঞ্চলিক ভাষা তিউনিসিয়া হইতে প্রায় সম্পূর্ণই উঠিয়া গিয়াছে। বারবার ভাষাভাষিগণকে বর্তমানে শুধু সেনেদ অঞ্চলে (গাফসা কাইদাত) দেখা যায়। উহাদের কথ্য ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন Provotelle, তামেযরেদে মাতমাতাগণের মধ্যে এবং জেরবা দ্বীপে, সেইখানে বিশেষ করিয়া নারীদের মধ্যে পুরাতন কথ্য ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে।

(খ) কথ্য আরবী ঃ ভাষাগতভাবে তিউনিসিয়ার আরবীকরণ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু এই ভাষাগত ধারার অগ্রগতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা সম্ভব নহে। W. Marcais অন্তত সাহিল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যতটুকু ধারণা করা হয় ইহার অগ্রগতি তদপেক্ষা অনেক বেশি। হিলাল ও সুলায়মগণের আগমনের পূর্ব হইতেই যেহেতু (খৃ. ১১শ-১৩শ শতক) শহর কেন্দ্রগুলি, আরবীকরণের স্থায়ী স্থানগুলি, সূসা, মনাসতীর ও মাহদিয়া হইতে চতুষ্পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষক অধিবাসিগণের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব শহরের ভাষার বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। উহা গ্রামের অধিবাসিগণের দ্বারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া ক্রমে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রাম্য ভাষার জন্ম হয়। ব্যঞ্জনধ্বনি পদ্ধতি ও ব্যাকরণের দিক হইতে বেদুঈন কথ্য ভাষা শহরের আরবী হইতে এবং সেই কারণে সাহিল হইতে ভিন্নরূপ হইয়া যায় বলিয়া ইবন খালদূন বর্ণনা করিয়াছেন।

Von Maltzan উল্লেখ করিয়াছেন (Z. D. M. G., ২৩ খ, পৃ. ৬৫৫-৬) যে, তিউনিসে যে আরবী কথিত হয় উহাতে মাগরিবের অন্য যে কোন অঞ্চল অপেক্ষা চিরায়ত ব্যঞ্জন ধ্বনিরীতি অধিকতর নির্ভুলতার সঙ্গে রক্ষিত হইয়াছে। আমরা শুধু দ ও জ-এর উচ্চারণরূপগুলি লক্ষ্য করিতে পারি। উভয়টি উচ্চারিত হয় জোরালো ঘোষবর্ণরূপে ও দন্ত্য ঘর্ষরূপে; ক উচ্চারিত হয় তালব্য ঘোষরূপে (গ) ধার করা শব্দে (যেমন বাগরা, গুমরুগ) অথবা বেদুঈনদের কথ্য ভাষা দ্বারা (যেমন বাগরা, নাগা); জ তালব্য ঘোষ (যেমন ফরাসী J) সীমা বা সংখ্যাবাচক বিশেষণের (article) পরে 'এর' 'হইতে' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং যেই সকল শব্দে আগেই ধ্বনিটি রহিয়াছে সেইখানে য-রূপে উচ্চারিত হয় (যেমন জাওয>যুয)। ল, র ও ন এই ধ্বনিগুলির তরল উচ্চারণের ক্ষেত্রে যে বিভ্রান্তি দেখা দেয় তাহা ধার করা প্রায় সকল শব্দকেই প্রভাবিত করে।

কয়েকটি দুর্লভ আদর্শিকা ব্যতীত আর সকল ক্ষেত্র হইতে runation উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কিছু চিহ্ন পাওয়া যায় কোন কোন ক্রিয়া বিশেষগণ বা বিশেষণীয় বিশেষণে কর্ম কারকে যেইখানে শব্দশেষের পুরাতন স্বরধ্বনি রহিয়া গিয়াছে, কখনও বা দীর্ঘায়িত হইয়াছে (যেমন দাইমান>দীমা, দীমা)।

W. Marcais তাকরুনার কথ্য ভাষা যে সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন উহাই এখন পর্যন্ত তিউনিসিয়ার স্বরধ্বনি উচ্চারণের একমাত্র সন্তোষজনক দলীল হইয়া রহিয়াছে। যদিও মাগরিবের শেষ প্রান্তে যেইরূপ এখানে যদিও স্বরধ্বনি ত্যাগ করা বা দুর্বল উচ্চারণ করাটা আদৌ সেইরূপ গুরুতর কিছু নহে, তথাপি এইখানে ইহা এক ভাঙিয়া পড়া স্বরধ্বনি পদ্ধতি। কখনও কখনও উচ্চারণের সুবিধার জন্য মধ্যবর্তী ধ্বনির সৃষ্টি করা হয়, মাধ্যমিক অতিশয় সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি, বিশেষ করিয়া কণ্ঠের ভিতর হইতে উচ্চারিত ধ্বনির আগে যখন ই বা উ হয়, তখন (যেমন হিব্রু ভাষার পাতাহ হাতুফ)। এইখানে স্মরণযোগ্য যে, তিউনিসে মেয়েরা পুরানা রীতির আই ও আরও এই যুক্ত উচ্চারণ রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু পুরুষরা সেইগুলিকে ই ও উ-তে সংক্ষেপিত করিয়া নিয়াছে; বেদুঈন কথ্যরীতিতে সাধারণভাবে সেইগুলিকে পুনরায় ঈ এবং ও হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এক ভুলযুক্ত উচ্চারণের মাধ্যমে সেইখানে একটু অতি সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় ধ্বনি যুক্ত হয় ঃ ইয়ে, ওয়ে। কোন কোন বেদুঈন বা যাযাবর ইমালা আ > ই খোলা উচ্চারণকে জোরের সঙ্গে কোন কোন শব্দে চাপা ঈ-রূপে উচ্চারণ করিয়া থাকে। শিক্ষিত লোকেরা পুরাতন ভাষার কাসরাকে খোলা ধ্বনিতে ই-রূপে উচ্চারণ করেন, কিন্তু ধ্বনির মাঝখানে থাকিলে প্রায় ফরাসী e-এর মত উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

H. Stumme-এর নিকটে আমরা তিউনিসীয় আরবী ভাষার শব্দতত্ত্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য ঋণী। উচ্চারণে জোর দিবার বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন ঃ শব্দের শেষে যদি দুইটি ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকে বা শেষ ব্যঞ্জন ধ্বনির আগের ধ্বনিটি যদি দীর্ঘ স্বরধ্বনি হয় তবে শেষ অক্ষরটির উপরে জোর পড়ে; অন্যান্য ক্ষেত্রে শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরের উপরে জোর পড়ে, যদি শেষোক্তটি দীর্ঘ ধ্বনির বা বদ্ধ ধ্বনির হয়, যদি না শব্দটির প্রথম অক্ষরের উপরে জোর দেওয়া হয়; ব্যতিক্রমসমূহ ঃ ক্রিয়াঘটিত রূপ য়াফআলু (য়াফআলু-এর জন্য) এবং ফাআল (ফাআল-এর জন্য) এমন এক শব্দরূপ যাহা একই সঙ্গে ভাব বিশেষ্য আবার নামবাচক। উচ্চারণকালে যখন পরবর্তী শব্দটিতে জোর দিতে হয় তখন জোর শেষ ধ্বনিতে না পড়িয়া শেষের পূর্ব ধ্বনিতে পড়ে।

সকল মাগরিবী কথ্য ভাষারই মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় স্বভাবতই ধাতুরূপে ঃ উত্তম পুরুষে ও না-এর ক্ষেত্রে একবচনে হয় নাফআল, ব. র. নাফআলু। Th. Noldeke বাক্য গঠনরীতি সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য করিয়াছেন।

শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে তুর্কী ও ইতালীর ভাষা হইতে অনেক ধার করা হইয়াছে। ফরাসী ভাষা হইতে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ফরাসী ভাষা জুডাই-আরবীকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে এবং উহা পঠন-পাঠন ব্যতীতই সম্ভবত মৃত ভাষাতে পরিণত হইবে।

(গ) স্থানীয় সাংবাদিকতা ঃ পরাধীনতার আমলে তিউনিসিয়াতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কোন সংবাদপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল; এমন কি বই মুদ্রণ

ও বিক্রয়ও নিয়ন্ত্রিত ছিল। ইহা ছিল প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে। ইহা বড় মসজিদের শিক্ষা বিষয়ক ফরমান অনুযায়ী ১৮৭৫ খৃ. জারি করা হয়। ১৮৫৯ খৃ. হইতে আল-কাইদুর-রাসমি আত্-তিউনিসী (Journal Official) কিছু পরিমাণে তথ্য প্রদান করিতে থাকে, প্রধানত প্রশাসনিক বিষয়ে, তবে উহাতে অন্যান্য নিবন্ধও প্রকাশিত হইত। ১৪ অক্টোবর, ১৮৮৪, বিশেষ করিয়া ১৬ আগস্ট, ১৮৮৭ জারিকৃত অধিকতর নরম ধরনের পত্র-পত্রিকা প্রকাশনা বিষয়ক ফরমান, পরবর্তী কালে কয়েকবার সংশোধিত হয়; তদ্বারা তিউনিসে ফরাসী, ইতালীয় ও আরবী ভাষায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১৮৮৮-৮৯ খৃ. বূ শূশার মালিকানাধীন আল-হাদিরা ও শাযলী-এর মালিকানাধীন আয-যুহরা দৈনিক পত্রিকা দুইটি আরবীতে প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে যুহরা পত্রিকাটি খুবই প্রগতিশীল ধরনের থাকিলেও পরবর্তী কালে উহা রক্ষণশীল পত্রিকাতে পরিণত হয়। উহার পাশাপাশি প্রকাশিত হইতে থাকে আন-নাহদা। এই প্রধান সংবাদপত্রটি সোমবার ব্যতীত সপ্তাহের প্রতিদিন প্রকাশিত হইত। সেই সময়কার (১৯৩০-এর দশক) অধিকাংশ আরবী পত্রপত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক আল-যামান (উদারপন্থী), লিসানুশ-শাব এবং আস্-সাওয়াব (উভয়টিই জাতীয়তাবাদী প্রবণতার, বিশেষ করিয়া প্রথমটি), আন-নাদীম (সাহিত্য-পত্রিকা, ব্যঙ্গধর্মী, যথেষ্ট আদৃত ছিল); তাহা ছাড়া ছিল হাস্যরসাত্মক আয্-যাহউ। উহার বিভিন্ন কলামে জনপ্রিয় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হইত। আল-ওয়াযীর নামে মাসিক পত্রিকা ছিল। আল-মুনীরও ছিল কিন্তু খুবই অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকাতে ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হইত, নাম আল-আলাম আল-আদাবী। কিন্তু তিউনিসিয়ার সর্বাধিক প্রচারিত আরবী পত্রিকাগুলি আসিত মিসর হইতে, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল আস-সিয়াসা। Journal Official ছিল সরকারী গেজেট ধরনের পত্রিকা। ১৮৮৩ খৃ. হইতে উহার একটি ফরাসী সংস্করণও প্রকাশিত হইতে থাকে, সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত, উহাতে সরকারী ধরনের দলীল-পত্রাদি ছাপা হইত। সবশেষে একটি বর্ষপঞ্জী ধরনের প্রকাশনার কথা উল্লেখ করিতে হয়, আল-রোযনামা আত-তিউনিসিয়্যা। ১৮৯৯ হইতে ১৯২১ খৃ. পর্যন্ত উহা প্রকাশিত হয়। অতঃপর উহার স্থলে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ধরনের একটি বার্ষিকী প্রকাশিত হইতে থাকে, নাম তাকবীম আত-তিউনিসী।

একটি উল্লেখযোগ্য চিত্তাকর্ষক বিষয় হইল যে, পরাধীনতার যুগে সফাক্সে একটি আরবী পত্রিকা প্রকাশের অসফল প্রচেষ্টা হইয়াছিল, নাম ছিল আল-আসরুল-জাদীদ এবং কায়রাওয়ানে যেইটি প্রকাশ করা হয় উহার নাম ছিল আল-কায়রাওয়ান। অপরপক্ষে সফাক্সে মুসলমানগণ কর্তৃক ফরাসী ভাষায় একটি সাপ্তাহিকী প্রকাশের চেষ্টা সফল হয়। Tunisie Nouvelle নামক উক্ত পত্রিকাটির মালিক ছিলেন যুহায়ের আয়্যাদী; তিউনিসেও বাশ হানবা-এর Le Tunisien ১৯১০ খৃ. হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেইখান হইতে শাযীর খায়রুল্লাহ Voix du Tunisien প্রকাশ করেন। উহা Etendard Tunisien-এর স্থান গ্রহণ করে। উহাও আবার Liberal-এর স্থান গ্রহণ করে; আগস্ট ১৯৩০ হইতে 'আবদুল-'আযীয লারৌই Croissant পত্রিকাটি প্রকাশ করিতে থাকেন। এই মুখপত্রগুলি হইতে তিউনিসিয়ার একান্তভাবেই মুসলিম জাতীয়তাবাদী মানসিকতা গড়িয়া উঠিবার পরিচয় পাওয়া যায়।

য়াহূদীগণের যথেষ্ট সংখ্যক জুজাঈ-আরবী ভাষার (হিব্রু হরফে) সাহিত্য ও পত্রপত্রিকা ছিল। সেইগুলি লইয়া E. Vassel ১৯০৭ খৃ. একখানি ইতিহাস রচনা করেন (La Litterature Populaire des Israelites Tunisiens, 1905-1907)। উহারা সেই আঞ্চলিক ভাষাতে পরে আর কোন বই বা পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে নাই। ফরাসী ভাষা সেই স্থান দখল করিয়া লয়। মাঝে মধ্যে কেবল আস-সাবাহ-এর নামমাত্র প্রকাশ ঘটিত। উহাদের তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে; রক্ষণশীল Egalite; Justice (সংমিশ্রণবাদী) এবং সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত Reveil Juif (য়াহূদীবাদী); ইহা Felix allouche ১৯২৪ খৃ. সফাক্সে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিউনিসে স্থানান্তরিত হয়।

সংযোজন ঃ তিউনিসিয়া প্রজাতন্ত্র (আল-জামহূরিয়্যাত-তিউনিসিয়া) আফ্রিকার মধ্যবর্তী স্থানে সর্বউত্তরে অবস্থিত। দেশটির উত্তরে ভূমধ্যসাগর। তিউনিসিয়াকে ধরিয়াই ভূমধ্যসাগরকে পূর্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পূর্বদিকে প্রাচ্য আর পশ্চিম দিকে পাশ্চাত্য বা প্রতীচ্য। দেশটির আয়তন ১,৬৩,৬১০ বর্গ কি. মি. (৬৩,১৭০ ব. মা.), ১৯৭৫ খৃ. জনসংখ্যা ছিল ৫৫,৭২,১৯৩, জাতিসংঘের অনুমানমতে ১৯৮৮ খৃ. জনসংখ্যা ছিল ৭৮,০৯,০০০, প্রতি বর্গ কি. মি. জনসংখ্যার গড় ৪৭.৭ জন। অধিকাংশ অধিবাসী উত্তরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস করে। রাজধানী তিউনিস (দ্র.) সুপ্রাচীন কার্থেজ নগরীর ধ্বংসাবশেষের নিকটে অবস্থিত।

উত্তরের বিস্তীর্ণ তটরেখা দেশটির বড় সম্পদ। এই অঞ্চলেই উর্বরা উপত্যকাসমূহ অবস্থিত। অধিকাংশ পশুপালন ও কৃষিকাজ এই দিকেই করা হইয়া থাকে। এই দিকে আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ ও মনোরম, শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়। দেশের অভ্যন্তরভাগ শুষ্ক এবং ক্রমেই অধিক গরম। দক্ষিণভাগ সাহারা মরুভূমির অন্তর্গত। উত্তরের সমুদ্র তটরেখা ধরিয়া বৎসরে গড়ে ৬০´´ বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে মাত্র ৮´´। উত্তরের উপকূলবর্তী উপত্যকাগুলিতেই প্রধানত কৃষিকাজ হয়। প্রধান প্রধান উৎপাদন গম, গোল আলু, জলপাই, ওট, বীট, আঙ্গুর, খেজুর ও কমলালেবু। অন্যান্য উৎপাদন যব, টমেটো, তরমুজ, সীম, মরিচ, তামাক, আপেল, পীচ এবং অন্যান্য ফলমূল। উত্তরাঞ্চলেই ব্যাপকভাবে পশু পালন করা হয়; ভেড়া (৫৯,০০,০০০), ছাগল (১১,১৫,০০০), গরু (৬,১২,০০০) গাধা (২,২০,০০০), উট (১,৮৪,০০০), খচ্চর (৭৬,০০০), ঘোড়া (৫৬,০০০) ও হাঁস-মুরগী এবং সেইগুলির গোশত, দুধ, চামড়া, পশম ও ডিম দেশের বড় সম্পদ। বনভূমি হইতে কাঠ উৎপাদিত হয়। সেইগুলি বিভিন্ন নির্মাণকাজ, পাল্প উৎপাদন ও অন্যান্য শিল্পজকাজে ব্যবহৃত হয়, জ্বালানি লাকড়ি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। সমুদ্র হইতে মাছ আহরণ এইখানকার অধিবাসিগণের এক গুরুত্বপূর্ণ পেশা। ১৯৮৭ খৃ. উৎপাদন ছিল ৯৯,০০০ মেট্রিক টন। সাম্প্রতিক সময়ের আবিষ্কারের ফলে তিউনিসিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসিয়াছে। সীমিত পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া গিয়াছে। প্রথম উত্তোলন শুরু হয় ১৯৭৯ খৃ.; বর্তমানে বার্ষিক উৎপাদন ৫.৯ মিলিয়ন টন। তাহা ছাড়া সমুদ্রে প্রচুর গ্যাসেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ১৯৮৮ খৃ. বিভিন্ন খনিজ ও শিল্পজাত উৎপাদন নিম্নরূপ ছিল ঃ পেট্রোল ২,২৪,০০০ টন, ডিজেল, ৪,৫৭,০০০ টন, কেরোসিন ১,৫৩,০০০ টন, জ্বালানি তৈল ৬,২৬,০০০ টন, গ্যাস ২,৪৬,০০,০০০ ঘন মিটার, সিমেন্ট ৩২,১৫,০০০ মেট্রিক টন, লবণ ৪,৩২,০০০ টন, বিদ্যুৎ উৎপাদন (রাষ্ট্রীয় Society Tunisienne-এর ৪১,১৫,০০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট, (অন্যান্য উৎপাদন) ৫৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট। ইহা ছাড়া সীসা, স্টীল, চিনি, চুন, সুপারফসফেট, জলপাই তৈল (১,২০,০০০ টন), সিগারেট, মদ ও বীয়ার উৎপাদিত হয়। প্রধান প্রধান রফতানি দ্রব্য পেট্রোলিয়াম (১৯৮৮ খৃ. ৩৩০ মিলয়ন দীনার মূল্যের), ফসফেট এসিড, সার, সূতা, কাপড়,

ফল ও জয়তুন (জলপাই) তৈল। তিউনিসিয়া বিদেশ হইতে গম, চিনি, সয়াবীন তৈল, কাঠ, তুলা, ঔষধ, শোধিত পেট্রোলিয়াম, লোহা ও স্টীল, যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ী, ট্রাকটর ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানি করে। দেশটি প্রায় ৮০ বৎসর ফ্রান্সের অধীনে আশ্রিত রাজ্যরূপে ছিল। বর্তমানেও প্রধান বাণিজ্য সম্পর্ক ফ্রান্সের সঙ্গে। অন্যান্য দেশ হইল ইতালী, জার্মানী, স্পেন, বেলজিয়াম ও যুক্তরাজ্য। তিউনিসিয়া য়ুরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর (EEC) একটি সংযুক্ত দেশ। বর্তমানে অধিবাসিগণের জনপ্রতি বার্ষিক গড় আয় (১৯৮৬ খৃ. হিসাব) ১,১০০ মার্কিন ডলার; বার্ষিক গড় জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ৯,৬১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে দেশটির প্রধান প্রধান আয়ের পরিমাণ এইরূপ ঃ কৃষি আয় ২৬.১%, শিল্প আয় ৩২%, খনিজ রফতানির আয় ১৬%, শিল্প উৎপাদন ১৫%। জাতীয় আয়ের আর একটি বড় উৎস পর্যটন। ভূমধ্যসাগর, মনোরম উপকূলভূমি, প্রাচীন ফিনিশীয় ও কার্থেজীয় পুরাকীর্তিসমূহ, অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি প্রধান আকর্ষণ; সরকার সড়ক নির্মাণ, হোটেল উন্নয়ন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে। দক্ষিণের সাহারা অঞ্চলেও উন্নয়ন করিয়া পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯৮৮ খৃ. দেশে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩৪,৬৮,৪০০ জন এবং পর্যটন হইতে রাষ্ট্রের আয় হইয়াছিল ১,৩০০ মিলিয়ন ডলার। পর্যটন উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য Office National du Tourisme Tunisiene গঠন করিয়াছে। ১৯৫৮ খৃ. দেশের মুদ্রার নাম বদল করিয়া তিউনিসীয় দীনার (TD) করা হইয়াছে। ১,০০০ মিলিমে ১ দীনার হয়, ১০০ দীনার-১১০.৫৫ মার্কিন ডলারের সমান (১৯৯০ খৃ. হিসাব)। দেশে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের নাম Banque Centrale de Tunisie। সমগ্র দেশ কতগুলি কমিউনে বিভক্ত। প্রধান প্রধান কমিউন এবং উহাদের জনসংখ্যা (১৯৮৪ খৃ.) নিম্নরূপ ঃ

তিউনিস ৫,৯৬,৬৫৪; সফাক্স (সাফাকিস) ২,৩১,৯১১; আরিয়ানা ৯৮,৬৫৫; বিযারতা (বিযেরতে) ৯৪,৫০৯; জেরবা ৯২,২৬৯; গাবেস ৯২,২৫৮; সূসা (সৌসসে) ৮৩,৫০৯ কায়রাওয়ান ৭২,২৫৪; বারদো ৬৫,৬৬৯; লা গৌলেত ৬১,৬০৯। প্রধান প্রধান শহর হইতেছে তিউনিস, রাজধানী, ৯,০০,০০০; সফাকস ১,৭৫,০০০; সূসা ৭৫,০০০; বিযারতা ৬৫,০০০; কায়রাওয়ান ৫৫,০০০; গাবেস ৪৫,৬০০ ও মেনযেন বারগুইবা ৪৫,০০০।

অধিবাসিগণ কৃষিকাজ, বিভিন্ন উৎপাদন, নির্মাণ কাজ, ব্যবসা, ব্যাঙ্ক-বীমা ও খনিজ উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। নারীগণ ক্রমেই অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করিতেছে। ১৯৯০ খৃ. হিসাবে দেখা যায় যে, মোট ১৭,৮৬,৪২০ জন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির মধ্যে ৩,৮৮,২০০ জন নারী।

তিউনিসিয়াতে ২,১৭৫ কি. মি. রেলপথ রহিয়াছে। রাজধানী তিউনিস ও উহার চতুর্দিক ঘিরিয়া ৩১ কি. মি. হালকা রেল সার্ভিস চালু রহিয়াছে। মরক্কো হইতে লিবিয়া পর্যন্ত একটানা একটি স্ট্যান্ডার্ড গেজ রেলপথ বর্তমানে নির্মীয়মান রহিয়াছে। উহা শেষ হইলে উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতি অর্জিত হইবে। দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই বাস যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাকা-কাঁচা মোট সড়কের পরিমাণ ২৬,৬৮৯ কি. মি.। তন্মধ্যে ১৩,৭৪৫ কি. মি. প্রধান সড়ক। তৈল আবিষ্কারের পরে মোটর গাড়ির সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। ১৯৮৭ খৃ. দেশে শুধু ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যাই ছিল ২,৮১,২০১; সেইগুলি ছাড়া রহিয়াছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক যানবাহন ও মোটর সাইকেল, সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের জন্য দেশের উপকূলে ৪টি প্রধান বন্দর তিউনিস-লা-গলেত, বিযারতা, সূসা (সৌসে) ও সফাক্স। তাহা ছাড়া তৈল রফতানির জন্য বিশেষভাবে ভিন্ন একটি বন্দর রহিয়াছে লা-সাখিরা। বাণিজ্যিক দ্রব্য, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য খনিজ দ্রব্য রফতানির জন্য গাবেসে এক বিরাট বন্দর কমপ্লেক্স নির্মিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দেশে কয়েকটি রহিয়াছে, যথা ঃ তিউনিস-কার্থেজ, তিউনিস এল-আউয়িলা, জেরবা, মুনাসতির ও তাজিউর। তাবারকা ও গাফসাতে আরও দুইটি নির্মিত হইতেছে। রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থার নাম Tunis Air (Societe Tunisienne de L'Air); অন্যান্য বিমান ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

দেশের ৯৯% অধিবাসী মুসলমান। রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম ১৯৫৬ খৃ. রাষ্ট্রীয় সংবিধানে স্বীকৃত রহিয়াছে। পরবর্তীতে কিছু কিছু সংযোজন ও সংশোধন হইতেছে। ১৯৯০ খৃ. দেশে মোট য়াহূদীর সংখ্যা ছিল ১০,০০০; বাদবাকি খৃস্টান, উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা রোমান ক্যাথলিক, গ্রীক অর্থডক্স এবং ফরাসী ও ইংরাজ প্রটেস্টান্ট। তিউনিসিয়ার মুসলিম ধর্মীয় প্রধান হইলেন গ্র্যাণ্ড মুফতী। এই অতি সন্মানিত পদে বর্তমানে রহিয়াছেন শায়খ মুহাম্মাদ হাবীব বেলখোজা। রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী। শিক্ষার প্রধান মাধ্যমও আরবী। ফরাসী ভাষা ব্যাপকভাবে কথিত ও ব্যবহৃত হয়। স্বল্প সংখ্যক গোত্রীয় অধিবাসী বার্বার ভাষায় কথা বলে। দেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। তিউনিস, নুনাসহির ও সফাক্সে। বয়স্ক শিক্ষার হার ৬২%। এই ক্ষেত্রে নারীরা বেশি অগ্রগামী। দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যথাক্রমে ৩,৬৭৬ ও ৪৮৫টি। মাধ্যমিক পর্যায় হইতে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিচার ব্যবস্থার অধীনে দেশের ৫১টি এলাকাতে Justice Cantonales এবং সেইগুলির উপরে ১৩টি Cours de Premiere Instance রহিয়াছে। তিউনিসে ৩টি দায়রা ও ১টি ফৌজদারী আদালত এবং ৩টি আপীল আদালত রহিয়াছে ঃ তিউনিস, সূসা ও সফাক্সে। বেতার ও টিভি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, অভিন্ন সংস্থাটির নাম Radiodiffusion Television Tunisienne। আরবী ছাড়াও ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় প্রচার করা হয়। টেলিভিশনে প্রচার শুরু করা হয় ১৯৬৬ খৃ.। ১৯৮৯ খৃ. মধ্যে দেশে টেলিভিশন সেটের সংখ্যা হয় ৫,০০,০০০; রেডিও সেটের সংখ্যা ছিল ১৬,৯৩,৫২৭টি। জাতীয় সংবাদ সংস্থার নাম Tunis Afrique Press (TAP)। উহা ১৯৬১ খৃ. স্থাপিত হয়; আরবী, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হয়। প্রায় সকল দৈনিক ও সাময়িকপত্রই রাজধানী তিউনিস হইতে প্রকাশিত হয়। প্রধান প্রধান দৈনিক ঃ (১) আল-সাবাহ, তিউনিস হইতে আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়, প্রতিষ্ঠা ১৯৫১ খৃ.; (২) আল-আমাল, পুরাতন আরবী দৈনিক, প্রতিষ্ঠা ১৯৩৪ খৃ.; (৩) L'Action, ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়, ১৯৩২ খৃ. স্থাপিত; (৪) La Presse de Tunisie, ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়, ১৯৩৬ খৃ. স্থাপিত। দেশের কয়েকটি প্রধান প্রধান সাময়িক পত্র ঃ (১) আল-আনওয়ার আত-তিউনিসিয়া, আরবী সাপ্তাহিক; (২) আল-আখবার, আরবী সাপ্তাহিক; (৩) আল-বিলাদী, বিদেশে কর্মরত তিউনিসীয় শ্রমিকগণের জন্য রাজনৈতিক সাপ্তাহিক, আরবী পত্রিকা; (৪) আচ-চৌরৌক (সূর্যোদয়), সাপ্তাহিক, (৫) Dialogue, ফরাসী ভাষায় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা; (৬) ইরফানে, শিশুদের পত্রিকা, আরবী; (৭) Journal official de La Republique Tunisienne, সরকারী গেজেট, ১৮৬০ খৃ. হইতে প্রকাশিত, আরবী ও ফরাসী ভাষায়; (৮) Tunis Hebdo, ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত সাধারণ ও ক্রীড়া বিষয়ক পত্রিকা। দেশে সমাজকল্যাণ

ব্যবস্থা ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। বর্তমানে ৭০% লোক বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা লাভ করিয়া থাকে।

স্বাধীনতা লাভের পরে ১৯৫৯ খৃ. ১ জুন জাতীয় সংসদ প্রথম সংবিধান পাস করে। পরে ১২ জুলাই, ১৯৮৮ উহা সংশোধন করা হয়। জাতীয় সংসদ (Assemblee Nationale) সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী। প্রতি ৫ বৎসরে একবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন। সরকার প্রেসিডেনট পদ্ধতির, তিনি প্রধান মন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভা গঠন করেন। সংবিধান সংশোধনের পরে বর্তমানে প্রেসিডেন্ট ৪০-৭০ বৎসর বয়স্ক হইবেন। একবার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি পরে সর্বাধিক আরও দুইবার নির্বাচিত হইতে পারিবেন। দেশে ইসলামী দল ও কম্যুনিস্ট দলসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে। বর্তমানে ক্ষমতাসীন জনপ্রিয় দল হইতেছে Rassemblement Constitutionnel Democratique। তিউনিসিয়া আরব অর্থনৈতিক তহবিল (Arab Monetary Fund), আরব মাগরিব ইউনিয়ন (Union of Arab Maghrib), ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (O.I,C) এবং জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত দেশ। প্রতিরক্ষার জন্য স্থল-নৌ-বিমান বাহিনীর মোট সদস্যসংখ্যা ৩৮,০০০। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস হইতেছে স্বাধীনতা দিবস ২০ মার্চ, প্রজাতন্ত্র দিবস ২৫ জুলাই, নারী দিবস ১৩ আগস্ট, শহীদ দিবস ঈদুস-সাগীর ও ঈদুল-কাবীর। জাতীয় পতাকা ঃ লাল পশ্চাৎ পর্বের মাঝখানে একটি সাদা গোল, সাদাতে লাল আধো চাঁদ ও ৫টি লাল তারা।

ইতিহাস ঃ বর্তমান তিউনিসিয়াতে প্রাচীন ফিনিশীয় এবং পরে কার্থেজীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী হানিবল এইখানকারই সম্রাট ছিলেন। পরবর্তীতে সমগ্র এলাকাটি উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রোমক শক্তিকে পরাজিত করিয়াই আরবরা ইহা দখল করিয়া নেয় এবং ইহা বে-শাসিত একটি মুসলিম দেশে পরিণত হয়। তুর্কী শাসনাধীনে আসিবার পরেও বে করদরূপে শাসন করিতে থাকেন, শেষদিকে উছমানিয়া তুর্কী শাসন নামেমাত্রই ছিল। ১৮৮৩ খৃ. এইখানে ফরাসী শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বে-কে ভাতা ভোগকারী রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাখা হইলেও প্রকৃত ক্ষমতা ফরাসীদের হাতেই ছিল। এই সময়েই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে ফরাসী তথা য়ুরোপীয় প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

২শ০ শতকের ৩০-এর দশক হইতে জাতীয়তাবাদিগণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন। তাঁহাদের নেতৃত্ব দান করেন হাবীব বরগুইবা (আবূ রাকীবা)। ১৯৩৪ খৃ. তিনি Neo Destour পার্টি প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে থাকেন। (স্বাধীনতার পরে এই পার্টির নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় Party Socialiste Destourun (PSD)। ফ্রান্স সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ প্রথমে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। পরের বৎসর ২০ মার্চ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং মুসলিম বিশ্বে আর একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ৫ দিন পরে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হাবীব বরগুইবা দেশের প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৫৭ জুলাই মাসে সংসদ বিশেষ অধিবেশনে বে-কে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশ হইতে কয়েক শতাব্দীর প্রচলিত রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। তিউনিসিয়াকে প্রজাতন্ত্র (জামহূরিয়া -Republic) ঘোষণা করা হয়। হাবীব বরগুইবা হন প্রথম প্রেসিডেন্ট। ১৯৫৯ জুলাই দেশের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র পাস করা হয়; ১৯৬১ খৃ. তিউনিসীয় বাহিনী বিযারতা বন্দরে স্থাপিত ফরাসী নৌ-ঘাঁটি অবরোধ করিলে যুদ্ধ বাধে। ফ্রান্স ১৯৬৩ খৃ. মধ্যে ঘাঁটি তুলিয়া লইতে সম্মত হইলে যুদ্ধের অবসান ঘটে। ১৯৬৪ খৃ. দেশের সকল যমিন হইতে বিদেশীদের মালিকানা বিলুপ্ত করিয়া প্রকৃত তিউনিসীয় মালিকানাধীন করা হয়। সেই একই বৎসরে যৌথ খামার ব্যবস্থাও প্রচলনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহা জনগণের সমর্থন লাভ করে নাই। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ১৯৮১ খৃ. পর্যন্ত একদলীয় শাসনই প্রবর্তিত ছিল এবং PSD পার্টিই প্রকৃত শাসক পার্টিরূপে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। অতঃপর বহুদলীয় শাসন পদ্ধতি চালু হয়। ১৯৭৪ খৃ. নির্বাচনের পরে শাসনতন্ত্রের কিছুটা পরিবর্তন করিয়া হাবীব বরগুইবাকে আজীবন প্রেসিডেন্ট করা হয়। প্রধান মন্ত্রী হেদী নৌয়িরাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়। কিন্তু ১৯৮০ খৃ. নৌয়িরার স্থলে মুহাম্মাদ মাযালীকে প্রধান মন্ত্রী ও উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়। এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে গুরুতর রাজনৈতিক গোলযোগের সৃষ্টি হয়। প্রধান প্রধান বিরোধী দলরূপে আত্মপ্রকাশ করে Union Generale des Travailleurs Tunisiens (UGTT); Movement de la Tendence Islamique (MTI) ও Party Communiste Tunisien (PCT)। ১৯৮০-এর দশক ব্যাপিয়া রাজনৈতিক বিরোধিতা বৃদ্ধি পায় এবং গোলযোগ ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। ১৯৮৬ খৃ. বরগুইবা কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল) যায়নুল-আবিদীন ইবন আলীকে গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। সেই বৎসরই সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হইলে সকল বিরোধী দল তাহা বর্জন করে। ১৯৮৬-৭ খৃ. ব্যাপিয়া ইসলামী পার্টির প্রবল বিরোধিতা চলিতে থাকে। মার্চ ১৯৮৭ তিউনিসিয়া ইরানের সঙ্গে এই অভিযোগে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করে যে, ইরান মৌলবাদী ইসলামী দলকে উস্কানি দিয়া সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করিয়াছিল। সেইজন্য প্রধানত MTI-কে দোষারোপ করা হয়। এক পর্যায়ে একটি বোমা বিস্ফোরিত হইলে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়, ৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৬৯ জনের কারাদণ্ড হয়। তন্মধ্যে MTI নেতৃবৃন্দ ছিলেন। অকটোবর মাসে বরগুইবা প্রধান মন্ত্রী রাশীদ সফরকে বরখাস্ত করিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যায়নুল-আবিদীন ইবন আলীকে সেই পদে এবং PSD-এর সেক্রেটারী নিয়োগ করেন। বরগুইবা ইসলামী মৌলবাদী দলের ৯০ জন অভিযুক্ত ও ধৃত ব্যক্তিরই প্রাণদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলে উহা নিয়া ইবন আলীর সঙ্গে গুরুতর মতবিরোধ দেখা দেয়। বরগুইবা ১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬৪, ১৯৬৯ ও ১৯৭৫ খৃ. বরাবর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৭৫ খৃ. তাঁহাকে আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৭ খৃ. শেষদিকে তাঁহার অতি বার্ধক্য নিয়া প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। সাতজন ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া ঘোষণা করেন যে, বার্ধক্য ও অসুস্থতাহেতু তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে আর সক্ষম নহেন। অতঃপর শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রধান মন্ত্রী ইবন আলী প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি একটি নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করেন, ইসলামী MTI পার্টির ৬০৮ জনসহ ৮,০০০ রাজবন্দীকে মুক্তিদান করেন, RSD পার্টির নাম পরিবর্তন করিয়া রাখেন RCD (Rassemblement Constitionnel Democratique)। তিনি অনেক পার্টি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন। জুলাই ১৯৮৮ আজীবন প্রেসিডেন্ট পদ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং ব্যবস্থা করা হয় যে, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট পরে আর দুইবারের বেশি নির্বাচিত হইতে পারিবেন না এবং রাষ্ট্রপতি পদে থাকিবার সর্বোচ্চ বয়স হইবে ৭০ বৎসর। ২ এপ্রিল, ১৯৮৯ নির্বাচনে যায়নুল-আবিদীন ইবন আলী একক প্রার্থী হইয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন, RCD পার্টি জাতীয় সংসদের ১৪১টি আসনের সবগুলি লাভ করে। ইসলামী MTI নাম পরিবর্তন করিয়া করে হিজবুন-নাহদাহ (Parti de la Renaissance)। ইবন আলী সকলের

জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা এবং ইতিপূর্বে অধিকার বঞ্চিত কয়েক হাজার ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার ফিরাইয়া দিলে দেশে ছাত্র আন্দোলন এবং ইসলামী আল-নাহদাহ-এর বিরোধিতা অব্যাহত থাকে। কিন্তু তিনি আলজিরিয়ার সঙ্গে ২০ বৎসর স্থায়ী সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা করেন। ১৯৮৫ খৃ. লিবিয়া ৩০,০০০ তিউনিসীয় শ্রমিককে বহিষ্কার করিলে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ইবন আলী ১৯৮৮ খৃ. লিবিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসিয়া উহার মীমাংসা করিলে লিবিয়া-তিউনিসিয়া-আলজিরিয়া নিয়া বৃহত্তর আরব মাগরিব (Greater Arab Maghrib) প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। ১৯৮৯ ফেব্রুয়ারীতে আলজিরিয়া, লিবিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়া মিলিয়া পারস্পরিক উন্নতির জন্য মরক্কোতে একটি অধিবেশনে Union of Arab Maghrib গঠন করে। ইতিপূর্বে তিউনিসের নিকটে ফিলিসতীন মুক্তি সংস্থার (PLO) অস্থায়ী সদর দফতরে ইসরাঈল বিমান হামলা করিলে ৭২ জনের মৃত্যু হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তিউনিসিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে যুক্তরাষ্ট্র আর উহাতে জড়িত হয় নাই। সীমিত পরিমাণে হইলেও তিউনিসিয়া তৈলসমৃদ্ধ দেশ, অত্যাধুনিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই প্রাচীন মুসলিম রাষ্ট্রটি দ্রুত অগ্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

মৌলিক অংশের গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Europa year-Book 1990, vol. II, art. Tunisia, London, Europa Pub. 1990; (২) Whitaker's Almanack, 1980, art Tunisia, London 1979; (৩) Information Please almanac, 1989, 42nd ed., art. Tunisia, Boston, Houghton Mifflin co., 1989।

অনুবাদ অংশের গ্রন্থপঞ্জী ঃ মাতমাতার বার্বার কথ্য ভাষা ঃ (১) H. Stumme, Marchen der Berber von Tamezrat in Sud-Tunisien, লাইপযিগ ১৯০০ খৃ.; জেরবার কথ্য ভাষা (২) R. Basset in J. A., 1893 ও (৩) de Calassanti-Motylinski in J. A. 1898; সেনেদের কথ্য ভাষা (৪) Provotelle, Etude sur la Tomazir'i de Qalaat et Sened, প্যারিস ১৯১১ খৃ.। আরবী বিষয়ে (৫) H. Stumme, Tunisische Marchen u Gedichte, লাইপযিগ ১৮৯৩ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Tripolit-tunisische Beduinen-tieder, লাইপযিগ ১৮৯৪ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, New Tunisische Sammlungen, বার্লিন ১৮৯৬ খৃ.; (৮) ঐ লেখক, Grammatik des tunisischen Arabisch, লাইপযিগ ১৮৯৬ খৃ.; (৯) Th. Noldeke, in W. Z. K. M., 1894. p. 250-71; (১০) K. Narbeshuber, Aus dem Leben der Arab, Bevsikerung in Sfax. লাইপযিগ ১৯০৭ খৃ.; (১১) Sonneck, Chants arabes du Maghreb, প্যারিস ১৯০২-৭ খৃ.; (১২) W. Marcaie and A. Gulga, Textes arabes du Takrovna, প্যারিস ১৯২৫ খৃ.।

R. Brunschvig (E.I.[1])/হুমায়ুন খান

তিকরীত (দ্র. তাকরীত)

তিজানিয়্যা (تجانية) ঃ তিজ্জানী, তিজীনীরূপেও ব্যবহৃত। আবুল-আব্বাস আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনিল-মুখতার ইবন সালিম আত-তিজানী (১১৫০-১২৩০/১৭৩৭-১৮১৫) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি সূফী তারীকা (দ্র.)।

১। প্রতিষ্ঠাতার জীবনী ঃ এই ব্যক্তি লাগুআত-এর ৭২ কিলোমিটার পশ্চিমে তাহমুত-এর ২৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত আয়নুমাদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সীদী শায়খ মুহাম্মাদ পরিবারভুক্ত। তাঁহার পিতা-মাতা উভয়ে ১১৬৬/১৭৫৩ সালে প্লেগ রোগে ইনতিকাল করেন। জন্মস্থানে বিদ্যার্জনের পর তিনি উহা প্রসারিত করিবার জন্য ১১৭১/১৭৫৮ সালে ফেয-এ গমন করেন। তথা হইতে আবয়াদে, সেইখানে পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর ১১৮১/১৭৬৮ সালে তিনি তেলেমসেন-এ গমন করেন। সেইখান হইতে ১১৮৬/১৭৭৩ সালে তিনি মক্কা ও মদীনাতে, অতঃপর কায়রোতে উপনীত হন। এই সমস্ত স্থানে তিনি সূফী শায়খগণের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন এবং এই প্রক্রিয়ার শেষভাগে জনৈক মাহমূদ আল-কুরদীর পরামর্শক্রমে তিনি একটি নূতন তারীকা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্বে তিনি কাদিরিয়্যা, তায়বিয়্যা তারীকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। নিজস্ব তারীকাকে শেষোক্তটির একটি শাখা হিসাবে প্রচার করা হয়। অতঃপর তিনি মাগরিবে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ফেয ও তেলেমসেন পরিদর্শনের পর ১১৯৬/১৭৮২ সালে সাহারার অন্তর্গত বূ সেমগুন হইয়া আল-বায়্যিদ বা Geryville-এর দক্ষিণস্থ একটি মরূদ্যানে উপনীত হন। তাঁহার নিজস্ব বিশ্বাস যে, তথায় তাঁহার তারীকা চালাইয়া যাইবার জন্য তিনি মহানবী (স)-এর তরফ হইতে নির্দেশ লাভ করেন। একজন শাগরিদ আলী হারাযিম তাঁহাকে ফেয-এ প্রত্যাবর্তনের পরামর্শ দেন। ১২১৩/১৭৯৮ সালে তিনি সেইখানে গমন করেন [এই সময় মাওলায় সুলায়মান ফেযের সুলতান ছিলেন]। তাঁহাকে হাওশুল-মারায়াত রাজপ্রাসাদ প্রদান করা হয়। যদিও তাঁহার বাকি জীবনের অধিকাংশই তারীকার কাজে ভ্রমণে কাটাইতে হইয়াছে, তথাপি মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ফেযেই তাঁহার সদর দফতর অবস্থিত ছিল এবং মৃত্যুর পর ঐ শহরেই তাঁহার যাবিয়াতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

২। তারীকার মতবাদ ও কর্ম ঃ এই তারীকার সদস্যগণ আহবাব-বন্ধুবর্গ নামে অভিহিত, অন্য কোন তারীকায় তাহাদের যোগদান কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দিবসের কতিপয় নির্দিষ্ট সময়ে তাহাদের যিকির রহিয়াছে কতিপয় নির্দিষ্ট সূত্রাদি (كلمات) যাহা বারংবার উচ্চারিত হয় (সচরাচর একশত বার; এইগুলির অনুবাদ করিয়াছেন Depont et Coppolani, পৃ. ৪১৭)। তাহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ হইতেছে প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি আনুগত্য। এই কারণেই আলজিরিয়া ফরাসী কর্তৃক বিজিত হইবার পর হইতে ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত তাহাদের মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

৩। তারীকার ইতিহাস ঃ ১২৩০ হি. প্রতিষ্ঠাতার ইনতিকালে তাঁহার দুই পুত্র (মুহাম্মাদ আল-কাবীর ও মুহাম্মদ আস-সাগীর)-এর দায়িত্বভার জনৈক মাহমূদ ইবন আহমাদ আত-তুনিসীর উপর ন্যস্ত হয়। পরবর্তী অভিভাবক নিযুক্ত হন আলহাজ্জ আলী ইবন ঈসা যিনি তারীকার প্রতিষ্ঠাতা মনোনীত তেমাসিন-এ একটি তিজানী যাবিয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহাদিগকে আয়ন মাদীতে আনয়ন করেন। কারণ ইতিমধ্যে ফেযস্থিত তাঁহাদের পিতার প্রাসাদ তৎকালীন এক আমীর, য়াযীদ ইবন ইবরাহীম দখল করিয়া লইয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আলী ইবন ঈসা উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে আয়ন মাদীর দায়িত্বে নিযুক্ত করিয়া তেমাসিনে প্রত্যাবর্তন করেন। মনে হয় যে, প্রতিষ্ঠাতার জীবনকালেই এই তারীকাপন্থীদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়াছিল, যাহার ফলে তাজাজিনা নামে অভিহিত বিরুদ্ধবাদী দলটিকে 'আয়ন মাদী হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। ১২৩৫/১৮২০ সালে এই বহিষ্কৃত দল ওরানের শাসক হাসানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হাসান 'আয়ন মাদী অবরোধ করেন। কিন্তু একটি প্রচণ্ড আক্রমণ উদ্যোগের ব্যর্থতায় এবং প্রচুর অর্থ প্রাপ্তির বিনিময়ে তিনি ফিরিয়া যান। দুই বৎসর পর তিত্তেরীর শাসক স্থানটি আক্রমণ করেন। কিন্তু উহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অর্জিত এই সামরিক সাফল্য প্রতিষ্ঠাতার পুত্রদ্বয়কে মাসকারাস্থ (Mascara)

তুর্কগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য তাঁহারা ১৮২৬ খৃ. (১২৪১-১২৪২ হি.) ও ১৮২৭ খৃ. উভয় প্রচেষ্টাতেই ব্যর্থকাম হন এবং শেষোক্ত উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মাদ নিহত হন।

তেমাসিন-এ অবস্থানকারী সাদী 'আলী ইবন ঈসার নির্দেশক্রমে এক্ষণে 'আয়ন মাদীর একক দায়িত্বে নিয়োজিত কনিষ্ঠ মুহাম্মাদ তারীকার প্রচারাভিযানে অগ্রসর হন, বিশেষত সাহারা ও সূদানে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে দলের শক্তি ও সম্পদ যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও 'আলী কিম্বা মুহাম্মাদ কেহই কোন সামরিক আক্রমণে অগ্রসর হন নাই। সুতরাং আলজেরিয়ায় ফরাসী আক্রমণের পর দেরকাবী মুকাদ্দাম জিহাদের জন্য তিজানীগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

১৮৩৬ খৃ. (১২৫১-১২৫২ হি.) আমীর 'আবদুল-কাদির, ফরাসিগণকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে তিজানীগণের সহায়তা চাহিলে তিজানী প্রধান জানান যে, ধর্মীয় জীবনের প্রশান্তিতে বাস করাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য। দীর্ঘ ও নিষ্ফল পত্রালাপের পর ১৮৩৮ খৃ. (১২৫৪ হি.) আমীর সসৈন্যে 'আয়ন মাদীর প্রাচীর সম্মুখে হাযির হইয়া তিজানী প্রধানের আত্মসমর্পণ দাবি করেন। উহা প্রত্যাখ্যাত হইলে সৈন্য সংখ্যার অসমতা সত্ত্বেও তিজানী প্রধান আট মাস পর্যন্ত তাঁহার দখল বজায় রাখেন। ঐ সময় আমীর স্থানটি জয় করণার্থে বহু বিচিত্র কৌশল করা সত্ত্বেও তিজানী ও তাঁহার উপদেষ্টাগণের বিচক্ষণতার ফলে সমস্ত প্রচেষ্টা বিফল হয়। যখন তিজানী দেখিলেন যে, স্থানটি আর বেশি দিন রক্ষা করা সম্ভব নহে, তখন তিনি লাগূআতে আশ্রয় নেন। তাঁহাদের সুদীর্ঘ ও সফল প্রতিরোধের কারণে দলটির খ্যাতি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তী বর্ষে (১৮৪০ খৃ.) আমীর 'আবদুল-কাদির-এর বিরুদ্ধে ফরাসী মার্শাল Valee-কে নৈতিক ও বৈষয়িক সহযোগিতা প্রদান করেন। তেমাসিনে অবস্থানকারী আলী ইবন ঈসারও ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে যোগদানে অনীহা প্রকাশ করেন। ১৮৪৪ খৃ. তাঁহার ইনতিকালের পর দলটির নিয়ন্ত্রণভার প্রতিষ্ঠাতার জীবিত পুত্রের উপরে বর্তায়। তিনি ১৮৫৩ খৃ. ইনতিকাল করেন। তখন আলী ইবন ঈসার পৌত্র মুহাম্মাদ আল-আইদ পরবর্তী উত্তরসুরি নিযুক্ত হন।

তারীকার তৃতীয় প্রধানের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় আহমাদ ও আল-বাশীর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল। তাহাদের দায়িত্বভার বর্তায় জনৈক রায়্যান আল-মাশারী-র উপর, যিনি 'আয়ন মাদীর যাবিয়াকে তেমাসীন হইতে মুক্ত করার সংকল্প করেন। এই নীতি দুইটি যাবিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য ঘটায়, যদিও ইহার ফলে তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে বিভক্ত হন নাই। ১৮৬৯ খৃ. এইরূপ সন্দেহ করা হয় যে, তিজানী ভ্রাতৃদ্বয় ফরাসী কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত নন, এই সন্দেহে তাঁহাদিগকে গ্রেফতার পূর্বক আলজিয়ার্সে প্রেরণ করা হয়। যাহা হউক, তাঁহারা ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন এবং ইহার পর হইতে এই দলের প্রধানগণ তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া চলিতেন।

৪। তারীকার প্রচার ও প্রসার ঃ যদিও তারীকার প্রচারকগণ গৌরবোজ্জ্বল উন্নতির যুগে মিসর, আরব ও এশিয়ার অন্যান্য অংশে বহু অনুসারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ইহার মুখ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে ফরাসী আফ্রিকাতে। জনৈক মুহাম্মাদ আল-হাফিজ ইবন মুখতার ইবন হাবীব উরফে বাদদী, যিনি আনু. ১৭৮০ খৃ. ফেয-এ প্রতিষ্ঠাতার সহিত সাক্ষাত করেন, মরক্কোর সর্ব-দক্ষিণের সাহারিয়াগণের মধ্যে ইহা বিস্তারের নির্দেশ লাভ করেন। শিনকুয়েতি ও তিজিকজা হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি তিজানী তারীকার সর্বাপেক্ষা সক্রিয় প্রচারণা পরিচালনা করেন এবং ১৮৩০ খৃ. নাগাদ তাঁহার ইনতিকালের প্রাক্কালে তিনি সমগ্র ইদা ওউ 'আলী উপজাতিকে তিজানী তারীকাভুক্ত রাখিয়া যাইবার সন্তুষ্টি লাভ করেন (Paul Marty, M. M., ৩১ খ, পৃ. ২৩৯)। তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধীনে, যিনি ১৮০৭ খৃ. ইনতিকাল করেন, এই আনুগত্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই দলটি বিশ্বস্ততার সহিত হজ্জ প্রতিপালন করিত। তাঁহার সহিত প্রতিষ্ঠাতার সমাধি পরিদর্শনার্থে ফেয যাত্রার প্রথা সংযুক্ত হয় এবং সাধারণত ইহা মক্কা শরীফ পরিদর্শনের অগ্রেই সম্পাদিত হয়। জনৈক আলহাজ্জ উমার মক্কা হইতে দিনগুইরায় (Dinguiray) প্রত্যাবর্তনের পর ফরাসী গিনিতে এই তারীকা প্রচার করেন। ইহার ফলে শেষোক্ত শহরটি এতদঞ্চলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় শহরের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়; 'প্রায় সর্বত্রই তিজানী তারীকা কাদিরিয়্যা সিলসিলার স্থান গ্রহণ করে (ঐ, ৩৬ খ., পৃ. ২০২)।

৫। তারীকার সাহিত্য ঃ তাহাদের আকাইদ, সাধনা ও অনুশীলনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহটি জাওয়াহিরুল-মাআনী ওয়া বুলুগুল-আমানী ফী ফায়দিশ-শায়খিত-তিজানী নামে অভিহিত। ইহা আল-কুননাশ (কায়রো ১৩৪৫ হি.) নামেও পরিচিত। এই রচনাটি, যাহা প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক হারায়িমকে শ্রুতলিখন (dictation) হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া কথিত, তাঁহার জীবনীর মূল সূত্র; অন্যান্য রচনা Depont and Coppolani, পৃ. ৪১৮, n., ও Levi-Povencal, Les Historiens des Chorfa, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ৩৭৭-এ বর্ণিত হইয়াছে। আবুল-'আব্বাস আহমাদ ইবন আহমাদ আল-'আয়্যাশী সুকাইরীজ এই তারীকার বিখ্যাত সদস্যগণের চরিতাভিধান প্রণয়ন করেন, যাহা কাশফুল-হিজাব আন মান তালাকা মাআত-তিজানী মিনাল-আসহাব নামে পরিচিত (ফেয ১৩২৫ হি. এবং ১৩৩২ হি.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) = ১৮৬১ খৃ. ও ১৮৬৪ খৃ. = -এর নিবন্ধমালা); (২) = (৩) = (৪) = ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ৩১১-৩৭২; (৫) = -এ (উপরে বর্ণিত); (৬) = আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ.; (৭) মুহাম্মাদ বাশা ইব্নুল-আমীর 'আবদিল-কাদির, তুহফাতুয-যাইর, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯০৩ খৃ., ১খ, পৃ. ৮০, সম্পাদনা পরিষদ।

D. S. Margoliouth (E. I. [1])/মোঃ আবুল কালাম আজাদ

আত্-তিজানী (التجانى) ঃ তুনিস-এর একজন আরব গ্রন্থকার। তাঁহার জীবন সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানা যায় না। এমন কি সূত্রসমূহে তাঁহার নামটি পর্যন্ত এককরূপে প্রদত্ত হয় নাই। তাঁহার রিহ্লা (দ্র. নিম্নে উদ্ধৃত Rousseau ও Bel-এর রচনাবলী শীর্ষক পাণ্ডুলিপিসমূহে তিনি আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ নামে অভিহিত হইয়াছেন, অধিকন্তু একই নামে অভিহিত হইয়াছেন ইবনুল-খাতীব ইবন কুনফুয (G. A. L, ২খ, পৃ. ২৪১); আল-ফারিসিয়্যা ফী মাবাদিদ-দাওলাতিল-হাফসিয়্যা (Cherbonneau-তে, J. A., ৪খ, ১৭, ১৮৫১ খৃ., পৃ. ৫৩, অনু. পৃ. ৬৪-তে) শীর্ষক রচনাবলীতে। তাঁহার তুহ্ফাতুল আরূস ওয়া-নুযহাতুন-নুফূস-এর শিরোনাম পৃষ্ঠায় আমরা আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ নামটি দেখিতে পাই। হাজ্জী খালীফা, নং ২৬২৩-ও ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন এবং আয-যারকাশী, তা'রীখুদ-দাওলাতায়ন আল-মুওয়াহ্হিদিয়্যা ওয়াল-হাফসিয়্যা, তুনিস ১২৮৯ খৃ., পৃ. ৫১-এর ক্ষেত্রেও অদ্রূপ। ব্যতিক্রম শুধু এই যে, শেষোক্ত রচয়িতা তাঁহাকে ইবন ইবরাহীম নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিসবাটির প্রথম উচ্চার্য নাম বা শব্দের পরিমাণ সম্পর্কেও এতদসংক্রান্ত সূত্রাবলী বহুধাবিভক্ত। যে দুইটি বিদ্যমান রচনার কৃতিত্ব তিজানীর উপর আরোপিত হয়, উহাদের রচয়িতা একাধিক হইতে পারে না; দুইটি

পরিপ্রেক্ষিত দ্বারা উহা প্রশ্নাতীত করা হইয়াছে। প্রথম ক্ষেত্রে আয-যারকাশী, যিনি তুহ্ফা-তে পরিদৃষ্ট নামের ন্যায় সাদৃশ্যপূর্ণ নাম ব্যবহার করিয়াছেন এবং সমভাবে আল-খাতীব, যিনি রিহলার ধরন ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনাবলী আমাদিগকে উহাই নির্দেশ করে যাহা আমরা রিহলা হইতেও অবগত হইতে পারি। হাফ্সী আমীর আবূ য়াহ্য়া যাকারিয়্যা ইবন আবীল-'আব্বাস আহমাদ আল-লিহ্য়ানী (৭১১-৭১৭ হি./১৩১১-১৩১৭ খৃ.)-এর সহিত আত-তিজানীর লেন-দেন বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তুহ্ফা-তে উদ্ধৃত রচনাবলীর রচয়িতাগণ এমন একটি কালে উপনীত হন যাহা হইতে উহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সংশ্লিষ্ট লেখক অবশ্যই ৮ম (১৪শ) শতাব্দীর প্রথমাংশে লিখিয়া থাকিবেন।

তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আমরা ইহাই অবগত হইতে পারি যে, তিনি তাঁহার রাজকীয় প্রভুর সহিত উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যাহা তিনি রিহ্লাতে বর্ণনা করিয়াছেন। জুমাদা উলা, ৭০৬-এর শেষদিকে (ডিসেম্বর ১৩০৬-এর শুরুতে) তুনিসে ইহার সূত্রপাত হয় এবং তাঁহার সহযাত্রিগণ মক্কাতে হজ্জে গমন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মুহার্রাম ৭০৯-এর শুরুতে (জুন ১৩০৯) আত-তিজানীকে ক্যারাভান হইতে পৃথক হইয়া পড়িতে হয়। কারণ একটি অসুস্থতা তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করিয়াছিল। সর্বত্রই দীর্ঘ অবস্থান হেতু তাহারা ত্রিপোলিস অতিক্রম করিয়া বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই দীর্ঘ বিলম্বসমূহ ভ্রমণ-গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ইহার ফলে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসর দেশের যাহা কিছু চিত্তাকর্ষক, তাহার সমস্তই লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর হইয়াছিল। রিহলাটি এইভাবে সফরকৃত দেশসমূহের ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক ও বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্যাদির একটি নিয়মিত আকর হিসাবে পরিগণিত হয়। অনেক রচয়িতার গ্রন্থ হইতে ইহাতে উদ্ধৃতিও প্রদান করা হইয়াছে, যে সমস্ত রচয়িতার মূল রচনাবলী এক্ষণে অবশ্যই লুপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। গুরুত্বপূর্ণ দলীলাদির অনুলিপি হইতেও ইহাতে উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে। রাজপুত্র যখন আমীর হন, তখন আত্-তিজানী তাঁহার একজন উচ্চতর কর্মকর্তা হিসাবে পরিগণিত হন। তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত রহিয়াছে।

অদ্যাবধি রিহ্লার একটি পরিপূর্ণ সংস্করণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই; M. Amari, Biblioteca Arabo-sicula, ১৮৫৭ খৃ., অধ্যায় ৪৫-এ দীর্ঘ উদ্ধৃতিমালা প্রদান করা হইয়াছে। অনুবাদসহ একটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি প্রকাশিত হইয়াছে A. Bel, Les Benou Ghanya (Publications de L'Ecole des Letteres d'Alger, ২৭খ., ১৯০৩ খৃ.) নির্ঘণ্টে। A. Rousseau পরিপূর্ণ গ্রন্থখানি হইতে উদ্ধৃতিসমূহের একটি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, দ্র. J. A., ৪খ., ২০ (১৮৫২ খৃ.), পৃ. ৫৭ প.; ৫খ., (১৮৫৩ খৃ.), পৃ. ১০১ প., ৩৫৪ প.। ইহার চয়ন প্রক্রিয়া খামখেয়ালী, মূল পাঠের পুনর্গঠন ত্রুটিপূর্ণ এবং অনুবাদটি যথেষ্ট সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। ইব্ন খালদূন -এর ইবার-এ মূল পাঠের কতিপয় অনুচ্ছেদ পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

আত-তিজানীর অপর পুস্তকটি প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্তসার। ২৫টি অধ্যায়ে তিনি স্ত্রী নির্বাচন সম্পর্কে উপদেশ দান করিয়াছেন। ইহাতে রমণী দেহের বিভিন্ন অংশস্থিত সৌন্দর্য-চিহ্নের পর্যায়ক্রমিক ও অত্যন্ত পরিপূর্ণ বর্ণনা, উহাদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ভোগের মাত্রা বৃদ্ধির উপাচারসহ বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তিনি উপদেশ দান করিয়াছেন। শ্রুতি ও গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃতির আকারে মোটামুটি সময়ানুক্রম অনুসারে তিনি এই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। পরিশেষে ধর্মতত্ত্ববিদ ও ফকীহগণের বিশদ উদ্ধৃতিও প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে ফিক্হ-এর নির্দেশ অপেক্ষা নৈতিক উপদেশের উপরই অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে। Brocklemann. G. A. L., ২খ, পৃ. ২৫৭-তে পাণ্ডুলিপির তালিকা এবং বইটির মূল পাঠ প্রদান করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বরাতনিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে; (২) অধিকন্তু তু. M. Amari, Stori dei Musulmani di Sicilia, ১খ, ১৮৫৪ খৃ., P. L. ও A. Bel, পূ. গ্র.-তে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলী।

M. Plessner (E.I. [1])/মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তিজারা (تجارة) ঃ (আ) ব্যবসা-বাণিজ্য করা। تجر-يتجر- تجارة বাণিজ্য করা, تاجر বণিক, ব্যবসায়ী। আরবদের অনেক বাণিজ্যিক পরিভাষার ন্যায় তাজির শব্দটিও আরামীয় ভাষা হইতে আসিয়াছে। উক্ত শব্দটি আরবী ভাষায় জাহিলী যুগ হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। (تاجر) শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যুৎপত্তি জানিবার জন্য তা-জীম-রা (ر-ج-ت) এই ক্রিয়ামূল হইতে গঠিত শব্দাবলীর আরব ভাষায় ব্যবহার লক্ষণীয়ভাবে অল্প হইবার কথা বাদ দিলেও تاجر শব্দটি যে আরামীয় শব্দ উহা এই বিষয়টি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, تاجر শব্দের প্রাথমিক অর্থ ছিল মদ্য বিক্রেতা। প্রাচীনকালে আরামীয় বণিকগণ আরবদের সহিত যাহাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক কায়েম হইয়াছিল তাহারা নিশ্চিতরূপেই মদ্য-ব্যবসায়ী ছিল। আরবী ভাষা উক্ত শব্দকে আত্তীকরণের পর উহার অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয় এবং উহা যে কোনও পণ্যের ব্যবসায়ী অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। تاجر শব্দের বহুবচনের অনিয়মিত রূপও শব্দটির অনারবীয় হইবার প্রমাণ বহন করে। ইবনুল-আছীর তাঁহার আন্-নিহায়া গ্রন্থে তা-জীম-রা (ر-ج-ت) এই ক্রিয়ামূলের অধীনে تاجر শব্দের নিয়মিত বহুবচন تجار ও تجّار ব্যতীত تجر শব্দকেও উহার বহুবচনরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (তু. Fraenkel, Die Aramasichen Fremdworter im Arabischen, পৃ. ১৮১ প.; এতদ্ব্যতীত দ্র. দা. মা. ই., ৪খ, পৃ. ১০, টীকা ৫৮১)।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যিক ইতিহাস বর্ণনা করিবার স্থান নহে, বিশেষত এই কারণে যে, এতদ্বিষয়ক প্রাথমিক জরুরী গবেষণাকার্য এখন পর্যন্ত প্রায় না হইবার পর্যায়েই রহিয়াছে [তু. যেমন Mez, Die Renaissance des Islams, হাইডেলবার্গ ১৯২২ খৃ., পৃ. ১৪১ প., অনু. সালাহুদ-দীন খুদাবাখ্শ, পৃ. ৪৭০ প. (?)। সম্পাদনা পরিষদ, দা. মা. ই.]। এই নিবন্ধে আমরা ইসলামী তিজারাতের মূল প্রাণশক্তিকে এবং তিজারাতের নিয়ম-কানুনের বৈশিষ্ট্যাবলীও বর্ণনা করিতে চাহি না, বরং ইহাতে আমরা প্রধানত নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে আলোচনা করিতে চাই; (ক) ধর্ম হিসাবে ইসলাম তিজারাত বিষয়ে কিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছে? (খ) তিজারাত বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি পবিত্র হাদীছশাস্ত্রে কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে? (গ) নৈতিক চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে তিজারাত সম্বন্ধে কীরূপ চিন্তাধারা প্রকাশিত হইয়াছে? ফিক্হশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তিজারাতের সকল দিকের আলোচনা জানিবার জন্য বায় (بيع) নিবন্ধ তু.।

(ক) রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজেই প্রথমে একজন তাজির (ব্যবসায়ী) ছিলেন। তাই মদীনা মুনাওয়্যারার প্রজাতন্ত্রের নূতন পরিবেশে তিজারাতের প্রতি তাঁহার সহযোগিতা প্রদান একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কারণ উক্ত প্রজাতন্ত্রের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ তিজারাতের উপরই নির্ভরশীল ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মাক্কী যিন্দেগীর প্রাথমিক পর্যায়ে

নাযিলকৃত প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাসমূহের মধ্য হইতে অন্তত সূরা কুরায়শ (যাহা পবিত্র মক্কার প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ও ইসলামের মধ্যে সংঘাত শুরু হইবার অল্প কিছুকাল পূর্বে নাযিল হইয়াছিল)-এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে হইলে আরবদের, বিশেষত মক্কা মুকাররামার কুরায়শের তৎকালীন তিজারাত বা বাণিজ্যিক অবস্থার ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়াই উহা করিতে হইবে। সূরা কুরায়শে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কুরায়শের অন্তরে অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিবার কারণে, তাহাদের অন্তরে শীত ও গ্রীষ্মকালের সফরের প্রতি তাঁহার অনুরাগ সৃষ্টি করিয়া দিবার কারণে তাহারা যেন এই কা'বা গৃহের প্রতিপালক প্রভুর ইবাদত করে, যিনি তাহাদিগকে ক্ষুধায় অন্ন দান করেন এবং ভয়-ভীতি হইতে নিরাপত্তা দান করেন।"

তবে সেই যুগেও তিজারাতকে কলুষিত করিবার বিভিন্নরূপ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সতর্কীকরণ বাণী উচ্চারিত হইয়াছে এবং তিজারাত সুনীতি ও ন্যায়নিষ্ঠার ভিত্তিতে পরিচালিত হইবার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, দুর্ভোগ তাহাদের জন্য, যাহারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, যাহারা লোকদের নিকট হইতে যখন মাপিয়া গ্রহণ করে, তখন পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে; কিন্তু যখন তাহারা অন্যকে মাপিয়া দেয় অথবা তাহাদিগকে ওজন করিয়া দেয়, তখন কম দেয় (৮৩ ঃ ১-৩; এতদ্ব্যতীত তু. ৫৫ ঃ ৬-৮; মাক্কী যিন্দিগীর তৃতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ ৬ ঃ ১৫৩; ৭ ঃ ৮৩)। অতঃপর তিজারাত বিষয়ে অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা নিশ্চিতরূপে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী যিন্দিগীতে হইলেও উহার সাক্ষ্য কুরআন মাজীদ নাযিল হইবার শুধু মাদানী পর্যায়ে পাওয়া যায়। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি মুতাবিক তিজারাত নিষিদ্ধ না হইলেও উহা দ্বারা এই বিষয়টি স্পষ্ট জানা যায় যে, তিজারাতের মধ্যে এইরূপ কিছু বিষয় রহিয়াছে, যাহা মু'মিনদিগকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত তথা সালাত আদায় হইতে বিরত রাখিতে পারে। উক্ত বিষয়টি অত্যন্ত শক্তিশালী পন্থায় আসহাব-ই সুফ্ফা (মসজিদ-ই নাবাবী সংলগ্ন চত্বরে অবস্থানকারী ইসলাম নিবেদিত-প্রাণ সাহাবীগণ)-এর উল্লেখপূর্বক কুরআন মাজীদের ২৪ ঃ ৩৭ আলোচিত হইয়াছে। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তাহারা হইতেছে সেই সকল ব্যক্তি যাহাদিগকে তিজারাত ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে উদাসীন রাখে না এবং যাহারা সেই দিবসকে ভয় করিয়া থাকে, যেই দিবসে অন্তর ও চক্ষুসমূহ বিপর্যস্ত হইবে"।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হইত জানা যায় যে, তিজারাত ধর্মীয় জীবনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলিতে পারে এবং উক্তরূপ প্রভাব হইতে নিজেদের ধর্মীয় জীবনকে রক্ষা করা মু'মিনদের কর্তব্য। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির ধারাবাহিকতার পরিণতি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাদানী যিন্দিগীতে এইরূপ পরিলক্ষিত হয় যে, জুমুআ সালাতের ওয়াক্তে, যাহা শুধু ইবাদত ও মানবিক, তামাদ্দুনিক ও নৈতিক কর্তব্যাবলী বিষয়ে চিন্তা করিবার বিশেষ সময়, তিজারাতকে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখিতে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, "হে মু'মিনগণ! যখন জুমুআর দিনে সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা দ্রুত আল্লাহর যিকির-এর দিকে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখ। উহা তোমাদের জন্য মঙ্গলকর-যদি তোমরা জ্ঞানী হও। অতঃপর যখন সালাত আদায় সমাপ্ত হয়, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহর ফাদ্‌ল (রিযিক) তালাশ কর। আর তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। উহাতে আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হইবে। আর যখন তাহারা কোনও তিজারাত অথবা পার্থিব আনন্দ দর্শন করে তখন তাহারা তোমাকে সালাতে একাকী দণ্ডায়মান রাখিয়া দ্রুত সেই দিকে দৌড়াইয়া যায়। তুমি বল, আল্লাহ্‌র কাছে যাহা রহিয়াছে, তাহা পার্থিব আনন্দ ও তিজারাত অপেক্ষা শ্রেয়তর। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম রিযিকদাতা" (৬২ ঃ ৯-১১)।

পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাদানী যিন্দিগীর শেষ পর্যায়ে এমন কি হজ্জ পালনকালেও তিজারাত করিবার সুস্পষ্ট অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ, "তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ (রিযিক) তালাশ করা তোমাদের জন্য গুনাহের কাজ নহে" (২ ঃ ১৯৮)। কিন্তু এতদ্‌সহ আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, স্বগোত্রীয় লোকগণ, ধনসম্পদ ও তিজারাত-আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার পাইবার মত কোনও বস্তু নহে (৯ ঃ ২৪) (قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ...)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাদানী যিন্দিগীর শেষ পর্যায়ে আর্থিক লেন-দেনের চুক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার গুরুত্বপূর্ণ বিধানাবলী প্রদত্ত হইয়াছে (২ ঃ ২৮২)।

(খ) সামগ্রিকভাবে হাদীছ শারীফে তিজারাত বৈধ ও হালাল হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তবে তিজারাতে অসাধু পন্থা, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও বিশ্বাসভঙ্গ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। হাদীছ শারীফে বৈধ তিজারাতকে লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে এবং উহাকে পশু পালন ও হস্তশিল্প অপেক্ষা অধিক আয়ের কার্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (কানযুল-উম্মাল, ২খ, সংখ্যা ৪২১১, ৪২২৭ ও ৪৭৪৪)। বিশ্বস্ত সৎ ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখা হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ সৎ ও বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদগণের সহিত পুনরুত্থিত হইবে (ইবন মাজা, আত-তিজারাত, ১ পরিচ্ছেদ), উক্তরূপ ব্যবসায়ী জান্নাতে প্রবেশ করিবে পক্ষান্তরে অসাধু ও অসৎ ব্যবসায়ীর জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারিত হইবার কথা বর্ণিত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদিগকে পাপীদের সহিত উঠান হইবে। তবে যেই সকল ব্যবসায়ী আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে এবং যাহারা সৎ ও সত্যবাদী তাহাদিগকে নহে (ইবন মাজা, আত-তিজারাত, ৩ পরিচ্ছেদ)। অন্য এক হাদীছে উপরোক্ত বিষয়কে কঠোরতর ভাষায় নিন্দা করা হইয়াছে। অবশ্য উহা একটি খাব্‌রই ওয়াহিদ বটে (যে হাদীছের সনদের যে কোনও স্তরে অল্প সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকেন তাহাকে খাব্‌র-ই ওয়াহিদ বলা হয়)। একদা রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ব্যবসায়িগণ পাপী ও গুনাহগার। জনৈক সাহাবী আরয করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তা'আলা কি ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেন নাই? রাসূলুল্লাহ-(স) বলিলেনঃ নিশ্চয়ই তিনি উহাকে হালাল করিয়াছেন; কিন্তু তাহারা কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলে এবং তাহারা কসম করিয়া গুনাহ্-ই কামাই করে (আহমাদ ইবন হাম্বাল, ৩খ, ৪২৮ হাদীছ, তু. ৪৪৪ হাদীছ)। অন্যদিকে আমরা হাদীছ শারীফে ইহাও বর্ণিত পাই যে, বৈধ তিজারাত দ্বারা মুনাফা অর্জন করিয়া কেহ তাহার পরিবারবর্গকে ভরণ-পোষণ করিলে আল্লাহ তা'আলা উহার কারণে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন।

মুসনাদে যায়দ (র) গ্রন্থে হযরত আলী (রা) হইতে তাঁহার নিম্নোক্ত বাণী বর্ণিত রহিয়াছে ঃ হালাল রিযিক উপার্জন করা একটি জিহাদ। আর যদি তোমরা উক্ত উপার্জনকে তোমাদের পরিবারবর্গ ও নিকট আত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর, তবে উহা সাদাকা বলিয়া গণ্য হইবে। আর নিশ্চয়ই হালাল উপায়ে উপার্জিত এক দিরহাম অন্যরূপ উপায়ে উপার্জিত

দশ দির্‌হাম অপেক্ষা শ্রেয়তর (মাজ্‌মূউল-ফিক্‌হ, সম্পা. Griffini, ৫৩৯ হাদীছ, তু. ৫৪৪ হাদীছ; আল-মাজমূউল-ফিক্‌হী মানার কর্তৃক মুদ্রিত, মিসর, পৃ. ১০৩; দা. মা. ই.-এর টীকা, ৪খ, পৃ. ৫৮৩)। তিজারাতে এই বিষয়গুলি প্রশংসনীয় যে, তাজির উদারচেতা ও প্রতিপক্ষের মনস্তুষ্টি সাধনে যত্নবান হইবে এবং ওজনে ও মাপে কম দিবে না, বরং ক্রেতাকে কিছু বেশি দিবে (ইব্‌ন মাজা, পৃ. ১৬১, বাবুর রুজহানি ফিল-ওয়াযন, ১, ২ ও ৩ হাদীছ), বিশেষভাবে (দিনের প্রথমভাগ) তিজারাতের জন্য মুস্‌তাহাব ও লাভজনক সময়। পণ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ এবং প্রতারণা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ উহার ফলে তিজারাতের বরকত চলিয়া যায়। পণ্যে কোনও দোষ থাকিলে ক্রেতাকে তৎসম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত করা একান্ত দরকার। যদি কেহ দোষযুক্ত পণ্য উহার দোষ নির্দেশ ব্যতিরেকেই বিক্রয় করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতি সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহার জন্য বদদুআ করিতে থাকেন (ইবন মাজা, তিজারাত, ৪৫ পরিচ্ছেদ)। যদি কেহ উক্তরূপ গুনাহ করিয়া বসে তবে লব্ধ আয় সাদাকা প্রদানের মাধ্যমে উহার প্রায়শ্চিত্ত করা তাহার কর্তব্য। হাদীছ শারীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) পণ্যদ্রব্যে, বিশেষত খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশাইবার কঠোর নিন্দা করিয়াছেন (দ্র. কানযুল-উম্মাল, ২খ, ৪৩৭৫-৪৩৭৯ সংখ্যা, সম্পাদনা পরিষদ)।

তিজারাত ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে হওয়া জরুরী। পক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে কোনও পক্ষের প্রতিই বল প্রয়োগ কোনক্রমে সিদ্ধ নহে। ক্রয়-বিক্রয়ের কথা সম্পন্ন হইয়া যাইবার পর ক্রেতা বা বিক্রেতা শুধু তাহাদের পরস্পর হইতে পৃথক না হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উহা ভঙ্গ (ফিস্‌খ) করিতে পারে। উক্ত সময়ের মধ্যে যে কোনও পক্ষের এমন কি পরোক্ষ ইচ্ছায়ও ক্রয়-বিক্রয় প্রত্যাহৃত হইতে পারে (আহমাদ ইবন হাম্বাল, ২খ, পৃ. ৫৩৬)। [হানাফী মায্‌হাবমতে ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত বিষয়টি সম্পন্ন হইয়া যাইবার পর অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে প্রস্তাব ও সম্মতি (ইজাব ও কবুল) সম্পন্ন হইবার পর উহা এক পক্ষের ইচ্ছায় কোনক্রমে ফিস্‌খ বা ভঙ্গ হইতে পারে না। ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হইবার পর ক্রেতা-বিক্রেতা যত দীর্ঘক্ষণই এক স্থানে অবস্থান করুক না কেন, কোনও অবস্থায়ই উহা এক পক্ষের ইচ্ছায় প্রত্যাহৃত হইতে পারে না। অর্থাৎ হানাফী মাযহাবমতে ক্রয়-বিক্রয়ে খিয়ারে মাজলিস (ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসে উহা প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য উভয় পক্ষের অধিকার থাকিবার বিধান) নাই (হিদায়া, ৩খ, কিতাবুল-বুয়ূ', লাখনৌ, পৃ. ২৫)–সম্পাদনা পরিষদ]। বিক্রেয় পণ্য বিক্রয় স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে থাকা অবস্থায় উহার বিক্রয় একমাত্র তখনই বৈধ, যখন উহা ক্রেতার অধিকারে থাকে (উক্তরূপ বিধান সম্পর্কিত হাদীছে শুধু খাদ্যদ্রব্যেরই উল্লেখ রহিয়াছে; [ইমাম মালিক মুওআত্‌তা, মিসর ১৩৭০ হি., পৃ. ৬৫ ও ৬৭)। কিন্তু উক্ত হাদীছের বাখ্যাকারগণ বলেন যে, হাদীছে খাদ্যপণ্যকে উল্লেখ করা হইয়াছে শুধু উদাহরণ হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে অন্য একটি হাদীছে শুধু খাদ্যপণ্য নহে, বরং যে কোনও পণ্যই বিক্রেয় স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে থাকা অবস্থায় উপরোক্ত শর্তে বিক্রয় করা বৈধ হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে (আহমাদ ইবন হাম্বাল, ৩খ, পৃ. ৪০২; কানযুল উম্মাল, ২খ, পৃ. ২০৪, ৪৩৬৪ হাদীছ এবং ২খ, পৃ. ২১০, হাদীছ ৪৫৩৩ ও ৪৫৩৪)।

যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মতভেদের ক্ষেত্রে পক্ষদ্বয়ের কেহই স্বীয় দাবি প্রমাণ করিতে সক্ষম না হয়, তবে সেমতাবস্থায় হয় উক্ত ক্রয়-বিক্রয়কে শুদ্ধ বলিয়া রায় দেওয়া হইবে এবং বিক্রেতার কথাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে নতুবা উভয় পক্ষকে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করিতে হইবে (ইব্‌ন মাজা, পৃ. ১৫৯, বাবু আল-বায়'আনি য়াখতালিফান)। যদি একাধিক ব্যক্তি একই বস্তুর ক্রেতা হইবার দাবিদার হয় তবে যেই ব্যক্তি উহাকে প্রথমে ক্রয় করিয়াছে তাহাকেই উহার প্রকৃত ক্রেতা বলিয়া ধরা হইবে [মালিক, মুওআততা, (এবং সুয়ূতী রচিত বাখ্যাগ্রন্থ তানবীরুল-হাওয়ালিক, মিসর ১৩৭০ হি., ২খ., পৃ. ৭৯, বাবু বায়'ইল-খিয়ার; তু. কানযুল-উম্মাল, ২খ, পৃ. ২১০, ৪৫২১-৪৫২৩ হাদীছ, সম্পাদনা পরিষদ]।

বিক্রীত পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধের ওয়াদার ভিত্তিতে অথবা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে সাধারণভাবে হাদীছ শারীফে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই। উক্তরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা পণ্যের নির্ধারিত মূল্য নির্দিষ্ট দিনের পরে পরিশোধ করিলে বিক্রেতা তাহার নিকট হইতে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক অর্থ আদায় করিতে পারিবে না। ক্রেতা নির্ধারিত মূল্য নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে পরিশোধ করিলে সে বিক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম অর্থও প্রদান করিতে পারিবে না (মালিক, আল-বুয়ূ', ৮১ হাদীছ) [তু. মালিক, মুওআত্‌তা, ২খ, পৃ. ৮০]। বাকীতে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্যের মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উহার পরিবর্তে কোনও বস্তু বন্ধক রাখাও জাইয রহিয়াছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) একদা কোনও পণ্য খরীদ করিয়া উহার মূল্যের পরিবর্তে স্বীয় লৌহবর্ম বিক্রেতার নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন (ইবন মাজা, পৃ. ১৭৮, আবওয়াবুর-রুহূন, সম্পাদনা পরিষদ)।

বিক্রেয় পণ্যের মান উন্নত হওয়া ইত্যাদিকে প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রেতা কর্তৃক কসম (শপথ) করিবার বিষয়ে হাদীছ শারীফে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছে। যেমন একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে– কসম খাইবার ফলে পণ্য বিক্রয় হইয়া যায় বটে, কিন্তু উহার বরকত উঠিয়া যায় (সাহীহ বুখারী, বুয়ূ', ২৬ পরিচ্ছেদ)। [তু. ইবন মাজা পৃ. ১৬০। অন্য এক হাদীছ [বুখারী, ২খ, পৃ. ১৩] মুতাবিক কুরআন মাজীদের ৩ ঃ ৭১ আয়াতের শানে নুযূলও ছিল বিক্রেয় পণ্যের মান উন্নত হওয়া ইত্যাদিকে প্রমাণিত করিবার উদ্দেশ্যে কসম খাওয়া। অবশ্য পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কসম খাইবার সহিত উক্ত আয়াতের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। উক্ত আয়াতের মর্ম অন্যরূপ। উহা আলোচ্য কসম খাওয়া সম্বন্ধে নাযিল হয় নাই। উহার শানে নুযূল নিছক নৈতিক বিষয়। [পণ্য বিক্রয়ে কসম খাইবার সহিত উক্ত আয়াতের সম্পর্ক এইরূপে প্রমাণ করা যায় যে, উহাতে পরিষ্কাররূপে "আর তাহাদের কসমসমূহের বিনিময়ে (وايمانهم)" উল্লিখিত হইয়াছে। বলা অনাবশ্যক যে, এই স্থলে উল্লিখিত কসমসমূহ সকল ক্ষেত্রের কসমকেই বুঝাইতেছে]।

কতগুলি বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় হাদীছ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঃ (ক) এইরূপ বস্তু যাহার বিক্রেতা উহার প্রকৃত মালিক নহে (আহমাদ ইবন হাম্বাল, ২খ, পৃ. ১৮৯-১৯০; এতদ্ব্যতীত দ্র. কানযুল-উম্মাল, ২খ., পৃ. ২০৪, ৪৩৬৫ হাদীছ; ২খ, পৃ. ২০৩, ২ অনুচ্ছেদ)। (খ) হারাম অথবা অপবিত্র বস্তুসমূহ। যেমন মদ্য, শূকর, কুকুর, বিড়াল, মূর্তি, মৃতদেহ (মায়তা নিবন্ধ দ্র.); ইব্‌ন মাজা, পৃ. ১৫৭)। (গ) পানি। একটি হাদীছ মুতাবিক পানি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত তিনটি বস্তুর অন্যতম। উহার বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করা হারাম (ইবন মাজা, রুহূন, ১৬ পরিচ্ছেদ, বাব আল-মুসলিমূনা শুরাকাউ ফী ছালাছ)।

ক্রয়-বিক্রয়ে দর কষাকষি ও অযথা তর্ক-বিতর্ক হাদীছ শারীফে কঠোরভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। বাজার দর অপেক্ষা অধিক মূল্য দাবি

করাও কোন বিক্রেতার জন্য জাইয নহে (কানযুল-উম্মাল, ২খ, পৃ. ২০৪, ৪৩৫৭-৪৩৫৮ হাদীছ)। হাদীছ শারীফে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা (نجس)-ও নিষিদ্ধ হইয়াছে (ইবন মাজা, পৃ. ১৫৮; নাজাশ্ বা মুনাজাশা (مناجشة) -এর ব্যাখ্যার জন্য দ্র. ইবন মাজা, পূর্বোক্ত স্থা., ৫ টীকা। হাদীছ শারীফে মজুতদারী (احتكار) -ও নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। তু. Fraenkel, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮৯; ইবন মাজা, পৃ. ১৫৬, ১০ টীকা)। রাসূলে কারীম (স) বলিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য মজুত করে, সে গুনাহ্গার (আহমাদ ইবন হাম্বাল, ২খ, পৃ. ৩৫১; তু. ইবন মাজা, পৃ. ১৫৬, ১৫৭)। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যেই ব্যক্তি খাদ্যশস্য মজুদ করিয়া মুসলিম জনগণকে বঞ্চিত রাখিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে কুষ্ঠ ব্যাধি ও দারিদ্র্য দিয়া শাস্তি প্রদান করিবেন (ইবন মাজা আত-তিজারা, ৬ পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫৭)। রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলিয়াছেন ঃ মজুতদার ব্যক্তি অভিশপ্ত (পূ. গ্র., পৃ. ১৫৬)। অন্যান্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলে আকরাম (স) বলিয়াছেন ঃ মজুতদার ব্যক্তিকে দোযখের গভীরতম স্থানে নিক্ষেপ করা হইবে (আত-তায়ালিসী, পৃ. ১২৫, হাদীছ ৯২৮)। উক্তরূপ বর্ণনার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (স) দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন (ইবন মাজা, তিজারা)। কিন্তু সামগ্রিকভাবে হাদীছ শারীফে সকল প্রকারের মজুতদারিরই নিন্দা করা হইয়াছে।

খাদ্যশস্য বিনা মাপে বা বিনা ওজনে ক্রয়-বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (কানযুল-উম্মাল, ২খ, পৃ. ২০৮, হাদীছ ৪৪৮০-৪৪৮১; তু. পৃ. ২০২, হাদীছ ৪৩০৩, পৃ. ২০৪, হাদীছ ৪৩৫৬)। খাদ্যশস্যকে যে স্থানে ক্রয় করা হয়, উহাকে সেই স্থানেই বিক্রয় করিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ; কিন্তু যেই সকল বাজার ও গঞ্জ উক্ত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সকল বাজার হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া সেইখানেই উহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া জাইয। তবে তালাককী (تلقي) অর্থাৎ সস্তায় ক্রয় করিয়া অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অগ্রগামী হইয়া বাজারের বাহিরে আগন্তুক বণিকদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করাকেও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (ইবন মাজা, পৃ. ১৫৮, ছত্র ১৬; কানযুল উম্মাল, ২খ, হাদীছ ৪৩১৪; তু. হাদীছ ৪৩১৮)। গ্রাম হইতে অল্প মূল্যে পণ্য ক্রয় করিয়া আনিয়া উহা শহরে অধিক লাভে বিক্রয় করা শহরবাসীদের জন্য জাইয নহে (ইবন মাজা, পৃ. ১৫৮, ছত্র ১২ প.; এতদ্ব্যতীত দ্র. কানযুল-উম্মাল, ২খ, পৃ. ২০৬, হাদীছ ৪৪১৯-৪৪২৩)। এই কারণেই পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে দালালী করিবারও নিন্দা করা হইয়াছে (ইবন মাজা, পৃ. ১৫৮, ছত্র ১৬; বুখারী, ৬৮ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৮)।

হাদীছ শারীফে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত বিভিন্ন প্রকারের তিজারাত ও উহার বিভিন্ন রূপ নিয়ম-রীতি বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) একই চুক্তির অধীনে দুইটি ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদিত হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একই চুক্তির অধীনে কোনও পণ্যের একাংশ নগদ মূল্যে এবং অপরাংশ বাকি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয নহে (তু. আহমাদ ইবন হাম্বাল, ১খ, পৃ. ৩৯৮)।

(২) বায়উল-উরবান (بيع العربان) তু. ফ্রাঙ্কেল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯০) অর্থাৎ বায়না দিয়া কোনও পণ্য ক্রয় করা। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা যথাসময়ে পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিয়া বিক্রীত পণ্য গ্রহণ না করিলে শর্তানুযায়ী বিক্রেতা বায়নার অর্থের মালিক হইয়া যায়, ইহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (ইবন মাজা, পৃ. ১৫৯), কিন্তু ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের মতে বায়নার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয (তু. ইবনুল-আছীর, নিহায়া, মিসর ১৩১১ হি., ৩খ, পৃ. ৭৮)।

(৩) বায়উল-মুযায়াদা (بيع المزايدة) বা নিলামে ক্রয়-বিক্রয়। তিনটি অবস্থায় নিলামে ক্রয়-বিক্রয় জাইয ঃ (ক) চরম দারিদ্র্যের অবস্থায়, (খ) অসুস্থ অবস্থায় এবং (গ) অধিক পরিমাণে ঋণে জর্জরিত হওয়া অবস্থায়। [নিবন্ধকার উক্ত শর্তগুলি কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। তিনি তাঁহার উক্ত বক্তব্য কোথা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। ইবন মাজা, ১৫৯ পৃষ্ঠার শেষদিকে বর্ণিত একটি হাদীছে অবশ্য নীলামে ক্রয়-বিক্রয় জাইয হইবার জন্য নহে, বরং ভিক্ষা করা জাইয হইবার জন্য অনুরূপ তিনটি শর্তের যে কোনও একটি শর্ত বিদ্যমান থাকিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি উক্ত হাদীছের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই জনৈক আনসারী সাহাবীর জন্য নিলামে ক্রয়-বিক্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুত নিলামে ক্রয়-বিক্রয় কোনরূপ শর্ত ছাড়াই জাইয রহিয়াছে (ইবন মাজা, পূর্বোল্লিখিত হাদীছ; তু. হিদায়া, লাখনৌ ১৩১১ হি., ৩খ, পৃ. ৬৯ প., এবং পৃ. ৭০, ২ টীকা; কানযুল-উম্মাল, ২খ. পৃ. ২০৮-তে বর্ণিত ৪৪৭৩ ক্রমিক সংখ্যক হাদীছ ফকীহগণের নিকট গ্রহণীয় নহে। ইবন মাজা শারীফে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীছ ও মুসনাদ ইসহাক ইবন রাহ্ওয়ায়হ-তে বর্ণিত হাদীছ (হিদায়া, পূর্বোক্ত বরাত দ্র.) উহার তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। এতদ্ব্যতীত তু. বুখারী, লাইডেনে মুদ্রিত, দ্বিতীয় চতুর্থাংশ (২খ), ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, ৫৯ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৫]।

(৪) বায়উল-মুযাবানা (بيع المزابنة) [আল-মুযাবানা শব্দটিও সম্ভবত আরামীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে, তু. ফ্রাঙ্কেল, পৃ. ১৮৯] অর্থাৎ ওযন, পরিমাপ অথবা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট কোনও বস্তুর বিনিময়ে ওযন, পরিমাপ অথবা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট নহে—এইরূপ কোনও বস্তুকে শুধু অনুমানের ভিত্তিতে পরিমাপ করিয়া বিক্রয় করা। যেমন গাছে রহিয়াছে এইরূপ খেজুর (رطب) নির্দিষ্ট পরিমাপের পাকা খেজুরের (تمر) বিনিময়ে অথবা খাদ্যপণ্যের বীজ, যাহা এখনও পুষ্ট হয় নাই, নির্দিষ্ট পরিমাপের কোনও খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা। উক্তরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে অনির্দিষ্ট ও অনুমানভিত্তিক উপাদান বর্তমান থাকে। হাদীছ শারীফে উহা এই কারণে নাজাইয বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে যে, বিক্রেয় পণ্য, যাহা বৃক্ষ হইতে অথবা ক্ষেত হইতে এখনও সংগৃহীত হয় নাই এবং উহার ফলে যাহার পরিমাণ অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত রহিয়াছে, অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ কারণে উহার মূল্যের তুলনায় ক্রেতার নিকট কম বা বেশি আসিতে পারে (তু. আহমাদ ইবন হাম্বাল, ২খ., পৃ. ৬৫; বুখারী, লাইডেনে মুদ্রিত, ৮২ পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩২ প.; হিদায়া, ৩খ, পৃ. ৫৬, বায়উল-মুযাবানা)। বস্তুত শারীআতের উক্ত বিধানের উদ্দেশ্য হইতেছে ক্রেতাকে পণ্য প্রদান না করিয়াই তাহার নিকট হইতে বিক্রেতা কর্তৃক অসংগতভাবে অর্থ লাভ করিবার পথ বন্ধ করা। তবে একটি হাদীছ মুতাবিক এক প্রকারের বায়উল-মুযাবানা জাইয রহিয়াছে। এই প্রকারের বায়উল-মুযাবানার নাম বায়উল-আরায়া (بيع العرايا)। উক্ত বিধান মুতাবিক কোনও দরিদ্র ব্যক্তি, যাহার নিজস্ব কোন খেজুর বাগান নাই, স্বীয় পরিবারের সদস্যদের জন্য টাটকা ও নরম খেজুর সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে শুষ্ক খেজুরের বিনিময়ে এখনও গাছে রহিয়াছে এইরূপ টাটকা ও নরম খেজুর খরিদ করিতে পারে। তবে তজ্জন্য শর্ত এই যে, ক্রয়কালে উহার বাজারদর যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে (দ্র. নিহায়া, যা-বা-নূন-এই ক্রিয়ামূলের অধীনে)। একাধিক হাদীছ শাস্ত্রবিদের মতে আলোচ্য শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয় একমাত্র তখনই জাইয হইবে যখন ক্রীত পণ্যের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসক (এক ওয়াসক বা ষাট সা' (এক উটের

বোঝা) ছাড়াইয়া না যায়। অবশ্য হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল 'আস (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছ মুতাবিক রাসূলুল্লাহ (স) বিক্রেয় পণ্যের পরিমাণ পাঁচ ওয়াস্ক-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অবস্থায়ও আলোচ্য শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করিয়াছেন (আহমাদ ইবন হাম্বাল, ২খ, পৃ. ১৮৩; সাহীহ বুখারী, লাইডেন, সংখ্যা ৩৩, পরিচ্ছেদ ৮৩)। [আরবী বিশ্বকোষে এই স্থানে টীকায় লিখিত রহিয়াছে যে, উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা বায়উল-আরায়া নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয় না। মুসনাদ আহমাদে 'আমর ইবন শুআয়ব বর্ণনা করিয়াছেন স্বীয় পিতা হইতে, তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার পিতামহ হইতে, এই সনদে বর্ণিত হাদীছে বায়উল-'উরবান (بيع العربان) নিষিদ্ধ হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রণ বিভ্রাটের দরুন উহাতে বায়উ'ল-'উরবান স্থলে বায়উল-'আরিয়্যাত (بيع العريات) মুদ্রিত হইয়াছে। আর রক্ষ্যমাণ নিবন্ধের মূল লেখক العريات শব্দকে العرية শব্দের বহুবচনরূপে ধরিয়া লইয়া উহার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত হাদীছ العربان শব্দের সহিত মুওয়াত্তা মালিকে (২খ, পৃ. ৪৬)-এ বর্তমান রহিয়াছে। উর্দূ অনুবাদক]।

(৫) বায়উল-মু'আওয়ামা (بيع المعاومة) ঃ অগ্রিম মূল্যে খেজুর বৃক্ষের ভবিষ্যৎ দুই-তিন বৎসরের ফল খরিদ করা। উক্তরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রয়-বিক্রয়কালে বিক্রেয় পণ্যের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে না (ইবন মাজা, দিল্লী, বাবু বায়'ইছ-ছিমারি সিনীনা, পৃ. ১৬১)।

(৬) বায়উল-মুনাবাযা (بيع المنابذة) ঃ এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পণ্যের আদান-প্রদান হইয়া থাকে। উহাতে পণ্য-বিনিময়ের চুক্তি এইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে, যাহাতে উহা আর বাতিল করা যায় না; কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা তাহাদের বিক্রেয় পণ্য চুক্তি সম্পাদিত হইবার পূর্বে দেখিয়া বা যাচাই করিয়া লয় না। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের একটি রূপের নাম বায়উল-হাসাত (তু. হিদায়া, শেষ দুই খণ্ড, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, পৃ. ৫৬; ইবনুল-আছীর, নিহায়া, হাসাত শব্দের অধীনে দ্র.)। [১খ, পৃ. ২৩৫, উক্ত স্থানে আলোচ্য প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্নরূপ অবস্থার বিবরণ রহিয়াছে। আর উহা সকল অবস্থায়ই নাজাইয; কারণ উহাতে প্রতারণা রহিয়াছে (নিহায়া, পৃ. ১৪১, ক্রমিক সংখ্যা ১৮; ইবন মাজা, বাবুন-নাহয়ি আন বায়'ইল হাসাত, পৃ. ১৫৯)। বায়উল-হাসাত বায়উ ইলকাইল হাজার নামেও অভিহিত (তু. আহমাদ ইবন হাম্বাল, ৩খ, পৃ. ৫৯, ৬৮, ৭১)। উহাতে ক্রেতা কর্তৃক ক্রীত পণ্যের উপর এক খণ্ড প্রস্তর রাখিয়া দেওয়া অথবা ক্রীত পণ্যের বিনিময়ে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতার নিকট একখণ্ড প্রস্তর অর্পণ করা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হইবার চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয় (তু. মুতাররিযী, মুগরিব, নুন-বা-যাল এই ক্রিয়ামূল দ্র.)। [হিদায়া, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি; উহাতে ক্রীত পণ্যের উপর প্রস্তর নিক্ষেপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে]।

(৭) বায়উল-মুলামাসা (بيع الملامسة) ঃ এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়েও ক্রেতা পণ্য না দেখিয়াই ক্রয় করিয়া থাকে এবং ক্রয়ের পর ক্রেতা উহাকে আচ্ছাদিত অবস্থায় স্পর্শ করিলেই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হইল বলিয়া ধরা হয় (সাহীহ বুখারী, লাইডেন, ৬৩ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৬; তু. হিদায়া, পূর্বোক্ত বরাত দ্র.)।

(৮) বায়উল-গারার (بيع الغرر) ঃ হাদীছ শারীফে এই প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি উদাহরণ বর্ণিত হইয়াছে। যেমন এইরূপ দুধ, যাহা এখনও পশুর ওলানে রহিয়াছে, পলাতক দাস, গানীমাতের এইরূপ মাল-যাহাকে ভাগ করিয়া অন্যান্য মুজাহিদের প্রাপ্য অংশ হইতে এখনও পৃথক করা হয় নাই, এইরূপ মাছ যাহা এখনও নদীতে বা জলাশয়ে রহিয়াছে এবং অনুরূপ অনির্দিষ্ট পণ্যাদি (তু. যেমন আহমাদ ইবন হাম্বাল, ১খ, পৃ. ৩০২, ৩৮৮, ৩খ, পৃ. ৪২; ইবন মাজা, পৃ. ১৫৯; এতদসহ উক্ত পৃষ্ঠার ৫ টীকা)। আলোচ্য প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশেষ উদাহরণ, যাহা আরব দেশে অধিক প্রচলিত ছিল এবং যাহা জটিলও বটে, হইতেছে বায় হাবালিল-হাবালা অর্থাৎ গর্ভবর্তী উষ্ট্রী তথা উহার গর্ভস্থ ভ্রূণ ক্রয়-বিক্রয় করা। উক্ত ক্রয়-বিক্রয় একমাত্র তখনই আলোচ্য প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, যখন গর্ভবতী উষ্ট্রীটি যবেহ করিবার উদ্দেশ্যে খরিদ করা হয় এই লক্ষ্যে যে, উহা মাদী বাচ্চা প্রসব করিবে এবং সেই মাদী বাচ্চা বড় হইয়া আবার বাচ্চা দিবে (সাহীহ বুখারী, লাইডেন, ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়, ৬১ পরিচ্ছেদ, পৃ. ২৫)।

উপরোক্ত সকল প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় সাহীহ হাদীছ মুতাবিক নিষিদ্ধ। কারণ উহাতে এক অনিশ্চয়তার উপাদান বর্তমান রহিয়াছে। মুদ্রা বিনিময় (صرف-সারফ) সম্পর্কিত বিধান ও সূদ (ربا-রিবা) নিষিদ্ধ হইবার প্রমাণাদির জন্য দ্র. সারফ ও রিবা নিবন্ধদ্বয়। হাদীছশাস্ত্রের সকল গ্রন্থেই উপরোক্ত সকল প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্তী যুগে সংকলিত হাদীছ গ্রন্থসমূহে এতদসম্পর্কিত বিশদ বিবরণ রহিয়াছে (দ্র. কানযুল-উম্মাল; তু. Ritter, Published in Isl., ৭খ., ১৯১৭ খৃ., পৃ. ২৮; সেইখানে এতদসম্পর্কিত কতকগুলি হাদীছের অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে)।

(গ) ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে সংকলিত হাদীছ গ্রন্থাবলীতে ব্যবসায়ীকে ক্রেতার সহিত সম্মানজনক ও ন্যায়বিচারমূলক আচরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সে যেন গ্রাহকের সহিত ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করে এবং তাহার সহিত যেন কোনরূপ প্রতারণামূলক আচরণ না করে। এই কারণেই যেই সকল ক্রয়-বিক্রয়ে অনিশ্চয়তা ও ভাগ্য পরীক্ষার উপাদান রহিয়াছে, পবিত্র হাদীছ সেই সকল ক্রয়-বিক্রয়কে আপত্তিকর তথা নাজইয বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় পক্ষের কেহই যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তদুদ্দেশ্যেই হাদীছ শারীফে উক্ত বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। তিজারাতের ইসলামী নীতি-দর্শনের উক্ত মূলনীতিকে ইমাম আল-গাযালী, (মৃ. ৫০৫/১১১১) তাঁহার ইহ্য়া' উলূমিদ-দীন গ্রন্থে (কায়রো ১৩২৬ হি., ২খ, ৪৮ প.) বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত ইমাম আল-গাযালী (র) তিজারাতের ইসলামী মূলনীতিসমূহের বর্ণনায় অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিৎ পরকালের কথা স্মরণ রাখিয়া জীবিকা উপার্জন করা। তাঁহার মতে রিযিক কামাই করা পরকালীন সৌভাগ্য অর্জনের একটি উপায় বটে। দুনিয়া হইতেছে আখিরাতের কৃষিক্ষেত্র। এইখানে যাহা বপন করা হইবে আখিরাতে তাহাই কর্তন করা হইবে। তবে ইমাম আল-গাযালী (র) নিঃশর্তভাবে তিজারাতকে জীবিকা উপার্জনের অন্যান্য উপায় অপেক্ষা অধিকতর উত্তম উপায় বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলেন, যে তিজারাতের মাধ্যমে তাজির ব্যক্তি হয় অতি প্রয়োজনীয় জীবিকা তথা সুখের সন্ধান করে, আর না হয় উহা দ্বারা সে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করে। যে অর্থ-সম্পদ নেক কাজে ব্যয়িত হয় না, তিনি উহা উপার্জনের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মতে যদি কোনও তাজির ব্যক্তি তিজারাতের মাধ্যমে নিজের ও নিজের পরিবারের সদস্যদের জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জীবিকা উপার্জন করে, তবে তাহার উক্ত কার্য ভিক্ষা করা অপেক্ষা সর্বাবস্থায় উত্তম হইবে। তবে কতক শ্রেণীর লোকের জন্য, যেমন দাসগণ, উলামায়েকিরাম, সূফীগণ ও

সরকারী কর্মচারীগণের জন্য তিজারাতের ন্যায় কার্যাবলী হইতে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) তিজারাতের নৈতিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই স্থলে আমরা শুধু উহার সারসংক্ষেপই উপস্থাপিত করিতে পারি ঃ

এইরূপ অসম্ভব নহে যে, নির্দিষ্ট কোনও তিজারাত বৈধ তিজারাতের নিয়ম-কানুনসম্মত হইবে এবং উহা নিন্দনীয়ও হইবে না; কিন্তু এতদসত্ত্বেও উহা নৈতিকতা বিরোধী ও অপরের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। কারণ নিষেধাজ্ঞামাত্রই যে ক্রয়-বিক্রয়মূলক চুক্তি সম্পাদনকে নাজাইয বানাইয়া দেয়, তাহা নহে।

অতঃপর ইমাম গাযালী দুই প্রকারের তিজারাতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (ক) এইরূপ তিজারাত, যদ্দরুন সমগ্র সমাজ (Community) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং (খ) এইরূপ তিজারাত, যদ্দরুন শুধু তিজারাতকারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খাদ্যদ্রব্য, বিশেষত, খাদ্যশস্য গোলাজাত করিয়া রাখা এবং অচল মুদ্রা চালান প্রথমোক্ত প্রকারের তিজারাতের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। অচল মুদ্রার বেলায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা দোকানদারের কর্তব্য ঃ (ক) কাহারও হাতে অচল মুদ্রা আসিলে উহাকে কূপে নিক্ষেপ করা উচিৎ; (খ) অচল মুদ্রা চিনিবার জন্য দেশে প্রচলিত আসল মুদ্রা ভালরূপে চেনা জরুরী; (গ) যদি কোনও ব্যক্তি কাহারও সম্মতিতে তাহাকে জাল মুদ্রা অর্পণ করে, তথাপি সে নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণিত হইবে না। কারণ জাল মুদ্রার গ্রহীতা উহাকে অন্যের নিকট চালাইা দিতে পারে; (ঘ) যদি কোনও ব্যক্তি কাহারও মনস্তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত তাহার নিকট হইতে জাল মুদ্রা গ্রহণ করে তবে নেক নিয়্যাতের কারণে তিজারাতে যে বরকত নাযিল হইয়া থাকে সেই ব্যক্তি একমাত্র তখনই সেই বরকতের অংশীদার হইবে, যখন জাল মুদ্রা গ্রহণের পশ্চাতে তাহার নিয়াত হইতে উহাকে কূপে নিক্ষেপ করা।

অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) যে তিজারাত শুধু তিজারাতকারী ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর হইয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নেক তিজারাতের সর্বপ্রধান মূলনীতি এই যে, একজন মুসলিম তাহার মুসলিম ভ্রাতার প্রতি সেরূপ আচরণ করাই পসন্দ করিবে, যেইরূপ আচরণ সে নিজের জন্য পসন্দ করিয়া থাকে। এই কারণেই তিজারাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে মানিয়া চলা তিজারাতকারীর জন্য জরুরী ঃ

(১) স্বীয় পণ্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করা অথবা উহার উন্নত মান ও গুণসমূহের প্রচারের উদ্দেশ্যে কসম খাওয়া বিক্রেতার পক্ষে উচিত নহে, বরং পণ্যের মধ্যে যেই সকল গুণ প্রকৃতই বর্তমান রহিয়াছে অথচ পণ্যের ব্যবহারের পূর্বে উহার সেই সকল গুণের কথা ক্রেতার পক্ষে জানা সম্ভব নহে, একমাত্র সেই সকল গুণই বর্ণনা করা বিক্রেতার কর্তব্য।

(২) স্বীয় পণ্যের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি ক্রেতার নিকট প্রকাশ করা বিক্রেতার কর্তব্য। বিক্রেতা যেন তাহার পণ্যের শুধু গুণাবলীই বর্ণনা না করে এবং সে যেন অন্ধকার কক্ষে পণ্য ক্রেতাকে না দেখায়, ইত্যাদি। কারণ পণ্যের শুধু গুণাবলী বর্ণনা করা অথবা অন্ধকার কক্ষে উহা ক্রেতাকে প্রদর্শন করা তাহার প্রতি প্রতারণা করিবারই নামান্তর। ক্রেতা তাহার নিকট হইতে যেই সদাচরণ প্রত্যাশা করিতে পারে উহা সেই সততার পরিপন্থী। দুইটি কথা স্মরণ রাখা তিজারাতকারীর জন্য অত্যন্ত জরুরী ঃ (ক) বিক্রেতা তাহার পণ্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখিয়া উহা বিক্রয় করিতে সক্ষম হইলেও উহার ফলে সে তিজারাতের বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। (খ) এই দুনিয়া ধন-সম্পদের লাভ ও উপকারিতাসমূহ মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হইয়া যায়; কিন্তু তিজারাতকারী তাহার তিজারাতে যে অন্যায়, অবিচার ও গুনাহ্ কামাই করে, উহা শেষ না হইয়া বরং তাহার আখিরাতের আযাবের কারণ হিসাবে রহিয়া যায়।

(৩) তিজারাতকারীর উচিৎ যে, সে বিক্রীত পণ্য ন্যায়পরায়ণতা সহকারে পূর্ণ পরিমাণে মাপিয়া বা ওযন করিয়া দিবে।

(৪) বিক্রেতার কর্তব্য, সে যেই দিন যেই বাজারে যেই পণ্য বিক্রয় করিবে সেই দিন সেই পণ্যের যে বাজারদর রহিয়াছে তাহা ক্রেতাকে অবহিত করা।

অতঃপর ইমাম আল-গাযালী (র) তিজারাতে অতি সাধারণ সৌজন্য ও উদারতা প্রদর্শনের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, ক্রেতা-বিক্রেতার উচিত পরস্পরের প্রতি এইরূপ সৌজন্য ও উদারতা প্রদর্শন করা, সচরাচর যেইরূপ আচরণ করিতে তাহারা বাধ্য নহে, যথাঃ (ক) বিক্রেতার ক্রেতার নিকট হইতে পণ্যের বাজার দর অপেক্ষা অধিকতর মূল্য গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন। (খ) বিক্রেতা দরিদ্র হইলে ক্রেতা স্বেচ্ছায় তাহাকে পণ্যের বাজারদর অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান সম্মত হইবে। (গ) বিক্রীত পণ্যের বাকি মূল্য উসূল করিবার ক্ষেত্রে বিক্রেতা উহার অংশবিশেষ মওকুফ করিয়া দিবে অথবা সে ক্রেতার সুবিধার জন্য উহা পরিশোধ করিবার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া দিবে। (ঘ) ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতার কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য নিজেই তাহার নিকট উপস্থাপন করিবে। (ঙ) ক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর ক্রেতার অনুরোধে বিক্রেতা উহা রহিত করিয়া দিবে। (চ) ধনী ব্যক্তি দরিদ্রদের নিকট বাকীতে পণ্য বিক্রয় করিবে এবং ক্রেতা যত দিন উহার মূল্য পরিশোধ করিবার সঙ্গতি লাভ না করে, সে ততদিন পর্যন্ত উহা তাহার নিকট চাহিবে না অথবা সে উক্ত বাকী মূল্যের হিসাব তাহার হিসাব বহিতে না লিখিয়া বরং উহার পরিশোধের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ক্রেতার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিবে।

সওদাগরের কর্তব্য এই যে, সে তিজারাতের মুনাফার পশ্চাতে পড়িয়া আখিরাতে নাজাত প্রাপ্তির প্রচেষ্টাকে যেন ভুলিয়া না যায়। এইজন্য তাহার নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মানিয়া চলা উচিৎ ঃ (ক) সে নেক নিয়াতসহকারে তিজারাতের কার্য আরম্ভ করিবে। (খ) সে তিজারাতকে ফরযে কিফায়া বা সমাজের সকলের পক্ষে সম্পাদিত আবশ্যিক কর্তব্য বলিয়া বিবেচনাপূর্বক উহা গ্রহণ করিবে। কারণ তিজারাত প্রকৃতপক্ষে সমাজের জটিল সামাজিক শৃংখলার একটি অংশ বৈ কিছু নহে। (গ) পার্থিব বাজার যেন তাহাকে আখিরাতের বাজার হইতে উদাসীন করিয়া না দেয় অর্থাৎ তাজির ব্যক্তি যেন মসজিদে যাওয়া ও সালাত আদায় করা বন্ধ করিয়া না দেয়। (ঘ) বাজারে প্রবেশ করিবার কালে এবং যতক্ষণ সে তথায় অবস্থান করে, ততক্ষণ যেন অধিকাংশ সময়ে আল্লাহ তা'আলার কথা চিন্তা করে। (ঙ) তিজারাত করিতে গিয়া যেন সে বাজার ও তিজারাতের ধান্ধায় পড়িয়া অন্য সকল কর্তব্য ভুলিয়া না যায়। এইরূপ যেন না ঘটে যে, সে সকলের পূর্বে বাজারে প্রবেশ করে এবং সকলের শেষে বাজার হইতে বাহির হয় (ইহ্য়া' উলূম, কায়রো, ২খ, পৃ. ৫৭)। (চ) তিজারত সে যেন শুধু হারাম কার্যাবলী হইতেই দূরে না থাকে, বরং এতদসহ সন্দেহপূর্ণ কার্যাবলী হইতেও যেন দূরে থাকে। সে যে পণ্য খরিদ করিতে চাহে, উহা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং বিক্রেতা উহা কী উপায়ে লাভ করিয়াছে, ক্রেতা যেন উহার সন্ধান লয়। যাহারা জুলুম, খিয়ানত, চুরি ও রিয়াকারীর জন্য কুখ্যাত রহিয়াছে, সে যেন তাহাদের সহিত কারবার না করে। (ছ) তিজারাতে তাজির যেন কথায়

ও কাজে অন্যায় বিষয়াদি হইতে সতর্ক থাকে। কারণ কিয়ামতের দিন তাহাকে তাহার কথা ও কার্যাবলীর হিসাব দিতে হইবে।

ইমাম আল-গাযালী (র)-এর মতে সওদাগরের সওদাগরীর বাজার তাহার জন্য জিহাদের ময়দান। উক্ত জিহাদের ময়দানে সে তাহার সমব্যবসায়ীদের সহিত কারবার করিবার কালে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। তিজারাত যেহেতু আখিরাতের প্রাথমিক মনযিল, যেইখানে সে আখিরাতের জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া থাকে, তাই আল-গাযালী (র) এইরূপ বৈরাগ্যসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিকে বাতিল বলিয়া রদ করিয়া দেন যে, সাধারণ মানুষ যেন দুনিয়ার কাজ-কারবার ছাড়িয়া না দেয়। তিনি উহাকে জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সাহিত্য ও নৈতিক চরিত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে সাধারণত ইমাম আল-গাযালী (র)-র উপরোক্ত চিন্তাধারার অনুরূপ চিন্তাধারা বর্ণিত দেখা যায়। অবশ্য উক্ত চিন্তাধারা সর্বক্ষেত্রে ইমাম আল-গাযালী (র) উচ্চ স্তরের চিন্তাধারার সমকক্ষ হইবার দাবি করিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ তাবাকাতুশ-শাফিইয়্যা গ্রন্থের লেখক তাজুদ-দীন আস-সুব্কী (মৃ. ৭৭১/১৩৭০ সন) তাঁহার মু'ঈদু'ন-নি'আম গ্রন্থের কয়েক স্থানে সওদাগরের বিভিন্নরূপ অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁহার উক্ত আলোচনায় স্বীয় যুগেরই ব্যবসায়িক অবস্থাবলী ও উহার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রূপ-প্রকৃতিকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়াছেন। যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, যেই সকল ব্যক্তি দীনী কিতাবাদি লিখিবার উদ্দেশ্যে কাগজ খরিদ করেন বলিয়া কাগজের ব্যবসায়ী অবগত থাকে, সে যেন কাগজ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। পক্ষান্তরে যেই সকল লোক ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাস সম্বলিত গ্রন্থাবলী অথবা জাল দলীল ইত্যাদি অবৈধ ও অন্যায় দস্তাবীযসমূহ লিখিবার উদ্দেশ্যে কাগজ খরিদ করে বলিয়া তাহার সন্দেহ হয়, সে যেন তাহাদের নিকট উহা বিক্রয় না করে (মু'ঈদু'ন-নি'আম, সম্পা. Myhrmann, লণ্ডন ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১৮৮, অনু. Rescher, ইস্তাম্বুল ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১৩৮)। দীনী কিতাবাদি খরিদ করিয়া যাহারা উহা বিনষ্ট করিয়া দিবে অথবা উহার বিরূপ সমালোচনা করিবে বলিয়া পুস্তক বিক্রেতা অবগত থাকে, সে যেন তাহাদের নিকট উহা বিক্রয় না করে। এতদ্ব্যতীত ভ্রান্ত 'আকীদা-বিশ্বাসসম্বলিত পুস্তকাদি বিক্রয় করাও তাহাদের জন্য উচিত নহে। এইরূপে গণক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদগণের রচনাবলী এবং মিথ্যা কাহিনীর বর্ণনায় রচিত গ্রন্থাবলী, যেমন, ভূত-প্রেত (?) ইত্যাদির কাহিনী ও জীবন-বৃত্তান্তের বর্ণনায় রচিত গ্রন্থাবলী বিক্রয় করাও তাহার জন্য উচিত নহে। অসৎ উদ্দেশ্যে ক্রয়কারী কাফিরদের নিকট কুরআন মাজীদ, পবিত্র হাদীছ গ্রন্থ এবং ফিকহশাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী বিক্রয় করাও তাহার জন্য উচিত নহে (মু'ঈদুন নি'আম, পৃ. ২০৪)। আদ-দাল্লালূন (الدلالون-দালাল) সম্বন্ধে দ্র. আশ-শাফিঈ, কিতাবুল-উম্ম, ৪খ, পৃ. ১৩২; Heffening, Frendenrecht, পৃ. ৪৯, টীকা ৫, hanaf Werke শব্দের পূর্বে অবস্থিত keine শব্দকে বাদ দিতে হইবে। এইরূপে ভূসম্পত্তি ইত্যাদি বিক্রয়ের কার্যে নিয়োজিত দালালকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, সে যেন ওয়াক্ফকৃত কোনও ভূমি ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া না দেয় (মু'ঈদু'ন-নি'আম, পৃ. ২০৫, অনু. Rescher, পৃ. ১৫০ প.)।

(ঘ) ইমাম আল-গাযালী (র) ও তাজুদ-দীন আস-সুব্কীর গ্রন্থাবলীর বিপরীতে অন্য একটি গ্রন্থ রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থখানা পাশ্চাত্য পণ্ডিত Ritter কর্তৃক অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তিজারাতের ক্ষেত্রে অধিক স্বার্থপরতামূলক নৈতিক ভাবধারার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। গ্রন্থখানার নাম কিতাবুল-ইশারাতি ইলা মাহাসিনিত-তিজারত। উহা ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ/১১শ অথবা ১২শ শতকে আবুল-ফাদল জা'ফার ইব্ন 'আলী আদ-দিমাশ্কী নামক জনৈক লেখক কর্তৃক রচিত। গ্রন্থখানা দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তাজির বা সওদাগর সম্বন্ধে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার বিক্রেয় পণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যবসায়িক পণ্য বিষয়ে আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। উহাদের কতকগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে এবং কতকগুলি বিখ্যাত ইসলামী বিশ্বকোষের অংশরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বিষয়ক তথ্যাবলীর জন্য Ritter কর্তৃক অনূদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃ. ১৭ প. দ্র। এই স্থলে আমরা পূর্বোক্ত গ্রন্থের শুধু তাজির বিষয়ক অংশের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

তাজিরগণের বিখ্যাত শ্রেণীসমূহ হইতেছে ঃ (১) পাইকারী বিক্রেতা তাজির ঃ এই শ্রেণীর তাজির সর্বাধিক সুবিধাজনক অবস্থায় অর্থাৎ পণ্যের মূল্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকা অবস্থায় ব্যবসায়িক পণ্য খরিদ করিতে চেষ্টা করে। তাহার উদ্দেশ্য থাকে পণ্যের অভাব দেখা দিলে এবং উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সে উহা বিক্রয় করিয়া দিবে। যাহাতে পণ্য ক্রয়ের সর্বাধিক অনুকূল ও সুবিধাজনক সময়টি তাহার হাতছাড়া হইয়া না যায়, তদুদ্দেশ্যে তাহাকে পণ্যের উৎপাদন অঞ্চলের বাজারসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে এবং উহাদের সহিত যোগাযোগের রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সঠিকরূপে অবগত থাকিতে হয়। যাহারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে একত্রে বিপুল পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে তাহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন তাহাদের ক্রয়ক্রিয়া প্রতি পনের দিনে এক কিস্তি করিয়া মোট চারি কিস্তিতে সমাপ্ত করে। এইরূপ করিলে পণ্যমূল্যের আকস্মিক পরিবর্তন অথবা অনুরূপ অন্য কোনও অপ্রত্যাশিত প্রতিকূল অবস্থার কারণে তাহাদিগকে লোকসান দিতে হইবে না। পাইকারী ব্যবসায়ীকে দেশের সরকারের অবস্থা সম্বন্ধেও অর্থাৎ সরকার ন্যায়বিচারক ও শক্তিশালী অথবা ন্যায়বিচারক অথচ দুর্বল অথবা জালিম ও অত্যাচারী, তৎসম্বন্ধেও সম্যকরূপে অবগত থাকিতে ও তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়।

(২) বিভিন্ন স্থানে গিয়া পণ্য বিক্রয়কারী তাজির ঃ এই শ্রেণীর তাজির কিরূপ পণ্য খরিদ করিবে, তাহা তাহাকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া নির্ধারিত করিতে হয়। ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয়ে তাহাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কারণ তাহার বাণিজ্যিক ভ্রমণ দীর্ঘ হইতে পারে অথবা সে কোনও অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পণ্য বিক্রয়ে গমনকালে সে পথিমধ্যে এইরূপ কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, যদ্দরুন তাহাকে উদ্দিষ্ট বিক্রয়-বন্দরে পণ্য বিক্রয় না করিয়া বরং উহা সেই স্থানে বিক্রয় করিতে হইতে পারে, যে স্থান হইতে সে উহা ক্রয় করিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহাকে অনেক লোকসানও দিতে হইতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে যে মূল্যে সে তাহার ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবে, তৎসম্বন্ধেও তাহাকে অবহিত থাকিতে হইবে। এইরূপে পৌর কর, বিক্রয় কর ইত্যাদি বিভিন্নরূপ প্রচলিত শুল্ক ও কর সম্বন্ধেও তাহাকে বিস্তারিত জ্ঞান রাখিতে হইবে। এতদসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয়ের পূর্বেই যেন তাহার লাভের অর্থ অন্য অঞ্চল অথবা অন্য দেশের হাতে চলিয়া না যায়। তাহাকে পণ্য বিক্রয়ের জন্য উদ্দিষ্ট স্থানে একজন বিক্রয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে এবং সেইখানে পণ্য রাখিবার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক কুঠির বন্দোবস্ত করিতে হয়।

(৩) দূর অঞ্চলে অথবা বিদেশে পণ্য রফতানিকারক তাজির ঃ এইরূপ তাজিরকে তাহার তিজারাতে আড়তের সাহায্য লইতে হয়। যেই

স্থানে সে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়িক পণ্য প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক সেই স্থানে নিজের বিশ্বস্ত কোনও বিক্রয়-প্রতিনিধি নিযুক্ত করা তাহার কর্তব্য। বিক্রেয় পণ্যকে কোনও বিশ্বস্ত ও সতর্ক ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত বিক্রয়-প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করা তাহার কর্তব্য। উক্ত বিক্রয়-প্রতিনিধি তাহার নিকট প্রেরিত পণ্য বিক্রয় করিতে থাকিবে এবং তদস্থলে নূতন করিয়া সংগৃহীত পণ্য তাহার নিকট আসিতে থাকিবে। উক্ত বিক্রয়-প্রতিনিধি পণ্য প্রেরণকারী তাজিবের সহিত তাহার তিজারাতে উহার লাভের অংশীদার হইয়া থাকে।

সওদাগর ও তাজিরদিগকে আরও বিভিন্নরূপে উপদেশ প্রদান এবং ঠগ ও প্রতারকদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকিবার পরামর্শ প্রদানের পর আদ-দিমাশ্‌কী তাঁহার গ্রন্থে বিভিন্নরূপে অর্থনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধেও যেমন ঃ বাজারে বর্তমান দ্রব্যমূল্যের নির্ধারণ এবং পণ্যের গড়মূল্য অর্থাৎ একই পণ্যের বিভিন্ন স্থানে বর্তমান বিভিন্নরূপ মূল্য তথা উহাদের গড় সম্বন্ধেও–উল্লেখ্য যে, উক্তরূপ মূল্য সম্বন্ধে ব্যবসায়ীকে সম্যকরূপে অবগত থাকিতে হয়–আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন কালের অর্থনীতিবিদগণের অর্থনৈতিক মতবাদসমূহের সহিত উপরিউক্ত বিষয়গুলির কি সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই।

ইবন খালদূনও তাঁহার বিখ্যাত মুকাদ্দিমা গ্রন্থে (কায়রো ১৩১৭ হি., পৃ. ৪৪১ প., ১৮৭৯ খৃ. মুদ্রিত অনুলিপি, ১খ. পৃ. ৩৪৫, অনু-প্রকাশিত N. E., ২খ, ১৮৬৫ খৃ., পৃ. ৩৪৮ প.)। পূর্বোক্ত রূপ চিন্তাধারা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও তাঁহার বর্ণনাকে পাইকারী বিক্রেতা (خزان) এবং বিভিন্ন স্থানে গিয়া পণ্য বিক্রয়কারী তাজির (رکاض) এইরূপ শিরোনামসমূহের অধীনে বিন্যস্ত করিয়াছেন এবং তিনি বাহ্যত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বিক্রয়ে পণ্য প্রেরণকারী তাজির (مجهز) এই শিরোনামকে বাদ দিয়াছেন। তিনি তিজারাতের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন ঃ তিজারাত হইতেছে কোনও ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য ক্রয় করিয়া যত দিন উহার মূল্য বৃদ্ধি না হয়, ততদিন উহা মওজুদ রাখিয়া বিক্রয় করিবার মাধ্যমে অথবা এইরূপ অন্য কোনও অঞ্চল বা দেশে, যেইখানে উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, উহা বিক্রয় করিবার মাধ্যমে স্বীয় সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার নাম।

ইবন খালদূন তাজিরদিগকে যেই সকল পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন, উহা বেশ চিত্তাকর্ষক বটে। তিনি লিখিয়াছেন, "তাজির ব্যক্তির মধ্যে চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তা, তার্কিকতা ও বাকপটুতা এবং গ্রাহকের সহিত কথা বলিবার কালে বাক-চাতুর্য প্রদর্শন–এই সকল গুণ থাকা জরুরী।" বস্তুত উক্ত গুণাবলীর প্রকৃতি এই যে, উহারা মানুষের সম্ভ্রমবোধ, ন্যায় বিচার, মানবতাবোধ ও অন্যান্য মানবিক গুণকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অতি দ্রুত উহাদের দ্বারা বিরূপভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়ে। কারণ তাহাকে সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ খরিদদারদের সহিত কারবারে লিপ্ত থাকিতে হয়। অবশ্য যেই ব্যবসায়ী অনুকূল অবস্থার কল্যাণে হঠাৎ বড়লোক হইয়া যায় এবং লোকদের নিকট সম্মানীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার অবস্থা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর অবস্থা হইতে ভিন্নতর হইয়া থাকে। সে তিজারাতের দূষিত নৈতিক প্রতিক্রিয়া হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে। কারণ তাহার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সম্পাদনের দায়িত্ব প্রধানত তাহার বিক্রয়-প্রতিনিধিগণের উপরই ন্যস্ত থাকে। সরাসরি তাহার নিজের কাজ থাকে—শুধু তাহাদের কার্যাবলী দেখাশোনা করা এবং তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি প্রদান করা।

(ঙ) বক্ষ্যমাণ নিবন্ধের প্রথম দিকে আমরা তিজারাত সম্বন্ধে ইসলাম কি আচরণ ও ভূমিকা গ্রহণ করে, সেই সম্পর্কে আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা কতটুকু, উক্ত প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নেরই একটি দিক বটে। উল্লেখ্য যে, এই বিষয়টি বর্তমান যুগে একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হইত। যেমন এখনও অনেক সময়ে খৃস্ট ধর্ম প্রচারক মহল উহাকে অস্বীকার করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Barthold কর্তৃক Mir Islâma সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য লিখিত মৌলিক ও ভূমিকা স্থানীয় প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক দলীল-প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা না থাকিবার ধারণাটির পশ্চাতে কোনও যুক্তি নাই। উল্লেখ্য যে, Barthold রচিত উক্ত প্রবন্ধটিই এই শ্রেণীর প্রবন্ধসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমে রচিত প্রবন্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। Max Weber-এর ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক গবেষণাকে অনুসরণ করিয়া C. H. Becker, R. Junge এবং আরও পরবর্তী কালে Alfred Ruhl আলোচ্য বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারাও সকলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইসলাম কখনও অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির বিরোধী ছিল না। অবশ্য একথা সত্য যে, প্রাচ্যের অর্থনৈতিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র। উক্ত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণ হইতেছে, প্রাচ্যের বিশেষ ও স্বতন্ত্র পারিপার্শ্বিক ও অন্যান্য অবস্থা, বিশেষত উহার কতগুলি বংশগত বৈশিষ্ট্য, প্রায় সর্বত্র বিরাজমান শুষ্ক জলবায়ু এবং সেচকার্য ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের অপ্রতুলতা। উল্লেখ্য যে, উক্ত সমস্যাবলী প্রাচ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে বিরাট অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। উক্ত অবস্থাবলী প্রাচ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বজাতীয়দের সহিত তুলনামূলকভাবে অধিকতর ঐক্যের সম্পর্কে সম্পৃক্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই কারণেই প্রাচ্যের দেশসমূহের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান মূলনীতি হিসাবে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বরং পারস্পরিক সহযোগিতাকেই সক্রিয় দেখা যায়। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তিজারাতের ইসলামী নৈতিক মূলনীতি কি তাহা বুঝিতে পারেন। আর উক্ত মূলনীতি হইতেছে ঃ প্রত্যেক তাজিরকে এই কথা ভালরূপে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, ব্যবসায়িক পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তাহার গ্রাহক তাহার ভ্রাতা বটে। বস্তুত ইসলাম মুসলিম সমাজের সদস্যদের এইরূপ মহান উপলব্ধি ও মানসিকতাকে শক্তি জোগায় যে, "আমরা মিল্লাতের অধীন পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ"। উক্ত উপলব্ধি ও মানসিকতা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তাহার প্রতিটি কর্মে আলোকবর্তিকারূপে সক্রিয় রহিয়াছে। মানব জীবনের অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের ন্যায় তিজারাতও ইসলামেরই নির্দেশনার অধীন বটে। অতএব ইসলামে উহার জন্য কোনরূপ স্বতন্ত্র নৈতিক বিধান বর্ণিত হয় নাই, হইবার প্রয়োজনও ছিল না।

উপরোক্ত বিষয়াবলী সত্য হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ব্যবসায়িক কারবারের আধুনিক প্রক্রিয়াসমূহ আত্মস্থ করিয়া লইবার যোগ্যতা রাখে। ইসলাম ইতিপূর্বেও একাধিকবার উহার গতিশীল ধর্ম হইবার এবং পারিপার্শ্বিকতার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র, যেমন তুরস্ক ও মিসর বিশ্বসমাজের প্রগতি অর্জনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলিম সমাজের মানসিক জড়তার ফলে সৃষ্ট অভাব ও শূন্যতাকে পূরণ করিয়া লইতে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। দিয়া গোকালপ এবং মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু উক্ত প্রগতিশীলতার মহাসড়কের মাইলফলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাতসমূহ ব্যতীত (১) হাদীছ গ্রন্থাবলীর ক্রয়-বিক্রয় অথবা তিজারাত অধ্যায়; (২) Wensinck, A Handbook of Early Muhammadan Tradition, লাইডেন ১৯২৭ খৃ., উক্ত গ্রন্থের barter নিবন্ধের অধীনে প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্র.; (৩) Ritter, Ein arabisches Handbuch der Handelswissenschaft, Published in Isl., ১৭খ (১৯১৭ খৃ.), পৃ. ১ প.; (৪) বারটল্ড রচিত নিবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, দেখুন W. I., ১খ. (১৯১৩ খৃ.), পৃ. ১৩৮ প.; (৫) C. H. Becker, Islam und Wirtschaft, Published in Archv. f. Wirts chafts forschung im Orient, ১খ. (১৯১৬ খৃ.), পৃ. ৬৬প. | Islamstudien, ১খ. (১৯২৪ খৃ.), পৃ. ৫৪ প.; (৬) R. Junge, Das Wirtschaftsproblem des naheren Orients., Published in Archiv., F. Wirtschaft-sforschung im Orient, ১খ. (১৯১৬ খৃ.), পৃ. ১ প.; (৭) ঐ লেখক, Das Problem der Euroaisierung orientalischer Wirtschaft, Weimar কর্তৃক মুদ্রিত ১৯১৫ খৃ., পৃ. ১০৮ প., ২৬০ প. (উহাতে রুশীয় (?) তুর্কিস্তান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে); (৮) Alfred Ruhl, Vom Wirtschaftsgeits im Orient, লাইপযিগ ১৯২৫ খৃ. (উহাতে আলজিরিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে), এতদ্ব্যতীত তু. R. Hartmann, Die Krisis des Islam, লাইপযিগ ১৯২৮ খৃ. (H. 15 Morgenland)।

Heffening ও সম্পাদনা পরিষদ (দা, মা. ই.)/মু. মাজহারুল হক

তিতুমীর, সায়্যিদ মীর নিছার আলী (تیتومیر سید میر نثار علی) ঃ বাংলায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনের নেতা, হাফিজে কুরআন, তাপস ও একজন খ্যাতনামা পাহলোয়ান। জন্ম ১৪ মাঘ, ১১৮৮/১৭৮২ খৃ. সালে ২৪ পরগনা জিলার বশীরহাট মহকুমার চাঁদপুর নামক গ্রামে। পিতার নাম মীর হাসান আলী এবং মাতার নাম আবিদা রুকায়্যা খাতুন। কথিত আছে যে, তিক্ত ঔষধের প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল বলিয়া তাঁহাকে তিতা মিঞা ডাকা হইত। এই তিতা মিঞাই পরবর্তী কালে তিতুমীর নামে পরিচিত হন (সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, পৃ. ১৫)।

তিতুমীর-এর পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত আলী (রা)-এর বংশধর। তাঁহারা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আরবদেশ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে আগত তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন সায়্যিদ শাহাদাত আলী। তাঁহার পুত্র সায়্যিদ আবদুল্লাহ দিল্লীর শাহী দরবার কর্তৃক জাফরপুরের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া মীর ইনসাফ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সেই হইতে শাহাদাত আলীর বংশধররা মীর এবং সায়্যিদ—উভয় উপাধিই ব্যবহার করিতেন।

নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তিতুমীর স্থানীয় মাদ্‌রাসায় লেখাপড়া করেন। তিতুমীর তাঁহার (মাদ্‌রাসার) শিক্ষা জীবনে একজন আলিম ও হাফিজ উস্তাদের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট তিতুমীর কুরআন শারীফ হিফজ করেন। তিনি হাদীছশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার মাদ্‌রাসার শিক্ষা জীবন শেষ হয়। আরবী, ফারসী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। এই তিনটি ভাষায় তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৪)। তাহা ছাড়াও তিনি ফারসী সাহিত্য, ফারাইয, ইসলামী দর্শন, তাসাওউফ, মানতিক এবং আরবী ও ফারসী কাব্যশাস্ত্রের অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন (পূ. গ্র.)।

তিতুমীর একজন খ্যাতনামা পাহলোয়ান ছিলেন। মাদ্‌রাসার শিক্ষার সাথে সাথে তিনি উসতাদ সায়্যিদ নিসাআতুল্লাহ-এর উৎসাহে স্থানীয় আখড়ায় শরীর চর্চায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতায় সমসাময়িক কালের কয়েকজন খ্যাতনামা পাহলোয়ান 'আরীফ 'আলী, মীর লাল মুহাম্মাদ প্রমুখকে পরাজিত করিয়া একজন বিখ্যাত পাহলোয়ানরূপে পরিচিত হন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিতুমীর হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শারীফ গমন করেন। তথায় মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ শহীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তিতুমীর তাঁহার মুরীদ হন। কিছুদিন তাঁহার সান্নিধ্যে সাধনার পর মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর রওযা শরীফ যিয়ারতকালে তিতুমীর তাঁহার মুরশিদের নিকট খিলাফাত প্রাপ্ত হন।

তিতুমীর মাওলানা সায়্যিদ আহমাদের নিকট হইতে শারীআত ও তারীকাত-এর দীক্ষার সাথে সাথে মুসলিম জাতির আযাদী লাভের জিহাদী প্রেরণাও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেশে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে শিরক-বিদআতের উৎখাত এবং সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দু কৃষক সম্প্রদায়কে জমিদার ও নীলকরদিগের অত্যাচার প্রতিরোধে একতাবদ্ধ হইতে এবং বাংলাদেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়নের সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলিতেন, মুসলমানদেরকে কথায় ও কাজে, আচার-ব্যবহারে পুরাপুরি মুসলমান হইতে হইবে এবং সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করিলে মজলুমের সাহায্য করিতে হইবে।

মুসলিম বিদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ সায়্যিদ আহমাদ ও তাঁহার ভক্ত খলীফাদেরকে ওয়াহ্হাবী (দ্র. ওহ্হাবিয়্যা) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই বর্ণনাটি ভ্রমাত্মক এবং মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের এই মত সমর্থন করেন নাই। কারণ সায়্যিদ আহমাদের মুরশিদ ছিলেন দিল্লীর খ্যাতনামা 'আলিম শাহ আবদুল-আযীয মুহাদ্দিছ দিহ্‌লাবী এবং মাওলানা সায়্যিদ আহমাদ ছিলেন তাঁহারই অতীব ভক্ত খলীফা।

এই সময় স্থানীয় হিন্দু জমিদার ছিল কৃষ্ণদেব রায়। জমিদার মুসলমানদের দাড়ি, গোঁফ, মসজিদ ও মুসলমানী নামের উপর কর আরোপ করিলে তিতুমীর ইহার প্রতিবাদ করেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তিতুমীর ও জমিদারের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। জমিদার তিতুমীরকে ওয়াহ্হাবী প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির প্রয়াস পান। কিন্তু মুসলমানগণ জমিদারের শঠতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ফলে মুসলমানদের উপর জমিদারের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।

তিতুমীর অতীব ধৈর্যের সহিত হিন্দু জমিদারের আক্রমণ ও প্রতিহিংসা প্রতিহত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায় নীলকর ইংরেজদের সহায়তায় তিতুমীরের ভক্তদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার চালাইতে থাকে। তাহাদের আক্রমণে তিতুমীরের কয়েকজন ভক্ত শহীদ হন। বাধ্য হইয়া মুসলিম মুজাহিদগণ তিতুমীরের ভক্ত ও ভাগিনেয় গুলাম মা'সূমের নেতৃত্বে একটি প্রতিরোধী মুজাহিদ দল গড়িয়া তোলেন এবং নারকেলেবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কিল্লা নির্মাণ করেন। তিতুমীর ইংরেজ রাজত্বের বিলুপ্তি এবং মুসলিম রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলেন। সমগ্র চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও ফরিদপুর জিলা তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল ৪/৫ হাজার। জমিদারের ও কলিকাতা হইতে প্রেরিত ইংরেজ সেনাদল মুসলিম মুজাহিদদের হাতে পুনঃ পুনঃ পর্যুদস্ত হয়। পরিশেষে লর্ড বেন্টিঙ্ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল

ষ্টুয়ার্ট-এর নেতৃত্বে এক শত ঘোড়সওয়ার গোরা সৈন্য, তিন শত পদাতিক দেশীয় সৈন্য ও দুইটি কামানসহ তিতুমীর ও তাঁহার দলকে শায়েস্তা করিবার জন্য পাঠান। ১৮৩১ সালের ১৪ নভেম্বর ইংরেজ বাহিনী মুসলিম মুজাহিদদিগকে আক্রমণ করে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর মুকাবিলায় ঢাল-সড়কিধারী মুজাহিদগণ টিকিতে পারিলেন না। ইংরেজ বাহিনী কামানের গোলার আঘাতে তাঁহাদের বাঁশের কিল্লাটি ধ্বংস করিয়া দিল। অনেক ভক্তসহ তিতুমীর কামানের গোলাতে শহীদ হইলেন (১৮৩১ খৃ.)। ৩৫০ জন মুজাহিদ বন্দী হন। তন্মধ্যে ১৪০ জনের কারাদণ্ড এবং গুলাম মা'সূমের মৃত্যুদণ্ড হয়। তিতুমীরের শাহাদাত এখনও মুসলিম সমাজে জিহাদী প্রেরণার উৎস হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বিহারী লাল সরকার, নারকেলবাড়িয়ার লড়াই, কলিকাতা ১৩০৪ বাং.; (২) নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ, কলিকাতা, ১৩০৩ বাং; (৩) আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শহীদ তিতুমীর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৭৫ বাং.; (৪) Dr. Azizur Rahman Mallik, British Policy and the Muslims in Bengal, 1757—1856, A Study of the Develoment of the Muslims in Bengal with Special Reference to Their Education, Dhaka 1961; (৫) Dr. Abdul Bari, A History of the Freedom Movement, Karachi 1958, I, 551; (৬) Dr. Muin-ud-din Ahmed Khan, History of the Faraidi Movement in Bengal, Karachi 1965 ; (৭) ঐ লেখক, Titumir and His Followers, Dhaka 1980; (৮) W. W. Hunter, The Indian Mussalmans, 3rd ed., The Comrade Publications, Calcutta 1945; (৯) বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আত-তিন্‌নীন (التنين) ঃ নক্ষত্রমণ্ডলী। আল-কাযবীনীর মতে ইহা ৩১০টি নক্ষত্রের সমাবেশে গঠিত যাহার কোনটিই এই মণ্ডলের বাহিরে অবস্থিত নহে; যাহা গ্রীক (এবং সম্ভবত ইহার পূর্বে ব্যাবিলনীয়) জ্যোতির্বিজ্ঞান হইতে গৃহীত নক্ষত্রমণ্ডলের অস্পষ্ট আকৃতি ছাড়াও আরব জ্যোতির্বিদগণ ইহার অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র সমষ্টির জন্য পৃথক পৃথক নাম ব্যবহার করেন। এইভাবে μ নক্ষত্রটি ড্রাগনের জিহ্বা নামে, আর-রাফিদ, একাকী চারণরত উষ্ট্র মস্তকে অবস্থিত চারটি নক্ষত্র $\beta 6 \nu \phi$ আল-আওয়াইয মা উষ্ট্রী ইহাদের মধ্যস্থ একটি খুব বেশি উজ্জ্বল নয়, নক্ষত্র 'আর-রুবা' উষ্ট্রের শাবক ইত্যাদি নামে পরিচিত; উজ্জ্বল নক্ষত্রদ্বয় ε μ আল-যিবায়ন দুই শৃগাল, অনুজ্জ্বল wf আজফারুয-যিব শৃগালের নখর নামে পরিচিত। আরব জ্যোতির্বিদদের কল্পনায় শৃগাল দুই উষ্ট্রের শাবকটিকে ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে এবং মা উষ্ট্রী উহাকে রক্ষা করিতেছে। ড্রাগনের গুচ্ছের অগ্রভাগের নক্ষত্রটির নাম আয-যীখ 'পুরুষ হায়েনা'। উলুগ্ বেগের গ্রন্থে আল-আওয়াদ 'বীণা বাদক' এবং আর-রাকিস 'নর্তকী' পাঠ দুইটি দেখিতে পাওয়া যায় (Wustenfeld-এর ভাষ্যেও দেখা যায়); এই পাঠদ্বয়ের অপর কোন সর্বজনমান্য বিশেষজ্ঞের সমর্থন পাওয়া যায় না এবং এইগুলিকে আল-আওয়াইয ও আর-রাফিদ-এর ভ্রমাত্মক পাঠরূপে ব্যাখ্যা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. Ideler, Untersuchingen uber Ursprung und Bedeutung der Sternamen, ১৮০৯ খৃ., পৃ. ৩২-৪১; (২) আল-কাযবীনী, আজাইবুল-মাখলূকাত, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৩১; (৩) H. Ethe, el-Kazwini's Kosmographie, ১৮৬৮ খৃ., পৃ. ৬৫-৬৬।

J. Ruska (E. I. [1]) মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

তিফলিস (تفلس) ঃ জর্জিয়ার রাজধানী এবং অধিকন্তু জর্জিয়ার পূর্বাঞ্চল (খারথালিয়া)।

নামকরণ ঃ জর্জিয়ান ভাষাতে শহরটিকে তপহিলিস অথবা তহবিলিসি বলা হয়। তপহিলি উষ্ণ (তিফলিস-এর উষ্ণ প্রস্রবণসমূহের নামানুসারে) হইতে এই নামটি গৃহীত হইয়াছে। সচরাচর এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রদান করা হইয়া থাকে। আর্মেনিয়ান ভাষায় ইহা তপহখিস (তপহলিস) এবং আরবীতে ইহা তাফলীস (বালাযুরী ঃ তাফলীস) নামে পরিচিত। অনুরূপ নামসমূহের মধ্যে আমরা টলেমি, ৫খ, অধ্যায় ১১-তে বর্ণিত আবনিয়ার উত্তর-পূর্বে অর্থাৎ দাগিস্তানে $\Theta\tau\lambda\beta\tau_c$ অথবা $\Theta\alpha\lambda\beta\tau_c$ শহর এবং উরমিয়া হ্রদের দক্ষিণে তাফলীস নামক স্থানের কথা উল্লেখ করিতে পারি (তু. কুদামা, পৃ. ২১৩ ঃ দনাওআর হইতে আযারবায়জান পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তাটি বারযাতে দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে (সাকিয? দ্র.)। উরমিয়াগামী রাস্তাপথে বারযার দুই ফারসাখ উত্তরে তিফলীস অবস্থিত ছিল।

ইসলাম-পূর্ব যুগে জর্জিয়ার পুরাতন রাজধানী মতসখেতাতে অবস্থিত ছিল (টলেমি, Geography, ৫খ, অধ্যায় ১০, Meo $M\tau\sigma\imath\lambda\iota\kappa\imath\alpha = *M\xi\sigma\alpha\kappa\imath\alpha$) যাহাকে আরব ভৌগোলিকগণ একটি জনপ্রিয় শব্দতত্ত্ব দ্বারা কখনও কখনও মসজিদ যুল-কারনায়ন নামে অভিহিত করিয়াছেন (মাসঊদী, মুরূজ, ২খ, পৃ. ৫৬; তু. Marquart, Streifzuge, পৃ. ১৮৬)। জর্জিয়ান ইতিহাস অনুসারে জর্জিয়ার রাজা (সাসানিয়ান বংশোদ্ভূত খুসরাও বংশীয় রাজপরিবারে) ওয়ারায-বাকার (৩৭৯-৩৯৩?)-এর বিরুদ্ধে প্রেরিত পারসিয়ান এরিসতহাও (জনগোষ্ঠী অথবা প্রদেশের গভর্নর) ককেসাসের ফটকসমূহের মধ্যে (দারিআল ও দারবান্দ-এর মধ্যে) মতসখেতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ব্যূহ হিসাবে ব্যবহারের জন্য তিফলিসের গোড়াপত্তন করেন (Brosset, Histoire de la Georgie, ১খ., পৃ. ১৪০)।

পারসিয়ানদের সহিত রাজা ওআখতানভ গুরগাসাল (৪৪৬-৪৯৯?)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ চলাকালে তিফলিস-এর দুর্গ (কালা ও গ্রাম (সপহেলি)-সমূহ বিধ্বস্ত হয়। ওআখতানভ তিফলিসে একটি শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাহার পুত্র দাচি (৪৯৯-৫১৪ খৃ.) ইহার প্রাচীরসমূহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৮০, ১৯৬, ২০১)।

৫২৩ খৃষ্টাব্দের পরে পারসিয়ানগণ পূর্ব জর্জিয়ার ক্ষমতাসীন রাজবংশকে অবদমন করিয়া তিফলিসে একটি পারসিয়ান মারযপান বজায় রাখেন, যাহার পাশাপাশি জর্জিয়ান অভিজাতবর্গের প্রতিনিধিগণ দেশটির শাসনকার্যে নামমাত্র অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করিতেন (Brosset, ১খ, পৃ. ২২৬; Marquart, পূ. গ্র., পৃ. ৩৯৭, ৪৩১-৪৩২; জাওআখোও, খরিস্ত, ভস্টক, ১খ, পৃ. ১১০)। মতসখেতার গভর্নর মারযপানার অধীনস্থ ছিলেন। বয়যানতিউম-এর থিওফেনেস-ই (৬ষ্ঠ শতাব্দী) সর্বপ্রথম বায়যানটাইনে গ্রন্থকার, যিনি ৫৭১ খৃষ্টাব্দে $\Tau\tau\phi\iota\lambda\iota_c$ ($\Tau\phi\lambda\iota_c$) $\mu\kappa\tau\rho\, b\chi o\lambda\iota_c$-এর উল্লেখ করেন, (Theoph. byz. apud photium, Migne-তে, Patrologia graeca, cili, 139; Muralt, Essai de chronologie byz., সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৫৫ খৃ., ১খ, পৃ. ১৫৬)।

তুর্কীগণ ও বায়যান্টাইনীদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে আইবেরিয়ার উপর পারসিয়ানদের মনোযোগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে জর্জিয়ানগণ তাহাদের জন্য বায়যানটানে সম্রাটের নিকট একজন রাজা প্রার্থনা করেন এবং এইভাবে মতসখেতাতে বাগরাতিয় গুআরামকে (৫৭৫-৬০০ খৃ.) ক্ষমতায় বসানো হয়। এই ইতিহাস রাজন্যের উপর তিফলিসে সিওন-এর গির্জার ভিত্তি পুনরুদ্ধারের কৃতিত্ব আরোপ করিয়াছে (১খ., পৃ. ২২২)।

রাজা খুসরাও পারভেজ কর্তৃক বায়যানটাইনের উপর বিজয় অর্জনের পর (৬০৬ খৃষ্টাব্দের পর) গুআরামের পুত্র সতেপহাগেস-১ (যিনি এরিসতহাওই-জনগোষ্ঠী অথবা প্রদেশের গভর্নর খেতাবে সন্তুষ্ট ছিলেন) পারসিয়ানদের সহিত যোগদান করেন। পরবর্তী কালে ৬২৫ খৃষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস ও তাঁহার তুর্কী মিত্রবর্গ যখন তিফলিস-এর উপরে অবরোধ করেন, তখন সতেপহাগেস সাহসিকতার সহিত শহরটি রক্ষার চেষ্টা করেন। হেরাক্লিয়াস পুরাতন খুসরু পরিবারের আদারনাসেসকে মছাওআর (প্রধান) হিসাবে নিয়োজিত করেন এবং তাহার সহযোগী হিসাবে মনোনীত করেন এরিসতহাও জিবগুকে (Theophanes : ζπβya Marquart-এর মতো তহোনভ য়াবগু খাকান)। দুর্গটি (কাল'আ) দখল করিয়া লওয়া হয় এবং সতেপহানোসকে হত্যা করা হয়।

আরবদের তিফলিস জয়ঃ আরবদের আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া হতবুদ্ধি হইয়া (তু. বালাযুরী, পৃ. ১৯৪ এবং য়াকূত, ২খ., পৃ. ৫৮, যেইখানে জুরযান আর্মেনিয়া দেশের একটি নাহিয়া) জর্জিয়ান ইতিবৃত্ত অনুসারে (খারথলিস তসখোওরেবা), আগারিআনগণ সোমখেতিয়া [আর্মেনিয়া, খারতলিয়ার সোমখেতিয়া-এর জন্য বরং একটি দ্ব্যর্থক শব্দ, খরাম নদীর দক্ষিণে, তিফলিসের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে আরম্ভ হয়] আক্রমণ করেন তিফলিসে বসবাসকারী আদারনাসেসের পুত্র দ্বিতীয় স্তেপহানোস (৬৩৯-৬৬৩ খৃ.?)-এর রাজত্বকালে। এই রাজন্যের মৃত্যুর পর তাহার দুই পুত্র মির ও আরচিল এগরিসে (মিনগ্রেলিয়া, রাইওনের উত্তর ও কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ইমেরেতহিয়ার পশ্চিমদিকস্থ ভূমি) প্রস্থান করেন। তাঁহাদের যৌথ রাজত্বকালে (৬৬৩-৬৬৮ খৃ.) আমীর আল-মু'মিনীন এলিম (হিলাম, যাঁহার সময় কাল প্রকৃতপক্ষে ১০৫-১২৫ হি./৭২৪-৭৪৩ খৃ.) কর্তৃক প্রেরিত হিংস্র মারওআন করু (ম. বধির ব্যক্তির) জর্জিয়া ভ্রমণ করেন। এইরূপ ভ্রান্তিমালা ও কালানৌচিত্যসমূহের ব্যাখ্যা এই ঘটনা দ্বারা প্রদান করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে জর্জিয়ার জাতীয় জীবন চওরোখ (কলারজেথিয়া) হইতে দুর্গম সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে আশ্রয় নিয়াছিল। যাহা হউক আরব ও আর্মেনিয়ান বর্ণনাসমূহ হইতে ঘটনাসূত্রকে একত্রে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে [তু. আর্মেনিয়া শীর্ষক নিবন্ধ]।

প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক খলীফাগণের রাজত্বকালেই আরব অভিযানসমূহ ট্রান্সককেসিয়াতে ঢুকিয়া পড়ে। তাবারী ১খ, পৃ. ২৬৬৬ -এর মতানুসারে ২২/৬৪৩ সালে সুরাকা শহর বারায্-এর (যাব আল-আবওয়াব-এর রাজা) সহিত শান্তি স্থাপনের পর হাবীব ইব্ন মাসলামাকে তিফলিসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাবারী, ১খ, পৃ. ২৬৭৪ অনুসারে একই বর্ষে এই শহরটির লোকদের সহিত শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা উছমান (রা)-এর শাসনামলে ২৫/৬৪৫ সালে সম্পাদিত হয় (আল-য়া'কূবী, পৃ. ১৯৪; বালাযুরী, পৃ. ১৯৮)। যখন হাবীব ইব্ন মাসলামা আর্মেনিয়া [দ্র.] দখল করেন, তখন তাঁহার মনোযোগ জর্জিয়ার প্রতি নিবদ্ধ হয়। একজন জর্জিয়ান দূত (নকলয়-নিকোলাসঃ তফলয়-থিওফিলাস?) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রত্যয়ন করেন যে, জুরযানের বাতবী' ও তাহার জনগণকে সুষ্ঠুভাবে সমাবেশ করা হইয়াছে। হাবীবের জওয়াব (তু. বালাযুরী, পৃ. ২০১ ও তাবারী, ১খ, পৃ. ২৭৬৪-তে প্রদত্ত তরজমাসমূহ; য়াকূত, ১খ, পৃ. ৮৫৭-তে বরং বালাযুরীকে অনুসরণ করা হইয়াছে) খুব সাধারণভাবে হরমুয অঞ্চলে আল-জুরযান (জর্জিয়া)-এর অন্তর্গত মানজালীস (এক্ষণে মানভলিস-এর রুসতাক)-এ তিফলিসের অধিবাসিগণকে নিবেদন করা হয়।

হাবীব জনগণকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেন। কিন্তু তিনি ইসলামের আইন ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞ আবদুর-রহমান ইব্ন জায-কে তিফলিসে প্রেরণ করেন এবং বাস্তবিকপক্ষে শহরটির অধিবাসিগণ শীঘ্রই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

তিফলিসকে করায়ত্তকরণের পর হাবীব জর্জিয়ানগণ ও তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ অধ্যুষিত অন্যান্য অঞ্চলে তাহার বিজয় অথবা তাহার শান্তি-চুক্তিসমূহের আওতা বিস্তৃত করেন (বালাযুরী, ২০২-২০৩; তু. গহাযারিআনে উহাদিগের বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা. পৃ. গ্র.)। এইগুলির মধ্যে সানারিয়া একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে (পতোলেময়, ৫খ, অধ্যায় ৮, শাখা ১৩; Mayapatot আর্মেনিয়ানে তসানায়খ) তাহারা ছিল একটি যুদ্ধংদেহী খৃস্টান জনগোষ্ঠী যাহারা কাখোতহিয়া ও সুউচ্চ আলাযানে বসবাস করিত এবং যাহারা N. Y. Mar-এর ধারণা অনুসারে আধুনিক যুশদের অনুরূপ ছিল, যাঁহাদের ভাষা চেচেনগণের সহিত সম্পর্কযুক্ত (তু. Izw. Akad. Nauk., ১০খ/১২খ, ১৯১৬ খৃ., ১৩৭৯-১৪০৮)।

হাবীবের অভিযানের সময় হইতে আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি.)-এর শাসনামল পর্যন্ত জুরযান (পূর্বাঞ্চলীয় জর্জিয়ানগণ) ও আবখায (দ্র. এখানে রাহত্তম উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চলীয় জর্জিয়ানগণ-এর অর্থাৎ ইমেয়েতহিয়ার বিস্তৃত অর্থে) তিফলিসে আরব সামরিক অধিনায়কের নিকট রাজস্ব প্রদান করিত, (মুরূজ, ২খ, পৃ. ৬৫; য়াকূত, ২খ, পৃ. ৫৮৩)। আমরা দ্বিতীয় য়াযীদ (১০১-১০৫ হি.)-এর শাসনামলের একটি পত্র প্রাপ্ত হই যাহাতে জাররাহ ইবন আবদুল্লাহ জুরযানকে হাবীব ইব্ন মাসলামা কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তাসমূহের অনুমোদন করিয়াছেন (বালাযুরী, পৃ. ২০২; সেইখানে মানজালীসের রুসতাক বিষয়ে একটি রেফারেন্সও নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু কতিপয় স্থানের নাম অদ্যাবধি অশনাক্তকৃত অবস্থায় রহিয়াছে)।

আর্মেনিয়ান ও জর্জিয়ান ট্রাডিশনের 'মারওয়ান করু' বিষয়ে দুই ব্যক্তিকে গুলাইয়া ফেলা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় (Marquart) ঃ মুহাম্মাদ ইবন মারওয়ান যাঁহার বিষয়ে আর্মেনিয়ানগণের আলোচনা জর্জিয়ানগণ শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হয় এবং তাঁহার পুত্র মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদ যিনি (হিশামের শাসনামলে ১০৫-১২৫ হি.) প্রধানত দাগিস্তানে যুদ্ধরত ছিলেন। কিন্তু আলান-এর ফটক-এর বিরুদ্ধে যাহার অভিযান আংশিকভাবে তিফলিসের মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া থাকিবে তাহার সদর দফতর ছিল কিসালে (?) যাহা তিফলিস হইতে ২৯ ফারসাখ ও বারযাআ হইতে ৪০ ফারসাখ দূরবর্তী (সম্ভবত তাউস-এর নিম্নস্থ কেসালা, যাহা বর্ণনাটির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ; তু. নিম্নে)। আবদুল-মালিকের একটি দিরহাম বিষয়ে অবগত হওয়া গিয়াছে যাহা ৮৫/৭০৪ সালে তিফলিসে তৈরি হয়।

আব্বাসীগণ ১৪১/৭৫৮ সালে র'স তারাখানের অধীনে খাযারগণ আর্মেনিয়া আক্রমণ করে (য়া'কূবী, ২খ, পৃ. ৪৪৬)। তাবারী একই

ঘটনার তারিখ দিয়াছেন ১৪৭/৭৬৪ সালে। তিনি উল্লেখ করেন যে, আসতারা খান আল-খাওয়ারিযমী (সিচ)-এর আক্রমণকালে অনেক মুসলিম ও যিম্মী বন্দী হন এবং তুর্কীগণ তিফলিসে প্রবেশ করেন। য়া'কূবী ১৪১ হিজরীর অব্যবহিত পরে সানারিয়াগণের একটি অভ্যুত্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্তগণকে আমির ইবন ইসমাঈল পরাজিত করেন; অতঃপর তিনি তিফলিসে প্রত্যাবর্তন পূর্বক তথায় তাঁহার বন্দীগণকে প্রচলিত আইনানুসারে প্রাণদণ্ড দেন।

আরেকটি খাযার আক্রমণ পরিচালিত হয় ১৮৩/৭৯৯ সালে। তাহাদের নৃপতি কুর নদীর উপরস্থ সেতু পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং দেশটিকে ছারখার করেন। কিন্তু আরব লেখকগণ তিফলিস দখল করার কথা উল্লেখ করেন নাই (য়া'কূবী, ২খ, পৃ. ৫১৮; তাবারী, ৩খ, পৃ. ৬৪৮)। অপরপক্ষে জর্জিয়ান ইতিহাসে বলা হইয়াছে যে, ইওয়ানে ও জুআনশের (৭৯৮-৭৮৬ খৃ.?) ভ্রাতৃদ্বয়ের যৌথ শাসনামলে খাকানের জেনারেল বলুচান (আর্মেনিয়ানে বুলচআন) তিফলিস দখল করেন এবং খারথলিয়া জয় করেন।

হারূনুর-রাশীদ (১৭০-১৯৩/৭৮৬-৮০৯) যে সকল গভর্নরকে আর্মেনিয়াতে প্রেরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিলেন খুযায়মা ইবন খাযিম (বালাযুরী, পৃ. ২১০)। জর্জিয়ানগণ তাঁহাকে চর্চচটম-আঙ্গিম নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। য়া'কূবী, ২খ, পৃ. ২১০ হইতে তাঁহার দ্বিতীয় গভর্নর থাকাকালীন নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। জুরজান (জুরযান পঠনীয়) ও সানারিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খুযায়মার জেনারেল সাঈদ ইবন হায়ছাম তাহাদিগকে পরাজিত করেন, দেশটি হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন এবং অতঃপর তিফলিসে প্রত্যাবর্তন করেন।

আল-মা'মূনের (১৯৮-২১৮ হি.) অধীনে জনৈক মুহাম্মাদ ইবন আত্তাব নিজেকে আর্মেনিয়াতে অধিষ্ঠিত করেন। ২১৪/৮২৯ সালে তিনি জুরজান-ভূমি দখল করেন এবং সানারিয়াগণ তাঁহার সহিত যোগদান করেন (য়া'কূবী, ২খ, পৃ. ৫৪০, ৫৬৫-৫৬৬)। খালিদ ইবন য়াযীদ মুহাম্মাদ ইবন আত্তাবকে আমান প্রদান করেন এবং তাঁহার মিত্রবর্গ সানারিয়াগণকে পরাজিত করেন। কিন্তু আর্মেনিয়াতে গোলযোগ অব্যাহত থাকে (য়া'কূবী, ২খ, পৃ. ৫৬৬; বালাযুরী, পৃ. ২১০-২১১)। ২১৫-২৩৯/৮৩০-৮৫৩ সালে ইসহাক ইবন ইসমাঈল জর্জিয়ত প্রাধান্য অর্জন করেন।

ইসহাক ইবন ইসমাঈল ঃ মাসঊদী, মুরূজ, ২খ, পৃ. ৬৫ অনুসারে তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশোদ্ভূত। তাঁহার পিতা ইসমাঈল ছিলেন দ্বিতীয় মারওয়ানের (১২৬-১৩২/৭৪৪-৭৫০ সালে) একজন মোয়াক্কেল শুআয়বের পুত্র। তিনি খলীফা আসিমের (১৯৩-১৯৬ হি.) আমলে জর্জিয়াতে বসতি স্থাপন করেন এবং ওয়ালী আসাদ ইবন য়াযীদের সহিত খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হন (য়া'কূবী, ২খ, পৃ. ৫২৮)। ইসহাকের চাচা, জর্জিয়ান ইতিহাসে, ১খ, পৃ. ২৬০, ২৬৫ বর্ণিত, আলী ইবন শুআয়ব, খালিদের নিকট হইতে তিফলিস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইহা সম্ভবত মুহাম্মাদ ইবন আততাব-এর পরবর্তীতে হইয়া থাকিবে। কিন্তু খালিদের দ্বিতীয় উত্তরসূরি হাসান বাযগীসীর গভর্নরিতেই আমরা ইসহাকের নাম প্রাপ্ত হই। যখন তাহেওপহিলোসের (৮২৯-৮৪২ খৃ.) বায়যানটাইন সেনাবাহিনী ওআনানদে (কারস-এর নিকট) পৌঁছে, তখন ইসমাঈলের পুত্র সাহ তাহাদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কর্তন করেন (তু. Stephen Asolik, ২খ, অধ্যায়-৫, অনু. Dulaurier, পৃ. ১৭১)। এইরূপ বীরোচিত অপূর্ব কর্মের জন্য খলীফা ওয়াছিক (৮২৪-৮৪৭ খৃ.) ইসহাককে আর্মেনিয়ার অধিপতি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন, কিন্তু ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মুহাম্মাদ খালিদের পুত্র ও উত্তরসূরি ইসহাককে পরাজিত করেন এবং সানারিয়াগণকে বিতাড়িত করেন। জর্জিয়ান ইতিহাস অনুসারে জর্জিয়ান নেতৃবৃন্দ (যাহারা বহু দূরবর্তী কেন্দ্রীয় সরকারকে অপেক্ষাকৃত কম ভয় পাইত) মুহাম্মদকে ইসহাক এবং তাঁহার মিত্রবর্গ কাখেতহিয়ার জনগণ এবং সানারিয়াগণের বিরুদ্ধে সমর্থন দান করেন।

পরিশেষে আল-মুতাওয়াক্কিলের শাসনামলে জনৈক তুর্ক, বুগা আল-কাবীর আশ-শাবাবী, আর্মেনিয়াতে প্রেরিত হন। রাবী' আওয়াল, ২৩৮ (শরৎকাল ৮৫২ খৃ.)-তে তিনি তিফলিসের উদ্দেশ্যে দাবীল ত্যাগ করেন। সুগদাবীলের পার্শ্ববর্তী সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণী হইতে তিনি অপারেশনসমূহ লক্ষ করিতেছিলেন (ও রেফারেন্সটি ইসানির উত্তর দিকস্থ মাখাতহা মালভূমির প্রতি সুগদাবীল; তু. তিফলিসের নিম্নে প্রদত্ত বিবরণী)।

অবরুদ্ধ ইসহাক একটি অতর্কিত বহির্গমনে সক্ষম হন। কিন্তু বুগায় নাফ্‌ফাতীন (শত্রু পক্ষস্থ লক্ষ্যবস্তুতে অগ্নি সংযোগের জন্য দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপকারিগণ) শহরটিতে অগ্নিসংযোগ করে। ইসহাকের প্রাসাদটিকে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। তুর্কগণ ও মুরগণ তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র আমরকে বন্দী করেন। ইসহাকের শিরশ্ছেদ করা হয় এবং অগ্নিসংযোগে শহরটির ধ্বংসযজ্ঞে ৫০,০০০ (?) লোক প্রাণ হারায়। মুরগণ জীবিতগণকে বন্দী করেন এবং মৃতদেহগুলিকে বিনষ্ট করেন। ইসহাকের সহধর্মিণী, সারীর (উত্তর দাগিস্তানে আভারগণের প্রধান শহর) অধিপতির কন্যা সুগদাবীলে ছিলেন। শেষোক্ত স্থানটি খুওয়ায়ছিরাগণ (সাসুনের জনগণ; তু. মায়্যাফারিকীন) কর্তৃক প্রতিরক্ষিত হইয়াছিল। বুগা তাহাদিগকে তাহাদের অস্ত্র সমর্পণের শর্তে নিরাপত্তা দান করেন এবং জারদমান ও বায়লাকগণ অভিমুখে তাঁহার অপারেশনসমূহ অব্যাহত রাখেন (তাবারী, ৩খ, পৃ. ১১১৪-১১১৬; তু Thomas Artsruni, ৩খ, অধ্যায় ৯-১০, সম্পা. = সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ১৪০-১৫০। আর্তেনির গির্জায় একটি উৎকীর্ণ লিপি বুগা কর্তৃক তিফলিস দখলের ইসলামী তারিখ প্রদান করিয়াছে ২৩৯ হি.; তু. জাওয়াখোও, খারিসত, ভস্টক ১৯১২ খৃ., ১খ, পৃ. ২৮৪)। উমায়্যাগণের প্রাক্তন মোয়াক্কেলগণের মুসলমান রাজশাসিত রাষ্ট্র যাহা ছিল একটি কেন্দ্রবিন্দু এবং যাহার চতুর্দিকে স্থানীয় জনগণ একত্র হওয়ার সুযোগ লাভ করিত, তাহার ধ্বংসসাধন ছিল খিলাফাতের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আরব লেখকগণ (মাসঊদী, ২খ, পৃ. ৬৭; য়াকূত, ২খ, পৃ. ৫৮) এই ঘটনা হইতেই ককেসাসে আরব শক্তির তারিখ চিহ্নিত করিয়াছেন। শীঘ্রই বুগাকে প্রত্যাহার করা হয়; তু. Brosset, পূ. গ্র., ১খ, পৃ. ২৬৬-২৬৮ ও Thomas Artsfuni, ঐ।

৯২২ খৃ. পর্যন্ত দিরহাম তৈরীর জন্য তিফলিসে একটি আব্বাসী টাকশাল ছিল (হিজরী ২১০, ২৪৮, ২৫০, ২৯৪, ২৯৮, ৩০৪, ৩০৭, ৩১১, ৩১২, ৩১৪, ৩৩০, ৩৩১ সনের মুদ্রাসমূহের বিষয়ে অবগত হওয়া গিয়াছে); তু. Tiesenhausen, Monnaies des khalifs orientaux, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৭৩ খৃ., ও বিশেষত পাখোমোভ, পূ. গ্র.।

৯ম শতাব্দীর শেষার্ধে তিফলিস ছিল আরমীনিয়া প্রদেশের রাজধানী। ৮৫৩ খৃ. আরমীনিয়ার শাসনকর্তা বুগা তিফলিস অধিকার করেন। ৮৮৫ খৃ. আশোট বাগরাত (৮২৬-৮৭৬ খৃ.) ইসহাকের বিরুদ্ধে খলীফাকে যে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যুত্তরে পূর্বাঞ্চলীয় রাজবংশটি বাঞ্ছিত পুরস্কারপ্রাপ্ত হয় নাই। আবখাযিআ নামক বৈরী রাজবংশ (তু. উপরে প্রদত্ত এই শব্দটির ব্যাখ্যা) খারথলিয়া দখল

করেন। এইভাবে মাসঊদী (রচনাকাল ৩৩২-৯৪২ সন), মুরূজ, ২খ, পৃ. ৬৯, ৭৪ উল্লেখ করেন যে, কুর জুরজানের দখল পরিত্যাগ করেন (পার্শ্বরেখার বাগবতিদ্, তা. ৯৪১ খৃ., Marquart, পূ. গ্র., পৃ. ১৭৬) আব্‌খায (এইরূপে ব্যবহার উচ্চারিত ইত্যাদি) অঞ্চলের অতিক্রম করেন এবং তিফলিসের প্রান্তে উপনীত হন, যাহার অধিবাসীগণ চতুর্দিকে অবিশ্বাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও তদবধি তাঁহারা সাহস হারান নাই এবং সংখ্যায় ছিলেন অগণিত। আর্মেনিয়ান বাগরাতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আশোট (৮৮৫-৮৯০ খৃ.?)– ও খারথলিয়ার ঘটনাবলীতে হস্তক্ষেপ করেন (Brosset, ১খ, পৃ. ২৭০, নোট ১২)। মাসঊদী, মসজিদ যুল-কারনায়ন (মতসখেতা)-কে জুরজান-রাজের বাসা হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন [আল-তানবাগী, Marquart কর্তৃক নিপুণভাবে সংশোধিত, পূ. গ্র., পৃ. ১৮৬, আর্মেনিয়ান মামবাগি মামপহালি, একটি জর্জিয়ান টাইটেল]।

সাজিদীয়, সালারীয় ও শাদ্দাদীয়ান ঃ ইতিমধ্যে সাজিদীয়গণ বাগদাদের আধিপত্য অর্জনকারী প্রথম মুসলমান রাজবংশ হিসাবে আযারবায়জানে আত্মপ্রকাশ করে (২৭৬ অথবা ২৭৯-৩১৭ সন; তু. অত্র নিবন্ধ এবং R. Vasmer ও মোনেতাখ সাজিদোও. ইযওএসটিআ, অবশচ, ইয়ুচ আযেরব, বাকু ১৯২৭ খৃ., নং ৫, পৃ. ২২-৫১)। আবুল-কাসিম য়ূসুফ উত্তরাঞ্চলের বিচ্ছিন্ন অবস্থাগ্রস্ত মুসলমানদের সহায়তায় আগাইয়া আসেন। ৯১২ খৃ.-এ (?) তিনি তিফলিসে আগমন করেন যাহার আমীর ছিলেন জাফার ইবন আলী (তু. নিম্নে) এবং উজারমো ও বোচ ওরমা (উচ্চতর ইওরাতে) দুর্গ দখল করেন (তু. Brosset, ১খ, পৃ. ২৭৫, নোট ২)। সাজ নামে অভিহিত সারাচেনগণের আরও একটি অভিযানের (৯১৮ ও ৯২৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে) বর্ণনা ইতিহাসে রহিয়াছে যাহার ব্যাপ্তিকালে মতসখেতা দখল করা হয়। এই সমস্ত অভিযানের বিষয়ে মুসলমান সূত্রগুলি নীরব। ইহার অব্যবহিত পরেই ইতিহাসে সালীরীয়গণের [দ্র.] আবির্ভাব ঘটিয়াছে বারযাআ ও আযার-বায়জানে।

বাগরাত ৩ ও বাগরাত ৪ ঃ পরপর অনেকগুলি রাজত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি সন্দেহ প্রদর্শন করে যতদিন পর্যন্ত না রাজা বাগরাত ৩ (৯৮০-১০১৪ খৃ.?) খারথলিয়া, আবখাযিআ, তাও (চওরোখে) ও আরদানুজকে পুনঃ একত্রীকরণ করেন। তাঁহার সময়ে শাদ্দাদীয় [দ্র.] ফাদলুনগণ আর্মেনিয়া আক্রমণ করেন কিন্তু জর্জিয়গণ কর্তৃক পরাজিত হন। মতসখেতা সর্বদাই রাজকীয় শহরের মর্যাদা লাভ করিয়াছে যদিও শাসনকর্তাগণ কুতাঈ-এ (খুতহাতহিসি)-বসবাস করিতেন। ১০৩০ (১৬২০) সালে জর্জিয়ান ও কাখেথিয়ান অভিজাতগণ তিফলিসের আমীর জাফারের সহযোগিতায় শাদ্দাদীয় ফাদলোন (গানজার ফাদলুন)-এর বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু যখন শেষোক্তের ইনতিকাল ঘটে তখন লিপারিত, ওরবেলিআনি, তহরিআলেতহ (উচ্চতর খরামে)-এর শক্তিশালী নৃপতি কৌশলে জাফারকে পরাজিত করেন এবং শুধু যুবরাজ চতুর্থ বাগরাত (১০২৭-১০৭২ খৃ.), যিনি স্পষ্টতই চাহেন নাই যে, ভয়ঙ্কর লিপারিত কর্তৃক তিফলিস সংযোজিত হউক, তাঁহার আবেদনক্রমে জাফারকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। জাফারকে তিফলিসে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু দুই বৎসর পরে রাজা নিজেই তিফলিস অবরোধ করেন। অবরোধটি দুই বৎসর কাল স্থায়ী হয় যখন আকস্মিকভাবে রাজা লিপারিত-এর পরামর্শক্রমে জাফারের সহিত শান্তি স্থাপন করেন। শেষোক্তের ইনতিকালের পর তিফলিসের মুরব্বীগণ (ber) শহরের চাবিগুলি বাগরাতকে প্রদানের প্রস্তাব করেন যিনি দার আল-জালাল দুর্গ ও দ্বৈত টাওয়ার্স টসকালকিন এবং তহাবের দখল করিয়াছিলেন (তু. নিম্নে প্রদত্ত তিফলিসের বিবরণী)। যাহা হউক, কুর-এর বাম তীরস্থ ইসান কোয়ার্টারের বাসিন্দাগণ সেতুটি ভাঙ্গিয়া দেন এবং বাগরাত তাঁহার বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ অস্ত্রগুলি তাহাদের উপর তাক করিতে বাধ্য হয়।

সালজূকগণ ঃ ১০৪৮ খৃস্টাব্দের ইবরাহীম য়ানাল (জর্জিয়ার বাহরাম-লাম)-এর সোনাবাহিনী প্রথমবারের মত বাসিয়ান (আরাক্যে-এর উর্ধ্বতর জলরাশিস্থ সিন)-এ উপনীত হন। ১০৫৩ খৃ. (?)-তে সালজূকগণ গানজার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু চতুর্থ বাগরাতের বায়যানটাইনে মিত্রবর্গের পাল্টা আন্দোলনের ফলে শহরটি রক্ষা পায়। অতঃপর তিফলিসের জনগণ বাগরাতকে পুনরায় আক্রমণ করেন। কিন্তু লিপারিতে ষড়যন্ত্রের ফলে বায়যানটাইনগণ বাগরাতিকে তিন বৎসর যাবৎ কনস্টান্টিনোপলে বন্দী করিয়া রাখেন। তারপর বাগরাত তাঁহার দুর্গের বৃহদাংশ পুনরুদ্ধার করেন, যখন অতর্কিতে আলপ আরসলান (১০৬৩-১০৭৯ খৃ.) জর্জিয়া আক্রমণ করেন (Brosset, ১খ, পৃ. ৩২৬)। ১০ ডিসেম্বর, ১০৬৮ সনে আলপ আরসলান আর্মেনিয়া ও কাখেথিয়া (আস-সারতহান, গাগিকের পুত্র, কোবিক-চিহোরেপিনচোপি] রাজবংশসম্ভূত যাঁহারা ৭৮৭ খৃ. হইতে ১১০৫ খৃ. পর্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন)–এর রাজগণ এবং তিফলিসের আমীর সহযোগে বাগরাতের বিরুদ্ধে অগ্রসর করেন। সম্পূর্ণ খারথলিয়া দখল করা হয় এবং অনেক খৃস্টানকে হত্যা কিম্বা বন্দী করা হয়। শাদ্দাদীয়গণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তিফলিস ও রুসতাও গানজার ফাদলূনকে প্রদান করা হয় এবং আনী মানুচিহর ইব্‌ন আবুল-আসওয়ারকে প্রদান করা হয়। ১০৬৯ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে বাগরাত খারথলিয়াতে ফিরিয়া আসেন। ফাদলুন ঈসান-এ (বাম তীরবর্তী একটি উপশহর) শিবির স্থাপন করেন এবং ৩৩,০০০ লোকসহ দেশটিতে লুটতরাজ চালান। বাগরাত ফাদলুনকে পরাজিত করেন। পরাজিত ফাদলুন কাখেথিয়ার মধ্য দিয়া বিস্তৃত রাস্তা ধরিয়াছিলেন। কিন্তু আগসারতহান তাঁহাকে বন্দী করেন। ইওরা তীরবর্তী কতিপয় দুর্গের অধিকার প্রদান মূল্যে বাগরাত ফাদলুনের নিকট হইতে মুক্তিপণ হিসাবে তিফলিসের আত্মসমর্পণ আদায় করেন, যেইখানে ইতিমধ্যে জনৈক সিথলারাবা (সায়্যিদ আল-আরাব?) নিজেকে আমীর হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ আলপ আরসালান ফাদলুনের মুক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিওরজি ২. বাগরাতের পুত্র (রাজত্বকাল ১০৭২-১০৮৯ খৃ., জীবনকাল ১১২৫ খৃ. পর্যন্ত) কুতাঈসে বসবাস করিতেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার শর্তাধীনে আগসারথান তাঁহার কাখেথিয়াস্থ সম্পত্তি ভোগ-দখলে রাখার অনুমতি পান।

দাবিদ ২ঃ পুনরুজ্জীবনটি ঘটে দ্বিতীয় দাবিদগণ ২-আগ-মাশিনেবিলি (পুনঃস্থাপক)-এর অধীনে যিনি খারথলিয়া এবং আবখাযিয়ার রাজা উপাধি গ্রহণ করেন (১০৮৯-১১২৫ খৃ.?) দাবিদগণ আলানস (দারিআল)-এর গিরিপথে ৪০,০০০ কিপচাক (পোলোভতসি) এবং খৃস্টধর্মে দীক্ষিত ৫,০০০ ক্রীতদাসকে জর্জিয়াতে আনয়ন করেন। তাহাদের বেআইনী কার্যকলাপ সত্ত্বেও (Brosset) পূ. গ্র., পৃ. ৩৭৯) এই সমস্ত যুদ্ধংদেহি ব্যক্তি দাবিদকে সালজূক আধিপত্য দূরীকরণে সক্ষম করিয়া তোলেন। তিনি খারাজ পরিশোধের পরিসমাপ্তি টানেন এবং জর্জিয়াতে তুর্কীগণের মৌসুমী অভিবাসন বন্ধ করিয়া দেন। তিনি তাঁহার কন্যা তহামারকে শীরওয়ানশাহ (দ্র.) আখসিতান (জর্জিয়ান আগসারথান)-এর সহিত বিবাহ দেন এবং জামাতাকে তাঁহার সামন্ত হিসাবে ব্যবহার করেন।

৫১৫/১১২১ সনের তিফলিস বিজয় ঃ তিফলিসের মুসলমানগণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সালজূক মাহমূদ ইবন মুহাম্মাদ (১১১৮-১১৩১ খৃ.) জর্জিয়াতে একটি অভিযান প্রেরণ করেন যাহাতে উরতুকিয় নাজমুদ-দীন গাযী, মায়্যাদীয় দুবায়স ইবন সাদাকা (গেওরগিয়ান ইতিহাসের দুরবেয) এবং সুলতান তুগরিল (আল-আররান ও নাখচিওয়ান-এর লর্ড)-এর ভ্রাতা তাঁহার আতাবেগ কুন-তোগদীসহ সকলেই অংশগ্রহণ করেন। ১৮ আগস্ট, ১১২১ খৃস্টাব্দে এই সেনাবাহিনী গারিয়ালেতহ্ ও মাঙ্গলিসে প্রবেশ করে। কিন্তু দাবিদ ও তাঁহার কিপচাকগণ কর্তৃক তাহাদিগের ধ্বংস সাধিত হয়। অতঃপর ৫১৫/১১২১-১১২২ সনে দাবিদগণ অতর্কিতে তিফলিস আক্রমণ করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শরহটিকে চিরকালের জন্য একটি অস্ত্রাগার এবং তাঁহার পুত্রগণের জন্য রাজধানী করা (Brosset, ১খ, পৃ. ৩৬৫-৩৬৭ এবং Additions, ১খ, পৃ. ২৩০, ২৩৬-২৪১; তু. ইবনুল-আছীর, ১০খ, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯ [Defremery, Fragments, পৃ. ২৬] কামালুদ-দীন, তারীখ হালাব, Recueil des hist. descroisades-এ, ৩খ, পৃ. ৬২৮; য়াকূত, ১খ, পৃ. ৮৫৭, তিফলিস)। আরব ঐতিহাসিক আল-আয়নী (১৩৬০-১৪৫১ খৃ.), যিনি এমন সব সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন যেইগুলির অনেকগুলি এখন আর পাওয়া যায় না। Brosset (১খ, পৃ. ২৪১) স্বীকার করেন যে, তিফলিস অগ্নিদগ্ধ ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যান্য সূত্র যাহা দাবিদকৃত নৃশংসতা (Matth. of Edessa in Brosset, Add. ১খ, পৃ. ২৩০)-এর উপর গুরুত্বারোপ করিয়াছে, তাহার প্রতিকূলে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নৃপতি মুসলমানগণের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন, এমন কি মুসলিম শাসনকর্তাগণ যেইরূপ করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে। অধিকন্তু কথিত আছে যে, দাবিদ মুসলিম পৌরাণিক কাহিনীমালা অবলম্বনে মুদ্রাদি প্রস্তুতকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজন্যের মুদ্রাদি (তু. পাখোমোও, মোনেতী ইত্যাদি, পৃ. ৭৭-৮১) কুমারী মাতা মেরীর মূর্তিসমন্বিত। মুসলমানগণের সহিত এই মুদ্রা ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। কারণ জর্জিয়ান ইতিহাসের স্বীকৃতি অনুসারে মুসলমান ও খৃস্টানগণের মধ্যে তৎকালেও অত্যন্ত তিক্ত লড়াই চলিতেছিল (তু. Brosset, ১খ, পৃ. ৩৮০)।

বানূ জা'ফারগণ ঃ তিফলিসে দাবিদ বানূ জা'ফারের উত্তরাধিকারী হন। বানূ জা'ফারগণ আরব, নাকি সম্পূর্ণরূপে কোন জর্জিয়ান বংশোদ্ভূত, সেই বিষয়ে কিছু জানিতে পারা যায় নাই। যেখানে Georgian Chronicle (১খ, পৃ. ৩৬৭)-এ তিফলিসে মুসলিম রাজত্বকাল ৪০০ বৎসর বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে, সেইখানে আল-আয়নী শুধু বানূ জা'ফারগণের রাজত্বকালই দুই শত বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখি যে, ৩০০/৯১২ সনেই তিফলিসের আমীর জা'ফার [ইবন আলী] নামে অভিহিত ছিলেন (Brosset, ১খ, পৃ. ২৭৫)। তাঁহার উত্তরসূরি তিফলিসে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন; ৩৪২ হি. এবং ৩৪৩ হি. সনে মুদ্রিত মানসূর ইবন জা'ফার (খলীফা আল-মুতী' লিল্লাহ-এর নামসহ) এবং ৩৬৪, ৩৬৬ হি. সনে মুদ্রিত জা'ফার ইবন মানসূর (আল-তাই' লিল্লাহ্)-এর দিরহামসমূহের বিষয়ে অবগত হওয়া গিয়াছে। ৪র্থ বাগরাত (১০২৭-১০৭২ খৃ.)-এর আমলে তিফলিসের আমীর ছিলেন জা'ফার (তাঁহার পিতা আলী বলপূর্বক মতসখেতার সওএতি-তসখোত্রলি গির্জার সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছিলেন)। Chronicle-এ তিনি মুখাথ গওএরদ জা'ফার নামে পরিচিত (মুখাথ গওএরদ, মতসখেতা-এর নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম)। দাবিদ কর্তৃক তিফলিস জয়ের পূর্ববর্তী ৪০ বৎসর ধরিয়া শহরটি বানূ জা'ফার পরিবারের যুবকগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল, যাঁহাদের প্রত্যেকেই পালাক্রমে একমাস যাবৎ ক্ষমতায় থাকিতেন (আল-আয়নী)।

শক্তিশালী রাজন্যবর্গ ঃ দিমিতরি-এর রাজত্বকাল (১১২৫-১১৫৪ খৃ.) ওরবেলিয়ানি পরিবারের সহিত একটি গৃহযুদ্ধে আচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার সমসাময়িক মুসলমান শানসকর্তাগণ ছিলেন ঃ আযারবায়জানে আতাবেগ ইলদিগিয (জর্জিয়ায় ইলদিগুয); আনীতে শাদ্দাদীগণের অল্পবয়স্ক বংশধরগণ, খিলাতের জাহীরুদ-দীন শাহ-ই আরমান (১১২৮-১১৮৩ খৃ.) এবং এরযেরুমে আমীর সালতুক ইবন আলী যাঁহাকে জর্জিয়ানগণ ৫৪৮/১১৫৩ সনে আনীর নিকটে পরাজিত করেন তু. ইবনুল-আছীর, ১১খ, পৃ. ১২৬; উপসন ৫৪৮ (১১৫৭); মুনেজ্জিম-বাশী, ২খ, পৃ. ৫৭৭; Defremery, Fragments, পৃ. ৪০)। দিমিতরি-ই, গানজাতে ১১৩৯ খৃস্টাব্দের ভূমিকম্পের সুযোগ গ্রহণপূর্বক এই শহরের বিখ্যাত লৌহ ফটক বলপূর্বক অপহরণ করিয়া গেলাথিয় সন্ন্যাসীর মঠে লইয়া যান (তু. Frachn, Mem, Ac. St. Petersbourg, ৭ম সিরিজ Sc. morales, ৩খ, পৃ. ৫৩১)। ৫৪৮/১১৫৩ সনে তিফলিস সফরকারী মায়্যাফারিকীনের [দ্র.] ঐতিহাসিক ইব্নুল-আযরাক তিফলিসের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। দিমিরি প্রতি শুক্রবারে মসজিদে আগমন করিতেন এবং খাতীবের বিপরীতে একটি উচ্চাসনে (দাক্কা) উপবেশন করিতেন (তু. আমেডরোয, Three Arabic MSS., F. R. A. S., ১৯০২ খৃ., পৃ. ৭৯১, আল-আয়নী কর্তৃক ব্যবহৃত সূত্র আল-আযরাক হইতে পারেন)।

তৃতীয় গিওরগির (১১৫৬-১১৮৪ খৃ.)-এর অধীনে জর্জিয়ার চতুর্দিকস্থ মুসলিম রাজতন্ত্রগুলি অপরিবর্তিত রহিয়া যায় এবং রাজা এরযেরুম, আনী, দাওঈন, নাখচিওয়ান, গানজা, বারযাআ ও বায়রাকান-এর বিরুদ্ধে দুর্ধর্ষ অভিযানসমূহ পরিচালনা করেন। গিওরগির ফুফু থামারের পুত্র শীরওয়ান শাহ আখসিতানের সাহায্যার্থে রাজা দারবানদ পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন (তু. Brosset, ১খ, পৃ. ৩৮৩-৪০৩ ও Add., ১খ, পৃ. ২৫৩-২৫৭, ২৬৬; ইব্নুল-আছীর, ৫৫৬-৫৫৭, ৫৫৯, ৫৬১, ৫৬৯ হি. সন)।

থামার (১১৮৪-১২১১ অথবা ১২১২ খৃ.) অর্থাৎ খরথলিয়া-র সূর্য-এর রাজত্বকাল জর্জিয়ার ইতিহাসের সর্বোচ্চ সীমা প্রাপ্তি নির্দেশ করে। এক্ষণে ইহা কঠিন সব পরীক্ষার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইল। সালজূক-রাজকে শান্তিচুক্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়া খৃস্টান নৃপতি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ইহাকে মুসলিম সামন্তবর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখেন। ত্রেবিযোনদের চোরমেনোই-এর সাম্রাজ্যের উদ্ভবে থামার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন (Kunik, Osnov. Trapez, Imperii v 1204, Ucen, Zap. Akad. Nauk, ১৮৫৩ খৃ., ২খ, পৃ. ৭০৫-৭৩৩)। এরযেরুম ও ফরযিনজান হইতে যুদ্ধ পরিচালনাকারী সৈন্যগণ আযারবায়জানের ইলদিগিযিগণকে পরাজিত করেন। জর্জিয়ানগণ কর্তৃক আরদাবীলের পদচ্যুতির (Brosset, ১খ, পৃ. ৪৬৯-৪৭৩) বিষয়ে সিলসিলাত আন-নাসাব-ই সাফাবীয়াতে (বার্লিন ১৮৪৩ খৃ., পৃ. ৪৩) সমর্থন মিলে। তু. খানয়কোও, Mel, Asiatiques ১খ, ১৮৫২ খৃ., পৃ. ৫৮০-৫৮৩। Chronicle-এ ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, ১২১০-১২১২ খৃস্টাব্দে সুদূর রোমগুয়ারো (রামজার, নীশাপূরের সন্নিকটে) পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পারস্যের মধ্য দিয়া একটি অভিযান পরিচালিত হয়। কিন্তু তাবরীযের বাহিরে এই মার্চের পর্যায়সমূহ বেশ কাল্পনিক বলিয়া অনুমিত হয় (Brosset, ১খ, পৃ. ৪৬৯-৪৭৩),

মৃখারগরদযেল পরিবারের (কুরদ বংশোদ্ভূত আর্মেনিয়ান; তু. Brosset, Add., ১খ, পৃ. ২৬৭) যাখারে ও ইওয়ানে নামক জেনারেলগণের উজ্জ্বল সাফল্য সত্ত্বেও জর্জিয়ান বিজয়সমূহ স্থায়িত্ব লাভ করে নাই এবং তাঁহার সকল বিজয়ের মধ্যে থামার শুধু কারস রক্ষা করিতে সক্ষম হন (Brosset, ১খ, পৃ. ৪৬৭)। স্বদেশেও (জাওয়াখেতি) সামন্ত প্রভুগণের উদীয়মান শক্তি রানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মুসলিম রীতিনীতি জর্জিয়াতে প্রবেশ করে; জেনারেল ইওয়ানেকে আতাবেগ উপাধি প্রদান করা হয় (সুল্‌তানদের মধ্যে ব্যবহৃত, Brosset: ১খ, পৃ. ৪৭৪)। থামারের রাজত্বকালে আমরা আবুল-হাসান, তিফলিস ও খারথলিয়ার আমীর-এর পুত্র গোযান নামক একজন বিদ্রোহীর কথা জানিতে পারি (ইহা কি বানূ জা'ফারদের কোন যুবা পুরুষ?)।

মোঙ্গলগণ থামারের পুত্র, গিওরগি ও লাশা (চমৎকার আবখাযিয়ান ভাষায়), যিনি ১২১২-১২২৩ খৃ. পর্যন্ত দেশ শাসন করেন, গানজা, নাখচিওয়ান, এরযেরুম (কারনুকালাক) ও খিলাত-এর খাজনা (খারাজ) আদায় করেন। কিন্তু ৬১৭/১২২০ সনে সুবুতায় ও জেবে (জর্জিয়ানে যুবা ও লামা অথবা চত্রবা)-এর মোঙ্গল সেনাবাহিনী পারস্যে উপনীত হন। জর্জিয়ানগণ কয়েকবার পরাজিত হন; Chronicle (Brosset, ১খ, পৃ. ৪৯৩) বেরদুজ (বরচালাতীরস্থ)-এ সংঘটিত পরাজয়কে এতকাল অপরাজেয় জর্জিয়ান সেনাবাহিনীর ভাগ্যের মোড় পরিবর্তনকারী হিসাবে বিবেচনা করা হইয়াছে।

গিওরগি আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। অতঃপর সিংহাসনের উত্তরাধিকারিনী হন তাঁহার ভগিনী রুসুদান (১২২৩–১২৪৭ খৃ.) [কিস-মালিক, মুসলমানগণের কুমারী নৃপতি, আমোদ-প্রমোদের প্রতি উৎসর্গীকৃত একজন সুন্দরী রাজকন্যা, মুসলিম প্রতিবেশিগণ যাহার পাণি প্রার্থনা করেন (Brosset, ১খ, পৃ. ৪৯৫)। পরিশেষে তিনি এরযেরুমের সালজূক-এর পুত্র মুগীছুদ-দীন তুগরিল (জর্জিয়ানে ওরতহুল)-কে পসন্দ করেন; শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার পিতার নির্দেশে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হন (ইবনুল-আছীর, ১২খ, পৃ. ২৭০ ঃ হাদিছাতুন-গারীবাতুন-লাম যুজাদ মিছলুহা)। রুসুদান কর্তৃক তৃতীয় পোপ ইনোসেন্ট-কে প্রেরিত পত্রে (যাহা ১২২৪ খৃ. রোমে পৌঁছে) নৃপতি মোঙ্গল আক্রমণকে একটি গুরুত্বহীন দুর্ভাগ্যজনক হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন, কিন্তু তখন একটি নব্য শত্রু উপস্থিত ছিল দ্বারপ্রান্তে।

শা'বান ৬২২/আগস্ট ১২২৫ সনে খাওয়ারিযম শাহ জালালুদ-দীন জর্জিয়ানগণকে গারনি-তে পরাজিত করেন (ইবনুল-আছীর, ১২খ, পৃ. ২৮৩; নাসাবী, সম্পা. Houdas, পৃ. ১১২; Brosset, Add., ১খ, পৃ. ৩০৯)। জর্জিয়ান অধিনায়ক শালওয়া (জুওয়ায়নী, ২খ, পৃ. ১৫৯; তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা)-কে বন্দী করা হয়। শহরে বসবাসকারী পারসিয়ানগণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ৯ মার্চ, ১২২৬ খৃস্টাব্দে তিফলিস বিজিত হয়। জুওয়ায়নীর মতে জালালুদ-দীন শহরের অধিবাসীবৃন্দকে রেহাই দেন এবং তাহাদিগকে আবখাযিয়াতে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেন। কিন্তু তিনি খৃস্টানদের সকল ধর্মীয় উপাসনালয় ভাঙ্গিয়া দেন। অপরপক্ষে ইবনুল-আছীর বলেন যে, শহরটিকে অতর্কিতে আক্রমণে দখল করা হয় (আনাওয়াতান ওয়া কাহরান মিন গায়র আমান) এবং যাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন নাই তাহাদিগেক হত্যা করা হয়। নাসাবীও (পৃ. ১২২) তিফলিসে সকল জর্জিয়ান ও আর্মেনিয়ানের বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন (তু. Brosset, ১খ., পৃ. ৫০৪-৫০৭)। প্রতিমন্ত্রী শারাফুল-মুলক-কে শহরটির গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। যখন তিনি গানজাস্থ সেনা-শীতাবাসে গমন করেন তখন জর্জিয়ানগণ তিফলিসে প্রত্যাবর্তনপূর্বক শহরটিতে অগ্নিসংযোগ করে; শহরটিতে তাহাদের দখল বজায় রাখা আর সম্ভব নহে, এরূপ অভিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই তাহারা ইহা করিয়াছিল (নাসাবী, পৃ. ১২৫)। অন্যত্র ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে জালালুদ-দীন ১২২৮ খৃ. পর্যন্ত জর্জিয়াতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই, যখন তিনি লোরের সন্নিকটে মিনদোরে (জর্জিয়াতে প্রান্তর) প্রধান সেনাপতি ইওয়ানের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করিয়া নানাদিকে বিতাড়িত করেন। ইওয়ানের এই শেষোক্ত সেনাবাহিনী ছিল বিচিত্র লোকবলসমন্বিত ঃ গেওরগিয়ান, আলান, আরমেনিয়ান, সারীর (দাগিস্তানের আওআর)-এর লোক, লাকয, কিপচাক; সওয়ান, আবখায, জানীত (চয়ান এতহি; তু. লায শীর্ষক নিবন্ধ), সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের লোক (তু. জুওয়ায়নী, ২খ., পৃ. ১৭০)। Georgian Chronicle (Brosset, ১খ, ৫১০) অনুসারে বোলনিস (মিনদোর?)-এ বিজয় লাভের পর জালালুদ-দীন তিফলিস নূতন করিয়া নৃশংসতা শুরু করেন।

মোঙ্গলগণের দ্বিতীয় আগমন ঃ ৬২৮/আগস্ট ১২৩১ সালে জালাদুন-দীন কার্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়ান। কিন্তু খাওয়ারিযমিগণের অবশিষ্টাংশরা জর্জিয়ার পূর্বাঞ্চলকে অশান্ত রাখেন ও সামন্ত প্রভুগণকে তাঁহাদের দুর্গসমূহে আবদ্ধ করেন। যাহা হউক, তিফলিস তখনও রুসুদানের দখলে ছিল, যখন জুরমাগানের মোঙ্গলগণ গানজা হইয়া জর্জিয়াতে প্রবেশ করেন। এই ঘটনা ঘটে ১২৩৬ খৃস্টাব্দে (Brosset, ১খ, পৃ. ৩৩৩; d'Ohsson, ৩খ, পৃ. ২৫ অনুসারে; আনু. ৬৩২/১২৩৫ সন)। রুসুদান কুতায়সের উদ্দেশ্যে তিফলিস ত্যাগ করেন এবং তিফলিসের গভর্নর শহরটিতে অগ্নিসংযোগ করেন (Brosset, ১খ, পৃ. ৫১৪; এইভাবে তিফলিস শহরের ধ্বংস সাধিত হয়)।

নোইনগণ, Chronicle-এ সর্বদাই যাহাদের চতুষ্টয়ের (চার-মাগান, চাগাতায়, ইত্তসের-ও বিচুয়) উল্লেখ রহিয়াছে, দেশটি দখলপূর্বক পুনঃস্থাপন করে। রুসুদানের শাসন শুধু রিওন উপত্যকায় আবদ্ধ ছিল।

মোঙ্গলগণ দেশটির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাঙ্গিয়া দেয়, জর্জিয়ানগণকে মোঙ্গল সার্ভিসে যোগদানে বাধ্য করা হয় (রুমের সালজূক, গিয়াছুদ-দীন-এর বিরুদ্ধে আলামূতের ইসমাঈলীগণের বিরুদ্ধে এবং বাগদাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানসমূহে)। দেশটিকে ছয়টি তুমানে বিভক্ত করা হয় এবং জর্জিয়ান সামন্ত প্রভুগণকে (মতহাওয়ার), যাঁহাদের জায়গীরসমূহের ভিতরে ইতিমধ্যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে নোইনদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে বাতুখানের নিকট, অতঃপর মঙ্গোলিয়াতে মহান খানের নিকট গমন করিতে হইত যেইখানে তাঁহারা বৎসরের পর বৎসর আবদ্ধ থাকিতেন। এই পদ্ধতিতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, দাবিদ (মোঙ্গলে নারিন 'চমৎকার' নামে অভিহিত)-কে দেশটি হইতে অপসারণ করা হয়। জনৈক এগারসলান মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে দেশটিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন (শুধু রাজ-নাম গ্রহণই তাঁহার বাকী ছিল; Brosset, ১খ, পৃ. ৫৪২), কিন্তু মোঙ্গলগণ তাঁহার বিরুদ্ধে গিওরগি লাশার পুত্র দাবিদকে মতসখেতার অধীশ্বররূপে দাঁড় করান। ইহাদের মধ্যে ৬৪৩/১২৪৫ সনে গুয়ুক খানের কুরুলতায়তে উপস্থিত দাবিদদ্বয়-এর বর্ণনাও প্রদান করা হইয়াছে (তু. জুওয়ায়নী, ১খ, পৃ. ২০৫-২১২; রাশীদুন-দীন, সম্পা. Blochet, পৃ. ২৪২)। মোনঙকের ক্ষমতাপ্রাপ্তির (১২৪৮-১২৫৯ খৃ.) পরে জর্জিয়াতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক তাঁহারা প্রথমে একত্রে দেশ শাসন করেন।

যেহেতু হুলাগু দাবিদ নারিনকে পসন্দ করিতেন না, সেহেতু শেষোক্ত ব্যক্তি আবখাযিয়াতে পলায়ন করেন। Chronicle-এ উল্লেখ করা হইয়াছে, এইভাবে আমাদের দেশটি দুইটি রাজ-শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়" (Brosset, ১খ, পৃ. ৫৪৬)। পূর্বে জর্জিয়াতে দুইজন অধিরাজ ছিলেন ঃ একপক্ষে বাতুখান ককেসাসের উত্তরস্থ দেশটির প্রভু, জর্জিয়ার উপরে তাঁহার কর্তৃত্ব বিস্তৃত করিতে আগ্রহী ছিলেন; অপরপক্ষে পারস্যের ঈলখানগণ, ইহার উপরে তাহাদের অধিকার প্রয়োগ করিতেন। লাশার পুত্র দাবিদ মোঙ্গল কর সংগ্রাহক খোজা আযীয (রাশীদুদ-দীন, সম্পা. Quatremere, পৃ. ৩৯৫ তাঁহাকে জর্জিয়ার গভর্নরগণের মধ্যে একজন হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন)-এর বলপূর্বক খাজনা আদায়ে কুপিত হইয়া তাঁহার ফুফাত ভাইয়ের নিকট পলায়ন করেন এবং নোইন, ওয়রাত আরগুন তিফলিস অধিকার করেন। একটি পুনর্মিলনী হয় শুধু তখন, যখন লাশার পুত্র হুলাগুর পাশাপাশি থাকিয়া ১২৬২ খৃষ্টাব্দে শারওয়ান আক্রমণকারী বাতুর উত্তরসূরি বেরকের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন (d' Ohsson, ৩খ, পৃ. ১৮২)। আবাগার রাজত্বকালে বেরকে ট্রান্স-ককেসিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তিফলিসে পৌঁছান, যেইখানে কতিপয় খৃষ্টানকে হত্যা করা হইয়াছিল (১২৬৬ খৃষ্টাব্দ; তু. ঐ, পৃ. ৪১৮)।

লাশার পুত্র দাবিদগণের উত্তরসূরি হন তাঁহার পুত্র ২য় দিমিতরি (১২৭৩-১২৮৯ খৃ.) যিনি আবগা ও আহমাদের অসংখ্য অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু আরগুনের রাজত্বকালে তাঁহার সঞ্চিত ধনাদি বাজেয়াফত করা হয় এবং ওরদুতে পায়ের তলায় বেত্রাঘাত করত তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়। জর্জিয়ানগণ তাঁহাকে তহাও-দাদেবুলি নামে অভিহিত করেন, "যিনি তাঁহার মস্তক উৎসর্গ করিয়াছেন"।

মোঙ্গলগণ আরও কতিপয় রাজন্যকে মনোনীত এবং অতঃপর তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ৬ষ্ঠ দীওঁজ (১২৯২-১৩১০ খৃ.), বাতু (ওতাখা-তোখতৌগু) পরিবারের খানের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার ব্যর্থ প্রয়াস চালান। তাঁহাকে গাযানের নিকট একদল রাজদূত প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, যাহাতে ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিকগণ ও তিফলিসের কাদী (তু. Brosset, ১খ, পৃ. ৬১৫; এই শেষোক্ত বর্ণনা গাযানের ক্ষমতা প্রাপ্তির ফলে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের প্রমাণ)। জর্জিয়ানগণ মোঙ্গলদের সকল সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখেন। তৎসত্ত্বেও ইহা কখনও তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন (তু. গাযান-এর রাজত্বকালে মুসলিম নোইন নাওরোয-এর কার্যকলাপ, Brosset, ১খ, পৃ. ৬১৭) কিম্বা তাহাদিগকে ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই (উদাহরণস্বরূপ ১৩০৭ খৃষ্টাব্দের গীলান অভিযানের পরবর্তীতে)।

৫ম গিওরগি ঃ উলজায়তুর ইনতিকাল (১৩১৬ খৃ.)-এর পর ৫ম গিওরগি (বরাতসকিনওয়ালে, "দীপ্তিমান") আমীর চোবানের পৃষ্ঠপোষকতায় সিংহাসন লাভ করেন (১৩১৬-১৩৪৬ খৃ.)। মোঙ্গলদিগকে বিতাড়িত করিয়া ঈলখান রাজবংশের অন্তিম বর্ষসমূহের গোলযোগগুলি দ্বারা গিওরগি লাভবান হইয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহিগণকে নির্মূল করেন, তাঁহার সেনাবাহিনীর সহিত ইমেরেতেহিয়াতে গমন করেন এবং তাঁহার শাসনাধীনে কেবল সপের (অধুনা ইসপির) পর্যন্ত সুবিস্তৃত জর্জিয়ান ভূখণ্ডসমূহই নয়, বরং নিকোফেসিয়া (কৃষ্ণ সাগরস্থ সুখুম হইতে ১৫ মাইল) হইতে দারবান্দ পর্যন্ত সকল ভূখণ্ডকেও সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

তীমূর ঃ ৫ম বাগরাত (১৩৬০-১৩৯৫ খৃ.)-এর রাজত্বকালে তীমূরের অভ্যুদয় ঘটে। তাঁহার রাজত্বকালের দাফতরিক ঐতিহাসিক তাঁহার জর্জিয়া অভিযানকে একটি জিহাদ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ৭৮৮/১৩৮৬ সালের শীতকালে তীমূর কারস হইতে যাত্রা শুরু করেন (জাফারনামা, ১খ, পৃ. ৪০১) ও বাগরাত তিফলিসের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শহরটিকে দখল করিয়া রাজা ও রানীকে বন্দী করা হয়। Chronicle ও Thomas of Metsoph (Neve. Expose, পৃ. ৩৭) রাজার স্বধর্ম ত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে একটি চতুর কৌশল হিসাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে যাহা তাঁহাকে তীমূরের ১২,০০০ সৈন্য নির্মূল এবং তাঁহার ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারে সমর্থ করিয়াছিল। ১৩৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। জাফারনামা, ১খ, ৭০৫, ৭২০ এই সমস্ত বিবরণী প্রদান করে না। ৭৯৬/১৩৯৪ সালে তিনি শুধু উল্লেখ করিয়াছেন যে, আখাল-তসিখে (আখিসখা দ্র.) গাযান আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যে তথায় চারজন জেনারেলকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। পরিশেষে তীমূর কারা- কালকানলীক (যুদ্ধে আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য কালো রংয়ের ছোট ঢালসহ" জর্জিয়ান পর্বত আরোহিগণ, পাশাওগণ ও খেওসুরগণ) নামে অভিহিত জর্জিয়ানগণকে সংশোধনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন এবং তিফলিস হইয়া শেক্কী [দ্র.]-তে প্রত্যাবর্তন করেন।

৭৯৮/১৩৯৫ সালে গেওরগিয়ানগণ শেক্কী [দ্র.]-তে সীদী আলীর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তীমূরীয় মিরান শাহের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। শেষোক্ত শাহ আলিনজাক (নাখচিওয়ান-এর সন্নিকটে) অবরোধ করিতেছিলেন এবং সুলতান তাহির জালাইরকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যিনি ইহাতে আবদ্ধ ছিলেন (ঐ, ২খ, পৃ. ২০৩)। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয় ৮০২/১৩৯৯ সনে, যখন তীমূর শেক্কী দখল করেন এবং নির্দয়ভাবে খিমশা (?)-এর পাহাড়ীয় ঢাকা দীর্ঘ, সংকীর্ণ গিরিসংকট লুণ্ঠন করেন। শেষোক্ত স্থানটি সম্ভবত উত্তর কাখেথিয়াতে অবস্থিত ছিল, যেইখানে একটি খিমশিয়া পরিবার তহিওনেথির পূর্বদিকে মারেলিতে একটি জায়গীর দখল করিয়াছিল (Brosset, ইখ/২, পৃ. ৪৬৪)। ১৪০০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তীমূর তিফলিসে অগ্রসর হন এবং রাজা গিওরগি (গুরগীন)-এর নিকট হইতে সুলতান তাহিরের প্রত্যর্পণ দাবি করেন। একটি ছলনাপূর্ণ জওয়াব প্রাপ্ত হইয়া তীমূর দেশটিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করেন (ঐ, ২খ, পৃ. ২৪১)। তিফলিসে একটি খুরাসানিয়ান গ্যারিসন স্থাপিত হয়। কিন্তু গিওরগি পুনরায় পার্বত্যঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করেন। জানীবেগ নামক একজন জর্জিয়ান যুবরাজের স্বেচ্ছাভিত্তিক আত্মসমর্পণ এবং যারীত (?)-এর দুর্গ দখলের পর তীমূরের সেনাবাহিনী গিওরগির পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং সওয়ানেথিয়ার ধ্বংসসাধন করেন। গিওরগি আবখাযিয়াতে প্রবেশ করেন এবং তাহিরকে এশিয়া মাইনরে ফেরত পাঠান। ইসমাঈল নামক একজন মুসলমানের মধ্যস্থতায় (Brosset, ১খ, ৬৬৮) তিনি তীমূরকে খারাজ পরিশোধের প্রস্তাব দেন। তীমূর প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। পরে গিওরগিয়ান ইওয়ানে (সামতসখের আতাবাক) ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয় এবং কারা-কালকানীক ভূখণ্ডে লুটতরাজ চালানো হয়। কারস-এর সন্নিকটে অবস্থিত মিনগোল (১,০০০ হ্রদ)-এর গ্রীষ্মাবাসে দুই মাস বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি জর্জিয়ানদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন; যাঁহারা ফারাসগিরদে কেন্দ্রীভূত হন (Phanaskert, চওরোখের উজানে; ঐ, ২খ, প. ২৫০)।

৮০৪ (১৪০১-এর শেষ) সনে তীমূর সীওয়াস, বাগদাদ ও তাবরীয হইয়া ট্রান্সককেসিয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার ডেলিগেটগণ (মুহাসসিল) গিওরগির নিকট হইতে খাজনা (সাও ওয়া খারাজ ওয়া জিয়য়া) আদায় করিতে যান। গিওরগি তাঁহার ভ্রাতাকে দিয়া উক্ত কর প্রেরণ করেন। তীমূর গিওরগিকে আমান প্রদান করেন, তবে শর্ত

থাকে যে, তিনি সেনা সরবরাহ করিবেন এবং মুসলমানদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবেন (ঐ, ২খ, পৃ. ৩৭৯)। ৮০৪/১৪০২ সনের গ্রীষ্মকালে তীমূর কারাবাগ হইতে মিনাগোলে গমন করেন এবং জনৈক তাগী (?)-এর লেফটেন্যান্ট কুরজীক কর্তৃক দখলীকৃত তোরতুম দুর্গ অধিকার করেন।

যখন ৮০৫ হিজরী সনে তীমূর এরযেরুমে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তিনি বায়াযীদের উপরে তাঁহার বিজয়ের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে না আসায় গিওরগিকে শাস্তি প্রদানের মনস্থ করেন। মিনগোলে ইওয়ানে, আক-বুগার পুত্র উপঢৌকনসহ উপস্থিত হন, সেইরূপ করিয়াছিলেন কুসতানদীল (কনস্টান্টাইন), গিওরগির ভ্রাতা, যিনি তৎকালে তাঁহার ভ্রাতার সহিত বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন (ঐ, ১খ, পৃ. ৫১২)। শীরওয়ানের শায়খ ইব্‌রাহীম গেওরগিআ-র রাজস্ব ও করের হিসাবের জন্য প্রেরিত হন (ঐ, ২খ, পৃ. ৫২১)। গিওরগি নূতন উপঢৌকন সামগ্রী প্রেরণ করেন কিন্তু উহা প্রত্যাখ্যাত হয়; গিওরগি ব্যক্তিগতভাবে তীমূর সম্মুখে উপস্থির নির্দেশপ্রাপ্ত হন। ৮০৬/আগস্ট ১৪০৩ সালে তিনি নিজে নাযাল অথবা নায়ত আন কর্তৃক প্রতিরক্ষিত কূরতীনের দুর্ভেদ্য দুর্গটি অবরোধ করেন (Chrornicle ইহাকে আলগেত তীরবর্তী বিরথলীস নামে অভিহিত করিয়াছেন) এবং নয় দিনে ইহা দখল করেন (ঐ, ২খ, পৃ. ৫২৪-৫৩২)। সেনাবাহিনী অতঃপর জর্জিয়ার চতুষ্পার্শ্বস্থ (আতরাফ) দেশটিতে লুটতরাজ চালায় এবং তাহাদের এই কার্যকলাপ সুদূর আবখাযিয়ার সীমান্ত (হুদূদ) পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ঃ "যাহা এই দেশটির শেষ প্রান্ত"। ৭০০ শহর ও গ্রামকে ধ্বংস করা হয়। তীমূরের ঐতিহাসিক এই বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের উপর তাহার বাগ্মিতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইয়াছেন (২খ, ৫৩৬)। তীমূর ইহা বন্ধ করেন শুধু তখনই, যখন উলামা ও মুফতী আমান মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। গেওরগিয়ানগণ তীমূরের নামাঙ্কিত ১,০০০ স্বর্ণ-তামগা, ১,০০০ অশ্ব, ১৮ মিছকাল ওজনের একটি পদ্মরাগ-মণি ইত্যাদি তীমূরকে প্রেরণ করেন।

তীমূর তিফলিসের ভিতর দিয়া অগ্রসর হন। তিনি সেইখানকার সন্ন্যাসীদের সকল মঠ ও গির্জা ধ্বংস করিয়া পরিশেষে বায়লাকানে গমন করেন (১৪০৩-১৪০৪ খৃস্টাব্দের শীতকাল)। বায়লাকান হইতে ত্রাবিযোন্দ পর্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড যুবরাজ খালীল মীরযাকে তাঁহার ভরণপোষণের সংস্থান হিসাবে প্রদান করা হয় (২খ, পৃ. ৫৪৫)।

তীমূরী পরবর্তীকাল ঃ তীমূরকৃত ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সাধারণ বিশৃংখলা Chronicle-এর সেই অংশে প্রতিফলিত হইয়াছে, যেইখানে বিভিন্ন রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করা হইয়াছে। মুসলিম সূত্রাদিতে (মাতলা' আস-সা'দায়ন, N, E., ১৪খ, পৃ. ২৩৫ ও মীরখান্দ, তু. Defremery, Frarngents, পৃ. ২৪৫) কারা-কোয়ুনলু কারা য়ূসুফ-এর বিরুদ্ধে জালাইর রাজবংশের জনৈক মিত্র শীরওয়ানের শায়খ ইবরাহীমের একটি অভিযানের বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে যাহাতে গুরজিস্তানের রাজা কুসতানদীল অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মিত্রবাহিনী আরাক্সেসের উত্তরে পরাজিত হয় এবং কারা য়ূসুফ নিজ হাতে কুসতানদীলকে হত্যা করেন। ৮১৫/১৪১২-১৪১৩ সনে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। অধিকন্তু ৩০০ আযনাউরস (জর্জিয়ান অভিজাতবর্গ; তু. আরমেনিয়ান আযন "জনগোষ্ঠী")-কে বধ করা হয়। ওয়াখুশ্‌ত (Brosset, ১খ, পৃ. ৬৮৯) একাই কনস্টান্টাইনকে রাজা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মৃত্যুর সাল নির্দেশ করিয়াছেন ১৪১৪ খৃ.। ১৪১৩ (১৪১৬ খৃ.)-তে আখাল-তসিখের পারসিয়ানগণের (মুসলমানগণের) আমন্ত্রণক্রমে কারা য়ূসুফ এই অঞ্চলটি আক্রমণ করেন এবং ইহার ধ্বংসসাধন করেন (Thomas of Metsoph; তু. Neve, পৃ. স্থা., পৃ. ৯৬; Brosset, Add., ১খ. পৃ. ৩৯৯)। Chronicle-এ স্বীকার করা হইয়াছে যে, আলেক্সাণ্ডারের (১৪১৩-১৪৪৩ খৃ.) ক্ষমতা লাভের পূর্বে কোন স্থান হইতে কোন সান্ত্বনা প্রদানকারীর উদয় ঘটে নাই। এই নৃপতি বিদ্রোহিগণকে ক্রমান্বয়ে বিতাড়িত করেন, (মতসখেতাতে) স্বোতি তসখোওএলি গির্জা পুনঃ স্থাপন করেন এবং দুর্গসমূহের সংস্কার সাধন করেন। জর্জিয়ান দূতগণ, যাঁহারা ৮২৩/১৪২০ সনে কারাবাগে শাহরুখকে শুভেচ্ছা জানাইয়াছিলেন (তু. মীরখান্দ, Defremery-তে, পৃ. গ্র., পৃ. ২৫১) তাঁহারা আলেক্সাণ্ডার কর্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকিবেন এবং যখন ৮৪১/১৪৩৭ সনে শাহরুখ সোমখেতিয়াতে আগমন করেন (তু. উপরোক্ত সূত্র), তখন আলেক্সাণ্ডার তাঁহাকে মূল্যবান উপঢৌকন সামগ্রী প্রেরণ করেন। এই ঘটনার পরে তীমূরের পুত্র জর্জিয়া ত্যাগ করেন। ৮৪৮/১৪৪৪ সনে কারা-কোয়ুনলু জিহান-শাহ, আখালতসিখে আক্রমণ করেন (তু. Brosset, ১খ, ৬৮৩, Thomas of Metsoph-এর মতে জিহান-শাহ ১৪৪০ সনে তিফলিস দখল করেন; তু. Neve, পৃ. ১৪৯)।

জর্জিয়ার বিভক্তি ঃ এই সময়ের জর্জিয়ান ট্রাডিশনের জট খোলা খুব দুঃসাধ্য (Brosset, ১খ, পৃ. ৬৭৯-৬৮৯)। ওয়াখুশতএর চলমান ইতিহাস, যাহা Chronicle-কে সংশোধন করিয়াছে এবং যাহার বর্ণনা মুসলিম ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার সহিত অধিকতর সংগতিপূর্ণ, তাহা শুরু হইয়াছে ৩য় কনস্টান্টাইনের রাজত্বকাল (১৪৬৯-১৫০৫ খৃ.) হইতে যখন জর্জিয়া তিনটি প্রধান রাজতন্ত্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে (Brosset, ২খ/১খ, পৃ. ১১-১৮; ১৪৭, ২০৮, ২৪৯); থারথলিয়া (কুর তীরবর্তী [জর্জিয়ানে মতকওয়ার], রাজধানী তিফলিস), ইমেরেতহিয়া (রিওন তীরবর্তী রাজধানী কুতাইস) ও কাখেতহিয়া (আলাযান তীরবর্তী, রাজধানী গরেমি [পাসিআনে গিরীম] এবং পরে তাহলও)। অধিকন্তু সামতসখে (রাজধানী আখালতাসিখে)-র আতাবেগ বিদ্রোহ করেন এবং সাআতাবারোর-রাজ শাসিত স্বাধীন রাষ্ট্র (কুবের উজান তীরবর্তী সামতসখে এবং চওরোখ তীরবর্তী কলারজেতিয়া সমন্বিত) প্রতিষ্ঠা করেন যাহার ৩য় মানুচার-সাফার পাশা (১৬২৫ খৃ.) সম্ভূত যুবরাজগণ মুসলমান হইয়াছিলেন (Brosset, ২খ, পৃ. ২২৮)। কতিপয় স্থানীয় যুবরাজও ইমেরেথিয়া হইতে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছেন (গুরিয়ার গুরিএলগণ, মিনগরেলিয়ার দাদিআনগণ ও সওআনসের গেলোওয়ানীগণ; তু. আবখায শীর্ষক নিবন্ধ)। থারথলিয়াতেও ৩য় কনস্টান্টাইনের রাজত্ব ইমেরেথিয়ার ২য় বাগরাতের আক্রমণ দ্বারা আলোড়িত হইয়াছিল।

আক-কোয়ুনলুঃ এই সময়ে ঘটনার রঙ্গমঞ্চে উযুন হাসানের আবির্ভাব ঘটে। মুনেজজিম-বাশী, ৩খ, পৃ. ১৬০ অনুসারে তিনি প্রথমবার জর্জিয়াতে গমন করেন ৮৭৯/১৪৬৬ সালে, যখন তিনি মুসলিম বন্দীদিগকে মুক্ত করেন, তিনি চেমাকার (?)-এর দুর্গ দখল করেন। বেসামরিক জটিল অবস্থাদি তাঁহাকে আখালতসিখে দখল হইতে নিবৃত্ত করে, কিন্তু তিনি ৮৭৭/১৪৭২ সালে আক্রমণটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। রাজা বাকযাতী (পঠিতব্য ইমেরেথিয়ার ২য় বাগরাত) সিংহাসনচ্যুত (কাহর) হন এবং জর্জিয়া হইতে ৩০,০০০ ব্যক্তিকে বন্দী করা হয়। ওয়াখুশ্‌ত-এর ভাষ্য অনুসারে, দৃশত বাগরাতকে এড়াইবার জন্য কনস্টান্টাইন উযুন হাসানকে তিফলিস সমর্পণ করেন। উযুন হাসান তিফলিসে একটি গ্যারিসনের সংস্থান রাখেন। কিন্তু ইহার সরকার পরিচালনার ভার কনস্টান্টাইনের উপর অর্পণ করেন (তু. Brosset, ২খ, পৃ. ১৩ এবং ২৫)। তারীখ-ই আমীনীতে অবশ্য উযুন হাসান কর্তৃক

সূফী খালীল বেগকে গভর্নর (আয়ালাত) রাখিয়া যাইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, যিনি ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে উযুন হাসানের ইনতিকাল পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন; যখন জর্জিয়ানগণ শহরটিকে পুনর্দখল করে।

৮৯১/১৪৮৬ সালের শরৎকালে সুলতান য়া'কূব আককোয়ুনলু, আতাবেগ শওয়ারকওয়ারে-কে সংশোধনকল্পে শাস্তি প্রদানের জন্যে সামতসখে আক্রমণ করেন। পরবর্তী বর্ষে য়া'কূব, সূফী খালীল বেগকে গেওরগিআ বিজয়ে প্রেরণ করেন। দেবেদা (বরচালা)-এর ভাটিতে যেই স্থলে দক্ষিণ দিক হইতে জর্জিয়ায় প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয় তথায় তুর্কোমানগণ কর্তৃক আগজা-কালআ ও কাওজানি দুর্গাদির নির্মাণ কার্য শুরু করা হইয়াছিল (তু. ওয়াখুশ্‌ত-এর Geography)। কুসতানদীল (৩য় কনস্টান্টাইন) তিফলিস হইতে পশ্চাদপসরণ করেন। শীতকালে আগত অতিরিক্ত সৈন্যদল কর্তৃক নবর্বলে বলীয়ান হইয়া সূফী খালীল অবরোধ শুরু করেন। প্রথমে তিনি কূজীর (কোজোরি, তিফলিসের দক্ষিণে অবস্থিত)-এর সকল দুর্গ দখল করিয়া ফেলেন, তিফলিসের পার্শ্ববর্তী যুদ্ধে মুসলমানগণ ভয়ানক দুর্ভোগ পোহান, কিন্তু অবশেষে ওয়ালী আগা-এশিকচি-আগাশী শহরটি দখল করেন (৩ রাবী'উল আওয়াল, ৮৯৪/১৪৮৯ সন) [তু. য়া'কূবের রাজত্বকালের অপ্রকাশিত ইতিহাস, তারীখ-ই আমীনী, MS. Bibil. Nat. Parts, No. 101, fol. 101r-105r এবং 155r-159r)। Chronicle (Brosset, ২খ, পৃ. ৩২৬-৩২৭), যাহাতে অনেক কথনার সত্যতা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য তিফলিস দখলের ঘটনাকে অস্বীকার করা হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, আলগেতস্থ সাবার থিয়ানো (মুসলিমগণ কর্তৃক বারাত-ইলি নামে অভিহিত) জায়গীরের লোকেরা তুর্কোমানগণকে পরাজিত করে।

সাফাবীগণ ঃ ৯০৭/১৫০১ সালে ১ম ইসমাঈলের সেনাবাহিনীর একটি বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল খাদিম বেগের অধিনায়কত্বে জর্জিয়া আক্রমণ করে (শাহিনশাহনামা, দোরন কর্তৃক উদ্ধৃত)। ৯২৬/১৫২০ সালে দীও সুলতান কর্তৃক পরিচালিত আক্রমণ ১ম ইসমাঈলের নিকট প্রেরিত ৮ম দাবিদ-পুত্র রামাযের রাজদূত ও তাঁহার সঙ্গী রাজ-কর্মচারিগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ও রুদ্ধ হয় (তু. হাবীবুস-সিয়ার, বোম্বাই, ৩খ, জুয ৪খ, পৃ. ৯২)। ৯২৯/১৫২২-১৫২৩ সনে সাফাবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আগজাকালআ অবরোধ করেন এবং কতিপয় প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তিফলিসের দুর্গের আত্মসমর্পণ আদায় করেন; তিনি গির্জাগুলিকে অপবিত্র করেন এবং " সেতুটির কোণে" একটি মসজিদ নির্মাণ করেন; তু. ওয়াখুশ্‌ত, Brosset-এ, ২/১খ, পৃ. ২৩ (দক্ষিণ তীরবর্তী মসজিদটি অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে)।

ইস্কানদের মুনশী উল্লেখ করিয়াছেন যে, শাহ তাহমাস্‌প কর্তৃক জর্জিয়ার বিরুদ্ধে চারিটি বড় ধরনের অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল ৯৪৭/১৫৪০ সনে তাহমাসপ তিফলিস অবরোধ করেন, সেইখানকার গভর্নর (লুআরসাবের জন্য) পার্সিয়ানগণের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং মুসলমান হন। অতঃপর বারতীস (? বিরথইস)-এর দুর্গ দখল করা হয় [আলামআরা (তেহরান ১৩১৪), পৃ. ৬৩]। দ্বিতীয়বার ছিল ৯১৩/১৫৪৬ সালে, যখন তাহমাসপকে আনুগত্য প্রদর্শনার্থে জর্জিয়ান যুবরাজগণ শূরাগেল (সন্নিকটে গুমরী-আলেক্সান্দ্রপল-লেনিনাকান)-এর আগমন করিয়াছিলেন। ৯৫৮/১৫৫১ সালে তৃতীয় অভিযানটি কুরকুরা (কওয়ারকওয়ারে)-এর পুত্র আতাবেগ কায়-খুসরাও-এর আবেদনক্রমে শেক্‌কী হইতে প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি লুয়ারসাব (ইস্কান্দের মুনশী লিখিয়াছেন লাওয়াসাব কিন্তু নামটি ইরানী ঃ লুলরাসপ; তু. মির'আতুল-বুলদান) কর্তৃক তাঁহাকে যখমের বিষয়ে অভিযোগ করিয়াছিলেন।

ইস্কান্দের মুনশী, আলামআরা, পৃ. ৬৫ অনুসারে, ৯৬১ (১৫৫৩)-র তুর্কো-পার্সিয়ান শান্তি দ্বারা মাসক (মেসখি-সামতসখে)-এর, কারতীল (খারথলিয়া)-এর ও কাখিতের এলাকাসমূহ শাহ তাহমাসপকে বরাদ্দ করা হয়, অপরপক্ষে সুলতান সুলায়মান, বাশী–আচুক (নগ্ন-মস্তকসহ, ইমেরেতহিয়া রাজের একটি ডাকনাম)-এর দার্দিয়ান-এর এবং ত্রাবিযোন্দ ও তারালু (তিরে-বোলি) পর্যন্ত বিস্তৃত গূরিয়গান (গুরিয়া)-এর এলাকাসমূহ গ্রহণ করেন। ১ম লুয়ারসাব অবশ্য তিফলিসের উদ্বিগ্নতা অব্যাহত রাখেন। ইহা চতুর্থ অভিযানের পথ প্রশস্ত করে। বারাত-ইলি (সাবারাতহিয়ানো), গোরি ও আতেনি দখল করা হয় এবং যুদ্ধে রাজা স্বয়ং ক্ষমতাচ্যুত হন। ওয়াখুশ্‌ত চারিটি অভিযানের তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন যথাক্রমে ১৫৩৬, ১৫৪৮, ১৫৫৩ ও ১৫৫৮ খৃ.। Brosset, ২/১খ, পৃ. ৪৫২-তে এইগুলিকে খুব সম্ভাব্য বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে। কেননা তুর্কো-পার্সিয়ান যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা প্রবাহের পট পরিবর্তনের সহিত উহা অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ।

অজেয় লুয়ারসাবের পুত্র রাজা ১ম সোইমোন-এর রাজত্বকাল (১৫৫৮-১৬০০) ছিল গোলযোগপূর্ণ। তিনি পার্সিয়ানগণের নিকট পরাজিত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা দাবিদ (দাউদ খান), যিনি স্বধর্ম ত্যাগের মূল্যে সিংহাসন ক্রয় করিয়াছিলেন, কর্তৃক প্রতিস্থাপিত হন, সোইমোনকে আলামূতে বন্দী করা হয়, সেই স্থল হইতে ২য় ইসমাঈল (১৫৭৬-১৫৭৭) উছমানীগণের কার্যকলাপকে পরাভূত করণার্থে তাঁহাকে অব্যাহতি দেন।

উছমানী আধিপত্য ১৫৭৮-১৬০৩ ঃ ১৫৭৮ সালে দুর্বল শাহ খুদাবান্দা-র রাজত্বকালে মুসতাফা লালা পাশার নেতৃত্বাধীন উছমানীগণ সামতসখে হইয়া জর্জিয়াতে প্রবেশ করেন এবং আগস্টে তিফলিস অবরোধ করেন, সেই স্থল হইতে দাউদ খান পলায়ন করিয়াছিলেন। তুর্কগণ তিফলিসে ১০০ বন্দুকসহ ২০০ ব্যক্তির একটি গ্যারিসন রাখেন। ফেরহাদ পাশার পুত্র মুহাম্মাদকে তিফলিসের সানজাক (পাশালীক?) প্রদান করা হয় (V. Hammer, G. O. R^2, ২খ, পৃ. ৪৮৩)। দুইটি গির্জা মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। অক্টোবরে গোরি একটি তুর্কী গ্যারিসন প্রাপ্ত হয় এবং ইহা একটি সানজাক হিসাবে সোইমোনকে প্রদত্ত হয়। যখন মুসতাফা পাশা এরযেরুমে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন ইমাম কুলি খান, ওযদেমির পাশা কর্তৃক নিহত শামখালের পুত্র ও সোইমোন তিফলিস অবরোধ করেন। হাসান পাশা (ঐ, পৃ. ৪৮৯) কর্তৃক গ্যারিসনে রসদপত্রাদি আনীত হইয়াছিল, কিন্তু শহরটির চতুষ্পার্শ্বস্থ লড়াই অব্যাহত থাকে। ১৫৮০ খৃ. নূতন সেরআসকের সিনান পাশা তিফলিসে আগমন করেন এবং বেগলেরবেগ হিসাবে লুয়ারসাবের এমন এক পুত্রকে নিয়োগদান করেন যিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণপূর্বক য়ুসুফ (?) নাম ধারণ করেন। সোইমোন তুর্কগণকে অগ্রিম প্রদান করেন। কিন্তু উহা গৃহীত হয় নাই। আগস্ট ১৫৮২ সনে মুহাম্মাদ বে তিফলিসে সরবরাহাদি আনয়নের জন্য এরযেরুম ত্যাগ করেন, কিন্তু পার্সিয়ানগণ ও জর্জিয়ানগণ কর্তৃক গোরিতে পরাজিত হন। ফরহাদ পাশা একটি নূতন অভিযান (ডিসেম্বর ১৫৮১)-র অধিনায়কত্ব করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীগণ কর্তৃক দখলীকৃত শহরগুলিকে শক্তিশালী করা। ১৫৮৪ খৃ. রিদওয়ান পাশা তিফলিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অধিকতর কার্যকর ব্যবস্থার অনুধাবন-প্রতিফলন হিসাবে দাউদ খান তুর্কগণের নিকট গমন করেন। সোইমোন রিদওয়ানকে আক্রমণ করেন, কিন্তু উহা ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হয়। ফেরহাদ পাশার তুর্কী পদাতিক বাহিনী গঠনকারী সুলতানের গার্ড ও সেনাবাহিনীর মুখ্যাংশ আখাল-কালাকিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করাতে তিনি অবসর গ্রহণে বাধ্য হন। ১৫৮৫ খৃ. তাবরীয [দ্র.]-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযানের পর উছমানীগণ পারস্যের নিকট হইতে আযারবায়জান ও জর্জিয়াসহ ট্রান্সককেসিয়ার সমর্থন লাভ করেন (২১ মার্চ, ১৫৯০-র চুক্তি); তু The Chronicle of the Paslter of Meshki (1559-1587) তাকায়শওইলি, পূ. গ্র., পৃ. ১৮৩-২১৪ তে; Von Hammer, ২খ., পৃ. ৪৮১-৪৯৭; = টীকা-টীপ্পনীযুক্ত একটি তরজমা প্রদান করিয়াছেন, ২/১খ, পৃ. ৪১১-৪১৯]। Von Hammer কর্তৃক ব্যবহৃত প্রধান সূত্র হইতেছে আলীকৃত নুসরাতনামা (জানু. ১৫৭৮-জানু. ১৫৮০ খৃ.)। অন্যান্য তুর্কী সূত্রের উপর তু. Babinger, G. O. W., পৃ. ১১৭, ১৮১। ৩য় মুহাম্মাদের সিংহাসনে আরোহণ (১৫৯৫)-এর অল্পকাল পরেই সোইমোন একটি খণ্ডযুদ্ধে নীত ও কনস্টান্টিনোপলে প্রেরিত হন, যেখানে তিনি ১৬০০ খৃ. ইন্তিকাল করেন। কমবেশি গোলযোগপূর্ণ উছমানী শাসনামল ১৫৯১ হইতে ২১ অকটো., ১৬০৩ খৃ. পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করে, যখন ১ম শাহ আব্বাস তিফলিস পুনর্দখল করেন। ১৬১২ খৃ. তুর্কো-পারসিয়ান চুক্তিবলে সুলতান সেলীম (১৫১২-১৫২০ খৃ.)-এর শাসনাধীন অবস্থা পুনঃস্থাপিত হয়।

শাহ আব্বাস-১ ও মুসলিম রাজন্যবর্গ এই সম্রাটের শাসনামলে জর্জিয়ার উপর (বিশেষত কাখেথিয়ার উপর) অত্যন্ত মন্দ ভাগ্য নামিয়া আসে। যদিও খারথলিয়ার গিওরগি কাখেথি আর আলেক্সান্ডার ১৬০২ খৃ. এরীওয়ান অবরোধে তাঁহার পতাকাতলে লড়াই করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বিজয় লাভের পর তিনি জর্জিয়া হইতে লোরে দখল করিয়ান লন। তিনি লুয়ারসাব-২ (১৬০৫-১৬১৬ খৃ.)-এর ভগিনীকে বিবাহ করেন কিন্তু তাঁহার শ্যালককে পারস্যে আনয়নপূর্বক গুলাব কালআতে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করেন। ১০২৫/১৬১৬ সালে আব্বাস ব্যক্তিগতভাবে জর্জিয়াতে আগমন করেন এবং মুসলিম বাগরাত-৬ (১৬১৬-১৬১৯ খৃ.)-কে খারথলিয়া মঞ্জুর করেন। অতঃপর তিনি কাখেথিয়াকে শাস্তি প্রদান করেন। রাজত্বকালটির দাফতরিক ইতিহাস অনুসারে আলামআরা, পৃ. ৬৩৫, যাহাদিগকে হত্যা করা হয় তাহাদের সংখ্যা ছিল ৬০-৭০,০০০ এবং নারী-পুরুষ বন্দীর সংখ্যা ছিল ১০০,০০০-১,৩০,০০০; "ইসলামের প্রারম্ভকাল হইতে কোন রাজার শাসনামলে অনুরূপ ঘটনা ঘটে নাই।" ১০৩৩/১৬২৩ সালে কাবচিকাই খান জর্জিয়াতে প্রেরিত হইয়া কাখেথিয়ার ১৯,০০০ লোককে সৈন্যদলভুক্ত করিবার ছলনায় আহ্বান করেন এবং তাহাদিগকে ইমেরেথিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবার পরিবর্তে হত্যা করেন– "শিকারীর সুবিধার্থে শিকারের জন্তুসমূহকে তাড়াইয়া এক স্থানে জড়ো করার ন্যায় পদ্ধতিতে" (শিকারীওয়ার; আলামআরা, পৃ. ৭১৯)। এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা কুপিত হইয়া মৌউরাও (অপেক্ষাকৃত নিম্ন পদমর্যাদার গভর্নর, Brosset, ২/১খ, পৃ. ১৪৮; পার্সিয়ানগণ লেখেন মিহরাও) গিওরগি সাআকাদযে (একজন মুসলমান ও তদবধি শাহের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী খারথলিয়াতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, যাহা পার্সিয়ানগণ ১৬২৬ খৃ. পর্যন্ত দমন করিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই (ইওসসেলিয়ান, যিযন, মাউরাওয়া গ. সাআকাদযে, তিফলিস ১৮৪৮ খৃ.; Brosset, ২/১খ, পৃ. ৫৩-৫৯ ও ৪৮৯-৪৯৭)। এই সমস্ত দুর্যোগ সত্ত্বেও পারস্যের জীবন যাত্রায় জর্জিয়ানগণের পালিত ভূমিকা উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং প্রথম আব্বাসের উত্তরাধিকারী শাহ সূফী তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য ইসাফকাহানারে দারুগা রাজা বাগরাতের ভ্রাতা খুসরাও মীরযার সমর্থনের নিকট ঋণী।

যখন ২য় সোইমোন গৃহযুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (১৬২৯ খৃ.), তখন কাখেথিয়ার তাহইমুরায-১ (১৬০৫-১৬৬৪ খৃ.; সকল প্রকার দুর্ভাগ্যের চিহ্নযুক্ত রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ একটি রাজত্বকাল; ১৬২৪ খৃ. শীরাযে তাঁহার মাতা খেতহেওয়ানকে বধ করা হয়; Brosset, ২/১খ, পৃ. ১৬৭) খারথলিয়াতে আগমন করেন, যেইখানে তিনি ১৬২৯ হইতে ১৬৬৪ খৃ. পর্যন্ত রাজত্ব করেন, যাহার পর পারস্য হইতে ইতিমধ্যে বর্ণিত কায়খুসরাও আসিয়া রুস্তাম (১৬৩৪-১৭৫৪) নাম ধারণপূর্বক নিজেকে তিফলিসে প্রতিষ্ঠিত করেন। পারস্য দেশে লালিত-পালিত বয়োবৃদ্ধ নৃপতি কুললার-আগাসী উপাধি ধারণ করেন। তিনি তাহার রাজসভাকে ফারসী কায়দায় পরিচালনা করিতেন। গোরি ও সুরামে ফারসী গ্যারিসনসমূহ স্থাপিত হয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী জর্জিয়ান বন্দীগণ পারস্য হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। ফারসী আদব-কায়দা ও প্রথাদি ফ্যাশানে পরিণত হয়। অপরপক্ষে দুইটি সংস্কৃতির একীভূত হওয়ার ঘটনাকে দৃশ্যত উৎসব করিয়া প্রতিপালন করণার্থে রুস্তাম তাহার বিবাহোৎসব মস্‌জিদ ও গির্জা উভয় স্থানেই করেন এবং মতসখেতার গির্জাটিকে পুনঃস্থাপন করেন।

১৬৩৬ সনে ৪র্থ মুরাদ এরীওয়ান দখল করেন এবং ১০৪১/১৬৩৯ সালের চুক্তিবলে পারস্য কারস ও আখালতসিখে তাঁহার দাবি পরিত্যাগ করে (তারীখ-ই নাঈমা, পৃ. ৬৪৬); ওয়াখুশ্‌ত অনুসারে (Brosset, ২/১খ, পৃ. ৬৮) সুলতান ইমেরেতহিয়া ও সাআতবাগো গ্রহণ করেন এবং শাহ খারথলিয়া ও কাখেথিয়া সংরক্ষণ করেন।

রুস্তামের পালিতপুত্র ওয়াখটানঙ (মুসলমানগণের নিকট শাহ নাওয়ায-১) তাঁহার উত্তরাধিকারী হন (১৬৫৮-১৬৭৬ খৃ.) Persophil-নীতি অব্যাহত থাকে। শাহ আব্বাস-২ (১৬৪২-১৬৬৭ খৃ.) শাহ্ নাওয়াযের কন্যাকে বিবাহ করেন। শাহ নাওয়ায যদিও একজন মুসলমান ছিলেন, তথাপি তিনি খৃস্ট ধর্মের আনকূল্য করিতেন, এমন কি তিনি পুরোহিতের নিকট যে পাপ স্বীকার রুস্তামের রাজত্বকালে লোকদিগকে লজ্জিত করিয়াছিল তাহা পুনঃ প্রবর্তন করেন (Brosset, ঐ, পৃ. ৭৯)। শাহ নাওয়াযকে অধিকতর সমর্থন দানের জন্য আযারবায়যান ও কারাবাগের মুসলমান উপজাতীয়গণকে (১৫,০০০ জাওয়ানী-শীশীরী ও বায়াত) কাখেতহিয়াতে বসতি প্রদান করা হয় (তু. The History of Shah Abbas, রচনাকার মুহাম্মাদ তাহির ওয়াহীদ, দোরন-এ, পৃ. ১০৯-১১১; Brosset, ২/১খ, পৃ. ৫০৩-৫০৪)। শাহ নওয়ায ইমেরেতহিয়াতে লড়াই করিয়াছিলেন কিন্তু যখন তিনি সেখানকার সিংহাসনে তাঁহার পুত্রকে অধিষ্ঠিত করেন তখন শাহ ১৬৩৯ খৃস্টাব্দের চুক্তি দ্বারা নিশ্চয়তা প্রদানকৃত অবস্থা পুনঃস্থাপিত করেন।

১১শ গিওরগি (২য় নাওযায) শাহ্ সুলায়মান কর্তৃক ক্ষমতায় অভিষিক্ত হন। ১৬৮৮ খৃস্টাব্দে তিনি কাখেতহিয়াতে তাঁহার নিজের ষড়যন্ত্রের কবলে পতিত হন এবং শাহ তাঁহার স্থলে ১ম ইরেকলে (১৬৮৮-১৬৯১ খৃ.; ১৬৯৫-১৭০৩ খৃ.)-কে প্রতিস্থাপন করেন। রাশিয়াতে প্রতিপালিত এই নৃপতি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং নাজার আলী খান নাম ধারণ করেন।

পারস্যের আফগান আক্রমণ ঃ যখন বালূচ ও আফগানগণ পূর্ব পারস্যে গোলযোগ শুরু করে, তখন শাহ হুসায়ন তাহাদের বিরুদ্ধে গিওরগিকে একটি জর্জিয়ান বাহিনীসহ প্রেরণ করেন। তিনি কান্দাহারে শৃংখলা ফিরাইয়া আনেন। কিন্তু ১৭০৯ খৃস্টাব্দে মীর উওয়ায়স কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকঅপূর্ণভাবে নিহত হন [তু. আফগানিস্তান শীর্ষক নিবন্ধ]।

মীর উওয়ায়স অতঃপর গিওরগির উত্তরাধিকারী কায়-খুসরাও (১৭০৯-১৭১১ খৃ.) পরিচালিত নব্য জর্জিয়ান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। এই সমস্ত ঘটনা পারস্যের আফগান আক্রমণের পথ উন্মুক্ত করে।

ওয়াখতানঙ (খারথলিয়ার গভর্নর ১৭০৩-১৭১১; রাজা ১৭১১-১৭২৪ বিরতিসহ) প্রথমে একজন খৃষ্টান ছিলেন। কতিপয় জর্জিয়ানের সমর্থনে পারসিয়ান গ্যারিসনগুলি দাস ব্যবসায় শুরু করে। ওয়াখতানঙ এই প্রবণতাকে রোধ করার চেষ্টা করেন (Brosset, ২/১খ, ৯৭, ১০১, ১০৫) এবং গড়ে সকল মুসলমানকে অপদস্থ করেন, বিশেষত যাহারা তিফলিসের দুর্গকে সেনাবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিতকরণে নিয়োজিত ছিলেন। ১৬১৪ ও ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার স্থলে একজন অত্যুৎসাহী মুসলমান ইএসে (আলী-কুলী খান) ক্ষমতাসীন হন এবং শুধু ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্তে সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন।

ইসফাহানের সন্নিকটে গুনাবাদে আফগানদের চূড়ান্ত বিজয়ের (১৭২২ খৃ.) পর শাহ্ হুসায়ন, ওয়াখতানঙ-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু নভেম্বর ১৭২১ খৃষ্টাব্দে শেষোক্ত নৃপতি রাশিয়াকে তাঁহার সাহায্য প্রদান করেন (Brosset, ২/১খ, পৃ. ১১৭)। ২৩ আগস্ট, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দারবানদে আগমনকারী মহান পিটারকে অবিলম্বে রাশিয়াতে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। অপরপক্ষে কাখেথিয়া-রাজ মুহাম্মাদ কুলী খান (৩য় কনস্টান্টাইন) যুদ্ধে ওয়াখতানঙ-এর বিরুদ্ধে লেযগিসের পক্ষাবলম্বন করেন এবং ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে তিফলিস দখল করিয়া উহা তিন বৎসর ধরিয়া লুণ্ঠন করেন।

দ্বিতীয় উছমানী অধিকার ঃ ১৭২৩-১৭৩৪ খৃ., পারস্য ও রাশিয়ান অগ্রবর্তী অঞ্চলসমূহে গোলযোগ তুরস্ককে আলোড়িত করে। শীঈগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অনুমোদিত ঘোষণা করা হয়। জুন ১৭২৩ খৃ. ওয়াখতানঙ-এর সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার প্রচেষ্টারত সেরআসকার ইব্রাহীম পাশা তিফলিসে ওয়াখতানঙ-এর পুত্র বাকার (পার্সিয়ানে শাহ নাওয়ায এবং এক্ষণে তুর্কীতে ইব্রাহীম পাশা নাম প্রদত্ত)-কে অধিষ্ঠিত করেন। তুর্কী সেনাদল দুর্গটি দখল করে। বাকার শীঘ্রই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু তুর্কগণ বাকার (এক্ষণে যিনি আবদুল্লাহ্ নাম ধারণ করিয়াছিলেন)-এর চাচা ইয়েসের অধীনে তিফলিসে নূতন সেনাশক্তি প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে ১২ সেপ্টেম্বর, ১৭২৩ খৃ. রুশো-পারসীয়ান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যদ্বারা কাস্পিয়ান তীরবর্তী প্রদেশসমূহ রাশিয়াকে সমর্পণ করা হয়। শক্তির ভারসাম্যরূপে ফরাসী দূতের শুভ প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১২ জুন, ১৭২৪ খৃ. কনস্টান্টিনোপলে একটি রুশো-তুর্কী চুক্তি সম্পাদিত হয়; রাশিয়া দাগিস্তান ও সমুদ্র উপকূলবর্তী সংকীর্ণ ফালি রাখিয়া দেয়; তুরস্ক জর্জিয়ান এলাকাসহ সুদূর শামাখ পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ট্রান্সককেশিয়া গ্রহণ করে (Von, Hammer, G. O. R., ৪খ, পৃ. ২০৬-২১৪। এই সমস্ত ঘটনার উছমানী ইতিহাসবিদ হইতেছেন চেলেবিযাদে; অন্যান্য সূত্র বিষয়ে তু. Babinger, G. O. W., পৃ. ২৮৯; নামী, ফাতহনামে দের হাকক-ই গুরজিস্তান)।

ক্ষমতাচ্যুত রাজা ওয়াখতানঙ ১,৪০০ অনুচরসহ রাশিয়াতে গমন করেন (আগ. ১৭২৪ খৃ.)। তুর্কগণ খারথলিয়ার দখল গ্রহণান্তে একটি আদমশুমারি করিয়া অধিবাসিগণের উপর করারোপ করেন। একা অভিজাত উছমান তোপাল পাশার তিফলিসে অবস্থানই জর্জিয়ানগণের মধ্যে এক আনন্দঘন স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে (Brosset, ২/১খ, পৃ. ১২৯)। ইয়েসের রাজ উপাধি ছিল না এবং প্রকৃত ক্ষমতা তিফলিসে প্রতিষ্ঠিত আখাল-তসিখের বংশানুক্রমিক শাসনকর্তা ইসহাক পাশার হস্তগত হইয়াছিল। ইয়েসের ইনতিকালের (১৭২৭ খৃ.) পর ইসহাক পাশা নিখিল জর্জিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন (Brosset, ২/১খ, পৃ. ২৩৬)। ১৭১৮ খৃ. তিনি খারথলিয়াকে সামন্ত প্রভুদের (মতহাওয়ার) মধ্যে ভাগ করিয়া দেন, যাঁহাদিগের বিবাদ তাঁহার জন্য তাঁহাদিগের নিয়ন্ত্রণকে সহজতর করিয়াছিল। লেযগিস জর্জিয়া লুণ্ঠন অব্যাহত রাখেন (তু. Brosset, পূ. স্থা.; V. Hammer, ৪খ, পৃ. ২২৩, ২৩১,২৩৫, ২৮০ ও ৩১৩)।

নাদির শাহ্ ঃ ১১৪৩/১৭৩০-১৭৩১ সালে সংঘটিত একটি যুদ্ধ, যাহাতে শাহ্ তাহমাসপ সামান্যই গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি আরাক্সেসকে পারস্য এবং তুরস্কের মধ্যবর্তী সীমান্ত হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেন (মাহদী খান, তারীখ-ই নাদিরী, তাবরিয ১২৮৪ হি., পৃ. ৯০ অনু জোনস, ১খ, পৃ. ১৪১; V. Hammer, ৪খ, পৃ. ২৭৭; শান্তি স্থাপনের তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন ৬ ফেব্রু., ১৭৩২ খৃ.)। নাদির অসন্তুষ্ট হইয়া তাহমাসপকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং ট্রান্সককেসিয়া বিজয় পুনরারম্ভ করেন। যখন তিনি দাগিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছিলেন (১১৪৭/১৭৩৪ শরৎকাল) তখন তিফলিসের ইসহাক পাশা, গানজার সাহায্যার্থে একটি সেনাবাহিনীসহ যাত্রা করেন। নাজার আলী খান (১ম এরেকলে)-এর পুত্র খাইমুরায় ও তাঁহার ভাইপো আলী মীরযা আলেকজাণ্ডার (ইমাম কুলীর পুত্র-৩য় দাবিদ) ইসহাক পাশাকে আক্রমণ করেন। নাদির খুব সন্তুষ্ট হইয়া রাজপুত্রদ্বয়কে পুরস্কৃত করেন (ঐ, পৃ. ১১৪; জোনস, ১খ, পৃ. ২০০)। গানজা অবরোধকালে নাদির সূফী খান বুগাইরীকে জর্জিয়ান অভিজাতবর্গের সহায়তায় তিফলিস অবরোধের নির্দেশ দেন (মাওয়াওয়ান ওয়া আযনাওউরান; ঐ, পৃ. ১১৬; জোনস, পৃ. ২০৫)।

যখন আবদুল্লাহ্ পাশা ইরীওয়ানের সন্নিকটে বাগাওয়ারদে পরাজিত হন, তখন ইসহাক পাশা ২২ রাবী উল আওয়াল, ১১৪৭ হি./১৭, সেপ্টে, ১৭৩৪ খৃ. তিফলিসের দুর্গ সমর্পণ করেন (ঐ, পৃ. ১২৩)। নাদির খারথলিয়া ও কাখেথিয়ার অভিজাতবর্গকে ডাকিয়া পাঠান (তাওয়াদান ওয়া আযনাওউরান) যাঁহাদের মধ্যে তাহমূরাছ (তাহইমুরায)-এরই গুরুত্বও প্রিভিলেজসমূহ ছিল সর্বাধিক। নাদির অবশ্য খারথলিয়া ও কাখেথিয়ার ওয়ালী হিসাবে নিযুক্ত করেন আলী মীরযাকে। কারণ তিনি ছিলেন একজন মুসলমান এবং তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ মীরাযা (=লওন) উছমান পাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবার (কুচ)-কে তিফলিসে আনয়নের জন্য তাহমূরাছকে কাখেথিয়াতে গমনের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন একজন তরবারিধারী ব্যক্তি এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তিনি কারাকাল খান (পশাও), রূপ (গোরির পশ্চিমদিকস্থ রুইস?) এবং চেরকেস্ পর্বতমালায় পলায়ন করেন। নাদির তাঁহার সেনাবাহিনীকে তাহার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি ২৯ জুমাদা উলা, তারিখে স্বয়ং তিফলিসে আগমন করেন, যেইখানে তিনি শান্তি ও পুরস্কার বিতরণ করেন। কায়ুকুল (আবোতগণ)-এর ৬,০০০ জর্জিয়ান পরিবারকে খুরাসানে স্থানান্তর করা হয় (ঐ, পৃ. ১২৪-জোনস, পৃ. ২৫৯)। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে সূফী খান থাইমুরাযকে বন্দী করেন এবং তাঁহাকে পারস্যে পাঠান। ভারতীয় সামরিক অভিযানের শুরুতে নাদির থাইমুরাযকে অব্যাহতি দেন। কিন্তু তাহার যুবক পুত্র ইরিকলেকে তাঁহার সহিত রাখিয়া দেন।

১১৫৬ (১৭৪৩-এর শেষ) সনে তাহমূরাছ খান মিথ্যা দাবিদার সাম মীরযাকে পরাজিত করেন এবং পরবর্তী কালে (১৭৪৪ খৃ.) তিফলিসের নূতন বেগলেরবেগি আলী কিলিজার (?জর্জিয়ান সূত্রাদি তাঁহাকে

খানজাল, কিযিলিজালি নামে অভিহিত করিয়াছে) সহিত আরাগওই তীরবর্তী রুইসের সন্নিকটে আখালতসিখের য়ূসুফ পাশাকে পরাজিত করেন, যিনি তুরস্ক সরকারের নির্দেশে একজন মিথ্যা দাবিদার সাফী মীরযার কাজে দাগিস্তানে গমন করিয়াছিলেন। গোরিতে উপনীত হইয়া নাদির তাহমূরাছের কার্যাবলীর পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে খারথলিয়াতে বদলী করেন এবং তাঁহার পুত্র ইরিকলেকে কাখেথিয়া প্রদান করেন [ঐ, পৃ. ২০২-জোনস, ২খ, পৃ. ১৬৪); তু. Brosset, ২/১খ, পৃ. ৭৭ (পাপুনাওরবেলিয়ানি) ও ২/২খ, পৃ. ২০৮ (খেরখেউলিদযে)]।

১৭৪৫ খৃস্টাব্দে নাদির গেওরগিয়ার উপর ৫০,০০০ তুমানের এক কর ধার্য করেন। থাইমুরায কিছু কমানোর জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাবরীযে পৌঁছিয়া তিনি নাদিরের ইনতিকালের সংবাদ পান। শেষোক্তের উত্তরাধিকারী ছিলেন থাইমুরাযের কন্যা খেতহিওযানের স্বামী আলী কুলী খান।

কাখেথিয়ার বাগরাতিগণ ঃ নাদিরের ইনতিকালের পরবর্তী গোলযোগকাল এবং শান্ত প্রকৃতির যুবরাজ কারীম খান, যাঁহার রাজত্ব আরাক্সাসের উত্তরে বিস্তৃত হয় নাই, জর্জিয়ার জন্য তাঁহার আমল একটি বিরাম সূচিত করে। থাইমুরায (খারথলিয়ার রাজা ১৭৪৪-১৭৬১ খৃ.) ও তাঁহার পুত্র ইরিক্লে অথবা ইরাকলে-২ (কাখেতহিয়ার রাজা ১৭৪৪-১৭৬১ খৃ.) দক্ষতার সহিত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। এই খৃস্টান নৃপতিগণের রাজত্বকাল জর্জিয়ার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সুখময় সময়গুলির একটি। তাঁহারা ট্রান্সককেসিয়াতে অসংখ্য অভিযান পরিচালনা করেন। ১৭৫২ খৃস্টাব্দে আফগান আযাদ খান, যান্দ রাজবংশের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী, এরীওয়ান-এর সন্নিকটে ইরিকলে কর্তৃক পরাজিত হন এবং ১৭৬০ খৃস্টাব্দের কাযাখে ধৃত এবং কারীম খানের নিকট প্রেরিত হন। ১৭৬৫, ১৭৭০ ও ১৭৮০ খৃস্টাব্দে এরীওয়ানের কুরদগণকে সংশোধনমূলক শাস্তি প্রদান করা হয় এবং জর্জিয়ান সেনাবাহিনী বায়াযীদ জিলায় তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করেন। প্রায় প্রতি বৎসরই জর্জিয়ানগণ সফলতার সহিত দাগিস্তানের হানাদার বাহিনীর (যাহাদের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক সর্দার ছিলেন উমার খান আওয়ার) আকস্মিক আক্রমণসমূহকে প্রতিহত করেন। কম্মিনকালে শুধু শেক্কীর খানগণ [দ্র.] হাজ্জী চেলেবি ও আগা কিশি (১৭৫২-১৭৫৩ খৃস্টাব্দে) জর্জিয়ানগণকে বিপর্যস্ত করিতে সক্ষম হন।

এই সমস্ত সাফল্য সত্ত্বেও জর্জিয়ার অবস্থা ছিল অনিশ্চিত এবং ১৭৬০ খৃস্টাব্দে থাইমুরায সাহায্যের সন্ধানে রাশিয়াতে গমন করেন। কিন্তু তিনি সম্রাজ্ঞী এলিযাবেথের মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পরে আগমন করেন এবং তিনি নিজে ৮-২০ জানু., ১৭৬২ খৃস্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গে ইনতিকাল করেন।

সংযুক্ত রাজতন্ত্রসমূহের রাজা হিসাবে ইরিকলে রাশিয়ার সহিত পুনর্মিলনের নীতি অব্যাহত রাখেন। রুশো-তুর্কী যুদ্ধের প্রারম্ভে, জেনারেল তোতলেযেনের অধিনায়কত্বে একটি রুশ সেনাবাহিনী (১৭৬৯ খৃস্টাব্দে) জর্জিয়াতে উপনীত হয় এবং ইরিকলেসহ আখালতসিখের বিরুদ্ধে মার্চ করে। মিত্রবর্গের মনের মিল হয় নাই (তু. ৪ ডিসেম্বর, ১৭৭০ খৃস্টাব্দে ক্যাথেরিন-২ কর্তৃক ভল্টেয়ারকে প্রেরিত পত্র) এবং ১৭৭২ খৃস্টাব্দে রুশ সেনাবাহিনী রাশিয়াতে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু একাকী ফেলিয়া আসা ইরিকলে, আসপিনযাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন এবং ইমেরেতহিয়ার সুলায়মানের সহিত আখালকালাকি অবরোধ করেন। শীঘ্রই আখালতসিখের সুলায়মান পাশা আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন। কুচুক কায়নারজার রুশো-তুর্কী চুক্তি (১৭৭৪ খৃ.) জর্জিয়ার ভূখণ্ডে এলাকাগত কোন পরিবর্তন আনয়ন করে নাই। তুরস্ক সরকার শুধু যুবকগণ ও কুমারিগণের রাজস্ব এবং অন্যান্য কর আদায় রহিত করেন (অনুচ্ছেদ ২৩)। কিন্তু চুক্তি সম্পাদনের পরে আখালতসিখের সুলায়মান পাশাকে কনস্টান্টিনোপলে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। অপরপক্ষে সেন্ট পিটার্সবার্গের নিকট তিনি তাঁহার আবেদন পুনর্ব্যক্ত করেন এবং তাঁহার রাজত্বকে রাশিয়ার সহিত সংযুক্তির (Prisovokuplĕno) প্রস্তাব রাখেন (Tsagareli, Gramoti, No. 144)। রাশিয়ার জওয়াব ছিল ছলনাপূর্ণ এবং ২৪ জুলাই, ১৭৮৩ খৃস্টাব্দের পূর্বে একটি আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা বিষয়ক কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় নাই। রাশিয়া ইরিকলেকে তাঁহার ভূখণ্ডগত নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাঁহাকে অভ্যন্তরীণ নীতির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেয়। কিন্তু পররাষ্ট্র বিষয়ক ব্যবস্থাপনা রাশিয়ার হস্তগত হয়। রাশিয়ার একটি সেনাবাহিনীকে তিফলিসে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে এই বাহিনীকে প্রত্যাহার করা হয়।

কাজারগণ ঃ এই সময়ে কাজারগণ যান্দগণের উত্তরাধিকারী হয়। ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে আগা মুহাম্মাদ কাজার কারাবাগস্থ শূশা অবরোধ করেন এবং অতঃপর তিফলিস আক্রমণ করিয়া ১১ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৫ সালে উহা দখল করিয়া ভয়ঙ্করভাবে লুটপাট করেন; তু. Brosset ২/২খ, পৃ. ২৩; Olivier, Voyages en Orient, ৩খ, পৃ. ৭৮ (একজন প্রত্যক্ষদর্শী হাঙ্গেরিয়ান চিকিৎসকের সাক্ষ্য)। পারর্সিয়ান আক্রমণ দাগিস্তানিয়ানগণ কর্তৃক পরিচালিত একটি আক্রমণ দ্বারা অনুসৃত হয়। ১৭৯৫ খৃস্টাব্দে দুইটি রাশিয়ান ব্যাটেলিয়ান জর্জিয়াতে উপনীত হয়; মার্চ ১৭৯৬ খৃস্টাব্দে রাশিয়া পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু নভেম্বর ৬-১৮ তে দ্বিতীয় ক্যাথেরিন মৃত্যুবরণ করেন এবং তাহার পুত্র ১ম পল অবিলম্বে রুশ সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে। আগা মুহাম্মাদ ট্রান্সককেসিয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় বহির্গত হন, কিন্তু শূশার সন্নিকটে নিহত হন (জুন ১৫, ১৭৯৭ খৃ.)। বৃদ্ধ রাজা ইরিকলে ১২-২৩ জানুয়ারী, ১৭৯৮ খৃস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার পুত্র ১২শ গিওরগি তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ফাত্হ আলী কাজার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। কারস হইতে তাঁহার দুই পুত্রের অধিনায়কত্বে গিওরগি ২,০০০ লেযগীর একটি বাহিনী প্রেরণ করেন; রাজপরিবারের বংশগত জটিলতা তাঁহার অবস্থানকে খুব সংকটময় করিয়া তোলে। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি দূতাবাস স্থাপন করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ একটি আশ্রিত রাজ্যের মর্যাদায় নয়, রাশিয়ার অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় জর্জিয়াকে সম্রাটের পূর্ণ ক্ষমতাধীনে ন্যস্ত করা উচিত। অপরপক্ষে রাজবংশের জন্য সিংহাসনটিকে সংরক্ষণ করিবার তাগিদ ছিল।

১৮ ডিসেম্বর, ১৮০০ খৃস্টাব্দে ১ম পল জর্জিয়ার সংযুক্তি (Prisoyedineniye) ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন, যাহা ২৮ ডিসেম্বর, ১৮০০ খৃস্টাব্দে গিওরগির ইনতিকালের পর ১৮ জানুয়ারী, ১৮০১ খৃস্টাব্দে ঘোষিত হয়। ১১ মার্চে ১ম পলকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এপ্রিলে জর্জিয়ার দূতগণ সম্রাট ১ম আলেক্সাণ্ডারকে একজন গভর্নর নিযুক্তির অনুরোধ জানান, যিনি হইবেন রাজকীয় লেফটেনেন্ট ও জর্জিয়া রাজ-উপাধিযুক্ত একজন জর্জিয়ান যুবরাজ। ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮০১ খৃস্টাব্দে ১ম আলেক্সাণ্ডার, একটি আশ্রিত রাজ্যের অধীনে পুরাতন সরকারকে পুনঃস্থাপন করা সম্ভবপর নয়, এই যুক্তিতে ১ম পলের ঘোষণাপত্রটিকে স্বীকার করিয়া নেন ফিনকেনসতেইনের চুক্তি (১৮০৭ খৃ.), যদ্দ্বারা নেপোলিয়ান জর্জিয়ার উপরে পারস্যের অধিকারকে স্বীকৃতি

দেন, তাহা কখনই কার্যকর হয় নাই এবং ১৮১৩ খৃস্টাব্দের চুক্তির ৩ নং ধারা অনুসারে পারস্য জর্জিয়ার ভূখণ্ডসমূহের উপরে তাহার অধিকার ত্যাগ করে।

১৯১৭ খৃস্টাব্দ হইতে ঃ ১৯১৭ খৃস্টাব্দের রুশ বিপ্লব পর্যন্ত তিফলিসের মর্যাদা অপরিবর্তিত রহিয়া যায়। রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন ট্রান্সককেসিয়া ১২ এপ্রিল, ১৯১৮ খৃস্টাব্দে ইহার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তিফলিস সামন্ততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রটির রাজধানী হয়, কিন্তু মুসলমানগণ তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ব্যবস্থাপক সভা (মে ২৬) ট্রান্সককেসিয়ার বিভক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। তিনটি প্রজাতন্ত্র জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আযারবায়জান গঠিত হয়; তিফলিস পুনরায় জর্জিয়ার রাজধানী হয়। ২৮ মে, ১৯১৮ খৃস্টাব্দে জর্জিয়া ও জার্মানীর মধ্যে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মান সেনাবাহিনী তিফলিসে উপনীত হয়; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিরতির পর বৃটিশ সেনাবাহিনী তাহাদের স্থালাভিষিক্ত হয়। ২৬ জানুয়ারী, ১৯২১ খৃস্টাব্দে মিত্রবাহিনী জর্জিয়াকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী নাগাদ কিছু লড়াইয়ের পর জর্জিয়ার ক্ষমতা রাশিয়ার হস্তগত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের (U.S.S.R) একটি অংশ হিসাবে ট্রান্সককেসিয়াকে একটি ফেডারেল প্রজাতন্ত্ররূপে সংগঠিত করা হইয়াছে। সুতরাং তিফলিস ট্রান্সককেসিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের (Z. S. F. S. R.) কেন্দ্র এবং যুগপৎ জর্জিয়ার রাজধানীর (S. S. R. G.) মর্যাদা লাভ করে।

তিফলিস (সংযোজন) ঃ জর্জীয় ভাষায় ৎবিলিসি/তবিলিসি; জর্জীয় 'ইবিলি' মূল শব্দ হইতে উদ্ভূত। 'ইবিলি' শব্দের অর্থ 'উষ্ণ' শহরে উষ্ণ গন্ধক প্রস্রবণ বা স্নানাগার আছে। উহা হইতেই শহরের এই নামকরণ। তিফলিস শহরের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৪র্থ শতকে। ৪৫৫ সনে তিফলিস শহরের পত্তন হয়। উহা ছিল প্রাচীন জর্জীয় রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। ককেসাস পর্বতমালার মধ্যবর্তী এই শহর হইতেই একদা তুর্কী ও তাতার শাসকগণ বিজিত জর্জীয় অঞ্চলগুলি শাসন করেন। তিফলিস রুশ জার সরকারের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহের কেন্দ্র। শহরটি প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে উহা পরপর হূন, খাযার, পারসীয়, বায়যান্টীয়, আরব, মোঙ্গল ও তুর্কী আক্রমণে বহুলাংশে ধ্বংস হয় এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন শাসনামলে শহরটি কয়েক দফা পুনঃনির্মাণ করা হয়।

১২শ-১৩শ শতকে জর্জীয় রাজশক্তির রাজ্য বিস্তারের চরম স্বর্ণযুগে তিফলিসের সর্বাধিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধিত হয় বলিয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের অভিমত। শহরটিতে সর্বশেষ পারস্য আক্রমণ ১৭৯৫ সালে সংঘটিত হয়। পরে ইহা (১৮০০-১ খৃ.) রুশ জার সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়।

বলশয় কাবকাজ (বৃহৎ ককেসাস) ও মালীঈ কাবকাজের (ক্ষুদ্র ককেসাস পর্বতমালা) মধ্যবর্তী অঞ্চলে পার্বত্য নদী কূরার দুই তীরে চিত্রবৎ এই শহরের অবস্থান। শহরটি ভূপৃষ্ঠ হইতে ১,৩০০-২,১০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। কূরা নদীর স্তরবিন্যস্ত অববাহিকার উভয় তীরে মনোরম এই শহরের উপর দিয়া উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয়। শহরটি উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে দৈর্ঘ্যে ১০ মাইল এবং ২ হইতে ৪ মাইল প্রশস্ত। মূলত ইহা প্রাচ্য রীতিতে নির্মিত এক প্রাচীন জনপদ হইলেও প্রাক ২য় বিশ্বযুদ্ধ আমল হইতে লক্ষণীয় আধুনিকায়ন ঘটিয়াছে পাশ্চাত্য কেতায়, আর বলাই বাহুল্য প্রধানত রুশ রীতি ও পরিকল্পনায়। এই শহরের একটি অংশে মধ্য এশীয় স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আজও স্পষ্ট। এখানে রহিয়াছে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলি। শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ রুশ পদ্ধতিতে নির্মিত।

প্রাচীনকাল হইতেই তিফলিস য়ুরোপ ও প্রাচ্য তথা এশিয়া, বিশেষ করিয়া ভারতের সহিত বাণিজ্যের মধ্যবর্তী কেন্দ্র। বিশ শতকের প্রথম ভাগেও ইহা ট্রান্স-ককেসীয় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৮৭১ সনে বাকু-বাটুম রেলপথ নির্মাণের পথ ধরিয়া ১৯শ শতকের তিফলিসের আধুনিক কালের বিকাশের উন্মেষ ঘটে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর তিফলিস মেনশেভিক সরকারের শাসনাধীন (১৯১৭-২১) থাকে। ১৯২১ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিফলিস ছিল ট্রান্স-ককেসিয়ান সোভিয়েট ফেডারেটেড রিপাবলিকের অঙ্গ। ১৯৩৬ সাল হইতে তিফলিস-এই রুশ নামটি বদলাইয়া উহার জর্জী প্রতিশব্দ ৎবিলিসি বা ত্বিলিসি করা হয়। সুনির্দিষ্টভাবে ১৯৩০-এর দশকের শেষের দিক হইতে তিফলিস শহরের আধুনিক পুনঃনির্মাণ ও নাগরিক আধুনিকায়ন চলিতে থাকে। এই তিফলিসের একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সোভিয়েট সাম্যবাদের অন্যতম নেতা জোসেফ স্তালিন ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এখানেই সাবেক সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী শেভার্দনাদজে কমসোমলের সদস্য হিসাবে তাঁহার রাজনৈতিক কর্মজীবন শুরু করেন। এখানেই স্তালিন সোভিয়েট বিপ্লবী সরকারে যোগ দেন।

তিফলিস জর্জিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। ১৯১৮ সনে এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিফলিস একটি বিখ্যাত রেল জংশন। এখানে একটি বিমান বন্দর আছে। এখানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জর্জিয়ান একাডেমী অব সায়েন্স বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১৯৪২)। তিফলিস শহরে ভারী যন্ত্র নির্মাণ, চলচিত্র নির্মাণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন, রেশম বয়ন, বিদ্যুৎ সরঞ্জাম নির্মাণ, রেল ইঞ্জিন ও কোচ নির্মাণ শিল্প রহিয়াছে। শহরের আট মাইল উত্তরে রহিয়াছে জামো-আবচালা পানি বিদ্যুত উৎপাদন কেন্দ্র। ইহা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম বৃহত্তম পানি বিদ্যুত কেন্দ্র। ১৯৮৬ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী শহরের জনসংখ্যা ১১,৭৪,০০০।

এই শহরের বিশেষ আকর্ষণীয় পর্যটন এলাকা মাউন্ট ডেভিডে ১৯০৫ সালে প্রথমবারের মত কেবল রেলপথ স্থাপন করা হয়। মাউন্ট ডেভিড ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪০০-৫২২ মিটার ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক অপরূপ পার্বত্য অঞ্চল। ইহা শহরের পশ্চিমে অবস্থিত (ইহা জর্জীয় অর্থোডেক্স চার্চের প্রধান যাজক বা প্যাট্রিয়ার্কের কার্যালয়। ইহা ছাড়াও এখানে ৬ষ্ঠ শতকের সেন্ট ডেভিড চার্চ (ও ইহার প্রাঙ্গণে সাধু গ্রিবয়েদতের সমাধি সৌধ) রহিয়াছে। চার্চটি ডেভিড'স মাউন্ট পার্ক এলাকায় অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষও পরিলক্ষিত হয়।

সাবেক সেভিয়েট ইউনিয়নের অন্যান্য জনপদের মত তিফলিসও ১৯১৭ সনের পর ১৯৮৭ সালে সোভিয়েট পার্টি প্রধান ও প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ ঘোষিত পেরেসত্রেইকা ও গ্লাসনস্ত কার্যক্রম শুরুর পর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিতে শুরু করে। গত ১৯৯১ সনের শেষদিকে জর্জীয় সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রে প্রথম ও শেষবারের মত জনগণের অবাধ নির্বাচনে কমিউনিস্ট বিরোধী জাতীয়তাবাদী জর্জীয় নেতা জভিয়াদ গামসাখুদিয়ার ৮৭ শতাংশ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়লাভের কিছু দিনের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অবসান ঘটিলে অন্যান্য সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রের মতই জর্জিয়াও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু সেখানে, বিশেষ করিয়া রাজধানী তবিলিসিতে ক্ষমতার অন্তর্কলহের পথ ধরিয়া ন্যাশনাল গার্ড ইউনিট (কার্যত জর্জিয়ার সেনাবাহিনী) গামসাখুদিয়ার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯৯২ সনে জানুয়ারীর গোড়ার দিকে জর্জিয়ায় কার্যত গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এর কেন্দ্রভূমি হয় ত্বিলিসি। গামসাখুদিয়ার অনুগত বাহিনী ও

সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতে ত্বিলিসির পার্লামেন্ট ভবনসহ বহু দালানকোঠা গুলিগোলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিহত হয় অসংখ্য লোক। এই সংঘাতের জের ত্বিলিসিতে এখনও চলিতেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের অবসানের পর ১৯৯১ সনর ২১ ডিসেম্বর কয়েকটি সাবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র নিজেদের মধ্যে কমনওয়েল্থ ঘোষণা করে। কিন্তু জর্জিয়া ঐ কমনওয়েল্থে যোগ দেয় নাই, বরং কিছু দিনের মধ্যে গামসাখুদিয়ার নেতৃত্বে জর্জিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই মিত্রদের সঙ্গে ক্ষমতার অন্তর্কলহগত কারণে একটি সামরিক পরিষদ ত্বিলিসেতে ক্ষমতা গ্রহণ করিলে জননির্বাচিত প্রেসিডেন্ট গামসাখুদিয়া প্রথমে চেচেনের গ্রজনি ও পরে পার্শ্ববর্তী আর্মেনিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কার্যত তিনি দেশে ক্ষমতা গ্রহণকারী সামরিক পরিষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার সমর্থকরা পশ্চিম জর্জিয়া ও ত্বিলিসিতে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে এবং ক্ষমতাসীন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ত্বিলিসিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাতে লিপ্ত হয়, ত্বিলিসেতে কয়েক হাজার গামসাখুদিয়া সমর্থক সামরিক পরিষদকে ঘেরাও করে ও অন্যত্র তাহারা কয়েকজন সরকারী সৈন্যকে হত্যা করে। ইহা ছাড়াও ত্বিলিসিতে কয়েক দফা প্রচণ্ড বিক্ষোভ সংঘটিত হয়। ইতোমধ্যে গামসাখুদিয়ার অনুগত বাহিনী পশ্চিম জর্জিয়ার তিনটি শহর দখল করে। অবশ্য সরকারী বাহিনী পরে দুইটি শহর পুনরুদ্ধার করে। জর্জিয়ার এই কার্যত গৃহযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ের জন্য বিবদমান দুই পক্ষ পরস্পরের প্রতি 'স্বৈরতন্ত্রের' দোষারোপ করিয়াছে। ঘটনাপ্রবাহের এই পটভূমিতে সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের সাবেক জর্জীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এদুয়ার্দ শেভার্দনার্দজে গোড়ার দিকে নিমরাজী থাকার পর পরিশেষে জর্জিয়ার ক্ষমতার হাল ধরিতে রাজী হন। তিনি ত্বিলিসিতে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু উহার প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত হইলেও অবস্থার বিশেষ রকমফের ঘটে নাই। এমনকি পশ্চিমা বিশেষজ্ঞগণ, জর্জিয়ায় বর্তমান ক্ষমতাসীনেরা গোটা দেশে দূরে থাক, ত্বিলিসিতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। দেশের সীমান্তবর্তী রুশ ফেড়ারেশন সংলগ্ন দুইট অঞ্চলের সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রশ্নে সংঘাতের ঘনঘটা দেখা দেওয়ায় জর্জিয়ায় গৃহযুদ্ধ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। আর উহা জর্জিয়ার সাবেক কম্যুনিস্ট নেতা হিসাবে নিন্দিত ও ভুল সম্পর্কিত জ্ঞানোদয়, দূরদর্শিতা ও শক্ত হাতে হাল ধরার ক্ষমতার জন্য এমনকি জর্জিয়াতেও নন্দিত শেভার্দনার্দজের জন্যও বিব্রতকর। ঠিক এই পটভূমিকায় ২৪ জুন গামসাখুদিয়ার সমর্থক কিছু বিদ্রোহী খোদ ত্বিলিসেতে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থান প্রয়াস চালানোর সময় রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও বেতারকেন্দ্র দখল করে এবং ঐ সময় ৪০ জনের মত লোক নিহত হয়। অবশ্য সামরিক বাহিনী পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বলা হইয়াছে, শেভার্দনার্দজে ক্ষমতায় আসার পর ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে গামসাখুদিয়া সমর্থকদের ইহা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুতর চ্যালেঞ্জ। দেশের সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর অশান্তিজনিত কারণেও শত শত লোকের প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই পটভূমিতে রাজধানী ত্বিলিসি কার্যত্র রক্তক্ষয়, ধ্বংস ও সংঘাতসংক্ষুব্ধ অনিশ্চয়তায় ভরা এক জনপদ বিশেষ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The Columbia Lippincot Gazetteer of the World, Ed. Leon E. Seltzer with 1961 supplement, Columbia University Press 1966; (২) Cambridge World Gazetteer, Ed. David Munro, Cambridge University Press, N. Y. 1988; (৩) Webster's New Geograhical Dictionary, Merriam-Webster Inc, USA; (৪) Worldmark Encyclopaedia of the Nations, Asia & Oceania, 7th ed., Worldmark Press Ltd., Newyork, 1988; (৫) Time Mag., USA; (৬) Reuter.

তিফলিসের বিবরণ ঃ আরব ভৌগোলিকগণ তিফলিসের কিছু বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ইসতাখরীর (পৃ. ১৮৫) মতে শহরটি ছিল খুব বড়; ইহা তিনটি ফটক সম্বলিত মাটির দেওয়ালসমূহ (তীন) দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; তিবেরিয়াসের ন্যায় ইহা ছিল প্রাকৃতিক উষ্ণ গোসলখানাসমূহে সমৃদ্ধ। মুসইর ইব্ন মুহালহিল (য়াকূত)-এর মতে এই সমস্ত গোসলখানা মুসলমানগণের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ইব্ন হাওকাল (পৃ. ১৪২-১৪৪) তিফলিসের জল-চক্র চালিত কলগুলিকে ('উরুব) মাওসিল এবং রাককার জল-চক্র চালিত কলসমূহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি তিফলিসের প্রচুর খাদ্য সরবরাহ এবং ইহার অধিবাসীগণের মেহমানদারীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিফলিস ছিল ইসলামের একটি দূরবর্তী উপনিবেশ, যাহার আরও দূরে আর কোন মুসলমান ছিল না (ইসতাখরী)। শহরটি শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল (ইব্ন হাওকাল)। ৯ম শতাব্দীতে বালাযুরী একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণী প্রদান করিয়াছেন, নগরটি পাইনকাষ্ঠ (সানাওবার) নির্মিত ছিল (কাযবীনীর মতে, শুধুমাত্র ছাদগুলি পাইনকাষ্ঠ নির্মিত ছিল)।

মোঙ্গল যুগে যাকারিয়া কাযবীনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিফলিসের কুরের এক তীরে মুআযযিনের আযানের ভাবগম্ভীর ধ্বনি এবং অপর তীরে খৃস্টীয় নাকূসের ধ্বনি শোনা যাইত। খৃস্টানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। হামদুল্লাহ্ মুসতাওফী বর্ণনা করিয়াছেন, তিফলিসের বাড়িগুলি একটির উপর আর একটি নির্মিত এবং একটির ছাদ অপরটির আঙ্গিনা হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

১৭শ শতাব্দী হইতে আমরা হাজ্জী খালীফা (তাঁহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ১৬৩০-৩৫ খৃ. বর্ষসমূহ সংশ্লিষ্ট) এবং আওলিয়া চেলেবি (১৬৪৮ খৃস্টাব্দে)-এর তুর্কী বিবরণাদিসহ একজন য়ুরোপিয়ান (চহারদিন ১৬৭৩ খৃ.)-কৃত প্রথম বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া আওলিয়া দুর্গাদির অনেক বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত বৃহৎটি (কুরের দক্ষিণ তীরেরটি)-র পরিধি ছিল প্রায় ৬,০০০ কদম এবং ইহার দেওয়ালটির উচ্চতা ছিল প্রায় ৬০X৪৫ ইঞ্চি (যি'রা)। ইহার ৭০টি টাওয়ার এবং ৩,০০০ লোকের একটি গ্যারিসন ছিল। ইহাতে কোন খানা-খন্দক ছিল না। একটি টাওয়ার হইতে দুর্গের পানীয় জল (সুলুক কূলে) সরবরাহের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হইয়াছিল। বড় দুর্গটিকে মাটির ছাদযুক্ত ৬০০ বাড়ি ছিল। অপেক্ষাকৃত ছোট দুর্গটিতে (বাম তীরে) শুধুমাত্র ৩০০ বাড়ি ছিল, কিন্তু ইহার দেওয়ালগুলির বিবেচনায় ইহা খুব শক্তিশালী ছিল। চহারদিনের Atlas-এর ৩নং প্লেট তিফলিসের একটি সাধারণ দৃশ্যের উপস্থাপনা করে, যাহাতে পর্যটক ১৯টি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (গির্জাসমূহ, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি) প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৮শ শতাব্দীর জন্য আমরা Tournerfort (১৭০১ খৃ.), ২খ, পৃ. ৩০৭ (একটি দৃশ্যসহ পৃ. ৩১৪) এবং ওয়াখুশতের Geography (এক্ষণে যাহার সমস্যাসমূহ Brosset, ১খ, পৃ. ১৮০ কর্তৃক বিদূরিত হইয়াছে)-তে প্রদত্ত বিবরণীসমূহ প্রাপ্ত হই। তিফলিসের একটি একত্র সমাবিষ্ট বহুদৃশ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ চিত্র প্রকল্প প্রকাশ করা হইয়াছিল, প্রকাশক, De L'Isle, Avertissement, sur la carte generale de la Georgie, Paris 1766 (সম্পাদক রাশিয়াতে তাহার ক্ষণস্থায়ী

প্রবাসকালে 'জর্জিয়ার যুবরাজ'-এর নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন)। P. Iosselian (১৮৬৬ খৃ.)-কৃত গেজেটিয়ার মূল্যবান, কারণ ইহা প্রাচীন ভবনাদির স্থান নির্দেশ করিয়াছে।

পুরাতন তিফলিস চারিটি কোয়ার্টার সম্বলিত ছিল, যাহার মধ্যে তিনটি কুরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল (কুর নদী এইখানে উত্তর-দক্ষিণ হইতে উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়াছে) ঃ ১. কালা অথবা কালিসি (আরবী কালআ;), প্রাচীরের মধ্যগত পুরাতন কোয়ার্টার (কুরে পতিত সোলোলাকি এবং দাবা-খানা জল প্রবাহদ্বয়ের মধ্যবর্তী) নারিন কালা দুর্গসহ। ২. তপহিলিসি নামে পরিচিত মূল শহর, যাহা উষ্ণ ঝরনাসমূহের চতুষ্পার্শে গড়িয়া উঠিয়াছিল (Brosset, 1/1, p. Ixxx-অনুসারে ইহা আর্মেনিয়ার অধিবাসীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল)। শহরটি কুর নদীর তীরে কালার বিপরীতে এবং নিম্নে অবস্থিত ছিল। শাহ সাফী, তহাবোর মালভূমিতে (দাবা-খানার পূর্বে) সায়্যিদগণের একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার কারণে এই জিলাটির ফারসী নামকরণ হইয়াছে সায়্যিদ-আবাদ। ৩. প্রথম দুইটি কোয়ার্টারের উপরে এবং উত্তরে রেসকোর্স (আসপারেয) সমীপবর্তী বহিঃস্থ কোয়ার্টার গারেতহ উবানি। ৪. কালার বিপরীত কুরের বাম তীরবর্তী কোয়াটারটি ইসানি অথবা নিসানি (পরবর্তীতে আওলাবার) নামে অভিহিত ছিল এবং ইহার উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল মাখাতহার উচ্চভূমি। ইসানি আরবগণের সুগদাবীলের অনুরূপ। ইহা হইতেছে গোরস্থান সাগোদেবেল, জর্জিয়াতে গভীর আর্তনাদস্থল"; যাহা Life of St. Abo-তে বর্ণিত হইয়াছে; তু. Brosset, Additions, p. 136 এবং Schulze, Das Martyrium d. hl. Abo Von Tiflis, Texte und Untersuchungern 1905, xiii, fasc. 4, p. 35. একই নামের উল্লেখ Georgian Chronicle-এ দুইবার ঘটিয়াছে (তু. Brosset, ১খ, পৃ. ৪০৭ এবং ৬৩৩)।

তিফলিসের নিম্নবর্ণিত তিনটি দুর্গ ব্যতিক্রমধর্মীয়তার দাবিদার ঃ ১. দাবা-খানার দক্ষিণ তীরস্থ পাহাড়ে অবস্থিত প্রাচীন তহাবোর (কোরচি-কালআ) দুর্গ। ১৬১৮ খৃ., ১৭২৫ খৃ. এবং সর্বশেষ ১৭৮৫ খৃ. ইহার ধ্বংসসাধন করা হয়। ইহা সানজা ফটক নামে অভিহিত দক্ষিণাঞ্চলীয় কালা ফটকের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে। ২. কালা পাহাড়স্থ নারিন-কালআ দুর্গ। ইসলাম-পূর্ব যুগে দুর্গটি গুরিশ-তসিখে নামধারী ছিল বলিয়া অনুমিত হয় (ওয়াখুশত)। ১৮১৮ খৃ. ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় (তু. গামবার Atlas-এ প্রদত্ত চিত্র)। ৩. বাম তীরবর্তী দুর্গটি (ইসানি) একটি সেতুমুখ হিসাবে ব্যবহৃত হইত; ১৭২৮ খৃ. তুর্কগণ এই স্থলটিতে সর্বশেষবারের মত তাহাদের অবস্থান জোরদারকরণে তৎপর হন, কিন্তু তাহারা কাজটি অসমাপ্ত রাখিয়া চলিয়া যান।

রাজকীয় প্রাসাদগুলির বিষয়ে বলিতে পারা যায় যে, পুরাতন সেতুর সম্মুখস্থ বাম তীরে অবস্থিত মেতেখি রাজপ্রাসাদই ছিল সর্বপ্রাচীন। ১৬৩৮ খৃ. মুসলমান রাজা রোসতোম তপহিলিসিতে কুর নদীর তীর বরাবর আনুমানিক ৪০০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। এইখানে শাহ নাওয়ায কর্তৃক চহারদিনকে স্বাগত জানানো হইয়াছিল। আরও কিছুটা দক্ষিণে রাজা ওয়াখতান্‌ও ফারসী কায়দায় খুব উন্নত মানের কারুকাজযুক্ত একটি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭২৫ খৃ. তুর্কগণ কর্তৃক ইহার ধ্বংস সাধন করা হয়; তু. Iosselian, Opisaniye (মসজিদসমূহ বিষয়ে তু. পৃ. ২৩৯)।

কুর এবং দক্ষিণ তীরস্থ পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে সংকোচনজনিত স্থানটির প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে প্রাচীন তিফলিসের উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটে নাই (তু. চহারদিন)। ১৯শ শতাব্দীতে শহরটি ইহার প্রাচীন সীমানাসমূহ অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে থাকে। এক্ষণে বিশেষত বাম তীরে শহরটির বিকাশ ঘটিতেছে। এই বাম তীর বরাবর রেল লাইনসমূহ স্থাপিত হইয়াছে (তিফলিস-বাকু, তিফলিস-বাতুম, তিফলিস-জুলফা এবং তিফলিস-কাখেতহিয়া)।

জনসংখ্যা ঃ ১৭৮৩ খৃ. থাইমুরায ও এরিকলের সমৃদ্ধিশালী রাজত্বের পর শহরটিতে ৬১,০০০ অধিকাসীসহ ৪,০০০ গৃহ ছিল। ১৮০৩ খৃ. এইখানে শুধুমাত্র ৩৫,০০০ অধিবাসীসহ ২,৭০০-৩,০০০ গৃহ ছিল। ইহা ছিল ১৭৯৫ খৃ. আগা মুহাম্মাদের আক্রমণের পরিণতি; এমনকি গামবার আমলেও যাহার চিহ্ন সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইত। ১৮৩৪ খৃ. অধিকতর সঠিক গণনায় (Dubois de Montpereux) ৩,৬৬২টি গৃহ, ৪,৯৩৬টি পরিবার এবং রাশিয়ানগণ বাদে ২৫,২৯০ জন অধিবাসীর হিসাব পাওয়া যায়। শহরটির জনসংখ্যা দ্রুততার সহিত বাড়িয়া যায় ঃ ১৮৫০ খৃ. ৩৪,৮০০ জন, ১৮৬৫, খৃ. ৭০,০০০ জন, ১৮৯৭ খৃ. ১৬০,৬০৫ জন। শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে আর্মেনিয়ান ছিল ৩৮.১%, জর্জিয়ান ২৬.৩% এবং রাশিয়ানগণ ২৪.৮%। ১৯২২ খৃ. আদমশুমারি অনুসারে তিফলিসের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ২,৩৩,৯৫৮ জন, যাহাদের মধ্যে ছিলেন ৮৫,৩০৯ জন আর্মেনিয়ান, ৮০,৮৮৪ জন জর্জিয়ান, ৩৮,৬১২ জন রাশিয়ান, ৯,৭৬৮ জন য়াহূদী, ৩,৯৮৪ জন পারসিয়ান, ৩,২৫৫ জন আযারবায়জানী তুর্ক, ২,৪৫৭ জন জার্মান ইত্যাদি; তু. যাকাওকাযয়ে, তিফলিস ১৯২৫ খৃ., পৃ. ১৫৬-১৫৭। পরিশেষে ১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৬ খৃ. আদমশুমারি অনুসারে তিফলিসের জনসংখ্যা ২,৮২,৯১৮ জন-এ উন্নীত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) স্ট্যাণ্ডার্ড কাজ হইতেছে M. F. Brosset, Histoire de la Georgie., St. Peersburg, 1849-1857, Vol. 1/1-গ্রন্থকার কর্তৃক একটি উল্লেখযোগ্য সূচনা এবং ১৪৫০ খৃ. পর্যন্ত প্রাচীন ইতিহাস; vol. 1/2-Additions, যাহার জন্য আর্মেনিয়ান এবং মুসলিম সূত্রাদি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইয়াছে; vol. ii/I-Additions কর্তৃক অনুসরণকৃত যুবরাজ ওয়াখুশ্‌ত -এর ইতিহাস (১৪৫০-১৭৫০ খৃ. চারিটি রাজতন্ত্রের পৃথক ইতিহাস্ খারথলিয়া, কাখেথিয়া সাআতাবাগো, ইমেরেতহিয়া); Vol.ii/1-পরবর্তী ইতিহাসমালা, জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ ইত্যাদি (আনু. ১৬৫৯-১৮৫৬ খৃ.); ৪টি খণ্ডে সর্বমোট ২,৪২৪টি পৃষ্ঠা রহিয়াছে, (২) তু. অধিকন্তু Laurent Brosset, Bibliographie analytique des ouvrages de M. F. Brosset (1824- 1879). St. Petersburg 1887 (২৭১টি পুস্তক এবং নিবন্ধের বিশ্লেষণ)। (৩) সূত্রাদির ইতিহাসের জন্য তু. Sbornik materialow, Tiflis 1900, xxviii, 1-214-এ তাকাইশবিলি কর্তৃক অনূদিত ৩টি ইতিহাস। ঘটনাপঞ্জীগুলি নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী দ্বারা সংযোজিত হইয়াছেঃ (৪) যুবরাজ ওয়াখুশ্‌তের Geography [১৭৪৫ খৃস্টাব্দে মস্কোতে সম্পাদিত], ফরাসীতে অনু. Brosset, Description geographique de la Georgie, St. Petersburg 1842 (মূল মানচিত্রাদিসহ), রাশিয়ান অনু. জানাশওইলি, তিফলিস ১৯০৪, Zap, Kawk. Otd. Russ. Georg. Obshc, xxlv. fasc. 5-এ; (৫) P. Losselian, Istoriceskii vzgliad, Tiflis 1849 (মুসলমান রাজগণের অধীনে জর্জিয়ান ইতিহাস ১৫৬৯-১৭২৯ খৃ.); (৬) জর্জিয়ার ইতিহাস পুনঃ পরীক্ষার কাজ হাতে নেন জাওয়া-খিশবিলি, Kharthvel eris istors, 2 vols. Tiflis 1913 (মোঙ্গল আক্রমণ পর্যন্ত); Vol.

i. 3rd ed., 1924, 8র্থ খণ্ডের একটি অংশ (তীমূরী উত্তরকাল), ১৯২৪ খৃ.।

নিবন্ধে উল্লিখিত মুসলিম সূত্রাদি ছাড়াও দ্র. (৭) য়াকূত, ১খ, পৃ. ৭৮ (আবখায); (৮) ১খ, পৃ. ৮৫৭ (তাফলীস); (৯) ২খ, পৃ. ৫৮ (জুরযান); (১০) যাকারিয়া কাযবীনী, আছারুল-বিলাদ, সম্পা. Wustenfeld, p. 348 (তু. Dorn, Geographica, p. 538); (১১) হামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহাতুল-কুলূব, G. M. S., ২৩খ, পৃ. ৯৩, ১৮২; (১২) হাজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, পৃ. ৩৯৪; (১৩) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাতনামে, ২খ, পৃ. ৩১৫-৩১৯; (১৪) যায়নুল-আবিদীন শীরওয়ানী, বুস্তান আল-সিয়াহা (১৮৩১ খৃ.), তেহরান ১৩১৫ হি., পৃ. ৪৮১; (১৫) সানীউদ-দাওলা মিরআতুল-বুলদান, ১খ, পৃ. ৪৬৯-৫০০; (১৬) তু. Dorn, Erster Beitrag z. Geschichte d. Geogier, Mem. Acad. de St. Petersburg, Sciences Politiques, Series Vi., vol. vi, 1843 (সাফাবীগণের ইতিহাস হইতে জর্জিয়া সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদেসমূহের অনুবাদ.) ফরাসী ভাষায় পুনরানুবাদ Brosset, u-1, p. 445-509; (১৭) Dorn, Geographica caucasica Mem. Acad. St. Petersburg 1847, vol. vii, 1847 p. 465-561 (ইসতাখরী, কাযবীনী, মুস্তাওফী, হাফ্ত ইকলীম); (১৮) Defremery, Frgments Des Geographes et Historiens Arbes et Persans Inedits Relatifs Aux Anciens Peuples du Caucase, F. A., 1849, xiii, . 457-523; xiv., p. 447-514; 1840, xiv., p. 50-75, 153-201; 1851, xvii, p. 105-162 (অধিকন্তু tirage a part হিসাবে); (১৯) Karaoulow, Swedeniya arab. pisately o Kawkaze, Sborn. materialow dlia Opisaniya Kawkaza, xxix., xxxi., xxxii., xxxviii. (আরব ভৌগোলিকগণের টেকস্টসমূহের অনু.); (২০) Ghazarian, Armenien unter der arabaschen Herrschaft, Zeitschr. f. armen. Philologie. Marburg 1903. i. 149-225; (২১) Marquart, Osteuprop, und ostasiat, Strefizuge, Leipzig 1903 : Exkurs iv., Der Ursprungd. iberischen Bagratiden. p. 291-436.

মোঙ্গল এবং মোঙ্গল উত্তরকাল ঃ (২২) Klaproth, Apercu des entreprises des Mongols en Georgie et en Armenie, Paris 1833; (২৩) d'Ohsson, Histoire des Mongols, 1834-1835, স্থা.; (২৪) Howorth, History of the Mongols, 1876-1888. তু. ১৯২৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত নির্ঘণ্ট; (২৫) G. Altunian, Die Mongolen und ihre Eroberungen in kaukasischen Landern, Berlin 1911 (আর্মেনিয়ান সূত্রাদি হইতে); (২৬) F. Neve, Expose des guerres de Tamerlan et de Schah-Rokh dans L'Asie Occidentale (Thomas of Metsoph হইতে) Brussels 1860 (Memoires.....Publics Par L'Aca royale de Belgique-এ প্রদত্ত ১১শ খণ্ডের উদ্ধৃতি)।

মুদ্রাতত্ত্ব ঃ (২৭) Langlois, Essai de classification des suites monetaires de la Georgie, Paris 1861; (২৮) পাখোমোও, Moneti Gruzii, I (১৩শ শতাব্দীর পূর্বকাল পর্যন্ত), Zap. Numizm. Old. Russ. Arkh. Obshc., I., fasc. iv., St. Petersburg 1910 (পর্যালোচনা জাওয়াখোও, খরিসস্তিয়ান, ভস্টক, ১৯১২ খৃ., ১/১খ, ১০৪-১১৪); (২৯) তিফলিসে স্বর্ণের দীনারসমূহের অস্তিত্ব (অতি পার্থক্য) বিষয়ে বিশেষত কাযবীনী, আছারুল-বিলাদ, পৃ. ৩৪৮-এর সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক বিষয়ে (যাহা ১৫শ শতাব্দীর শুরু হয়) ঃ (৩০) পেরেপিসকা গরুযিন্সকিখ তসারেই (১৬৩৯) হইতে ১৭৭০ খৃ. পর্যন্ত সময়ে জর্জিয়া-রাজগণ কর্তৃক রাশিয়ার শাসকগণের সহিত বিদেশী ভাষায় পত্রালাপ), সম্পা. Brosset, St. Petersburg 1861 (১৭৩৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রুশো-জর্জিয়ান সম্পর্কের উপরে p. i-xci-এ, F. Ploen কৃত একটি অভিজ্ঞাতালব্ধ বিবরণী); (৩১) Berge. Akti sobran, Kawkaz. arkhegraf. Komissiyey (ককেসাস সংশ্লিষ্ট দাফতরিক দলীল-দস্তাবেজ), ফলিও-তে ১০ খণ্ড, তিফলিস ১৮৬৬-১৮৮৫; (৩২) Butkow, Materiali noveishey istorii Kawkaza (1772-1803), St. Petersburg 1869 z vols. (L. Brosset-কৃত একটি কালানুক্রমিক বিস্তারিত বর্ণনাসহ); (৩৩) Belokurow, Snosheniya Rossiis S Kawkazom. i. (1578-1613), Moscow 1889; (৩৪) Belokurow, Arsenii Sukhanow, i, Moscow 1892; (৩৫) Tsagareli, Perepiska gruz. tsarey v. xviii veke, St. Petersburg 1890; (৩৬) ঐ লেখক, Gramoti otnosiashciyasia k Gruzii (১৮শ শতাব্দী), 2 vols., St. Petersburg 1891, 1898 ও 1902; (৩৭) Belawski এবং Potto, Utwezdeniye russ. Vladicestva na Kawkaze, Teflis 1901-1908, 12 vols.; (৩৮) Avalow, Prisoyedineniye Gruzii k Russii, St. Petersburg 1901 এবং 1906 (পারস্যের সহিত সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীও ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে); (৩৯) W. S. Romanowski, Ocerki iz istorii Gruzii, Tiflis 1902.

বিশেষত তিফলিস সংশ্লিষ্ট রচনাবলী ঃ (৪০) P. Losselian, Opisaniye drewnostey Tiflisa, Tiflis 1866 (মুহাম্মাদীর প্রাচীন কালের ললিতকলার দুষ্প্রাপ্য নিদর্শনাদি, পৃ. ২৩৮-২৭৩); (৪১) Bakrade এবং Berzenow, Tiflis v istor. i etnograf. otnosheniyakh. St. Petersbug 1870; (৪২) জানাশওইলি, Tiflis-stolitsa Gruzii, Tiflis 1899 (জর্জিয়ান ভাষায়)।

পাশ্চাত্য এবং রাশিয়ান পর্যটকগণের গ্রন্থপঞ্জী ঃ (৪৩) Miansarow, Bibliographia Caucasica. St. Petersburg 1870, বিশেষত পৃ. ৮৭-৮৯; (৪৪) Dubrowin, Istoriya woyni na Kawkaze, vol. i./3, St. Petersburg 1871; (৪৫) La Grande Encycl. Russe (Masalski, Tsagareli-কৃত নিবন্ধমালা); (৪৬) তিফলিসের সর্বপ্রাচীন পর্যবেক্ষণসমূহে Josaphat Barbaro (১৪৩৬ খৃ.) এবং A. Contarini (১৪৭৩ খৃ.)-কৃত; (৪৭) Chardin, Voyages, সম্পা. Langles, ii, 72-88 এবং Atlas-এবং ৩ নং প্লেট; (৪৮) Tournefort, Relation d'un voyage au Levant (1701), Paris 1717, ii, 307-320; (৪৯) Guldenstat, Reisen durch Russland, 2 vols., St. Petersburg 1787-1791; (৫০) ঐ লেখক, Reisen in Georgien (1770), সম্পা. Klaproth, Berlin 1815, p. 127-132; (৫১) Gamba, Voyage dans la Russie meridionale, Paris 1826, ii, 154-184 (Tiflis) এবং Atlas, প্লেট ৩৩; (৫২) Dubois de Mont-pereux, Voyage autour du caucase, Paris 1839, iii, 225-275 (Tiflis) ইত্যাদি।

V. Minorsky (E. I. [1])/ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তিফলী (দ্র. আহমাদ চেলেবী)

আত-তিফাশী (التفاشى) ঃ শিহাবুদ-দীন আবুল-আব্বাস আহমাদ ইব্ন য়ূসুফ (মৃ. ৬৫১/১২৫৩), কিতাব আযহারিল-আফকার ফী জাওয়াহিরিল-আসজার গ্রন্থের প্রণেতা; মণি-মুক্তাদির উপর সর্বাপেক্ষা পরিচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা একটি। ইহাতে তিনি সেইগুলির উৎপত্তি, প্রাপ্তিস্থান, প্রাকৃতিক এবং ঐন্দ্রজালিক বৈশিষ্ট্য, ত্রুটি ও গুণাবলী, মূল্য ও সুনির্দিষ্ট বৈচিত্র্যাবলীর যথোচিত বিচার অনুসারে ২৫ প্রকার মণিমুক্তার বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। উহা অদ্যাবধি সুষ্ঠু অবস্থায় সুরক্ষিত, গ্রন্থখানি পাণ্ডুলিপির একখানি সংস্করণ ও অনুবাদ অতিশয় বাঞ্ছনীয়। কেননা ১৮১৮ খৃ. Count Raineri Biscia-কৃত সংস্করণটি (নূতন সংস্করণ ১৯০৬ খৃ.) আধুনিক চাহিদা মিটাইবার যুগোপযোগিতা হারাইয়াছে। ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধীয় তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থখানার একটি পাণ্ডুলিপি প্যারিসে সংরক্ষিত আছে। উহার বিষয়ে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। তিফাশীকে কতিপয় অশ্লীল রচনাবলীর প্রণেতা হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) S. F. Ravius (Rau), Specimen arabicum continens descriptionem et excerpta libri A. T. de gemmis et lapidibus pretiosis, Utrecht ১৭৮৪ খৃ.; (২) A. R. Biscia, Fior di Pensieri sullc Pictre preziose di Ahmed Telfascite, ফল্‌রেন্স ১৮১৮ খৃ., বলোগনা ১৯০৬ খৃ. (৩) C. Mullet, F. A. (১৮৬৮ খৃ.) ; (৪) M. Stinschneider, Z. D. M. G., xlix, (১৮৯৫ খৃ.), পৃ. ২৫৪ প.; (৫) C. Brockelmann, G. A. L., ১খ., ৪৯৫; (৬) J. Ruska, Das Steinbuch des Aristoteles, হাইডেলবার্গ ১৯১২ খৃ., পৃ. ২৩-৩২; (৭) J. Ruska, Tabula Smaragdina, হাইডেলবার্গ ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১৫১-৫৫।

J. Ruska (E.I.[1]) মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তিব্ব্ (طب) ঃ আরবী শব্দ, অর্থ 'ঔষধ' বা 'চিকিৎসাবিদ্যা'। আরব মুসলিমগণ বিজ্ঞানের যে সকল শাখায় সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন তন্মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান অন্যতম। মুসলিমগণ প্রধানত গ্রীকদের নিকট হইতে এতদ্বিষয়ক জ্ঞান আহরণ করেন। প্রাথমিক যুগে সিরীয় ও পারসিকদের মধ্যস্থতায় এবং পরবর্তী কালে নিজেরাই গ্রীক ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এই জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহারা অধিগত করেন। মুসলিম বাদশাহ ও বাদশাহ-যাদাহগণ সর্বদাই তাঁহাদের চিকিৎসক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাতিশয় ঔদার্যের পরিচয় দান করিতেন। খলীফাগণের দরবারে য়াহূদী, খৃস্টান, মাযদাঈ, সাবাঈ, এমনকি কতিপয় হিন্দুসহ সকল ধর্মাবলম্বী চিকিৎসক অবস্থান করিতেন। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে প্রাচ্যভূমিতে প্রভূত পরিমাণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা হইয়াছিল, বিশেষত মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া গবেষণাগার এবং পারস্যের জুনদীসাবুর-এর সুবিখ্যাত শিক্ষানিকেতন আব্বাসীদের আমল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

আরব মুসলিমদের নিকট চিকিৎসা বিজ্ঞানের লেখক হিসাবে গ্রীকদের মধ্যে সর্বাধিক সুপরিচিত ছিলেন হিপোক্রেটস ও গ্যালেন। উক্ত পণ্ডিতদ্বয় ভিন্ন যাঁহাদের নাম সবিশেষে উল্লেখ্য তাঁহারা হইলেন ঃ Ephesus-এর 'রুফুস', 'ওরিবাসেস', 'আইটিয়াস' ও এজিনা (Aegina) নামক স্থানের 'পল'। হিপোক্রেটস (বুকরাত)-এর রচনাবলী যাঁহারা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন তাঁহারা হইলেন হুনায়ন ইবন ইসহাক, কুস্‌তা ইব্ন লুকা, ঈসা ইব্ন য়াহয়া ও আবদুর-রাহমান ইব্ন 'আনী। তাঁহারা বুকরাত-এর Aphorisms নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পরবর্তী কালে Prognostics ও Epidemics গ্রন্থদ্বয়ের পঠন-পাঠন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল। গ্যালেন-এর লিখিত বহুবিধ রচনা আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁহার Ars Medica অথবা Isagoge-এর অনুবাদ মধ্যযুগে সাতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। De elementis secundum Hippocratem, De temperamentis, De sanitate tuenda গ্রন্থদ্বয় খাদ্যদ্রব্যের গুণাবলী সম্পর্কে লিখিত। De alimentorum facultatibus নামক পুস্তক Therapeutics-এর উপর ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত। Methodus medendi রোগ নিরূপণ সম্পর্কে একটি সুলিখিত পুস্তিকা। De morbis et symptomatibus জ্বরব্যাধি সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থখানি ল্যাটিন ভাষাভাষীদের নিকট সুপরিচিত ছিল। অধিকন্তু নাড়ীর স্পন্দন, শরীরে আব জাতীয় স্ফীতি প্রভৃতি রোগ-লক্ষণ সম্পর্কেও হিপোক্রেটস -এর রচনাবলীর গ্যালেনকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিশেষত মহামারী সম্পর্কে লিখিত পুস্তকের ব্যাখ্যা Aphorisms পুস্তকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেও উপরোক্ত পণ্ডিতের সারগর্ভ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, প্লেটোর Timaeus প্রভৃতি গ্রন্থের আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন হুনায়ন ইব্ন ইসহাক।

খৃস্টান চিকিৎসাবিদদের মধ্যে যাঁহারা খলীফাগণের দরবারে সবিশেষ খ্যাতিমান হইয়াছিলেন তন্মধ্যে হারূন আর-রাশীদ-এর চিকিৎসক ইব্ন মাসাওয়ায়হ-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। খলীফা তাঁহাকে ঔষধপত্র সম্পর্কে লিখিত প্রাচীন কালের পুস্তকাবলী সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করেন। অধিকন্তু তিনি বাগদাদে রোগ প্রতিষেধক ঔষধ সম্পর্কে পাঠ দান করিতেন। এই একই যুগে বাখতীশূ-এর পরিবার সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এই পরিবারের জনৈক চিকিৎসক হারূন আর-রাশীদের রাজত্বকালের প্রথমভাগে খলীফাকে চিকিৎসা করেন। কথিত আছে যে, তাঁহারা পারস্যের জুন্দীসাবুর হইতে বাগদাদে আগমন করেন। আলী ইবন রিদওয়ান নামক জনৈক মিসরীয় খৃস্টান মিসরের ফাতিমী খলীফা হাকিম-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গ্যালেন লিখিত পুস্তকাদির টীকাভাষ্য প্রণয়ন করেন।

আলী ইব্ন আব্বাস নামক জনৈক অগ্নি উপাসক বুওয়ায়হী সুলতান আদুদ্দুদ-দাওলা-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি The Royal Book (শাহী কিতাব) নামক একখানি গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেন। ইব্ন সীনার কানূন (Cunon) রচনার প্রাক্কালে উক্ত গ্রন্থ অতি সুপ্রচলিত ছিল। সুসিদ্ধ জ্যামিতিবিশারদ ছাবিত ইব্ন কুর্‌রা (দ্র.)-এর পুত্র সাবাঈ সিনান খলীফা আল-কাহির-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম চিকিৎসাক্ষেত্রে সরকারী সনদপত্র পদ্ধতির প্রচলন করেন। চিকিৎসা পেশায় আত্মনিয়োগে ইচ্ছুক এবং উচ্চপদপ্রার্থিগণকে বিধিবদ্ধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সনদপত্র লাভ করিতে হইত। কোন চিকিৎসক চিকিৎসা পরিচালনার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাহা তাঁহার সনদপত্রে সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইত। শুধু বাগদাদ শহরের এই জাতীয় সরকারী সনদপত্রধারী চিকিৎসকদের সংখ্যা ছিল আট শতাধিক। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সুচিকিৎসক হিসাবে সুখ্যাতিবশত এই জাতীয় পরীক্ষা হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্তদিগকে এই সংখ্যার মধ্যে গণনা করা হয় নাই। খলীফা কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া সিনান খুরাসানে পলাইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৯৪২ খৃ. ইনতিকাল করেন।

চিকিৎসকবৃন্দের মধ্যে প্রজ্ঞা ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে মৌলিক ও মতাদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের মধ্যে কোন মারাত্মক মতভেদ ছিল না। অতি নগণ্য সংখ্যক ক্ষেত্রে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র প্রদান ও কতিপয় জিজ্ঞাস্যের উত্তর সম্পর্কিত পন্থা-পদ্ধতি হয়ত বা কোন ভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকদের নিকট অভিনব বলিয়া প্রতিভাত হইত।

এতদসম্পর্কে ইবনুল-কিফতী কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনার বিবরণী সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। একদা বাদশাহ হারূন আর-রাশীদ-এর পরিবারস্থ বাদশাহযাদার অস্বাভাবিক দীর্ঘকাল নিদ্রাভিভূত হওয়ার পীড়া দেখা দেয়। তাঁহার চিকিৎসার জন্য প্রথমে জনৈক খৃস্টান চিকিৎসককে নিয়োগ করা হয়। অতঃপর একজন য়াহূদী চিকিৎসকের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। তাহাদের চরম ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক ভারতীয় চিকিৎসককে তলব করিয়া এই গুরুদায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করা হয়। তিনি বাদশাহযাদার আরোগ্য সাধনে সফলতা অর্জন করেন। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় ঔষধের জয়জয়কার ঘোষিত হয়। তথাপি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কাহারও পক্ষে সঙ্গত হইবে না যে, ঐ ভারতীয় ঔষধ, য়াহূদী অথবা বায়যান্টীয় ঔষধের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। এমন কি উহা সর্বাংশে শ্রেয় ছিল–এমন অভিমত প্রদান করাও যথার্থ হইবে না।

সুখ্যাতির বিচারে মুসলিম চিকিৎসকগণ তাঁহাদের পূর্বসুরিগণকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। রাযী-ল্যাটিন ভাষায় 'রাযেস' সুবিজ্ঞ চিকিৎসক, ঔষধ প্রস্তুতকারক, আবিষ্কারক, অস্ত্রোপচারকারী ও রসায়নশাস্ত্রবিদ হিসাবে মধ্যযুগে সাতিশয় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। মানব শরীরের বিশেষ বিশেষ পীড়া সম্পর্কে রচিত তাঁহার প্রধান গ্রন্থদ্বয় আল-হাবী ও আল-মানসূরী সামানী সুলতান আবূ সালিহ্ মানসূরকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আর-রাযী রায় নগরের হাসপাতালের মহাপরিচালক ছিলেন। অতঃপর তিনি বাগদাদ হাসপাতালের মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মতান্ত্রিক ও বিধিবদ্ধভাবে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং উহা পরিচালনার সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মুসলিম সরকার ও শিক্ষিত জনমণ্ডলীর জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি নিপতিত হয়। ঐতিহাসিকগণ দামিশকে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল প্রসঙ্গেও বিবরণী পেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সকল বৃহৎ শহরেই সরকার কর্তৃক "প্রধান চিকিৎসক" খেতাবধারী একজন চিকিৎসককে সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করা হইত। এই উপাধিপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় ইব্‌ন যুহর-এর নাম দেখিতে পাই।

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্য মহাদার্শনিক ও বিজ্ঞ প্রবরগণও অনেকে চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহারা ঔষধ সম্পর্কে গ্রন্থাদিও প্রণয়ন করিয়াছেন। আবী সীনা ছিলেন অন্যতম সমধিক খ্যাতিমান চিকিৎসক। মধ্যযুগে রচিত এতদ্বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে তাঁহার রচিত কানূন (Canon) সর্বাধিক বৃহদাকৃতির রচনাসম্ভার। আরবী ভাষায় ইহার বহুবার, বহুবিধ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী লিখিত হইয়াছে। প্রথমে প্রাচ্যে ও পরবর্তী কালে পাশ্চত্য জগতেও উক্ত পুস্তক সবিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রধানত ঔষধাবলীর গুণাগুণ এবং উহার প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে। কুল্লিয়্যাত (সামগ্রিক আলোচনা) নামক খণ্ডে সাধারণভাবে অস্থিবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং সমগ্র শরীরে আক্রমণকারী রোগসমূহের প্রতিষেধক প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। পক্ষান্তরে মানব শরীরের শুধু একই অঙ্গে আক্রমণকারী বিশেষ বিশেষ রোগ সম্পর্কিত আলোচনা ৩য় খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নাভিমুখী পদযুগল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি অঙ্গের রোগ ও উহার প্রতিষেধক প্রসঙ্গে আলোচনা উপরোক্ত খণ্ডে বিদ্যমান। চতুর্থ খণ্ডের প্রথমাংশে সাধারণত প্রকাশ্য ও বাহ্যিক রোগের প্রতিষেধক নিরূপণ করা হইয়াছে। অতঃপর নানাবিধ দুর্ঘটনা, আব জাতীয় স্ফীতি, বিষক্রিয়া ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভগ্নাবস্থায় চিকিৎসার বিধিবিধান আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড হইল ভেষজ ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী বা Simples। আকরাবাযীন অর্থাৎ ভেষজবিদ্যা নামক পঞ্চম খণ্ডে নানাবিধ জটিল রোগের যৌগিক মিশ্র প্রতিষেধক-প্রতিবিধান করা হইয়াছে।

মরক্কোর আল-মুওয়াহহিদ বাদশাহদের বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন ইব্‌ন বাজ্জা ও ইব্‌ন তুফায়ল। ইব্‌ন রুশ্‌দ, ইব্‌ন তুফায়লের সমমর্যাদায় স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কুল্লিয়াতে পাশ্চাত্যের মুসলিম বিশ্বে, অতঃপর খৃস্টান জগতে আবী-সীনার কানূন-এর জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। স্পেনীয় মুসলিম জগৎ মধ্যযুগের ল্যাটিন ভাষাভাষীদের চিকিৎসাগুরু ইব্‌ন যুহর (Avenzoar) প্রমুখের ন্যায় সুচিকিৎসক উপহার দিয়াছিল। এই চিকিৎসকের পরিবারের অনেক সদস্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

পাশ্চাত্য জগতের উপর মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাব সমধিক ও সুদূরপ্রসারী। প্রথমত য়াহূদীগণ, বিশেষত চিকিৎসা নৈপুণ্যে সবিশেষ সুবিখ্যাত মায়মোনী শ্রেণীর য়াহূদীগণই এই মুসলিম প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। অতঃপর খৃস্টান জগতও এই অবদান গ্রহণে ব্রতী হয়। ইহারই ফলশ্রুতিতে ক্রিমোনার প্রসিদ্ধ বিদ্বজ্জন 'জেরার্ড' আবী সীনার Canon ও রাযীর কিতাবুল-মানসূরীর অনুবাদ করেন। পরবর্তী কালে বেল্লোনার আন্দ্রে আলপাগাত Canon-এর অনুবাদ পরিমার্জিত করেন। অধিকন্তু তিনি ইব্‌ন রুশদ-এর De Theriaca ও Ibn Serapion-এর Practica পুস্তকদ্বয় অনুবাদ করেন। রাযী ও Bonacossa রচিত Continens-এর অনুবাদ করেন Farragut। Padua নামক জনৈক খৃস্টান Colliget নাম দিয়া ইব্‌ন রুশ্‌দ-এর কুল্লিয়াত অনুবাদ করেন। এই সকল অনূদিত গ্রন্থ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের প্রথমলগ্নেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী ও ভেষজবিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা স্বীয় গবেষণামূলক সন্দর্ভে উপস্থাপিত করেন মালাগা শহরের ইবনুল-বায়তার। অবশ্য আবী সীনার কানূন-এর কতিপয় খণ্ডেও এতদসম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছিল। আরব মুসলিমগণ ঔষধি লতাগুল্ম সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণা করেন। অধিকন্তু তাহারা Dioscorides ও গ্যালেন প্রদত্ত শিক্ষণীয় উপদেশ হইতে ঔষধ প্রস্তুতের প্রয়োজনে ব্যবহার্য লতাগুল্মের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হইয়া বিজ্ঞানের এই শাখার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাবিকগণের সাহায্যে তাঁহারা প্রতিষেধক প্রস্তুতের প্রয়োজনে নব নব ঔষধি ব্যবহারের জন্য সুদূর মালয়, আর্চিলোগো এমন কি চীনদেশ হইতে আমদানীকৃত কর্পূর, দারুচিনি, চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করিতেন। মুসলিমগণ ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর সমধিক উন্নতি সাধন করেন এবং সিরাপ, জুলেপ, এ্যালকোহল প্রভৃতি নিত্য নূতন বস্তু আবিষ্কার করেন।

ফলত মুসলিম বিশ্বে মানবীয় রোগ প্রতিষেধক সম্পর্কে পঠন-পাঠন শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। আরব মনীষীদের রচিত নানা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিবন্ধরাজির মধ্যে পশু চিকিৎসা বিষয়ক বৈজ্ঞানিক রচনাবলীও বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মুসলিম বিশ্বের চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত সবিস্তার বিবরণী বহুবিধ আরবী গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। (১) ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, তাবাকাতুল-আতিব্বা, সম্পা. A Muller, ১৮৮৪ খৃ.; (২)

ইবনুল-কিফতী, তা'রীখুল-হুকামা; (৩) আবুল-ফারাজ, মুখতাসারুদ দুওয়াল, সম্পা. সালহানী; (৪) মাক্কারী, Analecta, স্পেনদেশীয় চিকিৎসকদের জন্য; (৫) আবী সীনা, কানূন, সম্পা. আরবী ভাষায়, রোমে প্রকাশিত ১৫৯৩ খৃ., at the Typographia Medicea ১১৯৪ খৃ. বূলাকে পুনর্মুদ্রিত।

য়ূরোপীয় গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. Lectero, Historire de la medecine arabe, ২ খণ্ডে সমাপ্ত, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ.; (২) F. Wustenfeld, Geschichts der arabischen Arzte und Naturforscher, Gottingen 1840; (৩) Donald Campbell, Arabian Medicine and its influence on the middle Ages, লণ্ডন ১৯২৬ খৃ., ২ খণ্ডে সমাপ্ত, গ্রন্থপঞ্জী সং; (৪) Carra de Vaux, Les Penseurs de L'Islam, ২খ, অধ্যায় ৯, প্যারিস ১৯২১ খৃ.; (৫) E. G. Browne, Arabian Medicine, ক্যামব্রিজ ১৯২২ খৃ.।

B. Carra De Vaux (E. I.[1])/মুহম্মদ শওকত আলী

তিব্বত (TIBET) ঃ চীনদেশের দক্ষিণে অবস্থিত একটি দেশ। ঐতিহাসিক য়াকূত ইহার তিনটি উচ্চারণ তথা তুব্বাত, তুব্বিত ও তাববুত-এর মধ্যে প্রথমোক্তটিকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন। আরবীয়দের নিকট তিব্বত ও তিব্বত সাম্রাজ্যের সুপ্রাচীন উল্লেখ খুব সম্ভব তুর্কী সূত্রেই হইয়াছিল। তিব্বতের শাসনকর্তার উপাধি ছিল খাকান, Orkhon শিলালিপির ন্যায় সুপ্রাচীন শিলালিপিতে Tuput ও Tuput Kaghan নাম খোদিত আছে। ছাবিত (Thabit) ও তুব্বা (Tubba)-এর সহিত তিব্বত নামটির কাল্পনিক বকসের সাদৃশ্য এমন আজগুবি গল্পমালার সৃষ্টি করিয়াছে যে, য়ামানবাসিগণ তিব্বতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা (দ্র. তাবারী, ১খ, ৬৮৬ পৃ; Gardizi in Barthold, Otcet opoiezdke V Srednyuyu Aziy, পৃ. ৮৭ প.)। আরবীয়দের আরও বহু অলীক বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ইব্ন খুর্রাদাযবিহ সর্বপ্রথম বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক নবাগত তিব্বতে আসিয়া অনুভব করে এবং হাস্য করিবার দুর্দমনীয় অনুভূতি লাভ করে (B. G. A., ৬খ, ১৭০)। মুসলিমদের রচনায় প্রায়শ এই গল্পের উদ্ধৃতি দৃষ্ট হয় (দ্র. নিজামী, সিকান্দারনামা, কানপুর, ১৩২০ হি., পৃ. ২২৬), এমন কি অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক রচিত حدود العالم গ্রন্থেও এইরূপ কল্পকাহিনী পাওয়া যায় (দ্র. Comptes Rendus de L'Acad, de Russie ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৭৩; এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম লাসা (Lhasa) শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হইয়াছে, এই লাসাতে একটি মসজিদ এবং একটি ক্ষুদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল।

তিব্বতীয় রাজশক্তি যখন উন্নতির চরম শিখরে উপনীত এবং তিব্বত যখন চীন-বিরোধী সংগ্রামে সাধারণত জয়যুক্ত হইত সেই কালে মধ্য এশিয়ায় আরবদের বিজয়লাভ ঘটে নাই। চৈনিক ঐতিহাসিক দলীলপত্রাদিতে আরবীয় ও তিব্বতীদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। Chavannes এই বন্ধুত্বের বর্ণনা দিয়াছেন (Documents sur les Tou-kiue [Turcs] occidentaux, (সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯০৩ খৃ., পৃ. ২৯১)। Cen-yuan রাজবংশের (৭৮৫-৮০৫) শাসনামলের পূর্বে আরবীয়গণ তিব্বতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান শুরু করে নাই। এই শাসনামল হইতে তিব্বত সরকার বরাবর পশ্চিমাভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতে থাকে যাহাতে চৈনিক সীমান্ত জিলাগুলি পূর্বের তুলনায় তিব্বতীদের দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল (Bretschneider. On the Knowledge possessed by the Ancient Chinese of the Arabs, London ১৮৭১ খৃ., পৃ. ১০)। আরবীয় ঐতিহাসিক সূত্রসমূহে বন্ধুত্ব বা বিরোধ কোনটিরই উল্লেখ নাই। তাবারীর বর্ণনায় দেখা যায়, বিদ্রোহী মূসা ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন খাযিম যখন তিরমিয-এর শাসনকর্তা ছিলেন (১৫ বৎসর, ৮৫/৭০৪ সন পর্যন্ত), তখন তিনি আক্রান্ত হইয়াছিলেন 'হায়াতিলা' অথবা 'হাবাতিলা' কর্তৃক (দ্র. China, পৃ. ৮৪৫ খ); তিব্বতী ও তুর্কীরাও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল (বালাযুরী, পৃ. ৪১৮, অবশ্য তিনি তিব্বতীদের উল্লেখ করেন নাই)। মূসা ইব্ন 'আবদিল্লাহ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। য়া'কূবীর মতে (২খ, ৩৬২; অধিকন্তু দ্র. B. G. A., ৭খ., ৩০১ প.) দ্বিতীয় 'উমার (র)-এর শাসনামলে (৭১৭-৭২০) তিব্বতের রাষ্ট্র প্রতিনিধির মাধ্যমে খুরাসান-এর গভর্নর জার্‌রাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্‌র দরবারে তিব্বতে একজন ইসলাম শিক্ষক প্রেরণের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়। কথিত আছে, সালীত ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-হানাফীকে এই দায়িত্বে প্রেরণ করা হয়। একই পুস্তকে (পৃ. ৪৭৯) খলীফা আল-মাহ্‌দী (১৫৮-১৬৯/৭৭৫-৭৮৫-৭৮৫)-র নিকট আত্মসমর্পণকারী রাজন্যবর্গের মধ্যে তিব্বত রাজ্যের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। খলীফা হারূনুর-রাশীদ-এর আমলের (১৭০-১৯৩/৭৮৬-৮০৯) শেষভাগে বিদ্রোহী রাফি' ইব্ন লায়ছ; সামারকান্দ অঞ্চলে তাঁহার রাষ্ট্রদ্রোহিতা উপলক্ষে তিব্বতী সেনাবাহিনীর (جنود) সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ৫২৮)। কথিত আছে, আল-মা'মূন-এর রাজত্বকালে (১৯৮-২১৮/৮১৩-৮৩৩) তিব্বতরাজ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইহার স্মারকস্বরূপ তিনি তদীয় স্বর্ণমূর্তিকে একখানি স্বর্ণ সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিতভাবে খুরাসানে প্রেরণ করেন। মামূন উক্ত স্বর্ণমূর্তি মক্কায় প্রেরণ করেন (পূ. গ্র., পৃ. ৫৫০)। মক্কার গভর্নর য়াযীদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাখযূমী এক বিদ্রোহকালে উক্ত স্বর্ণমূর্তি স্বর্ণমুদ্রায় রূপান্তরিত করেন (পৃ. ৫৪৪)। তাবারী (৩খ, ৮১৫) তদীয় ইতিহাসে তিব্বত-রাজ খাকানকে ১৯৫/৮১০-৮১১ সনের বর্ণনায় খলীফা আল-মামূনের অন্যতম শত্রু হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে আল-আমীনকে আক্রমণ করিবার পূর্বে আল-মামূন খাকান-এর সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৯৬/৮১১-৮১২ সনে আল-ফাদল ইব্ন সাহ্‌ল (দ্র.)-কে হামাযান হইতে তিব্বত পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের গভর্নর নিয়োগ করা হয় (তাবারী, ৩খ, ৮৪১)।

আরব ভৌগোলিকগণ সম্ভব 'তুব্বাত' বলিতে Little Tibet (ক্ষুদ্র তিব্বত) অথবা বাল্‌তিস্তান (দ্র.) বুঝিত। খোতান (দ্র.) ও বাদাখ্‌শান (দ্র.) হইতে ওয়াখান হইয়া তিব্বতগামী সড়ক-পথসমূহ বিরাজমান ছিল। আল-বীরূনী (Chronology, সম্পা. Sachau, পৃ. ২৭১, ৮। ইহাতে "বায়ত"-এর স্থলে "Tubbat" বুঝিতে হইবে) এবং গারিদযী (পূ. গ্র., পৃ. ৮৮) জায়হানীর সূত্রে যেই পার্বত্য অঞ্চলের অসুস্থতার কথা বর্ণনা করিয়াছেন সেই বর্ণনায় খোতান-তিব্বত সড়কেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। বাদাখ্‌শান-এর জিরম নামক স্থানে তিব্বতগামী সড়কের নিকট অবস্থিত সীমান্ত চৌকী সম্বন্ধে দ্র. B. G. A., ৭খ, ২৮৮; ওয়াখান হইয়া তিব্বতগামী সড়কপথে সবিস্তার বর্ণনা হুদূদু'ল-আলাম (পত্রক ২৫খ) গ্রন্থে প্রদত্ত। মা ওয়ারাউন-নাহ্‌র-এর এই দিককার সীমান্তবর্তী দুর্গরূপে উল্লিখিত হইয়াছে একটি বৃহৎ গ্রাম "সামারকান্দাক (সম্ভবত ক্ষুদ্র সামারকান্দ) যেথায় ভারতীয়, তিব্বতীয়, ওয়াখানীয় (Wakhiyan) ও মুসলিমগণ বাস করিত। তিব্বত হইতে এই সড়কপথেই মুসলিম বিশ্বের মৃগনাভি আমদানি করা হইত (B. G. A., ১খ, ২৮০, ২৯৭)। ঐতিহাসিকগণের অভিমতের, এমন কি স্বীয় উক্তির বিরোধিতা করিয়া য়া'কূবী (১খ, ২০৪) তিব্বত ও চীনের (১খ, ২০৮)

সীমান্ত প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে বলেন, "তিব্বতের সহিত কোন দিন কেহ যুদ্ধ পরিচালনা করে নাই।"

সম্ভবত তিব্বতের বিরুদ্ধে প্রথম যে মুসলিম সুলতান হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও ৭ম শতাব্দীর প্রথম পাদে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন, তিনি হইলেন বাঙলার সুলতান ইখতিয়ারুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন বাখতিয়ার খালজী (মূল গ্রন্থে প্রদত্ত সন ৬৪১/১২৪৩-১২৪৪ সঠিক নহে। কারণ ঐ একই সূত্রে প্রদত্ত এই শাসকের ইনতিকালের সন ছিল ৬০৭/১২০৫-১২০৬)। বাঙলার সুলতানের এই অভিযানের সবিস্তার বর্ণনার রহিয়াছে মিন্হাজুদ-দীন জুযজানীর তাবাকাত-ই নাসিরী-তে (সম্পা. W. Nassau-Lees, খাদিম হুসায়ন এবং আবদুল হায়্যি, পৃ. ৫৫৩; অনু. Reverty, পৃ. ৫৬০ প.; Elliot, History of India, ২খ, ৩১০ প.)।

তিব্বত (Tibet, Thebet, Thabet, Thibet) নামটি পাশ্চাত্যে পরিচিতি লাভ করে আরবদের মাধ্যমে নহে [Breischneider (Mediaeval Researches, ২খ, ২১)-এর বর্ণনার বিপরীতে], বরং য়ূরোপীয় পরিব্রাজকদের মাধ্যমে মোঙ্গলদের শাসনামলে তিব্বতের নাম সরাসরি পাশ্চাত্যে পৌঁছিয়াছিল। যদিও Tudela-র Benjamin ১২শ শতাব্দীতে ইতিপূর্বেই তিব্বতের নাম (Tubbot) উল্লেখ করিয়াছিলেন (অনু. Adler, পৃ. ৫৯), কিন্তু তাহার বিবরণ সম্ভবত তখনও য়ূরোপে প্রসার লাভ করে নাই। অধুনা অনুমিত হয় যে, বেঞ্জামিন শুধু বাগদাদ পর্যন্ত সফর করিয়াছিলেন (J. K. Wright, The Geographical Lore of the Time of the Crusades, New York ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২৮২)। মুসলিম সাম্রাজ্যে, সম্ভবত য়াহূদী সূত্রে সংগৃহীত তাঁহার তথ্যাদির বিবরণ অতি মাত্রার বিভ্রান্তিকর। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য যে, তিনি বলেন, সামারকান্দ হইতে তিব্বত মাত্র চারি দিনের পথ।

মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রসংগে রচিত রাশীদুদ-দীন-এর মহাগ্রন্থেও তিব্বত সম্পর্কে কতিপয় তথ্যের উল্লেখ আছে। 'বুরী তাব্বাত' নামটি (রাশীদুদ-দীন Trudi Vost. otd. Arkh. Obshc., ১৩শ খণ্ড, মূল পাঠ, পৃ. ২৩৭) অন্যান্য মুসলিম লেখকের রচনাবলীর মধ্যে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ১৮শ শতাব্দীতে Plano Carpini ও চৈনিক তথ্যাবলীতে উহার উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্র. Bretschneider, পূ. গ্র.)। খৃ. ৭ম শতাব্দীতেই তিব্বত বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল; বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার-প্রসারের কেন্দ্ররূপে তিব্বত মোঙ্গলদের শাসনামলে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। রাশীদুদ-দীনের বর্ণনায় (সম্পা. Blochet, পৃ. ৫৪৫) বৌদ্ধ ভ্রমণ (Bakhshi)-গণের মধ্যে তিব্বতীগণ সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

৯ম/১৫শ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের পর মুসলিম শাসকগণ তিব্বত, বিশেষত ক্ষুদ্র তিব্বত আক্রমণ করেন। হিজরী নবম শতাব্দীর শেষদিকে কাশগাড়ের দুগলাত রাজবংশীয় শাসক আবূ বাক্র-এর সেনাপতি মীর ওয়ালী বাদাখশান এবং কাশ্মীর (দ্র.)-এর মধ্যবর্তী সমগ্র ভূখণ্ড (দ্র. Kafiristan) ও তিব্বত অঞ্চল অধিকার করেন (তারীখ-ই রাশীদী, অনু. Ross, পৃ. ৩২০ ও ৪০৩)। ১৫১৪ সনে আবূ বাক্র যখন সাঈদ খান কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন, তখন তিব্বতের লাদাখ শহরে নির্মিত দুর্গাদি তাঁহাদের রক্ষীবাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং তিব্বতবাসীরা ধনরত্নসহ দুর্গগুলি অধিকার করে। সাঈদ খানের আমলে (১৫১৪-১৫৩৩ খৃ.) তিব্বত, লাদাখ এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ আক্রান্ত হয়। প্রথমে মীর মাযীদ কর্তৃক ১৫১৭ সনে এবং ইহার পর ১৫৩২ সনে সাঈদ খান স্বয়ং ঐতিহাসিক হায়দার মীরযা (দ্র.) (পূ. গ্র., ৪১৭ প.) সমভিব্যাহারে অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৩৩ সনে হায়দার মীরযা Lhassa (লাশা)-য় উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। তিনি বৃহত্তম মন্দিরসমূহের এই শহরকে উরসাঙ্গ নামে আখ্যায়িত করেন। তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হইল; মাত্র এক সপ্তাহের পথে অবস্থিত আস্কাব্রাক-এ (পৃ. ৪৫৪) তিনি পশ্চাদগমনে বাধ্য হইয়াছিলেন। গুরসাঙ্গ-ই সম্ভবত হুদূদু'ল-আলাম গ্রন্থে বর্ণিত উরসাঙ যেইখানে ছিল মূর্তিসমূহের কয়েকটি সুবৃহৎ মন্দির,। এই গুরসাঙকে 'লাসা' হইতে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হইলেও তাহা ভিন্ন পরিচয়ের দলীল নহে। হুদূদুল-আলাম গ্রন্থের প্রায় সমগ্রই লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে রচিত। ফলে একই শহরের নাম ভিন্ন ভিন্ন বানানে হইয়াছে দৃশ্যত ভিন্ন ভিন্ন সূত্র হইতে গ্রহণের কারণে। পরবর্তীকালে ১৫৪৮ সনে কাশ্মীরের রাজা হায়দার মীরযা (১৫৪১ সনের পরে) লাদাখ ও বালতিস্তানের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন।

উপরোক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে ইহাই অনুমিত হয় যে, হি. ১০ম শতাব্দীতে বালতিস্তান তিব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল [তা'রীখ-ই রাশীদী, পৃ. ৪৩৬-এর মতে ইহা তিব্বত ও বোলের-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল] এবং তখনও বালতিস্তান মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয় নাই। Cunningham ও A Francke (A History of Western Tibet, পৃ. ৯০)-সহ পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের এই উক্তি যে, খৃ. ১৩৮০-১৪০০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে কাশ্মীর-রাজ সিকান্দার [Zambaur, (Manuel de Genealogie et de Chronologie, Hanover ১৯২৭ খৃ., পৃ. ২৯৩)-এর মতে সময় ছিল ৭৮৮-৮১৩/১৩৮৬-১৪১০-১১] কর্তৃক বালতিস্তান মুসলিম রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল, এই উক্তি অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হইবে।

খৃ. ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ক্ষুদ্র তিব্বতে ইসলাম রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়। কাপূল্-রাজ আলী মীর শের খান সমগ্র বালতিস্তানকে একাবদ্ধ করিয়া স্বীয় শাসনাধীন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ভূখণ্ড হইতে তখন মূর্তিসহ বৌদ্ধ ধর্মের কীর্তিসমূহ অপসারিত হয়। পরবর্তী কালে তিনি অস্থায়ীভাবে হইলেও লাদাখ বিজয়ে সক্ষম হন। তিনিই বালতিস্তানের রাজধানী কস্কারদো (Skardo) শহর প্রতিষ্ঠা করেন [তা'রীখ-ই রাশীদী, পৃ. ৪০৫-তে বর্তমানে নিশ্চিহ্ন কাশ্মীরগামী সড়ক পথে অবস্থিত একটি গিরিপথের (Pass) নাম হিসাবে আসকারদু (Askardo)-এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়]। বালতিস্তানই তিব্বতী অধ্যুষিত একমাত্র মুসলিম রাজ্য ছিল এবং ১৮৪১ সন হইতে কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কথিত আছে, বাল্টিসবাসীদের ভাষায় ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকাদিও রচিত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহার করে, যাহা তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সময় উদ্ভাবিত বলিয়া মনে করা হয়। বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত ঐ লিপিমালা সম্ভবত আসলে তিব্বতী, যদিও উহাতে আরবীর প্রভাব দৃষ্ট হয় (Grierson, Linguistic Survey of India, ৩খ, ৩২ প.; Franeke, পূ. গ্র., পৃ. ৮৯ প.)। বালতিস্তানীগণ প্রথমাবধি শী'আ মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু মাহমূদ ইব্ন ওয়ালী লিখিত বাহ্রুল-আসরার (মূল Zap., ১৫খ, ২৩৫) পুস্তকের মাধ্যমে জানিতে পারা যায় যে, ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে সম্ভবত স্বল্পকালের জন্য সুন্নীগণের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। সুন্নী মাযহাব-এ দীক্ষিত রাজার (নাম অনুল্লিখিত) পিতা ও ভ্রাতাবৃন্দ ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কাশগাড় হইতে সুন্নী আলিম আনয়নের ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিশ বৎসর পরে ১০৪৪/১৬৩৪-৩৫ সনে এই সকল ঘটনার বিবরণ জনৈক হাসান খান কর্তৃক বালখে আনীত হয়। হাসান খান ছিলেন রাজবংশের আত্মীয়।

১৬৮২ সনের দিকে যখন মধ্য তিব্বত কালমুক (দ্র.) রাজাদের শাসনাধীন ছিল তখন সুপ্রসিদ্ধ খোজা আপাক (কাশগাড়ে তাঁহার সমাধি অদ্যাবধি শ্রদ্ধেয়) খান ইসমাঈলের (১৬৭০-১৬৮২) সহিত ঝগড়া করিয়া লাসায় গমন করেন [যুদ্ধের সুবৃহৎ মূর্তির অবস্থিতি হেতু লাসাকে তিনি "Djo"-এর শহর (Dju Shahri) নামে আখ্যায়িত করেন]। তাঁহারই অনুরোধে দালাইলামা (একখানি তুর্কী পাণ্ডুলিপিতে ইহার বহুবচনের রূপ Dalailamalar) 'কালমুক রাজবংশের খান 'গালদান বোশোকতু'-এর নিকট নিরাপত্তা প্রদানসূচক পত্র প্রেরণ করেন। একটি সেনাবাহিনীর (যন্মধ্যে স্বয়ং খোজাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) অধ্যক্ষরূপে অগ্রসর হইয়া ইসমাঈল খান কাশগাড়িয়া আক্রমণ করেন। ইসমাঈল খান বন্দী হন এবং কাশগাড়িয়ার শাসনভার খোজাকেই অর্পণ করা হয় (M. Hartmann, Der Islamische Orient, ১খ, ২১০, ২১২, ৩৩১ ও ৩২৬ Zap. ১৫খ, ২৫০)।

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম বিশ্বের সহিত তিব্বতের কোন যোগাযোগ নাই–যদিও য়ুরোপীয়গণের লাসায় প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকাকালে মুসলিমগণ তথায় গমন করিতেন। প্রতি তিন বৎসর অন্তর একদল দূত উপহার সামগ্রীসহ কাশ্মীর হইতে তথায় আগমন করিতেন। A Waddell কর্তৃক অঙ্কিত 'লাসা' নগরীর একটি নকশায় (Lhassa and its Mysteries, লণ্ডন ১৯০৫) দেখা যায়, একটি মসজিদ, কাশ্মীরী মুসলিমদের জন্য একটি ইসলামী বিচারালয় এবং চৈনিক মুসলিমদের জন্য একটি সরাইখানা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে বরাত প্রদত্ত হইয়াছে।

W. Barthold (E. I. [1])/মুহম্মদ শওকত আলী

তিব্বু (দ্র. তুবু)

তিবরীয (দ্র. তাবরীয)

তিমবাক্তু (تمبكتو) ঃ ফরাসী Tombouctou) পশ্চিম আফ্রিকার একটি শহর। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলামের প্রসারের স্মৃতি হিসাবেই কেবল নহে, বরং মুসলিম জীবনের নানা তৎপরতার খোদ একটি কেন্দ্র হিসাবেই এই জনপদটি গুরুত্ববহ। এই শহরেই ছিল এক বিখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি ও ঐতিহাসিকের সৃষ্টি হইয়াছিল যাঁহারা নিজ নিজ জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। History of the Sudan-এর লেখকের মতে ৫ম শতকের শেষদিকে (১১শ শতকের শেষে) মাগশারেন তুওয়ারেগ নামে এক যাযাবর জনগোষ্ঠী এই শহরের পত্তন করে। এই জনগোষ্ঠীটি প্রথমে তাহাদের পশুপাল লইয়া তিমবাক্তু অঞ্চলে পশু চারণ করিবার জন্য আসিয়া গ্রীষ্মকালে নাইজার নদীর তীরবর্তী আমাদাগা নামক এক গ্রামে শিবির স্থাপন করে। শরতে তাহারা তাহাদের স্বদেশভূমি আরাওয়ানে চলিয়া যাইত। অবশেষে এক সময় তাহারা তিম্বাকতূ শহরে কায়েমীভাবে বসতি স্থাপন করে। তিম্বাকতূ এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে। মরক্কো ও ত্রিপোলিতানিয়া-র উপকূল হইতে পর্যটকগণ নদীপথে কিংবা উটের কাফেলায় তিম্বাকতূ আসিতেন। ওয়াগতাও-এর অধিবাসীরা বিপুল সংখ্যায় এই শহরে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলে পূর্বেকার বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল ওয়ালাতা। অচিরেই জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান ধর্মবিশারদগণ সওদাগর ও ব্যবসায়ীদের অনুসরণ করিয়া তিম্বাকতূতে আসেন। এই সকল ব্যক্তির আগমন ঘটে মিসর, গাদামিস, তুআত, তাফিলালত, ফেয, সূস ইত্যাদি শহর ও জনপদ হইতে। তিম্বাকতূ শহরে অনেক সুন্দর ইমারত নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহাদের বেষ্টন করিয়া নির্মিত হইয়াছিল শহর রক্ষাপ্রাচীর। জনপদের যেসব কুঁড়েঘর একদা গম বা অন্যান্য ফসলের বিচালি বা বর্জ্য অংশ দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল সেইগুলির পরিবর্তে গৃহগুলি মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত হয়। খোদ তিম্বাকতূ শহরে একটি সুপরিসর মসজিদ ও শহরের দক্ষিণে সানকোরে আরেকটি মসজিদ নির্মিত হয়।

মালি (দ্র.) হইতে আগত তিম্বাকতূর প্রথম শাসক বংশ ৭৩৭ হইতে ৮৩৭ হি. (১৩৩৬-১৪৩৩ খৃ.) পর্যন্ত তিম্বাকতূতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। এই বংশের শাসনামলে সুবিখ্যাত পর্যটক ইব্ন বাততূতা তিম্বাকতূ সফরে আসেন। তিমবাকতূ সম্পর্কে তাঁহার বিবরণ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ৭৫৩/১৩৫২ সালে তিনি মরক্কো হইতে এক কাফেলার সাথে তিম্বাকতূ আসেন। ঐ কাফেলায় সিজিলমাসা নিবাসী সওদাগর ও ব্যবসায়ী ছিলেন। সিজিলমাসা ঐ সময়কার এক অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ২৫ দিনের পথ অতিক্রম করিবার পর ইব্ন বাততূতা তাগাযা জনপদে যাত্রা বিরতি দেন। এই লোকালয়ে শিলালবণ বা সৈন্ধব লবণের অনেক খনি ছিল। ইহার পর তিনি সেইখান হইতে ওয়ালাতা (লায়উআলাতেন) পৌঁছান। এই ওয়ালাতায়ই ছিল ইব্ন বাততূতা-র ভ্রমণ পথের সর্বপ্রথম জনপদ যেইখানে তাঁহার সহিত নিগ্রো কৃষ্ণকায় জনগোষ্ঠীর প্রথম সাক্ষাত হয়। সিজিলমাসা হইতে দুই মাস ও ওয়ালাতা হইতে দশ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া তিনি যাগারী ও সেইখান হইতে নাইজার নদীর নিকটবর্তী কারাসাকহ শহরে পৌছান। সেইখান হইতে তিনি সানসারা নদীপথে মালি যান ও পরিশেষে নৌপথেই তিনি তিম্বাকতূ পৌঁছান। তিম্বাকতূ অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল মুসলিম। ঐ অঞ্চলে মেসসূফা নামে এক উপজাতির লোকেরাই ছিল ক্ষমতাশালী। ইব্ন বাততূতা এই নিগ্রো অধিবাসীদের বেশ কিছু গুণের প্রশংসা করিলেও তিনি মুসলিম নারীদের নগ্ন থাকার বিষয়টির মর্মোদ্ধার করিতে পারেন নাই। খোদ শহরটি ইব্ন বাততূতাকে খুব একটা আকর্ষণ করিয়াছিল এমন মনে হয় না। মেস্‌সূফী উপজাতির লোকেরা লিছাম নামে কথিত এক ধরনের মুখমণ্ডল ও মস্তক আবরণী পরিত যাহাকে এক ধরনের বোরখা বলা যায়। এই লিছাম মুখমণ্ডলের নিম্নাংশ তথা নাসিকার মধ্যভাগ (চোখের নীচে) পর্যন্ত জুড়িয়া থাকিত। আমরা জানি, আরবগণ এই অধিবাসীদের আল-মুলাছছিমূন বা মুখাবৃত জনগোষ্ঠী হিসাবে অভিহিত করিত। এই লিছামধারী লোকজন কার্যত ছিল বার্বার জাতির অংশবিশেষ। এই যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা সুদূর নুবিয়ার মরু অঞ্চল (Juynboll ও de Goeje, Descr. du Maghrib, Leyden 1860, p. 48) অবধি বাস করিত।

তিম্বাকতূর দ্বিতীয় শাসকগোষ্ঠী হইতেছে মাগশারেন তুআরেগ উপজাতির লোক। এই শাসকগোষ্ঠী ৪০ বৎসরকাল তিম্বাকতূ-তে ক্ষমতায় বহাল থাকে। ইহার ফলে সুন্নী 'আলী তিমবাকতূ জয় করেন। তাঁহার শাসনকাল ২৪ বৎসর (৮৭৩-৯৮/১৪৬৮-৯২) স্থায়ী হয়। ৮৭৩ হি. সনে তিনি বিজয়ী বেশে তিম্বাকতূ প্রবেশ করেন এবং ঐ জনপদে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালান। স্থানীয় ঐতিহাসিকগণ সুন্নী 'আলী সম্পর্কে অত্যন্ত বৈরী বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে খল, রক্তলোলুপ ও অমিতাচারী শাসক হিসাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর নির্যাতন চালান। ধর্ম ছিল তাঁহার নিকট উপহাস-বিদ্রূপের বস্তু। তিনি বসিয়া সালাত সম্পাদন করিতেন। এতদসত্ত্বেও এই সুনগাই শাসক বংশ হইতেই একজন চমৎকার কর্মদক্ষ, সুযোগ্য শাসকের জন্ম হয় এবং তাঁহার সুশাসনে এই শহর সমৃদ্ধির

শিখরে উন্নীত হয়। এই শাসক বংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান সুলতান হইতেছেন আসকিয়া আল-হাদী মুহাম্মাদ। এই সুলতান ছিলেন বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক। এই শাসক বংশের সর্বশেষ শাসক আসকিয়া দাউদ ৯৩৫/১৫২৮ সালে ইনতিকাল করেন। ইহার পর তিম্‌বাক্তু মরক্কোর আধিপত্যাধীন হয়। মাররাকুশের পাশা মাহমূদ ৯৯৯/১৫৯০ সালে মরক্কোর সুলতান মাওলায় আহমাদের নিকট হইতে তিম্‌বাক্তু জয় করেন। তিম্‌বাক্তুতে মরক্কোর শাসন ৯৯৯ সন হইতে ১১৬৪ হি. সন পর্যন্ত স্থায়ী হয় (১৫৯০-১৭৫০ খৃ.)। পাশাদের শোষণ ও তুআরেগ হানাদারদের বারংবার হামলার মধ্যে তিম্‌বাক্তুর অবক্ষয় দশা চলিতে থাকে। ১২০৭/১৭৯২ সালে তিমবাকতু পুনরায় তুআরেগ-এর করায়ত্ত হয়। ইহার পর পালাক্রমে এই জনপদটি প্রথমে ১২৪৩/১৮২৭ সালে Pul ও পরে Tuculor শাসকগোষ্ঠীর পদানত হয়।

হি. নবম শতকে (খৃ. ১৫শ শতকে) য়ুরোপীয়রা তিম্‌বাক্তুর সংস্পর্শে আসে। তিউনিস ও ত্রিপোলিতানিয়ার মধ্য দিয়া তিম্‌বাক্তুর, ইতালী, বিশেষত Florence-এর সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন চলিত। তিম্‌বাক্তু হইতে ঐ সময় চারটি কাফেলা পথ ছিল ঃ একটি কানেম ও গাও হইয়া মিসর, একটি Hoggar হইয়া তিউনিস, একটি সিজিলমাসা, তাফিলালত ও তুআত হইয়া মরক্কো ও অপরটি মালি হইয়া সুদান। দুইজন য়ুরোপীয় ঐ সময়কার তিমবাক্তু শহরের বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ বিবরণ হইতে মনে হয় যে, ঐ সময় তিম্‌বাক্তু বেশ সুপরিচিত জনপদ ছিল। উল্লিখিত দুই য়ুরোপীয়ের মধ্যে একজন হইতেছেন ফ্লোরেন্স নিবাসী Beedetto Dei, ইনি ৮৭৫/১৪৭০ সালে তিম্‌বাক্তু সফর করেন। তিনি জানান, এই শহরে কেবল মোটা বস্ত্রাদি এবং Lombardy-তে প্রস্তুত সার্জ (এক ধরনের পশমী বস্ত্র) ও অন্যান্য উপকরণ বিক্রয় হইয়া থাকে। আর ইহার কয়েক বৎসর পর তিম্‌বাক্তু সফরে আসেন Leo Africanus। তিনি অবশ্য এই জনপদ সম্পর্কে আরও প্রাণবন্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এই শহরে দোকানপাটের সংখ্যা যথেষ্ট। শহরে পাথর ও চুনাপাথর নির্মিত একটি উপাসনালয় রহিয়াছে যাহা স্পেনের Granada হইতে আগত নিপুণ ও প্রতিভাবান স্থপতির দ্বারা নির্মিত। তাহা ছাড়া সুলতানের প্রাসাদটিও সুরম্য ও চমৎকার অট্টালিকা। এই প্রাসাদে রহিয়াছে স্বর্ণের ফলক ও দণ্ডের অত্যন্ত জৌলুসময় অলঙ্করণের কাজ। ঐ ফলক বা দণ্ডগুলির এক একটির ওজন ছিল ১,৩০০ পাউণ্ড পর্যন্ত।" এই সময়ে এই শহরে স্বর্ণ ও লবণের আমদানি-রফতানির বিষয়টিও বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে।

১০ম/১৬শ শতকের পর তিম্‌বাক্তু য়ুরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন হইতে য়ুরোপে এই ধারণা গড়িয়া উঠে যে, তিম্‌বাক্তু এক রহস্যময় ও দুর্গম জনপদ। একই সঙ্গে শহরটি অত্যন্ত সুন্দর ও ধন-সম্পদ সমৃদ্ধ, এই ধরনের জল্পনা-কল্পনাও চলিতে থাকে। ইহার কারণ ঐ সময় এই শহর স্বর্ণ, উট পাখির পালক, গজদন্ত, দাস ব্যবসায় ও ইত্যাকার লেনদেনের জন্য কিংবদন্তীর খ্যাতি অর্জন করে। তিম্‌বাক্তু শহরের এই ধরনের রহস্য ভেদের জন্য য়ুরোপীয়দের নানা প্রকারের প্রয়াস চলে তিম্‌বাক্তুর সহিত যোগসূত্র স্থাপনের। আর এই প্রয়াসের আগে নিহত হন Major Laing নামে জনৈক য়ুরোপীয় অভিযাত্রী। ইহার পর ফরাসী অভিযাত্রী Rene Caillie ১২৪৪/১৮২৮ সালে তিম্‌বাক্তু পৌঁছিতে সক্ষম হইলেও এই জনপদ সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা সুখকর হয় নাই, বরং Djenne তাঁহার নিকট অধিকতর শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। ১৮৫৩ খৃ. Barth তিম্‌বাক্তু সফরে আসেন।

তিম্‌বাক্তু শহর আজিও মোটামুটি ধরনের শহর। অবশ্য এই শহরের স্থানীয় স্থাপত্যকর্মমূলক সৌধগুলি কিছুটা উন্নত রুচির পরিচয় বহন করে। ১৩১১/১৮৯৩ সালে তিম্‌বাক্তু ফরাসী উপনিবেশের আওতাধীন হয়। আলজিরিয়ার সহিত তিম্‌বাক্তুর মোটর যোগাযোগের সূচনা হয় Haardt-Audouin-Dubreuil-এর অভিযানের মাধ্যমে। শহরটি সুনগাই সুলতানী আমলের ন্যায় অতখানি সুপরিসর নহে। তিম্‌বাক্তুবাসী বস্তুত আজও তিম্‌বাক্তুর ঐ সোনালী দিনগুলি স্মরণ করে। শহরটি নাইজার নদীর একটি শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যদিও নদীটি এখন এই জনপদের ধ্বংসস্তূপের ১০ মাইল দূরে দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তবে আজিও এই শহরের লবণের ব্যবসায় আগের মতই জোরেসোরে পরিচালিত হয়।

প্রধানত Felix Dubois ও Colonel Archinard M. Houdas এই জনপদ সম্পর্কিত সুদানী লেখকদের রচনাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেইগুলির কয়েকটি প্রকাশও করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে History of the Sudan ও Dictionary of the Pashas সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিম্‌বাক্তু সম্পর্কিত সর্ববিখ্যাত গ্রন্থকার হইতেছেন ঃ আহমাদ বাবা। ইনি একটি জীবনী অভিধান রচনা করেন। মরক্কোর বিজয়ীরা যখন এই শহর পদানত করে তখন আহমাদ বাবাকে বন্দী করিয়া মরক্কোয় লইয়া যাওয়া হয়। তিনি সেইখানে ১০০৬/১৫৯৭ সাল পর্যন্ত বসবাস করেন। তিনি ১০৩৬/১৬২৬ সনে তিমবাকতুতে ইনতিকাল করেন। তিম্‌বাক্তুর জ্ঞানী ব্যক্তিদের রচনা তথা বিভিন্ন শাস্ত্রে চর্চার কাল হি. ৮ শতক (খৃ. ১৪শ শতক) হইতে ১৩ শতক (খৃ. ১৯শ শতক) অবধি বিস্তৃত। তিম্‌বাক্তুর শহর-গ্রাম-জনপদে আজিও শিক্ষিত মুসলিমের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক্ষেত্রে কাযীদের কথা উল্লেখ করা যায়। এই কাযীগণ কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯১৩ খৃ.) এমন কিছু লিপির সন্ধান দান করেন যাহা হইতে নাইজার নদী অববাহিকা অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সূদানী ঐতিহাসিকদের জন্য তু. (১) Publications de l' Ecole des Langues orientales vivantes, series 4, vols. xii, xiii, xix, xx; (২) ইব্‌ন বাতূতা, সম্পা. ও অনু. Defremerya Sanguinetti, IV, 237-432; (৩) Ch. de La Ronciere, La decouverte de L'Afrique, au moyen-age, cartographes et explorateurs, 2 vol. with plate, Cairo 1925; (৪) Leo Africanus, Description de L'Afrique, সম্পা. Ch. Schefer, iii, 292; (৫) F. Dubois, Tombouctou la mysterieuse, 1897; (৬) Pere Hacquart, Monographie de Tombouctou, 1900; (৭) Dr. Oskar Lenz, Timbouctou, Voyage au Maroc, au Sahara et au Soudan, ফরাসী অনু. Paris, 2 vol., 1886-1887; (৮) Leiutenant Prefontan. Historire de Tombouctou de sa fondation a L'occupation francaise Bulletin de L'A. O. F., 1922; (৯) A. Lamande ও J. Nanteuil, La Vie de Rene Caillie, Paris 1928; (১০) G. M. Haardt ও L. Audouin-Dubreuil, Le Raid Citroen, Paris 1923.

B. Carra De Vaux (E. I. [1])/ আফতাব হোসেন

তিম্‌সাহ্‌ (تمساح) ঃ Eastern Delta (পূর্ব ব-দ্বীপ), যাহার মধ্য দিয়া পোর্ট সাঈদ হইতে সুয়েজ খাল দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়, সেই সকল হ্রদ Delta-য় অবস্থিত অনেকগুলি জলা (Swamp) ও উপহ্রদ (lagoon)-এর মধ্যে তিম্‌সাহ্‌ (কুম্ভীর) একটি ক্ষুদ্র হ্রদবিশেষ। এক কালে হ্রদটি কুম্ভীর অধ্যুষিত ছিল বলিয়া ইহাকে Crocodile Lake নাম দেওয়া হয়; প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই প্রাণী (কুম্ভীর)-এর ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত কোন ধারণা দিতে পারেন নাই। সুয়েজ খাল ৮০তম কিলেমিটারের মাথায় তিম্‌সাহ্‌ হ্রদের সহিত মিলিত হইয়াছে। হ্রদের উত্তর উপকূলে ইস্‌মাঈলিয়্যা (দ্র.) শহর, যাহা একচেটিয়া ফরাসীদের একটি আবাসিক কলোনী। তিম্‌সাহ্‌ হ্রদের আয়তন প্রায় ৬ বর্গমাইল। সুয়েজ খাল খননের পূর্বে ইহার পানি কিছুটা লোনা ও নলখাগড়ায় পূর্ণ থাকিলেও বর্তমানে ইহার উজ্জ্বল নীল পানি এবং মরু পাহাড়ের পশ্চাৎদৃশ্য খুবই চিত্তাকর্ষক ও সুন্দর। Wallis Budge (Hist. of Egypt, ৫খ, ১৩১ প.) মনে করেন যে, ইসমাঈলীগণ মিসর হইতে পলায়নের সময় এই হ্রদের কাছাকাছি কোন স্থান হইয়া অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি এই হ্রদটিকে যাত্রাপুস্তক, ১৩ ঃ ১৮-এ উল্লিখিত Sea of Reeds-রূপে সনাক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আলী মুবারাক, খিতাত জাদীদা, ৮খ, ৪৬; (২) S. W. Baker, Ismailia, ১খ, ১৯০; (৩) Baedeker, Egypt, Index.

J. Walker (E. I[1])/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

তিয়ূল (تيول) ঃ পারস্যের প্রশাসন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ। সচরাচর উচ্চারণ তুয়ূল, ইহার কারণ আরবী শব্দের বহুবচন ফু'উল-এর সহিত প্রমাদপূর্ণ সদৃশকরণ। একইভাবে Chardin-এর 'চিরস্থায়ী' অনুবাদের কারণ আরবী তাবীল (দীর্ঘ) হইতে ইহার উৎপত্তি নির্ণয়করণ যাহা অশুদ্ধ।

তিয়ূল (কমপক্ষে খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে ও মৌলিকভাবে) কোন ব্যক্তিকে প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত সেই ক্ষমতাকে বুঝায় যাহার বলে সে রাজস্ব হইতে (যাহা কোন গ্রাম অথবা গ্রামবাসীদেরকে রাজকোষে জমা দিতে হয়) সরাসরিভাবে তাহার বেতন বা ভাতা সংগ্রহ করিতে পারিত। সহজভাবে তিয়ূল ছিল ভাতা প্রদান নিশ্চিত করার এক প্রকার জামানত। এই জামানত কখনও কখনও যুগপৎভাবে ভাতা মঞ্জুরির সময়েই এবং কখনও কখনও পরে অতিরিক্ত সুবিধা হিসাবে প্রদত্ত হইত। সুবিধাভোগী ব্যক্তি গ্রামে নবাগত হইতে পারিত অথবা সেই গ্রামের অধিকারীও হইতে পারিত। পারস্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসেই এই সম্পর্কে আলোচনা থাকিতে পারে। এই প্রবন্ধে ইহার উৎপত্তি ও ইহার প্রচলন সম্পর্কে শুধু আলোচনা করা হইবে।

শব্দ প্রকরণ ঃ শব্দটি মূলত পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী ভাষা হইতে উদ্ভূত। Radloff (Opit Slovara, iii, col. 1343, 1380) ইহাকে কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত সম্পত্তি অবণ্টন (des Zuertheilte)-রূপে ব্যাখ্যা করেন এবং তী মাক (Ti mak) [Constantinople Turkish, degmek, deymek] ক্রিয়াপদ হইতে গঠিত বলিয়া উল্লেখ করেন। শব্দ গঠন বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে Tiy-ul-কে কায়ত-উল অর্থাৎ উর্দু আসকার (ছাউনি)-এর সহিত তুলনা করা যায়। এই শব্দটি ফারসী ভাষায়ও প্রবেশ করিয়াছে। তিয়ূল শব্দটি মোঙ্গল যুগে দৃষ্ট হয় না, উদাহরণস্বরূপ গাযানের সংস্কার বিষয়ে রাশীদুদ-দীনের নিবন্ধে ইহা দৃষ্ট হয় না (MS. Bibl. Nat. Paris, Suppl. Pers., No. 209, fol. 405-443 এবং d'Ohsson, Hist. des Mongols, ৪খ, ৩৭০-৪৭৭)। এমনকি তীমূর-এর যুগ সম্পর্কে রচিত জাফারনামায় ইহা দেখা যায় না। যতদূর জানা যায়, শব্দটি তীমূরীয়দের একটি দাফতরিক পরিভাষারূপে প্রথম আবির্ভূত হয় (তু. মাতলাউস-সা'দায়ন, ৮১০/১৪০৭ সালের বিবরণে; তু. N. E., ১৪খ, ১৮৪৩, পৃ. ১২৪-১২৫)। সেইখানে Quatremere শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং আকবারনামাহ (১৫৯৭ খৃ. সমাপ্ত) ও আলামআরা (১৬২৯ খৃ. পর্যন্ত) হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করেন।

প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তি ঃ তিয়ূল নামটি তুলনামূলকভাবে পরবর্তী কালের হইলেও যে কার্যপদ্ধতিতে ইহা ব্যবহৃত হয় তাহা সালজুকদের সময়ে বা তাহার পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। চলতি ভাষায় প্রাচীন তুর্কী শব্দ তিয়ূল অবশ্যই ইকতা' (জায়গীর, ব. ব. ইকতাআত)-এর ন্যায় একটি দাপ্তরিক পরিভাষায় সমার্থক শব্দ যাহাকে ইহা চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ করিয়া উহার স্থান অধিকার করে। আরবী শব্দ ইকতা' ঠিক ঐ সময়ে অদৃশ্য হয় যখন সিয়ূরগাল (তু. নিম্নে) ও তিয়ূল শব্দগুলি সাধারণভাবে ব্যবহারে আসে।

সিয়াসাতনামার ৫ম অধ্যায়ে নিজামুল-মুলক জায়গীরভোগীদের (মুকতাআন) বিশেষ সুবিধাসমূহ এইভাবে বর্ণনা করেন, তাহারা অবশ্যই অবগত থাকিবে যে, প্রজা (রা'আয়া)-দের উপর তাহাদের সংবিধিবদ্ধ অধিকার (আম ফারমান) শুধু একটি অনুগ্র পদ্ধতিতে বৈধ পাওনা (মাল-ই হাকক), যাহা জায়গীরদারদের নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া (হাওয়ালাত) হইয়াছে, আদায় করা। এই সকল পাওনা পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে কৃষকবৃন্দ মুক্ত। তাহাদের দেহ, তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদের সহিত সম্পর্কযুক্ত সকল দিকই নিরাপদ (আমান) থাকিবে। তাহাদের সম্পত্তি-মালামাল ও জমিজমা (আসবাব ওয়া দিয়া)-ও মুক্ত এবং ইহার উপর মুকতাআনদের কোন দাবি থাকিবে না। ইকতা' এইভাবে কৃষকগণ কর্তৃক পরিশোধযোগ্য বৈধ পাওনা (মাল-ই হাকক) আদায়ের অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই ধরনের ইকতা' (আমরা জানি না ইকতা'-এর শুধু এই একটি পদ্ধতিই কিনা) পরবর্তী কালের তিয়ূলের সহিত খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। রাশীদুদ-দীন ৭০৩/১৩০৩ সালের ঘোষণাটির মূল পাঠ উদ্ধৃত করেন যাহা দ্বারা মোঙ্গল যুগে গাযান খান সামরিক জায়গীর (ইকতা') সৃষ্টি করেন। এই রাজকীয় ঘোষণাটি রাজকীয় (ইনজু ও দীওয়ানী) বেসরকারী ব্যক্তিগত, ওয়াক্‌ফ ও পতিত ভূ-সম্পত্তির পার্থক্য প্রদর্শন করে। প্রথম শ্রেণীর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী কৃষকগণ (রাআয়া) জমিসমূহে তাহাদের ভোগাধিকার অব্যাহত রাখে। কিন্তু তাহাদের সকল প্রকার প্রদেয় (বাহ্‌রাহ, মাল, কোবচুর, মুতাওয়াজ্জিহাত-ই দীওয়ানী) রাজকোষে জমা দিবার পরিবর্তে তাহারা সামরিক জায়গীরদারকে (চারিকিয়ান ঃ এই সকল শব্দের কিছু সংখ্যকের অর্থ সম্পর্কে তু Barthold, Nadpis na meceti, Manuce, Aniiskiya seriya, No. 5. St. Petersburg 1911, p. 32 প.) প্রদান করিত। এই পদ্ধতিটিও তিয়ূলের প্রায় অনুরূপ, যদিও ৭০৩ হি. সালে ইহা সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত সমগ্র ব্যবস্থার (যাহা সামরিক সেবার এক নজীর) একটি অংশে পরিণত হয় (d' Ohson, ৪খ, ৪২৪, শা. ১-৯)।

একটি অর্থনৈতিক কৌশল হিসাবে তিয়ূল ঃ নিয়মিত তিয়ূল কার্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা অর্থ প্রদানের পদ্ধতিকে সরল-সহজ করে যাহা ধীরে ধীরে একটি সরল অর্থনৈতিক কৌশলে পরিণত হয়। কিন্তু তুলনামূলকভাবে অর্থ প্রদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে কেন্দ্রীয় রাজকোষের পক্ষে বারে বারে প্রদত্ত অর্থ মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে

অসুবিধা হয়। Chardin (৫খ, ৪১৬) প্রধানত মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতাই প্রদত্ত সম্পত্তির দ্বারা বেতন পরিশোধের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তিয়ূলের স্বাভাবিক প্রকৃতি (অর্থাৎ একটি গ্রামের খাজনা আদায়ের অধিকার) প্রায় একই সময়ে তিয়ূলদারকে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা (অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে সাধারণের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার) দ্বারা জটিলতাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। য়ূরোপীয় পর্যবেক্ষগণ এই বিষয়টির যে ব্যাখ্যা দেন তাহাতে অস্পষ্টতা বিদ্যমান।

Chardin তিয়ূল শব্দটির অনুবাদ করেন "Assignation de terre" অর্থাৎ 'জমিনের ইজারা' এবং তিনি তিয়ূলের দুইটি শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করেন। কারণ এই সকল ভূসম্পত্তি তত্ত্বাবধানাধীন ব্যক্তির ভরণ-পোষণার্থে প্রদত্ত ভূসম্পত্তি (অর্পিত বৃহৎ কর্তব্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বেতন প্রদানের জন্য এই সমস্ত জমি প্রদত্ত) অথবা এই সমস্ত সম্পত্তি যাহা উহার সহিত সংযুক্ত বটে, কিন্তু রাজকোষের ইচ্ছামাফিক প্রদত্ত। শেষোক্ত ক্ষেত্রেও সেই সম্পত্তি কয়েক বৎসরের একটি পর্যায়ের জন্য স্থায়ীভাবে অধিকারের রূপ গ্রহণ করে। Chardin যথেষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টিসহকারে পদ্ধতিটির সমালোচনা ও পর্য্যালোচনা করেন (পৃ. ৪১৮)। বেতন প্রদানের জন্য অর্পিত ভূসম্পত্তি রাজপুরুষদের পর্যবেক্ষণাধীন নহে। ঐগুলি যেন যে ব্যক্তিকে প্রদান করা হইয়াছে তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি! তিনি রাজস্ব নির্ধারণ ব্যাপারে এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিতেন।

অনুরূপভাবে Kaempfer (১৬৮৪-১৬৮৮ খৃ.) পারস্যে তিন প্রকার বেতনের উল্লেখ করেন ঃ বারাত-ই (দূরবর্তী প্রদেশের উপর দাবি), হামা সালা (শুধু পেনশনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানদার জমি) তিয়ূল। এই সকল "Tawill seu tijuul" যাহা মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে Chardin -এর প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ, রাষ্ট্রের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ (Ministris regni)-কে প্রদত্ত জমিজমা (Pagi, Praedia vel Fundi), তাঁহারা তাঁহাদের পদে বহাল থাকাকালে ঐগুলির মালিকানা (?) এবং তাহা হইতে প্রাপ্য করাদি ভোগ করেন (ut durante servitio eorum possessione et annona gaudeant) ও শুধুমাত্র (আমীরদের অধিকারভুক্ত) এই সকল জমি হইতে তাঁহারা তাঁহাদের বেতনের ২ হইতে ১০ গুণের সমান রাজস্ব আদায় করেন।

সিয়ূরগাল ঃ তিয়ূল যে দলীলপত্র দ্বারা এই সুবিধাদি প্রদান করা হয় এই দুইয়ের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য থাকা উচিৎ। এই দলীলপত্রকে সচরাচর তুর্ক-মোঙ্গল নাম সিয়ূরগাল (আনুকূল্য) (অথবা অসম্ভব ইনআম?) প্রদান করা হয় ঃ তু. Chardin, ৬খ. ৬৫ (যিনি অর্থটিকে অত্যধিক সীমিত করেন) ও Budagov, ১খ, ৬৫০। শাহ হুসায়ন সাফাবীর ১১১৩/১৭০১ সালের তারিখবিশিষ্ট ফরমানটিকে (Khanykow কর্তৃক প্রকাশিত, Mel. Asiat...., ৩খ, ১৮৫৯ খৃ., পৃ. ৭০-৭৬) সিয়ূরগাল (দলীলপত্রের মূল পাঠে ইহার জন্য একমাত্র নাম)-এর নমুনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। আনুকূল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সাতজন সশস্ত্র ব্যক্তি শাহের খেদমতে প্রেরণ করিতে হইত। ইহার জন্য তিনি বার্ষিক মোট ৬ তুমান, ৩ হাজার সাড়ে ৯৬ দীনার পাইতেন, যাহা দিয়মার জিলার রাজস্বের সমতুল্য। কৃষকগণকে তাহাদের করাদি (মাল-ওয়াজাহাতে(?) ওয়া উজূহাত ওয়া হুকূক-ই দীওয়ান) সিয়ূরগালের প্রাপকদের নিকট পরিশোধ করিতে হইত এবং প্রশাসনের এজেন্টগণ এই সুবিধা ভোগের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। এইভাবে শাহের আনুকূল্য (সিয়ূরগাল) সুবিধা ভোগকারী তিয়ূল গঠন করিত।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী ঃ এই শতাব্দীর প্রারম্ভকালে Rawlinson রচিত Notes on a Journey from Tabriz (J. R. G. S. X., 1840, p. 5)-এ তিয়ূলের যথার্থ অর্থের দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায় ঃ "তিয়ূল কোন শহর বা জিলার শাহী রাজস্ব কোন ব্যক্তিকে প্রদান; এই দান গ্রহণকারী সচরাচরভাবে ইহা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হন যদিও ইহা অপরিহার্য নহে। অন্য রকম কিছু নির্দিষ্ট কথা না থাকিলে এই দান শুধু গ্রহণকারীর জীবনকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে। ইহা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বর্তমান পারস্যের সমগ্র ভূমি রাজস্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষ হইতে এইরূপ স্থানান্তরিত হইয়াছে"। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই তিয়ূল একই গ্রহণকারীকে প্রদত্ত অন্যান্য সুবিধার সহিত মিলিতভাবে অব্যাহত থাকে যাহার ফলে তিয়ূলের বিস্তৃতিকে গোপন রাখে। Dr. Polak, যিনি নিজে প্রায় একজন তিয়ূলদার হইয়া গিয়াছিলেন, এইভাবে তিয়ূলের সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, "তিয়ূল একটি রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড যাহার আয় হইতে নগদ মুদ্রার পরিবর্তে বেতন গ্রহণ করার অনুমতি রহিয়াছে।"

তিয়ূল পদ্ধতি সকল প্রকার দুর্নীতির জন্ম দান করে। পারস্যের ভূমির মালিক ছিলেন সরকার এবং প্রজাদের মধ্যবর্তী একটি শ্রেণী। শেষোক্তগণ মালিকদের ভূমিদাস (রাঈয়াত) হিসাবে বিবেচিত হইত। ভূমি মালিকগণ (আরবাব) কতক পরিমাণ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন যাহার একটি ছিল, নিজে প্রজাদের নিকট হইতে সকল প্রকার কর আদায় করিতেন। আদায়কৃত অর্থ হইতে মালিক হিসাবে তাঁহার প্রাপ্য (মালিয়াত-ই আরবাবী) কাটিয়া রাখিতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ রাজকোষে (মালিয়াত-ই দীওয়ানী) জমা দিতেন। যদি একটি তিয়ূল এই পদ্ধতির সহিত যুক্ত হইত তিয়ূলদার এবং ভূমি-মালিক, দুই বেসরকারী ব্যক্তি সরকারের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই তাঁহাদের মধ্যে সমঝোতা করিয়া লইতেন। দুইটি পদ একই ব্যক্তির অধিকারে থাকিলে "মালিক তিয়ূলদার সরকারী অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এড়াইয়া চলিতেন এবং তিনি এক ধরনের সামন্ত প্রভুতে পরিণত হইতেন যাহার এলাকা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের স্থানীয় প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত এলাকার মধ্যে একটি ছিটমহল গঠন করিত। তিয়ূল প্রায়শ ইহার ভোগকারীকে একজন ভূমিমালিকে পরিণত করিত। শাহী দরবারের Personae Gratae-দের প্রতি তিয়ূলের আনুকূল্য প্রদর্শিত হওয়া তাহাদের বিশেষ অধিকার, তাহাদিগকে তাহাদের প্রভাব বিস্তার দৃঢ় করার অবস্থায় উন্নীত করিত। বিরান ক্ষেত্রে প্রজারা ভূমির মালিক (মুরদা-মালিক) হইলে অধিকতর শক্তিশালী প্রতিবেশী বা সরকারী এজেন্টদের অত্যাচার প্রতিরোধ করার অসম্ভাব্যতা তাহাদিগকে একজন ক্ষমতাশালী তিয়ূলদারের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিত। শেষোক্তগণ তাহাদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করিতেন; কিন্তু এই নিরাপত্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র মালিক হিসাবে তাহাদের অধিকারের বিলুপ্তিতে পর্যবসিত হইত। সাধারণভাবে এই তিয়ূল কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবনকালের জন্য প্রদান করা হইত। (মৃত) তিয়ূলদারের উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের জীবনকালের জন্য ইহার মেয়াদ বর্ধিত করিতে সক্ষম হইলে ইহার আয়তন সাধারণত এক-তৃতীয়াংশ কমিয়া যাইত। এই ব্যবস্থা কয়েক পুরুষ পরে তিয়ূলের অবসান ঘটাইত, কিন্তু উত্তরাধিকারিগণ সহজেই তাহাদের বিশেষ অধিকার বিলুপ্ত বা সংকুচিত হওয়া হইতে রক্ষা করার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিত। রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি (খালিসা) হইতে সরকার কর্তৃক উদারভাবে প্রদত্ত তিয়ূল পরিশেষে কয়েকটি স্থানে, যেমন আযারবায়জানে, খালিসার প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটায় (Tigranow)।

একমাত্র Bogdanov তিয়ূল প্রথার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা লক্ষ করেন (তিয়ূলদার কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত উপঢৌকনের মূল্য, যাহা অন্যভাবে রাজধানীতে পৌঁছাইত, করাদির মোট পরিমাণ হইতে অধিকতর হইত, তিয়ূলদার তাহার প্রজাদিগকে সরকারী এজেন্টদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেন) কিন্তু এই মধ্যযুগীয় পদ্ধতিটির অসুবিধাসমূহ ছিল খুবই প্রকট এবং ১৯০৭ খৃ. জুন মাসে মাজলিস ইহার প্রথম অধিবেশনে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, সমস্ত তিয়ূল রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাহার করা হইবে এবং তাহা করাও হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Chardin, Voyages, সম্পা. Langles ১৮১১ খৃ, ৫খ, ৩৮০, ৪১১, ৪১৬-৪২০; ৬খ, ৫৬; (২) Kaempfer, Amoenitates exoticae, Lemgoviae 1712, fasc. i, relatio vii শী. ও p. 97-98; (3) Fraser, journey into Khorasan, London 1825, p. 211; (4) Polak, Persien, ২খ, ১২২; (৫) Buadgov, Slovar turetskotatar. Nareciy 1869, ১খ., ৪২৪; (৬) Curzon, Persia, ২খ, ৪৭০, ৪৭৪, ৪৮৪, ৪৮৮; (৭) Greenfiel, Die Verfassung des Pers. Staats, বার্লিন ১৯০৪ খৃ., পৃ. ৩৪৯; (৮) Browne, The Persian Revolution, ১৯১০ খৃ., ১৪৩; (৯) Tigranow, Izcobshiest-Ckonome. Otnosheniy v. Persii, St. Petersburg ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৮২-৮৫ (আরদাবিল প্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে একটি বিস্তারিত আলোচনা); (১০) Sultanzode, La Questian agraire en Perse (রুশ ভাষায়), Nowyi Vostok, Moscow 1922, No. 1., p. 138-140।

V. Minorsky (E.I[1])/মোঃ গোলাম সরওয়ার

তিরমিয (ترمذ) ঃ সুরখান নদীর মোহনার নিকটে আমু দরিয়া (দ্র.)-র উত্তর তীরে অবস্থিত একটি শহর। আস-সাম্আনী এই শহরে ১২ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছেন, খোদ এই শহরের অধিবাসীরা শহরটির নাম তিরমিয (G. M. S., ১০খ, পত্র ১০৫ খ) উচ্চারণ করিত। শহরটির নামের চীনা উচ্চারণ তা-মি (উদাহরণস্বরূপ Hiouen-Thsang, Memoires sur les contrees occidentales, ১খ, ২৫) হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। ১৮৮৯ খৃ. রাশিয়ার পদস্থ কর্মকর্তারা এই শহরের নামের উচ্চারণ তেরমিয বা তারমীয শুনিয়াছিলেন (Sbornik materialov po Azii, ৫৭খ, ৩৯৩ ও ৩৯৯)। শহরটি এখন সরকারীভাবে তেরমেয' নামে পরিচিত।

গ্রীক বীর Alexander তিরমিয শহরে আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা প্রাচীন কোনও সূত্রে এই শহরের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, যদিও বলা হইয়া থাকে Alexander পরবর্তী কালে শহরটি স্থাপন করিয়াছিলেন। হাফিজ-ই আব্রূর বর্ণনা অনুযায়ী (দ্র. আল-মুজাফারিয়্যা গ্রন্থে Barthold -এর মূল পাঠ, St. Petersburg ১৮৯৭, পৃ. ২০) কেবল তিরমিয-ই নহে, বরং ইহার অদূরে একই নদীর তীরে "বুরদাগুই" একটি গ্রীক শব্দ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে যাহার অর্থ "সরাইখানা" (মেহমানখানা)।

মুসলিম বিজয়ের সময় তিরমিয ছিল বৌদ্ধপ্রধান জনপদ। ঐ শহরে ঐ সময়ে ১২টি বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং ঐসব মঠে ১,০০০ ভিক্ষু বাস করিতেন (Hiouen Thsang, পূ. স্থা.)। ঐ সময় একজন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ শাসক তিরমিয শাসন করিতেন। তাঁহার উপাধি ছিল তিরমিয শাহ (তাবারী, ২খ, ১১৪৭; B. G. A. ৬খ., ৩০); এই শহরের নদীতীরে একটি অত্যন্ত মযবুত দুর্গ ছিল (তাবারী, ২খ, ১১৪৭)। ৭০/৬৮৯-৯০ সনে মূসা ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন খাযিম তিরমিয জয় করেন। তিনি মুসলিম সরকারের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া নিজেই স্বাধীনভাবে দীর্ঘ ১৫ বৎসর তিরমিয শাসন করেন (তু. বালাযুরী, পৃ. ৪১৭ প.; তাবারী, ২খ, ১১৪৫ প.)। মাত্র ৮৫ হি. সনের শেষের দিকে গভর্নর আল-মুফাদ্দাল ইব্ন মুহাল্লাবের আদেশক্রমে উছমান ইব্ন মাসঊদ ঐ শহরটিকে মুসলিম শাসনের আওতায় আনিতে সক্ষম হন। এই সময়কার যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরবর্তী কালের অবরোধ ও সেতু নির্মাণ ইত্যাদি কার্যকলাপের দরুন তিরমিযের দ্বীপটি (আরব আমলে জাযীরা উছমান নামে অভিহিত) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উযবেগ আমলে এই দ্বীপটিকে 'ওর্তা-আরাল' বা ওরতা আরালী (মধ্যবর্তী দ্বীপ) নামে অভিহিত হইত (J. Senkowski, Supplement a L'histoire generale des Huns etc. সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮২৪ খৃ., মূল পাঠ, পৃ. ২০; অতঃপর বর্ণিত সূত্রে অন্তর্ভুক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের অনুচ্ছেদসমূহ ঃ Barthold, K. istorii orosheniya Turkestana, পিটার্সবার্গ ১৯১৪ খৃ.)। য়ু'ল-কিফ্ল (আ) (B. G. A., ৩খ, ২৯১) পয়গাম্বরের উপাসনার বিষয়টির উল্লেখ ৪র্থ (১০ম) শতকের শুরু হইতে লক্ষ করা যায় (কালিফে এই উপাসনার প্রচলন ছিল)। তাহা এই দ্বীপে স্থানান্তরিত হয়। দ্বীপটিতে প্রচলিত এই প্রথার জন্য দ্বীপটি বর্তমানে আরল পয়গাম্বর (পয়গাম্বরের দ্বীপ) নামে অভিহিত।

৪র্থ/১০ম শতকে এই শহর অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিষয়ে তু. বিশেষ করিয়া B. G. A., ১খ, ২৯৮ ও ৩খ, ৯১। তিরমিয আমূ দরিয়ার তীরে এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। এই বন্দরে নির্মিত নৌযান রফতানি করা হইত (B. G. A., ৩খ, ৩২৫. ৭)। বাল্খ-এর মত তিরমিয ও সাবানের জন্য প্রসিদ্ধ (পূ. গ্র., পৃ. ৩২৪)। তিরমিযের দুইজন অধিবাসী মুসলিম সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের একজন হইতেছেন খ্যাতিমান হাদীছ সঙ্কলক আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (দ্র.) (মৃ. ২৭৯/৮৯২) এবং অন্যজন মুহাদ্দিছ ও সূফী আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আত-তিরমিযী (দ্র.) [মৃ. ২৫৫/৮৬৯]; তু. Brockelmann. G. A. L., ১খ, ১৬৪। শেষোক্ত ব্যক্তির মাযার, যাহা সম্ভবত ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল, আজিকার তিরমিযের নানা ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুরম্যতম সৌধ ও মধ্য এশিয়ার সুন্দরতম সৌধগুলির অন্যতম (ছবির জন্য দ্র. Izv. Geogr. Obshc., ৪৪খ., ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৬৫২; ঐ সৌধগাত্রে উৎকীর্ণ লিপির রুশ অনুবাদসহ ও Barthold, Islam, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১৮ খৃ., পৃ. ৫৭)। উল্লিখিত মাযার সৌধের উৎকীর্ণ লিপি হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহা ফারীদুদ-দীন আততার (দ্র.) রচিত তায্কিরাতুল-আওলিয়ায় (Pers. Hist. Texts, ৫খ., ৯৩) ও জামী (দ্র.) রচিত নাফাহাতুল-উন্স (লিযু, পৃ. ৭৭) গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত মুহাম্মাদ ইব্ন আলী সম্পর্কিত বিবরণের অংশবিশেষ। আমরা আরও জানিতে পারি যে, আল-বুখারী যেইসব পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তিনিও তাঁহাদের নিকটেই শিক্ষা লাভ করেন। সাম'আনী (G. M. S., ২০খ, ১০৬ ক) এই কথা মুহাম্মাদ ঈসা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর হইতে তিরমিযের রাজনৈতিক ইতিহাস খুরসান ও মা ওয়ারাউন-নাহ্র-এর ইতিহাসের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়; কখনও আজিকার দিনের মত আমূ দরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে এবং কখনও বা বাল্খের সহিত সম্পর্কের বিষয়টি বেশি গুরুত্ববহ হইয়া দেখা দেয়। মাহমূদ ও তাঁহার আশু উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে আমূ দরিয়ার উত্তরে

বালখের অন্যান্য অধীনস্থ রাজ্যের মত তিরমিযও গাযনাবী শাসকদের (দ্র.) সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সামারকান্দের নিকট কাতওয়ান মরুভূমির যুদ্ধের (৫ সাফার, ৫৩৬/৯ সেপ্টেম্বর, ১১৪১) ফলে মা ওয়ারাউন-নাহর-এর শাসন ক্ষমতা কারাখিতায় (দ্র.) শাসকদের হাতে চলিয়া যায়, কিন্তু তিরমিয সালজূকদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। এই বিষয়টি সত্য এই কারণে যে, সুলতান সানজার (দ্র.) ৫৫১/১১৫৬ সনে এই তিরমিযে আশ্রয় চাহিয়াছিলেন। পরে তিরমিয কারাখিতায় শাসকদের পদানত হয়। কারাখিতায় শাসকদের নিকট হইতে বালখের গুরী (দ্র.) গর্ভনর ইমাদুদ-দীন উমার যুল-কা'দা ৬০১/জুন-জুলাই ১২০৫ সালে তিরমিয দখল করেন (ইবনুল-আছীর, ১২খ, ১৩৫)। ইমাদুদ-দীনের পুত্র বাহরাম শাহ (এই নামটির উল্লেখ পাওয়া যায় "নাসাবী"-তে সম্পা. Houdas, পৃ. ৩৯) তিরমিযের গভর্নর নিযুক্ত হন। ইহার ঠিক পরের বৎসরেই খাওয়ারিযম শাহ মুহাম্মাদ তিরমিয জয় করেন এবং কারাখিতায়-এর সহিত তাঁহার মিত্রতার দরুন তিনি তিরমিয কারা খিতায়-এর শাসকের নিকট ইহা হস্তান্তর করেন। ইবনুল-আছীরের বিবরণ অনুসারে (১২খ, ১৫২ প.) তৎকালীন মুসলিম জাহানে খাওয়ারিযম শাহের বিরুদ্ধে এই খবরের তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। জুওয়ায়নীর (G. M. S, ১৬/২ খৃ., ৬৪) বিবরণ অনুসারে গভর্নর তাঁহার পিতার পরামর্শ অনুযায়ী সামারকানদের উছমান খানের নিকট তিরমিয সমর্পণ করেন। মীর খাওয়ানদ-এর রচনায় (Hist. des sultans du khorezm, সম্পা. Defremery, প্যারিস ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৫১) সংশ্লিষ্ট খানের (উছমান খান) পরিবর্তে খাওয়ারিযম শাহের উল্লেখ রহিয়াছে। কারা খিতায় সাম্রাজ্যের পতনের পর তিরমিয খাওয়ারিযম শাহী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১২২০ খৃ. শরৎকালে মোঙ্গলগণ তিরমিয দখল করে এবং জনপদটিকে পুরাপুরি ধ্বংস করিয়া দেয়। জুওয়ায়নীর ঐ বিজয়াভিযানের বর্ণনায় (G. M. S, ১৬খ, ১০২) বলা হয় যে, নগরীর প্রাচীরের অর্ধেক নদীর মধ্যে অবস্থিত।

ইহার কয়েক বৎসর আগে আমরা প্রথমবারের মত তিরমিযের সায়্যিদগণের উল্লেখ পাই। মোঙ্গলদের বিজয় সত্ত্বেও ঐ জনপদে এই সায়্যিদদের গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হয় নাই। খাওয়ারিযম শাহ মুহাম্মাদ যখন খলীফা নাসিরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন তখন তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট আলিমদের মাধ্যমে এই মর্মে ঘোষণা করান যে, 'আব্বাসীগণ অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ ক্ষমতার হকদার আলীর বংশধরগণ। অতঃপর তিরমিযের একজন বিশিষ্ট সায়্যিদ (সাদাত-ই বুযুর্গ) অন্যতম আলাউল-মুলককে খলীফা (G. M. S., ১৬/২খ, ৯৭, ১২২) নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগের কোনও প্রতিক্রিয়া হয় নাই। আর এই পাল্টা খলীফার জীবন বা তাঁহার জীবনাবসান সম্পর্কেও আর কিছু জানা যায় না। হামদুল্লাহ কায্বীনীর তারীখ-ই গুযীদায় (G. M. S., ১৪/১খ, ৪৯৬) এই খলীফাকে সায়্যিদ ইমাদুদ-দীন তিরমিযী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পরের শতকে পর্যটক ইব্ন বাতূতা (দ্র.) (সম্পা. Defremery ও Sanguinetti, ৩খ, ৪৮) চাগাতাঈ (দ্র.) রাজ্যগুলির ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ দিয়াছেন। তিরমিযের অধিপতি (সাহিবা) ও হুসায়নের অন্যতম বংশধর আলাউল-মুলক খুদাওয়ান্দ-যাদাহ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ ঐ বিবরণীতে আছে। কথিত আছে যে, তিনি ৪,০০০ মুসলমানের নেতা হিসাবে খান খালীলুল্লাহর নিকট আসিয়া হাযির হইলে তিনি তাঁহাকে উযীর নিযুক্ত করেন। তাঁহার পরিবারের লোকজন পরবর্তী কালেও খুদাওয়ানদ যাদাহ নামে অভিহিত হন, জাফারনামাহ, ভারতীয় সং, ১খ, ২১০ এবং স্থা., ও বাবুর-নামাহ, facs. Beveridge, পত্র ২০৮, এবং গ্রন্থদ্বয়ে খুদাওয়ান্দ-যাদাহ শব্দটি খান-যাদাহ এই সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়াছে। শব্দটির পরিপূর্ণ রূপ তীমূরের সময়ে রচিত জাফার-নামাহ্র আদিতম পরিমার্জনায় দেখিতে পাওয়া যায় (Teksti po istorii Sredney Azii, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৯৫ খৃ., পৃ. ১৩১ ও ১৯৯)। জাফার-নামাহ-তে খান-যাদাহ আবুল-মাআলী ও তাঁহার ভাই আলী আকবারের নাম কয়েকবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৩৭১ খৃ. আবুল-মা'আলীকে তীমূরের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণের দায়ে (জাফার-নামাহ, ১খ, ২৩১) নির্বাসনে পাঠান হয়। তবে তাঁহার ঐ নির্বাসনের মেয়াদ খুব বেশিকাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ আমরা উহার পরের বৎসরেই দেখিতে পাই যে, তিনি খাওয়ারিযমের বিরুদ্ধে তীমূরের সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (পূ. গ্র, পৃ. ২৪১)। পরে খানযাদে আলা আল-মুলক নামে আরও একজন খানযাদাহ-এর উল্লেখ আছে। তীমূর ১৩৯৯ খৃ. ভারত ও ১৪০৪ খৃ. য়ুরোপের অভিযান (পূ. গ্র., ২খ, ১৯০ ও ৫৯৩) হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন। ১৪৮৭ খৃ. আহমাদ মীরযা সায়্যিদ পরিবারের এক কন্যাকে বিবাহ করেন (বাবুর-নামাহ, পত্রক ২০৬)।

ইব্ন বাতূতার সফরকালে বাল্খের অবস্থা ছিল ধ্বংস দশায়। তবে তিরমিয ঐ সময় নাগাদ মোঙ্গলদের ধ্বংসলীলা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল। শহরটিতে আর পুরাতন অবস্থান পুনরায় গড়িয়া না তুলিয়া উহা হইতে দুই আরাব মাইল দূরে বর্তমান স্থলে নির্মাণ করা হয়। শহরটি মনোরম ও আকারে বিশাল এবং উহার অধিবাসীরা অবস্থাপন্ন ছিল (ইবন বাতূতা, সম্পা. Defremery ও Sanguinetti, ৩খ, ৫৬ প.)। এই শহরের ধ্বংসস্তূপগুলির মধ্যে একটি সমাধিসৌধের বিবরণ দিয়াছেন A. A. Semenov (Protokoli Turk, Kruzka Lyub. Arkh., ১৯খ, ৩ প., ছবিসহ– এবং এই সমাধিসৌধের সহিত বিবরণ আছে সায়্যিদদের মাযারসমূহের যেইগুলিকে এখন সুলতান সাদাত (সম্ভবত সুলতান-ই সাদাত) বলা হয়। এই সায়্যিদদের উত্তর-পুরুষেরা বর্তমান তিরমিযের নিকটবর্তী একটি গ্রামে বাস করে (সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী উহার জনসংখ্যা ৭২৪)। গ্রামটির নাম সালিহাবাদ A. Semenov সায়্যিদদের এই বংশধরদের নিকট হইতে বংশলতিকার একটি পাণ্ডুলিপি ও তাঁহাদের বংশের একটি ইতিহাস পাইয়াছেন যাহাতে সর্বশেষ ৪ যুলহিজ্জা, ১০৪৬/২৯ এপ্রিল, ১৬৩৭ সন পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা রহিয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী সায়্যিদ হাসান আল-আমীর ছিলেন আমীর হুসায়নের পুত্র। তিনি ২৩৫/৮৪৯-৫০ সনে সামারকানদে আসেন এবং অতঃপর ২৪৬/৮৬০-৮৬১ সনে বালখ ও তিরমিযে গমন করেন। আমাদের জানান হইয়াছে যে, এই সায়্যিদ হাসান আল-আমীরের সঙ্গে সামানীদের কিছুটা আত্মীয়তার যোগসূত্র ছিল। অবশ্য এই কথিত আত্মীয়তার সূত্রে কিছু কালাসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। ইহা ছাড়া বংশলতিকাটির অবশিষ্টাংশ কোনও রকম বাস্তব প্রামাণিক তথ্য কিংবা ইতিহাসের কোন সম্পর্ক ছাড়াই কেবল কতকগুলি নামের সমষ্টি-তালিকামাত্র (ইহাতে সুলতান সাদাত একজন মহিলার নাম বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। জাফার-নামাতে, ১খ, ৫৭) তিরমিযের পাশাপাশি "পুরাতন তিরমিযের" (তিরমিয-কুহনহ) নামোল্লেখ রহিয়াছে। সদ্য যে পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করা হইল উহাসহ বিভিন্ন রচনা ও মুদ্রায় মোঙ্গল অভিযান পরবর্তী তিরমিযের নাম প্রায়ই "পুরুষের শহর" (মাদীনাতুর-রিজাল) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তীমূরের মৃত্যুর পর আম দরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল আরও একবার স্বল্প মেয়াদের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। সামারকান্দ অবরোধকারী খালীল সুলতান আম দরিয়ার উত্তরাঞ্চলই কেবল দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার এবং

শাহরুখ (দ্র.)-এর মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে খালীল সুলতান ৮১০/১৪০৭ সালে পুরাতন তিরমিয শহরটি পুনঃনির্মাণ করেন এবং শাহরুখ বালখের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণ করেন (ইব্ন আরাবশাহ, মিসর সং, পৃ. ২০৫)। সম্ভবত এই সময়েই মুহাম্মাদ ইবন আলী আত-তিরমিযীর সমাধি নির্মিত হইয়াছিল।

১০ম/১৬শ শতক হইতে তিরমিয ও স্বাভাবিক কারণেই বালখ ছিল উয্‌বেগ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। বালখ দখলের জন্য উয্‌বেগ ও ভারতীয় নৃপতি (পরে সম্রাট) আওরাঙ্গযীব (দ্র.)-এর মধ্যে ১৬৪৬ ও ১৬৪৭ খৃ. সংঘটিত যুদ্ধের সময় সা'আদাত খানের সৈনাপত্যে ভারতীয় বাহিনী তিরমিয দখল করিয়া লয় (Elliot -Dowson, History of India, ৭খ, ৭৯ এবং Barthold, Bulletin de L'Acad., etc. সাময়িকিতে, ১৯২১ খৃ., পৃ. ২০৪)।

১৮শ শতকের গোড়ার দিকে বৎসরগুলিতে তিরমিয কুন্‌গুরাত বংশীয় শির আলীর দখলে ছিল। এই শাসকই ছিলেন শীরাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা) Z. D. M. G., (২৭৬)। এই সময় "তিরমিযের বড় নগর দুর্গ" (কাল্‌আ-ই কালান=قلعه كلان) ও "গ্রামের দুর্গের (?)" মধ্যে একটি পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। বস্তুত ঐ গ্রাম দুর্গটিতেই (তিরমিযের) অধিকাংশ লোকের বসতি ছিল। পরের দশকগুলির অনিশ্চিত পরিস্থিতির কারণে অন্য বহু শহরের মত তিরমিয শহরটিও পুরাপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ১৭৫৮ খৃ. মুহাম্মাদ রাহীম খান শহরটি পুনঃনির্মাণ করেন (Barthold, Kistorii orosheniya Turkestna, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৭৪)। ইহার পরে আরও একবার শহরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

খৃ. ১৯শ শতকের শেষার্ধে পুরাতন তিরমিয শহরের নিকট পাত্‌তা-হিসার (অধিবাসীর সংখ্যা ১,২৫৭) ও সালিহাবাদ (তু. উপরে) নামে দুইটি গ্রাম ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। আমূ দরিয়া নৌপথে রুশ বাষ্পীয় পোতগুলির যাত্রা শুরুর স্থানে পরিণত হওয়ার পর হইতে পাত্‌তা-হিসারের গুরুত্ব অধিকতর বাড়িয়া যায়। ১৮৯৪ খৃ. তিরমিযের ধ্বংসাবশেষ হইতে ৫ মাইল দূরে রুশ দুর্গ তেরমেয নির্মাণ করা হয়, যাহা কালক্রমে একটি শহর হিসাবে গড়িয়া উঠে। তবে উহার বেশিরভাগ অধিবাসী ছিল পুরুষ (সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযয়ী ৮,০৫২ জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক ২০৬৯ জন)। ১৯১৬ খৃ. বুখারা-কারশী- তেরমেয রেলপথ চালু হয়। রুশ বিপ্লবকালে এই রেলপথ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইলেও পরে উহা পুনঃনির্মিত হয়। প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতির জন্য মস্কো জাদুঘরের তরফ হইতে এই অঞ্চলে খনন কার্যের ফলে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির মধ্যে বৌদ্ধ যুগের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত বরাতসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) ঃ G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, কেম্ব্রিজ ১৯০৫ খৃ, পৃ. ৪৪০ প.; (২) W. Barthold, Turkestan, G. M. S., N.S., ৫খ, ৭৪ প. ও নির্ঘণ্ট, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন সম্পর্কে তু; (৩) B. Denke, Termez Noviy Vostok, ২২খ, (১৯২৮ খৃ.), ২০৮ প.; (৪) Kul'tura Vostoka, নং ১ (১৯২৭ খৃ.), পৃ. ৯ প.; নং ২ (১৯২৮ খৃ.), পৃ. ৩ প.।

W. Bathold (E.I[1])/ আফতাব হোসেন

আত্-তিরমিযী (الترمذى) ঃ আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন, আল-হাকীম (জ্ঞানী) নামে পরিচিত। তিনি খুরাসানের অন্যতম সুন্নী ধর্মতত্ত্ববিদ, মুহাদ্দিছ, হানাফী ফকীহ ও সূফী ছিলেন। তিনি ২৮৫/৮৯৮ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার প্রায় ৩০টি রচনাকর্ম অদ্যাবধি পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান, যেইগুলির বর্ণনা পদ্ধতি কিছুটা দীর্ঘ হইলেও সম্পূর্ণরূপে প্রামাণিক রচনা হিসাবে স্বীকৃত।

তিনি তাঁহার "নাওয়াদিরুল-উসূল" ও "খাত্‌মুল-বিলায়া" গ্রন্থদ্বয়ে "নূর-ই মুহাম্মাদী" ও "হাকীকাতুল-আদামিয়্যা"-এর অস্তিত্বপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ আধ্যাত্মিক রহস্যবাদী ধারণার ভিত্তিতে (গোঁড়া শী'আদের দ্বারা যাহার আরও বিকাশ ঘটে) গোঁড়া সূফীতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করার চেষ্টা করেন। আরবী বর্ণমালার ২৮টি হরফের মান নির্ণয়, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ফিরিশ্‌তার দৌত্যকার্য ও "ধার্মিকতার"র অবস্থানগত প্রকরণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া দক্ষতা অর্জনের দাবি করেন এবং এইগুলির পারিভাষিক নাম দেন বিলায়া (যাহা শী'আদের নিকট হইতে ধারকৃত)। ইহাতে তিনি হযরত ঈসা (আ)-এর এক বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ করেন।

তিনি তাঁহার "ইলালুল-উবূদিয়্যা" (এই গ্রন্থটির নিন্দা করা হয়), "শারহু'স-সালাত", "আল্-হাজ্জ ওয়া আসরারুহু" ইত্যাদি গ্রন্থে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আনুশাসনিক রীতিনীতির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেন। তাঁহার কৌতূহলোদ্দীপক গ্রন্থ "কিতাবুল-ফুরূফ"-এ ইহা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, কোন সঠিক সমার্থক শব্দ নাই (ইহা অর্থ-মু'তাযিলা ধারণাভিত্তিক)। তিনি অন্তর্দর্শনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চ নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার "কিতাবুল-আক্‌য়াস"-এ সেই যুগের বিভিন্ন কপটাচারীদের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং নানা ধরনের কূটতার্কিকদের কূটতর্ক খণ্ডন করেন। তিনি সূফীদের প্রথম জীবনী সংকলনের গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু এই রচনাকর্মটি কেবল উদ্ধৃতির মাধ্যমেই পরিচিত।

তিনি ইব্নুল-আরাবীর সঠিক পূর্বসূরী ছিলেন। ইব্নুল-আরাবী তাঁহার মৃত্যুর তিন শতাব্দী পর তাঁহার সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হুজবীরী, কাশ্‌ফুল-মাহ্‌জূব, সম্পা. Shukovski, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১৭৭-১৭৯, ২৬৫ প.; (২) ঐ, অনু. নিকল্‌সন ১৯১১ খৃ., পৃ. ১৪১-১৪২, ২১০ প.; (৩) Amedroz, in J. R. A. S., ১৯১২ খৃ., পৃ. ৫৮৪; (৪) L. Massignon, Essai sur.....la mystique musulmane, ১৯২২ খৃ., পৃ. ২৫৬-২৬৪; (৫) ঐ লেখক, Textez inidits..., ২৯২৯ খৃ., পৃ. ৩৩-৩৯ ও সংযোজন।

L. Massignon (E.I[1])/সিরাজ উদ্দিন আহ্‌মাদ

আত-তিরমিযী (الترمذى) ঃ আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা সাওরা ইব্ন মূসা আস-সুলামী। কোনও কোনও রিওয়ায়াতে সাওরা-এর পিতার নাম শাদ্দাদ এবং কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আস-সাকান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (দাইরাতুল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা-র টীকা)। তিনি ছিলেন সিহাস সিত্তার অন্যতম সাহীহ গ্রন্থের সংকলক। তিরমিযী শব্দটি তিরমিয-এর প্রতি নিসবা। এই শহরটি আমূ দরিয়ার বেলাভূমিতে বাল্‌খ হইতে ৬ ফারসাখ দূরত্বে অবস্থিত (গ্রীনিচ হইতে আনুমানিক ৩৭ অক্ষাংশে ও ৬৭ দ্রাঘিমায় অবস্থিত; তু, কাযবীনী, নুয্‌হাতুল-কুলূব, সম্পা. ও অনু. Le Strange, গিব মেমোরিয়াল সিরিজ সংখ্যা ২৩, নির্ঘণ্ট, শিরো.; Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, পৃ. ৪৪০ প. ও চিত্র ৯; প. ৪৩৩-এর বিপরীত)। এই স্থানেই ২৭৯/৮৯২-৮৯৩ সালে তিনি ইনতিকাল করেন (মীযানুল-ই'তিদাল ও মুল্লা আলীকৃত শারহুশ-শামাইল; কিন্তু সামআনী

শুধু ২৭০-এর দশক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)। অন্যান্য সূত্রমতে তিনি ২৭৫/৮৮৮-৮৯ সালে বূগ নামক গ্রামে ইনতিকাল করেন। বূগ ছিল তিরমিয-এর অন্তর্গত একটি গ্রাম এবং তিরমিয হইতে ৬ ফারসাখ দূরে অবস্থিত (সামআনী; য়াকূত, মু'জাম)। এই গ্রামের প্রতি নিসবা অনুযায়ী তাঁহাকে বূগীও বলা হয়। হয়ত তিনি উক্ত গ্রামেরই লোক ছিলেন নতুবা ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত গ্রামে বসবাস করিয়াছিলেন (সাম'আনী, তু. য়াকূত, মু'জাম)।

তাঁহার জীবনচরিত সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। বলা হয় যে, তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। আর ইহাও বর্ণিত আছে যে, তিনি জীবনের শেষভাগে অন্ধ হইয়া যান। তিনি হাদীছ সংগ্রহ করিবার জন্য খুরাসান, ইরাক ও হিজায-এ দীর্ঘ সফল করেন। আল-বুখারী (দ্র.), আবূ দাউদ আস-সিজিস্তামী (দ্র.) [কুতায়বা ইব্ন সাঈদ, ইসহাক ইব্ন মূসা, মাহমূদ ইব্ন গায়লান, আহমাদ ইবন মানী', মুহাম্মাদ ইবনুল-মুছান্না, মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার, সাঈদ ইব্ন আবদির-রাহমান ও সুফ্য়ান ইব্ন ওয়াকী প্রমুখ] তাঁহার উস্তাদ ছিলেন।

তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ঃ হাদীস সংকলন (কায়রো ১২৯২ হি.), দুই খণ্ডে, মীরাট ১২৮৩ হি. প. এবং শামাইল যাহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীছসমূহ জমা করা হইয়াছে (কায়রো সং ১৩০৬ হি., মূল গ্রন্থ ভাষ্যসহ মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম জাসসাস প্রণীত আল-ফাওয়াইদুল-জালীলা আল-বাহিয়্যা আলাশ-শামাইলিল-মুহাম্মাদিয়্যা নামে এবং সেইখানেই ১৩১৮ হি. এই গ্রন্থখানা দুইটি ভাষ্যসহ পুনর্মুদ্রিত হয়। প্রথমটির নাম আল-ওয়াসাইল। ইহা আলী ইবন সুলতান মুহাম্মাদ আল-কারী প্রণীত এবং অপরটির লেখক হইলেন, আবদুর-রাউফ আল-মুনাবী। অন্যান্য সংস্করণ ও ভাষ্য গ্রন্থের জন্য দ্র. Brocklmann, G. A. L., ১খ. ১৬২, পরিশিষ্ট ১, ২৬৮। ব্রকেলম্যান উক্ত স্থানে চল্লিশটি হাদীছ-এর একটি সংকলনও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না যে, ইহা তাঁহারই চয়নকৃত হাদীছ গ্রন্থ না অন্য লোকের। আরবী সূত্রসমূহে আরও বিভিন্ন বিষয়, যথা যুহদ, আসমা ওয়া কুনা এবং ইতিহাস বিষয়ে কতিপয় রচনাও তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু বাহ্যত এইগুলির একটিও আমাদের নিকট পৌঁছায় নাই।

কায়রো সংস্করণে তাঁহার হাদীছ সংকলনটি আস-সাহীহ নামেই নামকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও স্থানে ইহাকে জামি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (অপর তিনখানা সুনান গ্রন্থের ন্যায় আত্-তিরমিযীর গ্রন্থখানিকে আস-সুনানও বলা হইয়া থাকে। পূর্বসূরিগণ ইহাকে আল-জামিউস-সাহীহও বলিয়াছেন। আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থের রচয়িতা আল-হাকিম প্রমুখ ইহাকে উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন [দ্র. দা. মা. ই., টীকা-১])। ইহাকে জামি' এইজন্য বলা হয় (তু. Goldziher, Muhammadanische Stud., ২খ, ২৩১, টীকা ২) যে, উহার মধ্যে ফিকহ সম্পর্কিত হাদীছ ছাড়া অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত হাদীছও রহিয়াছে। এই কিতাব-এর পরিচ্ছেদসমূহের প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যায় যে, গ্রন্থখানার প্রায় অর্ধেকই কালামশাস্ত্রের মাসআলাসমূহ (কাদর, কিয়ামাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ঈমান, কুরআন), প্রচলিত আকীদাসমূহ (ফিতান, রু'য়া), ইবাদতসমূহ (যুহদ, কুরআনের ছাওয়াব, দু'আসমূহ), শৃঙ্খলা ও শিষ্টাচার (অনুমতি প্রার্থনা, বিনয়) এবং সাহাবীগণের চরিত্রাবলী (মানাকিব)-এর সহিত সম্পর্কিত।

এই হাদীছ সংকলনটিতে বুখারী ও মুসলিম-এর তুলনায় হাদীছের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু পুনরুক্তি (তাকরার)-ও উহাদের তুলনায় কম। ইহাতে বিশেষভাবে দুইটি পরিচ্ছেদ দীর্ঘ এবং সবিস্তার অর্থাৎ "মানাকিব" ও "তাফসীরুল-কুরআন"-এর পরিচ্ছেদদ্বয়। এই পরিচ্ছেদ দুইটি অপর তিন সুনান গ্রন্থে নাই (সুনান বলিতে কখনও কখনও আবূ দাউদ, আত-তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা যে চারখানা হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন সেইগুলিকে বুঝায়)। জামি' তিরমিযীতে যেমন হযরত আলী (রা) সম্পর্কিত হাদীছ বিরল নহে, অনুরূপভাবে হযরত আবূ বাকার (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা) সম্পর্কিত হাদীছও কম নহে।

কিন্তু জামিউত-তিরমিযী দুইটি বৈশিষ্ট্যের জন্য সমধিক খ্যাত ঃ (১) সনদ সম্পর্কে সমালোচনামূলক মন্তব্য এবং (২) ফিকহী মাস'আলার ক্ষেত্রে ইখতিলাফ (মতবিরোধ)-এর স্থানগুলির বিস্তারিত বিবরণ, যাহা প্রতিটি হাদীছ-এর পরে উল্লেখ করা হইয়াছে। শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তিরমিযীর সংকলনটি ইখ্তিলাফ সম্পর্কিত যেই সকল গ্রন্থ আমাদের হাতে আসিয়াছে তন্মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই বিষয়ে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মন্তব্যসমূহ তাঁহার কিতাবুল-উম্ম গ্রন্থে তুলামূলকভাবে কম পর্যাপ্ত।

তাকরীব গ্রন্থকারের বর্ণনামতে, যাহার উদ্ধৃতি Goldziher (Muhams. Stud., ২খ, ২৫২, টীকা ১) প্রদান করিয়াছেন, সুনানূত-তিরমিযীর পাণ্ডুলিপিতে সনদ সম্পর্কে তিরমিযীর মূল্যায়ন (সাহীহ, হাসান, গারীব, হাসান-সাহীহ, হাসান-গারীব, সাহীহ-গারীব) সর্বত্র একইভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই। কোন্ উসূল (মূলনীতিসমূহ)-এর উপর ভিত্তি করিয়া হাদীছগুলির একটি হইতে অপরটিকে উল্লিখিত পন্থায় পৃথক করা হইয়াছে, তাহার তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। জামিউত-তিরমিযী-র শুরুতে পূর্ণ সনদ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং উহা যেই রাবী হইতে কিতাব বর্ণিত হইয়াছে সেই রাবী পর্যন্ত পৌঁছান হইয়াছে। গ্রন্থের উপসংহারে রহিয়াছে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও দু'আ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুন-নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ৩২৫; (২) আস-সামআনী, কিতাবুল-আনসাব, গিব মেমোরিয়াল সিরিজ, ২০খ, ১০৬ ক; (৩) আল-হাযিমী, শুরূতুল-আইম্মা আল-খামসা, প্রকাশিত; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'য়ান, সম্পা. Wustenfeld, সংখ্যা ৬২৪; (৫) ইবনুল-আছীর, আল্-কামিল, ৭খ, ১৬৪-১৬৫; [(৬) ওয়ালিয়্যুদ-দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ আল-খাতীব, আল-ইক্মাল ফী আসমাইর-রিজাল, লাহোর ১৩০৪/১৮৮৭, পৃ. ১৫৩]; (৭) আল-মিয্যী আল-হাফিজ, তাহযীবুল-কামাল (মিসর-এর দারুল-কুতুব-এ রক্ষিত পাণ্ড.); (৮) আস-সালাহ আস-সাফাদী, নুকাতুল-হিময়ান, পৃ. ২৬৪-২৬৫; (৯) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, তাহ্যীবুত-তাহ্যীব (হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি.), ৯খ, ৩৮৭-৩৮৯, সংখ্যা ২৩৬; (১০) ঐ লেখক, তাকরীবুত-তাহযীব, দিল্লী, লিথু. তা. বি., পৃ. ২৩০; (১১) ইবনুল-ইমাদ, শাযারাতুয-যাহাব, ২খ, ১৭৪-১৭৫; (১২) ইব্ন তাগরীবিরদী, আন-নুজূমুয-যাহিরা, ৩খ, ৮১-৮২; (১৩) আয্-যাহাবী, তাবাকাতুল-হুফ্ফাজ, সম্পা. Wustenfeld, ২খ, ৫৭, সংখ্যা ৩; (১৪) ঐ লেখক, মীযানুল-ই'তিদাল, কায়রো ১৩২৫ হি., ৩খ, ১১৭, সংখ্যা ১০২১; (১৫) তাশকুবরা যাদাহ, মিফ্তাহুস-সা'আদা, ২খ, ১১; (১৬) হাজ্জী খালীফা, কাশ্ফুজ-জুনূন, ১খ, ৩৭৫; (১৭) কাদী আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনুল-আরাবী, আরিদাতুল-আহওয়াযী, ১খ, ৫-৬; (১৮) আল-মুকাদ্দাসী, হাফিজ আবুল-ফাদল, শুরূতুল-আইম্মা আসহাবিল

কুতুব আস-সিত্তাহ, পাণ্ডু; (১৯) ইব্ন খাতীবিদ-দাহ্শা, তুহফাত যাবিল-আরাব, সম্পা. T. Mann, পৃ. ১৪৩; [(২০) শাহ আবদুল-আযীয ইব্ন শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্, বুস্তানুল-মুহাদ্দিছীন (তা. বি.), পৃ. ১০৮]; (২১) আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মুকাদ্দামাত শারহিত-তিরমিযী; (২২) Goldziher, Muhammdanische Studien, ২খ, ২৫০ প; [(২৩) Brockelmann, G. A. L., ১খ, ১৬১ প. এবং G. A. L. S., ১খ, ২৬৭ প. (?)।

A. J. Wensinck ও আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (দা মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

তিরমিযী (ترمذى) ঃ সায়্যিদ বুরহানুদ-দীন, একজন সূফী। তিনি সায়্যিদ হুসায়ন তিরমিযী, সায়্যিদ মিরদান অথবা বুরহানুদ-দীন মুহাক্কিক নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি তিরমিয নামক স্থানের বাসিন্দা ছিলেন এবং মাওলানা বাহাউদ-দীন ওয়ালাদ-এর মুরীদ ছিলেন। মাওলানা বাহাউদ-দীনের নিকট কিছুকাল অধ্যয়নের পর তিনি দীর্ঘকাল কঠোর রিয়াদাত ও মুজাহাদায় মগ্ন ছিলেন এবং পরিশেষে তিনি তিরমিয শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। এইখানে তাঁহার নিকট বহু শাগরিদ সমবেত হন। কূনিয়ায় বাহাউদ-দীন ওয়ালাদ-এর মৃত্যু (৬২৮/১২৩১)-র পর বুরহানুদ-দীন তিরমিযী ৬২৯-৬৩০ হি. সালে কূনিয়ায় যান। কারণ তাঁহার পীর ও মুরশিদ-এর পক্ষ হইতে সেইখানে গমন করার রূহানী ইঙ্গিত ছিল। সেইখানে পৌঁছিবার পর যুবক জালালুদ-দীন রূমীর আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। জালালুদ-দীন রূমী তখন ফিকহ ও সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নয় বৎসর পর মাওলানা রূমীর একান্ত অনুরোধে তিনি কূনিয়া ত্যাগ করিয়া কায়সারিয়ায় গমন করেন ও তথায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার জীবনী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, যখন মোঙ্গলগণ কায়সারিয়া শহর অধিকার করিয়া এখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যাকাণ্ড চালায়, তখন বাহাউদ-দীন এই শহরে উপস্থিত ছিলেন। মুনাজ্জিম বাশী-এর পাণ্ডুলিপি জামিউদ-দুওয়াল (সং-৫০১৯ এবং ৫০২০, কিতাব খানা-ই উমূমী)-এ উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই ঘটনা ৬৪১/১২৪৩ সালে সংঘটিত হয় (বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. Recueil de textes rel. L'histoire des Seldj, ed. Houtsma, iv. 241)। কায়সারিয়া শহরের সালজূক গভর্নর শামসুদ-দীন ইসফাহানী বুরহানুদ-দীন (র.)-এর পৃষ্ঠপোষক ও মুরীদ ছিলেন। এই শামসুদ-দীন ইসফাহানীই বুরহানুদ-দীনের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই তাঁহার মাকবারা নির্মাণ করেন। আমরা তাঁহার প্রকৃত জন্মতারিখ জানি না এবং তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত নহি। আওলিয়া চেলেবী বলেন, সায়্যিদ বুরহানুদ-দীন তিরমিযী কায়সারিয়া নামক স্থানে বসবাস করিতেন এবং তিনি ৪৭৪ খৃ. সেই স্থানে ইনতিকাল করেন। তথ্যটি ভ্রমাত্মক। বর্তমান কালের কূনিয়া শহরে তাতারখানিলের তুরবেসী নামে যে একটি তুরবা রহিয়াছে, উহার সন্নিকটে বুরহানুদ-দীন তুরবেশী নামে একটি তুরবা রহিয়াছে যাহা সর্বদা বুরহানুদ-দীনেরই মাযার বলিয়া পরিচিত, যদিও সেইখানে কোনও লিপির অস্তিত্ব নাই। দাওলাত শাহ্ বুরহানুদ-দীন মুহাক্কিক-কে বাহাউদ্দীন ও মাওলানা রূমীর শায়খ মনে করেন। দাওলাত শাহ্ বলেন যে, বুরহানুদ-দীন মুহাককিক তাঁহার দুই শাগরিদ বাহাউদ-দীন ও মাওলানা রূমীসহ একত্রে সিরিয়া ও হিজায ভ্রমণ করেন এবং এই ভ্রমণকালে বুরহানুদ-দীন সিরিয়ায় ইনতিকাল করেন। দাওলাত শাহের বর্ণনা অনুযায়ী ধারণা করা হয় যে, তাঁহাকে সিরিয়াতেই দাফন করা হয়। এই বর্ণনা তথ্যনির্ভর নয় মনে হয় (দাওয়াত শাহ, সম্পা. Browne, পৃ. ১৯৪; বোম্বাই সং., পৃ. ৮৬; এবং দাওলাত শাহ্-এর উদ্ধৃতি ঃ ফাহীম, সাফীনাতু'শ শু'আরা, কনস্টান্টিনোপল, মাতবা'আ 'আমিরে, ১২৫৯ হি., পৃ. ৮২)। সায়্যিদ বুরহানু'দ-দীন তিরমিযী তাঁহার মাওলাবী তারকীকার প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অবদানের জন্য অধিক খ্যাতি অর্জন করেন। এই ধারণা হইতে বুঝা যায় যে, মাওলাবী তারীকার ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রাচীনতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে সিপাহসালার মানাকিবী ও আফ্লাকী মানাকিবীর মত গ্রন্থ হইতে আমরা নিশ্চিতভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য আহরণ করিতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (নিবন্ধে উল্লিখিত রচনাসমূহ ব্যতীত) (১) ফীরীদূন ইব্ন আহমাদ সিপাহসালার, মানাকিব-ই হাদরাত-ই খোদাওয়ান্দিগার, তুর্কী অনু., মুদ্রিত ১৩৩১ হি., পৃ. ১৫৯-১৬৪; (২) আফ্লাকী, মানাকিবু'ল-'আরিফীন, ফায়গী পাণ্ডু.; (৩) ঐ লেখক, মাহমূদ দেদে কর্তৃক তুর্কী ভাষায় অনূদিত, পাণ্ডু, পরিচ্ছেদ ২ (উভয় ভাষায় পাণ্ডুলিপিসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে); (৪) ঐ লেখক, CL. Huart কর্তৃক ফরাসী অনু. Les Saints des deruiches, Toueurs, প্যারিস ১৯১৮ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৫) লামিঈ, নাফাহাতু'ল উন্স-এর অনুবাদ, পৃ. ৫১৫-৫১৬; (৬) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত নামাহ, দার-ই সা'আদাত ১৩১৪ হি., ৩খ, ১৮৬; (৭) খালীল আদহাম, কায়সারিয়ে শেহরী, কন্স্টান্টিনোপল ১৩৩৪ হি., পৃ. ১১৮; (৮) কোপরূলূ যাদে ফু'আদ, ইলক্ মুতাসাওবিফলের, কন্স্টান্টিনোপল ১৯১৮ খৃ., পৃ. ২৪৫।

কোপরুলু যাদে ফুআদ (E.I. [1])/সিরাজ উদ্দীন আহমাদ

তিরহালা (ترحالہ) ঃ তুর্কী Trik (K) ala-র তুর্কী নাম। Volos Kalabaka রেলপথের ধারে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০ ফুট উঁচুতে কূপের পানি সরবরাহ ব্যবস্থাসম্পন্ন Trikkalmos-এ অবস্থিত পশ্চিম Ehessaly-র (গ্রীস) একটি শহর। তিরহালা নামের এই শহর জনপদটি প্রাচীন Trikka-র অদূরে অবস্থিত ছিল; এখন উহা বিখ্যাত Asclepius-এর মন্দিরসহ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। ১৮৮১ সাল হইতে ইহা গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত। ইহার আগে ছিল সাবেক 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ৭৯৮ হি. সনে (১৬ অক্টোবর, ১৩৯৫) সুলতান ১ম বায়াযীদ কর্তৃক (তু. হাজ্জী খালীফা, Rumeli and Bosna, সম্পা. J. V. Hammer, পৃ. ১০০ ও J. V. Hammer, G.O. R..i, 249) শহরটিকে একই সময়ে Larissa নামেও চিহ্নিত (তুর্কী ঃ ইয়েনী শেহ্র, দ্র.) করা হইত। পরে এই শহর জনপদটি তুরাখান-ওগলু (দ্র.)-এর আধিপত্যে আসে। এই তুরাখান-ওগলু 'উছমানী পরিবারের অভিজাত রাজপুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ও বিশিষ্টদের অন্যতম। মহামতি সুলতান সুলায়মানের শাসনামলে বুদাপেস্ট হইতে নির্বাসিত য়াহূদী (দ্র.)-কে তিরহালায় (তু. F. Belon, Les observations de plvsievrs hingularitez etc,., Paris 1555, fol, 58a) পুর্নবাসিত করা হয়। এই শহরে 'উমার ইব্ন তুরাখান সীসার ছাদবিশিষ্ট এক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসায় অন্যদের সঙ্গে উছমানী ঐতিহাসিক আহমাদ পারা-পারাযাদে শিক্ষকতা করিতেন। পারা-পারাযাদে ৯৬৮/১৫৬০ সালে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে 'উমার ইব্ন তুরাখান মসজিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। এই মসজিদটির অস্তিত্ব এখন বিলুপ্ত (তু. 'আতা'ঈ, যাইল শাকা'ইকুন'-নু'মানীয়া, পৃ. ২০ ও F. Babinger, G. O. W., p. 83 প); তু. আরও না'ঈমা, তা'রীখ, ৪খ., ৩৮। তিরহালা একজন কাদীর সরকারী আবাসস্থলও ছিল। 'আতা'ঈ ও ওয়েসীর মত কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তিও তিরহালার

কাযী পদে দায়িত্ব পালন করেন। এই শহরে গাযী তুরাখান, 'উছমান শাহ বেগ, হাজ্জী মুসতাফা ও হুসায়ন আগা নামে চারিটি মসজিদ ছিল। এই চারিটি মসজিদের মধ্যে মাত্র দুইটির অস্তিত্ব আছে। প্রথম মসজিদটি বিখ্যাত স্থপতি সিনান নির্মাণ করেন। কারা 'উছমান নির্মাণ করেন উছমান শাহ মসজিদ। কারা 'উছমান মহামতি সুলায়মানের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি Thessly-র গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিরহালাতেই তিনি ইনতিকাল করেন (৯৭৫/১৫৬৭; তু. পেচেবী, তা'রীখ, ১খ., ৪৫ ও আওলিয়া, সিয়াহাতনামে, ৩খ, ১৭২; ঐ, Travels, সম্পা. J. V. Hammer, i, p. 87)। প্রতিষ্ঠাতার সমাধিসৌধসহ মসজিদটি যদিও ধ্বংসস্তূপ প্রায় তবুও এই ঐতিহাসিক পুরাকীর্তির মাঝে অতীত জৌলুসের কিছু স্বাক্ষর এখনও বর্তমান। এইখানে যেইসব বিখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তির মাযার ছিল তাঁহাদের মধ্যে অতঃপর বর্ণিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ জালালু'দ-দীন বাবা, সিনান বাবা, রামাদান এফেন্দী, জা'ফার এফেন্দী ও এতলি কালকান। মুহসিন পাশা যাদে 'আবদুল্লাহ পাশা এই শহরে ১৪টি কূপ খনন করিয়াছিলেন। ফলত কূপগুলি এই শহরে এককালে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহের প্রমাণ। তিরহালায় এখন কোনও মুসলিম বসতি নাই। এই শহরে এখন কেবল গ্রীক (প্রায় সকলেই ওয়ালাশীয়) ও য়াহূদীরা বাস করে। এই জনপদটি যদিও খুব বেশি স্বাস্থ্যকর নহে তবুও ইহার বিশাল বায়যান্টীয় দুর্গ, উদ্যানের নিসর্গ ও প্রাচুর্য সহজে ভুলিবার নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাজ্জী খালীফা, Rumeli und Bosna, পৃ. ৯৯ দ্র.; (২) সামী, কামূসু'ল-'আলাম, পৃ. ১৬৩৭ দ্র.; (৩) সালনামে-ই বিলায়েত-ই য়ানিয়া, সন ১২৮৮, পৃ. ১১৫ দ্র.; (৪) J. V. Hammer, G. O. R., i, 249দ্র. ; (৫) Leon Heuzey, Excursion dans la Thessalie turque en 1858, Paris 1927, p. 80-এ; (৬) Const. Chr. Vaytsakis, Athens 1892, 38, p. 80; 'উছমানী আমলের প্রতি আদৌ গুরুত্ব প্রদান করেন নাই; (৭) আওলিয়া চেলেবি, সিয়াহাত, ৮খ., (ইস্তাম্বুল ১৯২৮), পৃ. ২০২ প. নির্মিত 'উছমান শাহ মসজিদ সম্পর্কিত তথ্যের জন্য তু. আওলিয়া, পূ. স্থা., পৃ. ২০৩ প.; (৮) F. Babinger, in iv, 1929 January; (৯) K. K. Orlandos, প্রাগুক্ত, জুন (পরিকল্পনা ও ছক-নক্শাসহ)।

Franz Babinger (E.I. [1])/আফতাব হোসেন

তিরায (طراز) ঃ শব্দটি ফারসী ভাষা হইতে গৃহীত, অর্থ সূচিশিল্প (embroidery); অতঃপর এই শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে জমকালো সূচিশিল্প, অলংকৃত পোশাক অর্থে যে পোশাক শাসক বা উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক পরিহিত হয় যাহা সূচিকর্মে লিখিত বাণীসম্বলিত, বিশেষত অলংকৃত পার্টি (band) দ্বারা সজ্জিত, যে পার্টির উপর নানা ধরনের অলংকৃত লিখন থাকে। সর্বশেষ পর্যায়ে ইহা দ্বারা এমন কারখানা বুঝায়, যাহাতে এই জাতীয় জিনিস অথবা পোশাক প্রস্তুত হয়। অতঃপর শব্দটির অর্থে একটি মাধ্যমিক রকমের বিবর্তন ঘটে অর্থাৎ ইহার অর্থ হয় "সূচিকর্ম দ্বারা অলংকৃত Strip (ফালি)"; ইহার অর্থের আরও সম্প্রসারণ ঘটে যখন ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন ধরনের "লিখিত পাড় বা পাট"; তখন এই শব্দের প্রয়োগ শুধু বস্ত্র মাধ্যমে বুননকৃত সূচিকর্ম অথবা সেলাইর সাহায্যে উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না, বরং যে কোন প্রকারের ফিতা বা পাটির উপর যে কোন প্রকার লিপি নির্দেশের জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হইতে থাকে–এই লিপি প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ হউক বা মোজাইক, কাচ, চীনামাটির (Faience) পাত্রে লিখিত হউক বা কাষ্ঠে খোদাই করা হউক (তু. উদাহরণস্বরূপ মাক্রীযী, খিতাত, ২খ, ৭৯, ২১২, ৪০৭)। পরবর্তী পর্যায়ে তিরায় নামটি প্যাপিরাস (Papyrus) পাত্রের উপর সরকারীভাবে মুদ্রিত লিখন বুঝাইবার জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এই মুদ্রণ নানা বর্ণের (লাল, সবুজ) কালির ব্যবহারে সম্পাদিত হইত প্যাপিরাস কারখানাদিতে। পরবর্তী কালে এই কারখানাকেও তিরায নামে অভিহিত করা হয়। আনু. খৃ. দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন প্যাপিরাস প্রস্তুত বন্ধ হইয়া যায়, তখন শেষোক্ত দুইটি অর্থের অবলুপ্তি ঘটে। কাপড়, পর্দা বা পোশাক, যাহার উপর সূচিকর্মের বা বুনটের বা সেলাইয়ের সাহায্যে উৎকীর্ণ লিপি করা হয়, এই সকল উৎকীর্ণ সামগ্রী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি দুইটি ঃ (১) উৎকীর্ণ লিপির মর্মকথা এবং (২) পোশাক পরিধানকারীর মর্যাদা। এক শ্রেণীর উৎকীর্ণ পদার্থ সাধারণ্যের খেয়ালীপনা চরিতার্থ করে [কিতাবু'ল-মুওয়াশশা, পৃ. ১৬৭ প. গ্রন্থে সংগৃহীত লিপিসমূহের মধ্যে ইহার চরম উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়; ফুলবাবু রকমের লোক ও সাজসজ্জাপ্রিয় মহিলাগণ ইত্যাকার লিপি দ্বারা তাহাদের পোশাক অলংকৃত করিতে পসন্দ করিত]। অপর শ্রেণীর উৎকীর্ণ লিপি সরকারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, কিছুটা প্রচলিত নিয়োগে (Orders) এবং বিশেষ খেতাব প্রদান (Decorations)-এর সহিত তুলনীয়। এই সূচি শিল্পোৎকীর্ণ লিপি পোশাকের বিভিন্ন স্থানে হইতে পারে, যথা কিনারায় (border), জামার চতুর্দিকে, গলাবন্ধনীতে, বাহুতে, হাতায়, কব্জী বরাবর এমন কি মস্তকবারণে, দুই কিংবা ততোধিক লাইনে; চওড়া হইত বিভিন্ন মাপের ২-৫৫ সেন্টিমিটার (J. V. Karabacek, Susandschird, পৃ. টীকা ৫৬; Papyrusprotokolle, পৃ. ২৬)। ভিন্ন মাপও হইতে পারে, যেমন মিসরীয় সমাধিসমূহ হইতে প্রাপ্ত বস্ত্রে এক সে. মি. অপেক্ষা কম চওড়া পার্টিরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ইব্ন খালদূন তিরায সম্পর্কে অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার বক্তব্য অনুসারে, শাসকের মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রতিভাত হইত রেশম বা Brocade পোশাকে। তাঁহার নাম এবং রাজকীয় ব্যাজ (علامة)-এর তিরায হইতে বিশেষ মর্যাদা দান বা মর্যাদাপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে যে পোশাক প্রদত্ত তাহাতেও এইরূপ জাঁকাল তিরায শোভা পাইত। উমায়্যা ও 'আব্বাসী শাসনকালে শাসক বংশের পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরীর কারখানা (দারু'ত-তিরায) তাঁহাদের প্রাসাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। একজন মুক্তি-প্রদত্ত, বিশ্বস্ত, উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে এই কারখানার অধ্যক্ষ (সাহিবু'ত-তিরায) নিযুক্ত করা হইত।

এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল স্পেনের উমায়্যা খলীফাগণ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের আমলে, মিসরে মামলূক সুলতানগণের অধীনে এবং প্রাচ্য অঞ্চলে তাঁহাদের সমসাময়িক পারসিক রাজন্যবর্গের শাসনামলে। মুসলিম সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সহিত এই ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

ইব্ন খালদূনের বর্ণনা (এই প্রবন্ধে প্রধানত অনুসৃত) মুসলিম বস্ত্রশিল্পের প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। মিসরের বিভিন্ন স্থানে (উল্লেখযোগ্য আখ্মীম, অ্যান্টিনো, এরমেন্ট, আসয়ূতের নিকটস্থ আল-'আজাম) প্রস্তুত মুসলিম বস্ত্রবয়ন শিল্পের বহু নিদর্শন উক্ত বর্ণনার সাক্ষ্য বহন করে। এই সকল নিদর্শন সংরক্ষিত রহিয়াছে য়ূরোপের বহু যাদুঘরে, যথা বার্লিন (Schlossmuseum Kaiser Friedrich-Museum, Kunstgewerbemuseum), প্যারিস (Louvre এবং Musee de cluny), লণ্ডন (Victoria and Albert Museum), ভিয়েনা (Osterreisches Museum fur vunst und Industrie এবং Sammlung Papyrus Erzherzog Rainer in the National Library) ও লেনিনগ্রাড যাদুঘরে, বহু সংখ্যক

ব্যক্তিগত সংগ্রহে, সমৃদ্ধ বস্ত্র সংগ্রহ প্রতিষ্ঠানে এবং য়ুরোপের সর্বত্র গির্জা, মঠসমূহে ও মুসলিম বয়ন শিল্পের সংগ্রহে সংরক্ষিত রহিয়াছে। অদ্যাবধি বিদ্যমান নিদর্শনসমূহের উৎকীর্ণ লিপিও ইব্ন খালদূনের বক্তব্য সমর্থন করে। প্রথমত দেখা যায়, তিরাযে বহু ক্ষেত্রে শুধু শাসকের নাম অংকিত রহিয়াছে, যেমন আল-আজাম হইতে প্রাপ্ত এবং Victoria and Albert Museum- এ রক্ষিত [Inv. no,. 769-1898] একটি সবুজ রেশমী Damask বস্ত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে ঃ "নাসির'দ-দুনয়া ওয়া'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন কালা'উন"। দ্বিতীয়ত দৃষ্ট হয় শাসকের নামের সহিত তাঁহার উপাধি ও শুভ-কামনাসূচক একটি বাণী উৎকীর্ণ রহিয়াছে, যেমন Friedrich Museum-এ রক্ষিত এক খণ্ড লিনেন বস্ত্রে সাদা রেখার বেষ্টনীর মধ্যে লাল সুতার বুননে দেখা যায়, "বিসমিল্লাহি'র রাহমানি'র রাহীম, বারাকাতু'ম-মিনাল্লাহি ওয়া কারামাতু'ন লি'ল-খালীফা 'আবদুল্লাহ আল-মুতী' লিল্লাহ আমীরি'ল-মু'মিনীন, আতালাল্লাহু বাকাউহু"–"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহর আশীর্বাদ ও করুণা খলীফা 'আবদুল্লাহ আল-মুতী' লিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন-এর উপর বর্ষিত হউক, তাঁহাকে আল্লাহ দীর্ঘজীবী করুন" (তু. E. Kuhnel, Isl., ১৪খ, ৮৬)। কায়রোস্থ 'আরব যাদুঘরে রক্ষিত ইস্পাত-নীল এক খণ্ড রেশমী বস্ত্রের উপর নীল ধূসর রঙে লতা ও পদ্ম ফুলের নকশা অংকিত হইয়াছে। শেষোক্ত নকশাগুলির চারি ধারে বেষ্টনী রেখাতে লিখিত হইয়াছে ঃ 'ইয়্যুন লি-মাওলানা আস্-সুলতানু'ল মালিক, আন-নাসির, নাসিরু'দ-দুনয়া ওয়া'দ-দীন মুহাম্মাদ কালা'উন– "মহিমান্বিত হউন আমাদের পৃষ্ঠপোষক সুলতান আল-মালিকুন-নাসির পৃথিবী ও ধর্মের রক্ষক মুহাম্মাদ কালা'উন" (তু. Herz-Bey, Catalogue raisonne, পৃ. ২৭২ এবং চিত্র ৫১; Falke, Seidenweberei, ২খ, চিত্র ৩৬৬; A. F. Kendrick, Catalogue of Muhammadan Textiles, পৃ. ৪১ এবং প্লেট ১২, ৯৫৭)। এই ধরনের আশীর্বাণী কোন কোন ক্ষেত্রে তিরায-এর বেশি অংশ জুড়িয়া থাকে। Quest (F.R.S., ১৯০৬ খৃ. পৃ. ৩৯২ প.; South Kensington Museum, Inv. No. 1381-1888; A. F. Kendrick, catalogue of Muhammadan Textiles, S. 10) কর্তৃক প্রকাশিত, এরমেনত্ হইতে প্রাপ্ত বুননকৃত পাড় দ্বারা সজ্জিত রঙ্গীন সিল্কের একটি পোশাকের খণ্ডাংশ উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায়ঃ বিসমিল্লাহি'র-রাহমানি'র রাহীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদু'র রাসূলুল্লাহ 'আলী ওয়ালিয়্যুল্লাহ সাল্লি (صل)... আল-মুসতান্‌সির বিল্লাহ আমীরু'ল মু'মিনীন সালাওয়াতুল্লাহ 'আলায়হি ওয়া 'আলা আবা'ইহি ['লআক্‌রামীন] আত-তাহিরীন ওয়া আব্‌না'ইহি'ল-মুনতাজিরীন। "পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মাদ (স.) তাঁহার প্রেরিত, 'আলী (রা) আল্লাহ্‌র বন্ধু (মনোনীত).... আল-মুনতাসির বিল্লাহ, আমীরু'ল-মু'মিনীন, তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হউক এবং তাঁহার (মহান) পূত চরিত্র পূর্বপুরুষগণের উপর এবং তাঁহার প্রতীক্ষিত সন্তানবর্গের উপর।"

কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিসিদ্ধ আশির্বাণীর সহিত উৎকীর্ণ হয় তিরায কর্মের স্থান ও কারখানার নাম, প্রধান উযীর বা কোষাগার অধ্যক্ষের নাম, বিরল ক্ষেত্রে কারুশিল্পীর নাম। উদাহরণ ঃ ভিয়েনাস্থ Rainer collection (Iny. Ar. Lin No. 19)-এর একটি সরু লিনেন খণ্ডে লাল সিল্ক-এর বুননে নিম্নলিখিত সূচিকর্মলিপি ঃ বিসমিল্লাহি'র রাহমানি'র রাহীম, বারাকাতু'ম মিনাল্লাহ, নি'মাতুন ওয়া সাআদাতুন-লি 'আবদিল্লাহ (نعمة وسعادة لعبد الله) আল্লাহ্‌র দাসের উপর নি'মাত ও সৌভাগ্য] জা'ফার আল-ইমামু'ল মুকতাদির বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন, আতালাল্লাহু বাকা'আহু (الطال الله بقاءه) আল্লাহ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন], মিম্মা আমারা'ল-ওয়াযীর (مما امر الوزير) উযীর (অমুক)-এর একটি আদেশে এই তিরায সম্পন্ন] আবূ আহমাদ আল-'আব্বাস ইবনু'ল হাসান (তু. J. V. Karabacek, Papyrusprotokole, পৃ. ৩৮)। কায়রোস্থ Arab Museum-এ রক্ষিত বস্ত্রসমূহের সংগ্রহে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তিরাযসমূহের অন্যতম, আল-ফুসতাতে প্রাপ্ত (তু. Herz, Bey, Catalogue raisone, পৃ. ২৭১; E. Kuhnel, Isl, ১৪খ, ৮৩), একটি বস্ত্রে নিম্নলিখিত উৎকীর্ণলিপিঃ বিস্‌মিল্লাহ, বারাকাতু'ম-মিনাল্লাহ লি-'আবদিল্লাহ আল-আমীন মুহাম্মাদ আমীরু'ল-মু'মিনীন আতালাল্লাহু বাকাআহু; মিম্মা আমারা বিসান'আতিহি ফী তিরাযি'ল-'আম্মাতি বি-মিসর (مما امر صنعته فى طراز العامه بمصر) (এই শিল্পকর্মটি) মিসরের সরকারী তিরায কারখানায় সম্পন্ন করিবার আদেশ তিনি দিয়াছিলেন] 'আলা য়াদায় আল-ফাদল ইবনু'র-রাবী' মাওলা আমীরু'ল-মু'মিনীন (على يدى الفضل بن الربيع مولى امير المؤمنين) আমীরু'ল মু'মিনীনের মুক্তদাস (مولى) আল-ফাদ্‌ল ইবনু'র-রাবী'-এর মাধ্যমে]। আল-ফাদ্‌ল ইবনুর-রাবী' (জন্ম ১৪০ হি., মৃ. ২০৮ হি.) ইব্ন তাগীরবিরদী (১খ, ৫৯৮)-র বর্ণনা অনুসারে ছিলেন খলীফা হারূনু'র-রাশীদ-এর উযীর ও রাজ-সরকার Chamberlain); হারূন-এর মৃত্যুর পর ফাদ্‌ল ধনভাণ্ডারসমূহের (খাযা'ইন) দখল গ্রহণ করেন এবং তাহা তাঁহার নির্ধারিত উত্তরাধিকারী আল-আমীনের নিকট বাগদাদে হস্তান্তর করেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁহার জন্য শাসকের প্রতীক চিহ্ন (জুব্বা/লাঠি ও অঙ্গুরীয়)-গুলি আনয়ন করেন; প্রতিদানে আল-আমীন তাঁহাকে বিপুল সম্মানে ভূষিত করেন এবং যাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমীন-এর উযীর পদাধিকারে খলীফার বস্ত্র প্রস্তুতির কারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। উল্লিখিত তিরায হইতে এই বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় (আল-মাকরীযী [খিতাত, ১খ, ১৮১, ২২৬], তু. J. Von. Karabacek, Papyrusprotokolle, পৃ. ৩৫ প. কর্তৃক উল্লিখিত পবিত্র কা'বা গৃহের জন্য প্রস্তুত দুইটি পর্দার (কিস্‌ওয়া) অলংকৃত তিরাযে তাঁহার নাম উৎকীর্ণ ছিল (পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্র. E.I.[1], vol, viii)।

তিরায লিপিসমূহের বহু প্রকারভেদ রহিয়াছে; বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, উহাতে শুধু ক্ষমতাসীন শাসকের উপাধির উল্লেখ রহিয়াছে, মূল নাম নাই, অনুষঙ্গীরূপে কতিপয় শুভ বাণী অন্তর্ভুক্ত হয়, কখনও হয় না, ক্ষেত্রবিশেষে শুধু শুভ বাণীই থাকে (উদাহরণের জন্য দ্র. E.I[1], vol, viii)।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লিপি উৎকীর্ণ তিরাযসমূহ এক হিসাবে বর্তমান কালের খেতাব ও সম্মানসূচক পদকসমূহের সহিত তুলনীয়। এই ধরনের অলংকৃত পোশাক প্রদান, মুদ্রা প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকের এখতিয়ারভুক্ত থাকে। প্রাচ্যে এই রীতিটি ছিল অত্যন্ত প্রাচীন। মিসরের ফির'আওনগণ তাহাদের বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে প্রদত্ত স্বর্ণের গলবন্ধনী এবং অন্যান্য মূল্যবান উপহারের সহিত এই ধরনের পোশাকও প্রদান করিত। ইসলামী আমলে এই রীতি সর্বপ্রথম বিপুল বিস্তৃতি লাভ করে। রাষ্ট্রের উচ্চ পদে নিয়োগ প্রদানের অনুষঙ্গীরূপেই কেবল এই পোশাক দেওয়া হইত না, বরঞ্চ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ কমপক্ষে বৎসরে একবার এবং মামলূক সুলতানগণের দরবারে বৎসরে দুইবার (শীত এবং গ্রীষ্মকালে) এইরূপ পোশাক পাইতেন (তু. A. V. Kremer, Kulturgeschichte, ২খ, ২২০-২৩; কালকাশান্দী, সুবহ'ল-আ'শা', ৪খ, ৫৫)। ইব্ন জুবায়র

[রিহলা, পৃ. ৯৪]-এর বর্ণনা অনুসারে মক্কা নগরীর আল-মাসজিদু'ল-হারাম-এর ইমাম ও অন্যান্য বৃহৎ মসজিদের ইমামগণকে আনুষ্ঠানিক পোশাকরূপে দেওয়া হইত সোনালী ফিতায় সজ্জিত (trimmed) একটি কাল রঙের আলখেল্লা, একই রঙের একখণ্ড মস্তকাবরণ এবং মিহি 'শারব' বস্ত্রের পাগড়ীর কাপড়; সাম্রাজ্যের ইমামগণকে এইগুলি খলীফার নিজস্ব বস্ত্র ভাণ্ডার হইতে সরকারী পোশাকরূপে সরবরাহ করা হইত। অবশ্য আমীরগণকে প্রদত্ত পোশাকসমূহ (রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে পরিধেয়) স্বভাবতই অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ হইত। ফাতিমী বংশের আমলে এই ধরনের পোশাকের মধ্যে থাকিত 'দাবিক' হইতে সংগৃহীত বস্ত্র ও সেই সঙ্গে সোনালী তিরাযসহ মস্তকাবরণ, যাহা খলীফার নিজস্ব বস্ত্র ভাণ্ডার (দারুল-কিস্ওয়া) হইতে সরবরাহ করা হইত [মাকরীযী, খিতাত, ১খ, ৪০৯, ৪২৭, তু. ৪৪০]। কালকাশান্দী [সুবহু'ল-আ'শা', ৪খ, ৫২প.] বলেন যে, আমীরগণকে প্রদত্ত পাগড়ীর কাপড়ে সুলতানের নাম সূচিকর্মে লিখিত হইত এবং মূল পোশাকেও অনুরূপ লিপি থাকিত।

খলীফাগণ সার্বভৌমের এই অধিকারের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করিতেন এবং ইহার অপব্যবহার প্রতিরোধের জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, হারূনু'র-রাশীদের উইলে (১৮৬ হি.). খারাজ (রাজস্ব), ডাক বিভাগ ও রাষ্ট্রীয় কোষাগার সম্পর্কীয় ব্যবস্থাদি উল্লেখের পাশাপাশি তিরায কারখানাসমূহের (তুরুয) ব্যবস্থাদিও উল্লিখিত হইয়াছে (তু. আল-আয্রাকী, আখবারু মাক্কা, পৃ. ১৬২, ১৬৬)। তিরায লিপিতে ক্ষমতাসীন শাসকের নাম উল্লেখ উক্ত শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতার নিদর্শনরূপে বিবেচিত হইত খুত্বায় শাসকের নাম উল্লেখের ন্যায়। আল-মা'মূন যখন তাঁহার ভ্রাতা আল-আমীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তখন তিনি তাঁহার প্রথম তৎপরতারূপে তিরায লিপি হইতে খলীফার নাম অপসারিত করেন (ইব্ন্ তাগরীবিরদী আন-নূজূমু'য যাহিরা, ১খ, ৫৪৪)। যখনই কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত হইত, তাঁহার নাম সঙ্গে সঙ্গে তিরায লিপিতে সংযোজন করা হইত (J.V. Karabacek, পূ. স্থা.)। ফাতিমী খলীফা আল-'আযীয বিল্লাহ তাঁহার উযীর য়া'কূব ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন কিল্লীস (মৃ. ৩৮০ হি.)-এর নাম তিরায লিপিসমূহে সংযুক্ত করেন (আল-মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ৬, ২৮৪)। অনুরূপভাবে ফাতিমী খলীফা আল-মুসতা'লী বিল্লাহ (১০৯৪-১১০১ খৃ.) তিরায লিপিতে তাঁহার উযীর আল-আফদাল-এর নাম উল্লেখ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। যেমন দেখা যায় Vatican Library-তে রক্ষিত উৎকীর্ণ তিরাযে (তু. J V. Karabacek, Papyrus Protokolle, পৃ. ৩৯), কিন্তু এই ক্ষেত্রে উযীরের নামোল্লেখের পরে দুইটি শব্দ তথা "ইমামের নাম" (অর্থাৎ শী'আ ইমাম) সংযোজনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন শাসকের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ করা হইয়াছে। পরবর্তী কালে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ নিজস্ব তিরায কারখানা স্থাপন করিতেন। বিশাল এক এলাকার গভর্নর 'আলী ইব্ন আহমাদ আর-রাসিবী (মৃ. ৩০১ হি.) কমপক্ষে ৮০টি তিরায কারখানার অধিকারী ছিলেন, যাহাতে তাঁহার নিজস্ব ব্যবহারের বস্ত্র বয়ন করা হইত (ইব্ন তাগরীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা, ২খ, ১৯২)।

পবিত্র কা'বা গৃহের গিলাফ (কিসওয়া) প্রেরণের একান্ত অধিকার ছিল খলীফার (আল-কালকাশান্দী, সুবহু'ল-আ'শা', ৪খ, ৫৭)। 'আব্বাসীগণ প্রতি বৎসর বাগ্দাদ হইতে মক্কায় কিসওয়া প্রেরণ করিতেন; এই কিসওয়া প্রায়শ মিসরে প্রস্তুত হইত। পরে এই অধিকার মিসরের শাসকবর্গের নিকট হস্তান্তরিত হয়। কালকাশান্দী-র সময়কালে "মাশহাদু'ল-হুসায়ন"-এ কালো সিল্ক সুতার বুননে শ্বেতবর্ণের লিপি উৎকীর্ণ কিসওয়া প্রস্তুত করা হইত। জাহির বারকূক-এর আমলের সমাপ্তি পর্যায়ে উৎকীর্ণ লিপির জন্য স্বর্ণ গিল্টি শোভিত হলুদ বর্ণ ব্যবহৃত হইতে থাকে। J. V. Karabacek (Papyrus Protokolle, পৃ. ৩৫-৩৯) কর্তৃক লিপির একটি সংগ্রহ সংকলিত হইয়াছে।

উমায়্যা ও 'আব্বাসী বংশীয় শাসকবর্গ তিরায অলংকৃত বস্ত্র উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার সংরক্ষণের প্রতি সম্যক্ মনোযোগ দিতেন। জাঁকজমকপ্রিয় ফাতিমী শাসকবর্গের আমলে এই শ্রেণীর বস্ত্রসামগ্রীর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি লাভ করে [ইবনু'ত-তুওয়ায়র-এর অনুসরণে, আল-মাকরীযী, খিতাত, ১খ, ৪৬৯ প.]। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন দারু'ত-তিরায ব্যতিরেকে কায়রোতে একই নামে পরিচিত অপর একটি কারখানা ছিল, যাহা স্থাপিত হইয়াছিল খলীফা আল-'আযীয বিল্লাহ-এর উত্তরাধিকারিগণের আমলে উযীর আবু'ল-ফারাজ য়া'কূব ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন কিল্লীসের (মৃ. ৩৮০/৯৯১) নামে। এই কারখানা দারু'দ-দীবাজ নামেও পরিচিত ছিল। কারণ এইখানে সিল্ক ব্রোকেড উৎপাদিত হইত (আল-মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ১০৪ প.)। এই সকল রাষ্ট্রীয় কারখানার প্রশাসনিক দায়িত্বে সর্বদা থাকিত বিচার অথবা সামরিক বিভাগ হইতে মনোনীত একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, যাঁহাকে স্বয়ং খলীফা অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। রাজকীয় ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত বস্ত্রসামগ্রী দরবারে লইয়া আসিলে তিনি বিদেশী রাজদূতের সম্মান ও মেহমানদারী লাভ করিতেন। বস্ত্রের গাঁইটগুলি দরবারে আনীত হইলে তিনি এক একটি করিয়া বস্ত্রগুলি দেখিতেন এবং পরিশেষে পোশাক-পরিচ্ছদ উপস্থাপন অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে তিনি একটি সম্মানসূচক পোশাক লাভ করিতেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিরায কারখানাসমূহে উৎপাদিত মূল্যবান পণ্যসামগ্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব অর্জন করিত। ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, তিন্নীম, দামিয়েত্তা ও আল-উশমূনায়ন শহরসমূহের কোষাগার হইতে হি. ৩৬৩ সালে ফাতিমী উযীর ইব্ন কিল্লীস-এর আমলে মাত্র একদিনে কেন্দ্রীয় কোষাগারে ২,০০,০০০ দীনার প্রদান করা সম্ভব হয় (আল-মাকরীযী, খিতাত, ২খ, ৬)। মামলূক সুলতানগণের আমলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয় বলিয়া মনে হয়। অন্ততপক্ষে ইব্ন খালদূনের (১খ, ২২৩) বর্ণনায় জানা যায় যে, তখন তিরায অলংকৃত বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ আর রাষ্ট্রীয় কারখানা ও প্রাসাদ কর্মশালাসমূহে তৈরি হইত না, বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের বস্ত্রাদি সরাসরি তাঁতীদের গৃহে সিল্ক ও খাঁটি স্বর্ণ দ্বারা বয়ন করাইয়া লওয়া হইত।

রাজকীয় তিরায প্রতিষ্ঠান শুধু মিসরে সীমাবদ্ধ ছিল না, সিসিলী দ্বীপের Palermo শহরে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ইব্ন জুবায়র [রিহলা, পৃ. ৩২৯] এমন কি তিরায়ু'ল-মালিক নামে পরিচিত রাজকীয় কারখানার একজন সূচিশিল্পীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই কারখানা হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর প্রধান নিদর্শন হইল ৫২৮/১১৩৩ সালের ২য় Roger-এর জন্য বয়ন করা একই আলখেল্লা। এই কারখানা পরে অস্ট্রীয় রাজকীয় কোষাগারের অভিষেকের জন্য পোশাক তৈরি করে। ইহাতে উৎকীর্ণ তিরায লিপিতে এই কারখানা "খিযানাতু'ল-মালিকীয়া" নামে উল্লিখিত হইয়াছে (তু. F. Book, Kleindien, পৃ. ২৯)। স্পেনে এই শ্রেণীর পণ্য উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল আলমেরিয়া; তথায় ইদরীসীর কালে ৮০০ তাঁত চালু ছিল এবং জুরজান ও ইসফাহান-এর উৎপাদিত পণ্যের আদলে মূল্যবান ব্রোকেড বুনন করা হইত; অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রের মধ্যে ছিল মুরসিয়া, সেভিল, গ্রানাডা ও মালাগা। এশিয়া মাইনর অঞ্চলে সালজূক প্রাসাদে একটি তিরায কারখানা স্থাপন

করা হইয়াছিল। ইহার উৎপাদিত পণ্যের নিদর্শন হইল Lyon Textile Museum-এর সংগ্রহের মধ্যে একটি স্বর্ণ-তন্তুর ব্রোকেড, ইহার প্রান্তিক পাড়ের কায়খুসরাও-এর পুত্র সুলতান কায়কুবায (১২১৯-১২৩৬ খৃ.)-এর নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। Marcopolo (তু. O. V. Falke, Seidenweberei, ১খ, ১০৬) সালজূক সাম্রাজ্যের গ্রীক ও আর্মেনীয়দের সূচিশিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে উৎকৃষ্ট গালিচা ও চমৎকার সিল্ক বস্ত্র প্রস্তুত হইত। সিরিয়ায় দামিশক ও Antioch কেন্দ্র উহাদের উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রীর জন্য সুবিখ্যাত ছিল (O. V. Falke, পূ. গ্র., ১খ, ১০৮; J. V. Karabacek, Dieliturg, Gewander, পৃ. ১৯৬)। ইরাকে বাগদাদ ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র; ইহার বিশেষ পণ্য ছিল শ্বেত বর্ণের মারওয়া বস্ত্রসমূহ (ইব্‌নু'ল- ফাকীহ, B G.A., ৫খ, ২৫২); এই কেন্দ্র একই সঙ্গে সিল্ক ও জড়োয়া সূচিকর্ম শোভিত ব্রোকেড বস্ত্র প্রস্তুত করিত যাহা Baldachinus ও baudekinus নামে সমগ্র পাশ্চাত্যে সুবিখ্যাত ছিল (O.V. Falke, পূ. গ্র., ১খ, ১০৮)।

পারস্য অঞ্চলে সিল্ক বস্ত্র বয়ন শিল্পের উন্নতি শুরু হয় যখন, মনে হয় ২য় শাপূর মেসোপটেমিয়া, আমিদ ও অন্যান্য বায়যান্টাইন প্রদেশ হইতে কারুশিল্পী আমদানি করেন আহওয়ায অঞ্চলে সূস, তুস্‌তার ও অন্যান্য স্থানে (তু. মাস'উদী, মুরূজ, ১খ, ১২৪)। লিনেন বস্ত্র বয়নের জন্য বিখ্যাত ফারিস প্রদেশে মিসরের কারখানাসমূহের ন্যায় কারখানা ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ফাসা-র কারখানাটি শাসকের জন্য এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত; একই সঙ্গে শাসকের নিজস্ব চাহিদার জন্য শীনীয, জান্‌নাবা, তাওওয়াজ ও আল-গুনদিজানে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মরত ছিল (ইব্‌ন হাওকাল, B. G. A., ২খ, ২১৩ প.; J. V. Karabacek, Susandschird, পৃ. ১০৬ প.; আল-ইদরীসী, ১খ, ৩৯১, ৩৯৯ প.)। কাযারূন, যাহা "পারস্যের দামিয়েত্তা" নামে খ্যাতি অর্জন করে, পরবর্তী কালে লিনেন বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ৫ম/১২শ শতাব্দীতে ইহা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে।

বয়ন শিল্পে খুযিস্তান পারস্য হইতে কম বিখ্যাত ছিল না। "ইরাকে যাঁহারা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই তুস্‌তার শহরে একটি কারখানা ও একজন তত্ত্বাবধায়ক ছিল (তিরায ওয়া সাহিব) (তু. J. V. Karabacek, Uber einige Benennungen mittelalterlicher Gewebe, পৃ. ৩০-৩২)। আল-ইদরীসীর আমলের মধ্যেই কিসওয়া তৈরীর জন্য ব্যবহৃত সামগ্রী ইরাকে প্রস্তুত হইত (নুযহাতু'ল-মুশ্‌তাক, ১খ, ৩৪৩)। সূস ও কুরকূব শহর দুইটি গুরুত্বে তুসতার হইতে কোন অংশে কম ছিল না। সূস শহরে একটি রাষ্ট্রীয় কারখানা ছিল এবং ইহাতে খায্‌ম বস্ত্র ও মিহি লিনেন বস্ত্র উৎপাদিত হইত (ইসতাখ্‌রী, B. G. A., ১খ, ৯৩; ইব্‌ন হাওকাল, B.G.A., ২খ, ১৭৫; আল-মুকাদ্দাসী, B. G. A., ৩খ, ৪১৬)। এইরূপ অপর একটি কারখানা (তিরায লি'স-সুলতান) কুরকূব শহরে চালু ছিল এবং তথায় সূস শহরের ন্যায় রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ, জড়োয়া ব্রোকেড ও এক প্রকার ডোরাদার বস্ত্র উৎপাদিত হইত। শেষোক্ত বস্ত্র শহরের নামে পরিচিত ছিল (আল-ইসতাখ্‌রী, B. G. A., ১খ, ৯৩; ইব্‌ন হাওকাল, B.G.A., ২খ, ১৭৫; আল-ইদ্‌রীসী, ১খ, ৩৮৩ প.; J.V. Karabacek, Susandschird, পৃ. ১০৭); সর্বশেষে উল্লেখ্য, সিজিস্তানেও একটি তিরায কারখানা ছিল যাহা শাসকের জন্য পোশাক উৎপাদন করিত এবং উহাতে সম্মানসূচক পোশাকাদি প্রস্তুত করা হইত, যাহা তিনি অত্যন্ত উদারভাবে বিতরণ করিতেন (য়াকূত, মু'জাম, ৩খ, ৪৫৮)।

তিরায প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। J. V. Karabacek (Papyrus Protokolle, পৃ. ২৭)। ইহার উৎপত্তিতে বিদেশী, সম্ভবত ব্যাবিলনীয় আসিরীয় প্রভাব সন্ধানের প্রয়াস পাইয়াছেন; তিনি এমন কি ইহাও মনে করেন যে, হয়ত সাসানীয় ঐতিহ্য হইতে ধারস্বরূপ ফারস অঞ্চলে অবস্থিত বহু সংখ্যক রাষ্ট্রীয় বস্ত্র উৎপাদক কারখানা এবং পোশাক সংরক্ষণের বিশাল ভবন (খাযা'ইনু'ল-কিসওয়াত) নির্মাণ রাজকীয় প্রথায় পরিণত হইতে পারে (Uber einige Benennungen mittelalter licher Gewebe, পৃ. ২০)। এই প্রসঙ্গে Karabacek হয়ত যথার্থভাবে ইব্‌ন খালদূন (১খ, ২২২)-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এই মর্মে যে, ইসলাম-পূর্ব পারস্যের রাজন্যবর্গ অলংকরণের জন্য রাজপোশাকে প্রাপ্ত রাজা ও শাসকবর্গের প্রতিকৃতি অথবা প্রাণীর ছবি ও চিত্রাবলী উৎকীর্ণ করাইতেন, অন্যপক্ষে মুসলিম শাসকগণ তদস্থলে তাঁহাদের নাম ও অন্যান্য সৌভাগ্যসূচক বাণী প্রতিস্থাপন করেন। Karabacek ইহাও দেখাইয়াছেন যে, এই বিষয়ে মুসলিম শাসকবর্গ বায়যান্টাইন শাসকবর্গ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শেষোক্তরাই তিরায ব্যবহার করিতেন এবং ইহা ঐ একই উৎস (পারস্য) হইতে উদ্ভূত (পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্র. E. I[1], vol. viii)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধগর্ভে বরাত প্রদত্ত হইয়াছে।

A. Grohmann (E.I. [1])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন (সংযোজন)

তিরায (طراز) ঃ বস্ত্রলিপি, এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ সমাপ্ত ও প্রস্তুত হইবার পর প্রবন্ধকার কায়রো গমন করিলে অধ্যাপক G. Wiet তাঁহাকে তাঁহার তিরায লিপি বা বস্ত্রলিপিসমূহের অত্যন্ত সমৃদ্ধ সংগ্রহটি পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ প্রদান করেন। এই সংগ্রহে বিপুল সংখ্যক নূতন উপাদান সংরক্ষণ করা হইয়াছিল, যেইগুলির কিছু সংখ্যক বিভিন্ন বস্ত্র ও দুর্লভ সামগ্রীর ব্যবসায়ী অথবা ব্যক্তিগত সংগ্রাহকগণের সংগ্রহে এবং অপরাপর নমুনাসমূহ বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত ছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় স্থানের অধিকারী কায়রোর Arab Museum, যাহা বিগত কয়েক বৎসরের সংগ্রহ প্রচেষ্টায় ইহার মূল্যবান বস্ত্র সংগ্রহের সহিত তিরায শিলালিপি সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ সংযোজন করিয়াছে। ইহার পরেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছে এথেন্স-এর অতুলনীয় Benaki Museum নূতন প্রাপ্ত নমুনাসমূহের মধ্যে, যেইগুলির সংখ্যা এক শতেরও অধিক বস্ত্রলিপি ভাষ্য, স্বভাবতই আলোচ্য প্রবন্ধের স্থান সংকুলান সমস্যার আলোকে কেবল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণসমূহ এইখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব হইয়াছে; তবে এই সীমাবদ্ধতা অতি সহজেই গ্রহণযোগ্য, যেহেতু G. Wiet কর্তৃক Ripertoire chronologique d'epigraphie abare প্রবন্ধে তিরায লিপিসমূহের ভাষ্য এবং E. Combe কর্তৃক Arab Museum-এর তিরায নিদর্শনসমূহের লিপিভাষ্য প্রসঙ্গে রচিত প্রবন্ধদ্বয় ইহার স্বল্পকাল পরেই প্রকাশ লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত করা হইতেছিল।

তৎকালীন ক্ষমতাসীন শাসকের নাম সেই সঙ্গে শুভ কামনাসূচক বাণী সম্বলিত যেই সকল তিরায লিপি রহিয়াছে উহাদের সহিত ফাতিমী ও 'আব্বাসী যুগদ্বয়ের অপরাপর কয়েকটি নূতন উদাহরণ সংযোজন করা যাইতে পারে। প্রথমোক্ত যুগের উদাহরণসমূহের মধ্যে রহিয়াছে কায়রোস্থ Arab Museum-এর সংগ্রহের তিনটি তিরায ঃ Inv. No. 8072 ঃ 'ইয্য মিনাল্লাহ লি'ল-খালীফা জা'ফার মিম্মা [দুইটি শব্দ অনুপস্থিত] আল-ইমামু'ল-মুক্‌তাদির বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন সানাতু

'আশারা ওয়া ছালাছা মি'আতিন গাফারাল্লাহু লাহু (?) ওয়ালি ওয়ালিদায়হি। 'ইয্য মিনাল্লাহ লি'ল-খালীফা জা [?] ফার,– "খালীফা জা'ফার-এর উপর আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। ইহা উহার অংশবিশেষ যাহা ইমাম আল-মুকতাদির বিল্লাহ, বিশ্বাসিগণের নেতৃত্ব দানকারী [তৈরির আদেশ দান করেন?], সাল ৩১০। আল্লাহ তাঁহার উপর এবং তাঁহার পিতা-মাতার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। খলীফা জা'ফার-এর উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হউক" (উৎকীর্ণ লিপিটি আপাতদৃষ্টিতে পুনরুক্ত হইয়াছে)। Inv. No. 7961-এর বাসমালা-এর পরে রহিয়াছে ঃ [বারাকা মিনাল্লাহ লি-'আবদিল্লাহ আবি']ল 'আব্বাস মুহাম্মাদ' আল-ইমাম আর-রাদী বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন আয়্যাদাহুল্লাহ সানাতু [আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হউক তাঁহার ভৃত্য আবু'ল-আব্বাস মুহাম্মাদ ইমাম আর-রাদী বিল্লাহ, বিশ্বাসিগণের নেতা আল্লাহ তাঁহাকে শক্তিশালী করুন, সাল...।" কায়রোস্থ Moritz Nahman সংগ্রহের অংশ অপর একটি অনুরূপ নমুনা এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, ইহা সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আয়্যাদাহু-এর আলিফ-এর পর আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় নমুনাটি সম্ভবত 'আব্বাসী যুগের উদাহরণসমূহের বিদ্যমান একটি আধুনিকতম উদাহরণ, Inv. Nc. 8164-এর ভাষ্য ঃ বিসমিল্লাহি'র রাহমানি'র-রাহীম। বারাকা মিনাল্লাহ [লি-'আবদ্]-আল্লাহ আবি'ল-'আব্বাস আল-ইমাম আল-কাদির বিল্লাহ্ আমীরু'ল-মু'মিনীন [আয়্যাদা]-হু আল্লাহ [৩-৪টি শব্দ অনুপস্থিত]।

ফাতিমী যুগের উদাহরণসমূহের মধ্যে রহিয়াছে কায়রোস্থ Tano সংগ্রহের অন্তর্গত একটি নমুনা যাহা দুইটি খণ্ডাংশ 'ক' ও 'খ' লইয়া গঠিত ঃ ক। [আল-মালি] কু'ল-হাককু'ল-মুবীনি'ল- য়াকিয়ীন (মূল পাঠ) আলহামদু লিল্লাহি রাব্‌বিল 'আলামীন ওয়াসাল্লা আল্লাহ, খ... [আ]-ইমামু'ল-মু'ইয্য (লি-দীন) আল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন, সালাওয়াতুল্লাহ 'আলায়হি ওয়া 'আলা আবনা'ইহি আত্-তাহিরীন, "অধিপতি, সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত সত্য; সকল জীবের প্রভু 'আল্লাহ্ সকল প্রশংসার অধিকারী এবং আল্লাহ্‌র করুণা [.....]ঃ খঃ.... ... ইমাম মু'ইয্য (লি-দীন) আল্লাহ, বিশ্বাসিগণের নেতা, তাঁহার উপর এবং তাঁহার পুত্রদের উপর 'আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হউক...। প্যারিসের Musee des Arts Decoratifs-এর সংগ্রহে রক্ষিত দ্বিতীয় একটি উদাহরণের ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ [বিসমিল্লাহির-রাহমানি'র-রাহীম, লা [ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু....২... বারাকা মিনাল্লাহি লি'আবদিল্লাহ ওয়া ওয়ালিয়্যিহি নিযার [আবি'ল মানসূর আল-ইমাম আল-'আযীয বিল্লাহ আমীরু'ল-মুমিনীন]। খলীফা ও তাঁহার উযীরের নাম যুগ্মভাবে উল্লিখিত হইবার একটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতে পারে; Nabman সংগ্রহ, কায়রো বিসমিল্লাহি'র-রাহমানি'র-রাহীম, 'ইয্য মিনাল্লাহ লি-'আবদিল্লাহ জা'ফার আল-ইমামু'ল-মুকতাদির বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন আ'আযযাহুল্লাহ, মা(আ) মারা'ল-ওয়াযীর 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা বি-'আমালিহি ছালাছু ওয়া ছালাছা মি'আতিন। Benaki Musum, এথেন্স বিসমিল্লাহি'র-রাহমানি'র-রাহীম। আলহামদু লিল্লাহ [রাব্‌বি]'ল-'আলামীন। বারাকা মিনাল্লাহ লি'ল-খালীফা জা'ফার আল-ইমামুল মুকতাদির বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন, আতালাল্লাহু বাকা'আহু। মা আমারা আল-ওয়াযীর হামিদ ইবনু'ল-'আব্‌বাস 'আয্‌যাহুল্লাহ বি-মাসর 'আলা য়াদায় শাফীআল-মুকতাদিরী মাওলা আমীরু'ল-মু'মিনীন সানাত সাব' ওয়া-ছালাছু মি'আতিন। Arab Museum, কায়রো, Inv. No....১। [বিসমিল্লাহ আ]-ল-রাহমান আল-রাহীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু..২ সালাওয়াতুল্লাহ 'আলায়হি...ওয়া আলা আবনা'ইহি আল-মুনতাজারীন মিম্মা আমারা বি-আ'মালিহি আল-ওয়াযীর আল-আজাল্ল] (E. Kuhnel, Islamische Stoffe aus agyptischern Grabern, পৃ. ২২, No. ৩১৩২ ও প্লেট ৭-এ প্রকাশিত একটি তিরাযে এই একই লিপি আংশিকভাবে সংরক্ষিত এবং শূন্য স্থানসমূহ উপরে পূর্ণ করা হইয়াছে)। রাসেল পাশা সংগ্রহ ঃ ক ১ বিসমিল্লাহি'র-রাহমানি'র রাহীম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, মুহাম্মাদু'র-রাসূলুল্লাহ...খ ১।... লি'আবদিল্লাহ ওয়া-ওয়ালীয়িহি মা'আদ্‌দ...ক ২। আল-মুসতানসি'র বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন সালাওয়াতুল্লাহ 'আলায়হি খ [ওয়া'আলা আবা'ইহি আত-তাহিরীন ওয়া-] আবনা'ইহি আল-আকরামীন, মিম্মা আমারা বি-'আ'মালিহি আল-কাদী আল-আ [জাল্ল]...। কায়রোস্থ Arab Museum -এর একটি তিরায বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে (Inv. No. 7966) যাহাতে ফাতিমী শাসক আজ-জাহির এবং আল-মুস্তানসির-এর উযীর আল-জারজারা'ঈ (যিনি ৪৩৬ হি. সনে ইনতিকাল করেন)-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ভাষ্যের পাঠ নিম্নরূপ ঃ আল-ওয়াযীরু'ল-আজাল্ল সাফী আমীরু'ল-মু'মিনীন ওয়া-খালিসাতুহু আবু'ল-কাসিম 'আলী ইব্‌ন আহমাদ]... "সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান উযীর, বিশ্বাসিগণের সেনাপতি আবু'ল-[কাসিম 'আলী ইব্‌ন আহমাদ-এর বন্ধু ও বিশ্বস্ত সহচর। এই প্রসঙ্গে বুওয়ায়হী বংশীয় বাহা'উ'দ্-দাওলা আবূ নাসর-এর একটি তিরায লিপি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে (তু. V. Zambaur, Manuel, de genealogie, ২খ, পৃ. ২১২) যাহা মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং বর্তমানে ওয়াশিংটনে Geogre H. Meyer সংগ্রহের অন্তর্গত একটি রেশমী পরিচ্ছদে উৎকীর্ণ রহিয়াছে ইহার পাঠ ঃ ক। ['ই]-য্য ওয়া ইকবাল লি-মালিকি'ল -মুলূক দ... খ। [বাহা'উ'দ-দাওলা ওয়াদিয়াউ'ল-মিল্‌লাতি ওয়া গিয়াছু'ল- উ[মমাহ আবূ নাসর ইব্‌ন 'উদূদ। গ। আল-দা]ওলা ওয়া তাজু'ল-মিল্লাতি তালা 'উমরুহু...। ঘ। ইসতীমাল আবী সা'ঈদ যাদান ফাররূখ ইব্‌ন আযাদমারদ্ আল-খাযিন। ক। "রাজাধিরাজ শক্তি ও সৌভাগ্য লাভ করুন...। খ। বাহা'উ-দাওলা এবং জনসমাজের আলোক ও জাতির আশ্রয় [আবূ নাসর ইব্‌ন উদূদ গ। আদ-দাওলা এবং জনসমাজের শিরোমণি, দীর্ঘ জীবন লাভ করুন.... ঘ। কোষাধ্যক্ষ আবূ সা'ঈদ যাদান ফাররূখ। ইব্‌ন আযাদমারদ্-এর ব্যবহারের জন্য"। এই পর্বের সমাপ্তিরূপে বাগদাদের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাজন্যবর্গের নামসম্বলিত তিরাযের দুইটি উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে একটি Riano (Industrial Arts in Spain, পৃ. ২৫৪) ও Amador de los Rios (Enseroas musulmanas, পৃ. ১৩৮) কর্তৃক প্রকাশিত এবং উহাতে স্পেনীয় উমায়্যা খলীফা ২য় হিশাম-এর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; বাসমালা পরবর্তী ইহার ভাষ্য পাঠ আল-বারাকা মিনাল্লাহ ওয়া'ল-য়ুমন্ ওয়াদ-দাবীম লি'ল-খালীফা আল-ইমাম 'আবদুল্লাহ হিশামু'ল-মু'আয়্যাদ বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন। দ্বিতীয় উদাহরণটি ৫৭×৫২ সে. মি. ৩ মাপের এক খণ্ড বস্ত্রের উপর অলংকৃত কূফী রীতিতে বৃহৎ অক্ষরে লিখিত হইয়াছে; কায়রোস্থ Moritz Nahman সংগ্রহের অংশ এই নমুনাটি যায়দী ইমাম আল-মানসূর য়ূসুফ ইব্‌ন য়াহ্‌য়ার আদেশে প্রস্তুত (তু. E. V. Zambaur, Manuel, ২খ, ১২২) ঃ আদ-দা'ঈ ইলা'ল-হাক্ক আমীরু'ল-মুমিনীন য়ূসুফ ইব্‌ন য়াহয়া ইবনি'ন-নাসির...আহমাদ। ধারণা করা যাইতে পারে যে, ইহা সান'আ-এর তিরায কারখানা হইতে প্রস্তুত এবং এই কারখানার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে আরও তথ্য প্রদান করা হইবে।

মিসরে অবস্থিত তিরায কারখানাসমূহের প্রসঙ্গে বর্তমানে আমাদের নিকট যে সকল উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হয়

যে, তিনবীসে যে কারখানাটি ছিল তাহা কেবল খলীফার দরবারের চাহিদা পূরণের জন্য চালু থাকিত; এতদ্ব্যতীত আর একটি কারখানা জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য চালু ছিল। এথেন্স-এর Benaki Museum-এর সংগ্রহের একটি বস্ত্র নিদর্শনে প্রথমোক্ত কারখানার উল্লেখ রহিয়াছে যাহাতে স্বর্ণ রেখায় নিম্নলিখিত দুইটি পংক্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে ঃ ১।.... (লা ইলাহা) ইল্লাল্লাহ; নাসর মিনাল্লাহ লি-'আবদিল্লাহ ওয়া ওয়ালীয়িহি নিযার আবি'ল-মানসূর আল-ইমাম[ম আল-'আযীয বিল্লাহ]... ২। ... [মা আমারা... আল-ইমাম আল-'আযীয বিল্লাহ... সালাওয়াতুল্লাহি 'আলায়হি... ওয়া 'আলা আবনা' ইহী] আল-আকরামীন বি-'আমালিহি ফী তিরায (মূল পাঠ) আল-খাসসা বিতুননীস-সানাত। শেষোক্ত কারখানা প্রসঙ্গে উল্লেখ রহিয়াছে কায়রো-র Nahman সংগ্রহের অন্তর্গত দুইটি নিদর্শনে; ইহাদের একটিতে উৎকীর্ণ লিপিটির পাঠ বিসমিল্লাহি'র-রাহমানি'র-রাহীম। বারাকা মিনাল্লাহ লি'আবদিল্লাহ জা'ফার আল-ইমাম আল-মুকতাদির বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন আয়্যাদাহুল্লাহ, মা আমা[রা আল-ওয়াযীর] 'আলী ইব্ন 'ঈসা বি 'আমালিহি ফী তিরায আল-'আম্মা বি তিন্নীস 'আলা য়াদায় শাফী মাওলা আমীরু' [ল-মু'মিনীন]; দ্বিতীয় নমুনাটি কেবল ভগ্নাংশে রক্ষা পাইয়াছে... [হামিদ ইব্ন] আল-'আব্বাস বি'আমালিহি ফী তিরায আল-মু'মিনীন]...। একই সংগ্রহের অন্তর্গত হি. ৩০৯ সালের তৈরী অপর একটি উদাহরণেও তিরায কারখানাটি প্রসঙ্গে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইহার ভাষ্য-পাঠ... আল-ইমাম আল-মুকতাদির বিল্লাহ আমীরু'ল-মুমিনীন আ'আয্যাহুল্লাহ মা আমারা'ল-ওয়াযীর হামিদ ইবনু'ল-'আব্বাস বি'আমালিহী তিরায তিন্নীস 'আলা য়াদি শাফী' মাওলা আমীরু'ল-মুমিনীন সানা'ত-তিস'আ ওয়া ছালাছু মি'আতিন।

তূনা শহরে অবস্থিত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত একটি কারখানা প্রসঙ্গে বর্তমানে তিরায লিপি হইতে প্রাপ্ত দুইটি নির্দেশনা আমাদের আয়ত্তে রহিয়াছে। উভয় উদাহরণ এথেন্স-এর Benaki Museum-এর সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের প্রথমটিতে লিনেন বস্ত্রে কৃষ্ণবর্ণে বয়ন করা কূফী লিপিতে নিম্নলিখিত ভাষ্য উৎকীর্ণ রহিয়াছেঃ মানসূর আবি 'আলী আল-ইমাম আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন, সালাওয়াতুল্লাহ 'আলায়হি ওয়া 'আলা আবা'ইহি আত্-তাহিরীন ওয়া-আবনা'ইহি আল-আকরামীন আল-আখয়ার ওয়া-সাল্লামা তাসলীমা। মিম্মা আমারা বি 'আমালিহী ফী তিরায আল-'আম্মা বিতূনা (মূ. পা.) সানাত ছামান ওয়া-ছামানীন ওয়া-ছালাছা মি'আতিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...ইনশা'আল্লাহ ওয়া'ত-তাওফীক বিল্লাহ, আল-ইকবাল মিনাল্লাহ। "মানসূর আবূ 'আলী, ইমাম আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ, বিশ্বাসিগণের সেনাপতি, তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার নির্মল পিতার প্রতি ও তাঁহার মহান ও উত্তম পুত্রদের প্রতি আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন এবং তাঁহাকে উন্নতি দান করুন। (ইহা অংশবিশেষ) যাহা তিনি হি. ৩৮৮ সালে তূনা-র গণ-তিরায কারখানায় প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই... এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সাফল্য আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে এবং সৌভাগ্য তাঁহার নিকট হইতেই আগত হয়।' দ্বিতীয় উদাহরণটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষিত, এই তিরাযটির ভাষ্য ঃ বিসমিল্লাহ ওয়া বিল্লাহ (মূল পাঠ) আর-রাহমানি'র-রাহীম; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল-মালিকু'ল-হাককু'ল-মুবীনু'ল-হামদু লিল্লাহ রাব্বুল' 'আলামীন, নাসরুম মিনাল্লাহ লি-'আবদিল্লাহ ওয়া-ওয়ালীয়্যিহি আল-মানসূর (অতঃপর পূর্বোক্তের ন্যায়)...ফী তিরায আল-'আম্মা বি-তূনা সানাত তিস'ঈন ওয়া-ছাল্লাছু মি'আতিন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ....ইনশাআল্লাহ। দামিয়েত্তা-এর কারখানা প্রসঙ্গে আমাদের হাতে বর্তমানে নিম্নলিখিত তিরাযটি রহিয়াছে; জনৈক ব্যক্তির নিজস্ব সংগ্রহের অংশ এই উদাহরণটি ১১০ সে. মি. দীর্ঘ এবং বৃহৎ কূফী অক্ষরে লাল রেশমী বস্ত্রে লিখিত ইহার লিপির ভাষ্য ঃ [দুইটি শব্দ অনুপস্থিত] মিম্মা আমারা বিহি'ল-ওয়াযীর [আবু]'ল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ [দুইটি শব্দ] ফী তিরায আল-খাসসাহ বিদিময়াত ওয়া যারআ 'আলা য়াদায় বিশর আল-খাদিম মাওলা আমীরু'ল-মু'মিনীন সানাত সিত্তা ওয়া-তিস'ঈন ওয়া মি'আতায়ন। আল-বাহনাসাতে অপর একটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তিরায কারখানা ছিল, যাহা সম্পর্কে আমরা কায়রোস্থ Arab Museum-এ রক্ষিত নমুনা Inv. No. 7120 হইতে পরিজ্ঞাত ইহার লিপির ভাষ্য... মিম্মা 'উমিলা ফী তিরায আল-খাসসা বি-মাদীনাতি'ল বাহনা [সা]। ফায়্যুম শহরে (দুর্ভাগ্যক্রমে নামটি সুনিশ্চিতভাবে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই) এই প্রকার অপর একটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তিরায কারখানার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে কায়রোস্থ Arab Mueum -এর সংগ্রহের একটি পোশাকে (Inv. N. 9061.. .) উৎকীর্ণ চমৎকার লিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ...] দা ওয়া-নি'মা কামিলা লি সাহিবিহি; মিম্মা 'উমিলা ফী তিরায আল-খাসসা বি-স্তমূল (?) মিন কূরাত আল-ফায়্যুম। কায়রোস্থ Arab Museum -এর সংগ্রহের বস্ত্র খণ্ডাংশ (Inv. No. 7086 এবং 8174) হইতে অপর আরও দুইটি তিরায কারখানার নাম পাওয়া যায়, তবে ইহাদের পাঠোদ্ধার অদ্যাবধি অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত নমুনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক অংশটি হইতেছে ঃ মিম্মা 'উমিলা جالسسد 'আলা য়াদি মুহাম্মাদ ইব্ন হিলাল সানাত [সিত্ত] খামসীন মি'আতায়ন। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, [ফী] তিরায আল-'আম্মা ياسمون ফী সানাত ছালাছা ওয়া-'ইশরীন [...]। শেষোক্ত নামের ক্ষেত্রে যদি রেখার সংখ্যা এত অধিক না হইত তবে উহাকে উশমূনরূপে পাঠ করা যাইত। কোন প্রকার সুনির্দিষ্ট অতিরিক্ত তথ্য প্রদান না করিলেও ২৯৮, ৩০১, ৩০৫, ৩৩০, ৩৩৬, ৩৫৩ হিজরী সালের প্রস্তুত এবং বর্তমানে প্রধানত Moritz Nahman সংগ্রহে রক্ষিত পূর্ণাঙ্গ একগুচ্ছ তিরায উদাহরণ হইতে কায়রোর তিরায কারখানা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। একই সংগ্রহের অংশ তিনটি তিরায লিপিতে তিরায আল-'আম্মা বি-মিসর-এর উল্লেখ রহিয়াছে (৩০২ এবং ৩১০ সারের দুইটি ও সালবিহীন অপর একটি)। একটিমাত্র তিরায লিপির ভাষ্য এইখানে পূর্ণাঙ্গরূপে উদ্ধৃত করা হইতেছে। কারণ দেখা যাইতেছে যে, ইহা একটি কিসওয়ার প্রতি নির্দেশ করে ঃ বিসমিল্লাহি'র-রাহমানি'র রাহীম। বারাকাতু মিনাল্লাহ লি-'আবদিল্লাহ জা'ফার আল-ইমামু'ল-মুকতাদির বিল্লাহ আমীরু'ল-মু'মিনীন আয়্যাদাহু আল্লাহু মিম্মা আমারা আল-ওয়াযীর 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ফী তিরায আল-'আম্মাতি বি-মিসর 'আলা য়াদায় শাফী' মাওলা আমীরু'ল-মু'মিনীন, সানাতু 'আশার (ওয়া) ছালাছা মি'আতিন [১-২ অক্ষর]· কিসওয়া...। এই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত তিরায কারখানা ছাড়াও যে ক্ষমতাসীন শাসকের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য অপর একটি তিরায কারখানা চালু ছিল, তাহা কায়রোস্থ Arab Museum-এর একটি সূতী (লিনেন) বস্ত্র খণ্ড; Inv. No.7085, হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়; ইহার উৎকীর্ণ লিপির ভাষ্য... [আ] মীরু'ল-মু'মিনীন 'আয্যাহুল্লাহু মিম্মা আমারা বি-'আমালিহি ফী তিরায আল-খাসসা বি-মিসর সানাত আরবা'আ ওয়া-খামসীন ওয়া-মি'আতায়ন; এথেন্স-এর Benaki Museum-এর সংগ্রহের অপর এটি নমুনা হইতেও একই তথ্য পাওয়া যায়। ইহার লিপি ভাষ্য ঃ... [আ]মীরু'ল-মু'মিনীন আয়্যাদাহুল্লাহু আমারা আল-ওয়াযীর [আ]

'আয্‌যাহুল্লাহু বি-'আমালিহি ফী তিরায আল-খাসসা বিমসির সানাত খামসা [ওয়া-সি] ততীন ওয়া-ছালাছা মি'আতিন। ইহা অবশ্যই গুরুত্ববহ যে, বর্তমানে আমরা অবগত হইয়াছি, মিসরে অবস্থিত তিরায কারখানাসমূহ প্রসঙ্গে এই সকল নূতন প্রমাণের অতিরিক্তরূপে এই প্রদেশের বাহিরেও অপর দুইটি তিরায উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। টাইবেরিয়াস-এর কারখানাটি এথেন্স-এর Benaki Museum-এ রক্ষিত ১১৫-২৩৩ সে. মি. মাপের একটি গালিচায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই গালিচার লিপি ৯৫ সে. মি. দীর্ঘ দুইটি পংক্তিতে বিন্যস্ত, যাহার একটি গালিচার উপরিভাগে ও অপরটি নিম্নদেশে লিখিত, চমৎকার কূফী লিপিতে বৃহৎ আকারে বাদামী-পিঙ্গল বর্ণে দুইবার পুনরুক্ত ইহার ভাষ্যের পাঠ নিম্নরূপ ঃ বারাকাতুন কামিলাতুন ওয়া-নি'মাতুন শামিলাতুন ওয়া-সা'আদা মুতাওয়াসিতাতু লি-সাহিবিহি মিম্মা আমারা বি-'আমালিহি ফী তিরায আল-খাসসাতি বি-তাবারীয়া। দ্বিতীয় কেন্দ্র সান'আ'-র উল্লেখ পাওয়া যায় সম্প্রতি কায়রোস্থ Arab Museum কর্তৃক সংগৃহীত একখণ্ড ডোরাদার য়ামানী নমুনায় উৎকীর্ণ তিরায লিপিতে। ইহার ভাষ্য নিম্নরূপঃ বিসমিল্লাহি'র রাহমানির'-রাহীম ওয়া'লহামদু লিল্লাহি রাব্বি'ল 'আলামীন ওয়া সাল্লাল্লাহু 'আলা মুহাম্মাদিন 'আবদিহি ওয়া রাসূলিহি (২-৩ শব্দ) আল্লাহ ওয়া-বারাকা। বারাকাতু মিনাল্লাহ ওয়া মুয়ূমন্ ওয়া সা'আদা ওয়া-নি'মা লি'আবদিল্লাহ আল-খালীফা জা'ফার আল-ইমামু'ল- মুকতাদির বিল্লাহ আমীরু'ল- (মু'মিনীন) আতালাল্লাহু বাকাআহু ওয়া-আদামা আ'যাযাহু ওয়া-সালামাতাহু মিম্মা আমারা বি 'আমালিহি ফী তিরায আল-খাসসা বি সান'আ', সানাত ইহদা 'আশারা ওয়া ছালাছা মি'আতিন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, য়ামান-এর রাজধানী সান'আ যাহা উহার উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রীর জন্য সুবিখ্যাত ছিল, তথায়ও 'আব্বাসীগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত তিরায কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন।

A. Grohmann (E. I[1], Supl.)/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আত-তিরিম্মাহ ইব্‌নুল-হাকীম আত-তাঈ (الطرماح بن الحكيم الطائى) ঃ ইসলামের প্রথম শতকের এক বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান কবি। তিনি তদীয় উপজাতির এক অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন শাখার উত্তরপুরুষ যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য নবম হিজরীতে মক্কায়(?) আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন কবির পিতামহ কায়স। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রের বিবরণাদি অনুযায়ী আত-তিরিম্মাহ সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন আর সেইখানেই প্রথম তাঁহার জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। পরে তিনি সৈনিক হিসাবে কূফায় আসেন এবং কতিপয় খারিজী নেতার প্রভাবে তিনি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হন এবং জীবনের শেষ দিন অবধি খারিজী মতবাদে আস্থাবান থাকেন। তিনি সৈনিক হিসাবে বা অন্য কোন না কোন পদে পারস্যের বহু অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তাঁহার কবিতা সংগ্রহের অংশবিশেষ একটি বহু প্রাচীন স্পেনীয় পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাঁহার কবিতাগুলি সমসাময়িক কবিদের কাব্য হইতে স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্য ছিল পরিকল্পিতভাবে অসাধারণ (uncommon)। শব্দাবলীর ব্যবহার যেমন দেখা যায় রাজায-কবি রু'বা-র কবিতায়; অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহারকে কবি রু'বা তাঁহার কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত করেন। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য শব্দাবলী সম্পর্কীয় তথ্যের জন্য বস্‌রার ব্যাকরণবিদগণ কবি রু'বা-র রচনাকে প্রামাণিক সূত্ররূপে ব্যবহার করিতেন। ব্যাকরণবিশারদ আল-আসমা'ঈ ও অন্য কয়েকজনের বিবরণ অনুসারে রু'বা নাকি বলিতেন, তিনি এই ধরনের অদ্ভুত শব্দসম্ভার তিরিম্মাহের নিকট লাভ করিয়াছেন। তবে তাঁহার এই কথিত দাবি খুব সম্ভবত ভিত্তিহীন। কেননা কবি রু'বা-র প্রতিষ্ঠা লাভের পূর্বেই তিরম্মিাহ ইনতিকাল করেন। কবি আল-কুমায়ত-এর সঙ্গে কবি তিরিম্‌মাহ্-র সম্পর্ক ছিল স্বতন্ত্র প্রকৃতির। আল-কুমায়ত ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান শী'ঈ কবি, তাঁহার প্রতিষ্ঠাও নগণ্য ছিল না। কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে প্রায় প্রতিটি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকিলেও তাঁহাদের বন্ধুত্ব ছিল আন্তরিক ও স্থায়ী। আল-মুহাল্লাব পরিবারের সহিত তামীমীদের বিশ্বাসঘাতকতা, য়াযীদ ইব্‌নু'ল- মুহাল্লাব-এর পতন (৭২০-৭২১) এবং ইহাতে তামীমীদের প্রকাশ্য আনন্দ-উল্লাস ইত্যাদির কারণে তিরিম্‌মাহ কবি আল-ফারাযদাক-এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। পরিশেষে তিরিম্‌মাহ্-র এক চরম হুল ফুটানো রকমের বিদ্রূপাত্মক কবিতা (هجاء)-র প্রেক্ষিতে দৃশ্যত আল-ফারাযদাক প্রতিযোগিতায় ক্ষান্ত হন। তিরিম্‌মাহ্-র এই কবিতা শত বর্ষাধিক কালের জন্য য়ামানীদের গৌরব হইয়া থাকে এবং তামীমীদের বিরুদ্ধে ইহা নিরন্তর আবৃত্ত হইতে থাকে। এই বিদ্রূপাত্মক কবিতার কারণেই কবি তিরিম্‌মাহ্-র পৌত্র আমান এক শতক পর উত্তর আফ্রিকায় সচিবের চাকরিটি হারান যখন ১৮৪/৮০০ সনে ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আগ্‌লাব তথাকার গভর্নর পদে নিযুক্ত হইলেন। কারণ ইব্‌রাহীম ছিলেন তামীমী বংশের উত্তরপুরুষ হইবার দাবিদার।

এই কবির দীওয়ান বা কাব্য সংকলনের খণ্ডদশার কারণে উহা হইতে কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া সম্ভব নহে। তবে তাঁহার কোনও কোনও কবিতায় ধার্মিকতার অনুসরণ রহিয়াছে, যাহা তাঁহার পরম অমিতাচারী প্রতিপক্ষের রচনায় পাওয়া যায় না। তাঁহার বর্ণনামূলক যেই সকল কবিতায় বিস্তর অপ্রচলিত শব্দের সমাবেশ রহিয়াছে, আরবী অভিধানগুলিতে প্রায়ই সেই সকল কবিতার উদ্ধৃতি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আরবী ভাষায় এই সকল শব্দের অস্তিত্ব ছিল। কতকটা সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করিতে পারা যায় যে, তিরিম্‌মাহ কর্তৃক ব্যবহৃত অনেকগুলি শব্দ তাঁহার স্বগোত্রীয় কবি আবূ যুবায়দ ও ইব্‌ন মুকবিল (তামীম ইব্‌ন উবায়্যি ইব্‌ন মুক্‌বিল আল-'আজ্‌লানী)-এর কবিতায় অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেষোক্ত দুই ব্যক্তির সঙ্গে তরুণ বয়সে হয়ত তিরিম্‌মাহ-র পরিচয় ছিল। ঈদৃশ শব্দগুলি কোনও কোনও আরব উপজাতির কথায় ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়, তাঁহার উদ্ভাবিত শব্দ নহে। কিন্তু রু'বা-র ব্যাপার স্বতন্ত্র অর্থাৎ তিনি নিজে নূতন নূতন শব্দ উদ্ভাবন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The Poems of Tufail al-Ghanawi and Tirimmah b. al-Hakim, Ed. F. Krenkow, Leyden 1928; (২) কিতাবু'ল আগানী, ১০খ, ১৫৬-১৬০; (৩) ইব্‌ন কুতায়বা, কিতাবু'শ-শি'র, সম্পা. de Goeje; (৪) মার্‌যুবানী, মুওয়াশ্‌শাহ-লিসানু'ল আরাব গ্রন্থে শতাধিকবার তাঁহার বরাত দেওয়া হইয়াছে; কেবল যামাখ্‌শারীর আসাসু'ল-বালাগা-তে উদ্ধৃত হইয়াছে তাঁহার কবিতার ৫৬টি চরণ যেইগুলি তিরিম্‌মাহ-র দীওয়ান-এর পাণ্ডুলিপিতে বা অন্য কোনও লভ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

F. Krenkow (E.I.[1])/আফতাব হোসেন

তিলসাম (Tilsam) ঃ গ্রীক উৎস হইতে উদ্ভূত এবং তিলসিম, তিলিস্‌ম, তিলাস্‌ম ইত্যাদিরূপেও পরিচিত, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বা মন্ত্রপুত মাদুলী, উদাহরণস্বরূপ রাশিচক্র এবং অন্যান্য যাদুবিদ্যা বিষয়ক চিহ্ন ইত্যাদি সম্বলিত কোন লিপি অথবা এই প্রকার উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা আবৃত কোন প্রকার বস্তু, বিশেষত যেই সকল বস্তুতে উপরোক্ত অলংকরণের সহিত জ্যোতিষী চক্র হইতে গৃহীত চিত্র অথবা নক্ষত্ররাশির প্রতিরূপ এবং কুদৃষ্টি হইতে রক্ষা লাভের জন্য মন্ত্রপুত কবচের ন্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর প্রতিচ্ছবি সংযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ

বস্তু। ইহার গ্রীক উদ্ভূত নাম হইতে হেলেনীয় যুগের শেষভাগে ইহা উদ্ভূত হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায় এবং এই প্রকার মন্ত্রপুত কবচ ইত্যাদির অত্যন্ত বিশদ ব্যবহার রীতি হইতে সুস্পষ্টভাবেই রহস্যবাদী ভাবধারার প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। বলা হইয়া থাকে যে, তিনি Balinas এই প্রকার মন্ত্রপুত বস্তু বা কবচের প্রবর্তক তথা উদ্ভাবক ছিলেন। প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহ অনুসারে তিনি বহু সংখ্যক শহরে, উক্ত শহরসমূহকে ঝড়, সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদি হইতে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য মন্ত্রপুত কবচ রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রকার মন্ত্রপুত কবচ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় বহু সংখ্যক রীতি ও আইন Hermes Trimegistos-এর প্রবর্তিত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হামাইল প্রবন্ধগর্ভে প্রদত্ত বরাতসমূহের অতিরিক্তরূপে অন্যান্য দ্রষ্টব্য উৎসের মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) আল-বূনী, শামসু'ল-মা'আরিফ, বোম্বাই ১২২৮; (২) ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, N. E., ২খ, ১৭১-১৯৬; (৩) J. Ruska, Griechische Planetendarstellungen in arabischen Steinbuchern, হাইডেলবার্গ ১৯১৯ খৃ.; (৪) H. Ritter, Picatrix, ein Arabisches Handbuch hellenistischer Magie, Vortrage der Bibl., Warburg ১৯২৩ খৃ.;(৫) W. Gundel, Sterne und Sterbilder in Glauben des Altertums und der Neuzeit, ১৯২২ খৃ., পৃ. ২৮১ প.; (৬) J. Ruska, Tabula Smaragdina, হাইডেলবার্গ ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৯৮-১০৫; (৭) Blochet, Le gnostioisme musulman...; (৮) Lynn Thorndike, History of Magic and Experimental Science, নিউইয়র্ক ১৯২৩ খৃ.; (৯) F. Boll, Sternglaube und Sterndeutung [3], লাইপযিগ ১৯২৬ খৃ.।

J. Ruska (E.I.[1])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তিলিমসানী (تلمساني) ঃ কতিপয় আরবীয় পণ্ডিত ব্যক্তি এই বিশেষ নিসবা দ্বারা পরিচিত হইয়াছেন, তবে সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থসমূহে এই নিসবার উল্লেখ দ্বারা সাধারণ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিন ব্যক্তিকেই নির্দেশ করা হয় ঃ

(১) 'আফীফু'দ-দীন সুলায়মান ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আলী ইব্ন য়াসীন দাবি করিতেন যে, তিনি যেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তাহা শুরুতে আল-কূফা নগরী হইতে আগমন করিয়াছিল (অবশ্য যাহাবী, MS. Or. 53-তে ইহাকে কূমী-আল-আসল-রূপে পাঠ করিয়াছেন) এবং তাঁহার নিজের প্রদত্ত বক্তব্য অনুসারে ৬১৬/১২১৯ সালে তিলিমসান নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। জীবনের প্রথম ভাগেই তিনি সিরিয়া আগমন করেন এবং তথায় কখনও কখনও সরকারী দায়িত্বে কর্মরত থাকেন; তবে একই সময়ে তিনি বারবার বেকার অবস্থাতেও দিন যাপন করিতে বাধ্য হন। তিনি দাবি করিয়াছেন যে, একজন সূফী সাধকরূপে তিনি কোনও প্রকার বিরতি ছাড়াই প্রতিবারে চল্লিশ দিবসের হিসাবে এশিয়া মাইনর (রূম) অঞ্চলে নির্জন বাসের (খালওয়া) জন্য চল্লিশ বার গমন করেন এবং সাদরু'দ-দীন আল-কুনাবীর শাগরিদিত্ব গ্রহণ করেন। এই বক্তব্য প্রসঙ্গে যাহাবী যথার্থভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, কারণ তাঁহার দাবিমতে একাদিক্রমে ১,৬০০ দিবস নির্জনবাস (খালওয়া, চিল্লাহকাশী) করা হইয়াছে।

কোনও এক সময়ে তিনি বাজার খাজনা (মাক্স দ্র.) সংক্রান্ত তত্ত্বাবধায়কের পদে নিয়োজিত ছিলেন এবং যখন সুলতান আল-মানসূর কালাউনের অনুচর বাহিনীর একজন সদস্যরূপে আল-আস'আদ (ইবনি'স-সাদীদ আল-'আ'আয্য) দামিশ্ক নগরীতে আগমন করেন, তখন তিনি 'আফীফুদদীনের নিকট হইতে তাঁহার কার্যকলাপের হিসাব সংক্রান্ত একটি চূড়ান্ত স্থিতিপত্র দাখিলের দাবি করেন। যেহেতু বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এই হিসাব দাখিলের কোন প্রকার আভাস দেখা যায় নাই, সেই কারণে তিনি 'আফীফুদদীনকে প্রচণ্ডভাবে ভর্ৎসনা করেন। ইহাতে শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহার মেযাজের নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলিয়া এই মর্মে সুলতানের নিকট অনুযোগ করেন যে, শারী'আ আইন লংঘন করিয়া সুলতান একজন কিবতী খৃস্টানকে মুসলিম কর্মচারীদের উর্ধ্বতনরূপে বহাল করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে শান্ত করা হয় এবং সম্ভবত তিনি কখনও আর উক্ত হিসাব দাখিল করেন নাই।

কথিত আছে যে, 'আফীফ একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার ব্যবহর ছিল অমায়িক, একই সঙ্গে তিনি সুনির্দিষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সর্বদাই সন্দেহের চক্ষে দেখা হইত। কারণ যাহাবীর মন্তব্য মতে তাঁহার প্রকৃত অভিমত কি সেই সম্পর্কে কেহই কখনও সঠিকভাবে স্থির করিতে পারিত না, এমন কি তাঁহাকে একজন নুসায়রী সম্প্রদায় (দ্র.) অনুসারীরূপেও অভিযুক্ত করা হইয়াছে (ইব্ন 'ইমাদ, ৫খ, ৪১২; নাফাহাত, ৬৬৫প.)। সকল সমস্যারই উৎস ছিল তাঁহার কাব্যসমূহ, যাহা রচনাশৈলীর দিক হইতে সহজবোধ্য, বাঙময় ও মনোমুগ্ধকর হইলেও তাঁহার জীবনীকারগণের ভাষায় উহাতে লুক্কায়িত ছিল বিষ (মাওলানা জামী ইহার সহিত একমত নহেন, দ্র. নাফাহাত, পৃ. ৬৬৬)। তাঁহার কাব্যসমূহ একটি দীওয়ান আকারে সংকলিত হইয়াছে এবং ইহার কপিসমূহ বৃটিশ মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়া অফিস, অক্সফোর্ড-এর Bodleian গ্রন্থাগারসমূহে এবং অন্যত্র সংরক্ষিত; এই দীওয়ানে অন্তর্ভুক্ত কাব্যসমূহে নিশ্চিতভাবে কোন প্রকার খোলাখুলি ধর্মবিরোধী মতামত প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না, বরঞ্চ বহু ক্ষেত্রেই সূফী কাব্য রচনার শৈলী অনুসরণে তাহা কোন কাল্পনিক প্রেমিককে লক্ষ্য করিয়া রচিত [এই দীওয়ানটি কায়রো ও বৈরূত হইতে তিনবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহার ফরাসী অনুবাদ প্যারিসে পাওয়া যায়। ইবনু'ল-ফুওয়াতী মাজমা'উ'ল আদাব নামক গ্রন্থে ইহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দিয়াছেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি 'উলামা-ই 'আরিফীন-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উত্তর আফ্রিকা (মাগরিব) হইতে তিনি দামিশক আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করেন। তাঁহার কবিতায় প্রেমের উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়]।

কুত্বু'দ-দীন আল-য়ূনীনী তাঁহাকে একজন সুসঙ্গীরূপে বিবেচনা করেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কবি 'ইরফান (দ্র.) অর্থাৎ আল্লাহ্র পূর্ণাঙ্গ ও পরম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিতেন। তাঁহার অন্তিম শয়নে তিনি এই মন্তব্য করেন বলিয়া কথিত রহিয়াছে ঃ আল্লাহ্কে চিনিতে সক্ষম হইয়াছে এইরূপ কাহারও পক্ষে কিভাবে তাঁহাকে ভয় করা সম্ভব এবং যেহেতু আমি তাঁহাকে চিঠিতে পারিয়াছি তাই আমার মনে আর কোন ভীতি নাই এবং এই ভাবিয়া আমি আনন্দিত যে, আমি তাঁহার সাক্ষাত লাভ করিয়া ধন্য হইব। তিনি ৫ রাজাব, ৬৯০ (১ জুলাই, ১২৯১) সালে দামিশ্ক নগরীতে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে উক্ত নগরীর সূফীদের কবরস্থানে দাফন করা হয়।

(১) দীওয়ান ছাড়া বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাঁহার (২) রিসালা ফী 'ইলমি'ল-'আরূদ, বার্লিন, নং ৭১২৮, সংরক্ষিত; (৩) মাকামাত, ইহার পাণ্ডুলিপি মাওসিল-এ রহিয়াছে; (৪) শারহু'ল-মাওয়াকিফ লি'ন নিফ্ফারী, উক্ত শারহ-এর কতিপয় অংশের অনুবাদের জন্য দ্র. কিতাবু'ল-মাওয়াকিফ, পৃ. ২৫; (৫) শারহু'ল-কাসীদাতি'ন নাফসিয়্যা লি

ইব্‌ন সীনা; (৬) শারহু মানাযিলি'স সা'ইরীন; ইহার অতিরিক্তরূপে যাহাবী; (৭) শারহু'ল আসমা' আল-হুসনা ও ইবনু'ল-'আরাবীর শারহু ফুসূসি'ল হিকামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি যে জ্ঞানী গোষ্ঠীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন এই সকল গ্রন্থের শিরোনামসমূহ তাহার প্রতি ইঙ্গিত করে এবং সম্ভবত আমরা নিরাপদে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি যে, তিনি ইবনু'ল-'আরাবীর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাহাবী, তা'রীখু'ল-ইসলাম, MS. Brit. Mus., Or. 53, fol. 77v; (২) কুতুবী, ফাওয়াতু'ল-ওয়াফা যাত, ১খ, ২২৮; (৩) য়াফি'ঈ, মিরআত, হায়দরাবাদ সং., ৪খ, ২১৬-২১৮; (৪) Brockelmann, G. A. L., ১খ, ২৫৮ নং ১৮।

(২) পূর্বোক্ত ব্যক্তির পুত্র শামসু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান, যিনি আল-শাব্বু'জ-জারীফ (বুদ্ধিমান যুবক) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৬৬১/১২৬৩ সালে কায়রো নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং অপরিণত বয়সে রাজাব ৬৮৮/জুন ১২৮৯ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বেই ইনতিকাল করেন। তিনি দামিশ্‌ক নগরীতে রাজস্ব সংক্রান্ত দফতরের একটি পদে নিয়োগ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে চিত্তবিনোদন ও ভোগবিলাসে আসক্ত একজন তরুণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার খ্যাতি প্রধানত তাঁহার রচিত কাব্যসমূহের উপর ভিত্তিপ্রাপ্ত এবং একটি ক্ষুদ্রাকৃতি দীওয়ান গ্রন্থে সংকলিত হইয়া তাহা কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কবিতা সহজ-সরল ভাষায়, প্রধানত পুরুষ চরিত্রের প্রতি এবং কখনেও কখনও কাল্পনিক প্রেমিকার প্রতি নিবেদিত সংক্ষিপ্ত প্রণয়ঘটিত ঘটনা লইয়া রচিত। ইহাদের একটি সূফী দৃষ্টিকৌণিক ব্যাখ্যা সম্ভব, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা মোটেই বাস্তবভিত্তিক নয়।

পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত তাঁহার অন্যান্য রচনা হইতে ধারণা লাভ করা যায় যে, এই সকল কাব্য বাস্তবভিত্তিক ছিল। বার্লিন নং ৩৯৫৩ পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত দুইটি খুতবা রসিকতাপূর্ণ, কামোদ্দীপক প্রকৃতির, ফাসাহাতু'ল-মাসবূক ফী মালাহাতি'ল-মা'শূক এবং আল-মাকামাতু'ল-হিয়ীয়া ওয়া'শ-শীরাযিয়্যা নাম বার্লিন নং ৮৫৮৪ পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত অপর দুইটি রচনার ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য করা যাইতে পারে। প্যারিস পাণ্ডুলিপি নং ৩৯৪৭-এর অন্তর্ভুক্ত মাকামাতু'ল-'উশ্‌শাক এবং একটি মাকামা-এর দামিশ্‌ক মুদ্রণটি সম্ভবত শেষোক্ত শিরোনামের রচনার সহিত অভিন্ন। তাঁহার পিতার জীবনী গ্রন্থে যাহাবী কর্তৃক বর্ণিত শামসু'দ-দীন সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র কাহিনী তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং উহাতে এই সন্দেহের প্রতি অতিরঞ্জন সংযুক্ত হইয়াছে যে, 'আফীফু'দ-দীন তাঁহার পুত্রের বিলাস-ব্যসন ও ভোগলিপ্সু চরিত্রকে মালামা (দ্র.)-এর পথ অনুসরণ করিয়া একজন পূর্ণাঙ্গ সূফী সাধকে পরিণত হইবার লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার এই প্রকার কার্যাবলী সম্ভবত তাঁহার অকালমৃত্যুর অন্যতম হেতু ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যাহাবী, তা'রীখু'ল-ইসলাম, MS. Brit. Mus., Or. 53, fol. 62r; (২) কুতুবী, ফাওয়াত, ২খ, ২৬৩; (৩) Brockelmann, G. A. L., ১খ, ২৫৮; (৪) I. E. Sarkis, Dictionnaire de Bibliographie Arabe, পৃ. ১৮৭; দীওয়ান সংকলনের সংস্করণসমূহ, কায়রো ১২৮১ এবং ১৩০৮। বৈরূত ১৮৮৫ খৃ. ও ১৩২৫ হি.। একটি মাকামা, দামিশক, তা. বি., পৃ. ১৬।

(৩) আবূ ইসহাক ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী বাক্‌র ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী, জুমাদা ছানী মাসের শেষভাগে অথবা ১ রাজাব, ৬০৯/নভেম্বর ১২১২ সালে তিলিমসান শহরে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রানাডা লইয়া যান (স্পেনে)। ইহার তিন বৎসর পর তাঁহারা মালাগা গমন করেন এবং এই স্থানেই ইব্‌রাহীম তাঁহার শিক্ষা জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। পরবর্তী কালে তিনি সাবতা (সিউটা) শহরে গমন করেন এবং তথায় মালিকী আইনজ্ঞ (ফকীহ) মালিক ইবনু'ল-মুরাহহালের ভগ্নিকে বিবাহ করেন; এই শহরেই ৬৯০/১২৯১ সালের পরবর্তী কোনও এক সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একজন জ্ঞানী মালিকী আইনজ্ঞ (ফকীহ) ছিলেন, চুক্তিনামা মুসাবিদা করিবার কার্যে সুদক্ষ ছিলেন এবং একজন কবি ছিলেন। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে তিনি উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে তাঁহার উরজুযা গ্রন্থ রচনা করেন, যাহার ভিত্তিতে রচিত বেশ কিছু সংখ্যক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বর্তমানে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হইতেছে ২। নাতীজাতু'ল-খিয়ার ফী মুযীলাতি'ল-গিয়ার (কাব্য ছন্দে রচিত হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী); ৩। মাকালা ফি'ল-'আরূদ; ৪। মানজূমা ফি'ল-মাওলিদি'ল-কারীম; (৫) আল-'আশারাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন ফারহূন, দীবাজ, ফেয সং. পৃ. ৯০; (২) ইব্‌ন মারয়াম, বুস্‌তান, পৃ. ৫৫ প.; (৩) Brockelmann, G. A. L., ১খ, ৩৬৭, নং ৬ এবং ৩৮৫, নং ১০।

F. Krenkow (E.I.[1])/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তিলিসম (দ্র. তিলসাম)

তিশাদ (দ্র. শাদ)

তিহ্‌ফা আল-গিফারী (طهفة الغفرى) ঃ (রা), বানূ গিফার গোত্রীয় জনৈক সাহাবী এবং সুফ্‌ফাবাসীদের একজন। পিতার নাম কায়স আল-গিফারী। তিনি মক্কা ও মদীনার মাঝখানে আস-সাফ্‌রা'-র অন্তর্গত গায়কা নামক স্থানে বাস করিতেন। ইমাম আল-বুখারী (র) তাঁহার আল-আদাবু'ল-মুফ্‌রাদ গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ দাউদ, আন-নাসা'ঈ ও ইবন্ মাজাহ তাঁহাদের সুনান গ্রন্থে নিদ্রা সম্পর্কে তিহ্‌ফা (রা) বর্ণিত একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ আমি মসজিদের অভ্যন্তরে উপুড় হইয়া শায়িত ছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে প্রবেশ করেন। আমাকে এই অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কে? আমি নাম বলিলাম। তিনি বলিলেনঃ এইরূপ শয়ন আল্লাহ তা'আলা অপসন্দ করেন। ঐতিহাসিক ও হাদীছ বিশারদগণের মধ্যে এই ব্যাপারে প্রচণ্ড মতভেদ যে, প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য কে লাভ করিয়াছিলেন, তিহ্‌ফা, না তাঁহার পুত্র? পুত্র হইলে তাঁহার কী নাম? তদুপরি তিহ্‌ফা-র শাব্দিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে চারটি মত পাওয়া যায়। কেহ বলেন তিখফা ط-এর পরবর্তী বর্ণ خ), কেহ বলেন তিগ্‌ফা (ط)-এর পরবর্তী বর্ণ غ), আবার কেহ বলেন, তুক্‌ফা (দ্বিতীয় বর্ণ ق) এবং কেহ বলেন তিহ্‌ফা (ط-এর পরবর্তী বর্ণ ه)। ইমাম আল-বুখারী (র) প্রথমোক্ত মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। সাহাবী কে ছিলেন এই ব্যাপারে রিওয়ায়াতের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে। কোনও কোনও রিওয়ায়াতে খোদ তিহ্‌ফাকেই সাহাবী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার কোনও কোনও রিওয়ায়াতে তাঁহার পুত্রকে সাহাবী বলা হইয়াছে। আল-বুখারী (র) অবশ্য তিখফাকেই সাহাবী হিসাবে দেখাইয়াছেন। যেই সকল রিওয়ায়াত অনুযায়ী তাঁহার পুত্র সাহাবী হন, উহার এক একটিতে এক একটি নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ কোনও রিওয়ায়াতে 'আবদুল্লাহ' কোনটিতে কায়স, আবার কোনটিতে য়া'ঈশ।

না'ঈম আল-মুজ্‌মার তাঁহার কোন এক পুত্রের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা একবার রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তিনি হি. ৬০-৭০-এর মাঝামাঝি সময়ে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, বৈরূত তা.বি., ২খ, ২২৭; (২) ঐ লেখক, তাহ্যীবুত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১০; (৩) ঐ লেখক, তাক্‌রীবুত-তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৬; (৪) ইব্ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইস্‌তীআব (আল-ইসাবা, ২খ, পৃ. ২৩০-এর টীকা দ্র.); (৫) ইবনুল আছীর, উসদুল-গাবা বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৬৭, ৬৮; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, পৃ. ৬৭৯; (৭) ইব্ন হিব্‌বান, কিতাবুছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ২০৫, ২০৬; (৮) আল-বুখারী, আত-তা'রীখুল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২, ৩৬৫, ৩৬৬; (৯) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত-তাদীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৫০০; (১০) মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আল-মুনফারিদাত ওয়াল-ওয়াহ্‌দান, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮, পৃ. ৯৭, ৯৮।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তিহ্য়া ইব্ন আবী যুহায়র (طهبة بن ابى زهير) ঃ (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবী। বানূ নাহ্‌দ গোত্রের লোক। হি. নবম সালে তিনি বানূ নাহদের প্রতিনিধি দলের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে আগমন করেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হন। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তিনি অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় কথোপকথন করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাঁহার সহিত অনুরূপ অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার নাম বর্ণনায় ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। কেহ তাঁহাকে তিহ্‌ফা ইব্ন যুহায়র, কেহ তিহ্‌ফা ইব্ন আবী যুহায়র, আবার কেহ তিখ্‌ফা ইব্ন যুহায়র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনু'ল-আরাবী, আবূ নুআয়ম, ইব্ন কুতায়বা, ইব্নু'ল-জাওযী, আর-রাশাতী প্রমুখ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমীপে তাঁহার আগমন ও কথোপকথনের ঘটনা বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২২৭, ২২৮; (২) ইব্ন 'আব্‌দি'ল বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (আল-ইসাবা, ২খ, ২৩০); (৩) ইব্নু'ল-আছীর, উস্‌দু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৬৯; (৪) আয়-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আস্‌মাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৬৮০।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তিহামা (تهامة) ঃ এক ফালি নিম্নভূমি, যাহা সিনাই উপদ্বীপ হইতে আরবদেশের পশ্চিম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে উপকূল রেখা বরাবর বিস্তৃত। আল-ইদ্‌রীসী তিহারমা প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা অনুসারে একটি অনুচ্চ পর্বতমালা সর্পিল গতিতে তিহামায় বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা কুলযুম (লোহিত) সাগরে শুরু হয় এবং পূর্ব অভিমুখে একটি শৈলশ্রেণী বিস্তার করে। তিহামার সীমা হইল পশ্চিম দিকে লোহিত সাগর এবং পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি অনুচ্চ পর্বতমালা (The Sarat)। তিহামা নামে পরিচিত প্রদেশটি, ইদ্‌রীসীর বক্তব্য অনুসারে, সারজা হইতে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত, সমুদ্র উপকূল বরাবর ১২ দিনের পথ এবং পর্বতশ্রেণী হইতে গালাফিকা (আলাবাকা নহে) পর্যন্ত সড়ক ধরিয়া গেলে ৪ দিনের পথ। তিহামার সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত অংশটি জিদ্দার পশ্চাদ্‌ভূমিতে অবস্থিত; মক্কা নগরীর এই বন্দর সাধারণত তিহামার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা হয় [তিহামার অন্তর্গত মক্কার জিলাসমূহের নাম তথা দানকান, 'আশাম, বায়শ ও 'আক্‌ক-এর উল্লেখ দেখা যায়]। এই বিশেষ স্থানে তিহামার বিস্তৃতি প্রসঙ্গে অবশ্য বিভিন্ন গ্রন্থকারের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ আল-আসমা'ঈর মতে তিহামার শুরু যাত-ই 'ইরক হইতে। ইবনুল-কুতামীর মতে তিহামার সীমান্তে যাত-ই 'ইরক' এবং আল-জুহ্‌ফা ও য়ামানের উচ্চভূমি অবস্থিত। 'উমার ইব্ন 'আকীল-এর বর্ণনা অনুসারে সমুদ্র উপকূল হইতে হার্‌রা সুলায়ম ও হার্‌রা লায়লা পর্যন্ত বিস্তৃত; আল-মাদা'ইনীর বক্তব্য অনুসারে যে কেহ মক্কা অভিমুখে ওয়াজ্‌রা, গামরা ও আত-তা'ইফ হইয়া অগ্রসর হয় সে তিহামায় উপনীত। তাঁহার মতে তিহামা হিজায হইতে দক্ষিণে অবস্থিত; অন্যান্য লেখক আবার মনে করেন, তিহামা যাত-ই 'ইরক হইতে মক্কা হইয়া 'উস্‌ফান (মক্কা ও আল-মদীনার মধ্যস্থলে) পর্যন্ত বিস্তৃত [এই প্রসঙ্গে সকল বক্তব্য য়াকূত রচিত মু'জাম গ্রন্থে রেকর্ড করা হইয়াছে (১খ. ৯০২), য়ামান-তিহামা, ইহার বিস্তৃতি ও জনগোষ্ঠী ইত্যাদি সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দ্র. আল হামাদানী, সিফাতু জাযীরাতি'ল-'আরাব, পৃ. ৫৩ প., ১১৯-১২৯]। যাহা হউক, ভৌগোলিকগণ তিহামা শব্দটিকে যে শুধু "উপকূল" (সাহিলু'ল-বাহ্‌র) ও "অবতলীয় স্থান" (গাওয়ার) অথবা 'গর্ত' (সাফিলা)-এর সমার্থকই মনে করেন, তাহা নহে, বরঞ্চ তাহারা ইহাকে য়ামান, আল-য়ামামা ও আল-'আরূদ-এর পাশাপাশি একটি স্বতন্ত্র ভৌগোলিক অথবা রাজনৈতিক এককরূপেও বিবেচনা করেন (B.G.A., ৮খ, ৭৯)। প্রকৃতপক্ষে য়ামানের ইতিহাসের বিভিন্ন কালে তিহামা প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে একটি পৃথক প্রদেশরূপে পরিগণিত হইত। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, খৃ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের মত সুপ্রাচীন সময়ে পারস্যের য়ামান বিজয়ের পর তিহামা ছিল প্রাক্তন সারা রাজ্যের একটি সাংগঠনিক কাঠামোর একটি সম্ভাব্য অবশেষরূপে, পরে ইহা যিয়াদী রাজবংশের অধীনেও ছিল তদ্রূপ একটি অঞ্চল; অতঃপর ইহা স্বাধীন রাষ্ট্র (রাজধানী ছিল যাবীদ, খৃ. ১১৫৯-১১৭৪)-রূপে বিরাজ করে; পুনরায় ইহা সান'আ'-র ইমামগণের অধীনে য়ামানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, লোহিত সাগরের উভয় পার্শ্বের উপকূল অঞ্চলের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য ইব্ন খুররাদাযবিহ্-র সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; তিনি ইথিওপিয়াস্থ তিহামার উল্লেখ করিয়াছেন (B. G. A., ৬খ., ১৫৫); ইহাতে তিনি বস্তুত ইরিত্রিয়া অঞ্চলের উপকূল এলাকা নির্দেশ করিয়াছেন বলিয়া দৃশ্যত মনে হয়। ইব্নু'ল-ওয়ারদী তিহামাকে অদ্ভুত এক পার্বত্য অঞ্চলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ উপকূলরেখা বরাবর সমগ্র সমভূমির মধ্য দিয়া অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী বিস্তার লাভ করিয়াছে; আল-ইদরীসীও এই পাহাড়গুলির উল্লেখ করিয়াছেন। আল-ইসতাখরী ও ইব্ন হাওকাল একইভাবে তিহামাকে পর্বতসমূহের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতরূপে দেখাইয়াছেন; কিন্তু অপরাপর সূত্রে সুস্পষ্টভাবেই তিহামাকে সমুদ্র ও সারাতের মধ্যবর্তী স্থলভূমিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই নামের শব্দপ্রকরণ প্রসঙ্গে, উদাহরণস্বরূপ, B. Moritz (Arabien, পৃ. ৯, টীকা ১) মনে করেন যে, তিহামা শব্দটি সম্ভবত হিব্রু-ব্যাবিলনীয় একটি শব্দ (যাহার অর্থ সাগর) হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যপক্ষে H. Zimmern (Die Keilinschriften und des alte Testament[3], বার্লিন ১৯০২ খৃ., পৃ. ৪৯২, টীকা ২) নিশ্চিতভাবে বলিতে পারেন না, উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থে ব্যবহৃত নাম

হিসাবে আরবী তিহামার ন্যায় হিব্রু তেহুম (Tehom) শব্দটি মূলত ব্যাবিলনীয় তিআমতু (Tiamtu)- এর সহিত সম্পৃক্ত কি না অথবা যাহা অধিকতর সম্ভাব্য, উভয় ক্ষেত্রে তিহামা শব্দটি ব্যাবিলনীয় ভাষা হইতে প্রাচীন কালে গৃহীত শব্দাবলীর একটি উদাহরণ কি না। সেই ক্ষেত্রে বলা হয় যে, "মহাসমুদ্র", "লবণাক্ত সাগর" অর্থবোধক শব্দরূপে তিআমতু ও তামাতু শব্দদ্বয় "দুর্গন্ধময়" অর্থবোধক হিব্রু শব্দের সহিত সম্পৃক্ত (তু. P. Jensen, Keilinschr, Bibl. ৬/১খ, পৃ. ৫৫৯ প.)। সেই ক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আরব ভাষা-বিজ্ঞানিগণ একইভাবে তিহামা নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে একই অর্থ প্রকাশক "তাহিমা" শব্দের উদ্ধৃতি প্রদান করেন (তথাকার দুর্গন্ধময় বাতাসের জন্য); একই সঙ্গে তাঁহারা তাহামুন (تهم-দুর্গন্ধ)-এর সহিত "প্রচণ্ড তাপ" অর্থের তুলনাও প্রদান করেন (য়াকূত, মু'জাম, ১খ, ৯০২; বাকীর, মু'জাম, ১খ, ২০৩)। উপরন্তু তিহামা নামটি ইতিপূর্বেই দক্ষিণ আরবীয় উৎকীর্ণ লিপিসমূহে দেখা গিয়াছে....। য়াকূত কর্তৃক উদ্ধৃত (মু'জাম, ৪খ, ১০৪) রাজা শুরাহবীল ইব্ন-য়াহসুব্-এর মুসনাদ লিপিতেও দেখা যায়। এই শাসকের উপাধি ছিল 'সাবা' অর্থাৎ তিহামা এবং উক্ত অঞ্চলের "আরব জনগোষ্ঠীর রাজা"; আল-হাম্‌দানী (সিফাতু জাযীরাতি'ল-'আরাব, পৃ. ২০৮, ৯ প.) কর্তৃক উল্লিখিত অপর একটি মুসনাদে "আহলু তিহামা ওয়া তাওদিম" অর্থাৎ তিহামা (উপকূল অঞ্চল) ও পর্বত এলাকার জনগোষ্ঠীর উল্লেখ রহিয়াছে, যাহা Glaser কর্তৃক উদ্ধৃত পরিচ্ছেদ (সং ৫৫৪, ৩, ৫, ৬১৮, ৮ প.)-এর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। এই সকল মুসনাদের প্রথমটিকে [যাহা স্পষ্টতই একটি পরবর্তী কালের শিলালিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে] প্যারিসের Academie des Inscriptions et Belleslettres-এর নং ১৩ শিলালিপির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। শেষোক্ত লিপিটি J. and H. Derenbourg কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহাতে নাম ভিত্তিতে উল্লিখিত শাসকগণকে "সাবা ও তিহামা-র রাজারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

তিহামা অঞ্চলের প্রস্থ উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ভিন্ন; কখনও ইহা সংকীর্ণ এক ফালি (strip) তটরেখামাত্র, যথা আত-তূর ও সুয়েজের মধ্যবর্তী স্থানে এবং যথা কুনফুযযা ও লুহাইয়া নামক স্থানদ্বয়ে। তিহামা-র উৎপত্তির তারিখ সম্ভবত প্লায়োসিন (Pliceine) যুগের মধ্যভাগ এবং ইহা লোহিত সাগরের অবক্ষেপণের (Subsidena) সহিত সংযুক্ত। প্রবাল ও সাম্প্রতিক কালের পলিমাটি ইহার উৎপত্তির উপাদান। য়ামান অংশে ইহা সমুদ্র সমতল হইতে ২,০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ হইয়া হঠাৎ য়ামান-সারাত-এর বিশাল উচ্চভূমি অঞ্চল অভিমুখে খাড়াভাবে অগ্রসর হইয়াছে। আসীর-এর তিহামা-সহ বিবেচনা করা হইলে তবে য়ামান-তিহামা অঞ্চল আল-লীছ হইতে শুরু হয় এবং উহা এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। য়ামান অংশ ইহার প্রস্থের তারতম্য ৩০ হইতে ৫০ মাইলের মধ্যে। সামান্য তরঙ্গায়িত ভূমি হইতে বিশেষত উচ্চভূমি অঞ্চল অভিমুখে উত্থিত হয় বিচ্ছিন্ন অনুচ্চ পাহাড়সমূহ যাহার গঠনে রহিয়াছে, হয় সাম্প্রতিক কালের চুনাপাথর [যাহার উল্লেখযোগ্য উচ্চতায় প্রায়শ জীবাশ্ম (nummuliths) পাওয়া যায়] অথবা আগ্নেয়গিরি শিলা। আবহাওয়া অত্যন্ত বিরূপ, গরম ও শুষ্ক এবং বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে তাপমাত্রা (মে ও সেপ্টেম্বর মাস c. ৩৫-৪৩°, এপ্রিল মাসে c. ৪০°) উচ্চে উঠে। গ্রীষ্মকালে পুনঃ পুনঃ বৃষ্টিপাতের প্রভাবে তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পায়, তথাপি উপকূল অঞ্চলে দিবাভাগে c. ৪০° এবং রাত্রিকালে c. ৩০° তাপমাত্রা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। শীতকালে তাপমাত্রা c. ২৫° ও c. ৩৫°-এর মধ্যে উঠানামা করে, তবে শীতলতম মাসসমূহেও তাপমাত্রা কখনও c. ১৪°-এর নিম্নে যায় না। বর্ষাকাল ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত অথবা মে হইতে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ অবধি বিরাজ করে। আরব ভূমির পশ্চিম তটের সর্বদক্ষিণস্থ অংশটি কেবল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টিপাত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। তিহামা-র একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে সুখায়মানী অথবা 'উমমা নামক কুয়াশা; এই কুয়াশা প্রাতঃকালে উত্থিত হয় এবং উচ্চভূমি অঞ্চল অভিমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এই অঞ্চলকে কার্যত উষ্ণ, আর্দ্র কক্ষে (hothouse) পরিণত করে, যাহার ফলে তথায় বেশ কিছু সংখ্যক মূল্যবান ফসলের উচ্চ ফলন হয়, ইহাদের অন্যতম হইল কফি।

গরম ও শুষ্ক তিহামা-র মাটি কাঁটাবন ও তৃণপূর্ণ সমভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদাদির জন্য স্বাভাবিকভাবে উপযোগী। উপকূল (খাব্‌ত) সংলগ্ন লবণাক্ত স্তেপভূমি ঝোপ-ঝাড়ে আবৃত। অভ্যন্তরভাগে, বিশেষত উচ্চভূমি অঞ্চল অভিমুখে জোয়ার, যব, বাজরা, গম, ইক্ষু, খেজুর, তিল, নীল ও কার্পাস প্রচুর জন্মায়। তিহামা-র জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা হয় ('আবদু'ল-ওয়াসি' ইব্ন য়াহয়া, তা'রীখু'ল-য়ামান, পৃ. ২৯২)। উপকূল অঞ্চলের লোক জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য, জাহাজ চলাচল, মৎস্য শিকার (তৎসহ মুক্তা সংগ্রহ), জাহাজ নির্মাণ দ্বারা এবং অভ্যন্তর অঞ্চলে প্রধানত কৃষিকার্য দ্বারা। জাতিগতভাবে তাহারা মিশ্র রক্তের অধিকারী বলিয়া মনে করা হয়; ইহাদের দেহ-বর্ণ জলপাইয়ের এবং তাহাদের কুঞ্চিত কেশ ও মোটা অধরোষ্ঠ তাহাদের মধ্যে প্রচুর আফ্রিকীয় রক্ত সংমিশ্রণের সাক্ষ্য দেয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, Botta বলেন, ইহাদের গাত্রবর্ণ বেশ কৃষ্ণ; Bury ইহাদের মধ্যে নিগ্রো লক্ষণাদির উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহাদের গড়ন হাল্‌কা পাতলা। ইহাদের বৃহত্তম গোত্র, যেরানীক, কোকড়ানো হ্রস্ব দাড়ি এবং খাড়া চুলের কারণে বিশিষ্ট (তু. Bury, Arabia Infelix, পৃ. ২৮-এর বিপরীতে প্রদত্ত চিত্র)। সাধারণভাবে বলা হইয়া থাকে, তিহামা-র আরব গোষ্ঠীসমূহের ভাষা অবিমিশ্র 'আরবী' ভাষা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন এবং উহাতে বিদেশী ভাষা হইতে গৃহীত বহু শব্দ অন্তর্ভুক্ত।

তিহামা-র দক্ষিণ অঞ্চল, যাহার প্রাকৃতিক সীমান্ত মুখা হইতে মাওযা' পর্যন্ত বিস্তৃত, সর্বদিকে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত বহু সংখ্যক আগ্নেয় পর্বতশ্রেণীতে আবৃত। এই অঞ্চলে অতি নগণ্য মাত্রায় পাললিক (Sedimentary) শিলার সঞ্চয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রধানত একই প্রকার মহাদেশীয় শিলা দ্বারা গঠিত। উপকূল অঞ্চলে কোন অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ সমতলভূমি দেখা যায় না; ঐরূপ সমতল দেখা যায় ফাঁকে ফাঁকে কেবল অভ্যন্তরভাগের উচ্চ ভূমির অবিক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে অথবা উপকূল অঞ্চলের আগ্নেয়গিরি গঠনসমূহের মধ্যে যাহার প্রস্থ কদাচিৎ ২৫ মাইলের অধিক হয়। সেই দক্ষিণ তিহামা-র বৈশিষ্ট্য হইল উপকূল অঞ্চল বরাবর বিস্তৃত উল্লম্ব চকশিলা এবং বেলে পাথরের খাড়া দূরারোহ পাহাড়শ্রেণী, যাহার ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ চক সঞ্চয় এবং বালুকাময় অবতলীয় স্থানসমূহ। দক্ষিণ তিহামার অভ্যন্তরভাগ প্রকৃতিগতভাবে অধিকতর স্তেপভূমিসদৃশ; অপরদিকে ওয়াদীসমূহের উপত্যকা অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন উর্বরা শক্তিসম্পন্ন বৃষ্টির পর ফলে-ফুলে পূর্ণ কিছু সংখ্যক মরূদ্যান দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, লাহাজ-এর অতি সমৃদ্ধ মরূদ্যান অথবা ওয়াদী মায়ফা'আ-এর মরূদ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত মরূদ্যানের উদ্ভিদ সম্পদ পশ্চিম তিহামা-র উদ্ভিদের অনুরূপ। স্বাভাবিক অবস্থায় দক্ষিণ তিহামার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নগণ্য। শীতকালীন বৃষ্টিপাত অনিয়মিত, যদিও উহা কদাচিৎ অবর্ষিত থাকে। এপ্রিল মাসের শেষভাগে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেই সঙ্গে হয় প্রচণ্ড বজ্রপাত ও ঝড়। জানুয়ারী, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জুলাই ও আগস্ট মাসে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উৎকীর্ণ লিপিসমূহের জন্য দ্র. (১) E. Glaser, Zwei Inschriften uber den Dawmbruch von Marib, M. V. A. G., ২খ, (১৮৯৭ খৃ.), পৃ. ৭, ১৩, ৩২, ৪২; (২) J. and H. Derenbourg, Etudes sur l'epigraphie du Yemen, ৫খ, F. A., সিরিজ ৮, ১খ, ২৬৩-২৬৫, নং ১৩; (৩) আল-ইসতাখরী, B.G.A., ১খ., ১৫; (৪) ইব্ন হাওকাল, B. G. A., ২খ, ১৯, ২০, ৩১, ৩৫; (৫) আল-মুকাদ্দাসী, B. G. A., ৩খ, ৬৯; (৬) ইবনুল ফাকীহ আল-হামাযানী, B. G. A., ৫খ, ২৬প., ৩১; (৭) ইব্ন খুররাদাযবিহ (B. G. A., ৬খ., ১২৮, ১৩৩, ১৫৫; (৮) ইব্ন রোসতেহ (Rosteh), B. G. A., ৭খ, ১৭৭; (৯) আল-মাস'উদী, B. G. A., ৭খ, ৭৯; (১০) আল-হামদানী, সিফাতু জাযীরাতিল-'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Leyden ১৮৮৪-১৮৯১ খৃ., পৃ. ২, ৪৮, ৫০, ৫৩ প.; ১১৯-১২১, ১৩৫, ১৯৩, ২০৮, ২৩৩; (১১) আবু'ল ফিদা, কিতাবু তাকবীমিল-বুলদান, সম্পা. Ch. Schier, Dresden ১৮৪৬ খৃ., পৃ. ৬৮; (১২) য়াকূতম' মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৯০২; ৪খ, ১০৪; (১৩) মারাসিদুল-ইতিলা', সম্পা. T. G. J. Juyboll, ১খ, Leyden ১৮৫২ খৃ., পৃ. ২২০; (১৪) আল-বাক্‌রী, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, Gottingen ১৮৭৬ খৃ., ১খ, ৭, ১১, ২০৫; (১৫) আল-ইদ্‌রীসী, নুযহাতুল-মুসতাক, অনু. Jaubert, ১খ, ১৪৫ প.; (১৬) আদ-দিমাশকী, কিতাবু নুখবাতিদ-দাহ্‌র ফী 'আজাইবিল-বার্‌র ওয়াল-বাহর, সম্পা. A. F. Mehren[2], Leipzig ১৯২৩ খৃ., পৃ. ২২, ২১৫ প. ২২০; (১৭) 'আবদুল-ওয়াসি' ইব্ন য়াহ্‌য়া আল-ওয়াসি'ঈ আল-য়ামানী, তা'রীখুল-য়ামান, কায়রো ১৩৪৬, পৃ. ৩৯০, ৩২৬, ৩৩১; (১৮) C. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Copenhagen ১৭৭২ খৃ., পৃ. ২২১; (১৯) Jomard, Etudes geopraphiques et historiques sur l'Arabie, in F. Mengin, Histoire sommaire de L'Egypte sous le gouvernement de Mohammed Aly, প্যারিস ১৮৩৯ খৃ., পৃ. ২৭৪, ৩৩১ প., ৩৬৩; (২০) C. Ritter, Vergleichende Erdkunde V. Arabien ১খ, বার্লিন ১৮৪৬ খৃ., পৃ. ১৮৯ প., ২০৭ প., ২১৩, ২১৯ প., ২২৫, ৭৭১; (২১) A. Sprenger, Die Post u Reiserouten des Orients (Abk. K. M., ৩/৩খ, Leipzing ১৮৬৪), পৃ. ১০৯; (২২) A. V. Kremer, Uber die sudarabische Sage, Leipzing ১৮৬৬ খৃ., পৃ. ১-৪; (২৩) Ch. Millingen, Notes of a Journey in Yemen. F. R. G. S., ৪৯, (১৮৭৪), ১১৮ প., ১২৫; (২৪) P. E. Botta, Relation d'un Voyage dans L'Yemen, প্যারিস ১৮৮০ খৃ., পৃ. ১৬০ প.; (২৫) A. Delfers, Voyage au Yemen, প্যারিস ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ২৩, ২৫, ৩০; (২৬) C. Landberg, Arabica, ৫খ, Leyden ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ১১৫ প.; (২৭) M. Hartmann, Die arabische Frage, Der islamische Orient (Berichte u. Forschungen, ২খ, Leipzig ১৯০৯), পৃ. ১১৩, ২৭৮, ৫৩২, ৫৩৭ প. ৫৪০; (২৮) G. W. Bury, The Land of Uz, লণ্ডন ১৯১১ খৃ., পৃ. ২৬ প., ৩ প,; (২৯) W. Schmidt, Das sud-Westiliche Arabien (Angewandte Geographie, সিরিজ 8, Heft. 8, Frankfort a/M. ১৯১৩), পৃ. ১৬ প.; (৩০) G. W. Bury, Arabia Infelix or the Turks in Yamen, লন্ডন ১৯১৫ খৃ., পৃ. ২০, ২৯, ৩৫, ৪০, ৪৩, ১০০, ১০৭ প., ১১৩, ১৩৮; (৩১) A. Grohmann, Sudarabien als Wistschaftsgebiet, ১খ. (Osten u. Orient, R. Geyer ও H. Ubersberger কর্তৃক সম্পাদিত, I. Reihe, Forschungen, ৪খ, Vienna, ১৯২২), পৃ. ৬-৮, ১৭-২৪, ৪০-৪২, ৫৩ প.; (৩২) B. Moritz, Arabien, Studien zur phsikalischen u. historischen Geographie d. Landes, Hanover ১৯২৩ খৃ., পৃ. ৯, টীকা ১।

A. Grohmann (E. I. [1])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তীত (تيط) ঃ (মূল পাঠ অনুযায়ী কেহ কেহ ইহাকে বার্বার নাম "তীত-আন-ফিত্‌র" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কখনও ইহা আরবীতে "আয়নু'ল-ফিত্‌র" অর্থাৎ প্রাতঃরাশের উৎস" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে"), মূলত তীত একটি স্থানের নাম, স্থানটি আটলান্টিক মহাসাগরের মরক্কো উপকূলে মাযাগান-এর ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

স্থানীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী তীত নামটির উৎপত্তি হয় ইসমা'ঈল আমগার নামক একজন ওয়ালী-র এই স্থানে আগমনের প্রেক্ষিতে (বার্বার-আরবী শায়খ)। তিনি একটি স্বর্গীয় আলোকবর্তিকা কর্তৃক পথ প্রদর্শিত হইয়া মদীনা মুনাওয়ারা হইতে এইখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আযেম্মুর-এর সানহাজা গোত্রের এক শাখাগোত্র গুদালা-র মাঝে বাস করিতে থাকেন। তিনি "সমুদ্রে প্রবাহিত" একটি ঝরনার বিপরীত দিকে অবস্থিত এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে বসবাস শুরু করেন। সিয়াম পালন অবস্থায় ইফতারের সময়ে তিনি সমুদ্র তরঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া ঐ ঝরনার নিকট গমন করিতেন। ফলে এই স্থানের নাম হয় তীত আন-ফিত্‌র। আমরা যদি কিংবদন্তী প্রদত্ত তথ্যের সমকালীনত্ব গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই স্থানে তাঁহার বসবাসকাল খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল বলিয়া ধারণা করা যায়।

ইসমা'ঈল দেশের প্রধান প্রশাসকের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আমগারীগণের অভিজাত পরিবারের পিতৃপুরুষে পরিণত হন। এই অভিজাত পরিবারের অন্যতম এক বিশিষ্ট সদস্য মাওলায় 'আব্‌দুল্লাহ্‌ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তীত-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ রিবাত প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এই স্থানের ইতিহাস সুবিদিত নহে। আল-বাক্‌রী, যিনি আটলান্টিক উপকূলের বন্দর ও শহরসমূহের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনায় তীত-এর উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু উল্লেখ্য যে, তিনি আযেম্মুরকেও বাদ দিয়াছেন। খৃষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীতে আল-'উমারী তীত-কে মরক্কোর ৪২টি শহরের একটি বলিয়া চিহ্নিত করেন। ঐ সময়ে তীত শহর ৫,০০০ মিছকাল কর প্রদান করিত। করের এই পরিমাণ তিগিসাস-এর করের সমান এবং সুফরু-এর কিছু কম ছিল।

১৫১৩ খৃ. পর্তুগীজগণ যখন আযেম্মুর অধিকার করে, তখন তীত ও পর্তুগীজদের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং কর দান করে। কিন্তু ১৫১৪ খৃ. তীত-এর রিবাতটি খৃস্টানদের সৈন্যশিবির হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে—এই ভয়ে শাসক মুহাম্মাদ আন-নাসির ইহার প্রাচীরসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলেন এবং তীত-এর সকল বাসিন্দাকে ফেয অঞ্চলে স্থানান্তরিত করেন। ফলে ঐ সময় হইতে তীত সকল গুরুত্ব হারায় এবং তীত-এর পরিবর্তে পার্শ্ববর্তী মাযাগান বন্দরটি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। এই মাযাগান বন্দরের দুক্‌কালায় পর্তুগীজদের প্রধান কারখানা নির্মিত হয়। বর্তমান সময়ে ইহা প্রাচীন রিবাতটির প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত টাওয়ার ও তোরণের মধ্যে একটি চরম দুর্দশাগ্রস্ত গ্রাম হিসাবে পরিগণিত। ইহার প্রাচীন নামটি (তীত) ইহার অধিবাসীদের নিকট কদাচ পরিচিত। তাহারা রিবাত-এর প্রতিষ্ঠাতার নামে ইহাকে মাওলায় 'আবদুল্লাহ হিসাবে অভিহিত করে।

অর্থগত সাদৃশ্য ("ওয়ালীর ঝরনা (?) সত্ত্বেও তীত 'আন-ওয়াগুর্‌রাম্‌ত-এর সঙ্গে এই তীত-এর কোন সম্পর্ক ছিল না। আল-মুওয়াহহিদ ঐতিহাসিক আল-বায়যাক যেন, এই তীত আন-ওয়াগুর্‌রামত বারগাওয়াতা অঞ্চলের তামাস্‌না-এ অবস্থিত ছিল। এই তামাস্‌না, উম্মু রাবী'-র দক্ষিণে নহে, বরং উত্তরে অবস্থিত। এই দ্বিতীয় 'তীত' সঠিকভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত, যাহা ইদ্‌রীসী-র পাণ্ডুলিপিতে ভুলক্রমে تطن وقرى নামে চিহ্নিত হইয়াছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র স্থান, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা বৈশিষ্ট্যগতভাবে একটি শহর। ইহার অধিবাসিগণ মিশ্র বার্বার উৎসের। ইহা তাদলা হইতে সালে (Sale)-গামী রাস্তার পার্শ্বে তাদলা হইতে ৪ দিনের পথ এবং সালে হইতে ২ দিনের পথের দূরত্বে অবস্থিত। ইহা সম্ভবত যা'ইর গোত্রের বর্তমান অবস্থান অঞ্চলের দক্ষিণ কোণে অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আজীম আয্‌-যাম্মুরী কর্তৃক বানূ আমগার-এর কিংবদন্তী সম্পর্কে লিখিত দীর্ঘ পাণ্ডুলিপি; (২) H. Basset ও H. Terrasse, Sanctuaires it forteresses almohades : Le ribat de Tit (in Hesperis, 1927, p. 117-156)।

G. S. Colin (E.I. [1])/ সিরাজ উদ্দিন আহ্‌মাদ

তীততাবীন (طيطاوين) ঃ তেতুয়ান, ফরাসী TETOUAN, স্পেন দেশীয় ভাষা TETUAN, Leo Africanus-এর Tetteguin, একটি বার্বার স্থানের নাম, অর্থ "ঝর্ণাসমূহ" (শহরটির এক-চতুর্থাংশ বর্তমানেও আল-'উয়ুন নামে অভিহিত) আল-ইদরীসী, ত্রুটিপূর্ণ নাম তিততাবীন প্রদান করিয়াছেন এবং আধুনিক জনপ্রিয় উচ্চারণ Tsittawen, Tsittaun। স্পেনীয়গণ কর্তৃক প্রদত্ত তেতুয়ান নামটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ফিলালী রাজবংশের প্রাথমিক রাজাদের মুদ্রায় খচিত تطوان নাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা সিউটার ২১ মাইল দক্ষিণে মরক্কোর উত্তরাঞ্চলের একটি শহর। ইহা দারসা পর্বত হইতে বহির্গত একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে নির্মিত এবং ইহা সাত মাইল দূরবর্তী সমুদ্রে পতিত মারাটিনের (অথবা Martil) অববাহিকাকে নিয়ন্ত্রিত করে। তেতুয়ান ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে আনজেরা, বুই হোযমার পর্বতশ্রেণী এবং বুই মা'দান নীচু পাহাড়শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত একখণ্ড সমতল ভূমি রহিয়াছে। মার্টিন নদীটি টলেমীর Oapovda ও Pliny-এর তামুদা-র সহিত অভিন্ন। এই সকল প্রাচীন নাম বার্বার ভাষায় তামুদা-এর সহিত সম্পর্কিত হইতে পারে, যাহার অর্থ 'পুকুর', 'জলাভূমি'; কারণ মার্টিন নদীর অববাহিকা অসংখ্য জলাভূমিতে পূর্ণ। Pliny তামুদা নামে অভিহিত একটি Oppidum সম্পর্কেও উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা অবশ্যই বার্বার-রোমক শহরের নাম হইয়া থাকিবে। এখনও ইহার ধ্বংসাবশেষ শাফশাওয়ান রেলপথ যে সেতুটির উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া তাহার নিকটে তেতুয়ানের ২(১/২) মাইল উত্তরে মার্টিনের দক্ষিণ দিকে দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে একটি প্রাচীন লিবীয় শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তখন নদীটি অধিকতর নাব্য ছিল এবং জাহাজ সম্পূর্ণ Oppidum পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিত। Notitia Dignitatum (Occ. xxv, ১৩) তামুদাকে Praefectus এবং ala herculea-এর আবাসস্থল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছে। যাজকদের তালিকাসমূহ একটি Tamudensis episcopus-এর উল্লেখ করিয়াছে।

তেতুয়ান নামটি আরবদের বিজয় অভিযানের প্রাথমিক যুগে পরিদৃষ্ট হয় না। সেইকালে দেশটি য়ুলিয়ান (=যুলিয়ান?) কর্তৃক শাসিত হইত। তিনি সমগ্র গুমারা ভূখণ্ডটি শাসন করিতেন, যাহার রাজধানী ছিল সিউটা। ৮২৮ খৃ. দ্বিতীয় ইদরীস-এর সাম্রাজ্য বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মরক্কোর মুসলিম ইতিহাসে তেতুয়ান দৃষ্ট হয় না। শহরটি তানজিয়ার, সিউটা, কাসর মাসমূদা ও হাজারু'ন-নাস্‌রসহ আল-কাসিমের শাসনাধীনে আসে। কিন্তু রাজ্যটির রাজধানী ছিল তানজিয়ার।

১১শ শতাব্দীতে আল-বাক্‌রী তেতুয়ানকে সমুদ্র উপকূলস্থ মাসমূদা উপজাতির একটি শাখা বানূ সিক্‌কীনদের ভূখণ্ডের রাজধানী হিসাবে অবগত হন। এই সময় শহরটিতে একটি পুরাতন নগর দুর্গ এবং একটি মিনার ছিল।

৩৪৭/৯৫৩ সালে ফাতিমী সেনাপতি জাওহার উমায়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে মরক্কো হইতে আগমন করেন এবং ফাস জয় করিয়া সিউটা ও তেতুয়ানের দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু সিউটার উপর তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হয় বলিয়া তিনি আর বেশী দূর অগ্রসর না হইয়া সিজিলমাসায় প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর ৩৯৯/৯৭৯ সালে ফাতিমী সেনাপতি বুলুগ্‌গীন ইব্‌ন যীরী তেতুয়ান পাহাড়ের চূড়ায় অধিরোহণ করিলেও শহরটি অধিকার করিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীতে তেতুয়ান আল-মুওয়াহহিদ ঐতিহাসিক বালযাক কর্তৃক দুইবার উল্লিখিত হইয়াছে। আল-মুরাবিত সেনাপতি Reverter আল-মুওয়াহহিদ সৈন্যবাহিনীকে অনুসরণকালে তথায় শিবির স্থাপন করেন। আল-ইদরীসী ইহাকে মাজাকসাদের একটি দুর্গ হিসাবে উল্লেখ করেন। ইহা আল-মুওয়াহহিদদের অধীনে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করে নাই বলিয়া অনুমিত হয়। ৬৮৫/১২৮৬ সালে মারিনী সুলতান য়ূসুফ ইব্‌ন য়া'কূব গ্রানাডার রাজা কর্তৃক অধিকৃত সিউটার বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য একটি ঘাঁটি স্থাপন করিতে চাহিয়া তেতুয়ানে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী সুলতান আবূ ছাবিত 'আমির ৭০৮/১৩০৮ সালে ইহার চতুষ্পার্শ্বে একটি শহর নির্মাণের নির্দেশ দান করেন। এই নির্দেশটি ইতিপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন তেতুয়ানের পুনঃনির্মাণের, না কি পৃথক স্থানে নূতন শহর নির্মাণের জন্য প্রদান করা হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ ঐতিহাসিকগণ প্রদান করেন নাই। ১৫৩০ খৃ. তেতুয়ানে মারিনী সুলতান 'আলী ইব্‌ন 'উছমানের পুত্র আবূ 'ইনান তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নিজেকে সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেন। নূতন শহরটি কোন প্রকারে এক শতাব্দী টিকিয়া থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে ইহা বিশেষভাবে স্পেনের উপকূলের নিকটস্থ হওয়ার কারণে স্পেনের পক্ষে একটি বিপজ্জনক জলদস্যুদের আড্ডাস্থলে পরিণত হয়। ১৪০০ খৃ. ক্যাস্টাইলের রাজা Transtamare-এর তৃতীয় হেনরী একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন, যাহা মার্টিন নদীর মোহনায় প্রবেশ করিয়া জলদস্যুদের নৌবাহিনীর ধ্বংসসাধন করে। অতঃপর সেনাবাহিনী স্থলে অবতরণ করিয়া শহরটি অধিকার করে এবং ইহার অধিবাসীদের অনেককেই বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

প্রায় আট বৎসরকাল তেতুয়ান পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ১৪১৪ খৃ. পর্তুগীজগণ নিজদিগকে সিউটাতে প্রতিষ্ঠিত করিলে পরে ইহা খৃস্টানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। জানুয়ারী ১৪৯২ খৃ. Ferdinand কর্তৃক গ্রানাডা অধিকৃত হইলে অনেক স্পেনদেশীয় আরব মরক্কো চলিয়া যায়। আবু'ল-হাসান আল-মান্দারী নামক তাহাদের জনৈক গ্রানাডা সাহসী রক্ষক ফাসের ওয়াততাসী শাসক, মুহাম্মাদ আশ-শায়খের নিকট হইতে তেতুয়ান এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের বিশেষ অধিকার লাভ করেন। রাজনৈতিক কারণে স্পেন হইতে বিতাড়িত কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে তাহার পার্শ্বচর করিয়া আত্মরক্ষার্থে নির্মিত গড় ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দুর্গ নির্মাণ করেন; অচিরেই শুক্রবারের মসজিদসহ একটি নূতন শহর

নির্মিত হয়। স্পেনীয় অশ্বারোহী ও পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি বাহিনীসহ, যাহারা ইতিপূর্বে তাহার দলে যোগদান করিয়াছিল, আল-মান্দারী সিউটা, আল-কাসরু'স সাগীর ও তানজিয়ারের পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া তাহাদিগকে উত্যক্ত করে। তাহাদের অনেককে বন্দী করিয়া শহরটির নির্মাণ কাজে নিয়োগ করেন। Leo Africanus তেতুয়ান অতিক্রমকালে ইহাদের তিন শত জনের অধিক সংখ্যক লোক দেখিতে পান। ইহাদিগকে রাত্রিতে বায়ুহীন শয্যাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত (শহরের একটি অংশকে বর্তমানেও আল-মাতামার 'বায়ুহীন ঘর' বলিয়া অভিহিত করা হয়)। স্পেনের মুসলমানদের বিদ্রোহ দমনের পর অনেকেই ১৫শ শতাব্দীর শেষের এবং ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভিক বৎসরগুলিতে, বিশেষত ১৫০১ ও ১৫০২ খৃ. আল-মান্দারীর সহিত যোগদান করে। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধের সহিত সমুদ্রে জলদস্যুদের যুদ্ধ যুক্ত হয়, তেতুয়ান পার্শ্ববর্তী শাফশাওয়ানসহ ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

আল-মান্দারীর মৃত্যুর পর নব তেতুয়ানের বীরত্বপূর্ণ যুগের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখন হইতে ইহা শুধু স্পেন হইতে আগত বিত্তশালীদের একমাত্র অভিপ্রায় ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি এবং শান্তিতে শিল্প ও সংস্কৃতির আনন্দ উপভোগ করা। তাহারা ছিল স্বাধীনতা ও বিদ্রোহপরায়ণ ও তাহাদের শহরটির বিচ্ছিন্ন অবদানের আনুকূল্য প্রাপ্ত এবং এই কারণে তাহারা সুলতানদের কর্তৃত্ব ও করভার অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যেই সময় তাহারা অর্ধ স্বাধীনতা ভোগ আরম্ভ করে, তাহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল দল শহরটিকে দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া তোলে এবং বিদেশী হস্তক্ষেপ সহজ করে।

'আলাবী সুলতান মাওলায় ইসমা'ঈলের শাসনকাল পর্যন্ত সার্বভৌম ক্ষমতা আন-নাকসীস পরিবারের হস্তে ছিল বলিয়া সুলতান পরিবারটিকে বিতাড়িত করিতে হইয়াছিল। মাওলায় ইসমা'ঈলের মৃত্যুর পর নৈরাজ্যপূর্ণ যুগটিতে 'উমরু'ল-ওয়াককাশ কর্তৃক পরিচালিত তেতুয়ানবাসীদের বিরুদ্ধে রীফের জিহাদের নেতা (কা'ইদ) আহমাদ ইবনু'ল-বাততূয়ি-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরিশেষে রীফের নেতা তেতুয়ানের উপরে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিতে সফল হন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৭৪৩) তেতুয়ানীগণ অঞ্চলটিতে আগমনকারী সকল দাবিদারকে স্বীকৃতি দান করিয়া তাহাদের পুরাতন রীতিনীতির পুনরাবৃত্তি ঘটায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে, তেতুয়ান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ১৮৫৯-৬০ খৃ. স্পেন-মুরীয় যুদ্ধ। অবশেষে স্পেন দেশীয়গণ শহরটি অধিকার করে এবং মে ১৮৬২ খৃ. পর্যন্ত শহরটি অধিকারে রাখে। ১৮৯০ খৃ. সুলতান মাওলায় আল-হাসান তেতুয়ান পরিদর্শন করেন। ১৯০৩-১৯০৪ খৃ. ইহা পার্শ্ববর্তী পর্বত অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। তাহারা দাবিদার আবূ হিমারা-র বিদ্রোহ দ্বারা সৃষ্ট নৈরাজ্যের সুযোগ গ্রহণ করে। পরিশেষে ১৯১৩ খৃ. স্পেনীয়গণ তেতুয়ান অধিকার করে এবং উত্তরাঞ্চলীয় মরক্কোতে তাহাদের অভিভাবকত্বাধীন অঞ্চলগুলির রাজধানী ও সুলতানের খলীফার আবাসস্থলে পরিণত হয়।

তেতুয়ানের সমুদ্র বন্দর সিউটা এবং ইহার রেলপথ দ্বারা যুক্ত। ইহা একটি বাণিজ্যকেন্দ্র, যেইখানে গুমারার উপজাতি ও শাফশাওয়ান অঞ্চলসমূহ আমদানিকৃত মালামালের সরবরাহ গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থানীয় শিল্প-কারখানাসমূহ, বিশেষত বুটিদার ও রেশমী বস্ত্র উৎপাদনের কারখানাসমূহ আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। জনসংখ্যা প্রায় ২৫,০০০, যাহার ১২,০০০ জন মুসলমান ও ৪,২৫০ জন য়াহূদী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তেতুয়ানের ইতিহাস ও স্থান-বিবরণ এবং অর্থনৈতিক জীবনের বিস্তারিত বিবরণ A. Joly কর্তৃক নিম্নলিখিত রচনাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। (১) বিবরণের জন্য Archives Marocaines, ৪খ, পৃ. ১৯৯-৩৪৩ দ্র.; (২) ইতিহাসের জন্য, তু. Archives Marocaines, ৫খ, পৃ. ১৬১-২৬৪, ৩১১-৪৩০; ৮খ, পৃ. ৪০৪-৫৩৯; ৩খ, পৃ. ২৬৬-৩০০ (১৯০৩-১৯০৪ খৃ. অবরোধের উপর)। অর্থনৈতিক জীবনের উপরম তু. L'Industrie de Tetuan, in Archives Marocaines ৮খ, পৃ. ১৯৬-৩২৯; ১১খ, পৃ. ৩৬১-৩৯৩; ১৫খ, পৃ. ৮০-১৫৬; ১৮খ, পৃ. ১৮৭-২৫৬ তু। ইহা ব্যতীত Cerdeira Inscripciones arabes de Tetuan, in Reviota de tropas coloniales do. de Tetuan, in Ceuta, Nov. 1925 Cuevas y Espinach, Coleccion de estudios referentes al bajalato de Tetuan, in Bol, Soc, Georg. Madrid ১৮৯৭ খৃ., ৩৯খ, পৃ. ৪৯-৭৪; (৪) Gomes Moreno, Descrubrimientos Y. Antiguedades en Tetuan, in revista hispano-africana, Jan-Feb. 1924; (৫) H. Cohn, Maurs des Zuifs et des Arabes de Tetuan, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.।

D. S. Colin (E.I. [1])/মুহঃ আবু তাহের

আত-তীন (سورة التين) ঃ আল-কুরআনের ৯৫তম সূরা। তীন এক প্রকার ডুমুর জাতীয় বৃক্ষ ও উহার ফল। এই জাতীয় বৃক্ষ বহু প্রকারের এবং ইহার ফলের মধ্যে বহু ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ থাকে। ইহার মধ্যে কর্তৃক ফল মানুষ খাইয়া থাকে। এই বৃক্ষ সাধারণত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মে (লিসানু'ল-'আরাব, ১৩খ, ৭৫)। হুলওয়ান ও হামাদানের মাঝখানে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীকেও তীন বলা হয় (পূ. গ্র.)। সূরা আল-বুরূজ (দ্র.)-এর পর ইহার অবতরণ (আল-কাশ্‌শাফ, ৪খ, ৭৭৩; আল-মারাগী, ৩০খ, ১৯৩)। অধিকাংশ তফ্‌সীরবিদের মতে সূরাটি মাক্কী, তবে কাতাদা (র) ও ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় ইহাকে মাদানীও বলা হইয়াছে (রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ, ১৯৯)। বর্ণনান্তরে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) জাম্‌হূর (অধিকাংশ)-এরই সঙ্গে (পূ. গ্র.)। وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ। বাক্য দ্বারাও অধিকাংশের মত সমর্থিত হয়। কেননা তাফসীরবিদগণের ঐকমত্যে البلد الامين দ্বারা মক্কা মুকাররামা-কে বুঝান হইয়াছে (পূ. গ্র.)। এই সূরায় আটটি আয়াত ও একটি রুকূ'। পূর্ববর্তী সূরার সহিত ইহার যোগসূত্র সম্পর্কে আল-আলূসী (র) বলেন, পূর্ববর্তী সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরিপূর্ণ মানব তথা শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মুহাম্মাদ (স)-এর অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই সূরায় সেই পরিপূর্ণ মানবের আবির্ভাব যে জাতির মাঝে হইয়াছিল, সেই জাতির অবস্থা, পরিণতি এবং উক্ত পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে কি প্রতিদান লাভ হইবে তাহা তুলিয়া ধরিয়াছেন (রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ, ১৯৯; আল-মারাগী, ৩০খ, ১৯৩)। এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় দুইটিঃ (ক) মানব জাতিকে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা এবং (খ) পরকালের হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানে বিশ্বাস (সাফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর, ২০খ, ৭৬)। সূরার প্রথমে বায়তু'ল-মাক্‌দিস, তূর পর্বত ও মক্কা মুকাররামা, ওহী নাযিলের এই পবিত্রতম স্থানত্রয়ের শপথ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মানুষকে সর্বতোভাবে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু সে যদি তাহার প্রতিপালক প্রদত্ত নি'মাতের কৃতজ্ঞতা আদায় না করে, তবে জাহান্নামের অতল তলে পতিত হইবে (পূ. গ্র.)। কিন্তু যাহারা ঈমান আনিবে ও সৎ

কর্মের অধিকারী হইবে তাহাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কারের সুসংবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। পরিশেষে যাহারা আখিরাতের হিসাব-নিকাশে অবিশ্বাস করে তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া আল্লাহ তা'আলার ন্যায়পরায়ণতা ও শ্রেষ্ঠতম বিচারকর্তা হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে (পূ. গ্র.)। এই সূরা পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ (স.) بلى وانا على ذلك من الشاهدين বলিতে নির্দেশ দিয়াছেন (রূহু'ল-'মা'আনী, ৩০খ, ২০৫)। এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যেই ব্যক্তি সূরা তীন পাঠ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ইহকালে সুখ-শান্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় দান করিবেন এবং আখিরাতে দিবেন ইহার হরফ পরিমাণ পুণ্য (আল-বায়দাবী, ২খ, ৪৩৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, মুলতান তা. বি., ৩০খ, ১৯৯; (২) আল-মারাগী, তাফসীরু'ল-মারাগী, বৈরূত তা. বি., ৩০খ, ১৯৩; (৩) মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী, সাফ্ওয়াতু'ত-তাফাসীর, বৈরূত ১৪০১/১৯৮১, ২০খ, ৭৬; (৪) আয-যামাখ্শারী, আল-কাশশাফ, বৈরূত তা. বি., ৪খ, ৭৭৩; (৫) ছানাউল্লাহ পানীপতী আত-তাফসীরু'ল মাজহারী, কোয়েটা, পাকিস্তান তা. বি., ১০খ, ২৯৬-২৯৯; (৬) ইব্ন কাছীর, তাফসীরু'ল-কুরআনি'ল-'আজীম, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৯, ৪খ, ৫২৬; (৭) কাদী আল-বায়দাবী, আন্ওয়ারু'ত-তান্যীল ওয়া আসরারু'ত-তা'বীল, দেওবন্দ (ভারত) তা. বি., ২খ, ৪৩৩; (৮) ইব্ন মান্জূর, লিসানু'ল-'আরাব, কুম (ইরান) ১৪০৫ হি., ১৩খ, ২৫ এবং এতদ্ভিন্ন উর্দূ ও বাংলা ভাষায় রচিত বা অনূদিত তাফসীর গ্রন্থসমূহ দ্র.।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তীমার (تيمار) ঃ (তুর্কী) সামরিক বাহিনীতে চাকরি করার জন্য (beneficium) প্রদত্ত ভূসম্পত্তি কিংবা এক ধরনের তুর্কী জায়গীর যাহার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট জায়গীরভোগীর উপর অশ্বারোহীরূপে যুদ্ধে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা বর্তায় (sefere eshmek) এবং জায়গীরের (দিরলিক) আয়ের আনুপাতিক সংখ্যায় সৈনিক বা নাবিক পাঠাইবার দায়িত্ব তাঁহাকে পালন করিতে হয়। এই জায়গীরদারী বা "তিমারিয়াত-কে তীমার সাহিবী বা আহ্ল-ই তীমার বা তীমার এরি ('আশিক পাশা যাদা, সম্পা. (Giese, পৃ. ২২, ৩৮, ২৩২) বা তীমার সিপাহিসি বা কেবল সিপাহী অর্থাৎ 'অশ্বারোহী' (সৈনিক) বলা হইত; আর শেষোক্ত প্রয়োগ হইতেই তীমার বুঝাইতে 'সিপাহীলিক' শব্দটির উদ্ভব ঘটিয়াছে। গুরুত্ব অনুযায়ী সামরিক জায়গীরদারী তিন শ্রেণীর ছিল ঃ

১। খাস্স (خاص ব. ব. খাসস-লার বা খাওয়াস্স) অথবা বিশেষভাবে যেসব জায়গীর অধিকাংশ প্রাদেশিক শাসকগণ পাইতেন;

২। যে'আমেত বা যি'আমাত (زعامة) যাহার অন্যূন বার্ষিক আয় (হাসিল) ২০,০০০ আসপার (Asper) [আকচা বা আকচে];

৩। তীমার যাঁহার সর্বাধিক আয় (হাসিল) ১৯,৯৯৯ আসপার।

অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থে তীমার বলিতে কখনও কখনও বুঝায় শেষোক্ত দুই শ্রেণী; এমন কি সমুদয় তিন শ্রেণীর ক্ষেত্রেও এই তীমার শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

প্রায়ই 'তীমার' শব্দের অনুবাদ করা হইয়া থাকে 'অধিনায়কত্ব' (Commanderie, Meninski, Michel Baudier, Pitton de Tournefort) অর্থে যাহার সহিত Malta-র Knight (Commendatoriae)-এর ও Teutonic যাজকশ্রেণীর একটা সাদৃশ্য আছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক দিক হইতে তীমারের সহিত এইগুলির কোন মিলই নাই। 'Commander-গণ ছিলেন সাবেক নাইট (Knight) যাঁহাদিগকে তাঁহাদের অবদানের পুরস্কার হিসাবে সম্প্রদায়ের কোনও কোনও তালুকের রাজস্বের অংশবিশেষ নিজস্বরূপে আদায়ের অধিকার দেওয়া হইত।

তীমার শব্দটির আরও কয়েকটি অর্থ আছে, যেমন অসুস্থ বা উন্মাদ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা, মানুষ বা ভারবাহী পশুর পরিচর্যা, আহত (আজও এই অর্থে শব্দটি আধুনিক ফারসীতে ব্যবহৃত) ব্যক্তির ক্ষত পরিষ্কার করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দেওয়া, অশ্বচারণ [ইহা হইতে তীমারজী (মিসরীয় তামুরগি অর্থাৎ পুরুষ শুশ্রূষাকারী) শব্দের উদ্ভব হইয়াছে]। তদুপরি দাস বা ক্রীতদাসদের বিশ্রাম, পরিচর্যা বা খোলা বাতাসে চিকিৎসা (খালা'ইক, কালফা) এবং কোন তালুক, খামার বা আঙ্গুর বাগানের যত্ন (শামসু'দ-দীন সামী বে) অর্থেও শব্দটির ব্যবহার চলে।

তীমার শব্দের ব্যুৎপত্তিতত্ত্ব ঃ তীমার শব্দটি গ্রীক ভাষা, মতান্তরে ফারসী ভাষা হইতে উদ্ভূত, অথচ সামরিক জায়গীর অর্থে ফারসীতে তীমার শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না, বরং মনে হয় তুর্কী জায়গীরদারী ব্যবস্থা বায়যান্টাইনদের নিকট হইতে ধার করা হইয়াছে। আমার মতে তীমার শব্দটি বায়যান্টাইন Pronoya (Pronia)-এর প্রতিধ্বনিবিশেষ (বিস্তারিত বিবরণের জন্য মূল প্রবন্ধ দ্র.)।

তীমার ব্যবস্থার উৎপত্তি ঃ Von Hammer (এই ব্যবস্থায় পারস্যের প্রভাবের উপর গুরুত্ব প্রদান করিলেও), Worms (যিনি তাঁহার পূর্বসূরীর কতিপয় ভুল সংশোধন করিয়াছেন), Belin ও Tischendorf, ইঁহারা সকলেই তীমারকে 'সামন্ত' ব্যবস্থার এক প্রকার adaptation বা মানানসই রূপ বলিয়া উপস্থাপিত করেন। ঐতিহাসিক সা'দু'দ-দীন যদিও তুরস্কের মুসাল্লিম (musellam)-দের মধ্যে বিতরিত জমিগুলি সম্পর্কে 'তীমার' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা সত্ত্বেও আরবী ইক্তা' (اقطاع) হইতে তুর্কী তীমার-এর মূল অনুসন্ধান দুরূহ ব্যাপার। 'উশরিয়্যা ও খারাজিয়্যা (عشرية এবং خراجية) এই দুই রকম ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে আইনগত ও রাজনীতিগত পার্থক্যই হইল বিশেষভাবে তুর্কী আইনে প্রতিফলিত মুসলিম উপাদান; عشرية ('উশরিয়্যা) যে জমি শক্তি প্রয়োগে বিজিত হইয়াছে ও tithe (عشر=এক দশমাংশ) প্রদানের শর্তে বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর خراجية (خراج= খাজনা) বলিতে বুঝায় সেই ভূসম্পত্তি যাহা সন্ধিক্রমে গৃহীত ও নজরানা প্রদানের বিনিময়ে যিম্মী (অমুসলিম) প্রজাগণের নিকট দেয়া হয়। Belin নিজেই বলিয়াছেন Proper fonciere, No. 303), সামরিক জায়গীর বলিতে যে কোনও রকমের ভূ-সম্পত্তি, অথচ কোনও কোনও আইনবিদ অত্যন্ত ব্যাপক ব্যাখ্যায় সামরিক জায়গীরসমূহকে খারাজিয়্যা শ্রেণীর ভূ-সম্পত্তির শামিল করিয়াছেন যে সম্পত্তি সামরিক প্রয়োজনে ওয়াকফ করা হয় (প্রাগুক্ত, নং ২৯৮)। মহামতি তুর্কী খলীফা সুলায়মানের আমলে বেশ শেষের দিকে ফকীহ্গণ সামন্ত ভূভাগগুলির আইনগত মর্যাদা নির্ধারণে কিছুটা বেকায়দায় পড়িয়াছিলেন (তু. Steeg ও Padel, পৃ. ১৯-২০, বিশেষত M. T. M., পৃ. ৫৮-৫৯ [তুর্কী পাঠ], Von Hammer, ১খ, ৩৪২ প. [জার্মান সংস্করণ], Fourn. As., Jan-Feb. 1844, পৃ. ৬৮ প.)। Voltaire সঠিকভাবেই বলিয়াছিলেন যে, তুর্কীরা 'তীমার' ব্যবস্থাটি আরব খলীফাদের নিকট হইতে ধার করে নাই [Essai des Moeurs, XCXI (?) অধ্যায়]।

ইহাই স্বাভাবিক যে, তুর্কীরা বায়যান্টীয় ব্যবস্থার অনুকরণ করিয়াছে এবং অধিকতর সম্ভাবনা এই যে, প্রচলিত বায়যান্টীয় ব্যবস্থাকে তাহারা বহাল রাখে। তুরস্কের জায়গীরদারগণকে প্রয়োজনে অশ্বারোহী সৈন্য যোগান দেওয়া ছাড়া নৌসেনাও সরবরাহ করিতে হইত। এই বাধ্যবাধকতা উপরোক্ত উক্তির সত্যতার আভাস দেয়। অবশ্য বায়যান্টীয়দের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য (Aug. Fr. Gfrorer, Byzantinische geschichte, iii, 21)।

'উছমানী সামরিক জায়গীর ব্যবস্থার সংগঠন ও প্রশাসন ঃ গোড়ার দিকের 'উছমানী আমলের প্রশাসনিক তৎপরতা সম্পর্কে আমরা খুব সামান্যই জানি। 'উছমানী শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'উছমানের যবানীতে এই কথাগুলি অবশ্য রহিয়াছেঃ "আমি যাহাকে জায়গীর মঞ্জুর করিয়াছি, উত্তম কারণ ব্যতিরেকে ঐ ব্যক্তি জায়গীর হইতে বঞ্চিত হইবে না। ঐ ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে তাহার পুত্র ঐ জায়গীরের উত্তরাধিকারী হইবে। পুত্র যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহা হইলে তাহার গুলামগণ যুদ্ধে তাহার স্থান গ্রহণ করিবে, যদ্দিন সে অস্ত্র ধারণে সমর্থ না হইবে।" ওরখানের শাসনামলে 'আলা'উ'দ্-দীন 'মুসেল্লম' (অর্থাৎ করমুক্ত) নামে এক অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনী আংশিকভাবে তীমার ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয় (তু. Belin, Fiefs Milit. p.39-40; Grzegorzewski, p. 45; Marsigli, Bibl. Nat., Paris, Ms, Suppl. Turc, No. 79, lst in fine)।

রুমেলিয়ার তিমুরতাশ পাশা বেইলারবেয়ি-র সহায়তায় ১৩৭৫ সনে সুলতান ১ম মুরাদ এক কানূন জারির মাধ্যমে ক্ষুদ্র তীমার ও যে'আমেত-এর (Bibl, Nat. Paris, Ms. Suppl, Turc. No. 68, fo. 63) মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারণ করিয়া দেন। ৮৮১ হি.-তে ২য় মুহাম্মাদ সামরিক জায়গীরগুলির সুবিন্যস্ত রেজিস্টার সংরক্ষণের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই শাসকের কানূন-নামায় এই সকল জায়গীরের উল্লেখ তুলনামূলকভাবে কমই দেখা যায় (Publ. in a Supplement to T. O. E. M., 1330 A. H. 32 pp. 80, তু. V. Hammer, Staatsverfassung, 8, p. 87-101 : Catal. of the MSS in Vienna, No. 1820, 3rd and 1813, 3rd)। এই কানূন নামায় দৃষ্ট হয়, রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ (সিপাহ য়াযীজীলারী) যাঁহারা এইসব জায়গীরের প্রশাসন পরিচালনা করিতেন, তাঁহারা প্রদেশ পর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সংগঠিত ছিলেন। সাধারণ তীমারগুলির কর্মকর্তাগণকে যে'আমেত-এর দাফ্তার-ই কেতখুদাসী-তে (কিয়াহিয়া-তে) তীমার দফ্তরদারীরূপে আখ্যায়িত করা হইত। উভয় শ্রেণীর রাজস্ব কর্মকর্তাগণ দফ্তর এমীনী-র অধীন ছিলেন, যিনি পর্যায়ক্রমে সাম্রাজ্যের দফ্তরদার-এর কর্তৃত্বাধীন ছিলেন (তু. কানূন, পৃ. ১৯; von. Hammer, p. 93 এবং Belin, Fiefs mili, p. 44)।

মহামতি সুলায়মান-কে তীমার-এর সংগঠক বলা হয়, তবে সম্ভবত তিনি কেবল প্রচলিত বিধি-বিধানগুলিকে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক তিনি তেযকেরেলি (নিম্নে দ্র.) নামে অভিহিত অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ তীমারগুলির উপর গভর্নরদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লোপ করেন। সুলায়মান-এর আমল হইতে এই সংক্রান্ত আইনের নানা সংকলন প্রকাশিত হয় এবং সময়ের গতির সহিত ক্রমে শায়খু'ল ইসলাম-এর অধিকতর সহায়তায় তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সকল আইন হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তীমার প্রতিষ্ঠানটি ভূ-সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল।

সামরিক দৃষ্টিকোণ হইতে তীমার ব্যবস্থা ঃ আমরা জানি পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের আমলের পূর্বেও তুর্কীদের অত্যন্ত সুসংগঠিত নিয়মিত (Regular) সেনাবাহিনী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তথা তীমার প্রথার বিলুপ্তির প্রাক্কালে এই সেনাবাহিনীর কাঠামো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। স্থায়ী নিয়মিত সেনাবাহিনী, যাহাদের বেতন সরকারী কোষাগার হইতে নিয়মিত প্রদত্ত হইত। এই বাহিনীর সৈনিকেরা কাপু (কাপী)-কুলু অর্থাৎ তুরস্ক সুলতানের ভৃত্য নামে পরিচিত ছিল। এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ঃ জানিসারি, গোলন্দাজ (তোপজি), গোলা নিক্ষেপক (কুমবারাজি), পরিখা খননকারী (sapper, লুগেইনজি), প্রকৌশলী (মুহানদিস), তোপদার (তুলুমবাজি), গোলাবারুদবাহক (জেবেজি), অশ্বারোহী সৈনিক (সিপাহি), অবশ্য এই সিপাহি তিমারিয়াত-এর সমার্থক নহে।

২। অশ্বারোহী (তোপরাকলী) ও সামন্ত বাহিনী।

৩। সেরাতকুলু (সারহদ্দ-কুলু) বা সীমান্ত বাহিনী, এই বাহিনীর সৈনিকদেরকে আইনত বড় রকমের বিপদের সময় তলব করা এবং অনিয়মিতভাবে বেতন দেওয়া হয়।

(৪) য়েরলি-কুলু অর্থাৎ পাশা, সানজাক বে অথবা আ'য়ান-এর 'স্থানীয় বাহিনী'। আইনত সুলতানের প্রদত্ত বিশেষ কর্তৃত্বাধিকার বলে এই বাহিনী গঠিত হইবার কথা, কিন্তু বাস্তবে প্রায়শ সুলতানের অনুমতি ব্যতিরেকে গঠিত সেনাবাহিনী কয়েকজন উচ্চাভিলাষী পাশা (যথা তেবেলেন-এর 'আলী, জায্যার, মুসতাফা বায়রাকদার প্রমুখ)-র প্রতিপত্তি অর্জনে সহায়তা করিতে দেখা গিয়াছে। এই বাহিনীকে কখনও কখনও অন্যান্য বাহিনীর নামে অভিহিত করিয়া বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর সৈনিকদের মধ্যে সুচিহ্নিত পার্থক্য ছিল না। জানিসারি সৈনিকও তীমারের অধিকারী হইতে পারিত। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলিতেও তীমারিয়ত ছিল। সিপাহী বা (স্বেচ্ছা-সৈনিকের) জেবেলি-র সন্তান নহে এমন ব্যক্তির পদোন্নতির অন্যতম উপায় ও একমাত্র বৈধ উপায় ছিল স্বেচ্ছা-সৈনিকরূপে সীমান্তে গিয়া সাহসিক কার্যাবলীর মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করা। সর্দার (প্রধান সেনাপতি)-এর অধিকারভুক্ত ছিল রণক্ষেত্রেই নিহত সৈনিকদের তীমার বণ্টন ও যোগ্য স্বেচ্ছা-সৈনিকগণকে 'য়োলদাশ' (সহসৈনিক) হিসাবে গ্রহণ করা (তু. Belin, Fiefs milit, tir a Part, p. 65; Abesci, p. 23; Mme. Louise St. Belloc, Bonaparte et les Grecs, Paris 1826, p. 109)।

সাধারণত বলা হইয়া থাকে যে, যাহাদের সরকারী গ্রান্ট (অনুদান) কমাইয়া কিলিজ'-এ পরিণত করা হইয়াছে এমন তীমারিয়ভোগিগণের প্রধান সামরিক দায়িত্ব ছিল ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে যোগদান (অথবা ইহা সম্ভব না হইলে বিকল্প কাহাকেও প্রেরণ)। অনুদানে অধিকতর সমৃদ্ধ তীমারিয়তদের দায়িত্ব ছিল এক বা একাধিক জাবালীকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ। আর যেসব তীমারিয়তের জায়গীয় মঞ্জুরি হ্রাস করা হয় তাহাদের ন্যূনতম দায় হিসাবে 'কিলিজ' নামে পরিচিত একখানি তলোয়ার পাঠাইতে হয়।

অপেক্ষাকৃত কম বিত্তবান তীমারিয়ত-কে বর্ম (cuirass)-সহ রণক্ষেত্রে হাযির হইতে হইত; এইজন্য ঐ তীমারিয়ত একজন জেবেলি (কানূন-এ কেনদু জেবেরী-রূপে অভিহিত, তু. T. O. E.M., পৃ. ১১)। অন্য সকল তীমারিয়তকে তাহাদের গুলাম (Squine) ও তাঁবু সংগে লইয়া যাইতে হইত। অধিকতর ধনীদের দায়িত্ব ছিল এক বা একাধিক জেবেলি এবং উন্নততর তাঁবু লইয়া যুদ্ধে যোগদান।

Abesci-এর রচনায় (পৃ. ১৮) জায়গীরদারগণের অস্ত্রসজ্জার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। tournefort (পৃ. ৩২০) বলেন যে,

তীমারভোগী অশ্বারোহী সৈনিকেরা যথার্থভাবে সিপাহীদের অপেক্ষা অধিকতর সুশৃঙ্খল, যদিও সিপাহিগণ অধিকতর দ্রুতগামী। এই সিপাহিগণ পল্টনে (Platoon) বিভক্ত হইয়া যুদ্ধ করে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ অশ্বারোহী সৈনিকের নেতৃত্বে। পক্ষান্তরে যাহিম ও তীমারিয়তগণ রেজিমেন্ট পর্যায়ে বিভক্ত হয় এবং পাশার আদেশাধীন একজন কর্নেল পর্যায়ের কর্মকর্তা তাহাদের অধিনায়কত্বে থাকেন।

সামরিক জায়গীরদারদের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ ঃ প্রাদেশিক গভর্নরদের খাস্স (خاص), Tournefort-এর লেখায় ইহা পরিষ্কার যে, প্রদেশসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যে একটা বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনকি, কখনও কখনও গভর্নর ও খাস্স-এর অধিকারী এই দুইয়ের পার্থক্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

অবশ্য উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতে ধরিয়া লওয়া যাইবে না যে, সকল প্রদেশেই যে'আমেত ও তীমার ছিল। বস্তুত দানিয়ুব নদী এলাকার বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে Crimea অঞ্চলের পরোক্ষ (mediate)-ভাবে অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহে এবং Barbary রাজ প্রতিনিধি শাসিত অঞ্চলগুলিতে (regency) কোনও তীমার ছিল না। একইভাবে মিসর, বাগদাদ, ক্রীট, সাইপ্রাস, Varad ও Caffa-এর মত সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশগুলিতেও কোন তীমার সৃষ্টি হয় নাই। আওলিয়া চেলেবী বলেন, Morea উপদ্বীপেও (কয়েকটি সংলগ্ন দ্বীপ ব্যতীত) তীমারের অস্তিত্ব ছিল না, যদিও pouqueville (voy. dans la Grece, p. 12) ইহার বিপরীত বিবরণ দিয়াছেন।

অন্যান্য 'উছমানী লেখকালিয়ানি" হিসাবে শাসিত প্রদেশ ও "খাস্স" হিসাবে শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। 'সালিয়ানি' শব্দটি ফারসী, অর্থ 'বার্ষিক'। এই সালিয়ানি প্রদেশগুলি ছিল প্রাদেশিক গভর্নরদের, হয় পূর্ণ মালিকানাধীন (ملكية) ছিল অথবা ছিল পরোক্ষে (mediate) শাসিত প্রদেশগুলির মত কিংবা 'হুকূমাত' (حكومة) নামে অভিহিত ৫টি কুর্দ-সানজাক-এর মত কিংবা দিয়ারবাক্‌র বিলায়েতের ১৯টি সানজাক-এর অনুরূপ কিংবা এককালীন এক বৎসরের জন্য থাকিত। এই ব্যবস্থায় গভর্নরের বেতন ও আনুষঙ্গিক প্রাপ্য ঐ প্রদেশের রাজস্ব কার্যালয় কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ হইতে কাটিয়া রাখা হইত। এই ব্যবস্থায় 'বেইলারবেয়ি' (viceroy) জনসাধারণের নিকট হইতে এক কপর্দকও আদায় করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল না (Marsigli)। বিপরীতে খাসস-এর মালিক গভর্নরগণ জায়গীরগুলির উপর ভূমিকর (উশ্‌র, ব. ব. আ'শার) আদায় করিতেন।

উপরে উল্লিখিত পার্থক্যমূলক কথাগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা আদৌ ঠিক হইবে না। কেননা কোনও কোনও সালিয়ানি গভর্নর প্রকৃতপক্ষে খাসস-এরও অধিকারী ছিলেন এবং সকল খাসস সামরিক জায়গীর ছিল না। একটি দৃষ্টান্ত এই যে, Crimea-এর খান খাসস-এর নামে Caffa-র Customs-এর উপর ১২,০০০,০০ অ্যাসপার আদায় করিতেন। অন্যদিকে একই প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের সানজাকের অস্তিত্ব ছিল। এই সানজাকগুলির কোন কোনটি খাসস, আবার কোনটি সালিয়ানি। বাগদাদ, সাইপ্রাস (ইতিপূর্বে এইগুলিকে খাসস প্রদেশ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে), দামিশ্‌ক, আলেপ্‌পো, চিলদির এই ধরনের প্রদেশের দৃষ্টান্ত, অবশ্য কাপূদান পাশার এয়ালেত বিবেচনা বহির্ভূত।

খাসস-এর ধারণার সহিত কোনক্রমেই সামরিক জায়গীরদারীকে মিশ্রিত করা চলিবে না। খাসস সামরিক জায়গীরের তুলনায় আকারে বৃহৎ। অন্যপক্ষে খাস্‌স গভর্নরের পদের সঙ্গে সম্পর্কিত, ব্যক্তির সহিত নহে। ৩য় মুরাদের আমলে যখন সানজাকবেয়ি আর অপসারণযোগ্য রহিল না, অন্তত তখন এই ছিল অবস্থা (তু. Belin, propr. fonciere. No. 313) ব্যক্তিগতভাবে সুলতানের খাস্‌স ছিল যাহা খাস্‌স-ই হুমায়ুন নামে অভিহিত হইত।

উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে প্রথম শ্রেণীর সামন্তদের প্রতিনিধিত্ব করিতেন দুই ধরনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ঃ বেইলারবেয়ি ও সানজাক বেয়ি। এই দুই ধরনের কর্মকর্তাদেরই খাসস-এর মালিকানা ছিল। প্রত্যেক বেইলারবেয়িকে প্রতি ৫,০০০ অ্যাস্‌পার রাজস্ব আয়ের মুকাবিলায় পূর্ণ একদল সৈন্য (মুকাম্মাল জেবেলী) সরবরাহ করিতে হইত। Marsigli ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজস্ব আয়ের একটি অংশ সামরিক দায়মুক্ত ছিল। অন্যপক্ষে প্রত্যেক সানজাকবেয়ি-কে প্রতি ১,০০০ অ্যাসপারের বদলে একটি মুকাম্মাল জেবেলী পাঠাইতে হইত।

যি'আমাত (زعامة) বা যে'আমেত ঃ যি'আমাত নামে অভিহিত জায়গীরের ন্যূনতম রাজস্ব আয় ছিল ২০,০০০ অ্যাসপার। ন্যূনতম এই অঙ্কের রাজস্ব আয়কে 'কিলিজ যি'আমাত' বলা হইত। ইহার অতিরিক্ত আয় যাহাই হউক না কেন উহাকে হিস্‌সা বা অংশ বলা হয়।

রেজিস্টার বা ইজমাল-এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি যি'আমাতকে ইজ্‌মালী বলা হইত। কারণ ইহা হ্রাসযোগ্য নহে, উহার বিপরীত হিস্‌সালী যাহা ছিল বিভাগযোগ্য (Belin, Fiefs Milit., p. 55-57)। তীমার-এর বেলায়ও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য (তু. Marsigli, পৃ. ৯৬-৯৭)।

যি'আমাতের মালিককে যা'ঈম (زعيم ব. ব. যু'আমা') বা 'প্রধান' বলা হইত। যা'ঈম ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে যাইতে বাধ্য এবং (কিলিজ যি'আমাত-এর ২০,০০০ অ্যাসপারের ঊর্ধ্বে) প্রতি ৫,০০০ অ্যাসপার রাজস্ব আয়ের জন্য তাঁহাকে একজন জেবেলী সরবরাহ করিতে হইত। যা'ঈম, যিনি রাজধানীর কোনও কাদা' (قضاء)-তে বাস করিতেন, সাধারণত একজন সু-বাশী হইতেন।

তীমারিয়াত তাঁহার কিলিজের জন্য ব্যক্তিগত সেবাদানে বাধ্য ছিলেন এবং ঐ কিলিজ অঙ্কের (১০,০০০ অ্যাসপার) ঊর্ধ্বে প্রতি ৩,০০০ অ্যাসপারের জন্য এজন জেবেলী যোগান দিতে হইত। তবে দৃশ্যত প্রথমদিকে ১০,০০০ অ্যাসপার পর্যন্ত আয় ছাড় দেওয়া হইত। এই সকল ব্যবস্থার ভিত্তিতে ধরিয়া লওয়া যায় যে, তুর্কী সাম্রাজ্যের বাকি অঞ্চলগুলিতে প্রতি ২,০০০ অ্যাসপার আয়ের জন্য তীমারিয়াতকে একজন করিয়া জেবেলী যোগান দিতে হইত। একুন (বা এশ-কিন বা এশ-কিন-জি) তীমারী বা "যোদ্ধা তীমার" নামে অভিহিত জায়গীরদারগণ তলবক্রমে প্রত্যক্ষ সেবা ও সংরক্ষিত সেনা (retainer) যোগান দিতে বাধ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত এক ধরনের তীমারিয়াত ছিল [বানাওয়েত (বে-নোবেত) তীমারলারী নামে অভিহিত] যাহার অধিকারী হইত নানা ধরনের ব্যক্তি, যাহারা সরকারকে প্রয়োজনে সেবা প্রদান করিতে বাধ্য ছিল। পক্ষান্তরে আরেক ধরনের তিমারিয়াতের নাম ছিল মুস্‌তাহ্‌পিজ তীমারলারী; এই জায়গীর (সংখ্যায় কম) অযোদ্ধা তিমারিয়াত, যেমন সীমান্তস্থিত শহরগুলির ইমাম বা মুআযযিনগণকে

দেওয়া হইত অথবা সুলতানের প্রাসাদে ভক্ষণযোগ্য পাখি বা গোশ্‌ত সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে মঞ্জুর করা হইত।

আইনত তীমার কেবল মুসলিমগণকে দেওয়ার কথা থাকিলেও প্রসিদ্ধ 'উছমানী বিজয় অভিযানের যুগে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। বিজিত অঞ্চলে খৃস্টান সামন্ত ভূম্যাধিকারিগণকে তাহাদের তালুকে বহাল রাখা হইয়াছিল (সার্বিয়ার জন্য তু. Grzgorzwski, p. 62 এবং Morea-র জন্য Pouqueville, পূ. স্থা.)।

জায়গীরসমূহের সামরিক সংগঠন ঃ প্রদেশের গভর্নর জায়গীরগুলির সর্বাধিনায়ক (অবশ্য গভর্নরগণ নিজেরাও ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ জায়গীরদার)-রূপে দায়িত্ব পালন করিতেন, আর এইভাবে মীর-লিওয়া' (সান্‌জাকবেয়ি-র সমার্থক) পদবিটি ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের সমার্থক হয়।

এই জেনারেলগণের অধীনে থাকিতেন কতিপয় অফিসার যাঁহাদের কর্তব্য ছিল জায়গীরদারদের তলব-সমাবেশ করা, এমন কি সম্ভবত তাহাদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করা [এই সকল কর্মকর্তা, তাঁহাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ইত্যাদির জন্য মূল প্রবন্ধ দ্র.]। সেনাসমাবেশ ও তলবের ক্ষেত্রে সুলতান সংশ্লিষ্ট বেইলার-বেয়িদের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ফরমান জারি করিতেন।

সামরিক জায়গীরসমূহের প্রশাসন ঃ যে সকল প্রশাসনিক ও রাজস্ব কর্মকর্তা জায়গীরসমূহ বরাদ্দ-বন্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই কর্মকর্তাগণ "বিলায়েত মুহাররিরলারী" বা প্রাদেশিক মুন্‌শী নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁহারা 'ইজমাল' অর্থাৎ জায়গীরগুলির সাধারণ পরিসংখ্যান সম্বলিত একটি রেজিস্টার ও মুফাসসাল অর্থাৎ বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত অপর একখানি রেজিস্টার রক্ষা করিতেন। জায়গীরগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত সরকারী আদেশপত্র বা বরাত রক্ষিত হইত অপর একটি রেজিস্টারে যাহার নাম ছিল রোযনামা বা Journal। সৈন্যাধ্যক্ষগণ এই রেজিস্টারগুলি (সম্ভবত প্রতিলিপি) যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন, যাহাতে রণক্ষেত্রে বণ্টিত তীমারের বিলিবণ্টন (তু. Grzgorzewski, doc. : No. 78, 100 and 102) ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়। তুরস্কের মুহাফিজখানাগুলিতে কতিপয় রেজিস্টার সংরক্ষিত আছে। এইগুলি 'বিজয়ী' সুল্‌তানের আমল পর্যন্ত তথ্যপ্রদ।

তীমার লাভের ব্যাপারে অগ্রগণ্য ছিলেন ঐ সকল জায়গীরদারের পুত্রগণ (সিপাহী-যাদা. ব.ব. আবনা-ই সিপাহিয়ান) কিংবা জেবেলী-র পুত্রগণ—যে জায়গীরদার ও জেবেলীগণ সরকারের প্রতি তাঁহাদের দায়-দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। উত্তরাধিকারের উল্লিখিত হকদারদের বৈধতা দশজন তীমারিয়াতের সাক্ষ্য-প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইত (কোচু-বে)। কোনও তীমারিয়াত তলবাদেশ পালনে ব্যর্থ হইলে তিনি 'মা'যূল' (معزول-অপসারিত) হইতেন অর্থাৎ এক বা দুই বৎসরের জন্য তাঁহার তীমার হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। সরকারে প্রত্যাবৃত্ত (escheat) বা খেলাপী হওয়ার কারণে তীমার মাহ্‌লূল বা মাওকূফ হিসাবে সরকারী ব্যবস্থাপনায় চলিয়া যাইত। এইরূপে তীমারের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তার পদবী ছিল মাওকূফাতজি যিনি পুনর্বণ্টনের পূর্ব পর্যন্ত এই তীমারগুলির রাজস্ব আদায় করিতেন। সিপাহিগণ তাহাদের জায়গীর বা তালুকে বাস করিতে বাধ্য ছিলেন। জমিজমা তদারকীর জন্য গড়ে দশজন সিপাহীর মধ্যে একজন সাধারণত বাড়িতেই থাকিয়া যাইত, যাহাকে কুরুজু বা রক্ষী বলা হইত। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হইলে প্রতিটি সানজাকের সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিজ এলাকায় পাঠাইয়া দিতেন তাঁহার দলের বিশজন লোককে, যাহাদের কাজ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত সহচরদের জন্য রসদ (খারজ্‌লীক) প্রেরণ। কোন রায়ত বা প্রজা রণক্ষেত্রে তাঁহার শৌর্যবীর্যের প্রমাণ দিয়াই কেবল তীমারিয়াত অর্জন করিতে পারিত এবং সেইজন্য তাহার একমাত্র পথ ছিল স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে সীমান্তবর্তী রণক্ষেত্রে যোগদান।

সামরিক জায়গীর ব্যবস্থার অবক্ষয় ঃ ১৬৩২ সালে Korica-র কুজি বে (কুচি বে কিংবা সম্ভবত আরও শুদ্ধভাবে কোচু বে) কর্তৃক উপস্থাপিত স্মারকের আলোকে এবং পুনরায় ১৬৫৭ ও ১৭৭৭ সনে প্রদত্ত স্মারকদ্বয়ের আলোকে সাবধানতামূলক ব্যবস্থা এবং সংস্কারের প্রয়াস সত্ত্বেও জায়গীর ব্যবস্থার অবক্ষয় লক্ষণীয়ভাবে চলিতেই থাকে। এই জায়গীর ব্যবস্থা সম্পর্কে তুর্কী কর্মকর্তাদের বিরূপ সমালোচনার পাশাপাশি পাশ্চাত্য লেখকদের লেখাতেও প্রায়ই সমালোচনা লক্ষ করা যায়। কাগজে-কলমে যদিও যা'ঈম ও তীমারদারগণকে অবশ্যই যুদ্ধে যাইতে হইত, তাঁহারা গুরুতর পীড়িত এবং সন্তান-সন্ততি সমভিব্যাহারে শিবিকা বাহিত হইলেও সশরীরে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইত (Tournefort), কিন্তু পরে গৃহে ফিরিবার একটা অবকাশ সর্বদাই মিলিত (Abesci, 88, p. 18)। Grzegorzewski-র লেখায় বিদ্রোহপরায়ণ ও আত্মগোপনকারী তীমারিয়াতগণকে সেনাবাহিনীতে ফিরাইয়া আনিবার রাষ্ট্রীয় আদেশের (উদাহরণ doc. No. 73) নমুনা লক্ষ করা যায়।

কোন তীমারিয়াত নিজ তীমার বিক্রয় করিয়া দিতে পারিত, যাহার মাধ্যমে কোনও কোনও মন্ত্রীর মোটা উপার্জনের ব্যবস্থাও হইয়া যাইত (Philippe du Fesne-Canaye, Le Voyage du Levant en 1573, Paris, 1897, p. 137)। একই পর্যটকের রচনার (পৃ. ৬০) আরেক অনুচ্ছেদের অর্থ এই মনে হয় যে, ভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিদের জন্য তীমার সংগ্রহ করিতে পারিতেন। Tournefort (২খ, পৃ. ৩১৯) লিখিয়াছেন, "রাজদরবারে যোগসাজশের মাধ্যমে রাজপ্রতিনিধি (বেইলারবেয়ি) ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ এতই ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের অঞ্চলের বাহিরের সৈনাধ্যক্ষের পদগুলিও তাহাদের ভৃত্যগণকে কিংবা সর্বাধিক অর্থ প্রদানকারিগণকে অর্পণ করিতে সক্ষম ছিলেন।"

Baron de Tott বলেন, Crimea-র খান তুরস্ক সম্রাট প্রেরিত ১০,০০০ সিপাহীর কাজে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি জানান, তিনি প্রমাণ পাইয়াছেন যে, এই সিপাহীদের অনেকেই ছিল খৃস্টান। উহারা কেবল তীমার লাভের জন্য (Memoires, 1785, i, p. 112) ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভান করে। Mouradjea d'Ohsson-এর লেখায় (Tableau de l'Emp. Oth.vii,, p. 375) আরও অনেক দুর্নীতির উল্লেখ আছে।

২য় মাহ্‌মূদের আমলে জানিসারি অশ্বারোহী বাহিনী এবং বেতনভোগী সিপাহীদের দমনের মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক এই সকল আধা-সামরিক বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তবে ঐ সকল সৈনিক ভূ-সম্পত্তিতে যে স্বত্বাধিকার ইতিমধ্যে অর্জন করিয়াছিল তাহা রক্ষার

জন্য সুলতান ২য় মাহ্‌মূদ ১৮৩১ সালে উৎখাত মৃত জায়গীরদারদের মধ্যে অভিজাতগণের চারিটি স্কোয়াড্রন (Squadron) গঠন করেন যেইগুলি পরবর্তী কালে নূতন নিয়মিত অশ্বারোহী বাহিনীর কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রায়ত্ত পুরাতন তীমারগুলির অন্যান্য মালিক রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ হইতে ভাতা লাভ করেন। তীমারের আওতাধীন চাষীদের আবাদী জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। অতঃপর জায়গীরভিত্তিক কোনও সামরিক সংগঠন রহিল না। তবে 'তাপু' ব্যবস্থা বহাল রাখা হয় এবং এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সুবিধার জন্য রাজস্ব আরোপ করা হয়।

তীমার ও 'উছমানী ভূমি আইন ঃ 'সিপাহী' তাঁহার সেবার বিনিময়ে তদীয় জায়গীর হইতে দুই প্রকার রাজস্ব আদায়ের অধিকারী ছিল ঃ (এক) হুকূক শার'ইয়্যা (حقوق شرعية), সাকুল্যে বা আংশিক; (দুই) রাষ্ট্র আরোপিত কর অর্থাৎ (رقوم عرفيه) প্রথাগত কর। কৃষক প্রজা বা রায়ত, মুসলিম হউক বা খৃস্টান, সিপাহী তাহাদের উপর এক ধরনের জমিদারী ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। চাষী অর্থাৎ আবাদকারী ব্যক্তি জমিতে কেবল তাসাররুফ (تصرف) স্বত্বের (দখলী স্বত্ব; মালিকানা স্বত্ব নহে) অধিকারী হইয়া থাকিলে ঐ স্বত্ব তাঁহার মৃত্যুতে কেবল তাঁহার সন্তানদের নিকট হস্তান্তরিত হইত। অন্যান্য উত্তরাধিকারী বা স্বত্বাধিকারী সংশ্লিষ্ট সিপাহীকে তাহার প্রাপ্য নগদ (مغجل) প্রদান করিয়াই ঐ জমিতে দখল পাইতে পারিত। এই ক্ষেত্রে সিপাহীর প্রাপ্যকে 'তাপু' নামে অভিহিত করা হয়; কোনও উত্তরাধিকারী না থাকিলে ঐ একই 'তাপু' পরিশোধের মাধ্যমে ও বিশেষ বিধানের আওতায় নূতন কোনও ব্যক্তিকে জমি বরাদ্দ করা হইত (Belin, Prop. Fonc., No. 303)।

তীমারিয়াত তাঁহার সামরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিনিময়ে কিছু সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন। তিনি ভূ-সম্পত্তির মালিক (صاحب الارض) হইতেন বটে, তবে এই মালিকানা কেবল সামরিক সেবার সহিত সম্পর্কিতই ছিল না, এই মালিকানা ছিল নাজুক ধরনের ও প্রত্যাহারযোগ্য (revocable)।

মুসলিম হউক বা খৃস্টান, কৃষক (رعية ব. ব. رعايا) ছিল রাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কিত (রা'য়াত শব্দটি পাশ্চাত্য লেখকদের লেখায় কেবল খৃস্টানদের বুঝাইতে ভ্রমাত্মকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; Belin, Fiefs milit., spec. repr., p. 50)। কৃষকগণ সিপাহীকে নানা কর ও আবওয়াব প্রদান করিত এবং ঐগুলির হার ও পরিমাণ স্থানবিশেষে বিভিন্ন হইত (এই সকল করের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য মূল প্রবন্ধ দ্র.)।

এই ধরনের তুর্কী সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যময় ও এখনও বিদ্যমান ব্যবস্থাটির নাম তাপু। ইহার আভিধানিক তথ্য নিম্নরূপ (সংক্ষেপিত) ঃ ক্রিয়াপদ তাপ-মাক হইতে উদ্ভূত তাপু-র অর্থ ঃ (১) মান্য করা, স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ ও নিরাপত্তা প্রার্থনা বা বিজয়ীর অনুগত হওয়া (তু. 'আশিক পাশা যাদে তারীখি, সম্পা. Giese, পৃ. ২২; Noldeke, নেশরী, in Z. D. M. G., 1859, p. 212); (২) উপাসনা, (ইবাদত) করা; (৩) আনুগত্য স্বীকার করা (তু. Vambery, Alt. Osman. Sprache, p. 219)।

বুরহান-ই কাতি' ফারসী হইতে ধার করা এই শব্দটির এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে ঃ ইহা এক সৌজন্যমূলক প্রথা যাহাকে ট্রান্সঅক্সানিয়ার তুর্কীরা তাপু বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। অপরাধী অনাবৃত মস্তকে স্বীয় কর্ণ ধারণ করিয়া আনত হইয়া সুলতানের বা উযীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাকে বলা হয় 'তাপু'। উল্লেখ্য যে, Silvestre de Sacy-র বর্ণনা অনুযায়ী 'আরবী 'খিদমাত' বা সেবা 'তাপু' শব্দের সমার্থক (কাশগাড়ীর মতানুসারে 'খিদমাত' শব্দটির অর্থও তুর্কী তীমার শব্দের অনুরূপ; N.E., i, 210, noted; Bibliotheque des arabisants, Cairo, ii., p. 114, 116)। মোঙ্গল ভাষার এই একই শব্দের Kowalewski-র মতে যাহার উচ্চারিত রূপ তাবিক, ইহার আবশ্যিক তুর্কী শব্দরূপঃ তাপ-ইগ) অর্থঃ অর্ঘ্য, ত্যাগ, ঐশী উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন, সেবা, উপাসনা ও সম্মানজ্ঞাপক কর্ম।

তীমারের সহিত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে 'তাপু' শব্দটি স্বত্ব-দলীলের নাম যে স্বত্ব সংশ্লিষ্ট ভূসম্পত্তির করদ অবস্থান (tributary state) নিশ্চিত (Confirm) করে, বিজিত সম্পত্তিতে বিজেতার স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এই স্বত্বের নবায়ন বাধ্যতামূলক (Belin, No. 298, Note 2)। জমি সংশ্লিষ্ট তাপু-র সম্পর্ক সিপাহী ও রা'য়াত-এর মধ্যে, সিপাহী ও সুলতানের মধ্যে নহে। এই কারণেই তাপু সত্যিকার অর্থেই জমির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকৃত বন্ধনবিশেষ। এই স্বত্ব লাভের জন্য যে অগ্রিম (মু'আজজাল) নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করা হইত সেই অর্থকেও তাপু বলা হইত।

পাশ্চাত্যের জায়গীর ব্যবস্থার সহিত তীমার-এর তুলনা ঃ তীমার সামাজিক সংগঠন অপেক্ষা অধিকতর ছিল প্রশাসনিক সংগঠন। তীমার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের উদ্যোগই বড়। তীমার তদারকী, এমন কি সরাসরি নিয়ন্ত্রণের অধিকার রাষ্ট্র কখনও হাতছাড়া করে নাই; রাষ্ট্রের জন্য সুবিধাজনক হইলেই কেবল বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার স্বীকৃত হইত। প্রদেশগুলিতে সামন্তদের রাজবংশ (dynasty) শক্তভাবে গড়িয়া না উঠে রাষ্ট্র তাহা নিশ্চিত করিত। ক্ষেত্রবিশেষে উহার অপব্যবহার সত্ত্বেও সামরিক সেবাদানের সহিত তীমার ব্যবস্থার সম্পর্ক অতিশয় নিবিড় ছিল। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার বা বিদ্রোহের সামান্যতম আভাস পাইলেই জায়গীর কাড়িয়া লওয়া হইত। পূর্বে বলা হইয়াছে, তীমার দখলে বহাল থাকা খুবই অনিশ্চিত ও নাযুক। দেখা গিয়াছে, কেবল একটি সমরাভিযানকালেই কোনও কোনও তীমার আটবার পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যাহৃত হইয়াছে (Thornton)। জায়গীরের মালিকানা পাশ্চাত্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করে, তীমার ব্যবস্থায় জায়গীরদারদের তেমন মর্যাদা লাভ ঘটিত না, কোন প্রকার আভিজাত্যও লাভ হইত না। তীমার ব্যবস্থায় এমন অপ্রত্যাশিত প্রবণতাও রহিয়াছে যে, একজন রায়ত অব্যাহতভাবে রায়ত থাকিয়াও তীমারের অধিকারী হইতে পারিত। বড় বড় সামন্ত যুগপৎভাবে সরকারী কর্মকর্তা হইতেন; Feudal Lord হিসাবে রাষ্ট্র তাহাদিগকে ভয় করিত না, বরং বড় বড় প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি হিসাবেই তাঁহারা আশঙ্কা-উদ্বেগের কারণ হইতেন।

তীমার ব্যবস্থায় কোনও অধস্তন সামন্ত শাসকের অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক জায়গীরদার তাহার জায়গীরের জন্য সরাসরি সুলতানের নিকট ঋণী (অবশ্য বেইলারবেয়ি নিযুক্ত খুব ছোট ধরনের কিছু জায়গীরদার ছিল ব্যতিক্রম)। তীমারের কোন জায়গীরদার তদপেক্ষা শক্তিশালী জায়গীরদারের আজ্ঞাধীন ছিল না, তবে যুদ্ধের সময় সৈন্য সমাবেশের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইত। রা'য়া বা চাষীর উপর তীমার জায়গীরদারের কিছু রাজস্ব আদায়ের অধিকার ছিল, তবে তাহারা পাশ্চাত্যের সামন্ত প্রভুদের Serf বা ভূমিদাসদের তুল্য ছিল না। Mme. Louise St. Belloc-এর মতে Napoleon তুর্কীদের নিকট হইতে জমি মঞ্জুরির পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন,এমন ধারণা অযৌক্তিক হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Belin (Constantinople-এর ফরাসী দূতাবাসের Secretary-interpreter যিনি তুর্কী তীমার ব্যবস্থার অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সমীক্ষক), Etude sur la propriete fonciere en pays musulman, et specialement en Turquie (Rite hanefite), সূত্র ঃ J. A., Paris 1862 হইতে পুনর্মুদ্রণ; (২) ঐ লেখক, Du regime des fiefs militaires dans l'islamisme, et principalement en Turquie, J. A., Paris 1870; (৩) Worms, Recherches sur la constitution de la propreite territoriale dans les pays musulmans et subsidiairement en Algerie J. A., 1842, 1843 et 1844; (৪) Paul Andreas von Tischendorf, (Das Lehnswesen im den moslemischen Staaten inbesondere in osmanischen Rieche., Leipzig 1872, 129, pp. in 8°); (৫) Joseph von Hammer (purgstall), Des osmanischen Reiches Staatsver fassung und Staatsver waltung, Vienna 1815, i. 337-434 (chaps. vi. : Das Lehenrecht, Kanuni timar); (৬) Pitton de Tournefort, Relation d'un Voyage du Levant, Lyon 1717, 3 volumes; (৭) Comte de Marsigli, L'Etatmilitaire de l'Empire Ottoman, ses progres et sa decadence, the Hague & Amsterdam 1732, folio (Italian & French); (৮) Elias abesci, L'Etat actuel de l'Empire ottoman, ইং অনু. Fontanelle, Paris 1792, 2 vols: (৯) A. de Juchereau de sSint-Denis, Revolutions de Constantinople en 1807 to 1808; (১০) Th. Thornton, Etat actuel de la Turquie, ইং. অনু., Paris 1812, 2 vols; (১১) J. Grzegorozewski, Z sidsyllatow rumeli jskich epoki wyprawywiedenskiej, Lwow 1912, 144 pages (তুর্কী লিপির পাঠ) ও (পোল লিপির পাঠ) ঃ Recueli de documensts turcs des archivas de Sofia, retalifs a l'Expedition centre Vienna; (১২) W. Padel L. Steeg, De la legislation ottomane, Paris 1904.

তীমার সম্পর্কিত বিধিবিধান সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ দলীলগুলি হইল ঃ

১। সুলায়মানের বিধিসমূহ কানূননামে আল-ই 'উছমান (পৃ. ৭২, ১৩২৯);

২। উল্লিখিত কানূননামের আরেকটি (পরবর্তী কালের) পাঠ (Vienna, No. 1799, i.; Bibl. Nat, Paris, Suppl. Turc, No. 81);

৩। একই সুলতানের বিধিমালা বা কানূন যাহা সাধারণত 'জেদীদ' (নূতন) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, পূর্ববর্তী দুই কানূন-এর ক্ষেত্রে এই বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে বিখ্যাত শায়খু'ল-ইসলাম আবু'স-সু'উদ ও কামাল পাশা-যাদের বহু সংখ্যক ফাতওয়া;

৪। মু'ঈনু'ল-মুফ্তী গ্রন্থের প্রণেতা শায়খু'ল-ইসলাম ওসকূবি পীর মেহমেত এফেনদী ইব্ন হাসান প্রণীত কানূন বা রিসালা। এই কানূন পূর্ববর্তী কানূনটির মতই প্রধানত শায়খু'ল-ইসলাম আবু'স-সু'উদ-এর ফাতওয়ার ভিত্তিতে প্রণীত;

৫। কানূন-ই লীওয়া-ই বুস্না; ইহা সুলায়মানের নির্দেশে ও যা'ঈম-এর নির্দেশনায় মুসতাফা ইব্ন আহ্মাদ কিয়াতিব আদ-দেফাতিরু'ল-খাকানি জুমাদা উলা, ৯৭৩ হি. শেষের দিকে (ডিসেম্বর ১৫৬৫-র মাঝামাঝি) প্রণয়ন করেন;

৬। ১ম আহমাদের বলিয়া কথিত কানূন ১০১৮/১৬০৯ সনে 'কাওয়ানীন-ই আল-ই মান দার খুলাসা-ই মাদামীন-ই দাফতার-ই দীওয়ান' নামে সম্পাদিত;

৭। নাসীহাতনামা (উপদেশ গ্রন্থ) সুলতান ১ম ইবরাহীমের (১৬৪০-১৬৪৮খৃ.) জন্য তাঁহার জনৈক উযীর উহা প্রণয়ন করেন;

৮। তালখীসু'ল-বায়ান ফী কাওয়ানীন-ই আল-ই 'উছমান; ৪র্থ মুহাম্মাদের (১৬৪৮-১৬৮৭ মৃ.) আমলে হুসায়ন এফেনদি হারজারফেন কর্তৃক লিখিত;

৯। হাজ্জী খালীফার রচনা, শিরোনাম দাস্তূরু'ল-'আমাল, তু. Behrnauer, Z. B. M. G., xi, p. 111-32;

১০। সামরিক জায়গীরের সাংগঠনিক নিয়ামক বিধি-বিধানরূপে ১৩৭৭/১৯১১ সনে যাহা সুলতান 'আবদু'ল-হামীদ জারি করেন সেইগুলির পুনঃ সন্নিবেশ (দ্র. জেওদেত, তা'রীখ, ১খ, ১৮৪-১৯২)।

[বি. দ্র. ঃ উপরোক্ত কানূননামাগুলির প্রতিটি সম্বন্ধে প্রবন্ধকার বিস্তারিত তথ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তদুপরি আরও কতিপয় কানূননামা-র উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল তথ্যের জন্য মূল প্রবন্ধ তীমার দ্র.] (সংক্ষেপিত)।

J. Deny (E.I. [1])/আফতাব হোসেন

তীমূর তাশ (تيمورتش) ঃ একজন ওরতোকী, মারদীন বংশের নাজমু'দ-দীন ইলগাযী-র পুত্র। আল-মালিক, আল-'আলিম আল-'আদিল হুসামুদ-দীন তীমূর তাশ ৪৯৮/১১০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ বৎসর বয়সে (৫১২ হি.) সালে তাঁহার পিতা ইলগাযী তাঁহাকে তাঁহার সাময়িক প্রতিনিধিরূপে আলেপ্পোতে রাখিয়া যান। হি. ৫১৫ সালে সালজূক সুলতান মাহমূদ-এর নিকট তীমূর তাশকে প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং এই মিশনের ফলস্বরূপ মায়্যাফারিকীন [দ্র.] ওরাতোকীগণ-এর ভূখণ্ডের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। ইলগাযী-র ইনতিকালের পর তাঁহার সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায় ঃ তীমূর তাশ মারদীন, তাঁহার ভাই সুলায়মান মায়্যাফারিকীন এবং তাঁহার চাচাত ভাই সুলায়মান ইব্ন 'আবদি'ল জাব্বার আলেপ্পোর অধিকারী হন। হি. ৫১৮ সালে মানবিজ (যাহা বা'আল-বেক-এর আমীর আল-হাস্সান-এর কর্তৃত্বাধীন ছিল) অবরোধকালে আলেপ্পোর বালাক ইব্ন বাহরাম ইব্ন ওরতোক নিহত হন। তীমূর তাশ এই সময়ে বালাক-এর শিবিরে ছিলেন, তিনি দেশটি আক্রমণ করেন এবং আলেপ্পো পর্যন্ত অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি ২০ রাবী'উ'ল-'আওয়াল, ৫১৮ সালে আলেপ্পো দখল করেন। তিনি তথায় তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া যান। কারণ সিরিয়াতে সেই সময় পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং তিনি ছিলেন একজন শান্তিকামী ব্যক্তি (ইবনু'ল আছীর, ১০খ, ৪৩৬)। শী'ঈপন্থী দুবায়স (মায়্যাদী বংশ)-এর ষড়যন্ত্রের ফলে ফ্রাঙ্কগণ আলেপ্পো অবরোধ করিলে ইহার অধিবাসিগণ তাহাদের অধিপতির দুর্বলতা (আল-ওয়াহ্ন ওয়া'ল-'আজয) দেখিয়া মাওসি'ল-এর আকসুনকুর আল-বুরসূকীর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন এবং তাহারা তাঁহাকে নগরদুর্গে প্রবেশানুমতি প্রদান করে।

'ইমাদু'দ-দীন যান্‌গী (যিনি হি. ৫২১ সালে মাওসিল-এ বুরসুকীর উত্তরাধিকারী হন) ক্ষমতাসীন হওয়ার অব্যবহিত পর তীমূর তাশ ধারাবাহিকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে থাকেন। অপরদিকে যানগী তাঁহার অধিকৃত রাজ্য বিস্তারের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া মারদীনের অন্তর্ভুক্ত নিসীবীন অভিমুখে অগ্রসর হইলে তীমূর তাশ হিসন কায়ফাস্থ তাঁহার চাচাত ভাই দাউদ ইব্‌ন সুকমানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয়ের সেনাবাহিনী গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার পূর্বে যানগী একটি কৌশলের মাধ্যমে নিসীবীন-এর আত্মসমর্পণ লাভ করেন।

৫২৪ হি. সালে সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে যান্‌গী সারজী (মারদীন ও নিসীবীন-এর মধ্যবর্তী; নিসীবীন-এর ৮ মাইল পশ্চিমে কাসি সেরচীখেন (?) অবস্থিত) অবরোধ করেন। তীমূর তাশ, দাউদ ও দিয়ারবাক্‌রের শাসক বিশ হাজার তুর্কোমান যোদ্ধা সংগ্রহ করা সত্ত্বেও পরাজিত হন। হিসন কায়ফা জয় করিতে ব্যর্থ হইয়া যান্‌গী দারা-র দুর্গটি অধিকার করার জন্য প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সকল বিপর্যয় সত্ত্বেও আমিদ (দিয়ারবাক্‌র)-এর অবরোধের সময় হি. ৫২৮ সালে তীমূর তাশ যানগীর সহিত মিলিত হন। এই দুর্গের শাসক তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য দাউদকে তলব করা সত্ত্বেও শেষোক্ত ব্যক্তি পরাস্ত হন। যান্‌গী ও তীমূর তাশ আমিদ জিলাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও দুর্গটি পরাজয় স্বীকারে অস্বীকৃত হয়। দিয়ারবাক্‌রের অন্তর্ভুক্ত সাউওর দখল করিয়া যানগী ইহার ক্ষতিপূরণ করেন [মারদান ঃ সাওউর-এর কাদা]।

হি. ৫১৮ সালে তীমূর তাশ মায়্যাফারিকীনে তাঁহার চাচাত ভাই সুলায়মান-এর উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার একমাত্র সাফল্য মায়্যাফারিকীন-এর উত্তরের হাততাখ (অথবা 'আত্‌তাখ, শারাফনামা, ১খ, ২৪৫, 'আতাক) অধিকার করা, যাহা তিনি হি. ৫৩২ সালে মারওয়ানীগণ-এর শেষ বংশধরের নিকট হইতে দখল করেন।

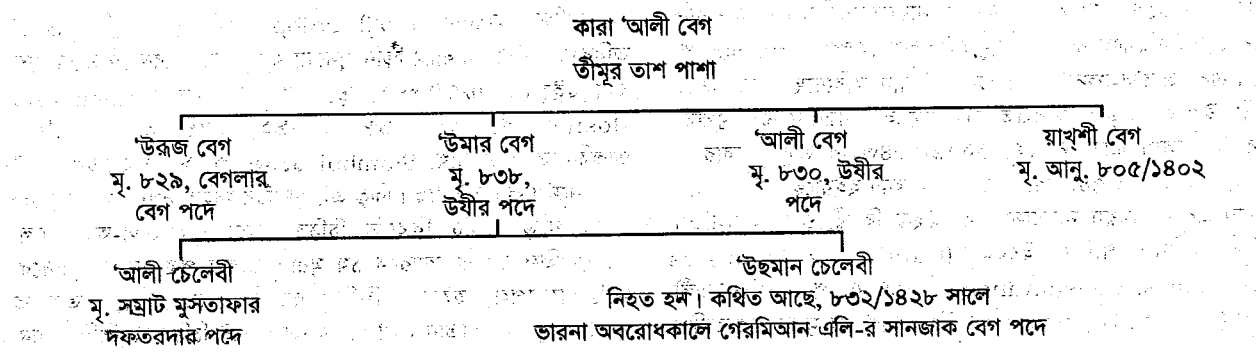
হি. ৫৪১ সালে যান্‌গীর ইনতিকালের পর তীমূর তাশ ও দাউদ তাঁহাদের পূর্বের অধিকৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন যাহা ইতিমধ্যে মাওসিল-এর অধিপতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সায়ফু'দ-দীন যান্‌গী অবশ্য কেবল উহাদের পুনরুদ্ধারই করেন নাই, বরং মারদীন অবরোধ করেন এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশকে ধ্বংস করেন। শান্তিকামী তীমূর তাশ অতঃপর যান্‌গীর আমলের স্মরণে দুঃখ প্রকাশের মাধ্যমে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন যাহা তাঁহার মতে ছিল উত্তম আমল [আয়্যামুহু লাকাদ কানাত আ'য়াদান]। তিনি দ্রুততার সহিত সায়ফু'দ-দীন-এর সহিত শান্তি স্থাপন করেন এবং তাঁহার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। কিন্তু হি. ৫৪৪ সালে সায়ফু'দ-দীন ইনতিকাল করেন এবং তরুণ শাহযাদী তাঁহার উত্তরাধিকারী কুতবু'দ-দীন-এর স্ত্রী হন। ৩০ বৎসর রাজত্ব করার পর ৪৮ বৎসর বয়সে ৫৪৭/১১৫২ সালে মারদীন ও মায়্যাফারিকীন-এর অধিপতি তীমূর তাশ ইনতিকাল করেন। আবু'ল-ফারাজ (সম্পা. Pococke, পৃ. ৩৯১) এবং আবু'ল-ফিদা' একই তারিখ প্রদান করিয়াছেন। অন্যদিকে 'আলী ইমেরী কর্তৃক ব্যবহৃত উৎসসমূহে [মারদীন-এর মুফতী 'আবদু'স-সালাম এফেনদী (মৃ. ১২৫৯/১৮৪৩)-র উম্মু'ল-ইবার ও ফেরদী] মৃত্যু তারিখ ৫৪৮ হি. সালে প্রদান করা হইয়াছে। তীমূর তাশ মারদীন-এর হুসামিয়্যা মাদরাসা এবং ইহার বিপরীতে বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন। গালিব ইয়েম (Catal. des Monnaies Turcomanes, Constantinople ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ২৭) ও 'আলী ইমেরী (পূ. গ্র., পৃ. ১৮) কর্তৃক বর্ণিত তীমূর তাশ-এর মুদ্রাসমূহে তারিখ বা টাঁকশালের নাম কোনটিরই উল্লেখ নাই। তবে 'আলী ইমেরী মুদ্রার উপরে প্রতীকটির ব্যাখ্যা করেন ঃ তুর্কী কায়ী গোত্রের "তামগা"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দ্র. ওরতোকীদ ও মারদীন প্রবন্ধদ্বয়; (২) ইবনু'ল-আছীর, ১০খ, ৩৭৩, ৪১৮, ৪২৬, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৫৫, ৫২৬, ১১খ, ৬, ৩৪, ৮১, ৯২, ১১৫; (৩) আবু'ল-ফিদা', Annales Moslemici, সম্পা. Reiske; (৪) কাতিব ফেরদী, মারদীন মুলূক-ই উরতুকিয়ে তা'রীখ (৯৪৪ [১৫৩৭], এই রাজত্বকালের একটি গুরুত্বহীন বিবরণ, কিন্তু সম্পাদক 'আলী ইমেরী কর্তৃক মূল্যবান টীকাসমূহ সংযোজিত), ইস্তাম্বুল ১৩৩১ হি.।

V. Minorsky (E.I.[1])/মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

তীমূর তাশ (تيمور تاش) ঃ একজন উছমানী সেনাপতি ও উযীর (Vizier), কারা 'আলী বেগ-এর পুত্র, যিনি ওরখান-এর রাজত্বের প্রথম বৎসরে Nicomedia উপসাগরের তীরে অবস্থিত Hereke -এর দুর্গটি দখল করেন, Aidos অবরোধকালে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার চক্ষুতে বিদ্ধ একটি তীর নিজ হাতে উৎপাটন করেন। তীমূর তাশ পরিবারটির উৎপত্তি সম্পর্কে অতি সামান্য তথ্য জানা গিয়াছে। 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রারম্ভিক পর্যায়ের অপর অভিজাত পরিবারবর্গের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তীমূর তাশ পাশার নাম প্রথমবারের মত উল্লিখিত হয় যখন তিনি সুলতান প্রথম মুরাদের আদেশে এবং লালা শাহীন পাশার সহায়তায় Tundja নদী বরাবর সুলতানের বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। ৭৬৭/১৩৬৫ সালে তিনি জয় করেন Enidje Kisilaghac (তু. হাজ্জী খালীফা, Rumeli und Bosna, পৃ. ৪৯ প., যাহাতে বিজয়ের সন ৭৬৮ উল্লিখিত) এবং Tundja সমভূমিতে অবস্থিত যান্‌বুলী জয় করেন একই সনে (ঐ লেখক, পৃ. ৫৩ প.)। পরবর্তী দশকে তাঁহার কার্যাবলী কোন তথ্যসূত্রসমূহে পাওয়া যায় না। সার্বো-বুলগার যুদ্ধের (৭৭৭/১৩৭৫) শেষভাগে লালা শাহীন মৃত্যুবরণ করিলে তীমূর তাশ রূম-এলির বেগলার-বেগ (Begler-beg)-রূপে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি প্রথমত সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন সম্পন্ন করিবার মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি সিপাহিগণের জন্য জায়গীর (দ্র. তীমার) ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ সদস্যবর্গের জন্য ভৈনাক (Voinak) সৃষ্টি করেন। শেষোক্ত শ্রেণীতে প্রধানত বুলগেরীয় খৃস্টানগণ অন্তর্ভুক্ত ছিল যাহারা প্রায়শ গাড়িচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিত (তু. J. V. Hammer, G. O. R., ১খ, ১৮১ প.)। মনে হয়, তীমূর তাশের উদ্যোগেই ওরখান-এর আমল হইতে সাধারণত জনগণের পরিহিত ফেল্ট (Felt) টুপী (সাধারণত বিলেজিক-এ প্রস্তুত) সেনাবাহিনীর পরিধানের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং বেগ ও অফিসারবর্গের মস্তকাবরণের জন্য বিশেষভাবে লাল রং ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (তু. J. V. Hammer, G. O. R., ১খ, ৮৯ প.)। তিনটি দুর্গ, তথা মোনাস্‌তির (আধুনিক Bitolj), Prilop ও Ishtip (আধুনিক Stip) অধিকার করিবার মাধ্যমে তিনি পুনরায় খ্যাতিলাভ করেন (বিজয়ের সন বলা হইয়াছে ৭৮৪/১৩৮২; তু. হাজ্জী খালীফা Rumeli und Bosna, পৃ. ৯৭, ৯৬ ও ৯২ এবং তাঁহার রচিত তাকবীমু'ত-তাওয়ারীখ, Stambul ১১৪৬, পৃ. ৯৭ যাহাতেও একই সাল নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সালটির সহিত সমন্বয় সাধন দুরূহ হইয়া পড়ে একটি বিখ্যাত চিঠির, যাহা রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৭৮৭/এপ্রিল ১৩৮৫ তারিখে ১ম মুরাদ তাঁহার পুত্র ১ম বায়াযীদকে আদ্রিয়ানোপল হইতে লিখিয়াছিলেন। Feridun তৎকৃত মুনশা'আতু'স-সালাতীন (১খ, ১০৭) গ্রন্থে এই চিঠির অনুলিপি প্রদান

করিয়াছেন; এই প্রসঙ্গে আরও তু. J. V. Hammer, G. O. R., ১খ, ১৯১ প., যাহাতে ঐ পত্রের কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে)। প্রাথমিক 'উছমানী যুগের কালপঞ্জী চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ইহা মোটের উপর নিশ্চিতভাবে বিবেচনা করা যায় যে, তীমূর তাশ Wardar নদী পার হইয়া আধুনিক সার্বিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল আক্রমণ করিয়া তথায় সুলতানের পক্ষে তিনটি শক্তিশালী ঘাঁটি অধিকার করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হইয়াছিল কারলী-এলী অর্থাৎ Aetolia ও Acarnania, যাহা ছিল "King of the Epirotians", Carlo 11 Tocco (মৃ. জুলাই ১৪২৯)-এর দেশ। ১৩৮৫ খৃ. তীমূর তাশ বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ আরতা উপজাতির (আয়োলিয়ান সাগরের অনতিদূরে) বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন বলিয়া কথিত আছে (তু. Epirotica, সম্পা. J. Bekker (জ. ১৮৪৯], পৃ. ২১৯-২২, ও Jorga, G. O. R., ১খ, ২৭৩)। ফলে তিনি কখনও এই স্থানে কখনও বা Thessaly এবং Epirus এলাকার অপর নানা স্থানে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন। শেষোক্ত দুই এলাকায় তুরাখান বেগ (দ্র.)-ও সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ৭৮৮/১২৮৬ সালে তুরাখান বেগ আকস্মিকভাবে আনাতোলিয়া অঞ্চলে উপস্থিত হন। কোনয়া (Konya)-এর সমভূমিতে সুলতান মুরাদ তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী কারামান-এর 'আলা'উ'দ-দীন 'আলীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে লিপ্ত হন তাহাতে তীমূর তাশ ছিলেন 'উছমানী সেনাবাহিনীর পশ্চাদভাগের সেনাপতি এবং তাঁহার হস্তক্ষেপের কারণেই কারামানের শাসক পলায়ন করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে 'উছমানী পক্ষের বিজয় ঘটে। ইহার পুরস্কারস্বরূপ তীমূর তাশকে লুণ্ঠিত মালামালের বৃহদাংশ প্রদান করা হয় এবং উযীর (vizier) অর্থাৎ পাশা উপাধিতে ভূষিত করা হয়, যাহার তামগা তিনি রাজ্যের প্রধান বেগ্‌লের বেগরূপে ধারণ করিতে থাকেন। পরবর্তী বৎসর (৭৮৯/১৩৮৭) যখন মুরাদ পুনরায় য়ূরোপে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন, তীমূর তাশ তখন আনাতোলিয়াতে অবস্থান করিয়া যুবরাজ য়া'কূব-এর অনুপস্থিতিতে গেরমিআন-এলি (দ্র.) জিলার শাসকের দায়িত্ব পালন করেন। ৭৯২/১৩৯০ সালে তীমূর তাশ পুনরায় বলকান এলাকায় আবির্ভূত হন। হাজ্জী খালীফার তাকবীমু'ত-তাওয়ারীখ অনুসারে এই বৎসর তিনি Uskub-এর পূর্বদিকে অবস্থিত রৌপ্য ও তাম্র খনির জন্য প্রসিদ্ধ স্থান Kratovo (তুর্কী কারাতোওয়া) অধিকার করেন। পরবর্তী বৎসর (৭৯৩)/১৩৯১) ব্রুস্‌সা (Brussa) ও আঙ্গোরার বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি কারামানীয় আক্রমণের সময় ব্রুসসাতে তিনি বন্দী হন। পরে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং প্রতিশোধস্বরূপ তিনি আক-চায় (গেরমিতনান-এলী)-এর সমভূমিতে কারামান-এর যুবরাজকে পরাজিত করেন এবং যদিও যুবরাজ প্রথম বায়াযীদ-এর ভগ্নিপতি ছিলেন তথাপি তাঁহাকে নৃশংসভাবে ফাঁসিতে হত্যা করেন। তীমূর তাশ-এর পরবর্তী ইতিহাস সম্বন্ধে মুনাজ্জিমবাশী (যিনি সম্ভবত ইদরীস বিতলীসী, [৩খ, ৩১১] হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন) প্রদত্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে ঃ (১) ৭৯৯/১৩৯৬-৯৭ সালে প্রথম বায়াযীদ-এর আদেশক্রমে তিনি আনাতোলিয়ার কিআন্‌গ্‌রি (দ্র.) জয় করেন; (২) পরবর্তী বৎসরে (৮০০/২৪ সেপ্টেম্বর, ১৩৯৭-তে আরম্ভ) এথেন্স এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা জয় করেন (তু. Chronicon breve in Ducas, Bonn সং. পৃ. ৫১৬ এবং J. H. Mordtmann, in Byz-Neugr, Tahrb, ৪খ, পৃ. ৩৪৬ প.); (৩) তুর্কোমানদের নিকট হইতে বেহেসনী (Behesni) (দ্র.) ও Malatya অধিকার করেন; (৪) কুর্দীদের নিকট হইতে Diwrigi, Darende ও Kemakh (দ্র.) বিজয় করেন (আরও তু. সা'দু'দ-দীন ১খ, ১৫০)। এইজন্য তিনি কখনও য়ূরোপে, কখনও বা এশিয়া মাইনরে সামরিক উদ্যোগে ব্যস্ত ছিলেন (তু. J. V. Hammer, G.O.R., ২খ, ২৪৮ প.)। আঙ্গোরা (Angora)-র যুদ্ধে (১৯ যু'ল-হিজ্‌জা, ৮০৪/২০ জুলাই, ১৪০২) তিনি তাঁহার পুত্র য়াখশীসহ প্রথম বায়াযীদ-এর মত বন্দীরূপে তীমূরের হস্তে গতিত হন। কূতাহিয়া (দ্র.)-তে তীমূর তাশের সঞ্চিত ধনরত্নের ভাণ্ডার উন্মোচিত হইয়া পড়িলে তীমূর তাহাকে প্রচণ্ডভাবে ভর্ৎসনা করেন এবং প্রথম দিকে তাঁহাকে মুক্তি প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন (তু. J. V. Hammer [G.O.R., ১খ, ৩৩০], শারাফুদ্দীন 'আলী য়াযদী [Histoire de Timur Bee, অনু. Petis de la Croix, ৫খ, ৫৪, পৃ. ৪১]-এর মতানুসরণে)। 'উছমানী সাম্রাজ্যের পতনের পর তিনি স্বল্পকালই জীবিত ছিলেন। উলুবাত (এশিয়া মাইনর)-এর যুদ্ধে যুবরাজ 'ঈসা-র পক্ষে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানের সময় ৮০৮/১৪০৫ সালে তাঁহার এক বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য তাঁহাকে হত্যা করে। বিজয়ের স্মারকরূপে সুলতান ১ম মুহাম্মাদ তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান-এর নিকট এই পুরাতন যোদ্ধার ছিন্ন মস্তক প্রেরণ করেন। তাঁহার দেহ Brussa শহরে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত মসজিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। তাঁহার চার পুত্রের প্রত্যেকেই উযীর কিংবা সেনাপতিরূপে খ্যাতি লাভ করেন। সা'দু'দ-দীন-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহাদের নাম 'উরূজ বেগ, 'উমার বেগ, 'আলী বেগ ও য়াখশী বেগ, যাঁহারা বলকান অভিযানসমূহে সাফল্যের প্রমাণ রাখেন; উদাহরণস্বরূপ ৭৭৭/১৩৭৫ সালে নিশ অধিকার (তু. J. V. Hammer, G. O. R., ১খ, ১৮১) এবং ১৩৮৮ সালে Provadija অধিকার [Turk, Prawadi, Bulg. Ovec, তু. K. Jirecek, Das Furstentum Bulgarien, পৃ. ৫৩৯ ও Jorga, G. O. R., ১খ, ২৫৯] Angora যুদ্ধের অল্পকাল পরেই শেষোক্ত সেই পুত্র মারা যান বলিয়া মনে হয়। J. V. Hammer কর্তৃক উল্লিখিত (G. O. R., ১খ, ৪৯৫) 'উছমান বেগ নামে তাঁহার অপর এক পুত্রের সন্ধান 'উছমানী ইতিহাসে পাওয়া যায় না। একই নামধারী তীমূর তাশ-এর একজন পৌত্র সম্ভবত এই বিভ্রান্তির কারণ (নিম্নে দ্র.)। তীমূর তাশের পরিবারপঞ্জী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ



গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধগর্ভে প্রদত্ত বরাতের অতিরিক্ত ঃ (১) বেলীগ-ই ব্রূসেবী, গুলদাশতা-ই রিয়াদ-ই 'ইরফান ব্রূসা ১৩০২ খৃ., পৃ. ৬৩ (দুই তীমূর তাশ-এর ভ্রমাত্মক উল্লেখ হইতে); (২) Zinkeisen, G.O.R., ১খ, ১১২ ('উছমান এবং ওরখান-এর অধীনে সেনাপতিরূপে)।

Franz Babinger (E.I.[1])/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

তীমূর (تیمور-Tanmerlane) ঃ (তায়মূর লঙ-تیمور لنگ) (প্রথম প্রবন্ধ), এশিয়া বিজয়ী, মা ওয়ারা'উ'ন-নাহ্‌র-এর খিত্তা-ই কাশ ("জাহির খিত্তাই দিলকাশ কাশ", য়াযদী)-এর নিকট কাশ শাহরিয়ার সাল-ই মুশ (সিচ্‌কান য়ীল) ৭৩৬/৮ এপ্রিল, ১৩৩৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন। আমীর তারাগাই (تاراغای) [অথবা তুরগাই] [মাতলা' (১খ., ১৮ ب) ঃ তুরগাই-র ঔরসে ও তাকীনা খাতূনের গর্ভে তাঁহার জন্ম। আমীর তারাগাই হাজ্জী বারলাস-এর পূর্বে কাশ ও উহার সন্নিহিত এলাকার শাসক ছিলেন। তিনি চেঙ্গীয খানের বংশধর বলিয়া (তিনি ও) তাঁহার পরিবার দাবি করিতেন (দ্র. ফারীদূন বেক, মুনশাআত, ১খ, ১২৫ (তীমূরের উক্তি (ماخود از دودمان ایلخانیه باشیم); আরও দ্র. নিজামী শামী, ১খ, ২২১, ২৩); Barthold, Turkestan, ১৯২৮, ৫৩; Vambery, History of Bokhara, ২য় সং., লণ্ডন ১৮৭৩ খৃ., ১৬৩, ২খ.; কিন্তু ইহার বিপরীতক্রমে দ্র. আহমাদ যাকী ওয়ালিদী তুগান, "তাহকীক নাসাব আমীর তীমূর", আরমুগান 'ইলমী-তে প্রকাশিত, লাহোর ১৯৫৫ খৃ., ১০৫ প. এবং একই লেখকের রচিত প্রবন্ধ যাহা প্রবন্ধের পরেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মাতলা' প্রণেতার উক্তি অনুসারে (পূ. স্থা.) তীমূরের অষ্টম পিতৃপুরুষ কাজুলাই নূয়ান, যিনি বারুলাস (গোত্রের মূল ছিলেন, চেঙ্গীয খানের চতুর্থ পিতৃপুরুষের ভাই ছিলেন)। তীমূরের সমাধিগাত্রে (আরবী ভাষায়) যে লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে উহাতে তীমূরের বংশতালিকা নিম্নরূপ প্রদত্ত হইয়াছে ঃ তূমনাই খান, কাচুলাই, ঈরযূমচী বারুলা (মাতলা' ঈরদুমজী নুয়ান; অধিকতর মাতলা'-তে সূপূচীচিন), কারাচার নূয়ান, অধিকতর মাতলা'-তে ঈচিল; ঈলিঙ্গীর (তূগান রচিত ও আরমূগান, ইল্‌মী, ১০৫-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে এবং বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ঈলিঙ্গীয উক্ত হইয়াছে), বুরকিল, আরাগাই, তীমূর (মাতলা' ও আরমুগান 'ইলমী-তে কতিপয় নামের বানান সামান্য ভিন্নতর উল্লিখিত হইয়াছে এবং তীমূর ও তুমনাই-এর মধ্যে দুইটি অতিরিক্ত নামেরও উল্লেখ রহিয়াছে, উপরোক্ত লাইনসমূহ দ্র. Blochet তাঁহার Introduction a l'histoire des Mongols. লণ্ডন ১৯১০ খৃ., ১খ, ৬০ প. গ্রন্থে উক্ত লিপিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপরোক্ত লাইনসমূহে নামের বানান তদনুসারেই লিখিত হইয়াছে)। তীমূরের নিন্দুক ইব্‌ন 'আরাবশাহ (পৃ. ৫) লিখিয়াছেন যে, তীমূর এক মেষ পালকের পুত্র ছিল এবং প্রথম জীবনে সে লুটতরাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত [কিন্তু উহার পরপরই লিখিয়াছেন (দ্র. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ح) যে, "তবে বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, তাঁহার পিতা সুলতানের সভাসদবর্গের অন্যতম ছিল] এবং ভেড়া চুরি করিবার সময় যখম হওয়ার কারণে তাহার 'লং' উপাধি হয়" (ইব্‌ন 'আরাবশাহ, ৫খ, ৫; দ্র. তীমূরের যবানীতে ইব্‌ন খালদূনের বর্ণনা, শা. ৪৭)। তীমূরকে কূরগান অর্থাৎ "খাকানের জামাতা" নামেও অভিহিত করা হইত। ইহা ছাড়া আমীর, 'আল-আমীর'ল-কাবীর' ও "সাহিব কিরান"ও তাঁহার অন্যান্য উপাধি ছিল। ৭৯০/১৩৮৮ সনে তীমূর চূড়ান্তরূপে সুলতান উপাধি ধারণ করেন। মৃত্যুর পর তাঁহার নাম হয় "জান্নাত মাকান"।

অল্প বয়সেই তিনি মেধা, দূরদৃষ্টি ও সাহসিকতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথমদিকে স্থানীয় শাসনকর্তা আমীর কাযুগানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময় (তূগলুক) তীমূর খানের হামলার মুখে হাজ্জী বারলাসের সহিত পলাতকের জীবন গ্রহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশবাসীর প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনার জন্য দেশজয়ীদের সামনে হাযির হন। তাঁহাদের নিকট এইরূপ চিত্তাকর্ষক ভাষায় ও সাহসিকতার সহিত নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করেন যে, হামলাকারিগণ এইরূপ একজন বিদ্রোহীকে নিজেদের দলভুক্ত করিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার নিজ দেশের শাসনভার অর্পণ করেন (য়াযদী, পূ. স্থা., ১খ, ৫৯। ৫৯-এ উক্ত হইয়াছে যে, জনৈক আমীর জাতা তীমূরের সাহসিকতা ও বাগ্মিতার কথা খানের নিকট উল্লেখ করিলে খান তাঁহাকে দূত মারফত ডাকিয়া আনেন এবং কাশ, তূমান মুরুছী ও সন্নিহিত এলাকার শাসনভার অর্পণ করেন)। পরবর্তী বৎসর (৭৬২/১৩৬১) (তূগলুক) তীমূর স্বীয় বিজিত এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ পুত্র ইল্‌য়াসকে সমরকন্দের গভর্নর নিয়োগ করেন এবং তীমূরকে তাঁহার অধীনে মন্ত্রিত্বের পদ প্রদান করেন। কিন্তু তীমূর তাঁহার আশপাশের লোকজনের বোকামীর কারণে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজ শ্যালক (য়াযদী, ১খ, ৬৫) আমীর হুসায়নের সহিত মিলিত হন, যিনি তখন হামলাকারীদের মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন।

(তূগলুক) তীমূর ও ইলয়াসের পালাও শেষ পর্যন্ত আসিয়া পড়ে। তাঁহারা উভয়েই পরাজিত ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। তীমূর এইবার স্বীয় মিত্র আমীর হুসায়নের বিপক্ষে চলিয়া যান, তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসেন এবং এক কৃত্রিম সন্ধির পর তাঁহাকে হত্যা করেন। এইবার তিনি বাল্‌খের অধিপতি হইয়া বসেন। সুতরাং ১২ রামাদান, ৭৭১/১০ এপ্রিল, ১৩৭০ সনে তীমূর "চুগতা'ঈর স্থলাভিষিক্ত ও চেঙ্গীযের বংশধর" উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত শাসনকাল জাতা ও খাওয়ারিযম বিজয়ের পর হইতে শুরু হয়, যেজন্য তাঁহাকে দশ বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হয় (৭৭১-৭৮২/১৩৬৯-১৩৮০) এবং নয়বার সেনা অভিযান পরিচালনা করিতে হয়, পাঁচবার জাতা ও চারবার খাওয়ারিযম-এর বিরুদ্ধে। ইসলামের সহায়তাকারী হিসাবে তীমূর 'উলামা' ও নব প্রতিষ্ঠিত নাক্‌শবানদিয়া সিলসিলাকে অত্যন্ত মান্য করিতেন এবং যখনই কোনও যুদ্ধের জন্য বাহির হইতেন তখনই সাধু পুরুষ, পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের একটি বিরাট দল তাঁহার সঙ্গী হইতেন।

৭৭৭/১৩৭৫ সনে কীচাক বিভক্তির সময় তীমূর তুকতামিশ (দ্র. তুকতামিশ খান)-এর সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ক্রিমিয়ার খান ছিলেন এবং আক উরদূর সরদার উরূস তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৭৮২/১৩৮০-৮১ সনে তীমূর তুকতামিশকে রুশদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। খান মস্কো জয় করিয়া উহার ধ্বংস সাধন করেন। কিন্তু চারি বৎসর পর তুকতামিশ নিজের সাহায্যকারীর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। প্রথমদিকে তিনি জয়ী হইলেও পরে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। তীমূর তাঁহাকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু খান নিজেই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিলেন। সুতরাং ৭৯০/১৩৮৮ সনে তিনি মা ওয়ারা'উ'ন-নাহ্‌র আক্রমণ করেন এবং তীমূরের পুত্র 'উমার শায়খ ও তাঁহার সৈন্যবাহিনীর নেতৃবৃন্দকে পরাজিত করেন। ইহার ফলে সমরকন্দ বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়ে। সরেযমিনে অবস্থা পরিদর্শনের জন্য তীমূরকে সেইখানে গমন করিতে হয়। ৭৯৩/১৩৯০-৯১ সনে পুনর্বার হামলা করা হইলে 'উমার শায়খ এইবার তাঁহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন এবং বিদ্রোহী খান দেশ ছাড়িয়া গুরজিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু চার বৎসর পর পুনরায় হামলা করেন।

৭৮২/১৩৮০-৮১ সনে তীমূর ইরান জয়ের সঙ্কল্প করেন এবং খুরাসান আক্রমণ করিয়া উহার সূচনা করেন। খুরাসান তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। ৭৮৪/১৩৮৩ সনে বিধর্মী মুগলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানশেষে প্রত্যাবর্তনের পর তীমূর গুরগান, মাযানদারান ও সীস্তান একের পর এক দ্রুত জয় করেন। স্থানীয় শাসনকর্তাগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয় এবং নামেমাত্র তাহাদের রাজত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। ইহার পূর্ববর্তী বৎসর হিরাতের বিদ্রোহ দমন করা হয় এবং সেই সঙ্গে কুর্‌ত্ বংশের শাসনেরও অবসান ঘটে। ৭৮৬/১৩৮৪-৮৫ সনে (আমীর) ওয়ালী মাযানদারানের সিংহাসন ছিনাইয়া লওয়া হয়। ৭৮৮ হইতে ৭৮৯/১৩৮৬-১৩৮৭ পর্যন্ত তীমূর ফারস, 'ইরাক ('আজাম), উরিস্তান ও আযারবায়জান বিজয়ে ব্যাপৃত থাকেন। সুলতান আহমাদ জালাইর পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তীমূর একটি শীতকাল তিবরীযে অতিবাহিত করেন। যখন ইসফাহানবাসীর উপর কঠোর জরিমানা আরোপিত হয় এবং তাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে তখন শাস্তিস্বরূপ সেইখানকার সত্তর হাজার অধিবাসীকে হত্যা করা হয় এবং তাহাদের মস্তক দ্বারা কিল্লার মিনার নির্মিত হয় [য়াযদী, ১খ, ৪৩৪; গিয়াছু'দ-দীন, রোযনামা-ই গাযওয়াত হিন্দুস্তান, যীমান-এ মুদ্রিত, ৩০ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে যে, নিহত ব্যক্তিদের মাথা দ্বারা যে 'মীল হায় রাফী (میل های رفیع) নির্মিত হয়, উহার উচ্চতা সুউচ্চ অট্টালিকা অপেক্ষাও বেশি ছিল]। কথিত আছে যে, হাফিজ শীরাযীর সঙ্গেও তীমূরের বাক-বিতণ্ডা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয় নাই।

১০ রামাদান, ৭৯৪/৩১ জুলাই, ১৩৯২ সনে (য়াযদী, ১খ, ৫৬৮; গিয়াছু'দ-দীন রোযনামা-ই গাযাওয়াত হিন্দুস্তান, ৩০) তীমূর তাঁহার "পাঁচসালা অভিযানে" রওয়ানা হন। এই অভিযানের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নিম্নরূপ ঃ কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী এলাকার মুলাহিদাদের নির্বিশেষে হত্যা ('মুলাহিদার' স্থলে 'ফিদা'ইয়া-এর জন্য দ্র. য়াযদী, ১খ, ৫৭৪, ৫৭৭; জাহীরু'দ্- দীন মার'আশী, তা'রীখ তাবারিস্তান, B. Dorn, পিটার্সবার্গ ১৮৫০ খৃ., ৪৩০প.)। পারস্যের মুজাফফার বংশের ধ্বংসসাধন (৭৯৫/১৩৯৩) এবং বায়না'ন-নাহ্‌রায়ন অভিযান। আহমাদ জালাইর শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টার পর সিরিয়ার দিকে পলায়ন করেন এবং সেইখানে মিসরের সুলতান আল-মালিকুজ্-জাহির বারকূক-এর আশ্রয় লাভে সমর্থ হন। আল-মালিকুজ-জাহির এই আশ্রিতকে তীমূরের নিকট সোপর্দ করিতে অস্বীকার করিলে তীমূর এশিয়া মাইনর আক্রমণ করিয়া এডেসা (Edessa) জয় করেন এবং লুটতরাজ চালাইয়া উহার ধ্বংস সাধন করেন; তাকরীত দখল করিয়া নেন এবং সেইখানে কিল্লা মিনার তৈয়ার করেন (য়াযদী, ১খ, ৫৬৬)। তিনি মারদীন ও আমিদও অবরোধ করেন। কিন্তু এই যুদ্ধ চলাকালীন 'উমার শায়খের ইনতিকাল হয়। তূকতামিশ-এর এক নূতন হামলার কারণে প্রতিরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া তীমূর ৭৯৭/১৩৯৫ সনে (দাশ্‌ত) কীচাক-এর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং এক বৎসরেরও বেশি সময় ধরিয়া মস্কোর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখেন। অতঃপর তিনি গুরজিস্তান আক্রমণ করেন এবং ইরানে কয়েকবার বিদ্রোহ দমন করেন।

শারাফু'দ-দীনের বর্ণনামতে (য়াযদী, ২খ, ১৫) তীমূরের ধারণা ছিল যে, ভারতের বাদশাহ সীমাহীন উদার ছিলেন (রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের কাফিরদের নিকট হইতে অল্প কিছু সম্পদ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের কুফর ও গোমরাহীতে অটল থাকিতে দেওয়া হয়)। সুতরাং ৮ রাজাব, ৮০০/২৭ মার্চ, ১৩৯৮ সনে তীমূর ভারতবর্ষের দিকে রওয়ানা হন। ১২ মুহাররাম, ৮০১/২৪ সেপ্টেম্বর, ১৩৯৮ সনে তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন এবং ৭ রাবী'উছ ছানী (১৮) ডিসেম্বর দিল্লী অধিকার করেন। নগরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তীমূর লুণ্ঠন করিয়া শহরটি বিরান করিয়া দেন এবং উহার আশি হাজার বাসিন্দাকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। সুলতান তৃতীয় মাহমূদ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান। তীমূর অল্প দিন পূর্বেই তাঁহার সাম্রাজ্য বিভিন্ন আমীরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই নূতন পরিস্থিতি মুকাবিলা করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইল। সিরিয়ায় সবেমাত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল এবং আহমাদ জালাইর দ্বিতীয়বার বাগদাদ দখল করিয়া আযারবায়জান আক্রমণ করিয়াছিল। কারণ সেইখানে তীমূরের পুত্র মীরান শাহের অত্যাচার, অবিচার ও বাড়াবাড়ির কারণে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তীমূর ও প্রথম বায়াযীদের মধ্যেও বৈরিতা শুরু হয় এবং মিসরের নূতন বাদশাহ ফারাজ তীমূরের জনৈক (কিল'আদার আতলামাশ কূচীন)-কে মুক্তি প্রদান করিতে অস্বীকার করেন, বরং আলোচনার জন্য যে দূতদের প্রেরণ করা হইয়াছিল দামিশকের ওয়ালী তাহাদিগকে হত্যা করান (য়াযদী, ২খ, ২৭৫ প.)।

মীরান শাহের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের পর তীমূর গুরজিস্তান লুণ্ঠন করেন এবং মুহাররাম ৮০৩/আগস্ট ১৪০০ সনে এশিয়া মাইনরের দিকে যাত্রা করেন। সীওয়াসে মুসলমানদের নিরাপত্তা কর প্রদান করিতে হয় এবং উহার বিনিময়ে তাহাদের জীবন রক্ষা পায়। কিন্তু সেইখানকার বাসিন্দাদের বেশীর ভাগ ছিল আর্মেনীয় এবং তাহাদিগকে বন্দী করিয়া নিয়া যাওয়া হয়। যেই সকল সৈনিক (এইখানে সৈনিক অর্থ আরোহী, দ্র. 'তীমার শীর্ষক প্রবন্ধ, ৪খ, ৮৯৫) তীমূরের সৈন্যদের বিরোধিতা করিয়াছিল এবং যাহাদের সংখ্যা ছিল চারি সহস্র, তাহাদিগকে কূপের মধ্যে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয় (নিজামী, শামী, ১খ, ২১৯, দ্র. য়াযদী, ২খ, ২৬৯)। মিলাতিয়্যাও বিজিত হয় (সেইখানেও মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা করের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আর্মেনীয়দিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, নিজামী শামী, ১খ, ২২০)। ইহার পর তীমূর সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। এইখানে তিনি আলেপ্‌পো (হালাব) জয় করেন এবং 'আলিমদের নিকট হইতে এই ফাতওয়া নেওয়ার পর যে, যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার ও তাহার শত্রুপক্ষের লোকদের মধ্যে কাহাদের শহীদী মর্যাদা লাভ হইবে (ইব্‌ন 'আরাব শাহ, অনুসরণে ঃ তা'রীখ ইবনু'শ-শিহনা) আলেপ্‌পোতে তিন দিন পর্যন্ত লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালাইবার নির্দেশ প্রদান করেন (হাফিজ আবরূ, যিনি তখন স্বয়ং আলেপ্‌পোতে উপস্থিত ছিলেন, বলেন যে, (পৃ. ৬৩৮), পরের দিন পর্যন্ত সৈন্যদল ঘরবাড়ি ও দালান-কোঠা ধ্বংস সাধন এবং লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞে ব্যাপৃত থাকে)। হামাত, হিমস ও বা'লাবাক বারবার পদানত হয়। সুলতান ফারাজ পরাজিত হন এবং দামিশ্‌ক বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয়। তীমূর সেইখানে লুণ্ঠনকার্য চালান এবং সেইখানকার বাসিন্দাদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করেন (দামিশ্‌কের সেনাবাহিনীর সকলেই ক্রীতদাস ছিল, তাহাদিগকে এবং দামিশক দুর্গ ও দামিশ্‌ক নগরীর সকল বাসিন্দাকে বন্দী ও তাহাদের মালামাল লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। শহরটি জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। দামিশক হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তীমূর দামিশক ও সমগ্র সিরিয়ার বন্দীদের মুক্তি দানের এবং তাহাদিগকে দামিশক অভ্যন্তরে পৌছানোর নির্দেশ প্রদান করেন (য়াযদী, ২খ, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৪১)। (প্রবন্ধকার য়াযদী ব্যতীত অন্য কোনও উৎসের ভিত্তিতে লিখিয়াছেন যে; তীমূর) 'আলিমদের নিকট হইতে জোরপূর্বক এই মর্মে ফাতওয়া আদায় করিয়াছিলেন যে, দামিশকবাসীদের ক্রীতদাস বানানো বিধিসম্মত। ২৭

যু'ল-কা'দা, ৮০৩/১০ জুলাই, ১৪০১ সালে তীমূর অতর্কিত বাগদাদ জয় করেন এবং বাগদাদ অবরোধের সময় তাঁহার নিহত অফিসারদের প্রতিশোধস্বরূপ ব্যাপক আকারে হত্যাযজ্ঞ চালান। বিশ সহস্র এবং ইব্ন 'আরাব শাহ্-র মতে চল্লিশ সহস্র জীবন (দ্র. 'আজা'ইবু'ল-মাকদূর, লণ্ডন ১৬৩৬ খৃ.) এই হাঙ্গামায় বিনষ্ট হয়। এই এলাকাটিকে কুরা য়ূসুফের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য আবূ বাক্র ইব্ন তীমূরকে আদেশ প্রদান করা হয়।

তুরস্কের সুলতান বায়াযীদ মিসরের আব্বাসীদের নিকট হইতে শাসন ক্ষমতার সনদ তলব এবং তীমূরের বন্ধু বুযানতী বাদশাহকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এখন তিনি তীমূরের অন্যান্য মিত্রের অর্থাৎ এশিয়া মাইনরের আমীরদের সঙ্গেও সংঘর্ষে লিপ্ত হন (কিন্তু দ্র. য়ায্দী, ২খ, ৩৮৯ প.) তীমূর গুরজিস্তানের সদ্য সমাপ্ত অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে লড়াই বাধিয়া যায় এবং তাহাদের ভাগ্যের ফায়সালা আঙ্কারার যুদ্ধক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ আঙ্কারার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত (চিবুক আবাদ, সামী, ৩খ, ১৮৬৭) নামক স্থানে ১৯ যু'ল্-হিজজা, ৮০৪/২১ জুলাই, ১৪০২ সনে অনুষ্ঠিত হয়। বা সায়াযীদের সৈন্যবাহিনীর বিন্যাস সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী ছিল না বলিয়া তাঁহার সৈন্যদের অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করা সত্ত্বেও বায়াযীদের শেষ পর্যন্ত পরাজয় হয়। বায়াযীদ পলায়নপর ছিলেন, এমন সময় তাঁহার ঘোড়া পড়িয়া গেলে তিনি বিজয়ীর হাতে ধরা পড়েন। তীমূর তাঁহার সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করেন এবং যখন ১৪ শা'বান, ৮০৫/৮ মার্চ, ১৪০৩ সনে আক শেহীরে বায়াযীদের ইনতিকাল হয় তখন তীমূর দারুণ মর্মাহত হন (য়ায্দী, ২খ, ৪৮৯)। একটি ফারসী কবিতার পংক্তির অর্থ ভুল বুঝার কারণে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি লৌহনির্মিত পিঞ্জরে আবদ্ধ অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কল্পিত কাহিনী মাত্র, ইহার পক্ষে কোনও প্রমাণ নাই।

বারূসা ও সামারনা (স্মার্না) অধিকৃত হইলে এই শহরগুলিতে নূতন নূতন অত্যাচার চালানো হয়। এশিয়া মাইনরে অবস্থানকালে তীমূরের পৌত্র এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদ সুলতানের ইনতিকাল হয়। মিসরের দূত দরবারে আগমন করেন এবং মিসর তীমূরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লয়। বায়যান্টাইন সম্রাট অষ্টম জনের তরফ হইতেও দূত প্রেরিত হয়। গুরজিস্তানও একটি করদ রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ৮০৭/১৪০৪ সনে তীমূর সমরকন্দ প্রত্যাবর্তন করেন। সেইখানে একাধিক দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন Ruy Gonzalez de Clavijo, ইনি Castile-এর রাজা তৃতীয় হেনরীর নিকট হইতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ যে, তিনি সমরকন্দের দরবার এবং তীমূরের একাধিক পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে যেই মনোরম সমাবেশ সেইখানে অনুষ্ঠিত হয় সেই সম্পর্কে সুন্দর বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর তীমূর এক নূতন অভিযানের সূচনা করেন। এই অভিযান ছিল চীনের বিরুদ্ধে। কারণ তীমূর কোনক্রমেই মানিয়া নিতে পারিতেছিলেন না যে, সেইখানে তাঁহার ভূমিকা কেবল একজন তত্ত্বাবধায়কেরই থাকিবে। সমরকন্দে কুরিল্তাই অনুষ্ঠিত হইল। সেইখানে যুদ্ধ ঘোষণার উপর পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৩ জুমাদাল উলা, ৮০৭/২৭ নভেম্বর, ১৪০৪ তিনি এই অভিযানে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে বরফ আবৃত জায়হূন নদী (আমু দরিয়া) অতিক্রম করেন। উতরার নামক স্থানে তূকতামিশের আবেদনক্রমে তীমূর তাঁহাকে মাফ করিয়া দেন। ১০ শা'বান, ৮০৭/১১ ফেব্রুয়ারী, ১৪০৫ সনে তীমূর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন তিনি সকল বিষয়ে ওসিয়াত করিয়া রাখেন। অতঃপর ১৭ শা'বান/১৮ ফেব্রুয়ারী রাত্রিবেলা ৭১ (চান্দ্র) বৎসর বয়স ৩৬ বৎসর দেশ শাসনের পর এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। (২২ শা'বান) তাঁহার মৃতদেহ আবনুস কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে করিয়া সমরকন্দ নিয়া আসা হয় এবং সেইখানে তাঁহার সালাতুল জানাযা ও দাফনের অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। সেই জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা গোরেমীর, যেইখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়, আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

তীমূর দুইজন চীনা রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্ন 'আরাব শাহ তাঁহাদেরকে আল-মালিকাতু'ল-কুবরা ও আল্-মালিকতুস্-সুগরা অর্থাৎ বড় রানী ও ছোট রানীরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তীমূর নাখশারের শাসনকর্তা আমীর মূসার কন্যা তূমান এবং অপর এক রমণী জালবানকেও বিবাহ করিয়াছিলেন। জালবান (য়ায্দী, ১খ, ৬৬৫-তে চালপান) অত্যন্ত সুন্দরী রমণী ছিলেন; কিন্তু কোন এক কথিত অপরাধের কারণে তীমূর তাঁহাকে হত্যা করান (ইব্ন 'আরাবশাহ্র ধারণা, সে তাঁহার প্রিয় দাসী ছিল)। এতদ্ব্যতীত তাঁহার হেরেমে বহু সংখ্যক দাসীও ছিল ["আস্-সারাবী ওয়া'ল-হাজায়া", ইব্ন 'আরাবশাহ, তীত=৪১৯]। তীমূরের পুত্রদের নাম নিম্নরূপ ছিল ঃ গিয়াছু'দ-দীন জাহাঙ্গীর (মৃ. ৭৭৭/১৩৭৫-৭৬ নিজামী শামী, ১খ, ১৪৭; হাফিজ আবরূ, যুবদা, ৫৩১; য়ায্দী, ১খ, ২৭১), মু'ইয়্যু'দ্-দীন 'উমার শায়খ (যিনি কুর্দিস্তান অতিক্রম করিয়া বাগদাদ যাইতেছিলেন, এমন সময় বাগদাদ হইতে চারি মানযিল দূরবর্তী খুরমাতু দুর্গের নিকট ইনতিকাল করেন, ৮৯৬/১২৯৬-এর শেষভাগ অথবা ১২৯৭-এর প্রথম ভাগ; য়ায্দী, ১খ, ৬৬৮), জালালু'দ-দীন (কুরগান) 'উরফ মীরান শাহ (মৃ. ২৪ যি'ল্-কা'দা, ৮১০/১৪০৮), শাহ রুখ, ভাগ্য তাহাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে (মৃ. ৮৫০/১৪৪৭)। ইহা ব্যতীত তাঁহার একজন কন্যাও ছিল। তাঁহার নাম ছিল সুলতান বাখ্ত এবং সুলায়মান শাহের সহিত তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তীমূর এই ভাবিয়া যে, তাঁহার রাজত্ব তো আর চিরদিন টিকিয়া থাকিবে না এবং ইহা লইয়া যেন তাঁহার পর কোনও গৃহযুদ্ধের অবতারণা না হয়, তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য নিজের পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করিয়া দেন। তবে মুহাম্মাদ সুলতান ইব্ন গিয়াছু'দ্-দীন (জাহাঙ্গীর) এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা পীর মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর-এর জন্য অগ্রাধিকারের প্রস্তাব রাখিয়া যান।

তীমূরের চরিত্রে গাম্ভীর্য ও অধ্যবসায় বিদ্যমান ছিল। তিনি খেলাধুলা ও আনন্দ-তামাশা প্রদর্শন মোটেও পসন্দ করিতেন না। তিনি সর্বদা আশা করিতেন যে, তাঁহার সহিত স্পষ্টবাদীর ন্যায় ব্যবহার করা হউক, তাহাতে যদি তাঁহাকে দুঃখও পাইতে হয় তবুও কিছু যায় আসে না [দ্র. لا يحب المزاح والكذب ولا يستميله اللهو واللعب ইব্ন 'আরাবশাহ, شصح (৩৯৮)]। ক্লাভিজো (Clavijo) তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি সত্য সত্যই অপরাধীদের সহিত নির্দয় ব্যবহার করিতেন। তাঁহার আল্লাহপ্রদত্ত স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল ("তিনি নিরক্ষর ছিলেন, লেখাপড়া জানিতেন না, 'আরবী ভাষায় অজ্ঞ ছিলেন, কেবল ফারসী, তুর্কী ও মুগূলী জানিতেন এবং শুধু এই পর্যন্তই"; ইব্ন 'আরাবশাহ, ص=৪০৩)। যেহেতু তিনি স্বয়ং শিক্ষা হইতে বঞ্চিত ছিলেন, তাই জ্ঞানী-গুণীদের অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং সর্বদা তাহাদিগকে পুরস্কার ও সম্মানে

ভূষিত করিতেন। যেই সকল বিষয় 'তীমূরী' নামে অভিহিত সেইগুলির সূচনা তাঁহার আমলেই হইয়াছিল। সমরকন্দকে তিনি জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকা দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন এবং উহাকে এক আন্তর্জাতিক বিপণী কেন্দ্রে পরিণত করেন, যাহা অন্তত তাঁহার জীবদ্দশায় তিবরীয ও বাগদাদের স্থান দখল করিয়াছিল। তীমূর তাঁহার বিজিত শহরগুলি হইতে শিল্পী ও কারিগরদের সমরকন্দে নিয়া আসেন। তিনি ব্যবসায় ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য সম্ভব সব কিছু করেন এবং স্বীয় বিজিত এলাকার সহিত ভারতবর্ষ ও পূর্ব ইরানের বাণিজ্যের নূতন স্থলপথ খুলিয়া দেন। সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী জনকল্যাণের স্বার্থে তিনি বড় বড় নির্মাণ কাজ সমাধা করেন। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও সামরিক বিষয়াদি তিনি যুক্তিসঙ্গত ও সঠিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন এবং ইসলাম বিস্তারে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

তীমূর দীর্ঘদেহী ব্যক্তি ছিলেন [(ইব্ন 'আরাবশাহ, شصز (=৩৯৭]। কপাল ও মাথা বেশ বড় এবং গায়ের রং লাল সাদা ছিল। মাথার চুল অল্প বয়সেই সাদা হইয়া গিয়াছিল। ডান হাত এবং ডান পায়ে যখম হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহার গঠনে সামান্য ত্রুটি দেখা দিয়াছিল [ইব্ন আরাবশাহ, شصح (৩৯৮) ঃ وشل اعرج اليمناوين]। ইরানী অথবা ভারতীয় চিত্রকরদের অঙ্কিত তাঁহার অসংখ্য চিত্র রহিয়াছে, তবে উহাদের অধিকাংশই কাল্পনিকমাত্র (দ্র. Vambery, Gesch. Bochara's, ১খ, ২১২-২১৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তীমূরের রচনাবলী (১) মালফূজাত ও (২) তূযুক্বাত-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু উহার মৌলিকত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। তবে উহা সত্য যে, তিনি নিজের আমলের দুইটি সরকারী ইতিহাস গ্রন্থ স্বয়ং রচনা করাইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ দুইটির একটি (৩) তা'রীখ খানী (দ্র. য়াযদী, জাফারনামা, ১খ, ২৫), যাহা তুর্কী পদ্যে ও আরবীগুর লিপিতে রচিত। গ্রন্থটি বর্তমানে অপ্রাপ্য এবং অপরটি (৪) নিজামু'দ-দীন শামী, জাফারনামা (৮০৬ হিজরীর শেষ পর্যন্ত)। ইহার পাণ্ডুলিপি বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে (Add. 23, 980) (অন্যান্য কপির জন্য দ্র. সিটোরী, ১খ ২/২, ২৯৭; (মুদ্রণ, বিশুদ্ধকরণসহ, ফিলিক্স তাউইর এবং প্রকাশনা চেকোশ্লোভাক ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট, প্রাগ, দুই খণ্ডে); (৫) শারাফু'দ-দীন 'আলী য়াযদী, জাফারনামা, ইহার গ্রন্থপঞ্জীতে জাফারনামা, শামীও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এবং য়ুরোপে তীমূরের ইতিহাস গ্রন্থাবলীর মধ্যে এইখানিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ; (৬) য়াযদীর গ্রন্থের ভাষা, হাফিজ আবরু রচিত; এইখানিও প্রফেসর ফিলিক্স তাউইর প্রকাশ করিয়াছেন; দ্র. সিটোরী, পূ. স্থা.; (৭) ইব্ন 'আরাবশাহ, 'আজা'ইবু'ল্ মাকদূর ফী (আখবারি তীমূর), ইব্ন 'আরাবশাহ তীমূরের ঘোর অপবাদ দানকারী; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি তীমূরের উচ্চ মানসিকতা ও চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাও পোষণ করেন এবং তাঁহার গ্রন্থে সমরকন্দ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়াছে; (৮) হাফিজ আবরু, যুবদাতু'ত-তাওয়ারীখ বইসুনগারী, দ্র. সিটোরী, ১খ, ২ অংশ ঃ ৮৮); (৯) কামালু'দ-দীন 'আবদু'র-রাযযাক সামারকান্দী, মাতলা'উ'স-সা'দায়ন' প্রথম খণ্ড, বিশুদ্ধিকৃত; মুহাম্মাদ শাফী' লাহোরী, ২খ, ১-৩ অংশ, লাহোর; (১০) মীর খাওয়ান্দ, রাওদা, ৬খ, বিশেষ করিয়া (১১) খাওয়ানদামীর, হাবীবু'স্-সিয়ার, পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সর্বোত্তম; (১২) von Hammer, Gesch, d.Osm, Retches, ৭ম ও ৮ম খণ্ডে, সমসাময়িক 'উছমানী ও বায়যান্টাইন ঐতিহাসিকদের সারাংশ উল্লেখ করিয়াছেন; (১৩) ফারীদুন বেক, মুনশাআত-এরও উল্লেখ করা প্রয়োজন; ইহা একটি মূল্যবান দলীল সঙ্কলন; (১৪-১৬) য়ুরোপীয় পর্যটকগণের মধ্যে Clavya, Schiltberger Boucicault উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জীর আরও অধিক বিবরণের জন্য আমরা নীচের মূল্যবান গ্রন্থসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ঃ (১৭) E. Blochet, Introduction a' L'Histoire des Mongols; (১৮) E.G. Browne, A History of Persian Literature under Tartar Dominion, ১৮০-৮৫; (১৯) ও (২০) L. Zimine-এর নিম্নোক্ত রচনাবলীও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ Les details de la mort de Timur (Protocoles et commmunications de la Societe archeologique du Turkestan) এবং Les exploits d'Emirzade 'Omar Cheikh (RMM, ১৯১৪ খৃ., ২৮খ, ২৪৪-৪৫)/ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ; (২১) Petis de la Croix -এর অনুবাদ শারাফু'দ-দীন ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে খুব কমই ব্যবহৃত হইয়াছে; পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে (২২) D'Herbelot; (২৩) Gibbon ও (২৪) De Guignes (Hist. des Huns, ২০ খ.) সর্বপ্রধান ঐতিহাসিকবৃন্দ; আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নিম্নোক্তগণ উল্লেখযোগ্য ঃ (২৫) Vambery, Gesch, Bachara's, মূলঃ ইংরেজী, লণ্ডন ১৮৭৩, উর্দূ অনুবাদ, মাজলিস তারাককী আদাব, লাহোর ১৯৫৯ খৃ., অধ্যায় ১০-১১; (২৬) Skrine ও Ross, The Heart of Asia; (২৭) Sykes, History of Persia, অধ্যায় ৫৯; (২৮) E. G. Browne, উল্লিখিত গ্রন্থ, ২খ.; (২৯) Gaplic Ka, the Turks is central Asia; (৩০) Grousset, Histoire de L'Asie, ২খ.; (৩১) Carra de Vaux, les Penseurs de L'Islam, প্যারিস ১৯২১ খৃ., ৪৮-৫৯)।

L. Bouvat (দা. মা. ই.)/ মু. আবদুল মান্নান

তীমূর (تيمور) ঃ (দ্বিতীয় প্রবন্ধ), তীমূর এশিয়ার মহান দিগ্বিজয়ীদের অন্যতম। মধ্য এশিয়ায় তাঁহার নামের বানান সাধারণত তিমূর (Temur=تمور) লেখা হইত এবং 'উছমানী লেখকদের নিকট হইতেও অনুরূপ বানান উল্লিখিত রহিয়াছে। য়ুরোপে তাঁহার নামের সহিত ফারসী লেং (لنگ= খোঁড়া) শব্দ সংযুক্ত হয় এবং সেইখানে তিনি তামারলেইন (Tamerlane) নামে পরিচিতি লাভ করেন। আরবী ভাষায় শব্দটি সর্বদা 'যের' দ্বারা লেখা হইত বলিয়া ইহার বানান 'তীমূর' (Timur, تيمور الاعرج)-এ পরিণত হইয়াছে। তীমূরের নিজ বংশধরগণ তাঁহাকে সর্বদা তিমিরবেক নামে অভিহিত করিত।

তীমূর ২৫ শা'বান, ৭৩৬ এপ্রিল/১৩৩৬ সনে মধ্য এশিয়ার এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামটি তৎকালে হোজা ইলগার (Hoja Ilgar) নামে পরিচিত ছিল [বর্তমানে মেওলূদ্খানে (Mevluthane) নামে অভিহিত] এবং আধুনিক সব্য নগরীর নিকট অবস্থিত ছিল [সব্য নগরী তৎকালে কেশ (كش) নামে অভিহিত ছিল]। তীমূরের ইচ্ছা ছিল, পরবর্তী কালে এইখানেই তাঁহার রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইবে (Vambery, History of Bokhara, ২০৪) এবং (মৃত্যুর পর) এইখানেই তাঁহাকে তাঁহার বংশীয় প্রধান ওয়ালী সায়্যিদ (আমীর) কুলালের পার্শ্বে সমাহিত করা হইবে (আমীর কুলাল সেই ব্যক্তি যাঁহার উল্লেখ জামী, নাফাহাত, ৪৩৬ এবং 'আলী, রাশহাত, লাখনৌ ১৩০৮ হি., ৪২-তে রহিয়াছে?)। এই উদ্দেশ্যে তিনি সেইখানে কয়েকটি জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকাও নির্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি তাঁহাকে সমরকন্দে রাজধানী স্থাপনে বাধ্য করে। তীমূরের সম্পর্ক মুগল বংশের বারলাশ (برلاس) গোত্রের সহিত ছিল; বরং এইরূপ বলা যায় যে, তাঁহার

ও চেঙ্গীয খানের বংশ মূলত একই ছিল এবং তাঁহারা বারলাস গোত্রের উপর শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তীমূর সম্পর্কিত ইতিহাস গ্রন্থাবলীতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাঁহার সমাধি শিলালিপিতেও অনুরূপ উক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু রাশীদু'দ্-দীনের রচনায় [যাহার আরম্ভ তীমূরের জন্মের (৩৬) বৎসর পূর্বে হইয়াছিল] যেই সমস্ত উৎস হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও ইহাই সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া উঠে। চেঙ্গীযের সমসাময়িক ও মহান নেতাদের অন্যতম কারা চার নূয়ান সম্পর্কে রাশীদু'দ-দীন লিখিয়াছেন, "সে উরূগ বুযেনজার চানমুনতাক (Canmuntaq) বংশীয় ছিল।" এতদ্ব্যতীত তিনি কারা চারের তৃতীয় পিতৃপুরুষ (প্রপিতামহ) কাচুলাই সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, তিনি তূমনাই খান (Tumene Han)-এর নয় পুত্রের অন্যতম এবং চেঙ্গীযের চতুর্থ পিতৃপুরুষ (পিতামহের পিতামহ) ছিল" (মুহাম্মাদ শাফী', আরমুগান 'ইলমী, ১০৯-১১০) [মাতলা' সা'দায়ন-এর বর্ণনা ইহা হইতে ভিন্নতর; দ্র. তীমূর প্রথম প্রবন্ধ; উক্ত গ্রন্থ অনুসারে চেঙ্গীয খান কাচুলাই-এর ভাই-এর প্রপৌত্রের পুত্র]। সুতরাং যে শাখাটি তূমনাই খালফ্ বুযেনজার হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল তীমূরের সম্পর্ক সেই শাখার সহিত ছিল এবং তাঁহার খান উপাধি অর্জিত হয় নাই। এইজন্যই তীমূর ও তাঁহার পুত্র 'বেক', 'সুলতান', আমীর ও আমীরযাদা উপাধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং স্বয়ং তীমূর ব্যক্তিগতভাবে চেঙ্গীযী বংশের শাহযাদাগণকে খান উপাধি দ্বারা গৌরবান্বিত করেন এবং তাঁহাদের নামেই নিজের অধিকাংশ মুদ্রা জারি করেন। চেঙ্গীয ও তাঁহার পুত্রদের ন্যায় তীমূর ও তাঁহার পুত্রগণ নিজেদেরকে এক সুপ্রাচীন তুর্কী পরিবারের বংশধর মনে করিতেন, যাঁহাদের সম্পর্ক ছিল উগুযখানী শাখার সহিত। চেঙ্গীযের সমসাময়িক এবং দক্ষিণ চীনের দূত চিয়াওহোং (Ciao-Hong)-এর মতে এই পরিবারের সম্পর্ক গুওয়াক তুর্কলির-এর শাখা শাতু (?) (Sato)-র সহিত ছিল। অন্য কথায় তাঁহার পূর্বপুরুষগণ বোখারার তুর্কীদের নিকট হইতে নিজেদের শাসন ক্ষমতা ঐ সকল গোত্রের উপর প্রতিষ্ঠা করে যাহারা ভাষাগতভাবে মুগল ছিল, কিন্তু মুগলী ভাষা বলা সত্ত্বেও নিজেদের ভাষাকে তুর্কী মনে করিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জুওয়ায়নী রচিত জাহান গুশাই ও লাহোর যাদুঘরে রক্ষিত উহার অনুলিপিতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, চেঙ্গীয মুগলী ও তুর্কী ব্যতীত অন্য কোনও ভাষা জানিতেন না। তীমূরের পৌত্র উলুগ বেগ স্বীয় গ্রন্থ শাজারা-ই আতরাক-এ একটি তুর্কী কবিতা চেঙ্গীযের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যদিকে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত জামি'উ'ত্-তাওয়ারীখের কপিটিতে (Add.7628) উলুগ বেগের ভাই বায়সুন্গুর মির্যা নিজ হাতে তুর্কী শব্দটি লিখিয়াছেন এবং উহা সোনালী রঙ দ্বারা রঞ্জীন করা হইয়াছে। এইভাবে ভারত সম্রাট বাবুর নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে মুগলদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করিতেন। যাহা হউক, তীমূরের পূর্বপুরুষদের সময় বারলাস গোত্র তুর্কী এবং মুগল দুইটি উপাদানে গঠিত ছিল। নিজামু'দ-দীন শামীর গ্রন্থে একটি গোত্রের নাম "দুলান চাবূন" (Dulan Cavun) উল্লিখিত হইয়াছে। এই গোত্রটি তীমূরের পূর্বপুরুষদের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিল এবং এই নাম মুগলী ভাষার। তীমূর তাঁহার মুদ্রায় মুগলী শব্দ "উকে মেনু" (Uke Menu) অঙ্কিত করাইতেন; কিন্তু শাহরুখ তুর্কী ভাষায় "শাহরুখ সোযুম" (Shahroh sozum) লিপিবদ্ধ করান। ইহার বিপরীতক্রমে তীমূরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে, যাহারা কেশ এলাকায় বসবাসকারী বারলাস গোত্রের উপর শাসন করিত, এমন কিছু লোক ছিল যাহাদের নাম খাঁটি তুর্কী ছিল, যথা "তুগলুক খোজা বারলাস", "ইঙ্গির চাক বারলাস", "তুতান বাশ্লী বারলাস"। অনুরূপভাবে বর্তমানে সমরকন্দে বসবাসকারী বারলাস গোত্রের একটি শাখার নাম "তুবক বারলাস"। অনুমান করা যায় যে, ইহার বিপরীত ""মুগল বারলাস"-ও হয়ত থাকিবে এবং যেহেতু এই গোত্রটি তুর্কী ও মুগল এই দুইটি শাখার সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তাই ইহা একটি দ্বিভাষী গোত্র ছিল। রাজ্যের অধিপতি হইবার পর তীমূর যে কূরিলতাঈ (মু'তামার) তলব করেন তিনি উহার নাম রাখেন "তুরক লিরেন ওয়া চুরগতাঈ উলুসুঙ্গ বুযুক কূরুলতাঈ" (তুর্কী ও চুগতাঈ গোত্রের কূরিলতাঈ বৃযুগ) তাঁহার জীবদ্দশায় যেই সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে তিনি ও তাঁহার পুত্রগণ সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহা চুগতাঈ সাহিত্য নামে অভিহিত ছিল।

সতের বৎসর বয়সে (অর্থাৎ ১৩৫২ খৃ.) তীমূরের তিনজন স্ত্রী ছিল। তন্মধ্যে উলজাই তুরকান নাম্নী প্রথম স্ত্রী মা ওয়ারাউ'ন্-নাহ্র-এর প্রকৃত শাসক কাযাগান খানের পৌত্রী ছিলেন। ইহাকে শুধু একটি আকস্মিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল যে, তীমূরের পিতা ও তাঁহার পরিবারের কৃষক ও যাযাবর শ্রেণীর একটি গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ভূস্বামীর মর্যাদা ছিল। অনুরূপভাবে এই অভিমতও সঠিক নহে যে, তীমূর তাঁহার কর্মদক্ষতার গুণে এইরূপ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন যাহাদের পেশা ছিল দস্যুবৃত্তি (দ্র. ইব্ন 'আরাবশাহ, ৫)। তীমূরের পিতা আমীর তুরগাই একজন ধর্মপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন, যাঁহাকে শুধু বারলাস গোত্রেই সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হইত। কথিত আছে যে, পূর্ব তুর্কিস্তানের শাসনকর্তা তুগলুক তীমূরের উযীর ও প্রধান সেনাপতি আমীর হামীদ, (যাহার ইইমাক) কূরিলগূত ছিল, "আমীর তুরগাই-এর পুরাতন বন্ধু ছিলেন" (জাফারনামা, ১খ, ৫৮, ৯৮)। তুরগাই-র এক কন্যা (শিরীন বেক আগা) 'আশীরা-ই আরলাত-এর নেতা মু'আয়্যিদ আরলাত-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইনি খুরাসানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার অপর এক কন্যা (কুতলূগ তুরকান)-এর বিবাহ আমীর সুলতান (দুগলাত) এবং তাহার পর দা'ঊদ দুগলাত-এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহারা উভয়েই দুগলাত গোত্রের দলপতি ছিলেন, যাঁহারা কাশগর এলাকায় বসবাসরত ছিল। তীমূরের প্রথম তিন স্ত্রীর একজন তুরমিল আগা কাতাগান গোত্রের ছিলেন, যাহারা বালখের প্রান্তদেশে বসবাসরত ছিলেন। আমীর তুরগাইর অধিকারে কীশ ও নেসেফ-এর প্রান্তদেশের বড় বড় রাজ্য ছিল। উহা ছাড়াও আশকান, চুগানিয়ান ও খাওয়ারিযম-এর কাত এলাকার উপরিভাগেও তাঁহার বিস্তৃত রাজ্য বিদ্যমান ছিল। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে যাঁহাদের উল্লেখ তীমূরের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে রহিয়াছে, নিম্নোক্তদের নাম রাশীদু'দ্-দীনের গ্রন্থসমূহেও পাওয়া যায় ঃ কারা চার নূয়ান, যাঁহাকে চেঙ্গীয তাঁহার পুত্র (চুগতাঈর) চাকুরীতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন)– কারা চার-এর পুত্র আমীর ইঞ্জিল চুগতাঈর প্রধান 'আমীর ছিলেন এবং তারপর আলগুখানের "আমীরু'ল্-আমরাসী" হন। অতঃপর ঈজিলের পুত্র আমীর ইলিঙ্গিয চুগতাঈ গোত্রের খান (দুওয়া খান ইব্ন আলগু খান)-এর দরবারে একই পদে উন্নীত হন। তীমূরের প্রথমা স্ত্রী মা ওয়ারা'উ'ন-নাহ্র-এর শাসনকর্তা আমীর কাযাগান-এর পৌত্রী হওয়া এবং তীমূরের মাত্র সতের বৎসর বয়সের সময় তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ইহাই প্রমাণ করে যে, তীমূর তাঁহার পিতা তুরগাই ও পিতামহ আমীর বুরকিল চুগতাঈ গোত্রে কতখানি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তীমূর তাঁহার শত্রু আমীর হুসায়নের জীবন নাশের পর তাঁহার স্ত্রী সারাই মুলক খানমকে বিবাহ করেন। ইনি খান-ই চুগতাঈর কন্যা ছিলেন এবং এইরূপে তীমূর "কুরিগিন" [Kuregen=চুগতাই শাসকের জামাতা, দ্র.

বারানী, ৫৩৩, ১৪] উপাধি ধারণ করেন। চেঙ্গীযের বংশধররা যখন চীন ত্যাগ করে এবং তাহাদের স্থলে মিং বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ঐ বংশের রাজা তীমূরকে 'ফূমা' উপাধিতে স্মরণ করিতেন, যাহা চীনা ভাষায় 'কুরিগিন'-এর সমার্থবোধক।

বারলাস গোত্রের সৈন্যবাহিনীর যেই অংশটি সরাসরি তীমূরের পূর্বপুরুষদের অধীনে ছিল তাহা 'উলুগ মিং' (এবং কোন কোনও সময় ইরানীদের নিকট 'হাযারা-ই কিলান') নামে অভিহিত ছিল। ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আমীর তুরগাঈ খুব বেশি শক্তিশালী লোক ছিলেন না এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার গোত্রের নেতৃত্ব অন্য কাহারও হাতে চলিয়া গিয়াছিল। তুরগাঈর ইনতিকালের পর (তাঁহার চাচাতো ভাই) বুরু'ল-গী-র পুত্র আমীর হাজ্জী বারলাস "উলুগ মিং"-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যখন চুগতাই গোত্রের শাসক তুগলূক তীমূর খান ১৩৬১ খৃ. মা ওয়ারা'উ'ন্-নাহ্র-এর উপর, যাহা আমীর কাযাগানের সময় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন তখন তীমূর উক্ত আমীর হাজ্জী বারলাসের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু শেষোক্তজন যখন পশ্চাদপসরণ করিয়া আমূ দরিয়ার দক্ষিণ অভিমুখী হন তখন তীমূর তাঁহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া কীশ-এ প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেইখান হইতে তুগলূক তীমূর খানের নিকট গমন করিয়া নিজ গোত্রের পক্ষ হইতে আনুগত্যের শপথ করেন। এই সকল পদক্ষেপের মাধ্যমে তীমূর পঁচিশ বৎসর বয়সেই রাজনীতির ময়দানে অবতীর্ণ হন। সুতরাং তুগলূক তীমূর খান বারলাস গোত্রের যেই নেতাকে মা ওয়ারা'উ'ন্-নাহ্র-এর শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাকে নিজ পুত্র ইলয়াস খাওয়াজা-র অধীনস্থ করিয়া দেন। এইরূপে তীমূরের আধিপত্যাধীন এলাকা দক্ষিণ দিকে বিস্তৃতি লাভ করে এবং সমরকন্দের দক্ষিণের পাহাড়গুলি হইতে আমূ দরিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে আসে। আমীর কাযাগানের পৌত্র ও তীমূরের শ্যালক আমীর হুসায়ন চুগতাই সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বিপরীতক্রমে সে ইলয়াস খাওয়াজা খান ও মা ওয়ারা'উ'ন্-নাহ্রে মোতায়েন চুগতাঈ সৈন্যদের বহিষ্কারের জন্য নিজের সৈন্য সমাবেশ করিতে শুরু করিয়া দেয়। তীমূর নির্দ্বিধায় তাহার সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু তিনি ইহাতে তাৎক্ষণিক সাফল্য লাভে ব্যর্থ হন। চুগতাই সৈন্যদের হাতে তীমূর ও আমীর হুসায়ন পরাজয় বরণ করিলে তীমূর বর্তমানে যাহাকে আফগানিস্তান বলা হয় সেইখানে ও খাওয়ারিযমে এবং কখনও কখনও খুরাসানে সক্রিয় থাকেন। ইহাতে তিনি কোনও কোনও সময় চুগতাই সৈন্যদের পরাস্ত করিতেও সফল হইতেন। একবার তিনি চুগতাঈ সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ করিতে করিতে সীর দরিয়ার উত্তরে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, কিন্তু আমীর হুসায়ন অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার এই স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ বেশির ভাগ বিজয়ের সময়ই ঘটিত। ইহাই তাঁহার ও তীমূরের মধ্যে বিরোধের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। পরিশেষে তীমূর তাঁহার চৌত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমীর হুসায়নকে বালখের নিকট এবং পুনরায় উক্ত নগরীর দুর্গ অভ্যন্তরে পরাজিত করেন এবং বন্দী করিয়া প্রাণবধ করেন। ইহার পর তীমূর স্বীয় চুগতাঈ গোত্রের 'আমীরু'ল-আমরাসী' হইবার ঘোষণা প্রদান করেন (১০ এপ্রিল, ১৩৭০)।

ইহার পর হইতে তীমূর তুর্কীদের নিকট "উলুগ বেক" অথবা শুধু 'বেক' এবং যেই সমস্ত এলাকায় ফারসী ভাষা প্রচলিত ছিল সেইখানে 'আমীর' উপাধিতে সম্বোধিত হইতে থাকেন। লিপিসমূহে তাঁহার জন্য 'আমীর' অথবা 'সুলতান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহে, প্রভাবশালী গোত্রসমূহের নেতৃবৃন্দের মৃত্যুদণ্ডাদেশে স্বাক্ষর দানকালে, খুতবায় ও মুদ্রার উপর চেঙ্গীসী বংশের বাদশাহ 'খান' শব্দটি ব্যবহার করিতেন, যাহার সম্পর্ক ওগোদেই খানের বংশের সহিত ছিল, খান পদে অধিষ্ঠিত হইবার ঘোষণা প্রদান করা হয় এবং তিনি ১৩৮৮ খৃ. পর্যন্ত ১৮ বৎসর যাবত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাহার পর সুলতান মাহমূদ আওগিলানকে খান বানানো হয়। ইনি চুগতাঈ শাহযাদাদের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁহাকে ১৪০২ খৃ. পর্যন্ত অর্থাৎ পনের বৎসর যাবত খানরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এতদসত্ত্বেও এই খানগণ তীমূরের সৈন্যবাহিনীতে কার্যীক নেতা হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কেবল সেই সময় রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন দেখা দিত যখন তাহাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা হিসাবে পেশ করা হইত। তীমূর যখন সিরিয়া অধিকার করেন তখন মহান আরব ঐতিহাসিক ইব্ন খালদূন তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন (ইব্ন 'আরাবশাহ, قصو=১৯৬) এবং (৮=৪০১) বলেন, "আপনিই পৃথিবীর রাজন্যবর্গের মধ্যমণি।" ইহাতে তীমূর সুলতান মাহমূদ খানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়া বলিলেন, "প্রকৃত বাদশাহ তো ইনি (দ্র. W. J. Fischel, ৩৭ ও পরিশিষ্ট ১০১; আরও দ্র. ইব্ন 'আরাবশাহ); আমি তাঁহার দরবারে একজন খাদেম মাত্র।" তীমূরের কর্মধারায় যে নীতি প্রচলিত ছিল তাহা ছিল চেঙ্গীযের য়াসা (মুহাম্মাদিয়া নীতিমালার বিপরীতক্রমে তিনি উহাকে চালু রাখিয়াছিলেন, ইব্ন 'আরাবশাহ, تم (৪০৩)। য়াসা অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব নামেমাত্র হইলেও একমাত্র চেঙ্গীযী বংশের শাহযাদাদের দ্বারাই সম্ভব ছিল। এইজন্য তীমূরকে তাহা পালন করিয়া চলিতে হইত। যদি তিনি এইরূপ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই সমগ্র রাজ্য বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইত।

তীমূর সম্পূর্ণ প্রাথমিক বৎসরগুলিতেই একদিকে চুগতাঈ শহর এবং অন্যদিকে ঈলখানিয়া রাজ্য (যাহা তখন তাওয়া'ইফ অধিকারভুক্ত ছিল) উভয়ের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার সাফল্য যেন চেঙ্গীয খানের স্বপ্নেরই সার্থক রূপায়ণ ছিল। কারণ তিনি এই সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। য়াসার ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা করিয়া তিনি তুর্কী ও মুগল গোত্রগুলিকে নিজ কর্তৃত্বাধীন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং একজন যথার্থ মুসলিম হিসাবে শহরগুলিতে শারী'আত প্রবর্তন করিয়া এই আশা করিতেছিলেন যে, ইরানী জনগণের সহানুভূতিও তাঁহার অর্জিত হইবে।

সর্বপ্রথম ১৩৭০ ও ১৩৮০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে তীমূর চুগতাঈ গোত্রের পূর্বাঞ্চলীয় অংশগুলির উপর, যাহা 'চিতা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন। এইখানে অনেক গোত্র মুগলী ভাষা বলিত। খাওয়ারিযমের কাত এলাকাও ইহার আওতায় পড়ে, যাহা কোনও এক সময় চুগতাঈ খানদের অধীনে ছিল। আমীর কামরু'দ্-দীন (হাম্মাসী কবিতায়, কামার দীন), যিনি দূগলাত গোত্রের সরদার ও চিতার শাসক ছিলেন এবং খাওয়ারিযমের কুঙ্গরাতে গোত্রের শাসনকর্তা এই এলাকাসমূহের অধিপতি ছিলেন, আমীর কাযাগানের ইনতিকালের পর সৃষ্ট হাঙ্গামার সময় চিতার শাসনকর্তা সির দরিয়ার দক্ষিণে চলিয়া যান এবং কুঙ্গরাত গোত্রের সরদার হুসায়ন সূফী, যিনি খাওয়ারিযম এলাকার সেই অংশের উপর রাজত্ব করিতেছিলেন যেই অংশটি আলতীন উরদূ (Golden Horde)-র খানদের অধিকারভুক্ত ছিল, জোরপূর্বক কাত এলাকাটি দখল করিয়া নেন। ১৩৭২ খৃস্টাব্দে তীমূর (এই কারণে যে, কাত ও খীবা চুগতাঈ খানের সহিত সংশ্লিষ্ট, নিজাম শাহী, ৬৫) হুসায়ন সূফীকে উক্ত এলাকা পরিত্যাগের দাবি জানান। কিন্তু তিনি তাহা মানিতে অস্বীকার করিলে তীমূর নিজ সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন এবং কাত

এলাকাটি দখল করিয়া নেন। সেই যুগে আক উরদা নামে খ্যাত জূচী গোত্রের একটি শাখা (দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছাড়াইয়া পড়িয়াছিল) উত্তর-পূর্ব দিকে, সির দরিয়া হইতে শুরু করিয়া য়িদী সুর তীরবর্তী কারাতাল (Qaratal) এলাকা পর্যন্ত (এই স্থানটির জন্য দ্র. য়াযদী, ১খ, ৪৯৪); কাতারাল নদী বালকাশ হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া উক্ত হ্রদে পতিত হইয়াছে, সেই স্থানে হ্রদটির প্রশস্ততা পাঁচ-দশ মাইলের অধিক নহে (দ্র. ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ১৯৬১, প্রবন্ধ বালকাশ, ২খ, ৯৯১; Schayler, Turkistan, লণ্ডন ১৮৭৬, ২খ, ১৫৪), উত্তরে সাইবেরিয়ার সেই সমস্ত এলাকা পর্যন্ত যাহা তুমেন (Tumen) নামে বিখ্যাত এবং ভলগা নদীর তাস ও আরও পশ্চিম দিকে আলতীন উরদূর মূল এলাকা পর্যন্ত উক্ত শাখাটি বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত এলাকায় অত্যন্ত অস্থিরতা ও অশান্তি বিরাজমান ছিল। তাহা সত্ত্বেও আক উরদার খান, উরূস খান (Urus Han,) সির দরিয়ার সমগ্র তাসকে নিজ অধিকারভুক্ত করার অভিলাষী ছিলেন। তিনি কতিপয় নরপতিকে অসন্তুষ্ট করিয়া তোলেন, এমন কি কয়েকজনের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটান। কুঙ্‌রাত গোত্রের সরদার য়ূসুফ সূফী (হুসায়ন সূ'ফীর ভ্রাতা; য়াযদী, ১খ, ২৪১) কাত দ্বিতীয়বার দখল করিয়া লন। ১৩৭৩-৭৪ সনে তীমূর পুনরায় খাওয়ারিযম অভিমুখী হন এবং নিজের সমস্ত পূর্ববর্তী এলাকা পুনর্দখল করেন। উরূস খান আকখোজা নামক জনৈক চেঙ্গীযী শাহাযাদাকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র তুকতামিশ উগলান উরূস খানের কব্জা হইতে বাহির হইয়া তীমূরের নিকট আগমন করে (নিজামী শামী, ৭৪; য়াযদী, ১খ, ২৭৩)। তীমূর তাঁহাকে সামরিক সাহায্য প্রদান করেন এবং আক আওয়ারদার উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ১৩৭৭ সনে উরূস মৃত্যুবরণ করিলে তুকতামিশ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং ১৩৭৯ সনে তীমূরের সাহায্যে আক আওয়ারদা দখল করিয়া নেন। অতঃপর তীমূরের সাহায্যে তিনি ভলগা অঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ১৩৮০ সনে আলতীন উরদূ ("স্বর্ণালী উরদূ")-র খান পদে অধিষ্ঠিত হন (য়াযদী, ১খ, ২৮৪)। নিজের শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করিবার জন্য তুকতামিশ তাঁহার বিরোধী শাসকবর্গ ও তাঁহাদের মিত্র নেতৃবৃন্দকে ধ্বংস করিবার এক বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। "স্বর্ণালী উরদূ"-র জনৈক শাহযাদা তীমূর কুতলুক উগলান মাঙ্গেত (মাংকুত) গোত্রের দলপতি ইদিগো (Edigo)-র সহিত তীমূরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চাকুরী গ্রহণ করেন (দ্র. য়াযদী, ১খ, ৪৪৭)। এই সময় ইদিগো দূগলাত গোত্রের অধিপতি কামারু'দ- দীনের বিরুদ্ধে তীমূরের সেনা অভিযানে অংশগ্রহণ করে। আলতীন উরদূ দাস্তানী-তে যেই ইদিগোর কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে, সে কোহ আলতাই এলাকায় কামারু'দ্-দীনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে সে এই ইদিগোই ছিল। তুকতামিশ যখন দেখিলেন যে, তাহার সমস্ত বিরোধীদেরকে তীমূরের এইখানে অত্যন্ত উদারতার সহিত গ্রহণ করা হইতেছে তখন তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হইলেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তীমূর যখন ইরান অভিযানে ব্যস্ত থাকিবেন তখন তাঁহার এলাকাগুলি তিনি দখল করিয়া লইবেন। তীমূর ঈলখানীদের দেশ দখলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তুকতামিশ এই ক্ষেত্রে তাঁহার সমকক্ষ হইবার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করিলেন এবং ১৩৮৫ সনে তিবরীয় অধিকার করিয়া লইলেন।

৭৮২-র শেষ ১৩৮১-র প্রথমদিকে তীমূর ইরান অবরোধের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন এবং সৈন্য সংগ্রহপূর্বক ইরান অভিযানে রওয়ানা হন। প্রথমে তিনি হিরাত অধিকার করেন এবং সেইখানকার কতিপয় 'আলিম ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সেইখান হইতে বহিষ্কার করিয়া সাব্‌য্ শহরে পাঠাইয়া দেন এবং কুর্‌ত্ শাসক মালিক গিয়াছু'দ্-দীন ও তাঁহার পুত্রগণকেও সমরকন্দ প্রেরণ করেন (য়াযদী, ১খ, ৩২৩, ৩৫২)। সাবযাওয়ার শাসকদের (৭৮৩ হি.) শেষ করার পর তিনি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে মাযানদারান, জুরজান ও ভারত সীমান্তে অবস্থিত সীস্তান অঞ্চলসমূহ নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ৭৮৮/১৩৮৬ সনে তীমূর "তিন বর্ষীয় হাঙ্গামা" নামে খ্যাত বিশাল ইরান অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করেন (য়াযদী, ১খ, ৩৯৩)। তিনি এই সময় আযারবায়জানের উপর পূর্ণাঙ্গরূপে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং পারস্য, ইরাক ও লুরিস্তানেও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। আযারবায়জান ও ইরাকের শাসনকর্তা সুলতান আহমাদ জালাইর বাগদাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তীমূর তিবরীযে শীতকাল অতিবাহিত করিতেছিলেন, এমন সময় ইসফাহানের অধিবাসিগণ বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। এই বিদ্রোহের পিছনে সুলতান আহমাদ জালাইর ও অন্যান্য বিরোধী নেতার সক্রিয় সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল। তীমূর এই বিদ্রোহ দমনকালে সমস্ত 'আলিম ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিকে সাধারণ লোকদের নিকট হইতে পৃথক করিয়া নিজ দেশে পাঠাইয়া দেন। ইহার পর সত্তর দিন পর্যন্ত (?) সেখানে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয় [যাহাতে সত্তর হাজার (?) লোকের প্রাণহানি ঘটে বলিয়া কথিত আছে] এবং নিহতদের মাথা দ্বারা মিনার তৈয়ার করা হয় (এই ঘটনা ৭৮৯/১৩৮৯ সনের শেষভাগে সংঘটিত হয়; য়াযদী, ১খ, ৪৩৪ প.)। যেই সময় তিনি এই অভিযানে গিয়াছিলেন তখন মা ওয়ারা'উ'ন্-নাহ্‌র-এর শাসনভার নিজ পুত্র 'উমার শায়খের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তুকতামিশ ইহা মনে করিয়া যে, চুগতাঈ জাতি নেতৃত্বহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ১৩৮৮ সনে সমরকন্দ ও কীশ পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং উক্ত এলাকাগুলির ধ্বংস সাধন করেন। যেহেতু এই জাতীয় সকল অভিযানের সময় তুকতামিশের সামরিক প্রাণকেন্দ্র হইত খাওয়ারিযম, তাই তীমূর ঐ অঞ্চলের যেই সমস্ত এলাকা জূচী জাতির মালিকানাধীন তাহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করার মনস্থ করেন। সুতরাং ইরান অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর (৭৯০/১৩৮৮ সনে) তিনি খাওয়ারিযম অভিমুখে অগ্রসর হন (য়াযদী, ১খ, ৪৪৭)। তিনি আরেকবার ফরমান জারি করিলেন যে, আওরগেন্‌চ্-এর ন্যায় সমস্ত বড় শহরের পণ্ডিত, শিল্পী ও কারিগরদেরকে যেন বুখারা ও কীশ এলাকায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আকসারাই নামে খ্যাত বিশাল সরাই (=মহল), যাহা আজিও কীশ-এ বিদ্যমান রহিয়াছে, খাওয়ারিযমবাসী কারিগরদের নির্মিত। তিনি আওরগেনচের দুর্গসমূহ ধূলিসাৎ করিয়া সেইখানে যব ও গমের চাষ করেন। কিন্তু খাওয়ারিযম সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও তুকতামিশের হামলার ধারা বন্ধ হয় নাই। তাহার হামলাকারী সৈন্যরা পূর্বে তাশকন্দ ও দক্ষিণে আযারবায়জানের উপর হামলা অব্যাহত রাখে। এইজন্য তীমূর তাহাকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করিবার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। সুতরাং তিনি ১৩৯১ সনে সির দরিয়ার তাসে প্রবেশ করেন। শত্রুকে ধোঁকা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনীর কিছু অংশ পূর্ব তুর্কীস্তানে বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণ করেন। এমন কি কিছু সৈন্য চীন সীমান্ত পর্যন্ত পাঠাইয়া দেন এবং ইহার পর হঠাৎ বর্তমানে যাহাকে কাযাকিস্তান বলা হয় তাহার মধ্য দিয়া অতিক্রমকালে উরাল পর্বত ও ভলগার তাস পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই অভিযানকালে তিনি কাযাকিস্তানের উলূ তাভ্ (Ulu Tav) এলাকার কারসাক বে নামক স্থানে তুর্কী ভাষায় একটি শিলালিপি স্থাপন করেন। উক্ত শিলালিপিটি আবীগূরীলিপিতে লিপিবদ্ধ ও বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল এবং পাঠ করা যাইত। ১৮ জুন তারিখে দক্ষিণ উরালের পার্বত্য অঞ্চলে কুন্‌দুযজা নদীর তীরে

অধুনা যাহাকে সামারা (Samara) [অথবা Kaibyshak, Encyclopaedia Britannica, ১৯৫০, চিত্র ৫৯, কাযানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে] বলা হয় সেই স্থানে তুকতামিশের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাঁধে। তীমূর তাহাকে পরাজিত করেন এবং সেইখানে সমস্ত দুর্গ ও স্থাপনা ধ্বংস করিয়া দেন। "স্বর্ণালী উর্দূ"-র উপরোল্লিখিত খান তীমূর কুতলুক তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী ইদিগুর সহিত মিলিত হইয়া [যে মাঙ্গেত (বা মাংকুত) গোত্রের দলপতি ছিল] এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু উযবেক উপজাতিগুলির ধ্বংসসাধন তাঁহার পসন্দ হয় নাই। এই অভিযানে তীমূর বহু সংখ্যক লোককে কয়েদ করেন। অতঃপর তীমূর সমরকন্দ প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে উক্ত উপজাতিদের বসতি স্থাপন করেন।

তীমূর ১৩৯৫ খৃস্টাব্দে আযারবায়জান হইতে উছমান উগলু ইল্‌দিরিম বায়াযীদকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহাতে লিপিবদ্ধ আছে যে (এবং এইরূপই ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে), তীমূরের ধারণায় পূর্ব ইরান ও ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী এলাকা ঠিক সেইরূপ চুগতাঈ রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল যেইরূপ তখন হইতে এক শত বৎসর পূর্বে চুগতাঈ শাসনকর্তা বারাক খান, যিনি হালাকূর পুত্র আবাকা (৬৬৩/১২৬৫-৬৮০/১২৮২, দ্র. জামি'উ'ত্-তাওয়ারীখ)-র সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইরান সম্পর্কে উক্তি করিয়াছিলেন তীমূর তাঁহার "তিন সালা অভিযান পরিকল্পনা" কালেই এই সমস্ত ঈলখানী এলাকা নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিতেন, কিন্তু তুকতামিশ তাহা করিতে দেন নাই এবং তীমূরকে বাধ্য হইয়াই "স্বর্ণালী উরদূ"-র বিরুদ্ধে সেনা প্রেরণ করিতে হয় যাহা প্রকারান্তরে নিষ্প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তাঁহার পূর্বোক্ত ধারণাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক পৃথক পাঁচসালা অভিযান পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

৩১ জুলাই, ১৩৯২ খৃস্টাব্দে তিনি এই অভিযানের সূচনা করেন। তিনি আযারবায়জান হইতে রওয়ানা হইয়া সমগ্র কাফকায অতিক্রম করিয়া গুরজিস্তান ও আর্মেনিয়ায় পৌঁছেন এবং এই সকল স্থানে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৯৩ খৃস্টাব্দে মুজাফফার বংশকে ধ্বংস করিয়া ফারস অঞ্চলে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বীয় পুত্র 'উমার শায়খকে সেইখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন (য়াযদী, ১খ, ৬১৭ প.)। বাগ্‌দাদে আক্রমণ চালাইয়া তিনি বাগদাদও দখল করিয়া নেন। সুলতান আহ্‌মাদ জালাইর মিসরের শাসনকর্তা মালিকু'জ্-জাহির বারকূকের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন ও দামিশক চলিয়া যান। দামিশক আগমনের পর তিনি ও কারা কূয়ুনলু তুর্কমানদের দলপতি কারা য়ূসুফ সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালান যেন মিসর হইতে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত এশিয়া মাইনরের সকল শাসনকর্তাকে তীমূরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করিয়া তোলা যায়। উক্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তীমূর মারদীন, দিয়ারবাক্‌র এবং ইরযিনজানের তুর্কী শাসনকর্তাগণকে তাঁহার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। ইঁহাদের শাসনাধীন এলাকা ঈলখানী রাজ্যের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল।

মিসরের মামলূক শাসনকর্তা বারকূকের ইচ্ছা ছিল যে, সে পৃথিবীময় ঘোষণা করিয়া দেয় যে, তীমূরের সহিত তাহার শত্রুতা কখনও শেষ হইতে পারে না। সুতরাং তাহার নির্দেশে তীমূরের প্রেরিত একদল দূতকে, যাহাদের মধ্যে কতিপয় খ্যাতনামা 'আলিমও ছিলেন, হত্যা করা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সে আল্‌তীন উরদূ (স্বর্ণালী উরদূ)-র নেতা তুকতামিশের সহিত ঐক্য সম্পর্ক জোরদার করার প্রস্তাব কার্যকর করিতে আরম্ভ করে। তুকতামিশ আযারবায়জান গমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ফেব্রুয়ারি ১৩৯৫ খৃস্টাব্দে তীমূর শীরওয়ান হইতে বায়াযীদকে যে পত্র লিখেন উহাতে তিনি সবিস্তারে নিজ সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, তিনি বারকূকের বিরুদ্ধে, যে তাঁহার দূতদের হত্যা করিয়াছে, আক্রমণ পরিচালনা করিবেন। কিন্তু যদি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তুকতামিশ সন্ধি স্থাপনের যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা কেবল ধোঁকামাত্র (কারণ সে "স্বর্ণালী উরদূ" সীমান্তে তীমূরের সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিকে সন্দেহের চোখে দেখিতেছিল), তাহা হইলে তিনি বারকূকের পূর্বেই তুকতামিশের উপর হামলা চালাইবেন।

তুকতামিশ প্রকৃতপক্ষে য়ূরোপীয়দের সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। সে তাহাদের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য লাভ করিত এবং উহার বিনিময়ে ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে তাহাদের গোয়েন্দাগিরির কাজ করিত। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ করা এক প্রকারের ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল। য়ূরোপীয়দের নামে যে খৃস্টান জাতিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে লিথুয়ানীয় (Lithuanians), লাহিস্তানী (পোল) ও রুশরা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পূর্ব য়ূরোপের দিনিপির (Dnieper) নদীর (তুর্কীদের 'উযী' ও তাতারদের 'আকশী সূ') তীরে তাহাদের শক্ত ঘাঁটি অবস্থিত ছিল। তীমূর তাঁহার উপরিউল্লিখিত পত্রে বিশদভাবে লিখিয়াছিলেন, যদি অভিযান শুরু হয় তাহা হইলে বায়াযীদের জন্য প্রয়োজন হইবে বলকান এলাকা হইয়া তীমূরের সহিত মিলিত হওয়া, যাহাতে উভয়ের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী দ্বারা য়ূরোপীয়দের পর্যুদস্ত করা যায়।

তীমূর যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তুকতামিশ তাহার কন্যাদের তীমূরের পুত্রদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়া তাঁহার নিকট যে দূত প্রেরণ করিয়াছে তাহা একটি চাল ছাড়া অন্য কিছু নহে, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ঐ বৎসর (১৩৯৫ খৃ.) ২ এপ্রিল দারবান্দ্-এর উত্তরে তেরেক (The Terek) নদীর তীরে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় উহাতে তুকতামিশ পরাজিত হন। অতঃপর তীমূর উক্ত এলাকার, বিশেষ করিয়া আসতারাখান ও সরাই শহর দুইটির সমস্ত সামরিক ঘাঁটি, যাহা তুকতামিশের জন্য কেন্দ্রীয় সেনা শিবির হিসাবে ব্যবহৃত হইত, সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেন। এই অভিযানকালে তীমূর এশিয়া মাইনরের মালাতিয়া রাজ্যের শাসনকর্তা ইয়ালমান (Yalman)-কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন উহা হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হইতে হইতে কাযান (এলাকার) সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছিল যেইখানে তলগা (ইতিল) ও কামা (Kama) নদীর সঙ্গমস্থল অবস্থিত।

এইখান হইতে অগ্রসর হইয়া তিনি কিয়েভ (Kieve) পৌঁছেন যাহা বর্তমানে ইউক্রেনের (=মিঙ্গেরমানের) রাজধানী এবং ইহার পর সেইখান হইতে অগ্রসর হইয়া রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া মস্কো পর্যন্ত পৌঁছেন এবং উহা অবরোধ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাশিয়ার কয়েকটি শহর পোড়াইয়া ভস্মীভূত করেন এবং সেই সমস্ত রুশ সৈনিককেও ধ্বংস করিয়া দেন যাহারা তুকতামিশের সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বায়াযীদকেও এই অভিযানে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান হইয়াছিল, কিন্তু তিনি গ্রীস জয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে হউক অথবা অন্য যে কোনও কারণেই হউক, উহাতে অংশগ্রহণ করেন নাই। ঐ বৎসর শীতকাল নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বেই শুরু হয়। তীমূর তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে দক্ষিণ দিকে পশ্চাদপসরণ করান এবং আযাক নদীর ডান তীরবর্তী শহর আযাককে ও দ্বীপসদৃশ ক্রীমের শহর কাফকা অধিকারে ব্যস্ত জেনোইজদেরকে (Genoese) ধ্বংস করিয়া দেন (নিজামী, শামী, ১খ, ১৬১)।

অতঃপর তিনি বালজীমান এলাকায় অর্থাৎ যেইখানে আজকাল ভালাদি কাফকাস শহরটি (Valadi Kafkas) অবস্থিত সেইখানে প্রবেশ করেন এবং সেইখানকার সমস্ত দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দেন, যাহা তুকতামিশের জন্য কেন্দ্র হিসাবে কাজ করিত অথবা কাজ করিতে পারিত এবং এইভাবে সেইখানকার সকল গোত্রকে তাঁহার অনুগতে পরিণত করেন। তিনি অনেক অমুসলিম গোত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দের বসন্ত কালে তিনি আযারবায়জানাভিমুখী হন। রামাদান মাসে নিহাওয়ান্দ পৌঁছেন এবং হামাদানে 'ঈদ উৎসব পালনের পর ইরানের বিভিন্ন অংশে শাসন কাজ পরিচালনার জন্য গভর্নর নিযুক্ত করেন। ঐ সময় য়াযদে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু তীমূর অত্যন্ত নির্মম ও নৃশংসভাবে বিদ্রোহ দমন করেন। এই উপলক্ষে পারস্যের ত্রিশ হাজার অধিবাসী নিহত হয় (? দ্র. য়াযদী, ১খ, ৭৯০)। বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যককে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু যাহারা এই বিদ্রোহে কোন অংশ নেয় নাই তীমূর তাহাদের সহিত অত্যন্ত কোমল ও সহমর্মিতামূলক আচরণ করেন এবং বিদ্রোহের কারণে তাহারা যেই সমস্ত কর পরিশোধ করিতে পারে নাই তীমূর তাহা রহিত করিয়া দেন। ১৮ আগস্ট তিনি হামদান হইতে সুলতানিয়া পৌঁছেন এবং সেইখান হইতে সমরকন্দ রওয়ানা হন।

উপরোক্ত অভিযান সমাপ্ত হইবার পর তীমূর সমরকন্দে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং রাজধানীর সকল অধিবাসীর তিন বৎসরের সকল প্রকার কর মওকুফের ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁহার অবর্তমানে যাহারা জনসাধারণকে জ্বালাতন ও অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছিল তিনি তাহাদের সকলকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং গরীব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বস্ত্র ও জিনিসপত্র বিতরণ করেন।

ইরান অভিযানের পর তীমূরের অভিপ্রায় ছিল তিনি চীন গমন করিবেন এবং চেঙ্গীয বংশীয় শাহযাদাগণকে তাঁহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লওয়ার অধিকার প্রত্যর্পণ করিবেন। উক্ত শাহযাদাগণকে এক মহাবিদ্রোহের সময় চীন হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। তীমূর চুগতা'ঈ গোত্রের শাসনকর্তা হইলে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে বল্‌খ হইতে উহার ঘোষণা দেওয়া হয়। চীনের উল্লিখিত বিদ্রোহ এখন হইতে পাঁচ বৎসর পূর্বে (১৩৬৫?) হইয়াছিল। উক্ত চেঙ্গীয বংশীয়দের কেহ কেহ চীন হইতে বহিষ্কারের পর তীমূরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং তীমূরই তাহাদের লালন-পালন করিতেন। এইবার তীমূরের ধারণা হইল, তাহাদের নিরাপত্তা বিধান এবং তাহাদের অধিকার ফেরত প্রদান উপলক্ষে তিনি পূর্ব তুর্কিস্তান ও মঙ্গোলিয়া অধিকার করিয়া সমস্ত এলাকাবাসীকে মুসলমানে পরিণত করিতে পারেন। আশ্রয় গ্রহণকারী চেঙ্গীয বংশীয়গণ নিঃসন্দেহে তীমূরের প্রভাবাধীনে ইসলাম কবূল করিয়াছিল। কিন্তু এই অভিযান শুরু করিবার পূর্বেই ভারতবর্ষে সৈন্য প্রেরণ জরুরী হইয়া পড়ে (দ্র. নিজামী, শামী, ১খ, ১৭০; য়াযদী, ১খ, ১৫)।

ইহার কারণ এই ছিল যে, কোনও কোনও ঘটনা হইতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার রাজ্যের যে সীমান্ত মুলতান ও কাবূলের নিকট ভারতবর্ষ সংলগ্ন তাহা অতিশয় সুদৃঢ় ছিল না। তীমূর স্বীয় পৌত্র পীর মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাহাঙ্গীর মীরযাকে ৭৯৪/১৩৯২ সালে ছুগূর-ই হিন্দের গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং নিজের কতিপয় উমারা'কেও তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত এলাকার শাসনকেন্দ্র কান্দাহারে অবস্থিত ছিল। সঙ্গী উমারা-র মধ্যে ছিলেন বারলাস গোত্রের উমারা' সায়ফুল, মুহাম্মাদ দারবেশ, বাহলুল (মুহাম্মাদ দারবেশ-এর পুত্র) ও কুমারী ঈনাক, দূগলাত গোত্রের আমীর কুতবু'দ্-দীন ও নায়মান গোত্রের আমীর তীমূর খাওয়াজা আকবূগা (দ্র. য়াযদী, ১খ, ৫৫৮; ২খ, ১৪)। এই উমারা' সোনবাহিনীতে যে সৈনিকদের ভর্তি করেন তাহা নিজ নিজ গোত্র হইতে গ্রহণ করেন। সুতরাং পীর মুহাম্মাদের সৈন্যবাহিনীর ভিত্তি উপরোক্ত বিভিন্ন গোত্রের লোকদের উপর স্থাপিত ছিল। আজকাল যেই অঞ্চলটি আফগানিস্তান নামে পরিচিত উহার শাসন ক্ষমতা পীর মুহাম্মাদের উপর ন্যস্ত করিয়া তীমূর মন্তব্য করিয়াছিলেন, "শুধু কাবুল, কান্দাহার ও যাবুলই নহে, বরং মাহমূদ গাযনাবী যেই অঞ্চলটি জয় করিয়াছিলেন উহার সম্পূর্ণটাই তোমার অধীনে ন্যস্ত করিলাম" ("মামালিক সুলতান মাহমূদ গাযী", য়াযদী, ১খ, ৫৫৮)।

কথিত আছে যে, শাহরুখ আমলে উক্ত নায়মান ও আরগুন বংশীয়রা, যাহারা একই গোত্রের নেতা ছিল, সিন্ধু অঞ্চলের শাসনক্ষমতায়, যেইখানে পুত্র (সিয়ূরগাতমিশ মীরযা) গভর্নর ছিলেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যখন এই এলাকাটি পীর মুহাম্মাদের অধিকারভুক্ত করা হয় তখন তীমূর এইখানকার শাসনভার উক্ত নেতৃবৃন্দের উপরই ন্যস্ত করেন (পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের সহিত তীমূর বংশীয়দের প্রাথমিক সম্পর্ক সম্পর্কে দ্র. মাতলা' সা'দায়ন, লাহোর ১৪৭০, পরি. সোয়াদ ৭০৪, সীন ১২; এবং য়াহ্‌য়া সিরহিন্দী, তা'রীখ মুবারাকশাহী, কলিকাতা ১৯৩১, ২০১)।

দিল্লীর সুলতান সুলতান মাহমূদের দুর্বলতা ও সিদ্ধান্তহীনতার সুযোগে মাললূ খান আফগান এবং তাঁহার ভ্রাতা সারিং ভারতবর্ষের মুসলিম এলাকাসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য আফগান তাহাদের কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা ঐ সমস্ত তুর্কী গোত্রের উপর হামলা চালায় যাহাদের প্রতি তুগলুকদের আস্থা ছিল এবং সময় অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছাকাছি পৌঁছে। উৎস গ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত তথ্যাদি হইতে জানা যায় যে, এই অবস্থার ফলে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় মুসলিম সংখ্যালঘুদের অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাইতে থাকে এবং শুধু ইহাকেই তীমূরের ভারত আক্রমণের পর্যাপ্ত কারণ হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। গিয়াছু'দ্-দীন 'আলীর (দ্র. রোযনামাহ্, পৃ. ৪৩-৪৬) বর্ণনানুযায়ী আমীর তীমূরের নিকট দিল্লীর মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুশরিক জাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা তাঁহার নিজ রাজ্যের জন্য ভয়ের কারণ ছিল। এইজন্যই তিনি অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দূর করিয়া এই ভয় হইতে মুক্তি লাভের ফায়সালা করিয়াছিলেন। পীর মুহাম্মাদ উপরোক্ত সরদারদের সঙ্গে লইয়া প্রথমে আফগান গোত্র সুলায়মান খেলের উপর লুণ্ঠনকার্য চালায় এবং তারপর সিন্ধুতে পৌঁছিয়া উচ ও তালামবাহ এলাকা অবরোধ করে। কিন্তু মাললূ খানের ভাই, যে মুলতানের শাসনকর্তা ছিল, ছয় মাস পর্যন্ত তাহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। অবশেষে সে শহর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্থানীয় কাফির বাসিন্দাদের সাহায্যে আফগান আমীরদের এতদিন পর্যন্ত যুদ্ধে টিকিয়া থাকা তীমূর ও পীর মুহাম্মাদের নিকট দারুন অসহনীয় ব্যাপার ছিল এবং এইজন্যই যেই পর্যন্ত ভারতকে সম্পূর্ণরূপে নিজের অনুগত করা না যায় সেই পর্যন্ত চীন আক্রমণ করা তীমূরের জন্য সম্ভব ছিল না। সর্বত্র এই কথারই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তীমূর এই অভিযানে মাহমূদ গাযনাবী ও শুজাতাই খান তিরমাহ শারীন (বিল দুওয়া)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার কর্মকৌশল উপরোক্ত বাদশাহদ্বয় হইতে এই হিসাবে ভিন্ন ছিল যে, প্রথমত, তিনি ইসলাম

প্রচারে শক্তি প্রয়োগ করেন এবং দ্বিতীয়ত, সীমান্ত এলাকায় তুর্কী গোত্রসমূহের বসতি স্থাপন করেন, যাহাতে অধিবাসীদের মধ্যে শাসক পক্ষের সধংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে।

১৩৯৮ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষদিকে তীমূর সমরকন্দ হইতে রওয়ানা হন (এবং ১ যু'ল্-হিজ্জা, ৮০০/১৫ আগস্ট, ১৩৯৮ তারিখে) কাবুল অঞ্চলে পৌঁছিয়া তাঁহার বিশাল বাহিনী পার্বত্য পথে অগ্রসর হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে কাফিরিস্তান আক্রমণ করিয়া বসে, যেইখানকার অধিবাসিগণ এই পর্যন্ত অমুসলিম ছিল। তীমূর এই অঞ্চলে একটি শিলালিপিতে এই বিখ্যাত যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন এবং উহাতে তারিখ (রামাদান ৮০০) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যেন লোকেরা ইহাকে শিক্ষাস্বরূপ পাঠ করে এবং দিগ্বিজয়ী এই বীরের ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করিতে পারে। কারণ স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে ইহার পূর্বে কোনও বাদশাহই এই অঞ্চলটি জয় করিতে পারে নাই (য়াযদী, ২খ, ২৫)। পাকিস্তানের কেন্দ্রস্থলে একটি দুর্গ রহিয়াছে, যাহা কাল্লাম দুর্গ নামে অভিহিত। এই দুর্গের দ্বারদেশে আমীর 'আবদু'র-রাহমান খানের কাফিরিস্তান জয়ের সময় (১৮৯৬ খৃ.) একটি পাথরখণ্ড পাওয়া যায় যাহার উপর এই ধরনের লিপি বিদ্যমান ছিল। আমীরের জনৈক সেনা অফিসার উক্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে আমীর কর্তৃক কাফিরিস্তান জয়ের ঘটনাও উৎকীর্ণ করিয়া রাখেন [দ্র. তূযূক 'আবদু'র-রাহমানী (উর্দূ অনুবাদ), আগ্রা ১৯০২ খৃ, ২৮৯]। সেইখান হইতে তীমূর হিন্দুকুশ পথে পানীঝের পৌঁছেন এবং জুলগাহ বারানা নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন দ্র. বাবুরনামা, অনু. Beveridge, ২খ, ৩২০, ২৫৩, পরিশিষ্ট ৩, যেইখানে বারানকে কেবল একটি নদী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে]। তীমূর তাঁহার আমীর ও সৈন্যদের দ্বারা সেইখানে প্রবাহিত গুরবান (গূর বন্দ্?) নদী হইতে পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ একটি খাল খনন করান এবং কয়েকটি বড় গ্রাম উক্ত খালের কারণে গড়িয়া উঠে, গ্রামগুলি জাবী মাহীগীর নামে অভিহিত [য়াযদী, ২খ, ৩২; দ্র. বাবুরনামা, অনু. বেভেরিজ, ২খ, ২২৫)।

উল্লিখিত সূত্রসমূহে উক্ত এলাকার বারান নদীর মৎস্য শিকারের উল্লেখ রহিয়াছে এবং যেই এলাকাটি এই পর্যন্ত অনুর্বর ও অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছিল তাহা এখন হইতে বাগ-বাগিচা ও শস্য-শ্যামলা মাঠে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তীমূর এইখানে উযবেক ও কিপচাক গোত্রসমূহের বসতি স্থাপন করান যাহাদিগকে তিনি দাশ্ত-ই কিপচাক অভিযানের পর দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া সমরকন্দ এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই উযবেকগণ ইহার পূর্বে ইউক্রেন•(Ukraine)-এর কেফ অঞ্চলের অধিবাসী ছিল এবং তাহারা সংখ্যায় চারি শত পরিবার ছিল। ইহাদিগকে উক্ত নদীর তীরে তাহাদের পুরাতন নেতা বেক ইয়ারীক উগলানের অধীনে এবং অনুরূপভাবে কিপচাক গোত্রকে তাহাদের পুরাতন নেতা শায়খ হাসান বেকের শাসনাধীনে পুনর্বাসিত করা হয় (বাবুরনামা, অনুবাদ পূর্বোক্ত, ২খ, ২১৫, তুর্কী ও মুগল আয়মাকদের জন্য বারান অঞ্চলটি আবাসভূমিরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাবুর এই প্রসঙ্গে তীমূরের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই)।

কাবূল অবস্থানকালে তীমূর "স্বর্ণালী উরদু"-এ মনোনীত প্রতিনিধি তীমূর কুতলুক খান ও ঈদিগূবেক-এর দূতগণকে সাক্ষাত দান করেন। ইঁহা ছাড়া তীমূরের গোত্র মুহাম্মাদ সুলতান মীরযার দূতও উপস্থিত হন। মুহাম্মাদ সুলতান মীরযাকে তীমূর মঙ্গোলিয়া ও চীনের সীমান্ত এলাকায় দেশ শাসনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে কাশগরের শাসনকর্তাদের দূতও তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হন। এইখান হইতে তিনি তাঁহার সৈন্যদলের বামভাগের নেতৃত্ব সুলতান মাহমূদ খানের উপর ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে অন্যান্য অনেক নেতার সহিত দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা করান (উক্ত নেতৃবৃন্দের তালিকার জন্য দ্র. রোযনামা, ৯৭ প.; য়াযদী, ২খ, ৩৬প.) এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি স্বয়ং মুলতান অভিমুখে রওয়ানা হন। উভয় সৈন্যদল দিল্লীর উত্তরে কোপিলা সেতুর উপর একত্র হয় (রোযনামা, ৯৭; য়াযদী, ২খ, ৮২ ও ইলিয়ট, History of India etc, ৩খ, ৪৯৩। এই প্রাচীন সেতুটি ঘাগর নদীর উপর এবং সামানা ও কেযালের মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল)।

১২ মুহার্‌রাম, ৮০১/২৪ সেপ্টেম্বর, ১৩৯৮ তীমূর সিন্ধু নদ (দীনকোট হইতে রাওয়ারটি, তাবাকাত-ই নাসিরী, ২৯১) অতিক্রম করেন এবং জালালু'দ্-দীন খাওয়ারিযম শাহ্‌র নামানুসারে "চুল-ই জালালী" নামে বিখ্যাত প্রান্তরে (চূল জারাদ) পৌঁছেন (Rennel, Memoir of a Map of India, লণ্ডন ১৭৯২ খৃ., ১১৬ ও ৬৩ পৃ.-র বিপরীত চিত্রে চূল জালালীর অবস্থান সোয়ান ও সিন্ধু নদের সঙ্গমস্থলের উপরে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা সঠিক নহে। দীনকোটের বিপরীত দিকের নদীর পূর্বতীর সংলগ্ন অর্থাৎ মিয়ানওয়ালী অঞ্চলে এই চূল অবস্থিত হইবে)। পথিমধ্যে চুগতাঈ রীতি অনুযায়ী তিনি ঈরয়াব দুর্গ পুনঃনির্মাণ করেন এবং মসজিদ ও জনকল্যাণমূলক অন্যান্য ভবন নির্মাণ করেন (য়াযদী, ২খ, ৩৯)। ৭ অক্টোবর তিনি ঝিলাম ও চেনাব নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট পৌঁছেন এবং ইতিপূর্বে সেইখানে সংঘটিত চুগতাঈ খান তিরমা শারীনের যুদ্ধসমূহের কথা তাঁহার মনে পড়ে। ১২ অক্টোবর তিনি তালমী (তালামরা) দুর্গে পৌঁছেন। এই দুর্গটি পীর মুহাম্মাদ মীরযা অধিকার করিয়া নিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর এইখানে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং (শহরটি) ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়।

২০ অক্টোবর তীমূর বিয়াস (বিপাশা) নদীর তীরে পৌঁছিয়া জানিতে পারেন যে, (জুনায়দ বূরালদা ও তাহার ভাই বায়াযীদ ও মুহাম্মাদ দারবীশ তায়খানী–যাহারা মুগল ছিল) ১৩৮৮ খৃস্টাব্দে খাওয়ারিযম অভিযানের সময় তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের পরিবর্তে বলখ হইতে এইখানে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল। এই সময় তাহারা দিল্লী সরকার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া পীর মুহাম্মাদের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিল (তিনি বিয়াস নদীর তীরে উপস্থিত হন। তীমূর তাহাদিগকে ইয়াসাক কাঠ দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন এবং মাফ করিয়া দেন (য়াযদী, ২খ, ৬০ প.)। এই ঘটনা হইতে জানা যায় যে, মুলতান জয়ের পর তীমূরের সৈন্যবাহিনী সেই সকল স্থানে গমন করিয়াছিল (যাহা লাহোরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত)। আজূধানের সকল বাসিন্দা যেহেতু মুসলিম ছিল, তাই তীমূর তাহাদিগকে কোনও কষ্ট দেন নাই।

১১ ডিসেম্বর তিনি যমুনার তীরে জিহাননুমাই (প্রাসাদ)-এর সামনে উপস্থিত হন। এই প্রাসাদটি ফীরোয শাহ তুগলুক কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তীমূর এই তুগলুক বংশীয় প্রাসাদের নাম অনুসারে নিজের একটি প্রাসাদের নাম জিহাননুমা রাখিয়াছিলেন, যাহা তিনি সমরকন্দের কারাতিপা নামক স্থানে নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তীমূর যখন

কারাতিপা-র প্রাসাদ নির্মাণ করেন তখন তাঁহার কল্পনায় দিল্লীর উপরোক্ত প্রাসাদের চিত্র অঙ্কিত ছিল। এইরূপে ইহার পূর্বেও তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রাসাদগুলির তিবরীয, দামিশক ও বাগদাদের ন্যায় শহরগুলির নাম অনুসারে নামকরণ করিয়াছিলেন।

তীমূর সুলতান মাহমূদ খানকে তাঁহার সৈন্যদলের বামভাগের সহিত প্রথম প্রেরণ করিযাছিলেন। উক্ত সৈন্যদলের সহিত তিনি কোপলো সেতুর উপর আসিয়া মিলিত হন এবং তারপর তিনি মাল্‌লূ খানের সহিত যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। তীমূর পথিমধ্যের দুর্গগুলি হইতে সেই সকল মুসলিমকে একত্র করিয়াছিলেন যাহারা বন্দী অবস্থায় তাঁহার সৈন্যদলের সহিত ছিল। যখন মাললূ খানের সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়িয়া দিল্লী হইতে বাহির হয় তখন ঐ সমস্ত কয়েদী সীমাহীন উল্লাস প্রকাশ করিতে থাকে। ইহা হইতে তীমূরের নিকট স্পষ্ট হইয়া যায় যে, ভারতবর্ষের মুশরিকগণ আফগানদেরকে আপন বলিয়াই মনে করে এবং মাল্‌লূ খান ও সারেং এইখানকার অমুসলিম বাসিন্দাদের উপর ভরসা করিতে পারে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে এক লক্ষের বেশি কয়েদী তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে রাখা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়াই মনে হইল। সুতরাং তিনি তাহাদের সকলকে হত্যা করেন। দিল্লীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাল্‌লূ খান পলায়ন করেন এবং তীমূর নগরীতে প্রবেশ করেন (দিল্লী নগরীতে লুণ্ঠন ও উহার অধিবাসীদের হত্যা ও বন্দী করার ব্যাপারে তীমূর 'আলিমদের নিকট ফাতওয়া চাহিয়াছিলেন। উক্ত ফাতওয়া সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও 'আলিমদের প্রদত্ত ফাতওয়া সম্পর্কে দ্র. মুহাম্মাদ জা'ফার থানেশ্বরী, তাওয়ারীখ 'আজীবা, ২য় সং, সাতোরা তা. বি., ২২৯)।

দিল্লীতে পনর দিন অবস্থানের পর তীমূর যমুনা নদী অতিক্রম করেন এবং কাতা নামক স্থানে (কাতা রোযনামা, ২খ, ১৫৩) উপস্থিত হন। অতঃপর বাগপাত ইত্যাদি স্থান হইয়া ৮ জানুয়ারি, ১৩৯৯ মীরাট পৌছেন এবং মীরাট দুর্গের সকল অগ্নিপূজককেও তিনি হত্যা করেন (৯ জানুয়ারি, ১৩৯৯)। এইখানে পৌছিবার পূর্বে তাঁহাকে দুর্গবাসীদের তরফ হইতে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তিরমা শারীন খান এই পর্যন্ত আসিয়াছিলেন কিন্তু এই দুর্গ অবরোধ করিতে পারেন নাই। ইহার পর তীমূর হিমালয় পর্বতের পাদদেশের রাজাদেরকে পরাজিত করেন। কাশ্মীর সীমান্তে (ঝিলাম নদীর চার ক্রোশ দূরে) জাহান (রোযনামা, ১৮৯ অথবা জুবহান, দ্র. য়াযদী ২খ, ১৭৭) নামক স্থানে পৌছিবার পর তিনি সমরকন্দ প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতির প্রতি মনোযোগী হন। দিল্লী অথবা মুলতানে তীমূর নিজ চুগতা'ঈ বংশীয় শাসনকর্তা নিয়োগ করেন নাই, বরং সেইখানে তিনি তুগলুক বংশীয় শাসকদের মধ্যে হইতে যাহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল তাহাদিগকে বহাল রাখেন। মুলতানে তিনি নিজের সৈন্যদলের একটি মাত্র অংশ রাখিয়া যাওয়াই যথেষ্ট মনে করিলেন। ঈরয়ান ও শিনুযান দুর্গের শাসনভার তিনি কিপচাক নেতাদের উপর সোপর্দ করেন। তীমূর কাবূলের দুর্গসমূহ মেরামত করেন এবং সেইখানে পীর মুহাম্মাদের দরবারের জনৈক আমীর নুসরাত কুমারী, জনৈক জূচী শাহযাদা বেক য়ারীক উগলানী এবং অন্য দুইজন শাহযাদাকে সামরিক গভর্নর নিযুক্ত করেন। অবশেষে মার্চ মাসে তিনি কাবুল হইতে রওয়ানা করিয়া ২২ শা'বান, ৮০১/২৯ এপ্রিল, ১৩৯৯ সমরকন্দ পৌছেন।

ভারতবর্ষে তাঁহার অনেক কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছিল। এই অসমাপ্ত কাজ রাখিয়া অতি দ্রুত তাঁহার সমরকন্দ প্রত্যাবর্তনের কতকগুলি কারণ ছিল। দিল্লী জয়ের মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই এশিয়া মাইনর হইতে দুঃসংবাদ পৌছিতে শুরু করে। আহমাদ জালা'ইর ও বায়াযীদ য়িলদিরিমের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। মিসরের মামলূক শাসনকর্তা ফারাজ ইব্‌ন বারকূক (আন-নাসিব) ১৪০৫-১২ খৃ. যিনি বারকূকের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, তীমূরের বিরুদ্ধে তৎপরতা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজ পুত্র মীরান শাহ, যাঁহাকে তিনি আযারবায়জানের ওয়ালী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, খারাপ অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছিল। তীমূর এই সকল ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাঁহার ভারতবর্ষ অভিযান যথাসময়ের পূর্বেই শেষ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চিন্তাধারা মঙ্গোলিয়া ও চীনকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছিল। তিনি আফগান (আমীর) সারেংকে, যিনি মুলতানের ওয়ালী ছিলেন, গ্রেপ্তার করিয়া সমরকন্দ গমনের পথে স্বীয় পৌত্র মুহাম্মাদ সুলতান মীরযার নিকট পাঠাইয়া দেন। মুহাম্মাদ সুলতান মীরযা তখন মঙ্গোলিয়া সীমান্তের শাসনকর্তা ছিলেন। তীমূরের ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষে আটককৃত বন্দীদের দ্বারা চীন অভিযানে একইরূপ কাজ সমাধা করা হইবে, যেইরূপ "স্বর্ণালী উরদূ"-তে গ্রেপ্তারকৃত কয়েদীদেরকে ভারতীয় অভিযানে কাজে লাগান হইয়াছিল। এই অভিযান শুরু হইবার পূর্বে কায়যী উগলান চেঙ্গীযী মঙ্গোলিয়া (মুগূলিসতান) হইতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে (কাবুলে) তীমূরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় অভিযানে তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন (য়াযদী, ২খ, ৩৪; রোযনামা, ৫৬ প.)। তীমূর তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং তাঁহার সহিত এইরূপ আচরণ করিতেন যেইরূপ একজন স্বাধীন দেশের নরপতির সহিত করা উচিত। তিনি তাঁহাকে "উলূগ য়ূরাত" অর্থাৎ চীন ও মঙ্গোলিয়ার সমগ্র এলাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে সুলতান মাহমূদ খানের ন্যায়, তিনি পূর্ব হইতেই তীমূরের সঙ্গে ছিলেন, উল্লিখিত কায়যী উগলানের সম্পর্কও উগেদাই খানের (Ugeday Han) পরিবারের সহিত ছিল। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তীমূর কায়যী উগলানকে নিজের সহিত সমরকন্দ লইয়া যান।

এশিয়া মাইনরের তখনকার অশান্ত পরিস্থিতির কারণে তীমূর পুনরায় একবার সেইদিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হন। এই অভিযানে তাঁহাকে নিজ অনুমানের কিছু বেশি সময় ব্যয় করিতে হয় (দ্র. য়াযদী, ২খ, ২০৭)। তিনি সেইখানে পূর্ণ ছয় বৎসরকাল অবস্থান করেন। মাত্র চারি মাস সমরকন্দে অবস্থান করিবার পর তিনি ১০ সেপ্টেম্বর, ১৩৯৯ পুনরায় রওয়ানা হন। এশিয়া মাইনরে অভিযান চলাকালে তীমূরের নিয়ম ছিল, তিনি শীতকাল আযারবায়জানে এবং গ্রীষ্মকাল উক্ত এলাকায় অথবা পূর্ব আনাতোলিয়ার উচ্চ পাহাড়ে অতিবাহিত করিতেন। আযারবায়জান পৌছিবার পর তাঁহার প্রথম কাজ ছিল মীরান শাহ্‌র দিকে দৃষ্টিপাত করা–যে বিলাসিতায় ডুবিয়া থাকিত এবং সেই সমস্ত লোকের শাস্তি প্রদান করা যাহারা তাঁহাকে এই ধরনের জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করিত। সর্বাপেক্ষা বেশি শাস্তি তিনি মীরযা-র দরবারের কবি, শিল্পী ও তাহার সেই সমস্ত বন্ধুকে প্রদান করিতেন যাহারা তাঁহার পান ও আহারের সঙ্গী ছিল (উদাহরণস্বরূপ, মুহাম্মাদ কুহিস্তানী, কুতবুদ্‌দীন নায়ী, হাবীব 'আওদী, 'আবদু'ল্‌-মু'মিন গোয়েন্দা; ইহাদিগকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হয়; য়াযদী, ২খ, ২১৪)।

তীমূর যখন আযারবায়জানে অবস্থানরত ছিলেন তখন তাঁহার পৌত্র ফারগানার ওয়ালী ইসকান্দার মীরযা কাশগরের পার্শ্ববর্তী এলাকা জয় করেন এবং এইরূপে তীমূরের রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান। তীমূর এই উদ্দেশ্যে তাঁহার কয়েকজন আমীরকে য়িদীসূর দিকে প্রেরণ করেন যেন তাহারা চীন অভিমুখী সড়কের উপর সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে এবং কৃষি জমির উন্নয়ন সাধন করে, যাহাতে সৈন্যদের সেইখান হইতে খাদ্য সরবরাহ সম্ভব হয়। আমীর আল্লাহ দাদ এই আমীর দলের নেতা ছিলেন। নকশা প্রণয়নের দায়িত্বও তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়, যাহাতে অভিযান চলাকালে উহা হইতে সাহায্য লাভ করা যায়। ৮০৩ হিজরীর মুহার্‌রাম/১৪০০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে তীমূর গুরজিস্তান হইতে রওয়ানা করিয়া সীওয়াস আগমন করেন এবং সেইখান হইতে মালাতিয়া, হালাব, হামা, হিমস ও বা'লাবাক হইয়া সিরিয়া পৌছেন এবং দামিশক অধিকার করেন। তীমূর মিসরের মামলূক শাসনকর্তা ফারাজকেও পরাজিত করেন, অথচ ফারাজের নিকট প্রচুর গোলাবারুদ ও বিরাট সৈন্যবাহিনী মওজুদ ছিল।

মাযিনদারান ও তাবারিস্তানের ন্যায় এলাকাসমূহে সেইখানকার অধিবাসিগণ শী'আ ছিল, তীমূর এক গোঁড়া সুন্নী হইবার প্রমাণ রাখেন। ইহার বিপরীতক্রমে দামিশকে, সেইখানকার বাসিন্দাগণ প্রচলিত সুন্নী মতাবলম্বী ছিল এবং তাহারা শী'আদের পবিত্র স্থানসমূহে আক্রমণ চালাইয়াছিল, তীমূরের আচরণ এক কট্টর শী'আর ন্যায় ছিল, কিন্তু নিজে এক মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করিতেন। যদিও তিনি 'আকীদা ও বিশ্বাস অনুযায়ী একজন পরিপূর্ণ সুন্নী ছিলেন, কিন্তু দামিশকে তাঁহার আচরণ শী'আদের ন্যায় মনে হয় [এই প্রসংগে দ্র. ইব্‌ন 'আরাবশাহ, পৃ. قمع (১৭৮), هوشيعى]। "তিনি একজন শী'ঈ" (তীমূরের উপস্থিতিতে জনৈক ব্যক্তির উক্তি) এবং ফারীদূন বেক, মুনশা'আত, ১খ, ১৩১, লাইন ২০, "আহ্‌লুস সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতের বিশ্বাস সূর্যালোকের ন্যায় সত্য" (তীমূরের উক্তি)। দামিশকে তীমূর রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুইজন স্ত্রীর মাযারের উপর শ্বেত পাথরের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন (য়ায্‌দী, ২খ, ৩৩৬)। এখানেই তিনি (বিখ্যাত) ঐতিহাসিক ইব্‌ন খালদূনকে সাক্ষাত দান করেন। তীমূর ও ইব্‌ন খালদূনের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যাহার উল্লেখ ইব্‌ন খালদূন তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে (দ্র. আত্-তা'রীখ বি-ইব্‌ন খালদূন.... ওয়া রিহলাতুহু) সবিস্তারে করিয়াছেন। দামিশক হইতে তীমূর ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ২৭ যুল-কা'দা, ৮০৩/২৯ জুলাই, ১৪০১ দ্বিতীয়বার বাগদাদ অধিকার করেন (য়ায্‌দী, ২খ, ৩৬৫)। এইখানে যেই বিশ হাজার লোক সুলতান আহমাদ জালা'ইরকে সাহায্য করিয়াছিল তাহাদের সকলকে তীমূর হত্যা করেন (দ্র. ইব্‌ন 'আরাবশাহ, পৃ. كى, =২২৮)।

কারা কুয়ূনলু তুর্কোমানদের নেতা কারা য়ূসুফের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য তীমূর স্বীয় পৌত্র আবূ বাক্‌র মীরযাকে দিয়ারবাক্‌রের দিকে প্রেরণ করেন, যাহা ফোরাত নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। তীমূর শীতকাল আযারবায়জানে অতিবাহিত করেন এবং ১৪০২ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে তিনি পুনরায় কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যদি বায়াযীদ য়িলদিরিম সন্ধিতে রাজি না হন তাহা হইলে চূড়ান্ত ফায়সালা যুদ্ধক্ষেত্রেই হইবে। য়িলদিরিম বলকান অঞ্চলে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। কিন্তু মিসরের মামলূক শাসকবৃন্দ, আহমাদ জালাইর ও কারা য়ূসুফের প্রতারণায়, যাঁহারা তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'উছমানী সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্বদিকে সম্প্রসারণের আশায় তিনি তাঁহার সৈন্যদলকে বলকান হইতে ফেরত ডাকিয়া আনেন এবং আনাতোলিয়ায় প্রবেশ করেন। কারামান উগলী, য়ু'ল্-কাদ্‌র উগলী ও গিরমিয়ান উগলী শহরগুলি অধিকারের মাধ্যমে তিনি তাঁহার বিজয় অভিযানের সূচনা করেন। উক্ত শহরগুলি ঈলখানীদের আমল হইতেই অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল। ইহার পর তিনি এই ভাবিয়া ইরযিনজানে সেনা অভিযান প্রেরণ করে যে, উহা তীমূরের সাম্রাজ্যের অংশ হইবে। কারণ উহা ঈলখানীদের প্রদেশ ছিল। ইরযিনজানের আমীর তাহরাতিনকে পরাজিত করিয়া য়িলদিরিম এই প্রদেশটি অধিকার করিয়া লন এবং ইহার পর মঙ্গোলীয় আমীর তাহরাতিনের পরিবারকে গ্রেফতার করিয়া বরোসা পাঠাইয়া দেন।

এই সমস্ত পদক্ষেপ তীমূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই নামান্তর ছিল। 'উছমানী আমীরদের ভালোভাবেই জানা ছিল যে, এই ধরনের পদক্ষেপের একমাত্র পরিণতি যুদ্ধ এবং বায়াযীদকে এইজন্য অতি ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে ২০ জুলাই, ১৪০২ খৃস্টাব্দে আঙ্কারার নিকট বায়াযীদকে এক ঘোরতর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়। বায়াযীদের সৈন্যবাহিনীতে বলকানী খৃস্টানদের একটি বিরাট সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বায়াযীদ অত্যন্ত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তীমূরের দলপতিদের হাতে বন্দী হন। স্বয়ং সুলতান মাহমূদ (খান) তাঁহাকে গ্রেফতার করেন (১৯ যু'ল্-হিজ্জ, ৮০৪/২০ জুলাই, ১৪০২) এবং সঙ্গে সঙ্গে তীমূরের সম্মুখে হাযির করেন (য়ায্‌দী, ২খ, ৪৩৮)। যেই ঐতিহাসিকগণ নিজেরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা এই সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যেমন হাফিজ আবরূ ও শিহাবুদ-দীন মুহাম্মাদ মুন্‌শী (যিনি তীমূরের ভারতবর্ষের যুদ্ধসমূহের রোযনামচা লিপিবদ্ধকারী গিয়াছু'দ্-দীন 'আলীর পুত্র ছিলেন)। শিহাবু'দ্-দীন মুহাম্মাদ রুসূম ফুতূহাতী নামে সম্পূর্ণরূপে এই যুদ্ধসমূহের বর্ণনা দিয়া একটি পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু ১৪ শা'বান, ৮০৫/৯ মার্চ, ১৪০৯ তারিখে বায়াযীদ হাঁপানিতে আক্রান্ত হইয়া আক শহরে ইনতিকাল করেন (য়ায্‌দী, ২খ, ৪৮৯)। অনুমান করা হয় যে, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন এবং ইহা ৯ মার্চ তারিখে সংঘটিত হয় (দ্র. A. D. Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty, অক্সফোর্ড ১৯৫৬, পৃ. ১০৭, ৬০প., ৩৮। য়িলদিরিমের আত্মহত্যা সম্পর্কে দ্র. ফুওয়াদ কোপরালূ-র দুইটি প্রবন্ধ, Belletin, ২খ, ৫৯১ ও ২৭খ, ৫৯১; দ্র. 'আশিক পাশাযাদা ইস্তাম্বুল স. ৮০ ও Giese স, ৭২, উরূজবেক তা'রীখী, Babinger, ৩৭; লুতফী পাশা তা'রীখী, ৫৯; তাওয়ারীখ আল-ই 'উছমানী, Giese, ৪৬; ডঃ অলডারসনের পত্র হইতে, তারিখ ৩১ অক্‌টোবর, ১৯৬১)।

শান্তি স্থাপনের অজুহাতে তীমূরের সৈন্যবাহিনী বরোসা ও দক্ষিণ-পশ্চিম আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং সেইখানে লুটতরাজ চালায়। কোন কাফির রাজ্য জয়ের আশায় তীমূর ইয্‌মীর (স্মার্না) আক্রমণ করেন এবং খৃস্টান নাইটদের পরাজিত করিয়া ইয্‌মীর জয় করেন। তীমূরের পৌত্র মুহাম্মাদ সুলতান ও খান সুলতান মাহমূদ খান উভয়ে আনাতোলিয়ায় ইনতিকাল করেন। মিসরীয় মামলূক

শাসনকর্তাগণ ও রোমান (বায়যান্টাইন) সম্রাট তৃতীয় হেনরীর দূত Ruy Ganzales de Clavijo এবং আরও কয়েকজন দূতকে সঙ্গে লইয়া সমরকন্দ ফিরিয়া আসেন।

এইবারও তীমূর সমরকন্দে বেশি দিন থাকিতে পারিলেন না। চীন অভিযানের জন্য যে সকল প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল সেই সম্পর্কে এবং মঙ্গোলিয়া ও চীনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার নিকট পূর্ণ তথ্য পৌঁছিতেছিল। ইহা ছাড়া আমীর আল্লাহ দাদের প্রস্তুতকৃত নক্শা তীমূরের আনাতোলিয়া অবস্থানকালেই তাঁহার নিকট পেশ করা হইয়াছিল (উক্ত আমীর উহা নিজেই সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন)। সমরকন্দ পৌঁছিবার পর তীমূর এই সমস্ত প্রস্তুতির পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন এবং এক বিশাল সমাবেশ (Kurultay=কুরুলতায়) আহ্বান করেন। এই সমাবেশ তাঁহার সকল আমীর ও দেশের প্রবীণ নেতার সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অভিযানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ২৩ জুমাদাল উলা, ৮০৭/২৭ নভেম্বর, ১৪০৪ সালে তিনি সমরকন্দ হইতে চীন অভিযানে রওয়ানা হন। সময় সময় যেই সকল মোঙ্গল শাহযাদা মঙ্গোলিয়া হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ছাড়াও তীমূর বহু সংখ্যক 'আলিমকেও তাঁহার সঙ্গে লইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, তাঁহাদের সহায়তায় বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী এবং চীন গমনের পথে সাক্ষাতপ্রাপ্ত শামানী ধর্মাবলম্বীদেরকে (Shamanists) ইসলামের গণ্ডিতে আনয়ন।

তীমূর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, চীন ও মঙ্গোলিয়া জয়ের পর উহার শাসনভার তাঁহার পৌত্র মুহাম্মাদ সুলতানের উপর ন্যস্ত করিবেন, যিনি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উক্ত শাহযাদা আকশেহিরে ইনতিকাল করেন। ইহার পর স্থির হয়, তীমূরের দ্বিতীয় প্রিয় পৌত্র উলুগবেক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। কিন্তু সির দরিয়া অতিক্রমের পরবর্তী বৎসর স্বয়ং তীমূর সর্দিতে আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি কিছু দিন উতরারে থাকিয়া যান, কিন্তু ঔষধ ও বিশ্রাম কোনটিই তাঁহার উপকারে আসিল না। ১৭ শা'বান, ৮০৭/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৪০৫ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃতদেহ সমরকন্দ নিয়া আসা হয় এবং পৌত্র মুহাম্মাদ সুলতান মীরয়ার (যিনি আনাতোলিয়ায় ইনতিকাল করিয়াছিলেন) নির্দেশে মাদরাসার গম্বুজের নীচে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে মীরান শাহ ইরাকের ওয়ালী ছিলেন, শাহরুখ খুরাসানে এবং মীরান শাহ্র পুত্র আবূ বাক্র মীরযা বাগদাদে ছিলেন, 'উমার শাহ মীরযার পুত্র মীর মুহাম্মাদ পারস্যের ওয়ালী এবং দ্বিতীয় পীর মুহাম্মাদ ইব্ন জাহাঙ্গীর মীরযা ইব্ন তীমূর কান্দাহার, মুলতান ও ছুগূর-ই হিন্দ-এর ওয়ালী ছিলেন। তীমূরের ইচ্ছা ছিল পীর মুহাম্মাদ ইব্ন জাহাঙ্গীরকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা। তীমূরের ইনতিকালের পর তাঁহার পৌত্র খালীল মীরযা তীমূরের স্থলাভিষিক্ত হইবার চেষ্টা করেন এবং ইহা লইয়া পীর মুহাম্মাদ, যে সেই সময় বালকে ছিল, ও শাহরুখের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। কিন্তু যুদ্ধে শাহরুখ জয়ী হন এবং সমগ্র জাতি তাঁহাকে উলুগবেকরূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

ইতিহাস গ্রন্থসমূহে তীমূর সম্পর্কে সর্বদা এই কথা বলা হয় যে, তাঁহার ডান হাত ত্রুটিযুক্ত এবং ডান পা খোঁড়া ছিল (ইব্ন 'আরাবশাহ, পৃ. شصح (=৩৯৮) ঃ اشل ،شل اعرج اليمناوين, ৪৭ ও ১১৭)। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রফেসর কারিনিয়াযভ (Kariniyazov) ও প্রফেসর ওশানিন (Oshanin) তীমূরের কবর খুঁড়িয়া তাঁহার হাঁড়গুলি পর্যবেক্ষণ করেন। এই পর্যবেক্ষণ হইতে উপরোক্ত তথ্য সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং তাঁহার হাত, পা ও মাথা যে কত বড় ছিল তাহাও ইহা হইতে জানিতে পারা যায়। সমসাময়িকগণের সাক্ষ্য অনুসারে তীমূর এক বিশাল দেহের অধিকারী (দীর্ঘদেহী) ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কপাল প্রশস্ত ও মাথা বড় ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল গুরুগম্ভীর [দাড়ি সোজা নীচের দিকে ঝুলন্ত ছিল, দ্র. مسترسل اللحية; ইব্ন 'আরাবশাহ, পৃ. (=৩৯৮), হাত-পা বড় ছিল]। কাঁধ প্রশস্ত এবং মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ছিল (দেহের বর্ণ লাল-সাদা মিশ্রিত ছিল)। শেষ বয়সে তাঁহার মাথার চুল ও দাড়ি সম্পূর্ণ সাদা হইয়া গিয়াছিল। মুনাফিকী ও কপটতার প্রতি তাঁহার ভীষণ ঘৃণা ছিল এবং যে কোন মূল্যে সত্যবাদিতা পসন্দ করিতেন। দুষ্কর্ম ও কুঅভ্যাসের জন্য তাঁহার মনে এতটুকুও দয়া ছিল না। যাহারা কোনও স্থান দিয়া সৈন্য যাওয়ার অজুহাতে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ কিংবা অন্যায় সুবিধা আদায় করিত তাহাদিগকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করিতেন। এমন কি বলা হইয়া থাকে যে, তিনি সমরকন্দের কসাইদেরকে উপরোক্ত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ টগবগে গরম তেলের বড় বড় কড়াইতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ইব্ন 'আরাবশাহ লিখিয়াছেন, তীমূর নিরক্ষর ছিলেন, তিনি লিখিতে-পড়িতে জানিতেন না। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যাস্বরূপ তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি আরবী মোটেও জানিতেন না [অবশ্য ফারসী, তুর্কী ও মুগুলীয় ভাষা জানিতেন এবং ব্যস এইটুকুই ইব্ন 'আরাবশাহ, পৃ. (=৪০৩) ও (১৭৯); দ্র. ৩৮। নিবন্ধকারের প্রাপ্ত তথ্য মুতাবিক তীমূর উয়গূর ও আরবী লিপি পড়িতে পারিতেন]। সফর ও মুকীম উভয় অবস্থায় তিনি ইতিহাস গ্রন্থ [নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলী ও রাজা-বাদশাহদের জীবনকাহিনী] পড়াইয়া শুনিতেন, এই সকল গ্রন্থ ফারসী ভাষায় রচিত ছিল [ইব্ন 'আরাবশাহ, পৃ. (৪০৩)]।

তিনি ইতিহাস ও শিল্পকলা, বিশেষ করিয়া স্থাপত্য শিল্পের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং ইতিহাসের বিপরীতে উহার বিষয়বস্তুর সমালোচনা ও সংশোধন করেন। শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন (য়াযদী, ২খ, ৫৬০)। তিনি কতকগুলি মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ এবং উদ্যান রচনা করেন। তন্মধ্যে সমরকন্দের উদ্যানরাজি, যথা ঃ বাগ-ই চিনার, বাগ-ই দিলকুশা, বাগ-ই বেহেশত, বাগ-ই বুলন্দ, বাগ-ই শামাল, বাগ-ই নাওয়া ইত্যাদি (দ্র. ওয়ামবেরী, History of Bokhara, পৃ. ২০৫ প., উর্দূ অনু. পৃ. ২৫৮ প.; য়াযদী, ১খ, ৮০০, ২খ, ৬) অতি বিখ্যাত ছিল। সেনা অভিযানের সময় তিনি মানুষের বিনোদন কেন্দ্রসমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিতেন। স্বীয় রাজধানী সমরকন্দকে এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত করিবার জন্য তিনি উহার চতুর্দিকে লোকবসতি স্থাপন করেন এবং উহাদের নাম দামিশক, সুলতানিয়্যা, বাগদাদ, শীরায ইতাদি রাখেন (দ্র. Barthold, Turkestan, ৮৮, দামিশক সমরকন্দ-এর জন্য যাহা আজিও বর্তমান রহিয়াছে, শীরাযের উল্লেখ বাবুর করিয়াছেন, উক্ত গ্রন্থ, ৯৪, ১১)। বড় বড় নদী হইতে খাল খনন করা তাঁহার প্রিয় কাজ ছিল এবং ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অধিক পরিমাণ জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়ন করা। এই ক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কীর্তিসমূহ নিম্নরূপঃ তুয়ি তাতার

(Tuye tatar) খাল। ইহা সমরকন্দের উপরে যারাফশান নদী হইতে খনন করা হইয়াছে এবং বায়লাকান ও বারলাস খাল, যাহা আযারবায়জানে আরাস নদী হইতে খনন করা হইয়াছে (য়াযদী, ২খ, ৫৪৬ ও ৩৯৪)। প্রাচীন কিরত্ বংশের আমলে হিরাতের দুর্গ ও শহরের বাহিরের খাল ব্যবস্থা তীমূরই কায়েম করেন এবং নূতন শহরও তিনিই নির্মাণ করেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধন তীমূরের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। মিসরের মামলূক শাসনকর্তা ফারাজ ও ফরাসী সম্রাটের নিকট তিনি যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় [দ্র. য়াযদী, ১খ, ৬৪৩]।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে চেঙ্গীয খান ও মাহমূদ গাযনাবী তাঁহার নিকট অতি প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার বংশধরের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতেন। সুতরাং তাঁহার আমলে বলখে 'উক্কাশা [ইব্ন মিহসান আল্-আসাদী, ৩খ, ৬২] এবং সমরকন্দে কুছাম ইব্ন 'আব্বাস [সমরকন্দে সমাহিত]-এর সমাধিসমূহের সংস্কার সাধন করা হয়। তীমূর স্বীয় আত্মীয়স্বজনকে তাঁহাদের আশেপাশে সমাহিত করেন। রাসূল কারীম (স)-এর বংশধর হইবার কারণে যেই সকল 'আলিম বিখ্যাত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সায়্যিদ বিরিকিহ্ তিরমিযী ও সায়্যিদ শারীফ জুরজানীকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করিতেন। ফকীহগণের মধ্যে তাঁহার সর্বাধিক আস্থা ছিল জনৈক তুর্কী শায়খ আহমাদ য়িসিবীর উপর। সঙ্কটকালে স্বজনদের সান্ত্বনা দানের জন্য তিনি শায়খের নিকট তাঁহার কবিতা শ্রবণ করিতেন। রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের ক্ষেত্রে তীমূর চেঙ্গীযের চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীকে পৃথক করিলে তাঁহার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগিত যে, পৃথিবীর যেই সকল স্থানে এখনও ইসলামের আলো পৌছে নাই সেই সকল স্থানেও যদি ইসলামের আলো প্রজ্বলিত করিতে পারিতেন! সরকারী অনুষ্ঠানসমূহে, যেইখানে 'আলিমগণও অংশগ্রহণ করিতেন, মদ পরিবেশন করা হইত। বিশেষ ধরনের এক প্রকার মিষ্টি মদ, যাহা মহিলাদের জন্য উপযোগী বলিয়া মনে করা হইত, মহিলাদের পৃথক অনুষ্ঠানে পরিবেশন করা হইত। এই সকল ক্ষেত্রে তিনি শারী'আতের পরিবর্তে চেঙ্গীযী রীতিনীতির অনুসারী ছিলেন (দ্র. ইব্ন 'আরাবশাহ, পৃ. ঈ (=৪০৩)।

তীমূরের সমসাময়িকগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার সম্পর্কে লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনজন পাশ্চাত্য লেখক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য (এক), ক্যাস্টাইল (Castile) রাজের দূত ক্লাভিজো (Clavijo), যাঁহার সম্পর্কে উপরে উল্লিখিত হইয়াছে; (দুই) ইভান শিল্ট্বারগার (Ivan Schiltberger), যিনি তীমূর কর্তৃক বায়াযীদ গ্রেফতার হওয়ার সময় বায়াযীদের সঙ্গে ছিলেন এবং (তিন), প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ার দ্য আইলী (Pierre d'Ailly)। এই শেষোক্ত লেখক তীমূরকে "সেই যুগের হানিবল" (Hannibal) নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ক্লাভিজোর উক্তি অনুসারে তীমূর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন। শিল্ট্বার্গার সম্পর্কে যতটুকু বলা যায় তাহা হইল, তিনি যদিও একজন অশিক্ষিত সৈনিক ছিলেন তবুও তীমূর ও তাঁহার শত্রুদের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নিজামুদ-দীন শামী, জাফারনামা, সং F. Tauer, ১খ, বৈরূত ১৯৩৭ খৃ.; (২) জাফারনামা, সংশোধন ও পরিবর্ধন হাফিজ আবরূ, সং. Tauer, ২খ, প্রাগ ১৯৫৬ খৃ.; (৩) শারাফু'দ-দীন য়াযদী, জাফারনামা, কলিকাতা (তেহরান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে); (৪) 'আবদু'র-রায্যাক সামারকান্দী, মাতলা' সা'দায়ন, ২খ, মুহাম্মাদ শাফী', লাহোর ১৯৪১, ১৯৪৯ (১ম খণ্ড এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়াছে) [নিবন্ধটিতে ১ম খণ্ডের বরাত সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক এদিরনে পাণ্ডুলিপি হইতে প্রদত্ত হইয়াছে]; (৫) তা'রীখ মু'ঈনী নাতানযী, সং. J. Auben; (৬) জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদ জা'ফারী হুসায়নী, তা'রীখ কাবীর, কলিকাতা ও লেনিনগ্রাদ পাণ্ডুলিপি (ফারহাঙ্গ-ই ঈরান যামীন, ৬খ, ৮৯-৯৪); (৭) মূসুবী, আসাহ্'ত-তাওয়ারীখ, য়াকী জামি' পাণ্ডুলিপি, নূন, খাদীজা তুরখান, ২২৮; (৮) জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ হুসায়নী, ফাতিহ ৪৩০৭; (৯) খুদাওয়ান্দ শাহ হুসায়নী, জাফারনামা, ফাতিহ ৪৪২৯; (১০) তাজ সিলমানী, শামসু'ল্-হুস্ন, Wiesbaden ১৯৫৬; (১১) ইব্ন 'আরাব শাহ, 'আজাইবু'ল-মাকদূর ফী আখবারি তীমূর, লণ্ডন ১৬৩৬ খৃ. [মিসর ১৩০৫/১৮৮৭ সংস্করণও রহিয়াছে, গ্রন্থটির কোনও কোনও সংস্করণে নামের মধ্যে আখবার-এর স্থলে নাওয়া'ইব রহিয়াছে]; (১২) গিয়াছু'দ-দীন 'আলী, কিতাব রোযনামা গাযাওয়াত হিন্দুস্তান, লিউযিমিন, পিটার্সবার্গ ১৯১৫ খৃ.; (১৩) মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতু'স -সাফা, বোম্বাই ১২৭১ হি., তেহরান ১২৭০-১২৭৪ হি.; (১৪) খাওয়ান্দামীর, হাবীবু'স-সিয়ার, বোম্বাই ১৮৫৭ খৃ., তেহরান ১২৭১/১৮৫৫; (১৫) মাকরীযী, সুলূক; (১৬) বাদরু'দ-দীন 'আয়নী, 'ইকদু'ল্-জামান, বায়াযীদ 'উমূমী ও তুপকাপূসারায় পাণ্ডুলিপি; (১৭) W. J. Fischel, Ibn Khaldun and Tamerlane (বারক্লে ১৯৫২); (১৮) মুহাম্মাদ ইব্ন তাবীত তানজী,তা'রীফ বা ইব্ন খালদূন ওয়া রিহলাতুহু গারবান ওয়া শারকান (কায়রো ১৯৫১); (১৯) ইবনু'ল-ফুরাত, তা'রীখ, জেরুসালেম ও কায়রো; (২০) ইব্ন ইয়াস, বাদা'ই'উ'য-যুহূর, P. Kahle ও মুহাম্মাদ মুসতাফা; (২১) য়ূসুফ ইব্ন তাগরীবিরদী, আন্-নুজূমু'য-যাহিরা, মিসর; (২২) Clavijo, Travels, উত্তম সংস্করণ, স্পেনীয় ভাষায়, Russian Academy of Science-এর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের সংস্করণসহ; (২৩) H. Schiltberger, Bondage and Travels of John Schiltberger, Hakluyt Society, প্রাচীন সিরিজ, খ. ৫৮, লণ্ডন ১৮৭৯; (২৪) পূর্ব য়ূরোপের ব্যাপারে তীমূরের কৌশলগত কর্মপন্থার জন্য দ্র. বায়াযীদের নামে লিখিত তাঁহার পত্র, ফেব্রুয়ারী ১৩৯৫, যে সম্পর্কে Z D- M. G., খ. ১০৮, ১৯৫৯, ২৮০-২৯৮ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে; (২৫) যেই সকল বাণী তীমূরের বলিয়া অভিহিত করা হয় এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে একাধিকবার প্রকাশিত হইয়াছে উহার সামান্য মাত্রই আসল এবং অধিকাংশই নকল (দ্র. Z.V. Togan, Torihte Usul, ইস্তাম্বুল ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৮৯); (২৬) Image Mundi de Pierre d'Ailly, ৩খ, ৭৪৯; [(২৭) মারাককা 'বায়সূন্গুরী, তোপকাপূসারায় সংখ্যা ২১৫২-তে তীমূর ও তাঁহার পুত্রদের সমকালীন চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই চিত্রগুলি চেঙ্গীযের বংশধরের বংশতালিকায় অন্তর্ভুক্ত দেখান হইয়াছে, যেইখানে সাধারণত আবীগূরী ও ফারসী উভয় ভাষায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া উহার নীচে বৃত্তাকারের মধ্যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চেঙ্গীয খান ও তীমূরের চিত্র দুইটি রঙীন, বাকিগুলি কালো রঙের। যতদূর জানা যায়, তীমূরের পুত্রদের এই চিত্রগুলি এইখানে প্রথমবারের মত প্রকাশিত হইয়াছে। দ্র. আরমুগান-ই 'ইল্মী, ১০৫, ৩]।

আহমাদ যাকী ওয়ালিদী তুগান (দা. মা.ই.)/মু. আবদুল মান্নান

তীমূরীগণ বা তায়মূরীগণ (بنو تيمور) ঃ সাধারণত আমীর তীমূরের সকল বংশধর। ইহা ছাড়া আরও বিশেষভাবে খৃস্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে পারস্য ও মধ্য এশিয়ায় শাসন পরিচালনাকারী তাঁহার পরিবারের রাজন্যবর্গের ক্ষেত্রেও নামটি ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত অর্থে ইহা এই নিবন্ধের বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

তীমূরীদের ইতিহাস দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (তু. Browne, A History of Persian Literatue under Tarter Dominion, পৃ. ৩৬০)। প্রথম যুগে বিজেতার পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে বিভক্ত সাম্রাজ্যটি যাহা শীঘ্রই দুইটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়–পশ্চিমেরটি মীরানশাহ ও তাঁহার পুত্র আবূ বাক্‌র ও মুহাম্মাদ 'উমার-এর এবং পূর্বেরটি শাহরুখের যাহা প্রথমত খুরাসানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যাহার সহিত পরবর্তী কালে কয়েক বৎসরের মধ্যে ট্রান্স অকসিয়ানা সংযুক্ত হয়। তীমূর কর্তৃক শাসিত প্রায় সমগ্র এলাকা লইয়া এই সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। ইহা ছিল একটি অতিশয় উন্নত ও তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ যুগ। যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও শান্তিপ্রিয় স্বভাবের শাহরুখ তাঁহার পিতা কর্তৃক কৃত ক্ষতির খেসারত প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং যতদূর সম্ভব জ্ঞানী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শাহরুখের মৃত্যু হইতে শুরূরের যুদ্ধ পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগে ইরানীদের ঐক্য নিশ্চিত করিয়া তীমূরীয় আধিপত্যের প্রতি চরম আঘাত হানা হয়। সাম্রাজ্যটি ধীরে ধীরে খণ্ড-বিখণ্ড হইতে থাকে। প্রত্যেক যুবরাজ তাঁহার নিজস্ব রাজ্য পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক হন এবং এইভাবে শত্রুদের, যাহারা সকল দিক হইতে দুর্বল রাজ্যটিকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছিল, অগ্রগমনের পথ প্রশস্ত করে। কিন্তু একটি অদ্ভুত বৈপরীত্য দ্বারা পুনর্জাগরণটি (যাহা শাহরুখের রাজত্বকালকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছিল) ইহার সকল ঔজ্জ্বল্যসহ তাঁহার উত্তরাধিকারীদের অধীনে তাঁহাদের শাসনামলের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সমগ্র খৃস্টীয় ১৫শ শতাব্দীটি ছিল শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য স্বর্ণযুগ। দ্বিতীয় সর্বশেষ তীমূরী হুসায়ন বায়কারার রাজদরবার শাহরুখের রাজদরবারের তুলনায় হীনতর ছিল না।

তীমূরের মৃত্যু সংবাদ গোপন করিয়া আমীরগণ সফলভাবে চীনে অভিযান পরিচালনায় সক্ষম হইবেন, ধারণা করিতেন। তাঁহারা অভিযানের সময়ে যুবরাজ খালীলকে শাসক হিসাবে গ্রহণ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যাঁহাকে একটি প্রতিনিধি পরিষদ সহায়তা দান করিবে এবং যিনি তীমূরের অভিপ্রায় অনুসারে পীর মুহাম্মাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন। দুইজন দাবিদারের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং পীর মুহাম্মাদ দুইবার পরাস্ত হইয়া খালীলের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, যিনি তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। উযীর পীর 'আলী তাজ ছয়মাস পরে পীর মুহাম্মাদকে হত্যা করেন এবং স্বয়ং সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন; ইহাতে তিনি প্রাণ হারান (৮০৮/১৪০৬)। আমীরগণ খালীলকে তাঁহার অমিতব্যয়িতার জন্য নিন্দা করেন। তদুপরি তিনি তাঁহার সেনাদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হন ও আমীরগণ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। তাঁহাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ ইরাকের শাসকর্তার পদ দেওয়া হয় (৮০৯/১৪০৬-১৪০৭)। ইরাকেই তিনি তাঁহার শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন।

মীরানশাহ তাঁহার পুত্র আবূ বাক্‌রের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ 'উমারের পক্ষে (ইহা তীমূরের নির্দেশ ছিল) যেই রাজ্যটি শাসন করিতেন তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল ইরাক, আযারবায়জান, মুগান, শীরওয়ান ও জর্জিয়া। অতঃপর দুই ভ্রাতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয় এবং আমীর জিহানশাহ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে তাঁহার প্রাণনাশ হয়। মীরানশাহ শাহরুখের বিরুদ্ধে শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শন করিলেও শেষ পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন (৮০৮/১৪০৫-১৪০৬)। ৮১০/১৪০৮ সালে মীরানশাহ কারা য়ূসুফের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার পুত্রগণও প্রায় একই সময়ে প্রাণ হারান।

তীমূরের মৃত্যুর পর শাহরুখ কেবল খুরাসানের শাসক ছিলেন। তিনি ৮০৯/১৪০৬ সালে মাযানদারান এবং পরের বৎসর সীস্তান জয় করেন। অতঃপর তিনি ট্রান্স-অক্সিয়ানার উপর তাঁহার কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেন। ৮১১/১৪০৯ সালে তিনি সামারকান্দ অধিকার করার উদ্দেশ্যে ট্রান্স-অক্সিয়ানায় গমন করেন। দেশটিকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে মারব পুনর্নির্মাণ করেন এবং মুরগাব নদীর পুরাতন প্রবাহ পুনঃ চালু করেন। অধিকন্তু তিনি ফার্‌স (৮১৭/১৪১৪-১৫), কিরমান (৮১৯/১৪১৬-১৭) ও আযারবায়জানে তাঁহার ক্ষমতা সম্প্রসারণ করেন। তাঁহার দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কারা য়ূসুফকে আক্রমণ করিতে তিনি আযারবায়জান গমন করেন। শেষোক্তজন হঠাৎ করিয়া ইনতিকাল করিলে শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয় (৮২২/১৪১৯)। কিন্তু কারা য়ূসুফের উত্তরাধিকারী ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আককারী বেনলূ বংশের সহিত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। পরিশেষে শাহরুখ সিরিয়া ও 'আরাবিস্তান ব্যতীত তীমূরের সকল অঞ্চলই অধিকার করেন। তাঁহার শাসনামলে বহু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু সবগুলি দমন করা হয়। এইগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল আমীর খুদায়দাদ ও শাহ বাহাউদ-দীন (৮১২/১৪০৯-১০), শীরাযে বায়কারা মীরযা (৮১৮/১৪১৫-১৬), ইসকান্দার ও জিহানশাহ (৮৩২/১৪২৯) কর্তৃক পরিচালিত বিদ্রোহসমূহ।

৮২০/১৪১৭-১৮ সালে শাহরুখ তাঁহার পুত্র বায়সোনগোর-কে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্থানে স্থাপিত করেন এবং যাহারা তাঁহাদের উপর স্থাপিত বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে নাই তাহাদিগকে অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে বাধ্য করেন। উলূগ বেগ ব্যতীত অন্য সকল পুত্রই তাঁহার জীবদ্দশায় মারা যান। তিনি উদার, শান্তিপ্রিয়, সাহসী ও উচ্চাভিলাষ হইতে মুক্ত একজন রাজার স্মৃতি পশ্চাতে রক্ষা করিয়া ২৫ যু'লহিজ্জা, ৮৫০/১২ মার্চ, ১৪৪৭ তারিখে ফিশাওয়ারদ (রায়)-এ ইনতিকাল করেন। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে হিরাতে বিশাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা তাঁহার কাছে ঋণী। চীনের সহিত তিনি যাঁহার অধিরাজ ছিলেন, সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রাখিয়াছেন এবং ভারতের উপর তিনি শুধু নামেমাত্র মালিকানা দাবি করেন। অপরপক্ষে 'উছমানী ও মিসরীয়দের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল সর্বদা অপ্রীতিকর।

তাঁহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের দ্রুত ও অপ্রতিকার্য পতন শুরু হয়। জ্যোতির্বিদ নৃপতি উলূগ বেগ (৮৫০-৮৫২/১৪৪৭-৪৯) ছিলেন শাসক অপেক্ষা ছাত্র হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি। যেই সকল বিপদ-আপদ তাঁহাকে জর্জরিত করিয়াছিল সেইগুলির মুকাবিলা করিতে তিনি অসমর্থ ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র

'আলাউদ-দাওলা কর্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি তাঁহার পুত্র 'আবদু'ল-লাতীফের মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সকল দাবি মানিয়া লইতে সম্মত হন। কিন্তু বিজেতা তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণে ব্যর্থ হন। উযবেকগণ হিরাত ও সামারকান্দ অধিকার ও ধ্বংস করে। 'আবদু'ল-লাতীফ বিদ্রোহ করেন, তাঁহার পিতাকে (যিনি কয়েকবার পরাস্ত হইয়াছিলেন) বন্দী করেন, বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। কিন্তু তিনি নিজেই ছয় মাস রাজত্বশেষে নিহত হন (৮৫৩-৫৪/১৪৪৯-৫০)। শাহরুখের পৌত্র 'আবদুল্লাহ মীরযা উযবেকদের সমর্থন প্রত্যাশী আবূ সা'ঈদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সিংহাসনারোহণ করেন। 'আবদুল্লাহ পরাস্ত ও নিহত হন (৮৫৩-৫৪/১৪৫০-৫১)। অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদে মত্ত ও একজন মাতাল যুবরাজ, বাবর মীরযা, 'ইরাক, ফারস ও কিরমান হারান, 'আলাউ'দ-দাওলাকে অন্ধ করেন, আবূ সা'ঈদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হন এবং অতিরিক্ত অনাচার-অমিতাচারের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হন (৮৫৫-৬১/১৪৫২-৫৭)।

সর্বাধিক শক্তিশালী শাসক আবূ সা'ঈদের রাজত্বকাল ছিল অত্যন্ত ভিন্নধর্মী। শত্রু 'আবদুল্লাহ মীরযার মৃত্যুর পর তিনি সামারকান্দ অধিকার করেন। বাবর মীরযার অন্তর্ধান এবং তাঁহার আরও বিজয় তাঁহাকে ট্রান্স অক্সিয়ানা, বাদাখশান, কাবুল, কান্দাহার, ভারতের সীমান্ত অঞ্চলসহ ইরাক ও খুরাসান অধিকারের সুযোগ প্রদান করে। ইহা তিনি ৮৬৩/১৪৫৮-৫৯ সালে সম্পূর্ণ অধিকার করেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন; কিন্তু ঐতিহাসিকগণ একমত যে, তাঁহার কতিপয় চমৎকার গুণ ছিল ঃ মর্যাদাবোধ, বিচক্ষণতা, অকপটতা, কর্মচাঞ্চল্য ও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক যোগ্যতা। তাঁহার পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া তিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরও তাহাদের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। উযূন হাসান সমঝোতার প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কারাবাগে প্রবেশ করেন। এইখানে তাঁহার খাদ্যাভাবে ক্লিষ্ট সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তিনি তাঁহার শত্রুর হাতে পড়েন এবং উযূন হাসানের অফিসারগণ তাঁহাদের প্রভুর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন (৮৫৫-৭২/১৪৫২-৬৯)।

সুলতান মাহমূদ, যিনি তাঁহার পূর্ববর্তী শাসকদের চারি পুত্রকে হত্যা করিয়া রাজত্ব শুরু করেন, তিনি মাত্র ছয় মাস ঘৃণিত ও তিরস্কৃত রাজকীয় জীবন-যাপন করেন। তাঁহার অত্যাচার, স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈতিক বিচ্যুতি তুলনাবিহীনভাবে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। তিনি গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন। তাঁহার উযীর খুসরূ শাহ (৯০০-৯০১/১৪৯৪-৯৫) এই মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখেন। ইতিমধ্যে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হইবার উপক্রম হয়। তখন গোপনকৃত মৃত্যু সংবাদটি প্রকাশ পায়। তিনি কয়েকজন পুত্র রাখিয়া যান। সুলতান মাস'উদ চারি বৎসর রাজত্ব করেন, সিংহাসনের জন্য তাঁহার ভ্রাতা বায়সোনগোর ও 'আলীর সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। খুসরূ শাহের ষড়যন্ত্রের কল্যাণে তাঁহারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন (৯০১-৯০৫/১৪৯৫-৯৯)।

আবূ সা'ঈদের পুত্র উত্তরাধিকারী সুলতান আহমাদ কিছু সংখ্যক ভাল গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনুগত, স্পষ্টভাষী, বিনয়ী ও সাহসী ছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা না থাকার কারণে তিনি কেবল তাঁহার সভাসদবৃন্দ, বিশেষ করিয়া 'আলিমদের হাতের ক্রীড়নক ছিলেন। 'উমার শায়খ কর্তৃক একটি আক্রমণ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ বিজেতা বাবুরের বিরুদ্ধে একটি অভিযান ব্যতীত তাঁহার রাজত্বকাল ছিল শান্তিপূর্ণ। এই সময় সামারকান্দে বিশাল ইমারতাদি নির্মিত হয় এবং দলে দলে পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ তাঁহার রাজদরবারে আগমন করেন (৮৭৪-৯৯/১৪৬৯-৯৪)।

আবূ সা'ঈদের চতুর্থ পুত্র 'উমার শায়খ ফারগানায় তাঁহার নিজের জন্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার রাজধানী ছিল আখসী। সাহসী ও রণনিপুণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সৈন্যদল ছিল মাত্র ৪,০০০ লোকের। তিনি সামারকান্দ অধিকারের জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেন। তাঁহার সমসাময়িকগণ তাঁহার ন্যায়বিচার, বদান্যতা ও মনোরম স্বভাবের জন্য তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। মদ্যপান ও শিকারে আসক্ত হইলেও তিনি নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি চাগাতায়ের শাসকের জামাতা ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে কিছু এলাকা প্রদান করেন। কিন্তু তাঁহার আরও পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল। ফলে শ্বশুর য়ূনিস খানের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। একটি সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালের পর ৪ রামাদান, ৮৯৯/৮ জুন, ১৪৯৪ সালে একটি দুর্ঘটনার পর মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র জাহীরু'দ-দীন বাবুর (যিনি বিভিন্ন সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনা করেন এবং একটিতে তিনি সামারকান্দ অধিকার করেন) মাত্র ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন ও শায়বানী খান কর্তৃক ৯০৬/১৫০০ সালে রাজ্যচ্যুত হন। তিনি ভারতে গমন করেন এবং সেইখানে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

সুলতান হুসায়ন বায়কারা ৩৭ বৎসর হিরাত শাসন করেন। সাহিত্য ও শিল্পানুরাগী, সাহসী ও সফল সৈনিক সুলতান খুরাসান, তুখারিস্তান, কান্দাহার, সীস্তান ও মাযানদারান জয় করেন। তিনি তাঁহার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বিজয়ী হন। কিন্তু তাঁহার শাসনামলের আট বা নয় বৎসর ছিল গোলযোগপূর্ণ। তিনি ছিলেন বাত রোগের শিকার ও উদ্বেগ ভয়ে ভীত। এই অবস্থায় তাঁহাকে তাঁহার পুত্রদের বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। পরিশেষে শায়বানীর বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রার পথে তিনি ইনতিকাল করেন। প্রথমদিকে তিনি ছিলেন একজন পরহেযগার ধর্মপ্রাণ মুসলিম। কিন্তু পরবর্তী কালে লাম্পট্যে আসক্ত হন। এই দৃষ্টান্তটি তাঁহার পুত্রগণ ও প্রজাবৃন্দ অনুকরণ করেন। হুসায়ন বায়কারার দরবারের সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল বিখ্যাত। সেইখানে তুর্কী সাহিত্যের স্রষ্টা বিখ্যাত উযীর মীর 'আলী শের ছাড়াও জামী-র ন্যায় কবি, মীরখাওয়ান্দ ও খাওয়ান্দ আমীরের ন্যায় ঐতিহাসিক, বাহযাদ ও শাহ মুজাফ্ফারের ন্যায় চিত্রকর ছিলেন। হিরাতের প্রাসাদগুলি সামারকান্দের প্রাসাদগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল (৮৭৩-৯১১/১৪৬৯-১৫০৬)। সুলতান হুসায়ন বায়কারার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বাদী'উ'য-যামান ছিলেন পারস্যের সর্বশেষ তীমূর বংশীয় রাজা। শায়বানী কর্তৃক পরাস্ত, শাহ ইসমা'ঈলের একজন মেহমান ও পরিশেষে সুলতান সেলীমের বন্দী, তিনি মুহাম্মাদু'য-যামান নামক একজন পুত্র সন্তান রাখিয়া কনস্টান্টিনোপলে ৯২৩/১৫১৭ সালে ইনতিকাল করেন। মুহাম্মাদু'য-যামান ভাগ্য পরীক্ষার জন্য ভারতে গমন করেন। সেইখানে তিনি পর্তুগীজদের সাহায্যে গুজরাটের নৃপতি হওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া ৯৪৬/১৫৩৯ সালে মারা যান।

ইরানে শাহ ইসমা'ঈলের আগমন ঘটে এবং শী'আগণ প্রাধান্য লাভ করে। ফলে ইরানে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে চীনদেশ ও রাশিয়ায়ও জাতীয় ঐক্যের সূত্রপাত ঘটে। অনুরূপভাবে শায়বানী বংশীয়গণ কর্তৃক ট্রান্সঅক্সিয়ানায় বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে তীমূরী বংশধরদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সকল আশার বিনাশ ঘটে। অবশ্য ভারতে একজন তীমূরী (বাবুর)-র হস্তে একটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন যাহা ৯ম/১৫শ শতাব্দীকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে, তাহা ছিল আংশিকভাবে তীমূর বংশীয় রাজা ও যুবরাজদের অবদান। তাঁহাদের অনেকেই নিজেরা ছিলেন কবি, শিল্পী ও পণ্ডিত। তাঁহারা প্রতিভাধর ব্যক্তিদের তাঁহাদের দরবারে আকৃষ্ট করেন। পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিলেন শাহরুখ, যিনি ইতিহাস অধ্যয়নের অগ্রগতি সাধন করেন, উলুগবেগ জ্যোতির্বিদ, কবি এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ, হুসায়ন বায়কারা চিত্রকর ও কবি এবং বাবুর যিনি তাঁহার আত্মচরিতসহ কিছু সংখ্যক মূল্যবান রচনাবলী রাখিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্তীদের মধ্যে শাহরুখের পুত্র বায়সোনগোর একজন সুন্দর হস্তাক্ষরবিদ, যাঁহার কাছে গ্রন্থ শিল্প বহুলাংশে ঋণী। জামী এই সময় ছিল পারসী সাহিত্যে একটি সর্বাধিক বিখ্যাত নাম। নি'মাতুল্লাহ কিরমানী ও কাসিমু'ল-আনওয়ার ছিলেন মরমী কবি, হাতিফী ও কাতিবী ছিলেন মাছনাবী রচয়িতা। হুসায়ন ওয়া'ইজ কাশিফী ছিলেন একজন নীতিবাদী ও নীতিকাহিনীর প্রণেতা। ঐতিহাসিক মীরখাওয়ান্দ ও খাওয়ান্দ আমীর, 'আবদু'র-রায্যাক সামারকান্দী, হাফিজ আবরূও পারসী সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। শেষোক্তজন ভৌগোলিক হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ধর্মশাস্ত্রবিদ ছিলেন আহমাদ তাফতাযানী ও হাদীছবেত্তা মীর জামালু'দ-দীন মুকাদ্দাস। আইনশাস্ত্রবিদ, গণিতজ্ঞ, চিকিৎসক প্রভৃতি গুণীজনের সংখ্যাও ছিল পর্যাপ্ত।

ঐ সময়ে তুর্কী কবিদের মধ্যে মীর 'আলী শের ছিলেন একমাত্র জ্ঞাত কবি। অবশ্য শায়খুম বেগ সুহায়ল ও কামালু'দ-দীন গাযারগাহী-র ন্যায় তাঁহার কিছু সংখ্যক বিখ্যাত শাগরিদও ছিলেন।

৯ম/১৫শ শতাব্দীতে পারস্যের শিল্পকলা পূর্ণতা অর্জন করে। সামারকান্দ, বুখারা ও হিরাতের চিত্রকলা প্রতিষ্ঠানসমূহ ইহাদের সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। গ্রন্থাদির জন্য বায়সোনগোর কি করিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। চীনদেশীয় প্যাগোডা (Pagoda) ও মোঙ্গল তাঁবু দ্বারা সমভাবে অনুপ্রাণিত স্থাপত্যকলাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল গূর-ই মীর ও বীবী খানুম, উলূগবেগ ও শাহ যিনদার মসজিদ। ইহা ছাড়া সামারকান্দে আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ইমারত রহিয়াছে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তীমূর সামারকান্দ ও আযারবায়জানে শিল্পী ও কারিগরদের একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহাদের দ্বারা সাজসজ্জার উপকরণাদি, বিশেষভাবে মৃৎশিল্পের উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধিত হয়। সঙ্গীত শিল্পেরও তীমূরীগণ চমৎকারভাবে প্রতিনিধিত্ব করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সমগ্র যুগটির জন্য মীর খাওয়ান্দ, বিশেষ করিয়া খাওয়ান্দামীর অতি প্রয়োজনীয়; (২) 'আবদু'র-রায্যাক' সামারকান্দী, মাতলা' সা'দায়ন, ২ খণ্ডে, ১ম খণ্ড এখনও অপ্রকাশিত, ২খ, লাহোর ১৩৬০-৬৮ হি., Quatremere, Memoire historique sur le regne du sultan Schah-rokh, J.A., 1836 এবং Notice de l'ouvrage person...N. E.-এর ১৪শ খণ্ডের প্রথম উৎস হইল মাতলা'; (৩) মু'ঈনু'দ-দীন ইসফিযারী, রাওদাতুল-জান্নাত, হিরাতের একটি মূল্যবান ইতিহাস (J. A. 1860-1862-তে Barbier de Meynard কর্তৃক উহা ব্যবহৃত)। গোড়ার বৎসরগুলির জন্য ঃ (৪) শারাফু'দ-দীন 'আলী য়াযদী; (৫) ইব্ন 'আরাবশাহ; (৬) ফাসীহী, মুজমাল-এর লেখক, অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ। শেষের বৎসরগুলির জন্যঃ (৭) বাবুরের স্মৃতিকথা অত্যধিক মূল্যবান; (৮) মীরযা হায়দার দুগলাত, তা'রীখ-ই রাশীদ; (৯) মুহাম্মাদ সালিহ, শায়বানী নামাহ-র অধ্যয়নও প্রয়োজন; 'উছমানীদের সহিত সম্পর্কের বিষয়টিও দ্র.; (১০) ফেরীদুন বেক ও (১১) মুনাজিজম বাশী। আরও বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্র. ঃ (১২) E. Blochet ও (১৩) E. G. Browne-এর রচনাবলীতে TIMUR LANG শিরোনামে; (১৪) L. Bourat, Essai sur la civilization timouride, J. A., ccviii, 1926. পৃ. ১৯৩-২৯৯; (১৫) ঐ লেখক, L. Empire Mongol (2-phase) A.E. Cavaignac-এর নির্দেশনাধীনে প্রকাশিত (প্যারিস ১৯৭২ খৃ.), Histoire du monde, viii/iii.

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে দ্র. ঃ (১৬) দাওলাত শাহ, তাযকিরা; (১৭) মীর 'আলী শের-এর রচনাবলী, বিশেষত মাজালিসুন-নাফা'ইস, সম্পা. 'আলী আসগার বহিকমাত, তেহরান ১৩২৩ সৌর হি. (Belin, Z. A. 1861, xviii ও 866, vii, viii-এ উদ্ধৃত।

য়ুরোপীয় পর্যটকগণ, যাহারা তীমূরীয় রাজ্যের বিবরণ প্রদান করেনঃ (১৮) Clavijo ও Pero Tafur, স্পেনীয় ভাষায়; (১৯) Ambrogio Contarini,; (২০) Nicolo Conti; (২১) Hieronymodi San Stefano and Caterino Zeno, ইতালীয় ভাষায়; (২২) Bouci cault, ফরাসী; (২৩) Nikitine, রুশ ভাষায়; (২৪) Schiltberger, জার্মান। প্রধান প্রধান য়ুরোপীয় ঐতিহাসিগণ ঃ (২৫) D. Herbelot; (২৬) De Guignes; (২৭) Gibbon; (২৮) von Hammer ও (২৯) Vambery, Gesch. Bochara', chap. XII; (৩০) Browne, পূ. গ্র., book iii; (৩১) Skrine ও Denison Ross, the Heart of Asia; (৩২) Sykes, Hist. of Persia, Chap. ix-ixi; (৩৩) Czaplicka, The Turks of Central Asia; (৩৪) Gronsset, Histoire de l'Asie, ২খ; (৩৫) Archives Marocaines, ৩খ.-এর গ্রন্থপঞ্জীতে (নিঘণ্টন্ট, পৃ. ৯৪-৯৫) ১৯০৫ খৃ. পর্যন্ত তীমূরীয় শিল্পের উপর রচিত রচনাবলীর প্রদত্ত একটি তালিকা। পরবর্তী কালে প্রকাশিত অন্যান্য রচনা ঃ (৩৬) Cl. Huart, Les calligraphes et les miniaturistes de l'Orient musulman. প্যারিস ১৯০৮ খৃ.; (৩৭) E. Blochet, Les Peintures de manuscrits arabes, Persans et turcs de la Bibliotheque Nationale, প্যারিস ১৯১১ খৃ.; (৩৮) E. R. Martin, The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey, লণ্ডন ১৯১২ খৃ.; (৩৯) T.W. Arnold ও A. Grohmann, The Islamic Book, লণ্ডন ১৯২৯ খৃ.; (৪) Armenag Beg Sakisian, La miniature, Persane du xii eme au xviii eme siecle, প্যারিস ১৯২৯ খৃ., ও Annada K. Coomraswamy, Les

miniatures orientales de la Collection goloubew au Museum of fine Arts de Boston, প্যারিস ১৯২৯ খৃ.।

L. Bouvat (E.I.[1])/মুহঃ আবু তাহের

তীরানা (Tirana=تيرانه) ঃ তীরানরূপেও পরিচিত; আলবেনিয়া রাজ্যের (বর্তমানে আলবেনীয় Republic) রাজধানী। মাল'ই দাজতিত পর্বত (৫,৩৭০ ফুট)-এর পাদদেশস্থ উত্তম চাষাবাদসমৃদ্ধ সমতলে সমুদ্রতল হইতে ৪০০ ফুট উচ্চে এক মনোরম অবস্থানে তীরানা স্থাপিত। তিন পার্শ্বে (পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম) পর্বত ঘেরা এবং আড্রিয়াটিক (Adriatic) সাগর ও উহার সমুদ্র-বন্দর দুরাজ্জো (Durazzo)-এর সহিত সড়কপথে (২৫ মাইল) এবং নব-নির্মিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। ১৯২৭ খৃ. শহরটির লোকসংখ্যা ছিল ১২,৪৫৪ (১৯৮০ সালে ছিল ২,৯৭.০০০)। মুসলিমগণ সংখ্যাগুরু; প্রথমে আলবেনীয় মুক্তরাষ্ট্র (Free State) এবং পরে আলবেনীয় রাজতন্ত্রের প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে দুরাজ্জো-এর পরিবর্তে যখন তীরানাকে নির্বাচিত করা হয় শুধু তখন ইহা গুরুত্ববহ অবস্থান অর্জন করে। তীরানা আলবেনিয়ার প্রধান মুফ্তীর কার্যস্থলও বটে এবং বহু মুসলিম অভিজাত পরিবারের বসতি হওয়ার কারণে আলবেনিয়াতে ইহা ইসলামের প্রধান শক্তিকেন্দ্র। নিম্ন আলবেনীয় অঞ্চলের একটি বৃহৎ অংশের বাজাররূপে ইহা বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সচরাচর বলা হয় তীরানা শহর বারকীন যাদা সুলায়মান পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (আনু. ১৬০০ সাল); তিনি তাঁহার পারস্য অভিযানসমূহের স্মৃতিস্বরূপ ইহাকে পারস্যের রাজধানী তেহরান-এর নামানুসারে নামকরণ করেন, তীরানা ইহার অপভ্রংশ। এই বক্তব্যটি (তু. A. Degrand, Souvenirs de la Haute Albanie, প্যারিস ১৯০১ খৃ., পৃ. ২০৫ প.)'বিশ্বাসযোগ্য নহে; কারণ ইতিপূর্বেই ১৫৭২ খৃ. 'il borgo di Tirana' -এর উল্লেখ দৃষ্ট হয় (তু. M. V. Sufflay, Stadte und Burgen Albaniens, in Denkschr.Ak. Wien, ৬৩/১খ, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৩৫)।

ইহা নিশ্চিত যে, এতদ্‌সংলগ্ন ক্রুয়া (Kruya)-এর তুলনায় ভূতপূর্বকালে তীরানার কোন গুরুত্ব ছিল না। ১৪৭৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তীরানার সমভূমিতে Venice-এর Provvcditore Francesco Contarini, ২,৫০০ অশ্বারোহী ও আলবেনীয় পদাতিক বাহিনীর সহিত তুর্কী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন (তু. J. V. Hammer, G. O. R, ২খ, ১৫১)। পরে এই অঞ্চল ক্রুয়া এলাকার ক্ষমতাশালী পরিবার তোপতান-এর অধিকারে চলিয়া যায়। এই পরিবার ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সদস্য ছিলেন কাফলান আহমাদ পাশা (আনু. ১৮০০)। ক্কুটারী (আলবেনিয়া)-র কারা মাহমূদ পাশা বুশাত্‌লী-র বিরুদ্ধে সুলতানের পক্ষে যুদ্ধে তাঁহার অবদানের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে তীরানার চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি বড় বড় সম্পত্তি প্রদান করা হইয়াছিল। তীরানার সম্পূর্ণ সমভূমি অঞ্চল এখনও তোপতান পরিবারের অধিকারে রহিয়াছে।

এই শহরে প্রাচীন কালের স্মারক ভবন বা স্থাপনা নগণ্য সংখ্যক। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল ঃ (১) হাজ্জী আদহাম বে-র (উল্লিখিত সুলায়মান পাশার বংশধর) কয়েকটি মসজিদ; (২) আসনাফ জামি'ঈ ভবন এবং (৩) ১৬০৫ সালে সুলায়মান পাশা কর্তৃক স্থাপিত একটি মসজিদ, যাহার পার্শ্বে তাঁহার তুর্‌বা (মাটি অর্থাৎ মরদেহ) সমাধিস্থ। শহরের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে সুপ্রাচীন সাইপ্রেস বৃক্ষে পরিবেষ্টিত নামাযগাহ নামে পরিচিত একটি চতুষ্কোণ উন্মুক্ত চত্বর রহিয়াছে, যাহাতে বায়রাম উৎসবের সময় শহরের মুসলিমগণ সালাতের জন্য সমবেত হইয়া থাকেন। ১৮৩০ খৃ. গৃহযুদ্ধে তীরানা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। শহরের মুসলিম অধিবাসিগণ অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অত্যন্ত গোঁড়ারূপে খ্যাতিমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Muller, Albanien, Rumelien, Prag ১৮৪৪ খৃ., পৃ. ৭১; (২) Th. A. Ippen, Skutari unddie nordalbanische Kustenehene, Sarajevo ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৮০ প.; (৩) A. Degrand, Souvenirs de la Haute Albanie, প্যারিস ১৯০১ খৃ., পৃ. ১৮৪ প.; (৪) H. Louis, Albanie, Stuttgart ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৭১ প.; (৫) সামী বে ফ্রাশেরী, কামূস'ল-'আলাম, পৃ. ১৭১৭; (৬) J.V. Hammer, Rumeli und Bosna, Vienna ১৮১২ খৃ.; (৭) Historiya e Tiranes in Shikniya e illustrume, Kalendari ১৯২৯ খৃ. Skurari (Shhoder) ১৯২৯ খৃ., ১৯ প. (বহু চিত্রসম্বলিত); (৮) H. Baedeker, Dalmatin, Leipzig ১৯২৯ খৃ. (দ্র. Albanien অধ্যায়)।

F. Babinger (E.I.[1])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

তীরে (দ্র. তাইরে)

তীরে বোলী (تيرى بولى) ঃ কৃষ্ণ সাগরের তীরে অবস্থিত আনাতোলিয়ার ট্রাপিযান্দ বিলায়েত-এর তীরে বোলীর কাদা-র রাজধানী। ইহার অবস্থান চমৎকার নৈসর্গিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ তিনটি অন্তরীপে, যাহা হইতে খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে জিলেতুন হইতে আগত গ্রীকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ত্রিপলীস শহর ইহার নাম লাভ করে। শীর্ষদেশে এক মধ্যযুগীয় দুর্গ ইহার প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। অবশিষ্ট দুইটি ছোট গির্জার ধ্বংসাবশেষ অদ্যবধি রায়যানটাইন শাসনামলের স্মৃতি বহন করিতেছে। ট্রাপিযন্দ ও কেরাসান্টের অতি নিকটে অবস্থিত ইহার কারণে আধুনিক অথবা প্রাচীন যুগে তীরে বোলী ইতিহাসে কোন বিশেষ ভূমিকা পালন করে নাই। অপর দিকে ট্রাপিযন্দ-এর Comnenoi-গণ এইখানের দুর্গটিতে বসবাস করিতে পসন্দ করিত। ১৪৬১ সালে শরৎকালে দ্বিতীয় মুহাম্মাদ কর্তৃক ট্রাপিযন্দের বিজয়ও তীরে বোলীর ভাগ্য বিপর্যয় ডাকিয়া আনে। ইহার অধিবাসীগণ বিশ মাইল দূরে অবস্থিত পেট্রোমার দুর্গে পলায়ন করে এবং কেবল দীর্ঘ অবরোধের পর খাদ্যাভাবের কারণে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তখন হইতে তীরে বোলী 'উছমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যায়। অবশ্য ১৪০৪ খৃ. স্পেনীয় Ruy Gonzalez de Clavijo তাঁহার সমারকান্দ ভ্রমণকালে তখনও তীরে বোলীকে একটি বৃহৎ শহররূপে দেখিতে পান। পরবর্তী কালে শহরটি তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে। য়ুরোপীয় পর্যটকগণ প্রায়শই তীরে বোলী ভ্রমণ করেন ও ইহার বর্ণনা প্রদান করেন। উদাহরণস্বরূপ J. Pitton de Tournefort (তু. Relation d'un voyage du Levant. ২খ. [প্যারিস ১৭১৭], ২২২ দ্র., ছবিসহ); Wm-J. Hamilton (তু. Researches in Asia Minor, লণ্ডন ১৮৪২, ১খ, ২৫৫); A. D. Mordtmann (তু.

Anatolien, সম্পা. ৫খ, F. Babinger, Hannover ১৯২৫, পৃ. ৪২১); J. Ph. Fallmerayer (Fragmente aus dem Orientf, ১খ., ১৩১, ১৩৫ দ্র.) ইত্যাদি। তীরে বোলীতে ৮টি মসজিদ ব্যতীত বহু সংখ্যক গ্রীক গির্জাও আছে, উহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রাচীন। ইহার সন্নিকটে পরিত্যক্ত সারী খলীফার দরবেশের খান্‌কাহ্ বিদ্যমান (তু. Thereon J. H. Mordtmann, in M. S. O. S. As., ২৯, ১১২ দ্র. এবং ৩০, ২০৬, সম্ভবত ব্যক্তিগত আলোচ্য বিষয়ে)। তুর্কী-গ্রীক জনসংখ্যার বিনিময়ের পূর্বে তীরে বোলীতে প্রায় আট হাজার অধিবাসী ছিল। তন্মধ্যে ১/৪ ভাগ ছিল গ্রীক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (প্রবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাতের অতিরিক্ত) (১) V. Cuinet, Turquie d'Asie, ১খ., ৫৩ দ্র., C. Ritter Erdkunde von Kleiaasien, ১খ, Barlin ১৮৫৮, পৃ. ৮২১ দ্র.; (২) H. Barth, Reise von Trapezunt sach Sthutari, Gotha ১৮৬০, পৃ. ৪খ.; (৩) শাকির শাওকেত, তারাবেযূম তা'রীখি [Stambul] ১২৯৪; (৪) হাজ্জী খালীফা, জিহান্‌নুমা, Stambul ১১৪৫, পৃ. ৪২৯, ১খ, ১৮; (৫) Ewliya Celebi, Seyahetname, ২খ., ৮০।

F. Babinger (E.I.[1])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

আত-তীহ (التيه) ঃ সঠিকভাবে ফাহসু'ত-তীহ, সিনাই উপদ্বীপের অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে সীমান্তরেখা গঠনকারী মরুভূমির নাম। আরব ভৌগোলিকগণ ইহাকে "বনী ইসরাঈলের মরুভূমি" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। Tabula Peutingeriana -এর ন্যায় সুপ্রাচীন উৎসে আমরা নিম্নোক্ত কিংবদন্তীর উল্লেখ দেখিতে পাই; Desertum ubi quadraginta annis errauerunt filii Israel ducente Moyse এবং মাদাবা প্রণীত মানচিত্রে অনুরূপ একটি গ্রীক বর্ণনাও সংযুক্ত হইয়াছে। উক্ত মরুভূমিতে একই নামে পরিচিত একটি দুর্গের অস্তিত্ব ছিল (De Guignes, Perle des Merveiles, N. E., ২খ, ৩১); ইহার পূর্ব অংশে ওয়াদি'ত-তীহ নামে পরিচিত একটি ওয়াদী (উপত্যকা) রহিয়াছে (Quatremere, Memore sur l'Egykpte, ১খ, ১৮৬)। আত-তীহ-এর মরুভূমি যাহা ফিলিস্‌তীনের সর্বাপেক্ষা দক্ষিণস্থ জিলা গঠন করিয়াছে, ৪০ ফারসাখ দীর্ঘ ও প্রায় সমপরিমাণে প্রশস্ত ছিল এবং উহা আল-জিফার জিলা হইতে (আল-ফারামা', 'আল-'আরীশ, আল-ওয়াররাদা অঞ্চলসমূহ) সিনাই পর্বতমালা (তূর সীনা) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পশ্চিম অভিমুখে ইহার সীমান্ত রেখা মিসরীয় প্রদেশ আল-রীফ দ্বারা চিহ্নিত হইত (Maspero-Wiet, M.I.F.A.O., ৩৬খ, ১০১ প.)। পূর্বদিকে জেরুসালেম ও দক্ষিণ ফিলিস্‌তী জিলা ছিল ইহার সীমান্ত।

আরব ভৌগোলিকগণের প্রদত্ত বিবরণীসমূহ অনুসারে দেখা যায় যে, ইহা অংশত প্রস্তরময় এবং অংশত বালুকাময় মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত ছিল। এই অঞ্চলে কিছু সংখ্যক নোনা জলাভূমি ও লোহিত বেলে পাথরের পাহাড়সহ অতি সামান্য সংখ্যক খেজুরবৃক্ষ এবং ক্ষুদ্র ঝরনা প্রসঙ্গেও উল্লেখ পাওয়া যায়। আদ-দিমাশকী তাঁহার বর্ণনায় তীহ বনী ইসরাঈলের মরু অঞ্চলীয় জিলাসমূহে কাদাস (Kadesh Barnea), হুওয়ায়রিক, আল-খালাসা (Elusa), আল-খালূস (Lyssa), আল-সাবা' (Beerseba) ও আল-মাদুরা–এই সকল য়াহূদী শহরের বিদ্যমানতার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বেই কারাক রাজ্যের অন্তর্গত জিলাসমূহের মধ্যে আত-তীহ্-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন–যাহা দ্বারা তিনি সম্ভবত এক সময়ে (Chatillon-এর Renaud-এর অধিকারভুক্ত এলাকগুলি নির্দেশ করিয়া থাকিবেন। আত্-তীহ-এর মরু অঞ্চল হইতে পথযাত্রীকে 'আকাবাত বূসাক হইয়া আয়লা অভিমুখে গমন করিতে হইত (য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৬১০)। খুমারাওয়ায়হ (৮৮৪-৮৯৬)-এর আমলে এই পথটি প্রথম তীর্থযাত্রীদের কাফেলা দলসমূহের চলাচলের জন্য সুগম করা হইয়াছিল। এই পথে দুই পর্যায়ে অশ্ব অথবা অন্য কোন প্রকার বাহনে আয়লা হইতে এই মরু অঞ্চলের ভিতর দিয়া ফারানের সমুদ্র উপকূলে যাওয়া যাইত।

৬৫২/১২৫৪-১২৫৫ সালে যখন বাহরী মামলূকগণ কায়রো হইতে পলায়ন করে, তখন তাহাদের একটি অংশ পাঁচ দিন যাবত মরু অঞ্চলে ইতস্তত পথভ্রষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে থাকে; ষষ্ঠ দিবসে তাহারা বালুকারাশির মধ্যে প্রোথিত অবস্থায় নগর প্রাচীর এবং মর্মর প্রস্তর নির্মিত বৃহদাকার কক্ষসম্বলিত একটি বিশাল পরিত্যক্ত নগরীর সন্ধান লাভ করে। তাহারা তথায় মৃৎপাত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্ন নমুনা দেখিতে পায়। কিন্তু এই সকল বস্তু স্পর্শমাত্র ধূলির ন্যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এই স্থানে তাহারা বরফ শীতল পানি দ্বারা পরিপূর্ণ একটি জলাধারেরও সন্ধান লাভ করে। তাহারা যখন পরবর্তী দিবসে কারাক নগরীতে উপনীত হয় এবং তথায় তাহাদের দ্বারা ক্রীত মালামালের জন্য মূল্যস্বরূপ উক্ত সমাধিস্থ নগরীতে প্রাপ্ত দীনার মুদ্রা প্রদান করে, তখন তাহারা জানিতে পারে এইসব মুদ্রা ও বস্তুসামগ্রী মূসা ('আ)-এর সময়কালের সামগ্রী এবং তাহারা বস্তুতপক্ষে "ইসরাঈলী জাতির সবুজ নগরীর" সন্ধান লাভ করিয়াছিল।

স্বাভাবিক সময়ে কায়রো হইতে সিরিয়া অভিমুখে বিস্তৃত কাফেলা ও সামরিক সড়কটি আল-জিফার হইয়া এবং আত-তীহ-এর মরু অঞ্চল স্পর্শ না করিয়া গমন করিত। কিন্তু যখন ফ্রাংক বাহিনীর দখলে আসার কারণে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে কেবল তখনই সরাসরি মরু অঞ্চল অতিক্রম করিয়া এই বিস্তৃত সড়ক পথটি কিছু মাত্রায় সামরিক গুরুত্ব অর্জন করে। সালাহ্'দ-দীনের সামরিক অভিযানসমূহ এবং সাদরের দুর্গটি (বর্তমানে কাল'আত গিন্দী) নির্মাণের মধ্যে আমরা ইহার প্রতিফলন দেখিতে পাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইসতাখরী, B. G. A., ১খ, ৫৩; (২) ইব্‌ন হাওকাল, B. G. A., ২খ, ১০৪; (৩) আল-মাকদিসী, B. G. A., ৩খ, ১৭৯; (৪) আল-ইদ্‌রীসী, সম্পা. Gildemeister, in Z. D. P. V., ৭/১খ, ২১ (অনু. পৃ. ১১৯, ১৩৯); (৫) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৯১২; (৬৫) সাফিয়্যু-দীন, মারাসি'দুল-ইতত্বিলা', সম্পা. Juynboll, ১খ, ১২৩; (৭) দিমাশকী, সম্পা. Mehren, পৃ. ২১৩; (৮) মাকরীযী, খিতাত, সং. বূলাক, ১খ, ২১৩, অনু. Bouriant, in M. M. A. F., ১৭খ. (১৯০০ খৃ.), ৬৩১; (৯) Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ২৭-৩০; (১০) Raym. Weill, La presquile du Sinai (Bibl. de l'ecole des haut. etud, ১৭১, ১৯০৮), পৃ. ১১৪-১১৬ এবং স্থা.; (১১) R. Hartmann. Z. D. M. G., ৬৪, পৃ. ৬৭৯-৬৮৩; (১২) J. Maspero and G. Wiet, in M. I. F. A. O., ৩৬খ, পৃ. ৬২; (১৩) Gaudefroy-Demombynes, La Syriea L'epoque

des Mamelouks. প্যারিস ১৯২৩ খৃ., পৃ. ৬, ৮, ১২৯; সাদর প্রসঙ্গে; (১৪) Barthoux and Wiet, in Syria, ৩খ, পৃ. ৪৪-৬৫, ১৪৫-১৫২।

E. Honigmann (E.I.[1])/মুহাম্মদ ইমাদুদীন

তুওয়ায়স আবূ 'আবদিল-মুন'ইম (طويس ابو عبد المنعم) ঃ 'ঈসা ইব্ন 'আবদিল্লাহ আয-যাইব ইসলামী যুগের প্রথম বিখ্যাত গায়ক। বলা হয় যে, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল তা'উস (تاؤوس-ময়ূর), কিন্তু পরে উহা لويس-ছোট ময়ূররএ পরিবর্তিত হয় এবং 'আবদু'ল-মুন'ইম পরিবর্তিত হইয়া হয় 'আবদু'ন-না'ঈম। কথিত আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ওফাত দিবসে তাহার জন্ম হয় (৮ জুন, ৬৩২) এবং আবূ বাক্‌র (রা)-এর ওফাত দিবসে মাতৃস্তন্য পান ছাড়ান হয়, 'উমার (রা)-এর শাহাদত দিবসে খৎনা করানো হয়, 'উছমান (রা)-এর শাহাদত দিবসে বিবাহ হয় এবং 'আলী (রা)-এর শাহাদত দিবসে তাহার প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই সমস্ত অসাধারণ সংঘটন এক প্রবাদের সৃষ্টি করে ঃ "তুওয়াস অপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগা।" সে মদীনাবাসী ছিল এবং খলীফা 'উছমান (রা)-এর মাতা আরওয়া'র সেবায় নিয়োজিত থাকায় বানূ মাখযূমের একজন মাওলা ছিল।

পারস্য দেশীয় দাসদের নিকট হইতে শ্রুত কতকগুলি সুমধুর গান গাহিয়া সে প্রথমে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 'উছমান (রা)-এর শাসনকালে (৬৪৪-৬৬৬) গায়ক হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এই সময় মদীনায় এক নূতন রীতির সঙ্গীত প্রচলিত হয়, যাহা গিনা'উ'র রাকীক (লঘু সঙ্গীত) বা গিনা'উল-মুতকান (নিখাদ সঙ্গীত) নামে পরিচিত। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল, সুর (লাহন-لحن)-এর সঙ্গে তাল বা মাত্রার (ঈকা'-ايقاع)-এর সমন্বয় (দ্র. মূসীকী)। বলা হয় যে, সে-ই ছিল মদীনায় এই "নূতন সঙ্গীতে"র প্রথম গায়ক (আগানী, ৪খ, ৩৮; আল-'ইক্‌দু'ল ফারীদ, ৩খ, ১৮৭)। "আগানী'র অন্যত্র (২খ, ১৭০) তাহার প্রতি যাহা আরোপিত উহা কেবল উপরের বর্ণনার সঙ্গে সমন্বয় করিয়া সঠিক বুঝা যাইতে পারে, অতএব উহা পড়িতে হয় ঃ "তুওয়ায়স মদীনায় আরবীতে [গিনা'উ'ল-মুতকান-এর] প্রথম গায়ক ছিল।

এই সময় মদীনায় অন্যান্য আরও বহু গায়কের ন্যায় তুওয়ায়স ছিল মুখান্নাছ (দ্র. প্রবন্ধ লেখকের Hist of Arabian music, পৃষ্ঠা ৪৫) এবং যাহা হইতে এই প্রবাদের উৎপত্তি ঃ "তুওয়ায়স অপেক্ষা অধিকতর মেয়েলী-ভাবাপন্ন।" বস্তুত বলা হইত যে, সংগীতের উৎপত্তি হয় মদীনায় মুখান্নাছদের মধ্যে (আগানী, ৪খ, ১৬১)। সে ৭১০-৭১১ খৃ.-এর দিকে মদীনায় (মতান্তরে অন্যত্র) মৃত্যুবরণ করে।

তুওয়ায়স শুধু একটি চতুর্ভুজাকার খঞ্জনী (দাফ্‌) ব্যবহার করিত, যাহা সে একটি থলেতে বা তাহার আলখাল্লাতে রাখিত এবং যাহা গানের সময় সে ব্যবহার করিত। ইহা সত্ত্বেও সঙ্গীতে তাহার এত উচ্চ সুখ্যাতি হয় যে, ইব্ন খাল্লিকান বলেন যে, তাহার প্রতিভা প্রবাদে পরিণত হয় এবং মদীনার একজন কবি বলেন, "তুওয়ায়স ও তাহার পরে ইব্ন সুরায়জ (সঙ্গীতে) পরম উৎকর্ষ লাভ করে, কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট স্থানের অধিকারী মা'বাদ।" তাহার শাগরিদদের মধ্যে ছিল ইব্ন সুরায়জ (দ্র.) আদ-দালাল নাফিয, নাওমাতু'দ-দুহা ও কান্দ। ইব্ন সুরায়জ বলেন যে, তুওয়ায়স ছিল তাহার সময়ের সর্বোৎকৃষ্ট গায়ক এবং হাযাজ তালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বিবেচিত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগানী, সং. বূলাক., ২খ, ১৭০-১৭৬; ৪খ, ৩৮-৩৯; এবং গিদির (guidis) নির্ঘণ্ট (গিদি এই নামের দুইজন সংগীতকারের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা একই ব্যক্তি); (২) আল-ইক্‌দু'ল-ফারীদ, সং কায়রো ১৮৮৭-১৮৮৮, ৩খ, ১৮৬; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, সম্পা. Wustenfeld, ২খ, ৪৩৮; (৪) মায়দানী, আমছাল (امثال), সম্পা. Freytag, ৭খ, ১২৪; ১৩খ, ১৫৮; (৫) ইব্ন 'আবদূন, Commentaire hist. sur le Poeme d'Ibn Abdoun Par Ibn Badroun, সম্পা. Dozy (১৮৪৬), পৃ. ৬৪; (৬) ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'ল মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ১৬৪; (৭) Kosegarten, Lib. Cant., পৃ. ১১; J. A., ১৮৭৩, পৃ. ৩৯৯-৪০১; (৮) Farmer, Hist. of Arabian music, পৃ. ৫০-৫৩)।

H. G. Farmer (E.I.[1])/ মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

তুকমাক খাঁ ঃ আবি. ১৭শ শতক, পাবনা জিলার শাহজাদপুরের জায়গীরদার। অপর স্থানীয় জমিদার রাজা রায় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শাহজাদপুরের দুর্গে তিন দিন আটক থাকার পর পাল্টা আক্রমণ করিয়া রাজা রায়কে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। তিনি সুবাদার ইসলাম খানকে কলাকোপা জয়ে সাহায্য করেন এবং কোদালিয়া দুর্গ হইতে আক্রমণ চালাইয়া কদমরসূলের পতন ঘটান। ইসলাম খান কর্তৃক তিনি আলপ সিংহ থানার ভারপ্রাপ্ত হন। পরে খাজা উছমানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন এবং উছমানের পরাজয় ও পলায়নের পরে বোকাইনগরে জায়গীর পান। বায়াযীদ কররানীর (সিলেট) সহিত মুগলদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন (১৬১২ খৃ.)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭২৭

তুগতেগীন (طغتگين) ঃ ইব্ন 'আবদুল্লাহ আমীনু'দ-দাওলা জাহীরু'দ-দীন আবূ মানশূর বুরী (البوريه) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তুগতেগীন সালজূক সুলতান তুতুশ [দ্র.]-এর অধীনে একজন মামলূক (ক্রীতদাস) হিসাবে তাঁহার সামরিক জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তুতুশ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন এবং নিজ পুত্র দুকাক-এর শিক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। এমন কি দুকাকের মাতা সাফওয়াতু'ল-মুল্‌ককে তাঁহাকে স্ত্রীরূপে প্রদান করেন। স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বারকইয়ারূকের সহিত যুদ্ধে তুতুশের পতন ঘটিলে (৪৮৮/১০৯৫) দুকাক তাঁহার সৎপিতাকে অত্যধিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং তৎকালীন অন্যান্য অনেক আতাবেগের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তুগতেগীন শীঘ্রই নিজেকে প্রকৃত শাসকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেন। রামাদান ৪৯৭/জুন ১১০৪ সনে দুকাক ইনতিকাল করিলে তুগতেগীন প্রথমে মাত্র এক বৎসর বয়স্ক মৃতের পুত্র তুতুশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাহার পর ১২ বৎসর বয়স্ক দুকাকের ভাই আরতাশ (বা বেকতাশ)-এর প্রতি তাহার আনুগত্য প্রকাশ করেন। আরতাশ শীঘ্রই ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তুগতেগীন নিজেই শাসক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

ইহার পর আরতাশ জেরুসালেমের রাজা ১ম বল্‌ডুইনের সহিত আলোচনায় মিলিত হন। খুব বেশি দিন পূর্বের কথা নহে যে, ফরাসীদের সহিত তুগতেগীনের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ফাতিমী উযীর আল-মালিকু'ল-আফদাল যখন ফিলিসতীনে (প্যালেস্টাইনে) এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন, তখন তুগতেগীনকেও তাঁহার সমর্থনে সৈন্য প্রেরণের জন্য সম্মত

করান হয়। কিন্তু যু'ল-হিজ্জা ৪৯৮/আগস্ট ১১০৫ সনে বল্‌ডুইন আর-রামলার নিকট মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে। সাফার ৪৯৯/অক্টোবর ১১০৫ সনে তুগতেগীন জনৈক ফরাসী কাউন্টকে পরাজিত করেন, যে দামিশক জিলায় বারবার হামলা করিয়া বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল এবং শহর হইতে মাত্র দুই দিনের দূরত্বে অবস্থিত তাঁহার দুর্গটিও ধ্বংস করিয়া দেন।

ইহার কিছুকাল পর অথবা অন্য এক সূত্র অনুসারে কিছুদিন পূর্বে রাফানিয়া অধিকার করেন, যেইখানে কাউন্ট রেমণ্ডের জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র সেনাদলের নেতৃত্বে ছিল। ত্রিপোলিসের উত্তর-পূর্বের 'ইরকা দুর্গটি দখলে তিনি কম সাফল্যের পরিচয় দেন। উল্লেখ্য যে, এই দুর্গটির সেনাপতি তাহার মনিব ত্রিপোলিসের আল্-কাদী ইব্‌ন 'আমমার [দ্র.]-এর প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়া তুগতেগীনের নিকট সাহায্য কামনা করিয়াছিল। তুগতেগীন কয়েকটি শক্ত ঘাঁটি দখল করিতে সফল হন। কিন্তু তাঁহার সাফল্যের কথা শুনিয়া ত্রিপোলিসের কাউন্ট উইলিয়াম মাঠে অবতীর্ণ হন এবং দামিশক বাহিনীকে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যে, তাহারা বিশৃঙ্খলাপূর্ণভাবে হিমস-এর দিকে পলায়ন করে এবং কাউন্ট উইলিয়াম 'ইরকা দুর্গটি দখল করেন (শা'বান ৫০২/মার্চ ১১০৯)।

৫০৪/১১১০-১১ সনে সালজূক সুলতান মুহাম্মাদ [দ্র.] সিরীয় পলাতকদের অনুরোধক্রমে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তদনুযায়ী তিনি আল্-মাওসিলের শাসনকর্তাকে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে মাঠে অবতীর্ণ হইবার আদেশ দেন এবং সালজূকদের সকল করদ রাজাকে মাওদূদের সৈন্যদলে যোগদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর কিছু সাফল্যের পর মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয় এবং রাবী'উল আওয়াল, ৫০৭/সেপ্টেম্বর ১১১৩ সনে মাওদূদ দামিশকে আততায়ীর হাতে নিহত হন। তুগতেগীনসহ কয়েকজন মুসলিম শাসনকর্তাকে এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারে সন্দেহ করা হয়। কিন্তু সুলতান মুহাম্মাদ যখন বাগদাদের পুলিশ প্রাধ্যক্ষ আক-সোঙ্কোর আল্-বুরসুকী [দ্র.]-কে মাওদূদের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেন, তখন ১ম আরতোকিদ ঈলগাযী [দ্র.] এই নিয়োগের ফলে নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তুগতেগীন তাঁহার সহিত যোগ দেন। কারণ বাগদাদে তাঁহাকে মাওদূদ হত্যার যোগসাজশকারীরূপে গণ্য করা হইত এবং এইজন্য তিনি সুলতানের প্রতিশোধের আশঙ্কা করিতেন। খৃস্টানদের সহিত এই দুই মুসলিম নেতার মৈত্রী স্থাপন ও যুদ্ধের পরবর্তী গতিধারার জন্য দ্র. ঈলগাযী শীর্ষক প্রবন্ধ।

যু'ল-কা'দা ৫০৯/মার্চ-এপ্রিল ১১১৬ সনে তুগতেগীন বাগদাদ গমন করেন এবং সুলতানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সুলতান তাঁহাকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং এমন কি কর আরোপ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাসহ তাঁহাকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন। কিছুকাল পর তুগতেগীন পুনরায় ঈলগাযীর সহিত যোগ দেন এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে যুদ্ধ পরিচালনা অব্যাহত রাখেন [দ্র. ঈলগাযী]। সময়ের ধারায় খৃস্টানদের নিকট টায়ারের পতন ঘটে। এই গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহরটি রাজনৈতিকভাবে মিসরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ৫০৬/১১-২৩ সনে শহরবাসিগণ ফরাসীদের ভয়ে তুগতেগীনের নিকট সাহায্যের আবেদন জানায়। আত্যাবেগ উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে মাস'উদ নামক একজন গভর্নরকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করেন, যিনি কয়েক বৎসর যাবত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাহার আচরণ সম্পর্কে ফাতিমী খলীফার নিকট টায়ারবাসীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে খলীফা তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করেন এবং অন্য একজনকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। শহরটি অতঃপর ক্রুসেডারদের আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন হইলে নূতন গভর্নর তুগতেগীনের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। তুগতেগীন আক্রমণকারীদের পশ্চাদপসরণে ব্যর্থ হইয়া তাহাদের সহিত আলোচনা শুরু করিতে বাধ্য হন। নগরীর সৈনিক ও অধিবাসীদেরকে বহনযোগ্য জিনিসপত্র লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করা হয় এবং জুমাদা উলা, ৫১৮/জুলাই ১১২৪ সনে ফরাসী বাহিনী টায়ারে প্রবেশ করে।

"খৃস্টান জগতের অন্যতম ভয়াবহতম শত্রু" তুগতেগীন ৮ সাফার, ৫২২/২ ফেব্রুয়ারি, ১১২৮ তারিখে ইনতিকাল করেন। প্রাচ্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাজুল-মুলূক বুরী দামিশকের অধিপতি হিসাবে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফাতু'ল-আ'য়ান, নিবন্ধ তুতুশ, সম্পা. Wustenfeld, নং ১২১; de Slane-এর অনুবাদ, ১খ, ২৭৪; (২) আবু'ল-ফিদা', Annales, সম্পা. Reiske, ৩খ, ৩৪৪, ৩৮৬, ৩৮৮, ৪২০, ৪২৬, ৪৩২; (৩) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg, x., Passim; (৪) উসামা ইব্‌ন মুনকিয, সম্পা. Derenbourg, দ্র. index; (৫) ইবনু'ল-কালানিসী, যায়ল তা'রীখ দিমাশক, সম্পা. Amedroz, ১৩০, ১৩৯, ১৪২, ১৪৪-১৫, ১৫৬-২১৮; (৬) ইব্‌ন খালদূন, কিতাবু'ল-'ইবার, ৫খ, ১৫০; (৭) আবু'ল মাহাসিন, আন্-নুজূমু'য-যাহিরা, সম্পা. Popper, ২খ, ৩০০, ৩৩৬-৩৮, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৭২, ৩৮২, ৩৮৮; (৮) Weil, Geschichte der Chalifen, ৩খ, ১৫৩, ১৬৫, ১৭৭, ১৯৫-১৯৮, ২০০-২০২, ২৩৪-২৩৭, ২৪১, ২৪৩, ২৫০; (৯) Recueil des historiens des croisades, Hist. orientaux, ১-৩, দ্র. index; (১০) Rohricht, Geschichte des Konigreichs Jerusalem, দ্র. index।

K. V. Zetterrsteen (E.I.[1])/ মু. আবদুল মান্নান

তুগ্‌রা (طغرا) ঃ মুল্লা তুগ্‌রা মাশ্‌হাদী, একজন ইরানী সাহিত্যিক, জন্ম (তারিখ অজ্ঞাত) মাশ্‌হাদ-এ। জাহাংগীর-এর রাজত্বের শেষদিকে তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। কিছুদিন দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের পর শাহজাহান-এর রাজত্বকালে তিনি রাজপুত্র মুরাদ বাখ্‌শ-এর মুন্‌শী নিযুক্ত হন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে বাল্‌খ্ অভিযানে গমন করেন। এই অভিযানে রাজপুত্র বাল্‌খ্ ও বাদাখ্‌শান জয় করেন (১০৫৫-৫৭/১৬৪৫-৪৭)। ইহার স্মরণে তুগ্‌রা' মিরআতু'ল-ফুতূহ নামক একখানা গদ্য পুস্তিকা (رساله) রচনা করেন। ইহারই অনুকরণে গুলাম মুহ্‌য়ি'দ-দীন নামক এক ব্যক্তি ১১৩৫/১৭২২-২৩ সালে মুগল সাম্রাজ্যের একজন ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসার সায়ফু'দ-দাওলা 'আবদুস-সামাদ (মৃ. ১১৫০/১৭৩৭-৩৮) ফুতূহাতনামা-ই সামাদী নামে কাব্যে একখানি স্তুতিমূলক জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন।

পরবর্তী কালে তুগ্‌রা' দীওয়ান (একান্ত সচিব) মির্যা আবু'ল-কাসিম-এর সহগামীগণের সহিত কাশ্মীর গমন করেন। জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি এই স্থানে অতিবাহিত করেন এবং ১০৭৮/১৬৬৭-৬৮ সালের পূর্বে ইনতিকাল করেন।

তুগ্‌রা' পদ্যে ও গদ্যে সমভাবে রচনা করিতেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যরচনাবলী হইল ঃ (১) সাকী নামাহ, যাহা একখানি ব্যাপক মাছনাবী গ্রন্থ, কবি জুহূরী (মৃ. ১০২৫/১৬১৬)-এর একই নামের মাছনাবী গ্রন্থের অনুকরণে রচিত; (২) [দার] তা'রীফ-ই কাশ্মীর, মাছনাবী রীতিতে হাকীম যুলালী (মৃ. ১০২৬/১৬১৭)-এর অনুকরণে রচিত; হাকীম যুলালীর রচনাবলীর একটি ভূমিকাও তিনি লিখিয়াছিলেন (তু. Ethe, Catalogue of the Pers. Manuscripts in the India Office Library, পৃ. ৮১৬-৮১৯)। দৃশ্যত তা'রীফ-ই কাশ্মীর কাশ্মীরেই অর্থাৎ রাজদরবার পরিত্যাগের পর রচিত হয়। পারস্যের প্রায় সকল করি মত তুগ্‌রা' গাযাল (দ্র.) রুবা'ইয়্যাত (দ্র.) ও মুকাত্‌তা'আত (দ্র.) প্রভৃতিও লিখিয়াছেন। তাঁহার অত্যন্ত কৃত্রিম এবং শব্দাড়ম্বরপূর্ণ গদ্য রচনা (রিসালা)-গুলি তাঁহার পদ্যের তুলনায় মনে হয় অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছে। এই গদ্য রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রহিয়াছে, পদ্যের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা কম (অন্তত য়ুরোপে)। তুগরা' প্রায় ৩০খানি গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মিরআতু'ল-ফুতূহ ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির উল্লেখ যথেষ্ট ঃ (১) মি'য়ারু'ল-ইদ্‌রাক দীওয়ান-ই হাফিজ-এর উপর একটি প্রবন্ধ; (২) ফিরদাওসিয়্যা এবং তাজালিয়াত, গদ্যে কাশ্মীরের দুইখানি বিবরণ; (৩) তাযকিরাতু'ল আতকিয়া', ইহা কাশ্মীরের বারজন কবি ও গুণীজণের প্রশংসায় লিখিত; (৪) মিরআতু'ল-'উয়ূব, গোলকুণ্ডা রাজদরবারের একজন আমীরের ব্যঙ্গ চিত্র; (৫) জুলূসিয়্যা, রাঙ্গযীব-এর প্রশংসায় লিখিত এবং (৬) পারীখানাহ, ইরানের শাহ দ্বিতীয় 'আব্বাস-এর প্রশংসায় রচিত।

অবশেষে উল্লেখ করা যায়, তুগ্‌রা কর্তৃক তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের বরাবরে লিখিত পত্রাবলী; তাঁহার ১৮টি চিঠিপত্রসহ রিসালা এবং চিঠিপত্রের (ময় টীকা) একটি সংকলন ১৮৭১ খৃ. কানপুরে (লিথু) এবং ১৮৮৫ খৃ. লাখনৌতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Grundriss der Iran philologie, ২খ, ৩৩৪, ৩৩৬-৩৩৮; (২) Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, ৭৪২, ৮৫০, ৮৭৫, ১০৬৮, ৭৯৬, ৬৭৭, ৯৭১, ১০৩৬; (৩) Rieu, Supplement, পৃ. ২০৫ (এখানে দীওয়ান কুদ্‌সীতে তুগ্‌রার ভূমিকার উল্লেখ রহিয়াছে), পৃ. ২৬; (৪) Sachau and Ethe, Catal. of the Pers. Ms. in the Bodleian Library, ১খ, ৮৪৪ প.; (৫) Ch. Stewart, A descriptive Catalogue of the Oriental Library of the late Tippoo Sultan of Mysore, পৃ. ৬৪; (৬) Ethe, Catal. of Pers. Mss. in the Library of India Office, পৃ. ৮৬৮ প., ৯৬৩; (৭) w. Pertsch, Verzeichnis der Perrischen Handschriften der Koniglichen Bibliothek zu Berlin, পৃ. ৪৮০, ৬৪৯, ৬৭৯, ৮৬৫, ৬৯১, ৬৯৬; (৮) ঐ লেখক, Die persischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, পৃ. ২৪; (৯) E. G. Browne, Supplementary Handlirt of the Muhammadan Manuscripts....in Cambridge, পৃ. ২০, ৪২, ১০৭, ১২২, ১৯৬, ২০৮, ২৬১, ২৯৬, ২৯৯, ৩০২; (১০) E. Edwards, Catal. of Persian Printed Books in the Brithsh Museum, লণ্ডন ১৯২২ খৃ.।

V.F. Buchner (দা.মা. ই.)/ ড. আবদুল জলীল

তুগরা (طغرا، طغرى) ঃ ('উছমানী ও সালজূক তুর্কী) ওগুয এবং পরবর্তী সালজূক ও 'উছমানী শাসকদের সাংস্কৃতিক ও লিপিশৈলীর (Calligraphic) প্রতীক যাহা সময়ের বিবর্তনে রাষ্ট্রীয় সীল বা রাজকীয় প্রতীকচিহ্নে পরিণত হয়। প্রান্তিক এই চিহ্ন শুধু রাষ্ট্রীয় অনুশাসন বা ফরমানের উপরই নয়, বরং সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দলীল, মুদ্রা, সরকারী স্মারক, ইমারত, স্মৃতিসৌধ ও যুদ্ধজাহাজের উপরও ব্যবহার করা হইত এবং আধুনিক কালে পরিচিতি সংক্রান্ত দলীল, পাসপোর্ট, ডাক টিকেট, স্ট্যাম্প-কাগজ ও স্বর্ণকারদের প্রতীক প্রভৃতিতেও ব্যবহৃত হইতেছে।

অভিধানগত উৎস ও অর্থ ঃ তুগরা শব্দটি ফার্সী 'নিশান' অথবা "নীশান" (ইহা হইতেই 'আরবী বহুবচন হইয়াছে "নায়াশীন") শব্দের সমার্থবোধক। অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক ও আরবী তাওকী' (توقيع) [নি. দ্র.] শব্দের সমার্থবোধক; অর্থ গুপ্ত লিপি, 'স্বাক্ষর' প্রভৃতি এবং ফরমানের সমাপ্তিসূচক আনুষ্ঠানিক লেখায় তুগরাকে 'আলামত" (علامة) বলে। এই সকল শব্দের অর্থ তুগরা হইতে ব্যাপকতর এবং তুগরা উদাহরণস্বরূপ মিসরে 'আলামাতের অংশ অথবা ইহার একটি বিশেষ দিক হিসাবে বুঝাইত। তুগরা শব্দ ফার্সী ভাষাতেও প্রচলিত আছে (তু. হাকীম খাকানী ও মীর নাজমা হইতে উদাহরণ, T. O. E. M, No. 43 পৃ. ৫৬) এবং ইব্‌ন খাল্লিকান (ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ১খ, ২০২) এতদূর মনে করেন যে, শব্দটির ফার্সী ভাষার বানানই আরবী হরফে طغرى ও طغرا আলিফ মাকসূরা সহযোগে হইয়াছে। এই কারণেই তুর্কী সাহিত্যে আরবী স্ত্রীলিঙ্গে طغرى-এর ওজনে প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং তুর্কী-ফার্সী পদবিন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণের (مؤنث اسم صفت) সহিত ব্যবহার করা হয়। যেমন– তুগরা-ই গাররা' (طغرى غراء) অর্থাৎ ঝলমল তুগরা বা উজ্জ্বল তুগরা। কিছু পাশ্চাত্য লেখকও ইহাকে স্ত্রীলঙ্গে ব্যবহার করেন (die Tughra)।

আরবী ভাষায় কিছুকাল যাবৎ طغر ক্রিয়া "তুগরা" লাগাইবার অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে (আল-মাকরীযী, আল-খিতাত, কায়রো ১২৭০ হি., ২খ, পৃ. ২১১)। কথ্য আরবীতে তুগরাকে 'তুররা' (কোনও কাপড়ের আঁচল অথবা কোনও দলীলের উপরের অংশের গোলভাগ)-এর সংগে মিলাইয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং শেষোক্ত নামটি তুগরা-এর ক্ষেত্রে আল-জাবারতী (৪খ, পৃ. ৯৫) এবং মিসরের বর্তমান প্রচলনে ব্যবহৃত হয়। এই বিভ্রান্তির কারণ দলীলের তুগরা স্থাপনের স্থান হইতে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায় (তু. নীচে), যথেষ্ট প্রাচীন (তু. ইব্‌ন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত, আরও তু. Quatremere, Mamlouks, ২/২খ, পৃ. ৩০৮, টীকা)।

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় তুগরার-এর উচ্চারণ তুরা (تورە) ও তুরা (تۆرە), উদাহরণস্বরূপ গাগাউয (گاگاوز - Gagauz) Radloff, Proben, ১০খ; Moschkoff, পৃ. ৯৮ এবং এইভাবে শব্দে এই ধ্বনিবিশিষ্ট হইয়া পড়ে। তুর্কী ভাষায় ইহার অর্ত লাঠি (Stick) অথবা কণ্ডরা যাহার সাহায্যে বৃহৎ ঢোল বাজানো হয় অথবা পাকানো রুমাল, যাহার সাহায্যে খেলায় হাতের মাঝে আঘাত করা হয়" (আরবী শব্দ طوه -তুররা ও যাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, এই একই অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়; তু. আরবী বা ফার্সী দুররা বা দেরা শিরো.)। বিদেশী ভাষাসমূহে এই শব্দটিকে অঙ্গীভূত করিবার এই সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তুগরা শব্দটিকে খাঁটি তুর্কী উৎসজাত বলিয়া অবশ্যই গণ্য করিতে

হইবে। কাশগারীর মূল্যবান টীকা হইতে (১খ, পৃ. ৩৮৮) জানা যায় যে, শব্দটি ও গুয ভাষার তুগরাগ (تغراغ) হইতে আসিয়াছে, যাহার অর্থ

১. সীল (তাবি'-طابع) এবং ওগুয বাদশাহদের গুপ্ত লিখন (توقيع); কিন্তু (নগরবাসী) তুর্কীগণ ইহা পরিজ্ঞাত ছিল না।

২. রাজকীয় পর্যবেক্ষণের দিনগুলিতে ফৌজকে সাময়িকভাবে ধার দেওয়া অথবা যুদ্ধের সময়ের জন্য ধার দেওয়া কোন ঘোড়া (সম্ভবত এই ব্যবহার এইজন্য যে, এই জাতীয় ঘোড়ায় শাহী প্রতীক চিহ্নিত করা হইত)।

কাশগারী ক্রিয়া-تغراغ لنمق প্রদান করিয়াছেন যে, (২খ, পৃ. ২১৭) তুগরাগ গ্রহণ করা কোন দলীল বা চাকর সম্পর্কিত (তুর্কী ভাষায় চাকর oghlan (اوغلان) আরবী গুলাম-غلام)।

تغراغ > تغرا তুগরাগ হইতে তুগরা-এর পরিবর্তন এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, ওগুয ভাষার শব্দের শেষ কণ্ঠাক্ষর (خلقى) তুর্কী উচ্চারণে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অনুরূপ পরিবর্তনের আরও অনেক উদাহরণ রহিয়াছে।

তুর্কী ও ফার্সী ভাষার অন্যান্য শব্দের অনুরূপ, যাহার শেষে الف থাকে এবং আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তুগরা শব্দের বহুবচনের জন্য لغراوات ঃ وات যুক্ত হয় (তু. কালকাশান্দী, ১২খ,, পৃ. ১৬২) যেমন-اغاوات، خورداوات، استاوات، قللفوات، اشاوات প্রভৃতি।

অপরপক্ষে পুরাতন ধরন تغراغ-এর উপস্থিতির কারণে طغرى সম্পর্কিত এমন কতকগুলি অসম্বিত ব্যুৎপত্তি উপেক্ষা করা আর যাহা কিছু সংখ্যক লোকে প্রস্তাব করিয়াছেন, যেমন Zenker, তিনি ইহাতে বর্ণ বিপর্যয় দেখিয়াছেন, কামনাসূচক ক্রিয়া (ترغارى) "এইরূপ হইতে দাও" অথবা Tychsen যিনি ইহাতে دوغر (طوعزو)" সত্য, সঠিক, শব্দটি দেখিয়াছেন (Introductio in remnumariam Muhammedanorum, Rostock 1794; Description de l'Egyp-এর ১৬ খ., পৃ. ৩৩৮-৩৩৯-তে উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

এতদসত্ত্বেও تغرى-কে একটি কাল্পনিক পাখি تغرى-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করিবার মতবাদটির বিশদ আলোচনার দাবি রাখে। উক্ত মতবাদের প্রবক্তা, লেখকগণ আহমাদ মিদহাত আফিন্দী, আহমাদ ওয়াফীক পাশা, দিয়া গোকআল্প M. T. M. সংখ্যা ৩, পৃ. ৪০৪, ৪৪৫) ও কর্নেল 'আলী (T. O. E. M., সংখ্যা ৪৩ এবং ৪৪ বর্ষ, ১৩৩৪ হি.) বলেন যে, এই পাখি ওগুযদের মহান খাকান-এর প্রতীক অথবা اوتغون (ongun) (দিয়াগোকআল্প বলেন যে, এই পাখি ওগুয গোত্রের টোটেম (Totem) ছিল এবং তাহার অধীনস্থ ২৪টি গোত্রের প্রত্যেকের এবং উক্ত গোত্রসমূহের ছয় ছয়টির নেতৃত্বদানকারী ৪ জন খানের প্রত্যেকের নিজস্ব তামগা (تمغة) ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল লেখকের মধ্যে কেহই নিজের বর্ণনার সপক্ষে কোন দলীল দেন নাই। রাশীদু-দীন ও মাহমূদ কাশগারীর উদ্ধৃতিতে শুধু উক্ত কাল্পনিক পাখির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (আমরা সংযোজন করিতে পারি যে, শাহনামাহ, Mohl সং., ৫খ., পৃ. ৬১৯ ও ৬২১-এ এই পাখির উল্লেখ আছে, খাকান বাহ্‌রাম গুরকে এই পাখি উপহার প্রদান করেন)। যদিও কাশগারী "তুগরাগ"-এর উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনার যোগ্যতম ব্যক্তি, তবুও তিনি শুধু ইহা বলিয়াছেন, "লা আদরী আসলাহু", "আমি উহার উৎস জানি না।"

তুগরা-এর ইতিহাস ঃ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জানা নাই যে, ওগুয ও সালজূকগণ, যাহারা একই বংশোদ্ভূত, কোন ধরনের তুগরা ব্যবহার করিতেন, "তুগরা'ঈ" (طغرائى) উপাধি অথবা সেই কর্মকর্তা যাহাকে সালজূকগণ তুগরা অঙ্কনের জন্য নিয়োগ প্রদান করিতেন, তাঁহাদের একজনের খ্যাতির কারণে সংরক্ষিত রহিয়া গিয়াছে, যিনি মালিক শাহ্ ও মাস'উদ-এর 'উযীর ও লামিয়াতু'ল-'আজাম কবিতার রচয়িতা ছিলেন। তিনি কাহারও মতে ৫১৪ হিজরীর দিকে এবং অন্যদের মতে ৫১৮ হিজরীতে ইনতিকাল করেন [তু. দ্র. আল-তুগরাই]। তাঁহার জীবনী লেখকগণ (ইব্‌ন খাল্লিকান, সম্পা. de Slane, ১খ, পৃ. ৪৬২; ইবনুল-ওয়ারদী, কায়রো ১২৮৫ হি., ২খ., পৃ. ১৩১; ইবনুল আছীর, Recuil des Hist, des : Croisades. ১খ, পৃ. ৩২৭) সকলেই বলেন যে, "তুগরাই অর্থ সেই কর্মকর্তা, যিনি তুগরা তৈরি করেন।" M. Babinger 'আলা'উ'দ-দীন 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-বাহাই (মৃ. ৮১৫/১৪১২) রচিত মাতালি'উ'ল বুদূর ফী মানাযিরি'স-সুরূর (কায়রো ১৩০০ হি., ২খ., পৃ. ১১৮)-এর উদ্ধৃতিতে একজন রা'ঈস দীওয়ান ইনশা' বা আত্-তুগরাবীয়া-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা মিসরের মামলূক সুলতানদের আমলে তুগরা-র প্রচলন দেখিতে পাই। নিঃসন্দেহে তাঁহারা ইহা সালজূকদের (আয়্যুবীয়দের মাধ্যমে) নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, আল-কালকাশান্দী-এর বর্ণনামতে ইহার ব্যবহার শা'বান ইব্‌ন হুসায়ন (১৩৬৩ খৃ.-১৩৭৬ খৃ.)-এর শাসনকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই বর্ণনার প্রত্যয়ন আল-মাকরীযীও করিয়াছেন (আল-খিতাত, পৃ. স্থা.)। তিনি বলেন যে, তাঁহার সময়ে অর্থাৎ হি. ৭৬৬-৮৪৫/১৩৬৪-১৪৪২ সালে তুগরা-এর ব্যবহারের প্রচলন ছিল না।

যে তুগরা মিসরের সুলতানগণ মানশূর (নি. দ্র., বহুবচন মানাশীর)-এর উপর ব্যবহার করিতেন আল-কালকাশান্দী (১৩খ, পৃ. ১৬২-১৬৬) তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। মানশূর অর্থ সেই উপদেশ বা নির্দেশ যাহা এক হাজার অশ্বারোহী-প্রধানের নিকট অথবা তাবলখানার আমীরের নামে জারি করা হইত।

একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তার এই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি আয়তাকার কাগজের কতকগুলি খণ্ডের উপর এই সকল তুগরা তৈরি করিতেন। অতঃপর লেখকগণ ঐ সকল খণ্ডকে দস্তাবীযের উপরিভাগে ইহাদের নির্ধারিত স্থানে অর্থাৎ 'তুর্‌রা'-এর স্থানে 'বিসমিল্লাহ'-এর উপর দিকে সাঁটিয়া দিতেন (আরও তু. Quatremere, Sultans Mamlouks, ২/২খ, পৃ. ৩০৮-৩০৯)।

তুগরাতে সুলতানের পদবীসমূহ এক পংক্তিতে লিখিয়া দেওয়া হইত। সুলতান মালিকু'ন-নাসির মুহাম্মাদ ইব্‌ন কালাউনের তুগরা-র ভাষা (Text) ছিলঃ আস-সুলতানু'ল-মালিক আন-নাসির নাসিকরু'দ-দুনয়া ওয়া'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আস-সুলতান আল-মালিকু'ল-মানসূর সায়ফুদ-দীন ক্বালাউন।

সকল ঋজু অক্ষরসমূহের খাড়া দাগগুলিকে (মুনতাসির), যেমন আলিফ, কাফ, লাম, তা, জা, যাহা এই তুগরা-তে মোট ৩৫টি, অনেক লম্বা করিয়া একটির পর একজোড়া পর্যায়ক্রমে দেওয়া হইয়াছে (কালকাশান্দী দুই লম্ব রেখার মধ্যবর্তী দূরত্বের সঠিক পরিমাণ প্রদান করিয়াছেন)। এই নিয়মিত ব্যবস্থা নিশ্চিত করণার্থে কিছু কিছু অক্ষরকে তাহাদের স্থান হইতে সরাইয়া দেওয়া হইত; যেমন 'আল-মালিক'-এর আলিফকে 'আস-সুলতান-এর দুই লামের মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয়। উপাধির পংক্তির নীচে 'খাল্লাদাল্লাহু সুলতানাহু' বাক্যটি ছিল, যাহা তুগরা

কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত নয়, বরং মানশুর লেখক স্বয়ং লিখিয়া দিতেন এবং এই বাক্য মানশূরের কিছু স্থান দখল করিয়া লইত (সম্ভবত ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ করা হইত)।

এই তুগরা-এর পরিমাপ কালকাশান্দীর মতানুসারে ছিল লম্বা ও চওড়ায় নিসফ যিরা' [আধা হাত] আল-কুম্মাশ আল-কাহিরী। হরফের পরিমাপ অথবা কলমের মাপ খাড়া রেখার সংখ্যানুসারে বিভিন্ন ধরনের হইত।

দুই নম্বর চিত্রের বিবরণের জন্য আমরা উক্ত একই রচনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। ইহাতে ৪৫টি খাড়া রেখা রহিয়াছে (৭৭টি খাড়া দুরযের জন্য) যাহা ইহাদের প্রান্তে সমান্তরালসহ জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় ব্যতিক্রম এই যে, এইখানে খাড়া রেখার নীচে (ছোলুছ জালীল পদ্ধতিতে লিখিত) সুল্‌তানের নাম লেখা হইয়াছে, শা'বান ইব্‌ন হুসায়ন (অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বা তুমার পদ্ধতিতে লিখিত)।

আমরা দুই 'নূনের' অদ্ভুত বিশিষ্টতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিতে পারি (শা'বান ও ইব্‌ন শব্দে ব্যবহৃত দুই নূন) যাহা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। সম্ভবত ইহা দুই বাক্যের সেই সম্মিলন, যাহার আলোচনা পরে করা হইবে।

আমার জানামতে প্রাচীনতম 'উছমানী তুগরা আমীর সুলায়মান (৮০৬/১৪০৩ হইতে ৮১৬/১৪১৩)-এর মুদ্রার উপর দেখা যায়। Von Hammer তুগরা বিষয়ে মুরাদ ১ম অথবা তাঁহার পিতা ওরখানের সময় হইতে পাওয়া বিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাঁহার বাস্তব কোন ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা সত্য যে, Fekete, খলীল আদহামের বরাতে, যিনি কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য সংকেত (reference) প্রদান করেন নাই, মুরাদ ১ম-এর তুগরাযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এই লেখকের ক্যাটালগে (মুদ্রা তালিকায়) এই মুদ্রার উল্লেখ করেন নাই। কর্নেল 'আলীও (পৃ. ১১০-১১১) মুরাদ ১ম-এর সময়কাল হইতে তুগরার লেখচৈত্রিক (graphic) বিবর্তনের বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহা বলেন নাই যে, তিনি কোথা হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ইহা স্মরণযোগ্য যে, আমীর সুলায়মানের তুগরাতে এই ধরনের লেখার প্রধান প্রধান উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে অর্থাৎ (১) তিনটি উল্লম্ব রেখা যাহা যুবরাজ ও তাঁহার পিতার নামের মধ্যের 'আলিফ' হরফসমূহ হইতে লওয়া হইয়াছে। 'আমীর সুলায়মান' শব্দের উপরে 'ইব্‌ন' শব্দ এবং তদূর্ধ্বে "বায়াযীদ" লেখা হইয়াছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বায়াযীদ (মুহাম্মাদ ১ম, তু. খালীল আদহাম, মূযা-ই হুমায়ুন মাসকূফাত-ই 'উছমানীয়া, কনস্টান্টিনোপল ১৩৩৪ হি., ১খ, পৃ. ৩১)-এর একটি তুগরাতে ৪টি উল্লম্ব রেখা রহিয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যা ব্যতিক্রম এবং শুধু তুলনামূলকভাবে বা উপবৃত্তাকারে উন্মুক্ত দুইটি বক্ররেখা, যাহা বাদ্‌শাহের নামের নীচের অংশে আসিয়া মিলিত হয় এবং প্রথমত বাম দিকে বাঁক নিয়া উপরের দিকে উত্থিত হয়। অতঃপর ডানদিকে বাঁকিয়া উল্লম্ব রেখাসমূহের উপরের অংশকে কাটিয়া (অতিক্রম করিয়া) ডান দিকে বিলীন হয়। ব্যতিক্রমভাবে আমরা এইরূপ বক্ররেখা একটি বা তিনটি দেখিতে পাই। দুই সংখ্যার বিষয়টি অনেক প্রাথমিক কাল হইতেই সুলতানের তুগরার আকৃতির জন্য সুনির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

এই সকল বক্ররেখা প্রারম্ভিক কালে 'নূন' হরফকে লম্বা করিবার ফলে সৃষ্টি হইত বলিয়া মনে হয়, যাহা ইব্‌ন শব্দ শাসকের নাম এবং তাঁহার পিতার নামে পাওয়া যাইত অথবা যুবরাজ সুলায়মানের তুগরাতে অথবা মুরাদ ১ম-এর নামে (কর্নেল 'আলীর মতানুসারে) মুহাম্মাদ ১ম-এর তুগরায় যেখানে দ্বিতীয় 'নূন' সুলতান শব্দ হইতে পাওয়া যাইত (তু. খালীল আদহাম, প্রাগুক্ত) অথবা পরবর্তী কালের তুগরায় যেখানে Fekete-এর মতানুসারে 'ইব্‌ন'-এর 'নূন' ও খান-এর নূনকে লম্বা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা সত্য যে, এইগুলি অনেক প্রাচীন কালেও পাওয়া যাইত, বরং সেই সময়ও যখন নামসমূহে দ্বিতীয় 'নূন' পাওয়া যাইত না, সেই সকল তুগরা, যদিও অসম্পূর্ণ, খালীল আদহাম যেইগুলি প্রদান করিয়াছেন, পৃ. ৪৪, ৪৮, ৫৫, ৬৭ ও ৬৮।

প্রথম প্রথম নাম [বাদশাহর] ও পিতৃনাম সেই বৃত্তের মাঝে লেখা হইত, যাহাকে বক্ররেখাদ্বয় (ধনুকসদৃশ) ঘিরিয়া রাখিত, কিন্তু তুগরা-র পরবর্তী উন্নয়নে উক্ত স্থানের একটি অংশ খালি রাখা হইত। প্রথম সেইখানে শুধু সুলতানের নাম থাকিত; তাঁহার পিতার নাম এবং পরে উভয় নামই উল্লম্ব রেখার নিচে লেখা শুরু হয়, যেইখানে উহারা পরস্পর বিভাজনকারী রেখার সমাহার ঘটাইয়া একটি কমবেশি জ্যামিতিক নক্‌শা গঠন করিত, যাহাকে সেরে (Sere) বলা হইত অর্থাৎ 'হাতের ছোট তালু" তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যবর্তী স্থান [সঠিক অর্থে 'প্রসারিত'-যাহা سيرمك=سيرمك ক্রিয়ার নামপদ (اسم مصدر), তু. প্রবচন ازادمنش، لا سرسريه سله سريه [ابالى اخيلا] এই শব্দ একই অর্থে কিরগিয ভাষায় পাওয়া যায়; তু. Radloff, Worterbuh, ৪খ, পৃ. ৪৫৮]।

'সেরে' ও বৃত্তের মাঝে আল-মুজাফ্‌ফার (المظفر) (বিজয়ী) শব্দটি লিখিত হইত এবং উহার সহিত دائما (সর্বদা) শব্দটি বর্ণনা করা হইত, যাহা খুবই প্রথাসিদ্ধ একটি সীলের আকৃতিতে বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করা হইত। دائما শব্দের শেষ আলিফ হরফ প্রলম্বিত করিয়া এবং উহা একদম বামে ঘুরিয়া ধনুকসদৃশ বাঁকা রেখাগুলিকে অতিক্রম করে; এই শব্দগুলি গালিব আদহাম-এর মতানুসারে (Catalogue, পৃ. ২ এবং ২০৬ টীকা) সর্বপ্রথম ২য় ইব্‌রাহীম-এর মুদ্রায় উৎকীর্ণ হয়। তাঁহার রাজত্বকাল ১০৪৯ হি. হইতে শুরু হয়।

বাঁকা রেখাদ্বয়ের ডানদিকের দুই শেষ প্রান্তকে আরও প্রলম্বিত এবং সুন্দর আকৃতি দেওয়া হইত। এই ধরনের প্রান্ত আধুনিক তুগরা-এর একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়ে এবং বাহু গঠন করে (তুগরা-কোললারী=طغرى قولارى) তিনটি উল্লম্ব রেখার উপর হইতে তিনটি ভগ্ন রেখা সন্তরিত শিখার ন্যায় নীচে নামিয়া আসে। যতদূর 'খান' শব্দটির সম্পর্ক তাহা হইতেছে, প্রথমত উহা শাসকের পিতার নামের শেষে যুক্ত হইত, কিন্তু মাহমূদ ১ম (১৭৩০ হইতে ১৭৫৪ খৃ.)-এর সময় হইতে শাসকের নামের শেষে যুক্ত হওয়া শুরু হয়।

তুগরা-র ডানদিকের উন্মুক্ত স্থানে প্রায়শ একটি ফুল স্থাপন করা হইত। উক্ত স্থানেই পরবর্তী কালে সুলতান নিজস্ব উপাধি গাযী ব্যবহার করিতেন, যখন তিনি উক্ত উপাধির অধিকারী হইতেন। মাহমূদ ২য় উক্ত স্থানে নিজের কবিনাম 'আদলী (عدلى) স্থাপন করেন (তু. চিত্র ৮), (তুগরা-র অন্যান্য আরও যেই সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহার জন্য তু. Fekete, পৃ. ৪৬, টীকা ১)।

তুগরার এইমাত্র বর্ণিত চিত্রটি সাধারণত লোকেরাও প্রায়শ অনুকরণ করিয়াছেন, যাহারা "লাওহা" অথবা লিপিশৈলীর ফলকে সুলতানের নামের স্থানে ধর্মীয় বাণী ব্যবহার করিয়া মসজিদসমূহে, পাঠাগারসমূহে, চায়ের দোকানে অথবা নিজস্ব বাড়িতে ঝুলাইতে শুরু করে। মিসরে আমরা এমন কি ব্যবসায়ীদের এই ধরনের প্রতীক দেখিতে পাই, কিন্তু ইহার প্রচলন এখন হ্রাস পাইতেছে এবং অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত একজন লিপিকার বা কুম্ভকারকে দিয়া নিজের নামের তুগরা

বানাইয়া লইবার অনুমোদন ছিল (তু. চিত্র ১২, ১৩)। তুরস্কের শেষ সুলতানের অপসারণের পর হইতে সেইখানে তুগরার সরকারী ব্যবহার পরিত্যক্ত হইয়াছে (আঙ্কারা বিধি, ১ নভেম্বর, ১৯২২ খৃ.)।

এখন যদি আমরা 'উছমানী তুগরা ও মামলূক তুগরার উভয়ের মধ্যকার চিত্রানুগ সাধারণ উপাদান নির্ধারণের জন্য তুলনা করি তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, এই উপাদান শুধু খাড়া হরফসমূহের উল্লম্ব রেখার মাঝে সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ফলে সাধারণভাবে উহা হইতে আমরা এই উপসংহারে পৌঁছি যে, তুগরা-র অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে উল্লম্ব রেখাসমূহের এক বিশেষ সংখ্যা, যাহা স্থিরীকৃত নয়।

লেখকগণ ২য় মুরাদ-এর মুদ্রায় অঙ্কিত এক ধরনের তুগরার উল্লেখ করিয়াছেন ('আলী, পৃ. ১১৩; খালীল আদ্হাম, পূ. স্থা.) যেখানে শুধু ডিম্বাকৃতি বাঁকা রেখা রহিয়াছে, কিন্তু আমার ধারণায় ইহা প্রকৃত তুগরা বলিবার যোগ্য নহে। আর যদি হয়ও, তবু অবশ্যই সম্পূর্ণ তুগরা আমরা দেখিয়াছি যে, যদিও কিছু কিছু মামলূক তুগরাতে উক্ত বাঁকা রেখাদ্বয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ রেখাসমূহ রহিয়াছে যাহা তুগরার অপরিহার্য উপাদান নহে। পরবর্তী কালে যদিও শব্দ লিখন পদ্ধতির সঙ্গে এই উপাদানও মিশিয়া গিয়াছে, তথাপি নিশ্চিতভাবে উল্লম্ব রেখার সাহায্যে সৃষ্ট অলংকরণ মটীফ (Motif) তুর্কীদের মাঝে আরবী লিপি ব্যবহারের পূর্বেও প্রচলিত ছিল।

তুগরা-র চিহ্ন ঃ যদি আমরা ইহা মানিয়া লই যে, তুগরা শুধু এক ধরনের রীতিসিদ্ধ লেখা নহে, তাহা হইলে কি ধরনের প্রতীক বা চিহ্ন প্রকাশ করে? আমরা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, কিছু সংখ্যক লোক ইহাতে পাখির চিত্র দেখিয়া থাকেন। কেহ কেহ এত দূর পর্যন্ত বলেন যে, উহাতে একজন দ্রুত ধাবমান অশ্বারোহীর আকৃতি দেখা যায় (Tychsen)। কিন্তু সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় মতবাদ যাহা V Hammer-এর বদৌলতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে (Hist, de L'emp. Ottoman, ১খ, পৃ. ২৩১) তাঁহার বর্ণনানুসারে। সুলতান ১ম মুরাদ-এর হাতের ছাপ, যিনি লেখাপড়া জানিতেন না এবং যিনি নিজের হাত কালিতে ডুবাইয়া স্বীয় স্বাক্ষরের পরিবর্তে রাগুসিয়দের (Regusans) সহিত সম্পাদিত চুক্তিনামায় ছাপ দিয়াছিলেন। উক্ত সুলতানের দরবারে দীওয়ানে ইনশা বিদ্যমান ছিল, সেই কথা স্মরণে না রাখিয়াই এই ব্যাখ্যা V. Hammer Engel হইতে বর্ণনা করিয়াছেন (Gesch. des Freystaates Ragusa, ভিয়েনা ১৮০৭ খৃ., পৃ. ১৪১) যিনি কোনও উৎসের উল্লেখ করেন নাই। প্রাচ্যে ইহা পরিজ্ঞাত নহে এবং সুস্পষ্টরূপে ইহা একটি কাহিনী, যাহার প্রারম্ভ নিঃসন্দেহে রাগুসাতেই হইয়া থাকিবে, তথাপি এই মতবাদের প্রসিদ্ধি ছিল। সুতরাং Barbier de Meynard ইহা গ্রহণ করিয়াছেন (Rec. des Hist., des Croisades, ৪খ, পৃ. ১৩৮ টীকা এবং সম্প্রতি উহার সমর্থন এইজন্য করা হইয়াছে যে, আঙ্গুলীর ছাপের ব্যবহারের প্রচলন প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে [সম্পূর্ণ হাতের ছাপের প্রচলনও], বিশেষত কিছু কিছু অনুষ্ঠানে অথবা বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে। কিছু কিছু প্রাচ্য দেশে (উদাহরণত হিন্দুস্তান) প্রচলিত রহিয়াছে।

তুগরার-র প্রাচীনতম ধরনের (দ্র. উপরে) প্রতি লক্ষ করিলে আমাদের বর্ণিত ব্যাখ্যা (hypotheses)-গুলি ধূলিসাৎ হইয়া যায়। ইহাও লক্ষণীয় যে, Fekete 'উছমানী তুগরা-র নক্শা হইতে শুরু করিয়া যাহা বেশি জটিল হইলেও এই একই নেতিবাচক উপসংহারে পৌঁছিয়াছেন। তুগরা-র উন্নত ধরনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত তেমন গুরুত্ব বহন করে না।

এই কারণেই তুগরা বা 'পাঞ্জে'কে যাহা উহার নকল কখনও কখনও তুর্কী অলংকার শিল্পে একটি পাখির আকৃতি প্রদান করা হইয়াছে (১১৮১ হিজরীর একটি নমুনা চিত্র নম্বর ১৪-তে প্রদান করা হইয়াছে)। অনুরূপভাবে 'পাঞ্জা'-এর অর্থ পাখির পাঞ্জা এবং "সেরে"-এর অর্থ হাতের তালু Von Hammer-এর মতবাদের সমর্থনে কোন প্রমাণ নয় এবং তিনি স্বয়ং ইহা উদ্ধৃত করিবার চিন্তা করেন নাই (ফ্রেঞ্চ শব্দ "Griffie" [নখ, পাঞ্জা]" স্বাক্ষরের পরিবর্তে সীল অর্থেও ব্যবহৃত হয়)।

এই সমস্যাকে এইভাবে সরলীকরণ করিবার ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন জাগে যে, আমাদের উল্লিখিত ঐ সকল বাঁকা রেখা (hook) কোন প্রকার প্রতীকী গুরুত্ব আছে কী অথবা নাই? এই ক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, যাহা আমরা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে উপস্থাপন করিতেছি ঃ উল্লম্ব রেখাসমূহ তুগ (توغ) -এর প্রকাশ নয়তো? যে বিষয়ে আমরা জানি যে, তুর্কীগণ ঘোড়া বা তিব্বতী গাভীর লেজ যাহা একটি দণ্ডের শীর্ষে অথবা পূর্বে পতাকার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার করিত। এই ধারণার বিপরীতে প্রধান যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, উক্ত শব্দের (تغ সঙ্গে ر) ক্রিয়া বিভক্তির যে সংযুক্তি দেখা যায় তাহার খুবই কম ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে আমরা راغ (যেমন তুগরাগ=تغراغ) -এ প্রভৃতি গঠন এমন কোন প্রক্রিয়ায় করিতে পারি যাহা প্রসিদ্ধ বিভক্তি লা (লাগ) ইত্যাদির অনুরূপ হইবে। যাহা হউক, আমরা উক্ত বিভক্তির প্রতি আমাদের পুস্তক Grammaire de la langue turque, বিশেষত L'Anthropologie, ৩৩খ. (১৯২৩ খৃ.), পৃ. ১৭৪-তে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। এই মতবাদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য উক্ত বিভক্তির আরও গভীর পর্যবেক্ষণের (Study) সাহায্যেই করা যাইতে পারে, যাহা এখনও পর্যন্ত করা হয় নাই।

সেই যুক্তি, যাহ তুগরার শীর্ষে আন্দোলিত হইতে দৃষ্ট শিখা হইতে গৃহীত অথবা "পাঞ্জে"-তে প্রতিষ্ঠিত সেই ঘটনা যাহা অধিকাংশ সময়ে উল্লম্ব রেখা দুই তুগধারী পাশাদের জন্য এবং তিন উল্লম্ব রেখা তিন তুগধারী পাশাদের বা উযীরের জন্য অংকন করা হইত। এই সবই এমন ব্যাখ্যা যাহা পরবর্তী কালে করা হইয়াছে এবং যাহার গুরুত্ব তেমনই যেমনটি প্রথমোক্ত প্রমাণসমূহের উপরে যাহা আমরা বাতিল করিয়া দিয়াছি (কৌতূহলবশত আমরা চিত্র ১৫-তে এমন একটি স্বাক্ষর পেশ করিতেছি যাহাতে "খালিস' আল-ফু'আদ" শব্দ তিনটি উল্লম্ব রেখাযুক্ত। একটি তুগ-এ সজ্জিত করা হইয়াছে, যদিও ইহাদের ইঙ্গিত একজন মহিলার প্রতি করা হইয়াছে)। ইহা আরও লক্ষণীয় যে, কখনও কখনও মুদ্রাতত্ত্ববিদেরা তুগরাকে "হরফের সাহায্যে অলংকরণ মটীফের" বৃহত্তর অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া মনে হয় (J. R. A. S., ৯খ, পৃ. ৩০০, ৩৮১ [১৮৪৮ খৃ.])।

নিশানজী ঃ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, সালজূক ও মামলূক বাদশাহদের দরবারে এমন সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন যাঁহাদের বিশেষ কর্তব্যই ছিল তুগরা অংকন করা (তুর্কী ভাষায় তুগরা চেকমেক [تغره چكمك] ফার্সীতে তুগরা কাশীদান (طغرى كشيدن) 'উছমানী তুর্কীদেরও এই প্রচলনই ছিল, যাঁহাদের এতদসংক্রান্ত কর্মকর্তা ছিল এবং নিশানজী অথবা তাওকী'ঈ বলা হইত।

নিশানজী তিন 'দাফতারদার" ও "দাফতার আমীনীর" সংগে সংগে সেই পাঁচ উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে গণ্য হইতেন যাঁহারা দরবারে "খোজাগিয়ান"-এর মর্যাদার অধিকারী ছিলেন (Mouradja d'Ohsson, ৩খ, পৃ. ৩৫০; von Hammer, ১৭খ, পৃ. ৫৪)।

উক্ত বিশেষ কর্তব্য পালন ব্যতীত কমপক্ষে প্রথম যুগে তাঁহার দায়িত্ব কতগুলি বিধিগত কর্তব্য পালন করিতে হইত যাহার কারণে তাঁহাকে "মুফতী কানূন" বলা হইত, "ধর্মনিরপেক্ষ বিধির তিনি পরামর্শক হইতেন; শায়খু'ল-ইসলামের বিপরীতে যিনি বিশেষভাবে ধর্মীয় আইন প্রণয়নের পরামর্শদাতা হইতেন, তাঁহার দফতরে বিভিন্ন আইনের মুসাবিদা তৈরি হইত। আইনের টেক্সট (Text)-এর যাচাই একজন 'মুমায়্যিয' করিতেন এবং অতঃপর নিশান্‌জী নিজে উক্ত আইনের উপর তুগরা তৈরি করিতেন। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যেই সকল আইন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে উহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিশানজীগণ দ্বারাই তৈরীকৃত।

প্রথমত ঐ সকল কর্মকর্তাদের এই অধিকারও ছিল যে, তাহারা প্রতিটি দস্তাবীয যাহা তাহাদের নিকট বাদশাহী মোহর (সীল) লাগাইবার জন্য আসিত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন এবং উহাদের সম্পর্কে নিজস্ব অধিকারে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। এইভাবে দস্তাবীয তাহাদের নিকট প্রেরণকারী দফতরসমূহের পর্যবেক্ষণেরও সুযোগ তাহাদের মিলিত (Mouradja d'Ohsson, পূ. স্থা.)।

'আবদু'র-রাহমান তাওকী'ঈ (নিশান্‌জী)-এর কানূননামা (১০৮৭ খৃ., M. T. M., পৃ. ৫১৫) অনুসারে এই সম্পর্কে যেই সকল প্রচলিত রীতি মানা হইত তাহা নিম্নরূপঃ যখন কোনও ফরমান জারির জন্য সরকারী অনুমতিপত্রের (তাসহীহ ফারমানী) প্রয়োজন হইত তখন নিয়ম এই ছিল যে, ইহার তুগরা স্বয়ং প্রধান উযীর তৈরি করিতেন। এই ফরমান প্রাপ্তির পর নিশান্‌জী উহার বিপরীত দিকে (উল্টা দিকে) "দফতরী গিলাহ" অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার উপস্থিত হউক (যাহাতে পূর্ববর্তী উদাহরণের নজীর দেখা যাইতে পারে) লিখিয়া উহা "দফতর আমীনী"-এর নিকট পাঠাইয়া দিত। দফতর আমীনী তৎক্ষণাৎ উক্ত ফরমান সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারের সঙ্গে আর্কাইভের (দফতরখানা) কীমেদারের (রেজিস্টারসমূহের সংরক্ষক) মাধ্যমে ফেরত পাঠাইয়া দিত। সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাইয়ের পর নিশানজী ইহা প্রত্যয়ন করিতেন এবং অনুমতিপত্র নিজের কাছে রাখিয়া দিতেন।

নিশানজী একটি সীলবদ্ধ থলিয়ায় ('মেহহুর কীস') কাদী 'আসকার-এর জারি করা 'বরাত" গ্রহণ করিতেন। তিনি রেজিস্টারে বরাতদারদের নামের বিপরীতে "সাহাবী" (প্রত্যয়নকৃত, দেখা হইয়াছে, মঞ্জুরকৃত) লিখিয়া দিতেন এবং পুনরায় উহা উক্ত থলিয়ায় বন্ধ করার পর সীল করিয়া কীসাদারের মাধ্যমে "কাগায আমীনী"-এর নিকট পাঠাইয়া দিতেন (যিনি দীওয়ানী শাখার প্রাপ্য আদায় করিতেন)।

মুহাম্মাদ ২য়-এর কানূন অনুযায়ী নিশান্‌জী মুদারিসীন অর্থাৎ আইনজ্ঞদের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত, যাহাদের মর্যাদা 'দাখিল' ও "সাহেন"-এর ন্যায় হইতে (কেননা ইহা সুস্পষ্ট যে, পদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আইনের প্রকার প্রয়োজন ছিল) এবং "দাফতারদারদের" ও রাঈসু'ল-কুত্তাব [নি. দ্র.]-দের মধ্য হইতেও নিয়োগ করা হইত। প্রথম যুগের দাফতারদার এই স্থলে বেইলার বেঈ (beylerbeyis)-এর মর্যাদার বলিয়া গণ্য হইতেন এবং রাঈসু'ল কুত্তাবকে শুধু "সানজাক বেয়ী"-এর সমকক্ষ মনে করা হইত। পরবর্তীতে রা'ঈসু'ল-কুত্তাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে নিশানজীদের কার্যক্রম তুগরা অঙ্কনে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। তথাপি তাঁহাদের দায়িত্বে "তীমার" [নি. দ্র. যিয়ামাত খাসস] ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির হস্তান্তরে রেজিস্ট্রীর (তাসজীল) কাজ রহিয়া যায় (মুহাম্মাদ ২য়-এর কানূননামা, সম্পা. মুহাম্মাদ 'আরিফ, ১৩৩০ হি., পৃ. ১৪, টীকা ৫, suppl. to T. O. E.M)। উক্ত কানূননামা অনুসারে নিশানজী দীওয়ানে হুমায়ুনে উযীর কাদী 'আসাকির ও দাফতারদারদের সঙ্গে সদরে (সাদর) একই সঙ্গে উপবেশনের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিতেন।

সম্মানজনক আসনের ক্রম এইভাবে নির্ধারণ করা হইয়াছিল ঃ উযীরদের এক পাশে কাদী 'আসাকির এবং তাঁহার পর দাফতারদার বসিতেন এবং অন্যদিকে নিশানজী। যদি নিশানজীর মর্যাদা উযীর অথবা বেগলার বে (যাহার জন্য তিনি পাশা উপাধির অধিকারী হইতেন)-এর মর্যাদার হইতেন তাহা হইলে তিনি দাফতারদারের উপরে বসিতেন। যদি তিনি শুধু সানজাক বে অথবা আমীর লিওয়া হইতেন (যাহার কারণে তিনি শুধুমাত্র 'বে' উপাধির অধিকারী হইতেন) তাহা হইলে তিনি দাফতারদারের পরে হইতেন কিন্তু সাম্রাজ্যের নূতন ও পুরাতন রাজধানীর কাদীদের অগ্রে তাহার আসন হইত। নিশানজী ও দাফতারদারদের একই উপাধি থাকিত (আলকাব, তু. মুনশাআত-ই ফারীদূন বে, পৃ. ৯)। সেই নিশান্‌জী যাহাদের মর্যাদা উযীরের সমকক্ষ হইত তাহাদের অন্যান্য উযীরের ন্যায় একই ধরনের অধিকার ছিল (কানূননামা-ই 'আবদু'র-রাহমান)। Mouradja d'Ohsson-এর বর্ণনা অনুসারে (৩খ, পৃ. ৩৭৩) নিশান্‌জীদের সরকারী বেতন ৬,৬২০ পিয়াস ত্রেশ [ترش] ছিল। নিশান্‌জীদের সম্পর্কিত অন্যান্য বিশদ বিবরণ উক্ত 'কানূননামা'-র দীওয়ানের আনুষ্ঠানিকতায় পাওয়া যাইবে। 'অপর দীওয়ান খোজালারীর" ন্যায় তাঁহারাও আনুষ্ঠানিক পাগড়ী অর্থাৎ "মুজাওওয়াযা" পরিধান করিতেন এবং একটি 'উস্‌ত' অথবা উলের তৈরী ওভারকোট জাতীয় পোশাক (لباده), কাফতান অথবা লুকমারী কুতনীর ভিতরের জামা। Von Hammer (১৭খ, পৃ. ৫৪)-এর মতানুসারে নিশান্‌জদের দরবারী পোশাকের রঙ ছিল লাল, অপরপক্ষে অন্যান্য খোজাসীয়ানের ছিল বেগুনী রঙ। তাহাদের ঘোড়ার একটি আচ্ছাদন ('আবা'য়ী) ও সজ্জা (রাখ্‌ত) দ্বিতীয় শ্রেণীর (ওরতা) হইত। তাহাদের 'খাসস' (خاص) ৪ "য়ুক" (يوك)-এর কিছু বেশি ছিল (৪,০০,০০০ অ্যাস্‌পার)।

তুগরাকাশ ঃ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির কারণে নিশান্‌জীদের নিজস্ব সাহায্যের জন্য অন্যান্য কর্মকর্তার প্রয়োজন অনুভূত হয়। সুতরাং মুহাম্মাদ ২য়-এর কানূননামাতে নিম্নবর্ণিত বিবরণ রহিয়াছে। তুগরা-ই শারীফী উযারালার (মূ. পা.) "চেকূপ নিশান্‌জীয়্যা য়ারদীম আতমেক কানূনুমদুর (چكوپ نشانجيه ياردیم اتمك قانونم در) অর্থাৎ "আমি উযীরকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছি যে, তিনি যেন নিশান্‌জীদের তুগরা অঙ্কনের কাজে সাহায্য করেন" (পৃ. ১৪)। তিনি গুম্বজের উযীর ছিলেন (কুব্বা-ই উযীর লেরী) যাহার এই অধিকার ছিল। তাহাদের তুগরাকাশ উযীর বলা হইত এবং তাহারা নিজেদের অধিকারেই নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করিতেন (আহমাদ রাসিম, ২খ, পৃ. ৬৩৩; তু. না'ঈমা, ২খ, পৃ. ৭২, নিচের দিক হইতে ৭ম 'উমূর দাওলাত-ই 'উছমানীয়ানিন হাল ওয়া 'আকদীনী সাকা বেরদীলার ওয়া আসম্মাক তুগরা-এ সুলতানী মুতাবিক আওলা (عموم دولت عثمانيه نن حل وعقد ينى سكه وردى لرو اسمك طغر اے سلطانى مطابق اونه)। প্রধান সেনাপতিরও এই একই অধিকার ছিল, তুলীচের বর্ণনা ঃ সারদারলীক তুগরা-এ গারাসী আয়লা আমীরলার গিদিপ" অর্থাৎ সিপাহ্‌সালার-এ 'আযম-এর তুগরার সংগে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে" (আওলিয়া চেলেবী, ৫খ, পৃ. ১০৩; 'হালিয়া খাত্তে-ই শারীফ আয়লা সারদার মু'আজজাম ওয়া তুগরাকাশ দাসতূর-ই মুকার্‌রাম হায়" অর্থাৎ "আমি সুলতানের স্বহস্তলিখিত স্বাক্ষরের নির্দেশ মুতাবিক হইতেছি প্রধান সেনাপতি ও উযীর" (ঐ পুস্তক, ৪খ, পৃ. ১২৭. পংক্তি ১৩)।

"মশক-এ তুগরা"-এর পরিভাষা সুলতানের সেই অনুগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হইত যাহা সুলতান স্বয়ং কোনও ব্যক্তির উপর করিতেন যাঁহাকে তিনি তুগরা অঙ্কনের কাজের দায়িত্ব প্রদান পূর্বক অনুগৃহীত ও বিশিষ্ট করিতে চাহিতেন।

নিশানজীদের কাজ কিছু এইভাবে কমিয়া গিয়াছিল যে, দরবারের যেই সকল নির্দেশনামা রাজধানীর জন্য জারি হইত উহার উপর তুগরা থাকিত না। তুগরা শুধু সেই সকল ফরমানের উপর লাগানো হইত যাহা বাহিরের অন্যান্য দেশে প্রেরণ করা হইত; উহাদিগকে "তুগরিলী" বলা হইত (Mouradja d'Ohsson Bianchi ও Kieffer [طغرالو] তুগরালূ শব্দের অধীনে), তথাপি উপরে "তুগরা তাসহীহ্ ফারমানী" বিষয়ে দেখুন।

অবশেষে ইহাও বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গভর্নরও নিজস্ব 'পাঞ্জা' তৈয়ারির সময়ে অধিকাংশ সময় উহাকে তুগরার অনুরূপ আকৃতি প্রদান করিতেন। আমার নিকট মিসরের প্রাক্তন গভর্নরদের জারিকৃত নির্দেশনামার আলোকচিত্র রহিয়াছে, যাহাতে 'পাঞ্জা' বাদশাহী তুগরার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। মুজাফ্ফার (مظفر) শব্দের স্থানে (১০৬১ হি. ও ১০৬২ হিজরীর পাঞ্জায় উহার সঙ্গে সঙ্গে) দুই ও পরবর্তীতে তিনটি ডিম্বাকৃতি বৃত্ত পাওয়া যায়। তিনটি উল্লম্ব রেখার সঙ্গে মিলাইয়া 'ط' অক্ষর তৈরি করা হইত, যাহা সম্ভবত "তুগ" (طوغ) শব্দের প্রথম অক্ষরের স্মারক। দা'ইমা, (دائما) -এর স্থলে "সাহহা" (صح) শব্দ পাওয়া যায়। দলীলের উপরের স্থানের ডান দিকের মার্জিনে ইচ্ছাকৃতভাবে স্থাপন করা হইত (আমি এই কথা বুঝিতে অক্ষম যে, কিছু কিছু গ্রন্থকার এই বিশিষ্টতাকে সুলতানের সঙ্গে সম্মান ও বিশ্বাসের অনুভূতির উপর কেন স্থাপন করেন না)।

সংস্কার সাধনের পর যখন নিশানজীদের পদ বিলুপ্ত করা হয়, তখন তুগরা তৈরীর জন্য এমন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় যাহাদের "তুগরাকাশ" বলা হইত। ১৩৪৪/১৯১৬ সালে 'উছমানী সালতানাতের বর্ষপঞ্জীর ১২৩ পৃষ্ঠায় একজন তুগরাকাশের নাম রহিয়াছে যাহার মর্যাদা দ্বিতীয় পর্যায়ের ছিল এবং যিনি বাদশাহী দীওয়ানের (বীলিক জী দাইরা-ই সী) সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন।

ইহার পূর্বের বর্ষপঞ্জীতে (যেমন ১৩০৩/১৮৮৬, ১৩২৩/১৯০৭, ১৩২৪/১৯০৮) দুইজন তুগরাকাশ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহাদের পর্যায়ক্রমে 'প্রথম' (اول) ও 'দ্বিতীয়' (ثانى) লেখা হইয়াছে এবং যাহাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা "মুহিম্মে উদহ সী"-এর সদস্য ছিলেন, অন্যান্য কর্মকর্তা অর্থাৎ বাশকাতিব (পরবর্তীতে মুদীর), মুমেইয়িস (পরে) মু'আবিন, নামানাবীস (মুকাদাম)– ও দুই মুকাবিলিজীয়ূন। তাঁহাদের "মুতামায়্যিয" "ছানিয়া" ও "ছালিছার" পদ ছিল।

'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রাচীনতর বর্ষপঞ্জী ১২৬৩/১৮৪৭ সালের বিবরণে নিশানজীর উল্লেখ আসে নাই। কেননা ঐ সময়ে এই পদের অস্তিত্ব ছিল না, তুগরাকাশ-এর উল্লেখও নাই, যাঁহাকে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হইত না। এই খণ্ডে কর্মকর্তাদের তালিকা অন্যান্য খণ্ডের তুলনায় অসম্পূর্ণ ছিল (তু. J. A., সেপ্টেম্বর ১৮৪৭ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ আল-কালকাশান্দঊ, সুবহু'ল-আ'শা, কায়রো ১৩৩৭ হি., ১৩খ, ১৬২-১৬৬; (২) Howland Wood, the toughra as found upon Coins. Numismatist, ১৮খ, ১৯০৫ খৃ.; (৩) 'আলী, তুগরা-ই হুমায়ূন (তুর্কী ভাষা), T.O.E.M. ৮খ, (১৯১৭-১৯১৮ খৃ.), সংখ্যা ৪৩, পৃ. ৫৩-৫৮ এবং সংখ্যা ৪৪, পৃ. ১০৯-১২৫; (৪) Fr. Kraelitz-Greifenhorst, Di Tugra der omanischen Prinzen, M. O. G., ১৯২১-১৯২২ খৃ., পৃ. ১৬৭-১৭০; (৫) ঐ লেখক, Die Handfeste (Pence) der osman, Wesire (তিনটি চিত্রসহ)। M. O. G., ১৯২৩-১৯২৬, পৃ. ২৫৭-২৬৮; (৬) F. Babinger, Die grossherrliche Tughra, Ein Beitrag Zur Geschichte des Osmanischen Urkunden, wesens, in Beitrage zur Kunst des Islam, Festschrift fur Friedrich Sarre Zur Vollendung Seines 60. Lebensjahres, লাইপযিগ, পৃ. ১৮৮-১৯৬ (Jahrbuch der asiatischen Kunst, ১৯২৫ খৃ.; (৭) L. Fekete, Einfuhrung in die osmanischturkische Diplomatik, বুদাপেস্ট ১৯১৬ খৃ., পৃ. ৪২-৪৪।

J. Deny (E.I. [1])/মোঃ রেজাউল করিম

আত-তুগরাঈ (الطغرائى) ঃ মুআয়্যিদু'দ-দীন ফাখ্রু'ল-কুত্তাব আবূ ইস্মা'ঈল আল-হুসায়ন্ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'স-সামাদ্ আল-ইস্ফাহানী, যিনি সাধারণত তুগ্রা' নামে অধিকতর পরিচিত (তুগরা'ঈ নামটির ভিত্তি একটি Scroll অর্থাৎ পাকান পার্চমেন্ট কাগজ, যাহাতে খেতাবগুলি সমেত সম্রাটের নাম সরকারী দলীলাদির ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ্-এর পূর্বে লিখিত হয়) ছিলেন একজন আরব কবি, জ. ৪৫৩/১০৬১ সনে, সম্ভবত ইসফাহান-এ। তাঁহার প্রাথমিক জীবন বিশদভাবে জানা নাই, তবে তাঁহাকে প্রথমে ইরবিশ-এর সচিব পদে নিয়োগ করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অতঃপর তিনি সালজূক সুলতানগণের মুখ্য মন্ত্রণালয়ে (chancellory) চাকুরিতে যোগদান করেন এবং মালিক শাহ ও তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ-এর শাসনামল পর্যন্ত কার্যরত ছিলেন। হস্তলিপিশিল্পে (Calligraphy) তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্যাদি বিরক্তিকর শ্লথ গতিসম্পন্ন ছিল বলিয়া 'ইমাদু'দ-দীন-এর শব্দবহুল উক্তি হইতে জানা যায়। সুলতান মুহাম্মাদ-এর উযীর ছিলেন তাঁহার শত্রু; মনে হয় উযীর তাঁহাকে সম্ভাব্যরূপে ভয় করিয়া তাঁহার অপসারণ কামনা করিতেন, কিন্তু কোন অজুহাত খুঁজিয়া পাইলেন না। জীবনীকারগণের মন্তব্যে প্রকাশ যে, তুগরাঈ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং উযীরের পদ লাভের জন্য উৎকোচরূপে অর্থ ব্যয় করিয়াও বিফল হইয়াছেন। মুহাম্মাদ-এর মৃত্যুর পরে তিনি সম্ভবত সেই সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন যখন তিনি যুবরাজ মাস'ঊদ-এর সহিত মাওসিল-এ ছিলেন। অপরদিকে উযীর আস্-সুমায়রিমী যুবরাজ মাহমূদ-এর সহিত ইসফাহান-এ অবস্থান করিতেছিলেন। অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তির সহযোগিতায় তুগরাঈ যুবরাজ মাহমূদ-এর আনুগত্য প্রত্যাহার করিবার জন্য যুবরাজ মাস'ঊদকে প্ররোচিত করিয়াছিলেন; আস-সুমায়রিমী ইতিমধ্যে মাহমূদকে সালজূক সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলির সুলতান হিসাবে ঘোষণা দান করিয়া ফেলেন। সুলতান মুহাম্মাদ ৫১১/১১১৭-১৮ সালে ইনতিকাল করেন, অথচ তাঁহারা সিংহাসন অধিকার করিবার প্রচেষ্টা শুরু করেন হি. ৫১৩ (ইবনু'ল-আছীর-এর মতে ৫১৪) সনে। যুবরাজ মাস'ঊদ ও তুগরাঈ (যিনি অবশেষে উযীর পদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন) স্বল্প সমরসম্ভার সজ্জিত একটি বাহিনী লইয়া সুলতান মাহমূদকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করেন। হামাদানা-এর নিকট উভয় পক্ষের যুদ্ধে উক্ত সনে যুবরাজ মাস'ঊদ পরাজিত এবং তুগরাঈসহ বন্দী হন। মাস'ঊদকে ক্ষমা করা হইয়াছিল, কিন্তু তুগরাঈকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। এক দল সৈন্যের সমবেত তীর নিক্ষেপে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাদেশ

কার্যকর করিবার নির্দেশ দেওয়া হইলেও মৃত্যু সম্মুখীন তুগরাঈ-র উচ্চারিত কয়েক পংক্তি কবিতা উযীরকে দণ্ডাদেশ স্থগিত করিতে প্রলুব্ধ করে। যাহা হউক, পরবর্তী কোন সময়ে (সাধারণ বিশ্বাস ৫১৫/১১২১-২২ সালে, অপর এক ভুল বর্ণনামতে ৫১৮ হি.) এই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হইয়াছিল। শেষোক্ত তারিখটি যে ভুল তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, আস-সুমায়রিমী ৫১৬ হি. সালের সাফার মাসে নিজামিয়্যা মাদ্‌রাসার সন্নিকটে তুগরা'ঈ-র দাস বলিয়া কথিত জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; এই দাস প্রভু হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্যই হত্যাকাণ্ডটি ঘটাইয়াছিল। সুতরাং ঘটনাগুলির তারিখপঞ্জী নির্ভরযোগ্য নহে।

তুগরাঈ-র খ্যাতির ভিত্তি প্রধানত তাঁহার 'লামিয়্যাতু'ল-'আজাম' কবিতা যাহা ৫০৫/১১১১-১২ সালে বাগদাদে রচিত হইয়াছিল। যে অশুভ সময়ে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহারই আক্ষেপ ছিল এই কবিতার বিষয়বস্তু। ল্যাটিন অনুবাদসহ Golius কর্তৃক প্রকাশিত এই কবিতাটি, সম্ভবত য়ূরোপে ব্যাপকতর পরিসরে আলোচিত আরবী কাব্য সাহিত্যের প্রচীনতম নমুনা যাহা কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়ছিল এবং বেশ কতিপয় আরবী ভাষ্যের উপজীব্য ছিল। কন্‌স্টান্টিনোপল্-এ মুদ্রিত তাঁহার দীওয়ান (কাব্য সংগ্রহ) লেখকের মৃত্যুর পরে সংকলিত হইয়াছিল, যাহাতে লামিয়্যা কবিতার সঙ্গে গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের প্রশস্তিমূলক কবিতাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল; সম্ভবত সর্বশেষ রচিত কবিতাবলীতে ছিল তাঁহার তরুণ প্রভু যুবরাজ মাস্‌উদ-এর প্রশংসা।

তুগরাঈ-র অপর একটি চর্চার বিষয়বস্তু ছিল আল-কেমী বা কীমিয়্যা অর্থাৎ ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিবার প্রয়াসমূলক রসায়ন। এই অপ-বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন যাহাতে যাহাবী-র ভাষায় লেখকের নিজের এবং যাহারা এই সকল গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাদের অপরিসীম সম্পদের অপচয় ঘটে। গ্রন্থগুলির ভাষা ছিল দুর্বোধ্য যাহা স্বভাবতই এই শ্রেণীর সাহিত্যে বিদ্যমান থাকে। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে কয়েকটি পাণ্ডুলিপিসহ নিম্নলিখিত শিরোনামসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ (১) জামি'উ'ল আস্‌রার (MS. in Gotha?); (২) তারাকীবু'ল-আনওয়ার (সম্ভবত প্রথমোক্ত গ্রন্থের অংশবিশেষ); (৩) হাকা'ইকুল-ইসতিশহাদাত; (৪) কিতাবু যাতি'ল-ফাওয়া'ইদ; (৫) কিতাবু'র-রাদ্দি আলা ইব্‌ন সীনা ফী ইব্‌তালি'ল কীমীয়া'; (৬) মাসাবীহু'ল-হিক্‌মাহ ওয়া মাফাতীহু'র রাহ মা, (উচ্চমানের শিক্ষার্থিগণের জন্য, MS. Paris N. 2614)k; এই সকল গ্রন্থের অতিরিক্ত প্যারিস পাণ্ডুলিপি নম্বর ২৬০৭ জাবির ইব্‌ন হায়ান রচিত কিতাবু'র-রাহ্‌মার ভাষ্য বলিয়া দাবি করা হয় এবং ইহার শিরোনাম হইল সিররু'ল হিক্‌মাহ ফী শারহ্ কিতাবি'র-রাহ্‌মাহ, তবে ইহার প্রকৃত রচয়িতা কে তাহা অনিশ্চিত।

তুগরাঈর কবিতাবলীর সংস্করণসমূহের শিরোনাম (১) দীওয়ান, কনস্টান্টিনোপল ১৩০০ খৃ.; (২) লামিয়্যা, by Golius, Leyden 1629, পুনর্মুদ্রণ by H. van der Sloot in Franker 1769; (৩) ল্যাটিন ভাষায় অনু. সহকারে পুনর্মুদ্রণ by E. Pocock, Oxford 1661, and J. Hirth in Institutiones Arabicae, Jena 1770; (8) L. G. Parenu, Utrecht 1824 and A. Raux, Paris 1903, ফরাসী ভাষায় অনু., ইংরেজী অনুবাদক J. D. Carlyle, Specimens of Arabic Poetry, Oxford 1796; (৫) পুনঃমুদ্রণে W. A. Clauston, Arabic Poetry, Glasgow 1881; (৬) L. Chappelow, Cambrige 1758 (Pocock কর্তৃক ল্যাটিন অনুবাদ পরবর্তী); P. Vattier কর্তৃক ফরাসী অনুবাদ, প্যারিস ১১৬০ (উপরোক্ত Golius এবং Raux-এর পরবর্তী) ভাষ্যসমূহের শিরোনাম ঃ সালাহ্'দ-দীন আস-সাফাদী, গায়ছুল-মুসাজ্জাম বি-শারহি লামিয়্যাতি'ল-'আজাম, ইহার অপর নাম গায়ছু'ল-আদাবি'ল লাযিস-সাজামা ফী শারহি লামিয়্যাতি'ল-'আজাম, মুদ্রিত কায়রো ১২৯০ ও ১৩০৫; বৃহদায়তন এই ভাষ্য গ্রন্থে কবিতার সহিত সংশ্লিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা সংযোজিত হইয়াছে। এই ভাষ্যটির কয়েকটি সংক্ষেপিত রূপ (abbreviations) বিদ্যমান বিভিন্ন শিরোনামে, যথা ঃ 'আবদু'র-রাহ্‌মান আল-'আলাওয়ামী, কাত্‌রু'ল গায়ছি'ল-মুসাজ্জাম, বূলাক ১২৯০; ১৮৯৭ খৃ. বৈরূতে মুদ্রিত কিতাবু'ল-আরাব মিন গাইছি'ল আদাব শিরোনামে অপর একটি অত্যন্ত সংক্ষেপিত সংস্করণ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত অন্যান্য ভাষ্য হইল ঃ নাশ্‌রু'ল-'আলাম ফী শারহি লামিয়্যাতি'ল-'আজামকৃত মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার আল-হাদ্‌রামী (মৃ. হি. ৯৩৯), ইহার কিছু সংখ্যক কপি গ্রন্থাগারগুলিতে পাওয়া যায়; নাবৃগু'ল-'আজাম 'আন লামিয়্যাতি'ল-'আজাম, হি. ৯৬২ কন্‌সটান্টিনোপল-এ জালাল ইব্‌ন খিদ্‌র কর্তৃক রচিত; মুহিব্‌বুদ্-দীন আবু'ল-বাকা' 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন'ল-হুসায়নি'ল-'উকবারী (মৃ. ৬১৬ খৃ.)-কৃত ভাষ্যটিই সম্ভবত প্রাচীনতম; আরও অনেক।

প্রায় সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থেই তুগরাঈর জীবন-চরিত স্থান পাইয়াছে। মনে হয় ঐ সমস্ত ইতিহাসের উৎস অভিন্ন, যথাঃ য়াকূত, ইরশাদ, ৪খ, ৫০-৬০; ইব্‌ন খাল্লিকান, সং. কায়রো ১৩১০, ১খ, ১৫৯; সাফাদী, গায়ছ, কায়রো ১৩০৫, ১খ, ৬প.; ইব্‌নু'ল আছীর, কামিল, স্থা.; বুন্‌দারী, সম্পা. Houtsma, Recueil, ২খ., স্থা., পরবর্তী সকল কাব্য সংকলনে তাঁহার কবিতার উদ্ধৃতি বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

F. Krenkow (E.I.[1])/মোঃ শফিকুর রহমান

তুগরিল-১ ((١)طغرل) ঃ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ছিলেন ইরাকের একজন সালজূক শাসক (৫২৬-২৯/১১৩২-৩৪) জ. ৫০৩/১১০৯। তিনি দুর্দান্ত 'আমীর শীরগিরকে তাঁহার অভিভাবক (আতাবেগ) হিসাবে লাভ করিয়াছিলেন এবং জায়গীর হিসাবে তিনি সীওয়া, কায্‌বীন, আবহার, যানজান, তালাকান ইত্যাদি নামক শহরগুলি সমেত জিবাল প্রদেশের একটি বিরাট অংশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা ইনতিকাল করিলে (৫১১/১১১৮) আতাবেগ শীরগির-কে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাঁহার স্থান দখল করেন কুন্‌দুগদী। শেষোক্ত ব্যক্তির সহিত তুগরিল-এর ভ্রাতা সুলতান মাহ্‌মূদ-এর সম্পর্ক ছিল তিক্ত। তিনি ৫১৫/১১২১ সনে কুন্‌দুগদীর সহিত জর্জিয়ানদের বিরুদ্ধে দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধবিগ্রহে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হন এবং যখন সেই বৎসরেই তাঁহার অভিভাবক আতাবেগের মৃত্যু ঘটে তখন তাঁহার ভ্রাতার সহিত বরাবরের তিক্ত সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। এমনই এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে দক্ষ ও বিদ্রোহী মনোভাবসম্পন্ন আরব নেতা দুবায়স ইব্‌ন সাদাকা (দ্র.) তাঁহাকে এই মর্মে সহজেই প্ররোচিত করিলেন যে, ইরাক প্রদেশ অধিকার করা এবং খলীফা ও সুলতানকে উৎখাত করা সহজসাধ্য। যাহা হউক, তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তাঁহারা উভয়ে সুলতান সাঞ্জার-এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি তাঁহাদের পক্ষে আর-রায়-এ মাহমূদের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করেন (৫২২/১১২৮-এর শেষাংশে)। কয়েক বৎসর পরে (৫২৫/১১৩১)

মাহ্‌মূদ ইনতিকাল করিলে তদীয় পুত্র দা'উদকে (সাঞ্জার কর্তৃক চূড়ান্তভাবে উত্তরাধিকারী নির্ণয় সাপেক্ষে) সিংহাসনারোহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। তুগরিলের পক্ষে রায় প্রদান করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার অপর এক ভ্রাতা মাস্‌'উদ সিংহাসন দাবি করিয়া বসেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। দীনাওয়ার নামক স্থানে সান্‌জার ও মাস্‌'উদের মধ্যে যে যুদ্ধ (৫২৬/১১৩২) সংঘটিত হয় তাহাতে মাস্‌'উদ পরাজিত হন, তাঁহাকে তাঁহার নিজ প্রদেশ গাঞ্জাতে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তুগরিলকে সুলতান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সান্‌জার অতঃপর প্রত্যাবর্তন করেন এবং প্রতিপক্ষীয়দের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তথায় রাখিয়া যান। দাউদ-এর অনুসারিগণকে ছত্রভঙ্গ করিতে ভ্রাতুষ্পুত্র সক্ষম হইলেন। কিন্তু দাউদ স্বয়ং বাগদাদে পলায়ন করিলেন। মাস্‌'উদ শীঘ্রই বাগদাদে ক্ষমতাধর হইয়া উঠেন। খুত্‌বাতে তাঁহার নাম উল্লেখ করিবার জন্য এবং দাউদকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবার জন্য তিনি খলীফাকে রাজি করাইতে সক্ষম হন (৫২৭/১১৩২)। তুগরিল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাঁহার ভ্রাতার সমকক্ষ ছিলেন না এবং দীর্ঘকাল ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইবার পর অবশেষে তাবারিস্তানের ইসপাহবাযের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন; তথায় তিনি ১১৩২-৩৩ খৃস্টাব্দের সম্পূর্ণ শীতকালটি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরবর্তী বৎসর তাঁহার ভাগ্য মোটের উপর প্রসন্ন হয় এবং তিনি রাজধানী হামাযান অধিকার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু সেইখানে উপস্থিত হইবার পর তিনি অম্লশূল রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫২৯/১১৩৪ সালের শুরুতে (ভ্রান্তমতে ৫২৮ সনে; Recueil, ii, 174) ইনতিকাল করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী পরবর্তী কালে ইলদেগীয (দ্র.)-কে বিবাহ করেন। ইলদেগীয তুগরিলের পুত্র আরস্‌লান-কে সাল্‌জূক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (৫৫৫/১১৬০ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য তু. সাল্‌জূক প্রবন্ধ।

M. Th. Houtsma (E.I. [1])/ মোঃ শফিকুর রহমান

তুগ্‌রিল ইব্‌ন আর্‌সলান-২ (طغرل (۲) بن ارسلان) ঃ ইরাকের সাল্‌জূক বংশীয় শেষ সুলতান (৫৭১-৫৯০/১১৭৫-৯৪), জন্ম ৫৬৪/ ১১৬৮-৬৯। বিষ প্রয়োগে পিতার মৃত্যু হইলে আতাবেগ পাহ্‌লওয়ান নাবালক অবস্থায়ই তুগ্‌রিলকে সিংহাসনে বসান। আতাবেগের দুর্বহ অধীনতাপাশ হইতে তুগ্‌রিলের পিতার মুক্ত হইবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় (তু. Houtsma, in Acta Orientalia, iii, 140 প.)। ৫৮১ বা ৫৮২/১১৮৬ সালে পাহ্‌লওয়ানের মৃত্যুর পরই মাত্র বুঝা গেল বয়ঃপ্রাপ্ত তুগ্‌রিল তাঁহার পিতার ন্যায় নামেমাত্র সুলতান হইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন। তুগ্‌রিলকে খুবই যত্নসহকারে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়, তাঁহার শারীরিক শক্তি ও মানসিক গুণাবলীও ছিল অসাধারণ। তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র ফারসী কবিতাও রচনা করেন। পরিস্থিতিও তাঁহার সহায়ক ছিল। পাহ্‌লওয়ানের উত্তরসুরি কিযিল আর্‌সলান স্বীয় ভ্রাতার বিধবা পত্নী ও তাঁহার দুই পুত্রের সহিত বিরোধে লিপ্ত হন। এই সুযোগে তুগ্‌রিল কতিপয় তুর্কী আমীরের সহিত যোগসাজশে রাজধানী হামাযান দখল করিয়া লইতে সক্ষম হইলেন। কিযিল আর্‌সলান তাঁহার এই বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীকে চূড়ান্তভাবে খতম করিতে আরও নিশ্চিত হইবার জন্য খলীফার নিকট বাগ্‌দাদ হইতে তাঁহার জন্য সৈন্য-সাহায্য প্রেরণের আবেদন জানাইলেন। এদিকে আরসলান নিজেও আযারবায়জান হইতে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু বাগ্‌দাদ হইতে খলীফা কর্তৃক প্রেরিত বাহিনীর অযোগ্য অধিনায়ক উযীর ইব্‌ন য়ূনুস দায়মারগে (৫৮৪/১১৮৮) তুগ্‌রিলকে আক্রমণ করিয়া প্রচণ্ড সাহসী সুলতানের হাতে ভীষণভাবে পরাজয় বরণ করিলেন।

তবে এই বিজয়ে তুগ্‌রিলের তেমন কোন সুবিধা হইল না। কারণ কিযিল আরসলান ক্রমাগত তাঁহার নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। আর খলীফাও বাগ্‌দাদে আর একটি সেনাবাহিনী সজ্জিত করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজধানী হামাযানে ফিরিয়া আসিয়া সুলতান তুগ্‌রিল নিজের লোকজনদের সহিত বিরোধ বাধাইলেন এবং তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কতিপয় সমর্থককে ফাঁসি দিলেন। ফলে তিনি নিজের রাজধানীতেই টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। অচিরেই কিযিল আরসলান উহা অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর তুগ্‌রিল কিছুকাল ধরিয়া উর্‌মিয়া, খোয় ও সাল্‌মাস অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালাইতে লাগিলেন, খলীফাকে সপক্ষে আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলেন এবং সালাহুদ্‌-দীনসহ কতিপয় মুসলিম নৃপতির নিকট সাহায্য লাভের ব্যর্থ আবেদন জানাইলেন। পরিশেষে তুগ্‌রিল কিযিল আর্‌সলানের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। ৫৮৬/১১৯০ সালে কিযিল আর্‌সলান সুলতানকে তাব্‌রীযের নিকটবর্তী কাহ্‌রান দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন। কিযিল আর্‌সলান অতঃপর নিজেই সিংহাসন অধিকার করিলেন। কিন্তু পরের বৎসরই তদীয় ভ্রাতার বিধবা পত্নীর প্ররোচনায় আরসলান নিহত হওয়ায় তুগ্‌রিল বন্দীদশা হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন এবং যান্‌জানের বানূ কাফ্‌গুদ গোত্রের আশ্রয় লাভ করিলেন।

এদিকে আযারবায়জানে ক্ষমতাসীন পাহ্‌লওয়ান পুত্রদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে তুগ্‌রিল পুনরায় হামাযানে ফিরিয়া আসার সুযোগ পাইলেন এবং পাহলওয়ানের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহাকে (পত্নীকে) হত্যা করা হইল। তুগ্‌রিল ইস্‌ফাহান ও আর-রায় অধিকার করিলেন এবং আর-রায় শহরের নিকটবর্তী শক্তিশালী ঘাঁটি তাবারাক বিধ্বস্ত করিলেন (য়াকূত, মু'জাম, ৩খ, ৫০৭ প.)। কিন্তু ইহার ফলে শক্তিশালী নৃপতি খাওয়ারিযম শাহের সহিত তাঁহার শত্রুতার সৃষ্টি হইল। খাওয়ারিযম শাহ মাত্র অল্পকাল পূর্বে আর-রায় শহরটি অধিকার করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি উহা হাতছাড়া হইতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সাল্‌জূক সুলতানের নিকট হইতে আর-রায় পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি সৈন্য প্রেরণ করিলেন। খাওয়ারিযম শাহের বিপুল সংখ্যাগুরু সৈন্য সমাবেশের মুখে তুগ্‌রিলের পক্ষে তাহাদের সহিত সংঘর্ষ এড়াইয়া যাওয়াই বিজ্ঞোচিত হইত। কিন্তু তুগ্‌রিল মনে করিলেন, প্রাণের বিনিময়ে হইলেও ইরাকের উপর সাল্‌জূক বংশের অধিকার রক্ষা করা একটি আত্মসম্মানের প্রশ্ন। সুতরাং বন্ধু-বান্ধবদের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া তুগ্‌রিল রণক্ষেত্রে আসিয়া শত্রুর আগমনের অপেক্ষায় রহিলেন। অতঃপর তাহাদের দেখামাত্র কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরসহ শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং অচিরেই নিহত হইলেন (২৯ রাবী'উল আওয়াল, ৫৯০/২৫ মার্চ, ১১৯৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য দ্র. নিবন্ধ সাল্‌জূক।

M. Th. Houtsma (E.I. [1])/শায়খ ফজলুর রহমান

তুগরিল বেগ (طغرل بگ) ঃ রুকনু'দ-দীন আবূ তালিব মুহাম্মাদ ইব্‌ন মীকাঈল ৪২৯-৫৫/১০৩৮-৬৩ সনে প্রথম সালজূক সুলতান ছিলেন। সালজূক শাসনের প্রারম্ভে তুগরিল বেগ ও তাঁহার ভ্রাতা চাগরী বেগের অভ্যুত্থানের জন্য পরবর্তী জনের উপর লিখিত প্রবন্ধ দ্র.। ৪২৯/১০৩৮ সনে তুগরিল বেগ নায়সাব্‌র (নিশাপুর) শহরে প্রবেশ

করিলে তাঁহার নাম খুতবায় পাঠ করা হয়। আল-বায়হাকী (পৃ. ৬৯১) এই বিষয়ে আকর্ষণীয় বিশদ বিবরণ প্রদান করেন। ইবনু'ল-আছীর ও অন্য লেখকগণ বর্ণনা করেন যে, গোড়ার দিকে এই সময়ে তিনি খলীফার একজন দূতকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এই দূত বর্বর গুযদের লুণ্ঠনাদির অভিযোগ করেন। ইহা খুব সম্ভব সত্য। কারণ সালজূকগণ প্রাথমিক দলীলে (বায়হাকী, পৃ. ৫৮৩) নিজদিগকে আমীরু'ল-মু'মিনীনের মাওয়ালী (মিত্র) বলিয়া আখ্যায়িত করেন। সালজূকদের খলীফার সহিত তখন হইতে সর্বপ্রথম নিশ্চিতভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

যাহা হউক, তুগরিল বেগকে গাযনাবীদের জন্য খুব শীঘ্রই আবার শহরটি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ৭ রামাদান, ৪৩১/২২ মে, ১০৪০ সালে কেবল দানদানকানে পরাজয়ের পর মাস'উদ প্রদেশটি সালজূকদের জন্য ছাড়িয়া দিয়া খুরাসান হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। সালজূকগণের উল্লেখযোগ্য নেতৃবর্গ তুগরিল বেগ, চাগরী বেগ, ইবরাহীম ইনাল ও কুতলুমিশ প্রত্যেকেই তাঁহাদের নিজেদের শাসনও সংযুক্ত এলাকাগুলিতে বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। তুগরিল বেগ তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পাইলেন। ৪৩৩/১০৪১-৪২ সনে সর্বপ্রথম জুরজান ও তাবারিস্তানের যিয়ারিগণ বার্ষিক কর প্রদানের মাধ্যমে তুগরিল বেগের বশ্যতা স্বীকার করেন। পরবর্তী বৎসর তিনি তাঁহার ভ্রাতা চাগরী বেগকে খাওয়ারিযম বিজয়ে সহায়তা করেন। ইবরাহীম ইনালের নেতৃত্বে দুর্দমনীয় গুযগণ আল-রায় দেশটিকে বিধ্বস্ত করিতেছিল। তারপর তিনি সেইখানে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করেন। তাবারাকের সুরক্ষিত আশ্রয় বুওয়ায়হী শাসনকর্তা মাজদু'দ-দাওলা তখনও দখলে রাখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার উপর বিজয় লাভ করেন। কাযবীন ও হামাযানেও সালজূক শাসন স্বীকৃতি লাভ করিল। ইসফাহানের রাষ্ট্রনায়ক ফারামার্য মোটা অংকের অর্থ প্রদানে সম্মত হইলেন।

হি. ৪৩৫ সনে খলীফা বিখ্যাত আইনজ্ঞ আল-মাওয়ার্দীকে তুগরিল বেগের নিকট প্রেরণ করিলেন। খলীফার মধ্যস্থতায় বুওয়ায়হী শাসনকর্তা জালালু'দ-দাওলা সালজূকদের সহিত শান্তি স্থাপনের প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু সেই বৎসরে তিনি ইনতিকাল করেন। ৪৩৯/১০৪৭ সনে কেবল তাঁহার উত্তরাধিকারী আবূ কালিজারের শাসনকালে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা গিয়াছিল। ইবরাহীম ইনাল গুযদের দ্বারা কুর্দিস্তান বিধ্বস্ত করিয়া এখন বাগদাদের পথে যাত্রা করিয়া হুলওয়ান ও খানিকীনে পৌঁছিলেন। এইজন্য সেই স্থান হইতে সরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার কার্যকলাপের জন্য অন্য আর এক এলাকা অন্বেষণ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হইলেন। তজ্জন্য তিনি আবখায ও বায়যানটাইনদের বিরুদ্ধে গিয়া আবখাযদের রাজপুত্র লিপারিটেসকে বন্দী করিলেন। ফলস্বরূপ ৪৪০/১০৪৮ সালে এত বিশাল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য তিনি লাভ করেন, যাহা ১,০০০ চতুষ্পদ শকটের পরিবহণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাঁহার সহিত তুগরিল বেগের বিবাদ উপস্থিত হইল। ইহা তাঁহার বন্দীত্বের মধ্য দিয়া অবসান হইল। কিন্তু তাঁহাকে ক্ষমা করা হইল। এমন কি পরে তাঁহাকে আল-মাওসিলের সেনাপতিরূপে অধিষ্ঠিত করা হইল।

তুগরিল বেগ মুক্তিপণ ছাড়াই লিপারিটেসকে মুক্তি দিলেন এবং শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা করার জন্য বায়যানটাইনে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গুযদের আকস্মিক বহিরাক্রমণের ফলে ইহা বেশি দিন স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। ইতিমধ্যে তিনি ক্রমাগতভাবে তাঁহার শাসন বিস্তার করিতেছিলেন। তিনি দিয়ারবাক্‌রের মারওয়ানীদের আনুগত্য লাভ করেন এবং ৪৯২/১০৫০ সনে ইসফাহান অবরোধ করেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসফাহানের শাসনকর্তা ফারামুর্য সালজূকদের অথবা পরবর্তীতে বুওয়ায়হীদের অনুকম্পার পাত্র হইলেন। একটি সুরক্ষিত নগর অবরোধ তাঁহার অমার্জিত যোদ্ধাদের কাজ ছিল না। এই অবস্থায় অবরোধ চলিতে লাগিল। পরবর্তী বৎসরে কেবল অভাবপূরক দ্রব্যাদির সরবরাহের অভাবে ফারামুর্য আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। শহরটি তাহার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সেইখানে তাঁহার বাসস্থান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ক্ষতিপূরণস্বরূপ ফারামুর্যকে য়াযদ ও আবারকূয়া প্রদান করেন। ৪৪৬/১০৫৪ সনে গুরুতর অসুস্থতার পর আযারবায়জানে তাহাকে আমরা তাবরীয ও গানজার রাষ্ট্রনায়কদের আনুগত্য লাভ করিতে দেখি। বায়যানটাইন রাজ্য আক্রমণে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। মালাযগার্ত অবরোধ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল (তু. Math. of Edessa, ধারাবিবরণী ৭৮; Cedrenus, সম্পা. Bonn, খ২, ৫৯০)।

ইহা সত্য যে, তখন তুগরিল বেগ অন্যান্য পরিকল্পনায় ব্যস্ত ছিলেন। শরৎকালে তিনি তাঁহার সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেন এবং বাগদাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের এক সামরিক অভিযান পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে হামাযানে যুদ্ধোপকরণাদির বিশাল সরবরাহ পুঞ্জীভূত করেন। খলীফার উযীর ইব্‌নু'ল-মুসলিমা [দ্র.] কর্তৃক তিনি এই অভিযান পরিচালনার জন্য আমন্ত্রিত হইলেন। আল-মুসলিমা গোপনে তাঁহার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছিলেন। কারণ ৪৪০/১০৪৮ সাল হইতে আবূ কালিযারের উত্তরাধিকারী মালিকু'র-রাহীমের বুওয়ায়হী শাসন ব্যবস্থা বাগদাদের সামরিক সেনাপতি আল-বাসাসীরী (দ্র.] কর্তৃক পরিচালিত হইত। তাঁহার সহিত ফাতিমীদের গোপন আঁতাত ছিল। তাঁহার ও খলীফার নিকট ইহা অসহনীয় ছিল।

তুগরিল বেগ এই সনির্বন্ধ অনুরোধে রাজি হইতে দ্বিধা করিলেন না। ৪৪৭/১০৫৫ সনের রামাদান মাসে বাগদাদের পথে তিনি হুলওয়ান পৌঁছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি সেইখানে আতংকের কারণ হইয়াছিল। আল-মালিকু'র-রাহীম তখন ওয়াসিতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে দ্রুত গমন করিলেন। কিন্তু আল-বাসাসীরী প্রস্থান করিয়া দুবায়স গোত্রের আল-হিল্লার মাযয়াদিদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। এখন তুগরিল বেগের সহিত সন্ধির আলোচনা আরম্ভ করিবার কোনও প্রতিবন্ধকতা রহিল না। হি. ৪৪৭ সনের ২২ রামাদানের মধ্যে খলীফা তাঁহার নাম খুতবায় সন্নিবেশিত করাইলেন এবং তিনদিন পরে সুলতান বাগদাদে প্রবেশ করিলেন। দুর্দমনীয় গুযদের উপস্থিতির ফলে শীঘ্রই লুণ্ঠন ও হত্যা পরিচালিত হইল। ইহা রাস্তায় রাস্তায় নিয়মিত যুদ্ধের মাধ্যমে অবসানের মতো বিপদের আশংকা পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ অবস্থায় তুগরিল বেগকে তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ করিয়া ইহার অবসান ঘটাইতে হইল। আল-মালিকু'র-রাহীম এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী, এই মিথ্যা অজুহাতে খলীফার মধ্যস্থতা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে বন্দী করিলেন। এইভাবে বুওয়ায়হী শাসনের চিরতরে অবসান হইল।

খলীফার সহিত চাগরী বেগের কন্যার বিবাহের মাধ্যমে তাঁহার সহিত খলীফার মৈত্রী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু কেবল দুবায়স ও অন্যান্য আরব বিদ্রোহীদেরকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিবার পর ৪৪৯/১০৫৮ সনের প্রারম্ভে সুলতান খলীফার সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাকে পূর্ব ও পশ্চিমের রাজন্য উপাধিতে ভূষিত করা হইল। যাহা হউক পরবর্তীতে শীঘ্রই পরিবর্তন আরম্ভ হইল। ইতিমধ্যে

আল-বাসাসীরী সক্রিয়ভাবে ফাতিমীদের জন্য কর্মতৎপর ছিলেন। তিনি এমন কি ইবরাহীম ইনালকে তুগরিল বেগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রলুব্ধ করেন। ইবরাহীম ইনাল তাঁহার মাওসিলের পদ আল-বাসাসীরীকে প্রদান করেন এবং নিজেই হামাযানে গমন করেন। ইরাকে অনেককাল কর্মতৎপরহীনতার ফলে সুলতানের অশান্ত অনেক গুয় সেইখানে তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তজ্জন্য তাঁহার প্রতি তখনও বিশ্বস্ত সৈন্যদলসহ তুগরিল বেগ বাগদাদ হইতে যাত্রা করিলেন। চাগরী বেগের পুত্রগণ অধিক সৈন্যদলসহ তাঁহার সাহায্যার্থে আসিলে তিনি ইবরাহীম ইনালকে আর-রায়-এ বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন এবং শীঘ্রই তাঁহাকে হত্যা করিলেন। ইতিমধ্যে আল-বাসাসীরী সৈন্যমুক্ত বাগদাদে প্রবেশ করিলেন। তিনি ফাতিমী খলীফা আল-মুস্তানসির-এর নাম খুতবাতে সন্নিবেশ করাইলেন (৮ যু'ল-কা'দা, ৪৫০/২৭ ডিসেম্বর, ১০৫৮ খৃ.)। ঠিক এই সময়ে খলীফা ও তাঁহার উযীর ইব্নু'ল-মুসলিমা আল-বাসাসীরীর বন্ধু কুরায়শ ইব্ন বাদরানকে [দ্র.] সাহায্য করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তিনি খলীফাকে নিরাপদে হাদিছাত 'আনায় আনয়ন করিতে কৃতকার্য হইলেন এবং উযীরকে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য আল-বাসাসীরীর নিকট হস্তান্তর করিলেন। আল-বাসাসীরী উযীরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেন। এক বৎসর পরে তুগরিল বেগ কার্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া খলীফাকে আবার রাজধানীতে আনয়ন করিলেন। তিনি আল-বাসাসীরীর সৈন্যদলকে পরাজিত করিলেন। আল-বাসাসীরী যুদ্ধে নিহত হইলেন (৪৫১/১০৬০ সনের প্রারম্ভে)। এই সকল ঘটনার বিবরণ বাগদাদে ঐতিহাসিক য়াকূত-এর সময় পর্যন্ত প্রবাদতুল্য কাহিনীরূপে প্রচলিত ছিল (মু'জাম, ৩খ, ৫৯৫ প.)।

ইহার পর তুগরিল বেগ ওয়াসিতে গমন করিয়া দুবায়সদের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন। তিনি ওয়াসিতে ও বসরাতে কর সংগ্রহের জন্য কৃষকদের নেতা নিয়োগ করিলেন। ৪৫২/১০৬০ সনে তিনি স্বীয় অন্তরের দৃঢ় বাসনা খলীফার কন্যার পাণি গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপনের জন্য আবার বাগদাদে ফিরিয়া আসিলেন। আত্মাভিমানী 'আব্বাসীগণ ইহার ঘোর বিরোধিতা করিলেন। তুগরিল বেগের উযীর আল-কুন্দুরী খলীফার রাজস্ব বাজেয়াফ্ত করিবার হুমকি প্রদান করিলে তখন কেবল খলীফা ইহাতে সম্মত হইলেন। ৪৫৪/১০৬২ সনে সুলতানের আর্মেনিয়ায় অবস্থানের সময় তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিবাহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। পরবর্তী বৎসর তাহার বাগদাদে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার স্ত্রীকে কেবল অবগুণ্ঠনরত অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে দেওয়া হইল। বিবাহের পূর্ণ নিষ্পাদন ছাড়াই ইহার কোনও কথা না বলিয়া তিনি আর-রায়-এ প্রস্থান করিলেন। অধিকন্তু এখন তিনি সত্তর বৎসরের একজন বৃদ্ধ মানুষ ও তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত নিকটবর্তী। ৮ রামাদান, ৪৫৫/৪ সেপ্টেম্বর, ১০৬৩ সনে তিনি আর-রায়-এ ইনতিকাল করেন। সন্তানহীন হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতা চাগরী বেগের ইনতিকালের পর তিনি তাঁহার এক স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সুলায়মানকে তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলায়মান তৎক্ষণাৎ চাগরী বেগের আর এক পুত্র আল্প আরস্লান-এর [দ্র.] জন্য অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য সালজূক প্রবন্ধ দ্র.।

M. Th. Houtsma (E.I. [1])/মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান

তুগরিল শাহ ইব্ন কিলিজ আরসলান طغرل شاه بن قلج ارسلان ঃ মুগীছু'দ-দীন, তুরস্কের একজন সালজূক শাসক। বৃদ্ধ সুলতান ২য় কিলিজ আরসলান তদীয় পুত্রদের মধ্যে যখন রাজ্য বণ্টন করেন তখন তুগরিল শাহ আবুলুস্তায়ন শহর লাভ করেন। ৫৯৭/১২০০-১ সালে তদীয় ভ্রাতা রুকনু'দ-দীন সুলায়মান [দ্র.] এরযেরূম জয় করিয়া তুগরিল শাহ-এর নিকট হস্তান্তর করেন, তিনি স্বয়ং আবুলুস্তায়ন অধিকার করেন। কতিপয় বৎসর পর খিলাত (আখলাত)-এর শাসনকর্তা বালাবান আয়্যূবী আল-আওহাদ আয়্যূব ইব্নু'ল 'আদিল [দ্র.] কর্তৃক আক্রান্ত হন। তিনি একা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তুগরিল শাহ-এর সাহায্য কামনা করেন। তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী আল-আওহাদকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে। খিলাত-এর প্রতি তুগরিল শাহ-এর লোভ ছিল। ফলে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বালাবানকে হত্যা করেন। কিন্তু শহরটি অধিকারের চেষ্টা করিলে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। তাই তিনি মালাযগারদ-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এখানেও তিনি পরাজিত হন এবং এরযেরূমে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত তাঁহার আর উপায় রহিল না। খিলাত-এর অধিবাসিগণ তৎপর আল-আওহাদের নিকট আবেদন করিলে তিনি ৬০৪/১২০৭-৮ সালে শহরটি অধিকার করেন। তুগরিল শাহ তদীয় প্রতিবেশী জর্জিয়গণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় অসমর্থ ছিলেন? তিফলিস-এ রাজা ৩য় Giorgi Lash-কে তাঁহার কর প্রদান করিতে হইত এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিজেকে তাঁহার সামন্ত হিসাবে নিবেদন করিতেন। অবশেষে তুগরিল শাহ খৃস্টধর্মে দীক্ষা লাভ করিয়া জর্জি-এর ভগ্নি রুসুদান-এর পাণিগ্রহণ করেন ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন (দ্র. তিফলিস)। তুগরিল শাহ-এর ৬২২/১২২৫ সালে মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র রুকনু'দ-দীন জাহান শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬২৭ হি. সালে তদীয় জ্ঞাতিভ্রাতা ১ম 'আলা'উ'দ-দীন কায়কোবাদ [দ্র.] তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অন্য এক কাহিনী অনুসারে (যাহা নিঃসন্দেহে ভ্রমাত্মক) তদীয় ভাতিজা ১ম কায়কাউস [দ্র.]-এর রাজ্য অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পর বন্দী হইয়া ৬১০/১২১৩-১৪ সালে কায়কাউস কর্তৃক নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্নু'ল-আছীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg, ১২খ, ৫৮, ১৩৪, ১৮০, ২৭১, ২৭৯, ২৯৫, ৩১৮; (২) আবু'ল-ফিদা', Annals, সম্পা. Reiske, ৪খ, ২৪৯, ২৫১; (৩) Recuil des Historiens des Croesades, Historiens Orientaus, ১খ, ৮৪, ৮৭, ২/১খ, ৬৯, ৯৭, প., ১৭২ প.; (৪) Houtsma, Recueil de textes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, ৩খ, ১১, ২৭ প., ৫৭, ৫৯ প., ৯৯, ১০২, ১০৪ প., ১৮৭; ৪খ, ৫, ৯, ২১-২৩, ৪০-৪৩, ৮৪, ১৪৮; (৫) খালীল এদহেম, দুওয়েল-ই ইসলামিয়ে, পৃ. ২১১, ২১৯, ২২৮; (৬) de Zaumbaur, Manuel de Genealogie et de Chronologie, p. 143 প.

K.V. Zettersteen (E.I. [1])/আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তুগলুক (تغلق) ঃ বা তাগলাক বা তোগলক, দিল্লীর বিখ্যাত তুর্কী রাজবংশ, ১২২০ খৃ. হইতে ১৪১৩ খৃ. পর্যন্ত দেশ শাসন করেন; নামের শুদ্ধ উচ্চারণ তুগলক উল্লেখ করিয়াছেন ইব্ন বাত্তূতা; প্রতিষ্ঠাতা গিয়াছু'দ-দীন তুগলুক-এর নাম হইতে রাজবংশটির নাম হয়। তিনি ছিলেন কারাওনিয়্যা তুর্কী অর্থাৎ তাঁহার পিতা ছিলেন তুর্কী, মাতা ভারতীয়। শেষ খালজী (দ্র.) সুলতান মুবারাক তাঁহার প্রিয় সভাসদ কুচক্রী খুসরাও কর্তৃক নিহত হইলে তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকাতে নিযুক্ত শাসক তুগলুক, যিনি মুগলদের অগণিত আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করিয়া গাযী মালিক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন, রাজধানীর নিকট যুদ্ধে খুসরাওকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া ৮ সেপ্টেম্বর, ১৩২০ খৃ. সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৩২৫ খৃ. প্রথম দিকে বৃদ্ধ সুলতান বাংলা অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত মুহাম্মাদ, যিনি ইতিপূর্বে একবার দাক্ষিণাত্যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, পিতাকে বিজয় সম্বর্ধনা প্রদানের উদ্দেশ্যে দিল্লীর নিকটেই একটি অস্থায়ী তাঁবু বা মণ্ডপ তৈরি করান। শোভাযাত্রার হাতীর গায়ের ধাক্কা লাগিয়া (এইরূপেই ইহা নির্মিত ছিল) সেই মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া সম্রাটের মাথায় পড়ে ও তিনি মারা যান। মুহাম্মাদ ইব্ন তুগলুক (বা তুগলাক) (দ্র.) ছিলেন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মুসলিম সম্রাটগণের অন্যতম। কিন্তু এতটা খামখেয়ালী ছিলেন যে, তাহা প্রায় পাগলামির কাছাকাছি ছিল। সমগ্র হিন্দুস্তানের উপরে তিনি নিজ প্রভাব বিস্তার করেন, তাঁহার কারণেই আবার প্রায় প্রতিটি প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সিন্ধু প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তিনি যখন মার্চ ১৩৫১ সালে সেইখানে মারা যান তখন ইতিমধ্যেই সিন্ধু, দাক্ষিণাত্য ও বাংলা প্রদেশ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

তাঁহার উত্তরাধিকারী হন ভ্রাতুষ্পুত্র ফীরূয ইব্ন রাজাব বা ফীরূয শাহ (দ্র.)। তিনি সিন্ধু পুনরাধিকার করিতে সক্ষম হন। কিন্তু বাংলা দখল করিতে ব্যর্থ হন এবং দাক্ষিণাত্য জয় করিবার চেষ্টাও করেন নাই, উহা শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজত্বের শেষদিকে ফীরূয অলস ও আরামপ্রিয় হইয়া পড়েন। ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মৃত্যুর আগে তিনি পুত্র মুহাম্মাদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু শাহযাদা ক্ষমতার অতিরিক্ত অপব্যবহার করেন এবং ১৩৮৮ খৃ. ফীরূয মারা গেলে তখন তাঁহার নাতি ২য় তুগলুক সিংহাসনে বসেন। তিনি সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে অপসারণ করিতে গিয়া চাচাতো ভাই আবূ বাক্‌রকে সচকিত করেন। আবূ বাক্‌র বিদ্রোহ করিলে তুগলুক রাজধানী হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু বন্দী হইয়া নিহত হন এবং ১৩৮৯ খৃ. প্রথমদিকে আবূ বাক্‌র সিংহাসনে বসেন। তাঁহার চাচা মুহাম্মাদ সম্রাট ফীরূয-এর মৃত্যুর পর হইতেই সিরমূরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি সরকারী বাহিনীকে পরাজিত করিয়া ৩১ আগস্ট, ১৩৮৯ সালে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। সেইখানে তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আবূ বাক্‌র পলায়ন করেন। মুহাম্মাদ ২০ জানুয়ারী, ১৩৯৪ তারিখে জালেসারে মারা গেলে তাঁহার পুত্র হুমায়ূন খান সম্রাট হইয়া 'আলা'উ'দ-দীন সিকান্দার উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র দুই মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমীরগণ অতঃপর তাঁহার ভাই মাহমূদকে সিংহাসনে বসান। তিনি প্রথম দিকে একান্তভাবেই মালিক সারওয়ার (দ্র.) নামক একজন আমীরের প্রভাবাধীনে পড়েন। এই ব্যক্তি প্রথমে ছিলেন একজন গোলাম। কিন্তু সুলতান তাঁহাকে জৌনপুরের সুবাদার নিযুক্ত করেন। মালিক সারওয়ার সেইখানে শারকী রাজবংশের পত্তন করেন এবং মাহমূদ অতঃপর মাল্‌লূ (ইকবাল খান নামে পরিচিত)-র প্রভাবাধীন হইয়া পড়েন। সভাসদগণের মধ্যে একটি দল মাহমূদ-এর চাচাতো ভাই বুসরাতকে সিংহাসনে বসান এবং কিছু সময়ের জন্য দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতে দুইজন পুতুল সুলতান রাজত্ব করিতে থাকেন। উভয়কেই সভাসদ ও আমীরগণের পৃথক পৃথক দল সমর্থন দান করেন। এইরকম যখন পরিস্থিতি তখন তৈমূর লঙ (আমীর তীমূর দ্র.) ১৩৯৮ খৃ. ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি দিল্লী পর্যন্ত আসিবার পূর্বেই নুসরাতকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করা হয়। ফলে তৈমূরকে মুকাবিলা করিবার দায়িত্ব পড়ে মাহমূদ ও মাল্‌লূ-এর উপরে। যুদ্ধে উভয়ে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, মাহমূদ যান গুজরাটে, মাল্‌লূ বারানে, কিন্তু তৈমূর চলিয়া যাইবার পরে উভয়ে দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। মাহমূদ রাষ্ট্রীয় উপাধি ধারণ করেন, কিন্তু বাকি জীবন তাঁহাকে বস্তুত রাজবন্দীরূপে কাটাইতে হয়। প্রথমে মাল্‌লূ-এর হাতে এবং ১৪০৫ খৃ., মাল্‌লু-এর মৃত্যুর পরে দাওলাত খান লোদীর হাতে তিনি সাম্রাজ্যের শাসকরূপে মাল্‌লূর উত্তরাধিকারী হন। মাহমূদ ফেব্রুয়ারি ১৪১৩ কাইথালে মারা যান এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীতে তুগলুক রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর ১৬ মাসের মধ্যেই ২৮ মে, ১৪১৪ সালে দাওলাত খানকে পরাজিত করিয়া খিদর খান (দ্র.) দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সায়্যিদ রাজবংশের পত্তন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বারানী, তা'রীখ-ই ফীরূয শাহী, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.; (২) শামস-ই সিরাজ 'আফীফ, তা'রীখ-ই ফীরূয শাহী, কলিকাতা ১৮৯১ খৃ.; (৩) বাদা'উনী, মুনতাখাবু'ত-'তাওয়ারীখ, মূলপাঠ এবং G. S. A. Ranking- কৃত অনুবাদ, কলিকাতা ১৮৬৯ খৃ.; (৪) মুহাম্মাদ কাসিম ফিরিশতা, গুলশান-ই ইবরাহীমী, বোম্বাই ১৮৩২ খৃ.।

T. W. Haig (E.I. [1])/হুমায়ুন খান

তুগা তীমূর (تغا تيمور) ঃ একজন মোঙ্গল খান, ৮০৮/১৪০৫ সালের পূর্বে তাঁহার বংশ শতাব্দীব্যাপী জুরজানে রাজত্ব করে।

নাম ঃ খান-এর নাম তুগা বা তোগারূপেও পাঠ করা যাইতে পারে। জাফারনামা-এর প্রতিলিপিতে ইহা তগয় (তুগায়?); Fraehn প্রকাশিত মুদ্রায় ইহার বানান তোগান (মোঙ্গল অক্ষরে; তু. Howorth, পূ. গ্র. ৩খ, ৭১৮)।

বংশ ঃ তুগা তীমূর ইব্ন সুরি (সুরিকুরি?) ইব্ন বাবা বাহাদুর চেঙ্গীয খানের এক ভ্রাতার ষষ্ঠতম বংশের বংশধর (জুচিকাসার, শাজারাত, পৃ. ৩১৫, Miles ভুল বুঝিয়াছেন)। ৭০৫/১৩০৫ সালে বাবা বাহাদুর তাঁহার তুমান (১০,০০০ পরিবারসহ খুরাসানে আগমন করেন এবং উলজায়তূ খানের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। ৭১৫/১৩১৫ সালে খাওয়ারিয্‌মে তিনি এক আক্রমণ পরিচালনা করেন। পূর্ব কিপচাকের উযবেক খানের অভিযোগে উলজায়তূ বাবা এবং তাঁহার পুত্র সুরিকে হত্যা করেন (শাজারাত, পৃ. ৩২১, ৩৩০; d'Ohsson, Hist, Des Mongols, iv, 572-5)। বাবা-এর গোত্র মাযানদারানে অবস্থান করে (এই সময়ে নুযহাতু'ল-কুলূব, পৃ. ১৫৯ মতে, জুরজান ও তাবারিস্তানের পূর্বাংশ এই নামের অন্তর্ভুক্ত ছিল)।

হালাকু বংশীয় আবূ সা'ঈদ (হি. ৭৩৬)-এর ইনতিকালের পর পারস্যে অরাজকতা দেখা দেয়। জালায়ির হাসান বুযুর্গ ভণ্ড দাবিদার মুহাম্মাদকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। হাসান বুযুর্গের আমীরদের বিবাদের ফলে উইগুর ইগরাজের ন্যায় কিছু সংখ্যক আমীর (Miles, পূ. গ্র., পৃ. ৩১৫, ৩২০ ভ্রমবশত আকার পুখ) খুরাসানের আমীরদের সহায়তায় (শায়খ 'আলী ইব্ন 'আলী কুশ্‌জী, 'আলী জা'ফার, আরগুন শাহ) তুগা তীমূরের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ৭৩৭/১৩৩৭ সালে খান ঘোষণা করে। তুগা তীমূর তাঁহার আমীরদের সহিত আযারবায়জানে অগ্রসর হন; সেইখানে ওয়ারাতগোষ্ঠী সমর্থিত অন্য দাবিদার মূসার সঙ্গে তিনি পুনর্মিলিত হন। তুগা তীমূর ও মূসা পারস্য বিভক্তির প্রস্তাব করেন, কিন্তু ৬ যু'ল-হিজ্জা, ৭৩৭ হি.-এ গারমারূদের তীরে হাসান বুযুর্গ তাহাদের পরাজিত করেন (সিয়ানা-এর পশ্চিমে; শাজারাতু'ল- আতরাশ, পৃ. ৩১৬; d'Ohsson, iv, 726)। তুগা তীমূর বিস্তামে পশ্চাদপসরণ করেন; সেইখানে তিনি মাযানদারান (উপরোল্লিখিত অর্থে) এবং খুরাসানের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। একই সময়ে খুরাসানের উযীর খোজা 'আলাউ'দ-দীন মুহাম্মাদের দুর্বৃত্ত ও দুর্বিনীত কর্মচারীদের অত্যধিক খাজনা আদায়ের ফলে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং সারবাদারগণ ক্ষমতাসীন হয় [দ্র.]। তাহাদের ক্ষমতা প্রসারের ফলে

তুগা তীমূরের ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। হেরাতের কারত্ বংশের সঙ্গে তুগা তীমূরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কারণ মু'ইয্যু'দ-দীন কারত্ তাঁহার কন্যা সুলতান খাতুনের পাণি গ্রহণ করেন (জাফারনামা, ১খ, ৩২০)।

৭৩৯/১৩৩৮ সালে হাসান বুযুর্গ স্বয়ং ইরাকে আগমন করিবার জন্য তুগা তীমূরকে আমন্ত্রণ জানান। নাওরোয পুত্র ও বিখ্যাত আরগুন-আকা-র প্রপৌত্র আমীর আরগুন শাহ সমভিব্যাহারে তিনি তথায় গমন করেন; তু. জুওয়ায়নী, ২খ, ২৫১ [নীশাবূর, তুস ও কালাত এই পরিবারের অধিকারে ছিল; ইহা মোঙ্গল নাম জা'উন (জুন) গুরবান (পারস্যে জানী-ই কুরবানী) নামে পরিচিতও, হাসান বুযুর্গ তুগা তীমূরের সঙ্গে সাক্ষাত করিবার জন্য সাওয়া-তে গমন করেন। কিন্তু একদিকে অর্থ প্রশাসনের অধিকর্তা খোজা 'আলা'উ'দ-দীন মুহাম্মাদ অধিবাসীদের শান্ত করেন এবং অপরদিকে খান স্বয়ং চোবানীয় হাসান কূচিকের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। শেষোক্ত ব্যক্তি হাসান বুযুর্গের সঙ্গে খানের আপোস-মীমাংসার সুযোগ গ্রহণ করেন। এই ষড়যন্ত্রে অতিষ্ঠ হইয়া সরল মোঙ্গল সেই রজনীতেই তাঁহার মারাগা (?) ছাউনি তুলিয়া খুরাসান প্রত্যাবর্তন করেন (শাজারাত, পৃ. ৩২৭; d'Ohsson, iv, 732)।

৭৪১/১৩৪১ সালে তুগা তীমূর তৃতীয়বার ইরাক আক্রমণ করেন। তিনি উলজায়তূ খানের কন্যা শাহযাদী সাতি এবং আমীর চোবানের ঔরসজাত শাহযাদীর পুত্র শিবুরগানের সমর্থন লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা 'আলী গাউন পরিচালিত তুগা তীমূরের বাহিনী আবহারে হাসান কুচিকের বাহিনীর নিকট পরাজয় বরণ করেন।

খুরাসান অনতিবিলম্বে সারবাদারদের অধীনে আসে; তাহারা নীশাপূর ও তূগের শাসনকর্তা আরগুন শাহকে বিতাড়িত করে। সারবাদার ওয়াজীহু'দ-দীন মাস'উদ আত্রাকে খানের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে এবং 'আলী গাউনকে হত্যা করেন, এমন কি কিছু সময়ের জন্য জুরজান অধিকার করেন। দাওলাত শাহ-এর (পৃ. ২৩৬-২৩৭) মতানুসারে তুগা তীমূরকে কেবল নাম ও আনুষ্ঠানিক ক্ষমতায় (নাম-উ রাস্ম-ই সালতানাত) পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়। যদিও সারবাদারগণ সামন্ত হিসাবে আনুগত্য নবায়নের নিমিত্ত খানের দরবারে বৎসরে একবার আগমন করিত (মুলাযিমাত ওয়া তাজদীদ-ই 'আহ্দ)। এমনি এক সাক্ষাতের সময় সারবাদার য়াহ্য়া কর্তৃক সুলতান দুবীনে (গুরগান ও কারাসূ-এর মধ্যবর্তী) খান নিহত হন। কাল নির্ঘণ্ট রচয়িতা কবি 'আযীযী এই ঘটনার তারিখ প্রদান করেন ১৬ যু'ল-কা'দা, ৭৫৪/ডিসেম্বর ১৩৫৩। দাওলাত শাহ-এর মতে গণতান্ত্রিক প্রবণতার ক্ষেত্রে তুগা তীমূর সারবাদারদের অনুরূপ; তিনি সাধারণ পরিবারের লোকদের উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং সম্ভ্রান্তদের অবিশ্বাস করিতেন। তিনি গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতেন রাদকানে এবং শীতকাল গুরগানে। মাশহাদে তিনি একটি চমৎকার ইমারত নির্মাণ করেন। তুগা তীমূরে নামাঙ্কিত মুদ্রা শুধু আমূল, মাশহাদ, কাযবীন প্রভৃতি স্থানেই নহে, বসরা (হি. ৭৪১) ও বাগদাদেও (হি. ৭৪০-এর পরে) তৈরি হয়। ইহা প্রমাণ করে যে, নামেমাত্র হইলেও তিনি কতখানি মর্যাদার অধিকারী ছিলেন (S. Lane-poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, vol. vi, 1881, p. 98-101)। মাজমা'উ'ল-ফুসাহা'-এর মতে কবি ইব্ন য়ামীন তুগা তীমূরের স্তুতিকার ছিলেন (Browne, Pers. Liter. under Tartar Dominion, p. 216)। কোন কোন পণ্ডিত খানের কবি-প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন (V. Hammer, পূ. স্থা., P. 341) এবং মুদ্রায় তাঁহার উপাধি ছিল আস-সুলতানু'ল-'আলিম, 'বিজ্ঞ (عالم) সুলতান'।

কিছুকাল পর যখন সারবাদারগণ আস্তারাবাদে তাহাদের নিজস্ব শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তখন জুরজানে তুগা তীমূরের বৃদ্ধ সেনাপতি (২) শায়খ 'আলী হিন্দু (বা বীসূদ)-এর পুত্র আমীর ওয়ালীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। নাসা শাসনকর্তার (জা'উন গোরবান পরিবার) সমর্থনে তিনি সারবাদারদের পরাজিত করেন এবং নিজের জন্য একটি রাজ্য জয় করিয়া নেন। আস্তারাবাদ, বিস্তাম, দামগান, সিমনান ও ফীরূযকূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত (৭৬১ হি.-তে মাতলা'উ'স-সা'দায়ন, in Dorn, Auszuge, p. 155-157)-। ৭৭২/১৩৭০ সালে তিনি রায় জয় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু জালায়িরী উওয়ায়স তাঁহাকে পরাজিত করেন। পর বৎসর উয়ায়স আমীর ওয়ালীর কর্তৃত্বমুক্ত হইবার প্রবল আগ্রহে পুনরায় অভিযান আরম্ভ করেন, কিন্তু উজানের পরে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। হি. ৭৭৪ সালে মুজাফ্ফারী শাহ শুজা' কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া আমীর ওয়ালী রায় ও সাওয়াত অধিকার করেন। উওয়ায়সের ইনতিকালে (৭৬৬/১৩৬৪) সকল সামরিক প্রস্তুতির অবসান ঘটে (Markov, Katalog Djelayir, Monet., St. Petersburg 1897, p. xiv)। ৭৮৩/১৩৮১ সালে তীমূর যখন আমীর ওয়ালী শাসিত (জাফারনামা, ১খ, ৩২৫) ইসফারাইন অধিকার করিয়া ধূলিসাৎ করেন তখন আমীর নিজে তাঁহার দূতদের সসম্মানে গ্রহণ করেন। কিন্তু তীমূর সামারকান্দে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র ওয়ালী আরগুন শাহ-এর পুত্র 'আলী বেগের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি কালাত ও তুস (জাফারনামা, ১খ, ৩০২) অধিকার করিয়া সারবাদার 'আলী মুআয়্যিদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। একই বৎসরের (১৩৮১-১৩৮২) শীতকালে তীমূর খুরাসানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কারাত অবরোধ করিয়া জুরজান গমন করেন। রূগী নামক স্থান হইয়া তিনি কাবূদ-জামা ও শাসমান গমন করেন (কাবূদ-জামা, বর্তমানে হাজ্জিলার, গুরগানের এক উপনদীর বাম তীরে, নারদীন ও গুন্বাদ-ই কাবূসের মধ্যবর্তী)। আমীর ওয়ালী সত্বর তীমূরের নিকট ক্ষমতা লাভের জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং তীমূর সামূলকান হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন [আত্রাক উপত্যকায়] (ঐ., পৃ. ৩৪৯, ৩৫১)। ইতোমধ্যে 'আলী বেগও বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন (মুতা'আল্লিকান) ট্রান্স ওকসানিয়াতে নির্বাসিত হন। ৭৮৪ সালে (ঐ, পৃ. ৩৫৫) 'আলী বেগকে আন্দিজান-এ হত্যা করা হয়।

৭৮৫/১৩৮৩ সালে তীমূর আমীর ওয়ালীর রাজ্যে সৈন্য প্রেরণ করেন। সীস্তান বিজয়ের পর তীমূর ব্যক্তিগতভাবে আমীর ওয়ালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেন। গাওয়ারস (জাফারনামা, গাওকারশ)-এর যুদ্ধের পর দুরূন দুর্গ (আসখারাদ ও কিযিল আরওয়াতের মধ্যপথে) অধিকার করেন (ঐ, ১খ, ৩৮২)। তীমূর দিহিস্তানে ও জীলাউনে (চাত নদীর সচিত্রে আত্রাক-এর তীরে মাশহাদ-ই মিসরিয়ান্) তাঁহার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং গুরগান নদী অতিক্রম করেন। আমীর ওয়ালী ধাপে ধাপে বীরত্বের সঙ্গে তাঁহার অগ্রযাত্রায় বাধা দেন, কিন্তু (৭৮৬/১৩৮৪ সালের শাওয়াল) তাঁহার নৈশ আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তীমূর আস্তারাবাদ অধিকার করেন। আমীর ওয়ালী গির্দকূহতে (দামগান-এর নিকটে) তাঁহার পরিবারকে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং পশ্চিম দিকে পলায়ন করেন (ঐ, ১খ, ৩৮২-৩৮৬)। তোকতামিশের বিরুদ্ধে তাবরীয [দ্র.] প্রতিরক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং ৭৮৮/১৩৮৬ সালে তাঁহার মেযবান মাহমূদ খালখালীর (ঐ., পৃ. ৩৯২,৩৯৮) বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে তিনি নিহত হন।

অন্যায় অধিকারী আমীর ওয়ালী কর্তৃক জুরজান হইতে বিতাড়িত তুগা তীমূরের পুত্র লুকমান বাদশাহকে হি. ৭৮৬ সালে তীমূর তাঁহার বংশগত জায়গীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। সারি ও আমূলের (ঐ, পৃ.

৩৮৭, ৩৯১) সায়্যিদ ওয়ালীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখিবার জন্য তীমূর তাঁহাকে নির্দেশ প্রদান করেন।

৭৯৪/১৩৯১ সালে অভিযানের সময় আস্তারাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন লুকমান পাশা (=পাদশাহ; জাফারনামা, ১খ, ৫৭০)-র পুত্র।

পীর (বা পীরাক) পাশা তাঁহার পিতার ইনতিকালের পর তীমূর তাঁহাকে তথায় অভিষিক্ত করেন। পীর পাশা তীমূরকে উদার হস্তে আপ্যায়ন করেন এবং তাঁহার মাহানাসার (আমূল হইতে ৪ ফারসাখ) বিজয়ের জন্য জাহাজ সংগ্রহ করিয়া দেন। ৮০৬/১৪০৪ সালে মাযানদারানে (ঐ., ২খ, ৫৯১) ইসকান্দার চালাবির বিরুদ্ধে তীমূরের এই অভিযান উপলক্ষেও তাঁহার রাজভক্তিসুলভ খিদমতের উল্লেখ করা হয়। শাহরুখ-এর রাজত্বের প্রথম দিকে সাবযাওয়ার-এর সুলতান 'আলী সারবাদারদের একটি সেনাদল সংগ্রহ করিয়া খুরাসানে বিদ্রোহ করে। পীর পাদশাহ আকস্মিকভাবে জুওয়ায়নে উপস্থিত হইয়া সুলতান 'আলীর সঙ্গে যোগদান করেন, কিন্তু শাহরুখ প্রেরিত সায়্যিদ খোজা মিত্রশক্তিকে পরাজিত করেন (মাতলা'উ'স-সা'দায়ন, উ. পূ., ১৮৪৩ খৃ., পৃ. ২৬)। সুলতান 'আলী তাঁহার মিত্রগণসহ আযারবায়জান হইতে আগত মীরান শাহ-এর শরণাপন্ন হন। কিন্তু মীরান শাহ তাঁহাকে সায়্যিদ খোজার নিকট সমর্পণ করেন। এই উপলক্ষে পীর পাদশাহ-এর কতিপয় পুত্র সায়্যিদ খোজার হস্তে বন্দী হয় (ঐ, পৃ. ৫৪, ৮০)। ৮০৮ সালে শাহরুখ পীর পাদশাহকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করত তাঁহাকে স্বীয় দরবারে আহ্বান করেন। সায়্যিদ খোজা অবশ্য শাহরুখ-এর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনে এতটা অভিভূত হন যে, তিনি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার চিন্তা করেন, ইসকান্দারের (ফারেস-এর) সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন এবং অবশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কালাত হইতে তাঁহাকে পীর পাদশাহ-এর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে হয়। ইহা মাযানদারানের বিরুদ্ধে (৮০৯/১৪০৬) শাহরুখের অভিযানে প্ররোচনা যোগায়। পীর পাদশাহ-এর অধীনে পর্যাপ্ত বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি পরাজিত হন। তিনি খাওয়ারিযমে পলায়ন করেন এবং সায়্যিদ খোজা শীরায গমন করেন। শাহরুখ শাহযাদা 'উমার বাহাদুরকে মাযানদারানে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি অনতিবিলম্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং উলূগবেগ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ৮১০ সালে পীর পাদশাহ-এর নব প্রস্তুতি সম্পর্কে উলুগবেগ তাঁহার পিতা শাহরুখকে অবহিত করেন। শাহরুখ দ্বিতীয়বারের মত মাযানদারানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং তাঁহার অগ্রযাত্রার সংবাদ পীর পাদশাহকে বাদূস পানী কায়ুমারছ ইব্ন বীসূতূনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। কোন আঘাত না হানিয়াই শাহরুখ আস্তারাবাদ ও শাসমানে তাঁহার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

হি. ৮১২ সালে পীর পাদশাহ-এর পুত্র সুলতান 'আলী শাহরুখে আগমন করিয়া সীস্তান অভিযানে অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু পিতার ইনতিকালের সংবাদে রুস্তামদারে পলায়ন করেন। যেইখানে তিনি আমীর কায়ুমারছের সমর্থন লাভ করেন এবং তাঁহার পিতার সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেন। শাহরুখের প্রস্থানের পর সুলতান 'আলী আস্তারাবাদ অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু শাসনকর্তা কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার মস্তক হারাত-এ প্রেরিত হয় (Dorn-এ, মাতলা'উ'স-সা'দায়ন, Auszuge, p. 195)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তু. সারবাদারস প্রবন্ধ। (১) দাওলাত শাহ তায'কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. Browne, পৃ. ২৩৬-২৩৭, ২৮০-২৮২-২৮৩, বোম্বাই ১৮৮৭ খৃ., পৃ. ১০৪, ১২৩; (২) শাজারাতুল আত্রাক, অনু. Miles, London 1838, p. 315, 320-426 (এই গ্রন্থটি উলূগবেগ-এর নামে রচিত তা'রীখ-ই আরবা' উলূস-এর অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থকারের সারসংক্ষেপ; তু. Barthold, Turkestan, G. M. S., p. 57; (৩) আবুল-গাযীর শাজারা-ই তুর্ক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; (৪) মীরখান্দ, রাওদাতুস-সাফা, বোম্বাই ১২৬১/১৮৪৫, ৫খ, ২১৯, ২২০, ২৫১; (৫) খাওয়ান্দামীর, হাবীবুস-সিয়ার, তেহরান ১২৭১, ৩/১খ, পৃ. ১২৮-১২৯; (৬) Dorn, Die Geschichte der Serbedare nach Chondemir 1849, p. 146, 150, 155; (৭) Dorn, Auszuge aus Muham, Sohriftstellern, St. Petersburg 1858, তু. নির্ঘণ্ট বিষয় তুগাতীমুর খান, আমীর ওয়ালী, লুকমান ও পীর পাদশাহ-এর; (৮) মুনাজ্জিমবাশী, ৩খ, ১২; (৯) d'Ohsson, Histoire des Mongols, iv, 726; (১০) Hammer, Geschichte d. Hchane, ii, 317-342; (১১) Howorth, Hist. of the Mongols, iii, 638, 717-726 ; (১২) Lane Poole, Mohammadan Dynasties, এবং রুশ অনু.-তে Barthold-এর সংযোজন ও St. Petersburg 1899, p. 249; (১৩) Rabino, Mazandaran, 1928, G. M. S., index.

V. Minorsky (E. I.[1])/আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তুগরিল তুগান খান (طغرل تغن خان) ঃ মালিক 'ইয্যু'দ-দীন (রাজত্বকাল ১২৩৬-৪৫) বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা। সুলতান ইলতুৎমিশের তুর্ক ক্রীতদাস। তিনি প্রথমে সুলতানের সাকী-ই খাস ও পরে সরদয়াতদার চসনীগীর ও আমীর-ই আখুর পদে কাজ করার পর বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইত্যবসরে সায়ফুদ-দীনের মৃত্যুর অথবা নিহত হওয়ার পর জনৈক আওর খান আয়বাক লক্ষণাবতীতে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তুগরিল আওর খানকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া বাংলার সিংহাসনে বসেন। দিল্লীর সুলতানের নামে খুতবা পড়াইলেও কার্যত তিনি স্বাধীন ছিলেন। তিনি তিরহুত জয় করেন এবং এক বিরাট স্থল ও নৌ-বাহিনী লইয়া কারা অভিযানে বাহির হন (১২৪৩)। এদিকে উড়িষ্যার রাজা নরসিংহদেব লখনৌর লুণ্ঠন আরম্ভ করেন (১২৪৩)। তুগরিল তাঁহাকে তাড়াইয়া নিয়া কাতাসিরন অবরোধ করেন। কিন্তু আকস্মিক আক্রমণে বিভ্রান্ত হইয়া পলাইয়া আসেন। নরসিংহদেব লখনৌর অধিকার ও শাসনকর্তাসহ বহু মুসলমানকে হত্যা করিয়া লক্ষণাবতী অবরোধ করে (১২৪৪)। দিল্লী হইতে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক তামার খানের অধীনে সাহায্যকারী সৈন্য আসিলে রাজা অবরোধ উঠাইতে বাধ্য হন। কিন্তু রাঢ় তাঁহার দখলে থাকিয়া যায়। তামার খান রাঢ় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া তুগরিল খানকে বিতাড়িত করিয়া লক্ষণাবতী দখল করেন (১২৪৫)। তুগরিল দিল্লীতে আশ্রয় লন (১১ জুলাই, ১২৪৫)। অতঃপর সুলতান নাসীরুদ্-দীন মাহমূদ দিল্লীর সুলতান হইয়া (১০ জুন, ১২৪৬) তুগরিলকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু অযোধ্যায় পৌঁছিবার পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (৯ মার্চ, ১২৪৭, শুক্রবার)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭২৭

তুজীব (বানূ) (بنو تجيب) ঃ একটি আরব পরিবারের নাম, স্পেনে মুসলিম শাসনামলে মুলূক'ত-তাওয়া'ইফ (ملوك الطوائف) -এর এবং উমায়্যা খলীফাদের আমলে এই পরিবারের অনেক সদস্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরিবারটি দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে, তথা সারাগোসা-র বানূ হাশিম ও আলমেরিয়া-র বানূ সুমাদিহ। স্পেন বিজয়ের সময়ে বানূ তুজীব আরাগন (Aragon)-এ বসতি স্থাপন করে। আমীর ১ম মুহাম্মাদের রাজত্বকালে (২৩৯-৭৩/৮৫২-৮৬)

'আব্দু'র-রাহমান ইব্ন 'আব্দি'ল-'আযীয আত-তুজীবী এই গোত্রের প্রধান ছিলেন এবং কর্দোভা (Cordova)-র শাসনকর্তা এই গোত্রের উপর তাঁহার আধিপত্যের স্বীকৃতির মাধ্যমে আরাগন-এর ভিজিগথ (visigoth) বংশোদ্ভূত অন্য একটি পরিবার তথা বানূ কাসী-র ক্ষমতার বিলোপ সাধনের প্রয়াস পান। বানূ তুজীব পরবর্তী কালে কর্দোভার সামন্ত এবং তৎপর বানূ হূদ-এর অনুকূলে সিংহাসনচ্যুত হইবার পূর্ব পর্যন্ত সারাগোসা-এর স্বাধীন শাসকদের (বানূ হাশিম) সামন্ত ছিল (তু. সারগোসা প্রবন্ধ)।

অপর তুজীবী শাখা বানূ সুমাদিহ 'আব্দু'র-রাহমান আত-তুজীবীর বংশধর কর্তৃক আরাগণ হইতে পূর্বেই বিতাড়িত হয়। হি. পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে দ্বিতীয় শাখার প্রধান আবু'ল-আসবাগ মা'ন [দ্র.] ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন সুমাদিহ আত-তুজীবী ক্ষুদ্র রাজ্য আলমেরিয়ার অধিকার লাভে সমর্থ হন; ১০২৫ সালে খায়রান ও যুহায়র নামক দুইজন "স্লাভ" এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন। ৪৪৩/১০৫২ সালে আবু'ল-আসবাগ-এর ইনতিকালের পর তাঁহার পুত্র আবূ য়াহ্য়া মুহাম্মাদ আল-মু'তাসিম উপাধি ধারণ করিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার বয়স তখন মাত্র ১৪ বৎসর ছিল এবং তিন বৎসর পর্যন্ত তাঁহার পিতৃব্য সুমাদিহ ইব্ন মুহাম্মাদ রাজপ্রতিনিধি (regent) হিসাবে শাসন পরিচালনা করেন। আল-মু'তাসিম ৪৮৪/১০৯১ সালে ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত আলমেরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন এবং আরব ঐতিহাসিকদের মতে তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকাল ছিল গৌরবময় সমৃদ্ধিশালী। তাঁহার পুত্র আহ্মাদ মু'ইয্যু'দ-দাওলা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরেই আল-মুরাবিতদের আক্রমণের মুখে তিনি অপসারণ করেন এবং আল-মুরাবিতগণ যখন সেভিল (Seville) অধিকার করেন তিনি Bougie-তে গমন করেন এবং সেইখানে অজ্ঞাত-অখ্যাত অবস্থায় তাঁহার ও তদীয় পুত্রগণের জীবনাবসান হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) R. Dozy, Essai sur l'histoire des Todjibides, les Beni Hachim de Saragosse et les Beni Comadih d'Almerie, in Recherches sur l'histoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyen-age[3], Paris-Leyden 1881, i, ২১১-২৮১; আরও তু. (২) ইব্ন 'ইযারী, আল-বায়ানু'ল-মুগ্রিব, ৩খ. (সম্পা. E. Levi-Provencal, Paris 1930), ২খ., স্থা.; (৩) A. Prieto Vives, Los Reyes, de taifas, Madrid 1926, p. 43-45, 61-62; (৪) R. Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne, Leyden 1861, ৪খ., স্থা.।

E. Levi-Provencal (E.I. [1])/আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তুতুশ ইব্ন আল্প আরস্লান (تتش بن الپ ارسلان) ঃ তাজু'দ-দাওলা সিরিয়ার একজন সালজূক শাসক (৪৭১-৮৮/ ১০৭৯-৯৫)। ৪৭১ হি. (অথবা ইব্ন 'আসাকির-এর মতে ৪৭২ হি.) তাঁহার ভ্রাতা সুলতান মালিক শাহ তাঁহাকে সিরিয়া বরাদ করিবার পরে তুতুশ দামিশক দখল করেন। ইহা সত্য যে, তাঁহাকে এই প্রদেশটি প্রথম জয় করিতে হয়। কেননা তুর্কোমান সর্দার আতসিয (দ্র.) কয়েক বৎসর পূর্বে জেরুসালেম ও কয়েকটি দুর্গ ব্যতীত সমস্ত ফিলিস্তীন ফাতিমীদের নিকট হইতে দখল করিয়া লন, কিন্তু ফাতিমীরা তাহাদের দেশের দাবি পরিত্যাগ করে নাই এবং অবিরাম যুদ্ধ করিতে থাকে যেইজন্য কর্তৃত্ব বজায় রাখা আতসিযের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। একই বৎসর দামিশকে ফাতিমীরা তাঁহাকে অবরোধ করে, যেইজন্য তিনি তুতুশের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তখন মাত্র ১৪ বৎসরের বালক (তাহার জন্ম ৪৫৮ হি. সালে), আতসিযের আবেদনে সাড়া দেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হতভাগ্য আতসিযকে হত্যা করেন যাহাতে তিনি নিজে শহরটি হস্তগত করিতে পারেন। তৎপর তিনি মনোযোগ দেন হালাবের দিকে কিন্তু হালাবের অবরোধ ব্যর্থ হয়, তখন তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আশেপাশের অঞ্চলসমূহ জয় করেন (বুযা'আ, আল-বীরা ইত্যাদি)। তাঁহার অনুপস্থিতিতে হালাবীরা মুসলিম ইব্ন কুরায়শের নিকট আবেদন করে। মুসলিম মিরদাসীদের শাসক পরিবারকে শহর হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার এই অধিকার মালিক শাহ কর্তৃক স্বীকৃত করাইয়া লন। স্বভাবতই ইহা তুতুশের অভিপ্রায় অনুযায়ী ছিল না; তিনি অনতিবিলম্বে 'উকায়লীদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন, এমন কি তাঁহার দামিশক অবরুদ্ধ হয় (৪৭৬/১০৮৩)।

যাহা হউক পরবর্তী বৎসর রূমের সালজূক সুলায়মানের সঙ্গে যুদ্ধে মুসলিম নিহত হইলে তিনি এই শত্রু হইতে মুক্তি পান। এখন যেহেতু সুলায়মান ও তুতুশ উভয়ই হালাবের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহারা যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে সুলায়মানের মৃত্যু হইলে সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে (৪৭৯/১০৮৬)। কিন্তু ইহাতেও তুতুশ শহরটি অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ মালিক শাহ নিজে এই সমস্ত জিলা সংগঠন করিতে এক বিশাল বাহিনী গড়িয়া তোলেন; তিনি তাঁহার বন্ধু আকসোনকোর (দ্র.)-কে হালাব প্রদান করেন। তাঁহার আগমনে তুতুশ প্রস্থান করেন এবং আকসোনকোর ও বুযানের সঙ্গে যোগ দিয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, বুযানকে মালিক শাহ এদেসা প্রদেশটি প্রদান করেন। ৪৮৫/১০৯২ সালে তাঁহারা সিরিয়া, হিম্স্, আপামিয়া প্রভৃতি স্থানে উল্লেখযোগ্য বিজয় সাধন করেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ত্রিপোলি পৌঁছেন, সেইখানকার সেনাপতি ইব্ন 'আম্মার আকসোনকোরকে তাঁহার পক্ষে টানিয়া লইতে সক্ষম হন। ফলে আকসোনকোর তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কিছু করিতে অস্বীকার করেন। তিনি তাঁহার সেনাদলসহ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার এই পদক্ষেপের জন্য তুতুশ তাঁহাকে ভীষণভাবে ভর্ৎসনা করেন। বুযানও অনুরূপ কাজ করেন। ফলে তুতুশ প্রস্থান করিতে বাধ্য হন।

এই সময় মালিক শাহ্র আকস্মিক মৃত্যুতে সমস্ত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। উত্তরাধিকার সম্পর্কে অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে দুইজন তুর্কী আমীর দাবিদার তুতুশের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং পূর্বদিকে তাঁহার অভিযানে তাঁহাকে সমর্থন করিতে বাধ্য হন। নিসিবিস, আমিদ, মায়্যাফারিকীন ও আল-মাওসিল বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং প্রথমোক্ত শহরে তুতুশ এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। যখন জানা গেল যে, বারকিয়ারুক তাঁহার পিতার ন্যায়সম্মত উত্তরাধিকারী হিসাবে অগ্রসর হইতেছেন, তখন আমীরদ্বয় তুতুশকে বিপজ্জনক অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া বারকিয়ারুকের সঙ্গে যোগদান করেন। ফলে তুতুশকে সিরিয়ায় প্রস্থান করিতে হয়। তিনি আমীরদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হন। অতঃপর তিনি নূতন বাহিনী সমাবেশ করিতে থাকেন যাহাতে আমীরদের বিরুদ্ধে মাঠে নামিতে পারেন; অন্যদিকে আমীররাও বারকিয়ারুকের পক্ষে কুরবুকা কর্তৃক সমর্থিত হইয়া একই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হালাবের ছয় ফারসাখ দক্ষিণে তাল্লা আস-সুলতানে দুই পক্ষ মুখামুখি হয় (৪৮৭/১০৯৪)। তুতুশ জয়লাভ করেন; আকসোনকোরকে বন্দী করা হয় এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড প্রদান করা হয়। কুরবুকা ও বুযান হালাবে পলায়ন করে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকেও আত্মসমর্পণ করিতে হয়। তুতুশ শেষোক্ত ব্যক্তিকেও প্রাণদণ্ড প্রদান করেন এবং তাহার মস্তক এদেসায় প্রেরণ করেন যাহাতে সেইখানকার অধিবাসীদিগকে ভীতি

প্রদর্শন করিয়া বশীভূত করা যায়। প্রত্যেকে এখন এই বিজয়ীর বশ্যতা স্বীকার করে।

তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সৈন্য-সামন্তসহ ইরাক প্রবেশ করেন এবং হামাযানে পৌঁছেন। অন্যদিকে বারকিয়ারুক, যাঁহার অধীনে তখন ছিল একটি ক্ষুদ্র সেনাদল, ইসফাহানে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। সেইখানে তিনি গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন, তথাপি শহরের তুর্কী আমীরগণ তুতুশের বশ্যতা স্বীকার করিতে ইতস্তত করে। বারকিয়ারুক পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহার মত প্রকাশ করেন যে, দুই দাবিদারের দাবি শুধু তরবারি দ্বারাই মীমাংসা করা যাইবে। তখন সকল দিক হইতে সৈন্য-সামন্ত বারকিয়ারুকের সঙ্গে যোগ দেয় এবং তিনি আর-রায়-এর নিকট দাশীলু নামক এক স্থানে তুতুশকে আক্রমণ করেন (১৭ সাফার, ৪৮৮/২৬ ফেব্রুয়ারী, ১০৯৫)। তুতুশ তাঁহার সৈন্যদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন এবং কথিত আছে যে, আকসোনকোরের কোন লোকের দ্বারা নিহত হন। এই ব্যক্তি তাহার প্রভুর হত্যার প্রতিশোধ লয়। ইহার পর সিরিয়া তাঁহার পুত্র রিদওয়ান (দ্র.) এবং দুকাকের হস্তগত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ "সালজুক" নিবন্ধগর্ভে যে সমস্ত বরাত উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলির মধ্যে দামিশকের ঐতিহাসিকদের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে; (১) ইবনু'ল-কালানিসী, সম্পা. Amedroz, তু. নির্ঘণ্ট, হালাব; (২) কামালু'দ-দীন, যুবদাতু'ত-তালাব ও বুগয়াতু'ত-তালাব, বিশেষ করিয়া Historiens Orientaux des Croisades-র উদ্ধৃতিসমূহ, ৩খ, (পৃ. ৭০৩-৭০৬ আকসোনকোরের জীবনী); (৩) ইব্ন খাল্লিকান, সং. বূলাক ১২৯৯ হি., ১খ, ১৬৮ প.।

M. Th. Houtsma (E.I.[1])/মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

তুদেলা (TUDELA=تطيلة) ঃ স্পেনের একটি ক্ষুদ্র শহর। অধিবাসী ৯,৫০০, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৮০ ফুট উচ্চে ও সারাগোসা-র ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এব্রো (Ebro) নদীর দক্ষিণ তীরে এবং ইহার শাখানদী কেয়েলিস (আরবী কালাশ)-এর বাম তীরে অবস্থিত। আরব ভৌগোলিকদের মতে আমীর ১ম আল-হাকাম-এর রাজত্বকালে (১৮০-২০৬/৭৯৬-৮২২) উমায়্যা বংশ কর্তৃক শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে এবং অন্যান্য কতিপয় উপলক্ষে ইহা বিদ্রোহী মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রধান কার্যালয় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ২২৯/৮৪৩-৮৪৪ সালে আমীর 'আবদু'র-রাহমান এবং ২৬৪/৮৭৭-৭৮ সালে আল-মুনযির এই শহর অবরোধ করেন। কয়েকবার খৃস্টানগণ ইহা অধিকার করে এবং মুসলিমগণ পুনরাধিকার করেন। ৩য় আবদু'র রাহমান স্পেনে উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে তাহার অভিযানসমূহের একটিতে এই স্থানটিকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করেন (৩০৮/৯২০-২১)। সেনাপতি আল-হামীদ ইব্ন বাসীস তিন বৎসর পর একই খলীফার অনুকূলে ইহা পুনরাধিকার করেন। কোন্ সময় তুদেলা চূড়ান্তভাবে খৃস্টানদের অধিকারে যায়, আরব ঐতিহাসিকগণ তাহা উল্লেখ করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইদরীসী, Description de l'Afrique et de l'Espagne, মূল পৃ. ১৭৬ ও ১৯০, অনু. পৃ. ২১১ ও ২৩১; (২) আবু'ল-ফিদা', তাকবীমু'ল-বুল্দান, মূল পৃ. ১৮০, অনু. পৃ. ২৫৯; (৩) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুল্দান, ১খ, ৮৫৩; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিম্য়ারী, আর-রাওদু'ল-মি'তার, স্পেন নং ৫৫; (৫) E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghrib, পৃ. ১২৮; (৬) ইব্ন 'ইযারী, আল-বায়ানু'ল মুগরিব, ২খ, স্থা., নির্ঘণ্ট।

E.Levi-Provencal (E.I.[1])/আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তুনবূর (طنبور) ঃ 'আ. তানপুরা। তানপুরা সাধারণত ইহার ক্ষুদ্রতর তবলী বা বস (Sound chest) এবং দীর্ঘতর গ্রীবার জন্য বীণা হইতে স্বতন্ত্র। প্রাচীন মিসর (Saches Die Musikinstrumente des atten Agyptens, P 54), অ্যাসিরিয়া (Engel, Music of the most ancient nations, p. 54) ও পারস্যে (terracota from Susa in the houvre, Paris) আমরা ইহার সন্ধান লাভ করি। প্রতীয়মান হয়, মিসরে ইহা নেফের (Nefer) [তু. Larignac, Encycl. de la musique, ১খ, ২৭; Transact, Glasgow University Oriental Society, ৫খ, ২৬] হিসাবে পরিচিত, কোন কোন মনীষী ইহাকে হিব্রু নেবেল-এর সমকক্ষ মনে করেন। উত্তর আফ্রিকায় বাদ্যযন্ত্রটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে গুনীব্রী নামে বিদ্যমান, নামটির ব্যঞ্জন বর্ণ ন-ব-র-তে প্রাচীন মিসরীয় শব্দের চিহ্ন পাওয়া যায়।

আদিমতমরূপে গুনব্রী (গুনীব্রী-এর সংক্ষেপ) কুম্মাও, শক্ত আবরণ বা কাঠের তবলী, আবরণ বা মধ্যভাগে চর্মাচ্ছাদন ও সুরবিন্যাসী কান ব্যতীত অশ্বলোমের তার প্রভৃতিসহ আমাদের জ্ঞান তানপুরার প্রাচীনতম রূপ। আটলান্টিক হইতে নীল নদ পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার কৃষক সমাজে ইহা পরিদৃষ্ট হয়। তবলীটি বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে নির্মিত হয়, নাশপাতি আকৃতি, ডিম্বাকৃতি, অর্ধ গোলাকৃতি, আয়তাকৃতি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পেশাদার শিল্পী ব্যবহৃত উন্নততর বাদ্যযন্ত্রে সুরবিন্যাসী কান বিদ্যমান এবং সচরাচর ইহা রুচিসম্মতভাবে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়। ইব্ন বাততূতা (মৃ. ১৩৩৭ খৃ.) তাঁহার তুহফাতু'ন-নুজজার (৪খ, ৪০৬)-এ ইহার উল্লেখ করেন। ব্রাসেলস-এর যাদুঘরে সঠিক নমুনা দেখুন, সংখ্যা ৩৯৬-৪০০; প্যারিস, সংখ্যা ৮৪৮-৮৪৯; নিউ ইয়র্ক, সংখ্যা ১৩২২-১৩২৪। বাদ্যযন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য দেখুন Farmer, Studies in Oriental Musical Instrument, পৃ. ৩৯-৪৯।

প্রাচ্যে তানপুরার অনাড়ম্বর নাম তুনবুর, তিনবার, তুনবূর (জনপ্রিয়, তানবূর)। আল-মাস'উদী (মুরূজ, ৮খ, ৯০) sodom ও ২ Gomorra-এর অভিশপ্ত জাতির উপর ইহার আবিষ্কারের দায়িত্ব আরোপ করেন। সম্ভবত সেইখান হইতেই নামটি উদ্ভূত (তান্ন="সঙ্গীতের ধ্বনি"–বূর=:অভিশপ্ত), যদিও অভিধান রচয়িতাগণ ফারসী দুম বা দুন্বা ('লেজ') ও বারা ('মেষ') হইতে শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেন। একই সময়ে আমরা লক্ষ করি পূর্বোল্লিখিত ব্যঞ্জন বর্ণ ন-ব-র এবং আরবী ক্রিয়া ধাতু নাবারা অর্থ "সুর উচ্চগ্রামে উঠানো"। Julius Pollux বলেন যে, একতারা বাদ্যযন্ত্রটি আরবগণ আবিষ্কার করেন। খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে (কিতাবু'ল-আগানী, ৫খ, ১৬১) আরবী সাহিত্যে আমরা প্রথম তুনবূর সম্পর্কে অধ্যয়ন করি। বাদ্যযন্ত্রটি ইতোমধ্যেই পারস্য, আল-রায়, তাবারিস্তান ও দায়লাম-এ (মুরূজ, ৮খ, ৯১) অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং খৃস্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে ও খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীর প্রথমভাগে ইহা আরবদের মধ্যে এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, 'উদ (বীণা)-এর প্রাধান্য ক্ষুণ্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই সময়ে প্রসিদ্ধ তানপুরাবিশারদদের জীবনী সম্পর্কে দুইটি গ্রন্থ রচিত হয় (ফিহরিস্ত, পৃ. ১৪৫-৪৬)।

খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে দুইটি স্বতন্ত্র নমুনা জানা ছিল ঃ তুনবূর আল-মীযানী বা তুনবূর আল-বাগদাদী-ইহার আবিষ্কার সাবিঈদের উপর আরোপিত এবং তুনবূর আল-খুরাসানী। পৌত্তলিকদের সময়কার পর্দায় রক্ষিত স্বরগ্রাম মানসহ প্রথমোক্তটি আল-'ইরাক এবং ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিমে ব্যবহৃত হইত। শেষোক্তটি খুরাসান এবং ইহার উত্তর ও পূর্বে প্রিয় ছিল। উভয়টিই সাধারণত দো-তারা, যদিও তুনবূর আল-খুরাসানী

কখনও কখনও ত্রি-তারে বাঁধা থাকিত। খৃস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে (উল্লিখিত, Kosegarten, Land and d'Erlanger) আল- ফারাবী এই সকল তানপুরার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করেন। তৎপর এই বিশেষ প্রকার তানপুরার চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইখওয়ানু'স-সাফা' (খৃ. ১০ম শতাব্দী), ইব্ন সীনা (মৃ. ১০৩৭ খৃ.), ইব্ন যায়লা (মৃ. ১০৪৮ খৃ.) ও সাফিয়্যু'দ্-দীন 'আবদু'ল-মু'মিন (মৃ. ১২৯৪ খৃ.) নামেমাত্র তানপুরার উল্লেখ করেন। শেষোক্তজন দো-তারা বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা প্রদান করেন (কিতাবু'ল-আদাওয়ার, পত্র ১৮; Cara de vaux, Traite des rapports musicaux, পৃ. ৫২), কানযু'ত্-তুহাফ (খৃ. চতুর্দশ শতাব্দী)-এ ইহার বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই, যদিও ইব্ন গায়বী অন্য কতিপয় নমুনার বিশদ বিবরণ প্রদান করেন; তন্মধ্যে তিনটি এই নামের। তুনবূর-ই শিরবীনান-এর তবলী (কাসা) নাশপাতি আকৃতির ও দো-তারা। ইহা তাবরীয-এর অধিবাসীদের প্রিয়!

তুনবূরা-ই তুর্কী কখনও কখনও ত্রি-তারা, কিন্তু সাধারণত দো-তারা। ইহার তবলী পূর্ববর্তী বাদ্যযন্ত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র যদিও ইহার গ্রীবা (সা'ইদ) দীর্ঘতর। এই উভয় যন্ত্রই অঙ্গুলী দ্বারা বাজান হয়। দ্বি-তারে বাঁধা নায় তুনবুর-এ মিদরাব ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন নমুনার তুনবূর-এর দৃষ্টান্ত খৃস্টীয় পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর ইরানী চিত্রকলায় ভরপুর। আওলিয়া চেলেবী (Taavels, 1/ii, 234, 236) ও হাজ্জী খালীফা (কাশফ, ১খ, ৪০০) খৃ. সপ্তাদশ শতাব্দীর তুর্কী বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ইহার উল্লেখ করেন। চেলেবী বলেন, সিরিয়ার মার'আশ-এ তুনবুর আবিষ্কৃত হয়। স্পষ্টতই ইহা অন্ত্র-তারে বাঁধা, যেমন তিনি তাল তুনবূর-এর উল্লেখ করেন, সম্ভবত তার বাঁধা বাদ্যযন্ত্র। তুরস্কের কুতাহিয়া-এর কোন এক এফেন্দী উগলী ইহা আবিষ্কার করেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ইহা অন্যান্য তুনবুর হইতে ক্ষুদ্রতর এবং মহিলাদের মধ্যে জনপ্রিয়। তিনি শারকী-র যে উল্লেখ করেন সম্ভবত তাহা তুনবূর শারকী-র অনুরূপ (দেখুন, Villoteau)। তিনি বলেন, ইহা চার-তার-এর ন্যায় এবং তুর্কেমানগণ ইহা বাজাইত।

Estat de la persean 1660 (P.E.L.O.V, 2nd ser., xx, 118), chardin (Voyages, Paris 1735, ii, 159) এবং Kaempfer (A Moenitatum Exocicarum, 1712, p. 443, fig. 16) হইতে যতদূর জানা যায়, খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পারস্যে তুনবূর বা (ও) তুনবূরা তখনও সমাদৃত ছিল। শেষোক্তজনের মতে ইহা ত্রি-তার সম্বলিত; তবে বলেন, চার বা ততোধিকও প্রচলিত ছিল। দার 'ইলম-ই মূসীকী শিরোনামের (John Rylonds Library M. Manchester, No, 346) ফারসী গ্রন্থে খৃস্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের দ্বিগুণ পুরু ত্রি-তারসম্বলিত তুনবূর-এর নকশাসহ বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে। Russel (Nat. hist. of Aleppo, 1794,i, pl. iv) দ্বিগুণ (?) পুরু ত্রি-তারা একটি সিরীয় তুনবূর-এর নকশা প্রদান করেন। Toderini (Letterature turchesca, Venice 1789) এবং La Borde-3 (Essai sur la musique, 1780) তুনবূরটির নকশা প্রদান করেন। ঃNiebuhr (Voyage en Arabic, Amsterdam 1776) বলেন, সকল তার যন্ত্রের সাধারণ নাম তুনবূরা। তিনি তিন প্রকার তানপুরার উল্লেখ করেন ঃ তুনবূর বা একিতালী, সাওউরী ও বাগলামা। তিনি বলেন, যে তুনবূরকে মিসরীয় ও দ্বীপবাসী গ্রীকগণ একিতালি আখ্যায়ত করে (?) (ঈকীতালী তুর্কী ঈকী=দুই "তারের ছিলা"), উহার দুই তারের ছিলা ছিল। Villoteau (Descr. de l'Egypte) [তিনি এক-চতুর্থাংশ শতাব্দী পরে লিখেন] তুনবূর যুবুরক (বৃহৎ তানপুরা) অপেক্ষা সাওউরি বেশি পসন্দ করিতেন এবং তাই সম্ভবত নাম সুওওয়ারী ("শ্রেষ্ঠ")। অপরপক্ষে যেহেতু ইহার সুর Villoteau বর্ণিত তুনবূর শারকী-র ("প্রাচ্য তানপুরা") অনুরূপ, তাই ইহার স্বকীয় নাম হয়ত সূরীয়ী ("সিরীয়")। ইহার ত্রি-তারের ছিলা ছিল, তন্মধ্যে দুইটি দ্বিগুণ পুরু। বাগলামা ত্রি-তারের তুনবূর অপেক্ষা ক্ষুদ্র। Nibuhr বলেন, এই নাম কায়রোর গ্রীক অধিবাসিগণপ্রদত্ত। Niebuhr-এর এই সকল বাদ্যযন্ত্রের তবলী নাশপাতি আকৃতির। Villoteau মিসরের তানপুরাসমূহের নকশা এবং পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, তিনি এইগুলি শুধু তুর্কী, গ্রীক, য়াহূদী ও মিসরের আরমেনীয়দের নিকট দেখেন। তিনি পাঁচটির নাম করেন। দীর্ঘতম হইতে খর্বতম এইগুলি ছিল ঃ তুনবূর কারবীর তুরকী, তুনবূর শারকী, তুনবূর বুযুরক, তুনবূর বুলগারী ও তুনবূর বাগলামা (=তুনবূরা=বি=গুলামা)। প্রথম নামের বাদ্যযন্ত্রটির তবলী গোলাকৃতির এবং চারটি দ্বিগুণ পুরু তারের। অবশিষ্টগুলির তবলী নাশপাতি আকৃতির ও ত্রি-তারা, কোন কোনটি দ্বিগুণ পুরু।

Lane-এর সময় (Modern Egyptiens, 1836) মিসরের স্থানীয় যন্ত্রশিল্পিগণ কর্তৃক তুনবূর প্রত্যাখ্যান অব্যাহত ছিল এবং ইহা শুধু গ্রীক এবং অন্যান্য বিদেশীদের নিকট পরিদৃষ্ট হইত। অদ্যাবধি তাহাই বিদ্যমান (দারবীশ মুহাম্মাদ, সাফাউ'ল-আওকাত, পৃ. ১৩)। সিরিয়া এবং ফিলিস্তীনের স্থানীয় যন্ত্রশিল্পীগণ বিভিন্নরূপে ইহা পসন্দ করিতেন (Z.D.P.V., ১৯২৭ খৃ., ১খ, ৪৭ চিত্র ৪; মুশাকা, M.F.O.B--তে, ৬খ, ২৬; Densmore, Handbook... of mus. instr. in the U.S. National Museum, চিত্র ৩৫)। তুরস্কের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নমুনাটি মায়দান সাযী নামে পরিচিত। ইহা দ্বিগুণ পুরু ত্রি-তারা ও মজবুত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্রতর নমুনাটি প্রাচীন বুযুরক ও বাগলামা নাম পরিগ্রহ করে (Lavignoe, Encycl. de la musique, v. 3018)। পারস্যে এই নমুনা সিতার, চারতার এবং এই প্রকার বাদ্যযন্ত্রের নামে খ্যাত। ইহা খাওয়ারিযম, তুরস্ক এমন কি ককেসাস ও বলকানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র (যাদুঘরে ইসলামী দেশসমূহের বাদ্যযন্ত্রের দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন South Kensington, নং ৫৭৬-৫৭২; New York, case ২৫, ২৫২; ব্রাসেলস, নং ১৬১-১৬২, ৪০৬, ৬৬৯-৬৭০; প্যারিস নং ৮৪৪-৮৪৬)। ইহা চীনের তান-পৌ-লা; ভারতের তুম্বুরু, রাশিয়ার দোমরা ও গ্রীসের rauoupac St. Medard Evangel (খৃ. ৮ম শতাব্দী) The Lothair ও Labeo Nokter Psatters (৯ম-১০ম শতাব্দী) ও St. John -এর Apocalypse (Bible-Nac, Madrid, খৃ. একাদশ শতাব্দী) পশ্চিম য়ুরোপে তুনবূর-এর প্রাচীন প্রভাব প্রমাণ করে।

তার দীর্ঘ গ্রীবার তানপুরা, তবলী দীর্ঘায়িত খিলানাকৃতি, কটিদেশ বক্র। সম্ভবত প্রাচীন Hittile ললিতকলায় আমরা এই নমুনার সন্ধান লাভ করি (Stainer, Music of the Bible, 2nd ed., Pl. iii)। কুসায়র 'আমরা-এর প্রাচীর চিত্রে ইহা স্পষ্টভাবে চিত্রায়িত এবং পরবর্তী ইরানী চিত্রে ইহা প্রায়শ পরিদৃষ্ট হয়। বর্তমানে ইহা পারস্যে (Adverlle, পূ. গ্র., পৃ. ১২; Lavignac, পূ. গ্র., ৫খ, ৩০৩৭), ফিলিসতীনে ও তুর্কিস্তানে দেখা যায় (Z. D.P.V., pl. 4; Uspensky, Sovietsky Uzbekistan, তাশখন্দ ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৩১৪; প্যারিসে ইহার নমুনা নং ১২৫২, ১৪৩৫; ব্রাসেলস নং ৭৭২; এবং London College of Music)। য়ুরোপ নমুনাটি Chitarra battente আকারে অনুকরণ করে (Densmore, পূ. গ্র., চিত্র ৩৫)। আধুনিক তার-এর একটি নির্দেশিকা ফারসীতে প্রকাশিত হইয়াছে ('আলী নাকী খান ওয়াযীরী, দাসতূর তার)। যেহেতু তার অর্থ "তন্তু" বিভিন্নভাবে বাঁধা, বহু সংখ্যক

বাদ্যযন্ত্রের নামে এই শব্দ সংযুক্ত। য়াকতার একটি একতারা বাদ্যযন্ত্র, ভারতে অধিক পরিচিত (Day, পূ. গ্র., পৃ. ১৩০)। ব্রাসেলস নং ৯৬-তে নমুনা দেখুন, ইহার তবলী গোল কুম্মাণ্ড এবং ইরানী দার 'ইল্‌ম-ই মূসীকীতে (John Rylands Library, MS. No. 346) যে বাদ্যযন্ত্রের নকশা প্রদত্ত তাহার অনুরূপ। তুর্কিস্তানে বর্তমান দূতার নাশপাতি আকৃতির তবলীসম্বলিত একটি দো-তারা তুনবূর (ফিতরাত, পূ. গ্র., পৃ. ৪০; ব্রাসেলস নং ৭৬৮-তে দেখুন নমুনা)। হাফিজ (মৃ. ১৩৮৯ খৃ.) দ্র.] তাঁহার মুগাননী নামাহ-তে (সম্পা. Jarrett, পৃ. ২২৫) ইহার উল্লেখ করেন।

সিতার আদিতে ত্রি-তারা বাদ্যযন্ত্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইহা চৌ-তার সম্বলিত (Adveelle., পূ. গ্র., পৃ. ১৩)। আমরা লক্ষ করি ভারতে ইহা আরও অধিক তারসহ অনবরত ব্যবহৃত হইতেছে। সেইখানে ইহা তুমবুরু (=তুনবূর) হইতে স্বতন্ত্র নকশা করা এবং মিদরাব সহকারে বাজান হয়। সেইখানে ইহার আবিষ্কার দিল্লীর আমীর খুসরাও (খৃ. দ্বাদশ শতাব্দী)-এর উপর আরোপ করা হয়। চারতার বা চাহারতার একটি চৌ-তারা বাদ্যযন্ত্র। আওলিয়া চেলেবি (খৃ. সপ্তদশ শতাব্দী)-র মতে সাফাবী শায়খ হায়দার (মৃ. ১৪৮৮ খৃ.) ইহা আবিষ্কার করেন। তুরস্ক বা পারস্যে বর্তমানে ইহা অজ্ঞাত, তবে ভারতে ইহার ব্যবহার এখনও বিদ্যমান (Shahinda, Indian Music, পৃ. ৭৮)। পঞ্চ-তারা বাদ্যযন্ত্র পাঁচতার আফগানিস্তানে পরিচিত (Sachs, Reallexikon...)। আওলিয়া চেলেবীর বক্তব্য অনুসারে ষষ্ঠ-তারা বাদ্যযন্ত্র, শাশ-তার বা শাশ্‌তা শীরওয়ান-এর কোন এক রিদাউ'দ-দীন আবিষ্কার করেন। ইবন্ গায়বী (মৃ. ১৪৩৫ খৃ.) ইহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন এবং তিনটি পৃথক নমুনা উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে একটির পনরটি অতরিক্ত সংবেদনশীল দ্বিগুণ পুরু তার বিদ্যমান। ইহার নাশপাতি আকৃতির তবলী বীণার তবলীর অর্ধেক, তবে ইহার গ্রীবা দীর্ঘ। তিনটি প্রিয় বাদ্যযন্ত্রের অন্যতম হিসাবে তুর্কী কবি আহমাদ পাশা (মৃ. ১৪৯৬ খৃ.) ইহার প্রশংসা করেন (Gibb, Hist, Ottoman Poetry, No, 77)। হাজ্জী খালীফাও ইহার উল্লেখ করেন। ইহা এখনও পারস্য, আযারবায়জান ও ককেসাস-এর জনপ্রিয়।

তানপুরা নমুনার অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র কারাদুমান, য়ূনকার, য়ালতামা, চুগুর, চাশদা ও সুনদার। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কুদুয পারহাদী নামীয় এক তুর্কী কারাদূযান আবিষ্কার করেন। আওলিয়া চেলেবীয় সময় ইহার ত্রি-তার ছিল। আধুনিক নমুনার জন্য ব্রাসেলস নং ২৫০৮ দেখুন। তুর্কী কবি হামদী চেলেবী-র (মৃত্যু ১৫০৯ খৃ.) পুত্র শামসী চেলেবী ত্রি-তারা ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি য়ালতোমাও আবিষ্কার করেন। ইহাও তার-এর ন্যায় একটি-তবলী সম্বলিত ক্ষুদ্র ত্রি-তার বাদ্যযন্ত্র। কুতাহিয়ার য়া'কূব কারমিয়ানী চুগুর আবিষ্কার করেন, কাষ্ঠ অভ্যন্তরসহ ইহার পঞ্চ-তার। তুর্কী সৈন্যগণ ইহা ব্যবহার করিত। সায শা'ইরলেরি হিসাবে পরিচিত (প্যারিস নং ১২৫৩, ১৪৩৮ নমুনা দেখুন) দীর্ঘ গ্রীবার আধুনিক তুর্কী বাদ্যযন্ত্র চারণগণ ব্যবহার করে। ইহা জর্জীয় চুনগূর আওলিয়া চেলেবীর বক্তব্যানুসারে সেলোনিকার বানকলীশাহ চাশদা আবিষ্কার করেন। ইহা অর্ধ গোলাকৃতি তবলীর একটি ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র (তু. Kaempfer, পূ. গ্র. উল্লিখিত ও বিত্রিত চাহায্‌দা), কুর্দীদের সুনদার চুকূর-এর সদৃশ, তবে দ্বাদশ ধাতু-তারসম্বলিত (দেখুন আওলিয়া চেলেবী, Travels, ১/২খ, ২৩৫-২৩৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতের জন্য 'উদ প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দেখুন।

H. G. Farmer (E.I. [1])/আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তুফায়ল ইব্ন 'আম্‌র আদ-দাওসী (طفيل بن عمرو الدوسى) ঃ (রা), রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী। উপাধি যু'ন-নূর (আলোধারী)। তিনি বানূ'ল-আয্‌দ-এর শাখা বানূ দাওস-এর গোত্রপতি। তুফায়ল(রা) একজন সম্ভ্রান্ত, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিও ছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দিতে গিয়া তিনি বলেন, মক্কা গমনের পর ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত হেরেম শরীফে তাঁহার সাক্ষাত হয়। সালাতশেষে তিনি গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিলাম। দীন সম্পর্কে জানিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ (স) সংক্ষেপে ইসলামের মর্মকথা বর্ণনা করেন। আল-কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তুফায়ল সেই মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার গোত্রের সকলে আমাকে মান্য করে। আমি তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইব। দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোন নিদর্শন দান করেন, যাহা আমার কার্যে সহায়ক হইবে। তিনি দু'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ! তাহাকে একটি নিদর্শন দান করুন।

অতঃপর তুফায়ল গৃহাভিমুখে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে এক উপত্যকায় একটি কাফেলার সম্মুখীন হন, কিন্তু গভীর অন্ধকারের কারণে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। হঠাৎ তাঁহার ললাটদেশ হইতে প্রদীপের ন্যায় আলো বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু তাঁহার দু'আয় সেই আলো তাঁহার যষ্ঠির অগ্রভাগে চলিয়া গেলে কাফেলার সকলেই প্রদীপ-সদৃশ সেই আলো প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তখন হইতে রাত্রি অন্ধকার হইলেই তাঁহার যষ্ঠির অগ্রভাগ হইতে আলো বিচ্ছুরিত হইত। এইজন্য তাঁহার উপাধি হয় যু'ন-নুর (আলোধারী)। তাঁহার আহ্বানে পিতা 'আম্‌র ও স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি গোত্রের লোকদের ইসলামের দা'ওয়াত দেন। এই সময় আবূ হুরায়র (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। তুফায়লের চেষ্টায় দাওস গোত্রের প্রায় সত্তর কিংবা আশিটি পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তাহাদিগকে লইয়া খায়বারে উপস্থিত হন। তুফায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতি লইয়া স্বীয় গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর তিনি পুনর্বার মদীনায় গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে দাওস গোত্রের চার শত লোক অস্ত্রশস্ত্র সহকারে যোগদান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন তা'ইফে ছিলেন। তাঁহারাও তা'ইফে গিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তা'ইফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তুফায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যে থাকিয়া তাঁহার ইনতিকাল পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

১১/৬৩২ সালে হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাতকালে তুফায়ল (রা) মুসায়লামার বিরুদ্ধে য়ামামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার ইনতিকাল হয়। কাহারও মতে য়ারমূকে, আবার কেহ বলেন বায়যান্টাইনে তাঁহার শাহাদাত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ, পৃ. ২২৫, ২২৬; (২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়াঃ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ৩খ, পৃ. ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ৫খ, ৫৫, ৩২, ৬খ, পৃ. ১৬০, ৭খ, পৃ. ৩২; (৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, মিসর ১৩৫৫/১৯৩৬, ১খ, পৃ. ৮৪, ২খ, পৃ. ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫; (৪) আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবু'ল-আগানী, মিসর তা. বি., ১২খ, পৃ. ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩; (৫) ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, দেওবান্দ ১৯৮২ খৃ., ১খ, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫; (৬) 'আবদু'র-রাউফ দানাপুরী, বঙ্গানুবাদ আসহাহু'স-সিয়ার

(কুতুব খানা-ই রাশীদিয়া, ঢাকা তা. বি.), পৃ. ৫২; (৭) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব (আল-ইসাবা-এর সহিত সংযুক্ত, পৃ. ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬); (৮) আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৩খ, পৃ. ২৫৯, ৪খ, ৭৬; (৯) শাহ মু'ঈনু'দ-দীন নাদাবী, মুহাজিরীন, আজমগড় (ভারত) ১৯৫২ খৃ., ২খ, পৃ. ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪; (১০) আল-বুখারী, আল-জামি'উ'স-সাহীহ, আসাহ্হুল-মাতাবি', দিল্লী তা.বি., ২খ, পৃ. ৬৩০; (১১) মুসলিম, আস-সাহীহ, আসাহ্হুল-মাতাবি', দিল্লী তা.বি., ১খ, ৭৪, ২খ, পৃ. ৩০৭; (১২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৬৮, ৪খ; পৃ. ১৭৫-১৭৬; (১৩) আল-খাতীব আত-তাবরীযী, আল-ইকমাল ফী আসমাইর-রিজাল, (মিশকাতুল-মাসাবীহ্‌র সহিত সংযুক্ত, আসাহ্হুল-মাতাবি', দিল্লী তা.বি., পৃ. ৬০১); (১৪) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, মিসর তা.বি., ৩খ, পৃ, ৫৪, ৫৫; (১৫) আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন-নুবালা, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ১খ, পৃ. ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭; (১৬) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক আল-কাবীর, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৭খ, পৃ. ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭; (১৭) আয-যাহাবী, তাজ্‌রীদু আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত, তা. বি., ১খ, পৃ. ২৭৬; (১৮) ইব্ন হিব্বান, কিতাবুছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (ভারত), ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ২০৩, ২০৪।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তুফায়ল ইব্ন উবায়্যি ইবন কা'ব (طفيل بن ابى بن كعب) ঃ (র) একজন তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ এবং প্রখ্যাত সাহাবী উবায়্যি ইব্ন কা'ব আল-আন্‌সারী আল-খায্‌রাজী (রা)-এর পুত্র। তাঁহার উদর অতিমাত্রায় স্থূল ছিল বিধায় লোকেরা তাঁহাকে আবূ বাত্‌ন (ভুঁড়িওয়ালা) উপনামে ডাকিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায়ই তঁহার জন্ম। এমন কি আবূ মূসা প্রমুখ তাঁহার নাম সাহাবী হিসাবেও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ তাবি'ঈ। স্বীয় পিতা ছাড়াও হযরত 'আম্‌র ইব্ন 'উমার (রা)-এর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা)-এর বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সূত্রে ইস্‌হাক ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আবী তাল্‌হা (র), 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আকীল (র) ও আবূ ফাখিতা সাঈদ ইব্ন 'আলাকা (র) হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। হাদীছ বিশারদগণের দৃষ্টিতে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। ইব্ন সা'দ, আল-'ইজলী প্রমুখ একজন ছিকাহ রাবী হিসাবে তাঁহার প্রত্যয়ন করিয়াছেন। অবশ্য তিনি ছিলেন স্বল্প সংখ্যক হাদীছের রাবী। ইমাম আল-বুখারী (র), আবূ দাউদ (র) ও ইব্ন মাজা তাঁহাদের হাদীছ গ্রন্থে তুফায়ল বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানীর স্তর বিন্যাস অনুযায়ী তিনি দ্বিতীয় স্তরের রাবী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আস্‌কালানী, তাহ্‌যীবুত-তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৩; (২) ঐ লেখক, তাক্‌রীবুত-তাহযীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭; (৩) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জার্‌হ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭১/১৯৫২, ৪খ, ৪৮৯, ৪৯০; (৪) ইব্ন হিব্‌বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৪খ, ৩৯৭; (৫) মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্‌মা'ঈল আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/২খ, ৩৬৫।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তুফায়ল ইব্ন মালিক (طفيل بن مالك) ঃ (রা), ইব্ন খান্‌সা' ইব্ন সিনান ইব্ন 'উবায়দ আল-আনসারী। একজন আনসারী সাহাবী। মদীনার খাযরাজ গোত্রে জন্ম। জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। মাতার নাম আসমা' বিনতু'ল-কায়ন। তুফায়ল (রা) 'আকাবার শপথানুষ্ঠানে হাযির ছিলেন। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হন। 'আবদুল্লাহ ও রুবায়্যি' নামে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল, যাহাদের মাতার নাম ছিল ইদাম বিন্‌ত কুরত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭হি., ৩খ, ৫৫-৫৬; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা.বি., ৩খ, ৫৭২; (৩) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৭৬, সংখ্যা ২৯১৪; (৪) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২২৬, সংখ্যা ৪২৫৫।

ড. আবদুল জলীল

তুফায়ল ইব্ন যায়দ (طفيل بن زيد) ঃ (রা), বানু'ল হারিছ গোত্রীয় একজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মা'মূন ইব্ন মু'আবিয়া নামক প্রখ্যাত জ্যোতিষীর নিকট তিনি তাঁহার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন। তুফায়ল (রা) বলেন, একটি বাজ পাখি প্রত্যহ মা'মূনের নিকট আসিত এবং জনসমক্ষে তাঁহার সামনে বসিয়া ডাকিতে থাকিত। এই সময় মা'মূন নানা ভবিষ্যদ্বাণী করিত, যাহা ঠিক ঠিক হইত। ধর্মবিশ্বাসে সে ছিল 'ঈসাঈ (খৃস্টান)। একবার শুক্রবার দিন প্রভাতকালে পাখিটি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মা'মূন মজলিসে বাহির হয় নাই। পাখীটি ছটফট করিতে লাগিল। যখন সূর্য বেশ উপরে উঠিল তখন মা'মূনকে মজলিসে দেখা গেল। অভ্যাসমত সে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে লাগিল। এক পর্যায়ে সে একজন নবীর আবির্ভাবের কথা বলিল এবং তাহার বিভিন্ন লক্ষণ ও 'আলামতের কথাও উল্লেখ করিল। অতঃপর আক্ষেপ করিয়া বলিল, হায়! আমি যদি তাঁহার সাক্ষাত লাভ করিতাম! আমার জন্ম যদি তাঁহার পূর্বে না হইত! ইহার বহুদিন পরে একদিন তুফায়ল ইব্ন যায়দ আরও অনেকের সাথে তিহামায় ছিলেন। এমনি মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাব সংবাদ লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, ওহে! এই তো সেই নবী যাঁহার সম্পর্কে মা'মূন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। তুফায়ল (রা) বলেন, এই দিন অপেক্ষা অধিক প্রিয় দিন আমার নিকট আর নাই। 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা) তাঁহার খিলাফাতকালে মজলিসের লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যিনি জাহিলিয়্যাতের যুগে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে কোনও সংবাদ লাভ করিয়াছিলেন? তখন তুফায়ল ইব্ন যায়দ আল-হারিছী (রা) তাঁহার উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। এই সময় তুফায়ল (রা)-এর বয়স হইয়াছিল এক শত ষাট বৎসর। ইবনু'ল-কালবী ও আবূ মূসা এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২২৪; (২) আয-যাহাবী, তাজরীদু আস্‌মাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৭৬; (৩) ইবনু'ল-আছীর আল-জাযারী, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫৩।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তুফায়ল ইব্ন সাখ্‌বারা (طفيل بن سخبره) ঃ (রা), বানুল আয্‌দ গোত্রীয় সাহাবী। 'আ'ইশা (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। তাঁহার

পিতার নাম 'আবদুল্লাহ। সাখবারা তাঁহার পিতামহ কিংবা প্রপিতামহ (যদি আল-হারিছ তাঁহার পিতামহ হয়)। কেহ কেহ তাঁহাকে তুফায়ল ইবনু'ল-হারিছ হিসাবেও উল্লেখ করেন। সাখবারা-এর বংশতালিকা নিম্নরূপ ঃ সাখবারা ইব্ন জারছুমাতু'ল-খায়র ইব্ন 'আদিয়্যি ইব্ন মুররা ইবনু'ল-আওস ইব্নুন নামির ইব্ন 'উছমান আল-আয্দী। 'আবদুল্লাহ ইসলাম-পূর্বকালে মক্কায় আগমন করেন। তখন আবূ বাক্র (রা)-এর সহিত তিনি মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং এই সূত্রেই তাঁহার বংশধরগণ কুরায়শী বলিয়া পরিচিত। তুফায়ল (রা)-এর জন্মের পর তাঁহার পিতা 'আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। অতঃপর তাঁহার জন্য উম্মু রূমান হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আসেন। তুফায়ল ইব্ন সাখ্বারা নামে আরও এক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যাঁহার সূত্রে ইমাম যুহ্রী হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি সাহাবী নহেন ঃ اعظم النساء بركة ايسر مونة (বরকতের হিসাবে মহত্তম নারী হইল ব্যয়ভার বহনে সহজতর নারী) হাদীছটি সম্ভবত এই তুফায়ল হইতেই বর্ণিত, যিনি হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন আল-কাসিম হইতে এবং তিনি হযরত 'আইশা (রা) হইতে (দ্র. আল-ইসাবা, ২খ, ২২৪)। ইব্ন মাজা, হাকিম প্রমুখ আলোচ্য তুফায়ল (রা)-এর সূত্রেও একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রখ্যাত তাবি'ঈ রিব'ঈ ইব্ন খিরাস (র) তুফায়ল ইব্ন সাখ্বারা (রা)-র সূত্রে হাদীছটি এইরূপ বর্ণনা করেন, "তিনি একবার স্বপ্নযোগে একদল নাসারা-র সাক্ষাত পান। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিল, আমরা নাসারা। তিনি বলিলেন, তোমরা কতই না ভাল সম্প্রদায় ছিলে, যদি মাসীহ ('আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র না বলিতে! তাহারা বলিল, তোমরাও উত্তম সম্প্রদায় ছিলে যদি না তোমরা বলিতে ما شاء الله وشاء محمد (আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন এবং মুহাম্মাদ যাহা ইচ্ছা করেন)। অতঃপর একদল য়াহূদীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? তাহারা উত্তর দিল, আমরা য়াহূদী। তিনি বলিলেন, তোমরা কত উত্তম সম্প্রদায় ছিলে, যদি না হযরত 'উযায়র ('আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলিতে! তাহারা বলিল, তোমরাও উত্তম সম্প্রদায় ছিলে, যদি না ما شاء الله وشاء محمد বলিতে। তুফায়ল (রা) এই স্বপ্নের কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ব্যক্ত করিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহা কি আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপনের পর সাহাবীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ তোমাদের এই ভাই স্বপ্নযোগে কি দর্শন করিয়াছে তাহা শুনিয়াছ। সুতরাং তোমরা আর ما شاء الله وما شاء محمد বলিও না; বরং বলিও ما شاء الله وحده لا شريك له (শরীকহীন এক আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ২খ, ২২৪; (২) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতীআব (আল-ইসাবা, ২খ, ২২৯-এর টীকা দ্র.); (৩) আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী, আল-মুস্তাদরাক, বৈরূত ১৪০৬/ ১৯৮৬, ৩খ, ৪৬২, ৪৬৩; (৪) আয-যাহাবী, আত-তালখীস (আল-মুসতাদরাক, ২খ, ৪৬৩-এর টীকা দ্র.); (৫) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহ্যীব, বৈরূত ১৪০৪/১৯৮৪, ৫খ, ১৩, ১৪; (৬) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ১৫৭; (৭) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮৪/ ১৯৬৪, ২/২খ, ৩৬৩, ৩৬৪; (৮) ইব্ন হিব্বান, কিতাবু'ছ-ছিকাত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৯৭/১৯৭৭, ৩খ, ২৩৩; (৯) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত তা.বি., ১খ, ২৭৬; (১০) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫৩, ৫৪।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তুফায়ল ইবনুন-নু'মান (طفيل بن النعمان) ঃ (রা) আল-আনসারী, একজন আনসারী সাহাবী। মদীনার প্রখ্যাত খাযরাজ গোত্রের শাকখা বানূ সালামায় জন্ম। জন্মতারিখ অজ্ঞাত। মাতার নাম খানসা' বিন্ত রি'আব, যিনি ছিলেন হযরত জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন রি'আব (দ্র.)-এর ফুফু। তুফায়ল (রা) -এর বংশলতিকা হইল ঃ আত-তুফায়ল ইবনু'ন-নু'মান ইব্ন খানসা' ইব্ন সিনান ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন 'আদী ইব্ন গানম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালামা ইব্ন 'আম্ম আল-মাদী আল-আনসারী আস-সালামী। কোনও কোনও সীরাতবিদ তাঁহাকে ও আত-তুফায়ল ইব্ন মালিক (রা)-কে একই ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ে ভিন্ন দুই ব্যক্তি। সর্বসম্মত বর্ণনামতে তিনি 'আকাবার বায়'আত অনুষ্ঠানে শরীক ছিলেন। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি দেহের ১৩টি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এতদসত্ত্বেও তিনি জীবনে বাঁচিয়া যান এবং পরে খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। ওয়াহশী ইব্ন হারব (দ্র.) তাঁহাকে শহীদ করেন। ওয়াহশী পরবর্তী কালে বলিতেন, আল্লাহ তা'আলা হামযা ইব্ন 'আবদি'ল-মুত্তালিব ও তুফায়ল ইবনু'ন-নু'মানকে আমার হাতে মর্যাদাবান করিয়াছেন আর তাঁহাদের হাতে আমাকে অপদস্থ করেন নাই অর্থাৎ আমি কাফির অবস্থায় নিহত হই নাই। রুয়ায়্যি' নামে তাঁহার এক কন্যা ছিলেন, যাঁহার মাতার নাম ছিল আসমা' বিন্ত কুরত। তাঁহাকে আবূ য়াহ্য়া 'আবদুলাহ ইব্ন 'আবদ মানাফ বিবাহ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২২৬, সংখ্যা ৪২৫৭; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৫৬; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫৭৩; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ২খ, ৭৬২-৭৬৩, সংখ্যা ১২৭৫; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৭৬, সংখ্যা ২৯১৬।

ড. আবদুল জলীল

তুফায়ল ইবনুল-হারিছ (طفيل بن الحارث) ঃ (রা), ইবনু'ল-মুত্তালিব ইব্ন 'আবদ মানাফ আল-কুরাশী, একজন মুহাজির সাহাবী। মক্কার সমভ্রান্ত কুরায়শ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, অজ্ঞাত জন্মতারিখ। তাঁহার মাতার নাম সুখায়লা বিন্ত খুযা'ঈ আছ-ছাকাফিয়্যা। মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার-এর বর্ণনামতে হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মুনযির ইব্ন মুহাম্মাদ-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে সুফয়ান ইব্ন নাসর-এর সহিত তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে বেশ কিছু হাদীছও বর্ণিত আছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে তিনি ৩২/৬৫২ সালে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭০ বৎসর। মতান্তরে তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৩১ কিম্বা ৩৩ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২২৪, সংখ্যা ৪৩৪৭; (২) ইবনুল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৫২; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫২; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা. বি., ২খ, ৭৫৬, সংখ্যা

১২৭১; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত, তা. বি., ১খ, ২৭৬, সংখ্যা ২৯০৮।

ড. আবদুল জলীল

তুফায়লী (طفيلى) ঃ "পরজীবী, গলগ্রহ", আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষার অধিকাংশ য়ূরোপীয় অভিধানে, যেমন Belot, Ghaffarow, Sami-bey প্রভৃতিতে শব্দটির এই অর্থই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা শব্দটির সঠিক অর্থের দ্যোতনা দেয় না, যে ব্যক্তি বিনা আমন্ত্রণে বা আমন্ত্রিত ব্যক্তির সঙ্গী হিসাবে কোন ভোজে অংশগ্রহণ করে শব্দটি প্রথমত সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কথ্য ফারসী ভাষায় অপেক্ষাকৃত নীচ শ্রেণীর পরজীবী কুফায়লী নামে আখ্যায়িত হয়– শব্দটি তুফায়লীর গলগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আরবী ভাষার বিশ্বকোষ লিসানু'ল-'আরাব (১৩খ, ৪২৯) ও তাজু'ল-'আরূস (৭খ, ৪১৮) অনুযায়ী তুফায়ল শব্দটি কূফার অধিবাসী তুফায়লু'ল-আ'রাস (অতিভোজী তুফায়ল) হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সে বিন্য আমন্ত্রণে সকল ভোজে যোগদান করিত এবং এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশে অভ্যস্ত ছিল যে, কুফা একটি ভাণ্ডের ন্যায় যাহার অভ্যন্তরস্থ কোন কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়ায় না। এই তুফায়ল নাম হইতে আরবী ক্রিয়া তাফ্ফালা বা তাতাফ্ফালা "তুফায়লের ন্যায় আচরণ করা" উদ্ভূত। সে উমায়্যাদের শাসন আমলে বাস করিত এবং বানূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন গাতাফান গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইবনু'স-সিক্কীতের (মৃ. ২৪৪/৮৫৮) সময় হইতে তাহার কাহিনী প্রচলিত।

তুফায়লরূপে শব্দটির (ফারসীতে) "পূরক, জিনিসের দর-কষাকষি, পরিত্যক্ত বস্তু" প্রভৃতি বিশেষ অর্থ আছে। হাফিজ তাঁহার অন্যতম এক গীতি কবিতায় বলেন, "সকল মানব ও পরী প্রেমের বিদ্যমানতা স্বাভাবিক ফল (তুফায়ল)।"

হিন্দুস্তানী ভাষায় (তু. Shakespear, A.Dict. Hind and Engl., p. 1436, তুফায়ল 'উপায়ে, মাধ্যমে, কল্যাণার্থে" প্রভৃতি অর্থে ক্রিয়া বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

V. Minorsky (E.I.[1]) আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তুবায়' ইব্ন 'আমির (تبيع بن عامر) ঃ (র), বিখ্যাত তাবি'ঈ ও মুহাদ্দিছ। বানু'ল-হিম্য়ার গোত্রের লোক ও শামের অধিবাসী। কা'ব আল-আহবার (রা) তাঁহার বিপিতা। তাঁহার সাতটি উপনাম পাওয়া যায়, যথা আবূ 'উবায়দা, আবূ 'উবায়দ, আবূ 'উতবা, আবূ আয়মান, আবূ হিময়ার, আবূ গুতায়ফ ও আবূ 'আমির। তবে প্রথমোক্ত উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিত। জাহিলী যুগে তুবায়'-এর জন্ম। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাতও লাভ করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর রাহবার ছিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি ইহাতে সাড়া দেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর হযরত আবূ বাক্র আস-সিদ্দীক (রা) মতান্তরে 'উমার আল-ফারূক (রা)-এর আমলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন (সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', ৪খ, ৪১৩)। তুবায়' পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখিতেন। ইহার সিংহভাগই তিনি কা'ব আহবার হইতে সংগ্রহ করেন। তিনি প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিছ মুজাহিদ (র)-এর নিকট আল-কুরআনু'ল-কারীমের শিক্ষা লাভ করেন। অপরদিকে মুজাহিদ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেন। জিহাদের ময়দানে তাঁহারা দুইজন একসঙ্গে থাকিতেন। কা'ব আল-আহবার (রা) ও হযরত আবু'দ-দারদা' (রা)-এর সূত্রে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে আয়মান (র), হুসায়ন ইব্ন শুফায়্য (র), আতা ইব্ন আবী রাবাহ (র), মুজাহিদ (র), মু'আয ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন হাবীব (র), হাকীম ইব্ন 'উমায়র (র) ও হায়্যান আবু'ন-নাদ্র উল্লেখযোগ্য। ইমাম আল-বুখারী (র) বলেন, বিভিন্ন দেশের বহু মুহাদ্দিছ তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। মুহাম্মাদ হিমস নিবাসী মুহাদ্দিছবৃন্দের তালিকায় তাঁহার নাম প্রথম স্তরে উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ তাঁহার নাম শামনিবাসী মুহাদ্দিছগণের দ্বিতীয় স্তরে স্থান দিয়াছেন। হুসায়ন ইব্ন শুফায়্য বলেন, আমি একদা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা)-এর মজলিসে উপবিষ্ট। এমনি মুহূর্তে সেইখানে তুবায়' ইব্ন 'আমিরের আগমন হয়। 'আবদুল্লাহ (রা) বলিলেন, তোমাদের কাছে আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর শুভাগমন হইয়াছে। অতঃপর বলিলেন, হে তুবায়! আমাদেরকে বলুন সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি জিনিস কি? তিনি বলিলেন, সত্যাশ্রয়ী রসনা, আল্লাহ্ভীরু অন্তর ও সতীসাধ্বী স্ত্রী। ইমাম আন-নাসাঈ (র) তাঁহার সূত্রে উযূ সম্পর্কে একটি মাওকূফ হাদীছ (কা'ব আল-আহবারের উক্তি) উদ্ধৃত করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে এবং উহা দ্বারা 'ইশার পর পরিপূর্ণভাবে রুকূ'-সিজদা আদায় ও পূর্ণ অভিনিবেশযুক্ত তিলাওয়াতের সহিত চার রাক'আত সালাত আদায় করে, সে লায়লাতু'ল-কাদ্রে 'ইবাদতের সমান ছাওয়াব পাইবে। তুবায়' ইব্ন 'আমির হি. ১০১ সালে ইসকান্দারিয়ায় ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহ্যীবু'ত তাহযীব, বৈরূত ১৪০৪/ ১৯৮৪, ১খ, ৪৪৬; (২) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহ্যীব, লাহোর ১৪০৬/১৯৮৫, পৃ. ৪৯; (৩) ঐ লেখক, আল-ইসাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১৮৯; (৪) ইব্ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়া'ত-তা'দীল, বৈরূত ১৩৭২/১৯৫২, ১খ, ৪৪৭; (৫) আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা', বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৪খ, ৪১৩, ৪১৪; (৬) ইব্ন 'আসাকির, তা'রীখু দিমাশ্ক, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৭, ৩খ, ২৫৭; (৭) আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৮২/১৯৬২, ২/১খ, ১৫৮।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তুমান, তুমান (تومان، تمن) ঃ তুর্কী শব্দ, মূল উচ্চারণ তূমেন, তবে সাধারণত তূমান লিখিত হয়। প্রথমে অস্পষ্টভাবে "অনেক" অর্থে ব্যবহৃত হইত, পরে দশ হাজার-এর সংখ্যাবাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। তুর্কী সংখ্যা সর্বপ্রথম G. Ramstedt চীনাদের নিকট হইতে ব্যাখ্যা করেন (I.S. F. Ou., ২৪খ, ২২) এবং পরবর্তী কালে N. Mironov (Zap, ১৯, ২৩) তোখারীদের নিকট হইতে ব্যাখ্যা করেন (তমাম বা তমান, দশ হাজার)। মাহমূদ কাশগারী (১খ, ৩৩৭) এখনও তুর্কী শব্দটিকে একমাত্র উহার অনির্দিষ্ট অর্থেই জানেন। তাঁহার মতে তূমেন তুরলুক (Tumen Turluk) অর্থ "অতিশয় বিভিন্ন", তুমেন মিং (Tumen ming) অর্থ ১০,০০০×১,০০০=১ কোটি নহে, বরং ১,০০০×১,০০০= ১০,০০,০০০। তুমান শব্দটি "দশ হাজার" অর্থে সর্বপ্রথম মোঙ্গল যুগে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয়। সৈন্যবাহিনীর ডিভিশন হিসাবে ১০,০০০ সৈন্য লইয়া তুমেন গঠিত (N.E., ১৪/১, ২৮০)। কোন কোন সময় তুমেন শব্দ ইল্ (গোত্র) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আঞ্চলিক একক হিসাবে তুমেন এইরূপ এলাকা ছিল বলিয়া কথিত যেইখান হইতে ১০,০০০ যোদ্ধার সরবরাহ পাওয়া যাইত (যেমন ইব্ন 'আরাবশাহ, 'আজা'ইবুল মাকদূর, কায়রো ১২৮৫ হি., পৃ. ১৭)। ইহাকে কদাচিৎ সঠিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কেননা

তুমেন ছিল ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক বা কর এলাকা। যে কোন আয়তনের প্রতিটি প্রদেশ (বিলায়েত) বহু সংখ্যক তুমেনে বিভক্ত ছিল, যেমন সামারকন্দ প্রদেশে সাতটি তুমেন ছিল। ইহা ধারণা করা কষ্টকর যে, একমাত্র এই প্রদেশটিই ৭০,০০০ যোদ্ধার যোগান দিত। এই অর্থেই (ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক এককের নাম হিসাবে) তুমেন শব্দ মোঙ্গল শাসনামলে পারস্যে (যেমন পারসিক ইরাক ৯টি তুমেনে বিভক্ত ছিল, G. M.s., ২৩/১খ, ৪৭) এবং ফারগানা [দ্র.] ব্যতীত সাবেক রাশিয়ান তুর্কিস্তানে ব্যবহৃত হইত। তুর্কিস্তানে এইরূপ ব্যবহার (তুমেন কোন কোন সময় বিলায়েত-এর পরিবর্তেও ব্যবহৃত হইত) রুশ শাসনের প্রথম দুই দশকেও, বুখারা [দ্র.]-র খানের রাজ্যে এবং আরও পরে ১৯২০ খৃ. সনের বিপ্লবের পর বুখারা প্রজাতন্ত্রে প্রচলিত ছিল। কর আরোপযোগ্য সমগ্র পল্লীর জনগণকে কখনও কখনও তুমেন নামে অভিহিত করা হইত (তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. Ross, ৩০১)। পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারীদেরকে যাহারা ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে, কখনও কখনও পল্লীবাসীদের হইতে পার্থক্য করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সামারকান্দে শায়বানী খান [দ্র.] কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসায় অধ্যয়নকারী তুমেন ও পার্বত্য এলাকার (কূহিস্তান) ছাত্রদের (তুল্‌লাব) মধ্যে ওয়াকফ-নামায় পার্থক্য করা হইয়াছে।

অর্থ গণনার ক্ষেত্রে মোঙ্গল শাসনামলে তুমেন বা তুমান ১০,০০০ দীনার ছিল। মোঙ্গল সাম্রাজ্য হইতে সৃষ্ট তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রেরঃ পারস্য, গোল্ডেন হোর্ড ও চাগাতাই লাইন, প্রতিটিতে ছোট (পারস্যে গাযান খান [দ্র.]-এর আমলে দিরহাম ২.১৫ গ্রাম=৩৩.১ গ্রেইন, পরবর্তীকালে আরও ছোট) ও বড় রৌপ্য (দীনার=৬ দিরহাম) মুদ্রা প্রবর্তিত ছিল; বড় বড় অঙ্কের অর্থ ১০,০০০ দীনার বা ৬০,০০০ দিরহামের একেক তুমানরূপে গণনা করা হইত [দ্র. হামদুল্লাহ কাযবীনী কর্তৃক প্রদত্ত রূপান্তরের হিসাব, G.M.S., ২৩/১খ, ২৯); ১২,৮০,০০,০০০ দিরহাম= ২,১৩৩ তুমানের কিছু বেশি (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. W. Barthold, persidskaya nadpis' na stienie Aniyskoi meceti Manuce, St. Petersburg ১৯১১ খৃ., পৃ. ১৫) তীমূর ও তীমূর বংশীয়দের আমলেও ১০,০০০ দীনারের তুমান হিসাবে গণনা করা হইত। তুর্কিস্তানে এই দীনারকে কেবেক খানের নাম অনুসারে কেবেকী বলা হইত (N.E., ১৪/১খ, ৭৪; আরও দ্র. চাগাতাই খান শীর্ষক প্রবন্ধ)। পরবর্তী কালে তুর্কিস্তানে সাময়িকভাবে তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং তাহাও দীনার ও তুমান হিসাবে গণনা করা হইত। উদাহরণস্বরূপ, বাবুরের হিসাবমতে (সম্পা. Beveridge, ৫৬খ) হিসার প্রদেশের সৈন্যদের খাদ্য বাবদ ব্যয় ধরা হইয়াছিল ১,০০০ তুমান তাম্র মুদ্রা (ফুলুস)। উপরে বর্ণিত ওয়াক্‌ফনামা অনুসারে ৬ তাম্র মুদ্রা এক দীনারের সমান ছিল; ২০ দীনার এক রৌপ্য মিছকাল (প্রায় ৬৬.৩ গ্রেই=৪.৩ গ্রাম)-এর সহিত বিনিময় করা হইত।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে পারস্যে তুমান শব্দটি দ্বারা পূর্বের তুলনায় অনেক অল্প পরিমাণ অর্থ বুঝান হইত। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে Raphael du Mans তুমানের মান ৪০ ফরাসী ফ্রাঙ্কের সমান বলিয়া উল্লেখ করেন (P.E.L.O.V, ২, খণ্ড ২০, পৃ. ১৮৩)। Sir Thomas Herbert (১৬৩০ খৃ.) ও Fryer (১৬৭৭ খৃ.) তুমানের মান ইংরেজী মুদ্রায় ৩, ৬, ৮ পাউণ্ডের সমান বলিয়া উল্লেখ করেন। স্বর্ণ মুদ্রা হিসাবে তূমান সর্বপ্রথম ফাতহ 'আলী শাহ কাজার কর্তৃক ১২১২/১৭৯৭ সালে প্রবর্তিত হয়। প্রথমে ইহার ওজন ছিল ৯৫ গ্রেইন (৬.১৬ গ্রাম), পরে ৭০ গ্রেইন (৪.৫ গ্রাম) ও আরও পরে ৫৩ গ্রেইন (৩.৪ গ্রাম)-এ ইহার ওজন হ্রাস করা হয়। নাসিরু'দ-দীনের আমলে, যিনি কিছু সংখ্যক বড় আকারের স্বর্ণের দশ তুমান মুদ্রা চালু করিয়াছিলেন, তুমান দশ ক্রান বা ১০,০০০ দীনারের সমান ছিল। দীনার এই সময় কোন মুদ্রা ছিল না, বরং অতি ক্ষুদ্র মূল্যমানের অর্থের হিসাব ছিল মাত্র। আহমাদ শাহ্-এর শাসনকাল পর্যন্ত তুমান স্ট্যাণ্ডার্ড স্বর্ণ মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল; কিন্তু নূতন রাজবংশ উহাকে বাতিল ঘোষণা করে এবং ২৯ গ্রেইন (১.৮৮ গ্রাম) ওজনবিশিষ্ট পাহলাবী উহার স্থান দখল করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধগর্ভে উল্লিখিত বরাতসমূহ ছাড়া অভিধান (Freytag, Vullers, Radloff) দ্র. অবশ্য ইহা এই প্রসঙ্গে অতি ত্রুটিপূর্ণ।

W. Barthold (E.I. [1])/মু. আবদুল মান্নান

(শাহ) তুর্‌কান শাহীদ (شاه ترکان شهید) ঃ বঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে অথবা পরে যেই সকল মহান সূফী তাপস ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আগমন করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিংবদন্তী ব্যতীত ঐতিহাসিক সূত্রে বিশেষ কিছুই অবহিত হওয়া যায় না। তাঁহাদের মাযারই তাঁহাদের অস্তিত্বের সাক্ষী। প্রাথমিক যুগের ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তুর্‌কান শাহীদ নামে তিনজন মুজাহিদ সূফী সাধকের নাম বিভিন্ন সূত্রে অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন তুরকান শাহীদের মাযার পশ্চিম বঙ্গে ইংরাজআবাদের সন্নিকটে, দ্বিতীয়জনের মাযার উত্তর বঙ্গের বগুড়া জিলায় এবং তৃতীয়জনের মাযার রাজশাহী শহরে অবস্থিত। এই তিনজন মুজাহিদ ইসলাম প্রচারকের প্রকৃত নাম-পরিচয় অজ্ঞাত, তবে তাঁহারা "তুর্কমান শহীদ" নামে পরিচিত হওয়ায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তুর্কিস্তান বা তুরস্ক হইতে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় ইসলাম-বিদ্বেষী হিন্দু সামন্ত রাজার সহিত সংঘর্ষে শহীদ হন। সায়্যিদ ইলাহী বাখ্‌শ আল-হুসায়নীর বর্ণনামতে, ইংরাজ আবাদ হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে তুর্‌কান শাহীদ নামে স্থানীয় জনগণের নিকট আখ্যাত জনৈক সূফী সাধকের মাযার অবস্থিত। সম্ভবত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকেই তিনি এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন। তবে কেহ কেহ ধারণা করেন যে, তিনি প্রখ্যাত সূফী সাধক ও ইসলাম প্রচারক শায়খ আঁখী সিরাজু'দ-দীন 'উছমান (মৃ. ৭৪৩/১৩৬৭)-এর সমসাময়িক ছিলেন (খুরশীদ-ই জাহাননু'মা, পৃ. ৬৭৮; 'উবায়দু'ল-হাক, তাযকিরা-ই আওলিয়া-ই বাঙ্গালা, ১খ, হামীদিয়া লাইব্রেরী, ফেনী তা. বি., পৃ. ৯৮)। মাযারের অদূরেই এই সাধকের চিল্লাখানা (নিভৃত সাধনা স্থান) অবস্থিত।

বগুড়া জিলার তুরকান শাহীদ (ترکان شهید) সম্পর্কেও ধারণা করা হয় যে, গৌড়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক দিকে তিনি তুরস্ক হইতে এতদ্দেশে আগমন করেন এবং বগুড়ায় আস্তানা স্থাপন করিয়া ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। স্থানীয় জনৈক প্রতাপশালী হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। যুদ্ধে তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়– তাঁহার শির এক স্থানে এবং ধড় (দেহ) অন্য স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়। ভক্তগণ তাঁহার শির যেই স্থানে দাফন করেন উহা "শির মোকাম" নামে এবং অবশিষ্ট দেহ যেই স্থানে দাফন করেন উহা "ধড় মোকাম" নামে পরিচিত। করতোয়া নদীর অদূরে শেরপুরে এই শহীদ মুজাহিদ সাধকের উপরোক্ত দুইটি মাযারই অবস্থিত।

উইলিয়াম হান্টারও এই যুগে "তুর্কান শহীদ" নামক জনৈক সূফী সাধকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (আব্দুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮০ খৃ, পৃ. ৯৬)।

তুরকান শাহীদ নামে অভিহিত অন্য একজন ইসলাম প্রচারক মুজাহিদ সূফী সাধকের মাযার রাজশাহী শহরের পদ্মা নদীর তীরে দরগাহ্ পাড়া নামক মহল্লায় রাজশাহী সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কথিত আছে যে, তিনি হযরত মাখদূম শাহ রূপোশের রাজশাহী আগমনের দশ বৎসর পূর্বে (আনু. ৬৮৭ হি.) তুরস্ক হইতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং তৎকালে মহাকাল গড় নামে পরিচিত বর্তমান রাজশাহী শহর অঞ্চলে ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারে ব্রতী হন। মহাকাল গড়ের তদানীন্তন পরাক্রমশালী নিষ্ঠুর শাসক দেবরাজ দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তদনির্মিত মন্দিরে নির্দিষ্ট দিনে নরবলি দিত। ভীত-সন্ত্রস্ত অসহায় জনগণ এই নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ করিতেও সক্ষম ছিল না। সম্ভবত এই নিষ্ঠুর প্রথার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে স্বীয় পীরের নির্দেশে শাহ তুরকান মহাকাল গড়ে আগমন করেন এবং ইসলামের মানবতাবাদ, শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী জনগণের নিকট প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া বহু হিন্দু ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইহাতে দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তুরকান শাহকে গ্রেফতার করিয়া মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে বলি দিবার সংকল্প করে। কিন্তু ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহাকে জনগণের অগোচরে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করা হয় এবং পথিমধ্যে তাঁহার লাশ ফেলিয়া রাখা হয়। পরে ভক্তগণ গোপনে এই মহান শহীদের মৃতদেহ অপসারণ করিয়া বর্তমান স্থানে দাফন করেন। সম্ভবত শাহ তুরকান শাহীদ খৃ. ১২শ শতকের শেষভাগে এই অঞ্চলে আগমন করেন এবং তিনিই রাজশাহী সদরে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাদিক শিবলী জামান, বাংলাদেশের সূফী সাধক ও অলী আওলীয়া, রহমানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ., ১৬২-৬৩; (২) মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ফেনী ১৩৮৯/১৯৬৯, পৃ. ২৮৪।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ুব আলী

আত-তুরতূশী (الطرطوشي) ঃ মুহাম্মাদ ইব্নু'ল ওয়ালীদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন খালাফ ইব্ন সুলায়মান আল-কুরাশী, আল-ফিহরী, আল-আন্দালুসী, আত-তুরতূশী। উপনাম আবূ বাক্র এবং সাধারণত ইব্ন আবী রানদাকা (রুনদীকা) (ابن ابى رندقة) নামে পরিচিত। মালিকী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ! আন্দালুস (মুসলিম স্পেনে)-এর তুরতুশা (طرتوشة) নামক শহরে ৪৫১/১০৫৯ সালে জন্ম। শায়খ আবু'ল-ওয়ালীদ আর-রাযীর নিকট হাদীছ ও ফিক্হ অধ্যয়ন করিয়া ইজাযা (সনদ) লাভের পর শিক্ষা সফরে প্রাচ্যে গমন করেন। হজ্জ পালনের পর তিনি বাগদাদ যান এবং তথায় আবূ বাক্র আশ-শাশী, শায়খ ইব্ন সা'ঈদ মুতাওয়াল্লী ও শায়খ আবূ সা'ঈদ আল-জুরজানী ও শাফি'ঈ মাযহাবের অন্যান্য বিজ্ঞ 'আলিমের নিকট ফিক্হ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। অবশেষে বসরা নগরীতে তিনি শায়খ আবূ 'আলী আত-তূসতারীর নিকট হাদীছ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর তিনি কিছুকাল সিরিয়ায় শিক্ষাদান কার্যে অতিবাহিত করেন। তথা হইতে তিনি আল-ইস্কান্দারিয়া (আলেকজান্দ্রিয়া) গমন করিলে সেই স্থান হইতে বহিষ্কৃত হন। অতঃপর মিসরের প্রাচীন শহর ফুসতাত গমন করেন এবং প্রতিকূল পরিবেশ ও কর্তৃপক্ষের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ফুস্তাতে অবস্থান করিয়া অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনায় তিনি জীবন অতিবাহিত করেন।

শায়খ আত-তুরতূশী হাদীছ, ফিক্হ, উসূল ও আরবী ভাষায় প্রথিতযশা 'আলিম ছিলেন। শারী'আতের নির্দেশাবলী তিনি কঠোরভাবে পালন করিয়া চলিতেন। ধর্মপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, কৃচ্ছ্রসাধনা, অল্পে তুষ্টি, অমায়িক আচার-আচরণ তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। খালাফিয়া (মাযহাব বিরোধী) সম্প্রদায় ও প্রচলিত শির্ক ও বিদ্'আতের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করিয়াছেন। সম্ভবত এই কারণেই কর্তৃপক্ষ তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্র ও ওয়া'জ মাহফিলে জনগণকে সমবেত হইতে নিষেধ করিতেন। এতদসত্ত্বেও তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর ভিড় অব্যাহত ছিল। তাঁহার শিক্ষাকেন্দ্রটি আবাসিক ধরনের ছিল। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কোনও কোনও সময় ৩৬০-এর অধিক হইত। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন আবূ বাক্র ইবনু'ল-'আরাবী, আবূ 'আলী আস-সাদাফী ও ইব্ন তুমারত। জনগণের নিকট হইতে দানস্বরূপ প্রাপ্ত সকল অর্থ-সম্পদ তিনি শিক্ষার্থীদের বাবত ব্যয় করিতেন।

বহু ধন-সম্পদ তাঁহার হস্তগত হইলেও স্বীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উহা ব্যয় না করিয়া জনগণ ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণে উহা মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন। পার্থিব ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসা পরিহারের জন্য তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপার একই সঙ্গে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ আখিরাতের ব্যাপারটি গ্রহণ করিও, তাহা হইলে ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই তোমার জন্য কল্যাণকর হইবে। এই মহান 'আলিম সাধকের মর্মস্পর্শী ওয়া'জ শ্রবণে বিগলিতচিত্ত শ্রোতৃগণ ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিত না।

শায়খ আত-তুরতূশী ফিক্হ, উসূল ও বিদ'আত বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে কয়েকখানা গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হইল ঃ (১) তা'লীকাত ফী মাসাইলি'ল-খিলাফ; (২) ফী উসূলি'ল ফিক্হ; (৩) কিতাব ফি'ল-বিদ'ই ওয়া'ল-মুহদাছাত; (৪) কিতাব ফী বিররি'ল-ওয়ালিদায়ন; (৫) সিরাজু'ল-হুদা; (৬) সিরাজু'ল-মুলূক; (৭) কিতাবু'ল-ফিতান; (৮) তাহরীমু'ল-ইসতিম্না'; (৯) ছা'লাবীর তাফসীরের সারসংক্ষেপ। ৬৯ বৎসর বয়সে ৫২০/১১২৬ সালে তিনি আল-ইসকান্দারিয়্যা শহরে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে তথায় দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ২খ, ২৯৩-৫, ক্রমিক নং ৫৭৭; (২) আশ-শাজারাতু'য-যাকিয়্যা, পৃ. ১২৪; (৩) ইব্ন তাগরীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা, ৫খ, ২৩১; (৪) 'আবদুল্লাহ মুসতাফা আল-মারাগী, আল-ফাতহু'ল-মুবীন ফী তাবাকাতি'ল-উসূলিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ২খ, ১৭-৮।

ডঃ এ. কে. এম. আইয়ূব আলী

তুরফান (طرفن) ঃ সাধারণত তুরফান (طرفان) লেখা হয়। স্থানীয় উচ্চারণ তুরফান। চীনা তুর্কিস্তানের একটি শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিম্নে অবস্থিত লুকচুন (Lukcun) নিম্নভূমি ও থিয়ান-শান (Thian-Shan) অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। পানির স্বল্পতা সত্ত্বেও এই উর্বর মরূদ্যানটি প্রাচীন কাল হইতে চীন ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন কাল ও মধ্যযুগের প্রথমদিকে যেই সকল বসতির উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি ছিল আধুনিক তুরফানের পশ্চিম ও উত্তরে। খৃ. পূ. ২য় শতাব্দীতে এইখানে কু-শি (Ku-Shi) রাজ্য ছিল। খৃ. পূ. ৬০ সালে চীনারা ইহাকে ধ্বংস করে এবং তুরফান অঞ্চলে পূর্ববর্তী কূ-শিসহ আটটি রাজ্যের উদ্ভব হয়। ইহার রাজধানী ছিল একটি নগরী যাহাকে চীনারা কিয়াওহো (Kiaoho) নামে অভিহিত করিত। তুরফান হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে Klementz কর্তৃক প্রদত্ত য়ারখুতু (yarkhoto) নামক স্থানটি ইহার ধ্বংসাবশেষ দ্বারা চিহ্নিত। পরবর্তী কালে চীনা উপনিবেশ কাও-কাঙ্গ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। তুর্কীতে ইহাকে প্রথমে খোচো (Khoco) (মাহমূদ কাশগারী, ১খ, ১০৩, কূজূ) এবং পরে কারা-খোজা নামে অভিহিত করিত। বর্তমানে

তুরফানের ২০-২৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত ইদিকুত-শাহ্‌রীর ধ্বংসাবশেষ। Klementz অনুসারে আধুনিক তুরফানের সংলগ্ন দক্ষিণে পুরাতন তুরফান নামক ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত (পূ. গ্র., পৃ. ২৮)। S. Franke (Eine chinesische Tempelins chirft aus Idikustahri bei Turfan. Anhang zu Abh. preuss., Akad. 1907, p. 36) অনুসারে এই ধ্বংসাবশেষগুলি "প্রাচীন কালের হইলেও স্থানটি গুরুত্বহীন"। তবে এইগুলি ইদিকুত-শাহরীর তুলনায় বৃহত্তর তিন বর্গ কি.মি. জুড়িয়া আছে।

মোঙ্গল আমলে ও খৃ. ১৩৩১-এর চীনা মানচিত্রে তুরফানের উল্লেখ নাই (E. Bretschneider, Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, ২খ.)। প্রাচীন কালে সেইখানে সম্ভবত তুরফান নামে একটি শহর ছিল, এই ইঙ্গিত শুধু Sten-Konow কর্তৃক প্রকাশিত তুন-হাং (Tun-Huang)-এর একটি সাকা (Saka) দলীলে পাওয়া যায় (Oslo Etnografiske Museums Skrifter, Publication of the India Institute, iii, 3, Oslo 1929, p. 137 & 148)। ইহাতে Tturpamni নামক শহরের উল্লেখ করা হইয়াছে। তুরফান বিষয়ে খৃ. ১৩৭৭ সালে সর্বপ্রথম চীনা উদ্ধৃতি মিং-শিঙ-এ (চীনা Tu-lu-fan) পরিদৃষ্ট হয়। চীন গমনের পথে জনৈক বিদেশী দূত তুরফানে লুণ্ঠিত হইলে তুরফান রাজার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চীনা সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল (Med. Res, ii, 193)। তুরফানের উল্লেখ মুসলিম লেখকের বর্ণনায় তুলনামূলকভাবে পরবর্তী কালের। তা'রীখ-ই রাশীদী-র বর্ণনামতে চীন সীমান্তে দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শহর "কারা খোজা ও তুরফান"-এর বিরুদ্ধে মোগুলিস্তানের খান খিযর খোজা (আনু. ১৩৮৯-৯৯) এক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। শহর দুইটির অধিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় উহা দারু'ল-ইসলাম হিসাবে গণ্য করা হয় (তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. Ross, পৃ. ৫২)। ৮২৩/১৪২০ যখন বিখ্যাত শাহরুখ ইব্‌ন তীমূর (দ্র.)-এর রাষ্ট্রদূত এই অঞ্চল অতিক্রম করিতেছিলেন তখনও অধিবাসীদের অধিকাংশই পৌত্তলিক ছিল। সেইখানে বিশাল মন্দির ও বৌদ্ধ শাক্যমুনির মূর্তির অনেক নূতন ও পুরাতন মূর্তি ছিল (N. E. XIV, পৃ. ৩১০ ও দ্র. Barthold-এ হাফিজ-ই আবরু-এর মূল পাঠ আল-মুজাফ্‌ফারিয়্যা, পৃ. ২৭)। তুরফানের বর্তমান অধিবাসিগণ (তুরফানলীক) জানেন যে, এইখানে যে উইগুরগণ বাস করিত তাহারা মুসলমান ছিল। সকল বৌদ্ধ নিদর্শনের কৃতিত্ব কালমুকগণের (Klementz, পূ. স্থা., পৃ. ২০) অথবা রাজা দাকয়ানুস-এর প্রতি আরোপ করা হয় [দ্র. আসহাবু'ল-কাহফ্‌]।

আধুনিক কাল অপেক্ষা অতীতে তুরফানে পানির সংকট তীব্রতর ছিল। ওয়াবিস খানের আমলে (১৪১৮-২৮) কৃষিকার্য অত্যন্ত আদিম ও শ্রমসাধ্য পদ্ধতিতে সম্পাদিত হইত। খান একটি গভীর কূপ খনন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার ক্রীতদাসগণ তাহাদের শস্যক্ষেত্রে মৃৎপাত্রে সেচের পানি বহন করিতেন (তা'রীখ-ই রাশীদী, পৃ. ৬৭)। পরবর্তী কালে অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৭শ শতাব্দীর শেষাংশে কালিশ অঞ্চল (আধুনিক কারা শহর) তুরফান হইতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিত (Zap., xv, 251; quoted by M. Hartmann, Der islamische Orient, i., 302)। বর্তমান ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীগুলি ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত নির্মিত হয় নাই (Sir A. Stein in Geogr. Forum, 1916, Sept. P. 47)।

আধুনিক চীনা তুর্কিস্তানের (১৫শ-১৭শ শতাব্দী) কাগাতায় খান হইতে আগত বলিয়া দাবিদার হিসাবে তুরফানের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। পরবর্তী কালে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় তুরফান প্রথমে কালমুকদের অধীনে এবং কালমুক সাম্রাজ্যের পতনের পর ১৭৫৮ খৃ. চীনাদের অধীনস্থ হয়। ১৭৬৫ খৃ. চীনাদের বিরুদ্ধে উচ (UC) নগরী বিদ্রোহ করিলে সমুদয় অধিবাসীকে হত্যা করত শহরটি বিধ্বস্ত করা হয়। এই নগরীকে পুনর্গঠনের জন্য অন্যান্য শহর, বিশেষত তুরফান হইতে লোকজন আমদানি করা হয়। তখন হইতে উচ (UC) নগরী উচ-তুরফান (UC-Turfan) অথবা উশ-তুরফান (Ush-Turfan) নামে পরিচিতি লাভ করে। দুইটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য মূল তুরফানকে পুরাতন তুরফান (কোহনে তুরফান) নামে অভিহিত করা হয়। য়া'কূব বেগের আমলে (১৮৬৬-৭৭) তুরফান তাহার রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত শহর ছিল। ১৮৭৬ খৃ. সেইখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং ১৮৭৭ খৃ. চীনারা বিনা বাধায় উহা দখল করিয়া লয়। তখন হইতে তুরফান Lukcun-এর 'রাজা' (Wang)-এর রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৭৯ খৃ. সর্বপ্রথম য়ূরোপীয় Dr. A. Regel (নিম্নে দ্র.) তুরফান ভ্রমণ করেন। Regel-এর মতে তুরফানের আধুনিক দুর্গটি য়া'কূব বেগ কর্তৃক নির্মিত। ইহার পূর্ব দিকে চীনা দুর্গ, যাহা Grum-grzimcilo-এর (Opisanie puteshestviya v zapadny Kitai, i, St Petersburg 1856, p. 275) মতানুসারে ১৮৮৬ খৃ.-এর পূর্বে নির্মিত হয় নাই। কিন্তু Regel এই কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন। Regel-এর মতে আরও পূর্বে "অসংখ্য অনবদ্য গুম্বজশোভিত সমাধি, মসজিদ এবং একটি সুরম্য মিনারসহ বিগত শতাব্দীর তুরফানের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।" ইহার মালিকানাধীন মাদ্‌রাসা ও মিনারটি বহুবার সচিত্র বর্ণিত হইয়াছে (Klementz, পূ. গ্র., পৃ. ৪৯; O. Donner, Resai, Zentralasien 1898, Helsingfors 1901, p. 120, A. V. Le Coq. Auf Hellas Spuren in Ostturkistan, Leipzig 1926, pl.2)। যদিও বলা হইয়াছে যে, মিনারটি এক খৃস্ট গির্জার ঘণ্টা ঘর, সম্ভবত তাহা সত্য নয়, বরং Lukcun wang (রাজা) কর্তৃক উহা ১৭৬০ খৃ. নির্মিত হইয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষগুলি সম্ভবত Klementz-এর পুরাতন তুরফান ধ্বংসাবশেষগুলির অনুরূপ, যাহা এক্ষেত্রে Frunke (উপরে দ্র.) ও Grumwedel ("Uighur আমলের ভয়ঙ্করভাবে বিধ্বস্ত প্রাচীন শহর") অনুমিত সময়ের পরবর্তী আমলের। Klementz নিজেও (পূ. স্থা., পৃ. ২৮) "আধুনিক চীনা তুরফানের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পুরাতন তুরফানের সহিত মিং ভূগোলবিদদের তু-লুফানকে চিহ্নিত করিতে চান।" পুরাতন শহরের অধিকাংশ অট্টালিকা ১৮৭৯ হইতে ১৮৯৮ -এর মধ্যবর্তী সময়ে ধ্বংস করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ১৯০৯ খৃ. Oldenburg প্রমাণ করিয়াছেন যে, Klementz-এর বর্ণনা হইতে যাহা অনুমিত হইতে পারে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি অট্টালিকা অবশিষ্ট রহিয়াছে। বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে আধুনিক নগরটির স্বল্প গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহার জনসংখ্যা প্রায় ২০,০০০।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে উধৃত বরাত ছাড়াও, (১) A. Regel, Turfan, in Petermanns Mitteilungen, xxvi, 1880, p. 205 প.; (২) Sir A. Stein, Innermost Asia, Oxford 1928, p. 566 প., উহাতে আরও সূত্র প্রদান করা হইয়াছে; (৩) O. Grum-Grzimailo, Opisanie Puteshestviya V Zapandniy Kitai, I, St. Petersburg 1896, chap xii-xvi; (৪) A. Grunwedel, Bericht uber archaologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902-1903, Munich 1905 (Abh, Bayer, Akad., Kl., i.,

vol, xxiv, Ser.i), P. 4; (৫) S. Oldenburg, Russkaya turkestankaya Ekspediciya 1909-1910, St. Petersburg 1914, p. 25.

W. Barthold (E.I. [1])/আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম হোসাইনী

তুরবাত-ই শায়খ জাম (تربت شيخ جام) ঃ আফগান সীমান্তের অদূরে (খুরাসান প্রদেশে) পারস্যের উত্তর-পূর্বে একটি স্থান। ইহার অবস্থান প্রায় ৬১° পূর্ব দ্রাঘিমা ও ৩৫° উত্তর অক্ষাংশে। ইহা মাশহাদ-হিরাত সড়কে একটি মানযিল (বিশ্রামস্থল)- তুরবাত-ই শায়খ জাম হইতে মাশহাদ-এর দূরত্ব প্রায় ৯৬ মাইল, মাশহাদ এবং হিরাতের দূরত্বের মোটামুটি মধ্যস্থলে। ইহা হারীরূদ উপনদীর তীরে অবস্থিত। ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গৃহের সংখ্যা প্রায় ২০০ দেখানো হইয়াছে (Conolly, প্রায় ১৮৩০ খৃ.)। শতাব্দীর শেষদিকে Gate (১৮৯৪) গৃহের সংখ্যা প্রায় ২৫০ উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত পরিব্রাজক লক্ষ্য করিয়াছেন যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহাকে জাম বলে। এই স্থানের অধিবাসীরা নিজদিগকে জামী নামে পরিচয় দেয়। ১৮৯৪ খৃ. পরিবারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০০, তাহাদের সবাই কৃষিজীবী। তাহাদের একজন সরদার ছিল। তবে Gate এই ছোট শহরটি যখন ভ্রমণ করেন তখন উহা সরাসরি জিলা গভর্নরের কর্তৃত্বাধীন ছিল। তুরবাত-ই শায়খ জাম-এর একটি নিজস্ব মাটির কেল্লা ছিল। গ্রামটির পূর্ব দিকে সেই সাধকের মাযার অবস্থিত যাঁহার নামে গ্রামটির নামকরণ হইয়াছে। তিনি ছিলেন শায়খ আহমাদ জামী (মৃ. ৫৩৬/১১৪২; তু. নিবন্ধ আহমাদ জামী)। ইব্ন বাত্তূতা-র মতানুসারে (সং, প্যারিস, ৩খ, ৭৫ প.) তিনি শিহাবু'দ-দীন আহমাদ নামে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার বংশধরদের মালিকানাধীন স্থানটি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ইহার পর ইব্ন বাত্তূতা এই শায়খ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্পষ্টতই স্থানীয় লোককথা, যাহার বিশেষ কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। মাযারটি তীমূর ও পরবর্তী কালে হুমায়ূন পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

তুরবাত-ই শায়খ জাম-এর মধ্যযুগীয় নাম ছিল বুযজান (তাহা ছাড়াও পূচকান; য়াকূত, ৩খ, ৮৯০ প.; আরও বিভিন্ন নাম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ ফুয্য অথবা ফায্য, কিছু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির আল-ফাস্যী নিস্বা ছিল। আল-বুযজানী নিস্বাও অবশ্যই পাওয়া গিয়াছে)। ইহা কূহিস্তানের উত্তর-পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত জাম জিলার সদর বা রাজধানী ছিল (ইহাকে যামও লেখা হইয়াছে)। য়াকূত-এর মতে বুযজান নায়সাবুর হইতে ৪ দিনের এবং হেরাত হইতে ৬ দিনের পথের দূরত্বে অবস্থিত। অপর দিকে আল-ইসতাখরী (পৃ. ২৮২) বলিয়াছেন, বুযজান হইতে বুশানজ চার দিনের পথের দূরত্বে অবস্থিত। অন্যূন ১৮০টি গ্রামের নির্ভরস্থল এই শহরটি একটি উর্বর ও সুজলা অঞ্চলে অবস্থিত। ইব্ন রুস্তা (পৃ. ১৮১)-এর মতে জাম নায়সাবুর নির্ভর ১৯টি রাসাতীক-এর অধিকারে ছিল। আল-মুকাদ্দাসী (অন্তত De Goeje, p. 319, note-এ উদ্ধৃত ভাষ্য অনুযায়ী) বলেন যে, বুযজান নামটি শুধু মূল শহর (কাসর)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সম্পূর্ণ জিলার ক্ষেত্রে নয়, যাহার মধ্যে উহার উপর নির্ভরশীল গ্রামগুলিও অন্তর্ভুক্ত (তু. শহর)। খুব স্পষ্ট রচনা নয় বলিয়া এই বিবৃতি সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ স্বল্প; পৃ. ৩২১, টীকা খ, পুনরায় আল-কাসরকে আল-মাদীনা-র (শহর অর্থে?) সহিত চিহ্নিত করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Le. Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, p. 356.; (2) E. Yate, Khurasan and Sistan, p. 35 প.; (৩) C. Ritter, Erdkunde, viii, 264 p, 278, 286 p; (৪) C. Barbier de Meynard, Dictionnaire....de la Perse, p. 121, 149 Sq.

V. F. Buchner (E.I. [1])/আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম হোসাইনী

তুরবাত-ই হায়দারী (দ্র. যাওয়া)

তুরশীয (ترشيز) ঃ (য়াকূত ঃ তুরশীশ, মুকাদ্দাসী ঃ তুরছীছ তুরায়ছীছ), পারস্যের একটি শহর, নিশাপুর প্রদেশের বুশ্ত্ জিলার রাজধানী, শেষোক্ত শহর হইতে চার-পাঁচ মন্যিল দূরে। ইহা ৫৩০/১১৩৬ সালে বিধ্বস্ত হয়; তখন ইহার বংশানুক্রমিক গভর্নর ছিলেন আল-'আমীদ মানসূর (বা মাস'ঊদ) ইব্ন মানসূর আয-যূরআবাদী। তিনি ছিলেন বাতিনিয়্যা বা ইসমা'ঈলীদের একজন শত্রু, তাঁহার ভূসম্পত্তির প্রতিরক্ষায় তাঁহাকে সাহায্য করিতে তিনি তুর্কীদেরকে আহ্বান করেন। কিন্তু শেষোক্তরা তাহাদের প্রচলিত লালসার পরিচয় দিলে তিনি সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে অক্ষম হইয়া ইসমা'ঈলীদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার পুত্র 'আলা'উ'দ-দীন মাহমূদ ৫৪৫/১১৫০ সালে 'আব্বাসী খলীফাদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লন; তাঁহাদের নিকট হইতে কোন সমর্থন না পাইয়া তিনি নীশাপুরে পালাইয়া যান এবং ইসমা'ঈলীরা এই অঞ্চলে তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তায়মূর শহরটি অবরুদ্ধ ও দখল করেন ৭৮৪/১৩৮২ সালে। ইহার গভীর পরিখা ও উচ্চ প্রাচীরের জন্য শহরটিকে অভেদ্য মনে করা হইত। কিন্তু পরিখার পানি পাম্প করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং বিস্ফোরক প্রাচীরে ভাঙনের সৃষ্টি করে। সেনাদলকে রেহাই দেওয়া হয় এবং তাহারা বিজয়ীর অধীনে তুর্কীস্তানে চাকুরী গ্রহণ করে। এইখানে তায়মূর ফারসের মুজাফ্ফারী শাসনকর্তা শাহ শুজা'র এক দূতকে সাক্ষাত প্রদান করেন এবং তাহাদের নিকট তাঁহার পৌত্র পীর মুহাম্মাদের বিবাহের জন্য একটি কন্যা চাহেন। হেরাতের বিরুদ্ধে 'আব্বাস মীরযার অভিযানের সময় তুরশীয ১২৪৮/১৮৩২ সালে খুসরাও মীরযা কর্তক অধিকৃত হয়।

বাসিন্দাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন নীশাপুরের কাতিবী (পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামে তাঁহার জন্ম), আহ্লী (মৃ. ৯৩৪/১৫২৭-২৮) ও যুহূরী (মৃ. ১০২৪/১৬১৫)। পার্শ্বেই ছিল কিশমার গ্রাম, কিংবদন্তীমতে যেইখানে যোরোস্টার একটি সাইপ্রাস বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। ইহা বিখ্যাত হইয়া উঠে, খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল উহা বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে আদেশ দেন (ফিরদাওসী, শাহনামাহ্, সম্প.Turner Macan, পৃ. ১০৬৮; সম্পা. ৬ অনু. J. Mohl, ৪খ, ৩৬৪; fr. Spiegel, Eran. Alterthumskunde, ১খ, ৫৪, টীকা ২, ৭০৩; মুহাম্মাদ মাজদী, যীনাতু'ল মাজালিস, in Barbier de Meynard, Dict. de la Perse, পৃ. ৩৯০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, ১খ, ৮৩৬, ৩খ, ৫২৮; (২) ইব্ন হাওকাল, B. G.A., ২খ, ২৯১, (৩) মুকাদ্দাসী, B. G. A., ৩খ, ৩১৮, ৩৫২; (৪) Quatremere, Hist. des Mongols, ১খ, ১৭৭; (৫) আবু'ল-ফিদাহ', Geogr., ১খ, ৪৪৩; (৬) P. M. Sykes, F. R G. S., ১৯১১ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, Hist. of Persia, ২খ. ৮৩, ২০১, ৪২৪; (৮) Edw. G. Browne, Liter. Hist of Persia under Tartar Dominion, পৃ. ১৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮; (৯) ঐ লেখক, Liter. Hist. of Persia in Modern Times পৃ. ২৩৩, ২৩৪, ২৫৩।

Cl. Huart (E.I. [1])/মুহাম্মাদ আবদুল আজিজ

তুরসুন ফাকীহ্ (طرسن فقيه) ঃ তুরস্কবাসী একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি। তুরসুন ফাকীহ, মালখাতুনের স্বামী সুলতান 'উছমানের ন্যায়

শায়খ ইদি বালীর অন্যতম জামাতা ছিলেন; ইদি বালী ৭২৬/১৩২৬ সালে মারা যান। বলা হয় ১২০ বৎসর বয়সে এবং বিলেজিতে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তুরসুন মুদাররিসও ইমাম হিসাবে পূর্বোক্তের শূন্য পদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদাধিকারবলে তিনি সুলতান 'উছমানের অভিযানসমূহে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে এবং কারা হিসারে 'উছমানের নামে প্রথম জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন। এস্কি শহরে তিনি বৈরাম খুতবা দেন। দৃশ্যত কোন কারণ ব্যতিরেকেই "সিজিল্ল-ই 'উছমানীতে" তাঁহার মৃত্যুর বৎসর ৭২৬/১৩২৬ সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে বস্তুত ইদি বালী ও সুলতান 'উছমানের মৃত্যু বৎসরে তিনিও মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. V. Hammer, G.O.R., ১খ, ৫৬, ৭৭; (২) তাশকোপরুষাদা-মাজদী, আশ-শাকা'ইক আন-নু'মানীয়া, পৃ. ২১; (৩) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ৩খ, ২৫৪; (৪) J. Leunclavius, Hist. Musulm. Turc., পৃ. ১৫০ প.)

Franz Babinger (E.I. [1])/মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

তুরসুন বেগ (طرسن بیگ) ঃ একজন তুর্কী ঐতিহাসিক। তুরসুন বেগের মাখলাস ছিল লাবীবী, তাঁহার বংশপরিচয় অজ্ঞাত; তাঁহার পিতা ছিলেন ব্রুসা শহরের তত্ত্বাবধায়ক জুব্বে 'আলীর এক চাচা ('আমূজা) এবং তাঁহার অধিকারে একটি জায়গীরও ছিল যাহা অচিরেই পুত্রের হস্তগত হয়। তুরসুন বেগ কনস্টানটিনোপল দখলে এবং ২য় মুহাম্মাদের রুমেলিয়া অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে ট্রেবিযন্দের বিরুদ্ধে অভিযানে দীওয়ানে (দীওয়ান কাতিবিতে) একজন কারণিক হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়; পরবর্তী কালে তিনি আনাতোলিয়ার ও শেষে রুমেলিয়ার দেফতেরদার হন। ২য় বায়াযীদের শাসনকালেও তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত। তুরসুন বেগ তা'রীখ-ই আবু'ল-ফাত্হ শীর্ষক ২য় সুলতান মুহাম্মাদের শাসনকালের ও ২য় বায়াযীদের প্রথম ছয় বৎসর শাসনকালের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ৯০৩-৯০৫/১৪৯৭-১৫০০ সালের মধ্যে লিখিত গ্রন্থটিতে হি. ৮৯৩ (১৭ ডিসেম্বর, ১৪৮৭) পর্যন্ত ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ইতিহাসের (Chronicle) একটি সংস্করণ মুহাম্মাদ 'আরিফ বেগ কর্তৃক T.O.E.M.-এর পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত হয় (২৬-৩৮ খণ্ড পাণ্ডুলিপির জন্য তু. Babinger, G. O. W., পৃ. ২৬ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ F. Babinger, G. O. W., পৃ. ২৬ প. যেইখানে আরও প্রসঙ্গ প্রদত্ত আছে।

Franz Babinger (E.I. [1])/মুহাম্মদ আবদুল আজিজ

তুরাখান বেগ (تراخان بیگ) ঃ একজন 'উছমানী সেনাপতি, থেসালী (Thessaly) বিজেতা এবং ইহার সামরিক অভিযানসমূহের তত্ত্বাবধায়ক। তুরাখান বেগ-এর এই যাবৎ অজ্ঞাত আদি জন্মসূত্র তাঁহার ১ জুমাদিউল উলা, ৮৫০/আগস্ট ১৯৪৬-এর ওয়াসিয়্যাতানামায় (Epam. G. Pharmakides-এ একটি সত্যায়িত গ্রীক অনুবাদে, H. Axpiox Volo. ১৯২৬, খৃ., পৃ. ২৮০-২৮৭) এখন এইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, তিনি নিজকে "মৃত পাশা য়িগিত বেগ"-এর পুত্র হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই মতানুসারে তাঁহার পিতা ছিলেন সুপরিচিত পাশা য়িগিত বেগ (সার্বীয় ও ইতালীয় গাসায়থুস কর্তৃক বাসায়তুস ইত্যাদি নামে অভিহিত; তু. C. J. Jirecek, Staal und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien, ৪খ, পৃ. ৭, টীকা ৫) যিনি উসকুব (Skoplje, ৬ জানুয়ারি, ১৯৩২) জয় করিয়াছিলেন এবং সীমান্ত অঞ্চলের অভিযানে তুর্কী তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আধুনিক দক্ষিণ সার্বিয়াতে অবস্থিত বোসনিয়ার অংশবিশেষ ৭৯১/১৩৯০ সালের পর শাসন করেন। ১৪১৩ খৃ.-এর দিকে তিনি অবশ্যই উসকুবে ইনতিকাল করিয়া থাকিবেন। সেইখানে তাঁহার সমাধিসৌধ এখনও দেখা যায় (Turbe, তু. Glisa Elezovic, Turski spomenici u Skoplju, Skoplje, ১৯২৭ খৃ. একটি ছবিসহ, পৃ. ৫)। সিজিল্লি 'উছমানীর বিবরণীতে (১খ, পৃ. ৩৭) যেমন ইহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না যে, তিনি ৮৩৫/১৪৩১ সালের পূর্বে মারা যান নাই, তেমনি প্রধান উযীর ইসহাক পাশা যে তাঁহার 'ক্রীতদাস' (Kole) ছিলেন তাহার সত্যতাও সমর্থিত হয় নাই। স্পষ্টতই বোস্নিয়ার প্রথম গভর্নর ইসহাক বেগের সম্পর্কে বিভ্রান্তির কারণে ইহা ঘটে।

Altosman, anonymen Chroniken, সম্পা. F. Giese, পৃ. ২৮, ৩-এ (যাহা সম্ভবত সোলাকযাদের তা'রীখ, পৃ. ৫২-এ অনুসৃত হয়) এক অদ্ভুত বাহ্যাড়ম্বরের সহিত তাঁহাকে ইসহাক বেগের প্রভু এফন্দি হিসাবে অভিহিত করা হয়। C. j. Jirecek, Geschichte der Serben, ২/১খ, ১২৭-এ (সম্ভবত Leunclavius, Hist. Musulm. Turc., পৃ. ৩১৫, ১৩ অনুসরণ করা হইয়াছে) যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসহাক বেগের পুত্র য়িগিত বেগ নন, বরং সুস্পষ্টভাবে তিনি তাঁহার পিতাই ছিলেন, যাহা ৮৪২ হি. (১৪৩৮-১৪৩৯ সনে) Skoplje-তে অবস্থিত গাযী ইসহাক বেগের মসজিদে খোদাইকৃত আরবী লিপি হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে (তু. Elezovic গ্রন্থের মূল পাঠ্যাংশ, পূ. গ্র., পৃ. ১১ প. দ্র.)। ইহার পর C. Truhelka, Tursko slovenski spomenici dubrovacke arhive (Sarajevo ১৯১১ খৃ.), পৃ. ২০০, গ্রন্থে ইসহাক বেগ যখন পাশা য়িগিত বেগের ("পাসাইত বেগ") পুত্র হিসাবে উপস্থিত হন তখন ইহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয় যদি Hranusic-এ তাঁহার গুণবাচক উক্তিসমূহ অনাবশ্যক অতিশয়োক্তি ছৈ আর কিছুই নহে (পৃ. ১৯২ প. দ্র.)। ইহা অতঃপর আরও সুস্পষ্ট যে, ইসহাক বেগ ও তুরাখান বেগ হইতেছেন পাশা য়িগিত বেগের দুই পুত্র অর্থাৎ তাঁহারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা। তুরাখান বেগ কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন তাহা আমরা জানি না। ইবন্ বাততূতার (২খ, পৃ. ৪১০) ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লিখিত তারখান (তু. আস্ত্রাখান)-এর সহিত সম্পর্কিত না হইয়া থাকিলে তাঁহার নামের অর্থও অনিশ্চিত। বায়যানটীয় রীতিতে ইহার উচ্চারণ Tousazarle (G. Phrantzes, Ducas, Chalcocondyles, Chronicon breve)।

তুরাখান বেগের প্রাথমিক জীবনধারা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ১৪২৩ সালের মে মাসে তাঁহার নাম প্রথম পাওয়া যায় যখন তিনি Peloponnesus-এ অশ্বারোহী সেনাদলের কর্তৃত্বে নিয়োজিত হন এবং Hexamilia-তে Isthmus-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিখার মধ্য দিয়া তিনি জোরপূর্বক স্বীয় পথ করিয়া এই এলাকার সম্মুখভাগে অবস্থিত অধিকাংশ প্রতিরোধ ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেন, অবশ্য পরে সম্রাট এমানুয়েল কর্তৃক উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন না হওয়ায় তিনি দেশটির অভ্যন্তরভাগের ধ্বংসসাধন করেন। Mistra, Leondari, Gardhiki, Dabia-এর (তু. Ducas- এর বন সংস্করণের Chronicon breve, পৃ. ১৯৯) ন্যায় অনেকগুলি বায়যানটীয় শহর তিনি আক্রমণ করেন এবং তিনি 'উছমানীদের জন্য ভেনিসীয়দের অধিকৃত ভূমিসহ Peloponnesus স্বীয় আয়ত্তাধীন করেন। খুব সম্ভবত ভেনিসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনাকল্পে এক গোপন পরিক্রমা হিসাবে এই সামগ্রিক অভিযান পরিকল্পিত হইয়াছিল (তু. Phrantzes, পৃ. ১১৭; Chalcocondyles, পৃ.

২৩৮)। Ducas-এর বর্ণনা সঠিক হইলে তুরাখান খুব শীঘ্রই তাঁহার অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া কৃষ্ণসাগরের তীরে উপনীত হন (পৃ. ৫০, ৪)। তিনি আলবেনীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ এবং তাহাদিগকে চূড়ান্ত পরাজয় বরণে বাধ্য করেন (তু. Chalcocondyles, পৃ. ২৩৯, ২, ২৫২, ১)। তিনি Peloponnesus-এ আবার উপস্থিত হন, যেইখানে স্বৈরাচারী শাসক কনস্টান্টাইন যাহাতে Patras শহর অধিকার করিতে না পারে, সেইজন্য Naupaktos হইতে তাহাকে প্রতিহত করেন (Phrantzes, পৃ. ১৫০, ১৮)।

১৪৩১ খৃ.-এর শেষদিকে তিনি পুনর্বার করিন্থের ইস্থমাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া ১৪৩৫ খৃ. গ্রীষ্মকালে থিবিস অবরোধ করেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ইহা জয় করেন (তু. Phrantzes তাঁহার সহিত থিবিসে পরিচিত হন; পৃ. ১৬০, ৩ প.)। ১৪৪৩ সালের নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে John Hunyadi-র বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তুরাখান বেগ তুর্কী সেনাবাহিনীর একটি দলের নেতৃত্ব দেন। ইযলাদী'র (তু. Altosman-Chron, সম্পা. Giese, পৃ. ৫৮, অনু, পৃ. ৯০) যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য তাঁহার অদ্ভুত আচরণ দায়ী ছিল (তু. Katona, ১৩খ, ২৫৩; তোরহাম বেগ; Chalcocondyles, পৃ. ৩১৫) এবং তোকাত-এ অবস্থিত বেদেবী চারদাক-এর রাষ্ট্রীয় কারাগারে তাঁহাকে প্রহরাধীনে রাখা হয়। তাঁহার জীবনের পরবর্তী ১০ বৎসর সম্পর্কে কোন কিছুই লিখিয়া রাখা হয় নাই। ১৪৫৩ খৃ.-এর একেবারে গোড়ার দিকে সুলতান ২য় মুহাম্মাদ তুরাখানের দুই পুত্র আহমাদ ও 'উমারসহ তাঁহাকে এক বিরাট সৈন্যদল দিয়া Peloponnesus প্রেরণ করেন। সেইখানে তিনি আবার ইস্থমাসের বহিঃপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া আরাকাদিয়া আক্রমণ করেন এবং লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করিয়া Ithome-এর মধ্য দিয়া অতিক্রম করার সময় Messene-এর সমগ্র উপসাগরীয় এলাকা বিধ্বস্ত করেন এবং সমস্ত কিছু লুটপাট ও ভস্মীভূত করেন।

পারস্পরিক যোগাযোগের অসুবিধার কারণে যখন তাঁহার সেনাদলকে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন তাঁহার পুত্র আহমাদ Mycemae ও করিন্থের মধ্যে অবস্থিত Dervenaki-র উপত্যকায় Malthaeus Azanes-এর শ্যালক স্পার্টার স্বৈরাচারী শাসক দিমিত্রিয়াস কর্তৃক ধৃত হন (তু. Phrantzes, পৃ. ২৩৫ ও W. Miller, The Latins in the Levant, লণ্ডন ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৪২৬)। কিন্তু ১৪৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার ভ্রাতা 'উমার কর্তৃক তিনি মুক্ত হন (ঐ, পৃ. ৩৮৩, ১১ প.)। ১৪৫৫ সালের অক্টোবর মাসে তুরাখান তাঁহার দুই পুত্রসহ আদ্রিয়ানোপল-এ উপস্থিত হন (Phrantzes, পৃ. ৩৮৫, ১প.)। ১৪৫৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি সম্ভবত পরিণত বয়সে ইনতিকাল করেন (তু. Phrantzes, পৃ. ৩৮৬, ১ প.)। গভর্নর হিসাবে Thessaly-র Larisa-তে তাঁহার সরকারী আবাসস্থল ছিল (তুর্কী ভাষায় য়েনি-ই ফানার)। Thessaly-এর এই অঞ্চলকে তিনি একটি জায়গীর হিসাবে স্বীয় দখলে রাখিয়াছিলেন যেইখানে তিনি একটি মসজিদ ও দাতব্য উদ্দেশ্যে অসংখ্য ভবন নির্মাণ করেন। লারিসার অনতিদূরে অবস্থিত তিরনোভোতে (গ্রীক ভাষায় Tyrnawos) তিনি একটি খৃস্টীয় গির্জা পর্যন্ত নির্মাণ করেন; গির্জাটি এখনও বিদ্যমান। একটি ক্ষুদ্র খৃস্টীয় গির্জা সদৃশ turbe-এর ন্যায় তাঁহার সমাধিসৌধ শহরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে লারিসাতে অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে অবস্থিত গোরস্থানে একটি খৃস্টীয় মঠ ছিল যাহা এখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

তুরাখান বেগের দুই পুত্র আহমাদ ও 'উমার তাঁহার সমরাভিযানের সংগী ছিলেন (Peloponnesus-এর সীমান্ত অঞ্চলের তুর্কী শাসক হিসাবে 'উমারকে পাওয়া যায়, পক্ষান্তরে তাঁহার ভ্রাতা আহমাদ Thessaly-এ তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৪৫৬ খৃ. Peloponnesus-এ একটি সেনাদলের দায়িত্ব অর্জন করিয়া ২য় মুহাম্মাদ তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান (Phrantzes, পৃ. ৩৮৮, ১১ প.)। 'উমার ১৪৬৩ খৃ. Naupactos-এর চতুর্দিকের অঞ্চল অধিকার করেন এবং ১৪৬৭ খৃ. একটি প্রাথমিক বিপর্যয়ের পর ভেনিসবাসীদের পরাজিত করেন (Phrantzes, পৃ. ৪২৫, ২৩; 'উমার সম্পর্কে Chalcocondyles একটি পূর্ণ বিবরণী Ouxone [Phrantzes সর্বদা Auxone লিখিয়াছেন]-এ প্রদান করিয়াছেন, তু. নির্ঘণ্ট Omares শিরো.)। এই দুই ভ্রাতার পরবর্তী কালের জীবনের মধ্যে আহমাদ তাঁহার পিতার ন্যায় পবিত্র হজ্জ পালন করেন এবং তাঁহার সম্পর্কে আর অধিক কিছু জানা যায় না। দুই ভ্রাতার মধ্যে 'উমার অধিকতর কর্মোদ্যোগী ছিলেন। ১৪৭৭ খৃ. ইহসানযোতে তিনি ভেনিসবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন (তু. J. von Hammer, G.O.R., ২খ., পৃ. ১৫১), পরবর্তী বৎসর আলবেনীয়দিগকে পরাজিত করেন (ঐ, ২খ, পৃ. ১৫৭) এবং ৮৮৯ হি. মুহাররাম (ফেব্রুয়ারি ১৪৮৪ খৃ.) মাসে সম্পাদিত উইল অনুসারে দেখা যায়, তিনি তখনও ১৪৮৪ খৃ. পর্যন্ত জীবিত ছিলেন (তু. E. G. Pharmakides, পূ. গ্র., পৃ. ২৮৭-৩০৩ অথবা ৩০৭-৩১০)।

৯৩৭ হি. শাওওয়াল (মে ১৩৫১ খৃ.; তু. Pharmakides, পৃ. ৩১০ প.) মাসে লিখিত তাঁহার উইল হইতে জানা যায় যে, 'উমার বেগের দুই পুত্র ছিলেন এবং তাঁহাদের একজন হাসান বেগ নামে অভিহিত হইতেন। পক্ষান্তরে অন্যজন ইদ্‌রীস বেগ তাঁহার জীবদ্দশায় একজন কবি এবং তুর্কী ভাষায় হাতিফী'র খুসরাও ওয়া শীরীন এবং লায়লা ওয়া মাজনূন গ্রন্থের চমৎকার অনুবাদক ছিলেন (তু. সেহী, তেযকিরে, পৃ. ৩৬ প.)। তুরাখান ওগলুএর পরিবারবর্গ লারিসা'র চতুর্দিকে বসতি স্থাপন করিয়া নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আধুনিক কালের পূর্ব পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি অর্জন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ইতিহাসে তাঁহারা কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম হন নাই। তুরাখান বেগের পরবর্তী বংশধর হিসাবে রেকর্ডকৃত কোন এক ফা'ইক পাশা রূম-এলির গভর্নর থাকাকালীন তাঁহার অত্যাচারের কারণে ঘৃণিত হন; অতঃপর ১৬৪৩ সালের মার্চ মাসে ৭০ বৎসর বয়সে ইস্তাম্বুলের সেরাই দরবারে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয় (তু. J. von Hammer, G. O. R. না'ঈমা হইতে, পৃ. ৩২২ এবং Zinkeisen, G. O. R., ৪খ, ৫৩৫)।

১৮৪২ খৃ. J. Ph. Fallmerayer লারিসার প্রধান মসজিদে তুরাখান বেগের আত্মচরিত রক্ষিত আছে দেখিতে পান (তু. Fragmente aus dem Orient^2, ১৮৭৭ খৃ., পৃ. ৩৮১ প.) কিন্তু ইহা সম্ভবত তখন হইতেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে (Beaujour কর্তৃক উল্লিখিত এওরেনোস ওগলুম [দ্র.]-এর আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপির ন্যায় Tablean du Commerce dela Grece, ১খ, ১১৭)। ৮৭৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বংশতালিকাতে এই অভিজাত 'উছমানী পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা পাশা য়িগিত বেগের বংশধরের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করা হইয়াছে। বংশতালিকার বাম অংশটি Cl. Elezovic কর্তৃক রচিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত (পূ. স্থা., পৃ. ১২১)। ইহা পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কারণ জনৈক এওরেনোস ওগলুম-এর বংশধরদের সহিত, বিশেষ করিয়া 'ঈসা বেগ-এর পুত্রদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ রহিয়াছে। তু. C.

J. Jirecek. Staat und Gesellshart, ৪খ, ৮, টীকা ১, সেইখানে এইরূপ সম্ভাব্য বিভ্রান্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) D. Urquhart, Spirit of the East, লণ্ডন ১৮৩৮ খৃ., ১খ.; (২) F. G. Buck কর্তৃক জার্মান অনুবাদ, Stuttgart and Tubingen ১৮৩৯ খৃ., ১খ, ২২৬ প., Thessaly-তে অবস্থিত Tyrnacos-এর গণগ্রন্থাগারে সংরক্ষিত তুরাখান ও তাঁহার পরিবারবর্গের আরবী আত্মজীবনী হইতে।

F. Babinger (E.I. [1])/ আবু মুহম্মদ

তুরাব 'আলী কালান্দর শাহ (تراب علی قلندر شاہ) ঃ ১৭৬৭-১৮৫৮ খৃ., উর্দূ ও ফারসী ভাষায় লেখক, 'আরিফ বিল্লাহ্ মাওলানা শাহ মুহাম্মাদ কাজিম কালান্দর কাকুরবীর পুত্র। সমসাময়িক ইসলামী শিক্ষাবিদগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। উর্দূ ও ফারসী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। প্রথমে তাঁহার ছদ্মনাম ছিল শহীদ, পরে তুরাব নাম ব্যবহার করেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকটি হইল ঃ উসূলু'ল-মাকসূদ*, মাজ্মা'উ'ল-কাওয়া'ইদ*, ফাতহু'ল-কানূয*, মাকালাতে-সূফিয়া*, মাতালি'ব-রাশীদী*, শারারিতু'ল-ওসায়াত*, মুজাহাদাতু'ল-আওলিয়া*, আস্নাদু'ল-মাশীখাত*, তা'লীমুল-আস্মা*, কাশ্ফু'ল-ফী মুতা'ওয়ারী ফী হালি নিজামু'দ্-দীন আশ্কারী*। পুস্তকগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রকাশিত হইয়াছে; দুই-একটি এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭৩০

তুর্ক (ترك) ঃ ক। (সাধারণ বর্ণনা)

১। ইতিহাস ও পরিবেশগত বিবরণ (W. Barthold)

২। ভাষা (A. Samoilovitch-)

৩। চাগতাই সাহিত্য ও রচনাবলী (W. Barthold)

খ। (উছমানী তুর্ক)

(ক) ভাষা (J. H. Kramers)

(খ) উপভাষাসমূহ (T Kowalski)

(গ) সাহিত্য ও রচনাবলী (কোপরূলু যাদে ফু'আদ)

(ঘ) ইতিহাস (J. H. Kramers)

ক। ১। ঐতিহাসিক ও জাতিগত বিবরণ

তুর্ক শব্দটি (চীনা ঃ Tu-Kue) প্রথমবারের মত ষষ্ঠ শতকে এক যাযাবর জনগোষ্ঠীর নাম হিসাবে লক্ষ করা যায়। এই শতকে এই তুর্ক বা তুর্কী জাতির লোক মঙ্গোলিয়া ও উত্তর চীন সীমান্ত হইতে কৃষ্ণসাগর অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। চীনারা এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে Tu-men নামে অভিহিত করে (তুর্কী শিলালিপি অনুযায়ী ঃ বু-মীন)। ৫৫২ সনে এই শাসকের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা ইস্তামি (চীনা ঃ She tie-mi; দ্র. আত-তাবারী, ১খ, ৮৯৫ ও ৮৯৬; সিনজিবু খাকান) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ইস্তামি সাম্রাজ্যের পশ্চিমে বহু বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ৫৭৬ সন অবধি জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। এই শাসক ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর হইতে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতেন বলিয়াই মনে হয়। চীনাদের নিকট তুর্কী সাম্রাজ্য ঐ সময়ে উত্তরের তুর্কী সাম্রাজ্য ও পশ্চিমের তুর্কী সাম্রাজ্য এই দুই পরিচয়ে পরিচিত ছিল। ৫৮১ সালে নবোত্থিত দুই শাসক বংশের প্রভাবে উত্তর ও পশ্চিম তুর্কী রাজ্য দুইটির মধ্যে সম্পর্কে চূড়ান্ত ভাঙ্গন দেখা দেয়। আর ইহার পরিণতি হিসাবে দুইটি তুর্কী রাজ্যকেই নামেমাত্র হইলেও চীনা তা''ঙ শাসকগোষ্ঠীর (৬১৮-৯০৭) অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। উত্তরাঞ্চলীয় তুর্কীরা আনুমানিক ৬৩০ ও পশ্চিমের তুর্কীরা ৬৫৯ সন নাগাদ চীন সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া নেয়। ৫০ বৎসর যাবত বিদেশী শাসনাধীন থাকার পর উত্তরাঞ্চলীয় তুর্কীরা তাহাদের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। 'ওরখন শিলালিপি' (মঙ্গোলিয়ার ওরখন নদীর নামানুসারে) নামে আদি তুর্কী শাসনের যে নিদর্শনটি পাওয়া গিয়াছে উহা এই নূতন সাম্রাজ্য-আমলের। ইহা তুর্কীলিপি ও ভাষার আদিতম নিদর্শন। মাঝে মাঝেই, বিশেষ করিয়া ৬৯৯ হইতে ৭১১ সালের মধ্যে এই নূতন তুর্কী সাম্রাজ্যের শাসকগণ পশ্চিমের তুর্কী জনগোষ্ঠীকে নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করিলেও তাহাদিগকে কায়েমীভাবে পদানত করিতে পারে নাই। পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্কী উপজাতিগুলির মধ্যে তুর্গেশগণ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। এই উপজাতির বিভিন্ন গোত্র প্রধানত ৮ম শতকের শেষের বৎসরগুলিতে খানদের ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী হয়। নাস্র ইব্ন সায়্যারের ১২১/৭৩৯ [তাবারী, ২খ., ১৫৯৩ প. দ্র. '১৬১৩, ১৬৩৯ প.] নেতৃত্বে আরবগণের বিজয়াভিযানের মুখে তুর্গেশদের রাজত্বের অবসান ঘটে।

উল্লিখিত আদিতম তুর্কীদের সঙ্গে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ, পূর্ব ও পশ্চিমের যাযাবর জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের প্রশ্নে নানা অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, উল্লিখিত শতকের আগের শতকগুলিতে আরও তুর্কী ভাষার অস্তিত্ব ছিল (অবশ্য ভিন্ন নামে) ও ইহার সপক্ষে যুক্তি মজবুত করার জন্য খৃষ্টপূর্ব আমলের কিছু অবশিষ্ট বিচ্ছিন্ন তুর্কী শব্দের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশও করা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্কী রাজ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে যে, প্রাচীন ও বিশুদ্ধ যাযাবর জাতির লোক, Scythians বা ন্যূনপক্ষে তাহাদের একাংশের সঙ্গে তুর্কীদের সম্পর্ক ছিল। মহাবীর আলেকজাণ্ডার ইতিহাসে Curtius vii, 7, 1-এর বিবরণ অনুযায়ী Scythian রাজার অন্যতম ভ্রাতা Carthasis Yaxartes বা সীর দরিয়ার অপর তীরে বসবাস করিতেন (তু. সীর দরিয়া) বলিয়া উল্লেখ আছে। Th. Noldeke, A. Gutschmid-কে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ঐ Carthasis-ই তুর্কী কারদাশী হইতে পারে যিনি Scythian রাজার ভ্রাতা। তাঁহার এই আকস্মিক উল্লেখের ফলে সম্ভবত আমরা ইতিহাসে প্রথমবারের মত এক তুর্কী জাতির উল্লেখ পাইয়াছি (A. Gutschmid, geschichte Irans und seiner Nachbarlander von Alexander dem Grossen bis zum Untergang der Arsaciden, Tubingen 1888, p. 2, note 1)। Noldeke স্বয়ং Gutschmid-এর রচনার মুখবন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ 'তিনি ইতিপূর্বে কোনও কোনও সময় অতি আকস্মিকভাবে উল্লিখিত যে আভাস-অনুমানের কথা বলিয়াছেন পরবর্তী কালে আর কখনও তিনি গুরুত্বসহকারে ঐসব ধারণা-অনুমানের পক্ষ সমর্থন করিয়া কথা বলেন নাই।

ইহার আরও আগের আমলের বিষয়াবলী সম্পর্কে Herodotos -এর (৪খ, ২৩) রচনায় grimpaean বা Agrimpaean নামে এক জনগোষ্ঠী ও একটি বৃক্ষের রসের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের রস দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করা হইত। Mullenhof, Deutsche Altertumskunde, iii, 15-এর বর্ণনানুসারে শব্দটির তুর্কী রূপঃ 'আজি' বা 'আচি' 'তিক্ত'; Tomaschek, S. B, Ak. Wien, cxvii, 60 ইহার সহিত 'খাদ্য' এই অর্থে কল্পনা-অনুমানমূলক 'আরগ'-এর তুলনা করিয়াছেন; আরও তু. F. Braun,

Raziskaniya v oblasti gotoslavy anskikh otnosheniy, St. Petersburg 1899, p. 88)। কোনও কোনও সময় মনে করা হয় যে, প্রাচীনতম এক তুর্কী শব্দ যাহা আমাদের নিকট অবধি পৌঁছাইয়াছে। চীনাদের বর্ণনা অনুযায়ী, তুর্কী জাতির লোকেরা Hiung-nu (Huns)-র উত্তরপুরুষ। চীনের সম্রাট ও হুনদের শাসকের মধ্যে ৪৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে সম্পাদিত এক চুক্তিপত্রের বিবরণের Ts'ien-han shu-তে একটি হুন শব্দ (চীনা লিপির প্রতিবর্ণায়ন অনুযায়ী ঃ 'কিংলু, প্রাচীন ধ্বনি ঃ 'কিং-লুক) উল্লেখ করা হইযাছে, যাহার অর্থ 'হুন জাতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত তরবারি'। Fr. Hirth-(Bulletin de l'Acad. etc., 1900 p. 222) এই শব্দটির সহিত Teleut kingirak "দু'ধারি ছুরি" (R. Shaw, Worterbuch. ii. 709) এবং পূর্ব তুর্কিস্তানী শব্দ Kingrak "একটি চওড়া ছুরি"র (R. Shaw, A Sketch of the Turk Language, ii, 163) সম্পর্কসূত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। আরও প্রাচীন চীনা কোনও কোনও সূত্রে এই একই হুন শব্দ খৃষ্টপূর্ব ১০২২ সনের এক ঘটনার বিবরণে অন্তর্ভুক্ত থাকায় Hirth এই শব্দকে প্রাচীনতম লিপিবদ্ধ শব্দ হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন (The Ancient History of China, New York 1911, p. 67). K. Shiratori (Bulletin de l'Acad. etc. 1902, p. 67)। তিনি তুর্কী ভাষা হইতে নানা চীনা সূত্রে সংরক্ষিত বহু সংখ্যক হুন শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়াস পান; কিন্তু পরবর্তী কালে তিনিই (J. A., ccii, 1923, p. 71 প.) এই কথা প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, হুনদের ভাষা ছিল মোঙ্গল ভাষা এবং ঐ ভাষায় তুনগুয-এর উপাদান মিশ্রিত ছিল।

চীনা সূত্রগুলিতে হুনদের পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশী হিসাবে Sien-pi জাতির লোকজনের উল্লেখ আছে। এই শেষোক্ত জাতির প্রথম খৃস্টীয় শতকের শেষ নাগাদ হুনদিগকে মঙ্গোলিয়া হইতে বিতাড়িত করে। পরবর্তী কালে হুন ও সেই সঙ্গে Sien-pi-গণও চীনে কয়েকটি শাসক বংশ কায়েম করে। Sien-pi শাসক বংশগুলির মধ্যে উত্তরাঞ্চলের Wei(৩৮৬-৫৩৪) বংশ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Sien-pi জাতির লোকজনকে সাধারণত তুনগুয জাতির [দ্র. E. Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux, St. Petersburg 1903, p. 155, note 5] লোক বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে ১৯২৫ খৃ. শরৎকালে St. Petersburg-এ প্রদত্ত এক ভাষণে P. Pelliot এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, চীনা ভাষায় কিছু কিছু Sien-pi শব্দের অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, Sien-pi জাতির লোকেরা ছিল তুর্কী ভাষাভাষী। আমার জ্ঞানমতে, উল্লিখিত Sien-pi শব্দমালার ব্যাপারে এ যাবত কোনও কিছুই ছাপার আকারে প্রকাশিত হয় নাই। এই ধরনের কোনও সূত্র আমাদের হাতের নাগালে না পৌঁছানো অবধি Sien-pi জাতির আদি উৎপত্তির প্রশ্নটির নিষ্পত্তি সম্ভব হইবে না। যদি ইহা সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, হুনগণ প্রকৃতপক্ষেই মঙ্গোল আর Sien-pi জাতির লোকেরা তুর্কী, তাহা হইলে ইহাও সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হইবে যে, একদা তুর্কীরা মঙ্গোল অধ্যুষিত অঞ্চলের পূর্বাঞ্চলে বাস করিত। বর্তমান পরিস্থিতি অবশ্য তাহা নহে, যেই জাতির নাম কেবল চীনা লিপির প্রতিবর্ণায়নে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে সেই জাতির নামের উচ্চারণ আসলে কী ছিল তাহা আমরা জানি না। E. Blochet (G. M. S., xii, 201) Sien-pi ও Sibir-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বায়যান্টীয় ও আর্মেনীয় সূত্রগুলিতে ৪৬৩ সনে আমরা প্রথমবার ও ৫৫৮ সনে শেষবারের মত Sabir নামে অভিহিত এক জাতির উল্লেখ পাই (তু. J. Marquart, Osteuropaische und ostasiatische Streifzuge, Leipzig 1903, index, তবে Sien-pi জাতির লোকজনের পশ্চিমাঞ্চল অভিমুখে দেশত্যাগের ব্যাপারে কোনও কিছুই জানা যায় না)।

N. Poppe সাম্প্রতিক কালে আরেকটি দৃষ্টিকোণ হইতে তুর্কী জাতির আদি উৎপত্তি ও প্রাচীন ইতিহাস বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি অনুমান করিয়াছেন, আলতাই পার্বত্য অঞ্চলের আদিম ভাষা (Ursprache) হইতে আদি তুর্কী, আদি মঙ্গোল ও আদি-তুনগুয ভাষা বিকাশ লাভ করিয়াছে। ওরখন শিলালিপিতে প্রাচীন তুর্কী লিপির ভাষা যে পর্যায়ে বিকাশ লক্ষ করা যায়, সমসাময়িক কালের আদি তুর্কী ভাষাও ছিল তাহার সমকক্ষ পর্যায়ের। আমাদের আদি তুর্কী ভাষা সম্পর্কিত ধ্বনিতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ওরখন তুর্কী ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান (ধ্বনিতত্ত্ব) পরিপূর্ণরূপেই সঙ্গতিপূর্ণ (Ungarische Fahrbucher, v, 98)।

উল্লিখিত লেখক অবশ্য এই দাবি করেন না যে, সকল আধুনিক তুর্কী ভাষারই উৎপত্তি হইয়াছে 'ওরখন শিলালিপি'র ভাষা হইতে। এই ধরনের দাবিও সঙ্গত নয় এই কারণে যে, খোদ ওরখন শিলালিপি হইতেই কয়েকটি তুর্কী উপজাতির উদ্ভবের কথা জানা গিয়াছে। ওরখন তুর্কী একটি "অচলপ্রায় উপভাষা"। আদি তুর্কী ভাষার কাল পরিসর অবশ্যই খৃস্টীয় সাল গণনা শুরুর ঠিক আগের সর্বশেষ শতকগুলি বলিয়া চিহ্নিত করিতে হইবে (পূ. গ্র.)। সাধারণত তুর্কী ভাষাগুলি মোঙ্গল ভাষাগুলির তুলনায় উন্নততর স্তরের। এমন কি মোঙ্গল ভূভাগের যে কোনও অঞ্চলের উপভাষা আমাদের জ্ঞানমতে প্রাচীনতর তুর্কী ভাষাগুলির তুলনায় অনেক বেশি জরাগ্রস্ত, অব্যবহৃত। প্রচলিত মোঙ্গল উপভাষাগুলি ছাড়া আধুনিক মোঙ্গলীয় রচনাবলী (সাহিত্য) 'ধ্বনিগত দিক হইতে' আলতাই অঞ্চলের আদি-ভাষার বিকাশের প্রায় সমান স্তরের (পূ. গ্র., পৃ. ১১৭)।

অন্যান্য তুর্কী ভাষার সহিত "Cuwassisch" (তাঁহার ব্যবহৃত নিজস্ব আঙ্গিক বা শব্দরূপ) সম্পর্কে উল্লিখিত গ্রন্থকারের (পূ. গ্র.; আরও দ্র. Bulletin de l' Acad. etc., 1924, p. 299 sqq., Asia Major, i. 775 sqq; Korosi, Czoma-Archiv, ii. 65 sqq; Ungarische Fahrbucher, vii, 151 sqq.) বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হইয়াছে। চুওয়াসিশ ভাষাটি আদি তুর্কী ভাষার সহিত নহে, বরং চুয়াসিশ-এর আদিতম ও উহার পরবর্তী কালের রূপটির উদ্ভব ঘটিয়াছে একটি আদিম চুওয়াসিশ-তুর্কী ভাষা হইতে, আর সেই সুবাদে আদিম মঙ্গোল ভাষার উৎপত্তিও একটি আদিম আলতাই অঞ্চলীয় ভাষা হইতে। চুওয়াসিশ তুর্কী মূল ভাষায় হুন জাতির লোকদের পশ্চিমাঞ্চলে গমনের পটভূমিকায় সতর্কতার সহিত নানা বিভক্তি আনয়ন করা হইয়াছে। চুওয়াসিশ জনগোষ্ঠীর লোকেরা পশ্চিমাঞ্চলীয় উল্লিখিত হুনদেরই বংশধর। চুওয়াসিশ-তুর্কী আদিম ভাষা ছিল হুনদের ভাষা। Ramstedt-এর ধারণা, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কালে তুর্কী ভাষা বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন ঘটে (যাহা চুওয়াসিশ ভাষায় ঘটে নাই অর্থাৎ র> য ও ল> শ-এ পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই) [F. S. F. Ou., xxxvii/1,31], বরং এই পরিবর্তন ঘটিয়াছিল আরও বহুকাল আগে সম্ভবত খৃস্টীয় সনের সূচনাপর্বের কোনও এক সময়ে।

V. Thomsen (Z. D. M.G., lxxviii. 122)-এর ধারণা, তুর্ক শব্দটির অর্থ "শক্তি, ক্ষমতা" (আরও তু. F. W. K. Muller, Uigurica, ii. 97 : ark turk; আর্ক তুর্ক ঃ "শক্তি ও ক্ষমতা")।

কথিত হইয়া থাকে যে, "আদতে ঐ শব্দটি দ্বারা সম্ভবত একটিমাত্র উপজাতি বা খুব সম্ভব একটি শাসক পরিবারের নাম" বুঝাইত। বিভিন্ন লিপিতে 'তুর্ক' শব্দের যে উল্লেখ আছে উহা কোনও জাতি-গোষ্ঠীগত নহে, বরং অধিকতর রাজনৈতিক তাৎপর্যে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 'আমার তুর্ক জাতির লোক, আমার প্রজা (লোক) [দ্র. in Thomsen, i. E. 18; ii, E.16; ii, S.10] এই অভিব্যক্তিমূলক কথাগুলি শব্দটির রাজনৈতিক তাৎপর্যের প্রতিই বরং অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 'তুর্ক' এই নামের পাশাপাশি ওগুয বা তোকুয [নয় (৯) জনসমষ্টির বিভিন্ন উপজাতি ও পরিবারের সংখ্যা হইতে] নামেরও প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ওগুয বা তোকুয-এর উল্লেখ কোনও কোনও ক্ষেত্রে তুর্কী জনসমষ্টি ও তাহাদের শাসক হিসাবে, কখনও কখনও খান-এর নিজস্ব লোকজন হিসাবে (দ্র. esp. i., N. 4;ii., E. 30) রহিয়াছে। ঐসব উল্লেখের বেলায় খোদ খান তোকুয ওগুযকে নিজস্ব লোক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাঁহার শাসনের বিরুদ্ধে "নিজের লোকজনের" উত্থানকে আসমান-যমীনের সর্বত্র শৃঙ্খলার অবলুপ্তি গণ্য করিয়াছেন। এই খান ও তাঁহার লোকজন সম্ভবত ওগুয জনগোষ্ঠীর লোক। খানের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ওগুযদের বসবাস ছিল খান-এর প্রাসাদের উত্তরে, Otuken নামক (এই শব্দটি সম্পর্কে এখন আরও দ্র. B. Vladimircov, in Comptes rendus de l'Acad. etc. 1929, p. 133 sq.) পার্বত্য আঞ্চলের নিকট; ইহা Thomsen-এর (Z. D. M. G., lxxviii, 123) বর্ণনা অনুযায়ী সম্ভবত উত্তর মঙ্গোলিয়ার ওরখন নদী অববাহিকার বর্তমান হানগাই পার্বত্য অঞ্চলেরই একটি অংশ। ইহা ছাড়া উত্তর মঙ্গোলিয়ার সেলেংগা নদী তীরবর্তী অঞ্চলে উইগুর জনগোষ্ঠীর বসবাসের উল্লেখও একটিমাত্র অনুচ্ছেদে লক্ষ করা যায় (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৩৭)। তুর্কদের ওগুয দুশমনদেরও নিজস্ব একজন কাগান ছিল ৬৮০ সালের দিকে, যিনি ছিলেন চীন সম্রাটের একজন সামন্ত। অবশ্য ৮ম শতক নাগাদ এই কাগানের আর কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। উইগুর জনগোষ্ঠীর নেতা অপেক্ষাকৃত নমনীয় 'এলতাবির' এই পদবী ধারণ করিতেন। বিভিন্ন লিপিতে কাগানলীগ বুদুন (কাগানের অধীন জনগোষ্ঠী) ও "এলতাবিরলীগ বুদুন" (এলতাবিরের শাসনাধীন জনগোষ্ঠী)-এর মধ্যকার পার্থক্যটি পরিষ্কার পূর্বাঞ্চলে তুর্ক কাগান ছাড়াও (উত্তরাঞ্চলের চীনাদের অভিমত অনুযায়ী) পশ্চিমাঞ্চলেও একজন তুর্কী কাগান বা তুর্গী (তুর্গেশ) কাগানও ছিলেন। আরবী গ্রন্থে (তাবারী, ২খ., ১৫০৩, 'নাওয়াকেত' নামে এক শহরের উল্লেখ আছে; শহরটির অবস্থানের জন্য দ্র. B. G. A., vi., text, p. 29 and 206) ও নানা চীনা সূত্রে জানা যায়, তাঁহার প্রাসাদ ছিল চু (দ্র.) নদীর তীরে। এই শাসকের প্রজাবর্গ 'Ten Arrows বা "দশ তীর" নামে অভিহিত। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঐ জনসমষ্টির উপজাতির সংখ্যা ছিল ১০। ইহা ছাড়া ৩য় আরও একজন তুর্কী কাগানের অস্তিত্ব ছিল। তিনি ছিলেন কিরগিয (দ্র.) কাগান। Yenisei নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এক কিরগিয জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল। বিভিন্ন লিপি সূত্রের দাবি অনুসারে খান স্বয়ং কিরগিয জনগোষ্ঠীর শাসককে কাগান (i. E. 20; ii., E. 17) খেতাব প্রদান করেন। একজন খান (কাগান) হইতে হইলে ঐ নেতাকে আরেকজন খানের নিকট হইতে উহা পাইতে হইবে–এই অভিমতটি বিভিন্ন মুসলিম সূত্র হইতেও পাওয়া গিয়াছে (Awfi in Barthold, Turkestan v epokhu mongol' skago nashestviya, i, 96)।

পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্কীদের পূর্বাঞ্চলে এবং আলতাই ও Irtish নদীর উজান অঞ্চলের মধ্যবর্তী (দ্র. Thomsen, Z. D. M. G., lxxvii, 172) তুর্ক-অধ্যুষিত অঞ্চলে কারলুক নামধেয় এক জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল। সন্দেহাতীতভাবে ইহারা তুর্কদের একটি শাখা। ৭৬৬ খৃ. পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্কদের রাজ্য এই কারলুকদের দখলে আসে। এই সময়ে কারলুকদের শাসক সীর দরিয়া তীরবর্তী ওগুয শাসকের মতই তুর্কী (মূল তোখারি; তু. Marquart, Eranshar, p. 204; W. Bang. in Ung. Fahrb., vi. 102, note 3) খেতাব 'য়াবগূ' ধারণ করিতেন। ওরখন শিলালিপিতে বলা হইয়াছে, য়াবগূ একজন শাসকের খেতাব। একমাত্র যে তুর্ক উপজাতিটি ঐ সময়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল (অন্ততপক্ষে পূর্বাঞ্চলে) উহারা হইতেছে, বিশবালীক (দ্র.)-এর বাসমীল উজপাতি। ইহাদের শাসকের খেতাব ছিল ইদুক-কুট "পুণ্য রাজ মহোদয়" (ii, P. 25)। ১৩শ শতকে একই অঞ্চলে উইগুর শাসকেরও ঐ একই খেতাব ছিল। এই খেতাবের আদি উৎস সম্পর্কে লোকজন ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হইয়াছিল (আর একই কারণেই রাশীদু'দ-দীন ও আবু'ল-গাযীর (তু. Radloff, Kudatku Bilik, Part i., p. xxvii & xxxix-এর উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ) রচনায় ঐ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস লক্ষণীয়। A. Grunwedel মনে হয় এই অঞ্চলেই 'idikut' এই উচ্চারণটি শুনিয়াছিলেন। এইজন্যই তুরফানে (A. Grunwedel, Berichte uber archaologische Arbiten in Idikutschari und Umgegebung, Munich 1905) ইদিকুতশারি নামের ধ্বংসাবশেষের কথা জানা যায়। Thomsen (Z. D. M. G., lxxviii, 171) বাসমীল উপজাতির বর্ণনায় "তুর্কদের সম্পর্কিত একটি উপজাতি" হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বাসমীলগণ যে বিশুদ্ধ তুর্ক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নহে তাহা উপজাতিটির নাম হইতেই স্পষ্ট। Aristow (Zamietki ob etniceskom sostavie tyurkskikh plemen, St. Petersburg 1897, p. 91 sq.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, Ducange-এর (Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis) অভিমত অনুসারে বায়যান্টিয়ামে ফরাসী পিতা ও গ্রীক মায়ের সন্তানকে 'Basmoule'বা Gasmoule নামে অভিহিত করা হইত। এমন কি ১২শ শতকেও মাহমূদ কাশগারী (১খ., ৩০) বাসমীলদের এমন এ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যেই জনগোষ্ঠীর লোকজন তুর্কী ভাষা জানিলেও তাহাদের নিজস্ব অ-তুর্কী ভাষাও ছিল।

শিলালিপিতে বর্ণিত অন্যান্য জনগোষ্ঠী সম্ভবত তুর্কী ছিল না, যদিও তাহাদের নামের আগে "Otuz" -এর মত তুর্কী গাণিতিক সংখ্যা ৩০ বোধক ও তোকুয (৯) যুক্ত। ইহাদের মধ্যে তাতার জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখযোগ্য। Thomsen (Z. D. M. G., lxxvii, 174) ইহাদের সম্পর্কে সঠিকভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহারা নিঃসংশয়ে 'মঙ্গোল'। আনুমানিক ৭৪৫ সনে মঙ্গোলিয়ার শাসন ক্ষমতা ওগুযদের (তুর্ক) হাত হইতে উইগুরদের হাতে চলিয়া যায়। ইহার পর হইতে উইগুর শাসক কাগান খেতাব গ্রহণ করেন। তাহার শাসক বংশের শাসনকাল ৮৪০ খৃ. পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই শাসনামলের কিছু শিলালিপি আমাদের হাতে আছে। ইহার একটি জনৈক কাগান সম্পর্কিত। এই উৎকীর্ণ লিপিটি প্রকাশ করিয়াছেন Ramstedt (F. S. F Ou., xx. 3) । এই কাগানের শাসনামল ৭৪৬ হইতে ৭৫৯ খৃ. পর্যন্ত। Thomsen (Z. D. M. G., lxxvii, 128 প.) এই অভিমতের সহিত একমত যে, এই কাগানের রাজ্যটি ওগুয রাজ্যসমবায়ের (কনফেডারেশন) অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ওগুয ও উইগুর জনগোষ্ঠীর কথিত ভাষার মধ্যে সামান্য উপভাষাগত অমিল ছিল মাত্র। অবশ্য উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ইহার সপক্ষে কোনও সমর্থন পাওয়া যায় না। দৃশ্যত মনে হয় উইগুর ওগুয রাজ্যসমবায় হইতে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র এক রাজ্যসমাবেশ। সংশ্লিষ্ট

কাগানের দাবি অনুসারে তিনি 'অন (১০) উইগুর' ও 'তোকুযওগুয' রাজ্যের শাসক। তবে বিশ্বস্ত চীনা সূত্র অনুযায়ী উইগুর জনগোষ্ঠীও নয়টি উপজাতির সমষ্টি ছিল। মনে হয়, ওগুয জনগোষ্ঠীর কিছু কিছু লোক উইগুর শাসনাধীনে মঙ্গোলিয়ায় থাকিয়া যায়। শেষোক্তদের মধ্যে 'চোল' (চীনা প্রতিবর্ণায়ন অনুসারে C'u-yue, চীনা অনুবাদ ঃ শা-তো= "বালুকাময় মরুভূমি") উপজাতির লোকেরা আদতে পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্ক। সাত শতকে শা-তোগন বারকুল (সঠিক ঃ বার্‌সকুল) হ্রদের তীর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তবে এইখানে তাহারা তিব্বতীয়দের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। পরে তাহারা (৭১২ সাল হইতে) আরও কিছুটা পশ্চিমে বিশবালীকে বসতি স্থাপন করে। ৮০৮ সালের পর এইখান হইতেও উহারা তিব্বতীয়দের দ্বারা বিতাড়িত হয় এবং পরে চীনা ভূখণ্ডে চলিয়া যায়। চীনের ইতিহাসে ইহাদের সর্বাপেক্ষা বেশি পরিচয় মিলে হুয়াঙ-চাও-এর বিদ্রোহ (৮৭৭-৮৮৩) দমনকে কেন্দ্র করিয়া। মুসলিম ইতিহাসে ইহাদিগকে তোগুযুগুয-এর লোক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দশম শতকে শা'তো' তুর্কী (পরবর্তী তা'ঙ বংশ, ৯২৩-৯৩৬, পরের ৎসিন বংশ, ৯৩৬-৯৪৭ এবং পরের হান বংশ, ৯৪৭-৯৫১) জনগোষ্ঠী তিনটি স্বল্পস্থায়ী শাসক বংশের প্রতিষ্ঠা করে।

কারাবালগাসুন-এ প্রাপ্ত চীনা শিলালিপিটি রচনা করেন উইগুরের কাগান। ৮২১ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হয়। এই উইগুর জনসমষ্টির লোকজনের মানি ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণের বিষয় এই শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। ৭৬২ খৃ. চীনের বিরুদ্ধে এক অভিযানের সময় (হো-নানের নিকট) লো-ইয়াং শহরে উইগুর উপজাতির লোকেরা মানি মতবাদের সহিত পরিচিত হয়। এই শহর হইতে চারজন মানি ধর্মপ্রচারককে উইগুরগণ তাহাদের দেশে (মঙ্গোলিয়া) লইয়া যায়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল "বর্বর রীতিপ্রথা ও রক্তপাতময় ঐ দেশটিকে এমন এক দেশে রূপান্তরিত করা, যেইখানকার অধিবাসীরা হইবে নিরামিষাশী, একে অন্যকে হত্যার ঐতিহ্যময় ঐ দেশকে এমন দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলা যে দেশে মানুষ কল্যাণময় কর্মে অনুপ্রাণিত হইবে" (F. A., xi, l. 194)। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও সিরীয় খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকগণ (বিশেষ করিয়া নেস্তোরীয় খৃষ্টীয় ধর্মমত) চীনে ও তুর্কদের মধ্যে জোর ধর্মীয় প্রচার তৎপরতা গড়িয়া তোলে। চীনা তুর্কিস্তানে প্রত্ন অনুসন্ধানমূলক বিভিন্ন অভিযানের সেইখানে বহু তুর্কী নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যেইগুলি উল্লিখিত ধর্মীয় প্রচার-তৎপরতার স্বাক্ষর। তবে কাবরাবালাগাসসুন শিলালিপিই দৃশ্যত একমাত্র নিদর্শন যাহাতে উল্লিখিত ধর্মগুলির একটিতে একজন তুর্ক শাসকের ধর্মান্তর গ্রহণের প্রমাণ রহিয়াছে, বিশেষত সোগদীয় (তু. সোগদ) চীনে ও তুর্কদের মধ্যেমানি মতবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। চীনা উৎকীর্ণ লিপিসমূহ ছাড়াও একটি ছোট ভিন্ন উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে। আগে মনে করা হইত এই শিলালিপিটি উইগুর লিপিতে লেখা, কিন্তু এখন উহা সোগদীয় লিপিতে লেখা বলিয়া F. W. K. Muller (Ein iranisches Sprachdenkmal aus der nordlichen Mongolei in S. B. Pr. Ak. W. 1909) স্থির করিয়াছেন। R. Gauthiot (Essai de Grammaire sogdenne, Premire partie, Phonetique, Paris 1914-1923, xiii)-এর মতে এই উৎকীর্ণ লিপির ভাষা " Somme toute, la tradition la plus vieille et al plus constante de sogdien"। সোগদীয় লিপি হইতেই উইগুর লিপির বিকাশ ঘটিয়াছে। পরবর্তী কালের উইগুর লিপি সম্ভবত নবম শতকেই আদিতম তুর্কী বর্ণমালা তথা ওরখন শিলালিপির বর্ণমালা পুরাপুরি উৎখাত করিয়া উহার স্থান দখল করে। ১৩শ শতকে মোঙ্গলগণ উইগুর বর্ণমালা গ্রহণ করে। মঙ্গোলীয় সাম্রাজ্যের শাসনামলে মঙ্গোলিয়া হইতে দক্ষিণ রাশিয়া ও পারস্য পর্যন্ত সকল দেশে উইগুর বর্ণমালার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ৮৬০ খৃ. নাগাদ কিরগিযগণ উইগুর সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়। নবম শতকের মাঝামাঝি মঙ্গোলিয়া হইতে বিতাড়িত উইগুরগণ দুইটি রাজ্য স্থাপন করে। ইহার একটি কান-চৌ (কানসু দ্র., শ্রেয় ঃ কান-জু) ও অন্যটি বিশবালীক ও কারা-খোজাতে। এই দুই রাজ্য ও খোতানেও (F. A., xi, 1,265 প.) ১০ম শতকে মানি মতবাদ প্রচলিত ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশবালীক ও কারা-খোজা-র শাসকগণ চীনা সম্রাট ও সামানী শাসকদের হাত হইতে স্বধর্মীদের রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন (মাস'উদী, মুরূজ, ২খ, ৩০০)। সম্ভবত উইগুরদের পূর্বসূরী তোকুয-ওগুযদের উদ্যোগে বিশবালীক-এ মানি মতবাদ আগেই প্রসার লাভ করিয়াছিল। য়াকূত (মু'জাম, ১খ, ৮৪০, supra) এই ক্ষেত্রে তামীম ইব্‌ন বাকর আল-মুতাওওরা'ই-এর বরাত দিয়াছেন এবং খুর্‌রাদাযবিহও (B. G. A., vi, text, p. 30 প.) নিশ্চিতভাবে এই সূত্রটি ব্যবহার করিয়াছেন। খুর্‌রাদাযবিহ উইগুর নয়, বরং খোদ তোগুযগুয (তোকুয-ওগুয) পরিদর্শন করেন বলিয়াই মনে হয়।

এই সময় ঐ অঞ্চলে, বিশেষত খাকানের (কাগান) রাজধানীতে মানি মতবাদই ছিল প্রধান ধর্মীয় মতবাদ। রাজধানীর পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশেও অনেক মানি মতানুসারী ছিল। তবে তথায় জরাথুস্ট্রবাদী অগ্নিপূজক পারশীরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। Whetber, Chavannes ও Pelliot (F. A., xl, l. 269)-এর মতে আজ যে অঞ্চল চীনা তুর্কিস্তান বলিয়া পরিচিত তাহার প্রায় সকল অঞ্চলের (en grande Partie') তুর্কীকরণের কাজটি প্রথমে উইগুরগণ করেন বলিয়া যে ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে, বরং উইগুরদের পূর্বসূরীরা আগেই হয়ত এই অঞ্চলে মানি মতবাদ প্রচার ও প্রসারে অনেকখানি আগাইয়াছিল। কাশগার ও ইহার পূর্বের সকল ভূখণ্ডকে আরবগণ শুরু হইতেই বিশুদ্ধ তুর্কী অধ্যুষিত অঞ্চল গণ্য করিত।

দুই উইগুর রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্য (কান-চৌ) ১০২৮ খৃ. তানগুতদের পদানত হয়। তবে মোঙ্গল আমলে দ্বিতীয় রাজ্যটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। ৯২৪ সনে কিতাই (তু. কারা-খিতাই) রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা Apaoki কান-চৌ-এর উইগুর অধিবাসীদের বলেন যে, কিরগিযদের তাহাদের আদি বাসস্থান, ওরখন নদীতীর অঞ্চলে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। তবে উহাতে তাহারা এই কারণে অসম্মতি জানায় যে, তাহারা ইতিমধ্যেই মঙ্গোলিয়ায় নয়া বসতি অঞ্চলের পরিবেশে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা নূতন করিয়া আবার যাযাবর হইতে চাহিতেছিল না (E. Bretschneider, Mediaeval Researches from Eastern Asiatic sources, i, 214; J. Marquart, Guwaini's Bericht uber die Bekehrung der Uighuren, S. B. Dr. Ak. 1912)।

কিরগিযদের বিরুদ্ধে কিতাই-এর বিজয় মঙ্গোলিয়ায় তুর্কী শাসনের সত্যিকারের অবসান ও মোঙ্গল শাসনের সূচনা করে। কিরগিযগণ মঙ্গোলিয়া নিবাসী সর্বশেষ তুর্ক জাতির লোক। আজিও মঙ্গোলিয়ায় এই কিরগিযদের স্মৃতিই জাগরূক আছে। মঙ্গোলিয়ায় উইগুর জাতির লোকদের কবরসহ প্রাক-মোঙ্গল আমলের সকল সমাধিকে 'কিরগিয কবর' (খিরগীয উর)–বলিয়া অভিহিত করা হয়। ওরখন শিলালিপিতে ওতুকান পাহাড়ী অঞ্চল তুর্কী অঞ্চল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মাহ্‌মূদ কাশগারীর (দীওয়ান লুগাতি'ত-তুর্ক, ১খ., ১২৩) বর্ণনা অনুযায়ী এই অঞ্চলটি তাহার স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এই সময় হইতেই সকল মুসলিম সূত্রে তুর্ক জাতির লোক সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখ

পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন আমলের বেলায়, তুর্ক শিলালিপি ও চীনা সূত্রগুলিতে তুর্ক জাতির লোক সম্পর্কিত উল্লেখের পরিপূরক উৎস হিসাবে পাশ্চাত্য সূত্রসমূহ কাজ করিয়াছে। বায়যান্টীয় সূত্রসমূহ হইতে আমরা জানিয়াছি যে, ৫৭৬ খৃ. তুর্ক জাতির লোকেরা Tauric--এর Bosporus জয় করে এবং ৫৮১ খৃ.-এর পূর্বেই তাহারা Chersonesus-এর প্রাচীরের নিকটে পৌঁছায়। কিন্তু Tauric উপদ্বীপ অঞ্চলে তুর্কী শাসন খুব বেশি কাল স্থায়ী হয় নাই। ৫৯০ খৃ. নাগাদ সেইখানে বায়যান্টীয় শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (A. Vasil'yev, in Izv. Akad. Mater. kulturi., v, 185 প.)।

৫৬৮ খৃ. হইতে ৫৯৮ খৃ. অবধি বায়যান্টীয় সূত্রগুলিতে তুর্ক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় (Zemarchos-এর নেতৃত্বে তুর্কদের নিকট প্রেরিত বায়যান্টীয় দৌত্য) [সম্রাট Maurice -এর নিকট তুর্কী কাগান-এর পত্রাবলী; তু. এইসব সূত্রের সর্বাধুনিক সমীক্ষার জন্য দ্র. E. Chavannes, Documents sur les Tou-Kiue (Turcs) occidentaux. St. Petersburg 1903, p. 233 প.]।

বায়যান্টীয় দূতগণের মধ্যে কেবল প্রথম দূত Zemarchos ভলগা নদী অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্কদের কাগানের প্রাসাদে গমন করেন। Chavannes-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐ প্রাসাদটি কুচা শহরের উত্তরে আকতাগ (শ্বেত পর্বত)-এর নিকট অবস্থিত ছিল। সাসানীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানের ব্যাপারে তুর্কদের সহিত বায়যান্টীয় পক্ষের সঙ্গে প্রায়ই রফা হইত, যদিও কোন স্থায়ী মিত্রতা হয় নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তুর্কগণ বায়যান্টীয় ও পারসিক–উভয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুর্কগণ Alan (তু. আল্লান) জয়ের পর সাসানী সাম্রাজ্য কেবল মধ্য এশিয়া হইতেই নহে, বরং কাস্পিয়ান হ্রদের পশ্চিমাঞ্চলে স্থলবন্দী হইয়া পড়ে। সম্ভবত এই তুর্ক আক্রমণের মুকাবিলায় দারবান্দ (দ্র.)-এর প্রাচীর নির্মাণ করা হয়।

খাযার শাসকগণ তুর্ক যাযাবর সাম্রাজ্যের ধারা বজায় রাখে। এই খাযারগণ পরবর্তী কালের 'Golden Horde' অঞ্চলে চিঙ্গীয খান (দ্র.)-এর সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের মতই ৭ম শতকে (দ্র. বুলগার ও খাযার) এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়। Golden Horde অঞ্চলে মোঙ্গলগণের রাখিয়া যাওয়া প্রভাবের সহিত ৬ষ্ঠ শতকের পূর্ব য়ুরোপ বিজেতাদের অবশিষ্ট প্রভাবের তুলনা করা যায়। বুলগার ও খাযারদের ভাষা উল্লিখিত আদি পর্যায়ের তুর্কদের ভাষার অন্তর্গত। বর্তমানে কেবল চুওওয়াস ও Magyar-এর তুর্ক জাতিগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যেই ইহার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। কেবল ৯ম শতকের শেষের দিকে Peceneg-গণ য়ুরোপে বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষা লইয়া আসে। কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বাঞ্চলের সাসানীগণ প্রতিবেশী তুর্কী হামলার মুকাবিলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। জুরজান (দ্র.) প্রদেশ রক্ষার জন্য এক ইস্টক-প্রাচীর নির্মাণ করে। কিন্তু ইহা দ্বারা তুর্কদের বিজয়াভিযান (বালাযুরী, পৃ. ৩৩৬; B. G. A., vi., text, p. 261 প.) রোধ করা যায় নাই। Gurgen নদীর দক্ষিণ তীরে এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে কীযীল-আলান নামে অভিহিত (বর্ণনার জন্য দ্র. I. poslawskiy, in Protokoli Turk Kruzka Lyub, Arkh, v. 185)।

সম্ভবত জুরজান প্রদেশ তুর্কদের পদানত হওয়ার কারণেই জুরজানে ও তাবারিস্তান (দ্র.) সীমান্তে পোড়ানো ইটের আরেকটি প্রতিরক্ষা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এই প্রাচীর খুসরাও আনুশীরওয়াঁ (B. G. A., vii, 150) নির্মাণ করেন বলিয়া কথিত আছে। ৯৮ হিজরী সনে (৭১৬-১৭) আরব ও তুর্কদের মধ্যে যুদ্ধে জুরজানের তুর্কদের নেতৃত্ব দেন দিহিস্তানের দিহকান সুল (তাবারী, ২খ., ১৩২০)। এইখানে উল্লিখিত সূল অবশ্যই একটি তুর্কী নামবাচক পদ বা পদবী। সম্ভবত ইহা তুর্কী চুর শব্দের প্রতিশব্দ। সাসানী আমলে তুর্কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইতিহাসে 'সূল' শব্দটি তাবারীর রচনায় একটি অনুচ্ছেদে এক জনগোষ্ঠীর নাম হিসাবে উল্লিখিত আছে। আর এই বিষয়ে Marquart (Eransahr, p. 51 & 73) 'চোল' (উপরে আরও দ্র. জুরজান) উপজাতি বা জনগোষ্ঠীর নিরিখে তাঁহার অভিমত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বক্তব্যের সঙ্গে Gurgen অঞ্চলের কোনও যোগসূত্র নাই, কেননা আলানদের সহিত সুল-এরও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পরবর্তী কালের একটি সূত্র (কিতাবুল-আগানী, ৯খ., ২১) অনুসারে Gurgen নিবাসী তুর্কগণ পারসিকদের ভাষা ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আর এই কারণেই ধরিয়া লওয়া যায় যে, সম্ভবত ৬ষ্ঠ শতকেই তাহারা অবশ্যই সাসানীদের শাসনাধীন অঞ্চল পদানত করিয়াছিল, যদিও কিতাবু'ল-আগানীতে এই একই ব্যক্তিদিগকে (সূল ও তাঁহার ভ্রাতা ফীরূয) ঐ অঞ্চলের বিজেতা ও আরবদের বিরুদ্ধে যোদ্ধা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আমূ দরিয়া (দ্র.)-র দক্ষিণাঞ্চলের যুদ্ধে পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে তুর্কীদের অনুকূলে ছিল। অন্তত Marquart (Eransahr, p. 53) ও তাঁহার অনুসরণে Chavannes (Documents etc., p. 252) সেই রকম বর্ণনাই দিয়াছেন। ঐ সময় সাসানী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত ছিল মুরগাব। তুর্ক বিজেতা ও তাহাদের আশ্রিত শেষ সাসানী শাসকেরা পরে এই অঞ্চলে আরবদের বিরুদ্ধে তেমন সাফল্য দেখাইতে ব্যর্থ হন। এই যুদ্ধের বর্ণনায় কেবল তুর্কদের উল্লেখ করা হইয়াছে, আলাদা আলাদা তুর্ক জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন নামের উল্লেখ নাই। তবে ইহার ব্যতিক্রম হিসাবে কারলুক [আরবীতে এই জনগোষ্ঠীর নাম খারলুখ (خرلخ) ও ফারসীতে খাললুখ হিসাবে উল্লিখিত]-এর জাবগুর উল্লেখ দেখা যায়। এই শাসক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই "তুখারিস্তান (দ্র.)-এর জাবগা নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাই কারলুক জনগোষ্ঠীর একাংশ ঐ সময় নাগাদ আমূ-দরিয়ার দক্ষিণ ভূভাগে পৌঁছাইয়া গিয়াছিল। আরও ঐ অঞ্চলে ঐ জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বর্তমান (এখন ইহাদিগকে কিছু বিচ্ছিন্ন ওযবেগ পরিবার হিসাবে গণ্য করা হয়)। ঐ সময় শান্তির দৌত্য লইয়া কয়েকজন আরব দূত তুর্ক শাসকদের দরবারে যান। কথিত আছে যে, খলীফা হিশাম 'তুর্করাজ'কে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত জানাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সব দৌত্য মিশনের ইহাই একমাত্র বিবরণ বা লিপি, যাহা আমাদের হাতে আছে (য়াকূত, মু'জাম, ১খ., ৮২৩; য়াকূতের সূত্র হইতেছে ইবনু'ল ফাকীহ, তু. Bulletin de l'Acad. etc., 1924, p. 241)। কিন্তু এই তুর্ক রাজার রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল সেই সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

আমরা কেবল ৩য়, বিশেষ করিয়া ৪র্থ (১০ম) শতকের আরব ভৌগোলিকদের নিকট হইতে বিভিন্ন তুর্কী জনগোষ্ঠী ও তাহাদের আচার-রীতি সম্পর্কে অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ পাইয়া থাকি। ভূগোল বিষয়ক এইসব রচনায় 'তুর্ক' শব্দটি কেবল একটি জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ভাষার শাখা সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে, যাহা ওরখন শিলালিপি ও চীনা বিবরণগুলির মত নহে। ওরখন শিলালিপি ও চীনা সূত্রগুলিতে 'তুর্ক' শব্দটি একটি একক জনগোষ্ঠী বা রাজ্য সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই সব সূত্রে পাঁচটি জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে (B. G. A., i, 9) যাহারা একটি ভাষায় কথা বলিত ও একে অন্যের কথা বুঝিতে পারিত। এই পাঁচটি জনগোষ্ঠী হইতেছে ঃ তোগুয-গুয (দ্র.), খিরছিয (কিরগিয দ্র.), কীমাক (তু. কিমাক), গুয্য (দ্র.) বা ওগুয ও খারলুখ বা কারলুক

(দ্র.)। আজিকার মত ঐ আমলেও Yenisei নদীর উজান অববাহিকা অঞ্চলই ছিল তুর্ক অধ্যুষিত ভূভাগের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শেষ সীমা; এই অঞ্চলে আরবদের পরিচিত পৃথিবীর সীমাও ছিল ইহাই। আরবদের মতে কিরগিয অধ্যুষিত শেষ উত্তর-পূর্বাঞ্চলটি সমুদ্র তীর অবধি বিস্তৃত ছিল।

ওগুয ও কারলুক তুর্করা ছিল মধ্য এশিয়ার মুসলিম রাজ্যগুলির সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী। ওগু'য ও তুর্ক অধ্যুষিত দেশ ছিল পশ্চিমে ফারাব (দ্র.) ও আসবিজাব [সিমকেন্ত (দ্র.)-এর নিকটে আধুনিক সায়রাম] অবধি জুরজানের মুসলিম অঞ্চল সংলগ্ন। পূর্বে আরও পূর্বাঞ্চলে বাস ছিল কারলুক তুর্কদের। চীনে যাইতে হইলে একজন লোককে কারলুক ও তোগুয-গুযদের দেশের মধ্য দিয়া পাড়ি দিতে হইত। এইজন্য ফারগানা (দ্র.)-র পূর্ব সীমানা হইতে কারলুক রাজ্যের মধ্য দিয়া ৩০ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া তোগুয-গুয হইয়া সেইখান হইতে চীনের মধ্য দিয়া সমুদ্র অবধি পৌঁছানো যাইত (B. G. A., ii. 11) অন্যান্য বিবরণের মধ্যে তারতম্য লক্ষণীয়। ইব্ন খুররাদাযবিহ (B. G. A., vi, p. 28 প.) তাঁহার রচনায় আরও দুইটি জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন– তারায (বর্তমানে আওলিয়া আতা, দ্র.)-এর পূর্বাঞ্চলে কারলুকদের শীতকালীন শিবির হইতে অল্প দূরে অবস্থিত ছিল খালাজ (দ্র. এই জনপদের একই নামের জনগোষ্ঠীর দক্ষিণাঞ্চলীয় শাখার কথাই কেবল এখানে আলোচ্য; খালাজ জনগোষ্ঠীর যে সকল লোক পারস্যে চলিয়া যায় তাহাদের সম্পর্কে দ্র. সাওয়া) ও খালাজ জনগোষ্ঠীর এখানেই বসবাস ছিল। অপর জনগোষ্ঠীটির নাম তুরগেশ। তারাস ও চূ-নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, চূ নদীর অপেক্ষাকৃত নিকটে তুরগেশদের খাকান শহর অবস্থিত ছিল। হুদূদু'ল-'আলাম ও গারদীযী (দ্র.)-তে প্রদত্ত বিভিন্ন পারস্যদেশীয় সূত্রে এই বিষয়ে আরও উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল সূত্র অনুসারে তুরগেশ জনগোষ্ঠী তুখ্সী (মাহমূদ কাশগারীর লেখায় এইভাবেই উচ্চারিত) ও অন্য নামে দুইটি উপ-জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তূখসীগণ চূ (দ্র.) নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করিত। সূয়াব নামক শহর-জনপদটি তুখসী ভূখণ্ডে অবস্থিত ছিল। এইসব জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলের পূর্বে ইসীক-কুল (দ্র.) নদী অববাহিকায় বাস ছিল চিগিল জনগোষ্ঠীর (মাহমূদ কাশগারীর লেখায় উল্লিখিত জনপ্রিয় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এক কাহিনী বলে এই উচ্চারণ কায়েমী (মাহমূদ কাশগারী, ১খ, ৩০০)। নারীন (দ্র.সীর দরিয়া) নদীর দক্ষিণে য়াগমা জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। ইহারা ছিল তোগুয-গুয জনগোষ্ঠীর অন্যতম শাখা। ইহাদের শাসক ছিলেন এই জনগোষ্ঠীরই এক রাজবংশের অন্যতম উত্তরপুরুষ। কাশগার শহর য়াগমা জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলভুক্ত। মাহমূদ কাশগারীর বর্ণনা অনুযায়ী (১খ, ৮৫) য়াগমা ও তুখসী জনগোষ্ঠীর লোকজন চিগিল জনগোষ্ঠীর একাংশের মতই ইলি (দ্র.) নদীর তীরে বসবাস করিত। তুখসী চিগিল (১খ, ৩৫৪) এই নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। চিগিল জনগোষ্ঠী তিন অংশে বিভক্ত ছিল। ইলি নদী অঞ্চলের চিগিলদের বিষয় আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের অপর অংশের বসবাস ছিল কাশগারের নিকটবর্তী এক গ্রামে এবং অবশিষ্ট অংশ তারাযের নিকট চিগিল নামে একটি ক্ষুদ্র শহর বা দুর্গ-জনপদে বাস করিত। তারাযের চিগিল অধ্যুষিত অঞ্চলটি ওগুয ভূভাগ সংলগ্ন ছিল। ওগুযগণ প্রায়ই চিগিল জনপদ অবরোধ করিত। আমূ দরিয়া হইতে চীন অবধি গোটা অঞ্চলের সকল তুর্ককে ওগুযগণ চিগিল বলিয়া অভিহিত করিত। খোদ মাহমূদ কাশগারী অনেক ক্ষেত্রেই এই ধারণাতেই চিগিল কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। লিপিবদ্ধ প্রমাণ অনুযায়ী চিগিল ও ওগুযদের (৩খ, ৩১) ভাষায় 'য়ারলীগ' বা 'edict' শব্দটি অজ্ঞাত ছিল। এই শব্দটি কোনও এক মাত্রার সংস্কৃতিগত তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়। য়াগমা জনগোষ্ঠীর লোকজনকে কারা য়াগমা (কৃষ্ণ য়াগমা) বলিয়াও অভিহিত করা হইত। তারাযের (৩খ, ২৫, পরবর্তী) নামের একটি গ্রামও আছে। মুকাদ্দাসীর রচনার দুইটি অনুচ্ছেদে তথা তাঁহার ভূগোল বিষয়ক রচনায় প্রথমবারের মত 'তুর্কোমান' শব্দটির উল্লেখ করা হইয়াছে (B. G., A., iii, 274 প.) যদিও ইহার আর তেমন কোনও সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য নাই।

সাওরানের নিম্নে সীর দরিয়ার অববাহিকায় ওগুয অধ্যুষিত অঞ্চলে বালাজ ও বারূকাত নামে দুইটি শহর ছিল। এই শহরগুলি ছিল তুর্কোমান আক্রমণের বিরুদ্ধে সীমান্ত দুর্গবিশেষ। ওগুযগণ ঐ সময় নাগাদ ইসলাম গ্রহণ করে। সূত্রের আরেকটি অনুচ্ছেদে এই অঞ্চলে অর্থাৎ কারলুক অঞ্চলের শাসক হিসাবে তুর্কোমানদের একজন শাসক বা রাজার নামোল্লেখ আছে। এই শাসকের নিকট হইতে আসবীজাহের শাসক নিয়মিত নজরানা পাইতেন। কাশগারী আরও বলেন যে, কেবল ওগুযগণই (১খ. ২৭ ও ৫৬; ৩খ, ৩০৪) নয়, বরং কারলুকগণও তুর্কোমান নামে অভিহিত হইত। রাশীদু'দ-দীনের (Trudi Vost. Otd. Arkh. Obshc. vii., 26 infra : Turk manend, তুর্ক সদৃশ) লেখায় তুর্কোমান নামের অতি পরিচিত জনপ্রিয় ব্যুৎপত্তির বিষয় কাশগারীর লেখাতেও (৩খ. ৩০৭) পাওয়া যায়। F. Hirth (S. B. Bayr., Akad., 1899, ii. 263, প.) আমাদের জানাইয়াছেন, তুর্কোমান শব্দটির চীনা প্রতিবর্ণায়িত লিপিরূপ "To-ku-mong" অনেক পূর্বেই অর্থাৎ ৮ম খৃস্টীয় শতকেই T'ung-tien বিশ্বকোষে লক্ষ করা যায়। এই বিশ্বকোষে এই তুর্কোমানদের বসতি আলান-অধ্যুষিত অঞ্চলের পশ্চিম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবত ওগুয বা তুর্কোমানগণ (১১শ শতক নাগাদ দেখা যায় যে, ওগুয বা তুর্কোমান নাম দুইটি নির্বিচারে যত্রতত্র ব্যবহার করা হইয়াছে) যাযাবর ইরানী বংশসম্ভূত এক জনগোষ্ঠী, যাহারা কালক্রমে তুর্কী আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করে। অন্তত এই জনগোষ্ঠীর লোকদের করোটির গঠন বৈশিষ্ট্য এই ধারণার সমর্থক।

উহারা অ-তুর্কী ও সম্ভবত মোঙ্গল–আমরা যে ধারণাই করি না কেন, উহারা তুর্কদের সহিত পশ্চিমাভিমুখে কেন দেশান্তরী হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। কিমাকদের সাত উপজাতির অন্যতম হিসাবে তাতারদিগকে (Gardizi, in Barthold. Otcet etc., p. 82) তোগুযগুযদের অন্যতম উপজাতিও (পূ. গ্র., পৃ. ৩৪) বলা হইয়া থাকে। তুর্ক জনগোষ্ঠী, তাহাদের দেশ, ভাষা, উপভাষা (বিশুদ্ধ তুর্কী উপাদানসম্বলিত নহে এমন উপভাষাসহ) সম্পর্কে প্রথম পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন মাহমূদ কাশগারী। কিন্তু তাঁহার বিবরণ সর্বত্র নির্ভরযোগ্য মনে হয় না, যদিও মুসলিম রচনাবলীর অন্যত্র তুর্ক এই নাম বা শব্দটি পূর্ব এশিয়ার অ-তুর্কী জনসমষ্টির ক্ষেত্রেও আরোপ করা হইয়াছে।

একটি অনুচ্ছেদের (১খ, ২৭ প.) পাঠ অনুসারে তুর্কদের আদি পুরুষ ছিলেন ২০ ব্যক্তি। এই ২০ ব্যক্তি ১০ জন করিয়া দুইভাগে ভাগ হইয়া যান। এক ভাগের নাম হয় উত্তরা ও অপর ভাগের নাম হয় দক্ষিণা। লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী এই বিশ ব্যক্তি পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। উত্তরা ভাগের ১০ জন তুর্ক আদি পুরুষের

নাম ঃ বেজেনেক, কিফজাক, ওগুয, য়ামাক, বাশগ্রুত, বাসমীল, কায়, য়াবাকূ, তাতার, কিরকিয এবং ২য় ভাগের ১০ ব্যক্তির নাম ঃ জিকিল, তুখশী, য়াগমা, ইগরাক, জারুক, জুমূল, উইগুর, তানকুত, খীতাই ও তাফগাচ। উত্তরা ভাগের নামের যে অনুক্রম দেওয়া হইয়াছে তাহা স্পষ্টতই ঠিক নহে; কেননা ইসতাখরীর (উপরে দ্র.) বর্ণনা অনুসারে কিরকিয (Yenisei নদীতীরের কিরগিয) তুর্কগণের বসবাস ছিল; আরও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, যদিও একই রচনার অন্য এক অনুচ্ছেদের (১খ, ১২৩) পাঠ অনুযায়ী তাতারগণ আরও পূর্বে উতূকানে (ওরখন নদী তীরবর্তী ওতুকেন) বাস করিত। য়ামাকগণ [য়েমেক-আদতে কিমাকদের (দ্র.) একটি উপজাতি, যে বিষয়ে কাশগারী কোনও উল্লেখ করেন নাই] ইরতীশ নদী তীরবর্তী ভূভাগে বাস করিত। বাশগুরত (বাশকির, দ্র. বাসজিকত) জনগোষ্ঠীর লোকেরা স্পষ্টত এত দূরবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী হইতে পারে না। (ইহাদের সম্পর্কে ইতিমধ্যে যাহা জানা গিয়াছে সে বিষয়ে ইহা উল্লেখ করা যায় যে, ইব্ন ফাদলান (দ্র. ইরোবো-র দক্ষিণে প্রথম একজন বাশকির তুর্কের সাক্ষাত পান। এত বেশী দক্ষিণে কোনও বাশকিরের সাক্ষাত পাওয়ার আর কোনও উল্লেখ কোনও সূত্রে পাওয়া যায় না (দ্র. Bull. De l'Acad. etc., 1924, p. 246)।

উত্তরাঞ্চলীয় তুর্ক জনগোষ্ঠীসমূহ যথা ঃ কায়, য়াবাকূ, তাতার ও বাসমীল তুর্কদের নিজস্ব ভাষা ছিল, যদিও তাঁহারা তুর্কী ভাষাও ভাল বলিতে পারিত (কায় জনগোষ্ঠী,সম্পর্কে তু. J. Marquart, in Osttürk. Dialektstudien, p. 53, ইহাতে ভুলক্রমে ওগুয পরিবার কায়ী-এর সহিত সম্পর্কসূত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে। মাহমূদ কাশগারীর রচনায় উহা কায়িগ; তু. একই বিষয়ে কোপরূলু-যাদে, তুরকীয়াত মাজমূ'আসী, ১খ, ১৮৭ পরবর্তী)। য়াবাকূগণ য়ামার (৩খ, ২১) নামে এক বৃহৎ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করিত। উহাদের লোকালয়ের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে লেখকের ধারণা খুব স্বচ্ছ নহে বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবত স্থানটির নাম 'ওব' এখনও তাতারগণ স্থানটিকে ওমার বা উমোর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। ৫ম (১১শ) শতকে বুকা বুদরাজের শাসনাধীন ও তাহার সামন্তদের য়াবাকূ ও তাহাদের মিত্র বাসমীলদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ সংক্রান্ত বিবরণের জন্য বি. দ্র. ৩খ, ১৭৩ প., বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অন্যান্য অনুচ্ছেদ দ্র., নদী অতিক্রম সংক্রান্ত বিবরণের জন্য ২খ., ৫; তু. C. Brockelmann, in Hirth Anniversary Volume, p. 11 প.) যুদ্ধযাত্রা পথে আরসলান তেগীনের নেতৃত্বে এক মুসলিম বাহিনী নদীটি অতিক্রম করে।

উত্তর ভাগের উল্লিখিত দশ আদি পুরুষভিত্তিক জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জিকিল, তুখসী, য়াগমা, ইগরাক, জারুক, জুমুল (১খ., ৩৮২-এর মত অন্যান্য অনুচ্ছেদে ঃ জুমাল), উইগুর, তানকুত, খিতাই অর্থাৎ স্তা, তাওগাহ অর্থাৎ মাসিন–এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে জুমুল অ-তুর্কীভাষীসমূহের অন্যতম জনগোষ্ঠী। ইহাদের সকলের অবশ্য তুর্কী ভাষায় ভাল দখল ছিল। আমরা এমন উইগুর জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও তথ্য পাইয়াছি যাহারা বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষায় কথা বলিতে পারিলেও তাহাদের আরও একটি ভাষা ছিল। আর এই ভাষাতেই তাহারা নিজেদের মধ্যে বাক-বিনিময় করিত। তানকূত (তানগূত) জনগোষ্ঠীর লোকেরা খোতান ও তুবূতের (তিব্বত) অধিবাসীদের মত একটি বিদেশী ভাষায় রপ্ত ছিল। ইহারা তুর্কী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। খোতানবাসীদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা ছিল। তাহারা খোতানে ভাল করিয়া তুর্কী ভাষায় কথা বলিতে পারিত না। সীন ও মাসীনের অধিবাসীদের নিজস্ব ভাষা ছিল। তবে তাহাদের মধ্যকার শহরবাসিগণ তুর্কী ভাষাও ভাল বলিতে পারিতেন। তুর্কদের নিকট প্রেরিত তাহাদের পত্রগুলি তুর্ক বর্ণমালায় লিখিত ছিল। একটি অনুচ্ছেদ (১খ., ৩৭৮) সীন শব্দটির উপর এক ব্যাপক অর্থারোপ করা হইয়াছে। সীন নামে তিনটি স্থানের অস্তিত্ব ছিল। এক সীন ছিল উত্তরাঞ্চলীয় বা তাওগাজ (মাসীন) সীন; মধ্যাঞ্চলীয় বা খিতাই (সীন) ও নিম্নাঞ্চলীয় বা বারখান (সীন)। কাশগারের নিকট উঁচু পাহাড়ে একটি দুর্গের নামও ছিল সীন। সীনে এক সমৃদ্ধ স্বর্ণখনি ছিল।

উল্লিখিত জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জারুক (সম্ভবত চারুক উচ্চারিত হইত) জনগোষ্ঠীর লোকেরা আধুনিক কালের মারাল-বাশি (২খ., ৩১৮) অতীত বারচুকের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত লোকালয় (তু. বিশেষত Valikhanow, Socineniya, p. 85 প.) তথা বারজুক (বারচুক) শহরে বাস করিত। ইহার ফলে আদতে অ-তুর্কী জনগোষ্ঠী জুমুলগণ কোথায় বাস করিত সেই সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা নির্ধারণে আমাদের সুবিধা হইয়াছে (বারচুকদের পূর্বে ও উইগুরদের পশ্চিমে)। য়ামার নদী তীরের যুদ্ধে জুমুলগণ য়াবাকূদের মিত্র ছিল। আর দৃশ্যত সেই কারণেই ধরিয়া নেওয়া যায়, তাহারা তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই। উইগুর ভূভাগে পাঁচটি শহর ছিল। এগুলির মধ্যে ছিল বিশবালীক ও কূজূ বা কোচো বা তুরফানের নিকটে অবস্থিত কারা খোজা। উইগুরগণ ছিল বৌদ্ধ ও বুরখান (মূর্তিপূজক)। তুর্কদের মাঝে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর একমাত্র প্রমাণ 'বাজাক' (বাচাক) শব্দের তুর্কী অনুবাদের অস্তিত্ব, যাহা মানি ধর্ম বিষয়ক রচনাবলীতে লক্ষ করা যায় [তু. Chuastuanift, App. to Abh. Preuss. Ak., 1910, p. 39) by "Christian fast" (i. 345)]।

রচনার অন্যান্য অনুচ্ছেদে মাহমূদ কাশগারী অন্যান্য তুর্ক উপজাতির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত ও ২০ তুর্ক আদিপুরুষ সম্ভূত তুর্কী শাখা-জনগোষ্ঠীসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাদের মধ্যে আছে আযকিশ (১খ., ৩৯) উপজাতি যাহাদের সম্পর্কে ভৌগোলিক রচনাসমূহ হইতে জানা যায় (B. G. A., vi, 31)। আরও উল্লেখ আছে কুজাত নামে একটি উপজাতি সম্পর্কে। ইহারা খাওয়ারিযমে বসতি স্থাপন করে। ইহাদের বিষয়ে বায়হাকীও (সম্পা. Morley, p. 91) অবহিত ছিলেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত উপজাতিগুলি ছাড়াও পূর্ব য়ুরোপের জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যকার বুলগার ও সুওয়ার উপজাতি দুইটিও তুর্ক বলিয়া অভিহিত হইত। খাযারদের বিষয়ে কোনও উল্লেখ নাই; সম্ভবত ঐ সময় নাগাদ খাযারদের পৃথক রাজনৈতিক অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছিল। ইসতাখরীর বর্ণনার বিপরীতধর্মী বয়ানে যেসব লেখক বলেন যে, খাযার ও বুলগারগণ অভিন্ন ভাষাভাষী ছিল তাহাদের একই বর্ণনা অনুযায়ী, ঐ ভাষাটি ছিল তুর্কী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কাশগারী, বুলগার, সুওয়ার ও পেচেনেগদের উপভাষাগুলিকে একটি একক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

কিরগিয, কিপচাক, ওগুয, তুখসী, য়াগমা, চিগির, ইগরাক ও চারুক উপভাষাগুলি ছিল বিশুদ্ধ তুর্কী। য়েমেক ও বাশকিরদের উপভাষাগুলি বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষার সহিত ছিল ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ইতিল হইতে য়ামার নদী বরাবর ভূভাগের অধিবাসিদের ভাষা সাধারণত স্থায়ী নিবাসী লোকজনের ভাষা (যাহা মূলত সম্ভবত তুর্কী ছিল না) ছিল

বিশুদ্ধতর। নিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ বা উপজাতিগুলির মধ্যে রহিয়াছে সায়রাম হইতে বালাসাগূন অবধি জনপদ (এই অঞ্চলের শহর-জনপদগুলিতে তুর্কী ভাষার পাশাপাশি সোগদীয় ভাষার অস্তিত্ব বজায় রাখে)। নিবাসী আরগূ ও কাশগারের নিকটস্থ গ্রামগুলির কেনজাকদের (কেনসেকদের) ভাষা বিশুদ্ধতর। বিভিন্ন তুর্কী উপভাষার বিভিন্ন ধর্মগত বৈশিষ্ট্য আলোচনায় দেখা যায়, এইগুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনি বৈশিষ্ট্য এখনও তুর্কী ভাষায় তাৎপর্য বহন করে। যেমন 'y' ও 'aJ' এবং 'K 'Kh'-এর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিস্থাপন। দক্ষিণাঞ্চলীয় তুর্কী উপভাষাগুলিতে ওগুয (তুর্কোমান) শব্দভাণ্ডারে আগে হইতেই এই গঠন বৈশিষ্ট্য হিসাবে কায়েমী হইয়া গিয়াছিল। শব্দসম্পদের দিক হইতে অন্যান্য তুর্কী ভাষা হইতে তুর্কোমান ভাষা আগে হইতেই এতই ভিন্ন ছিল যে, তুর্কোমান ও তুর্কদের মধ্যকার পার্থক্যকে ওগুয ও চিগিলদের পার্থক্যের সহিত (১খ., ৩; ২খ., ২৫৩ প. দ্র.) সমান করিয়া দেখা হয়।

হিজরতের গোড়ার দিকের শতকগুলিতে তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ পরিচালনাসহ তুর্কী ভূভাগের অভ্যন্তরে কতিপয় অভিযান পরিচালিত হইলেও মুসলিম বাহিনীর সাফল্য তুর্কদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অতি সামান্যই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। মহানবী (স) আবিসিনীয়দের বেলায় যে নীতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন, তুর্কদের ক্ষেত্রেও উহা বলবৎ করা হয়। নীতিটি ছিল, "উহারা যতদিন তোমাদিগকে শান্তিতে বসবাস করিতে দেয় তোমরাও ততদিন তাহাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দাও" (দ্র. Goldziher, Muh. Studien, i. 270; ii. 127; অনূদিত ১ম অনুচ্ছেদে আছে ঃ "তোমাদিগকে নিজেদের মত থাকিতে দিলে তুর্কীদেরও তাহাদের মত থাকিতে দাও।" অন্য ধারণায় ও কিছুটা ভিন্ন আকারে সংশ্লিষ্ট হাদীছের উদ্ধৃতির জন্য দ্র. (B. G. A., v. 316; vi. 262; য়াকূত, মু'জাম, ১খ., ৩৮৩ প. দ্র.)।

তুর্কগণ ৪র্থ (১০ম) শতকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। ২৯১/৯০৪ সালে ইসলামের সীমান্তবর্তী ভূভাগ সামানী রাজ্যে বিধর্মী তুর্কদের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয় (তাবারী, ৩খ., ২২৪৯)। ৩৮২/৯৯২ সনে মুসলিম তুর্কগণ প্রথমবারের মত বিজয়ীর বেশে বুখারায় প্রবেশ করে। তবে ইহা অপেক্ষাও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ৫ম (১১শ) শতকে মুসলিম সালজূকদের এশিয়া মাইনর জয়। তুর্কীদের ব্যাপারে আরও যেইসব উক্তির অস্তিত্ব রহিয়াছে সেইগুলিকে স্বয়ং মহানবী (স)-এর বলিয়া উল্লেখ করা হয়। তিনি এই মন্তব্য করেন বলিয়া কথিত আছে যে, "তাহাদের ভাষা শিখুন। কেননা তাহাদের দীর্ঘ শাসন নিয়তি-নির্ধারিত" (কাশগারী, ১খ., ৩)। আল্লাহ মহানবী (স)-কে বলিয়াছেন, "আমার একজন মেষবান আছে। আমি তাহাকে 'তুর্ক' নামে অভিহিত করিয়াছি। উহারা পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। যদি কেহ আমার ক্রোধের কারণ হয় আমি তাহাকে ঐ মেষবানের কর্তৃত্বে ছাড়িয়া দিব" (পূ. গ্র., পৃ. ২৯৪)। তুর্ক জাতির অসংখ্য লোকের (২,০০,০০০ তাঁবু) ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত কাহিনীর জন্য দ্র. কাশগারী।

এই নিবন্ধে এমনও আভাস রহিয়াছে যে, উল্লিখিত কাহিনীর সহিত ইলেক খান (দ্র.) শাসক বংশ বা 'আফরাসিয়াব' নরগোষ্ঠীর উত্থানের যোগসূত্র রহিয়াছে। এই শাসক গোষ্ঠীর লোকেরা কোন্ উপজাতি বা নরগোষ্ঠীর সেই বিষয়ে কোনও সূত্রেই উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই শাসককুল ও তাহাদের লোকজনকে সর্বত্রই কেবল তুর্ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কাশগারীর লেখায় এই শাসকদের কেবল 'খাকান শাসক' (আল-মুলূক আল-খাকানীয়া, ১খ., ৩০ প. দ্র. বা কেবল 'খাকানীয়া', ১খ., ৩৪৭ Supra) বলা হইয়াছে। কাশগারের মুসলিম শাসকগণ ৫ম (১১শ) শতকের গোড়ার দিকের দশকগুলিতে খোতান জয় করেন। তবে ঐ সামরিক অভিযানের সঠিক তারিখ বা বিস্তারিত বিবরণ কিছুই জানা যায় না। কাশগারীর বর্ণনা অনুযায়ী জেনকশি নামে একজন আমীরের বদৌলতে খোতান (৩খ., ২৭৯) বিজিত হয়। ইহা হইতে দেখা যায়, তৎকালে বিজয় সংক্রান্ত প্রচলিত এই কাহিনী শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে আসিয়া পৌছাইয়াছে। কাশগারীর আমলে আজিকার চীনা তুর্কিস্তানে ইসলামের সীমান্ত শহর Kusen বা Kuca (১খ., ৩৩৬) অবস্থিত ছিল। ইহার পূর্বে কুচা ও উইগুরের মাঝে পাহাড়ের উত্তরে অবস্থিত দুর্গ শহর ছিল বুগুর (১খ., ৩০১) ও দক্ষিণে Cercen (কাশগারী, ১খ., ৩৬৪; জুরজান)। আরও পরবর্তী কালে আরও পশ্চিমাঞ্চল নিবাসী তুর্কগণ ইসলাম গ্রহণ করে।

ইবনু'ল-আছীরের (১খ., ৩৫৫ প.) বর্ণনা অনুসারে সাফার ৪৩৫ হিজরী সনে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১০৪৩) শীতে বালাসাগুন ও গ্রীষ্মে পশু চারণের জন্য বুলগার ভূভাগের (সম্ভবত উরাল পর্বতমালা সংলগ্ন চারণক্ষেত্র অঞ্চলে অবস্থানকারী) এক তুর্ক জাতি সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করে। তাহাদের নামের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। উহার এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়িয়া বসবাস করিলেও উহারা মধ্য এশিয়ার তুর্কদের তুলনায় সংখ্যায় অল্প ছিল। তাহারা ৯৬০ খৃ. ইসলাম গ্রহণ করে। ইবনু'ল-আছীরের বর্ণনা অনুযায়ী তাহাদের তাঁবুর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ হাজার। পক্ষান্তরে আবু'ল-ফিদা'র (Mukhtasar, সম্পা. Reiske-Adler, iii, 120) মতে তাহাদের সংখ্যা ৫,০০০ মাত্র।

ইরতিশ হইতে কিপচাকদের (কিপচাক দ্র.) সীর দরিয়া অবধি দক্ষিণ-পশ্চিম ও অন্যদিকে পূর্ব য়ূরোপের দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে তুর্কদের জাতিগোষ্ঠীগত পরিস্থিতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটে। ওগুযদের দেশান্তর গমনের ফলে বর্তমান দক্ষিণী তুর্কদের যেমন উদ্ভব তেমনি কিপচাকদের দেশান্তর গমনের ফলে আধুনিক পশ্চিমাঞ্চলীয় তুর্কদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, ৭ম (১৩শ) শতকে সীর দরিয়া তীরবর্তী ভূভাগে কাঙ্গলিদের পাশাপাশি কিপচাকগণও বসবাস করিতেছে। এই দুই তুর্ক উপজাতির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনায় খুবই অস্পষ্ট (আরও তু. J. Marquart, Osttürk, Dialektstud., P. 78 & 172)। মাহমূদ কাশগারীর আমলে কাঙ্গলি নামে অভিহিত কোনও তুর্ক উপজাতির অস্তিত্ব ছিল না। তবে ঐ সময়ে 'কাঙ্গলি' কথাটির বরাত (৩খ, ২৮০) দেওয়া হইত "কিপচাকদের মধ্যে এক মহৎ ব্যক্তির নাম হিসাবে"। ৬ষ্ঠ (১২শ) শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি সীর দরিয়ার তীরে মুসলিম ভূভাগের নিকটে বসবাস করিয়াও ইহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। জান্স (দ্র.)-এ (দ্র. সীর দরিয়া) একজন শাসকের আগমনের বর্ণনাসম্বলিত এক দলীলে এই মর্মে আশা ব্যক্ত করা হয় যে, "আল্লাহ তাহাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেন" (রাযযাকাহুল্লাহ 'ইয়্যু'ল-ইসলাম, তু. W. Barthold, Turkestan etc., i, 79)।

পূর্ব য়ূরোপের কিপচাক ও তাহাদের পূর্বসূরী পেচেনেগ ও ওগুযদের (গ্রীক....রুশ সম্ভবত) Torki; রুশ ইতিহাসে Berendei-এর উল্লেখ আছে। এই Berendei সম্ভবত বায়ূনদূর নামের ওগূয পরিবার (তু.

মাহমূদ কাশগারী, ১খ, ৫৬) সম্পর্কে প্রায় সকল তথ্যই রুশ ও গ্রীক উৎসগুলিতে পাওয়া যায়। ১২শ শতকের মধ্যভাগ হইতে রুশ ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলিতে পূর্ব য়ূরোপের কিপচাক (Polowci) ছাড়া সকল তুর্কী জনগোষ্ঠীকে Cernii Klobuki-এই নামের আওতাভুক্ত করা হইয়াছে (এ বিষয়ে দ্র. D. Rasowskiy, in Seminnarum Kondakovi anum, Prag 1927, i, 95) নামের অভিন্নতার আলোকে এমন একটা ধারণা অসম্ভব নহে যে, কারা কালপাক জনগোষ্ঠীর উদ্ভব Cernii Klobuki হইতেই ঘটিয়াছে, তবে বিষয়টি আজও চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয় নাই। এমন ধারণা করাও হয়ত প্রতিকূল নহে যে, কারা কালপাক জনগোষ্ঠীর আদি উৎস পশ্চিমী (ইহাদের বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭শ শতকে) যাহা মধ্য এশিয়ার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ব্যতিক্রমধর্মী। কারা কালপাক জনগোষ্ঠীর লোকজন প্রধানত গবাদিপশু পালন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।

পেচেনেগ তুর্কদের মধ্যে ইতিমধ্যে সফল প্রচার সম্পন্ন হইয়া থাকিলেও (J. Marquart, Osteuropaische und ostasiatische Streifzuge, p. 73) মোঙ্গল বিজয়ের আগে অবধি ইসলাম পূর্ব য়ূরোপের তুর্কদের মধ্যে তেমন অগ্রগতি সাধন করিতে পারে নাই। মধ্য এশিয়ায় অমুসলিম কারা খিতাই (দ্র.) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও কিংবা ৭ম/১৩শ শতকের গোড়ার দিকে ইসলামের বিরুদ্ধে দমন অভিযান চলিলেও তাহা ঐ অঞ্চলে ইসলামের বিস্তার রোধে সক্ষম হয় নাই। কারা খিতাই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় (১১৩০ সনের দিকে) বালাসাগূনের খান রাজ্যটি ছিল ঐ অঞ্চলের সর্ব-উত্তরের মুসলিম রাজ্য। ইহার পরে কারা খিতাই সাম্রাজ্য যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখনও ইলির উত্তরে একাধিক মুসলিম রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে কায়ালীগের কারলুক (দ্র.) রাজ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন কারলুক বংশীয় আলমালীগের জনৈক ব্যক্তি। আধুনিক কুলজার (দ্র.) নিকট আলমালীগ লোকালয় অবস্থিত ছিল। চীনা পরিব্রাজক C'ang C'un (1221)-এর সফরকালে (১২২১ খৃ.) C'angba-al তথা উইগুর রাজধানী জানবালীকের অস্তিত্বের বিষয় সম্পর্কে কাশগারী (১খ, ১০৩) ইতিমধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন। এই জনপদটি পশ্চিমাঞ্চলের অমুসলিম ভূভাগের সীমান্ত জনপদ ছিল (E. Bretschneider, Mediaeval Researches, i, 67 প.)। আর্মেনীয় ভ্রমণকারী Hethum (ভ্রমণকাল ঃ ১২৫৪ খৃ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী 'Djambalekh' শহরটি "Khutapai'-এর ঠিক পূর্বে অবস্থিত ছিল। এই Khutapai হইতেছে আধুনিক কালের মানচিত্রে উল্লিখিত খুতুকবার, যাহা ঠিক Manas-এর পূর্বে অবস্থিত ছিল (পূ. গ্র., ১খ., ১৬৯)। এই কারণেই ধরা যায় যে, আজিকার Manas অঞ্চল ছিল তৎকালে মধ্য এশিয়ায় ইসলাম বিস্তারের সীমা।

আধুনিক চীনা তুর্কিস্তান বহুকাল তুর্কী প্রভাবের আওতায় ছিল। কিন্তু উহার বিপরতীক্রমে দেখা যায় যে, মা ওয়ারাউ'ন্-নাহর ও খাওয়ারিযম অঞ্চলেই তুর্কীকরণ কেবল মোঙ্গল বিজয়াভিযানের পরে লক্ষণীয় মাত্রায় আগাইয়াছে। অন্তত যারাফশান নদীর ভাটি অঞ্চলে কারাকোল (Narshakhi, সম্পা. Schefer, p. 17) এবং খাওয়ারিযমের কারাসূ (তাবাকাত-ই নাসিরী, সম্পা. Raverty) বা সূকারার মত (ইবনু'ল-আছীর, ৭খ, ১২২ প.); তুর্কী শব্দমূল যুক্ত ভৌগোলিক নামকরণ হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। সালজূকগণ এশিয়া মাইনর ও আযারবায়জানে তুর্কী সংস্কৃতি লইয়া আসে। সম্ভবত গোড়ার দিকে সীমান্ত প্রহরার জন্য ও বায়যান্টীয় আক্রমণের মুকাবিলা করার জন্য এইখানে তুর্কদের বসবাসের পত্তন ঘটে। ইহা ছাড়া জর্জীয় রাজ্যের ক্রমবর্ধমান (তু. জর্জিয়া) শক্তি ও প্রভাবের মুকাবিলাও এইখানে তুর্কদের আবাসনের অন্যতম কারণ। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট গোটা অঞ্চলের পরিপূর্ণ তুর্কীকরণ সম্পূর্ণ হইলেও ঐ অঞ্চলে গোড়া হইতে তুর্কী সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বিবরণ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। দক্ষিণ পারস্যে তুর্কদের প্রায় সকলেই যাযাবর রহিয়া গিয়াছে। আর নবম (১৫শ) শতক নাগাদ তুর্কীকরণ প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হয়। সুলতান সালাহ্'দ-দীন মিসরে বহু তুর্কী সেনা লইয়া আসেন। ঐ সময় হইতে ঐ তুর্কী সেনাদের অনেকে কালক্রমে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে চলিয়া যান। স্পেনের তুর্কদের বিষয়ে বিবরণীর জন্য বিশেষভাবে দ্র. 'আবদু'ল-ওয়াহীদ আল-মার্‌রাকুশী, সম্পা. Dozy, p. 210)। এই তুর্কী সেনারা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে তুর্কী সংস্কৃতির প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা খোদ মোঙ্গলদের অপেক্ষা তুর্কদের জন্য অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। পরবর্তী কালের সকল লেখক কর্তৃক ইহার বিপরীত অবস্থা প্রমাণের সকল প্রয়াস সত্ত্বেও Abel Remusat (Recherches sur les langues tatares, p. 240)-এর এই অভিমতটিকে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয় যে, চিঙ্গীয খানের উত্থানের সময় মোঙ্গল অধ্যুষিত ভূভাগের পশ্চিমাঞ্চলের সীমানা যাহা ছিল [পরবর্তী কালে কালমুক (দ্র.)-দের দেশান্তর গমনের ক্ষেত্রে ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া] আজও তাহাই রহিয়াছে। চিঙ্গীয খান ও তাঁহার উত্তর-পুরুষগণের শাসনামলে মোঙ্গলদের যেসব বংশধর পশ্চিমাভিমুখে আসে তাহাদের মধ্যে আফগানিস্তানের মোঙ্গলগণই কেবল অদ্যাবধি মোঙ্গল ভাষা অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হয়। G. Ramstedt (Mogholia in F. S. Ou., xxiii [1905], 4) এই মোঙ্গলদের উপভাষাগুলি সম্পর্কে গবেষণামূলক সমীক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের অধিবাস-অঞ্চল নিখুঁতভাবে আজও নির্ণীত হয় নাই। Dr. Emil Trinkler, (Afghanistan, Gotha, 1928=Peterm. Mitt. suppl. 196. p. 53 প.)-এর সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও তিনি আফগানিস্তানে কোনও মোঙ্গল ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। প্রায় সকল মোঙ্গল তুর্কের মাঝে মিলিয়া-মিশিয়া গিয়া উহারা বরং তুর্কদিগকে সংখ্যাগত, বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।

ইসলাম গ্রহণের পর তুর্কদের রাজনৈতিক ইতিহাসে Golden Horde রাজ্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৪শ শতকের শেষ নাগাদ "Golden Horde" রাজ্যের তুর্কীকরণ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই রাজ্যের সকল দলীলপত্র তুর্কী ও চুওয়াস্‌স ভাষায় লিখিত। ভল্‌গা নদীর উজান অঞ্চলে প্রাচীনকালে লোকেরা চুওয়াস্‌স ভাষায় কথা বলিত। পরে বিশুদ্ধ তুর্কী ভাষা চুওয়াস্‌স ভাষার স্থান গ্রহণ করে। মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া যাইবার পর কাযান (দ্র.), আস্ত্রাখান ও Krim উপদ্বীপে তিনটি নূতন তাতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যগুলি মোঙ্গল শাসনামলে ইসলাম ও তুর্কী প্রভাবের আওতায় আসে। সাইবেরিয়ার ইরতীশ (দ্র.)-এও আরও একটি নূতন 'তাতার' রাজ্য গঠিত হয়; ইহার অবস্থান ছিল আধুনিক Tobolsk-এ। এই ভূ-খণ্ডটি বুলগার দেশের পরিবর্তে উত্তরে ইসলামের সীমান্ত দুর্গ হইয়া উঠে।

'তাতার' শব্দটির আদি প্রয়োগ ছিল মোঙ্গলদের ক্ষেত্রে। এখন ইহা একটি তুর্কী জনগোষ্ঠীর নাম হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া ক্রিমিয়ার খোদ মোঙ্গলগণই নিজদিগকে 'তাতার' বলিয়া অভিহিত করে। রাশিয়ায় 'তাতার' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত। অবশ্য উহার ব্যাপ্তি চীন বা য়ুরোপীয় চীনতত্ত্বের (তু. মুখবন্ধ, Abel Remusat, Recherches sur les langues tartares) মত নহে। ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি (W. Radloff, Aus Sibirien, vol. i, বিষয়াবলী-তে এখনও অনুরূপ প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়) রুশীয় পণ্ডিতেরা 'উছমানী তুর্ক নহে এমন সকল তুর্ককে 'তাতার' বলিয়া অভিহিত করিতেন। তাহাদের প্রভাবেই য়ুরোপীয়গণও ঐ তুর্কদিগকে 'তাতার' বলিত। এইভাবেই 'তুর্কো-তাতার' শব্দটির প্রচলন ঘটে, যাহা আজও পুরাপুরি বিলুপ্ত হয় নাই।

'Golden Horde' ভূভাগে ওযবেগ ও নোগাই জনগোষ্ঠীর উদ্ভব। জুচি (দ্র.) রাজবংশের শাসকদের নামে এইসব নামকরণ ঘটে। ওযবেগগণ ১৫শ শতকে মা ওয়াউন-নাহ্র-এ চলিয়া যায় এবং সেইখানে তাহারা চাগাতাই রাজবংশের পতন ঘটাইয়া বুখারা ও খীবা (দ্র.) রাজ্যের পত্তন করে। ১৭শ শতকের শেষ নাগাদ ওযবেগ রাজ্যের অর্থাৎ খোকান্দ খান রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ বুখারা ও খীবা রাজ্যের সঙ্গে সংযোজিত হয়।

রুশগণ যাহাদিগকে 'নোগাই' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে ১৬শ শতকে ও উহার পরবর্তী কালে সকল প্রাচ্য সূত্রে তাহারা সর্বত্র মানগীত বলিয়া অভিহিত। রুশ আধিপত্যের আওতায় এই মানগীত বা নোগাই জনগোষ্ঠী ভল্গা নদীর নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলের পূর্বে একটি অসম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ এক যাযাবর রাজ্যের পত্তন করে। আস্ত্রাখানের দেশজ তুর্কী লোকজন এখনও নোগাই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ১৭শ শতকে কালমুকগণ এই নোগাইদিগকে ভল্গার পূর্বাঞ্চলীয় ভূভাগ হইতে বিতাড়িত করে। নোগাই নামটি ওযবেগগণ এখনও ভল্গা অঞ্চলের তুর্ক অধিবাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকে। রুশগণ ওযবেগদের 'তাতার' বলিয়া সম্বোধন করে (আর খোদ ওযবেগগণ এখনও নিজদিগকে 'তাতার' বলিয়া পরিচয় দেয়)। ১৫শ শতকের গোড়ার দিকেই কাযাকগণ (দ্র. কিরগিয) ওযবেগ জনগোষ্ঠী হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৯শ শতক নাগাদ ওযবেগগণের নেতৃত্বে কয়েকজন খানের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের কয়েকজন যথেষ্ট শক্তিশালী ও বিশাল বাহিনীর অধিকারী হইয়া উঠেন।

প্রাচ্যে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে শেষ যে তুর্কী রাজ্যটির আবির্ভাব ঘটে উহা ছিল কার্যত এক মোঙ্গল রাজ্য, যাহা কাশগার হইতে চীন সীমান্ত অবধি বিস্তৃত ছিল। চাগাতাই (দ্র. চাগাতাই খান, শেষের দিকে দ্র. দুগলাত) রাজ্যের পতনের পর এই রাজ্য গঠিত হয়। তবে নাম যাহাই হউক, এই মুগলগণ অন্ততপক্ষে ১৬শ শতক নাগাদ তুর্কী ভাষায় কথা বলিত। ইহারা আনুমানিক ১৪শ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ইসলাম গ্রহণ করে। তাহাদের মাঝে ইসলাম প্রচারের জন্য মুহাম্মাদ খান (১৪০৮-১৪১৬)-কে সর্বাধিক কৃতিত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। কোনও মুগল পাগড়ি পরিহিত না থাকিলে সাজা হিসাবে তাহার মাথায় পেরেক ঠুকিয়া দেওয়া হইত (তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. Ross, পৃ. ৫৮)। ইহা সত্ত্বেও ৮২৩ (১৪২০) সালেও তুরফানে বৌদ্ধ মূর্তিসমূহ পরিদৃষ্ট হইবার এবং কিছু নবনির্মিত বুদ্ধমূর্তি (N. E., xiv. 310; আল-মুজাফফারিয়্যা, ২৭) প্রতিষ্ঠারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই একই শতকে উইগুরে ইসলামের আগমনে তথায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবসান ঘটে। জনগোষ্ঠীর নামের পরিচয় হিসাবে 'উইগুর' নামটির ব্যবহার ক্রমেই বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং সম্ভবত উইগুর জনগোষ্ঠীর লোকদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়া এই পরিবর্তন সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া ১৮৩২ খৃ. কালমুকদের পূর্ব তুর্কিস্তান জয়ের পর মুগল নাম অপসৃত হইতে থাকে। কেবলমাত্র "পীত উইগুর" (সারীগ উইগুর) জনগোষ্ঠীর নিজস্ব নামের পরিচয় ও বৌদ্ধ ধর্ম অদ্যাবধি বহাল রহিয়াছে ও ইহাদের সম্পর্কে তা'রীখ-ই রাশীদীতেও (নির্ঘণ্ট দ্র.) উল্লেখ রহিয়াছে। মাত্র ১৮শ শতকে ইহারা তাহাদের উইগুর লিপি পরিত্যাগ করিয়া উহার স্থলে তিব্বতীয় লিপি গ্রহণ করে (Bibl. Buddhica, xvii, মুখবন্ধ)। চীনা ভাষাভাষী Dumgan-সহ তুর্কীভাষী সালারগণও ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। শেষোক্ত সালার জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তা'রীখ-ই রাশীদীতেও উল্লেখের কথা ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে (দ্র. চীন, কান-সুও সালার)।

'উছমানী (তুর্কোমান বংশোদ্ভূত) বা আনাতোলীয় তুর্কগণ (দ্র. তুরস্ক) ছাড়াও তুর্কোমানগণও গোটা অঞ্চলের ইতিহাসে অত্যন্ত বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। কালো মেষ (কারা কোয়ুনলু দ্র.) তুর্কোমান ও শাদা মেষ (আক-কোয়ুনলু দ্র.) তুর্কোমান রাজ্য, বিশেষ করিয়া ১৫শ শতকে বিশেষ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিল। দিয়ার বাক্র (দ্র.) হইতে গায্যা (দ্র.) অবধি বিস্তৃত মামলূক সাম্রাজ্যেও বহু তুর্কোমান উপজাতির অস্তিত্ব ছিল। খালীল আজ-জাহিরী (যুবদাত কাশফু'ল- মামালিক, সম্পা. Revaisse, Paris ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ১০৫)-এর লেখায় এই উপজাতি-গুলির একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেবল দুলগাদির (যু'ল-কাদ্র দ্র.-এর তুর্কী উচ্চারণ) নামের পরিবারটিই কিছুটা গুরুত্ব অর্জন করে। উপজাতিগুলি ১৪শ শতকে মামলূকদের সামন্ত হিসাবে নিজেদের জন্য ক্ষুদ্র একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

মোঙ্গল শাসনের গোড়ার দিকে অন্যান্য বহু তুর্কী জনগোষ্ঠীর স্থানীয় জনসাধারণের সহিত মিশিয়া যাইবার উল্লেখ থাকিলেও তুর্কোমানগণ ঐ আমলে নব নব জাতিগোষ্ঠী গঠনের প্রক্রিয়ায় উহাদের মাঝে মিলিয়া মিশিয়া বিলুপ্ত হয় নাই, বরং স্বকীয় অস্তিত্ব বজায় রাখে, যদিও 'Golden Horde' রাজ্য হইতে দেশান্তরীরাও ঐ সময় তুর্কোমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬শ শতকে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-(Turkmeniya, vol. i., Laningrad 1929, p. 47 প.) সায়িন খানী (সায়িন খান আখ্যানের জন্য দ্র. বাতু খান) উপজাতির নামের উল্লেখের মাঝে ইহার আভাস রহিয়াছে। তুর্কোমানগণ কখনও মধ্য এশিয়ায় তাহাদের কোনও নিজস্ব রাজ্য গঠন করিতে পারে নাই। অনেক পরবর্তী কালে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের দিকে উত্তর দিক হইতে রুশ ও দক্ষিণ দিক হইতে আফগান অগ্রাভিযানের মুখে তুর্কোমানদের কার্যত স্বাধীন অবস্থার অবসান ঘটে।

১৭শ ও ১৮শ শতকে তুর্কোমানগণ মধ্য এশিয়ার অন্যান্য তুর্ক জনগোষ্ঠী, বিশেষ করিয়া কাযাক ও কিরগিযদের মতই মধ্য এশিয়ায় শেষ বিশাল যাযাবর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা কালমুকদের আক্রমণে ব্যাপক অত্যাচার-নিগ্রহের শিকার হয়। কালমুকগণ কাযাক ও কিরগিযগণ তাহাদের অধ্যুষিত ভূভাগের একাংশ হইতে বিতাড়িত করে। কালমুক সাম্রাজ্যের পতনের পরই কেবল উহারা তাহাদের আগের পরিবেশ

ফিরিয়া পায়। তুর্কোমানদের একাংশ আজও Stawropol-এ সরকারের অধীনে বাস করে। মানগীশলাক (দ্র.) উপদ্বীপ হইতে ১৭শ শতকের শেষ নাগাদ উহারা কালমুকগণ কর্তৃক সেইখানে বিতাড়িত হয়। ইহার আগের কোনও এক সময়ে তুর্কোমানগণ প্রথমে নোগাই ও পরে কাযাকদের বিরুদ্ধে উপদ্বীপ রক্ষার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেও উহাতে তাহারা ব্যর্থ হয়। কাযাকদের মত কিরগিযদের Yenesei নদী অঞ্চল বা Semirecye-র (দ্র. কিরগিয) কোথাও কোনও খানতন্ত্র ছিল না। ১৮শ শতক অবধি Yenisei অববাহিকাবাসী কিরগিযগণ বর্তমান কালেও একই এলাকাবাসী তুর্ক লোকজনদের মত একেবারেই ইসলামের প্রভাবের আওতায় আসে নাই। এই তুর্ক জনগোষ্ঠী রুশ বিপ্লবের পর 'খাকাস' নাম ধারণ করে (আদতে ইহা কিরগিয কথাটির চীনা প্রতিলিপির ভ্রমাত্মক পাঠমাত্র)।

ওব নদীর উজান অববাহিকার আলতাই পার্বত্যাঞ্চলের পার্বত্য অধিবাসীরাও অ-মুসলিম তুর্ক। আলতাই অঞ্চলের এই জনগোষ্ঠীকে (আলতাই কিযি) রুশগণ "পার্বত্য কালমুক" বলিয়া অভিহিত করে। তবে রুশ বিপ্লবের পর উহারা "Oirat' নাম ধারণ করে, যাহা যথার্থ অর্থেই কালমুকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহাদের অধিবাস আজিকার স্বায়ত্তশাসিত ওইরাত অঞ্চলে। য়াকূতগণ (যাহারা নিজদিগকে সাকা বা সাখা বলিয়া অভিহিত করে। এই সাকা বা সাখাগণ সম্ভবত Yenisei অঞ্চলের সাগাই জাতিগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত) অন্যান্য তুর্কদের হইতে, এমন কি ভাষার দিক হইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্ভবত ১৩শ শতকের পর উহাদিগকে Yenisei অঞ্চল হইতে Lena নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বিতাড়িত করা হয়। য়াকূতদের ভাষার শব্দ ও বৈয়াকরণিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য হইতে দেখা যায়, তাহাদের ভাষা তুর্কী ভাষা হইতে নানা দিক দিয়া ভিন্ন, যাহার সরাসরি উদ্ভব ঘটিয়াছে আদি তুর্কী ভাষা হইতে, যদিও চুওয়াস্স ভাষার উদ্ভব এইভাবে হয় নাই।

১৬শ শতকের প্রথমার্ধে বলকান উপদ্বীপ ও কৃষ্ণ সাগরের উত্তর তট হইতে চীন সীমান্ত অবধি অঞ্চলে মুসলিম শাসন বলবৎ ছিল। এইসব দেশের প্রায় সবগুলিরই ঐ আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্ববর্তী আমলগুলির তুলনায় যথেষ্ট বিপর্যস্ত হয়। কৃষির, বিশেষত শহর জনপদের স্বার্থের পরিপন্থী যাযাবর জীবনযাত্রা প্রচলিত হয়। আর বিশ্ব বাণিজ্যপথগুলি এই মুসলিম ভূভাগ এড়াইয়া পুনঃ নির্ধারিত হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট ভূভাগের ভবিষ্যতও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তুর্কগণ রুশদের বিকাশমান শক্তির মুকাবিলার জন্য অর্থনৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক কোনও দিক হইতেই যোগ্য ছিল না। রুশগণ (কাযান ১৫৫২; আস্ত্রাখান, ১৫৫৪) ভলগা অঞ্চল জয় করিলে মধ্য এশিয়ার তুর্কদের সঙ্গে তাহাদের পশ্চিমাঞ্চলের জাতিদের সহিত তাহাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অবশ্য কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমাঞ্চলে তুর্কী শাসনামলে (১৫৭৮-১৬০৩) অতি অল্প মেয়াদের জন্য তাহাদের মধ্যে বিকল্প যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১৭শ শতকের গোড়ার দিক হইতেই রাশিয়া এই নীতি আরোপ করে যে, উত্তর এশীয় ভূভাগের গোটা অঞ্চল রাশিয়া ও চীনের মধ্যে ভাগাভাগি হইতে হইবে। তবে আঞ্চলিক নিষ্পত্তির এই প্রক্রিয়াটি অনেক পরে ফেব্রুয়ারি ১২-২৪, ১৮৮১ সালে (St. Petersburg, Feb. 12-24, 1881) চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

ধর্ম হিসাবে ইসলাম (তু. বারাবা) ও ভাষা হিসাবে তুর্কী রুশ শাসনাধীনে নয়া অগ্রগতি লাভ করে। ককেসাস অঞ্চল ও সেই সঙ্গে মধ্য এশিয়ায় সর্বজনবোধগম্য সার্বজনীন ভাষা হিসাবে তুর্কী ভাষা পূর্বাপেক্ষা ব্যাপকতর প্রসার লাভ করে। রাশিয়া প্রবর্তিত য়ুরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের পর, বিশেষত ১৯২৪ খৃ. জাতীয়তার নীতি বলবৎ হইবার পর সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন তুর্কী জনগোষ্ঠীকে লইয়া কয়েকটি প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। এই প্রজাতন্ত্রগুলির নিজ নিজ সরকারের আওতায় প্রজাতন্ত্র গঠনের এক জাতীয় ভিত্তি যেমন ছিল তেমনি তাহাদের বিকাশের নিজ নিজ ধারাও উহাতে ভূমিকা পালন করে। ওযবেগ ও তুর্কোমান প্রজাতন্ত্রগুলি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশ হিসাবে গণ্য হয় এবং আযারবায়জান প্রজাতন্ত্র ট্রান্স-ককেশীয় জোটের অঙ্গে পরিণত হয়। সাতটি স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র (ক্রীম-তাতার, চুওয়াস্স, বাশকির, তাতার, কাযাক, কিরগিয ও য়াকূত প্রজাতন্ত্র) রুশ সোভিয়েট ফেডারেশনের সদস্যভুক্ত। একইভাবে কারাচাই, বালকার-কাবারদিন, কারা-কালপাক ও ওইরাত নামের চারটি স্বায়ত্তশাসিত তুর্ক প্রধান অঞ্চলও এই ফেডারেশনভুক্ত।

জাতীয়তার নীতি বলবৎ করার প্রক্রিয়ায় কোনও কোনও জনগোষ্ঠীর নাম এমন অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করিয়াছে যাহার অস্তিত্ব আদৌ পূর্বে ছিল না। এক কালে মধ্য এশিয়ার বহু তুর্ক, বিশেষত শহরবাসী তুর্কগণ নিজদিগকে তুর্কীভাষী মুসলিম ও অমুক শহর নিবাসী–এই রকম একটা পরিচয় দিয়াই তুষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহারা কোন্ নির্দিষ্ট তুর্কী জনগোষ্ঠীর লোক বলিয়া গণ্য হইবে–এই বিষয়টি ছিল উপেক্ষার বিষয়। কোনও জাতীয়তা বুঝায় না, জনগোষ্ঠীর এমন নামও প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে সার্ত (দ্র.) শব্দটির উল্লেখ করা যায়। এই শব্দটির ব্যবহার এখন বর্জিত হইয়াছে। এখন ওযবেগ এই কথাটি আগের চাইতে অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। আগে যাহারা নিজদিগকে 'সার্ত' বলিয়া অভিহিত করিত তাহাদিগকে এখন ওযবেগ বলা হয়। ইহা ছাড়া কোনও কোনও জনগোষ্ঠীর জন্য নূতন নামেরও উদ্ভব ঘটিয়াছে। তারানচি (দ্র.) জনগোষ্ঠী কাশগারিয়া জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে কাশগারলীকগণ নিজদিগকে এখন উইগুর বলিয়া পরিচয় দেয়, যদিও তাহারা ইতিহাসগতভাবে উইগুর জনগোষ্ঠীর লোক নহে। কেননা উইগুরগণ কোনও কালেও পশ্চিমের এত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আসে নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রায় সকল তুর্কী জনসাধারণই বাধ্য হইয়া তাহাদের ভাষার জন্য রোমান লিপি গ্রহণের পক্ষে যোগ দেয়। পক্ষান্তরে চুওয়াস্স, খাকাস ও ওইরাত জনগোষ্ঠীর লোকজন তাহাদের ভাষাগুলির জন্য রুশ লিপিই বহাল রাখে।

তুর্কদের মোট জনসংখ্যার একটা হিসাব করিবার জন্য এক প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। ইহা করেন N. Aristow, Zamietki ob etniceskom sostavie tyurkskikh plemen i narodostei i svedieniya o ikh cislennosti, St. Petersburg 1897, p. 170)। তাঁহার বিবরণ অনুযায়ী ১৮৮৫ খৃ. রাশিয়ায় তুর্কদের সংখ্যা ছিল ২,৬০,০০,০০০০; কিন্তু তাঁহার ধারণা হয় যে, তুর্কদের মোট জনসংখ্যা ইহার চাইতেও বেশি হওয়া উচিত। আজ কেবল সোভিয়েট রাশিয়াতেই তুর্কদের সংখ্যা ১,৬০,০০,০০। ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নে এখন তুর্কদের মোট সংখ্যা সম্ভবত ৩,০০,০০,০০০-এরও বেশি। অন্যদিকে তুর্ক প্রচার বিশারদ ও রাষ্ট্রনায়কগণ তুর্কদের সংখ্যা আরও অনেক বেশী করিয়া দেখাইয়াছেন। আহমাদ আগনেব-এর হিসাবে এই সংখ্যা ৭-৮ কোটি (A. Samoylovic, in M. I., 1912, p. 490) ও মুসতাফা কামাল পাশার মতে ১০ কোটি।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (নিবন্ধের মূল পাঠে ভাষাতাত্ত্বিক রচনাবলীতে প্রদত্ত সূত্রনির্দেশগুলি বাদে) ঃ (১) W. Radloff, Ethnographische Ubersicht der Turkstamme Sibiriens und der Mongolei, Leipzig 1883; (২) H. Vambery, Das Turkenvolk in seinen ethnologischen und ethnographischen Bezichungen, Leipzig 1885; (৩) N. Katanow, Ethnograficeskiy obzor turecko-tatarskih plemen, Kazań 1894; (৪) I. Zarubin, Spirok narodnostei Soyuza Sovetskikh Socialisticeskikh Respublik, Leningrad 1927.

W. Barthold (E. I. [1]) আফতাব হোসেন

২। তুর্কী ভাষা

(১) তুর্কী ভাষাসমূহের শ্রেণীবিভাগ ও ভৌগোলিক বণ্টন

সাধারণ ধ্বনিবৈশিষ্ট্য অনুসারে তুর্কী ভাষাগুলিকে প্রধান ও অসম দুইটি বর্গে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ R ভাষাবর্গ তোখার=৯ (গাণিতিক সংখ্যা নয়) ও Z-ভাষাবর্গ (তোকুয)। প্রাচীন তুর্কী ভাষাগুলির মধ্যে বুলগার কিংবা ইহার অন্যতম উপভাষা প্রথমে উল্লিখিত বর্গের অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক তুর্কী ভাষা বলিতে কেবল চুওয়াস্‌স ভাষাকেই বুঝায়। তবে আমরা দেখিতে পাই, অনেক বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তে সব তুর্কী ভাষার ক্ষেত্রেই R-বর্গের সহিত Z-বর্গের ভাষার মিল রহিয়াছে। দ্বিতীয় Z- বর্গের য়াকূতসহ প্রাচীন ও আধুনিক অন্য সকল তুর্ক ভাষা অন্তর্ভুক্ত। হূনদের যাযাবর জনগোষ্ঠী সংঘ এবং মধ্য এশিয়া ও পূর্ব য়ুরোপের অন্যান্য প্রাচীন জনগোষ্ঠীর (সিয়াংপি, আবার, খাযার) আধিপত্যশীল জাতীয়তায় বিশ্বাসী লোকদের জাতিগোষ্ঠী ও ভাষাগত মূল উৎসের প্রশ্নটি সম্পর্কে অদ্যাবধি যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাহা অপর্যাপ্ত ও অস্পষ্ট। Z-বর্গের ভাষাসমূহ সাবেক আমলে (একমাত্র চুওয়াস্‌স অঞ্চল ব্যতীত) আধুনিক মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ সাইবেরিয়া, আলতাই পার্বত্যাঞ্চলের স্তেপ তৃণভূমি অঞ্চল এবং পরবর্তী কালে কালক্রমে তুর্ক জনগোষ্ঠীসমূহের আধুনিক অধিবাস অঞ্চল ওখটস্ক সাগর হইতে ভূমধ্যসাগর অবধি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

Z-বর্গের তুর্কী ভাষাগুলি আবার দুইটি উপবর্গে বিভক্ত ঃ D-ভাষা উপবর্গ (আদাক বা আযাক=পা)ও Y-ভাষা উপবর্গ (আয়াক=পা) মাহমূদ কাশগারী ১২শ শতকেই এই উপবর্গ বিভক্তির বিষয়টি লক্ষ করিয়া থাকিলেও আসলে ইহা আরও প্রাচীন। নিম্নবর্ণিত প্রাচীন ভাষাগুলি D-উপবর্গের অন্তর্ভুক্ত ঃ কিরকিয, একান্ত বিশুদ্ধ তুর্কী ও উইগুর। পূর্ব সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও চীনের সীমিত সংখ্যক ভাষা ও উপভাষা আজ এই উপবর্গভুক্ত। ইহার আবার তিনটি শাখা রহিয়াছে ঃ T-শাখা বা য়াকূত (আতাক=পা), D-শাখা বা তাননু-তুবিন উপভাষা বা Soyote or Uriankhay ও কারাগাস উপভাষা, যাহা শেষোক্ত উপভাষার সহিত সম্পর্কিত (আদাক = পা) এবং কামাসিনে, কয়বাল, সাগায়, কাচিনে, বেলতির, কীযীল, চুলীম-কুয়েরিক, শর ও সারীগ-উইগুর (আযাক=পা) উপভাষাগুলি Z-শাখার অন্তর্ভুক্ত। D-বিভাগের Z-শাখার উপভাষাগুলির অস্তিত্ব বর্তমান কালে তুর্কী ভূভাগের উত্তরাংশে লক্ষ করা যায়। মাহমূদ কাশগারীর বর্ণনা অনুযায়ী ১২শ শতকে পূর্ব য়ুরোপেও এইগুলি প্রসার লাভ করে। আরবী ভাষার লেখক মধ্যযুগের ভাষা বিজ্ঞানীরা বুলগার উপভাষাকে Z-শাখার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। Azov (আযাক =পা অর্থাৎ Don নদীর খাঁড়া/মোহনা) সাগরের নামের মাঝে পূর্ব য়ুরোপে আজও Z-উপভাষাসমূহের অন্যতম উপভাষার আভাস পাওয়া যায়।

মাহমূদ কাশগারীর বর্ণনা অনুযায়ী কিপচাক ও ওগুয ভাষা মধ্য এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্ব য়ুরোপে কথ্য ভাষা হিসাবে প্রচলিত ছিল এবং ১২শ শতকে তুর্কী ভাষাসমূহের দ্বিতীয় বর্গের Y- বিভাগের (আয়াক=পা) অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজ এই Y বিভাগীয় উপভাষাগুলিই বৃহত্তম পশ্চিম সাইবেরিয়া ও আলতাই হইতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল অবধি এশিয়া ও য়ুরোপের বিশাল অঞ্চলে ঐ ভাষাগুলি (চুওয়াসস উপভাষা ব্যতীত) প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। মাহমূদ কাশগারী ১২শ শতকে Z-বিভাগের উপভাষাগুলির দুইটি শাখা ঃ কালগান ও কালান (অবশিষ্ট) নির্ধারণের জন্য একটি মাপকাঠি বা নির্ণায়কের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত শাখার অন্তর্ভুক্ত ঃ ১২শ শতকের ওগুয জনগোষ্ঠী, তাহাদের আধুনিক উত্তরপুরুষগণ (বিশুদ্ধ/মিশ্র নির্বিশেষে); তুর্কোমান, আযারবায়জানী, পারস্য ও আনাতোলিয়ার অন্যান্য তুর্ক জনগোষ্ঠী, দক্ষিণ বেসারাবিয়ার গাগাউয এবং দক্ষিণ ক্রিমিয়ার তথা তুর্কী ভূভাগের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের তাতারগণ। তুর্কী ভাষার ওগুয শাখাটি উল্লিখিত নির্ণায়কের মূল্যমানে স্বাতন্ত্র্যধর্মী। এই কালান তথা ওগুয উপভাষাটি শুধু Y-বিভাগের (কালগান) প্রথম শাখা হইতেই পৃথক নহে, বরং কেবল চুওয়াস্‌স উপভাষা ব্যতীত অন্য সকল তুর্কী ভাষা হইতেও ভিন্ন। প্রথম শাখা Y- বিভাগের কালগান দ্বিতীয় শাখার তুলনায় অনেক ব্যাপ্তিসম্পন্ন। ইহা ছাড়া Tobolsk হইতে বাগচিসেরাই এবং Kasimow (অর্থাৎ রিয়াযান প্রদেশ) হইতে তুরফান অবধি তুর্কী ভূভাগের সকল মধ্যাঞ্চলবাসী এই শাখার অন্তর্গত উপভাষাগুলিতেই কথা বলে। কালগান শাখার উপভাষাগুলিকে আরও বিভক্ত করা যায়। এই বিভক্তিতে দুইটি উপশাখা রহিয়াছে ঃ তাওলী ও তাগলীক (পার্বত্যাঞ্চল নিবাসীদের ভাষা)। 'লী'-এই বৈশিষ্ট্যসূচক শর্তযুক্ত অন্ত্য স্বর-ব্যঞ্জন যোজনার মাধ্যমে তাওলী উপশাখার সহিত কালানী উপশাখার (উভয় ক্ষেত্রেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের সারীগ ও তাগলীক উপশাখার সারীক-এর স্থলে উভয় ক্ষেত্রেই সারীক = হলুদ) এবং চুওয়াস্‌স-এর সহিত যোগসূত্র নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে তাও স্বর-ব্যঞ্জন প্রাক-যোজনা ইহার সহিত চুওয়াস্‌স (তু.) ও য়াকূতের (তীয়া) সম্পর্ক নির্দেশ করে। Korsch-এর বিবেচনামতে 'আও' ও 'আগ'-এর মধ্যকার যোগসূত্র অত্যন্ত প্রাচীন। তাঁহার ধারণা, তুর্কী ভাষাগুলি আদিতে উত্তরাঞ্চলীয় (আও) ও দক্ষিণাঞ্চলীয় (আগ)-এই দুই বর্গে বিভাগযোগ্য ছিল। কিন্তু কোনও প্রাচীন দলীল-প্রমাণবলে এখনও এই ধরনের কোনও যোগসূত্রের বিষয় সমর্থিত হয় নাই। তুর্কী ভূভাগের উত্তর-পশ্চিম ভাগে তাওলী উপভাষাগুলির প্রতিনিধিত্ব করে তেলেউত-আলতাই-তেলেঙ জনগোষ্ঠী, আলতাই পার্বত্যাঞ্চলের কুমন্‌দি ও লেবেদ উপভাষাগুলির প্রতিনিধিত্ব করে ঃ কিরগিয (দ্র.) কাযাক ও কারা কালপাক (দ্র.) উপভাষা, কিছু বিশুদ্ধতম ওযবেগ উপভাষা, Tobol-tumene ও কাযান উপভাষা এবং মিশহার, বাশকির, নোগাই ও আস্ত্রাখানের (দ্র.) জনগোষ্ঠীর কথিত উপভাষাসমূহ, দাগিস্তান (দ্র.)-এর কু-মীক, উত্তর ককেসাসের বালকার ও কারাচায় জনগোষ্ঠীর উপভাষাসমূহ, ক্রিমিয়ার স্তেপ অঞ্চলের উপভাষা, কারা'ঈদের ('উছমানীকৃত উপভাষাগুলি বাদে) উপভাষাসমূহ এবং ক্রিমিয়ার তুর্কীভাষী ক্রিমচাকদের উপভাষা। যে উপভাষাগুলি

Y-বিভাগের তাওলী উপশাখা হইতে D- বিভাগীয় উপভাষাসমূহে উত্তরণের প্রক্রিয়ার শামিল সেইগুলির প্রতিনিধিত্ব করে সাইবেরিয়ার চুলীম, আবা, চেরনি (য়ীশ) উপভাষাগুলি। এই সব উপভাষা d-এর পরিবর্তে y-বর্গভুক্ত হইলেও 'আও'-এর পরিবর্তে 'আগ' ও 'ঈ'-এর (আয়াক, আগলীগ) পরিবর্তে 'য়গী'যুক্ত।

Y-বিভাগের কালগান শাখার তাগলীক উপশাখার কথা আমরা সদ্য উল্লেখ করিয়াছি। তুর্কী ভূ-ভাগের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ইহার প্রতিনিধিত্ব করে ঃ পশ্চিম ও পূর্বাংশের (চীনা) এবং আফগান তুর্কিস্তানের স্থায়ী নিবাসী জনসমষ্টির উপভাষাসমূহ; ওযবেগ উপভাষাসমূহ (খীবা ও তাওলী ধরনের উপভাষাসমূহ বাদে) তারানচি এবং কাশগার (দ্র.)-এর মরূদ্যানবাসীদের উপভাষাসমূহ, খোতান (দ্র.) আকসু, তুরফান (দ্র.) ইত্যাদি তাহার প্রতিনিধিত্ব করে। এই উপশাখাকে কোনও কোনও সময়ে অনেকটা অসুবিধাজনকভাবেই চাগাতাই বলা হয়। ইহাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের D-বিভাগের সহিত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তাওলী উপশাখার একটা মিশ্রণ বর্তমান। সাবেক খীবা (খাওয়ারিযম দ্র.) খানতন্ত্রের ওযবেগ ও সার্ত (তুর্কীকৃত ইরানী; তু. সার্ত) উপভাষাগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উপভাষাগুলির এক ধরনের অন্তর্বর্তী উপভাষা। এই উপভাষাগুলি কালগান ও তাগলী মানের।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Radloff, Phonetik der nordlichen Turksprachen, 1882, kp. 280-91; (২) ঐ লেখক, Altturkische Studien, iv-v. (Bull, de l'Acad. de Sc. St. Petersburg, 1911); (৩) Kors, Klassifikaciia tureckikh plimen po iazekam (Etnograficesakoe obozrienic, 1910); (৪) A. Samoilovic, Nekotor ye dopolnentia k klassifikacii tureckikh iazykov (petrograd 1922); (৫) ঐ লেখক, K. Voprosu o klassifikacii tureckikh iazykov (Bull. Org. Komissii po soyvu I Turkolog S'iezda, 1926, No. 5)।

(৩) তুর্কী ভাষা—সাধারণ বিবরণ

তুর্কী ভাষার বাক্য গঠন রীতিটি একটি বৈয়াকরণিক বাক্যাংশ-বিন্যাস কিংবা ঐ বিন্যাসের অনুসারী কয়েকটি বাক্যের বিন্যাসের নিয়ামক নীতির বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। আর এই কারণেই কোনও একটি বিবৃতি বা বাক্যের মূল অংশ তথা গুণবাচক অংশটি সাধারণত গোটা বাক্যের শেষে স্থাপন করা হয়। পরিপূর্ণ বাক্যাংশগুলি পরিপূরকের পরে ন্যস্ত হয়। গুণারোপিত বাক্যাংশগুলি উহাদের বিশেষণের পরে স্থান গ্রহণ করে এবং বাক্যের মূল বয়ান বা অংশটি, আনুষঙ্গিক বিবৃতির পরে (যদি থাকে) বসে। এই নীতিসূত্র অনুসারে বাক্যের সহায়ক রূপ প্রকরণমূলক উপাদানগুলি শব্দগুলির শব্দমূলের অনুসারী হয়, অগ্রবর্তী হইতে পারে না। নিয়মটি বিশেষ করিয়া প্রযোজ্য যখন উল্লিখিত রূপতাত্ত্বিক উপাদানগুলি নিয়ামক ধাতুমূলগুলির সহিত ঐতিহাসিক সম্পর্কসূত্রে সম্পর্কিত থাকে। উল্লিখিত সহায়ক রূপপ্রকরণমূলক উপাদানগুলি কার্যত ধারাবাহিক সম্পর্ক-পরম্পরাবিশেষ, যাহার সূচনা হয় পশ্চাদ অবস্থান হইতে (এগুলি ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক হইতে অপরিবর্তিত থাকে)। এইগুলি গঠনাত্মক ও বিশেষায়ক প্রত্যয়গুলির সহিত সম্পর্কসূত্র হিসাবে পূর্ববর্তী শব্দটিকে যুক্ত করিয়া স্বরাঘাত স্বরসুসঙ্গতিমূলক একক অন্বয় গড়িয়া তোলে। এই বিষয়ে আমরা নিবন্ধের পরের কোনও এক পর্যায়ে আলোচনা করিব।

ধারণা করা হয় যে, তুর্কী ভাষাসমূহে মূলত স্বরাঘাত প্রথম শব্দাংশের উপর পড়িয়া থাকে। ইহা আজও অন্তত মোঙ্গল ভাষাগুলির বেলায় সত্য। আধুনিক তুর্কী ভাষাগুলিতে মূল স্বরাঘাত সাধারণত শব্দের শেষাংশে পড়িয়া থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আজ অবধি, বিশেষ করিয়া দরাজ স্বরবর্ণ (ধ্বনি) যুক্ত (a, e, o, o.) শব্দগুলির মধ্যে গৌণ স্বরাঘাতের আকারে পুরাতন স্বরাঘাতের অস্তিত্বের আভাস রহিয়া গিয়াছে বলিয়া লক্ষ করা যায়; এই স্বরাঘাত কোনও কোনও উপভাষার বেলায় অধিকতর প্রবল, আবার কোনও উপভাষার ক্ষেত্রে দুর্বল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রথম শব্দাংশে স্বরাঘাতের অস্তিত্ব হইতে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, প্রগত স্বরসঙ্গতির বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ইহা দুই প্রকার ঃ প্রথমত, সমীভবন সূত্র অনুযায়ী পশ্চাদ্বর্তী স্বরবর্ণগুলির (A, i, o ও u) পর সর্বদাই অনুবর্তী স্বরবর্ণ এবং সম্মুখবর্তী স্বরবর্ণগুলির (e. i, o, u) সম্মুখে সর্বদাই সম্মুখবর্তী স্বরবর্ণ অবস্থান গ্রহণ করে। এই সমীভবনের নিয়মটি, এমন কি ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের ক্ষেত্রেও, বিশেষ করিয়া k, g, l; kat (থামা), Katghan (স্তব্ধ, রুদ্ধ); (আস), kelgen (আগত) ইত্যাদির বেলায় সম্প্রসারিত হয়। আমরা কোনও উপভাষায় মৌলিক স্বরসঙ্গতির দৌর্বল্য লক্ষ্য করিয়া থাকি, যাহা অন্যান্য ভাষার প্রভাবে, বিশেষ করিয়া তুর্কী ভাষা-উপভাষাগুলির উপর, যেমন ইরানী ভাষার (ফারসী) প্রভাব লক্ষ্য করিয়া থাকি (কোনও কোনও তুর্কোমান ও আযারবায়জানী উপভাষা, আনাতোলিয়ার তুর্কী ভাষা এবং ইরানীকৃত ওযবেগ ভাষায় এই প্রভাব লক্ষণীয়)। উল্লিখিত দ্বিতীয় ধরনের স্বরসঙ্গতি প্রথম ধরনের স্বরসঙ্গতির তুলনায় কম লক্ষণীয়। কুঞ্চিত ও অকুঞ্চিত স্বরবর্ণগুলির (কুঞ্চিত স্বর ঃ o. u, o, u) অ-কুঞ্চিত স্বর ঃ (a, i, e, i) এই দুই স্বরের বেলায় উল্লিখিত বিষয়টি প্রযোজ্য। সাধারণত সঙ্কীর্ণ কুঞ্চিত স্বরবর্ণগুলি (u, u) সর্বঘনিষ্ঠ অবস্থায় কুঞ্চিত স্বরবর্ণগুলির অনুসরণ করে এবং ঐ স্থান বিন্যাসটি ঘটে সন্নিবিষ্ট শব্দাংশের বেলায় পক্ষপাতের প্রবণতার কারণে। অকুঞ্চিত স্বরবর্ণগুলির পরে থাকে সাধারণত অকুঞ্চিত প্রসারিত স্বরবর্ণ (a, e) কিংবা সংকীর্ণ স্বরবর্ণঃ যেমন বিল (Bil) জানা, বিল+দিম (Bil+dim)= আমি জানিতাম; ওল olঃ মৃত্যু, ওল+দুম (ol+dum)-আমি মরিয়াছিলাম; বেশ+তেন (besh+ten)=পাঁচের; কোল (kol)-হ্রদ, কোল+দেন (kol+den)= হ্রদের। কেবল কোনও কোনও উপভাষায় (যেমন কারা-কিরগিয উপভাষা) দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বরসঙ্গতি সকল প্রসারিত স্বরবর্ণে (ধ্বনিতে) সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অন্যান্য উপভাষায় (যেমন কিরগিয-কাযাক উপভাষায়) সম্মুখবর্তী প্রসারিত স্বরবর্ণের ক্ষেত্রেই কেবল (e.o) উহা ঘটিয়া থাকে। যেমন কোল (kol)= হ্রদ, কোল (kol)+দোর (dor)=হ্রদগুলি (উভয় উপভাষাতেই) কিন্তু কোল (kol)=হাত কোল+দার (Kol+dar) (কিরগিয-কাযাক) ও কোল (kol)+ দোর (dor) [কারা-কিরগিয]। এই স্বরসঙ্গতির সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ইস্তাম্বুলের তুর্কী ভাষার সঙ্কীর্ণ স্বরবর্ণগুলির ক্ষেত্রে; অবশ্য ইহাতে সংশ্লিষ্ট প্রসারিত স্বরবর্ণগুলি কোনও প্রকারে প্রভাবিত হয় নাই।

তুর্কী ভাষাগুলিতে নয়টি মৌলিক স্বরধ্বনি রহিয়াছে ঃ a, a (বিকৃত), e (সংবৃত) o, o, i,ı, u,u। এইগুলি সাধারণত প্রলম্বিত স্বরধ্বনি (বর্ণ) যেইগুলি সম্পর্কে কেবল য়াকূত ও তুর্কোমান ভাষাতেই পর্যাপ্ত মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। কোনও কোনও উপভাষায় (যেমন, কাযান-তাতার) স্বরবর্ণের সংখ্যা নয়-এর অধিক ও স্বরবর্ণের সংশ্লিষ্ট

অনুক্রমটিতে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, যেমন (0> u, o> u, e> i,ı> ı)। অন্যদিকে তুর্কী ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণমালা সম্পর্কেও তেমন সমীক্ষা এখনও করা হয় নাই। ইহা ছাড়া অঘোষ ও ঘোষ ব্যঞ্জনবর্ণ (ধ্বনি) ছাড়াও যে মধ্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলির অস্তিত্ব আছে (যেমন তুর্কোমান ও আযারবায়জানী উপভাষায়) সেইগুলির ব্যাপারেও পর্যাপ্ত মনোনিবেশ করা হয় নাই। ঘোষ স্বরধ্বনিগুলির সহিত অঘোষের সমীভবন ও উহার বিপরীত সমীভবনের প্রসার তেমন ব্যাপক নহে ঃ য়ায+দী (yaz+di), সে লিখিয়াছে; তুত+তী (tut+ti) সে ধরিয়াছে; কোয+দা (koz+da), চোখে; বাশ+তা (Bash+ta), মাথার উপর। ব্যঞ্জনবর্ণগুলির অন্য ধরনের ক্রমবর্ধমান সমীভবন হইয়া থাকে। শুধু গুটিকয়েক উপভাষাতেই ক্রমবর্ধমান বিসমীভবন লক্ষণীয় (যেমন, কাযাক; কিরগিয, আলতাই) ঃ আতা+চার (ata+car), পিতাগণ; কোল (kol) +দোর (dor), হৃদসমূহ। য়াকূত ভাষার একটি অত্যন্ত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের ক্রমহ্রাসমান সমীভবন ঃ আত+ঈম (at+Im), আমার ঘোড়া; আত+ঈন, (at+In) তোমার ঘোড়া; কিন্তু আপ-পার (ap+par), আমার ঘোড়ার জন্য; আক-কীতান, (ak+kittan), তোমার ঘোড়া হইতে।

তুর্কী ভাষার অধিকাংশ উপভাষার কেবল আদ্য ঘোষ ব্যঞ্জনবর্ণগুলি হইতেছে ঃ b ও m এবং ব্যতিক্রমভাবে n ও d; তুর্কোমান, আযারবায়জানী ও আনাতোলীয় তুর্কীতে আদ্যাক্ষর হিসাবে d, w, g, এই ঘোষ বর্ণগুলি দেখা যায়। ইহা ছাড়া ১২শ শতকের ওগুয উপভাষাতেও ইহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। r,l,n এই ব্যঞ্জনবর্ণগুলির কোনওটির দ্বারা কোনও শব্দ গঠিত হইতে পারে না [শেষোক্ত 'য' ধ্বনির প্রতিনিধিত্বকারী ব্যঞ্জনটি (কৃতঋণ শব্দগুলি ইহার ব্যতিক্রম) কেবল গুটিকয়েক ধনাত্মক শব্দের বেলায় ঐ শব্দের প্রারম্ভে দেখা যায়]। দুইটি ব্যঞ্জন দ্বারা সূচিত শব্দের বেলায়ও ইহা সম্ভব নহে। কেবল শব্দের প্রারম্ভিক অক্ষর r,l বা s হইলে কেবল সেইসব শব্দের শেষে দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিতে পারে। আর এই কারণেই আমরা কৃতঋণ শব্দগুলিতে অনুপূরক স্বরবর্ণসমূহের অস্তিত্ব লক্ষ করি ঃ আরাজাব > রাজাব ('আরবী), ইসতাপ < স্তেপ (রুশ), ফিকির <ফিক্‌র ('আ)।

আমরা আগেই আলোচনাকালে বলিয়াছি, রূপপ্রকরণমূলক শব্দ গঠন ও পরিবর্তনগুলি ক্রিয়া বা বিশেষ্যবাচক ধাতু ও মূলগুলির সহিত এক বা একাধিক গঠনাত্মক বা পরিবর্তনসাধক প্রত্যয়যোগে সাধিত হইয়া থাকে; এমন কি এই যোজনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট শব্দের একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ থাকে। যেমন ক্রিয়ামূল, মধ্যম পুরুষ, একবচন ও সেই সঙ্গে আদেশবাচক অর্থ (তাপ-খুঁজিয়া দেখ), আবার বিশেষ্য (নামবাচক) মূল অর্থাৎ কর্তা, কর্ম ও সম্বন্ধ কারকসহ ও এক বা বহুবাচনিক আরও কোনও কোনও কারকের নামবাচক মূল ঃ [আলমা (alma), আপেল, আপেল সম্পর্কিত, আপেলগুলি]। সাদৃশ্যমূলক শব্দরূপ গঠন বা পরিবর্তনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন বির (bir)= এক বির+আর (bir+ar)=এক দ্বারা বা সাদৃশ্য দ্বারা; ইকি (iki)= দুই, ইকি+রার (iki+rar) =দুই দ্বারা (চাগতাই); বা বেশ (besh) = পাঁচ, বেশ+আর (besh+ar)= পাঁচ দ্বারা ও সাদৃশ্য দ্বারা; আলতী (alti)=ছয়, আলতী+শার (alti+shar)=ছয় দ্বারা।

তুর্কী ভাষার ব্যাকরণে দুইটি মৌলিক শ্রেণী আছেঃ একটি বিশেষ্য ও অপরটি ক্রিয়া। বিশেষ্য পদ সর্বনাম, সংখ্যাবাচক পদ ও সাধারণভাবে বিশেষ্য–এই তিনভাগে বিভক্ত। এই ভাষায় বিশেষণের বিশেষ কোনও রূপ প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নাই। কাহারও পক্ষে বিশেষ্য ও বিশেষণবাচক শব্দাবলীর মধ্যে কোনও স্পষ্ট পার্থক্য করাও সম্ভব নয়, যেমন তেমির (temir)= লৌহ ও লৌহ সম্পর্কিত (লৌহজ) তাশ (tash)=প্রস্তর, প্রাস্তরিক, সু (sü)=পানি ও পানি সম্পর্কিত, জলজ। বিশেষণ বিশেষ্য দিয়াই গঠিত হয় এবং ঐ বিশেষ্যটি নিজেই ব্যাকরণগত দিক হইতে পূর্ণ হইয়া উঠে। আর এইভাবেই বহুবাচনিক ও শব্দরূপের প্রত্যয়গুলি কেবল একটি বিশেষায়িত বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, বিশেষণটি শব্দরূপ পায় না। ক্রিয়ারূপগুলি এইভাবে বিভক্তঃ (১) সমাপিকা ক্রিয়া, সংখ্যায় অতি সীমিত; (২) ক্রিয়াবিশেষ্য, ইহা ক্রিয়া বা আধারবাচক বিশেষ্য এবং (৩) ক্রিয়াবিশেষণ। নাম (বিশেষ্য) বা ক্রিয়াপ্রসূত ক্রিয়া বিশেষণবাচক শব্দের সংখ্যা অতি কম। আর এই ক্রিয়াবিশেষণ বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ অতিরিক্ত, অনন্বয়ী অব্যয় ও অনুসর্গের মতই, তুর্কী ব্যাকরণের একটি গৌণ শ্রেণীমাত্র।

তুর্কী ভাষার বিশেষ্যের সম্বন্ধবাচক প্রত্যয়গুলির সহিত ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগুলির সম্বন্ধবাচক সর্বনামের মিল আছে। যেমন, আত-ঈম (at+im)= আমার ঘোড়া, আত-ইন (at+in)= তোমার ঘোড়া, আত-ঈ (at+i)= তাহার ঘোড়া, আতা+ম (ata+m) = আমার পিতা, আতা+ন (Ata+n)=তোমার পিতা, আত+ঈমীয (at+imiz)= আমার ঘোড়া, আত+ঈনীয (at+iniz)=তোমাদের ঘোড়া, আতা+মীয (ata+miz)=আমাদের পিতা, আতা+নীয (ata+niz)=তোমাদের পিতা। কোনও কোনও ক্রিয়াবাচক শব্দরূপে একই প্রত্যয় ব্যক্তিসূচক অন্তর্যোজনা হিসাবে ব্যবহৃত হয় ঃ কেল+গু+ম (kel+gu+m)= আমি আসিব, কেল+গু+ন (Kel+gu+n)= তুমি আসিবে, কেল+গু+ন (Kel+gu+n)=সে আসিবে (চাগাতাই); কেল+দি+ম (Kel+di+m)= আমি আসিলাম, কেল+দিন+ন (Kel+di+n)= তুমি আসিলে, কেল+দি (kel+d+ı) (কেল+দ+ই?)=সে আসিল। ব্যক্তিবাচক সর্বনাম হইতে উদ্ভূত কোনও কোনও উপভাষায় সম্বন্ধবাচক প্রত্যয় দ্বারা প্রভাবিত বিধেয় (প্রস্বরবিহীন) অর্ধ অনুসর্গসমূহ বিশেষ্য আকারে ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাসমূহের অস্ত্যর্থ ক্রিয়ার সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। ইত্যবসরে ক্রিয়াগুলি সর্বাধিক ব্যবহৃত পুরুষবাচক অন্ত্যপ্রত্যয় ধারণ করে ঃ এক বচন, উত্তম পুরুষ ঃ ben, men, bin min, in, im; মধ্যম পুরুষ sen, sin, zin ব. ব. উত্তম পুরুষ ঃ biz, uz, iz, miz; মধ্যপ পুরুষ siz, simiz; দৃষ্টান্তঃ আদগু-বেন (Adgu-ben) (bin, men, min] দয়ি-য়িম> (ayi-yim) আমি ভালঃ য়াযার-বেন (yazar-ben) (bin, men, min) > য়াযার-ইম (yazar-im) (im) আমি লিখি। পুরাতন ভাষায় অভিনির্দেশক সর্বনাম ol অভ্যর্থ ক্রিয়ার প্রথম পুরুষে প্রযুক্ত হইতঃ আদগু+ওল (adgo-ol)-সে ভালঃ আধুনিক ভাষায়-বিধেয় অর্ধপ্রত্যয় ক্রিয়া গঠনঃ তুরুর (turur)-সে সোজা (ঋজু) হইতে দীর (dı) dir (di)। ব.ব. car-এর প্রত্যয় বিশেষ্য ও সেই সঙ্গে ক্রিয়াসহযোগেও প্রযুক্ত হইয়া থাকেঃ at+tar (at+tar)=ঘোড়াগুলি, atXtıXlar তাহারা ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। পুরুষবাচক ক্রিয়াবাচক শব্দগঠনগুলি ঘটে; অতঃপর বর্ণিতভাবে অন্ত্যপ্রত্যয় ধারণ করে ঃ বিশুদ্ধ ক্রিয়ামূল হইতে অনুজ্ঞার আকারে, অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি বা অন্য কোনও ক্রিয়াভাব বা কাল হইবে। সম্বন্ধ ও বিধেয়বাচক প্রত্যয়সমূহ ছাড়াও পুরুষবাচক বিশেষ বিভক্তি/প্রত্যয়ও প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যেমন অনুজ্ঞায় প্রথম পুরুষের জন্য ঃ যু, যুন, সুন, সুনি (zu, zun, sun,

suni) ইত্যাদি, আধুনিক উপভাষাগুলিতে অতীত অনির্দিষ্ট (ক্রিয়া) কাল ও আপেক্ষিক কালের প্রথম পুরুষের জন্য ক, ক (k, k) (যেমন, কেল-দি+ক (kel+di+k)-আমরা আসিয়াছি, কেল+সে+ক =আমরা যদি আসিতাম)। শেষোক্ত প্রত্যয়/বিভক্তিগুলি (ক.ক) আযারবায়জানী উপভাষা, কোনও কোনও আনাতোলীয় তুর্কী ভাষা এবং তুর্কোমানদের গোকলেঙ উপভাষা বিশেষ্য ও ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের প্রস্বররিহীন বিধেয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

অধিকাংশ আধুনিক তুর্কী ভাষায় বিশেষ অন্ত্যপ্রত্যয়সহ পাঁচ ধরনের শব্দরূপ প্রচলিত ঃ সম্বন্ধবাচক (ইন, নিন, নিন, নি, ইন) (in, nin, nin, ne, in), কর্মবাচক (ই, নি, = পুরাতন 'ইগ'), সম্প্রদানবাচক (কা, আ, য়ায, গার, গান) [ka, a, yas, ghar, ghan], অধিকরণ (দা) (da), অপাদান (দান, দান দীন) (dan, dan, din); অবশ্য পুরাতন তুর্কী ভাষাগুলিতে এবং কোনও কোনও আধুনিক তুর্কী ভাষায় এককালে নির্দেশবোধক, করণ ও অন্যান্য কারকের বেলাতেও প্রত্যয়যুক্ত হইত। তুর্কী ভাষার ব্যাকরণে লিঙ্গের অস্তিত্ব নাই; আর বচন কেবল দুইটি আছে।

তুর্কী ভাষাগুলিতে ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দকোষের পার্থক্যগুলি শব্দরূপ প্রকরণের চাইতে অধিকতর লক্ষণীয়। চুওয়াশ ও য়াকূত ভাষাদ্বয়ের অবস্থান একান্তই ভিন্ন। অন্য সকল তুর্কী ভাষাকে কার্যত একটি মাত্র মূল ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ও প্রকার হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

তুর্কী ভাষায় পরিজ্ঞাত ইতিহাসের গোটা পরিসরে (৮ম শতক হইতে) যথেষ্ট রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তুর্কী ভাষাসমূহের ইতিহাসের তুলনামূলক সমীক্ষার কাজটি এখনও প্রারম্ভিক পর্যায়ে রহিয়াছে (এ বিষয়ে Radloff, Gronbeck, Thomsen, Melioranski, Brockelmann' ও Deny কিছু সমীক্ষামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন)। Ramstedt, Gombocz, Nemeth ও Poppe-এর গবেষণামূলক সমীক্ষার ফলে ইহা কম-বেশি প্রমাণিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তুর্কী ভাষাগুলি মোঙ্গল ও চুওয়াশ ভাষার সহিত সম্পর্কিত, আর খোদ্ চুওয়াশ ভাষাটি মোঙ্গল ও তুর্কী ভাষার সহিত অনেকখানি ঘনিষ্ঠ। N. Marr তুর্কী ভাষার ইতিহাসের উপর এক নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তিনি Japhetio তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে চুওয়াশ ভাষাটি পরীক্ষা করার পর তুর্কী ভাষাকে এমন একটি বর্গের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন যাহার পরিসর তুরানী তাত্ত্বিকদের সাবেক প্রস্তাবিত তত্ত্বাবলীর পরিসর হইতে বড় নয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bothlingk, Ueber die Sprache der Fakuten, St. Petersburg 1851; (২) Radloff, Vergleiochende Grammatik der nordlichen Turksprachen, i, Phonetik, Leipzing 1882; (৩) V, Gronbeck, Forstudier til tyrkish lydhistorie, Copenhagen 1902; (8) P. Melioranskii, Arab-filolog o tureckom iazykie, St. Petersburg 1900; (৫) N. Katanov, Opyt issliedovania uriankhaiskogo iazyka s ukazaniem glavnieisikh rodstvennoyoh otnoshenii ego k drugim iazykam tiurskogo kornia, Kazan 1903; (৬) Bang. Vom Kokturkischen zum Osmanischen ও সেই সঙ্গে তাঁহার অন্যান্য রচনা; (৭) মাহমূদ ইবনুল হুসায়ন আল-কাশগারী, দীওয়ান লুগাতিতে তুর্ক, ইস্তাম্বুল; (৮) N. Marr, Cavashi-ja fetidy na Volgie, Ceboksary 1926; (৯) N. Poppe, O rodstvennych o tnosheniiakh cuvaskogo i tiurko-taturskikh jazykov, Ceboksary 1925; (১০) ঐ লেখক, Istoriia i sovremennoe polodjenie voprosa a vzaimmom rodstvie altarskikh iazykov (Stenograficeskii otcet Pervogo Turkologioeskogo Siezda v Baku, Baku 1926); (১১) M. Th. Houtsma, Ein turkisch-arabisohes Glossar, Leyden 1894; (১২) Comes Geza Kuun, Codex Cumanicus, Budapest 1880; (১৩) Bang.,Beitrage zur Kritik des Codex Cumanicus (Bull. de 1'Acad. R. de Belgique, 1911) ও তাঁহার অন্যান্য রচনা; (১৪) C. Salemann, Zur Kritik des Codex Cumanicus (Bull, de 1'Ac. des Sc. de St. Petersb. 1910; (১৫) N. Ashmarin, Materialy dlia issledovania cuvashskogo yazyka, Kazan 1898; (১৬) ঐ লেখক, Opyt, issled, cuvash. sintaxisa. Kazan 1903; (১৭) Radloff, Proben der Volkslitteratur der turkischen Stamme, i-x, St. Petersburg 1866-1904; (১৮) Pekarsky, Obrazcy narodn, literatur, yakutov, St. Petersburg 1907-1918.

রচনাবলী (পাণ্ডুলিপি) ও ভাষাসমূহ

তারিখযুক্ত তুর্কী লিপির সর্বপ্রাচীন নমুনাগুলি ৮ম শতকের। এইগুলি ৬ষ্ঠ-৮ম শতকের তুর্কী রাজবংশের শাসককুল-তাগিন ও বিলজে খানের সম্মানে স্থাপিত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ লিপিবিশেষ। মঙ্গোলিয়ার ওরখন নদী উপত্যকা হইতে ladrincev ১৮৮৯ খৃ. এই লিপিগুলি উদ্ধার করেন। এই একই ভাষালিপিতে উৎকীর্ণ অন্যান্য ছোট-বড় আকারের নানা প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ লিপির অস্তিত্বের কথা মঙ্গোলিয়া, সাইবেরিয়া ও পশ্চিম তুর্কিস্তানে রহিয়াছে বলিয়া আমরা জানি। Messerschmidt ১৭২১ খৃ. সাইবেরিয়ার প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ লিপিগুলি আবিষ্কার করেন। আনুমানিক নবম শতকের বলিয়া কথিত উল্লিখিত উৎকীর্ণ লিপির একই হস্তাক্ষরযুক্ত পাণ্ডুলিপি সাম্প্রতিক কালে চীনা তুর্কিস্তানে এক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় পাওয়া গিয়াছে। বিশিষ্ট ডেনিশ ভাষাবিজ্ঞানী V. Thomsen ১৮৯৩ খৃ. এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। তিনি এই লিপিগুলির 'তুর্কী বর্ণমালা' নামকরণ করেন। অন্যেরা অবশ্য এই লিপিকে ওরখন বর্ণমালা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ওরখন লিপিসমূহের জন্য W. Bang 'kok-Turkisch' নামকরণের যে প্রস্তাব করেন তাহা Radloff, Thomsen প্রমুখ প্রত্যাখ্যান করেন। প্রাচীন সোগদীয় বর্ণমালার মধ্য দিয়া অরামীয় বর্ণমালা হইতে তুর্কী বর্ণগুলির উদ্ভব ঘটিয়াছে। তবে কোনও কোনও তুর্কী বর্ণের উদ্ভব স্বকীয় ও স্বাধীন ও এগলি ভাবচিত্রের (ideographic) বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন; যেমন o (k)=তীর, (a)j= চন্দ, (a) b= বাড়ি ইত্যাদি। তুর্কী লিপিতে লেখা কোনও কোনও দলীল ৭ম, এমন কি ৬ষ্ঠ শতকেরও হইতে পারে। তুর্কী বর্ণমালার ভাষা প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ কিংবা পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ, যে আকারেই হউক ইহার ধ্বনি বৈশিষ্ট্যে (d, j ধ্বনিসমূহ) ও শব্দরূপ প্রকরণে (In-এ নির্দেশবাচক ও করণ কারক এবং সম্বন্ধ পদ দ্বারা, da-এ অপাদান কারক দ্বারা sar, ighma ইত্যাদি ক্রিয়ারূপ দ্বারা-শব্দরূপ প্রকরণেও শব্দ

কোষে [Kan কোন পিতা lc (ওগ)=মাতা] এক ধরনের মান্ধাতা বা প্রাচীনত্বের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট।

উইগুর বর্ণমালা ৮ম-৯ম শতকে উইগুরের তুর্কী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণভাবে প্রসার লাভ করে। এই বর্ণমালা উত্তরাঞ্চলের সমৃদ্ধ বর্ণমালা হইতে ও একই সঙ্গে সোগদীয় ভাষার (লিপির) মাধ্যমে উদ্ভূত। এমন একটি ভুল ধারণা প্রচলিত রহিয়াছে যে, এই বর্ণমালা Estranghelo হইতে উদ্ভূত। আসলে উইগুর সাহিত্যমানের বা লিপির ভাষাটি মঙ্গোলিয়য় প্রাপ্ত ওরখন লিপির তুর্কী ভাষার মত একই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই ভাষায় উপভাষাগত কিছু কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে (nin-এ সম্বন্ধ, din-এ অপাদান)। বৃটিশ, রুশ, ফরাসী, জার্মান ও জাপানী অনুসন্ধান অভিযানগুলিতে প্রাপ্ত উইগুর কাঠ-খোদাই লিপি ও পাণ্ডুলিপিমূলক রচনাগুলির পরিমাণ বিপুল। উইগুর বর্ণমালা ছাড়াও চীনা-তুর্কিস্তানের আদি তুর্ক বাসিন্দারা তুর্কী, মানি, সিরিয়াক ও ব্রাহ্মী বর্ণমালা ব্যবহার করিত। চীনের অমুসলিম তুর্কীদের মাঝে উইগুর লিপির প্রচলন ১৩শ শতকের সূচনা পর্যন্ত বজায় ছিল। মধ্য এশিয়ার তুর্কদের ইসলাম গ্রহণের পর উহারা আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করে (১০ম-১১শ শতক)। তবে রাজদরবারে লিপি হিসাবে উইগুর বর্ণমালার ব্যবহার বহাল থাকে। ১৩শ-১৫শ শতকে Golden Horde -বাসী ও তীমূরীদের মধ্যে কিপচাক ও চাগাতাই ভাষাগুলির জন্য ব্যবহার প্রচলিত ছিল (য়ারলীক গদ্য ও কাব্য রচনাবলী)। ১৬শ শতকের প্রারম্ভেও ইস্তাম্বুলে উইগুর লিপি লিখনের বিশেষজ্ঞদের অস্তিত্ব ছিল ('আবদু'র রাযযাক বাখ্‌শী)। পশ্চিম য়ুরোপে Klaproth, Remusat ও Jaubert প্রমুখ ১৯শ শতকের প্রথমার্ধ নাগাদ উইগুর লিপি পাঠের কাজ শুরু করেন। প্রাক-ইসলামী আমলের রচনামানের উইগুর ভাষার বুনিয়াদে আরবী বর্ণমালায় লেখা মধ্য এশিয়ার মুসলিম আমলের রচনামানের তুর্কী ভাষার বিকাশ ঘটে ইলেক খান (দ্র.) তন্ত্র বা কারাখানী রাজ্যের ইসলামে ধর্মান্তরিত জনগণের মধ্যে। ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, আমাদের নিকট এই ভাষার সর্বপ্রাচীন দলীল হিসাবে পরিচিত মূল পাণ্ডুলিপি Kudat ghu-bilig (শান্তি প্রদায়ক বিজ্ঞানশাস্ত্র)-এর লিপি ছিল আরবীতে। এই রচনাটি ১১শ শতকের এক উপদেশাত্মক কাব্য রচনা। ইহার রচয়িতা য়ূসুফ যিনি বালাসাগুন ও কাশগার রাজ্যের খাসস হাজিব (দ্র.) ছিলেন। ১৫শ শতকে হেরাতে প্রস্তুত এই রচনার আরবী লিপির দুই কপি পাণ্ডুলিপি ও উইগুর লিপির একটি কপি পাণ্ডুলিপি (পরবর্তীকালে প্রস্তুত) আমাদের হাতে পৌঁছিয়াছে। তবে এই পাণ্ডুলিপিগুলির ভাষাকে বিশুদ্ধ উইগুর বিবেচনা করা যাইবে না। M. Kopruluzade এই Kudat ghu bilig -এর ভাষাকে কারলুক তুর্কী বলিয়া মনে করেন। তবে ইহার ভাষাকে কারাখানী ধরাই নিরাপদ।

কামা নদীর তীরবর্তী বুলগার রাজ্যে বুলগার ভাষায় কোনও রচনাবলীর অস্তিত্ব ছিল কি না সে বিষয়ে কোনও উপাত্ত পাওয়া যায় না। এই কামায় ১০ম শতকে ইসলাম প্রচারিত হয়। যাহাই হউক, ভল্‌গা অঞ্চলে প্রাপ্ত ১৪শ শতকের সমাধিলিপিতে বুলগার ভাষার উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। ১১শ শতক হইতে মধ্য এশিয়ার রচনামানের তুর্কী ভাষার বিকাশ অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে; অবশ্য ভাষা বিকাশের কেন্দ্রটি বিভিন্ন সময়ে বদলাইয়া যায়।

"আইবেতু'ল-হাকা'ইক" নামে এক উপদেশাত্মক কাব্য রচনা করেন এদীব আহমাদ। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, এই কাব্যটি ১২শ শতক নাগাদ রচিত। ইহার ভাষায় 'কুতাদগু-বিলিগ'-এর ভাষার সহিত যথেষ্ট মিল থাকিলেও উহারা অভিন্ন নহে। পূর্বেকার পাণ্ডুলিপির অনুপস্থিতিতে আমাদের পক্ষে তুর্কী মরমীবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ ইসেবীর (১৩শ শতক) হিকমেতেব-এর ভাষার কোনও সুনির্দিষ্ট নাম দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। এম কোপরুলু যাদের মতে আহমাদ ইসেবী একজন কারলুকও বটেন। ১৪শ শতকের সূচনা নাগাদ জুচি রাজ্য বা 'দেশতী কিপচাক'-এর বিভিন্ন অংশ রাজধানী সারাই (দ্র.)-এর সীর দরিয়া (দ্র.)-র মোহনাসহ খাওয়ারিয্‌ম ও ক্রিমিয়ায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিকাশ ঘটিয়াছিল। তবে জুচি রাজ্যে সাহিত্যের ভাষার সুষম বিকাশ ঘটে নাই। এই যুগের যেই সকল রচনামূলক উপকরণ আমরা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহার সবগুলিতেই লক্ষ্য করা যায় কারাখানী আমলের সাহিত্য উপাদানগুলির সহিত এখনও বর্তমান (প্রচলিত) স্থানীয় উপভাষাসমূহ, তথা কিপচাক ও ওগুয (তুর্কোমান) উপভাষায় সমন্বিত রহিয়াছে। ১৪শ শতকের রচিত এক প্রণয়-কাব্যের কপি প্যারিসের Bibliotheque Nationale-এ সংরক্ষিত রহিয়াছে। কবি কুত্‌ব রচিত "খুসরাও উ-শিরীন" নামের এই কাব্যগ্রন্থটি নিজামী রচিত একই ধরনের কাব্যের অনুকরণবিশেষ; ইহা 'White Horde'-এর তেনি বেক ও তাঁহার পত্নীকে উৎসর্গ করা হয়। এই কাব্যের ভাষা 'কুতাদগূ-বিলিগ'-এর খুবই কাছাকাছি, যদিও ইহাতে কিপচাক (সালা=গ্রাম ইত্যাদি) এবং ওগুয উপাদানও লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে কবি খাওয়ারিযমীর 'মাহাববেত-নামে' শীর্ষক কবিতাটি যাহা ১৫শ ও ১৬শ শতকের দুইটি কপি বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই পাণ্ডুলিপির রচনায় কারাখানী ভাষার উপাদানের চাইতে অনেক বেশি কিপচাক ও ওগুয উপাদানের সমাবেশ লক্ষ করা যায়।

১৩শ শতকের তুর্কী মুসলিম বিশ্বের সাহিত্য বিষয়ক রচনাবলীর ভাষাগুলি একে অপর হইতে স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র ছিল না। সংশ্লিষ্ট আমলের প্রায় গোটা তুর্কী ভূভাগে মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সুবাদে সেইখানে সমসাময়িক কালে তুর্কী-মুসলিম জনগোষ্ঠীর এক ব্যাপক অংশের মাঝে একটি একক সাহিত্যিক ভাষা বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, সূচনাপর্বে এশিয়া-মাইনরের সালজূক শাসিত ভূভাগে তুর্কী ভাষায় সাহিত্যকর্মের বিকাশ একটি মাত্রায় মধ্য এশিয়া ও পূর্ব য়ুরোপ অবধি পরিব্যাপ্ত হয়। ঠিক কোথায় জনৈক 'আলী তাঁহার 'কিস্‌সা-ই য়ূসুফ' শীর্ষক চতুষ্পদী প্রণয়কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা খুবই কঠিন। ইহার ভাষার সহিত 'Golden Horde-এর ১৪শ শতকের সাহিত্যের ভাষার অনেকখানি মিল রহিয়াছে। ইহাতে রহিয়াছে ওগুয-তুর্কোমানে উপাদানের পাশাপাশি সমাবেশ। এই প্রণয়কাব্যমূলক রচনাটি পরবর্তী কালে ভল্‌গা অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। Brockelmann-এর মতে "কিস্‌সা-ই য়ূসুফ"-এর সহিত আনাতোলীয় সাহিত্যের সম্পর্ক আছে। কিন্তু মারজানী নামে একজন কাযান পণ্ডিত ইহার সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বুলগার ভাষার সহিত উহার যোগসূত্র রহিয়াছে। ১৫শ শতকে রাবাতই ওগুয রচিত 'কিসাসু'ল-'আম্বিয়া' নামে গদ্য রচনাটির মাঝে মাঝে কবিতায় রচিত অনুচ্ছেদ আছে। ইহার ভাষাটি কারাখানী ভাষার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইহার ভাষাকে চাগাতাই ভাষা হিসাবে অভিহিত করা ঠিক হইবে না। ১৩শ-১৪শ শতকে Semiriecie-র সমাধিগুলিতে যে সিরিয়াক-খৃস্টান তুর্ক লিপি দেখা যায় তাহার সহিত কারাখানী ভাষার (উদ=ষাঁড়, য়ন্‌দ=ঘোড়া, য়ারতুনচু=এই দুনিয়া, আতা-পিতা, আনা=মাতা) অত্যন্ত মিল লক্ষ করা যায়।

তুর্কী মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সাহিত্যের বিভিন্ন ভাষার বিকাশের সূচনা ১৪শ ও ১৫শ শতকে হয় বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। মধ্য-এশিয়ায় তুর্কী সাহিত্য সবার আগে বিকশিত হইতে শুরু

করে, যাহাকে আমরা ঐ আমলে একমাত্র সাহিত্য বলিয়াও গণ্য করিতে পারি। এই ধরনের বিকাশের চরম শিখর হিসাবে 'উছমানী তুর্কী ও চাগাতাই তুর্কী সাহিত্য সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করে। 'উছমানী তুর্কী ভাষার অগ্রগতির আদি বা প্রারম্ভিক মাধ্যম হইতেছে মধ্য এশীয় তুর্কী সাহিত্য; পরে উহা সালজুক আমলে আনাতোলীয় তুর্কী সাহিত্যের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করে। চাগাতাই তুর্কী ভাষা তুর্কী ভাষার বিকাশ-পর্যায়গুলির তৃতীয় ও দীর্ঘতম পর্যায় (১৫শ-২০শ শতক)। আর ইহাই হইতেছে মধ্য এশীয় তুর্কী সাহিত্যের উজ্জ্বলতম বিকাশ-পর্যায়। এই পর্যায়ের সরাসরি উদ্ভব তুর্কী সাহিত্য বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় হইতে, যাহাকে জুচি পর্যায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তীমূরীয়দের অধিবাস অঞ্চলে চাগাতাই ভাষা বিকশিত হয়। তীমূরীয় অঞ্চল ছিল চিঙ্গীয খানের দ্বিতীয় পুত্র চাগাতাই (দ্র.)-এর আধিপত্যাধীন অঞ্চল। মধ্য এশিয়ার সাহিত্য মানের তুর্কী ভাষার বিকাশের পূর্ববর্তী পর্যায়ে এই ভাষার কিপচাক ও তুর্কোমান উপাদানগুলির পরিবর্তে স্থলাভিষিক্ত হয় চাগাতাই দেশের সর্বপ্রধান তুর্কী ভাষার সজীব চাগাতাই উপাদানসমূহ। সম্রাট বাবুর বলিয়াছেন, চাগাতাই সাহিত্যের সর্বাপক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মীর 'আলী শের নাওয়াঈ-এর ভাষা ও শহরের উপভাষা অভিন্ন। চাগাতাই কাব্যিক ভাষার সহিত গদ্য ভাষার শব্দরূপ ও শব্দকোষের পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

কিছুকাল আগেও ১২শ শতকের সাহিত্য নিদর্শনগুলির ভাষা ও সেই সঙ্গে পশ্চিম ও পূর্ব তুর্কিস্তানের তুর্কী উপভাষাগুলির বেলায় কোনও কোনও পণ্ডিত ভুলক্রমে 'চাগাতাই' তু. (চাগাতাই সাহিত্য/রচনাবলী) শব্দটি আরোপ করিয়াছেন। খোকান্দ ও খীবা খানতন্ত্রে ১৯শ শতকে ও ২০শ শতকের গোড়ার দিকে চাগাতাই গদ্য ও কাব্য সাহিত্যে এক নব জাগরণ লক্ষণীয় হইয়া উঠে। বর্তমান কালে ওযবেগিস্তানে (উযবেকিস্তানে) চাগাতাই ভাষা ওযবেগ সাহিত্যিক ভাষাকে জায়গা ছাড়িয়া দিতেছে অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার তুর্কী সাহিত্যের বিকাশের ৪র্থ পর্যায় শুরু হইয়া গিয়াছে। তবে ওযবেগ (উযবেক) সাহিত্যিক ভাষার পরিমণ্ডলটি মধ্য-এশীয় জনগণের নূতন নূতন সাহিত্য ভাষার ব্যবহার ২০শ শতকে সূচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে যথেষ্ট সীমিত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি ১৭শ শতকেও ঐতিহাসিক আবু'ল-গাযী খান খীবায় সমসাময়িক কালের ধারা ও ঐতিহ্যের বিপরীতে ওযবেগ ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন, চাগাতাই ভাষায় নহে। জুচি সাম্রাজ্যের আমলে মধ্য এশিয়ার তুর্কোমানগণ খাওয়ারিযমের সাহিত্যের ভাষার বুনিয়াদ স্থাপনে অংশগ্রহণ করেন। পরের কয়েক শতক ধরিয়া তাহাদের নিজস্ব ভাষার সাহিত্য নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বজায় থাকে, বিশেষ করিয়া কবিতার ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। ১৫শ শতকের পর তুর্কোমানদের কাব্যকর্ম চাগাতাই প্রভাবের আওতায় আসে এবং ঐ ধারার কাব্য আর বিকশিত হইতে পারে নাই। বর্তমান কালেও তুর্কমেনিস্তানে একান্তভাবে প্রচলিত তুর্কোমান উপভাষাগুলির (বিশেষত তেককে ও য়োমুত) বুনিয়াদে সেইখানে সাহিত্যে এক নয়া ভাষার বিকাশ ঘটিতেছে।

আনাতোলিয়া সালজুকদের যে উৎস সে একই উৎস হইতে পারস্যের তুর্কদের মধ্যে আযারবায়জানী (আযারী) ভাষা গড়িয়া উঠে। ১৬শ শতকের এক বর্ধিষ্ণু আমলের পর আযারবায়জানী ভাষার অস্তিত্ব কয়েক শতক ধরিয়া চলিতে থাকে। এই ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন প্রথম দিকের সাফাবী (দ্র.) শাসকগণ। তবে ঐ আযারবায়জানী একদিকে যেমন পারস্য (ফারসী) সংস্কৃতির প্রভাবের বিরুদ্ধে আগাইতে পারে নাই, তেমনি অন্যদিকে 'উছমানী তুর্কী ভাষার বিরুদ্ধেও অগ্রগতি লাভ করিতে পারে নাই। ১৯শ শতকের মাঝামাঝি ট্রান্সককেসিয়ায় কথিত উপভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আযারবায়জানী ভাষার পুনর্বাসন শুরু হয় (মীরযা ফাতহ 'আলী 'আখুনদো)। ২০শ শতকের সূচনাপর্বে 'উছমানী তুর্কী ভাষা দ্বারা আযারবায়জানী ভাষা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয় এবং ইহার ফলে যে দুই প্রবল ধারার সৃষ্টি হয় তাহা আজও বজায় আছে।

১৫শ শতকে Golden Horde অঞ্চল বিভিন্ন খান রাজ্যে (তন্ত্রে) বিভক্ত হইলেও ক্রিমিয়ায় সাহিত্যের ভাষা হিসাবে কিপচাক উহার অস্তিত্ব বজায় রাখে, আর উহা 'উছমানীদের নিকট ক্রিমীয় বা দেশ্‌ত (স্তেপ্) ভাষারূপে' পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু 'উছমানী সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে ক্রিমীয়/দেশ্‌ত ভাষার বিকাশ বিঘ্নিত হয়, বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিক সাহিত্য ও প্রেমপত্রমূলক সাহিত্যে 'উছমানী সংস্কৃতির প্রবল প্রভাবে ক্রিমীয় ভাষার আরও বিকাশ রুদ্ধ হয়। ক্রিমিয়ায় খান শাসকের সরকারী সচিবালয়গুলিতে ১৭শ শতক অবধি সরকারী ভাষায় অনেকখানি মাত্রায় জুচি ঐতিহ্য ধারা বজায় থাকে। ১৯শ শতকের শেষ ও ২০শ শতকের শুরুতে মীরযা গ্যাসপ্রিন্‌স্‌কী ক্রিমিয়ায় একটি নিখিল তুর্ক সাহিত্য-ভাষা কায়েম করিবার প্রয়াস পান। এই প্রয়াস চালানো হয় সরলীকৃত 'উছমানী ভাষার বুনিয়াদে, যাহার সহিত ক্রিমিয়ার দক্ষিণে প্রচলিত উপভাষাগুলির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে। গ্যাসপ্রিন্‌স্‌কী'র রচনা তারজুমান কাশগার অবধি প্রচারিত হয়। আযারবায়জান-এর মত আজিকার ক্রিমিয়াতেও দুই প্রবল প্রতিযোগী 'উছমানী ও স্থানীয় ভাষার সংঘাত সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে অব্যাহত রহিয়াছে। আর এই পরিস্থিতি এই বাস্তবতার কারণে আজিও জটিল হইয়া উঠিয়াছে যে, ক্রিমিয়ার প্রচলিত উপভাষাগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দুই ভিন্ন জনগোষ্ঠীতে দ্বিধাবিভক্ত।

কাযানের খান রাজ্যও জুচি সাহিত্যিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়। কাযানে জুচি সাহিত্য-ভাষা চাগাতাই ও পুরাতন 'উছমানী উভয় ভাষা দ্বারাই প্রভাবিত হয় এবং পরে ১৯শ শতকে আধুনিক 'উছমানী ভাষার প্রভাবে আসে। ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কায়্যুম নাসীরীর সময় হইতে কাযানের তাতারদের মধ্যে সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে স্থানীয় উপভাষার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার এক আন্দোলন শুরু হয়। গ্যাসপ্রিন্‌স্‌কীর অনুসারীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এখন আবার তাতারদের সাহিত্যের ভাষায় রুশ প্রভাবের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য প্রতিরোধও গড়িয়া তোলা হইয়াছে। কোনও কোনও লেখকের রচনায় এই প্রতিরোধের বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষণীয় আর উহা কেবল শব্দাবলীর ব্যবহারেই নহে, বরং বাক্য গঠনরীতির ক্ষেত্রেও স্পষ্ট। কাযানের তাতার ভাষা কেবল তাতারগণই নহে, বরং আস্ত্রাখানের মিশার ও নোগাইদের মধ্যেও প্রচলিত। বাশকীর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে বাশকীর ও তেপতার (তু. তেপতয়ার)-গণও তাতার ভাষা ব্যবহার করিত। এক্ষণে বাশকীরগণ তাহাদের সাহিত্যের নিজস্ব ভাষা গড়ার কাজে নিয়োজিত; অবশ্য তাহারা ইহা করিতেছে একটি মধ্য পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে ও বিভিন্ন প্রবণতার মধ্যে সংঘাত না এড়াইয়াই উল্লিখিত প্রবণতাগুলির অন্যতম। বলাই বাহুল্য, ইতিপূর্বে উল্লিখিত মধ্যপন্থা বা মধ্যস্রোত যাহা, যেইসব উপভাষায় ধ্বনি ও শব্দাবলীর বৈশিষ্ট্য অতি প্রকট সেই উপভাষাগুলিকে বুনিয়াদ করিয়া সাহিত্যের ভাষা নির্মাণ প্রয়াস এড়াইয়া যাইতেছে। কাযান-তাতার সাহিত্যের ভাষাটি আনাতোলীয় তুর্কী ভাষার পরেই সর্বাপেক্ষা বিকশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং আনাতোলীয় তুর্কীর মতই কাযান-তাতার ভাষা জনপ্রিয়

হইয়া উঠিবার কারণে উহার প্রভাব ভল্‌গা অঞ্চলকেও ছাড়াইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছে।

বিশেষত ১৯০৫ খৃ. রুশ বিপ্লবের পর তুর্কী সাহিত্য-ভাষাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯১৭ সালের অক্‌টোবর বিপ্লবের পর জাতিত্ববোধ মাথাচাড়া দিয়া উঠিলে তুর্কী জগতের অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে তুর্কী অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির কারণে ঐ সংখ্যা আরও অনেক বাড়িয়া যায়। কাযাক (কিরগিয) সাহিত্য ভাষা তরুণ হইলেও সমৃদ্ধ ও নমনীয়তা গুণসম্পন্ন। ২০শ শতকের গোড়ার দিকে এই ভাষাটি যথেষ্ট বিকশিত হয়। এই ভাষাটি তুলনামূলকভাবে ধার করা আরবী ও ফারসী শব্দবাহুল্যমুক্ত ও সাধারণ মানুষের উপভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ। ইহাতে বায়তুরসুন কর্তৃক কৌশলে সংস্কারকৃত আরবী বর্ণনামালা ব্যবহৃত হইয়াছে। কিরগিয প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে (কারা) কিরগিযগণ (কিরগিয) কাযাক ভাষা হইতে স্বতন্ত্র, তাহাদের নিজস্ব সাহিত্য ভাষা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে।

উত্তর ককেসাস অঞ্চলে কারাচাই-বালকারিয়ান সাহিত্য ভাষা গড়িয়া উঠিতেছে। তবে ক্রিমীয় ও আযারবায়জানীর মত অধিকতর উন্নত ভাষার অবস্থান কাছাকাছি হওয়ায় ও উত্তর ককেসাস অপেক্ষাকৃত বিরল জনবসতিসম্পন্ন হওয়ায় ঐ ভাষার বিকাশ প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হইতেছে। দাগিস্তানে এই শেষোক্ত আযারবায়জানী ভাষার প্রভাব আরও বেশি বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। বস্তুত দাগিস্তানে এই ভাষা এখন প্রায় সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং ইহার ফলে স্থানীয় নবীন সাহিত্য-ভাষা কুমলীক-এর প্রায় উৎখাত হওয়ার মত দশা। কুমলীক ভাষাটি ১৯শ শতকে আরবী ভাষা উৎখাতের পর বিকশিত হইতে শুরু করে। দাগিস্তানে ইহাই সর্বসাধারণের দৈনন্দিন ভাষা।

বর্ণমালার ক্ষেত্রে তুর্কী মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে দুইটি পরস্পর বিরোধী প্রভাব ক্রিয়াশীল। এই দুই প্রভাবের একটি পক্ষ তুর্কী ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের উপযোগী করিয়া 'আরবী বর্ণমালা সংস্কারের পক্ষপাতী। এই ধারাটিই কাযান-তাতার (কিরগিয) কাযাক, (কারা) কিরগিয, ওযবেগ, তুর্কোমান ও ক্রিমীয় ভাষাগুলিতে নূতন 'আরবী বর্ণমালা চালু করিতে সফল হইয়াছে। অন্য ধারাটি সকল তুর্কী ভাষার জন্য অতিরিক্ত একাধিক বর্ণমালাসহ একটি লাতিন বর্ণমালার পক্ষপাতী। তুরস্কে রোমান (রোমক) বর্ণমালা প্রচলনের ব্যাপারটি সাদরে গৃহীত হইলেও কার্যত ইহা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করিয়াছে আযারবায়জানে। এইখানে উল্লিখিত বর্ণমালা পরিবর্তনের আন্দোলন ১৯শ শতকের মধ্য নাগাদ শুরু হয়।·এই আন্দোলন এখনও অন্যান্য তুর্কী জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে। সাবেক সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রগুলির তুর্কী মুসলিম জনসাধারণ ১৯২৭ খৃ. আনুষ্ঠানিকভাবে লাতিন বর্ণমালাভিত্তিক নূতন অভিন্ন তুর্কী বর্ণমালা গ্রহণ করে।

সম্ভবত রুনিক (Runic) বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত হরফে প্রাচীনতম তুর্কী যে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই লিপিতে সেমিটিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ছিল। আর বহু ক্ষেত্রেই ঐ লিপিতে স্বরবর্ণের অস্তিত্বই ছিল না, [যেমন, kghn= কাগান (kaghan), yghz= য়াগীয (yaghiz), kilnmish= কীলীনমীশ (kilinmish), a ধ্বনিটির আভাস বা অস্তিত্ব কেবল ধ্বনিটি প্রলম্বিত হইলেই প্রথম শব্দাংশে রহিয়াছে (যেমন, t (at)= আত (ঘোড়া), আত (at)=আত (at), নাম]। উইগুর বর্ণমালায় রুনিক বর্ণমালার তুলনায় স্বরধ্বনিগুলি (পরবর্তীকালে প্রচলিত আরবী বর্ণমালার তুলনায়) আরও ঘন ঘন লক্ষণীয় এবং আরও সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠে। o,u হইতে o ও u-এর ধ্বনির পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য i এই হরফটি শেষোক্ত ধ্বনির সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয়। (যেমন soiz=soz)। আরবী বর্ণনামালার প্রভাবে মুসলিম আমলে উইগুর লিপিতে ঐ ব্যবহার-রীতিটি বাদ দেওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন উইগুর লিপিতে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির উচ্চারণ (notation) পরবর্তী কালের বর্ণমালা অপেক্ষা অধিকতর সুনির্দিষ্ট। পরবর্তী কালের উইগুর বর্ণমালায় t ও d বর্ণের ব্যবহার যেমন নির্বিচার তেমনি ঐ বর্ণমালায় আরও অন্যান্য সরলীকরণ সাধিত হইয়াছিল। আর এই কারণেই Radloff ভ্রমাত্মক উইগুর ব্যঞ্জনবর্ণ পদ্ধতির সমর্থন করিয়াছিলেন। পরে Thomsen ঐ ভুলগুলি সংশোধন করেন। স্বরবর্ণ বা ধ্বনির বর্ণবিন্যাসের ব্যাপারে o ও u-এর বেলায় বিশেষ উচ্চারণ/ স্বর notation ব্যতিরেকে উইগুর বর্ণবিন্যাস পদ্ধতিটি আরবী বর্ণমালা গ্রহণের সময় মধ্য এশিয়ায় গৃহীত হয়, আর তখন হইতেই চাগাতাই ও 'উছমানী বর্ণবিন্যাস পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যটি চিহ্নিত হইয়া যায়। আরবী বর্ণবিন্যাস পদ্ধতির আশু প্রভাবের কারণে এশিয়া মাইনরে এক বিশেষ তুর্কী বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যাহা প্রাচীন 'উছমানী রচনাবলী তথা লিপির একান্ত প্রকট বৈশিষ্ট্য (যেমন স্বরধ্বনির কোনও নির্দেশ নাই, আরবী হারাকাত-এর ব্যবহার ইত্যাদি)। পরের শতকগুলিতে ইহা সত্য যে, আরবী বর্ণবিন্যাস রীতির কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য বর্জিত হইলেও অদ্যাবধি 'উছমানী বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি স্বরচিহ্ন নির্দেশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিধিনিষেধের কারণে উহা চাগাতাই তুর্কী হইতে স্বতন্ত্র ('উছ ঃ kl-চাগাতাই, kil; 'উছ br= চাগ bir)। আর s ও t ধ্বনি বুঝাইবার জন্য আরবী হরফ ঃ S ও F-এর ব্যবহার ও সেই সাথে পশ্চাদবর্তী স্বরধ্বনি (বর্ণের) সমাবেশও 'উছমানী বর্ণবিন্যাসের বর্তমান [যেমন, su= পানি=চাপ ঃ su; tagh= পর্বত=চাগ ঃ তাগ (tagh)। প্রাচীন কাযান-তাতার বর্ণবিন্যাস পদ্ধতিটি মধ্য এশীয় বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি ভিত্তিক হইলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহাতে প্রাচীন 'উছমানী প্রভাব লক্ষণীয়।

ধ্বনিমূলক লিপি গ্রহণের আকারে বর্ণবিন্যাস পদ্ধতির সংস্কার আন্দোলন ১৯শ শতকের শেষ হইতে তুর্কী মুসলিম বিশ্বে প্রবলভাবে অনুভূত হইতে শুরু করে। তবে ইহার সর্বাধিক প্রভাব তুরস্কে নহে, বরং রাশিয়ার তুর্কী জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া (কিরগিয) কাযাকদের মধ্যে পড়িয়াছে। ১৯২৫ সনে বাকুতে তুর্কী ভাষা সংক্রান্ত মহাসম্মেলন ধ্বনি ও ব্যুৎপত্তির সমন্বয়ে এক মিশ্র বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি গ্রহণের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই বর্ণবিন্যাস পদ্ধতিটি কায়েমী করিবার জন্য এখন সংস্কারকৃত আরবী বর্ণমালা ও নূতন তুর্কী লাতিন বর্ণমালার সাহায্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

আধুনিক অমুসলিম তুর্কী সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলি তথা চুওয়াসস, য়াকূত, আলতাই-এর ও yenisei নদী অঞ্চলের তুর্কী জনগোষ্ঠীগুলিকে অতি সাম্প্রতিক কাল অবধি নিরক্ষর শ্রেণীর জনগোষ্ঠীসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইত। অবশ্য য়াকূতদের মধ্যে এই ধরনের প্রাচীন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, প্রাচীন কালে তাহাদের নিজস্ব বর্ণমালা ছিল,

যদিও আলতাই পার্বত্য অঞ্চলের তুর্করা অদ্যাবধি তুর্কী ভাষায় অভিযোজিত মোঙ্গল বর্ণমালা অতি সীমিত আকারে হইলেও ব্যবহার করিয়া থাকে। এইসব মুসলিম তুর্ক জনসম্প্রদায় ১৮শ ও ১৯শ শতকে রুশদের নিকট হইতে রুশ বর্ণমালা নিজেদের বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করে। ১৯১৭ খৃ. য়াকূতগণ রুশ বর্ণমালার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ও M. Novgorodov নামে এক য়াকূত ছাত্রের প্রণীত এক লাতিন বর্ণমালা গ্রহণ করে। তাননু-তুয়িন জনগোষ্ঠীর (উরিয়ানখাই বা সোয়োত) লোকেরা, যাহারা মোঙ্গল সংস্কৃতি দ্বারা খুবই প্রভাবিত তাহারা বর্তমানে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় সাহিত্যের ভাষা বিকাশের ও নিজেরাই তাহাদের জন্য একটি বর্ণমালা নির্বাচনের প্রয়াস চালাইতেছে।

Danube নদীর তীরে অবস্থিত তুর্কী বলগার রাজ্য ৯ম শতক হইতে তুর্কী ভাষার জন্য গ্রীক বর্ণমালা ব্যবহার করিত। বেশ সাম্প্রতিক কালেও আনাতোলিয়া ও ইস্তাম্বুলের তুর্কীকৃত গ্রীকদের মাঝে এই বর্ণমালার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। জর্জীয় বর্ণমালায় লিখিত আযারবায়জানী পাণ্ডুলিপিরও অস্তিত্ব আছে। কারাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাহারা তুর্ক ভাষায় কথা বলিত তাহারা প্রাচীন কাল হইতেই হিব্রু বর্ণমালা ব্যবহার করিতেছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V. Thomsen, Samlede Abbandlinger, iii, Copenhagen 1922; (২) W. Radloff, die Altturkischen Inschriften der Mongolei, Neue Folge 1897; (৩) ঐ লেখক, Altturkische Studien v. (Bull. de l'Acad. des Scinces de St. Petersburg 1911; (৪) A. v. Le Coq, Kurze Einfuhrung in die uigurische Schriftkunde (Mitteil. d. Sem. fur or Spr. zu Berlin, xxii, 1919); (৫) Kokowzoff, Kosiroturecko epigrafike Semiriecia (Bull, de l'Ac. des So. de St. Petersburg 1909; (৬) Kopruluzade, Turk Edebiyatinde ilk Mutesawwifler, 1918; (৭) A. Samoilovic, Materialy dlia ukazatelia literatury po ieniseisko-orkhanskoi pismennosti (Trudy troickiosa vsko-kiakhtinskogo Otdeila R. Geogr. Obscestva. xv., 1919); (৮) ঐ লেখক, Kistorii literaturnogo sredneasiatskogo tureckogo iazyka (Mir-ali Shir, Sbornik k piatisotlietiiu so dnia rogdeniia, Leningrad 1928; (৯) Inscriptions de L'Ienissei, Helsingfors 1889; (১০) Inscriptions de l' Orkhon, Helsingfors 1892; (১১) W. Radloff, Arbeiten der Orkhon_Expedition, Atlas der Alterthumer der Mongolei, St. Petersburg 1892-1899; (১২) ঐ লেখক, Kudatku Bilik, facsimile; St. Petersburg 1890; (১৩) text und Ubersetzung, St. Petersburg 1900-1910; (১৪) W. Radloff ও Malov, Suvarnaprabhasa (Bibliotheca Buddhica, xvii); (১৫) F. W. K. Muller, Uigurica, i-iii (Abh. pr. Ak. W., 1908-1912); (১৬) A. V. Le Coq, Khuastuanift (F. R. A.S., 1911, Anhang zu Abh., Pr., Ak. W., 1910); (১৭) Annette S., Beveridge, The Babar-nama (G. M.S., i.)k; (১৮) A. Pavet de Courteille, tezkereh-i evlia, Paris 1889-1890; (১৯) ঐ লেখিকা, Dictionnaire turk-oriental, Paris 1870; (২০) C. Brockelmann, 'Ali's Qissa'i Fusuf, der alteste Vorlaufer der osmanischen Literatur (Abh. Pr. Ak. W., 1926); (২১) নাজিব 'আসিম, হিববাতু'ল হাকা'ইক, ইস্তাম্বুল ১৩৩৪; (২২) P. Pelliot, La version ouigoure de l'histoire des princes Kalynamkara et Papamkara (T'oung-pao, 1914); (২৩) Rieu, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum, London 1888.

(৪) নিকটবর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন ভাষার সহিত তুর্কী ভাষার আদান-প্রদান

প্রাক-ইসলামী আমলের তুর্কী ভাষাসমূহের নিদর্শনগুলিতে আমরা চীনা, সোগদীয় সংস্কৃত ও উত্তর অঞ্চলের সেমিটিক ভাষা হইতে শব্দ ধার করার বিষয়টি লক্ষ্য করি। এমন কি এইসব ভাষা নিদর্শনগুলিতে বাক্য গঠনের রীতিতে, বিশেষ করিয়া অন্যান্য ভাষা হইতে অনূদিত অনুচ্ছেদগুলির ক্ষেত্রে বিদেশী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাইবেরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার আধুনিক উপভাষাগুলিতে, বিশেষ করিয়া য়াকূত ভাষায় বেশ কিছু মোঙ্গল উপাদান রহিয়াছে, যেগুলি সরাসরি ধার ও বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিশ্রণের ফলে আমদানি হইয়াছে। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মিশ্রণের কারণে যেইসব প্রাচীন এশীয় ভাষা-উপাদান ও অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে এখনও পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই সেই উপাদানগুলি এইসব উপভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। Yenisei, Kem নদীর নাম ওরখন লিপিমালার সময়কাল হইতেই পরিজ্ঞাত। এই নাম আসিয়াছে কোত ভাষা হইতে। কোত ভাষায় Yenisei, Kem বলিতে নদীকে বুঝায়। আধুনিক Soyot Turk উপভাষাতেও ইহার ঐ একই অর্থ ঃ নদী। ভল্‌গা অঞ্চলের তুর্ক উপভাষাগুলিতে কিছু কিছু ফিন ভাষা-উপাদান পাওয়া যায়। চিঙ্গীয খানের (দ্র.) মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে কতকগুলি কৃত ঋণ মোঙ্গল শব্দ বেশিরভাগ তুর্ক ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া যায়। এইভাবে পুরাতন তুর্কী শব্দ 'য়্যুলার' (yular), 'halter' য়াকূত, সোয়োত ও আনাতোলীয় তুর্কীদের মাঝে এমন কি আলতাই তুর্ক জনগোষ্ঠীর নারীদের ভাষায় বাঁচিয়া থাকিলেও তাহা ১৩শ শতক নাগাদ মোঙ্গল 'নোকতা' দ্বারা ক্রমে ক্রমে উৎখাত হইয়া যায়; এখন এই নোকতা চুওয়াস্‌স (চুওয়াশ)-সহ সকল তুর্কী ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তুর্ক উপভাষা ঃ ওযবেগ, তুর্কোমন ও আযারবায়জানী এবং পারস্যের তুর্কভাষীদের উপভাষাসমূহে নরগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের কারণে ইরানী ভাষার (ফারসীর) যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তুর্কদের সহিত এশিয়া মাইনর ও বলকান উপদ্বীপের অন্যান্য নরগোষ্ঠীর জটিল সংমিশ্রণের ফলে ও সংস্কৃতিগত পরিগ্রহণের কারণে আমরা দেখিতে পাই, আনাতোলিয়ার তুর্কদের ভাষায় গ্রীক, স্লাভ, বিশেষ করিয়া সার্ব, আর্মেনীয়, কুর্দ, ইতালীয়, ফরাসী এবং আরবী ও ফারসী ছাড়া অন্যান্য উপাদানও রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ককেসাসের দেশজ অধিবাসীদের সঙ্গে তুর্কদের সংমিশ্রণের কারণে তুর্ক উপভাষাগুলিতে ককেসীয় ভাষাগুলির ধ্বনি ও শব্দ উপাদান আসিয়াছে। যেইসব তুর্ক মিসর ও সিরিয়ায় প্রবেশ করে তাহাদের মধ্যে আরবীয় প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এই আরবীর একই রকমের প্রবল প্রভাব দাগিস্তানের কুমলীক তুর্কদের

মধ্যেও। এই কুমলীকদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যাহা অন্যান্য মুসলিম তুর্কদের মধ্যে দেখা যায় না। ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যটি হইতেছে কুমলীকগণ সপ্তাহের দিনের নামগুলির ফারসী নাম ব্যবহার না করিয়া আরবী নামসমূহ ব্যবহার করে। তুর্কী ভূভাগের অন্যান্য অংশে ইসলাম প্রসারের ফলে ঐসব অঞ্চলে আরবীর তুলনায় ফারসীর ভাষা-উপাদানগুলির অধিকতর প্রচলন ঘটে। তুর্কী ভাষাগুলিতে আরবী ও ফারসী ভাষার কৃত-ঋণ শব্দাবলীর হার অনেক ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশেরও বেশি। তবে এইসব শব্দ ইসলামের তেমন কোনও প্রভাব ছাড়াই তুর্কী উপজাতিগুলির গণমানুষের উপভাষাগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য কাযাক ও কিরগিয ভাষার ক্ষেত্রেও এই একই কথাই প্রযোজ্য (ten=দেহ, ian=মন/অন্তর)।

কতকগুলি আরবী ও ফারসী শব্দ অমুসলিম তুর্কদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে। ইহা কেবল চুওয়াস্‌সদের মধ্যে নহে, বরং আলতাই ও Yenisei নদী অঞ্চলের তুর্কদের মধ্যেও ঘটিয়াছে। য়াকূতদের মধ্যে ইহা ঘটিয়াছে রুশ ভাষার মাধ্যম অবলম্বনে (ampar=anbar)। ভল্‌গা অঞ্চলে প্রচলিত তুর্কী উপভাষাগুলিতে রুশ প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া মিশার তুর্কী জাতিগোষ্ঠীর লোকজনের মাঝে রুশ ভাষার প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের সকল তুর্কী ভাষার মাঝে কৃত-ঋণ রাশিয়ান শব্দ আছে।

পক্ষান্তরে তুর্কী ভাষাগুলিও বেশ প্রাচীন কাল হইতেই পড়শী ভাষাগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছে। এই প্রভাবের সূচনা হিসাবে চীনা ভাষার কথা উল্লেখ করা যায়। মোঙ্গল ভাষাসমূহে, কয়েকটি ফিন ভাষায় (বিশেষ করিয়া Ceremiss ও Magyar ভাষায়), ইরানী ভাষাসমূহে, আধুনিক আরবীতে আর্মেনীয়, জর্জীয়, গ্রীক, আলবেনীয়, রুমানীয় এবং বলকান উপদ্বীপের স্লাভ ভাষাগুলিতে ও পূর্ব-পশ্চিম য়ুরোপের ভাষাগুলিতে তুর্কী শব্দ রহিয়াছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায়, তাহাদের গুটিকয়েক নরগোষ্ঠীর লোকজনের (যেমন বলকানের বুলগার, হাঙ্গেরীর কুমান, লিথুয়ানিয়ার তাতার, চীনের দুনগান ও ভারতের তুর্কীগণ) তুর্কী ভাষা লুপ্ত হইলেও উহার তুলনায় অনেক বেশি জনগোষ্ঠীর তুর্কীয়করণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যেমন সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া, ককেসাস, এশিয়া মাইনর, বলকান ও পূর্ব য়ুরোপে (মিশার জনগোষ্ঠী) ইহা ঘটিয়াছে। তুরস্কে, ক্রিমিয়ায়, ট্রান্সককেসিয়া ও তুর্কিস্তানে জিপসী (বেদে) জনগোষ্ঠীর মাঝেও তুর্কীকরণ লক্ষণীয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ অভিধান ঃ (১) Radloff, Pekarskii (Yakut) ও Paasonen (Cuwass); নিবন্ধসমূহ ঃ (২) Korsh ও Melioranskii; রুশ ভাষায় তুর্কী শব্দ পরিগ্রহণ সম্পর্কিত (Izviest. Otd. russ. iazyka i slovesnosti Ak. Nauk, vol. vii-xi; (৩) F. Miklosich, Die turkischen Elemente in den sudostund osteuropaischen Sprachen, Vienna 1884-1885; (৪) Vladimircov, Tureckie elementy v mong'olskom iazyke (Zap., xx., 1911); (৫) F. v. Kraelitz-Greifenhorst. Studien zum Armenisch-Turkischen, Vienna 1912; (৬) Z. Gombocz, Die bulgarisch-turkischen Lehn-worter in der ungarischen Sprache (M. S. F. O, xxx 1912); (৭) Kowalski, W sprawie zapozyczen tureckich w grammaticis in honorem I. Rozwadowski, ii...1927); (৮) M. Bitner, Der Einfluss des Arabischen und Persischen auf des Turkische, 1900।

A. Samoylovitch (E. I. [1])/আফতাব হোসেন

৩। চাগাতাই সাহিত্য

চাগাতাই রাজ্যে (তু. চাগাতাই খান) তুর্কী সাহিত্যের অতুলনীয় বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে তীমূরী শাসনামলে। খোদ প্রাচ্যে (পূর্বাঞ্চলে) এই পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী সাহিত্য ভাষার নাম দেওয়া হইয়াছে চাগাতাই। আর ইহার সঙ্গে য়ুরোপীয় সাহিত্যেও ইহা একই পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। অজ্ঞাতপরিচয় এক লেখকের রচনায় (সম্ভবত ইহা ভারতে রচিত, Rieu., Cat.Turk. MSS., p. 268) সকল তুর্ক উপভাষাকে দুইটি ভাষায় ভাগ করা হইয়াছে ঃ চাগাতাই ও তুর্কোমান। ইব্‌ন মুহান্না (তুর্ক সং., পৃ. ৭৩; Melioranskiy, Arab filolog, p.xx) 'তুর্কিস্তানী' কথাটি উল্লিখিত ধারণাতেই ব্যবহার করিয়াছেন। তুর্কদের ভাষা তুর্কিস্তান হইতে আসিয়াছে বলিয়া কথিত হয়, যেমন আরবী আসিয়াছে হিজায হইতে। "আমাদের ভূভাগের তুর্কদের ভাষা" (আনুমানিক ধারণা ফারসী)-র সহিত তুর্কিস্তানী ও তুর্কোমান ভাষার পার্থক্যও নির্দেশ করা হইয়াছে। Radloff-এর Worterbuch-এ (৪খ, ১৫) চাগাতাই শব্দটি 'জাগাতাই' আকারে ও 'উছমানী শব্দ হিসাবে উদ্ধৃত আছে, আরও তু. শায়খ সুলায়মান বুখারী, লুগাত-ই চাগাতাই ওয়া তুর্কী 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১২৯৭-১৩০০; সংক্ষিপ্ত সংস্করণে জার্মান অনুবাদ ঃ Dr. S. Kunos, Budapest 1902 (Publ. Sect. Orient. de la Soc. Ethn. Hongroise, i.)।

Radloff (Zap., iii. I প.) চাগাতাই সাহিত্য ভাষার আদি উৎস স্থল একান্তভাবেই প্রাচ্যে (পূর্বাঞ্চলে) বলিয়া অনুমান করেন। উইগুর বর্ণমালা ও সাহিত্যের ভাষা মুসলিম তুর্কদের মধ্যে প্রাক-ইসলামী আমল হইতেই বিদ্যমান; বহু আরবী ও ফারসী শব্দ পরিগ্রহণের মধ্য দিয়া শেষাবধি উইগুর বর্ণমালার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের হাতে "বিশুদ্ধ উইগুর ভাষা'য় লেখা গ্রন্থাদি রহিয়াছে; তবে উহার লিপিতে আরবী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ধরনের গ্রন্থের দৃষ্টান্ত হিসাবে কিসাসু'ল-আম্বিয়া' [রাবগূযী কর্তৃক ৭১০/১৩১০-১১ সনে রচিত]-এর উল্লেখ করা যায়। Radloff তৎকৃত 'কুতাদকু বিলিক (পৃ. ৭৮) সংস্করণের ভূমিকায় ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইলেক খানগণ 'সন্দেহাতীতভাবেই' উইগুরদের শাসক ছিলেন। এই শাসকদের রাজ্যেই তুর্কী ভাষায় মুসলমানদের রচনাগুলি রচিত হইয়াছিল। মোঙ্গল শাসনামলে উইগু'র বর্ণমালা ও ভাষার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। এই আমলেই আবার বহু 'বিশুদ্ধ উইগু'র শব্দ ও ব্যাকরণিক রূপের ব্যবহার "মধ্য এশীয় উপভাষাসমূহ" হইতে পরিগ্রহণের সুবাদে রহিত হইয়া যায়। তবে আজও চাগাতাই শব্দ ও ভাষা-গঠনরীতিতে উইগুর উৎসমূলের অস্তিত্ব রহিয়াছে–যেইগুলি কেবল সাহিত্যের ভাষায় ব্যবহৃত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কদের অভিন্ন কোনও সাহিত্য-বিকাশ কেন্দ্র না থাকায় (যাহা দক্ষিণাঞ্চলীয় তুর্কদের ছিল) [Constantinople] চাগাতাই সাহিত্যের ভাষা বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় উপভাষাগুলি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

উল্লিখিত ধারণার বিপরীতে বর্তমানে এই বিষয়টি প্রমাণিত হইয়াছে যে, (দ্র. A. Samoylovic in Mir-Ali-Shir, Leningrad 1928, p. 1 প.) তুর্কী ভাষার সাহিত্য চর্চার প্রাচীনতম মুসলিম কেন্দ্র কাশগার (দ্র.) ছাড়াও সীর দরিয়ার ভাটিতে খাওয়ারিয্‌মেও এই ধরনের একটি দ্বিতীয় কেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল। 'Golden Horde'-এর খানদের শাসনাধীন মোঙ্গল আমলে এই অঞ্চলের গুরুত্ব বজায় ছিল। চাগাতাই রাজ্যে সাহিত্য সৃষ্টির কাজ উল্লিখিত সময়ের আরও পরবর্তী কালেও শুরু হয় নাই এবং চাগাতাই সাহিত্য 'Golden Horde'-এর সাহিত্য দ্বারা উহা প্রভাবিত হয় নাই। "মুলহিকাতু'স-সূরাহ"-এর রচয়িতা জামালু'ল-কুরাশী, যিনি কাশগারে তাঁহার এই রচনাটির কাজ সম্পূর্ণ করেন, তাঁহার সহিত গভীর জ্ঞানের অধিকারী শায়খু'ল-ইসলাম হুসামু'দ-দীন আবু'ল-মাহামিদ হামিদ ইবনু'ল-'আসিম আল-বারচিনলিগির পরিচয় ঘটে ৬৭২/১২৭৩-১২৭৪ সনের বারচকেন্দ-এ (বারচিত ও বারচিনলীগ নামেও পরিচিত)। বারচকেন্দ সীর দরিয়ার ভাটি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। উল্লিখিত জ্ঞানী শায়খ আরবীতে ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে বিভিন্ন রচনা ছাড়াও ইসলামের তিনটি সাহিত্য ভাষায় কাব্যও রচনা করেন (সম্ভবত এই প্রথমবারের মত এইভাবে ঐগুলির শ্রেণীবদ্ধ রূপ আমরা পাই) ঃ তাঁহার আরবী কাব্যের কবিতাগুলির আঙ্গিক ও গঠন ছিল খুবই সুন্দর (ফাসীহা), ফারসী কাব্যকর্ম ছিল কুশলী, নিপুণ (মালীহা) ও তাঁহার তুর্কী রচনা ছিল বাস্তবধর্মী (রাইহা)। আরবী রচনার নিখুঁত আঙ্গিক ও রূপের সহিত ফারসী রচনার উদ্ভাবনক্ষম ভাবধারার মধ্যে প্রায়শই যে বৈপরীত্যের সাক্ষাত ঘটে তাহার সহিত অতঃপর তুর্কী ভাষার রচনার সত্যনিষ্ঠার সংযোজন ঘটে; আর বাস্তবিকপক্ষেই চাগাতাই কবিগণ তাঁহাদের কাব্যকর্মের সহজ ভাষা ও সাবলীল চিন্তাধারার সুবাদে ফারসী দৃষ্টান্তের তুলনায় অনেক বেশি সত্যনিষ্ঠ একটি ধারণা দিতে সক্ষম হইয়াছেন (তু. E. Berthels, Newai-i 'Altat, in Mir Ali-Shir, p. 24 প., esp. p. 80)।

'Golden Horde' রাজ্যে সাহিত্য কর্মগুলির মধ্যে খাওয়ারিযমীর 'মাহাব্বাত-নামাহ (সীর দরিয়ার তীরে ৭৫৪/১৩৫৩ সনে রচিত)-র প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছিল। বৃটিশ যাদুঘরের পাণ্ডুলিপি ছাড়াও (Add. 7914, Rieu, Turk.Man, p. 284 প.) আমাদের নিকট, রাজাব ও শা'বান ৮৩৫ সনে (মার্চ-এপ্রিল ১৪৩২) য়াজদ-এ রচিত আমীর জালালু'দ-দীনের জন্য মাহাব্বাত-নামার উইগুর পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে (Or. 8193, Comptes Rendus de l'Acad. des Sciences, 1924, p. 57 প.; F. R. A. S., 1928 p 99 প.)। তীমূরী শাসক সিদী আহমাদের তা'শুকনামাও, যাহা ৮৩৯ সনে রচিত (১৪৩৫-১৪৩৬) [ঐ পাণ্ডু, Add. 7914] মাহাব্বাত নামার আদর্শে পরিকল্পিত।

চাগাতাই রাজ্য নিবাসী মুষ্টিমেয় সংখ্যক তুর্কী কবি ৮ম শতকে (১৪শ শতকে) জীবিত ছিলেন। তীমূরের সমসাময়িক আমীর সায়ফুদ-দীন তুর্কী ও ফারসী ভাষায় 'সায়ফী' এই ছদ্মনামে পাঁচটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (দাওলাতশাহ, সম্পা. Browne, পৃ. ১০৮)। তীমূরের অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণের আমলের তথা ৯ম (১৪শ) শতকের কিছু সাহিত্য নিদর্শনের কিছুটা অস্তিত্ব এখনও আমাদের নাগালে আছে। সাক্‌কাকী ছিলেন হালীল সুলতান (১৪০৫-১৪০৯) ও উলুগ বেগের (১৪০৯-১৪৪৯) [Brit. Mus., Or. 2079; Rieu, Turk. Man., p. 284] প্রশস্তিকার কবি (রাজকবি)। কবি লুতফীও উলুগ বেগের নাম তাঁহার কাব্যকর্মে উল্লেখ করিয়াছেন। লুতফীর কিছু কবিতাও উইগুর পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত (MS., Or. 8193) [লুতফী সম্পর্কে আরও পরিপূর্ণ উল্লেখের জন্য দ্র. Rieu, Turk. Man., p. 285 & 287 ও আহমাদ যাকী ওয়ালিদে, Dzagatayskiy poet Lutfiy i ego diwan, Kazan 1914]। সাক্‌কাকী ও লুতফী উভয়েই তাঁহাদের নিজেদের সম্পর্কে অন্তত গৌরবময় বর্ণনা দিয়াছেন। সাককাকী উলুগ বেগকে বলেন, "আমার মত একজন তুর্কী কবি ও আপনার মত একজন বিচক্ষণ ও জ্ঞানী শাসকের পুনরাবির্ভাব ঘটিতে বহুকাল লাগিয়া যাইবে।" লুতফী বলেন, খান উলুগ বেগই জানেন, লুতফীর অবদানের মূল্যায়ন কিভাবে করিতে হয়, যাঁহার অত্যন্ত চমৎকার কবিতাগুলি সালমান (দ্র.)-এর কাব্যকর্ম (মূল পাঠের জন্য দ্র. W. Barthold, Ulugbek, St. Petersburg 1918, p. 112 প.) হইতে নিকৃষ্ট নহে।

এই একই আমলের আরও একজন রাজপ্রশস্তিকার কবি আছেন। তাঁহার নাম মীর হায়দার মাজযূব (দাওলাত শাহ, পৃ. ৩৭১; Rieu, Cat. Turk. Man. p. 286; A. Pavet de Courteile, in p. Ec. Long. Or. Viv., ser. ii., vol. vi., p. xxii, sqq.) । তিনি তীমূরের আরও একজন পৌত্র ও ফার্‌সের শাসক ইসকান্দার সুলতানের প্রশস্তিকার কবি ছিলেন। মীর হায়দার মাজযূবের 'মাখযানু'ল-আসরার' নামক কাব্যকর্মটি নিজামীর (G. F. Ph., ii, 241প.) মাখযানু'ল আসরার-এর জওয়াবে রচিত। তাঁহার উল্লিখিত রচনা পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ Pavet de Courtelile কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (ইহার সূত্র ঃ উইগুর পাণ্ডুলিপি) যাহা এখন বালিনে সংরক্ষিত আছে। এই কবি আরও বলিয়াছেন যে, "আসমান ও যমীন তাঁহার রচিত গানগুলির প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাময়"। উইগুর ভাষায় রচিত অন্য দুইটি পাণ্ডুলিপি ৯ম শতকের প্রথমার্ধের (১৫শ শতক)। পাণ্ডুলিপি দুইটি হইতেছে ঃ বাখ্‌তিয়ার-নামা [MS. of 838 (1435) in Oxford (G. F. ph. , ii. 324] ও মি'রাজ-নামা (যাহা ফারীদু'দ-দীন 'আততারের [দ্র. 'আততার] 'তায-কিরাতু'ল-আওলিয়ার একটি তুর্কী অনুবাদসহ [এই পাণ্ডুলিপিটি (সংশ্লিষ্ট হিজরী [হিজরা] সনটি ঐ বৎসরের চক্রের সহিত মিলে না) ১০ জুমাদা, ৮৪০ হিজরী সনে প্রণীত (২০ ডিসেম্বর, ১৪৩৬) ও ইহা এখন প্যারিসে রহিয়াছে (P. Ec. Lang. Or. Viv., পৃ. স্থা.) বলিয়া জানা যায়।

৯ম/১৫শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মীর 'আলী শীরের (জন্ম ৮৪৪/১৪৪০-৪১, মৃ. রবিবার, ১১ জুমাদাছ-ছানী, ৯০৬/জানুয়ারী ১৫০১) সাহিত্যকর্মের মধ্যে চাগাতাই সাহিত্য উৎকর্ষের শীর্ষে আরোহণ করে। তাঁহার গুরুত্ব ও তাঁহার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে তথ্যের জন্য তু. Belin, Notice biographique et litteraire sur Mir Ali-Chir-Nevai (F. A, xvii, 1861, p. 175-256, 281-357); E. G. Browne, A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920, esp. p. 437 প.; Mir-Ali-Shir, Leningrad 1928.

অন্যান্য চাগাতাই কবির মত মীর 'আলী শীরকে তাঁহার দীওয়ান ও অন্যান্য কবিতার নিরিখে সাদামাঠা একজন ফারসী কবিদের অনুকারক

কবিই বলা যায়। অবশ্য তিনি তাঁহার কাব্য রচনার আদর্শগুলিকে অন্ধ অনুসরণ করেন নাই, বরং তাঁহার কবিতাগুলি সমসাময়িক কালের রুচিমাফিক ও জননন্দিত হওয়ায় তাঁহার কাব্যকর্মগুলি অদ্যাবধি বিপুল জনপ্রিয়তায় ধন্য। তাঁহার সর্বশেষ কাব্যকর্মটি সম্পাদিত হয় জুমাদাল উলা, ৯০৫/ডিসেম্বর ১৪৯৯ সনে, কাব্যগ্রন্থটির নাম ঃ মুহাকামাতু'ল-লুগাতায়ন (Quatremere, Chrestomathie en turc oriental, Parts 1-2, Paris 1842)। ইহা তাঁহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাব্যকর্মও বটে। এই গ্রন্থে তুর্ক ভাষা ও সংস্কৃতির সহিত পারসী ভাষা ও ইরানী সংস্কৃতির তুলনা করা হইয়াছে। কবি তাঁহার এই রচনার মধ্য দিয়া ইহা প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন যে, সাধারণভাবে কাব্য-প্রয়াস ও অন্যান্য বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের জন্য তুর্কী ভাষাও ফারসী ভাষা হইতে কর্ম উপযোগী নহে। য়ুরোপীয় লেখায় মীর 'আলী শীরকে বহু ক্ষেত্রেই একজন মন্ত্রী বা উযীর হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনও কোনও সরকারী পদে ছিলেন না। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় তৎপরতায় তাঁহার যাহা কিছু প্রভাব এবং বিজ্ঞান ও কলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁহার যাহা কিছু কার্যকলাপ আমরা লক্ষ্য করি তাহা ছিল কেবল শাসক সুলতান হুসায়নের সহিত বন্ধুত্বের (যাহা কোনও কোনও সময় ক্ষুণ্নও হইয়াছে) সুবাদে। সুলতান হুসায়ন (১৪৬৯-১৫০৬) নিজেই একজন কবি ছিলেন। তাঁহার 'দীওয়ান' ১৯২৬ খৃ. বাকুতে প্রকাশিত হয়।

এই সুলতানেরই এক পুত্র ও পরবর্তী কালে শাসক শাহ গারীবের ছদ্মনাম ছিল গারীবী (দ্র. বাবুরনামাহ, সম্পা. Beveridge, G.M.S., i, 166) যাহাতে খুব সম্ভব ভ্রমাত্মকভাবে গুরবেতি নামে তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার রচিত একটি তুর্ক ও ফারসী দীওয়ান (যাহার বিষয়ে Brockelmann অবহিত নন) জার্মানীতে (Hamburg Stadtbibliothek, No. 15; Brockelmann, Katalog, No. 183 & 277/MS. রামাদান ৯৪০/March-April 1534 তারিখ যুক্ত) রক্ষিত আছে। ভারতে তীমূরী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবুর (দ্র.) নিজে কয়েকটি কবিতার রচয়িতা। তবে তাঁহার স্মৃতিকথাই (বাবুরনামাহ, যাহা ওয়াকা'ই' বা ওয়াকী'আত-ই বাবুরী নামেও পরিচিত; তু. তা'রীখ-ই রাশীদী, অনু. Ross, p. 173 প.) সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অবশ্য ফারসী ভাষা ভারতীয় মুগল রাজদরবারে প্রায় একচ্ছত্রভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ওযবেগণ তীমুরীদিগকে মধ্য এশিয়া ও পূর্ব পারস্য হইতে বিতাড়িত করে। ওযবেগ শাসনামলে, বিশেষ করিয়া এই শাসনামলের গোড়ার দিকে যখন তাহারা পারস্যের সংস্কৃতির সহিত নিজদিগকে পুরাপুরি খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই, তখনও তুর্কী ভাষায় গদ্য ও পদ্য উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হইত। তবে ঐ রচনাগুলি ছিল নূতনত্ব বা মৌলিকত্ব বর্জিত পুরাতন চাগাতাই আদর্শের গতানুগতিক অনুকরণ। শিক্ষিত মহলের কবিদের জন্য মীর 'আলী শীর ও আহমাদ য়েসেবী (দ্র.) আধুনিক আকারে সাধারণ মানুষের কবিদের জন্য আদর্শ হিসাবে বিরাজ করিতে থাকেন। আহমাদ য়েসেবীর রচনার আধুনিক সংস্করণের দীওয়ানের পাণ্ডুলিপিই আমাদের সংগ্রহে আছে। একমাত্র সেই সঙ্গে ঐতিহাসিক আবু'ল-গাযী বাহাদুর খান (দ্র.)-ই সম্ভবত একক ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁহার রচনায় ফারসী, আরবী ও চাগাতাই তুর্কী শব্দ এড়াইয়া এত সহজ ও সাবলীলভাবে লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন, যে লেখার বিষয়বস্তু পাঁচ বছরের শিশুও বুঝিতে পারে। ওযবেগ আমলের অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিদের অন্যতম (তাঁহার রচনা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেও ব্যবহৃত) কবি ছিলেন মরমী সূফী আল্লাহ য়ার (১৭শ শতকের শেষ ও ১৮শ শতকের সূচনা পর্যায়)। পরবর্তী কালে বুখারায় ফারসীর [অংশত স্থানীয় তাজিক (দ্র.) ভাষার প্রভাবে] প্রভাবে তুর্কী সাহিত্য প্রায় সম্পূর্ণই উৎখাত হয়। ১৯শ শতকে খোকান্দ (দ্র.) ও খীবায় (দ্র. খাওয়ারিযম) চাগাতাই সাহিত্যের বেশ উল্লেখযোগ্য রকমের পুনর্জাগরণ ঘটে। তু. বিশেষ করিয়া M. Hartmann, M. S. O. S. As., vii. 87 প. [অভিব্যক্তি ঃ 'পুনর্জাগরণ' (Nachblute), p. 79); A.] Samoylovic, Zap., xix, 198 প.।

অতঃপর ওযবেগরা উইগুর বর্ণমালার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেয়, যদিও তীমূরীদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তখনও উইগুর বর্ণমালার প্রচলন বজায় ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ওযবেগদের আরবীতে উইগুর বর্ণমালার প্রভাবের চিহ্ন এখনও লক্ষ করা যায় (দক্ষিণাঞ্চলীয় তুর্কী ভাষার পাণ্ডুলিপিতে স্বরচিহ্নের বদলে স্ববর্ণের প্রয়োগ এখনও প্রচলিত আছে)। কাশগারের আদিতম আমলের সাহিত্য দ্বারা চাগাতাই সাহিত্য কতখানি প্রভাবিত হইয়াছে সেই ব্যাপারে তেমন মনোযোগ পড়ে নাই। M. Hartmann-এর ধারণা ছিল (M.S.O.S. As., vii. 79) যে, কুতাদগূ-বিলিগ (এই কারণেই Radloff-এর কুতাদকু বিলিক-এর পরিবর্তে এইভাবে লিখিত হওয়া উচিত) উহার খোদ স্বদেশেই প্রায় উপেক্ষিত ছিল এবং বেশ আগেই এই রচনাটির পাণ্ডুলিপি মিসরে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু এখন আর এই ধারণা বজায় রাখা খুবই কঠিন।

Samoylovic (Zap., xxi.038 প.) প্রমাণ করিয়াছেন যে, Ural নদীর ভাটি অঞ্চলে সারাইচিকে ১৩শ শতকে প্রাপ্ত এক পাত্রে কুতাদগূ বিলিগ হইতে উদ্ধৃতি উৎকীর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এমন কি ১২৮০ সনে যু'ল-কা'দা মাসে (মে ১৮৬৪) মুল্লা বাবাজানের রচিত "তাওয়ারীখ-ই খাওয়ারিযম শাহিয়া"-তেও (ইহার একমাত্র জ্ঞাত পাণ্ডুলিপিটি বার্লিনে সংরক্ষিত, সংগ্রহকাল ঃ ১৯২৯, পত্রক ৯ বি) আমরা এমন সব কবিতা বা চরণের সন্ধান পাই যাহা কুতাদগূ-বিলিগ (যদিও ইহাতে পাওয়া যায় নাই)-এর একটি উদ্ধৃতির হুবহু অনুরূপ শোনায় ঃ "ওয়াযীর এত্কুসি দূর তামানী নিজাম ওলমাসা", "আদাল তাপমাস কিয়াম ('শৃঙ্খলা উযীরের সকল কার্যকলাপের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেইখানে শৃঙ্খলা নাই সেইখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না")।

ওযবেগ ভূভাগে তুর্কী সাহিত্যের ভাষা যেইভাবে লেখা হইত অদ্যাবধি সেইভাবেই উহা চীনা তুর্কিস্তানে (কাশগারিয়ায়) লেখা হইয়া থাকে। এইখানকার তুর্কী সংস্কৃতিতেও আজ ফারসী/ইরানী সংস্কৃতির প্রভাব পড়িয়াছে। কাশগারিয়ায় একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রচনা ঃ হায়দার মীর্যা (দ্র.) রচিত 'তা'রীখ-ই রাশীদী' ফারসী ভাষায় লিখিত। ইহার অন্তত দুইটি তুর্কী অনুবাদ বিদ্যমান। একটি অনুবাদ মুহাম্মাদ সাদিক কৃত; অনুবাদকাল ঃ ১৮শ শতক; অন্য অনুবাদটির অনুবাদকের নাম অজ্ঞাত। খোতানবাসী এই ব্যক্তির পাণ্ডুলিপিতে তারিখ দেওয়া আছে ঃ ২২ জুমাদিউস ছানী, ১২৬৩/৭ জুন, ১৮৪৭। এমন কি ইসমা'ঈল খানের অধীনে (১৬৭০-৮২) মীরযা শাহ্ মাহমূদ চুরাসও (Zap, xxii, 313 প.) নিজস্ব দেশীয় তুর্কী ভাষা ছাড়িয়া নিকৃষ্ট ফারসী ভাষায় তাঁহার ইতিহাস রচনা করেন। ইহার অল্পকাল পরে (১৮শ শতকের সূচনায়) লেনিনগ্রাদের Asiatic Museum-এ ইতিহাস বিষয়ক যে গ্রন্থখানি

সংরক্ষিত (Zap., xv. 236 প., M. Hartmann, Der islamische Orient, i., Berlin 1899-1905, p. 291) আছে সেইটি রচিত হয়। এই পাণ্ডুলিপিটি ছাড়া এখন উহার দ্বিতীয় আরেকটি পাণ্ডুলিপিও রহিয়াছে (Petrovskiy 9); ইহাও Leningrad-এর Asiatic Museum-এ রক্ষিত। এই ইতিহাস গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ও সরল তুর্ক ভাষায় রচিত। কাশগার হইতে সর্ব সাম্প্রতিক ইতিহাস বিষয়ক রচনার জন্য তু. যেমন Zap., xvii, 0188 প. (সায়রামের মুল্লা মূসা রচিত "তা'রীখ-ই আমানিয়া" সম্পর্কিত; গ্রন্থটির রচনা ১১ শাওওয়াল, ১৩২১/১৭ ডিসেম্বর, ১৯০৩-এ সম্পূর্ণ হয়)।

২০শ শতকে য়ূরোপীয় প্রভাবে (রুশ ও তাতার ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে) ওযবেগদের মাঝে এখন এক নূতন তুর্ক সাহিত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সাহিত্যকে অনেক ক্ষেত্রে "আধুনিক চাগাতাই সাহিত্য" বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই নূতন সাহিত্যে কিছু নাটকও আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত সূত্রনির্দেশসমূহের অতিরিক্ত ঃ (১) H. Vambery, Cagataische Sprachstudien, Leipzig 1867; (2) M. Hartmann, Zentralasiatisches aus Stambul. Mesreb der weise Narr und fromme Ketzer. Ein zentealasiatisches Volksbuch. Ein Heililgenstaat im Islam (all in "Der islamische Orient", vol. i.); (৩) ঐ লেখক, Der cagataische Diwan Huwida's (M. S. O. S. As., v. 132 প.); (8) M. F. Gavrilov, Sredneaziatskiy poet i sufiy khuwaido, Tashent 1927; (5) A. Samoylovic, Literature tureckikh norodov (in Literatura Vostoka, St. Petersburg 1919)।

W. Barthold (E.I. [1])/আফতাব হোসেন

(খ) ১। **'উছমানী তুর্ক ভাষা ও বর্ণমালা**

১৫শ শতকের শেষদিক হইতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাষা হইয়া উঠে 'উছমানী তুর্কী। চার শতকের মেয়াদে এই ভাষা অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এই ভাষার বিবর্তন ও ইহার প্রভাব-পরিমণ্ডলের সম্প্রসারণের বিষয়টি 'উছমানী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সহিত সম্পর্কিত। এই কারণে 'উছমানী তুর্কী গুরুত্বের দিক হইতে আরবী ও ফারসীর পরেই ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হিসাবে স্থান লাভ করিয়াছে। ১৯শ শতকে তানজীমাত (দ্র.) আমলে এবং আরও বেশি করিয়া ১৯২২ খৃ. 'উছমানী সাম্রাজ্যের অবসানের পর হইতে সাহিত্যকর্মে ব্যবহৃত এই একই ভাষা এক জাতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তুরস্কে এই ভাষাকে তুর্কী (তুর্কীচে) ছাড়া অন্য কোনও নামে অভিহিত করা হয় না। একদা 'উছমানী সাম্রাজ্যের অঙ্গ ছিল এমন সব অঞ্চলের মুসলিম ও খৃস্টান অধিবাসীদের মধ্যে উল্লিখিত 'উছমানী তুর্কী ভাষার প্রভাবের চিহ্ন আজও লক্ষ করা যায়।

'উছমানী তুর্কী হইতেছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বা তুর্কী ভাষাসমূহের তুর্কোমান গোষ্ঠীর ভাষা (তু. Samoylovic, Nekotorye dopoleniya k Klassifikaciitureckikh Jazykow, Petrograd 1922, p. 5 প.)। এই একই ভাষাগোষ্ঠীকে Radloff (Phonetik der nordlichen Turksprachen, Leipzig 1883, p. 280) দক্ষিণাঞ্চলীয় তুর্কী ভূভাগের জনসাধারণের উপভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ওগুয তুর্কগণই মূলত এই ভাষায় কথা বলিত। এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্য উপভাষাগুলির সঙ্গে আযারী, তুর্কোমান ও 'উছমানীর কিছু কিছু ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য–যেমন, একটি ব্যঞ্জনবর্ণের পরের ব্যঞ্জনবর্ণ বর্জনের (তু. যেমন, অন্যান্য গোষ্ঠীর কালগান-এর তুলনায় কালান) এবং 'হওয়া' এই ক্রিয়ার ধাতুর জন্য bol-এর পরিবর্তে ol' এইরূপ–ইত্যাদি। ইহা ছাড়া শব্দরূপ প্রকরণগত দিক হইতে ক্রিয়ার বর্তমান কালের জন্য (geliyorum) একটি বিশেষ আদর্শ-নির্মিতি ইত্যাদি রহিয়াছে। স্বরসঙ্গতি প্রয়োগের বেলায় এই ভাষায় দুই ধরনের অন্ত্যস্বরধ্বনির পাঠান্তর স্পষ্ট হইয়া উঠে অর্থাৎ এই পরস্থিতিতে e (ই) a (এ)-র মধ্যে এবং শব্দের i, i, u, u পর্যায়ক্রমিক একান্তর বা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, আর উহার সহিত বেশ ঘন ঘনই একটি বিভক্তির আভাস পরিলক্ষিত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কেবল u, u এই স্বরধ্বনি দুইটির একান্তর হইয়া থাকে (V. Gronbech, Forstudier til tyrkisk Lydhistorie, Copenhagen 1902, p. 18-19), বিশেষ করিয়া 'উছমানী তুর্কী ভাষায় আদ্য m বর্ণটি 'b'তে বদলাইয়া যাইবার কারণে (যেমন, men-এর স্থলে ben-) ইহা আযারী ও তুর্কোমান ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। তুর্কী ভাষাগুলির মাঝে সাধারণভাবে একটি রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। ইহা এই কারণে হইয়া থাকে যে, এইসব ভাষার নামপদ ও ক্রিয়াধাতুর কোনও পরিবর্তন খুবই ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। আর এই কারণেও আবার 'উছমানী তুর্কী ভাষার উপভাষাগুলির মাঝে খুবই কম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় (তু. নিম্নে ৩খ.)।

য়ূরোপীয় ভাষাগুলির বিভিন্ন ব্যাকরণে তুর্কী ভাষা সম্পর্কিত পাঠ দানের বিষয়টি পরিচালিত হইয়া থাকে উপভাষাসমূহ ও Constantinople-এ প্রচলিত উচ্চারণের বুনিয়াদে, Constantinople-এর তুর্কী ভাষার উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে মৃদু ও ছন্দময় উচ্চারণ। ইহার কারণ, Constanitinople -এর উপভাষায় সাধারণত, বিশেষ করিয়া অন্ত্যস্বরধ্বনির বেলায় বিভক্তি/প্রত্যয়গুলিতে 'হালকা/মৃদু ও অকুঞ্চিত' স্বরবর্ণ প্রধান হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে তুর্কী ভূভাগের পূর্বাঞ্চলের ভাষার উচ্চারণে 'k'-এর পরিবর্তে 'kh' উচ্চারণ থাকিলেও Constantinople ভাষায় আমরা তাহা লক্ষ করি না। ইহা ছাড়া 'উছমানী তুর্কীতে বিপুল সংখ্যক আরবী কৃত-ঋণ শব্দ থাকার কারণেও ঐ শব্দগুলি 'মৃদু' উচ্চারণ প্রবণতার প্রাধান্য নিশ্চিত করিয়াছে। বিভিন্ন ব্যাকরণে এই যে ভাষাটির শিক্ষা দান করা হয় তাহার বৈশিষ্ট্যটি অনেকটাই গতানুগতিক। আর ইহা বিশেষ করিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ব্যাপক নিয়মানুগতার মাঝে। এই নিয়মানুগতার প্রতিনিধিত্ব করে 'উছমানী তুর্কী ভাষার ধাতুর স্বর পদ্ধতি (দুইটি অনুক্রম ঃ a,i, o, u ও e, i, o, u) ও স্বর সঙ্গতির সূত্রসমূহের কঠোর প্রয়োগ। অবশ্য বাস্তবে এই নিয়মতান্ত্রিকতার প্রয়োগ তেমন লক্ষ করা যায় না। অবশ্য শিক্ষিত জনসাধারণে ভাষায় এই ধরনের নিয়মানুগতার প্রবণতাটি দেখা যায়। তবে আরবী বর্ণমালা ব্যবহারের কারণে মনে হয় যে, সাধারণভাবে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রশ্নগুলি হইতে তুর্কী বৈয়াকরণগণের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, লাতিন হরফে তথা বর্ণমালায় তুর্কী ভাষার বর্ণ বিন্যাসের ফলে ক্রমান্বয়ে তুর্কী উচ্চারণে স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি প্রকাশ পাইবে।

কোন্‌টি আদর্শ 'উছমানী উপভাষা তাহা নির্ধারণ অবশ্য কিছুটা কঠিন ব্যাপার। খোদ তুরস্কে এ বিষয়ে যে অভিমতটি প্রচলিত ও প্রধান উহা হইতেছে, Constantinople-এর তুর্কী ভাষাটিই সেরা (Zia Gok Alp, Turkdjuluyun Esaslari, Ankara 1339, p. 97)। অবশ্য এই জওয়াবটিকে বিষয়টির অতি সরলীকরণ বলিতেই হয়। আসলে বিষয়টি এত সহজ নহে। Constantinople-এর অধিবাসীদের মাঝে বহু বিজাতীয় জনশ্রেণী রহিয়াছে। ঐ ধরনের

বিজাতীয় অন্যান্য উপাদানও স্বাভাবিক কারণেই সেইখানে বিদ্যমান। ইহা ছাড়া নিঃসন্দেহে এ কথাও বলা যায় যে, বহু সংখ্যক 'উছমানী উপভাষা তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর ভাষা গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে অবদান যোগাইয়াছে। আমরা যদি শিক্ষিত শ্রেণীর কথিত ও ব্যবহৃত ভাষা বিবেচনায় আনি তাহা হইলে উল্লিখিত প্রচলিত অভিমতটির বুনিয়াদ অনেকখানি খাঁটি ও যথার্থই বলিতে হয়। ভাষার উচ্চারণের প্রশ্নে M. Bergstrasser মনে করেন, Constantinople অধিবাসীদের উচ্চারণ কমবেশি একই রকমের (Z. D. M. G., lxxii., 236)। কিন্তু ইহার পরেও উচ্চারণ ও শব্দাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে বিস্তর তারতম্য বর্তমান। প্রাচীন উপভাষাগত নানা পার্থক্যের স্মৃতি সুনিশ্চিতভাবেই নিশ্চয় আজও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। আমরা Vambery-র এই কৌতূহলোদ্দীপক বিবৃতির জন্য তাঁহার নিকট ঋণী যে, 'উছমানী রাজবংশের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে যে ধরনের বাক-বিনিময় করিতেন তাহা সাধারণ প্রচলিত তুর্কী ভাষা হইতে ভিন্ন ছিল। তবে শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের ভাষার বিবর্তন কিভাবে সাধিত হইয়াছে সে বিষয়ে আমরা আদৌ সুপরিজ্ঞাত নহি। উচ্চারণের জন্য আমাদের হাতে ১৫শ শতকের কিছু লাতিন লিপিতে লেখা তুর্কী রচনার পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে (তু. বিশেষ করিয়া Foy, M. S. O. S., iv. & v.; Babinger, in Literaturdenkmaler aus Ungarns Turkenzeit Berlin Leipzig 1927, p. 43)। কিন্তু উল্লিখিত দলীলগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হওয়া সত্ত্বেও ঐগুলিতে গোটা 'উছমানী ভাষার তুলনায় বরং বিশেষ ভাষাগত উচ্চারণেরই পরিচয় মিলে। আরও পরবর্তী কালের দলীল, যেমন Holdermann-এর তুর্কী ভাষার ব্যাকরণ (১৭৩০) [তু. Babinger, Stambuler Buchwesen, Leipzig 1919, p. 14-15) বর্তমান কালের Constantinople-এর তুর্কী ভাষার সহিত, বিশেষ করিয়া সংকুচিত স্বরবর্ণের বিভক্তি বজায় থাকার মধ্যে পুরাতন 'উছমানী তুর্কীর যথেষ্ট তারতম্য প্রদর্শন করে।

শিক্ষিত শ্রেণীর তুর্কী শব্দাবলী সম্পর্কে আমরা এখনও অনেকখানি অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি এবং ইহা এই কারণে যে, কোন্‌টি উত্তম তুর্কী ভাষার আদর্শ, যুগের কালপরিক্রমায় তাহার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯শ শতকের মধ্যভাগ অবধি এই আদর্শটি সাহিত্যের ভাষা দ্বারা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

১৩শ শতকে এশিয়া মাইনরের অধিবাসীদের বিভিন্ন তুর্কীভাষী গোষ্ঠী কথ্য তুর্কী ভাষা লেখার প্রথম প্রয়াস চালান (তু. নিম্নে ৪খ.)। তাহাদের সেই প্রয়াসের ফল হিসাবে লিখিত সাহিত্যিক ভাষার বিকাশ ঘটে। আর এই কারণেই সাহিত্যমানের লিখিত তুর্কী ভাষাটি কয়েকটি তুর্কী উপভাষার বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। ঐ উপভাষাগুলির মধ্যে কোনও বড় রকমের পার্থক্য নাই। তাহা ছাড়া আরবী বর্ণমালায় ঐ ভাষাটি লেখার ক্ষেত্রে উল্লিখিত পার্থক্য আরও কম। এই আরবী বর্ণমালা আযারী উপভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লোপেরও কারণ হয়। সাহিত্যিক 'উছমানী ভাষার বিকাশে এই আযারী ভাষারও কিছু প্রভাব রহিয়াছে। 'উছমানী সাহিত্যিক ভাষাটি যথার্থ অর্থে বলিতে গেলে সত্যিকার চিরায়ত কোনও গুণের অধিকারী নহে, যাহা কুরআনের আরবী ও অপেক্ষাকৃত সীমিত ধারণায় শাহনামার ফারসীর মত ভাষার আদর্শ ও শৈলী হিসাবে কাজ করিতে পারে। ধ্রুপদী বা চিরায়ত অভিধাটি দেওয়া হয় সাধারণত ১৬শ ও ১৭শ শতকের মহৎ 'উছমানী কবিদের ভাষাকে। কিন্তু তবুও এই ভাষার অতিরিক্ত কৃত্রিমতার কারণে ভাষাটি স্থায়ী প্রভাবের অধিকারী হইতে পারে নাই।

এই প্রাচীন সাহিত্য-ভাষার সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য হইতেছে আরবী ও ফারসী সাহিত্যের শব্দাবলী ও ভাবের কার্যত সীমাহীন প্রয়োগ। অন্যান্য তুর্কী ভাষার মত (যেইগুলি মুসলিমদের ভাষা হইয়া উঠে)। 'উছমানী তুর্কী সূচনা পর্ব হইতেই ধর্ম ও সংস্কৃতির আওতাভুক্ত আরবী ফারসী হইতে কিছু শব্দ পরিগ্রহণ করিয়াছে। এই তুর্কী ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এমনই যে কারণে এই ভাষায় একগাদা বিদেশী শব্দ পরিগ্রহণে কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই এবং 'উছমানী তুর্কী ভাষা পদ্ধতিতেও এই শব্দগুলিকে আদৌ অসহনীয়, দুর্ভার বলিয়া মনে হয় না (তু. যেমন E. Sapir, Language, New York 1921, p. 210)। এই পরিস্থিতিগত কারণে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ উভয়ই প্রকাশ ক্ষমতার দিক দিয়া নানা সম্ভাবনার বিশাল সম্পদের অধিকারী হইয়াছে (আরবী মাসদার-এর সঙ্গে সহায়ক ক্রিয়া etmek, eylemek, kilmak, olmak-এর সমন্বয়ের মাধ্যমে)। ইহা ছাড়া যেহেতু তুর্কী সাহিত্যের বেশির ভাগেরই সূচনা হইয়াছে ফারসী হইতে অনুবাদের মাধ্যমে এবং যেহেতু এই শেষোক্ত ফারসী ভাষারও আরবী হইতে একই পরিগ্রহণের প্রবণতা ও পারঙ্গমতা রহিয়াছে সেহেতু এই রচনার ভাষাটি প্রকাশের ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্য এই সূত্র হইতে বিপুল পরিমাণে শব্দ পরিগ্রহণ করিয়াছে। এইভাবে সাহিত্যিক সৌন্দর্যের এক আদর্শের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা আবার লিখিত ও কথ্য ভাষার মধ্যে শব্দ সম্পদে বিরাট ভাঙ্গন ধরাইয়াছে এবং ইহা কাবা-তুর্কী নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। ইহা সত্য, বহু পণ্ডিত ব্যক্তি সব সময়ই এই কৃত্রিম ভাষার নিন্দা করিয়াছেন (basif turkce আন্দোলন সম্পর্কে নিম্নে দ্র. ৪খ.; 'উছমানী সাহিত্য)। অবশ্য এই সাহিত্যিক ভাষায় প্রচুর আরবী ও ফারসী কৃত-ঋণ শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সূচনা হয় মাত্র ১৯শ শতকের মাঝামাঝি হইতে। তাহা ছাড়া এই আন্দোলন শুরু হইয়াছে এমন এক কাকতালীয় সময়ে যখন তুর্কী সাহিত্যে য়ূরোপীয় প্রভাবও পড়িতে শুরু করিয়াছে। আবার ঐ একই সময়ে তুরস্কে সাধারণভাবে য়ূরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের কারণে নূতন নূতন ভাবধারা, প্রায়োগিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ধারণা প্রকাশের নূতন নূতন পরিভাষার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তুরস্ক প্রতীচ্যের অনুসারী হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করিলে ঐসব ভাবধারা ও ধ্যানধারণা তুর্কী সভ্যতায় আসিয়া পড়ে। এই সঙ্কটের সময় 'উছমানী তুর্কী ভাষাকে আবারও আরবী শব্দাবলীর অশেষ সম্পদের দ্বারস্থ হইতে হয়। শুধু তাহাই নহে, আরবী শব্দরূপ প্রকরণের সম্ভাবনাগুলিকেও ঐ একই ভাষায় কাজে লাগাইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইহার ফলে তুর্কী ভাষার পণ্ডিত ও অন্যান্য বিদ্বজ্জন ১৯শ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ সাহিত্য ও বিদগ্ধ মানের উছমানী তুর্কী ভাষায় অতিরিক্ত রকমে দুর্ভার বিপুল পরিমাণ বিদেশী ভাষা উপাদানের ঝামেলার সম্মুখীন হন। আর ইহার ফলে খোদ ঐ ভাষাটির তুর্কী উপাদানগুলির শ্বাসরুদ্ধকর দশা ঘটে। তুর্কী ভাষার গ্রহণের প্রবল সামর্থ্য থাকার গুণটি থাকা সত্ত্বেও উহা এই অবস্থায় দৃশ্যত বিদেশী উপাদানে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়।

তুর্কী ভাষাটির ভাষা ও উহার জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাস জানার জন্য তুর্কী ভাষায় বিদ্যমান আরবী ও ফারসী উপাদানের সমীক্ষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তুর্কী ভাষার উচ্চারণের বহু ক্ষেত্রের সুবাদে আমরা নির্ণয় করিতে পারি–কোন্ কোন্ শব্দ সত্যিকার অর্থেই তুর্কী জনসাধারণের ভাষায় আত্মস্থ হইতে পারিয়াছে। আর কোন্ কোন্ বিদেশী শব্দ তুর্কী ভাষায় কেবল পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনেরই একচ্ছত্র সম্পত্তি রহিয়া গিয়াছে। যে বিদেশী শব্দগুলি এই ভাষায় স্বরসঙ্গতির নিয়মসূত্র অনুযায়ী অধিকতর পরিপূর্ণভাবে মিলিয়া-মিশিয়া গিয়াছে

সেইগুলিই যে জনসাধারণের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে উহা লক্ষ করা যায় (তু. M. Bittner, Der Einfluss des Arabischen und Persischen auf das Turkische, Sb. Ak. Wien, CLXXII/iii.; G. Bergstrasser, Zur Phonetik des Turkischen, Z. D. M. G, lxxii; A. Schade, Der Vokalismus der Arabischen Fremdworter im osmanischen Turkish, Festschrift Meinhof, p. 449)। উল্লিখিত পরিগৃহীত বিদেশী শব্দগুলির অর্থ সমীক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তুর্কী ভাষায় বহু আরবী শব্দ যে ধারণাগত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে তাহা হইতে আরবী শব্দগুলির মূল ধারণাগত অর্থ ভিন্ন। এই বিষয়ে প্রাচীন অভিধানকারগণ ghale-tat-i meshhure-এর উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিষয়ে কয়েকটি তুর্কী রচনা রহিয়াছে।

তানজীমাত যুগের তুর্কী প্রজন্মের মানুষের নিকট এই প্রশ্নটি সংস্কৃতির প্রশ্ন হইয়া দেখা দেয়। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণা জন্মে যে, জনগণের ভাষায় ফিরিয়া যাওয়াই এই অচলাবস্থা কাটাইবার একমাত্র উপায়; কেননা জনগণের ব্যবহৃত ভাষাতে বিদেশী উপাদানগুলির উপস্থিতি সর্বদাই অপেক্ষাকৃত লঘু। রুশ-তুর্কী যুদ্ধখ্যাত সুলায়মান পাশাই (মৃ. ১৮৯৩ খৃ.) অপেক্ষাকৃত সরল ভাষা ব্যবহারের অগ্রণীদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি সৈনিকদের ব্যবহৃত সরল ভাষা গ্রহণের সুপারিশ করেন এবং সারফ-ই তুর্কী নামে (নামটি সুলায়মান পাশা প্রদত্ত) একটি তুর্কী ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার ঐ ব্যাকরণে 'উছমানী' শব্দটি পরিহার করেন। অবশ্য আহমাদ জেওদেত পাশা (দ্র.) তাঁহার পরেও তাঁহার ব্যাকরণ গ্রন্থের শিরোনামে 'উছমানী শব্দটি ব্যবহার করেন (কাওয়া'ইদ-ই 'উছমানিয়ে, Constantinople 1311)। ঐ আমলের আরও একজন ব্যক্তিত্ব হইতেছেন আহমাদ ওয়াফিক পাশা (দ্র.); তাঁহার "লেহচে-ই 'উছমানী' রচনাটি কার্যত বিদেশী শব্দ তুর্কী ভাষায় প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণের এক সনিষ্ঠ প্রয়াস। এই আমলের রচনায় অনেক বেশি আধুনিক সাহিত্যিক আঙ্গিক ও নির্মিতি প্রযুক্ত হইলেও উহাতে তাহার পরেও তৎকালীন সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে প্রচলিত পুরাতন সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহৃত হইত (মু'আল্লিম নাজী)। তবে ঐ শতকের শেষ নাগাদ 'উছমানী সাম্রাজ্যে যে অনুপাতে রাজনৈতিক সংকট ঘনাইয়া আসিতে থাকে সেই অনুপাতে 'উছমানী তুর্কী ভাষার ব্যাপারেও সংকট উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। এই সময় নাগাদ আমরা এই ভাষার অতি শুচিশুদ্ধতার জন্য এক আন্দোলনের সাক্ষাত পাই; বিশেষত ইকদাম নামে একটি পত্রিকা এই আন্দোলন পরিচালনা করে। তাস্‌ফিয়েজিলিক-এর মহান পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন ফু'আদ রা'ইফ বে। তিনি সর্বতোভাবে 'উছমানী ভাষার সকল ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে আরবী ও ফারসী শব্দ বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি চাহিতেন অন্য তুর্কী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলি হইতেও প্রয়োজনে পরিগ্রহণ করিয়া নূতন তুর্কী শব্দ গঠন করিতে, যাহাতে এমন এক ভাষার সৃষ্টি হয় যাহাকে যি-য়া গোকাল্প 'Turkish Esperanto' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এমনকি অভিধানকার সামী (দ্র.) নিজেকে তত্ত্বগতভাবে এই মতবাদের সমর্থক ঘোষণা করেন। তবে অচিরেই এই চরম শূচিবাদ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বিশুদ্ধতাবাদকে জায়গা ছাড়িয়া দেয়। আর এই শেষোক্ত যৌক্তিক বিশুদ্ধতাবাদ প্রথমবারের মত প্রচার করে স্যালোনিকার (১৯১০) সাময়িকী 'গেঞ্জ কালেমলার' ও ইহার পরে এই মতবাদের প্রচার চালায় Constantinople-এ 'তুর্ক য়ূরদু'। এমন কি 'উমার সায়ফু'দ-দীন বের মত উদ্ভাবনী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিও মনে করিতেন যে, তুর্কী সাংস্কৃতিক সংস্কার-কার্যক্রমে তুর্কী ভাষার সংস্কারের বিষয় অন্যতম প্রধান করণীয় হওয়া উচিত (তু. Newsal-i `Oshmani', Constantinople 1330, p. 305)। ১৯১৭ খৃ. জেলাল নূরী তাঁহার 'Turkcemiz' পুস্তিকায় প্রশ্নটি খতাইয়া দেখেন। বিশ্বযুদ্ধের পর যি-য়া' গোকাল্প "Turkdjuluyun Esaslari"-তে ভাষার সংস্কারের নূতন কার্যক্রমের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করেন (আঙ্কারা ১৩৩৯ হি., পৃ. ১০০ পত্রক)। ভাষা সম্পর্কে এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমতের ফলে সাহিত্যিক বাক্‌ধারাটি যে দিকনির্দেশনা লাভ করে উহার ফলে তুর্কী সাহিত্যিক ভাষাটি উহার কথ্য ভাষার অধিকতর কাছাকাছি পৌঁছায়। উদাহরণ হিসাবে আমরা খালিদে এদীব হানুম ও রূশেন এশরেফ-এর রচনাবলীর ভাষা উদ্ধৃত করিতে পারি। অন্যদিকে আবার ঐ সময়ে তুলনামূলকভাবে জনসাধারণের নানা স্তরে আরও ব্যাপক পর্যায়ে রচনার ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান পরিব্যাপ্ত হয়। 'উছমানী তুর্কীতে লাতিন বর্ণমালার প্রবর্তন নিঃসন্দেহে রচনার ও সংলাপের ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করিবে।

আরবী ও ফারসী পরিগৃহীত শব্দাবলীর পাশাপাশি 'উছমানী তুর্কী ভাষায় অন্যান্য ভাষারও অনেক শব্দ রহিয়াছে। এইভাবে আমরা বলিতে পারি যে, ইতালীয় ভাষা নৌ-চলাচল সংক্রান্ত তুর্কী পারিভাষিক শব্দাবলীকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছে। ইহা ছাড়া 'উছমানী ভাষায় বেশ অনেক গ্রীক ও আল্‌বেনীয় শব্দও রহিয়াছে। ১৯শ শতকে এই একই ভাষায় ফরাসী ভাষার প্রভাব অনুভূত হয়। অবশ্য তাহা প্রায় একান্তভাবেই বৈজ্ঞানিক ও আধা-বৈজ্ঞানিক রচনাবলীর ক্ষেত্রে। সাহিত্যিক শৈলীর সরলীকরণ এবং পুরাতন তুর্কী গদ্যের দীর্ঘ গুরুভার বাক্যাংশ বর্জনের প্রবণতার ক্ষেত্রে য়ূরোপের প্রধান ভাষাগুলির, বিশেষ করিয়া ফরাসী ভাষার পরোক্ষ প্রভাব অনুভূত হইয়াছে।

সর্বপ্রাচীন পরিজ্ঞান বলিয়া কথিত আনাতোলীয় দলীলপত্র হইতে দেখা যায়, তুর্কী ভাষা লেখার জন্য এই সময় হইতেই আরবী বর্ণমালার ব্যবহার শুরু হইয়াছে। চাগাতাই ভাষায় যে লিপি লিখন পদ্ধতি অনুসৃত হয় তাহা 'উছমানী তুর্কীতে অনুসৃত লিপি লিখন পদ্ধতি হইতে অনেকখানি ভিন্নতর এই কারণে যে, 'উছমানী তুর্কী ভাষায় জোরাল উচ্চারণসম্পন্ন আরবী হরফের (বিশেষ করিয়া গুরু স্বরবর্ণসহ t ধাতুতে যাহার সহিত উচ্চারণের প্রকৃত পার্থক্যের মিল রহিয়াছে, তু. Schaade উদ্ধৃত নিবন্ধ, পৃ. ৪৫১) ব্যাপকতর প্রয়োগের সহিত e, i বা i, এমন কি a-এর ধাতুসমূহের সহিত (scriptio defectiva) ত্রুটিযুক্ত লিপি?) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৭২৭ খৃ. তুরস্কে আনুষ্ঠানিকভাবে পুস্তক মুদ্রণ প্রবর্তিত হয় (তু. Babinger, Stambular Buchwesen im XVIII. Fahrhundert, Leipzig 1919)। কিন্তু রেনেসাঁ যুগে য়ূরোপে এই মুদ্রণ ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা তুরস্কে ঘটিল না। আরবী বর্ণগুলি বর্ণবিন্যাসের নিখুঁত গঠনসাম্য কখনও অর্জিত হয় নাই, বিশেষ করিয়া আমরা ১৯০০ সনের পর লক্ষ করি যে, আরবী বর্ণগুলি দিয়া অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্নতর রচনার কয়েক দফা চেষ্টা চলিয়াছে অর্থাৎ স্বরবর্ণ 'e' (ই)-এর পরিবর্তে হরফ 'h' (হ)-র অন্ত্য বা চূড়ান্ত গঠন ব্যবহার দ্বারা ঐ প্রয়াস চালানো হয়। তবে সংস্কারের এই প্রয়াসগুলির কোনটিই সামগ্রিক অনুমোদন পায় নাই। আরবী চারু হস্তলিপিবিদ্যার চর্চাটি তুরস্কে প্রচুর। তুর্কী ভাষার জন্য বৈশিষ্ট্যমূলকভাবে সম্পর্কিত বেশ কয়েক ধরনের লিপি, যেমন দীওয়ানী চারু হস্তলিপিটি সুলতান ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জারি করা সরকারী নানা দলীলপত্রের জন্য ব্যবহৃত হইত। উহা ছাড়া ছুলুছ নামে অভিহিত অলঙ্কারমূলক হস্তলিপি ও রিক'আ নামে পরিচিত এক ধরনের জড়ানো হাতের লেখার মত হস্তলিপিশৈলী কিছুকাল আগে পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। তুরস্কের আরবী চারু হস্তলিপিবিদ্যা (হুসন-ই খাতত) ঐ সময়ের অন্য

যে কোনও মুসলিম দেশের তুলনায় উৎকর্ষের উচ্চ স্তরে ছিল [তু. জীবনী সঙ্কলন, খাতত-উ খাততাতীন (লেখক ঃ হাবীব), Constantinople ১৩০৫]। 'উছমানী তুর্কীতে অন্যান্য বর্ণমালার যেইসব বর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে সেইগুলির মধ্যে আছে কারামানলীদের ব্যবহৃত গ্রীক ও তুর্কীভাষী আর্মানীদের আর্মানী (তু. যেমন, E. Ehe, A Vol. of Or. Stud. Pres. to E. G. Browne, Cambridge 1922, p. 269 প.)। 'উছমানী তুর্কী ভাষার জন্য কস্মিনকালেও হিব্রু লিপি ব্যবহৃত হয় নাই।

১৯২৮ খৃ. আরবী বর্ণমালার পরিবর্তে প্রথমবারের মত সরকারীভাবে তুরস্কে রোমক (লাতিন) বর্ণমালার প্রবর্তন করা হয়। নব্য তুর্কী বিপ্লবের পর হইতে তুর্কী ভাষায় ব্যবহার সহজ করার জন্য আরবী বর্ণমালা সংস্কারের কয়েক দফা প্রয়াস চলে। আরবী বর্ণবিন্যাসের ব্যাপারটি অসুবিধাজনক। আর এই কারণেই তুর্কী শব্দাবলী আরবী ও ফারসীর পরিগৃহীত শব্দগুলি লেখার ব্যাপারে বিভিন্ন নিয়মের শর্তকে অত্যন্ত সঠিকভাবেই লিখিত ভাষা সাধারণ গণমানুষের মধ্যে বিস্তারের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য করা হয়। এইজন্য খোদ আরবী বর্ণমালার বর্ণবিন্যাস পদ্ধতিটি সংস্কারের (তু. উপরে) কয়েক দফা প্রয়াস চলে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে আরও কড়া প্রস্তাবও পেশ করা হয়। যেমন এক প্রস্তাবের আওতায় এনভার পাশা (আনোয়ার পাশা) যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে আরবী বর্ণমালার এমন পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা করেন যাহাতে হরফগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয় না এবং শব্দের সকল স্বরবর্ণের জন্যে সুসঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চারণ (ধ্বনি) সঙ্কেত থাকে। তবে এই ধরনের কোনও পদ্ধতিই বড় রকমের সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে 'উছমানী তুর্কী ভাষায় লাতিন বর্ণমালার ব্যবহারের বিরুদ্ধে বরাবরই, এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনেও লাতিন বর্ণমালার ব্যবহারের বিরোধিতা করা হইয়াছে। তুরস্কে জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিবার পর এই প্রশ্নটি কয়েক বৎসর ঝুলিয়া থাকে। ঐ সময় নাগাদ ভাষাপ্রশ্নে ধর্মীয় মহলের প্রভাব লুপ্ত হয় এবং সংবাদপত্রে মাঝে মাঝেই লাতিন বর্ণমালা সম্পর্কে আলোচনা চলিতে থাকে (পুস্তিকা দ্র. A. Galanti,Turkcede 'arebi we-latin Harflari we-imla Mes'elesi Constantinople 1925)। ইহা ছাড়া রাশিয়ায় বসবাসকারী তুর্কী, বিশেষ করিয়া আযারবায়জানের তুর্কী সম্প্রদায়ের এই প্রশ্নে মনোভাব এবং ১৯২৬ সনের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে বাকুতে অনুষ্ঠিত তুর্কী ভাষাতাত্ত্বিক সম্মেলনের (তু. Islam, xvi, 173 প.) আলোচনার আলোকেও বিষয়টি প্রভাবিত হয়। ঐ সম্মেলনে অবশ্য তুরস্কের প্রতিনিধিত্ব তেমন ছিল না। পরিশেষে ১৯২৮ খৃ. জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের সমর্থনে তুরস্ক সরকার বিষয়টি লইয়া আগাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ মে এক আইনবলে তুরস্কে সরকারীভাবে য়ুরোপীয় গাণিতিক সংখ্যা প্রবর্তন করা হয়। ইতিমধ্যে সরকারী পর্যায়ে নূতন বর্ণমালা সংক্রান্ত সমীক্ষা চলিতেছিল। ২১ আগস্ট মুসতাফা কামাল পাশা Constantinople-এ নব লাতিন বর্ণমালা সম্পর্কিত তাঁহার সুবিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন। প্রথম পরিকল্পনায় সামান্য কিছু রদবদল ও সংশোধনের পর ১ নভেম্বর এক আইনের মাধ্যমে ঐ নূতন বর্ণমালা দেশে প্রবর্তন করা হয়। উল্লিখিত আইনে Dil endjumeni (Dil encumeni) নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী লাতিন বর্ণমালা ব্যবহার করার নির্দেশ বলবৎ করা হয়। সেই সাথে আরবী বর্ণমালা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী ভাষার এই উত্তরণের পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থাও করা হয়। নূতন বর্ণমালা আবশ্যিকভাবে সকল প্রকাশিত দলীলপত্রে ব্যবহারের জন্য চূড়ান্ত তারিখ ১৯৩০ সালের ১ জুন বলিয়া উল্লিখিত আইনে নির্ধারণ করা হয় (তু. ঐ আইনের পাঠের জন্য দ্র. Oriente Moderno, Jan. 1929, p. 41 প. ও নিবন্ধ ঃ H. W. Duda, Die neue Lateinschrift in der Turkei, in O. L. Z. 1929, col. 441-453)। ১৯২৮ সালের ১ জানুয়ারি হইতে সংবাদপত্র নূতন বর্ণমালায় প্রকাশিত হইতে শুরু করে। আর ঐ একই সময়ে চার মাস মেয়াদী কোর্সের মাধ্যমে' millet mektebi) জনসধারণের সকল শ্রেণীর মানুষকে নূতন বর্ণমালা শিখানো হয়।

খুব দ্রুত এই বিষয়ে দফায় দফায় ব্যবস্থা গ্রহণ চলিতে থাকে। তাহা ছাড়া সরকারের এইসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দৃশ্যত কোনও প্রবল বিরোধিতা দেখা না দেওয়ায় উহাতে এ বিষয়ে সরকারের বলিষ্ঠ অবস্থান যেমন প্রতিভাত হইয়া উঠে, তেমনি এই বিপ্লবী সংস্কারমূলক ব্যবস্থাটিও কার্যকর দেখা যায়। ইহা সম্ভবত এই বাস্তবতার কারণে ঘটে যে, তুরস্কের মোট জনগোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্রাংশই এই পরিবর্তনের জন্য বড় রকমের অসুবিধায় পতিত হয়। অন্যদিকে এই সত্যটিও উপেক্ষা করিবার মত নহে যে, লাতিন বর্ণমালা আরবী বর্ণমালার চাইতে তুর্কী শব্দাবলীর ধ্বনি বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অধিকতর সুপ্রযুক্ত। তুর্কী ভাষায় নূতন বর্ণমালা প্রবর্তনের সময়টিও প্রতিকূল ছিল না। ইহাও অত্যন্ত স্পষ্ট যে, শত শত বৎসর ধরিয়া যে বর্ণমালাটি বহাল ছিল উহা বিসর্জনের ফলে অনিবার্যভাবে একটা সাংস্কৃতিক সঙ্কট দেখা দেয়। ইহার কারণ বর্ণমালাটি সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির ধর্মীয়, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সহিত জড়িত ছিল। আর সেইজন্যই বিষয়টি ঐ জনসমষ্টির বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃবৃন্দের উপর এক বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করে। তবে 'উছমানী তুর্কী ভাষার উল্লিখিত সংস্কার এখনও তেমন বয়স পায় নাই যাহাতে উহার ফলাফল সম্পর্কে কোনও যথার্থ মূল্যায়ন করা যায়।

প্রবর্তিত নূতন বর্ণমালার বেশ কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে (যেমন, dj (জ) ধ্বনির পরিবর্তে c (C) ধ্বনির, c বদলে c এবং (C)-এর বদলে বিন্দু চিহ্ন ছাড়া 1 (2) ইত্যাদির ব্যবহার; sh (o)-এর পরিবর্তে (S)-এর ব্যবহার রুমানীয় বর্ণবিন্যাস পদ্ধতির প্রভাবের পরিচায়ক। নূতন বর্ণমালা অতিরিক্ত উচ্চারণ চিহ্ন ভারাক্রান্ত নহে। একটা কায়েমী বর্ণবিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে এখনও বলার সময় আসে নাই, তবে Dil endjumeni-র সূচনাপর্বে যেইসব নিয়মবিধি দেওয়া হইয়াছে সেইগুলিই কার্যত এমন এক বর্ণবিন্যাসের মূলনীতি নির্ধারণ করিয়া দেয় যাহা সম্ভবত ধনাত্মক, এমন কি উহা লাতিন ভাষায় লিখিত ও বিভিন্ন বিদেশী ভাষা হইতে পরিগৃহীত (যেমন federation-এর পরিবর্তে Federasyon)। ইহার ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই পরিগৃহীত আরবী শব্দগুলি এমন আকার গ্রহণ করে যাহা আরবী বর্ণমালার সহিত অভ্যস্তদের পক্ষে চিনিয়া লওয়া বেশ শক্ত ব্যাপার। সাধারণভাবে আমরা বলিতে পারি যে, নূতন বর্ণমালা আরবী ভাষার তুলনায় কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে অনেক বেশি উপযোগী। ইহা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই পরিস্থিতি নানা বিষয়ের বিবেচনায় 'উছমানী ভাষার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার জন্য সহায়ক হইতে পারে।

J. H. Kramers (E.I.[1])/আফতাব হোসেন

২। 'উছমানী তুর্কী উপভাষা[১]।

(১) ব্যাপ্তি

প্রয়োজনীয় বিস্তারিত জরিপ পরিচালনার অভাবে, ঠিক কোন্ কোন্ সীমানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে 'উছমানী তুর্কী ভাষা প্রচলিত আছে তাহা

১. লেখকের প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতিটি এই নিবন্ধে বাস্তবসম্মত বিচার-বিবেচনার সুবিধার জন্য অপরিবর্তিত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে;; টীকা দ্র. পৃ. ৯২৬-ক।

নির্ধারণ সম্ভব নহে। ইহার ব্যাপ্তি য়ূরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশেই বর্তমান। য়ূরোপে বলকান উপদ্বীপে বিক্ষিপ্তভাবে অন্যান্য ভাষা পরিবৃত অবস্থায় ইহার প্রচলন বর্তমান। ফলে ঐসব বিচ্ছিন্ন তুর্কীভাষী অঞ্চলে নিশ্চিতভাবেই তুর্কী নিরবচ্ছিন্নতা অবলুপ্ত। আমরা ঐ ধরনের বিচ্ছিন্ন তুর্কীভাষী অঞ্চল হিসাবে নিম্নলিখিত স্থানের নাম উল্লেখ করিতে পারি। যেমন, ১। Gallipoli উপদ্বীপসহ পূর্ব থ্রেস।

এইখানে জনসমষ্টি প্রায় এককভাবেই তুর্কী; উহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি। ২। Macedonia-এর একটি অংশবিশেষ, যেমন Vardar নদীর বাম তীরের একটি লম্বা চিলতে অঞ্চল, Istip (Stip) ও Radovis-এর (Radovista) মধ্যবর্তী ইজীয়ান সাগর কূল বরাবর মোটামুটি স্যালোনিকা হইতে Dede-Ayac অবধি ও বিশেষত Dama, Eskize, Gumulzina (Gumurzina) শহরবেষ্টিত ভূভাগ। বলকান যুদ্ধের সময়ের জন্য এইসব ভূভাগের একটা সমৃদ্ধ সাহিত্য। (রচনাসম্ভার) রহিয়াছে। উহার কিছু কিছু রাজনৈতিক দিক হইতে প্রভাবিত; তু. Carte ethnographique de Macedoine du sud representant la repartition ethnique a la veille de la guerre des Balkans 1912 by I. Ivanov (scale 1 : 200,000); Etnograficna karta na adrinskija viljaet kem 1912 god. by L. Miletic (scale : 1 : 750,000); Etnograficeska karta na Makedonija, ঐ লেখক, (scale, 1 : 1,500,000) : এবং Vasil Kancof, Makedonija etnografiai statistika, Sofia 1900. অবশ্য ঐ সময় হইতে এ যাবত ঐ অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীগত জনসংখ্যা অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে। Lausanne চুক্তি (১৯২৩) অনুযায়ী গ্রীক ও তুর্কী জনগোষ্ঠীর মাঝে পারস্পরিক বিনিময়ের ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় (চুক্তিটি গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত) উল্লিখিত ভূভাগের বর্তমান গ্রীস অংশে তুর্কীভাষীদের সংখ্যা অনেক সংকুচিত হইয়াছে। কেননা গ্রীস ৪,০০,০০০ -এর বেশি তুর্কীভাষীকে ঐ অঞ্চল হইতে তুরস্কে পাঠাইয়া দিয়াছে।

৩। বুলগেরিয়ার কোনও কোনও অঞ্চল যেমন দক্ষিণ-পূর্ব বুলগেরিয়ার Deli-Orman, Tozluk ও Gerlovo জিলা (তু. D. G.Gadzanow, Vorlaufiger Bericht uber eine im Auftrag der Balkan Kommission der kais. Akademic d. Wiss, in Wien durch Nordost-Bulgarien unternommene Reise zum Zwecke von turkischen Dialektstudien, Anz. Wien of 8th Febr. 1911 ও ঐ লেখক, Zweiter vorlaufiger Bericht uber die erganzende Untersuchung der turkischen Elemente im nordostl. Bulgarien in sprachlicher, kultureller und ethnogr. Bezichung. ebd., 24th Jan. 1912; তুর্কী জন-পুনর্বাসনের প্রশ্নটির জন্য দ্র. L. Miletic, Staroto belgarsko naselenie v sieveroiztocna Belgarija, Sofia 1902; A. Ischirkoff, Das Bulgarentum auf der Balkanhalbinsel im F. 1912, in Petermanns Geogr. Mitteilungen, year 1915-এ প্রদত্ত মানচিত্রটিও অত্যন্ত মূল্যবান। ৪৪ নং চিত্রে প্রদর্শিত এই মানচিত্রে তুর্কীভাষী বিচ্ছিন্ন/বিক্ষিপ্ত এলাকাগুলির তুর্কীভাষী জনসংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে)। ইহা ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব বুলগেরিয়ার Kyrzaly ও Mastanly-র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও বেশ বড় তুর্কী অধ্যুষিত এলাকা রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও গোটা বুলগেরিয়ায় তুর্কীদের ছড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহারা Kobn Balkan-এর Philippolis (Plovdiv) চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চলে ও অন্যত্র বসবাস করে; তু. Dr. Constantin Jirecek, Das Furstentum Bulgarien, Prag-Vienna Leipzig 1891. p. 133-146 (out of date) ।

৪। আজিকার আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে তুর্কী জনগোষ্ঠী বাস করে। ইহাদের বেশির ভাগের বাস Macedonia-য় (তু. J. Cvijic, Ethnographische Karte der Balkanhalbinsel nach allen vohandenen Quellen und eigenen Beobachtungen, Petermanns Mitteilungen, March etc. 1913) ও ঐ লেখক, Raspored balkanskih naroda, Glasnik Srpskog Geografskog Drustva, Belgrade 1913, p. 234-265)। Orsova-য় কৌতূহলোদ্দীপক Adakale নামক এক দ্বীপ অবধি Danube নদী তীর বরাবর অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত তুর্কী বসতি পরিলক্ষিত হয় (তু. ভূমিকা, vol. 1. of Kunos, Turkische Volksmarchen aus Adakale) ।

৫। কৃষ্ণসাগরের গোটা পশ্চিম তীর ও উত্তর-পশ্চিম তীরে যথেষ্ট 'উছমানী প্রভাব বর্তমান। Dobrudja শহর-জনপদ ও স্তেপভূমি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে 'উছমানী তুর্কী প্রচলিত রহিয়াছে (তু. St. Romansky, Le caractere ethnique de la Dobroudja, Sofia 1917 এবং ঐ লেখক, Carte ethnographique de la novelle Dobroudja Roumaine, Sofia 1915)। পরিতাপের বিষয়, আমরা ঐ সব অঞ্চলের উপভাষাসমূহ সংক্রান্ত বিষয়ের তথ্যাদি ও পরিস্থিতি পরিপূর্ণরূপে অবগত নহি। এই বিষয়টি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে যে, খৃস্টান Gagauz-গণ যে ভাষায় কথা বলিয়া থাকে তাহা মূলত 'উছমানী তুর্কী। Varna-র উত্তরাঞ্চলে নিবন্ধের এই লেখকের সহিত কিছু Dobrudja-র Gagauz খৃস্টানের সহিত সাক্ষাত হয়। তাহারা যে উপভাষায় কথা বলে তাহার সহিত Constantinople-এর সাধারণ কথ্য উপভাষার পার্থক্য নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। ইহা ছাড়া Bessarabia-র Gagauz-দের যে ভাষা সম্পর্কে আমরা Moskov-এর সমৃদ্ধ সঙ্কলন হইতে অবগত হইয়াছি (Radloffs, Proben der Volkslitteratur der turkischen Stamme, Vol. x., Mundarten der bessarabischen Gagausen, St. Petersburg 1904) তাহা একান্ত অর্থেই 'উছমানী তুর্কী উপভাষা ব্যতীত কিছুই নহে। কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তির বিবেচনায় Gagauz-গণ কুমানদের উত্তর-প্রজন্ম হিসাবে গণ্য হইলেও (C. Jiecek Einige Bemerkungen uber die Uberreste der Petschenegen und Kumanen, sowie uber die Volkerschaften der sogenannten Gagauzi und Surguci im heutigen Bulgarien, Sitzungsber, d. kon. bohm. Gesellschaft der Wiss., 1889) তাহাদের কথিত বর্তমান ভাষায় কোনও কুমান উপাদানেরই অস্তিত্ব নাই।

ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলের ভাষায় 'উছমানী প্রভাব অত্যন্ত প্রবলভাবেই লক্ষণীয়। সম্প্রতি Bazcysarai ও Tuak (Alusta-র নিকট)-এর জনপ্রিয় কবিতার যে সঙ্কলন O. Satskaja প্রকাশ করিয়াছেন ইহার ভাষাকে সোজা কথায় 'উছমানী তুর্কীই বলিতে হয় (J. A., April-June, 1926, p. 341-369)। Radloff- এর লেখা অনেক, লেখা সম্পর্কে ঐ একই কথা প্রযোজ্য (in Die Mundarten der Krym, (Proben den Volkslitteratur der nordl.

turk. Stamme, vol. VII)। 'উছমানী তুর্কীর লিখিত রূপ হইতে ক্রিমিয়ার তাতারদের সাহিত্যের কোনও বড় রকমের পার্থক্য নাই (Samoilovic, Opyt kratkoj krymsko-tatar skoj grammatiki, petrograd 1916, p. 7, পরবর্তী)। Crete ও Cyprus-এর মত বিভিন্ন ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও ইজীয়ান দ্বীপগুলির জনসাধারণের অংশবিশেষের তুর্কী ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের হাতে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য নাই। আনাতোলীয় তুর্কীভাষী অঞ্চলের সীমা উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে সুচিহ্নিত ও ঐ সীমানা প্রাকৃতিক। তবে উত্তর-পশ্চিমে ইহার তেমন সুচিহ্নিত সীমারেখা নাই, বরং দৃশ্যত ক্রমান্বয়ে আযারবায়জানী ভাষার এলাকার সহিত মিলিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক ভাষাগত বৈশিষ্ট্য, যেগুলিকে Foy-ও সুনির্দিষ্টভাবে আযারবায়জানী বলিয়া মনে করিয়াছেন (Azerbajganische Studien mit einer Charakteristik des Sudturkisschen, M. S. O. S. As., vi., 126-193; vii. 197-265) সেইগুলি এশিয়া মাইনরের উপভাষাগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। আর এই বিষয়গুলির প্রতি Giese (তু. উপরে, ১খ., পৃ. ৫৩১) সঠিকভাবেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্বে 'উছমানী ভাষা উত্তর সিরীয় আরবীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর মেসোপটেমিয়ায় কুর্দী ভাষার কারণে তুর্কী ভাষা অনেকাংশেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং উহা পারস্যের আযারবায়জানী ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

আনাতোলিয়ায় স্থায়ী নিবাসী তুর্কদের ছাড়াও আমরা যাযাবর ও আধা-যাযাবর শ্রেণীর অস্তিত্ব লক্ষ করি। এই বৈশিষ্ট্যটি বলকান উপদ্বীপেও লক্ষণীয়। এশিয়া মাইনরে এই যাযাবর জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এখনও প্রচুর। তবে য়ুরোপীয় ভূখণ্ডে ইহাদের উপস্থিতি এখন অনেক কম (তু. P. Traeger, Die Turken und Konjaren in Makedonien, Ztschr., fur Ethnol., 1905, p. 198-206; বুলগেরিয়ার Juruk ও Konjar সম্পর্কিত তথ্যাদির জন্য Jirecek, Das Furstenthum Bulgarien, p. 139 প.)। আনাতোলিয়ায় তুর্কী যাযাবরগণ অনেকটাই অস্পষ্ট পরিচয়ে পরিচিত, যেমন Asiretler ("কওমসমূহ"), Juruk, তুর্কোমান অথবা তাহাদের নিজ গোত্রের নাম, যেমন Avsar (বা 'আফসার) ইত্যাদি। ফলত তাহাদের ভাষাটির সহিত তাহাদের প্রতিবেশী স্থায়ী নিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষার মূলত কোনও পার্থক্য নাই। 'উছমানী তুর্কী ভাষার অঞ্চলগত সীমা-পরিসীমার আজ বেশ রদবদল ঘটিতেছে। পশ্চিমে অর্থাৎ বলকান অঞ্চলে 'উছমানী তুর্কী এলাকা ক্রামগতভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে; পক্ষান্তরে পূর্বাঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে তুর্কী ভাষার বুনিয়াদ আরও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে।

(২) 'উছমানী তুর্কী অঞ্চলে ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীসমূহ তুরস্কের বর্তমান প্রজাতন্ত্রী সরকার আধুনিক তুরস্কের রাষ্ট্রীয় পরিসীমার মধ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর আয়তন অনেকখানি কমাইয়া আনিয়াছেন। তবুও 'উছমানী তুর্কীভাষী এলাকা এখনও কোনও অর্থেই সুষম হইয়া উঠে নাই, বরং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অন্য বহু ভাষার অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে। প্রধান প্রধান ভাষাগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলি হইতেছেঃ গ্রীক–ইহারা আগে সংখ্যায় অনেক থাকিলেও এখন জনবিনিময়জনিত কারণে কেবল Constantinople-এ গ্রীকভাষী কিছু লোক আছে; আর্মানী সম্প্রদায়ের লোকদের বাসও কার্যত পুরাপুরি Constantinople-এ-ই সীমাবদ্ধ, আরব (ইহারা সিরিয়া ও ইরাক সংলগ্ন সীমান্ত বেষ্টনীর তুর্কী ভূভাগের মুসলিম অধিবাসী) আর আরবদের মধ্যে কিছু খৃষ্টানও আছে। উহারা Mersin ও জেলার অধিবাসী পূর্বাঞ্চলীয় বিলায়েতগুলিতে রহিয়াছে কুর্দগণ; অবশ্য এশিয়া মাইনরেও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু কুর্দ জনগোষ্ঠীর বসবাস আছে। ১৯২৫ খৃ. শায়খ সা'ঈদ-এর অভ্যুত্থানের পর বেশ বহু সংখ্যক কুর্দকে শাস্তি হিসাবে এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরভাগে স্থানান্তর করা হয়, পূর্বাঞ্চলীয় বিলায়েতগুলিত (বিশেষত স্লোককিয়ারি) নেস্তোরীয় সিরীয় খৃস্টান, সকল প্রকার ককেশীয় নরগোষ্ঠীর লোক (লায, জর্জীয়, আবখায, সারকাসীয়) ইহাদিগকে এশিয়া মাইনরের সর্বত্র বিক্ষিপ্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহাদের সর্বাধিক ঘনবসতি পরিলক্ষিত হয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। ইহা ছাড়া বড় বড় শহরে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যায় আলবানীয় (আরনত) জিপসী, স্পেনীয় য়াহূদী বাস করে।

ইহা ছাড়া এশিয়া মাইনরেও কোন কোন তুর্কী সংখ্যালঘুর সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন ক্রিম তাতার অভিবাসী যাহার Eski-shehir তৎসন্নিহিত অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ইহাদিগকে রুমেলিয়াতেও (বুলগেরিয়ার দানিয়ুব নদী তীরের Dobrudja) দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) 'উছমানী তুর্কী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষাগুলির পারস্পরিক প্রভাব।

অন্যান্য পার্শ্ববর্তী ভাষার উপর 'উছমানী তুর্কীর প্রভাব ও 'উছমানী তুর্কীর উপর অন্যান্য পড়শী ভাষার প্রভাব সম্পর্কে আমরা যাহা জানি তাহা অত্যন্ত প্রমাদ ও ত্রুটিপূর্ণ। আমরা তাই কেবল কোন কোন বিচ্ছিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করিতে পারি ঃ যেমন আদ্য h (x)-এর লোপ, যেমন ঃ Ak. (=আরবী حق), ain (=আরবী خائن) ane (=ফারসী خانه), ani (=hany, kany) ইত্যাদি.... এইগুলি ম্যাসিডোনিয়ার উপভাষাগুলির (Kowalski, Zagadki ludowe tureckie, p. 11; ঐ লেখক, Osmanischeturkische Volkslieder aus Mazedonien, W. Z. K. M., xxxii, 167-168) অত্যন্ত একান্ত বৈশিষ্ট্য; কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার Bosnia -র তুর্কী ভাষাতেও দেখিতে পাওয়া যায় (Blau, Bosnisch-turkische Sprachdenkmaler, p. 27)। ইহা দক্ষিণের Slavonic ভাষাগুলির প্রভাবে হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। একইভাবে উত্তর বুলগেরিয়ায় তুর্কী শব্দের আদ্য elie-এর মধ্যে প্রায়ই যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয় উহাও বুলগেরীয় ভাষাগুলির প্রভাবে হইয়া থাকে বলা যাইতে পারে। বেসারবীয় Gagauz-দের উপভাষাগুলিতে (Moskov, p. xxvii. প.) শব্দের উচ্চারণের তালব্যকরণের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায় উহা সার্বীয় প্রভাবে ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে।

Blau বস্নিয়ার মিশ্র তুর্কী-সার্ব ভাষার উপর সমীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি উহা করিয়াছেন কেবল প্রায় একান্তভাবেই পাণ্ডুলিপির লিখিত ভাষার উপর, কথ্য ভাষার উপরে নহে। (Hungary-তে তুর্কী শাসনামলে সেখানকার ঐ আমলের 'উছমানী তুর্কী ভাষার তথ্যাদির জন্য মূল্যবান সূত্র ঃ In Litteraturdenkmaler aus Ungarns Turkenzeit (F. Babinger, R. Gragger, E. Mittwoch ও J. H. Mordtmann, Berlin 1927)।

আরবী প্রভাবাধীন তুর্কী দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের তুর্কী ভাষার শব্দাবলীর মাঝেও অন্যান্য অঞ্চলের 'উছমানী ভাষাতেও বহু সংখ্যক ও নানা ধরনের কণ্ঠ্যমূলীয় বর্ণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, বিশেষ করিয়া আরবী ع (ain) অক্ষরটি ঐসব অঞ্চলে পরিগৃহীত বিদেশী অক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হয় বলিয়া বেশ কয়েকজন পর্যবেক্ষক লক্ষ করিয়াছেন (তু. M. Hartmann, in K, i. 154; Balkanoglu, Dialecte turc de Kilis, K. S., iii. 263)।

তুর্কী ও আশপাশের অন্যান্য ভাষার মধ্যকার এই পারস্পরিক ক্রিয়ার বিষয়টি তুর্কী ভাষার বিপুল সংখ্যক শব্দ পরিগ্রহণের মধ্যেই সর্বোত্তমভাবে লক্ষণীয়। এ যাবতকাল 'উছমানী ভাষায় বিদেশ কৃত-ঋণ শব্দগুলি যত না মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে উহার চাইতে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে অ'উছমানী ভাষায় গৃহীত তুর্কী শব্দগুলি। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব য়ুরোপীয় ভাষাগুলির উপর 'উছমানী তুর্কীর প্রভাবের জন্য দ্র. Fr. Miklosich (Die turkischen, Elemente in der sudost-und tsteuropaischen Sprachen. Griechisch, Albanisch, Rumanisch, Balgarisch Serbisch, Kleinrussisch, Grossrussisch, Polnisch, Denkschriften d. Kais Akad. d. Wiss. Wien, vol. xxxiv.-xxxviii.; তু. Fr. Kraeliz-Greifenhorst.Corollarien zu Miklosich. Die turkischen Elemente.....", S. B. Ak. Wien, vol. cxlvi., 1911)। অধিকতর মূল্যবান সূত্র ঃ Fr. Miklosich : Uber die Einwirkung des Turkischen auf die Grammatik der sudoteuropaischen Sprachen, S. B. Ak. Wien, vol. cxx,, 1890; আরও N. K. Dmitrijev, Etjudy po serbsko-tureckomu jazykovomu vzaim odejstviju, Doklady Akad. Nauk. S. S. S. R., 1928-1929)। সার্বীয় ভাষায় তুর্কী পরিগৃহীত শব্দাবলীর জন্য দ্র. Gj. Popovic, Turske i druge istocanske reci u nasem jeziku, Belgrade 1889; রুমানীয় ভাষায়... Th. Lobel, Elemente turcesti, arabesti si persane in limba Romana. Constantionple-Lipsca 1894, ও Lazare Sainean, L'influence orientale sur la langue et la civilisation romaines, i., La langue; les elementes orientaux en roumain, Paris 190z, L. Ronzevalle, Les emprunts turcs dans le grec zulgaire de Roumelie et specialement d'Adrinople (F.A., 1911. July-Dec.)। ইহাতে প্রচলিত গ্রীক ভাষায় গৃহীত 'উছমানী শব্দাবলী সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। অন্যদিকে স্পেনীয় য়াহূদীদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষায় পরিগৃহীত তুর্কী শব্দাবলী সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দ্র. A. Danon, Essai sur les vocables turcs dans le judeo espagnol (K.S., iv, 1903; 1904 xiii, 1912)।

বলকান অঞ্চল, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার তুর্কী উপভাষাগুলিতে অত্যন্ত বেশি হারে স্লাভ ও রুমানীয় পরিগৃহীত শব্দ বিদ্যমান। ঘটনাক্রমে তুর্কী ভাষায় আরবী ও ফারসীর প্রভাব সম্পর্কে M. Bittner যে আলোচনা তাঁহার রচনায় (S. B. Ak. Wien, cxlii, 1900) করিয়াছেন তাহা কেবল লিখিত ভাষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। তুর্কী ভাষায় গ্রীক উপাদানের বিষয়ের জন্য দ্র. G. Meyer (Turkische Studien, S. B. Ak. Wien. cxxviii., 1893)।

তুরস্কবাসী বহু অতুর্কীভাষী সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের লোকদের 'উছমানী-তুর্কী ভাষার উচ্চারণ সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত গলদপূর্ণ। Karagoz নাটক হইতে অবশ্য সংশ্লিষ্ট উপভাষাগুলির ধরন সম্পর্কে অতি সামান্য জানা যায়। তবে সেই ক্ষেত্রেও G. Jacob অতি সঠিকভাবেই সতর্ক করিয়া (Das turkische Schatten theater, Berlin 1900. p. 29-37; Geschichte des Schatten theaters, Hanover 1925, p. 143) বলিয়াছেন, এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন এই কারণে যে, ঐ নাটকের উপভাষাগুলি বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কিত নহে, বরং ঐগুলি উপাখ্যানমূলক প্রহসনমাত্র, যেইগুলিকে সত্যিকারের জীবননিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ফল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। Constantinople-নিবাসী গ্রীক ও আর্মানীদিগকে এক সময়ে তুরস্কের রঙ্গরসাত্মক সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তামাশা-বিদ্রূপ করা হইত। এই ব্যাপারে অতি সাম্প্রতিককাল অবধিও তথ্য সরবরাহের সূত্র ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক সংবাদপত্রগুলি, যেগুলি একমাত্র তুর্কী ভাষায় কথা বলিতে সক্ষম গ্রীক (কারামানলীস) ও আর্মানীদের জন্য মুদ্রিত হইত। এই ধরনের রচনামূলক লিপি উপকরণের জন্য (কথ্য ভাষা বাদে)– অতঃপর উল্লিখিত নির্ভরযোগ্য ও সনিষ্ঠ রচনা দ্র. Studien zum Armenisch Turkischen of F. Kraelitz -Greifenhorst (S. B. Ak. Wien vol. clxviii/3, Vienna 1912) উল্লিখিত সমীক্ষাগুলিতে প্রধানত Constantinople-এর আর্মানী তুর্কী ভাষা আলোচিত হইয়াছে। কারামানলী গ্রীকদের (কারামালি) ভাষার জন্য তু. N. Dmitrijev, Materialy po osmanskoj di alektologii. Fonetika "Karamalickogo" jazyka. Zap. Kollegii Wostokowedow, ii., (1928), p. 417-458.

তুর্কী ভাষা গ্রীকদের উচ্চারণের অন্যতম অত্যন্ত লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে এক ধরনের Zeta-ism (গ্রীক বর্ণমালার অন্যতম Zeta, যাহার রোমান সমতুল্য হইতেছে ঃ Z, যেমন s=s, c=c, z=z, cok (cok), olazak ইত্যাদি (তু. G. Jacob, Zur Grammatik des Vulgar-Turkischen, Z. D. M. G., lii., 701)।

Bosphorus-এর Adampol-এর নিকটবর্তী Laz koi-এর দুইজন তুর্কীভাষী লায সম্প্রদায়ের লোকের উচ্চারণ এই নিবন্ধকার সমীক্ষা করেন। তাঁহার যবানী নিম্নরূপ ঃ আমি কিছুকাল ধরিয়া সমীক্ষায় ইহা লক্ষ করিয়া রীতিমত আশ্চর্য হই যে, তাঁহারা ki-এর উচ্চারণ ci অর্থাৎ ecin--এর উচ্চারণ ekin (বীজ), z-z-এর উচ্চারণ z করিতেছেন। একই ব্যাপার সামসুনের একজন লাযের উচ্চারণেও পরিলক্ষিত হয় ঃ oda cilitlidir (o. kilitlidir)। ঐ লাযগণ ঘোষ আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেমন b. d. g কণ্ঠ্যধ্বনিগুলিকে p. t, k- এই অঘোষ উচ্চারণ করিতেছে (তু. Jacob, পূ. গ্র., পৃ. ৬৯৯)।

তুর্কীদের বর্ণনা অনুযায়ী য়াহূদীদের তুর্কী উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ঃ e, i, o, u-এই স্বরধ্বনি বা বর্ণগুলির আগের g-এর উচ্চারণ উষ্ম ও শেষ শব্দাংশের স্বরাঘাতযুক্ত স্বরধ্বনি বা বর্ণের দীর্ঘায়ন, যেমন ben ieldim (=geldim), Baktym।

(8) বর্তমান 'উছমানী ভাষাভাষী অঞ্চলসমূহ গঠনের ইতিহাস ঃ আজ আমরা 'উছমানী তুর্কীভাষী অঞ্চলগুলির যে চিত্র দেখিতে পাইতেছি তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ ও অত্যন্ত জটিল এক পুনর্বাসন ও আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার ফল।

ইহা স্পষ্ট যে, তুরস্ক ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীরা, যাহারা আজ 'উছমানী তুর্কী ভাষায় কথা বলে, তাহাদের অতি ক্ষুদ্র অংশই কেবল তুর্কদের উত্তর-পুরুষ যাহারা এইখানে দেশান্তরী হইয়াছিল, বরং তুরস্কের অধিবাসীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দেশজ বিবাসী জনগোষ্ঠীর লোক, যাহাদের তুর্কীকরণ ঘটিয়াছে।

এশিয়া-মাইনর ও বলকান উপদ্বীপের তুর্কী জনঅধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে জনবসতি স্থাপনের ইতিহাস আজও রচিত হয় নাই। অদ্যাবধি উহার প্রয়োজনীয় প্রারম্ভিক কাজও হাতে নেওয়া হয় নাই।

তবে আমাদের আলোচ্য ভূভাগে তুর্কীকরণ প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ রূপরেখা নিম্নবর্ণিত মতে দেওয়া যাইতে পারে ঃ

এশিয়া-মাইনর ও বলকান, উভয় অঞ্চলে দক্ষিণা তুর্কী জনগোষ্ঠীসমূহ, এমন কি সালজূক বিজয়াভিযানের আগেই বায়যান্টিয়াম নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। বলকান অঞ্চলসমূহে আজও অনিবার্যভাবেই উত্তর হইতে আদি তুর্কী জনগোষ্ঠী অভিবাসনের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর বেশ উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই তুর্কগণ কৃষ্ণসাগরের উত্তর হইতে তুরস্কের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আগমন করে। তবে ১১শ শতকের মধ্যভাগের পূর্ব পর্যন্ত তুর্কদের ব্যাপক পর্যায়ে এইখানে আগমন ঘটে নাই। তবে উহার পরই ব্যাপক সংখ্যায় সালজূকদের আগমন ঘটে ও উহা ১৩শ শতকের শেষাবধি চলিতে থাকে। এশিয়া-মাইনরে সালজূক তুর্কদের আধিপত্য অবসানের শেষ পর্যায়েই আবশ্যিকভাবে দেশজ জনগোষ্ঠীর তুর্কীকরণ শুরু হইয়া থাকিবে। সালজূক সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট রাজ্যের শাসকদের শাসনামলেও ঐ তুর্কীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

১৩শ শতকে উছমানী তুর্কদের দেশান্তরী হইয়া আসার বিষয়টি এশিয়া মাইনরের জনবসতি স্থাপনে প্রথমদিকে দৃশ্যত অত্যন্ত গৌণ ভূমিকা পালন করে; কেননা ঐ সময়ে তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল। তবে ঐ সময়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল 'উছমানী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের তুর্কীকরণ প্রক্রিয়ায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। একমাত্র সংশ্লিষ্ট ভূভাগের তুর্কীকরণের প্রধান ও প্রাথমিক কারণগুলি 'উছমানী শাসকদের এশিয়া-মাইনরের ক্রমান্বয়ে একত্রীকরণ ও তাহাদের বিজয়াভিযানগুলির বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত। 'উছমানী শাসনের গোটা কাল পরিসরে 'উছমানী সাম্রাজ্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে জনগোষ্ঠীর স্থানান্তর গমন চলিতে থাকে। উহা কখনও ছিল বিপুল আকারে, কখনও বা ক্ষুদ্রাকারে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রের বাহির হইতেও, বিশেষত পূর্বাঞ্চল হইতেও কখনও দ্রুত, কখনও ধীর লয়ে তুর্কী জাতির নানা উপজাতির লোকদের অনুপ্রবেশ চলিতেছিল। এই বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রাখিতে হইবে। বলকান উপদ্বীপের একটি বিরাট এলাকায় তুর্কী বসতি গড়িয়া উঠে; যদিও উহা তেমন ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল না। তুর্কী বিজয়াভিযানের পরপরই এশিয়া মাইনর হইতে তুর্কীরা বলকানের অঞ্চলগুলিতে বসতি স্থাপনের জন্য যায়। এই সময় তুর্কী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ ইসলাম গ্রহণ করে এবং ক্রমান্বয়ে তাহারা তুর্কদের সহিত মিশিয়া যায়। এমন কি নিজেদের ভাষা বলকান অঞ্চলের তুর্কগণ এখনও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা এশিয়া-মাইনর হইতে আগত কোনও তুর্কী অধিবাসীর বংশধর না ধর্মান্তরিত খৃস্টান, যাহারা কালক্রমে প্রায় তুর্কীকৃত হইয়া গিয়াছিল–তাহাদের উত্তর-পুরুষ তাহা বলিতে পারেন।

রাশিয়া মুসলিম তুর্কী অধ্যুষিত ভূভাগে তাহার ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্প্রসারিত করিলে বর্তমান তুরস্কের ভূভাগে তুর্কী জনগোষ্ঠীর অভিবাসন বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করিয়া ১৭৮৩ খৃ. ক্রিমিয়াকে রুশ জার-সাম্রাজ্যের দখলে লওয়ার পর এবং ১৮৮৪ খৃ. ককেসাস অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে জারের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যাওয়ার পর সেইখানকার তুর্কী লোকজন বড় দলে দলে গোটা 'উছমানী ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। অন্যদিকে বলকান অঞ্চলের দেশগুলি স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলগুলি হইতেও তুর্কীরা এশিয়া-মাইনরে আগমন করিতে থাকে। আজও ঐ প্রক্রিয়া চলিতেছে। বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয়। আর গ্রীসের সহিত তুরস্কের জনবিনিময়ের চুক্তির ফলে প্রায় পাঁচ লক্ষ তুর্ক তুরস্কের বর্তমান গ্রীস অংশ হইতে চলিয়া আসিয়া প্রায় গোটা এশিয়া-মাইনরের বিভিন্ন এলাকায় পুনর্বাসিত হয়।

এইভাবে জটিল প্রক্রিয়ায় কোনও ভাষাগত এলাকা গঠন অন্তত যে উপভাষাগত দিক হইতে একইরূপ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে না তাহা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। তাহা ছাড়া ইহাতে উপভাষাগত সম্পর্কসূত্রগুলিও যে অনিবার্যভাবেই অত্যন্ত জটিল হইবে তাহাও পরিষ্কার ভাষায় বলা চলে; এশিয়া-মাইনরে ওগুয উপজাতির লোকজনের অভিবাসন স্পষ্টতই ছিল সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে আমরা যতটুকু অবহিত তাহার ভিত্তিতে বলা যায়, সালজূক তুর্কদের ভাষা ও পুরাতন 'উছমানী তুর্কী ভাষার মধ্যকার পার্থক্য প্রায় ধরা যায় না। অবশ্য ইহা ঠিক যে, বিভিন্ন উপজাতির উপভাষার বাচ্যে অবশ্যই প্রচ্ছন্ন ধরনের তারতম্য রহিয়াছে, যাহা কোনও কোনও সময় প্রগাঢ় হইয়া উঠে, আবার কোনও কোনও কালে তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। বিভিন্ন উপভাষার মিশ্রণ ও উপভাষাগুলির সামঞ্জস্য সম্পর্কিত প্রশ্নে বলা যায়, এই প্রক্রিয়াগুলির জন্য এশিয়া-মাইনরের পরিস্থিতি বিশেষভাবে অনুকূল। কেননা সেইখানে যাযাবর ও অর্ধ যাযাবর বিশুদ্ধ তুর্ক জনগোষ্ঠীর অধিবাস ছিল এবং তাহাদের জীবনধারা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব পায়, বস্তুত ঐ জীবনধারা আজও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

উত্তরা তুর্কদের উত্তর-প্রজন্মের (বিশেষ করিয়া রোমানদের অবশিষ্ট) লোকজন, যাহাদের অস্তিত্ব বায়যান্টীয় আমলেও লক্ষ করা গিয়াছে তাহারা, ভাষার দিক দিয়া বলিতে গেলে কার্যত পুরাপুরিভাবেই 'উছমানী প্রভাবে স্বকীয়তা হারায়। কৃষ্ণসাগরের পশ্চিমাঞ্চলের (Deli Orman, Dobrudja, Bessarabia) ভূভাগের উপভাষাগুলিতে পরিলক্ষিত কোনও কোনও ভাষাগত (একক) বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এশিয়া-মাইনর সংলগ্ন এলাকাগুলির উপভাষাসমূহের কিছু কিছু সাদৃশ্য বর্তমান। বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক। সম্ভবত বলা যায়, উত্তরা ও দক্ষিণা তুর্কদের মধ্যে যোগাযোগ সংসর্গের ফলেই ঐ সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়।

তুর্কীকৃত গণমানুষের ভাষায় তুর্কী ধ্বনিগুলির গৌণ অদল-বদল অনিবার্য। ইহা সংশ্লিষ্ট লোকজনের উচ্চারণ রীতির উত্তরাধিকারের ফল। এই জনসমষ্টির চলমানতা এবং সামরিক কার্যকলাপ ও সাম্প্রতিক কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভাষায় এক ধরনের সমরূপ আনয়ন করিয়াছে। উপভাষাগুলির মিশ্রণ ও প্রমিতি যাহা খোলা চোখে লক্ষ করি প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহার অধিক অগ্রসর হয় নাই। ইহার কারণ, নূতন জনবসতিগুলির লোকজন গতানুগতিক নিয়মে পুরাতন নিবাসীদের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যায় নাই, বরং উহারা পাশাপাশি নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে এবং দীর্ঘকাল যাবত প্রতিটি নূতন জনগোষ্ঠী (বসতি) তাহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিবর্তিতভাবে বহাল রাখিয়াছে।

তুর্কদের বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়ায় ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিক সূত্রগুলির এখনও পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় নাই। তবে এশিয়া-মাইনর ও রুমেলিয়ার ক্রমনির্বাসন ও তুর্ককরণ সংক্রান্ত সমীক্ষার ব্যাপারে স্থানের নামগুলি এক মূল্যবান সহায়ক হইতে পারে। অথচ পরিতাপের বিষয়, স্থানের নাম সম্পর্কিত সমীক্ষার আদৌ কোনও অগ্রগতি হয় নাই। কোনও কোনও ওগুয উপজাতীয় নামে অনেক স্থানের (Kopruluzade Mehmed Fu'ad, Ogus etnolodjisine da'ir ta'rikh-i notlar, Turkiyat medjmu'asi, i, 185-211; H. Nihal ও Ahmad Nadji, Anadoluda Turklere 'a'id ver isismleri, প্রাগুক্ত, ii, 243-259) নামকরণ করা হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসরে এই বিষয়ে তুর্কী পণ্ডিতগণ কিছুটা

মনোনিবেশ করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের অধিবাসীদের গ্রামগুলির নাম সাধারণত কৃত্রিম এবং এই নামগুলি আরবী অন্ত্যপ্রত্যয়/বিভক্তি-iie- যোগে ব্যক্তিনাম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যেমন, Osmaniie, Resadiie ইত্যাদি।

(৫) 'উছমানী তুর্কী সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের উৎসসমূহ ও সেইগুলির মূল্য 'উছমানী ভূভাগে ভাষার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস হইতেছে য়ূরোপীয় গবেষক-ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ। এই ব্যাপারে খোদ তুর্কদের তরফে আজও তেমন কিছুই করা হয় নাই।

উপভাষা সম্পর্কিত তথ্যাদি কিছুটা পরিমাণে আমাদের জানা আছে এমন স্থানগুলিকে তুরস্কের মানচিত্রে আমাদের যদি চিহ্নিত করিতে হয় তাহা হইলে তাৎক্ষণিকভাবেই আমরা বুঝিতে পারিব কত সামান্য কাজ এ যাবত করা হইয়াছে আর গোটা ভাষাগত এলাকা সম্পর্কিত নিখুঁত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে আমরা কতখানি পিছাইয়া আছি।

নানা পর্যবেক্ষণের মূল্য ও গুরুত্বের উপর আমরা একান্তভাবে নির্ভরশীল। অথচ ঐ মূল্য ও গুরুত্বগুলি অত্যন্ত বিষম। এই বিষয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ গবেষক ছাত্রদের নিকট নানা বিষয়ক রচনার পাঠ হইতে তাহাদের নিজ সংগৃহীত লোকগাঁথামূলক উপাদানগুলিই মুখ্য বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, আর ইত্যবসরে ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়গুলি একান্তই গৌণ হইয়া পড়ে। বিভিন্ন রচনায় পরিলক্ষিত ভাষাগত বিষয়গুলির উৎসস্থল নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া দাঁড়ায় এই কারণে যে, ঐসব উপাদানের সংগ্রাহক-গবেষকগণ উৎস-স্থাপনগুলিতে উহাদের যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টিকে অবহেলা করেন। 'উছমানী তুর্কী উপভাষাগুলির উপাদানসমূহের পরিপূর্ণ সংগ্রহের কথা বলিতে গেলে I. Kunos-এর সংগ্রহের কথাই উল্লেখ করিতে হয়। তবে এই সংগ্রহও পদ্ধতিগত গলদমুক্ত নহে। আর এইজন্যই এই ধরনের উপাদান অত্যন্ত সতর্কতা ও বাছ-বিচার সাপেক্ষ।

লোকগাঁথার দৃষ্টিকোণ হইতে লোকগীতিগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও উপভাষাসমূহ সমীক্ষার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত উপাদান বিবেচিত হইবার দাবিদার নহে। কেননা ঐ ধরনের গোটা লোকগীতি ও সেই সাথে তার স্বকীয় উপজীব্য বিষয়গুলি লক্ষণীয় দ্রুততার সহিত স্থান হইতে স্থানান্তরে, লোকালয় হইতে লোকালয়ে ছড়াইয়া পড়ে এবং গীতির ভাষা স্থানীয় উপভাষাগুলির সহিত অভিযোজিত হইয়া যায়। অবশ্য এই পরিবর্তন ঠিক তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে না, বরং দেখা যায় বেশ একটা দীর্ঘকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও ঐ অভিযোজন বা আত্মস্থকরণ প্রক্রিয়াটি পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত হয় নাই। আর এই কারণেই কখনও কখনও লোকগীতিগুলিতে অনেক দূরবর্তী স্থানের উপভাষাগত আঙ্গিকসমূহের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ইহা ছাড়াও এই গীতিসমূহের মাঝে এক ধরনের কৃত্রিম ভাষাও চিহ্নিত করা যায়, যাহা তুর্কী জনসাধারণের মাঝে প্রায়ই লক্ষ করা যায়। ধাঁধা ও প্রবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আর সামগ্রিকভাবে লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা নাই, কেননা এই সাহিত্যের রচনাবলীর মাঝে ভাষার আঙ্গিক ও উপাদানগুলি কমবেশি ঋজু, অনমনীয়।

উল্লেখ্য যে, সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট রচনাবলীর অধিকাংশ পাঠের লিপি গ্রহণের কাজটি সম্পাদিত হইয়াছে প্রধানত শহর-জনপদে, যেইখানে জনগোষ্ঠী সাধারণ নিয়মেই গ্রামের তুলনায় মিশ্র ও প্রচলিত উপভাষাগুলিও স্পষ্টত আলাদা করিয়া নির্ণয় করা কষ্টকর। পল্লীর দেহাতি মানুষের কণ্ঠ হইতে ভাষা উপাদান সংগ্রহের নজীর অত্যন্ত বিরল। কাজেই এমতাবস্থায় আমরা সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এখনও 'উছমানী তুর্কীভাষী অঞ্চলের উপভাষাগুলির সমীক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করিতে অক্ষম। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময়ের কারণ নাই।

(৬) বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ভাষার সংগৃহীত নমুনাসমূহ

এই যাবত ভাষা উপাদানগত পাঠের যেইসব লিপি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা, হয় বেশ বহু ও বড় এলাকার নতুবা অতি সীমিত এলাকার। প্রথমোক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট সংগ্রহের মধ্যে পড়ে ঃ I. Kunos, Mundarten der Osmanen, St. Petersburg 1899 (Forms vol. viii of the Proben der Volkslitteratur der turkischen Stamme, সম্পা. Radloff)। ভিন্ন ভিন্ন নমুনার উৎসস্থলের কোনও সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকায় সংগ্রহের এই কাজটি উপভাষা সমীক্ষার জন্য খুব সামান্য মূল্য বহন করে (Mund. হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত)। V. Gordlevskij, Obrazcy osmanskago narodnago tvorcestva, Moscow 1916; প্রধানত Constantinople হইতে ও কিছু এশিয়া মাইনর (বিশেষ করিয়া Nigde হইতে) লোকগাঁথামূলক রচনার পাঠ (লিপি) ঃ Abbr. Gord. T. Kowalski, Zagadki ludoweturecckie, Cracow 1919; সুনির্দিষ্ট উৎসমূহের উল্লেখসমূহ ধ্বনির লিপি রূপান্তরভিত্তিক ১৪১টি ধাঁধার সঙ্কলন ঃ সংক্ষিপ্ত ঃ Zag

স্বতন্ত্র এলাকাগুলির জন্য উল্লেখ্য ঃ

১। দানিয়ুব নদীর দ্বীপ, Adakale, I. Kunos Ada-Kalei torok nepdalok : Budapest 1906, Adakale-তে সংগৃহীত এক শতটি লোকগীতির প্রতিলিপিকৃত ও হাঙ্গেরীয় ভাষায় অনূদিত সঙ্কলন ঃ সংক্ষিপ্ত ঃ Adak. Lied. : i. Kunos, Materialiien zur Kenntnis des Rumelischen Turkisch, Part. i. : Turkische Volks marchen aus Adakale gesammelt, in Transkription herausgegeben und mit Einleitung vers., Leipzig-New York 1907, Part ii., : Deutsche Ubersetzung mit Sachregister, প্রাগুক্ত, 1907, সংক্ষিপ্ত : Adak।

২। বেসারাবিয়া ঃ W. Moskov, Mundarten der Bessarabischen Gagausen, Text, St. Petersburg 1904 (forms Vol. x of Radloff's Proben der turkischen Volkslitteratur সংক্ষিপ্ত ঃ Gagaus.

৩। বুলগেরিয়া ঃ S. Cilingirov, Turski poslovici, pogovorki i charakterni izrazi (in Bulletin du Musee National d'Ethnographie de Sofia, ii. 157-71; iii. 59-65), Sofia 1922-23। বুলগার তুর্ক উপভাষা সম্পর্কে ইহাতে সঠিক ধারণা প্রদত্ত হয় নাই; এই সম্পর্কে তু. ঃ N. Dmitrijev, Zametki po bolgarsko-tureckim govoram (Doklady Akademii Nauk B, Leningrad 1927, p. 210-215)।

৪। ম্যাসিডোনিয়া (Macedonia) : T. Kowalski, Osmanisch-turkische Volkslieder aus Mazedonien, W. Z. K. M., xxxiii., 1926, p. 166-231. সংক্ষিপ্ত : Maz।

Zag-এ ম্যাসিডোনিয়া হইতে সংগৃহীত কিছু নমুনাও রহিয়াছে ঃ

৫। Thrace ও Constantinople. I. Kunos, Osmantorok nepkoltesi gyujtemeny, 2 vols.,

Budapest 1887 ও 1889; Constantinople-এর লোকগাঁথা উপকরণের অত্যন্ত পরিপূর্ণ সংকলন। সংক্ষিপ্ত ঃ O. T.; L. Bonelli, Locuzioni pro verbiali del Turco volgare, K. S., i., 1900, p. 308-322 (Constantinople -এ সংগৃহীত ১৪০টি প্রবাদ ও বাগধারার প্রতিলিপি); I Halasz, torok dalok, Nyelv-tudomanyi Kozlemenyek, xxii. (1892), p. 526-528 (Constantinople-এর উপভাষায় রচিত ৯টি ক্ষুদ্র গীতি)।

৬। পশ্চিম এশিয়া মাইনর ঃ I. Kunos, Kisazsiai torok nyelv, I. Brusza-Ajdin videki nyelvmutatvanyok (nepdalok), Nyelvtudomanyi Kozlemenyek, xxii. (1890), p. 113-156, প্রতিলিপির আকারে ও হাঙ্গেরীয় অনুবাদ ও টীকা সহকারে Brusa-Aldin এলাকা হইতে সংগৃহীত ৪০টি গান (গীতি) ঃ সংক্ষিপ্ত ঃ Brus-A., II. Brusza, videki szolasok, p. 261-274, 165, হাঙ্গেরীয় অনু. ও টীকাসহকারে Brusa-র প্রবাদসমূহ ঃ সংক্ষিপ্ত ঃ Brus. : I. Kunos, Nasreddin Hodsa Trefai, Budapest 1899; নাসিরু'দ-দীন হোজার ১৬৫টি কৌতুক Aidin উপভাষায় রচিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আর এই উপভাষা Aidin হইতে কোনিয়া অবধি প্রচলিত বলিয়া Kunos জানান। সংক্ষিপ্তঃ Aid., K. Foy, Das Aidinisch-Turkische, K. S., i. (1900), p. 177-194, 286-307; T. Kowalski, Piosenki ludowe anatolskie o rozbojniku Czakydzym, Rocznik Orjentalistyczny, i. 334-355, Kaza Usak নামে এক ব্যক্তির নিকট হইতে সরাসরি গৃহীত চতুষ্পদী ২৯টি চাকয়ায সঙ্কলন (কাযাউসাক)। সংক্ষিপ্ত ঃ Dum.; T. Kowalski, Cinq recits de Gunei (Vilayet Smyrne), Rocznik Orjentalistyczny, ii. 204-212. সংক্ষিপ্ত ঃ Gun. V. A. Maksimov, Opyt izsljed ovanija tjurkskich dialektov v Chudavendgiarje i Karamanii, St. Petersburg 1867। W. Heffening যেসব প্রতিনিধি স্থানীয় সূত্র তাঁহার গবেষণামূলক রচনায় (Turkische Volkslieder, Isl.; xiii, 236-267) ব্যবহার করিয়াছেন সেইগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশেরই উৎসস্থল এশিয়া-মাইনর।

৭। কাসতামনি বিলায়েত। J. Thury, A. Kasztamunni, i torok nyelvjaras, Budapest (Academy) 1885; কাসতামুনি উপভাষার ব্যাকরণের একটি রূপরেখা (পারিভাষিক শব্দাবলীসহ), সূত্র (গালিব, মুতায়াবাত-ই তুরকিয়ে, সংক্ষিপ্ত ঃ Kast. আরও তু. Cl, Huart, Un commentaire du Qoran en dialecte turc de Qastamouni (XVeme siecle), F. A., ser. 11, xviii (1921), p. 161-216।

৮। উত্তর-পূর্ব এশিয়া মাইনর। V. Pisasev, Njeskolko slov o trebizondskom dialektje (Zap, Vost. Otd. Imp. Russ. Arch. Obsc., xiii (1901), p. 173-201), সংক্ষিপ্ত ঃ Pis. : L. Bonelli, Voci del dialetto turco di Trebisonda, K. S., iii. (1892). p. 55-72; I. Kunos, Laz dalok, Nyclv. Kozl., xxii (1891), p. 275-298, ১১টি 'লায-তুর্কী গীতি এবং Samsun-Trebizond এলাকার লায-তুর্কী শব্দের একটি তালিকাসহ। সংক্ষিপ্ত ঃ লায; M. Rasanen, Eine Sammlung von Mani-Liedern aus Anatolien, F. S. F. O., xli (1926), Erzerum, Rize Trebizond সঠিক, নিখুঁত ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিলিপির আকারে জেলার ২৯০টি চতুষ্পদী কবিতাসহ। সংক্ষিপ্ত ঃ Ras (কবিতা ও কবিতার চরণ উদ্ধৃত); Balhassanoglu, Dialecte ture d' Erzerum, K. S., V. (1904)।

৯। কোনিয়া বিলায়েত। F. Giese,Erzahlungen und Lieder aus dem Vilajet Qonjah, Halle a. S.-New York 1907. সংক্ষিপ্ত ঃ G.; F. Vincze, Beitrage zur Kenntnis, des anatolischen Turkisch, K. S., ix. (1908), p, 141-179,-এ খোদ কোনিয়া শহরের উপভাষা বিষয়ে আলোচনা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। সংক্ষিপ্ত ঃ Vin. ।

১০। Antiturus অঞ্চল। D. Hamid Zubeir, Avsar Turk ayvtlaryna da' ir, Turk Furdu, May 1928, p. 21-24, Antitaurus-এর Avsar-গণের কথিত ayyt (dirges) -এর নমুনাসমূহ। সংক্ষিপ্তঃ Avs.।

১১। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া বরাবর সীমান্ত অঞ্চল। Balkanoglu, Dialecte turc de Kilis. K. S. iii. p. 261-273, উত্তর সিরিয়ার কিলিস (ক্লিস) জনগোষ্ঠীর কথ্য উপভাষার সংক্ষিপ্ত রূপরেখামূলক রচনা; ঐ লেখক, Dialecte de Behesni, K. S., iv. মারাস ও দিয়ারবাক্‌রের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কথ্য বেহেস্‌নি উপভাষা সম্পর্কিত; M. Hartmann, Zur turkischen Dialektkunde, K.S.. i (1900), p. 154-156, উত্তর সিরিয়ার 'উছমানী উপভাষা সম্পর্কিত কিছু টীকাভাষ্য (ক্লিস, আইনতাব); E. Littmann, Ein turkisches Marchen aus Nordsyrien, K. S., ii (1901); Felix v. Luschan, Einige turkische Volkslieder aus Nordsyrien, Zeitschrift fur Ethnologie, vol. xxxvi. (1904), p. 177-236। Aintab অঞ্চলের উপাদান–প্রধানত আর্মানী ভাষা হইতে গৃহীত।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জীমূলক রূপরেখা হইতে ইহা পরিষ্কার যে, য়ূরোপীয় ও এশীয় তুরস্কের অনেক গুরুত্বপূর্ণ এলাকার উপভাষাসমূহ সম্পর্কে এখনও কোন সমীক্ষা হয় নাই।

(৭) 'উছমানী তুর্কী ভাষা অঞ্চলের উপভাষিক বিভাগ

'উছমানী তুর্কী উপভাষাগুলির প্রচলিত সকল নাম, যেমন কাসতামুনি, লায-তুর্কী, কারামানি, খারপুত ইত্যাদি উপভাষার নাম হিসাবে কোনই মূল্য বহন করে না। এইগুলির সম্পর্ক কেবল ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ধারণার সহিত। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপভাষাগুলির সহিত ঐ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আঞ্চলিক পরিসীমার যোগসূত্রটি সর্বাগ্রেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে যদি উহার অস্তিত্ব আদৌ থাকিয়া থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, 'উছমানী তুর্কী ভাষার প্রধান বিভাজনের বেলায় রুমেলীয় ও আনাতোলীয়–এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কার্যত উপভাষাতাত্ত্বিক দিক হইতে ইহার কোনই মূল্য নাই, বরং উহা বিভ্রান্তিকর। য়ূরোপে (য়ূরোপীয় তুরস্কে) তুর্কী বসতি স্থাপনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত বিভাজন বিভ্রান্তিকর হিসাবে পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা আছে যে, এশিয়া মাইনর হইতে আগত কোনও কোনও জনগোষ্ঠী রুমেলিয়ার কয়েকটি এলাকায় বসতি স্থাপন করে ও উহার ফলে ঐসব এলাকার অধিবাসীদের উপভাষাগুলিতে আজও তাহাদের আনাতোলীয় আদি নিবাসের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

তবে আমরা এ যাবত যাহা কিছুই আলোচনা করিয়া থাকি না কেন, তাহার পরেও আমরা নিকট ভবিষ্যতে 'উছমানী তুর্কী উপভাষাসমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিভাজনের আন্তরিক ও সনিষ্ঠ উদ্যোগ নেওয়া হইবে–এমন আশা করিতে পারি না। এই যাবত এই ক্ষেত্রে যাহা কিছুই করা হইয়াছে তাহা কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যতার ভিত্তিতে বা বাস্তবতার নিরিখে করা হয় নাই, উহা বরং অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে করা হইয়াছে। উপভাষাগুলির ভিত্তিতে Kunos এশিয়া-মাইনরের যে বিভাজন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন সেই ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

Kunos (Kisazsia Torok dialectusairol, Budapest 1896) নিম্নবর্ণিত সাতটি উপভাষাকে সুনির্দিষ্টভাবে স্বতন্ত্র বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন ঃ (১) যেইবেক (Smyrna ও Brusa-র মধ্যবর্তী পশ্চিম আনাতোলীয় অঞ্চলে প্রচলিত); (২) কাসতামুনি (কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী মধ্যাঞ্চল); (৩) লায (ককেসাস অভিমুখী কৃষ্ণসাগরের পূর্ব উপকূল অঞ্চল); (৪) খারপুত (আরমেনীয় মালভূমি অঞ্চলবর্তী এশিয়া মাইনরের পূর্বাঞ্চল); (৫) কারামানি (Mersin ও কোনিয়ার মধ্যবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া মাইনর); (৬) অ্যাঙ্গোরা উপভাষা (এশিয়া মাইনরের প্রাণকেন্দ্র Kyzyl Yrmak উপত্যকা অঞ্চল); (৭) জুরুকুশ তুর্কোমান [যাযাবর জনগোষ্ঠীগুলির (asiretler) মধ্যে প্রচলিত ও উহারা এশিয়া-মাইনরের এক ব্যাপক অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে যাযাবর জীবন-যাপন করে]।

Kunos-এর মতে যেইবেক ও জুরুকুশ-তুর্কোমান উপভাষা দুইটি আদি তুর্কী অভিবাসীদের অমিশ্র, বিশুদ্ধ উপভাষা, বিশেষ করিয়া জুরুকব তুর্কদিগকে প্রাক-সালজুক তুর্কোমানদের ও যেইবেকদিগকে সালজুক তুর্কদের উত্তর-পুরুষ মনে করা হয়। অ্যাঙোরা উপভাষাটিকে আদিতম 'উ'ছমানী তুর্ক অভিবাসীদের ভাষার বিদ্যমান অবশেষ গণ্য করা হয়। অন্য চারটি উপভাষাকে এশিয়া মাইনরের মূল অধিবাসীদের তুর্কীকৃত উপভাষা বলিয়া গণ্য করেন। তাঁহার মতে এশিয়া মাইনরের মূল অধিবাসীদের মূল ভাষায় প্রভাবিত হওয়াই এই উপভাষাগুলির উদ্ভব ঘটিয়াছে। তাঁহার বিশ্বাস, কাসতামুনি উপভাষা, বিশেষত গ্রীক ভাষা, খারপুত কুর্দী ভাষা ও কারামানি আর্মানী ভাষা প্রভাবিত। আর লায উপভাষাটি কোনও এক 'ইন্দো-জার্মান (!) ভাষা দ্বারা প্রভাবিত যাহার অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় নাই।

এশিয়া মাইনরের উপভাষাগুলির এই শ্রেণীকরণের প্রয়াসটির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এই বিভাজনকে বেশ যুক্তিসংগত বলিয়াই মনে হয়।

কথ্য 'উছ মানী ভাষার স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি সংগ্রহের প্রথম সনিষ্ঠ প্রয়াস হইতেছে ঃ Jacob -এর নিবন্ধ [in Z. D. M. G., lii (1898), p. 695-729, Zur Grammatik des Vulgar Turkischen, J. Deny, in Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli), Paris 1920]। এই রচনায় 'উছমানী উপভাষাগুলির কতগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

(৮) উপভাষাসমূহ ও লিখিত ভাষা

লিখিত ভাষা সর্বদাই কথ্য উপভাষাগুলির উপর এক সমতাবিধায়ক প্রভাব হিসাবে কাজ করিয়াছে। এই লিখিত ভাষা Constantinople -এর শিক্ষিত শ্রেণীর ভাষার বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত এবং আদর্শ হিসাবে এই যাবতকাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণভাবে অনুশীলিত ও প্রচারিত।

এই ভাষা সম্পর্কে আমাদের অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত কেবল একটা অস্বচ্ছ ধারণাই ছিল। মাত্র কিছুকাল আগে Bergstrasser অন্তত ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক হইতে উল্লিখিত শিক্ষিত শ্রেণীর প্রাণবন্ত লিখিত ভাষাটির সংজ্ঞায়নের সনিষ্ঠ প্রয়াস শুরু করেন (G. Bergstrasser, Zur Phonetik des Turkischen nach gebildeter Konstantinopler Aussprache, Z. D. M. G., lxxii. (1918), p. 233-262)। ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, লিখিত ভাষাটির ধ্বনিবৈশিষ্ট্য সুষম নহে। আর সে কারণ Constantinople-এর শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উচ্চারণের বেলায় যথেষ্ট সতর্কতা ও সর্ব প্রকারের বাছবিচার প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য।

'উছমানী লিখিত ভাষার মূল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দুর্ভাগ্যবশত অতি সীমিত (উপরে তু.)। আমরা কেবল ইহাই ধরিয়া লইতে পারি যে, উত্তর আনাতোলিয়ায় দরবারী মহলের উপভাষা হইতে ধীরে ধীরে এই লিখিত ভাষার উদ্ভব ঘটিয়াছে। রাজধানী প্রথমে Constantinople ও উহার পরে Adrianople-এ স্থানান্তরিত হয় এবং লিখিত ভাষাটির বিকাশ প্রথমে Constantinople-এর উপভাষাগুলি দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়। তবে সে যাহাই হউক, লিখিত ভাষাটি প্রত্যন্ত পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের তুলনায় বসফোরাস ও মর্মর সাগর সংলগ্ন থ্রেস ও এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন উপভাষার অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

রচনাবলীর আদিতম নিদর্শগুলিতে প্রায়ই উপভাষাগত নানা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় আর সেইগুলির আভাস এখনও বিভিন্ন প্রচলিত উপভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পরিতাপের বিষয়, ঐগুলি সম্পর্কে পদ্ধতিসম্মত তেমন সমীক্ষা আজও শুরু হয় নাই।

লিখিত 'উছমানী তুর্কী ভাষা ও উহার সহিত অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও আধুনিক উপভাষাগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিলিপির আকারে বর্তমান প্রাচীন 'উছমানী রচনার যেইসব পাঠ রহিয়াছে সেইগুলির সমীক্ষা হইবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ [তু. K. Foy, Die altesten osmanischen Transcriptionstexte in gothischen lettern, M. S. O. S., 2nd part, iv. (1901), p. 230-277; v. (1902), p. 233-293 ও Dmitriyev, in Zapiski Kollegii vostokovedov, iii, (1928), p. 420]।

(৯) 'উছমানী তুর্কী উপভাষাসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

'উছমানী ভাষার বিভিন্ন উপভাষার মধ্যকার পার্থক্যগুলি সাধারণত খুব বড় কিছু নহে। তুর্কী ভাষাগুলির মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য না থাকাও ইহার অন্যতম কারণ। বর্তমানে যে অঞ্চল জুড়িয়া তুর্কী ভাষায় কথা বলা হইয়া থাকে সেই গোটা অঞ্চলে এমন দুইটি স্থান খুঁজিয়া পাওয়া খুবই কঠিন যে, দুই স্থানের লোকজন একে অপরের ভাষা বুঝিবে না।

কোনও ধ্বনির সামান্য ভিন্ন ধরনের উচ্চারণের মাঝেই প্রধানত বিভিন্ন উপভাষার পার্থক্যটি নিহিত। কোনও কোনও উপভাষায় ধ্বনি বদলায়। শব্দাবলীর পার্থক্যটি তেমন বড় কিছু নহে। শব্দরূপগত পার্থক্যগুলিও উল্লিখিত কারণে স্বাভাবিকভাবেই খুবই সামান্য। অনেক অনুসন্ধানী গবেষক ইতিমধ্যেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, উপভাষাগুলির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে সমরূপত্ব খুবই কম। সর্বত্রই লক্ষ করা যায়, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন ধ্বনির উচ্চারণ ও সেই সঙ্গে ব্যাকরণের আঙ্গিক ব্যবহারে যথেষ্ট তারতম্য হয়। আর এই কারণেই আমরা এই ক্ষেত্রে যেসব দলীলপত্র সংগ্রহ করিয়াছি অর্থাৎ বিভিন্ন

উপভাষার যেইসব প্রামাণিক দলীল সংগ্রহ করিয়াছি সেইগুলি উল্লিখিত ধরনের সঙ্গতিতে পূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রে যাঁহারা ঐগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের অসতর্কতার জন্যও উহা ঘটিয়াছে। এই দলীলপত্রগুলি প্রকৃত অবস্থার মোটামুটি একটা সত্যিকার পরিস্থিতি তুলিয়া ধরে। যেই তারতম্যের বিষয় উল্লেখ করা হইল সেইগুলি বিভিন্ন উপভাষা মিশ্রণের একটা প্রাগ্রসর পর্যায়ের অনিবার্য কারণেই হয় বলিয়া ধরিতে হইবে। আর এই বিষয়টি প্রায় সচরাচর ব্যাপার।

আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, তুর্কী জনগোষ্ঠীর নানা ধরনের লোক যাহারা মাত্র কিছুকাল আগেও যাযাবর ছিল—এক বিরাট অঞ্চলে তাহাদের গতিবিধি ছিল। সম্ভাব্য সকল তুর্কী এলাকা হইতে বহু লোক যাহারা অধিবাসী হিসাবে আসিয়াছে তাহারা বহুকাল হইতেই প্রথম দিকের ভাষাগত মানচিত্রটি, বিশেষ করিয়া এশিয়া মাইনরের ভাষাগত মানচিত্র ভাঙ্গিতে শুরু করিয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসর আগেও একটা মেয়াদে বলকান হইতে আনাতোলিয়ায় ব্যাপক সংখ্যায় উদ্বাস্তুকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভাষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের মধ্যে সম্ভাব্য সর্বাধিক সমরূপত্ব অর্জনের জন্য রিপাবলিকান সরকারের লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত ব্যবস্থা প্রধানত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামরিক সার্ভিসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হইতেছে। এই ক্ষেত্রে স্পষ্টত ও অনিবার্যভাবেই স্থানীয় উপভাষাগুলি ভাঙ্গিয়া ধ্বংস হইতেছে।

ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে উপরে যাহা বলা হইয়াছে উহা মনে রাখিলে বর্তমান উপভাষাগুলির বিভ্রান্তিকে স্বাভাবিক না ধরিয়া উপায় নাই।

তুর্কীদের উচ্চারণ শৈথিল্য এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আর স্বতন্ত্র ধ্বনিগুলির উচ্চারণ তারতম্যের জন্য অন্তত কিছু মাত্রায় এই উচ্চারণ তারতম্যকে দায়ী করা যায়। উচ্চারণ স্থান এবং বাক বা স্বরযন্ত্রের উন্মোচন ও প্রসারণেও যথেষ্ট অবকাশ ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। আমি এইখানে মাত্র একটি অত্যন্ত শিথিল ও বিভিন্ন ধরনের উচ্চারণের বিষয়ের নজীর হিসাবে উল্লেখ করিব ঃ—এই বর্ণটি উচ্চারিত হয় জিহ্বাগ্রে ও উহার উচ্চারণ অত্যন্ত শিথিল ও জিহ্বাগ্রে উচ্চারিত হইয়া থাকে (Bergstrasser, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১)।

উচ্চারণের সত্যিকার অসঙ্গতি নজীরগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি লিপিবদ্ধকারীর উচ্চারণ সঙ্কেত দানের ভুল বা ভুল নহে, তাহা সতর্কতার সহিত আলাদাভাবে চিহ্নিত করিতে হইবে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে যে, একটি ধ্বনি প্রকৃতপক্ষে সমরূপাত্মক হইলেও লিপিকার উহার প্রতিলিপি বিভিন্ন ভাগে করিয়াছেন। যেমন e-এর উচ্চারণ সঙ্কীর্ণ হইলেও অনেক সময় উহা 'e' বা 'i' হিসাবে অথবা ঈষৎ ওষ্ঠ্য 'ü'-কে কখনও 'u' বা y হিসাবে লেখা হয়।

(১০) সমাপনী মন্তব্য

কঠোর বিজ্ঞানসম্মত ধারণায় উপভাষাগুলির ঐক্যের বিষয় বলা সম্ভব নহে। এই কারণে বিভিন্ন ভাষাগত (প্রধানত ধ্বনাত্মক চরিত্রের) দলীলসমূহের একটা সুশৃঙ্খল বিন্যাসেই তুষ্ট থাকিতে হইবে। ভাষাগত দলীল-প্রমাণগুলির বিষয় লিখিত ভাষা হইতে ভিন্ন এবং ঐ দলীলসমূহের ভিন্নতাগুলির বিভিন্ন সমন্বয়-সমাবেশই বিভিন্ন উপভাষার স্বাতন্ত্র্যকে তুলিয়া ধরে। এই ধরনের বিভিন্নতাগুলির এলাকাওয়ারী বণ্টন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। আর সেই কারণে বিষয়টিকে ভবিষ্যতের হাতেই ছাড়িয়া দিতে হইবে, যখন পদ্ধতিসম্মত সমীক্ষা অনুসন্ধানের সুবাদ 'উছমানী ভাষাভাষী অঞ্চলের মানচিত্রে নিখুঁত বিশদ তথ্য উহার শূন্য স্থানগুলি পূরণ করিবে।

আমরা 'উছমানী তুর্কী ভাষার ইতিহাসগত ব্যাকরণ সম্পর্কে কিছু জানি না। এইজন্য কালপঞ্জীমূলক প্রশ্নে মাথা না ঘামাইয়া আমাদের বাহ্যত উচিত হইবে আমাদের সংগৃহীত উপাদানগুলির সাহায্যে বাস্তব তথ্যগুলির চয়ন ও বিন্যাস করা।

৩। 'উছমানী তুর্কী সাহিত্য (রচাবলী)

আজ সাধারণত যেসব সাহিত্য কর্ম বা সাহিত্যকে 'উছমানী সাহিত্য নাম দেওয়া হয় ঐ সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে ওগুয তুর্কগণের। ওগুয তুর্কগণ সালজুক আমলে এশিয়া মাইনরে বসতি স্থাপন করে ও ৩য় রূমের 'উছমানী আমলে তাহারা তথায় এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য কায়েম করে। সালজুক আমল হইতে অদ্যাবধি উল্লিখিত সাহিত্যে যে নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ ঘটিয়াছে উহা আজও অপেক্ষাকৃত পুরাতন উপভাষাসমূহের বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত ও সকল কাল পরিক্রমায় উল্লিখিত সকল উপভাষার সহিত সম্পর্কিত রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া ১৪শ শতক হইতে তুর্কী 'উছমানী শাখা তুর্কী সাহিত্যের অন্য সকল শাখার তুলনায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পদশালী। 'উছমানী শাখা অন্যান্য তুর্কী উপভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমরা অবশ্য নিবন্ধের এই পরিসরে কেবল এই সাহিত্যের সাধারণ বিবর্তনের প্রধান প্রধান শাখা ও মুখ্য ব্যক্তিত্বের উল্লেখসহ একটি রূপরেখা প্রদান করিব। আমরা আমাদের আলোচনা কেবল উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমিত ধ্রুপদী সাহিত্য অঙ্গনেই সীমিত রাখিব না, বরং ঐ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ ও সেই সঙ্গে গণমানুষের সাহিত্য তথা কবি, সঙ্গীতকার (saz sha'irleri) ও বিভিন্ন মরমী সম্প্রদায়ের সাহিত্যকীর্তি লইয়াও আলোচনা করিব। 'উছমানী তুর্কী সাহিত্যের যে যে বিষয়ে সন্তোষজনক সমীক্ষা হয় নাই কিংবা যেইগুলি বিশ্বের সুধীজনের নিকট সুপরিজ্ঞাত নহে, সেইগুলি লইয়াও আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সুপরিজ্ঞাত বিষয়গুলির খুঁটিনাটিতে আমরা এখনও মনোনিবেশ করিতে পারি নাই, বরং আমরা এক্ষণে নিজদিগকে একটা কৃত্রিম উপস্থাপনায় সীমিত রাখিয়াছি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ১৩শ ও ১৪শ শতকে এই সাহিত্যের জন্য কিছুটা কম পরিজ্ঞাত কাল হইলেও অন্যান্য শতকের অনুপাতে এই দুই শতক সম্পর্কে অধিকতর সামগ্রিক উপস্থাপনা ঘটিয়াছে। অজ্ঞাত নানা বিষয় সম্পর্কে অধিকতর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য ইহা প্রয়োজন, আর এই কারণে কোনক্রমেই এই সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনাকে বিষম আনুপাতিক বিবেচনা করা যাইবে না। আমরা 'উছমানী সাহিত্যকে তিনটি বৃহৎ কালপর্যায়ে ভাগ করিয়াছি। কালপর্যায়গুলি তুরস্কের ইতিহাসের সাধারণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ঃ

(ক) ১৩শ শতক হইতে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি অবধি অর্থাৎ তানজীমাত (দ্র.) আন্দোলন অবধি মুসলিম সাহিত্য;

(খ) তানজীমাত আমল হইতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিকাশ অবধি য়ুরোপীয় সাহিত্য; এবং

(গ) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে উদ্ভূত জাতীয় সাহিত্য। আমরা বিতর্কসাপেক্ষ পর্যায় বিভাজন এড়াইবার জন্য কালপঞ্জীক্রমে ঐ তিন পর্যায়ের আলোচনা করিব।

মুসলিম তুর্কী সাহিত্য

আনাতোলিয়া ১১শ শতকে সালজুকদের পদানত হয়। ঐ সময় ঐ অঞ্চলের ক্রমান্বয়ে তুর্কীকরণ ঘটে ও আনাতোলিয়াবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে। অবশ্য ১৩শ শতকেও এশিয়া মাইনরের গ্রাম ও শহরগুলিতে

যথেষ্ট অনুপাতে গ্রীক ও জার্মানদের বসতি ছিল (Pauthier, Le Livre de Marco Polo, Paris 1865, p. 33-39)। তুর্কগণের যাহারা এশিয়া মাইনর নিবাসী হইয়াছিল তাহারা তুর্কদের বিভিন্ন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে ওগুযগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় ওগুয উপভাষাটিই সাহিত্যের ভাষার বুনিয়াদ হইয়া উঠে এবং এশিয়া মাইনরে উহা পূর্ণাবয়বে বিকশিত হয়। ১০ম শতকের আগেই ওগুয উপভাষা অন্যান্য তুর্কী উপভাষা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উঠে এবং ততদিনে একটি সমৃদ্ধ জনপ্রিয় সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গাযনাবী আমলে রচিত কিছু ওগুয কবিতার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা অবহিত (কোপরুলু-যাদে, এম. ফু'আদ, গাযনাবী দেওরিন্দে তুর্ক শি'রি এদেবিয়াত ফাকুলতাসী মেজমূ'আসী, ৭খ, নং ২, পৃ. ৮১-৮৩)।

এশিয়া মাইনরে আসিয়া বসতি স্থাপনকারী ওগুযগণ এই সাহিত্য ঐতিহ্যের সকল উত্তরাধিকার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অন্যান্য উপভাষায় সাহিত্যকর্মও ঐ সঙ্গে আসিয়া পড়ে (এই সম্পর্কে তু. কোপরুলু-যাদে এম. ফু'আদ, তুরক এদেবিয়ানিতদা ইলক মুসতাওবিফলার, Constantinople, ১৯১৯ খৃ.)।

এই সব কিছুর প্রভাবে সাধারণ সাহিত্যের পাশাপাশি একটি লিখিত সাহিত্যও ক্রমশ গড়িয়া উঠে। এই লিখিত সাহিত্যের সূচনা ১৩শ শতকের আগেই হইয়াছিল কিনা তাহা আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানি না। আমরা কেবল জানি যে, ১৩শ শতকে সালজূক আমল হইতেই এশিয়া মাইনরের বড় শহরগুলিতে ইসলামী কৃষ্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সালজূক শাসকগণ দানিশমানদীদের উৎখাত ও ক্রুসেডারগণকে পরাজিত করিবার পর এশিয়া মাইনরের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। এই আন্দোলনের কীর্তিগুলিকে সাহিত্যিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে উহা অংশত আরবী ও প্রধানত ফারসীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। কাজেই এই বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই যে, সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিবার জন্য আনাতোলীয় তুর্কী ভাষাকে আরবী ও ফারসীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়িতে হইয়াছে। ধর্মীয় ভাষায় আরবীর প্রাধান্য ও আধিপত্যের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট; ইহা মাদ্‌রাসা শিক্ষারও বাহন। 'আব্বাসী খলীফাগণ এবং আয়্যূবী ও মামলূক শাসকদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আরবী ব্যবহৃত হইত। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ফলক ও স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি ও ওয়াক্‌ফ দলীলের লিপি হিসাবেও এই শতক ও পরবর্তী শতকগুলিতে আরবী ব্যবহৃত হয়। ফারসীর প্রভাব ছিল আরও ব্যাপক। সুলতানগণ, নানা বিদ্বজ্জন ও শাসকদের সঙ্গী-অনুগামী রাজপুরুষগণ ফারসী ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ফারসী কাব্য চর্চা চলিত। একইভাবে দেখা যায়, মোঙ্গল আমলের কোনও কোনও দলীলে বিরল ঘটনা হইলেও কিছু কিছু মোঙ্গল বাক্যাংশ সন্নিবেশিত, কিন্তু উহাও উইগুর লিপিতে লিপিবদ্ধ। এইসব সত্ত্বেও সরকারী কাজকর্ম ও রাষ্ট্রীয় দলীলগুলিতে আরবীই ছিল প্রধান ভাষা।

সম্ভবত জনসাধারণের সঙ্গে কাজকর্মেই তুর্কী ভাষার ব্যবহার সীমিত ছিল। ৬৭৬/১২৭৭ সালে কারামান ওগলু মুহাম্মাদ বে কোনিয়া জয় করার পর তিনি সরকারী সচিবালয়ের কাজ তুর্কী ভাষায় সম্পাদনের নির্দেশ দেন। কথিত আছে, তিনি কয়েকজন লিপিকারকে হত্যার নির্দেশ দেন এবং উহা কার্যকর করা হয় (তু. সায়্যিদ লুকমান, ইজমান-ই আল-ই সালজূক; J. J. W. Lagus Seid Locmani ex libro turcico qui Oghuzname inscribitur excerpta, Helsingfors 1854, p. 13)।

ইব্‌ন বীবীর বিবরণ অনুযায়ী তুর্কী ছাড়া অন্য কোনও ভাষার ব্যবহার কেবল সরকারী কাজকর্মেই নহে, বেসরকারী ক্ষেত্রেও নিষিদ্ধ ছিল (সালচূক-নামে; আনাতোলিয়া পাণ্ড. নং ২৮৯৫)। তাঁহার এই স্বল্পমেয়াদী শাসনামলে তুর্কী ভাষাকে প্রদত্ত গুরুত্ব হইতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তুর্কী ভাষা ঐ সময় নাগাদ অন্য সকল ভাষার উপর প্রাধান্য লাভ করে। আমরা যদি মনে রাখি যে, মাত্র ১৫শ শতক হইতে এশিয়া মাইনরে ধর্মীয় আদালতে তুর্কী ভাষার ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হয় এবং ১৮শ শতকের বাগদাদের রাষ্ট্রীয় সচিবালয়ের রেজিস্টারগুলিতে ফারসী ভাষার ব্যবহার বলবৎ ছিল, তাহা হইলে প্রকৃত পরিস্থিতি আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে। অবশ্য ইহাও ঠিক যে, ১৩শ শতকের শেষ নাগাদ তুর্কী ভাষা গুরুত্ব পাইতে শুরু করে (তু. T. O. E. M., No. 17-94, 1926)। এই শতকেই সালজূক রাষ্ট্রীয় সচিবালয়ে "সিয়াকাত" লিপি ব্যবহৃত হয় এবং ইহা ছাড়া সংশ্লিষ্ট সচিবালয়গুলিতে এক বিশেষ ধরনের লিখন পদ্ধতিও অনুসৃত হয়। অন্যদিকে তুর্কী ভাষায় লিখিত দলীলগুলিতে আরবী নিয়ম অনুযায়ী কখনও হরফ দ্বারা স্বরধ্বনিগুলি চিহ্নিত করা হইত না; কেবল স্বরচিহ্ন দেওয়া হইত। ইহা হইতে বুঝা যায় ঐ সময় আনাতোলিয়ার তুর্কদের মধ্যে পুরাতন উইগুর লিপি ঐতিহ্যের স্মৃতিটিও সম্ভবত লুপ্ত হইয়াছিল।

আর এইসব অবস্থার প্রেক্ষাপটেই ১৩শ শতকের কাল পরিক্রমায় তুর্কী সাহিত্যের রচনাবলী প্রকাশিত হয়। ইহার অতি ক্ষুদ্রাংশই আধুনিক কালে আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমাদের হাতে যেইসব রচনা পৌঁছে নাই অথচ ঐতিহাসিক সূত্রগুলিতে যেইগুলি সম্পর্কে অবহিত হইয়াছি সেইগুলি হইতেছে ঃ কাব্যে রচিত শায়খ সান'আনের কাহিনী, যাহা একজন অজ্ঞাতপরিচয় কবি কর্তৃক রচিত; সালসালনামে, ইহা গদ্য ও পদ্যে শায়্যাদ 'ঈসা নামে জনৈক কবি রচিত, যাহাতে সালসালনামে এক দৈত্যের সহিত 'আলীর লড়াইয়ের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। দানিশমেন্দনামে, রচনা কাল ঃ ৬৪৩/১২৪৫। সালজূক শাসক মালিক 'ইয্যু'দ-দীন কায়কা'উস ইব্‌ন্ গিয়াছু'দ-দীন এর আদেশে সালজূক সুলতানের সচিব ইব্‌ন 'আলা ইহা রচনা করেন। ১৩শ শতক হইতেই সায়্যিদ বাততাল রচিত কাহিনীগুলির অস্তিত্ব মিসরে সুপরিজ্ঞাত। সম্ভবত এই কাহিনীগুলি ১৩শ শতকে তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। বস্তুত বাততাল-নামে ও দানিশমেন্দ নামে মালিক দানিশমেন্দ আহমাদ গাযীকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হয়। এই বীর এশিয়া মাইনরে সালজূক দখলের প্রথম দিকে আগমন করেন ও দানিশমান্দী শাসক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লিখিত সাহিত্য কীর্তিগুলি কার্যত এশিয়া মাইনরে মুসলিম ও বায়যান্টীয়দের মধ্যকার দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি।

১৩শ শতকের আনাতোলিয়ার আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করিয়া প্রথম মোঙ্গল আক্রমণের ফলে সৃষ্ট বৈষয়িক ও নৈতিক সঙ্কট সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে মরমীবাদী চেতনার বিকাশ ও প্রসারে অনুকূল হয়। পূর্বাঞ্চল হইতে এই অঞ্চলে হায়দারী ও য়েসেবী দরবেশদের আগমন ঘটে। তাঁহারা এশিয়া মাইনরে মরমী কাব্যের আমদানি করেন, যাহার পরিচয় ঘটে আহমাদ য়েসেবী ও তাঁহার অনুসারীদের তুর্কী মরমী কবিতায়। আরবী ও ফারসী মরমীবাদের প্রভাবে তুর্কী মরমী সূফীগণ তাঁহাদের অনুসারী সংখ্যা বৃদ্ধির মানসে তাঁহাদের রচনার মাধ্যম হিসাবে তুর্কী ভাষা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। আর এই কারণেই জালালু'দ-দীন রূমীও যৎসামান্য সংখ্যায় কবিতা তুর্কী ভাষায় রচনা করেন। ইহা ছাড়া সুলতান ওয়ালাদও তুর্কী কবিতা রচনা করেন। অতি সাম্প্রতিক কাল অবধি এইগুলিই সালজূক সাহিত্যের গোটা অবয়ব বলিয়া জানা ছিল। এইখানে আমরা কোনিয়ার আহমাদ ফাকীহের কথাও উল্লেখ করিতে

পারি। তিনি ঐ শতকের গোড়ার দিকে জীবিত ছিলেন। তিনি বেশ একটি দীর্ঘ পরিসরের মরমী মাছনাবী রচনা করিয়াছিলেন। উহার পাণ্ডুলিপিটি এখনও আমাদের হাতে বর্তমান (তু. কোপরুলু-যাদে এম. ফু'আদ, Anatolische Dichter in der Seldschukenzeit Korosi Csoma Archiv, ii)। তাঁহার আরও কিছুকাল পরে আরও একজন সূফীর কথা আমরা জানি। তাঁহার নাম শায়্যাদ হামযা (দ্র.)। আমরা তাঁহাকে আহমাদ ফাকীহের মুরীদ বলিয়া গণ্য করিতে পারি। এই কবিগণ তাঁহাদের কবিতাগুলি 'আরূয মিত ছন্দে পারস্য দেশীয় সূফীদের অনুকরণে রচনা করেন। তবে এশিয়া মাইনরের মরমী আন্দোলন কেবল অনুকারী ও মৌলিকত্বহীন রচনাতেই সীমিত ছিল না, বরং এক নূতন ধরনের কাব্য সৃষ্টিতেও নিয়োজিত হয়, যাহা মৌলিক ও বিশুদ্ধ তুর্কীতে জনসাধারণের ভাষায়, আক্ষরিক মাত্রায় ও লোকরঞ্জক সাহিত্যের উপযোগী আকারে রচিত। য়েসেবী ও তাঁহার অনুসারিগণ এই শেষোক্ত ধরনের কবিতার উন্মেষে বিরাট প্রভাব রাখিয়া যান। সাহিত্যিকদের এই প্রজন্মের মহত্তম প্রতিনিধি ছিলেন য়ূনুস ইমরে। ১৪শ শতকেও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যকীর্তি ছিল মূলত গণ-চরিত্রের, উহা তুর্কী ভাষায় রচিত। তাঁহার রচনায় মুসলিম নব্য-প্ল্যাটোবাদী চিন্তাধারাটি স্পষ্ট করিয়া চিনিতে পারা যায়, যাহা (দৃষ্টান্ত হিসাবে) জালালুদ-দীন রূমীর মরমী দর্শন হইতে আদৌ ভিন্ন নহে। আর উহার সহিত সমাবেশ ঘটিয়াছে লোকরঞ্জক উপাদান, যাহা ঐ সাহিত্য কর্মের ভাষা, শৈলী ও ছন্দমাত্রা নির্ধারণ করিয়া দেয়; য়ূনুসের মরমী কবিতাগুলির মধ্য দিয়া জনগণের ভাষায় ও লোকপ্রিয় অক্ষর মাত্রায় (মিতছন্দে) কাব্য রচনার এমন একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠে যাহার স্বকীয় ক্ষমতা, এমন কি ফারসী প্রভাবের চরম বিকাশের যুগেও ম্রিয়মাণ হইয়া যায় নাই। জনগণের উপরে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে পরের দশকগুলিতে এশিয়া মাইনরের উদ্ভূত বিভিন্ন রক্ষণবাদী ও উদারনৈতিক সূফীগণ য়ূনুসের অনুসরণে লোকপ্রিয় কবিতা রচনা করেন। শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বেকতাশী, হুরূফী ও কিযিলবাশ কবিগণ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে তাহাদের কাব্যকর্মে য়ূনুসকে অনুসরণ করেন।

ফারসী সাহিত্যের প্রভাবে আমরা ১৩শ শতকে আনাতোলিয়ায় এক ধরনের ধর্ম-বিরোধী কবিতার উন্মেষ লক্ষ করি। ঐ সময় উচ্চ শ্রেণীর লোকজন পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন ও বিলাসী জীবন-যাপন করিতেন। আর উহার প্রভাবেই উল্লিখিত ধরনের কবিতা উৎসাহিত হয়। মোঙ্গল শাসনাধীনে এই ধরনের কাব্যান্দোলন আরও জোরদার হয়। সালজূক শাসকদের রাজদরবারে ফারসী সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় সারল্য ও নীতিবিযুক্ত এক ধরনের ইহবাদী কাব্য ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। এই কাব্যধারার প্রথম প্রতিনিধি হইতেছেন কবি খাওয়াজা দাহহানী। খুব সম্ভবত এই ধারার কাব্য সাহিত্য চর্চা ১২শ শতকের গোড়ার দিকে পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর তাই দাহহানীর আগেই আনাতোলিয়ায় তাঁহার কাব্যধারার প্রতিনিধি বর্তমান ছিলেন; কেননা তাঁহার রচিত কবিতাগুলি প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণের বিচারে বেশ নিখুঁত শৈলীর ও উচ্চ মানের। আর এই কারণেই তুর্কী ইহবাদী কবিতার উন্মেষকাল বায়াযীদ য়িলদিরিমের সময় অবধি অনুসন্ধান করিতে যাওয়া 'উছমানী সাহিত্যের ইতিহাসের য়ূরোপীয় ও তুর্কী লেখকদের জন্য ভুল হইবে। দাহহানী তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শাসক ৩য় 'আলাউদ-দীনের শাসনামলে তাঁহার নির্দেশে সালজূকদের একটি শাহনামা ফারসীতে রচনা করেন। তিনি নিজে খুরাসানের একজন তুর্কোমান ছিলেন। উপভাষাগত দিক হইতে তাঁহার রচনার ভাষায় আনাতোলিয়ার ওগুয উপভাষার সকল বৈশিষ্ট্য পরিদৃশ্যমান। দৃষ্টান্ত হিসাবে দাহহানীর রচনা ও তাঁহার সমসাময়িক সুলতান ওয়ালাদের তুর্কী ভাষার রচনার মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যাইবে কবি কতখানি সাফল্যের সহিত 'আরূজ' মিতছন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে তাঁহার রচনাবলীর কোনও স্থানেই আমরা মরমী প্রভাবের আভাস পাই না (তু. Dahhani সম্পর্কে এই নিবন্ধকারের নিবন্ধ ঃ প্রকাশনা ঃ Hayat, No. 1 দ্র.)।

এই সময় আনাতোলিয়ার জনসাধারণ ও যাযাবর উপজাতিগুলির মাঝে লোকপ্রিয় সাহিত্যের উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত। কেননা পূর্ববর্তী শতকগুলিতেও এ ধরনের সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। ইহা ছাড়া সেইখানে জনগণের মাঝে কিছু চারণ কবিও থাকার কথা। ওগুযগণ এই চারণ কবিদিগকে ওযান নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই ওযানগণ বিভিন্ন জনসমাবেশ, যাযাবর অবস্থান ও গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেন। সালজূক সেনাবাহিনীতেও ওযান ছিল। তাহারা Dedekorkud-এর কাহিনীগুলির মত প্রাচীন ওগুয মহাকাব্যের অংশবিশেষ গানের মত আবৃত্তি করিয়া শুনাইত। লোকপ্রিয় সাহিত্যের এইসব রচনা হইতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী লোকপ্রিয় তাল ও ছন্দে এবং প্রাচীন অতীতের ঐতিহ্যিক আঙ্গিকে সুর করিয়া আবৃত্তি করা হইত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই আঙ্গিকগুলির নামকরণের মাঝে জাতিগোষ্ঠীতাত্ত্বিক উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়–যেমন, তুরক (দ্র. তুর্কমানি, ওয়ারসাগি), অন্যান্য যেমন, কাশমা, দেয়িশ, কায়া বাশী ইত্যাদিতে এইগুলির লোকচরিত্র ফুটিয়া উঠে কিংবা ঐ নামগুলি হইতে বুঝা যায়, ঐ অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে সর্বদাই একটি মিঠা সুর বা সুরমূর্ছনা অবিচ্ছেদ্যভাবে বর্তমান। এইসব লোকপ্রিয় কবিগণ সাধারণত তাঁহাদের কাব্যানুশীলনের সময় kobuz নামে প্রাচীন তুর্কী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিতেন।

১৪শ খৃ. শতক

আমরা দেখি, ১০ম শতকে সূচিত সাহিত্য বিকাশের অভিন্ন ধারায় ১৪শ শতকেও সাহিত্য সৃষ্টি চলিতে থাকে। এশিয়া মাইনরের রাজনৈতিক বিভক্তি সত্ত্বেও আর্মানী ও গ্রীকদের প্রতিকূলে ঐ অঞ্চলে মুসলিম ও তুর্কী কৃষ্টির প্রসার ঘটিতে থাকে। আনাতোলিয়ার পশ্চিম প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত 'উছমানী রাজ্যটির পরিসীমা মর্মর সাগর কূল অবধি বিস্তৃত হয়। ঐ শতকের শেষ নাগাদ রাজ্যটি আনাতোলিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আবারও একবার তুর্কদের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বায়যান্টীয়, সার্ব, বুলগার ও পরিশেষে Nicopolis -এর রণক্ষেত্রে য়ূরোপের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যটি একটি বিশাল ও পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদ কায়েম করে।

এশিয়া মাইনরের কিছু বে'র কোনও ফারসী বা আরবী কৃষ্টির পটভূমি ছিল না। আর এই কারণেই জনগণের ভাষা প্রধান হইয়া উঠে, গ্রন্থাদি তুর্কী ভাষায় লিখিত হয় এবং আরবী ও ফারসীতে রচিত বেশ কিছু রচনা তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। তুর্কোমান বে'গণের দরবারে তুর্কী ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কেও তুর্কী ভাষায় কাব্যানুশীলনকারী কবিদের সম্পর্কে ইব্ন বাততূতা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক টীকাভাষ্য প্রদান করিয়াছেন।

আমরা জানি, ১৫শ শতকে কোনিয়া, Nigde, লাদিক, কাসতামুনি, সিনূব, সিবাস, কীর শেহরী, বুরসা ও ইযনিক নামক স্থান (কেন্দ্র)-গুলিতে তুর্কী ভাষায় গ্রন্থাদি রচিত হয়। এই আমলের বহু রচনা হারাইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে কবিদের জীবনের জীবনীকারগণের (তেযকেরে-ই গু'আরা) রচনাগুলি ১৬শ শতকে প্রকাশিত হইতে শুরু করে। ঐ জীবনীগুলিতে এই প্রাচীন কালের খুব কম তথ্যই পাওয়া যায়।

তাহা ছাড়া রচনার সিংহভাগের লেখাই ত্রুটিযুক্ত। আমরা ঐসব সূত্র হইতে নিম্নবর্ণিত রচনাবলীর তথ্য পাইয়াছি ঃ

(১) ইনান্‌জ ওগলু দেনীযলী ও লাদিক (১২৭৭-১৩৬৮ খৃ.) অঞ্চলে।

একজন অজ্ঞাত লেখক রচিত সূরা ফাতিহার তাফসীর (পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার) ও সূরা ইখলাসের তাফসীর (পাণ্ডু. আঙ্গোরা) সম্ভবত একই লেখকের লেখা। তিনি মুরাদ আরসূলান বে ইব্‌ন ইনান্‌জের (মৃ. ৭৬৩ হিজরীর আগে) নির্দেশে ইহা রচনা করেন। এই শাসক বংশের সহিত মাওলাবী (Mewlawis) সূফী সাধক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিল। উল্লিখিত লেখক খুবই শ্রদ্ধাসহকারে জালালুদ-দীন রূমী সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা আরও একজন কবি সম্পর্কে জানি। তাঁহার নাম ছিল মু'আর্‌রিফ লাদিকী। তিনি লাদিকের (ilk Mutasawwfler, p. 263) অধিবাসী ছিলেন। আরেকজন কবির নাম ঃ নাকীব ওগলু। তিনি কাব্যে রচিত হাসান ও হুসায়ন (রা) কাহিনীর রচয়িতা (Millet Kutubkhanesi, 1518)। সম্ভবত তিনিও উল্লিখিত একই শহরের অধিবাসী। আমার ধারণা চেলেবি "আরিফের (মৃ. ৭১৯ হি.) সমসাময়িক হিসাবে আফলাকীর (Les Saints des Derviches tourneurs, অনু. Huart, ii 329) লেখায় যে নাকীব ওগলুর উল্লেখ রহিয়াছে তিনি এবং এইখানে আলোচ্য নাকীব অভিন্ন ব্যক্তি।

(২) আয়দিন ওগলু (১৩০৭-১৪০৩ খৃ.)।

বুরসার উলু জামি' গ্রন্থাগারে কিসাস-ই আওলিয়া নামে একটি গ্রন্থ রহিয়াছে। ইহার প্রথম অংশটি হারাইয়া গিয়াছে। মা'আরিফ বিকালেতি সম্প্রতি ইহার একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। উহা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি, গ্রন্থটি আয়দিন ওগলু মাহমূদ বে'র (৭০৭-৭৩৪ হি.) জন্য অনূদিত হয়। ইহার গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই। আরেকটি রচনার নাম ঃ কালীলা ওয়া দিমনা। মাহমূদ বে'র পুত্র বিখ্যাত উমূর বে'র জন্য জনৈক মাস'ঊদ ইহা অনুবাদ করেন। রচনার তারিখ ৭৩৪ হি. সনের আগে (তুর্কী পাণ্ডুলিপিসমূহের Bodelian সংগ্রহশালার সংগ্রহে ইহার একটি পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, Marsh 180; ইহার আরও একটি কপি রহিয়াছে Laleli Library-তে, নং ১৮৯৭)।

(৩) মেনতেশে ওগলু (১৩০০-১৪২৫ খৃ.)।

Hammer-এর প্রকাশনার (Falknerklee) সুবাদে বারজিনের মাহমূদ ইব্‌ন মাহমূদ ফারসী হইতে অনূদিত একটি বাযনামে-এর অস্তিত্বের বিষয় আমরা অবগত হইয়াছি। ইহা অনুবাদক মাহমূদ বে'র (১৫শ শতকের মধ্যভাগে) জন্য অনুবাদ করেন। হাজ্জী খালীফা উল্লেখ করিয়াছেন, ইল্‌য়াস ইব্‌ন মাহমূদ বে'র জন্য মাহমূদ ইব্‌ন মাহমূদ শীরওয়ানী আরবী 'ইল্‌য়াসিয়ে' শীর্ষক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে তিনি ইল্‌য়াস বে'র নির্দেশে তুর্কী ভাষায় ইহা অনুবাদ করেন এবং ভাষাটি স্থূল বলিয়া উল্লেখ করেন।

(৪) জেরমিয়ান ওগলু (১৩০০-১৪২৮ খৃ.)।

এই মর্মে লিখিত দলীল আছে যে, কাবূসনামে ও মারযুবাননামে দুইটি গ্রন্থ মাহমূদ বে' শাসক বংশের (৭৭০-৭৯০ হি.) সুলায়মান শাহের জন্য তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। কিন্তু ইহার কোন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব আছে বলিয়া জানা নাই (তু. আহমাদ তাওহীদ, T. O. E. M., No. 8)। শায়খ ওগলু তাঁহার মহৎ মাছনাবী কাব্য ঃ খুরশীদনামে রচনার ভূমিকাতেই কেবল উল্লিখিত গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) হামীদ ওগলু (১৩০০-১৩৯১ খৃ.)

অ্যাঙ্গোরার গ্রন্থাগারে একটি পাণ্ডুলিপি (নং ৫/৪২) আছে। এই পাণ্ডুলিপির রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। গ্রন্থে সূরা মুলক (সূরা ৬৭)-এর একটি তাফসীর রহিয়াছে। খিয্‌র ইব্‌ন গোলবেয়ি নামে এক আনাতোলীয় আমীরের নির্দেশে ইহা রচিত হয়। আমাদের বিশ্বাস এই খিয্‌র বে দুনদার বে'র পুত্র এবং তিনি হামীদ ওগলু'দেরই একজন, যিনি এগরিদির হ্রদ (এগরিদির গোলু) অঞ্চল শাসন করিতেন। আর ইহাও আমাদের ধারণা যে, সম্ভবত দুনদার বে-ই গোল বেয়ি এই ডাক নামেও অভিহিত হইতেন।

(৬) 'উছমান ওগলু 'উছমানী রাজ্য

আঙ্গোরার মুসতাফা ইব্‌ন মাহমূদ নামে একজন লেখক ওরখান-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মান পাশার জন্য সূরা মুলক (সূরা ৬৭)-এর একটি তাফসীর রচনা করিয়াছিলেন। এই লেখার একটি পাণ্ডুলিপি বায়াযীদ গণগ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বুরসালী তাহির বে (Othmanli Mu'ellifleri, ii, 13) জানান যে, ঐ একই গ্রন্থাগারে ঐ একই লেখকের তুর্কী ভাষায় লেখা 'হিলবু'ন-নাসিহীন নামে একটি গ্রন্থ আছে। এই সঙ্গে আরও যোগ করিতে পারি ঃ ১ম মুরাদের নির্দেশে তোকাত দুর্গ প্রাসাদের অধিনায়ক 'আরিফ 'আলী কর্তৃক ৭৬২ হিজরীতে (১৩৬১) পুনর্লিখিত দানিশমান্‌দ নামে এবং একজন অজ্ঞাত পরিচয় অনুবাদক কর্তৃক কাব্যে অনূদিত ও ১ম মুরাদকে নিবেদিত কালীলা ওয়া দিমনা (Pertsch, Die turkischen Handschriften. ....zu Gotha, p. 168)।

উল্লিখিত রচনাগুলি ছাড়াও এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন স্থানে এই শতকে রচিত আরও কতকগুলি রচনার পাণ্ডুলিপি আমাদের সংগ্রহে রহিয়াছে ঃ

তাবারীর রচনার একটি অনুবাদ, ৭১০ হি. সনে (Rieu, Catalogue of the Turkish MSS. of the British Mus., P. 22) লিখিত।

দাস্তান-ই মাকতাল-ই হুসায়ন, শাদী বা শাইয়াদ নামে একজন কবি কর্তৃক ৭৬৩ হিজরীতে কাস্তামুনিতে রচিত।

তাউস নামে একটি কবিতা, রচয়িতা ঃ 'ইয্যূ'দ-দীন ওগলু। ইহা উল্লিখিত রচনার সহিত একত্রে সংগ্রথিত।

হায়েত-ই 'উমার দেস্তানী, 'আলী রচিত।

মাছনাবী মিহ্‌র-উ ওয়েফা, একজন অজ্ঞাতপরিচয় লেখক কর্তৃক ৭৬০ সনে রচিত।

মুনাজাত, খাওয়াজা ওগলু রচিত।

কাব্যে আপ্তবাক্যমূলক সঙ্কলন, সিনান ওগলু রচিত (পাণ্ডুলিপি আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রক্ষিত)।

গাযেবাত-ই 'আলীর উপর বে পাযার-এর মা'আয ওগলু রচিত এ মাছনাবী ও 'আলী রচিত "ফাতহ-ই কাল'আ-ই সালাসিল (Millet Kutubkhanesi, MS. No. 1518) শীর্ষক আরও একটি মাছনাবী।

অজ্ঞাতনামা লেখক/অনুবাদক কর্তৃক ৭৪১ সনে অনু. ও J. Thury উল্লিখিত আততারে 'তাযকিরাই আওলিয়া' (Turk dili Yadkarlari, Milli Tetebbu'lar Medjm, iv, 107)

তাযকিরা-ই আওলিয়া'র [in Bibliotheque Nationale (Anc. fonds Turc No. 87) আরও একটি] অনূদিত পাণ্ডুলিপি।

মাওলানা সিনানু'দ-দীন আকশেহ্‌রীর খলীফা আহমাদ ইব্‌ন দারবীশ রচিত 'মানাকিবু'ল-আহরার ফী মাকালাতি'ল-আখয়ার (পাণ্ড. সংরক্ষণস্থল ঃ Koprulu Library, No. 253, II)।

মাওলাবী য়ূসুফ মেদদাহ কর্তৃক ৭৭০ সনে (১৩৬৯) সিবাসে রচিত মাছনাবী, ওয়ারাকা ওয়া-গুলশাহ (Institute of Turcology -তে সংরক্ষিত)।

তুরসুন ফাকিহ (দ্র.) রচিত মাছনাবী;

'আলী রচিত' হিকায়াত-ই কান'আন বে-শিম'উন'-শীর্ষক মাছনাবী (নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রক্ষিত);

তেশিল, হাজ্জী পাশা রচিত (Pertsch Dieturk, Handschr. ...zu Gotha, p. 97); অনেকগুলি কপি রক্ষিত।

ইসহাক ইব্‌ন মুরাদ কর্তৃক ৭৯০ সনে রচিত 'মুনতাখাবু'শ-শিফা' (Pertsch, p. 99)। মানাকিব-এর লেখক আফলাকী রচিত কতকগুলি গাযাল (ওয়ালাদ চেলেবি, সুলতান ওয়ালাদের তুর্কী কবিতাসমূহের শেষে)।

মাহমূদ 'আশিক সালমান আল-লাদিকী কর্তৃক ৮০০ হিজরীতে 'কাশফু'ল-মা'আনী' শিরোনামে শাতিবীর কাব্যানুবাদ এবং একই লেখক কর্তৃক কুরআন-এর উপর আরও একটি কাব্যকর্ম (নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)।

খালীল রচিত ফুতূয়েত নামে (O. L. Z., 1928, p. 12)।

য়িলদিরিম আমলে লিখিত আরও একটি ফুতুয়েত নামে (নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রক্ষিত)।

গুলশেহরী কর্তৃক ৭১৭ হি. সনে মানতিকু'ত-তায়ের-এর অনুবাদ ও কতকগুলি কবিতা (Ilk Mutesawwifler, p. 268 প.)-।

খাওয়াজা মাস'ঊদ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'ইয়্যু'দ-দীন আহমাদ কর্তৃক ৭৫১ হি. সনে রচিত 'সুহায়ল-ই নাও বাহার' শীর্ষক মাছনাবী (সম্পা. J. H. Mordtmann, Hanover 1924)।

৭৫৫ হি. সনে কৃত সা'দাত-এর ফারহাঙ্গনামে-এর অনুবাদ। অনুবাদক খাওয়াজা মাহমূদ (ওয়ালাদ চেলেবি, সম্পা. কিলিসলি রিফআত, ইস্তাম্বুল ১৩৪২; Copenhagen গ্রন্থাগারে এই রচনার একটি পাণ্ড. রহিয়াছে; তু. এই দুই লেখক সম্পর্কে, কোপরুলু-যাদে এম. ফু'আদ, তুরকিয়াত মেজমূ'আসি, ২খ, ৪৮১-৪৮৯)।

মামলূক সাম্রাজ্যের আমলে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের উপভাষায় কিছু রচনার কাজ সম্পাদিত হয়, যেমন একটি ফারাহনামে; এই মাছনাবীটি সিরিয়ার ত্রিপোলীতে ৭৮৯ সনে কেমাল ওগলু ইসমা'ঈল নামে এক কবি কর্তৃক রচিত হয় (এই রচনাটি নিবন্ধকারের নিজস্ব গ্রন্থাগারে রক্ষিত)। আমরা এই রচনার উল্লেখ করিতেছি এই কারণে যে, রচনাটি আনাতোলিয়াতেও জনপ্রিয় ছিল। 'আশিক চেলেবি এই রচনাটি শায়খ ওগলুর ও 'আলী উহা আহমাদ দা'ই-এর (তু. Gibb, Hist. Ott. Poetry, i, 256) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'উমার ইব্‌ন নাযীদ (অন্যান্য পাণ্ড. রক্ষণস্থল ঃ ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার) নামে একজন কবি কর্তৃক ৮৭০ হিজরীতে রচিত "মাজমা' আন-নাজাইর" শীর্ষক কাব্যসঙ্কলন, এগিরদীর-এর হাজ্জী কেমাল কর্তৃক ৯১৮ সনে রচিত 'জামিয়ু'ন-নাজা'ইর' এবং আরও কিছু সঙ্কলনে এই শতকের আরও বহু সংখ্যক কবি ও রচনার সন্ধান পাই (এইসব রচনা ও সেইগুলির গ্রন্থপঞ্জীমূলক বিষয়বস্তুর জন্য তু. কোপরুলু-যাদে এম. ফু'আদ, মিল্‌লি এদেবিয়াতীন ইলক মুবাশিরলারী, ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৬০-৬২)।

সালজূক সুলতানগণ ফারসী কৃষ্টিতে খুবই প্রভাবিত ছিলেন। তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হয় সাধারণ, কেবল মাতৃভাষা জানা সাধারণ তুর্কোমান বে'গণ। ফলত এই শেষোক্ত শাসকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চার বাহন হিসাবে তুর্কী ভাষার ব্যবহারকে উৎসাহিত করেন। বহু বিদ্বজ্জন, শায়খ ও কবি এই তুর্কোমান বে ও তাঁহাদের রাজ্যের রাজপুরুষদের (ইহারাও সমান অসংস্কৃত) অনুগ্রহ পাইবার আশায় তুর্কী ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করেন এবং আরবী ও ফারসী রচনা অনুবাদ করিতে থাকেন। তুর্কোমান শাসকেরা তাঁহাদের কৌতূহল অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাহিত্যমূলক রচনা অনুবাদের নির্দেশ দেন। তাঁহারা তাফসীর, ধর্মীয় পুস্তকাদি, মরমী রচনা, দরবেশ কাহিনী, চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তক, শিকার ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক রচনা এবং সাধারণভাবে বলিতে গেলে বিভিন্ন মাদরাসায় ব্যবহৃত ও সমাদৃত প্রধান পাঠ্য পুস্তকসমূহের অনুবাদ শুরু করেন। সূফী আন্দোলন, বিশেষ করিয়া মাওলাবী সূফী মরমীবাদ, যাহা শাসকের রাজপ্রসাদগুলিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছিল সেই আন্দোলনগুলির সুবাদে উল্লিখিত রচনাগুলিতে আমরা মাওলানার প্রভাব লক্ষ করি। এই প্রভাব অংশত সুলতান ওয়ালাদের রচনায়ও পরিদৃষ্ট হয়। এমন কি আমরা ইহাও বলিতে পারি, বিভিন্ন কাব্যকর্মেও এই প্রভাব বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে। ঐ আমলের বহু কবি নিজেরাই মরমীবাদী মাওলাবী ছিলেন।

এই আমলে বেশিরভাগ গদ্য রচনাই নীতিমূলক ক্ষেত্রে সীমিত ছিল। এই একই সময়ে কাব্য সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়। ধর্ম-মহাকাব্য বৈশিষ্ট্যের জনপ্রিয় কাহিনীগুলি হইতে শুরু করিয়া একান্তভাবে নন্দনতাত্ত্বিক উপকরণ অবলম্বনে সব ধরনের রচনা রচিত হইতে থাকে। এই আমলে ধর্ম-মহাকাব্যধর্মী কাহিনীগুলির যথেষ্ট বিকাশ সাধিত হয় এবং এই ধরনের রচনাগুলির মধ্যে অনেক লোকপ্রিয় রচনাও অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেইগুলিতে নবীদের বিজয় ও অলৌকিক কার্যকলাপের, বিশেষ করিয়া হযরত 'আলী (রা)-র নানা কাজের বিবরণ রহিয়াছে। এই রচনাগুলি মাছনাবী আকারে রচিত, ছন্দের দিক হইতেও অত্যন্ত সরল। এইসব রচনায় সংশ্লিষ্ট মূল চরিত্রের ঐতিহাসিক তথ্যগুলি কিংবদন্তীতে পর্যবসিত। ফলে সেইখানে অতিপ্রাকৃত ঘটনা, দেও-দানব, জিন্ন এবং নানা ঐন্দ্রজালিক ও অলৌকিক উপাদানের সমাবেশ ঘটিয়াছে। ইহাতে রচনাগুলির অনেকগুলি কল্পনাবিলাসী হইয়া উঠিয়াছে। এইসব মহাকাব্যধর্মী উপাখ্যানগুলির কোনও কোনটিতে মুসলিম ধ্যান-ধারণা প্রধান এবং ঐ উপাখ্যান হামযার চরিত্রকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইব্‌ন তায়মিয়া (র) জানাইয়াছেন, ১৩শ শতকের শেষের দিকে একটি হামযানামের রচনার সাক্ষাত তুর্কোমানদের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ঐ তুর্কোমানগণ ছিল সিরিয়াবাসী (মিনহাজু'স-সুন্নাহ, ৪খ., ১২; মুসলিম সাহিত্যে হামাযানামে সম্পর্কে জ্ঞাতব্যের জন্য তু. কোপরুলযাদে, এম. ফু'আদ, তুরকিয়ে তারীখী, ১খ., ৭৩)। যেইসব বীর উপাখ্যানে ইসলামের প্রভাব জোরদার সেইগুলির ব্যাপারে আমরা 'বাততালনামে ও দানিশমান্দনামের কথা উল্লেখ করিতে পারি।

এই শতকের ইসলামী ধ্যান-ধারণাভিত্তিক বহু সংখ্যক রচনার মধ্যে আমরা সিয়ার সম্পর্কিত রচনা, ফাতিমা (রা), হাসান ও হুসায়ন (রা),

কারবালা ও মাওয়ালিদ বিষয়ক রচনার কথাও উল্লেখ করিতে পারি। এই যুগের ইসলামী পরিবেশে মহানবী (স) ও তাঁহার পরিবার সম্পর্কিত রচনাবলীও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল; মামলূক শাসক ও মিসরের আমীরদের প্রাসাদে কিছু লোক ছিলেন যাঁহাদের কাজ ছিল ঐ শাসক ও রাজপুরুষদিগকে সিয়ার গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিয়া শুনানো। ইঁহাদেরই একজন ছিলেন এরযেরূমের যারীর। তিনি আল-ওয়াকিদীর ফুতূহু'শ-শাম গ্রন্থের অনুবাদক ও তুর্কী ভাষায় কাব্য ও গদ্যে রচিত একখানি সিয়ার-এর লেখক। উহা ১৪শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে লিখিত হয় (তু. কোপরুলু যাদে, এম. ফু'আদ, ফুযুলী, Constantinople 1924, p. 9; 'উছমানলি মুআ'ল্লিফলেরি, ৩খ., ৩৭; Rieu., তুর্কী পাণ্ডু., পৃ. ৩৮)। ইহার ভাষা বেশ আগের আযারী উপভাষা। ঐ সময় পূর্বাঞ্চলীয় ওগুয উপভাষা তখনও পুরাপুরি আনাতোলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় ওগুয হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তবে আনাতোলিয়ার এই লেখকের খ্যাতির কারণে আমরা এইখানে উহার উল্লেখ করিতে পারি। এই ধরনের রচনাবলীর ভাষা সহজ-সরল, সহজে বোধগম্য ও জনপ্রিয়। লেখকগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজদের নামোল্লেখ প্রয়োজন মনে করেন নাই।

১৫শ শতক হইতে লক্ষ করা যায় যে, একান্ত নান্দনিক লক্ষ্যে নিয়োজিত কবির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিতেছে। এই কবিরা তাঁহাদের রচনার জন্য ধ্রুপদী ফারসী সাহিত্যকে আদর্শ হিসাবে গণ্য করেন। কীরশেহরীর শায়খ আহমাদ গুলশেহ্‌রী এইসব কবিদের অগ্রগণ্য। কাব্যকর্মের উৎকর্ষ ও কালের বিবেচনায় অগ্রসর—এই দুই কারণেই তিনি উহার দাবিদার। তিনি "আততারের মানতিকু'ত তায়ের"-এর তুর্কী অনুবাদসহ বিভিন্ন সূত্র হইতে, বিশেষত রূমীর মাছনাবী হইতেও তাঁহার নিজের যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য চিন্তাধারাসহকারে উহার কাহিনীগুলিকে সম্প্রসারিত করেন, তাঁহার বিচ্ছিন্ন কিছু কবিতার সংগ্রহ আমাদের হাতে রহিয়াছে। মরমী সূফী হইলেও তাঁহার কাব্য চর্চার উদ্দেশ্য একান্তভাবেই শিল্পচর্চামূলক। তাঁহার মাছনাবী কারামাত-ই আখী এওরান সম্প্রতি F. Taeschner (Ein Mesnevi Gulschehris auf Achi Evran, 1930) প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার জীবন সম্পর্কিত তথ্যও প্রদত্ত হইয়াছে; তবে উহার কোন সাহিত্য মূল্য নাই। এই বিরাট কবির খ্যাতি ১৬শ শতকের সূচনা পর্যন্ত বজায় ছিল। তবে তাঁহার মহান কবি হিসাবে খ্যাতি ১৪শ শতকের পরই লুপ্ত হয়। আমাদের সংগৃহীত তাযকিরা বা জীবনীমূলক রচনাগুলিতে তাঁহার নাম (তাঁহার রচনার দুইটি পাণ্ডু. ইস্তাম্বুলের প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরে রহিয়াছে) নাই। কীরশেহরী শহরে খাওয়াজা গুলশেহরী ছাড়া আরও লেখকের জন্ম হয়। মনে হয় শহরটি কৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এই শহরেই সুপরিচিত সূফী কবি 'আশিক পাশার (মৃ. ৭৩৭ হি.) জন্ম হয়। ৭৩০ সনে তাঁহার রচিত গারীবনামে প্রথম হইতেই এশিয়া মাইনর অঞ্চলে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে ও ইহার বহু পাণ্ডুলিপি তৈয়ারি হয়। আমাদের সংগৃহীত তায্‌কিরাঃ (জীবনীগ্রন্থ) ও কালপঞ্জীমূলক রচনার সংগ্রহে 'আশিক পাশা একজন মহান মরমী সূফী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও কবি হিসাবে তিনি মাওলানা ও সুলতান ওয়োলাদের একজন অনুকারী কবি মাত্র। তাঁহার রচনাবলী প্রধানত নীতিমূলক। কবি হিসাবে তাঁহার স্থান গুলশেহরীর অনেক নিম্নে। 'আশিক পাশা আক্ষরিক মিতছন্দে কিছু ইলাহী রচনা করেন। তবে তাঁহার এই রচনা য়ূনুস ইমরের তুলনায় গীতিময়তা উৎকর্ষের দিক হইতে অনেক নিকৃষ্ট ('আশিক পাশার পরিবার সম্পর্কিত তথ্যের জন্য তু. 'আলী বে রচিত 'আশিক পাশার তারীখ-এর ভূমিকা); বিগত কয়েক বৎসর আগে অবধি একজন পুণ্য চরিত্রের ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবরণীর জন্য V. Gordlewski-র নিবন্ধ দ্র. (Comptes rendus de l'Academie des Sciences de U. R. S.S., 1927, i. 25-28) 'আশিক পাশার রচনার ভাষা সম্পর্কে Brockelmann -এর গবেষণাকর্ম দ্র. (Z. D. M. G., 1919, lxxiii, p. 1-29)।

য়ূনুস ইমরের সাহিত্যকীর্তির প্রভাব কেবল 'আশিক পাশার মরমী কবিতাগুলির মাঝেই সীমিত নহে। বহু দরবেশ লোকপ্রিয় ভাষায় ও আক্ষরিক ছন্দে 'ইলাহী' রচনা করেন। 'ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেন সা'ঈদ ইমরে ও কায়গুসূয আবদাল। সা'ঈদ ইমরে হাজ্জী বেকতাশ ওয়ালীর অন্যতম খলীফা প্রখ্যাত খাজিম সুলতানের মুরীদ ছিলেন। তিনি ১৫শ শতকের গোড়ার বৎসরগুলিতে জীবিত ছিলেন। ফলে তিনি য়ূনুসেরও সমসাময়িক ছিলেন সা'ঈদ ইমরের আরও একটি কবিতা 'আরূয' ছন্দে রচিত। উহা আহমাদ ফাকীহ-এর (সা'ঈদ ইমরে সম্পর্কে তু. কোপরুলুযাদে, এম. ফু'আদ, হায়াত, ১৯২৭, নং ৭২) চারখনামে-এর উপর এক নাযীরা বিশেষ। বেকতাশি দরবেশ, আবদাল মূসার খলীফা কায়গুসুয আবদাল তাঁহার কাব্যকর্মের মাঝে খাঁটি গীতিধর্মী অনুভূতি, গভীর দরদ ও নিকষিত বৈদগ্ধ ইত্যাদির স্বাক্ষর রাখিলেও একই সঙ্গে য়ূনুসের তুলনায় ভাষার উপরও বলিষ্ঠ দখল ও সাবলীলতার পরিচয় দিয়াছেন। পরের কয়েক শতকে বিশাল বেকতাশি কাব্যসম্ভারের বিকাশে কায়গুসুযের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল (Ilk Mutesawwifler, p. 376)।

এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায়, ধ্রুপদী মরমী কবিতা নেসীমির মাঝে অত্যন্ত উঁচু দরের উৎকর্ষ অর্জন করিয়াছে। নেসীমি আনাতোলিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলেই সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁহার উপভাষার সহিত 'আযারী উপভাষাবর্গ সম্পর্কিত। তবে এশিয়া মাইনরে তাঁহার বিপুল খ্যাতির কারণে তিনি এই অঞ্চলের সাহিত্য পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। হুরূফী তারীকার প্রতিষ্ঠাতা ফাদল হুরূফীর অন্যতম প্রধান খলীফা ছিলেন নেসীমি (এই তারীকা সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য তু. কোপরুলু-যাদে এম. ফু'আদ, আনাদোলুদা ইসলামিয়েত, এদেব.ফাক. মেজ্‌ম., ২খ. ৬, পৃ. ৪৬৪; খোদ তারীকা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য তু. নি. হুরূফী)। তিনি আনাতোলিয়ায় হুরূফিয়া মতবাদ প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করেন। তাঁহাকে ৮০৭ সনে আলেপ্পোতে (তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে, যাহা সকল সূত্রেই ভুল, তু. কোপরুলু-যাদে এম. ফু'আদ, হায়াত, ১৯২৭, নং ২০) জীবন্ত অবস্থায় শরীরের ত্বক ছাড়াইয়া লইয়া হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন একজন মহৎ কবি। তাঁহার মরমী গীতিগুলি অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী। তাঁহার রচনাশৈলী সরল অথচ ওজস্বী ও সুসঙ্গতিময়। খুব কম কবিই মরমী প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁহার বৈদগ্ধ ও নিষ্ঠ অভিব্যক্তির সমকক্ষ হইতে পারিয়াছেন। কিন্তু উহার মধ্যেও তিনি কাব্যশৈলীর সব বিধিই পালন করিয়াছেন এবং সাফল্যের সহিত ধ্রুপদী আঙ্গিকের প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার দীওয়ান-এ আমরা তুর্কী কবিতার একান্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তুযূগ-এর সন্ধান পাই, যাহা ফারসী সাহিত্যে স্বভাবতই বিজাতীয় (তু. কবিতার উল্লিখিত আঙ্গিকের জন্য তু. কোপরুলু-যাদে, এম. ফু'আদ, তুরকিয়াত মেজমূ'আসী, ২খ., ২১৯-২৪৩)।

১৪শ শতকেও ফারসী সাহিত্য হইতে রোমান্স ও উপাখ্যানের বিষয়বস্তু পরিগ্রহণ চলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে কালীলাঃ ওয়া দিমনা (দ্র.)-র গদ্য অনুবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। মাস'ঊদ মাঝে মাঝে কিছু কাব্যানুবাদসহ ইহার গদ্য অনুবাদ করেন। পরে ১ম মুরাদের জন্য এই রচনার কাব্যানুবাদও করা হয়। মাস'ঊদ ইব্‌ন আহমাদ ও তাঁহার

ভ্রাতুষ্পুত্র 'ইয়্য'দ-দীন কাব্যে সুহায়ল-উনওবিহার নামে একটি আখ্যানমূলক রচনা সম্পন্ন করেন, যাহার সাহিত্যমূল্য উল্লিখিত অনুবাদের তুলনায় অনেক বেশি। কার্যত ইহা ছিল এক মাছনাবী ও ইহা মূলত এক অজ্ঞাত পরিচয় ফারসী রচনার অনুবাদ বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য আমাদের ধারণা, ইহা নিছক এক অনুবাদকর্ম মাত্র নহে, বরং ইহা মূল রচনার এক সম্প্রসারিত ভাবানুসরণবিশেষ। এই আমলে মাছনাবীতে সচরাচর ব্যবহৃত ছন্দ ঃ --/--/--/ -এর পরিবর্তে আমরা --/--/--/-- এই ছন্দ এবং ইহার সর্বত্র এইখানে সেইখানে বিভিন্ন ছন্দের গাযাল লক্ষ করি। খাওয়াজা মাস'ঊদ ইব্ন আহমাদ কর্তৃক বুসতান-এর মিশ্র অনুবাদটির সাহিত্য মূল্য একান্তই কম।

খাওয়াজা মাস'ঊদ-এর পর রোমান্টিক কবি হিসাবে শায়খ ওগলু মুসতাফা (জন্ম ৭৪১ হি.) সর্বোচ্চ যশের অধিকারী হন। তিনি খাওয়াজা মাস'ঊদের অন্যতম শাগরিদ ছিলেন ও তাঁহার খুরশীদনামে রচনার কাজ ৭৮৯/১৩৮৭ সালে সমাপ্ত হয়। জারমিয়ান-এর এক প্রভাবশালী পরিবারে শায়খ ওগলু মুসতাফার জন্ম। তিনি প্রথমে জারমিয়ান-এর বে সুলায়মান শাহের নিশানজী ও দেফতারদার হিসাবে চাকরি করেন। পরবর্তী কালে তিনি বায়াযীদ য়ীলদিরীমের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাঁহাকেই এই কবি তাঁহার খুরশীদনামের দ্বিতীয় ভাষ্যটি উৎসর্গ করেন (তাঁহার ও তাঁহার খুরশীদনামে সংক্রান্ত তথ্যের জন্য তু. নি. শায়খ-যাদে)। শায়খ ওগলুর দীওয়ানের সমগ্র আমাদের নাগালে নাই; তবে প্রথম দিকের মেজমূ'আসি-এ তাঁহার অনেক কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। কানযু'ল-কুবারানামে তাঁহার একটি গদ্য রচনাও রহিয়াছে। হি. ৮০৩ সনে ইহা রচনার পর তিনি রচনাটি ঐ আমলের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব পাশা আগা ইব্ন খাওয়াজা পাশাকে উৎসর্গ করেন (ব্যতিক্রমধর্মী পাণ্ডুলিপি, কোপরুলু এম. ফু'আদ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)। এই রচনার কোনও কোনও অংশ কবিতা স্তবকে শোভিত। তাহা ছাড়া ইহাতে য়ূসুফ মেদদাহ, খাসস, দাহহানি, গুলশেহরী, খাওয়াজা মাস'ঊদ ও এলওয়ান চেলেবির রচনার অংশবিশেষও (উপরে তু.; উল্লিখিত কবিদের মধ্যে আমরা খাসস সম্পর্কে কিছুই অবহিত নহি) সন্নিবেশিত রহিয়াছে। রচনাটি আসলে এক ধরনের সিয়াসেত-নামে, আর এই সুবাদেই ঐ আমলের সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানার জন্য ইহা আমাদের নিকট কৌতূহলোদ্দীপক।

এক নেসীমীকে বাদ দিলে নিঃসংশয়ে আহমেদী (দ্র.) এই আমলের সর্বাপেক্ষা বড় কবি হিসাবে বিবেচনার দাবিদার। তিনি ইসকানদার-নামের রচয়িতা। এই রচনাটির কাজ ৭৯২/১৩৯০ সালে শেষ হয়। রচনাটি বিপুল খ্যাতি অর্জন করে; ইহার অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি বর্তমান। Joseph Thury (Torok Neylvemlekek a XIV sazad vegig, Budapest 1903) এই রচনাটির উপর বিশদ সমীক্ষা করিয়াছেন। পরে ইহার উপর ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা করিয়াছেন Brockelmann (Z. D. M. G., lxxii, i/2, 1919) ইসকান্দার-নামের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আহমেদী তাঁহার এই রচনার বিষয়বস্তু ফারসী (পারস্য দেশীয়) সূত্র হইতে গ্রহণ করেন। এই বিষয়টি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় আনাতোলীয় অঞ্চলেই অতি প্রচলিত বিষয়। তবে তিনি তাঁহার এই রচনায় এশিয়া মাইনরের ইতিহাস, বিশেষ করিয়া 'উছমানী শাসকদের ইতিহাস সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ পরিসরের বিবরণ উহাতে সংযোজিত করেন। এইদিক হইতে আমরা তাঁহাকে কাব্যে প্রথম তুর্কী কালপঞ্জী/ঘটনাপঞ্জীকার হিসাবে অভিহিত করিতে পারি। আহমেদীর দীওয়ান নিঃসন্দেহে শিল্পমানের বিবেচনায় অধিকতর আগ্রহোদ্দীপক। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কিছু কবিতার স্থানীয় বিষয়বস্তু লক্ষণীয়। যেমন এইগুলির কোন কোনটিতে বুরসা শহরের ও ইহার অধিবাসীদের উপর আক্রমণের বিবরণ রহিয়াছে। ১৫শ ও ১৬শ শতকের কাব্যকর্মে আমরা এই কবির বিপুল খ্যাতির প্রমাণ লক্ষ্য করি। এই আমলের বহু কবি তাঁহার উপরে নাযিরাসমূহ রচনা করেন। আমরা জানি ঐ সময়ে আযারবায়জান, খুরাসান ও Transoxiana-য় ইস্কান্দারনামে পঠিত হইত এবং শায়বানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কবি শায়বানী এই রচনার দারুণ সমাদর করিতেন।

১৪শ শতকের সাহিত্য পরিস্থিতির চিত্র সম্পূর্ণ করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই কাদী বুরহানু'দ-দীনের নাম উল্লেখ করিতে হইবে, যদিও তাঁহার রচনায় আযারী উপভাষার বৈশিষ্ট্য পরিদৃশ্যমান। বুরহানু'দ-দীন সালুর উপজাতির লোক ও সিবাসের সুলতান ছিলেন। তাঁহার চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক জীবনের কথা সুপরিজ্ঞাত (৭৪৫-৮০১ হিজরী; তু. তাঁহার সম্পর্কিত নি.)। ঐতিহাসিক আয়নী'র বিবরণ অনুযায়ী, ব্যবহারতত্ত্বের উপর আরবী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছাড়াও তিনি কিছু আরবী ও ফারসী কবিতাও রচনা করেন। তুর্কী ভাষায় তাঁহার একটি দীওয়ানও রহিয়াছে। এই দীওয়ানে গাযাল, রুবা'ঈ ও তুয়ুগ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। তাঁহার ভাষা পরিশীলিত ও শুদ্ধ না হইলেও উহাতে আন্তরিকতা ও স্বকীয় প্রগাঢ় হৃদয়ানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা এ পর্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে ইহা স্পষ্ট যে, ১৪শ শতকের তুর্কী সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি ঘটে এবং সাফল্যের সঙ্গে ইহা ধর্মীয় ভাষা–আরবী ও সাহিত্যের বাহন ফারসীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে থাকে। ফারসী মডেলের অনুসরণে তুর্কী ধ্রুপদী সাহিত্যের সুদৃঢ় বুনিয়াদ গড়িয়া উঠে। তবে তখনও তুর্কী ভাষা তাহার উন্নতির শিখর সীমায় পৌঁছাইতে পারে নাই এই কারণে যে, তখনও বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী/রাষ্ট্রীয় দলীলাদি ফারসীতে লেখা হইতেছিল। অন্যদিকে নানা উৎকীর্ণ লিপি, আইনগত কাগজপত্র ও ওয়াকফ দলীলগুলিতে আরবী ব্যবহৃত হইতেছিল। সূফীবাদী রচনাগুলি আরবী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই রচিত হইতেছিল। ইহার পরেও আমরা অবশ্য লক্ষ করি যে, সরকারী কাজকর্মে ও লেনদেনে তুর্কী ভাষার ব্যবহার বাড়িতেছে। যেমন, ঐ সময় ১ম মুরাদের (Kraelitz, T.O.E.M., xxviii, 242 প.) কোন কোনও রাষ্ট্রীয় আদেশ তুর্কী ভাষায় প্রদত্ত হয়। বহু লেখক ও কবি তুর্কী ভাষা তখনও পর্যাপ্ত রকমের চর্চিত ও পরিমার্জিত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেও সাধারণ প্রভাব ও প্রবণতার চাপে পড়িয়া ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন যে, তুর্কীতে লেখার, অন্ততপক্ষ ফিরদাওসী, নিজামী, 'আততার, সা'দী, মাওলানা, সালমান সাওয়াজী ও কামাল খুজানদীর মত ফারসী কবি-মহাকবিদের রচনার তুর্কী অনুবাদের আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। এইভাবে তুর্কী ভাষা ক্রমশ ফারসী ও আরবী উপাদান সমাকীর্ণ হইয়া উঠে। আরবী ও ফারসী ভাষার ব্যাকরণ হইতে তুর্কী ভাষায় কোনও কোনও নিয়মসূত্র গৃহীত হয়, আর উহার ফলে তুর্কী ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হইবার উপক্রম হয়। ছন্দ প্রকরণ ও ছন্দমাত্রা ফারসী হইতে ধার করা হয়। অবশ্য এতদসত্ত্বেও তুর্কী শব্দের প্রচুর ব্যবহার বহাল থাকে, যাহার কারণে তখনও তুর্কী ভাষায় আরবী ও ফারসীর আধিপত্য প্রকট হইয়া উঠে নাই–যাহা পরবর্তী কালে ঘটে।

১৫শ শতক

এই শতকের গোড়ার দিকে তীমূরের অভিযানের ফলে একটি সংক্ষিপ্ত কালের জন্য এশিয়া মাইনরে 'উছমানী রাজ্যের বিবর্তন ব্যাহত

হয়; পক্ষান্তরে ঐ আক্রমণের কারণে রুমেলিতে (রুমেলিয়া) তুর্কী কৃষ্টি জোরদার হয়। অনেক শিক্ষিত মুসলমান দেশ ত্যাগ করিয়া রুমেলিতে চলিয়া যান।

এই শতক ধরিয়া ক্রমবর্ধমান গতিতে ইসলাম ও তুর্কী কৃষ্টির অগ্রগতি চলিতে থাকে, বিশেষ করিয়া dewshirme-র প্রয়োগে এই ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। অবশ্য রুমিলিতে এই অগ্রগতি সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় হইয়া উঠে। দক্ষিণ আনাতোলিয়ার তুর্কীকরণের ব্যাপারে আমাদের নিকট Bertrandon de la Broquiere-এর সূত্রে (Le voyage d'Outremer, প্রকাশনা, Ch. Schefer, Paris 1892, p. 100, 101) প্রমাণ আছে। রুমেলি ভাষায় সর্বপ্রথম রচিত রচনাটি ফাতিমা (রা)-র ইনতিকালের উপর একটি কবিতা। কবিতাটি Adrianople-এর কারাবুলুত মসজিদের ইমাম খালীল ৮০৩/১৪০০ সালে রচনা করেন। তবে ১৪শ শতকে রচিত এ ধরনের সাহিত্যকর্মের সহিত কবিতাটির পার্থক্য প্রায় ধরাই যায় না (এই ধরনের একমাত্র জ্ঞাত পাণ্ডু. নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত)।

ঐ সময়ে সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় উভয় পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত ভাষা হিসাবে তুর্কী ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের প্রথম তুর্কী উৎকীর্ণ লিপির নমুনা হইতেছে ৮১৪/১৪১১ সালের জারমিয়ান ওগলু ২য় য়া'কূবের উৎকীর্ণ লিপি (খালীল এদহেম, T. O. E. M., i. 116)। অ্যাঙ্গোরায় তুর্কী কবিতার চরণে লিখিত একটি স্তম্ভলিপি রহিয়াছে। এই ধরনের আরও একটি স্তম্ভলিপি রহিয়াছে ব্রুসায়। লিপিটি কাব্যছন্দে লিখিত। কবি জেমালী ইহা ৮৭০/১৪৬৩ সালে রচনা করেন। সুলতান ২য় মেহমেদের শাসনামলের প্রথম যুগের সকল সরকারী দলীল তুর্কী ভাষায় লিখিত (আহমাদ রেফীক, T. O. E. M., নির্ঘণ্ট)। ইহা ছাড়া এই শতকের একেবারে গোড়ার দিকের কিছু রাজ নির্দেশও (ফরমান) তুর্কীতে প্রদত্ত। এইগুলিতে কাল নির্দেশ অনুযায়ী ৮৬০/১৪৫৫ সালে লিপিবদ্ধ (F. Von Kraelitz, Osmanische Urkunden in turkischer in Sprache, Vienna 1922)। বালিকেসারের দেওলেত ওগলু য়ূসুফ-এর একটি রচনা হইতে (রচনাকাল ৮২৮/১৪২৫) আমরা ইহাও জানি যে, তুর্কী ভাষা মাদরাসাগুলিতেও ব্যবহৃত হইত। আমরা এই ক্ষেত্রে ইহাও খুব সম্ভবত অনুমান করিয়া লইতে পারি, মাদ্রাসায় তুর্কী ভাষার ব্যবহার ১৫শ শতকে ঘটে। অন্যান্য মুসলিম, খৃস্টান রাজ্য অ-তুর্কী অধ্যুষিত অন্যান্য অঞ্চলের সহিত রাষ্ট্রীয় পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্যান্য ভাষার ব্যবহার আগের মতই চলিতে থাকে। ঐতিহাসিক Critoboulos-এর এই তথ্য অনুযায়ী ২য় মেহমেদ-এর একজন গ্রীক সচিবও ছিলেন।

১৫শ শতকের প্রথমার্ধে তিনটি বড় শাসক পরিবার পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ ও কবিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই শাসক পরিবারগুলি হইতেছে ঃ কোনিয়ার কারামান ওগলু, কাসতামুনির জানদার ওগলু Adrianople ও ব্রুসার উছমানী শাসকগণ। এই শতকে ফাখ্‌খার, খোজা ফাকীহ কারামানী, হালীমী ও নিজামী প্রমুখ কবি কারামান ওগলু পরিমণ্ডলের কবি। নিজামীকে ব্রুসার আহমাদ পাশার প্রতিযোগী বিবেচনা করা যায়। আর জানদার ওগলুর দরবারে পৃষ্ঠপোষিত হন ঃ মিফতাহ্'ন-নূর ওয়া খাযা'ইমু'-স-সুরূর শীর্ষক এ চিকিৎসাশাস্ত্রীয় রচনার লেখক মু'মিন ইব্‌ন মুকবিল ইব্‌ন সিনান এবং কুরআনের উপর তাফসীর (টীকা ভাষ্যের) রচনার এক অজ্ঞাতপরিচয় লেখক (তাফসীরটির নাম ঃ জাওয়াহিরু'ল আসযাফ (Cl. Huart, Un commentaire du Qoran en dialecte turc de Qastamouni, T.A., 1921, p. 161-216)। এই রচনাটির কয়েকটি অনুলিপির অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইহার ভাষা কাসতামুনি মনে করা ভুল হইবে। এই শাসক বংশের অন্যতম সদস্য ইসমা'ঈল বেগ (শাসনামল ১৪৪৩-১৪৫৭ খৃ.) "হুলবিয়াত-ই সুলতানী" (তু. Rieu., Cat. of Turk. MSS. p. 11) নামে তুর্কী ভাষায় একটি ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এই একই ইসমা'ঈল বেগের নির্দেশে জনৈক 'উমার ইব্‌ন আহমাদ (পাণ্ডু. সংরক্ষণ স্থল ঃ মিল্লেত কুতুবখানেসী, Constantinople) 'কীমিয়া-য়ি সা'আদাত' (নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার)-এর তুর্কী অনুবাদ করান। (ইসমা'ঈল বেগ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য তু. অনুবাদ দ্র. শাকা'ইক, পৃ. ১২১, ১২৫, ১৩৯)। জানদার ওগলুর ভ্রমণ-সহচর কবিদের মধ্যে আছেন ঃ মেহমূদ সীনূবী, কাসতামুনির দরবেশ তুরাবী; হামদী, খাকী, ছানা'ঈ ও দা'ঈ ছিলেন ইসমা'ঈল বে-র। শেষোক্ত দুই কবি উছমানী শাসকদের দরবারে ছিলেন। একই শাসক বংশের কাসিম বে ইব্‌ন ইসফেনদিয়ারের প্রতি উৎসর্গ করা তুর্কী ভাষায় 'খুলাসাতু'ত-তিব্‌ব' নামে একটি রচনা লক্ষ করা যায়। কাসিম বে'র পুত্র রুস্তেম বেগ একটি দীওয়ান রচনা করেন। ১৫শ শতকের কবি শেমসী পাশা ও এমীরীও এই বংশের লোক ছিলেন।

তবে সাহিত্য চর্চার সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটে উছমানী শাসকদের আমলে। আহমেদী ও আহমেদ দা'ঈ-এর মত কবিগণ আমীর সুলায়মানের জন্য কাসীদাসমূহ রচনা করেন। জনৈক মেহমেদ শায়খ মুসতাফা (Bibl. Nat., Anc. Fonds Turc. No. 164) কাওস-নামে' শীর্ষক একটি রচনা এবং মেহমেদ নামে জনৈক কবি তাঁহার "তুহফে-নামে বা ইশক-নামে" শীর্ষক একটি মাছনাবী উল্লিখিত আমীরকে উৎসর্গ করেন (রচনাটি আধিকাল ঃ ৮০০/১৩৯৬ সাল)। এই মাছনাবী বা কবিতাটি মূলত পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী ভাষায় রচিত 'হুমা বে-ফাররূখ শীর্ষক রচনার ভাবানুবাদ ও অনুবাদ, এই সাহিত্য কর্মটির মাঝে কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে (Bibl. Nat., Suppl. Turc., No. 604)। ইহা ছাড়াও আছে জাওয়াহিরু'র-মা'আনী, ইহা ৮০৯/১৪০৬ সনে লিখিত এক ধর্মীয় গ্রন্থ। ইহার লেখক খিয্‌র ইব্‌ন য়া'কূব (Bibl. Nat., Suppl. Turc. 499)। এই আমলের অন্যান্য সাহিত্যকীর্তি ঃ শেমসীরে (মাছনাবী), রচনা সমাপ্তি ৮১১/১৪০৮ সন, লেখক ঃ য়াযীজী সালাহ্'দ-দীন (Fleischer, Cod. Lips., cclxii); মাকালাত-ই হারী বেকতাশ ওয়েলি-র একটি কাব্যানুবাদ। ইহা খাতীব ওগলু কর্তৃক ৮১২/১৪০৯ সনে অনূদিত [Turk. Medjm., ii. 494; কুতবুদদীন ইযনিকী (মৃ. ৮২১/১৪১৮ সন); তু. Osthmanli Mu'ellifleri, i, 144]।

তুর্কী ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সর্বাধিক অবদানের অধিকারী ২য় মুরাদ। তাঁহার দরবার ছিল জ্ঞানী, সুধী, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের সমাবেশ স্থল। ইহার একটি নজীর হিসাবে বলা যায় যে, ২য় মুরাদ জনৈক খিয্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহকে (পাণ্ডু. Bibl. Nat., Anc., Fonds Turc, No. 150; অন্যটি Berlin-এ) দিয়া সঙ্গীতের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। এই আমলের আরও একজন লেখক সঙ্গীতের উপর দুইটি রচনা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ঃ আহমাদ ওগলু শুকরুল্লাহ (তু. (Albert Lavignac, Encyclopedie de la musique, p. 2978)। শায়খীসহ এই আমলের কবিগণের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ রূমী, হুসামী, শেমসী, হাসসান, সাফী আযহারী, নুজূমী, নেদীমী, 'উলকী ও দা'ঈফী। সুপ্রাচীন তাযকিরাগুলিতে এইসব নাম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও আমরা আরও বহু কবি, লেখক ও অনুবাদকের নাম পাইয়াছি, যাঁহাদের সাহিত্যকর্মের কোন অস্তিত্ব এখন আর নাই। ইহার নজীর

হিসাবে মেহমেদ ইব্ন 'উমার আল-হালাবী (Rieu Cat., P. 224; H. Vambery, Altosmanische Sprachstud., Leyden 1901) রচিত 'আল-ফারাজ বা'দাশ-শিদ্দাহ, ঐ লেখক কর্তৃক মানাকিব-ই ইমাম-ই আ'জামীর অনুবাদ (পাণ্ডু. কোপরুলু-যাদে এম. ফু'আদ গ্রন্থাগার), মারজমেক আহমাদ কর্তৃক ৮৩৫/১৪৩১ সনে কাবূস নামে অনুবাদ (Bibl. Nat. Suppl. Turc, No. 530; Rieu, p. 116; Persch Kat. der turk. Hss. zu Berlin, p. 276), কাসিম ইব্ন মাহমূদ কারাহিসারী অনূদিত মিরসাদু'ল-'ইবাদ, মেহমেদ ইব্ন সুলায়মান অনু. হায়াতু'ল-হায়ওয়ান (নূর-ই 'উছমানিয়ে, নং ২৯৯৮-৯৯); ৮২৮/১৪২৫ সনে দেওলেত ওগলু য়ূসুফ অনু. হিদায়া ও বিকায়া (কয়েকটি পাণ্ডু.); ৮২৯/১৪২৬ সালে শেখ এলওয়ান শীরাযী অনু. 'গুলশেন-ই রায'; ৮৪০/১৪৩৭ সনে অজ্ঞাত এক অনুবাদক অনু. মেছনেবী-ই মুরাদী' শিরোনামে জালালু'দ-দীন রূমীর মাছনাবী (অনুবাদের পাণ্ডু. Cambridge); অজ্ঞাত পরিচয় অনুবাদক কর্তৃক ইব্ন বায়তারের 'মুফরাদাত'-এর অনুবাদ (পাণ্ডু. Upsala); কোনিয়ার গ্রন্থাগারে রক্ষিত পবিত্র কুরআনের তাফসীর ও সেই সঙ্গে লিপির লাইনের মধ্যবর্তী তুর্কী অনুবাদ; ৮২৯/১৪২৬ সালে খাতীব ওগলু উপস্থাপিত ফারাহনামে (তু. Turk. Medjm., ii, 489-496); ফারসী হইতে মূসা 'আবদী অনূদিত (৮৩৩/১৪৩০) জামাস্প- নামে; ফারসী হইতে মূসা ইব্ন মাস'ঊদ অনু. বাহ্নামে (শাহীদ 'আলী পাশার গ্রন্থাগার, নং ২৮৩); সিরায-এর সা'দী রচিত ৩,৫০০ বায়েতসম্বলিত সুলেয়মাননামে; ইব্ন কাছীর রচিত তা'রীখ (দামাদ ইবরাহীম পাশা গ্রন্থাগার); য়াযীদী-যাদে 'আলীর সালজূকনামে (Vol. iii of the Recueilde texte relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Houtsma–ইহার অংশবিশেষ); য়াহ্য়া ইব্ন মুহাম্মাদ কাতিব রচিত মানাহিজু'ল-ইনশা'; কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলীলসম্বলিত একটি রচনা (Bibl. Nat., Suppl. Turc., No. 660); আনফাসু'জ-জাওয়াহির' শীর্ষক তাফসীরের অনুবাদ; অনুবাদক ঃ আবু'ল-ফাদল মূসা ইব্ন হাজ্জী হুসায়ন ইব্ন 'ঈসা আল-ইযনিকী, অনুবাদ কাল ঃ ৮৩৮ (O. L. Z., 1927, p. 9)। হাজ্জী খালীফা আবু'ল-লায়ছ–এর একটি তাফসীর ও 'আওফীর জামি'উ'ল- হিকায়াত -এর অনুবাদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; অনুবাদকঃ 'আরাবশাহ। উসকুবের মানিয়াস ওগলু মাহমূদ রচিত 'আজাবু'ল-'ইজাব' (পাণ্ডু. Bibl. Nat., Anc. Fonds Turc, No. 13)। ইহা গদ্য রচনা। ৮৪১/১৪৩৭ সালে লেখক ইহা ২য় মুরাদকে উৎসর্গ করেন। এই রচনা হইতে দেখা যায় যে, ঐ সময় রুম-ইলিতেও তুর্কী কৃষ্টি শিকড় গাড়িতে শুরু করিয়াছিল। অবশ্য এই আমলের কাব্যে ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি হইতেছে ৮৪০/১৪৩৬-১৪৩৭ সালে 'উমার ইব্ন মাযীদ রচিত মাজমূ'আতু'ন- নাসা'ইর। এই রচনায় ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ শতকের ৮৩টি কবিতা স্থান পাইয়াছে।

২য় মুরাদের অন্যতম প্রভাবশালী রাজ-কর্মকর্তা তীমূরতাশ পাশার পুত্র 'উমূর বেগও তুর্কী সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রচুর উৎসাহ প্রদর্শন করেন। বহু রচনা তাঁহার নামে উৎসর্গ করা হয়। এই সব রচনার মধ্যে রহিয়াছে ঃ মেহমেদ ইব্ন মাহমূদ শিরওয়ানী (পাণ্ডু. Dresden) রচিত 'জাওহারনামে' ও ইকসিরু'স-সা'আদাত (পাণ্ডু. Dresden)-এর অনুবাদ। এই অনুবাদের অনুবাদক খোলাখুলি বলিয়াছেন যে, তিনি যতদূর সম্ভব বেশী তুর্কী শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছেন ও তাহা করিয়াছেন উমূর বেগের ইচ্ছা সহিত সঙ্গতি রাখিয়া। ব্রুসার উলু জামে'তে আনফাসু'জ জাওয়াহির-এর একটি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। এই পাণ্ডুলিপির সূচনায় একটি গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবেশিত আছে। এই বইগুলি উমূর বেগ ওয়াকফ হিসাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটিকে দান করিয়াছিলেন। ঐসব গ্রন্থের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তুর্কী ভাষায় রচিত। এইসব বিষয় হইতে দেখা যায় যে, ১৫শ শতকের প্রথমার্ধে ভাষা হিসাবে তুর্কী কৃষ্টি ও জ্ঞান চর্চার বাহন হইয়া উঠিয়াছে এবং এমন সাহিত্য সৃষ্টিতে সমর্থ হইয়াছে যাহার চৌহদ্দিতে ঐ যুগের সকল রচিত জ্ঞানের শাখা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আগের শতকগুলির ন্যায় এই শতকেও সাহিত্য চর্চার তৎপরতা কেবল ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যের মুসলিম রচনাবলীর অনুবাদেই সীমিত ছিল না। এই আমলের তুর্কী লোকপ্রিয় সাহিত্যের পরিমণ্ডলে আমরা নিম্নলিখিত সাহিত্যকর্মের উল্লেখ করিতে পারি ঃ কবিতার অন্যতম সেরা অনুপম নিদর্শন 'সীরাহ'। কবিতাটি সুলায়মান চেলেবি (দ্র.) ৮১২/১৪০৯ সালে ব্রুসায় রচনা করেন। তাঁহার রচিত মাওলিদ শত শত বৎসর ধরিয়া পাঠককুল কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, এই কবিতার উপর প্রতি শতকেই বহু সংখ্যক নাযিরা লেখা হইয়াছে। এইগুলিও তুর্কী সাহিত্যের উজ্জ্বল মণিরত্নতুল্য। নূতন নূতন সূফী তারীকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সূফী মরমী সাহিত্যের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ধ্রুপদী মরমী সাহিত্যকর্মগুলি অনুবাদের পাশাপাশি (গুলশান-ই রায, মিরসাদু'ল-'ইবাদ, ফাসলু'ল-খিতাব, তাযকিরা-ই আওলিয়া') আমরা সূফী বিধিবিধান ও তারীকার নিয়মাদি সম্পর্কিত গদ্য ও কাব্য রচনারও সন্ধান পাই। এই শ্রেণীর সাহিত্যের আওতায় রহিয়াছে (উদাহরণ হিসাবে) মাছনাবীসমূহ, মুনাজাতনামে, 'ইবরেতনামে, মা'যেরেতনামে, এলেস্তনামে ও শায়খ এশরেফ ইব্ন আহমেদ-এর হায়রেত-নামে। এইগুলি অপেক্ষাকৃত আদিম ধরনের রচনা, আমার মতে এইগুলি এই শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রচিত হয় (এই নমুনার একমাত্র পাণ্ডুলিপিটি নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রহিয়াছে)। ইহা ছাড়া হাজ্জী বেক্তাশের বিলায়েত-নামের খাতীব ওগলু-র অনুবাদও এই সময়ের। একই যুগের কয়েকজন সূফী য়ূনুস ইমরের রচনাশৈলীতে কাব্য রচনা করেন। এই সূফীদের মধ্যে রহিয়াছেন ঃ বিখ্যাত আমীর সুলতান। তিনি আমীর সায়্যিদ–এই মাখলাসের আওতায় আক্ষরিক মিতছন্দে ইলাহী রচনা করিতেন। অ্যাঙ্গোরার হাজ্জী বায়রাম ওয়েলি-র সঙ্গে আমীয় সুলতান মালামীয়ে-ই বায়রামীয়ে তারীকা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের ধারার একদল কবিও গড়িয়া তোলেন। এই শেষোক্ত কবিদের একজন ছিলেন য়াযীজী সালাহ'দ-দীনের পুত্র মেহমেদ। তিনি বিশেষত তাঁহার রচনা মুহাম্মাদীয়্যা-র বদৌলতে য়াযীজী ওগলু মাখলাসে মশহুর হইয়া উঠেন। তাঁহার 'মুহাম্মাদীয়্যা' রচনার কাজ ৮৫৩ সনে শেষ হয় এবং পরের শতকগুলিতে তিনি তাঁহার পুণ্য-পূত চরিত্রের সুবাদে ক্রিমিয়ায় ও কাযানের তুর্ক ও বাশকীর উপজাতির (তু. আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাতনামে, ৭খ., ৮১২) লোকজনের মধ্যে বিপুল যশের অধিকারী হন। তাঁহার ঐ মহৎ কবিতাটি কিছুটা গুরু ভাষায় কয়েকটি ছন্দে রচিত। সিয়ার-এর বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে ইহার বিষয়বস্তু গৃহীত হয়। এই কবিতায় মরমী প্রভাবের অনুরণনও পাওয়া যায়, যদিও উহাতে বিভিন্ন ভাবধারার রক্ষণবাদী কাঠামোটি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। এই কবিতার সাহিত্য প্রভাব অত্যন্ত বিপুল। Constantinople ও কাযান হইতে ইহার কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (আরও তু. আ. 'আযীম ও 'আলী রাহীম, তাতার এদবিয়াতী তা'রীখী, ১খ., দ্বিতীয়াংশ, পৃ. ১৬৬-১৭৭)।

এই আমলের অন্যতম বিশিষ্ট মরমী কবি হইতেছেন কেমাল উমমী। তিনি খালওয়াতী তারীকার একজন দরবেশ। তাঁহার কবিতার মাধ্যমে তিনি নিজেকে একজন খাঁটি কবি প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাব কাযান, বাশকীর ও ওযবেক তুর্কীদের মাঝেও বিস্তৃত। বায়রামীয়ে

তারীকার এশরেফিয়ে উপ-তারীকার প্রতিষ্ঠাতা (উপনাম এশরেফ ওগলু) 'আবদুল্লাহ ইবন্ এশরেফ ইব্ন মেহমেদও (মৃ. ৮৭৪/১৪৭০) একই ধরনের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি মুযকী আন-নুফূর নামে একটি গ্রন্থ ও একটি দীওয়ান রচনা করেন। বিখ্যাত সব সূফী-মরমীদের আবির্ভাব ও নূতন নূতন তারীকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে আমীর সুলতান, এশরেফ ওগলু ও পরবর্তীকালে হাজ্জী বেকতাশ ওয়েলী, কাইগুসুয ও 'উছমান বাবার মত দরবেশদের কিংবদন্তীসুলভ কাহিনীর সঙ্কলনগুলি মিলিয়া তুর্কী ভাষায় নিয়মিত দরবেশ কাহিনী রচিত হইতে থাকে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ হইতে এই সাহিত্যের এক বিরাট মূল্য ও সার্থকতা রহিয়াছে। ১৪শ শতক হইতে এই সাহিত্যে সাহিত্যের রচনাসম্ভার বিশেষভাবে প্রচুর হইয়া উঠে।

নেসীমীর মধ্য দিয়া হুরূফী সাহিত্যের সূচনা ঘটে। তাঁহার মুরীদ রেফী'ঈ এবং আরও অনেকে উহার ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন। এইভাবে রেফী'ঈ ৮১২/১৪০৯ সনে তাঁহার বেশারেতনামে, ফেরিশতে ওগলু (মৃ. ৮৬৪/১৪৫৯) 'ঈশকনামে শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। একইভাবে এই ধারা বজায় রাখিতে সহায়তা করেন বীরানী বাবা। হুরূফী তারীকার মরমীবাদের প্রচারণা ২য় মেহমেদ-এর দরবার পর্যন্ত পৌঁছায়। ২য় বায়াযীদের আমলে এই হুরূফী বিজাতীয় চিন্তাধারার মরমীবাদীদের নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ১৫শ ও ১৬শ শতকে হুরূফী কবিদের সংখ্যা বেশ ভারী ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কায়সারীয়ে, কারা ফেরিয়া, হুসেইনী, ইয়েনিজে-ই ওয়ারদার-এর হুসেইনী ও উসূলী, বাগদাদের নেবাতি, তারযি, বস্নিয়ার ওয়াহদেতি, তাবরীয-এর পেনাহী ও মুহীতী। আযারী ভাষাভাষী অঞ্চল হইতে আসেন শাহ্ ইসমা'ঈল সাফাবী (তু. খাতাঈ). লাশকার্ত, তিফলী ও হাবীবী। হাবীবী পরে Constantinople-এ আসেন।

ধর্মীয় বিষয়বর্জিত সাহিত্যের অঙ্গনে আলোকপাত করিলে আদিতম প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আহমেদ দা'ঈ-এর নাম উল্লেখ করিতে পারি। আহমেদ দা'ঈ জারমিয়ান ওগলুর দরবারে ও 'উছমানলী দরবারের একজন কবি ছিলেন। তিনি যেমন কিছু কিছু অনুবাদ করিয়াছেন তেমনি তাঁহাকে আমরা 'উকূদ আজ-জাওয়াহির নামে একটি আরবী-ফারসী-তুর্কী অভিধানের প্রণেতা হিসাবেও দেখিতে পাই। কবি হিসাবে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ফারসী কবি সালমান সাবেজী ও কামাল খুজান্দীর অনুকরণ করেন। সমসাময়িক কালের কবিতার উপর অবশ্য তাঁহার তেমন প্রভাব পড়ে নাই।

আহমেদী ও নেসীমীর পর এই আমলের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কবি ছিলেন শায়খী। তিনি কাসীদার কবি। সুলতান ১ম মেহমূদ ও ২য় মুরাদ তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম সিনান জারমিয়ানী। কিন্তু তাঁহার জীবনের যেইসব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে সেইগুলি আংশিকভাবে পরস্পরবিরোধী (তু. শায়খী)। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত, তবে তাহা অবশ্যই ৮৩২/১৪২৯ সনের পরে। তাঁহাকে কুতাহিয়ার নিকটে দুমলূ-পিনারে দাফন করা হয় (আওলিয়া চেলেবি, ৯খ.)। শায়খী নিঃসন্দেহে একজন মহৎ কবি, নিজামীর 'খুসরাও-উ শীরীনের' যে অনুবাদ তিনি করেন তাহা কোনও সাধারণ অনুবাদমাত্র নহে। খারনামা নামে যে রচনাটি তিনি ২য় মুরাদকে উৎসর্গ করেন তাহা এক অসাধারণ ব্যঙ্গ রচনা (তু. কোপুরুলু-যাদে এম. ফু'আদ, য়েনি মেজমূআ, ১৯১৭ খৃ., নং ১৩)। ১৫শ শতক অবধি এই কবির কাব্য-প্রভাব অসাধারণ পর্যায়ে বজায় থাকে। নেজাতীর মত কবিরা ও খায়ালী তাঁহার কথা পরম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করেন। আর এই কারণেই তিনি শায়খু'শ-শু'আরা মর্যাদা লাভের যোগ্য। ধর্মীয় মহলে এমন কি মিসরের তুর্কীদের মধ্যেও তিনি সম্মানিত ছিলেন (ইব্ন তাগরীবিরদী, সম্পা. Popper, vii, 323-25)।

শায়খীর পর আমরা 'আতা'ঈ-র নাম উল্লেখ করিতে পারি। ব্রুসার অধিবাসী ছিলেন তিনি। তাঁহার রচিত একটি দীওয়ান আমাদের সংগ্রহে আছে। তাঁহার আসল নাম আখী চেলেবি। ব্রুসায় তাঁহার কবরের ফলকে ৮৪১/১৪৩৭-১৪৩৮ সন উৎকীর্ণ আছে। স্পষ্টতই তিনি শায়খী দ্বারা প্রভাবিত, তবে তাঁহার কবিতায় একটা নৈরাশ্যবাদী সুর আছে। তিনিই সর্বপ্রথম গযলে প্রবাদ ব্যবহার করেন। এই আমলের আরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হইতেছেন ব্রুসার সাফী। তাঁহার দীওয়ানের কাসীদাগুলি ২য় মুরাদ, উযীর খালীল ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিত্বের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। জীবনীকার সেহী তাঁহার জীবনের অতি সামান্য তথ্যই দিয়াছেন।

একই আমলের অন্যান্য কবি হইতেছেন ঃ ব্রুসার 'উলবী, ইযনীকের হুমামী, গ্যালিপোলির আহমাদ রূমী, বেকতাশীদের কবি বাবা নেদীমী ও গ্যালিপোলির দা'ঈফী। হুমামী মাছনাবীসীনামে-এর (Bibl. Nat., Anc. Fonds Turc, No. 304) রচয়িতা। রচনাটি খালীল পাশাকে উৎসর্গ করা হয়। দা'ঈফী ২য় মুরাদের যুদ্ধের বিবরণ কাব্যে বর্ণনা করেন। আমরা আরও কিছু নাম এইখানে উল্লেখ করিতে পারি। জেমালী তাঁহার রচনাবলী কবির ২য় মেহমেদ ও ২য় বায়াযীদকে উৎসর্গ করেন। অবশ্য সকল সূত্রেই এই জেমালীকে ১৫শ শতকের কবি শেখ ওগলু মুসতাফার (শায়খযাদে নিবন্ধও তু.) সহিত এক করিয়া তালগোল পাকাইয়া ফেলা হইয়াছে। জেমালী ৮৫০/১৪৪৬ সালে ২য় মুরাদের জন্য 'গুল্‌শেন-ই উশ্‌শাক নামে একটি মাছনাবী রচনা করেন। ২য় মেহমেদের জন্য হুমা-উ হুমায়ূন নামে আরও একটি মাছনাবী রচিত হয়। জেমালীর ৩য় মাছনাবীর নাম মিফতাহু'ল-ফারাজ (Pertsch, Kat. d. turk. Hss. zu Berlin, p. 371)। তিনি পত্রলিখন শৈলীর উপর "আর-রিসালা 'আল-আজিবা ফি'স-সানা'ই' ওয়া'ল-বাদা'ই" নামে একটি কবিতাও রচনা করেন (Browne, Cat.of Mss. in Cambridge, 1900, p. 87)। লাতীফী এই কবির প্রশংসা করিয়াছেন। ব্রুসার বিভিন্ন ভবনে উৎকীর্ণ করার জন্য এই কবি বেশ কিছু লিপিও রচনা করেন (T. O. E. M., No. xv)।

২য় ফাতিহ মেহমেদ ও ২য় বায়াযীদ, যাঁহারা নিজেরাই কবি ছিলেন, তাঁহাদের আমলে 'উছমানী ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল বিকাশ সাধিত হয়। এশিয়া মাইনরে তুর্কোমান শাসক বংশগুলি লুপ্ত হওয়ার পর 'উছমানলী রাজদরবার ও শাসকের সংজ্ঞা ছিল কবি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের একমাত্র অবলম্বন। তুর্কী সাম্রাজ্যের বিজয়াভিযানের ফলে ক্রিমিয়া ও ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলি অবধি 'উছমানী প্রভাব প্রসারিত হয়। 'উছমানী প্রভাবের সঙ্গে ঐ সব অঞ্চলে তুর্কী ভাষা ও মুসলিম কৃষ্টিও ছড়াইয়া পড়ে। ঐ সময় তুর্কী 'উছমানী সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এক নয়া শিখরে আরোহণ করে; ২য় মেহমূদ যুগের প্রয়োজনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নানা আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেন। মাদরাসা, teke, বিশেষ করিয়া ভিন্ন মতবাদ বেকতাশী দরবেশগণ ইসলামের প্রসারে বিপুল অবদান রাখেন। অন্যদিকে 'উছমানী সাম্রাজ্যিক রাষ্ট্র ক্রমাগতভাবে নিজের প্রজাবর্গকে দলে দলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পাঠাইয়া নিজ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে।

২য় মেহমেদ ও তাঁহার মহাউযীর মাহমূদ পাশা কবি ও জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে উদার হারে ভাতাদি মঞ্জুর করেন। নেজমী, ফেনায়ী, নূরী,

'ইকী, খাফী, দা'ঈ, দু'আঈ, কুদসী, কাতিবী, নাহীফী, ওয়াহীদী প্রমুখ কবি ও সঙ্গীতিজ্ঞগণ তাঁহাদের কাজের জন্য বিপুলভাবে পুরস্কৃত হন। মেহদী, মেলছী, বুরসালী, আহমদ পাশা ও অন্যান্য কবি প্রায় অনুক্ষণ ২য় মেহমেদের সাহচর্যে থাকিতেন। হায়াতী, সারীজা কেমাল ও এনবারী মাহমূদ পাশার বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। শাসক জেম-এর দরবারীদের মধ্যে ছিলেন শাহিদী, সাখায়ী, লা'লী, হায়দার, কানদী, সা'দী ও তুরাবী। তুরাবী জেম-এর শিক্ষক ছিলেন। ২য় বায়াযীদ ও তাঁহার পুত্রগণ গুণীজন পৃষ্ঠপোষকতার এই ঐতিহ্য সমুন্নত রাখেন। ২য় বায়াযীদের শাসনামলে ৩০ জনেরও বেশি কবি রাজকোষ হইতে ভাতা গ্রহণ করিতেন। যেহেতু নানা সূত্র হইতে ১৫শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বিষয় সুপরিজ্ঞাত, আমরা বিভিন্ন আঙ্গিক চর্চার ও ঐসব ক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিদের একটা সাধারণ আলোচনায় নিজদিগকে সীমিত রাখিব।

২য় মেহমেদের শাসনামলের সর্বাপেক্ষা বড় কবি ছিলেন আহমাদ পাশা (দ্র.)। তিনি ব্রুসার অধিবাসী। নিয়াযী, শায়খী, 'আতাঈ ও তাঁহার ওস্তাদ মেলছীর (তু. Yeni Medjmua, 1918, No. 31) প্রভাব সত্ত্বেও আহমাদ পাশা গাযাল, বিশেষ করিয়া কাসীদার ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সমসাময়িকদের ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। শায়খীর পরেই তাঁহাকে তুর্কী কাব্য পরিমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা মহৎ ব্যক্তিত্ব বিবেচনা করা যায়। সমসাময়িক কালের কবিদের উপর তাঁহার প্রভাব অনস্বীকার্য। ঐ সময়কার কবিদের মধ্যে রহিয়াছেন রেসমী, হারীরী, কানদী, কোনিয়ার নিজামী, সাফী (উযীর জেযায়র্ত পাশা) ও সুলতান। এমন কি নেজাতী, বাকীর মত কবিসহ ১৫শ শতক অবধি তাঁহার প্রভাব লক্ষ করা যায়, তাঁহার সময়ের অন্য কবিদের মত তাঁহার রচনায়ও ফারসী কবিতার প্রভাব পড়িয়াছিল। কোনও কোনও তাযকিরা লেখক, যেমন জা'ফার চেলেবি ও লাতীফী প্রমুখ তাঁহাকে অযথা ধিক্কার দিয়াছেন। অন্যদিকে আহমাদ পাশা কবি নেবাবীর কোনও কোনও কবিতার উপর নাজিরা রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার কাব্য চর্চার সূচনা (ইহা আমরা হাসান চেলেবি-এর তেযকেরে-তে প্রথম বারের মত লক্ষ করি) করেন বলিয়া যে ব্যাপক অভিমত প্রচলিত রহিয়াছে তাহা একেবারেই ভ্রমাত্মক (তু. Turk Yurdu, 1927, No. 27)। আহমাদ পাশা ২য় বায়াযীদের আদেশক্রমে কবিতা সঙ্কলন করিয়া তাঁহার দীওয়ান প্রণয়ন করেন। এই দীওয়ানে কিফ'আ নামের বিভিন্ন ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, বিশেষত অত্যন্ত চমৎকার মুরাববা' সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

আহমাদ পাশার পরেই ১৬শ শতকের সর্বাপেক্ষা বড় কবি হইতেছেন নেজাতী। ইনি বিশেষ করিয়া তাঁহার মারছিয়্যা ও গাযাল-এর জন্য বিখ্যাত। তাঁহার কাব্যকীর্তির আরও একটি বৈশিষ্ট্য—কবিতায় ঘন ঘন প্রবাদের ব্যবহার। ইদ্‌রীস বিলিসী তাঁহাকে রূমের খুসরাও এবং সকল লেখক তাঁহাকে আহমাদ পাশার পর সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা 'উছমানী কবি (আরও তু. Pertsch, Kat. d. turk. Hss.zu Gotha, No. 168) গণ্য করেন। তাঁহার খ্যাতি 'উছমানী সীমান্ত অতিক্রান্ত হইয়া ব্যাপ্তি লাভ করে। নেজাতীর কাব্যের প্রভাব সুন'ঈ, তালি'ই, শাওকী, রিদায়ী ওসকূবের যহারী, ফিলিবের সাফী, সেহী, ইযনীকের কুরবী, ওয়াসফী ওয়েরদী ও শাবের, ১৪শ ও ১৫শ শতকের কবিগণ এমনকি তাঁহার সমসাময়িক কালের মিহরীর মত কবিদের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। বহু কবি তাঁহার রচনাবলীর উপর সাজীরা রচনা করেন ও তোকাতের ওয়ালিহীর মত তাঁহাদের কয়েকজন প্রায় ধর্মীয় পর্যায়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। নেজাতীর সঙ্গে তাঁহার সমসাময়িক কবি মেসীহীর (দ্র.) কথাও উল্লেখের দাবিদার। তিনি তাঁহার দীওয়ান ও শেহর-এঙ্গিয-এর জন্য বিখ্যাত। তাঁহার রচনায় কম-বেশি তাঁহার জীবদ্দশার স্থানীয় পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। কবি বাকীর উপর তাঁহার কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৪শ শতকে যে মাছনাবী কাব্যের প্রচলন শুরু হয় এই সময়ে তাহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই ধরনের মরমী রচনাগুলির মধ্যে আমরা নিম্নলিখিতগুলির বিশেষ উল্লেখ করিতে পারি ঃ ইবরাহীম তাননূরী (মৃ. ৮৮৭/১৪৮২) রচিত গুলযার-ই মা'নাবী আক শামসু'দ-দীন রচিত খালীফা কারা হিসারের 'আবদু'র রাহীম রচিত ওয়াহদাতনামে (রচনাকাল ঃ ৮৬৫/১৪৬০, তু. Pertsch, Die turk. Hss. zu Berlin, No. 375-376) আয়দিনের রূশেনীর মাছনাবী (রূশেনী খালওয়াতীয়া তারীকার একজন প্রথিতযশা শায়খ; মৃ. ৮৯২/১৪৮৭, তাবরীয), দিয়ার বাকর-এর খালীল (তু. খালীল) কর্তৃক ইযনীকে ৮৭৬/১৪৭১ সালে লিখিত ফিরকাতনামে। উল্লিখিত কবিতাগুলির রোমান্টিক বিষয়বস্তু পারসী সাহিত্য হইতে গৃহীত। আর এইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি সুপরিজ্ঞাত হইতেছে আক শামসু'দ-দীন যাদে হামদীর (তু. হামদী) য়ূসুফ-উ জালিসা আহীর (তাঁহার সম্পর্কে তু. য়েনি মেজমূ'আ, ১৯১৮, নং ৫৪) খুসরাও ও শিরী, রেওয়ানীর ইশরেতনামে, বিশেষ করিয়া জা'ফার চেলেবি (দ্র.) কর্তৃক ৮৯৯/১৪৯৩ সালে রচিত হেবেসনামে। শেষোক্ত রচনাটি সামগ্রিকভাবে মৌলিক রচনা ও ইহাতে কবি নিজেকে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। কেননা এই রচনায় কল্পনা অনুভূতি সংবেদনশীলতা অতিক্রম করিয়াছে। এই শতকের শেষের দিকে খামসার বিষয়বস্তুগুলিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। নিজামীর খামসা কয়েকবার অনূদিত হয়। বেশ কয়েকটি ঘটনাপঞ্জীমূলক কাব্যাখ্যানও এই সময় রচিত হয়। কেমাল রে'ঈসের নানা অভিযানের উপর ভিত্তি করিয়া ১১,০০০ বায়েত-এর একটি মাছনাবী রচনা করেন সিনুবের কবি সাফায়ী। নৌ-বিষয়ে নৈপুণ্যসম্পন্ন এই কবির বাস ছিল গালাতার teke-তে। ১৫,০০০ বায়েত-এর আরেকটি মেছনেবী এদ্‌রিনের সাবায়ী রচনা করেন। মাছনাবীটি বস্‌নিয়ায় কোজা দাউদ পাশার বিজয়াভিযানের উপর রচিত হয়; 'সেলাতীননামে শীর্ষক একটি ছন্দে রচিত কাব্য ঘটনা-আখ্যান কবি সারী কেমাল ২য় বায়াযীদকে উৎসর্গ করেন; মাহমূদ পাশার জন্য আনওয়ারী ৮৬৯/১৪৬৬ সনে একটি 'দেসতূরনামে' রচনা করেন। আয়দিন-ওগলুর (তুর্ক তারীখী এনজুমেনি কুল্লিয়াতী, নং ১৫) ইতিহাসের জন্যই প্রধানত এই রচনাটির গুরুত্ব অধিক; পরিশেষে ১৫,০০০ বায়েত-এর আরেকটি ঘটনা আখ্যান। ইহা প্রিযরীনের সূবী মিখাল ওগলু আলী বেগের বিজয় অভিযান অবলম্বনে রচনা করেন। আমরা কুতবনামে এর উল্লেখও করিতে পারি। ২য় বায়াযীদকে উৎসর্গীকৃত এই রচনাটিতে কবি উযূন ফিরদাওসী মিদিল্লি দ্বীপ জয়ের বর্ণনা দিয়াছেন। রচনাটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক সূত্র। এই একই কবি 'সিলাহশুর-নামে ও সুলায়মান-নামে শীর্ষক অন্যান্য রচনার জন্যও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

এই আমলে গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রধানত নান্দনিক গদ্য চর্চারই প্রসার ঘটে। এই ধারার সাহিত্য চর্চার উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি ছিলেন সিনান পাশা (দ্র.)। তিনি তাযাররূনামে, রিসালে-ই আখলাক ও তেযকেরে-ই এওলিয়া-র রচয়িতা। প্রথমে উল্লিখিত রচনাটির মাঝে মাঝে কবিতা সন্নিবেশিত। ধর্মীয় গীতিকাব্য লেখক হিসাবে তিনি অত্যন্ত শক্তিমান। তাঁহার রচনাশৈলীর সহিত 'আবদুল্লাহ আল-আসারীর বিখ্যাত রচনার রচনাশৈলীর মিল আছে অর্থাৎ

তাঁহার রচনা যুগপৎ শিল্পালঙ্কারে অলঙ্কৃত, স্বাভাবিক হৃদ্য। এই আমলের নান্দনিক গদ্যের প্রধান প্রতিনিধিদের মধ্যে রহিয়াছেন (১) সারী কেমাল, তিনি তা'রীখ-ই মু'জাম অনুবাদ করেন; আহী, তিনি ফেত্তাহী নিশাবূরী রচিত হুসান-উ দিল-এর অনুবাদ করেন। মেসহী, গুল-ই সাদবার্গ-এর রচয়িতা এবং জা'ফার চেলেবি। অন্যান্য মহৎ গদ্য লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন মহাউযীর মাহমূদ পাশা। তিনি 'আদনী এই মাখলাসের আড়ালে লিখিতেন; নিশানজী মেহমেদ পাশা (মাখলাস ঃ নিশানী) ও তুরসুন বেগ যিনি য়াযীজী নামেই সমধিক পরিচিত। 'উছমান

এই আমলে গদ্যে ইতিহাস রচনার কাজও শুরু হয়। তুর্কী ভাষা আরবী ও ফারসীর স্থান দখল করিতে থাকে। ২য় বায়াযীদের শাসনামলে আমরা জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের "তাওয়ারীখ-ই আল-ই 'উছমান"-এর কিছু চমৎকার নমুনা লক্ষ করি। এই রচনায় গদ্যের সহিত আহমেদী রচিত 'ইস্কান্দার-নামে' হইতে গৃহীত কবিতার সংমিশ্রণ রহিয়াছে। এইগুলি হইতে জানা যায় যে, ১৫শ শতকে জনসাধারণ, বিশেষত সৈনিকদের মধ্যে এমন সব ঘটনা-আখ্যানের প্রচলন ছিল যেইগুলি প্রায় মহাকাব্য চরিত্রের সাহিত্যসম্পদ। 'আশিক পাশা যাদে নামে পরিচিত দারবীশ আহমাদ 'আশিকী ও উরূজ বেগের ইতিহাসমূলক রচনাগুলি শৈলীর দিক হইতে উল্লিখিত অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত ঘটনা-আখ্যান হইতে খুব একটা ভিন্ন নহে। কাতিব শেওকী, বেহেশ্তী ও নেশরীর আখ্যানমূলক রচনাগুলিও এই আমলের। তুরসুন বেগ (দ্র.)-এর তা'রীখ আবু'ল-ফাত্হ ও বেয়াতীর জাম-ই জেম-ই আঈন-এরে মত রচনাগুলি অবশ্য সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জন্য লিখিত হইয়াছিল। ফলে এই শেষোক্ত ধরনের রচনাগুলি উল্লিখিত ঘটনা-আখ্যানগুলি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন প্রকৃতির। শেষোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ও অভিজাত মহলের জন্য রচিত রচনাগুলির মধ্যে পড়ে য়াযীজীর রচনাসমূহ। য়াযীজী 'আলী ১ম মুরাদের আমলে একটি 'সেলজূকনামে' রচনা করেন। এই রচনার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রাওয়ান্দীর লেখার একটি সংক্ষিপ্তসার ও ইব্ন বীবীর রচনার অনুবাদ রহিয়াছে, যেইগুলি ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর ইতিহাস লিখনের জন্য আদর্শ হিসাবে গণ্য। এই ধরনের ঐতিহাসিক রচনাগুলির কোনও কোনওটি, যেমন তুরসুন বেগের রচনা ও জা'ফার চেলেবির ইস্তাম্বুল ফেতহ নামেসি রচিত হইয়াছিল অনেকটাই বরং এমন এক বিশেষ শৈলী ও সাহিত্য সামর্থ্যের কসরৎমূলক প্রদর্শনী হিসাবে, যাহার ফলে গদ্যে কোনও কোনও সাহিত্যমূলক রচনা দুঃখজনক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

আলোচ্য আমলের প্রভাব বর্জিত গদ্য রচনার একটি অনুপম নিদর্শন হইতেছে দেলি লুতফীর রচনা। তাঁহার এই রচনাটি তুর্কী ভাষায় রসাত্মক সর্বপ্রাচীন রচনাগুলির অন্যতম (প্রকাশক ঃ O. Rescher Orientalistische Miszellen, ii, 1826, p. 40-43; গ্রন্থকারের জীবনীর জন্য তু. হায়াত, ১৯২৮ খৃ., নং ১০০)।

এই আমলে কিছু সংখ্যক রচনা আনাতোলীয় তুর্কী ভাষায় মিসর ও সিরিয়ায় রচিত হয় বলিয়া আমাদের জানা আছে। মিসরের সারকাসীয় মামলূকগণ ছিল ভাষা ও কৃষ্টির দিক হইতে তুর্ক। এই মামলূকদের বিভিন্ন শাসকের শাসনামলে পূর্বাঞ্চলীয় ও আনাতোলীয় তুর্কী ভাষায় বিভিন্ন রচনা রচিত হয়। আনাতোলীয় তুর্কী ভাষায় রচনাগুলির মধ্যে পড়ে ঐতিহাসিক আয়নী (দ্র.) কর্তৃক কুদূরীর রচনার অনুবাদ। অন্যান্য রচনা হইতেছে ইব্রাহীম ইব্ন বালী কর্তৃক ৮৯৩/১৪৮৮ সনে রচিত ও কাইত বে-কে উৎসর্গীকৃত কাব্যে রচিত হিকমেত-নামে; কান্সাওহ আল-গাওরীর তুর্কী কবিতামালা, কান্সাওহ আল-গাওরীর জন্য শেরিফ নামে' একজন কবি কর্তৃক ৯০৩/১৪৯৭ সনে শাহনামে-র অনুবাদ (পাণ্ড. British Museum, Upsala Leningrad ও নেওশেহিরে ইবরাহীম পাশা গ্রন্থাগার ও Constantinople-এর মিল্লেত-ই কুতুবখানেসী)। ইহা ছাড়া আনাতোলীয় তুর্কী হইতে মেহমেদ ইবন বালী কর্তৃক কিতাব-ই গুযিদার একটি পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী অনুবাদও রহিয়াছে। সম্ভবত এই মেহমেদ বালী ও ইহার আগে উল্লিখিত ইবরাহীম বালী অভিন্ন ব্যক্তি। কানসাহহ কর্তৃক ১ম সেলীমকে (প্রকাশক ঃ খালীল এদহেম, T. T. E. M., 1928, No. 19) তুর্ক ভাষায় লিখিত একটি পত্রও রহিয়াছে।

এইভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৫শ শতকে তুর্কী গদ্য ও কবিতায় ফারসী প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এমন কি ফারসী প্রাধান্যের বিষয়টি প্রায় এক ধরনের ফ্যাশনে পরিণত হয়। ১ম মেহমেদও আনাতোলীয় কবি শেহদীকে দিয়া তাঁহার জন্য 'উছমানী শাসকদের উপর ফারসী ভাষায় এক 'শাহনামে' রচনা করান। ২য় বায়াযীদও ইদরীস বিতলিসীর ইতিহাসের ফারসী অনুবাদ করান। মেসোপটেমিয়া, আযারবায়জান, পারস্য ও খুরাসানের সুধী পণ্ডিত ও কবিগণ 'উছমানী রাজদরবারে আগমন করেন এবং তাঁহাদেরকে এমন সম্মান ও এত প্রচুর উপহার দেয় যে, তাহাতে তুর্কী কবিদের অভিযোগের কারণ ঘটে। পূর্বাঞ্চল হইতে আগত কবিদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হইতেছেন হামীদী (জন্ম ৮৩৪/১৪৩০)। তাঁহার দীওয়ানে তুর্কী ও ফারসী উভয় ভাষায় রচিত কবিতা রহিয়াছে। তিনি নিজে তুর্ক বংশোদ্ভূত ছিলেন। কাসতামূনীর ইসমাঈল বে-র দরবারে কাটানোর পর তিনি ৮৬৪/১৪৫৯ সাল হইতে ২য় মেহমেদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ঐ আমলের ইতিহাসের জন্য তাঁহার দীওয়ান এক কৌতূহলোদ্দীপক রচনা।

২য় মেহমেদ ও ২য় বায়াযীদের দরবারের সহিত হেরাত ও প্রাচ্যের অন্যান্য রাজদরবারের অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং 'উছমানী সাম্রাজ্যের সহিত প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির, বিশেষত তুর্কী জনঅধ্যুষিত দেশগুলির সাহিত্য ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে নিবিড় সম্পর্ক বজায় থাকে। ২য় মেহমেদ, ২য় বায়াযীদ ও সেই সঙ্গে মাহমূদ পাশারও খাওয়াজা-ই জিহান, জামী ও জালালুদ-দীন রূমীর (তু. যেমন. Browne, A Literary History of Persia, iii. 422-423) সম্পর্ক ছিল। একইভাবে এই শতকের শেষভাগে পূর্বাঞ্চলীয় কবি আলী শীর নাওয়াঈ গোটা তুরস্কে খ্যাত ছিলেন। ১৫শ শতকেও যে পুরাতন তুর্কী ঐতিহ্য অস্তিত্বশীল ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ইহা হইতে যে, তখনও গোটা অঞ্চল হইতে উইগুর হরফের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে নাই। মিল্লেত কুতুবখানেসীতে রক্ষিত একটি ক্ষুদ্রায়তন রচনা ও হিবাতুল-হাকাইক-এর একটি অনুলিপিতে দেখা যায়, রচনা দুইটি উইগুর হরফে লিখিত। প্রাগুক্ত রচনাটি ২য় বায়াযীদকে উইগুর হরফ শিক্ষাদানের জন্য রচিত হইয়াছিল। এই শতকের শেষদিকে কবিতায় অতিরিক্ত আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কবিরা বিদেশী শব্দ ও বাকভংগী বর্জন করিয়া আরূয ছন্দে কবিতা রচনার প্রয়াস পান। এই কাব্যান্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন কবি বিসালী। আন্দোলনটি 'তুরকী-ই বাসীত' নামে পরিচিতি লাভ করে।

লোকসাহিত্যের প্রধান বাহন হিসাবে কাজ করেন ওয়ানগণ। তাঁহাদের প্রভাব পূর্ববর্তী শতকগুলির মত এই শতকেও বজায় থাকে এবং বিভিন্ন রাজদরবারে তাঁহারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে থাকেন, যদিও ওয়ানগণ মহৎ ধ্রুপদী কবিগণের তুলনায় দরিদ্র সঙ্গীতকারে পর্যবসিত হন। অবশ্য জনসাধারণের মাঝে তাঁহাদের জনপ্রিয়তা বজায়

থাকে। আমরা এই শ্রেণীর সাহিত্যকর্ম কিসসা খাওয়ান-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এই রচনাটি শাহনামে-খাওয়ান ও মেদ্‌দাহ (তু. হিকায়াত, কাসসাস ও মেদদাহ) নামেও অভিহিত। ওযানগণ পুরাতন মুসলিম বীরত্বগাথা আবৃত্তি করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। অবশ্যই এই শতকে তাঁহাদের অঞ্চলের প্রাত্যহিক জনজীবনকেও তাঁহাদের রচনার উপজীব্য করিয়া তুলিতে শুরু করেন। এই শেষোক্ত বিষয়বস্তু অবলম্বনের কারণে তাঁহাদের রচনায় এক ধরনের স্থূলতার সৃষ্টি হয় যাহা তাঁহাদেরকে ধ্রুপদী কাব্য হইতে আরও দূরে সরাইয়া দেয়। আমাদের নিকট এই ধরনের আর কোনও লোকপ্রিয় সাহিত্যের রচনা নাই। আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, কারাগোয-এর নাট্যচর্চা কেন্দ্রটিও (তু. কারাগোয ও খায়াল-ইজিল্ল) এই শতকেই গড়িয়া উঠে।

১৬শ শতক

১৬শ শতক 'উছমানী শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশ কাল। ১ম সেলীম ও মহান সুলায়মানের সময় 'উছমানী সাম্রাজ্য সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ভাষা ও সাহিত্যের পরিমণ্ডলেও উহা প্রতিফলিত হয়। কৃষ্টির সুবিখ্যাত কেন্দ্রগুলি তথা নগর-জনপদে ভাষা ও সাহিত্য পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তেক্কে ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের আরও প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। যেহেতু রূম-ইলি সরকারের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে সেই কারণে ঐ অঞ্চলে বহু কবির জন্ম হয়। এই আমলেই তুর্কী, গ্রীক ও স্লাভ ভাষাগুলি একে অপরের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। সামগ্রিকভাবে ক্রিমিয়াও ক্রমে আবার তুর্কী কৃষ্টির পরিমণ্ডলে প্রত্যাবর্তন করে। ক্রিমিয়ায় এই পর্যায়ে কয়েকজন 'উছমানী কবির আবির্ভাব ঘটে। খোদ কয়েকজন খানই এই কবিদের অন্তর্ভুক্ত (তু. Ilk Mutesawwifler, p. 197)। একই প্রভাব কুর্দিস্তানের Dere-Bey-গণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। অতুর্কী জনসমষ্টির মধ্যকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীও তুর্কী ভাষা শিখিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে অন্যান্য তুর্ক ও মুসলিম ভূভাগ হইতে ইস্তাম্বুলে জ্ঞানী ব্যক্তি ও কবিগণের সমাবেশ ঘটে।

'উছমানী শাসক বংশের সকল সুলতান ও শাসক শিল্পকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের উযীরগণও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। ১ম সেলীম (দ্র.) 'উছমানী তুর্কীতে ও চাগাতাই উপভাষায় কবিতা রচনা করেন। তাঁহার একটি ফারসী দীওয়ানও রহিয়াছে। মুহিববী এই মাখলাসে সুলায়মান (দ্র.) কবিতা রচনা করেন। তিনিই কবি বাকী-র অসাধারণ প্রতিভা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন ও উহার স্বীকৃতি দেন। মহাউযীর ইবরাহীম পাশা যিনি নিজে একজন কবি ছিলেন, তিনি খায়ালী, লামী ও রাহমীর মত কবিদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ২য় সেলীম, ৩য় মুরাদ ও ৩য় মেহমেদের আমলেও একই ঐতিহ্যের ধারা বজায় থাকে। এই কারণে এই শতকের আনাতোলীয় তুর্কী ভাষা শিল্প ও জ্ঞানচর্চার এক অসাধারণ বাহন হইয়া উঠে।

ফারসী কবি জামী ও পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী কবি নেওয়াঈর প্রভাব ১৬শ শতকে অত্যন্ত লক্ষণীয় হইয়া উঠে। তাঁহাদের বহু কবিতা 'উছমানী তুর্কীতে অনূদিত হয়। নানা অনুবাদকর্মের জন্য কবি লামীকে কোনও কোনও সময় রূমের জামী বলিয়াও অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে চাগাতাই উপভাষায় কবিতা রচনাও এই সময়ে একটা ফ্যাশন হইয়া উঠে। জেমিলী (নেওয়াঈ-এর উপর তাঁহার একমাত্র নাজীরাসম্বলিত চাগাতাই ভাষার দীওয়ানটি Top Kapu জাদুঘরে সংরক্ষিত, নং ৭৫৫) মত পূর্বাঞ্চলের কবিরা নেওয়াঈ-এর কাব্য প্রতিভার প্রচারে অত্যন্ত বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। বহু আযারী কবি 'উছমানী সুলতানদের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ববিখ্যাত হইতেছেন শাহী; তিনি শাহ ইসমাঈলের দরবার ত্যাগ করেন। আরেকজনের নাম হাবীবী। তিনি যথাক্রমে আককোয়ুনলূ সুলতান য়া'কূব ও সাফাবী শাসক ইসমাঈল-এর দরবারে ছিলেন। হাবীবী ফুযূলীর (তু. হাবীবী সংক্রান্ত তথ্যাদির জন্য ঃ Kopr. Zade Fuad, Adheri Edebiyatina a'id Tedkikler, Baku 1926) পূর্বসূরী ছিলেন। ইহা ছাড়া কয়েকজন আযারী কবিও (যেমন বাসীরী) 'উছমানী উপভাষায় কাব্য রচনা শুরু করেন। 'উছমানী রাজদরবারসমূহ এবং সাফাবী, শায়বানী, এমন কি মুগল রাজদরবারগুলির মধ্যে নিবিড় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক থাকারও যথেষ্ট নিদর্শন-প্রমাণ রহিয়াছে। এই সাংস্কৃতিক যোগসূত্র সম্পর্কিত বিষয়ে বিখ্যাত পর্যটক সায়্যিদ রেঈসের ভ্রমণবৃত্তান্তে কৌতূহলোদ্দীপক বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। সায়্যিদ রেঈস 'কাতিবী'-এই মাখলাসে (তু. আলী ইবন হুসেইন) লিখিতেন।

কেবল ইস্তাম্বুলেই নহে, বাগদাদ, দিয়ার বাকর, কোনিয়া, কাসতামুনি, ব্রুসা, এদিরনে, Yenidje-i Wardar ও উসকুবেও সাহিত্য চর্চার বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটে। ইস্তাম্বুলের কবিগণ তাঁহাদের কাব্যালাপ ও চর্চার জন্য বিভিন্ন স্থানে, যেমন ছোট দোকানে যেইখানে কবিরা তাঁহাদের নিজস্ব ব্যবসায় বা পেশার কাজ চালাইতেন সেখানে, উদ্যানে (বেশিকতাশের বাখশী উদ্যানে),গালাতার বিখ্যাত সরাইখানাগুলিতে (মেইখানে), কেকেসমূহে (সুদলুজের জাফারাবাদের তেক্কে) ও ধনীদের (ইহাদের মধ্যে আছেন কবি নিগারী ও যীরেকী) অট্টালিকায় (কোনাক) মিলিত হইতেন। 'উছমানী ভূভাগে কফি পানের প্রচলন হওয়ার পর কাহবেখানেগুলিও কবিদের এক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ কেন্দ্র হইয়া উঠে। আর এই সমাবেশে সমাজের সকল শ্রেণীর দর্শক-শ্রোতা-গুণগ্রাহীর আগমন ঘটিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতির সহিত তাল মিলাইয়া আগাইয়া চলিয়াছিল সমসাময়িক কালের স্থাপত্য, সজ্জা (নাক্‌শ), চারু হস্তলিপি শিল্প, সঙ্গীত ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখা। রাহমী, যাতী ও খায়ালীর মত বিশাল প্রতিভাসম্পন্ন কবিদের কারণে, বিশেষ করিয়া বাকী ও ফুযূলীর প্রতিভাগুণে তুর্কী সাহিত্যের এক ধ্রুপদী বুনিয়াদ গড়িয়া উঠে। আর ফারসী সাহিত্যের ধ্রুপদী মানের তুলনায় এই তুর্কী ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যটি কোনও অংশে খাটো ছিল না, যদিও তুর্কী সাহিত্যের মৌল আদর্শ ছিল ফারসী সাহিত্য। এই 'উছমানী তুর্কী সাহিত্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণ হইতে ঐ আমলের নানা ভাবধারার, সমাজ পরিস্থিতি, সাম্রাজ্যের বড় বড় সামরিক অভিযানের সাফল্য ও স্থানীয় পরিবেশের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। আমরা এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধারণ গদ্য রচনা ও ইতিহাস বিষয়ক গদ্য রচনাগুলির বিপুল গুরুত্বের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

১৫শ শতকেও সাহিত্যের ভাষায় আরবী ও ফারসী হইতে ধার চলিতেছিল। সুরূরী, সুদী, ইব্‌ন কেমাল ও রিয়াদীর মত বিদগ্ধ মনীষীরা ভাষাতাত্ত্বিক টীকাভাষ্য, অভিধান ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত নানা গ্রন্থ রচনা করেন। বহু সংখ্যক পুস্তক আরবী ও ফারসী হইতে তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। আরবী ও ফারসী হইতে শব্দ পরিগ্রহণের সুবাদে তুর্কী কবিগণ তাঁহাদের যুগের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী তাঁহাদের কাব্যকর্মের ছন্দপ্রকরণ ও শৈলীকে নিখুঁত, নিটোল করিয়া তুলিতে সক্ষম হন। এই আন্দোলনের ফলে ভাষা সুন্দর হইয়া উঠিলেও নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম হইয়া উঠে। ইহাতে তুর্কী ভাষার স্বাভাবিক গুণ লুপ্ত হয়। অন্যদিকে আমরা এমন কিছু কবির সন্ধান পাই যাঁহারা তাঁহাদের কবিতায় প্রবাদের বহুল ব্যবহার করিয়াছেন (সম্ভবত নেজাতীর প্রভাবে)। এই ধরনের রচনার

নমুনা হিসাবে গুওয়াহীর পান্দনামে বা কানযুল-বাদী-র উল্লেখ করা যায়। Trebizon-এর দেরূনী, Yenidje-i wardar-এর ইশকী ও য়েতীমের মত কবিগণ তাঁহাদের কাসীদা ও গাযাল-ও নৌ-পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের ব্যাপক ব্যবহার করিয়াছেন। তুরকী-ই বাসীত (তু. ১৫শ শতক) নামে অভিহিত এই আন্দোলনের দুইটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনার (১৬শ শতকের) সন্ধান পাওয়া যায় তাতাওলার মাহরানীর (মৃ. ৯২৪/১৫৩৫) [রচনা বাসীত নামে] ও এদিরনের নাজমীর (মৃ. ৯৬২/১৫৫৫ সনের পরে) রচনার মাঝে (তু. কোপরুল-যাদে এম. ফুআদ, মিললি এদেবিয়াত জেরিয়ানিনীন ইল্ক মুবাশশিরলারি যে দীওয়ান-ই তুরক-ই-বাসীত, ১৯২৮)।

কাসীদা ও গাযাল রচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা ও যশের অধিকারী কবিদের নাম কালানুক্রমে নিম্নরূপঃ যাতী, খায়ালী, ফুযূলী ও বাকী। কাসীদা ও গাযাল ছাড়াও যাতী বহু সংখ্যক গদ্য ও কবিতা গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির সাহিত্য মূল্যমানে অবশ্য ব্যাপক তারতম্য রহিয়াছে। তাঁহার প্রথম দিকের রচনায় আহমাদ পাশা, বিশেষ করিয়া নেজাতীর প্রভাব পরিষ্কার। তাঁহার ভাবকল্প ও নূতন ধ্যান-ধারণার কারণে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং অনেকে তাঁহার শাগরিদ হন। তুর্কী কবিতার বিবর্তনে তাঁহার স্থান নেজাতী ও বাকীর মধ্যবর্তী।

যাতী যখন তাঁহার কাব্য-প্রতিভার মধ্যগগনে তখন খায়ালী (দ্র.)-এর কাব্য চর্চায় হাতেখড়ি ঘটে। তবে কবি হিসাবে খায়ালী খোদ যাতী এবং আরও অনেককে ছাড়াইয়া যান। তেসকেরেজি আহদী-ই বাগদাদীতে তাঁহাকে রূমের হাফিজ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। তাঁহার সব কবিতা সন্নিবেশিত রহিয়াছে এমন একখানি দীওয়ান জনৈক আলী চেলেবি সংকলন করেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, যদিও স্বয়ং কবি সুলতান সুলায়মানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এক কাসীদায় বলিয়াছেন, তিনি নিজেই এক দীওয়ান সংকলন করেন। খায়ালী তাঁহার যৌবনে নানা মরমী সূফী সাধক, বিশেষ করিয়া উসূলীর প্রভাবে ছিলেন। তবে তাঁহার মোট কাব্যকর্মের অতি ক্ষুদ্রাংশই মরমী কবিতা। তাঁহার সর্বাপেক্ষা মৌলিক কবিতাবলী বলিতে তাঁহার গাযালগুলিকেই বুঝায়। বাগদাদে ফুযূলীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয় এবং আপাতদৃষ্টে খায়ালী ফুযূলীর কবিতার উপর কতকগুলি নাজিরা রচনা করেন।

ফুযূলীকে সাধারণভাবে অবশ্যই তুর্কী সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় কবি বলিতে হইবে, যদিও তিনি বাগদাদের সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার কবিতাসমূহে আযারী উপভাষা ব্যবহার করেন। তিনি তুর্কী বংশোদ্ভূত বায়াত উপজাতির লোক ছিলেন। তিনি একটি দীওয়ান ও মাছনাবী 'লায়লা ওয়া মাজনূন' রচনা করেন। তাঁহার এই রচনাগুলিই তাঁহাকে সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্থান নির্ধারণ করিয়া দেয়। মরমী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত থাকার কারণে তাঁহার রচনার উপজীব্য প্রেম কখনও পুরাপুরি জড় ও পার্থিব নহে। কিন্তু তাঁহার কাসীদায় লক্ষ করা যায়, তিনি মূল্যহীন কৃত্রিমতার ফাঁদে পড়িয়াছেন। তাঁহার রচিত মাছনাবী 'লায়লা ওয়াল মাজনূন' যতখানি না ভাবানুবাদ তাহার চাইতেও অধিক মৌলিক কাব্য কীর্তি। গোটা তুর্কী ভাষাভাষী ভূভাগে এক নাসীমী ও নেওয়াঈ ব্যতীত অন্য কোনও কবিই তাঁহার ন্যায় খ্যাতির অধিকারী হইতে পারেন নাই। এমন কি গণমানুষের পল্লী গীতিকবিদের উপরেও তিনি প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হন (তু. Kopr. Zade M. Fuad, Introduction aux Kuliyat de Fuzuli, Constantinople 1342, p. 3-22; Turkiyat Medjm, ii, 434-436)।

খায়ালীর মৃত্যুর পর বাকীই ছিলেন ইস্তাম্বুলের সর্বাপেক্ষা বড় কবি। অচিরেই তাঁহার খ্যাতি গোটা সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি তাঁহার খ্যাতি সুদূর ভারতেও পৌঁছায়। ১৯শ শতক অবধি পরবর্তী সকল কবি তাঁহাকে তাঁহাদের শিক্ষক বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার কাসীদা, মারছিয়া ও গাযাল অত্যন্ত নিখুঁত, নিটোল ও অনবদ্য। তিনি তাঁহার বেশ কয়েকজন পূর্বসূরী দ্বারা অনুপ্রাণিত–একথা সত্য হইলেও তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। অনুভূতির বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে বাকীর স্থান ফুযূলীর নিম্নে, কিন্তু রচনার সঙ্গীতময় মাধুর্য ও নিটোল স্বাচ্ছন্দ্যের বৈশিষ্ট্যটি বাকীকে অনুকরণীয় ক্লাসিক স্রষ্টার খ্যাতি দিয়াছে।

১৬শ শতক গাযাল ও কাসীদার আরও কয়েকজন দিকপাল কবির জন্ম দিয়াছে। আমরা তাঁহাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কবিদের কথা উল্লেখ করিতে পারিঃ হায়রেতী, রাহমী, ফিগানী, মাকালী, দুররী যাদে আলাবী। হায়রেতী একজন মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি। তিনি তাঁহার কাব্যকর্মে রূম-ইলি'র শহরসমূহ ও তাঁহার বিভিন্ন প্রণয়লীলাকে উপজীব্য করিয়াছেন। তাঁহার বন্ধু ইসহাক চেলেবি, ব্রুসার রাহমী যিনি হিলালীর শাহ-ই দেরবেশ-এর অনুবাদ ও তাঁহার চমৎকার গাযালের জন্য সুপরিচিত। ফিগানীকে ইবরাহীম পাশার নির্দেশে হত্যা করা হয়; মাকালী ফিগানীর উত্তরসুরি; ইস্তাম্বুলের দুররী যাদে আলাবী কিছু উল্লেখযোগ্য কাসীদার রচয়িতা। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এম্‌রী, উবেইদী, মুয়েযযিন, হুদায়ী ও নেওঈ ছিলেন গাযাল রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত খ্যাতিমান শক্তি। নেওঈ যুগপৎ একজন অগাধ পণ্ডিত ব্যক্তি ও সুন্দর রচনাশৈলীসম্পন্ন লেখক। বাগদাদের রূহীর নামও আমাদিগকে আবশ্যিকভাবেই এইখানে উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার রচিত তেরকিববেন্দ পরবর্তী কালে তাঁহাকে খ্যাতিমান করিয়া তোলে। ইহার পরে আছেন কেওরী, ব্রুসার জেনানী ও সেলিকী নামে তিন কবি। তাঁহারা তাঁহাদের রচিত মুখাম্মেস ও মুসাদ্দেস-এর জন্য খ্যাত ছিলেন। সুননী ও বিখ্যাত কবি কারা ফাযলী খায়্যাম-এর অনুসরণে রুবাঈ রচনা করিতেন। সা'আতী, শুরেতী, রিয়াদী ও আতা 'হিজ্‌ব' রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাগিরী, ছানী ও গাযালী (উপনাম দেলি বিরাদের) হেযেল, মেযদহ (তরল হাস্য-পরিহাসমূলক কবিতা) রচনা করিতেন (তু. গাযালী ও কোপরুলু যাদে এম. ফু'আদ, য়েনি মেজমূআ, ১৯১৭ খৃ., নং ১৫)। সর্বশেষে উল্লেখ করিতে হয় যে, এই আমলে কবিতার দুইটি রূপের বিশেষ প্রসার ঘটে ঃ মু'আম্মা (হেঁয়ালি) ও তারীখ (ঘটনামূলক উপাখ্যান)। এমরী উল্লিখিত দুই ধরনের কবিতা রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

মাছনাবীর আলোচনার বলা যায় যে, ফারসী মাছনাবীগুলির অসংখ্য অনুবাদ ও অনুকরণের পাশাপাশি শেহর-এনগীয ইত্যাদির মত স্থানীয় বিষয়বস্তুভিত্তিক মাছনাবী, মরমী কবিতা ও ঘটনাকাব্যের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। য়ূসুফ-উ যুলায়খার বিষয়বস্তু ঐ সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, বিশেষ করিয়া হামদীর রচনাটি একান্ত উল্লেখের দাবি রাখে। বহু কবি লায়লা ওয়া মাজনূন কাব্য রচনা করেন। এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাটি ফুযূলীর। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল মিহ্‌র উ মুশতেরি (ফারসী হইতে অনুবাদ ঃ মীরী), এবকার-ই এফকার ও বাহরাম-উ যুহরা (ফিহরীর রচনার বিষয়বস্তু) ও অন্যান্য বিষয়। মাছনাবীর বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে ছিলেন ঃ ইস্তাম্বুলের কারা ফাদলী (দ্র.) গুল-উ বুলবুলের রচয়িতা, তাশলিজার য়াহআ বে ও অপেক্ষাকৃত কম খ্যাত লামিঈ (দ্র.)। য়াহ্‌য়া বে-র সর্বাপেক্ষা মশহুর কবিতাটি হইতেছে শাহযাদা মুসতাফার মৃত্যুর উপর রচিত মারছিয়া (১৫৫২-৫৩ খৃ.)। তাঁহার রচিত মাছনাবীগুলি

হইতেছে ঃ শাহ-উ গেদা, গেনজিনে-ই রায, কিতাব-ই উসূল, গুলশেন-ই এনওয়ার, য়ূসুফ-উ যুলায়্যা। এই মাছনাবীগুলি রচনাগত অনন্য মৌলিকতাসম্পন্ন (তু. য়াহ্য়া বে)। আরও আবশ্যকীয় উল্লেখ্য ঃ আযারী ইব্রাহীম চেলেবি (৯৯৩/১৫৮৫), নাক্শ-ই খায়ার-এর রচয়িতা, ব্রুসার মুসতাফা জিনানী (মৃ.১০০৪/১৫১৬), মাখযানুল-আসরার-এর রচয়িতা, রিয়াদুদ-দীন জিনান ও জালাল-কুলূব। কাব্যে ব্রুসার বর্ণনা লামিঈ-র কলমে সূচিত হয় এবং পরে অনেকে এই শহরের বর্ণনামূলক কাব্য চর্চা করেন। এদরিনে, দিয়ারবাকর, ইস্তাম্বুল ইত্যাদি শহর-নগরীর উপরেও এই ধরনের কাব্যকর্ম রহিয়াছে। এই শ্রেণীর কাব্যের মধ্যে আরও পড়ে ফাকীরী (মৃ. ৯৪১/১৫৩৪) রিসালেত-ই তা'রীফাত; এই রচনাটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনসমষ্টির বিবরণের জন্য যথেষ্ট ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ (তু. কোপরুল-যাদে এম. ফু'আদ, য়েনি মাজমূআ, ১৯১৮ খৃ., নং ৬২)।

১৫শ শতকেও মরমী রচনাবলী, দরবেশ কাহিনী, সূফী তারীকাগুলির জন্য বিধি-বিধান ও অভিধান রচনায়ও মাছনাবী রচনা কাঠামো তথ্য আঙ্গিকের ব্যবহার চলিতে থাকে। অবশ্য এই শ্রেণীর রচনার সাহিত্যমূল্য তেমন বিশেষ ছিল না। কয়েকজন কবি জামী ও নেওয়াঈ-এর অনুকরণে হাদীছে আরবাঈন রচনা করেন। এই শ্রেণীর রচনার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে খাকানী (দ্র.)-র বিখ্যাত 'হলবে' এবং একই লেখক অনূদিত হাদীছে আরবাঈন। সুলেইমান চেলেবির মাওলিদ-এর খ্যাতিতে উৎসাহিত হইয়া বহু কবি, যেমন আক শামসুদ-দীন যাদে হামদী শুরু করিয়া পরে অনেকে একই বিষয়ে রচনা করেন, তবে সেইগুলি সুলেইমান চেলিবি-র মাওলিদের খ্যাতির সমকক্ষতা অর্জন করিতে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষে আমরা শেমসী রচিত দেহ-মুরগ-নামের উল্লেখ করিতে পারি। কবি ইহা আত্তারের মানতিকুত-তায়র-এর অনুপ্রেরণায় রচনা করেন এবং রচনাটি ৯১৯/১৫১২ সালে ১ম সেলীমকে উৎসর্গ করা হয়।

এই শতকে সূফী আন্দোলন আরও জোরদার হইয়া উঠিলে সর্বত্র নূতন নূতন তেক্কে গড়িয়া উঠিতে থাকে। আর এই কারণেই ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই যে, ঐ সময় বিভিন্ন সূফী তারীকার কবিগণ বিভিন্ন ধরনের নীতি-উপদেশমূলক কবিতা, মরমী কবিতা ও দরবেশ কাহিনী রচনায় যেমন প্রবৃত্ত হন তেমনি পাশাপাশি আরবী ও ফারসী সূফী মরমী রচনাবলীর অনুবাদও চলিতে থাকে। আমরা বলিতে পারি যে, প্রতিটি সূফী তারীকারই নিজস্ব সাহিত্য ছিল। আর এই শ্রেণীর সাহিত্যকর্মগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকীর্তি ভিন্ন ও উদার মতাবলম্বী সূফী সম্প্রদায়গুলির সাহিত্য। ফলত ১৫শ শতকে নেদীমীর মাধ্যমে সূচিত বেকতাশি সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব য়েতীমী, আসকারী, সায়্যিদ গাযীর তেক্কের দরবেশগণ ও অন্যান্যের মাঝে গড়িয়া উঠে। উল্লিখিত ব্যক্তিরা ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁহাদের চিন্তাধারার মুক্ত ও অবাধ প্রকাশের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র হইয়া আছেন, আর তাঁহাদের এই ধরনের মুক্ত উদার চিন্তাধারার জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে প্রাণ দিয়া মূল্য দিতে হইয়াছে। তাঁহাদের বিজাতীয় উদার মতবাদ কেবল বেকতাশি ও হুরূফী সূফী তারীকার মাঝেই সীমিত ছিল না, বরং উহা খালওয়াতী ও মেলামীর মত রক্ষণবাদী সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্তত ঐতিহাসিক সূত্রগুলি ইহর সাক্ষ্য দেয়। অন্যান্য সূফী কবি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় কাব্য চর্চা করেন। ইহাদের মধ্যে বেকতাশের য়াহ্য়া এফেনদি ও অন্যেরা রহিয়াছেন।

বেশ কয়েকটি ইতিহাস বিষয়ক রচনা মাছনাবীর আকারে রচিত হয়। ৯৩৭/১৫৩১ সনে হাদীদী রচিত 'উছমানী ইতিহাস ব্যতীত ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলি সর্বক্ষেত্রেই একটি একক বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, যেমন বুদা-জেরবে ও য়ামান জয়ের ঘটনা কিংবা একজন সুলতানের (বিশেষত সুলায়মানের) বা কোনও সেনাপতির, যেমন খায়রুদ-দীন পাশা বারবারোসা কিংবা ওয দেমির ওগলু উছমান পাশার বিজয়াভিযানগুলির ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

এই শতকের গদ্য আরও গুরু প্রকৃতির ও অধিকতর কৃত্রিমতাময়। ইহাতে ফারসী আদর্শের অতিরঞ্জন ঘটিয়াছে; সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ক্ষুণ্ন করিয়া সহজতর ভাবটিকেও এক জটিল ভাবমূর্তিতে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। রুচির এই দৈন্যটি ঐ আমলের নিম্নবর্ণিত সেরা গদ্য রচনা-শৈলীকারদের মধ্যে লক্ষ করা যায় ঃ লামিঈ, কেমাল পাশা যাদে, জেলাল যাদে, ফেরিদুন বেগ, আজমী, হুমায়ুন-নামে'র অনুবাদক 'আলী চেলেবী, কীনালী যাদে, 'আলী চেলেবি, খাওয়াজা সা'দুদ-দীন (দ্র.) ও অন্যান্য। উল্লিখিত কৃত্রিমতার প্রবণতাটির প্রভাব কবিতার তুলনায় গদ্যে অধিকতর বিপর্যয়কর হইয়া উঠে। শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা সহজ-সরল ভাষায় লিখিত রচনাকে ঘৃণা ও অবহেলার চোখে দেখিতেন। অবশ্য আমরা দীর্ঘ পরিসরের রচনাগুলিতে দেখিতে পাই যে, রচনার মুখবন্ধটিই কেবল বিশৃঙ্খল ও আড়ম্বরময় বাকবিন্যাসে রচিত। বস্তুত এই আমলের বহু ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও নীতিমূলক রচনাসহ অনেক সাহিত্যমানের লেখাও অধিকতর সহজ-সরল ভাষায় রচিত হয়। রাষ্ট্রীয় পত্র যোগাযোগ ও দলীলাদির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। জনসাধারণের জন্য রচিত ধর্মীয় রচনাগুলির ক্ষেত্রে উহা যতখানি সম্ভব সরল ভাষায় লেখার সর্বাত্মক যত্ন নেওয়া হয়। বাকী ও ফুযূলীর যেইসব গদ্য রচনা আমাদের সংগ্রহে আছে তাহা চমৎকার অথচ তুলনামূলকভাবে সহজ ভাষায় রচিত।

আমরা ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলি সম্পর্কে প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করিব। প্রধানত 'উছমানী সাম্রাজ্যের সামরিক অভিযানগুলির সাফল্যের ব্যাপারে শিক্ষিত শ্রেণীর আগ্রহের কারণেই এই ধরনের রচনার ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়। ছন্দোবদ্ধ অর্থাৎ কাব্যাকারে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ সালজূক আমলের ঐতিহ্য। উহা এই শতকেও চলিতে থাকে। তবে ২য় বায়াযীদ ও ১ম সেলীমের আমল হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটি গদ্যে রচিত হইতেছে। ইদরীস বিতলিসী কর্তৃক ফারসীতে রচিত 'উছমানী সাম্রাজ্যের সরকারী ইতিহাস তাঁহার পুত্র কর্তৃক তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। অন্যান্য সাধারণ ইতিহাসের রচয়িতা হইতেছেন ইবন কেমাল, জালাল যাদে, মুসতাফা চেলেবি রচনাঃ তাবাকাতুল-মামালিক, মুহ্য়িদ-দীন জেমালী, লুতফী পাশা, খাওয়াজা, সা'দুদ-দীন ও 'আলী। ইহা ছাড়া এই মেয়াদে আরও কতকগুলি বিশেষ ধরনের ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক মেয়াদ বা বিশেষ ঘটনা (ফেতহনামে), জীবন-চরিত (যেমন জাওয়াহিরুল-মানাকিব-সোকোল্লী সম্পর্কিত)-মূলক বিষয় উল্লিখিত রচনাগুলির উপজীব্য। ঐ আমলে রাজদরবারে শেহনামেজি' পদটি বহাল ছিল। সুলায়মানের শাসনামলে ঐ পদে আসীন ছিলেন ফাতহুল্লাহ আরিফ। আর তাঁহার উত্তরসুরিরা হইতেছেন আফলাতুন শিরওয়ানী, সায়্যিদ লুকমান ও তা'লীকী যাদে (মৃ. ১০১৩-১৬০৪)।

এই পদাধিকারিগণ ছিলেন তুর্কী ভাষার কবি, কিন্তু রীতি-ঐতিহ্য অনুযায়ী তখন রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক শেহনামে (শাহনামা) ফারসী ভাষায় মুতাকারিমব ছন্দে রচনা করিতে হইত। ৩য় মেহমেদের শাসনামলে তিনি উহা তুর্কী ভাষায় রচনার নির্দেশ দেন। তা'লীকী-যাদের সময়

হইতে রচনার পাঠের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে গদ্যের আবির্ভাব লক্ষ করা যাইতে থাকে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের নিরিখে স্বাভাবিকভাবেই এইসব শেহনামের গুরুত্ব বেসরকারী ঘটনাপঞ্জীমূলক বিবরণের তুলনায় কম। সা'দুদ-দীনের তাজুত-তাওয়ারীখ-এর মত রচনাগুলি এই ধরনের ইতিহাস লিখন-শৈলীর আদর্শরূপে গণ্য। তবে সংশ্লিষ্ট আমলের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যের জন্য লুতফী পাশার (দ্র.) তা'রীখ অনেক বেশি মূল্যবান। তাঁহার রচনাশৈলী পুরাতন ঘটনাপঞ্জী রচনার সহিত অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। সেলানিকলি মুসতাফা এফেনদি রচিত তারীখ হইতে আমরা জানিতে পারি, আলোচ্য শতকের শেষভাগে প্রশাসন কতখানি দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। আলোচ্য আমলের অবিসংবাদী ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হইতেছেন 'আলী (দ্র.)। তাঁহার অন্যান্য রচনা হইতে বুঝা যায়, তিনি জ্ঞান চর্চার দিক হইতে কার্যত এক বিশ্বকোষ ছিলেন। কেবল তাঁহার কুনহুল' আখবার হইতেই নহে, বরং তাঁহার নাসীহাতুস-সালাতীন, কাওয়াইদুল-মাজালিস ও মেনাকিব-ই হুনেরবেরান হইতেও দেখা যায় যে, লেখক তাঁহার সমসাময়িক কালের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত ও ঐ পরিস্থিতির একজন কঠোর সমালোচক ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস বিষয়ক রচনার শৈলীটি ছিল তুলনামূলকভাবে সরল [তাঁহার জীবন ও রচনা সম্পর্কে তু. মেনাকিব-ই হুনেরবেরান (ইস্তাম্বুল ১৯২৬ খৃ.) গ্রন্থের সংস্করণে ইবনুল-আমীন মাহমূদ কেমালের ভূমিকা]। তাশ্‌কোপ্‌রু যাদে (দ্র.) এই শতকেই আরবীতে শাকাইক-ই নুমানিয়্যে রচনা করেন এবং সংযোজনসহ ইহার তুর্কী অনুবাদ করেন এদীরনের মেজ্‌দী ও এদীরনের খাকী। ইহা ছাড়া আলোচ্য আমলে রচিত বেশ বড় আকারের জীবনচরিতমূলক সাহিত্যও গড়িয়া উঠে। এইসব জীবনচরিতের মধ্যে তুর্কী সূফী-শায়খদের জীবনীগুলি ঐতিহাসিক দিক হইতে যথেষ্ট মূল্যবান। লামিঈ-র নাফসুল-আমর-নামের মত চটুল রঙ্গরসমূলক কিছু রচনা ও নীক্‌সারী যাদের অনুরূপ রচনারও এই ধরনের গুরুত্ব রহিয়াছে (তু. বিল্লী) তেতেবুলার মেজমূ'আসী, নং ৩)।

সাহিত্যের ইতিহাসসম্বলিত এই আমলের ঐতিহাসিক রচনাবলী বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। 'উছমানী ভাষা/সাহিত্যের সর্বপ্রথম তেযকেরে হইতেছে নেওয়াঈ-র মাজালিসুন-নাফাইস-এর অনুকরণে সেহী কর্তৃক ৯৪৫/১৫৩৮ সালে রচিত হাশত বেহেশ্‌ত। লাতীফী (দ্র.), আশিক চেলেবি (দ্র.), বাগদাদের আহ্‌দী ও হাসান চেলেবি (দ্র.) সেহরী অনুসরণে রচনা করেন। 'আলী তাঁহার কুনহুল-আখবার-এ বিভিন্ন কবি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সন্নিবেশ করেন। ৯১৮/১৫১২ সালে হাজ্জী কেমাল জামিউন-নাজাইর রচনা করেন। ইহা ছিল অন্যান্য কবির কবিতার উপর রচিত নাজিরার সংগ্রহের এক সঙ্কলনবিশেষ। ইহাতে ২৬৬ জন কবির কবিতা স্থান পায়। এই ধরনের আরও সঙ্কলন ঐ মেয়াদে রচিত হয়। বস্তুত উহা এক প্রথায় পরিণত হয়। প্রথাটি ১৬শ শতকে প্রচলিত ছিল। এই ধরনের রচনা থাকার কারণে তুর্কী কবিদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের পরিসর অনেকখানি প্রসারিত হইয়াছে।

এই শতকেই ভূগোল ও ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনা সূচিত হয়। ১৫শ শতকে আমরা এই জাতীয় লেখার মধ্যে কেবল কাযবীনীর রচনার অনুবাদ ও ঐ রচনা হইতে উদ্ধৃতিমূলক লেখা, ইবনুল-ওয়ারদীর লেখা হইতে অনুবাদ ও উদ্ধৃতি এবং গ্রীক পণ্ডিত টলেমির লেখার অনুবাদ লক্ষ করিয়াছি। ১৬শ শতকেও উল্লিখিত আরবী লেখকদের দুই রচনার অনুবাদ করা হয়। ইহা ছাড়া আবুল-ফিদা (অনু. সিপাহী যাদে), ইসতাখ্‌রী (অনু. শেরীফ এফেনদী) ও আলী কুশজির গণিত, ভূগোল ও মিসরের ভৌগোলিক বিবরণসম্বলিত রচনাটিরও অনুবাদ করা হয়। সওদাগর আলী একবার খিতায়ী কর্তৃক ফারসীতে রচিত চিন সিয়াহাত-নামেসি" নামক গ্রন্থটি ৩য় মুরাদের জন্য তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তুর্কী সাম্রাজ্যের নৌ সম্প্রসারণ নীতির ফলে পীরী রেঈস (দ্র.) কর্তৃক ৯৩৫/১৫২৯ সালে সুবিখ্যাত গ্রন্থ বাহরিয়ে রচিত হয়। গ্রন্থটি সাফাঈর-র মত প্রবীণ মানচিত্রকার ও ইতালীর মানচিত্রসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয়। সুলায়মানের স্থলভাগের উপর দিয়া সমরাভিযানের ফলে আমরা মিতরাকজী নাসহুস-এর রচনাটি পাইয়াছি। এই গ্রন্থে অনেকগুলি চমৎকার নক্‌শা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ভারত মহাসাগরে সায়্যিদী আলী রেঈসের দুর্ভাগ্যজনক অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুহীত শীর্ষক রচনাটি লিখেন। অবশ্য গ্রন্থটি পুরাপুরিভাবেই বিভিন্ন আরব রচনার ভিত্তিতে লিখিত। একই লেখকের "মিরাতুল-মামালিক" তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি মৌলিক। ইহার পর রহিয়াছে ব্যবসায়ী আহমাদ ইব্‌ন ইবরাহীমের কাব্যে রচিত সিয়াহাতনামে। ইহার রচয়িতা সমুদ্রপথে তাঁহার ভারতবর্ষ সফরের বিবরণ দিয়াছেন। Trebizond-এর মেহমেদ আশিকের মানাজিরুল-আওয়ালিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনা। আরবীয় ভূগোলবিষয়ক রচনাবলীর ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থে 'উছমানী ভূভাগ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যাদি দেওয়া হইয়াছে। পরিশেষে আমরা নয়া দুনিয়া আবিষ্কার সংক্রান্ত তারীখ-ই হিন্‌দ-ই গারবী-র উল্লেখ করিতে পারি। য়ুরোপীয় ভাষায় রচিত একটি গ্রন্থ হইতে মেহমেদ য়ূসুফ আল-হেরেবী (তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে তু. Taeschner, in Z. D. M. G., lxxvii., 1923) ৯৯০/১৫৮২ সালে অনুবাদের মাধ্যমে উল্লিখিত গ্রন্থটি রচনা করেন।

ধ্রুপদী তুর্কী সাহিত্যের পাশাপাশি এই আমলে আমরা সাধারণ তুর্কী গণমানুষের লোকসাহিত্যের বিকাশও লক্ষ করি। কিসসা-খাওয়ান, মেদদাহ ও জনপ্রিয় সরাইখানার কারাগোযজী এবং জানিসারী সেনাদের ব্যারাকগুলির মাধ্যমে তুর্কী লোকসাহিত্য প্রসার লাভ করে। বহু চিরায়ত কবি সাধারণ দেহাতি মানুষের জন্য তুর-কু (দ্র.) রচনা করেন। তুর-কু নামের এই এক ধরনের কবিতাগুলি আরূয্ ছন্দে ও মুরাববার আঙ্গিকে রচিত হইত। পরে এই তুর-কু শারকী (দ্র.) নামে অভিহিত হয়। কবিতার এই আঙ্গিকের আদি পরিচয় নিহিত রহিয়াছে তুর্কদের মধ্যে প্রচলিত আদিতম কবিতার আঙ্গিকে। তবে ধ্রুপদী কবিদের অনুসরণে আনওয়ারী, ছিয়াবী, রায়ী, রাহকী ও অন্যান্য নিরক্ষর কবি যাহা রচনা করেন সেইগুলিই বরং সাধারণ মানুষের রুচির নিকট অধিকতর গ্রহণীয় হইয়া উঠে। সাধারণ মানুষের নানা সমাবেশে আবূ মুসলিম, হামযা-নামে, বাততাল গাযী ইত্যাদি বিষয় বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইহাতে ইস্তাম্বুলের হাশিমী বারকী বে-পূলাআ শীর্ষক মাছনাবী রচনায় উৎসাহিত হন। এই মাছনাবী রচিত হয় হামযা-নামে হইতে গৃহীত বিষয় অবলম্বনে। একইভাবে অন্যান্য লেখক ও কবিও অনুরূপ ধরনের রচনায় উৎসাহিত হন। সুলতান সুলায়মান জামিউল-হিকায়াত-এর অনুবাদক সালিহ্ এফেনদিকে দিয়া আট খণ্ডে তুর্কী ভাষায় ফীরূয-শাহর কাহিনীর অনুবাদ করান। এমন কি সুলতানের প্রাসাদ পর্যন্ত কিসসা-খাওয়ান পৌঁছিয়া যায়। পুরাতন ইরানী ও মুসলিম বিষয়গুলির পাশাপাশি কবি ওয়াহদী রচিত বুরসালী খাওয়াজা আবদুর-রাউফ এফেনদি হিকায়েসি-র মত দৈনন্দিন সাধারণ জীবনযাত্রার কাহিনীর সংকলনও আমরা লক্ষ করি। ব্রুসার মুসতাফা জিনানী তাঁহার অকৃত্রিম শৈলীতে লিখিত দৈনন্দিন জীবন কেন্দ্রিক গল্পের মাধ্যমে ঐ আমলের জনজীবনের নানা বিষয়ে আমাদিগকে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি দিয়াছেন। এই কাতারের আরও একজন কবির নাম মেদ্‌হী। তাঁহার প্রকৃত নাম দেরবীশ হাসান।

তিনি ৩য় মুরাদের মেদদাহ (তু. Rieu, Cat. of Turk. MSS., P. 42) ছিলেন।

১৬শ শতকে ওযানগণের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশি জানিতে পারি। অবশ্য এই আমল নাগাদ তাঁহারা সাধারণত আশিক বা চোগুরজু নামে পরিচিতি লাভ করেন। এই চারণগীতি কবিগণ যেখানেই দেহাতি মানুষ জমায়েত হইয়াছে সেখানেই উপস্থিত হইয়াছেন। আর সেই সব জমায়েতে তাঁহারা আক্ষরিক ছন্দে রচিত কবিতা, প্রণয়-গীতি, বীর কাহিনী, মারছিয়া ও তুর-কু সুর করিয়া পড়িবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এই শতকের সূচনায় আমরা ১ম সেলীমের মিসর অভিযান সংক্রান্ত ও বাখশী রচিত এক মহাকাব্যের অংশবিশেষের সন্ধান পাই। শতকের শেষভাগে যেসব লোকগীতি কবির সন্ধান মিলিয়াছে তাঁহারা হইতেছেন ঃ কুল মেহমেদ (মৃ. ১০১৪/১৬০৫); ওক্সুয দেদে, খায়ালী ও কোর ওগলু ও মাগরিব অঞ্চলের সেনানিবাসগুলিতে ঃ চীরপানলী, আরমুদ্‌লু, কুল চুলখা, গাদামুস্‌লু (তু. আরও কোপরুল-যাদে এম. ফু'আদ, তুরক সায শাইরলারি, ১৯৩০)।

একে অপরের উপর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রভাবের কারণে দেখা যায় যে, দেহাতি শ্রেণীর উপজীব্য অক্ষর মিল ছন্দও কোনও কোনও সময় পরিমার্জিত সংস্কৃত শ্রেণীর মাঝেও (তবে বিশেষত হেসেল-এ) প্রবেশ করিয়াছে, আরূদ ছন্দ জনপ্রিয় কবিতার বাহন হইয়া উঠিয়াছে–যেমনটি উহা এতকাল ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কবিতার বাহন ছিল। সূফী মরমী কবিরা অবশ্য য়ূনুস ইম্‌রের ঐতিহ্যানুসরণে তাঁহাদের ইলাহিগুলি অক্ষর ছন্দে রচনা করেন। আমরা এ ক্ষেত্রে উম্মী সিনান (মৃ. ৯৫৮/১৫৫১), আহমাদ সারবান (মৃ. ৯৫২/১৫৪৫), ইদরীস মুখতেফী (মৃ. ১০১০/১৬০১) উল্লেখ করিতে পারি। তবে কবি য়ুনুস ও কায়গুসুযের সর্বাপেক্ষা যোগ্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যাঁহাদিগকে লক্ষ করা যায় তাঁহারা প্রধানত বেকতাশী ও কিযিলবাশ সূফী তারীকার মরমী ব্যক্তি, যেমন কুল হিমমেত ও তাঁহার শাগরিদ পীর সুলতান আবদাল। আবদাল সীওয়াশের অধিবাসী। খিয্‌র পাশার আদেশে (তু. সা'দুদ-দীন নুযহেত, পীর সুলতান আবদান, ১৬০০ খৃ.) তাঁহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। লোকপ্রিয় এই সাহিত্য অঙ্গনের অন্যান্য ব্যক্তিত্ব হইতেছেন ঃ হাসান ওগলু তুরকুলারি, কারা ওগলান তুরকুস, গেইক্ দেস্‌তানী।

১৭শ শতক

সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবক্ষয় সত্ত্বেও বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্যানুশীলন স্বাভাবিক গতিতে চলিতে থাকে। মুসলিম নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেও সাধারণভাবে 'উছমানী সাহিত্য ভাষার প্রসার ঘটে। ইহা ছাড়া পূর্ব আনাতোলিয়া (আযারী উপভাষা) ও ক্রিমিয়ার মত অতুর্কী জনগোষ্ঠী কিংবা অ-'উছমানী তুর্কীভাষী লোকালয়গুলিতে 'উছমানী তুর্কীর প্রসার ঘটে। ক্রিমিয়ায় কয়েকজন 'উছমানী তুর্কী কবির উদয় ঘটে। বস্তুত এই কবিদের মধ্যে খোদ কয়েকজন খানও রহিয়াছেন। ১৬শ শতকের গোড়ার দিক হইতেই হাঙ্গেরী ও ক্রোয়েশিয়ার মুসলমানদের আরবী হরফের ব্যবহার 'উছমানী তুর্ক সাহিত্য ও কৃষ্টির প্রভাব পরিলক্ষিত হয় (তু. Ungarische Bibliotiek. 1927. N0. 14)। কাব্যে একটি তুর্কী-সার্ব অভিধানের অস্তিত্বও আছে। Potur Shahidije নামে এই অভিধানটি হাওয়ায়ী (Bull. de la Soc. scient. de Skopliye, iii, 189-202) রচনা করেন। উসকূফ প্রণীত একই ধরনের তুর্কী-বোসনীয় অভিধান এবং কয়েকটি ছন্দমিলের তুর্কী পারিভাষিক শব্দাবলীও আছে। ইস্তাম্বুল সর্বদাই 'উছমানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র ও ঐ সাম্রাজ্যের সীমান্তের বাহির হইতেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাবেশস্থল ছিল। একমাত্র ৪র্থ মুরাদ ব্যতীত আর কোন সুলতানই এই আমলে সাহিত্যের বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কের মধ্যেও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক তুলনামূরকভাবে কম পরিদৃষ্ট হয়, যেমন ইলিয়াস পাশা, মুসাহিব পাশা, রাম্মী পাশা এবং শায়খুল-ইসলাম য়াহ্‌য়া ও বেহাঈ। এই পরিস্থিতি ও মাদ্‌রাসাগুলির অবক্ষয়দশা সত্ত্বেও এই দশকেই সারী আবদুল্লাহ (দ্র.) ইসমাঈল আন্‌কারেবী, ইসহাক খাওয়াজাসী, আহমাদ এফেন্দী ও অন্যান্যের মত সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য এই শতকে ধর্মীয় জ্ঞান আরবী ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় কোনও বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব নাই। মাদ্‌রাসা ও তেক্কেগুলির মধ্যে কাদী-যাদের প্রশ্ন বলিয়া কথিত সংঘাত বিরাজমান থাকায় বুঝা যায়, তখনও মাদ্‌রাসাগুলিতে কি ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় ছিল। বিভিন্ন সূফী তারীকার উপর নিপীড়নমূলক দমন এবং অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নির্যাতন সত্ত্বেও গোটা সাম্রাজ্যে এই ধরনের তারীকার উদয় বন্ধ হয় নাই, বরং তারীকা গঠন জোরদারভাবেই আগাইতে থাকে।

১৭শ শতকের চিরায়ত (ধ্রুপদী) তুর্কী কবিতা কোনও অংশেই উহার ফারসী আদর্শ হইতে নিম্ন মানের ছিল না। কিন্তু এখন অনুকরণ ও অনুবাদ ছাড়িয়া তুর্কী কবিরা মৌলিক বিষয় ও মৌলিক রচনায় প্রয়াসী হন। অন্যদিকে ইহাও সত্য যে, তখনও তুর্কী সাহিত্যে সমসাময়িক কালের ফারসী ও ইন্দো-ফারসী সাহিত্যের প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। নেফঈ-র রচনায় উরফী সাইবের নাবী ও নাইলী-ই কাদীমের রচনায় শাওকাতের রচনার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কল্পনাশক্তি, ভাষার সম্পদ ও শৈলীর সুসঙ্গতির বিবেচনায় নেফঈকে কাসীদার সর্বশ্রেষ্ঠ তুর্কী বিশারদ বলিয়া অভিহিত করা যায়। তবে তাঁহার গাযাল ও হিজ্‌ব্ তেমন সাফল্য লাভ করে নাই। নেফঈ-র প্রভাব তাঁহার উত্তরসুরিদের মধ্যে সর্বদাই প্রবল থাকিলেও তাঁহার জীবদ্দশায় বেশ কিছু বিখ্যাত কাসীদেজির জন্ম হয়। তাঁহাদের মধ্যে আছেন ঃ নেওঈ যাদে আততার, কাফাযাদে ফাইদী, রিয়াদী, সাবরী ও রিদাঈ প্রমুখ। গাযালের সর্বাপেক্ষা বিশাল ব্যক্তিত্ব হইতেছেন শায়খুল-ইসলাম য়াহ্‌য়া (দ্র.)। তাঁহাকে, বিশেষত ভাব ও অনুভূতির বিরাট প্রকাশ ক্ষমতার জন্য বাকীর উত্তরসাধক বলিয়া গণ্য করা যায়। তাঁহার খ্যাতির পরিসরও একইভাবে পরবর্তী কয়েক শতকের পরিসর অবধি বিস্তৃত। বাকী ও য়াহ্‌য়ার অনুসারীদের অন্যান্য প্রতিনিধির মধ্যে আছেন শায়খুল ইসলাম হোয়ী ও ওয়েজ্‌দী। শেষোক্ত কবির বিপরীতক্রমে ফেহীম (দ্র.), নাইলী কাদীম (দ্র.), শেহরী, এমন কি নাবীও (দ্র.) সমসাময়িক ফারসী কবিতার প্রভাবাচ্ছন্ন ছিলেন। নাবীর উপর সাইবের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই নাবী তাঁহার মাছনাবী খায়রীয়ে ও গাযালের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার কবিতা বৈদগ্ধময় ধারণা-প্রধান। কিন্তু তদসত্ত্বেও তাহাতে তাঁহার জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হয় নাই। তিনি তাঁহার বহু কবিতায় তাঁহার সমসাময়িক কালের সামাজিক জীবনের বর্ণনা দিয়াছেন ও উহার সমালোচনা করিয়াছেন। বয়সে তরুণ তাঁহার সমসাময়িক কবি ছাবিত (দ্র.) তাঁহার কাব্যে প্রবাদ-প্রসূত ভাবের সংমিশ্রণের মাধ্যমে নিজ মৌলিকত্বকে তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। ১৭শ শতকের গাযাল বিশারদদের মধ্যে আমরা নিশাতী মাওলাবী, জেওরী ও রামী মেহমেদ পাশার নাম উল্লেখ করিতে পারি।

আজামী যাদে হালেতী (দ্র.) সকল প্রকার কবিতা রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি রুবাই-এর জন্য। লাগয, মু'আম্মা ও তারীখ (ঘটনাভিত্তিক রচনা) অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিভিন্ন আঙ্গিকে রচিত হিজ্‌ব ও মেযাহ বহু প্রথম কাতারের কবিকে

অত্যন্ত স্থূল রচনায় প্রলুব্ধ করে। অবশ্য এই জাতের কোনও কোনও কাব্যকর্ম প্রশংসারও দাবি রাখে। যেমন, আমরা গুফতীর মাছনাবীর আকারে তাযকেরির কথা উল্লেখ করিতে পারি। এইসব তাযকিরায় কবি সমসাময়িক কালের কবিদের চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। মুলা'ম্মার আকারে ফেহীম ও জেওরীর হিজ্‌বগুলি অত্যন্ত কিম্ভূত ধরনের, কেননা অতুর্কী ভাষার অনেক অনুচ্ছেদসহ রচনাটির পাঠ বিক্ষিপ্ত।

এই শতকের প্রথমার্ধের কোনও কোনও মাছনাবী অসাধারণ রকমে নিখুঁত, নিটোল। পুরাতন খাম্‌সাগুলির বিষয়বস্তুর পরিবর্তে ক্রমেই বেশি হারে সমসাময়িক বিষয়বস্তু স্থান গ্রহণ করিতে থাকে। এই রচনাশৈলীর সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিনিধি হইলেন নেওঈ যাদে আতায়ী (দ্র.)। ইনি তাঁহার খাম্‌সার জন্য বিপুল খ্যাতির অধিকারী হন। খামসাগুলির বিষয়বস্তু তাঁহার সমসাময়িক কালের জীবন হইতে গৃহীত। তাশলীজার য়াহ্‌য়া ও জিনানীর (তু. ১৬শ শতক) মত তুর্কী কবির প্রভাব তাঁহার রচনায় পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার পরে আমরা নিম্নবর্ণিত মাছনাবী রচয়িতা কবির নাম উল্লেখ করিতে পারিঃ কাফ যাদে ফাইদী, গানী যাদে নাদিরী ও রিয়াদী। প্রধানত এই শতকেই ফারসী কবি জুহূরীর অনুকরণে সাকীনামে রচনা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্যই এই জাতের রচনা এই শতকের আগেও রেওয়ানীর (১৬শ শতক) ইশরেত-নামের মাঝে দেখা গিয়াছে। সাকী নামেগুলির মধ্যে আমরা বিশেষভাবে আতায়ী, রিয়াদী ও হালেতীর সাকীনামের উল্লেখ করিতে পারি। এইগুলির সকলের মাঝেই মরমীবাদের মিশ্রণ আছে। এইভাবে বলা যায়, মাছনাবী সকল প্রকারের বিষয়বস্তুর, যেমন দৈনন্দিন জীবন কাহিনী বর্ণনা, কল্পনামূলক রচনা, বাস্তব ঘটনার কাহিনী ইত্যাদি সব কিছুরই বাহন হইয়া উঠে।

এই শতকে ধর্মীয়, মরমী সূফীবাদমূলক দরবেশ-জীবনী ও নৈতিকতামূলক রচনার সংখ্যা বিপুল। অবশ্য এই শতকে তারীকার সংখ্যাও ছিল অনেক বেশি। এই তারীকাগুলির জন্য বিভিন্ন কাব্য আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়। ইহার মধ্যে সর্বাধিক পরিচিতি পায় নাদিরীর মি'রাজিয়ে। ইহা ছাড়া মহানবী (স)-র প্রশস্তিমূলক রচনাও (না'ত), হাদীছয়ে আরবাঈন ও মাওলিদ ইত্যাদির অনুবাদও করা হয়। কোনও কোনও সূফী কবি অক্ষর মিল ছন্দে কবিতা রচনা করেন। নিয়াযী-ই মিসরী" ছিলেন খালওয়াতীয়া তারীকার মিসরীয়ে উপ-তারীকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার রচিত কবিতাগুলি দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই ধরনের সূফী কবিদের কাতারে বেকতাশি তারীকার কয়েকজন কবি ছিলেন। ইহা ছাড়া কাব্যে বহু সংখ্যক ইতিহাস গ্রন্থও এই আমলে রচিত হয়। এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে ২য় উছমান ও অন্যান্য শাসনামলের নাদিরীর শাহনামের মত শাহনামে ও গাযানামে ইত্যাদি। মুলহেমি রচিত শাহিনশাহনামের কেবল ভূমিকাটি তুর্কী ভাষায় রচিত। ইহা ৪র্থ মুরাদের আদেশে লিখিত। গ্রন্থটির অবশিষ্টাংশ ঐতিহ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ফারসীতে লিখিত। এই শতকেই কাব্যে সংক্ষিপ্ত 'উছমানী ইতিহাস রচনার রীতি শুরু হয়। এই শ্রেণীর ইতিহাস লেখকদের মধ্যে তালিবী (রচনাকাল ঃ ১০১৭/১৬০৮), নিছারী (রচিত গ্রন্থ ৪র্থ মাহমূদের জন্য) ও সোলাক যাদে হেমদেমী (রচনা ঃ ফিহরিস্‌ত-ই শাহানা, ৪র্থ মাহমূদকে নিবেদিত)। এই ধরনের আরও লেখক ১৯শ শতকে যিয়া পাশা অবধি উল্লিখিত শ্রেণীর ইতিহাস রচনার কাজ চালাইয়া যান। অবশ্য এই ধরনের রচনার তেমন কোনও সাহিত্য বা ঐতিহাসিক মূল্য ছিল না।

সাহিত্য মানের গদ্যও এই শতকেও পূর্ববর্তী শতকেরই অনুরূপ। গদ্য সাহিত্যে এই আমলের মহাশৈলীকার (মুন্‌শী) ওয়েইসী, নেরগিসী, ওকজু যাদে প্রমুখ তুর্কী গদ্য ভাষাকে আরও উচ্চতর স্তরে উন্নীত করেন। হুকমীর মত মুন্‌শী লিখিত ও পারস্যের রাজদরবারের উদ্দেশ্যে সম্বোধিত সরকারী দলীলগুলির এক অনুপম নমুনার পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, অনেক সময় ব্যক্তিগত ও বেসরকারী পর্যায়ের পত্র যোগাযোগের ক্ষেত্রেও রুচিবর্জিত ঐ একই শৈলীতে গদ্য লিখিত হইত। যেইসব গদ্য রচনা তৎকালে সাহিত্য মূল্যহীন বিবেচিত হইত আধুনিক কালে সেইগুলি যথেষ্ট প্রশংসিত হইতেছে। এমন রচনার লেখকদের মধ্যে আছেন কোচী বেগ, কাতিব চেলেবি, আওলিয়া চেলেবি ও নাঈমা। এই শতকে গদ্য রচনায় ইতিহাসের স্থান সর্বাগ্রে। এই ধরনের কয়েকটি রচনা আধা সরকারী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেমন তাশকোপ্‌রুযাদে কর্তৃক ২য় উছমানের জন্য গদ্যে রচিত শাহনামে। ৪র্থ মুরাদ তাঁহার ইরিওয়ান অভিযানের জন্য কাবিলীকে ওয়াক'আনাবীস নিযুক্ত করেন। ১০৭৪/১৬৬৪ সালে ৪র্থ মেহমেদ নিশান্‌জী আবদুর-রাহমান পাশা এবং একইভাবে ২য় মুসতাফা ফিন্‌দীকলীর মেহমেদ খালীফাকে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের ঘটনাপঞ্জী রচনার জন্য নিয়োগ করেন। কিছুকাল পরে নাঈমাকে ওয়াকআ-নাবীস নিয়োগ করা হয়। এই শতকের ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ইসলামের সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থগুলির অনুবাদ, ইসলামের উপর মৌলিক রচনাসমূহ, সাধারণ ও বিশেষ ধরনের রচনা ও 'উছমানী ইতিহাসের উপর বিশেষ সন্দর্ভ। ইতিহাসগত দৃষ্টিকোণের বিচারে এই রচনাগুলির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে আরবী ভাষায় মুনেজ্‌জিম বাশী রচিত জামিউদ-দুওয়াল, কাতিব চেলেবির ফেযলেকে, পেচেবীর তারীখ ও নাঈমার উৎকৃষ্টতম রচনা। মহা বিশ্বকোষ রচয়িতা সুপণ্ডিত কাতিব চেলেবি (তু. হাজ্জী খালীফা) তাঁহার মীযানুল-হাকক ও দাসতূরুল-আমাল গ্রন্থে ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তুলিয়া ধরিয়াছেন। পেচেবীর রচনাও তাঁহার সুষ্ঠু বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও নিরপেক্ষতার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি তাঁহার রচনায় খৃস্টান সূত্রও ব্যবহার করিয়াছেন। নাঈমার বর্ণনা ক্ষমতা প্রথম স্তরের। তিনি তাঁহার রচনায় ইতিহাসের চরিত্রগুলির অত্যন্ত প্রাণবন্ত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিয়াছেন। কোচী বেগ (দ্র.) তাঁহার সুবিখ্যাত রিসালাতে 'উছমানী সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের কারণগুলি তুলিয়া ধরিয়াছেন। কারা চেলেবি যাদে যত না ঐতিহাসিক তাহার চাইতেও বেশি একজন মুন্‌শী। ইহা ছাড়া যাঁহাদের নাম ঘটনাপঞ্জীকার হিসাবে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয় তাঁহাদের মধ্যে আছেন ঃ ওয়েজীহি, হাসান বে যাদে, সোলাক যাদে এবং সেই সঙ্গে নেওঈ যাদে আতায়ী রচিত শাকাইক-ই নুমানীয়ে-র dheil ও উশশাকী যাদে কর্তৃক উহার ধারাবাহিকতামূলক প্রয়াস।

এই শতকের তাযকিরা ১৬শ শতকের স্তরেরও অনেক নিম্নমানের। এইসব তাযকিরার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে রিয়াদী কর্তৃক ১০১৮/১৬০৯ সনে লিখিত তাযকিরা। কাফ যাদে ফাইযী কর্তৃক ১০৩০/১৬২১ সনে রচিত রিয়াযুশ শুআরাতেও যেইসব কবির বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে তাঁহাদের রচনার কিছু কিছু নমুনাও ঐ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। এই রচনার জন্য মেহমেদ আসিম (মৃ. ১০৮৬/১৬৭৫) রচিত একটি dheil-ও আছে। ইহা ছাড়া রহিয়াছে রিদার সংক্ষিপ্ত তাযকিরা ও গুফতীর তাযকিরা যাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। খিসালী (মৃ. ১০৬২/১৬৫২) রচিত মাতালী' আন-নাজাইর মাতলা'সমূহের একটি সঙ্কলনবিশেষ।

ভূগোল বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে ক্বাতিব চেলেবি ও আবূ বাকর দিমাশকীর রচনাগুলিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহারা তাঁহাদের রচনার জন্য য়ূরোপীয় ও মুসলিম উভয় সূত্রই ব্যবহার করিয়াছেন। সমাজ

জীবনের সকল দিকের ইতিহাসের জন্য আওলিয়া চেলেবির (দ্র.) সিয়াহাতনামে এক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এই রচনায় কিছু ত্রুটি অবশ্যই আছে; কিন্তু উহা সত্ত্বেও রচনাটি তুর্কী সাহিত্যে তুলনাহীন। এই শতকেই প্রথমবারের মত সেফারেতনামে রচিত হইয়াছে।

শেহনামেজি, মেদদাহ, কারাগোযজি প্রভৃতির বিপুল জনপ্রিয়তা এই শতকের সমাজ জীবনের সকল স্তরেই বজায় থাকে। উল্লিখিত পদধারিগণের মধ্যে আমরা ব্রুসায় দেরবীশ কামিলী, কুরবানী আলিসী ও অন্যান্য এবং এরযেরুমে কাসসাব কুর্‌দ, কানদিল্লী ওগলু প্রমুখ ব্যক্তির উল্লেখ করিতে পারি। ইস্তাম্বুলে ৮০ জন মেদদাহ ছিলেন। তাঁহারা একটি সংঘে (এসনাফ) সংগঠিত ছিলেন। সর্ববিখ্যাত মেদদাহ ছিলেন তিফলী। ইনি ৪র্থ মুরাদের নেদিম ছিলেন। এই শতকের শেষের দিকে মেদদাহ কীরীমীর (মৃ. ১১২০/১৭০৮) প্রতিভার বিকাশ ঘটে।

১৭শ শতকে গায়ক-কবির (সায শাইরলারি) সংখ্যা বিপুল হইয়া উঠে। জানিসারি সেনা, সিপাহী, লেওবেন্‌দ, জেলালী এবং ধর্মীয় সূফী তারীকা কীযীলবাশ ও বেক্‌তাশিদের মাঝে ইঁহাদের গতিবিধি পরিলক্ষিত হয়। ইঁহাদেরকে সর্বদাই সেনাদলের সহিত থাকিতে লক্ষ করা গিয়াছে। এই নিবন্ধনকার এই শতকের আনুমানিক ৩০ জন গায়ক-কবির নাম ও তাঁহাদের রচনা চিহ্নিত ও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই গায়ক-কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দুই কবি হইতেছেন ঃ গেওহেরী ও আশিক ওমের। শেষোক্ত কবি কার্যত সায-শাইরলারি সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক মহাপুরুষ (তু. কোপরুলু-যাদে এম. ফুআদ, তুরক সাযসাইরলারিনে আইত মেতিনলার বে-তেতকিকলার, ১-৫খ, ইস্তাম্বুল ১৯২৯-১৯৩০) হইয়া উঠেন। এই লোকপ্রিয় সাহিত্যের প্রভাব উচ্চতর শ্রেণীর মাঝেও বিস্তৃত হয়। যেমন ক্রিমিয়ার খান মেহমেদ গিরা, যিনি কামিল এই মাখলাসে লিখিতেন, তাঁহার কবিতাসমূহে ও ৪র্থ মেহমেদের অন্যতম বিশেষ সমাদৃত আফীফে সুলতানের একটি মরছিয়াতে ইহার প্রভাব পরিষ্কার। কয়েকজন ধ্রুপদী কবি দেহাতি জনসাধারণের জন্য শারকী রচনা করেন। কায়ীকজী মুসতাফা রচিত বীর গেঞ্জ উছমান সংক্রান্ত কবিতাটিই কার্যত এমন এক লোক-আখ্যান বা কাহিনীর জন্ম দেয় যাহা আজিও আনাতোলিয়ায় বিদ্যমান (কোপরুলু-যাদে এবং ফু'আদ, কায়িকচি কুল মুসতাফা বে গেঞ্জ 'উছমান হিকায়েসি, ইস্তাম্বুল ১৯৩০ খৃ.)। সম্ভবত এই শতকে আশিক কেরেম, আশিক গারিব ও শাহ ইসমাঈল নামের আরও কিছু লোককাহিনীর সৃষ্টি হয়। আওলিয়া চেলেবির বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, এই শতকেই জনসাধারণের মধ্যে ওরতা ওযুনু (দ্র.) জনপ্রিয় হইতে শুরু করে।

১৮শ শতক

এই শতকেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শতকগুলির একই ধারা বজায় থাকে। গদ্য ও কাব্যের এক বিরাট সম্ভার এই শতকে গড়িয়া উঠে। অন্যদিকে পারস্য ও ট্রান্সওক্সানিয়ার সহিত বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগও বজায় থাকে। ফারসী কবিগণ, বিশেষ করিয়া শাওকাত ও সাইব-এর মত কবিদের বিপুল প্রভাব তুর্কী কবিতায় লক্ষ করা যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তুর্কী সাহিত্যের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিকাশের প্রবণতাটি ক্রমশ আরও জোরদার হইতে থাকে এবং ভাষার সরলীকরণে ইহার প্রতিফলন ঘটে। এই শতকের গোড়ার দিকের বড় বড় কবির অবদানেই প্রধানত ধ্রুপদী তুর্কী কাব্য সমসাময়িক ফারসী কবিতা হইতে সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত সাহিত্যবলয়ে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়।

দামাদ ইবরাহীম পাশার (দ্র.) শাসনামল তুর্কী 'উছমানী সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ কালপরিক্রমা। তাঁহার অথবা সুলতান ৩য় আহমাদের আদেশক্রমে বহু গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলী দ্রুত অনুবাদের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠিত হয়। এই আমলের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে উছমান যাদে তাইব-এর নাম করিতে হয়। তাঁহাকে কবিকুলের রাজা বলিয়া অভিহিত করা হইত। ঐ আমলের অন্যান্য কবির মধ্যে আছেন সায়্যিদ ওয়েহবী, সামী, রাশিদ, নেইলী, সেলীম, এদরিনের কামী, দুররী, ছাকিব, আরিফ, সালিম, চেলেবি যাদে আসিম ও ইযযেত আলী পাশা, বিশেষ করিয়া নেদীম (দ্র.) এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ও উহার পরে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার গাযাল ও শারকী সা'দাবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার রচনায় মৌলিক বিষয় চয়ন, সমৃদ্ধ ভাবকল্পনা ও সুসঙ্গতিপূর্ণ ভাষাগুণে তিনি পূর্বসূরী ও সমসাময়িকগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি শারকী রচনায় যে স্তরে উন্নতী হইয়াছিলেন তাঁহার আগে নাজিম কিংবা তাঁহার পর ফাদিল এনদেরূনী কেহই পৌঁছাইতে পারেন নাই। দামাদ ইবরাহীমের পৃষ্ঠপোষকতায় ইবরাহীম মুতাফাররিকা (দ্র.) উছমানী ভূভাগে তুর্কী ছাপার হরফ চালু করেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে মুদ্রণের বিষয়টি ঐ শতকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলে সীমিত রহিয়া যায়; ফলত উহা সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিল্পকলামূলক জীবনে বিশেষ কোনও প্রভাব ফেলিতে সক্ষম হয় নাই।

এই শতকের মহান কবিগণের মধ্যে অবশ্যই কোজা রাগিব পাশা (দ্র.)-র নাম উল্লেখ করিব। তিনি ছিলেন নাবীর কাব্যধারা ও ধ্রুপদী সাহিত্য যুগের সর্বশেষ দিকপাল শেইখ গালিবের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। কাসীদার ক্ষেত্রে নেফঈর প্রভাবই ছিল প্রধান। আর গাযালের ক্ষেত্রে একদিকে নেদীম ও সামীর অনুসারীবর্গ এবং অন্যদিকে নাবীর অনুরাগীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিত। তবে এই শতকের শেষের দিকে ঐ দুই ধারার কাব্য চর্চার অবক্ষয় দশা ফুটিয়া উঠে। ফাদির এনদেরূনী (দ্র.) ও সুনবুলযাদে ওয়েহবী (দ্র.) এই ক্ষেত্রে অনুকারীমাত্র ছিলেন। এই শতকের কবিগণ কবিতার সকল আঙ্গিকের চর্চা করেন। তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয় এমন ধারার কাব্য চর্চায় যাহা অবক্ষয়ের কালপরিক্রমার বৈশিষ্ট্য। তাঁহাদের কাব্য চর্চার অবলম্বন হইয়া উঠে হিজব, হেযেল, মুআম্মা (হেঁয়ালি) ও তা'রীখ (ঘটনা-আখ্যান)। আর উহার সহিত যুক্ত হয় অনৈতিকতা। তাহা ছাড়া ঐ সময় সুরুচির অবক্ষয় সাধারণভাবে জোরদার হয়। তবে সত্যিকারের ধর্মীয় অনুপ্রেরণামূলক সাহিত্যের চর্চাও চলিতে থাকে। নাজীমের মুনাজাত ও না'ত এবং নায়ী উছমানে দেদে, নাহীফী ও আরিফ সুলায়মান বে'র মত কবিদের মীরাজিয়ে এবং মাওলানার মাছনাবীর নাহীফী কর্তৃক অনুবাদের মধ্যে উল্লিখিত ধারাটির ছায়াপাত পরিদৃশ্যমান। এই আমলে রচিত মাছনাবীর সংখ্যা বিপুল। কিন্তু এইগুলির সাহিত্যমূল্য তেমন নাই। খামসার পুরাতন বিষয়বস্তু ইহাতে পুরাপুরি বর্জিত। তবে শেষ প্রতিভাধর কবি শায়খ গালিবের হুসন-উ ইশক শীর্ষক রচনাটি ব্যতিক্রম। পরিশেষে বলা যায়, এই আমলের কাব্যছন্দে রচিত ইতিহাসমূলক রচনা ও বিভিন্ন তারীকার মুরীদগণ কর্তৃক রচিত মরমী কবিতাগুলির মূল্য সামান্যই।

সাহিত্যের গদ্য ক্রমেই সহজতর হইয়া উঠে, যদিও আমরা উহার পরেও ঐ শতকে নেয়গিসী ও ওকচী যাদের শৈলীর অনুকরণ দেখিতে পাই। উছমান যাদের মত সুবিখ্যাত গদ্যশৈলীকার গদ্য রচনায় অতিরিক্ত কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মত প্রকাশ করেন। গদ্য রচনাবলীর ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক রচনাগুলিরই প্রাধান্য। যেসব লেখক ওয়াকআনাবীস (দ্র.) হিসাবে কাজ করেন তাঁহাদের মধ্যে আমরা রাশিদ, চেলেবি যাদে আসিম ও ওয়াসিফ-এর নাম স্মরণ করিতে পারি। তবে ইহাদের কাহাকেও

নাঈমার মত পূর্বসূরীদের সহিত তুলনা করা যাইবে না, যদিও ঐ আমলে শত শত ব্যক্তি জীবনচরিত ও ইতিহাস বিষয়ক রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামরিক অবক্ষয়ের কারণে বিপুল সংখ্যক লা'ইহা (স্মৃতিকথা) রচনার কারণ ঘটে। এই স্মৃতিকথামূলক রচনাগুলির মধ্যে সেরা রচনাটি হইতেছে কোজা সেগ্‌বান বাশীর। ভূগোল বিষয়ক রচনার প্রশ্নে আমরা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেফারেত-নামেসির উল্লেখ করিতে পারি। এইগুলির মধ্যে ভিরমি সেকিয্ চেলেবি মেহমেদ এফেন্দি রচিত ফ্রান্সা সেফারেত-নামেসির উল্লেখ করা যায় একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে। এই ধরনের রচনাগুলি বিরল হইলেও কখনও কখনও কাব্যে রচিত হইতে লক্ষ করা যায়। সুলতানগণ কর্তৃক আয়োজিত বর্ণাঢ্য উৎসব-আয়োজন পালনের জন্য যেইসব সুরনামে রচিত হইয়াছিল সেইগুলি সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সূত্র নিঃসন্দেহে। সায়্যিদ ওয়াহবী ও হাশমেত রচিত সুরানামেই এই জাতীয় রচনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাত। পূর্ববর্তী শতকের তুলনায় এই শতকে কবিদের জীবনীর সঙ্কলনমূলক লেখার সংখ্যা অনেক বেশি। আমরা সাফায়ী, সালিম ও বেলীগের তাযকিরার উল্লেখ করিতে পারি। ইস্‌রার দেদের তাযকিরা বিশেষ করিয়া মাওলাবীদের জন্য নিবেদিত। এই শতকেই শেইখীর ওয়াকাই' আল-ফুদালা রচিত হয়, যাহা শাকাইক-এর চূড়ান্ত পরিশিষ্ট (যেইল)। শেষে আছে মুসতাকীম যাদের তুহফা-ই খাততাতীন। রচনাটি মুসলিম ও তুর্কী চারু হস্তলিপিকারদের ব্যাপারে তথ্যের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। এই গ্রন্থে লেখক তাঁহার শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষকার ব্যক্তিত্ব হিসাবে বিবেচিত। ভূগোল বিষয়ক রচনাবলীর ক্ষেত্রে আমরা এই শতকে কেবল য়ূরোপীয় রচনাবলী ও একই সূত্র হইতে উদ্ধৃতিমূলক রচনা পাই।

এই শতকে মেদ্দাহ, (স্তুতিকার) কারাগোযজী (ভাঁড়) ও ওরতা-ওয়ুনজুগণ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে আগের মতই জনপ্রিয় থাকে। গায়ক-কবিদের রচনাবলীও সর্বত্র পরিজ্ঞাত ছিল। এইসব গায়ক কবির মধ্যে ছিলেন কিমেতী, নূরী, লেওনী, কাবা সাকাল মেহমেদ ও ফাসীহী। অবশ্য এক্ষেত্রে গেওহেরী ও আশিক উমারের জনপ্রিয়তা আগের মতই বজায় থাকে। উল্লিখিত কবিদের অনেকেই আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত। এমন কবিদের মধ্যে আছেন মেজনূন ও ওয়ারতান। তাঁহারা এই শতকের প্রথমদিকে জীবিত ছিলেন। সম্ভবত ১৫শ শতকের গোড়ার দিকে আর্মেনীয় আশুগদের কবিতার উপর তুর্কী গায়ক-কবিদের (তু. কোপরুলু যাদে এম. ফু'আদ, এদেবিয়াত ফাকুলতাসি মেজমুয়াসী, ১৯২২, নং ১, পৃ, ১-৩২) প্রভাব পড়িতে শুরু করে। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মাঝে সাধারণ দেহাতি মানুষের সাহিত্য রুচি যেভাবে প্রবিষ্ট হয় তাহার সর্বোত্তম নজীর হিসাবে বলা যায় যে, সুবিখ্যাত কবি নেদীমও লোকরঞ্জক ছন্দে একটি তুরকু রচনা করিয়াছিলেন। এই শতকের সময়ের অগ্রগতির সহিত ঐ প্রবণতাও অধিকতর লক্ষণীয় হইয়া উঠে।

এই শতকের শুরুতে উছমানী সাহিত্য অত্যন্ত নিম্নস্তরে নামিয়া যায়। আর এই অবনতি তানজীমাত যুগ অবধি চলিতে থাকে। এই আমলের কবিদের মধ্যে কেবল ওয়াসিফ এনদেরূনী (দ্র.) ও ইয্‌যেত মোল্লাহ (দ্র.)-এর মধ্যে কিছুটা মৌলিকত্ব পরিদৃষ্ট হয়। ওয়াসিফের রচনায় লোকরঞ্জক রুচির আবেদন রহিয়াছে। আর তাঁহার কাব্যকর্মে নেদীম ও সেই সঙ্গে ফাদিল এন্‌দেরূনীর প্রভাব আছে। ইয্‌যেত মোল্লা ওয়াসিফের তুলনায় অনেক বড় কবি। তাঁহার কবিতায় নেদীম ও শায়খ গালিবের প্রবল প্রভাব বর্তমান। তাঁহার ভাষার পরিশুদ্ধতা ও তাঁহার কাব্যের আঙ্গিক তাঁহাকে ওয়াসিফ হইতে অনেক উচ্চ মর্যাদা দিয়াছে। কাসীদা ও গাযাল ছাড়াও তিনি বেশ ভাল মাছনাবী রচনা করিয়াছেন। তানজীমাত যুগের আগে তিনিই তুর্কী ধ্রুপদী কাব্যের সর্বশেষ বিশারদ। ইহা সত্য যে, এমন কি তানজীমাত যুগের পরেও বহু কবি প্রাচীন আঙ্গিকে কাসীদা ও গাযাল রচনা করেন। এইস কবির মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়া উদ্ভাবনী ধারার মহান প্রবক্তা, যেমন নামীক কেমাল ও দিয়া পাশা রহিয়াছেন। এই আমলের অন্যান্য আরও কবির মধ্যে আছেন লেসকোফচার গালিব বে, নাইলীর অনুকার, আরিফ হিকমেত ও ফেহীম-ই কাদীম। সাহিত্যের বিকাশে এইসব কবির অবশ্য কোনও প্রকার প্রভাব ছিল না। সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্য কলমের এক খোঁচায় যে সহজে চলিয়া যাওয়া সম্ভব নহে, উহাই স্বাভাবিক। এই আমলেও তাহা হয় নাই। শিনাসি ও তাঁহার অনুসারীদিগকে প্রাচীন ধারার কাব্য চর্চার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

তানজীমাত যুগের আগের আমলের গদ্য আদৌ তেমন মূল্যবান নহে, যদিও গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির পরিমাণ পূর্ববতী শতকগুলির তুলনায় কম নহে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে মুতেরজিম আসিম-এর তারীখ উহার রচনাশৈলী ও সমালোচনামূলক দক্ষতার জন্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই লেখক বুরহান-ই কাতি' ও কামূস-এর অনুবাদে আরও সহজ, সাবলীল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। ওয়াকআ নাবীস ইস্‌আদ এফেন্দি মুসতাত রাফ-এর অনুবাদক ও জানিসারী নিধনের উপর সুপরিজ্ঞাত উসস্-ই জাফার শীর্ষক রচনার লেখক। অবশ্য তাঁহার স্থান আসিমের অনেক নিচে। তাঁহার ভাষা অত্যন্ত নীরস ও বিভ্রান্তিকর শৈলীতে রচিত। এই একই লেখক তাকবীম-ই বিকার-এর সম্পাদনা করেন। তিনি সুলতান মাহমূদের পক্ষে তাঁহার ভ্রমণের উপর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতান ঐ রচনার ভাষার জড়তা ও অস্পষ্টতার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন। অন্যদিকে আবার এই লেখক তাঁহার মুসতাতরাফ-এর অনুবাদে আরবী ও ফারসী শব্দের পরিবর্তে তুর্কী শব্দের ব্যবহার ও রচনাশৈলীর সরলীকরণের সুপারিশ করেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ঐ সময় ভাষা সরলীকরণের আন্দোলন কী পরিসরে প্রসার লাভ করিয়াছিল। পরিশেষে সুবিখ্যাত কবি ও গদ্যশৈলীকার আকিফ পাশার (দ্র.) নাম অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয়। তিনি কতিপয় কবিতা লোকরঞ্জক ছন্দে ও সরল ভাষায় কিছু গদ্য রচনা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী প্রয়োগ প্রসারের কাতারের প্রথম ব্যক্তিত্ব গণ্য করা হয় না। বস্তুতপক্ষে তিনি য়ূরোপীয় কৃষ্টির প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিয়া যান। তিনি পুরাতন তুর্কী সাহিত্যের শেষ প্রতিনিধিদের অন্যতম।

আমাদের তথ্য অনুযায়ী লোকপ্রিয় সাহিত্যের প্রতিনিধিদের মধ্যে আছেন মাদ্‌দাহ পিচ এমীন, কীয আহমাদ, হাজ্জী মুয়েযযীন, কোর হাফিজ ও অন্যরা এবং সেই সঙ্গে আছেন শেরবেতজি এমীন, কাসিম পাশার হাফিজ, মুসাহিব সাঈদ এফেনদির মত কিছু ছায়ানাটকের (খায়ালজি) লেখক। এই শতকের গোড়ার দিকেই মাত্র কাতিব সালিহ সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের নিগড় ভাঙ্গিয়া আধুনিক নাট্য সাহিত্যের অনুকরণে নাট্য রচনার কাজ শুরু করেন।

এই শতকের সর্বাধিক খ্যাত গায়ক-কবিদের মধ্যে আছেন দার্‌দলি, বায়বুর্তের যিহনী ও এরযেরুমের এমরাহ। এই গায়ক কবিগণ এশিয়া মাইনর ও Erzerum-এর সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহাদের ঐ খ্যাতির সত্যিকারের দাবিদারও ছিলেন তাঁহারা। কাব্যগুণেই তাঁহারা ঐ খ্যাতির অধিকারী হন (তু. কোপরুলু-যাদে এম. ফুআদ, এরযুরুমলু-এমরাহ, ইস্তাম্বুল ১৯২৯ খৃ.)।

আবদুল-আযীযের শাসনামলের শেষাবধি এই গায়ক-কবি তথা আশিকগণ তাউক-পাযারীর একটি ক্যাফেতে মিলিত হইতেন। তাঁহাদের একটি নিজস্ব সংগঠন ছিল এবং ঐ সংগঠনের একজন প্রধানও (রে'ঈস) ছিলেন। সংগঠনটি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ছিল। পরে অবশ্য এই সংগঠনটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। তবে ২০শ শতকেও এশিয়া মাইনরে গায়ক-কবিদের সাক্ষাত পাওয়া যায়।

তানজীমাত যুগের সূচনা নাগাদ এই তুর্ক ধ্রুপদী সাহিত্য, বিশেষ করিয়া কাব্য, উহার সঙ্কীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে কোনও প্রকার নূতন কিছু সৃষ্টির সামর্থ্য হারায়, কবিরা কেবল অতীতের বিরাট দিকপাল কাব্যবিশারদদের অনুকরণে কিছু নকল কবিতা সৃষ্টিতে (নাজিরা) সমর্থ হন কিংবা কিছুটা মৌলিকত্ব দেখাইতে গিয়া তাঁহারা কৃত্রিমতা ও প্রাণহীনতার ফাঁদে আটকা পড়েন। এইভাবে একই ধরনের সীমিত ভাব প্রকাশের মাধ্যমে নিরন্তর একই জিনিসের পুনরাবৃত্তির ফলে তুর্কী কবিতার সকল সজীবতা ও প্রাণশক্তি উবিয়া যায়। এমন কি নেদীম শায়খ গালিবের মত সুবিখ্যাত কবিদ্বয়ও পুরাতন আঙ্গিকের অনমনীয় নিয়ম-কানুনের নিগড় হইতে মুক্তি অর্জন করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে জনসাধারণের ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে পদচারণার মাধ্যমে আরও লোকরঞ্জক রুচি ও ভাষার আবেদন সৃষ্টির যে প্রয়াস আমরা ফাদিল এন্‌দেরুনী ও ওয়াসিফের মধ্যে লক্ষ করি তাহাতে কেবল তুচ্ছতা ও অশ্লীলতারই সৃষ্টি হইয়াছে। য়ূরোপের সহিত শত শত বৎসর ধরিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ থাকিলেও উছমানী সাম্রাজ্যের জনগণের সামাজিক নির্মিতিটি কখনও ইসলামী সভ্যতার কাঠামো হইতে বাহিরে আসিতে পারে নাই। ফলে উছমানী সাম্রাজ্যের জনগণ মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার বেড়াজালে বন্দী থাকিয়া যায়। অবশ্য ইহা সত্য যে, অনবরত সামরিক পরাজয় ও অর্থনীতির ক্রমাবক্ষয়ের ফলে উছমানী সাম্রাজ্যের চিন্তাশীল মহলে য়ূরোপের বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ভাবনা-চিন্তা শুরু হয় এবং ১৮শ শতক নাগাদ উছমানী রাষ্ট্র য়ূরোপীয় দক্ষতা ও নৈপুণ্য কাজে লাগাইয়া সেনাবাহিনী ও নৌবহর পুনর্গঠিত করিতে শুরু করে। কিন্তু সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে য়ূরোপের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া নেওয়ার ব্যাপারটি অত সহজ ছিল না। পূর্ববর্তী শতকগুলির তুলনায় এই শতকে মাদরাসাগুলির অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ ছিল। তাহা ছাড়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তখনও প্রবলভাবে মধ্যযুগীয় মানসিকতা ও রুচি আঁকড়াইয়া ছিল। প্রকৌশল বিদ্যালয় (মুহেনদিসখানে), চিকিৎসা বিজ্ঞান বিদ্যালয় (তিব্‌বখানে) ইত্যাদির মত সেনাবাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেই কেবল আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন করা হইতে থাকে। আর এইসব নূতন নূতন প্রবর্তনার সিংহভাগের কৃতিত্ব মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ব্যক্তির। ইহাদের মধ্যে আছেন খোজা ইসহাক এফেনদি, জেলেনবেরি ও শানী যাদের মত ব্যক্তিগণ যাঁহারা পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ ও বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন ও চর্চা শুরু করেন। সুলতান ৩য় সেলীম, বিশেষ করিয়া ২য় মাহমূদ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী পুনর্গঠিত ও একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সামন্ত প্রধানের মধ্যে গোটা সাম্রাজ্য ভাগাভাগি হইয়া যাওয়ার আকঙ্কা রোধের লক্ষ্যে মাদরাসাগুলির বিরোধিতা সত্ত্বেও গণিত ও অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার সংস্কার কর্মসূচিতে সম্মতি দেন। ১৮শ শতকের শেষের দিক হইতে তুরস্কে ফরাসী ভাষাজ্ঞানসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা য়ূরোপীয় সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ফ্রান্স হইতে শিক্ষক আনয়ন ও য়ূরোপে ছাত্র প্রেরণের মধ্য দিয়া তুরস্কে য়ূরোপীয়করণের আন্দোলনকে উৎসাহিত করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এইসব চাহিদার কারণে তুরস্কে কেবল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নহে, বরং মনীষা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে য়ূরোপীয় প্রভাব পড়িতে থাকে।

খ। য়ূরোপীয় তুর্কী সাহিত্য

তানজীমাত যুগ ও নূতন সাহিত্য পরিমণ্ডল

য়ূরোপের বিরাট শিল্প বিপ্লব ও পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে এবং সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী বিরাট শক্তিগুলির রাজনৈতিক সম্প্রসারণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তুরস্ক অচিরেই এই শক্তিগুলির নিকট এক বিশাল ও সম্ভাবনাময় বাজার হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর ঐ একই সময় উছমানী সাম্রাজ্যের মধ্যযুগীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বহিঃপ্রভাব প্রতিরোধের ক্ষমতা হারায়। ফ্রান্সের বৈপ্লবিক আন্দোলনসমূহ উছমানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের অমুসলিম অধিবাসীদের মাঝে জাতীয়তার নীতি ছড়াইয়া দেয়। আর এই সকল বিষয়ের প্রেক্ষাপটে উছমানী সাম্রাজ্যের সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা জরুরী হইয়া উঠে। তবে এইসব সংস্কার যথেষ্ট প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই বাধা কেবল নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যেই সীমিত ছিল না, মাদরাসায় শিক্ষিত সমাজেও বিস্তৃত হয়। তবে রাশীদ পাশা ও তাঁহার ক্ষুদ্র অনুচরবর্গের প্রয়াসে সংস্কার কার্যক্রমগুলি দেশে ধীরে ধীরে প্রবর্তন করা হয়। তুরস্কের ইতিহাসে এইসব সংস্কার তানজীমাত (দ্র.) নামে পরিচিত।

তানজীমাত কেবল প্রশাসন, বিচার ও অর্থ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না। মুসলিম তুর্কীদের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ খোলা হয় এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়। বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য একটি আঞ্জুমান-ই দানিশ (১২৬৯/১৮৫৩) গঠন করা হয় এবং ছাত্রদেরকে য়ূরোপে প্রেরণ করা হয়। অচিরেই আবার আঞ্জুমান-ই দানিশের পরিবর্তে জামঈয়াত-ই উছমানীয়ে (১২৭৭/১৮৬০) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠান তাহার নিজস্ব মুখপত্র মাজমূ'আ-ই ফুনূন প্রকাশ করিতে শুরু করে। পরের বৎসর বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয় এবং ১২৭৯ (১৮৬২) সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স (শিক্ষাক্রম) চালু করা হয়। ১২৮২/১৮৬৫ সালে একটি তারজেমে জামঈয়েতি গঠিত হয় এবং ১২৮৪/১৮৬৭ অসামরিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিদ্যালয় পাঠ দান শুরু করে। পরের বৎসর গালাতা সেরায়-এর Lycee উদ্বোধন করা হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমের বাহন হিসাবে তুর্কী ভাষার পাশাপাশি ফরাসী ভাষাও চালু করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমটিও পাশ্চাত্যের মাধ্যমিক স্কুলগুলির শিক্ষাক্রম হইতে গ্রহণ করা হয়। ১২৮৬/১৮৬৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের (দারুল-ফুনূন) উদ্বোধন করা হইলেও রক্ষণশীল মহলগুলির চক্রান্তে দুই বৎসর পর ঐ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ১২৮৭/১৮৭০ সনে আইন বিদ্যালয় (হুকূক মেকতেবি) খোলা হয়। ১২৯৪/১৮৭৭ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় নাগাদ বিভিন্ন জাদুঘর, গ্রন্থাগার এবং প্রকৌশল, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত প্রযুক্তি বিষয়ক বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করা হয়। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তুরস্কে মাদরাসা পরিমণ্ডলের বাহিরে স্বতন্ত্র এক শিক্ষিত শ্রেণী গড়িয়া উঠে। আর এইসব তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে দৈনিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানও ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১২৪৭/১৮৩১ সালে তাক্‌বীম-ই ওয়াকাই'-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা শুরু হয়। উহার পরের প্রকাশনাটি প্রকাশিত হয় ১২৫৬/১৮৪০ সনে। পত্রিকাটির নাম জেরীদে-ই হাওয়াদিছ। ইহার পর ১২৭৬/১৮৫৯ সালে তেরজুমান-ই

আহওয়াল ও ১২৭৮/১৮৬১ সালে তাসবীর-ই এফকার প্রকাশিত হয় (তু. জারীদা)। শেষোক্ত পত্রিকা দুইটি তুরস্কের আধুনিকতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তরকে চিহ্নিত করিয়াছে। কেননা এই দুই পত্রিকার মাধ্যমেই তুরস্কের নূতন সাহিত্য ধারার প্রতিষ্ঠাতা শিনাসী ও তাঁহার শাগরিদ নামীক কেমাল জনগণের উদ্দেশ্যে সাহিত্য পরিবেশন করিতেন। আবদুল-হামীদের আমল অবধি তুর্কী সংবাদপত্রের (পত্রিকার) অত্যন্ত দ্রুত বিকাশ ঘটে। উহার পর অবশ্য সুলতানের স্বৈর শাসনে তুর্কী পত্রপত্রিকার উৎকর্ষ ও প্রসার ব্যাহত হয়। কেননা ঐ সময় যে কোন প্রকার প্রকাশনার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বহু য়ুরোপীয় রচনা তুর্কী ভাষায়, বিশেষত ফরাসী হইতে তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। তুর্কী ভাষা আগের তুলনায় সহজ হইতে থাকে এবং একই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিগ্রহণের ফলে খোদ তুর্কী ভাষা আরও সমৃদ্ধ হয়।

নয়া তুর্কী সাহিত্যের তিন দিকপাল ব্যক্তিত্ব হইতেছেন শিনাসী (দ্র.) ও তাঁহার দুই শাগরিদ নামীক কেমাল (তু. কেমাল) ও দিয়া পাশা (দ্র.)। শিনাসী ফ্রান্সে শিক্ষিত। তাঁহার দুই শাগরিদও নির্বাসিত হিসাবে ফ্রান্সে বাস করেন। এই পরিস্থিতিতে তুরস্কের এই নূতন ধারার সাহিত্য ১৮শ ও ১৯শ শতকের ফরাসী সাহিত্য সম্ভারের প্রভাবে পরিপুষ্ট হয়। ফ্রান্সের সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক বিপ্লবসমূহের নীতিদর্শন তুর্কী সাহিত্যকেও প্রভাবিত করে। নূতন ধারার সাহিত্য প্রবক্তারা পুরাতন সামন্তবাদী সাহিত্যের অবসান ঘটাইয়া নূতন ধারার সাহিত্যের মাধ্যমে পিতৃভূমি (ওয়াতান), স্বাধীনতা (হুররিয়েত), গণতন্ত্র (খালক জীলীক) ও নিয়মতান্ত্রিকতাবাদের (মেশরূতিয়েত) জয়গান প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল এক বুর্জোয়া সাহিত্য ধারার প্রতিষ্ঠা। আর এইভাবেই তুরস্কের সাহিত্য চর্চার পরিমণ্ডলে সাংবাদিকতা, রাজনৈতিক ও সাহিত্য সমালোচনা, নাট্য সাহিত্য, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদ, উপন্যাস এবং দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক রচনার যাত্রা শুরু হয়। শিনাসী যেমন কোনও প্রচণ্ড প্রতিভাধর গদ্য শৈলীকার ছিলেন না, তেমনি তিনি কোনও বিরাট কবিও নন। তবে তাঁহার কাজের পরিকল্পনা ছিল সুনির্দিষ্ট ও নিটোল আকৃতিসম্পন্ন। তিনি চাহিয়াছিলেন পুরাতন দুর্বোধ্য ভাষার জটাজাল হইতে মুক্ত হইতে। যদিও তিনি তাঁহার ভাবদর্শনের সব কিছুরই স্পষ্ট বাস্তব রূপ দিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার চিন্তাধারা তাঁহার ঘনিষ্ঠদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার অন্যতম অনুসারী দিয়া পাশা Rousseau ও Moliere-এর রচনা অনুবাদ ও তাঁহার সাহিত্য ও রাজনৈতিক সমালোচনার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে বিরাট সহায়তা দান করেন। তিনি ধ্রুপদী সাহিত্য সম্পর্কে অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, তুর্কী ভাষার চরিত্রের সহিত উক্ত সাহিত্যের কোনও সংস্রব নাই। এই তত্ত্বের সমর্থনে বলেন, প্রকৃতি তথা স্বাভাবিকতাকেই অনুসরণ করা উচিত অর্থাৎ তিনি লোকভাষা ও সাহিত্য হইতে সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে এই মতবাদ তথা তত্ত্বগুলিকে কার্যকর করার শক্তি যেমন দিয়া পাশার ছিল না, তেমনি সাহসও ছিল না।

নিঃসংশয়ে বলা যায়, নামীক কেমালই নয়া ধারার তুর্কী সাহিত্যকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। তিনি ছিলেন একাধারে এক বিরাট শিল্প, একাগ্র যোদ্ধা, বিপুল রচনার জন্মদাতা ও একজন মহৎ দেশপ্রেমিক। তাঁহার নিকট শিল্প ছিল দেশে পুনর্জাগরণ আনার একটি উপায়। তিনি তাঁহার নিবন্ধমালা, তাঁহার নাটক-উপন্যাস, দেশপ্রেমমূলক কবিতা, ঐতিহাসিক রচনাবলী, সমালোচনামূলক রচনা, এমন কি ব্যক্তিগত পত্রাবলীর মাধ্যমেও তুরস্কের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে বলিষ্ঠ অবদান যোগান। বস্তুত তাঁহার প্রভাব ছিল সুগভীর। তাঁহার ওয়াতান-এর উপস্থাপনা ছিল দেশের ইতিহাসে এক বিরাট রাজনৈতিক ঘটনা। তিনি দিয়া পাশার চাইতেও অনেক বেশি তীব্রভাবে পুরাতন ধারার সাহিত্যের সমালোচনা করেন। তাঁহার ধারণা ছিল, আরূদ ছন্দে তুর্কী কবিতা রচনা অসম্ভব। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্বয়ং নামীক কেমালই পুরাপুরিভাবে পুরাতন সাহিত্যধারাকে বর্জন করিতে পারেন নাই, তাঁহার বন্ধুরাও পারেন নাই। এই কারণেই সা'দুল্লাহ পাশা ১২৯৭/১৮৮০ সনে ওয়াকত্ নামক এক পত্রিকায় লেখকের নাম-পরিচয়বিহীন এক নিবন্ধে লিখিতে পারিয়াছিলেন যে, শিক্ষার্থীদিগকে পাশ্চাত্যের রচনাবলীর শাব্দিক (হুবহু) অনুবাদ পড়িতে দেওয়া উচিত। কেননা 'নূতন' ধারার লেখকগণ বাস্তবিকপক্ষে কোনও সত্যিকারের সাহিত্যকর্ম উপহার দিতে পারেন নাই।

নামীক কেমালের অন্যতম অনুসারী আবদুল হাকক হামিদ (দ্র.) কবিতার ক্ষেত্রে এক বড় রকমের বিপ্লব আনয়ন করেন। তুর্কী কাব্য তখনও পর্যন্ত উহার প্রাচীন আঙ্গিকের বাঁধনমুক্ত হইতে পারে নাই। তবে বিপুল-প্রসূ লেখনীর অধিকারী কবি আবদুল-হাকক হামিদ তুর্কী ভাষায় যে গীতিময়তা ও নাটকীয়তা যোজনা করেন তাহার আদর্শ হইতেছে Dante, Racine, Corneille, Shakespeare। এমন কি নামীক কেমাল পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন যে, তুর্কী সাহিত্যে 'নূতন' ধারার কবিতার যাত্রা শুরু হইয়াছে হামিদের হাতে। এই প্রজন্মের অন্যান্য ব্যক্তিত্বের মধ্যে রহিয়াছেন রিজাঈ যাদে এক্‌রেম (তু. এক্‌রেম) ও সামী পাশা যাদে সেযাঈ (দ্র.)। তবে রাষ্ট্রীয় স্বৈরতান্ত্রিক চাপ লেখক-বুদ্ধিজীবীদের উপর যতই বাড়িতে থাকে সেই অনুপাতে তান্‌জীমাত যুগের পরবর্তী প্রজন্মের লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে আরও বেশি করিয়া ঐকান্তিক কলাবাদী সাহিত্য চর্চার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

ইহা ছাড়া আরও অনেক মনীষী ও লেখক দেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনে নিজ নিজ অবদান রাখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আহমাদ জেওদেত পাশা (দ্র.), আহমাদ ওয়াফীক পাশা (দ্র.), সুলায়মান পাশা এবং অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন লেখক ও বিশ্বকোষ রচয়িতা আহমাদ মিদহাত এফেন্দি (দ্র.) ও অভিধানকার শামসুদ-দীন সামী বে (দ্র.)। প্রাচ্যদেশীয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জেওদেত পাশা ফু'আদ পাশার সঙ্গে এক তুর্কী ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার তুর্কী গদ্য অত্যন্ত চমৎকার। পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রাণিত আহমাদ ওয়াফীক জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কামনা করিতেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আনাতোলিয়ার তুর্কীগণ বিশাল ও ঐতিহ্যবাহী তুর্কী জাতির একটি শাখা। তিনি আনাতোলীয় তুর্কী ভাষার প্রথম অভিধান প্রণয়ন করেন। তুর্কী প্রবাদসমূহও তিনি সঙ্কলন করেন এবং আবুল-গাযী রচিত শাজারা-ই তুরক-এর অনুবাদ করেন। Moliere-এর কমেডি হইতে তুর্কী ভাষায় ভাবানুবাদের মাধ্যমে তুর্কী নাটকের বিকাশে তিনি এক বিরাট ভূমিকা পালন করেন। একজন বড় দেশপ্রেমিক সুলায়মান পাশা সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দাবি করেন, ভাষা ও সাহিত্যকে উছমানলী নহে, বরং তুর্কী নামে অভিহিত করা উচিত। তিনি Deguignes ও অন্যান্য সূত্র হইতে উপকরণ লইয়া আদি তুর্কীগণের উপর একটি বিশেষ অধ্যায় তা'রীখ-ই আলাম-এ সন্নিবেশিত করেন।

পরিশেষে আহমাদ মিদহাত, তিনি লোকরঞ্জক জাতীয় শত শত পুস্তক রচনা ও অনুবাদ করেন। তাঁহার রচনার পত্তন হয় বর্ণমালার উপর লিখিত নানা পুস্তক দিয়া। এইভাবে তিনি জনসাধারণকে পাঠের প্রশিক্ষণ

দেন ও শিক্ষার স্তরের উন্নতি সাধনে অবদান রাখেন। শিক্ষার মান বা স্তরের উন্নতিই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহার রচিত পুস্তকগুলির কোনও বৈজ্ঞানিক কিংবা সাহিত্যমূল্য ছিল না। সামী বে নিজেকে ওয়েফীক পাশার যোগ্য উত্তরসুরি প্রমাণ করেন। তাঁহার রচনার মধ্যে আছে কামূসুল-আলাম ও কামূস-ই তুরকী।

১৯শ শতকের শেষ প্রান্তে মুআল্লিম নাজী (দ্র.)-র উদয় ঘটে। আহমাদ মিদহাতের আশ্রয়ে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। নাজী প্রাচ্য দেশীয় সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং নূতন শৈলীর উত্তম কবিতার পাশাপাশি ধ্রুপদী আঙ্গিকে গাযাল লিখিতেন। পুরাতন ধারার অনুসারিগণ তাঁহার নিকট হইতে কার্যত ধ্রুপদী ধারার পুনরুত্থান প্রত্যাশী ছিলেন, যদিও নাজী আদৌ ঐ ধরনের প্রতিক্রিয়ার কোনও প্রবক্তা ছিলেন না। এই বিষয়টি অন্তত তাঁহার অত্যন্ত সুন্দর সরল, সাবলীল গদ্যে (নমুনা Omerin codjuk-lughu) লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার সহিত 'একরেম বে'র কলহ ছিল। কিন্তু উহার মূল কারণ অনেকটাই ব্যক্তিগত। ঐ সময়ে নাবী যাদে নাজিমও খ্যাতির সম্মুখ সারিতে আসেন। তবে তরুণ বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উপন্যাস যেহরা তুর্কী সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে গুরুত্বের দিকে প্রথম কাতারে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

১৯শ শতকের শেষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইতেছে একদল তারুণ্যদীপ্ত শিক্ষিত ব্যক্তির সাহিত্য আন্দোলন। ইহারা রিজা'ঈ যাদে একরেমের ইঙ্গিতে সাময়িক পত্রিকা 'ছেরওয়েত-ই ফুনূন'-এর সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁহাদের উল্লিখিত আন্দোলন তুর্কী সাহিত্যের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের য়ূরোপীয়করণকে চিহ্নিত করিয়াছে। এই আন্দোলনের সদস্যদের প্রধান ব্যক্তিত্ব হইতেছেন তেওফীক ফিকরেত (দ্র.) ও খালিদ দিয়া। তাঁহারা ১৯শ শতকের শেষে ফ্রান্সের সাহিত্য আন্দোলনগুলি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত। এই সাহিত্য আন্দোলনের তৎপরতা শুরু হয় একান্ত স্বৈরবাদী শাসনামলে। ইহার মেয়াদ ছিল মাত্র পাঁচ হইতে ছয় বৎসর। এই আন্দোলনের আওতায় সাহিত্যের ফসলে বিকারগ্রস্ত ও নৈরাশ্যবাদী অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাহিত্য আন্দোলনের মূলনীতি ছিল কলাকৈবলবাদ। আমরা যদি জনাব শিহাবুদদীনকে হিসাবে না ধরি (যিনি এই সাহিত্য বিপ্লবের পর এক মহৎ গদ্য লেখক হিসাবে খ্যাত হন) তাহা হইলে সুলায়মান নাজীফ, যাঁহাকে নামীক কেমালের ছাত্র ধরা যায় ও যাঁহার নিজস্ব মৌলিকত্বও আছে, ফাইক আলী, যিনি আবদুল হাকক-এর অন্যতম অনুকারী ও ইসমাঈল সাফা, যাঁহার সাহিত্য-উপকরণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা হইতে চয়িত ও নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর, তাঁহাদের মধ্যে যেইসব কবি ছেরওয়েত-ই ফুনূন-এ লিখিতেন তাঁহারা সকলেই ছিলেন তেওফীক ফিকরেত'-এর অনুসারী। খালিদ দিয়া তুর্কী ভাষায় সাহিত্য স্তরের উপন্যাসের প্রকৃত পথিকৃৎ। তাঁহার গদ্য রচনাশৈলীটি অনবদ্য। সাধারণত তাঁহার রচনার বিষয়বস্তু উচ্চ শ্রেণী হইতে আহরিত, তবে তাঁহার কোনও কোনও ছোট গল্পে সাধারণ মানুষের জীবনের বর্ণনা রহিয়াছে। এই সাধারণ মানুষের জীবনভিত্তিক উপন্যাস রচনায় অনেক বেশি সাফল্যের পরিচয় আরও সহজ ভাষায় দিয়াছেন আহমাদ হিকমাত ও হুসায়ন যাহিদ। ঔপন্যাসিক মেহমেদ রেউফ মনোবিশ্লেষণে চমৎকার, যদিও তাঁহার ভাষা অশুদ্ধ। বিজ্ঞান, দর্শন ও সমালোচনার ক্ষেত্রে ছেরওয়েত-ই ফুনূন-এর সহযোগীরা কেবল অনুবাদই করিয়াছেন তাহাই নহে, উহার চাইতেও আরও অনেক বেশি কিছু করিয়াছেন। তবে কড়া সেন্সর ব্যবস্থা ও ঐ গোষ্ঠীটির স্বল্প মেয়াদের কারণে উহার সদস্যগণ তাঁহাদের অধিকতর প্রাণশক্তির স্বাক্ষর রাখিতে পারেন নাই।

তেওফীক ফিকরেত ও খালিদ দিয়াপন্থী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলিতে কেবল সমাজের উপর তলার জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে হুসায়ন রাহমী (দ্র.) তাঁহার উপন্যাসে গণ-মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আর ঐ একই সময়ে বিখ্যাত প্রচারবিশারদ আহমাদ রাসিম (দ্র.) একই বিষয় উপজীব্য করিয়া কয়েকটি রচনা সমাপ্ত করেন। এই আমলের কবিদের মধ্যে আমরা আরও কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করিতে পারি, আশিক কবিদের ও বেকতাশী শৈলীতে অনুপম গতিময় কাব্য রচনা করেন রিদা তেওফীক (দ্র.)। তবে ধ্বনিমিল ছন্দের ক্ষেত্রে মহিলা কবি নিগার খানিম ও সবার শেষে মেহমেদ এমীন বে (দ্র.) প্রতিষ্ঠা পান। শেষোক্ত কবি তুর্কো-গ্রীক যুদ্ধকালে তাঁহার "তুরক্চি শিরলার" কাব্যের জন্য রাতারাতি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। মেহমেদ এমীন ধ্বনিমিল ছন্দে অত্যন্ত সহজ ভাষায় তাঁহার কাব্য রচনা করেন, যাহাতে তাঁহার ঐ কাব্য প্রয়াসের আবেদন সরাসরি (খালকা দোগরু) জনমানসে পৌঁছায়। অবশ্য তখনকার চলতি লোকপ্রিয় সাহিত্যের মানস, রুচি ও আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি আদৌ অবহিত ছিলেন না। ফিক্রেত অনুসারী ধারার এই কবি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অবশ্য তাঁহার সমসাময়িকদের মত আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদী মনের লোক ছিলেন না, বরং তিনি গণতান্ত্রিক প্রেরণায় উজ্জীবিত (খালক জীলীক) ছিলেন। তিনিই প্রথম একজন তুর্কী কবি যিনি প্রথমবারের মত গণমানুষের স্তরে মাটিতে আসিয়া তাহাদের কাতারে শামিল হইয়াছেন। তাঁহার মধ্যে কাব্যময়তাবোধের একটা অভাব আছে—এই ধরনের অভিযোগ সম্ভবত তাঁহার বিরুদ্ধে সঠিকভাবেই আনা যায়। তবে তাই বলিয়া তাঁহাকে তুর্কী সাহিত্যের ইতিহাসে একজন কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিত্ব মনে করা যাইবে না, তাহা নহে। ঐ সময়ে ভাষা সরলীকরণ আন্দোলন যুগপৎ চলিতে থাকে, এমন কি অতি শুচিতাবাদের উদয়ও ঘটে। য়ূরোপীয় পণ্ডিতদের রচনাবলীর অনুবাদের মাধ্যমে তুর্কদের আদি ইতিহাস ও কৃষ্টি সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, বিদেশে নব্য তুর্কীদের সাংবাদিকতাসুলভ কার্যকলাপের সুবাদে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের বিচারে তুর্কী জাতীয়তাবাদের কল্প আদল গড়িয়া উঠে। ১৯০৮ খৃ. বিপ্লবের আগে তুরস্কের কৃষ্টি ও সাহিত্যের এইগুলিই ছিল প্রধান উপাদান।

২০শ শতক

১৯০৮ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের বদৌলতে সেন্সর প্রথা বিলুপ্ত হয়। ফলে ব্যাপক পরিসরে সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। কেমাল ও হামিদের দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলি পুনঃমঞ্চস্থ হয় এবং সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক প্রকৃতির বহু সংখ্যক রচনা তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। একই সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি ঘটে ও য়ূরোপের সহিত যোগাযোগের ফলে দেশের সামগ্রিক কৃষ্টি স্তর এযাবতকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হয়।

বিপ্লবের পরে গঠিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ সাহিত্য সংগঠনের নাম 'ফেজ্র-ই আতী'। ইহা এক সাহিত্য সমাজ হইলেও ইহার অস্তিত্বকাল ছিল স্বল্পমেয়াদী। এই সংগঠনের সদস্যরা ফিকরেত ও খালিদ যিয়ার সাহিত্য ধারার অনুসারী হইলেও তাহাদের বেশির ভাগ শেষাবধি জাতীয় সাহিত্য আন্দোলনের কাতারে শামিল হন। কেবল আহমাদ হাশিম একা তাঁহার প্রথমে নির্বাচিত ধারাতেই সাহিত্য প্রয়াসে অবিচল থাকেন। তিনি কখনও রচনায় আরূদ ছন্দ পরিত্যাগ করেন নাই এবং কঠোর ধারণায় কলা-কৈবল্যবাদী সাহিত্য দর্শনও বর্জন করেন নাই। ইহা ছাড়াও সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যকার সম্পর্ক (তু. H. Duda, Ahmad Haschim in W. I. ii., 1928, No. 3-4, p. 200-244) বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ছিল। ১৯১২ খৃ.-র পরে কবি য়াহ্য়া কেমাল বিরাট প্রভাবের অধিকারী হন। তাঁহার ধ্যান-ধারণা আহমাদ হাশিমের সাহিত্য

বিষয়ক ধান-ধারণা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কেননা কলাকৈবল্যবাদী নীতিতে অটল থাকিলেও তিনি তাঁহার কবিতার বহিরঙ্গেই কেবল সঙ্গীতময়তার সন্ধান করিতেন। আরও একজন কবি হইতেছেন মেহমেদ আকিফ। তিনি জাতীয় সাহিত্য পরিমণ্ডলের বাহিরে থাকিয়া যান। তিনি ছিলেন প্যান-ইসলামী আদর্শের অন্যতম প্রবক্তা ও আরূদ ছন্দের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশারদ ব্যক্তি। জনজীবনের প্রতিটি বাস্তব দিক অতি সরল, সহজ ও সাবলীল আখ্যানে তুলিয়া ধরিয়াছেন তিনি। আকিফের কবিতা কখনও কখনও অত্যন্ত উন্নত মার্গ স্পর্শ করিলেও পাশ্চাত্যের কাব্যসম্ভারের প্রভাব তাঁহাকে কার্যত স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি গণতন্ত্রমনা, তাঁহার জন্ম সাধারণ মানুষের মাঝে। উল্লিখিত তিন কবির রচনা একে অপর হইতে একান্তই ভিন্ন। আমরা এই তিন কবির কাব্যকর্মে তুর্ক কবিতাকে তেওফীক ফিকরেত ও তাঁহার অনুসারীদের ধারা ঐতিহ্যের একান্ত সংকীর্ণ নিগড় হইতে মুক্ত হওয়ার প্রয়াসী দেখিতে পাই। তবে বিরাট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দীপনা, যাহা শিল্পকলার গোটা পরিমণ্ডলে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই। উহার প্রভায়, কবিতাও তাহার এতদিনের শানবাঁধানো পথ ছাড়িয়া নূতন পথে যাত্রা শুরু করে।

ক। জাতীয় সাহিত্য

শাসক শ্রেণীকে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের পর উছমানীবাদের (উছমানলীলীক) আদর্শ উদ্দীপ্ত করে। কিন্তু ইহার পরেই দ্রুত যেসব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিতে থাকে সেইগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অচিরেই প্রমাণিত হয় যে, এই আদর্শ শুধু মুসলমানদের নিকটেই নয়, খৃস্টানদের নিকটও অদ্ভুত অসার কল্পনা হইয়া উঠিয়াছে। তাই সাম্রাজ্যের প্রধান জনগোষ্ঠী তুর্কীদের নিকট একটি নূতন আদর্শের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর সেই আদর্শ হইতেছে জাতীয় আদর্শ, যাহার বহিঃপ্রকাশ ইতিপূর্বেই ঘটিয়াছে তানজীমাত যুগে। এই জাতীয়তাবাদী আদর্শটি সংস্কৃতিরূপে গোটা হামীদীয় আমলে বিরাজমান ছিল। বিপ্লবের পরেও এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাংস্কৃতিক আকৃতিতে গড়িয়া উঠিতে থাকে। ১৯০৮ সনের ২৮ ডিসেম্বর 'তুর্ক দের্নেয়ি' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী জনগণের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে সমীক্ষা পরিচালনা, তুর্ক ভাষাকে সহজতর করা এবং এই ভাষাকে বিজ্ঞানসম্মত করিয়া তোলা। এই সমিতি তেমন ক্ষমতাবান ছিল না। তবে ১৯১১ সনের নভেম্বরে 'তুর্ক য়ুর্দু' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় এবং ১২ মার্চ, ১৯১২ সনে, তুর্ক ওজাগী, প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলন কেবল মুষ্টিমেয় কিছু দেশপ্রেমিকের মধ্যে সীমিত ছিল না, জারতন্ত্রের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য অন্যান্য দেশ হইতে পলাইয়া আসা বেশ কয়েকজন তুর্কী বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন আগা ওগলু আহমাদ, হুসায়ন যাদে আলী ও আকচোরা ওগলু য়ূসুফ। ভ্রমাত্মক ধারণায় পরিচালিত কিছু প্রতীচ্যবাদী (গারব্জীলীক) এই আন্দোলনের ভয়ঙ্কর বিরোধিতা করে। ইহাদের বিরোধিতা তো ছিলই, ইহার পাশাপাশি নিখিল বিশ্ব ইসলামপন্থীরাও (ইত্তিহাদ-ই ইসলাম) ইহার বিরোধিতা করে। ঐ একই সময়ে সালোনিকাতে গেনজ্ কালেম্লার নামের সাময়িকীটির প্রকাশনা আবার শুরু হয়। এই পত্রিকাটি একটি কপট নামে তুর্কী ভাষাশুদ্ধির জন্য এক প্রচারাভিযান শুরু করে। এদিকে ঐক্য ও অগ্রগতি কমিটির (ইত্তিহাদ-উ তেরেককী) যিয়া গোক্আল্প নামে একজন সদস্য তাঁহার কার্যকলাপ শুরু করেন। কমিটির কেন্দ্রীয় কার্যালয় Constantinople -এ স্থানান্তরের পর যিয়া গোকআল্প তুর্কর য়ুরদুতে যোগ দেন। পরে, বলকান যুদ্ধের বিপর্যয়কর সমাপ্তির পর দেশের তরুণ সম্প্রদায়ও জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেয়। সময়টি জাতীয় আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত শুভ ছিল। ইহার জন্য একমাত্র দরকার ছিল একজন যোগ্য নেতার, যিনি জাতীয় ধ্যানধারণাকে যথাযথ পরিচালনায় সক্ষম এবং একটি কর্মসূচি দিয়া উহার একটি দার্শনিক বুনিয়াদ দানে সমর্থ। এই কাজটি ছিল যথার্থভাবেই যিয়া গোকআল্পের। তিনিই উহা সম্পন্ন করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দানকালে, ভাষণে, বক্তৃতায়, নিবন্ধ ও কবিতার মাধ্যমে তরুণ সম্প্রদায়ের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার গোটা জীবনে বলকান যুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া অস্ত্রবিরতি চুক্তির সময় অবধি, যখন তিনি মাল্টায় নির্বাসিত ছিলেন এবং পরে যখন তিনি স্বল্পমেয়াদের জন্য দিয়ার বাক্র ও আঙ্কারায় যান তখনও তিনি জাতীয়তাবাদী লক্ষ্যে তাঁহার তৎপরতা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালাইয়া যান। তাঁহার শিক্ষা ও প্রচারের বিষয়বস্তু তাঁহার রচিত 'তুর্কজুলুয়ুন এসাস্লারী' (অ্যাঙ্গোরা ১৩৩৯/ ১৯২৩) গ্রন্থে বিবৃত রহিয়াছে। ইহার অনতিকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে গোটা দেশ শোকাভিভূত হইয়া পড়ে।

জীবনের আর সকল ক্ষেত্রের মতই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব সাহিত্যেও অনুভূত হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কাব্যে প্রাধান্য লাভ করে। ভাষার সরলীকরণ সাধিত হয়। জীবনের জন্য শিল্পকলা —এই ধারণাটি কলাকৈবল্যবাদী দর্শনের স্থলাভিষিক্ত হয়। অতঃপর লেখকগণ লোকপ্রিয় সাহিত্য ও উহার ঐতিহ্যিক আঙ্গিক হইতে তাঁহাদের রচনার উপাদান গ্রহণ করিতে শুরু করেন। সাহিত্যে জীবন ও সমাজের সকল শাখার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন শুরু হয়। গায়ক-কবি, লোকপ্রিয় সাহিত্য, গণমানুষের সঙ্গীতের উপর ভাষাতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ঘটে (ঐসব উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষার প্রায় সামগ্রিক কৃতিত্ব এই নিবন্ধের নিবন্ধকার কোপরুলু যাদে মেহমেদ ফুআদের প্রাপ্য)। এই সকল কিছুই এই নূতন সাহিত্য আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনায় বিপুল অবদান যোগায়।

এই আন্দোলনের কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁহাদের নাম করিতে হয় তাঁহাদের মধ্যে আছেন ফারূক নাফিয, ইনি তাঁহার শেষের কবিতাগুলিতে আনাতোলিয়ার দৃশ্যপট তুলিয়া ধরিয়াছেন, ওরখান সেইফী, এনীস বেহীজ, য়ূসুফ দিয়া, খালিদ ফাখরী ও নেজীব ফাদিল। এইসব কবির মাঝে মেহমেদ এমীনের প্রভাবের তুলনায় যিয়া গোক আল্প ও য়াহ্য়া কেমালের প্রভাব বেশি। গদ্যে এই ধরনের অগ্রগতি আরও বেশি লক্ষণীয় এবং গদ্যকারদের রচনায় বলিষ্ঠতার স্বাক্ষর আরও সুপরিস্ফুট। এই আমলের সর্বাধিক খ্যাতনাম্নী ব্যক্তিত্ব হইতেছেন হালিদে এদীব হানিম। তিনি ভালবাসা ও আবেগানুভূতিমূলক গল্পগুলি তাঁহার লেখনী ধারণের প্রথম পর্যায়ে রচনা করেন। বস্তুত আবেগানুভূতিমূলক উপাদানই ছিল তাঁহার ঐ আমলের রচনার বৈশিষ্ট্য। উহার পরে তিনি 'Ateshden Gomlek'-এর আদর্শে লিখিতে শুরু করেন। তিনি তাঁহার এইসব গ্রন্থে আনাতোলিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের বর্ণনা দিয়াছেন। 'উমার সায়ফুদ-দীন অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বেশ কতকগুলি অত্যন্ত চমৎকার ছোট গল্প লিখিয়া যান। তাঁহার এই ধরনের একটি গল্পের নাম বোমবা। এই ধরনের গল্পগুলি তুরস্কের জাতীয় সাহিত্যের হীরা-জহরততুল্য। রাফীক খালিদ সম্ভবত সরল তুর্কী ভাষার সেরা লেখক। তিনি তাঁহার মেমলেকেত হিকায়েতলারিন গ্রন্থে আনাতোলীয় জীবনের এমন সব বাস্তব চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন যাহা এযাবৎ সাহিত্য অঙ্গনে অজানা ছিল। তাঁহার এই বাস্তবতাবাদী বিষয়গুলি অবশ্য নির্মম বিদ্রূপে ও সহানুভূতিহীন অনুভূতিতে পরিবেশিত হইয়াছে।

য়া'কূব কাদরী তাঁহার উপন্যাসে যতখানি না কাহিনীকার তাঁহার চাইতেও অনেক বেশি গদ্যশৈলীকার ও মরমী কবি। নূতন সাহিত্য আন্দোলনের গদ্যকারদের মধ্যে আছেন ফালিহ্ রিফকী, ইনি ফিলিস্তীন যুদ্ধের 'Atesh we-Gunesh' পর্বগুলি বর্ণনা করিয়াছেন। আরও আছেন রূশেন এশরেফ। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রেশাদ নূরী তাঁহার উপন্যাস চালি কুণ্ডর সুবাদে খ্যাত হন। তুর্কী নাট্যকলার বিবর্তনের ধারাটি বস্তাপচা ফরাসী প্রহসন হইতে বিরামহীন ভাবানুবাদের তোড়ে ব্যাহত হইতেছে। তবে তুর্কী নারী যে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছে, তুর্কীদের মাঝে বেশ অনেক ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী আছেন ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাশ্চাত্য নাটক যে তুর্কী মঞ্চে অভিনীত হইতেছে—এইগুলি অন্তত ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদের দ্যোতক।

তুরস্কে জাতীয়তাবাদী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাগুলি এখন দৈনন্দিন জীবনের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সরকার ভাষার সরলীকরণের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইয়াছেন। মনোযোগ পড়িয়াছে বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দসম্ভার গড়ায়। লাতিন বর্ণমালা তুর্কী ভাষার জন্য গৃহীত হইবার ফলে ঐ ভাষার সরলীকরণে উহা বহুলাংশে সহায়ক হইবে। কিন্তু এত কিছুর পরেও উদ্দীপনার অন্ত নাই। জাতীয়তাবাদী সাহিত্যের উন্মেষ ও যাত্রা শুরু হইতে না হইতেই আমরা ইতিমধ্যেই একটি আন্তর্জাতিকতাবাদী সাহিত্যের আগমনী সুর টের পাইতেছি। তরুণ ও প্রাণদীপ্ত মার্কসবাদী কবি নাযিম হিকমেত বহুকাল রাশিয়ায় অবস্থানের পর, যিনি তুরস্কে ফিরিয়া আসেন, তিনি একটি তুর্কী সর্বহারা বা প্রলেতারীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন; এই সাহিত্যের কবিতাগুলি ছন্দ-বিবর্জিত, অন্তানুপাসশূন্য রাখাই তাঁহার পরিকল্পনা। আর যুগপৎ তিনি পুঁজিবাদীদের ও তাঁহাদের পক্ষাবলম্বনকারী সাহিত্যিকদের প্রতি বজ্রাঘাত হানার সূচনা করেন। বেশ কিছু তরুণ কবি ও ঔপন্যাসিক নাযিম হিকমেতের চতুর্দিকে জমায়েত হন। তুরস্কের নবীন জাতীয় সাহিত্য এইসব বিদেশী, বিজাতীয় প্রভাব প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে কি না তাহা বলা অসম্ভব। তবে পরিস্থিতি যাহাই হউক, দেশের নিয়মিত সমান্তরাল খাতেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অবয়ব পাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) পদ্ধতিতত্ত্ব ঃ (১) Koprulu Zade Mehmed Fuad, Turk Edibiyati Ta'rikhinde Usul (প্রকাশনা সূত্র ঃ সাময়িকী ঃ Bilgi, i., 1329, p. 1-52); (২) ঐ লেখক, in Milli Tetebbular Medj-muasi, i., 1331, . 35-46.

(খ) **রচনাবলীর পাঠসমূহ** ঃ পুরাতন সাহিত্যের বেশিরভাগ পাঠ আজিও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান। পাণ্ডুলিপির কোন কোনটি কায়রো অথবা Constantinople-এ মুদ্রিত হইয়াছে, যদিও সেইগুলি আদর্শ সংস্করণ নহে। পাণ্ডুলিপির জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থসূচিগুলি দেখা যাইতে পারে। খুব কম রচনাই য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই নিবন্ধ ও এই বিষয়টির সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য নিবন্ধ দ্র.।

(গ) নির্বাচিত পাঠ্য ঃ এই নিবন্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও নির্বাচিত পাণ্ডুলিপিগুলির উল্লেখ আছে। য়ুরোপে প্রকাশিত সম্পর্কিত প্রকাশনাসমূহ ঃ (৩) E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, vol. v., vi.; (৪) W. D. Smirnoff, Muntakhabat-i Athar-i othmaniye, St. Perersburg' 1903; (৫) M. Wickerhauser, Wegweiser zum Verstandniss der turkischen Sprache, Vienna 1853; (৬) A. Fischer and Muhieddin, Anthologie aus der neuzeitilichen turkischen Literatur, i., Leipzig-Berlin 1919; (৭) La Muse ottomane by Servan de Sugny (প্রকাশকাল ১৮৫৫) ইহাতে কাব্যানুবাদ রহিয়াছে। তুর্কী চিরায়ত (ধ্রুপদী) কবিতার জন্য (দ্র.) খারারাত-ই দিযয়া পাশা, ৩খ., ১২৯১ ও (৮) মুন্তাখাবাত-ই মীর নাজীফ, বওলাক ১২৬১। গদ্য রচনার জন্য (৯) এবুযয়িয়া তেওফীক, নুমানে-ই এদেবিয়াতে-ই উছমানিয়ে (৬ষ্ঠ সংস্করণ, Constantinople ১৩৩০)। ইহা ছাড়া তুর্কী ভাষার বিভিন্ন ধারার জন্য কয়েকটি নির্বাচিত পাঠ্য রচনাবলী রহিয়াছে। এইগুলির মধ্যে সর্বসাম্প্রতিক হইতেছে হিফজী তেওফীক, হাম্মামী যাদে ইহসান ও হাসান আলী তুর্ক এদেবিয়্যাত নুমানেলারি, ১খ., Constantinople ১৯২৭ খ.।

(ঘ) **কবিদের জীবনী** ঃ নিবন্ধের পাঠে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাযকিয়া-ই শুআরা-র উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ধরনের বহু সংখ্যক কবি জীবনী এখনও মুদ্রিত হয় নাই। গ্রন্থপঞ্জীগত তথ্যের জন্য অতঃপর বর্ণিত প্রকাশনার ভূমিকা দ্র. ঃ (১০) ইবনুল-আমীন মাহমওদ কেমাল, সোরী আসর তুরক শাইরলারী, প্রকাশনার সূত্র ঃ T. T. E., vol. i. Constantinople 1930। ইহাতে সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত পুরাতন ও নূতন গ্রন্থপঞ্জীমূলক রচনাবলী সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়াও সকল ঐতিহাসিক সূত্রে সিয়াহাতনামে ও কিংবদন্তীভিত্তিক রচনাবলীতে (মানাকিব-নামে) কবিদের সম্পর্কে তথ্যসম্বলিত বিজ্ঞাপন আছে।

(ঙ) **সাধারণ রচনাবলী** ঃ তুরস্ক বা য়ুরোপে কোথাও সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত সাহিত্য ইতিহাসের অস্তিত্ব অদ্যাবধি নাই; (১১) J. Von Hammer, Geschichte der osmanischen Dichtkunst (4 vol., 1836) সম্পর্কিত রচনাটি লেখক কর্তৃক তাযকিরা-ই শুআরা হইতে গৃহীত নানা কবির জীবনীর একটি সঙ্কলনবিশেষ; লেখক এই পাণ্ডুলিপিটির অস্তিত্বের বিষয়ে অবহিত ছিলেন। Smirnow, Krymski ও অন্য কোনও কোনও লেখকের কাজগুলি সম্পর্কিত রচয়িতাদের সম্পর্কে তথ্য প্রদান ও তাহাদের কাজের বিচার-বিশ্লেষণের দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ। এই রচনাগুলির গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. (১২) Th. Menzel, Die Turkische Litteratur (in Kultur der Gegenwart), এই গ্রন্থকার Krymski, Istoriya Turciyi i yeya literatur, 2 vols, Moscow 1916, এই গ্রন্থের উল্লেখ বর্জন করিয়াছেন। তুরস্কের আদি কাব্যসম্ভার সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি হইতেছে (১৩) E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, 6 vols., London 1900-1909। ১৩শ-১৪শ শতকের সাহিত্য সম্পর্কিত বিবরণ অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও রচনাটি এখনও অত্যন্ত মূল্যবান। ইহা বস্তুতপক্ষে কবিদের জীবনীর সঙ্কলন, আর ইহাতে কেবল তানজীমাত আমল অবধি কবিদের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছে। রচনাটি এই আমল পর্যন্তই কার্যত সম্পূর্ণ। আরও দ্র. (১৪) P. Horn Geschichte der turkischen Moderne. Leipzig; (১৫) M. Hartann, Aus der neueren osmanischen Dich-tung. M. S. O. S., xix-xxi; (১৬) O. Hachtmann, Die turkische Litteratur des zwanzigsten Tahrhunderts, Leipzig। তুরস্কে প্রকাশিত সাহিত্যের ইতিহাসের (তু. আরও Menzel, এখানে নিবন্ধ উদ্ধৃত) বিষয়ে আমরা এইগুলির উল্লেখ করিতে পারি ঃ (১৭) শিহাবুদদীন সুলায়মান, তারীখ-ই এদেবিয়াত-ই উছমানিয়ে, Constantinople ১৯১৩ খৃ.; (১৯) ইবরাহীম নেজমী, তারীখ-ই এদেবিয়াত-ই দার্সলারি,

২খ., Constantinople ১৩৩৮-১৩৪১; (২০) ইসমাঈল হাবীব, তুর্ক তেজেদদুদ এদেবিয়াত-ই তারিখ, Constantinople ১৩৪০; (২১) ইমসাঈল হিকমেত, তুরক এদেবিয়াতী তারীখি, ৪খ., বাকু ১৯২৫-১৯২৬। তবে এই রচনাগুলি পদ্ধতিগত দিক হইতে শূন্যগর্ভ ও যোগান দেওয়া তথ্যও ভাসা ভাসা। কোপরুলু-যাদে মেহমেদ ফুআদ-এর তুরক এদেবিয়াতী তারীখিতে পদ্ধতিসম্মতভাবে বিভিন্ন তুর্কী জনগোষ্ঠীর সাহিত্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পর্যন্ত তাঁহার এই সুবিশাল রচনার মাত্র একটি খণ্ড (Constantinople, দেওলেত মাতবাআসী, ১৯২৬-১৯২৮) প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হইয়াছে। তুরস্কের সাহিত্য ইতিহাসের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও বিষয়ের উপর রচিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনোগ্রাফগুলি এই নিবন্ধে ও অন্যান্য বিশেষ নিবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।

৪। ইতিহাস

১। সাধারণ বৈশিষ্ট্যাবলী

ইসলামী কালপরিক্রমায় উছমানী সাম্রাজ্য হইতেছে একটি তুর্কী জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী রাষ্ট্র। একই সঙ্গে এই রাষ্ট্র ইসলামী ইতিহাসের পরবর্তী শতকগুলির সর্ববৃহৎ একক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের আদি কেন্দ্র এশিয়া মাইনর, ইসলামী বিশ্বের একান্ত উত্তর-পশ্চিম কোণে। এই রাষ্ট্রটি এমন দেশ যাহা অন্যূন চারি শতক স্থায়ী ছিল। এই দীর্ঘ কালপরিক্রমায় এই রাষ্ট্র প্রাচীন আব্বাসী খিলাফাতের প্রায় গোটা ভূভাগে আধিপত্য করিয়াছে। ইসলামী জাহানের সর্বত্র যখন পূর্বেকার রাজনৈতিক ধারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তখন ১৩০০ সনে উছমানী সাম্রাজ্য গঠিত হয়। ঐ সময় মুসলিম সভ্যতা দুর্বলতার এক সঙ্কটজন সময় সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করিতেছিল। বিদ্যমান কোনও সরকার দৃশ্যত ঐ গোটা অঞ্চলে স্থিতির তেমন কোনও নিশ্চয়তা বিধান করিতে পারিতেছিল না।

একটি বলিষ্ঠ নূতন ইসলামী রাষ্ট্রের উদয়ের জন্য কেবল এই পরিস্থিতিগুলিই পর্যাপ্ত ছিল না। আর এই কারণেই শেষের দিকের মধ্যযুগে বিশ্ব ইতিহাসের সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রবাহে উছমানী সাম্রাজ্য কি ভূমিকা পালন করে ও উহার উদয়ের ব্যাখ্যা কি সেই বিষয়ে অনুসন্ধান যথার্থ হইবে। দেখা গিয়াছে যে, আব্বাসী খিলাফাত ও উহার রাজনৈতিক ঐতিহ্যসমূহ লোপ পাওয়ার পরেই কেবল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে একটি নূতন শক্তির উদয় সম্ভব হইয়াছে। তখন ১২৫৮ খৃ. সন। ইহার কিছুকাল আগে ১২০৪ সনে (তু. R. Tschudi, Vom alten Osmanischen Reich, Tubingen 1930) লাতিন পদানত হওয়ার কারণে বায়বান্টীয় সাম্রাজ্যও অতি দুর্বল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় এমন এক নূতন রাষ্ট্রের উদয় সম্ভব হয় যে, রাষ্ট্র কিছুটা পরিবর্তিত ইসলামী ধারা ও ইতিমধ্যে বহুলাংশে প্রাচীকৃত বায়যান্টীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসাবে সুদীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় রাখে।

রূমের সালজূক সাম্রাজ্যের যুগে ভাবী উছমানী রাষ্ট্রের আদল গঠিত হওয়ার বহুকাল আগে হইতেই উল্লিখিত দুই কৃষ্টি পরিমণ্ডলের মধ্যে পারস্পরিক অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়াটি চলিতেছিল। ফলত খৃ. ১৪শ ও ১৫শ শতকে উছমানীদের দ্রুত একের পর এক যে বিজয়াভিযান পরিচালিত হয় সেইগুলি কোনও বন্য, অসভ্য জনগোষ্ঠী কিংবা জাতির স্থূল ধরনের হামলা ছিল না, বরং উহা ছিল এক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, যাহার বিষয় ১ম বায়াযীদ, ২য় মুহাম্মাদ, ১ম সুলায়মান ও তাঁহাদের কোনও কোনও রাষ্ট্রনায়কদের বিবেচনায় একটা মাত্রায় হয়ত বর্তমান ছিল। ঐ বিজয় যুগপৎ এক ধরনের সভ্যতারও প্রসার ঘটায়। খৃ. ১৬শ শতকে সেই সভ্যতা সুনির্দিষ্ট আকার নেয়। ইতিহাসের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই উছমানী সভ্যতার সঙ্গে পূর্বাঞ্চলীয় মুসলিম দেশগুলির জনগণের বৈপরীত্য অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে যাহার ফলে সুন্নী-শীঈ বিতর্ক এক নয়া রাজনৈতিক তাৎপর্য লাভ করে। অন্যদিকে তুর্কীভাষী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ট্রান্স্ অক্সানিয়ার সহিত উছমানী রাষ্ট্রের সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হইয়া আসে। আর ঐ একই সময়ে উছমানী ও পাশ্চাত্য য়ূরোপীয় সভ্যতার মধ্যকার ব্যবধানটি ১৫শ শতকে ঘুচানোর অযোগ্য মনে না হইলেও অতঃপর ক্রমান্বয়ে আরও বিস্তৃততর হইতে থাকে। কারণ তুরস্ক মধ্যযুগ হইতে আধুনিক কালে উত্তরিত হইতে প্রয়াসী হয় নাই। তুর্কী সুলতানদের শাসনাধীন বহু দেশে উছমানী সভ্যতা অধিকতর দৃঢ় হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যে সময়ে উছমানী রাজনৈতিক শক্তি দুর্বল হইতে থাকে, ঠিক সেই সময়টিতেই উছমানী ঐতিহ্য সর্বাপেক্ষা দৃষ্টিগোচরও হইয়া উঠে। ইহার একটি খুব ভাল দৃষ্টান্ত হিসাবে মিসরের কথা (তু. খেদীব) উল্লেখ করা যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ১৯০৮ খৃ. বিপ্লবের পর নব্য তুর্কী আন্দোলনের সদস্যগণ যখন একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উছমানীবাদকে আরেকবার রাজনৈতিক বাস্তবতা সচেতন করিয়া তোলে তখন তাহাদের ঐ প্রয়াস পরিপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ইতিমধ্যে তুরস্কে প্রবিষ্ট হওয়ায় উছমানীবাদের পচন ধরিয়াছিল।

খাঁটি ইসলাম হইতে অনেক দূরে জন্ম লইয়াও উছমানী রাষ্ট্র একটি ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই বিকশিত হয়। কেননা এই রাষ্ট্র/সাম্রাজ্য অচিরেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী হিসাবে সরকারী রক্ষণবাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। অবশ্যই এই প্রত্যাবর্তনের সহিত ঐ মাযহাবের অপেক্ষাকৃত পুরাতন ধারাটিও সংশ্লিষ্ট ছিল। ইসলামী খিলাফাতের উপর দাবি ও মুসলিম জাহানের উপর আধিপত্যের বিষয় ও সেই সঙ্গে সুলতান ২য় আবদুল-হামীদ অনুসৃত নিখিল বিশ্ব-ইসলামবাদী নীতি উছমানী সাম্রাজ্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য নহে, বরং ঐ বিষয়গুলি ছিল উছমানী রাষ্ট্রের রাজনীতির, বিশেষত খৃস্টান শক্তিগুলির মুকাবিলায় অনুসৃত নীতির অংশমাত্র।

১৮শ শতকে এমন এক সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পড়িতে শুরু করে, যখন "উছমানী সাম্রাজ্য তাহার স্বকীয় সাংস্কৃতিক আদলটি পাইয়া গিয়াছে, আর তখন হইতেই ঐ রাষ্ট্র য়ূরোপের তুলনায় স্বকীয় রাজনৈতিক নিকৃষ্টতার বিষয়টিও উপলব্ধি করিতে শুরু করে। প্রাচীনকাল হইতে সম্পর্ক সূত্রের কারণে ফ্রান্স প্রথম য়ূরোপীয় দেশ হিসাবে তুরস্ককে য়ূরোপের কিছু কিছু নয়া প্রয়োগ-উদ্ভাবন (যেমন সামরিক রণকৌশল ও প্রযুক্তি) সরবরাহ করে। ২০শ শতকের প্রথমভাগ অবধি এই যোগসূত্রগত ঐতিহ্য স্থিতিশীল থাকে। তুরস্কের কিছু কিছু পাশ্চাত্য ধারার সংস্কার বলবৎ করা হয়; কিছু প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলা হয়। কিন্তু ঐ সংস্কার বা পরিবর্তন বৈপ্লবিক প্রকৃতির ছিল না। প্রধানত সরকারী নানা ব্যবস্থার মধ্যে উহা সীমিত ছিল। এই সংস্কার কার্যক্রমের আওতাধীন পুনর্গঠন সাফলোর সঙ্গে তানজীমাত যুগই বাস্তবায়িত হয়। পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার অধিকতর পরোক্ষ পরিণতি ছিল তুর্কী জাতীয়তাবাদ। ১৯১৪-১৮-এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই তুর্কী ইহার অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করে। আজিকার আধুনিক তুরস্ক 'উছমানী সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র এক ভূভাগ।

তবু এই দেশে 'উছমানী সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য-উত্তরাধিকারগুলি বহুলাংশে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রহিয়াছে।

২। ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রথম আমল ঃ এই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং তীমূরের অভিযানে এই রাষ্ট্রের সাময়িক অবলুপ্তিকাল অবধি ইহার প্রাথমিক সম্প্রসারণ।

১ম 'উছমান ১২৯৯-১৩২৬

ওরখান (১ম 'উছমান-এর পুত্র) ১৩২৬-১৩৫৯

১ম মুরাদ (ওরখানের পুত্র) ১৩৫৯-১৩৮৯

১ম বায়াযীদ য়ীলদীরীম (১ম মুরাদের পুত্র, ১৩৮৯-১৪০২

উছমান ও ওরখানের আমল সন্দেহাতীতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। বায়াযীদ তাঁহার রাজত্বকালে অ্যাঙ্গোরায় (২০ জুলাই, ১৪০২) তীমূরের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া ধৃত হন। ইহার পরের ১২ বৎসরকাল বায়াযীদের চারি পুত্র ঈসা, মুহাম্মাদ, সুলায়মান ও মূসা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে মসনদের লড়াইয়ে লিপ্ত থাকেন। সোফিয়ার নিকট Camurli রণক্ষেত্রে ১৪১৩ সনের জুলাইয়ে মেহমেদ মূসার বিরুদ্ধে জয়ী হইলে ঐ অনিশ্চয়তার যুগের অবসান ঘটে।

২য় আমল ঃ 'উছমানী রাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সর্বাধিক সাম্রাজ্য বিস্তারকাল অবধি দ্রুত সম্প্রসারণ।

১ম মুহাম্মাদ (১ম বায়াযীদের পুত্র) ১৪০৩-১৪২১

২য় মুরাদ (১ম মুহাম্মাদের পুত্র) ১৪২১-১৪৫১

২য় মুহাম্মাদ ফাতিহ (২য় মুরাদের পুত্র) ১৪৫১-১৪৮১

২য় বায়াযীদ (২য় মুহাম্মাদের পুত্র) ১৪৮১-১৫১২

২য় সেলীম (২য় বায়াযীদের পুত্র) ১৫১২-১৫২০

১ম সুলায়মান কানূনী (১ম সেলীমের পুত্র) ১৫২০-১৫৬৬

৩য় আমল ঃ এই আমলে হাঙ্গেরী হাতছাড়া হইবার আগে পর্যন্ত, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা অটুট থাকে।

২য় সেলীম (১ম সুলায়মানের পুত্র) ১৫৬৬-১৫৭৪

৩য় মুরাদ (২য় সেলীমের পুত্র) ১৫৭৪-১৫৯৫

৩য় মুহাম্মাদ (৩য় মুরাদের পুত্র) ১৫৯৫-১৬০৩

১ম আহমাদ (৩য় মুহাম্মাদের পুত্র) ১৬০৩-১৬১৭

১ম মুসতাফা (৩য় মুহাম্মাদের পুত্র) ১৬১৭-১৬১৮

২য় উছমান (১ম আহমাদের পুত্র) ১৬১৮-১৬২২

১ম মুসতাফা, ২য় বার ১৬২২-১৬২৩

৪র্থ মুরাদ (১ম আহমাদের পুত্র) ১৬২৩-১৬৪০

ইবরাহীম (১ম আহমাদের পুত্র) ১৬৪০-১৬৪৮

৪র্থ মুহাম্মাদ (ইবরাহীমের পুত্র) ১৬৪৮-১৬৮৭

২য় সুলায়মান (ইবরাহীমের পুত্র) ১৬৮৭-১৬৯১

২য় আহমাদ (ইবরাহীমের পুত্র) ১৬৯১-১৬৯৫

২য় মুসতাফা (৪র্থ মুহাম্মাদের পুত্র) ১৬৯৫-১৭০৩

৪র্থ আমল ঃ এই আমলে 'উছমানী রাষ্ট্রশক্তি ক্রমশ ইহার শক্তি হারায় ও শক্তিশালী সামন্তরা এই রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া দেয়।

৩য় আহমাদ (৪র্থ মুহাম্মাদ-এর পুত্র) ১৭০৩-১৭৩০

১ম মাহমূদ (২য় মুসতাফার পুত্র) ১৭৩০-১৭৫৪

৩য় উছমান (২য় মুসতাফার পুত্র) ১৭৫৪-১৭৫৭

৩য় মুসতাফা (৩য় আহমাদের পুত্র) ১৭৫৭-১৭৭৪

১ম আবদুল-হামীদ (৩য় আহমাদের পুত্র) ১৭৭৪-১৭৮৯

৩য় সেলীম (৩য় মুসতাফার পুত্র) ১৭৮৯-১৮০৭

৪র্থ মুসতাফা (১ম আবদুল-হামীদের পুত্র) ১৮০৭-১৮০৮

২য় মাহমুদ (১ম আবদুল-হামীদের পুত্র) ১৮০৮-১৮৩৯

৫ম আমল ঃ পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রভাবে রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক নবজাগরণ।

আবদুল-মাজীদ (২য় মাহমুদের পুত্র) ১৮৩৯-১৮৬১

আবদুল-আযীয (২য় মাহমুদের পুত্র) ১৮৬১-১৮৭৬

৫ম মুরাদ (আবদুল-মাজীদের পুত্র) ১৮৭৬

২য় আবদুল-হামীদ (আবদুল-মাজীদের পুত্র) ১৮৭৬-১৯০৯

৫ম মুহাম্মাদ (আবদুল-মাজীদের পুত্র) ১৯০৯-১৯১৮

৬ষ্ঠ মুহাম্মাদ (আবদুল-মাজীদের পুত্র) ১৯১৮-১৯২২

তুর্কী জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯২৩ সনের ২০ অক্টোবর তুরস্কের প্রজাতন্ত্র ঘোষিত ও মুসতাফা কামাল পাশা উহার প্রেসিডেন্ট।

'উছমানী সাম্রাজ্যের চমৎকার সামগ্রিক বিবরণের জন্য দ্র. খালীল এদ্‌হেম দুয়েল-ই ইসলামীয়ে, ইস্তাম্বুল, ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৩২০ পরবর্তী।

৩। ১৩শ শতকের শেষভাগে এশিয়া মাইনরের পরিস্থিতি

'উছমানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের গবেষণা-সমীক্ষা হইতে দেখা যায়, পূর্বে ১৬শ শতকের বিভিন্ন সূত্রে প্রতিফলিত 'উছমানী ঐতিহাসিক ঐতিহ্য-নিদর্শনের মাধ্যমে যেইসব বিষয় পরিলক্ষিত হইয়াছিল ও পরবর্তী কালে যেইসব উৎকীর্ণ (শিলা) লিপি ও মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় সেইগুলির সহিত অপেক্ষাকৃত পুরাতন ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ (আল-ই উছমান-এর রচিত ঘটনাপঞ্জীসমূহের বিভিন্ন ভাষ্য) এবং আধা-কিংবদন্তী-আখ্যানমূলক সূত্রসমূহ (সূফী তারীকাসমূহের মানাকিব-নামে ও বিলায়েত-নামেসমূহ) সম্মিলিতভাবে এযাবতকাল কল্পনার অগোচর বহু ঐতিহাসিক সম্পর্ক-পরম্পরাকে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছে।

'উছমানী শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রের অঙ্কুরটি ছিল বস্তুতপক্ষে একদা কোনিয়ার সালজূক শাসকগোষ্ঠীর শাসনাধীন ভূভাগের উত্তর-সীমান্তের এক প্রত্যন্ত দূর চৌকিতে (উজ)। ১২৪৩ খৃ. ২য় কায়খুস্‌রাও-এর বিরুদ্ধে মোঙ্গল বিজয়াভিযানের পর সালজূক রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে অরাজকতায় নিমজ্জিত হয়। ঐ সময় নাগাদ এশিয়া মাইনর অনেকখানি তুর্কীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। আনাতোলীয় তুর্কদের একটা বিশাল অংশ ওগুয উপজাতির লোক। এশিয়া মাইনরে সালজূক বিজয়াভিযানকালে উহাদেরকে ঐ অঞ্চলে আনা হয়। এশিয়া মাইনরে ওগুয তুর্ক উপজাতির জনগোষ্ঠী ছাড়াও বায়যান্টীয় সাম্রাজ্যের য়ুরোপীয় অংশ হইতে খৃস্টান তুর্ক ও রাশিয়া হইতে তুর্কী লোকজনও এইখানে আগমন করে। ইহা ছাড়া মোঙ্গল বিজয়াভিযানের কারণে এই অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া সাবেক খাওয়ারিযমী সুলতান শাসিত রাজ্য হইতেও বহু আশ্রয়প্রার্থী এইখানে আসিয়া হাযির হয়। এই অভিবাসীদের অনেকেই ছিল ইরানী। এশিয়া মাইনরের গ্রীকীকৃত মূল অধিবাসীদের আকার ঠিক কি ছিল সেই সম্পর্কে আমরা অবহিত নহি। এই গ্রীক ভাষাভাষী লোকজন সম্ভবত প্রধানত শহর-নগরে বাস করিত। নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, কোনিয়ার মূল

বাসিন্দারা অনেকটাই ইসলামী ভাবধারায় রপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তবুও 'উছমানী সাম্রাজ্যের বায়যান্টীয় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রধানত খৃস্টান বসতি ছিল। সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে Trebizond জনবসতির এক বড় অংশ ছিল লায জনগোষ্ঠীর লোক, মধ্য আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল ও সিসিলীর আর্মেনীয় রাজ্যেও এই ধরনের বহু খৃস্টানের অধিবাস ছিল (১০৮০-১৩৭৫ খৃ.)। বাহ্যত মনে হয় না যে, সালজূক সাম্রাজ্যের সাবেক আঞ্চলিক পরিসীমার মধ্যে মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যে কোনও তীব্র সামাজিক বিরোধ ছিল, বরং নগরবাসী মানুষও তখনও যাযাবর তুর্কী উপজাতিগুলি তথা তুর্কোমানদের মধ্যে বিরোধই বরং শানিত হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ যাযাবরপ্রায় তুর্কোমানগণ এই সময় এশিয়া মাইনর অঞ্চলে তো বটেই, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্যের সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতেও ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিভিন্ন তুর্ক জনগোষ্ঠী, যাহারা ইসলামের এক বিশেষ ধারা অনুসরণ করিত, তাহাদের মধ্যে তখনও প্রাক-ইসলামী আমলের বহু ধর্মীয় রীতি-ঐতিহ্য রহিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এই বিশেষ ধরনের ইসলাম উদ্ভূত হয় কালানদারীয়া ও হায়দারীয়া তারীকার ধর্ম প্রচারক এক শ্রেণীর মুসাফির দরবেশদের বদৌলতে। তাঁহারা ১১শ শতকে গোটা উত্তর ইরান ও ট্রান্সঅক্সানিয়ায় ছড়াইয়া পড়েন। তাঁহাদের ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রচারে বহুলাংশে শীঈ মাযহাবের বহুল উপাদান সমন্বিত সূফী মতবাদে উজ্জীবিত ছিল। এশিয়া মাইনরে অভিবাসী হওয়ার পরেও তুর্কোমানদের মধ্যে উল্লিখিত প্রভাব থাকিয়া যায়। আর তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধর্মীয় এখতিয়ারের দায়িত্ব কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তাঁহারা বাবা নামে অভিহিত হন। এই বাবাদের সহিত প্রাক-ইসলামী আমলের বাকসিদের অনেকখানি মিল থাকিয়া যায়। এই ধর্মীয় নেতাদের অধীনে ১২৩৯ খৃ. এক ভয়ঙ্কর অভ্যুত্থান ঘটে। ইহাতে মূল নেতা ছিলেন বাবা ইসহাক। তৎকালীন সরকার শেষ পর্যন্ত ঐ উত্থান দমন করিতে সক্ষম হইলেও এশিয়া মাইনরের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিরুদ্ধ ধর্মীয় মতবাদীদের প্রভাব থাকিয়া যায় এবং উহা 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রথম শতকের ইতিহাসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এই তুর্কোমানগণ বাস্তবিকপক্ষেই শাসকশ্রেণীর লোকজন ও শহর-নগরবাসীদের অপেক্ষা অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। অন্তত এখন ঐ অঞ্চলে যেইসব ভৌগোলিক স্থানীয় নাম পাওয়া যায় তাহাতে উহার সপক্ষে প্রমাণ স্পষ্ট। বহু গ্রাম, নদী ও পর্বতের নাম বিশুদ্ধ তুর্কী। আমরা ঐসব প্রাচীন নামের মধ্যে প্রাচীন উপজাতীয় নাম–যেমন কায়, সালুর, বায়াত ও চেপনি ইত্যাদি দেখিতে পাই (তু. Kopr. Z. Fu'ad, Oghuz Etnolozhisine Tarikhi Notlar, Turkiyat Medjmu'asi, i, 185 প.)। তুর্কোমানগণ তখনও জঙ্গী প্রকৃতির থাকিয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে সীমান্তরক্ষী ও নূতন ভূখণ্ড জয়ে সর্বাত্মকভাবে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা ছিল। এই তুর্কোমানগণ কোথাও স্থায়ী নিবাসী হওয়ার পর হয়তবা আদি গ্রামবাসিগণের সহিত অনেকখানিই মিশিয়া গিয়াছিল, আর সেই কারণেই হয়ত এই মিশ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অদ্ভূত ধর্মীয় ও আধা-খৃস্টান আচার-রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি; পরবর্তী কালেও আনাতোলিয়ার সাধারণ শ্রেণীর লোকজনের মাঝে, বিশেষ করিয়া 'উছমানী সাম্রাজ্যের বেকতাশি সূফী তারীকার লোকজনের মাঝে প্রচলিত রহিয়াছে বলিয়া তথ্য পাওয়া যায়। এই বেকতাশি তারীকার নাম হাজ্জী বেকতাশ ওয়েলী হইতে উদ্ভূত। এই ব্যক্তি উল্লিখিত বাবা ইসহাকের একজন শাগরিদ ছিলেন বলিয়া কথিত আছে (Kopr. Z. Fu'ad, Les origines de Bektachisme, in Actes du Congres International de l'Histoire des Religions, tenu a Paris 1923)।

অন্যান্য সালজূক শাসক বংশের মত সালজূক আমলে সরকার ও সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকজন ইসলামের রক্ষণবাদী সুন্নী ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন। আর এই ঐতিহ্যের যোগসূত্র পাওয়া যায় খুরাসান ও ট্রান্সঅক্সানিয়ার সামানী সাম্রাজ্য-আমলের ঐতিহ্যধারায়। আবার এই অঞ্চলগুলির সঙ্গেই এশিয়া মাইনরের অধিবাসী তুর্কী জনগোষ্ঠীর নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বজায় ছিল। সালজূক শাসনামলে এশিয়া মাইনরের উচ্চ শ্রেণীর লোকজনের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ছিল প্রধানত ইরানী। আনাতোলিয়ায় ও পরবর্তী কালে 'উছমানী সাম্রাজ্যে হানাফী মাযহাব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একাধিপত্য লাভের নেপথ্যে উল্লিখিত যোগসূত্রগুলিরও ভূমিকা রহিয়াছে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাও নিজেরা উচ্চতর সূফী তারীকার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল না। এই উচ্চতর সূফী মতবাদী প্রভাবের উৎসস্থল ছিল খুরাসান। এইখান হইতেই স্বয়ং জালালুদ-দীন রূমীর (দ্র.) আগমন ঘটে। তিনি কোনিয়ার সালজূক দরবারে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাওলাবী সূফী তারীকা শত শত বৎসর ধরিয়া 'উছমানী তুর্কী কৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। এইভাবে দেখা যায় যে, এশিয়া মাইনরের শহরবাসীরাও সূফী ধারার ভ্রাতৃ-সম্প্রদায় সৃষ্টির সহিত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদের সমাজের এই কথিত মরমী ভ্রাতৃসংঘ ফুতূওয়া (দ্র.) স্তরে গঠিত হয়। আমরা এখন এশিয়া মাইনরের আখী ভ্রাতৃসংঘ (কার্যত এক ধরনের সূফী তারীকা) সম্পর্কে অনেকখানি সুপরিজ্ঞাত (F. Taeschner, in Islamica, iv, 1929. fasc. 1); গাযিয়ানগণও এই ধরনের একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করে।

এইসব ধর্মীয় ও সামাজিক বিরোধ-বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটেই ১৩শ শতকের শেষে ঘটনার পট পরিবর্তনের পরিস্থিতিকে বিচার করিতে হইবে। এশিয়া মাইনরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর জনপদ গড়িয়া উঠে (তাওয়াইফ-ই মুলূক)। এইসব শহর জনপদের অনেকগুলিতেই কোনও কোনও সময় রক্ষণবাদী ধর্মীয় মতবাদীদের আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে অরক্ষণশীল মতবাদীদের প্রভাব, বিশেষ করিয়া তুর্কোমানদের ধর্মীয় মতবাদ প্রবল হইয়া উঠিতে লক্ষ করা যায়। শেষোক্ত অরক্ষণশীল ধর্মীয় মতবাদ কারামান ওগল (দ্র.) নামক বর্ধিষ্ণু রাজ্যে অন্তত প্রথম দিকে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। সাধারণভাবে ধরিয়া নেওয়া হয় যে, ১২৯৯ খৃ. Karasi Oglu-য় 'উছমানী রাজ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময় নাগাদ যুগপৎ Mysia-র কারাসি ওগলু (দ্র.), Lydia-র সারুখান ওগলু (দ্র.) L'Om'a-র আয়দিন ওগলু (দ্র.), Caria-র মেনতেশে ওগলু এবং Lycia-র তেকে ওগলু নামক ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি গঠিত হয়। এই সব ক্ষুত্র রাজ্যের শাসক বংশগুলির সহিত উছমান ওগলু রাজ্যের একটি বিষয়ে মিল ছিল যে, বলকান উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলের বিরাট বিরাট অঞ্চল রাজ্যগুলির দখলে ছিল; রাজ্যগুলির অবস্থান ছিল সালজূক সাম্রাজ্যের বহিঃপরিসীমা বরাবর আর এই রাজ্যগুলির শাসকেরা তুর্কোমান সীমান্ত রক্ষীদের (উজ বেগলারি) বংশধর ছিল। এই অঞ্চলগুলি আনাতোলিয়ার ইসলামের কেন্দ্রস্থল হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত ছিল। অন্যদিকে ঐ উপকূলীয় গ্রীকগণ ও দ্বীপগুলির ইতালীয় উপনিবেশগুলির সহিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সম্পর্ক রক্ষা করিত। এই রাজ্যগুলির কয়েকটির (সারুখান, আয়দিন, মেনতেশে) এমন কি, মূর্তি ও লাতিন লিপিযুক্ত মুদ্রা পর্যন্ত ছিল। তবে উপকলীয় এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহাদের নৌবহর ছিল। এই নৌবহরের সাহায্যে তাহারা Morea হইতে সুদূর Dobruca অবধি গ্রীক দ্বীপসমূহ ও য়ুরোপীয় মহাদেশে হামলা চালাইতে পারিত। আয়দিন ওগলু উমুর বেগ বায়যান্টীয় সম্রাট Canacuzenos-এর মিত্র হিসাবে তাঁহারা নৌ-অভিযানগুলির জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। পশ্চিম অভিমুখে রাজ্য

বিস্তারের বিষয়টি উছমান ওগলুর রাজ্যের জন্য অত্যন্ত অনুকূল থাকার সুযোগে রাজ্যটি পরিণামে এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর আধিপত্য অর্জনে সক্ষম হয়। উল্লিখিত উপকূলীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পাশাপাশি Phrygia-তে জেরমিয়ান ওগলু (দ্র.), Pisidia-য় হামীদ ওগলু ও সেই সঙ্গে বে শেহীর-এ (পরে হামীদ ওগলুর অন্তর্ভুক্ত) অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ এশরেফ ওগলু রাজ্য ও লাদিক-এ (পরে জেরমিয়ান ওগলুর অন্তর্ভুক্ত) দেনীযলি রাজ্য গঠিত হয়। ইহা ছাড়াও ছিল জানদার ওগলুর গুরুত্বপূর্ণ শাসক বংশ–পরবর্তীকালে এই ইলি ইসফানদিয়ার ওগলু (দ্র.) নামে অভিহিত হন। Paphlagonia-র এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি সিনূব-এর সহিত যৌথভাবে কৃষ্ণসাগর নিয়ন্ত্রণ করে। এই অঞ্চলগুলির সহিত য়ুরোপীয় মহাদেশ, বিশেষ করিয়া Dobruca-র সহিত সম্পর্ক থাকিলেও ইহাদের নৌসম্প্রসারণের সুযোগ তেমন ছিল না। দক্ষিণ উপকূলে কারামান ওগলু (দ্র.) রাজ্যটির অবস্থানও ছিল অনুরূপ। এই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাকাল ১২৫৬ খৃ.। রাজ্যটি সিরিয়া অভিমুখে প্রধান সড়কের উপর ভৌগোলিকভাবে অবস্থিত হওয়ায় অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে অধিকতর ক্ষমতা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয় (তু. খালীল এদহেম, দুয়াল-ই ইসলামীয়া, পৃ. ২৭০ প.)।

১৪শ শতকে মোঙ্গলগণ যেইসব অঞ্চল শাসন করিত উল্লিখিত অঞ্চলগুলি কখনও সেইসব অঞ্চলভুক্ত ছিল না বলিয়া কথিত আছে। উলজায়তু (১৩০৪-১৩১৬ খৃ.) ও আবূ সাঈদ (১৩১৬-১৩২৫ খৃ.) কর্তৃক নিযুক্ত মোঙ্গলগণ প্রধানত কায়সারীয়াতে অবস্থান করিয়া আঙ্কারা অবধি এশিয়া মাইনরের মধ্যে মালভূমি অঞ্চল শাসন করিতেন। এই মোঙ্গল গভর্নরদের শেষ গভর্নর ছিলেন তিমুর তাশ। ১৩২৭ খৃ. এই তিমুর তাশ তাঁহার অধস্তন Ertena-কে রাখিয়া স্বীয় প্রদেশ হইতে মিসরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১৩২৫ খৃ. এই Ertena নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করেন এবং Ertena ওগলু (দ্র.) শাসক বংশ ও রাজ্যের পত্তন করেন। প্রায় ঐ একই সময়ে ১৩৯১ খৃ. মারআশ ও এলবিস্তানে যুলকাদারীয়া (দ্র.) শাসকবংশের পত্তন হয়। এশিয়া মাইনরের এই দক্ষিণ-পূর্বাংশে ঐ সময়ে মিসরের মামলূক শাসকেরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। কারামান ওগলু ও যুল-কাদারীয়া উভয় রাজ্যই ঐ মামলূক শক্তির সহিত নানা মৈত্রীসুলভ ও বৈরিতামূলক সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন।

যেইসব ক্ষুদ্র রাজ্যের বিষয় উল্লেখ করা হইল উহার সবগুলির সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি প্রায় একই রকমের ছিল। বেগ বা এমীরের সামরিক শক্তি তখনও কম-বেশি অনেকখানি নির্ভর করিত যাযাবর উপজাতিগুলির লোকদের উপর। আর এই যাযাবর উপজাতি জনগোষ্ঠীরই আধা-ধর্মীয়, আধা-সামরিক প্রধানগণ বিভিন্ন অঞ্চলে পাশা (দ্র.) উপাধিধারী ছিলেন। উদাহরণ হিসাবে উছমান ওগলু, তেকে, আয়দিন, দেনীযলি ও জানদার ওগলু-রাজ্যের পাশাদের উল্লেখ করা যায়। কোনও কোনও অঞ্চলে আমরা গাযী উপাধিধারীদিগের সাক্ষাত পাই। এই গাযীগণ বাহ্যত অপেক্ষাকৃত অধিক রক্ষণশীল ধর্মীয় সংগঠন, সালজূক আমলের 'ফুতুওয়া'-র অনুরূপ ছিলেন। বেগদের দরবার অপেক্ষাকৃত অধিক রক্ষণবাদী ধর্মবিশারদ ও সাহিত্যিকদের সমাবেশ হইয়া উঠে। তাঁহারা ঐ সময় হইতে তাঁহাদের রচনা তুর্কী ভাষায় লিখিতে শুরু করেন (তু. সাহিত্য, supra, B. iii)। অপেক্ষাকৃত বড় শহর-নগরে অপেক্ষাকৃত পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা-সংগঠন বজায় থাকে, বিশেষ করিয় মঙ্গোলিয়া হইতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত আঙ্কারার ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি লক্ষ করা যায়। এইখানকার সরকার প্রকৃতপক্ষেই আখী ভ্রাতৃসঙ্ঘের (মরমী ধর্মীয় সূফী সম্প্রদায়) করায়ত্ত ছিল।

এই প্রাক-'উছমানী আমলের ধর্মীয় ইতিহাসের জন্য দ্র. কোপরুলু যাদে ফুআদ, ইলক মুতাসাওবিফলার, ইস্তাম্বুল ১৯১৮ ও আনদালুদা ইসলামীয়েত, এদেবিয়াত ফাকুলতাসী মেজম, ১৯২২-১৯২৩ খৃ.।

৪। প্রথম আমল (১২৯৯-১৪০২)

'উছমানীদের ইতিহাসের ধারা-ঐতিহ্যে 'উছমানী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতাদের আদি যাযাবর তুর্কোমান উৎস সম্পর্কিত স্মৃতিমূলক চিহ্নাভাস রহিয়া গিয়াছে। কথিত হইয়া থাকে যে, উছমানের পিতা এরতোগরুল (দ্র.)-এর নিকটবর্তী এলাকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরতোগরুল ও তাঁহার পিতা সুলায়মান শাহের যে বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, তাঁহারা ওগুয তুর্কদের কায়ি (দ্র.) শাখার লোক ছিলেন। অবশ্য ওর-তোগরুল ও তাঁহার কাওম সম্পর্কে যেইসব বিবরণ পাওয়া যায় তাহা অনেকটাই কিংবদন্তীসুলভ উপাখ্যানের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। ইহা ছাড়া খোদ উছমানের তারুণ্য, যৌবন ও তাঁহার প্রথম বিজয়াভিযান সম্পর্কিত যেইসব বর্ণনা পাওয়া যায় সেইগুলিও একই বৈশিষ্ট্যময়। তবে বিভিন্ন সূত্রের তথ্যাদি মিলাইয়া মোটামুটি যে ঐতিহাসিক নির্মিতিটি আমরা উছমান সম্পর্কে পাই তাহা হইতেছে, উছমান (বা ইহার আদিতম জ্ঞাত রূপ উছমাজীক) এমন কি, এরতোগরুলের সত্যিকারের সন্তানও ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন অযাযাবর এক জনগোষ্ঠীর লোক, যেই জনগোষ্ঠীতে তুর্কোমানদের (J. H. Kramers, Wer War Osman A. O., vi, 242) তুলনায় রক্ষণবাদী ইসলামী ঐতিহ্য অনেক বেশি প্রবল। সে যাহাই হউক, উছমান গাযীয়ান-ই রূমের অন্যতম গাযী (তুর্কী আলপ) এবং এরতোগরুলের মৃত্যুর পর অন্যান্য গাযীসহ তিনি (আনু. ১২৬৫?) সংশ্লিষ্ট কাওমের নেতৃত্ব লাভ করেন। একইভাবে তিনিও আখী ভ্রাতৃসংঘভুক্ত লোকজন পরিবেষ্টিত ছিলেন। এমনকি সম্ভবত তাঁহার স্ত্রীর পিতা শায়খ এদেবালি, তাঁহারা বংশ-গোত্র যাহাই হউক, ঐ একই ভ্রাতৃসংঘের সদস্য ছিলেন। এই বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর লোকের সমন্বয়ে 'উছমানী কাওমটি কার্যত একটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। উহার কেন্দ্র ছিল কারাজা হিসার দুর্গ। লোকপ্রিয় ধর্মনেতারা (বাবা, দেদে, আবদাল) উচ্চ অবস্থানে বহাল থাকিলেও ক্রমেই অধিকতর রক্ষণবাদী ইসলামী ধর্মমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার ও ওরখানের শাসনামলের ইতিহাস সমসাময়িক কালের আনাতোলীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির অনুরূপ। তাঁহার উপজাতীয় লোকজনের সহায়তা, তাঁহার নিজ কৌশল ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের সুবাদে তিনি তাঁহার রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের পরিসীমা সম্প্রসারণে সক্ষম হন। তাঁহার মৃত্যুকালে 'উছমানী রাজ্যের পূর্ব সীমান্ত নির্দেশক ছিল কার্যত সাকারিয়া; দক্ষিণে উছমানের ক্ষমতার বাহু সম্ভবত এস্কিশেহির অবধি পৌঁছিয়াছিল। ওরখানের শাসনামলের গোড়ার দিকেই কেবল উপকূলের নিকটবর্তী বা উপকূলীয় গ্রীক শহর, যেমন ইযনীক, ইযনীকমিদ (ইযমিদ) ও পরিশেষে ব্রুসা 'উছমানী রাজ্যের পদানত হয়। আর উহার অনতিকাল পরেই ব্রুসা তৎকালীন 'উছমানী রাজ্যের রাজধানী হয়। এই সব নূতন অঞ্চল বায়যান্টীয়দের নিকট হইতে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বায়যান্টীয় দুর্গের স্থানীয় অধিনায়কদের নিকট হইতে জয় করা হয়। নিয়মিত কোনও বায়যান্টীয় সেনাবাহিনী (পূর্ণাঙ্গ সেনাবাহিনী) কচিৎ (১৩০১ ও ১৩২৯ খৃ.) তুর্কদের মুকাবিলা করিয়াছে। ওরখানের আমলে অন্যান্য আরও তুর্কোমান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল 'উছমানী রাষ্ট্রের আধিপত্যাধীন হয়। ইহার মধ্যে রহিয়াছে কারাসি ওগলু (দ্র.) রাজ্যটি। এইসব ভূভাগ জয়ের মধ্য দিয়া উছমান ওগলু আনাতোলিয়ার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মধ্যে অচিরেই সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নৌশক্তিতে পরিণত হয়। এই বিষয়টি এইখানে বিশেষ উল্লেখের

দাবিদার যে, 'উছমান ও ওরখানের শাসনামলের ইতিহাসে আশেপাশের অঞ্চলের খৃস্টান প্রধান ও সেনা অধিনায়কদের সহিত 'উছমান ওগলুর বাহ্যত নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান ছিল। খিরমেনজিক দুর্গের অধিপতি Kose Mikhal 'উছমানের বরাবরের বন্ধু ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কারাসি রাজ্য জয়ের পর আরও একজন খৃস্টান বংশসম্ভূত অভিজাত গাযী এওরেনস (দ্র.) ওরখানের পক্ষে যোগ দেন। উল্লিখিত দুই খৃস্টান মিত্রের বংশধরগণ পরবর্তীকালে 'উছমানের রাজ্যের বিশিষ্ট সামন্ত পরিবাররূপে গণ্য হয়। গোড়ার দিকেই গ্রীক খৃস্টানদের সহযোগিতার কারণে সম্ভবত অচিরেই বায়যান্টীয় আচার-ঐতিহ্য অন্যান্য সমসাময়িক উপকূলীয় ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির মতই 'উছমানী রাজ্যে প্রবেশ করে। 'উছমানী রাজ্যের খৃস্টান ও তুর্কোমান জনগোষ্ঠী ক্রমে রক্ষণবাদী মোল্লাদের বর্ধিষ্ণু প্রভাবে 'উছমানী সমাজে মিলিয়া মিশিয়া যায়। এই ধারণাটির পরিচয় অপেক্ষাকৃত পুরাতন দানিশমান্দ সূত্রগুলিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত উৎসসমূহের কিছু কিছু লোক আখী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে কাদী জানদারলী কারা খালীলের উল্লেখ করা যায়। তিনি পরবর্তী কালে খায়রুদ-দীন পাশা–এই নামে ১ম মুরাদের উযীর নিযুক্ত হন। উল্লিখিত ধরনের জনগোষ্ঠীর অনেকে এশিয়া মাইনরের অধিকতর প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চল হইতে আসেন। আর সম্ভবত ইহাদেরই অন্যতম হইতেছেন আলাউদ-দীন পাশা, যিনি ওরখানের উযীর নিযুক্ত হন। জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনি ওরখানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ওরখানের মোটামুটি শান্তিপূর্ণ শাসনামলে উল্লিখিত অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর লোক যে বিশেষ ধরনের প্রশাসন ও সভ্যতা গড়ায় অবদান রাখেন সেই বিশেষ স্বকীয় প্রশাসন ও সভ্যতার আলোকেই পরবর্তী কালের 'উছমানী রাষ্ট্র বিকাশের বিষয়টিকে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে বিশদ তেমন কিছুই আমাদের জানা নাই। প্রশাসন ব্যবস্থাটি ছিল সামরিক ও সম্ভবত ঐ ব্যবস্থায় সালজূক রীতি-ঐতিহ্যের অনুসরণ করা হইত। পূর্ববর্তী বায়যান্টীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর (তু. তীমার) আওতায় সামন্ত প্রধানদের মধ্যে রাজ্যের ভূভাগের বিলি-বণ্টন করা হয়। ওরখানের আমলে নব্যসৃষ্ট ও মুসেললেম বলিয়া অভিহিত অশ্বারোহী সৈনিকদের মধ্যে জায়গীর বণ্টন করা হয়। ওরখানের শাসনামলে যাযা' নামে একটি নূতন নিয়মিত পদাতিক বাহিনী গঠন করা হয়। কেননা ঐ সময় নাগাদ তুর্কোমান উপজাতীয় লোকদের লইয়া গঠিত মূল আকিনজী অনিয়মিত বাহিনী আর পর্যাপ্ত নহে বলিয়া বিবেচিত হয়। আদতে অন্য রাষ্ট্রনায়ক (যেমন ওরখানের আমলে সিনান পাশা) ও সামরিক অধিনায়কদিগকেও জঙ্গী দরবেশদের উপাধি পাশা প্রদান করা শুরু হয়।

দ্বীপরাজ্য সারুখান ওগলু ও গ্রীক উপকূলীয় অঞ্চল বরাবর নৌ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে নবীন 'উছমানী রাজ্যের স্বাভাবিক সম্প্রসারণ পশ্চিমাভিমুখী হয়। ইতিমধ্যে ওরখানের অধীনে Hellespont-এর ওপরে কয়েকটি সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। ইহার বেশিরভাগ পরিচালিত হয় সম্রাট Cantacuzenos-এর সঙ্গে তাঁহার মিত্রতাজনিত কারণে এবং সম্রাটের নিজ অঞ্চলের গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে ১৩৫৩ খৃ. ওরখানের পুত্র সুলায়মান পাশার সুবিখ্যাত সামরিক অভিযানের আওতায় য়ূরোপীয় ভূখণ্ডের দিকে অবস্থিত শহরগুলিতে 'উছমানী সামরিক দখলদারীর শুরু হয়। ১৩৫৭ খৃ. উল্লিখিত অভিযানের অনুসৃতি হিসাবে গ্যালিপোলি 'উছমানী রাজ্যের পদানত হয়। বস্তুতপক্ষে ইহা ছিল ১ম মুরাদ ও ১ম বায়াযীদের সামরিক অভিযানের পূর্বাভাস। এই দুই সুলতানের অভিযান প্রায় গোটা রূম-ইলি ধরিয়া চলে। প্রথমেই Constantinople-এর পশ্চিমের সকল বায়যান্টীয় ভূভাগ দখল করা হয়। এদিরনে (Adrianople) বিজিত হয় ১৩৬১ খৃ.। ১৩৬৫ খৃ. ইহা মুরাদের য়ূরোপীয় রাজধানীতে পরিণত হয়। ইহার পরে বুলগেরীয় ও সার্বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বর্তমান বুলগেরিয়া রাজ্যের (?) বৃহদাংশে 'উছমানী নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত হয়। ১৩৮৯ খৃ. কসোভোর যুদ্ধে সার্ব রাজশক্তি চূর্ণ হয়। ঐ রণক্ষেত্রে ১ম মুরাদ নিহত হন। Wallachia করদ রাজ্যে পরিণত হয়। বায়াযীদের সামরিক অভিযান আরও অনেক বেশি বিস্তীর্ণ ভূভাগে অনুষ্ঠিত হয়। আর ঐ পরিসরের অন্তর্ভুক্ত থাকে হাঙ্গেরী, বসনিয়া ও দক্ষিণ গ্রীস। তবে ঐ সব অঞ্চলে ঐ সময়েই "উছমানী দখল কায়েমী হইতে পারে নাই, যদিও 'উছমানী শক্তি ১৩৯৬ খৃ. Nicopoli-এ মিত্র হাঙ্গেরী, জার্মানী ও ফ্রান্সের সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। ঐ সময় Constantinople কেবল একটি সামন্ত শহরে পরিণত হয়। উছামানী সুলতান ঐ শহরের উপর ইচ্ছামত তাহার প্রভাব খাটাইতে পারিতেন। কার্যত ঐ শহরটি তখনও সত্যিকারের 'উছমানী দখলাধীন হয় নাই, যদিও বায়াযীদ ঐ শহরটিকে ঠিক নিরবচ্ছিন্নভাবে অবরোধ করিয়া দখলে রাখিতে চান নাই (তু. F. Giese, Turkische und abendlandische Berichte zur Geschichte Sultan Bajezids 1. Ephemerides Orientales, No. 34 : April 1928)। এশিয়া মাইনরে 'উছমানী নীতির আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৩৫৯ খৃ. শান্তিপূর্ণভাবে আঙ্কারা 'উছমানীদের করায়ত্ত হয়। পুত্রের বিবাহের উপহার হিসাবে মুরাদ জেরমিয়ান ওগলুর এক বিরাট অঞ্চল লাভ করেন। আর ক্রয়ের মাধ্যমে তাঁহার হস্তগত হয় হামীদ ওগলু রাজ্যটি। ১৩৮৬ ও ১৩৯১ খৃ. কারামান ওগলু রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানটি ছিল অনেক মৃদু ধরনের; বাহ্যত মনে হয়, মোঙ্গল বিজয়ী তীমূরের বিজয় অভিযানের পর যে রাজনৈতিক বাস্তবতা উদ্ভূত হয় উহার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত প্রয়োজনের তাগিদেই সুনির্দিষ্টভাবে কোনিয়া, সিওয়াস ও কাসতামুনি বিজিত হয়। অবশ্য তীমূর ১৪০২ খৃ. আঙ্কারার রণক্ষেত্রে বায়াযীদের রণোন্মাদনা চূড়ান্তভাবে চূর্ণ করিয়া দেন। বস্তুতপক্ষে তীমূরের যেমন, তেমনি বায়াযীদের অনেক সামরিক অভিযান ছিল নিছক সাময়িক, অস্থায়ী ব্যাপার।

সুলতানগণ যখন সামরিক অভিযানগুলি পরিচালনা করিতেছিলেন তখন সংগঠনের দায়িত্বটি রাষ্ট্রনায়কদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এইসব রাষ্ট্রনায়ক বা রাজপুরুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছেন জানদারলী কারা খালীল, পরবর্তী কালে খায়রুদ-দীন পাশা নামে পরিচিত (তু. F. Taeschner, Wittek, Die Vezier familie der Gandralyzade und ihre Denkmaler, Der Islam, 1929, p. 61প.)। বলা হইয়া থাকে, সুলতানের জন্য যুদ্ধের গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারণের প্রাসঙ্গিকতায় জানিসারী (দ্র.) নামক প্রতিষ্ঠানটির উদ্গাতা তিনিই। এই জানিসারীগণ ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী খৃস্টানগণ। তাহাদিগকে যুদ্ধবন্দীদের মধ্য হইতে নির্বাচিত করা হইত। তবে ১৪শ শতকে দেওশিরমে (দ্র.) প্রথা বলবৎ করা হইত কিনা তাহার কোনও উল্লেখ-আভাস পাওয়া যায় না। জানিসারী সংগঠন গড়িয়া তোলা হইত আখী বা গাযী ভ্রাতৃসংঘের আদলে। আর এই সংগঠনের সঙ্গে বেকতাশী দরবেশ তারীকার যোগসূত্র হইতে রাষ্ট্রের বিশেষ ধরনের ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাবের বিষয়টি আবারও পরিদৃশ্যমান হয়।

পুরাতন সূত্রগুলির উল্লেখ অনুযায়ী উছমান ওগলুর প্রথম বেগগণের উপাধি খুনকিয়ার বলিয়া লক্ষ করা যায়। বেগগণ ঐ সময়ে দীন ও দুনয়া সমন্বিত লাকাবযুক্ত কিছু সালজূক রীতি ঐতিহ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু ১ম মুরাদের পর হইতে এই রীতি পরিত্যক্ত হয়। মুরাদই প্রথমবারের মত

উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে সুলতান এই খেতাব লেখান ও ঐ উপাধি ধারণ করেন। প্রথম দিকের 'উছমানী শাসকরা অন্যান্য আনাতোলীয় শাসকের অভিজাত খৃস্টান বংশের মহিলাদের বিবাহ করিবার ঐতিহ্য অনুসরণ করেন। ওরখান প্রথমবারের মত এক বায়যান্টীয় রাজকন্যাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে প্রথমদিকের 'উছমানী সুলতানের (মুরাদ, বায়াযীদ) যথার্থ ও প্রকৃত নামের পুরাতন সূফী-গীঈ ঐতিহ্যটি রহিয়া গিয়াছে। ঐ একই আমলে সুলতানের অভিষেক অনুষ্ঠানের রীতি-আচারের মধ্যে যে সুলতান কর্তৃক তলোয়ার ঘুরানোর প্রথাটি চালু ছিল উহা সম্ভবত আদতে গাযী তারীকায় (তু. কীলীজ আলাভী) গৃহীত হইবার প্রতীকী আচার। 'উছমানী ইতিহাসের ১ম শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব ঘটনা হইতেছে ঃ বিপুল জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরে বাধ্যতামূলক অভিবাসন। ইহা এক প্রাচ্যদেশীয় আদিম রীতি, বিশেষ করিয়া ১ম বায়াযীদ পূর্বাঞ্চল হইতে জনগোষ্ঠীর পশ্চিমাঞ্চলে বাধ্যতামূলক জন-অভিবাসনের ক্ষেত্রে এই রীতিটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল অভিমুখে জনগণের সাধারণ প্রবণতায় সম্ভবত উছমান ওগলু ও কারামান ওগলু রাজ্যের মধ্যকার সম্পর্কের ক্রমাবনতি ঘটায়। আর অন্যান্য প্রভাব সহযোগে ইহা আনাতোলিয়ায় ধর্মীয় বিরোধিতার জন্ম দেয়।

'উছমানী সাম্রাজ্যের এই প্রথম আমল সম্পর্কে বিশেষ পাঠ সূত্রসমূহঃ H. A. Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire, Oxford 1916; F. Giese, Das Problem der Entstehung des Osmanischen Reiches. Z. S., vol. i (1922), p. 246 প.; Kopr. Zade Fu'ad, Othmanli Imperator Lughunun Kurulushu Mes'elesi in Hayat (weekly review), No. 11. 12 (Feb. 10. 17. 1927)।

৫। ২য় আমল

তীমূর যখন আবার এশিয়া-মাইনর ছাড়িয়া যান তখন ঐ উপদ্বীপের দশা এক শত বৎসর আগের মতই খণ্ডিত হইয়া পড়ে। পশ্চিম উপকূলের রাজ্যগুলিসহ কাসতামুনি ও কারান রাজ্য উহার সাবেক শাসক বংশের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এই শাসক গোষ্ঠীর একটি ১৪০৩ খৃ. নাগাদ উচ্চাভিলাষী ইয্মীর ওগলু কুনেইদ কর্তৃক উৎখাত হয়। বায়াযীদের দুই পুত্র, ঈসা ও মুহাম্মাদ যথাক্রমে ব্রুসা ও আমাসিয়ায় বাস করিতেছিলেন। তবে সুলায়মানের বাসস্থল ও উছমান ওগলু রাজ্যের য়ূরোপীয় অঞ্চল তীমূরের তাতার বাহিনীর আক্রমণ হইতে রেহাই পায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'উছমানী রাজ্য পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রস্থল হিসাবে আবার আনাতোলিয়ার আবির্ভাব ঘটে। এইখানে মুহাম্মাদ অতি অল্পকালের মধ্যেই এক বিরাট ভূভাগের উপর নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। পুরাতন রাজধানী ব্রুসাও তাঁহার করায়ত্ত হয়। ইহার পর তিনি য়ূরোপে 'উছমানী রাজ্যের এলাকাগুলি পুনর্জয়ে অগ্রসর হন। য়ূরোপের 'উছমানী অঞ্চলটি ঐ সময়ে প্রথমে সুলায়মান ও পরে মূসার করায়ত্ত ছিল। ১৪১৩ সনের পরেই কেবল মুহাম্মাদের পক্ষে আনাতোলিয়ার অন্যান্য রাজ্যকে নূতন করিয়া পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত 'উছমানী রাষ্ট্রকাঠামোতে সমন্বিত করা সম্ভব হয়। ২য় মুরাদ ও ২য় মুহাম্মাদও তাঁহার এই নীতি অনুসরণ করেন। এইবারেও একমাত্র কারামান ওগলু রাজ্যটি ছাড়া কার্যত অল্প রক্তপাতের মূল্যেই গোটা আনাতোলিয়া পুনর্বিজয়ের কাজটি সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, কারামান ওগলু রাজ্যটি ছিল উছমান ওগলু রাজ্যের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী। অথচ এই রাজ্যজয়ের প্রশ্নেও 'উছমানীগণ অনেকখানি আপোসধর্মী নীতি অনুসরণ করেন। ঐ সব রাজবংশের লোকদিগকে য়ূরোপের উচ্চ সামরিক পদ দান করা হয়। ১৪৬১ খৃ. Trebizond সাম্রাজ্য জয়ের মধ্য দিয়ে ২য় মুহাম্মাদ তাঁহার মূল আনাতোলিয়া বিজয় সম্পূর্ণ করেন। ১৪৬৮ খৃ. কারামান ওগলু শাসকগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিলে 'উছমানী সাম্রাজ্য উত্তরে আক কোয়ুনলু শাসকগোষ্ঠী ও দক্ষিণ-পূর্বে মিসর রাজ্যের মুখোমুখি হয়। ১৪৭২ খৃ. আক কোয়নলু-র শাসক উযুন হাসান 'উছমানী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এক বিপদজনক অভিযান চালান। তবে উহার পরিণতি তীমূরের অভিযানের মত বিপর্যয়কর ছিল না। অতঃপর 'উছমানী সাম্রাজ্য অধিকতর সুদৃঢ় বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত হয়। ২য় বায়াযীদের শাসনামলে আক কোয়ুনলু রাজ্যের ক্ষমতায় আসেন পারস্যের সাফাবী শাসকগোষ্ঠীর এক তরুণ শাসক। এই সুলতানের শাসনামল শেষ না হওয়া অবধি এশিয়া অভিমুখে 'উছমানী রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয় নাই, যদিও সিরিয়ার মামলূক বাহিনীর সহিত 'উছমানী সমর শক্তির কয়েক দফা গৌরবহীন সীমান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১ম মুহাম্মাদের শাসন আমল হইতে ২য় বায়াযীদের গোটা আমল উছমানের সামরিক তৎপরতা য়ূরোপে 'উছমানী ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত থাকে। সুলতানগণ বেশিরভাগ সময়ই য়ূরোপে কাটান। সেখানে তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে বহু অভিযান পরিচালনা করেন। ১ম মুহাম্মাদের আমলে আলবেনিয়া ও মোরিয়ায় তুর্কী অগ্রাভিযানের কারণে ভেনিসের সহিত 'উছমানী শক্তির সংঘাত শুরু হইয়া গিয়াছিল। ২য় মুরাদের সময় তুর্কী অভিযান এবং সার্বিয়া ও ওয়ালাশিয়া বিজিত হওয়ার কারণে হাঙ্গেরী 'উছমানীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রধান খৃস্টান পক্ষে পরিণত হয়। এইসব অক্রমণ ও বিজয়, যেমন আলবেনিয়া ও মোরিয়া বিজয়ের ঘটনাগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুলতানদের নির্দেশে ঘটে নাই, বরং সীমান্ত এলাকার 'উছমানী প্রধানদের অভিযানে ঘটে। প্রথম দিকে এইসব আক্রমণে প্রায় কিছু কিছু শহর দখলে আসে, আর সেইখানে সেনাবাহিনীর ছাউনি প্রধান হিসাবে একজন করিয়া সু-বাশী নিয়োগ করা হয়। বিজিত এলাকার বেশিরভাগই স্থানীয় শাসকদের প্রশাসনাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাঁহারা নজরানার আকারে খারাজ প্রদানের জন্য দায়ী থাকিতেন। আর এইভাবে Constantinople ও বায়যান্টীয় আরও বহু অধিকার দীর্ঘকালের জন্য আধা-স্বাধীন মর্যাদা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়, আবার বহু ক্ষেত্রে অবরোধ অবস্থা উপেক্ষা করিতেও সমর্থ হয়। ক্রমান্বয়ে খৃস্টানদের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির এই কেন্দ্রগুলি দখলে আনা হয়। ১৪৫৩ খৃ. Constantinople দখল সম্পন্ন হইলে উহা তুর্কদের মাঝে ও সেই সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলবাসীদের মধ্যেও অত্যন্ত সুগভীর প্রভাব বিস্তার করে। আর বস্তুত ইহা ছিল গোটা বলকান উপদ্বীপকে 'উছমানী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনার জন্য ২য় মুহাম্মাদের গোটা রাজনৈতিক পরিকল্পনার আংশিক বাস্তবায়ন। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার ঐ গোটা পরিকল্পনা প্রায় বাস্তবতায় পরিণত হইয়াছিল। তখনও আলবেনিয়া ও মোরিয়ায় ভেনিসের কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ বহাল ছিল। উত্তর Belgrad-এর অঞ্চল হইতে হাঙ্গেরীয়দের হটানো যায় নাই, যদিও বসনিয়াতেও তুর্কী বে'গণ শাসন পরিচালনা করিতেন। একমাত্র Rhodes ছাড়া অন্যান্য দ্বীপও একইভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কেবল দানিয়ুব অববাহিকার ওয়ালাশিয়া ও মোলদাভিয়াও ১৪৭৫ খৃ. হইতে ক্রিমিয়ার খান রাজ্য 'উছমানীদের সামন্ত থাকিয়া যায়।

এই সময়ে খৃস্টান শক্তিগুলি সর্বক্ষণ য়ূরোপ হইতে তুর্কদের বিতাড়নের জন্য ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেডের পরিকল্পনায় নিয়োজিত তাকে। ঐ সময় তাহারা 'উছমানীদের এশীয় প্রতিপক্ষগুলির সঙ্গেও আঁতাতের চেষ্টা চালায়। তবে কার্যক্ষেত্রে তেমন কোন বৃহৎ অভিযান 'উছমানীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নাই। কেবল হাঙ্গেরীর হুনায়দি, ওয়ালাশিয়ার

Wlad Dracul, আলবেনিয়ায় Skander Beg (দ্র.)-এর তরফ হইতে এবং কিছু ভেনিশীয় নৌ-অভিযানে "উছমানী পক্ষের কিছু সামরিক ক্ষতি হয়। তুর্ক আনাতোলিয়াতে সুদৃঢ় ঘাঁটি ছাড়া য়ূরোপে এইসব সামরিক সাফল্য সম্ভব ছিল না। সম্ভবত তুর্ক দখলদারীর দীর্ঘস্থায়িত্ব আরও বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহার কারণ সম্ভবত ও প্রধানত বহু খণ্ডিত বলকান উপদ্বীপে পর্যাপ্ত রকমের বৃহৎ খৃস্টান রাজনৈতিক শক্তির অনুপস্থিতির মাঝে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

২য় বায়াযীদের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ শাসনামলের পর আর এশিয়া মাইনর কিংবা বলকান উপদ্বীপের সমস্যা ছিল না। আলবেনিয়া ও মোরিয়ায় যুদ্ধ চলিতে থাকে। তবে সেই সকল যুদ্ধবিগ্রহ ছিল সামগ্রিক বিচারে সীমিত স্থানীয় পর্যায়ের। অতঃপর "উছমানী সাম্রাজ্য উহার নূতন এশীয় প্রতিবেশীদের মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে। ১ম সেলীম পারস্যের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিসরে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকেন। ইহা ছিল কার্যত খোদ এশিয়া মাইনরে শী'ঈ বিরোধিতার অভ্যন্তরীণ সংঘাতের সম্প্রসারণবিশেষ। এই যুদ্ধের ফলে আযারবায়জান তুরস্কের সাময়িক দখলে আসে এবং কুর্দিস্তান ও উত্তর মেসোপটেমিয়ায় স্থায়ী আধিপত্য অর্জিত হয়। ইহার পরে অচিরেই যে মিসরের মামলূক শাসকদের সঙ্গে ২য় বায়াযীদের আমলে "উছমানী কয়েক দফা অগৌরবজনক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সেই মিসর রাজ্যটি সেলীম মাত্র একটি অভিযানেই পদানত করেন। ইহার পরিণতিতে তুর্কী আধিপত্য ইসলামের পবিত্র নগরীগুলি এবং অচিরেই য়ামান অবধি সম্প্রসারিত হয়। পরিশেষে মহান ১ম সুলায়মানের শাসনামলে 'উছমানী সাম্রাজ্য য়ূরোপে মধ্যযুগের দুই প্রধান বিরোধীর অন্যতম হাঙ্গেরীর অধিকাংশ অঞ্চল বিজিত হইয়া উহার সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ঐ একই অভিযানে "উছমানী বাহিনী ভিয়েনা পর্যন্ত অবরোধ করিতে অগ্রসর হয়। "উছমানীদের অন্য প্রধান য়ূরোপীয় প্রতিপক্ষটি ছিল Venice রাজ্য। এই প্রতিপক্ষটিই কেবল বিজয়ী তুর্কী সাম্রাজ্য দ্বারা চূর্ণ হয় নাই। ২য় মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর Venice-এর সহিত আনুষ্ঠানিক যুদ্ধবিগ্রহ বিরল ঘটনা হইয়া দাঁড়ায়। 'উছমানী সাম্রাজ্য কোন কালেই একচ্ছত্র নৌশক্তি হইয়া উঠিতে পারে নাই। আর এই দিকটির দুর্বলতা 'উছমানী সাম্রাজ্যের বিজয়াভিযানের গৌরবময় যুগ পার হইবামাত্র Lepanto-র যুদ্ধে স্পষ্ট হইয়া উঠে। Rhodes বিজিত হয়, কিন্তু Malta চিরতরে 'উছমানী আওতার বাহিরে রহিয়া যায়। আর বায়াযীদ-এর আমলে কামাল রেঈস (দ্র.) ও বারবারোসা খায়রুদ-দীন ও অন্যদের যেইসব নৌ-অভিযান সুলায়মানী যুগে আফ্রিকার উত্তর উপকূল ও ভারত মহাসাগরে তুরস্কের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিশ্চিত করিয়াছিল সেইগুলি কখনও পুরাপুরি নৌ-দস্যুতার চৌহদ্দি কাটাইতে পারে নাই। এশিয়ায় পারস্যের সহিত সংঘাত চলিতে থাকায় ঐ সময়ে বাগদাদ ও ইরাক বিজিত হয়। ফলে 'উছমানী সুলতান ঐ সময় হইতে বাস্তবিকপক্ষেই সুলতানুল-বার্‌রায়ন ওয়াল-বাহরায়ন হইয়া উঠেন।

বিজয়মণ্ডিত এই দ্বিতীয় আমলের কালপরিক্রমায় "উছমানী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনও উহার বিশাল রাজ্য জয়ের চাইতে কম বিস্ময়কর ছিল না। প্রথম দিকের কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ইসলামী রক্ষণশীলতা পরে ধীরে ধীরে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবসিত হয়। বহু মুসলিম ও ন্যায় ও ব্যবহারশাস্ত্রবিশারদ পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলি হইতে "উছমানীদের নয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আসিয়া সমবেত হইতে থাকেন। এমন কি খৃস্টান বংশসম্ভূত ধর্মপ্রধানদেরও আগমন ঘটে (যেমন মোল্লা খুসরাও)। ইহারাও অবাধে ইসলামের আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় নেতাদের সহিত যোগ দেন। আবার এই রক্ষণশীলতার আবরণে সূফী মরমী সংগঠনসমূহ এবং তাহাদের মতবাদগুলির অস্তিত্বও পাশাপাশি বজায় থাকে। সূফী তারীকাসমূহ ও দরবেশগণ সচরাচর আনুকূল্য ও সম্মান পাইতে থাকেন এবং নানা ক্ষেত্রে প্রাচীন মরমী ঐতিহ্যসমূহের প্রতিফলন চলিতে থাকে। লোকজনের প্রকৃত নামের মাঝে সূফী আভাস অনেক ক্ষেত্রেই বজায় থাকে। শায়খুল-ইসলাম (দ্র.) নামে যে পদ বা প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব আমরা "উছমানী রাষ্ট্রে লক্ষ করি তাহা নিঃসন্দেহে সূফী ধর্ম-নেতাদের পুরাতন প্রভাবের লক্ষণীয় অবশেষের নিদর্শন। এই শায়খুল-ইসলাম প্রতিষ্ঠানের প্রথম সুস্পষ্ট আবির্ভাব ঘটে সুলতান ২য় মুরাদের আমলে এবং পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি কানূনের স্বীকৃতি লাভ করে। অন্যদিকে সূফী চিন্তাধারায় অধিকতর চরম শী'ঈপন্থী যেই বিরোধ এশিয়া মাইনরে বহুকাল আগে হইতেই চলিয়া আসিতেছিল তাহা কোনও কোনও পর্যায়ে কয়েক বার সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার গ্রহণ করে। এই ধরনেরই একটি বিদ্রোহ ছিল ১৪১৫ খৃ. সীমাওনা কাদী ওগলু বাদরুদ-দীনের (তু. ইব্‌ন কাদী সীমাওনা ও F. Babinger) বিদ্রোহ। এই ধরনের আরও নজীর হিসাবে শাহ কুলি বা শায়তান কুলি ও তাঁহার কিযিলবাশ-এর বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ২য় বায়াযীদের আমলে ঘটে। শেষোক্ত বিদ্রোহ ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক-ধর্মীয় এক আন্দোলনের অঙ্গ, যেই আন্দোলনের ফলে পারস্যে সাফাবী শাসক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই কারণে খোদ "উছমানী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য এই কিযিলবাশ বিদ্রোহ একটি গুরুতর বিপদ বলিয়া গণ্য হয়। আর এই একই কারণে ১ম সেলীমের আমলে শী'ঈ মতবাদীদের উপর প্রচণ্ড দমন-নিপীড়ন চলে। খৃস্টান ও য়াহূদী জনসমষ্টির প্রতি এই মুসলিম শাসকদের মনোভাব ছিল সহিষ্ণুতার পরিচায়ক। একমাত্র Dewshirme-এর আওতায় খৃস্টান সন্তানদের মুসলমান করা ছাড়া কাহাকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয় নাই। বহু গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় ইহা সত্য। যেমন আয়া সোফিয়া গির্জাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। তবে Constantinople জয়ের অব্যবহিত পর হইতে গ্রীক অর্থোডক্স ও য়াহূদী সম্প্রদায়ের যে ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকার বলবৎ করা হয়, অতঃপর তাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুরূপ নীতির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। মাত্র ১৬শ শতকের শেষদিকে মুসলমানদের গোঁড়ামি পরিলক্ষিত হয়।

রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য সশরীরে সুলতানের বর্তমান থাকার (জীবিত থাকার) বিষয়টির বিপুল গুরুত্ব এই আমলে আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। প্রায় প্রত্যেক সুলতানের মৃত্যুর পরপরই সামরিক বিদ্রোহের বিপজ্জনক ঘটনার মাঝে এবং সুলতানের মৃত্যুর পর নূতন কেহ ক্ষমতার উত্তরাধিকারী না আসা পর্যন্ত ঐ মৃত্যুর খবর গোপন রাখার মাঝে ঐ সত্যটির প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ইহা ছাড়া এই ক্ষেত্রে আরও কিছু বিষয় লক্ষ করিবার মত। যেমন, সুলতানের মৃত্যুর পরপরই ক্ষমতার বিভিন্ন দাবিদারদের (তু. জেম) মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতজনিত ঘোরতর গোলযোগ সৃষ্টি ও ভ্রাতৃহত্যার ঐতিহ্য। ১ম বায়াযীদ ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য এই ভ্রাতৃহত্যার ঐতিহ্যের সূচনা করেন। অবশ্য ইহা ক্ষমতার দাবিদারদের কলহেরই আবশ্যিক পরিণতি। "উছমানী সিংহাসনে কোনও না কোনও দাবিদারের প্রতি সমর্থন সাম্রাজ্যের বৈরী খৃস্টানগণ অত্যন্ত সঠিকভাবেই অন্যতম কার্যকর উপায় বলিয়া গ্রহণ করে। বায়যান্টিয়ামের রাজধানী দখলের পর "উছমানী খৃস্টান প্রজাদের দৃষ্টিতে 'উছমানী সুলতানের রাজ্য বিজয় তেমন কোন পরিবর্তন আনিল না। কেননা রাজধানী Constantinople জয়ের মধ্য দিয়া মুহাম্মাদ তাহাদের বৈধ প্রাচ্য রোমান রাজ্যের সকল ক্ষমতাই গ্রহণ করেন।

তীমূরের বিজয় অভিযান এশিয়া মাইনরে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ব্যাপক স্থান বদলের কারণ ঘটায়। শুধু তাহাই নহে, ঐ সময়ে 'উছমানী সুলতানদের নীতিও ছিল সাম্রাজ্যের একাংশ হইতে অন্য অংশে জনসমষ্টির স্থানান্তরণ ও অভিবাসন। আর এইভাবেই যেই Constantinople নগরে এশিয়া মাইনরের সকল সামরিক সড়ক আসিয়া মিলিত হইয়াছে তাহার জনবসতি পরিকল্পিতভাবে আনাতোলিয়ার বিভিন্ন এলাকার মানুষের সমন্বয়ে মিশ্র করিয়া তোলা হইয়াছে (ইস্তাম্বুল-ইসলামবোল)। এই একই পন্থায় ইহার আগেই Adrianople একটি ইসলামী শহর হইয়া উঠে। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও রূম্-ইলির বসতি স্থাপনকারী তুর্কী জনসাধারণ খৃস্টানদের পাশাপাশি বাস করিতে থাকে। সেইখানে বিভিন্ন অঞ্চলে তুর্কী মুসলিম ও খৃস্টানদের সংখ্যানুপাত বিভিন্ন ছিল। বস্নিয়া ও আলবেনিয়াতে জনসমষ্টির যে বিরাট একটি অংশ ইসলাম গ্রহণ করে তাহার নেপথ্যে অন্য কারণ কাজ করে।

য়ূরোপীয় তুরস্কে, বিশেষ করিয়া এই পরিবেশ-পরিস্থিতিই সেইখানকার "উছমানী রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ১ম সুলায়মানের আমলে এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জিত হয়। ২য় মুরাদের আমলে "উছমানী ধরনের ধর্মীয় রক্ষণবাদের পাশাপাশি উছমানী সভ্যতার এক নূতন নেতৃত্বের বিবর্তন চলিতে থাকে। অতঃপর 'উছমানী রাষ্ট্র পরিচালনা ও সেনাবাহিনীতে নূতন নেতৃত্বের বড় অংশে স্থান গ্রহণ করেন আলবেনীয়, স্লাভ, গ্রীক, এমন কি অধিকতর পাশ্চাত্য রক্তের অধিকারী খৃস্ট ধর্ম হইতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ। এই অবস্থায় এশিয়া মাইনরের মিখাল ওগলু ও এওরেমস ওগলুর মত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন খৃস্টান অভিজাত পরিবারগুলি দানিয়ুব ও Thessalia-র বড় বড় জায়গীরের মালিকানার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সারির অবস্থানে নামিয়া যান। Constantinople-এর পতনের অল্পকালের মধ্যেই উযীর খালীল পাশার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর হওয়ার পর উযীর পদের অধিকারী হিসাবে জানদার ওগলুর উন্নত পদমর্যাদার অবসান ঘটে। নব ধর্মান্তরিত খৃস্টানগণ যথাসাধ্য 'উছমানী রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত হয়। তবে সুলতানের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও সম্ভবত ইসলামের গণতান্ত্রিত ঐতিহ্যের কারণে এই নও-খৃস্টানরা উত্তরাধিকারভিত্তিক কোনও অভিজাতশ্রেণী গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। রাজপুরুষ ও সামরিক অধিনায়করা (বেগলারবেগ ও সানজাক্) ছিলেন সার্বভৌম সুলতানের দাস (কুল) আর সেই কারণেই আগের শতকের তুলনায় তাঁহারা ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম স্বাধীন। তবে বিদ্বজ্জন ও বিচারবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা সুলতানের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরশীল ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা অনেকখানি স্বাধীন ছিলেন। তাঁহারা শায়খুল-ইসলামের নেতৃত্বে মিলিত হইয়া একটি মোল্লাতান্ত্রিক কাঠামো গড়িয়া তোলেন। ইহাদের মাঝে একটি মোল্লাতান্ত্রিক অভিজাতবর্গ-কাঠামোরও আভাস পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যায়, ঐ সময় "উছমানী শাসক শ্রেণীর একটি বৃহদাংশ অতুর্কী ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত হয়। যুদ্ধবন্দী খৃস্টান ও ধর্মান্তরিতদের মধ্য হইতে ও Dewshirme সৈন্য সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে গৃহীত ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নিরন্তর শাসকশ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। আর এই পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবেই প্রশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে রায়যান্টীয় ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটে। দরবারের ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয়। এইসব কর্মকর্তার কার্যকলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কানূননামে দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের সর্ব-বিখ্যাত কানূননামেগুলির মধ্যে ২য় মুহাম্মাদ ও ১ম সুলায়মানের কানূননামে।

অনিয়মিত বাহিনী আকীনজি ও আযাব-এর পুরাতন সৈনিকগণ ছাড়া সেনাবাহিনী প্রধানত সিপাহীদের দ্বারা গঠিত ছিল। এই সিপাহীদের সংগঠন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামরিক প্রশাসনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল (তু. তামীর)। একইভাবে সম্পর্কিত ছিল জানিসারী সংগঠনের সহিত। ২য় মুরাদের সময় প্রথমবারের মত (সম্ভবত ১৪৩৮ সনে) dewshirme-এর আওতায় এই বাহিনীর লোক সংগ্রহ করা হয়। ২য় মুহাম্মাদ Constantinople অবরোধের সময় প্রথমবারের মত কামান ব্যবহার করেন। "উছমানী নৌবহরে প্রধানত নিয়োজিত ছিল আযার সংগঠনের সেনারা। উহাদের সহযোগী হিসাবে নিয়োজিত ছিল খৃস্টান বন্দীরা, রণতরীতে ক্রীতদাসের ন্যায় কাজ করার জন্য দণ্ডিত কয়েদী হিসাবে। কিন্তু এই নৌবহর তৎকালে সেনাবাহিনীর সমান গুরুত্ব লাভ করে নাই।

রাষ্ট্রীয় রাজস্ব কিংবা অধিকতর সুনির্দিষ্ট অর্থে সুলতানের রাজস্ব প্রধানত আসিত অমুসলিম প্রজাদের উপর নিরন্তর বর্ধমান খারাজ ও অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যগুলি প্রদত্ত নজরানা হইতে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের আমদানি শুল্ক হইতেও বেশ রাজস্ব আয় হইত। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রধানত গ্রীকদের হাতে ছিল। আর বৈদেশিক বাণিজ্যে এখতিয়ার ছিল 'উছমানী রাষ্ট্রের বসতি স্থাপনকারী Venetian, Genoese ও Florence-এর সওদাগরদের হাতে। এইসব বিদেশী বসতির জনসাধারণ দেশী অতুর্কী নাগরিকদের মতই অভিন্ন আচরণ লাভ করিত। এই বিদেশীরা তাহাদের Consul নামে একজন কর্মকতার অধীনে যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত। আর এইজন্য সংশ্লিষ্ট কনসালের একটি consular এখতিয়ারও ছিল। সুলতান তাহাদিগকে সুপরিজ্ঞাত আত্মসমর্পণমূলক চুক্তির আকারে ঐসব সুবিধা মঞ্জুর করিতেন। উহাতে বিদেশীদের প্রদেয় বাণিজ্যিক করসমূহও নির্ধারণ করিয়া দেয়া হইত। আর এই ব্যবসায়ী বিদেশীদিগকে ইসলামী আইন অনুসারে মুসতেমিন' নামে অভিহিত করা হইত। তবে ভেনিসের সহিত নানা যুদ্ধের পর সম্পাদিত প্রতিটি শান্তিচুক্তির আলোকে ঐ উল্লিখিত সন্ধি/আত্মসর্পণমূলক একটি চুক্তির নবায়ন করিতে হয় (১৪৫৪, ১৪৭৯, ১৫০২, ১৫৪০)। পরবর্তী কালে উল্লিখিত চুক্তিগুলি দ্বিপক্ষীয় আন্তর্জাতিক চুক্তির আকার নেয়। ঠিক এই মডেলের আদলে ফ্রান্সকে ১৫৩৫ খৃ. বিখ্যাত সন্ধিচুক্তিপত্র মঞ্জুর করা হয়। তবে এই দলীলের রাজনৈতিক দিকটি ইতালীয় প্রজাতন্ত্রগুলির সহিত সম্পাদিত সন্ধিচুক্তিগুলির তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কার্যত ইহা ছিল পরবর্তী কালে তুরস্কের আন্তর্জাতিক ভূমিকা স্বাভাবিককরণের সূচনা। মধ্যযুগের শেষ পাদের "উছমানী সভ্যতা তখনও পরবর্তী শতকগুলির মত মধ্য ও পশ্চিম য়ূরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। এমন কি ইহাও উল্লেখ করা হইয়া থাকে যে, ২য় মুহাম্মাদের সহিত ইতালীয় রাজপুরুষ ও শিল্পীদের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং ইতালীয় চিত্রকলার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও আকর্ষণের সুবাদে তাঁহাকে কোনও না কোনওভাবে রেনেসাঁ যুগের শাসকদের কাতারে স্থান পর্যন্ত দেওয়া হয় (Tschudi, পূ. গ্র., পৃ. ১৯)। অবশ্য ইহার অতি অল্পকাল পরেই জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি আবার সার্বিক প্রভাবসম্পন্ন হইয়া উঠে।

৬। ৩য় আমল (১৫৬৬-১৬৯৯-১৩৩ বৎসর)

১ম সুলায়মানের রাজত্বের শেষে 'উছমানী সাম্রাজ্যের অবস্থান ছিল দুইটি পরাক্রমশালী মহাদেশীয় প্রতিবেশীর মধ্যস্থলে। একদিকে ছিল য়ূরোপের অস্ট্রীয় রাজতন্ত্র, আর অন্যদিকে এশিয়ায় সাফাবী সাম্রাজ্য।

য়ুরোপে তুর্কী প্রদেশ বস্‌নিয়া ও হাঙ্গেরী ছিল অস্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা প্রাচীর আরও পূর্বে অর্ধস্বাধীন Transylvania, Wallachia ও Moldavia এবং তাতার রাজ্য Crimea-কে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে দেওয়া হয়। তুর্কী দৃষ্টিকোণের বিচারে কসাকসমন্বিত পোল্যাণ্ড, এমন কি Muscovy-কেও দুই সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী অবস্থানের রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করা হয়। এই আমলে তুরস্ক আরও একবার শেষোক্ত দেশগুলির উপর নিজ প্রাধান্যের দাবিটি উত্থাপন করে। এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থার কারণে 'উছমানী সাম্রাজ্য এবং অন্য কোন সাম্রাজ্যের মাঝে ঐ ধরনের মধ্যবর্তী শ্রেণীর রাষ্ট্রের অবস্থানের সুযোগ ছিল না। তবে এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল জর্জিয়া। এই রাজ্যটি ১৫৭৮ খৃ. আক্রমণের মাধ্যমে তুর্কী অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এশিয়ায় তুর্কী ক্ষুদ্র-সামন্ত পদ্ধতির আওতায় কিছু কিছু এলাকা ক্ষুদ্র স্থানীয় শাসকদের অধীনে থাকিয়া যায়। এইগুলির শাসকদের পাশা খেতাব দেওয়া হয়। এই ধরনের পাশার অস্তিত্ব ছিল পারস্য সীমান্তে কুর্দিস্তানে (বিতলিসের শাসকগণ) ও সিরিয়ায় (দ্রুজ এমীরগণ)। মক্কার শারীফগণও ছিল "উছমানী সামন্তের মর্যাদায়। অন্যদিকে ১৫৬৮-১৫৭০ খৃ. পুনর্বিজয়ের পর য়ামানের উপর আবার অংশত অধিকতর প্রত্যক্ষ 'উছমানী অধিকার বলবৎ হয়। ১৫৫০ খৃ.-র পর তুর্কীগণ আফ্রিকার উপকূলে মাসসাওয়ায় পদার্পণ করিতে সক্ষম হয়। তখন হইতে তাহারা আবিসিনিয়ায় হস্তক্ষেপ করিতে শুরু করে। তবে ১৫৭৮ খৃ. দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধের পর আবিসিনিয়ার সম্ভাবনা 'উছমানীদের জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়। মিসর তখনও তুর্কী পাশার (তু. মামলূক) কিছুটা নিয়ন্ত্রণে ছিল। মরক্কোর বার্বার রাজ্যগুলি প্রায় স্বাধীন ছিল। মরক্কোর শারীফ ১৫৮০ খৃ. তুর্কী সুলতানের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন।

তৃতীয় আমলে সাম্রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা আগাগোড়া বজায় থাকে। ইহা ছিল 'উছমানী সাম্রাজ্য ও বিরাট মহাদেশীয় অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত প্রতিষ্ঠিত এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষামূলক ব্যবস্থা।

২য় সেলীমের আমলে অথবা আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায়, মেহমেদ সোকোল্লী পাশার প্রশাসনিক আমলে সাইপ্রাস বিজিত হয় (১৫৭০-৭১)। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই ১৫৭১ খৃ. Lepanto যুদ্ধে (দ্র.) 'উছমানী শক্তির নৌ-পরাজয় ঘটে। এই পরাজয়কে তুর্কীদের উপর প্রথম বড় রকমের সামরিক সম্প্রসারণ অসম্ভব হইয়া পড়িলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং উহা সামগ্রিকভাবে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যর্থ সামরিক অভিযানে (১৫৯৬ খৃ. Keresztes-এর পরাজয়) ও পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজয়ের মাঝে বিশেষ লক্ষণীয় হইয়া উঠে। অন্যদিকে ১৬০৬ সনে অস্ট্রিয়ার সহিত এবং পরাক্রমশালী শাহ আব্বাস-এর প্রতাপশালী শাসনামলে ১৬১২ খৃ. পারস্যের সঙ্গে প্রতিকূল শান্তিচুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়াও ঐ দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পারস্যের সহিত সম্পাদিত উল্লিখিত শান্তিচুক্তির আওতায় তাবরীয় ও ইরীওয়ান ছাড়িয়া দিতে হয়। ১৬শ শতকের শেষ দশকে Transylvania ও রূমানিয়ার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি কিছুকালের জন্য স্বাধীন থাকে। ১৫৭২ খৃ. হইতে পোল্যাণ্ড ও তুর্কী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের জটিল রাজনৈতিক ও সামরিক নানা ঘটনা প্রবাহে প্রায়ই এক সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ক্রিমিয়ায় কসাক আক্রমণ ঘটে। তবে এই হামলাগুলি আরও এক শতক পর বিপজ্জনক হইয়া দেখা দেয়, যখন Muscovite শক্তির ক্রিমিয়া সীমান্তে আবির্ভাব ঘটিতে শুরু করে। ঐ সময় ৩০ বৎসর স্থায়ী যুদ্ধের কারণে মধ্য য়ুরোপ দুর্বল হইয়া পড়িলে উহা হইতে তুরস্ক লাভবান হয়। পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলির মধ্যে আগে হইতেই তুরস্কের বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ছিল। পরে ১৫৮০ খৃ. ইংল্যাণ্ডের সহিত ও ১৬০৩ খৃ. হল্যাণ্ডের সহিত একই ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে গোটা পরিস্থিতি 'উছমানী সাম্রাজ্যের অনুকূল হয়। এই শতকের শেষ নাগাদ স্পেনের তরফ হইতে কোনও গুরুতর নৌ আক্রমণের আশঙ্কা স্তিমিত হইয়া যায়। তবে তুরস্ক যেহেতু কোনও কালেই খুব শক্তিশালী কোনও নৌশক্তি হইয়া উঠিতে পারে নাই সেই কারণে ভেনিসের সহিত সম্পর্কটি উভয় তরফেই মাঝে মাঝে চমক সৃষ্টি করে। যেমন ১৭শ শতকে সাইপ্রাস 'উছমানী দখলে চলিয়া যায়। ক্রীট দ্বীপ জয়ের ঘটনাটিও (১৬৪৫-১৬৬৬) কম বিস্ময়কর ছিল না। অন্যদিকে আবার ভেনিস ১৬৫৫ খৃ. নাগাদ Morea ও ঐ দ্বীপপুঞ্জে গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করে। এমন কি ঐ সময় Constantinople-ও বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু তবুও সামগ্রিকভাবে Venice-এর সহিত 'উছমানীদের সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলকই ছিল। কেননা সামগ্রিক বিচারে তুরস্ক তাহার মহাদেশীয় অবস্থানের কারণে তখনও অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে গণ্য ছিল। এশিয়ায় তুরস্কের দুর্বলতার কারণে ১৬২৩ খৃ. বাগদাদ সাময়িকভাবে হাতছাড়া হইয়া যায়। পারস্যের দিক হইতে নূতন হুমকি দেখা দেয়। তবে ৪র্থ মুরাদের শাসনামলে 'উছমানী সমরশক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটিলে সাম্রাজ্যের পূর্ববর্তী অবস্থান পুনর্বহাল হয়। ৪র্থ মুরাদের শাসনাধীনে ও শাহ আব্বাস-এর মৃত্যুর পর 'উছমানী বাহিনী পারস্য আক্রমণ করে; ঐ অভিযানে ইরিওয়ান ও তাবরীয় পুনর্দখলের পর পরিশেষে বাগদাদ পুনর্বিজিত হয় (১৬৩৮)। ১৬৩৯ খৃ. পারস্যের সহিত 'উছমানী সাম্রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী শান্তির সূচনা ঘটে। ১৬৪০ খৃস্টাব্দের পর সাম্রাজ্যের বলিষ্ঠতর অবস্থান ও সেই সঙ্গে ক্রীট জয়ের ইতিবাচক বিষয়টিকে Transyl-vania ও দানিয়ুব অববাহিকার রাজ্যগুলিতে 'উছমানী রাষ্ট্রশক্তির কর্তৃত্ব এবং কৃষ্ণসাগরের উত্তরের সীমান্তের রক্ষাব্যবস্থাকে জোরদার করার কাজে লাগানো হয়। কৃষ্ণসাগরের উত্তরে কসাকদের নিকট হইতে Azov দখল করার পর উহা Muscovy কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ করা হয় এবং ১৬৬০ খৃ. উহার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়। ঐ একই বৎসরে পুনরুজ্জীবিত অস্ট্রিয়ার সহিত বৈরিতা আবার শুরু হয় ও সংঘাত প্রায় ক্রুসেডের মত ব্যাপকতা ও তীব্রতা লাভ করে। এমনকি ফ্রান্সও এবার অস্ট্রিয়ার মিত্রে পরিণত হয় (১৬৬৪ খৃ. St. Gothard-এ তুরস্ক পরাজিত হয়)। তবে ইহাও ছিল অস্ট্রিয়ার সহিত চূড়ান্ত লড়াইয়ের পূর্বাভাস মাত্র। ১৬৮৩ খৃ. ব্যর্থ ভিয়েনা অবরোধের মধ্য দিয়া ঐ লড়াইয়ের সূচনা এবং 'উছমানী প্রদেশ হাঙ্গেরী হাতছাড়া হাওয়ার মধ্য দিয়া ১৬৮৮ খৃ. উহার সমাপ্তি ঘটে। ইহার পরবর্তী কালে বলকান উপদ্বীপে অস্ট্রীয় বাহিনীর অভিযান শুরু হয়, অবশেষে Carlowitz-এর চুক্তির (১৬৯৯) মাধ্যমে উহার অবসান ঘটে। এই চুক্তির ফলে তুরস্ক আবার যথেষ্ট দুর্বল হইয়া পড়ে। উহাকে প্রায় গোটা হাঙ্গেরীর দখল ও Transylvania-র উপর দাবি পরিত্যাগ করিতে হয়। আর সেইসঙ্গে Morea-য় ভেনিসের অধিকারকেও স্বীকৃতি দিতে হয়।

প্রধানত অভ্যন্তরীণ কারণে এই আমলের সূচনায় "উছমানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা দেখা দেয়। ১৬শ শতকেই লক্ষ করা গিয়াছিল, নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমেই কেবল এই সাম্রাজ্য টিকিয়া থাকিতে পারে। অন্যথায় ইহার জন্য দরকার ছিল শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে উপযোগী শাসন ব্যবস্থা ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সুলতানের ব্যক্তিশাসনের পরিসরে ঐ ধরনের কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সুলতানের ব্যক্তিশাসন ছিল মূলত সামরিক বিজয়াভিযান-নির্ভর। মহান সুলায়মানের উত্তরাধিকারিগণ এইসব নব নব পরিস্থিতি মুকাবিলার যোগ্য ছিলেন না। ইহা সত্য যে, ৩য় মুহাম্মাদ, ২য় 'উছমান ও ৪র্থ মুহাম্মাদ কোনও কোনও

ক্ষেত্রে সামরিক অভিযানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করিতেন। তবে ৪র্থ মুরাদই ছিলেন শেষ 'উছমানী সুলতান, যিনি 'উছমানী রাষ্ট্র শক্তির সামরিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। আর প্রকৃত বিচারে তিনিই ছিলেন সত্যিকারের শেষ গাযী। কাইে সুলতানগণের ব্যক্তিগত গুণাবলী যাহাই থাকুক না কেন তাঁহারা রাষ্ট্র প্রশাসনের সহিত সম্পর্ক রক্ষার বিষয়টি কমাইয়া দেন, যদিও তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ছিল ঐতিহ্যিক মহিমার আলখেল্লায় ঢাকা। কিন্তু এই ভাবগাম্ভীর্য ও সম্মাননা ১৬২৮ খৃ. ২য় 'উছমানকে হত্যা ও ক্ষমতাচ্যুতি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই; পারে নাই ১৬৪৮ খৃ. ইবরাহীম ও ১৬৮৮ খৃ. ৪র্থ মুহাম্মাদকে অপসারণ হইতে রক্ষা করিতে। অতঃপর সুলতানের পরিবর্তে অন্যান্য রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপ্রধানেরাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমে যাঁহাদের নাম করিতে হয় তাঁহাদের মধ্যে আছেন ঃ ২য় সেলীমের অধীনে মেহমেদ সোকোলী পাশা (দ্র.); ৩য় মুহাম্মাদের আমলে অস্ট্রীয়দের মহাশত্রু সিনান পাশা (দ্র.), ১ম আহমাদ ও ২য় 'উছমানের আমলের মুরাদ পাশা (দ্র.) ও খালীল পাশা। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এই ধরনের ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন ঃ কোপরুলু পরিবারের প্রথিতযশা সদস্যবর্গ, মেহমেদ পাশা, তাঁহার পুত্র আহমাদ পাশা ও তাঁহাদের জ্ঞাতি মুসতাফা পাশা, কারা মুসতাফা পাশা (দ্র.)। এই শেষোক্ত পাশাই ১৬৮৩ খৃ. ভিয়েনা অবরোধ করিয়াছিলেন। এই সামরিক রাষ্ট্রনায়কগণ সংখ্যার দিক হইতে ক্ষুদ্র ও মূলত অ-তুর্কী শ্রেণীর লোক ছিলেন। ১ম সুলায়মানের শাসনে যে বিশেষ ধরনের 'উছমানী সরকার ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাঁহারা উহার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু এই সামরিক রাষ্ট্রনায়করা সাম্রাজ্যের প্রবল রকমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কোন গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করিতেন না। ঐ সময় অবধি কোনও 'উছমানী জাতিও সুনির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে নাই। অন্যদিকে, অন্যান্য কয়েকটি গোষ্ঠী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সামরিক রাষ্ট্রনায়কদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল 'জানিসারী' ও 'সিপাহী' গোষ্ঠীদ্বয়। সমর শক্তির অংগ হিসাবে, বিশেষ করিয়া গুরুতর সামরিক পরাজয়গুলির পরে এবং ১৬৩২ খৃ. সুলতান ৪র্থ মুরাদের সিংহাসনে আরোহণ ও ১৬৮৮ সনে ৪র্থ মুহাম্মাদের ক্ষমতা হইতে অপসারণের সময় গোটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইহারাই নিয়ন্ত্রণ করে। অতঃপর জানিসারী সেনাদিগকে খৃস্টান জনগোষ্ঠীর মধ্য হইতে প্রাচীন পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করার হারও অনেক কমিয়া যায়। তাহা ছাড়াও জানিসারী সাংগঠনিক ব্যবস্থার নানা অপব্যবহারে ঐ বাহিনীর সাবেক শৃঙ্খলা কার্যত ভাঙ্গিয়া পড়ে। কয়েকজন মহাউযীর জানিসারীদের রুদ্ররোষের শিকার হন। আরেকটি ক্ষমতাবান মহল এই সামরিক ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে কাজে লাগায়। এই মহলটির অবস্থান ছিল দরবারে। এই মহলের লোকেরা একজন ক্ষমতাশীল 'ওয়ালিদে সুলতান'-এর কিংবা 'কীজলার আগাসী'র নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে। পরিশেষে 'আলিম সমাজও এই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেন। 'উলামা' সমাজের সমর্থনে শায়খু'ল-ইসলাম রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনায় কয়েকবার সাফল্যের সহিত অংশীদার হন (যেমন মুফতী সা'দু'দ-দীন, ৩য় মুহাম্মাদের আমলে)। শায়খু'ল-ইসলাম প্রদত্ত ফাতওয়াবলে সুলতান ইবরাহীমকে ক্ষমতা হইতে অপসারণ করা হয়। রাষ্ট্রীয় অবক্ষয়ের এই উপসর্গগুলির সত্যিকার চিত্র কোচী বে (দ্র.) তাঁহার সুবিখ্যাত রিসালায় তুলিয়া ধরিয়াছেন। একমাত্র সুলতান ৪র্থ মুরাদ এই ধরনের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ দমন করিতে সক্ষম হন। অবশ্য এইজন্য তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে সহিংস পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। তিনি জানিসারী বাহিনীর পাশাপাশি আরেকটি নূতন সেনাবাহিনীও (সেগবান) গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন। রাজধানীতে বেশ কয়েকবার খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা দেয়। এই ধরনের ঘটনা ১ম ইবরাহীমের আমলে ঘটে। কিন্তু ঐসব অবাঞ্ছিত ঘটনায় রাজনৈতিক কার্যক্রম প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না; বরং মহান রাষ্ট্রনায়কেরা ঐ পরিস্থিতিতে লক্ষণীয় সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন।

সরকারের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার হইতে অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে দূরে রাখা হইলেও তাহারা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নেয়। Constantionple-এ নূতন গ্রীক অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের ধনসম্পদ ও প্রভাবের বদৌলতে তুর্কী মহলগুলি ও দানিয়ুব অববাহিকার রাজ্ঞগুলির নেতৃস্থানীয় মহলের সহিত জোরদার যোগসূত্র গড়িয়া তোলে। একই উপায়ে তাহারা গ্রীক খৃস্টীয় যাযকমণ্ডলীর নির্বাচনও নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ হয়। এই সময়ে Patriarch Cyrillus Lucaris-এর প্রভাবে গ্রীক Orthodox খৃস্টানদের সঙ্গে 'উছমানী খৃস্টানদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। Cyrillus Lucaris-কে ১৬৩৮ খৃ. ফাঁসি দেওয়া হয়। দুই খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল পরোক্ষভাবে 'উছমানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করার সহায়ক হয়। ঐ সময় পর্যন্ত 'উছমানী তুর্কদের মধ্যে অনেক ধর্মীয় ঐতিহ্য-রীতি প্রচলিত ছিল, যাহা গ্রীকদের ধর্মীয় আচরণের সহিত অভিন্ন। তুর্ক সামাজে খৃস্টান সাধুপুরুষদের সম্মানও প্রচলিত ছিল। গ্রীকদের পরে প্রভাবের দিক হইতে য়াহূদীদের উল্লেখ করিতে হয়। ১ম বায়াযীদের আমলে স্পেন ও পর্তুগীজ য়াহূদীগণ তুরস্কে আসার পর উহারা, বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী হিসাবে এক বিরাট সামাজিক ভূমিকা পালন করে। এই গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত প্রতিনিধি ছিলেন ২য় সেলীমের বিশেষ অনুগ্রহভাজন Joseph Nassy।

এশিয়া মাইনরের সাধারণ লোকেরা য়ুরোপীয় তুর্কদের মতই রাষ্ট্র পরিচালনায় সামান্যই অংশগ্রহণ করিয়াছে। তবে ঐ অঞ্চলে কিছু কিছু বিপজ্জনক বিদ্রোহ ঘটে। এইসব ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, ১৩শ ও ১৪শ শতকের পুরাতন ধর্মীয় ধারা-ঐতিহ্যগুলি তখনও পুরাপুরি সেইখান হইতে মুছিয়া যায় নাই। ১৫৯৯ খৃ. উরফায় কারা য়াযীজী (দ্র.) আন্দোলন শুরু হয়। সাম্রাজ্যের ঐক্যের জন্য অধিকতর বিপজ্জনক ঘটনাটি ছিল সারুখানে কালেন্দার ওগলুর বিদ্রোহ (৬০৬)। এই কালেন্দার ওগলু মুরাদ পাশা কর্তৃক ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া পশ্চিম আনাতোলিয়ার একটা বড় অংশ শাসন করেন। ইহার অনতিকাল পরেই (১৬২৩-২৮ সালে) আবাযা (দ্র.)-র বিদ্রোহ ঘটে। এই বিদ্রোহী ছিল জানিসারীদের চরম নিপীড়ক। ইহা ছাড়া, আরও পূর্বাঞ্চলে উত্তর সিরিয়ার কুর্দ নেতা জানবুলাত (দ্র.) স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন। লেবাননে দ্রুয নেতা ফাখরু'দ-দীন-এর (দ্র.) স্বাধীনতা প্রয়াসের মতই উল্লিখিত ক্ষেত্রে 'উছমানী কর্তৃপক্ষকে কিছুটা আপোস করিতে হয়। জনসমষ্টির সকল শ্রেণীর লোকের উপর সূফীবাদ ও সূফী শায়খদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা বহাল থাকে (Skutari মাহমূদের আস্তানায় ২য় 'উছমানের আমলের কয়েকজন উযীর আশ্রয় লাভ করেন)। বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য আগের মতই বিদেশীদের হাতে থাকে। ইহারা ছিল প্রধানত ভেনিসীয় ও ইতালীয়। Lepanto যুদ্ধের পর পুনর্গঠিত ও নির্মিত তুর্ক নৌবহরের বহু নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তা ছিলেন ইতালীয় বংশসম্ভূত। ইহাদের মধ্যে চিগালে যাদে সিনান পাশার (দ্র.) নাম উল্লেখ করা যায়।

৭। চতুর্থ আমল (১৬৯৯-১৮৩৯=১৪০ বৎসর)।

১৮শ শকের কাল পরিক্রমায় অবক্ষয়ের উপাদানগুলির অনিবার্য ক্রিয়া ক্রমেই সাম্রাজ্যে আরও বেশি করিয়া অনুভূত হইতে থাকে। উহার

ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহাকে ভাসা ভাসা বর্ণনায় অবক্ষয় বলিলে খুব কমই বলা হইবে। এই অবক্ষয়ের কারণ মূলত 'উছমানী রাষ্ট্রীয় অবয়বের ভিতরেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণগুলি তখনও বলা যায়, একটি রাজ্য বিজয়ী রাষ্ট্রের বা শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রশাসনের উত্তরণের ফল। কিন্তু এক্ষণে বিদেশী শক্তিগুলি ঐ কারণগুলিকে আরও বেশি করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে লাগায়। এই বিদেশী শক্তিগুলির অন্যতম অস্ট্রিয়া গোড়াতেও এক মহাশক্তিশালী বিরুদ্ধপক্ষ ছিল।

১৭১৬-১৮ খৃ. যুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত Passarowitz শান্তিচুক্তির আওতায় হাঙ্গেরী, ট্রানসিলভানিয়া, এমনকি Belgrad-এর যাহা কিছু তুরস্কের নিয়ন্ত্রণে ছিল তাহাও চুক্তির প্রতিপক্ষের হাতে তুলিয়া দিতে হয়। তবে ১৭৩৯ খৃ. সম্পাদিত Belgrad শান্তিচুক্তি অনুসারে 'উছমানী শক্তি খোদ Belgrad শহরটি ফিরিয়া পায়। আর ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অস্ট্রিয়ার পক্ষ হইতে সত্যিকারের আর কোনও বিপদের আশংকা ছিল না। অধিকন্তু ১৭১৫ খৃ. মহাউযীর জিন্ন 'আলী পাশা ভেনিসীয়দের নিকট হইতে Morea পুনরুদ্ধার করেন। এই সাফল্যের ফলেও প্রমাণিত হয় যে, ভেনিসের তরফ হইতেও আর তেমন কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই। তবে ইতিমধ্যে রাশিয়ার আকার অনেকখানি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বৃহত্তর রাশিয়াই 'উছমানী সাম্রাজ্যের জন্য এক নূতন ও ভয়ঙ্কর দুশমন হইয়া দেখা দেয়। ওদিকে রুমানিয়া ও সার্বিয়ার অর্থোডক্স খৃস্টানগণ অস্ট্রিয়ার চাইতেও রাশিয়াকে অধিকতর কাম্য মুক্তি প্রদায়ক হিসাবে দেখিতে শুরু করে। সুইডেনের রাজা ১২শ চার্লস তুরস্ক সফরে আসিলে, মূলত ঐ বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়াই রুশ জার ১ম পিটার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৭১১ খৃ. এই যুদ্ধের অবসান ঘটে Poltawa-রণক্ষেত্রে। তুরস্ক এই যুদ্ধে জয়লাভ করে। ১৭১২ খৃ. Azov আবার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। আর ১৭৩২ খৃ. যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে চুক্তি হয় উহার বদৌলতে ১৭৩৯ খৃ. পূর্বে উল্লিখিত যে চুক্তিটি সম্পাদিত হয় তাহাও তখনও তুরস্কের জন্য বিপর্যয়কর হইয়া উঠে নাই। ঐ সময় এমনকি, কৃষ্ণ সাগরেও রুশ নৌপরিবহণের উপর আনুষ্ঠানিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়।

১৭৩৯ খৃ. পর য়ুরোপীয় তুর্ক সাম্রাজ্যে শান্তির একটি কালপর্যায়ের শুরু হয়। পারস্যের সহিত তুরস্কের সামরিক ও শান্তিকালীন সম্পর্কের বিষয়টি এই সময়ে পারস্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত হয় আর উহার সুযোগে 'উছমানী শক্তি নিজের সুবিধা অন্বেষণ করে। ১৭৩০ খৃ. নাদির শাহের সাফল্যসমূহ ঐ স্বল্পকালীন সময়ের জন্য বিপজ্জনক হইয়া দেখা দেয়। এমনকি এই কারণে ৩য় আহমাদের অপসারণেরও অজুহাত ঘটে। তবে অবশেষে ১৭৩৬ খৃ. এক চুক্তি অনুযায়ী ৪র্থ মুরাদের আমলের সীমান্ত পুনর্বহাল হয়। 'উছমানী সাম্রাজ্যের সত্যিকারের দুর্বলতাটি রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে উদ্‌ঘাটিত হয়। তুর্কী যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে ১৭৬৮ খৃ. রাশিয়ার সহিত 'উছমানী সাম্রাজ্যের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধকালে রুশ সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ার গভীরে প্রবেশ করে এবং ১৭৭৪ খৃ. স্মরণীয় কুচুক-কায়নারজা চুক্তির মাধ্যমে উহার অবসান ঘটে। এই যুদ্ধের ফলে ক্রিমিয়া পুরাপুরি স্বাধীন হইয়া যায় (১৭৮৩ খৃ. ইহা রুশ দখলে চলিয়া যায়)। অন্যদিকে দানিয়ূব অববাহিকার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির উপর রুশ আধিপত্য তুরস্ককে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। চুক্তিতে ক্রিমিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সুলতানকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা বা অধিকার ১৯শ শতকের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পারস্যের কারীম খানের সহিত একই ধরনের এক দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধের (১৭৭৬) পর বসরা সাময়িকভাবে তুরস্কের হাতছাড়া হয়। ১৭৮৪-৯২ খৃ. যুদ্ধে 'উছমানী সাম্রাজ্য আবারও সাম্রাজ্যের এক বিপুল অংশ রাশিয়ার হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়। Jessy শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ঐ যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সময় Dniepr (নীপার) নদী দুই সাম্রাজ্যের মধ্যকার সীমা নির্ধারিত হয়। অস্ট্রিয়াও এই যুদ্ধের সুযোগ লইয়া অধিকতর সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে বুখারেস্ট দখল করে। কিন্তু ১৭৯৯ খৃ. Zistowa সম্পাদিত পৃথক চুক্তিতে সেই প্রত্যাশিত মুনাফাটুকু সে হাসিল করিতে পারে নাই।

উল্লিখিত আমলে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের সংগে, যাহার সংগে ১৭২৭ খৃ. হইতে সুইডেন যুক্ত হয়, 'উছমানী সাম্রাজ্যের বন্দুত্ব চলিতে থাকে। ১৭৫৬ খৃ. ডেনমার্ক ও ১৭৬৩ খৃ. রাশিয়ার সঙ্গে 'উছমানী রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত এই বন্ধুত্বের কারণে এই মিত্র দেশগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যবান সহযোগিতা দান করে। বিশেষ করিয়া তাহারা শান্তি চুক্তির দর কষাকষিমূলক আলোচনায় মধ্যস্থ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করিয়া এই দেশগুলির মধ্যে ফ্রান্স ১৭৪৪ খৃ. চূড়ান্ত সন্ধিচুক্তি হিসাবে তুরস্কের নিকট হইতে যেসব সুবিধা লাভ করে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তিবলে ফ্রান্স তুর্কী সাম্রাজ্যে রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের রক্ষার অধিকারবলে বিশেষ প্রভাবের অধিকারী হয়। এই শতকের শেষের দিকে অবশ্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলির নূতন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় 'উছমানী সাম্রাজ্য এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশসমূহ ও সেগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাবের নানা বিষয়ে 'উছমানী সাম্রাজ্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হইয়া উঠে। ঐ সময়ে অবশ্য ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি 'উছমানী ভূখণ্ড দখলের ব্যাপারে তেমন কোনও আগ্রহ বা মনোভাব প্রদর্শন করে নাই। কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ দেশ ও তাহাদের উপনিবেশগুলির মধ্যে এমন একটি দেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে শুরু করে যে রাজ্যের উপর তাহারা নিয়ন্ত্রণ খাটাইতে পারিবে। দক্ষিণ সমুদ্র পথের পরিবর্তে পারস্য উপসাগর ও ভারতে পৌঁছাইবার জন্য তাহারা অধিকতর সরাসরি পথ খুঁজিতেছিল, যাহা উল্লিখিত বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

১৭৯৮ খৃ. ফ্রান্সের মিসর দখলের আরও প্রত্যক্ষ ও আশু কারণ ছিল ঐ সময়ে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফলে ইহা আপাতত ইংল্যাণ্ড, এমনকি রাশিয়াকে তুরস্কের মিত্র করিয়া তোলে। তবে ১৮০২ খৃ. ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর রাশিয়ার সহিত 'উছমানী শক্তির নূতন যুদ্ধ শুরু হয়। ইংল্যাণ্ডের সহিতও বৈরিতা ঘটে এবং ১৮০৭ খৃস্টাব্দে বৃটিশ নৌবহর 'উছমানী রাজদানীর সন্নিকটে অগ্রসর হয়। ১৮১২ খৃস্টাব্দের বুখারেস্ট শান্তিচুক্তি অনুযায়ী 'উছমানী সাম্রাজ্য আবার রাশিয়ার নিকট তাহার অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে (বেসারাবিয়া) বাধ্য হয়। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড ভারতে ফরাসী ঔপনবেশিক শক্তি উৎখাত ও মিসরে 'উছমানী কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব দুর্বল করিয়া আপাতত তুষ্ট থাকে। ইতিমধ্যে স্বীয় ভূখণ্ডে গ্রীক অধিবাসীদের টালমাটাল উত্থানের ঘটনায় 'উছমানী সাম্রাজ্য বড় রকমের আঘাত পায় এবং ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খৃ.-এর মধ্যে গ্রীসের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান করে। অবশ্য গোড়া হইতেই গ্রীকদের ব্যাপারে রাশিয়া এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা রাশিয়ার সহিত এক বিপর্যয়কর যুদ্ধের পর তুরস্ক ১৮২৯ খৃস্টাব্দের Adrianople চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তির তৎপরতার কারণে রাশিয়াকে উহার ভূখণ্ড গ্রাসমূলক অভিসন্ধি চরিতার্থ

করা হইতে বিরত রাখে; সে তুরস্কের উপর জোরদার রাজনৈতিক প্রভাব লইয়া তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। ১৮৩৩ খৃ. 'হুঙ্কিয়ার ইসকেলেসি'-র চুক্তিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ চুক্তিতে একটি গোপন দফা বা শর্ত সন্নিবেশিত ছিল যাহার অধীনে কৃষ্ণসাগরে নৌপরিচালনার ক্ষেত্রে তুরস্ককে রাশিয়ার মিত্র হইতে হয়। রাশিয়ার সহিত 'উছমানী রাষ্ট্রের এই অস্বাভাবিক চুক্তির কারণে মিসরের মুহাম্মাদ 'আলী (১৮৩১ খৃ. শুরু) এক সময় 'উছমানী সাম্রাজ্য হইতে মিসর, সিরিয়া ও Cilicia-কে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেন। তবে শেষাবধি মিসরকে শুধুমাত্র এই সাম্রাজ্যের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে ও উহা বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার ভিত্তিক শাসক বংশের শাসনে পরিচালিত হইবে (১৮৪০) এই স্বীকৃতি পাইয়া তিনি তাঁহার ঐ হুমকি প্রত্যাহার করেন। রাজনৈতিক আবশ্যকতা হিসাবে ১৭৮৯ খৃস্টাব্দেই 'উছমানী সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব যথার্থ বিবেচিত হয়। ঐ সময়ে উছমানী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তের নিরাপত্তার গ্যারান্টির জন্য অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহা ছাড়াও ১৮৩০ খৃ. নাগাদ তুরস্ক ফ্রান্সের সহিত সম্পাদিত সন্ধিচুক্তির মডেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, পর্তুগাল ও স্পেনের সহিত কয়েকটি নূতন চুক্তি সম্পাদন করে। ফ্রান্সের আলজিরিয়া জয়ের (১৮২৭-১৮৫৭) বিষয়টিকে 'উছমানী সাম্রাজ্যের জন্য আদৌ ক্ষতিকর বলিয়া ধরা হয় নাই।

এই আমলে সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব হারাইতেছিলেন। ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে অবশ্য বিষয়টি তেমন নজরে আসার মত হয় নাই। Constantinople তখনও আগের মতই এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের ঝলসানো চমৎকার রাজধানী, যেইখানে সুলতান ৩য় আহমাদের দরবার বিলাসী জীবনযাত্রার দৃষ্টান্ত হইয়াছিল। এই সময়েই এইখানে টিউলিপ ফুলপ্রীতির এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিয়া বসিতে লক্ষ করা যায়। এই কারণে ঐ যুগটি 'লালে দেওরী' নামে অভিহিত হয়। এই সময়েই উচ্চতর সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিশেষ করিয়া 'উছমানী সাহিত্য-সংস্কৃতি 'উলামা' শ্রেণীর গণ্ডি কাটাইয়া বিস্তৃত হয়; সৃষ্টি হয় নূতন এক শ্রেণীর শিক্ষিত গোষ্ঠী, যাহারা ১৯শ শতকের গোড়ায় সৃষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত তুর্ক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্তরসুরি হিসাবে কাজ করেন। ১৭২৭ খৃ. তুরস্কে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র চালু হয়, আর উহার সহিত একইভাবে শুরু হয় উচ্চ শ্রেণীর সাংস্কৃতিক চর্চার নয়া দিকনির্দেশনা। ইহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই উচ্চ বা নিম্ন সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই শ্রেণী হইতেই আসিয়াছেন দামাদ ইবরাহীম ও রাগিব পাশার মত মহাউযীরগণ। ইহাতে সরকারের আদি সামরিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আসে।

এখন হইতে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র বিষয়ক এখতিয়ারগুলিকে 'উছমানী সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি (বাবা-ই 'আলী) রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করিতে শুরু করেন এবং রে'ঈসু'ল-কুত্তাব (দ্র.) নামক সাদামাঠা পদটি ক্রমেই আরও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে। ইহার কারণ এই পদধারী ব্যক্তি সুযোগ্য পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে কাজ করিতে শুরু করেন। ইহাদেরই অন্যতম হইতেছেন আহমাদ রাসমী। তিনি অন্যতম প্রথম 'উছমানী রাষ্ট্রদূত হিসাবে সুপরিচিত। কিন্তু ইহার পরও এই নূতন শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ ঐতিহ্য-রীতি অনুযায়ী সুলতানের ক্রীতদাস হিসাবে বিবেচিত হইতে থাকেন। তবে ২য় মাহমূদের আমলে এই কর্মকর্তাদের বেলায় অনেকখানি উদারনৈতিক আচরণ করা হয়। নয়া সংস্কৃতিবান উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সহিত বহু পর্যায়ে ঐ সময়কার শিক্ষিত ও পরিমার্জিত গ্রীকদের সম্পর্কমূলক যোগাযোগ ছিল। এই শিক্ষিত গ্রীক ফানারিওতগণ অনেকেই সরকারের উচ্চ পদে, বিশেষ করিয়া দোভাষী হিসাবে (যেমন Nikusios ও Mavrocordato) নিয়োজিত ছিলেন। সাধারণ মুসলিম শ্রেণীর জনগণের সহিত ইহাদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। উল্লিখিত সরকারী কর্মকর্তাদের অধীনে, তৎকালীন অপেক্ষাকৃত শিথিল শৃঙ্খলাসম্পন্ন জানিসারী ও সিপাহিগণ একাধিকবার বিপজ্জনকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে। ১৭৩০ খৃ. পাতরোনা খালীলের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত জানিসারী বিদ্রোহের কারণে ৩য় আহমাদকে তাঁহার মসনদ হারাইতে হয়। আর এই ধরনের বিদ্রোহের লক্ষ্য এই নূতন অভিজাত বা অমাত্য শ্রেণী বলিয়াই মনে হয়।

৩য় আহমাদের পর দরবারী জীবন অপেক্ষাকৃত মিতাচারী হইয়া আসে। শাসক শ্রেণী ও তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট সুলতান সকলেই সাম্রাজ্যের দুর্বলতার বিষয় উপলব্ধি করিতে শুরু করেন এবং সেই কারণে তাঁহারা সামরিক সংস্কার প্রবর্তনের মাঝে উহার প্রতিকার অন্বেষণে প্রয়াসী হন। এই ক্ষেত্রে কয়েকজন বিদেশী বিশেষ সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইহাদের মধ্যে ফরাসী নাগরিক Bonneval (মৃ. ১৭৪৭)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের আরও একজন ফরাসী সামরিক অফিসারের নাম de Tott; তিনিও একই উদ্দেশ্যে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি ৩য় মুসতাফার আমলে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু ঐ সুলতানের আমলেই রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ শুরু হইলে উক্ত সামরিক সংস্কার যে কত যৎসামান্য ছিল তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

৩য় সেলীম অনেক জোরদারভাবে সেনাবাহিনী সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। কিন্তু তদসত্ত্বেও তাঁহার আমলেও খুব কম সংখ্যক লোকই এই সংস্কারের সত্যিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। নূতন সেনা সংগঠন (নিজাম-ই জেদীদ) জানিসারীদের এক গুরুতর বিদ্রোহের কারণ হয়। এই বিদ্রোহে ইন্ধন যোগান 'উলামা' সমাজের এক বিপুল অংশ। ইহার পর সুলতান ২য় মাহমূদ সেনাবাহিনীর সংস্কারের বিষয়টি আরও সুপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করেন। এই সুলতানই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জানিসারীদের বিলোপ করা ছাড়া সামরিক বাহিনীতে সংস্কার প্রবর্তনের কোনও বিকল্প নাই। আর ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮২৬ সনের ১৬ জুন Constantinople-এ জানিসারী সেনাদের হত্যাকাণ্ডের সুপরিচিত ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ একই সময়ে বেকতাশী দরবেশদের দণ্ডিত করা হয়। এইসব ঘটনায় অবশ্য দেখা যায়, এই যাবত কোনও গঠনমূলক কিছু করার চাইতে বরং ধ্বংসাত্মক কাজই করা হইয়াছে বেশি।

যাহাই হউক, এই সুলতান অন্তত কিছু স্থানীয় আধা-স্বাধীন ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে বশে আনিতে কামিয়াব হন। বস্তুতপক্ষে ইহা বলিতেই হয় যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের শিথিলতাই ছিল ১৮শ শতকের 'উছমানী সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। আলজিয়ার্স, তিউনিস ও ত্রিপোলী ঐ সময় বংশানুক্রমিক বে'গণ শাসন করিতেছিলেন। মাহমূদ কেবলমাত্র ত্রিপোলিকে আবার সরাসরি 'উছমানী রাষ্ট্রশক্তির শাসনে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হন। ১৭৬৭ খৃ. 'আলী বে মিসরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। রুম-ইলিতে বড় বড় তীমার (জায়গীর) হইতে কিছু কিছু শক্তিশালী সামন্তের উদয় হয়। তাঁহারা আ'য়ান নামে অভিহিত হন। ইহাদের মধ্যে ৩য় সেলীম ও ২য় মাহমূদের আমলের য়ানিনার 'আলী পাশা ও বিদ্‌দিয়ার পায্‌ওয়ান ওগলুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৩৯ খৃ. আনাতোলিয়ায় সারী বেগ ওগলু এক বিপজ্জনক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। ঐ বিদ্রোহের পর কথিত দেরে-বে'গণ কার্যত প্রায় স্বাধীন হইয়া যান। কুর্দিস্তানেও এই পরিস্থিতি দেখা দেয়। মেসোপটেমিয়া ও ইরাকেও একই পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে।

১৭০৬ খৃ. মুনতাফিক নামের এক শক্তিশালী বেদুঈন রাজ্যসমবায় গঠিত হয় এবং ৩য় সেলীমের আমলে সুলায়মান পাশা বাগদাদে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করেন (মৃ. ১৮১০)। সিরিয়ার লেবাননে দ্রুজদের নিজেদের আমীর শাসন পরিচালনা করিতেন। ৩য় সেলীমের আমলে উপকূলভাগে শাসন পরিচালনা করিতেন 'আককা'র জাযযার পাশা (দ্র.)। আরবে ১৮০৩ খৃ. ওয়াহ্হাবীরা মক্কার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। একই সময়ে য়ামান ও 'আসীর কার্যত তুর্কী সাম্রাজ্যের আওতার বাহিরে ছিল। এদিকে য়ূরোপীয় ভূখণ্ডের দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলিতে কার্যত কোনও তুর্কী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। সিরিয়ার মত এইসব দ্বীপেও প্রবল য়ূরোপীয় প্রভাব চলিতেছিল। 'উছমানী সাম্রাজ্যের সত্যিকারের ক্ষমতা সর্বত্র পড়িয়া গেলেও এইসব বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনের উপর 'উছমানী প্রশাসনের সীলমোহর অঙ্কিত হইয়া যায়। বিশাল 'উছমানী ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে একত্রে ধরিয়া রাখে আর সেই সুবাদে ২য় মাহমূদ ও তাঁহার পরে অন্যান্য 'উছমানী রাষ্ট্রনায়কগণ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীকরণে ব্যাপৃত থাকেন যাহার ফলে আরও এক শতকের জন্য রাজনৈতিক ঐক্য বজায় থাকে।

৮। ৫ম আমল (১৮৩৯-১৯২২=৮৩ বৎসর)

'উছমানী সাম্রাজ্য হইতে তুর্কী জাতীয় রাষ্ট্রে উত্তরণের এই ক্রান্তিকালটি এমনভাবে সমাপ্ত হয় যাহা খৃস্টান শক্তিগুলি চাহে নাই। তেমনি তুরস্কের শাসক শ্রেণীও উহা প্রত্যাশা করেন নাই। তানজীমাতের ক্রম-প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থায় যে নূতন ধারা অনুসৃত হয় তাহা মূলত ফরাসী মডেলে পরিচালিত হয়। এই মডেলে এমন এক আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণা করা হইয়াছে, যেই রাষ্ট্রে সকল নাগরিক তাহাদের ধর্ম-নির্বিশেষে 'উছমানী সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আওতায় সমান রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার লাভের অধিকারী। কেবল মিসরে দানিয়ূব অঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ ও সার্বিয়া (১৮১৫ খৃ. হইতে) এবং এশিয়ায় হিজাযকে বিশেষ অধিকার ভোগ করিতে দেওয়া হয়। তবে নূতন 'উছমানী রাষ্ট্রের আদর্শটি য়ূরোপে বলবৎ গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে অনেকখানি ভিন্ন ছিল। এই শতক নাগাদ ইহার প্রতিক্রিয়া, বিশেষ করিয়া 'উছমানী সাম্রাজ্যের খৃস্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দিতে শুরু করে। ১৮৪৯ খৃ. মোল্দাভিয়া ও ওয়ালাশিয়ায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন হয়। তবে তুরস্ক ও রাশিয়া–উভয়েই সমানে উহার বিরোধিতা করে।

কিন্তু Balat Eiman-এর চুক্তি অনুসারে ঐ রাজ্যগুলিতে তুর্কী কর্তৃত্ব যৎসামান্য স্তরে আসিয়া ঠেকে। জেরুসালেমের ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলি লইয়া বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া ১৮৫৩ খৃ. রাশিয়া আবার এই রাজ্যগুলি আক্রমণ করিলে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স 'উছমানী সাম্রাজ্যের সমর্থনে আগাইয়া আসে। আর এখান হইতেই ক্রিমিয়া যুদ্ধের সূচনা হয়। ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের প্যারিস শান্তিচুক্তি অনুযায়ী মনে করা হইতে থাকে 'উছমানী সাম্রাজ্য অতঃপর নিরাপদ হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সাম্রাজ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের এবং সেই সঙ্গে অচিরেই রাশিয়ার পুনঃ হস্তক্ষেপের বিষয়টি আরও পাকাপোক্ত ও কায়েমী হইয়া ওঠে। কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই ইহা ঘটে নাই; উহারও বাহিরে উহা সম্প্রসারিত হয়। যেমন ১৮৪৫ খৃ. ও ১৮৬০ খৃস্টাব্দের সিরীয় গোলযোগের সময়, ১৮৫৮ খৃ. জিদ্দার গোলযোগের পর এবং ১৮৬৬ সনে ক্রীটের অবস্থার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত ধরনের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ঘটে। একইভাবে বিদেশী শক্তিগুলির প্রভাব অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়, আর এই ধরনের হস্তক্ষেপ আগেকার সন্ধিচুক্তিগুলির সুবাদেই সম্ভব হয়। আদতে এইগুলি ছিল একতরফা অধিকারমূলক সুবিধা, কিন্তু এখন হইতে উহা দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আলোকে দেখা হইতে থাকে। কিন্তু এই সময় নাগাদ চুক্তিগুলির বিষয়বস্তু তানজীমাত যে নূতন রাষ্ট্রীয় ধারণা বাস্তবায়িত করার প্রয়াসী হয় উহার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হইয়া উঠে। বস্তুতপক্ষে ১৮৫৬ খৃ. হইতে 'উছমানী সরকার এই ধরনের আন্তর্জাতিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার বৃথা চেষ্টা চালায়। ১৯শ শতকের শেষ নাগাদ গোটা বিষয়টি সন্ধিচুক্তির অধিকারী সকল দেশের যৌথ দাসানুগত্যের পর্যায়ে চলিয়া যায়। ১৯১৪ খৃ. অবধি তুর্কী সরকার এই নাগপাশ ছিন্ন করিতে পারে নাই। তবে ঐ সময়ে য়ূরোপীয় শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ঐ সন্ধিপত্রগুলি উপেক্ষা করার সুযোগ আসে।

১৮৬২ খৃ. 'উছমানী সরকার Montenegro ও Herzegovina-য় নিজ কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয়। তবে অন্য দিকে সার্বিয়া ও দানিয়ূবের আরও দুইটি রাজ্য ১৮৬৫ খৃ. প্রায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। ১৮৬১ খৃ. হইতে এই রাজ্যগুলিকে একটি রাজ্যে একীভূত রাখা হইয়াছিল। ১২ বৎসর পর বুলগেরিয়ায় গোলযোগ দেখা দিলে আবার রাশিয়ার সহিত 'উছমানী সাম্রাজ্যের সশস্ত্র সংঘাত দেখা দেয়। ১৮৭০ খৃ. নাগাদ রাশিয়া কৃষ্ণসাগর সংক্রান্ত ১৮৫৬ খৃ. চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করে। ১৮৭৮ খৃ. San Stefano প্রাথমিক চুক্তির সূত্র ধরিয়া ১৮৭৯ খৃ. বার্লিন চুক্তির সুবাদে সুনিশ্চিতভাবেই সার্বিয়া, Montenegro ও রুমানিয়া 'উছমানী পক্ষের হাতছাড়া হয়। বুলগেরিয়া আধা স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। ককেশাস অঞ্চলে তুরস্ক কারস ও বাটুম হারায়। গ্রেট বৃটেন সাইপ্রাসের প্রশাসনের কর্তৃত্ব লাভ করে। এইভাবে ইংল্যাণ্ড ইতিপূর্বে 'উছমানী সাম্রাজ্যের অঞ্চলকে অখণ্ডতার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের যে নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল তাহা বিসর্জন দেয়। ১৮৮২ খৃ. ইংল্যাণ্ড মিসর (দ্র. খেদীব) দখল করিয়া এই বিসর্জন নীতির ধারা অব্যাহত রাখে। তুরস্কের য়ূরোপীয় অঙ্গ ব্যবচ্ছেদের অপর তারিখগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ ১৮৯৭ খৃ. গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ, এই যুদ্ধে গ্রীসের আঞ্চলিক ভূখণ্ড উত্তরাভিমুখে সম্প্রসারিত হয়; ১৮৯৮ খৃ. ক্রীট দ্বীপ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে এবং ১৯০৯ খৃ. সুলতান 'আবদু'ল-হামীদের সম্প্রসারণের পর বুলগেরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং বসনিয়া ও Herzegovina অস্ট্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর ইতালীর সহিত যুদ্ধে (১৯১২, Lausanne শান্তিচুক্তি) ত্রিপোলী তুরস্কের হস্তচ্যুত হয়; ১৯১২-১৩ খৃ. বল্কান যুদ্ধে য়ূরোপে তুর্কী ভূভাগ মাত্র পূর্ব থ্রেসে সীমিত হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত Adrianople অবশ্য কিছুকাল ধরিয়া বুলগেরিয়া দখল করিয়া রাখে।

১৯শ শতকে পারস্যের সহিত তুরস্কের সম্পর্ক মোটামুটি শান্ত থাকে। সুলায়মানীয়ের কুর্দি অঞ্চলের কর্তৃত্বাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের মত সীমান্ত প্রশ্নে কখনও কখনও সংঘাতের সৃষ্টি হয় মাত্র। এই বিরোধটি তুরস্কের অনুকূলে ১৮৪৭ খৃ. নিষ্পত্তি হয়। পারস্য উপসাগরের চতুর্দিকের অঞ্চলগুলি ক্রমেই বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যাইতে থাকে। তবুও এশিয়ায় 'উছমানী ভূখণ্ডের পরিস্থিতিগত অবস্থা দীর্ঘকাল যাবত অপরিবর্তিতই থাকে বলা যায়। বাগদাদ রেলপথ প্রকল্পের মধ্য দিয়া মনে হইতে থাকে যে, তুরস্ক ধীরে ধীরে জার্মান সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ পরিকল্পনার আওতায় চলিয়া যাইতেছে। এই কারণে তুরস্কের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের আগ্রহ হ্রাস পায়। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বৎসরেই যখন তুরস্ক তাহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে ব্যর্থ হয় এবং কেন্দ্রীয় য়ূরোপীয় শক্তিগুলির পক্ষে যোগ দেয় তখন হইতে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড তুর্কী ভূখণ্ড গ্রাসের ব্যাপারে প্রথমবারের

মত সহযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। অবশ্য যুদ্ধ চলাকালে সমুদ্রপথে দার্দানেলিস প্রণালীতে মিত্রশক্তির প্রবেশের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। কিন্তু ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় ফরাসী ও বৃটিশ যৌথ অভিযান এবং ইরাক ও মেসোপটেমিয়ায় বিভিন্ন বৃটিশ অভিযান শেষ পর্যন্ত 'উছমানী সেনাবাহিনীর নিকট হইতে এই প্রবেশ পথগুলি ছিনাইয়া লইতে সফল হয়।

সিরিয়ায় মক্কার শারীফ মিত্রবাহিনীকে সমর্থন করে। মক্কার শারীফ ১৯১৭ খৃ. নিজেকে হিজাযের বাদশাহ হিসাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঐ সময় রুশগণ দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ার অনেকখানি অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়। তবে এই দিকে রুশদের পক্ষ হইতে বিপদের অকস্মাৎ অবসান ঘটে; কেননা ঐ সময়ে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়। কিছু দিনের মধ্যেই (৩ আগস্ট, ১৯১৮) Brest-Litowsk চুক্তির আওতায় তুরস্ককে তাহার হৃত ভূভাগ ছাড়াও কার্‌স, আরদাহান ও বাটুম ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার অল্প কালের মধ্যেই Mudros-এর (৩০ অক্টোবর, ১৯১৮) অস্ত্রবিরতি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য শক্তির সহিতও যুদ্ধের অবসান ঘটে। পরবর্তীকালে মিত্রশক্তি Constantinople দখল করে। ফরাসী বাহিনী গোটা উত্তর সিরিয়া ও Cilicia পদানত করে এবং উত্তর মেসোপটেমিয়ার যে অঞ্চলগুলি তখনও বিজিত হয় নাই মাওসিলসহ সেইগুলি কব্জা করে। ইতালীয় বাহিনী আদালিয়াতে অবতরণ করে। ১৯১৫ সনের মে মাসে গ্রীসকে পূর্ব থ্রেস ও স্মার্না দখল করিতে দেওয়া হয়।

এই সকল পট পরিবর্তনই Constantinople কর্তৃপক্ষকে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবলোকন করিতে হয়। ১৯২০ সনের জানুয়ারিতে আহূত তুর্কী পার্লামেন্ট তথাকথিত জাতীয় চুক্তির (মীছলাক-ই মিল্লী) অনুমোদন করিয়া সাময়িক কালের জন্য হইলেও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দেয়। কিন্তু মার্চ মাসে Constantinople-এর দখলদারী আরও কঠোর হইয়া উঠিলে পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। পরিশেষে আগস্টে 'উছমানী সরকার Sevres চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন। এই চুক্তির আওতায় অবশিষ্ট 'উছমানী সাম্রাজ্যের একটি বিশাল অঞ্চল (Constantinople ও Smyrna-সহ) এক বা একাধিক বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে, বিশেষ করিয়া Smyrna-য় গ্রীক সেনাবাহিনীর অবতরণ তথা বিদেশী দখলদারীর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ সংগঠিত হইয়া উঠিলে 'উছমানী সরকার আরেক অভ্যন্তরীণ শত্রুর সম্মুখীন হন। ১৯২০ খৃ. নাগাদ Constantinople সরকার আনাতোলিয়ার উপর সকল নিয়ন্ত্রণ হারান; মিত্রবাহিনীর সাহায্য লইয়া কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

জাতীয়তাবাদীদের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের মুখে সুলতানের সরকার ক্রমেই আরও বেশি করিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িতে থাকে এবং ১৯২২ সনের ১ নভেম্বর অ্যাঙ্গোরার মহাজাতীয় সম্মেলন Constantinople সরকারের বিলুপ্তি ঘোষণায় ও সুলতানের ক্ষমতা হইতে অপসারণে সফল হয়। এইভাবে সুলতান ৪র্থ মুহাম্মাদ ওয়াহীদু'দ-দীন ক্ষমতাচ্যুত হন। আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে 'উছমানী সাম্রাজ্য ও উহার শাসক বংশের বিলুপ্তি ঘটে। Constantinople ও পূর্ব থ্রেস জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনী দখল করে এবং সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সুলতান রাজধানী ত্যাগ করেন। অবশ্য Constantinople ঐ সময়ে আর তুরস্কের রাজধানী রহিল না। 'উছমানী শাসক বংশের ঐতিহ্যের একমাত্র ধারক ও অবশেষ হিসাবে সুলতান 'আবদু'ল-'আযীযের পুত্র 'আবদু'ল-মাজীদ খলীফা হিসাবে Constantinople-এ বাস করিতে থাকেন। তবে তাঁহার এই খলীফার সম্মান ১৯২৪ সনের ২ মার্চ জাতীয় পরিষদের এক মহা অধিবেশনের ঘোষণাবলে বিলুপ্ত করা হয়। 'আবদু'ল-মাজীদ ও 'উছমানী শাসক বংশের অন্যান্য সকল সদস্যকে একই সময়ে তুরস্ক হইতে নির্বাসিত করা হয়।

এই ছিল এক সুদীর্ঘ ঘটনাপ্রবাহের নানা পট পরিবর্তনের পরিণাম। আর এই পরিণামের জন্য বাহ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাইতে সাম্রাজ্যের নানা অভ্যন্তরীণ বিষয়ও কোনও অংশে কম ভূমিকা পালন করে নাই। সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ার জন্য বিদেশী শক্তিগুলির রাজনৈতিক স্বার্থের তুলনায় তানজীমাত আন্দোলনের প্রভাব কম শক্তিশালী কারণ নহে। ৩য় সেলীম ও ২য় মাহমূদের আমলে তানজীমাত সংস্কারের কার্যক্রম অধিকতর সুপরিকল্পিতভাবে আগাইয়া চলে এবং জনসমষ্টির এক বৃহদংশ এই আন্দোলন তথা সংস্কার কার্যক্রমের প্রতি সমর্থন জানায়। রাশীদ পাশা, 'আলী পাশা ও তাঁহাদের সহযোগিগণ তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

তাঁহাদের পরিকল্পনা ছিল এই রাষ্ট্রটি একটি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত হইবে। ইহার প্রেসিডেন্ট পদের পদবী হইবে সাদর-ই আ'জাম। কিন্তু তাঁহাদের ঐ রাষ্ট্র পরিকল্পনাটি মূলত ছিল সুলতানদের নামে একচ্ছত্র এক সরকার ব্যবস্থা। 'উছমানী সুলতানগণ প্রথমদিকে এই সরকার পরিকল্পনায় কোনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। তবে মিদহাত পাশা দেশের প্রথম প্রকৃত শাসনতন্ত্র যখন বিস্তারিত আকারে পেশ করেন তখন দেখা যায় যে, নূতন সুলতান 'আবদু'ল-হামীদ একাই দেশ শাসন করিতে চাহিতেছেন। আর সে দেশ শাসন তাঁহার পূর্বসূরীদের মতই একনায়কসুলভ পদ্ধতির। একটি পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা তিনি অনুকরণ করিতে চাহিলেও তাঁহার বরাবরের একমাত্র লক্ষ ছিল সার্বভৌম শাসক তথা সুলতানের অবস্থানকে নিরাপদ ও মজবুত করা। আর এই লক্ষ্যেই শেষ পর্যন্ত 'উছমানী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কুখ্যাত সেন্সর ও গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। আর এই সব ব্যবস্থাই তুরস্কের ইতিহাসে 'দাওর্-ই ইস্তিব্দাদ' নামে কুখ্যাতি লাভ করে।

এই সময় তানজীমাতের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয় বলিয়াই এই আমলকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যাইবে না। এই সময়ে সংস্কারের কোনও কোনও ফলের বিরোধিতা করা হয় মাত্র। আলোচ্য সংস্কারগুলির কারণে তুর্কীভাষী ও ইসলামী ধর্মীয় ভাবধারায় পরিপুষ্ট এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের বেশিরভাগ হয় সেনাবাহিনীভুক্ত লোকজন অথবা সরকারী কর্মকর্তা শ্রেণীর এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক লোক 'উলামা' সমাজের। অত্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন উৎস হইতে আগত এই বুদ্ধিজীবীরা দেশপ্রেমের এ নয়া আদর্শ গড়িয়া তোলে। কবি নামীক কামাল-এর ওয়াতান কবিতায় দেশপ্রেমের এই আদর্শটিকে অত্যন্ত চমৎকার করিয়া তুলিয়া ধরা হইয়াছে। এই বুদ্ধিজীবীরা যে জনমত গড়িয়া তুলিতে শুরু করেন তাহা দেশের সরকারের উপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। ঠিক এই সময়ে তুর্কী সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার যাত্রা শুরু ঘটে (তু. জারীদা)। সমাজের বুদ্ধিজীবীদের এই গোষ্ঠীটি অধিকতর সুনির্দিষ্ট আকারে সংগঠিত হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে খৃস্টান ও য়াহূদী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন মহল হইতে আরও বেশি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া এশীয় প্রদেশগুলির অ-তুর্কভাষী মুসলমানদের নিকট হইতেও ইহারা দূরে সরিয়া যায়।

ঐ একই সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়ায় খৃস্ট ধর্ম ও ইসলামের মধ্যকার সামগ্রিক ধর্মীয় বিরোধ আরও তীব্র ও ঘনীভূত হইয়া উঠে। ইহা ঘটে এই কারণে যে, ঐ সময় বহু মুসলিম অধ্যুষিত দেশ

খৃস্টান শক্তির শাসনাধীন হয়। আর এই প্রক্রিয়ায়ই নিখিল বিশ্ব ইসলামী চেতনা বা প্যান-ইসলামিজমের ধারণা গড়িয়া তুলনামূলকভাবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী Constantinople বিশ্ব ইসলামের রাজনৈতিক রাজধানী হইয়া উঠে। বহু তুর্কী বুদ্ধিজীবী, যাহাদের মধ্যে 'উলামা' সমাজের বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই অধিক, প্যান-ইসলামিক চেতনা তাহাদের মধ্যে বিরাজমান কিছুটা অস্পষ্ট (তখনও) দেশপ্রেমের চেতনাকে ছাপাইয়া যায়। অধিকন্তু ইসলামী চেতনাবোধ তুর্কী জনগোষ্ঠীর সাধারণ লোকজনের জোরালো সহানুভূতি অর্জন করে, কেননা তাহারা তখনও মরমী চেতনা ও ধারা-ঐতিহ্য দ্বারা অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল। সাম্রাজ্যের অ-তুর্কভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। 'আবদু'ল-হামীদ খলীফা পদের মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিলেও তিনি প্রধানত ইসলামী অনুভূতি ও আবেগকেই মূল্য দিতেন, যদিও কালক্রমে দেখা যায় যে, যেই সকল ব্যক্তি সুলতানের সাহচর্যে ছিলেন তাঁহাদের অনেকে ক্রমেই বেশি করিয়া সন্দিহান হইয়া উঠা সুলতানের সন্দেহের পাল্লায় পড়িয়া চরম দুর্ভোগে পড়িয়াছেন। কোনও রকম দেশপ্রেমমূলক কথাবার্তা ঘটিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। এই অবস্থায় উপায়ান্তর না দেখিয়া বহু বুদ্ধিজীবীকে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

ইসতিবদাদের বিরুদ্ধে ধূমায়মান বিরোধিতা অবশেষে ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশে সংঘটিত হয়। ১৯০৬ খৃ. হইতে উছমানী সাম্রাজ্যের এই প্রদেশটি য়ুরোপীয় নিয়ন্ত্রণের আওতায় একজন তুর্কী গভর্নর কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। এই প্রদেশের স্যালোনিকা নব্য দেশপ্রেমিক ও অধিকতর চেতনাসম্পন্ন নব্য তুর্কী আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় ইত্তিহাদ-উ তেরাককী বা ঐক্য ও প্রগতি কমিটি। সেনাবাহিনী ইহার প্রতি বিপুল সমর্থন জানায়। এই আন্দোলনের প্রভাবে সুল্তান ১৯০৮ সনের ২৪ জুন আবার মিদ্হাত পাশা প্রণীত শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিতে এবং ধিকৃত সেন্সর ও গোয়েন্দাগিরির ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিতে বাধ্য হন। নভেম্বর মাসে প্রথম উছমানী পার্লামেন্টে মিলিত হয়। কিন্তু ঐ সময় হইতেই পরবর্তী কয়েক বৎসর যে গোলযোগের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয় তাহার ফলে এই পার্লামেন্টের নিজস্ব কোন সত্যিকারের প্রভাব সরকারের উপর বিস্তার করিবার সুযোগই হয় নাই। ১৯০৯ সনের ১৩ এপ্রিল সুলতানের সাবেক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার এক প্রয়াস চলে। আর এই পরিস্থিতিতে নব্য তুর্কী আন্দোলনের স্বার্থ রক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে ম্যাসিডোনিয়ার সেনাবাহিনী রাজধানী Constan- tinople দখল করে ও সুলতানকে অপসারণ করা হয় (এপ্রিল ২৭)।

ইহার পর 'উছ'মানীবাদ–একটি আদর্শমাত্র হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করে, যাহার তাৎপর্য ছিল 'উছমানী রাষ্ট্রে ইসলামী ও অ-ইসলামী সকল জনগোষ্ঠীরই সমান অধিকার। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল যে, আগে হইতেই ঐ সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে অনেক ব্যবধান ও বিভেদের অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে। আর তাই উল্লিখিত নীতিগুলির ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে। নিখিল তুর্কীবাদী ধ্যানধারণার প্রভাবে নব্য তুর্করা অতঃপর একটি নীতি অনুসরণ করিতে শুরু করে যাহার চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল 'উছমানী সাম্রাজ্যকে এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত করা যেই রাষ্ট্রে তুর্কগণই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে। তাহারা তাহাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য অতঃপর তুর্কীভাষী জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া আনাতোলিয়ার তুর্কীভাষী জনসাধারণের শরণাপন্ন হয়। একটি সত্যিকারের তুর্কী জাতি গঠনের জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। এই একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতিপয় ব্যক্তি প্যান-ইসলামিজমের প্রচার শুরু করে। তবে এই পন্থাটি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়, যদিও কোন কোন উপলক্ষে ইহার বহিঃপ্রলেপসুলভ রাজনৈতিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বিপ্লবের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিকূল ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে নব্য তুর্কী শাসকরা এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাহা তাহাদের আদি কার্যক্রমে ছিল না। ইহার দৃষ্টান্ত যুদ্ধ চলাকালে আর্মেনীয়দের ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও সিরিয়ায় সরকার পরিচালনায় অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। যুদ্ধে প্রায় সকল অতুর্কী অঞ্চল চূড়ান্তভাবে হারাইবার পর অবশেষে তুর্কী দেশপ্রেম ভূমিষ্ঠ হয়। এই জাতীয়তাবাদ ছিল সর্বাপেক্ষা সহজ, সরল ও ইহা ছিল একই সময়ে তুর্ক দেশপ্রেমের সর্বাপেক্ষা কার্যকর অবয়ব যাহা কোনও ধর্মীয় ধ্যানধারণা কিংবা কোনও মৌলিক জাতিসত্তাগত ধারণার কারণে ক্ষুণ্ন হইতে পারে।

যেই সব রাষ্ট্রনায়ক তানজীমাত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা রক্ষণবাদী ইসলামের নেতাদের ধর্মীয় চেতনায় যাহাতে আঘাত না লাগে সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন। বিদেশী প্রতিনিধিদের অনেক ওজর-আপত্তির মুখেও এমন কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই যাহার সহিত শারী'আতের প্রত্যক্ষ সংঘাত ঘটিতে পারে, যদিও বা শারী'আতের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই শারী'আতই ছিল নয়া দীওয়ানী বিধি বা মেজেল্লে (দ্র.)-র ভিত্তি। মিদহাত পাশার শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয় ও শায়খু'ল-ইসলামকে মহা-উযীরের সমমর্যাদাসম্পন্ন পদমর্যাদা দেওয়া হয়। অবশ্য এই দূরদর্শী ধর্মীয় নীতিও দেশে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় গোলযোগের অবসান ঘটাইতে পারে নাই। আর এইসব গোলযোগের শিকার ছিল খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন। ১৮৫৮ খৃ. ও ১৮৬০ খৃ. দিমাশকে এই ধরনের গোলযোগ ঘটে। এই দুই স্থানই অবশ্য বিশুদ্ধার্থে তুর্কী ভূভাগের বাহিরে অবস্থিত ছিল।

আবদু'ল-হামীদের আমলে ধর্মীয় তৎপরতা প্রধানত প্যান-ইসলামিজমের প্রভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আর ইহার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার প্রয়াস তুলিয়া ধরা হয়। এমনকি নব্য তুর্কী জাতীয়তাবাদী সরকারও বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ক্ষেত্রে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হইতে বিরত থাকে নাই। অবশ্য অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ক্ষেত্রে নব্য তুর্কীগণ স্পষ্টতই ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের প্রভাবের বিরোধিতা করেন। আর ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁহারা ১৯১৭ খৃ. মাদ্রাসাগুলিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীনে আনিতে প্রয়াসী হয়।

ইসলামী ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে নব্য তুর্কী সরকারের আরেকটি কাজের নজীর হইতেছে ইসলামী চান্দ্রমাসের দেওয়ালপঞ্জী বাতিল। ১৭৮৯ খৃ. অর্থাৎ আগে হইতেই দ্ব্যর্থ প্রশাসনের জন্য গ্রীক জুলিয়ান দেওয়ালপঞ্জীর প্রবর্তন হইয়াছিল। কিন্তু তখন এক অদ্ভুত রকমের আপোষমূলক ব্যবস্থায় হিজরী সন (সেনে-ই মালীয়ে) বহাল রাখা হয়। ১৯১৭ খৃ. তুরস্কে জর্জীয় ক্যালেণ্ডার পদ্ধতি গৃহীত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর খৃস্টীয় সন ক্রমান্বয়ে প্রচলিত হয়।

তানজীমাত সংস্কারের আমলেই বিলায়েত সংক্রান্ত আইনবলে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন সামরিক প্রশাসন হইতে পৃথক করা হয়। ইহার পরেও বহুকাল ধরিয়া রাজস্ব সংগ্রহ স্বরাষ্ট্র বিভাগের কাজ হিসাবে বহাল থাকে। অর্থ ব্যবস্থার য়ুরোপীয় ও কেন্দ্রীয়করণ প্রধান সমস্যা থাকিয়া

যায়, কেননা ঐ ব্যবস্থা দক্ষতার সহিত উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য রাতারাতি একদল বিশ্বস্ত কর্মকর্তা তৈরি করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর তুরস্ক বেশ কয়েকটি বিদেশী ঋণ চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু ঐ ঋণের অর্থের সুষ্ঠু প্রশাসন বা উহার সদ্ব্যবহার সম্ভব হয় নাই। ১৮৭৬ খৃ. রাষ্ট্রীয় দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা করিতে হয়। ঐ পরিস্থিতিতে দেশে বিদেশী হস্তক্ষেপ ঘটে এবং সরকারী ঋণ পরিশোধ সংস্থা গঠিত হয়। তবে প্রায় সকল তুর্কী মহল এই ব্যবস্থার প্রবল বিরোধিতা করে। রাজস্ব আদায়ের আরও একটি বড় বাধা ছিল সন্ধিপত্র প্রসূত মান্ধাতার আমলের আমদানি শুল্কবিধি। মূলত এই শুল্কের হার ছিল ৩%। ইহা কয়েকবার বৃদ্ধি করা হয়। অবশ্য বিপ্লবের পর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যাগুলি কাটিয়া যায় বলিয়াই মনে হয়।

ক্রমান্বয়ে বাধ্যতামূলক ভর্তি পদ্ধতি ব্যবস্থায় জানিসারী বাহিনীর অস্তিত্বলোপের পর যে নূতন তুর্ক সেনাবাহিনী গঠিত হয় সেই বাহিনীকে এই আমলে বহুবার ইহার সাহস ও সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে হয়। সামরিক বাহিনীর সাফল্য দেশপ্রেমিক তুর্কী প্রেরণার বলিষ্ঠায়নে যথেষ্ট অবদান যোগায় এবং এই বাহিনী বিপ্লবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮০৬ সালের পর তাত্ত্বিকভাবে খৃস্টান ও য়াহূদী নাগরিকদের সামরিক বাহিনীতে যোগদানের অনুমোদন দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ঐ খৃস্টান ও য়াহূদীগণ অব্যাহতি কর পরিশোধ করিয়া দায়মুক্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র তুর্ক বিপ্লবের পরই অতুর্কী জনগোষ্ঠীর লোকও সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত হয়।

৯। তুর্কী জাতীয় রাষ্ট্র (১৯২২ সন হইতে)

নূতন তুর্কী রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল Mudros অস্ত্রবিরতি চুক্তির বিদেশী দখলদারীর বিরোধিতা। ১৯১৯ খৃ. মুসতাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে এই বিরোধিতামূলক তৎপরতার সংগঠন শুরু হয়। তিনি প্রথমে সেনাবাহিনী পরিদর্শক হিসাবে এশিয়া মাইনরে যান। এই সংগঠনের প্রথম পর্যায়ের ফল ছিল এরযেরুমের মহাসম্মেলন (২৩ জুলাই, ১৯১৯)। ইহার পর সিওয়াস মহাসম্মেলন (১১ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হয়। এইখানে মুসতাফা কামালের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি কমিটি (হেয়েত-ই তেমছীলীয়ে) গঠিত হয়। এই কমিটির কাজ ছিল নূতন জাতীয় কার্যক্রমের বাস্তবায়ন। Smyrna-য় বিদেশী দখলদারীর বিরুদ্ধে কুওয়ায়ী মিল্লীয়ে নামে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং সামসুন-এ বৃটিশ বাহিনী অবতরণ ও সেই সঙ্গে Constantinople হইতে ইযনিকের উপর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়। Constantinople পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ১৯২০ খৃ. পার্লামেন্টের বহু সদস্য এশিয়া মাইনরে চলিয়া যান এবং ২৩ এপ্রিল আঙ্কারায় জাতীয় পরিষদের (পার্লামেন্টের) মহাঅধিবেশন আহ্বান করা হয়। ঐ অধিবেশনে জাতীয় পরিষদ ব্যবস্থাপক ও নির্বাহী উভয় ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং কামাল পাশার সভাপতিত্বে (প্রেসিডেন্ট হিসাবে) একটি শাসক কমিটি (হে'য়েতি ওয়েকীলে) গঠিত হয়। ১৯২১ খৃ. গ্রীক বাহিনীর সহিত যুদ্ধ (১১ জানুয়ারি ও ৩১ মার্চ) শুরু হয়। ইহার পরে গ্রীক বাহিনী জুলাই মাসে তুরস্কের অভ্যন্তরে Eski Shehir অবধি অগ্রসর হয়। তবে ১৩ সেপ্টেম্বর গ্রীক বাহিনী পরাজিত হইলে ঐ গ্রীক অগ্রাভিযানের অবসান ঘটে। ইতিমধ্যে তুরস্কের নয়া সরকার মিত্রপক্ষের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। ২০ নভেম্বর, ১৯২১ সনের চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স তুরস্ককে Cilicia ফেরত দেয়। তবে অন্যান্য দর কষাকষিমূলক আলোচনায় সুনির্দিষ্ট ফল লাভ না হওয়ায় ১৯২২ সনের আগস্টে আঙ্কারা সরকার গ্রীক বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। Dumlu Bunar-এর ঐ যুদ্ধে তুরস্ক গ্রীসের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করে। সেপ্টেম্বরে Smyrna পুনরুদ্ধার করা হয়; ঐ সময়ে এক সাময়িক আশঙ্কা দেখা দেয় Constantinople হয়ত বা আক্রান্ত হইতে পারে। Mudania অস্ত্রবিরতি চুক্তি (১০ অক্টোবর) অনুযায়ী তুরস্কের জাতীয় সরকার থ্রেস ও Constantinople অধিকারের অনুমোদন লাভ করে। পরের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ শর্ত পালিত হয়। আর এইসব পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং Lausanne চুক্তির মাধ্যমে (২৩ জুলাই, ১৯২৩) মিত্র দেশগুলি ও নূতন তুরস্কের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তুরস্ক একটি পরিপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। অবশ্য চুক্তির আওতায় সাবেক তুর্কী বিলায়েত মাওসিলের বিষয়টি অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। তুরস্ক উহার প্রত্যর্পণ দাবি করে। জাতিপুঞ্জ তথা তৎকালীন বিশ্বসংস্থা লীগ অব নেশন্স-এর ব্যাপক প্রয়াসের ফলে ইংল্যাণ্ড ও তুরস্ক এমন এক রফায় উপনীত হয় যাহার আওতায় মাওসিল ইরাককে (৫ জুন, ১৯২৬) ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে নব্য তুরস্ক ১৯২২ সনের নভেম্বরে রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক পর্যায়ে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করে। Lausanne শান্তিচুক্তির পর অন্যান্য দেশের সহিত মৈত্রী ও বাণিজ্যিক লেনদেন সংক্রান্ত কয়েকটি চুক্তি একের পর এক স্বাক্ষরিত হয়। এখন ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক তুর্কী পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৯২৪ সনের ২০ এপ্রিলের তুর্কী শাসনতন্ত্র অনুমোদিত হওয়ার পর হইতে তুরস্ক একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হইতে মুসতাফা কামাল পাশাই উহার প্রেসিডেন্ট (রে'ঈস-ই জমহূরিয়েত)। Constantinople উহার রাজধানীর মর্যাদা হারাইয়াছে। আঙ্কারা এখন নব্য তুরস্কের রাজধানী শহর। তুর্কী জাতীয় পরিষদ (পার্লামেন্ট) ১৯২২ খৃ. হইতেই নূতন দেশকে নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য ও উহার প্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিকায়নের জন্য যথেষ্ট আইন প্রণয়নমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। ১৯২৪ সনের মার্চে খিলাফাত ব্যবস্থা বিলোপের পর দেশের নূতন শাসককুল পরিকল্পিতভাবেই ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে। তুরস্কে এখন আর কোনও শায়খু'ল-ইসলাম কিংবা কোনও আওকাফ মন্ত্রণালয় নাই।

১৯২৫ খৃ. সূফী তারীকাসমূহের তেক্‌কেগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং খোদ ঐ তারীকাগুলিকেও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ধর্মীয় বহিঃপ্রকাশের এই যেসব লোকপ্রিয় ঐতিহ্যিক ধারা ইহার বিরুদ্ধে উল্লিখিত ব্যবস্থাদি প্রধানত শায়খ সা'ঈদ-এর নেতৃত্বে কুর্দি মহাবিদ্রোহের কারণেই গৃহীত হয়। ১২২৪-এর শেষের দিকে এই বিদ্রোহ ঘটে। একইভাবে ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মস্তকাবরণ হিসাবে ফেয টুপি পরিধান নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়, আর উহার পর হইতে কেবলমাত্র 'উলামা' সমাজের লোকজনকেই পাগড়ি পরিধানের প্রথা বহাল রাখিতে দেওয়া হয়। এই সময়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তুর্কী ভাষার জন্য লাতিন বর্ণমালা প্রচলন। ১৯২৮ খৃ. দিকে আরবী হরফের ব্যবহার বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাটির একটি মুসলিম মোল্লাবিরোধী দিকও ছিল। এইসব ও অন্যান্য ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল–তুর্কী জনসাধারণের আরও উন্নততর সাংস্কৃতিক স্তরে উত্তরণের বিষয়টির নিশ্চয়তা বিধান। তবে এইসব ব্যবস্থার প্রয়োগকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সম্পর্কিত ধর্মীয় মহলের পক্ষ হইতে বারংবার বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দেশে প্রজাতন্ত্রী সরকার জাতীয় বিবর্তনের এই যে লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন,

অবস্থা যাহাই হউক উহার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা যে কোনও সময়ের চাইতে বেশি। কেননা এক্ষণে তুরস্কের জনসমষ্টির এক বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রকৃত তুর্কী অথবা তুর্কীকৃত। বলকান যুদ্ধের পর বহু মুহাজির এশিয়া মাইনরে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং গ্রীসের সহিত পরস্পরের জনবিনিময়ের ফলেও তুর্কী সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও বাড়িয়াছে।

১৯১৮ খৃ. হইতে বিশ শতকের সিকি ভাগের ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর এক পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলনের জন্য দ্র. G. Jaschke ও E. Pritsch, Die Turkei seit dem Weltkriege, Geschichts kalender 1918-1928, in Die Welt des Islams, x., 1927-1929। এই গ্রন্থে নব্য তুরস্ক সম্পর্কে এক বিশদ ও ব্যাপক গ্রন্থপঞ্জীমূলক টীকাভাষ্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই আমলের একটি বস্তুনিরপেক্ষ জরিপের জন্য দ্র. খালীল এদহেম, দুয়েল-ই ইসলামীয়ে-তে প্রকাশিত নিবন্ধ ঃ তুরকীয়ে জুমহুরিয়েতি, ইস্তাম্বুল ১৯২৭, পৃ. ৩৩১।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'উছমানী রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্রসমূহের মধ্যে খোদ 'উছমানী তুর্কদের নিজেদের ইতিহাসমূলক রচনাবলীই সর্বাগ্রগণ্য। এইসব রচনার জন্য পর্যাপ্ত সূত্রনির্দেশ হইতেছে ঃ (১) F. Babinger, Die Geschichtschreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig 1927)। প্রামাণ্য ঐতিহাসিক সূত্রগুলির বিষয়ে সমীক্ষা এখনও সূচনাস্তরে রহিয়াছে। আর এই ধরনের ঐতিহাসিক কিছু দলীল প্রকাশনার সূত্র ঃ (২) T. O. E. M. (T. T. E. M. ও তুর্কী ঐতিহাসিক আহমাদ রেফীক-এর রচনাবলী। কিছু সংখ্যক কানূননামে T.O. E. M. ও অন্যান্য তুর্কী প্রকাশনায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'উছমানী সাম্রাজ্য সম্পর্কিত মূল্যবান রচনার অন্যতম মূল্যবান সঙ্কলন ঃ (৩) Gabriel Effendi Noradounghian, Recueil d'Actes Internationaux de l'Empire Ottoman, iv., vols., Paris 1897-1903)। উৎকীর্ণ (শিলা) লিপিমূলক সূত্রসমূহের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনোগ্রাফ রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে খালীল এদহেমের মনোগ্রাফ ছাড়াও অধিকতর সাম্প্রতিক মনোগ্রাফ রচয়িতা হইতেছেন মুবারাক গালিব। 'উছমানী মুদ্রাতত্ত্বের উপর এখনও সর্বপ্রধান রচনা ঃ (৪) ইসমাঈল গালিব, তাকবীম-ই মাসকূকাত-ই 'উছমানীয়ে, Constantinople ১৩০৭। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য রচনা ঃ (৫) Ahmed Refik, 'Othmanli Imperatorlu ghunda Meskukat, in T. T. E. M., No. 6, 7, 8, 9, 10; (6) British Museum Catal. Oriental Coins. vol. viii।

অ-তুর্ক রচনাবলী (সূত্র) বিশেষ করিয়া প্রাচ্যের লেখকদের সম্পর্কিত রচনাবলী সম্পর্কিত আংশিক উপকরণ সন্নিবেশ করিয়াছেন Babinger তাঁহার গ্রন্থপঞ্জীমূলক রচনায়। পাশ্চাত্য সূত্রগুলির মধ্যে বায়যান্টীয় ঐতিহাসিকদের রচনা, বিশেষত 'উছমানী সাম্রাজ্যের প্রথম দিকের শতকগুলির সম্পর্কিত তাঁহাদের বিবরণ অসাধারণ গুরুত্বসম্পন্ন [(৭) KPhrantzes, Ducas, Chalcocondyles, Critobulos]। ১৫শ শতক হইতে এই শতকের ইতিহাসের জন্য Venetian bailcs-র Relazioni অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহার জন্য দ্র. Alberi (Florence 1839-1863) এবং Barozzi ও Berchet-র বিখ্যাত প্রকাশনাসমূহ। আর এইগুলির সহিত যুক্ত হইয়াছে অন্যান্য সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত 'উছমানী সরকারের বিভিন্ন সম্পর্কমূলক চুক্তির প্রতিবেদনসমূহ। ইহা ছাড়া ১৫শ শতক হইতে 'উছমানী সাম্রাজ্য সফরকারী য়ূরোপীয় পর্যটকদের লেখা অসংখ্য ভ্রমণ-বৃত্তান্তও ঐ একই পর্যায়ে পড়ে। তুর্ক ও 'উছমানী সাম্রাজ্য সম্পর্কে আরও কিছু বিবরণ আছে যেইগুলিকে উল্লিখিত ভ্রমণ সাহিত্য হইতে খুব একটা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই ধরনের রচনার মধ্যে সুপরিজ্ঞাত রচনাটি হইতেছে ঃ (৮) d' Ohsson, Tableau General de l'Empire Ottoman, vol i-iii, Paris 1787-1820। গোটা ১৯শ শতক ধরিয়া (Ubicini-এর গুরুত্বপূর্ণ রচনা) ও ২০শ শতকের প্রথম দিকেও এই ধরনের রচনা রচিত হইতে থাকে। 'উছমানী ইতিহাসের উপর সর্বপ্রথম মহৎ রচনাটি হইতেছে ঃ (৯) Josef von Hammer, Geschichte des osmanischen Reiches, vol. i-x, Pest 1827-1835; (10) Zweite verbesserte Ausgabe, vol. i-iv, pest 1834-1836 (ফরাসী অনু. J. J. Hellert, Histoire de l'Empire Ottoman, vol. i-ix, Paris 1835-1843)। এই রচনাটির একটি বিরাট অংশ তুর্কী রচনাবলীর ভিত্তিতে লিখিত এবং ইহাতে ১৭৭৪ সনের কুচুক কায়ানারজা চুক্তি অবধি বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। এই রচনার ১০ম খণ্ডে ১৭৭৪ সনের আগে অবধি য়ূরোপে প্রকাশিত 'উছমানী ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের এক বিশদ তালিকা দেওয়া আছে। একই পরিসরের আরেকটি রচনা (১১) J. W. Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, vol. i-vii (1812 পর্যন্ত), Hamburg 1840 ও Gotha 1854-1863; Zinkeisen, von Hammer-এর তুলনায় অনেক বেশি পাশ্চাত্য সূত্র ব্যবহার করিয়াছেন, মূল তুর্কী সূত্রগুলি হইতে সরাসরি উপাদানও তিনি সংগ্রহ করেন নাই। একই বিষয় অতঃপর বর্ণিত লেখকের কাজেও লক্ষ করা যায় ঃ (১২) N. Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, vol. i-v (1912 অবধি), Gotha 1908-1913; (13) de La Jonquiere, Histoire de l'Empire Ottoman, Paris 1914, ইহা 'উছমানী সাম্রাজ্যের ১৯শ শতকের ও ২০শ শতকের গোড়ার দিকে ঐতিহাসিক উপস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 'উছমানী ইতিহাসের একটি বিশেষ কাল পর্যায়ের উপর লিখিত বেশ কয়েকটি রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ (১৪) G. Rosen, Geschichte der Turkei (1826-1856), Leipzig 1866.

যুদ্ধের পর তুর্কী ইতিহাসের বিষয়ে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ খৃ. Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte by F. von Kraelitz p. Wittek প্রকাশিত হইতে শুরু করে। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই প্রকাশনাটি মাত্র দুই বৎসর চলিবার পর বন্ধ হইয়া যায়।

১৯০৮ সনের বিপ্লবের পর খোদ তুরস্কে 'উছমানী আমলের ইতিহাস চর্চা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ১৯১০ খৃ. হইতে তা'রীখ-ই উছমানী আঞ্জুমান-ই মাজমূ'আসীর প্রকাশনা শুরু হয় এবং যুদ্ধের পর ইহার নাম 'তুর্ক' তা'রীখ এনজুমেনি মেজমূ'আসী'-তে পরিবর্তন করা হয়। আরবী লিপিতে এই প্রকাশনার সর্বশেষ বালামের সংখ্যা ছিল ঃ ১৯ (৯৬)। এই মূল্যবান প্রকাশনায় বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক রচনা স্থান পায়। তবে অন্যান্য প্রকাশনায়ও (যেমন সাহিত্যমূলক মেজমূ'আ ও তুরকিয়াত মেজমূ'আসী-র দুইটি খণ্ড, ইস্তাম্বুল ১৯২৫ ও ১৯২৮) ঐতিহাসিক বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও তা'রীখ এনজুমেনির কুল্লিয়াত অনুক্রমে যথেষ্ট সংখ্যক ইতিহাসমূলক মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়। তুরস্কে সাম্প্রতিক ইতিহাস বিষয়ক সমীক্ষাগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপমূলক রচনা ঃ (১৩) P. Wittek, in O. L. Z. Neuere wissenschaftliche Litteratur in osmanisch-turkischer sprache এই শিরোনামে লিখিত ধারাবাহিক

নিবন্ধগুলিতে পাওয়া যাইবে। তুরস্কে আজও 'উছমানী সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোনও নূতন ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নাই। অবশ্য নাজীম 'আসিম ও মেহমেদ 'আরিফ রচিত 'উছমানলী তা'রীখ-ই-র ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হইয়াছে (ইস্তাম্বুল ১৩৩৫/১৯১৭)।

J. H. Kramers (E.I. [1])/আফতাব হোসেন

তুর্কমান চায় (ترکمان چای) ঃ [তুর্কমান চায়ই উত্তম] আযারবায়জান প্রদেশের গরমারূদ জিলার একটি গ্রাম। তুর্কমান চায় "তুর্কমানদের নদী", প্রকৃতপক্ষে যেই নদীর তীরে গ্রামটি অবস্থিত সেই নদীর নাম। ইহা চিচাকলি গিরিখাত (তুর্কমান চায় ও সারাব-এর মধ্যবর্তী) হইতে প্রবাহিত। ইহা কিযিলুযান-এ পতিত মিয়ানা (শাহা-র চায়ী) নদীর অন্যতম উত্তরাঞ্চলীয় শাখানদী (তু. নিবন্ধ সাফীদরূদ)। তাবরীয-যানজান-কাযবীন-তেহরান খুরাসান মহাসড়কের উপর তুর্কমান চায় গ্রামটি একটি মান্যিল। তাবরীয হইতে তুর্কমান চায়-এর দূরত্ব প্রায় ৬০ মাইল। তুর্কমান চায় হইতে যানজান-এর দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল। হামদুল্লাহ তাঁহার নুযহাতু'ল-কুলূব (G. M. S., xxiii, ১৮৩)-এ এই দূরত্বকে যথাক্রমে ১৬ ও ২৫ ফারসাখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি গ্রামটির নাম তুর্কমানকান্দী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রাম অর্থে কান্দ্ শব্দটি শধু আযারবায়জান-এ ব্যবহৃত। পারস্যের অন্যত্র ইহা অজ্ঞাত। শব্দটি অবশ্যই পূর্ব ইরান উৎপন্ন (তু. Sogdian, Kanth, town; তু. Barthold, Istoria the Kultur Zizni Turkestana, Leningrad 1927, p. 38)। শব্দটিকে আগ্রাসী তুর্কীরাই আযারবায়জান-এ আনয়ন করিয়াছে। হামদুল্লাহ আরও বলেন যে, এক সময় গ্রামটি একটি শহর ছিল যাহার ইরানী নাম (উচ্চারণ ভেদে) ছিল দিহ্ খার্রান)।

Clavijo (সম্পা. Sreznewski, St. Petersburg 1881, p. 172 and 354) তুর্কমান চায়কে Tuceler ও Tunglar বলিয়া উল্লেখ করিয়া (দৃশ্যত তুরক লার শব্দের বিকৃতি) বলিয়াছেন যে, এইখানে তুর্কমানরা বাস করে।

১০-১২ ফেব্রুয়ারী ১৮২৮ খৃ. রাশিয়া ও পারস্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির মাধ্যমে তুর্কমান চায় ইতিহাসে পরিচিতি লাভ করে। এই কূটনৈতিক দলীলটির দুইটি অংশ আছে। (১) ১৮১৩ খৃ. চুক্তির স্থলাভিষিক্ত এই রাজনৈতিক চুক্তির সুবাদে রাশিয়া এরিওয়ান এবং নাখিচেওয়ান খানাতেগুলির অধিকার করে এবং পারস্য হইতে পঞ্চাশ লক্ষ তূমান(=বিশ লক্ষ রুবল) কর লাভ করে। কিন্তু পরে ইহার পরিমাণ কমান হয়; (২) দুই দেশের মধ্যে ৫% এডভেলোরেম শুল্ককর নির্ধারণ ও রুশ নাগরিকদের ব্যক্তিগত মর্যাদা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ চুক্তি। ফৌজদারী অপরাধের ক্ষেত্রে রুশ নাগরিকগণকে তাহাদের দেশের আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করিতে হইত। উভয় দেশের নাগরিক জড়িত রহিয়াছে এমন দেওয়ানী মামলা রুশ কনস্যুলার প্রতিনিধির অংশগ্রহণের মাধ্যমে রুশ-পারস্য আদালতে নিষ্পত্তি হইত। ১৮২৮ খৃ. এই বিশেষ চুক্তি পারস্যের Capitulaion-এর ঐতিহাসিক সূচনা। অতি সুবিধাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র এই ধারা (clause)-টির আওতায় য়ুরোপের সকল রাষ্ট্র ধীরে ধীরে অনুরূপ অধিকার লাভ করে। ১৮১৭ খৃ. রুশ (কমিউনিস্ট) সরকার ক্ষমতা দখলের পর পারস্যের সহিত সকল প্রাক্তন রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় সুবিধামূলক চুক্তিসমূহ স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হইয়া যায়। ১৯২১ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পারস্য-সোভিয়েত চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। ১৯১৮ খৃ. হইতে ইরান সাধারণভাবে Capitulation চুক্তি বাতিলের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। কিন্তু ১০ মে, ১৯২৭-এর পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের নিকট এই বিষয়ে কোন প্রস্তাব উথাপন করে নাই। অতঃপর ইরানের আবেদনক্রমে অনেক রাষ্ট্রই ১০ মে, ১৯২৮-এ সমতাভিত্তিক নূতন চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। তবে ১৯২১ খৃ.-র পরেও ১৮২৮ খৃ.-র রুশ-পারস্য সীমান্ত (ক্ষুদ্র আরারাত-কাসপিয়ান সাগর) অপরিবর্তিত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাবরীয-কাযবীন হইতে গমনকারী সকল পর্যটক তুর্কোমান চায়-এর উল্লেখ করিয়াছেন, যেমন ঃ (১) Hommaire de Hell, Voyage, Paris 1854-1860, iii, 83-84 (গ্রামটিতে ১০০টি ঘর ছিল) এবং মানচিত্র PL. lvi-এ (চুক্তি স্বাক্ষরিত কক্ষটির চিত্র); (২) Brugsck, Resise, Leipzig 1862-1864, i, 181; (৩) Lyeklama a Nijeholt, Voyage, ii, 85; (৪) H. Schindler, Reisen, Zeitschr, Gesell, Erdk. 1883, p. 333, (১০০টি গৃহ, ৫,২৮৫ ফিট উচ্চতা)। ১৮২৮ খৃ.-র চুক্তির মূল ভাষ্যের জন্য দ্র. ঃ (৫) F. Martens, Nouveau recueil des traites, vii/2, 1830, p. 564-572; (৭) Yuzefovic, Dogovori Rossii s vostokom, St. Petersburg 1869, p. 214-227; (৮) Hertslet, Treaties concluded between Great Britain and Persia, etc., London 1891, চুক্তির বিশ্লেষণের জন্য দ্র. ঃ (৯) Greenfield, Die Verfassung des Pers. Staates, Berlin 1904; (১০) K. Vollers, Das Orientalische Munzkabinett der Universitat Fena im Fahre 1906, Dresden 1906, পৃ. ৭।

V. Mionorsky (E. I. [1])/আ.জ.ম. সিরাজুল ইসলাম হোসাইনী

তুর্কিস্তান (ترکستان) ঃ অথবা তুরকেস্তান, একটি ফারসী শব্দ, ইহার অর্থ 'তুর্কদের দেশ'। অবশ্য পারস্যবাসীদের নিকট তুর্কিস্তানের দক্ষিণ সীমান্ত অর্থাৎ ইরানের বিপরীত দিকের সীমান্তই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বাভাবিকভাবে এই সীমান্ত রাজনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল ছিল। খৃ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় তাহাদের প্রথম আবির্ভাবের সময়ই তুর্কীরা অক্সাস (তু. আমু দারয়া) পর্যন্ত পৌছিয়া যায়। ফলে সাসানীদের সময় অক্সাস ঠিক উত্তর হইতেই তুর্ক ভূমির সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। তাবারীতে প্রদত্ত (১খ, ৪৩৫ প.) বিবরণ অনুযায়ী তুর্ক ও "পারস্যদের ভূখণ্ড ('আমাল)'-এর মধ্যস্থলে অক্সাসকে সীমান্ত হিসাবে ঈরাশ নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। আরমেনীয় Sebeos (খৃ. ৭ম শতাব্দী) অনুযায়ী Vehrot অর্থাৎ অক্সাস (Oxus) তুরকাসতান-এর ভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছে (Histoire d'Heraclius par l'eveque Sebeos, অনু. Fr. Macler, Paris 1904, p. 49; J. Marquart, Eransahr, p. 48), একই রচনার জন্য এক স্থানে (P. 43; Marquart, p. 73) বলা হইয়াছে যে, তুরকাস্তান দেলহস্তান অর্থাৎ দেহিস্তান-এর সম্পর্কিত (Atrek দ্র.-এর উত্তরে কাসপিয়ান সাগরের পার্শ্ববর্তী)।

আরবদের বিজয় তুর্কীদিগকে সুদূর উত্তরে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিল। যেহেতু ৩য় (নবম) ও ৪র্থ (দশম) শতাব্দীর আরব ভূগোলবিদদের মতে অক্সাসের ঠিক উত্তর হইতেই তুর্কিস্তান আরম্ভ হয় নাই, বরং নদীর অপর তীরের ভূমি, মা ওয়ারাউ'ন্-নাহ্র (দ্র.) নামে পরিচিত আরব সংস্কৃতির উত্তরাঞ্চল হইতে তুর্কিস্তানের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং মা ওয়ারাউ'ন,-নাহর-এর উত্তর ও পূর্বাঞ্চল তুর্কীদের বাসস্থান তথা তুর্কিসতান হিসাবে পরিগণিত হইত। সীর দরিয়া

(দ্র.)-এর উত্তরে ফারগানা (দ্র.)-য় অবস্থিত কাসান শহর হইতে "তুর্কিস্তানের সীমানা আরম্ভ হইয়াছে" (য়াকূত, ৪খ, ২২৭)। একই নদীর নিম্ন অববাহিকায় অবস্থিত জান্দ ও শাহরকানদ্ শহরগুলি তুর্কিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল (পূ. গ্র., ২খ, ১২৭; ৩খ, ৩৪৪); খোতান শহর তুর্কিস্তানে পড়িয়াছে (পূ. গ্র., ২খ, ৪০৩)। নামের এই ব্যবহারের কারণে মনে করা হয় যে, (বিশেষভাবে M. Hartmann, Chinesisch-Turkestan, Halle 1908, p. 1) মধ্য এশিয়া বিজেতা রুশগণ কর্তৃক সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার সংগে মা ওয়ারা'উ'ন-নাহ্র এলাকাকে সর্বপ্রথম "তুর্কিস্তান" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বাস্তবে তুর্কীদের বিজয়ের ফলে তুর্কিস্তান নামটি বহু পূর্ব হইতেই ইহার প্রাথমিক গুরুত্ব পুনরুদ্ধার করিয়াছে। সম্ভবত প্রাত্যহিক জীবনে নামটির ব্যবহার সাহিত্যে ব্যবহারের তুলনায় অধিক ছিল। আফগানিস্তান ও পারস্যের অধিবাসীদের নিকট "তুর্কিস্তানের তুর্কীগণ" উত্তর দিকে তাহাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছিল। এইভাবে ১৮৮৬ খৃ. শীরাযে লিপিবদ্ধ করা এক ঘুমপাড়ানি গানে দেখা যায়, "দুই তুর্কী আসিল তুর্কিস্তান থেকে, ইহারা আনিল আমাকে হিন্দুস্তান" (V. Zukovsky, Obrazci Persidskago narodnago tvorcestva, St. Petersburg 1902, p. 169 প.)। ষোড়শ শতাব্দীর ওযবেগ বিজয়ের মাধ্যমে আমূ দারয়া-র দক্ষিণে একটি নূতন তুর্কিস্তানের উদ্ভব হয়। এখনও আফগানিস্তানের অনুরূপ প্রদেশটি তুর্কিস্তান নাম বহন করে। কেননা কোন কোন পর্যটক (R. Burslem, A Peep in Toorkistan, London 1846, p. 57 প.) ইহার দক্ষিণ সীমান্ত হিসাবে বামিয়ান-এর উত্তরে আকরাবাত গিরিপথকে নির্দেশ করিয়াছেন। অন্যরা (J. Wood, A Journey to the Source of the River Oxus, new edition, London 1872, p. 130) আরও সামান্য দক্ষিণের হাজিকাক গিরিপথের কথা বলিয়াছেন যেইখানে হেলমান্দ (দ্র.) ও আমূ দারয়ার অববাহিকার পানি-বিভাজিকা অবস্থিত। আরও দক্ষিণে মুরগাব ও আব-ই মাযমানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে বান্দ (অথবা তীরবান্দ)-ই তুর্কিস্তানের সীমানাকে তুর্কিস্তানের সীমান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। রুশরা নয়, বরং বৃটিশগণই তুর্কিস্তান নামটিকে ১৯শ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সূচিত করিয়াছে। ইহা সম্ভবত আফগানী ও পারস্য শব্দ প্রয়োগরীতির প্রভাবে হইয়াছে।

সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া পর্যটকদের নথিপত্রে রুশ, চীনা ও আফগান তুর্কিস্তানের মধ্যে সাধারণত পার্থক্য করা হইয়াছে। যদিও শুধু রুশ ও আফগান তুরকেস্তান (অথবা তুর্কিস্তান) শব্দটির মধ্যেই প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক সময় এই শব্দগুলির পরিবর্তে আমরা শুধু পশ্চিম ও পূর্ব তুরকেস্তান শব্দটি দেখিতে পাই। ১৮৬৭ খৃ. রুশগণ কর্তৃক তাশকেন্দ (দ্র.)-কে রাজধানী করিয়া তুরকেস্তান গভর্নর জেনারেল পদ প্রবর্তন করা হয়। এই গভর্নর জেনারেলশিপের সীমান্ত কখনও সংকুচিত কখনও বিস্তৃত হইয়াছে। এক সময় তুরকেস্তানের অন্তর্ভুক্ত Semiryecye প্রদেশ, ১৮৮২ হইতে ১৮৯৮ পর্যন্ত Omsk-এ রাজধানীসহ স্তেপসমূহের গভর্নর জেনারেলশিপের অধীনে ছিল। ১৮৯৮ খৃ. Semiryecye ও ট্রান্সকাসপিয়ান প্রদেশ (তুরকোমানিয়া) তুরকেস্তানের সহিত সংযুক্ত করা হয়।

১৮৮৬-তে প্রফেসর I. Mushketow "তুরকেস্তান" নামটিকে প্রশাসনিক অবস্থা-নিরপেক্ষ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। A. Petzhold রচিত গ্রন্থ Umschau in Russischen Turkestan nebst einer allgemeinen Schilderung des Turkestanischen Beckens,লাইপজিগ ১৮৭৭-এর প্রভাবে তিনি মধ্য এশিয়ার মধ্য-পর্বতমালা, কাসপিয়ান সাগরের অববাহিকা, পারস্য মালভূমি এবং তুহিন সাগরের মধ্যবর্তী স্থানকে তুরকেস্তান অথবা তুরকেস্তান অববাহিকা নামকরণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। Mushketow নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সীমান্ত হিন্দুকুশ (দ্র.) নির্ধারিত হইবে। তিনি "চীনা-তুরকেস্তীন" শব্দের পরিবর্তে চীনা হান-হাই (Chinese. Han-Hai) শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন (Richthofen হইতে য়ূরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক "শুষ্ক সাগর" হিসাবে ব্যাখ্যাত)। Mushketow শুধু ভৌগোলিক সত্য ও অনুমান লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য অথবা কোন নৃ-তাত্ত্বিক বিবেচনার প্রতি মনোযোগ দেন নাই।

প্রধানত নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিতে সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় তুরকেস্তান শব্দটির ব্যবহার ক্রমে লোপ পাইয়াছে। বিপ্লবের পরে প্রাক্তন রাজধানী তাশকেন্তসহ "তুরকেস্তান প্রজাতন্ত্র" অল্প কয়েক বৎসর টিকিয়াছিল। পূর্বের গভর্নর জেনারেলশিপের তুলনায় এই প্রজাতন্ত্রের সীমারেখা খুব ছোট ছিল। উত্তরের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে কিরগিয প্রজাতন্ত্রের (তু. 'কিরগিয) সঙ্গে সংযুক্ত করা হইয়াছে। অবশেষে ১৯২৪ খৃ. জাতীয়তা নীতি গৃহীত হওয়ার পর এই ভূখণ্ডের সাধারণ নামটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নামভিত্তিক হইয়া উঠে; যেমন উযবেকিস্তান, তুরকমেনিস্তান ও তাজাকিস্তান নামসমূহের কাছে নতি স্বীকার করে। আলোচ্য সবগুলি দেশের অল্প কয়েকটি প্রধানত অর্থনৈতিক বিষয় এখনও আশকেন্ত-এ মীমাংসিত হয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে তুরকেস্তানের স্থলে মধ্য এশিয়া শব্দমালা (Srednyaya aziya) ব্যবহৃত হয়।

ওযবেগদের আমলে/অধীনে সীর দারয়া-র মধ্যপথে অবস্থিত একটি শহরের নামও তুরকেস্তান ছিল। আরব ভূগোলবিদদের বর্ণনা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, চতুর্থ (দশম) শতাব্দীতে শাওগার (Le Strange-এর Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1905, p. 485-এ শাভাগার নামে অভিহিত) নামক শহর অবস্থিত ছিল। দুর্ভাগ্য এই যে, ইহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। ১৪শ শতাব্দীতে সম্ভবত আরও পূর্বে ১২শ শতাব্দীতে শেষোক্ত তুরকেস্তান য়াসী নামে পরিচিত ছিল। সর্বশেষ তীমূর (জাফারনামা, ভারত সং., ২খ, ৯)-এর ইতিহাসে ইহাকে একটি গ্রাম (কারয়া) হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। সর্বপ্রথম মোঙ্গল যুগে খ্যাত সাধক আহমাদ য়েসেবী (দ্র.)-এর প্রতি শ্রদ্ধার জন্য শহরটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি তুর্কীগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয় (তাঁহার আমলের জন্য আরও দেখুন Barthold, Der Islam, XIV, 112)। বিশেষভাবে তীমূর কর্তৃক সুদৃশ্য গুম্বজ নির্মাণের পর হইতে ইহার গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। এই সাধককে দেশের আধ্যাত্মিক রক্ষকের মর্যাদা দেওয়া হইত এবং তাঁহাকে হাযরাত-ই তুর্কিস্তান হিসাবে সম্বোধন করা হইত। ইহা সম্ভবত শহরটির নূতন নামকে ব্যাখ্যা করে। রুশদের বিজয়ের সময় শহরের আয়তন ছিল প্রায় ২ মাইল, লোকসংখ্যা ৫০০০; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে উহা ১৫ হাজারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের মূল ভাষ্যে প্রদত্ত বরাতসমূহ ছাড়াও (১) Mushketow, Turkestan, St. Petersburg 1886, ২য় সংস্করণ ১৯১৫ খৃ.; (২) W. Barthold, Stand und Aufgaben der Geschichtsforschung in Turkestan (Die Geisteswissenschaften, i, 1913-1914, p. 1075 প.); (৩) ঐ লেখক, Turkestan down to the Mongol Invasion,

1928 (G. M. S. New. Ser. v.); (৪) ঐ লেখক, Istoriya Kulturnoizizni turkestana, Leningrad 1927; (৫) W. Masalskij, Turkestanskij krai, St. Petersburg 1913, p.600 প. ; (৬) A. Dobromislow, Goroda Sir-Darinskoi oblasti, Tashkent 1912-On The tomb see especially M. Masson, in Izv. Sredne Az. Geograf obshc., xix. (1929), p. 39 প.।

W. Barthold (E.I. [1])/আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম হোসাইনী

তুর্কোমান (تركمان) ঃ মধ্য এশিয়ার তুর্কী জাতির এক জনগোষ্ঠী। এই নামটি পঞ্চম/একাদশ শতাব্দী হইতে ব্যবহৃত হয়, প্রথমে ফারসী ভাষায় "তুরকমানান" (বহুবচন)-রূপে নামটি ব্যবহার করেন দুইজন পারস্যবাসী ঐতিহাসিক, তথা গারদীযী (দ্র.) [তু. মুহ. নাযীম-এর মুদ্রিত সংস্করণ, E. G. Browne, Mem., vol. I, বার্লিন ১৯২৮ ও আবু'ল-ফাদল বায়হাকী (দ্র.) উভয়েই নামটি] ব্যবহার করিয়াছেন তুর্কী উগুয, আরব গুয জনগোষ্ঠী অর্থে। অবশ্য উগুয গোষ্ঠী মঙ্গোলিয়াতে বাস করিত, খৃ. ৮ম শতাব্দীর মত পূর্ববর্তী কালেও তথায় ওরখান শিলালিপিতে উহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। যতদূর জানা যায়, এই উগুয্গণকে তুর্কী বলা হইত, তুর্কোমান নহে, শুধু পাশ্চাত্যেই উহাদিগকে তুর্কোমান নামে উল্লেখ করা হয়। প্রথমবারের মত উল্লেখ দৃষ্ট হয় ৮ম শতাব্দীর চীনা বিশ্বকোষ T'ung-tien-এর ১৯৩ তম অধ্যায়ে (F. Hirth in S. B. Bayr, Akad., ২খ, ১৮৯৯, পৃ. ২৬৩ প.)। T'o-ku-Mong Transcription-এর এই বিশ্বকোষের বর্ণনানুসারে সুক-তাক্ (Suk-Tak) প্রদেশের অন্য এক নাম ছিল তূকূ-মং (Tu-ku-Mong) অর্থাৎ Allan-দের প্রদেশ (দ্র. আলান সুগ্দাক্), যাহা খৃস্টীয় অব্দের সূচনায় সীর দারয়া (দ্র.)-র পূর্বদিকে ভাটি অঞ্চলের ন্যায় দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এই স্থানটি চতুর্থ/দশম শতাব্দীতে উগুযদের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

আরবীতে ভৌগোলিক সাহিত্যে 'তুর্কোমান' (আত্-তুর্কমান অথবা আত্-তুর্কমানীয়ূন নামটি আল-মুকাদ্দাসীই (B.G.A, 3খ, ২৭৪ প.) উল্লেখ করিয়াছেন কয়েকটি শহরের বর্ণনা উপলক্ষে; এই শহরগুলি আরবী জাব অথবা সায়রাম-এর উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। কিন্তু উহাদের অবস্থান সঠিক বর্ণনা করা অসম্ভব। পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই তুর্কোমান শব্দটির আদি রূপ লুপ্ত হইয়া যায়। প্রচলিত (ফারসী) শব্দ তুর্কমানান্দ (তুর্কীর ন্যায়) সম্ভবত মাহমূদ কাশগারীর (৩খ পৃ. ৩০৭) পূর্ব হইতে ব্যবহৃত হয়। এই সময় হইতে প্রায়শই "Turks and Turkomans" ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তুর্কোমানদের ভাষা, বিশেষত তাহাদের অবয়বের উপর তাহাদের পশ্চিমাভিমুখী অভিযাত্রা (migration)-র প্রভাব পড়িয়াছিল; ফলে তাহাদের ও অবশিষ্ট তুর্কীদের মধ্যে একটি সাদৃশ্যমাত্র বিদ্যমান ছিল। বর্তমান কালে মধ্যএশিয়ার অধিবাসী তুর্কোমানদিগকে তাহাদের লম্বা মস্তিষ্কের (dolichocephalic) সাহায্যে সহজেই সনাক্ত করা যায়; মাথার খুলির এই গঠনাকৃতি অংশত শৈশবকালে কৃত্রিম বিকৃতির মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু মধ্য এশিয়ার ইরানী যাযাবর জনগোষ্ঠীর সহিত তাহাদের সংমিশ্রণের ফল বলিয়াও ইহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মাহমূদ কাশগারী (১খ, পৃ. ৮০, ৩৯০) কারলুক (দ্র.)-গণকে সমভাবে তুর্কোমান উগুয নামে আখ্যায়িত করেন।

পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে তুর্কোমানদের পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপক বিস্তৃতি সম্পর্কে দ্র. প্রবন্ধদ্বয় "গুয্য" "সালজূক"। সালজূক রাজবংশের রাজনৈতিক গুরুত্বের ফলে মধ্যযুগের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় সালজূক তুর্কোমানদের সম্পর্কে আমরা অধিক বিশদ বিবরণ লাভ করিয়াছি। উদাহরণস্বরূপ রাশীদু'দ-দীন (textintrudi Vost. dtd. Arkh Obshc, ৭, ৩২ প.) স্বতন্ত্র "গুয গোত্রাদি"-র নাম উল্লেখ করেন। ভাষাগতভাবে প্রাচীনরূপে (যথা সালজূক-এর স্থলে সালগুর, য়াযীর-এর স্থলে য়ায্গীর) আমরা এই নামগুলি মাহমূদ কাশগারীর রচনায়ও (১৫৬ প.) দেখিতে পাই। রাশীদু'দ-দীন কর্তৃক বর্ণিত ২৪টি গোত্রের নামের মধ্যে ২১টিই মাহমূদ কাশগারীর তালিকার অনুরূপ। তিনটি নাম (য়ায়ইবলী, কারীক ও কারকীন) শুধু রাশীদু'দ-দীনের তালিকায় এবং একটি নাম (জারুক্লুগ বা চারুক্লুগ) মাহমূদ কাশগারীর তালিকায় দৃষ্ট। রাশীদু'দ-দীনের বর্ণনামতে গোত্রগুলির মোট সংখ্যা ছিল ২৪ (বহু তুর্কী ও তুর্কোমান পৌরাণিক কাহিনীতেও একই সংখ্যার উল্লেখ রহিয়াছে)। মাহমূদের মতে ২২; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তিও (৩খ, ৩০৭) জানিতেন, আদি সংখ্যা ছিল ২৪। কথিত আছে, দুইটি গোত্র প্রাক-ইসলামী যুগে বাকিগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খালাজ [দ্র.] গোত্র গঠন করিয়াছিল। মোঙ্গল যুগের পূর্ব পর্যন্ত তুর্কোমান নামটির প্রচলন উগুয নামটিকে বিতাড়িত করে নাই। ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীতে গুয শব্দটি সরকারী দলীলাদিতেও (Barthold, Turkestan, ২৮. প.) পরিদৃষ্ট হয়। বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলির বাসস্থান সম্পর্কে রাশীদু'দ-দীন কিংবা মাহমূদ কাশ্গারী কিছুই বলেন নাই। ঐতিহাসিকগণের (উদাহরণস্বরূপ Zap., ৯খ, পৃ. ৩০৩; Nesewi, সম্পা. Houdas, পৃ. ৩৯; G.M.S., ১৬, পৃ. ১২০, ১২২, যেইখানে "য়াক"-এর স্থলে "তাক্" পড়িতে হইবে) বর্ণনায় যাযীর অথবা "য়াযগীর গোষ্ঠী ছিল প্রাচীনতম (৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীর শেষ এবং ৭ম-৮ম শতাব্দীর শুরু) একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের সহিত সম্পৃক্ত; অঞ্চলটি হইল বালখান (দ্র.)-এর পূর্বে যেইখানে তাক-এর দুর্গ নগর, পরবর্তী কালে একদা দুরূন শহর অবস্থিত ছিল, Boharden রেল স্টেশন সন্নিহিত, বর্তমানে ইহা একটি বিধ্বস্ত স্থান। হাম্দুল্লাহ কায্বীনী-র বর্ণনানুসারে (G. M. S., ২৩/১খ, পৃ. ১৫৯, উপরে দ্র. সেইখানে এবং অনু. ২, ১৫৫-তে ভুলক্রমে 'বাযার' উল্লিখিত হইয়াছে) সেইখানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত; সুতরাং "য়াযীর" কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করে বলিয়া অনুমিত হয়। পরবর্তী কালে 'য়াযীর'-কে 'কারাতালী' বা 'কারাদালী' বলা হইত; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাহারা Tekke-গণ কর্তৃক 'আখাল' হইতে বিতাড়িত হয় (দ্র. Akhal Tekke)। পশ্চিম এশিয়ায় দেশান্তরিত তুর্কোমানদের মধ্যে যাহারা জাতিগতভাবে তুর্কমান ছিল তাহারা ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত হইয়া অল্প কয়েকটি অঞ্চলে মাত্র টিকিয়া থাকে। এতদসত্ত্বেও ইব্ন বাত্তূতা (দ্র.) 'উছমানী তুর্কীগণকেও তুর্কোমান বলিয়া আখায়িত করেন (Voyages, ২খ, ৩২১)। নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীতে খালীল আজ-জাহিরী (G. A. L., ২খ, ১৩৫) মামলূক (দ্র.) সাম্রাজ্যের 'গায্যা' (দ্র.) হইতে 'দিয়ার বাক্র' পর্যন্ত ভূখণ্ডে বসবাসরত তুর্কোমান উপজাতিসমূহের একটি তালিকা প্রদান করেন (দ্র.) (P.E.L.O.V., ৭খ, S. V., ১৬খ, ১০৫)। তালিকায় উল্লিখিত উপজাতিগুলির মধ্যে শুধু দুল্গাদিরগণ (দ্র. যু'লকাদ্র) কিছুটা রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করেন। বস্তুতপক্ষে পশ্চিম এশিয়াতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি তুর্কোমান রাষ্ট্র ছিল। একটি কারা-কোয়ুন্লু [দ্র.] এবং অপরটি আক-কোয়ুন্লু [দ্র.] রাজবংশীয়দের দ্বারা গঠিত। অদ্যাপি বিখ্যাত তুর্কোমান কার্পেটের কথা পাশ্চাত্যে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয় (আবু'ল-ফিদা', সম্পা. Reinaud, পৃ. ৩৭৯, ইব্ন সা'ঈদ হইতে)।

কার্পেটগুলি মহিলাদের প্রধানত তরুণীদের হস্ত সম্পাদ্য ছিল। মধ্য এশিয়ার কতিপয় তুর্কী জনগোষ্ঠীর মধ্যে তুর্কোমানগণ ছিল মুষ্টিমেয়, উহারা এমন কি মোঙ্গল যুগের পরেও তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত করিয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক উপজাতির পুরাতন নাম টিকিয়াছিল, সমকালীন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম উপজাতি (তেক্‌কে, গুক্‌লেন, য়ুমুট, এরসারী, গাবীক প্রভৃতি)-গুলির নাম মোঙ্গলদের পূর্বে উল্লিখিত হয় নাই। অন্যান্য যাযাবর বা অর্ধ যাযাবরদের ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে, উহাদের মধ্যেও একক ব্যক্তিত্বের কৃতকর্মকে কেন্দ্র করিয়া নূতন নূতন সংগঠনের উৎপত্তি হয়; অনুরূপভাবে সারীক গোত্রের একটি শাখা জনৈক নেতার নামানুসারে নিজদিগকে 'বাইরুচ' নামে অভিহিত করে; তিনি ১৬৫১ খৃ. মারা যান (আবু'ল-গাযী, সম্পা. Desmaisons, পৃ. ৩২৪ প.)। ৬ষ্ঠ-৭ম শতাব্দীতে তুর্কোমানদের সম্পর্কে সর্বাধিক তথ্য পরিবেশিত হয়, আবু'ল-গাযী রচিত বৃহত্তর গ্রন্থে এবং তুর্কোমানদের প্রসংগে রচিত তাঁহার ইতিহাস "শাজারা-ই তারাকিমা"-তে (বিশ্বকোষে উল্লিখিত হয় নাই) যাহা অদ্যাবধি একটি রাশিয়ান অনুবাদে পরিদৃষ্ট হয় (আরখাবাদ ১৮৯৭)।

যেহেতু তুর্কোমানগণ তাহাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনে অপারগ ছিল, সুতরাং তাহারা বিভিন্ন রাষ্ট্রে (পারস্য, খাওয়ারিযম, বুখারা এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে আফগানিস্তানেও) বাস করিত। বস্তুত তুর্কোমানগণ সচরাচর এই সকল রাজ্যে তাহাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাবাহিনীকে বারংবার তাহারা মারাত্মকভাবে পরাজিত করে। বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলিও প্রায়শ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তেককে সম্প্রদায় অন্যান্য তুর্কোমান গোত্রের উপর বিজয়ের মাধ্যমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। একমাত্র কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তুর্কোমানগণ তাহাদের ঐক্যের অনুভূতি লাভ করিত; তাহারা Goklen গোত্রের মাখ্‌তূম কুলী-কে তাহাদের জাতীয় কবিরূপে বিবেচনা করিত। এই কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খ্যাতি অর্জন করেন (তাহার পিতা দাওলাত সামাদ যিনি ১১৬৭/১৭৫৩-৫৪ সালের দিকে গ্রন্থ রচনা করেন) [Zap., ১৭খ., পৃ. ১৪৬]। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তুর্কোমান গোত্রের একটি শাখা মাংগীশলাক্ [দ্র.] হইতে দেশান্তরিত হইয়া কাস্‌পিয়ান সাগর হইতে উত্তর দিকে গমন করে এবং প্রাক্তন রাশিয়ান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে; অদ্যাবধি তাহারা 'কুরনা" ও 'মানিচ' নদীর অববাহিকায় অবস্থান করে, খৃ. ১৯১২ সালে এই তুর্কোমানদের সংখ্যা ছিল ১৫,৫৩৪, খৃ. ১৯০৬ সালে ছিল ১৫,৯৯০। আত্মীয়-স্বজন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলেও এই সকল তুর্কোমানের জাতীয় কবি ছিলেন মাখ্‌তূম কুলী। মধ্যএশিয়ায় প্রাক্তন রাশিয়ার বিজয়, বিশেষত Krasnowodsk অধিকার (১৮৬৯) এবং খিওয়া-এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান (১৮৭৩), তুর্কোমান গোত্রসমূহের বশ্যতা লাভ করা অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে। তাহাদের বশ্যতা লাভ সমাপ্ত হয় খৃ. ১৮৮১ সালে গাক্‌টেপ (দ্র.)-এর জবরদখলের মাধ্যমে। ১৮৮৪ সালে মার্ব (مرو)-এর ও ১৮৮৫ সালে ইহার দক্ষিণাঞ্চলের 'স্বেচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। পরবর্তী বৎসরগুলিতে সম্পাদিত সীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত সন্ধিসমূহ, প্রাক্তন রাশিয়া, পারস্য ও আফগানিস্তানে তুর্কোমানদের বর্তমান আবাসভূমির বণ্টন স্থির করে। প্রাক্তন রাশিয়ার তুর্কোমানিয়া এলাকা প্রথমে একটি পৃথক অঞ্চল (Transcaspian) হিসাবে অনুমোদিত হয়, কিন্তু ১৮৯৮ সালে ইহা তুর্কিস্তান (দ্র.)-এর গভর্নর জেনারেলের প্রশাসনভুক্ত হয়। বিপ্লব ও বহুজাতিক সমস্যা সমাধানের পর ১৯২৪ খৃ. তুর্কোমানিয়া প্রাক্তন Socialist Soviet Republic-রূপে সংগঠিত হয়। খৃ. ১৯২৬-১৯২৭-এর আদমশুমারি অনুসারে এই প্রজাতন্ত্রের জনসংখ্যা ছিল ১০,৩০,৬৪১। তন্মধ্যে ৭,১৯,৭৯২ জন ছিল তুর্কোমান; বিভিন্ন শহর ও বৃহত্তর গ্রামগুলির জনসংখ্যা ছিল ১,৩৬,৯৮২, তুর্কোমান ছিল মাত্র ৮,৭৯০ জন। পারস্য ও আফগানিস্তানের তুর্কোমানদের সংখ্যা সম্পর্কে আমাদের নিকট কোন সঠিক পরিসংখ্যান নাই। Aristow-এর অনুমানে (১৮৯৬) ইহাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮০,০০০, আফগানিস্তানে ৫০,০০০ ও পারস্যে ২০,০০০। উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সনে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় তুর্কোমানীরাও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত সূত্রাদির অতিরিক্ত-(১) H. Vambery. Das Turkenvolk in Seinen ethnologischen und ethnographischen Beziehungen geschildert, Liepzing. ১৮৮৫ খৃ., পৃ. ৩৮২ প.; (২) N. Aristow, Zamietki ob etniceskom sostavie tyurkskikh plemen, St. Petersburg 1897; (৩) A. Semenow Ocerki iz istorii Presoedneniya holroi Turkmeuii (1881-1885), তাশ্‌খন্দ ১৯০৯ খৃ.; (৪) R. Karutz, Unter Kirzizen und Turkmenen, বার্লিন [তা. বি.]; (৫) L. Oshanin Tisyacele-tnyaya devnost dolikhcefalii u turkmen i vozmozniie Puti eic Proiskhozdeniya (Izv. Sreneaz. Komiteta, ১খ, ১৩১ প.); (৬) do, Neehkotoriie dopolnitel'nice niic dauniick gipoteze skifo- samteksgo proiskhoz deniya turkmen, তাশখন্দ ১৯২৮; (৭) Turkmeniya, ১খ, লেনিনগ্রেড ১৯২৯; (৮) W. Barthold, Ocerk istorii turkmenskogo naroda; (৯) A. Samoylovic, ocerki po istorii turk menskoi literaturi; (১০) N. Aitakow, Trigodo Turkmenii, আশ্‌খাবাদ ১৯২৮ খৃ.।

W. Barthold (E., I. [1])/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

তুর্কোমান সাহিত্য ঃ প্রায় আধুনিক যুগ পর্যন্ত Transcaspian Turkoman-দের সাহিত্য প্রধানত 'ইশক' (عشق)-গণের রচিত কবিতাবলী সম্বলিত জনপ্রিয় অলিখিত লোকসাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। লিখিত সাহিত্যের পশ্চাৎপদতার কারণ এই যে, তুর্কোমানগণ কখনও রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে নাই, তাহাদের জীবনধারা ছিল যাযাবরসুলভ এবং স্থায়ী শহুরে জীবনের ধারাসমূহ তাহারা কখনও অবলম্বন করে নাই। যদিও তুর্কোমানদের জনপ্রিয় সাহিত্য (যাহাতে ছিল প্রবাদবাক্য, ধাঁধা, কল্পকাহিনী, সঙ্গীত প্রভৃতি) ও আরও পশ্চিমে বসবাসরত উগুয (অর্থাৎ পারস্যবাসী, তুর্কী, ককেসীয় ও আনাতোলীয়)-দের সাহিত্যের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়, তথাপি আমরা তুর্কোমানদের মধ্যে প্রাক-ইসলামী যুগের জীবনধারার অধিকতর লক্ষণাদির সন্ধান লাভ করি। তুর্কোমানদের লিখিত সাহিত্যে রহিয়াছে গীতিকাব্য, মহাকাব্য, ধর্মীয় তথা শিক্ষামূলক কবিতা, এমন কি জনপ্রিয় প্রেমের কবিতা, যাহা বাক্‌শী (দ্র.) অর্থাৎ ভ্রমণশীল গায়কগণ তুর্কোমানদের সমাজে গাহিয়া বেড়াইত। অবয়ব ও বিষয়গতভাবে এই কবিতাদির মধ্যে এবং আযারবায়জান ও আনাতোলিয়ায় 'আশিক'-দের মাধ্যম জনপ্রিয়তা অর্জনকারী কবিতাসমূহের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। এই সকল কবিতা এক স্বরবিশিষ্ট শব্দের ছন্দে (Syllabic metre) এবং গোশ্‌গী (তু. কোশমা) নামে কথিত চতুষ্পদী

(quatrains) কবিতার স্তবকে লিখিত। তুর্কোমানদের মধ্যে এই শব্দটি (গোশগী) যে কোন কবিতার অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহৃত। অজ্ঞাতনামা কবিদের জনপ্রিয় রম্য রচনাসমূহ আযারবায়জান এবং আনাতোলিয়ার কবিতাবলীর ন্যায় অনুরূপ প্রসঙ্গে রচিত (উদাহরণ, যেমন ধীবর ও তাহার সহচর (সায়্যাদ-ইলা হাম্‌রাহ) 'আশিক'-ই গারীব, কূর ওগ্‌লু, তাহির ও যুহ্‌রা, য়ূসুফ ও আহ্‌মাদ) ইত্যাকার প্রসংগাদি মূলত উগুয সম্প্রদায়ের সাহিত্যের উপজীব্য ছিল। তুর্কোমান ও আযারবায়জানী জনপ্রিয় সঙ্গীতের মধ্যেও নিকট সম্পর্ক দৃষ্ট হয়। উগুয তুর্কী জাতিপুঞ্জের সাহিত্যের মধ্যে এই সংযোগের দুইটি ব্যাখ্যা দেওয়া যায় ঃ প্রথম, সকল গোত্রের মধ্যস্থিত প্রাচীন (Common) সংস্কৃতির আংশিক বিরাজমানতা এবং দ্বিতীয়ত, আংশিকভাবে তাহাদের পরবর্তী কালের পারস্পরিক প্রভাব। অনুরূপভাবে সুবিখ্যাত রম্য রচনা "য়ূসুফ ও আহ্‌মাদ" (যাহা উয্‌বেগগণ কর্তৃকও গৃহীত) এবং "দাদ্‌ কোরকুত"-এর গ্রন্থ (প্রাচীন উগুয মহাকাব্যের একটি অবশিষ্টাংশ) এই দুইয়ের মধ্যে সুদৃশ্যমান সম্পর্ক বিদ্যমান। তুর্কী সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি, তথা খুরাসান, খাওয়ারিয্‌ম ও তুর্কিস্তানের সহিত তুর্কোমানদের সংস্রবের কারণেও অধিকন্তু মধ্যএশিয়ার তুর্কী সাহিত্য দ্বারা তুর্কোমান সাহিত্য প্রভাবিত হইয়াছিল। নাসীমী ও ফুযুলীর ন্যায় উগুয্‌-আযেরী কবিদের রচনা এবং চাগ্‌তাই মহাকবি 'আলী শীর নাওয়াঈ-এর রচনা এখনও তুর্কোমানদের মধ্যে পঠিত হইয়া থাকে। শেষোক্ত ব্যক্তির এমন কি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সুলতান হুসায়ন বায়কারা-র স্মৃতি অদ্যাবধি জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান। আহ্‌মাদ য়েসেবী এবং তাঁহার শাগরিদদের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় সর্বাধিক পরিচিত তুর্কোমান কবি মাখ্‌দূম কুলীর রচনায় (তু. ঈল্‌ক মুতাসাওবিফলার, পৃ. ১৯৯)।

প্রাক্তন তুর্কমানিস্তানে রচিত তুর্কোমান সাহিত্যের প্রথম দিককার রচনাবলী সম্পর্কে অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্য খুবই নগণ্য। আবু'ল-গাযী তাঁহার "শাজারা-ই তারাকিমা" গ্রন্থে মু'ঈনু'ল-মুরীদ নামক একটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করেন যাহা তাঁহার মতে, তাঁহার সময়কালেও তুর্কোমানদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। খৃ. ১৩১৩ সনে রচিত এই গ্রন্থে যদিও যাযাবর জীবনের কিছু বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু বাস্তবে খাওযারিয্‌মের তুর্কীদের মধ্যেই এই গ্রন্থ রচিত হয় এবং তুর্কোমানদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অতঃপর আসে মাছনাবী রাওনাকু'ল-ইসলাম (رونق الاسلام)-এর কথা। লোককাহিনীতে খাওয়ারিযম-এর শায়খ শারাফ-এর প্রতি ইহার রচনা আরোপিত, কিন্তু যাকী ওয়ালীদ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ওয়াফা'ঈ নামক জনৈক কবি গ্রন্থখানা ৮৮৯/১৪৮৪ সালে রচনা করেন। তুর্কোমানদের মধ্যে অদ্যাবধি এই গ্রন্থ অধিত হয়; ইহা 'আরূদ (عروض) ছন্দে রচিত, কিন্তু ইহার কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। সম্ভবত এই ওয়াফা'ই ছিলেন শাহ ইস্‌মা'ঈল সাফাবীর শাসনামলে খুরাসানের তুর্কোমান রাজন্যবর্গের অনুগামিগণের অন্তর্ভুক্ত কবিদের অন্যতম। যাহা হউক, সম্ভবত তিমূরী আমলের মত দূরবর্তী সময়েও খুরাসানে তুর্কোমান চাগ্‌তাই রীতিতে রচিত কবিতাদির আবৃত্তি হইত। সাম মীরযা [দ্র.] রচিত তায্‌কিরা ও চাগতাই রীতিতে রচিত সাদীকী-র "মাজ্‌মা'উ'ল-খাওয়াস্‌স নামক তায্‌কিরা হইতে আমরা ১৬শ শতাব্দীর বিভিন্ন তুর্কোমান কবিদের কবিতা সম্বন্ধে অবগত হই (মাজ্‌মা'উ'ল্‌-খাওয়াস্‌স-এর জন্য দ্র. W. Pertsch, Die turk, HSS. Zu Gotha, নং ১৬৯)। যাহা হউক, এই কবিতাসমূহ শহরবাসীদের জন্য রচিত বিধায় যাযাবরদের মধ্যে পরিচিত ছিল না। আবু'ল-গাযী রচিত শাজারা-ই তারাকিমা গ্রন্থটি (আবু'ল-গাযী নিবন্ধে অনুল্লিখিত) তুর্কোমানদের মধ্যে পরিচিত ছিল। ১৮৯৭ খৃ. তুমান্‌স্‌কী কর্তৃক 'আশ্‌কাবাদ-এ এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয় (৬ষ্ঠ পাণ্ডুলিপিটি সম্প্রতি Samoilovitch কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; তু. Comptes Rendus de l'Academie des Sceinces del' U. R. S. S., ১৯২৭, নং ২, পৃ. ৩৯-৪২)। যদিও উগুযদের ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি হইতে ধার করা কিছু তথ্য এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তথাপি তুর্কোমানদের প্রাচীন ঐতিহ্যের জনশ্রুতিও ইহাতে রহিয়াছে। যেহেতু নকলনবীশগণের হস্তে জ্ঞাত পাণ্ডুলিপিগুলির ভাষা বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে, সুতরাং তুর্কোমানদের প্রাচীন উপভাষার নমুনাস্বরূপ এই ভাষার মূল্য যাহা হইতে পারিত তাহা হয় নাই।

বর্তমান কালের তুর্কোমানদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও প্রাপ্ত অন্য সূত্রসমূহ কেবল অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর জন্য সহায়ক। সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি Samoilovitch, তুর্কোমান গোত্রসমূহের প্রায় ২০ জন কবির নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতাসমূহ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক কর্মকাণ্ড স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে এবং বিনা ব্যতিক্রমে তুর্কোমানদের সকলেই এই সকল কবিতা আবৃত্তি করে। গুক্‌লেন-এর সম্প্রদায় সম্ভবত অন্যান্য গোত্রের পূর্বে স্থায়ী বসতি অবলম্বন করিয়াছিল বিধায় এই গোত্র অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক সংখ্যক কবির জন্ম দিয়াছিল। প্রথমত সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মাখ্‌দূম কুলী, তাঁহার পিতা দাওলাত মুহাম্মাদ মোল্লা আযাদী, অতঃপর তাঁহার জামাতা ও শাগরিদ যালীলী, পরিশেষে ইরসারীদের কবি সায়্যিদী, যিনি গুক্‌লেনদের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দাওলাত মুহাম্মাদ মোল্লা আযাদী ১১৬৭/১৭৫৩ সনে নীতি কাব্যসম্বলিত ওয়া'জ-ই আযাদী (وعظ ازادی) শিরোনামে 'আরূদ (عروض) ছন্দে একটি মাছনাবী রচনা করেন যাহাতে চাগ্‌তাই সাহিত্যের প্রভাব দৃশ্যমান ছিল। এই একই কবি 'আশিকদের রীতিতেও কবিতা রচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে মা'রূফী ও শায়দায়ী-র নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। আযাদীর ন্যায় মাদ্‌রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তেক্‌ক গোত্রের 'আব্‌দু'স্‌-সাত্তার কাদী, ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্য এক কবি, যাঁহার রচিত জাংগনামা ১৯১৪ খৃ. Samoilovitch কর্তৃক প্রকাশিত হয়। y-- 1--y---1y---1 ছন্দে রচিত এই মাছনারী, তেক্‌ক সুন্নী ও পারসিয়ান শী'ঈদের মধ্যে সংঘাতের একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা সম্বলিত এক ঐতিহাসিক কাব্য। যাহা হউক, গ্রন্থটি তুর্কোমানদের জনপ্রিয় ভাষার বিশুদ্ধ নমুনা নহে। মাখ্‌দূম কুলী খুরাসানে শের 'আলী খান-এর মাদ্‌রাসায় শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃত জীবন বিস্তর লোক-কাহিনীতে আচ্ছন্ন। তাঁহার জনপ্রিয়তা এত অধিক ছিল যে, অন্য বহু কবির কবিতাও তাহার নামে আরোপিত করা হইত, এমন কি ঐ সকল কবির কবিনাম (تخلص) কবিতার শেষে সংযোজিত থাকিত। খীওয়া-র তুর্কোমানদের মধ্যে, এমন কি উযবেগদের মধ্যে, 'মাখদূম' কুলীর কবিতা পড়, "তুর্কোমান ভাষায় শিক্ষামূলক কবিতা পাঠ কর", এই অর্থ প্রকাশ করা হইত। তাঁহার প্রতি আরোপিত ২৭৯টি কবিতার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কয়টি তাহার নিজের তাহা আমরা জানি না। এই সকল কবিতার মধ্যে ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কবিতা যেমন আছে, অনুরূপভাবে পারস্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অনুপ্রেরণায় রচিত কবিতাদিও রহিয়াছে। এই কবিতাগুলি জীবন সম্পর্কে তুর্কোমানদের ধারণা কি তাহা জানিবার পক্ষে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যালীলী ও সায়্যিদী রচিত "গোশগী" কবিতাতেও এই প্রচলিত গণপ্রজ্ঞা প্রতিফলিত। 'আরূদ ছন্দে ও পঞ্চপদী ষটপদী প্রভৃতি অবয়বে এই কবিতাগুলি রচিত।

খৃ. ১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লবের সময় হইতে তুর্কোমানদের মধ্যে পুনর্জাগরণের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, কিন্তু খৃ. ১৯১৭ সাল হইতেই কেবল এই আন্দোলন সুসংহত হয়। এই নবায়িত বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত

কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হইল 'আশকাবাদ। স্কুল পাঠ্যবই, সাময়িকী ও সংবাদপত্রাদিও তুর্কোমান ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং তুর্কোমান সংস্কৃতির জন্য একটি সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিতত্ত্ব, সঙ্গীত ও জনপ্রিয় সাহিত্য অনুশীলন করা হয় এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মার্কসীয় সাহিত্য প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপিত হয়। যদিও এই নূতন সাহিত্যিক প্রকাশনাগুলি অদ্যাবধি তেমন কোন সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে নাই, তবুও অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে ঃ যথা সায়্যিদী ও যালীলীর গ্রন্থাবলীর সংকলন এবং সায়্যাদ ইলা হাম্‌রাহ হিকায়িসী (Geldiyeff ও Kulmehmedoff-এর মত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংকলন)। প্রাক্তন রাশিয়ার প্রাচ্যবিদগণের সহযোগিতায় রচিত তুর্কোমানদের এই সকল গবেষণা কর্ম অদূর ভবিষ্যতে সম্ভবত তুর্কোমান সাহিত্যের অজ্ঞাত কালের উপর আলোকপাত করিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Chodzko, "Specimens of the Popular Poetry of Persia" 1842 (তুর্কোমান কবিগণ এবং মাখদূম কুলী সম্পর্কে প্রাচীনতম বর্ণনা); (২) Berezin, Chrestomathie (ইহাতে কতিপয় তুর্কোমান কবিতা প্রকাশিত); (৩) H. Vambery, Travels, লন্ডন ১৮৬৪ (মাখদূমকুলী সম্পর্কে এই গ্রন্থে কিছু তথ্য পরিবেশিত); (৪) ঐ লেখক, খৃ. ১৮৭৯ সালে Z. D. M. G. ৩৩-এ, নিবন্ধে মাখদূম-এর কবিতার ৩১টি খণ্ডাংশ প্রকাশ করেন, তবে ইহাতে অনেক ভুলভ্রান্তি রহিয়াছে; (৫) Samoilovitch ৮টি প্রবন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলির নাম ও তথ্যাদির জন্য দ্র. E. I.[1]; (৬) H. Vambery, Yusuf and Ahmed, Budapest 1911; Kazan 1904, in Cagataische Sprachstudien, Leipzig, ১৮৬৭, পৃ. ৯৫-১১৪, Vambery কর্তৃক কতিপয় অধ্যায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত। (৭) মু'ঈনুল-মুরীদ, তু. যাকী ওয়ালীদী, Khwarizmde yuzilmisk eski turkce Etherler, in তুর্কিয়াত মাজ্‌মূআসী, ২খ, ৩১৫-৪৫। রাওনাকু'ল-ইসলাম-এর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি Samoilovitch কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (উনবিংশ শতাব্দীর এক নূতন পাণ্ডুলিপি আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে আছে); ১৮৫০ খৃ. তাতারিস্তানের রাজধানী কাযানে গ্রন্থখানা প্রথম প্রকাশিত হয়; ১৯০৫ খৃ. Ostroumof কর্তৃক তাশ্‌কন্দ-এ ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়; মাখদূম কুলী বিরচিত দীওয়ান শায়খ মুহ্‌সিন ফানী কর্তৃক ১৯৩৪ খৃ. কন্‌স্টান্টিনোপল-এ প্রকাশিত হয়, Vambery -এর সংস্করণের তুলনায় ইহাতে অধিকতর ভুল-ভ্রান্তি রহিয়াছে। মাখ্‌দূম কুলী সম্পর্কিত প্রকাশনার সমালোচামূলক গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্র. (ক) যাকী ওয়ালীদী, তুর্কিয়াত মাজমূ'আসী, ২খ, ৪৬৫-৪৭৪; (খ) KulMehmed of Seydi ghoshghilari, 'আশ্‌কাবাদ ১৯২৬ খৃ.; (গ) ঐ, সায়াদ ইলা হামরাহ, 'আশ্‌কাবাদ ১৯২৭ খৃ.; (ঘ) তুর্কোমান সাহিত্য সম্পর্কিত সর্বশেষ ও অত্যন্ত নিখুঁত প্রকাশনা হইল Samoilovitch-এর নিবন্ধ, Ocerki po istoruturkmenskoy literatury, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান একাডেমী কর্তৃক Turkmeniya সাময়িকীতে, ১খ., ১৯২৯ খৃ. প্রকাশিত।

Koprulu zade Fu'ad (E.I.[1])/মুহাম্মাদ সাইয়েদুল ইসলাম

আত-তুলায়তিলী (الطليطلي) ঃ একটি জাতিগত নাম, বিখ্যাত স্পেনীয় পণ্ডিত আবু'ল-কাসিম সা'ঈদ ইব্ন আহমাদ আল-আনদালুসী, যিনি সাধারণ্যে "কাদী সা'ঈদ" নামে অভিহিত, কখনও কখনও এই নামে অভিহিত হন। ৪২০/১০২৯ সনে আলমেরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী সা'ঈদ তাঁহার শিক্ষা জীবন কর্ডোভায় শুরু করেন এবং তৎকালীন যু'ন-নূনী [বর্তমান নিবন্ধটি দ্র.] রাজবংশের রাজধানী ও অত্যন্ত উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র টলেডোতে সমাপ্ত করেন। আইন, ইতিহাস, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের কারণে তিনি অচিরেই খ্যাতি অর্জন করেন। যুন-নূনী আমীর য়াহ্‌য়া আল-মা'মূন কর্তৃক তিনি টলেডোর কাদী নিযুক্ত হন এবং শাওয়াল ৪৬২/জুলাই ১০৭০ সনে ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন।

সা'ঈদ জ্যোতির্বিদ্যার উপর একটি গ্রন্থ, একটি সার্বজনীন ইতিহাস পুস্তক এবং ইব্ন হাযম-এর কিতাবু'ন-নিহাল রীতিতে অন্য একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি বর্তমানে বিলুপ্ত বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানে এই লেখকের একমাত্র কিতাব তাবাকাতি'ল-উমাম (সম্পা. Cheikho, বৈরূত ১৯১২ খৃ.) শীর্ষক বিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রন্থটি আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই গ্রন্থটি দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে যে সকল জাতি বিজ্ঞান চর্চা করে না লেখক তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাঁহার এই আলোচনা জনসাধারণের মধ্যে সীমিত রাখেন। দ্বিতীয় অংশে সা'ঈদ বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী আটটি জাতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ইহারা হইলঃ হিন্দু, পার্সী, ক্যালডীয়, গ্রীক, পাশ্চাত্যবাসী, মিসরীয়, আরব ও য়াহূদী। বর্তমান কালে কেবল গ্রীক, আরব ও য়াহূদী জাতিগুলি সম্পর্কে রচিত অধ্যায়গুলির প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারি। তথ্যের সংক্ষিপ্ততা ও ক্ষুদ্র কাহিনী আকারে উহার পরিবেশন এবং তদুপরি কোন প্রকার কারিগরী উন্নয়নের অনুপস্থিতি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, সাই'দের বিশেষজ্ঞদের ন্যায় কোন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না, বরং তিনি একটি সাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। দুর্ভাগ্যবশত কিতাব তাবাকাতি'ল-উমাম গ্রন্থখানির যে বৈশিষ্ট্য উহার গ্রন্থকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা শীঘ্রই জনসাধারণের দৃষ্টিতে লোপ পায়। অতি শীঘ্রই গ্রন্থখানি বিজ্ঞানের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্তসার হইবার পরিবর্তে সকল মানবিক জ্ঞানের বিশদ আলোচনা সম্বলিত একটি প্রধান গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইতে শুরু করে। শীঘ্রই–এবং তাহা আরও মারাত্মক–সা'ইদের গ্রন্থখানি, এমন কি তথ্য সংকলনের পরিবর্তে তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসাবে পরিগণিত হইতে থাকে। ১৩শ শতাব্দীতে এই ভ্রম নিশ্চিতভাবে সে সকল আরব লেখকদের দ্বারা অনুমোদিত হয় যাঁহারা বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে লিখিয়াছেন। ইব্নু'ল কিফতী কিতাব তাবাকাতি'ল-উমাম গ্রন্থখানি হইতে প্রচুর পরিমাণে ধার করিয়াছেন এবং ইহা অনুমান করা যায় যে, তিনি উক্ত গ্রন্থখানি হইতে যে পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তদীয় গ্রন্থ তা'রীখু'ল-হুকামা'-র অন্তত সিকি পরিমাণ হইবে। এমন কি, ইব্ন আবী উসায়বি'আ তাঁহার 'উয়ূনু'ল-আনবা' ফী তাবাকাতি'ল-আতিববা' শীর্ষক মহাগ্রন্থে কয়েকজন চিকিৎসকের জীবন চরিত হুবহু সা'ইদের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বশেষ খৃস্টান লেখক Bar Hebraeus-ও বিজ্ঞানের শত্রু ও মিত্র পক্ষে মানুষদের বিভক্তিকরণ এবং তাঁহার আরবী ইতিহাস গ্রন্থ মুখতাসারু'দ-দুওয়াল-এ বর্ণিত প্রতিটি জাতির সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ উক্ত একই গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন বাশকুওয়াল, কিতাবু'স-সিলা, নং ৫৩৫; (২) আদ-দাব্বী, বুগয়াতু'ল-মুলতামিস, নং ৮৫২ bis; (৩) আল্-মাককারী, Analectes, ১খ, ৯০৫, ২খ, ১২৩; (৪) Brockelmann, G.A.L., ১খ, ৩৪৪; (৫) Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber, নং ২৪৪; (৬) Pens Boigues, Ensyo bio-bibliografico, নং ১০৬; (৭) Hesperis, 1928 (Une source de l'histoire des. sciences chez les Arabes: les "Tabakat al-umam" de Said al-Andalusi)।

R. Balchere (E.I.[1])/মু. আবদুল মান্নান

তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র আল-কুরাশী (طليب بن عمير القرشى) (রা) একজন মুহাজির সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফাতো ভাই, উপনাম আবূ 'আদী। মাতার নাম আরওয়া বিন্ত 'আবদি'ল-মুত্তালিব। তাঁহার বংশ তালিকা ঃ তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র (মতান্তরে 'আমর) ইব্ন ওয়াহ্ব ইব্ন আবী কাছীর ইব্ন 'আবদ ইব্ন কুসায়্যি ইব্ন কিলাব ইব্ন মুর্‌রা ইব্ন কা'ব ইব্ন লু'আয়্যি ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র ইব্ন মালিক ইব্নু'ন-নাদর ইব্ন কিনানা।

তুলায়ব (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদিগের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (স) আরকাম (দ্র.)-এর গৃহে থাকাকালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁহার মাতার নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং মুহাম্মাদ (স)-এর অনুসারী হইয়াছি। শুনিয়া তাঁহার মাতা বলিলেন, তুমি যাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ কর এবং যাঁহাদের সাহায্য-সহযোগিতা কর তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যনিষ্ঠ ও হক হইল তোমার মামাতো ভাই [মুহাম্মাদ (স)]। আল্লাহ্‌র কসম! পুরুষগণ যাহা করিতে সক্ষম হয় আমিও যদি তাহা করিতে সক্ষম হইতাম তবে অবশ্যই আমি তাঁহার অনুসারী হইতাম, তাঁহার কষ্ট দূর করিতাম এবং তাঁহার সাহায্য-সহযোগিতা করিতাম। পরে তুলায়ব (রা)-এর সক্রিয় ভূমিকায় তাঁহার মাতাও ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পুত্রকে সদাসর্বদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহায্য-সহযোগিতা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তুলায়ব (রা)-এর ছিল অত্যন্ত গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি কাফিরদের কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর পক্ষ হইয়া মুশরিকের রক্ত প্রবাহিত করেন। ঘটনাটি হইল, তিনি শুনিতে পাইলেন যে, 'আওফ ইব্ন সাবুরা আস-সাহ্‌মী রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দিতেছে। তখন তিনি তাহাকে বেদম প্রহার করিলেন, এমন কি তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত প্রবাহিত হইল। আল-বালাযুরীর বর্ণনামতে মুসলমানগণ শি'বে আবূ তালিব-এ অন্তরীণ থাকাকালে তিনি একবার আবূ লাহাবকেও মারিয়া রক্তাপ্লুত করিয়া দিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তিনি হাবশায় হিজরত করেন এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনাতে প্রথমে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালামা আল-'আজলানী (রা)-র গৃহে উঠেন। রাসূলুল্লাহ (স) তুলায়ব (রা)-কে মুনযির ইব্ন 'আমর আস-সা'ইদীর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন।

তুলায়ব (রা) একজন ভাল যোদ্ধা এবং বীর পাহলোয়ানও ছিলেন। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন এবং জুমাদা'ল-উলা ১৩ হি. আজনাদায়ন-এর যুদ্ধে শহীদ হন (মতান্তরে য়ারমূক-এর যুদ্ধে)। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৩৫ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২৩২-২৩৪, সংখ্যা ৪২৮৮; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৬৫; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'র-কুব্‌রা' বৈরূত তা. বি., ৩খ, ১২৩-১২৪; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইসতী'আব, মিসর তা., বি., ২খ, ৭৭২-৭৭৩, সংখ্যা ১২৯০; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমা'ই'স- সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৭৯, সংখ্যা ২৯৪০।

ড. আবদুল জলীল

তুলায়হা ইব্ন খুওয়ায়লিদ (طليحة بن خويلد) ঃ ইব্ন নাওফাল আল-আসাদী আল-ফাক'আদী, ভণ্ড নবী হিসাবে রিদ্‌দা যুদ্ধে গোত্রীয় নেতাদের মধ্যে অন্যতম।

৪র্থ হিজরীতে আসাদ গোত্রের নেতা হিসাবে ভ্রাতা সালামাসহ কাতান যুদ্ধে মুসলিমদের নিকট পরাজয় বরণ করে এবং পরবর্তী বৎসর (খন্দকের যুদ্ধে) মদীনা অবরোধে অংশগ্রহণ করে। ৯ম হিজরীর প্রথমদিকে তুলায়হা সম্ভবত আসাদ গোত্রের একটি অংশ মাত্রের প্রতিনিধি হিসাবে (দশজন আসাদীর অন্যতমরূপে) মদীনায় আগমন করে এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে। ৪৯ঃ১৪-১৭ আয়াতে ইহাদের ঔদ্ধত্যের নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। একটি বর্ণনামতে তুলায়হা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা ধর্মগ্রহণ অপেক্ষা রাজনৈতিক কারণে আত্মসমর্পণ বলিয়া মনে হয়। রিদ্দা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া এই ধর্মান্তরের প্রশ্নটি উঠিয়াছিল হয়ত, কারণ রিদ্দা যুদ্ধ ধর্মত্যাগীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

তুলায়হা ১০ম হি. সনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নবীর ভূমিকা গ্রহণপূর্বক সে 'সামীরায় তাহার সৈন্য সমাবেশ করে এবং হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার আগ্রহ প্রকাশ করে বলিয়া কথিত আছে। মহানবী (স) তাহাকে প্রতিরোধের জন্য দিরার ইব্ন আল-আদওয়ারকে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় কোন ফলপ্রসূ সংঘর্ষ বাধে নাই। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর তুলায়হা বানূ ফাযারা ও বানূ তায়্যি-এর একটি প্রধান অংশের সমর্থন লাভে সক্ষম হয় এবং যু'ল-কাসসা যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া মধ্য আরবের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে।

রাজাব ১১ হি. সনে খালিদ ইবনু'ল-ওয়ালীদ (রা) তুলায়হার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং ভীতি প্রদর্শন করিয়া বানূ তায়্যি-এর অধিকাংশ লোকের সমর্থন আদায় করেন। বুযাখা নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তুলায়হা যুদ্ধে পরাজিত হয়। কারণ বানূ ফাযারা গোত্রের প্রধান 'উয়ায়না ইব্ন হিস্‌ন দলত্যাগ করে। কথিত আছে যে, উৎসাহব্যঞ্জক ওয়াহয়ি লাভে ব্যর্থতার কারণে হতাশ হইয়া এই দলপতি তুলায়হার দল ত্যাগ করে। তুলায়হা তাহার স্ত্রীসহ পলায়ন করে। ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারী তাহার অনেক অনুগামীকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হয় এবং তাহার মাতা নিজেই অগ্নিকুণ্ডে মৃত্যু কামনা করে।

বুযাখা যুদ্ধের পর তুলায়হা কিছুকাল তা'ইফের নিকট কিংবা সিরিয়ায় অজ্ঞাত জীবন-যাপন করে। আসাদ, গাতাফান ও 'আমির গোত্রগুলির আত্মসমর্পণের পর অবশেষে তুলায়হা ইসলাম গ্রহণ করে। কিছুকাল পর 'উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মদীনা অতিক্রমকালে তাহার উপস্থিতি সম্পর্কে আবূ বাক্‌র (রা)-এর নিকট উল্লেখ করা হয়। আবূ বাক্‌র (রা) অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া এই নও-মুসলিমকে উৎপীড়ন করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। 'উমার (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলে তুলায়হা তাঁহার নিকট আনুগত্য স্বীকার করিতে গেলে খলীফা তাহাকে 'উককাশা ইব্ন মিহসান ও ছাবিত ইব্ন আকরামকে বুযাখায় হত্যা করার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর আর কি বাকি আছে তাহা জানিতে চাহেন। তুলায়হা বিনীতভাবে উত্তর দেয়, হাপরের একটি বা দুইটি জোরাল ফুৎকার।

তাহার পরবর্তী সামরিক জীবন দীর্ঘ ও প্রশংসনীয়। কাদিসিয়া যুদ্ধে সে তাহার নিজ গোত্রের লোকদের প্রধান হিসাবে অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেয়, জালূলা যুদ্ধে মুসলিম পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করে এবং নিহাওয়ান্দ যুদ্ধে জয়লাভ তাহারই নির্ভুল আক্রমণ পরিকল্পনার কৃতিত্ব বলিয়া স্বীকৃত। তুলায়হা এই যুদ্ধেই (২১ হি.) শহীদ হন বলিয়া সাধারণত উল্লেখ করা হয়, কিন্তু ২৪ হি. সনে কাযবীনে নিয়োজিত ৫০০ মুসলিম সৈন্যের একজন হিসাবেও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে

তাঁহার মৃত্যুর তারিখ অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। ২১ হি. সম্ভবত এই কারণে নির্ধারিত হইয়াছে যে, একই বৎসর খালিদ, নু'মান ইবনু'ল-মুকাররিন ও 'আমর ইব্‌ন মা'দীকারিব (রা)-ও ইনতিকাল করিয়াছেন।

তাঁহার প্রকৃত নাম তালহা। ক্ষুদ্রত্বব্যঞ্জক শব্দ তুলায়হা অবজ্ঞাসূচক অর্থে ব্যবহৃত (দ্র. মাসলামা-মুসায়লিমা)। ফেরেশতার (জিবরা'ঈল বা যু'ন-নূন) নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া দাবিকৃত তাহার প্রতি অবতীর্ণ ওয়াহ্‌য়ির অতি সামান্যই জানা যায়। তন্মধ্যে একটি সিরিয়া ও ইরাক জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী, অন্য একটিতে যুদ্ধ জয়ের সাধারণ প্রতীক জাঁতা প্রস্তরের উল্লেখ রহিয়াছে। তুলায়হা নবী না হইয়া বরং একজন গণৎকার ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহার কয়েকটি জ্ঞাত বাণী শুধু প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কিত এবং উহা হইতে কোন ধর্মীয় রীতি-নীতির বিষয় জানা যায় না।

তুলায়হা একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এবং এক হাজার অশ্বারোহীর সমান বলিয়া বিবেচিত ছিলেন। কিন্তু একজন বিদ্রোহী হিসাবে তাহার স্বল্প পরিসর জীবনের আলোকে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর অভাব ছিল। 'উমার (রা) তাহার সম্পর্কে আন্‌-নু'মান ইবনু'ল-মুকাররিনকে লিখিয়াছিলেন তাহাকে কাজে ব্যবহার করিবে এবং সামরিক বিষয়ে তাহার সহিত পরামর্শ করিবে; কিন্তু তাহাকে কোন আদেশ দানের দায়িত্ব প্রদান করিবে না। তাহার বাগ্মিতা এবং মাঠে-ময়দানে উপস্থিত কবিতা রচনার গুণের কথারও উল্লেখ রহিয়াছে। তাহার মধ্যে গণৎকার, কবি, বাগ্মী ও যোদ্ধার গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাবারী, সম্পা. de Goeje, ১খ, ১৬৮৭, ১৭৯৫, ১৮৮২, ১৮৯১; (২) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ১খ, ৬০২, ৬খ, ৪৮৭; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, ৩খ, ৬৫; (৪) আয-যাহাবী, তাজরীদ, ১খ, ২৯৯; (৫) ইব্‌ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৪৫২; (৬) বালাযুরী, সম্পা. de Goeje, পৃ. ৯৫, ৯৬, ২৫৮, ২৬১, ২৬৪, ৩২২; (৭) Caetani, Annale dell Islam, A. H. 10, শা. 67; A. H. 11,, শা. 127-146; A. H. 12, শা. 98; A. H. 16, শা. 21, 27, 31, 69, 78, 157, 162; A. H. 21, শা. 46, 62, 337-338; (৮) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten. ৬খ, ৯-১১, ৯৭।

V. Vacca (E. I. [1])/মু. আবদুল মান্নান

তুলুম্‌বাজী (تلمبجی) ঃ তুর্কী বিশেষ্য, অর্থ ঃ (১) [অপ্রচলিত] নিয়মিত অগ্নি নির্বাপক; (২) (বর্তমান ব্যবহার) স্বেচ্ছাসেবী বা অনিয়মিত অগ্নি নির্বাপক; (৩) (আলঙ্কারিক অর্থে) মন্দভাবে লালিত-পালিত ব্যক্তি (R. Youssouf); রাস্তার বদ স্বভাবের লোক, গুণ্ডা-বদমায়েশ (Redhouse), তুলুম্‌বা হইতে উৎপন্ন যাহার অর্থ 'পাম্‌প, পানি প্রবাহ যন্ত্র" (Meninski Thesaurus, 1680, p. 1375; তু. Relation de l'Ambassade de Mohammed Effendi, প্যারিস ১৮৪১ খৃ., পৃ. ৫২)।

তুলুম্‌বা শব্দটি ইটালীতে ট্রোমবা (tromba) এবং একই অর্থে ব্যবহৃত। কেহ কেহ তুলুম্‌বা শব্দের অন্যান্য অর্থ, যেমন "বাদক, অস্ত্র চিকিৎসকের সরু নল (ইসতিমারা তুলুমবাসী ঃ মদের সরু নল), সাগরের জলস্তম্ভ" হইতে পার্থক্য করিবার জন্য য়াঙ্গীন তুলুম্‌বাসী (অর্থ দমকল)-ও বলিয়া থাকে। তুলুম্‌বা শব্দটি তুরস্কে নৌবাহিনী কর্তৃক ব্যবহারের ফলে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কেহ সচরাচর প্রচলিত উক্তি "কারগা তুলুম্‌বা এটমেক" বিচার করিলে ইহার সত্যতা পাওয়া যাইবে। উক্তিটির অর্থ "পাম্‌পের কাজ করা (দ্র. Venetian carga) অর্থাৎ দুই বা ততোধিক লোক কর্তৃক অন্য কাহাকেও, বিশেষত অসুস্থ, আহত বা মৃতকে, তাহার মাথা ও পা ধরিয়া বহন করা" (মুহাম্মাদ জাওদা আখয-ই ছার, পৃ. ১৫৬; হুসায়ন রাহমী, জানপাযারী, ৮ ডিসেম্বর, ১৯২২ ইকদাম)। তুর্কী তুলুম্‌বা (ও ইটালীয় ট্রোমবা)-কে উহাদের সমার্থক শব্দসমূহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; যেমন প্রাচীন ফরাসী ট্রোমপে (trompe) [Jal, Gloss. Nautique], বাস্‌ক্‌ ট্রোমবা (ঐ) Hesseling, Les mots maritimes)। তুলুম্‌বা শব্দটি অদিকাংশ বলকান ভাষাতেও প্রবেশ করিয়াছে, যেমন রুমানীয় (Perime, Dame), বুলগেরীয়, রুমানীয় গ্রীক (P. Louis Ronzevalle)। ফারসী তুলুনবে (Nicolas) ও অন্তত আংশিক সিরিয়া, মিসর ও আফ্রিকার উত্তর উপকূলীয় আরবী তুরুম্বা বা তুলুম্‌বা তুর্কী ভাষা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে।

কন্‌সটানটিনোপলের অগ্নিকাণ্ড, বিশেষত বিগত আমলে কত ঘন ঘন ও ভয়াবহ ছিল তাহা প্রায় সকলেরই জানা। একটি তুর্কী প্রবাদে আছে, "যদি কন্সটানটিনোপলে অগ্নিকাণ্ড না হইত, তবে সেইখানকার বাড়ি-ঘরগুলির দরজা-জানালা স্বর্ণ নির্মিত হইত" (Istambolun yangini olmasa, ewlerin eshiyi altundan olurdu)।

অনেকগুলি কারণ একত্রে তুরস্কের প্রাচীন রাজধানীকে চিরস্থায়ীভাবে অগ্নি হুমকির সম্মুখীন করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইহা হইতে শহরটিকে মুক্ত রাখিবার জন্য অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্তও, এমন কি অতি কর্মতৎপর বীমা কোম্পানীগুলিকেও হিমসিম খাইতে হইত।

১. বাড়ি-ঘরগুলি প্রায় সমস্তই কাষ্ঠ (আখশাব) নির্মিত ছিল এবং তৈল (ব্যারন দ্য ডট-এর আমলে মাংসের তৈল) দ্বারা রঞ্জিত ছিল। কর্মবিমুখতা, নিয়তিবাদ এবং অপেক্ষাকৃত বিরল ঘটনা, ভূমিকম্পের ভয়ে তুর্কীরা বাড়িঘর নির্মাণে পাথর ব্যবহার করিত না। বলা হইয়া থাকে যে, সরকার দাঙ্গাকারীরা প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে পারে–এই আশঙ্কায় পাথরের মজবুত বাড়িঘর নির্মাণের অনুমতি দানে খুবই অনিচ্ছুক ছিল। পেরা ব্যতীত যেইখানে কাটা পাথরের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কেবল মসজিদে, ঝর্না, খান, গণ-হাম্মাম, বেযেস্তেন (আচ্ছাদিত ও রাত্রিবেলা বন্ধ মূল্যবান পণ্য-সামগ্রীর বিপণীকেন্দ্র) এবং ফ্যানারিওটদের কিছু সংখ্যক ঘরবাড়ি ও ভ্যালেন্‌স-এর কৃত্রিম জল প্রণালীর ন্যায় কিছু প্রাচীন কীর্তি সম্ভবত আগুনের ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পাইয়াছিল এবং কখনও কখনও উহা এমন কি অগ্নিশিখার গতি প্রতিরোধক হিসাবেও কাজ করিয়াছিল।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন অগ্নিকাণ্ডের সময় উল্লিখিত ভবনসমূহের কোন কোনটির গম্বুজ হইতে গলিত সীসা রাস্তায় গড়াইয়া পড়িত এবং সেইখানে যাতায়াত বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিত। উন্নত শ্রেণীর বাড়িঘরের মধ্যে চুন-সুরকি নির্মিত পাকা আশ্রয়স্থলও ছিল। গিউগির (giewgir) নামে অভিহিত ও লৌহ দরজা সংযোজিত এই সকল উন্নত মানের মজবুত ঘর, মূল্যবান জিনিসপত্র রাখিবার নিয়মিত দুর্ভেদ্য গুদামস্বরূপ ছিল। এইগুলি অগ্নি নিরোধক ছিল, কিন্তু কোন অগ্নিকাণ্ডের পর ইহাদের খোলার জন্য একজনকে কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইত। কারণ অকাল দমকা বাতাসের ফলে অগ্নিশিখা ইহাদের ভিতরে প্রবেশের ভয় থাকিত, কোন কোন অগ্নিকাণ্ডে এই সকল ভূগর্ভস্থ কক্ষ, চিমনি এবং ভিত্তিপ্রস্তর ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না বলিয়া ধ্বংসাবশেষ সহজেই পরিষ্কার করিয়া শহরটি দ্রুত পুনঃনির্মাণ করা হইত। কিন্তু ইহা কাল্পনিক সুবিধা ছিল মাত্র। কারণ কখনও কখনও

এমনও হইত যে, বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ পুনঃনির্মিত হইবার পূর্বেই আবার আগুনে ভস্মীভূত হইয়া যাইত।

২. রাস্তাগুলি সরু ছিল এবং মালিকগণ সরকারকে রাস্তা প্রশস্ত করার কাজে বাধা দানে সক্ষম ছিল (যেমন ৩য় 'উছমানের শাসনকালে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল)।

৩. বসফোরাসের উপকূলে বাতাসের গতিবেগ প্রায়ই বৃদ্ধি পাইত এবং সমুদ্র হইতে আগত বায়ুবার বার দিক পরিবর্তন করিত। কথিত আছে যে, বেগুনের (পাটলীজান), মৌসুমেই পুনঃপুনঃ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইত যখন এই একই নামের বায়ু (পাটলীজান মেলটোমি) রান্নাঘরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইত।

৪. প্রাচীন তুর্কীরা তামাক পাইপ (চুবুক) ও তানদীর (বা তানদুর তামনূর-এর পরিবর্তে) নামক শীতের এক প্রকার তাপ বাক্স ব্যবহারে অত্যধিক অসাবধানী ছিল।

৫. পরগৃহে অগ্নিসংযোগকারীদের (কোনডাকচী) কাজও কম ছিল না। তাহারা দাহ্য বস্তুর (কানডাক, মূলে একটি গ্রীক শব্দ) পুতুল তৈয়ার করিয়া উহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কিংবা কেবল প্রতিহিংসা চরিতার্থে গৃহে নিক্ষেপ করিত। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রতিটি সংকটের সময়ই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইত। জনগণ তাহাদের অসন্তোষ প্রকাশের জন্য এই সহজ পদ্ধতিটি গ্রহণ করিত। অগ্নি নির্বাপকরাও তাহাদের এই কাজে কোন কোন সময় সহযোগী হইত এবং আগুন নিভানোর পরিবর্তে তাহারা বরং উহার বিস্তারে সহযোগিতা করিত। অগ্নি সংযোগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞাত ঘটনাগুলি ১ম মাহমূদের অধীন অজনপ্রিয় প্রধান হারেম প্রহরী বেশির আগার শাসনামলে (Jouanin, Turquie, ৩৪৩, অনুসারে এই সময় সর্বপ্রথম কোনডাক ব্যবহৃত হয়), মিসরে ফরাসী দখলদারিত্বকালে এবং ২য় মাহমূদের সিংহাসনারোহণের সময় ঘটিয়াছিল। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণে সূচিত অগ্নিকাণ্ডের বেশির ভাগই ছিল মনিবদের প্রতি অসন্তুষ্ট নিগ্রো ক্রীতদাসদের কাজ (বাসিলির মতে)।

তুরস্কের ঘটনাপঞ্জীতে উল্লিখিত অগ্নিকাণ্ডের তালিকা অতি দীর্ঘ। নিম্নে কেবল ১৭৫০ হইতে ১৭৫৬ খৃ. পর্যন্ত সময়ের অতি ভয়াবহ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা হইল (প্রধানত V. Hammer, Histoire, ১৫খ., ২০০ অনুসরণে)। ১৭৫০ খৃ. ৩ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড ৩০ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল এবং উহাতে ৬,৬৬৭টি গৃহ ও জানিসারী বাহিনীর আগার প্রধান কার্যালয়টি ভস্মীভূত হয়; ১৮ দিন পর এক অগ্নিকাণ্ডে অন্যদের মধ্যে মুফতীর বাড়ি বিধ্বস্ত হয় (এই অগ্নিকাণ্ড পরশ্রীকাতরতার কারণে শুরু হইয়াছিল) এবং দুই মাস পর অস্ত্র বিপণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৭৫১ খৃ. একই সঙ্গে জানিসারী বাহিনীর পুরাতন ব্যারাক ও ২,০০০ গৃহ ভস্মীভূত হয়। ১৭৫২ খৃ. বেশির আগার (উপরে দ্র.) বিরুদ্ধে একাধিক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৭৫৪ খৃ. চারিটি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৭৫৫ খৃ. ৩য় 'উছমানের শাসনামলে ১২ জুলাই ১৬ ঘণ্টা স্থায়ী এক অগ্নিকাণ্ডে ২,০০০ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়; ৩ মাস পর ৩৬ ঘণ্টার এক অগ্নিকাণ্ড আরও অধিক সংখ্যক ঘরবাড়ি গ্রাস করে, তন্মধ্যে প্রধান উযীরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও দেফতেরদারের কার্যালয়ও ছিল। সর্বশেষ ১৭৫৬ খৃ. ৬ জুলাই কনস্টানটিনোপল বিজয়ের পর হইতে এই পর্যন্ত লিপিবদ্ধ অগ্নিকাণ্ডগুলির মধ্যে ভয়াবহতম অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ইহাতে ৮,০০০ গৃহ ভস্মীভূত হয় (Theophile Gauter ৮০,০০০ -এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন)। বায়ু কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আয়া সোফিয়ার নিকট অস্থায়ী বাধাপ্রাপ্তির পর অগ্নিশিখা ১৩টি দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং পরিশেষে একত্র হইয়া এক বিশাল অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হয়। এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের বিবরণ de Tott প্রদান করিয়াছেন।

Theophile Gautier তাঁহার কনস্টানটিনোপল অবস্থানকাল এক সপ্তাহের মধ্যে ১১টি অগ্নিকাণ্ড লক্ষ করিয়াছেন, উহাদের অধিকাংশই ছিল বেশ বড় ধরনের। তাঁহার সময় ৬০ বৎসরের অধিক কালের পুরাতন ঘরবাড়ি খুব কমই ছিল। প্রবন্ধকারের আমলে ফাতিহ মহল্লা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। গালাতার (Galata) এবং পরে সেরাসকেরাতের (Serskerat) টাওয়ারগুলির শীর্ষদেশে পাহারাদার, যাহারা সাধারণত গায়ক (মেহতের) হইত, নিয়োজিত থাকিত। তাহারা ঢোল পিটাইয়া এবং দিনের বেলা টাওয়ার হইতে নিচের দিকে ঝুড়ি ও রাত্রিবেলা লণ্ঠন ঝুলাইয়া অগ্নিকাণ্ডের ঘোষণা প্রদান করিত এবং ইস্তাম্বুল, গালাতা, ইস্কুতারী, ইহাদের যে মহল্লায় অগ্নিকাণ্ড ঘটিত তাহা সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিত।

নৈশ প্রহরিগণ (বেকচি বা পাসওয়ান্‌দ, পাসবান হইতে) "ইস্তাম্বোল্‌দা (বা গালাতাদা) য়াঙ্গীন ওয়ার!" বলিয়া চিৎকার দিতে থাকিত। পর্যটকগণ এই কথাগুলি সুপরিচিত করিয়া তুলিয়াছেন (দ্য এ্যাসিসিস তাঁহার কনস্টান্টিনোপলি গ্রন্থের একটি অধ্যায়ের শিরোনামরূপে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন)। যেইমাত্র বিপদ সঙ্কেত প্রদান করা হইত, অমনি গ্রাণ্ড উযীর, কাপুদান পাশা, জানিসারী বাহিনীর আগা এবং কখনও কখনও সুলতান নিজে ঘটনাস্থলে গমন করিতেন এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁহার উর্ধ্বতনকে এক প্রকারের জরিমানা প্রদান করিতে হইত যদি শেষোক্তজন তাঁহার পূর্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া যাইতেন। Th. Goutier বিশেষভাবে লাল পোশাক পরিহিতা দাসীদের সরবরাহকৃত স্থানীয় রঙ লক্ষ করিয়াছেন। তাহাদের দায়িত্বই ছিল শুধু নিজেদের উপস্থিতি দ্বারা হেরেমে অবস্থানরত সুলতানকে সতর্ক করা (তু. Robert de Flera, Vers l'Orient, পৃ. ৩৬২)।

অগ্নি নির্বাপক প্রতিষ্ঠান তুরস্কে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের। আওলিয়া চেলেবি (খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী), যিনি সকল প্রকারের বিভিন্ন ব্যবসায়ের এক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করয়াছেন, অগ্নি নির্বাপণকারী কোন সংস্থার উল্লেখ করেন নাই। তাহারা মাথায় আঙটাযুক্ত দীর্ঘ দণ্ডের (কানজা) সাহায্যে আক্রান্ত এলাকার ঘরবাড়ি ভাঙ্গিয়াই তুষ্ট থাকিত এবং কুড়ালের সাহায্যে ধ্বংস সাধন সম্পন্ন করিত। Castellani শিকলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা প্রাচীরের চতুর্দিকে বাঁধিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইত। অন্যদিকে Basili একত্রে সেলাইকৃত ও পানিতে ভিজা চাদরের উল্লেখ করিয়াছেন, যদ্বারা অগ্নিকাণ্ডস্থলের আশেপাশের বাড়িঘর রক্ষা করার চেষ্টা করা হইত।

ঐতিহাসিক রাশিদের মতে (১ম সং, ৩খ, পত্র ১১১খ-১১২) রামাদান ১১৩৪ (জুন-জুলাই ১৭২২) সনে ৩য় আহমাদের শাসনামলে এবং দামাদ ইবরাহীম পাশার ওযারতীকালে, যিনি নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রতি অতিশয় অনুরাগী ছিলেন, তুরস্কে সর্বপ্রথম পাম্প ব্যবহৃত হয়। গেরচেক দাউদ (Mouradja d'Ohsson-এর মতে ফরাসী বংশোদ্ভূত) এই পাম্পের প্রস্তুতকারক ও পরিচালক ছিলেন। ফলাফল এইরূপ উৎসাহব্যঞ্জক ছিল যে, দাউদের নেতৃত্বাধীন (তুলুম্‌বাজী বাশী) অগ্নি নির্বাপকদের একটি দল গঠন করা হয়। তাহাকে শাহযাদেবাশী এলাকায় নূতন সেনানিবাস বা য়েনি ওডালার-এর নিকট অবস্থিত নূতন নিয়োগপ্রাপ্ত সৈনিকদের আবাসস্থলে ('আজামী ওডালারী) বাসস্থান বরাদ্দ করা হয়। বাছাইকৃত লোকের এই দলটি

প্রথমে জানিসারী বাহিনী ও অন্যান্য সৈন্যদল (ওজাক) হইতে নিয়োগ করা হইত। ইহারা বিশেষ বেতন ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। Thalasso-এর মতে ইহাদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল। পদমর্যাদা অনুসারে ইহাদের স্থান জানিসারী বাহিনীর অব্যবহিত পরে এবং জেবেজি বা সেনা সার্ভিস কোর-এর পূর্বে ছিল। ক্রমান্বয়ে তাহাদের সামরিক বৈশিষ্ট্য লোপ পায়, ঠিক যেইরূপ জেবেজির ক্ষেত্রে ঘটে। তবে বিভিন্ন ওজাকের মধ্যে এই হিসাবে যোগসূত্র রহিয়াছে যে, সৈন্যদলের প্রত্যেক কোর-এরই নিজস্ব অগ্নি নির্বাপক দল রহিয়াছে। কিন্তু হোস্তান্‌জী ওজাকের অগ্নিনির্বাপক দল ব্যতীত, যাহারা নিয়মিত জানিসারী বাহিনীর সদস্যরূপে পরিগণিত, অন্য সকলেই নবীন কারিগর (এসনাফ ডেলিকানলীলারী), যাহাদিগকে অতি সামান্যই সৈনিকদের ন্যায় দেখায়। তুর্কী অগ্নি নির্বাপক বাহিনী সম্ভবত অল্পদিনের মধ্যেই অধঃপতনে পতিত হয়। উহাদের সৃষ্টির ত্রিশ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে তাহারা সাধারণের নিকট কাজের জন্য অর্থ দাবি করিত এমন কি যাহাদের বাড়িঘর পুড়িয়া গিয়াছে অথবা যাহারা তাহাদের অগ্নিকাণ্ডের হুমকির সম্মুখীন বাড়িঘর রক্ষার জন্য তাহাদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে জোরপূর্বক অর্থ আদায় করিত এবং দ্য টটের (de Tott) বিবরণ অনুযায়ী কোন কোন সময় তাহারা দর্শকদের দিকে পানির নল ঘুরাইয়া দিবার মতও আনন্দ-স্ফূর্তিতে মাতিয়া উঠিত।

তাহারা ধাতুর প্রলেপযুক্ত (কালায়লী) মুখাবরণবিহীন শিরস্ত্রাণ (তাস) পরিধান করিত। মুসলিম দেশগুলিতে আতঙ্কিত অবস্থায় ইহার ব্যবহার হয়। Castellani-র মতে এই শিরস্ত্রাণের উপর এক প্রকার সূচালো শক্ত খোঁটার ন্যায় বস্তু থাকিত এবং উহা স্যালিয়ান (Salian) ধর্মযাজকদের Galerus-এর ন্যায় দেখাইত, অন্যদিকে লুতফী ইফেন্দী একেবারে রসকষহীনভাবে উহাকে Souptureen (চোরবাতাসী)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহার উপর অগ্নিনির্বাপক যে ওরতার সদস্য হইত উহার ব্যাজ (নিশান) থাকিত। তুলুমবাজী বাশীর শিরস্ত্রাণ সম্পূর্ণ রৌপ্য নির্মিত ছিল। আগুন নিভাইবার কালে অগ্নি নির্বাপকগণের হাত, পা ও বুক নিরাভরণ থাকিত। অন্য সময়ে তাহারা বিশাল পাগড়ী (সারীক) লাল কোর্তা (কাপোত) পরিধান করিত, যাহা কারতাল কানাত (কানাদী-র স্থলে) অর্থাৎ ঈগল পাখির ডানা নামে অভিহিত হইত। খালি পায়ে তাহারা য়েমেনি পরিধান করিত এবং তাহাও ছিল লাল।

পাম্পগুলি খুব ছোট ছিল এবং মাত্র দুইজন লোকে উহা বহন করিতে পারিত। ১৭৫৪ খৃ. অপেক্ষাকৃত নমনীয় চামড়ার হৌজ পাম্প গ্রহণের মাধ্যমে উহাদের সামান্য উন্নয়ন সাধন করা হয়। কিছুদিন পরে, ৩য় 'উছমানের শাসনামলে, পাম্প সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং বিভিন্ন মহল্লার প্রধানদের নিকট জমা রাখার পূর্ববর্তী নিয়মের পরিবর্তে উহা প্রহরীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। (V. Hammer, Histoire, পৃ. ২৬৩)।

১৮২৬ খৃ. জানিসারী বাহিনীর বিলোপের পর অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর দ্রুত পতন ঘটে। অতঃপর একদল ভবঘুরে (দেরমে চাটমা) দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের (বাব-ই সের 'আসকেরী) পাম্পগুলিই শুধু অবশিষ্ট থাকে। অল্প দিন পরে ১২৪৩/১৮২৭-২৮ সালে প্রতিটি ইঞ্জিনের জন্য মুদীর বা 'পরিচালক' নিযুক্ত হয় এবং নূতন অগ্নিনির্বাপক দল গঠন করা হয় (খারিজীদের নেরেফাত তাহরীরি), বিশেষ করিয়া আরমেনীয়দের মধ্যে এই দল গঠিত হয় যাহারা বাসিলির মতে খুব কার্যক্ষম দেহের অধিকারী নহে বলিয়া বিবেচিত ছিল। তবুও উক্ত বাসিলির মতেই এই কাজে কিছু উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই প্রতিষ্ঠানটিতে যে ব্যাপক ভাঙনের সৃষ্টি হয় তাহা বিচার করিলে এই উন্নয়ন বেশি দিন টিকিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তুলুম্‌বাজী নিয়মিত তস্করে পরিণত হয় যাহারা অগ্নিকাণ্ডের সুযোগে ইচ্ছানুযায়ী লুটতরাজ করিত। ব্ল্যাকমেইল করার অভ্যাসের ক্ষেত্রে যেরূপ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের পুরাতন রীতিই সমানে অনুসরণ করিতে থাকে। কুলি (হাম্মাল) ও মাঝি (কায়িকচী)-দের মধ্য হইতে নিয়োগকৃত তুরস্কের প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ এই সংস্থাটি যে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত ২০,০০০ লোকের একটি দল ছিল। দুর্বল সরকারের মনে তাহাদের দ্বারা সঞ্চারিত ভয়ের কারণে তাহারা নিজেদের অবস্থান রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। এমন কি, নিম্নে আলোচিত নিয়মিত দমকল বাহিনীগণের পরও তাহাদের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে এবং Thalasso-এর মতে তাহাদের রুটির রেশন প্রাপ্তিও অব্যাহত থাকে। অদ্ভুত ধাবমান বার্তাবহ বা ঘোষকের পরপর রাস্তায় তাহাদের জেলঘুঘুর ন্যায় মূর্তিগুলিকে দৌড়াইতে দেখা যাইত। একমাত্র এই ঘোষকই সম্ভবত শিরস্ত্রাণ ব্যবহার অব্যাহত রাখিয়াছিল; তাহার গায়ে থাকিত আগুনের মত লাল পোশাক, পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কুঠার এবং ডান হাতে একটি বর্শা, যদ্বারা পথ হইতে সরিয়া যাইতে বিলম্বকারী কুকুর ও লোকদেরকে আঘাত করা হইত। এই বার্তাবহকে কারাকুলাক (কালো কান) অর্থাৎ 'বনবিড়াল' বলা হইত; কারণ প্রবাদ অনুযায়ী এই প্রাণীটি সিংহের জন্য একইরূপ দায়িত্ব পালন করে, সে শিকারের সময় সিংহের অগ্রে গমন করে। কোন কোন সময় নিয়মিত অগ্নি নির্বাপকদের সহিত তাহাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধিত। এই নিয়মিত অগ্নি নির্বাপকদের মধ্যে আবার শান্তি-শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব ছিল, আরমেনীয় ও গ্রীক খৃস্টান বাহিনীর সহিত মুসলিম বাহিনীর প্রায়ই সংঘর্ষ লাগিয়া থাকিত।

মাত্র তিন বা চার গ্যালন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ছোট ছোট পাম্প উজ্জ্বল রঙ দ্বারা রঙীন করা হইত এবং উহাদের শীর্ষে ক্ষেত্র অনুযায়ী চাঁদ কিংবা ক্রস অঙ্কিত থাকিত; ভিন্ন ভিন্ন মহল্লার নাম অথবা একই নাম হইলে, ভিন্ন ভিন্ন মসজিদ কিংবা গির্জার নামও উহাতে থাকিত। অগ্নি নির্বাপকগণ তাহাদের পাম্প তাড়াতাড়ি পূর্ণ করিতে পারিবে এই কারণে ঝরনার (চেশমে) ধারে বসবাস করিতে বেশি পসন্দ করিত। সাকা (সাক্কা) রাত্রিবেলা তাহাদের নিকট পাম্প খুলিয়া দিত এবং এই সাকাও আগুন নিভাইবার কাজে তাহাদের সাহায্য করিত। কোন কোন লেখক (যথা ঃ Ducket) তুলুম্‌বাজীদের দক্ষতা ও সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তবে von Hammer-এর মত লেখকদের সমালোচনাই এই ক্ষেত্রে বেশি। তাহাদের সম্বন্ধে এইটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, দলটি শৃঙ্খলাবিহীন ছিল।

আধুনিক নিয়মিত দমকল বাহিনী (ইতফা'ইয়ে) ঃ ৫ জুন, ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের (১৮৩১ খৃস্টব্দের পরে একই মহল্লায় সংঘটিত সর্ববৃহৎ অগ্নিকাণ্ড, De Amicis মৌখিক তথ্য অবলম্বনে ইহার বর্ণনা দিয়াছেন) পর আধুনিক দমকল বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী গঠনের দায়িত্ব হাঙ্গেরীয় Count Edmond Szeehenyi (শেচেনি পাশা)-র উপর ন্যস্ত ছিল, যিনি পূর্বে বুদাপেস্ট দমকল বাহিনীর প্রধান ছিলেন। প্রথম ব্যাটালিয়ন ৩ জানুয়ারি, ১৮৭৬ খৃ. উহার দায়িত্ব পালন শুরু করে এবং প্রথম বৎসরেই ৭৭টি অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত করে, যাহার মধ্যে কয়েকটি বেশ বড় ধরনের ছিল। ইহাতে ৫৮০ জন পুরুষ কর্মচারী, ২টি বৃহৎ অশ্বচালিত পাম্প, ৮টি ক্ষুদ্র পাম্প, একটি প্রাথমিক চিকিৎসার ওয়াগন, একটি পানির ওয়াগন (১৬টি বালতিসহ) এবং ইঞ্জিনের জন্য একটি ওয়াগন ছিল। পরবর্তী কালে এই যন্ত্রপাতির আরও উন্নয়ন সাধিত হয়। পরে আরও তিনটি ইউনিট যোগ করা হয়। দুইটি ব্যাটালিয়নের একটি পেরা (তাকসীম ঃ বাহিনীর সদর দফতরও

পেরায় অবস্থিত ছিল), ইস্তাম্বুল (Seraskierat), এশিয়ার ইসকুতারি ও নৌবাহিনী সদর দফতরে অবস্থিত ছিল। ইহা ছাড়া নৌবাহিনী অগ্নিনির্বাপক দল এবং এক ব্যাটালিয়ন পরিখা খননকারীও বর্তমান ছিল। এই সমস্ত ইউনিট সমন্বয়ে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী (ইতফা'ইয়ে আলায়ী) গঠিত ছিল এবং ইহা প্রথম সেনা কোর বা রাজকীয় রক্ষী বাহিনীর (খাসসে ওরদু-ই হুমায়ূন) অংশবিশেষ ছিল। প্রতিটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিল একজন বিনবাশী এবং কাউন্ট শেচেনয়ি একটি ডিভিশনের (ফেরীক) জেনারেল পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এই বাহিনীর সদস্যদের বিস্তারিত বিবরণ তুর্কী সামরিক বাহিনীর বর্ষগ্রন্থে (সালনামে-ই 'আসকেরী) প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তা'রীখ-ই রাশিদ, সং. ১১৫৩, ৩খ, পত্র ১১, ১১২; (২) তারীখ-ই লুতফী, ১খ, (১২৯০ হি.), ২৫১; (৩) Memoires du baron de Tott, আমসটারডাম ১৭৮৫ খৃ., ১খ, ১০-১৪, ৭৯-৮০; (৪) Mouradja d'Ohsson, Tableau de l'Empire Othoman, 1798-1824, ৭খ, ৩২৩ এবং চিত্র ২১১; (৫) G. A. Olivier, Goyage dans l'Empire Othoman, প্যারিস বর্ষ ৯, ১খ, ১৩২-১৩৪; (৬) Castellan, Lettres sur la Grece, l'Hellespont et constantinople, faisant suite aux lettres sur la Moree, প্যারিস ১৮১১ খৃ., ২খ, ১২২; (৭) J. Von Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, ভিয়েনা ১৮১৫ খৃ., ১খ, ৭৯; (৮) Ch. Pertusier, Promenades Pittoresques dans Constantinople, প্যারিস ১৮১৫ খৃ., পৃ. ৩১-৩২; (৯) Juchereau de Saint-Denys, Revolutions de Constantinople en 1807 et 1808, 1819, ১খ, ৮০-৮১; (১০) Andreossy, constantinople et le Bosphore de Thrace, Pendant les annees 1812, 1813 et 1814 et Pendant l'annee, 1826, প্যারিস ১৮২৮ খৃ., অধ্যায় ১২; (১১) Constantin Basili (Bazili), Bosfor i noviye Ocerki Konstantinopola (Russian), St. Petersburg ১৮৩৬ খৃ., পৃ. ১৩৯-১৬৮; (১২) Theophile Gautier, Constantinople, (নূতন সং.) ১৮৫৬ খৃ., পৃ. ২৫৭-২৬৬; (১৩) W. A. Duckett, La Turquie Pittoresque, প্যারিস ১৮৫৫ খৃ., পৃ. ১৯৫-১৯৭; (১৪) Edmondo de Amicis, Constantinopeli, ৮ম সং, মিলান ১৮৭৮ খৃ., পৃ. ৩৬১-৩৮৮; (১৫) G. des Godins de Souhesmes, Turcs et Levantins, প্যারিস ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ৩৭০-৩৭২; (১৬) Zboinski, Armee Ottomane, প্যারিস ১৮৭৭ খৃ., পৃ. ৯১-৯২; (১৭) Thalasso, Les Toulambadjis, সচিত্র প্রবন্ধ, Revnue Illustree of November 15, 1902; (১৮) B. Bareilles, Constantinople, ses cires franques et levantines (Pera-Galata-Banlieue), প্যারিস ১৯১৮ খৃ., অধ্যায় ৪; (১৯) Theodor Menzel, Mehmed Tewfiq, Ein Jahr in Konstantinopel, Funfter Monat, die Schenke, in Turk, Bibliothek, x. বার্লিন ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৯২, টীকা ৪।

J. Deny (E.I. [1])/মু. আবদুল মান্নান

আত-তুস্‌তারী (التستری) ঃ একজন খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ। প্রকৃত নাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন য়াহ্‌য়া ইব্‌ন যুহায়র। উপনাম আবূ জা'ফার, ২৩১ হিজরীতে জন্ম। তিনি খুযিস্তানের অন্তর্গত তুস্‌তার [=শূশ্‌তার, এইখানেই সাহাবী আল-বারা'আ ইব্‌ন মালিক আল-আন্‌সারী (রা)-এর মাযার] নামক স্থানের অধিবাসী। এই হেতু আত-তুস্‌তারী আখ্যায় পরিচিত। তিনি হাদীছশাস্ত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় 'আলিম আবূ কুরায়ব (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব (র),আল-হুসায়ন ইব্‌ন আবী যায়দ (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আম্মার (র), 'আম্‌র ইব্‌ন 'ঈসা (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাল্‌শার (র), মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন 'আকীল (র) প্রমুখ খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ হইতে হাদীছ আহরণ করেন। তাঁহার সূত্রে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান (র), আবূ ইস্‌হাক ইব্‌ন হাম্‌যা (র), আবু'ল-কাসিম আত-তাবারানী (র) ও আবূ বাক্‌র ইবনু'ল-মুক্‌রী প্রণিধানযোগ্য। আত-তুস্‌তারী বিপুল সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, এই বিষয়ে রচনা ও সংকলন করিয়াছেন এবং হাদীছের বিশুদ্ধতা ও ভুল বর্ণনা নির্ণয় করিয়াছেন। মোটকথা, হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার ছিল সার্থক গবেষণা। আবূ বাক্‌র ইবনু'ল মুক্‌রী তাঁহাকে তাজু'ল-মুহাদ্দিছ (মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি) আখ্যায় ভূষিত করেন। হাফিজ আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মানদা-র উক্তি কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেন, আমি হাদীছ শাস্ত্রে আবূ ইস্‌হাক ইব্‌ন হাম্‌যা (র) অপেক্ষা হাদীছের বড় হাফিজ দেখি নাই। আর তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "আমি পৃথিবীতে আবূ জা'ফার আত-তুস্‌তারী (র) অপেক্ষা বড় হাফিজ আর দেখি নাই।" আবার আবূ জা'ফার (র) বলেন, "আমি পৃথিবীতে আবূ যুর'আ (র) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোনও হাফিজু'ল-হাদীছ দেখি নাই।" আবার তিনি বলিতেন,"আমি আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবী শায়বা (র) অপেক্ষা বড় হাফিজ কোথাও দেখি নাই।" তিনি হি. ৩১০ সালে ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল আশি বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয-যাহাবী তায্‌কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ; বৈরূত ১৩৭৪/ ১৯৫৪, ২খ, ৭৫৮; (২) ঐ লেখক, সিয়ার আ'লামি'ন নুবালা', বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ১৪খ, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫; (৩) আস-সাম'আনী, আল-আন্‌সাব, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮, ১খ, ৪৬৫; (৪) ইবনু'ল-'ইমাদ আদ-দিমাশ্‌কী, শাযারাতু'য-যাহাব বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৩খ, ২০৫।

আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

তূগ (توغ) ঃ তুর্কী চমরী গরুর লেজ (কূতাস), পরবর্তী কালে খুঁটি সংলগ্ন ঘোড়ার লেজ অর্থে ব্যবহৃত। কখনও কখনও শীর্ষে অর্ধ চন্দ্রখচিত নকশা ঝুলাইয়া উহাকে সৈন্যদিগকে একত্র করিবার উদ্দেশ্যে পতাকা হিসাবে ব্যবহার করা হইত। প্রাচীন 'উছমানী সাম্রাজ্যে ইহা সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের ব্যাজস্বরূপ ব্যবহৃত হইতঃ মীর-লীওয়া ও সানজাক-বে একটি, বেয়লার-বে দুইটি, উযীরের তিনটি, প্রধান উযীরের পাঁচটি এবং যুদ্ধের সময় সুলতানের সাত বা নয়টি লেজ থাকিত। পাশা পদচ্যুত হইলে এই চিহ্ন হইতে বঞ্চিত হইতেন। জানিসারীদের অন্যান্য ব্যাজসহ ২য় সুলতান মাহমূদ ইহাও বিলোপ করেন। মধ্য এশিয়ায় নিশানবরদারকে বলা হইত তূগ-বেগী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহমাদ রাসিম, তা'রীখ, কনস্টানিটনোপল ১৩২৬-১৩২৮ হি., ১খ, ৫; (২) ওয়াসিফ, জাওয়াদ-বে-তে Etat mititaire Ottoman, Paris 1882, i, 181 (অ্যালবাম, চিত্র ৫), নকশা ১০৫, ১০৬; (৩) Tavernier, Nouvelle relation du Serrail (voyeges, part vi), p. 13-14; (4) H Hugon, Les Emblours des beys de Tunis, p. 82; (৫) আহমাদ রিফ'আত, লুগাত-ই তা'রীখীয়ে ওয়া-জোগ্রাফীয়ে, কনস্টান্টিনোপল ১২৯৯ হি., ১খ., ২৮৮; (৬) Radloff, Opit, iii, 1429; (7) সুলায়মান এফেন্দী, লুগাত-ই জাগাতা'ঈ, পৃ. ১২০।

CL. Huart (E.I. [1])/আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তূতীনামে (দ্র. নাখশাবী)

আত্-তূনিসী (التونسى) ঃ (শায়খ) মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার ইব্ন সুলায়মান, ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন আরব গ্রন্থকার। তিনি শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, বিশেষ করিয়া ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার প্রতি নিবেদিত এক সম্ভ্রান্ত তূনিসীয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতামহ সুলায়মান পুস্তকাদির অনুলিপিকার ছিলেন। তিনি মক্কায় হজ্জ করিতে যাওয়ার সময় তাঁহার তিন পুত্রকে তাঁহার মামা আহমাদ ইব্ন সুলায়মান আল-আযহারীর অভিভাবকত্বে রাখিয়া যান। আহমাদ ইব্ন সুলায়মান আল-আযহারী একজন অভিজ্ঞ ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন। হজ্জ সমাপন করিবার পর সুলায়মান তাঁহার সম্পূর্ণ সম্পদ হারাইয়া তুনিস (তিউনিস)-এ প্রত্যাবর্তন না করিয়া প্রথমে জিদ্দায় অবস্থান করেন এবং পুস্তকের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন। জিদ্দায় অবস্থানকালে তিনি সান্নার (سنار) (সুদানের একটি শহর) হইতে আগত কতিপয় লোকের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সান্নারে গমন করেন। সান্নার-এর শাসক তাঁহাকে আন্তরিক সমাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে একটি বাসগৃহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রদান করেন। সুলায়মান সেই স্থানে এক সান্নারীয় মহিলাকে বিবাহ করেন। সেই মহিলার গর্ভে তাঁহার এক পুত্র (আহমাদ যাররূক) এবং এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

সুলায়মান তূনিসে অবস্থানকালে প্রথম বিবাহের দ্বিতীয় পুত্র 'উমার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাঁহার পিতামহের ভ্রাতার সঙ্গে মক্কায় হজ্জ পালনের জন্য গমন করেন এবং ঘটনাক্রমে পথে তাঁহার পিতা সুলায়মানের সাক্ষাত লাভ করেন। সুলায়মান সান্নার হইতে আগত এক বাণিজ্যিক কাফেলার সহযাত্রী হইয়া কায়রো যাইতেছিলেন। 'উমারের পিতার পিতৃব্য মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন। 'উমার আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের মানসে মক্কা হইতে কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন। পরে তিনি সান্নার-এ তাঁহার পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় শিক্ষালাভ করিতে থাকেন এবং ১২০১/১৭৮৬ সালে বিবাহ করেন। দুই বৎসর পর তিনি তাঁহার নিজ শহর তূনিস-এ প্রত্যাবর্তন করেন। এই তূনিস শহরে তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ (আত-তূনিসী) ১২০৪/১৭৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। 'উমার তূনিস-এ মাত্র চারি বৎসর কাল অবস্থান করেন এবং পরে তিনি তাঁহার পরিবারসহ কায়রো ফিরিয়া গিয়া পুনরায় আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তী কালে আল-আযহার-এ তিনি আল-মাগরিব-এর (উত্তর আফ্রিকার) শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস (আর-রিওয়াক্'ল-মাগরিবা)-এর তত্ত্বাবধায়ক (নাকীবু'র-রিওয়াক) নিয়োজিত হন (তু. ১খ., পৃ. ৫৩৫০)।

১২১১/১৭৯৭ সনে সান্নার-এ বসবাসকারী তাঁহার সৎ ভ্রাতার নিকট হইতে তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ এবং সৎ ভ্রাতা-ভগ্নীদের দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারেন। তিনি তখন সান্নার-এ চলিয়া যান এবং ইহার পর আর কখনও তাঁহার নিজের পরিবারের কাছে ফিরিয়া আসেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে শেষবারের মত ঐ বৎসরই 'উমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহির ব্যবসা উপলক্ষে কায়রো আগমন করেন এবং পরে কায়রো হইতে হজ্জ করিবার জন্য মক্কা মুকাররামায় যাইবার মনস্থ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতার পরিবারকে তাঁহার পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং যুবক মুহাম্মাদকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করেন। মুহাম্মাদ ৭ বৎসর বয়সেই যথারীতি পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তাহিরের মক্কায় গমনের পর মুহাম্মাদের জীবন ধারণ উপযোগী সম্পদ ক্রমান্বয়ে নিঃশেষিত হইয়া যায়। তিনি তাঁহার পিতার সন্ধান লাভের জন্য সুদান গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এইদিকে কায়রোতে সংবাদ আসে যে, তাঁহার পিতা সান্নার-এ উপনীত হইবার পরই সেইখান হইতে দারফুর-এ চলিয়া গিয়াছেন। দারফুর হইতে কায়রো আগমনকারী একটি কাফেলার জনৈক সদস্য তাঁহার পিতার বন্ধু ছিলেন। এই পিতৃবন্ধুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হইলে তাঁহাকে দারফুর-এ নিয়া যাইবার অনুরোধ করেন। ইহা ১২১৮/১৮০৩ সালের ঘটনা। দারফুর-এ প্রথম তিনি তাঁহার পিতার সৎ ভ্রাতা আহমাদ যার্রূক-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আহমাদ যাররূক তাঁহাকে আবু'ল-জুদুল জিলার কুলটূ নামক স্থানে নিয়া যান। সেই স্থানে তাঁহার পিতা বাস করিতেন এবং রাজদরবারে উচ্চমর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সম্পদশালী ও সাফল্য অর্জনকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং তিনি একটি নূতন পরিবারেরও গোড়াপত্তন করেন বাদশাহ 'আবদু'র-রাহমান ইব্ন আহমাদ-এর নির্দেশে (মৃ. ১২১৪/১৭৯৯; তু. দারফুর-এর বাদশাহ্গণের তালিকা, ১খ, পৃ. ৯১৭)।

'উমার ধর্মতত্ত্ব ও আইন সংক্রান্ত দুইটি গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন (তু. Voyage au Dar-Four, পৃ. ১০৭; 'উমারের অন্যান্য সাহিত্যকর্মের জন্য দ্র. পৃ. ৪২৪)। মুহাম্মাদ যখন দারফুর-এ উপনীত হন, তখন মুহাম্মাদ কুর্‌রা নামে একজন (Nachtigal, Sahara und Sudan, iii, Berlin 1879, p. 387, calls him Abu Shaikh Kurra) শিশু প্রশাসক মুহাম্মাদ আল-ফাদ্ল-এর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত রাজা হিসাবে সমাসীন ছিলেন। মুহাম্মাদ আল-ফাদ্ল এক বিদ্রোহে নিহত হন। মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার, আহমাদ যাররূক-এর মধ্যস্থতায় মুহাম্মাদ কুর্‌রা-র নিকট হইতে উষ্ণ সম্বর্ধনা লাভ করেন। মুহাম্মাদ কুররা, 'উমারকে তূনিস-এ গমন করিয়া তাঁহার আত্মীয়-পরিজনকে দেখিয়া আসার জন্য রাজি করাইতে সক্ষম হন। 'উমার তাঁহার অবর্তমানে জুলুটে তাঁহার সম্পদ তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান।

'উমার প্রথমে ওয়াদা'ই (Wada'i)-এ উপনীত হন এবং তথায় কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। স্থানীয় সাবূন সুলতানের দরবারে তিনি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। তিনি সেই স্থানে মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পান এবং 'আলাবী' নামক গ্রামের জায়গীর লাভ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য বৃথাই অপেক্ষা করার পর তূনিস-এর দিকে গমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ তাঁহার পিতার দারফুর ত্যাগের পর সাড়ে সাত বৎসর কাল দারফুর-এ অবস্থান করেন এবং দারফুর-এর স্থান ও মানুষের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হন। দারফর ও ওয়াদা'ই-এর মধ্যে এক যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর তিনি দারফুর-এর সুলতানের পক্ষ হইতে দূত হিসাবে ওয়াদা'ই গমন করেন। তিনি প্রথমে ওয়ারা নামক স্থানে সুলতান সাবূন-এর তৎকালীন বাসস্থানে উপস্থিত হন। সুলতান সাবূন তাঁহার প্রতি (মুহাম্মাদের) তাঁহার পিতার মত ('উমারের মত) উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেন। মুহাম্মাদ তাঁহার পিতার মত ওয়াদা'ই-এ বেশ কিছুকাল অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা ক্রমান্বয়ে অধিক সংকটাপন্ন হইয়া উঠে। প্রথম অবস্থায় মুহাম্মাদের পিতৃব্য আহমাদ যাররুক, যিনি 'উমারকে ওয়াদা'ই পর্যন্ত অনুসরণ করেন এবং 'উমারের প্রস্থানের সময় তাঁহার আলাবীস্থ বাসগৃহ ও সন্তানদেরকে বিশ্বাস করিয়া আহমাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। কিন্তু আহমাদ 'উমারের সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার অধিকারে নিয়া 'উমারের সন্তানদেরকে কেবল জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন পূর্ণ করিবার মত সম্পদ দিতেন। দ্বিতীয় সংকট ছিল আহমাদ আল-ফাসী-এর (তাহার সম্পর্কে তু. Voyage au Ouaday, p. 66 প., 497 প. 508) সঙ্গে ক্রমাবনতিপূর্ণ বিরূপ ধারণা, এই আহমাদকে 'উমারের পরামর্শক্রমে তাঁহার স্থলে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। আহমাদ সাবূন-এর নিকট মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ

তুলেন। ফলে সাবূন মুহাম্মাদের প্রতি সন্দিহপ্রবণ হন এবং তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনে নিবৃত্ত হন। 'উমার তাঁহার পিতার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ওয়াদা'ই-এ আগমন করেন। তিনি আহমাদ আল-ফাসীকে চাকুরীচ্যুত করাইতে সক্ষম হন, কিন্তু 'উমারের প্রস্থানের পর আহমাদ আল-ফাসী তাঁহার পূর্ব পদ পুনরাধিকার করেন। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মাদ আট মাস অবস্থানের পর ওয়াদা'ই ত্যাগ করার জন্য সুলতানের অনুমতি প্রাপ্তির ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তিনি ফেয্যানগামী এক কাফেলার সহযাত্রী হইয়া ঐ কাফেলার সঙ্গে টুবু (Tubu), তিবেস্তী (Tibesti) অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ফেয্যান-এর রাজধানী মুরযুক (Murzuk) পৌঁছান। মুরযুক-এ তিনি তিন মাস কাল অবস্থান করেন। তাঁহার মুরযুক অবস্থানকালে সেইখানকার শাসক মুন্তাসীর মৃত্যুবরণ করেন। মুরযুক হইতে অব্যাহতভাবে ভ্রমণ করিয়া তিনি ত্রিপোলী উপনীত হন এবং পরিশেষে সীতাক্স (সীআক) হইয়া সুদানের উদ্দেশ্যে কায়রো ত্যাগের প্রায় ১০ বৎসর পর ১২২৮/১৮১৩ সালে তূনিস-এ পৌঁছেন।

মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম তূনিসে বসবাস শুরু করেন। পরে তিনি কায়রো চলিয়া যান এবং সেইখানে শাসনকর্তা তুর্কী সুলতানের প্রতিনিধি মুহাম্মাদ 'আলী পাশার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮২৪ খৃ. মুহাম্মাদ 'আলী যখন তাঁহার সৎ পুত্র ইবরাহীম পাশার অধীনে মুরিয়ায় (Morea) এক সেনাদল প্রেরণ করেন তখন মুহাম্মাদ এই অভিযানের এক পদাতিক রেজিমেন্টের সঙ্গে একজন ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে গমন করেন (তু. Voyage au Darfour, পৃ. ৬)। তাঁহার Ouaday ভ্রমণের সঙ্গে Missolonghi (১৮২৫-১৮২৬) অবরোধের এক ঘটনার সংযোগ দেখা যায় (পৃ. ৬৩৪-৬৩৫)।

যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর মুহাম্মাদ য়ূরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিশেষত ঔষধ প্রস্তুত সংক্রান্ত বিজ্ঞানের উপর রচিত রচনাবলী, যেইগুলি মুহাম্মাদ 'আলী কর্তৃক আবূ যা'বাল নামক স্থানে (কায়রো শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে) প্রতিষ্ঠিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হয়, তিনি সেই সকল আরবী অনুবাদের পুনঃপরীক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সেই স্থলে ডাঃ পেররন তাঁহার নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন এবং মুহাম্মাদকে তাঁহার সুদান ভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে উৎসাহিত করেন। প্রাথমিকভাবে তাহা আরবীতে লিখিবার পরামর্শ প্রদান করেন। ১৮৩৯ খৃ. ডাঃ পেররন যখন কায়রোয় কাসর আল-'আয়ন চিকিৎসা বিদ্যালয়ের পরিচালক নিযুক্ত হন তখন তাঁহার সুপারিশক্রমে মুহাম্মাদ সেইখানে অনুবাদ পুনঃপরীক্ষণ বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। A. V. Kremer, যিনি ১৮৫০ খৃ. প্রথমবারের মত মিসরে আগমন করেন তিনি মুহাম্মাদকে তাঁহার অন্যতম শিক্ষক হিসাবে অভিহিত করেন এবং তাঁহাকে উচ্চ স্তরের ব্যক্তিত্ব হিসাবে মূল্যায়িত করেন (তু. A. V. Kremer, পৃ. গ্র.; তু. গ্রন্থপঞ্জী)। A. V. Kremer বলেন যে, মুহাম্মাদ গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন আরবী সাহিত্যের রচনাসমূহের সম্পাদনার কাজেও নিজেকে নিয়োজিত করেন। যেমন—আল-হারীরী-র মাকামাত (দ্র.) এবং আল-ইবশীহ-এর 'মুস্তাত্রাফ (দ্র.; ইহা সম্ভবত ১২৭২/১৮৫৬ সালের বূলাক সংস্করণ)। জুমারদ-এর মতে (তু. Voyage au Darfour, p. x), মুহাম্মাদ ফীরূযাবাদী (দ্র.)-এর আরবী অভিধান আল-কামূস-এর নূতন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। এই অভিধানটির ১২৩০/১৮১৭-এর কলিকাতা সংস্করণের পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে সাত অথবা আটটি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে ফীরূযাবাদীর মূল পাঠের সংশোধন করেন। এই নূতন সংস্করণটি ১২৭৪/১৮৫৭ সালে বূলাক মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হয়। শেষ জীবনে শায়খ মুহাম্মাদ প্রতি শুক্রবারে যায়নাব মসজিদে হাদীছ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। তিনি ১২৭৪/১৮৫৭ সালে কায়রো শহরে ইনতিকাল করেন (... V. Kremer, পৃ. গ্র.)।

মুহাম্মাদ আত-তূনিসী সুদানে তাঁহার দীর্ঘকালীন অবস্থান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের জিলাসমূহ হইতে আগত তাঁহার সাক্ষাতপ্রার্থী লোকজনের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে অনেক পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানী বিবরণ প্রদান করেন। ডাঃ পেররনের উৎসাহে তিনি উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তাতির বিবরণ সম্বলিত দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ দুইটি ডাঃ পেররন ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থ দুইটির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। Voyage au Dar four par le Cheikh Mohammed Ebn Omer el-Tounsy (তুনসী, তূনিসীর পরিচিত নাম, তু. Stumme, Gramm, des tunesisch. Arabisch. Leipzig ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ৬৬)। Reviseur en Chef a l'Ecol de Medecine du Caire, traduit de l' Arabe par Dr. Perron, Directeur de l'Ecole de Medecine du Caire, Paris 1845 (lxxxviii, pp. 492 in 8'. with map)। এই গ্রন্থে Jomard কর্তৃক লিখিত ভূমিকা পৃথকভাবে নিম্নোক্ত শিরোনামে বিদ্যমান- Observations sur le Voyage au Darfour, suivies d'un Vocabulaire de la Langue des Habitants et de Remarques sur le Nil-Blanc supirieur, Paris 1845. ডাঃ পেররন পূর্বেই এই গ্রন্থ সম্পর্কিত তথ্য এবং তাঁহার অনুবাদের নমুনা নিম্নোক্ত জার্নালে প্রকাশ করেন, F. A., Ser.iii. vol. viii., 1839, পৃ. ১৭৭-২০৬ (Letter to J. Moh1) এবং অনুরূপভাবে Bibliotheque universelle de Genevee. N.S. 5th year, vol. xxviii (No. 56), 1840. p. 325 প. -এ প্রকাশ করেন। ডাঃ পেররনের প্রকাশনার একটি অত্যন্ত সম্পূর্ণ অবয়ব Sedillot কর্তৃক F. A. ser. iv., vol, vii, 1846. p. 522-543 -এ প্রদত্ত হয়।

ডাঃ পেররন মুহাম্মাদ কর্তৃক লিখিত দারফুর ভ্রমণের বিবরণ সম্বলিত আরবী গ্রন্থটি নিম্নোক্ত শিরোনামে প্রকাশ করেন ঃ তাশহীযু'ল-আযহান বি-সীরাত বিলাদি'ল-'আরাব ওয়া'স-সূদান (= L'Aiguisement de l'Esprit par le voyage au Sudan et Parmiles Arabes), ইহা ১৮৫০ খৃ. প্যারিসে স্বহস্তে লিখিত আকারে প্রকাশ করেন (310 pp. in 40, with 4 pp. in French of introduction emendations and addditions to the translation).

২। Voyage au Ouaday, par le Cheikh Mohammed Ebn Omar al Tounsy, traduit de l"Arabe par Dr. Perron, Paris 1851 (lxxv., 756 pp. in 8., মানচিত্রসহ ও ৯টি চিত্র লেখ)। Jomard এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণপূর্ণ একটি দীর্ঘ ভূমিকাও অন্তর্ভুক্ত করেন (পৃ. i-lxxv.)। ডাঃ পেররন তৎকর্তৃক লিখিত অবতরণিকায় বিশেষভাবে সুদানের বিভাগসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন (পৃ. ১-৩৫)।

দ্বিতীয় গ্রন্থটির আরবী ভাষ্য যাহা ডাঃ পেররন (পৃ. গ্র., পৃ. ৩৪) প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্ভবত তাঁহার নিকট ছিল। কিন্তু ১৮৭৬ খৃ. প্যারিসে ডাঃ পেররনের মৃত্যুর পর ইহা কোথায় গেল আমি জানি না।

শায়খ মুহাম্মাদ আত-তূনিসীই প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদিগকে সূদানের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহের নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রদান করেন। তাঁহার

পূর্বে আমরা দারফুর সম্পর্কে কেবল আবিষ্কারক W. G. Browne-এর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ওয়াদা'ই সম্পর্কে Burckhardt কর্তৃক সংগৃহীত সামান্য তথ্য পাই। মুহাম্মাদ সূদানে তথ্য সংগ্রহের কয়েক দশক পরে H. Harth S. Nachtigal এ সব অঞ্চল ভ্রমণ করিতে সক্ষম হন এবং তাঁহাদের পুস্তকে অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ দান করেন। আত-তূনিসীর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিবার কোনও কারণ নাই। ডাঃ পেররন মুহাম্মাদ কর্তৃক প্রদত্ত বর্ণনা কায়রোয় স্থায়ীভাবে বসবাসরত দারফুর ও ওয়াদা'ই-এর বহু ব্যক্তির সাহায্যে পরীক্ষা করেন এবং এই বর্ণনা সম্পর্কে তাঁহাদের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করেন। তবে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, শায়খ-এর বর্ণনার বিশেষ কিছু ভুলত্রুটি ছিল। তথ্যাদির বিন্যাস পরম্পরার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব, যথাযথ নিয়ম-নীতির বোধগম্যতার অভাব স্পষ্ট। অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যের প্রতি ঝোঁক এবং দেশের জনপ্রিয় ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে গভীর বিশ্বাসপূর্ণ সুবিন্যস্ত বর্ণনা তেমন কোনও ত্রুটি নহে। প্রকৃতপক্ষে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে কোন ভৌগোলিক, স্থান ভিত্তিক, পরিসংখ্যানগত এবং আবহাওয়া সম্পর্কিত কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করেন নাই (তু. Barth কর্তৃক সমালোচনাকৃত, in Reisen und Entdeckungen in Nord und Centralafrika, ii, Berlin 1859, p. 525 প.; and Nachtigal, in Petermanns Geogr, Mitteil, xxi, 1875, p. 176 and in Sahara und Sudan, iii, p. viii)। তাহা সত্ত্বেও তূনিসীর দুইটি গ্রন্থ সুদান অঞ্চলে তাঁহার ভ্রমণের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ, জাতিগত, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের সন্নিবেশ করিয়াছে। উপসংহারে উহা বলা যায় যে, শায়খ তূনিসী-এর দুইটি গ্রন্থের একটি অপরটির পরিপূরক। গ্রন্থ দুইটিতে ওয়াদা'ই সম্পর্কে অত্যন্ত ব্যাপক এবং দারফুর সম্পর্কেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তথ্য রহিয়াছে।

একটি অতিরিক্ত বিবরণ হিসাবে আমরা শায়খ মুহাম্মাদ আত-তূনিসী উল্লিখিত একজন গ্রামবাসী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব, যিনি আত-তূনিসীকে বিভিন্নভাবে সঙ্গ ও সহায়তা দান করিয়াছেন, তাঁহার নাম শায়খ যায়নু'ল-'আবিদীন। যায়নু'ল-'আবিদীন একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং য়ুরোপীয়দের সাহচর্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। ১৮১৮ অথবা ১৮১৯ খৃ. তিনি যখন পরিণত বয়সে উপনীত, তখন তিনি সুদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, এবং আত-তূনিসীর মত তিনিও সুদানে ১০ বৎসরকাল বসবাস করেন। এই ১০ বৎসরকাল তিনি একজন ধর্মপ্রচারক এবং দুঃসাহসিক ভ্রমণকারী হিসাবে ধর্মীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। তিনি প্রথমে সান্নার ও কর্দোফান (Cordofan)-এ যান এবং পরে দারফুর ও ওয়াদা'ই-এ উল্লেখযোগ্য সময় শিক্ষকতা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। তিন বৎসর ওয়াদা'ই-এ অতিবাহিত করিবার পর তিনি ফেয্যান হইয়া তূনিস-এ প্রত্যাবর্তন করেন। উপরোক্ত স্থানসমূহে অবস্থানকালে তিনি তাঁহার অর্জিত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ আরবী ভাষায় একটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটি অধিক বৃহৎ ছিল না এবং কখন ও কোথায় মুদ্রিত হয় তাহা অজ্ঞাত। এই গ্রন্থটি তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয় এবং ১২৬২/১৮৪৬ সালে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয় (তু. Z. D. M. G.,ii, 482)। এই তুর্কী ভাষ্যটি G. Rosen কর্তৃক নিম্নোক্ত নামে ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়, Dar Buch des Sudan oder Reisen es Scheich Zain el-Abidin in Nigritien, Lipzig 1847)।

এই গ্রন্থের গুরুত্ব দারফুর ও ওয়াদাই-এর রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সামাজিক সংগঠনের বিবরণের মধ্যে নিহিত। এই গ্রন্থের দ্বারা আমরা রাজকীয় জীবন, সৈনিক জীবন, যুদ্ধাভিযান, গ্রামবাসী, দাস ও নিগ্রো, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কুসংস্কার, বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে পারিয়াছি, এই আকর্ষণীয় বিবরণসমূহ-মুহাম্মাদ আত-তূনিসীর অধিকতর সম্পূর্ণ বর্ণনার গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক। লক্ষণীয় যে, ওয়াদা'ই-এর সুলতানের অনুমতিক্রমে যায়নু'ল-'আবিদীন রাজধানীর সন্নিকটে একটি ধ্বংসস্তূপের খননকার্য সম্পাদন করেন (পৃ. ৪৭-৫৯, ৬১-৭৫)। যায়নু'ল-'আবিদীন ওয়াদা'ই ত্যাগ করিবার পরেই শাসকের পরিবর্তন হয়। Rosen-এর অনুবাদে সেই শাসকের নাম 'আবদু'ল-'আজীম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (মৃ. ১০৮; তু. Nachtigal, পূ. গ্র., iii, 284-এ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ আত-তূনিসীর জীবনী ও তাঁহার পরিবার সম্পর্কে প্রধান উৎস তাঁহার দুইট ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থ, বিশেষ করিয়া সূচনামূলক পরিচ্ছেদে প্রদত্ত তাঁহার আত্মজীবনী, যাহা "Voyage au Darfour" (পৃ. ১-২৫) গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, অধিকন্তু বিচ্ছিন্নভাবে প্রদত্ত তথ্যাবলী, যেমন পূ. গ্র., পৃ. ৪৮-৪৯, এবং Voyage au Ouaday-এ প্রদত্ত তথ্যাবলী, পৃ. ৩৭, ৩৯, ৫০, ৬২, ৬৬-৬৭, ১২৯, ১৯৯, ২১১ প., ২১৫, ৪৯৭-৪৯৯, ৫০৮, ৫১২ প., ৬৪৩-৬৪৫; (২) Jomard কর্তৃক লিখিত জীবনী ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত নহে (Voyage au Darfour, পৃ. ৮-১০); (৩) তু. আরও পেররন-এর বিবরণ (voyage au Darfour, পৃ. lxxxi-lxxxii) এবং A. V. Kremer's Aegypten, Leipzig 1863, ii, 324; (৪) আরও তু. নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত তথ্যাবলীর অতিরিক্ত Wüstenfeld প্রদত্ত তথ্য Luddes Zeitschr. fur Verglrich, Erdkunde, i (Magdeburg 1842), p. 67 and Brockelmann, G. A. L., ii, 491 (Where the book on Wada'i is not given)।

M. Streck (E.I.[1]) সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তূপাল 'উছমান পাশা (طوپال عثمان پاشا) ঃ জনৈক 'উছমানী প্রধান উযীর। তূপাল অর্থাৎ "খোঁড়া" উছমান পাশা ১১০৪/১৬৯২ সালে Morea-তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে Stambul-এ রাজপ্রাসাদের চাকুরীতে প্রবেশ করেন। সেইখানে তিনি মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে Beylerbeyi (প্রাদেশিক প্রশাসক) পদে উন্নতি পাওয়ার পূর্বে অনেকগুলি দফতরে চাকুরী করেন। স্বল্পকাল পরেই তিনি Morea-এর Serasker (সেনাপতি) এবং সর্বশেষে দুইটি অশ্ব-পুচ্ছবিশিষ্ট পতাকা বা প্রতীক ধারণের মর্যাদা (তুগ দ্র.)-সহ উযীর পদে উন্নীত হন। তিনি অতঃপর পুনঃপুনঃ গভর্নরের পদ অলংকৃত করেন, যথাঃ দুইবার করিয়া বোসনিয়া, Naupactos ও Widin, পরে প্রধান সেনাপতি হিসাবে পারস্যে গমন করেন এবং পরিশেষে দামাদ ইবরাহীম পাশা অপসৃত হইলে ১৯ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১১৪৪/২১ সেপ্টেম্বর, ১৭৩১ সালে প্রধান উযীরের পদ লাভ করেন। তিনি মাত্র ছয় মাস উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৫ রামাদান, ১১৪৪/১২ মার্চ, ১৭৩২ সালে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয় এবং গভর্নর হিসাবে Trapezuns-এ প্রেরিত হন। অতঃপর তাঁহাকে পারস্যের নাদির কুলী খান (দ্র.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 'উছমানী বাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব না দেওয়া পর্যন্ত তিনি পালাক্রমে Erzerum-এর তিফ্লিস-এর শাসক পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯ জুলাই, ১৭৩৩ খৃ. টাইগ্রীসের যুদ্ধে তিনি পারস্য বাহিনীকে পরাস্ত এবং পলায়ন করিতে বাধ্য করেন এবং তাহাদিগকে বাগদাদ হইতে বিতাড়িত করেন। যাহা হউক, তিন মাস পরে ২৬ অক্টোবর, ১৭৩৩ খৃ. কিরকুকের দক্ষিণ-পূর্বে লায়লান (Lailan) সমভূমিতে অপর একটি যুদ্ধে তিনি মারাত্মকভাবে পরাস্ত এবং নিহত হন। নাদির কুলী খানের নির্দেশে তাঁহার মৃতদেহ বাদগাদে আনয়ন করত সেইখানে দাফন করা হয়।

ভূপাল 'উছমান পাশা একজন কঠোর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কিন্তু দক্ষ ও তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হিসাবে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে উত্তম বর্ণনা তাঁহার ব্যক্তিগত ফরাসী চিকিৎসক Sieur Jean Nicodeme (১০ আগস্ট, ১৭৩৩ খৃ. তারিখে Marquis de Villenenve-কে লিখিত, J. V. Hammer, G.O.R., ৭খ, ৫৯৯ প. মুদ্রিত একটি পত্রে)-এর বর্ণনা এবং Jonas Hanawy কর্তৃক তাঁহার Historical Account of British Trade over the Caspian (লণ্ডন ১৭৫৩ খৃ., ২খ, ১২ অধ্যায়, সম্পূর্ণ ভূপাল 'উছমানের উপর রচিত)-তে প্রদত্ত বর্ণনা। নাদির কুলী খানের বিরুদ্ধে ভূপাল 'উছমানের অভিযানের বিবরণ জনৈক খৃস্টান কর্তৃক সংকলিত গাযাওয়াত-ই ভূপাল 'উছমান পাশা নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে; (তু. F. Babinger, S. O. R., পৃ. ২৮৯, টীকা ১, নং ৬-তে)। ভূপাল 'উছমান পাশার পুত্রগণ ছিলেন রাতিব আহমাদ পাশা ও Beylerbeyi আরসলান বে (তু. J. V. Hammer, G. O. R., ৮খ, ৩৯০)। তাঁহার দৌহিত্রদের মধ্যে ছিলেন য়ূসুফ পাশা, মূসা পাশা এবং পরবর্তী বংশধর ছিলেন গ্রন্থকার ও কবি নামিক কামাল বেক (দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) সুবহী, তা'রীখ, Stambul 1198, স্থা.; (২) মুহাম্মাদ সা'ঈদ, যায়ল-ই হাদীকাতু'ল-উযারা', পৃ. ৪০ প.; (৩) সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ৩খ, ৪২৮ (after Meh. Sa'id); (৪) J. V. Hammer, G. O. R., ৭খ, 402 and esp. 430 প.; (৫) Relation des deux revolutions arrives a Constantinople en 1730 et 1731, হেইগ ১৭৩৭ খৃ., পৃ. ১৪৫-১৫২; (৬) St. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 1925, পৃ. ১৩৮, ১৪০ প.।

F.Babinger (E. I. [1])/মুহঃ আবু তাহের

তুফান [দ্র. নূহ ('আ)]

তূবূ (Tubu) ঃ পূর্ব সাহারার একটি জাতি। পূর্বদিকে লিবীয় মরুভূমি ও পশ্চিম দিকে হ্যাগার (Haggar), উত্তর দিকে ফেযযান (Fazzan) ও দক্ষিণ দিকে তেহাদ (Tehad) অঞ্চলের মধ্যবর্তী বিশাল রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া তাহারা বাস করিত। ফেযযানের অন্তর্বর্তী Gatrun জিলার বৃহত্তম অংশ তাহাদের সমন্বয়ে গঠিত; Kanem এবং Kawar মরূদ্যানে তাহারা সংখ্যাগুরু। য়ূরোপীয়গণ এই সকল জাতিকে 'তূবূ' বা 'তিব্‌বূ' নাম প্রদান করে; কিন্তু বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজদিগকে বিশেষ বিশেষ নামে আখ্যায়িত করে। Tibesti-এর অধিবাসীদের ক্ষেত্রে তূবূ নামটি সমধিক প্রযোজ্য। কানুরি (Kanuri) ভাষায় ইহার অর্থ 'তূ'-এর অথবা তিবেস্তি-র অধিবাসী; শেষোক্তগণ নিজদিগকে তেদা (Teda) নামে অভিহিত করে; অনুরূপভাবে অপর গোষ্ঠীগুলিও স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দুইটি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা যায়। যাহাদের আঞ্চলিক ভাষা (dialect) শব্দভাণ্ডার সম্পূর্ণ পৃথক, গোষ্ঠীদ্বয় হইল তিবেস্তি-র 'তেদা' (Teda) এবং দক্ষিণ দিকস্থ জেলাসমূহে বসবাসরত দাযাগাদা (Dazagada)। আরবগণ দাযাগাদা গোষ্ঠীকে গৌরান (Gouran) নামে অভিহিত করে।

তূবূগণ একদিকে যেমন কৃষ্ণবর্ণ সুদানীগণ হইতে, অপরদিকে তদ্রূপ আরব ও বার্বারগণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণত তাহাদের আকৃতি খর্ব, পাতলা গড়ন, ত্বক কৃষ্ণবর্ণ ও নাসিকা সোজা, কখনও কখনও বক্রাগ্র, ওষ্ঠ অপুরু এবং কেশ মসৃণ। এই সকল শারীরিক বৈশিষ্ট্য, বিশেষত তেদাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; তাহারা নিজেদের পার্বত্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাসরত রহিয়া গিয়াছে। অল্প বিস্তর নিগ্রো রক্তের সহিত মিশ্রিত Dazagada-দের মধ্যে তাহারা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। দেশের দারিদ্র্য তাহাদিগকে দীনহীন জীবন যাপনে বাধ্য করিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ যাযাবর, অন্যরা স্থায়ী বাসিন্দা। প্রধান জীবনোপকরণাদি আসে ennedi অর্থাৎ আর্দ্র উপত্যকাসমূহে তাল জাতীয় বৃক্ষ এবং শস্য চাষাবাদ হইতে, তিবেস্তি-তে আসে ছাগ পালন হইতে এবং তেহাদ অঞ্চলে পশু পালন হইতে। Teda গোষ্ঠী উষ্ট্র ভাড়া দিয়াও কিছু অর্থ উপার্জন করে, তাহারা কাফেলার পথ প্রদর্শকের কাজ করে, কিন্তু সুযোগমত বিশেষত দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। এই জীবনধারা তাহাদের মধ্যে যেমন ক্লান্তি এবং অভাব-অনটন-প্রতিরোধের অসাধারণ ক্ষমতার বিকাশ লাভ ঘটে তদ্রূপ তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর দস্যুতেও পরিণত করে; Tubu গোষ্ঠীর জীবনের সর্বপ্রথম য়ূরোপীয় পর্যবেক্ষক Nachtigal হইতে শুরু করিয়া সকল য়ূরোপীয় পর্যটক এই ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করেন। গৃহবাসী তূবূগণকে সাধারণত বিভিন্ন নাতিবৃহৎ দলে বিভক্ত দেখা যায়। তাহারা বাস করে হয় তালপাতা দ্বারা আচ্ছাদিত প্রস্তর গৃহে কিংবা খড়ে ছাওয়া কঞ্চি দ্বারা নির্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়েঘরে নতুবা এমন গুহায় যাহা মোটামুটি আসবাবে সজ্জিত। ক্রীতদাসগণ কুঁড়ে ঘর সংলগ্ন ক্ষেত্রে চাষাবাদ করে, খোদ তূবূগণ যুদ্ধ ও পশুচারণ করে।

তূবূগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত–সম্ভ্রান্ত শ্রেণী বা মায়ানা (maina) ও সাধারণ লোক। তেদাগণের মধ্যে গোত্রগুলি প্রভু (Suzerain) শ্রেণী ও নিকৃষ্ট দাস উপজাতিতে বিভক্ত। উক্ত প্রভুশ্রেণী সংখ্যায় তিনটি, তথা (১) Thomaghera. (২) Gunda (তাহাদের প্রায় সকলেই ফেযযানে দেশান্তরিত) (৩) Tuzaba তিবেস্তির সুলতান (বা দারদাই) যিনি সম্ভ্রান্তদের দ্বারা গঠিত একটি পরিষদের সাহায্যে দেশ শাসন করেন, তিনি আবশ্যিকভাবে Thomaghera প্রভুশ্রেণীর সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। অপরপক্ষে, সুদানীদের ন্যায় তূবূদের মধ্যে হাদ্দাদগণ (বাসার জেলে ও শিকারী) একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী, যাহারা সকলের ঘৃণার পাত্র এবং নিকৃষ্ট জীব বলিয়া বিবেচিত। তূবূগণ মুসলিম, মনে হয় ইদানিং ধর্মান্তরিত। আরবগণ তাহাদের প্রতি কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করে এবং তাহাদিগকে মুসলিমরূপে গণ্য করে না। তাহারা প্রকৃতপক্ষে অচেতন পদার্থে অন্ধবিশ্বাসমূলক পূজা অর্চনা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুরআনী আইনের পরিপন্থী তাহাদের নিজস্ব রীতিনীতিতে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হত্যার ক্ষেত্রে তাহারা দিয়াত (دية) বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে না এবং মদ্য সংক্রান্ত নিষেধও মানে না। এতদসত্ত্বেও তূবূগণ ধর্মোন্মত্ত মুসলিম, বিশেষত তিবেস্তি, বরকু ও বাহরুল-গাযাল অঞ্চলের অধিবাসিগণ; তাহারা সানূসী দরবেশ সম্প্রদায়ের ওয়াউ-এর যাবিয়া (زاوية), য়্যানিযালাকা যাবিয়া প্রভৃতির প্রভাবে খুবই প্রভাবান্বিত এবং য়ূরোপীয় অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের বিরোধিতা করে।

তূবূ জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে শুধু অসম্পূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড বর্ণনা বিদ্যমান। মাকরীযী পর্যন্ত আরব গ্রন্থকারগণ তাহাদের কোন উল্লেখ করেন নাই। বহুকাল যাবৎ তাহারা জাতিতে বারবার বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তাহাদিগকে Bardoa-দের শামিল বলিয়া শনাক্ত করা হইত। Barth তূবূ ও কানূরি ভাষাদ্বয়ের মধ্যে তৎকর্তৃক আবিষ্কৃত মিলের ভিত্তিতে উক্ত মতের সমর্থন করেন। অপরপক্ষে বর্তমানে ইহা স্বীকৃত যে, তূবূগণ মূলত সূদানে বাস করিত এবং পরে মরু সাহারাতে বিতাড়িত হয়। যেভাবেই হউক, মনে হয় যে, তাহারা Kanem-এর ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Kanem রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের ব্যাপারে Kanembon-এর সহিত এই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত

কতিপয় গোত্র সংশ্লিষ্ট ছিল। খৃ. দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত Kanem-এর সুলতানগণ তূবূ মহিলাদিগকে বিবাহ করিবার প্রথা অব্যাহত রাখেন। কিছু সংখ্যক তূবূ Kanem-এ বসতি স্থাপন করে। উহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য যাহারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আসিয়াছিল Tibesti-তে তাহারা থাকিয়া গিয়াছিল। সুলতান ২য় দূনেম (Duname) তাহাদের সঙ্গে সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হন। তিনি বিজয়ী হন বটে, তবে তাঁহার রাজ্যের সম্পদ নিঃশেষিত হইয়া যায়। চতুর্দশ শতাব্দীর তূবূগণ বূলাবা গোষ্ঠীর মিত্র ছিল এবং Kanem বিজয়ে তাহাদিগকে সাহায্য করে। শাদ (Tchad) হ্রদের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে বসবাসরত তূবূগণ প্রতিবেশীদের (তু. Bornu ও Kanem প্রবন্ধদ্বয়) ভাগ্যের অংশীদার হয়। তিবেস্তির অধিবাসী তূবূদের সম্পর্কে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সঠিক কিছু জানা যায় না। এই কালে তাহারা প্রায়শ বোরনূ এবং ফেযযান-এ আক্রমণ (raid) চালাইত। ১৭৮৮ সালের এক পরাজয়ের ফলে তাহারা ফেয্যান raid বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহাদের আত্মরক্ষার পালা শুরু হয়; তখন হইতে তাহারা Wlad ও Tuareg জাতির পুনঃপুনঃ আক্রমণের শিকার হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. Bally. Le Tibesti, Bulletin Comite Afrique francaise, 1914; (২) Barth, Reisen und Entdeckungen....., Gotha 1857; (৩) Comsme, Sammlung und Bearbeitung central-afrikanischer Vocabularien, Gotha 1862; (৪) Behma, Land und Volk der Tebu, Petermanns Mitteilungen, Erganzungsheft No 8, Gotha 1861; (৫) Blaisot, Le Tibesti d'hier et de demain, Bulletin Comite Afrique francaise, 1921; (৬) H. Carbau, La region du Tchad et du Wadai, Paris 1912, Publication de la Faculte des Lettres d'Alger, vol. xlviii. and xil; (৭) d'Escayrac de Lauture, Le Sahara et le Soudan, Paris 1855; (৮) F. Krasnel, Memoire sur le Ouadai. Bulletin Societ. Geographie, Paris 1849; (৯) Krause, Zur Volkerkunde Nord-Africas. I. Die Teda und Kanuri, II. Die Teda und die Garamanten. Zeitschrift der Geogr. Gesellschaft, Berlin 1876; (১০) Martin, Note sur les Toubou (Bulletin Comite Afrique francaise. 1910); (১১) Muhammad and Tunsi, Voyage au Wadai, transl. Perron, Paris 1851; (১২) Nachtigal, Sahara und Sudan, Berlin 1879-1889

G. Yver (E.I[1])/আ. খা. মু. আবদুল মান্নান

তূমান বায় ২য় (طومان باى ثانى) ঃ আল-মালিকুল-আশরাফ (মিন কানসাওহ আল-গাওরী), সর্বশেষ মামলূক সুলতান ছিলেন। তাঁহার শাসনকাল ১৪ রামাদান, ৯২২/১৭ অক্টোবর, ১৫১৬ সাল হইতে ২১ রাবী'উল আওয়াল, ৯২৩/১৫ সেপ্টেম্বর, ১৫১৭ সাল পর্যন্ত। আমীর কানসাওহ [পরবর্তী কালে সুলতান কানসাওহ আল-গাওরী (দ্র.) নামে অভিহিত] [সুলতানের সহিত তিনি সম্পর্কিত ছিলেন, তাঁহাকে একজন ক্রীতদাস হিসাবে ক্রয় করেন ও সুলতান কাইত বে (দ্র.)-কে প্রদান করেন]/শেষোক্তজন তাঁহাকে করনিক মামলূক (আল-কিতাবিয়্যা) হিসাবে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করেন। সুলতান মুহাম্মাদ আন-নাসির ২য়, সম্ভবত ৯০২/১৪৯৬ সনের প্রথম দিকে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন এবং জামদার [দ্র.] পদে উন্নীত করেন। কিছুদিন পর তিনি সুলতানের দেহরক্ষী দলে যোগদান করেন। তিনি এই পদে তাঁহার আত্মীয় সুলতান কানসাওহ আল-গাওরীর ক্ষমতা লাভ পর্যন্ত বহাল থাকেন, যিনি তাঁহাকে ১০ জনের আমীর (Commander?) নিযুক্ত করেন। ৯১০/১৫০৪ সনে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর ইনতিকালের পর তিনি আমীর তাবলাখানা ও প্রধান পরিবেশক নিযুক্ত হন। হি. ৯১৩ সনে দাওয়াদার কাবীর [দ্র.] এবং মামলূক বংশের শেষদিকের স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী প্রাসাদ-প্রধান (উসতাদার) ও ভূসম্পত্তি তত্ত্বাবধায়ক (কাশিফুল-কুশ্‌শাফ) পদ লাভ করেন। এইভাবে তিনি সর্বোচ্চ বেসামরিক পদে উন্নীত হন।

সুলতান যখন সুলতান সালীমের বিরুদ্ধে সিরিয়া গমন করেন, তিনি তখন সুলতানের অবর্তমানে নাইব (নাইবুল-গায়বা) নিযুক্ত হন। সুলতান গাওরীর পরাজয় ও ইনতিকালে তিনি পশ্চাদপসরণকারী সৈন্য ও আমীরদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঠেকান এবং যতদূর সম্ভব শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন, যাহাতে আমীর ও জনসাধারণ তাঁহার প্রতি আস্থা রাখিতে পারে। তিনি সর্বসম্মতভাবে সুলতান নির্বাচিত হন এবং অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরিশেষে পদ গ্রহণে সম্মত হন, যদিও তিনি পদের অসুবিধাগুলি সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল ছিলেন। প্রথম অবস্থায় অর্থাভাব প্রকট ছিল। কারণ তুর্কীরা সুলতান গাঁওরীর নিকট হইতে বহু লক্ষ দীনার আটক করিয়াছিল, উহার কিছু তাঁহার সঙ্গে শিবিরে ছিল এবং কিছু দুর্গে ছিল। ইহা ছাড়া সেনাবাহিনী ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং প্রভাবশালী আমীরদেরকে বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। প্রশ্নটি তাঁহার জন্য জনৈক বিজ্ঞ শায়খ আবূ সাউদ আল-জারিহী (পুরাতন কায়রোর নিকট একটি মহল্লা এখনও তাঁহার নাম বহন করে) মীমাংসা করিয়া দেন এবং আমীরদিগকে তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণে বাধ্য করেন। খলীফা সুলতান সালীমের সঙ্গে বন্দী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা নিয়োগপত্র প্রদান করেন এবং নূতন সুলতানের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। তূমান বায় সিরিয়া প্রত্যাগত আমীরগণকে সর্বোচ্চ পদসমূহ প্রদান করেন। গায্যা হইতে সাহায্যের আবেদন আসে এবং ত্বরিত সেইখানে সৈন্য প্রেরিত হয়। একই সময়ে সালীম শান্তি প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

তূমান বায় তাঁহাকে সার্বভৌম হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিতে রাজি ছিলেন। সুলতান শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমীরগণ উহাতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং দূতদেরকে তাহারা গোপনে হত্যা করিয়া ফেলেন; ফলে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সুলতান কর্তৃক আমীর জানবারদীর নেতৃত্বে প্রেরিত সৈন্যবাহিনী গায্যায় সিনান পাশার [দ্র.] নিকট পরাজিত হয় এবং কায়রো ফিরিয়া আসে। সালীম তাহার পর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া এবং বেদুঈনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সুশৃঙ্খলভাবে তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া মিসর পৌঁছেন। তূমান বায় তাঁহাকে সালিহীয়া নামক স্থানে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমীরগণ কায়রোর পূর্বে বায়দানীয়া নামক স্থানে সাতারিয়া জাবাল আহমারের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তুর্কী অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার জন্য বালুকারাশির মধ্যে বন্দুকসমূহ স্থাপন করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনাটি 'উছমানী তুর্কীদের নিকট ফাঁস করিয়া দেওয়া হয় এবং তুর্কী বাহিনীর একটি অংশ মিসরীয় অবস্থানের নিকটবর্তী হইয়া উহার পার্শ্বদেশে আক্রমণ চালায়। এক ঘণ্টার মধ্যে গতিময় ও চালাকিপূর্ণভাবে স্থাপিত তুর্কী গোলন্দাজ বাহিনী মামলূক

সৈন্যবাহিনীর বৃহত্তর অংশকে ধ্বংস করিয়া দেয়। সাহসী সুলতান তূমান বায় একটি ক্ষুদ্র দলের প্রধানরূপে যুদ্ধ করিতে সুলতান সালীমের তাঁবুর নিকটবর্তী হন এবং সেইখানে একদল আমীরকে এই মনে করিয়া হত্যা করেন যে, তাঁহাদের মধ্যে সালীম রহিয়াছেন। নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি মিসরীয়দের পলায়ন করিতে দেখিতে পান এবং নীল নদের দিকে তাহাদের অনুসরণ করেন ও সেইখানে তাঁহারা সৈন্যবাহিনীর সামান্য অবশিষ্টাংশকে পুনঃ একত্র করেন। তুর্কী বাহিনী কায়রো অধিকার ও লুণ্ঠন করে এবং তাহাদের হাতে পতিত সকল মামলূককে হত্যা করে। তূমান বায় কায়রো নর্দখল করিতে সক্ষম হন এবং দুই দিনের জন্য সেইখানে অবস্থান করেন। তারপর তাঁহাকে নীল নদ অতিক্রম করিয়া মিসরের উপর অংশের দিকে পলায়ন করিতে হয়। সেইখান হইতে তিনি সালীমের সহিত সন্ধিচুক্তি আলোচনা করেন। সালীম এই শর্তে ফিরিয়া যাইতে রাজি হন যে, মুদ্রায় ও জুমুআর খুতবায় তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইবে। তূমান বায় ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আমীরগণ তাঁহাকে বাধা দেন এবং সুলতানের দূতদের হত্যা করেন। সালীমও তারপর কায়রোয় আটককৃত আমীর ও মামলূকদেরকে হত্যা করেন এবং সৈন্যদের নীল নদ অতিক্রমের নির্দেশ দেন।

কিন্তু যেই তাহারা ছোট ছোট দলে তীরে অবতরণ করিতে থাকে অমনি তূমান বায়ের উন্নত সেনাবাহিনী তাহাদিগকে হত্যা করিতে থাকে। সালীম অতঃপর তাঁহার গোলন্দায বাহিনীকে সক্রিয় করিতে মনস্থ করেন। তিনি নীল নদের তীরে বন্দুক স্থাপন করিয়া শত্রুর উপর গোলা নিক্ষেপ করিতে থাকেন। ফলে তাহারা ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তুর্কী বাহিনী এখন বিনা বাধায় নদী অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। তূমান বায় পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিলে সালীম তাঁহার সহিত সন্ধিচুক্তি আলোচনার জন্য দূত প্রেরণ করেন। দূত তূমান বায়ের একজন প্রাক্তন মামলূক ছিল এবং সে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করিতে থাকে। আলোচনার সময় সে আহত হয় এবং তাহাকে ফেরত পাঠান হয়। রাত্রিবেলা অমীমাংসিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরের দিন তূমান বায় তাঁহার প্রাক্তন অনুগামী জানবারদীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু তাহাতে সুলতানেরই জয় হয়। মামলূকদের বীরত্ব প্রদর্শন সত্ত্বেও উন্নত তুর্কী বাহিনী ও তাহাদের সহিত যুক্ত বেদুঈনদের নিকট তাহারা সম্পূর্ণ পরাভূত হয়।

তূমান বায় জনৈক বেদুঈন দলপতির নিকট পলায়ন করেন, যিনি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার লোকদের চাপে তূমান বায়ের গোপন আশ্রয়ের কথা ফাঁস করিয়া দিতে বাধ্য হন। সালীম তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজ শিবিরে আনয়ন করেন এবং তাঁহার দূতদের হত্যা করার জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করেন। তূমান বায়ের মহৎ আচরণ সুলতানের মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষে যোগদানকারী আমীরদের পরামর্শক্রমে এক সপ্তাহ পর তাঁহাকে বাব যুওয়ায়লা নামক স্থানে ফাঁসি দেওয়া হয়। এইভাবে সর্বশেষ মামলূক সুলতানের জীবনাবসান ঘটে। তাঁহার পরাজয়ের কারণগুলি ছিলঃ মিসরের দুর্নীতিমূলক অবস্থা, মামলূকদের মধ্যকার চিরস্থায়ী অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অর্থাভাব। তবে পুনরায় জোর দিয়া বলিতে হয় যে, প্রধান কারণ ছিল তুর্কী গোলন্দায বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব। সাহসী মামলূকরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে আগ্রহী ছিল না এবং তাহারা উহার সম্পূর্ণ গুরুত্বও উপলব্ধি করে নাই। কারণ তাহারা বিশ্বাস করিত যে, ব্যক্তিগত যুদ্ধ জয়ের আসল কারণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Weil, Geschichte der Chalifen, v, Stuttgart 1862 (ইহাতে পাণ্ডুলিপি আকারে আরবী উৎসসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে, দ্র. ভূমিকা, ১৫); (২) V. Hammer, G. O. R., Pest 1827 (উৎসমূহের তালিকাসহ); (৩) ইব্ন ইয়াস, বাদাইউয-যুহূর, বূলাক ১৩১১ এবং যাঁহারা আরবী জানেন না তাঁহাদের জন্য Lieut Colonel W. H. Salmon-কৃত উক্ত গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের অনুবাদ, লণ্ডন ১৯২১ খৃ., Oriental Translation Fund-এ, N. S., xxv.; (৪) ইহা ছাড়া ইয়াস যুনবুল-এর সুলতান সালীম কর্তৃক মিসর জয়ের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, S. Brockelmann, G. A. L., ২খ, ৪৩ ও ২৯৮; (৫) এই সময়কার পরোক্ষ ব্যবহারের জন্য, H. Jansky, Beitrage zur osman, Geschichte, ২খ, ১৭৩ প., ইহাতে তুর্কী উৎসসমূহ বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

M. Sobernheim (E. I. [1])/মু. আবদুল মান্নান

তূযাক-ই জাহাংগীরী (توزك جهانگيرى) ঃ বাদশাহ্ জাহাংগী-র আত্মজীবনী। ওয়াকিআত-ই জাহাংগীরী ও জাহাংগীরনামা নামেও অভিহিত। প্রথম বার বৎসরের ইতিহাস বাদশাহ্ স্বহস্তে লিখেন; অবশিষ্ট অংশ তাঁহার নির্দেশে মুহাম্মাদ হালী ও মু'তামিদ খান কর্তৃক লিখিত। চিত্তাকর্ষক পুস্তক হিসাবে জগতে সম্ভবত ইহার জুড়ি নাই। বিষয়বস্তু ও লিখন পদ্ধতিতে কেবল তূযুক-ই বাবুরী (ওয়াকি'আত-ই বাবুরী বা বাবুরনামা)-এর পরেই ইহার স্থান। ইহাতে তিনি আদর্শ স্বৈরাচারী, সহৃদয় বন্ধু, নির্ভুল পর্যবেক্ষক, সদাশয় মুরুব্বী, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভক্ত এবং দোষ-গুণের এক বিচিত্র সংমিশ্রণরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সত্যের ছাপ বহন করে এবং ফারসী সাহিত্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়। এই গ্রন্থ রজার্স ও বেভারিজ কর্তৃক দুই খণ্ডে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় (লণ্ডন ১৯০৯-১৪)। দ্র. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী (অনুবাদ, বাংলা একাডেমী; ইংরাজী হইতে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর কর্তৃক অনূদিত, ১৯৬৩)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭৩৪

তূযাক-ই বাবুরী (توزن بابورى) ঃ বাদশাহ বাবুরের আত্মচরিত। বাবুরনামা বা ওয়াকিআত-ই বাবুরী নামেও পরিচিত, সরল, অবিকৃত তুর্কী ভাষায় লিখিত। মির্যা আবদুর রহীম কর্তৃক ফারসীতে অনূদিত (১৫৯০)। ইংরেজী (১৮২৬) এবং ফরাসী (১৮৭১) অনুবাদও বাহির হইয়াছে। সজীব, সাবলীল রচনাভঙ্গি, অকপটে নিজের দোষত্রুটি স্বীকার, সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা, নির্ভুল চরিত্র অঙ্কন প্রভৃতি গুণের দরুন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী; নির্জলা সত্য বলিয়া স্বীকৃত একমাত্র আত্মচরিত, সর্বযুগে অমূল্য বিবেচিত আত্মচরিতসমূহের অন্যতম। এশিয়ায় প্রায় অদ্বিতীয়। ইহা বাবুরকে এশিয়ার সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত ও কৃতিবিদ্যা ভূপতিদের অন্যতম পরিগণিত করিয়াছে। বাবুর বংশের ক্ষমতা ও আড়ম্বর আজ অতীতের কাহিনী। কিন্তু তাঁহার তূযুক অদ্যাপি অপরিবর্তনীয় ও অবিনশ্বর। দ্র. বাবুরনামা (জন লেডেন ও উইলিয়াম এরস্কিন রচিত ইংরেজী বইয়ের বাংলা অনুবাদ; অনুবাদক ইবরাহীম খাঁ, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৩)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ২খ, ৭৩৫

আত-তূর (الطور) ঃ জাবালুত-তূর (বিরলতরভাবে তূর সীনা নামে ব্যবহৃত হয়), সিনাই পর্বতের নাম, আরব ভৌগোলিকগণ (আবুল-ফিদা, সম্পা. Reinaud, পৃ. ৬৯; আল-কালকাশান্দী, অনু. Wustenfeld, in Adh, G. W. Gott., ২৫খ., ১০০; Makrizi Gesch, d.

Kopten, অনু. Wustenfeld, পৃ. গ্র., ৩খ., ১১৩; য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ., ৫৫৭) বলেন, এই নামটি মূলত হিব্রু ভাষা হইতে আগত। আত-তূর শব্দটি তূর সীনীনরূপে পবিত্র কুরআনে একবার উল্লিখিত হইয়াছে (৯৫ ঃ ২, ইবনুল-ফাকীহতে ইহার সংশোধিত রূপ তূর সীনা [B. G. A., ৫খ., ১০৪, সূরা ২৩ ঃ ২০-এ ইহাকে طور سناء বলা হইয়াছে [উভয় বিবরণই শুদ্ধ। পর্বতটি লোহিত সাগরের অদূরে অবস্থিত। যেই স্থানে Israel-এর সন্তানগণ একদা শিবির স্থাপন করিয়াছিল সেই স্থানে পর্বতটিতে আরোহণ করা হয় আল-আস্ন (Elim?) হইতে ইহার নিকটে ওয়াদী তূওয়া (طوى) যেইখানে মূসা ('আ) ফিরআওন-এর নিকট প্রেরিত হইবার পূর্বে আল্লাহ্র সহিত কথা বলেন (২০ ঃ ১২, ৭৯, ১৬; য়াকূত, পূ. গ্র., ৩খ, ৫৫৩; সাফীয়্যুদ-দীন, মারাসিদুল-ইত্তিলা, সম্পা, Juynboll, ২খ, ২১৩)।

এই পর্বত (বর্তমান নাম জাবাল মূসা)-এর উত্তর পার্শ্বে (যাহা এক্ষণে ওয়াদী শুআয়ব [Jethro] নামে পরিচিত) পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় Catherine-এর মঠ অবস্থিত। সম্ভবত খৃ. ৫৪৮ ও ৫৬২ (Gregoire, Bull. de Corres. Hellen, ১৯০৭, পৃ. ৩২৭-৩৩৪) সনের মধ্যে সিনাই (Procopious, .., ৫খ, ৮, সম্পা. Haury, ৩/২ খ., পৃ. ১৬৮ দ্র. Eutychios, Annals, in Corp. Script. Christ, Orient., series. ৩খ, খণ্ড ৬, পৃ. ২০২-২০৪)-এর সন্ন্যাসিগণকে রক্ষা করার জন্য ১ম Justinian কর্তৃক স্থাপিত দুর্গের অবস্থানে নির্মিত। শাবুশ্তি (য়াকূত কর্তৃক উদ্ধৃত, পূ. গ্র., ২খ, ৬৭৫, সাফীয়্যুদদীন, পূ. গ্র., ১খ, ৪৩৪)-এর রচিত Book of Churches (কিতাবুদ-দিয়ারাত) অনুযায়ী চার্চ (কানীসা যাহার জন্য য়াকূত, পূ. স্থা., dair শব্দ ব্যবহার করেন) আত্-তূর কাল পাথর দ্বারা নির্মিত এবং দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত পর্বত চূড়ায় অবস্থিত ছিল। উক্ত চার্চ ভবনের বহির্ভাগে একটি এবং অভ্যন্তরে অপর একটি ঝর্ণা ছিল। চার্চ আত্-তূর ছিল সন্ন্যাসীদের আবাস এবং সেইখানে সংঘটিত অলৌকিক ক্রিয়া দর্শনের উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক দর্শকের আগমন হইত (Sachau, Abh. Pr. AK. W., ১৯১৯, সংখ্যা ১০, পৃ. ২১)।

উপরোক্ত আশ্রমের সন্ন্যাসিগণের নিকট রহিয়াছে মুহাম্মাদ (স) প্রেরিত বলিয়া কথিত নিরাপত্তা প্রদানমূলক চিঠির একটি কপি (Pococke, Description of the East, ১খ, ২৬৮-২৭০; Moritz, Abh. Pr. Ak. W., ১৯১৮, Abh., ৪খ., পৃ. ৬-৮, তু. Coptic Christian-এর জন্য নিরাপত্তার অনুরূপ একটি পত্র প্রকাশিত by G. Graf., M. V. A. G., ২২খ, ১৮১-১৯৩, Moritz, পৃ. গ্র., পৃ. ২১-২৩) এবং তিনজন সুলতান (তথা সুলতান ইনাল, খুশকাদাম ও কাইত বে, Moritz, পৃ. গ্র.)-এর চতুর্পার্শ্বস্থ লুণ্ঠনকারী বেদুঈনদের আক্রমণ হইতে খৃস্টান সন্ন্যাসীদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত।

এই আশ্রমের অভ্যন্তরে ভবনসমূহের উত্তর দিকের বাসস্থানগুলি ও গির্জার মধ্যবর্তী স্থানে একটি মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, যাহার মিম্বারটি উপহারস্বরূপ দিয়াছিলেন, একটি উৎকীর্ণ লিপি অনুযায়ী, খলীফা আমির বি-আহকামিল্লাহ (Moritz, পৃ. ৫০-৫২)-এর আমলে, রাবী'উল-আওয়াল ৫০০/ নভেম্বর ১১০৬ সালে আবূ আলী আল-মানসূর আনূশতাকীন আল-আমিরী। এই শিলালিপি আত-তূর (....) ও কারান এ অবস্থিত মঠদ্বয় হইতে সিনাই-এর মঠটিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করিবার জন্য উহাকে 'উচ্চতর মঠ' (দাইরুল-'আলা) নাম দেওয়া হইয়াছে। অপর একটি শিলালিপি অনুযায়ী পূর্বোল্লিখিত আনুশতাকীন নির্মাণ করিয়াছিলেন, "মুনাজাত মূসা"য় তিনটি মসজিদ ফারান মঠের পাহাড়ের উপর একটি মসজিদ এবং ফারান-এর নিম্নদেশে ফারানুল-জাদীদা নামক স্থানে অপর একটি মসজিদ এবং সমুদ্র-উপকূলের ঢালে একটি বাতিঘর। "মুনাজাত মূসা" নিশ্চিতভাবেই ঐতিহ্যবাহী সিনাই পর্বতকে বুঝায় যাহা বর্তমানে জাবাল মূসা (Moritz, পূ. গ্র., পৃ. ৫৪) নামে অভিহিত; কেবল ১৪শ শতাব্দীতে এই নামটি সেন্ট ক্যাথারীন-এর মঠের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্রতর পাহাড়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতে থাকে, যাহা বর্তমানে (ফীরানের নিকটস্থ একটি পাহাড়ের ন্যায়) জাবাল মুনাজাত নামে পরিচিত। তিনটি মসজিদের মধ্যে কেবল দুইটি জাবালুত-তূর-এর শীর্ষে অবস্থিত হইতে পারে; এই দুইটি ছিল খৃ. ৩৬৪ সেন্ট Julian কর্তৃক নির্মিত খৃস্টান গির্যা এবং হইতে পারে একটি ক্ষুদ্র মসজিদ, যাহা আল-ইদ্রীসীও উল্লেখ করিয়াছেন; তৃতীয় মসজিদটি নিঃসন্দেহে চূড়ার পাঁচ শত ফুট নিম্নে একটি ক্ষুদ্র মালভূমিতে অবস্থিত ছিল যেই স্থানে বর্তমানে, পরবর্তী কোন সময়ে নির্মিত Chapel of Elijah দণ্ডায়মান। "ফারান মঠের পাহাড়ে অবস্থিত" মসজিদটির সন্ধান করিতে হইবে সম্ভবত জাবাল মুহার্রাতে এবং নিউ ফারান-এর মসজিদটির তালাশ করিতে হইবে ফীরান-এর মরূদানে যাহার বাগানগুলিতে ফারান (আমালেকাদের নগরী)-এর অধিবাসিগণ পরবর্তী কালে বসবাস স্থাপন করে (মাকরীযী, খিতাত, Bulak, i, 188; Moritz, পূ. গ্র., ৫৬)। Moritz মনে করেন যে, বাতিঘরটি উপকূলের সেই বিন্দুতে অবস্থিত ছিল যেইখানে ওয়াদী ফীরান সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে এবং যথায় একটি নগণ্য পোতাশ্রয় রহিয়াছে।

খৃ. ১৩শ শতাব্দীর সাত অঞ্চল (হাফ্ত ইকলীম) প্রসঙ্গে একটি সিরীয় বর্ণনায় সিনাই পর্বত (Tura de Sinai) দ্বিতীয় অঞ্চলের অর্ধচন্দ্রাকৃতি মানচিত্রের কেন্দ্র গঠন করিয়াছে (Chabot Notice, sur une mappemonde syrienne, in Bulletin de geogr. hist. et descrit. ১৮৯৭, পৃ. ১০৪ এবং pl. ৪খ)।

প্রথম সালীম-এর মিসরীয় অভিযানকালে তাঁহার সিনাই ভ্রমণ একটি মনগড়া কিংবদন্তী; এই সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব দিনপঞ্জীতে বা ইবন ইয়াস বর্ণনায় কিছুই উল্লেখ নাই (Moritz, পূ. গ্র.,পৃ. ৫, টীকা ১)।

আত-তূর নামক ক্ষুদ্র শহরটি সিনাই উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণ দিকস্থ বিন্দু রাস মুহাম্মাদ হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরত্বে সুয়েয উপসাগরের তীরে জাবাল মূসার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। শহরটি সেন্ট ক্যাথেরীন-এর মঠের সহিত নিয়মিত কাফেলার মাধ্যমে সংযুক্ত এবং মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেহ কেহ সাধারণত এই শহরে বসবাস করেন (Weill, La presqu'ile du Sinai, ১৯০৮, পৃ. ৮২)। উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে প্রবাল-প্রাচীর হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত একমাত্র স্থানে অবস্থিত এই শহরটিতে জাহাজ নোঙ্গর করিতে পারে। উপরন্তু যেহেতু আত-তূরে অতি চমৎকার পানি সমৃদ্ধ এবং ইহার নিকটবর্তী স্থানে বৃহৎ খর্জুরকুঞ্জ রহিয়াছে, সুতরাং ইহা সর্বদাই উপদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে। খুব সম্ভব আরবদের আগমনের পূর্বে এই স্থানে খৃস্টীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণিত (Harbour, Agatharchides in Strabo, ১৬খ, ৭৭৬ এবং Diodorus, ৩খ, ৪২)।

আনুমানিক ৪৫০/১০৪৭ সালে আইযাব [দ্র.] ইহার স্থান অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত মক্কার হজ্জযাত্রীবাহী জাহাজগুলির জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মিসরীয় পোতাশ্রয়রূপে আত-তূর-এর খ্যাতি সম্পর্কে কালকাশ নদী অবগত ছিলেন। ৭৮০/১৩৭৮-১৩৭৯ সাল পর্যন্ত আত- তূর পোতাশ্রয়টি পুনঃস্থাপিত হয় নাই এবং অতঃপর হজ্জযাত্রিগণ পুনরায়

উত্তরদিকস্থ পথটি ব্যবহার করিতে শুরু করেন (Weill, পূ. গ্র., পৃ. ৯২-৯৪)। পর্তুগীজগণ কর্তৃক ভারতগামী সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হইবার পর আত-তূর ক্রমশ ইহার গুরুত্ব হারাইয়া ফেলে এবং একটি নগণ্য মৎস্যজীবী গ্রামে পরিণত হয়; এই অবস্থা ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং মক্কা মু'আজ্জামা ফেরত যাত্রীদের জন্য তথায় একটি বিনোদন (quarantine) স্টেশন স্থাপিত হইবার ফলে স্থানটি পুনরায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। সুলতান মুরাদ প্রাচীন মঠটির সন্নিকটে কালআতুত-তূর দুর্গটি নির্মাণ করেন। কিন্তু বর্তমানে উভয়ই সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুকাদ্দাসী, B. G. A, ৩খ., ১৭৯; (২) আবুল-ফিদা, সম্পা. Reinaud, পৃ. ৬৯; (৩) আল-ইদ্‌রীসী, সম্পা, Gildemeister. in Z. D. P. V, ৮খ., ২; (৪) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfel ৩খ., ৫৫৭; (৫) সাফীয়্যুদ-দীন, মারাসিদুল-ইত্‌তিলা', সম্পা. Juynboll, ২খ., ২১৪; (৬) কিতাবুল-কাওয়াকিব, সম্পা. ইবনুয-যায়্যাত, কায়রো ১৯০৭, পৃ. ১২; (৭) আল-মাকরীযী, খিতাত, বূলাক, ২খ., ৫০৯ পৃ.; (৮) আদ-দিমাশ্‌কী, সম্পা. Mehren, পৃ. ২৩১; (৯) ইবনু দুক্‌মাক, Description de L' Egypte, publ, de la Bibt. Khediviale, কায়রো ১৮৯৩, ৫খ., পৃ. ৪৩; (১০) কাল্‌কাশান্‌দী, Die Geographie u. Verwaltung von Agypten, অনু. Wustenfeld, Gottingen ১৮৭৯, পৃ. ১০০, ১৬৯ প.; (১১) Quatremere, Histoire des Sultans Mamlouks, ১/১খ., ৭৯, টীকা ১১২; (১২) Le Strange, Palestine under the Moslems, ১৮৯০, পৃ. ৭৩, ৫৪৭; (১৩) R. Weill, La Presquile du Sinai (Biblioth. de l'ecde d. haut. etudes fasc. clxxi.), প্যারিস ১৯০৮, পৃ. ৯৩ প. এবং স্থা.; (১৪) Maspero-Wiet Materiaux pour servir a la geogr, de L'Egypte, ১খ, (M. I. F. A. O., ৩৬), পৃ. ১২২ (দ্র. আত-তূর ও তূর সীনা')।

২। তূর যাইতা অথবা জাবাল যাইতা, জেরুসালেম (দ্র. আল-কুদস, ২খ., ১০৯৪ প. এবং স্থা.)-এর পূর্বে Mount of Olives অদ্যাবধি জাবালুত-তূর নামে পরিচিত। কিংবদন্তী অনুযায়ী তথায় সত্তর হাজার পয়গাম্বর ইনতিকাল করেন এবং সেইখানেই তাঁহাদিগকে দাফন করা হয়। অন্য একটি প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্বারোহণ মাউন্ট অব ওলিভ্‌স হইতে ঘটিয়াছিল। এই পর্বত ও শহরটির মাঝখানে বিস্তৃত রহিয়াছে ওয়াদী (উপত্যকা) জাহান্নাম (vale of Cedron, Siloam-এর কূপসহ বর্তমানে ওয়াদী সিত্‌তী মার্‌য়াম নামে পরিচিত, আরবী "আইন সুলওয়ান) যাহার উপর আস-সিরাত-এর সেতু অবস্থিত। কাফরুত-তূর গ্রামটি বর্তমানে পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ, ৫৫৮; (২) সাফীয়্যুদ-দীন, মারাসিদুল-ইত্‌তিলা', সম্পা. Juynboll, ২খ. ২১৫; (৩) ইবনুল-ফাকীহ, B. G. A., ৫খ. ১০১; (৪) আবুল-ফিদা, সম্পা. Reinaud. পৃ. ৬৯; (৫) আল-ইদরীসী, সম্পা, Gildemeister. in ২., Z. D. P. V., ৮খ., ৮; (৬) আল-মুকাদ্‌দাসী, B. G. A., ৩খ. ১৭১ প.; (৭) ইব্‌ন বাতূতা, সম্পা. Defremery-Sanguinetti, ১খ. ১২৪; (৮) নাসির-ই খুসরাও, সম্পা. Schefer. পৃ. ২৬; (৯) মুজীরুদ-দীন, বূলাক ১২৮৩, পৃ. ৪১২; (১০) Le Strange, Palestine under the Moslems, ১৮৯০, পৃ. ৭২, ৭৪, ১৬২, ২১১, ২১৮-২২০।

৩। আত-তূর, Tabor পাহাড় (অদ্যাবধি জাবালুত-তূর নামে পরিচিত)। যে অকুস্থানে যীশুখৃষ্ট তাঁহার শাগরিদদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন সেইখানে পাহাড়ের উপর দায়র আত-তূর অথবা দায়রুত-তাজাল্লা-র আশ্রমটি অবস্থিত ছিল। Crusades-এর সময়ে পাহাড়ের চূড়ায় একটি ছোট দুর্গ অবস্থিত ছিল, যাহা সালাহুদ-দীন জয় করেন এবং ৬০৮/১২১৭ সালে আল-মালিকুল-আদিল উহা পুনরায় নির্মাণ করিয়াছিলেন। ৬১৪/১২১৭ সালে ক্রুসেড যোদ্ধাগণ ইহা পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ চেষ্টা করেন। জুমাদা ছানী, ৬৬১/১২৬৩ সালে সুলতান বায়বারস্ আক্‌কার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য দুর্গটি তাঁহার ঘাটিরূপে ব্যবহার করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ২খ., ৬৪৯, ৬৭৫; (২) সাফীয়্যুদ-দীন মারাসিদুল-ইত্‌তিলা', সম্পা. Juynboll, ১খ., ৪২৬, ৪৩৪; (৩) আবুল-ফিদা, সম্পা. Reinaud, পৃ. ৬৯; (৪) Weil, Geschichte der Chalifen, ৩খ, ৪৩৮, ৪৪০; (৫) ৪খ., ৪৬ প.; (৬) Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ৭৫, ৪৩৪ প.; (৭) Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelauks, প্যারিস ১৯২৩, পৃ. ১২৪, টীকা ৪।

৪। আত-তূর, Gerizim-এর পাহাড়, নাবুলুস হইতে ৩,০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত, Samaritan-গণের পবিত্র পর্বত। য়াহূদী ঐতিহ্যে ইহা ইসহাকের কুরবানীর স্থানরূপে চিহ্নিত। শহরের উত্তরদিকে অবস্থিত জাবাল আশ-শামালী বা ইস্‌লামীয়্যা (Ebal) হইতে এই পাহাড়কে পৃথক করিবার জন্য অদ্যাবধি ইহাকে জাবালুত-তূর বা জাবালুল-কিবলী বলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ., ৫৫৭; (২) সাফীয়্যুদ-দীন, মারাসিদুল-ইত্‌তিলা', সম্পা. Juynboll, ২খ., ২১৪; (৩) Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ৭৪।

৫। তূর হারূন, Hor-এর পাহাড় (৫,৬০০ ফুট) Petra নামক স্থানের পশ্চিমে, হযরত হারূন (আ)-এর নামে আখ্যায়িত যিনি প্রাচীন কিংবদন্তী অনুযায়ী সেইখানে সমাহিত হইয়াছেন (Josephus, Archaiol., ৪খ., ৪, ৭)। মাসঊদীর মতে উক্ত পাহাড়টি আশ-শারা জিলায় জাবাল মা'আব নামে পরিচিত। তিনি পর্বতের গুহাসমূহও উল্লেখ করিয়াছেন। জাবালুন-নাবী হারূন-এর পূর্ব চূড়ায় (৫,২০০ ফুট) হারূন (আ)-এর কাব্‌র (কবর হারূন) অবস্থিত বলিয়া কথিত যাহা অদ্যাবধি বেদুঈনদের তীর্থস্থান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ, ৫৫৯; (২) সাফিয়্যুদ-দীব, মারাসিদুল-ইতত্তিলা', সম্পা. Juynboll, ২খ., ২১৫; (৩) আল-মাস'ঊদী, মুরূজু'য-যাহাব, সংস্করণ প্যারিস, ১খ, ৯৪; (৪) Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, London ১৮২২, পৃ. ৪২৯ প.; (৫) Le Strange, Palestine under the Moslems, পৃ. ৭৪; (৬) Dalman, Petra, ১৯০৮, পৃ. ১৫ প., ৪২, ১৬৮; (৭) ঐ, Neue Petra-Forschungen, ১৯১২, পৃ. ২, ৮, ২৬। (সংক্ষেপিত)।

E. Honigann (E. I. [1])/আবদুল বাসেত

আত্-তূর (الطور) ঃ অধিকাংশ ভাষাবিদের মতে তূর প্রত্যেক পাহাড়কে বলা হয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনে তূর ঐ পাহাড়ের জন্যই

ব্যবহৃত হইয়াছে যেই পাহাড়ে আল্লাহ মূসা (আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছিলেন। ইহাকে তূরে সীনীন ও তূরে সায়নাও বলা হইয়াছে (আল-বাহরুল-মুহীত, ৮খ, পৃ. ১৪৬; রূহুল-মাআনী, ২৭খ., পৃ. ২৯)।

তূর পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নাম, সূরাটির প্রথম আয়াত হইতে এই নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। তিলাওয়াতের ক্রমিক সংখ্যা ৫২। সূরা আয-যারিয়াত-এর (দ্র.) পরে ও সূরা আন-নাজ্ম (দ্র.)-এর পূর্বে ইহার অবস্থান। তবে অবতীর্ণ হওয়ার ক্রমিক অনুযায়ী ইহার সংখ্যা ৭৬। সূরা আস-সাজাহ (দ্র.)-এর পরে এবং সূরা আল-মুল্ক (দ্র.)-এর পূর্বে মক্কায় নাযিল হয় (আল-ইতকান, পৃ. ১১; আল-কাশ্শাফ, ৪খ, পৃ. ৪০৮)। ফাতহুল-বায়ান গ্রন্থকারের (৯খ, ১২৭) বর্ণনামতে এই সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মাক্কী। ইবন আব্বাস (রা) ও ইবন যুবায়র (রা) হইতেও এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। এই সূরায় দুইটি রুকূ ও ৪৯টি আয়াত আছে (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রূহুল-মা'আনী, ২৭খ, ২৯)।

পূর্ববর্তী সূরার সহিত ইহার সম্পর্ক ও সামঞ্জস্য এই যে, পূর্বের সূরার শেষদিকে বলা হইয়াছে যে, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরগণ আযাবে পতিত হইবে। এখন এই সূরার সূচনাতেই সেইসব মিথ্যাবাদীর উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে ঃ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (৫২ ঃ ৭) "তোমার রবের আযাব অবশ্যই আসিবে" যাহা ঐসব মিথ্যাবাদী কাফিরদের জন্য নির্ধারিত (আল-বাহরুল-মুহীত ৮খ, ১৪৮)। জালালুদ-দীন সুয়ূতী বলেন, এই সূরা ও ইহার পূর্বের সূরার মধ্যে আরম্ভ ও সমাপ্তি বিষয়ে গভীর সামঞ্জস্য রহিয়াছে। উভয় সূরার শুরুতে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে এবং উভয়ের শেষদিকে কাফিরদের অবস্থা বিবৃত হইয়াছে (রূহুল- মা'আনী, ২৭খ, ২৯)। অনুরূপ উভয় সূরায় আয়াত-ই কাওনিয়ায় (বিশ্বজগতে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী বর্ণিত হইয়াছে যেইসব আয়াতে সেইসব আয়াত) একটি আয়াতের কসমের দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে (তাফসীরুল-মারাগী, ২৭খ, ১৬)। সূরার শুরুতে ঊর্ধ্বজগত ও অধঃজগতে বিদ্যমান আল্লাহ্র কতিপয় নিদর্শনের কসম করিয়া বলা হইয়াছে যে, আযাব অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিবেই। অতঃপর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য জাহান্নামের লাঞ্ছনাকর শাস্তির বর্ণনা এবং সাথে সাথে সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য জান্নাতের নি'মাতের বর্ণনা আসিয়াছে। ইহার পরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, কাফিরদের উদ্ভট উক্তি (যথাঃ অনর্থক ঝগড়া ও বিতর্ক, ফেরেশ্তাদিগকে আল্লাহ্র কন্যা বলা ইত্যাদি) ও অত্যাচারের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সত্য প্রচার করিয়া যান এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে যে, এইসব নির্বোধদের বিতর্কের ফয়সালা কিয়ামতে হইবে। শেষদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-কে রাত্রি-দিন ইবাদাত ও তাসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকার নির্দেশের সহিত এই কথাও বলিয়া দিয়াছেন যে, জালিমদিগকে এই দুনিয়ায়ও শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে। আল্লাহ তাহাদের অত্যাচার হইতে আপন রাসূলকে সর্বদা নিরাপদ রাখিবেন (তাফসীরুল-মারাগী, ৭খ, ৩৯, ৪০)।

ইমাম আবূ বাকর আল-জাস্সাস (আহকামুল-কুরআন, ৩খ, ৪১২)এই সূরার শেষের দুই আয়াত (৪৮-৪৯) দ্বারা সালাতের মধ্যে 'সুব্হানাকা....' পড়া এবং ফজরের সালাত ফরয হওয়া প্রমাণ করিয়াছেন। অনুরূপভাবে কাদী আবূ বাক্র ইবনুল-আরাবী (আহকামুল-কুরআন, পৃ. ১৭১৯ প.) এই সূরার তিনটি আয়াত, (২০, ৪৮-৪৯) হইতে শারীআতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান ও ফিক্হ-এর মাসআলা বাহির করিয়াছেন এবং প্রতিটি মাসআলার উপর যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত জুবায়র ইবন মুতইন (রা) বলেন, আমি মাগরিবের সালাতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সূরা তূর পড়িতে শুনিয়াছি (আল-দুররুল-মানসূর, ৬খ, ১১৬; ইব্ন কাছীর, আত-তাফসীর, ৪খ, ২৩৮; ফাতহুল-বায়ান, ৯খ, ১৩৭)। হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বায়তুল্লাহমুখী হইয়া সালাত আদায় করিতে দেখিয়াছি–তিনি তখন সূরা তূর পড়িতেছিলেন (পূর্ব বরাত)। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা তূর তিলাওয়াত করিবে আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে জাহান্নাম হইতে রক্ষা করিবেন এবং জান্নাত দানে সম্মানিত করিবেন (আল-কাশ্শাফ, ৪খ, ৪১৫; আল-বায়দাবী, ২খ, ২৯১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২) ঐ লেখক, আদ-দুর্রুল মানসূর ফিত-তাফসীর বিল-মা'ছূর, কায়রো ১৩০৬ হি.; (৩) ঐ লেখক, আসবাবু'ন-নুযূল, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.; (৪) আল-মারাগী, তাফসীরুল-মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৫) ইবন কাছীর, তাফসীরুল-কুরআনিল-আজীম, বৈরূত, ১৯৬৯ খৃ.; (৬) আবূ হায়্যান আল-গারনাতী, আল-বাহ্রুল-মুহীত, কায়রো হইতে মুদ্রিত; (৭) আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, কায়রো ১৩১০ হি.; (৮) নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, ফাত্হুল-বায়ান, কায়রো ১৩০০ হি.; (৯) আয-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (১০) আল-বায়দাবী, তাফসীর, লাইপযিগ ১৮৪৬ খৃ.; (১১) আবূ বাক্র আল-জাস্সাস, আহকামুল-কুরআন, কায়রো ১৩৩৫ হি.; (১২) কাদী আবূ বাক্র ইবনুল-আরাবী, আহকামুল-কুরআন, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.।

জাহুর আহমাদ আজহার (দা. মা. ই.)/বোরহান উদ্দীন

তূর আব্দীন (طور عبدين) ঃ উত্তর ইরাকের একটি পার্বত্য সমতল উচ্চ ভূমির নাম, যাহা পশ্চিমে প্রায় মারিদীন হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে জাযীরা ইবন উমার (যাহাকে সংক্ষেপে আল-জাযীরা [দ্র.] বলা হয়) পর্যন্ত বিস্তৃত। দাজ্লা (তাইগ্রিস) নদী আল-জাযীরা হইতে আরম্ভ করিয়া যেই স্থানে উত্তর দিক হইতে আগত বাতমান সুনদীর (بتمان صوندى) সহিত মিলিত হইয়াছে, উহার পূর্ব-উত্তর সীমান্ত উভয় নদীর সঙ্গমস্থল হইতে যদি একটি সরল রেখা মারিদীন পর্যন্ত টানা হয়, তবে এই রেখা প্রায়ই ঐ অঞ্চলের পশ্চিম সীমান্ত বুঝাইবে, যাহা তূর আবদীন নামে পরিচিত। কিন্তু উহার সঙ্গেই কূরুস তাগ (وروس تاغ) কেও, যাহা উহার পশ্চিম সীমান্তের উত্তর অংশে অবস্থিত, সম্পূর্ণ তূর আবদীনের মধ্যেই উহার দূরবর্তী অঞ্চলরূপে গণ্য করিতে হইবে। উহার দক্ষিণ সীমান্ত সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত। কেননা এইভাবে উচ্চ সমতল ভূমির কংকরময় প্রান্তরের ঢাল সোজা বরং অনেক সময় সম্পূর্ণ লম্বমান, যাহা আল-জাযীরার [বায়নান-নাহ্রায়ন–দুই নদীর সঙ্গমস্থল] প্রান্তর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং যেইখানে হইতে ইহা একটি সুদৃঢ় প্রাচীরের ন্যায় দৃষ্ট হয়। মারিদীন হইতে নাসীম রীন হইয়া যেই সড়ক আল-জাযীরা চলিয়া গিয়াছে, উহা প্রাচীনকাল হইতেই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং তূর আবদীনের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে সামান্য দূর দিয়া উহার পাশাপাশি থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছে। তূর আবদীনের মধ্যে সাধারণত সেই পর্বতশ্রেণীকেও শামিল করা হয়, যাহার মাঝখানে মারিদীন শহর অবস্থিত [এই কারণেই কখনও কখনও উহাকে ঐ নামে অভিহিত করা হয়। আরও দ্র. তুর্কী নাম মারিদীন তাগলারী (ماردين طاغلرى), শালাফলী (Schlafli), পূ. গ্র., পৃ. ৪৮]। এই পর্বতশ্রেণীর একটি অংশ, যাহা মারিদীনের পশ্চিমে অবস্থিত, জাবালুল-আফ্স (جبل العفص) নামে প্রসিদ্ধ। এই পর্বত প্রায় ৪০ ডিগ্রী ১৫ ফুট অক্ষাংশ প্রাচ্যে (গ্রীনউইচ) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং উহাকে একটি দৃশ্যমান বিরাট নিম্নভূমি

কারাহজাহতাগ (قرهجه طاغ)-এর কংকরময় প্রশস্ত পাদদেশ হইতে পৃথক করিয়াছে।

সমুদ্র হইতে তূর আবদীনের মধ্যভাগের গড় উচ্চতা প্রায় তিন-সাড়ে তিন হাজার ফুট। মিদয়াত ও হিস্‌ন কায়ফা-এর মধ্যভাগে দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত জিলা এবং কোহিস্তান মারিদীনে কোনও কোনও শৃঙ্গ ৪,৩০০ ফুট উচ্চ। তবে সামষ্টিকভাবে তূর আবদীনে কোনও উল্লেখযোগ্য উচ্চ শৃঙ্গ দৃষ্ট হয় না এবং সর্বত্র এই অঞ্চল একটি উচ্চ-নীচ মাঠের মত পরিদৃষ্ট হয়, যাহাকে গভীর ও প্রশস্ত পার্বত্য নদীসমূহ (উপত্যকাসমূহ) বিভক্ত করিয়াছে। উহাদের মধ্যে সর্ববৃহৎ নদী খালতান, যাহা ফিনিক নামক স্থানে (জাযীরার উত্তর-পশ্চিমে) দাজলা নদীতে গিয়া মিলিত হইয়াছে [বিস্তারিত দ্র. ই. আই., লাইডেন, প্রথম সং., শিরো.]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধগর্ভে প্রদত্ত বরাত ব্যতীত (১) BGA, নির্ঘণ্ট; (২) য়াকূত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৩খ., ৫৫৯; আরও দ্র. পাণ্ডুলিপির সূচীপত্রের ভৌগোলিক ইঙ্গিতসমূহ, বিশেষত যাহা ঃ (৩) Wright বৃটিশ মিউজিয়ামের জন্য সংকলন করিয়াছেন, পৃ. ১৩৩৬. শিরো. Izla Mons ও পৃ. ১৩৪১, শিরো. Abdin, Tur; (৪) Niebuhr (১৭৬৬ খৃ.), Reisebeschreib, nach Arabien und anderen umliegenden Landern, কোপেনহেগেন ১৭৭৮ খৃ., ২খ, ৩৮৭, ৩৮৮; (৫) Ritter, Erdkunde, ৪৩৯-৪৪২; (৬) H. Southgate (১৮৩৮ খৃ.); Narrative of a tour through Armenia, Kurdistan etc, লণ্ডন ১৮৪০ খৃ, ২খ., ২৬৮ প., ২৭৩-২৭৫, ৩১৩, ৩১৪; (৭) G. P. Badger (১৮৪২ খৃ., ১৮৪৪ খৃ., ১৮৫০ খৃ.), The Nestorians and their rituals, লণ্ড ১৮৫২ খৃ., ১খ, ৪৫-৫৮, ৬৩, ৬৬-৬৯; (৮) C. Sandreczki (১৮৫০ খৃ.), Reise nach Mosul una durch Kurdistan nach Urumia, স্টুটগার্ড ১৮৫৭ খৃ., ১খ, ২৬৭-৩০৭; ৩খ, ৩৪১-৩৬০; (৯) H. Petermann (১৮৫৩-১৮৫৪ খৃ.), Reisen im Orient, লাইপযিগ ১৮৬১ খৃ., ২খ, ৩১-৪৩, ৩৪০-৩৪৭; (১০) A. Schlafli (১৮৬১ খৃ.), Reisen in den Orient Winterthur, ১৮৬৪ খৃ., পৃ. ৪৩-৬১; (১১) J. G. Taylor (১৮৬১-১৮৬৩ খৃ.), Travels in Kurdistan in JRGS, ৩৫ খ. (১৮৬৫ খৃ.), ২১-৫৮; (১২) Czernik in Petermann's Geogr. Mitteil, Erg. Heft., সংখ্যা ৪৫, ১৮৭৬ খৃ., পৃ. ১৪, ১৫; (১৩) Socin (১৮৭০ খৃ.), Abdin Zur Geographie des Tur, in ZDGM, ৩৫ খ. (১৮৮১ খৃ.), ২৩৭-২৬৯; (১৪) Prym ও Socin, Abdin, Derneuaram. Dialekt des Tur, গোটিনজেন ১৮৮১ খৃ., ১খ, ১-১০ (ভৌগোলিক ও বংশগত বিভক্তি from Socin); (১৫) G. Hoffmann, Auszuge aus syrischen Akten Persischer Martyrer, লাইপযিগ ১৮৮০ খৃ., পৃ. ১৬৭-১৭৩; (১৬) Sachau (১৮৮০ খৃ.), ২খ. (১৮৮১ খৃ.), ৯-১৯, ২৭, ৬৫-৭৫; (১৭) Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien, বার্লিন ১৮৮৩ খৃ., পৃ. ৩৭৮-৪৩৫; (১৮) V. Cuinet, La Turquie d'Asie, প্যারিস ১৮৯২ খৃ., ২খ, ৪০৭-৫১৯; (১৯) Pairy, Six months in a Syrian Monastery, লণ্ডন ১৮৯৫ খৃ.; (২০) N. Hartmann, Bohtan (Mitteil er Vorder-asiat-Gesellsch, ১খ. ও ২খ.), বার্লিন ১৮৯৬-১৮৯৭ খৃ., দ্র. নির্ঘণ্ট, শিরো তূর আব্‌দীন প্রভৃতি; (২১) C. F. Lehmann-Haupt. (১৮৯৯ খৃ.), Armenieneinst und jetzt, ১খ, বার্লিন ১৯১০ খৃ., পৃ. ৩৩৭-৩৮০, ৫০৪, ৫০৮, ৫১০, ৫১৩; (২২) H. Pognon (১৮৯১ খৃ., ১৯০৫ খৃ.), Inscriptions Semitiques etc., প্যারিস ১৯০৭ খৃ., পৃ. ৩৯-৫০, ৭২-৭৫, ৯১-১০০, ১০৮-১১৬, ১২০-১২৫, ১৮৬-২০২, অথবা সংখ্যা ১৩ ও ১৪, ২২-৩৫, ৫১-৫৪,৬০ ও ৬২, ৬৭-৭১, ৯২-১০৬ পুস্তকের নামাঙ্কিত প্রথম পৃষ্ঠাসহ ৬ ও ৭, ১৬, ১৯-২১, ২৪ ও ২৫, ২৭-২৯, ৩৭-৪১; (২৩) E. Banse (১৯০৮ খৃ.) in Petermann's Geogr. Mitteil, ৫৭ খ. (১৯১১ খৃ.), ১১৯-১২২; ১৭২-১৭৫; (২৪) E. Banse, Auf den Spurender Bagdadbohn, Weimer ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৬৮-৮৭; (২৫) G. L. Bell (১৯০৯ ও ১৯১১ খৃ.), Amuruth to Amurath, লণ্ডন ১৯১১ খৃ., পৃ. ২৯৬-৩২২; (২৬) G. L. Bell, The Churches and Monastries of Abdin, Tur, in M. V. Berchem ও J. Strzygo, wski Amida, হাইডেলবার্গ ১৯১১ খৃ., পৃ. ২২৪-২৬২; (২৭) G. L. Bell Churches and Monasteries of the Tur Abdin and Neighbouring Districts (Zeitschr. f. die Gesch. der Architektur, Beiheft, ৯খ, ৫৭-১১২), হাইডেলবার্গ ১৯১৩ খৃ.; (২৮) Preusser (১৯০৯ খৃ.), Nordmesopotam Baudenkmaler (17, wissenschafil. Veroffentilich der deutsch. Orient-Gesellsch., লাইপযিগ ১৯১১ খৃ.), পৃ. ২৩-৫৫, চিত্রসহ ৩৪-৬৬; (২৯) T. A. Wigram ও W. A., The Cradle of Mankind, লণ্ডন ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৪২-৬৮; (৩০) Sykes (১৯০৬ খৃ.), The Caliph's Last Heritage, লণ্ডন ১৯১৫ খৃ., পৃ. ৩৫৪-৩৫৭, ৫৭৮; (৩১) S. Guyer (১৯১০ খৃ.), in Petermann's Geogr. Mitteil., ৬২খ, ১৯১৬ খৃ., পৃ. ২০৮-২১০, ২৫৪, ২৯৬-২৯৯; (৩২) K. Uglig, Mesopotamien in Zeitschr. der Gesel-isch, fur Erdjunde, বার্লিন ১৯১৭ খৃ., পৃ, ৫, ৭ ও ৮, ৫৬-৫৮; (৩৩) Th. Naab (প্রায় ১৯০৫ খৃ.)। Drei jahre in Mesopotamien, Basel ১৯১৮ খৃ., পৃ. ১৩১-১৩৮; (৩৪) Sarre ও Herazfeld, Archaeolog Reise im Euphrat-und Tigri-sgebiet, বার্লিন ১৯১১-১৯২০ খৃ., স্থাং ; দ্র. ইশারিয়া in ৪খ, ৪৭; শিরো. তূর আবদীন Socin তাঁহার উপরোক্ত প্রবন্ধে (ZDMG. Abdin, Zur Geographie des Tur, ৩৫খ, ২৩৭ প.) নিছক Taylor Sandreczki, Czernik, Southgate ও Badger, ন্যায় পর্যটকদের বর্ণনা হইতে উপকৃত হইয়া ফলায়ল নিরূপণ করেন নাই, বরং Sheil (প্রথম য়ুরোপীয় পর্যটক, যিনি ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তূর আবদীনের অভ্যন্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিলেন), de Beufort (১৮৪০ খৃ.) ও Goldsmid (১৮৬৪ খৃ.)-এর কিছু বিক্ষিপ্ত বর্ণনাও সামনে রাখিয়াছেন। অনেক পর্যটক দিয়ার বাক্‌র হইতে মারদীন ও নাসীরীন-এর পথে মাওসিল গমনকারী সড়ক ধরিয়া কেবল তূর আবদীনের দক্ষিণ দিকের অঞ্চলসমূহ পর্যটন করিতে পারিয়াছেন। যথা ঃ Neibuhr, Buckingham (১৮১৬ খৃ.), Badger, Banse, Wigram, Southgate ও Layard (১৮৪৯ খৃ.), যেইরূপ অন্যান্য পর্যটক উত্তর দিক হইতে (আরমেনিয়া হইতে) মাওসিল গিয়া শুধু তূর আবদীনের পূর্ব প্রান্তই দেখিতে পারিয়াছেন। এইখানে মানুষ অনেক সময় নদীপথেও পৌঁছিয়াছেন। যথা Moltke (১৮৩৯ খৃ.) ও Schlafli দাজলা নদীতে নল-খাগড়ার ভেলার সাহায্যে দিয়ার বাক্‌র হইতে মাওসিল গিয়া তূর আবদীনের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। নিম্নোক্ত পর্যটকগণ (ঐতিহাসিক বিন্যাস সহকারে) তূর আবদীনের অভ্যন্তরীণ এলাকাসমূহ পর্যটন করিয়াছেন ঃ de,

Badger, Sandreczki, Taylor, Fagnan, Sachau, Shuel Lehmann-Haupt Beaufort Preusser, Guyer (১৯১০ খৃ.), Godsmid, Socin (১৯১০ খৃ.) Hinrichs (১৯১১ খৃ.), Naab, Skyes, Bell, Guyer Viallet-এর পর্যটনের বিশদ বৃত্তান্ত এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। Viollet ও Hinrichs-এর অবস্থাও অনুরূপ (এই দুইজন সম্পর্কে দেখুন Bell, Church and Monast, ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৬১, ১০৫-১০৬)। এইখানে এই বিষয়টিও সংযোজন করা আবশ্যক যে, উপরোল্লিখিত আমেরিকান পর্যটক দলের বিবরণ হইতে তূর আবদীনের ধর্মীয়, সামাজিক ও বংশগত বৃত্তান্ত সম্পর্কে মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যাইতে পারে। চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে দেখুন ঃ (১) স্মারক চিহ্নসমূহ R. Kiepert কৃত in M. V. Oppenheim, Vom Mittlemeer zum Persicschen Golf, ২খ, ৪১০, ৪১১; (২) তূর আবদীনের চিত্র H. Kiepert-কৃত, যাহা ZDMG, ৩৫ খণ্ডে Socin-এর প্রবন্ধের সহিত সংযুক্ত, এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের এখন অধিক বিস্তারিত ও উৎকৃষ্ট উপকরণ হস্তগত হইয়াছে। এই জিলার উৎকৃষ্ট চিত্রগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) R. Kiepert (১৮৯৩ খৃ.), Karte von Syrien und Mesopotamien (১খ, ৮,৫০,০০০), প্রাচ্যের পাতা R. Kiepert-কৃত ১৮৯৩ খৃ, যাহার সহিত Oppenheim-এর গ্রন্থ সংযুক্ত R. Kiepert, Karte von Kleinasien, ২খ সং. (১খ, ৪০,০০০), বার্লিন ১৯১৪ খৃ. দিয়ার বাকর ও নাসীরীনের নকশা; (২) Maunsel-এর নকশা, Eastern Turkey in Asia (১খ, ২,৫০,০০০), লণ্ডন সমর বিভাগ (১৯০৩ খৃ.), পৃ. ২৫ (মারদীন) ও ২৬ (বৃহত্তান ও জাযীরা)-ও উল্লেখযোগ্য; (৩) Umgebung von Mardin una Nasibin (১খ, ২,০০,০০০)-এর একটি বিশেষ চিত্রে (১৯১৮ খৃ.); Kartographische Abteilung der Preussischen Landesaufnahme বার্লিন তৈয়ার করিয়াছিলেন।

M. Streck (সম্পা. পরি. কর্তৃক সংক্ষেপিত) (দা. মা. ই.)/মুহাম্মদ হাসান রহমতী

তূরগায় (طور غای) ঃ মধ্য এশিয়ার স্তেপগুলিতে Steppes) অবস্থিত একটি ছোট শহর ও নদীপ্রবাহ। প্রধান নদী তূরগায় ও কারীন-সালদী তূরগায় দ্বারা সৃষ্ট-যাহা তাসতী তূরগায় ও কারা, তূরগায়-এর মিলিত স্রোত বহন করিয়া দুরকুচা হ্রদে পতিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে সারী তূরগায় প্রবাহিত, যাহা উজান অঞ্চলে উলকুন-তামদী নামে পরিচিত। ইহাতে পশ্চিম দিকের মুইলদী তূরগায় ও সারী বুই তূরগায়-এর স্রোত পতিত হইয়াছে। তুর্কী ভাষায় তূরগায় অথবা তূরগাই শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র পাখি (Radloff, Worterbuch, iii, 1184, 1457)। কারা তূরগায় হরবোলা পাখির নাম। Orenburg-এর দুর্গ নির্মাণ কৌশলকে তূরগায় কালআ বলা হয়।

১৮৪৫ খৃ. ওরেনবুর্গ দুর্গটি (Orenburg fortress) Orenburgskoie Ukrelenie-নামে কিরগিযে (দ্র.) রুশ শক্তির অন্যতম কেন্দ্রীয় কেল্লা হিসাবে মেজর Tomilin আধুনিক তূরগাই শহরটি এই নামের নদীর তীরে পত্তন করেন। ওরেনবুর্গ কিরগিয অঞ্চলকে ১৮৬৫ খৃ. উরাল ও তূরগায় নামে দুইটি প্রদেশে (oblast) বিভক্ত করা হয়। ১৮৬৮ খৃ. তূরগায় প্রদেশকে কয়েকটি জিলায় (uiezd) বিভক্ত করা হইলে কেল্লাটিকে জিলা সদর নির্ধারণ করা হয় এবং তূরগায় নামে অভিহিত করা হয়। প্রদেশের মধ্যে কোন সুবিধাজনক কেন্দ্র না থাকায় ওরেনবুর্গ হইতে তূরগায় শাসিত হইত। গভর্নর এখানে বাস করিতেন এবং এইখান হইতে ১৮১৮ খৃ. সরকারী গেজেটে Turgaiskiya Oblastniya Viedomosti প্রকাশিত হয়। এই প্রদেশের চারিটি জিলা সদরের মধ্যে তূরগায় শহরের স্থান ছিল তৃতীয় এবং কখনও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ১৮৯৭ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৮৯৬ জন। ১৯১১ সালের শুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ১,৬৫৭। তূরগায় শহরসহ প্রদেশের দক্ষিণাংশ উর্বর ভূমির অভাবে কৃষি কার্য ও রুশ উপনিবেশ স্থাপনের জন্য উত্তরাংশের তুলনায় কম সুবিধাজনক ছিল, যদিও ষাটের দশকে শুধু তূরগায় নদীর তীরের ১,৩০০ হেকটর ভূমি আবাদ করা হইয়াছিল। তূরগায় হইতে উত্তর দিকে Orsk ও Kustanai এবং দক্ষিণ দিকে Irgiz ও perowsk (বর্তমান নাম কিযিলওরদা) অভিমুখী বাণিজ্য পথ রহিয়াছে।

রুশ শাসনের পূর্বে বর্তমান তূরগায় অঞ্চলে শুধু বেদুঈনগণ বসবাস করিত এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহারা কদাচ উল্লিখিত হইয়াছে। ৬১২/১২১৫-১২১৬ সালে খাওয়ারিযম্ শাহ (দ্র.) মুহাম্মাদ-এর কিপচাক-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান এবং মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধের বিবরণ সম্বলিত নাসারী-এর রচনা (সম্পা. Houdas. p.g. প.) একটি ব্যতিক্রম। তু. Barthold, Turkestan etc. = G. M. S., N. S. V., p. 370 প.। J. Marquart, Ostturkische Dialekstudien, Berlin 1914, p. 128 প. ইহার ১৩৩ পৃষ্ঠায় আরও পরবর্তী তারিখ (মধ্য গ্রীষ্ম ১২১৯) অনুমান করা হইয়াছে।

তূরগায় বর্তমানে স্বাধীন কাযাকিস্তান প্রজাতন্ত্রের অধীন। পূর্বের প্রদেশ ও জিলায় বিভক্তির স্থলে দেশটি এখন প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত (Okrug)। তূরগায় শহরটি বর্তমানে Kizil-Orda অঞ্চলের নিকট পূর্বতন তূরগায় প্রদেশের সর্বদক্ষিণাংশে Aktynbinsk অঞ্চলের অধীন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Rossiya, xviii; (২) Kirgizskiy Kari. Petersburg 1903, esp. p. 341 প. and map; (৩) articles by Ya. polferov and A. Kauman, in Encikop. Slovar. Borkgus-Efron, xxxiv. (1902); (৪) Aziatskaya Rossiy, i, Petersburg 1914, p. 347 and 351, আধুনিক অবস্থা সম্পর্কে আমি মৌখিকভাবে অবগত হইয়াছি।

W. Barthold (E. I. [1])/আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম হোসাইনী

তূরান (توران) ঃ একটি ইরানী পরিভাষা, ইরানের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত এলাকাটির নামকরণে ব্যবহৃত। এই পরিভাষাটির গঠন ফরাসী ভাষার মধ্যযুগের খুব বেশি পূর্বে হয় নাই। শব্দান্তে 'আন' প্রত্যয়টি বংশনাম (পাপাকান) এবং প্রদেশসমূহের নাম (জালান, দায়লামান) ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় (তু. Grundr, d. iran, Phil, ১/২খ, ১৭৬, Salemann, ঐ, ১/১খ, ২৮০, সম্বন্ধপদীয় বহুবচন 'আনাম' হইতে 'আন' আসিয়াছে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন)।

তূরান নামটি দ্বারা তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে ঃ (১) ইহার উৎপত্তি; (২) ইহার পরবর্তী কালের প্রচলিত অর্থ যাহা তুর্কীদের এলাকার সহিত তূরানকে অভিন্নরূপে গণ্য করে; (৩) ইহার আধুনিক ভৌগোলিক, ভাষাতত্ত্বগত ও রাজনৈতিক প্রয়োগ।

তূরাহ ঃ ইরানীয় পরিবেশে ধর্মগ্রন্থ আভেস্তার তূরাহ (তূরাহ) ও তূর-আনের তূর-এর মধ্যে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। আভেস্তার সংরক্ষিত অংশসমূহে আমরা পাই (১) তূরাহ দুইজন ধার্মিক ব্যক্তির পিতা

যাহাদের ইরানীয় নাম আরজাহাওয়ানুত ও ফ্রারাযী, কিন্তু তাহাদের সম্পর্কে আর অধিক কিছু জানা যায় না (য়াশ্‌ত, ১৩খ, ১১৩-১২৩); (২) একটি জনগোষ্ঠী যাহারা তূরা বা তূরা নামে অভিহিত, সম্ভবত তাহারা যাযাবর (য়াশ্‌ত, ১৭খ, ৫৫ ঃ আসু-আসপাহ অর্থাৎ দ্রুত গতিসম্পন্ন তেজী অশ্ব থাকা)। [তূরা হইতে আহৃত বিশেষণ তুইরয়া]।

তূরয়ানীদিগকে ইরানীদের ও সত্যধর্মের শত্রু হিসাবে একাধিকবার প্রতিপন্ন করা হইয়াছে (তু. য়াশ্‌ত, ১৭খ, ৫৫, যেখানে তাহারা আশি ওয়ানুহিকে অনুসরণ করিয়াছে)। তূরয়ানীদের একটি শাখাকে দানু (তু. য়াশ্‌ত, ১৭খ, ৫৫-৫৬) নামে অভিহিত করা হইয়াছে যাহাকে সংস্কৃত দানাওয়া অর্থাৎ দৈত্য-এর সহিত সম্পর্কিত করা যায়। 'তূরানী দস্যু' Eranrasyan (আফরাসিয়াব) একটি বিশেষ ঘৃণিত নাম, যাহার রাজকীয় ক্ষমতা (Xvarena) দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টা য়াশ্‌ত (১৯খ, ৫৬-৬৪) গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সেই একই গ্রন্থ (য়াশ্‌ত, ১৯খ, ৯৩) স্বীকার করে যে, এই রাজকীয় ক্ষমতা একদা Franrasyan-এর দখলে ছিল যখন তিনি অত্যাচারী যায়নিগার্ভ-এর বিরুদ্ধে ইরানের রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেন। সম্ভবত Franrasyan-এর প্রতি শত্রুতার রাজনৈতিক কারণ থাকিতে পারে।

এই গ্রন্থের অনেকগুলি অধ্যায়ে প্রমাণ পাওয়া যায় তূরাহদের মধ্যে অনেক ধার্মিক ব্যক্তি বর্তমান ছিল। গাথা (gathas) (য়াশ্‌না, ১০/৬খ, ১২) গ্রন্থের একেবারে প্রথম দিকের অংশে তূরয়ানীয় ফ্রায়ানা (Fryana) পরিবারকে বিশেষভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে। য়াশ্‌ত গ্রন্থের (১৩খ, ১৪৩) সংশ্লিষ্ট অধ্যায় খুবই সুপরিচিত; আর্য্য (ইরানীয়), তূরানীয়, সায়রিমীয়, সাইনীয় ও দাহীয় অঞ্চলের ধার্মিক পুরুষ ও ধার্মিক নারীগণের ফ্রাওয়াশি-র প্রতি আমরা উৎসর্গ করি।

য়াশ্‌ত, ৫খ, পৃ. ৫৭-তে তূরা-র বাসস্থান সম্পর্কে একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত রহিয়াছে যেইখানে Franrasyan-এর (তু. শাহনামাহ, সম্পা. Vullers, ১খ, ২৪৮, ২৬৪ ঃ Wesa) প্রতিনিধি vaesaka-র বংশধরগণের অবস্থান কান্‌হা (বুখারা; তু. Marquart, Komnen, পৃ. ১৯৬, প্রাচীন ভাষায় খান্‌গ-সামারকান্‌দ) অতি উচ্চে অবস্থিত খশায়রু-সুকা (Xsathro-suka) গিরিপথে নির্দেশ করা হইয়াছে। অপরপক্ষে Canton তূর-এর যে নামাল্লেখ করা হইয়াছে তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, টলেমির আরমেনীয় অনুবাদক উহা খাওয়ারিয্‌মে অবস্থিত বলিয়াছেন (সম্পা. Soukry, শা. ৩৪, নিম্নে তু.)।

তূরার জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হইয়াছে। Geiger (Ostir, Kultur, পৃ. ১৯৪) মনে করেন যে, জাতিগত পার্থক্য না করিয়া এই নাম শুষ্ক তৃণভূমি প্রান্তরের সকল মানুষের প্রতি আরোপিত হইতে পারে (ein Kollecitv begriff..... der Keine ethnograhische Trennung bezeichnete. sondern die Steppen volker der Ebenen vom Kasipisee bis an den Sir und daruber hinaus umfasste)। Geiger মনে করেন যে, সম্ভবত তূরাদের মধ্যে তাতারদের কিছু অংশও বিদ্যমান ছিল (Uberreste einer tatarischen Urbevolkerung?)। তবে ইহা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, তূরাদের মধ্যে হূনদের আবিষ্কারের Geiger-এর প্রচেষ্টা এখন প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (hunu, পুত্র, বংশধর; Bartholomae, Altir, Worterb., col. ১৮৩১)।

দানু (উপরে তু.) শব্দটির একটি অজাতিতত্ত্বমূলক তাৎপর্যও থাকিতে পারে, যেমন ইহা অমাযদাকী (Won-Mazdaecan) তূরার অর্থ বহন করে [Christensen (১৯২৮ খৃ.)। Geiger-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধে তদ্রূপ মন্তব্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি ধারণা করেন যে, " তূরা ছিল মূলত যাযাবর জনগোষ্ঠী, তাহারা ইরানী হউক বা না হউক"]।

অন্যদিকে Blochet তাঁহার নিবন্ধে (de nom des Turks dans L'Avesta) তূরার উৎপত্তি তূরক হইতে, এই মতের সমর্থন করেন এবং তিনি তূরী, দানু, কারা আসাবানা এবং ভারা আসাবানা নামসমূহের ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এইরূপে যে, তুর্কী শব্দ কারা (কাল) ও গোআর (চুতর) হইতে এইগুলির উৎপত্তি। তুর্ক নামটি অথবা কমপক্ষে ইহার শব্দমূল [Sie!] ৬ষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে, তুর্ক নামের শব্দ প্রকরণ যাহাই হউক না কেন (তু. arkturk শক্তি, ক্ষমতা; F. W. K. Muller, Uigurica, ২খ, ১০; turkum, 'পরিবার'; কাশগারী, ১খ., ৩৬৮), তূরা নামটি ইরানী ভাষায় সাহসী, নির্ভীক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তু. ইরানী ও কুর্দী ভাষায় তূর এবং ফারীদূনের পুত্র তূরের চরিত্রের প্রতি ফিরদাওসীর তাৎপর্যপূর্ণ পরোক্ষ উল্লেখ। ইহা সত্য যে, তূরা ও তারার শব্দ প্রকরণ এখনও অজ্ঞাত এবং ফিরদাওসীর মতানুসারে ভেসা পরিবারের একজন সদস্য কুরখান (?) নাম ধারণ করেন (সম্পা. Vallers, ১খ, ২৬১, কিন্তু সুস্পষ্টভাবে এই নামগুলির পাশাপাশি ইরানী রূপের অন্যান্য তূরীয় নাম উপস্থাপন করা যাইতে পারে। এই কারা ও ভারা নামের অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় আর এক নাম দূরায়েকায়েতা, অর্থ যাহার ইচ্ছা বহু দূরে অগ্রসর (এই যুক্তির কোন মূল্য থাকিবে না যদি আমরা প্রমাণ করিতে পারি যে, তূরার শাহযাদীগণ ভিন্ন দেশ হইতে আগত, কিন্তু ইহাতে একই সময়ে এই জনগোষ্ঠীকে শনাক্তকরণের সকল উপায় হারাইয়া যাইতে পারে)।

তূরা সম্পর্কে Marquart-এর ধারণা বিস্তারিত ও কাল্পনিক (Eransahr, পৃ. ১৫৫-৭), তাঁহার মতানুসারে ইরানীদের আদি বাসস্থান Airynnom Waejo খাওয়ারিয্‌ম-এ অবস্থিত ছিল। ইরান ও তূরানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ (যাহার বিবরণ লোককাহিনীতে পাওয়া যায়) স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ইরানী (স্বীয় উৎকর্ষতর সংস্কৃতির জন্য যাহারা গঠিত এবং যাহারা আইর্‌য়ানা নাম নিজেদের জন্য নির্ধারিত করিয়া লইয়াছে) ও মৎস্যভোজী যাযাবর মাস্‌সাগেতাই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে [তু. আভেস্তা মাসয়া মৎস্য ও সাইথিয়ী (Scythian) ভাষায় বহুবচনবিশিষ্ট শব্দান্তের প্রত্যয়]। ইঁহারা সেই সাইথিয় মাস্‌সাগেতাই সম্প্রদায় যাহারা প্রথমে অক্সাস (Oxus) নদী ও আরাল মুদ্রের পূর্বে বসবাস করিত এবং তাহারা নিশ্চয়ই তূরা নাম ধারণ করিয়াছিল। টলেমির শিরাফের (আনানিয়াস) আর্মেনীয় অনুবাদক খাওয়ারিয্‌মে তূর জিলার যে উল্লেখ করেন, তাহা অবশ্যই তূরা জনগণের স্মৃতি বহন করে (Tovplov (Strabo, ১১খ, ৫১৭)-এর বাকত্রীয় (Bactrian) প্রাদেশিক শাসকের রাজ্যের সহিত তূর জিলার সম্পর্কের বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত (তু. Berhummer, পূ. গ্র., পৃ. ১৯৪, ২০২)। পরবর্তী কালে জনগণের ভিন্ন এলাকায় অভিবাসন এশিয়ার জাতিগত মানচিত্রকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে এবং তূরা নামটি ক্রমান্বয়ে ইরানীদের শত্রুদের তথা সাফারউকায়ী, স্তেপ্পচারীয়, য়ুয়ে-চি, কুশানী, খিওনী, হেফথালী ও তুর্কীগণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

আভেস্তার সংস্কৃত অনুবাদক তূরাকে তুরুসকাহতে রূপান্তরিত করিয়াছে। এই শেষ শব্দটি সাধারণত তুর্কীদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু যেহেতু সংস্কৃত অনুবাদটি বহু পরের (Gurndr. d. iram.

Phil., ২খ, ৫০) তাই জাতিগত পরিভাষায় ইহার ব্যাখ্যার কোন মূল্য নাই। শাহনামার প্রভাব তূরান এবং তূরার মধ্যকার সংযোগ যথেষ্ট বিলম্বে পরিদৃষ্ট হয় (তু. (Spiegel, Eransiche Alterthumskunde, ১৮৭১ খৃ., ১খ., ৫৫৩ এবং বিশেষভাবে Geiger, পৃ. গ্র., ১৮২২ খৃ., পৃ. ১৯৩)। সম্ভবত পাহলাবী ভাষার মধ্যযুগীয় রূপে এমন কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইতে পারে যাহা দ্বারা তূরা হইতে তূরানের বিবর্তন সম্পর্কে কিছু তথ্য উদঘাটিত হইবে, কিন্তু তুরানের বর্তমান অর্থ গঠনের উপর ইহার কোন সরাসরি প্রভাব পড়িবে বলিয়া মনে হয় না। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, এই বিষয়ের উপর প্রাচ্য দেশীয় ও য়ূরোপীয় মতামতসমূহের মুখ্য সূত্রই হইতেছে শাহনামাহ গ্রন্থটি। ইহার সমান্তরালে অবস্থিত ইরানী ও আরবীয় সূত্রসমূহ ও পাহলাবী ভাষায় রচিত খাওয়াতায়-নামাক (খুদায় নামাহ্)-এর উপর স্থাপিত এবং ফিরদাওসীর কাব্যের সম্পূরক অংশ হিসাবে বিবেচিত।

শাহনামাহ গ্রন্থের সেই অধ্যায়ে তূরানের উল্লেখ আছে যেখানে শেষ সার্বজনীন সার্বভৌম বাদশাহ (Xvaniras দেশের শাসক) ফারীদূন (Tharetaona, Fredhon) কর্তৃক পৃথিবীকে ত্রিধা-বিভক্ত করিবার বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে (তু. মাকান সং., পৃ. ৫৮; Mohl, ১খ., ১৩৮; Vullers, ১খ., ৭৭-৭৮)।

তূরান ও ইহার বৈশিষ্ট্যময় নাম ঃ য়ানাত, ১৩খ., ১৪৩ (উপরে তু.) গ্রন্থটি খুবই প্রাচীন এবং ইহার এমন ধারণাকে প্রতিফলিত করে যে, আদিতে পৃথিবীতে ৫টি জাতির বাস ছিল। পক্ষান্তরে আমরা পাহলাবী Denkart গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, একটি বিলুপ্ত আভেস্তা গ্রন্থ ফারীদুনের পুত্র সারম্ তুচ এবং এরীচ-এর (পাহলাবী শব্দ) মধ্যে পৃথিবীকে ত্রিধা-বিভক্ত করিবার বিষয় উল্লেখ করে। স্পষ্টতই দুইটি বিবরণকে একত্র করিয়া প্রাচীন জনগণকে ইরানী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে যাহা ইরানীদের নিকট জ্ঞাত, তাই ফারীদুনের জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়ের একজনকে পশ্চিমে এবং অন্যকে পূর্বে রাজ্য প্রদান করা হয় এবং তাহা ঐ আমলের (সামানী) রাজনৈতিক বিভাজনের সহিত সংগতিপূর্ণ ছিল। এইভাবে রোম-এর (বায়যান্টীয় সাম্রাজ্য) সহিত প্রতীচ্য এবং খুসরাও ১ম (আনু. ৫৫৭ খৃ.)-এর অধীনে Hephthalites-এর পরাজয়ের সময় হইতে ইরানীদের প্রতিবেশী তুর্কীদের সহিত প্রাচ্যকে অভিন্নরূপে গণ্য করা হইয়াছে।

Tharetaona-র পুত্রদের মধ্যে পৃথিবীর ত্রিধা-বিভক্তির পৌরাণিক উপকথা প্রাচীন আমলের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রতীকী ব্যঞ্জনা দিয়াছে। তাই তাহারা এই প্রাচীন যুগের মানুষের বৈশিষ্ট্যময় নামে পরিণত হইয়াছে। ফিরদাওসীর আমলে পৌরাণিক কাহিনী ইহার জাতিগত ভিত্তি লাভ করিতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। তাই এই পরস্পর বিরোধিতাকে কথার মারপ্যাঁচে গোপন করা হয়। শাহনামাতে ফারীদূন তাঁহার পুত্রদের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়ার নিমিত্ত তাহাদিগকে কেবলমাত্র একটি পরীক্ষায় ফেলিয়া সালম, তূর ও ঈরাজ নামে অভিহিত করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র বিনা ক্ষতিতে (সালামাত) বিপদ এড়াইয়া যাইতে সক্ষম হন এবং খাওয়ার খুদায় খেতাবসহ পশ্চিমাঞ্চলের (রূম ওয়া খাওয়ার) এলাকা গ্রহণ করেন। তেজস্বী দ্বিতীয় পুত্রকে (তূর-সাহসী) তূরান অঞ্চল অর্পণ করা হয় এবং তিনি তূরান শাহ অথবা শাহ-ই চীন অর্থাৎ "তুর্কী এবং চীনাদের প্রভু" উপাধি ধারণ করেন (তূরক ওয়া চীন; তু. সম্পা. Vollers, ফারীদূনের রাজত্বকাল, শ্লোক ৪৬০ ও ২৯৫)। যেমন সাহসী তেমনি দূরদর্শী কনিষ্ঠ পুত্র ঈরানখুদায় উপাধি লইয়া 'ঈরান' এবং বীর পুরুষদের প্রান্তরের (অথবা সম্ভবত কুরদের, তু. ঐ, শ্লোক ২৯১, ৩০০ ও ৩২১) দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আরব লেখকগণের মধ্যে (তু. তাবারী, ১খ, ২২৬) জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের সারম মোয়রিমা পদ বিন্যাস এখনও বিদ্যমান। কিন্তু যেহেতু পাহ্লাবী বর্ণমালা ইংরেজী বর্ণমালার 'আর' ও 'এল'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করে না, তাই ফিরদাওসী (আরও দ্র. মুজমালুত-তাওয়ারীখ) পরিবর্তনশীল সালমকে অধিক পসন্দ করেন, যাহা আরবী শব্দমূল সীন-লাম-মীম=সাল্ম-এর সহিত সামঞ্জস্য (উচ্চারণগত-তাজনীস) সম্ভব হয় [Modi's Asiatic Papers, বোম্বাই ১৯০৫ খৃ., পৃ. ২৪৪, এবং Blochet, Rev. de l'or. Chretien, ১৯২৫ খৃ., ২৫খ, ৪৩১, সায়রিমাকে সরাসরি রোম (s Rim, তু. Armen. h Rom)-এর সহিত যুক্ত করা সকল প্রকারেই অস্বাভাবিক। যেহেতু পাশ্চাত্যের সহিত সাল্ম-এর সম্পর্ক খুবই সামান্য, তাই এই তথ্য হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, সালম এবং তূর ভ্রাতৃদ্বয় কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে যুদ্ধ করে (ছাআলিবী যুদ্ধের ঘটনাস্থলকে আযারবায়জান-এ নির্ধারিত করেন) এবং একত্রে আলানান-দিয় নামক নৌ-ঘাঁটি দখল করিয়া রাখে (হাসান-কুলী অন্তরীপে দিহিস্তান সুর? যাহা সম্পর্কে জানার জন্য দ্র. Barthold, K. istorii orosheniya Turkestana, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৩৩ দ্র.)। এই অঞ্চলসমূহ আলান্দের (Ossetes-এর পূর্বপুরুষ এবং Sauromates-Sairiman-দের বংশধর?) নাম খৃ. পূ. প্রথম শতকের সহিত কেবলমাত্র যুক্ত হইতে পারে যখন ইরানীরা কাস্পিয়ান অঞ্চল শাসন করিত (Marquart, Komanen, পৃ. ১০৮)।

তূর (ফিরদাওসী এবং মুজমালুত-তাওয়ারীখ) নামটি তুচ হিসাবে Denkart-এর ৮খ, ১৩-তে দেখা যায় এবং এই গঠনবিন্যাস আরবী মূল গ্রন্থে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া আছে। যেমন ইবন খুররাদাযবিহ, পৃ. ১৫ ঃ তুজ অথবা তূস; দীনাওয়ারী, পৃ. ১১ (নিমরূদের পুত্রগণ ঃ ঈরাজ, সালম ও তূস); তাবারী, ১খ, ২২৬; ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১২; মাসঊদী, মুরূজ, ২খ, ১১৬; বীরূনী, আল-আছারুল-বাকিয়্যা, পৃ. ১০২; ছাআলিবী, সম্পা. Zotenberg, পৃ. ৪১ (তূয, তূরু)। যাহাই হউক ফিরদাওসী এই বানান পদ্ধতি এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়াছেন যাহাতে, তূর-আন শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়, কিন্তু এই বানান পাহ্লাবী ও আরবী উৎস গ্রন্থে প্রাপ্ত বানান বিন্যাসের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। Marquart-এর মতানুসারে (Beitrage, Z. D. M. G., ১৮৯৫, পৃ. ৬৬৪-৭) তৌচ তোউরিচ (তূরা হইতে); Christensen-এর মতানুযায়ী তূর হইতে তুচ-এর উৎপত্তি চ='তূরীয়সূল'।

ভৌগোলিক নাম হিসাবে তূরান ঃ তূরা নামীয় জনগণের নাম হইতে তূরান শব্দটি গঠিত, তূচ/তূর উপনাম হইতে যাহা আহৃত এবং তুর্কীদের দেশের প্রতি যাহা অবশেষে প্রযুক্ত হইয়াছে। তূরান শব্দটি সাসানী খাওয়াতায় নামাক-এ দেখিতে পাওয়া উচিত যাহার সূত্র আরব ঐতিহাসিক এবং ফিরদাওসী কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা সত্য যে, বুনদাহিশ গ্রন্থটি (১২খ, ৩৯) শুধুমাত্র তুর্কিস্তান শব্দটি ব্যবহার করে [পক্ষান্তরে সালমান, সাল্মভূমি (ঐ, ২০খ, ১২) নামে দেশটি আখ্যায়িত হইয়াছে যেইখান হইতে তুগরা নামের উৎপত্তি] কিন্তু Denkart গ্রন্থ (৮খ.) এবং তূরফান-এর অসম্পূর্ণ অংশে আমরা তূরান শব্দটি পাই (F. W. K. Muller, ২খ., ৮৭)।

ফিরদাওসীর শাহনামাতে তুর্কী ও চীনাদের বাসভূমি তূরান অক্সাস নদী দ্বারা ইরান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে (শাহনামাহ, সম্পা. Vullers, ফারীদূনের শাসনকাল, শ্লোক ২৯৫, ৩০৯, ৩২২, ৪৫৬, ৪৫৯, ৫৪২, ৭৯২; নাওযার-এর রাজত্বকাল, শ্লোক ১৩৩; সম্পা. Mohl. ৫খ, ৬৮০, বাহরাম গুর-এর রাজত্বকাল)। পক্ষান্তরে আফরাসিয়াব-এর পরাজয়ের বিবরণীতে তাঁহার রাজ্যের সীমানা সম্ভবত কিপচাক পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। Marquart (Komanen, পৃ. ১১০) এই নাম সংশোধন করিয়া কোচকার (বাশী) নামকরণ করেন এবং কারলুখ (দ্র.) শিবিরের সহিত ইহাকে চিহ্নিত করেন যাহা তারায হইতে ৫ ফারসাখ দূরে; তু. ইবন খুররাদাযবিহ, পৃ. ২৪, কাযরীবাস। একইভাবে ফিরদাওসী আফরাসিয়াব-এর রাজধানী কান্‌গদিযকে চীনের নিকটে কোথাও অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু কান্‌গ এলাকার সহিত উহার সম্পর্ক নাই (সম্পা: Vullers, শ্লোক ১৩৮১; তু. Bartholomae, col. ৪৩৭; Marquart, Komanen, পৃ. ১০৯)। তুর্কীদের পশ্চিমমুখী গমনাগমনের প্রাথমিক পর্যায়গুলি এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাতে লিপিবদ্ধ থাকিতে পারে, আর চীনাদের বেলায় যাহারা তূরানের রাজাদের প্রজা ছিল, ফিরদাওসী সম্ভবত প্রাচীন আভেস্তীয় জনগণ সাইনাভদের নাম এই নামের স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন, যাহারা ইতোমধ্যে ধুনদাহিনা-এ চীনা জনগণের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে (Darmesteter, Le Zend Avesta, ২খ, ৫৫৪)।

আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষার মুসলিম লেখকগণ তূরান শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব বেশি যুক্তির ধার ধারেন নাই। কিন্তু যেহেতু আরব ভূগোলবিদদের নিকট তুর্কীদের দেশ সীর দরিয়ার কেবলমাত্র পূর্ব দিক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার মধ্যে Transoxiana-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই (তু. Barthold, Turkestan, Gibb, Mem, Ser, পৃ. ৬৪), তাই ইহা মনে হয় যে, Transoxiana-র সহিত তূরানকে অর্থাৎ আমূ দরিয়া ও সীর দরিয়ার মধ্যকার এলাকাকে একই এলাকা বলিয়া চিহ্নিত করিবার একটি প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। খাওয়ারিযমীর মাফাতীহুল-'উলূম (পৃ. ১১৪) গ্রন্থ অনুসারে অক্সাস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকে ইরানীগণ মারখ-ই তূরান বলিয়া অভিহিত করে। য়াকূত তাঁহার গ্রন্থে (১খ, ৮২৯) উল্লেখ করেন, তূরান হইতেছে মা ওয়ারাউন-নাহ্‌র (Transoxiana)-এর অন্তর্ভুক্ত দেশ; ফারীদূন কর্তৃক পৃথিবীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিবার পর তুর্কী জনগণ তাহাদের রাজা তূজ-এর নামানুসারে তাহাদের দেশকে তূরান নামে অভিহিত করে (হাররান-এর নিকটে তূরান নামে একটি গ্রামের নামও য়াকূত উল্লেখ করেন)। দিমাশকী [Cosmographie (আনু. ১৩২০ খৃ.), সেন্ট পিটার্সবার্গ, পৃ. ১১৪] খুবই অদ্ভুত এক প্রাচীন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, যাহার প্রেক্ষিতে সায়হুন (সীর দরিয়া) নদী Transoxiana অর্থাৎ তূলান (তূরান) নামে অভিহিত হায়াতিলা অঞ্চল এবং ফারগানা নামে অভিহিত তুর্কিস্তান অঞ্চলের মধ্যবর্তী সীমান্ত গঠন করিয়াছে (হায়তাল সম্পর্কে দ্র. Transoxiana, আরও তু. ইরানসাহ্‌র, পৃ. ৩০৭)। মাসালিকুল-আবসার গ্রন্থে (খৃ. ১৪শ শতাব্দী) এই শব্দটির আরও অনেক অস্পষ্ট ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, যেখানে ভল্‌গা নদীকে নাহ্‌র তূরান নামে অভিহিত করা হয় এবং তূরানের প্রাচীন রাজাদের কিপচাকের পূর্বতন খানগণ ঃ Marquart, Komanen, পৃ. ১৩৮, গ্রীষ্মকালীন আবাস আরক্ তাগ (?)-এ অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, Quatremere ও Marquart তাহাদিগকে উরাল পর্বতমালার সহিত চিহ্নিত করিয়াছেন।

জাফার-নামা ঃ (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী) গ্রন্থে কেবলমাত্র কাব্য উপমায় তূরান শব্দটি ব্যবহার করা হয় (১খ, ৩৪, ৬২৪ ঃ ইরানে তূরানের বীরগণ)। আবুল-গাযী (খৃ. ১৭শ শতাব্দী) কখনও ইহাকে পৌরাণিক পরিভাষা হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন (সম্পা. Desmaisons, পৃ. ২, ১২৯, ১৪০), কখনও পশ্চিম সাইবেরিয়ার সহিত অভিন্নরূপে গণ্য করিয়াছেন (পৃ. ১৭৭), আবার কখনও ইরান ও তূরানের মধ্যে অবস্থিত মুহাম্মাদ খাওয়ারিয্‌ম শাহের অঞ্চলকে অস্পষ্টভাবে গণ্য করিয়াছেন (ইরান-বিরলান তুরান আরাসী, পৃ. ৯৬)।

তূরান শব্দটি Herbelot's Bibliotheque Orientale, প্যারিস ১৬৯৭ খৃ., পৃ. ৬৩ হইতে য়ূরোপে পরিচিত হইয়াছে, যেইখানে বলা হইয়াছে যে, আফরাসিয়াব জন্মসূত্রে একজন তুর্কী কিন্তু ফারীদূনের পুত্র তূর-এর বংশধর, অক্সাস নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব এবং উত্তরে বিস্তৃত সকল অঞ্চলের রাজা ছিলেন; এই দেশকে তূরান বলা হইত, পরবর্তীকালে ইহা তুর্কিস্তান নাম ধারণ করিয়াছিল। এই শেষ শব্দটি ১৬শ শতকে Ortelius ও Mercator প্রণীত ভূচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় (Oberhummer)। খৃ. ১৯শ শতাব্দীতে য়ূরোপীয় ভাষায় তূরান শব্দটি স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হইয়াছে। যেইখানে সীমানার যথার্থতা লইয়া কোন প্রশ্ন উঠে না, সেইখানে বিভিন্ন ভাবধারায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহার অস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ইহাকে কিছু পরিমাণ জনপ্রিয় করিয়া তোলে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Justi, Iran, Namenbuch, sub Tura, Sairima; (2) Bartholomae, Altirao, Worterbuch, sub Tura, tuirya, Sairimn= (৩) Spiegel; Eranische Alterthumskunde, ১৮৭৫ খৃ., ১খ, ২৭০, ৫৪৬, ৫৭৫, ৫৭৯; (৪) Geiger, Ostiranische Kultur im Alterium, ১৮৮২ খৃ., পৃ. ১৯৩-২০২; (৫) Brunhofer, Urgeschichte der Arier in Vorder-und Central-Asien, Band I : Iran una Turan, Leipzig 1893, in the Series Einzelbeitrage z, allg, u. vergl. Sprachwiss, তু. Bhrtholomae Wochenschr. f. klass. phil, ১৮৯০ খৃ., স্তম্ভ ১১৬১); (৬) Marquart, Eransahr, প, ১৫৫-১৫৭; (৭) আরও তু. Marquart, Unters. z. Gesch. V. Eran, ২খ, ৭৮, ১৩৬; (৮) Marquart, Uber d. Volkstum'd. Komanen, বার্লিন ১৯১৪ খৃ., পৃ. ১০৪, ১৯৬; (৯) Feist, Kultur, Ausbreitung u. Herkunft d. Indogermanen, বার্লিন ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৪০৪; (১০) Blochet, Le nom des Turks dans I'Avesta, FRAS, ১৯১৫ খৃ., পৃ. ৩০৫-৩০৮; (১১) Blochet, Le Pays des Tchata et les Ephtalites, RRAL, ১৯২৫ খৃ. নং ৬, পৃ. ৩৩১-৩৫১; (১২) Blochet, Les sources grecquest chretiennes de I'astronomic hindoue, Rev. de L'Orient chritien ১৯২৫ খৃ., ২৫খ, পৃ. ৪৩০-৪৩১; (১৩) Blochet, Le nom des Turks, ১৯২৭-১৯২৮ খৃ., ঐ., ২৬খ., নং ১, পৃ. ১৮৮-২০৬; (১৪) Oberhummer, Die Turken u. d. osmanische Reich. Leipzig-Vienna, ১৯১৭ খৃ.; (১৫) Oberbummer, Der Name Turan, Turna, বুদাপেস্ট, এপ্রিল ১৯১৮, পৃ. ১৯৩-২০৮; (১৬) Christensen, Etudes sur le zoroastrisme de la Perse Antique D. Kgl. Danske Vid. Selskab, কোপেনহেগেন ১৯২৮ খৃ., ১৬; (১৭) Gray, Foundations of

the Iranian Religion, বোম্বাই ১৯২৯ খৃ., in Journ. Cama, Orient. Inst., নং ১৫, পৃ. ১২।

তূরানী ভাষাসমূহ ঃ এই পরিভাষাটির আবিষ্কারক সম্ভবত ঐতিহাসিক বুনসেন (১৮৫৪ খৃ.)। এশিয়া ও য়ূরোপের ঐ সকল ভাষা সম্পর্কে তিনি এই নাম প্রয়োগ করেন যেইগুলি ইন্দো-য়ূরোপীয়ও নহে আবার সেমিটিকও নহে। এই শব্দটি প্রকৃত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছেন Max Muller (ম্যাক্স মুলার), The Languages of the Seat of War in the East, with a Survey of Three Families of Languages, Semitic, Arian and Turanian, London 1855, যৌগিক শব্দ দ্বারা গ্রথিত ভাষাসমূহের এই শ্রেণীতে (তিন পরিবার শব্দটি পরিহার করিয়াছেন) তিনি শুধুমাত্র Finno-Ugrian এবং Altaic-ই নয় শ্যামী, তিব্বতী, মালীয় ইত্যাদি ভাষাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। Lenormant (la Magie chez les Chaldeens et les origines accadiennes), প্যারিস ১৮৭৪ খৃ.) এই ভাষা গোষ্ঠীতে সুমেরীয় ভাষাকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন J. Oppert, তাঁহার Les Peuples et la Langue des Mides (প্যারিস ১৮৮৯ খৃ.) গ্রন্থে Median-এর জন্য Achaemenian শিলালিপির (the Neo-Elamite) দ্বিতীয় স্তম্ভের ভাষাকে ভ্রান্তভাবে মেডিয় সাব্যস্ত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, Medes জাতি তুরানী। যেই সকল ভাষার নিয়মিত কোন উৎস অজ্ঞাত সেইগুলিকে সাধারণত তুরানী বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু Castren (১৮৬২ খৃ.) ইতোমধ্যে সমালোচনার সঠিক পথ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সর্বপ্রথম Ural-Altaic ভাষার ৫টি শাখা যথা Finno-Ugrian, Samoyed, Turko Tatar, Mongol এবং Tunguz-কে পৃথক করেন। পরবর্তী কালের গবেষণা উপরোক্ত ৫টি শাখার শেষ ৩টির প্রথম ২টিকে পৃথক করিয়া ইহার উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়াছে যাহা পরিণামে Altaic শ্রেণীর ভাষা গঠন করিয়াছে। এই শ্রেণীর তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠাতা G. Ramstedt কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর মঙ্গোলীয়দের সহিত তুর্কীর সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তুনগুয-এর সহিত তাহাদের সম্পর্ককেও স্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে Finno-Ugrian এবং Samoyed-এর সহিত Altaic-এর সম্পর্ক এখনও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় নাই। তুরানী পারিভাষিক শব্দটি আধুনিক ভাষাতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হইয়াছে। তু. Deny, Langues turques, mongoles et toungouzes, in Les langues du Monde, প্যারিস ১৯২৪ খৃ.; Peoppe, La parente des langues altaiques, Histoire et etat actuel de la question (রুশ ভাষায়), বাকু ১৯২৬ খৃ.; Sauvaget, Recherches sur le vocabulaire des langues ouralo-altaiques, প্যারিস ১৯২৯ খৃ.।

নিখিল তুরানীবাদ (Pan-Turanianism)

এই রাজনৈতিক পরিভাষাটি একদিকে সমগ্র তুর্কী আন্দোলনের (Turk-djuluk তুর্কীবাদ) সমার্থক শব্দ হিসাবে যেমন ব্যবহৃত হইয়াছে তেমনি অন্যদিকে ইহা অধিকতর অস্পষ্ট কোন বিষয়ের উপরও প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে তুরানী জনগণের মধ্যে একটি সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

ইহা হাঙ্গেরীতে শেষের অর্থে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় যেইখানে ১৮৩৯ খৃ. হইতে আদর্শ প্রাচীন জার্মানীর অর্থে তুরান শব্দটির প্রথম প্রয়োগ শুরু হয় (Count Teleki'র মতানুসারে ঃ eine gewisse Schwarmerei fur Stammland und Stammverwandte)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বুলগেরীয় ও তুর্কী পরিচিতি হইতে তূরান সম্পর্কে ধারণা লাভ করিবার জন্য Turanische Gesellscaft কর্তৃক বুদাপেস্টে তুরান সাময়িকী প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত জনগণের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য অধ্যয়ন করা ছিল ইহার উদ্দেশ্য (তুর্কী ভাষায় bizim-le karabeti olan milletler)। তবে এই সাময়িকীর সম্পাদক (১৯১৮ খৃ., ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫) নিম্নের ঘোষণা অনুযায়ী একটি সুস্পষ্ট মনোভাব গ্রহণ করেন ঃ আমাদের তুরান হইতেছে ভৌগোলিক; ইহা যেমন ম্যাক্স মুলারের তূরান নয় যাহা একটি জীবন্ত বিতর্কিত বিষয়, তেমনি রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের তূরানও নয়। Count Teleki এবং Prof. Cholnoky (Turan, ein Landschaftbe-griff, ঐ সংখ্যা, পৃ. ৮৫) এই অঞ্চলকে নিম্নবর্ণিত সীমানার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন ঃ কাস্পিয়ান সাগর, ইরানী মালভূমি, সীর দরিয়া এবং ইরতিশ নদীর উৎসস্থলের পর্বতমালা ও আকমলিনস্ক-এর মালভূমি। এই ভৌগোলিক পরিবেশের সংগতি এবং সেইখানে বসবাসকারী জনগণের উপর বিস্তারকারী প্রভাব সম্পর্কে এই সকল গ্রন্থকারের ধ্যান-ধারণার মূল্যকে বাতিল করিয়া ইহাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হইবে যে, ভৌগোলিক পরিভাষার দৃষ্টিকোণ হইতে (তু. উপরে) তুরান শব্দটির এইরূপ ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নূতন ও ব্যক্তিগত। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে তুর্কিস্তানের পরিবর্তে ব্যবহৃত এই তূরান শব্দটি একটি অকেজো পরিভাষা, যাহার অন্তত একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা বর্তমান থাকিবার মূল্য রহিয়াছে।

রাশিয়াতে ও হাঙ্গেরীয় তূরানীদের অনুরূপ প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়। য়ূরেশীয় নামে অভিহিত শ্রেণীটি য়ূরেশীয় জনগণের ভূ-রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের সহিত নিজদিগকে গভীরভাবে জড়িত করিয়াছে। তু. I. R. L'heritage de Cingiz-Khan (রুশ ভাষায়), বার্লিন ১৯২৫ খৃ.; Prince N. Troubetskoi, Sur l'element touranien de la culture russe (রুশ ভাষায়), প্যারিস ১৯২৭ খৃ.। নিখিল তুর্কীর সংকীর্ণ প্রেক্ষাপটে গঠিত নিখিল-তূরানীয় আন্দোলনের প্রবণতাসমূহ নীতিগতভাবে অনেক বেশি স্পষ্টতর, কিন্তু এই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর একটি সম্পূর্ণ গবেষণা না থাকাতে আমরা কেবলমাত্র ইহার উন্নয়ন ও কর্মসূচির বিভিন্ন পর্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করিতে পারি।

তুর্কী সাম্রাজ্য ইহার সর্বোচ্চ সম্প্রসারণের সময়ে তুর্কীবাদের প্রতি কোন বিশেষ প্রবণতা ব্যতীত ঠিকই ছিল। সরকারের সর্বোচ্চ পদ অতুর্কীদের দ্বারা পূরণ করা হইত যাহাদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ছিল প্রায়শই এক নিয়মিত ঘটনা। খৃস্টান শিশুদের সংগ্রহ করা হইত [তু. দেওশিরমে]। রাষ্ট্রকে সবচাইতে সক্ষম বেসামরিক ও সামরিক অফিসার সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে (তু. Lybyer, The Government..... of Suleiman the Magnificent, ক্যামব্রিজ পাণ্ডু. ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৫১-৫৬)। সুলতান-খলীফা তত্ত্ব সাম্রাজ্যের অন্যান্য মুসলিম প্রজাদের চাইতে তুর্কী উপাদানকে অধিক পসন্দ করিবার সম্ভাব্যতাকে পরিহার করে। এমনকি খৃ. ১৯শ শতাব্দীতেও তুর্কী সাম্রাজ্যে তুর্ক শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ ছিল, যথা চাষী, অভব্য, গ্রাম্য, জবুথবু (তু. জনপ্রিয় প্রবাদসমূহ)। ১৮৯৭ খৃ. গ্রীসের সহিত যুদ্ধকালে এই প্রসঙ্গে মুহাম্মাদ য়ামীন বে রচিত কবিতায় এই শব্দটির অর্থের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের তারিখ চিহ্নিত করা হয়। Ben bir turk-um, dinim djinsim ulu-dur ঃ আমি একজন তুর্কী, আমার ধর্ম ও জাতি উন্নত।

বিভিন্ন প্রকারের উপাদান তুর্কী আন্দোলনের অগ্রগতি নির্ধারণ করিয়াছে, এই আন্দোলনকে কখনও কখনও তুরানী নামে আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

(ক) খৃ. ১৯শ শতাব্দীতে অনেক জাতীয় আন্দোলনের সংগঠন (গ্রীক, জার্মান, ইতালীয়, স্লাভ, আর্মেনীয়, আরব) যাহাদের বেশ কয়েকটি তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

(খ) তুর্কী সাম্রাজ্য যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাতেও ইহাতে বলকান অঞ্চল, আফ্রিকা এবং অবশেষে এশিয়ার দখল হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল (সিরিয়া, আরবদেশ, ইরাক, মাওসিল)। তুর্কী শাসনাধীন এলাকা যতই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে থাকে ততই আনাতোলিয়ার তুর্কী উপাদান ক্রমে গুরুত্ব অর্জন করিতে থাকে। এই গুরুত্ব শুধুমাত্র সংখ্যানুপাতের ক্ষেত্রেই নহে, একটি রাষ্ট্র স্থাপিত হইতে পারে এমন নিশ্চিত ও দৃঢ় ভিত্তির দৃষ্টিকোণ হইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

(গ) তুর্কী ভাষাতত্ত্বের মাধ্যমে অর্জিত অগ্রগতি তুর্কী জনগণের একটি বর্ণনামূলক তালিকা প্রণয়ন ও তাহাদের ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করে, ফলে তুর্কীদের প্রাচীন ইতিহাসের উপরও আলোকপাত করা সহজ হয় [L. Cahun রচিত রোমান্টিক গ্রন্থ Introduction a L'histoire de L'Asie, প্যারিস ১৮৯৬ খৃ. (নেজীব আজীম কর্তৃক তুর্কী অনু.)-এর প্রভাব আরও অধিক সরাসরি হইয়াছে। এই ধারার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রথমদিকের গ্রন্থাবলীর মধ্য দিয়া গোকআল্প, de Guignes, Historie generale des Tures, des mongols et des Huns, প্যারিস ১৭৫৬-৫৮ খৃ. এবং Lumley Davids রচিত Turkish Grammar, লণ্ডন ১৮৩২ ও ১৮৩৬ খৃ.-এর নাম উল্লেখ করেন। এইখানে আমাদের ও R. M. M. কর্তৃক প্রকাশিত এবং তুর্কী জনগণের মধ্যে ঐক্যের একটি সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টায় লিখিত R. Hartmann-এর গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলনের বর্ণনামূলক প্রবন্ধের বিষয়ও আমাদের উল্লেখ করা উচিত]।

(ঘ) রাশিয়াতে একটি মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মুখ্যত তুর্কী তাতারদের গঠন এবং খৃ. ১৯০৫ সালের ঘটনাবলীর দ্বারা রাশিয়ায় তুর্কী সংবাদপত্রের প্রতি প্রেরণা। আলী হুসায়ন-যাদে (বাকু) য়ূসুফ আকচুরা (কাযান) এবং আহ্‌মাদ আগা-ওগলু (কারাবাগ)-র ন্যায় রাশিয়া হইতে বিতাড়িত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের চালিকাশক্তিতে পরিণত হন এবং এমনকি তাহাদিগকে তুরস্কের তুর্কীদের নিকট হইতে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ বিরোধিতাকে পর্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে হইয়াছিল।

খৃ. ২০শ শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কে ৩টি রাজনৈতিক তত্ত্ব লক্ষণীয় হইয়া উঠে ঃ নিখিল-ইসলামবাদ, তুর্কী সাম্রাজ্যবাদ ও নিখিল তুর্কীবাদ। কায়রোতে প্রকাশিত 'তুরক' সাময়িকীতে এই সকল মতবাদের উপর মুক্ত আলোচনা প্রবর্তন করা হয় ১৯০২-১৯০৩ খৃ.)। সাময়িকীতে য়ূসুফ আর্ক-চুরা ওগলু কর্তৃক নিখিল তুর্কী দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরা হয়। তাঁহার লিখিত নিবন্ধ Uc tarz siyaset (১৩২৭ হি. সালে ইস্তাম্বুলে পুনর্মুদ্রিত) এই আন্দোলনের কর্মসূচিকে সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আক-চুরা তুর্কীদের অধিকার হ্রাসে সহায়তাকারী হিসাবে তুর্কী সাম্রাজ্যবাদ সংক্রান্ত মতবাদের সমালোচনা করেন। এই মতবাদ ইসলাম ধর্মেরও বিপরীত, কারণ ইসলাম সকল ধর্মের বিশ্বাসীদের সমানধিকার সমর্থন করে। পক্ষান্তরে নিখিল-ইসলামবাদ অমুসলিমদিগকেও তিক্ত করিয়া তুলিবে এবং কোন কোন য়ূরোপীয় শক্তির নিকট হইতে প্রতিরোধের সম্মুখীন হইবে। এইরূপ অবস্থায় তখন নিবন্ধকার নিখিল তুর্কীবাদের ঘোষণা দান করেন এই চিন্তা করিয়া যে, রাশিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত বড় বাধা অন্যান্য সরকারের সহযোগিতায় এই আন্দোলনের মাধ্যমে অতিক্রম করা যাইবে (R. M. M., ২২খ, ১৭৯-২২১)।

এই একই 'তুরক' সাময়িকীতে তুর্কী সাম্রাজ্যবাদের নামে উদারনীতিবিদ আলী কেবাল এবং অনুমানের প্রেক্ষিতে আহমাদ ফেরীদ কর্তৃক আক-চূরার মতবাদ সমালোচিত হয়। কারণ তাহাদের নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে যে, নিখিল ইসলামবাদ বাস্তবে পরিণত হইবে না এবং নিখিল তুর্কীবাদ বলিতে গেলে অস্তিত্বহীন।

১৯০৮ সালের জুলাই-বিপ্লবের গোড়ার দিকে তুর্কী সাম্রাজ্যবাদ (সকল জাতিগত উপাদানের জন্য তুরস্কবাসী তুর্কী নাগরিকত্বের সমতুল্য) সরকারীভাবে সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু তুর্কী সাম্রাজ্য গঠনকারী জাতিসমূহের মধ্যে মীমাংসার অসাধ্য কিছু প্রবণতা থাকায় এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই Union and Progress কমিটি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহা অনুমোদন করে। ফলে তুর্কীবাদের আন্দোলন দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

তৎকালীন অবস্থা এবং সকল তুর্কী জনগণের কার্যকলাপ (আহওয়াল ওয়া আফআল) পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর ইস্তাম্বুলে তুর্কী পরিষদ (Turkish Assembly=Turk Derneyi) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবে এই সংগঠনের উৎসাহ শুধুমাত্র ভাষার প্রশ্নে সীমিত হইয়া পড়ে, যাহা Yeni-lisan, Gendj kalemler ইত্যাদি পত্রিকায় পর্যালোচিত হয়। ১৯১১ খৃ. জ্ঞানের প্রসার ও প্রচারকল্পে তুরানিয়ান সোসাইটি গঠন করা হয় এবং ডিসেম্বর মাসে য়ূসুফ আক-চূরা সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ সাময়িকী Turk-Yurdu-তে তাহা প্রকাশিত হয়। তুর্কী সংস্কৃতি অধ্যয়নের জন্য ১৯১২ সালের ২৫ মে Turk Odjaklari (Turkish Hearth) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

একই সময়ে প্রখ্যাত তুর্কী তাত্ত্বিক দিয়া গোকআল্প [দ্র.] ১৯১০ খৃ. Union and Progress-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি প্রথমে সালোনিকাতে (১৯০৯ খৃ.) ও পরে ইস্তাম্বুলে (১৯১২ খৃ.) তাঁহার কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁহার ধারাবাহিক কাব্যগ্রন্থসমূহ তিনি তুর্কীদের রক্তে তাহাদের ঘুমন্ত স্মৃতিকে জাগাইয়া তোলেন এবং তূরানের রহস্যময় ভূমিতে তুর্কী আদর্শকে মূর্ত করিয়া এই আদর্শের জয়গান করেন। গানটি হইতেছে ঃ ওগুয খানের সন্তানেরা তুরান নামে অভিহিত এই দেশকে কখনও ভুলিবে না (Turk luk, ১৯১১ খৃ.)। আততিলা, ফারাবী, উলুগ বেগ, ইব্‌ন সিনার (ইব্‌ন সিনা [দ্র.], তুর্কী ভাষায় জ্ঞান কোনমতেই প্রমাণিত হয় নাই) সহিত এই ভূমির সম্পর্ক রহিয়াছে। তুর্কীদের পিতৃভূমি যেমন তুরস্ত নহে তেমনি তুর্কিস্তান ও তুরস্ক নহে, তাহাদের পিতৃভূমি হইতেছে তূরানের বিশাল চিরন্তন দেশ (তূরান, ১৯১৪ খৃ.)।

"নিজেকে তুর্কী হিসাবে গড়িয়া তোল (সংস্কৃতি, হারছ-এর দৃষ্টিকোণ হইতে), নিজেকে ইসলামপন্থী কর, নিজের আধুনিকায়ন কর (সভ্যতার medeniyet-এর দৃষ্টিকোণ হইতে), এই ফর্মুলাতে দিয়া গোকআল্পের তত্ত্ব ও শিক্ষাকে সংক্ষেপিত করা হইয়াছে। এই লেখকের তত্ত্বগুলি নিয়মানুগ প্রকাশ turkculuyun esaslari, তুর্কীবাদের ভিত্তিতে দেখা যাইবে যাহা গ্রন্থকারের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১৩৩৯ হি. (১৯২৩ খৃ.)-তে আনগোরায় (Angora) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তূরানের ধারণা কিছু পরিমাণ বাস্তব বলিয়া দেখা যায়। দিয়া গোকআল্প ভাষা, ধর্ম, নৈতিকতা, নন্দনতত্ত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিসমূহের একটি দল হিসাবে জাতিকে সংজ্ঞায়িত করিয়াছেন। তূরান তুর্কী, মোঙ্গল,

তুনযু, ফিন ও হাঙ্গেরীয়দের সংমিশ্রণ নয়। তূরান শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে জাতিসমূহের নামকেই বুঝায়। তুর্কীদের পুনর্মিলন কেবলমাত্র পর্যায়ক্রমে ঘটান যাইতে পারে। তুর্কীবাদের তাৎক্ষণিক আদর্শ হইতেছে ওগুয তুর্কীদের সাংস্কৃতিক মিলন অর্থাৎ তুরস্কের তুর্কী এবং আযারবায়জান, পারস্য ও খাওয়ারিযমের তুর্কী। বর্তমানে তাহাদের রাজনৈতিক মিলন বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু কেহউ ভবিষ্যত সম্পর্কে বলিতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি তাতার, উযবেগ ও কিরগিযেরা তাহাদের নিজস্ব সভ্যতা সৃষ্টিতে এবং পৃথক জাতি গঠনে সফল হইতে পারে তাহা হইলে তাহারা তাহাদের স্ব স্ব নাম বজায় রাখিতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে তুরান একটি জাতিগত দল (জামিএ) গঠন করিয়া গণনাকৃত সকল মানুষের মধ্যে একটি সাধারণ পরিভাষা হিসাবে কাজ করিবে।

তূরানীর কল্পনা বিলাসিতাবাদের নানা প্রকার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আহমাদ হিকমাত (Altinordu), খালিদে এদীব হানুম (Yeni তূরান ১৯১৩ খৃ.), আকা গুনদুয (মুহতেরেম কাতিল, ১৯১৪ খৃ. প্রযোজিত একটি নাটক যাহার বিষয়বস্তু ছিল ককেসাসে তুর্কী অভ্যুত্থান), মূফীদে ফেরীদ খানীম (Ay Demir, মধ্য এশিয়ায় একটি তুর্কী অভ্যুত্থান) গ্রন্থসমূহে বিধৃত হইয়াছে। যুদ্ধকালে সাহিত্য বিষয়ক তূরানীবাদ সম্পর্কে তু. M. Hartmann, M. S. O. S, ১৯১৮ খৃ., ২১ খ., পৃ. ১৯-২২।

১৯১৪ খৃ. যুদ্ধের সময়ে তুর্কী সাম্রাজ্য শাসনরত তুরস্কের বিপ্লবী দলের সদস্যবর্গ (Committee of Union and Progress) কমপক্ষে মুসলিমদের বেলায় সরকারীভাবে প্রকাশ্যে তুর্কী সাম্রাজ্যবাদের ঘোষণা দান করেন, কিন্তু বস্তুতপক্ষে ১৯১৫ খৃ. আর্মেনীয়দের বিতাড়নের মধ্য দিয়া তুরস্কের তুর্কীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হইতে থাকে।

পূর্বদিকে সম্প্রসারণ

১৯১৪ খৃস্টাব্দের যুদ্ধ তুরস্কের তুর্কী ও তাহাদের জ্ঞাতিদের মধ্যে আলোচনার কোন সুযোগ দেয় নাই। ১৯১৭ খৃ. সংঘটিত রুশ বিপ্লব তুরস্কের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। Brest-Litowsk-এর সন্ধি চুক্তিতে শেষ মুহূর্তের একটি ধারা সংযোজনের মাধ্যমে তুরস্ক ১৮৭৭ খৃ. ট্রান্স-ককেসিয়ার সীমান্ত অঞ্চল ফেরত পায় (অর্থাৎ রাশিয়া কর্তৃক তুরস্ককে বাতুম, কারন ও আরদাহান অঞ্চল সমর্পণ)। তুর্কী শাসন প্রতিরোধ আযারবায়জানের তুর্কীদের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ট্রান্স-ককেসীয় মৈত্রীর সমাপ্তি টানিয়া দেয় (১৯১৮ সালের ২২ এপ্রিল) যাহার স্থলে ৩টি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্ম হয় (আযারবায়জান, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া)। আনওয়ার পাশা-র ভ্রাতার পরিচালনাধীনে তুর্কী বাহিনী কাস্পিয়ান সাগরের তীরে পেট্রোভস্ক (Petrowsk) পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু মুদ্রোস (Mudros)-এর যুদ্ধবিরতি (১৯১৮ সালের ৩০ অক্টোবর) তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করে। ইংরেজ বাহিনী তখন ইহা অধিকার করে এবং পরে ট্রান্সককেসিয়া হইতে ফিরিয়া আসে। মিত্র বাহিনী অধিকৃত রাজধানীতে দামাদ ফেরীদ পাশার সরকার যখন মরণপণ করিয়া তুর্কী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের একটি কর্মসূচি চালু করিবার শেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতেছিল তখন এশিয়া মাইনরে জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হয় (১৯১৯ খৃ. গ্রীষ্মকালে) এবং ব্রেস্টলিটোভস্কে বিপ্লবী তুর্কীগণের গৃহীত সাহসী পদক্ষেপ দ্বারা তাহাদের অধিকার বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। অতঃপর আর্মেনীয় প্রজাতন্ত্র বিজিত হয় (১৯২০ সালের ৩ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত আলেকজান্দ্রোপোলের শান্তিচুক্তি)। জর্জিয়া ইহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে এবং চূড়ান্ত শর্ত পেশ করিয়া (১৯২১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি) আরতুইন (Artwin) ও আরদাহান হইতে সেনা প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ১৯২১ সালের ১৬ মার্চ মস্কোতে তুর্কী-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং কারন-এ এটি ককেসীয় প্রজাতন্ত্রের (এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন) অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাহা অনুমোদিত হয়। তুরস্ক বাতুন হইতে তাহার দাবি প্রত্যাহার করিয়া লয়, কিন্তু ব্রেস্ট-লিটোভস্ক চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত নহে এমন বিষয় অর্থাৎ Araxes নদী তীরবর্তী ইগদির জিলা লাভ করে (যাহা পারস্য ১৮২৮ খৃ. পরাজয় স্বীকারপূর্বক রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিয়াছিল) এবং এইভাবে তুরস্ক তাহার শাসনাধীন এলাকাকে নাখচিওয়ান-এর পার্শ্বে সম্প্রসারণ করিতে সক্ষম হয়। আযারবায়জানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল উপনিবেশ হিসাবে এই নাখচিওয়ান সৃষ্টি করা হয়।

এইরূপে আনগোরাই সরকার ট্রান্সককেসিয়ার শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আনওয়ার পাশার সাফল্যকে প্রকাশ্যে মানিয়া লইতে অস্বীকার করে। আনওয়ার পাশা প্রথমে সোভিয়েত সরকারের সহিত মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, কিন্তু একটি তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে তিনি তুর্কিস্তানে চূড়ান্ত বিদ্রোহমূলক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। ১৯২২ সালের ৪ আগস্ট তিনি পূর্ব বুখারায় একটি ক্ষুদ্র লড়াইয়ে জড়াইয়া পড়েন (তুর্কী বিপ্লবী দলের সদস্যদের ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত বিচারানুষ্ঠানে তাঁহার সহকর্মী ডঃ নাজিম তুর্কীবাদের একজন মহান শহীদ হিসাবে তাঁহাকে অভিহিত করেন। তু. Castagne, Les basmatchis, প্যারিস সাংস্কৃতিক আন্দোলন। তূরানীয় আন্দোলনের পুরাতন নেতৃবৃন্দ আনগোরার সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন (কবি মুহাম্মাদ য়ামীর এবং আকচুরা ওগলু ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে আনগোরায় উপস্থিত হন)। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সংগঠন Turkish Hearths (turk odjaklari) হামদুল্লাহ সুবহীর নেতৃত্বে ১৯২৪ সালের ২৩ এপ্রিল হইতে আনগোরায় কার্যক্রম শুরু করেন। ১৯২৬ সালের ২৮ মার্চ আনগোরাতে তাহাদের প্রথম kurultai অনুষ্ঠিত হয়। য়ূসুফ আকচুরা ১৯২৮ খৃ. ইস্তাম্বুলে বার্ষিক তুরকয়ীলা (তুর্কী বৎসর) নামক বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বিদেশে অবস্থানরত তুর্কীদের কার্যাবলীর সারসংক্ষেপসহ নিবন্ধ লেখা হয়। খৃ. ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের ফলে দেশত্যাগকারী নূতন অভিবাসনকারীদের স্রোতের মত আগমনের ঢেউ তুরস্কের উপর আছড়াইয়া পড়ে। সোভিয়েত সরকার তুরস্কের পুরাতন জাতীয়তাবাদী সরকারের সমর্থকদের উৎখাত করিয়া Yeni Kafkasiya (১৯২৪ খৃ.) রিভিউ পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে odluyurt 'অগ্নিদেশ' (আযারবায়জান) Yeni Kafkasiya-এর স্থলাভিষিক্ত হয়। তুর্কী সংহতির এই সকল মত প্রকাশের মাধ্যম স্থানীয় তুর্কী সংবাদপত্রের সহিত কোন যোগসূত্র স্থাপন করে নাই।

১৯১৭ খৃস্টাব্দের বিপ্লবের পর রুশ সাম্রাজ্যে তুর্কীদের অবস্থা তাহারা সম্যক অনুধাবন করে এবং এই অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাহারা এমন কি নিজস্ব সভ্যতা ও স্বশাসনের পুরাতন কর্মসূচির বাহিরে গিয়াও প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিবর্তনের পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের তুর্কীগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সোভিয়েত বিপ্লবের সকল পর্যায়ের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এই সময়ে (১৯৩০ খৃ.) সুনির্দিষ্টভাবে সাধারণ বিষয়ের ফলাফল পৃথকীকরণ করা এবং মূল তুর্কী জনগণের প্রবণতা কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিন্দু অভিমুখে ধাবমান তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।

১৯২৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি হইতে ৬ মার্চ বাকূতে অনুষ্ঠিত প্রথম তুর্কলজিক্যাল কংগ্রেস (Turcological congress)-এ (এই কংগ্রেস

তুরস্ক হইতে ২ জনসহ সোভিয়েত যোগাযোগ এবং আলোচনার প্রভূত উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় (১৯২৬ সালে বাকূতে রুশ ভাষায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দ্র. এবং Der Islam, ১৯১৮ মেনযেলের বিস্তারিত বিশ্লেষণ) রোমান বর্ণমালাকে (১৯২৮ খৃ. হইতে বাধ্যতামূলক ছিল) ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে এই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তুর্কী নূতন বর্ণমালা প্রবর্তনের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করে (১৯২৮ খৃ.) (তু. H. Duda, Die neu Lateinechrift in d. Turkei, O. L. Z., জুন ১৯২৯, কলাম ৪৪১-৪৫৩; E. Rocsi, II nuovo alfabeto, Oriente Moderno, জানুয়ারি ১৯২৯, পৃ. ৩৩-৪৮)।

নিখিল তুর্কী আন্দোলন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। তুর্কীবাদের প্রধান কেন্দ্র আনগোরার সাংস্কৃতিক আকর্ষণ ছিল বৈধ এবং অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আনগোরা (আন্‌কারা) এখন একটি সাধারণ রাজধানী, যাহা প্রাচীন ইস্তাম্বুলে ইসলামী মর্যাদা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। ইহার প্রভাবের তীব্রতা প্রধানত তুর্কী সাংস্কৃতিক (হারছ) গুণগত মানের উপর নির্ভর করে এবং যাহা সেইখানে ক্রমান্বয়ে উন্নত হইবে। দিয়া গোকআল্প-এর ধারণানুযায়ী ওগুয বংশীয় তুর্কীগণকে একই সংস্কৃতির অধীনে আনয়ন করা সহজ নয়, কারণ যেমন তুরস্কের অতি নিকট প্রতিবেশী ইরানী তুর্কীগণ ইরানের সংস্কৃতির প্রভাবাধীন এবং তাহাদের এই সংস্কৃতি অটলভাবে টিকিয়া থাকা একটি ঐতিহাসিক সত্য। তুর্কী জনগণের রাজনৈতিক ঐক্যের ব্যাপারে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার তথ্য অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। তাহাদের বাসভূমি ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং কাস্পিয়ান সাগর ও মরু অঞ্চল দ্বারা তাহা ছিল বিচ্ছিন্ন। ট্রান্সককেশিয়ার একদিকে জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া এবং অপরদিকে ইরানের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ভূখণ্ডটি (করিডোর) ছিল খুবই সংকীর্ণ এবং ইহার কোন গুরুত্বই থাকে না যতক্ষণ পর্যন্ত ট্রান্সককেশিয়া ও ইরানে যুগপৎভাবে একটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অবস্থার সৃষ্টি না হয়, যাহার অবস্থান সহজ ও সরল তুর্কীবাদের কর্মসূচির বাহিরে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আক-চুরা ওগলু, উচতারয সিয়াসেত, in the Journal Turk, কায়রো (১৩২৭ হি, ইস্তাম্বুলে পুনঃমুদ্রিত); (২) Omer Seyfeddin, Yarinki Turan dewleti, ইস্তাম্বুল ১৩৩০ হি.; (৩) Martin Hartmann, Chinesisch-Turkestan, Halle ১৯০৮ খৃ., স্থা.; (৪) ঐ লেখক, Unpolitische Briefe aus d. Turkei, লাইপযিগ ১৯১০ খৃ., স্থা.; (৫) ঐ লেখক, d. neueren Osman. Dichtung M. S. O. S., ১৯খ. (১৯১৬ খৃ.), পৃ. ১২৪-১৭৯; (৬) ২০খ, (১৯১৭ খৃ.), পৃ. ৮৬-১৪৯; (৭) ২১খ. (১৯১৮ খৃ.), পৃ. ১-৮২; (৮) ১০খ. (-তাকীযাদে), Les courants olitiques en Turquje. R. M. M., ২১খ, ১৯১২ খৃ., ১৫৮-২২২; (৯) ঐ লেখক, Le panislamisme et le pantouranisme, R. M. M.,1 ২২খ, ১৯১৩ খৃ., পৃ. ১৭৯-২২১; (১০) Tekin Alp (Moses Kohen.), Turkismus un Panturkismus, Weimar, ১৯১৫ খৃ.; (১১) Lothrop Stoddld, Panturanism, The Amer, Polit, Science Review, ১৯১৭ খৃ., ১১খ, ১২-২৩; (১২) A manual on the Turanians and Pan-turanianism compiled by the Geogr. Section of the Naval intelligence Division, Naval Staff Admiralty, London 1917 (Samoyed এবং Finno Ugrian উপজাতিসহ তূরানীয় জনগণের একটি আদমশুমারি); (১৩) Muhammedan history. No, 57 of the Handbooks prepared under the direction of the historical section of the Foreign Offce, লন্ডন ১৯২০ খৃ. (Contains the chapter The rise of the Turks and the pan-Turanian movement) [Peace Conference উপলক্ষে এই দুই খণ্ডের তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে]; (১৪) আহমাদ মুহয়িদ-দীন, Die Kulturbewegung im modernen Turken tum, লাইপযিগ ১৯২১ খৃ.; (১৫) আহমেদ য়ামীন, The development of Modern Turkey as measured by its press, নিউইয়র্ক ১৯২৪ খৃ.; (১৬) Ziya Gok Alp, Turko-uluyun esaslari, আনগোরা ১৩৩৯/১৯২৩, (excellent resume by R. Hartmann, Grundlagen des turk. Nationalismus, O. L. Z.,1 ১৯২৫ খৃ., নং ৯-১০, কলাম ৫৭৮-৬১০ এবং E. Rossi, কর্তৃক Orient Moderno. ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৫৭৪-৫৯৫]; (১৭) Zarevand, Turtsiya i. Panturanism, প্যারিস ১৯৩০ খৃ. (রুশ ভাষায়, আর্মেনীয় দৃষ্টিকোণ হইতে, য়ুরোপীয় গ্রন্থপঞ্জী)।

V. Minorsky (E. I. [1])/আবু মুহম্মদ

তূরান (طوران) ঃ [অথবা তাওয়ারান?], বালুচিস্তানের একটি জিলার প্রাচীন নাম। তাবারী (১খ, পৃ. ৮২০), অনুযায়ী তরান ও মাকরান (মুকরান)-এর বাদশাহগণ সাসানী আরদাশীর (২২৪-২৪১ হি.)-এর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। পাইকুলী শিলালিপিতে কেবল মাকুরান শাহের উল্লেখ আছে। Herzfeld, (পাইকুলি, Paikuli, পৃ. ৩৮) মনে করেন যে, এই রাজকুমারগণ প্রথমে সাকাসমূহের সার্বভৌম কর্তৃত্ব অর্জন করেন এবং আরদাশীরের নিকট তাহাদের বশ্যতা স্বীকার ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এই বাদশাহ কর্তৃক সাকাস্তান (সীস্তান) বিজয়ের ফল।

বালাযুরী তাঁহার গ্রন্থে আত-তূরানের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার কোন একটি সূত্রমতে হাজ্জাজ [দ্র.] সাঈদ ইব্‌ন আসলামকে মুকরানে এবং সীমান্ত অঞ্চলে নিয়োগ করেন। ইসতাখরী (পৃ. ১৭১) এবং ইব্‌ন হাওকাল তূরানের জনবসতির মধ্যে মাহালী (?), কায় কানান, সূরা (শূরা) ও কুসদার (অথবা কুযদার)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন হাওকালের (পৃ. ২৩২) মতে তূরান একটি উপত্যকা। এইখানে আত-তূরান নামে অভিহিত প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি শহর (কাসাবা) আছে এবং একজন অজ্ঞ বাসরীয়ের অধীনে এই শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি দুর্গ (হিসন) আছে। ইবন হাওকাল (পৃ. ২৩২-২৩৩) এই নামের কাসাবা হইতে পৃথকভাবে কুযদারের উল্লেখ করিয়াছেন। কুযদার তূরানের অন্তর্গত একটি শহর (বাণিজ্যিক?)। ইহার মধ্যে একটি জিলা ও আরও কয়েকটি শহর ছিল। জনৈক মুগীর (বা মুঈন ইবন আহমাদ) মুযদার অধিকার করেন এবং কেবল আব্বাসী খলীফার কর্তৃত্বকে স্বীকার করিয়া লন।

ইদরীসীর (২খ., পৃ. ১৬৬, ১৭৭) গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণ এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ মাকরানে অবস্থিত অঞ্চলকে তিনি আত-তূবারান নাম দিয়াছেন, ইবন খুররাদাযবিহ, (পৃ. ৫৫) ইহাকে আত-তাবারান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন [সারবায নামে অভিহিত এবং গোয়াততারের নিকটে সমুদ্রে পতিত নদীর তীরে ফাহ্‌রাজের দক্ষিণ-পূর্বে দশ ফারসাখ দূরে]। কিন্তু তারপরও তিনি এই তূরারানের সহিত কুযদার ও কীযকানানকে (তূরান জিলার শহরসমূহ) সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি তূরানকে মাসতুমজের দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকে কুযদার হইতে ৪ দিনের পথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কুযদারের অবস্থান জানা থাকায় (৪০৫০ ফুট

উচ্চতায় কালাতের ৮৫ মাইল দক্ষিণে, তু. বালুচিস্তান নিবন্ধ), তূরান (শহরটি) অবশ্যই কালাতে অবস্থিত হইবে।

কুযদার হইতে ৫ ফারসাখ (আরও নিখুঁতভাবে ৫ মারহাল) দূরে কানদাবিল শহরটি তূরানের বাহিরে অবস্থিত এবং ইহা বুদ্হাস জিলার রাজধানী (বালাযুরী, পৃ. ৪৩৬; যুততুল-বুদহা)। সমভূমিতে অবস্থিত কানদাবিলকে গানদাওয়া-র সহিত চিহ্নিত করা হইয়াছে। গানদাওয়া সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩১৪ ফুট উচ্চতায় সিন্ধুনদের উত্তরে খোযদারের ৭৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত মুঈন ইবন আহমাদ (ইসতাখরীর মতে তূরানের অথবা ইব্ন হাওকালের মতে কুযদারের প্রধান)-এর বাসস্থান কীযকানানের অবস্থান অজ্ঞাত। Marquart (পূ. গ্র., পৃ. ১৯২, ২৭৫-২৭৬) কীযকানানকে কীকানের (তু. বালাযুরী, পৃ. ৪৩২) সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন এবং কালাতে ইহার সন্ধান করিয়াছেন। তাহা হইলে কীযকানান ও কাসাবা আত-তূরান একই অঞ্চল। বুদহান-এর বসতি ও তাহাদের দ্রাক্ষাকুঞ্জ কীযকানান ও কানদাবীলের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত, যাহার প্রধান হইলেন আয়ল [অথবা উতল (?)]-যাঁহার নামানুসারে এলাকার নামকরণ হইয়াছে।

য়াকূত (৩খ, ৫৫৭) সিন্ধু প্রদেশের নাহিয়ার মধ্যে তূরান অবস্থিত বলিয়া মনে করেন (তূরান হইল কুসদারের কাসাবা এবং ইহার কয়েকটি রুসতাক রহিয়াছে)। তিনি মাদাইনে তূরানের একটি নাহিয়া ও হারাতের একটি গ্রামকে তূরানের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আরবগণ তূরান শব্দটি ইহার আদ্যাক্ষর ত (ط) দ্বারা লিখিয়া থাকেন, যাহা স্থানীয় মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণের অনুরূপ। নীতিগতভাবে তূরান শব্দের সহিত তূরানের সম্পর্কে আপত্তির কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু নামের সাদৃশ্য বর্ণনার বাহিরে যাওয়া অবিজ্ঞজনোচিত হইবে। তূরান ও তাবারানের সহিত তূরানকে সংযুক্ত করিলে এই সম্পর্ক তবুও দুর্বল থাকিয়া যাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Towaschek, Azur hist. Toogr. Persiens, ১খ, ৫৬, মনে করেন যে, তূরান সম্ভবত ইরানী তূরা হইতে উদ্ভূত। তূরা অর্থ শত্রু, অ-ইরানী দেশসমূহ; (২) Marquart, Eransahr, ৩১-৩৩, ১৮৭, ১৯০; (৩) Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphates, পৃ. ৩৩২; (৪) Husing, Volkerschichten in Iran, Mitt, d. Anthrop, Gesell, Wien, ৪৬খ., ২০০, প্রকৃত তূরানকে তুর্কিস্তানে নয়, বরং কুসদারের তূরানে সন্ধান করিয়াছেন (বর্তমান কালের ব্রাহুই সম্প্রদায়ের বংশধরগণ কুসদারে বসবাস করিত)।

V. Minorsky (E. I. [1])/আবু মুহম্মদ

তূরান শাহ ইব্ন আয়্যূব (توران شاه بن ايوب) ঃ আল-মালিকুল-মুআজ্জাম শামসুদ্-দাওলা ফাখরুদ-দীন, য়ামানে আয়্যূবী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৫৬৯ হি. রাজাব (ফেব্রুয়ারী ১১৭৪ খৃ.) মাসের প্রথম দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শেষ ফাতিমী আদিদের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে সালাহুদ-দীনকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহারা এবং যাংগী আতাবেগ নূরুদ-দীন মাহমূদের মধ্যকার সামন্ত প্রজা এবং শাসনকর্তার সম্পর্ক অস্বাভাবিক হইয়া উঠে এবং যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনাইয়া আসে। সালাহুদ-দীনের সহিত যুদ্ধরত জেরুসালেমের রাজা আমালরিচ তখনও পরাভূত হন নাই। কেরাক ও শাওবাক দ্র.-এর ক্রুসেডারগণ মিসর পর্যন্ত সড়কসমূহে লোকদের হয়রান করিতেছিল। সালাহুদ-দীন এমন সময় য়ামান অভিযান শুরু করিবেন ইহা আশ্চর্য লাগে। এই অভিযানের কারণস্বরূপ যে ধর্মীয় অজুহাত দেওয়া হইয়াছে (যেমন যাবীদ হইতে শীঈ বানূ কারাম এবং খারিজী মাহদীর [দ্র.] বিতাড়ন) তাহাতে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তাহাদিগকে আদান (Aden) হইতে ফাতিমী শাসন কাঠামোতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিগমবদ্ধ করা হয়। ইহা সালাহুদ-দীনের দূরদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য যে, কোন জরুরী অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করিতে পারেন এমন একটি প্রদেশকে স্বীয় অধিকারে রাখিবার অভিলাষী হন। যুদ্ধের সাধারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইহার নির্দেশ করে যে, তাঁহার অভিলাষিত নিরাপদ প্রদেশ কেবলমাত্র দক্ষিণেই পাওয়া সম্ভব যেইখানে একমাত্র তাঁহার সেনাদল নিয়োগ করা যাইতে পারে। কারণ তিনি যদি নূরুদ-দীনের সহিত একটি খোলাখুলি বিরোধ পরিহার করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে আপাতত তাহাদের মধ্যে নিরাপত্তার উপায় হিসাবে জেরুসালেমে জার্মান জাতির শাসনকে থাকিতে দেওয়া সর্বোত্তম হইবে। কেবলমাত্র এক বৎসর পূর্বে তাঁহার পাঁচ ভ্রাতার একজন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ তূরান শাহকে নুবিয়াতে প্রেরণ করেন।

শেষ ফাতিমী শাসকের মৃত্যুর সহিত তূরান শাহের নাম জড়িত করিয়া একটি গুজব প্রচলিত ছিল। কিন্তু তূরান শাহ নুবিয়া দখলে কোন সমস্যা আছে বলিয়া মনে করেন নাই এবং অল্পায়াসে তাহা অধিকার করেন। পবিত্র নগরীসমূহ এবং মিসরের মধ্যে স্থাপিত পুরাতন সম্পর্ক এখন উত্তর দিকের প্রবেশদ্বার আরব উপদ্বীপের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই উত্তর দিকে অবস্থিত আইলা [দ্র.] বন্দর ইতোমধ্যে ৫৬৬/১১৭১ সালে অধিকৃত হয়। তূরান শাহকে অতঃপর য়ামানে প্রেরণ করা হয়, তিনি ৫৬৯ হি. শাওয়াল মাসে (মে ১১৭৪ খৃ.) যাবীদ এবং একই বৎসরে আদান দখল করেন, পরবর্তী বৎসরে হামদানী আলী ইব্ন হাতিমুল-ওয়াহীদকে সানআ হইতে বিতাড়ন করেন। সানআর হামদানী শাসকের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সা'দার যায়দী ইমাম আহমাদ ইব্ন সুলায়মানের বারংবার আক্রমণের ফলে দুর্বল করিয়া দেওয়া হয়। যে দেশে তুষারপাত হয় না এবং তাঁহার প্রিয় ফলাদি পাওয়া যায় না সে স্থানকে তূরান শাহ আরামপ্রদ মনে করিতেন না। তাহার ভ্রাতার নিকট জরুরী অনুরোধের ফলে তিনি ৫৭১ হি. সিরিয়াতে বদলীর সুযোগ পান, যাহা ইতিমধ্যে নূরুদ-দীনের মৃত্যুর প্রেক্ষিতে সালাহুদ-দীনের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে দামিশকে তিন বৎসর অতিবাহিত করিবার পর তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে আলেকজান্দ্রিয়াতে বদলী করেন। সেইখানে তিনি ১ সাফার, ৫৭৬ হি. (২৭ জুন, ১১৮০ খৃ.)-তে ইনতিকাল করেন।

তূরান শাহের কর্মজীবনের উন্নতি গুরুত্বহীন নয় তবে ইহার মূলে ছিল সালাহুদ-দীনের কর্মপ্রেরণা। তূরান শাহ এমন একজন মানুষই ছিলেন যিনি জীবন বেশি উপভোগ করিয়াছেন। এমনকি তিনি মিসরে অবস্থানের সময় প্রচুর পরিমাণ সম্পদ আহরণ করেন। নুবিয়া অভিযান হইতে তিনি খৃস্টীয় গির্জার বিশপসহ বহু দাস লইয়া আসিয়াছিলেন; য়ামান অভিযানের পূর্বে তাঁহাকে বা'লাবেকে সুবৃহৎ প্রাচীন পারিবারিক জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল। য়ামানেও তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে সমৃদ্ধ ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। য়ামান ছাড়িয়া আসিবার সময় তাঁহার এইরূপ দুশ্চিন্তা ছিল যে, তাঁহার প্রতিনিধি তাঁহাকে রাজস্ব প্রেরণ করে কি না। এই ব্যক্তি তাঁহার এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও দুই লক্ষ দীনার দেনা রাখিয়া যান যাহা তাঁহার ভ্রাতা পরিশোধ করেন। তূরান শাহের সিরিয়ার প্রতি অতি মাত্রায় দুর্বলতা ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মরদেহ তাহার ভগ্নী সিতুত্তুশ-শাম যুমুররুদ

সিরিয়ায় লইয়া যান এবং দামিশকে তিনি (যুমুররুদ) যে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করেন।

য়ামানের জন্য আয়্যূবী বিজয় একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য ছিল। য়ামানের ৩টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যুক্ত ও একত্র হইয়া একটি বড় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই দখল সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হয়। ইহা সত্য যে, শেষ হামদানী শাসক উচ্চভূমিতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন, কিন্তু শেষ মাহদী আবদুন-নাবী ও তাঁহার দুই ভ্রাতা এবং কারামের শেষ প্রকৃত শাসক ও পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক য়াসির-সকলকে তাহাদের আত্মসমর্পণের পর তূরান শাহের আদেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই বিজয়ের পর এত শীঘ্র তাঁহার য়ামান ত্যাগের ফলে বিজিত এলাকাকে একত্র করিয়া রাখিবার পরিকল্পনা সম্পাদন করা যায় নাই। তৎক্ষণাৎ বিপজ্জনক বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। সালাহুদ-দীন তখন তাঁহার অন্য ভ্রাতা তুগতেগীন সায়ফুল-ইসলামকে প্রেরণ করেন এবং তিনি সেইখানে ৫৭৮ হইতে ৫৯৩ হি. (১১৮২-১১৯৬ খৃ.) পর্যন্ত অবস্থান করিয়া আয়্যূবী শাসনকে বাস্তবতায় পরিণত করেন। তাহার পর তাঁহার পুত্র মু'ইয্যুদ-দীন ইসমাঈল ৫৯৮/১২০১ পর্যন্ত এবং আন-নাসির আয়্যূব ৬১১/১২১৪ পর্যন্ত সেইখানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন; কিন্তু উভয়ে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

৬১২/১২১৫-তে এই পরিবারের প্রধান, সালাহুদ-দীনের ভ্রাতা আল-আদিল সায়ফুল ইসলাম আবূ বাক্‌র তাঁহার কনিষ্ঠ পৌত্র আল-মাসঊদ য়ূসুফকে সেইখানে প্রেরণ করেন। এই নিয়োগের কিছুকাল পূর্বে পারিবারিক নিয়মানুবর্তিতার এই ক্রমাগত অবক্ষয়ের ফল এই দাঁড়ায় যে, নাসিরের ভ্রাতার অনুরোধে সালাহুদ-দীনের ভ্রাতার প্রপৌত্র নূরুদ-দীন শাহানশাহ (যিনি আল-মুজাফ্‌ফার নামে অভিহিত)-কে আহ্বান করা হয় যাহাতে তিনি নিজকে য়ামানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি একদল সূফীর সহিত নিজেকে একজন সূফী হিসাবে জাহির করিতে থাকেন। তূরান শাহের সহিত বানূ রাসূল পরিবারের পাঁচ ভ্রাতা এই দেশে আগমন করেন এবং শীঘ্রই অপরিহার্য পারিষদ ও ধনশালী ভূম্যাধিকারী হিসাবে প্রভূত পরিমাণ গুরুত্ব অর্জন করেন। সুলায়মান এবং য়ূসুফের মধ্যকার বিবাদে আলী ইব্‌ন রাসূল য়ূসুফের পক্ষে বিজয় ঘটাতে সাহায্য করেন, তাঁহার নামে হিজায জয় করেন এবং ৬১৯/১২২২ সালে মক্কার ওয়ালী নিযুক্ত হন। ৬২৬/১২২৮ সনে দুর্বল শাসক য়ূসুফের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উমার আল-মানসূর নাম ধারণ করিয়া রাসূলী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশ একটি স্থানীয় য়ামানী রাজবংশ হিসাবে দুই শতাব্দীর উপর দেশটি শাসন করেন। অথচ আয়্যূবী বিদেশী শাসন মাত্র অর্ধ শতাব্দী কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল-আছীর (সম্পা. Tornberg), ৯খ, ২৬০ প., দ্র. নির্ঘণ্ট; (২) ইবন খাল্লিকান, বূলাক ১২৯৯ হি., ১খ, ১২৩ প. (in de Slane, ২খ, ২৮৪); (৩) খাযরাজী, আল-উকূদুল-লুলুঈয়া, G. M. S., ৩খ.), ৪খ, ২৬প.; (৪) Lane-Poole, The Mohammedan Dynasties, ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৯৮; (৫) Von Zambaur, Manuel de genealogie et de Chronologie, হ্যানোভার ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৯৮।

R. Strothmann (E. I.[1])/আবু মুহম্মদ

তূলূনী বংশ (طولونى) ঃ মিসরের প্রথম স্বাধীন মুসলিম গভর্নর ও শাসক বংশের নাম। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ ইবন তূলূন [দ্র.] মিসরের জায়গীরদার তুর্কী সেনাপতি বায়াকবাক-এর সহকারী হিসাবে ২৩ রামাদান, ২৫৪/১৫ সেপ্টেম্বর, ৮৬৮ সালে ফুসতাতে প্রবেশ করেন এবং পরবর্তী দশ বৎসরের মধ্যে মিসর ও সিরিয়াকে খিলাফত হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার শাসনাধীনে একীভূত করিতে সক্ষম হন। তিনি ১০ যুল-কা'দা, ২৭০/১০ মে, ৮৮৪ সালে তাঁহার পুত্র খুমারাওয়ায়হ [দ্র.]-কে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া ইনতিকাল করেন। খুমারাওয়ায়হ কৃতিত্বের সহিত বার বৎসর রাজ্য শাসনের পর ১৭ যুল-হিজ্জা, ২৮২/৭ ফেব্রুয়ারী, ৮৯৬ সালে দামিশকে নিহত হন। ইহার পর সেনাবাহিনীর কমাণ্ডারগণ খুমারাওয়ায়হ-এর দুই অল্পবয়স্ক পুত্রকে পরপর সিংহাসনের বসান। জ্যেষ্ঠ পুত্র জায়শ ভ্রাতা হারূনের অনুকূলে ১০ জুমাদা (২), ২৮৩/২৬ জুলাই, ৮৯৬-এ সিংহাসনচ্যুত হয়। ১৯ সাফার, ২৯১/১ জানুয়ারি, ৯০৫-এ হারূনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে এই বংশের শাসনের সমাপ্তি ঘটে, যদিও তাঁহার চাচা শায়বান ইব্‌ন আহমাদ আরও ১২ দিনের জন্য মিসরের আমীর হিসাবে স্থানীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

তূলূনীদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং আব্বাসী খলীফাদের সহিত তাহাদের সম্পর্কের বিষয়টি আহমাদ ইবন তূলূন ও খুমারাওয়ায়হ শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটিতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। খলীফা মু'তাদিদের খিলাফাত লাভের (২৭৯/৮৯২) পর সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী মিসর, সিরিয়া, সাইলিসিয়া ও মেসোপটেমিয়া (মাওসিল ব্যতীত) ত্রিশ বৎসরের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ দীনার রাজস্বের বিনিময়ে খুমারাওয়ায়হ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে প্রদান করা হয় (উল্লেখ্য যে, পূর্বে সমপরিমাণ অর্থ একমাত্র মিসরের জন্যই আহমাদ ইবন তূলূন খলীফা মু'তামিদকে প্রদান করিতেন)। এই চুক্তিটিই এই বংশের ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারক ছিল। পরবর্তী কালে তাঁহারা দুর্বল হইয়া পড়িলে ২৮৬/৮৯৯ সনে চুক্তিটির শর্তাবলী সংশোধন করা হয়, যাহার ফলে তাঁহাদের শাসনক্ষমতা মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে সীমিত হইয়া পড়ে এবং বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার দীনারে উন্নীত হয়। সিরিয়ায় কারমাতী বিদ্রোহের মুখে তাঁহাদের প্রশাসন ভাঙ্গিয়া পড়িলে খোদ সিরীয়দের উস্কানিতে (তাবারী অনুসারে, ৩খ, ২২২২) ২৮৯ হি. দামিশকে রাজকীয় সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সুযোগ ঘটে। সেইখান হইতে বিজয়ী সেনাপতি মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মান তারসুসের নৌবহরের সহায়তায় মিসরে স্থল ও নৌবাহিনীর এক যৌথ আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং অপেক্ষাকৃত কম প্রতিরোধ মুকাবিলা করিয়া ২ রাবী' (১), ২৯২/১২ জানুয়ারি, ৯০৫ সালে ফুসতাত অধিকার করেন। অতঃপর নগরীতে লুণ্ঠনকার্য ও উহার অধিবাসীদের প্রতি নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়, আহমাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আল-কাতাই'-র সামরিক শহরতলী ধূলিসাৎ করিয়া দেওয়া হয় এবং তূলূন পরিবারের জীবিত পুরুষদিগকে আটক করিয়া বাগদাদে আনয়ন করা হয় এবং সেইখানে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

তূলূনী বংশের ক্ষমতা আহমাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। তুর্কী, গ্রীক ও সূদানী ক্রীতদাস এবং সম্ভবত গ্রীক ভাড়াটিয়া সৈন্যরা উক্ত সেনাবাহিনীর মূল ছিল। স্থানীয়ভাবে নিযুক্তদেরসহ সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা এক লক্ষের অধিক ছিল। নিয়মিত সৈন্যদের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলাবিধি পালন করা হইত এবং সম্ভবত প্রত্যেক কোর-এ উক্ত বিধি একজন করিয়া প্রভোস্ট-মার্শাল বলবৎ করিত। য়া'কূবী (২খ, ৬২৪)-র মতানুসারে, ২৫৮ হি. সকল সৈন্যকে আহমাদের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় হইতেই আল-কাতাই' এবং মিসরের অন্যান্য সামরিক স্থাপনাসমূহের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ২৬৪ হি. সিরিয়া বিজয়ের ফলে

শুধুমাত্র নূতন সামরিক বাহিনীই নহে, বরং ভূতপূর্ব তুর্কী গভর্নরদের ব্যক্তিগত সৈন্য ও তাঁহার সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁহার সহিত শুধুমাত্র একটি দুর্বল বন্ধনে আবদ্ধ এইরূপ একটি বিভিন্নধর্মী সেনাবাহিনীর উপর তাঁহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাঁহাকে অনেকখানি চাপ সহ্য করিতে হইত। তাঁহার পুত্র আল-আব্বাসের বিদ্রোহ (২৬৫-২৬৮ হি.) যাহা বাস্তবে তাঁহার নিজেরই কিছু সংখ্যক অফিসারের বিদ্রোহ ছিল এবং তারপর লু'লু'-র তাঁহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদ তাঁহার অবস্থানের স্থিতিশীলতার প্রতি মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করে—যে হুমকি হইতে তিনি ইনতিকালের সময় পর্যন্ত কদাচিৎ নিজেকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন।

এই ধরনের অশুভ সূচনার পরও খুমারাওয়ায়হ-এর বক্তিগত সাহসিকতার দরুন সাময়িকভাবে ভাঙ্গনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয় এবং মধ্য এশিয়া হইতে নূতন নিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। এতদসত্ত্বেও খুমারাওয়ায়হ প্রধানত বিপুল অর্থ ব্যয় এবং আহমাদ কর্তৃক প্রবর্তিত কঠোর বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিলতা দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হন। তাঁহার শাসনামলে সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯ লক্ষ দীনার। তদুপরি তাঁহার মাত্রাতিরিক্ত অপচয়ের কারণে রাজকোষ প্রায় শূন্য হইয়া পড়ে। ফলে জায়শ (দ্র.)-এর ক্ষমতালাভের সময়ই সেনাবাহিনীর একাংশ তাঁহার অর্থাভাবের কারণে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে অসম্মতি জানায়। জায়শের চরম অযোগ্যতার ফলেও প্রধান তুর্কী জেনারেলগণ তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা বাগদাদে পলায়ন করেন। সেইখানে তাহাদিগকে খলীফা মু'তাদিদ রাজকীয় সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন।

হারূনের শাসনামলে কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনীর উপর প্রায় সমস্ত সরাসরি নিয়ন্ত্রণই হারাইয়া ফেলে—এই সেনাবাহিনীর মধ্যে তখন গ্রীক উপাদানই ছিল সর্বপ্রধান। মিসরে, প্রধান প্রধান সেনানায়কগণ-বদর, সাফী ও ফাইক-প্রত্যেকেই সেনাবাহিনীর একেকটি অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাষ্ট্রীয় রাজস্ব দ্বারা তাহাদের ব্যয়ভার মিটানো হইতে থাকে। সিরিয়ায় সেনাপতি তুগ্জ ইবন জুফ্ফ্ (ভাবী ইখশীদ-এর পিতা) প্রকৃতপক্ষে দামিশকে স্বাধীন নৃপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কারমাতী বিদ্রোহের সময় সিরিয়ায় মিসরীয় সৈন্যদের শোচনীয় পরাজয়ের মূলে ছিল জেনারেলদের পারস্পরিক বিরোধিতা, যাহা আবার তূলূনীর সম্পদকে আরও নষ্ট করিয়া দেয়। তূলূনী বংশের সদস্যদের মধ্যকার বিরোধিতা এবং হারূন ও তাঁহার আমীরদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা তূলূনী বংশের পতন ত্বরান্বিত করে। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মানের দামিশ্ক উপস্থিতির পর শুধু তুগজই নহে, বরং বদর এবং ফাইক ও তাহাদের সকল সৈন্যসহ তাঁহার সহিত যোগদান করেন। অবশিষ্ট সৈন্যদের বৃহত্তর অংশটি প্রধানত তাহাদের বেতন প্রদানে হারূনের অক্ষমতার কারণেই ফুসতাত দখলের অভিযান কালে তূলূনীদের পক্ষ ত্যাগ করে।

সেনাবাহিনী গঠন ছাড়াও আহমাদ ইবন তূলূন নৌপ্রতিরক্ষা ও নৌঘাঁটি স্থাপনে এবং শক্তিশালী নৌবহর প্রতিষ্ঠায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার এই মনোযোগের কারণ অংশত সিরিয়ায় তাঁহার আধিপত্য বজায় রাখার মধ্যে নিহিত ছিল, যেখানে তিনি আল-আককায় একটি নৌঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন (দ্র. য়াকূত, মু'জাম, ৩খ, ৭০৭-৭০৮)। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ নৌবহর অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল, কিন্তু তিনশীসে উহা দমায়নার সেনাপতিত্বে পরিচালিত তারসূসের নৌবাহিনীর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যাহারা ছিল মুহাম্মাদ ইবন সুলায়মানের অভিযানের সঙ্গী।

মিসরীয় অর্থ প্রশাসনে আহমাদ ইবন তূলূন যে সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবরণ অনেকখানি অজ্ঞাত। সকল সূত্রেই এই তথ্যের উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাঁহার পূর্বসূরীদের আমলে খারাজ হইতে প্রাপ্ত যে রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ লক্ষ দীনার তাহা তাঁহার আমলে ৪৩ লক্ষ দীনারে বৃদ্ধি পায় এবং তিনি যে সঞ্চিত সম্পদ রাখিয়া যান তাহার পরিমাণ ছিল এক কোটি দীনার। খারাজ হইতে লব্ধ আয় ব্যতীত (আমীরগণ কর্তৃক তাহাদের সম্পত্তির জন্য প্রদত্ত রাজস্বও যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল), রাজকীয় ভূমির (আল-আমলাক) বার্ষিক রাজস্ব কোষাগারে জমা হইত। উক্ত ভূমি মিসরের জায়গীরদার আলোচ্য সময়ে খলীফা মুতাসিমের পুত্র ও উত্তরাধিকারী জাফার আল-মুফাওওয়াদ-এর নামে শাসিত হইত (P. E. R. F., No. 436)। ইহার তত্ত্বাবধানের জন্য প্রশাসনের একটি পৃথক দফতর নিয়োজিত ছিল (ইবন সাঈদ, ৬৭); সম্ভবত মুহাম্মাদের পুনর্বিজয় লাভের পর দীওয়ান ধ্বংসের কারণেই পরবর্তী লেখকদের পক্ষে বিস্তারিত তথ্য প্রদান অসম্ভব হইয়া পড়ে (মাকরীযী, ১খ, ৩২৫, ১২)। তবে ইহা স্বীকৃত যে, দেশের উপর অতিরিক্ত বোঝা না চাপাইয়া রাজস্বের বৃদ্ধির সঙ্গে অপব্যবহার সংশোধন, নিপীড়নমূলক শুল্ক আদায় রহিতকরণ এবং আমীর ও অর্থ কর্মকর্তাদের উপর কঠোর তদারকী প্রতিষ্ঠিত হয়। উপর্যুপরি প্লাবনের ফলে এবং সেই সঙ্গে যে অর্থ তখন বাগদাদে চলিয়া যাইত তাহা দেশের অভ্যন্তরেই ব্যয়িত হওয়ায় এইসব ব্যবস্থা প্রচুর সমৃদ্ধির সূচনা করে। কিছুটা অস্পষ্ট এক বর্ণনায় (ইবন সাঈদ, ৩৮) কোন কোন ক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধা সৃষ্টির ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তী কালে উহা পরিত্যক্ত হয়। একই সূত্রে (পৃ. ৬৭) আরও উক্ত হইয়াছে যে, আহমাদ তাঁহার শাসনকালের শেষ বৎসরগুলিতে একই ধরনের আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিত যে, মিসরীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য অনেকখানি প্রসার লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এতদসংক্রান্ত কোন উপাত্ত সংরক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয় না।

সম্ভবত খুমারাওয়ায়হ-এর শাসনামলে অর্থ প্রশাসনের অবনতি সূচিত হয়, তবে উহারও কোন বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নাই। তবে তাঁহার শাসনামলের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ বেপরোয়া অপচয় এবং আমীরদের প্রতি তাঁহার অতি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি হইতে এই অবনতি সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা হয়। উল্লেখ্য যে, তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে আমীরগণ তাহাদের ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাপনায় স্বাধীনতা ভোগ করিতে সক্ষম হয়, অর্থনৈতিক বিষয়ে আহমাদের দক্ষিণ হস্ত আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-ওয়াসিতীর অভাবও প্রশাসনের দক্ষতা ক্ষুণ্ন থাকিবে। খুমারাওয়ায়হ-এর ইনতিকালের সময় রাজকোষ ছিল সম্পূর্ণ শূন্য এবং বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব আমীরদের উপর অর্পিত হওয়ায় অর্থ ব্যবস্থায় নিঃসন্দেহে পরিচিত অপব্যবহারসমূহের পুনরাবির্ভাব ঘটে। শাসনকর্তা হারূন একজন শিশু মাত্র ছিলেন (ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র বাইশ বৎসর), ফলে শাসন কাজ পরিচালনার ভরার আবূ জা'ফার ইবন আবালীর হাতে ন্যস্ত হয়। তাঁহার সময় অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে এবং ২৯১ হি. নীল নদের এক বিরল নিম্ন প্রবাহের ফলে চূড়ান্ত বিপর্যয় নামিয়া আসে।

সাধারণ প্রশাসন ক্ষেত্রেও আহমাদের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। নথিপত্রাদির দফতর (দীওয়ানুল-ইনশা') খলীফার দরবারের দীওয়ানের অনুকরণে পুনর্গঠিত হয় এবং অভিযোগ

(মাজালিম) শ্রবণের জন্য নিয়মিত শাসকগণের বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। একটি প্যাপিরাস-দলীলে (P. E. R. F., No. 805) সম্ভবত উল্লেখ রহিয়াছে যে, ২৫৮ ও ২৬১ হি. সনের মধ্যে মিসরে এক সাধারণ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। য়াহূদী ও খৃস্টানগণ মোটের উপর কোন নির্যাতনের শিকার হয় নাই, বরং স্থানীয় মিসরীয় কর্মকর্তাদের প্রতি আহমাদের আনুকূল্য থাকার কারণে তাহারা সম্ভবত বিপুল পরিমাণে প্রশাসন বিভাগে নিয়োজিত ছিল। অপরদিকে আহমাদের শাসনামলে বিদ্রোহ ও ব্যক্তিগত যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রায়ই বিঘ্নিত হইত। সাঈদ-এর আলী পন্থিগণ বারবার গোলযোগ সৃষ্টি করিত। আহমাদ কর্তৃক তাহাদিগকে পাইকারীভাবে আল-মদীনায় বিতাড়িত করিয়াও ইহা বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। বদ্বীপের আরবগণ এতদূর অশান্ত ছিল যে, তাহাদিগকে তাহাদের প্রথাগত দস্যুবৃত্তি ও হিংস্রতা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য খুমারাওয়ায়হ (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আহমাদ ইবন মুদাবরির-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া) তাহাদের একদল মনোনীত যুবককে আল-মুখতারা নাম দিয়া নিজের দেহরক্ষী নিয়োগ করেন, বুহায়রার আরব ও বারবারদের লইয়া হারূনের বিদ্রোহী চাচা রাবীআর সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। এই সকল বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের জন্য আহমাদ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার জীবদ্দশায় পাইকারীভাবে হত্যা ছাড়াও তাঁহার ইনতিকালের সময় ১৮,০০০ ব্যক্তি কারাগারে বন্দী ছিল। প্রচুর দান-খয়রাত এবং ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মাধ্যমে তূলূনীরা ধর্মীয় শ্রেণীর সঙ্গে আপোস করার প্রয়াস পাইলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় শ্রেণীর সহিত টানাপড়েনের কারণে তূলূনীদের অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। তূলূনী ও খিলাফাতের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদের সময় ধর্মবিদগণ দৃশ্যত খিলাফাতের পক্ষাবলম্বন করেন এবং আহমাদ ও খুমারাওয়ায়হকে অবৈধ দখলদার হিসাবে চিহ্নিত করেন। আহমাদের প্রধান কাদী আবূ বাক্‌রা বাক্কার তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র আল-আব্বাসকে গোপনে সহায়তা করিতেন বলিয়া যে সন্দেহ আছে তাহা অমূলক নয়। আল-মুওয়াফফাকের বিরুদ্ধে ফাতওয়ায় স্বাক্ষরদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। এই দ্বন্দ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতের মধ্যে ইহাও একটি যে, মিসরের কাদীদের নামের তালিকায় ২৭০ হইতে ২৭৭ হি. পর্যন্ত ও ২৮৩ হইতে ২৮৮ হি. পর্যন্ত সময়ে কোন কাদীর নামের উল্লেখ নাই।

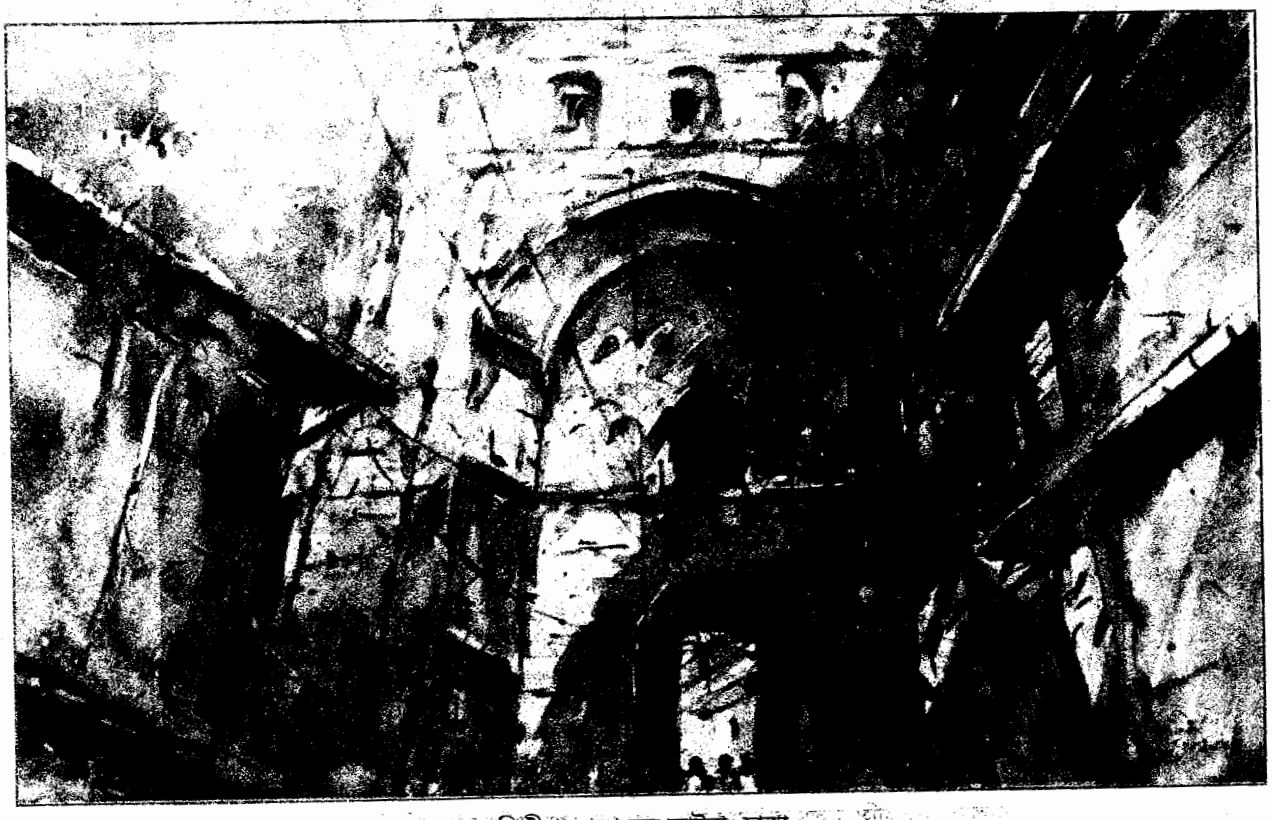
তূলূনীদের বেশির ভাগ গণপূর্ত কর্মই তাঁহাদের সামরিক নীতি ও নূতন শহর আল-কাতাই'-র প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ হয়। বিশাল সামরিক শিবিরের সৈন্য বা আম্‌র-মসজিদে ভিড় করিলে, ইবন তূলূনের নূতন মসজিদ নির্মিত হয়। এইরূপ অন্যান্য পূর্তকর্ম, যথা কৃত্রিম খাল খনন ও হাসপাতাল–উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সামরিক বিষয়ের সহিত কর্ম সম্পাদিত ছিল না, ২৭০ হি. ইবন তূলূন কর্তৃক মুআবিয়া (রা)-এর সমাধির সংস্কার সাধন ও ব্যয় বহনের ব্যবস্থা বাহ্যত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। খিলাফাতের বিরুদ্ধে, তাঁহার নিজপক্ষে মিসরের শী'আ বিরোধী ও মিসরীয়দের সহানুভূতি লাভ ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে অসাধারণ উদার শিক্ষার অধিকারী আহমাদ শিক্ষা ও শিল্পের একজন মস্ত বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহা মনে করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, তিনি মিসরে শিক্ষা বিস্তারে প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। খুব সম্ভব উশমুনায়ন-এর একটি মসজিদ-বিদ্যালয়ের দান সম্পর্কিত এক দলীলে তাঁহার কর্মকাণ্ডের কিছু বিবরণ সংরক্ষিত আছে (P. E. R. F., No. 773)। সঙ্গীত, চিত্রকলা, এমনকি ভাস্কর্যেও খুমারাওয়ায়হের আগ্রহ এবং সেই সময়কার সার্বিক বিলাসিতা-সবকিছু মিলিয়া স্থানীয় শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার উন্নয়নে তাঁহাদের অবদান রহিয়াছে। আল-কাতাই'-র বাজার সম্পর্কে মাকরীযী প্রদত্ত বিবরণও ইহার পরোক্ষ সাক্ষ্য বহন করে। সকল জ্ঞানী একনায়কের মতই আহমাদ ও তাঁহার পুত্রও বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও প্রচুর দান-খয়রাত দ্বারা শুধুমাত্র মানুষের মনোরঞ্জনের চেষ্টাই করেন নাই, বরং তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া এই বংশের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি এবং একই সঙ্গে রাজস্ব উৎপাদক হিসাবে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বিদেশী শাসন ও উহার ভিত্তি সামরিক হওয়া সত্ত্বেও তূলূনী যুগ মিসরীয় গণমানুষের বাস্তব সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির অন্যতম বিশিষ্ট যুগ হিসাবে চিহ্নিত। পরবর্তী কালে উহাই আবার স্বর্ণযুগরূপে অভিহিত হইয়াছে ; কানাত মিন গুরারিদ-দুওয়ালি ওয়া আয়্যামহুম মিন মাহাসিনিল-আয়্যাম (كانت من غرر الدول وايامهم من محاسن الايام) অর্থাৎ "তাহারা ছিল অতি উন্নত রাজবংশের অন্যতমরূপে পরিগণিত এবং তাহাদের যুগও ছিল পরম কল্যাণকর যুগের অন্যতম।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহমাদ ইবন তূলূন ও খুমারাওয়ায়হ শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি দ্র.; (২) আল-কিন্দী, Governors and Judges of Egypt (সম্পা. Rhuvon Guest), পৃ. ২১২-২৪৮, এবং পরিশিষ্টের পৃ. ৪৭৭-৪৮০; এবং (৩) W. Bjorkmann, Beitrage Zur Geschichte der Staatskanzlei im Islamischen Agypten (হামবুর্গ ১৯২৮ খৃ.), পৃ. ১৮, নুওয়ায়রীর বিশ্বকোষ (নিহায়াতুল-আরাব)-এর সংশ্লিষ্ট অংশ এখনও প্রকাশিত হয় নাই; (৪) তূলূনী যুগের মসজিদ ও অন্যান্য গণপূর্ত কর্মের জন্য দ্র. K. A. C Creswell, Early Muslim Architecture, ১ম খণ্ড।

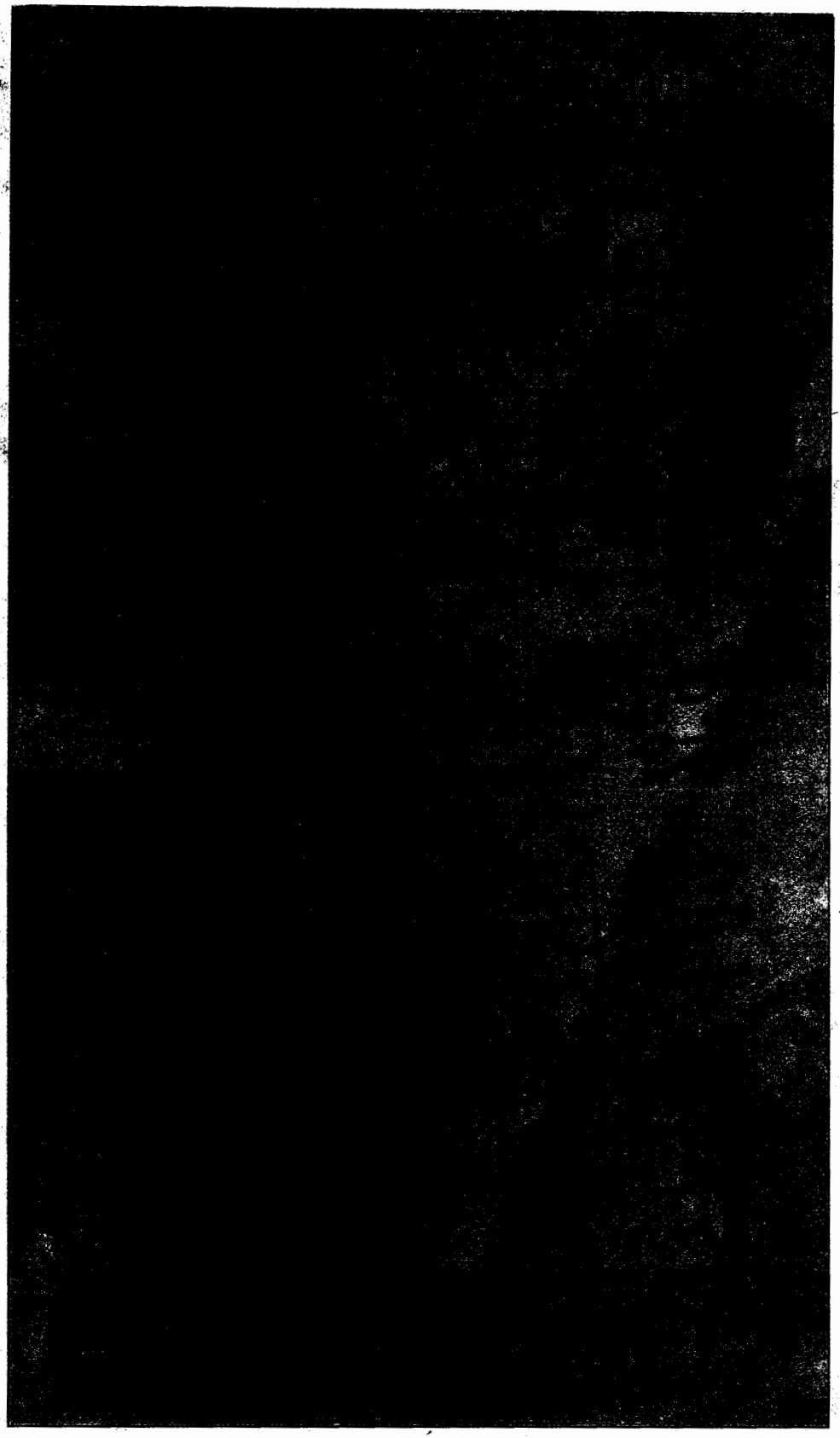
H. A. R. Gibb (E. I[1])/মু. আবদুল মান্নান



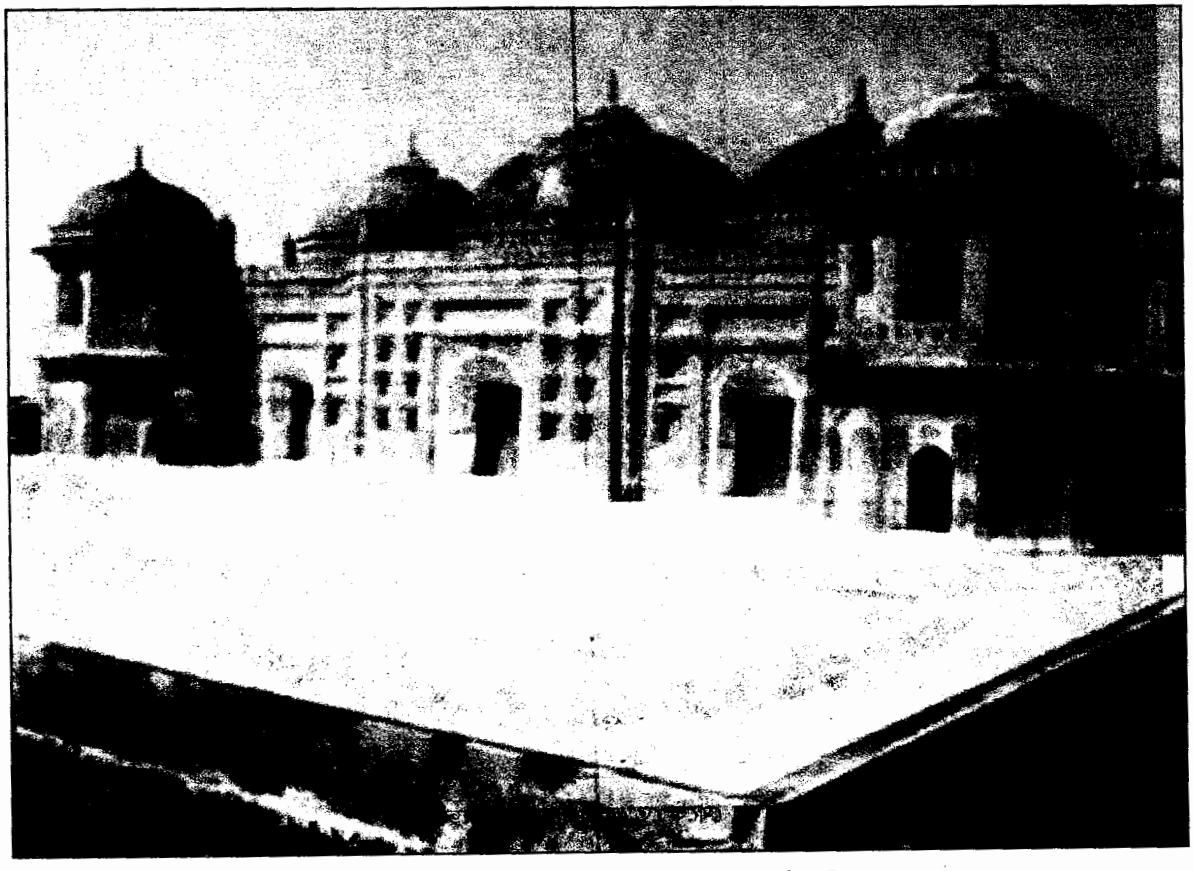
বড় কাটরা, ঢাকা



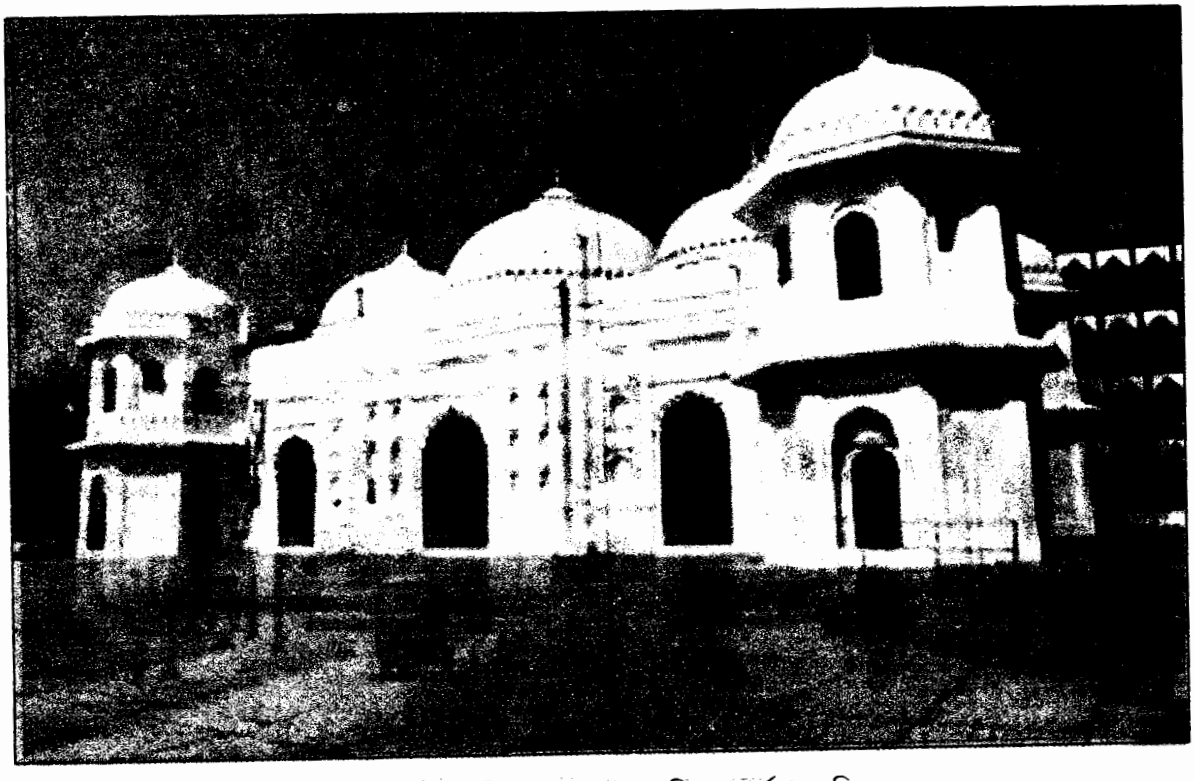
শিল্পীর চোখে বড় কাটরা, ঢাকা



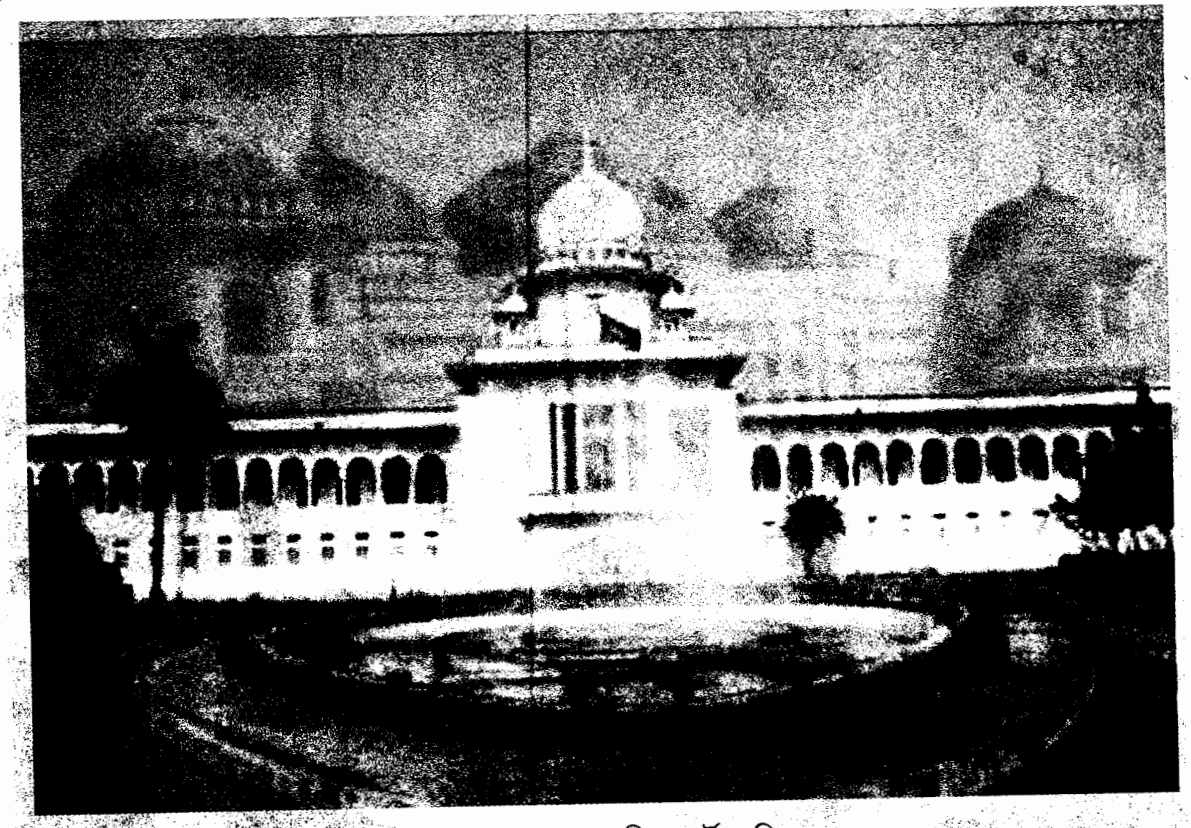
ঢাকার ঐতিহাসিক বড় কাটরার উত্তর প্রবেশ পথে স্থাপিত শিলালিপি



ঢাকার ঐতিহাসিক সাত গম্বুজ মসজিদের পূর্বের ছবি



ঢাকার ঐতিহাসিক সাত গম্বুজ মসজিদের বর্তমান ছবি

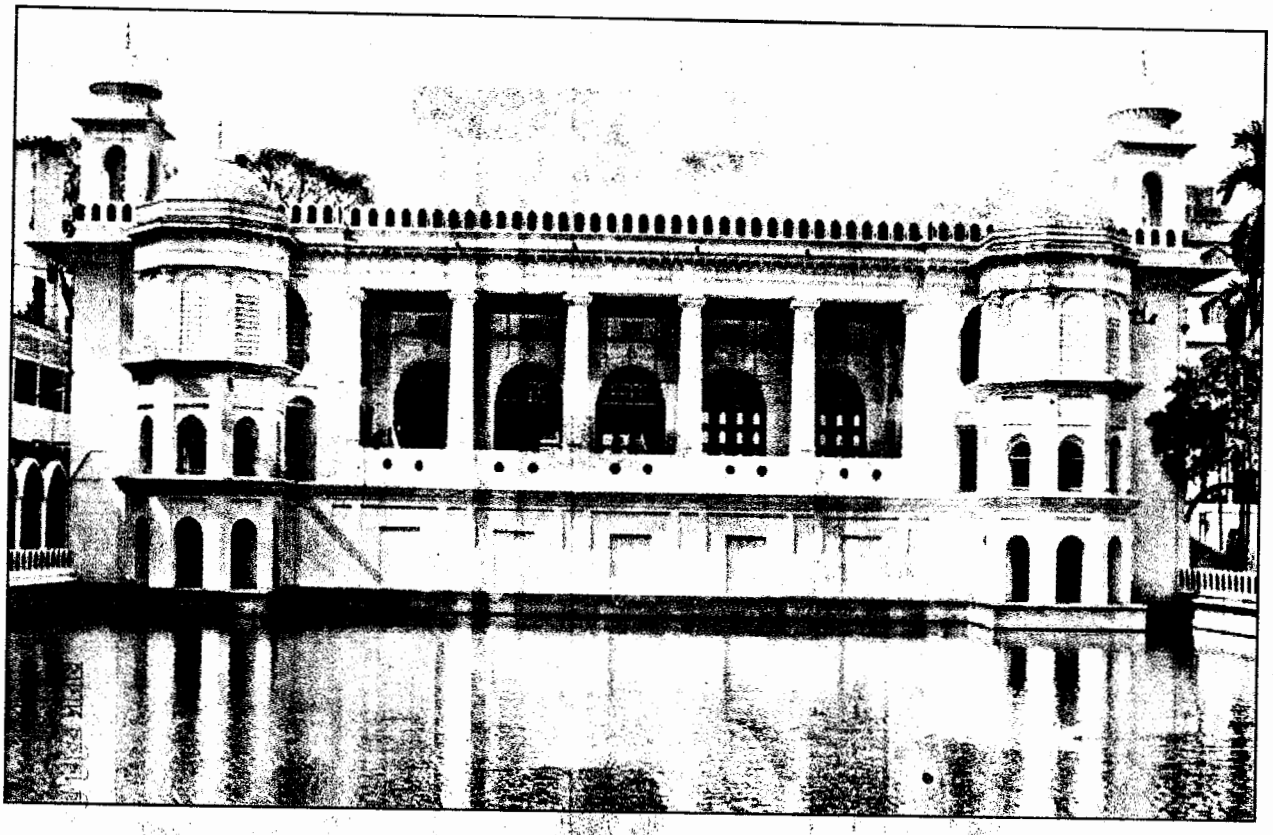


দূর থেকে তোলা সুপ্রীমকোর্টের ছবি

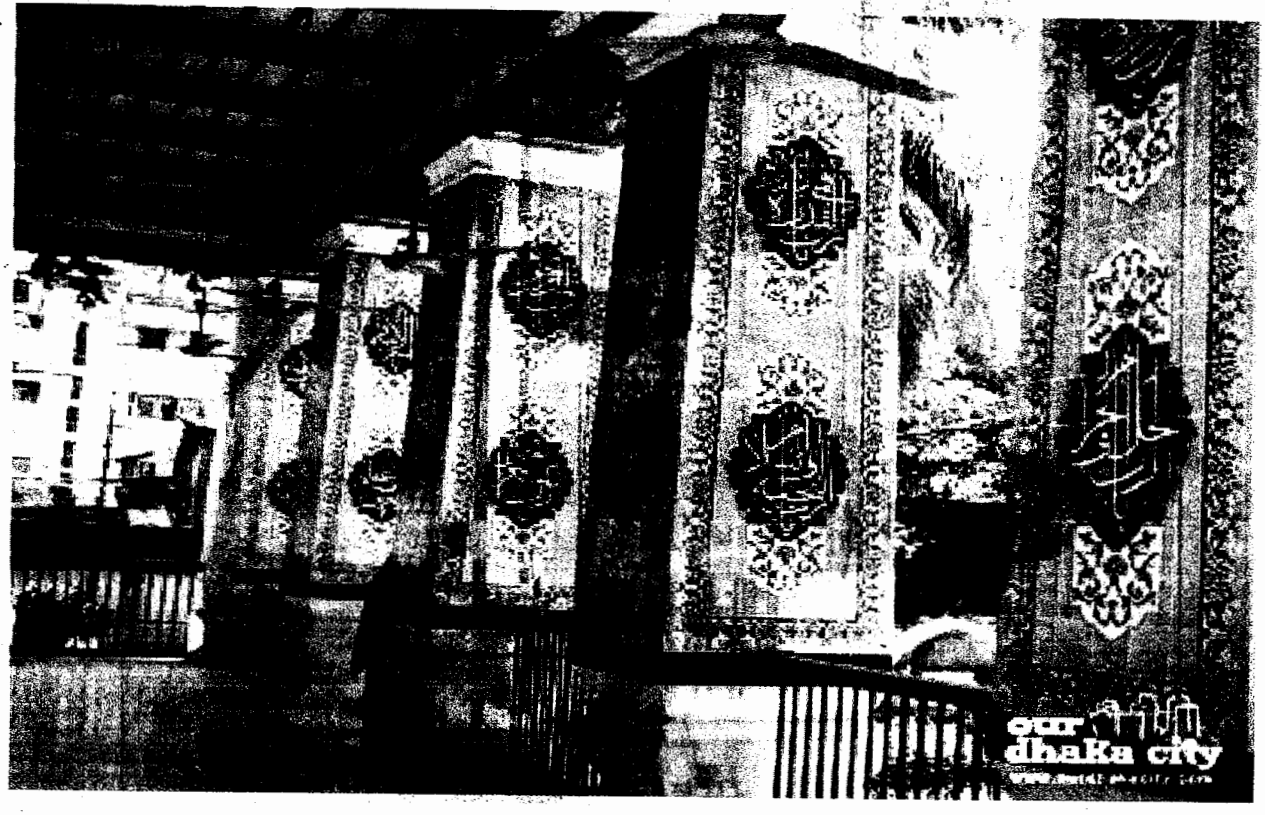


কাছ থেকে তোলা সুপ্রীমকোর্টের ছবি

লালবাগের কেল্লায় অবস্থিত পরি বিবির মাযার



ঢাকার ঐতিহাসিক হোসেনী দালান



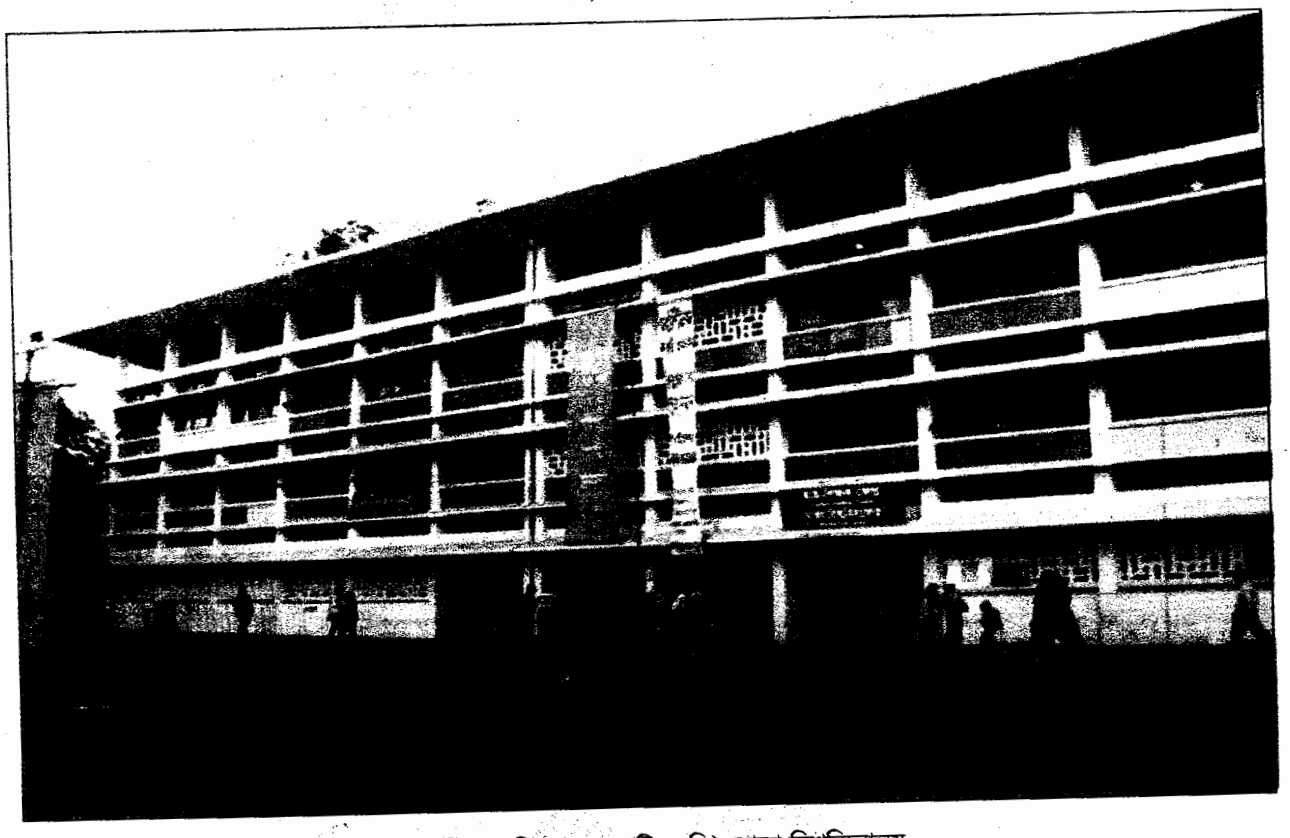
হোসেনী দালানের ভেতরের দৃশ্য

ঢাকার ঐতিহাসিক তারা মসজিদ

ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

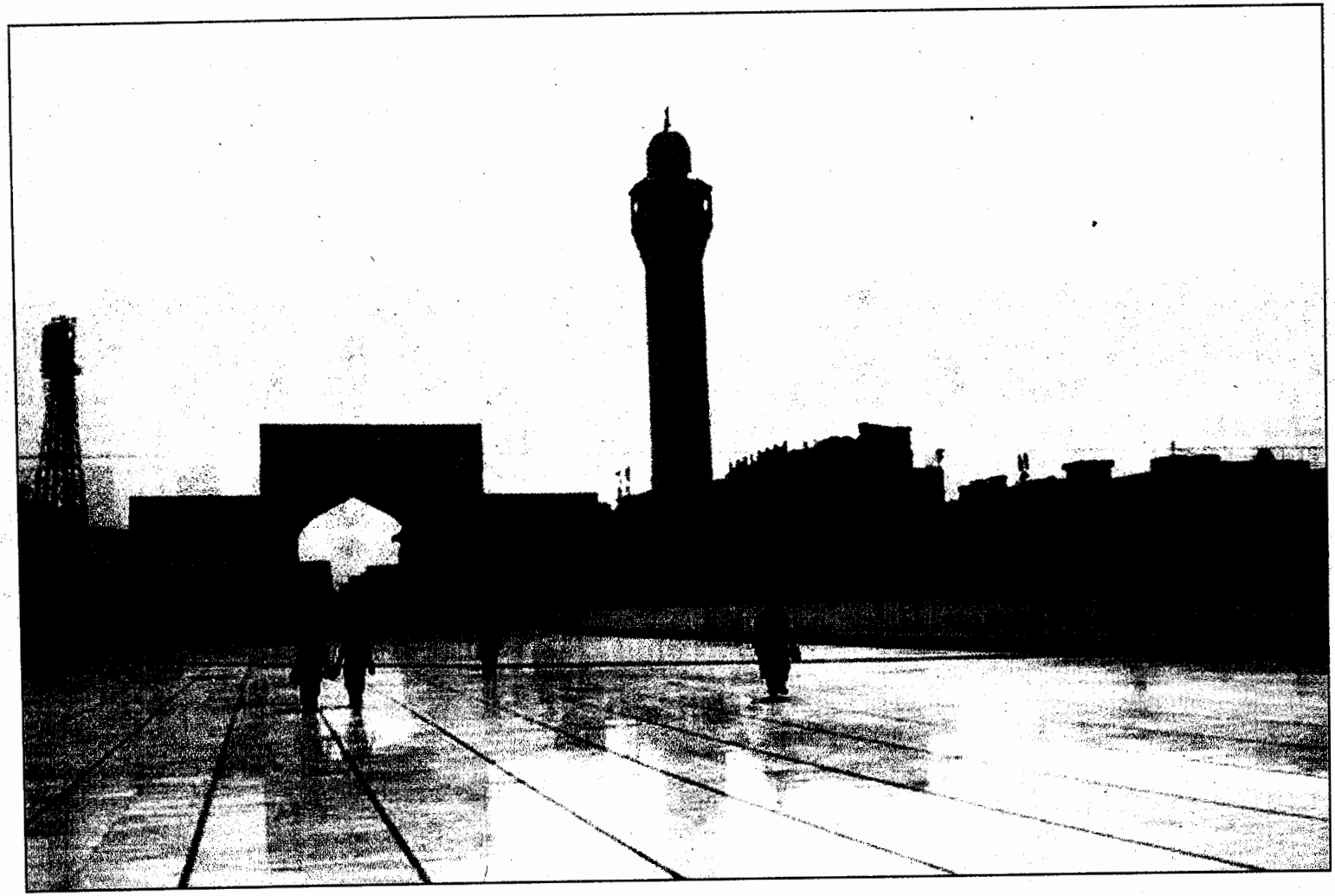


কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

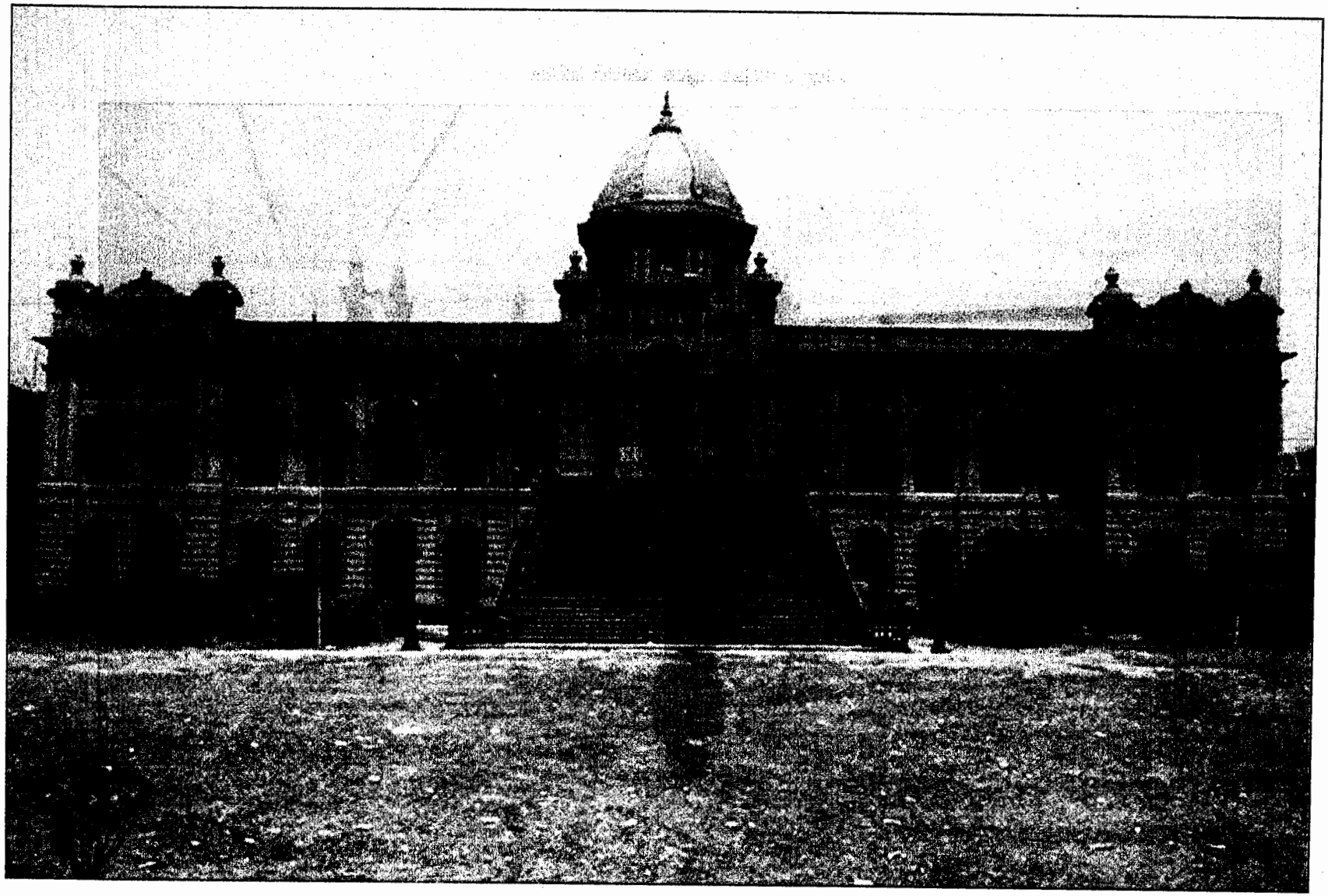


ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তন (টিএসসি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

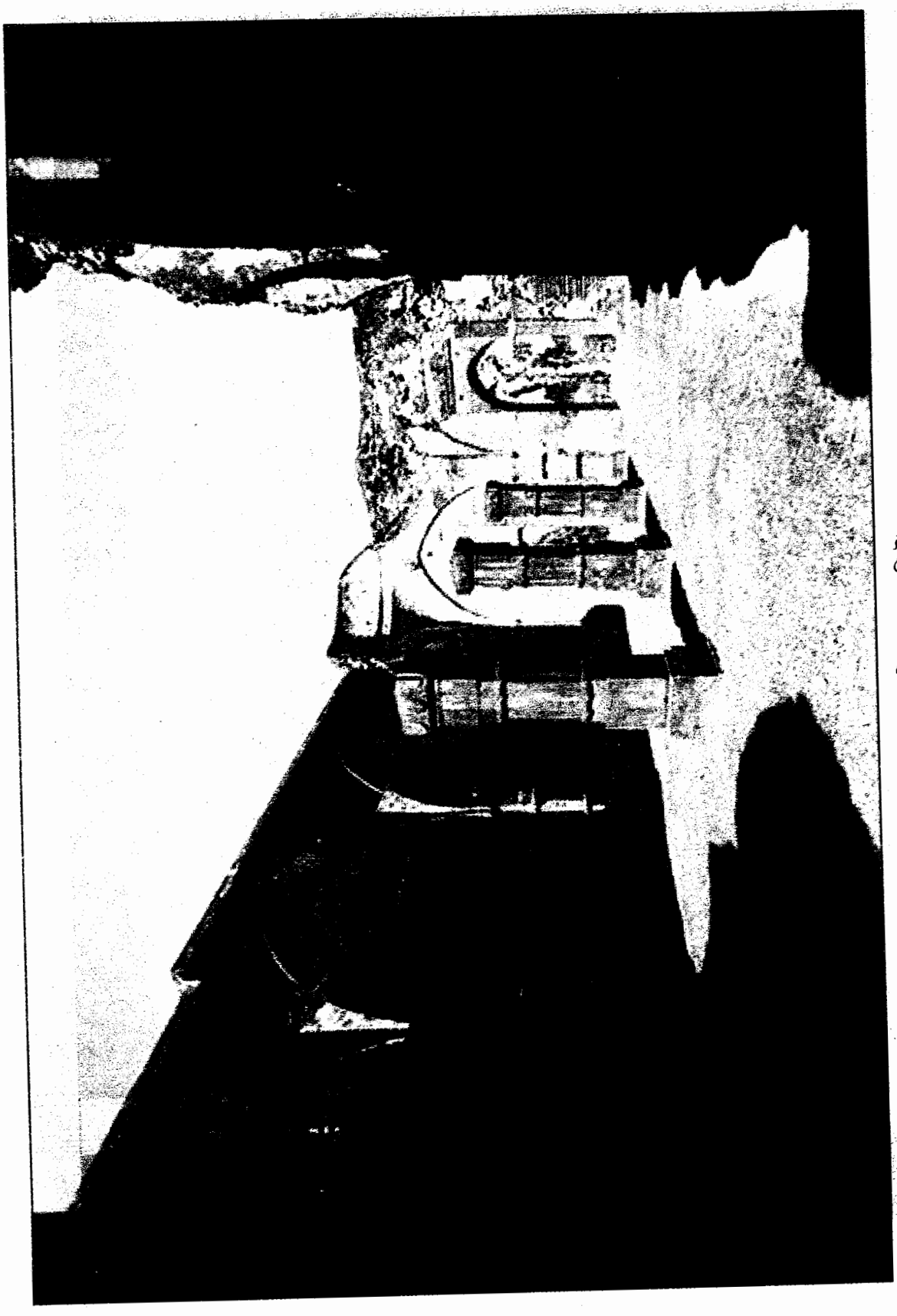
বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ



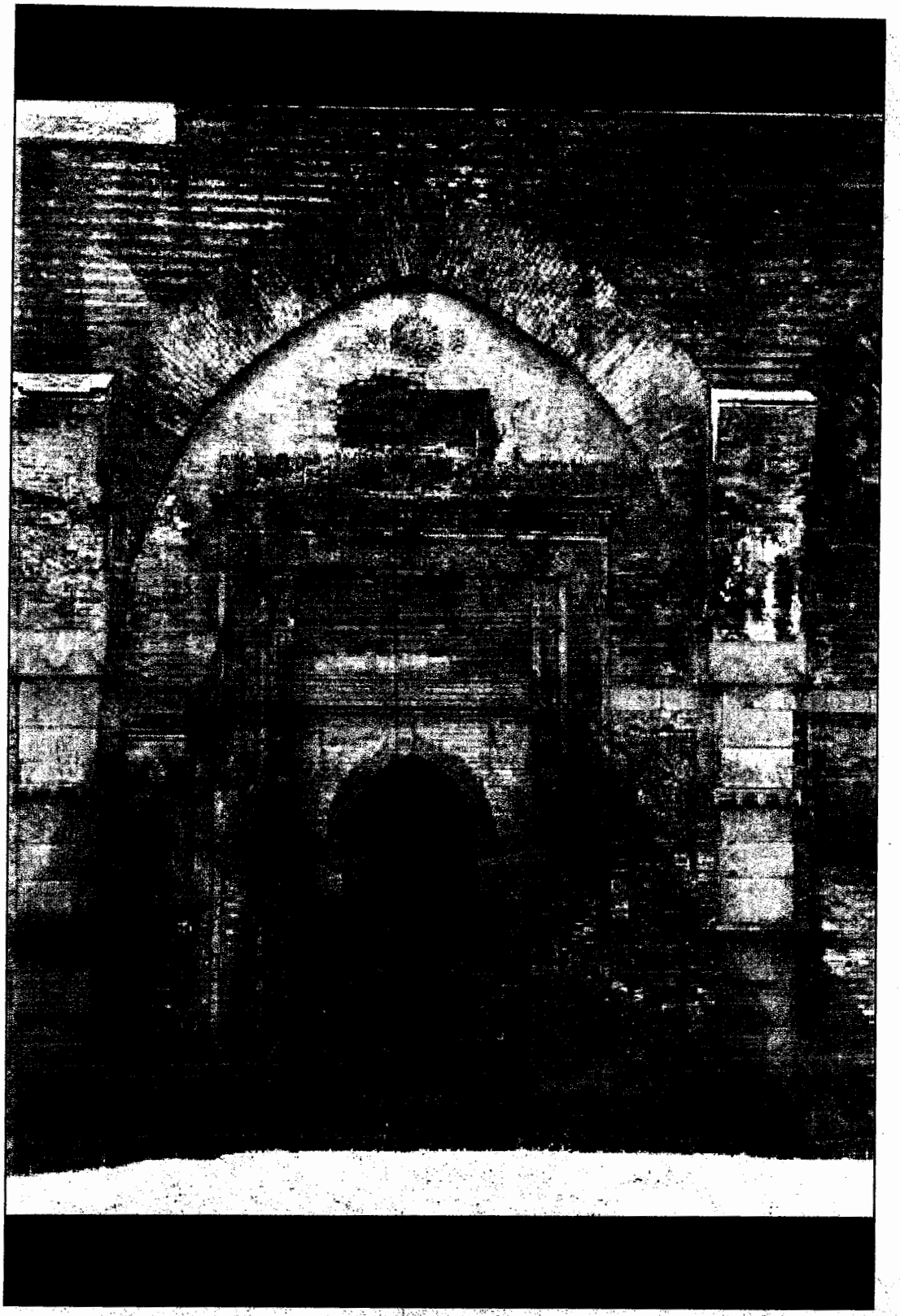
বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের মিনার



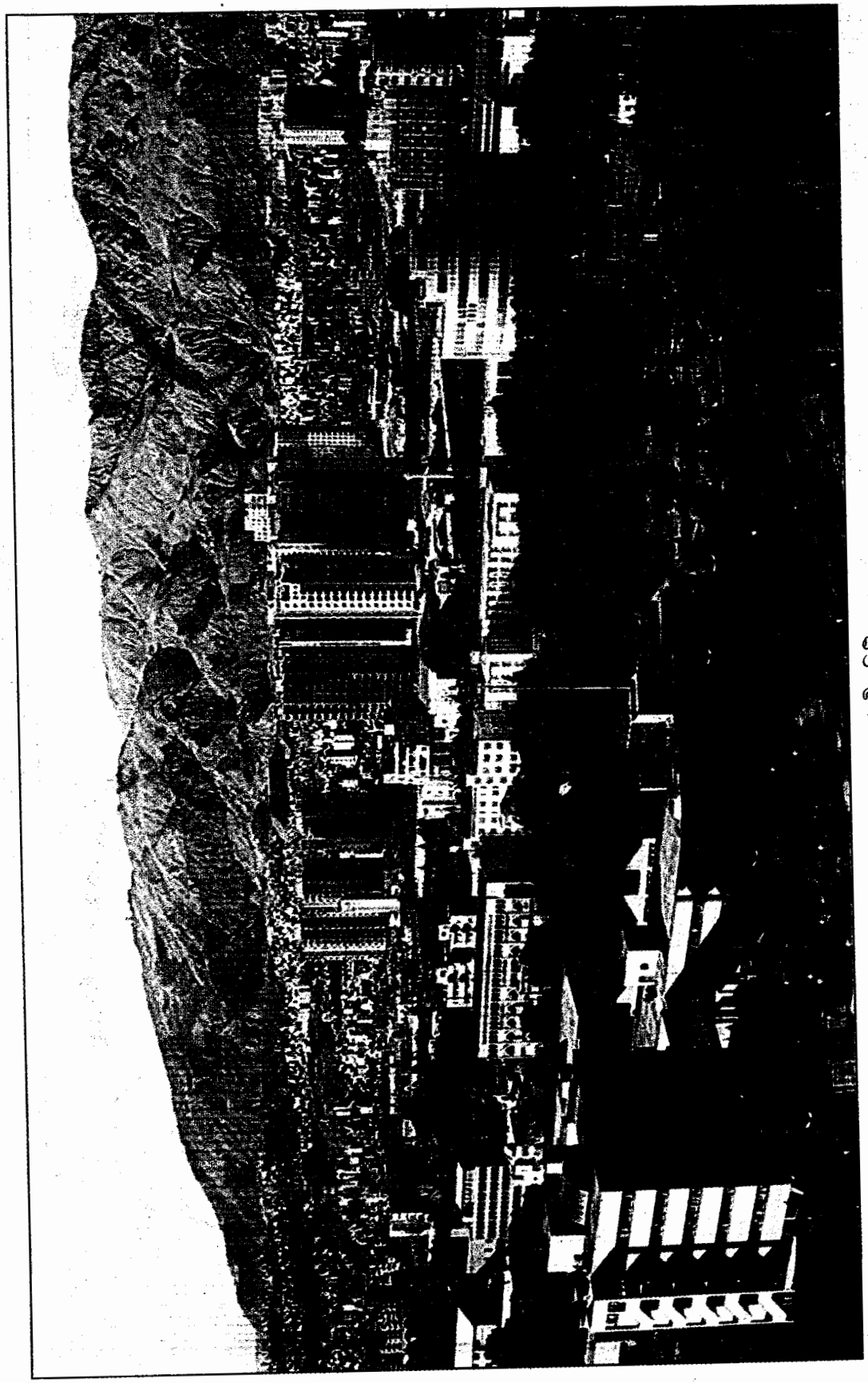
ঢাকার ঐতিহ্যবাহী আহ্সান মঞ্জিল



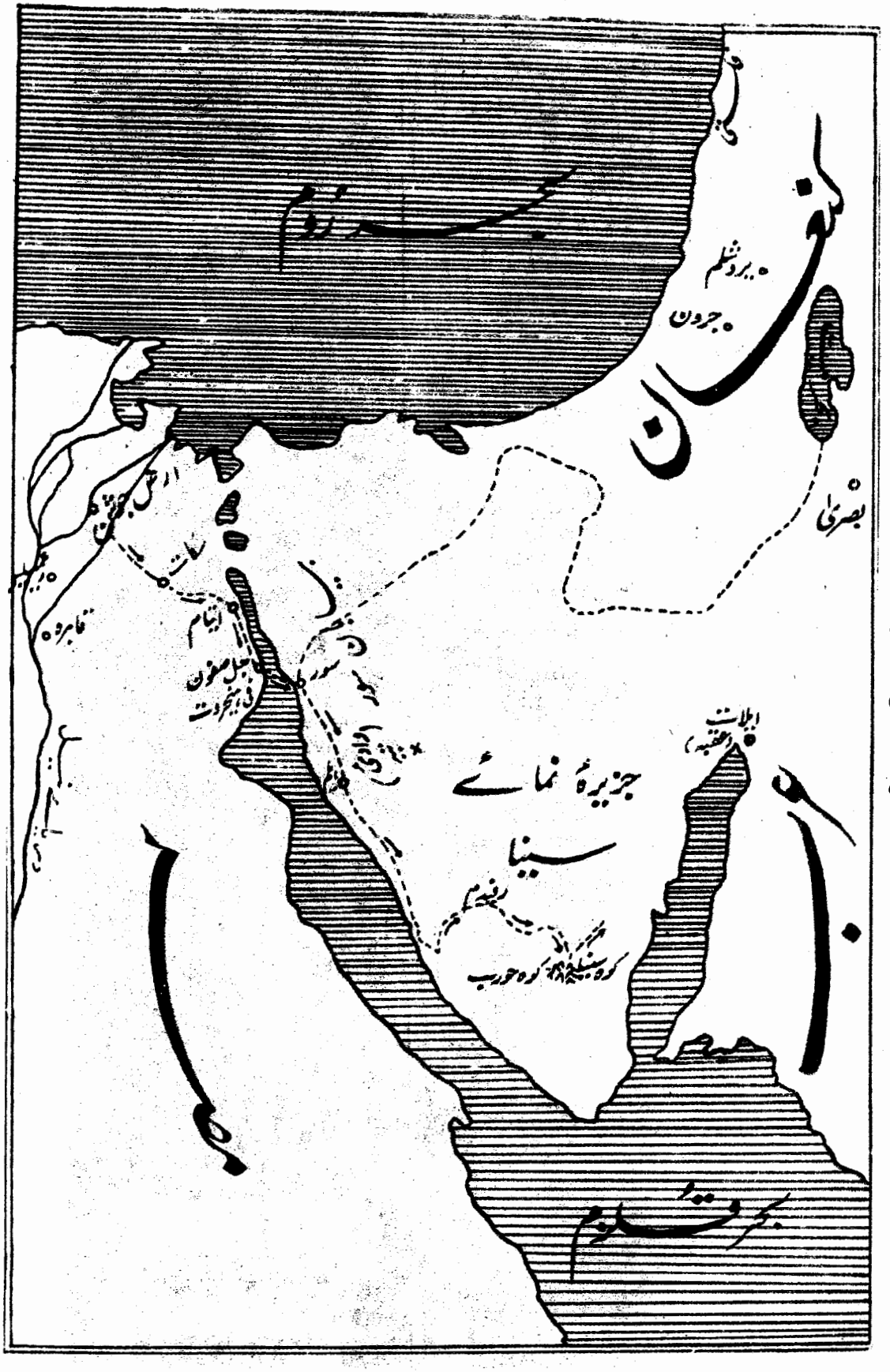
তাঁতীপাড়া মসজিদ : ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দ



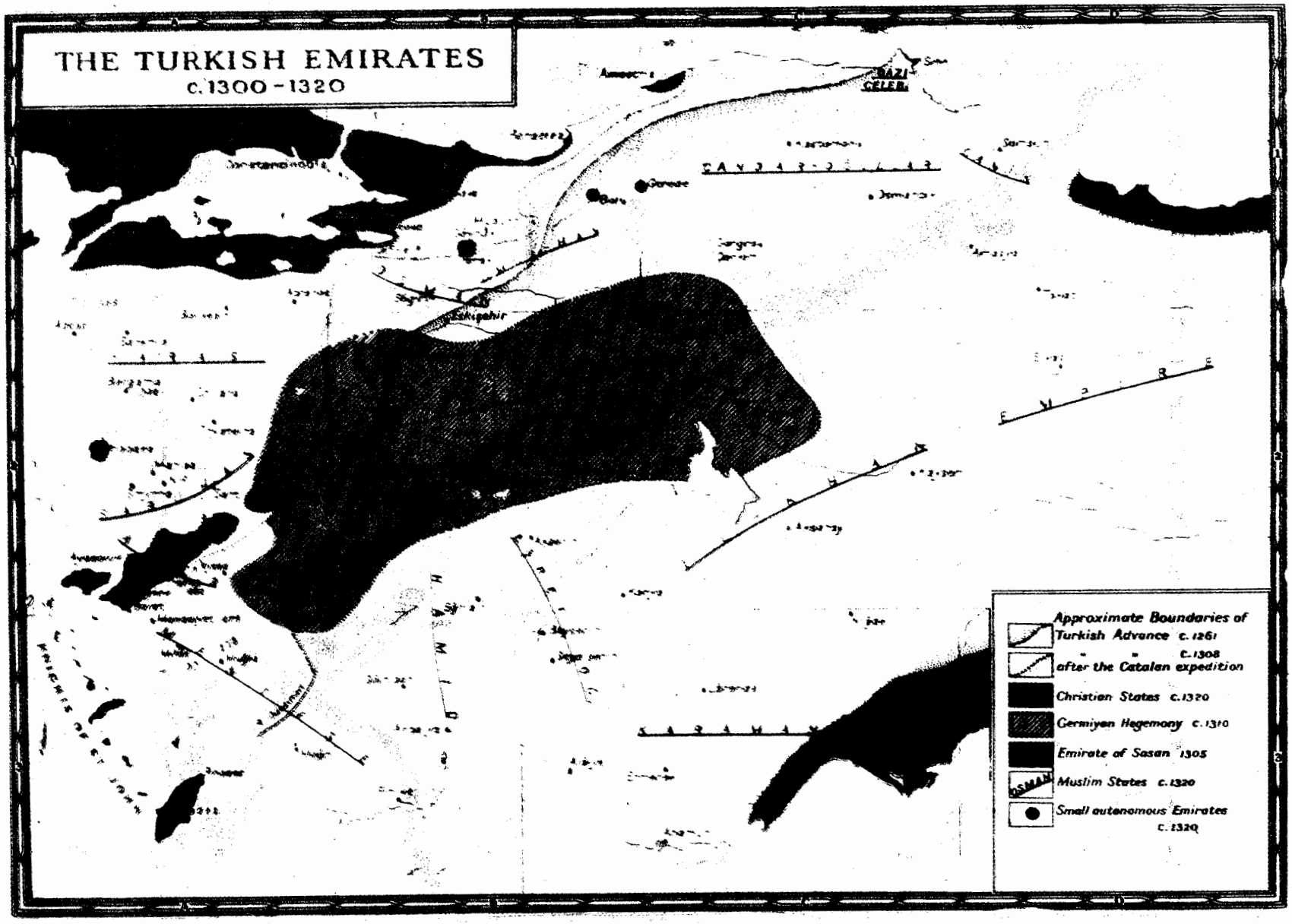
তাঁতীপাড়া মসজিদের কারুকার্য খছিত মেহরাব



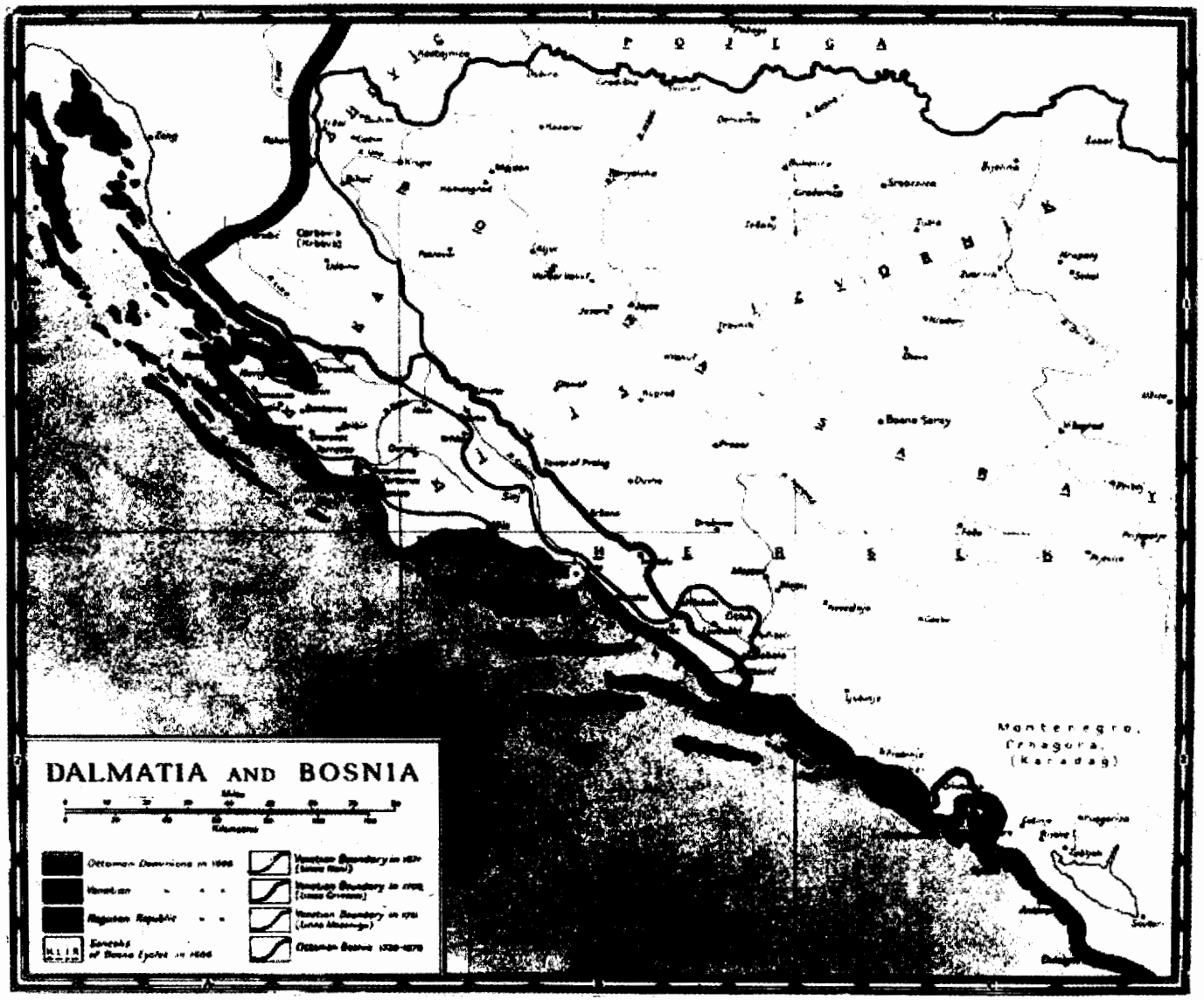
তাবরীয় সিটি



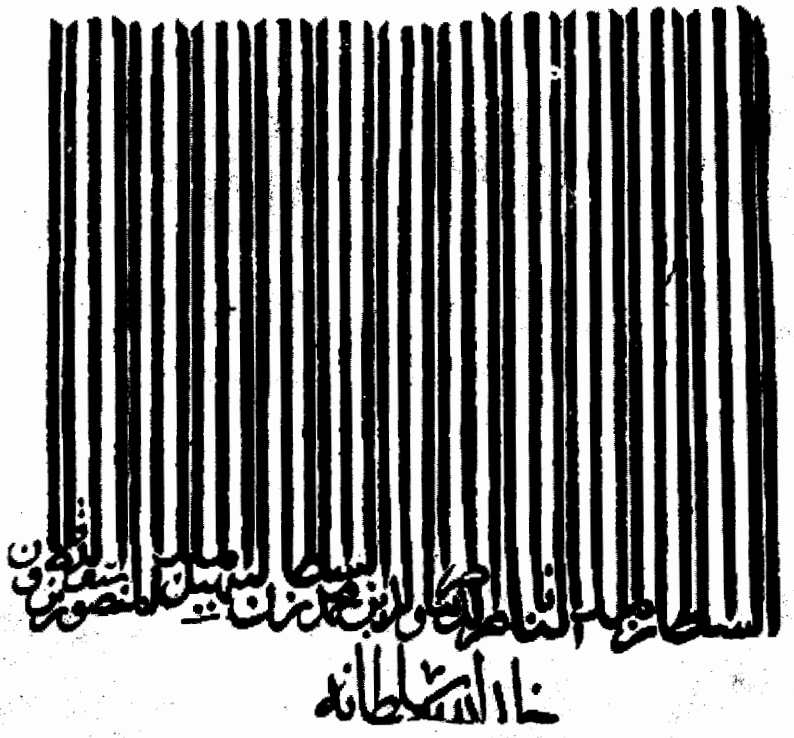
মানচিত্রে আত-তীহ্ মরুভূমির অবস্থান



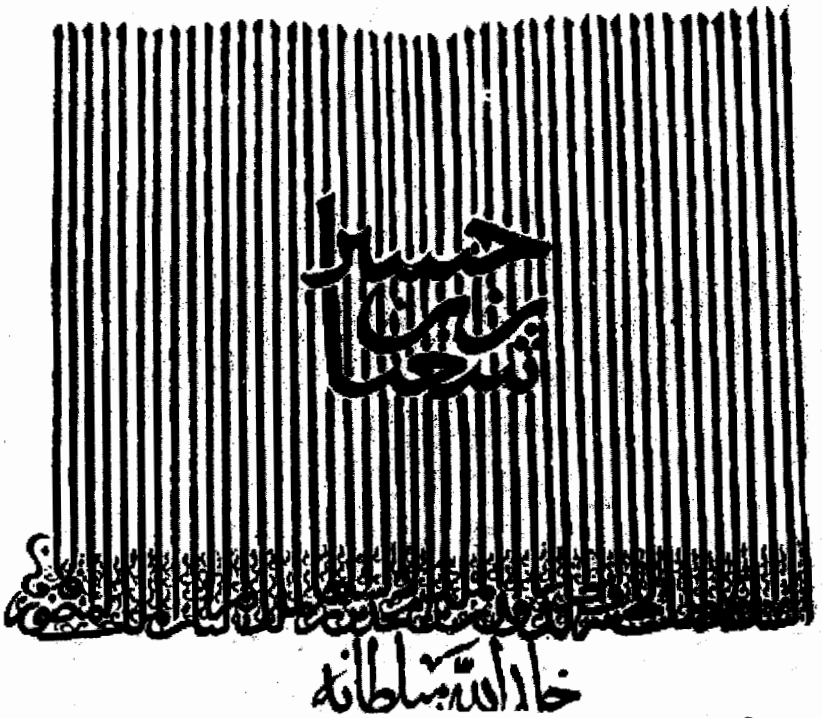
ওসমানী সাম্রাজ্যের একটি ভৌগোলিক মানচিত্র



ওসমানী সাম্রাজ্যের একটি ভৌগোলিক মানচিত্র



তুগরা লিপি, 'আস-সুলতানুল-মুল্‌ক্ আন্-নাসিরুদ-দুন্‌য়া ওয়াদ্-দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলতান আশ্-শাহীদ আল্-মালিক আল-মানসূর সাইফুদ-দীন কালাউন খাল্লাদাল্লাহু সুলতানাহু'।



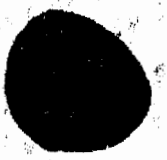
তুগরা লিপি, 'শাবান ইবন হুসায়ন আস্-সুলতান আল্-মুল্‌ক্ আল-আশরাফ নাসিরুদ্ দুন্‌য়া ওয়াদ-দীন ইব্‌নুল-মালিক আল-আমজাদ ইব্‌ন সুলতানুল-মুল্‌ক্ আন্-নাসির ইব্‌ন মালিক আল-মানসূর কালাউন খাল্লাদাল্লাহু সুলতানাহু'।



তুগরা লিপি, প্রথম
মাহমুদের আমল
(১৭৩০-১৭৫৪ খ্রি.)



তুগরা লিপি, প্রথম
ইবরাহীমের আমল
(১৬৪০-১৬৪৮ খ্রি.)



তুগরা লিপি, তৃতীয়
মুহাম্মদের আমল
(১৫৯৫-১৬০৩ খ্রি.)



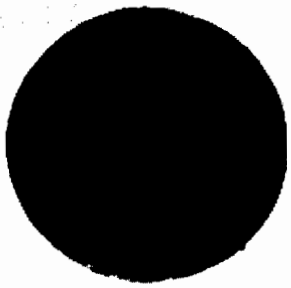
তুগরা লিপি, আমীর
সুলায়মানের আমল
(১৪০৩-১৪১৩ খ্রি.)



তুগরা লিপি, আব্দুল
আযীযের আমল
(১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.)



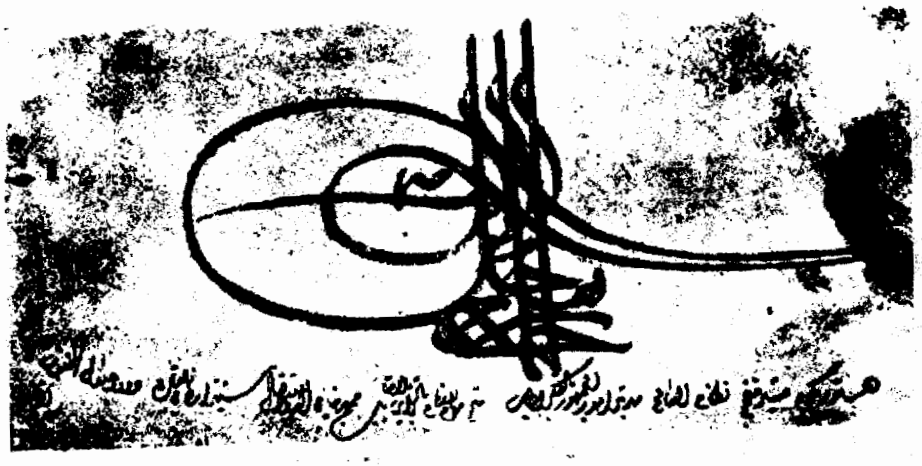
তুগরা লিপি, দ্বিতীয়
মাহমুদের আমল
(১৮০৮-১৮৩৯ খ্রি.)



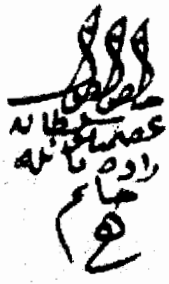
তুগরা লিপি, তৃতীয়
মুস্তাফার আমল
(১৭৫৭-১৭৭৩ খ্রি.)



তুগরা লিপি, দ্বিতীয় (তৃতীয়) সুলায়মান ইব্ন ইব্রাহীমের আমল
(যুল-কাদাঃ ১০৯৯ হি.=২৮ আগস্ট-৬ সেপ্টেম্বর, ১৬৮৮ খ্রি.)



তুগরা লিপি, দ্বিতীয় সুলতান আহমাদ ইব্ন ইব্রাহীমের আমল
(যুমাদাস-সানিয়াঃ ১১০৪ হি.=১৬-২৫ ফেব্রুয়ারি ১৬৯৩ খ্রি.)



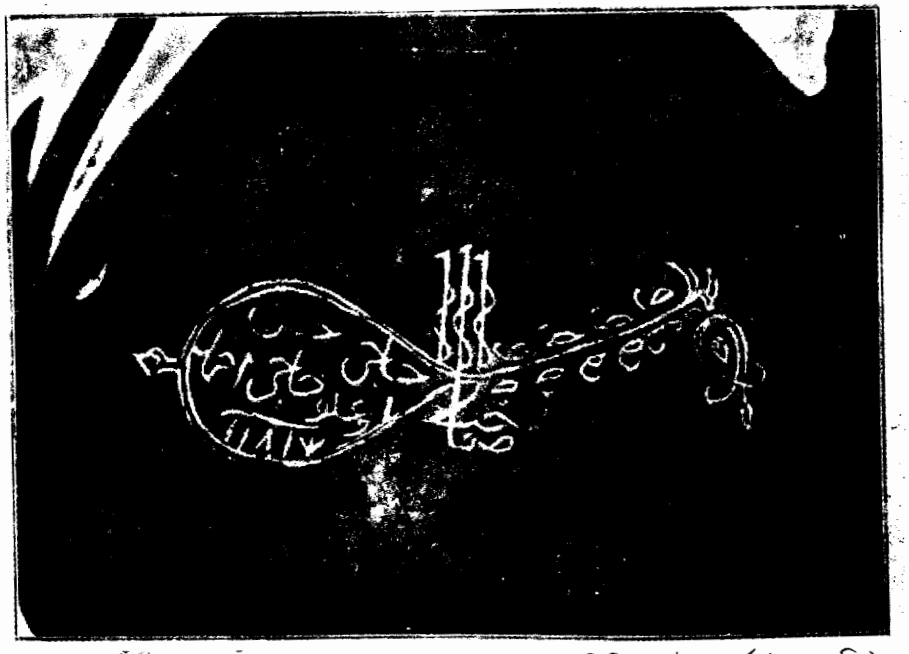
তুগরা লিপিতে লেখা 'খালিসুল কাওল ইসমাতলু সুলতান যাদাহ নাইলা ঃ খানাম'



কায়রোর একটি রেস্তোরায় খাবারের তালিকার উপর তুগরা লিপিতে লেখা 'বিসমিল্লাহ'



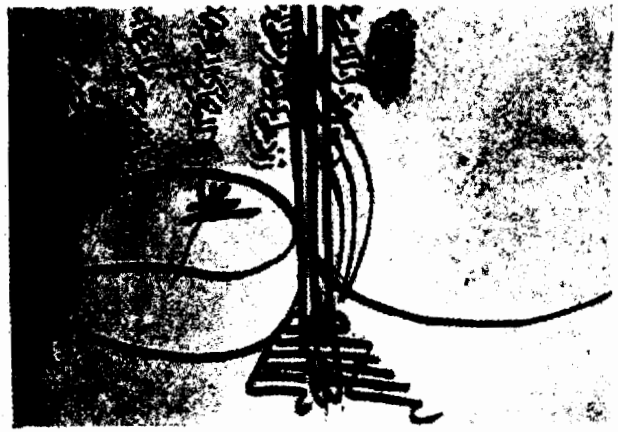
তুগরা লিপিতে লেখা একজন ব্যবসায়ীর নাম



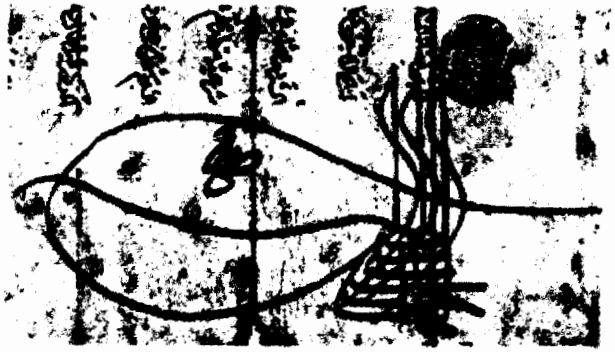
তুগরা লিপিতে হাজী হাসান ওগলু হাজী আহমাদ-এর নাম লিখিত সাইনবোর্ড (১১৮১ হি.)



তুগরা লিপি, বুশনাক,
উসমান পাশার আমল
(৯ রবিউস সানী, ১০৯৩ হি.
=১৭ এপ্রিল, ১৬৮২ খ্রি.)



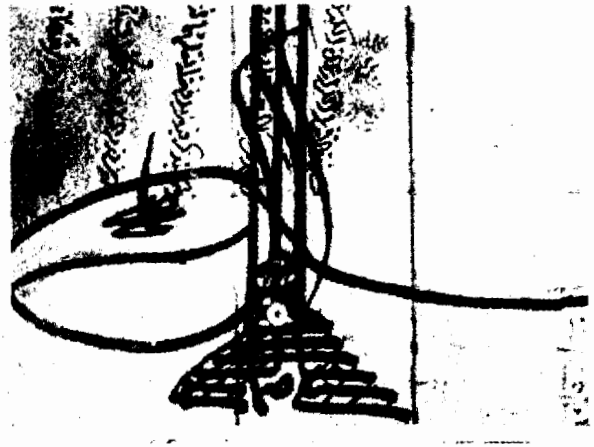
তুগরা লিপি, তারখূনজী আহ্‌মাদ পাশার আমল
(৭ শাওয়াল, ১০৬০ হি. =অক্টোবর, ১৬৫০ খ্রি.)



তুগরা লিপি, নিশানজী আহমাদ পাশার আমল
(রবিউস সানী, ১০২৬ হি. =১৭ এপ্রিল ১৬১৭ খ্রি.)



তুগরা লিপি, (দামাদ) মালিক ইব্‌রাহীম পাশার আমল
(১০ রবিউল আউয়াল, ১০৭২ হি. =৩ নভেম্বর, ১৬৬১ খ্রি.)



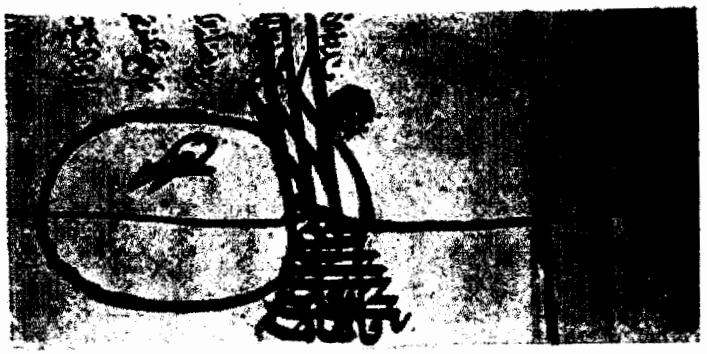
তুগরা লিপি, খাদিম আবদুর রহমান পাশার আমল
(১৭ মুহাররম, ১০৬২ হি. =৩০ ডিসেম্বর ১৬৫১ খ্রি.)



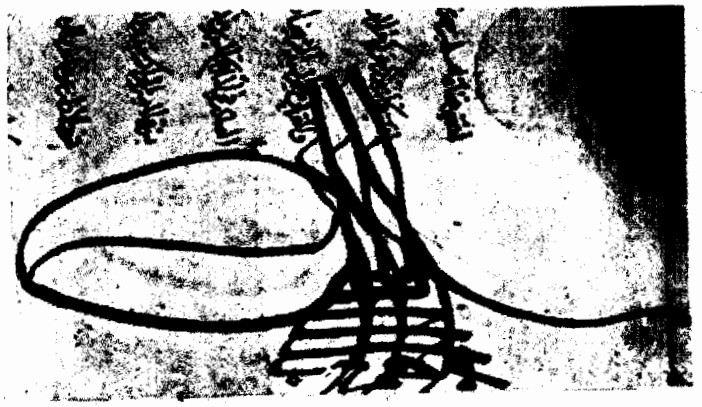
তুগরা লিপি, খাদিম আবদুর রহমান পাশার আমল
(১৮ যুলকাদা, ১০৬১ হি. =২ নভেম্বরর ১৬৫১খ্রি.)



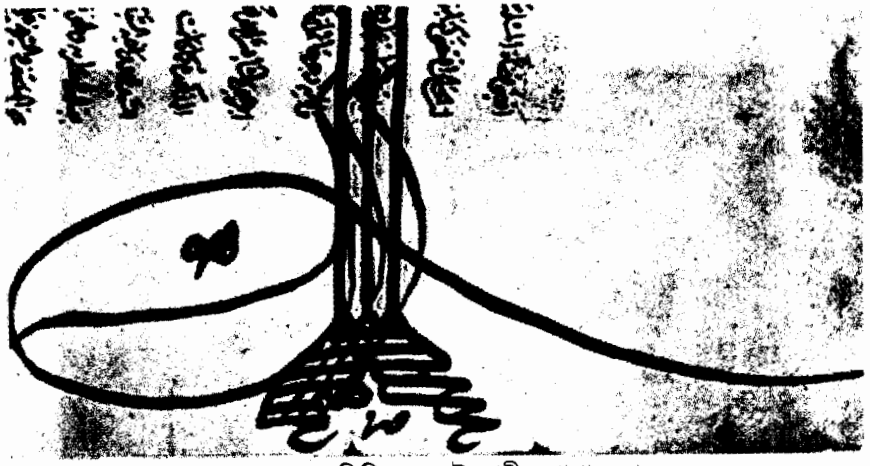
তুগরা লিপি, কারা ইব্‌রাহীম পাশার আমল
(১৪ শাবান, ১০৮১ হি. = ২৭ ডিসেম্বর ১০৭০ খ্রি.)



তুগরা লিপি, কিনআন, স্থলাভিষিক্ত (গভর্নর)-এর আমল
(১৯ রজব, ১০৮০ হি. = ৩ ডিসেম্বর, ১৬৬৯ খ্রি.)



তুগরা লিপি, হামজা পাশার আমল
(২৫ যিলহজ্জ, ১০৯৬ হি. = ২৪ নভেম্বর ১৬৮৫ খ্রি.)



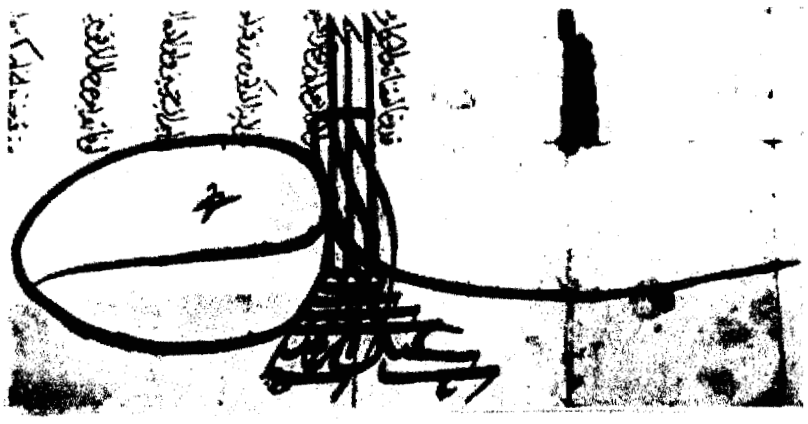
তুগরা লিপি, কারা ইবরাহীম পাশার আমল
(১৪ মুহররম, ১০৮৩ হি. = ১২ মে, ১৬৭২ খ্রি.)

তুগরা লিপি, হুমায়া পাশার আমল
(রবিউস সানি, ১০৯৮ হি. = ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৬৮৭ খ্রি.)

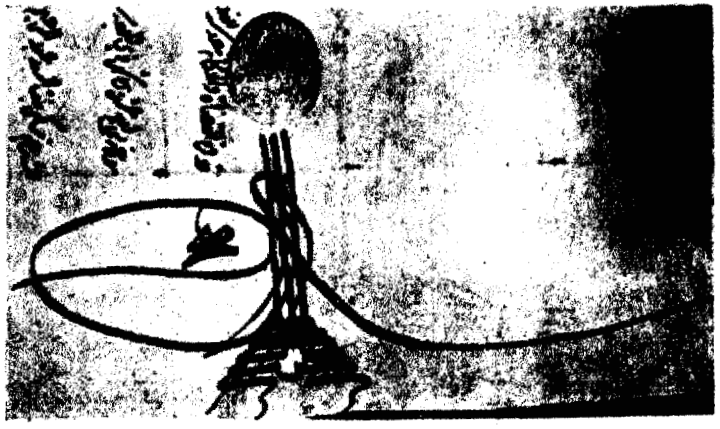
তুগরা লিপি, মুরালী খাযনাদার আলী পাশার আমল
(১৭ রমজান, ১১০৩ হি. = ২ জুন, ১৬৯২ খ্রি.)

তুগরা লিপি, সারখুশ আহমাদ পাশার আমল
(২৯ জমাদিউস সানি, ১১০১ হি. = ১৫ এপ্রিল, ১৬৮৮ খ্রি.)

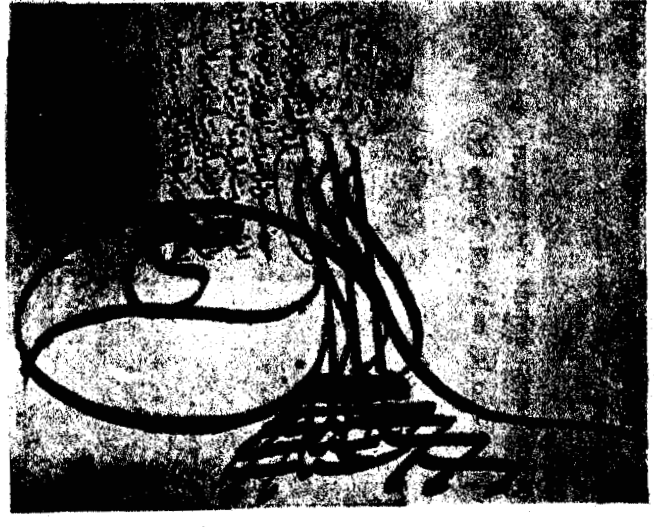
তুগরা লিপি, চেহেলী ইসমাঈল পাশার আমল
(১৬ জমাদিউল আউয়াল, ১১০৮ হি. = ১০ ডিসেম্বর, ১৬৯৬ খ্রি.)



তুগরা লিপি, আবদুর রহমান পাশার আমল
(১০ রবিউস সানী, ১০৮৯ হি. = ১ জুন, ১৬৭৮ খ্রি.)



তুগরা লিপি, দামাদ হাসান পাশার আমল
(২৪ জিলহজ্জ, ১১২০ হি. = ৬ মার্চ, ১৭০৯ খ্রি.)



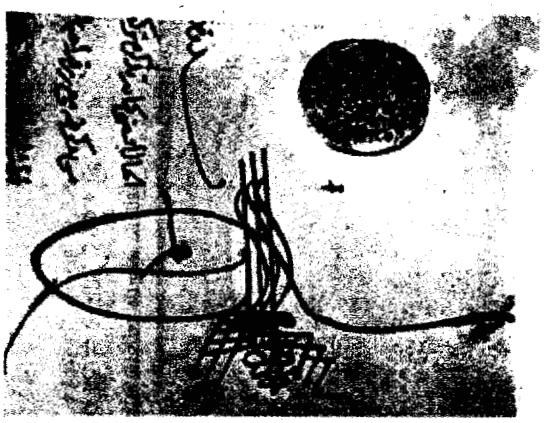
তুগরা লিপি, ইরী হাসান পাশা যাদা আবদুল্লাহ পাশার আমল
(১৫ জিলকদ, ১১৬৫ হি. = ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৭৫২ খ্রি.)



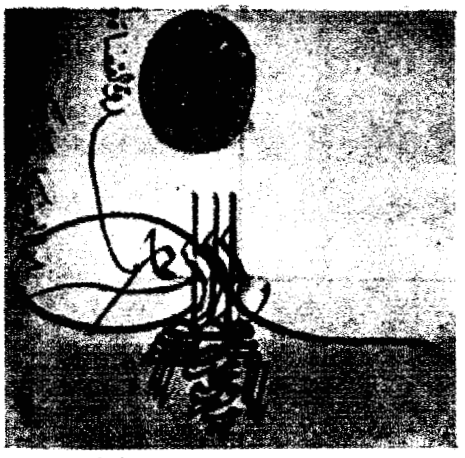
তুগরা লিপি, সাদর সাবেক নিশা[illegible]মল
(১৪ শাবান, ১১৩৭ হি. = ২৮ এপ্রিল, ১৭২৫ খ্রি.)



তুগরা লিপি, সিলাহদার মুহাম্মদ পাশার আমল
(১ যিলহজ, ১১৯৫ হি. = ১৮ নভেম্বর, ১৭৮১ খ্রি.)



তুগরা লিপি, নাবুলুসী মুসতাফা পাশার আমল
(১২ রজব, ১১৮৮ হি. = ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৭৪ খ্রি.)



তুগরা লিপি, য়াগুন মুহাম্মদ পাশার আমল
(১৩ রজব, ১২০০ হি. = ১২ মে, ১৭৮৬ খ্রি.)



তুগরা লিপি, ইবরাহীম বেক কামমাকাম-এর আমল
(১৯ জমাদিউস সানী, ১১৯৯ হি. = ২৯ এপ্রিল, ১৭৮৫ খ্রি.)



তুগরা লিপি, লুকমানজী (আবূ) বাকর পাশার আমল
(১ জমাদিউল আউয়াল, ১২১২ হি. = ১ নভেম্বর, ১৭৯৭ খ্রি.)



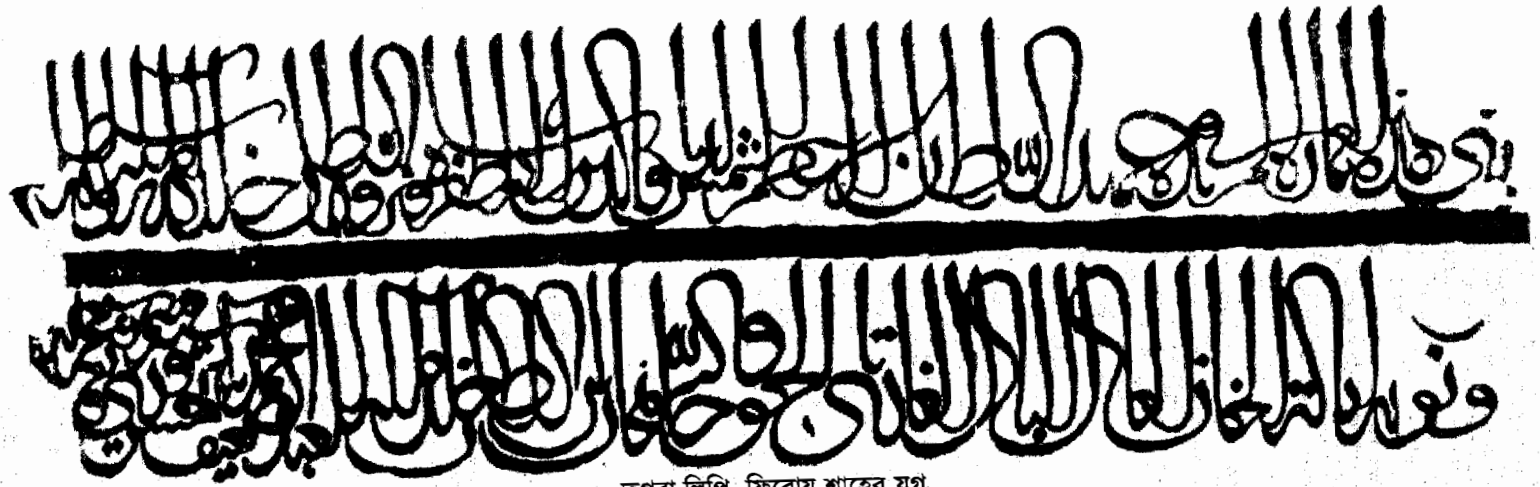
তুগরা লিপি, কুতব মিনার



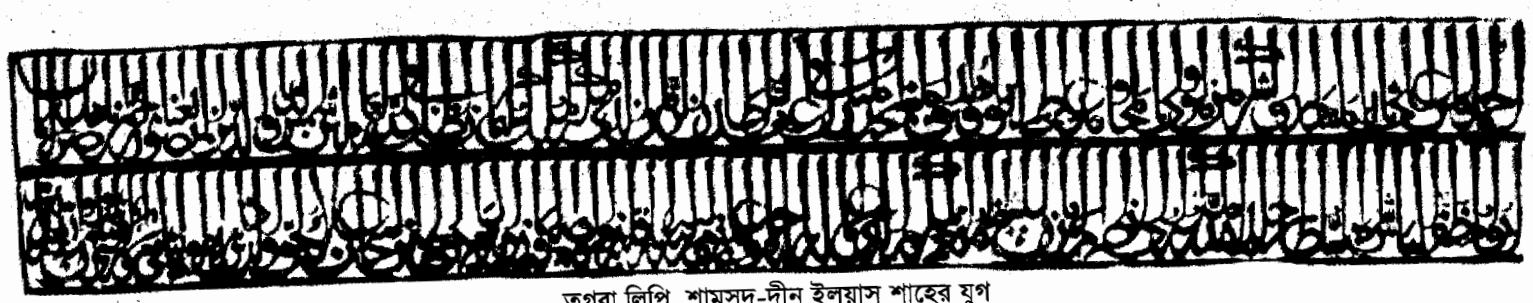
তুগরা লিপি, কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ

তুগরা লিপির সমশ্বয়ে নাসখলিপি (বাদাউনে প্রাপ্ত)

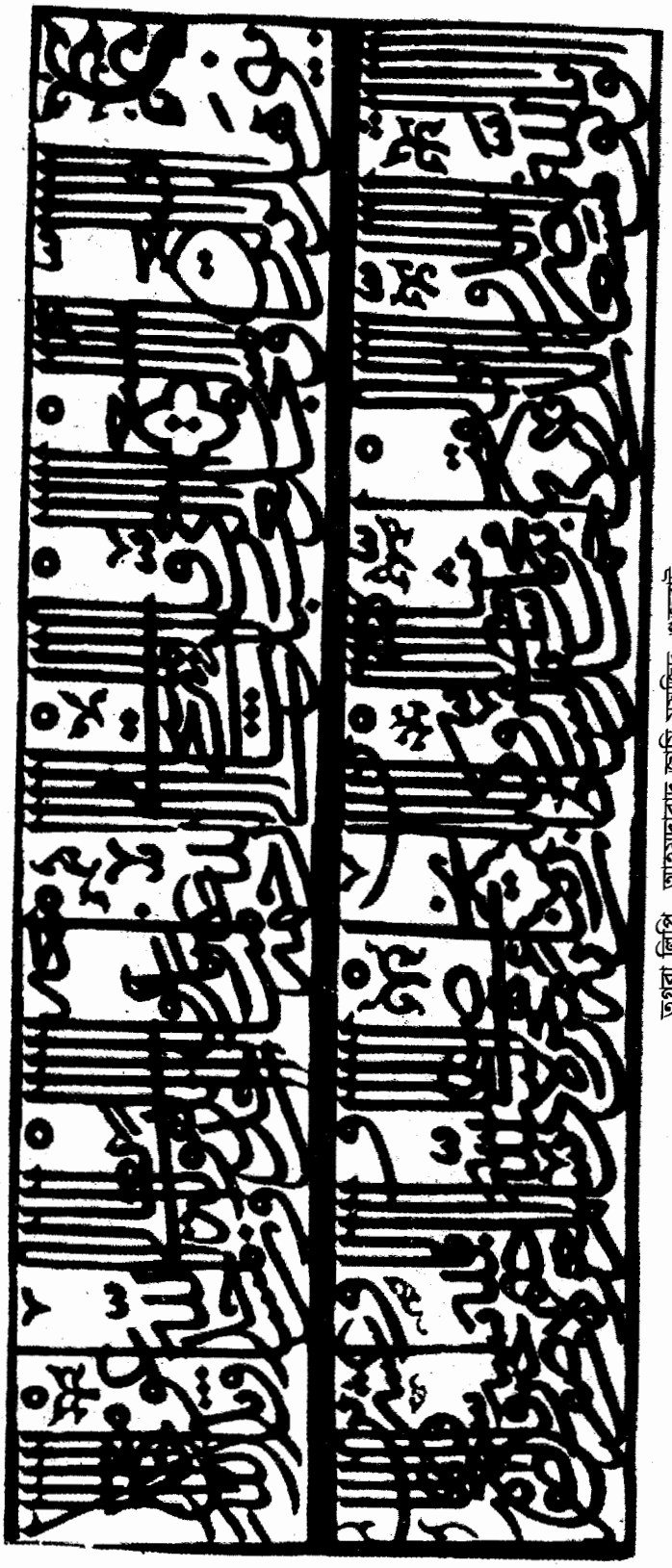
নাসখলিপি, আলাই দরওয়াযা, দিল্লী



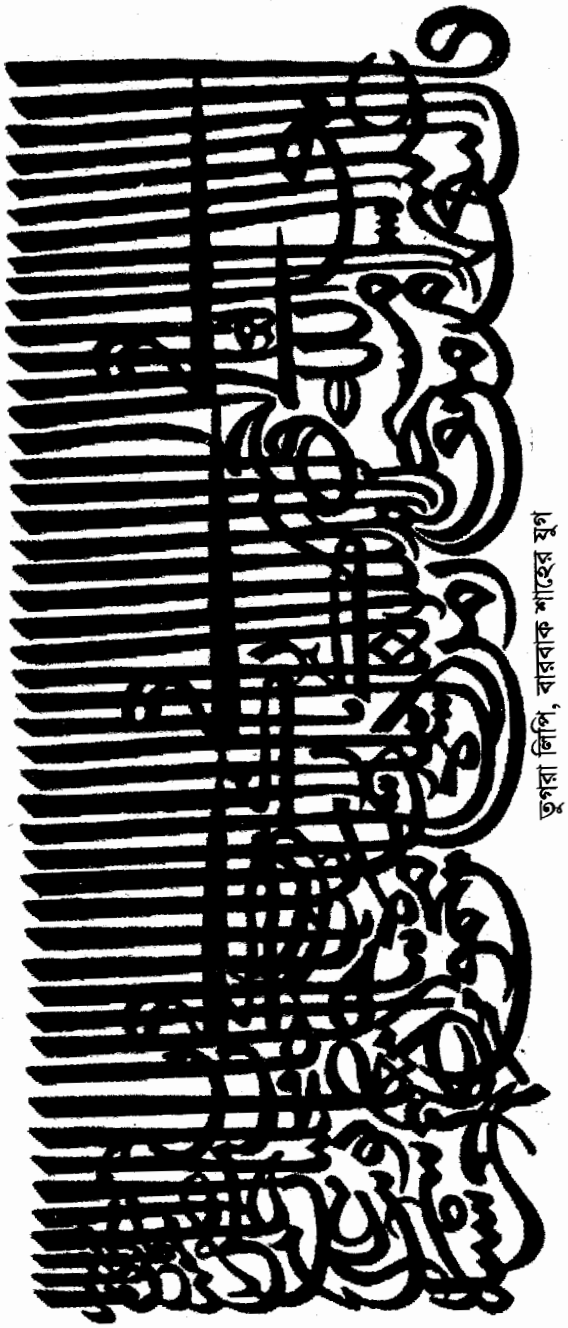
তুগরা লিপি, ফিরোয শাহের যুগ



তুগরা লিপি, শামসুদ-দীন ইলয়াস শাহের যুগ



তুগরা লিপি, আহমদাবাদ জামি মসজিদ, গুজরাট



তুগরা লিপি, বারবাক শাহের যুগ

তুগরা লিপি, তীর ধনুক চিহ্নিত নকশা

তুগরা লিপি, গৌড় (পশ্চিম বাংলা)

সূচীপত্র

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
'ড'	
ডন্‌মি	২১
ডাক্তার খান সাহেব	২২
ডাকার	২২
ডামুড্যা	২৬
ডালমেশিয়া	২৬
ডাহোমী	৩৪
ডিমলা	৩৫
ডিয়োট্রিসি	৩৬
ডুমুরিয়া	৩৬
ডেমরা	৩৭
ডেমোক্রাট পার্টি	৩৭
ডেরা ইসমাঈল খান	৩৮
ডেরাগাযী খান জিলা	৩৮
ডেরা নওয়াব সাহেব	৩৮
ডেরা বুখতী	৩৮
ডোমার	৩৮
'ঢ"	
ঢাকা	৩৯
'ত'	
তংকা	৭৪
তাবলীগ পত্রিকা	৭৪
তমদ্দুন মজলিস	৭৪
তরাইনের যুদ্ধ	৮০
তা'	৮০
তা'	৮০
তাআব্বাতা শাররান	৮০
তা'আম	৮১
আত-তা'ই লি-আমরিল্লাহ	৮৩
তা'ইফ	৮৩
তা'ইয্য	৮৫
তাইরে (টায়ার)	৮৮
তা'উস ইব্‌ন কায়সান (র)	৮৯
আত-তাওআমান	৯১
তাওকী'	৯১
তাওফীক পাশা	৯২
তাওফীক ফিকরেত	৯৩
তাওফীক মুহাম্মাদ	৯৫
তাওবা	৯৬
তাওবা আল-'আন্‌বারী (র)	৯৮
তাওবা সূরা (দ্র. বারাআ)	৯৯
তাওবাতু'ন-নাসূহ	৯৯

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
তাওয়াক্কুল (১)	৯৯
তাওয়াক্কুল (২)	৯৯
তাওয়াক্কুল ইব্‌ন বায্‌যায (র)	১০১
তাওয়াদদুদ	১০১
তাওয়াফ	১০২
তাওয়াশী	১০৪
তাওরাত	১০৪
তাওরিয়া	১১০
তাওহীদ (১)	১১১
আত-তাওহীদ, 'ইল্‌ম (২)	১১১
তাকওয়া	১২০
তাক্‌দীর (দ্র. কাদর)	১২২
তাক্‌বীর	১২২
তাকরীত	১২৩
তাকরূর	১২৪
তাকলীদ	১২৬
তাক্‌লীফ	১২৮
আত্‌-তাকাছুর (সূরা)	১২৯
তাকাশ	১২৯
তাকিয়্যা	১৩০
তাকিয়্যু'দ-দীন আল-'আরাবী, মাওলানা	১৩৩
তাকীকাশী	১৩৪
তাকী (তেকী) খান	১৩৪
তাকিদ-দীন (দ্র. আল-মুজাফ্‌ফার)	১৩৫
তাকোরোন্না	১৩৫
তাখ্‌তাজী	১৩৫
তাখাল্‌লুস	১৩৬
তাগলিব (দ্র. ওয়াইল)	১৩৮
তাগলিব	১৩৮
আত-তাগাবুন (সূরা)	১৪৪
তাগুস	১৪৫
তাজ	১৪৫
তাজউদ্দীন আহমদ	১৪৮
তাজ খান কার্‌রানী	১৪৯
তাজমহল	১৫০
তাজনীস	১৫১
তাজবীদ	১৫৩
তাজাম্মুল হোসাইন খান	১৫৪
তাজীক	১৫৬
তাজীকী	১৫৭
তাজু'দ-দাওলা (দ্র. তুতুশ)	১৫৭
তাজুদ-দীন (দ্র. সুবকী)	১৫৭

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
তাজুদ-দীন আরস্‌লান খান সান্‌জার-ই চিশ্‌তী	১৫৭
তাজু'দ-দীন ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আদ-দামীরী	১৫৭
তাজু'দ্-দীন ইব্‌ন যাকারিয়্যা	১৫৮
তাজু'দ-দীন কুরায়শী	১৫৯
তাজুল ইসলাম, মাওলানা	১৬০
তাজু'ল-মুলূক (দ্র. বূরী)	১৬২
তাজূর নজীবাবাদী	১৬২
তাড়াশ	১৬২
তাত	১৬৩
তাতার	১৬৩
তাঁতীপাড়া মসজিদ	১৬৫
তা'তীল	১৬৫
তাদবীর	১৬৫
তাদলা	১৬৬
তাদ্‌লীস	১৬৮
তাদাল্লীস, তাদেল্লীস	১৬৯
তান্‌গা	১৭০
তান্‌জিয়ার	১৭০
তান্‌জীমাত	১৭৩
তান্‌তা	১৭৬
তান্‌তাবী	১৭৭
তানতাবী, শায়খ	১৭৮
তানযীল (দ্র, ওহী)	১৭৯
তানরী	১৭৯
তান্‌সেন কলাওন্‌ত (গায়ক)	১৮১
আত-তানাবুতী	১৮২
তানাস (দ্র. তেনেস)	১৮২
তান্‌াসী	১৮২
তানাসুখ	১৮৩
তানূখ	১৮৪
আত-তানূখী	১৮৮
তানোর	১৮৯
তাফ্‌তাহ	১৮৯
আত-তাফ্‌তাযানী	১৯০
তাফ্‌দীন	১৯৩
আত-তাফ্‌ফ	১৯৩
তাফবীদ	১৯৩
তাফ্‌সীর	১৯৩
তাফ্‌সীর (২)	১৯৩
তাফীলাল্‌ত	২২৪
তাব্‌রীয	২২৪
আত-তাবরীযী (দ্র. মুহাম্মাদ হুসায়ন ইব্‌ন খালাফ)	২৩৮
আত-তাবরীযী	২৩৮
আত-তাব্‌রীযী	২৩৯
তাব্‌ল	২৪০
তাবলখানা	২৪৩
তাবাকাত	২৪৮
তাবারকা	২৫০
তাবারিস্তান	২৫১
আত-তাবারী	২৫২
আত-তাবারী (ইবন জারীর)	২৫৩
তাবারিয়্যা	২৫৫
তাবালা	২৫৬
তাবাশীর	২৫৮
তাবাস	২৫৮
তাবিউন	২৫৯
তা'বীয	২৬০
তাবীর (দ্র. রু'য়া)	২৬০
তাবীল	২৬০
তাবীল	২৬১
অবীলা	২৬১
তাবীলা (দ্র. লারিন নিবন্ধ)	২৬২
আত-তাবুযাবী (দ্র. মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল)	২৬২
তাবূক	২৬২
তাবূক যুদ্ধ [দ্র. হযরত মুহাম্মাদ (স)]	২৬২
তাবূর	২৬২
তামগ্রত	২৬২
আত-তামগ্রতী	২৬৩
তামতাম	২৬৩
তাম্‌মাম ইবন নুজায়হ	২৬৩
তামাতু' (দ্র. ইহরাম, মুতা')	২৬৪
তামীম (রা)	২৬৪
তামীম ইব্‌ন উসায়দ (রা)	২৬৪
তামীম ইব্‌ন জুরাশা আছ-ছাকাফী (রা)	২৬৪
তামীম ইব্‌ন তারাফা (র)	২৬৪
তামীম ইব্‌ন মুর্‌র	২৬৫
তামীম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুমগাজ	২৬৭
তামীম ইব্‌ন যায়দ আল-আনসারী (রা)	২৬৭
তামীম ইব্‌ন য়াআর আল-আনসারী (রা)	২৬৭
তামীম ইব্‌ন য়াযীদ (রা)	২৬৭
তামীম ইব্‌ন রাবী'আ (রা)	২৬৮
তামীম ইব্‌ন সালমা (রা)	২৬৮
তামীম ইব্‌ন সালামা	২৬৮
তামীম ইব্‌ন হাজার আল-আসলামী	২৬৮
তামীম ইব্‌ন হায্‌লাম (র)	২৬৯
তামীম ইব্‌ন হারিছ (রা)	২৬৯
তামীম ইব্‌নুল ম'ইয্য	২৬৯
তামীম ইব্‌নু'ল-মু'ইয্য	২৭০
তামীম ইবনু'ল-মুনতাসির (রা)	২৭০
তামীম আল-গানামী (রা)	২৭০

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
তামীম আদ-দারী (রা)	২৭১
তাযকিরা	২৭৪
তাযবীজ (দ্র. নিকাহ)	২৭৫
তাযা	২৭৫
তা'যিয়াহ	২৭৬
তা'যীর	২৮২
তায়ম ইব্ন মুর্‌রা	২৮৩
তায়মা	২৮৩
তায়মাল্লাহ ইবন ছা'লাবা	২৮৪
তায়াম্মুম	২৮৪
আত-তায়ালিসী	২৮৫
তায়্যি'	২৮৬
তায়্যিব, কারী মুহাম্মাদ	২৮৭
আত-তায়্যিব আদ-দারী	২৮৭
তায়্যিবা (দ্র. মদীনা)	২৮৮
তারকীব বান্দ	২৮৮
তারজুমান	২৮৮
তারজুমান	২৮৯
তারতুস	২৮৯
তারবিয়া	২৯১
তার্‌রাগোনা	২৯২
তারসূস	২৯২
তারা মসজিদ	২৯৩
তারাইল	২৯৪
তারাগঞ্জ	২৯৪
তারান্‌চি	২৯৫
তারাফা	২৯৬
তারাব (দ্র. মুসীকী)	২৯৬
তারাবীহ	২৯৭
তারাবুলুস	৩০১
তারায	৩০২
আত-তারাসূসী	৩০৩
তারি	৩০৩
আত-তারিক (সূরা)	৩০৩
তারিক ইব্ন আব্‌দির-রহমান (রা)	৩০৪
তা'রিক ইব্ন আব্‌দিল্লাহ (রা)	৩০৪
তারিক ইব্ন 'আমর (রা)	৩০৫
তারিক ইব্ন আশ্‌য়াম ইব্ন মাস'ঊদ (রা)	৩০৫
তারিক ইব্ন 'উবায়দ ইব্ন মাস্‌'ঊদ (রা)	৩০৫
তারিক ইব্ন যিয়াদ	৩০৫
তারিক ইব্ন শিহাব ইব্ন 'আবদি শাম্‌স (রা)	৩০৭
তারিক ইব্ন সুওয়ায়দ (রা)	৩০৭
তারিফা	৩০৭
তারিম	৩০৮
তারীকা	৩০৮

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
তা'রীখ	৩১৫
তা'রীখ (২য় নিবন্ধ)	৩১৬
তা'রীখ (৩য় নিবন্ধ)	৩২০
তারীখ-ই জাঁহা কোশা	৩৩৭
তারীখ-ই বাংলা	৩৩৭
তা'রীখুত-তাবারী	৩৩৭
তারীফ	৩৩৭
তা'রীফ	৩৩৭
তারীম	৩৩৮
তারীম	৩৩৯
তারূদান্‌ত	৩৪০
তারোম	৩৪০
তাল্‌ক ইব্ন 'আলী (রা)	৩৪৪
তাল্‌ক ইব্ন গান্‌নাম (র)	৩৪৪
তাল্‌ক ইব্ন য়াযীদ (রা)	৩৪৪
তাল্‌ক ইব্ন হাবীব (র)	৩৪৫
তালখীস	৩৪৬
তালখীসজি	৩৪৬
তালবিয়া	৩৪৬
তাল্‌হা ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক (র)	৩৪৬
তাল্‌হা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন খাল্‌ফ (র)	৩৪৭
তাল্‌হা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আওফ (র)	৩৪৭
তাল্‌হা ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'উছমান (র)	৩৪৭
তাল্‌হা ইব্ন 'আবদিল্লাহ (র)	৩৪৮
তাল্‌হা ইব্ন আবী সা'ঈদ (র)	৩৪৮
তাল্‌হা ইব্ন 'আম্‌র (রা)	৩৪৯
তাল্‌হা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ (রা)	৩৪৯
তাল্‌হা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন কুরায়য (র)	৩৫১
তাল্‌হা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ আত-তায়মী (রা)	৩৫১
তাল্‌হা ইব্ন খিরাশ (র)	৩৫২
তাল্‌হা ইব্ন নাফি' (র)	৩৫২
তাল্‌হা ইব্ন নুদায়লা (রা)	৩৫২
তাল্‌হা ইব্ন মালিক (রা)	৩৫৩
তাল্‌হা ইব্ন মুসার্‌রিফ	২৫৩
তাল্‌হা ইব্ন য়াহ্‌য়া	৩৫৩
তাল্‌হা ইব্ন য়াহয়া	৩৫৩
তাল্‌হা ইব্ন রুকানা (রা)	৩৫৪
তাল্‌হা ইবনুল-বারাআ (রা)	৩৫৪
তাল্‌হা আয-যুরাকী (রা)	৩৫৫
তাল্‌হা আস-সুলামী (রা)	৩৫৫
তালা	৩৫৫
তালা'ই'	৩৫৬
তালাক	৩৫৭
আত্‌-তালাক (সূরা)	৩৭২
তালাকান	৩৭৩

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
তালাবেরাহ্	৩৭৩
তালিকোটের যুদ্ধ	৩৭৩
তালিব আমুলী	৩৭৩
আত-তালিব ইব্ন ছা'লাবা (রা)	৩৭৪
(কবি) তালিম হোসেন	৩৭৫
তালীশ	৩৭৭
তালিসমান (দ্র. জামাইল)	৩৭৭
তালীক (দ্র. 'আরাবিয়্যা)	৩৭৭
তালূত	৩৭৭
তাল্ল (তেল্‌ল)	৩৭৯
তাল্ল আল-'আমারনা (দ্র. তেল্ল আল-'আমারনা)	৩৮০
তাল্ল আল-কাবীর (দ্র. তেল্‌লু'ল-কাবীর)	৩৮০
তাল্ল আল-বাশীর (দ্র. তেলল বাশীর)	৩৮০
তাশকন্দ	৩৮০
তাশকোপ্রযাদে	৩৮২
তাশ্‌বীহ্	৩৮৩
তাশরীক	৩৮৬
তাশরীহ্	৩৮৬
তাশরী (তেশরীন)	৩৮৮
তাশাহ্হুদ	৩৮৮
তাসকীন মীর হুসায়ন	৩৮৮
তাসদীক ওয়া তাসাওউর	৩৮৮
তাসনীম	৩৮৯
তাস্‌বীর	৩৮৯
তাসবীহ্	৩৯৫
তাস্‌ম	৩৯৫
তাসমিয়া (দ্র. বাসমালা)	৩৯৬
আত-তাসয়ীর	৩৯৬
তাসাওউফ	৩৯৭
তাসীর মুহাম্মাদ দীন	৪০৮
তাসূজ	৪০৮
তাহ্‌মান ইব্ন 'আম্‌র আল-কিলাবী	৪০৯
তাহ্‌মাস্‌প (১ম)	৪১০
তাহ্‌মাস্‌প (২য়)	৪১০
আত্-তাহ্‌লীল	৪১১
তাহ্‌সীন	৪১৩
তাহসীল	৪১৪
তাহা (সূরা)	৪১৫
তাহা হুসায়ন, ডক্‌টর	৪১৫
তাহাজ্জুদ	৪১৮
তাহাবী (র)	৪২১
তাহারত	৪২৩
তাহারাত	৪২৪
(বাবা) তাহির	৪২৮
তাহির ইব্ন 'আবদিল্লাহ	৪৩২
তাহির ইব্ন আবী হালা	৪৩২
তাহির ইব্ন আহমাদ	৪৩২
তাহির ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম	৪৩২
তাহির ইবনুল্-হুসায়ন	৪৩৩
তাহির 'উমার (দ্র. জাহীর 'উমার)	৪৩৩
তাহির ওয়াহীদ	৪৩৩
(শায়খ) তাহির আল-জাযা'ইরী	৪৩৪
তাহির পাটানী, মুহাম্মাদ	৪৩৫
তাহিরপুর	৪৩৬
তাহিরী বংশ	৪৩৮
তাহির সায়ফুদ্-দীন, সায়্যিদানা, ডক্‌টর	৪৪৪
তিউনিস	৪৪৪
তিউনিসিয়া	৪৫৩
তিকরীত (দ্র. তাকরীত)	৪৮৩
তিজানিয়্যা	৪৮৩
আত্-তিজানী	৪৮৪
তিজারা	৪৮৫
তিতুমীর, সায়্যিদ মীর নিছার 'আলী	৪৯৩
আত-তিন্‌নীন	৪৯৪
তিফলিস	৪৯৪
তিফলী (দ্র. আহমাদ চেলেবী)	৫১০
আত-তিফাশী	৫১০
তিব্‌ব	৫১০
তিব্বত	৫১২
তিব্‌বু (দ্র. তুব্‌বু)	৫১৪
তিবরীয (দ্র. তাবরীয)	৫১৪
তিমবাক্‌তু	৫১৪
তিমসাহ্	৫১৬
তিয়ূল	৫১৬
তিরমিয	৫১৮
আত্-তিরমিযী	৫২০
আত-তিরমিযী আবূ ঈসা (র)	৫২০
তিরমিযী, সায়্যিদ বুরহানুদ্-দীন	৫২২
তিরহালা	৫২২
তিরায	৫২৩
তিরায	৫২৬
আত্-তিরিম্মাহ ইব্নুল-হাকীম	৫২৯
তিলসাম	৫২৯
তিলিমসানী	৫৩০
তিলিসাম (দ্র. তিলসাম)	৫৩১
তিশাদ (দ্র. শাদ)	৫৩১
তিহফা আল-গিফারী (রা)	৫৩১
তিহ্‌য়া ইব্ন আবী যুহায়র (রা)	৫৩২
তিহামা	৫৩২
তীত	৫৩৪

প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
তীততাবীন	৫৩৫
আত-তীন (সূরা)	৫৩৬
তীমার	৫৩৭
তীমূর তাশ	৫৪২
তীমূর তাশ	৫৪৩
তীমূর	৫৪৫
তীমূর	৫৪৮
তীমূরীগণ বা তায়মূরীগণ	৫৫৯
তীরানা	৫৬২
তীরে (দ্র. তাইরে)	৫৬২
তীরে বোলী	৫৬২
তীহ-তীহ	৫৬৩
তুওয়ায়শ আবূ 'আবদিল-মুনইম	৫৬৪
তুকমাক খা	৫৬৪
তুগতেগীন	৫৬৪
তুগ্‌রা'	৫৬৫
তুগরা'	৫৬৬
আত্-তুগরাঈ	৫৭১
তুগরিল (১ম)	৫৭২
তুগরিল (২য়)	৫৭৩
তুগরিল বেগ	৫৭৩
তুগরিল শাহ ইব্ন কিলিজ আরসলান	৫৭৫
তুগলুক	৫৭৫
তুগা তীমূর	৫৭৬
তুগরিল তুগান খান	৫৭৮
তুজীব (বানূ)	৫৭৮
তুতুশ ইব্ন আল্প আরসলান	৫৭৯
তুদেলা	৫৮০
তুনবূর	৫৮০
তুফায়ল ইব্ন 'আমর আদ-দাওসী (রা)	৫৮৩
তুফায়ল ইব্ন উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা)	৫৮৩
তুফায়ল ইব্ন মালিক (রা)	৫৮৩
তুফায়ল ইব্ন যায়দ (রা)	৫৮৩
তুফায়ল ইব্ন সাখ্‌বারা (রা)	৫৮৩
তুফায়ল ইব্নুন-নু'মান (রা)	৫৮৪
তুফায়ল ইব্ন'ল-হারিছ (রা)	৫৮৪
তুফায়লী	৫৮৫
তুবার 'ইব্ন 'আমির (রা)	৫৮৫
তুমান, তূমান	৫৮৫
(শাহ) তুর্‌কান শাহীদ	৫৮৬
আত-তুরতূশী	৫৮৭
তুরফান	৫৮৭
তুরবাত-ই শায়খ জাম	৫৮৯
তুরবাত-ই হায়দারী (দ্র. যাওয়া)	৫৮৯
তুরশীয	৫৮৯
তুরসুন ফাকীহ্	৫৮৯
তুরসুন বেগ	৫৯০
তুরাখান বেগ	৫৯০
তুরাব 'আলী কালান্দর শাহ	৫৯২
তুর্ক	৫৯২
তুর্কমান চায়	৬৬৬
তুর্কিস্তান	৬৬৭
তুর্কোমান	৬৬৮
আত-তুলায়তিলী	৬৭২
তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র আল-কুরাশী (রা)	৬৭২
তুলায়ব ইব্ন খুওয়ায়লিদ	৬৭৩
তুলুম্‌বাজী	৬৭৪
আত-তুস্‌তারী	৬৭৭
তূগ	৬৭৭
তূতী নামে (দ্র. নাখশাবী)	৬৭৭
আত-তূনিসী	৬৭৭
তূপাল 'উছমান পাশা	৬৮০
তূফান (দ্র. নূহ (আ)	৬৮১
তূবূ	৬৮১
তূমান বায় ২য়	৬৮২
তূযাক-ই জাহাঙ্গীরী	৬৮৩
তূযাক-ই বাবুরী	৬৮৩
আত-তূর	৬৮৩
আত-তূর (সূরা)	৬৮৫
তূর 'আবদীন	৬৮৬
তূরগায়	৬৮৮
তূরান	৬৮৮
তূরান	৬৯৫
তূরান শাহ্ ইব্ন আয়্যূব	৬৯৬
তূলূনী বংশ	৬৯৭